ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

শ্রীমদ্ভগদ্গীতা

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on Bhagbat Gita
before the students of RKMVERI, Belur Math

(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

আচার্য – স্বামী সমর্পণানন্দ

অনুলিখন ও সম্পাদনা – অমিত রায় চৌধুরী

সূচীপত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on Srimad Bhagavat Gita before the students of RKMVERI - Deemed University, Belur Math (Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

ভূমিকা

(গীতা কি ও কেন, গীতাকে নিয়ে যে সমালোচনা করা হয়, গীতাকে কেন মোক্ষশাস্ত্র ও সমন্বয় বলা হয়, বর্তমান কালে গীতার প্রাসঙ্গিকতা কতটা)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করে আমরা গীতা শাস্ত্রের আলোচনা শুরু করছি। বিষয়বস্তুর নিরিখে গীতা একটি দীর্ঘ শাস্ত্র এবং সাথে সাথে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমূহের দিক থেকে খুব গভীর। যত আমরা আলোচনার ভিতর প্রবেশ করতে থাকব, তত আমরা বুঝতে পারব গীতা কত গভীর শাস্ত্র, এবং এই গভীরতার জন্য গীতার অর্থ ও বক্তব্য অনুধাবন করা ও ধারণা করা কত কঠিন। প্রথমে গীতার ভূমিকা, অর্থাৎ গীতাশাস্ত্র কি, এর উপর আমাদের আলোচনা করে নিতে হবে।

যাঁরা হিন্দু এবং ভারতবর্ষে যাঁরা বড় হয়েছেন, তাঁরা সবাই গীতার নাম অবশ্যই শুনে থাকবেন, গীতার মূল ভূমিকাটাও তাঁদের জানা আছে। কারণ, বেদের সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ভারতে যত আধ্যাত্মিক জ্ঞান, চিন্তাধারা ও বুদ্ধির উন্মেষ হয়েছে, সমাজে যা কিছু আচার, আচরণ, প্রথা প্রচলিত আছে, যার উপর মূল ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে, এর সব কিছুই শ্রীমদ্ভগবত গীতাতে সমণ্বিত করা হয়েছে।

মহাভারতে গীতা শুরু হওয়ার আগে বিরাট একটা লম্বা কাহিনী বা ইতিহাস আছে; কৌরব আর পাণ্ডব এরা সবাই ভাই, এদের মধ্যে নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রথম থেকেই বিবাদ চলছিল। তারপর একটা সময় পাণ্ডবদের বারো বছরের জন্য বনবাসে যেতে হল, তার সাথে এক বছর অজ্ঞাতবাস। অজ্ঞাতবাসের শর্ত হল, এই ত্রয়োদশ বছরের মধ্যে কৌরবরা পাণ্ডবদের যে কোন একজনকে দেখে নিলে তাদের সবাইকে আবার বারো বছরের জন্য বনবাসে চলে যেতে হবে। অজ্ঞাতবাসের এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর কৌরবদের কাছে পাণ্ডবরা তাদের রাজ্য ফেরত চাইল। দুর্যোধন রাজ্য ফেরত দিতে চাইল না। এই কাহিনী আমাদের সবারই জানা। কৌরবদের বক্তব্য হল, আমরাই ঠিক, অন্য দিকে পাণ্ডবরা বলছে তারা ঠিক। কৌরবদের দাবী হল অজ্ঞাত বাসের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই অর্জুন আমাদের সামনে এসে গিয়েছিল, অর্জুনকে আমরা দেখে ফেলেছি। পাণ্ডবদের বক্তব্য হল, আমরা শর্ত পূর্ণ হওয়ার পরই সামনে এসেছি। দু-পক্ষের এই বিবাদের কোন মীমাংসা করা গেল না। ফলে যুদ্ধ অবশ্যাম্ভাবি। তারও আগে সমস্ত রকম সন্ধি প্রস্তাব, কথাবার্তা, আলোচনা সব বিফল। কোন ভাবেই মীমাংসাতে আসা গেল না। যুদ্ধ ছাড়া আর কোন রাস্থা নেই। যার পরিণতি –সবাই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিল। বর্তমান কালেও সব রকম সন্ধিবার্তা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর সবাই যখন বুঝে যায়, এবার আর যুদ্ধকে ঠেকানো যাবে না, যুদ্ধ হবেই; তখন দু-পক্ষই জোর প্রস্তুতি শুরু করে দেয়।

তখনকার দিনে এই ধরণের যুদ্ধকে বলা হত ধর্মযুদ্ধ। ধর্মযুদ্ধ মানে, দুই পক্ষ একটা সীমা বেঁধে দিতেন, এই এই পদ্ধতি মেনে, এই এই নিয়ম মেনে যুদ্ধ হবে। কে কার সাথে লড়াই করবে, কোন কোন পরিস্থিতিতে লড়াই করা যাবে না, ইত্যাদি। কিন্তু যতই নিয়মে বেঁধে দেওয়া হোক না কেন, উত্তেজনার মুহূর্তে সবাইকে নিয়মের গণ্ডিকে লঙ্ঘন করে ফেলতে দেখা গেছে। কুরুক্ষেত্রের এই

যুদ্ধে অনেকেই অনেকবার নিয়মের গণ্ডিকে লঙ্ঘন করেছেন। কিন্তু এনাদের একটা বৈশিষ্ট্য হল, প্রতিদিনের লড়াইয়ের পর আবার সবাই মর্যাদা রেখার মধ্যে নিজেদের ঢুকিয়ে দিতেন। মহাভারতে এই ধরণের প্রচুর দৃষ্টান্ত আমরা কাহিনী রূপে পাই।

তখনকার সময় এই ধরণের কোন ধর্মযুদ্ধ হওয়ার আগে বিভিন্ন রাজার কাছে আমন্ত্রণ পাঠানো হত। আমি এই এই কারণে অমুকের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে যাচ্ছি, আপনি কি আমার পক্ষে যোগদান করবেন? যাঁরা মনে করতেন ইনি ঠিক, তখন তিনি তাঁর পক্ষে যোগ দিয়ে যুদ্ধে অংশ নিতেন। আবার অনেক সময় দেখা যেত, যিনি আগে এসে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তিনি কোন বিচার না করে তাঁর পক্ষেই যোগ দিতেন। মহাভারতে একটা ঘটনা আছে, যা খুব বেশী প্রচলিত নয়, এক রাজা ছিলেন, তাঁর নিজস্ব হাতির এক বিরাট বাহিনী ছিল। তিনি যুধিষ্ঠিরকে গিয়ে বললেন, 'তুমি যদি কৌরবদের ভয় পেয়ে থাক তবে আমি তোমার সঙ্গে আছি, আমি একাই কৌরবদের শেষ করে দেব'। যুধিষ্ঠির হাত জোড় করে বলে দিলেন, 'আমরা ভয় পাইনি, আর এটা ধর্মযুদ্ধ, আমরা নিজেরাই লড়াই করে নেব'। রাজা সেখান থেকে দুর্যোধনের কাছেও যায় এবং দুর্যোধনকে একই কথা বলে। দুর্যোধনও হাতজোড় করে সেই রাজাকে না করে দিয়ে বলছে, 'আমরা ধর্মযুদ্ধ করছি, আপনি যদি মনে করেন আমরা ঠিক, তাহলে আমাদের সাথে থাকুন, তা নাহলে আপনি আসতে পারেন'। শেষ পর্যন্ত কোন পক্ষই তাকে নিতে রাজী না হওয়াতে সেই রাজাকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করেই ফেরত চলে আসতে হয়েছিল। আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, মহাভারতের যুদ্ধ মানে ভালো লোকেদের সাথে দুষ্ট লোকেদের লড়াই, কিন্তু তা না, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছিল ধর্মযুদ্ধ।

অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষেরই হিতৈষী, তিনি বলে দিলেন আমি যুদ্ধে অংশ নেব না। শ্রীকৃষ্ণের দাদা বলরাম যুদ্ধ এড়াবার জন্য এলাকা ছেড়েই বেরিয়ে গেলেন তীর্থ ভ্রমণে। আসলে তিনি নিজের চোখে এই বিনাশ দেখতে চাইলেন না। অর্জুন অনেক অনুরোধ করাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথের সারথি হতে রাজী হলেন, কিন্তু পরিষ্কার বলে দিলেন তিনি এই যুদ্ধে কোন অস্ত্র ধারণ করবেন না, তার মানেই তিনি কোন যুদ্ধ করবেন না।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের মুহূর্তে অর্জুন হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, আমি একবার দেখে নিতে চাই ঠিক কাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। কুরুক্ষেত্রের বিরাট ময়দানের দু প্রান্তে দু পক্ষের রথী মহারথী, সৈন্যরা ব্যূহ রচনা করে সমবেত হয়েছে। অর্জুন রথ নিয়ে নিজেদের ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে এলেন দেখতে কাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। অর্জুন কি দেখলেন? গীতার প্রথম অধ্যায়ে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অর্জুন সব দেখার পর হতাশ হয়ে গেলেন।

হতাশার ভাব আমরা সবাই আমাদের জীবনেও কোন না কোন সময় দেখতে পাই। সারা জীবন ধরে একটা জিনিসের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি, কিন্তু আসল মুহুর্তটা যখন আসে, তখন আমরা কেমন যেন পিছিয়ে যেতে চাই, কেমন একটা অজ্ঞাত ভয় আমাদের গ্রাস করে নেয়। সারা বছর মন দিয়ে পড়াশোনা করে গেছে, কিন্তু পরীক্ষার ঠিক আগে, এমনকি যারা প্রথম সারির ছাত্র, তারাও কেমন একটা ভয় পেয়ে যায়। আমাদের ক্লাশে যারা ফার্স্ট সেকেণ্ড হত, ওরা যমজ ভাই ছিল। প্রত্যেক পরীক্ষার পর হল থেকে বেরিয়ে এসে কাঁদতে শুরু করত। কাঁদতে কাঁদতে বলত, 'আমার তো ডিস্টিংশানটাও হবে না'। ওকে আমরা পরীক্ষার আগে কাঁদতে দেখতাম, পরীক্ষার পরে কাঁদতে দেখাতাম। বোর্ডের রেজাল্ট বেরোবার পর দেখা গেল, এক ভাই সেকেণ্ড হয়েছে, আরেক ভাই ফিফথ্ হয়েছে। তখনকার দিনে CBSEতে ফিফথ্ হওয়াটা সাংঘাতিক ব্যপার ছিল। বিয়ের ক্ষেত্রেও ঠিক এই ব্যাপারটা হয়। অনেক দিন ধরে বিয়ের প্রস্তুতি চলছে, শেষ মুহুর্তে হয় ছেলে পালিয়ে যায়, নয়তো মেয়ে পালিয়ে যায়। এগুলো ঠিক না, খুব embarrassing, কিন্তু এই ধরণের ঘটনা হয়। এই ভীতি দুই প্রকারের হতে পারে। যেমন সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে, স্বপ্নেও যদি কোন

সন্ন্যাসীর নারীর রূপ দর্শন হয় বা স্বপ্নে যদি দেখে তাঁর বিয়ে হতে যাচ্ছে, স্বপ্নের মধ্যেই আঁতকে ওঠেন। কারণ স্বপ্নে তাঁর জীবনদর্শন একেবারেই বিপরীত হয়ে যাচ্ছে। অন্য দিকে যারা বৈবাহিক জীবনদর্শনে আছে, তারা হয়ত এটাই সারা জীবন চেয়ে এসেছে, কিন্তু আসল সময় পালিয়ে যায়।

এই জায়গায় অর্জুনের ব্যবহার দ্বিতীয় ধরণের, অর্জুন প্রথম ধরণের নন। কোন ব্রাহ্মণ ছেলেকে যদি অর্জুনের জায়গায় দাঁড় করিয়ে বলা হয়, তুমি যুদ্ধ কর, সে অবশ্যই বলতে পারে ‘আমি যুদ্ধ করব না’। আমাদের কারুর হাতে যদি বন্দুক ধরিয়ে বলা হয়, একে গুলি করে খুন কর, আমরা পারব না। অর্জুন ব্রাহ্মণ নন, অর্জুন হলেন ক্ষত্রিয়। গীতায় পরে বর্ণনা আসবে, যেখানে বলা হবে যে, যুদ্ধ করাটা অর্জুনের ধর্ম, যুদ্ধ করার জন্য সারাটা জীবন অর্জুন প্রস্তুতি নিয়ে আছেন। তাছাড়া অর্জুন কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে আসার অনেক আগে থেকেই বলে আসছিলেন, আমি এই যুদ্ধ করব। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের মুহূর্তে রণভূমির চেহারা দেখে অর্জুনের মধ্যে স্নায়বিক দৌর্বল্য এসে গেছে। যারা প্রথম বার খুন করতে যায়, তাদের হাত পা কেঁপে যায়, মানুষ খুন করা অত সহজ নয়। সেইজন্য সে চেষ্টা করে ভিতর থেকে সেই সময় প্রচণ্ড রাগ নিয়ে আসার, কিংবা মদ খেয়ে নেয় যাতে মস্তিষ্কটা নিস্তেজ হয়ে যায়। অর্জুনের কাণ্ড দেখে শ্রীকৃষ্ণ অবাক, যে কোন লোকই অবাক হয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ একবারও অর্জুনকে বলতে গেলেন না যে, তুমি যুদ্ধ কর বা তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে। পরিবর্তে অর্জুনের সামনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একটা জীবনদর্শন রেখে দিলেন।

জীবনে চলার পথে দেখা যায়, দুটো জিনিস আমাদের সামনে আসে – একটা হল জীবন, অপরটা হল জীবনদর্শন। বেশীর ভাগ মানুষ জীবনটাকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গতানুগতিক ভাবে একটা ছকে বাঁধা জীবন চালিয়ে যায়। স্কুলে কেন পড়তে যাচ্ছ? বাবা-মা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে তাই যাচ্ছি। পড়াশোনা কেন করছ? আমাকে পড়াশোনা করতে হবে। চাকরি কেন করছ? খেতে হবে, তাই করছি। বিয়ে কেন করলে? বাবা-মা বলেছিলেন। সব ক্ষেত্রে এভাবেই সবাই একটা খাপছাড়া উত্তর দিতে অভ্যস্ত। কিন্তু একবার যদি জিজ্ঞেস করা হয়, কেন? এই ‘কেন’র কোন উত্তর নেই। বিশ্বে যত ‘Selfhelp’ বই লিখছে, বিশেষ করে আমেরিকা, যারা সবাইকে উপদেশ দিয়ে বেড়ায় কিন্তু নিজের ঘর সামলাতে পারে না; সবাই লিখে যাচ্ছে, how to make money, how to make friend, how to be a happy father or mother, how to breath। কিন্তু কেউ জানতে চাইছে না, ‘কেন’? এটাই বিশ্বের সব থেকে বড় সমস্যা।

স্বামীজীর সময় আমেরিকায় রবার্ট ইঙ্গারসোল একজন খুব নামকরা পণ্ডিত ও বক্তা ছিলেন। স্বামীজীর সাথে ইঙ্গারসোলের একবার দেখা হয়। তখন তাঁর অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল। ইঙ্গারসোল স্বামীজীকে বলছেন, ‘আমার সামনে এই কমলালেবু আছে, এই কমলালেবুর ব্যাপারে আমি নিশ্চিত এবং আমি জানি এর রস আমাকে খেতে হবে, এটাই আমার কর্তব্য’। স্বামীজী বলছেন, ‘আমি যেহেতু ভারতবর্ষের, তাই আমার ফলটা আলাদা, কমলালেবুর জায়গায় আমার জন্য আম। আমিও আম খেতে চাই, তবে আমি জানি আমার তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। মৃত্যুই আমার শেষ নয়’। সেখানে স্বামীজী বলছেন, ‘We look for ‘why’ and we leave the ‘how’ for scientists’। স্বামীজী আসলে বলতে চাইছেন, ‘how’ জিনিসটা হল বালবুদ্ধি সম্পন্নদের জন্য। বাচ্চাদের প্রথমে দেখিয়ে দিতে হয় দাঁত কিভাবে মাজতে হয়, বড় হওয়ার পর বলা হয় দাঁত কেন মাজতে হয়। How বাচ্চা বয়সে শেখানো হয়, Whyটা একটু বেশী বয়সে শেখানো হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে how শেখাতে যাচ্ছেন না, তিনি why শেখাচ্ছেন।

অর্জুনের সামনে ভগবান জীবনদর্শন রেখে দিলেন –এই দেখো জীবনদর্শন। তিনটি জিনিস –প্রথম হল তুমি কে? দ্বিতীয় জগৎ কি আর তৃতীয় পরমসত্তা কি? এই হল জীবনদর্শনের তিনটি সত্য। দুঃখ আমাদের সবারই হয়ে থাকে, যারা বেশী অনুভূতিপ্রবণ তাদের দুঃখ বেশী হয়। কিন্তু

আমরা একবারও কেউ ভেবে দেখতে যাই না, আমি কে, জগৎ কি। একবারও কেউ ভেবে দেখি না, মৃত্যু কি, মৃত্যুর পর আমি কোথায় যাব? যখনই জীবনে দুঃখ আসে তখন যদি আমরা কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে ভাবি, আমি কে, জগৎ কি আর শেষ কি; মৃত্যুতেই যদি সব শেষ হয়ে যায়, তাহলে তো কয়েকটা বছরের ব্যাপার, তার জন্য কিসের এত কান্নাকাটি! আর আমি যদি নিজেকে শুদ্ধ আত্মা ভাবি, আমার জন্ম নেই মৃত্যু নেই, তাহলে আর কিসের কান্নাকাটি। যেদিক থেকেই দেখা হোক না কেন, কান্নাকাটি করার কোন কারণ নেই। কিন্তু সবাই আমাদের ট্রেনিং দিয়ে যাচ্ছে, দুঃখ হলে কোথায় গিয়ে মদ খেতে হবে, কোথায় ড্যান্স বারে গিয়ে একটু হৈ হুল্লোড় করতে হবে। কিন্তু কেন কান্নাকাটি করতে নেই, এটা কেউ শেখায় না। কারণ যারা শেখাচ্ছে, তারা নিজেরাও জানে না কেন কাঁদতে নেই; *অন্ধেনৈব নিয়মানা যথান্ধাঃ*, অন্ধ অন্ধকে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই তিনটে জিনিসকে পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিলেন, তুমি কে, জগৎ কি আর শেষ সত্য কি।

যে কোন দর্শন, তা সে ঘোর জড়বাদী দর্শনই হোক বা বিজ্ঞান হোক বা অদ্বৈতবাদী দর্শনই হোক, সবাই ঘুরে ফিরে এই তিনটে জিনিসকেই ব্যাখ্যা করে – তুমি কে, জগৎ কি আর ঈশ্বর কি। সেখানে যারা ঘোর ভৌতিকবাদী বা জড়বাদী বা বিজ্ঞানী, তারা বলবে ঈশ্বর বলে কিছু নেই। তারা বলবে, জগৎটাই সত্য, এই জগতে তুমি কোন ভাবে জন্ম নিয়ে এসে গেছ। তাতেও কিছু আসে যায় না। ব্যাখ্যা তাকেও একটা দিতে হবে এবং সিদ্ধান্তও একটা দিতে হবে। সমস্ত দর্শনে এই তিনটে জিনিসের ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নেই।

আজকে এই মুহুর্তে দাঁড়িয়ে আমরা জানি না ভগবান অর্জুনকে ঠিক কি বলেছিলেন। যেমন যেমন আমাদের আলোচনা গীতার গভীরে প্রবেশ করতে থাকবে, তেমন তেমন আমরা জানতে পারব। ভগবান অর্জুনকে যা যা কথা বলেছিলেন সব কথাগুলোকে ব্যাসদেব সাতশটি শ্লোকের মধ্যে ছন্দোবদ্ধ ভাবে বেঁধে দিলেন। আমেরিকাতে ভারতের যিনি রাষ্ট্রদূত আছেন, তাঁকে ভারত সরকার বলে দিলেন এই ব্যাপারে আমাদের এই সিদ্ধান্ত। এরপর রাষ্ট্রদূত যখন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কাছে যাবেন, তখন তিনি ভারত সরকারের বক্তব্যটা তাঁকে গুছিয়ে বলে দিলেন। এই গুছিয়ে যেটা বলা হল, এটা হল ভারত সরকারের মত। সরকার থেকে তাঁকে হয়ত এত কথা বলা হয়নি, একটি কথাই হয়ত বলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রদূত সরকারের বক্তব্যকে নিজের মত করে গুছিয়ে বলে দিলেন। সেইজন্য যে কোন রাষ্ট্রদূতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আর সেই কারণে দূত হলেন অবধ্য। কারণ দূত যেটাই বলবেন, সেটা তাঁর কথা নয়, যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন ওটা তাঁর কথা। ঠিক তেমনি, গীতা কে রচনা করেছেন, এই ব্যাপারে যদি বলা হয়, তাহলে বলতে হবে গীতা ব্যাসদেবের রচনা, কিন্তু গীতার কথাগুলো সব ভগবানের। এটাই হিন্দুদের মত। শঙ্করাচার্যকে আমরা আচার্য বলে সম্বোধন করে থাকি। আচার্য তাঁর গীতার ভাষ্যে যখনই কিছু বলছেন, সেখানেও তিনি বলছেন, ভগবান এই রকম বললেন। আগেকার কিছু বই আছে, যেখানে গীতাকে উদ্ধৃত করে বলা হচ্ছে, ব্যাসদেব গীতায় এই রকম বলছেন। এখানে দুটোই নেওয়া হয়।

ব্যাসদেব আঠারোটি পর্বে মহাভারত রচনা করেন। যুদ্ধের শুরুতে কৌরবদের সেনাপতি ছিলেন ভীষ্ম, সেই থেকে ওই পর্বের নাম হল ভীষ্মপর্ব। মূল মহাভারতের ভীষ্মপর্বে আমরা পাই যে, যুদ্ধের দশম দিনে ভীষ্মের পতন হয়ে গেল। কাহিনীতে আমরা জানি সঞ্জয়কে ব্যাসদেব দিব্যদৃষ্টি দিয়েছিলেন। অনেকের ধারণা যে, সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বসে যুদ্ধের রানিং ধারাভাষ্য দিচ্ছিলেন। এই তথ্য মূল মহাভারতে কোথাও নেই, এটা একটা সম্পূর্ণ ভূল ধারণা। আসলে সঞ্জয়ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, এবং তিনি যুদ্ধভূমিতেই থাকতেন। দিব্যদৃষ্টিতে ব্যাসদেব সঞ্জয়কে এই ক্ষমতা দিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে যাবতীয় যা কিছু হচ্ছে সঞ্জয় শুনতে পারবে, জানতে পারবে। সঞ্জয় মাঝে মাঝে যুদ্ধভূমি থেকে বেরিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে চলে যেতেন খবর দিতে। দশম দিনে ভীষ্মের পতন হওয়ার

পর সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে খবর দিতে গেলেন। পিতামহ ভীষ্মের পতনের খবর শুনে ধৃতরাষ্ট্র খুব ভেঙে পড়লেন। 'ভীষ্মের তো ইচ্ছামৃত্যু ছিল, তিনি কি করে পড়ে গেলেন'? সঞ্জয় বললেন, 'অর্জুনের বাণে'। তখন ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বললেন, 'তুমি প্রথম দিন থেকে সব কিছু বিস্তারে বল'। সঞ্জয় হেডলাইনটা দিয়ে দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র এবারে বিস্তারে এই কদিনের যুদ্ধের বিবরণ জানতে চাইলেন। গীতার শুরু ঠিক এই জায়গা থেকে।

ধৃতরাষ্ট্র বলছেন, *ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ*। কুরুক্ষেত্রে যোদ্ধারা যখন সবাই যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত, তখন তারা সবাই কি করল? এরপর সঞ্জয় বলতে শুরু করেছেন। এই জিনিসটাকে নিয়ে অনেকে আবার বলেন এই অংশটা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ পরে সংযোজন করা হয়েছে। কিন্তু এটাও একটা ভুল ধারণা। আলোচনা করতে করতে এই জিনিসটাও আমরা দেখব। যাই হোক, এখান থেকে শুরু হয়ে শেষে গীতা সাতশটি শ্লোকে দাঁড়িয়ে গেল। মহাভারতের ভীষ্মপর্বের এই সাতশটি শ্লোক ভারতের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের স্পন্দন রূপে গীতা দাঁড়িয়ে গেল। ভারতের যে দর্শন, ভারতের যে আধ্যাত্মিক ভাব, এর সমস্ত কিছুর রূপরেখা গীতার সাতশ শ্লোকের মধ্যে সঙ্কলিত করে রাখা হয়েছে।

ভারতের জন্য, শুধু ভারতের জন্যই না, সমগ্র মানবজাতির সত্যিকারের যা কিছু শুভপ্রদানকারী, যা কিছু মঙ্গলদায়ক হতে পারে, তা হল উপনিষদ আর গীতা। বর্তমান ভারতের যে ধর্ম, এই ধর্মের মূল বেদান্তের উপর আধারিত। বেদান্ত দর্শনের মূল শাস্ত্র এই তিনটি–গীতা, উপনিষদ আর ব্রহ্মসূত্র। এই তিনটি গ্রন্থকে আধার করে বেদান্ত দর্শন। ভারতবর্ষ বা ভারতবর্ষের বাইরে যাদের আমরা হিন্দু বলি, সবাই তাঁরা বেদান্তী। হিন্দু বলতে সবাই বেদান্তী। যাঁদের আমরা শৈব, শাক্ত বলছি, এনারাও কোন না কোন ভাবে বেদান্তের সাথে যুক্ত হয়ে আছেন। আর বেদান্তের সব কথা মূলতঃ আসে গীতা থেকে। যদিও যুদ্ধভূমিতে গীতার কথা বলা হয়েছে, যাঁরা নৈষ্ঠিক হিন্দু, তাঁরা প্রত্যহ গীতা পাঠ করেন, কেউ হয়ত পুরোটা পাঠ করেন, পুরোটা না করলে অন্ততঃ একটি অধ্যায় অবশ্যই নিত্যপাঠ করবেন। যে কোন হিন্দুর মৃত্যুর সময় গীতা গ্রন্থকে মুমূর্ষু রোগীর শিয়রে রাখা হয়, এবং শেষ বিদায় জানাবার সময় গীতা পাঠ করা হয়, গীতা গ্রন্থ দান করা হয়। কোথায় এক যুদ্ধের সময় ভগবান অর্জুনকে কি বললেন, সেই কথাগুলোকে ব্যাসদেব ছন্দোবদ্ধ করে সুন্দর ভাবে গুছিয়ে আমাদের জন্য রেখে দিয়ে গেলেন। আজও যখনই হিন্দু ধর্ম, হিন্দু দর্শনের উপর কোন কথা আসে, সব জায়গায় গীতাকে নিয়ে আসতেই হবে। এই সাতশটি শ্লোকের মধ্যে পুরো হিন্দু দর্শন, হিন্দু জীবনদর্শন, হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিকতা, সবটাই রাখা আছে। ফলে গীতা বোঝা খুব কঠিন। এই যে বলা হল, নিষ্ঠাবান হিন্দুরা প্রত্যহ গীতা অধ্যয়ন করেন, গীতা আবৃত্তি করেন, মৃত্যুর সময় গীতা আবৃত্তি করা হয়; কারণ গীতা হল মোক্ষশাস্ত্র। ঠাকুরও গীতাকে মোক্ষশাস্ত্র বলছেন। স্বামীজী যখন ভারত পরিক্রমা করছিলেন, তখন তাঁর কাছে অন্য কিছু ছিল না, কিন্তু গীতা ছিল। উপনিষদকেও মোক্ষশাস্ত্র বলা হয়।

মোক্ষশাস্ত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে বলা যেতে পারে – এই শাস্ত্র যতক্ষণ আমাদের কাছে নিজেকে না উন্মোচন করে দিচ্ছেন, ততক্ষণ এই শাস্ত্রের মর্ম আমরা বুঝতে পারব না। যেমন পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত এগুলো কেউ বুঝতে চাইলে সে বুদ্ধির জোরে বুঝে নিতে পারবে। দোকানে কোন জিনিস কিনতে গেলে টাকা দিলাম, কিনে নিলাম। কারুর ঠিক ঠিক ভালবাসা কি আমরা এভাবে কোন দিন কোন কিছুর বিনিময়ে কিনতে পারব? একটা খুব নামকরা কথা আছে, Loyalty can be purchased। কিন্তু এটা মুখের কথা, হৃদয় থেকে যে একজনের প্রতি যে ভক্তিভাব আসবে, সেটা কখনই কেনা যায় না, Loyalty cannot be purchased। ফিজিক্সের আমি বিরাট পণ্ডিত হতে পারি, আইনস্টাইন, নিউটন হয়ে যেতে পারি; কিন্তু মোক্ষশাস্ত্র বুঝতে পারব না, যতক্ষণ না এই শাস্ত্র নিজেকে উন্মোচন

করে দেয়। কি করলে এই গ্রন্থ নিজেকে খুলে ধরবে? খুশী করতে হয় তাকে। আমরা কাউকে খুশী করতে চাইলে তার সেবা করে তাকে খুশী করি। দিনরাত সেবা করে যাচ্ছে, সেবাতেই লেগে আছে। মোক্ষশাস্ত্রকে ঠিকে সেই ভাবে সেবা করতে হয়। নিয়মিত শাস্ত্রের আবৃত্তি, অধ্যয়ন, চিন্তন-মনন এগুলোই শাস্ত্রসেবা। এই শাস্ত্রসেবা করতে করতে যদি সন্তুষ্ট হয়ে তিনি কৃপা করে নিজেকে উন্মোচন করে দেন, তবেই আমরা মোক্ষশাস্ত্র বুঝতে পারব। তবে এটা নিশ্চিত নয় যে এতেই তিনি কৃপা করবেন কিনা।

ঠাকুরের পার্ষদ স্বামী তুরিয়ানন্দজী মহারাজ বলতেন, গীতার একটা শ্লোক নাও, সেটাকে মুখস্ত কর, এরপর এক মাস ধরে শ্লোকের অর্থের উপর অনুধ্যান করতে থাক, তবে গিয়ে তুমি ওই শ্লোকের মর্ম বুঝতে পারবে। গীতার সাতশ শ্লোক, আমরা না হয় প্রথম অধ্যায়ের সাচল্লিশটি শ্লোক বাদ দিলাম, বাকি থাকল প্রায় সাড়ে ছশো শ্লোক, এরপর এক মাস ধরে এক-একটা শ্লোকের অর্থ যদি ধ্যান করা হয়, তাহলে গীতা বুঝতে লাগবে সাড়ে ছশ মাস। অর্থাৎ কুড়ি বছর বয়সে গীতা যদি শুরু করা হয়, সত্তর বছর বয়সে গিয়ে গীতা বোঝা যাবে। আসলে মহারাজ আমাদের বোঝাতে চাইছেন গীতা কতটা দুর্বোধ্য। আচার্যও বলছেন, গীতা অত্যন্ত কঠিন শাস্ত্র। আমাদের আলোচনা যেমন যেমন এগোতে থাকবে তত আমরা বুঝতে পারব যে, গীতার মর্মার্থ ধারণা করা কত কঠিন। একেবারেই যে বোঝা যায় না তাও না, যদি লেগে থাকা হয়, সাধনা ও তপস্যাদি করতে থাকলে কিছু মর্মার্থ অবশ্যই বুঝতে পারা যাবে। বুঝতে না পারার সব থেকে বড় কারণ হল, একেই গীতা মোক্ষশাস্ত্র আবার অন্য দিকে বলা হয় বেদের সার উপনিষদ, আর সমস্ত বেদ, উপনিষদ, বেদান্তের সার হল গীতা। তার মানে গীতা হল একটা যেন ম্যানুয়াল। গীতা কোন গ্রন্থ না, শাস্ত্র না, এটা পুরো একটা ম্যানুয়াল (Mannual of Hindu Religion and Spirituality)। তার মানে যদি কারুর সমস্ত বেদ জানা থাকে, উপনিষদ জানা থাকে, রামায়ণ মহাভারত যদি জানা থাকে, তবেই সে গীতা বুঝতে পারবে।

বেলুড় মঠের একজন প্রাচীন সন্ন্যাসী ইয়ং সন্ন্যাসীদের বলতেন, প্রথমে সংস্কৃত ব্যাকরণ ভাল করে পড়বে, ব্যাকরণ আয়ত্ত করার পর প্রকরণগ্রন্থ পড়তে হবে, যেমন বিবেকচূড়ামণি, দিক্‌দৃশ্য বিবেক, অপরোক্ষানুভূতি। এগুলো পড়ার পর উপনিষদ পড়বে। এরপর উপনিষদ কি বলতে চাইছে জানার জন্য ব্রহ্মসূত্র পড়বে। এগুলো সমস্ত ভাল করে বুঝে নেওয়ার পর গীতায় আসবে। বেদের সার কি, উপনিষদের সার কি, সমস্ত সারকে গীতায় ম্যানুয়াল রূপে রাখা হয়েছে। যিনি বেদ, উপনিষদের সার জেনে গেছেন, তিনি গীতার একটা শ্লোক দেখলেই বুঝে যাবেন এই শ্লোকে গীতা কি বলতে চাইছেন। মনে করা যাক, আমার হাতে একটা পুলিশ ম্যানুয়াল দেওয়া হয়েছে, তাতে কি আমি বুঝতে পারব Indian Penal Code কিভাবে চলে? বা ইঞ্জিনিয়ারিংএর একটা Bridge Making Manual যদি দেওয়া হয়, সেটা দিয়ে আমি কিছুই বুঝতে পারব না। যিনি অনেক দিন ধরে খেটেখুটে ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর পড়াশোনা করেছেন, তিনি ওটা দেখলেই বুঝে যাবেন কি বলতে চাইছে। গীতা ঠিক তাই, সেইজন্য গীতাকে বোঝা খুব কঠিন। গীতার যখন যে জায়গাটা নিয়ে আলোচনা হবে তখন সব কিছু পরিষ্কার মনে হবে, কিন্তু যেমনি দশটা শ্লোক এগিয়ে গেলেন, পিছনের গুলো সব হারিয়ে যাবে। সেইজন্য আমাদের আচার্যরা গীতার নিয়মিত পাঠ ও অনুধ্যানের কথা বলেন।

উপনিষদ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রকে যেমন একদিকে মোক্ষশাস্ত্র বলা হয়, অন্য দিকে গীতা একাধারে মোক্ষশাস্ত্র আবার সমন্বয় শাস্ত্রও। সমন্বয় শাস্ত্র হল, দুটো দর্শন বা মতবাদকে পরস্পর বিরোধী বলে মেলানো যাচ্ছে না, কিন্তু সেই দুটো পরস্পর বিরোধী দর্শনকে যে শাস্ত্র যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক ভাবে মিলিয়ে দিচ্ছে, সেটাই সমন্বয় শাস্ত্র। সাংখ্য দর্শন আর যোগ দর্শন দুটো আলাদা, কিন্তু দুটো দর্শনে কিছু কিছু মিল আছে। আবার ন্যায় দর্শন আর বৈশাষিক দর্শনের সাথে এদের কোন

মিল নেই। আর ন্যায় দর্শন আর বেদান্ত দর্শনের সাথে কোন মিল নেই। ন্যায় দর্শনের সাথে আবার মীমাংসা দর্শনের কোন মিল নেই। ভারতে এই কটি খুব নামকরা দর্শন –সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশাষিক, মীমাংসা আর বেদান্ত। কারুর কারুর সাথে কিছু কিছু মিল পাওয়া যাবে, যেমন সাংখ্য আর যোগের অনেক মিল আছে, মীমাংসা আর বেদান্তের কিছুটা মিল আছে, কিন্তু পুরোটা নেই। আবার ন্যায় ও বৈশাষিকের কিছুটা মিল আছে। গীতা সব কটা দর্শনকে একটা প্ল্যাটফরমে নামিয়ে এনে মিলিয়ে দিচ্ছেন।

আমরা প্রায়ই আলোচনা করি কিভাবে ব্যাসদেব, শঙ্করাচার্য আর শ্রীরামকৃষ্ণ এই তিনজনকে সমন্বয়ের অবতার বলা হয়। ব্যাসদেব কি করলেন, তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় যা কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল, তিনি সব কিছুকে গুছিয়ে মহাভারত ও গীতাতে এক জায়গায় নিয়ে এলেন। কয়েক হাজার বছর চলার পর শঙ্করাচার্য এসে ঠিক তাই করলেন, ব্যাসদেবের পর কালের নিয়মে হিন্দু ধর্মের যা কিছু আবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছিল, সবটাকে তিনি এক জায়গায় নিয়ে এলেন। ঠাকুর কি করলেন, যে মতগুলিকে ব্যাসদেব ও শঙ্করাচার্য ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেইগুলিকেও ঠাকুর নিয়ে এলেন। যেমন শাক্ত মতাদি, এবং অন্যান্য ধর্মের মত। আসলে সব মতই যেন একই রকম কথা বলছে। গীতা শাস্ত্রের এই দুটি বৈশিষ্ট্য – মোক্ষশাস্ত্র আর সমন্বয় শাস্ত্র, এই দুটো বৈশিষ্ট্যের জন্য গীতা বুঝতে খুব কঠিন হয়ে যায়।

আমাদের জীবনের দিকে তাকালে দেখা যাবে, জীবন একটা ক্ষুদ্র রূপে যেমন রয়েছে, আবার বিরাট রূপেও রয়েছে। পদার্থবিদরা অনেক সময় বলেন, একটা এ্যটমের ভিতরে যা যা আছে, যেমনটি আছে, পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও ঠিক তাই তাই আছে। আমাদের ঋষিরা কয়েক হাজার বছর আগেই বলে দিয়েছেন, *যৎ ব্রহ্মাণ্ডে তৎ পিণ্ডাণ্ডে*, ব্রহ্মাণ্ডে যা আছে একটা অণুর ভিতরেও তাই আছে। এটাকেই স্বামীজী Microcosom আর Macrocosom দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন, সমষ্টিতে যা আছে, ব্যষ্টিতেও তাই আছে। গীতার বৈশিষ্ট্য হল সব কিছুকে এই দুটো স্তরেই দেখানো, Microতেও দেখে Macroতেও দেখে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন কর্মের গতিতে চলছে। আর সবটাই যেন যজ্ঞ। বেদের পুরুষসূক্তমে দেখাচ্ছেন, ভগবান যে সৃষ্টি করলেন, এই সৃষ্টিটাই একটা যজ্ঞ। এটাকেই গীতা দেখাচ্ছেন, তোমার যে জীবন, এই জীবনকে তোমাকে যজ্ঞ রূপে দেখতে হবে, এবং জীবনকে যজ্ঞ রূপে চালাতে হবে। চতুর্থ অধ্যায় পুরোপুরি এই জিনিসটাকে নিয়ে চলে।

যেমন অর্জুনকে ভগবান বলছেন বর্ণাশ্রম ধর্মনুসারে জীবনকে পরিচালিত করতে, আবার অন্য দিকে বলছেন এই যে বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এটিও একট মহাজাগতিক ধর্মানুসারে চলছে। প্রত্যেক জীবন যেমন একটা ধর্মের উপরে ভিত্তি করে চলছে, ঠিক তেমনি এই জগৎটাও একটা ধর্মের ভিত্তিতে চলছে। আবার এক জায়গায় ভগবান মানুষের জন্ম-মৃত্যুর যেমন আলোচনা করছেন অন্য জায়গায় এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের চক্রকে নিয়েও আলোচনা করছেন। মানে যেটা ছোটতে আছে সেটাই আবার বৃহতেও আছে, যেটা ক্ষুদ্র অনুতে রয়েছে সেটাই আবার মহতে রয়েছে। চৈতন্যের ক্ষুদ্র সংস্করণ রূপে প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়ে যিনি বিরাজ করছেন, সেই চৈতন্যই সর্বব্যাপী রূপে বিরাজিত। জীবাত্মারও কথা বলা হচ্ছে আবার পরমাত্মা বা ব্রহ্মেরও কথা বলা হচ্ছে। গীতাতে সব কিছুকে এক সঙ্গে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই সৃষ্টিটাও একটা cyclic processএ চলে, আগে ছিল আবার হবে। ঠিক তেমনি জীবনকেও cyclic দেখছেন। তুমি আজ আছ, কাল থাকবে না, আবার তুমি আসবে। যে জিনিসটা বৃহৎ স্তরে আছে, সেই জিনিসটাই আবার লঘু স্তরেও আছে। গীতাও সেই ভাবেই দেখে। গীতা যে একটা বিশেষ কোন একটা মতের বা পথের কথা বলছে, তা বলা যাবে না। গীতার দৃষ্টিভঙ্গীটাই হল

পুরো বিশ্বজনীন। কিছু কিছু জিনিস সরিয়ে দিলে, গীতা খ্রীশ্চানরাও মানতে পারে, বৌদ্ধরাও মানতে পারে, জুহুদিরাও মানতে পারে, অবশ্য তারা যদি চায়। কারণ গীতা যে সত্যগুলিকে নিয়ে আলোচনা করছে, এগুলো সব শাশ্বত সত্য। যখনই আমরা নিজেদের একটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে দিই, তার মানেই দাঁড়ায় আমরা বৃহৎকে কোথাও ছোটতে নামিয়ে দিচ্ছি। গীতা সেটা কখনই করে না। যেমন বেদের গায়ত্রী মন্ত্র যে কোন লোক উচ্চারণ করতে পারে, যেখানে খুশী করতে পারে। গায়ত্রী মন্ত্র কোন ধর্মে বাঁধা নয়, ঠিক তেমনি গীতা কোন বিশেষ একটা ধর্মে বাঁধা নয়। আর হিন্দুদের জন্য তো কোন মতেই না। হিন্দুদের যদি কেউ বলে আমি শাক্ত, আমি শৈব, আমি গীতা মানব না, এটা একটা মুর্খের মত কথা হয়ে যাবে। গীতা সব হিন্দুদের জন্য এবং সবারই জন্য।

আমরা এখন দেখব গীতাকে নিয়ে মানুষের মধ্যে যে ভুল, ভ্রান্ত ধারণা হয়ে আছে, সেগুলো কতটা যৌক্তিক। আজকাল সোশ্যাল মিডিয়া আসার পর অনেক রকম কথা, যদিও বেশীর ভাগই বোকা বোকা কথা, ঘুরতে থাকে। যেমন প্রথমে একটা কথা গীতাকে নিয়ে বলা হয়, যেটা আগেকার দিনের অনেক পণ্ডিতরাও বলতেন, তা হল, গীতা মহাভারতের অংশ না, গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে, পরে কেউ রচনা করে মহাভারতে ঢুকিয়ে দিয়ে ব্যাসদেবের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মহাভারত ভাল করে পড়লে দেখা যাবে, গীতার যে দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গী, এই দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গী সমগ্র মহাভারতের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। যদি গীতাকে মহাভারত থেকে বাদ দিতে বলা হয়, তাহলে পুরো মহাভারতকেই বাদ দিতে হবে। গীতাতে যে যে আইডিয়াকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটা আইডিয়া গোটা মহাভারতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সেইজন্য গীতা মহাভারতে পরে ঢোকান হয়েছে, এই কথা ধোপে টিকবে না।

প্রথমে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা এই ধারণাটাকে নিয়ে কিছু কথা বলেছিলেন। হিন্দুদের চিরদিনের দুশমন হল হিন্দুরাই। সব সময় এরা সুযোগ খুঁজতে থাকে, কিভাবে হিন্দু ধর্মকে গালাগাল দেওয়া যায়, কিভাবে বেদ, উপনিষদের সমালোচনা করা যেতে পারে। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে হয়ত একটা কিছু কথা বলে দিল, সেটাকেই এরা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এমন ভাবে প্রমাণিত করে দেখাবে যে, হিন্দু ধর্ম কত খারাপ। এরা হিন্দু ধর্মের দর্শন ও তত্ত্বের ভিতরে কখন গভীর ভাবে ঢোকার কোন চেষ্টা করবে না। যাঁরা ভিতরে ঢুকে বুঝে নেন, তাঁরা শান্ত হয়ে যান।

তার সাথে বলা হয়, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কি আদৌ হয়েছিল, কৌরব-পাণ্ডবরা কি সত্যিই ছিল, কৃষ্ণ বলে কি আদৌ কেউ ছিলেন। এগুলো ইতিহাসবিদদের কাজ, গীতার এটা কাজ নয়। দশজন মিলে যুদ্ধ করেছিল, নাকি এক কোটি লোক যুদ্ধ করেছিল, এটা দেখা গীতার কাজ না। ঠাকুর বলছেন, শাস্ত্রে চিনিতে বালিতে মিশে আছে। চিনি মানে সারতত্ত্ব, আধ্যাত্মিক সার; বালি মানে হয়, ওটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। কেউ যদি বলে আমি আম চাই, আমের খোসা চাই না, আঁটি চাই না। তা কি কখন সম্ভব! আঁটি আছে বলে শাঁস আছে, আর খোসা আছে বলে শাঁস আছে। অবাক লাগে, সাধারণ মানুষ এই সহজ জিনিসগুলো কি করে বুঝতে পারে না। মহাভারতে যে গল্পগুলো আছে, এই কাহিনীগুলির জন্যই গীতা দাঁড়িয়ে আছে। যাঁরা হিন্দু ধর্মকে একটু বোঝেন, তাঁরা জানেন এই কাহিনীগুলির ভিতর থেকে আমাকে সারতত্ত্বটা নিতে হবে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল কি হয়নি, কৃষ্ণ নামে কেউ ছিলেন কি ছিলেন না, আমার অত বিচারে গিয়ে কোন কাজ নেই। কৃষ্ণ নামে কেউ থাকুন বা না থাকুন, কেউ তো একজন ছিলেন, যাঁর মাথা থেকে এই উচ্চ চিন্তন এসেছিল। শুধু হিন্দুরা না, সব ধর্মেই আছে, যতক্ষণ ভগবানের কথা না হবে, ততক্ষণ কেউ মানতে চাইবে না। বাইবেলের এত সম্মান কেন? যীশু, যিনি ভগবানের সন্তান, তাঁর কথা হল বাইবেল। সেইজন্য সব খ্রীশ্চানরা বাইবেলের কথা মানে। মুসলমানরা কোরানকে কেন মানে? আল্লার কথা বলেই মানে। হিন্দুরা তাই যত উচ্চ চিন্তন হোক, যত ভাল কথা হোক, প্রথমেই

বলে দেবে এই কথাগুলো ভগবান থেকে এসেছে। ভগবান থেকে না এলে কেউ মানবে না, তোমার আমার কথা কে শুনতে যাবে, কে মানবে? সেইজন্য এই ধরণের যে আপত্তি করা হয়, এগুলো অত্যন্ত বোকা বোকা কথা।

গীতাকে নিয়ে আর-একটা কথা বলা হয়; অনেক পণ্ডিত, সন্ন্যাসীদেরও এই কথা বলতে দেখা যায় –যুদ্ধ হওয়ার মুখে, যে যুদ্ধে এত এত লোক মারা যাবে, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এত লম্বা একটা ভাষণ, আঠারোটি অধ্যায়ে সাতশ শ্লোকে কেন দিতে গেলেন আর কিভাবেই বা দিলেন। আঠারোটা অধ্যায় খুব তাড়াতাড়ি পাঠ করলে দু ঘন্টার মত বা তা থেকেও বেশি সময় লেগে যাবে। এত বড় একটা যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে, সেখানে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ দু ঘন্টা ধরে আবার ছন্দে অর্জুনকে গীতার উপদেশ দিয়ে গেলেন, এটা কি কখন সম্ভব? যাঁরা এই ধরণের সমালোচনা করেন, আসলে তাঁরা জিনিসগুলিকে বুঝতে চান না যে, অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে বক্তব্য, সেটাকে ব্যাসদেব সাতশটি শ্লোকে গুছিয়ে সাজিয়ে দিলেন; কিন্তু অর্জুনকে বলার সময় শ্রীকৃষ্ণ হয়ত পনের কি দশ মিনিটে বক্তব্যটা বলে দিয়েছিলেন।

আমরা ছোটবেলা থেকে গীতার উপর আরেকটা অভিযোগ আরোপিত হতে শুনে আসছি, তা হল –অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে প্ররোচিত করেছেন। চার পাঁচ বছর আগে রাশিয়াতে গীতার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়, কারণ গীতা মানুষকে যুদ্ধে প্ররোচিত করে। কিন্তু গীতাতে একবারও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন না যে, তুমি যুদ্ধ কর। অর্জুনকে ভগবান জীবনদর্শনটা দেখিয়ে দিলেন। জীবনদর্শন দেখিয়ে দেওয়ার পর আঠারো অধ্যায়ে গিয়ে শেষে তিনি অর্জুনকে বলছেন, *যথেচ্ছসি তথা কুরু*, আমার যা বলার তোমাকে বলে দিলাম, এবার তোমার যা ইচ্ছা হয় কর। মাঝে মাঝে একবার দুবার বলছেন, *মামুনস্মর যুধ্য চ*, যদি তুমি যুদ্ধ করতে চাও তাহলে আমাকে স্মরণে রেখে কর। অর্জুন যুদ্ধ করার জন্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে পিছিয়ে যেতে চাইছেন। তখন ভগবান তাঁকে আটকে দিলেন।

লোকেরা ভাবে বয়স হলে গীতা পড়া যাবে, গীতা শেষ বয়সের জন্য। এটা একটা মারাত্মক ভুল ধারণা, সারা জীবন ধরে পড়ার জন্য গীতা। যাদের বয়স হয়ে গেছে তার গীতা অবশ্যই পড়বেন, কিন্তু অল্প বয়স থেকে পড়লে সে পড়ার দাম অনেক বেশী। কারণ গীতা আমাদের শক্তি দেয়, জীবন তৈরী করার জন্য গীতা দরকার, জীবনকে বিস্তার করার জন্য গীতার উপদেশ দরকার, সঙ্কট ও সমস্যা সমাধানের জন্য গীতার বাণীকে দরকার। সেইজন্য জীবনযাত্রা সূচনা থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত গীতা দরকার।

ভগবান প্রথম যখন অর্জুনকে গীতা বলতে শুরু করছেন, সেখানে বলছেন, *কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং*, কোথা থেকে তোমার মধ্যে এই মোহ উৎপন্ন হল। বলেই পরের শ্লোকে এসে বলছেন, *ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ*, ক্লীব ভাবকে ধারণ করো না, ক্লীব ভাবকে ঝেড়ে ফেলে দাও। ক্লীব মানে নপুংসক। তুমি আসলে কি, তোমার ব্যক্তিত্বটা কি, তোমার আসল সত্তাটা কি? ঠাকুরের একটা খুব সুন্দর গল্প আছে, এক সাধুবাবা এক রাজাকে খুব উপদেশ দিচ্ছেন। রাজাও খুব মন দিয়ে শুনেছেন। উপদেশ দেওয়ার পর রাজাকে সাধুবাবা বলছেন, 'আর কত দিন সংসারে থাকবে, চলো বেরিয়ে পড়ো, রাজ্যটাজ্য ত্যাগ করে আমার সাথে এবার জঙ্গলে চলো ঈশ্বরের সাধনায় ডুবে থাকবে'। রাজা শুনে বলছেন, 'জঙ্গলে গেলে সেখানেও আমি একটা রাজ্য দাঁড় করিয়ে দেব'।

আমাদের যে স্বভাব, এই স্বভাব সহজে কোন দিন যাবে না। সাময়িক একটা আবরণ এসে যেতে পারে, কিন্তু ভোগী মানুষ কোন দিন সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবে না। একজন ত্যাগী সন্ন্যাসী কোন দিন সমাজে গিয়ে থাকতে পারবে না, তার আগে সে আত্মহত্যা করে নেবে। কোন সন্ন্যাসী

যদি কোন নারীর মোহে আসক্ত হয়ে সংসার পাতে, সে কোন দিন সুখী হতে পারবে না। যদি সুখী হয়, তাহলে বুঝতে হবে, সন্ন্যাস জীবন আদৌ তার জন্য ছিল না। ভিতরের যে স্বভাব ওটা বেরিয়ে আসবেই, কিন্তু মাঝে মাঝে আবরণ এসে যায়। গীতা এই আবরণটা সরিয়ে দেয়। স্বভাবে আমি যাই হই না কেন, আমি সন্ন্যাসী, আমি গৃহস্থ, তাতে কিছু আসে যায় না। কেউ বিষাদগ্রস্ত হয়ে ভাবছে আমি মাটিতে পড়ে গেছি। মাটিতে কি কেউ পড়তে পারে? একজন নামকরা সঙ্গীত শিল্পী, তার ভিতর হতাশার ভাব এসে তাকে গ্রাস করে দিয়েছে, বলছে আমি মাটিতে মিশে গেলাম। আপনি কি করে মাটিতে মিশে যেতে পারেন, আপনার core personality হল মিউজিক, তার মানে আপনার আসল যে ব্যক্তিত্ব, তা হল সঙ্গীত, সেটার উপর একটা আবরণ পড়ে গেছে। গীতা এই আবরণটাকে সরিয়ে দেয়। আবরণ সরিয়ে দিলে কি হয়? আপনি যা, আপনি তাই হয়ে গেলেন।

ভাল করে গীতা অধ্যয়ন করার পর আমার কি হবে? আমার কি দুটো শিং বেরোবে? কিছুই হবে না, আমি আসলে যা, আমি তাই হয়ে যাব। যে স্বভাবে কাপুরুষ সে কাপুরুষই থাকবে। কিন্তু ভিতরে যদি দম থাকে, সে অবশ্যই দাঁড়িয়ে যাবে। একজন বড় অভিনেতা, তার আবরণ এসে গেছে, গীতা সেই আবরণকে ছিড়ে তার অভিনয়ের দক্ষতাকে বার করে আনবে। যার ভিতর একটুও যদি দম থাকে, কিন্তু আবরণ পড়ে আছে, গীতা সেই আবরণকে ছিড়ে বার করে আনবে। আমি কি করে জানব আমার ভিতরে দম আছে কিনা? থাকতে বাধ্য। মা-বাবার সম্পর্ক থেকে তোমার জন্ম হয়নি। তুমি এক জীবাত্মা, জন্ম জন্মান্তর থেকে তুমি কর্ম সঞ্চয় করে আসছ; জন্ম জন্মান্তর থেকে তুমি নানা রকম উপলব্ধি করেছ। যতক্ষণ না তুমি নিজের শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছ, ততক্ষণ তুমি কি করে জানবে তোমার ভিতর কি আছে!

স্বামীজী যে বলছেন, Arise awake and stop not till the goal is reached, তিনি আমাদের কোন উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই কথাগুলো বলছেন না। স্বামীজী শুধু বলছেন, তোমার উপর যে একটা আবরণ চাপিয়ে দিয়ে রেখেছে, সেটাকে সরিয়ে দাও। ইদানিং একটা নূতন কথা উঠেছে, power of positive thinking, কিসের positive thinking! তুমি হলে শুদ্ধ আত্মা, তুমি অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তির মালিক। কোন একটা সময় তুমি হয়ত চাইলে, আমার একটা শরীর হোক, সেই থেকে তোমার এই শরীর হয়েছে। তুমি বললে, আমি ভোগ করব। তোমার ভোগের সামগ্রী এসে গেল, তুমি ভোগ করতে নেমে গেলে, এবার তোমাকে কাঁদতে হবে। কাঁদতে কাঁদতে তুমি ভুলেই গেছ তুমি আসলে কে। ছোট বাচ্চাকে যদি মলে নিয়ে যাওয়া হয়, মলের চাকচিক্য দেখে বাচ্চা বলবে, আমি এবার মলেই থাকব। মা যত বোঝায়, এটা থাকার জায়গা নয়; সে মায়ের কথা মানতে চাইবে না, সে যাবে না। আমরাও ছোটবেলায় মামার বাড়ি গেলে আর ওখান থেকে আসতে চাইতাম না। ওখানে নূতন বন্ধু হয়ে গেছে, কেউ শাসন করার নেই, বাড়ি ফিরতে মন চাইতই না। মা দুটো চড় মারতেই আমার চোখে জল এসে গেল। যখনই চোখে জল আসে, বুঝতে হবে জগজ্জননী এবার আমাকে চড় মারছেন; এটা তোমার জন্য নয়, বাড়ি চল।

গীতা আমাদের চড় মারছে না, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে চড় মারলেন না। কারণ অর্জুন ছিলেন মহা শক্তিধর পুরুষ, আগে থেকেই তাঁর মধ্যে শক্তি আছে। কিন্তু অর্জুনের মধ্যে একটা সাময়িক অবসাদ এসে চিত্তকে গ্রাস করে নিয়েছে। সেই অবসাদকে কাটাবার জন্য ভগবান অর্জুনের সামনে জীবনদর্শন রাখলেন। অনেক সময় ইয়ং ছেলেরা এসে বলে, গীতা খুব ভাল বই, কিন্তু আজকালকার দিনে চলে না। আজকালকার দিনে চলে না মানে? যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেখানে একটু পরেই মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার লোক মরতে যাচ্ছে, সেই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ জায়গাতে দাঁড়িয়ে গীতার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কে উপদেশ দিচ্ছেন? একজন চঞ্চল, উদ্বিগ্ন মানুষ এই উপদেশ দিচ্ছেন না, দিচ্ছেন শান্ত, ধীর, স্থির মনের মানুষ শ্রীকৃষ্ণ। ওই যুদ্ধের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে ঝঞ্ঝা, বিক্ষুব্ধ অশান্তির মধেও শান্ত, স্থির, অচঞ্চল হয়ে থাকা যায়। আমাদের এখানে চারিদিকে তো এখন আগুন লেগে আছে,

একদিকে ইনক্লাব জিন্দাবাদ, অন্য দিকে আমাদের দাবী মানতে হবে, আরেক দিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ, তার সাথে দুর্নীতির পাঁকে মানুষ জর্জরিত। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ময়দানে হয়েছিল, এখন এই যুদ্ধে অফিসে অফিসে, রাস্থায় রাস্থায়, অলিতে গলিতে, চৌমাথায় নেমে গেছে। আজকের দিনে গীতা তো আরও বেশি বেশি দরকার। গীতার উপদেশ শুনে অর্জুন যদি শক্তি পেয়ে থাকে, তাহলে আমি আপনি কেন শক্তি পাবো না, এর কারণ তো আমরা খুঁজে পাই না। প্রাথমিক ভাবে এই হল সংক্ষেপে গীতাকে নিয়ে দু-চারটি কথা। এরপর আমরা ধীরে ধীরে আরও গভীরে গিয়ে আলোচনা করতে থাকব।

গীতার বিষয়বস্তুটা কি আমাদের জানতে হবে। বিষয়বস্তুর উপর আমরা আরও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব, সেখানে আচার্য শঙ্কর কি বলছেন দেখব। অনেকেই জানতে চান, গীতা আমাদের কি বলতে চাইছে, গীতা জিনিসটা ঠিক কি। প্রথম কথা, গীতার একটাই উদ্দেশ্য মোক্ষ লাভ করা, সেইজন্য গীতা হল মোক্ষশাস্ত্র, যার কথা আমরা আগে বললাম। মোক্ষশাস্ত্র মানে, যে শাস্ত্র আমাদের মুক্তির পথ দেখিয়ে দিচ্ছে; মুক্তি মানে জন্ম-মৃত্যুর যে চক্র, সেই চক্র থেকে মুক্তি। এ-ছাড়া গীতার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

ঋষিরা, শাস্ত্র প্রণেতারা বারবার বলেন যাদের মন শুদ্ধ পবিত্র, তারা সব কিছু ত্যাগ করবে। এই শুদ্ধ পবিত্র বলতে কি বোঝায়? যে কাউকে এই প্রশ্ন করলে একটাই উত্তর সবার থেকে বেরিয়ে আসবে, শুদ্ধ পবিত্র মানে, সত্যি কথা বলে, চুরি করে না, পরনারী সঙ্গ করে না ইত্যাদি। একেবারেই তা না, শুদ্ধ পবিত্র মানে –নিঃস্বার্থপরতা, কোন স্বার্থ তার থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ যে এই যুদ্ধ করাচ্ছেন, সেখানে তাঁর কোন স্বার্থ নেই, করাতে হবে তাই করছেন। পুরো গীতার এটাই বক্তব্য। মানুষ বিষয়ের সাথে নিজেকে কখন জড়িয়ে নেয়? জিনিসগুলি কখন সে সংগ্রহ করে? মানুষ যখন স্বার্থপর হয়। স্বার্থপর মানে, যার অস্তিত্ব দেহকেন্দ্রিক, নিজের আপনজনদের নিয়ে অস্তিত্ব। তার মানেই, স্বার্থবোধ এসে গেল। স্বার্থবোধ আসা মানেই সে এখন ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। এবার সে যা কিছু চাইবে সব নিজের জন্য, আমার টাকা-পয়সা লাগবে, আমার নিরাপত্তা চাই, আমার বাড়ী লাগবে। শুধু যে ভোগের জন্যই যে এসব লাগবে তা না, জীবন রক্ষার জন্যও দরকার।

কিন্তু যে বলছে, জগতে আমার আপনার বলে কেউ নেই, হয়ত সত্যিকারের তার কেউ নেই, নিজেকে সে সেভাবেই দেখছে। তাকে এনারা বলছেন, তুমি মন থেকে সন্ন্যাসী। সব কিছু ছেড়ে তুমি পূর্ণ রূপে আত্মজ্ঞানের পথে চলে যাও। গীতা এই জিনিসটাকে বিস্তারে বর্ণনা করবে। আচার্যের ভাষ্য যখন আসবে তখন এই জিনিসগুলো আরও বিস্তারে বলা হবে, আমরা এখানে সংক্ষেপে বলছি।

আচার্য বলবেন, যাদের মন পরিষ্কার নেই, যাদের মধ্যে আমিত্ব বোধ প্রবল, আমি ও আমার ভাব খুব জোরালো; যারা বলছে, আমি আমার ভাল চাই, অন্যেরও ভাল চাই, তাদের বলছেন, তুমি পুরোদমে কাজ কর, be the best। সেখান থেকে তুমি ধীরে ধীরে এটাকেই কর্তব্য রূপে কর, আমাকে এটাই করতে হবে। মা-বাবার সেবা, দেখাশোনা আমাকে করতে হবে; সেখানে কোন প্রত্যাশা করো না। সন্তানকে কেন প্রতিপালন করব, কেন ভালবাসব? আমার দায়ীত্ব। স্ত্রীকে কেন ভালবাসব? আমার দায়ীত্ব। স্বামীকে কেন ভালবাসব? আমার দায়ীত্ব। পুরো মহাভারত এই দর্শনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। পুরো আদর্শ হিন্দু জীবন এটার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। গীতা এই দর্শনের উপরেই বলছে। প্রথমে মনকে শুদ্ধ কর। কিভাবে মনকে শুদ্ধ করবে? প্রথম হল কর্ম কর। দ্বিতীয়, কর্মকে কর্তব্য বোধে নিষ্কাম ভাবে করো। নিষ্কাম কর্ম মানে, আমি ও আমার বোধ থেকে বেরিয়ে এসে কর্ম করা। এভাবে মন শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেলে, এবার এখান থেকে তুমি পুরোপুরি আত্মজ্ঞানের দিকে চলে যাও। পুরো গীতা শুধু এই দুটি জিনিসকে নিয়ে আলোচনা করে। ত্যাগ কি? ত্যাগ কিভাবে হয়? কর্ম কি? কর্ম কিভাবে হয়? নিষ্কাম কর্ম কি? নিষ্কাম কর্ম কিভাবে হয়? আমরা আগে

why আর how নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমি কেন ত্যাগ করতে যাবো? কারণ আসল সত্য এই, তুমি আসলে এই, এটাকে পাওয়ার জন্য তোমাকে ত্যাগ করতে হবে।

শাস্ত্রের কিছু কিছু শব্দ এখানে technical term রূপে আসবে, শাস্ত্রে এই ধরণের শব্দগুলি ব্যবহার হয়। যেমন প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, প্রবৃত্তি মার্গ, নিবৃত্তি মার্গ, আবার আসবে অভ্যুদয়, নিঃশ্রেয়স, যার অর্থ জাগতিক কল্যাণ আর পারমার্থিক কল্যাণ। এই অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স, এই দুটো জিনিসকে গীতা ঘুরে ঘুরে আলোচনা করবে। অভ্যুদয় মানে জাগতিক কল্যাণ, জীবনে উঠে দাঁড়াও। নিঃশ্রেয়স মানে, সমস্ত কিছু ত্যাগ করে পরমার্থ লাভের বা ঈশ্বরকে পাওয়ার চেষ্টা কর। পুরো গীতা এই জিনিসগুলিকেও নিয়ে আলোচনা করছে –কখন নিঃশ্রেয়স, কখন অভ্যুদয়। ইদানিং কালে অনেকে বলছে Gita for Management, আসলে গীতা অভ্যুদয়কে নিয়ে বলছে, তাই ম্যানেজমেন্টের কোর্সেও গীতাকে নিয়ে আসা হয়েছে। মানবজাতির জাগতিক কল্যাণের জন্য, অর্থাৎ তোমার ভাল কিভাবে হবে, এর উপর যে কথাগুলো বলেছেন, এটাই অভ্যুদয়ের উপর বলা হচ্ছে। আমরা এগুলো আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখব, কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখা মানে এই না যে, এর কোনটাকেই জাগতিক দৃষ্টিতে লাগানো যায় না।

একজন নামকরা শিল্পী ছিলেন, খুব কঠিন কোন জিনিসকে সহজ করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ঠাকুর যে গল্পগুলি ভক্তদের বলতেন, সেই গল্পগুলিকে তিনি ছবির মাধ্যমে খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। একটা পত্রিকায় ওনার আঁকা ছবিগুলো ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হত। তিনি এক জায়গায় বলছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ভাব যাই হোক, তাতে আমার কিছু আসে যায় না, কিন্তু তাঁর কথাগুলি ছবিতে যখন আঁকা হয়, তখন এর একটা বিরাট দাম হয়ে যায়। গীতার একাদশ অধ্যায়ে যে বর্ণনা আছে, এর একটা আধ্যাত্মিক মূল্য আছে, ধ্যানের জন্যও এর একটা দাম আছে, কিন্তু যদি কাব্যের দিক দিয়ে দেখা হয় তাহলেও এটা খুব উচ্চমানের কবিতা। একটা জিনিস যে শুধুই আধ্যাত্মিক হবে তা না, ওর অন্য ভাল দিকও থাকতে পারে। ঠিক তেমনি, অভ্যুদয় জিনিসটা আমরা আধ্যাত্মিক ভাব নিয়ে দেখি, কিন্তু এটাকে দৈনন্দিন জীবনে নামিয়ে মানুষের জাগতিক কল্যাণ সাধনের দিকটাও দেখতে হবে। যার জন্য বলা হয়ে থাকে, একটা মানুষের জীবনে যত রকমের সমস্যা থাকতে পারে, গীতা সব সমস্যাকে নিয়ে আলোচনা করে। একজন এই কথা শুনে প্রশ্ন করেছিল, role of liquid money in market, গীতায় কি এর সমাধান আছে? ভাই, এটা তো জীবনের সমস্যা না, এই সমস্যা তো তোমাদের সৃষ্টি। গীতা মানবজীবনের সমস্যাকে নিয়ে আলোচনা করছে, যেখান আমাদের মন যুক্ত রয়েছে। গীতা এই ধরণের সব সমস্যার সমাধান দেন।

গীতার আঠারোটি অধ্যায়ে সাতশটি শ্লোককে বিভিন্ন ভাবে শ্রেনী বিন্যাস করা হয়। গীতার প্রত্যেকটি অধ্যায়ের যে নামকরণ করা হয়েছে, তাতে শেষে 'যোগ' এই শব্দটা যোগ করা হয়েছে। যেমন অর্জুনবিষাদযোগ, সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ ইত্যাদি। যোগ মানে যেটা আমাদের ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায় বা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করিয়ে দেয়। যোগ শব্দকে যুক্ত করার অর্থ হল, গীতার আঠারোটা অধ্যায়ের প্রত্যেকটা জিনিস দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে পেতে পারি, ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি। যেমন প্রথম অধ্যায়ের নাম অর্জুনবিষাদযোগ, তার অর্থ, মানুষের জীবনে প্রতিনিয়ত যে দুঃখ-কষ্ট আসছে, এই দুঃখ-কষ্ট দিয়েও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। একমাত্র গীতাই এই কথা বলছে।

প্রথম অধ্যায়ে গীতার যে ভাব, এই ভাবকে আধার করে অধ্যায়ের নাম অর্জুনবিষাদযোগ। বিষাদ মানেই সংসার, পরে আচার্য বলবেন, শোক আর মোহ এটাই সংসার, এই সংসার থেকে বেরোতে হবে। প্রথম অধ্যায় হল বেরোনর পথ, এটাই গীতার ভাব। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাপারে বলা হয়, গীতা যে মূল বিষয়বস্তুগুলিকে নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছে, ওর প্রত্যেকটি বিষয়কে সূত্রাকারে অর্থাৎ খুব সংক্ষেপে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলে দেওয়া হয়েছে। এরপর তৃতীয় অধ্যায় থেকে শুরু করে

সতের অধ্যায় পর্যন্ত প্রত্যেকটি বিষয়কে আলাদা আলাদা করে বিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তার মানে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে যেটা বলা হয়েছে, সেটাকেই পরের পনেরোটি অধ্যায়ে বিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে অর্থাৎ অষ্টাদশ অধ্যায়ে গিয়ে আবার পুরো জিনিসটাকে গুটিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে।

গীতার পুরো বক্তব্য এই দুটো বিষয়কে কেন্দ্র করে –অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স; অভ্যুদয়টাও ঠিক অভ্যুদয় রূপে নয়, এখানেও ত্যাগের ভাব আছে। ঠাকুর বলছেন, দশবার গীতা বললে যা হয় গীতার অর্থ তাই, অর্থাৎ ত্যাগী। শেষ কথা হল ত্যাগ, সব কিছু ছেড়ে ঈশ্বরের দিকে যাও, তোমার স্বরূপকে জানো এবং এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে বেরিয়ে নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও। তোমার মন যদি পুরোপুরি শুদ্ধ পবিত্র, তাহলে তুমি সম্পূর্ণ ত্যাগ কর। মন যদি পুরোপুরি শুদ্ধ পবিত্র নয়, তাহলে কর্মফল ত্যাগ কর। শুদ্ধ হয়ে গেলে কর্মত্যাগ। মনের মধ্যে যদি আমিত্ব ভাব থাকে তাহলে কর্মফল ত্যাগ। কেউ যদি বলে, আমি কর্মফল ত্যাগ করতে চাই না, তাহলে গীতা তার জন্য নয়। সেইজন্য প্রথম থেকে আমরা বলে আসছি, গীতা খুব কঠিন। আচার্য শঙ্করও বলবেন, গীতা কত কঠিন। আবার আচার্য শঙ্করের যে গীতার ভাষ্য, খুব উচ্চমানের যাঁরা আধ্যাত্মিক সাধক একমাত্র তাঁরাই বুঝতে পারেন। শুধু ভাষ্যকে নিয়েই কঠিন বলা হচ্ছে না, গীতাকে নিয়েও বলা হচ্ছে। এমনিতে উপর উপর গীতার অর্থ যে কেউ বলে দিতে পারে। কিন্তু গীতার ভিতরে প্রবেশ করতে হলে, বৌদ্ধিক ও চিন্তন দিয়ে গীতাকে বোঝার চেষ্টা করতে গেলে একটু পরিশ্রম ও সাধনা লাগে।

মধুসূদন সরস্বতী, শঙ্করাচার্যের পরম্পরার এবং তখনকার দিনের একজন বাঙালী হয়ে ঘোর বেদান্তী ছিলেন। গীতার উপর তাঁর খুব সুন্দর বই আছে, *গূঢ়ার্থদীপিকা*। তিনি নিজের মত অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার মধ্যে একটা বলছেন তত্ত্বমসি, বেদান্তের খুব নামকরা কথা। তত্ত্বমসি মানে, তুমি নিজেকে যা মনে করছ, আসলে তুমি তা নও, তুমি সেই পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম। মধুসূদন সরস্বতী গীতাকে তত্ত্বমসি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, গীতার প্রথম ছয়টি অধ্যায় ত্বম্‌কে বোঝাতে চাইছে তুমি কে। পরের ছয়টি অধ্যায়, সপ্তম থেকে দ্বাদশ অধ্যায় তৎ এটাকে বোঝাতে চাইছে। তৎ সম্বন্ধ বলা মানে ঈশ্বরীয় কথা বলে। তারপরের বাকি ছয়টি অধ্যায় তত্ত্বমসি এর পুরো জিনিসটার অর্থ নিরুপণ করেন। সবার বুদ্ধি তো এক রকম নয়, যার যেমন বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি দিয়ে তাঁরা গীতাকে নিজের নিজের মত নানান ভাবে বিভাজন করেছেন। কিন্তু এনাদের মূল কথা হল, গীতার সব কটি অধ্যায়ের বক্তব্য হল অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স, জাগতিক উত্থান আর শেষে সম্পূর্ণ ত্যাগ, এই দুটি। এই হল খুব সংক্ষেপে গীতার ভূমিকা, গীতা কি। এরপর আমরা দেখব আচার্য শঙ্কর গীতার ভূমিকাতে কি বলছেন, আর কিভাবে গীতার মূল বিষয়বস্তুকে আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন।

আচার্য শঙ্করের গীতা-ভাষ্যের সম্বন্ধ-ভাষ্য

এবার আমরা গীতার মর্মকে নিয়ে আলোচনা করব। এখানে আমাদের কোন কথা নেই আচার্য শঙ্কর গীতার ভূমিকাতে যা বলছেন, সেটাকেই আমরা সরাসরি তুলে ধরব। স্বামী নিখিলানন্দ মহারাজ রামকৃষ্ণ পরম্পরার একজন খুব উচ্চমার্গের সন্ন্যাসী ছিলেন। নিউইয়র্কের রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন, রামকৃষ্ণ ভাবধারার উপর ইংরাজী ভাষায় ওনার খুব ভাল ভাল বই আছে। আচার্য শঙ্করের সব বই উনি ইংরাজীতে সার সংক্ষেপে অনুবাদ করেছিলেন, যার মধ্যে অনেকগুলো অংশ তিনি আক্ষরিক ভাবে অনুবাদ করেছেন। তার মধ্যে শঙ্করাচার্যের গীতার এই ভূমিকাকেও তিনি অক্ষর অনুযায়ী অনুবাদ করে গেছেন। আচার্য শঙ্করের গীতার এই সম্বন্ধ-ভাষ্যকে যদি বুঝে নেওয়া যায়, তাহলে গীতার মর্মার্থ, গীতার কি বক্তব্য, সবটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে। এটাকে বলা হয় *উপোদ্‌ঘাৎ*, এটাও একটা টেকনিক্যাল টার্ম। আমরা যাকে Foreword বা Introduction বলি, ওনারা

সেটাকে উপোদ্‌ঘাৎ বা অনেক সময় সম্বন্ধ ভাষ্য বলছেন, যেখানে সব কিছুকে যুক্ত করা হচ্ছে। কিন্তু তারপর এরও বিস্তার আসে।

কোন ভাল বইয়ের যদি কোন Foreword থাকে, তাতে সাধারণত সেখানে ওনারা প্রথমে বলতে চান, এই বইয়ের বিষয়বস্তুটা কি। Forewordএ একজন লিখে জানিয়ে দিলেন, এই বইটা পড়ে তাঁর কি মনে হল, সেখানে ওনারা বিষয়বস্তুটাকে বিরাট করে বলে দেন। এরপর আসল যিনি লেখক, তিনিও একটা ভূমিকা লেখেন। এখানে লেখক ব্যাসদেবের কোন ভূমিকা নেই, যিনি ভাষ্যকার তাঁর একটা ভূমিকা রয়েছে।

সম্বন্ধ-ভাষ্যে ওনারা প্রথমে চারটে জিনিসকে নিয়ে আলোচনা করেন, এই চারটেকে একসাথে অনুবন্ধ চতুষ্টয় বলা হয়। অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের এক নম্বরে বলেন অধিকারী কে? এই গ্রন্থ অর্থাৎ এখানে এই গীতা ঠিক ঠিক কার জন্য? দ্বিতীয় হল, এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু কি? তৃতীয় হল, এর প্রয়োজনীয়তা কি? গীতা কেন, কি প্রয়োজন? সব শেষে চতুর্থ হল সম্বন্ধ। লেখক যেটা বলতে চাইছেন, তার সাথে এই বইয়ের কি সম্পর্ক। বিষয়টা তো আপনি বলে দিলেন, কিন্তু বইয়ের সাথে এর কি সম্পর্ক আছে? বা অধিকারীর সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে? যখনই এই ধরণের কোন ভাষ্য লেখা হয়, তখন সেখানে প্রথমেই এই চারটে জিনিসকে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয় – অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন। উপনিষদের উপর আচার্য শঙ্করের যত ভাষ্য আছে, সেখানেও প্রত্যকটি ভাষ্যে প্রথমে এই রকম সম্বন্ধ-ভাষ্য দেওয়া আছে। প্রত্যেকটি সম্বন্ধ ভাষ্যে উনি এই চারটে জিনিসকে নিয়ে প্রথমে আলোচনা করেছেন।

এখানেও আচার্য চারটে জিনিসকে নিয়ে বলবেন, গীতা কার জন্য, গীতার বিষয়বস্তু কি, গীতা কেন দরকার এবং শেষে কার সঙ্গে কার কি সম্পর্ক আছে। পরে আচার্য শঙ্কর বলবেন, গীতা এত গভীর, কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি গীতার ভাষ্য লেখার। আবার অন্য দিকে আচার্যের এই উপোদ্‌ঘাৎ বা সম্বন্ধ-ভাষ্য, যেটাই বলি না কেন, এটাও এত গভীর যে, প্রত্যেকটা লাইনকে ধরে ধরে ব্যাখ্যা করতে হয়। যদিও এই সম্বন্ধ-ভাষ্য খুবই ছোট, কিন্তু আমরা যেখানে গিয়ে এর আলোচনা শেষ করব, ততক্ষণে আমরা ভুলে যাব এটা কেন শুরু হয়েছিল।

আচার্য এখানে মূলতঃ চারটে জিনিসকে ধরছেন। প্রথম, ঈশ্বরকে পরিভাষিত করছেন। কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা যেভাবে নির্গুণ নিরাকার মনে করি, সেভাবে না ধরে তিনি ভগবানের অবতারের রূপটাকে ধরছেন। এখানে আমরা অবতার কি, ঈশ্বর কি, এটাকে নিয়ে আলোচনা করতে পারব না, যদিও পরে পরে গীতাতে এই আলোচনা ঘুরে ঘুরে আসবে। যেমন যেমন আসবে আমরা তেমন ভাবে আলোচনা করে যাব।

প্রথমে আচার্য ঈশ্বর ও অবতার এই দুটোকে নিয়ে আলোচনা করছেন। দ্বিতীয় সৃষ্টি এবং সৃষ্টি কিভাবে হল খুব সংক্ষেপে বলে দিচ্ছেন, পরে গীতাতে এটাই আবার বিস্তারে আসবে। সৃষ্টি হয়ে গেলেই তো সব হয়ে যাবে না, সৃষ্টিকে তো এবার ধরে রাখতে হবে। সেইজন্য তৃতীয় বলছেন, এই স্থিতিটা কিভাবে হয়। স্থিতিটা কিভাবে হয়, সেটাকে পরিভাষিত করতে গিয়ে নিয়ে আসছেন ধর্ম। সৃষ্টি ও ধর্মকে নিয়ে বলার আগে একটা ছোট্ট কথা বলে নিতে হয়। বেদের সুস্পষ্ট বক্তব্য ঈশ্বর থেকে সমস্ত সৃষ্টি। হিন্দুরা কখনই বলে না, সৃষ্টি শূন্য থেকে এসেছে, এবং শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে।

ভগবান যখন সৃষ্টি করেন, তিনি এলোপাতাড়ি কিছু সৃষ্টি করেন না। সৃষ্টি রচনার পিছনেও ভগবানের একটা বিধান আছে। ভগবানের এই বিধানেরও একটা টেকনিক্যাল টার্ম আছে, যাকে বলা হয় ***ঋতম্***। ঠাকুরের আরাত্রিক বন্দনায় স্বামীজীও ঠাকুরকে বলছেন, *ওঁ হ্রীং ঋতম্; ঋতম্* বেদের শব্দ। স্বামীজী ঠাকুরের স্তবে তিনটে শব্দ নিয়ে আসছেন, ***ওঁ*** হল সেই ভগবানের, শ্রীরামকৃষ্ণের

প্রতীক, ***হ্রীং*** হল শক্তির প্রতীক, আর ***ঋতম্*** হল বিধি-বিধান, যেটা দিয়ে ঠাকুর এই সৃষ্টি রচনা করেছেন, আর যেটাকে দিয়ে তিনি এই সৃষ্টিকে পালন করছেন। মুণ্ডকোপনিষদের বিখ্যাত মন্ত্র, যা আমরা অনেক জায়গায় লেখা দেখতে পাই, *সত্যমেব জয়তে নানৃতং, নানৃতং* এর সন্ধি ভাঙলে হয় *ন+অনৃতম্*। ঋতমের বিপরীত হল *অনৃত*। *ঋতম্* অনেক অর্থেই ব্যবহৃত হয়, সত্যের অর্থে আসে, ধর্মের অর্থে আসে, তপস্যার অর্থে আসে, অনেকগুলো অর্থেই আসে। আমাদের শাস্ত্রে এখন আর ঋতম্ শব্দের সে-রকম ব্যবহার হয় না। *ঋতম্* শব্দ ধীরে ধীরে ধর্মে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আচার্য এখানে সংক্ষেপে, ঈশ্বর, সৃষ্টি, সৃষ্টি তত্ত্ব আর ধর্ম, এই তিনটেকে নিয়ে আলোচনা করছেন।

ধর্ম কোথায় পাওয়া যাবে? শাস্ত্রে। গীতা শাস্ত্র, শুধু শাস্ত্রই না, আমরা আগে বললাম কিভাবে গীতা মোক্ষশাস্ত্র। সেইজন্য গীতার কি বৈশিষ্ট্য সেটার আলোচনা করা দরকার। আমাদের আচার্যের এই সম্বন্ধ ভাষ্যের প্রত্যেকটা লাইনকে ধরে ধরে আলোচনা করতে হবে, তা নাহলে আমরা হারিয়ে যাব। তবে এটুকু মনে রাখলেই হবে –আচার্য এখানে এই চারটে জিনিসকে নিয়ে আলোচনা করছেন –ঈশ্বর, ঈশ্বরের স্বরূপ, বিশেষ করে অবতার রূপে, সৃষ্টি, স্থিতি আর তার সাথে ধর্ম। এই কয়েকটি জিনিস যার পরিষ্কার হয়ে যাবে, গীতা বুঝতে তার অনেক সহজ হবে। আমরা আগেও বলেছি, পরেও আবার বলতে হবে – ভাসা ভাসা গীতা বুঝতে হলে কোন ব্যাপারই না, গীতার যে কোন একটা বই খুলে অর্থ দেখে নিলেই হল; কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবে না। গীতাকে বুঝতে হলে অনেক গভীরে যেতে হবে।

এটা খুবই আশ্চর্যের যে, আচার্য পুরাণের একটি মন্ত্র দিয়ে গীতার ভাষ্য রচনা শুরু করছেন। পুরাণের মন্ত্র দিয়ে শুরু করাতে এটা প্রমাণ করছে, বেদ যা বলছে উপনিষদও তাই বলছে, গীতাও তাই বলে আর পুরাণও তাই বলে, সব শাস্ত্র একই কথা বলছে।

ওঁ নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্।
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী।।

আচার্য এমন একটি মন্ত্রকে নিয়ে এসেছেন যে মন্ত্র দিয়ে পুরো হিন্দুধর্মের পুরো দর্শনকে স্পষ্ট করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। এটি একটি প্রণাম মন্ত্র। আগেকার দিনে লেখকরা যে কোন বড় কিছু রচনা শুরু করার আগে একটা প্রণাম মন্ত্র দিয়ে তিনি শুরু করতেন। আচার্শ শঙ্কর একজন খুব বড় কবি ছিলেন, তাঁর রচিত অনেক স্তুতি আছে, স্তোত্র ও প্রার্থনা আছে। কিন্তু প্রণাম মন্ত্রটি তিনি নিজে রচনা না করে পুরাণ থেকে নিয়ে এলেন। এর দ্বারা আচার্য প্রমাণিত করে দিচ্ছেন, হিন্দু ধর্মের সমস্ত শাস্ত্র একই কথা বলে।

আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি হিন্দুদের মূল শাস্ত্র বেদ। কিন্তু বেদের প্রচুর সীমাবদ্ধতা আছে। প্রথম কথা বেদের ভাষা অনেক প্রাচীন, বৈদিক সংস্কৃত একটা আলাদা category, সংস্কৃতের মধ্যে ধরাই হয় না। দ্বিতীয় হল, প্রথমের দিকে চারটি বর্ণেরই বেদ পাঠের অধিকার ছিল। পরের দিকে শুধু ব্রাহ্মণরাই বেদ পড়তে ও পড়াতে শুরু করলেন। সেখান থেকে দেখা গেল, যারা ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী, যারা আশ্রমে গিয়ে বেদ অধ্যয়ন করত, তারা ছাড়া আর কেউ বেদ অধ্যয়ন করতে পারত না। তৃতীয়ত, সময়ের সাথে বেদের ভাষা, বিষয়বস্তু ধীরে ধীরে এমন ভাবে হারিয়ে গেল যে, বেদের কিছুই বোঝা সম্ভব না। আমাদের মধ্যে প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে আমরা এখন যে বেদ পড়ছি, এগুলো কি পড়ছি? আমরা এখন যে বেদ পড়ছি, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সায়নাচার্য বেদের ভাষ্য লিখলেন। সায়নাচার্যের ভাষ্য আসার পর আমরা আজকে বেদ বুঝতে পারছি। সায়নাচার্যের ভাষ্য পড়ে প্রথমের দিকে অনেকেই বলতেন, উনি বেদের অর্থগুলি নিজের মত করেছেন; কিন্তু পরে পরে অনেক গবেষণা ও অনুসন্ধান করে দেখা যাচ্ছে উনি যেটা বলেছেন, সেটাই ঠিক। মূল কথা হল, আমরা বেদ আজ যতটা বুঝতে পারছি, সায়নাচার্যের জন্য। ঠিক তেমনি, আজ যে আমরা উপনিষদ

বুঝতে পারছি শঙ্করাচার্যের জন্য। গীতা অনেক পরের কাজ, যেটা পরের কাজ সেটা অনেক সহজে বোঝা যায়। পুরনো দিনের কাজকে বোঝা যাবে না, কারণ ভাষা পাল্টে গেছে।

ভারতের আধ্যাত্মিক ভূমিতে ব্যাসদেবের আবির্ভাবের পর উনি দেখলেন, বেদ যেভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অগোছাল অবস্থায় রয়েছে, এভাবে থাকলে বেদ একদিন ইতিহাসের গহ্বরে হারিয়ে যাবে। উনি তখন সমস্ত বেদরাশিকে সংগ্রহ করে এক জায়গায় নিয়ে এলেন। বেদ সংকলন করার পর উনি দেখছেন, এই বেদ সাধারণ মানুষ কিছুই বুঝতে পারবে না। উনি তখন রচনা করলেন মহাভারত। বেদের যা কিছু বক্তব্য, সবটাই উনি মহাভারতে ঢেলে দিলেন। বেদেরই শেষ অংশ হল উপনিষদ। প্রত্যেকটি ধর্মের, তা সে যে ধর্মই হোক, সবারই চারটি করে শাখা থাকে। প্রথমটি হল দর্শন। যে কোন ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে সেই ধর্মের নিজস্ব দর্শনের উপর, যে কোন ধর্মের যদি দর্শন না থাকে, সেই ধর্ম নাশ হয়ে যাবে। ওই দর্শনকে আবার আধ্যাত্মিকতার উপর আধারিত হতে হবে। এখন যেমন একটা নূতন ইজম্ এসেছে, বলছে হিউম্যানিজিম্, কিন্তু হিউম্যানিজিম্ কোন ধর্ম নয়, কারণ কোন দর্শন নেই তার। একজন বাবাজী ইদানিং বলতে শুরু করেছে, science is my religion, খুব ভাল কথা। কিন্তু তোমার দর্শনটা কি? কিছুই নেই। ধর্ম মানে তার প্রথম স্তম্ভ হবে দর্শন। হিন্দু ধর্মের দর্শন পুরোটাই আসে বেদ থেকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা জায়গায়তে দর্শন focus করা আছে, সেটা হল উপনিষদ, আর তার সাথে গীতা। গীতা অবশ্য মহাভারতের অংশ। এর আগে আমরা বললাম গীতা হল উপনিষদের সার, উপনিষদ আর গীতা মিলে হিন্দু ধর্মের দর্শন তৈরী হয়েছে।

ধর্মের দ্বিতীয় স্তম্ভ হল, কথা-কাহিনী বা পুরাণ। হিন্দুদের কথা-কাহিনী আসে বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণ থেকে। এর আগে বলা হল, কথা-কাহিনী যদি না থাকে, তাহলে আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি আমরা ধরতে পারব না। ধর্মের তৃতীয় স্তম্ভ আসে, পূজা, অর্চনা বিধি থেকে। পূজা অর্চনা আমরা কিভাবে করব? সেটা আসে মূলতঃ তন্ত্র থেকে, আর কিছুটা আসে পুরাণ থেকে। আমরা যে নিত্য বা বিশেষ পূজা-অর্চনাদি করি, তার বেশীর ভাগটা এসেছে হয় তন্ত্র থেকে, নয়তো পুরাণ থেকে। পুরাণ থেকে কম আসে, পুরাণ মানেই বেদ থেকে আসছে, যেমন সরস্বতী পূজা বৈদিক পূজা, কালীপূজা আবার তন্ত্রের পূজা, দূর্গাপূজা আবার তন্ত্র ও বেদ দুটো মিলিয়ে করা হয়। বেদের সব পূজা কখন রাত্রিতে হয় না, সব দিনেই সম্পন্ন করতে হয়। অথচ বিবাহ অনুষ্ঠান পুরো বৈদিক মন্ত্র দিয়ে হয়, কিন্তু রাত্রিবেলা হয়; এটাই একটা ব্যতিক্রম। ধর্মের চতুর্থ ও শেষ স্তম্ভ হল আচার-সংহিতা, আচার-সংহিতা আসে স্মৃতি থেকে। হিন্দুদের শত শত স্মৃতিশাস্ত্র রয়েছে, এর মধ্যে সব থেকে নামকরা মনুস্মৃতি।

বেদকে কোন দিন পাল্টানো যাবে না, বেদ যেমনটি আছে তেমনটিই থাকবে। কিন্তু দর্শন, কথা কাহিনী, পূজা-অর্চনা আর আচার-সংহিতা, এই চারটে পাল্টাতে থাকে। যেমন স্বামীজীর দেববাণী, এটাও একটা দর্শন, হিন্দু ধর্মের দর্শনকে ব্যাখ্যা করছে। এটাও পুরো বেদের উপর আধারিত, কিন্তু সময়োপযোগী করে নূতন করে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে। আমরা এই চারটের সবটাতে নূতন করে সংযোজন করতে পারি, কিন্তু বেদে কোন ভাবে হাত দেওয়া যাবে না। ব্যাসদেব বেদকে যেভাবে বেঁধে দিয়ে গেছেন, সেভাবেই তাকে রাখতে হবে। কোন গ্রন্থকে আমরা বলতে পারি কলিযুগের বেদ, বা পঞ্চম বেদ কিন্তু বেদ মানে সেই চারটি বেদ, যাতে কোন ভাবেই হাত দেওয়া যাবে না। তবে দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র ও স্মৃতি এই চারটেতে হাত দেওয়া যাবে।

পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ, যে গ্রন্থের এই পাঁচটি লক্ষণ থাকবে সেটাকেই পুরাণ বলা যাবে। প্রথম লক্ষণ হল সৃষ্টি, সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে পুরাণ বর্ণনা করে। সৃষ্টির এই বর্ণনা কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীকে আধার করে। আমি যদি বলে সৃষ্টির বর্ণনা বিজ্ঞানের সাথে মিলছে না, তাহলে বলা হবে;

মেলানোটা বিজ্ঞানের কাজ, সেটা পুরাণের নয়। আর্যভট্ট, ভাস্করের মত বিজ্ঞানীরা সৃষ্টিকে বিজ্ঞানের সাথে মিলিয়ে বলবেন। পুরাণাকাররা বলবেন, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে। পুরাণে এটাই বলছেন *ওঁ নারায়ণঃ পরোহব্যক্তাদ্*,, ওঁ রূপী নারায়ণ, তিনি প্রকৃতি, cosmic energy, সমষ্টির সব কিছুর পারে। গীতার সপ্তম অধ্যায়ে এই জিনিসটার উপর বিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর বলছেন, সেখান থেকে হিরণ্যগর্ভের জন্ম, যেটাকে বলা হয় ব্রহ্মাণ্ড। তার সাথে বলছেন সেই ব্রহ্মাণ্ডেই *অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী*। তার মানে এই চোখে সমস্ত লোকের যা কিছু দেখা যাচ্ছে, যার মধ্যে অন্তরীক্ষ, galaxy, super galaxis, ইত্যাদি সব আছে; আবার ধ্যানের গভীরে যে জিনিসগুলো দেখা যায়, যেমন ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ, জনঃ, মহঃ, তপঃ, সত্য এই সাতটি লোকের যে কথা বলা হয়, এর সবটাই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত। ভূঃ, ভূবঃ আদি এগুলো আধ্যাত্মিক লোক, যাঁরা ধ্যান ধারণা করেন তাঁরা এগুলো দেখতে পান। বলছেন, যে সৃষ্টিটা আমার চোখের সামনে আছে, যে সৃষ্টিটা আমার চোখের সামনে নেই, যে সৃষ্টিটা শেষ হয়ে গেছে আর যে সৃষ্টিটা আগামী দিনে আসবে, এর সমস্ত কিছু হচ্ছে cosmic energyর জন্য। এই cosmic energyর জন্ম ঈশ্বরের ইচ্ছাতে, কিন্তু তিনি এরও পারে। হিন্দুরা তাই এটাই মনে করে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান। তিনি ইচ্ছা করলেন সৃষ্টি হোক, সৃষ্টি হয়ে গেল। কিভাবে হল? বলছেন, energy রূপে।

সত্ত্ব, রজ ও তম, এই তিনটে শব্দ হিন্দুদের যে কোন শাস্ত্রের আলোচনায় ঘুরে ঘুরে আসবে। গীতাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। রজোগুণ মানে যেখানে ক্রিয়া ও ক্রিয়াকলাপ রয়েছে, তমো মানে যেখানে জড়তা, স্থবিরতা রয়েছে আর সত্ত্বগুণ সব কিছুকে ভারসাম্য করছে। তিনটে প্রাইমারী রঙ মিলে বিশ্বের সমস্ত রঙের সৃষ্টি করে, ঠিক তেমনি এই তিনটে গুণ মিলে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম দিয়েছে। *সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী*, পৃথিবীকে এনারা সপ্তদ্বীপা বলতেন, সাতটা দ্বীপ নিয়ে এই পৃথিবী। কেন বলতেন আমাদের জানা নেই। তখনকার দিনে ঋষিদের আমেরিকা, ইউরোপ সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল কিনা আমাদের সন্দেহ আছে। ভারতবর্ষকে ওনারা জম্বুদ্বীপ বলতেন। অনেক সময় বর্ণনা করা হয়, গঙ্গা যমুনা নদীর মাঝখানটা একটা দ্বীপের মত ছিল, আর সেখানে প্রচুর জাম গাছ ছিল, সেইজন্যই জম্বুদ্বীপ বলছেন কিনা জানা নেই। এনাদের কাছে ছিল মেদিনী হল পৃথিবী, এই পৃথিবীতে সাতখানা দ্বীপ, এর সবটাই ভগবানের সৃষ্টি। এখানে এসে আচার্য থেমে যাচ্ছেন, এরপর বলছেন –

***স ভগবান সৃষ্ট্বেদং জগৎ, তস্য চ স্থিতিং চিকীর্ষুঃ মরীচ্যাদীনগ্রে সৃষ্ট্বা, প্রজাপতীনুপ্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম গ্রাহয়ামাস বেদোক্তম্। ততোহন্যাংশ্চ সনকসনন্দনাদীনুৎপাদ্য, নিবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং গ্রাহয়ামাস*।**

এই অংশটাও আচার্য ভাগবত পুরাণ থেকেই নিয়েছেন, তবে তিনি নিজের মত করে একটু অন্য ভাবে বলছেন –*স ভগবান*, মানে সেই যিনি নারায়াণ তিনি এই জগৎ বা লোক, এখানে ভূঃ, ভূবঃ ও স্ব অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ আর স্বর্গ এই তিনটে লোক সৃষ্টি করলেন। পরের দিকে বলা হয় উপরে সাতটা লোক আর নীচের দিকে সাতটা লোক নিয়ে এই চতুর্দশভুবন। আচার্য ভালো করে জেনে বুঝেই পুরাণের একটা মন্ত্র দিয়ে শুরু করেছেন। তার কারণ, যদিও উপনিষদ সৃষ্টিকে অত গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু গীতা জগৎকে একেবারে সত্য বলে মনে করে নিয়ে এগিয়ে গেছে। জগৎ যদি সত্য হয় তাহলে তার সৃষ্টিটাও পুরোপুরি সত্য হতে বাধ্য। মানুষ যেমন সত্য, মানুষের সমস্যাও ততটাই সত্য। ভগবান তো সৃষ্টি করে দিলেন, তাঁর ইচ্ছাতে সৃষ্টি হয়ে গেল। সৃষ্টি হয়ে গেলেই তো হবে না, তাঁর রক্ষণা-বেক্ষণ তো করতে হবে। শুধু টাকা আয় করে গেলেই তো হবে, টাকাকে ঠিক মত রাখতে হবে, সঞ্চয় করতে হবে, খোঁজ নিতে হবে কোথায় ইনভেস্ট করলে বেশী সুদ পাওয়া যায়, ইনকাম ট্যাক্স থেকে বাঁচাতে হবে। চোর ডাকাতরা যেন টাকা-পয়সা লুট করে না নিয়ে যেতে

পারে ইত্যাদি। ঠিক সেই রকম জীব সৃষ্টি করলেই তো হবে না, জীবকে, জীবের জীবনকে সব দিক দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়।

আমরা ভগবানরই মূর্তি, ভগবান চাইছেন আমি সৃষ্টি করলাম, এই সৃষ্টিকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। শ্রীমা বলছেন, যিনি সৃষ্টি করেন তিনিই জানেন, সৃষ্টিকে সামলে রাখা কত কঠিন। আমরা বলে থাকি, তাঁর ইচ্ছা হলে এক্ষুণি সব কিছু হাজির হয়ে যেতে পারে। আমরা মনে করি ভগবান একজন ম্যাজিশিয়ান, কিন্তু ভগবান কোন ম্যাজিশিয়ান নন। আমরা এখানে কথা বলছি, হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র আর বাঁশি নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়ে গেলেন, ভগবান কোন জাদুকর নন, ভগবান কখনই আমাদের এই ধরণের জাদুখেলা দেখান না। ভক্তরা মনে করে ঠাকুর মা মা করে কাঁদতেন বলে ঠাকুরের মা কালীর দর্শন হয়েছিল, ভক্তরাও তাই ভাবে আমরা এত জপ করছি, এত ঠাকুরকে ডাকছি, কই আমাদের তো ঠাকুরের দর্শন হচ্ছে না। এগুলো সব মুর্খ ভক্তদের চিন্তা-ভাবনা।

আসলে বলা হয়, ভগবান হলেন সর্বশক্তিমান, তিনি সবারই উপরে। তাঁর ইচ্ছামাত্রই যেমন সৃষ্টি হয়ে গেল, তেমনি তাঁর ইচ্ছামাত্রই এই সৃষ্টির সংহার হয়ে যাবে। তার মানে এই নয় যে, ভগবান হঠাৎ এসে বলবেন, ভারতবর্ষে এখন প্রচুর গোলমাল, দুর্নীতিতে দেশটা গোল্লায় চলে গেছে; চলো দেশটাকে এক্ষুণি শেষ করে দেওয়া যাক। ভগবান কখনই এভাবে কোন কিছুকে নাশ করে দেবেন না। যেটাকে তিনি সৃষ্টি করে দিয়েছেন, এবার সেটাকে তিনিই রক্ষা করেন। কিভাবে রক্ষা করেন? রক্ষা করার জন্য তিনি কি করেন?

মরীচ্যাদীনগ্রে সৃষ্ট্বা, প্রজাপতীন্‌প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম গ্রাহয়ামাস বেদোক্তম্‌। বেদ প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের কথা বলছেন, প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম মানে, যেখানে কাজ করতে হচ্ছে। প্রবৃত্তি মানে কোন একটা কিছুতে মনকে লাগানো; আমরা যেমন বলে থাকি, আমার এই কাজে বা এই জিনিসে প্রবৃত্তি নেই। বেদে একটা ধর্ম হল, যেখানে কোন কিছু করা হয়, সহজ ভাষায় বলা যেতে পারে, Path of action। হিন্দু ধর্মের প্রথম পথ হল, Path of action, কাজ কর, কাজ করে যাও। তার সাথে বলছেন, *প্রজাপতীন্‌*, এটা বোঝার জন্য আমাদের একটু পিছনের দিকে যেতে হবে, যদিও এখানে এটা আমাদের বিষয় নয়।

ভগবান ম্যাজিকালী কিছু সৃষ্টি করেন না। সৃষ্টিতে প্রথম আসে হিরণ্যগর্ভ, যেটা ভগবানের প্রথম রূপ, যাকে আমরা ব্রহ্মাণ্ড বলছি; যেটাকে স্বামীজী দেশ, কাল, নিমিত্ত বলছেন। এই দেশ, কালের যে পর্দা, সেখানে এই ভগবানকে দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মা রূপে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ ভগবানেরই তিনটে রূপ। আগেকার দিনে পর্দার পিছনে আলো ফেলে হাত ও আঙুল নাড়িয়ে ছায়ার মাধ্যমে অনেক খেলা দেখানো হত। ভগবান পর্দার পিছনে আছেন, পর্দাটাই হল মায়া, এই পর্দাই প্রকৃতি, এই পর্দাটাই শক্তি। এবার তিনি যে দেখা দিচ্ছেন, এখানে তিনি তিনটে রূপে দেখা দেন– সৃষ্টি কর্তা, পালন কর্তা ও সংহার কর্তা। সৃষ্টি কর্তাকে বলা হয় ব্রহ্মা, পালন কর্তা বিষ্ণু এবং সংহার কর্তা হলেন শিব। এটা দিয়েই বোঝা যায় যে, সৃষ্টিতে একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। সৃষ্টি হঠাৎ দুম্‌ করে কিছু হয়ে যাচ্ছে না।

বাইবেল বলছেন, Let there be light and there was light, তারপরেই বলছেন, তিনি পৃথিবী তৈরী করলেন, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র সব কিছু তৈরী করলেন। কিন্তু আমাদের সৃষ্টিতত্ত্বে এভাবে কিছু হয় না। বেদ বা পুরাণে হিন্দুদের সব শাস্ত্রই দেখিয়ে আসছে যে, সৃষ্টি ম্যাজিকালি কিছু হয় না। খ্রীশ্চানদের সৃষ্টিকে বলে creationist theory। আমাদের সৃষ্টি creationist theoryতে হয় না। শ্রীমাও এক জায়গায় সৃষ্টির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলছেন, চিত্রকার যেমন ছবি বানায়, ভগবান সেভাবে সৃষ্টি করেন না, বীজ থেকে অঙ্কুর, সেখান থেকে যেভাবে গাছ বড় হয়, সৃষ্টি

সেভাবে হয়। চিত্রকর কোন মানুষের ছবি আঁকছেন, তিনি তাঁর খুশী মত প্রথমে হাতটা আঁকতে পারেন বা পা আঁকতে পারেন। কিন্তু সৃষ্টিতে গাছের ক্ষেত্রে আগে ফল এসে গেল, তারপর গাছ হল, এ রকম কিছু হয় না। তার মানে, যতক্ষণ আমরা এই সৃষ্টিতে আছি ততক্ষণ কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকবে। সৃষ্টির মধ্যে একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকে।

ব্রহ্মা যখন বুঝে গেলেন তাঁকে সৃষ্টি করতে হবে, তখন তিনি ধ্যানের গভীরে চলে গেলেন। তপস্যা করে তিনি পুরোপুরি সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন, তাঁর শুদ্ধ পবিত্র মন থেকে চার কুমারের সৃষ্টি হল – সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার। আচার্য এখানে আগে প্রজাপতিদের কথা বলছেন, যদিও পুরাণে এভাবে নেই। আচার্য কেন প্রথমে প্রজাপতিদের নিয়ে আসছেন আমাদের জানা নেই। আচার্য বলছেন, ভগবান প্রথমে প্রজাপতিদের সৃষ্টি করলেন। যাই হোক, ব্রহ্মার শুদ্ধ পবিত্র মন থেকে এই চার কুমারের জন্ম হওয়ার জন্য চারজনেরই মন একেবারে শুদ্ধ পবিত্র।

ভারতবর্ষে এখনও অনেক দম্পতি পাওয়া যাবে, বিয়ের পর তাঁরা যখন সন্তান লাভের ইচ্ছা করেন, তখন তাঁরা মন্দিরে মন্দিরে পূজা দিতে থাকেন। ইদানিং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও স্বীকার করছে, অন্তঃসত্ত্বা মায়ের মনে যে ধরণের চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকে, সেই চিন্তা-ভাবনা গর্ভস্থ সন্তানের উপর ছাপ ফেলে। মনু তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে পরিষ্কার বলছেন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে পাওয়া যে সন্তান, এই সন্তানই ঠিক ঠিক সন্তান। স্বামীজীও বলছেন, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যে সন্তান আসে, এই সন্তানই সমাজের আশীর্বাদ স্বরূপ। কারণ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে মন শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায় কিনা। এখানেও চারজন কুমার ব্রহ্মার শুদ্ধ পবিত্র মন থেকে সৃষ্টি। এনাদেরও মন তাই শুদ্ধ পবিত্র; এত শুদ্ধ পবিত্র যে তাঁরা জন্ম নিয়েই বলে দিলেন, আমরা সংসারের দিকে যাচ্ছি না। এই কথা বলে তাঁরা কমণ্ডুলু নিয়ে তপস্যায় বেরিয়ে গেলেন। এতে আবার ব্রহ্মা খুব মনঃক্ষুণ্ণ হয় গেলেন, আমি সংসার দাঁড় করাতে চাইছিলাম, আর এত কষ্ট করে এদের সৃষ্টি করলাম যাতে আমাকে সৃষ্টির কাজে সহায়তা করে, কিন্তু চারজনের কেউ আমাকে সাহায্য না করে সবাই তপস্যায় বেরিয়ে গেলেন!

ব্রহ্মার ভিতর রাগ উৎপন্ন হওয়াতে ওনার মধ্যে রজো গুণের আধিক্য এসে গেল। রজোগুণ আসাতে শুদ্ধ পবিত্রতা কিছুটা কমে গেল। চব্বিশ ক্যারেট সোনা দিয়ে গয়না হবে না। সন্ন্যাসীদের মধ্যে যাঁরা কাজ করতে চান না, তাঁদেরকে বলা হয় চব্বিশ ক্যারেট সোনা, এনাদের দ্বারা কিছু হবে না। স্বামী প্রেমেশানন্দ খুব মজা করে বলতেন, He is so good, so good that he is good for nothing। সংসারের দিক থেকে ব্রহ্মার প্রথম যে সৃষ্টি সেটাও so good so good কিন্তু good for nothing। জাগতিক দৃষ্টিতে, সাংসারিক দৃষ্টিতে তাঁরা কোন কাজের নন, ঈশ্বর চিন্তন ছাড়া তাঁরা কিছু জানেন না। আজও তাঁরা সৃষ্টিতে আছেন, আজও তাঁরা সেই প্রথম দিনের মত বাচ্চা কুমার, কিন্তু জ্ঞানে পরিপক্ক। ব্রহ্মা রেগে যাওয়ার পর তাঁর মন থেকে এবার যাঁরা সৃষ্টিতে এলেন, এনাদেরকেই বলা হয় প্রজাপতি।

প্রজাপতিদের মধ্যে যাঁরা খুব উচ্চমার্গের ছিলেন, তাঁরা হলেন সাতজন ঋষি। সপ্তর্ষিতে যে সাতজন ঋষিদের নাম পাওয়া যায়, বিভিন্ন পুরাণে এই নামগুলো পাল্টে যায়। কিন্তু যে সাতজন খুব নামকরা ঋষির নাম পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন মরীচ, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু আর বশিষ্ঠ। এখানে বলতে চাইছেন সপ্তর্ষির ঋষিরা সবাই খুব উচ্চমার্গের ঋষি। আচার্য এখানে বলছেন *মরীচাদি*। এখানে এর অতটা গুরুত্ব নেই, কিন্তু আমাদের ঋষিদের নামগুলো জেনে রাখা ভাল। প্রজাপতিদের কাজ হল জগতে সৃষ্টির প্রসার করা, কিন্তু নারীরা কোথা থাকে আসছেন সেই ব্যাপারে কিছু বলা নেই। তবে এনারাও সবাই ধ্যানের মাধ্যমেই সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। প্রজাপতিদের অনেক সন্তানাদি হল, অন্য সপ্ত ঋষিরা আছেন, তাঁদেরও বিবাহ হল। ব্রহ্মা দেখছেন ধ্যানের মাধ্যমে সৃষ্টি খুব মন্থর ভাবে এগোচ্ছে; এভাবে ধ্যানের মাধ্যমে মন দিয়ে সৃষ্টি করলে সৃষ্টি এগোবে না। তখন তিনি নারী ও

পুরুষ রূপে নিজেকে বিভাজন করে দিলেন। ব্রহ্মার বিভাজনে এলেন মনু ও শতরূপা। সেই থেকে প্রজনন ক্রিয়া দিয়ে সৃষ্টি শুরু হল। এরপর ধীরে ধীরে এই প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি ছেয়ে গেল।

এখানে এত যা কিছু বলা হল, এগুলো বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আচার্য বলছেন, যখন সৃষ্টি হয় তখন মরীচাদি, যাঁরা প্রজাপতি, তাঁদেরকে ভগবান কর্ম করা শেখালেন। আর তার সাথে আচার্য বলছেন, *ততোঽন্যাংশ্চ সনকসনন্দনাদীনুৎপাদ্য, নিবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং গ্রাহয়ামাস*, তারপর ভগবান সনক সনাতনাদিকে নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম দিলেন। নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম সম্বন্ধে বলছেন, *জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং*, এই ধর্মে জ্ঞান আর বৈরাগ্য রয়েছে। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম দিয়েও জ্ঞান বৈরাগ্য হয়, আমাদের অনেকের মনেই প্রশ্ন ওঠে, সংসারে কি আমাদের কিছু হবে না? কেন হবে না, গীতা শুরুই করছে প্রবৃত্তি দিয়ে। ঋষিরা সবাই প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মে ছিলেন। ঈশোপনিষদে প্রথম মন্ত্রটাই হল সন্ন্যাসীদের জন্য, দ্বিতীয় মন্ত্র যাঁরা সংসারে আছেন তাঁদের জন্য। সংসার মানে, যেখানে মানুষ কাজ করে এগোতে চাইছে, তাদের জন্য প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। এখানে বলছেন, প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, এই দুটি ধর্ম ভগবান নিজেই শেখালেন তাঁর দুই ধরণের সন্তানদেরকে, সনক সনন্দনাদি আর মরীচাদিদের। এই কথা বলার পর আচার্য বলছেন –

দ্বিবিধো হি বেদোক্ত ধর্মঃ, প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চং জগতঃ স্থিতি কারণম্। প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সহেতুর্যঃ স ধর্মো ব্রাহ্মণাদ্যৈর্বর্ণিভিরাশ্রমিভিশ্চ শ্রেয়োর্থিভিরনুষ্ঠীয়মানঃ। দীর্ঘেণ কালেন অনুষ্ঠাতৃণাং কামোদ্ভবাৎ হীয়মানবিবেকবিজ্ঞানহেতুকেন অধর্মেণ অভিভূয়মানে ধর্মে প্রবর্ধমানে চ অধর্মে, জগতঃ স্থিতিং পরিপিপালয়িষুঃ স আদিকর্তা নারায়ণাখ্যো বিষ্ণুর্ভৌমস্য ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য চাভিরক্ষণার্থং দেবক্যাং বসুদেবাৎ অংশেন কৃষ্ণঃ কিল্ সম্বভূব। ব্রাহ্মণত্বস্য হি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্যাদ্বৈদিকো ধর্মঃ, তদধীনত্বাৎ বর্ণাশ্রমভেদনাম্।

দ্বিবিধো হি বেদোক্ত ধর্মঃ, প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ, এই লাইনটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। কথাগুলো আমাদের মনে থাকার কথা নয়, কিন্তু এর ভাবটাকে আমাদের মনের মধ্যে বসিয়ে নিতে হবে। বেদের যে ধর্ম, অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, দুটোকেই সমান ভাবে গুরুত্ব দেয়। বিশ্বে একমাত্র হিন্দু ধর্মই দুটো ধর্মকে সমান গুরুত্ব দেয়, অন্য কোন ধর্ম এভাবে দুটোকে সমান ভাবে গুরুত্ব দেয় না। যেমন খ্রীষ্ট ধর্ম পুরোপুরি বৈরাগ্যের ধর্ম, সন্ন্যাসীর ধর্ম। যদিও খ্রীশ্চানরা বিশ্বে ধর্মের নামে বেশী লুটপাট করেছে। ভগবান বুদ্ধের ধর্মও সন্ন্যাসীর ধর্ম। অন্য দিকে জুহুদিদের ধর্ম পুরোপুরি গৃহস্থ ধর্ম, তাদের সন্ন্যাসের কোন ধারণাই নেই। পার্সীদের ধর্মেও সন্ন্যাসের কোন ধারণা নেই। একমাত্র হিন্দু ধর্মে দুটোকেই আদর্শ রূপে নেওয়া হয়েছে, আদর্শ গৃহস্থ ধর্ম এবং আদর্শ সন্ন্যাসের ধর্ম, দুটো প্রথম থেকেই চলে আসছে। আচার্য শঙ্কর তাই পরিষ্কার বলছেন, বেদের ধর্ম এই দুই প্রকার – প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম। যাঁরা সন্ন্যাসী তাঁরা নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করেন। নিবৃত্তি পথের লক্ষণ হল –জ্ঞান ও বৈরাগ্য। এই জ্ঞান মানে ঈশ্বরের জ্ঞান, ফিজিক্স কেমেস্ট্রি, ইতিহাসের জ্ঞান না। সংসারীদের ধর্ম প্রবৃত্তিলক্ষণ, প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম বলে তুমি কাজ কর, কর্মেই তুমি প্রবৃত্ত হও।

এরপর আচার্য ধর্মকে পরিভাষিত করছেন। জগতের যখন স্থিতি হয়, *জগতঃ স্থিতি কারণম্* আর তার সাথে বলছেন *প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সহেতুর্যঃ স ধর্মো*, ধর্ম মানে অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স। যে ধর্ম শুধু জাগতিক উত্থানের কথা বলে, সেই ধর্ম সম্পূর্ণ ধর্ম না, অসম্পূর্ণ ধর্ম কখনই ঠিক ঠিক ধর্ম হতে পারে না। অন্য দিকে যে ধর্ম শুধু ত্যাগের কথাই বলে, সেই ধর্মও সম্পূর্ণ ধর্ম নয়, ঠিক ধর্ম নয়। ঠিক ঠিক ধর্ম দুটোরই কথা বলবে, সংসার-ধর্মের কথাও বলবে, এবং ত্যাগের কথাও বলবে। কারণ প্রকৃত ত্যাগীর সংখ্যা খুব কম হয়। ত্যাগীরাও সংসারীদের উপরই দাঁড়িয়ে আছে। শঙ্করাচার্যের কোন চাষের জমি ছিল না, চাষবাশ করতেও জানতেন না, খাওয়ার জন্য ভিক্ষা

করতে হবে। ভিক্ষা মানে, তাঁকে গৃহস্থের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। গৃহস্থ ধর্মের উপরেই সবাই দাঁড়িয়ে আছে।

ব্রাহ্মণাদ্যৈর্বর্ণিভিরাশ্রমিভিশ্চ শ্রেয়োর্থিভির্নুষ্ঠীয়মানঃ, বলছেন সমাজে যাঁরা আছেন, যদি তাঁরা চান আমি ভাল হব, যদি তুমি তোমার ভাল চাও। হিন্দুরা কাউকে জোর করেন না, সেইজন্য হিন্দুরা ধর্মান্তরণ করে না। বলছেন, সমাজে যাঁরা আধ্যাত্মিক পুরুষ তাঁরা সমাজে এই ধর্মটাকে ধরে রাখেন। যাঁরা ধর্মকে ধরে রাখতেন, তাঁদের বলা হত ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বর্ণকে এখানে শ্রেষ্ঠ বর্ণ বলতে চাইছেন না, আমাদের শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছেন, যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানে বিচরণ করেন, ঈশ্বরের জ্ঞানে যাঁরা সব সময় ডুবে আছেন। আমরা 'পাণ্ডা' শব্দটা শুনে থাকি, 'পাণ্ডা' শব্দের অর্থ হল, *আত্মবিষয়ক ধৃতি এষা তে পাণ্ডা*। পণ্ডিত বা পাণ্ডা কে? আত্মবিষয়ে যাঁর বুদ্ধি আছে। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে যাঁরা ধরে রাখেন, তাঁরাই ব্রাহ্মণ। মনুস্মৃতিতে অনেকবার বলা হচ্ছে, যার বেদের বোধে ডুবে নেই, যাঁরা বেদরূপী আচরণ করেন না, তাঁরা ব্রাহ্মণ না।

বর্ণাশ্রমের উপর পরে আরও বিস্তারে আলোচনা করা হবে। এখানে সংক্ষেপে হল, আমাদের মনে রাখতে হবে আচার্য শঙ্কর ছিলেন অষ্টম শতাব্দীতে, আমরা বার'শ বছর আগেকার শাস্ত্র পড়ছি। যখন অবতাররা আসেন, বড় আচার্যরা যখন আসেন, তাঁরা কোন কিছু ভাঙতে আসেন না। আজকে আমরা রাস্তায় নেমে বলতে পারি, সমাজের এই ভুল, সেই ভুল। আজকে লোকেরা মনুস্মৃতি না পড়েই জ্বালিয়ে দিচ্ছে। আবার বলে, যে শাস্ত্রে নারী ও শূদ্রকে কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে, সেটাকে কিনা অধ্যয়ন করা হয়! কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করা হয় মনু কোন শ্লোকে নারী ও শূদ্রকে কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন দেখান তো? কোথাও মনু এই ধরণের কথা বলছেন না, দুম্ করে না পড়ে একটা কথা বলে দিল। এইসব মিথ্যাকে আশ্রয় করে বুদ্ধিজীবীরাও চেঁচিয়ে যাচ্ছে, সব ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও। তাহলে রাখব কি? কিছু রাখতে হবে না, সব ভেঙে সমান করে দাও। কিন্তু অবতাররা কক্ষণ কিছু ভাঙবেন না।

একটা কোন ব্যাপারে স্বামীজী আপত্তি করাতে, শ্রীমা সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীকে বলছেন, বাবা, ঠাকুর ভাঙতে আসেননি, গড়তে এসেছেন। যিনি ঠিক ঠিক গড়েন, তিনি কক্ষণ কোন কিছু ভাঙবেন না। যে কোন মানুষ যখন revoltএর কথা বলে, বুঝে নিতে হবে সে একজন অসফল ব্যক্তিত্বের মানুষ। যে আরও বড় অসফল পুরুষ সে আগাম revoltএর স্বপ্ন দেখে, একদিন সব মিশে যাবে, তখন আমি রাজা হব। কোন কারণে যদি একবার রাজা হয়ে যায়, যেমন মাও সে তুং হয়েছিল, তারপর নিজের দেশের যে কি করবে নিজেই জানে না। একটা যুদ্ধে যত লোক মারা যায়, তার থেকে ঢের বেশী লোক মারা গেছে একটি মাত্র লোক, স্ট্যালিনের হাতে।

আচার্যরা কক্ষণ কোন কিছু ভাঙবেন না, সমাজ নিজের গতিতে চলছে, নিজের মত চলবে। যেটা সমাজের জন্য মঙ্গল, সেটাকে নিয়ে তিনি এগিয়ে যান। আজকের দিনে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা যেভাবে সম্মান করছি, ঠিক সেভাবে তখন সবাই ব্রাহ্মণকে সম্মান করত। ব্রাহ্মণরাও সম্মান রক্ষার জন্য বিদ্যাচর্চাতে নিজেদের পুরোপুরি ঢেলে দিতেন, তাঁর থেকেও বেশী ছিল, সবাই ধর্মচর্চা করতেন। আজকালকার দিনে ব্রাহ্মণ বলে কিছু নেই। স্বামীজী বলছেন, ঠাকুর আসার পর সত্যযুগের শুরু। সত্যযুগ মানে একটি বর্ণ, সবাই ব্রাহ্মণ; হয় সবাইকে বলতে হবে ব্রাহ্মণ, না হলে বলতে হবে সবাই শূদ্র। আমরা কি চাইছি সেটা দেখতে হবে। আগেকার দিনে শূদ্র বলতে যা বোঝাত, সেটা কি আমরা হতে চাই? না, সবাই ব্রাহ্মণ হতে চাই? চরিত্রের দিক দিয়ে দেখলে ব্রাহ্মণদের দ্বারাই শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার হয়েছে, ব্রাহ্মণ মানেই তাই। আচার্য বলছেন, ভগবান সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করে তিনি তাতে ধর্ম প্রদান করলেন। এই ধর্মের যাতে নাশ না হয়ে যায়, তাই ধর্মরক্ষা ও ধর্মকে মানুষের মধ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ ব্রাহ্মণদের হাতে দিলেন।

বিষয় থেকে সরে গিয়ে আমাকে কয়েকটা কথা বলা নিতে হচ্ছে, যা কিনা এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক। এরপরেই আচার্য অবতার তত্ত্ব, অবতার কেন আসেন, এই নিয়ে বলবেন। সেখানে আচার্য বলবেন, ধর্ম রক্ষা এবং ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার যাঁদের উপর ন্যস্ত, তাঁদের রক্ষা করার জন্য। ঠাকুরও এই ধর্মকে রক্ষা করতেই এলেন। স্বামীজী হলেন তাঁর মুখপাত্র বা প্রধান সেনাপতি। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, তার সাথে ব্রহ্মবিদ্যা, কিভাবে এই জিনিসগুলি রক্ষিত থাকবে, ঠাকুর সেটা দেখিয়ে গেলেন। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হল ব্রহ্মবিদ্যা বা জীবনমুক্তির বিদ্যা, গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে যার উপর বিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। স্বামীজী বলে দিলেন, এই ব্রহ্মবিদ্যাকে রক্ষা করতে হবে। ব্রহ্মবিদ্যা রয়েছে একমাত্র হিন্দুদের কাছে, তাই আগে হিন্দুদের রক্ষা করতে হবে। হিন্দুরা মূলতঃ বাস করে ভারতে, তাই ভারতকে সব দিক দিয়ে রক্ষা করতে হবে। স্বামীজীর বাণী ও রচনার দশটি খণ্ডে এই কটি জিনিসই পুরো ছেয়ে আছে –ব্রহ্মবিদ্যা, হিন্দু আর ভারতবর্ষ, চতুর্থ আর কিছু নেই। এই তিনটির অবস্থা যখন সঙ্কুচিত হয়ে যেতে থাকে, তখনই অবতার আসেন; একটু পরে আচার্য এর উপর বলবেন। সেইজন্য স্বামীজী তাঁর লেকচারে, রচনায় শ্রীরামকৃষ্ণের কথা খুব কম বলেছেন, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা, হিন্দু ও ভারতবর্ষ, মূল এই তিনটের উপর বেশী জোর দিয়েছেন।

একটা সময় স্বামীজীর চিন্তার জগতে একটা জিনিস ঘুরপাক খাচ্ছিল, তিনি দেখলেন, এই ব্রহ্মবিদ্যা একদিন নষ্ট হয়ে যাবে, কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ, বাণী ও রচনা একদিন হারিয়ে যাবে। সেই সময় আমেরিকাতে স্বামীজী মিসেস লজেটের বাড়ীতে অতিথি ছিলেন। স্বামীজী একদিন হঠাৎ তাঁকে বললেন, আমার মনে এখন একটা temptation এসেছে। মিসেস লজেট ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, Who is she?। স্বামীজী বলছেন, it is not She, it is an organisation। বলার পরই তিনি খুব নামকরা কথা বলছেন, আমি জানি প্রত্যেক নূতন সম্প্রদায়, নূতন সংগঠন নূতন ধরণের সমস্যা সৃষ্টি করে, কিন্তু আমার কোন উপায় নেই, আমাকে একটা organisation করতেই হবে এই ব্রহ্মবিদ্যাকে রক্ষা করার জন্য। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বীজ স্বামীজী সযত্নে মনের মধ্যে প্রতিপালন করতে থাকলেন, এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা, এই হল রামকৃষ্ণ মিশনের সূত্রপাত।

রামকৃষ্ণ মিশন বলছে, *আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ*, *আত্মনোমোক্ষার্থং* মানে নিঃশ্রেয়স, *জগদ্ধিতায়* মানে অভ্যুদয়। বেদের সময় থেকে যে ধর্মের কথা বলে আসছে, আচার্য শঙ্কর যার কথা বলছেন, ঠাকুর এসে যার শিক্ষা দিলেন, স্বামীজীও যার শিক্ষা দিলেন ও প্রচার করলেন, এটা যেন হেলাফেলায় নষ্ট না হয়ে যায়, খেলো না হয়ে যায়। এটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য স্বামীজী এই বিদ্যা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের দিয়ে বলে দিলেন, তোমরা এটাকে ধরে রাখো। রামকৃষ্ণ মিশনের কেবলমাত্র *জগদ্ধিতায়* কাজ নয়, শুধু মানুষকে বলে দেওয়া। রামকৃষ্ণ মিশনের আসল লক্ষ্য হল *আত্মনোমোক্ষার্থং*, এটাই প্রধান কাজ, এটারই শিক্ষা দাও।

এই কাজটাই আগেকার দিনে ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ব্রাহ্মণরা ত্যাগ তপস্যা নিয়ে থাকবেন, ভোগের দিকে যাবেন না, সঞ্চয় করবেন না, সমাজের মঙ্গলের জন্য ধর্মের প্রচার প্রসার করবেন। এই কাজটাই বর্তমান যুগে এসে ব্রাহ্মণদের থেকে স্থানান্তরিত হয়ে সন্ন্যাসীদের কাছে চলে গেছে। শুধু রামকৃষ্ণ মিশন না, ভারতের যেখানেই সঙ্ঘবদ্ধ সন্ন্যাসীদের দেখতে পাওয়া যায়, তাঁরা সবাই এই কাজটাই করছেন। আচার্য এটাই বলছেন, কল্যাণকামী যাঁরা, যাঁরা নিজের মঙ্গল চায়, তাঁরাই এই ধর্ম পালন করেন। তাহলে দেশের সর্বত্র যারা আমাদের দাবী মানতে হবে বলে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, আন্দোলন করছে, ইনক্লাব জিন্দাবাদ করে যাচ্ছে, এরা কি কেউ নিজের মঙ্গল চাইছে না? আসলে ওরা কি চাইছে কেউ বুঝতে পারছে না। বাচ্চার কথা বাচ্চা বোঝে না, বাচ্চার মা ভাল বোঝে। বাচ্চার ভাল কিসে হবে মা জানে, বাচ্চা জানে না। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা সমাজের মা, তাঁরাই

বুঝতে পারছেন না, এরা কি চাইছে। তবে এটুকু আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে, নিজের বিনাশ আর অপরের বিনাশ ছাড়া এরা কিছুই চায় না।

হিন্দু ধর্ম ছাড়া অন্য যে কোন ধর্মে কি হয়, সেই ধর্মে একজন প্রফেট এলেন, এসে একটা কিছু বলে দিয়ে চলে গেলেন, সেটাই যুগ যুগ ধরে চলতে থাকে, এখনও চলছে। জুহুদিদের ধর্মে একটু সামান্য তফাৎ আছে, এদের ধর্মে প্রফেট আছেন, কিন্তু ওদের প্রফেট আমাদের এখানকার ভগবানের মত নন। জুহুদিদের ঠিক ঠিক প্রফেট হলেন এ্যব্রাহাম। ওদের প্রফেট মানে হয় শিক্ষক। যীশুকেও প্রথমের দিকে ওনারা যে প্রফেট বলতেন, তখনও প্রফেট ছিল শিক্ষকের অর্থে। মুসলমানরা প্রফেটকে ভগবানের দূত রূপে দেখে। জুহুদিদের একবার যিনি প্রফেট হয়ে এলেন, তাঁর শিক্ষাকে পরে একটু ডান দিক বাম দিক করা হয়। জুহুদি বাদে প্রত্যেকটি ধর্ম একজনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। জৈন ধর্মে পরম্পরা আছে, তাদের চব্বিশজন জিন ছিলেন। হিন্দুরা জানে, এটা কখনই হতে পারে না। প্রফেটের কথা বাদ দিন, স্বয়ং ভগবান যদি সাক্ষাৎ এসে যা যা শিক্ষা দিয়ে যাবেন, দেখা যাবে তাও ওই শিক্ষা স্থায়ী রূপে থাকবে না। কালের নিয়মে ওর মধ্যে আবরণ পড়বেই। প্রত্যেকটি ধর্মের এই সমস্যা আছে। হিন্দুদের নিয়ে প্রায়ই বিদ্রূপের ছলে বলা হয়, হিন্দুদের এত এত অবতার কেন, তোমাদের ধর্মের এত গ্লানি কেন?

অবতার যখন আসেন, তিনি প্রবৃত্তিলক্ষণ আর নিবৃত্তিলক্ষণ দুটো ধর্মেরই শিক্ষা দেন। জুহুদি ধর্মের যা কিছু শিক্ষা তা হল, জীবনযাত্রাটা কেমন হবে, শুধু এই নিয়ে। কিন্তু যেটা নিউ টেস্টামেন্ট, পরে খ্রীশ্চানরা নূতন যে বাইবেলকে অনুসরণ করে, সেটা হল পুরো বেদান্ত। কিন্তু ওরা এগুলো শুধু মুখে বলে, আসলে ওদের সব কিছু শিক্ষার কেন্দ্র হল – জীবনধারা। ইসলামও পুরোপুরি জীবনধারা কেমন হবে, সেটাকে নিয়েই চলে। যে ধর্ম জীবনধারা নিয়ে চলে, সেই ধর্মকে বেশী ডান দিক বাম দিক করতে হয় না। শুধু interpretation করে দিলেই হল, যেমন ইসলামে যেমন করা হয়, ওরা বলে ফতোয়া। প্রফেট মহম্মদ কি করেছিলেন, কোরানে কি আছে, হাদিসে কি আছে, এগুলোকে দেখে একটা ফতোয়া দিয়ে দেয়, আর এখানেই ধর্ম শেষ।

হিন্দুরা হল আধ্যাত্মিক জগতের রাজা, আধ্যাত্মিক রাজার দু-পয়সায় কাজ চলবে না। রাজা এমনি চলে না, সঙ্গে তার চার-পাঁচজন মন্ত্রী ও আমলা থাকে। প্রধানমন্ত্রী এলে আগে পিছনে চল্লিশটা গাড়ি থাকে, আমি আপনি রাস্তায় চললে কেউ টেরও পাবে না। প্রধানমন্ত্রী কোন রাজ্যে গেলে পুরো রাজ্য জেনে যাবে প্রধানমন্ত্রী এসেছেন। হিন্দুরা হল আধ্যাত্মিক জগতের রাজা, একটু ডান দিক বাম দিক চলে না। হিন্দু ধর্ম হল ভগবানের শ্রেষ্ঠ উপহার এই জগতের জন্য। এটা আমার আপনার কথা না, স্বামীজী বলছেন। স্বামীজী বলছেন, জগৎ থেকে হিন্দু ধর্মকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে জগতের যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা; যে বিদ্যার দ্বারা মানুষ জেনে যায় আমি সেই শুদ্ধ চৈতন্যের সাথে এক, আমিই সেই ব্রহ্ম, এই বিদ্যাটা চিরতরে হারিয়ে যাবে। অন্য কোন ধর্ম এই কথা বলে না যে, আমি ঈশ্বরের সাথে এক, আমিই সেই শুদ্ধ আত্মা। বৌদ্ধরা কোন দিন বলবে না যে, আমিও যা বুদ্ধও তাই; কোন খ্রীশ্চান বলবে না, আমি যা যীশু খ্রীষ্টও তাই। আর মুসলমানরা আল্লার কথা ছেড়েই দিন, মহম্মদের সঙ্গেও এক করবে না। ব্রহ্মবিদ্যা কোন থিয়োরী না, কারুর মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে সেটাকে বলছে, একেবারেই তা না। এই সত্যকে একমাত্র হিন্দু জাতি ধরে রেখেছে। এই বিদ্যাকে ধরে রাখার জন্যই ভগবানকে এখানে বার বার আসতে হয়।

আচার্য বলছেন, *দীর্ঘেণ কালেন অনুষ্ঠাতৃণাং কামোদ্ভবাৎ হীয়মানবিবেকবিজ্ঞানহেতুকেন অধর্মেণ অভিভূয়মানে ধর্মে প্রবর্ধমানে চ অধর্মে*। আচার্যের কী অপূর্ব কথা, বলছেন, ধর্ম যত ভালই হোক, এই ধর্ম যারা অনেক দিন ধরে পালন করে আসছে, ধীরে ধীরে তাদের মনে কামনা-বাসনা জন্ম নেয়, সেখান থেকে লোভ আসে, কারণ সবাই তাকে সম্মান করছে, লোকেরা সম্মান করছে বলে

মনে করে এই সম্মানে আমার অধিকার। এরপর তার যোগ্যতা থাকুক না থাকুক, তারা চাইবে আমি যেন আমার সম্মান থেকে বঞ্চিত না হই। আজকে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের কত সম্মান, কারণ রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে ঠাকুর জড়িয়ে আছেন, স্বামীজীর মত মানুষ ছিলেন বলে। সব সন্ন্যাসীরা তাঁদের ধারে কাছেই নেই। কিন্তু এইভাবে সম্মান পেতে পেতে তাঁদের একটা ক্ষমতা হয়ে যায়, এবং ক্ষমতা বাড়ার সাথে সাথে অনেক রকম কামনাও বেড়ে যায়। হিন্দুদের কোন মন্দিরে গেলে যে পাণ্ডাদের দেখা যায়, এদের মধ্যেও ঠিক একই জিনিস দেখা যায়।

আমরা মন্দিরে কেন যাই? আধ্যাত্মিক ব্যাপার আছে বলেই যাই। কোন এক সাধক হয়ত সেখানে ছিলেন যিনি ওখানে সাধনা করেছিলেন, বা কোন এক ঋষি হয়ত ছিলেন, তাঁদের ত্যাগ তপস্যার জোরে যে পবিত্রতা এসেছে, সেই টানেই আমরা যাচ্ছি। কিন্তু বর্তমানে ওই মন্দিরের দায়ীত্বে যারা আছে, তাদের মধ্যে ওই ক্ষমতাটা নেই। কারণ কালের নিয়মে তাদের আধ্যাত্মিক শক্তি নীচে চলে গেছে, অন্য দিকে কাম-বাসনা বেড়ে গেছে। ধর্মের এই নিম্নমুখিতা প্রত্যেক ধর্মে হবেই হবে। যে অবতারই এসে থাকুন না কেন, শ্রীরামচন্দ্রই আসুন, শ্রীকৃষ্ণ আসুন, ভগবান বুদ্ধ আসুন, শ্রীরামকৃষ্ণই আসুন, কোন ধর্ম, কোন অবতারের কথা, কোন শাস্ত্র শাশ্বত হবে না। কেন বেদও তো শাশ্বত? কিন্তু তা না, আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শেখায়।

একটা জিনিস ভাবলেই অবাক লাগে, স্বামীজী যে সময় আমেরিকায় গেলেন, সেই সময় ভারতে ও ভারতের বাইরে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুদেরকে নিয়ে সবাই হাসাহাসি করত। ভারত এক পরাধীন দেশ, ইংরেজদের বুটের তলায় আমরা পড়ে আছি। সেই ভারতের মাটি থেকে, সেই হিন্দু ধর্মের একজন প্রতিনিধি রূপে স্বামীজী আবির্ভূত হলেন। সেদিন থেকেই স্বামীজী আমেরিকায় সম্মান পেলেন, কত বিদেশীরা স্বামীজীর শিষ্য হলেন। স্বামীজীর কাজে হাত লাগাবার জন্য তাঁরা অনেকে ভারতেও এলেন। আজকেও স্বামীজীর কথা পড়ে দেশ বিদেশ থেকে সব ছেড়ে কত যুবক বেলুড় মঠে চলে আসছে শুধু সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য। শুধু হিন্দু ধর্ম থেকেই না, খ্রীশ্চানরা আসছে, মুসলিম ধর্ম থেকেও কেউ কেউ আসছে, অন্যান্য ধর্ম থেকেও আসছে। বিদেশে বিখ্যাত সব ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করা, পোস্ট ডক্টরেট করা ইয়ং ছেলেরা বিদেশে নামকরা ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসারী করা ছেড়ে বেলুড় মঠে সন্ন্যাসী হতে চলে আসছেন। স্বামীজীর এমন শক্তি যে, এই ধরণের লোকেরা নামযশ, অর্থ সব ছেড়ে চলে আসছেন ভিক্ষাপাত্র তুলে নিতে।

অন্য দিকে বর্তমান হিন্দু ধর্মের দিকে তাকিয়ে দেখুন, সবাই এসে হিন্দু ধর্মকে পদাঘাত করে যাচ্ছে। অন্যান্য ধর্মের লোকেরা যত না এসে হিন্দুদের গালাগাল দিচ্ছে, তার চাইতে বেশি হিন্দুরাই বেশি হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করছে, হিন্দু ধর্মকে নিয়ে হাসাহাসি করছে; আজ হিন্দুরাই নিজেদের হিন্দু বলতে লজ্জা পায়। এখন আবার একটা নূতন শব্দ এসেছে, আমরা সবাই সেকুলার। হিন্দুরা হয় নিজেকে বেদান্তী বলবে, নয় সনাতনী বলবে, আর এখন বলছে সেকুলার, কারণ নিজেকে হিন্দু বলতে লজ্জা পায়। কিন্তু বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা কি বীরদর্পের সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেখানেই যান সেখানেই তাঁরা সম্মান পান। কেন সন্ন্যাসীদের এত সম্মান? একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দের জন্য।

কিন্তু হিন্দু ধর্মের নামে এত নিন্দাবাদ, হাসাহাসি করছে কেন? কারণ আমরা নিজেরা হিন্দু ধর্ম নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা সহকারে পালন করছি না। আজকে যদি কেউ আধ্যাত্মিকতায় মহৎ হয়, নৈতিকতায় যদি স্বচ্ছ হয়, আর্থিক ভাবে যদি সমৃদ্ধ হয়, মনের দিক দিয়ে যদি বীর হয়, লোকেরা তাঁকে দেখেই বলবে, আমি হিন্দু হতে চাই। আমার যদি এই রকম দম থাকে, তাহলে লোকেরা নিজে থেকেই এসে বলবে, আমি আপনার মত হতে চাই। আজ কেন আমাদের মধ্যে সেই দম নেই? কারণ, এটাই আচার্য বলছেন, *দীর্ঘেণ কালেন অনুষ্ঠাতৃণাং*, দীর্ঘকাল ব্যাপী এর অনুষ্ঠান হতে হতে জিনিসটার মধ্যে ঘুন ধরে গেছে। এই অবস্থা থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। হিন্দু ধর্মে মাঝে মাঝে

অবতাররা আসেন বলে ধর্মটা এবার উপরে উঠে আসে। অন্যান্য ধর্মগুলিকে নিয়ে এই ব্যাপারে আলোচনা না করাই ভাল। ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তি একমাত্র হিন্দু ধর্মেই রয়েছে।

আচার্য বলছেন, একদিকে ধর্ম অন্য দিকে কাম। ভগবান ধর্মের স্থাপন করে দিয়ে গেলেন, বেদ রেখে দিলেন, ব্রাহ্মণদের সেই বেদ সংরক্ষণের দায়ীত্ব দিলেন। কিন্তু যে ব্রাহ্মণরা ধর্মকে আধার করে বেদের প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, ধীরে ধীরে সেই ব্রাহ্মণদের মধ্যে ঢুকে গেল কামনা-বাসনা। ফলস্বরূপ অধর্ম বেড়ে গেল। যেদিন থেকে আমরা গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবানের কথা শুনলাম –*যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত*, সেই থেকে আমরা মনে করছি অসুরদের মারার জন্য ভগবান অবতার হয়ে আসেন। কিন্তু অসুরদের মারার জন্য ভগবান কখনই আসেন না। ভগবান আসেন এটার জন্য, যার কথা আমরা এতক্ষণ বললাম।

এই যে দুটি ধর্ম, প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, একদিকে জ্ঞান, বৈরাগ্যের ধর্ম আর অন্য দিকে কর্মের ধর্ম, এই দুটো ধর্ম করতে করতে মানুষের মধ্যে লোভের জন্ম হয়, কামনা-বাসনার বীজের অঙ্কুরোদ্গমন হয়। ঋষিদের ধর্ম সনাতন ধর্ম, ঋষিরা কাজ করতেন, লোভ করতেন না। আমরা এখন কাজ করি না, লোভ করি। সবাই এখন বলছে, সরকার ভরতুকি কেন দিচ্ছে না, চাকরি কেন দিচ্ছে না। যারা এসব কথা বলে, তারা নিজেরা কি কোন কাজ করছে? সবারই অভিযোগ আর অভিযোগ, ব্যাঙ্কের সুদ কেন কমে যাচ্ছে, রেশনের বরাদ্দ কেন কম করে দিচ্ছে। সবাই চাইছে, আমি বসে থাকব, কিন্তু টাকাটা যেন আমার ব্যাঙ্কে ঢুকে যায়। টাকার সাথে আমার যেন সব রকমের সুখ সুবিধা এসে যায়। আমি ভোট দিয়েছি, ভোট দিয়ে আমি আপনাকে রাজা করে দিয়েছি, এরপর আমাকে কেন কাজ করতে বলছেন?

অন্য দিকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাবাজীদের দিকে তাকান, তাদের লাইফস্টাইল, সম্পত্তির বহর দেখলে ভিরমি খেয়ে যেতে হবে। এই বাবাজীর শত কোটি, ওই বাবাজীর হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি। ট্রাস্ট করে রেখেছে, দেখাচ্ছে নিজের কাছে একটা পয়সা নেই। এই হল তাদের বৈরাগ্য। আর জ্ঞান? ইউটিউব, টিভি চ্যানেলে জ্ঞান বিতরণ করে যাচ্ছে। আর ভারতের লোকেরা এত মুর্খ হয়ে গেছে যে, ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক পুরুষকে চিনতে পারছে না! এইভাবেই ধর্ম নাশের দিকে চলে যায়। ধর্ম এই রকম অবস্থা নেমে গেলে তখন ভগবান অবতার হয়ে আসেন। কিভাবে আসেন?

জগতঃ স্থিতিং পরিপিপালয়িষুঃ, তিনি জগতের সৃষ্টি করেছেন কিনা, তাই জগতের পরিপালনের হেতু তিনি একটা রূপ নিয়ে এসে যান। *স আদিকর্তা নারায়ণাখ্যো বিষ্ণুঃ*, তাঁকে নারায়ণ নামে ডাকা হয়। 'নারায়ণ' শব্দের অনেক অর্থ হয়, যার মূল একটা অর্থ হল, সৃষ্টির যেটা আদি, সেটাকে জলের সাথে তুলনা করা হয় এবং বলা হয় 'নার'। আগে বলা হল, তিনি সৃষ্টির পারে, আর এখন বলা হচ্ছে তিনি সেই নারের উপর শয়ন করে আছেন, সেইজন্য তাঁর নাম হল 'নারায়ণ'। আবার আরেকটা অর্থে বলা হয়, 'নর' মানে মানুষ, সেই মানুষের ভিতরে যিনি আছেন, সেখান থেকে তাঁকে বলা হয় 'নারায়ণ'।

বিষ্ণুরও অনেক অর্থ করা হয়। বিষ্ণু 'বিশ' ধাতু থেকে, বিশ ধাতু তালব্য 'শ' দিয়েও হয়, আবার মূর্ধণ্য 'ষ' দিয়েও হয়। যখন মূর্ধণ্য 'ষ' দিয়ে হয়, তখন তার অর্থ সমস্ত কিছুতে ছেয়ে থাকা। আর যখন ধাতু তালব্য 'শ' দিয়ে হয় তখন অর্থ হয়, যিনি ভিতরে অবস্থিত। সাধারণ ভাবে বিষ্ণু অর্থ, ভিতরে ঢুকে আছেন এই অর্থে হয়। তার মানে, আমার ভিতর, তোমার ভিতর, অতি সাধারণ যারা, সবার ভিতর সেই বিষ্ণু, সেই ভগবান ঢুকে আছেন। সেই নারায়ণ হলেন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনি সব জায়গায় আছেন, আবার তিনিই সমস্ত প্রাণীর ভিতরে প্রবেশ করে আছেন।

তার সাথে বলছেন, *ভৌমস্য ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য চাভিরক্ষণার্থং*, ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করার জন্য তিনি অবতার হয়ে আসেন। অবতার কেন আসেন, এই প্রশ্নের এটাই উত্তর, ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করার জন্য। অবতার তত্ত্ব নিয়ে অনেক আলোচনা শুনেছি, অনেক আলোচনা করেছি, ভবিষ্যতেও অবতার তত্ত্ব নিয়ে অনেক আলোচনা হবে, এর উপর অনেকে অনেক রকম ব্যাখ্যা দেবেন। কিন্তু আচার্য খুব সহজ ভাষায়, অত্যন্ত সহজ ভাবে বলছেন, অবতার আসেন এই জন্য – ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করার জন। ব্রাহ্মণত্ব কি? যেটা আগে এতক্ষণ ধরে বলা হল, দ্বিবিধ ধর্ম – প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম আর নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম, এটাই ব্রাহ্মণত্ব। ব্রাহ্মণদের কাজ হল এই ব্রাহ্মণত্বকে রক্ষা করা, অর্থাৎ প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মকে রক্ষা করা। ব্রাহ্মণ হল সমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, শ্রেষ্ঠ পুরুষ মানে অবশ্যই আধ্যাত্মিক পুরুষ।

বলছেন, *ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্ব চাভিরক্ষণার্থং*, ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন, যে কোন রূপে বা ভাবেই আসুন, তিনি দূত পাঠান অবতার রূপে, সন্তান পাঠান যীশু রূপে, স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ হয়ে সন্ত রূপে আসুন, কপিল মুনি হয়ে আসুন, শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ে আসুন, যে রূপেই ভগবান আসুন, তাঁর কাজ একটাই – *ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য চাভিরক্ষণার্থং*, ব্রাহ্মণের যে ভাব, এটাকে রক্ষা করার জন্য। এখানে ব্রাহ্মণ বলতে জাতি, বর্ণের মধ্যে যেতে হবে না, এখানে ব্রাহ্মণ তিনি, যাঁর ভিতর থেকে পুরো আধ্যাত্মিক ভাব বেরিয়ে আসছে; যাঁকে দেখে মানুষ আকর্ষিত হয়ে তাঁর কাছে ধর্মের কথা শুনতে চাইছে।

কেউ যদি এসে বলে, আমার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, আমি জীবনমুক্ত, এটাকে অপ্রমাণিত করার কোন উপায় নেই। ফলে প্রচুর ভেক বাবাজীর সমাজের মাঝখানে আবির্ভাব হয়ে যায়। নকল বাবাজী এসে যাওয়া মানেই হল, আসলটা আছে। কেন আসলটা আছে? খবরের কাগজের দৌলতে আমরা জানি ভারতে প্রচুর নকল টাকা চলে। কাগজে প্রায়ই দেখা যায়, এত এত নকল দু হাজার নোট ধরা পড়েছে। কোন দিন খবরে দেখা যায় না, নকল ডলার ধরা পড়েছে। কিংবা কোন দিন শোনা যায় না, পাকিস্থানি টাকা, বাংলাদেশী টাকা বা পাউণ্ড নকল হচ্ছে। কিন্তু নকল টাকার প্রচুর খবর পাওয়া যায়, কারণ এখানে আসল টাকা আছে। যেখানেই fraud, যেখানেই fake দেখা যাবে, বুঝতে হবে এখানে আসলটাও আছে। দু নম্বরী যেখানে আছে, তার মানে বুঝে নিতে হবে এখানে এক নম্বরী বাজার আছে বলেই দু নম্বরী চলছে। যখন বাবাজীরা টাকা আয় করছে, লোকেরা বোকা বনছে, তার মানে এখানে আসল বাবাজীরা আছেন। ভারতের মাটিতেই একমাত্র fraudগিরি চলে, অন্য দেশে চলে না। কারণ তাদের আসলটা নেই বলে নকলটাও নেই। এখানে আসলটা আছে বলে নকলটা আছে। আসল কিছু থাকলে তবেই তো নকল হবে। পাকিস্থান, বাংলাদেশে কেন fraudগিরি হয় না, ওখানে আসলটাই নেই তাই হয় না।

আসলটাকে ঠিক রাখার জন্য ভগবান মাঝে মাঝে অবতার হয়ে আসেন। আর ভগবান এসে ম্যাজিকালি কিছু করে দিয়ে বেরিয়ে যান না। ভগবান এসে কিভাবে করেন? যাঁর ভাল করবেন, তাঁর হয়ে তিনি আসেন। জাতক কথা গল্পে দেখা যায়, ভগবান বুদ্ধ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যোনিতে জন্ম নিয়েছেন। যখন যে যোনিতে জন্ম নিয়েছেন, তখন সেখানে তাঁদের কিছু মঙ্গল করেছেন। আমরা মনে করি, ভগবান বিভিন্ন রকম লীলা করেন, সেই রকম সৃষ্টিটাও তাঁর লীলা। দেবতাদের মধ্যেও তাঁর লীলা, ঈশ্বরের মধ্যেও তাঁর লীলা আর মানুষ রূপে এসেও তিনি লীলা করেন। গীতার সময়ে ভগবান কি লীলা করছেন? *দেবক্যাং বসুদেবাৎ অংশেন কৃষ্ণঃ কিল্ সম্বভূব*, বসুদেব থেকে ভগবানের নাম বাসুদেব। বসুদেবের সন্তান বাসুদেব। দেবকী ও বসুদেবের থেকে সেই ভগবানের অংশ কৃষ্ণ রূপে জন্ম নিলেন।

কেন তিনি এভাবে জন্ম নিলেন? *ব্রাহ্মণত্বস্য হি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্যদ্বৈদিকো ধর্মঃ, তদধীনত্বাৎ বর্ণাশ্রমভেদনাম্,* ব্রাহ্মাণের ব্রাহ্মণত্ব যদি রক্ষা করা হয়, তাহলেই ধর্মের রক্ষা হবে। কারণ বর্ণাশ্রমভেদ ব্রাহ্মণদের হাতেই রয়েছে। এখানে আবার বর্ণাশ্রম ধর্ম আসছে। আচার্য যখন গীতার ভাষ্য লিখছেন, তখনও হিন্দু ধর্ম বর্ণাশ্রমের উপরেই দাঁড়িয়ে ছিল। হিন্দুদের চারটি বর্ণ –ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারটি বর্ণ ঠিক করে দিচ্ছে সমাজের প্রতি তোমার কি কর্তব্য। আবার আছে চারটি আশ্রম – ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। চারটি আশ্রম ঠিক করে দিচ্ছে তোমার নিজের প্রতি কি কর্তব্য। তার মানে এটা হল তোমার অধিকার আর আগেরটা হল তোমার কর্তব্য। লোকেরা যখন বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে গালাগাল দেয়, তখন তারা ভুলে যাচ্ছে যে, বর্ণটা তোমার সমাজের প্রতি কর্তব্য আর আশ্রমটা হল তোমার অধিকার। তুমি নিজে ঠিক করবে তুমি কি হবে। তুমি কি ব্রহ্মচারী হয়ে সারাজীবন অধ্যয়ন করে জীবন অতিবাহিত করবে, নাকি সংসারী হবে, নাকি বাণপ্রস্থী হবে, নাকি সন্ন্যাসী হয়ে শুধু ঈশ্বর চিন্তনে ডুবে যাবে। এখানে তোমার option, তুমি যেমনটা পছন্দ করবে, তেমনটা বেছে নিতে পার। অন্য দিকে তুমি সমাজ থেকে সুযোগ সুবিধা নিচ্ছ, খাওয়া-দাওয়া করছ, সেটা সমাজকে তোমায় ফেরত দিতে হবে। হয় তুমি মানুষকে বিদ্যাদান করে ফেরত দেবে, তখন তুমি ব্রাহ্মণ; নয়ত দেশের সম্পদ রক্ষা করবে, যেমন আমাদের সৈন্যরা করছে, তাহলে তুমি ক্ষত্রিয়; দেশের সম্পদ বৃদ্ধিতে তুমি যোগদান দিতে চাইছ, ব্যবসা বাণিজ্য করে সম্পদ বৃদ্ধি করতে চাইছ, তখন তুমি হয়ে গেলে বৈশ্য।

আর এই তিনটের বাইরে চতুর্থ থাকল সেবা, সেবা মানে যে কোন ধরণের সেবা। এখন যেমন হোটেল, হাসপাতাল চলছে, এটা হল সেবা, পরিচর্যা, এরা হল শূদ্র। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এগুলো এক-একটা টেকনিক্যাল শব্দ। কিন্তু পরের দিকে সবাই সুযোগ নিতে শুরু করে দিল। যে সম্মান পায় সেও সমাজ থেকে সুযোগ সুবিধা নেয়। বর্তমান কালে যত পার্টি আছে, একটা দুটো পার্টি বাদে সব পার্টির মাথায় আছে একজন লোক। ধীরে ধীরে দেখা যাচ্ছে তারই পরিবারের লোকজন পার্টির ক্ষমতায় এসে যাচ্ছে। রাজনীতিতেও এটা ঢুকে গেছে। অথচ আমরা এই বলে চেঁচিয়ে যাচ্ছি, আমরাই গণতন্ত্রের পতাকার ধারক ও বাহক। প্রত্যেকটি পার্টির যিনি মাথায়, পরে তার ছেলেমেয়েরা, নয় তো তার পরিবারের কেউ এসে ওই চেয়ারে গিয়ে বসছে, এটাকে বলে প্রিভিলেজ। বর্ণাশ্রম ধর্ম হাজার হাজার বছর ধরে হিন্দু ধর্ম ও ভারতকে রক্ষা করল, তারপর এর মধ্যে এসে ঢুকলো প্রিভিলেজ। ব্রাহ্মণরা প্রিভিলেজ নিতে শুরু করে দিল। শূদ্রদের ওই ক্ষমতা ছিল না, তাই তারা প্রিভিলেজ নিতে পারল না, ধীরে ধীরে তারা সমাজে পদদলিত হয়ে গেল। তার মানে, বর্ণাশ্রমের উদ্দেশ্যটা ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল।

আমরা পরে আলোচনা করব কিভাবে বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগ এই চার ভাবে আমরা নিজেকে উপরের দিকে নিয়ে যেতে পারি। এই চারটের নাম না নিয়ে বলা যেতে পারে, সমাজকে আমি যখন বিদ্যাদানের মাধ্যমে সেবা করছি বা ব্যবসা করে দেশের সম্পদ সৃষ্টি করছি বা যে কোন রূপে সমাজের সেবা করছি, এই তিনটি হল পথ। আর তা নাহলে সব কিছু ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে বা ভক্ত হয়ে ঈশ্বরের পথে চলে যাওয়া। এই চারটে হল সমাজের প্রতি আমাদের কর্তব্য। এই চারটের মাধ্যমে আমরা নিজেদের উপরে উঠে নিয়ে আসতে পারি। আগেকার দিনে এটাই বর্ণাশ্রম রূপে চলত।

প্রথমেই বলা হয়েছিল, যারা নিজেদের মঙ্গল চাইছে, তাদের জন্য এটা, যারা নিজেদের ভাল চাইছে না, তারা যা ইচ্ছা করুক, তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। যদি তুমি নিজের ভাল চাও, চুরি না করে, অপরকে না ঠকিয়ে যদি টাকা-পয়সা পেতে চাও, চালবাজি না করে যদি ধর্ম অর্জন করতে চাও, তাহলে কিন্তু তোমাকে এই পন্থাই অবলম্বন করতে হবে। উদ্দেশ্য হল, তোমার নিজের উত্থান, তার সাথে জগতের প্রতি তোমার কর্তব্য পালন করা। এই দুটোকে মিলিয়েই ধর্ম

হয়। যখন এই ধর্মে গ্লানি আসে, তখন ভগবান কোন গর্ভকে আশ্রয় করেন, কোন ম্যাজিকালি আসেন না, এসে তিনি আবার এই ধর্মের শিক্ষা দেন; যেমন বর্তমান কালে শ্রীরামকৃষ্ণ এসে শিক্ষা দিলেন।

অবতার তত্ত্ব

আমরা এতক্ষণ দেখলাম কিভাবে হিন্দু ধর্ম বেদের দুটো ধর্ম প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্মকে ধারণ করে আছে। তার সাথে আমরা দেখলাম কিভাবে ধীরে ধীরে ধর্মের গ্লানি হয়। যাঁরা ধর্মের পালন করছেন তাঁদের মনে কাম, লোভ, বিশেষ করে কাম, কাম একটা generic term, যেটার মাধ্যমে সব কিছুই এসে যায়, তখন তাঁরা ধর্মকে আর প্রত্যক্ষ রূপে দেখে না। ধর্ম তখন শব্দ মাত্র হয়ে যায়। যেমন বেদের খুব নামকরা মন্ত্র গায়ত্রী মন্ত্র, গায়ত্রী মন্ত্র হল একেবারে সাক্ষাৎ মন্ত্র। কেউ যদি গায়ত্রী মন্ত্রকে নিয়ে সাধনা করেন, জপ করেন, ধ্যান করেন, তিনি গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থকে স্পষ্ট সাক্ষাৎ দেখতে পাবেন। ঈশ্বর দর্শন তাঁর সাক্ষাৎ হওয়ার কথা। বিশ্বামিত্র সাধনা করে, ধ্যানের গভীরে এই মন্ত্র সাক্ষাৎ করলেন। বিশ্বামিত্রের পর অনেকেই সাধনা করে এই মন্ত্রের সাক্ষাৎ করেছেন।

একটা অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা এখানে বলা যেতে পারে, বলা হয় যে, সন্ন্যাসীদের গায়ত্রী মন্ত্রের জপ করেতে হয় না। হিমালয়ে এবং অন্য অনেক মণ্ডলে নিষেধ আছে, আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনেও তাই। যেহেতু গায়ত্রী মন্ত্র বেদের মন্ত্র, এবং সন্ন্যাসীরা বেদের পারে চলে যান বলে এই মন্ত্রের জপ করেন না। স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজ যখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন আমার সন্ন্যাস হয়েছিল। ব্রহ্মচারী হওয়ার সময় সবাইকে গায়ত্রী মন্ত্র দেওয়া হয়। সন্ন্যাস হওয়ার পর আমরা সবাই স্বামী ভূতেশানন্দজীকে প্রণাম করতে গেলাম। একজন নূতন সন্ন্যাসী মহারাজকে জিজ্ঞেস করলেন, মহারাজ, আমাদের তো এখন আর গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে হবে না? মহারাজ কিন্তু যে ব্রহ্মচারীদের সন্ন্যাস হয়েছিল তিনি তাঁদের গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে বলে দিলেন। সন্ন্যাসীরা শুনে চমকে উঠলেন, সিনিয়র সন্ন্যাসীরাও শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কি করে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে বললেন, সন্ন্যাসীরা তো করেন না। একজন নূতন সন্ন্যাসী এগিয়ে গিয়ে মহারাজকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহারাজ, সন্ন্যাসীরা তো গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন না, আপনি আমাদের করতে বলছেন'? মহারাজের মধ্যে একটা কৌতুকরসবোধ ছিল। তখন তাঁর পচানব্বই বয়স, খুব মিষ্টি করে নূতন সন্ন্যাস হওয়া মহারাজকে বলছেন, 'গায়ত্রী মন্ত্রে তুমি সিদ্ধ হয়ে গেছ'? কথাটা নূতন সন্ন্যাসীর কাছে একটা shockএর মত লাগল। সন্ন্যাসী মানেই তাঁর গায়ত্রী মন্ত্র সিদ্ধ হয়ে গেছে, তার মানে তিনি সাক্ষাৎ দেখছেন গায়ত্রী মন্ত্রের তত্ত্ব এই। এরপর তিনি বলছেন, আমি এরও পারে যেতে চাই। সন্ন্যাসের শুরু হয় সেখান থেকে।

তিনি যত বড়ই ঋষি হয়ে থাকুন বা তিনি অবতার হয়ে থাকতে পারেন, পরম্পরাতে চলতে চলতে কি হয়, শিষ্যরা ধীরে ধীরে নিম্নগামী হতে থাকে। কেন নিম্নগামী হয়, আমরা আগে আলোচনা করেছি। একটা সময় এই ভাবে ধর্মটা গোল্লায় চলে যায়। যে কোন ধর্মের দিকে তাকালেই এই জিনিসটা দেখা যাবে। আমেরিকাতে যেত বড় বড় চার্চ ছিল; চার্চগুলি এখন সব শপিং মল হয়ে যাচ্ছে। চার্চে নাকি এখন আর কেউ যায় না। যায় না মানে, লোকেরা কি ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে গেছে, নাকি একেবারে হীন হয়ে গেছে? একেবারেই তা নয়। যারা ধর্ম শেখাচ্ছেন তারাই হীন হয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য ধর্মে যাই হয়ে থাকুক, এখানে হিন্দু ধর্ম পুরোপুরি অন্য রকম। আর আচার্যও হিন্দু ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম জানতেন না। এবার তিনি অবতার তত্ত্বকে নিয়ে বলছেন। এখান থেকে আমরা গীতার মর্ম আলোচনা করব। গীতা ভগবান নিজের মুখে বলেছেন। আমরা দেখব, গীতায় ভগবানের কি বক্তব্য।

প্রথমে আমরা আলোচনা করব ভগবানের অবতার রূপটা কি। এরপর আমরা দেখব বেদের সত্যকে ভগবান কিভাবে দাঁড় করালেন এবং সেটা শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ালো। ভগবান যখন রামকৃষ্ণ রূপে এলেন তিনি কথামৃত বললেন। কেউ যদি কথামৃতের ব্যাখ্যা রচনা করতে বসেন, প্রথমে তিনি যে একটা ভূমিকা দেবেন তাতে তাঁকে দেখাতে হবে, ঠাকুর কথামৃতে কি বলেছেন। কথামৃতে বেদেরই কথা বলা হয়েছে, বেদের বাইরে কিছু নেই। কথামৃত বেদেরই কথা, কিন্তু নূতন একজন অবতার বললেন। ঠিক তেমনি সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে কথা বলছেন, সেখানে তিনি বেদেরই কথা বলছেন, কিন্তু তৎকালীন নূতন একজন অবতার বলছেন। আচার্য এখন এই দুটো জিনিসকে নিয়ে আলোচনা করবেন। আচার্য এবার বলছেন –

স চ ভগবান জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নস্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য, অজোহব্যয়ো ভূতানাং ঈশ্বরো নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাবোহপি সন্, স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইত চ লোকনুগ্রহং কুর্বন্ লক্ষ্যতে। স্বপ্রয়োজনাভাবেহপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া বৈদিকং হি ধর্মদ্বয়ং অর্জুনায় শোকমোহমহোদধৌ নিমগ্নায় উপদিদেশ, গুণাধিকৈর্হি গৃহিতোহনুষ্ঠিয়মানশ্চ প্রচয়ং গমিষ্যতীতি। তং ধর্ম ভগবতা যথোপদিষ্টং বেদব্যাসঃ সর্বজ্ঞো ভগবান্ গীতাখ্যৈঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ।

আচার্য বলছেন, *স চ ভগবান জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্ন*, ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন, তখন তাঁর এই ছয়টি গুণ সব সময় থাকে। এমন কোন অবস্থা হবে না যে, এর একটা কি দুটো গুণ থাকবে না, ছটা গুণ সব সময় ভগবানের সাথে সমান ভাবে থাকবে। প্রথম হল জ্ঞান, শাস্ত্রের কথায় জ্ঞান মানে, সচ্চিদানন্দ কি, জগৎ কি, জীব কি, এই তিনটে মিলিয়ে বলে জ্ঞান, এই জ্ঞান তাঁর সব সময় থাকবে। কথামৃতে ঠাকুর খুব সুন্দর ভাবে এই জিনিসটাকে পরিভাষিত করছেন। নরেন, রাখালাদিদের উদ্দেশ্য করে ঠাকুর বলছেন, এই ছোকরারা শুধু যদি এটুকু জানে, এরা কে, আমি কে, আর এদের সাথে আমার কি সম্পর্ক, তাহলেই সব হবে।

সমস্ত ধর্ম, শুধু হিন্দু ধর্ম না, কেবল বেদ, উপনিষদ না, কথামৃত না, যে কোন ধর্ম ঘুরে ফিরে এই তিনটে শব্দে চলে যায় – ঈশ্বর কি, আমি কে, জগৎ কি, আমার সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক কি। ঠাকুর তিনটি শব্দে বলে দিচ্ছেন – এরা কে, আমি কে, এদের সাথে আমার কি সম্পর্ক, এদের শুধু এটুকু জানলেই হবে। এর বাইরে ধর্মের আর কিছু নেই। এটাকেই বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন দর্শনের পণ্ডিতরা বিভিন্ন ভাবে পরিভাষিত করেন। কেউ বলবে আমরা জীব, আমরা চিরন্তন রূপে ঈশ্বর থেকে আলাদা। কেউ বলবেন, আমিও যা, ঈশ্বরও তাই। পরিভাষিত করা হচ্ছে আলাদা আলাদা ভাবে, এরপর যার যেমন সাধনা হবে, তার তেমন সিদ্ধি লাভ হবে।

এই জ্ঞান ভগবানের কাছ থেকে কখনই চলে যাবে না, তিনি সবটাই জানেন, এবং সব সময় জানেন। ঠাকুরের কাছে যারাই আসত, তিনি তাদের সবারই কথা জানতেন, কে কোন ভাবের, কোন ঘরের, কার ভিতর কি কি সম্ভবনা আছে, কোথায় সে আটকে আছে, সবটাই তিনি জানতেন। ভগবান কখন ভাঙতে আসেন না, গড়তে আসেন। তিনি কাউকে কক্ষণ দুম্ করে কিছু করে দেবেন না। লোকেরা বলে তিনি জগতে এত দুঃখ-কষ্ট কেন দিলেন, কেন তিনি মানুষের দুঃখ নিবারণ করছেন না? ভগবান কেন দুঃখ মেটাতে যাবেন, তিনিই এই জগতের সৃষ্টি করেছেন, দুঃখটাও তিনিই দিচ্ছেন, মৃত্যুটাও তিনিই দিচ্ছেন। আমার আপনার কাছে মৃত্যুটা বিরাট কিছু, কিন্তু তাঁর কাছে মৃত্যুটা কিছুই না, তাঁর কাছে মৃত্যু হল এ-ঘর আর ও-ঘর। আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধি সম্পন্ন, এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি নিয়ে নিজের নিজের সংকীর্ণ জীবনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি, সেইজন্য আমাদের এত কান্না, ভগবানের তাতে কি এসে যায়!

দ্বিতীয় হল ঐশ্বর্য। ভগবানের কখন কোন কিছুর অভাব থাকে না। এই জিনিসটাকে বোঝানর জন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়, বিশেষ করে রামানুজ সম্প্রদায়রা নিয়ে এলেন লক্ষ্মী দেবীকে, যিনি বিষ্ণুর সঙ্গে থাকেন। শিব আর শক্তির যে সম্পর্ক, বিষ্ণু আর লক্ষ্মীর সেই সম্পর্ক না, অনেক আলাদা। আমরা যখন শিব ও শক্তি বা ঠাকুর ও মা বা ব্রহ্ম ও শক্তি বলি, তখন বলি এনারা দুজন এক। কিন্তু বিষ্ণু আর লক্ষ্মী এক নন, লক্ষ্মী এখানে inferior, এমনকি লক্ষ্মীর জন্মও সমুদ্র মন্থন থেকে। প্রথমের দিকে লক্ষ্মীর এতটা গুরুত্ব ছিল না, কিন্তু পরে শ্রী সম্প্রদায় অর্থাৎ রামানুজের সম্প্রদায় লক্ষ্মীকে অনেক উপরে নিয়ে গেছেন। আমরা যে শ্রীমন্নারায়াণ বলি, তাতে প্রথমে 'শ্রী' বলাতে এটাই বোঝাচ্ছে যে, ভগবানের সাথে শ্রী সব সময় আছে, শ্রী মানে ঐশ্বর্য। এখন লক্ষ্মী, যিনি বিষ্ণুবক্ষবিলাসিনী, তখন বিষ্ণুর ঐশ্বর্যের কিসের কম হবে।

এগুলো ধারণা করা আমাদের পক্ষে অনেক সময় কঠিন হয়। এই জিনিসগুলিকে বোঝানর জন্য আমাদের ঋষিরা অনেক গল্প তৈরী করেছেন। যেমন একটা গল্পে বলছেন, কুবেরের বিরাট ধন সম্পদ, প্রচুর ঐশ্বর্য, যার জন্য তাঁর খুব অহঙ্কার। কিন্তু এই সম্পদ কাউকে দেখাতে তো হবে, তবে না অহঙ্কার করা যাবে। সেইজন্য কুবের ঠিক করল, একদিন শিবকে নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে এনে খাওয়াতে হবে। কুবের শিবকে গিয়ে বলেছেন, 'একদিন কৃপা করে আপনি আমার বাড়িতে এসে দুটি শাকান্ন গ্রহণ করুন'। শিব হলেন অন্তর্যামী, তিনি কুবেরের মনের ভাব বুঝে গেছেন। শিব বললেন, 'আমি কোথাও যাই না, তুমি গণেশকে নিয়ে যাও, ওকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়ায়, তাতেই আমি তৃপ্ত হয়ে যাব'। বাচ্চা গণেশ এখন শুঁড় নাচাতে নাচাতে কুবেরের বাড়ি পৌঁছে গেছে নেমন্তন্ন খেতে। প্রথমে অনেক লাড্ডু দেওয়া হল। যত লাড্ডু ছিল সব খেয়ে নিল। একটু দেরী হতেই গণেশ হাঁক দিয়েছে জলদি খাবার নিয়ে এসো। কারিগররা লাড্ডু আর বানাবার ফুসরৎ পাচ্ছে না, লাড্ডুর মাল-মশলা সবটাই গণেশের সামনে রেখে দিয়েছে। আনার সাথে সাথেই সব শেষ। একটু দেরী সহ্য করতে পারছেন না গণেশ। খুব রেগে গিয়ে বলতে শুরু করল, 'নিমন্ত্রণ বাড়ি ডেকে এনে খাওয়াতে পারছ না, কেন নিমন্ত্রণ করতে গেলে'। এই বলে নিজেই এবার ভাণ্ডারে ঢুকে গেলেন। ভাণ্ডারে যত চাল, ডাল, আটা, ময়দা, তেল, নুন, মশলাপাতি আছে সব খেয়ে নিয়েছেন। এরপর রেগেমেগে কুবেরকে বলছেন, 'তুমি আমাকে নেমন্তন্ন করে এনেছো, আমার তো পেট ভরল না, এবার আমি তোমাকেই খাবো'।

কুবের এবার প্রাণভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়েছে। দৌড়ে আর কোথায় যাবে, সেই শিবের কাছেই গিয়ে উপস্থিত, 'প্রভু আমাকে বাঁচান'। হন্তদন্ত হয়ে একটু পরেই গণেশও সেখানে এসে হাজির হয়েছে। শিব দুজনকেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার তোমাদের'? গণেশ বলছেন, 'আমাকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গেল, আমাকে খাওয়াতেই পারল না; খাওয়াতেই যদি না পারে, নিমন্ত্রণ করে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল কেন? আমার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে'। শিব গণেশকে খুব ঠাণ্ডা করে বললেন, 'কেন এ-রকম করছ, খিদে পেলে যাও মায়ের কাছে, মা তোমাকে পেট ভরে খাইয়ে দেবে'। এই হল কাহিনী। কুবের একদিন একবেলা পেট ভরে যে গণেশকে খাওয়াতে পারছে না, আর তাতেই তার ঐশ্বর্যের কত অহঙ্কার; আর পার্বতী এই গণেশকে দু বেলা রোজ পেট ভরে খাইয়ে যাচ্ছেন। মা অন্নপূর্ণা কিনা, তিনি জগতের সমস্ত ঐশ্বর্যের মালকিন। শিব তাঁর উপর বসে আছেন। এইসব কাহিনী দিয়ে বোঝান হয় ভগবানের ঐশ্বর্য কেমন। ভগবান বা অবতারের ঐশ্বর্যের কথা যা বলা হয়, এটাই তাঁর ঐশ্বর্য।

এরপর হল শক্তি, *বলবীর্য*। বল হল ভিতরের দম। ভিতরের এই প্রাণশক্তি যখন কাজে লাগে, তখন এটাকে বলা হয় শক্তি। অনেকে বলে, আমি তোমার ক্ষতি করে দিতে পারি, কিন্তু করব না। এই কথা যে বলছে, তার ভিতরে আদৌ দম আছে কিনা জানার কোন উপায় নেই। আমি যদি চাইতাম আমি ফার্স্ট হয়ে দেখাতে পারতাম; আরে ভাই করে দেখাও না আগে। আমি যদি চাইতাম

তো আমি অনেক কিছু হতে পারতাম; কিছুই তো হয়ে দেখাতে পারছ না। এই বল যখন কাজে নামে, তখন তাকে বলে শক্তি। অনেকের মধ্যে হয়ত শক্তি এসে গেছে, কিন্তু সেই শক্তিকে ধারণ করা বা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু যে বলছে আমার শক্তিকে আমি যখন খুশী কাজে লাগাবো, যখন খুশী এই শক্তিকে আমি আটকে রাখব; এটাকে বলে বীর্য। বীর্য মানে ধারণ করার ক্ষমতা, নিজের শক্তিকে ধারণ করার ক্ষমতা। নিজের বল বা শক্তিকে ধারণ করার ক্ষমতা সবারই থাকে না।

স্বামীজী যখন বলছেন বীর্যবান হও, তখন তার অর্থও এটাই, তোমার ক্ষমতা বা শক্তিকে ধরে রাখ। আমাদের সমস্যা হল, যেমনি একটু ক্ষমতা হয়ে যায় তখনই আমরা ক্ষমতা দেখাতে শুরু করি। একজন সামান্য ট্রাফিক পুলিশ রাস্তার মোরে একটা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, সামান্য একটু কিছু হলেই গাড়ির উপর দুম্ করে এক ডাণ্ডার বারি মারবে। সেও নিজের ক্ষমতা দেখিয়ে দিতে চাইছে। ক্ষমতা ধারণ করার দম নেই।

আর শেষে হল তেজ, উনি যেখানে দাঁড়াবেন, সেখানে অন্যরা নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। পরে এক জায়গায় আচার্য তেজের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, তেজ মানে চামড়ার ঔজ্জ্বল্য না। কসমেটিক দিয়ে আমরা শরীরের ত্বকের চাকচিক্য বাড়িয়ে নিই। এখানে ত্বকের চাকচিক্য না, তাঁর ব্যক্তিত্বটা এমন যে, যেখানে গিয়ে দাঁড়াবেন সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে চাইবে। বাল্মীকি রামায়ণে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, শ্রীরামচন্দ্র রাজসভায় এসে দাঁড়ালেন, মনে হল যেন কোটি সূর্যের উদয় হল। অনেক জায়গায় বলছেন, শ্রীরামচন্দ্র সভায় উপস্থিত হয়ে সবার তেজ হরণ করে নিলেন। ছোটবেলা এগুলো পড়লে আমাদের মনে হত এটা কোন ম্যাজিকাল জিনিস, যার যার ক্ষমতা আছে তিনি কেড়ে নিয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা তা না, যেমন কোন জায়গায় প্রধানমন্ত্রী এসে গেলেন, তখন সেখানে বাকিরা নিষ্প্রভ হয়ে যান, সবার দৃষ্টি ওনার উপর গিয়ে পড়ে।

ভগবানের এই ছটি ঐশ্বর্যের বর্ণনা আচার্যের নয়, পুরাণে এই বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান, 'ভগ' মানে ঐশ্বর্য, যাঁর ঐশ্বর্য আছে তিনি ভগবান। যেমন আমরা বলি যার ধন আছে তিনি ধনবান, যার জ্ঞান আছে, তিনি জ্ঞানবান ইত্যাদি। ভগবান কেন? যাঁর মধ্যে এই ছটি গুণ সব সময় আছে – জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য ও তেজ। যখন উনি গর্ভে আছেন, তখনও আছে; যখন জন্ম নিলেন তখনও আছে, বাচ্চা হয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছেন তখনও আছে, কৃষ্ণ হয়ে যখন কান্নাকাটি করছেন তখনও আছে। এই ছটি গুণ কক্ষণ তাঁর থেকে চলে যাবে না।

লীলাপ্রসঙ্গে ভগবানের ষড়ৈশ্বর্যের ব্যাখ্যা যেখানে আছে, সেই জায়গাতে ঠাকুরের ব্যাপারে বলতে গিয়ে স্বামী সারদানন্দ পরিষ্কার এই কথাই বলছেন। অধ্যাত্ম রামায়ণে পার্বতী শিবকে জিজ্ঞেস করছেন, 'শ্রীরামচন্দ্রকে অনেকেই ভগবান বলেন, তিনি কি সত্যিই ভগবান? ভগবানই যদি হন তাহলে তিনি সীতার জন্য এভাবে প্রাকৃত পুরুষের মত কাঁদলেন কেন'? আবার বলা হয় পরে ঋষিদের কাছ থেকে তিনি জ্ঞান পেয়েছিলেন; যার অর্থ দাঁড়ায়, শ্রীরামচন্দ্র একজন আত্মজ্ঞানী পুরুষ, একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তিনি মর্যাদা পুরুষোত্তম নন। তখন ভগবান শিব বলছেন, না, তিনি ভগবান। কখন এমন সময় ছিল না যে, শ্রীরামচন্দ্রের জ্ঞান ছিল না। কিন্তু তিনি কখন সখন এমন ব্যবহার করতেন যে, মনে হতে পারে তখন তাঁর জ্ঞান ছিল না, সেইজন্য এটাকে বলা হয় লীলা। ওটা সত্যও না, মিথ্যাও না। তুলসীদাস তাঁর রামচরিতমানসে, এমনকি অধ্যাত্ম রামায়ণেও দেখানো হয়েছে যে, রাবণ কর্তৃক সীতার অপহৃণ হওয়া, এগুলো শ্রীরামচন্দ্র আগে থেকেই জানতেন। তিনিও সীতাকে এই ব্যাপারে আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছেন। তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন কিনা আমরা জানি না, কিন্তু শাস্ত্রের দিক থেকে ভগবানের জ্ঞান কখন মলিন বা ধুম্রাচ্ছাদিত হয় না, সব সময় পরিষ্কার থাকে।

আচার্য বলছেন, *সদা সম্পন্নত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য,* এখানে অনেকগুলো শব্দ আছে, যার অর্থ হয় মায়া। গীতার সপ্তম অধ্যায়ে মায়ার উপর ভগবান আলোচনা করবেন। আমরাও যখন সপ্তম অধ্যায়ে আসব তখন মায়ার উপর বিস্তারে আলোচনা করব। এখানে সংক্ষেপে আমরা একটু আলোচনা করে নিচ্ছি।

আমাদের শাস্ত্রের কথা মানার দরকার নেই। শুধু আমাকে আগে নিজে ঠিক করে নিতে হবে, আমি সাধন-ভজন, জপ-ধ্যানে আমার জীবন অতিবাহিত করব কিনা। কোথাও বেড়াতে যাওয়ার আগে আমরা যেমন সেখানকার একটা গাইডবুক দেখে ঠিক করি, কিভাবে আমরা যাব। ঠিক তেমনি এখানেও সাধনা করার জন্যও আমাদের একটা গাইডবুক দরকার। সাধন পদ্ধতির খুব নামকরা গাইডবুক হল রাজযোগ। কিংবা ঠাকুরের সাধনার কথার খুব নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যাবে লীলাপ্রসঙ্গে, সেদিক থেকে লীলাপ্রসঙ্গও একটা খুব ভাল গাইডবুক। রাজযোগের practical manual, অর্থাৎ সাধনার যে মূল বিষয় এবং তার সাথে ঠাকুরের সাধনার কথা, এই দুটোকেই আমরা রাখতে পারি।

সাধনা শুরু করতে গিয়ে দেখছি মন আমার খুব চঞ্চল, এই চঞ্চল মনকে শান্ত করতে শুরু করার পর ধীরে ধীরে মনের একটা শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং মন শান্ত হয়। শান্ত মন মানেই শক্তিশালী মন। শান্ত না হলে মনের শক্তি হয় না। মনকে শান্ত করতে করতে মন এমন একটা অবস্থায় চলে যায়, যেখানে মনে একটি মাত্র চিন্তা থাকে, অন্য কোন চিন্তা থাকে না। এই জিনিসটা হয় একমাত্র ঈশ্বরের চিন্তায়। এরপর ওই চিন্তাটাও শান্ত হয়ে যায়, যেমন ঠাকুরের হয়েছিল। তোতাপুরী ঠাকুরকে অদ্বৈত সাধনা শেখাতে এসেছেন, সব কিছু শিখিয়ে দিলেন। ঠাকুর তাঁর নির্দেশানুসারে সব কিছু ঠিক ঠিক করছেন, কিন্তু বারবার মা কালীর রূপ ঠাকুরের সামনে এসে যাচ্ছে। ঠাকুর বলছেন, জ্ঞান অসি দিয়ে তিনি মা কালীর রূপকে খণ্ডিত করে দিলেন। এরপর কি হয়, সেটা কাউকে বোঝান যায় না। উপনিষদেও বলছেন, সাধক ওই জায়গার কথা বাক্য দিয়ে বোঝাতে পারে না, কারণ ওই জায়গাতে মন থাকে না। ঋষিরা সেইজন্য এটাকে বলছেন, সচ্চিদানন্দ, সৎ, চিৎ ও আনন্দ – ঈশ্বর আছেন, চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ।

সব প্রফেট, সব শাস্ত্র, তা কোরান হোক, বাইবেল হোক, সবাই একই কথা বলে। আমাদের কাছে সত্য হল এই দৃশ্যমান জগৎ, কিন্তু তিনি দেখছেন ঈশ্বর বৈ কিছু নেই, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই, আত্মাই আছেন। শুধু গীতা বলছেন না, যে কোন সাধক তাঁর সিদ্ধির অবস্থায় পৌঁছে এটাই দেখেন। হিন্দু ধর্ম মহৎ কেন? হিন্দু ধর্মে এই ধরণের অনেক মহাত্মার আবির্ভাব হয়েছে, যাঁরা এই সত্যের সাক্ষাৎ করেছেন। কবীর দাসের লেখা পড়লে মনে হবে উপনিষদের তত্ত্ব পড়ছি নাকি কবীর দাসের রচনা পড়ছি। কবীর দাস একজন জোলা, তিনি কোন দিন কাগজ কলম ছুয়ে দেখেননি, কোন পড়াশোনা নেই, সবটাই তাঁর নিজের অনুভব থেকে লিখে গেছেন।

কিন্তু জগৎটা তো সত্য। যেটা অনন্ত, সেটা সীমিত কি করে হয়ে যায়? যিনি আনন্দস্বরূপ, তিনি দুঃখস্বরূপ কি করে হয়ে যান? দুঃখ-কষ্টে সব সময় আমাদের চোখ থেকে জল বেরোচ্ছে। একটু এদিক সেদিক হয়ে গেলে অভিমান, একটা কিছু অন্য রকম হয়ে গেলে রাগ, ক্রোধ এসে যাচ্ছে। যিনি আনন্দস্বরূপ তিনি এমন কেন করছেন? কারুর কাছে এর কোন ব্যাখ্যা আছে কি? কোন ধর্মে এর কি কোন ব্যাখ্যা আছে? কোন ব্যাখ্যা নেই। অন্য ধর্ম বলে দেয় তাঁর ইচ্ছা। আমরা 'তাঁর ইচ্ছা' এটাকে একটা টেকনিক্যাল শব্দ দিয়ে বলি 'মায়া'। মায়া একটা টেকনিক্যাল শব্দ, মায়া হল ত্রিগুণাত্মিকা, এর ব্যাখ্যা আমরা পরে করব। এই মায়া, বা আমাদের ভাষায় আরও সহজ করে বলতে পারি, world of mind, যাবতীয় যা কিছু আছে সবটাই মন। যেখানেই মন আছে, এটাই মায়া। তাহলে কি ভগবান বিশ্বমন? না, ভগবান ঠিক তার পারে। তাঁর ইচ্ছাতেই বিশ্বমন সৃষ্টি হয়। আমরা সবাই মনে আবদ্ধ, প্রথমে আমি আমার মনে আবদ্ধ, পরে আমি আপনার মনে আবদ্ধ।

আমি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, বেলুড় মঠ আমাকে যেমন বলবে আমাকে তেমনটা করতে হবে। এর বাইরে, আমার সাথে যার ভালবাসার সম্পর্ক, সে আমাকে যা বলবে আমি তাই করব। যার সাথে খারাপ সম্পর্ক, সে যা বলবে আমি তার বিপরীত করব। সবটাতেই আমি বাঁধা। ভগবান কক্ষণ কোন অবস্থাতেই বাঁধা থাকেন না। অথচ এই মনের জগতেই তিনি কাজ করেন, কিন্তু পুরো স্বাধীন। একজন কয়েদীকে যখন কোথাও স্থানান্তর করা হয় তখন তাকে চার-পাঁচজন আর্মড পুলিশ ঘিরে থাকে। প্রধানমন্ত্রীও যখন কোথাও যান তখন তাঁকে শ'দুয়েক আর্মড পুলিশ ঘিরে থাকে। প্রধানমন্ত্রী যেদিকে যাবেন, সব কটা পুলিশকে সেদিকে যেতে হবে। আর এখানে পুলিশ যেদিকে নিয়ে যাবে, বন্দীকে সেদিকে হাঁটতে হবে। মায়ার রাজ্যে আমরা হলাম এই একজন কয়েদীর মত। এই মায়ার রাজ্যেই ভগবান হলেন প্রধানমন্ত্রীর মত। আমরা যেমন মায়ার রাজ্যে পুলিশের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে আছি। মায়ার রাজ্যে ভগবানও পুলিশ দ্বারা বেষ্টিত হয়ে আছেন; কিন্তু পুলিশরা চলবে তাঁর কথামত, আমাকে চলতে হবে পুলিশের কথাতে, এইটুকু তফাৎ। বলছেন, *মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য*, মালিক বলে কথা, যেমনটা বলবে তেমনটাই হতে হবে।

ঈশ্বরের গুণ নিয়ে বলা হল, এবার বলছেন ঈশ্বরের স্বরূপ। ঈশ্বরের স্বরূপ কি? *অজোঽব্যয়ো ভূতানাং ঈশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধোমুক্তস্বভাবোঽপি সন্*, তিনি ***অজঃ***, যাঁর জন্ম হয় না, কারণ তিনি সব সময়ই আছেন। ***অব্যয়ঃ***, তাঁর কখন ক্ষয় হয় না। তিনি গতকাল যেমন ছিলেন, আজও তেমন আছেন, ভবিষ্যতেও এই রকমই থাকবেন। আমরা প্রতি মুহূর্তে পাল্টাচ্ছি। ***ভূতানাং ঈশ্বরঃ***, ঈশ্বর শব্দের অর্থই হয় যিনি সব কিছুর নিয়ন্তা, সমস্ত ভূতের নিয়ন্তা। ***নিত্য***, তিনি সব সময় আছেন, গতকালও ছিলেন, আজকেও আছেন, আগামীকালেও থাকবেন। ***শুদ্ধ***, ঈশ্বরের কোথাও কোন ধরণের খাদ নেই, জিনিসটা যেমনটি থাকার তেমনটি আছে। যেমন চব্বিশ ক্যারেটের সোনা, সোনা যেমনটি তেমনটি, কোথাও কোন খাদ নেই। ***বুদ্ধঃ***, তিনি হলেন চৈতন্যস্বরূপ, ভগবান বুদ্ধকে সেইজন্য বুদ্ধ বলা হত, চৈতন্যের সাথে এক হয়ে গেছেন। ***মুক্তস্বভাবঃ***, তিনি চিরন্তন মুক্ত। ঈশ্বর কখন কারুর, কোন কিছুর বন্ধনে থাকেন না।

অপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইত চ লোকনুগ্রহং কুর্বন্ লক্ষ্যতে, যাঁর এই রকম স্বভাব, তিনি তো অনন্ত, সনাতন, শুদ্ধ চৈতন্য। অথচ তাঁর এমন একটা শক্তি, যেটাকে ম্যাজিক বলা যায় না, সেইজন্য লীলা বা মায়া বলা হয়। এই কারণে বলা হয় যেন তিনি জন্ম নিলেন, যেন তিনি কর্ম করলেন। কর্ম তিনি যা কিছু করেন, সেটাও *লোকানুগ্রহম্*, মানুষের মঙ্গলের জন্য করেন। ঈশ্বরের দ্বারা কোন পরিস্থিতিতে এমন কোন কাজ কখনই হয় না, যে কাজের দ্বারা কারুর ক্ষতি হবে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবতারা দেবীকে স্তুতি করে বলছেন, মা তোমার দৃষ্টিতেই অসুরদের নাশ হয়ে যেত, কিন্তু তুমি তা করলে না, তুমি তাদের তোমার অস্ত্র দিয়ে বধ করলে। কারণ তোমার স্পর্শ যদি এরা পায়, মৃত্যুর পর দেবলোকে যাবে, এরা আর কেউ নরকে যাবে না। তোমার দৃষ্টিতে যদি এদের নাশ হত, তাহলে সবাই এরা নরকে যেত। মা ভগবতী জগজ্জননী, তাঁর কাছে দেবতা অসুর আলাদা কিছু না, সবাই তাঁর সন্তান। মা যদি কাউকে বধ করেন, সেখানেও তিনি তার ভালর জন্যই মারছেন। তত্ত্বের দৃষ্টিতে হিন্দুরা ভাল-মন্দ আলাদা ভেবে কিছু করে না; পরে এর উপর পরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। যেটাতে মন্দ হচ্ছে, সেখানেও হিন্দুরা দেখে এবার সে ঘুরে দাঁড়াবে। আচার্যরা সেইজন্য ভালমন্দের কোন তফাৎ করেন না। গীতার এটা একটা বড় আলোচ্য বিষয়, যা অনেকবার ঘুরে ঘুরে আসবে। এখানে ভাল আর মন্দ বলে কিছু নেই।

আমরা এখন ঠাকুরের জন্মতিথিতে জন্মোৎসব পালন করি। আগেকার দিনের মহারাজরা জন্মোৎসব বলতেন না, বলতেন আবির্ভাব তিথি। এর পিছনে যুক্তি হল, ভগবানের কিসের জন্ম, কিসের মৃত্যু, তাঁর আবির্ভাব। তিনি অনন্ত, তিনি কি করে শরীরে আবদ্ধ হবেন। আচার্য এটাই

বলছেন, তিনি ভগবান, তিনি যখন অবতার হয়ে আসেন, তখন মনে হয় যেন তিনি জন্ম নিলেন। তাঁর তিরোধান হলে মনে হয় যেন তিনি চলে গেলেন। আসলে কিন্তু তা কখনই হয় না। কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে পুরোপুরি এটাই হয়। তখন বলছেন, ভগবান কেন আসেন? জীবকুলকে অনুগ্রহ করার জন্য।

আচার্য বলছেন, *লোকনুগ্রহং কুর্বন্ লক্ষ্যতে, স্বপ্রয়োজনাভাবেহপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া,* এর আগে আমরা বললাম, ঈশ্বর আসেন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এখানে অবতার রূপে ঈশ্বরের আসার আরও একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আসছেন। কোন পরিস্থিতিতে, কক্ষণ ভগবানের কোন প্রয়োজন থাকে না। যাঁরা উচ্চমানের সাধু, মহাত্মা, ওনারা যদিও ঈশ্বরের মত নন, কিন্তু তাঁদেরও কোন প্রয়োজন থাকে না, স্বার্থ কোথাও থাকে না। *ভূতানুজিঘৃক্ষয়া,* ভূত বলতে সমস্ত প্রাণীকুলকে বোঝায়, মানুষ, জীবজন্তু, কীট-পতঙ্গ, সবাইকে মিলে ভূত বলা হয়। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের নামে বলছেন, যারা ঠাকুরকে দেখেছে, এমনকি যে ঘোড়ারা ঠাকুরকে টেনেছে, যোনিমুক্তি সবারই হবে। *ভূতানুজিঘৃক্ষয়া,* সবারই ভালোর জন্য তিনি অবতার হয়ে আসেন।

বৈদিকং হি ধর্মদ্বয়ং অর্জুনায় শোকমোহমহোদধৌ নিমগ্নায় উপদিদেশ, এখান থেকে আচার্য গীতার মর্ম নিয়ে আলোচনা শুরু করছেন। প্রথমে বললেন, ভগবান অবতার হয়ে এসেছেন। অর্জুন এখন শোক-মোহের মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমরা শুরুতে বলেছিলাম, গীতা কেন চিরদিন প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবে, সমস্ত যুগে, সমস্ত দেশে, সমস্ত জাতির জন্য গীতা দরকার। কারণ শোক আর মোহ সব কালেই আছে, সব দেশে আছে, সব জাতিরই আছে। যে জিনিসটা আছে, সেটা চলে গেলে যে দুঃখ হয়, এটাকে বলে শোক। একটা জিনিসকে আমার পাওয়ার খুব ইচ্ছা আছে, কিন্তু পাচ্ছি না, এটাকে বলে মোহ। আসলে দুটো একই জিনিস, দুটো ক্ষেত্রেই জিনিসটা আমার কাছে নেই, একটা স্থূল রূপে আমার কাছে ছিল, এখন নেই; আরেকটা কখনই আমার কাছে ছিল না, সেটাকে পেতে চাইছি। দুটোতেই কিন্তু মনের একটাই অবস্থা। একজনের বাবা মারা গেলেন, মেয়েটির এখন কান্নাকাটির শেষ নেই, এটা একটা mental state, ছিলেন, চলে গেলেন। আবার একজন আছে সে কেবল এটা চাই, সেটা চাই করে যাচ্ছে, এটাও একটা mental state। একটাতে কিছু একটা পাওয়ার জন্য মন লেগে আছে। মন সব সময় কিছু চায়। যাদের কাজকর্ম কম থাকে তাদের এগুলো বেশী হয়। প্রচুর কাজকর্মের মধ্যে যারা দিনরাত ডুবে থাকে, তাদের এত শোক-মোহ হয় না।

মনের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মন প্রচণ্ড শক্তিশালী আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য মন কখন ফাঁকা থাকতে চায় না। এটা সত্য যে অবতার ছাড়া সবার মন সমান। তার মানে, স্বামী বিবেকানন্দের মন আর আমার মন, ক্ষমতার দিক থেকে দুটো মনই সমান। স্বামীজীর মনটা খুলে যাওয়ার পর ওই স্তরে চলে গেছে, আমার মন এখনও বদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। মন কিন্তু সব সময় জানে, আমারও ক্ষমতা আছে। অনেকে নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলে, আমরা আসলে জমিদার বংশের লোক। কোন এক সময়ে হয়ত জমিদার ছিল, প্রচুর জমি-জায়গা ছিল, এখন দু কাঠাও জমি আছে কিনা ঠিক নেই, কিন্তু মনের মধ্যে ওই ভাবটা থেকে গেছে। স্বামী বিবেকানন্দের মন যে বংশের, আমার মনও জানে যে আমিও ওই একই বংশের।

ইদানিং কালের ব্রাহ্মণরা কোন দিন বেদ চোখে দেখেনি, একটা মন্ত্র জানে না, অথচ বলার সময় বলবে, 'আমি কিন্তু ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে'। 'পৈতে হয়েছে'? 'না, তা হয়নি'। 'গায়ত্রী মন্ত্র জানো'? 'রেকর্ডে অনেকবার শুনেছি'। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ওই ভাবটা আছে। আমাদের মনটাও ঠিক সেই রকম, মনও তাই বলে, আমারই বংশের লোক স্বামী বিবেকানন্দ, আমারই বংশের লোক আইনস্টাইন, আমারই বংশের লোক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সবাই মন দিয়েই সব করছে। সেইজন্য মন কখন চুপ করে বসে থাকতে চাইবে না, ব্যস্ত থাকতে চায়। সেই কারণে যেটা চলে গেছে সেটার

জন্য কান্না, আর যেটাকে জানে, পেলে আমার খুব ভাল হয়, কিন্তু আসছে না, সেটার জন্য হা পিত্যেশ করে যাচ্ছে, তাকে ব্যস্ত থাকতে হবে। মন নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য কখন শোক করবে, কখন ক্রোধ করবে, কখন মোহে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। কিন্তু কাজ যদি করতে থাকে, মন তখন একটা জিনিসকে নিয়ে ব্যস্ত থাকাতে ওগুলো আর মনের মধ্যে মাথা চাড়া দেওয়ার সুযোগ পায় না।

অর্জুনের মন এখন শোক-মোহের মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। নিজের জ্ঞাতি ভাই, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু, আচার্য সবাইকে এখন শেষ করে দেওয়ার জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে; তাঁর নিজের সন্তান, আত্মীয়স্বজন সবাই সবাইকে মারতে যাচ্ছে। ছোটবেলা যাঁর কোলে কত খেলা করেছি, কত আবদার করেছি, একটু পরে নিজের হাতে সেই পিতামহকেও আমায় মারতে হবে। কল্পনা করলে আমাদেরও গা শিউড়ে ওঠে।

সিভিল ওয়ারের উপর একটা গল্প, সিভিল ওয়ার মানেই যে যাকে পাচ্ছে তাকেই মারছে। গল্পে দেখাচ্ছে একটা শহরে ছাদের উপর থেকে রাস্থার এপার ওপারে এক অপরকে গুলি চালাচ্ছে। দু পক্ষেই খুব দক্ষ। অনেকক্ষণ ধরে গুলি চলছে। কিছুক্ষণ পর একটা দিক শান্ত হয়ে গেছে। তখন এদিককার লোকটি ভাবল, দেখি তো ওইদিকে কে এমন দক্ষতার সাথে, এমন নির্ভুল নিশানায় গুলি চালাচ্ছিল। ও বুঝে গেছে ওই দিকের লোকটি মারা গেছে। নীচে নেমে ডেডবডির সামনে গিয়ে দেখছে, নিজের ভাই। দুই ভাই কখন দু দিকে চলে গেছে, নিজেরাও বুঝতে পারেনি। এর নিশানা যত নিখুঁত, ওরও নিশানা তত নিখুঁত, এর বুদ্ধি যত তুখড়, ওরও বুদ্ধি সেই রকম তুখড়।

এখানে শুধু ভাই না, একটা পুরো বংশকে অর্জুন নাশ করতে যাচ্ছে। এই মোহ থেকে অর্জুনের শোক, শোক থেকে চোখে জল। গীতার প্রথম অধ্যায়ে এই দৃশ্যের বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান কিন্তু অর্জুনকে কোন ধমক দিয়ে বলছেন না যে, ওঠো, লড়াই করতে এসেছো, লড়াই করো। ঠাকুরের কাছেও যখন কেউ শোকাহত হয়ে আসত, ঠাকুর তার কথা শুনতেন, কিছু বলতেন না। তারপর হঠাৎ একটা গান গাইতে শুরু করে দিতেন। এমন একটা গান ধরতেন, যে গান শোকাহত ব্যক্তিকে একটা জীবনদর্শন দেখিয়ে দিত। কেউ কোন দিন কাউকে সাহায্য করতে পারে না, সাহায্য মানুষ নিজেকেই নিজে করে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান বলবেন, *উদ্ধরেদাত্মনাত্মনং*, নিজেকে দিয়েই নিজেকে উদ্ধার করতে হবে, কেউ কাউকে উদ্ধার করতে পারবে না। আমরা খুব জোর দুটো কথা বলে দিতে পারি, ওই দুটো কথা বলে দিলে তার ভিতরের শক্তিটা জেগে যায়। ভগবানও কাউকে সাহায্য করেন না। তাহলে তিনি কি করছেন? *উপদিদেশ*, উপদেশের মাধ্যমে তিনি একটা জীবনদর্শন দিয়ে দেন।

তার সাথে খুব সুন্দর কথা বলছেন, *গুণাধিকৈর্হি গৃহিতোহনুষ্ঠিয়মানশ্চ প্রচয়ং গমিষ্যতীতি*, যার মধ্যে প্রচুর গুণের সমাবেশ, তাকে যদি উপদেশ দেওয়া হয়, তাহলে সেই উপদেশের প্রচার প্রসার খুব ভাল হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, ভগবান এখানে কিছু উপদেশ, ওখানে কিছু উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু ভগবান যখন মর্ত্যভূমি ছেড়ে চলে যাবেন, তখন তিনি উদ্ধবকে উপদেশ দিলেন, এর নামই হল উদ্ধবগীতা। কিন্তু আমরা সবাই জানি, ভাগবত গীতাই শ্রেষ্ঠ। যাদেরকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন, তাদের মধ্যে সব থেকে গুণের সমাবেশ হয়েছিল অর্জুনের মধ্যে। সেইজন্য গীতার এত প্রসার প্রচার হয়েছে।

ঠাকুরের সময় কলকাতায় তখন কত বড় বড় স্কলার, কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, পণ্ডিত শশধর, কিন্তু দম ছিল নরেনের মধ্যে। ঠাকুর নরেনকে দেখেই চিনে নিয়েছিলেন, এই হল সেই গরু, যার লেজে হাত দিলে তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে উঠবে। ঠাকুর নরেনকে ধরলেন, আর তাকে উপদেশ দিলেন। স্বামীজীর মাধ্যমে ঠাকুরের উপদেশ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেল। আমাদের

বেশির ভাগই সব চরিত্রবান গরু, বিরাট দাম গরুর, কিন্তু এই গরু কোন দিন বাছুর দেয়নি, দুধ দেবে না, কোন দিন পাল খায়নি; তবে গরুটার চরিত্র আছে। এই ধরণের চরিত্রবানদের দিয়ে কিছু হয় না। অবতারও যখন ধরেন, এই ধরণের চরিত্রবান লোকেদের তিনি ধরেন না।

আলেকজাণ্ডারের যে ঘোড়া ছিল, কেউ সেই ঘোড়াকে কাবু করতে পারছিল না। আলেকজাণ্ডার সেই ঘোড়াকে কাবু করলেন, আর সেই ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে সারা বিশ্ব জয় করলেন। ঘোড়া মারা যাওয়ার পর, তার নামে একটা শহর দাঁড় করিয়ে দিলেন। দম চাই, শক্তি না থাকলে কিছু হবে না। আচার্য এখানে এই কথা বলছেন। আচার্য মণ্ডন মিশ্রের কাছে গেলেন, বিরোধী পক্ষের, তা হোক; কিন্তু লোকটার দম আছে। ওকে তিনি হারিয়ে নিজের শিষ্য তৈরী করে নিলেন। তারপরই আচার্যের কথা সারা ভারতে ছড়িয়ে গেল।

যা কিছু কথা ভগবান অর্জুনকে বলেছিলেন, বেদব্যাস, যিনি সর্বজ্ঞ, সাতশটি শ্লোকে সব কথাকে তিনি গীতাতে লিপিবদ্ধ করে দিলেন। ভূমিকাতে আমরা এর উপর আলোচনা করেছি। এখন গীতাতে যা যা কথা আসবে, এটাকে আমরা ব্যাসদেবের কথা বলতে পারি, আবার শ্রীকৃষ্ণের কথাও বলতে পারি। বেদব্যাস সর্বজ্ঞ, কোথায় কি হচ্ছে তিনি সব কিছু জানেন, অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ যা যা কথা বলেছেন, সেটাও তিনি জানেন। ব্যাসদেবের পক্ষে তাই এগুলও কোন ব্যাপারই না। শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য আমরা যাতে বুঝতে পারি সেইজন্যকে ব্যাসদেব নিজের মত করে গুছিয়ে, সহজ করে সাতশটি শ্লোকে বললেন। ব্যাসদেব সব কথা গীতাতে গুছিয়ে সুন্দর করে রেখে দেওয়ার পরেও আমরা গীতা পড়ে কিছু বুঝতে পারি না বলে শঙ্করাচার্য গীতার উপর ভাষ্য রচনা করলেন। আচার্য শঙ্কর যে ভাষ্য রচনা করলেন সেটারও অনেক কিছু আবার বোঝা যায় না, সেইজন্য আনন্দগিরি আচার্যের ভাষ্যের উপর টীকা লিখলেন। মধুসূদন সরস্বতী অনেক বড় মহাত্মা ছিলেন, তিনি দেখলেন, টীকা পুরোটা ঠিক হয়নি, অনেক ফাঁক থেকে গেছে। তিনি তাই শঙ্করাচার্যের ভাষ্যকে আধার করে আবার গূঢ়ার্থদীপিকার মত একটা মোটা বই লিখলেন। ভগবান অর্জুনকে ঠিক কি বলেছিলেন আমরা এখন জানতে পারব না। কিন্তু সমস্ত বেদের যে সার, বেদের যে মূল বক্তব্য, সেটাকে নিয়ে বেদব্যাস দাঁড় করিয়ে দিলেন গীতার মত এক কালজয়ী গ্রন্থ।

অনেকে নিন্দা করে বলে, আদৌ কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন সংবাদের মত ঘটনা হয়েছিল; আদৌ কি যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এত কথা বলেছিলেন? আমরা এর উপর আগে আলোচনা করে নিয়েছি। আচার্য এখানে পরিষ্কার করে বলছেন, *তং ধর্ম ভগবতা যথোপদিষ্টং বেদব্যাসঃ সর্বজ্ঞো ভগবান্ গীতাখ্যৈঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ*, এই যে প্রবৃত্তিলক্ষণ আর নিবৃত্তিলক্ষন দুটি ধর্মের কথা অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, সেটাকেই ব্যাসদেবস সাতশটি শ্লোকের মধ্যে বেঁধে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কিছু কথা বলেছিলেন, হয়তো তিনি দশ মিনিট কি পাঁচ মিনিট বলেছিলেন কিংবা হয়তো কুড়ি মিনিটি ধরেও বলতে পারেন আর সেটা আলোচনার মাধ্যমে বলেছিলেন। এই পুরো কথাবার্তাটুকুকে ব্যাসদেব, যিনি একজন কবি, একজন সর্বজ্ঞ মানুষ, তিনি সাতশটি শ্লোকের মধ্যে ছন্দোবদ্ধ করে সঙ্কলন করে দিলেন।

এরপর আচার্য বলছেন, *তদিদিং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থসারসংগ্রহভূতং দুর্বিজ্ঞায়ার্থং তদর্থাবিষ্করণায় অনেকৈর্বিবৃতপদার্থবাক্য-বাক্যার্থন্যায়ং অপি অত্যন্তবিরুদ্ধানেকার্থত্বেন লৌকিকৈর্গৃহ্যমাণং উপলভ্যাহং বিবেকতোঽর্থনির্ধারণার্থং সংক্ষেপতো বিবরণং করিষ্যামি*। গীতা সমস্ত বেদের সার, এর অর্থ বোঝা খুব কঠিন। আচার্য শঙ্কর নিজেই বলছেন, গীতাকে ধারণা করা খুব কঠিন। আচার্য এও বলছেন, এর আগে আগে অনেকেই গীতার অর্থ বোঝানর চেষ্টা করেছিলেন, আমিও চেষ্টা করছি। গীতা বোঝা বা ধারণা করা কেন কঠিন, এর আগে এটাকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গীতা কেন কঠিন যদি বলতে হয়, তাহলে বলা যায়, একদিক ওই বিশাল বেদ, যার

মধ্যে প্রচুর বৈচিত্র্যময় প্রার্থনা রয়েছে, সেই বেদের সারকে গীতায় রাখা হয়েছে; অন্য দিকে ভগবান যে কথাগুলো অর্জুনকে বললেন, সেটাকে সংক্ষেপে বিস্তার করছেন।

গীতার অর্থ বার করার জন্য অনেকেই পদচ্ছেদ, পদার্থ, বাক্যার্থ, আক্ষেপ ইত্যাদি নানান রকমের ভাষ্য লিখেছেন। সাধারণ ভাবে কোন কিছুর অর্থের ব্যাখ্যা করাকে ভাষ্য বলা হয়, কিন্তু ভাষ্যের ধরণ আলাদা হয়। টীকায় শুধু শব্দ ও তার অর্থ দেওয়া হয়। কিন্তু লোকেরা যখন এই ব্যাখ্যাগুলো পড়ছে, তখন তারা বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। খুশবন্ত সিং একবার স্বামীজীর নামে লিখতে গিয়ে বলছেন, স্বামীজীকে পড়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু দেখছি সব জায়গায় contradiction। উচ্চমানের যে কোন জিনিসকে বোঝার জন্য বা ধারণা করার জন্য একটা ভাল ট্রেনিং লাগে। যে কোন লোককে গীতা ব্যাখ্যা করতে দিলে একটা না একটা ব্যাখ্যা করে দেবে। কিন্তু যেমনি বলা হবে, গীতার এই শ্লোক আর ওই শ্লোক তো মিলছে না, তখন আর এটাকে মেলাতে পারবে না। শুধু তাই না, অনেক জায়গায় এর দর্শন এমন হয়ে যায় যে, যেমন আচার্য অনেক জায়গায় বলবেন, শ্লোকের এই শব্দকে ব্যকরণের নিয়মে ভাঙলে শ্লোকের এই অর্থ হয়, কিংবা সাধারণ দৃষ্টিতে এই অর্থ হয়। কিন্তু এই অর্থ যদি নেওয়া হয় তাহলে আগে একটা শ্লোকে এই রকম যেটা বলেছেন, তার বিরোধী বক্তব্য হয়ে যায়। গীতা কখনই শ্লোক অনুসারে চলে না, পুরো ছবিটাকে একসাথে না নিয়ে অর্থ করতে গেলে এই সমস্যা হবে।

এনাদের একটা বিধি আছে, কোন শ্লোকের অর্থ যদি বলতে হয়, সেখানে তার সীমা নির্ধারিত করে দেওয়া হয়, সেই সীমার বাইরে কেউ যেতে পারে না। সেইজন্য এখানে এই অর্থ, সেখানে এর এই অর্থ, এভাবে অর্থ নিরূপণ করা যায় না। আচার্য তাই খুব সুন্দর কথা বলছেন, *অত্যন্তবিরুদ্ধানেকার্থত্বেন*, অর্থ যখন বার করছে, তখন এক জায়গায় এক রকম অর্থ করছে, অন্য জায়াগায় অন্য রকম অর্থ করছে। সেইজন্য আচার্য খুব সুন্দর মিষ্টি করে বলছেন, *অহং বিবেকতোঽর্থনির্ধারণার্থং সংক্ষেপতো বিবরণং করিষ্যামি*। আচার্য এখানে বলছেন, বিভিন্ন ভাষ্যকাররা এর আগে গীতার অর্থ বিভিন্ন ভাবে নিরুপণ করে গেছেন, লোকেদের মনে গীতার অর্থ নিয়ে এত রকম বিভ্রান্ত হওয়ার কারণে আমি খুব সংক্ষেপে গীতার অর্থ, গীতা ঠিক কি বলতে চাইছে, তার ব্যাখ্যা করলাম। আমাদের পরম্পরাতে বলা হয় যে, আচার্য তাঁর ষোল বছর বয়সে গীতার এই ভাষ্য রচনা করেছিলেন। শঙ্করাচার্যের যে জীবনী আমরা পাই, তাতে বলা হয় যে, তিনি আট বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যান, পরের চার বছর তিনি সাধনা করেন, তার পরের চার বছর তিনি উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতার ভাষ্য রচনা ষোল বছর বয়সে শেষ করেন। আগামী ষোল বছর সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে হিন্দু ধর্মের জাগরণ ঘটালেন এবং ভারতের চার প্রান্তে চারটি ধাম করে দিলেন। আচার্য শঙ্করই পঞ্চ দেবতার পূজা প্রবর্তন করেন। ব্যাসদেব যেমন একা হাতে হিন্দু ধর্মের সমস্ত শাস্ত্র রচনা করলেন, ঠিক সেইভাবে আচার্য শঙ্কর একা হাতে হিন্দু ধর্মকে একত্রিত করে একটা ছাতার নীচে নিয়ে এলেন। স্বামীজীও একা হাতে হিন্দু ধর্মকে বিদেশে নিয়ে গেলেন।

সত্যিই তাই হয়েছে, গীতার একটি শব্দ নেই যেটার অর্থ আচার্য বলেননি। একটি শব্দ নেই, যে শব্দের ব্যাখ্যা করার দরকার, আচার্য ব্যাখ্যা করেননি। বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী ট্রেনিং সেন্টারে একজন আচার্য ছিলেন, তিনি বলতেন, যখনই কিছু লিখবে আচার্য শঙ্করের মত লিখবে, কোথাও যেন একটি অতিরিক্ত শব্দ না থাকে, যতক্ষণ খুব দরকার না হয় ততক্ষণ কোন উদাহরণ দেবে না, আর শেষে লিখবে, *ইতি শ্রুতে*। মহারাজদের মধ্যে মজা করা হয়, কোন মহারাজকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এই কথা আপনি কোথায় শুনেছেন বা পেয়েছেন? উত্তর দেবেন, *ইতি শ্রুতে*। শ্রুতির অর্থ বেদ। আচার্য বলবেন, বেদেও এই রকম কথা আছে। কোথায় বলা হয়েছে? *ইতি শ্রুতে*, আপনি খুঁজে নিন। আমাদের কিছু লিখতে দিলে, যদি গরুর রচনা লিখতে দেওয়া হয়, প্রথমেই বলতে থাকব, রবীন্দ্রনাথ এই বলেছেন, স্বামীজী এই বলেছেন, নিজের কোন বক্তব্য নেই, রচনা পড়ে কেউ জানতে পারবে

না, গরুর চারটে পা নাকি দুটো পা। আচার্য কক্ষণ এভাবে বলবেন না, সব জায়গায় উনি নিজের বক্তব্য বলে যাবেন, কিন্তু যে জায়গাতে একটু বিতর্কমূলক মনে হবে, সেখানে তিনি শ্রুতি থেকে উদ্ধৃতি এনে দেখিয়ে দেবেন, শ্রুতিও এই কথা বলছে।

উদ্ধৃতি নেওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে, যখনই কোন উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে কোন বাক্য নেওয়া হয়, তখন সেখানে পুরো বাক্যটাই বলতে হবে। দ্বিতীয়, আমি কথাটা বলছি, কিন্তু আপনি হয়ত মানবেন না, আপনি বলতে পারেন, তোমার কি অথরিটি বলার। তখন আমি বলব, রবীন্দ্রনাথও এই রকম বলেছেন। আপনি যদি রবীন্দ্রনাথকে না মানেন, তখন বলতে পারেন, আমি এই যুক্তিটা মানতে পারলাম না; এটাই নিয়ম। কিন্তু আমরা সবাই অমুক কি বলেছিলেন, তমুক কি বলেছিলেন উল্লেখ করতে থাকি, নিজের কোন বক্তব্য নেই। আচার্য কোথাও এভাবে কিছু বলবেন না। একটি শব্দ নেই যেটার উনি ব্যাখ্যা করবেন না, কোন জটিল, বিতর্কিত বিষয়কে ছাড়বেন না, অথচ ছোট ছোট করে বলবেন, সব কিছু জলবৎ পরিষ্কার, কোথাও কোন সংশয় আচার্য রাখেননি। কিন্তু তারপরেও আচার্যের ভাষ্যের উপর মধুসূদন সরস্বতী আবার একটা ভাষ্য লিখলেন। অনেকের মনে প্রশ্ন হতে পারে, দরকার নেই, তা সত্ত্বেও মধুসূদন সরস্বতী কেন লিখলেন? তখনকার দিনে সাধু সন্ন্যাসীদের খুব বেশী কাজকর্ম থাকত না, কিন্তু একটা ভাল উচ্চ চিন্তন নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য ওনারা একটা কিছুর উপর ভাষ্য লেখাতে নেমে যেতেন।

এরপর আচার্য কি বলছেন, সংক্ষেপে আমরা বলে দিচ্ছি। আমরা আগে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের উপর আলোচনা করেছি। অভ্যুদয় হল জাগতিক উত্থান আর নিঃশ্রেয়স হল পরম কল্যাণ। আচার্য এখানে পরপর গীতা থেকে, অনুগীতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে অনেক কিছু বলছেন। আমরা এখানে প্রসঙ্গটাকে পাল্টে একটা অন্য বিষয়ের উপর বলছি। আমাদের ভাষায় অভ্যুদয়ের অর্থ হল সাংসারিক উত্থান, পুরুষার্থের দিক থেকে ধর্ম, অর্থ ও কাম। অন্য দিকে মোক্ষ হল পরম নিঃশ্রেয়স। আমরা যদি প্রচলিত হিন্দু ধর্মের দিকে তাকাই, তখন কোথাও আমাদের মনে হয়, এই দুটো যেন পুরো আলাদা। আচার্যও প্রথমে বলছেন, বেদের দুটি ধর্ম – প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। আমাদের অধিকারই নেই আচার্যের কথার বিরোধীতা করার, কিন্তু স্বামীজীর এই মত ছিল না। প্রবৃত্তি মানে কোন কিছুতে মনকে লাগানো আর নিবৃত্তি মানে মনকে তুলে নেওয়া। আমি এখন গীতার ক্লাশ শুনছি, এটা প্রবৃত্তি। ক্লাশের পর বাড়িতে গিয়ে বই পড়ব, এটা প্রবৃত্তি। তার মানে গীতার ক্লাশ শোনা থেকে নিবৃত্তি নিয়ে আমি বই পড়ছি, একটা থেকে নিবৃত্তি নিয়ে আরেকটা জিনিসে প্রবৃত্ত হলাম। যদি আমরা পারমার্থিক দৃষ্টিতে দেখি, তাহলে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি আলাদা কিছু না। কারণ প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিতে নিবৃত্তি লাগে। যেমন একজন গৃহবধূ রান্না করছিলেন, তিনি এখন টিভি দেখছেন। তার মানে তাঁকে আগে রান্না থেকে নিবৃত্ত হতে হয়েছে, তবেই তিনি টিভি দেখাতে প্রবৃত্ত হতে পারলেন। যে কোন প্রবৃত্তির আগে একটা নিবৃত্তি থাকবেই। বাচ্চাদের খেলায় নিবৃত্তি হলেই পড়াতে প্রবৃত্তি আসবে, পড়াতে নিবৃত্তি হলে তবেই সে খেলাতে প্রবৃত্ত হবে। প্রবৃত্তিতে আগে নিবৃত্তি থাকতে হবে, এটা খুবই উচ্চমানের কথা। কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে এভাবে বলে দিলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, সব কিছু তিনিই করেন, ওই আমি বোধটাও তিনিই রেখেছেন। তখন একজন বলছেন, কেন আমি বোধ তিনি রাখলেন? ঠাকুর তার উত্তরে বলছেন, তা নাহলে জগতে পাপের বৃদ্ধি হত, পাপকে কেউ ভয় পেত না। হিন্দুরা বলে, ঈশ্বরই আছেন, একজন খুনী সেও সাক্ষাৎ ঈশ্বরেরই রূপ। একজন খুনী বা ধর্ষণকারী সেও ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছে, কোন ধর্ম এই সত্যকে নিতে পারবে না, অসম্ভব নেওয়া। আমেরিকাতে খ্রীশ্চানরা স্বামীজীকে বলত, How can you have a religion without sin, পাপ ছাড়া কি করে আপনারা ধর্মকে মানছেন? কিন্তু

একটু ভাল করে চিন্তা করলে দেখা যাবে, যে কোন প্রবৃত্তি, তা যতই নোংরা হোক, আসলে মানুষকে নিবৃত্তির দিকেই নিয়ে যায়।

খুন কে করে? যার মধ্যে হিংসা আছে। হিংসা ভাব কম বেশী আমাদের সবারই ভিতর আছে। মশারির ভিতর একটা মশা ঢুকে ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে। বিরক্ত হয়ে রাত একটায় ঘুম থেকে উঠে আলো জ্বেলে সেই মশাকে মারার জন্য অনেক কসরৎ করে একবার বাগে পেলে পিশে মেরে ফেলবে। কারণ ভিতরে হিংসার ভাবটা আছে কিনা। ভিতরের এই হিংসা ভাবকে যদি নিয়ন্ত্রণ না করা হয়, তবে এটাই তাকে ক্রমশ নীচের দিকে নামিয়ে নামিয়ে কোথায় নিয়ে যাবে বুঝতেও দেবে না। শেষে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাবে, একদিন সে কাউকে খুনও করে দিতে পারবে। প্রথম খুনটা করার পর হয়ত সে ধরা পড়ল না, বেঁচে গেল। এরপর দুটো খুন করবে, তিনটে খুন করবে। যেদিন সে ধরা পড়বে, সমাজ তাকে এমন শাস্তি দেবে যে তাতেই সে শিক্ষা পেয়ে যাবে। যদি না শিক্ষা হয়, তারপর আরও করবে। একজন লোক অন্যায় করতে থাকলে, প্রথমে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হল এগুলো অন্যায় কাজ, তাতে কাজ না হলে তিরস্কার করা হল, তাতেও না শোধরালে দণ্ড দেওয়া হল। এরপরও যদি শিক্ষা না পায়, তাহলে বুঝতে হবে এখনও তার বাকি আছে। যার শোনার একবার শুনেই নিজেকে শুধরে নেবে; যার বোঝার একবারেই বুঝে যাবে। যার এখনও সময় হয়নি, তাকে বোঝালেও বুঝবে না। উল্টে যে উপদেশ দিচ্ছিল তাকে বলবে, 'আপনি কি জানেন আমি কি সমস্যায় আছি? আপনি কি আমার সমস্যা জানেন, না জেনে জ্ঞান দিতে আসবেন না'। এদের দ্বারা কিছু হবে না, এদের যেমনি কিছু কেউ বলতে যাবে, উল্টে তাকে আরও চারটে কটূ কথা শুনিয়ে দেবে।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ ছিলেন সাক্ষাৎ ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান, পরে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, বেলুড় মঠের ঠাকুরের মন্দিরের নকশা তিনিই করেছিলেন। ১৯৩৬ সালে ইংল্যাণ্ডের রাজা ছিলেন অস্টম এডওয়ার্ড, যাঁর সাম্রাজ্যে কখন সূর্য অস্ত যেত না। তখনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হয়নি। বিশাল সাম্রাজ্যের রাজা, কত ক্ষমতাবান লোক। তিনি এক আমেরিকান মহিলার প্রেমে পড়েন। সেই মহিলাকে তিনি এমন ভালবাসলেন যে, নিজের স্ত্রী, রাজপ্রাসাদ, সাম্রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে এলেন, শুধু ওই মেয়েটিকে পাওয়ার জন্য। তখনকার ইংল্যাণ্ডের রাজপরিবারের নিয়ম ছিল, পরিবারের কেউ দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে না, ডিভোর্সিকে বিয়ে করতে পারবে না, এই ধরণের কিছু করলে তাকে রাজপরিবার থেকে চলে যেতে হবে; আরও অনেক রকম নিয়ম ছিল। দুটো পথ – হয় রাজ সিংহাসন ছাড় নয়ত মেয়েটিকে ছাড়। এডওয়ার্ড বললেন, আমি রাজ সিংহাসন ছেড়ে দিচ্ছি। তিনি সত্যিই বৃটিশের সাম্রাজ্যের সিংহাসন ছেড়ে দিলেন, যে সাম্রাজ্যে সূর্য কখন অস্ত যায় না। শ্রীরামচন্দ্রের কাছেও এই ধর্মসঙ্কট এসেছিল –প্রজার কল্যাণ করবেন, নাকি সীতার রক্ষা করবেন। একই সঙ্কট অষ্টম এডওয়ার্ডের কাছে এলো, এডওয়ার্ড বললেন, আমি এই মেয়েটিকে ছাড়তে পারব না। রাজ সিংহাসন ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

সেই সময় একজন সন্ন্যাসী স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজকে বললেন, 'দেখলেন! লোকটা কি রকম স্ত্রৈণ! একটা মেয়ের জন্য কি কাণ্ড করল'। বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ শুনে বললেন, 'না না এটা কিছু না, এটাও ত্যাগেরই রূপ। যে লোকটি আজ ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্য ছেড়ে দিল একটি মেয়ের জন্য, একটি মেয়েকে ছাড়তে তার কতক্ষণ লাগবে! এই জন্মে না ছাড়ুক, পরের জন্মে ছাড়বে, তা নাহলে পরের জন্মে ছাড়বে, এখানে কমন ব্যাপার হল ত্যাগ'। স্বামী বিজ্ঞানানন্দের এই কথা পড়ার পর আমাদের হতবম্ব হয়ে যেতে হয়।

দেওঘরের রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের খুব সিনিয়র সাহেব মহারাজ স্বামী পাবনানন্দ স্বামী শিবানন্দের শিষ্য, শম্ভু মহারাজ নামেই তিনি বেশী পরিচিত ছিলেন। একবার দেওঘর বিদ্যাপীঠে

সেখানকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রের এসেছিলেন, একজন আইএএস অফিসারও তখন এসেছিলেন। ওই আইএএস অফিসার দেওঘর বিদ্যাপীঠে দু-তিন মাস পড়েছিলেন। আইএএস অফিসার কেরল থেকে বিহারে বদলি হতে চাইছিলেন। শম্ভু মহারাজের সাথে তাঁর পরিচয় করানো হল। উনি কোন দিকে মন দিতেন না, কথা বলার সময় বেশীর ভাগ সময় চোখ বন্ধ করে কথা বলতেন। তিনি সেই অফিসারকে খুব মিষ্টি করে বললেন, 'দেখো, এটাই হল ত্যাগের চিহ্ন। আজকে এটা তোমার ভাল লাগছে না, এটাকে ছেড়ে কাল যেটা নেবে সেটাও তোমার ভাল লাগবে না। এই করে ধীরে ধীরে মানুষ ঈশ্বরের দিকে এগোচ্ছে'। এই হল একজন উচ্চমানের সন্ন্যাসী, একজন আইএএস অফিসার রাজ্য পাল্টাতে চাইছেন, সেখানেও তিনি ত্যাগের আদর্শ দেখছেন।

এই ত্যাগের ভাব যখন তুঙ্গে চলে যায়, তখনই ধর্মের জন্ম হয়। আমরা অনেক সময় বলে থাকি, তোমার কোন কিছুতেই শান্তি হয় না, তুমি কোন কিছুতেই খুশী হও না। কারণ যেটা পেয়েছে সেটাকে ফেলে দিয়ে আর-একটা ধরছে, সেটাকেও ফেলে দিয়ে আর-একটা পেতে চাইছে, এই ভাবে সে এগিয়ে যাচ্ছে, সে নিজেকে উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ভাল ছেলে, চরিত্রবান গরুর মত বসে আছে, একে নিয়ে কি হবে! কিন্তু দুর্দান্ত ছেলে, তাকে আটকানো যাচ্ছে না। আসলে সে কিন্তু উন্নতি করছে। এরপর একটা অবস্থায় গিয়ে তার মধ্যে প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা আসবে। স্বামীজী বলছেন, ধর্ম কখন শুরু হয়? যখন প্রচণ্ড dissatisfaction আসে, কোন কিছুতেই তার আর শান্তি পায় না, আমার আর লাগবে না। ঈশোপনিষদের শেষের দিকে আছে, ব্রাহ্মণ মৃত্যুকালে প্রার্থনা করছেন, এই যে আমার আসা-যাওয়া চলছে, একবার জন্মাচ্ছি, জন্মে মরছি, মরে আবার জন্মাচ্ছি, আমি তিতি বিরক্ত হয়ে গেছি, আমার আর লাগবে না। *পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্*, আবার জন্ম হবে, আবার মরব, আবার কোন মায়ের গর্ভে গিয়ে দশ মাস বাস করতে হবে, বিরক্তি ধরে গেছে, complete dissatisfaction, ধর্ম তখন শুরু হয়। যদি তোমার মনে হয়, সব কিছুতেই তুমি সুখী আছো, তাহলে বুঝে নাও, তোমার এখনও সময় হয়নি। কোথাও একটা বিরক্তির ভাব থাকতে হবে, তবে বিরক্তির মধ্যে একটা আদর্শ থাকলে পরিষ্কার বোঝা যায়।

সমস্যা হল, এসব কথা কাঁচা মনের লোকেদের বললে, ট্রেনিং পাইনি এমন লোকেদের বললে, তাদের কাছে এটা একটা ভুল বার্তা হয়ে চলে যাবে। আজ যে অনাচার করে বেড়াচ্ছে, বর্তমান কালে আজকে এই ছেলের সাথে ঘুরছে, কাল অন্য ছেলের সাথে ঘুরছে, এই মেয়ে আজকে যে ছেলের সাথে বন্ধুত্ব করছে, কাল অন্য ছেলের সাথে, পরশু আর-একটা ছেলের সাথে বন্ধুত্ব করছে। এরা বলবে, কেন, আমি তো ধর্মের পথেই এগোচ্ছি। ঠিকই বলছ, তুমি এগোচ্ছ, কিন্তু লম্বা রাস্তা নিয়ে ফেলেছ। কারণ তোমার কাছে পরিষ্কার নেই যে, তুমি কেন এগোচ্ছ। যত তুমি এগুলো করতে থাকবে তোমার অনাচার বাড়বে। এই করে করে তুমি গোল্লায় যাবে, তোমার সর্বনাশ হবে, অনেক জন্ম তুমি পিছিয়ে যাবে। পিছোতে পিছোতে এমন গাড্ডায় গিয়ে পড়বে যে তুমি সেখান থেকে আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না, যতক্ষণ না কোন সৎপুরুষ তোমার দিকে সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে দিচ্ছে।

যতক্ষণ তুমি স্থির ততক্ষণ তুমি মৃতবৎ হয়ে আছ, যতক্ষণ তুমি মুভ করছ ততক্ষণ তুমি মুক্তির দিকেই এগোচ্ছ। এটা হল স্বামীজীর ভাব। প্রবৃত্তি বলে কিছু হয় না, যেটা হয় নিবৃত্তিতেই হয়। এটাকে আচার্য সমন্বয় করছেন, কিন্তু অন্য ভাবে। আচার্য বলছেন, স্বর্গাদির যে কামনা হয়, এটা আমাদের কাছে highest প্রবৃত্তি, এটাই যখন অনাসক্ত ভাবে করা হয়, এটা আমার কর্তব্য তাই করছি, তখন এটাই মুক্তির কারণ হয়ে যায়।

তার মানে তিনটে পথ এসে গেল। একটা হয় ত্যাগের পথ, যেখানে কর্ম ত্যাগ। দ্বিতীয় হয় কর্মযোগ, লেগে আছি, কারণ আমি একটা কিছু হতে চাইছি। সেখান থেকে আসছে, আমার এটা

কর্তব্য, তাই আমি এটা করছি, now you are as good। যিনি ত্যগী আর যিনি যোগী, দুটো সমান হয়ে গেল। কর্ম ত্যাগ আর কর্মফল ত্যাগ দুটো প্রায় একই রকম হয়ে যায়। কর্ম ত্যাগে তাও বিপদ থাকে, কারণ যারা অলস, ফাঁকিবাজ, সে বলতে পারে আমি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। কোন সন্ন্যাসীকে কিছু একটা কাজ করতে দিলে বলবে, সবাইকে কি কাজ করতে হবে, আগের জন্মে সব কাজ করা হয়ে গেছে। এই ধরণের অপদার্থদের দিয়ে কোন কাজ হয় না। শাস্ত্রের দুটো কথা শিখে নিয়েছে, হজম করতে পারিনি, তাই যেখানে সেখানে বমন করে যাচ্ছে।

আচার্য মোটামুটি তিনটে category আনছেন, যার মধ্যে গীতা ঘুরঘুর করবে – কর্ম, কর্মফল ত্যাগ ও কর্মত্যাগ। কিন্তু আমরা যদি গভীর ভাবে দেখি, তখন দেখা যাবে সবটাই এক। কাজ করতে করতে একটা সময় বিরক্ত হয়ে গিয়ে মনে হবে, আমি এসব কি করছি।

অনেক আগেকার কথা, স্বামী সুহিতানন্দজী তখন দেওঘর বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি নূতন ব্রহ্মচারীদের বলতেন, দেখ, যারা বিয়ে-থা করে, তারা মনে করে ভোগ করব, তারপর কিছু দিন পর দেখে, সারাটা জীবন গরুর মত সংসারে খেটে যাচ্ছে। একটা লোক স্কুলে শিক্ষকতা করে পঞ্চাশ হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছে, তারপর কিছু টিউশিনিও করছে। কিন্তু কত টাকা সে নিজের জন্য খরচ করে? নিজের খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ সহজ, কারণ ছেলেমেয়েকে দিতে হবে, স্ত্রীকে দিতে হবে, বাবা-মার ওষুধপত্রের জন্য দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত হিসাব করে দেখলে দেখা যাবে, তার নিজের জন্য খুব বেশী হলে তিন থেকে চার হাজার তার মাসে খরচ হয়। বাকি পুরো টাকাটা অপরের জন্য খরচ হয়ে যায়। এরপরেও যদি বৈরাগ্য না আসে, আর কবে বৈরাগ্য আসবে! গাধার মত খাটনি আমি কার জন্য খাটছি? এখান থেকে বেরোনর কোন উপায় নেই। বিয়ে করে এনেছে, একটা দুটো বাচ্চা হয়ে গেছে, আবার তুমি বলবে আমি বৈরাগী হব, স্ত্রী কি তোমাকে অত সহজে ছেড়ে দেবে! এইভাবে দু জন্ম, চার জন্ম চলবে, তখন একটা সময় বলবে, আমার আর লাগবে না, আমাকে ছেড়ে দিন। ঠাকুর গরুর বর্ণনা করছেন, গরু হাম্বা হাম্বা করে, তাকে কত পেটায়, রোদে, জলে লাঙল টানায়, পেটপুরে খেতে দেয় না, তারপর মরার পর কসাইএর কাছে নিয়ে যায়, সেখানে ছাল চামড়া ছাড়ায়, তারপর তার নাড়িভুড়ি দিয়ে তাঁত তৈরী হয়, সেই তাঁত যখন ধুনুরীর হাতে পড়ে তখন বলে তুঁহু তুঁহু। ঠাকুর বোঝানর জন্য বলছেন। যতক্ষণ 'আমি আমি' থাকবে ততক্ষণ সে সংসারে ফেঁসে থাকবে। সংসারে সবাই সবাইকে শুষে নিচ্ছে, কেউ বুঝতেও পারছে না।

বিদেশে এক চিত্রকরের আঁকা একটা বিখ্যাত ছবি আছে। একটা ঘোড়া, তার পিঠে ঘা, সেই ঘায়ের উপর মাছি ভন ভন করছে। তার অর্থ হল, ঘোড়াটি সারাদিন বাইরে খাটছে, সারাদিন খাটার পর বাড়ি এসেছে, বাড়িতে আসার পর বাড়ির সব মাছিগুলো তার ঘায়ের উপর বসে তাকে শুষছে। বাইরে সে খেটে যাচ্ছে, বাড়ির ভিতরে মাছিরা তাকে শুষছে। আমাদের জীবনটাও তাই, বাইরে খেটে যাচ্ছে। সারাদিন খাটাখাটনির পর বাড়ি ফিরেছে, সন্তান বাবা বাবা বলে দৌড়ে এসেছে, তার মানে এবার সে কিছু আদায় করবে। কথামৃতে ঠাকুর খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন, গিন্নী খুব সুন্দর করে অনেক পদ রান্না করে স্বামীকে খেতে দিয়েছে, স্বামী খুব সুখে তৃপ্তি করে খাচ্ছে। পাশ থেকে গিন্নী বলতে শুরু করেছে, 'ওগো জানো, পাশের বাড়ির ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে কেমন সুন্দর একটা গয়না কিনে দিয়েছে'।

ভগবান এই প্রসঙ্গটা শেষ করছেন এই বলে, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং তাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।* তোমার ভালমন্দ যা কিছু আছে, সব ছেড়ে ঈশ্বরের শরণ নাও। গীতার এটাই উদ্দেশ্য। গীতার মর্ম হল, ত্যাগ কর, তা নাহলে কর্মফল ত্যাগ কর, এবং শেষে ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ সমর্পণ। এর বাইরে গীতায় অন্যান্য যে আলোচনা গুলো আসে, এগুলো হল গীতার বাইপ্রোডাক্ট। গীতার মূল উদ্দেশ্য হল, মানুষকে মুক্তির দিকে অর্থাৎ পরম নিঃশ্রেয়সের দিকে

নিয়ে যাওয়া। তার আগে নিষ্কাম কর্ম করে মন শুদ্ধি করতে হবে, মন শুদ্ধ হলে জ্ঞান, আর পূর্ণত্যাগ, সবটারই মূলে রয়েছে ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ সমর্পণ।

সব বলার পর আচার্য শেষে বলছেন, *ইমং দ্বিপ্রকারং ধর্মং নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনং। পরমার্থতত্ত্বং বাসুদেবাখ্যং পরব্রহ্মাভিধেয়ভূতং বিশেষতঃ অভিব্যঞ্জয়দ্বিশিষ্টপ্রয়োজনসম্বন্ধাভিধেভিধেয়বদ্গীতাশাস্ত্রং যতস্তদর্থবিজ্ঞানেন সমস্তপুরুষার্থসিদ্ধিঃ। অতঃ তদ্বিবরণে যত্নঃ ক্রিয়তে ময়া*। পরম কল্যাণ, এটাই প্রয়োজন। *যতস্তদর্থবিজ্ঞানেন সমস্তপুরুষার্থসিদ্ধিঃ*, যদি গীতাশাস্ত্রের অর্থ বুঝে নেওয়া হয়, তাহলে সমস্ত পুরুষার্থের, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সিদ্ধি হয়ে যায়। *অতঃ তদ্বিবরণে যত্নঃ ক্রিয়তে ময়া*, আগে আচার্য বললেন আমি সংক্ষেপে গীতার অর্থের ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছ, এখন বলছেন, সেইজন্য আমি গীতার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি।

আমাদের মনে হয়, আচার্য যখন ভাষ্য লিখতে শুরু করেছিলেন তখন তাঁর মনে হয়েছিল, গীতা এত কঠিন যে এর পুরো ব্যাখ্যা হবে কি হবে না। এর আগে চারটে কথা বলা হয়েছিল, প্রয়োজন, অধিকারী, বিষয় ও সম্বন্ধ। গীতার ঠিক ঠিক অধিকারী হল, যে নিজের পরমকল্যাণ চাইছে। বিষয় হল, আচার্য বলেননি, কিন্তু আনন্দগিরি যিনি আচার্যের ভাষ্যকে আধার করে যে গূঢ়দীপিকা লিখেছেন, তাতে তিনি বলছেন, গীতার বিষয় হল, পরমব্রহ্ম = বাসুদেব (কৃষ্ণ) = পরমার্থ, পরমার্থ হল জীবনে কৃষ্ণপ্রাপ্তি। কৃষ্ণপ্রাপ্তি মানেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি, তার মানে গীতার বিষয়বস্তু কৃষ্ণেরই রূপ। গীতার প্রতিটি অধ্যায়ে কৃষ্ণ নিজের বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন। আসলে কৃষ্ণের বর্ণনা নয়, এগুলো হল পরমব্রহ্মের বর্ণনা, সেই পরমব্রহ্ম তিনিই হলেন বাসুদেব। গীতার প্রয়োজন কি? প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি দ্বারা নিঃশ্রেয়স বর্ণনা। মুক্তি কিভাবে পাওয়া যাবে? প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দিয়ে। সম্বন্ধ হল, গীতাতে বিষয় আর অধিকারীর সম্বন্ধ। যে কোন অধিকারী যদি এই বিষয়কে বুঝে নিয়ে পালন করে, তাহলে তার প্রয়োজন সিদ্ধি হবে। এটাই আচার্যের উপোদ্ঘাৎ বা সম্বন্ধ ভাষ্য। এরপর আমরা গীতার মূল গ্রন্থে প্রবেশ করব। এখন আমরা গীতার প্রথম অধ্যায় অর্জুনবিষাদযোগ আলোচনা করতে যাচ্ছি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথম অধ্যায়

অর্জুনবিষাদযোগ

কিছু সাধারণ বর্ণনা আর তার সাথে অর্জুনের বিষাদের বর্ণনা, এই নিয়ে প্রথম অধ্যায় – অর্জুনবিষাদযোগ। প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের বিষাদের বর্ণনা ছাড়া বিশেষ কিছু ব্যাখ্যা করার নেই। সাধারণ বর্ণনাগুলির ব্যাখ্যা করার কিছু নেই। এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটাই খুব তাৎপর্যপূর্ণ। গীতার প্রথমের দিকে ভূমিকাতে বলা হয়েছিল, ব্যাসদেবের প্রচুর যোগ ক্ষমতা ছিল। ধৃতরাষ্ট্র জন্ম থেকে অন্ধ। পরে পরে ভাষ্যকাররা জন্মান্ধের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, ধৃতরাষ্ট্র জ্ঞানের দিক থেকে অন্ধ, সন্তানের মোহে একেবারে মোহান্ধ হয়ে পড়ে আছেন। ব্যাসদেব যুদ্ধের পূর্বে ধৃতরাষ্ট্রকে গিয়ে বললেন, 'তুমি জন্মান্ধ, কিন্তু তোমাকে আমি দিব্যদৃষ্টি দিচ্ছি, যার ফলে তুমি যুদ্ধে যা যা হবে সবটাই তুমি নিজের চোখে ঘরে বসেই দেখতে পারবে'। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'আমি এই চোখে এই বিরাট নরসংহার দেখতে চাই না'।

ধৃতরাষ্ট্রের সারথি ছিলেন সঞ্জয়, খুবই বিশস্ত, প্রায় মন্ত্রীর মর্যাদায় ছিলেন। সঞ্জয় আবার ব্যাসদেবের শিষ্য ছিলেন, আর খুব প্রিয় শিষ্য ছিলেন। ব্যাসদেবের কোন বাছ-বিচার ছিল না, কে ক্ষত্রিয়, কে শূদ্র, ভাল আধার পেলে তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নিতেন। সঞ্জয় সূত হওয়া সত্ত্বেও ব্যাসদেবের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। সঞ্জয়কে তিনি সেই দিব্যদৃষ্টিটা দিলেন। এই জায়গাতে এসে, অনেক কিছু পরিষ্কার বোঝা যায় না। কোথাও কোথাও মনে হয় যুদ্ধের সময় সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কাছেই বসে থাকতেন। কিন্তু মহাভারতে এর কোন সাক্ষ্য নেই, বরং বর্ণনা আছে, সঞ্জয়কে কৌরবদের হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে দেখা যাচ্ছে।

যুদ্ধের দশম দিবসে ভীষ্মের পতন হওয়ার পর সঞ্জয় হতাশ হয়ে হস্তিনাপুরে এসে ধৃতরাষ্ট্রকে ভীষ্মের পতনের খবর দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র এই মর্মান্তিক সংবাদ নিতে পারছিলেন না। তিনি সঞ্জয়কে বললেন, 'তুমি প্রথম দিন থেকে আমাকে পুরোটা বিস্তারে বলো'। এখান থেকে গীতার শুরু। এই অংশটাকে অনেকে প্রক্ষিপ্ত বলেন, তার মানে মহাভারতে পরে সংযোজন করা হয়েছে। আগেকার কিছু কিছু ভাষ্যকাররা এটাকে আখ্যায়িকা বলছেন। কঠোপনিষদে যেমন যমরাজ আর নচিকেতার সংলাপ, এটা একটা আখ্যায়িকা, একটা গল্প। গল্পের মাধ্যমে দুটো চরিত্রকে রেখে পুরো একটা শাস্ত্র দাঁড় করা হয়েছে। কিন্তু আচার্য বলছেন, যেটা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, অর্জুনের মধ্যে বিষাদ এসেছে, এরপর অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যা কিছু বলেছিলেন, সেটাকে ব্যাসদেব সাতশটি শ্লোকে নিবদ্ধ করে দিলেন।

এখানে একটা মজার ব্যাপার দেখার আছে, প্রথম অধ্যায়ে পর পর কয়েকজন রাজা বা যোদ্ধার নাম আসছে। মহাভারতে যেখানেই যুদ্ধের বর্ণনা এসেছে, তার প্রত্যেকটিতে যোদ্ধার বর্ণনা আছে। গীতা যদি কেউ পরে রচনা করে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত করে থাকেন, তাহলেও তিনি এত সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে করেছেন যে, খুব সুন্দর ভাবে খাপে খাপে বসে গেছে। আমাদের কাছে ঐতিহাসিকতার কোন দাম নেই, আমাদের কাছে মহাভারত, গীতা হল আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি। আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, বেদের পুরো আধ্যাত্মিক ভাব কিভাবে উপনিষিদে নিহিত। আর সব উপনিষদের যা বক্তব্য, সেটা গীতাতে এসেছে, আর তার সাথে ভক্তির কথাও এসেছে। কারণ উপনিষদে যদিও ভক্তির কথা আছে, কিন্তু গীতার মত এত পরিষ্কার ভাবে নেই। যাই হোক, ভীষ্মের পতনের খবর শোনার পর ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলছেন –

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়।।১।।

(ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন – হে সঞ্জয়, পূণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডবগণ যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়ে কি করেছিল?)

কিমকুর্বত সন্ধি ভাঙলে হয় *কিম্+অকুর্বত*। *কিম্ অকর্বুত* বলাতে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সঞ্জয় কোন ধারাভাষ্য দিচ্ছেন না। *অকুর্বত* শব্দের অর্থ হল, কি করল তারা? কি করছেন বলছেন না। অনেক বড় বড় নেতারা, গণ্যমান্য লোকেরা বড় বড় গলায় বলতে থাকেন, মহাভারতের সময় টেলিভিশনের টেকনলজি ছিল, সঞ্জয় টিভি দেখে ধৃতরাষ্ট্রকে সুন্দর ভাবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ধারাবিববরণী দিয়ে যাচ্ছেন। এরা একবার যদি শাস্ত্রটা খুলে পড়েন, তাহলে তাঁদের এই অজ্ঞতাগুলো পরিষ্কার হয়ে যেত। বাচ্চা বয়সে ঠাকুরমা, দিদিমার কাছে যে গল্প শুনে এসেছে, সেই গল্পগুলিই জ্ঞান রূপে এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। এখানে পরিষ্কার, গীতা শুরুই হচ্ছে *কিম্ অকুর্বত* দিয়ে, *অকুর্বত* শব্দের অর্থ হয় গত দশ দিনে কি হয়েছে। এটা যদি ধারাভাষ্য হত, তাহলে বলা হত, কি করছে।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের কাছে জানতে চাইছেন, আমার সন্তান আর পাণ্ডব পক্ষের যোদ্ধারা সমবেত হয়ে কি করলেন। *যুযুৎসবঃ*, যুযুৎস শব্দের অর্থ যুদ্ধ করার ইচ্ছা। এখানে আমরা দুটো শব্দকে নিয়ে আলোচনা করছি, *ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে*। গীতার নাম যখনই বলা হয় তখন সবাই এই *ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে* এই দুটোকেই মনে রাখে। ধর্ম মানে যে কোন জিনিসের স্বভাব বা স্বরূপ, যেমন অগ্নির ধর্ম হল দহন করা, দাহ্য শক্তি। সেইজন্য কোন জিনিসকে পরিভাষিত করার সময় বলা হয়, যে জিনিসটা ওটাকে ধরে আছে। গীতায় ধর্ম নিয়ে আলোচনা অনেক বার আসবে, বিশেষ করে স্বধর্ম, আমরা তখন বিস্তারে আলোচনা করব। যেটা আমাকে ধরে আছে, সেটাই ধর্ম। যেমন ঠাকুর মানুষকে পরিভাষিত করতে গিয়ে বলছেন, যার মানে হুঁশ আছে, অর্থাৎ আমিত্ব বোধ যার আছে। পরে অর্জুনকে বোঝাতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এটাই বলবেন, তোমার আমিত্ব ক্ষত্রিয় ধর্মে, তুমি যে বীর এটাই তোমার আমিত্ব, এটাকে নষ্ট হয়ে যেতে দিও না। বাইবেলে যীশু খুব সুন্দর বলছেন, লবণের লবণত্ব যদি চলে যায়, ওটাকে তখন পাথর বলে ফেলে দেওয়া হবে। যেমন স্বামী-স্ত্রী, স্বামী হওয়া মানেই তার একটা ধর্ম এসে গেল, ঠিক তেমনি স্ত্রী হলেই তার একটা ধর্ম এসে গেল। ছাত্রের ধর্ম কি? বলেন, *ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ*। অধ্যয়ন করাটাই ছাত্রের ধর্ম, যদি অধ্যয়ন না করে, তাহলে আর সে ছাত্র নয়। একটা সময় আমাদের রচনা লিখতে দেওয়া হত, ছাত্রের রাজনীতি করা ঠিক কিনা। ছাত্রের কাজ হল অধ্যয়ন করা, রাজনীতি করবে কি করবে না, এই প্রশ্ন আসে কোথা থেকে। ছাত্রের ধর্মই হল অধ্যয়ন করা, যদি তা না করে, সে আর ছাত্র না।

একবার নকশাল আন্দোলনের সময় কিছু ছাত্রকে পুলিশ লাঠি চালাতে সবাই চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। ছাত্রদের উপর লাঠি চালানোর প্রতিবাদে সবাই সমালোচনা করতে শুরু করে দিল। সমালোচনা করার কি আছে, ওরা তো ক্রিমিনাল, অধ্যয়ন ছেড়ে দিয়েছে মানেই তারা আর ছাত্র নয়।

কিন্তু শাস্ত্রে গিয়ে ধর্মের অর্থটা বিশেষ হয়ে যায়। সেখানে ধর্মের একটা সংজ্ঞা হল, ধর্ম অপ্রাপ্ত বস্তুকে প্রাপ্ত করায়, আর প্রাপ্ত বস্তুর বৃদ্ধি করে। যে জিনিসটা আমার কাছে নেই, সেটা এনে দেবে, আর যে জিনিসটা আমার আগে থেকেই আছে সেটার বৃদ্ধি করবে। যেমন আমার টাকা নেই, সে আমাকে টাকা পেতে সাহায্য করবে; টাকা যদি আগেই থেকে থাকে, সেটার বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। শাস্ত্রে যখন ধর্মের অর্থ আসে, তখন এই অর্থেই আসে। এখানে যখন ধর্মক্ষেত্রে বলছেন,

তখন এই অর্থেই বলা হচ্ছে। হিন্দু জীবনদর্শনে চার পুরুষার্থের কথা বলা হয়। আমি কেন বেঁচে আছি? হিন্দুদের মনে অনেক আগেই এই প্রশ্ন জেগেছিল। হিন্দুরা বলে, যতদিন তোমার মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন তোমার জন্ম-মৃত্যুর চক্র চলতে থাকবে। এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে যদি বেরোতে চাও, যদি তুমি উপরের দিকে যেতে চাও, তাহলে তোমাকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটে পুরুষার্থের সাধনা করতে হবে।

খুব সংক্ষেপে অর্থ হল, টাকা-পয়সা ন্যায় পথে অর্জন করা। অর্থ মানুষের শরীরের চাহিদা থেকে মুক্তি দেয়। যেমন আমাদের ক্ষুধা আছে, শরীর রক্ষার জন্য একটা আশ্রয় দরকার, শরীরকে রোগব্যাধি থেকে মুক্ত রাখা দরকার। অর্থ থাকলে দেহের যা যা আবশ্যিক চাহিদা, সেগুলো মেটানো সম্ভব। মনের মধ্যে চাঞ্চল্য থাকে, কাম মনকে এই চাঞ্চল্য থেকে মুক্তি দেয়। প্রথমটা শরীর থেকে, দ্বিতীয়টা মন থেকে মুক্তি দেয়। মন থেকে মুক্তি দেওয়া মানে, মনের মধ্যে ভোগের ইচ্ছা আছে, মনটা ছটফট করছে, ভোগ হয়ে গেল, মনটাও শান্ত হয়ে গেল। ধর্ম মানুষকে অশুভ যোনি থেকে রক্ষা করে। মৃত্যুর পর পরের জন্মে কুকুর বেড়াল বা কোন তীর্যক প্রাণী বা অসুর, রাক্ষস যোনিতে জন্ম নেওয়া থেকে ধর্ম রক্ষা করে। মোক্ষ জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি দেয়। হিন্দু ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি। মুক্তি ছাড়া হিন্দু ধর্ম আর কিছু জানে না। শুধু যে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি তা না, দেহের চাহিদা থেকে মুক্তি, মনের চাহিদা থেকে মুক্তি, মৃত্যুর পর শুভ যোনি না পাওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্তি আর জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি। আগে যে ধর্মের সংজ্ঞায় বলা হল, অপ্রাপ্ত বস্তুকে প্রাপ্ত করায়, প্রাপ্তকে সমৃদ্ধ করে, এখানে ধর্মক্ষেত্রের ধর্মও একই অর্থে বলা হচ্ছে।

ধর্মে কিছু করণীয় জিনিস থাকে আবার কিছু অকরণীয় বা নিষিদ্ধ জিনিস থাকে। যে কর্মগুলি করতে বলা হয়, সেগুলিকে বলছেন বিধি। এর মধ্যে নিত্যকর্ম থাকে, যে কর্ম আমাদের প্রত্যেক দিন করতে হবে, যেমন জপধ্যান, পূজা, পাঠ ইত্যাদি। নৈমেত্তিক কর্ম, বিশেষ সময়ে যে কর্মগুলি করতে হয়। কিছু আবার আছে কাম্য কর্ম, ভোগের ইচ্ছার জন্য যে কর্মগুলি করা হয়। যেমন কোন কিছু একটা পেতে চাইছি, তখন একটা যজ্ঞ করল। তার সাথে আছে প্রায়শ্চিত্ত কর্ম, একাদশী ব্রত পালন করা, তীর্থে যাওয়া, এগুলো প্রায়শ্চিত্ত কর্মের মধ্যে পড়ে। এগুলো আবার একটার সাথে আরেকটা মিলেমিশে যেতে পারে। যেমন গঙ্গাস্নানাদি একজনের কাছে প্রায়শ্চিত্ত কর্ম হতে পারে আবার যারা গঙ্গার কাছাকাছি থাকে তার রোজ গঙ্গায় স্নান করে, গঙ্গাস্নানটা তার কাছে নিত্যকর্ম। গঙ্গা থেকে যারা অনেক দূরে থাকে, তাদের কাছে গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাস্নান করাটা একটা তীর্থ হয়ে যায়; একটা বিশেষ দিনে গঙ্গায় স্নান করল।

আগেকার দিনে, অর্থাৎ হাজার হাজার বছর আগে বেদের সময় যে ঋষিরা ছিলেন, ওনাদের কাছে ধর্মের অর্থ ছিল যজ্ঞ। যজ্ঞ করাটাই তাঁদের ধর্ম ছিল, যে কোন জিনিসের জন্য ওনারা যজ্ঞ করবেন। আগে যে নিত্যকর্মের কথা বলা হল, যজ্ঞটাও তাঁদের নিত্যকর্ম ছিল, যেমন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম। কেরলে, মহারাষ্ট্রে কিছু কিছু ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁরা এখনও নিত্য অগ্নিহোত্র করেন। সকাল বিকাল অগ্নিতে বৈদিক মন্ত্রে আহুতি দেন আর অগ্নিকে সব সময় প্রজ্জ্বলিত রাখেন। অগ্নিহোত্রের অগ্নিকে কখন নির্বাপিত করা হয় না, চব্বিশ ঘন্টা প্রজ্বলিতে থাকে।

সেখান থেকে ধীরে ধীরে তাঁরা একটা ধারণা নিয়ে এলেন, সব সময় সবাইকে কেন যজ্ঞ করতে হবে, কারণ মনই হল আসল। এরপর এই যজ্ঞ চলে গেল তপস্যাতে। তখন ধর্মের অর্থ হয়ে গেল, তপস্যা করা, উচ্চ চিন্তন করা, মনন করা ইত্যাদি। একটা জিনিসকে নিয়ে বা ঈশ্বর চিন্তনে বা আত্মার চিন্তনে একজন ডুবে আছেন, এটাও ধর্ম। মহাভারতে এসে ধর্মের পুরো দৃষ্টিভঙ্গীটাই পাল্টে গেল। মহাভারতে ধর্ম হয়ে গেল স্বধর্ম। যে যেখানে আছে, যে জাতিতে আছে, যে বর্ণে আছে, যে

আশ্রমে আছে, যে বংশে আছে, সেখানে তার যা যা কর্তব্য, সেই কর্তব্য পালন করাটাই ধর্ম। যেমন একজন ব্যাধ, সে শিকার করে না, কিন্তু মৃত পশুর মাংস কেটে বিক্রী করছে, মহাভারত দেখাচ্ছে সেই ব্যাধও পুরোপুরি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত।

নারী জাতিকে নিয়ে অন্যান্য ধর্ম থেকে, বিদেশ থেকে হিন্দুদের কত রকম নিন্দা করা হয়, তারা বলে যে হিন্দুরা নারীদের সব দিক দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। আসলে মেয়েদের বেঁধে রাখা হয়নি। হিন্দু সমাজ একমাত্র সমাজ, যে সমাজে নারীদের সব থেকে বেশী স্বাধীনতা ছিল। বেদের সময় ঋষিদের সাথে ঋষিকারা ছিলেন, তাঁরাও ঋষিদের সাথে বেদের মন্ত্র রচনা করেছেন। আর স্বয়ম্বরের প্রথা ছিল, যেখানে একজন মেয়ে নিজেই নিজের স্বামীকে বেছে নিতে পারত। আবার এও দেখা যেত ছেলে মেয়ে উভয় উভয়কে পছন্দ করে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করছে, দুষ্মন্ত শকুন্তলা কাহিনীতে যেমন আছে। মেয়েদের সব রকম স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু পরে কোথাও সামাজিক স্তরে এসে কিছু একটা গোলমাল লেগে গেল, যার সাথে মূল হিন্দু ধর্মের কোন সম্পর্কই নেই।

ব্যাসদেব এসে বললেন, আগে দেখ, তোমার জীবনের উদ্দেশ্যটা কি, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চারটেই তোমার উদ্দেশ্য কিনা। একজন আদর্শ গৃহিণী হয়েও তুমি এই চারটে পুরুষার্থ সাধন করতে পারবে। এর জন্য তোমাকে কোন তপস্যা করতে হবে না। তপস্যার একটা গ্ল্যামার আছে, সুবিধাও আছে; যজ্ঞেরও একটা গ্ল্যামার আছে, সুবিধাও আছে। তুমি দেখ তোমার উদ্দেশ্য কি গ্ল্যামার, নাকি তোমার কোন কামনা পূরণ করা? কামনা পুর্তির ব্যাপার যদি হয়, তাহলে তোমাকে ঘরবাড়ি ছাড়তে হবে না। সংসারে থেকেও তুমি স্বধর্ম পালনের মাধ্যমে এই চারটে পুরুষার্থের সাধন করতে পারবে। অনেক পড়াশোনা করা লোকেরা হিন্দুদের নিয়ে অনেক সমালোচনা করে, এরা কেউ হিন্দু ধর্মের গভীরে গিয়ে দেখতে চায় না। হিন্দুদের সব কিছুই খুব খোলামেলা, শুধু একটা জিনিস, মুক্তিকে ওরা ধরে রেখেছে। হিন্দুদের আচার-আচরণ, বিধি-নিষেধ সব কিছু মুক্তি কেন্দ্রিক, আমার মুক্তি কিভাবে হবে। এরপর তুমি যজ্ঞ করে ধর্ম পালন করবে, নাকি তপস্যা করে পালন করবে, নাকি স্বধর্ম পালন করবে, এটা তোমার ব্যাপার, তুমি নিজে ঠিক করে নাও। মুসলমানদের যেমন পাঁচটা জিনিস সবাইকে করতেই হবে, হিন্দুদের এই ধরণের কিছু নেই, খুব লিবারাল সোসাইটি, সব খুলে রেখেছে। কিন্তু সেই খোলার মধ্যেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সীমা বেঁধে দিয়েছে –এটা করবে, ওটা করবে না। কিন্তু সেটাও খুব অনমনীয় নয়। মহাভারত পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায়, হিন্দু ধর্ম কাউকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে না।

আমরা এখানে তিনটে জিনিসকে নিয়ে এলাম, যজ্ঞ, তপস্যা ও স্বধর্ম। স্বধর্ম নিয়ে গীতায় পরে বিস্তারে আলোচনা চলবে। আমাদের কিছু প্রাচীন গ্রন্থাদি আছে, যেমন জাবাল উপনিষদ, সৎপথ ব্রাহ্মণ, সেখানে অনেক কিছুর বর্ণনা পাওয়া যায়; যেমন বলছেন, কুরুক্ষেত্রকে পূণ্যভূমি বলা হত, সেখানে তপস্যা করলে, যজ্ঞ করলে ফল দেয়। প্রাচীন কালে কোন ঋষি হয়ত একটা সময় কুরুক্ষেত্রে তপস্যা করেছিলেন। সব ধর্মেই এই ব্যাপারটা আছে, যেমন বৌদ্ধ ধর্মে, তিনি যেখানকারই বৌদ্ধ হন, জাপানের হোক, ইন্দোনেশিয়ার হোক, ওদের একটা ইচ্ছা থাকে যে, আমাকে বুদ্ধগয়ায় যেতে হবে, কারণ ভগবান বুদ্ধ ওখানে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কপিলাবস্তুতে না গেলেও বুদ্ধগয়ায় যাওয়ার চেষ্টা অবশ্যই করবে, কারণ সেখান ভগবান বুদ্ধের বোধি প্রাপ্তি হয়েছিল। তেমনি মুসলমানদের জন্য মক্কা বা খ্রীশ্চানদের জন্য জেরুজালাম।

কিন্তু এখানে ধর্মক্ষেত্র বলতে এটা হিন্দুদের তীর্থস্থান নয়, ধর্মক্ষেত্রের অর্থ হয়, নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য খুব ভাল স্থান। আজকের প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে নেগেটিভ ইমোশান, নেগেটিভ এনার্জির কথা খুব শোনা যায়। যদিও এগুলো একেবারেই অপ্রয়োজনীয়, এগুলো দিয়ে কিছু হয় না। কিন্তু একটা যেটা হয়, একজনের সংস্পর্শে এলে, আমার নিজের চিন্তা-ভাবনার

জন্যই হোক বা সেই লোকটার জন্যই হোক, আমার ভিতরে কিছু একটা হতে থাকে। হিন্দুরা এই জিনিসটাকে খুব বেশী মানে।

স্থানমাহাত্ম্যের কথা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। স্থানমাহাত্ম্য হল, প্রত্যেকটা দ্রব্যের যেমন তন্মাত্রা থাকে, ঠিক তেমনি সব স্থানেরই তন্মাত্রা থাকে। বিভিন স্থানে বিভিন্ন রকম তন্মাত্রার তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। কিছু কিছু স্থান আছে, সেখানে যদি কিছু দিন থাকা হয় সেই স্থানের একটা ভাইব্রেশান পাওয়া যায়। যেমন ভোগের স্থানে গেলে, আমাদের মনে ভোগের যে বাসনাগুলো থাকে, সেগুলো জেগে ওঠে। একটা প্রচলিত কথা আছে, কাশীতে সকালবেলায় আধ্যাত্মিক তরঙ্গ চলতে থাকে, বৃন্দাবনে নাকি মাঝ রাত্রিতে চলে। একজন মহারাজ স্বামী ভূতেশানন্দজীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বেলুড় মঠে কখন আধ্যাত্মিক তরঙ্গ প্রবল থাকে'? স্বামী ভূতেশানন্দজী হেসে বলছেন, 'চব্বিশ ঘন্টা'। তাই বেলুড় মঠে থেকে কেউ যদি জপধ্যান করে, তার আধ্যাত্মিক উন্নতি অনেক দ্রুত হবে।

স্বামীজীও এই জিনিসটাকে নিয়ে বলতেন, তিনি মনে করতেন, কেউ যদি কোন গুহায় বসে ধ্যান করে, বা শুভ চিন্তন করে, তার এই শুভ চিন্তন কখন নষ্ট হবে না। ওই শুভ চিন্তন দিয়ে সে বিশ্বকে সমৃদ্ধ করছে। লোকেরা মানুক আর না মানুক, তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু এটা সত্য। অন্ধের কাছে সূর্যের কোন দাম নেই, তার কাছে সূর্য নেই, তাই বলে সূর্যের অস্তিত্ব তো চলে যাবে না। আমরা যে তীর্থ করতে যাই, তীর্থের স্মৃতির জন্য আমরা যাই না। অন্যান্য ধর্মে তীর্থে স্মৃতির জন্য যায়। বুদ্ধ ভগবান হয়ে গেলেন, তাতে আমার কি, শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার ছিলেন, তাতে আমার কি, স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোতে বক্তৃতা দিয়ে প্রচুর হাততালি পেয়েছিলেন, তাতে আমার কি হল, সেটাকে নিয়ে আমি কি করব। আপনার সম্পত্তির খবর জেনে আমার কি হবে, আপনার গুণগান করে আমার কি হবে। হিন্দুরা এদিকে যাবেই না, সেইজন্য কার জন্মস্থান, কার মৃত্যুস্থান এই জিনিসগুলো হিন্দুদের কাছে ছিলই না। হিন্দুদের কাছে সব সময় উদ্দেশ্য ছিল আত্মোন্নতি। সেই জায়গাতে গিয়ে যদি আমার মনে হয় এখানে একটা ভাইব্রেশান আছে, তাহলে আমি সেখানে গিয়ে আরও জপধ্যান করব। যদি মনে হয় আমার আধ্যাত্মিক উত্থান হচ্ছে, তাহলে সেই জায়গার বিশেষ দাম আছে। বেলুড় মঠে যখন উৎসবাদি হয় তখন অনেক লোক খিচুরী খেতে আসে আবার সারা ভারতে যে পকেটমারদের এ্যাসোসিয়েশান আছে, তাদের লোকেরাও আসে, ওরা ওদের আধ্যাত্মিক উত্থানের জন্য আসে না, পকেট উত্থানের জন্য আসে। আর ছেলে আর মেয়েরা যারা হাতে হাত ধরাধরি করে আসে, ওরা সবাই আসছে প্রেমের উত্থানের জন্য। এগুলো তো আমাদের উদ্দেশ্য না, আমাদের উদ্দেশ্য হল, আমার আধ্যাত্মিক উত্থান হবে কিনা।

কামাখ্যা মন্দিরের কথা বললেই আমাদের মনে ভেসে উঠবে যে, কামাখ্যা হল খুব নামকরা শক্তিপীঠ। ওখানে মায়ের পা পড়েছিল, কি যোনি পড়েছিল, সেটার জন্য কামাখ্যার দাম কি? তা না, পরের দিকে এই সব তীর্থের সাথে অনেক রকম পৌরাণিক কাহিনী জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কোন এক কালে ওখানে নিশ্চয়ই বড় কোন সাধক সাধনা করেছিলেন। স্মৃতি রূপে নিশ্চয়ই যাওয়া যেতে পারে। কামারপুকুর ঠাকুরের জন্মস্থান, একদিন দুদিনের জন্য ঘুরতে যাওয়া হল, খুব ভাল। কিন্তু কামারপুকুরের একটা আলাদা দাম এইজন্যই আছে, কারণ আগেকার অনেক মহারাজরা ওখানে অনেক সাধন-ভজন তপস্যা করেছিলেন। কিন্তু বেলুড় মঠ সবারই রাজা। এখানে বসে একটু জপধ্যান করার চেষ্টা করলে সহজেই মন বসে যাবে। সিনেমা হলে বসে জপধ্যান করার চেষ্টা করলে মন বসতে চাইবে না।

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে কুরুক্ষেত্রের বর্ণনা থাকার অর্থই হল, এই স্থানে আগেকার দিনে অনেকেই তপস্যা করেছিলেন, তাই এখানে তপস্যা করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। প্রাচীন ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে আর্যরা পশ্চিম দিক থেকে ধীরে ধীরে ভিতরের দিকে এগিয়ে এসেছিলেন। মনুস্মৃতি

লেখার সময় দেখা যায় সেখানে ভারতবর্ষ বা আর্যবর্তকে পরিভাষিত করছেন, কালো হরিণ যত দূর চলে অর্থাৎ কাল হরিণ যেখানে যেখানে আছে, এটাই ভারতবর্ষ। মূলতঃ এটাই গাঙ্গেয় উপত্যকা। কুরুক্ষেত্র এই ভূমির কেন্দ্রে অবস্থিত, সেইজন্য কুরুক্ষেত্রে আর্য সভ্যতা খুব পুরনো আর পবিত্র বলে মনে করা হত। তার সাথে বলা হয়, গ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্রে গ্রহণের পাপ লাগে না। সম্রাট আকবরও গ্রহণের সময় আগ্রা ছেড়ে কুরুক্ষেত্রে চলে আসতেন। এই হল কুরুক্ষেত্রের মাহাত্ম্য। দিল্লী থেকে চণ্ডীগড়ের দিকে যাওয়ার সময় চণ্ডীগড় আর আম্বালার মাঝামাঝি জায়গায় কুরুক্ষেত্র অবস্থিত।

শ্রীকৃষ্ণ সন্ধির জন্য অনেক চেষ্টা করলেন, হস্তিনাপুরে নিজে গিয়ে কৌরবপক্ষকে বোঝালেন, কিছুই হল না। কর্ণকে আলাদা ভাবে বার করে এনে একান্তে অনেক বোঝালেন। কর্ণকে এটাও বললেন যে, তুমি জ্যেষ্ঠ কুন্তি পুত্র, তুমি পাণ্ডবদের দিকে চলে এসো। কর্ণ রাজী হলেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রকে দেখিয়ে বললেন, এই জায়গাটা সমান ভূমি, জলের সুবিধা আছে, আর এখন শরৎকাল, সব দিকে প্রশস্ত সময়, তুমি তোমার সেনাবাহিনী নিয়ে এসো। পাণ্ডবরা তখন বিরাট রাজার ওখানে ছিলেন, পাঞ্জাবের দিকে। এবার ধীরে ধীরে সেখান থেকে উভয়পক্ষের সেনারা কুরুক্ষেত্রে এসে হাজির হয়েছে।

মহাভারতে বর্ণনা আছে, ঠিক যুদ্ধের আগে উভয়পক্ষের সেনারা সমবেত হওয়ার পর, সেখানে ঘোষণা করা হল, এখনও যদি আপনাদের কারুর মনে হয় কেউ ভুল দিকে আছেন তাহলে শিবির পাল্টে নিতে পারেন, কারণ এটা ধর্মযুদ্ধ। তখন শেষ মুহূর্তে একজন দুজন শিবির বদল করে নিয়েছিলেন। বাকিরা সব এবার তৈরী। এরপর ঠিক হবে কে সেনাপতি হবে। কৌরবদের পক্ষ খুব শক্তিশালী, বড় বড় রথী মহারথীরা আছেন, ভীষ্ম আছেন, দ্রোণাচার্য আছেন, কর্ণ আছেন। কিন্তু আগে ভীষ্ম কর্ণকে কিছু কটূ কথা বলাতে কর্ণ বলে দিলেন যত দিন ভীষ্ম সেনাপতি থাকবেন, ততদিন আমি যুদ্ধ করব না। শ্রীকৃষ্ণ তখন কর্ণকে আরও একবার বলছেন, 'ভীষ্ম থাকলে তুমি যুদ্ধ করবে না, ততদিন তুমি পাণ্ডবদের পক্ষে এসে যুদ্ধ করো, পরে না হয় তুমি কৌরবদের দিকে চলে যেও'। এর অর্থটা কি? এই যুদ্ধ হল তোমার শৌর্য, বীর্য, তেজ দেখানোর একটা মহা সুযোগ। কতকটা মোহনবাগ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মত। একবার এক ফুটবল খেলোয়াড়কে, যে ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে মোহনবাগানে চলে গিয়েছিল, জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'আপনার অস্বস্থি লাগে না, এতদিন যাদের হয়ে খেললেন, এখন থেকে তাদের বিরুদ্ধে খেলতে হবে'? খেলোয়াড়টি খুব অবাক হয়ে বলল, 'অস্বস্থি লাগবে কেন, এটা তো ক্লাব, আজ আমি এই ক্লাবে আছি, সামনের বছর অন্য ক্লাবে যাব'। ইদানিং আইপিএলএ কয়েকটা টিমের মধ্যেই প্লেয়ারগুলো ঘুর ঘুর করে, যে টিম টাকা বেশী দিল সেই ক্লাবে চলে গেল। এখানে ছিলে শৌর্য দেখানো, একদিকে ধর্মযুদ্ধ, অন্য দিকে নিজের শৌর্য দেখানো। কর্ণ এবারও শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন। দুর্যোধন জানত, ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু, তাঁকে কেউ হারাতে পারবে না, সেইজন্য তাঁকে সেনাপতি করল। পাণ্ডবদের মধ্যে অনেক আলোচনা হওয়ার পর, তাঁরা ঠিক করলেন আমাদের সেনাপতি হবেন দ্রৌপদীর ভাই ধৃষ্টদ্যুম্ন, যজ্ঞ থেকে যাঁর জন্ম। দ্রোণাচার্যকে সে বধ করবে।

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল, পরে একটা কথা আসবে। যুদ্ধে একজন সেনাপতি থাকেন, আর তার নীচে অনেকেরই সৈন্য থাকে। ধৃষ্টদ্যুম্নকে ধরা যাক, ধৃষ্টদ্যুম্ন কমাণ্ডার ইন চীফ, তাঁর নীচে অর্জুন আছেন, ভীম আছেন, এনাদের অনেকেরই আলাদা করে অনেক সেনা থাকত। পরবর্তিকালে যে যুদ্ধ হত, তখন যিনি নামকরা কমাণ্ডাররা ছিলেন, যেমন জুলিয়াস সিজার, আলেকজাণ্ডার, এনারা হলেন সেন্ট্রাল কমাণ্ডার। আলেকজাণ্ডার যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছেন, সামনা সামনি অনেক সময় যুদ্ধ হত, যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছেন, আর পুরো সেনাবাহিনীও এগিয়ে যেত, মনে হত যেন পুরো একটা শরীর এগিয়ে যাচ্ছে। ইরানের রাজা ছিলেন ডারিয়াস, যাকে আলেকজাণ্ডার বিভিন্ন ভাবে পরাস্ত করেছিলেন। আলেকজাণ্ডার নিজের সেনাবাহিনীকে কয়েকটা

টুকরো করে বলে দিলেন, তোমরা এই সময় পিছন দিক থেকে আক্রমণ করবে। ডারিয়াসের সৈন্যবাহিনী অনেক শক্তিশালী ছিল, কিন্তু হেরে যায়। নেপলিয়ন, চেঙ্গিস খাঁ এরাও খুব নামকরা কমাণ্ডারস। চেঙ্গিস খাঁও সিঙ্গল আর্মি নিয়ে চলত।

নেপলিয়নই এসে প্রথম এই জিনিসটাকে পাল্টে দিলেন। তিনি যুদ্ধের কৌশলটাই পাল্টে দিলেন। নেপলিয়ন corpus system করলেন, সৈন্যবাহিনীকে তিনি কয়েকটা টুকরোতে ভেঙে দিলেন। আর প্রত্যেকটি টুকরো নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ। তার ঘোড়া আছে, কামান আছে, সবটাই আছে। একটা সেনা, কিন্তু তার মধ্যে যেন পাঁচ খানা সেনা, কেউ কারুর সাথে যুক্ত নয়। আর বিভিন্ন জায়গা থেকে নেপলিয়নের কাছে খবর আসত। মহাভারতের যুদ্ধ, traditional যুদ্ধ আর নেপলিয়নের corpus system, দুটোর combination। এক-একজন যাঁরা কমাণ্ডার ছিলেন, তাঁর complete army। এই নয় যে, যে হাতি দেখছে, সে হাতিই দেখছে, যেমন পোরাস যখন যুদ্ধ করছিলেন, ওটা single army। কিন্তু মহাভারতের যুদ্ধে নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ, যেমন অর্জুনের সেনা নিজের মধ্যে complete, ভীমের সেনা নিজের মধ্যে complete। অথচ ধৃষ্টদ্যুম্নের নেতৃত্বে পুরো জিনিসটা চলছে, formationটা একটু অন্য ধরণের ছিল। বলা হয়, হিন্দুদের যুদ্ধ কৌশল খুব উচ্চমানের ছিল, এটা কোন কাহিনীকে আধার করে বলা হচ্ছে না। এমনকি আলেকজাণ্ডার যুদ্ধ করতে করতে যখন ভারতে এলো, তখন তাকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল, মগধের রাজার সাথে তুমি যুদ্ধ করতে পারবে না। আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধ কৌশলটাকে চন্দ্রগুপ্ত নিয়ে ভারতের যুদ্ধের কৌশলকে আরও উন্নত করে দিল। সেইজন্য সেলুকাসকে এখানে এসে বেদম মার খেতে হল। এই হল মহাভারতের তখনকার যুদ্ধ কৌশল।

কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষ মিলে মোট আঠারো অক্ষৌহিনী সৈন্য যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। কৌরবদের এগারো অক্ষৌহিনী আর পাণ্ডবদের সাত অক্ষৌহিনী। এত চেষ্টা করেও পাণ্ডবরা কিন্তু বেশী লোক নিজেদের দিকে টানতে পারেননি। কারণ বেশীর ভাগ লোকেরা মনে করছিল কৌরবরাই ঠিক। এখানে একটা শব্দ আসবে চমূ, তিন নম্বর শ্লোকেই এসে যাবে। 1:1:3:5, একটি হাতি এবং একটি রথ। যত হাতি থাকবে তার তিন গুণ হবে ঘোড়া, হাতির পাঁচ গুণ হবে সৈন্য। এটা হল একটা ইউনিটের ফরমেশান, তার মানে একটা ইউনিটে একটা হাতি, একটা রথ, তিনটে ঘোড়া আর পাঁচজন সৈন্য। চমূতে থাকে সাতশ ঊনত্রিশ হাতি, ৭২৯ হাতি মানে ৭২৯টি রথ, ২১৮৭ ঘোড়া আর ৩৬৪৫ পদাতিক সৈন্য। অক্ষৌহিনীতে এই সংখ্যাটা অনেক বেড়ে যায়, চমূর তিরিশ গুণ হয়ে যায়। এক অক্ষৌহিনীতে ২১,৮৭০ হাতি, সম সংখ্যক রথ, ৬৫,৬১০ ঘোড়া এবং ১,০৯,৩৫০ পদাতিক সৈন্য। এখন আঠারো অক্ষৌহিনীতে পদাতিক সৈন্য হবে প্রায় আঠারো লক্ষ, তার সাথে রথ, হাতি, ঘোড়া এসবও রয়েছে। এটাকে নিয়েই অনেকে বলে একটা জায়গায় এত কিছু সমাবেশ কি কখন সম্ভব! মহাভারত, রামায়ণের কাহিনীকে আমরা গল্প বলিয়ে উড়িয়ে দিতে পারি, কিন্তু এটা তো সবাইকে মানতে হবে যে, বিশ্বজয়ী আলেকজাণ্ডারকে ভারতে এসে থেমে যেতে হয়েছিল, তার মধ্যে একটা প্রধান কারণ ছিল ভারতের সৈন্য ক্ষমতা আর নিপুণ রণকৌশল। যাই হোক, *ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে......*, এখান থেকে গীতা শুরু। তারপর ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় বিস্তারে বলতে শুরু করছেন –

সঞ্জয় উবাচ
দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবনীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ।।২।।

(সঞ্জয় বললেন – তখন রাজা দুর্যোধন পাণ্ডবসৈন্যদের বূহ্যাকারে সজ্জিত দেখে আচার্য দ্রোণের কাছে গিয়ে এই কথা বললেন।)

সঞ্জয় এবার প্রথম থেকে কুরুক্ষেত্রের বর্ণনা দিতে শুরু করেছেন, দু পক্ষই ব্যুহ রচনা করে পরস্পরের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, ভীষ্ম ও ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজের সেনাদের নিজের নিজের মত সাজিয়েছেন। তখন দুর্যোধন আচার্য দ্রোণের কাছে গিয়ে বললেন, 'এই দেখুন আমাদের সেনারা এই ভাবে ব্যুহ রচনা করে দাঁড়িয়েছে'। যদিও কুরুক্ষেত্রের মত একটা ছোট্ট জায়গায় এত লোকের সমাবেশকে নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করেন, কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছু কিছু আঁকা ছবি যদি দেখেন, তাহলে দেখবেন সেখানে দেখানো হয়েছে, বিরাট মাঠ, সেই বিশাল মাঠে দু পক্ষের সৈন্যরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। কুরুক্ষেত্রে এত লোক, এত রথ এবং হাতি, ঘোড়া কি করে সমবেত হতে পারে, এটাকে বুঝতে হলে আমাদের এই ছবিগুলোই দেখতে হবে। সৈন্য সংখ্যার বর্ণনা অতিশয়োক্তি কিনা আমাদের জানা নেই। তবে মহাভারতে যুদ্ধের যে বর্ণনা আমরা পাই, আর প্রত্যেকটা নাম করে করে যে লড়াইয়ের বর্ণনা আছে, তাতে স্বাভাবিক ভাবেই মনে হতে পারে যে, এই লড়াই খুব সাধারণ লড়াই ছিল না। বেদেও একটা যুদ্ধের বর্ণনা আছে, যেখানে দশজন রাজার মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও বিশ্বের বেশীর ভাগ দেশই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। তেমনি মহাভারতের এই যুদ্ধেও তখনকার দিনে ভারতের যত বড় বড় রাজারা ছিলেন, সবাই ওর মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। আবার অনেক রাজা নিজের রণকৌশল ও বীরত্ব দেখাবার জন্য যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। সেইজন্য এত লোকের সমাবেশকে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে নিজের সৈন্যদের দেখিয়ে পাণ্ডবদের সৈন্যদেরও দেখাচ্ছেন।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা।।৩।।

(হে আচার্য, আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন এই ব্যূহ রচনা করেছেন। আপনি পাণ্ডবদের এই বিপুল সৈন্যসমাবেশ অবলোকন করুন।)

এর আগে আমরা 'চমূ' নিয়ে কথা বললাম, চমূ হল কতকটা নেপলিয়নের corpusএর মত, চমূরের কম্বিনেশান হল 1:1:3:5, হাতি, রথ, ঘোড়া ও সেনা এই অনুপাতে একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সৈন্যদল। কেউ যদি বলে একটি চমূ থেকে একটা হাতি বা দুটো ঘোড়া নিয়ে যাবে, তা কখনই নেওয়া যাবে না, যখন চলবে পুরোটাই এক সঙ্গে চলতে থাকবে। দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে পাণ্ডব সৈন্যদের দেখিয়ে বলছেন, এই দেখুন পাণ্ডবদের মহতী সেনা। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদের পুত্র, আবার দ্রোনাচার্যের শিষ্য। যজ্ঞ থেকে জন্ম, জন্মাবার পর প্রত্যেক ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রশিক্ষা দরকার, দ্রোণের কাছে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আনা হল। সবাই দ্রোণকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্মই হয়েছে আপনাকে বধ করবার জন্য, একে কী আপনি শিক্ষা দেবেন'! দ্রোণাচার্য বললেন, 'ওর যদি জন্ম হয়ে থাকে আমাকে বধ করার জন্য, আমি যদি ওকে শিক্ষা নাও দিই, তাও সে আমাকে বধ করবে, মাঝখান থেকে আমি কেন আমার ধর্ম ছাড়ব'! ধর্ম বলতে এখানে আচার্যধর্ম। দ্রোণাচার্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে শিক্ষা দিলেন। দুর্যোধন এখন এটাই বলছেন, ওই যে আপনার ধীমান শিষ্যকে দেখুন। এগুলো কাব্যিক বর্ণনা। তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্যিকারের একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন। মহাভারতে ধৃষ্টদ্যুম্নকে একজন মহারথী বলা হয়েছে, তার মানে অর্জুনের সমকক্ষ। অর্জুন বিরাট বড় যোদ্ধা ঠিক, কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন পুরো সময় পাণ্ডবদের সেনাপতি হয়েই থাকলেন। অন্য দিকে কৌরবদের সেনাপতি পাল্টাতে থাকল। দুর্যোধন বলছেন, ওই দেখুন আপনার ধীমান শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে কে কে দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে শুধু নামগুলো আছে, এখানে বর্ণনা করার কিছু নেই, তার সাথে যে কিছু কিছু চারিত্রিক গুণ, সেটারও কোন দাম নেই।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ।।৪।।

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ।।৫।।
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্।
সৌভদ্রো দৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ।।৬।।

(এই পাণ্ডবসেনাদের মধ্যে যুদ্ধে ভীম ও অর্জুনের সমকক্ষ সাত্যকি, মৎস্যরাজ বিরাট, মহাযোদ্ধা দ্রুপদ, শিশুপালের পুত্র ধৃষ্টকেতু, যদুবংশীয় বীর চেকিতান, মহাবীর কাশীরাজ, পুরুজিৎ, রাজা কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, পাঞ্চালদেশীয় রাজা পরাক্রমশালী যুধামন্যু ও মহাশক্তিধর উত্তমৌজা, সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং অন্যান্য মহাধনুর্ধর বীরপুরুষগণ আছেন। এনারা সবাই মহারথী।)

সমবেত যোদ্ধাদের মধ্যে সবাই কেউ রথী, অতিরথী ও মহারথী। রথী, অতিরথী ও মহারথী এই তিনটে শ্রেনীতে বিভাগ করা হয়, রথী একটু নীচের দিকে, অতিরথী আর মহারথী, inter changeable। অতিরথী ও মহারথীর তফাৎটা ঠিক বোঝা যায় না, কারণ যাঁকে এখন অতিরথী বলছেন, আবার কখনো তাঁকেই মহারথী বলছেন। মহারথী মানে খুব বড় যোদ্ধা, এর মধ্যে একজন হলেন সাত্যকি, ইনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতম শিষ্য বলে মনে করতেন। শ্রীকৃষ্ণের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন কৃতবর্মা, তিনি আবার কৌরবদের দিকে আছেন। শ্রীকৃষ্ণ আবার অর্জুনের সারথি, এদিকে সাত্যকি কৃষ্ণ ছাড়া কোন কথাই বলবেন না। সেইজন্য যদুকুলের সমস্ত সেনা কৌরবদের দিকে চলে গেলেও সাত্যকি কৃষ্ণকে ছেড়ে কৌরবদের দিকে যায়নি। সাত্যকি পুরো সময় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে, মানে পাণ্ডবদের দিকেই থাকলেন। পাণ্ডবদের পক্ষে ছিলেন মৎস্যদেশের রাজা বিরাট, যার রাজ্যে পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসের সময় ছিলেন, পাণ্ডবদের শ্বশুর দ্রুপদ আছেন। এদের সাথে আছেন, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, শৈব্য, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, অভিমন্যু আর দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র। এনারা সবাই মহারথী। পাণ্ডব পক্ষের যোদ্ধাদের দেখানোর পর দুর্যোধন বললেন, এবার আমাদের পক্ষে যাঁরা যাঁরা আছেন দেখে নিন।

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে।।৭।।

(হে বিপ্রবর, আমাদের পক্ষে যে-সকল বিশিষ্ট যোদ্ধা ও সেনাপতি আছেন তাঁদেরকে অবগত হন। আপনার অবগতির জন্য তাঁদের নাম বলছি।)

আমাদের দিকে যাঁরা বড় বড় যোদ্ধা ও সেনাপতিরা আছেন, আপনার অবগতির জন্য এবার তাঁদের কথা বলছি শুনুন।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথাঃ।।৮।।

(আমাদের পক্ষে আপনি ছাড়া ভীষ্ম, কর্ণ, সমরজিৎ কৃপ, অশ্বত্থামা, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আছেন।)

ভবান্ মানে আপনি, আপনি হলেন আমাদের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, আর আছেন প্রধান সেনাপতি ভীষ্ম, কর্ণ যদিও তখন যুদ্ধ করছে না, কিন্তু সাথে আছে, সমরবিজয়ী কৃপাচার্য, কৃপাচার্য দ্রোণাচার্যের শ্যালক, অশ্বত্থামা, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিকর্ণ, সোমদত্তের পুত্র ভুরিশ্রবা ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ।

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যাক্তজীবিতাঃ।।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদঃ।।৯।।

(আমার জন্য প্রাণ দান করতে কৃতসঙ্কল্প অন্যান্য অনেক বীর আছেন। এনারা সকলেই নানা শস্ত্রনিক্ষেপে সুদক্ষ ও যুদ্ধনিপুণ।)

আরও অনেক বীর আছেন, যাঁরা আমার জন্য প্রাণ ত্যাগ করতে কৃতসঙ্কল্প এবং এনারা সবাই অস্ত্র ও প্রহরণ পরিচালনায় সুদক্ষ ও যুদ্ধনিপুণ।

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম।।১০।।

(হে আচার্য, পিতামহ ভীষ্ম কর্তৃক সুরক্ষিত আমাদের সৈন্যদল অপরিমিত(যুদ্ধজয়ে সমর্থ), কিন্তু ভীম কর্তৃক পরিচালিত পাণ্ডবসৈন্য পরিমিত(যুদ্ধজয়ে অসমর্থ)।)

বলছেন, ভীষ্ম দ্বারা রক্ষিত আমাদের সৈন্যবল *অপর্যাপ্তং*, অর্থাৎ অপরিমিত। বাংলায় যখন পর্যাপ্ত বলছি, তখন তার অর্থ হয় প্রচুর, অপর্যাপ্ত মানে কম, কিন্তু সংস্কৃতে অপর্যাপ্ত মানে সীমাহীন, আর পর্যাপ্ত মানে সীমিত। ভীমের সেনা অর্থাৎ পাণ্ডবদের সেনা সীমিত, কিন্তু আমাদের সেনা সীমাহীন, অপর্যাপ্ত, প্রায় দ্বিগুণ। একটু কম হলে তো এক আর দুইএর অনুপাত হয়ে যাবে। পর্যাপ্তের অর্থ হচ্ছে পরি+য়াপ্ত = পর্যাপ্ত, মানে সীমিত, একটা নির্দিষ্ট সীমানা দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। আর অপর্যাপ্ত মানে হচ্ছে যেটার কোন সীমা দিয়ে নির্দিষ্ট করা যাচ্ছে না। কিন্তু হিন্দী, বাংলাতে এসে পর্যাপ্তের অর্থ হয়ে যায় sufficient, আর অপর্যাপ্তের অর্থ less than sufficient, আর সংস্কৃতে অপর্যাপ্তের অর্থ হচ্ছে more than sufficient, এই জন্যই বলা হয় সংস্কৃত খুব জটিল ভাষা। আসলে দুর্যোধন বলতে চাইছেন – আমাদের সৈন্য অপরিমেয়, আর ভীমের সৈন্যবল পরিমিত।

এখানে আরেকটা সংশয় এসে যায়, এর আগে বলছেন *দ্রুপদপুত্রেণ* আবার এখানে বলছেন *ভীমাভিরক্ষিতম্*। একবার ভীষ্মের সাথে ধৃষ্টদ্যুম্নের তুলনা করে এখানে ভীমের কেন তুলনা করা হচ্ছে, ভীম তো প্রধান সেনাপতি নন? একদিকে ভীষ্ম যাদের রক্ষা করছেন আরেক দিকে ভীম যাদের রক্ষা করছেন, হঠাৎ ধৃষ্টদ্যুম্নের নাম না করে ভীমের কথা কেন বলা হল, কারণ ভীমতো প্রধান সেনাপতি নন? আসলে এগুলো কিছুই নয়, এগুলো হচ্ছে কবিতার ছন্দকে একটা ধারাতে নিয়ে যাবার জন্য শব্দের ব্যবহার, ভীষ্ম আর ভীম শব্দ দুটি খুব কাছাকাছি উচ্চারণ, ছন্দ মেলানোর জন্য এই ধরণের ব্যবহার কবিতাতে প্রয়োগ করার স্বাধীনতা কবিদের দেওয়া থাকে। কবিদের এমন স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া হয় যে প্রধান সেনাপতির নামটাই পাল্টে দেওয়া হল। যারা মহাভারত না পড়ে প্রথমেই যদি গীতা অধ্যয়ণ করে তারা বলবে দ্রুপদের পুত্রের নাম কি? ভীম। পুরো তালগোল পাকিয়ে যাবে। কেননা আগে বলা হয়েছে দ্রুপদের পুত্র, দ্রোণাচার্যের শিষ্য পাণ্ডবদের প্রধান সেনাপতি, ভীমও দ্রোণাচার্যের শিষ্য, তাহলে দ্রুপদের ছেলের নাম ভীম। কবিতা পড়তে গেলে এই সমস্যা আসবে। ছন্দ মেলানোর জন্য, কাব্যিক সৌন্দর্যকে বাড়াবার জন্য কবিদের এই ধরণের স্বাধীনতা দেওয়া হয়ে থাকে। আবার অন্য দিকে ভীমের নাম করে কোন ভুল কিছু করা হয়নি, কারণ ভীম নিজেই প্রচণ্ড শক্তিশালী, যে দলে ভীমের মত বিরাট শক্তিধর আছে তাদের সহজে পরাজিত করা যাবে না। শুধু যে প্রধান সেনাপতির উপরে সমস্ত সৈন্যের দায়ীত্ব থাকে তা নয়, অন্যান্য বড় বড় যোদ্ধাদের উপরেও অনেক গুরু দায়ীত্ব থাকে। কিন্তু এখানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, কবিতার ছন্দ মেলানো, আর শ্রুতি মধুর করার জন্যই ভীমের নাম করা হয়েছে।

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি।।১১।।

(এখন আপনারা সকলে নিজ নিজ বিভাগানুসারে সব ব্যূহদ্বারে অবস্থিত থেকে ভীষ্মকেই সর্বপ্রকারে রক্ষা করুন।)

দুর্যোধন তখন আচার্যকে বলছেন, 'আপনারা এখন নিজের নিজের জায়গায় অবস্থান করুন এবং সর্বপ্রকারে ভীষ্মকে রক্ষা করুন, কারণ তিনি হলেন আমাদের অর্থাৎ কৌরবদের সেনাপতি'। কারণ ভীষ্মকে যদি একবার পাণ্ডবরা বন্দি করে নিতে পারে, তার মানে, কৌরব সৈন্যবাহিনীর পরাজয় হয়ে গেল। আগেকার দিনের যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি সামনে থেকে লড়াই করতেন, এখনকার দিনের প্রধান সেনাপতি পিছন থেকে পুরো যুদ্ধকে পরিচালনা করে থাকেন। সেইজন্য দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে বলছেন, আপনারা সবাই পিতামহ ভীষ্মকে সব দিক থেকে রক্ষা করুন।

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্।।১২।।

(কুরুকুলের প্রতাপশালী প্রবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম উচ্চ সিংহনাদপূর্বক শঙ্খধ্বণি করতে লাগলেন এবং তাতে দুর্যোধনের হৃদয় হর্ষপূর্ণ হয়ে উঠল।)

যুদ্ধে সবাই প্রস্তুত হয়ে আছেন। ভীষ্ম, যিনি প্রধান সেনাপতি, তিনি এবার উচ্চ সিংহনাদে শঙ্খধ্বণি করলেন। এতক্ষণ বিভিন্ন বড় বড় প্রধান যোদ্ধাদের বর্ণনা করা হচ্ছিল। এবার বিভিন্ন সেনানায়করা যে যে শঙ্খ ব্যবহার করতেন, তাঁর কথা বলছেন। এখনকার দিনের যুদ্ধেও নানা ধরণের ড্রাম, বিউগেল থাকে। আগেকার দিনে যুদ্ধে শঙ্খধ্বণি করা হত। বিভিন্ন যে যোদ্ধারা ছিলেন, তিনি তাঁর যে শঙ্খ দিয়ে শঙ্খধ্বণি করতেন, সেই শঙ্খের ধ্বণি শুনে তাঁর সৈন্যরা বুঝতে পারতেন, আমার সেনাপতি শঙ্খ বাজিয়ে আমাদের সজাগ করে দিচ্ছেন বা কোন সঙ্কেত দিচ্ছেন। শঙ্খধ্বণি শুনে বোঝা যেত যুদ্ধ এখন কি অবস্থায় আছে। পিতামহ ভীষ্ম শঙ্খধ্বণি করে দুর্যোধনের মনে আনন্দবিধান করলেন। দুর্যোধন বুঝে গেল, যুদ্ধ এবার আরম্ভ হতে যাচ্ছে, আর দুর্যোধন নিশ্চিত ভাবে ভেবে রেখেছিলেন যে, তিনিই এই যুদ্ধে জয়লাভ করবেন। কারণ তাঁর সেনার সংখ্যা বেশী, তাঁর পক্ষের রথী, মহারথীরা খুব যুদ্ধপারদর্শি। এখন পর পর কয়েকটা শ্লোকে শঙ্খের বর্ণনা চলবে।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোহভবৎ।।১৩।।

(পিতামহ শঙ্খধ্বণি করতেই রণক্ষেত্রে অসংখ্য শঙ্খ, ভেরী, ঢাক, মৃদঙ্গ ও রণশিঙ্গা বেজে উঠল। সেই রণবাদ্য এক ভয়াবহ আবহাওয়া তৈরী করল।)

নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র রয়েছে, যার সাহায্যে যোদ্ধাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করা হয়। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ঢোলক আছে, বড় বড় ঢাক রয়েছে, বিভিন্ন ধরণের শঙ্খ, ভেরী আছে, সব রণবাদ্য হঠাৎ করে তুমুল সশব্দে বেজে উঠল, যা কিনা শত্রুপক্ষের ভয়দায়ক হয়ে উঠল।

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ।।১৪।।

(তারপর বহু শ্বেতাশ্বযুক্ত এক মহারথে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনও দিব্য শঙ্খদ্বয় বাজালেন।)

অর্জুনের রথের ঘোড়াগুলি সাদা রঙের ছিল, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথের সারথি, রথে বসে তাঁরা দুজনেই নিজের নিজের শঙ্খধ্বণি করলেন।

পাঞ্চজন্যং হৃষিকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ।।১৫।।

(হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্ত নামক শঙ্খ এবং ঘোরকর্মা ভীম পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাজালেন।)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য, অর্জুনের শঙ্খের নাম দেবদত্ত। ভীম ছিলেন মল্লবীর, ওনার শঙ্খ অন্যান্যদের তুলনায় খুব ভারী, তাঁর শঙ্খের নাম পৌণ্ড্র। তিনিও সেই শঙ্খ বাজালেন যাতে তাঁর সেনারা বুঝতে পারে, আমার সেনাপতি এই শঙ্খ বাজিয়ে আমাদের সজাগ করে দিচ্ছেন।

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ।।১৬।।

(কুন্তিপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ এবং নকুল ও সহদেব যথাক্রমে সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খদ্বয় বাজালেন।)

কুন্তিপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের শঙ্খের নাম অনন্তবিজয়। নকুলের শঙ্খের নাম সুঘোষ আর সহদেবের শঙ্খের নাম মণিপুষ্পক। তিনজনই নিজ নিজ শঙ্খ বাজাতে শুরু করলেন।

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ।।১৭।।
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্।।১৮।।

(সঞ্জয় বলছেন, হে পৃথ্বীপতি ধৃতরাষ্ট্র, মহাধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন, রাজা বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, রাজা দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং মহাবীর অভিমন্যু নিজ নিজ শঙ্খ পৃথক ভাবে বাজালেন।)

মহাধনুর্ধর কাশী নরেশ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটরাজ, অজেয় সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, মহাবাহু সুভদ্রাপুত্র অভিমুন্য – এনারা সকলেই পৃথক পৃথক শঙ্খ বাজালেন। এখানে এক-একজন যোদ্ধার নাম করে বলা হল, তাঁদের যে আলাদা আলাদা শঙ্খ ছিল, সবাই নিজের নিজের শঙ্খ বাজালেন। এখনও আমরা যে বাড়িতে শঙ্খ বাজাই, দেখা যায় বিভিন্ন ধরণের শাঁক বিভিন্ন রকমের আওয়াজ করে। এনারা সবাই বড় বড় যোদ্ধা ছিলেন, প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা শঙ্খ বেছে নিয়েছিলেন, যাতে সবাই বুঝতে পারে এটা কার শঙ্খ বাজছে।

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোহভ্যনুনাদয়ন্।।১৯।।

(সেই তুমুল শঙ্খধ্বণি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনাদির হৃদয় বিদীর্ণ করে আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে প্রতিধ্বণিত করল।)

বলছেন, সেই তুমুল শঙ্খধ্বনি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ও তাদের সৈন্যদের বুকে যেন কম্পন ধরিয়ে সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে প্রতিধ্বনিত করল। এটা একটা কাব্যিক বর্ণনা। একজন মহারাজ মজা করে খুব সুন্দর বলতেন, সঞ্জয় ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের সারথি ও মন্ত্রী, ঠিক মন্ত্রীও না, বুদ্ধি দিতেন। এখন তিনি যখন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বর্ণনা করছেন, তখন সঞ্জয়ের পক্ষে বলা, হে রাজন্ আপনার সন্তানদের বুক কেঁপে উঠল, এটা যেন আমাদের বিশ্বাস হতে চায় না। তবে এগুলোকে কাব্য বলে, আর সুন্দর ভাবে কাব্যিক বর্ণনা করছেন বলে আমাদের এগুলো মেনে নিতে কোন অসুবিধা হয় না।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষিকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।।২০।।

(হে মহীপতি, তখন রথারূঢ় অর্জুন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে যুদ্ধার্থে অবস্থিত দেখে শস্ত্র-নিক্ষেপে উদ্যত হয়ে ধনু উত্তোলনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বললেন।)

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন, যেমন আলাদা আলাদা শঙ্খ ছিল, তেমনি রথে আলাদা আলাদা ধ্বজা থাকত। অর্জুনের রথের ধ্বজায় একটা বানরের ছবি থাকত। বনবাসে থাকার সময় একবার মহাবীর হনুমানের সাথে ভীমের দেখা হয়েছিল, তিনি তখন ভীমকে বলেছিলেন, আমি তোমাদের সাথে থাকব। হনুমানের পাণ্ডবদের সঙ্গে থাকাটা অর্জুনের রথের পতাকা রূপে ছিলেন। পরের দিকের কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, মহাবীর হনুমান নাকি অর্জুনের রথে বসে থাকতেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন সব সেনারা তৈরী হয়ে আছে, সবারই হাতে অস্ত্র উদ্যত করে নিয়েছে, তখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন।

অর্জুন উবাচ
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত।।২১।।
যাবদেতান্নিরীক্ষেহহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমদ্যমে।।২২।।
যোৎস্যমানানবেক্ষেহহং য এতেহত্র সমাগতঃ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ।।২৩।।

(অর্জুন বললেন, আমি যাতে যুদ্ধার্থ অবস্থিত এদেরকে আমি নিরীক্ষণ করতে পারি ও এই মহারণে আমাকে কাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে তা নির্ণয় করতে পারি এবং দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের হিতকামী যে-সকল বীরপুরুষ যুদ্ধ করবার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাঁদেরকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি, সেইহেতু হে শ্রীকৃষ্ণ, উভয়পক্ষীয় সেনাদলের মধ্যে আমার রথ স্থাপন করুন।)

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, 'হে কৃষ্ণ, যুদ্ধ শুরু করার আগে আমি ভাল করে দেখে নিতে চাই, কারা কারা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চাইছেন, কাদের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে'। বড় বড় নামকরা বক্তারা যখন বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে ভাষণ দিতে যান, তখন ভাষণ দেওয়ার আগে শ্রোতৃমণ্ডলীদের দিকে একবার অবলোকন করে দেখে নেন, শ্রোতারা যাঁরা আছেন, এনারা কারা, কাদের সামনে আমাকে বলতে হবে। একজন মহারাজ ছিলেন, খুব ভাল বক্তা, তিনি বলতেন, 'আমি প্রথমে একবার শ্রোতাদের দেখে নিই, তারপর ঠিক করি কি রকম বলব'। হয়ত তিনি বড়দের বলার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন, কিন্তু এসে দেখছেন বেশীর ভাগ শ্রোতারাই অল্প বয়সী, তখন তিনি তাঁর ভাষণের বিষয়টা একটু পাল্টে নেন।

দুর্যোধন যে প্রকার দুর্বুদ্ধি, দুর্মতি সম্পন্ন ব্যক্তি, এই ধরণের ব্যক্তির পক্ষে কারা সমবেত হয়েছেন, এর জন্য কারা যুদ্ধ করতে চাইছেন, কারা এর জন্য প্রাণ দিতে চাইছেন, একটু ভাল করে আমি দেখতে চাই। অনেক সময় আমরা বলি, দেখি তো ওর মুখটা, কে আমার সাথে পাল্লা দিতে চাইছে। এখানে অর্জুন সব জানেন কে ও কারা দুর্যোধনের হয়ে যুদ্ধ করতে এসেছে, তাও বলছেন, একবার তো দেখে নিই কারা এই রকম দুর্বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের হয়ে যুদ্ধ করতে এসেছে। অবশ্য অর্জুন শেষ একবার দেখে নিতে চাইছেন, এটা হয়। আগেকার দিনে সামনা সামনি যুদ্ধ হত, এখন তো অনেক দূর থেকে হয়, কয়েক শত মাইল দূর থেকে মিশাইল ছুঁড়ছে, বা যুদ্ধ বিমান গিয়ে বম্বিং করে আসছে। এখানে শুধু তাই না, অর্জুন যেন দেখতে চাইছেন, ওরা কিভাবে সবাই দাঁড়িয়ে আছে, অর্থাৎ ব্যূহ রচনা কেমন হয়েছে।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষিকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্।।২৪।।
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি।।২৫।।

(সঞ্জয় বললেন –হে ধৃতরাষ্ট্র, গুড়াকেশ অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বললে শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য মহীপতিগণের সম্মুখে উত্তম রথ স্থাপন করে বললেন –হে পার্থ, যুদ্ধার্থ সমবেত কৌরবগণকে অবলোকন কর।)

গুড়াকেশ মানে যিনি নিদ্রাকে জয় করেছেন, অর্জুন নিদ্রাকে জয় করেছিলেন বলে তাঁকে গুড়াকেশ বলা হয়। বলা হয়, যাঁরা খুব উচ্চমানের হন, তাঁরা নিদ্রা জয় করে নেন। গান্ধীজীও এই রকম গুড়াকেশ ছিলেন। গান্ধীজী যখন চাইতেন ঘুমিয়ে পড়তেন, যখন ঘুম থেকে উঠতে হবে, ঠিক সেই সময় উঠে পড়তেন। বেলুড় মঠে অনেক মহারাজদের দেখেছি যাঁদের এই ক্ষমতা আছে। একটা খুব নামকরা ঘটনা আছে, ভারত বিভাজন নিয়ে সেই সময় খুব ঝামেলা চলছিল, তখন নেহরুজী, প্যাটেলজী এই নিয়ে গান্ধীজীর সাথে কথা বলছেন। খুব লম্বা সময় ধরে আলোচনা চলছে, রাত বারোটা বেজে গেছে। গান্ধীজী তখন শুতে চলে গেলেন। গান্ধীজীর কোমরে ঘড়ি থাকত, তিনি ওখানে ঘড়ি বার করে সবাইকে দেখিয়ে বললেন, রাত বারোটা হয়ে গেছে, আমার ঘুমোবার সময় এটা। প্যাটেল তখন খুব নামকরা কথা বলছেন, Bapu, India is burning, how can you sleep। গান্ধীজী তখন বললেন, কারণ তোমরা আসক্ত, আমি আসক্ত নই। এই কথা বলে তিনি ওখানেই মাদুরের উপর শুয়ে পড়লেন, আর সেকেণ্ডের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন। নেহরুজী আর প্যাটেলজী উঠে চলে গেলেন। নিজের উপর এমন নিয়ন্ত্রণ যে, এত ঝামেল তাতেও তিনি ওই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়তে পারলেন। সকালে ঠিক সময়ে উঠে আবার তাঁর দিন শুরু হয়ে গেল। অর্জুনেরও নিদ্রার উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ ছিল। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথি, অর্জুন বলাতে তিনি রথকে দু পক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, ইনি ভীষ্ম, উনি দ্রোণাচার্য। অর্জুন তখন দেখলেন –

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।
আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।।২৬।।
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধুনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিমব্রবীৎ।।২৭।।

(সেখানে অর্জুন উভয় সেনার মধ্যেই অবস্থিত ভূরিশ্রবাদি পিতৃব্যগণ, ভীষ্মাদি পিতামহগণ, দ্রোণাদি আচার্যগণ, শল্যাদি মাতুলগণ, ভীম-দুর্যোধনাদি ভ্রাতৃগণ, লক্ষ্মণাদি পুত্রগণ, পৌত্রগণ, অশ্বত্থামাদি বন্ধুগণ, দ্রুপদাদি শ্বশুরগণ এবং কৃতবর্মাদি বন্ধুবর্গকে উপস্থিত দেখলেন। সব বন্ধুদের যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত দেখে অতীব করুণাবিষ্ট হয়ে দুঃখিত চিত্তে অর্জুন এই কথা বললেন।)

তত্রাপশ্যৎ, অর্জুন দেখলেন, এখানেও কিন্তু বলছেন 'এরপর অর্জুন দেখলেন', বলছেন না যে তিনি দেখছেন। কি দেখলেন? অর্জুন দেখছেন, দু দিকে সেনারা দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে বাবা, কাকা, জ্যাঠা, ছেলে, দাদু, গুরু, ভাই, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর, সুহৃদ, দুই পক্ষেই দাঁড়িয়ে আছে। একটা যেন গৃহযুদ্ধের মত পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে, ভাই ভাইএর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। তবে মহাভারতের এই যুদ্ধ সিভিল ওয়ার নয়, এটা ধর্মযুদ্ধ। আগে যেমন বলা হয়েছে, এখানে সবাইকে উভয় পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, আপনি যদি আমাকে ঠিক মনে করেন, তাহলে আমার পক্ষে আসুন। এভাবে

ভাই ভাইকে, বাবা সন্তানকে, সন্তান বাবাকে, শিষ্য গুরুকে, গুরু শিষ্যকে, মামা ভাগ্নেকে, ভাগ্নে মামাকে মারার জন্য অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে দেখে, অর্জুন একেবারে মুষড়ে পড়লেন।

বলছেন – *তান্ সমীক্ষ্য কৌন্তেয়,* অর্জুন দেখছেন, কিভাবে এক অপরকে মারার জন্য অস্ত্র উদ্যত করে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই নিজের লোক, আত্মীয়-কুটুম্ব অথচ এক অপরকে মারার জন্য এখানে সমবেত হয়েছে, এই দৃশ্য দেখে অর্জুন একেবারে বিষন্নচিত্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন। ইংরাজীতে বলে, moment of reckoning, অর্জুনের চোখটা যেন খুলে গেল, এ কি হতে যাচ্ছে!

অর্জুন উবাচ
দৃষ্টেমান স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।।২৮।।

(অর্জুন বললেন – হে কৃষ্ণ, যুদ্ধকামী এই স্বজনদের সামনে অবস্থিত দেখে আমার শরীর অবসন্ন হচ্ছে; মুখও শুকিয়ে যাচ্ছে।)

কোন মানুষের মনে যখন প্রচণ্ড বিষণ্নতা আসে, বিষণ্নতায় সে যখন একেবারে ভেঙে পড়ে, তখন তার শরীরের কি কি অবস্থা হয়, এখানে তারই বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। এখানে শরীরের যে যে লক্ষণের কথা বলছেন, তার একটাও যদি কারুর শরীরে দেখা যায়, বুঝতে হবে তার মধ্যে depression আছে। অর্জুন বলছেন, হে কৃষ্ণ, যুদ্ধাকাঙ্খী আমার আত্মীয়-স্বজনদের সামনে অবস্থিত দেখে দেখুন আমার শরীরের কি অবস্থা হয়েছে, *সীদন্তি মম গাত্রাণি,* আমার শরীর অবসন্ন হয়ে যাচ্ছে, অঙ্গগুলি শিথিল হয়ে যাচ্ছে। যখন দেখা যাবে, আমার কাজ করার ইচ্ছে হচ্ছে না, মনে কোন উৎসাহ পাচ্ছি না, তার মানে আমার মধ্যে depression এসেছে। অর্জুনও তাই বলছেন, *সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি,* শরীর শিথিল হয়ে আসছে, মুখও শুকিয়ে আসছে। দেখা যায়, বিষম পরিস্থিতি এলে মুখের ভিতরটা শুকিয়ে যায়; অনেকের ত্বকেও সমস্যা দেখা যায়, চামড়ায় র‍্যাশ বের হয়। এটা হল ভিতরে stress থাকার লক্ষণ।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহ্যতে।।২৯।।

(আমার শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হচ্ছে। হাত থেকে আমার গাণ্ডীব খসে পড়ে যাচ্ছে এবং গায়ের চামড়া যেন পুড়ে যাচ্ছে।)

অর্জুনের শরীর থেকে প্রচুর ঘাম বেরোচ্ছে, ভয়ে তাঁর গায়ের রোমগুলি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। গাণ্ডীব হাত থেকে আলগা হয়ে পড়ে যাচ্ছে, ধরে রাখতে পারছেন না। গাণ্ডীব খুব ভারী ধনুক। আর শরীর থেকে যেন আগুন বেরোচ্ছে, জ্বালা অনুভব করছেন।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।।৩০।।

(হে কেশব, আমি আর স্থির থাকতে পারছি না; আমার মন যেন ঘুরছে; আমি নানা প্রকার অমঙ্গলসূচক লক্ষণ দেখছি।)

অর্জুন নিজের মানসিক অবস্থা ভগবানকে বর্ণনা করছেন, হে কেশব, আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। অশুভ কিছু হলে মানুষ স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, বসে পড়ে। *ভ্রমতীব চ মে মনঃ,* আমার মনটাও যেন ঘুরছে, কিছু দেখতে পাচ্ছি না। *নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব,* হে কেশব, পুরো জিনিসটাই আমি বিপরীত দেখছি। '*নিমিত্ত*' শব্দ আমাদের শাস্ত্রে দুটো অর্থে আসে,

এখানে নিমিত্ত শব্দের অর্থ হল, প্রথমের দিকে একটা আভাস দেখে বুঝে নেওয়া কি হতে যাচ্ছে। পরে গীতাতেই ভগবান অর্জুনকে বলবেন, *নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচীন্*, সব কিছু আমিই করছি, তুমি শুধু এর নিমিত্ত হও। নিমিত্ত হল সামনেরটা দেখলে বোঝা যায় পিছনটা কি হবে। অনেকে বিশ্বাস করে বেড়াল রাস্থা কাটলে যাত্রা অশুভ হয়। আসলে বেড়াল রাস্থা কাটার জন্য যাত্রা অশুভ হচ্ছে না, ওটা হল তার বিপরীত নিমিত্ত। তার সব খারাপ হওয়াটা আগেই ঠিক হয়ে আছে, তাই বেড়ালটা রাস্থা কেটেছে। বিশাল ঝড়বৃষ্টি হওয়ার আগে মিষ্টি মিষ্টি বাতাস চলে, এখানে মিষ্টি বাতাস আসছে বলে ঝড় আসছে তা না, ঝড় আসবে বলেই মিষ্টি বাতাস আসছে।

গীতায় নিমিত্ত শব্দ দু-বার আসে, একবার প্রথম অধ্যায়ে এখানে আসছে, দ্বিতীয় আর-একবার একাদশ অধ্যায়ে আসবে। দুটোরই এক অর্থ। ইংলিশে এটাকে বলে soothsaying, এই জিনিসটা বিশ্বের সব জায়গাতেই আছে। এগুলোকে নিয়ে আবার প্রচুর চালবাজী, লোক ঠকানো কারবার হয়। দুটো শালিক দেখেছি, আজকের দিনটা এই রকম হবে, একটা শালিক দেখেছি, এই রকম হতে যাচ্ছে, এগুলো যার যার বিশ্বাসের ব্যাপার, নাও মিলতে পারে। কিন্তু মানুষ যখন প্রচুর বিপদে আপদে পড়ে, তখন তারা তান্ত্রিক, জ্যোতিষী, সাধুবাবাজীদের কাছে গিয়ে নিজের বিপদের কথা বলতে থাকে। তারপর এরাও নানা রকমের কায়দা করে বলতে থাকবে, তোমার এই গ্রহ খারাপ, শনির দশা চলছে, এই এই যোগ চলছে। এগুলো কাটাবার জন্য এত টাকা খরচ করে একটা তাবিজ নিতে বলবে, নয়ত একটা যজ্ঞ করতে বলবে। এসব কিছু না করেই অনেক কিছু আগাম বলে দেওয়া যায়। আন্দাজে যদি আগাম কিছু বলে দেওয়া হয়, তাতেই শতকরা নব্বুইটা মিলে যাবে। বলে, ঝড়ে বক মরে যোগীর নাম বাড়ে। আসলে মানুষ যখন খুব হতাশ হয়ে ভেঙে পড়ে, তখন সে এগুলো বিচার করে না, যার কাছে যাবে সে এমন কিছু করতে বলে দেবে, যেটা তার পক্ষে অসম্ভব করা। সব বলে দেওয়ার পর আবার বলবে, তোমার একটা গুপ্ত শত্রু আছে, কোন কারণে সে যদি কিছু করে, তাহলে কিন্তু কিছু হবে না। দুটোই খুলে রাখল, যদি হয়ে গেল, তার নাম হবে, যদি না হয় তাহলে বলবে, আমি আগেই বলেছিলাম, ওই গুপ্ত শত্রুর জন্য হচ্ছে না। কোন দিন জানা যাবে না, গুপ্ত শত্রুটা কে।

কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রে অনেক কিছু বলা হয়, বলা হয় যে, স্বপ্নে কি দেখলে কি হয়, আবার কিছু কিছু লক্ষণ আছে। সেগুলো আবার সবার উপর এক ভাবে খাটবে না। যেটা আমার উপর খাটবে, সেটা আপনার উপর খাটবে না। অর্জুন এটাই এখানে বলছেন, *নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব*, যা কিছু লক্ষণ দেখছি এগুলো শুভ না।

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।।৩১।।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভৌগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামার্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।।৩২।।
ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।।৩৩।।

(হে কৃষ্ণ, যুদ্ধে স্বজনদের বধ করে আমি তো কোন মঙ্গল দেখতে পাচ্ছি না। আমি যুদ্ধে জয়লাভ আকাঙ্ক্ষা করি না; রাজ্য বা সুখভোগও কামনা করি না। হে কৃষ্ণ, আমাদের রাজ্যে কি প্রয়োজন অর্থাৎ রাজ্যলাভ করে আমাদের কি হবে, আর সুখভোগ বা জীবনধারণেই বা লাভ কি? যেহেতু, যাদের জন্য রাজ্যভোগ ও সুখাদি কামনা করি, সেই সব আচার্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও স্বজনবৃন্দ সবাই নিজ নিজ প্রাণ ও ধনাদির আশা পরিত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন।)

অর্জুন বলছেন, হে কৃষ্ণ, যুদ্ধে আপনজনদের বধ করে কি হবে, এতে আমি তো কোন মঙ্গল দেখছি না। এগুলোই ইমোশানাল ব্যাপার, আমরা এগুলোর উপর বেশী আলোচনায় যাচ্ছি না। কারণ আমরা নিজেরাই বুঝতে পারি, আমরা যখন খুব বিপদে পড়ি বা নানা রকম ঝামেলায় যখন জড়িয়ে পড়ি, সবাই কেমন হতাশ হয়ে যাই, তখন কিভাবে আমরা নানা রকম ভাবনা চিন্তায় ডুবে গিয়ে বুদ্ধি হারিয়ে ফেলি, এই অভিজ্ঞতা অল্পবিস্তর আমাদের সবারই আছে। এতদিন অর্জুন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে আসছিলেন, আমি এই করব, সেই করব, হঠাৎ এখন অর্জুন বলতে শুরু করেছেন, হে কৃষ্ণ, আমি জয় চাই না, রাজ্য চাই না। রাজ্য, ভোগ এগুলো নিয়ে আমাদের কি হবে! কারণ মানুষ যে কারণে, যাদের জন্য সুখ চায়, সেটাই যদি চলে যায়, তাহলে সেই সুখ নিয়ে মানুষ কি করবে! কারণ পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, মামা, ভাই, বন্ধু, এদের সবাইকে বলি দিয়ে আমাকে এখন রাজ্য পেতে হবে। এখনও আমাদের দেশে অনেক তান্ত্রিক আছে যারা বলে দেয়, তোমার ছেলে বা মেয়েকে যদি অমবস্যার রাতে মায়ের সামনে বলি দাও তাহলে তোমার সব ঠিক হয়ে যাবে। সব ঠিক হয়ে গিয়ে আমার কি লাভ হবে, নিজের সন্তানকেই আমি হারাতে যাচ্ছি। আমার সুখ তো সন্তানের সাথেই জড়িয়ে আছে। সেই সন্তানই যদি চলে যায়, তাহলে সব কিছু ঠিক হয়ে গেলে আমার কি থাকল! বিচার করলে দেখা যাবে, আমরা অনেক সময় অনেক কিছু করার সময় ভুলে যাই, যে জিনিসটা করতে যাচ্ছি, সেখানে যাদেরকে নিয়ে আনন্দ করার কথা, তারাই আমার জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। আমরা অনেক সময় বুঝতেও পারি না, অনেক সময় চলে যাওয়ার পর আমাদের বোধদয় হয়। তখন আবার অনেক দেরী হয়ে যায়।

এটাই অর্জুন এখানে বলতে চাইছেন, *ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ*, যাদেরকে নিয়ে সুখভোগ করব, তারাই আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, প্রাণ দেওয়ার জন্য ও প্রাণ নেওয়ার জন্য। তারা কারা? আগে ছাব্বিশ নম্বর শ্লোকে যেটা বলেছিলেন, সেটাই এখানে আবার বলছেন। *আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহঃ*, আমার আচার্য, কাকা, জ্যাঠামশাই, সন্তান, দাদু। আর তার সাথে *মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা*, মামা, শ্বশুর, নাতি, শ্যালক, সম্বন্ধি এদের আমাকে বধ করতে হবে, নয়তো এরা আমাকে বধ করবে, এর জন্যই আমরা আজ এখানে পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছি।

এতান্ন হন্তুমচ্ছামি ঘ্নতোহপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।।৩৪।।

(হে মধুসূদন, যদি এরা আমায় মেরেও ফেলে, তবু আমি এদের মারতে ইচ্ছে করি না এবং এই পৃথিবীর কথা কি, ত্রিলোক রাজ্যের জন্যও না।)

হে মধুসূদন, এদেরকে আমি কোন ভাবেই বধ করতে পারব না। যদি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল তিনটে লোকও আমাক দিয়ে দেওয়া হয়, তাতেও আমি আপনজনকে বধ করতে পারব না। আর সেখানে হস্তিনাপুরের এই ছোট্ট একটা রাজ্যের জন্য আমি সব আপনজনকে বধ করব? প্রশ্নই নেই।

নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।।৩৫।।

(হে জনার্দন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বধ করে আমাদের কি সুখ হবে? যদিও এরা আততায়ী তবুও এদের হত্যা করলে অবশ্যই আমাদের পাপ আশ্রয় করবে।)

এরা আততায়ী, এদেরকে মেরে আমাদের কি আনন্দ হবে, উল্টে আপনজনদের বধোজনিত পাপ লাগবে। এখানে আমাদের একটা জিনিস জেনে রাখা দরকার। হিন্দু শাস্ত্রে কাউকে বধ করা সর্বতো ভাবে নিষিদ্ধ। বৌদ্ধরা এটাকেই অহিংসা রূপে পালন করে, কিন্তু ওদের ইতিহাস দেখলে

দেখা যাবে, শ্রীলঙ্কা, তিব্বত, চীন এমনকি জাপানেও হিংসায় ভর্তি। সবাই মারামারি কাটাকাটি করেছে। হিন্দুরা কখন হিংসা করত না, যদি করে সেটাও যজ্ঞের জন্য করত বা কোন দণ্ড দেওয়ার জন্য করত। হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র হিংসাকে সম্পূর্ণ রূপে নিষেধ করে রেখেছে। আর লোভের জন্য, রাজ্য বৃদ্ধি, সম্পদ আরোহণ, কোন প্রশ্নই নেই। কিন্তু শাস্ত্রই আবার বলে দিচ্ছেন, যদি সে আততায়ী হয় তবে তাকে বধ করা যেতে পারে। কাউকে আততায়ী বলার জন্য পাঁচটা শর্ত বলে দেওয়া হয়েছে। প্রথমটা হল কেউ যদি কারুর উপর বিষ প্রয়োগ করে থাকে। দ্বিতীয় কেউ যদি আগুন লাগিয়ে থাকে, তৃতীয় কেউ যদি হত্যার চেষ্টা করে থাকে, চতুর্থ কেউ যদি কারুর ধন-সম্পদ, জমি-জায়গা লুট করে নিয়ে থাকে আর পঞ্চম কারুর স্ত্রীকে যদি অপহরণ করে নেওয়া হয়। এই পাঁচটি শর্তের একট শর্ত যে পূরণ করবে তাকে আততায়ী বলা হবে। বিষ প্রয়োগ, অগ্নি সংযোগ ও হত্যা এই তিনটে হত্যার দিক থেকে; আর জমি, ধন, সম্পদ লুট করা এবং স্ত্রীকে এখানে বেশী সম্মান দেওয়া হয়, সেইজন্য কারুর স্ত্রী অপহরণ করাটা আততায়ীর সংজ্ঞায় চলে আসছে। আততায়ী যদি হয়, তাকে মেরে দেওয়া যেতে পারে, এতে কোন পাপ হবে না।

কিন্তু অর্জুন বলছেন, *পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্*, যদি এদের বধ করি তাহলেও আমার পাপ হবে। আমরা ধর্মক্ষেত্রের ব্যাখ্যা করার সময় ধর্মের কথা বলেছি। এই ধর্মকে যে সব শাস্ত্র পরিভাষিত করে তাদের বলা হয় ধর্মশাস্ত্র। মহাভারত আমাদের খুব নামকরা ধর্মশাস্ত্র। এছাড়া আমাদের আরও অনেক ধর্মশাস্ত্র আছে, মনুস্মৃতির মত যত স্মৃতি শাস্ত্র আছে, সব ধর্মশাস্ত্র। ধর্মশাস্ত্রের একটু নীচে হল অর্থশাস্ত্র, এর নীচে আসে কামশাস্ত্র। ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটেরই জন্য শাস্ত্র আছে। যারা আততায়ী তাদের বধ করা যায়, এটা আসলে আসছে অর্থশাস্ত্র থেকে বা নীতিশাস্ত্র থেকে। ধর্মশাস্ত্র সব সময় বলবে, অহিংসা পরমো ধর্ম। ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র দুটোই স্মৃতি প্রধান শাস্ত্র। ভারতে হিন্দুদের শাস্ত্র দুটো শ্রেনীর, একটা হল বেদ ও উপনিষদ, এটাকে বলা শ্রুতি, শ্রুতির বাইরে যত গ্রন্থ আছে সব কটাকে বলা হয় স্মৃতিশাস্ত্র। এনারা বিধান দিয়ে রেখেছেন, শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে যদি বিরোধ লাগে, সেখানে শ্রুতিকেই প্রামাণ্য রূপে নিতে হবে। কিন্তু স্মৃতির সাথে স্মৃতির যদি বিরোধ লাগে, তখন বলে তোমার নিজের বুদ্ধি লাগাও। যার জন্য ধর্ম বিবেচনায় বলা হয়, পরিশ্রুত বুদ্ধির বিরাট দাম। অর্জুন ধর্মশাস্ত্র আর অর্থশাস্ত্রের এই বিরোধটাকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছেন। ধর্মশাস্ত্র বলছে অহিংসা পরমো ধর্ম, অর্থশাস্ত্র বলছে বধ কর। এই দুটো শাস্ত্রের যে লড়াই লেগেছে, এখানে অর্জুন এবার নিজের বুদ্ধিকে লাগাচ্ছে। বুদ্ধি লাগিয়ে অর্জুন বলছেন, আমাদের এটা করা ঠিক না। বলে দিলেই তো হবে না, এবার তাঁকে যুক্তি ও ন্যায় দিয়ে এর প্রতিপাদন করতে হবে।

তস্মান্নার্হাঃ বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব।।৩৬।।

(সেইজন্য বান্ধবগণ সহ দুর্যোধনাদিগকে হত্যা করা আমাদের উচিত নয়। হে মাধব, স্বজনবর্গকে বধ করে আমাদের পক্ষে সুখী হওয়া কিভাবে সম্ভব?)

অর্জুন বলছেন, হে মাধব, যতই হোক দুর্যোধন এরা আমাদের আপনজন, আমাদের কুটুম্ব, এদের বধ করে আমরা কি করে সুখে থাকতে পারি?

যদ্যপেতে ন পশ্যন্তি লোভোহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রাদ্রোহে চ পাতকম্।।৩৭।।
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন।।৩৮।।

(যদিও এরা রাজ্যলোভে অভিভূত হয়ে কুলক্ষয়জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহ নিমিত্ত পাপ দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু হে জনার্দন, বংশনাশজনিত দোষ উপলব্ধি করেও আমরা এই পাপ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার উপায় জানব না কেন?)

অর্জুনের বক্তব্য হল, এই দুর্যোধনদের মন লোভে পড়ে কলুষিত হয়ে আছে বলে পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে আছে। এরা আততায়ী ঠিক। আততায়ী কেন বলছেন? কারণ এরা আততায়ীর সব কর্মই করেছে, বিষ প্রয়োগ করেছে, জতুগৃহে অগ্নি সংযোগ করে পাণ্ডবদের মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে, অনেক ভাবে হত্যার চেষ্টা করেছে। আমি মানছি, ওরা আততায়ী। কিন্তু এটা ভুলে যাবেন না, লোভে পড়ে এদের বুদ্ধিটা সম্পূর্ণ কলুষিত হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের মন তো কলুষিত নয়।

লোভে পড়ে কৌরবদের মাথাটা বিগড়ে গেছে, মনটা কলুষিত হয়ে গেছে। আমরা কিন্তু এ-রকম নয়, আমাদের বুদ্ধি পরিষ্কার, আমরা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, আমরা কেন ধর্ম ছেড়ে এই প্রকার হিংসার কাজে লিপ্ত হতে যাব? এই ধরণের পরিস্থিতি আমাদের সবারই জীবনে আসে। আমরা যখন অবসন্ন হয়ে যাই, একটা ভুল পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি, কেউ এসে নিষেধ করছে আমাকে, এ-রকম করতে যেও না, আমরা গ্রাহ্য করি না। উল্টে যুক্তি দিতে থাকে, যে যুক্তিগুলো মনের স্বাভাবিক অবস্থায় কোন দিন সে নিত না। শ্রীমায়ের কাছে একজন ব্রহ্মচারী এসেছেন, কিছু দিন পরেই তাঁর সন্ন্যাস হতে যাচ্ছে। কিন্তু তাঁর আর এই মঠের জীবন ভাল লাগছে না, চলে যেতে চাইছেন। ব্রহ্মচারী মাকে জিজ্ঞেস করছেন, 'আচ্ছা মা, ঠাকুর তো গৃহস্থ আশ্রমে যেতে বারণ করেননি'। মা শুনে বলছেন, 'না বাবা ঠাকুর বারণ করেননি, তুমি অবশ্যই গৃহস্থ আশ্রমে যাও'। ব্রহ্মচারী চলে যাওয়ার পর একজন মাকে বলছেন, 'মা আপনি একি বললেন, সন্ন্যাসীর সাথে কি গৃহস্থ আশ্রমের তুলনা হয়'! শ্রীমা বলছেন, 'এত কথার মধ্যে ঠাকুরের অতটুকু কথাই ওর মাথার মধ্যে ঢুকেছে'! তার মানে ওকে বুঝিয়ে কোন লাভ নেই। শেষ পর্যন্ত সব ছেড়ে বিয়েথা করে সংসার সাজিয়ে বসে গেল। যখনই কেউ একটা বিচিত্র যুক্তি নিয়ে আসছে, তখন বুঝে নিতে হয়, এ কোন কথাই শুনবে না।

ইদানিং সবাই *বসুধৈব কুটুম্বকম্* যুক্তি আওড়াচ্ছে। তুমি একবার চিন্তা করে দেখ, তোমার ভাই বিদেশে থাকে। বিদেশ থেকে সে এসে গেলে তুমি তোমার বাড়িতে থাকতে দিতে পার, নাও থাকতে দিতে পার, তোমার খুশী। তোমার পাড়া প্রতিবেশীর কেউ যদি এসে থাকতে চায়, তুমিও তাকে থাকতে দিতে পার, নাও দিতে পার। কিন্তু তাই বলে *বসুধৈব কুটুম্বকম্*কে সামনে রেখে যদি বলে, তুমি ভাইয়ের উপরে পাড়া প্রতিবেশীদের বেশী দাম দাও, এটা কি যুক্তি সঙ্গত দেখাবে? কিন্তু ওর মাথায় ঢুকে গেছে, আর ওকে সরানো যাবে না। যখনই দেখা যাবে, কেউ যদি এমন একটা তর্ক নিয়ে আসে, যেটা সম্পূর্ণ অনৈতিক ও অযৌক্তিক, সে যদি স্বাভাবিক থাকত সে কখনই এই যুক্তিটা নিত না, তখন বুঝে নিতে হবে একে আর বোঝান যাবে না; এর সাথে তর্ক করা বৃথা। এখন ওকে ছেড়ে রাখতে হবে, কিছু বছর পর যদি বোঝে বা কিছু জন্ম পরে যদি বোঝে। এই মুহূর্তে ওকে কেউ কোন ভাবেই বোঝাতে পারবে না। অর্জুনেরও এখন ঠিক এই অবস্থা, কারুর ক্ষমতা নেই ওকে বোঝানর। কিন্তু এখানে শ্রীকৃষ্ণ একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ। শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে বলতে শুরু করবেন, অর্জুন শুনে তো অবাক। অর্জুনকে তখন শ্রীকৃষ্ণ এটাই বলবেন, *প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে*, তুমি পণ্ডিতের মত কথা বলছ, কিন্তু যে কথাগুলো তোমার মুখ থেকে বেরোচ্ছে, সব মুর্খের কথা। মুর্খের মত কথা বলছে, মানে অর্জুনের কথার মধ্যে সহজাত contradictions আছে।

অর্জুন কিন্তু খুব logical কথা বলছে, প্রথমে বলছেন, এরা সম্বন্ধী, এদের মারতে পারি না; দ্বিতীয় যুক্তি আনছেন, এরা আততায়ী ঠিকই, কিন্তু এদের বুদ্ধি কলুষিত, আমাদের বুদ্ধি পরিষ্কার। এরা বদমাইশি করছে, তাই বলে আমরাও বদমাইশি করতে পারি না। যুদ্ধ করলে *কুলক্ষয়ং দোষং*, পুরো কুল নাশ হয়ে যাবে, কৌরবরা নাশ হয়ে যাবে, পাণ্ডবরাও শেষ হয়ে যাবে।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত।।৩৯।।

(কুলনাশে চিরাচরিত কুলধর্ম অনুষ্ঠাতার অভাবে নষ্ট হয় এবং কুলধর্ম লোপে সমগ্র কুল অনাচাররূপ অধর্মে অভিভূত হয়।)

হিন্দু বাদে অন্যান্য সব ধর্মে একটা করে গ্রন্থ থাকে, সেই ধর্মের লোকেরা ওই গ্রন্থকেই পালন করে, এবং তাদের ধর্ম ওখানেই শেষ। আমাদের এখানে যেমন বৈষ্ণবদের কাছে ভাগবতই সব, ভাগবত দিয়ে শুরু ভাগবত দিয়ে শেষ, খুব হলে গীতা পর্যন্ত যাবে, কিন্তু গীতার অদ্বৈত কথাগুলি তারা মানবে না। একটা গ্রন্থকে ধরে যারা ধর্ম পালন করে, এরা সব সময় গোঁড়া হয়ে যায়। হিন্দুরা কক্ষণ একটা বইকে ধরে থাকে না বা একটা প্রথাকে ধরে থাকে না। সেইজন্য অন্যান্য ধর্মের লোকেরা হিন্দু ধর্মকে বলে, হিন্দু ধর্ম কোন ধর্মই না। বাকি ধর্মগুলি হল হিন্দু ধর্মের একটা গোষ্ঠির মত। এখানে বৈষ্ণব ধর্ম যেমন হিন্দু ধর্মের একটা গোষ্ঠি, ঠিক তেমনি অন্যান্য ধর্মগুলি হল এখানকার ছোট ছোট একটা sects। আমাদের কাছে ভাগবত একটা চটি বই। বেদ, পুরাণ, উপনিষদ সবটাই যদি নিয়ে নেওয়া হয়, তখন ভাগবত সেই মহাসমুদ্রে একট চটি বই। বৈষ্ণবদের কাছে ওটাই শেষ, পঞ্চম বেদ বলে চালিয়ে যাচ্ছে। ঠিক তেমনি অন্যান্য ধর্মের ওই চটি একটা বই হিন্দু ধর্মের কোন গ্রন্থে গিয়ে মিশে যাবে বোঝাও যাবে না। হিন্দুরা এসব নিয়ে কোন উচ্চবাচ্চ করতে যায় না। এনাদের প্রথম ধর্ম শুরু হয় কুলধর্ম দিয়ে। কুলধর্মের ব্যাপারটা না বুঝতে পারলে, পরে গীতার অনেক কিছু বক্তব্য বুঝতে পারব না।

প্রথম হল কুলধর্ম, বাড়িতে যে প্রথা বংশ পরম্পরায় পালন করা হয়ে আসছে, এই প্রথাকে পুরো সম্মান দেওয়া হয়। সেইজন্য অনেকে বলে হিন্দু ধর্ম কোন ধর্মই না। কিন্তু তা না, হিন্দুরা বলে, আমরা আমাদের বংশের পরম্পরাতে চলি। বংশের পরম্পরা কোথা থেকে আসছে? গোত্র থেকে। প্রত্যেক হিন্দুর গোত্র আছে, হিন্দু মাত্রই তার একটা গোত্র থাকতে হবে। যাদের গোত্র থাকে না, নূতন আনা হয়েছে, তাদের কাশ্যপ গোত্র দিয়ে দেওয়া হয়। তা নাহলে, যে গুরুর কাছে দীক্ষা বা শিক্ষা পেয়েছে, সে গুরুর গোত্রটা নিয়ে নেয়। এরপর ওই গোত্রের যে পরম্পরা রয়েছে, সেটাকে তারা পালন করতে থাকে।

সেখান থেকে আরেকটা যে ধর্ম হয়, তা হল জাতিধর্ম। জাতি অনেক, কর্মকার রয়েছে, ছুতোর রয়েছে, স্বর্ণকার রয়েছে, এরা এক-একটা জাতি। এরা সবাই নিজের নিজের ধর্ম পালন করত। আগেকার ঋষিরা দেখলেন, সবাই নিজ নিজ জাতির ধর্ম, নিজ নিজ কুলধর্ম পালন করলে ধর্মের তো শেষ হবে না। কুলধর্ম, জাতিধর্ম থেকে পুরো ভারতবর্ষে হাজার হাজার ধর্ম হয়ে গেছে। এটা ঠিক যে, সব ধর্মই বেদের উপর আধারিত, বেদের বাইরে কেউ যেতে পারবে না। জাতিধর্ম গুলি বেদকে মানে, কুলধর্মগুলি গোত্র মানে, গোত্রকে মানে তাই বেদকে মানে, বেদের বাইরে কেউ যেতে পারবে না। কিন্তু সবাই বেদকে নিজের মত করে পালন করে। তখন সামাজিক ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ঋষিরা মিলে ধীরে ধীরে সব কটাকে চারটে বর্ণে নিয়ে এলেন – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। বিভিন্ন জাতিধর্মকে ওনারা ঢুকিয়ে দিলেন এই চারটে বর্ণে। হিন্দুদের কাছে বর্ণাশ্রমটা গুরুত্ব নয়, গুরুত্ব হল কুলধর্ম ও জাতিধর্মের। বর্ণাশ্রমটা খুব তরল, যার জন্য দেখা যায় বাংলায় একটা জাতি অমুক বর্ণে আছে, বিহারে গিয়ে অন্য বর্ণে চলে যায়, ইউপিতে গিয়ে আবার আর-একটা বর্ণে চলে যায়। আবার কোন বড় ঋষি, মহাত্মা আসার পর তিনি হঠাৎ একটা জাতিকে নিয়ে বলে দিলেন, আজ থেকে তোমরা ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হবে। শঙ্করাচার্য কেরলে অনেক জেলেদের ব্রাহ্মণ বানিয়ে দিলেন। নিম্নবর্ণের জাতিকে ক্ষত্রিয় বানানো হয়েছে, এরও প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে।

এরপর মনুস্মৃতি এলো, মনুস্মৃতি অনেক পরের দিকের কাজ, ওরা তখন এই চারটে বর্ণধর্মকে চারটে ছাতার মত করে যতগুলো জাতি ছিল, সব জাতিকে এই চারটের কোন একটা ছাতার নীচে নিয়ে এলেন। অন্য দিকে কুলধর্মকে রেখে দেওয়া হল। জাতিধর্মে আস্তে আস্তে ওনারা বিলোপ করে দিলেন। এখনও যেখানে একটু orthodox ভাবাপন্ন পরিবার আছে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত বা বাংলায় কুলধর্ম আর বর্ণধর্ম, এই দুটো চলে। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে এসে সবটাই এখন নড়বড়ে হয়ে গেছে। এখন ধর্ম হল, যিনি যেখানে যে কর্মে নিযুক্ত আছেন, সঠিক ভাবে ও নিষ্ঠার সাথে সেই কর্ম করাটাই এখন ধর্ম। অর্জুন এখানে এই যুক্তিটা নিয়ে আসছেন, *কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ*, কুলধর্ম যদি নাশ হয়ে যায়, সব কিছুই নাশ হয়ে যাবে, কোন ধর্মই তখন আর থাকবে না।

অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।।৪০।।

(হে কৃষ্ণ, অধর্মের দ্বারা অভিভূত হলে কুললক্ষ্মীগণ দুষ্টা হয়। হে বার্ষ্ণেয়, কুলস্ত্রীরা দুষ্টা হলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়।)

হে কৃষ্ণ, কুলের ধর্ম নষ্ট হয়ে গেলে, এদের স্ত্রীরা সবাই ব্যভিচারিণী হয়ে যাবে। কারণ এত লোক যদি মারা যায় এই স্ত্রীরা সবাই কোথায় যাবে? তখন অসবর্ণ বিবাহ হবে, তার থেকেও বড় ব্যাপার হল, কুলটাই পাল্টে যাবে। যদি কুলই পাল্টে গেল, তখন কি হবে?

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ।।৪১।।

(কুলের সংমিশ্রণ হলে কুলনাশকগণ নরকগামী হয় এবং শ্রাদ্ধতর্পণাদি লুপ্ত হওয়ার ফলে তাঁদের পিতৃপুরুষগণও নরকে পতিত হন।)

বর্ণসঙ্কর মানে, inter mixing। হিন্দু ধর্মের মূল ধর্ম আসে বেদের মীমাংসা থেকে, সেখানে বলা হয় মৃত্যুর পর জীবাত্মা দেহকে ছেড়ে যে রকম কর্ম করেছে, সেই অনুসারে বিভিন্ন লোকে যায়। মৃত ব্যক্তির জন্য শ্রাদ্ধ করা হয়, পিণ্ড দান করা হয়। বলা হয়, এই শ্রাদ্ধ বা পিণ্ড দান করলে এর যে সার, এই সার সেই পিতৃগণরা পান। শ্রাদ্ধাদি করার সময় পুরোহিত যজমানের কাছ থেকে সাত পুরুষ বা চোদ্দ পুরুষের পুরো নামের তালিকা চেয়ে নেন। এর পুরোটাই বংশকুল দিয়ে চলে। অর্জুন বলছেন, যদি বর্ণসঙ্কর হয়ে যায়, তাহলে পিতৃগণরা যে পিণ্ডোদক ক্রিয়া এতদিন পেয়ে আসছেন, সেটা আর পাবেন না। কারণ, তখন কে পিণ্ড দান করবে? বর্ণসঙ্কর হয়ে গেছে কিনা, কোন কুলই তো থাকল না। অর্জুন এখনও শ্রীকৃষ্ণকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের সবার ক্ষেত্রেই তাই হয়, আমরা যখন খুব depressed হয়ে যাই, তখন যিনি আমাদের উপদেশ দিতে আসেন, তাঁকেই আমরা উপদেশ দিতে থাকি। অর্জুন বলছেন, পিণ্ড দান, শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে, স্বর্গে আমাদের পূর্বপুরুষরা আছেন, তাদের সেখান থেকে পতন হয়ে যাবে।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।।৪২।।

(এই সকল বর্ণসঙ্করকারক দোষের দ্বারা কুলনাশকগণের সনাতন বর্ণধর্ম, কুলধর্ম ও আশ্রমধর্ম উৎসন্ন হয়।)

হে কৃষ্ণ, এইসব কুলনাশকারীদের বর্ণসাঙ্কর্য দোষের জন্য সনাতন জাতিধর্ম, কুলধর্ম এবং আশ্রমধর্মাদিও নাশ হয়ে যাবে। এখনও দেখা যায় হিন্দু পরিবারে যাঁরা কুলদেবতাদির পূজা করেন,

তাঁর সব সময় চান, আমাদের বংশে আমাদের কুল থেকেই যেন কোন নারীকে বধূ করে আনা হয়, যাতে আমাদের পরম্পরাটা বজায় থাকে। পরম্পরাটা মিটে গিলে কিছুই আর থাকবে না। এনারা বলে থাকেন, আমাদের পিতৃগণরা যাঁরা স্বর্গে আছেন, তাঁরা তাঁদের অংশটা পাবেন না।

উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রম।।৪৩।।

(হে জনার্দন, যাদের কুলধর্ম উৎসন্ন হয়েছে তাদের নিরন্তর নরকে বাস করতে হয়, এই কথা আমরা শাস্ত্র ও আচার্যের মুখে অবগত আছি।)

অর্জুন বলে যাচ্ছেন, আমি গুরুজনদের কাছে এই রকম শুনেছি, যদি পিণ্ডোদক ক্রিয়া না করা হয়, তাহলে পিতৃগণরা নরকে বাস করেন। আমরা কি করে চাইব যে, আমার দোষের জন্য আমাদের বাবা, মা, দাদু, ঠাকুরমা, এনারা সবাই নরকে বাস করুন!

অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ।।৪৪।।

(আমরা কি মহাপাপ করতে প্রবৃত্ত হয়েছি, যেহেতু আমরা রাজ্যসুখের লোভে স্বজনগণকে হত্যা করতে উদ্যত।)

হায়, আমরা কী মহাপাপেই না প্রবৃত্ত হতে যাচ্ছি, একদিকে আমাদের পূর্বপুরুষদের নরকে পাঠাতে যাচ্ছি, আর অন্য দিকে একটু রাজ্যসুখ লাভের জন্য স্বজনদের বধ করতে উদ্যত হচ্ছি! এরপর অর্জুন তাঁর final decision নিয়ে বলছেন –

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তারাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।।৪৫।।

(প্রতিকাররহিত ও নিরস্ত্র আমাকে যদি শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ যুদ্ধে বধ করেন, তাতে আমার অধিকতর কল্যাণ হবে। আমার পক্ষে জীবনধারণ অপেক্ষা মরণই প্রিয়তর।)

আমি যুদ্ধ করব না, আমি অস্ত্র রেখে দিলাম। আমি বসে থাকব, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা ঢাল তলোয়ার এনে আমার মুণ্ডু কেটে দিক, আমি নিজেকে রক্ষার কোন চেষ্টা করব না। কোন মতেই আমি আর যুদ্ধ করছি না, এটাই আমার শেষ কথা। অর্জুন লৌকিক কারণ এনে দেখাচ্ছেন, যাদেরকে নিয়ে সুখভোগ করব, তাদের মেরে আমি কি করব। আর পারলৌকিক কারণ এনে দেখাচ্ছেন, আমার পিতৃগণ, যাঁরা স্বর্গে আছেন, তাঁরা সবাই আমার কারণে স্বর্গ থেকে পতিত হয়ে নরকে যাবেন।

সঞ্জয় উবাচ
এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ।।৪৬।।

(সঞ্জয় বললেন –এই কথা বলে অর্জুন ধনুর্বাণ ত্যাগপূর্বক শোকাকুল চিত্তে রথের উপর উপবেশন করলেন।)

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন, এই কথা বলে অর্জুন নিজের গাণ্ডীব রথের উপর রেখে দিলেন, যোদ্ধাদের দেখার জন্য অর্জুন যে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, বিষণ্ণচিত্তে শোকাকুল হয়ে সেই দাঁড়ানো থেকে রথের উপর বসে পড়লেন। এখানে এসে প্রথম অধ্যায় শেষ হয়ে যাচ্ছে।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়ং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অর্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ।।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্যযোগ

প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখলাম, অর্জুন দেখলেন যুদ্ধে এক অপরকে মারার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, যুদ্ধে এরা সবাই মারা যাবে। কিছুক্ষণের মধ্যে এত লোক মারা যেতে চলেছে আর সবাই আপনজন, এই দৃশ্য দেখেই অর্জুন অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। মানুষ মৃত্যুকে নিতে পারে না। ক্ষত্রিয়রা, যাদের প্রবৃত্তিতেই যুদ্ধ রয়েছে, তারাও চেষ্টা করতেন যাতে কাউকে প্রাণে না মারতে হয়। খুব বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া কাউকে মারতেন না। যুদ্ধ ক্ষেত্রেও ক্ষত্রিয়রা চেষ্টা করে যাতে কাউকে না মেরে থাকা যায়। প্রথমে তারা বন্দি করে নেওয়ার চেষ্টা করে। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই গীতা ধীরে ধীরে তার মূল বিষয়ে প্রবেশ করবে। তবে প্রথম দশ বারোটি শ্লোক পর্যন্ত ভূমিকাই চলবে।

সঞ্জয় উবাচ
তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ।।১।।

(সঞ্জয় বললেন – অর্জুন এই প্রকার দয়ার্দ্র হয়ে শোক করতে লাগলেন, অশ্রুপূর্ণ হওয়ায় তাঁর চক্ষুদ্বয় দর্শনে অসমর্থ হল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে এই কথা বললেন।)

সঞ্জয় এবার ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন, অর্জুনের চোখে জল, দৃশ্যগুলি ঝাপসা হয়ে গেছে, খুব করুণ অবস্থা। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব মুহূর্তে অর্জুন একেবারে ভেঙে পড়েছেন। শোকাতুর অর্জুনকে তখন শ্রীকৃষ্ণ বোঝাতে শুরু করছেন। আগের অধ্যায়ের নামের সাথে 'বিষাদ' শব্দ ছিল, আর দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে 'বিষাদ' শব্দটা পাল্টে গিয়ে এবার *কৃপয়া* শব্দটা এসেছে।

শুধু বিষাদেই না, যে কোন ইমোশান যদি মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তা যে কোন ইমোশান হোক না কেন, ভাল হোক, মন্দ হোক, হাসিখুশীর হোক, কান্নাকাটির হোক, ক্রোধের হোক, তখন আমরা সত্যকে দেখতে পাই না, সব কিছু ঝাপসা হয়ে যায়। ক্রিকেট খেলায় অনেক সময় দেখা যায়, একটা বল বাকি, আর জেতার জন্য দুই কি তিন রান বাকি, অনেক সময় ব্যাটসম্যান একটা চার কি ছয় মেরে বা খুচরো রান নিয়ে জিতে যায়। অনেক সময় পারে না। যাঁরা খুব বড় মাপের ব্যাটসম্যান, তাঁরা বলেন, আমি ওই সময় আমার মধ্যে কোন টেনশান আসতে দিই না। ওই একটা বল যে বাকি, ওটাকে আমি মাথায় আসতেই দিই না, অন্য বলের মতই ট্রিট করে খেলি। তার মানে তিনি মন থেকে সব ইমোশানকে সরিয়ে রেখে বলটা খেলতে যাচ্ছেন।

আমাদের একটা ধারণা যে, আমাদের যদি কোন motive না থাকে, ফল পাওয়ার ইচ্ছা যদি না থাকে, তাহলে মানুষ কি করে কাজ করবে? এটাকেই স্বামীজী বলছেন, unselfishness is more pain, only people do not have the patience to practice it। ইমোশানকে সরিয়ে একবার কাজ করে দেখুন, দেখবেন কাজ অনেক ভাল হবে। বাচ্চারা বাড়িতে সেই ভাবে ট্রেনিং পায় না, যার জন্য স্কুল, কলেজের এত গুরুত্ব। স্কুলে ড্রীল করাচ্ছে, শিক্ষকরা একটা কড়া অনুশাসনে রাখছে, এর একটাই উদ্দেশ্য, ওর ইমোশানসকে রেগুলেট করা।

আমরা সবাই ইমোশানসের মধ্যে ভাসছি, এই হাসছি, এই কাঁদছি, এই অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ছি, এর ফলস্বরূপ আমরা জিনিসটাকে সঠিক ভাবে দেখতে পাই না। আমাদের সবার জীবনের একেবারে শেষ ইমোশান হল আমার আমিত্ব। আমিত্ব আছে বলেই এত কিছু হচ্ছে। আর এই

আমিত্ব আছে বলেই ঈশ্বর দর্শন হয় না, আত্মজ্ঞান হয় না। এই আমিত্বকে কিন্তু আমরা কেউই ছাড়তে পারব না। তোতাপুরির তত্ত্বাবধানে ঠাকুরও অদ্বৈত সাধনার সময় আমিত্বকে ছাড়তে পারছেন না। দক্ষিণেশ্বরে নরেনকে যখন ঠাকুর একটু ছুঁয়ে দিলেন, তখন নরেন্দ্রনাথ চেঁচিয়ে বলছেন, 'আপনি একি করলেন, আমার যে বাবা আছে, মা আছে'। এই আমিত্ব কিছুতেই যেতে চায় না। আমরা মনে করতে পারি ওনারা কত বিরাট মাপের লোক, আমরা তো অতি সাধারণ; কিন্তু সাধারণ আর অসাধারণ যাই হয়ে থাকুন, আমিত্ব সবারই থাকবে। শ্লোক যখন আসবে তখন এর উপর আমরা যে আলোচনা করব, সেটাও জানার জন্য, জ্ঞানলাভের জন্য। কিন্তু সাধারণ জিনিসগুলো যেগুলো দৈনন্দিন জীবনে আমাদের সব সময় লাগছে, সেগুলোকে আমাদের বুঝতে হবে। সেখানে আমিত্ব থেকে সব ইমোশানগুলি ছড়াতে থাকে।

পতঞ্জলি যোগসূত্রে পাঁচটা শব্দ বলছেন অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ আর অভিনিবেশ। এই পাঁচটি মিলিয়েই সব কিছু হয়। অভিনিবেশ শব্দের অর্থ বেঁচে থাকার ইচ্ছা। আমাদের যাবতীয় কর্ম, উদ্যোগ, চেষ্টা, সবের পিছনে আছে বেঁচে থাকার ইচ্ছা। অর্থোপার্জন করছি, বেঁচে থাকার ইচ্ছা, ঘরবাড়ি করছি, গাড়ি করছি, বেঁচে থাকার ইচ্ছা। অভিনিবেশের উপরে আছে রাগ আর দ্বেষ, আমরা কিছু জিনিসকে পছন্দ করি, কিছু জিনিসকে অপছন্দ করি। তারও পিছনে রয়েছে অস্মিতা, এটাই আমিত্ব, যেখানে পুরুষ আর প্রকৃতির যোগ হয়। এই সব কিছুর পিছনে রয়েছে অবিদ্যা। অবিদ্যা মানে, আমি আমার স্বরূপ ভুলে গেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটা দুটো শ্লোক এই অবিদ্যাকে কেন্দ্র করেই চলবে।

স্বরূপ ভুলে যাওয়া মানেই, আমি তোমার সঙ্গে জুড়ে গেলাম। যখনই আমি তোমার সাথে জুড়ে গেলাম, তখন আমি নিজেকে ছোট করে নিলাম। পুরুষ অনন্ত, আর প্রকৃতি সীমিত। অনন্ত সীমিতের সাথে জুড়ে দেয়, তারপর তার সাথে থাকতে থাকতে এক অপরের ভাবকে আপন করে নেয়। কারুর সাথে গভীর বন্ধুত্ব হলে, যেমন স্বামী-স্ত্রীর হয়; লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কিছু দিন পর স্বামী যেভাবে কথা বলে, স্ত্রীও সেই ভাবে কথা বলতে শুরু করে। স্ত্রী যেভাবে হাঁটচলা করে, স্বামীর হাঁটাচলা সেই ভাবে হতে থাকে। ধীরে ধীরে দুজনের হাঁটাচলা, কথা বলা, হাত পা নাড়া, চোখের চাহনি, এক অপরের মত হতে শুরু করে।

পুরুষ ও প্রকৃতির ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। দুজনের যখন মিলন হয়, তখন পুরুষ প্রকৃতির স্বভাব পেয়ে যায়, প্রকৃতি পুরুষের স্বভাব পেয়ে যায়। পুরুষ বলতে এখানে চৈতন্য, প্রকৃতি বলতে জড়। জড় নিজেকে চেতন মনে করে, বুদ্ধি নিজেকে চেতন মনে করে, আর আত্মা নিজেকে সীমিত মনে করে। আমার খুব প্রিয়জন যদি কারুর পাল্লায় পড়ে যায়, আর যদি দেখি আমার প্রিয়জনকে অপমানিত করতে শুরু করেছে, আমার আপনজন তখন ছোট হতে থাকে। তাকে আমরা কত বোঝাই, তুমি ওর পাল্লায় পড়ে আর নিজেকে কত ছোট করবে! ঠাকুর বলছেন, যারা চাকরি করে, তাদের ওখানে কাজ করতে করতে তাদের আত্মসম্মান হারিয়ে যায়। ছোট হতে হতে আমরা নিজের মানমর্যাদা সব হারিয়ে ফেলে আমার আসল সত্তাকেই ভুলে যাই, কারণ আমি যে তার সাথে নিজেকে জুড়ে রেখেছি। একবার শুধু বলে দেওয়া, সম্পর্কটা আমি কেটে দিলাম, তুমি এবার বিদায় হও। বলা যায় না, খুব কঠিন, তাকে ছেড়ে যেতে যে কষ্ট হবে। কিন্তু একবার কেটে দিলে সঙ্গে সঙ্গে তুমি আবার নিজের মত স্বাধীন হয়ে যাবে।

পুরুষ আর প্রকৃতির সম্পর্ক ঠিক এই রকম, প্রকৃতি সব সময় পুরুষকে ছোট করে দাবিয়ে রাখতে চাইবে। পুরুষ ছোট হতে হতে একটা সময় বলতে শুরু করে, কৃপা করুন আমাকে। সবার কাছে গিয়ে কৃপা ভিক্ষা করে, মহারাজ কৃপা করুন, জেলাশাসককে বলবে, কৃপা করুন, পুলিশকে গিয়ে বলবে কৃপা করুন। কৃপা করুন মানে, আমি ছোট আপনি বড়, আপনি আমার উপর কৃপা

করুন। আমাদের একবারও কিন্তু মনে হয় না যে, তিনি যে পোস্টে আছেন, যেই হয়ে থাকুন, রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকুন, আত্মা রূপে আমি তার থেকে অনেক বড়। কিন্তু আমি নিজেকে সাধারণ মনে করছি বলে আমি তাঁর কাছে সাধারণ। মাটির ইঁদুর আর মাটির হাতি, ইঁদুর রূপে সে হাতির কাছে কিছুই না। কিন্তু মাটি রূপে সে হাতি থেকে বিরাট। আপনি হয়ত বলতে পারেন, মাটি রূপে হাতিটাও তো বিরাট। ঠিক, কিন্তু তার কাছে তো আপনি হাতি রূপে যাচ্ছেন না, সমস্যা তো আপনিই তৈরী করছেন। তখনই আমরা আমাদের স্বভাববশতঃ বলি, কৃপা করুন। যে কাতর হয়ে কাকুতি মিনতি করছে, বুঝতে হবে সে তার স্বরূপ ভুল গেছে। স্বরূপ ভুলে যাওয়া মানে, আমি কে, আমার আসল পরিচয় কি, সেটাকে ভুলে যাওয়া। যতক্ষণ না তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে, তুমি কে, তোমার কত ক্ষমতা আছে, ততক্ষণ তার দুঃখের আর শেষ নেই, ততদিন সে ছোট থেকে ছোট হয়েই সব জায়গায় ঘুরে বেড়াবে, ওখান থেকে সে আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

সঞ্জয় বলছেন, *বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ*, অর্জুনের বিষন্নতা, চোখে জল দেখে শ্রীকৃষ্ণ অবাক হয়ে গেছেন। যদিও এখানে অবাক শব্দ নেই। অবাক হয়ে অর্জুনকে তখন শ্রীকৃষ্ণ বলতে শুরু করলেন।

মানুষ যেমন পকেটে ঠাকুর দেবতার ছবি রাখে, তেমনি এর পরের দুটো শ্লোককে একটা কাগজে লিখে বুক পকেটে, মনিব্যাগে আমাদের রেখে দিতে হবে, সাথে সাথে মুখস্ত করে রাখতে হবে। মুখস্ত হয়ে গেলেও কাগজে লিখে সঙ্গে রাখতে হবে, আর মাঝে মাঝে কাগজটা বার করে শ্লোক দুটি দেখতে হবে। যখনই কোন কারণে চোখে জল আসবে, যখনই মনে হবে ভেঙে পড়ছি, খুব কষ্ট পাচ্ছি, কাগজটা খুলে এই শ্লোক দুটো পড়বেন, এর অর্থটা একটু চিন্তা করতে হবে, দেখবেন ভিতরে একটা শক্তি এসে যাবে। এই দুটো শ্লোককে এই ভাবে মনন করুন, চিন্তন করুন; দেখবেন জীবনের সমস্ত রকম দুর্বলতা, কাপুরুষতা চিরদিনের মত চলে যাবে।

উত্তর ভারতে, বিশেষ করে হিন্দীভাষী এলাকায়, কোন ঝামেলায় পড়লে তারা হনুমান চালিশা পাঠ করে, তারা মনে করে এতে নাকি তাদের শক্তি এসে যায়। বেদান্তের শক্তি আসে এই দুটি শ্লোক থেকে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের তিন নম্বর শ্লোক, *ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ...* এই শ্লোকটা স্বামীজীর এত প্রিয় ছিল যে, তিনি অনেক জায়গায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে এই শ্লোকটার উল্লেখ করতেন। আমরাও মনে করি *ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ*, এটি গীতার সবচেয়ে শক্তিশালী শ্লোক।

শ্রীভগবানুবাচ
কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন।।২।।
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।।৩।।

(শ্রীভগবান বললেন – হে অর্জুন, এই সঙ্কটকালে আর্যগণের অযোগ্য, স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক ও অযশস্কর এই মোহ তোমার মধ্যে কোথা থেকে এলো? হে অর্জুন, ক্লীবভাব আশ্রয় করো না, এই কাপুরুষতা তোমার শোভা পায় না। হে শত্রুতাপন, হৃদয়ের এই তুচ্ছ দুর্বলতা ত্যাগ করে যুদ্ধার্থে উঠে দাঁড়াও।)

এখানে প্রথম শ্লোকটা হল আমাদের দুরবস্থার বর্ণনা, দ্বিতীয় শ্লোক বলে দিচ্ছে এই দুরবস্থা থেকে কিভাবে আমরা বেরিয়ে আসব। *কুতস্ত্বা*, কোথা থেকে, ভগবান অবাক হয়ে গেছেন, তোমার মধ্যে কোত্থেকে এই দুর্বলতা এসেছে? *কশ্মলমিদং*, কশ্মল শব্দের অর্থ মলিন, অর্জুনের মত বীর, এক স্বচ্ছ চরিত্রের মধ্যে মলিনতা, ভাবাই যায় না! *বিষমে সমুপস্থিতম্*, এই সঙ্কট সময়ে কোথা থেকে তোমার মধ্যে এই মলিনতা এসেছে, অথচ এই রণভূমিতে তোমার শৌর্য দেখানোর কথা।

স্বামী-শিষ্য-সংবাদে স্বামীজী শিষ্যকে বলছেন, আগেকার দিনের লোকেরা চৌদ্দ পুরুষের নাম জানত, এখন সাত পুরুষের নামও জানে না। স্বামীজীকে তাঁর এক বন্ধু বললেন, পূর্বপুরুষদের নাম জেনে কি হবে? যদি পূর্বপুরুষদের নাম জানা থাকে, তখন নিজের ভিতরে একটা গর্ব হয়, আমি এই বংশের লোক। মন্দ কোন কাজ করার সময় তার একটা হুঁশ থাকে যে, আমি এই বংশের লোক, এই কাজ আমি করতে পারি না। সন্ন্যাসীদের যে গেরুয়া পরতে হয়, সেখানেও এই ভাবনাটাই কাজ করে। যদি কিছু গোলমাল করতে যাবে, তখন এই গেরুয়া যেন তোমাকে মনে করিয়ে দেয়, তুমি এ কাজ করতে পারো না।

বিদ্যাসাগরকে নিয়ে একটা ঘটনা আছে, তবে এই ঘটনা কতটা সত্য, কতটা সত্য না, আমাদের জানা নেই, একটা ম্যাগাজিনে এই লেখাটা আমি পড়েছিলাম। সত্য যদি নাও হয়, কিন্তু এই কাহিনীর আইডিয়াটা একশ ভাগ সত্য। বিদ্যাসাগর যখন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হলেন, তখন তাঁর চিন্তা এলো, আমি একজন প্রিন্সিপ্যাল, একজন প্রিন্সিপ্যালকে কি ধরণের পোশাক পরে কলেজে যাওয়া যেতে পারে। আমরা সবাই জানি বিদ্যাসাগর সব সময় ধুতি আর ফতুয়া পরতেন। এতদিন এই পোশাকেই তিনি কলেজ যেতেন। প্রিন্সিপ্যালের কি এই পোশাকে যাওয়া ঠিক হবে?

এই চিন্তা নিয়ে তিনি একদিন তিনি আউটরাম ঘাটের গঙ্গার ধার দিয়ে হাঁটছেন। সেই সময় তিনি দেখছেন, ওনার আগে আগে এক ভদ্রলোক নবাবী চালে হেঁটে যাচ্ছেন। পরে তিনি জানতে পারেন ভদ্রলোক একজন নবাব বংশের লোক। হঠাৎ একজন লোক দৌড়ে এসে তাঁকে বলছে যে, 'হুজুর আপনার বাড়িতে আগুন লেগে গেছে'। শোনার পর যেমন উনি চলছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই ধীর মন্থর পদক্ষেপে চলছেন। বিদ্যাসাগর দেখে চমকে উঠলেন। তখন আর-একজন লোক দৌড়ে এসে বলছে, 'হুজুর আপনার বাড়িটা ছাই হয়ে যাবে'। তাও সে নিজের স্টাইলে ধীরে ধীরে পা ফেলে এগোচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে তৃতীয় আরেকজন লোক এসে যখন বলছে, 'একটু পা চালিয়ে আসুন'। তখন ভদ্রলোক বলছেন, 'তোমাদের কটা পুরনো কাঠ পুড়ে যাচ্ছে, তাই বলে আমার বাপ-ঠাকুর্দার দেওয়া নবাবী চালে হাঁটার স্টাইল কি আমি ছেড়ে দেব'? সেখানেই বিদ্যাসাগর ঠিক করে ফেললেন, আমি একটা চাকরিই তো করতে যাচ্ছি, তাই বলে বাপ-ঠাকুর্দার দেওয়া ধুতি-ফতুয়া পরা ছেড়ে দেব! কখনই তা হতে পারে না।

আজ আমাদের চারিদিকে আজ কত অশান্তি, শুধু উৎপাত আর উৎপাত; দেশ-বিদেশের লোকেরা বলছে, ভারত গোল্লায় যাচ্ছে। কিন্তু আমরা সব সময় ভাবছি, এর উল্টোটাই হবে। ইদানিং একটা নূতন শব্দ এসেছে –সেকুলার। যারা বলছে, ভারত সেকুলার থেকে সরে যাচ্ছে, এদেরকে শুধু একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন, তোমরা তোমাদের পরম্পরাকে জানো? হিন্দু ধর্মের উপর তোমরা কোন বই কি পড়েছ? আমার কাছে একজন বড় ইউনিয়ন নেতা প্রায়ই দেখা করতে আসেন। একদিন এসে উনি বললেন, 'হিন্দুরা লিবারাল, সেকুলার'। বিরক্ত হয়ে তাঁকে বললাম, 'দেখুন শুধু হিন্দু ধর্মকে নিয়ে আমার তিন খানা বই আছে, আপনি এর একটি বই পড়ে দেখেছেন? পড়েননি, কিন্তু বলে যাচ্ছেন, হিন্দু ধর্ম লিবারাল, হিন্দু ধর্ম সেকুলার'। হিন্দু ধর্মের যে কোন একটি শাস্ত্র পড়ে কি তুমি হিন্দু ধর্মকে বোঝার চেষ্টা করেছ? করোনি, ফলে কোথা থেকে তোমার মধ্যে শক্তি আসবে! পরম্পরাকে যদি তোমার না জানা থাকে তোমার গর্ব কোথা থেকে হবে।

আমরা প্রায়ই বলে থাকি, এই ভাল বংশে কোথা থেকে একটা কুলাঙ্গার, একটা কুপুত্র জন্ম নিয়েছে; কিন্তু আমাদের কাছে এখন উল্টো হয়ে গেছে। আমাদের যত পূর্বজ আছেন, সবাই কুপূর্বজ; আমাদের পূর্বজরা কিছু জানতেন না, মুর্খের দল। এদের মন মলিন হবে না তো কার হবে! থেকে থেকেই তোমার মন মলিন হবে। মলিন হয়ে গিয়ে তুমি কি করছ, নিজেও বুঝতে পারছ না।

অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই বলছেন, *কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্,* এই সঙ্কটকালে যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার এ কী অবস্থা হল! কোথা থেকে তোমার এই পতন হয়ে গেল? পরে ভগবান অর্জুনকে বলবেন, যাঁরা তোমাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেন, তাঁরাই তোমাকে দেখে হাসাহাসি করবে। তোমার এ কেমন পতন হয়ে যাচ্ছে, নিজেকে ধরে রাখার ক্ষমতা নেই?

দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বিতীয় লাইনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম ও জীবনকে পরিভাষিত করছেন, খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। *অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন*। যে কোন কাজ করার আগে তিনটে প্রশ্ন বা শর্তকে সামনে রেখে টিক মার্ক করতে হবে। প্রথম হল, *অনার্যজুষ্টম্,* যাঁরা আর্য পুরুষ, সুসংস্কৃতবান, যাঁরা শাস্ত্র জানতেন। সুসংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত থেকে আসে, সংস্কৃত শব্দের অর্থ হয়, বিশেষ ভাবে যাকে সংস্কার করা হয়েছে। কালচার শব্দটাও 'কৃ' ধাতু থেকেই আসে, যেমন চাষ করা, এগ্রিকালচার। কালচার বা সংস্কৃতির অর্থ হল, যে জিনিসটা স্থূল নয়। স্থূল নয় মানে, জিনিসটা সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম হওয়ার জন্য জিনিসটা দেশ ও কালকে অতিক্রম করে যায়। যে জিনিস যত সূক্ষ্ম হয়, সেই জিনিসটা তত বেশী দেশ ও কালকে ছাড়িয়ে যায়।

ওনারা এর খুব সুন্দর উদাহরণ দেন, ঈজিপ্টের পিরামিডের দিকে যদি তাকান, পিরামিড গুলো হল স্থূল, বিশাল বড়। কিন্তু বিশ্ব সভ্যতায় পিরামিডের প্রভাব কিছুই পড়েনি। আজকে যারা পিরামিড দেখতে যাচ্ছে, তারা দেখছে বালির উপর একটা বিরাট পিরামিড দাঁড়িয়ে আছে। পিরামিড থেকে আমাদের কোন টেকনলজির জ্ঞান আসছে কিনা, কোন শক্তি বা প্রেরণা আসছে কিনা; যদি হিসাব করা হয়, তাহলে দেখা যাবে কিছুই না। ঈজিপ্টের উপর পিরামিডের কি অবদান? শূন্য। কিন্তু পিরামিড একটা বিরাট জিনিস। দেখে আমরা শুধু অবাক হই। পিরামিড গুলো দেশ ও কালে বাঁধা। যদি এমন হত, ওই পিরামিড সারা বিশ্বে সবাই বানাচ্ছে কারণ পিরামিড থেকে এই এই সুবিধা পাওয়া যাবে, তখন বলা যাবে পিরামিড দেশ ও কালকে ছাড়িয়ে গেছে। এবার গায়ত্রী মন্ত্রের দিকে তাকান, গায়ত্রী মন্ত্র দেশ ও কালকে ছাড়িয়ে গেছে। কত সহস্র বছর আগে সুদূর বৈদিক কালে বিশ্বামিত্র এসেছিলেন, আমরা কেউ জানি না, কিন্তু ধ্যানের গভীরে তিনি কি একটা মন্ত্র পেলেন, আজও কোটি কোটি ভারতবাসী ওই মন্ত্র জপ করে যাচ্ছে।

এই হল আমাদের সংস্কৃতি, দেশ কালকে ছাড়িয়ে গেছে। যাঁরা এ-রকম সুসংস্কৃত, তাঁরা হলেন আর্য, তাঁরা নিজেদের আর্য বলতেন। যারা সুসংস্কৃত ছিল না, তাদেরকে বলা হত অনার্য। অনার্য মানে তার মধ্যে কোন কালচার নেই, খুব স্থূল, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ভোগসর্বস্ব জীবনটাই তাদের কাছে প্রধান। সংস্কৃত মানে, তার নিজের মন, ইন্দ্রিয়ের উপর একটা নিয়ন্ত্রণ আছে। এই নিয়ন্ত্রণকে তাঁরা এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যে, বংশ পরম্পরায় তাঁরা এটাকে ধরে রেখেছেন। হে অর্জুন, তুমি যেটা করতে চাইছ এটা *অনার্যজুষ্টম্,* এটা অনার্যজোনিত কর্ম। তুমি যেটা করছ, এটা আর্যদের সাথে একেবারেই মিলছে না, কারণ আর্যরা এই কাজ কখনই করবেন না। এখনও রাস্তাঘাটে বা বাসে ট্রেনে কেউ আজেবাজে কিছু কথা বললে পাশের লোকেরা বলে, এটা কি কোন ভদ্রলোকের কথা হল, ভদ্রলোকের পোশাক পরে অভদ্রের মত আচরণ করছেন, ইত্যাদি।

এটাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, কিন্তু এখানে শব্দটা হল *আর্যজুষ্টম্,* হে অর্জুন, তুমি যা করছ এর সাথে আর্যরা যা করে এটা তা নয়। ঠিক তেমনি আমরা যখনই কিছু করতে যাব, তার আগে দেখতে হবে যাঁরা সুসংস্কৃতবান পুরুষ, সমাজ যাঁদের মহাপুরুষ বলছে, তাঁরা এই ধরণের কাজ করছেন কি করছেন না। এটা হল প্রথম চেকবক্স।

দ্বিতীয় চেকবক্স হল, *অস্বর্গম্*। এই কাজ কি আমার মধ্যে ধর্মের ভাব বৃদ্ধি করবে? এই কাজ কি আমাকে আরও ধর্মের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে? আমি যে স্বর্গে যাওয়ার প্রত্যাশী, এই কাজ কি

আমাকে স্বর্গের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে? আরও সহজ ভাবে বিচার করে দেখতে গেলে বলা যেতে পারে, এটা কি কোন পূণ্য কর্ম? এটা কি এমন কোন শুভ কর্ম, যে কর্ম আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে? কোন মহাপুরুষও এই কাজ করেননি, এই কর্ম আমাকে স্বর্গেও নিয়ে যাবে না। তাহলে এই কর্ম করা যাবে না।

তৃতীয় চেকবক্স হল, *অকীর্তিকরম্*। এবার জাগতিক উন্নতিকে নিয়ে বলছেন। এই কাজ করলে আমার কীর্তি কি বাড়বে? লোকেরা কি বলবে, আপনি কি সাংঘাতিক কাজ করেছেন? এমন অনেক কাজ আছে, যেটা পূণ্যকর্মের অতটা নাও হতে পারে, কিন্তু কীর্তি বর্দ্ধন করে। যেমন একটা খুব সুন্দর কবিতা লিখলেন, কবিতা লেখাটা পূণ্যের দিকে হয়ত তেমন কিছু না, মহাপুরুষরাও কবিতা লেখেন না, কখন সখন কদাচিৎ কোন মহাপুরুষ কবিতা লিখে থাকতে পারেন। কিন্তু আপনার তাতে কীর্তি বর্দ্ধন হয়। এই তিনটে যদি না থাকে, পারলে তিনটেই যদি ইয়েস থাকে, তবেই সেই কাজ তুমি করতে পার। তিনটেই যদি ইয়েস না হয়, অন্তত একটা যেন হয়। প্রথম আর্যরা এই কাজ করতেন, দ্বিতীয় ধর্ম বৃদ্ধি এবং তৃতীয় কীর্তি বৃদ্ধি। অর্থাৎ কোন কাজ করার সময়ে দেখতে হবে, এই কাজ কি আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে, এটা কি ধর্ম সম্মত, এবং শেষে এটাতে কি লোকেরা আমাকে সম্মান দেবে, আমার কীর্তি বাড়বে।

হে অর্জুন, তুমি যে ক্ষত্রিয় ধর্ম ছেড়ে ব্রাহ্মণদের মত ভিক্ষা করে জীবনধারণ করবে বলছ, আসলে তুমি বলতে চাইছ, আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাব, বৈরাগী হয়ে যাব; অন্য সময় এই কথা বলে থাকলে না হয় তোমার অনেক সম্মান হত, কিন্তু এই মুহূর্তে এই কাজের জন্য সবাই তোমাকে বিদ্রুপ করবে। পরে তাই হল, সব শেষে অর্জুন যখন সব কিছু ছেড়ে বৈরাগীই হয়েছিল, তাতে তখন তাঁর মান বেড়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ ভূমি থেকে পালিয়ে আমি বৈরাগী হব –এই কাজ আর্যরা কখন করবেন না, এই কাজ তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে না, আরও খারাপ হল, এতে তোমার কোন সম্মান তো বাড়বেই না, উপরন্তু লোকেরা তোমাকে বিদ্রুপ, তাচ্ছিল্য করবে। যে কোন decision making, একটা নূতন চাকরি নিতে যাচ্ছি, একটা কিছু করতে যাচ্ছি, আপনি আগে দেখুন এই তিনটে শর্ত পূরণ করছে কিনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান অর্জুনের অবসাদকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বললেন। তৃতীয় শ্লোকে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ সরাসরি বলছেন, এই অবসাদ থেকে বেরিয়ে এসো, উঠে দাঁড়াও। এই দুটো শ্লোক যদি মুখস্ত নাও করতে পারি, অন্তত তৃতীয় শ্লোকটিকে আমাদের অবশ্যই সবার মুখস্ত করে রাখা অত্যন্ত জরুরী। তৃতীয় শ্লোকের সাধারণ অর্থ হল, অর্জুন তুমি এভাবে কাপুরুষ হয়ে যেও না, তোমার মধ্যে এই কাপুরুষতা শোভা দেয় না। তোমার এই ক্লীব ভাবকে, হৃদয়ের দৌর্বল্য ভাবকে তুমি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যুদ্ধের জন্য উঠে দাঁড়াও।

এখানে ভগবান যখন বলছেন, *ক্লৈব্যং মাস্ম*, তুমি এই ক্লীব ভাব ভিতরে আসতে দিও না, আমরাও যখন এক অপরকে বলি বা ছোটদের বলি তোমরা বড় হও, এখানে জিনিসটা ঠিক তা না, অর্জুনকে সেভাবে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন না। কি ভাবে বলছেন? আমরা যখনই কোন কাজ করি, আমরা ওই কাজে একেবারে মজে যাই, তা যে কাজই হোক না কেন। ঝগড়া করছি, মজে যাচ্ছি। ভালবাসছি, মজে যাচ্ছি; সাধারণ ভাবে বাচ্চাদের মত আমরা মজে যাই। আমাদের হিতৈষীরা সতর্ক করার জন্য বোঝাবেন, তুমি এই রকমটি করো না। বোঝাতে এলে আমরা তাঁর কথা বুঝতে চাই না, অনেক সময় শুনতেও চাই না। এই ধরণের আচরণ যে আমরা বাচ্চা বয়সেই শুধু করতাম, তা না, এখনও যদি কেউ বোঝাতে আসে, তুমি এসব কি করছ? আমরা শুনতে চাই না। কিছুদিন যাওয়ার পর, অর্থাৎ দেশ ও কালে সরে আসার পর হঠাৎ পিছনের দিকে যখন আমাদের দৃষ্টি যাবে, তখন মনে হবে, সেদিন আমি সত্যিই ভুল করেছিলাম। দেশ ও কালে সরে আসার পর মনে হবে ওটা

আমার ঠিক ছিল না। একটু উপরে উঠে আসার পর আরও ভালো বোঝা যাবে। যত উপরে উঠতে থাকব, পুরো ছবিটা তত পরিষ্কার হতে থাকবে। আমাদের বয়স যত বাড়তে থাকে, অভিজ্ঞতা অর্জনের সাথে সাথে বুদ্ধিও আমাদের পরিপক্ক হতে থাকে। তবে কিছু মানুষ আছে, তারা যে বুদ্ধি নিয়ে জন্মায়, সেই বুদ্ধি নিয়েই মরে, এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে না। যত দেশ কাল আমার থেকে সরে যাবে তত আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা পরিষ্কার হতে থাকবে। অনেক সময় আমাদের বলা হয়, কোন একটা পরিস্থিতিতে আমি আছি, যখন আমি কোন কিছুই সামলাতে পারছি না, তখন বলা হয়, একটু পিছিয়ে এসো।

অনেক আগে ফটোগ্রাফির উপর একটা লেখা বেরিয়েছিল, তাতে বলছে, তুমি ক্যামেরাতে কোন ফটো তুলতে যাচ্ছ, ছবিটা তোমার ফ্রেমে পুরোটাই চলে এসেছে, এবার শট নেওয়ার আগে তুমি এক পা পিছিয়ে আসবে। এতে perspectiveটা perfect আসে। ফটোগ্রাফির এটা একটা টেকনিক, এক পা পিছিয়ে যেতে হয়। সব কিছুতেই কিন্তু বলে, একটু সরে আসতে। জীবনের সব কিছুতেও বলা হয়, একটু সরে আসতে হয়। একটা সম্পর্কে জড়িয়ে আছি, সেই সম্পর্ক থেকে একটু সরে আসতে হয়, সম্পর্কের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো তখন পরিষ্কার বোঝা যায়। কিন্তু দেশ ও কালে যখন আমরা সরে গেলাম, তখন স্বাভাবিক ভাবেই সরে গেছি। ছোটবেলা যে অঙ্কগুলি করতে আমাদের ঘাম বেরিয়ে যেত, এখন এই বয়সে এসে বুঝতে পারছি, জিনিসটা কত সহজ ব্যাপার ছিল। আমরা যেমন যেমন এগোব, যেমন যেমন উপরের দিকে উঠতে থাকব, তেমন তেমন আমার যে প্রকৃতি আমাকে ছোট করে রেখেছে, সেই প্রকৃতি থেকে বড় হয়ে গিয়ে পরিষ্কার দেখতে পারছি, আমি কোথায় কোথায় ভুল করছিলাম।

একটু আগে বলা হল, জীবনে সবচেয়ে বড় ভুল যেটা আমরা সবাই করি, তা হল, আমিত্বের সঙ্গে জুড়ে থাকা। আমিত্বকে মানুষ ছাড়তে পারে না, তার কারণ, আমিত্বটাই হল মন এবং মনটাই হল দেশ ও কাল। দেশ-কাল আর মন একই জিনিস। আমিত্ব, দেশ, কাল, মন এগুলো সব একসাথে থাকে আর সব কটাই এক। মানুষ যখন সমাধিতে চলে যায়, যেটা যাওয়া প্রায় অসম্ভব, সমাধিতে চলে যাওয়া মানে তিনি মনের এলাকাকে ছাড়িয়ে গেলেন, সেখানে উপর-নীচ বলে কিছু নেই। কিন্তু এইবার যখন তিনি পিছনের দিকে তাকাচ্ছেন, তখন দেখছেন, আরে এ-সব কি হচ্ছিল এতক্ষণ! এতদিন কি করছিলাম আমরা? আমরা দুয়ের মধ্যে বাঁধা ছিলাম। জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে বাঁধা, পাপ-পূণ্যের মধ্যে বাঁধা, ভাল-মন্দের মধ্যে বাঁধা, শীত-গ্রীষ্মের মধ্যে বাঁধা, সুখ-দুঃখের মধ্যে বাঁধা।

গীতা যেখানে ঠিক ঠিক শুরু হবে, সেখানে প্রথমে ভগবান এটা দিয়েই শুরু করবেন, মনের সাম্রাজ্য আর চৈতন্যের বাস্তবিকতা, এই দুটো জিনিস দিয়ে। আমরা মনের সাম্রাজ্যে বাঁধা বলে এগুলোকে বিরাট বলে মনে হয়। চৈতন্যের বাস্তবিকতায় গেলে মনে হবে, আরে আমরা এতদিন কি বোকামিই না করছিলাম। অন্য দিকে কি হয়, আমরা নিজেকে কখন বিচার করতে পারি না। আমরা প্রায়ই একে ওকে বলে থাকি, তুমি কি আমাকে আমার থেকে বেশী ভাল বোঝ! কিন্তু জিনিসটা পুরো উলটো, এই জগতে আমাকে আমার থেকে সবাই বেশী ভাল বোঝে, এটাই বাস্তব। নিউরোলজি বিজ্ঞানেও এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। আমরা অপরকে যেভাবে বিচার করি, ঠিক সেই ভাবে আমি নিজেকেও বিচার করি। প্রসেসটা পুরোপুরি এক, ফলে অপরে যখন আমাকে দেখছে, সে আমার চেহারা দেখতে পাচ্ছে, আমার চোখ, মুখের ভাষা দেখতে পাচ্ছে, আমি এর কোন কিছুই দেখতে পাই না। যার পরিণাম হল, আমার নিজের প্রতি আমি যে বিচার করি, সেটা সব সময় একশ ভাগ ভুল হতে বাধ্য। কেউ যদি বলে, আমি নিজেকে অনেক ভাল জানি, জানবেন সে শুধু বোকা না, মুর্খও নয়, মুর্খের শিরোমণি। কারণ কোন মানুষ নিজেকে ভাল জানে না।

কোন লেখক যদি কিছু লেখালেখি করেন, তা কোন আর্টিকেলই হোক, বা বই হোক, তিনি দশজন বন্ধুকে অবশ্যই লেখাটা পাঠাবেন। বন্ধুদের কাছ থেকে রচনাটার সম্বন্ধে মতামত পাওয়ার পরই তিনি প্রকাশকের কাছে পাঠাবেন। কোন প্রকাশকের এরপর সাহস হবে না যে ওই রচনাতে হাত দেবে। কারণ লেখক যখন কোন কিছু লিখছেন, তখন তিনি ওই লেখার মধ্যে জড়িয়ে আছেন। যদিও রচনাটা লেখকের থেকে আলাদা, তিনি সেটা বিচার করতে পারেন, কিন্তু তিনি নিজে ওই রচনার মধ্যে জড়িয়ে আছেন বলে ওই রচনার সঠিক মূল্যায়ন হবে না। অপরে বলতে পারবে, লেখাটা কেমন হয়েছে। সবাই নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে, সবাই নিজেকে বিরাট মনে করে, কিন্তু দেখতে হবে অপরে তার সম্বন্ধে কি মূল্যায়ন করছে। যেমন সমাধিতে গিয়ে নিজের ভুলগুলি বোঝা যায়, ঠিক তেমনি, যাঁরা আমার থেকে উপরে আছেন, তাঁরা আমার ভুলগুলি বুঝতে পারেন। শিক্ষক যেমন ছাত্রের ভুল বুঝতে পারেন, আচার্য শিষ্যের ভুল বুঝতে পারেন, কিন্তু সবচেয়ে ভাল বুঝতে পারেন সমাধিবান পুরুষ। সমাধিবান পুরুষ আচার্য হতে পারেন, সমাধিবান পুরুষ অবতার হতে পারেন। তাঁরা জিনিসটা যেমন, সেটাকে ঠিক তেমন দেখেন।

‘আমি’ আসলে কি? এই ‘আমি’কে একজন সমাধিবান পুরুষ বা একজন আচার্য যত ভাল বুঝবেন, অত ভাল অন্য কেউ বুঝবে না। Positive thinkingএর উপর ইদানিং অনেক লেখালেখি হচ্ছে, প্রচুর বই পাবলিশ হচ্ছে। এমনকি অনেক বক্তার নামে পরিচিতি দিয়ে বলা হয়, উনি একজন motivational speaker, কিন্তু তুমি কি করে অপরকে motivate করবে, তুমি তো আচার্য নও বাপু, দুটো পয়সা উপার্জন করার জন্য এই কাজ করছ। ঠিক ঠিক আচার্য হলেন অবতার; ঠিক ঠিক আচার্য হলেন শাস্ত্র। ঠিক ঠিক আচার্য তাঁর সামনের মানুষটিকে দেখলেই বুঝতে পারেন, এর মনের ভিতরে এই এই চলছে। ঠাকুরের কাছে যখনই কেউ আসত, ঠাকুর তাকে একবার দেখেই বলে দিতেন লোকটি কি স্বভাবের, ভিতরে ভক্তি আছে কি নেই ইত্যাদি। ঠাকুর বলছেন, কাঁচের আলমারির ভিতরে জিনিসগুলিকে যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, ঠিক তেমনি আমি মানুষের ভিতরটা দেখতে পাই। নরেনকে দেখেই বুঝে গেছেন, এর অখণ্ডের ঘর। অন্যান্য শিষ্যদের সম্বন্ধেও বলছেন এর এই ভাব, ওর এই অংশে জন্ম। কার কোথায় আটকাচ্ছে, সেটাও বুঝতে পারতেন; তার জন্য কি করতে হবে, সেটাও তাকে বলে দিচ্ছেন। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, ঠিক ঠিক আচার্য শিষ্যের সব কিছু বুঝতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ অবতার, উপরন্তু অর্জুনকে অনেক আগে থেকেই জানেন, এতদিন তাঁকে দেখে আসছেন; তিনি বুঝেছেন অর্জুন বীরপুরুষ, কিন্তু নিজের স্বরূপকে ভুলে আছে।

এক সিংহী একদল ভেড়াকে আক্রমণ করতে গেলে তার প্রসব হয়ে যায়, সেখানেই তার মৃত্যু। ওই সিংহ শাবক পরে ভেড়ার দলে বড় হতে থাকল এবং নিজেকে ভেড়া মনে করছে, এই গল্প আমরা সবাই জানি। এই যে একটা এমন পরিস্থিতি এসে গেছে, যে পরিস্থিতির জন্য যে অর্জুন একজন সিংহ, বিষাদে ভেঙে পড়ে নিজেকে ভেড়া মনে করছে। ক্লীব মানে পৌরুষত্বহীন, এই পৌরুষের অভাবটা সরাসরি জড়িয়ে আছে মর্যাদের সাথে। যে কোন কাজ করার সময় আমাদের মর্যাদা, আত্মসম্মানের দিকটা সব সময় মনে রাখতে হয়। মাথা নত হবে শুধু আচার্যের সামনে। মনুস্মৃতিতেও সুনির্দিষ্ট ভাবে বলে দেওয়া আছে, কোথায় কোথায় মাথা নত করতে হয়।

আমাদের সমস্যা হল, আমরা একটা জায়গায় বড়, কিন্তু ওই একটা জায়গার বড়কে আধার করে আমরা পাঁচটা জায়গা থেকে সম্মান পেতে চাই। যেমন অনেকে মনে করে আমি তোমার থেকে বয়সে বড়, আমি তোমার থেকে ভাল জানি। যার ফলে দেখা যায় সে ফিজিক্স নিয়ে, রাজনীতি নিয়ে, ওষুধ নিয়ে বলতেই থাকবে, যেটার ব্যাপারে ওনার কোন জ্ঞান নেই, আর বাস্তবিক দেখা যায়। একজন শিক্ষিত হন বা অল্প শিক্ষিত হন, বয়স্ক মানুষের সাথে তর্ক করাটাও কখনই শোভনীয় না, সেইজন্য কোন কিছু আপত্তি না করে, ভদ্র ভাবে ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। এক গ্রামের এক মহিলার দাদা খুব ভাল ইংরাজী জানত, মহিলাটি সম্পূর্ণ নিরক্ষর। ভদ্রলোক মাঝে মাঝে বোনকে

উদ্দেশ্য করে একজনের কাছে ইংলিশে চিঠি লিখে পাঠাতেন। মহিলাটা লোকটিকে বলত, ‘তুমি আমাকে চিঠিটা পড়ে শোনাও ওতে কি লেখা আছে’। লোকটি বলল, ‘ঠিক আছে আমি অনুবাদ করে চিঠিটা পড়ে দিচ্ছি’। ভদ্রমহিলাটি বলল, ‘অনুবাদ করতে হবে না, তুমি এমনিই পড়ে যাও, আমি সব বুঝতে পারব’। ‘আপনি কি করে বুঝবেন’? ‘আমি তোমার থেকে বয়সে বড় কিনা, ঠিক বুঝতে পারব’। বয়স দিয়ে বিদ্যা মাপা যায় না। বয়সে আপনি বড় হতে পারেন, আপনি সম্মানের পাত্র হতে পারেন, এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু যে ব্যক্তি কোন দিন ইংলিশ পড়েনি, সে কি করে ইংরাজী বুঝবে!

যে জায়গাতে আমার শক্তি আছে, আমার ক্ষমতা আছে, ওই জায়গাটাই ঠিক ঠিক আত্মসম্মানের জায়গা। আমরা যেখানে সেখানে আত্মসম্মান পেতে চাইছি। আমরা ভগবানের ঘর থেকে কিছু সম্পদ বা কিছু গুণ নিয়ে এসেছি, এরপর ঐ গুণের খাতিরে জগৎ থেকে দাবি করতে থাকবে আমার এটা চাই, সেটা চাই। যেমন একজন রূপবতী নারী, ভগবানের ঘর থেকে রূপের ঐশ্বর্য নিয়ে এসেছে, এরপর সে চাইছে, সারা জগৎ যেন আমার পায়ে এসে পড়ে। তোমার রূপটা তো তোমার নয়, কেন তোমাকে সবাই সম্মান করতে যাবে, আর তুমি সুন্দর বলে জগৎ কেন তোমার পায়ে পড়তে যাবে! একজনের একটা ডিগ্রী আছে, সে মনে করছে সবাই আমার সামনে নত হবে। আমার হাতে তলোয়ার আছে, সবাই আমার সামনে নত হবে। কেন নত হতে যাবে? আপনি বিরাট বড় জমিদার বাড়ির ছেলে, পৈতৃক সম্পর্কের সূত্রে আপনার অগাধ সম্পত্তি; এটা তো আপনার নয়, কেন এর জন্য অহঙ্কারে ফুলছেন? যদি আপনি সত্যিকারের খেটেখুটে কোন কিছু অর্জন করে থাকেন, তখন লোকে সত্যিই আপনাকে সম্মান করবে। এটাই আমাদের জীবনের দুর্ভাগ্য।

কোনটা মর্যাদার ব্যাপার, কোথায় আত্মসম্মান জড়িয়ে আছে, এই দুটো ভাল করে বুঝতে হয়। যেটাতে আমার অস্তিত্ব, বা যেটাতে আমিত্ব বেশী প্রকাশিত, আর সেই আমিত্বের পিছনে, মর্যাদার পিছনে সঠিক কারণ থাকা চাই, এলেমেলো কারণে হওয়া না, তখন সেই মর্যাদা ও আত্মসম্মানকে কক্ষণ যেন ছোট না করা হয়। এর একটা খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, আলেকজাণ্ডার পোরাসকে হারিয়ে দিল, পোরাস কিন্তু নিজের মর্যাদাকে ছাড়ল না। আলেকজাণ্ডার যখন পোরাসকে বলছে, ‘বল তুমি আমার কাছ থেকে কি রকম ব্যবহার প্রত্যাশা করছ’। পোরাস তখন বলছে, ‘এক রাজা যেমন অন্য রাজার সাথে ব্যবহার করে’। এটাই practical vedanta।

স্বামীজী বর্ণনা করছেন, একদিন আমেরিকায় ঘোড়ার গাড়ি করে যাচ্ছেন, হঠাৎ রাস্তায় দেখছেন দুটো ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চা খুব ভাল পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়ার গাড়ির কোচম্যান গাড়ি থেকে নেমে বাচ্চা দুটোকে আদর করল। স্বামীজী পরে জিজ্ঞেস করছেন, ‘তুমি কি করে ওদের আদর করলে? ওর তো কোন বড়লোকের ছেলে বলেই মনে হল’। লোকটি বলল, ‘না, ওরা আমারই ছেলে। আমরা আগে সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলাম, অভাবে পরে আজকে আমি ঘোড়ার গাড়ির কোচম্যান হয়েছি। কিন্তু আমার বাচ্চাদের, সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরা যেভাবে মানুষ হয়, ঠিক সেই ভাবে আমি ওদের পালন করছি’। স্বামীজী বলছেন, এটাই হল practical vedanta। নিজের আত্মসম্মানকে কখন নষ্ট হতে দিতে নেই। ঠাকুর বলছেন, মানুষ কে? যার মানে আছে হুঁশ। মান মানেই dignity, dignityকে, আত্মসম্মানকে কখনই ছোট করতে নেই।

একজন মহারাজের কাছে শোনা বার্মার একটা ঘটনা এখানে আমরা উল্লেখ করতে পারি। বার্মার এখন যিনি রাষ্ট্রপ্রধান সু কি, এনার বাবা এক সময় বার্মার রাষ্ট্রপতি ছিলেন। এক মিলিটারি ক্যুতে এনার বাবাকে এবং বার্মার অনেক মন্ত্রীকে মেরে ফেলা হয়। সেই দিনই রেঙ্গুনের রামকৃষ্ণ মিশনে একটা অনুষ্ঠান চলছিল, সু কির মা সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন। ওই মহারাজ সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেখছেন, সরকারের উচ্চ পদাধিকারীর একজন কেউ এসে

রাষ্ট্রপতির স্ত্রীর কানে ফিস ফিস করে কিছু বললেন। উনি নাকি তখন শুধু বলছিলেন, Is he dead? যাকে জিজ্ঞেস করলেন, সে কি উত্তর দিল বোঝা গেল না। উনি তখন কিছু বললেন না, শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানে ছিলেন। পরে জানা গেল, মিলিটারি ক্যু হয়ে গেছে, রাষ্ট্রপতিকে মেরে দেওয়া হয়েছে। সেই সময় ওই মহিলার, সু কির মায়ের খুব নামকরা কথা। এতদিন সু কিকে তারা জেলে রাখল, এমন করে দেওয়া হল যে সে কোন দিন সেই দেশের নেতা হতে পারবে না। তাতে কিছু আসে যায় না, ক্ষমতা কিভাবে আসে আমরা কেউ কিছু বলতে পারব না। আজ সু কি বার্মার রাষ্ট্রপ্রধান। তখন মিলিটারিরা রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে সবাইকে মেরে দিয়েছিল। সেই সময় সব মহিলারা কান্নাকাটি করছেন, তখন সু কির মা বলছেন, 'তোমরা কেঁদো না, আমাদের সারা জীবন পড়ে আছে কান্নার জন্য, এখন কেঁদে আমাদের শত্রুদের আনন্দ বর্দ্ধন করো না। চুপ করে সব সহ্য করে শান্ত হয়ে ধৈর্যকে ধরে রাখো'। এই হল শক্তি, এটাই হল আত্মমর্যাদা। ক্লীব ভাব, আত্মমর্যাদার সাথে আপোষ, কখনই এই দুটোকে আশ্রয় করতে নেই।

এটাই ভগবান বলছেন, *নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে,* অর্জুন! তোমার মধ্যে এই ক্লীব ভাব শোভা দেয় না, কারণ এটা তোমার স্বভাব না। তুমি যদি কাপুরুষ হতে, তাহলেও এই জিনিস মানা যেত না, আগেকার দিনের ব্রাহ্মণরা যুদ্ধ করতে জানত না, যুদ্ধ হলে তারা পালিয়ে যেত। কিন্তু তোমার স্বভাবে এই জিনিস নেই, তুমি কাপুরুষ নও।

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং, হৃদয়ের মধ্যে দৌর্বল্যের ভাব। ফরাসি বিপ্লবের সময় নেপোলিয়ন ঈজিপ্টে পৌঁছালেন, সেখানে গিয়ে দেখছেন প্রতিপক্ষের বিরাট সৈন্যবাহিনী। সৈন্যের সংখ্যা এক আর তিন অনুপাতে। নেপোলিয়ন তখন খুব নামকরা কথা নিজের সৈন্যদের বলেছিলেন, 'চার হাজার বছরের ইতিহাস তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে'। ওখানে পিছনের দিকে পিরামিডগুলো ছিল কিনা, আর সামনে মুসলিম সেনারা সমবেত হয়ে আছে। বলছেন, 'তোমরা এমন কিছু করো না, যাতে ইতিহাস তোমার উপর হাসে'। এই এক আর তিন অনুপাত দেখে নেপোলিয়নের সৈন্যদের হৃদয়ের মধ্যে যে সাময়িক দৌর্বল্য ভাব এসেছিল, এই একটা কথাতে তারা উজ্জীবিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর নেপোলিয়নের সৈন্যরা সবাই মিলে শত্রুপক্ষের সব কটাকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দিল। এই শক্তিটাকে বার করে আনা। আমাদের সমস্ত বেদ, উপনিষদ যদি পুড়িয়ে দেওয়া হয়, এবং একটা শব্দ যদি রেখে দেওয়া হয়, *ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ,* তাহলেই আবার সব কিছু দাঁড়িয়ে যাবে।

সংস্কৃতে 'মা' মানে 'না', ক্লীব ভাব আসতে দিও না, তোমার পৌরুষ, তোমার যে শক্তি, এটাকে compromise করো না, হৃদয়ে দৌর্বল্যের ভাব আসতে দিও না। *ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ,* তোমার হৃদয়ের মধ্যে যে দৌর্ব্যলের ভাব এসে গেছে, এটাকে এবার ছেড়ে উঠে দাঁড়াও, যুদ্ধ কর।

ভগবান বলে দিলেন বলেই যে অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু বুঝে নিয়ে তেড়েফুড়ে উঠে যুদ্ধ করতে ঝাপিয়ে পড়বেন, অত সহজে তা হবে না। লীলাপ্রসঙ্গে ঠাকুর আর নরেনের কথা যেখানে আছে, সেখানে এটা খুব সুন্দর বোঝা যায়। ঠাকুর নরেনকে অনেক কিছু বলছেন। নরেনও শুনছেন, বুঝছেন, সাধনা করছেন; কিন্তু বার বার বলতে হচ্ছে। উচ্চস্তরের কথা একবার বলে দিলে হয় না। অর্জুনের মত আধার, সেও কিছু বুঝতে পারছে না, নরেনের মত সপ্তর্ষির ঋষি আর ঠাকুরের মত শিক্ষক, তাও একদিনেই নরেনের সব কিছু হয়ে যায়নি। আর আমরাও দু-তিন বছর শাস্ত্রকথা শুনেই সর্বশাস্ত্রবিদ হয়ে যাবো ভাবছি। আমরা এখানে জীবনে নামানোর কথা বলছি না, বোঝার কথা বলা হচ্ছে, সেটাও হয় না। আমরা এখন শাস্ত্রের যে আলোচনা শুনছি, শুনে মনে হচ্ছে সব স্পষ্টম্, কিন্তু আগামীদিনে শাস্ত্রের আলোচনা শুরু হওয়ার আগেই আজকের আলোচনার কথাগুলো ভুলে যাব। তবে শুনতে শুনতে একটা সময়ে গিয়ে জিনিসগুলো স্পষ্ট হতে শুরু করে, কিন্তু সেটার জন্য অনেক সময় লাগে। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কথা মানতে পারলেন না, এখনও কাঁদছেন, বলছেন –

অর্জুন উবাচ
কথং ভীষ্মমহং সাংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন।।৪।।

(অর্জুন বললেন – হে শক্রমর্দন, হে মধুসূদন, ভীষ্ম, দ্রোণ, এনারা আমাদের পূজনীয়। এনাদের সাথে বাণাদি অস্ত্র দ্বারা কি করে প্রতিযুদ্ধ করব?)

যুদ্ধক্ষেত্রে কৌরবদের পক্ষে পিতামহ ভীষ্ম আছেন, আচার্য দ্রোণ আছেন, মামা শল্য আছেন, আর কৃপাচার্য, অর্জুন যাঁর কাছে তলোয়ার চালানোর শিক্ষা পেয়েছিলেন, এই ধরণের অনেক গুরুজনরা সবাই দাঁড়িয়ে আছেন। এনারা একদিকে আমার থেকে বয়সে কত বড়, আবার অন্য দিকে কেউ পিতামহ, কেউ আচার্য, সবাই আমার পূজনীয়; *ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি*, এদের প্রতি আমি কি করে বাণ নিক্ষেপের দ্বারা প্রতিযুদ্ধ করব। যুদ্ধের তৃতীয় দিনের যুদ্ধে অর্জুন আর ভীষ্ম মুখোমুখি হলেন, অর্জুন সেখানে বাণ চালাতেই পারছেন না। এত গীতা শুনে, সব কিছু করার পরেও অর্জুনের এই অবস্থা। ভীষ্ম দুর্যোধনকে কথা দিয়েছেন, প্রত্যেক দিন আমি দশ হাজার পাণ্ডব সেনা বধ করব। সত্যিই তিনি মারতে থাকলেন। অর্জুন ভীষ্মের দিকে বাণ মারছেন ঠিকই, কিন্তু ভীষ্মের কবচ ভেদ করে শরীরে আঘাত করতে পারছে না। আসলে অর্জুনের বাণ মারার মধ্যে সেই রকম জোশ বা জোর তখন কোনটাই ছিল না। শেষে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, 'তুমি এ কি করছে, তোমার দ্বারা হবে না, আমাকেই এবার নামতে হবে', বলেই নিজে যুদ্ধে ভীষ্মকে বধ করবার জন্য নেমে পড়লেন। অর্জুনের বাণের যে শক্তি নেই তা না, কিন্তু আবার তাঁর মধ্যে ইমোশান এসে গেছে। এই ইমোশানকে আবার শ্রীকৃষ্ণকে পরিষ্কার করতে হবে। যার জন্য আচার্য খুব সুন্দর বললেন, অর্জুনকে মাধ্যম করে মানুষের ভালর জন্য ভগবান গীতার উপদেশ দিলেন।

যদি ঠাকুরকে আমরা বিশ্বাস করি, তাহলে ঠাকুরের সব কথাকেই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। আমরা সেখানে ঠাকুরের এটা মানব, ওটা মানব না, কখনই বলতে পারি না। নিজের বুদ্ধিকে লাগানো যাবে না। পরে গীতায় ভগবান বলবেন, *তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে*, তুমি তোমার বুদ্ধিকে লাগাতে পারবে না, হয় শাস্ত্রের পুরোটা মানো, তা নাহলে তুমি ছেড়ে দিয়ে চলে যাও। দক্ষিণেশ্বরে নরেনের দ্বিতীয় দিনে ঠাকুর নরেনের সামনে হাতজোড় করে বলছেন, আমি আপনাকে চিনেছি, আপনি সেই নরঋষি। মহাভারতে নরনারায়ণ ঋষির বর্ণনা আছে, এনারা দুজন সব সময় একসাথে আসেন মানব কল্যাণের জন্য। অর্জুন সেই নরঋষি, আর ভগবান হলেন নারায়ণ ঋষি। আগেকার দিনে অবতারের ধারণা ছিল না, ওনারা এটাকে ঋষি রূপে নিতেন, এটাই সেমেটিক ধর্মে প্রফেটের ধারণা রূপে এসেছে।

নরেন হলেন নরঋষি আর ঠাকুর হলেন নারায়ণ ঋষি। নরঋষিকে মাধ্যম করে নারায়ণ ঋষি যা বলার বলে দিচ্ছেন। এখানে নরেনের উত্থানের কিছু নেই, জগতের কল্যাণের জন্য একটা পাত্র দরকার, নরেন সেই পাত্র। যেমন অনেক সময় দেখা যায় অনেক উঁচু থেকে যখন কেউ লাফ মারে, তখন নীচে স্প্রিংএর মত কিছু একটা লাগিয়ে দেয়, যাতে পড়লে ওই স্প্রিং এর উপরে পড়তে পারে, যাতে হাত পা ভেঙে কোন অঘটন না ঘটে। সবাই ঝাঁপ দিতে পারবে না। আমাদের ব্রেণের ফিউজ উড়ে যাবে। ঠাকুর যেমনি হৃদয়রামকে একটা দিব্য কিছু দিলেন, হৃদয়রামের ফিউজ উড়ে গেল। অর্জুন হলেন নরঋষি, নরেনও হলেন এই যুগের সেই নরঋষি। যার জন্য গীতা আজও চলছে, স্বামীজীর কথা আজও চলছে। যেমন step down transformer থাকে, ওখানে এসে কারেন্টটা নামে, তারপর ওর ভোল্টেজ কমিয়ে domestic কাজে লাগান হয়। সাধারণ লোকের কাছে গীতার কথা, স্বামীজীর কথা গেলে ফিউজ উড়ে যাবে। গীতা আমি রোজ আবৃত্তি করে যেতে পারি, সারা

জীবন আবৃত্তি করে যেতে পারি, কিছু হবে না। এর জন্য প্রস্তুতি লাগে। শয়ে শয়ে মানুষকে ভগবান দিয়ে থাকলে কিছুই হত না। মানুষের দিক থেকে যদি দেখা হয়, অর্জুনও এটা নিতে পারছেন না। না নিতে পারারই কথা, সবে যুদ্ধের চতুর্থ দিন। সেইজন্য অর্জুন বলছেন, *কথং ভীষ্মমহং সাংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন*, কি করে আমি আমার গুরুজনদের প্রতি বাণ মারব! উচ্চ চিন্তন একবার করলে হয় না, বারবার, অনেকবার, অনেক দিন ধরে করতে হয়।

অর্জুন আরও বলছেন, *ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন*, যাঁদের চরণযুগলের পূজা সারা জীবন করে এসেছি, শৈশবে ধুলাবালি মেখে যে পিতামহের বুকে দাপাদাপি করতাম, তাঁর বক্ষে আমি বাণ চালাব কি করে। শেষ যুদ্ধে যখন শিখণ্ডিকে সামনে রেখে অর্জুন ভীষ্মকে বাণ মারছিলেন, ওই দৃশ্যের বর্ণনা পড়লে আমাদেরও গায়ে কাঁটা দেয়, আমাদেরও চোখে জল চলে আসে। এই ভীষ্ম সারাটা জীবন নানা ভাবে পাণ্ডবদের রক্ষা করে এসেছেন, কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞা করে রেখেছেন, হস্তিনাপুরের রাজ্যকে তিনি রক্ষা করবেন, তা সে যে রাজাই হোক, তিনি রক্ষা করবেন। সেই ভীষ্মকে অর্জুন একের পর এক বাণ মেরে যাচ্ছেন। একদিকে যেমন এটা একটা depressed words, অন্য দিকে আবার logically correct। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে গীতা মহাভারতের অংশ, আর মহাভারত হল ধর্মশাস্ত্র। ধর্মশাস্ত্র দুই প্রকার হয়, এক প্রকার হল, সত্যকে সত্য রূপে বলে ছেড়ে দেওয়া। যেমন, উপনিষদ বা বাইবেল। কিন্তু সেটা দিয়ে জীবন চলে না। জীবন চালাবার জন্য সত্যের যে অনেকগুলি আবরণ, সেটাকে নিয়ে আসতে হয়। চব্বিশ ক্যারেটের সোনা দিয়ে গহনা হয় না, গহনা বানানোর জন্য সোনাতে খাদ মেশাতে হয়। আমাদের ঠিক ঠিক ধর্মশাস্ত্র হল মহাভারত আর রামায়ণ, যেখানে এটাও ঠিক ওটাও ঠিক।

কোনটা করা যাবে, কোনটা করা যাবে না, কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল, বাচ্চা বয়স থেকে আমরা সবাই মোটামুটি জানি। সত্যি কথা বলতে হয়, চুরি করতে নেই, এগুলো আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। তাহলে এত শাস্ত্র কেন? কারণ জীবন শুধু সত্য আর মিথ্যার লড়াইকে নিয়ে চলে না। আমরা মনে করি জীবন হল ধর্ম আর অধর্মের লড়াই, কখনই তা নয়। জীবনের লড়াই সব সময় ধর্ম আর ধর্মকে নিয়েই হয়ে থাকে, সেখানে এটাও ঠিক, ওটাও ঠিক।

শ্রীরামচন্দ্রকে কৌশল্যা বলছেন, 'আমি তোমার মা, আমি তোমাকে বলছি, তুমি জঙ্গলে যাবে না'। কিন্তু দশরথের আদেশ, রামকে জঙ্গলে যেতে হবে। শ্রীরামচন্দ্র এখন কোনটা করবেন? কৌশল্যা বলছেন, মায়ের স্থান সবার উপর। শ্রীরামচন্দ্র তখন বলছেন, রাম দুই রকম কথা বলে না। আগে বাবাকে কথা দেওয়া হয়ে গেছে, জঙ্গলেই সে যাবে। বালিবধের ক্ষেত্রেও একই জিনিস, ধর্মের সাথে ধর্মের সংঘাত। একদিকে লুকিয়ে কাউকে বধ করতে নেই। অন্য দিকে বালি রামের সাথে যুদ্ধই করবে না, কেন যুদ্ধ করবে সে! রামের সাথে তো আমার কোন শত্রুতা নেই। অন্য দিকে বন্ধু সুগ্রীবকে কথা দেওয়া হয়ে গেছে, আমি বালিকে বধ করে দেব। শ্রীরামচন্দ্র এখন কোনটা করবেন? রাজা হয়ে তিনি কথা দিয়েছেন, তিনি প্রজা ও রাজ্যের ভাল করবেন। অন্য দিকে তিনি সীতার সমস্ত ভার গ্রহণ করেছে। কাকে রাখবেন আর কাকে ফেলবেন? হয় তাঁকে রাজ্য ছাড়তে হবে, নয়তো সীতাকে ছাড়তে হবে। এই হল ধর্ম ও ধর্মের সংঘাত। আমাদের জীবন এভাবেই চলে।

জীবন কখন ধর্ম ও অধর্মের লড়াইয়ে চলে না। ধর্ম ও অধর্মে পরিষ্কার বোঝা যায়, এ চুরি করেছে, একে দণ্ড দিয়ে দাও; এ মিথ্যা কথা বলেছে, একে শাস্তি দিয়ে দাও। কিন্তু জীবনে এমন এমন কঠিন পরিস্থিতি আমাদের জীবনে এসে উপস্থিত হয় তখন কোনটা করা উচিৎ, আর কোনটা করা উচিৎ নয়, এটাকে ঠিক করতে গিয়ে আমাদের হিমশিম খেয়ে যেতে হয়। আমি জানি ঘুষ দেওয়া অপরাধ, আমি ঘুষ দিতে চাই না। কিন্তু আমার বাবা-মা আমার অত্যন্ত প্রিয়জন। তাঁদের কারুর চিকিৎসার প্রয়োজন, কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি করানো যাচ্ছে না, একটা মোটা টাকা ঘুষ দিলে

কাজ হয়ে যাবে। আমি তখন কি করব? আমি কি ঘুষ দেব না? বিনা চিকিৎসায় আমার চোখের সামনে বাবা কিংবা মাকে মরে যেতে দেব? এভাবে আমরা কাউকেই মরে যেতে দিতে পারি না, একটা জায়গায় গিয়ে আমাদের আপোষ করে নিতে হয়। আসলে ধর্ম আর ধর্মের লড়াই এভাবেই চলে। আমরা তখন বিভিন্ন রকমের যুক্তিতর্ক দিয়ে জিনিসটাকে বোঝাতে চাই। যাই হোক, গুরু স্থানীয়কে হত্যা না করার অনেক যুক্তি অর্জুন এখ তুলে আনছেন –

গুরুনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে
হত্বার্থকামাংস্তু গুরুনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্।।৫।।

(মহানুভব গুরুজনদের বধ না করে ইহজগতে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করলেও আমার কল্যাণ হবে। কিন্তু এনাদের বধ করলে ইহলোকেই শোণিতসিক্ত-ধনসম্পদ ও কাম্যবস্তুরূপ ভোগ্য বিষয় সমূহ ভোগ করতে হবে।)

অর্জুন বলছেন, মহাপ্রভাব পিতামহ ভীষ্ম, আমার আচার্য দ্রোণ, এনাদের মত গুরুদের বধ করে রাজ্যসুখ ভোগ করার চাইতে ভিক্ষান্ন ভোজন করে জীবনধারণ করা অনেক শ্রেয়স্কর। কেননা গুরুজনদের বধ করলে এনাদের রক্তে মাটি সিক্ত হয়ে যাবে, রুধিরলিপ্ত মাটি ভোগ করা যায় না।

কিন্তু তুমি বারো বছর ধরে জঙ্গলে রোজ কি প্ল্যান করছিলে? কিসের জন্য তুমি স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রের কাছ থেকে সব দিব্যাস্ত্রগুলি নিয়ে এলে? শিবের তপস্যা করে পাশুপত অস্ত্র কিসের জন্য নিয়ে এলে? অজ্ঞাতবাসে তোমার সবাই মিলে গোপনে গোপনে যে প্রস্তুতি নিলে, এত প্ল্যান, নিজেদের মধ্যে এত গভীর আলোচনা, এত দিব্যাস্ত্র সংগ্রহ তুমি কিসের জন্য করেছিলে? এখন শেষ মুহুর্তে এসে তোমার মনে পড়ল এনারা আমার গুরুজন? বনবাসের সময় যুধিষ্ঠির ভীমকে বলছেন, 'তুমি বুঝছ না, যুদ্ধ করা যাবে না, কারণ পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ যুদ্ধে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বাধ্য, তুমি ভেবে দেখ, কি করে আমরা এনাদের সাথে যুদ্ধ করে পেরে উঠব'! দু দিক থেকেই বলা যেতে পারে, ক্ষমতার দিকে থেকেও, ভালবাসার দিক থেকেও। তা সত্ত্বেও পাণ্ডবরা এত দিন ধরে সব রকম প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন। জীবনে ঠিক এটাই হয়, আমরা অনেক সময় অনেক কিছু প্রস্তুতি নিয়ে থাকি, কিন্তু আসল সময়ে আমাদের স্নায়ু এমন দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে যায় যে, অবসন্ন হয়ে আমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে পড়ি।

এতক্ষণ অর্জুন অবসাদের দরুণ নিজের কথাগুলোই শুধু বলে যাচ্ছিলেন। এবার কিন্তু অর্জুন ধীরে ধীরে শরণাপন্ন হওয়ার দিকে এগোচ্ছেন। প্রথম অধ্যায় হল অর্জুনবিষাদযোগ, বিষাদে কিন্তু কখন আমাদের ঈশ্বর প্রাপ্তি হবে না। সংসার থেকে অবসাদগ্রস্ত হয়ে বিষন্ন হয়ে পড়লেই যে ঈশ্বর লাভ বা ধর্ম লাভ হবে, তা কিন্তু হয় না। 'চলবে না', 'চলবে না' করে যারা সব কিছুর বিরুদ্ধে গলা ফাটিয়ে যাচ্ছে, যারা দিনরাত সমাজ ও সমাজের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গলাবাজি করে যাচ্ছে, আর যারা ভিখারী, তারা কি সবাই আধ্যাত্মিক? একেবারেই না। কিন্তু বলা হয়, ওই অবস্থায় যখন তুমি সব কিছু থেকে সম্পূর্ণ ভাবে অসন্তুষ্ট হয়ে গেছ, নিজেকে যখন একেবারে অসহায় মনে করছ, তখন তুমি যদি কোন গুরুর কাছে গিয়ে পড়ে এবং গুরু যদি কৃপা করে তোমাকে আপন করে শিক্ষা দেন, তবেই ধর্ম লাভ বা ঈশ্বর লাভ হয়। কেবল অবসাদ, অসন্তুষ্টির ভাব এলেই হবে না। আমি অসহায়, আমার আর কোন উপায় নেই, আমি শেষ; প্রভু তুমি আমাকে রক্ষা কর, তাতেও হবে না, তখন প্রভু যদি দয়া করে কৃপা করেন, তবেই কিছু হবে।

একজন বড় সাধুর মুখে আমরা একটা গল্প শুনেছিলাম, কুকুরের কোন ঘা হলে ওরা চেটে চেটেই সারিয়ে নেয়। কিন্তু কখন সখন কুকুরের মাথায় ঘা হয়ে যায়। মাথার ঘা চেটে সারানো যাবে

না। মাথায় ঘা হলে সমস্যা হল, ঘায়ে পোকা হয়ে যায়। অন্ধকারে থাকলে ঘায়ের পোকাগুলো কুটকুট করে কামড়ায়। তখন কুকুরটা দৌড়ে বাইরে রোদে চলে আসে। রোদে পোকাগুলো আর কামড়ায় না, তখন মাছিগুলো ঘায়ের উপর বসে কামড়ায়। কুকুরটাও কিছুক্ষণ ঘাড় নাড়িয়ে মাছি তাড়াতে থাকে, কিন্তু পরে বিরক্ত হয়ে আবার ছায়ায় চলে যায়। একবার ছায়ায়, একবার রোদে। ছায়ায় গেলে ভিতরের পোকাগুলো কুট কুট করে কামড়ায়; রোদে এলে বাইরের মাছিগুলো জ্বালাতন করতে থাকে। এই করে করে কুকুরটা আস্তে আস্তে পাগল হয়ে মারা যায়।

সাধারণ মানুষদের এই দুরবস্থা। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা বিহীন জীবন মানেই মাথায় ঘা। মাছি সব সময় ভন্ ভন্ করে যাচ্ছে। তখন বলে, আর পারছি না, সব ছেড়ে আমাকে কোথাও গিয়ে একা একা থাকতে হবে। সব কিছু ছেড়ে আমি হিমালয় চললাম। ওখানে যাওয়ার পর এবার ভিতরের পোকাগুলো কুট কুট করতে শুরু করে দেবে। তখন বলবে, ওরে বাবা, ওখানেই ভাল ছিলাম। দৌড়ে আবার নিজের স্বস্থানে চলে এলো। এখানে আসার পর বাইরের মাছিগুলো আবার ভন্ ভন্ করতে শুরু করে দেয়। সন্ন্যাসীদের নিয়ে এই কাহিনী বলা হয়। কাজকর্মে কর্তৃপক্ষের সাথে মনোমালিন্য হল, বলল, আমি হিমালয় চললাম। কর্তারাও ছেড়ে দেন, যাও বাপু, কিছু দিন বাইরে ঘুরে এসো। ওখানে গিয়ে মাথার পোকাগুলো জেগে ওঠে, তখন বলে আশ্রমে কাজকর্মে ভালই ছিলাম। ফিরে এসে আবার কাজে নামল, আবার খটাখটি লাগল, আবার চলল হিমালয়। এই করে করে শেষে পাগল হয়ে মারা যায়। কখন কোন মহাপুরুষের নজরে যদি পড়ে যায়, তিনি দেখেই বুঝতে পারেন, আরে এর তো মাথায় ঘা হয়েছে। তখন তিনি কুকুরটাকে কায়দা করে ধরে মাথায় ফিনাইল দিয়ে পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে দিতে থাকেন, ধীরে ধীরে একদিন সেরে ওঠে। তার মানে, মাথায় ঘা হলে, কোন মহাপুরুষ যদি কৃপা করে তাকে ধরে বেঁধে চিকিৎসা করেন, তবেই ঘা সারবে।

অর্জুনের মাথায় ঘা হয়েছে। মাথায় ঘা আমার আপনার সবারই আছে। প্রথম কথা হল, আমরা এখনও শেষ পর্যায়ে যাইনি। তবে চিন্তা নেই, যাবো, সবাই আমরা ঐ পাগলামির দিকেই এগোচ্ছি, যদি না গুরুর শরণাপন্ন হই। এই আলোচনার বিষয় এটাই, যখন মন অবসাদে একেবারে ভেঙে পড়ে, বর্তমান অবস্থার উপর সম্পূর্ণ অসন্তুষ্টি এসে গেছে, তখন আমাদের শরণাগত হতে হয়। ওই শরণাগতি নেওয়ার পর গুরু যদি কৃপা করেন, তিনি যদি চিকিৎসা করেন, তবেই বাঁচার উপায়, এ-ছাড়া কোন উপায় নেই।

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ।।৬।।

(আমরা জয়ী হই অথবা এঁরা আমাদের জয় করে, এ-দুটির মধ্যে কোনটি আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর, তা বুঝতে পারছি না। যাঁদের বধ করে আমরা বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণই আমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছেন।)

এতক্ষণ অর্জুন নিজের কথা বলে যাচ্ছিলেন, এটা ঠিক নয়, ওটা ঠিক না, ইত্যাদি, এবার গলার স্বরটা একটু নরম হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি না, এটা ঠিক, না ওটা ঠিক। একদিকে ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানরা আর তার সাথে তাদের সৈন্যবাহিনী, এরা যদি জয়ী হয় সেটা ভাল, না আমরা জয়ী হলে সেটা ভাল। কারণ ওরা জয়ী হতে গেলে ওদের আমাদেরকে মারতে হবে, আমরা যদি জয়ী হই তাহলেও তো এদেরকে মেরেই আমাদের জয়ী হতে হবে। তাহলে এই রক্তাক্ত ভূমি, রক্তমাখা রাজ্য, ধন, সম্পদ, এগুলো কি আমরা ভোগ করতে পারব? চিন্তা করুন, আপনার মা আইসিসিইউতে ভেন্টিলেশানে পড়ে আছেন। মেশিনের সাহায্যে তাঁর হার্টের স্পন্দন চলছে। যদি

আপনি সুইচ অফ্ করতে বলেন, এই মুহূর্তে আপনার এক লাখ টাকা বেঁচে যাবে, কিন্তু মায়ের জীবনের স্পন্দন থেমে যাবে। কেউ এটা করতে পারবে? আরও হিংসাত্মক, যদি বলা হয় আপনার মাকে গলা টিপে মেরে ফেলুন, আপনাকে এক কোটি টাকা দেওয়া হবে? পারবেন আপনি করতে? কখনই পারবেন না। অর্জুনের ঠিক এই অবস্থা, আপনজনকে গলা টিপে মেরে রাজ্য আদায় করতে হবে। আমরা পারব না ঠিকই, কিন্তু অর্জুন ক্ষত্রিয়, তাঁর এটাই করার কথা, কারণ এটা ধর্মযুদ্ধ।

যত যাই হোক, দুর্যোধনরা আমার ভাই, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, শল্য এনারা আমার গুরুজন। যাঁদের জন্য মানুষ জীবনধারণ করে, যাদের জন্য মানুষ সব কিছু অর্জন করে, তাঁরাই আজকে যুদ্ধভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে, যাঁদেরকে আমায় বধ করতে হবে। ইদানিং কালে মানুষ অর্থোপার্জনের জন্য দৌড়ে যাচ্ছে, বাবা সকালে উঠে একদিকে দৌড়াচ্ছে, মা আরেকদিকে দৌড়াচ্ছে, বাড়িতে তাদের ছেলেটা কেমন একা একা পড়ে থাকে। কিছু হলেই তারা সন্তানকে বোঝাতে যাবে, 'বাবা, তোমার জন্যই তো আমরা এগুলো করছি'। আমেরিকাতে একবার একটা বাচ্চা তার বাবা-মার সাথে ট্রেনে করে একটা পিকনিকে যাচ্ছে। সবারই খুব আনন্দ, বাবাও হাসছে, ছেলেও হাসছে। তখন ছেলেটির বাবা, যে কিনা অর্থোপার্জনের জন্য কাজেকর্মে সারাদিন ব্যস্ত থাকে, তার হঠাৎ মনে হল, আমি যে এত দৌড়াদৌড়ি করছি, আমার স্ত্রীও যে এত দৌড়ঝাপ করছে, আমরা ভাবছি, আমাদের ছেলের জীবন যাতে ভাল হয়। কিন্তু ছেলের যে আসল জীবন তৈরী হবে সেটা তো হবে তাকে আমাদের সঙ্গ দিয়ে। সেটাই এখন হারিয়ে যাচ্ছে। আজকে যে আমেরিকার দুরবস্থা, অল্প বয়সে হাতে বন্দুক তুলে নিয়েছে, কেন? কারণ যেটা আসল দরকার, সেটাই নেই। বাবা বলছে, আমি যা কিছু করছি সব তোমার জন্যই তো করছি বাবা। কিন্তু যেটা আসল প্রয়োজন, তোমাকে ছেলের সঙ্গ দেওয়া, সেটারই চূড়ান্ত অভাব।

অর্জুন এটাই বলতে চাইছেন, যাদের জন্য সব কিছু অর্জন করা হয়, তাদের মেরে আমার লাভটা কি? ছেলের যেটাতে মঙ্গল, যেটা তাকে খুশীতে রাখবে, সেটাকে বলি দিয়ে বলছে, আমি তো বাবা তোমার জন্যই এত কিছু করলাম, এটা কি ধরণের লজিক? যদি বলত, আমি আমার ক্যারিয়ারের জন্য এসব করছি, আমার ক্যারিয়ারের জন্য তোমাকে sacrifice করলাম, এখানে তাও আপনি একটা অন্তত সত্য কথা বলছেন। কিন্তু যদি বলেন, আসলে কি জানো, আমি তোমার জন্যই সব করছি, এটা কোন যুক্তি তো নয়ই, উপরন্তু আপনি নিজের সন্তানের সামনে একটা মুখোশ ধারণ করে আছেন। অর্জুন এখানে এটাই বলতে চাইছেন। যাদের জন্য রাজ্য পাওয়া, যাদেরকে নিয়ে ভোগ করা, তাদের সবাইকে মেরে দিয়ে কি করে সুখ ভোগ করব? এতক্ষণ অর্জুন সরাসরি সব কথা বলছিলেন, এবার তাঁর মনে কোথাও একটা দোনমোনা ভাব এসেছে। এখান থেকেই অর্জুনের মধ্যে একটা পূর্ণ শরণাগতির ভাব আসছে, যেটা পরের শ্লোকে তাঁকে পরিষ্কার করে বলতে দেখা যাচ্ছে –

কার্পণ্য দোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।।৭।।

(এঁদের বধ করে কিভাবে বেঁচে থাকব এরূপ দুশ্চিন্তাপ্রসূত চিত্তের দীনতায় আমি অভিভূত হয়েছি; এবং আমার প্রকৃত ধর্ম কি, সে সম্বন্ধেও আমার চিত্ত বিমূঢ় হয়ে গেছে। আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আমার পক্ষে যা মঙ্গলকর, তা নিশ্চয়পূর্বক বলুন। আমি আপনার শিষ্য, আমি আপনার শরণাগত, আমাকে উপদেশ দিন।)

এই শ্লোকের শেষ লাইনটা আমাদের প্রত্যেককে মুখস্ত করে একেবারে মনের মধ্যে গেঁথে রাখতে হবে, দরকার হলে লিখে রাখতে হবে, ***শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্***। প্রত্যেক

মানুষের জীবনে এমন একজন কি দুজন ব্যক্তি অবশ্যই থাকা দরকার, যাঁর কাছে গিয়ে সে মাথা নত করতে পারে। তিনি যদি মাথায় পদাঘাত করেন, পিঠে যদি লাঠি মারেন, তাও তাঁকে বলতে হবে আমি আপনার দাস। তিন নম্বর শ্লোকের ক্লীব ভাবটাই এখন অন্য রূপে এসেছে, এখানে শব্দটা বলছেন *কার্পণ্য*। *কার্পণ্য* মানে কৃপণ, কৃপণের অর্থ সঙ্কীর্ণ, ছোট। ঠাকুর বলছেন, এমন কৃপণ যে, দু পয়সার সন্দেশ আনতে বললে চুষতে চুষতে নিয়ে আসবে। আসলে দুষ্ট স্বভাব, বদমাইশ। আমরা স্বভাবে অনন্ত, সেই অনন্ত এখানে সীমিত হয়ে গেছে। সীমিত হতে হতে একেবারে ছোট হয়ে যায়। আমরা বলি অমুক খুব কিপ্টে, কিপ্টে মানেই কৃপণ, হৃদয়টা তার সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে, ইংলিশে বলে mean-minded, নীচমনা। অর্জুন এতক্ষণ ভগবানের সাথে আছেন, আস্তে আস্তে মনটা তাঁর শান্ত হচ্ছে। বুঝতে পারছেন তাঁর মনের মধ্যে যে ভাব এসেছে, এই ভাব একেবারেই ভাল না। সেইজন্য বলছেন, *কার্পণ্য দোষোপহতস্বভাবঃ,* আমার মনের মধ্যে কেমন একটা কৃপণ ভাব উদয় হয়েছে, মনটা ছোট হয়ে গেছে, যার জন্য আমি নিজেকে বিচার করতে পারছি না।

বেশীর ভাগ লোকেরাই, যারা এসে বলে, বলুন তো আমি কি করব, এদের আগে থেকেই ঠিক করা আছে কি করবে। আপনার কাছে আসছে, যাতে আপনি ওর reasonকে yes করে দেন, আর পরে গোলমাল হলে আপনার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বলতে পারে, আপনিই তো বলেছিলেন করতে। এখানে অর্জুনের ক্ষেত্রে এসব কিছু নেই, পরিষ্কার বলছেন, আমার মনের এখন যা অবস্থা, আমি পুরোপুরি সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে গেছি। আমার প্রকৃত স্বভাবটা সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে।

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ, ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ, প্রকৃত ধর্মের ব্যাপারে আমার যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিটা বিমূঢ় হয়ে গেছে। এখানে ধর্ম মানে, way of life, কোনটা ঠিক কোনটা ভুল এই ব্যাপারে আমি পুরোপুরি বিমূঢ় হয়ে গেছি। অর্জুনের কাছে প্রশ্ন হল, যুদ্ধ করাটি আমার পক্ষে ঠিক, নাকি যুদ্ধ থেকে সরে আসাটা ঠিক। ভগবান আগে একবার বলেছিলেন, তুমি যুদ্ধ কর, কিন্তু এরপর আর অর্জুনকে বলবেন না যে, তুমি যুদ্ধ কর। যেটা আগে আমরা বলেছি, তিনি অর্জুনের সামনে জীবনদর্শনটা বলতে থাকবেন।

যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে, হে কৃষ্ণ, আমার জন্য যেটা মঙ্গল আপনি বলে দিন। *শিষ্যেস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্,* আমি আপনার শিষ্য, আপনার চরণে এই আমার মস্তক রাখলাম, আপনার শরণাগত হলাম, আমাকে উপদেশ দিন। *শিষ্যেস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্,* এটা পুরো একটা সাধনা। আগে ভেবে দেখ, তোমার জীবনে এমন কেউ কি আছেন, যার পায়ে তুমি পুরোপুরি মাথা নত করে আছ। বেশীর ভাগ লোক বলবে, কেন আমার বাবা-মা, এনাদের পায়ে আমি মাথা নত করে রেখেছি। বাবা-মার কথা যদি শুনতে আজ তাহলে তোমার এই দুরবস্থা হত না। সাধারণ ভাবে এটাই তো দেখা যায়। এই কথা সবার জন্য বলা হচ্ছে না। বাবা-মার বাইরে কে আছেন বলো? আসলে কেউই নেই, এরা সবই হল selective Guru, গুরু করে নেয়, তারপর গুরু যে কথাগুলো মন মত হবে সেগুলো নেবে, যেগুলো মন মত নয় সেগুলোকে ছেড়ে দেবে। Philosophy of convenience যেমন হয়, যেটা আমার সুবিধা সেটাকে নিলাম, যেটা সুবিধার নয় সেটাকে বাদ দিয়ে দিলাম। গুরুজনদের কথাতেও আমরা এইভাবে selective, কিছু নিলাম, কিছু নিলাম না। আধ্যাত্মিক জগৎ এভাবে চলে না। আসলে স্থূল জগৎও চলে না। ঠাকুর বলছেন, ভাল লোককে অছি করলে সে কখন কোন মন্দ হতে দেবে না। অছি করা মানেই, আমি আপনার উপর সমস্ত ভার অর্পণ করলাম। অর্জুন এখানে নিজেকে একজনের কাছে পুরোপুরি ছেড়ে দিচ্ছেন, আমি আপনার দাস, আমাকে উপদেশ দিন, বলুন, আমার জন্য কোনটা মঙ্গল। এই অবস্থায় বলা হয়, যিনি বলছেন, এবার তাঁর দায়ীত্ব হয়ে যায়।

আমরা যে শরণাগতির কথা শুনে থাকি, দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাত নম্বর শ্লোক হল শরণাগতির শর্ত। প্রথম শর্ত জীবনে তার একটা বিষম পরিস্থিতি হতে হবে, দ্বিতীয় সেখানে তার চিত্ত সম্পূর্ণ বিমূঢ় হয়ে যেতে হবে, তৃতীয় ও শেষ শর্ত যাঁকে আচার্য মনে করছে, যাঁকে ইষ্ট মনে করছে, তাঁর চরণে গিয়ে পূর্ণ সমর্পণ। আমি তোমার মুরগি, তুমি আমাকে সামনে দিয়ে কাটো, পিছন দিয়ে কাটো, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। ঠাকুর এই কথা সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্যে বলছেন, সন্ন্যাসী সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে থাকবে, তালগাছ থেকে পড়লে হাত-পা পর্যন্ত নাড়বে না। শরণাগতি কি এত সহজ! তবে শরণাগতির এটা শেষ অবস্থা, যেখানে তালগাছ থেকে পড়লে হাত-পা পর্যন্ত নাড়বে না। ওই অবস্থায় হয়ত আমরা কখনই পৌঁছাতে পারব না, তবে আদর্শটাকে মাথায় রাখতে হয়। প্রথম অবস্থায় মাথা নত করা, আপনি যা করতে বলবেন আমি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। এই কথা বলার পর অর্জুন তাঁর বক্তব্যের ইতি টানছেন। আদালতে সওয়াল চলার পর একটা যেমন concluding argument থাকে, এখানেও অর্জুন তাঁর শেষ বক্তব্য পেশ করছেন।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্।।৮।।

(পৃথিবীতে নিষ্কন্টক সমৃদ্ধ রাজ্য এবং সুরলোকের আধিপত্য পেলেও আমার ইন্দ্রিয়গণের সন্তাপক শোক নির্বাপিত হতে পারে, এমন কোন উপায় তো দেখছি না।)

অর্জুন বলছেন, এনাদের বধ করতে হবে ভেবে আমার ইন্দ্রিয়ের যে শোক উৎপন্ন হয়েছে, আমার তো মনে হয় না, পৃথিবীতে নিষ্কন্টক রাজ্য পেয়ে এবং সুরলোকের আধিপত্য পেলেও আমার যে এই শোকাগ্নি নির্বাপিত হবে এবং আমি সুখী হব। আমরা আগে যেটা বর্ণনা করলাম, আমার কোন প্রিয়জন যদি বলে ওকে তুমি মারো, তাহলে তুমি এত টাকা পাবে। এ-রকম লোক যে হয় না, তা না, এই রকম লোকও হয়। একজন মহারাজ বলতেন, 'নরাধম কারা হয় জানো'? এই বলে তিনি একটা কাহিনী বললেন, একজনের লম্বা দাড়িতে আগুন লেগে গেছে, লোকটা চিৎকার করে বলছে, আমার আগুনটা কেউ নিভিয়ে দাও। একজন লোক এসে বলছে, আমি নিভিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে আমার বিড়িটা একটু ধরিয়ে নিই। এই ধরণের লোক তো যে কোন সময় যে কাউকে মাটিতে ফেলে ফায়দা তুলে নেবে। কিন্তু সে যদি সত্যিকারের মানুষ হয়, কখনই সে এই ধরণের কোন কর্ম করতে পারবে না।

কয়েক বছর আগে বাংলাদেশে একটা মুসলিম ছেলের বাড়িত আমেরিকা থেকে তার কয়েকজন অমুসলিম বন্ধু এসেছিল। ঠিক ওখানেই ইসলামের সন্ত্রাসবাদীরা আক্রমণ করেছে। সেই ছেলেটি সন্ত্রাসবাদীদের বলে দিল, তোমাদের কাউকে আমার বন্ধুদের মারতে দেব না। ছেলেটি ওদের সামনে দাঁড়িয়ে গেল, গুলিতে ওই ছেলেটিই প্রথমে মারা গেল। ছেলেটি সহজেই নিজেকে বাঁচিয়ে নিতে পারত, ওরা এসেছিল বিদেশীদের মারতে। কিন্তু সে রুখে দাঁড়িয়ে গেল, এরা আমার বন্ধু, এদেরকে আমি মারতে দিতে পারি না। অনেক সময় আমরা বলি, এই অপরাধ নিয়ে বেঁচে থাকতে পারব না, তার থেকে বরং তুমি আমাকে মেরে দাও।

জার্মানীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার একটা ঘটনা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধটা খুব এলেমেলো ব্যাপার ছিল, পুরো ইতিহাসটা ঠিক ঠিক আমাদের জানা নেই। যাই হোক আমেরিকা যখন জার্মানের অনেক কিছু দখল করে নিয়েছিল, সেই সময় আমেরিকা অনেক রকম উল্টোপাল্টা গোলমেলে কাজ করেছিল। অনেক ধরণের ট্রায়াল, যেগুলোকে বলা হচ্ছিল এগুলো সব ফেক ট্রায়াল। তার মধ্যে একজন বড় যে কমাণ্ডার ছিলেন, ওরা তঁকে বলল তোমার ফাঁসি হবে। আসলে তিনি কিন্তু দোষী

ছিলেন না। সেই ভদ্রলোক ওদের হাতে পায়ে ধরে বলছেন, 'আপনারা এটা আমার সঙ্গে করবেন না। আমি একজন সোলজার, বংশপরম্পরায় আমরা সোলজার, আমাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে মারুন, সিভিলিয়ানদের মত আমাকে ফাঁসি দেবেন না'। কিন্তু আমেরিকার সরকার তাঁর কথা শুনল না, ফাঁসিতেই তাঁকে ঝুলিয়ে দিল। তিনি বলে যাচ্ছিলেন, এটা আমার জন্য অত্যন্ত অসম্মানজনক মৃত্যু। কিন্তু আমেরিকা চাইছিল, এদের শিক্ষা দিতে, যত ভাবে এদের অপমান করা যায় করতে হবে।

অর্জুন বলছেন, এই পরিস্থিতিতে নিষ্কন্টক রাজ্য তো কিছুই না, পুরো স্বর্গরাজ্যের অধিকার পেলেও এই পরিস্থিতিতে আমার ইন্দ্রিয়ের শোক নিবারিত হবে না। এখানেই অর্জুনের বিলাপ শেষ। এরপর দুটি শ্লোকে সঞ্জয় বলছেন।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তুষ্ণীং বভূব হ।।৯।।
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ।।১০।।

(সঞ্জয় বললেন – শক্রতাপন অর্জুন হৃষীকেশ গোবিন্দকে এরূপ বলার পর 'আমি যুদ্ধ করব না' – একথা বলে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করলেন। হে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে মৃদু হেসে যেন উপহাসের ছলে একথা বললেন।)

এইসব বলে অর্জুন বলছেন, আপনি যাই বলুন, যুদ্ধ আমি করতে পারব না। এই কথা বলে অর্জুন রথের উপর চুপ মেরে বসে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের চোখেমুখে সেই জগদ্বিখ্যাত হাসি ফুটে উঠল। এই হাসিটা কি রকম যদি বলতে হয়, তাহলে এর ভাল দৃষ্টান্ত হবে, একটা ছ-সাত বছরের বাচ্চা সে যদি মাকে বলে, 'মা, আমি ঠিক করে নিয়েছি, আমি আর কোন দিন স্কুল যাব না'। মা কি করবে? ছেলেকে একটি চড় মারবে। আর দাদুকে যদি বলে? দাদু একটু মিষ্টি হাসি দিয়ে বলবে, 'হ্যাঁ বাবা, যেও না'। যেটাই বলবেন, হেসে বলবেন। কারণ তিনি জগতকে দেখে নিয়েছেন।

আমরা এর আগে আলোচনা করেছিলাম, একটা জিনিসকে যদি ঠিক ঠিক বুঝতে হয়, তাহলে দেশ ও কাল থেকে সরে আসতে হয়। আচার্য বা অবতার পুরুষরা চিরকালের জন্য দেশ ও কালের বাইরে চলে গেছেন। যেমন, ঠাকুর, তিনি দেশ ও কালের এমন উপরে চলে গেছেন বলে তিনি সবাইকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। ফলে হর্ষ ও শোক কোনটাই তাঁর হয় না। ওনার খুশীও হয় না, দুঃখ বা শোকও হয় না। কারণ, তিনি জিনিসটা যেমন, ঠিক তেমনটা দেখতে পান। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দেখছেন, অর্জুনের ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ তিনটেই পরিষ্কার ভাবে জানেন। তিনি জানেন অর্জুন একজন বড় যোদ্ধা, তিনি দেখছেন অর্জুন এখন শোকাতুর, তিনি এটাও জানেন যে, ভবিষ্যতে সে যুদ্ধই করবে। শ্রীকৃষ্ণ শেষের দিকে অর্জুনকে বলবেন, *প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি*, তোমার স্বভাবই তোমাকে দিয়ে যুদ্ধ করাবে। এখন তুমি সরে যাবে বলছ, কিন্তু দুদিন পরেই তুমি নিজে থেকে যুদ্ধ করতে শুরু করবে।

আমাদের স্বভাব স্প্রিংএর মত, স্বভাবকে যতই আমরা চেপে রাখি, হাত সরালেই, বুম্ করে স্প্রিং ঠেলে আমাকে আমার স্বভাবানুযায়ী কাজ করিয়ে নেবে। কোন মানুষেরই স্বভাব চলে যায় না। তাহলে আমাদের স্বভাব পাল্টাবো কি করে? সেইজন্য বলা হয়, লেগে থাকো; লেগে থাকতে হয়। একদিনে কারুর স্বভাব পাল্টে যাবে না, একটু একটু করে স্বভাব পাল্টাতে হয়। অর্জুন যদি এই কথা যুধিষ্ঠিরকে বলত, যুধিষ্ঠির কি বলতেন? তাহলে বাপু তুমি ছেড়ে দাও, আমরা তাহলে চলো আবার বনবাসে চলে যাই, কারণ তোমাকে ছাড়া তো আমরা যুদ্ধই করতে পারব না। দ্রুপদ বলতেন, কোন

কাপুরুষের সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দিলাম! কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হলেন আচার্য, তিনি অবতার, তাঁর কাছে সবটাই পরিষ্কার, তিনি জানেন অর্জুনের এটা সাময়িক একটা মতিভ্রম।

প্রহসন্নিব ভারত সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ, উভয় পক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে হাসিমুখে এবার তিনি বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে উত্তর দিতে শুরু করলেন। কারণ ওখানে অর্জুনের প্রশ্ন আছে, আপনি বলুন আমার জন্য কোনটা ঠিক। প্রশ্ন যখন করা হয়েছে, অবতার এখন ছাড়বেন না, পুরো উপদেশ দিয়ে ছাড়বেন। অর্জুনের হাসপাতালে নাম লেখানো হয়ে গেছে, পুরো রোগমুক্ত, এখানে সংশয়াচ্ছন্ন মনের সংশয় মেঘ পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত অর্জুনের আচার্য তাঁকে ছাড়বেন না। যাই হোক, অর্জুনের ওই একটি প্রশ্নের উত্তরে এই লম্বা গীতা দাঁড়িয়ে গেল।

ঠিক ঠিক গীতা এই এগারো নম্বর শ্লোক থেকে শুরু হয়। এতক্ষণ যা কিছু হচ্ছিল, আসলে এটা হল গীতার ভূমিকা। আমাদের আলোচনার শুরুতে বলা হয়েছিল, আচার্য শঙ্কর দু-বার গীতার ভূমিকা লিখেছেন। আগে উপোদ্‌ঘাৎ বা সম্বন্ধ ভাষ্য নামে একটা ভূমিকা বললেন, যেখানে অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের কথা বলা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল, ভগবান যখন সৃষ্টি করলেন, সেখানে তিনি ধর্ম রক্ষার জন্য কি কি করলেন। তখন এটাও বলা হয়েছিল যে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে যখন এগারো নম্বর শ্লোক আসবে, তার আগে তিনি গীতার কি ভাব, এবং গীতা কেন, এটাকে নিয়ে আর-একবার খুব গভীর ভাবে আলোচনা করবেন। প্রথমটা ছিল সাধারণ ধর্মকে নিয়ে, এবার পুরোপুরি গীতাকে নিয়ে। এখানে তিনি অনেক মতবাদকে খণ্ডন করছেন। ওই মতবাদগুলি এখন চিরদিনের মত খণ্ডন করা হয়ে গেছে। তাছাড়া এগুলো খুব technical, ইংলিশে বলা হয় dialectic। ওর মধ্যে আমাদের যাওয়ার কোন দরকার নেই, গীতার মূল কথার মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

আচার্যের ভাষা খুব মধুর ও সহজ। অনুবাদ সহ একটু পড়ার চেষ্টা করলে আমরা সবটাই বুঝতে পারব আচার্য কি বলতে চাইছেন। বারোশ তেরোশ বছর আগে লেখা, এমনিতেই যে কোন ভাষা বারোশ বছর হয়ে গেলে বোঝা যায় না, কিন্তু আচার্যের ভাষা এত প্রাঞ্জল, এখনও পরিষ্কার বোঝা যায়। একদিকে ভাষার যেমন বাঁধন, অন্য দিকে তীক্ষ্ণ ও ক্ষুরধার যুক্তি, যুক্তিতে কোথাও কোন ফাঁক পাওয়া যাবে না। আচার্যের প্রত্যেকটা কথা পুরোপুরি logical, একটা শব্দও এদিক ওদিক যাবে না। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রথম গীতা অনুবাদ করেন স্বামীজীর শিষ্য স্বামী স্বরূপানন্দ, স্বামীজী সেই অনুবাদ দেখে দিয়েছিলেন। সেখানে স্বামীজী পরিষ্কার বলছেন, আচার্য শঙ্করের মত আমাদের মত, উনি যেমনটি বলে গেছেন, তেমনটি আমরাও মানি।

আচার্য শঙ্কর দ্বিতীয় অধ্যায়ের আগে একটা সংক্ষিপ্ত ভূমিকা দিচ্ছেন। এর ভিতরে ঢুকে আলোচনা করতে গেলে আমরা হারিয়ে যাব। তবে আমরা খুব সংক্ষেপে আলোচনা করব, আচার্য কি বলতে চাইছেন। ভগবান বুদ্ধ যখন শিক্ষা দিতে শুরু করলেন, তখন তিনি এই দিয়ে শুরু করলেন– *চত্বারি আর্যসত্যানি*, চারটে আর্যসত্য। বৌদ্ধ ধর্ম যারা পালন করছে, তাদের জন্য চারটি সত্য। খুব নামকরা বুদ্ধের শিক্ষা, এটার উপরেই বৌদ্ধ ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম আর্যসত্য হল –সংসারে দুঃখ আছে। জগতে কোন এমন মানুষ দেখা যাবে না যার দুঃখ নেই। সেখান থেকে তিনি বলছেন, দুঃখসমুদয়, সমুদয় বাংলা অর্থে নিলে হবে না, সমুদয় শব্দের অর্থ হয়, এর একটা উৎস আছে। কোথাও না কোথা থেকে দুঃখের জন্ম হয়েছে। কোথা থেকে? কাম, ক্লেশ এই জিনিসগুলি থেকে জন্মেছে। সেখান থেকে বলছেন, দুঃখ নিরোধ। যেটা জন্ম নিয়েছে, তাকে আটকানো যায়। আর শেষে বলছেন, দুঃখনিরোধ মার্গ। দুঃখকে নিরোধ করার উপায়ও আছে, শুধু আছে তা না; যেমন অনেক সময় বলা হয়, এই জিনিসটা কি বিক্রীর জন্য আছে? হ্যাঁ বিক্রীর জন্য আছে। প্রথমে জিনিস আছে, তারপরে বিক্রীর জন্য আছে। তারপরে বলছে, তোমাকে তো দেওয়া হবে না, কারণ এটা আগেই বিক্রী হয়ে গেছে। আর্ট এ্যাগজিবিশানে যে মডার্ন আর্টের প্রদর্শনি হয়, সেই ছবি আমরা

কিছুই বুঝতে পারব না। কিন্তু যেমনি দাম জিজ্ঞেস করতে যাবে, বলে দেবে বিক্রী হয়ে গেছে। ভগবান বুদ্ধ তা বলছেন না, উপায় আছে, তার পথও আছে, তখন অষ্টাঙ্গমার্গের কথা বললেন।

আচার্য শঙ্করও গীতার পুরো আঠারোটি অধ্যায়কে এক জায়গায় এনে এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকাতে চারটি কথা বলছেন। কিন্তু ভগবান বুদ্ধ ও আচার্যের মধ্যে একটু তফাৎ আছে। প্রথমেই শঙ্কর বলছেন, সংসার কি? উনি বলছেন, শোক আর মোহ, এটাই সংসার। আচার্য দুঃখ নিচ্ছেন না, ভগবান বুদ্ধ যেভাবে দুঃখ বলছেন, আচার্য সেভাবে না বলে শোক আর মোহ বলছেন। শোক হল মনের সন্তাপ আর মোহ হল বিবেকের অভাব। দ্বিতীয় বলছেন সংসার কারণ। এই শোক আর মোহের কারণ কি? ভগবান বুদ্ধ যেমন সমুদায় বলছেন। আচার্য কারণ বলছেন, অজ্ঞান। আমরা আমাদের নিজেদের স্বরূপকে ভুলে গেছি, সেইজন্য আমাদের এই দুরবস্থা। তৃতীয় বলছেন, *সংসার উপরাম*, সংসারের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই বলছেন আত্মজ্ঞান।

এই তৃতীয় পয়েন্টটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, পুরো গীতার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হল আত্মজ্ঞান, এটাকে কেন্দ্র করেই গীতার পুরো আলোচনা চলতে থাকবে। আচার্য দেখাবেন, আত্মজ্ঞান ছাড়া সংসারের আত্যন্তিক নিবৃত্তি কোন ভাবেই হবে না, অর্থাৎ আমাদের শোক আর মোহের নাশ কোন মতেই হবে না। ঠাকুরও বলছেন, জ্ঞানী ভয়তরাসে। সেখানে ঠাকুর জ্ঞানী আর বিজ্ঞানীকে আলাদা করছেন। যতক্ষণ আত্মজ্ঞান না হবে, ততক্ষণ তোমার ভয় যাবে না, তোমাকে আবার শোক মোহ গ্রাস করে নেবে।

শেষে চতুর্থ বলছেন, উপায়। উপায়কে ভগবান বুদ্ধ অষ্টাঙ্গমার্গ বলছেন, কিন্তু আচার্য এখানে বলছেন, গীতা দুটো উপায় নিয়ে আসছে। প্রথমটাকে তিনি বলছেন সাংখ্যযোগ, সাংখ্যযোগ মানে আত্মার ব্যাপারে ঠিক ঠিক জ্ঞান, তার আগে, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হওয়ার আগের অবস্থাকে বলছেন জ্ঞাননিষ্ঠা। জ্ঞাননিষ্ঠা মানে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, গুরুর মুখে শাস্ত্রের আলোচনা শুনেছেন, চিন্তন মনন করেছেন, এই করে করে শাস্ত্র বাক্যের প্রতি একটা প্রীতি জন্মে গেছে, এই জ্ঞানের কথা তাঁর কাছে সত্য বলে বোধ হচ্ছে এবং শেষে বলছেন, আমার এটাই লাগবে –এটাকে বলছেন জ্ঞাননিষ্ঠা।

দ্বিতীয় উপায় হল, যারা এটা পারবেন না, যে বলছে, আমার দেহের প্রতি আসক্তি আছে, সংসারের প্রতি প্রীতি আছে। একজন বলছেন, আমার ইচ্ছা সারাদিন জপধ্যান নিয়ে থাকি, কিন্তু আমার এক ছোট নাতি আছে, তার প্রতি আমার স্নেহ মমতা আছে। ওনার পক্ষে জ্ঞাননিষ্ঠা সম্ভব না। কারণ সে নাতিকে ভালবাসে, নাতিকে ভালবাসতে গেলে তার মেয়েকে ভালবাসতে হবে, মেয়েকে ভালবাসতে গেলে তার মাকে ভালবাসতে হবে, এটা হল কলমির দল। একটাকে যদি ধরেছ, বা একটা কিছু যদি তোমাকে ধরে, পুরো সংসারটা চলে আসবে। আগেকার দিনে বলত, ভারতে দুজনের মধ্যে বিয়ে না হয়ে পুরো দুটো গ্রামের মধ্যে বিয়ে হয়। যখন বিয়ে হত, তখন পুরো গ্রাম উৎসব করত। ঠিক তেমনি, একটাকে ধরা মানে পুরোটাই চলে আসা, কিছু করার নেই। এদের জন্য বলছেন, কর্মযোগ বা যোগবুদ্ধি, এটাই দ্বিতীয় উপায়। এই দুটো উপায় – সাংখ্যবুদ্ধি আর যোগবুদ্ধি। যাঁরা যোগবুদ্ধিতে আছেন, তাঁদের কাজের প্রতি নিষ্ঠা থাকতে হবে।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই দুটো জিনিসকে পরপর বলতে থাকবেন, তার সাথে জ্ঞানের কথা ঘুরে ঘুরে আসবে। সংসারের উপর আলোচনা কম করবেন, গীতার বৈশিষ্ট্যই হল জ্ঞান। জ্ঞান আর সেই জ্ঞানে পৌঁছানর উপায়, এই দুটোকে নিয়েই বেশী বলতে থাকবেন। প্রথমে সাংখ্যযোগ নিয়ে বলবেন, তারপর বলবেন কর্মযোগ, এই দুটোকে জ্ঞাননিষ্ঠা আর কর্মনিষ্ঠাও বলছেন। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই এই আলোচনা শুরু হয়ে যায়, আর এটাই ঘুরে ঘুরে চলতে থাকবে।

অনেকে আছেন, যাঁরা বলতে চান, গীতা মূলতঃ হল কর্মযোগ। কিন্তু আমাদের ভাল করে জেনে রাখা উচিৎ, গীতা কর্মযোগ নয়। কর্মযোগ হল একটা পথ, যে পথে বলা হয়, তুমি কাজ কর, কাজ করতে করতে মন পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, তারপর কাজকে কর্তব্যবোধ রূপে করতে থাক, সেখান থেকে নিষ্কাম কর্ম করতে করতে শেষে হবে কর্মত্যাগ। ঈশোপনিষদের প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে একই কথা বলা হয়েছে। প্রথম মন্ত্রে বলা হয়েছে জ্ঞাননিষ্ঠার কথা, সেখানে বলছেন, তুমি ত্যাগের দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ কর। দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্মনিষ্ঠার কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে, তুমি কর্ম কর কিন্তু অনাসক্ত হয়ে কর্ম কর, কর্মে তুমি আসক্ত হয়ো না। এটাই হিন্দুদের ভাব –জ্ঞাননিষ্ঠা আর কর্মনিষ্ঠা।

এই যে আমরা চারটে পয়েন্ট বললাম, সংসার কি, এর কারণ কি, কারণের নিবৃত্তি কিভাবে হবে এবং এর উপায় কি, আচার্য তাঁর এই ভাষ্যে এই চারটে পয়েন্টকে নিয়ে বলছেন। আচার্য বলছেন, অর্জুনকে মাধ্যম করে ভগবান বলতে চাইছেন, *ইতি এতদন্তঃ প্রাণিনাং শোকমোহাদি-সংসারবীজভূতদোষ*। সংসার কি বলতে গিয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে সংসারের সংজ্ঞা দিচ্ছেন, ঠাকুরও সংসার কেন বলছেন, রাজযোগেও আলোচনা হয় সংসার কি। কিন্তু সংসার কি বলতে গিয়ে আচার্য বলছেন, শোক আর মোহ এটাই সংসার, শোক আর মোহই সংসারের বীজ। শোক হল মনের সন্তাপ, একটা জিনিস আমার কাছে ছিল, সেটা চলে গেছে। যে জিনিসটা চলে গেছে সেটার জন্য মনে সন্তাপ এসেছে। আর মোহ হল, বিবেক অভাব। কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল এই বিচার করার জন্য যে শক্তির দরকার, সেটার অভাব হয়ে যায়, এটাই বিবেক অভাব।

এই শোক আর মোহ কেন আসে? প্রাণি মাত্রই শুদ্ধ চৈতন্য, যিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। নিত্য, তুমি সনাতন, তোমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, তোমার কোন পাপও নেই, পূণ্যও নেই। আর তুমি কোন সময়েই মুর্খ ছিলে না, কারণ তুমি চৈতন্যস্বরূপ; মা সরস্বতী তোমারই একটা ছোট্ট রূপ। এই কথা শুনলে আমাদের আতঙ্ক লাগে। তার সাথে তুমি চিরমুক্ত, কিসের বন্ধন তোমার। তুমি নিজেকে বদ্ধ মনে করছ বলেই তোমার এই বন্ধন। বাস্তবে কি তাই? পুরোটাই উল্টো ছবি সর্বত্র দেখছি –আমরা অনিত্য, সব সময় জন্মাচ্ছি আর মরছি; আমাদের দেহ, মন সব অশুদ্ধ; অজ্ঞানের আমরা খনি। আর বন্ধন! যদি কেউ আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে চায়, আমরা দৌড়ে গিয়ে তার পা জড়িয়ে ধরি বলি, তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না, আমি তোমাকে ছাড়া মরে যাব। শুধু যে আমরা বন্ধনে পড়ে আছি তা না, যদি কেউ আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলে, যাও আমি তোমাকে ছাড়লাম, তুমি আমার জীবন থেকে সরে যাও, তখন কি অবস্থা হয় আমরা ভাল করেই জানি। একশ বছরের বৃদ্ধা দিদিমা মরতে চলেছে, তখনও চোখে জল নিয়ে নাতনী বলবে, আমাদের ছেড়ে যেও না। আরে সে তোমাকে মুক্তি দিচ্ছে তুমি বুঝতে পারছ না?

অনেক আগেকার কথা, বেলুড় মঠে একজন নাপিত ছিল, ইউপি থেকে প্রথম আসার পর দেখছে, একজন সাধু মারা গেছে। তাকে বলা হল ভাল করে মাথা কামিয়ে দেওয়ার জন্য। তারপর দেখছে সাধুরা কাঁধে নিয়ে খোল করতাল নিয়ে গান করতে করতে আনন্দের সাথে দাহ করতে নিয়ে যাচ্ছে। এতদিন গ্রামে দেখে এসেছে, 'রামনাম সৎ হ্যায়' বলতে বলতে নিয়ে যাওয়া হয়, আর তার পিছনে সবাই কাঁদতে কাঁদতে যায়। আর এখানে সাধুরা আনন্দে গান গাইতে গাইতে সাধুর মৃতদেহ দাহ করতে নিয়ে যাচ্ছে। সাধুদের ওই কাণ্ড দেখে ওখানেই খুর-কাঁচি সব গঙ্গায় ফেলে পালিয়ে গেল, বলছে আমি এই অসুরদের মধ্যে থাকত পারব না। যাই হোক পরে তাকে আবার নিয়ে আসা হয়, সেই থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বেলুড় মঠেই কাটিয়ে গেছে।

সব কিছুতেই আমরা বন্ধনে পড়ে আছি, ঠাকুর বলছেন আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা, তার উপর আবার স্ক্রুপ মারা। কোন উপায় নেই যে, বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসবে। যে ছেড়ে দিতে চাইছে, তাকে জড়িয়ে ধরে বলবে, তুমি আমাকে বাঁধ, আমাকে ছেড়ে দিও না, আমি মরে যাব। কেন বন্ধন?

আচার্য বলছেন, শুধু যে আচার্যই বলছেন তা না, এটা শাস্ত্রেরই কথা, আসলে তুমি তোমার স্বরূপ ভুলে গেছ। এটাই জগৎ। কজন আর মুক্তির দিকে এগোয়, সবাই বন্ধনে পড়ে আছে। বন্ধনে পড়ে থাকতে থাকতে কাপুরুষ হয়ে যায়, সেটাতেই তার আনন্দ।

বন্ধনের মূল কারণ তিনটে – অবিদা-কাম-কর্ম। অবিদ্যা মানে, আমি আমার স্বরূপ ভুলে গেছি, আমি নিত্য-বুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্ত, এটাই আমার স্বরূপ। এই স্বরূপকে ভুলে গেলে এর ঠিক বিপরীত হয়ে যায়। স্বরূপ ভুলে যাওয়ার পরে মানুষের মধ্যে অভাব বোধ এসে যায়, আর সে কখনই অভাবে থাকতে চাইবে না। যে অনিত্য সে চাইছে আমি নিত্য হব। তার মানে আমি বেঁচে থাকতে চাই। কিভাবে বেঁচে থাকব? হয় ব্রহ্ম রূপে বেঁচে থাকব, তা নাহলে ব্রহ্মা রূপে বেঁচে থাকব। ব্রহ্ম রূপে বাঁচা মানে আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে। আত্মজ্ঞান লাভ না হলে ব্রহ্মা রূপে বেঁচে থাকবে, সৃষ্টি করতে থাকবে, সন্তান, সন্ততির মাধ্যমে আমি বেঁচে থাকব। সেইজন্য সবাই নিজের সন্তানকে ভালবাসে, জেনেটিক্যালি ভালবাসে। ঠিক তেমনি, আমরা অশুদ্ধ বলে শুদ্ধি লাভের চেষ্টা করি। আমি জানি আমি অজ্ঞান, তাই জ্ঞান লাভের চেষ্টা করে যাই। আর বন্ধন, আমরা বলছি বটে যে আমরা বন্ধন ভালবাসি, কিন্তু স্বামীজী তাঁর অনেক জায়গার লেকচারে বলছেন, এই বন্ধনই আমাদের মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। আমরা যে বন্ধনে ফেঁসে আছে, তার মানে এখনও আমাদের জগতের রূপ-রস-গন্ধাদির আস্বাদ অপূর্ণ। এরপর জগৎ থেকে যখন প্রচুর আঘাত পেতে শুরু করবে, প্রচণ্ড মার খেতে শুরু করবে, তখন সে আস্তে আস্তে মুক্তির দিকে এগোতে শুরু করবে। তারপর একদিন সে ওই বন্ধনকে কেটে বেরিয়ে যাবে।

অবিদ্যা থেকে আসে কামনা। কামনা মানেই শোক আর মোহ। মোহ মানে ভবিষ্যতে কোন কিছু আমি পেতে চাইছি। শোক, যে জিনিসটা চলে গেছে, সেটার জন্য সন্তাপ করা। শোক আর মোহ দুটোই একই, আলাদা কিছু নয়। একটাতে কোন জিনিস পেতে চাইছি, আর-একটাতে কোন জিনিস চলে গেছে। একজন মা, তার সন্তান মারা গেছে, তার শোক হবে, কোন দিন মা সন্তানের কথা ভুলতে পারবে না। একজন বন্ধ্যা নারী, তার সন্তান নেই, সে সন্তান প্রাপ্তির মোহে পড়ে আছে। দুটো কিন্তু আসলে এক, কোন তফাৎ নেই।

ট্রেনের জানলা বা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখছি একটা সিগন্যালের পোস্ট এগিয়ে আসছে। সিগন্যাল এগিয়ে আসছে না, আমি এগিয়ে যাচ্ছি। দেখছি দূর থেকে সিগন্যালটা আমার কাছে এলো, এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ের জন্য আমার কাছে এলো, আবার পিছনের দিকে চলে গেল। আমি তাকিয়েই আছি, সিগন্যালটা চলে যাচ্ছে। মনের এই যে বিরাট সাম্রাজ্য, যেখানে আমি আছি, সেখানে বস্তু, প্রাণী, সব কিছু নিজের মত স্থির হয়ে আছে, আমি ছুটে দৌড়ে চলে যাচ্ছি। কিংবা আমি স্থির হয়ে আছি, তারা ছুটে দৌড়ে চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে। যদি আমি নিজেকে স্থির মনে করি, তারা দৌড়াচ্ছে। আর তাদেরকে যদি স্থির মনে করি, যদি জড় বস্তু রূপে দেখি, যদি মনে করি যাবতীয় যা কিছু আছে সব প্রকৃতির খেলা, প্রকৃতি মানেই জড়, তার মানে তারা সবাই স্থির, দৌড়াচ্ছি আমি।

ওই জায়গাতে, যে জিনিসটা আমার দূরে আছে, আমার মন এগিয়ে এগিয়ে গিয়ে ওটার সঙ্গে নিজেকে জুড়ে নিচ্ছে। যখন চলে গেল, মন তখন পিছন পিছন গিয়ে ওটাকে জড়িয়ে ফেলছে। যে জায়গাতে মন থাকার কথা, সেখানে মন থাকছে না, মনের এটাই স্বভাব। মন সব সময় গতিশীল, মন নিজের জায়গায় কখন স্থির থাকে না, মন দৌড়াতে থাকে। কখন ভবিষ্যতে দৌড়ে চলে যাচ্ছে, কখন ভূতকালে দৌড়ে চলে যাচ্ছে। মন যখন ভবিষ্যতে বিচরণ করে তখন সে জিনিসগুলিলে আঁকড়ে ধরে রেখেছে, এখনও তার শরীরটা কিন্তু সেখানে পৌঁছায়নি।

মনের সাথে আমাদের সম্পর্কটা ঠিক কুকুর আর মনিবের মত। রাস্থায় পোষা কুকুরকে নিয়ে বেড়াতে গেলে, কুকুর সব সময় তার মনিবের থেকে এগিয়ে এগিয়ে যাবে। ও জানে যে, আমার প্রভু এই রাস্থা দিয়ে যায়। কিন্তু কোন কারণে মনিব ঠিক করল অন্য রাস্থা দিয়ে যাবে, অন্য রাস্থা দিয়ে যাওয়ার সময় কুকুরটা খুব মনমরা হয়ে আস্তে আস্তে তার পিছন পিছন চলে। আমাদের মনেরও ঠিক এই স্বভাব, মন এগিয়ে এগিয়ে গিয়ে একটা জিনিসকে ধরে নেয় –এটা আমার, এটা আমার। কিন্তু বাস্তব হল, সেটা আমার নয়। ফলে যখন পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়, তখন ভেঙে পড়ে –এটা তো আমার হল না। শাস্ত্রকাররা এটাকে খুব সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেন, বলেন, *অহংতা* ও *মমতা* বা আমিত্ব ও মমত্ব। সোজা বাংলায় বলা যায়, আমি ও আমার। *অহংতা,* আমির সাথে জুড়ে যাচ্ছে আর মমতার ক্ষেত্রে জিনিসগুলো বাইরে আছে কিন্তু আমি সেগুলোর সাথে জুড়ে আছি। সব ক্ষেত্রেই আমাদের মন এগিয়ে এগিয়ে গিয়ে অক্টোপাসের মত জড়িয়ে নিয়ে বলে এটা আমার, বাস্তবে যা কোন পরিস্থিতিতেই আমার নয়। জীবাত্মা যখন নিজের মত চলতে থাকে বা সময়ের প্রভাবে জিনিসটা যখন নাগালের বাইরে চলে গেল, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর মন খারাপ হয়। যতই আঁকড়ে ধরে রাখতে চেষ্টা করুক, কোন দিন ধরে রাখতে পারবে না, কারণ ওটা তো তার নয়। বাস্তব হল, জগতের কোন কিছুই আমার না।

এই জিনিসটাই অর্জুনের হল। আচার্য বলছেন, *তথা হি অর্জুনেন রাজ্যগুরুপুত্রমিত্রসুহৃৎস্বজন-সম্বন্ধিবান্ধবেষু ‘অহম্ এষাং মম এতে’*। এখানে সবাই এক অপরের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছে, কিন্তু তাদের দেখে অর্জুন কি মনে করলেন? এরা আমার আমি এদের। এই জগতে কেউ কারুর নয়। ঠাকুরের গল্প, একজন পাহাড়ের উপর একটা বাড়ি করেছে। একদিন খুব ঝড় উঠেছে, ঝড়ে বাড়ি নড়বড় করছে, যায় যায় অবস্থা। লোকটি তখন ভাবল, পবন দেবতার পুত্র হনুমান, তখন চিৎকার করে বলতে লাগল ‘এটা হনুমানের বাড়ি’। তাও ঝড় থামছে না, তখন বলতে শুরু করল ‘এটা রামের বাড়ি’। সেখান থেকে বলতে লাগল, ‘এটা সীতার বাড়ি, লক্ষ্মণের বাড়ি’। ইতিমধ্যে ঝড়ে বাড়িটা হুড়মুর করে ভেঙে পড়ল। তখন সে বেরিয়ে এসে বলে, ‘শালার বাড়ি’। আমাদের জীবনেও একই জিনিস হয়ে চলেছে, তুমি যে আমার, আমি যে তোমার; যখন সব কিছু বেরিয়ে গেল, তখন বলবে, ‘ধুর শালা! এই জগতে কে কার’।

অর্জুনেরও ‘কে বা কার’ হতে যাচ্ছে, কিন্তু তার আগে অর্জুনের কান্নাকাটিটা শুরু হয়ে গেছে। এটাকে আচার্য এখানে খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তলছেন, *ভ্রান্তিপ্রত্যয়নিমিত্তস্নেহবিচ্ছেদাদি নিমিত্তৌ আত্মনঃ শোকমোহৌ প্রদর্শিতৌ*। বলছেন, *ভ্রান্তিপ্রত্যয়,* প্রত্যয় মানে জ্ঞান। এই জায়গাতে *ভ্রান্তিপ্রত্যয়,* পুরো জগৎটাই *ভ্রান্তিপ্রত্যয়*। এখান থেকেই বেদান্তের শুরু।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই জিনিসগুলো ধারণা করা আমাদের কাছে সত্যিই খুব কঠিন, কারণ সবটাই আমাদের কাছে নূতন। ঠাকুর বলছেন, একসের ঘটিতে তিন সের দুধ ধরে না। তাহলে উপায় কি? উপায় হল যত আমাদের জ্ঞানের উন্মোচন হবে, অধ্যয়ন, আচার্যের সঙ্গ এবং উপদেশ, জীবনকে দেখা, এগুলো হল জ্ঞানোন্মোচন এবং অজ্ঞান নাশের পথ। এগুলো হল হাতুড়ির মত। একসের ঘটির পাত্রকে হাতুড়ি দিয়ে মারা হচ্ছে, মারতে মারতে তার পাত্রতটা বাড়তে থাকে। পাত্র তো ভেঙে যেতেও পারে। না, ভাঙবে না, কারণ এখানে মনকে পাত্র রূপে বলা হচ্ছে, আমার যে মন আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে মন, দুটো এক। সৃষ্টি মানেই বিশ্বমন, মন ছাড়া সৃষ্টিতে কিছু নেই। তাই, ঈশ্বরের পরেই যেটা সব থেকে বড়, সেটা হল মন। আমি, আপনি সবাই হলাম সেই বিশ্বমনের এক একটা ছোট ছোট অংশ, কিন্তু আমরা সবাই সেই মন। যদি আমরা ঠিক ঠিক exposure দিতে থাকি, তাহলে কিন্তু আমাদের মনটা আস্তে আস্তে বড় হতে হতে বিরাট বড় হয়ে যাবে।

রাজযোগের সাধনা এটাই; রাজযোগের যে পুরো সাধনা, সেখানে আস্তে আস্তে মনটাকে বিস্তার করা হচ্ছে। বিস্তার করতে করতে একটা জায়গায় গিয়ে মন সব কিছু ভেঙে বেরিয়ে যায়। এই যে কথাগুলো আমরা এখন শুনছি, বা বই যখন পড়ছি, তখন আমরা কিছুই বুঝতে পারব না, না বোঝারই কথা। কিন্তু এই কথাগুলো আমাদের মনে হাতুড়ির ঘা হয়ে পড়ছে, ওই হাতুড়ি যখন পড়ছে, সেখান থেকে আস্তে আস্তে মনের বিস্তার হতে থাকে। এক্ষুণি হাতেনাতে এটা বোঝা যাবে না, অনেক দিন ধরে শুনে যাচ্ছে, আলোচনা করছে, জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হচ্ছে, অনুভূতি হচ্ছে, এতে তার মনের অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, তারপর একদিন দুম্ করে পুরোটাই পরিষ্কার হয়ে খুলে যাবে, ও তাই, এই ব্যাপার।

অর্জুনের *ভ্রান্তিপ্রত্যয়* হয়েছে, ঠিক ঠিক প্রত্যয় হল *আত্মপ্রত্যয়*, *আত্মপ্রত্যয়* মানে আত্মার জ্ঞান। *ভ্রান্তিপ্রত্যয়* মানে, যখন আত্মা ব্যতিরেকে বাকি সব কিছুতে প্রত্যয়। এখানে *ভ্রান্তিপ্রত্যয়* কি? গুরু, পিতা, ভ্রাতৃ যাদের কথা অর্জুন বলছেন, এরা কেউ অর্জুনের নয়, কিন্তু সেখানে জুড়ে গিয়ে বলছেন, *অহম্ এষাং মম এতে*, আমি এদের, এরা আমার। এই কারণে অর্জুনের মধ্যে শোক মোহ এসে গেছে। *ভ্রান্তিপ্রত্যয়* কি? শোক আর মোহটাই *ভ্রান্তিপ্রত্যয়*। মানুষের বাবা মারা যায়, স্ত্রী মারা যায়, স্বামী মারা যায়, সন্তান মারা যায়, মারা যাওয়ার পর বলে আমার জীবনের সব কিছু শেষ হয়ে গেল, আমার জীবনে আর হাসি আসবে না। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই স্ত্রী আবার সাজগোজ করে, স্বামী আনন্দ করে, বা আর-একজনকে বিয়ে করে নিয়ে আসে। সব কিছুই ধীরে ধীরে আগের মত স্বাভাবিক ভাবে চলতে থাকে। কারণ, আসলে এটাই *ভ্রান্তিপ্রত্যয়*। বিয়ে করছে, ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে, আবার বিয়ে করছে, আবার ডিভোর্স দিচ্ছে, কেন? *ভ্রান্তিপ্রত্যয়*। মানুষ যখন সাধনার পথে নামে, সাধনা করে করে আরও গভীরে যখন যাবে, একটু চিন্তন মনন করে মন যখন সূক্ষ্ম হবে, তখন বুঝতে পারে সমস্ত রকম জ্ঞান, বিশেষ করে শোক আর মোহ হল *ভ্রান্তিপ্রত্যয়*।

বেলুড় মঠে একজন খুব উচ্চমানের মহারাজ ছিলেন, তিনি সব সময় সন্ন্যাসীদের বলতেন, ‘কারুর নামে নেগেটিভ কিছু বলো না, থার্ড পারসনকে নিয়ে কক্ষণ আলোচনা করবে না। যদি আলোচনা করতে হয়, তার ভাল দিকগুলো নিয়ে বলবে’। আমাদের পক্ষে এটা সম্ভব হয়ে উঠবে না, তার কারণ এই *ভ্রান্তিপ্রত্যয়*। *ভ্রান্তিপ্রত্যয়* সমস্ত সমস্যার মূলে। যদি *ভ্রান্তিপ্রত্যয়কে* নিয়েই চলতে হয়, যেমন বলা হয় ধর্ম হল সম্মোহনকারক, যদি নিজেকে আমি হিপনোটাইজ নাই ভাবতে চাই তাহলে, আমাকে ভাবতে হবে আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। এই বোধ যদি আমাদের রাখতে হয় তাহলে, শোক মোহে না থেকে বরঞ্চ অন্য প্রত্যয় নিয়ে আসা অনেক ভাল।

আচার্য বলছেন, শোক আর মোহ অর্জুনের মনে এমন ভাবে চেপে গেছে যে, তাঁর যে আসল ধর্ম, ক্ষত্রিয় ধর্ম, যে ধর্মযুদ্ধ করার জন্য অর্জুন প্রস্তুত হয়ে এসেছে, সেই ধর্মটাই শোক আর মোহে চাপা পড়ে গেছে। ভাল ইমোশান হোক আর মন্দ ইমোশান হোক, ইমোশান মাত্রই আমাদের ক্ষতি করবে। শোক মোহের ইমোশান, ভালবাসার ইমোশান, আনন্দের ইমোশান, সব ইমোশান আমাদের প্রকৃত স্বভাবকে আবৃত করে দেয়। পরে হর্ষ ও অমর্ষ নিয়ে বলবেন, অমর্ষ মানে যেখানে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে, দুটোই মারাত্মক বিপজ্জনক। আমাদের পজিটিভ থিঙ্কিং আর নেগেটিভ থিঙ্কং দুটোই বন্ধ করতে হবে, তুমি নিজের স্বরূপে অবস্থিত হও, দেখবে সব কিছু আপনা থেকেই বেরিয়ে আসবে। পজিটিভ থিঙ্কিং, নেগেটিভ থিঙ্কিং এই জিনিসগুলো বিদেশীরা নিয়ে এসে সারা জগতকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে, আর আমরাও ওদের তালে তাল দিয়ে এগুলোকে নিয়ে লাফালাফি করছি। যেটাতে আমরা আনন্দে মত্ত হয়ে যাই, সেটা শোক মোহের মতই ক্ষতিকারক ও বিপজ্জনক, কারণ এতে আমাদের স্বভাব, আমাদের আসল স্বরূপ চাপা পড়ে যায়।

শোক আর মোহের কারণে অর্জুনের আসল স্বভাব এমন চাপা পড়ে গেছে যে, বলছেন, আমি আমার ধর্ম ছাড়লাম, পরধর্ম নিলাম। পরধর্ম মানে ভিক্ষুকের ধর্ম, আমি বৈরাগী হব, ভিক্ষা করে জীবনধারণ করব। প্রত্যেক ইমোশানই মারাত্মক বিপজ্জনক, ইমোশান কখন পজিটিভও হয় না, নেগেটিভও হয় না; যে কোন ইমোশান, তা ভালবাসার ইমোশান হোক, শত্রুতার ইমোশান হোক, আনন্দের ইমোশান হোক, প্রত্যেকটা ইমোশান হল eternal enemy of wisdom। Wisdom কি? আমার স্বরূপ, আমি বাস্তবিক যা। প্রথমে অবিদ্যা এসে আমাকে ঢেকে ফেলেছে, ওতেই আমি বরবাদ হয়ে গেছি, কারণ আমি কে, এটাই ভুলে গেছি। এই অবিদ্যার উপর আবার আসছে সমস্ত ধরণের ইমোশানগুলি। এই হল সেই ঠাকুরের বিখ্যাত কথা –আমরা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, তার উপর আবার স্ক্রুপটাও মেরে রেখেছে। অর্জুনের ক্ষেত্রে হল, যুদ্ধক্ষেত্রে যারা দাঁড়িয়ে আছে যুদ্ধ করার জন্য, রাজা, মিত্র, গুরু, সুহৃদ, এদের সাথে যে *অহম্ এষাং মম এতে*, আমি এদের, এরা আমার, এই ভাবটা অর্জুনের মনকে গ্রাস করে নিয়েছে।

এরপর আবার আচার্য বলছেন, *তথা চ সর্বপ্রাণিনাং শোকমোহাদিদোষাবিষ্টচেতসাং স্বভাবত এব স্বধর্মপরিত্যাগঃ প্রতিসিদ্ধসেবা চ স্যাৎ*। আচার্যের ভাষার এত মাধুর্য আর একটা কথাতে অনেক কিছুকে পরিষ্কার করে বলে দেন যে, অবাক লাগার কথা। আচার্য এখন অর্জুন থেকে সরে এসে সব প্রাণীর উপর চলে এসেছেন; বলছেন, প্রত্যেক প্রাণীর ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যখনই তাদের মধ্যে শোক আর মোহের বৃদ্ধি হয়, তখন *স্বধর্মপরিত্যাগঃ প্রতিসিদ্ধসেবা*, নিজের ধর্মকে ছেড়ে দেয় আর তার সাথে যেটা নিজের নয় সেটাকে গ্রহণ করে, যেটা নিজের সেটাকে ছেড়ে দেয়। মহাভারত পুরোটাই স্বধর্মকে নিয়ে চলে। তৃতীয় অধ্যায়ে যখন স্বধর্মের প্রসঙ্গ আসবে, বিশেষ করে যখন, *স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ*, আসবে, তখন আমরা স্বধর্মের উপর বিস্তারে আলোচনা করব। স্বধর্মই হিন্দুদের মূল ধর্ম।

যে কোন ধর্মের code of conduct খুব সহজ ও সাধারণ, যেমন জুহুদিদের টেন কমাণ্ডমেন্টস্, তার সাথে আছে তাদের সাথে ভগবানের যে চুক্তি হয়েছে, এই চুক্তি আর টেন কমাণ্ডমেন্টস্ এই দুটোকে নিয়ে জুহুদিদের ধর্ম। এরপর আসে খ্রীশ্চান ধর্ম, বিশ্বে যত খ্রীশ্চান আছে, তা আমেরিকার খ্রীশ্চান হোক, ভারতের খ্রীশ্চান হোক আর ইংল্যাণ্ডের খ্রীশ্চান হোক, সবারই ধর্ম মোটামুটি সমান। ঠিক তেমনি বিশ্বের সব মুসলমানদের একটা common practice আছে, পাঁচবার নমাজ পড়বে, জীবনে একবার হজে যাবে ইত্যাদি। হিন্দু ধর্ম তা নয়, হিন্দ ধর্মের যে মূল সিদ্ধান্তগুলি রয়েছে, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তগুলি অনুশীলনে নেই, এটা যে করতেই হবে, এমন নয়। হিন্দু ধর্ম অন্যান্য ধর্মের তুলনায় অনেক মুক্ত ধর্ম। বিশ্বের অন্যান্য ধর্ম কতকগুলি common praticeএর মধ্যে বাঁধা।

আমরা এই দুটো শব্দ প্রায়শই ব্যবহার করি, তা হল equality and freedom। যেখানে equality আছে সেখানে freedom থাকবে না, আর যেখানে freedom আছে সেখানে equality হয় না। লোকেরা এটা বুঝতে পারে না। আমরা এই শব্দগুলি যেখানে সেখানে খুব ব্যবহার করে থাকি – justice, freedom, equality ইত্যাদি, মনে করি শব্দগুলি বুঝি inter-changeable। কিন্তু একবারও খেয়াল করি না যে, যেখানেই equality সেখানে freedom হবে না। বিশ্বে যে কটি সমাজতান্ত্রিক সরকার আছে, যেখানে তারা যে equalityর কথা বলছে, সেখানে প্রথমেই এরা বলে দেয় freedomটাকে শেষ করে দাও। আর যেখানে freedom থাকবে, সেখানে equality থাকবে না। যে কোন ধর্মে যদি equal practiceএর কথা বলে, পুরুষদের জন্য এটা, মেয়েদের জন্য এটা, বড়দের জন্য এটা, ছোটদের জন্য এটা, বুঝে নিতে হবে সেই ধর্মে freedom নেই। মিলিটারিতে যেমন, মিলিটারির সমস্ত প্র্যাক্টিস সবার জন্য একই রকম।

বিশ্বের ধর্মগুলো মনে হয় যেন এক একটা মিলিটারি শাসনব্যবস্থা। হিন্দুদের ক্ষেত্রে একেবারেই তা নয়। হিন্দুদের সিদ্ধান্তগুলি পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত হল মুক্তি – মুক্তি মানে সমস্ত রকমের মুক্তি, দেহের মুক্তি, মনের মুক্তি, ইমোশান থেকে মুক্তি, সমস্ত কিছুর থেকে মুক্তি। হিন্দুরা equalityর দিকে যায় না। হিন্দু ধর্ম একমাত্র ধর্ম যে মুক্তির কথা বলে। অন্যান্য যত ধর্ম আছে, তারা যদি মুক্তির কথা বলে, বুঝে নিতে হবে তারা মিথ্যা কথা বলছে। মুক্তির কথা হিন্দু ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম বলতে পারবে না, কারণ তারা equalityকে নিয়ে চলে। আর equality in practice কখনই হয় না। বিশ্বের সমগ্র ইতিহাস ঘাটলে এবং তার সাথে বর্তমান বিশ্বকেও যদি দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে equality কোথাও হয় না। যে কোন সমাজে, যে কোন দেশে, যেখানেই equalityর কথা বলতে শুরু করে, তখন বুঝতে হবে এরা মানুষকে বোকা বানাবার জন্য, লোক ঠকানোর একটা নূতন মেশিন বার করেছে।

ফরাসী বিপ্লব খুব নামকরা ঘটনা, পুরো বিপ্লবটাই হল equalityর নামে। আর কিছু দিন পরেই নেপোলিয়ন নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে দিলেন। যারাই equality নিয়ে বেশী কথা বলে, ওদের মধ্যে অবশ্যই প্রচুর inequality পাওয়া যাবে। হিন্দু ধর্ম এই ধাপ্পাবাজিতে কোন দিনই ছিল না, হিন্দু ধর্ম পরিষ্কার বলে দেয়, জগৎ মাত্রই inequality, যদি equality চাও তবে একমাত্র আধ্যাত্মিক স্তরে যেতে হবে, সেখানে গিয়ে equality হবে। যখন তুমি সমাধিতে যাবে, যখন তোমার আত্মজ্ঞান হবে, একমাত্র তখনই তোমার equality হবে, বাকি সব সময়, সব কিছুতেই inequality। আমরা স্লোগানে, আন্দোলনে সমান অধিকার, সবার জন্য সমান মর্যাদ বলে চেঁচাতে পারি, কিন্তু জীবনে একবার নামাও তো সমানতা ব্যাপারটা, কয়েক দিনের মধ্যেই পুরো ব্যবস্থাটাই collapse করে যাবে।

হিন্দুরা প্রথম থেকে ভাল করে জানে, A man is born inequal, he lives ineually and he dies inequally। হিন্দুরা পরিষ্কার জানে, আমি তোমার সমান কোন দিন হব না, তুমিও আমার সমান কোন দিন হবে না। এটাকে নিয়ে হিন্দুরা কখন কোন সময় ধাপ্পাবাজি করেনি, করবেও না। কেউ হয়ত বলতে পারে, কেন এখন তো সব দেশ equality of opportunityর কথা বলছে। কোথায় equality of opportunity আছে? আমেরিকা এত equalityর কথা বলে, কিন্তু একবার খোঁজ নিয়ে দেখুন না কেন, ওখানে কোটিপতির সন্তান যে সুযোগ পায়, সাধারণ লোকের সন্তান কি সেই সুযোগ পায়? রাশিয়া, চীনের ওপরওয়ালা রাষ্ট্রপ্রধান কমরেডদের ছেলেমেয়েরা যে সুযোগ পায়, নীচের তলার কমরেডের ছেলেমেয়েরা কি তাই পায়? সবাই ধাপ্পা মেরে যাচ্ছে। হিন্দুরা এই জিনিসটা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, সেইজন্য বললেন তোমার ধর্ম আমার ধর্ম কক্ষণ সমান না। ওনারা সেইজন্য নিয়ে এলেন বর্ণাশ্রম ধর্ম। বর্ণাশ্রম ধর্মে তুমি যে বর্ণে আছ, যে অবস্থায় আছ আর তার সাতটি আলাদা শর্ত আছে। *স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়* যখন আলোচনা করা হবে তখন এর উপর আমরা আরও বিস্তারে আলোচনা করব।

ফলস্বরূপ দুজন মানুষের ধর্ম কখন সমান হবে না। যেমন ক্ষত্রিয়, একজন ক্ষত্রিয় রাজা, আরেকজন ক্ষত্রিয় মন্ত্রী, দুজনের ধর্ম সমান হবে না, তফাৎ একটু থাকবেই। ক্ষত্রিয় রাজা, তারই সন্তান রাজকুমার, দুজনের ধর্ম সমান হবে না। ক্ষত্রিয় যে রাজা, ক্ষত্রিয় যে রানী, দুজনের ধর্ম কক্ষণ সমান হবে না। কারণ ক্ষত্রিয় রাজা রাজার ধর্ম পালন করবে, অন্য দিকে তাকে স্বামীর ধর্ম পালন করতে হবে। ক্ষত্রিয় যে রানী, সে রানীর ধর্ম পালন করবে, আবার স্ত্রী রূপে স্ত্রীর ধর্ম পালন করবে। এখানেই ধর্ম কত ভাবে আলাদা হয়ে গেল। আসলে যত মানুষ তত ধর্ম দাঁড়িয়ে যাবে। সেটাকেই বলছেন স্বধর্ম।

মানুষের মধ্যে যখনই শোক মোহ আসে, বুঝতে হবে সে এখন যে জায়গাতে আছে সেখানে তাকে তার যে স্বধর্ম পালন করতে হবে, সেটা করতে গিয়ে সে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে দেখে, শোক মোহের কারণে তার সব কিছু কেমন যেন এলেমেলো হয়ে যাচ্ছে, একটা ঝড় এসে যেন সব উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। তখন এই প্রতিক্রিয়াটাই হয় –আমি আমার ধর্ম ছাড়লাম। আত্মহত্যার ক্ষেত্রে নিজের ধর্মকে বিসর্জন দেওয়াটা সব থেকে বেশী দেখা যায়। কেউ যখন আত্মহত্যা করতে যায়, বুঝতে হবে সে স্বধর্ম ছেড়ে দিয়েছে। কারণ প্রত্যেক মানুষের ধর্মই হল বেঁচে থাকা, ধর্মই হল বেঁচে থেকে একটা আদর্শ জীবনযাপন করা। মা তিরস্কার করে কিছু কথা বলেছে, সন্তান আত্মহত্যা করে নিচ্ছে; বাবা মোবাইল ফোন দেয়নি বলে ছেলে আত্মহত্যা করে নিল। ছেলে মানে সে এখন ছাত্র, ছাত্রের ধর্মই হল *ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ*, অধ্যয়ন করাটাই তার ধর্ম। সে এখন মোবাইল ফোন চাইছে, মোবাইল ফোন হল বিনোদন শিল্প, বিনোদন হল গৃহস্থের জন্য, গৃহস্থরা কিছুক্ষণ বিনোদন জন্য সময় ব্যয় করবে, এটা কোন দোষের না।

ইদানিং বয়স্ক মানুষদের দেখা যায়, জীবনের শেষের দিন গুনতে শুরু করেছে, কিন্তু এখনও মোবাইল ফোন খুলে সারাক্ষণ হোয়াটসাপ, ফেসবুকে চ্যাট করে যাচ্ছে, আলতু ফালতু জিনিস করে যাচ্ছে অমূল্য সময় নষ্ট করছে। তার মানে আপনি আপনার স্বধর্ম ছেড়ে দিয়েছেন। ছেড়েছেন, কারণ আপনার মধ্যে শোক আর মোহ আছে। মোহ কেন? আপনি বাড়ির সবার কাছ থেকে একটু মিষ্টি ব্যবহার, একটু মিষ্টি কথা প্রত্যাশা করছেন, একটু ভালবাসা চাইছেন, কমফর্ট লেভেলটা ঠিকঠাক রাখতে চাইছেন। বাচ্চা বয়স থেকে আমাদের ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, বয়স্ক মানুষ মানে একটা রোগ-শোক-জরার আখরা। তাও তো কোন মানুষ আগে থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছে না যে, একটা বয়স থেকে আমার এই এই সমস্যা আসবে। দ্বিতীয় হল, যেমনি আপনি গৃহস্থ ধর্ম পার করে বাণপ্রস্থে গেলেন, তার মানে পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছেন, এবার আপনি ভগবানের দিকে মন দিচ্ছেন না কেন? আপনি রোজ সকালে উঠে গীতা পাঠ, চণ্ডী পাঠ, কথামৃত পাঠ করছেন না কেন? আপনার পূর্বজরা তো এটাই করতেন, তাঁরা সারা জীবন শান্তিতে ছিলেন। ওনাদের তো কোন অশান্তি ছিল না, আপনার কোথা থেকে এত অশান্তি আসছে? ইদানিং বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষের জীবন খুব মসৃণ হয়ে গেছে, তাও আপনার মধ্যে এত জটিলতা কেন? একটাই কারণ, স্বধর্ম পালন করেননি। বৃদ্ধ বয়সে সবাই বলেন, আমার কষ্টের শেষ নেই। কেন কষ্ট হয়? স্বধর্ম পালন করেননি, সেইজন্য শোক আর মোহ আপনাকে বেঁধে ফেলেছে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মোহ বেঁধে ফেলে।

বলা হয়, বৃদ্ধদের মত বোকা আর কেউ হয় না। অথচ বিদেশে বলে, life begins at sixty। বিদেশে ষাট বছর হয়ে গেল, টাকা-পয়সা ভাল জমে গেছে, কারুর সাথে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীতা নেই, এবার সে জগৎ ঘুরতে শুরু করে। তার সাথে যত ইয়ং মেয়েদের জোগাড় করতে থাকে। তারপর এক-একটা দিন যেতে থাকে, আজ একটা দাঁত পড়ে গেল, কাল চোখে ছানি পড়ছে, পরশু হাঁটুতে বাত ধরেছে, হাঁটতে পারছে না। অন্য দিকে তরুণী মেয়ে এই বুড়োকে কি করে সামলাবে! সামলাতে গিয়ে এদিকে গোলমাল, সেদিকে গোলমাল হতে শুরু করে। যদি মনে করেন আপনার একটাই জীবন, তখন তো আপনি কাঁদবেন, আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। ভারতবর্ষে ইদানিং যে লেখাগুলো পত্রপত্রিকাতে বেরোচ্ছে, পড়ে আঁৎকে উঠতে হয়, মনে হয় এরাও এই সিস্টেমকে মেনে নিয়েছে – কি সিস্টেম? তোমার এই একটাই জীবন, যত পারো ভোগ করে নাও। তাহলে যখন কষ্ট পাও তখন তোমার চোখে কেন জল আসছে, কাঁদছ কেন? বলে ওটাও নাকি আনন্দের।

ভগবান বুদ্ধ যখন সিদ্ধার্থ ছিলেন, একদিন দেখছেন ওনার এক দাসী কাঁদছে। সিদ্ধার্থ জানেই না কান্না কাকে বলে। কান্না দেখে অন্য দাসীদের জিজ্ঞেস করছেন, 'এটা কি কোন নূতন ধরণের খেলা? আগে তো আমি এই খেলা দেখিনি? আমাকে খেলাটা শিখিয়ে দাও না কেন'। কোন কিছুর কারণে চোখে জল বেরোচ্ছে, সেটাও সিদ্ধার্থের মনে হচ্ছে খেলা। এরা বলবে, জগৎকে ভোগ

করতে গিয়ে যে চোখের জল বেরোচ্ছে, এটাও নাকি একটা আনন্দ। শূকরের মত নোংরার মধ্যে ঘঁৎ ঘঁৎ করে আনন্দ পাও, তাই পাও। আমরা তোমাকে এই আনন্দ পেতে নিষেধ করছি না। কিন্তু যেদিন জগৎ থেকে মার খাওয়া শুরু হবে, মার খেয়ে যখন দুঃখ, বেদনায় চোখে জল আসবে, সেই সময় যদি আমাদের কাছে আসো, তখন একটা কথাই তোমাকে বলা হবে। স্বধর্ম পালন করোনি কেন? যা হওয়ার হয়ে গেছে, এবার থেকে স্বধর্ম পালন কর।

এটাই আচার্য এখানে বলছেন। শোক মোহ সবারই হয়, কিন্তু যদি বেশী হয়ে যায়, তখন তা স্বধর্মকে চেপে দেয়। স্বধর্ম চাপা পড়ে গেলে প্রথম কাজ হবে *প্রতিষিদ্ধ্য*, অর্থাৎ যেটা তোমার ধর্ম নয় সেটা করার ইচ্ছা। যার বয়স হয়ে গেছে, যার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, সে বলছে আমি আর বাঁচতে চাই না, আমি মরে যেতে চাই। আমাদের হিন্দু ধর্মে, হিন্দু সমাজে কোথাও আত্মহত্যার অনুমতি দেওয়া হয় না। কেন আত্মহত্যা করতে চাইছে? কারণ সে স্বধর্ম পালন করেনি, যে বয়সে যে স্বধর্ম পালন করার কথা সেটা করেনি। অন্য দিকে আবার দেখা যায়, স্বধর্ম পালন করছে, শরীর, মন, বাণী দিয়ে কাজ করছে ঠিকই, কিন্তু কাজের ফলের প্রতি একটা তীব্র আসক্তি জন্মায়। যারাই রাজনীতিতে নামে, তারা সবাই চাইছে, আমি রাজা হব, আমাকে মন্ত্রী হতে হবে, এমএলএ হতে হবে। রাজনীতিতে নেমেছে, খুব ভাল, এটাই কর, কিন্তু মাথায় খালি ঘুরছে, কিভাবে এমপি হব, কিভাবে এমএলএ হব, কিভাবে মন্ত্রী হব, কিভাবে মুখ্যমন্ত্রী হওয়া যায়। এগুলো হওয়ার জন্য কাকে ফাঁসাতে হবে, কাকে তুলতে হবে, এসব নিয়ে সর্বদা অঙ্ক কষে যাচ্ছে আর চিৎকার চেঁচামেচি করে যাচ্ছে। সারা দেশে, সব রাজ্যে, এ তাকে গালাগাল দিচ্ছে, সে ওকে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছ। লোকসভা, বিধানসভা এসবের জন্য নয়, এটা হল সমস্ত দেশের, রাজ্যের জনগণের কল্যাণের জন্য। একদিকে স্বধর্ম ছেড়ে চলে যায় পরধর্মে, অন্য দিকে স্বধর্ম করছে ঠিকই, কিন্তু কামনা-বাসনা এত বেশী যে, কোথাও কারুর শান্তি নেই। ফলে পূণ্য ও পাপ দুটোই বাড়তে থাকে। যখনই আমরা কোন কাজ করি, সব কাজেই ভাল মন্দ মিশে থাকে। ভাল কিছু কর্ম করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে, খারাপ কর্ম করলে খারাপ ফল হবে।

এতক্ষণ আমরা অবিদ্যা, কাম ও কর্ম নিয়ে বললাম। কাম থাকলে কর্ম করতে হবে। মানুষ যখন নিজেকে ভুলে যায়, তখন হয় –আমি অপূর্ণকাম, আমাকে পূর্ণ হতে হবে। আমার টাকা নেই, টাকা হলে আমি পূর্ণ হব। নেমে গেলাম একটা চাকরিতে। আমার স্ত্রী নেই, স্ত্রী হলে আমি সুখী হব। ঠাকুর বলছেন, বাবা-মা ভাবে ছেলের বিয়ে দিলে একটা ছায়া হবে, জিরুতে পারবে। কিন্তু স্ত্রী তো এমনি হবে না, তার জন্য তাকে খাটতে হবে। তাকে এবার কাজ করার জন্য নামতে হবে। কাজ করা মানেই তার ভাল মন্দ ফল হবে। ভালমন্দ ফল হওয়া মানে, অবিদ্যা অজ্ঞান তার আরও বাড়বে। অবিদ্যা-কাম-কর্ম, এটা একটা cycle। একটা সার্কেলের মধ্যে এই তিনটে ঘুরতে ফিরতে থাকে। যত অবিদ্যা বাড়বে, তত নিজের স্বরূপকে ভুলে যাবে, যত নিজের স্বরূপকে ভুলে যাবে তত কামনা বাড়বে, কামনা যত বাড়বে তত কাজ বাড়বে। যত কাজ বাড়বে তত তার পাপপূণ্য ভালমন্দের ফল হবে। যত ভালমন্দের ফল হবে তত তার অজ্ঞান বাড়বে। এই সাইকেলের মধ্যেই সমস্ত মানুষ ঘুর ঘুর করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

এর জন্য আরও যেটা হয়, সেটা হল ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তি, স্বর্গনরক প্রাপ্তি। এই স্বর্গে যাচ্ছে, এই নরকে যাচ্ছে, একবার উপরে একবার নীচে ওঠানামা করতে থাকে, ফলে কি হয়, সংসারের নিবৃত্তি কখনই হয় না। ফলে জন্ম-মৃত্যুর চক্র, ওঠা-নামার চক্র চলতেই থাকবে। অনেকে এসে মহারাজদের বোকার মত প্রশ্ন করে, আচ্ছা মহারাজ, পুনর্জন্ম হয় ঠিক আছে, কিন্তু জনসংখ্যা কেন বেড়ে যাচ্ছে? এই প্রশ্ন নিয়ে কম্যুনিস্ট, লিবারাল, বুদ্ধিজীবিরা প্রায়ই হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করে। এদের কাছে ভগবান যেন সীমিত, দশটা আত্মাকে ছেড়ে দিয়েছেন। তাই তো নূতন কোথা থেকে আসছে? ভগবান অনন্ত, তাঁর সৃষ্টি অনন্ত, তাঁর আত্মা অনন্ত, জীব অনন্ত। কত মানুষ হবে? অনন্ত মানুষ হবে। এরা প্রশ্ন

করছে অনন্তকে, আর কোথা দিয়ে প্রশ্ন করছে? সীমিত দিয়ে। বিচিত্র বিচিত্র রকম প্রশ্ন, জনসংখ্যা কি করে বাড়ছে? একদিকে আপনি পুনর্জন্মের কথা বলছেন, আক্রমণ করা হচ্ছে অনন্তকে, কিন্তু যুক্তিকে নিয়ে আসছে সীমিত জিনিসের মাধ্যমে।

আচার্য বলছেন, সংসার নিবৃত্তি কিছুতেই হবে না, কারণ শোক মোহ থেকে মানুষ বেরোতে পারে না। একটাই উপায়, এই যে অবিদ্যা-কাম-কর্ম, অবিদ্যার যদি নাশ হয়। কর্মের নাশ হবে না, কারণ কর্মের যদি নাশ কেউ করে, তাহলে কাম তো ভিতরে থেকে যাবে। কামেরও নাশ হবে না, কারণ কামের বীজ হল অবিদ্যা, তাই অবিদ্যাকে পোড়াতে হবে। অবিদ্যাকে কিভাবে পোড়াবে? বিদ্যা দিয়ে। অজ্ঞানকে কিভাবে পোড়াবে? জ্ঞান দিয়ে। অন্ধকারকে কিভাবে নাশ করবে? আলো দিয়ে। আচার্য এখানে বলতে চাইছেন, আত্মজ্ঞান ছাড়া কোন পথ নেই এই অবিদ্যা নাশের।

এটাই আচার্য খুব সুন্দর করে বলছেন, *তয়োঃ চ সর্বকর্মসন্ন্যাসপূর্বকাদ্ আত্মজ্ঞানাদ্ ন অন্যত্রো নিবৃত্তিঃ ইতি*। অন্য কোন উপায় নেই, আত্মজ্ঞান যদি না হয়, তা আপনি সংসারে থেকে আত্মজ্ঞান করুন, বন্দুক চালিয়ে আত্মজ্ঞান করুন, সন্ন্যাসী হয়ে আত্মজ্ঞান করুন, তাতে কোন অসুবিধা নেই। তুমি কে? যদি এটা না জানো, তুমি সংসার-চক্রে ঘুরতে থাকবে। তুমি কালী দর্শন কর, তুমি বিষ্ণু দর্শন কর, তুমি অনন্ত স্বর্গে যাও, কোনটাতেই তোমার মুক্তি নেই।

আগেকার দিনে কিছু লোক ছিলেন, তাঁরা বলতেন কর্ম করা দরকার, বিশেষ করে বেদের বৈদিক কর্মগুলির অনুষ্ঠান করা খুব দরকার। আচার্য যুক্তি দিয়ে দেখাচ্ছেন, আত্মজ্ঞানীর কখনই কর্ম থাকতে পারে না। তিনি তাঁর বক্তব্যকে সিদ্ধ করার জন্য বেদ থেকে অনেক উদ্ধৃতি আনছেন, গীতা ও উপনিষদ থেকেও অনেক কোটেশান আনছেন। এখানে বলছেন, যিনি আত্মজ্ঞানী, তাঁর আর কোন কর্তব্য থাকে না। বর্তমান কালে এই যুক্তিগুলি আর দরকার পড়ে না। কিন্তু তখনকার দিনে বেদের ধর্মকে সবাইকে পালন করতে হত। আচার্য শঙ্কর বার বার বলছেন, যাঁর জ্ঞাননিষ্ঠা হয়ে গেছেন, যিনি বুঝে গেছেন ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, ঠাকুর যেমন বলতেন ঈশ্বরই সত্য বাকি সব অসত্য, তখন তাঁর জন্য এখন একটাই পথ, তা হল ঈশ্বরের দিকে যাওয়া, তাঁর আর ধর্মের দরকার পড়ে না।

এই কথা বলার পর আচার্য বলছেন, এই আত্মজ্ঞান ঠিক ঠিক যেটা দিয়ে হয়, সেটাকে বলে সাংখ্যবুদ্ধি। সাংখ্য মানে যেটা দিয়ে জিনিসটাকে ঠিক ঠিক বোঝা যায়। যাদের মধ্যে সাংখ্যবুদ্ধির উদয় হয়ে গেছে, তাদের জন্য হল ত্যাগের পথ। যাদের সাংখ্যবুদ্ধি হয়নি, তাদের জন্য কর্ম, সংসারের সব কর্ম যতটা পারা যায় অনাসক্ত হয়ে করা। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা মানে, কোন প্রকার কামনা-বাসনা থাকবে না, স্বার্থশূন্য হয়ে সব কাজ করা। সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ, এই দুটি পথ গীতাতে আগাগোড়া পরিষ্কার ভাবে চলতে দেখা যায়। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, এই দুটো ধর্মের আলোচনা করার সময় বলা হয়েছিল যে, আচার্য শঙ্কর পরিষ্কার করে এই দুটো ধর্মের কথা বলছেন ঠিকই, কিন্তু যদি গভীর ভাবে দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে প্রত্যেকটা প্রবৃত্তির পিছনে কোন না কোন ভাবে নিবৃত্তি লেগে থাকে। স্বামীজীও বলছেন, প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিই নিবৃত্তি। আমরা এর বেশী আর যাচ্ছি না, গীতায় যেমনটি আছে তেমনটি আলোচনা করে যাব।

রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা কত স্কুল, কত হাসপাতাল চালাচ্ছেন, রিলিফের কাজ করছেন, এসব দেখে অনেকে সম্মান দিয়ে বলেন, আপনারা হলেন কর্মযোগী। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের কোন সন্ন্যাসীই কর্মযোগী নন। এখানকার সমস্ত সন্ন্যাসী সাংখ্যযোগী। কর্মের মাধ্যমে কেউ মুক্তি চাইছেন না, তাঁদের কাছে জ্ঞাননিষ্ঠা পরিষ্কার। ঠাকুর নিত্য, এটা তাঁদের কাছে পরিষ্কার। সন্ন্যাসীরা যে জপধ্যান করছেন, সেটা ভক্তির জন্যই করেন। কর্মযোগী হলেন তাঁরা, যাঁরা মনে করছেন আমার এখন সুখভোগ বাকী আছে, আমি আরেকটু সুখ পেতে চাই। কিন্তু কোন সন্ন্যাসীই সুখ পেতে চান

না। যাঁরা আমাদের শাস্ত্রগুলি ঠিক ঠিক বুঝেছেন, জপধ্যান করছেন, চিন্তন মনন করছেন, এনারা সবাই সাংখ্যযোগী। এনাদের সবারই মন কিন্তু একটা স্তরকে অতিক্রম করে উপরের দিকে উঠে গেছে। কিন্তু পরিস্থিতি বা অন্য কোন কারণের হয়ত সংসারে পড়ে আছেন, সেখানে সংসার ধর্মটা পালন করছেন। উদ্দেশ্য হল, যত তাড়াতাড়ি সংসার থেকে মুক্তি পাওয়া। কথামৃতেও ঠাকুর বারবার এই কথাগুলো বলছেন। আসলে এনারা সবাই সাংখ্যযোগী, অর্থাৎ এনাদের জ্ঞাননিষ্ঠা হয়ে গেছে। কিন্তু ওই জ্ঞানটাকে ধরে রাখতে পারছেন না।

একটা জায়গায় আচার্য বলবেন, যাঁদের কাছে এগুলো সত্য বলে বোধ হয়ে গেছে, এই পথে যাঁরা পা রেখেছেন, তাঁরাও কিন্তু জ্ঞানী। কিন্তু যারা বলছে, আমার স্ত্রী-সুখ দরকার, আমি সন্তান-সুখ চাই, আমার বাড়ি-গাড়ি চাই, এদের যোগবুদ্ধির আশ্রয় করতে হবে। আবার যারা বলছে, অনেক হয়েছে আমার আর সংসারের কোন সুখ লাগবে না। কিন্তু তারপরেও হঠাৎ কোন প্রলোভন এসে গেল বা কোন বিপর্যয় হয়ে গেল, সে কি করবে? বলছেন, প্রত্যেক পদে পদে তো আপনি খাদে পড়ছেন, আপনি আবার নিজেকে সাংখ্যযোগী বলছেন? আচার্য শঙ্কর পরিষ্কার বলছেন, সাংখ্যযোগীরা যখন কোন ফাঁদে পড়ে, এরা তখন এই ভেবে খুব কষ্ট পায়, আমার পূর্ব পূর্ব জন্মের এমন কর্ম জমে আছে যে, এখনও আমি বারবার ভুল পথে, লোভের পথে চলে যাচ্ছি; হে ঠাকুর আমাকে রক্ষা কর, আমি যেন এগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে পারি।

কিন্তু যারা যোগবুদ্ধিতে আছে, যারা ঠিক ঠিক প্রবৃত্তিলক্ষণে আছে, লোভের কিছু পেলে তারা খুব আনন্দ পায়। একবার এক মহারাজ অন্য একজন মহারাজকে বাচ্চার মত বলছেন, 'মহারাজ আমাকে একটা কেক খেতে হবে, এমন কেক যেটা খুব দামী হবে, আর এমন কেক আমাদের এখানে কেউ কোন দিন খায়নি'। যে মহারাজকে বলছিলেন, শুনে তাঁর খুব হাসি পেয়ে গেছে। সন্ন্যাসীদের বাচ্চার মত বুদ্ধি, যেমনি কিছু মাথায় উঠেছে, ওটা এখন মাথায় ঘুরঘুর করতে থাকবে। সেই মহারাজ একজনকে বলে একটা নামকরা হোটেলে অর্ডার দিয়ে একটা স্পেশাল কেক ওনার জন্য নিয়ে এলেন। ওটা পেয়ে উনি খুব খুশী হয়ে গেলেন। কিন্তু তারপর ওই কেকের প্রতি তাঁর কোন আগ্রহই থাকল না, ওখানেই সব শেষ। কিন্তু তাঁর যদি যোগবুদ্ধি থাকত, তাহলে বলতেন, ওই যে কেক খেয়েছি, আবার যখন কেক খাওয়ার ইচ্ছা হবে, ওই কেকই খাবো, তার মানে মনটা ওই কেকের উপর পড়ে আছে। এই হল সাংখ্যবুদ্ধি আর যোগবুদ্ধির তফাৎ।

একটা ইচ্ছা হয়েছিল, বা কোথাও শুনেছেন ভাল কেক বলে কিছু একটা হয়, একটু টেস্ট করতে ইচ্ছে হল, করে নিলেন, চ্যাপ্টার ওখানেই ক্লোজড্, ভোগ করে ত্যাগ। গৃহস্থরা একটু ত্যাগ করে যাতে আরও ভোগ করতে পারে, এই তফাৎ। সন্ন্যাসীরা কাজ করেন ঠিকই, আর যদি জ্ঞানী হয়ে যান, যেমন স্বামী বিবেকানন্দ, এনারা অনেক সময় লোকসংগ্রহের জন্য অর্থাৎ মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করেন। সেইজন্য কর্ম কখনই শেষ পথ হতে পারে না। ঠাকুরও বলছেন, কর্মকাণ্ড আদিকাণ্ড। প্রথমের দিকে সবাইকে কর্ম করতে হবে, কিন্তু ধীরে ধীরে কর্ম থেকে সরে আসতেও হবে।

যাঁরা এই যোগ করবেন, তাঁরা কিভাবে করবেন? আচার্য বলছেন, *তত্ত্ববিৎ তু ন অহং করোমি ইতি মন্যতে। ন চ তৎফলং অভিসন্ধতে*। যাঁরা আত্মজ্ঞানী, তাঁদের কর্মের প্রতিও আসক্তি নেই, কর্মফলের প্রতিও আসক্তি নেই। শ্রীশ্রীমা একদিন বাগবাজারের গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে গেছেন। সেখানে এক ব্রাহ্মণকে একটা ফল দান করে বলছেন, 'এই ফল তোমার, এর ফলটাও তোমার'। মায়ের এত সুন্দর কথা, সেই ব্রাহ্মণ আদৌ বুঝতে পেরেছিলেন কিনা জানা নেই। একটা ফল দান করা হল, যাকে দান করা হল ফলটা তার, আর এই দানের যে একটা পূণ্য ফল, এটাও তোমার। এই কাজ আমাকে করতেই হবে, এই ভাব কোন সন্ন্যাসীর মধ্যে থাকে না। জগতের কল্যাণ

করাটাও সন্ন্যাসীদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। ইদানিং দূর্গাপূজা বা যে কোন বড় বারোয়ারী পূজায় ক্লাবের লোকেরা গরীবদের মধ্যে কম্বল বিতরণ, বস্ত্র বিতরণ করে। সেই কবে স্বামীজী শুরু করেছিলেন, জগতের মঙ্গলের জন্য তোমরা কিছু করো। এটা এখন পাড়ায় পাড়ায় লোকেরা করছে। *যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ,* শ্রেষ্ঠ মানুষরা যা করেন, সাধারণ মানুষরা তাই অনুকরণ করে। শ্রেষ্ঠ মানুষরা এইজন্যই কাজ করেন, যাতে সাধারণ মানুষ তাঁকে দেখে শেখে। মা-বাবাকে দেখে যেমন বাচ্চারা শেখে, ঠিক তেমনি শ্রেষ্ঠ পুরুষকে দেখে সমাজ শেখে। এইসব বলে আচার্য এই বিষয়টা এখানে শেষ করতে গিয়ে বলছেন, গীতা শাস্ত্রের শেষ কথা হল তত্ত্ব জ্ঞান থেকেই মুক্তি হয়, অন্য কোন কিছু থেকে মুক্তি হয় না।

সেইজন্য বলছেন, *তত্র এবং ধর্মসংমূঢ়চেতসো মহতি শোকসাগরে নিমগ্নস্য অর্জুনস্য অন্যত্র আত্মজ্ঞানাদ্ উদ্ধরণম্ অপশ্যন্ ভগবান্ বাসুদেবঃ ততঃ অর্জুনম্ উদ্দিধারয়িষুঃ আত্মজ্ঞানায় অবতারয়ন্,* ভগবান দেখছেন অর্জুন শোকমোহের সাগরে এমন ডুবে আছে যে, একে আর উদ্ধার করা যাবে না। এখন একমাত্র উপায় হল আত্মজ্ঞান দিয়ে এই শোকমোহের সাগর থেকে তুলে আনতে হবে। কোন সমস্যা হলে আমরা সবাই তার সমাধান খুঁজি। যাঁর কাছেই সমাধান চাইতে যাই, তিনি নিজেও কিন্তু আমার মতই। উপনিষদে বলছেন *অন্ধেনৈব নিয়মানা যথান্ধাঃ,* অন্ধ অন্ধকে পথ দেখায়। যে সমস্যাতে আমি আছি, সেই স্তর থেকে একটু ডানদিক বামদিক করে আমাকে সমাধান দিয়ে দেবেন। কিন্তু আমি যে স্তরে আছি, সেই স্তর থেকেই সমাধান আসে। যত পজিটিভ পাওয়ারের বই আছ, সব বই এই রকমই। কিন্তু যেখানে জীবনের কঠিন সমস্যা, সেখানে এভাবে কখনই সমাধান হয় না। সমস্যার সমাধান সব সময় হয় উপর থেকে। যে সমস্যায় আমি আছি, ওখানে থেকে ওই সমস্যার সমাধান কখনই হবে না। সমস্যাকে যদি ভাঙতে হয়, তাহলে ওর সার্কেল থেকে বাইরে এসে একটা হায়ার লেভেলে গিয়ে সমাধান দিতে হয়।

একজন টাকার জন্য কাঙাল। আর সত্যিই দুটো টাকা হলে ওর ভাল হয়। টাকা ওকে আয় করতে হবে। কিন্তু টাকা আয় করার পরেও ওর টাকার জন্য কাঙালিপনাটা দূর হচ্ছে না, আরও চাই, আরও চাই করে যাচ্ছে। এখন পরিস্থিতিটা দাঁড়িয়েছে, টাকাটা ওর প্রয়োজনীয় নয়, টাকার চাহিদাটা ওর একটা ব্যাধি হয়ে গেছে। অর্জুনের কাছে শোক মোহটাও একটা ব্যাধি হয়ে গেছে। চাহিদার সমুদ্রে যদি একবার কেউ ডুবে যায়, ওকে আর কেউ ওখান থেকে বার করতে পারবে না। একজন সমুদ্রে ডুবে আছে, আরেকজন যে সমুদ্রে ডুবে আছে, সে যদি এখন তাকে উদ্ধার করতে যায়, কোন দিন উদ্ধার করতে পারবে না। সমুদ্রের বাইরে যে আছে, সেই পারবে ওখান থেকে তাকে তুলে আনতে। সমস্যার মধ্যে কেউ পড়ে আছে, কেউ যদি তাকে সমাধান দিতে চায়, তাহলে তাকে ও বর্তমান যে পরিস্থিতিতে আছে সেই পরিস্থিতির বাইরে গিয়ে তার সমাধান দিতে হয়। এই জিনিসটাকে মাথায় রেখে ভগবান অর্জুনকে আত্মজ্ঞানের কথা বলছেন। তুমি এখন যে দুরবস্থায় আছ, আত্মজ্ঞানের শিক্ষা ছাড়া কোন অবস্থায় তুমি এই অবস্থা থেকে বেরোতে পারবে না।

স্বামীজী ভারতবর্ষের জন্য ঠিক এই ব্যবস্থাটাই অনুসরণ করলেন। ভারতবর্ষ দীন হীন কাঙালীর মত শোক মোহে ডুবে ছিল। বর্তমান ভারতবর্ষ থেকে স্বামীজীর সময়ের ভারতের দুরবস্থা আমরা কল্পনাই করতে পারি না। স্বামীজী ভারতের এই দুরবস্থা ঘোচাবার জন্য সব চেষ্টাই করলেন। তিনি রাজাদের কাছে গেলেন, বৃটিশদের দেখলেন, কিন্তু দেখছেন কোথাও কিছু সুরাহা হচ্ছে না। তিনি তখন ভারতের যুবকদের মধ্যে আত্মার উপদেশ দিতে শুরু করলেন –তোমার ভিতরেই অনন্ত শক্তি, তোমার ভিতরেই অনন্ত জ্ঞান, তুমি সিংহ, তোমার অতীত গৌরবের কথা স্মরণ কর। এইভাবে বেশ কিছু দিন প্রচার করতে করতে কয়েকজনের মধ্যে এই ভাবটা জেগে উঠল, এবং কয়েকজন সন্ন্যাসের পথ অবলম্বন করল। এইভাবে ভারতের কুলকুণ্ডলী জেগে উঠল। সেই থেকে ভারত উঠে

দাঁড়াতে শুরু করল, মাথা উঁচু করতে শিখল। তবে এখনও পুরোপুরি কুণ্ডলীনি জাগেনি, সময় লাগবে। এরপর ভারতকে কেউ আটকাতে পারবে না। অর্জুনকে যেমন কেউ আটকাতে পারল না।

উপমা সব সময় একদেশীয় হয়, একটা জিনিসকে দিয়ে আরেকটা জিনিসকে সংযোগ করে দেওয়া যায় না। কিন্তু অর্জুনের যে সমস্যা ছিল, সমষ্টি রূপে সেই সমস্যা দেশেরও ছিল। অর্জুনকে ভগবান যে সমাধান দিলেন, সেই সমাধান স্বামীজী দিলেন পুরো দেশের জন্য। ভগবান অর্জুনের মাধ্যমে মানবজাতিকে উপদেশ দিলেন, স্বামীজী নিজের কয়েকজন গুরুভাই, কয়েকজন শিষ্য আর ভারতের সেই সময়ের নামকরা কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিকদের উপলক্ষ করে ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য সমস্ত ভারতবাসীকে উপদেশ দিলেন আর সেখান থেকে মানবজাতির জন্য সমাধান দিলেন, কিসে তোমাদের সবার ভাল হয়। এই হল আচার্যের ভাষ্য। এরপর গীতা যেখান থেকে শুরু হবে, সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত এই দুটোর মধ্যে ঘুর ঘুর করবে –আত্মজ্ঞান ও কর্মযোগ। কর্মযোগ মানে পুরোদমে কাজ কর। কিন্তু ধীরে ধীরে ফলাকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা থেকে মনকে সরিয়ে আনো। এরপর মন ধীরে ধীরে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেলে তুমি আত্মজ্ঞানের দিকে চলে যাও। ভগবান অর্জুনকে বলছেন–

শ্রীভগবানুবাচ
অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।।**১১**।।

(শ্রীভগবন্ বললেন – যাঁদের জন্য শোক করা উচিত নয়, তাঁদের জন্য শোক করছ; অথচ প্রাজ্ঞের মত কথা বলছ। পণ্ডিতরা মৃত বা জীবিত কারও জন্য শোক করেন না।)

অর্জুন এতক্ষণ যত কথা বলে গেলেন, সব ধর্মের কথাই বলে গেলেন। কুলধর্ম নাশ হয়ে যাবে, বর্ণধর্ম ভেঙে যাবে, অহিংসা পরমো ধর্ম, আমরা অহিংসা থেকে সরে যাব, ইত্যাদি যত কথা বললেন সব কিন্তু ধর্মের কথাই বলে গেছেন। অর্জুনের যুক্তিতর্ক শুনে ভগবান হতবাক হয়ে গেছেন। তখন ভগবান বলছেন, তুমি জ্ঞানীদের মত কথা বলছ, ধর্মের কথা বলছ ঠিকই; কিন্তু তুমি মূল ব্যাপারটাই ভুলে যাচ্ছ। যাঁরা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার অধিকার যাঁদের আছে, তাঁরা সবাই *গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ*, পণ্ডিতরা যেটা চলে গেছে সেটাকে নিয়েও তাঁরা শোক করেন না, আর যেটা আসছে না, সেটাকে নিয়েও শোক করেন না, জীবিত বা মৃত কারুর জন্য শোক করেন না। তুমি একদিকে জ্ঞানী, পণ্ডিতদের মত কথা বলছ, অথচ অন্য দিকে তুমি শোক করছ। পণ্ডিতদের মত কথা বলে যাচ্ছ, কিন্তু পণ্ডিতদের মত যে তুমি আচরণ করবে, সেটা তোমার মধ্যে নেই। তোমার কথাগুলো পণ্ডিতের মত, কার্যগুলো পণ্ডিতের মত না। এই রকম কারা করে? উন্মত্ত যারা, যারা পাগল। তুমি এখন পণ্ডিতও না, ক্ষত্রিয়ও না, তুমি একটা উন্মত্ত।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় সূত্রাকারে রাখা হয়েছে, অর্থাৎ খুব সংক্ষেপে কয়েকটা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। এগুলোকেই পরে তৃতীয় অধ্যায় থেকে সপ্তদশ অধ্যায় পর্যন্ত ভগবান বিস্তার করে গেছেন। প্রথম ভাব হল, অবসাদ, যেটা প্রথম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের এগারো নম্বর শ্লোক থেকে শুরু হয় আত্মার স্বরূপ। কয়েকটা শ্লোকে আত্মার স্বরূপ সূত্রাকারে বলে শুরু করবেন স্বধর্ম, কর্মযোগ, স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ; গীতা এইভাবে চলতে থাকবে।

এগারো নম্বর শ্লোকের ব্যাখ্যা করার আগে কয়েকটা কথা আমাদের মনের মধ্যে বসিয়ে রাখলে খুব ভাল হয়। প্রথম কথা হল, আমাদের জ্ঞান কিভাবে হয়? কিভাবে আমাদের উপলব্ধি হয়? উপনিষদের ঋষিরা একটা খুব সুন্দর শব্দ ব্যবহার করতেন, তা হল বিদ্যা। আমরা এখন বিদ্যা বলতে যা বুঝি, এই বিদ্যা তা নয়। উপনিষদের বিদ্যা একটা টেকনিক্যাল টার্ম। আমরা সব কিছুতে বিদ্যা শব্দ জুড়ে দিয়ে বলি, আত্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা আবার শস্ত্রবিদ্যাটাও একটা বিদ্যা। উপনিষদে এর

বাইরে আরও বিদ্যা আছে, যেমন দহরবিদ্যা, শাণ্ডিল্য বিদ্যা, ইত্যাদি। কিন্তু ঈশ্বরবিদ্যা, ভক্তিবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা নেই। বিদ্যার অর্থ, একটা জিনিসকে নিয়ে যখন কালচার করা শুরু হয়।

আমাদের সমগ্র জীবনটাই যেন একটা ট্রেনিং। ট্রেনিং দিয়ে দিয়ে যখন একটা জায়গায় চলে এলো, তখন হঠাৎ একটা কিছু, যেখানে তার উপলব্ধি হয়ে যায়। উদাহরণ দিলে জিনিসটা বোঝা যাবে, ভারতে শেষ বড় যুদ্ধ হয়েছিল ১৯৭১ সালে, যদিও কিছু দিন আগে কার্গিল যুদ্ধ হয়েছিল, তবে এই যুদ্ধ অত ব্যাপক ভাবে হয়নি। কিন্তু ১৯৭১ সালের আগেও এবং ১৯৭১ সালের পরেও মিলিটারিতে আগা থেকে মাথা পর্যন্ত পুরো ট্রেনিং দিয়ে দিয়ে একেবারে তৈরী করে রাখা হয়েছে। হঠাৎ কিছু একটা হয়ে গেলে, বা এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে গেলে, তখন এতদিনের যে ট্রেনিং, তার সাথে প্রস্তুতি, সবটাই পল্লবিত হয়ে ওঠে। জীবনে আমরা যা কিছু করছি, সবটাই যেন এক বিদ্যার সাধনা। জীবনের সব কিছু যদি বিদ্যার সাধনা না হয়ে থাকে, তাহলে পুরো জীবনটাই যেন বৃথা হয়ে যায়।

এক একটা বিদ্যার সাধনা যেন এক এক ধরণের ক্ষেতের চাষ। ধান চাষের জন্য মাটি, সার, জল এক রকম দরকার, আবার আলু চাষের জন্য অন্য ধরণের মাটি, সার, জল দরকার। ঈশ্বর বীজ ছড়াতে থাকেন। কার ক্ষেত কেমন প্রস্তুত, সেই অনুসারে তিনি বীজগুলি ছড়িয়ে দেন, সেখান থেকে আমরা ফসল পেয়ে যাই। যিনি ব্রহ্মোপসনা করছেন, ব্রহ্মবিদ্যাকে নিয়ে সাধনা করে যাচ্ছেন, করতে করতে তাঁর ব্রহ্মজ্ঞানের প্রস্তুতি হয়ে গেছে। অন্য কিছু ওখান থেকে আর ফল হয়ে বেরোবে না, ফলবে ওই একটাই জিনিস। তিনি অন্য কিছু যদি হতে যান, যদি একজন বড় লেখক হতে চান, তা তিনি আর হতে পারবেন না। যিনি কবি বা সাহিত্যিক হতে চান, তাঁকে ওই বিদ্যারই উপাসনা করতে হবে, যেটাকে আমরা বলে থাকি, সাহিত্যের সাধনা, কবিতার সাধনা। কিন্তু এখানে আমরা ঠিক সাধনা জিনিসটাকে নিয়ে বলছি না, বলছি বিদ্যাকে নিয়ে নিজের একটা প্রস্তুতি। ওই প্রস্তুতি হয়ে গেলে, ভগবান সেখানে একটা বীজ ফেলে দেন। কখন তিনি ফেলেন আমরা বুঝতেও পারি না। যতক্ষণ না তিনি বীজ ফেলছেন, ততক্ষণ তার ফসল হবে না। আর ক্ষেত যদি তৈরী না থাকে তাহলে কিন্তু বীজ কোন দিন আসবে না। অনেক সময় ভগবান ধ্যানের গভীরে একটা কিছু দিয়ে দেন। সবাইকে তিনি এভাবেই দেন। যখন দেন, তখন কেউ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত একজন বড় কবি হয়ে যান, কেউ নিউটন বা আইনস্টাইনের মত একজন বড় বিজ্ঞানী হয়ে যান।

অন্য আরেকটা হয়, যেমন অর্জুনকে তিনি দিয়ে দিলেন, সেখান থেকে তাঁর শক্তি এসে গেল। এই যে এতদিন ধরে অর্জুনের একটা দীর্ঘ প্রস্তুতি ছিল, পরে যেমন ভগবান বলবেন, *সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্,* সারা জীবন ব্যাপী তোমার ক্ষত্রিয় ধর্মের প্রশিক্ষণ হয়েছে, এখন তার ফসল কাটার সময় হয়েছে, এখন তোমার আর কোন ভাবেই পিছিয়ে যাওয়া চলবে না। ঠাকুরও যখন তোতাপুরীর কাছে অদ্বৈত সাধনা করতে গেলেন, তিনিও পিছিয়ে যাচ্ছেন, তোতাপুরী ঠাকুরকে ঠেলে এগিয়ে দিলেন। সেই কথাগুলিই পরে সাধনার উপায় হয়ে যায়, যে কোন একটা উপায়ে আমাদের মনকে চাষ করানো নিয়ে কথা। আর অনেক সময় ওই কথাগুলিই আমাদের ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের এটাই বৈশিষ্ট্য।

এই অধ্যায়ে অনেক বিদ্যার কথা বলা হয়েছে, বিদ্যা শব্দটা যদিও নেই, প্রত্যেকটি শ্লোকের আলাদা করে একটা বিশেষ দাম আছে। যদিও প্রত্যেকটি শ্লোকের সাথে প্রত্যেক শ্লোকের যোগসূত্র আছে, কিন্তু সবটাই সূত্রাকারে আছে। এই সূত্রগুলির কিছু তৃতীয় অধ্যায়ে, কিছু চতুর্থ অধ্যায়ে, কিছু পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তার করে বলবেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কথাগুলি সূত্রাকারে রয়েছে। এর যে কোন একটা শ্লোকের ভাবকে আধার করে কেউ যদি ধীরে ধীরে নিজের জীবনকে সেই ভাবানুযায়ী গড়তে শুরু করে, সেটাই তখন হয়ে যাবে বিদ্যার সাধনা। এই বিদ্যার সাধনা করতে করতে একটা সময়

আসবে, যখন তিনি কৃপা করে তাকে আসল বীজটা দিয়ে দেবেন, তখন ওই ভাবটা পুরো খুলে যাবে। এই ভাব নিয়ে আমরা এগারো নম্বর থেকে বাহাত্তর নম্বর পর্যন্ত যাব। এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে, এর যে কোন একটা ভাবকে নিয়ে আমাকে কোথাও না কোথাও গিয়ে সাধনা করতে হবে। আমার মন যেন একটা বিশাল ক্ষেত্র, সেখানে আমি চাষ করছি।

এই এগারো নম্বর শ্লোক থেকে শুরু হয় আত্মবিদ্যা, আত্মা কি, আত্মার বৈশিষ্ট্য কি, এই জিনিসগুলোকে নিয়েই এখন বলতে শুরু করবেন। এগারো থেকে তিরিশ নম্বর শ্লোকগুলি খুব সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হওয়ার জন্য আমাদের ধারণা করতে কঠিণ হবে। খুব সংক্ষেপে মূল চাবিকাঠিটাকে (master key) যদি বলে দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের সবটা বুঝতে সুবিধা হবে। বিশ্বের সব ধর্মকে এক জায়গায় নিয়ে এসে বোঝার চেষ্টা করতে হয়, কিভাবে ধর্মগুলি এসেছে, আর ওদের জীবনদর্শন এবং আধ্যাত্মদর্শন কি, এগুলোকে ভাল করে বুঝতে হয়।

একটা কথা আমরা বিভিন্ন সময় আলোচনা করেছি, যে কোন দর্শন, এবং যারা বস্তুবাদী, যারা বিজ্ঞানবাদী, তাদের সবাইকে তিনটে জিনিসের ব্যাখ্যা করতে হবে – জীব, জগৎ এবং ঈশ্বর। দর্শন মানেই, তাঁকে এই তিনটে জিনিসকে ব্যাখ্যা করতে হবে –আমি কে, জগৎ কি এবং ঈশ্বর কি। যেমন বস্তুবাদীরা বলবে, ঈশ্বর বলে কিছু নেই, দ্বিতীয় বলবে জীবের জন্ম জগৎ থেকে, মৃত্যুর পর এই জগতেই জীব আবার মিশে যাবে। বিভিন্ন ধর্মে আবার ঈশ্বরের অবধারণা পাল্টে যায়, যেমন যেমন পাল্টায় তেমন তেমন জীব ও জগতের অবধারণা পাল্টাতে থাকে। মধ্যপ্রাচ্য এশিয়ার ধর্মের এই জিনিসগুলিকে বিভিন্ন পণ্ডিতরা বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেন। অতি প্রাচীন ধর্মগুলি, যে ধর্মগুলি এখন প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গেছে, তাঁরা সেগুলোকেও নিয়ে আসেন। এখানে ইতিহাসের আলোচনা করাটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তবে এগুলো জানা থাকলে আমাদের অনেক কিছু বুঝতে সুবিধা হবে।

জুহুদি, খ্রীশ্চান ও ইসলাম এই তিনটে ধর্ম ইজরাইল, আরব আর ইরানের মাটিতে জন্ম নিয়েছে। পার্সি ধর্ম বা জরাথ্রুয়ান ধর্ম সরাসরি হিন্দু ধর্মের সাথে যুক্ত, কারণ এই দুটো ধর্মের শব্দগুলির মধ্যে, ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলিতে প্রচুর মিল পাওয়া যায়। পণ্ডিতরা বলেন জরুথ্রিয়ান ধর্ম স্বাধীন ধর্ম, নিজের মত হয়েছে। কিন্তু চারটে ধর্ম একই এলাকার। বাকি তিনটে ধর্মকে নিয়ে এনারা খুব মজার ব্যাপার বলেন, এই তিনটে ধর্মের মূল সূত্র আসে ব্যবিলন থেকে। পণ্ডিতরা যেটা বলেন সেটা আমাদের মেনে নিতে হয়, তর্ক করার কিছু নেই। পণ্ডিতরা বলেন যে, ব্যবিলিয়ান ধর্মের যে বৈশিষ্ট্য ছিল, সেই বৈশিষ্ট্য আজকে আমরা ইসলাম ধর্মে পুরোদমে পাই। তখনকার দিনে অন্যান্য যে ধর্মগুলি ছিল, যেমন গ্রীক, রোমান; এদের নানা রকম দেবী-দেবতা ছিল, যাদেরকে তাঁরা পুজা করতেন। এক এক দেবী-দেবতার জন্য এক একটা মন্দির ছিল, আমরা যেমন বলি কাশীর মন্দির হল শিবের মন্দির, বৃন্দাবন কৃষ্ণের স্থান। গ্রীক, রোমানদের দেবী দেবতারা যেন এক একটা স্থানে জেঁকে বসেছিল, সেই স্থানে সেই দেবতাদের মন্দির থাকত, সেখানে সবাই আহুতি দিত, পুজা আদি করত।

ব্যবিলিয়ান ধর্ম পুরো আলাদা। ব্যবিলিয়া ধর্মে যে জিনিসগুলি পূজারীরা করেন, অর্থাৎ ধর্মের শ্রেষ্ঠ পুরুষরা যা করেন, সেটাই সাধারণ মানুষরাই করতে শুরু করে দিল। মনুস্মৃতিতে মনুও পরিষ্কার ঠিক এটাই বলছেন, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরা যা করেন, সেটা সবারই করা দরকার, এইভাবে করতে করতে যারা নীচে পড়ে আছে, যেমন শূদ্রাদি জাতি, তারাও ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসবে। এই সংস্কৃতি ভারতে ছিল। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক বা প্রাচীন রোম সংস্কৃতিতে এই জিনিসটা ছিল না। ব্যবিলিয়ানরা অনেক রকম শুদ্ধিকরণ, শুদ্ধাচার করত, ধীরে ধীরে এই জিনিসগুলি সবাই করতে শুরু করল। ভারতে যেমন পুরোহিতরা রোজ সকালে স্নান করবে, পূজা অর্চনাদি করবে, যদিও এটা যে শুধু পুরোহিতদেরই করা উচিৎ, তা নয়, প্রত্যেক হিন্দুরই এগুলোই করার কথা, এটাই তাদের কর্তব্য।

সেখান থেকে ওনারা ঈশ্বরের অবধারণাকে নিয়ে গেলেন এই জগতের বাইরে, তিনি উপরে কোথাও আছেন। যেটা আজকে আমরা জুদাইজিম, ইসলাম ও খ্রীশ্চান তিনটে ধর্মেই পাই। তার থেকে আরও যেটা বড় কাজ করলেন, সেটা হল, মন্দিরগুলোকে মূর্তিমুক্ত করে দিলেন, মন্দিরে কোন মূর্তি নেই। ভগবান যিনি এতদিন মাটিতে গেঁড়ে বসেছিলেন, তিনি এবার উপরে চলে গেলেন। ইতিহাসবিদদের মতে, এই ভাবগুলি ধীরে ধীরে এই তিনটে ধর্মেই ছড়িয়ে গেল। ফলে একটা নৈর্ব্যক্তিক ভাব, যেটা মূর্তির বাইরে চলে গেল, ভগবান উপরে transcendent, আমাদের বাইরে, কিন্তু তিনি হলেন সব কিছুর নিয়ন্তা। এতদিন যে দেবী দেবতারা জগতের বিভিন্ন জিনিসগুলি সামলাতেন, এখন থেকে ভগবান একাই সব কিছু সামলাতে শুরু করলেন। এ্যব্রাহামকে নিয়ে অনেক কাহিনী আছে, তবে এগুলো কাহিনী না আখ্যায়িকা, আমাদের জানা নেই। এই কাহিনীগুলিকে দিয়ে একটাই জিনিস বোঝান হয় যে, এক ঈশ্বরই আছেন। মধ্যপ্রাচ্যের চারটে ধর্মই, জুহুদি, খ্রীশ্চান, ইসলাম ও পার্সি, এক ঈশ্বরকে অর্থাৎ একেশ্বরবাদকে নিয়ে চলে। গীতা বুঝতে গেলে এই জিনিসগুলি আমাদের অনেক সাহায্য করবে।

এটাই ভারতভূমিতে এসে চারটে বড় ধর্মের জন্ম –হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ। ভারতে এসে কি হল, যদি আমরা গভীরে গিয়ে দেখি তখন দেখা যাবে, এই চারটে ধর্মে ভগবান আছেন অথচ নেই। কিন্তু একেশ্বরবাদ এই চারটে ধর্মের কোনটাই নেয়নি। একেশ্বরের বদলে আসছে, ঈশ্বর থাকুন, নাই থাকুন, ঈশ্বর সর্বভূতে থাকুন, সর্বব্যাপী থাকুন, অনন্ত থাকুন, সীমিত থাকুন, স্বর্গে থাকুন, স্বর্গের বাইরে থাকুন, ঘুরে ফিরে হল আমিই সেই আত্মা, এই দেহটা আমার নশ্বর এবং আত্মা অবিনশ্বর। সুতরাং দেহের কোন গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব হল আত্মার, চারটে ধর্মই এই একটি কথাই বলবে। এরপর বলবেন, কোন ভাবে আমি এই শরীরের মধ্যে ফেঁসে আছি, এখান থেকে আমি বেরোতে পারব না, জন্মজন্মান্তর ধরে এই অবস্থা চলতে থাকবে, যতক্ষণ না আমার মুক্তি হয়ে যাচ্ছে।

চারটে ধর্মে কয়েকটা সাধারণ জিনিস আছে, তার মধ্যে প্রথম হল এই দেহটা শেষ কথা না। দ্বিতীয় সাধারণ ভূমিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, মৃত্যুতে আমাদের কারুরই মুক্তি হবে না, চারটে ধর্মেই এই ধারণা আছে। ঈশ্বরের যে ধারণা আর জীব, জীবাত্মা যিনি ভিতরে আছেন, তার ধারণা একটু আলাদা। মধ্যপ্রাচ্য এশিয়ার যে চারটে ধর্ম, তাঁদের কাছেও শরীর সব কথা না এবং মৃত্যুই শেষ নয়। কিন্তু এই দেহটা মৃত্যুর আগে পর্যন্ত যা কিছু করছে, সেটাই হল শেষ কথা। কারণ তার কর্ম দিয়েই তারা বিচার করে দেখবে, মৃত্যুর পর তার কি হবে, কাহিনী এখানেই শেষ। এক কথায় এর অর্থ হল, আমরা পুনর্জন্ম মানি না। ফলে এই চারটে ধর্ম সব দিক দিয়ে আলাদা হয়ে যায়, গুণগত ভাবে আলাদা হয়ে যায়, তার জীবনদর্শন আলাদা হয়ে যায়। পুনর্জন্ম না মানাটা পতনের দিকে ঠেলতে ঠেলতে এই জায়গায় নিয়ে আসে, যেখানে তারা বলা শুরু করে, জীবন একটাই, মরে গেলে সব শেষ, সেইজন্য যত দিন বাঁচব লুটেপেটে নাও, পুলিশ ধরতে না পারলেই হল। আজকে সারা বিশ্ব যে বিপদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছ, শুধু এই ভাবের জন্য।

হিন্দুদের পুনর্জন্মবাদের দোষ হল, এই জন্মে পাপ করে নাও, পরের জন্মে না হয় প্রায়শ্চিত্ত করে নেওয়া যাবে। এই নয় যে এটা ভাল, ওটা খারাপ, দুটোতেই দোষ পাওয়া যাবে। কিন্তু এই আটটি মূল ধর্মের একটা সাধারণ পয়েন্ট হল, মৃত্যুই শেষ নয়। মৃত্যু হল অন্য জীবন শুরু করার দরজা। কোন ধর্ম কক্ষণ ধর্মই হবে না, যদি না সেই ধর্ম মৃত্যুর পরের জীবনকে বিশ্বাস করে। আমি যদি বলি মৃত্যুর পর কিছু থাকে না, অন্য দিকে বলছি আমি ধর্ম মানি, সেই ধর্ম কোন ভাবেই ধর্ম হবে না। ধর্ম মানে, মৃত্যুর পরেও তুমি কোন না কোন ভাবে থাকবে। কিভাবে তুমি থাকবে সেটা অন্য প্রশ্ন। মধ্যপ্রাচ্যের ধর্ম বলবে, তুমি এই জন্মে ভাল মন্দ যা করেছ, সেই অনুসারে তোমার সব হবে। হিন্দুরা বলবে এটা তোমার চলতে থাকবে। এটা একটা অন্য বিষয়, এই বিষয় যখন আসবে তখন আমরা আরও বিস্তারে আলোচনা করব, কেন হিন্দুরা পুনর্জন্ম মানে।

এখন জীবাত্মাকে মানলে, অর্থাৎ শরীরের পিছনে একটা কিছু আছে, তখন তিনটে সিদ্ধান্ত এসে যাবে। এই তিনটে সিদ্ধান্তকে আমাদের ভাল করে বুঝে নিতে হবে, নাহলে আমরা এগারো থেকে তিরিশ নম্বর শ্লোক বুঝতে পারব না। কারণ গীতাতেই এক জায়গায় এক রকম বলবেন, অন্য জায়গায় অন্য রকম বলবেন, ফলে আমাদের সংশয় আসতে পারে। প্রথমটা হল দেহাত্মা, দেহই আত্মা। তার মানে দাঁড়ায়, শরীর ভিতর চৈতন্য রূপে যিনি আছেন, তিনি থাকলেও মৃত্যুর পর দেহের সাথে disintegrate করে শেষ হয়ে যান। এটা হল প্রথম একটা সিদ্ধান্ত, দেহটাই আত্মা। দ্বিতীয়টা হয় জীবাত্মা, জীবাত্মা হিন্দুদের খুব সাধারণ বিশ্বাস। আমার ভিতরে এক চৈতন্য সত্তা আছেন, মৃত্যুর পর এই জীবাত্মাই স্বর্গে যায়, নরকে যায় বা পাতালে যায়, বিভিন্ন জন্মান্তরে যায়। এই দুই নম্বর সিদ্ধান্ত জীবাত্মা, জীবাত্মার ধারণা হিন্দুদের বৈশিষ্ট্য। তিন নম্বর সিদ্ধান্তও খুব গুরুত্বপূর্ণ, তা হল আত্মা। দেহাত্মা, জীবাত্মা আর শুদ্ধাত্মা, শুদ্ধাত্মার একটাই পরিভাষা – তিনি অনন্ত।

ভগবান এগারো নম্বর থেকে যখন বলতে শুরু করবেন, তখন তিনি একবার জীবাত্মা, আর-একবার শুদ্ধাত্মা, এই দুটোর মধ্যে বাচ খেলতে থাকবেন। একটা দুটো ক্ষেত্রে দেহাত্মা নিয়ে আসবেন শুধু অর্জুনকে বোঝানর জন্য যে, যদি তুমি এটাকেও মানো তাও তোমার যুদ্ধ করা দরকার, কিন্তু ততটা গুরুত্ব নয়। প্রথম ধারণা দেহাত্মা, এটা হল লৌকিক লোকেদের জন্য। চতুর্থ আরেকটা ধারণা পাওয়া যায়, যে ধারণা সেমেটিক ধর্মগুলিতে রীতিমত আছে। তাদের কাছে এটা দেহাত্মাও নয়, জীবাত্মাও নয়, এটা একটা সোল্, এই সোল্ মানে হিন্দু বা ইণ্ডিক ধর্মের আত্মা নয়। সোল কিছুটা আমাদের সূক্ষ্ম শরীরের সাথে মেলে। জীবাত্মা যিনি আমাদের শরীরের সূক্ষ্ম জিনিসের সাথে জড়িয়ে রাখেন, এটাই ওদের সোল। সেমেটিক ধর্ম বলে, এই সোল শরীর ধারণ করে ঠিকই, কিন্তু একবারই সে শরীর ধারণ করবে। হিন্দু ধর্মের সাথে আরও যে তিনটে ইণ্ডিক ধর্ম আছে, এই চারটে ধর্ম একেবারেই এই মতকে মানে না।

আমরা এইভাবে মোট চারটে মত পেয়ে যাচ্ছি। দেহাত্মা, জীবাত্মা, জীবাত্মা থেকে আরেকটা মত হল সোল, সোল শুধু একবারই দেহ ধারণ করতে পারে, আর শেষে হল শুদ্ধাত্মা। হিন্দুরা জীবাত্মা একবারই শরীর ধারণ করে, পুনর্জন্ম বলে কিছু নেই, এই ধারণাকে অত্যন্ত অযৌক্তিক মনে করে। আমি মন্দ কাজ করি, ভাল কাজ করি, তার ফল আমি পাব। এখন সীমিত কাজ করে অসীম ফলভোগ এটা একেবারেই অযৌক্তিক। এই দেহে যে একশ বছর বেঁচে থেকে মারা গেল, তার তাও একশ বছর ভাল মন্দ কাজের ফল ভোগ করল; কিন্তু যে কুড়ি বছরে মারা গেল, প্রথম ছয় বছর তার ভালমন্দের কোন জ্ঞানই হয়নি, ষোল বছরের ভাল-মন্দ কাজের জন্য অনন্ত ফল ভোগ, একেবারেই অযৌক্তিক। অন্য দিকে চোদ্দ বছরে কোন একটা ভাল কাজ করল, আর তার জন্য তাকে অনন্ত সুখ দেবে, এটাও যুক্তিতে দাঁড়ায় না। আবার চোদ্দ বছরে কোন ভুল করেছে, যার জন্য তাকে অনন্ত কালের জন্য নরকে যেতে হবে, এটাও কোন ভাবেই যুক্তিতে দাঁড়ায় না।

জীবাত্মার ধর্ম হল, সে কেবল শরীর ধারণ করতে থাকে। যেমন কর্ম করবে, যেমন চিন্তা-ভাবনা করবে, মৃত্যুর পর সেই অনুযায়ী সে শরীর ধারণ করবে। সেখানে গিয়ে সে আবার নূতন কর্ম করবে, সেই কর্মের জন্য তার আবার পাপ-পূণ্য হবে। ওই পাপ-পূণ্য অনুসারে তার মনে ভোগ-বাসনা আদি উৎপন্ন হবে। সেখান থেকে সে মৃত্যুর পর আবার নূতন দেহে যাবে। মৃত্যুটাও মন্দ কিছু না, এটা একটা running stage, যেমন আমরা ঘুমোই। ঘুম ভাঙার পর আমাদের জীবনটা যেমন আগের মতই চলতে থাকে, ঠিক তেমনি মৃত্যুর পরে জীবনটা চলতে থাকে। ঘুমনোটা খুব অল্প সময়ের জন্য হওয়াতে আমরা সব কিছু মনে রাখতে পারি, মৃত্যুর সময়টা বিরাট লম্বা, সেইজন্য মনে রাখা যায় না। এখন পুনর্জন্ম মানা ঠিক, নাকি মানা ঠিক নয়, এই যুক্তিতর্কের মধ্যে আমরা যাচ্ছি

না। পুনর্জন্মের পক্ষে সব রকম প্রমাণই আছে, যুক্তিগত প্রমাণ আছে, লোকেরা যারা দেখেছেন, তার প্রমাণ আছে, গীতাও বলবেন ঋষি, যাঁরা শুদ্ধ মনের অধিকারী তাঁরাই পুনর্জন্ম দেখতে পান।

এগারো নম্বর শ্লোকের খুব সহজ অর্থ হল, অর্জুন, তোমার কথাগুলো এলেমেলো কারণ যাদের জন্য শোক করা যায় না, তাদের জন্য তুমি শোক করছ, অথচ তোমার কথাগুলো পণ্ডিতের মত। যাঁরা ঠিক ঠিক পণ্ডিত, তাঁরা, *গতাসূনগতাসূংশ্চ*, যেটা চলে গেছে তার জন্যও শোক করেন না, যেটা আসছে না, তার জন্যও শোক করেন না, অথচ তুমি পণ্ডিতের মত কথা বলছ। এই হল এই শ্লোকের সহজ অর্থ। কিন্তু আরও গভীরে গেলে কিছু জিনিস পরিষ্কার হয়। যেমন বলছেন ভীষ্ম দ্রোণের মত গুরুজনরা শোকের যোগ্য নন। তা কি কখন হতে পারে? এই গুরুজনরা মারা যাবেন, এতে কি শোক হবে না? এই জীবনের কি কোন দাম নেই? নিশ্চয়ই জীবনের দাম আছে।

আচার্য শঙ্কর এখানে একটি শব্দে পুরো জীবনদর্শনকে দাঁড় করিয়ে দিলেন, বলছেন, *সদ্‌বৃত্তত্বাৎ*, তিনি সারাটা জীবন সদ্‌বৃত্তি অবলম্বন করে এসেছেন, সেইজন্য তাঁকে নিয়ে শোক করা যাবে না। এই হল জীবনদর্শন। আমরা বারবার একটা কথাই সব সময় বলে থাকি, জীবনের দিকে তাকাবেন না, জীবনদর্শনের দিকে তাকান। যদি জীবনের দিকে আদপে তাকাতে হয়, শুধু একটা জিনিস দেখতে হবে সদ্বৃত্তি আছে কিনা। তুমি জন্ম নিলে, জন্ম নেওয়ার একটা ধারাতে এসে গেলে, এখন দেখতে হবে তুমি সদাচারী কিনা, আচার ঠিক মত করছ কিনা। কারণ এই সদ্‌বৃত্তিই তোমাকে উপরের দিকে নিয়ে যাবে। আমরা একটু আগে আলোচনা করছিলাম আত্মার তিনটে রূপ –একটা দেহাত্মা, এর কোন দাম আমাদের কাছে নেই। সেইজন্য দেহাত্মা নিয়ে বেশী কিছু বলবেন না, কিন্তু জীবাত্মাকে নিয়ে ভগবান প্রথমের দিকে কিছু কিছু বলবেন, তারপর থেকে জীবাত্মা আর শুদ্ধাত্মার মধ্যে বাচ খেলবেন।

আমরা যদি নিজের জীবনের দিকে তাকাই, প্রথমে আমি একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়তাম, সেখান থেকে মিডল স্কুল, তারপর হাইস্কুল। হয়ত অনেকে একই স্কুলে পড়েছেন, অনেক বিভিন্ন স্কুলে পড়েছেন। যাঁরা বিভিন্ন স্কুলে পড়েছেন, তিনি যখন একটা স্কুল ছেড়ে আরেকটা স্কুলে যাচ্ছেন, স্কুল ছাড়ার সময় অনেকেরই চোখে জল আসে। কারণ প্রিয় বন্ধু-বান্ধবদের ছেড়ে চলে আসতে হচ্ছে, চোখে জল আসছে। বিয়ের পর বাপের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুড় বাড়ি যাচ্ছে, মেয়ের চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসছে। কিন্তু এর মধ্যে দুটো জিনিস আছে, একটা হল অনিবার্যতা, এই রকমই হবে, এটাই করতে হবে। দ্বিতীয় হল, যা কিছু হচ্ছে এটা মন্দ কিছু হচ্ছে না, কিন্তু তুমি আরও বড় হচ্ছ। প্রাইমারী স্কুল থেকে মিডল স্কুল যাচ্ছে, তাতে খারাপ কিছু হচ্ছেন, evolve করছে। মৃত্যু কখনই শোকের কারণ হতে পারে না, কারণ মৃত্যুও মানে সে evolve করছে। নিজের পরিজন মারা গেলে চোখে জল আসাটা স্বাভাবিক, এতদিন এই মানুষটার সাথে ছিলাম, আর কোন দিনও তার সাথে দেখা হবে না, কোন কথাও বলা যাবে না। এটা আলাদা জিনিস।

ইংরাজীতে দু রকমের expression হয় –একটা হয়, I am sorry, আরেকটা হল I feel sorry, দুটো আলাদা expression। একজন খুব কষ্টে পড়েছে, আমি তাকে বলছি, I am sorry, তার মানে, তোমার এই কষ্টের জন্য আমারও খারাপ লাগছে। আর যখন বলছি, I feel sorry তার মানে, আমি তোমার উপর করুণা করছি। দ্বিতীয়টাতে তুমি গোল্লায় গেছ, তুমি করুণার পাত্র, কৃপার পাত্র, আমি তোমাকে করুণা করছি। শোক করে কখন? যখন আপনজন ওই দুরবস্থায় পড়ে যায়। শত্রুর যদি ওই রকম দুরবস্থা হয়, তখন মুখে যাই বলি না কেন, ভিতরে ভিতরে একটা আনন্দ হয়। আর যার প্রতি কোন সম্পর্ক নেই, তার এ-রকম কিছু হলে, তার প্রতি করুণা বোধ হয়। হিন্দু জীবনদর্শন কিন্তু কখনই আমাদের অনুমতি দেবে না যে, পরিস্থিতির উপর নিজের জন্য কেউ দয়ার পাত্র বা করুণার পাত্র হবে। কেউ মারা যাচ্ছে, বা কোন দুর্ঘটনা হয়েছে, সে কখনই দয়ার

পাত্র না, আমার যতটুকু সাধ্য ততটুকু তাকে সাহায্য করতে পারি, এর বেশী কিছু না। আদৌ শোক যদি কারুর জন্য করতে হয়, তাহলে তার জন্যই শোক করা যেতে পারে, যে সদ্বৃত্তি ছেড়ে অসদ্বৃত্তিকে অবলম্বন করেছে, যে সদাচারী থেকে দুরাচারী হয়ে গেছে। ঠাকুর এগুলোকে কোন কোন জায়গায় খুব বাজে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন, যেমন এক জায়গায় বলছেন, সাবির দিন ফিরেছে। সাবিত্রী একজন বিধবা ব্রাহ্মণী, সে একজনকে উপপতি করেছে, এখন তার অনেক টাকা-পয়সা, শাড়ি গয়না হয়েছে। এর জন্য শোক করা যায়, কারণ তার সদ্বৃত্তি চলে গেছে।

এখানেই অবাক হয়ে ভাবতে হয়, ভগবানের রচনায় আর মানুষের রচনায় কত তফাৎ হয়। এই জায়গাতে যদি আমাদের বলা হত একটা শব্দ দিতে, যাতে একটা শব্দে পুরো জিনিসটা স্পষ্ট হয়ে যাবে, আমাদের মাসের পর মাস ভাবতে হত। কিন্তু আচার্য শঙ্কর গড়গড় করে লিখে চলে যাচ্ছেন। একেবারে ঠিক জায়গায় ঠিক ভাবটাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য সঠিক একটা শব্দকে বেছে নিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যদি একটা কবিতা লিখতে বলা হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ কবিতার চারটে লাইন লিখে দেবেন। পরে দেখা যাবে, ওর একটা শব্দকেও পাল্টানো যাবে না। এই হল প্রতিভা। আচার্য শঙ্করকে ঠাকুর অবতার বলছেন। যে জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের কত শব্দ, কত সময় লাগাতে হচ্ছে, আর উনি একটা শব্দ 'সদ্বৃত্তি' দিয়ে সবটাকে স্পষ্ট করে রেখে দিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ এনারা সদ্বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁদের অসৎ বৃত্তি ছিল না, কোন দিন কোন অন্যায় কাজ করেননি, এনাদের জন্য কখনই শোক করা যায় না। এনাদের জন্য তুমি শোক করতে পারতে, যদি এনারা যদি কখন সদ্বৃত্তি ছেড়ে অসৎ বৃত্তি অবলম্বন করে থাকতেন।

এতক্ষণ ভগবান জাগতিক দৃষ্টিতে বললেন। কিন্তু এবার পারমার্থিক দৃষ্টিতে বলছেন। যদি তুমি পারমার্থিক দৃষ্টিতে দেখ, এবং তাতে তুমি দেহাত্মা রূপেও যদি নিয়ে থাক, তাহলে দেখ তাঁর সদ্বৃত্তি ছিল কিনা। পরে অর্জুনকে ভগবান বলবেন, *স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য*, নিজের স্বধর্মের দিকে যদি তাকাও তাহলে দেখবে এখানে শোকের কোন ব্যাপার নেই, কারণ ভীষ্ম, দ্রোণ এনারা সবাই স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়েই আজ যুদ্ধভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমরা জীবন থেকে কি চাই, কখন কি ভেবে দেখেছি? কিছু একটা তো জীবন থেকে তুমি চাইবে। কথামৃত পড়ে তুমি হয়ত বলবে, ঈশ্বর দর্শন। যদিও না বুঝেই বলে থাকে, তবুও কিছু তো একটা বলছে। ওখান থেকে আরেকটু ব্যবহারিক জীবনে নামুন, তখন বলবেন, স্বর্গে যেতে চাই। আরও ব্যবহারিক জগতে নামুন, বলবেন, আমি জীবনে সুখ পেতে চাই। খুব ভাল কথা, জীবনে সুখ চাই।

সুখ সবাই চাইছে, টাকা-পয়সা সবাই চাইছে, কিন্তু সুখ আসবে কিভাবে? আমি টাকা পেলে সুখী হব। কত লোক আছে কোটি কোটি টাকা পেয়েও একেবারেই সুখী নয়। এতে প্রমান হয় যে টাকা কখনই সুখ দিতে পারে না। ঋষিরা তাই শাস্ত্রে আমাদের অনেক আগেই বলে গেছেন, ধর্ম যাঁরা পালন করেন, একমাত্র তাঁরাই সুখে থাকেন। ধর্ম যে পালন করে, তারও রোগ-ব্যাধি হয়, তারও জীবনে দারিদ্রতা আসে, তারও মৃত্যু হয়, কিন্তু তাদের মনে কখন অশান্তির ছায়া পড়ে না। এই অধ্যায়ের শেষের দিকে, যেখানে ভগবান স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলবেন, সেখানে তিনি বলবেন, শান্তি কার জীবনে আসে। জীবনের সত্য যদি হয় মৃত্যুর পর সব শেষ; জীবনের উদ্দেশ্য যদি সুখপ্রাপ্তি হয়, তাহলে ভাই তোমাকে সদ্বৃত্তি অবলম্বন করতে হবে। সুখপ্রাপ্তি একমাত্র সদ্বৃত্তিতেই হয়, অন্য কিছু দিয়ে হয় না। সদ্বৃত্তি হল আচার আচরণ ঠিক ভাবে পালন করা, আচার মানে তোমার ধর্ম তোমাকে যা যা করতে বলছে, আর যা যা করতে নিষেধ করছে, ইংলিশে বলছে code of conduct। বিশ্বের সব ধর্মেই তাদের নিজস্ব আচারের কথা বলা আছে। খ্রীশ্চানদের আলাদা code of conduct আছে, ইসলামের আছে, হিন্দুদের আছে। যদি বলেন, আমি কি করে অত জানব হিন্দু ধর্মে কি কি করতে হবে? ঠাকুরের কথা বলতে গেলে বলা যায়, যেটা করলে মন খুঁত খুঁত করে, কখনই সেটা করবে না, শুধু এটুকু পালন কর।

পারমার্থিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দুটো আসবে, হয় জীবাত্মা রূপে আসবে, নয়তো শুদ্ধাত্মা রূপে আসবে। জীবাত্মা রূপে যদি দেখ, ভীষ্ম দ্রোণ মৃত্যুর পরেও থাকবেন। জীবাত্মা রূপে নিলে, তাঁদের মৃত্যু মানে, এই ঘর আর সেই ঘর মাত্র। দেহাত্মা রূপে যদি নেওয়া হয়, তাঁরা তো সদ্বৃত্তিতে ছিলেন, এনারা সবাই সৎপুরুষ। তার জন্য শোক করার কিছু নেই। আর শুদ্ধাত্মা রূপে যদি নাও, ভীষ্ম দ্রোণের কখন মৃত্যু হতেই পারে না। তবে তার যদি পতন হয়ে যেত, কোন কলঙ্ক যদি হয়ে যেত, সবার কাছে যদি হাসির পাত্র হয়ে যেতেন, তবে তার জন্য অবশ্যই শোক করবে – আমার এত আপনজন, তার এই রকম পতন হয়ে গেল! *অশোচ্যান্ অন্যশোচঃ,* তুমি ভাবছ মৃত্যুতেই যেন সব শেষ হয়ে যাবে, আমিই তাদের মারতে যাচ্ছি, এই কথাগুলো যে তুমি বলছ, এগুলো একেবারেই মুর্খের মত কথা। কিন্তু কথাগুলো বলছ একেবারে পণ্ডিতদের মত।

প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন বলছিলেন কিনা, কুলধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে, জাতিধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে, বর্ণসঙ্কর হয়ে যাবে, পিণ্ডোদক ক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে। এত কথা বলার পরেও অর্জুন যখন দেখলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কিছু হল না, অর্জুনের কথাগুলোর প্রশংসা তো করলেনই না, উল্টে বলছেন; এই সঙ্কটকালে আর্যদের অযোগ্য, স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক, অযশস্কর এই মোহ তোমার মধ্যে কোথা থেকে এলো? তখন অর্জুন আবার বলতে শুরু করলেন, আমি গুরুজনদের প্রতি কি করে তীর চালাব? তখন ভগবান খুব সুন্দর একটা মিষ্টি হেসে বললেন, তুমি একেবারে পণ্ডিতদের মত লম্বা লম্বা কথা বলছ, *প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে*।

এই এগারো নম্বর শ্লোকটা দেখলেই বর্তমান কালের হিন্দুরা যারা ফেসবুক, হোয়াটস্আপে ঘুর ঘুর করে, তাদের কথা মনে পড়ে যায়, একটা কি দুটো বই পড়েছে কি পড়েনি, তাতেই সবাই নিজেকে হিন্দু ধর্মের বিরাট পণ্ডিত মনে করতে শুরু করে।

ভগবান অর্জুনকে বলছেন তোমার কথাগুলো পরস্পর বিরোধী কথা। তুমি নিজেকে দেখাচ্ছ যেন তুমি একজন বিরাট পণ্ডিত, তোমার কথগুলোও সেই রকম, কিন্তু অন্য দিকে তোমার যে ব্যবহার তার সাথে তোমার কথাগুলো এক বিন্দুও মিলছে না। এই ধরণের অবস্থা কাদের হয়? যারা উন্মত্ত প্রমত্ত তাদেরই এই রকম অবস্থা হয়। কারণ *গতাসূন্,* যেটা চলে গেছে, *অগতাসূন্,* যেটা আসেনি, এই দুটোর কোনটাকে নিয়েই প্রজ্ঞাবানরা শোক করেন না। আমাদের খুব প্রচলিত একটা স্বভাব হল, আমরা ভেবে ভেবেই মরি। সব সময় আমরা ভেবে ভেবেই মরে যাচ্ছি, যদি এই রকম হয়ে যায় তাহলে আমার কি হবে, এই রকম যদি করে আমি কি করব, যদি পাস না করতে পারি, সারাক্ষণ আমরা ভেবেই যাচ্ছি। প্রজ্ঞাবানরা অতীতে যেটা চলে গেছে সেটাকে নিয়েও কোন হা হুতাশ করেন না, আবার কল্পনার জগতে গিয়ে ভবিষ্যতে কি হবে, কি হবে না, এই ভেবেও অস্থির হয়ে পড়েন না। আমরা এখন থেকেই এই ভেবে কাঁদতে বসে পড়ি –আমার বাবা যদি মরে যায়, আমার স্ত্রী/স্বামী যদি মরে যায়, আমার গাড়িটা যদি এ্যাক্সিডেন্ট করে। যখন হবে তখন দেখা যাবে, তার জন্য এখন থেকেই ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে কি লাভ!

নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ, আচার্য আবার এখানে একটা শব্দে পণ্ডিতের ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন, *আত্মজ্ঞাঃ*। বলছেন, পণ্ডিত কে? *পণ্ডা আত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ যেষাং তে হি পণ্ডিতাঃ,* পণ্ডিতে কে? আত্মার ব্যাপারে যাঁর ঠিক ঠিক জ্ঞান আছে, তিনিই পণ্ডিত। আত্মবিষয়ক বুদ্ধিকে বলা হয় পণ্ডা, যাঁর ভিতরে এই বুদ্ধি থাকে তাঁকে বলা হয় পণ্ডিত। আচার্য বলছেন, পারমার্থিক দৃষ্টিতে যদি দেখা হয়, তখন দেখা যাবে ভীষ্ম, দ্রোণ এনারা নিত্য, আর এনারা *অশোচ্যান্*, ভীষ্ম, দ্রোণ এনাদের নিয়ে শোক করা যায় না। তাই তুমি হলে মূঢ়, কারণ পণ্ডিতরা, যাঁদের আত্মবিষয়ক বুদ্ধি আছে, তাঁরা কোনটাতেই শোক করেন না। তাহলে কেউ মারা গেলে কি আমি শোক করব না? ভগবান স্পষ্ট বলে দিলেন, না,

শোক করবে না। পারমার্থিক দৃষ্টি দিয়ে একটা ছোট্ট কথা দিয়ে বলে দিলেন, *সদ্বস্তাত্মাৎ*। গীতা যেহেতু ধর্মশাস্ত্র, এবার তাই ভগবান পারমার্থিক দৃষ্টিতে বলতে শুরু করছেন।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব না ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্।।১২।।

(পূর্বে আমি কখনও ছিলাম না এমন নয়, তুমি কখনও ছিলে না তাও নয় বা এই নৃপতিরাও ছিলেন না – এটা সত্য নয়। এই দেহধারণের পূর্বে আমরা সকলেই নিত্য আত্মরূপে বিদ্যমান ছিলাম। এই দেহত্যাগের পরেও যে আমরা কেউ থাকব না, তাও না। বর্তমানে দেহ সত্ত্বেও আমরা নিত্য আত্মস্বরূপে বিদ্যমান আছি এবং দেহান্তে ভবিষ্যতেও নিত্য আত্মরূপে বিরাজমান থাকব।)

চতুর্থ অধ্যায়ে গিয়ে ভগবান পরে আবার বলবেন, তুমিও আগে ছিলে, আমিও আগে ছিলাম, আমার সব কিছু মনে আছে, তোমার কিছু মনে নেই। ভগবান গীতায় যা যা বলছেন, আমাদের মনে রাখতে হবে হিন্দুদের এটাই মূল দর্শন। এই শ্লোকে বলছেন, *ন ত্বেবাহং জাতু নাসং*, এমন কোন সময় ছিল না, যখন আমি ছিলাম না বা *ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ*, তুমি ছিলে না, বা এই যে রাজারা এখানে যুদ্ধ করার জন্য একত্র হয়েছেন, এনারা ছিলেন না। *ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্*, এমন কোন দিন হবে না যে, আমরা দুজনের কেউ থাকব না, এমন কোন দিন হবে না, যেদিন এই রাজারা থাকবে না।

আমরা অনেক সময় এই শ্লোকের গভীরে না গিয়ে এর অর্থ বলে দিই। অনেকে আবার প্রশ্ন করবেন, আমিও আছি, তুমিও আছ, রাজারাও আছেন, কিন্তু মুক্তি হয়ে গেলে তখন কি করে থাকবে? কিছু পরে আবার এই অধ্যায়েই ভগবান বলবেন, *জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ*, যে জন্মেছে সে একদিন মরবে। উপর উপর দেখলে মনে হবে এই কথাগুলোর মধ্যে যেন বিরোধ আছে। কিন্তু কোথাও কোন বিরোধ নেই। সবটাই একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে, অবশ্য যদি আমরা গভীরে যাই। এখানে প্রথমে যখন বলছেন তখন বলছেন, আমি (শ্রীকৃষ্ণ), তুমি (অর্জুন) এবং এরা (রাজারা), এই তিনজনের কথা বলছেন। এটা কিন্তু উপাচার মাত্র, নামের জন্য বলতে গিয়ে আমি, তুমি এবং এরা, এইভাবে বলছেন; কিন্তু আসলে বলছেন পারমার্থিক দৃষ্টিতে, *সর্বে বয়মতঃপরম্*, এখানে সবাইকে ভগবান আত্মা রূপে বলছেন। দেহ রূপে সবারই নাশ হবে, এমনকি জীবাত্মা রূপেও নাশ হবে। আমরা যে তিন ধরণের আত্মার কথা বললাম – দেহাত্মা, জীবাত্মা এবং শুদ্ধাত্মা, এটাকে আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, ভুলে গেলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। দেহ রূপে তোমার নাশ হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। দেহ রূপে যদি তোমার নাশ হয়, তাতে তোমার কি এলো গেলো, কারণ তুমি *সদ্বস্তত্মাৎ*, সদ্বস্তে আছ, সেইজন্য দেহ নাশের ব্যাপারটা কিছু না।

থাকল এবার জীবাত্মা আর শুদ্ধাত্মা; জীবাত্মা রূপে যদিও চলে যাবে কিন্তু শুদ্ধাত্মা রূপে কোন দিন যাবে না। এই জিনিসটাকে ধারণা করার জন্য স্বামীজী সমুদ্র আর তার ঢেউএর উপমাটা অনেক জায়গায় নিয়ে এসেছেন। আমরা যদি একটা বড় ঢেউএর কল্পনা করি –বিরাট একটা ঢেউ, সেই ঢেউএর মধ্যে আবার অনেকগুলো ছোট ছোট ঢেউ ঘুরপাক খাচ্ছে। আমরা ওই এক একটা ঢেউএর মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি। একটা সমুদ্রে এই রকম কত ঢেউ আছে কে জানে। এক একটা ঢেউ যেন এক একটা ব্রহ্মাণ্ড, একটা সৃষ্টি। ওর একটার মধ্যে আমরা সবাই আছি, আবার অন্য দিকে স্বামিজী বলছেন, আলাদা ভাবে যদি দেখা হয়, তাহলে যীশু, বুদ্ধ, এনারা যেন একটা বড় ঢেউ, আমরা যেন ছোট ঢেউ। স্বামী বিবেকানন্দের যে দেহ, এর নাশ হয়ে যেতে পারে, স্বামী বিবেকানন্দ যে জীবাত্মা রূপে আছেন, এর নাশ হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। কিন্তু আত্মা রূপে স্বামী বিবেকানন্দের কোন দিন নাশ হবে না। ঢেউ রূপে নাশ হয়ে যাবে, কিন্তু সমুদ্র রূপে কোন দিন নাশ হবে না।

অনেক সময় বলা হয়, জীবাত্মা রূপে নাশ হবে না, কারণ যাঁরা মহাপুরুষ হন তাঁরা সূক্ষ্ম শরীরটাকে ধরে রাখেন এবং জীবের কল্যাণের জন্য স্থূল একটা শরীর ধারণ করে আসতে থাকেন। কিন্তু সাধারণ জীবের আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে, তাদের জীবাত্মা ওখানেই নাশ হয়ে যায়। কিন্তু সব জীবাত্মা যে জ্ঞান হলেই নাশ হয়ে যাবে, তা নয়। ঈশ্বরের যাঁরা নিত্যসঙ্গী, ঠাকুর যাঁদের বলছেন, নিত্যমুক্ত বা ঈশ্বরকোটি, তাঁদের জীবাত্মার নাশ হতে পারে, নাও হতে পারে। অবতাররাও যখন আসেন, তখন ওই রকম একটা সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে আসেন, এবং ততদিন তিনি ওই সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থান করে থাকেন, যত দিন না নূতন একজন অবতার আসছেন। পারমার্থিক রূপে, সমুদ্রের কোন দিন নাশ হবে না, ঢেউএর নাশ হবে। বলছেন, পারমার্থিক রূপে নিত্য আত্মা তোমার বাস্তব স্বরূপ, ওই নিত্যাত্মার দিকে যদি দৃষ্টি দাও, তোমার কোন দিন নাশ হবে না। সেইজন্য তুমি যে ভাবছ, ভীষ্ম, দ্রোণ, তুমি, আমি, রাজারা সবারই এই যুদ্ধে নাশ হবে, এই ভাবনাটা তোমার একেবারেই অমূলক, ভ্রান্ত।

একটা গ্লাশে আমি জল ঢালছি, চাইছি গ্লাশটা জলে পূর্ণ হয়ে উপচে পড়ুক। গ্লাশে জল ঢালতে থাকলাম, ঢালতে ঢালতে গ্লাশটা একেবারে কানায় কানায় জলে ভরে গেছে, জল উপচে পড়ছে না। এরপর একটি মাত্র ফোঁটা গ্লাশে ঢাললে জল পড়ে যাবে, এটাকে tipping point বলে। জীবনটাও তাই, এই যে কথাগুলো যাচ্ছে, পাত্রে পড়ছে, এরপর একটা সময় আসবে তখন পুরোটা বেরিয়ে আসবে। আমরা আগে যে আলোচনা করেছি, সেগুলো মাঝে মাঝে আমাদের দরকার পড়বে।

অর্জুন বলে দিলেন আমি যুদ্ধ করব না, আর ভগবান হঠাৎ আত্মা নিয়ে বলতে শুরু করে দিলেন কেন? আগে আমরা এর আলোচনা করেছি। ওর মধ্যে দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা ছিল – জীবনের দিকে বেশী জোর দেবেন না, জীবনদর্শনের দিকে সব সময় বেশী জোর দিতে হবে। জীবনে যখনই কারুর কোন সমস্যা আসে, তখন তার সামনে সব সময় জীবনদর্শনটা রাখতে হবে। স্বামীজীর জীবনে একটা ঘটনা আছে। স্বামীজী হিমালয়ের পথে চলেছেন, যেতে যেতে দেখছেন একজন মহিলা আর চলতে পারছেন না। স্বামীজী সেই মহিলাকে বলছেন, পিছনের দিকে একটু ফিরে তাকাও, দেখ কত দূর তুমি চলে এসেছ। উৎসাহ পেয়ে আবার মহিলা চলতে শুরু করলেন। আমাদের মুশকিল হল, আমরা কিছু বোকা বোকা কথা শিখে রেখেছি, কারুকে কিছু কথা বলতে গিয়ে আমরা ওই বোকা বোকা কথগুলি বলে ফেলি। কিন্তু তা না, দেখতে হবে ওই জীবনদর্শনটা তার কাছে গ্রহণযোগ্য কিনা, আর ওটাতে আমার নিজের পুরো বিশ্বাস আছে কিনা। যার সন্তান মারা গেছে, সে যদি আমার কাছে আসে, তার কাছে আমি কখনই গীতার এই শ্লোকগুলি বলে তার শোক নিবারণ করার চেষ্টা করতে যাব না। ঠাকুরও কখনই বলতেন না। সন্তানহারা পিতা চোখের জল ফেলছেন, ঠাকুরও তার সাথে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলতেন, দুঃখী হয়ে তার সমব্যাথী হতেন। ওর কথাগুলো শুনতেন, তারপর হঠাৎ একটা গান শুরু করে দিতেন। এইভাবে তিনি আস্তে করে ওর মনটাকে উপরে তুলে আনতেন।

বয়ম্ বলছেন, সংস্কৃতে এগুলো বহুবচন, আমি, তুমি, তারা, বহুবচনে যে বলছেন, এটা দেহ ভেদে বলছেন। পারমার্থিক দৃষ্টিতে দেখলে, আত্মার দৃষ্টিতে যদি দেখা হয়, কোন তফাৎ নেই।

অর্জুনকে ভগবান কেন এইভাবে উত্তর দিলেন? কারণ অর্জুন প্রথমেই ধর্মের কথা দিয়ে শুরু করেছিলেন। তাই ভগবান বলছেন এই নাও তোমাকে আমি তোমার ধর্মের কথা দিয়েই উত্তর দিচ্ছি। আর দ্বিতীয় কথা, যখনই কারুর শোক দুঃখ হয় তখন তাকে বোঝাতে গেলে উচ্চ তত্ত্বের কথা দিয়েই শুরু করতে হয়। যখন ধুম্ জ্বর হয় প্রথমে আগে ডাক্তাররা বলে জ্বরটা আগে কমাতে হবে, জ্বর কমলে তারপর আসল চিকিৎসা শুরু হবে। ভগবানও ঠিক তাই করছেন, প্রথমেই অর্জুনের

সামনে সব থেকে উচ্চ দর্শনের তত্ত্বকে রাখছেন। ঠিক এই রকমই আরেকটি খুব উচ্চ দর্শনের কথা পরের শ্লোকে বলছেন –

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।।১৩।।

(যেমন দেহীর (আত্মার) এই দেহে কৌমার, যৌবন ও জরা ক্রমে উপস্থিত হয়, তাতে দেহীর কোনও পরিবর্তন হয় না, সেই রকম দেহান্তরপ্রাপ্তিতে অর্থাৎ মৃত্যুতে দেহী অবিকৃত থাকেন। মৃত্যু দৈহিক বিকারমাত্র। এইজন্য দেহান্তর প্রাপ্তি বিষয়ে জ্ঞানিরা মোহগ্রস্ত হন না।)

এখানে ভগবান দ্বিতীয় জীবনদর্শনকে, দেহাভিমানী আত্মাকে, যাঁকে জীবাত্মা বলা হয়েছে, তাঁকে নিয়ে আসছেন। আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য, কিন্তু কেন, কিভাবে সৃষ্টি হয় কারুর কাছে এর কোন উত্তর নেই, এমনকি বেদান্তের কাছেও উত্তর নেই। এক এখন বহু রূপে দেখাচ্ছেন। কেউ বলেন তাঁর ইচ্ছা, কেউ বলেন এটাই তাঁর শক্তি, কেউ বলেন এটাই তাঁর মায়া। একটা খুব বিশাল পাওয়ারের আলো জ্বলছে, তার সামনে একটা পর্দা দিয়ে দেওয়া হল। এবার পর্দার মধ্যে ছোট ছোট ফুটো করে দেওয়া হল। যত ফুটো করা হবে তত আলোর উৎস হবে, ওই ফুটো দিয়ে আলো আসতে থাকবে। তাহলে এই জগতে কত জীব আছে? যত ফুটো করা হবে, তত জীব হবে।

তাহলে সংখ্যা কোথায় বাড়ছে, কিছুই তো বাড়ছে না। লোকেরা অনেক সময় মুর্খের মত প্রশ্ন করে, জন্মান্তর যদি সত্য হয় তাহলে জনসংখ্যা বাড়ছে কি করে? এদেরকে তখন বলতে হয়, এই সিংহ, বাঘ, ভাল্লুক মরছে কিনা, মরে সব মানুষ হয়ে জন্মাচ্ছে। মানুষের ব্যবহার দেখলেই বোঝা যায় এরা কোথা থেকে এসেছে। এগুলো হল খ্রীশ্চান, মুসলমানদের সমস্যা, ওদের বিশ্বাস হল ভগবান একবার সৃষ্টি করে দিয়েছেন, ওর মধ্যেই সব ঘুর ঘুর করছে। হিন্দুদের কাছে এটা কোন সমস্যাই না। ঈশ্বর ইচ্ছা করলেই অসংখ্য জীবাত্মা এসে যাবে। কিভাবে? যেমন পর্দার ফুটো দিয়ে আলো আসছে, আমি আরও চারটে ফুটো করে দিলাম। তাহলে কি আলোর পাওয়ারটা আরও বাড়াতে হবে, কিছুই বাড়াতে হবে না, যা ছিল তাই থাকবে।

শুদ্ধ চৈতন্যের আলোর উপর যে মুহুর্তে ওই পর্দারূপ আবরণ এসে গেল, সেখান থেকে শুরু হয়ে গেল সৃষ্টি। সৃষ্টি শুরু হতেই জড় আর চৈতন্য যেন দুটো আলাদা সত্তা পেয়ে যায়। ওই পর্দাটা হল সত্ত্ব, রজো ও তমো –তিনটে বিশুদ্ধ গুণ। গীতাতে এই তিনটে গুণের জন্য একটা আলাদা অধ্যায় আছে, সেখানে এর যেমন আলোচনা হবে, তার বাইরেও অনেকবার তিন গুণের আলোচনা আসবে। সত্ত্ব, রজো আর তমো, এটাই হল জড়। এই জড়ের সাথে চৈতন্য যে জুড়ে নিচ্ছে, এটাকে বলে দেহাভিমানী। যিনি শুদ্ধ চৈতন্য, সমষ্টি যিনি, তিনি যখন সত্ত্ব, রজো আর তমোর সাথে নিজেকে জুড়ে নেন বা মনে করেন আমি এর সাথে জুড়ে আছি, সেটাকেই বলে ঈশ্বর। ব্যাষ্টি হল, ক্ষুদ্রের সাথে ক্ষুদ্র যে নিজেকে জুড়ে নেয়, এটাই জীবাত্মা বা জীব।

জীব আর ঈশ্বরের সাথে কি তফাৎ? কোন তফাৎ নেই। যদি অনন্ত সমুদ্রের কল্পনা করি আর সেখানে একটা অনন্ত পর্দা আছে। সেই অনন্ত পর্দা থেকে পর্দার এপারে যেন সৃষ্টির খেলা চলছে। এক-একটা উপমাকে এক-একটা জিনিসকে বোঝানর জন্য নিতে হবে। ওই পর্দাটা হল যেন sum total of energy। ওই sum total of energy হল জড়, এনার্জি মাত্রই জড়। ওই sum total of energyর সাথে চেতনা যখন জুড়ে যায়, এটাই তখন সৃষ্টি। শুধু জড় থাকলে সৃষ্টি হবে না, শুধু চেতনা থাকলেও সৃষ্টি হবে না। সৃষ্টি হতে গেলে শুদ্ধ চৈতন্য আর জড়ের সংযোগ হতে হবে, এটাকেই বলে চিজ্জড়গ্রন্থি। সমষ্টি জড়ের সাথে যিনি জুড়ে আছেন, তাঁকে আমরা বলছি ঈশ্বর। আমরা কল্পনা করছি, একটা বিরাট ঢেউ, ওই বড় ঢেউএর মধ্যে আবার অনেকগুলো ছোট ছোট

ঢেউ ওঠানামা করছে –ওই বিরাট ঢেউটা যেন ঈশ্বর আর মাঝখানে যে ঢেউগুলো উঠছে নামছে, এরা হল যেন জীব। একটা হাজার ওয়াটের বালবকে একটা কালো কাগজ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। কালো কাগজটার উপর কয়েকটা ফুটো করে দেওয়া হল। এবার দেখছি ফুটোগুলো দিয়ে আলো আসছে। এই আলো, আর বালবের যে আলো, এই দুটো আলোর মধ্যে কি কোন তফাৎ আছে? কোন তফাৎ নেই, তফাৎটা হল ওই কালো কাগজের আবরণের জন্য। আবরণ সরিয়ে দিলে কোথাও কিছু নেই, বালবের আলোই আছে। তাহলে আলাদা একটা আলো এলো কোথা থেকে? কোন দিনই আসেনি, তুমি আবরণটা দিয়েছ বলে আলাদা দেখছ, আসলে তো কিছুই নেই। এই ভাবে যিনি নিজেকে জুড়ে নেন, তিনি হয়ে যান দেহী, একটার নাম দেহী, আরেকটার নাম জীবাত্মা।

আমরা এটুকু সব সময় বুঝতে পারছি যে, একটা কিছু আমাদের ভিতরে আছে, যে আমাকে এই বোধটা দিয়ে যাচ্ছে যে আমি আছি। যেদিন প্রথম আমার আমিত্ব বোধ এসেছিল তখন আমি নেহাতই এক শিশু ছিলাম। কেউ যদি জিজ্ঞেস করত, তোমার কত বয়স হয়েছে? আমি বলতাম, আমার এখন দশ বছর বয়স। সেখান থেকে আমি যৌবনে পদার্পণ করলাম। বাবা, তুমি কোন কলেজে পড়ো? আমি অমুক কলেজে পড়ি। কলেজ পাশ করে আমি চাকরি করতে শুরু করলাম। তুমি কোথায় চাকরি করছ? আমি সরকারি অফিসে চাকরি করি। 'আমি'টা কিন্তু সব সময় থাকছে। আমার সব কিছুই পাল্টে গেছে, আমার হাঁটাচলা, কথাবার্তা পালটে গেছে, আমার রুচি পাল্টে গেছে, ছোটবেলার বন্ধুরা চলে গিয়ে এখন নূতন নূতন বন্ধু হয়েছে, সব পাল্টে গেল, কিন্তু একটা জিনিসই পাল্টালো না, সেটা হল 'আমি'। তারপর বিয়ে করে সংসারী হলাম, আমিত্বটা সমান ভাবে থাকল, কিন্তু জীবনের সব পাল্টে গেল। বৃদ্ধাবস্থায় এ্যলবাম খুলে পুরনো দিনের ছবির দিকে তাকাচ্ছি আর অবাক হয়ে ভাবছি, এটা কি আমি, আমি এই রকম ছিলাম? তখন কত দৌড়ঝাপ করতাম, কিন্তু আজ লাঠি ছাড়া এক পা চলতে পারি না। কিন্তু ওই বোধ 'আমি' সমান ভাবে চলেছে। পরিবর্তন তো হয়েই যাচ্ছে, শিশু, শৈশব, কৌমার, যৌবন, প্রৌঢ়, বৃদ্ধাবস্থা; ঠিক সেইভাবে মৃত্যুটাও একটা অবস্থার পরিবর্তন। ভগবান এটাই বলছেন, *দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা*। শৈশব থেকে কৌমার অবস্থায় চলে গেলাম, তার মানে এই নয় যে আমি নাশ হয়ে গেলাম, আমি সেই আমিই থাকছি।

সমস্যাটা হচ্ছে মৃত্যুর পর তাকে তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি না। যে অন্ধ সেও তো জগতের কিছু চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে না, তাই বলে কি জগৎ নেই, জগৎ কি চলছে না। আমরা বলতে পারি সে চোখে দেখতে পায়না কিন্তু শুনতে পারছে, স্পর্শ করতে পারছে। অন্ধ একটা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জগৎকে অনুভব করতে পারছে না কিন্তু আমি পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়েই জগতের সব কিছু অনুভব করতে পারছি। গীতাতে সাধারণ মানুষের কথা বলা হচ্ছে না, এখানে এক উচ্চ তত্ত্ব ও উচ্চ আদর্শকে মানবজাতির সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। যাঁরা মৃত্যুর পরও দেখতে পারেন যে এই জগৎ একই ভাবে চলেছে, তাঁদের কাছে মৃত্যু একটা রূপান্তর মাত্র। কারা এটাকে দেখতে পান? জ্ঞানীরাই দেখতে পান, তাঁরা দেখছেন আত্মার উপর কোন কিছুই হয় না। কিন্তু এগুলো কার উপর হচ্ছে? দেহাভিমানী আত্মার উপর। যিনি নিজেকে দেহের সাথে এক করে রেখেছেন, তিনিই দেখছেন আত্মা জন্ম নিল, আত্মার যৌবন এল, আত্মা জরাগ্রস্ত অবস্থায় চলে গেল। চতুর্থ অবস্থাটা জ্ঞানীরাই দেখতে পান, অজ্ঞানীরা দেখতে পায়না। এই যে তিনটে অবস্থার কথা বলা হল এটাই হচ্ছে মূল কথা।

সেইজন্য ভগবান বলছেন, *ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি*, যাঁরা ধীর পুরুষ তাঁরা এই অবস্থান্তর প্রাপ্তির জন্য মোহগ্রস্ত হন না। ধীর পুরুষ কে? আচার্য এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, ধীমান, যাঁর ধী আছে। সহজ বাংলায় ধীমান হল, বোঝার ক্ষমতা যাঁর আছে, যাঁর বুদ্ধি পরিষ্কার। এই যে একের পর এক বিভিন্ন পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, ধীমান পুরুষরা জানেন এগুলো কিছুই না, এটাই স্বাভাবিক। ঠিক তেমনি মৃত্যু, এটাও স্বাভাবিক একটা পরিবর্তন। সুতরাং তুমি যে পণ্ডিতের মত এত কথা বলছ,

এগুলো সব ভুল। কারণ ঠিক ঠিক তোমার যদি পাণ্ডিত্য থাকত, তাহলে এই জিনিসগুলো তোমার কাছে পরিষ্কার থাকত। যারা মরবে, যারা মারবে, কোনটারই গুরুত্ব নেই। ভগবান অর্জুনকে এখানে একটা জীবনদর্শন দিচ্ছেন, আসল সত্য হল এটা। তুমি নিজের ধর্ম থেকে কেন সরে যেতে চাইছ?

আচ্ছা, না হয় মানলাম তিনি মরবেন না, না হয় তার জন্য শোক করব না, কিন্তু বিয়োগ হওয়ার দুঃখ তো আমার আছে। পিতামহ মারা যাবেন, গুরু মারা যাবেন, মামা মারা যাবেন, ভাই-বন্ধুরা মারা যাবেন, এদের যে বিয়োগ হয়ে যাবে, সেই দুঃখটা তো আমার হবে? অবশ্যই হবে, কিন্তু কতক্ষণ দুঃখ করবে, সেটাই পরের শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলবেন।

এই যে বলছেন *ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ,* তুমিও এর পরে থাকবে আমিও এর পরে থাকব, এর আগে তুমিও ছিলে আমিও ছিলাম, এই রাজারাও ছিল। পরে চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান আবার যখন বলবেন তখন তিনি দেহাভিমানী রূপে বলবেন, এখানে যেটা তিনি বলছেন শুদ্ধাত্মা, সর্বব্যাপী আত্মা রূপে বলছেন। এখানেই একজন সাধারণ পুরুষ আর একজন জ্ঞানী পুরুষের মধ্যে বিরাট পার্থক্য ধরা পড়ে। অজ্ঞানী মনে করে মৃত্যুই হচ্ছে সব কিছুর পরিসমাপ্তি, জ্ঞানী দেখেন মৃত্যু হচ্ছে একটা অবস্থার রূপান্তর মাত্র। যিনি সন্ন্যাসী তাঁর জীবনের প্রতিও কোন মোহ থাকে না আবার মৃত্যুর প্রতিও কোন আসক্তি থাকবে না, জীবন-মৃত্যুর পারে তারা চলে যান। বিভিন্ন ধর্মে এইগুলোকেই বিভিন্ন ভাবে দেখা হয়।

হিন্দু ধর্মে এই কারণে আত্মহত্যাকে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়। কারণ মৃত্যুই যদি সব কিছুর শেষ হত তাহলে আত্মহত্যা করাটা কিছু অন্যায় হত না। কিন্তু আমরা মৃত্যুকে এভাবে দেখি না, আমরা দেখি মৃত্যু হচ্ছে একটা অবস্থার রূপান্তর মাত্র। মৃত্যুর পর আবার একটা নূতন রূপ পরিগ্রহ করে তার জীবন চলতে থাকে, তাই আত্মহত্যা করার কোন অর্থই হয় না, এই কারণে আমাদের শাস্ত্রে আত্মহত্যাকে পাপ বলা হয়। আত্মহত্যার ব্যাপারে অন্যান ধর্মে বলে ভগবান এই শরীর দিয়েছেন এই শরীরকে এভাবে শেষ করে দিতে নেই।

এতক্ষণ তো অনেক উচ্চ আদর্শের কথা বলা হল, কিন্তু আদর্শের অনুশীলন করে লক্ষ্যে পৌঁছাবে কি করে? তখন ভগবান এক এক করে বলতে থাকবেন। এখানে শুধু খুব সারতত্ত্বটাকে বলে দেওয়া হল। আসলে গীতা হচ্ছে পুরোটাই condensed milk যতই জল ঢালা হবে ততই দুধ তৈরী হতে থাকবে, তাই গীতারও কোন শেষ নেই। বাল্মীকি রামায়ণে যত ধর্মের কথা বলা হয়েছে গীতাতে সেই সব কথা গুলোকে কয়েকটা শ্লোকের মধ্যেই বলা হয়ে গেছে। এখন লক্ষ্যে পৌঁছাবে কি করে? প্রথম কথা আত্মা ছাড়া কিছু নেই, এক দিকে সংসার হচ্ছে দুই, অন্য দিকে অধ্যাত্ম হচ্ছে অদ্বৈত, মানে দুইয়ের অভাব। অদ্বৈতের 'অ' মানে এক নয়, দ্বৈতের অভাব, সংসার হচ্ছে দ্বৈত। দ্বৈত মানে দুই, তাহলে অদ্বৈত মানে দুই নয়। দুই যদি না হয় তাহলে কত হবে? দুই না হলে কি হবে, সেটা আবার মুখে বলা যায় না।

অদ্বৈত আর একেশ্বরবাদ দুটো পুরো আলাদা। একেশ্বরবাদ মানে এক ঈশ্বর আছেন, এরা অদ্বৈতের অর্থ করেন যে সেই এক ঈশ্বর অদ্বৈতম্। কিন্তু তা নয়, অদ্বৈতের অর্থ হচ্ছে দুই নেই। দুই নেই তো তাহলে আছেটা কি? আমি বলব দুই নেই তাহলে এক আছে। কিন্তু এক বললে তো দুইও আসবে। যেখানে এক থাকবে সেখানে দুইও থাকবে, যেখানে শূন্য থাকবে সেখানেও দুই আসবে। ঠাকুর বারবার বলছেন – যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞান আছে। এগুলো খুব গভীর তত্ত্বের কথা, দু-চারটে কথাতে এগুলো কারুকে বুঝিয়ে দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার। প্রথমে শুনে যেতে হয়, তারপর অনেক বছর সাধন-ভজন করতে করতে হঠাৎ করে জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। অদ্বৈত হচ্ছে এক দুইয়ের পার, আধ্যাত্মিক জিনিস হচ্ছে এক দুইয়ের পার।

অধ্যাত্ম রামায়ণে বলছে রাম চলেনও না রাম কিছু করেনও না। যেমন সূর্যে অন্ধকারের কল্পনাই করা যায় না। অন্ধকারের কল্পনা যখন করা যায় না, তখন সূর্যে দিনও নেই রাতও নেই। ঠিক তেমনি অদ্বৈতে একও নেই দুইও নেই। দ্বৈত হচ্ছে একটা মতাদর্শের নাম, যারা এর অনুগামী তাদেরকে বলা হয় দ্বৈতবাদী। অদ্বৈত হচ্ছে জগতের, সাংসারিক যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তার বাইরে। সংসারটা কি? দ্বৈত, duality, এর আর-একটা অর্থ হল দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব মানে যেটা আছে তার একটা বিপরীত থাকবে, গরম থাকলে ঠাণ্ডা থাকবে, সুখ থাকলে দুঃখ থাকবে, কথায় বলে যার আছে সুখ তার আছে দুঃখ, যার আছে জন্ম তার হবে মৃত্যু, সংসার মানেই এই দ্বন্দ্ব। যেখানে দুই নেই, এক দুইয়ের পার সেইটাই অধ্যাত্ম। অধ্যাত্ম মানে আত্মা, আত্মা মানে সংসারের পার, সংসারের পার মানে দ্বন্দ্বাতীত, দুই নেই।

পরের শ্লোকে এইটাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন – আমাদের যা কিছু দ্বন্দ্ব আছে ইন্দ্রিয় দিয়ে মাপা হয়। কিভাবে মাপা হয় –

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।।১৪।।

(হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সংযোগহেতু শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখাদি দ্বন্দ্ব অনুভূত হয়। কিন্তু এ সবই দ্বন্দ্ব উৎপত্তিবিনাশশীল; অতএব অনিত্য। হে ভারত, হর্ষ ও বিষাদশূন্য হয়ে অপ্রতিকারপূর্বক এ-সকল সহ্য কর।)

আমরা এই কথাটা খুব শুনে থাকি – প্রহারেণ ধনঞ্জয়, যদিও মন বানানো কথা, কোথাও নেই, কিন্তু *তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত*, শ্লোকের এই শেষ অংশটুকু আমাদের দাগ দিয়ে রাখতে হবে, খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিতিক্ষা মানে সহ্য কর। প্রথমে বলছেন *মাত্রাস্পর্শাঃ তু কৌন্তেয়*, গীতা যদি আমরা নাও বুঝতে পারি, কিন্তু শুধু গীতার ভাবগুলির দিকে যদি একটু তাকাতে চেষ্টা করি, আর তার সাথে যদি ভাবা হয়, গীতা আজ থেকে তিন-সাড়ে তিন হাজার বছর আগের রচনা, তখন শুধু অবাক হয়ে ভাবতে হয় যে, আমাদের পূর্বজরা কি এক অমূল্য সম্পদ আমাদের জন্য রেখে গেছেন। বলছেন *মাত্রা*, আমরা প্রায়ই বলে থাকি, আজ ঠাণ্ডার মাত্রাটা একটু কম আছে বা রান্নায় ঝালটা একটু বেশী মাত্রায় দিয়েছে; মাত্রা মানে পরিমাণ, যেটাকে মেপে নেওয়া যায়। এই জগতের সব কিছুকেই মেপে নেওয়া যায়।

জগতে এমন কোন জিনিস নেই, যেটাকে মাপা যায় না, সেইজন্য জগতের সমস্ত বস্তুকে বলছেন মাত্রা। কে মাপে? ইন্দ্রিয় মাপে। আমি যখন কিছু দেখছি, তখন আমার চোখ থেকে চেতনা বেরিয়ে এসে জিনিসটাকে মেপে নিয়ে আমার বুদ্ধিকে খবর দেয়, সেখান থেকে ওই জিনিসটার ব্যাপারে আমার বোধ হয়। দুদিন আগেও ঠাণ্ডা ছিল, আজকে অল্প অল্প একটু গরম লাগছে। এই যে আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে, আমরা কি করে বুঝতে পারছি? আমাদের শরীরটা চামড়া বা ত্বক দিয়ে আচ্ছাদিতে, এই ত্বক ইন্দ্রিয় স্পর্শ দ্বারা বুঝে নিচ্ছে আজ গরম, আজ ঠাণ্ডা। বুঝে নিয়ে বলছে, আজ ঠাণ্ডা কম, গরম জামা খুলে ফেল। খাওয়ার সময়, কোন খাবারে নুন বেশী হয়েছে, কোন খাবারে ঝাল বেশী লাগছে, কোন খাবারে মিষ্টি কম হয়েছে, চাটনিটা আরেকটু টক হলে ভাল হত, এখানেও আমাদের জিহ্বা ইন্দ্রিয় এই খাবারগুলিকে মেপে নিচ্ছে। আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয় জগতের পাঁচ রকম বস্তুকে মেপে নিচ্ছে। তার মানে, এই জগৎ চলছে মাত্র দুটো জিনিস দিয়ে, মাত্রা আর স্পর্শ দিয়ে। ইন্দ্রিয়গুলিকে যদি ভিতরে টেনে নিয়ে আসা হয়, তখন বাইরে জিনিস থাকলেও কিছু হবে না, কোন কিছুতেই আকর্ষণ হবে না। ছোটবেলায় মিষ্টির দোকান দেখলেই জিবে জল চলে আসত। এখন বয়স হয়ে গেছে, আর জিবে জল আসে না। আর ডায়বেটিসের রুগী হলে বলবে, মিষ্টির দোকানের শোকেসে শুধু বিষগুলি সাজিয়ে রাখে।

আমাদের সবারই জীবনে একটা সময় আসে, একটা জিনিসকে দেখে আমরা দৌড়াতে থাকি, মুখ থেকে লালা পড়ে। আবার ওটার পিছনে ছোটার জন্য জীবনে অনেক চড়-থাপ্পড় খেলে বলবে, থাক, আমার লাগবে না। জগতে যা কিছু আছে তার উল্টোটাও আছে, যা কিছুই দ্বন্দ্বাত্মক তারই জন্ম হবে আবার মৃত্যুও হবে, একটা সময় তার আগমন হবে আরেকটা সময় তার প্রস্থান হবে। শাস্ত্র আমাদের বারবার বলছে, যে জিনিসটা স্থায়ী নয়, আসছে আবার চলে যাচ্ছে, সেই জিনিসের দিকে মন দিও না। যেমন জন্ম মৃত্যু, যার জন্ম হল তার মৃত্যু অবধারিত, তাই মৃত্যুতে বিচলিত হয়ে মন খারাপ করো না। বিয়ে হচ্ছে ডিভোর্সও হতে পারে, ডিভোর্স যদি হয়ে যায় তাহলে মন খারাপ করো না। তুমি চাকরি পেয়েছে, এই চাকরিকেও একদিন তোমাকে বিদায় জানাতে হবে, তখন কিন্তু তুমি মন খারাপ করো না। সব কিছুতেই যদি তোমার মনে ক্রিয়া-বিক্রীয়া হতেই থাকে তাহলে কি হবে? কিছুই না, এই দ্বন্দ্বাত্মক জগতের মধ্যেই পড়ে থাকবে। কারণ সব জিনিসই হল মেপে নেওয়ার জিনিস, আর সেখানে পাঁচটা ইন্দ্রিয় গিয়ে পাঁচ রকমের স্পর্শ নিয়ে নিচ্ছে। বাচ্চাদের আধো আধো কথা কত মিষ্টি লাগে, কানে যেন মধু ঢেলে দিচ্ছে। এখানেও তাই, কর্ণেন্দ্রিয় গিয়ে ওই শব্দগুলিকে মেপে নিচ্ছে।

এভাবেই সব রকমের অনুভূতি হচ্ছে, *শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ*, শীত আর উষ্ণ দিয়ে আমাদের যত রকম অনুভূতি হতে পারে আর *সুখদুঃখদাঃ* হল আমাদের প্রতিক্রিয়া। শীত আর উষ্ণ আমাকে আঘাত দিচ্ছে, ভালমন্দ সবটাই আমাকে এসে আঘাত করছে, সুখ আর দুঃখ হল ওই আঘাতের প্রতিক্রিয়া। মানুষের যত প্রতিক্রিয়া সুখ আর দুঃখ দিয়েই হয়। যেমন শীত, কখন ভাল লাগে, আবার কখন খারাপ লাগে। গরমের সময় এসি ঘরে থাকতে কত আরাম লাগে, আবার শীতকালে ঠাণ্ডা বেশী পড়লে বিরক্তি লাগে। শীত একটা নিরপেক্ষ বস্তু, নিজের মধ্যে সে খারাপও না, ভালও না, কিন্তু ওর প্রতি আমার প্রতিক্রিয়াটা কখন ভাল, কখন খারাপ। ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ যখনই হবে, তখন আমাদের মনে একটা ছাপ দেবে, সেই ছাপের জন্য মন আবার একটা প্রতিক্রিয়া করে। কিভাবে প্রতিক্রিয়া করে? সুখ আর দুঃখ রূপে, আমার এটা ভাল লাগছে, আমার এটা খারাপ লাগছে।

আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত, সন্ধি ভাঙলে হবে – *আগম-অপায়িনঃ অনিত্যাঃ তান্ তিতিক্ষস্ব*, এই জিনিসগুলো আসছে যাচ্ছে, এই আছে, এই চলে গেল, এগুলোর উৎপত্তি আছে আবার বিনাশও আছে, তাই অনিত্য। তাহলে কি করবে? *তিতিক্ষস্ব ভারত*, তুমি সহ্য কর। ধৈর্য ধরে রাখ, জানবে যেটা এসেছে, আবার সেটা চলে যাবে, কিছুই স্থায়ী না। কিছু কিছু থিয়োরী আছে, যেখানে বলে, this too shall pass, এটাও একদিন চলে যাবে, এই থিয়োরীটা ইদানিং খুব পপুলার হয়ে গেছে, অনেককেই এই কথা বলতে শোনা যায়। তার সাথে বলে, বেদান্তে আপনারা তো এটাই বলছেন? না, বেদান্তে আমরা তা বলছি না। আমরা বলছি, আপনি গঙ্গার তীরে বসে গঙ্গার শোভা দেখছেন। গঙ্গার জলে অনেক কিছু ভেসে যাচ্ছে, কখন কচুরিপানা ভেসে যাচ্ছে, কখন মরা কুকুর আবার কখন ফুল, ফুলের মালা ভেসে যাচ্ছে; আমরা বলি যাই ভেসে যাক, ওই দিকে কখন দৃষ্টিপাত করবেন না। কারণ কোন জিনিসই এই জগতে স্থায়ী না।

সংক্ষেপে এটাই বলা যেতে পারে, যখনই জগতের কোন বস্তু ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ পায়, তখনই শীতোষ্ণাদি রূপে অনুভূতি হয়; ঠাণ্ডা বা গরম শরীরের ত্বকে লাগার পর আমরা শীত বা উষ্ণ অনুভব করি। তেমনি বিভিন্ন রকম বস্তু থেকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের অনুভূতি আমাদের মনে যায়। মন সব সময় প্রতিক্রিয়া রূপে ওটাকে সুখ আর দুঃখ রূপে দেখে, রাগ ও দ্বেষ রূপে মনে করে। কিন্তু সবটাই অনিত্য, অস্থায়ী; ধৈর্য ধরে সব সহ্য কর। শরীর, মন, ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু অনুভূতি হচ্ছে সেটার দিকে কখন মন দিও না। যদি এইসব দ্বন্দ্বের দিকে মন দাও তাহলে তুমি সংসারের

জাঁতাকলে পড়ে পিষে যাবে। তোমাকে অভ্যাস করতে হবে এইসব দ্বন্দ্ব থেকে বেরিয়ে আসা। তারপরের শ্লোকে ভগবান বলছেন, কে অমৃত লাভ করতে পারে, অমৃত লাভের অধিকারী কে?

এবারে ভগবানের যুক্তিগুলি পর পর দেখা যাক। প্রথমে বললেন, তোমার কথাগুলো বোকা বোকা, পরে বলছেন, ভীষ্ম, দ্রোণ এনারা আত্মা রূপে নিত্য। এরপর আর-একটা যুক্তি নিয়ে আসছেন জীবাত্মাকে নিয়ে, জীবাত্মা এই দেহ থেকে অন্য দেহে যাতায়াত করতে থাকে, সব সময় পাল্টে যাচ্ছে। এই দুটো যুক্তির পর নিয়ে আসছেন লৌকিক দৃষ্টি দিয়ে। সবারই জীবনে এই কষ্টগুলি আসে, সুখ যেমন আসে, দুঃখও তেমন আসে। কিন্তু এগুলো তোমার আসল স্বভাব না, সুখ-দুঃখ সব মাত্রা আর স্পর্শ থেকে আসছে। ফিজিক্সের দিক দিয়ে দেখলে আমরা দেখছি এই কলমটা আছে, কলমের উপর আলো পড়ল, সেই আলো প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখে পড়ল, আর আমরা দেখলাম এটা কলম। রাজযোগে পতঞ্জলি বলছেন, তত্ত্বের দৃষ্টিতে এটা কিন্তু দৃষ্টি হয় না। কারণ আমাদের চোখটা ক্যামেরা না, ক্যামেরার কোন বোধ হয় না, কিন্তু আমাদের বোধ হয়। কিভাবে বোধ হয়?

স্বামীজী রাজযোগে এটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কোন বস্তুর অনুভূতি যখন আমাদের মনে যায়, তখন মন একটা প্রতিক্রিয়া ছুড়ে দেয়, এই প্রতিক্রিয়াটাই জ্ঞান। ট্রেনে বাসে করে যাওয়ার সময় জানালা দিয়ে বাইরে আমরা কত রকম দৃশ্য দেখতে থাকি, কিন্তু সব কিছু চোখে পড়ে না। কারণ আমাদের মস্তিষ্ক সব দৃশ্যের প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে না। প্রতিক্রিয়া যখন ছুঁড়ছে, তখনই জ্ঞান হয়। ওই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এসে যায় রাগ ও দ্বেষ, জ্ঞানের সাথে এই দুটো জুড়ে থাকে। ভগবান অর্জুনকে বলছে, ভীষ্ম দ্রোণ থেকে যে তুমি আলাদা হয়ে যাচ্ছ, তাতে দুঃখ হতেই পারে, কিন্তু হে অর্জুন, তুমি ধৈর্য ধরো। তিনটে যুক্তি ভগবান দিচ্ছেন, পারমার্থিক দৃষ্টিতে ভীষ্ম দ্রোণের কোন দিন মৃত্যু হবে না। ধর্মের দৃষ্টিতে বা জীবাত্মার দৃষ্টিতে পরিবর্তন হয়, পরিবর্তন হচ্ছে। এই দুটো যদি না মানতে চাও, তাহলে একেবারে জাগতিক দৃষ্টিতে দেখো, মাত্রা আর স্পর্শ থেকে সুখ ও দুঃখ রূপ যে প্রতিক্রিয়া, সবটাই *আগমাপায়িনঃ*, আসছে যাচ্ছে, অনিত্য; তাই সব ধৈর্য ধরে সহ্য কর। পরে অবশ্য ভগবান অন্য যুক্তিও নিয়ে আসবেন।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে।।১৫।।

(হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, সুখে দুঃখে অবিচলিত যে জ্ঞানী ব্যক্তিকে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব বিচলিতে করতে পারে না, অর্থাৎ আত্মার নিত্যত্ব-জ্ঞান থেকে বিচ্যুত করতে পারে না, তিনি অমৃতত্ব লাভের প্রকৃত অধিকারী।)

যিনি এই সুখ ও দুঃখকে সমান ভাবে গ্রহণ করে নেন, কোনটাতেই তিনি হর্ষিত বা ব্যাথিত হন না, এনারাই ঠিক ঠিক বুদ্ধিমান পুরুষ, ধীর পুরুষ। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, একটা হাতি যদি ডোবাতে নামে, তখন ডোবাতে তোলপাড় হয়ে যায়, কিন্তু দীঘিতে নামলে বোঝাই যায় না, আর সমুদ্রে নামলে কোন প্রশ্নই নেই, কোথায় হাতি, কোথায় কি। আমরা হলাম ছোট্ট ডোবা, হাতি দূরে থাক, একটা ছাগলও যদি নামে জল তোলপাড় করতে শুরু করবে। সমুদ্রের মত হয়ে গেলে, হাজারটা হাতি নামলেও কিছু বোঝা যাবে না। ভগবান পর পর যত যুক্তি অর্জুনকে দিচ্ছেন, এগুলো কোনটাই ইমোশানাল কিছু না, একেবারে শুদ্ধ দর্শন নিয়ে বলছেন। বারো, তেরো আর চোদ্দ, তিনটে শ্লোকে ভগবান তিনটে স্তর থেকে বললেন। আত্মা সর্বব্যাপী, আত্মা দেহাভিমানী, আত্মা দেহ, তিনটে স্তর থেকে এনে দেখাচ্ছেন, কোনটাতেই তোমার শোক করা চলে না। তুমি যদি শোক মোহে অবসাদগ্রস্ত হও, আর যাই হোক, তুমি ধীর পুরুষ নও, তুমি বুদ্ধিমান পুরুষ নও। নিজেকে যদি তুমি বুদ্ধিমান মনে কর, ধীর মনে কর, শোক করা থেকে বিরত হও।

ভগবান এখানে এটাই বলতে চাইছেন যে, সুখে আর দুঃখে যাঁর সমান দৃষ্টি, শীত আর উষ্ণতায় কখনই বিচলিত হন না, এই ধরণের পুরুষরাই অমৃততত্ত্ব লাভ করতে পারেন। যিনি মহাপুরুষ, যিনি ঋষি তাঁরও কষ্ট হয়, কষ্ট হওয়াটাই স্বাভাবিক, আবার আনন্দের জিনিসকে যে তিনি ভোগ করেন না তা নয়, খুবই উপভোগ করেন। তাঁকেও যদি ভালো খাবার দেওয়া হয়, ভালো কাপড় দেওয়া হয়, ভালো সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া হয়, তাঁরও সেটা ভালো লাগবে, তাঁকে যদি কটূ কথা কেউ বলে, তাঁরও খারাপ লাগবে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের যে মূল কেন্দ্রে তিনি অবস্থান করে আছেন সেখান থেকে তাঁকে কখন টলান যাবেন না, সুখ দুঃখ যেটাই আসুক, তিনি জানেন ওটা আসবে আবার ক্ষণিকের মধ্যে চলে যাবে। একটু নড়ে উঠবেন, কিন্তু বিচলিত হয়ে যাবেন না। সুখ এলে তিনি কখনই চেষ্টা করবেন না কিভাবে এই সুখকে ধরে রাখা যায়। আবার খারাপ কিছু হয়ে গেল, তখনও তিনি বাবাগো মাগো বলে অস্থির হয়ে পড়বেন না, ও এসেছে আবার চলে যাবে, এই ভাব নিয়ে ঐদিকে মন দেবেন না, একটু কষ্ট হবে ব্যস্ ঐটুকুই। এনারা মনটাকে কখন এগুলোতে ফেলে রাখেন না, মনটা তাঁর সব সময় অমৃততত্ত্বে দিয়ে রাখেন, আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে মন আর কোথাও যাবে না। এরপর ষোল নম্বর শ্লোক, এই শ্লোকটি দর্শনের দিক থেকে অত্যন্ত উচ্চমানের।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোহন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।।১৬।।

(প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের গোচর হলেও শীতোষ্ণাদি উৎপত্তি-বিনাশশীল বলে অসৎ। এদের পারমার্থিক অস্তিত্ব নেই। কিন্তু আত্মার পারমার্থিক সত্তা আছে। আত্মা অজ্ঞদের অবিজ্ঞাত হলেও আত্মার কখনও অনস্তিত্ব হয় না। তত্ত্বদর্শিগণ সৎ ও অসৎ উভয়ের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন।)

ভগবান এর আগে তিনটে দর্শনকে এনে অর্জুনকে দেখালেন, কেন তোমার শোক করা উচিৎ নয়। প্রথম দর্শন, আত্মা সর্বব্যাপী; দ্বিতীয় দর্শন, জীবাত্মা দেহ থেকে দেহে যাচ্ছে; তৃতীয় দর্শনে বলছেন, যদি মনে কর দেহটাই আত্মা, তাতেও তোমার মন খারাপ করার কিছু নেই। কারণ এগুলো সবই *মাত্রাস্পর্শাস্তু*, ইন্দ্রিয়ের সাথে বস্তুর সংযোগে এই রকম হয়েছে, এতে মন খারাপের কিছু নেই। এগারো নম্বর শ্লোকে বললেন, যেটাকে নিয়ে শোক করার নয়, সেটাকে নিয়ে তুমি শোক করছ, তারপরেও তুমি নিজেকে একজন পণ্ডিত মনে করছ। এই পুরো জিনিসটাকে এবার ভগবান একটা দার্শনিক ভিত্তি দিচ্ছেন। একটা দার্শনিক ভিত্তিকে আমরা ব্যাখ্যা করলাম, আত্মাকে যদি সর্বব্যাপী রূপে দেখা হয়, তাহলে শোক করার কিছু নেই, কারণ সর্বব্যাপী হলে মারা যাওয়ার কোন প্রশ্নই হতে পারে না, সুতরাং যুদ্ধে কেউ মারা যাচ্ছে না। আর যদি আত্মাকে এইভাবে তুমি দেখ, আত্মা দেহ থেকে দেহে যাচ্ছেন, তাহলেও মৃত্যুতে শোক করার কিছু নেই, কারণ সে তো কোন না কোন দেহে আছেই। আর যদি মনে কর দেহটাই শেষ কথা, মরে গেলেই সব শেষ, তাতেও তোমার শোক করার কিছু নেই, কারণ শেষে দেখা যায় এগুলো সব ইন্দ্রিয় আর বস্তুর সংযোগ। এগুলো আমরা আগে আগে ব্যাখ্যা করে নিয়েছি।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই ষোল নম্বর শ্লোক বেদান্তকে প্রতিষ্ঠিত করে। সেইজন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক, শ্লোকের মর্মার্থ বুঝতে হয়ত আমাদের খুবই কঠিন মনে হবে, কিন্তু শুনে রাখা খুব দরকার। কারণ এই শ্লোক দেখিয়ে দিচ্ছে, আমাদের পূর্বজ ঋষিরা কত উচ্চস্তরে গিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। ওনারা সত্যকে কিভাবে দেখেছিলেন, এগুলোকে আমাদের সবারই জেনে রাখা দরকার।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ, খুব সহজ কথা। যেটা অসৎ বস্তু, সেটার কোন ভাব হয় না, অর্থাৎ উৎপন্ন হয় না, কখন তার অস্তিত্ব হয় না। আর যেটা সৎ বস্তু সেটার কখন অভাব হয় না, অভাবে মানে নাশ হয় না। আমার জীবন থেকে কেউ চলে গেল, জীবন থেকে কিছু চলে গেল, তখন প্রায়ই অনেককে এই কথা বলতে শোনা যায় –ও যদি তোমার থাকত, তাহলে

তোমার কাছেই থাকত। কোন জিনিস চুরি হয়ে গেলে বলবে, ওটা যদি তোমার জিনিস হত, তোমার কাছেই থাকত; তোমার নয়, let go। কিন্তু এর পিছনে একটা গভীর তত্ত্ব রয়েছে। বলছেন, অসৎ বস্তুর কখন অস্তিত্ব হয় না, এখানে অস্তিত্ব না বলে বলছেন ভাব হয় না। ভাব মানে হওয়া, সৎ বস্তুর কখন অভাব হয় না, তার মানে কখন নাশ হয় না। যেটা আছে সেটা সব সময় থাকবে, যেটা নেই সেটা কখনই থাকবে না। এর উলটো, যদি কোন জিনিস চলে যায়, তার মানে ওটা আদপেই ছিল না। আর যদি মনে করি কোন জিনিস আছে, ওটা কোন দিন যাবে না। এই কথা এমনি শুনলে মনে হবে, বাঃ কি সুন্দর কথা। একটা জিনিস, যেটা নাশ হয়ে যাচ্ছে, তার মানে ওটার অস্তিত্ব কখন ছিলই না। আর যদি মনে করি, এই জিনিসটা আছে, তার মানে এর কোন দিন নাশ হবে না। ঘুরিয়ে একটাই কথা আসে, নাশবান বস্তুর কোন অস্তিত্ব নেই, আর যার অস্তিত্ব আছে তার কখন নাশ হয় না। অত্যন্ত সাধারণ কথা, না বোঝার কিছু নেই। আমার পকেটে এই কলমটা আছে, এই কলম যদি নাশবান হয়, তার মানে এই কলমটা কখনই ছিল না। আমাদের কাছে এটা কি যুক্তিতে দাঁড়াবে? আমরা জানি কলমটা একদিন নষ্ট হয়ে যাবে। বেদান্ত বলবে, না, কলমটা কখন ছিলই না। কারণ এই কলমের জন্ম হয়েছে, একদিন এর বিনাশ হয়ে যাবে। সেইজন্য আসলে এর অস্তিত্ব কখন ছিল না।

এখন আমার হাতে যেটা দেখছি এটাকে নিয়ে আপনি আলোচনা করুন। এখন তুমি যেটা হাতে দেখছ, এটা তোমার বুদ্ধিবৃত্তি; তোমার মনের একটা বৃত্তির বাইরে আর কিছু না। এই জায়গাতে এসে জিনিসটা বুঝতে বা ধারণা করতে কঠিন লাগবে, লাগাটাই স্বাভাবিক। সহজেই যদি গীতা বুঝতে হয়, তাহলে আমাদের তো এক কথায় বলেই দেওয়া হল। কি বলে দেওয়া হল? যে জিনিসটা আছে, ওটার কখনই নাশ হয় না। যদি জিনিসটা চলে গিয়ে থাকে, তাহলে ওটার কোন কালেই অস্তিত্ব ছিল না। এই জায়গাতে আচার্য খুব ছোট্ট একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বেদান্ত দর্শন এর উপরেই দাঁড়িয়ে আছে।

খুব সংক্ষেপে আমাদের আগে বুঝতে হবে হঠাৎ এই শ্লোকটাকে কেন আনা হয়েছে। তার সাথে মনে রাখতে হবে হিন্দুদের দর্শন, শুধু ধর্ম দর্শন না, হিন্দুদের পুরো দর্শন এই শ্লোকের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সেইজন্য বলা হয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষোল নম্বর শ্লোক গীতার প্রাণ। হিন্দুদের যত উচ্চ চিন্তন আছে, এই শ্লোক তার প্রাণ। কোন কিছুকে জানার প্রক্রিয়াকে বলা হয় দর্শন, দর্শন মানেই তাই, জিনিসটাকে জানা।

পাশ্চাত্য দর্শনের বৈশিষ্ট্য হল, যখনই পাশ্চাত্যের কোন দর্শনের কথা বলা হয় তখন ওনারা সেই দর্শনের আগে একটা নাম নিয়ে আসেন, তারপর বলা হবে অমুকের দর্শন, যেমন বলা হয়, philosophy of Hegel, philosophy of Kant, philosophy of Plato ইত্যাদি। যাঁরা ফিলজফিতে অনার্স নিয়ে পড়েছেন, বা যাঁরা ফিলজফি একটু জানেন, তাঁরা এই জিনিসটা অবশ্যই জেনে থাকবেন। হিন্দুরা বলেন, যখনই কোন নাম লাগিয়ে দেওয়া হল, তার মানে এটা তাঁর বুদ্ধির কথা। প্লেটো, এ্যরিস্টটল, কান্ট, হেগেল যত বড় মেধাবীই হন, যত বড় পণ্ডিত হয়ে থাকুন, এই ফিলজফি তাঁর বুদ্ধি থেকেই আসছে। বুদ্ধি সব সময় দূষিত হতে বাধ্য। যিনি যত উচ্চ চিন্তনই দিয়ে থাকুন, তিনি কান্টই দিয়ে থাকুন আর হেগেলই দিয়ে থাকুন, যাঁরাই বুদ্ধিকে মাধ্যম করে কিছু দিয়ে যাচ্ছেন, হিন্দুরা কখনই তাঁদের কথাকে শেষ কথা বলে মানবেন না। হিন্দুরা যখনই জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেন, তখন তাঁরা জ্ঞানের দুটো অঙ্গ একেবারে স্পষ্ট করে দেন, একটা হল শেষ কথা, আরেকটা সাধারণ চলিত কথা। সাধারণ চলিত কথা নিয়ে আমরা যত খুশী মারামারি করতে পারি, এতে ওনাদের কোন আপত্তি নেই। শেষ কথাকে নিয়ে তাঁরা বলবেন, তোমার বুদ্ধিকে আমি ভরসা করতে পারব না। কারণ আজ তোমার এক রকম বুদ্ধি, আগামীকাল তোমার বুদ্ধি আর-এক রকম থাকবে। আর আজকে তোমার যা বুদ্ধি আছে, আগামীকাল তোমার থেকে আরও ভালো বুদ্ধি নিয়ে

আর-একজন আসবে, সে তোমার বুদ্ধিকে কেটে উড়িয়ে দেবে। তুমি কি সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছ? যদি সত্যকে প্রত্যক্ষ করে না থাক, তাহলে তোমার কথার কোন দাম নেই।

এখন কেউ এসে যদি দাবী করে বলে, আমি সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছি; কি করে বুঝব যে তিনি আদৌ সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন কিনা, নাকি মিথ্যা বলছেন? হিন্দুরা এখানে স্পষ্ট করে বলে দেন কিভাবে আমি বুঝব যে, তিনি সত্যকে আদৌ প্রত্যক্ষ করেছন, নাকি করেননি। বেদে যত মন্ত্র আছে, হিন্দুরা বেদের সব মন্ত্রকে সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে করেন, কারণ ঋষিরা ওই মন্ত্রগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন। আমরা যেমন কথামৃতকে সত্য বলে গ্রহণ করি, কারণ আমরা জানি ঠাকুর এগুলোকে প্রত্যক্ষ করেছেন। যারা ঠাকুরের ভাবকে মানে না, তারা বলবে, ঠাকুরের কথাগুলো ভাল, কিন্তু শেষ সত্য বলে আমরা মানি না। তেমনি বেদকেও সবাই সত্য বলে মনে করে না। বেদকে যারা সত্য বলে মনে করে না, তারা অহিন্দু। যেমন ভগবান বুদ্ধ, তিনি বেদকে শেষ সত্য বলে মানলেন না, তিনি আলাদা হয়ে গেলেন। জৈনরা বেদকে মানল না, আলাদা হয়ে গেল। কিন্তু হিন্দুদের ধর্মের ব্যাপারে বেদ হল শেষ কথা। হিন্দুদের যাবতীয় যত শাস্ত্র বা গ্রন্থ আছে, হিন্দুদের যত ঋষি, সাধু, মহাত্মা হয়েছেন, এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণ, এমনকি স্বামী বিবেকানন্দ, এনাদের সবারই শব্দগুলি বেদকে আধার করে।

বেদ হল এক বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার। এখন প্রশ্ন, এই বিশাল বেদ কি বলতে চাইছেন? বেদের মূল বক্তব্য কি? কারণ বেদ যে জিনিসগুলি অপরোক্ষ, সেই জিনিসগুলিকে নিয়ে বর্ণনা করছেন। ঈশ্বরকে নিয়ে বলছেন, স্বর্গ নিয়ে বলছেন, জন্মমৃত্যুকে নিয়ে বলছেন, কিন্তু কোথাও কোথাও আমরা যেন বুঝতে পারি না। তখনকার দিনে যে বড় বড় ঋষিরা ছিলেন, সত্যিকারের বড় ঋষি, আমরা যাতে বেদ বুঝতে পারি তাঁরা সেভাবেই বেদকে ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন, তাঁরা বলে দিলেন, আমরা বেদকে এই ভাবে বুঝলাম। সেটাকে তাঁরা নাম দিলেন দর্শন। তার মানে বেদের দর্শন বলে কিছু হয় না, উপনিষদেরও কোন দর্শন হয় না। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা, যাঁরা বেদ, উপনিষদকে নিয়ে গ্রন্থাদি লিখেছেন, তাঁরা সেখানে বলছেন, Philosophy of Veda, Philosophy of Upanishad, কিন্তু এভাবে কখন হয় না। কারণ বেদ উপনিষদের কথাগুলো হল সত্য। আগামীকাল যদি কেউ বলে Philosophy of Sri Ramakrishna, এই জিনিস কখনই হবে না। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের সবটাই প্রত্যক্ষ। কিন্তু যিনি উপনিষদের মন্ত্রের, ঠাকুরের কথার ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছেন, তখন ওই ব্যাখ্যাটা হয়ে যাবে ফিলজফি। এরপর তাঁকে প্রশ্ন করা হবে, আপনি কিসের উপর আধার করে এই ব্যাখ্যা দিচ্ছেন? উনি বলবেন, আমার আধার বেদ। আমি বলতে পারি, আমি বেদ মানি না। তখন ওনারা এটাই করবেন, যে অংশগুলি বেদের বাইরে, সেটাকে নিয়েই একটু আলোচনা করে দেখিয়ে দেবেন আপনি কিভাবে ভুল।

বেদকে আধার করে ভারতে ছয়টি দর্শন হয়েছে, একত্রে বলা হয় ষড়দর্শন। এর মধ্যে নামকরা দর্শন হল বেদান্ত। কিন্তু ছটি দর্শনেরই নিজস্ব দাম আছে। সাংখ্য আর যোগ এই দুটি দর্শন হল খুব প্রাচীন দর্শন। ন্যায় ও বৈশাষিক এই দুটি আর মীমাংসা ও বেদান্ত, সব মিলে এই ছটি দর্শন। ছটি দর্শনেরই দাম আছে। যোগ সম্বন্ধীয় আমরা যা কিছু শুনে থাকি, সেগুলো এসেছে যোগদর্শন থেকে। ইদানিং ব্যাঙের ছাতার মত সংস্থা গজিয়ে উঠেছে, যেখানে নাক বন্ধ করে কিভাবে নিঃশ্বাস নিতে হবে, হাত উপরে কর, পা মাথার উপরে নিয়ে যাও, বিভিন্ন রকমের যোগাভ্যাসের শিক্ষা দিচ্ছে। মূলতঃ এগুলো সব হঠযোগ, এদের আমরা কাউন্টিংএ নিই না।

রাজযোগ হল পুরোপুরি মনকে নিয়ে। সত্য কি, অবিদ্যা-বিদ্যা কি ইত্যাদি রাজযোগের যে তত্ত্বকথা, এগুলো ওনারা বেদ থেকে নেন, সাংখ্য দর্শনও তাই করে। ন্যায় দর্শন পুরো লজিক দিয়ে চলে, আর বৈশাষিক লজিককে আরও নিজের মত রিফাইন করে। কিন্তু বৈশাষিক, ধীরে ধীরে তার

গ্রহণযোগ্যতা কমে গেল, থেকে গেল ন্যায়। সাংখ্য দর্শন সব দর্শনের জনক। কিন্তু পরে সাংখ্য দর্শনও ধীরে ধীরে তার জনপ্রিয়তাটা হারিয়ে ফেলে, যদিও সাংখ্য দর্শনের অনেক কিছু পরে যোগ আর বেদান্ত নিয়ে নেওয়ার ফলে, সাংখ্যের জিনিসগুলো থেকে গেল। মীমাংসা বেশী জোর দেয় বেদের কর্মকাণ্ডের উপর, তার সাথে স্বর্গ, দেবতা; পরে হিন্দুদের যত আচার উপাচার পালন করা হয়, এগুলো সব মীমাংসা থেকে এসেছে।

কিন্তু হিন্দুদের মূল দর্শন বেদান্ত থেকে আসে। আচার্য শঙ্কর বা রামানুজরা যখন বেদ, উপনিষদের ভাষ্য রচনা করলেন, এনারা সবাই ওই ছয়টি দর্শন থেকে কিছু কিছু কথা নিয়েছেন। তার মানে, তাঁরা এই ষড়দর্শনকে মানছেন। আবার অনেক জায়গায় আক্রমণও করেছেন, এটা দেখানোর জন্য যে, তোমার দর্শনে ত্রুটি আছে। ত্রুটি থাকা মানে, এটা শেষ কথা হতে পারে না। কয়েকবার আমরা এই কথা বলেছি, সমস্ত দর্শনের কাজ হল, জীব, জগৎ ও ঈশ্বর এই তিনটেকে পরিভাষিত করা। এই ছটি দর্শনই জীব, জগৎ আর ঈশ্বরকে নিজের মত পরিভাষিত করেন। আর এখনও যাঁরা দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করেন, তাঁদের ছটা দর্শনই পড়তে হয়।

আমরা আলোচনা করছি গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষোল নম্বর শ্লোক, যেখানে বলছেন, অসতের জন্ম হয় না, সৎএর নাশ হয় না। তার মানে আপনি সৃষ্টি আর নাশের কথা বলছেন, সৃষ্টি আর নাশের কথা বলা মানেই হল জীব আর জগতের ব্যাপারে বলা, ঈশ্বরের তো সৃষ্টিও হতে পারে না, নাশও হতে পারে না। সৃষ্টি আর নাশ জীব আর জগতেরই হবে, খুব হলে জগতের হবে। তার মানে এখানে জগৎকে ব্যাখ্যা করছেন। সৎ ও অসৎকে নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব, তার আগে আমরা এর দর্শনটা দেখে নিচ্ছি।

হিন্দুদের সৃষ্টিতত্ত্বে একটা নামকরা ফিলজফি হল, বিবর্তবাদ। বিবর্তবাদ আবার বেদান্তের মত। এর ঠিক ভাই হল পরিণামবাদ। আর এই দুটোরই মা হল সৎকার্যবাদ। শুরু হয় সৎকার্যবাদ থেকে, পরে দুটোই বিভক্ত হয়ে যায় বিবর্তনবাদ আর পরিণামবাদে। সৎকার্য বাদ হল, আমরা যে কোন বস্তু দেখছি, সেই বস্তুর কার্য আগে থেকেই কারণের মধ্যে নিহিত আছে। আমরা যে ঘট দেখছি, ঘট আগে থেকেই মাটিতে আছে, এটাকে বলে সৎকার্যবাদ। বিভিন্ন দর্শন সৃষ্টিতত্ত্বকে বিভিন্ন ভাবে বলেন, কিন্তু আমাদের এখানে সৎকার্যবাদ থেকেই সৃষ্টিতত্ত্ব শুরু হয়। সৎকার্যবাদে আবার দুটো দর্শন এসে যায়, একটা বিবর্তনবাদ আরেকটা পরিণামবাদ।

পরিণামবাদে বলেন, যে পরিবর্তনগুলি হয় সেটা বাস্তবিক। আমরা যেমন জানি এবং দেখছিও, দুধ থেকে দই হল, এটা বাস্তবিক হচ্ছে। দই আর কোন দিন দুধ হতে পারবে না। বেদান্ত এটাকে পরিণামবাদ না বলে বলছেন বিবর্তবাদ। বিবর্তবাদ বলছে, এই পরিবর্তনটা বাস্তবিক পরিবর্তন নয়, এই পরিবর্তনটা উপরে উপরে। কেন এই রকম বলছেন, এটা না বুঝলে ষোল নম্বর শ্লোকটা বোঝা যাবে না।

আমরা জীব, জগৎ ও ঈশ্বরের কথা বললাম। প্রথমে এনারা ধরবেন, ঈশ্বর যদি সত্য হন এবং তার সাথে এনার্জি যদি সত্য হয়, অর্থাৎ এনার্জি একটা আলাদা সত্তা, আর এটাই সাংখ্য দর্শনের বলিষ্ঠ মত। সাংখ্য ছাড়া আরও অনেকে মনে করে দুটো সত্তা আছে, এটাকেই বলে দ্বৈতবাদ। দুটো যদি সত্য হয়, যেমন সাংখ্য আর যোগ বলছে, যেখানেই এই প্রসঙ্গ আসবে সেখানে বলবে পুরুষ আর প্রকৃতি দুটোই স্বাধীন। আমরা ফিলজফিকে ছেড়ে দিয়ে ধরে নিচ্ছি এই জগৎ আছে আর ঈশ্বর আছেন। আমাদের মোটা বুদ্ধিতে যেমন মনে করি, ভগবান বিষ্ণু আছেন বা শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন আর এই জগৎ আছে। এই জগৎ কি ঠাকুর থেকে আলাদা? এই জগতের কি বাস্তবিক অস্তিত্ব রয়েছে?

ইদানিং কালে একটা নূতন শব্দ এসেছে, বলছেন স্পেস। কোন পুরুষ একজন নারীকে ভালবাসে, বা বিয়ে করেছে, করার পর পুরুষ নারীকে বলবে, তুমি আমাকে স্পেস দাও না। স্পেস না দেওয়া মানে, তুমি আলাদা আমি আলাদা, দুটো পৃথক স্বাধীন সত্তা। আবার অনেকে আছে যারা বলছে, আমি আর তুমি মিলে এক হয়ে গেছি। ঈশ্বর আর জগৎ যদি দুটো আলাদা স্বাধীন সত্তা হয়, তাহলে জগৎ নিজের স্পেস চাইবে, তার মানে ঈশ্বর অসীম ক্ষমতাবান নয়। কারণ তাঁর স্পেস দরকার। দুটো আলাদা সত্তা হয়ে গেল। কারণ সে নিজের স্পেস চাইছে, সে বলছে, আমি স্বাধীন সত্তা, আমি আমার মত চলব, ঈশ্বরের ইচ্ছা মত চলব না। যেমনি আমরা স্বাধীন সত্তা শব্দ নিয়ে আসছি, তার মানে সে স্বাধীন, তেমনি সে নিজের মত চলবে। যদি সে নিজের মত চলে, তার মানে তার উপর ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ নেই। আর ঈশ্বরের যদি তার উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকে, সেই ঈশ্বর আবার কিসের ঈশ্বর!

বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্তেরই একটা মত, রামানুজ যার প্রবক্তা, তাতে বলছেন এই জগৎ ঈশ্বরেরই একটা অংশ। বেদের পুরুষসূক্তমেও এই রকম বলছেন, ভগবান নিজের শরীর থেকেই এই সৃষ্টি করেছেন, উপনিষদেও এই রকম আসে। কিন্তু সেখানে আচার্যের শঙ্করের ব্যাখ্যাতে পরিষ্কার আছে, জগৎ যদি ঈশ্বরেরই একটা অংশ হয়ে থাকে, যেমন আমরা জানি এই কলমটা একটা জড় বস্তু, এতে কোন সন্দেহ নেই। জগৎটা জানি জড়, তাহলে এই দাঁড়ায় যে, ভগবান কিছুটা হলেন চৈতন্য আর কিছুটা জড়। এটা কি ধরণের ভগবান! আবার অন্য দিকে, জড় আর চৈতন্যের ঝামেলাটা মেটানোর জন্য যদি বলা হয়, পুরো সৃষ্টিটাই যদি ঈশ্বর হন, তাহলে ঈশ্বর বলে কেউ আর থাকবেন না, যেটা জড়বাদী, ভৌতিকবাদীরা বলেন। ফিজিক্সে যেমন বলা হয়, জগৎই শেষ কথা, জগৎই আছে, জগতের বাইরে কিছু নেই; এরপর ঈশ্বরের আর কোন প্রয়োজন থাকে না। এটাই যদি সত্য হয়, তাহলে বেদ, বেদের দর্শন, বেদের ঋষি বলে কিছুই থাকল না। তাহলে বেদান্ত যুক্তিতে কিভাবে এটাকে দাঁড় করাল? এরপর আমরা এটাই দেখব।

আচার্য দেখাবেন দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত সব অদ্বৈত বেদান্তের মধ্যে রয়েছে; দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত বেদান্তেরই ছোট অংশ। অদ্বৈত বেদান্ত প্রথমে দেখালো, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশাষিক, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত, তোমাদের এই মতগুলো হল সীমিত। এটা যুক্তিতে দাঁড়ায় না। এরপর আচার্য বাকিদের ধরবেন, নাস্তিকদের ধরবেন, চার্বাকদের ধরবেন, বৌদ্ধদের ধরবেন, সবাইকে ধরে ধরে দেখাবেন তোমাদের মত কেন ভুল। যার জন্য আজ ভারতবর্ষের সবচেয়ে উচ্চমানের দর্শন হল বেদান্ত। আচার্য সৃষ্টি কিভাবে হয় বোঝনর জন্য, এক এক করে যুক্তি দিচ্ছেন।

একটু আগে আমরা যে দই আর দুধের কথা বললাম, দই আর দুধটা কোন ব্যাপার নয়, যেটা পরে আমরা দেখব, কারণ আমরা দুধ আর দই নিয়ে কথা বলছি না, বলছি শেষ কথা নিয়ে। বলছেন, যার অস্তিত্ব নেই, যাকে অসৎ বলছি, যদি বলি একটা জিনিস নেই, আসলেই নেই; অসৎ থেকে যদি কিছু বেরিয়ে আসতে পারত, তাহলে আমি আপনি পাথর, বালি থেকেও বেরিয়ে আসতে পারতাম। বালি থেকে তেল পাওয়া যায় না, তেল আসে সরষে, তিসি ইত্যাদির বীজ থেকে। তার মানে তেল আগে থেকেই সরষেতে রয়েছে, সেইজন্য সরষে থেকে তেল আসছে। এনারা সাধারণ স্তর থেকে কথা বলছেন না, খুব উচ্চস্তর থেকে বলছেন।

প্রথম যুক্তি আনছেন, অস্তিত্ববিহীন কোন বস্তুর যদি সত্তা এসে যায়, তার মানে তার অস্তিত্ব যদি এসে যায়, তাহলে কিন্তু আমরা যে কোন বস্তু থেকে যে কোন বস্তু বার করে দিতে পারব। জাদুকর জাদু দেখাতে গিয়ে একটা রুমাল থেকে কত রকম জিনিস বার করে দেয়। আমরাও তো জীবনে এই ভাবে অনেক কিছু বার করতে চাই, কিন্তু কিছুতেই বার হয় না। তাহলে প্রথম কথা হল, কিছু জিনিস থেকে কিছু বিশেষ জিনিস বেরোবে। দই যদি বার করতে হয় তাহলে দুধ থেকেই বার

করতে হবে, জল থেকে বার করা যাবে না। তার মানে কোন না কোন ভাবে দই আগে থেকেই দুধে আছে বলেই দই বের হচ্ছে, অত্যন্ত সহজ যুক্তি। কিভাবে আগে থেকেই আছে আমরা পরে আলোচনা করব। কিন্তু যে কোন জিনিস যেখান থেকে খুশী বেরিয়ে আসতে পারত, তাহলে জল থেকেও দই বেরিয়ে আসত। একটু গভীরে গিয়ে যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখতে পাওয়া যায় যে, কিছু পরিবর্তন বাদে কার্য ও কারণের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। যেমন মাটি ও পাত্র, যখন মাটি থেকে পাত্র তৈরী করা হয়, তখন আসলে দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কারণ কার্য যেটা হবে বা হচ্ছে, সেটা কারণের মধ্যে আগে থেকেই ঢুকে আছে; যেমন বলা হল, ঘট মাটি থেকে বেরিয়ে আসছে। সাংখ্যবাদীরা এই জায়গাতে বলবেন, কুম্ভকার নিজের দক্ষতা, কুশলতা ওর মধ্যে লাগাচ্ছে, পরিশ্রম করছে বলেই মাটি থেকে ঘট বেরিয়ে আসছে। এনারা বলবেন, সেটাই যদি সত্য হত, তাহলে পাথর থেকেও ঘট বেরিয়ে আসত। ঘট মাটির মধ্যে আগে থেকে আছে বলেই, ঘট বেরোতে পেরেছে। সেখান থেকে পরিণামবাদ আর বিবর্তবাদ আলাদা হতে শুরু করল। সাংখ্যের যে পরিণামবাদ, মাটি ঘটে পরিবর্তন হল, বেদান্তীরা বলছেন, এটা সম্ভব না। কারণ ঘট যদি মাটিতে আগে থেকেই না থাকত, ওটা মাটিই যদি না থাকত, তাহলে ঘটগুলো পাথর থেকেও বেরিয়ে চলে আসতে পারত।

তাহলে দুধ থেকে যে দই হচ্ছে, এই দই জিনিসটা কি? বলছেন, যে কোন রূপ আমরা যেটা দেখি, যেমন একটা পাত্র দেখছি, এটা হচ্ছে একটা বস্তু, এটা হল তার একটা অবস্থার পরিবর্তন। কেমেস্ট্রিতে বলা হয়, physical change and chemical change। যেমন জল, কখন বরফ হয়ে যাচ্ছে, কখন বাষ্প হয়ে যাছে, কিন্তু ওর chemical property সব সময় থাকবে H_2O। এনারা কিন্তু আরেক ধাপ এগিয়ে যান, এনারা বলেন দুধ যখন দই হয়ে যায়, যদিও এটা chemical change, কিন্তু এনারা বলবেন chemical change বটে কিন্তু substanceএ পালটায় না, আসল বস্তুটা পালটায় না, ঠিক তেমনি এই পরিবর্তনে আসল বস্তুটা পালটায় না। আসল বস্তু আগে থেকেই ছিল, আর যখন ছিল তখন মিলে মিশে এক হয়ে ছিল। সেইজন্য কার্য ও কারণ কোন পরিস্থিতিতেই আলাদা কিছু হতে পারে না। বলছেন, যদি আলাদা থাকত, দুধ আর দই আসলে যদি আলাদা থাকত, আলাদা হওয়ার জন্য এই দুটোর সংযোগ করতে হলে একজন ঘটক লাগবে, যার জন্য একটা তৃতীয় জিনিসকে নিয়ে আসতে হবে।

যদি স্বভাবে আলাদা হত, যেমন বালি আর তেল স্বভাবে আলাদা, দুটোর সংযোগ হয় না। আমরা যদি বলি, সরষে আর তেল যদি সত্যিকারের আলাদা থাকত, তাহলে এই যে সরষের মধ্যে তেলকে ঢুকিয়ে রেখেছে, যেখানে আমরা তেলকে দেখতে পাচ্ছি না, সরষেকে দেখছি; তাহলে তৃতীয় কিছু লেগেছে দুটোকে জোড়ার জন্য। আমরা যে আঠা ব্যবহার করি, দুটো আলাদা জিনিসকে জোড়ার জন্য আঠা লাগাতে হচ্ছে। তার মানে তৃতীয় একটা শক্তি লাগছে। এই তৃতীয় শক্তি যেটা আসবে, সেটাকে এই দুটোর সমান হতে হবে; তার সাথে কিছু তফাৎ থাকতে হবে, নাহলে দুটো এক হয়ে যাবে। ঐটাকে করার জন্য একটা চতুর্থ জিনিস লাগবে। ওটাকে জোড়ার জন্য আরেকটা পঞ্চম জিনিস লাগবে, যুক্তিতে এটাকে বলে অনবস্থাদোষ। অনবস্থাদোষ মানে, একটা থেকে আরেকটা, সেটা থেকে আরেকটা, এইভাবে চলছে তো চলছেই, কোথাও শেষ হবে না। যুক্তিতে এই ধরণের অবস্থাকে মানা হয় না।

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের একটা খুব সুন্দর ঘটনা আছে, বাচ্চারা কাহিনী শুনে শুনে জগতের ব্যাপারে একটা ধারণা করে নেয়। এই জিনিস অনেক বড় বড় নেতাদের মধ্যেও দেখা যায়, হঠাৎ দুম্ করে একটা কথা বলে দিল, গরুকে নিয়ে, গরুর দুধকে নিয়ে, গোবরকে নিয়ে, গোমুত্রকে নিয়ে; বাচ্চা বয়সে কিছু শুনেছে সেটা আজও তার কাছে সত্য হয়ে আছে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল, এক জায়গায় একটা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন তাঁর বয়স কম। একজন বৃদ্ধা মহিলা সামনের সারিতে বসে খুব মন দিয়ে

শুনে যাচ্ছেন। রাসেল সৃষ্টি, জগৎ, কসমস এই জিনিসগুলোকে নিয়ে বলছিলেন। বক্তৃতার শেষে ওই বৃদ্ধা মহিলা উঠে বলছেন, 'ইয়ং ম্যান তুমি খুব ভাল বলো, কিন্তু তুমি যা কিছু বলেছ সব বকওয়াস। এই পৃথিবীটা আসলে একটা কচ্ছপের উপরে স্থির হয়ে আছে'। বার্ট্রাণ্ড রাসেল সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই কচ্ছপটা কোথায় আছে'? মহিলা তখন হেসে বলছেন, 'আমি বুঝতে পারছি, তুমি খুব ইন্টেলিজেন্ট। ওই কচ্ছপটা আরেকটা কচ্ছপের পিঠে আছে, সেই কচ্ছপটা আরেকটা কচ্ছপের উপর আছে, ওই কচ্ছপটা আরেকটা কচ্ছপের উপরে'। 'কতদূর পর্যন্ত'? 'যত দূর তুমি যাবে tortoise is all the way'। পুরাণে আছে, খুঁজতে খুঁজতে পাতাল লোকে গিয়ে দেখছেন সেখানে হাতিগুলো পৃথিবীকে ধারণ করে আছে। সেই হাতিগুলো কোথায় আছে? এগুলো হল বাচ্চাদের কাহিনী, বোঝানর জন্য বলা হয়, সেটাকে একটা ধর্মীয় ভাবের দিকে মোর ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু যখন যুক্তিতে যাবে, তখন পুরোটাই যুক্তিতে চলবে।

দুধ আর দই যদি পুরোপুরি আলাদা হয়, তাহলে দুটোকে জুড়ে দেবার জন্য তৃতীয় একটা জিনিস লাগবে। আমরা বলতে পারি ব্যাক্টেরিয়া জুড়ছে। না, ব্যাক্টেরিয়া জোড়ে না, এটা হল আসল substanceটা যদি পুরোপুরি আলাদা থাকে, qualitatively যদি ভিতর থেকে আলাদা থাকে। আমাদের সমস্যা হল, আমরা মনে করি হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন আলাদা। ইলেক্ট্রিসিটি পাস করলে জল হয়ে যায়, আসলে আলাদা নয়। আজ থেকে দুশো বছর আগে লোকেরা হয়ত মনেও করতে পারত, কিন্তু যখন পিরিয়ডিক টেবিল এসে গেল, আর তার উপর যখন structure of atom এসে গেল, তখন দেখলেন আসলে সবটাই হল ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন যখন হয়, তখন ওদের ইলেক্ট্রন প্রোটন এক অপরকে ছাড়ে, এক অপরের সাথে জুড়ে যায় বলে ওটা জুড়ে যাচ্ছে। তার মানে দুটোর মধ্যে কমন জিনিস রয়েছে, তা হল ইলেক্ট্রন প্রোটন। তা নাহলে এটা কখনই সম্ভব হত না।

একটা তৃতীয় জিনিস যদি নিয়ে আসা হয়, তাহলে আরেকটা চতুর্থ জিনিস লাগবে, ওই জিনিসটাকে জোড়ার জন্য আরেকটা পঞ্চম জিনিস লাগবে, এভাবে চলতেই থাকবে, কোথাও গিয়ে সমাধান হবে না। এটাকে বলে অনবস্থাদোষ। বেশীর ভাগ সময় আমরা তর্কবিতর্ক করার সময় অনবস্থাদোষে পড়ে যাই।

আচার্য বলছেন, একটা বস্তুর যেটা বাস্তব, ওই বাস্তব যে জিনিসটা, সেটাকে কোন ভাবেই পরিবর্তন করা যাবে না। যেমন সোনাকে আমরা কখনই পাল্টে দিতে পারি না, সোনা সব সময় সোনাই থাকবে। যদি পাল্টে দেওয়া হয় তাহলে ওটা আর সোনা থাকবে না, আসলে ওর মধ্যে আদপে সোনার ভাব কখনই ছিল না। অর্থ হল, অবস্থার পরিবর্তন হয়, কিন্তু তার ভিতরে যে জিনিসটা আছে, সেটার কখন পরিবর্তন হয় না। অবস্থার পরিবর্তনকে এনারা পুরোপুরি মানেন। আমরা চারিদিকে দেখছি শুধু পরিবর্তন আর পরিবর্তন। কিন্তু আসল জিনিসটা যেমন থাকার তেমন থাকে। খুব সহজ উপমা হল, সমুদ্র আর ঢেউ, সমুদ্র হল মূল, ঢেউ হল পরিবর্তন। পরিবর্তন সব সময় পাল্টাচ্ছে। দুধ দই হয়ে যাচ্ছে, এটা একটা পরিবর্তন, কিন্তু বস্তুর কোন পরিবর্তন হয় না।

আমরা তাহলে আসলে কি দেখছি? আমরা কোন কিছু যখন দেখি, তখন দুটো জিনিস দেখি। আমি এই কলমকে দেখছি, বেদান্ত বলবে, আমি দুটো জিনিস দেখছি, কিন্তু আমরা বলব একটা জিনিস দেখছি। একটা জিনিস হল কলম। আমি দেখছি কলম। বেদান্ত বলবে, তুমি শুধু কলম দেখছ না, দুটো জিনিস দেখছ –কলম আর কলমের অস্তিত্ব, মানে কলম আছে। আমরাও মুখে অত বলি না, কিন্তু মনে মনে কিন্তু ভাবছি কলমটা আছে। তার মানে আমার বুদ্ধি একই সাথে দুটো জিনিস দেখে, কলম আর কলমের অস্তিত্ব। আবার অনেক সময় অভাব দেখে। যেমন আমরা এখানে সবাই বসে আছি, এখানে হাতি নেই। যেমনি একজন কেউ বলে দিল, 'হাতি আছে', তখন আমরা

দুটো জিনিসকে এক সঙ্গে বোধ করছি, হাতি আর হাতির অভাব। সেইজন্য অভাব যে দেখছি, এটাও আমার বোধের বস্তু। বোধ যখন হয় তখন দুটো জিনিস একসাথে হয়, হাতি আর হাতির অভাব, কলম আর কলমের অস্তিত্ব।

এখন কলমটাকে যদি খাপ থেকে আলাদা করে দিই, বা কলমটা আমার পকেটে চলে গেল। তখন বলছি কলমটা কোথায় গেল, বা খাপটা আছে, কলমটা নেই। এখন কলমটা নেই, কিন্তু আছে বোধটা থেকে যাচ্ছে। কোথায় থাকছে? এই খাপে। জগতের সব কলমকে যদি নষ্ট করে দেওয়া হয়, তাহলেও কিন্তু খাপগুলো থেকে যাবে। আর খাপগুলোকেও যদি নষ্ট করে দেওয়া হয়, অর্থাৎ সমস্ত কলমকে পুরোপুরি নষ্ট করে দেওয়া হয়, তখন অন্য বস্তুগুলো থাকবে। অন্য বস্তুগুলো যখন আছে, সেখানে 'আছে' এই বোধটা কিন্তু থেকেই যাবে; 'আছে' বোধটা কখনই যাবে না।

অস্তি বোধ আর বস্তু বোধ, এই দুটি বোধ সব সময় এক সঙ্গে চলে। মনে করা যাক একটা পদ্ম, যেটা ওনাদের খুব মনের মত উদাহরণ। একটা লাল পদ্ম নিলাম, লাল পদ্মে তিনটে বোধ একসাথে চলে, একটা চলে লাল, একটা পদ্ম, আরেকটা চলে অস্তি। ঠিক এই রকমই যে দুটো আসছে তা নয়, কারণ সেখানে লাল হল তার বিশেষণ বা গুণ। বস্তুর যে বোধ, লাল আর পদ্ম, দুটোরই বোধ আসে, তার সাথে অস্তি বোধটা রয়েছে। এবার যদি আমরা আস্তে আস্তে পিছনের দিকে যেতে শুরু করি, তখন দেখছি এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবটাকে এ্যাটমসে ফেলে দেওয়া যায়। আর একটা অতি সাধারণ জ্ঞান হল, যা কিছু আমাদের এখানে আছে সবটাকে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, যেটা সূর্যের মূল জিনিস, সেখান থেকে আসছে। ওখান থেকেও ধীরে ধীরে নেমে এলে ইলেক্ট্রন প্রোটনে চলে যাচ্ছে, আর সেখান থেকে এখন ফিজিক্স বলছে, সব কিছু কোয়ার্ক। একটা একটা করে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বেসিক জিনিসে চলে যাচ্ছে। তার মানে দুধ হোক আর দই হোক, সোনা হোক আর গয়না হোক, সবটাই হল ইলেক্ট্রন আর প্রোটন, তাছাড়া কিছু না। যখন শুনলাম দুধ আর দই বাস্তবে এক, শোনার পর আঁৎকে উঠলাম। কিন্তু এবার দেখছি সবটাই হল এ্যাটম, কি ইলেক্ট্রন প্রোটন। এবার দেখতে পাচ্ছি সব সমান হয়ে গেল। গভীরে যেতে হলে ঠিক ঠিক গভীরে যেতে হবে। এমনি যখন বলছি, দুধও যা দইও তাই, শুনে লোকেরা বলবে, লোকটা পাগল। কিন্তু যখন সব কিছু বিশ্লেষণ করে ভিতরে ঢুকছি, তখন দেখছি, তাই তো আসলে তো তাই। যত মূলে যাচ্ছি, তত দেখছি সব কিছু এক হয়ে যাচ্ছে।

মনে করা যাক, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কিছু নেই শুধু আমি আছি, তখন আমার কি বোধ থাকবে? আমার অস্তিত্ব আছে, এই বোধটা থাকবে। তখন দুটো জিনিস থাকবে, আমি ও আমার অস্তিত্ব। ধ্যানের গভীরে গিয়ে যখন আমিটাও উড়ে যায়, তখন ওই জায়গাতে এসে যায় শুধু অস্তি মাত্রম্। কথামৃতে ঠাকুর এই কথা বারবার বলছেন – সত্তা মাত্রম্। ধ্যানের গভীরে এটাই শেষ অবস্থায় দেখে –যাবতীয় যা কিছু আছে, শুধু সত্তা মাত্রম্।

এই সৎ জিনিসটাকে বলা হয় ব্রহ্ম। ঠিক তেমনি যে কোন জিনিস যখন ভাবছি, যা কিছু দেখছি, সবটাতে আমরা অস্তি ভাব দেখি; জিনিসটা আছে, এই 'আছে' ভাব সব কিছুর মধ্যে সাধারণ; তুমি আছ, সে আছে, এটা আছে। মানুষ, বস্তু সব পাল্টে যাচ্ছে, কিন্তু 'আছে' এই জিনিসটা থেকে যাচ্ছে। এই 'আছে' ভাব, অস্তি ভাব সমস্ত কিছুর মধ্যে রয়েছে। এখন যা কিছু আমরা চিন্তা করছি, যা কিছু আমরা দেখছি, যা কিছু অনুভব করছি, সব কিছুর মধ্যে ওই একটি জিনিস থেকে যাচ্ছে, সত্তা মাত্রম্। এই বোধটা যদি কোন সময় নাশ হয়ে যায়, তারপর আবার যদি ফিরে আসে, যেমন গভীর ঘুমে আমাদের কোন বোধ থাকে না। ঘুম ভাঙার পর যখন জাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসি, তখনও আমাদের ওই বোধটা থাকে। গভীর নিদ্রার পর ঘুম ভাঙলে আমরা বলি, এমন গভীর ঘুমে ছিলাম যে আমার কিছু মনে নেই। তখনও বলছি, আমি ঘুমিয়েছিলাম, তার

মানে সেখানেও একটা সত্তার বোধ থেকে যায়। যোগীরা নির্বিকল্প সমাধিতে গিয়ে আবার যখন সেখান থেকে ফিরে আসেন, তখনও সমাধির অবস্থায় কি হয়েছিল মুখে বলতে পারেন না ঠিকই, কিন্তু ওই বোধ, সত্তা আছে, এটা থেকে গেল। এই সৎ জিনিসটা কখনই নাশ হবে না।

কিন্তু যে জিনিসগুলিকে আমরা দেখছি, অনুভব করছি, এটা হল appearance, এটা নাশ হয়ে যাবে। নাশ হয়ে যাবে বুঝলাম, তাহলে আগে কি কখন ছিল? কি করে থাকবে, সবটাই তো আমাদের মনের একটা অবস্থা। যেমন বলা হল, সোনা থেকে গয়না হচ্ছে, গয়নার উপর আরও কারিকুরি করলে তার দাম বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু আসলে বস্তুতঃ ওটা কিছুতেই কিছু পাল্টাচ্ছে না। আর দর্শনের দিক থেকে যখন গভীরে যাচ্ছি, তখন দেখছি সত্তা মাত্রম্, এর বাইরে আর কিছু থাকছে না। কিন্তু সত্তাকে আমরা সব সময় দেখতে পাচ্ছি না, বস্তুকে দেখতে পাচ্ছি। ঠিকই বলছেন, দেখতে পারা যায় না, কারণ সেখানে বাধা রয়েছে। সেখানে আমাদের ইন্দ্রিয়, আমাদের মন বাধা তৈরী করে রেখেছে। ঠিক তেমনি দই আর দুধ, দইএর যে নাম আর রূপ, এটা তাকে বাধা রূপে আটকে দিচ্ছে, দুধ রূপে দেখতে দেয় না। এই জগৎও নাম-রূপ দিয়ে আটকে দিচ্ছে, আসল ব্রহ্মকে জানতে দেয় না। এই যে আমরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি, জপধ্যান করছি, তপস্যা করছি, এত কিছু করার উদ্দেশ্য যেটা নেই সেটাকে নিয়ে আসা না, যেটা সব সময় আছে, আর সেটার উপর যত বাধা চাপা পড়ে আছে, সেই বাধাকে সরিয়ে দেওয়া। এই পয়েন্টটার জন্যই আমাদের এই এত দীর্ঘ আলোচনা।

ঈশ্বর দর্শন হওয়া, ঠাকুরের দর্শন হওয়া, আমাদের মনে হয় যেন একটা অপ্রাপ্য বস্তুকে দাঁড় করালাম। যেমন আমরা কাহিনীতে শুনে থাকি, যোগীরা বালি থেকেও তেল বার করে দিলেন। যে জিনিসটা হতে পারে না, সেটা করে দেখালেন। বেদান্ত এটা মানে না, বেদান্ত সব সময় বলবে, যে বস্তুটা সব সময় রয়েছে, তুমি শুধু সেটাকেই জানতে পারবে। যদি বস্তুটা না থাকে, তুমি কোন দিন জানতে পারবে না। কিন্তু আমি তো ঈশ্বরকে দেখতে পাচ্ছি না, জানতে পারছি না। ঈশ্বরকে দেখতে না পাওয়া বা জানতে না পাওয়ারই তো কথা, ঈশ্বর কি তোমার থেকে দূরে কোথাও, ঈশ্বর কি বাইরে কোথাও? কিন্তু আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। দেখতে পাচ্ছ না কারণ বাধা রয়েছে। একটা লণ্ঠনের আলো, তার কাঁচের বাইরেটা তুমি মোটা কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছ, তুমি আলো দেখবে কি করে! সাধনা কেন, শাস্ত্র অধ্যয়ন কেন? শাস্ত্র অধ্যয়ন করা, শাস্ত্রের মর্মার্থ মনন করা, জপধ্যান করা, তপস্যা করা, এগুলো করা হয় শুধু ওই বাধা বা আবরণটাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য। এটা শুধু বেদান্তের মত না, যোগদর্শনও তাই বলে, পতঞ্জলি যোগসূত্রে *ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ* সূত্র আছে, সেখানেও জীবের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির বাধাগুলির অপসারণের কথা বলা হয়েছে।

ঠাকুর খুব সুন্দর করে সহজ ভাষায় বলছেন, তাঁর কৃপা বাতাস সব সময় বইছে, পাল তুলে দাও। এটা যেমন বলছেন, ঠিক তেমনি বাইরে মিষ্টি মিষ্টি শীতল হাওয়া বইছে, কিন্তু ঘরের জানালা দরজাগুলো সব বন্ধ। আমাজন নদীর এত জল আর এত বেগ যে, সমুদ্রের মোহনায় এসে আশি থেকে একশ কিলোমিটার নদীটা সমুদ্রের ভিতরে ঢুকে যায়। একবার একদল অভিযাত্রী আমাজন অভিযানে যাচ্ছিল, যেতে যেতে ওদের পানীয় জল শেষ হয়ে গেছে। সবাই তৃষ্ণায় ছটফট করছে, মিষ্টি জল দরকার। কিছুক্ষণ পর ওরা দেখে একটা লঞ্চ যাচ্ছে। ওরা ওদের নৌকা থেকে চিৎকার করে লঞ্চের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল, আমাদের একটু খাবার জলে দেবেন। লঞ্চের নাবিকরা অবাক হয়ে বলছে, 'তোমরা তো মিষ্টি জলের উপরেই দাঁড়িয়ে আছ'। ওরা জানে এই জায়গাটা মিষ্টি জলের এলাকা। যিনি এই ঘটনাটা লিখছিলেন, তিনি বলছেন, তখন আমার মনে হল, আমাদের সব জানা, এত ট্রেনিং নিয়েছি, আমাজন নদী তার এত বেগ যে, একশ কিলোমিটার সে মিষ্টি জল নিয়ে সমুদ্রের ভিতর ঢুকে যায়। আমরা মিষ্টি জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, সমুদ্র কিন্তু নদীর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। আর আমরা তৃষ্ণায় মিষ্টি জলের জন্য ছটফট করছি। তাহলে বাধা কোথায় ছিল, জল কেন

পাচ্ছিল না, সবটাই এই মস্তিষ্কে। ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই না কেন, কারণ বাধা তো আমাদের মস্তিষ্কে, মনে, অন্য কোথাও কোন বাধা নেই। বাধা তো আমার নিজের সৃষ্টি করা, তাই দেখছি না।

আমাদের মস্তিষ্কেই যদি সব বাধা হয়ে থাকে, কিন্তু আমরাই তো আবার অনেক সময় মরীচিকা দেখছি। তখন বলছেন, ঠিকই, শুধু মরীচিকা না, ওই জলের উপর পুরো শহরের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। কিন্তু মরুভূমির যত ভিতরে যেতে থাকি, মরীচিকা তত দূরে সরে যেতে থাকে, যেতে যেতে দেখছি কোথাও কিছু নেই, না আছে জল, না আছে শহর। ঠিকই, মরীচিকা দেখা যায়, কিন্তু ওই মরীচিকা দেখার জন একটা আধার চাই। জগৎকে যদি আমরা মরীচিকা রূপেও দেখি, তখনও একটা আধার দরকার, এই আধারই হলেন ঈশ্বর। যদি এটাকে পরিবর্তন রূপে দেখা হয়, তাহলেও আসলে ঈশ্বরই রয়েছেন। যদি এটাকে আমরা মরীচিকা রূপেও দেখি, তাহলেও কিন্তু ঈশ্বরই রয়েছেন। এই গোলমালটা কোথায়? বলছেন, আবরণ আর বিক্ষেপ। আবরণ মানে ঢেকে দেওয়া, বিক্ষেপ মানে নূতন করে দেখানো। জাদুকর যেমন একটা জিনিসকে ঢেকে দিয়ে আরেকটা জিনিসকে সামনে নিয়ে আসে।

তাহলে আমরা জগৎ যেটা সামনে দেখছি, এটা কি? এনারা তখন তিনটে সত্তার কথা বলেন –প্রথমটা হল পারমার্থিক সত্তা, কোন পরিস্থিতিতে যাঁর নাশ হবে না, যেমনটা ছিল তেমনটাই থাকবেন। ব্রহ্ম বলুন, আত্মা বলুন, ঈশ্বর বলুন, তিনি সব সময় সব অবস্থাতেই আছেন। দ্বিতীয় হয় প্রাতিভাসিক, যেমন মরীচিকা, illusion, বেদান্তে এর কোন দাম নেই। বৌদ্ধরা এই দ্বিতীয় সত্তাকে নিয়ে খুব গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেন। তৃতীয় হয় ব্যবহারিক, ব্যবহারিক সত্তাটাই পুরো বেদান্তের দর্শন। আমরা যে সৎ অসৎ আলোচনা করছি, এটা সত্তাকে নিয়ে। বেশীর ভাগ লোকে মনে করে, বেদান্ত শুধু মায়াকে নিয়েই চলে। কিন্তু না, বেদান্তে মায়া মানে ব্যবহারিক সত্য। এর খুব সহজ উপমা হল, আমার কাছে একটা পাঁচ হাজার টাকার নোট আছে। আসলে এটা কি? একটা কাগজ বই তো কিছু না। কিন্তু ওটার দাম কত? পাঁচ হাজার টাকা। এবার ওটাকে ছেপে দু হাজার করে দেওয়া হলে কাগজটার দাম হয়ে গেল দু হাজার টাকা। আসলে কিন্তু কাগজ। ওর আসল সত্তা হল কাগজের, কিন্তু ব্যবহার কালে হয়ে যায় দু হাজার টাকা। পুরো এই জগৎটা হল ব্যবহারিক সত্তা। আসলে একটা কাগজ কিন্তু ওর দাম বেড়ে যাচ্ছে, যেমন যেমন ছাপ মেরে দেওয়া হল, তেমন তেমন ওর দাম বেড়ে গেল। এই ছাপ জিনিসটাই এক জিনিস থেকে অপরকে আলাদা করে দেয়।

এই হল সংক্ষেপে বেদান্ত কিভাবে জিনিসটাকে দেখে। এবার এখান থেকে *নাসতো বিদ্যতে ভাবো* এই শ্লোকের অর্থে গেলে এবার কিছুটা বোঝা যাবে। আমাদের শাস্ত্রে সৎ আর অসৎ এই দুটো শব্দের প্রচুর ব্যবহার হয়। আমাদের এই লম্বা আলোচনার উদ্দেশ্য হল, এই পুরো জিনিসটার পিছনে দর্শনটা কি জানা। সৎ আর অসৎ এই দুটো শব্দের সাথে আরেকটা শব্দও আসে, তা হল অলীক। অলীক হল, যেটা একটু আগে বলা হল, প্রাতিভাসিক। অলীক হল সেই শব্দ, যেটা শুধু শব্দের খেলা, কিন্তু বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব নেই। যেমন যদি বলা হয় বন্ধ্যাপুত্র, বন্ধ্যপুত্র বলে কিছু হয় না। বন্ধ্যা হলে পুত্র হবে না, পুত্র হলে বন্ধ্যা হবে না। তেমনি আকাশকুসুম, সোনার পাথর বাটি, এগুলো অলীক, শব্দ দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু এই ধরণের কোন বস্তু হয় না।

সৎ শব্দকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অর্থে নেওয়া হয়। সৎ এর প্রথম অর্থ কখন কখন হয় পারমার্থিক সত্য বা পরম সত্তা। সৎ এর দ্বিতীয় অর্থ হয়, প্রকৃতি, কারণ প্রকৃতিকেই একমাত্র দেখা যায়। আর সৎ এর তৃতীয় অর্থ হল, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যেটা জানা যায় সেটাই সৎ, যার অস্তিত্ব আছে। সৎ এই তিনটে অর্থেই হয়। গীতার কোন কোন শ্লোকে, উপনিষদের কোন কোন মন্ত্রে সৎ বা অসৎ কি অর্থে ব্যবহার হয়েছে, ভাষ্য ছাড়া বোঝা যায় না। সেইসব শ্লোক বা মন্ত্রের অর্থকে শঙ্করাচার্য এক রকম ব্যাখ্যা করেন, রামানুজ আর-এক রকম ব্যাখ্যা করেন, ফলে অনেক সমস্যা হয়ে যায়। গীতার

এই শ্লোকে শঙ্করাচার্য অর্থ করছেন, দেশ, কাল ও বস্তুতে যেটা পরিচ্ছিন্ন নয় বা আবদ্ধ নয়, সেটাই সৎ। যেটাই আবদ্ধ সেটাই অসৎ। এমনকি সংস্কৃতে অসৎকে পরিভাষিত করেছেন, *যৎ কালতোদেশতোবস্তুতোপরিচ্ছিন্নম্*, দেশ, কাল ও বস্তুতে যেটা পরিচ্ছিন্ন আছে, সেটাই অসৎ; এর বাইরে যা কিছু আছে সেটাই সৎ।

অন্য দিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের কথা যে বলা হল, এটাকে বলা হয় সৎ; আর ইন্দ্রিয় দিয়ে যেটা বোঝা যায় না, সেটাকে বলে অসৎ। তবে অলীক অর্থেও অসৎ শব্দ ব্যবহার করা হয়। সৎ আর অসৎ এই দুটো জিনিসকেই মন দিয়ে গ্রহণ করা হয়। সেইজন্য অনেক জায়গায়, বিশেষ করে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আসবে, সেখানে বলবে *ন সত্তন্নাসদুচ্যতে*, ব্রহ্ম সৎও না অসৎও না, কারণ ব্রহ্ম বুদ্ধির বাইরে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য শ্লোকে সৎএর অর্থ ব্রহ্ম। এইভাবে সৎএর অর্থ কোথাও হয় ব্রহ্ম, কোথাও হয় প্রকৃতি আবার কোথাও হয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। অসৎএর অর্থ কোথাও হয় অলীক, কোথাও হয় যার কোন অস্তিত্ব নেই। বস্তুরও শেষ অস্তিত্ব থাকে না, প্রকৃতিরও শেষ অস্তিত্ব থাকে না, এই অর্থে সেইজন্য এরা অসৎ।

এবার আচার্য পুরো জিনিসটাকে যুক্তি দিয়ে দেখাচ্ছেন কিভাবে সৎ বলতে অস্তি বোধ, যার ঠিক ঠিক অস্তি বোধ আছে, সেটার কোন দিন নাশ হবে না। তোমার বুদ্ধির নাশ হয়ে যাবে কিন্তু, এই অস্তির নাশ হবে না। দেশ, কাল ও বস্তু এই তিনটেতে যেটা পরিচ্ছিন্ন, সেটা অসৎ। অসৎ মানেই হয়, এর কখনো সত্তা হয়নি, অর্থাৎ অস্তিত্বেই কখন আসেনি। তাহলে কি হয়েছে? এর শুধু অবস্থার একটা পরিবর্তন হয়েছে। যেমন সোনা থেকে গয়না হয়েছে, সোনাই আছে, কিন্তু তার উপর একটা নাম আর রূপ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। গয়নাকে নিয়ে মেয়েদের কত আনন্দ হয়, কত নাচানাচি করে, আসলে কিন্তু ওটা সোনা। দোলের সময় চিনির মঠ দেওয়া হয়, চিনির হাতি, চিনির ঘোড়া, বাঘ, টিকটিকি, ইঁদুর সব রকম থাকত। ছোটবেলায় আমরা সবাই এই নিয়ে ঝগড়াও করতাম, আমাকে কেন কুকুর দেওয়া হল, ওকে কেন সিংহ দেওয়া হল। কিন্তু একটু বড় হতেই যখন বুঝে গেল, সবটাই চিনির ড্যালা, দুধের মধ্যে হাতি ফেল, ইঁদুর ফেল, যেটাই ফেল মিষ্টি ছাড়া আর কিছু লাগবে না। আমরাও যখন বালবুদ্ধিকে আশ্রয় করে চলি, তখন আমাদের কাছে সব কিছুরই দাম থাকে। আবার যখন আমাদের আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা হয়, তখন বুঝে যাই, যে জিনিসটা সত্যিই আছে, ওটার কোন দিন নাশ হবে না। যে জিনিসটার নাশ হয়ে যাচ্ছে, আসলে ওটা কোন দিন ছিল না। সেইজন্য যা কিছু পরিবর্তনশীল দেখছ, সেই বস্তুর দিকে দৃষ্টি দিও না।

অর্জুনকে এর আগে ভগবান বললেন, ভীষ্ম দ্রোণ মারা যাবেন বলে তুমি যে এত কান্নাকাটি করছ, এই কান্নাকাটি করার কোন অর্থই নেই। কারণ তুমি যদি মনে করে থাক, ভীষ্ম দ্রোণ মারা যাবেন, তাহলে মনে রেখো, এনাদের কোন কালেই অস্তিত্ব ছিল না। আর যদি মনে করো, এনাদের অস্তিত্ব ছিল, তবে জেনে রাখো ভীষ্ম দ্রোণের কোন দিন নাশ হবে না, হতে পারে না। আপাত ভাবে শুনে মনে হবে এটা খুব উচ্চ দর্শন, ঠিকই, উচ্চ দর্শনতো বটেই, কিন্তু এটাই সত্য। হিন্দুরা প্রথম থেকেই মৃত্যুকে নিয়ে বেশী মাতামাতি করতেন না। পাশ্চাত্য দুনিয়া, বিশেষ করে আমেরিকা তো উঠে পড়ে লেগেছে, আর সেখান থেকে ভারতের সংবাদ মাধ্যম, পত্রপত্রিকার লেখালেখিতে সবাই দেখাচ্ছেন, আমাদের কয়েক বছর আয়ু বাড়িয়ে দিতে পারলে যেন কি করে নিল। কিন্তু এই কয়েক বছরে যে যন্ত্রণা বাড়িয়ে দিচ্ছে, সেটাকে নিয়ে কেউ কিছু বলছেন না। মৃত্যকে নিয়ে, বেঁচে থাকা নিয়ে এত ভাবাভাবি হিন্দু দর্শন অনুমতি দেয় না। এনাদের বক্তব্য হল, আসলে আমরা যা কিছু দেখছি, এটা হল বিশেষণ মাত্র। যেমন পদ্ম ফুলের একটা বিশেষণ হল লাল পদ্ম বা নীল পদ্ম, ঠিক তেমনি আসল যে সৎ, আসল যে ব্রহ্ম বা আসল যে আত্মা, এর উপর বিশেষণ হল জীব, জগৎ। জীব জগতের এই বিশেষণের উপর আবার বিশেষণ হল, ইনি অমুক, আমি অমুক, আমি অধ্যাপক,

আমি বুদ্ধিমান, সে বোকা, আমি বড়লোক, ওরা গরীব ইত্যাদি। এনারা বলছেন, তুমি বিশেষণকে নিয়ে মাথা খারাপ করো না, তার আসল জিনিসটার দিকে দৃষ্টিপাত কর।

যেখানেই চোখে জল, যেখানেই শোক, যেখানেই উল্লাস, যেখানেই মোহ, যেখানেই হর্ষ, যেখানেই বেদনা, সেখানেই শুধু কষ্ট আর কষ্ট। সব কিছুর মূলে ওই একটাই জিনিস, কিন্তু সেটাকে ভুলে যেটা পরিবর্তনশীল, যেটা ক্ষণস্থায়ী সেটাকে নিয়েই আমাদের মাতামাতি, সেটাকে নিয়েই আমরা পড়ে আছি। ভগবান বলছেন *অনয়োঃ তত্ত্বদর্শিভিঃ,* তত্ত্ব শব্দ তৎ শব্দ থেকে আসে, তত্ত্ব এটাকে বলে সর্বনাম, যাবতীয় যা কিছু আছে সব তৎএ এসে যায়, যেমন ওঁ তৎ সৎ তৎ, তৎ ব্রহ্মের একটি নাম। বলছেন, যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী, যাঁরা তত্ত্বদর্শি অর্থাৎ যাঁরা ঠিক ঠিক এই জিনিসটাকে বোঝেন, তাঁরা কখনই সেই জিনিসের দিকে দৃষ্টি দেন না যে জিনিসগুলোর পরিণাম হয়ে যাচ্ছে, একমাত্র ব্রহ্মের দিকে দৃষ্টি দেন। যদি ব্রহ্মের দিকে দৃষ্টি না দেন, অন্য দিকে ভাবছেন সব কিছুরই নাশ হয়ে যাবে, তাহলে আপনি পাগল হয়ে যাবেন। আর তা নাহলে, জীবন একবারই পাওয়া গেছে, চল লুটেপুটে খাই, এক নৃশংস পুরুষ হয়ে যাবেন। বৌদ্ধরা শূন্যবাদের কথা বলেন, কিন্তু সেখানেও তাঁরা বলেন, ওই অবস্থায় তোমাকে পৌঁছাতে হবে, যেখানে তুমি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এক দৃষ্টিতে দেখতে পারবে। যতক্ষণ ওই দৃষ্টি না আসছে, ততক্ষণ তোমার অশান্তির শেষ নেই। পরে পরে আচার্য অবশ্য বলবেন, যদি এটাকে তাত্ত্বিক ভাবেও বুঝে নেওয়া যায়, মাঝে মাঝেও যদি জীবনে প্রয়োগ করা যায়, তাতেই বিরাট কিছু হয়ে যাবে।

এই ভাবে বলে বলে শেষে বলছেন, শীত, গ্রীষ্ম, সুখ, দুঃখ এদিকে বেশী দৃষ্টি দিও না। কোন জিনিস? অনেক আগে শীতকালে বেলুড় মঠে খাওয়ার পঙ্কতিতে বসে একজন অল্প বয়সী মহারাজ বলছেন, 'উঃ আজ বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছে, ঠাণ্ডায় আর পারা যায় না'। পাশে একজন বরিষ্ঠ মহারাজ বসে ছিলেন, তিনি শুনে বিরক্ত হয়ে বলছেন, 'আপনার যদি শীত করে, আপনি গায়ে একটু গরম জামা চাপান, মনে এই ভাবটা আনবেন না, আর দয়া করে মুখে বলতে যাবেন না'। মনকে কোন পরিস্থিতিতে সেই যে সত্য, সেখান থেকে সরতে দেবেন না। বাঁচার জন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী কি করতে হবে করুন, যদি না পারেন তাহলে এটাকে মেনে নিন। পরে ভগবান বলবেন *তস্মাদহপরির্যার্থে,* এটা অপরিহার্য।

ইংলিশে একটা কোটেশান আছে, If a problem has a solution, it is not a problem, it is a situation and face it। একটা সমস্যার সমাধান যদি না থাকে, তাহলে ওটা সমস্যাই না, ওটা একটা পরিস্থিতি; পরিস্থিতির কখন সমাধান হয় না, পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিয়ে চলতে হয়। বাইরে বৃষ্টি পড়েই চলেছে, একটা সমস্যা; বেরোবার প্রয়োজন থাকলে ছাতা মাথায় দিয়ে যান। বাড়িতে ছাদ দিয়ে জল লিক করছে, ছাদকে সারিয়ে নিন। কিন্তু আপনার ছেলে মারা গেছে, এখন কি করবেন আপনি? এটা পরিস্থিতি, ছেলে তো আর ফিরে আসবে না, শান্ত হন। অর্থ হল মনকে কোন পরিস্থিতিতে কক্ষণ চঞ্চল হতে দেওয়া চলবে না। কারণ, এখানে মূল যুক্তি হল, যে কোন জিনিস তা যাই হোক, সব কিছু ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণস্থায়ী যদি হয়, তাহলে জানবে এর অস্তিত্ব কখনই ছিল না। কারণ এর অস্তিত্ব যদি থাকত, তাহলে সব সময়ই থাকত। একজন কেউ যদি আপনার উপর একবারও রেগে যায়, তখন এটা বুঝবেন যে, শান্ত থাকাটা তার স্বভাব না, রাগান্বিত হওয়ার স্বভাটাই তার সত্য। আজকে রেগেছে, আবার রাগবে, আজ হোক কাল হোক আবার তার রাগ আসবে। কোন লোক যদি একবার বাজে কাজ করে থাকে, বা চুরি করে, আর-একবার সে চুরি করবে। এই হল গীতার ষোল নম্বরের ব্যাখ্যা, এটাকে যদি একবার বুঝে নেওয়া যায় যে, সৎ বস্তুর কখন অভাব হয় না, আর যেটা অসৎ বস্তু তার কখন অস্তিত্ব হয় না। গীতার এই শ্লোকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শ্লোক, মুখস্ত করে এর অর্থ ও ভাবকে যদি একবার খুব ভাল করে মনে বসিয়ে নেওয়া যায়, জীবনে আমরা অনেক অশান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যাব। এটা কোন উৎসাহ দেওয়ার

জন্য বা পজিটিভ থিঙ্কিং নিয়ে যে ধরণের আকর্ষণীয় লেখাগুলো ছাপা হয়, এটা সে ধরণের কিছু না, এটা একটা সনাতন সত্য।

কোন বিষম পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেলে আমরা সব সময় ওই পরিস্থতি থেকে বেরিয়ে আসতে চাই। একটা খুব interesting ঘটনা আছে, গান্ধীজী ১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু করেন, তখন তিনি এটাই বলছেন, in the name of God you leave, leave us to anarchy। আমাদের এখানে নৈরাজ্য হোক, আগে তুমি ভারত ছাড়ো। ইংরেজ সরকার পরে সবাইকে জেলে ঢুকিয়ে দিল। পরে যখন এটা নিয়ে ঝামেলা শুরু হল, তখনও তিনি এই কথাই বলছেন, আমার এখানে নৈরাজ্য হোক আর যাই হোক, দেশ টুকরো টুকরো হয়ে যাক, তোমরা ভারত ছাড়ো। কারণ তোমরা একটা বিষধর সাপের মত আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে রেখেছ, কোন কিছুর দায়ীত্ব নিচ্ছ না, শুধু লুটপাট করে যাচ্ছ। কিন্তু সেই সময়, কোন নেতারই এই আইডিয়াটা ছিল না যে, আমরা কি রকম একটা দেশ চাই। গান্ধীজী, নেহরুজী, বল্লভভাই প্যাটেল কারুরই মনে কোন আইডিয়া ছিল না। যার জন্য জিন্না যখন বললেন, দেশ আলাদা হোক, নিরুপায় হয়ে দেশকে দু টুকরো করতে হল।

এরপর দেশ আমাদের কেমন হবে, এই চিন্তা করে করে প্রায় আড়াই বছর লাগিয়ে দিল ভারতের একটা সংবিধান তৈরী করতে। তারপর ইন্দিরা গান্ধী এসে সংবিধানের মূল জিনিসে কিছু জিনিস ঢোকালেন। ভারত কোথায় যাচ্ছে কেউ জানে না। কিছু জিনিসকে ঠিক করার জন্য নেতারা পার্লামেন্টে বলতে লাগলেন যে, আমাদের যাঁরা founding fathers ছিলেন তাঁরা এই ভুল করে গেছেন, আমরা সেটাকে ঠিক করতে চাইছি। যেমনি ঠিক করতে যাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রতিবাদ করতে রাস্থায় নেমে যাচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টে চলে যাচ্ছে, বলছে, এই সংশোধনটা ঠিক হচ্ছে না। আপনি কি চাইছেন? আপনার principleটা কি? মনুস্মৃতির নিন্দা করতে গিয়ে লোকেরা ভুলে যাচ্ছে যে, মনুস্মৃতি পরিষ্কার বলছেন, দেশ কালের পরিস্থিতি যখন পাল্টাবে তখন এই বিধানগুলিকেও পাল্টাতে হবে। কয়েকজন মানুষ মিলে চিন্তা-ভাবনা করে ঠিক করলেন, আমাদের সিদ্ধান্ত এই। আর তার কদিন পরেই শুরু হয়ে গেল সেই সিদ্ধান্তের সংশোধন। ইতিমধ্যে ভারতের সংবিধানের শতাধিক সংশোধন হয়ে গেছে। যখন সংশোধন করতে হচ্ছে, তখন এটাই তাঁরা বলতে চাইছেন যে, আমাদের নেতারা ভুল করেছিলেন, সংশোধনের মাধ্যমে আমরা এটাকে ঠিক করছি। কারুর কাছে পরিষ্কার নেই, কি চাইছেন। পরিষ্কার যদি না থাকে, আমি ত্যাগ কেন করতে চাইছি, তার মাথা খারাপ হতে বাধ্য। আমাদের পরিষ্কার থাকা উচিৎ, আমি কি চাইছি।

ভগবান অর্জুনকে বলছেন, যে জিনিসগুলি প্রতিনিয়ত পাল্টাচ্ছে, ওই পরিবর্তনশীল বস্তুগুলিকে ছাড়ো। কিন্তু সেটা করতে গেলে তুমি পাগল হয়ে যাবে, কারণ সব জিনিসই তো পাল্টাচ্ছে। বলছেন *নাসতো বিদ্যতে ভাবো*, এই সৎ জিনিসটা কি, সতের নম্বর শ্লোকে এবার এর ব্যাখ্যা করছেন। যখন আমরা জীবনে কোন কিছু ছাড়ছি, জীবনে যখন এগোতে চাইছি, যখন আমরা সচ্চরিত্র, ভাল মানুষ হওয়ার চেষ্টা করছি, এই চেষ্টার মানেই দাঁড়ায় আমাদের ত্যাগ করতে হচ্ছে। বিশেষ করে মন্দ জিনিস ত্যাগ করছি। ভাল মন্দের তফাৎ আমরা বুঝব কি করে? ইন্দ্রিয়কে যদি ছাড় দিয়ে দেওয়া হয়, তখন এটাই হয় যাবে মন্দ। আমাদের পাঁচটা কর্মেন্দ্রিয় আর পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, এদের সবাইকে যখন ছাড় দিয়ে দেওয়া হল, যা ইচ্ছে হচ্ছে তাই করছে, তখন এটাই হল মন্দ। মন যখন ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে, তখন এটাই হয়ে গেল ভাল।

ভাল আর মন্দের এটাই তফাৎ। পরে গীতাতেও বলবেন, মন্দ কি, যখন ইন্দ্রিয়কে ছাড় দেওয়া হচ্ছে। ভাল কি, যখন ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হচ্ছে। কেউ যদি আমাকে ভাল বলে, আপনি তো খুব ভাল মানুষ, তার মানে আমি অনেক জায়গায় ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে

এসেছি। ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করা মানেই ত্যাগ, ত্যাগ মানেই ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু এই ত্যাগের পিছনে যদি একটা কোন আদর্শ না থাকে, সব কিছু এলেমেলো হয়ে যাবে। এবার আমরা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সতের নম্বর শ্লোকের ব্যাখ্যাতে যাচ্ছি।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি।।১৭।।

(যিনি এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছেন, তাঁকেই অবিনাশী আত্মা বা ব্রহ্ম বলে জানবে। কেউই এই অব্যয় আত্মার বিনাশ করতে সমর্থ হয় না।)

এর আগে আলোচনা করা হয়েছিল, ধর্মই মানুষকে মহৎ করে। বিশ্বে যত মহাপুরুষ আছেন, যত শ্রেষ্ঠ পুরুষ আছেন, যদি আমরা কয়েকটা গুণকে বৈশিষ্ট্য রূপে ধরে নিই, তাহলে দেখা যাবে সব মহাপুরুষরাই ধর্ম জগৎ থেকে এসেছেন, যীশুও তাই, ভগবান বুদ্ধও তাই, স্বামী বিবেকানন্দও তাই। আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়নের মত মানুষদের যখন বিচার করি, তখন আমরা তাঁদের বীরপুরুষ রূপে, একজন নেতা রূপে দেখি। কিন্তু ভাল মানুষ বলতে যেভাবে আমরা ভাবি বা দেখি, যাঁর ভিতর সদ্ভাব রয়েছে, অপরের প্রতি করুণা রয়েছে, এই জিনিসগুলো নেতা বা বীরপুরুষদের মধ্যে আমরা সচরাচর দেখতে পাইনা। কিন্তু সক্রেটিস একমাত্র লোক, যাঁর জীবন খুব উচ্চমানের, কিন্তু তাঁর সততা ধর্মের উপর ভিত্তি করে ছিল না। পরে পরে পাশ্চাত্যের চিন্তকরা নিয়ে এলেন Good for good sake, morality for morality sake, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই থিয়োরী দাঁড়াতে পারলো না। স্বামীজীও এর নিন্দা করে বলছেন, Morality cannot be an end by itself, কিন্তু সক্রেটিসের কাছে moralityই ছিল শেষ কথা। সক্রেটিসের কাছে ছিল, আমি ভাল হব এটাই শেষ কথা, আমি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হব, এটাই আমার শেষ কথা। গান্ধীজী যদি রাম নাম না করতেন, তাহলে মনে হত গান্ধীজী সক্রেটিসের লাইনের। তা না, গান্ধীজীর জীবন পুরো ধর্মের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত, তিনি ধর্মকে ভিত্তি করেই জীবন দাঁড় করিয়েছিলেন।

এখানে এবার গীতা পরিষ্কার করছেন। এই যে তুমি ত্যাগ করবে বলছ, সব কিছু ত্যাগ করে ভিক্ষা করবে বলছ, কিন্তু ত্যাগের উদ্দেশ্য হল সেই সত্যকে পাওয়ার জন্য, সেই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য। কি সেই সত্য? *অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি*, অবিনাশির অর্থ হল, যেটা কক্ষণ নষ্ট হবে না, কোন পরিস্থিতিতে বিনাশ হয়ে যাবে না। *অবিনাশি তু*, এই যে *তু* শব্দ বলছেন, এর অর্থ হল যা কিছু বিনাশশীল আছে, তার সাথে তফাৎ করার জন্য, মানে অসৎ বস্তুগুলোর সঙ্গে তফাৎ করার জন্য। যেটারই বিনাশ হয় সেটাই অসৎ, আর ষোল নম্বর শ্লোকে উচ্চমানের তর্কে বললেন, যেটারই নাশ হচ্ছে, আসলে তার অস্তিত্ব আদপেই ছিল না। অর্জুন তোমাকে তাই বলছি, যেটা অবিনাশী সেটাতে তোমার মনটাকে লাগাও।

আচার্য বলছেন *ব্যপ্তং সদাখ্যেন ব্রহ্মণা*, যেটারই নাম সৎ, তার মানে সেটাই ব্রহ্ম। নাম আর নামী অভেদ, তাই ব্রহ্মই সৎ, সৎই ব্রহ্ম। আকাশ যেমন সব কিছুতে ব্যপ্ত, ঠিক তেমনি ব্রহ্ম সব কিছুতে ব্যপ্ত, এমনকি আকাশেও ব্রহ্ম ব্যপ্ত, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। আমরা কল্পনা করতে পারি, সমুদ্রের জলের গভীরে কিছু মাছ আছে, ওরা কোন দিন জলের উপরে আসে না, সমুদ্রের ভিতরেই থাকে। সেখানেই তারা খেলা করছে, জলকে জল থেকে সরিয়ে অনেক কিছু করছে। এখন কেউ যদি এসে মাছেদের বলে, জানো সব কিছুই জল, জল ছাড়া কিছু নেই। মাছেরা তার কথা বুঝতেই পারবে না, কি বলতে চাইছে। কারণ সেই গভীর জলের মাছেরা সর্বক্ষণ জলের মধ্যেই রয়েছে কিনা। যে যার ভিতরে থাকে, সে তার কথা বুঝতে পারে না।

আচার্য বলছেন, ব্রহ্মের পরিভাষা হল অবিনাশী, তাঁর বিনাশ হয় না। তিনি কি করেন? *যেন সর্বমিদং ততম্, ততম্* শব্দের অর্থ ব্যপ্ত, সব কিছুকে আচ্ছাদিত করে রেখেছেন, ব্রহ্ম সমস্ত কিছুর ভিতরে ঢুকে রয়েছেন। আমার শরীরের ভিতরে ব্রহ্ম, আমার শরীরে যত অঙ্গ আছে, এই হাত, পা, এর ভিতরেও সেই ব্রহ্ম, হাতের তালু, হাতের আঙুল, তার ভিতরেও ব্রহ্ম। আঙুলকে আরও যদি বিশ্লেষণ করা হয়, তাতে যে কোষিকাগুলি আসবে, তার মধ্যেও ব্রহ্ম। সেই কোষিকার মধ্যে এ্যটম্, তার মধ্যেও ব্রহ্ম। এ্যটমের মধ্যে ইলেক্ট্রন, প্রোটন, তার মধ্যেও ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ওতপ্রোতো হয়ে আছেন। কেন ওতপ্রোতো? কারণ ব্রহ্মই সব হয়েছন। জন্মদিনে চকলেট দিয়ে অনেকে অনেক কিছু তৈরী করে, যা কিছুই বানাক, সবটার মধ্যেই চকলেট ওতপ্রোতো হয়ে আছে। নর্থ পোল, সাউথ পোলে বরফের নানা রকমের আকৃতি দেখা যায়। বরফের যত আকৃতি আছে, সব আকৃতির মধ্যে জল রয়েছে। সেই আকৃতিগুলি কোথায় আছে? সমুদ্রের উপর ভাসছে। তার বাইরেও জল, ভিতরেও জল। একটা হিমশৈল জলে ভেসে ভেসে যাচ্ছে, সে বলছে, আমার বাইরেও জল, ভিতরেও জল, আমি নিজেও জল। কেউ হয়ত বলতে পারে, 'আরে ভাই, জলটা তো তরল, তুমি তো নিরেট বরফ'? তাহলেও আমি জল, আমি জল থেকে আলাদা কিছু না। এই উপমাগুলি বোঝানর জন্য, এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, ওই রকম আছে বলে এই রকম বলা হচ্ছে। তা একেবারেই না, আমরা ষোল নম্বর শ্লোক যতটা পারা যায় যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছি।

এরপর বলছেন, এটা হল *বিনাশমব্যয়স্যাস্য*, ব্রহ্মের একটাই পরিভাষা, *অব্যয়ঃ*। ব্যয় মানে ক্ষয় হওয়া, বলছেন যেটার কক্ষণ কোন পরিস্থিতিতে ব্যয় হয় না, তাঁর কম-বেশী হয় না। ঈশ্বরকে বা পরমসত্তাকে যদি পরিভাষিত করতে হয়, তাহলে তার একটাই পরিভাষা হবে, ঈশ্বর অনন্ত। ব্রহ্ম শব্দের মানেই হয় অনন্ত, ব্রহ্ম মানে সবচেয়ে বৃহৎ, এর অর্থই হল অনন্ত। অনন্ত মানে, ওর কোথাও যাওয়ার নেই, কখন বড় হবে না, কখন ছোটও হবে না, তার ক্ষয় হবে না, বিস্তার হবে না। পরে এই আইডিয়াটাকে নিয়ে আরও বিস্তারে বলবেন। সৎ ও অসৎ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, অসৎ বলছেন যেটা নাশ হয়ে যায়, ব্রহ্ম জিনিসটা নাশ হয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, এর ব্যয় পর্যন্ত হয় না, একটু যে ক্ষয় হবে, তাও হয় না।

কেন ব্রহ্মের ক্ষয় হয় না? আচার্য এখানে খুব সহজ যুক্তি এনে দেখাচ্ছেন। এই ধরণের যুক্তি দেখলে অবাক হয়ে ভাবতে হয়, আচার্যের কি সাংঘাতিক ক্ষুরধার বুদ্ধি ছিল কল্পনা করা যায় না। আচার্য বলছেন, কোন জিনিসের ক্ষয় তখনই হয়, যখন ওর অবয়ব থাকে, অবয়ব মানে parts। যদি different parts থাকে তাহলে একটা parts খসে পড়ে যাবে। যার কোন part নেই, তার খসে পড়ারও কিছু নেই। আমাকে শরবৎ দেওয়া হয়েছে, খেয়ে বলছি, শরবৎটা পান্‌সে। কেন পান্‌সে? চিনি বা লেবু কম দিয়েছে। চিনি আমি বেশী দিতে পারি কম দিতে পারি। এবার ধরুন জল, জলকে যদি আমার নাশ করতে হয়, তাহলে আমাকে তার মাঝখান দিয়ে ইলেক্ট্রিসিটি প্রবাহিত করে দিতে হবে, তার ফলে হাইড্রোজনে আর অক্সিজেন আলাদা হয়ে যাবে। কারণ এই দুটো parts দিয়ে জল তৈরী, জলের একটা part হল হাইড্রোজেন, আরেকটা part হল অক্সিজেন। শরবতের একটা part হল জল, আরেকটা part হল মিষ্টি, ওর একটা partকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, শরবৎ জিনিসটার নাশ হয়ে যাবে। আমার আপনার নাশ কখন হবে? যদি হাত কেটে দেয়, পা কেটে দেয়, কারণ অবয়ব দিয়ে আমরা তৈরী। কিন্তু যে জিনিসটার কোন অঙ্গ নেই, তাকে আমি কাটব কি করে! এটা ধারণা করা আমাদের পক্ষে খুব কঠিন, কারণ এই জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে, সবটাতে parts রয়েছে। জগতে যা কিছু আছে, সব কিছুই বিভিন্ন parts দিয়ে তৈরী, যেটা আমরা ষোল নম্বর শ্লোকে আলোচনা করলাম।

যে কোন জিনিসকে যদি আমরা পিছনের দিকে ঠেলতে শুরু করি, ঠেলতে ঠেলতে আমরা পৌঁছে যাব ইলেক্ট্রন প্রোটনে। কিন্তু ইলেক্ট্রন প্রোটনও part। ঠেলতে ঠেলতে আরও যদি পিছনের

দিকে যাই, তখন আসবে কোয়ার্ক, ওটাও part। এইভাবে ঠেলে ঠেলে যদি পিওর এনার্জিতে চলে যাই, এইবার ওটাকে নাশ করা যাবে না, কারণ ওর কোন part নেই। এই কারণে সাংখ্য দর্শন ও অন্যান্য দর্শন এনার্জিকে শাশ্বত মনে করে, আর এই জন্য অনেকে বলেন এনার্জিই শেষ সত্য। কিন্তু আমরা আলোচনা করে দেখলাম, যদি ঈশ্বরই সত্য হন তাহলে এনার্জি কখনই সত্য হতে পারে না; তাই যদি হয় তাহলে ঈশ্বর সীমিত হয়ে যাবেন। এই জিনিসটার আলোচনা আমাদের আগে হয়ে গেছে, শুধু এখানে এই জিনিসটা বোঝানর জন্য বলছেন, কোন জিনিসের যদি তার অঙ্গ থাকে, সেই অঙ্গ বা টুকরোকে কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু যে জিনিসের কোন অবয়ব নেই, তাকে আমরা কাটব কি করে! যার জন্য বিশাল বিশাল যে পাথর হয়, যার নামই হল monolith, ওটার টুকরো হবে না। কিন্তু এখানে শুদ্ধ চৈতন্যের কথা বলা হচ্ছে, শুদ্ধ চৈতন্যের কোন অঙ্গ নেই, সেইজন্য এর কখন ক্ষয় হবে না।

অনেক সময় এমন হয় জিনিসটা থাকে, কিন্তু তার অন্য কিছু আছে যেটা চলে গেল; যেমন একজন মানুষের সব টাকা চলে গেল, আমরা তখন বলি লোকটা শেষ হয়ে গেল; কিংবা তার চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে, বলি, লোকটার পতন হয়ে গেল; কিন্তু মানুষটা থেকে যাচ্ছে। বলছেন, এই যে ব্রহ্ম, এর নিজস্ব কোন পদার্থ নেই, তাই কোন কিছু চলে যাওয়ারও প্রশ্ন নেই। প্রথম কথা হল ব্রহ্ম অবয়ব শূন্য, দ্বিতীয় এর নিজস্ব কোন কিছু দিয়ে নিজের কাছে আসে না যে, সেটা চলে যাবে। যেমন আমরা মানুষ, প্রথম আমাদের অঙ্গ রয়েছে, তারপর অনেক কিছু অর্জন করে থাকি, বাড়ি করলাম, গাড়ি করলাম, টাকা আয় করলাম, ওগুলো যখন চলে গেল, আমরা তখন বলছি, আমার নাশ হয়ে গেল। ব্রহ্মের সেটাও নেই। সেইজন্য কোন অর্থেই আমরা বলতে পারব না যে, ব্রহ্মের নাশ হয়ে গেছে।

এরপর বলছেন, *ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি*, যিনি অব্যয়, কেউ তাঁর নাশ করতে পারে না। যদি কেউ যুক্তি দিয়ে বলতে চায়, আচ্ছা ব্রহ্ম তো অনন্ত, অনন্ত মানেই তিনি সর্বশক্তিমান তাঁকে কেউ নাশ করতে পারে না, কিন্তু তিনি তো নিজেকে নাশ করতে পারেন। যদি তিনি নিজেকে নাশ করতে না পারেন, তাহলে তিনি শক্তিমান নয়। আর যদি নাশ করতে পারেন, তাহলে ব্রহ্মের নাশ হয়ে গেল। দুদিক দিয়েই ব্রহ্মকে হেয় প্রতিপন্ন করা যেতে পারে। আগের শ্লোকের আলোচনা করতে গিয়ে অনবস্থা দোষের কথা বলা হয়েছিল। ঠিক তেমনি এই যুক্তিতে একটা মারাত্মক দোষ আছে। তোমার কথার মধ্যে দোষ আছে, ইংরাজীতে বলা হয় inherent contradiction। আচার্য এখানে বলছেন, *ন কশ্চিদ্ আত্মানং বিনাশয়িতুং শক্নোতি ঈশ্বরঃ অপি*, কেউই অর্থাৎ ঈশ্বরও নিজেকে নিজে নাশ করতে পারেন না। কারণ *আত্মা হি ব্রহ্ম স্বাত্মনি চ ক্রিয়াবিরোধাৎ*, নিজের উপর ক্রিয়া হয় না। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বাক্য।

প্রথমে বললেন, এর কোন অবয়ব বা পার্ট নেই বলে এর বিনাশ হবে না। তাহলে নিজেকে যদি নিজে মারতে পারে? পারবে না। কেন পারবেন না? বলছেন *স্বাত্মনি চ ক্রিয়াবিরোধাৎ*, যে কোন জিনিস নিজের উপর ক্রিয়া করতে পারে না। ডান হাত দিয়ে আমি সারা জগৎকে ধরে নিতে পারি, কিন্তু ডান হাত দিয়ে নিজের ডান হাতকে কোন দিন ধরতে পারব না। চোখ দিয়ে আমরা সমস্ত জগৎকে দেখে নিতে পারি, কিন্তু আমার চোখ দিয়ে আমি নিজের চোখকে কোন দিন দেখতে পারব না। কোন জিনিসই নিজের উপর ক্রিয়া করতে পারে না, ক্রিয়া করার জন্য subject object এর duality লাগে, subject object duality যদি না হয় ক্রিয়া করা যাবে না। তাছাড়া ব্রহ্ম হলেন শেষ কথা, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। ব্রহ্ম কখন object হন না যে, তার উপর ক্রিয়া করা যাবে।

সমস্যা হল আমরা যখন ব্রহ্ম, শুদ্ধ চৈতন্য বা আত্মার আলোচনা করি তখন অনেক উপমা এনে জিনিসটাকে বোঝানর চেষ্টা করা হয়। যেমন সমুদ্রের উপমা প্রায়ই নেওয়া হয়, কখন আবার

আকাশের উপমা নিয়ে আসা হয়। কিন্তু যখনই সমুদ্রের উপমা আনছি, তখনই আমরা মনে করি এইতো সমুদ্রের ঢেউ উঠছে, সমুদ্র যদি শুকিয়ে যায়, সমুদ্র অবশ্যই কোন না কোন সময় শুকিয়ে যাবে। কিন্তু কে সমুদ্রকে শুকিয়ে দেবে? সূর্যই শুকিয়ে দিতে পারবে। সেটা আরেকটা জিনিস এসে গেল। কিন্তু ব্রহ্মের ওখানে তো আর কিছুই নেই, ওটাই আছে। যুক্তির দিকে থেকে তিনি কি নিজেকে নাশ করতে পারেন? কখনই পারবেন না। কারণ নিজের উপর ক্রিয়া হয় না। যেমন আগুন নিজেকে পোড়াতে পারে না, জল নিজেকে ভেজাতে পারে না, এটাই স্বক্রিয়া অভাব।

এখানে যেমন সৎকে ব্যাখ্যা করছেন, সৎ হল ব্রহ্ম, তিনি অব্যয়, অবিনাশী। তাহলে অসৎ কি? আগের শ্লোকে আমরা লম্বা আলোচনা করেছিলাম। এবার আঠারো নম্বর শ্লোকে কি বলছেন আমরা দেখব।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যাস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত।।১৮।।

(প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অতীত, অবিনাশী ও নিত্য আত্মার এই সকল দেহ নশ্বর বলে উক্ত হয়েছে। অতএব হে অর্জুন, তোমার এই জড় দেহ কালে বিনষ্ট হবেই; কিন্তু তুমি আত্মারূপে অবিনাশী। অতএব যুদ্ধ করে স্বধর্ম পালন কর।)

যেটারই অন্ত আছে, বিনাশ আছে, সেটাকেই বলছেন *অন্তবন্ত*। আমরা মরীচিকা দেখছি, মরীচিকাতে জল দেখছি। কিন্তু জ্ঞান হয়ে গেলে বুঝতে পারি, এখানে জল নেই, আসলে এটা বালি। তার মানে জ্ঞানপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ওই মরীচিকার নাশ হয়ে গেল। ঠিক তেমনি জ্ঞান হলে তখন দেখা যায়, জগৎ কখন ছিলই না, সেইজন্য এই জগৎটা হল অন্তবান। যা কিছু জগতে আমরা দেখছি, শরীর হোক, বস্তু হোক সবটাই অন্তবান। এর জন্ম হয়েছে, একদিন সে শেষ হয়ে যাবে। এই যে অন্তবান যা কিছু আছে, শুদ্ধ ব্রহ্ম এই শরীরগুলো ধারণ করে নিচ্ছেন। কিন্তু আসলে এগুলো সব শক্তির খেলা, মায়ার খেলা। সব কিছুর একটা সময় জন্ম হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে, এক সময় সবটারই নাশ হয়ে যাবে।

এখানে একবার বলছেন নিত্য, আরেকবার বলছেন অবিনাশী, ব্যাপারটা খুব interesting। বেদের আলোচনায় একটা নিয়ম আছে, যেখানে বলা হয় পুনরোক্তি দোষ, একই কথা বারবার বলছেন, বেদে এটা নিষেধ আছে। আচার্য বলছেন, আসলে কি হয়, শাস্ত্রের কথা সহজে ধারণা করা যায় না, সেইজন্য শাস্ত্র কৃপা করে একই কথা বারবার বলতে থাকেন যাতে মানুষ ধারণা করতে পারে। ভাগ্নে হৃদয়রাম ঠাকুরকে বলছে, মামা, তুমি একই কথা বারবার বলো কেন? ঠাকুর বলছেন, আমি একই কথা বারবার বলি তাতে তোর কিরে শালা। এটা পুনরোক্তি না, বোঝানর জন্য বারবার বলা হচ্ছে, জানেন এরা বুঝতে পারবে না, তাই বারে বারে মনে করিয়ে দেওয়া হয়। আচার্যরাও অনেক সময় একই কথা বারবার বলেন কারণ উনি জানেন এরা ধারণা করতে পারবে না।

বলছেন *অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য, অনাশিনঃ* হল যার কখন নাশ হয় না, অবিনাশী আর প্রমেয় শব্দের অর্থ যেটাকে মেপে নেওয়া যায়, অপ্রমেয় মানে যেটাকে মাপা যায় না। আমরা যখন *মাত্রাস্পর্শাস্তু* আলোচনা করছিলাম, সেখানে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছিল, ইন্দ্রিয়গুলি বাইরে গিয়ে কিভাবে বস্তুগুলিকে গ্রহণ করে, সেখান থেকে মন বলতে পারে আমি এটা জানলাম, জানতে পারে যে আমি এটাকে মেপে নিয়েছি। আত্মা অপ্রমেয়, ইন্দ্রিয় তো দূরের কথা আত্মাকে কোন মন, বুদ্ধি জানতে পারবে না, সেইজন্য বাণীও আত্মার ব্যাপারে কিছু বলতে পারবে না। সেইজন্য আত্মা অপ্রমেয়। কোন প্রমাণের দ্বারা আত্মাকে মাপা যায় না। প্রমাণ মানে যে জিনিসটাকে দিয়ে মাপা হয়, পরে এই বিষয়টা যখন আসবে তখন আমরা বিস্তারে এর আলোচনা করব।

আমরা যে মাপি, সেখানে একটা standard আছে, যেমন এক কিলো ওজন, এটা standard, সেটা দিয়ে বাকি জিনিসকে মেপে বলা হয় এর এত ওজন। প্যারিসে সব standard রাখা আছে, সেখান থেকে কপি সমস্ত দেশে গেছে, যেখান থেকে এক কিলো, এক মিটার এগুলো হয়। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিও জগতের সব জিনিসকে মেপে দেখছে। কোন খাবার জিব দিয়ে চেখে বলে দিই রান্না ভাল হয়েছি কি মন্দ হয়েছে, নুন বেশী হয়েছে কি কম হয়েছে, মিষ্টি বেশী হয়েছে কি কম হয়েছে, সব কিছুকে মেপে নেওয়া হচ্ছে। কিভাবে? জিহ্বার দ্বারা আস্বাদ করে। কারুর বাড়িতে চা খেতে দিলে জিজ্ঞেস করে, চিনি কতটা দেব, যার যে রকম টেস্ট, সেইভাবে মেপে চিনি দেওয়া হবে। জগতের সব কিছুকেই মেপে নেওয়া যায়। আত্মাকে মাপা যাবে না। কেন মাপা যাবে না? কারণ আত্মা সব কিছুর পারে।

তার সাথে আত্মা স্বতঃসিদ্ধ। যে কোন জিনিসকে জানার জন্য প্রমাণ দরকার। কাউকে কোন কথা বললেই, সে বলবে, এই কথার কি কোন প্রমাণ আছে? বা বলবে, তোমার কথার প্রমাণ দাও। কোন বিষয়ের উপর কিছু লিখতে বললে, আমরা সেখানে লিখি, রবীন্দ্রনাথ এই বলেছিলেন, স্বামীজী এই বলেছিলেন; আসলে আমি বলতে চাইছি, আমার বক্তব্য যে ঠিক, এই কথাগুলো হল তার প্রমাণ। হিন্দীতে একটা প্রবাদ আছে, হাত কঙ্গন কো আরশি কেয়া, হাতে বালা পরে আছ, সেটার জন্য আয়নার কি দরকার। আয়না কিসের জন্য? আমার সাজগোজ ঠিক হয়েছে কিনা, টিপ ঠিক পরা হয়েছে কিনা, চুল ঠিকমত আঁচড়ানো হয়েছে কিনা। কিন্তু হাতে বালা আছে কিনা এটার জন্য আয়নার কিসের দরকার। কারণ এটা হল স্বতঃসিদ্ধ, আমি তো দেখছি আমার হাতে বালা আছে।

বলছেন, আত্মা স্বতঃসিদ্ধ। তাহলে আত্মা অপ্রমেয়, এ-কথা কেন বলছেন? আচার্য এখানে খুব সূক্ষ্ম যুক্তি আনছেন, খুব সুন্দর বলছেন, মানুষ কোন না কোন ভাবে নিজেকে জানে। আমি ভাব সবারই ভিতর আছে, আমি অমুক, আমি তমুক, আমি সেই –এই ভাব সবারই ভিতর আছে। এই বোধটাই সবাইকে ঠেলে দেয় এক অজানা অনুসন্ধানের দিকে, আমাকে জানতে হবে আত্মার বাস্তব স্বরূপ কি। বাচ্চা থেকে আশি বছরের বৃদ্ধ সবারই এই বোধটা আছে যে, আমি আছি। এই কথা বলার পর আচার্য বলছেন, যত শাস্ত্র আছে, যত গুরুবাক্যগুলি আছে, এরা আত্মার উপর অনাত্মা বস্তু যে অধ্যারোপ হয়ে আছে, সেই অনাত্ম বস্তুগুলিকে সরিয়ে দিতে সাহায্য করে। যেমন আমি শুদ্ধ আত্মা, আপনিও শুদ্ধ আত্মা, কিন্তু আমি কি আপনাকে শুদ্ধ আত্মা রূপে দেখি? দেখি না। আমি দেখি শরীর, আমি দেখি মন, আমি দেখি এর মন ভাল, ওর মন খারাপ, আমি দেখি বিদ্যা, আমি দেখি বুদ্ধি, আমি দেখি রূপ, আমি দেখি রঙ। কিন্তু রূপ, রঙ, বিদ্যা, বুদ্ধি, মন এ-সবই অনাত্মা, উপর থেকে শুদ্ধ আত্মার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্র, গুরুবাক্য উপর থেকে এগুলিকে সরিয়ে দেন। শাস্ত্র নূতন করে কিছু বলে না, যে অনাত্ম জিনিসগুলো আত্মাকে আবৃত করে রেখছে, শাস্ত্র শুধু সেই অনাত্ম বস্তুগুলিকে সরিয়ে দেয়।

এই সব কথা বলে ভগবান অর্জুনকে বলছেন, বাপু, তুমি এই জিনিসগুলি ভাল করে বুঝে নাও, এবং বুঝে নিয়ে *তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত*। এই প্রথম গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধ করতে বললেন। আচার্য শঙ্কর এখানে পরিষ্কার বলছেন, এটা হল অনুমোদন মাত্র। এই পয়েন্টের সাথে মহাভারতের যে মূল সমস্যা, গীতার যে মূল সমস্যা, সেটার সাথে সংযোগ আছে। অর্জুনকে যুদ্ধ করতে বলে ভগবান এখানে যুদ্ধ করাটা তোমার কর্তব্য এই বিধান দিচ্ছেন না। কারণ অর্জুন তো আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন যুদ্ধ করার জন্য, যুদ্ধভূমিতে এসে ভীষ্ম, দ্রোণ, এবং আত্মীয়স্বজনদের দেখে অর্জুন শোক আর মোহগ্রস্ত হয়ে ভগবানকে পণ্ডিতদের মত অনেক কথা বললেন। অর্জুনকে সেখানে ভগবান একবারও বলছেন না যে, যুদ্ধ করারটাই তোমার কর্তব্য। তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলে, যুদ্ধ করাটা ঠিক কি ঠিক না, আমি তোমাকে অনুমোদন মাত্র করছি যুদ্ধ

করাটাই ঠিক। কিন্তু আমি তোমাকে যুদ্ধ করার জন্য উস্কে দিচ্ছি না, বা বাধ্য করছি না যে, না, তোমাকে যুদ্ধ করতেই হবে। তুমি জানতে চাইলে, যুদ্ধ করাটা ঠিক হবে কিনা, তার উত্তর আমি বলছি হ্যাঁ এটাই ঠিক।

অর্জুন এক বীরযোদ্ধা, কিন্তু শোক আর মোহ তাঁর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, অর্জুনের ক্ষত্রিয় ধর্ম, যেটা তাঁর স্বধর্ম, সেই স্বধর্মের স্বাভাবিক অবস্থায় শোক আর মোহ আসতে দিচ্ছে না। সেইজন্য ভগবান এখন যখন বলছেন, তুমি যুদ্ধ করো, এর দ্বারা তিনি অর্জুনের এই শোক আর মোহকে সরিয়ে দিচ্ছেন। এমনও হতে পারে, এখানে এসেই হয়ত সব কথা শেষ হয়ে গিয়ছিল, তুমি জিজ্ঞেস করছিলে যুদ্ধ করাটা ঠিক কিনা, হ্যাঁ আমি বলছি ঠিক, এই এই কারণে। এখানেই সব মিটে যাওয়ার কথা, কিন্তু তারপরেও গীতায় শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুনের সংলাপ চলছে। কারণ গীতার একটাই উদ্দেশ্য, এই সংসারের যে কারণ শোক আর মোহ, এটাকে নাশ করা।

ভগবান অর্জুনকে বলছেন, আসল সত্য হল, আত্মা কোন ক্রিয়া করেন না, আত্মার উপরেও কোন ক্রিয়া হতে পারে না, কারণ আত্মা অনন্ত। তাঁর উপর কেউ কাজ করতে পারে না, অনন্তের উপর কে কাজ করবে! অন্য দিকে আত্মাও কারুর উপর কাজ করে না, কারণ আত্মা ছাড়া তো আর কিছু নেই, কাজ করবেন কোথায়! অনেকের হয়ত মনে হতে পারে, কেন এই যে বলা হয় ভগবান আমাদের ফল দেন। আমরা মনে করছি বটে ভগবান আমাদের ফল দেন, কিন্তু ভগবান কাউকে কোন ফল দেন না। ভগবান অবশ্যই আমাদের ফল দিতেন, যদি ভগবান আর আমরা আলাদা হতাম। আর চিরন্তন রূপে যদি আলাদা হতাম। আমরা সবাই বলি, ঠাকুর আছেন, ঠাকুর দেখবেন। কোন দিন ঠাকুর দেখবেন না, কারণ ঠাকুরের যে সত্তা, সেটা আমারও সত্তা। এই জগতে আমাদের মনে হয় ঠাকুর আমাদের থেকে আলাদা, তাই আমরা মনে করি তিনি আমাদের দেখবেন, ভাল কর্ম করলে তিনি ভাল ফল দেবেন, মন্দ কর্ম করলে তিনি মন্দ ফল দেবেন। তপস্যা জপধ্যান করে যেদিন ঠিক ঠিক বোধ হবে, ঠাকুর আমার ভিতর আছেন, ঠাকুর আপনার ভিতর আছেন, ঠাকুর সবার ভিতর আছেন, সেইদিন এই ভেদভাব মিটে যাবে। আমরা যখন বলি, হে ঠাকুর, অমুক আমার সাথে খুব অন্যায় করেছে, আমার ভাল না হক, ও যেন শাস্তি পায়, ও যেন কষ্ট পায়। কিন্তু যেদিন দেখব, ঠাকুর তার ভিতরেও আছেন, তখন কি আর এই কথা বলা যাবে বা বলতে পারব?

গীতা এখন কঠোপনিষদের দুটি মন্ত্রকে সরাসরি তুলে আনছেন, দুটো মন্ত্রে শব্দ বিন্যাসে একটু তফাৎ আছে, কিন্তু বাকি সব কিছুই সমান। পঞ্চোদশ অধ্যায়েও আবার কঠোপনিষদ থেকে একটা মন্ত্র নিয়ে আসবেন। কঠোপনিষদ থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে মানে, এই প্রমাণ দেওয়ার জন্য যে, ব্যাসদেব বা ভগবান যে কথাগুলো বললেন, এই কথাগুলো তাঁর মনের কথা নয়, তাঁর বুদ্ধির কথা নয়, কারণ বেদেও এই একই কথা বলা হয়েছে। এই প্রমাণ দেওয়ার জন্য উনিশ নম্বর আর কুড়ি নম্বর শ্লোক নিয়ে আসছেন, এই দুটো শ্লোক আসলে বেদেরই মন্ত্র।

আঠারো নম্বর মন্ত্রে বর্ণনা কর হল, আত্মা, যেটা আমাদের অস্তিত্ব, এটাই আসল। এই শরীরটা *অন্তবন্ত*, এর নাশ হয়। তার আগে মন্ত্রে বলেছিলেন *নাসতো বিদ্যতে ভাবো,* এই শ্লোকটা ভাল ভাবে বুঝে নিলে আমাদের বেদান্ত বুঝতে সুবিধা হয়। অসৎ জিনিস কখন অস্তিত্বে আসে না, সৎ জিনিসের কখন অভাব হয় না। বাকি যে জিনিসগুলো হচ্ছে, এগুলো শুধু পরিবর্তন। পরিবর্তনটা আমাদের কাছে নাশের মত মনে হয়, আর পরিবর্তনটাই আমাদের কাছে জন্মের মত বোধ হয়।

গীতাতে একটা শব্দ বারবার আসবে, যেটা আসা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে, যখন ভগবান অর্জুনকে কর্ম নিয়ে বলছেন –যুদ্ধ কর। তৃতীয় অধ্যায়ে এটাকে আরও বিস্তারে আলোচনা করবেন। আচার্য বলবেন, শাস্ত্রে পুনরোক্তির নিষেধ আছে, একই কথা বারবার বলা নিষেধ আছে। আচার্য

স্বীকার করছেন, গীতাতে কিন্তু পুনরোক্তি আছে, একই কথা অনেকবার বলা হয়েছে। আচার্য তখন বলছেন, আসলে বিষয়টা অতীব দুর্বোধ্য কিনা, বোঝা বা ধারণা করা খুব কঠিন, সেইজন্য বারবার করে বলা হচ্ছে। গীতা প্রথম প্রথম যদি কোন ভাল আচার্যের কাছে শোনার সৌভাগ্য হয়, তখন শোনার পর মনে হবে গীতা সব বুঝে ফেলেছি। সেই গীতাই সাত বছর পর যখন ট্রেনিং সেন্টারে এসে পড়তে হয়, তখন গীতার কথা শুনতে শুনতে মনে হয়, সাত বছর আগে আমি কি বোকাই না ছিলাম, তখন মনে হত সব বুঝে ফেলেছি। তারপর আরও দশ বছর পনের বছর নিজে নিজে যখন গীতা অধ্যয়ন করে চিন্তন মনন করতে শুরু হয় তখন মনে হবে, প্রথম যখন গীতা শুনেছিলাম, তখন কি আমি গীতা সত্যিই বুঝেছিলাম? যত গীতার গভীরে গিয়ে চিন্তন মনন করা হবে, ততই মনে হবে, এর আগে কি আমি গীতা সত্যিই আদৌ বুঝতে পেরেছিলাম? একটা সময় আসে তখন মনে হয় আশা করি সত্যিই আমি গীতা বুঝে নিয়েছি, কিন্তু তখনও মনে একটা খটকা লেগে থাকে, জানি না পরে নিজের উপর হাসতে হবে কিনা। কিন্তু বিজ্ঞান বা সাহিত্য বা অন্য কোন বিষয় বুঝে নিলে হয়ে গেল, আমি আলাদা জ্ঞান আলাদা। ধর্ম তত্ত্বে তা হয় না, যতক্ষণ ওই তত্ত্বের সাথে আমি এক না হয়ে যাচ্ছি, তার অর্থ হল ততক্ষণ কিন্তু আমি ঠিক ঠিক বুঝিনি। যদি তাত্ত্বিক ভাবে জিনিসটাকে ঠিক ঠিক বুঝে নেওয়া যায়, তারপর যখন প্রত্যক্ষ হয়, বাস্তব জ্ঞানটা যখন হয়, তখন দেখে, পড়ে যা বুঝেছিলাম এখন ঠিক তাই মিলছে।

গীতাতে একটা শব্দ বারবার আসবে, যে শব্দটা আমরাও আনতে বাধ্য, তা হল কর্ম। এই কর্ম দুই প্রকার হয় – লৌকিক কর্ম ও বৈদিক কর্ম। লৌকিক কর্ম হল, যে কর্ম দিয়ে আমাদের ঘর সংসার, প্রাত্যহিক জীবন চলছে। বৈদিক কর্ম হল, বেদ যেটা আমাদের করতে আদেশ করছে। আদেশ আর নির্দেশ দুটো আলাদা অর্থ বহন করে। বেদ আমাদের আদেশ দেয়, আর বাড়ির লোকেরা নির্দেশ দেয়। গীতার আলোচনায় অধিকার আর কর্তব্য, এই দুটি শব্দও ঘুরে ঘুরে আসবে। অধিকার আর কর্তব্য এই দুটি গীতার টেকনিক্যাল শব্দ। কর্তব্যের অর্থ দায়ীত্ব, আমাকে এটা করতে হবে। অধিকার থেকে যে অর্থ বেরিয়ে আসে, তা হল, তোমার এলাকা এত পর্যন্ত, তোমার যতটুকু এলাকা এর মধ্যে তোমাকে এই এই করতে হবে।

আচার্য এবার জ্ঞানীর ব্যাপারে বলতে শুরু করেছেন। জ্ঞানী বলতে এখানে একটা জিনিস ভাল করে বোঝার আছে। যিনি তত্ত্বতঃ বুঝে নিয়েছেন আত্মাই সত্য, তিনিও জ্ঞানী, আবার যাঁর জ্ঞান হয়ে গেছে অর্থাৎ আত্মাকে যিনি প্রত্যক্ষ করে নিয়েছেন, তিনিও জ্ঞানী আর যাঁরা এই পথে পা রেখেছেন তাঁরাও জ্ঞানী। জ্ঞানী বলতে এই তিনটে অর্থেই বলা হয়। এখন জ্ঞানী কোন জায়গায় কোন অর্থে বলছেন, বলা মুশকিল, ভাষ্য দেখে বুঝে নিতে হয়। আচার্য বলছেন, যিনি তত্ত্বতঃ বুঝে গেছেন, তাঁর আর কোন কর্তব্য থাকে না।

স্বামীজী আলমোড়াতে অদ্বৈত আশ্রম স্থাপন করেছিলেন, কলকাতার এন্টালিতে তারই একটা শাখা আছে। সেখানে কোন পূজা আদি হয় না, কোন ধরণের উপাচার হয় না। ওখানকার সাধু ব্রহ্মচারীরা প্রত্যেক রবিবার বেলুড় মঠে আসেন। বেলুড় মঠের সাধুরা এনাদের দেখে রসিকতা করে বলতেন, 'এই রে এদের এবার অদ্বৈত থেকে দ্বৈতে মনটা নেমেছে'। মাঝে মাঝে মজা করার জন্য বলতেন, 'আচ্ছা তোমরা খাও কি করে? যে অদ্বৈত সে খাবে কেন'? ব্রহ্মচারীরা তখন বুঝতে পারতেন না, এসব প্রশ্নের কি উত্তর হতে পারে। আসলে বলতে চাইছেন, যেখানেই কর্তব্য বোধ আছে, তার মানে মনে একটা চাঞ্চল্য আছে। কারণ কর্তব্য বোধ থাকা মানে মনে চাঞ্চল্য থাকবে। হিন্দুরা যদি বৈদিক কর্ম না করে, তাহলে তাদের মন খুঁত খুঁত করবে। একজন হিন্দু জানে বৈদিক কর্ম করা আমার কর্তব্য, এটা আমাকে করতে হবে। কর্মের নিয়ম হল, যেমনি একটা কর্মের কথা জেনে গেল, যেমন ব্রাহ্মণ ছেলের উপনয়ন হয়ে গেলে তার গুরু বলে দেন, তুমি আজ থেকে দ্বিজ হলে, আজ থেকে তোমাকে এই এই করতে হবে। প্রথম দিন থেকে নিয়ম ভেঙে যায়, সেটা আলাদা

জিনিস। কিন্তু এখনও গুরুরা বলে দেন, তোমাকে রোজ এই এই করতে হবে। কুমারী মেয়েকে তার বিয়ের প্রথম দিন থেকেই বড়রা সাবধান করে দেন, বারবার মনে করিয়ে দেওয়া হয়, তোমার এখন বিয়ে হয়ে গেছে এখন তোমার এই এই দায়ীত্ব। ঠিক তেমনি বৈদিক কর্ম করাটা দায়ীত্ব।

গীতায় যখন কর্মের কথা আসে, সেখানে খুব সাধারণ স্তরে বৈদিক কর্মের যে বিধান আছে, সেটাকে নিষেধ করছেন। আর উচ্চস্তরে গিয়ে সমস্ত কর্মের নিষেধ হয়ে যায়। তাহলে যে মজা করে বলতেন, জ্ঞানীরা কি খায় না? সাধারণ স্তরের জ্ঞানীরা অবশ্যই খান, আমি খাচ্ছি এই বোধ থাকে না। সমাধিবান পুরুষ, যেমন ঠাকুর ছিলেন, তাঁর খাওয়া-দাওয়ারও কোন হুঁশ থাকত না, কোন রকমে মুখের মধ্যে একটু দুধ ঢেলে দিচ্ছে, সেখানেও বেশীর ভাগ দুধ বাইরে গড়িয়ে পড়ত।

কথামৃতে একটা খুব বিখ্যাত গল্প আছে, ব্যাসদেব যমুনা পার হবেন, কোন নৌকা নেই, গোপীরাও দাঁড়িয়ে আছেন। গোপীরা বলছেন, যমুনার পারে যাবার জন্য আপনি কিছু একটা করুন। ব্যাসদেব বললেন, আমার খুব খিদে পেয়েছে, আগে কিছু আমাকে খেতে দাও। গোপীদের কাছে দই, মাখন ছিল, ব্যাসদেবকে খেতে দিলেন। খাওয়ার পর ব্যাসদেব বললেন, আমি যদি কিছু না খেয়ে থাকি, তাহলে হে যমুনে তুমি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। তাই হল, যমুনা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল, সবাই সেই পথ দিয়ে যমুনা হেঁটে পার হয়ে গেল। গোপীরা ভাবছেন, তিনি এত কিছু খেলেন, তাও কি করে বললেন, যদি আমি কিছু না খেয়ে থাকি? এই কাহিনীর অন্তর্নিহিত সত্যটা বোঝা একটু কঠিন। ব্যাসদেব, যাঁর আমিত্ব হল শুদ্ধ আত্মার, শুদ্ধ আত্মা কখন কোন ধরণের ক্রিয়া করেন না, খাওয়া-দাওয়া, এটা, সেটা কিছুই করেন না। আদৌ যদি তাঁর মন একটু নীচে নেমে থাকে, তখন যেটা সামনে পড়ে গেল, সেটা করে বেরিয়ে যান। তাঁরা দায়ীত্ব বোধ নিয়ে কিছু করেন না, যা কিছু করেন করুণাবশাৎ।

একটা কাহিনী আছে, মূলতঃ এটা খ্রীশ্চান সম্প্রদায়ের কাহিনী, এখন সব পরম্পরার লোকেরা নিজেদের দিকে টেনে নিয়েছে। দুজন ফাদার নদী পার করবেন বলে ঘাটে এসেছেন, সেখানে একটা মেয়ে বসে আছে। মেয়েটি পায়ে আঘাত পেয়েছে, হাঁটতে পারছে না, তার প্রেমিক নদীর ওপারে থাকে, সে তার প্রেমিকের কাছে যাবে বলে মন খারাপ করে বসে আছে। একজন ফাদার তাকে নিজের কাঁধে বসিয়ে নিয়ে ওপারে গিয়ে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। তারপর ফাদার দুজন নিজেদের চার্চে চলে গেছেন। অন্য ফাদারের কাছে এই কাজটা ভাল লাগেনি। সন্ধ্যাবেলায় দেখা হতে বলেই দিলেন, 'আপনি একজন খ্রীশ্চান ফাদার, একটা যুবতী মেয়েকে কাঁধের উপর তুললেন? এটা আপনি কি করলেন'? উনি তখন হেসে বলছেন, 'আমি তো নদীর পারেই যুবতী মেয়েটিকে নামিয়ে দিয়ে এসেছি, আর আপনি এখন তাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন'? আসলে তিনি জ্ঞানী নন, আইডিয়াটা ঠিক তাই। ইনি জ্ঞানী, সামনে পড়ে গেছে, একটা কিছু করে দিলাম, করে বেরিয়ে গেলেন।

একবার অমরনাথ যাত্রায় কিছু সন্ন্যাসী চলেছেন। যেতে যেতে একজনের পায়ে কি করে একটা চোট লাগে, তিনি ব্যাথায় বসে পড়েছেন। সন্ন্যাসীরা সবাই চিন্তিত। সেই সময় অন্য এক সম্প্রদায়ের সাধু ওখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, পরে জানা গেল তিন প্রতি বছর পায়ে হেঁটে অমরনাথ দর্শনে যান। তিনি দেখছেন একজন সাধুর পায়ে চোট লেগেছে। তিনি তাঁর ছোট্ট একটা পুটলি থেকে কি একটা বার করে ওনার পায়ে ঘষে দিয়ে বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই সব ঠিক হয়ে যাবে'। দিয়ে তিনি হন্ হন্ করে সামনের দিকে এগিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেলেন। জিজ্ঞেসও করলেন না, আপনারা কোথা থেকে আসছেন, কোথায় থাকেন, কোন সম্প্রদায়ের। আমরা তো খোস গল্প জুড়ে দিতাম, আরও আগ বাড়িয়ে হয়ত বলতাম, চলুন সামনে একটু চা খাওয়া যাক। কিছুই না, অতটুকু করে দিয়ে যেমন হন্ হন্ করে আসছিলেন, তেমন হন্ হন্ করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। এটাকে বলে নিষ্কাম কর্ম। সামনে একটা কাজ কিংবা কোন সমস্যা এসে গেল, করে দিয়ে বেরিয়ে

গেলাম। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাসদেব, আচার্য শঙ্কর, এনারা সবাই জ্ঞানী, এনাদের কখনই মনে হবে না যে, আমি কিছু করছি। যদি কাহিনীর মাধ্যমে বুঝতে হয়, তাহলে আমাদের ব্যাসদেবের যমুনা পার হওয়ার কাহিনীকে মনে রাখতে হবে।

আগে যেখানে আমরা শেষ করলাম, সেখানে বলছেন *তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত*। এবার এখান থেকে যে দুটি শ্লোকে যাচ্ছেন, এই দুটি শ্লোক কঠোপনিষদ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। ব্যাসদেব ছিলেন একজন বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব; ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, সাহিত্য সব বিষয়ে তাঁর সাংঘাতিক ক্ষমতা, অথচ তিনি ছিলেন এক অবৈধ সন্তান। পরাশর মুনি ও এক জেলের মেয়ের সম্পর্ক থেকে ব্যাসদেবের জন্ম। সেইজন্য অনেক শাস্ত্রে ব্যাসদেবকে বলা হয় পরাশার্য, পরাশর মুনির সন্তান। তাহলে কেন আমাদের শাস্ত্রের কোথাও এর নিন্দা বা সমালোচনা করা হয় না? কারণ আমাদের কাছে এই স্থূল শরীরটার কোন গুরুত্ব নেই, সূক্ষ্ম শরীরের গুরুত্ব আমাদের কাছে অনেক বেশী। যেমন শুকদেব, ব্যাসদেব আবার বিয়েই করলেন না, কিন্তু তাঁর সন্তান শুকদেব। অন্য দিকে কৌরব, পাণ্ডবরা হলেন ব্যাসদেবের সন্তান। এনারা সব সময় সূক্ষ্ম শরীরকে গুরুত্ব দেন। কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরকে একটা স্থূল শরীর ধারণ করার জন্য তাকে একটা গর্ভ দিয়ে আসতে হয়। সেই গর্ভ কিভাবে হবে, সেদিকে এনারা বেশী দৃষ্টি দিতেন না। ব্যাসদেব প্রথম যে কাজটা করলেন, বেদের সব ঋচাগুলি, যেগুলি বিভিন্ন ঋষি, বিভিন্ন আশ্রমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, উনি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বেদের সব ঋচাগুলিকে সংগ্রহ করে এক জায়গায় রেখে দিলেন। পরাশার মুনির সন্তান হওয়াতে তাঁর বিরাট সম্মান, তার সাথে উনি খুব ভাল ভাল শিষ্য পেয়েছিলেন। তাই স্বাভাবিক ভাবে ব্যাসদেব বেদ উপনিষদ সবটাই জানতেন। চারটে বেদেরই জ্ঞান তাঁর আছে, বেদের জ্ঞানরাশি তিনি তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিলেন।

ব্যাসদেব আর-একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি ঠিক করে দিলেন। হঠাৎ একজন উঠে বলে দিল, আমি এই সত্যটা পেয়েছি, এটা সত্য। ইদানিং কালে সোস্যাল মিডিয়াতে, বিশেষ করে ফেসবুকে, ইউটিউবে বাবাজীরা ছেয়ে আছেন, কেউ গান শেখাচ্ছেন, কেউ নাচ শেখাচ্ছেন, কেউ আবার ধ্যান শেখাচ্ছেন। খারাপ কিছু না, ঈশ্বরীয় কথাই বলছেন। কিন্তু যখন ঘষতে শুরু করা হবে, তখন তাঁদের ভিতরের সব চুনোপুটি বেরিয়ে আসতে শুরু হবে। ঠাকুর যেমন বিদ্যাসাগরের নামে বলছেন, চুনোপুটি বেরিয়ে এলো। ভিতরের অজ্ঞানরাশি গুলি বেরোতে শুরু হয়ে যায়। ব্যাসদেব কি করলেন, গীতাতে আমরা এটা পরিষ্কার দেখতে পাই, এবং পরে হিন্দু পরম্পরায় এটা দাঁড়িয়ে গেল – সত্যের তিনটে মাপকাঠি, three conditions of truth। হঠাৎ একজন উঠে বলে দিলেন আমি বলছি, এটা তোমরা মানো, আমি বলছি এটা সত্য, তোমরা মানো। আমরা কেউই মানতে বাধ্য হব না, যতক্ষণ না এই তিনটে মাপকাঠি দিয়ে তোমার কথাকে দেখা হচ্ছে। হঠাৎ যে কোন লোক একটা কথা বলে দেবে, সেই কথা আমরা কি করে মেনে নেব?

এই তিনটে মাপকাঠি দিয়ে দেখা হবে– শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি। শ্রুতি মানে, তুমি যে কথাটা বললে, তোমার এই কথার পরম্পরা আছে কিনা। একজন এসে বলছে, আমার জ্ঞান আছে, এই জ্ঞান আর কারু হবে না। তোমার এই কথা আমরা কোন দিন শুনিনি, অর্থাৎ এর কোন পরম্পরা নেই; কি করে তোমার কথা গ্রহণ করব! দ্বিতীয় মাপকাঠি যুক্তি, জিনিসটা যুক্তিতে ঠিক ঠিক দাঁড়াচ্ছে কিনা। আমরা গীতার আলোচনায় শাস্ত্রের কথা বলছি; ভগবান, ঈশ্বর, আত্মা, জীব, জগৎ সবই বলছি, আবার যেমন যেমন সুযোগ আসছে, তেমন তেমন এর পিছনে কি কি যুক্তি আছে, সেটারও আলোচনা করে যাচ্ছি। সবচেয়ে বড় হল তৃতীয় মাপকাঠি অনুভূতি। আপনি যে কথা বলছেন, এটা আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন কি? বা আগে বা পরে কেউ প্রত্যক্ষ করেছেন কি করেননি? বলতে পারেন, বেদে একটা কথা আছে যে, যুক্তিতে দাঁড়ায় কিন্তু প্রত্যক্ষ করা যায় না, ওটার কোন

দাম নেই। এই হল শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি; সত্যটা আদৌ সত্য কিনা তার পরিমাপ করার এই তিনটে শর্ত।

ব্যাসদেব এখন আত্মতত্ত্ব বলতে শুরু করলেন, এর পরেও বলবেন। ব্যাসদেবের যে authority, তাতে সবাই মেনে নেবেন, আর সবটাই ব্যাসদেবের নিজের রচনা। কিন্তু তিনি এই জায়গাতে যাতে কারুর কোন সংশয় না হয়, সেইজন্য কঠোপনিষদ থেকে দুটো মন্ত্র নিয়ে আসছেন। ওনার বক্তব্য হল, এখানে আমি যে কথা বলছি, এটা যে শুধু আমি বলছি তা না, বেদেও একই কথা বলা হয়েছে। বেদ মানে হিন্দুদের শেষ কথা। ব্যাসদেবও নিজের মত করে বলছেন। এটাই একজন লেখক বা প্রবন্ধকারের সঠিক পন্থা, আপনি নিজের কথা বলুন, আপনি লিখুন আপনি কি বলতে চান। তবে যদি মনে হয় এই জায়গাতে কোন বিতর্কের সম্ভবনা আছে, বা লোকের মনে সংশয় হতে পারে, তখন সেখানে এমন একজনের একটা কোটেশান দিতে হয়, যাঁকে সবাই মানে, যাঁর কথাকে সবাই মান্যতা দেয়, দেখানো যে উনিও এই কথাই বলেছেন।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।।১৯।।

(যিনি এনাকে হন্তা বলে মনে করেন এবং যিনি এনাকে নিহত বলে ভাবেন, এনারা উভয়েই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানেন না। আত্মা কাউকেও হত্যা করেন না এবং কারও দ্বারা নিহতও হন না। কারণ, আত্মা অবিনাশী।)

প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত আত্মাকে নিয়েই আলোচনা চলছে। যে মনে করছে আমি মারছি, মারা মানে হনন ক্রিয়া, তার সাথে যে মনে করছে, আমি মারা গেলাম, দুজনেই ভ্রান্ত। আত্মার যে বাস্তবিক স্বভাব, এটাকে তারা জানে না তাদের অবিবেকীতার জন্য। তাদের বুদ্ধি এমন ভাবে আবৃত হয়ে আছে যে, তারা আত্মার বাস্তবিক স্বরূপ জানে না। সেইজন্য তারা মনে করে, আমি মারছি বা আমি মারা গেলাম। এখানে যে হনন ক্রিয়া আনা হচ্ছে, অষ্টাদশ অধ্যায়ে গিয়ে আবার এটাকে নিয়ে বলবেন। কিন্তু অর্থটা শুধু মারামারিকে নিয়ে না, হনন ক্রিয়া দিয়ে সমস্ত ক্রিয়াকে নিয়েই বলা হচ্ছে। এখানে ব্যাসদেবের যমুনা পার হওয়ার কাহিনীটা মনে রাখতে হবে, সমস্ত ক্রিয়াকে নিয়েই বলা হচ্ছে। উনি যেটাই করছেন, তিনি জানেন এটা আমি করছি না। আমার শরীর ইন্দ্রিয় সব করছে, আমি এগুলো থেকে আলাদা।

একটা ঘটনা আছে, কঙ্খলের সেবাশ্রমে এক সাধুবাবা এসেছেন, তার শরীরে বিশাল একটা ক্ষত হয়েছে, ওটার অপারেশান করাতে হবে। সাধুবাবাকে বলা হল, অপারেশানের জন্য ওনাকে এ্যানাস্থেসিয়া দেওয়া হবে। সাধুবাবা গীতার শ্লোক আউড়ে বলছেন, 'আরে উসকো কুছ জরুরৎ নহি, *য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্,* ম্যায় তো শুদ্ধাত্মা হুঁ'। ডাক্তার ছুরি চালিয়ে দিয়েছে। সাধুবাবা যন্ত্রণায় খুব জোর চেঁচিয়ে উঠেছেন। 'এই যে আপনি বলছিলেন, আপনি শুদ্ধ আত্মা'। 'আরে ওতো গীতা মে হ্যায়'। গীতার শ্লোক এমনিতে ফরর ফরর করে মুখে বলা যায়, কিন্তু জীবনে নামাতে গেলে দম বেরিয়ে যাবে। ছুরি চালাতেই তখন চিৎকার করে উঠবে।

স্বামী তুরিয়ানন্দজী মহারাজের পিঠে একবার কার্বঙ্কল হয়েছিল। ওনার পিঠেও ডাক্তার ছুরি চালাতে গেছে, উনি সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, দাঁড়াও, আগে মনটাকে তুলে নিই। মহারাজ মনটাকে ওখান থেকে উঠিয়ে নিলেন, ডাক্তারও আরামসে অপারেশন করে দিলেন। আবার আরেকদিন কি আর-একটা অপারেশন করতে যাচ্ছিল, ওনাকে না জানিয়েই ছুরি চালাতে গেছে, ছুরি লাগাতেই মহারাজ জোর চিৎকার করে উঠেছেন। ডাক্তার বলছেন, 'আগের অপারেশান তো এর থেকে অনেক বড় ছিল, সেদিন কিছু বললেন না, আজ কেন চেঁচিয়ে উঠলেন'? মহারাজ বললেন, 'তখন আমি তো মনটাকে

সরিয়ে নিয়েছিলাম, এখন তো মন আমার ওখানে লাগানো আছে'। এই হল দেহ, মন, ইন্দ্রিয়ের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। বয়স কালে লোকেরা আসে মনের নিয়ন্ত্রণ করতে, যে বয়সে বাহ্য প্রস্বাবের নিয়ন্ত্রণ থাকে না, আর উনি করবেন মনের নিয়ন্ত্রণ। একদিনেই সবাই যোগী হতে চাইছে, যেখানে খুশী মনকে লাগাবো, মন সেখানে বসে যাবে, যখন চাইব তুলে নেব। একদিনে কি এই ক্ষমতা আসবে! এই ঘটনা গুলো বলা হল বোঝানর জন্য। এটা যে অসম্ভব তা না, এটা যে একজন দুজনের হয়েছে তাও না, এটা যে একদিনেই হয়ে যাবে তাও না। তাই বলে যে সবারই হয়ে যাবে, তাও না।

এই শ্লোকে একজন মারছে, আরেকজন মার খাচ্ছে। বাংলা ভাষার ব্যাকরণের মতে যে মারছে, তাকে বলা হয় কর্তা, ইংরাজীতে subject। যে মার খায় বাংলার ব্যাকরণে বলে দ্বিতীয়া, ইংরাজীতে object, আর এর সংস্কৃত শব্দ হল কর্ম। কর্ম বললে সংশয় হয়ে যাবে তাই আমরা দ্বিতীয়া বলি, প্রথমা আর দ্বিতীয়া। যিনি ক্রিয়া করেন, তাকে বলা হয় কর্তা, যার উপর ক্রিয়া করা হয় তাকে বলে দ্বিতীয়া। এখানে বলছেন, *য এনং বেত্তি হন্তারম্ যশ্চৈনং মন্যতে হতম্*, এখানে যে মনে করছে আমি মারছি, সে হল কর্তা আর যে বলছে আমি মার খাচ্ছি, সে হল দ্বিতীয়া, subject and object। আত্মা subjctও না, আত্মা objectও না। কিন্তু প্রায়ই বলা হয় eternal subject, এটা উপাচার, ব্যবহারের দৃষ্টিতে বলা হয়। কারণ একমাত্র আত্মা, যাঁর চৈতন্য আছে, একমাত্র আত্মা, যিনি জানতে পারেন। কিন্তু এই জানাটা এখানে ক্রিয়া অর্থে না। যেমন আমি কলমটা দেখছি, আমি কলমটা ধরলাম; এখানে আমি কর্তা; ধরা, দেখা ক্রিয়া আর কলম দ্বিতীয়া।

আমি আর কলমের সাথে ক্রিয়া জড়িয়ে আছে, তার সাথে কারকের বিভক্তিগুলি ধরলে আরও অনেকে কিছু এসে জুটে যাবে। যেমন আমি হাত দিয়ে কলম ধরছি, এখানে আরেকটা বিভক্তি জুটে গেল। সংক্ষেপে এটাকে তিনটেতেই নিয়া আসা হয়, কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া। আত্মার ব্যাপার যেখানেই আসবে, সেখানে না আসবে কর্তা, না আসবে কর্ম আর না আসবে ক্রিয়া। কথামৃতে ঠাকুর একাধিকবার বলছেন, ধ্যাতা, ধেয় ও ধ্যান এক হয়ে যায়, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এক হয়ে যায়। এক হয়ে যাওয়া মানে, ওখানে আত্মা ছাড়া কিছুই থাকে না। এগুলো ধারণা করা যায় না, তাতে মন খারাপ করে বসে থাকলে তো চলবে না, শুনে যেতে হবে। শুনতে শুনতে একটা ধারণা হবে, তখন আত্মার ব্যাপারে একটা দৃঢ় বিশ্বাস আসবে, এতেও অনেক উপকার হবে।

এখানে বাতিল করা হচ্ছে; আত্মা কর্তাও নন, আত্মা কর্মও নন। যিনি কর্তাও নন, কর্মও নন, তাহলে তিনি ক্রিয়া কি করে করবেন? আত্মা না করেন কোন ক্রিয়া, না করা যায় তঁর উপর কোন ক্রিয়া। এর আগেও বলেছিলেন যে, নিজের উপর কখনই ক্রিয়া করা যায় না। কারণ একমাত্র আত্মাই আছেন, এবং আত্মা অনন্ত; ফলে তিনি সাবজেক্টও নন, অবজেক্টও নন, তিনি কার উপর ক্রিয়া করবেন! এগুলো কেন হয় না? কারণ কর্তা যেখানে হবে, কর্ম যেখানে হবে, ক্রিয়া যেখানে হবে, সেখানে বিকার থাকতে হবে। অনন্ত যিনি, তাঁর বিকার হয় না। সীমিত যিনি, তাঁরই বিকার হবে। খুব সাধারণ কথা, আমি হয়ত বললাম, দুধটা কেটে গেল। তার মানে দুধের উপর একটা ক্রিয়া হল। কেন ক্রিয়া হল? কারণ দুধ হল বিকারবান। লোকটা মারা গেল। কেন মারা গেল? কারণ মানুষ বিকারবান। যে জিনিসটা বিকারযুক্ত, তার উপরেই ক্রিয়া হবে, তা নাহলে কোন কর্ম হবে না। যার কোন বিকার নেই, তার উপর আমরা কি করে ক্রিয়া করব! লোহাকে আমরা ইস্পাতে রূপান্তরিত করে দিতে পারি। হীরা এত কঠিন পদার্থ, তাকেও আমি পালিশ করে বিশেষ ভাবে ভেঙে দিতে পারি। বলে এ্যটমকে ভাঙা যায় না, কিন্তু ইউরেনিয়াম এবং অন্য অনেক কিছু এ্যটমকে ভেঙে দিচ্ছে, যদিও অন্যান্য এ্যটমকে ভাঙা একটু কঠিন। বিকারযুক্ত মানেই সে যৌগিক, যেটা দুই বা দুইয়ের অধিক জিনিস দিয়ে তৈরী, সেটা বিকারবান। যেটাই বিকারবান, সেটারই উপরে ক্রিয়া হবে।

আত্মা হলেন, সহজ, সরল, অনন্ত, ফলে তাঁর মধ্যে কোন বিকার হয় না। এই জিনিসটাকে এবার কুড়ি নম্বর শ্লোকে বলছেন, এটাও কঠোপনিষদের মন্ত্র।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বাভবিতা বা ন ভূয়ঃ।।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।২০।।

(এই আত্মা কখনও জাত বা মৃত হন না। কারণ পূর্বে না থেকে পরে বিদ্যমান হওয়ার নাম জন্ম এবং পূর্বে বিদ্যমান থেকে পরে না থাকার নাম মৃত্যু; আত্মাতে এই দুই অবস্থার কোনটিই নাই। অর্থাৎ আত্মা জন্ম ও মৃত্যু-রহিত, অপক্ষয়হীন এবং বৃদ্ধিশূন্য; শরীর নষ্ট হলেও আত্মা বিনষ্ট হন না।)

কুড়ি নম্বর শ্লোক হল হিন্দু ধর্মের প্রাণ, বেদান্তের প্রাণ। এই একটি মন্ত্র যদি মনে রাখা যায়, তাহলে আত্মতত্ত্ব কি, পুরোটাই পরিষ্কার বোঝা যায়। এই কুড়ি নম্বর শ্লোক থেকে সেই আত্মতত্ত্ব এবং বেদান্ত কিভাবে বেরিয়ে আসছে আমরা বোঝার চেষ্টা করব। যুক্তিটা এখানে খুব সাধারণ। কোন জিনিসের পরিবর্তন তখনই করা যাবে, যদি সেটা যৌগিক হয়। কোন মৌলিক জিনিসের উপর কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না। পরে আমরা আর-একটা যুক্তি নিয়ে আলোচনা করব, যেখানে বলা হবে যেটা খুব সরল, একেবারে বেসিক, যেমন কেমেস্ট্রিতে বলা হত building blocks, একেবারে fundamentals, এই মৌলিক জিনিসকে পরিভাষিত করা যায় না। যেগুলি যৌগিক, সেগুলিকে মৌলিকের সাহায্যে পরিভাষিত করতে হয়। যদি আমরা দুইকে ব্যাখ্যা করতে চাই, তাহলে এক দিয়ে আসতে হবে, এক আর এক দুই। জগতের যে কোন জিনিসকে ব্যাখ্যা করতে হলে, যেটা সহজ সেটাকে দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হয়।

বাচ্চা যখন প্রথম শিক্ষা পায়, তখন সে একটা জিনিসকেই জানে, তার ফুড সোর্সকে। মা বুকে টেনে এনে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে, তখন সে জানে এটা আমার ফুড সোর্স। আড়াই মাস, তিন মাসের বাচ্চাকে যে কেউ গালে লাগালে সে গালটাকেই চুষতে থাকবে দুধ খাওয়ার জন্য। ওই বয়সের শিশু শুধু খাওয়াটাই বোঝে। বাবাকে যবে থেকে দেখতে শুরু করে, বাচ্চা তফাৎ করতে পারে না, বাবাও তার কাছে মায়ের মত মনে হয়। ওর কাছে একটাই শব্দ ফুড সোর্স। কোন ভাষা, কোন সংস্কৃতি কত সমৃদ্ধ যদি বুঝতে হয়, আমাদের দেখতে হবে তার জন্য কত শব্দ আছে। যে কোন সমৃদ্ধ ভাষা, যেমন সংস্কৃত ভাষা, খুব সমৃদ্ধ ভাষা, একটা জিনিসের জন্য পঁচিশ খানা শব্দ আছে। সংস্কৃতে এক এক বয়সের জন্য তার এক একটা নাম, এইভাবে হাতির ষাট খানা শব্দ আছে। এক বছরের হাতির এই নাম, দু বছরের হলে এই নাম, তিন বছরের হলে এই নাম। হাতির উপর সংস্কৃতে একটা পুরো বই আছে গজশাস্ত্র, শুধু হাতিকে নিয়ে। এতেই বোঝা যায় সংস্কৃত কত সমৃদ্ধ ভাষা। আইসল্যাণ্ডে শুধু বরফের জন্য চল্লিশ খানা নাম আছে। নূতন বরফ, বরফ জমে গেছে, বরফ টুকরো হয়ে আছে, সব আলাদা আলাদা নাম। কিন্তু আমাদের কাছে একটাই শব্দ, বরফ। এইভাবে বোঝা যায় কোন ভাষা কত সমৃদ্ধ।

আমরা বলছিলাম, সহজকে দিয়ে যৌগিককে বোঝান হয়। সহজকে বোঝান যায় না, সহজকে ধারণা করতে হয়। আত্মা সহজ, ঈশ্বর সহজ, সেইজন্য আত্মা বা ঈশ্বরকে কোন দিন ব্যাখ্যা করা যাবে না। আত্মা বা ঈশ্বরকে দিয়ে বাকি সব কিছুর ব্যাখ্যা হবে। আত্মা সহজ, সেখান থেকে সব কিছুই যৌগিক, সৃষ্টি মানেও তাই; কিন্তু সৃষ্টির যে উৎস, সেটা সহজ। মৌলিকের সাথে অনেক কিছু মিলে মিশে অনেক কিছু দেখায়, আত্মা ওই অর্থে সব কিছুর মিলে মিশে দেখা না। এটা বোঝানর জন্য। আমরাও দিনরাত কিভাবে এই জিনিসগুলিকে নিয়ে আছি। যেমন রঙ, মাত্র তিন খানা রঙ, এই তিনটে রঙ মিলেমিশে জগতে কত রকম রঙের বাহার হয়ে চলেছে।

আগে বলা হল আত্মা অবিকারী। তার সাথে বলা হল, আত্মা সাবজেক্টও না, অবজেক্টও না, কেন এই রকম বলা হচ্ছে? কারণ আত্মা অবিকারী, আত্মার কোন ধরণের বিকার নেই। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আত্মা কি, তখন আমরা এই কুড়ি নম্বর শ্লোক বলতে পারি। আর সেটা যদি মনে না থাকে, তাহলে একটা কথাই বলা যেতে পারে, আত্মা অনন্ত। আর কিছু বলার দরকার নেই। একবার অনন্ত শব্দটাকে নিয়ে এলে, বাকি সব কিছু নিজে থেকেই চলে আসবে। এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে এক-একটা পরিবর্তনকে নিয়ে, এক-একটা ক্রিয়াকে নিয়ে; এগুলো সেই অনন্তই, তাঁকেই বিভিন্ন ভাবে বলা হচ্ছে। এই যেমন বলা হল হাতি, হাতির অতগুলি নাম, কিন্তু বস্তু সেই এক।

আত্মা অনন্ত, অনন্তের কিসে থেকে জন্ম হবে, সেইজন্য আত্মা হলেন অজ, আত্মার কখন জন্ম হয় না। *ন জায়তে*, কখন যে তাঁর জন্ম হয়ে গেছে, তাও না। আর সেইজন্য আত্মার মৃত্যুও হয় না। যেটা অনন্ত, সেটা মরবে কি করে, কারণ কোন বিকার নেই কিনা। কম্পাউণ্ড যদি হতে, আমরা ভেঙে দিতে পারতাম, কিন্তু এককে ভাঙা যাবে না।

আমরা এতক্ষণ ধরে যে বিকারের কথা বলে যাচ্ছি, হিন্দু শাস্ত্রে ছয় রকমের বিকারের কথা বলা হয়। এই ছটি দ্বারা পরিভাষিত হয়, একটা জিনিসের বিকার আছে কিনা। এটাকে বলে ষড়্‌বিকার। প্রথমটা হল *জায়তে*, যার জন্ম হয়। দ্বিতীয় হল *অস্তিত্বে*, যার অস্তিত্ব থাকে; জন্মাল আর মরে গেল তা না। জন্ম হয়েছে, সে একটা সময় পর্যন্ত থাকবে; মাইক্রো সেকেণ্ডই থাকুক, কিন্তু থাকবে। তৃতীয় *বর্ধতে*, বৃদ্ধি পায়। চতুর্থ *পরিণমতে*, একটা থেকে আরেকটাতে তার পরিণতি হতে থাকে, অর্থাৎ পাল্টাতে থাকে। পঞ্চম *অপক্ষিয়তে*, তার ক্ষয় হয়। শেষ বিকার *বিনশ্যতে*, তার বিনাশ হয়। যে কোন জিনিসের এই ছটি বিকার থাকবে –*জায়তে, অস্তিত্বে, বর্ধতে, পরিণমতে, অপক্ষিয়তে এবং বিনশ্যতে*। কোন জিনিসের যদি একটি বিকার থাকে, তাহলেও সেটা বিকারী হবে। একটা বিকার থাকা মানে তার মধ্যে বাকি বিকারগুলিও আছে।

অবিকারী কি? যার মধ্যে ছয়টি জিনিস নেই। আত্মাতে এই ছটির কোনটাই নেই, পুরোটাই অভাব। বস্তুতে ছটাই থাকবে, তার জন্ম হবে, তার অস্তিত্ব থাকবে, তার বৃদ্ধি হবে, তার একটা জিনিস থেকে আরেকটা জিনিসে পরিণতি হবে, আর ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকবে, তারপর শেষে একদিন তার বিনাশ হয়ে যাবে। আমরা যখন বলছি, অমুক মারা গেছেন, তার মানে কি? মারা যাওয়টাই একটি বিকার? কিন্তু তা না, তার জন্ম হয়েছে, তার অস্তিত্ব ছিল, সেখান থেকে সে বড় হয়েছে, তার নানা রকম অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, সেখান থেকে ধীরে ধীরে তার ক্ষয় হতে শুরু হয়েছে, বৃদ্ধাবস্থা মানে ক্ষয় হয়ে হয়ে এই জায়গায় এসেছে, শেষে মৃত্যু। তার মৃত্যু হয়ে গেল বলে আমরা কান্নাকাটি করছি, কিন্তু তার যে এতগুলো পরিবর্তন হয়ে মৃত্যু হল, সেটার দিকে আমরা কেউ তাকাই না। শৈশব থেকে একদিন যৌবনে প্রবেশ করল, গোফ-দাড়ি বেরোল, শৈশব চলে গেল বলে কেউ কি কান্নাকাটি করে?

এখানে এনারা ইতিবাচকতাকে নিয়ে কোন উপদেশ দিচ্ছেন না। এনাদের উপদেশ হল, যেটা আগে বলা হল, *অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ*, শরীর অন্তবান। কেন অন্তবান? কারণ শরীর এই ছটা পরিবর্তনের মধ্যে বাঁধা। আত্মা অবিকারী। কেন অবিকারী? আত্মা এই ছটি বিকারের বাইরে। এই জিনিসটাকে কঠোপনিষদ থেকে এনে বলছেন, *জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ*। কদাচিৎ বলা মানে, ছটি বিকারগুলিকে, *জায়তে, অস্তিতে, বর্ধতে, বিপরিণমতে, ক্ষিয়তে, বিনশ্যতে* সব কটাকেই না করে দেওয়া হল। আসলে কুড়ি নম্বর শ্লোকের সাথে ঊনিশ নম্বর শ্লোকের সরাসরি যোগ রয়েছে। কিভাবে যোগ আছে আমরা এবার দেখব।

এখানে যুক্তিটা চলছে, অর্জুন এর আগে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কি করে আমি যুদ্ধ করব, যুদ্ধ করলে আমার প্রিয়জনরা মারা যাবে; আপনি এখন বলুন আমি কি করব? ভগবান তখন অর্জুনকে বলছেন, তুমি যেটার জন্য 'আমি' 'আমি' করছ, এর আসল আমিটা আত্মা। আত্মা কোন ক্রিয়া করে না, আত্মার উপর কোন ক্রিয়া হয় না। এটা হল ভগবানের প্রথম পয়েন্ট। আমরা এগুলো শ্লোকে পাব না, কিন্তু এটাই শ্লোকের conclusion, বিশেষ করে আচার্য তাঁর ভাষ্য রচনার সময় এই যুক্তিগুলিকে দাঁড় করিয়ে দ্বিতীয় পয়েন্টে বলছেন, ক্রিয়া সব সময় বিকারী বস্তুতেই হয়। তৃতীয় পয়েন্টে হল বিকার ছয় প্রকার। চতুর্থ পয়েন্ট এই ছটি বিকারের মধ্যে কোন বিকারই আত্মার মধ্যে নেই। এই চার নম্বর পয়েন্টটাকে ভগবান কুড়ি নম্বর শ্লোকে উল্লেখ করছেন। এই চারটে পয়েন্টকে আমরা যদি মনে রাখি, তাহলে এখন, এর ঠিক পরে পরে আত্মাকে নিয়ে যত বারই আলোচনা হবে বা যে কোন শাস্ত্রে, উপনিষদে, যোগে, বেদান্তে, স্বামীজীর কথায়, ঠাকুরের কথায় আত্মাকে নিয়ে, ঈশ্বরকে নিয়ে, ব্রহ্মকে নিয়ে যত আলোচনা আছে, সবটাতে কিন্তু এই চারটে যুক্তি চলবে।

প্রথম আত্মা কোন ক্রিয়া করে না, আত্মার উপর কোন ক্রিয়া হয় না। তাহলে ঠাকুরের ইচ্ছা? ইচ্ছাটাও তো একটা ক্রিয়া, সেটা কোথায় যাবে? ঠাকুরের ভারি বয়ে গেছে আমাদের নিয়ে ইচ্ছা করতে। কারণ ঠাকুর আর আত্মা এক। ঠাকুর কোন ক্রিয়া করেন না। দ্বিতীয়, ক্রিয়া শুধু বিকারী বস্তুর উপরই হয়। তৃতীয়, বিকার ছয় প্রকার। আত্মা এই ছটি বিকারের পারে, *ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ*।

ছোটবেলা থেকে আমরা শুনে আসছি, ধর্ম মানে বিশ্বাস করে যাও; ধর্ম মানে কটি শাস্ত্র আছে, ওই শাস্ত্র কটির কথা মেনে নাও। এদিকে শাস্ত্রগুলো এক অপরের সাথে ঝগড়া করছে, ধর্মগুলি এক অপরের সাথে লড়াই করছে, কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এসব কিছুই কিছু না, ধর্ম সম্পূর্ণ ভাবে যুক্তির উপর চলে। তথাকথিত যারা নিজেদের যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমস্কতার মানুষ মনে করে, তাদের গীতার এই দুটি শ্লোক বোঝার ক্ষমতা আছে? এতটুকু যুক্তি বোঝার ক্ষমতা আছে? সেইজন্য এদের কথা আলোচনা না করাই ভাল।

যাই হোক, এবার ছটি বিকারের উপর জোর দিচ্ছেন, শুধু তাই না, এর সাথে আরও যা যা হতে পারে, সবটাকে নিয়েই বলছেন। আত্মার কোন জন্ম নেই, এই কথা বলছেন কঠোপনিষদের ঋষি ধ্যানের গভীর থেকে। ঠাকুর ব্রহ্মকে নিয়ে, আত্মাকে নিয়ে, মা কালীকে নিয়ে যা যা বলছেন, সাক্ষাৎ নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকে বলছেন। সেই প্রত্যক্ষের কথা এখানে চলছে। ব্যাসদেব নিজের খুশি মত কিছু বলে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন না। ঋষিদের হাজার হাজার বছরের পরম্পরা দিয়ে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেমে এসেছে, সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কথা চলছে। কি সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান?

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ, আত্মার জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না। *বা কদাচিৎ*, এই কথা দিয়ে বাকি সব কিছুকে বলে দিলেন। আচ্ছা এমনও তো হতে পারে, আত্মা জন্ম নিল, বিকারের অনুভব করে তারপর অভাব হয়ে গেল? তার মানে বাকি বিকারগুলি হয়নি বলতে চাইছে। না, *নায়ং ভূত্বাভবিতা বা ন ভূয়ঃ*, এই যে মৃত্যু জিনিসটা যখন বলা হয়, তখন এই নয় যে হঠাৎ করে চলে গেল বা চিরদিনের জন্য চলে গেল। এর আবার নানা রকমের যুক্তি আছে। যেমন মনে করা যাক একটা ঘট আছে, ঘটের এবার নাশ হয়ে গেল, ভেঙে দিল। ঘটের নাশ হওয়াকে বলা হয় ঘটের অভাব। ঘটের নাশের সাথে এই অভাবের জন্ম হল, আর চিরদিনের জন্য এটা অনন্ত, কারণ এই ঘট আর কোন দিন হবে না। আত্মা কি এই রকম কিছু একটা? আত্মার জন্ম হল, তারপর আর কোন দিন থাকবেন না, তাও না। সব দিক থেকে প্রতিষেধ করছেন।

এখানে বাকি শব্দগুলি, *বা ন ভূয়ঃ,* এগুলো বোঝানর জন্য বলছেন, এই নয় যে, আগে ছিল না, তারপর তার জন্ম হয়ে গেছে। যেমন আমার এই কলম আছে, অনন্তকাল থেকে এর অনুপস্থিতি ছিল, কোন দিন ছিল না। কোম্পানি এই কলমকে যেদিন তৈরী করল, সেদিন এর জন্ম হয়ে গেল। তার মানে অনন্ত ছিল ঠিকই, কিন্তু অভাবটা অনন্ত থেকে আসছিল, বুম্ করে হয়ে গেল। আত্মার ক্ষেত্রে তাও প্রযোজ্য নয়। যেদিক থেকেই যুক্তিতর্ক আনা হোক, শুধু বলা হবে আত্মাতে এটা নেই। সেইজন্য বলছেন, আত্মা অজ এবং অমর, আত্মার জন্ম হয় না, মৃত্যুও হয় না। যে কোন ভাবে জন্মকে নেওয়া হোক না কেন, মানুষ হিসাবে জন্মাচ্ছে তাও না, আবার অনন্ত কাল থেকে জিনিসটা নেই, অভাবের নাশ হয়ে গিয়ে হঠাৎ করে এসে গেল, তাও না। *অজ,* অর্থাৎ অজন্মা বলে দিলেন, তার মানে মাঝখানের বাকি সব কিছুকে উড়িয়ে দিলেন।

তাহলেও একটু পুনরোক্তি করে বলছেন, *শাশ্বতোহয়ং,* যে জিনিসটা সব সময়ই আছে সেটাই শাশ্বত, আত্মা সব সময়ই আছেন, কখনো এদিক সেদিক যান না। শাশ্বত মানে আবার, যার কক্ষণ কোন ক্ষয় হয় না। আত্মার মধ্যে কোন অবয়ব নেই, সেইজন্য স্বরূপ থেকে কখন কোন ক্ষয় হয় না, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। ক্ষয় দুই প্রকার হয়, প্রথম বলা হয় স্বরূপ ক্ষয়। মানুষের দুটি হাত, একজন মানুষের একটি হাত কাটা গেল, আমরা বলি ক্ষয় হয়ে গেছে। এটাই স্বরূপ থেকে ক্ষয় হয়ে যাওয়া। কারণ তার অঙ্গ ছিল, সেই অঙ্গটা কাটা গেছে। আবার যখন কোন গুণ চলে যায়, সেটাকেও ক্ষয় বলে। ওষুদের প্যাকিংএ লেখা থাকে expiry date, তার মানে ওষুদের যে গুণ, এই গুণের আয়ু এতদিন আছে। তার মানে ওই তারিখের পর ওষুদের গুণ আর কাজ করবে না, ওষুধটা আছে কিন্তু কাজ করবে না। এটাও ক্ষয়। প্রথমটাতে তার অঙ্গটা নাশ হয়ে গেল, দ্বিতীয়টাতে জিনিসটা আছে, কিন্তু তার ক্ষমতা চলে গেছে।

তারপর বলছেন, *পুরাণো,* পুরাণ মানে যার কোন বৃদ্ধি হয় না। যেমনটি ছিল তেমনটিই আছে। যেমন হিমালয়, প্রথম দিন থেকে যেমনটি দেখে আসছি, আজও তেমনটি আছে। কোন কিছু দিয়ে তার পুষ্টি হচ্ছে, বড় হয়ে যাচ্ছে, সেটা হয় না। প্রথমেও নূতন ছিল, এখনও নূতন আছে। পুরাণের একটা অর্থ হয়, পুরনো হয়েও নূতন।

তারপর বলছেন, *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*। বয়সের সাথে সাথে শরীর যেমন দুর্বল আদি হয়ে যায়, আত্মার সেরকম কিছু হয় না। অনেক সময় দেখা যায় একটা জিনিসের বিপরীত স্বভাব হয়ে যাচ্ছে। সোডিয়াম পুরোটাই বিষ, ক্লোরিন পুরো বিষ, অথচ সোডিয়াম আর ক্লোরাইড দুটো যখন মিশে যায়, তখন লবণ হয়ে যায়, বিপরীত পরিণাম হয়ে যাচ্ছে। যে জিনিসটা ঘাতক, সেই জিনিসটাই আমাদের খাদ্যের জন্য এক প্রয়োজনীয় দ্রব্য হয়ে যায়। আমরা বলতে পারি, আত্মারও এই রকম বিপরীত স্বভাব হয়ে যেতে পারে? না, তারও কোন সম্ভবনা নেই।

এই শ্লোক, যেটা কঠোপনিষদের একটা মন্ত্র, তাতে দেখানো হল, আত্মা কিভাবে অবিকারী, নিত্য, সব সময়েই আছেন। যদিও আমরা খুব সংক্ষেপে বলে দিই, আত্মা অনন্ত। এটাকে আরও ভাল করে বোঝানর জন্য বলছেন, *অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*। শরীরের যদি নাশ হয়ে যায়, আত্মার তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ আত্মাতে তো কোন অঙ্গ নেই, কোন অবয়ব নেই, যা আছে একাই আছে। পদার্থ কখন এই রকম হয় না, যোগ, সাংখ্য, বেদান্ত সৃষ্টিকে যেভাবে দেখছেন, সেখানে অর্থাৎ সৃষ্টিতে যা কিছু আছে, সবই সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে জিনিস মিলেমিশে আছে। সেইজন্য জগতে কোন জিনিস নেই, যেটাতে এই তিনটে জিনিস মিলেমিশে থাকবে না। আমাদের মনটাও ওই সৃষ্টির মধ্যে, মনের মধ্যেও সত্ত্ব, রজো ও তমো আছে, সত্ত্ব রজো তমো আছে বলেই আজকে মন খারাপ হয়ে গেল, কাল মন ভাল হয়ে গেল, মনের বৃদ্ধি হয়, মনের নাশ হয়, কারণ মনটাও সত্ত্ব, রজো ও তমো দিয়ে মিশে আছে। এই জগতে

কোন কিছু নেই যেটাতে এই তিনটে গুণ নেই। অঙ্গ আছে বলেই এই দুরবস্থা। কিন্তু আত্মার তো কোন অঙ্গই নেই।

বোঝানর জন্য বলা যেতে পারে, সাধারণ ভাবে যে জিনিসগুলো পিওর ফর্মে থাকতে পারে, সেটার সহজে নাশ হয় না। যেমন সোনা, সোনা সহজে নাশ হয় না, কারণ ওটা পিওর। তবে লোহাতে মরচে ধরে, ওর তাড়াতাড়ি নাশ হওয়ার সম্ভবনা অন্যদের থেকে বেশী। তবে বেশীর ভাগ জিনিসগুলি প্রতিক্রিয়া করে না। হাইড্রোজেন ওই ভাবে react করে না, হিলিয়াম তো একেবারে react করতেই চায় না, পিওর ফর্মে যেগুলি আছে সাধারণ ভাবে react করে না। কিন্তু এটার সাথে আমাদের শ্লোকের কোন সম্পর্ক নেই, এটা শুধু বোঝানর জন্য বলা হল। আত্মাতে কোথাও কোন ধরণের বিকার হয় না।

এতক্ষণ *অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং* থেকে শুরু করে আত্মাকে নিয়ে যে আলোচনা চলছিল, আত্মার এই আলোচনাকে আরও পুষ্ট করবার জন্য ব্যাসদেব কঠোপনিষদ থেকে দুটি মন্ত্র নিয়ে এলেন। এরপর তিনি আলোচনার উপসংহার টানছেন। যেমন কেউ যদি একটা ভাল প্রবন্ধ রচনা করেন, ইদানিং কালে জার্নালিস্টরা অনেক ভাল ভাল প্রবন্ধ লেখেন, সেখানে ওনারা নিজেদের বক্তব্য বলে যেতে যেতে হঠাৎ মাঝখানে আগেকার কোন বড় চিন্তাবিদ্, ঐতিহাসিকের কথা ঢুকিয়ে দিয়ে একটা ইতি টেনে নিজের সিদ্ধান্তটা বলে দেবেন। এই concluding remark ব্যাসদেব দিচ্ছেন একুশ নম্বর শ্লোকে।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্।।২১।।

(হে পার্থ, যিনি এই আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলে জানেন, তিনি কিভাবে কাকেই বা হত্যা করেন এবং কাকেই বা হত্যা করান?)

আত্মার কথা বলার পর ভগবান বলছেন, *বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্,* হে অর্জুন, এটাকে জানো, এটা অবিনাশী, নিত্য, অজ, অব্যয়, এ-রকম যদি হয়, কে একে মারবে, কেই বা কাকে মারবে। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পুরোটাই এই শ্লোকের বিস্তার। আগেও আমরা বলেছি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সব কিছু সংক্ষেপে বলা হয়েছে, পরে এক-একটা অংশকে ধরে ধরে তৃতীয় অধ্যায় থেকে শুরু করে সপ্তদশ অধ্যায়ে বিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই জিনিসটাকে নিয়েই বলা হয়েছে।

একটু মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে, পুরো হিন্দু ধর্মতত্ত্ব, হিন্দুদের যেটা প্রাণ, তার বর্ণনা সতের নম্বর শ্লোক, যেখানে বলছেন *নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ,* সেখান থেকে হিন্দু ধর্মের মূলতত্ত্বের আলোচনা শুরু হয়ে গেল। এই শ্লোকের আলোচনায় বলা হয়েছিল, যদি একটা জিনিস সৎ হয়, সেই জিনিসের কখনই নাশ হবে না। আর যদি অসৎ হয়, বুঝতে হবে ওর কখনই জন্ম হবে না। আমরা যা কিছু দেখছি, এগুলো সব বিকার। এরপর গীতা উপনিষদ থেকে দুটি মন্ত্র নিয়ে এলেন, দেখানোর জন্য যে উপনিষদের ভাবও এটাই। এখানেও গীতা তাই নূতন কিছু বলছেন না।

এবার যেন পুরো জিনিসটাকে আবার একটা জায়গায় গুটিয়ে আনছেন। এর পরের শ্লোক, তার পরে শ্লোকেও একই কথা যেন বারবার বলছেন। শাস্ত্রে এটাকে বলে পুনরোক্তি দোষ। শাস্ত্রে পুনরোক্তি নিষেধ আছে। সাহিত্যেও একই কথা বারবার বলা নিষেধ। উচ্চমানের লেখকরা একটা বিশেষ শব্দকে দ্বিতীয়বার ব্যবহার করেন না। ভাবের পুনরোক্তি, শব্দের পুনরোক্তি নিষেধ। এখানে

বলছেন, এই জায়গাতে পুনরোক্তি আছে। কারণ এই কথাগুলো অত্যন্ত উচ্চমানের, যারা শুনছে, তারা নিতে পারবে না। বারবার শুনতে শুনতে একটু ধারণা হয়।

একুশ নম্বর শ্লোকে ভগবান আবার একই জিনিস নিয়ে আসছেন। কয়েকটা জিনিস সব সময় মনে রাখতে হয়। প্রথম, অর্জুনের একটা সমস্যা এসে গেছে, দ্বিতীয় দর্শন, তৃতীয় হিন্দু ধর্মতত্ত্ব। এই তিনটে জিনিসকে নিয়ে চলছে। সেইজন্য ঘুরে ঘুরে অর্জুনের সমস্যায় নিয়ে আসবেন। অর্জুনের সমস্যা আবার অনেক ধরণের। প্রথম কথা, কাউকে মারা যাবে কিনা, কারণ হিংসা করা যাবে না। দ্বিতীয়, এই যুদ্ধ করাটা কি ঠিক, না ঠিক না; ধর্ম আর অধর্মে কোথাও একটা যেন ধোঁয়াশে ভাব। মূল সমস্যা ছিল, যুদ্ধ করাটা ঠিক কিনা। এই অংশে ভগবানের মূল বক্তব্য হল, জাগতিক দৃষ্টিতে যদি দেখ, মানুষ জন্মায়, মানুষ মরে, সেইজন্য তুমি তোমার স্বধর্ম কেন ছেড়ে দেবে। আর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে যদি দেখ, তাহলে আত্মার জন্ম নেই, আত্মার মৃত্যু নেই, এখানে কে কাকে মারছে। এটা ঠিক যে, এগুলোকে আমরা অনেক ভুলভাল প্রয়োগ করি। সর্বসাধারণের জন্য এই কথাগুলো নয়। একটা গল্পে দুই যুবক এক আম বাগানে গিয়ে আম চুরি করছিল। দারোয়ান যখন ওদের ধরেছে, তখন বলছে, কার বাগান, কার গাছ, কার আম। বলতে চাইছে, সবই তো ঈশ্বরের। দুজনকে ধরে দারোয়ান খুব উত্তম-মধ্যম দিচ্ছে আর চেঁচিয় চেঁচিয় বলছে, কার ডাণ্ডা, কার পিঠ, কার গায়ে লাগছে। নিতে হলে দুটোই নাও, একটা কেন নেবে।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং, ভগবান বলছেন, এই যে আত্মতত্ত্বের কথা চলছে, এই আত্মাকে অবিনাশী রূপে জানো, কখন তাঁর বিনাশ হয় না। আবার যদি আমরা *নাসতো বিদ্যতে ভাবো* শ্লোকে যাই, সেখানেও বলছেন, সৎ বস্তুর কখন নাশ হয় না, এটা অবিনাশী, এটাকে ভাল করে জানো। *অজম্*, এর কখন জন্ম হয়নি। এর আগের শ্লোকে *ন জায়তে ম্রিয়তে*, দেখানো হল ষড়্‌বিকারের কোন বিকার আত্মার মধ্যে থাকে না। এর উপর আগে আলোচনা হয়ে গেছে, এখানে conclude করছেন। *অব্যয়ম্*, আত্মা অনন্ত, অনন্তের কক্ষণ ব্যয় হয় না। কারণ ব্যয় হয়ে যাবেন কোথায়, সব জায়গাতেই তো আত্মা আছেন। আমাদের সব কিছু যদি মাথায় না থাকে, তাহলে একটা জিনিস মনে রাখলেই হবে, আত্মা, ঈশ্বর, ব্রহ্ম, তিনটের একটাই পরিভাষা, অনন্ত। আত্মা অনন্ত, ঈশ্বর অনন্ত, ব্রহ্ম অনন্ত। আত্মাকে নিয়ে, ঈশ্বরকে নিয়ে, ব্রহ্মকে নিয়ে উপনিষদে যা কিছু পড়ি, সব কিছু ওখান থেকেই আসে। কোন পদার্থ কখনই অনন্ত হতে পারে না। সেইজন্য আত্মা বা ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ব্যক্তি না, ঈশ্বর কখনই ব্যক্তি হতে পারেন না। কারণ ব্যক্তি মানেই পঞ্চতত্ত্ব থেকে, পদার্থ থেকে তৈরী। যেহেতু অনন্ত, সেইহেতু তাঁর জন্ম হয় না, কোন কিছু থেকে যে তাঁর জন্ম হবে, তাহলে তিনি কিসের অনন্ত! সেইজন্য আত্মার নাশ হতে পারে না। কারণ তাঁকে কে নাশ করবে, আত্মার বাইরে তো কিছু নেই। আর যেহেতু নিজের উপর ক্রিয়া হয় না, তাই নাশ হতে পারে না।

তার সাথে আচার্য বললেন, যদি কোন মিশ্র পদার্থ থাকে, তাহলে সেই মিশ্রণটা ভেঙে যেতে পারে। এক অপরের সংস্পর্শে ভেঙে গিয়ে নাশ হয়ে যেতে পারে। তিনি তো অনন্ত, কার সাথে কিসের সংস্পর্শ হবে, তিনি মৌলিক, সেইজন্য কখনই তাঁর নাশ হতে পারে না। আর তিনি হলে শুদ্ধ চৈতন্য। এটাই এখানে পুনরাবৃত্তি করছেন, *বেদাবিনাশিনাং*, '*বেদ*' শব্দের অর্থ জানা, এটাকে তুমি জানো যে আত্মা অবিনাশী। *নিত্যং*, তিনি চিরদিন আছেন, গতকাল ছিলেন, আজকেও আছেন, আগামীকালও থাকবেন। সেইজন্য আত্মা *অজম্* এবং *অব্যয়ম্*, আত্মার জন্ম হয়নি, আত্মার কোন রকম ব্যয় হয়ে যায় না।

কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্, যিনি এই জিনিসটা জেনে গেছেন, তুমিই সেই, তোমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, তুমি গতকালও ছিলে, আজও আছ, আগামীকালও থাকবে, তিনি তখন কি প্রকারে কাউকে হত্যা করতে পারেন বা করাতে পারেন। ইদানিং Power of Positive

Thinkingএর উপর কত বই বেরিয়েছে, যেখানে বলছেন, you can do it। এটা পড়েই কত লোক কত কিছু করে দিচ্ছে। শুধু বলে দিচ্ছে, তুমি এটা পারবে, তাতেই এত কিছু হয়ে যাচ্ছে। জেহাদীদের শুধু বলে দিয়েছে, আল্লা তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, তাতেই মানববোমা হয়ে নিজেকে উড়িয়ে দিচ্ছে। যদি আমরা একবার জেনে যাই, আমি নিত্য, আমি অবিনাশী, তাহলে আমাদের কি ক্ষমতা হবে কল্পনা করা যায়! Positive thinkingএর কথা যারা বলছে, ওটাও সত্য, যারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করে, তাদের কাছে জেহাদী হয়ে যাওয়াটাও সত্য, আর যারা হিন্দু, তারা জানে আমি অবিনাশী, নিত্য, আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, সেটাও সত্য। আসলে তিনটের মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

স্বামীজী বলছেন, সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত শক্তি তোমার মধ্যেই। কারণ তুমি শুদ্ধ আত্মা। স্বামীজীর যত নামকরা কোটেশান আছে, যে কোটেশানগুলিকে বাচ্চা থেকে শুরু করে প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ, প্রাচীন, নবীন সব সন্ন্যাসীরা সমস্ত ভাষণে উগড়ে যাচ্ছেন; সব কোটেশানের পিছনে, পুরো কথামৃতে, স্বামীজীর সমগ্র রচনাবলী জুড়ে ওই একটাই তত্ত্ব –আত্মা অনন্ত, আর তুমিই সেই আত্মা। উপনিষদের মহাবাক্য *তত্ত্বমসি*, তুমিই সেই, আর কিছু না। তুমি কে? আত্মা। আত্মাটা কি? অনন্ত। সেইজন্য চারটি মহাবাক্য নিয়ে এলেন, *অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি, প্রজ্ঞানাং ব্রহ্ম* এবং *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* সব একই কথা, শুধু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছেন। সাধু, সন্ন্যাসীরা সর্বত্র শুধু এই একটা জিনিসকে হাজার হাজার বছর ধরে ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন। অনেক সময় মনে হয়, স্বামীজী এইসব কথা বলে দেশকে জাগ্রত করলেন। স্বামীজী কি জাগ্রত করবেন, ভারতভূমি এই বিদ্যা নিয়েই চিরদিন বেঁচে আছে। কি সেই বিদ্যা? *বেদাবিনাশিনং নিত্যং*। ভগবানও অর্জুনকে এই শিক্ষা দিচ্ছেন, অর্জুন তুমি ভাল করে জানো, তুমি অবিনাশী, তোমার কখন জন্ম হয়নি, তুমি নিত্য, চিরদিন ছিলে, চিরদিন থাকবে, *অব্যয়ম্*, তোমার কোন ক্ষয় হবে না।

পুরো জিনিসটা আসে শুধু এই একটি কথা থেকে, আত্মা অনন্ত। এর বাইরে আর কোন কিছু নেই। এই একটা জিনিসকে বুঝে নিতে পারলে সমস্ত শাস্ত্রকে বোঝা হয়ে যাবে। তাহলে বাকি শাস্ত্র এত এত কথা কেন বলছেন? কারণ আমাদের বুদ্ধি খুব স্থূল, কিন্তু আত্মা সূক্ষ্মতম। ভক্ত সম্মেলনে গিয়ে আগে খোঁজ নেবে কোন কোন মহারাজ গান করবেন। কারণ ওটাই সবাই বুঝতে পারে কিন। যদি বলা হয়, আপনারাও আমার সাথে হাততালি দিয়ে গান করুন, তাহলে তো আর কোন কথাই নেই; আহা, এনার মত আর কেউ হন না। গান, নাচ, এর বাইরে আমরা কিছু জানি না, স্থূল বুদ্ধি কিনা। লেকচারে ঠাকুরের জিলিপি খাওয়া, আর শ্রীমার শরতও আমার ছেলে, আমজাদও আমার ছেলে, একটু ইমোশানালের ছোঁয়া আছে কিনা, তাই এটুকুই বুঝতে পারি, এর বাইরে আর কিছু বুঝতে পারি না। শাস্ত্র হল মায়ের মত, এই দুরূহ আত্মতত্ত্বকে শাস্ত্র নানা দিক দিয়ে, বিভিন্ন ভাবে আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করছেন, সেইজন্য শাস্ত্রকে এত কথা বলতে হয়।

এবার এই শ্লোকের যে তাৎপর্য, সেটাকে এখন বলছেন, *কথং স পুরুষঃ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্*। যে ব্যক্তি বুঝে গেছে আত্মা অনন্ত, আর আমি সেই আত্মা, তখন সে কাকেই বা মারবে, আর তাকেই কে মারবে! এর মানে, সে ব্যক্তি কাউকেই মারে না। আগে যে আলোচনা করা হয়েছে, সেটাই এখানে conclude করছেন। এই জায়গাতে আচার্য শঙ্কর, তিনি সত্যিকারের আচার্য কিনা, তিনি কিছুক্ষণ পর পর থেকে থেকে বেশ কিছু জিনিস আলোচনা করছেন, আজকে আমরা বেদান্ত বলতে যা বুঝি, আচার্যের এই আলোচনা গুলির উপরই তা দাঁড়িয়ে আছে। উপনিষদেও আচার্য এটাই করেছেন, গীতাতে আরও বেশী করেছেন। কারণ গীতাতে অন্যান্য দর্শনগুলির উপর আলোকপাত করা হয়েছে, আর ব্রহ্মসূত্রেও তাই করেছেন।

আগে যেটা বলা হল, আত্মা subjectও না, objectও না, কারণ আত্মা অনন্ত, অনন্তের উপর কে ক্রিয়া করবে, কার উপর তিনি ক্রিয়া করবেন, সম্ভবই না। ফলে আত্মা কর্তাও নন, কর্মও নন। এখানে ক্রিয়া হল *হন্তি, হন্তি* মানে মারা, শুধু মারা না, মারা এই একটি ক্রিয়া দিয়ে সমস্ত রকম ক্রিয়ার কথা বলা হচ্ছে। গীতা হল শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন সংবাদ, অর্জুনের প্রশ্ন ছিল, এদের আমি মারব কি মারব না, কিন্তু মন্ত্রটা নেওয়া হয়েছে কঠোপনিষদ থেকে, কঠোপনিষদে মারামারির কোন ব্যাপারই নেই, ওখানে ওটা একটা poetic expression। বলছেন, আত্মা কর্তাও না, কর্মের দ্বিতীয়াও না। যার এই বোধ বা জ্ঞান হয়ে গেছে, তাঁর আর কোন কর্তব্য বোধ থাকে না, তিনি আর কোন কাজ করেন না। যদি কাজ করেনও, ওই কাজ করার মধ্যে তাঁর কোন কর্তব্য বোধ থাকে না।

সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসী নিয়ে লোকেদের মধ্যে অনেক ভুলভাল ধারণা ঢুকে আছে, অনেকে বলে সন্ন্যাসীদের উচিত লেকচারবাজী বন্ধ করে লোকেদের সেবা করা। কিন্তু যারা এই ধরণের কথা বলে, তাদের জেনে রাখা দরকার, সন্ন্যাসীর কক্ষণ কোন কর্তব্য হয় না। সন্ন্যাসীর কারুর প্রতি কোন কর্তব্য নেই; মা-বাবার প্রতি কোন কর্তব্য নেই, সমাজের প্রতি কোন কর্তব্য নেই। এমন কি শাস্ত্র, যে হিন্দু ধর্মকে বিধান করে, সেই শাস্ত্রের কোন কথা সন্ন্যাসীর উপর প্রযোজ্য নয়। উপাচারের দিক থেকে সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাস নেওয়ার সময় নিজের আদ্যশ্রাদ্ধ করে নেন, পিণ্ড দান করে নিয়েছেন, সমস্ত শাস্ত্র থেকে সন্ন্যাসী তাই মুক্ত। হিন্দুদের যে ষোড়শ সংস্কার, সংস্কার মানে শুদ্ধিকরণ, শেষ সংস্কার হল অন্ত্যেষ্টি। অন্ত্যেষ্টির পরে শ্রাদ্ধ কর্ম, যা কিনা শাস্ত্র বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন হয়, সব কিছুই সন্ন্যাসীর জন্য আগেই সম্পন্ন করা হয়ে গেছে। শাস্ত্রের কোন নিয়ম সন্ন্যাসীর উপর প্রযোজ্য হয় না।

সন্ন্যাসীদের যত মন্ত্র আছে, সমস্ত মন্ত্রই ত্যাগকে আধার করে। যখন কোন কর্ম হয়, এমনকি খ্রীশ্চান ফাদাররা যখন ফাদার হন, তখন তাঁদের কোন কোন ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা বা দিব্যি দিতে হয়; কিন্তু আমাদের সন্ন্যাসীদের কোন প্রতিজ্ঞা করতে হয় না বা দিব্যি দিতে না, তাঁদের কোন ব্রত নিতে হয় না। সন্ন্যাস নেওয়ার পর সন্ন্যাসীরা সব কিছুর পারে চলে যান। ব্রহ্মচারীদের ব্রত নিতে হয়, আমাকে এমনটা করতে হবে, এমনটা করব না। সন্ন্যাসীরা সব ত্যাগ করে বেরিয়ে যান। সন্ন্যাসীরা কি তাহলে আলতু ফালতু যা খুশী করতে পারে। তা নয়, সন্ন্যাসী সব কিছুর উর্ধ্বে চলে গেছেন, সমস্ত কিছুর ত্যাগ হয়ে গেছে। যে কোন কর্মের পিছনে একটা কামনা থাকে, এষণা থাকে, সন্ন্যাসীর মনে কোন এষণা থাকবে না।

সন্ন্যাসীরা তাহলে সারা দিন কি নিয়ে থাকবেন? আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *বেদান্ত বাক্যেষু সদা রমন্ত;* বেদান্তের বাক্য হল আত্মা অনন্ত। এই ভাব থেকে সন্ন্যাসী যদি একবার সরে আসে, তাহলে তাঁর পতন অনিবার্য। সন্ন্যাসীর পতন কামিনী-কাঞ্চনের পিছনে দৌড়ালে হয় না, নাম-যশের পিছিনে দৌড়ালে হয় না। যে মুহুর্তে সন্ন্যাসী আত্মা অনন্ত, এই ভাব থেকে সরে এসেছে, সেই মুহুর্তে তাঁর পতন নিশ্চিত হয়ে যায়। আত্মা অনন্ত এই ভাব থেকে সরে আসা মানেই, জগতের বাকি সব কিছুর মধ্যে নেমে পড়া। আত্মা অনন্ত এই ভাব শুধু সন্ন্যাসীদের জন্যই না, যাঁরা এই কথা শুনছেন, তাঁদের জন্যও প্রযোজ্য। যে কোন লোক, যার মধ্যে এই বোধ এসে গেছে, আত্মা অনন্ত, আমি সেই আত্মা, ওর কিন্তু আর কোন দায়ীত্ব থাকবে না। এটাকে নিয়ে আচার্য এবার আলোচনা করবেন, খুব সূক্ষ্ম আলোচনা।

আচার্য প্রথম আপত্তি করছেন, যেমন জ্ঞান সব সময় জ্ঞানী থেকে আলাদা হয়। আমি এই কলমকে জানলাম, কলম আলাদা, আমি আলাদা। আর আমরা সব সময় বস্তুকে জানছি, আমি আপনাকে দেখছি, আপনি আমাকে দেখছেন। একটা জিনিসকে আমি জেনে নিলাম, তাই বলে কি আমার সব দায়ীত্ব শেষ হয়ে গেল, তাই কি কখন হয়? আত্মাকে আমি জেনে গেলাম, আত্মজ্ঞানের ব্যাপারটা জেনে গেলাম, তাই বলে আমার কর্তব্য বোধ কেন শেষ হয়ে যাবে? যাঁরা আপত্তি করছেন,

ফোকাসটা তাঁদের রয়েছে জ্ঞানের উপর। কিন্তু এখানে হল আত্মজ্ঞান, যিনি জেনে গেছেন আত্মাই সত্য, যিনি জেনে গেছেন আত্মা অনন্ত আর আমিই সেই আত্মা, তাহলে তাঁর আর কোন কর্তব্য থাকে না। যারা আপত্তি করছে, তারা বলছে, কেন তা হবে, ফোকাসটা রয়েছে জ্ঞানকে নিয়ে। আচার্য বলছেন না, তিনি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তফাৎ হল, এখানে জ্ঞান হল, আত্মা কোন বিষয় নন, আত্মা কোন পদার্থও নন যে, এটাকে আমি জানছি। এই জিনিসটাকে আমরা আগে অল্প একটু বলেছিলাম, এবার সেটাকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

এই কলমটাকে আমি জানছি, তার মানে আমার এই বোধটা পরিষ্কার যে, আমি আলাদা, কলমটা আলাদা। যখনই আমরা ঈশ্বর দর্শনের কথা বলি, ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞানের কথা বলি, জন্মজন্মান্তর ধরে 'জানা' ব্যাপারটাকে নিয়ে যে আমাদের এই সংস্কার চলে আসছে তাতে আমরা অবশ্যই সব সময় ঈশ্বরকে বস্তু বলে ভাবব, ব্রহ্মকে বস্তু বলে বোধ করব, আত্মাকেও বস্তু বলে বোধ করব। ফলে আমরা মনে করি, আমি আলাদা, আত্মা আলাদা, আমি আত্মাকে জানলাম, তাতে আমার কেন মুক্তি হবে? আমি আত্মাকে জানলাম বলে কর্মত্যাগ কেন হবে? আচার্য বলছেন, মূল জিনিসটাই তুমি ভুল বুঝছ। আত্মা কোন object নন, আগে আমরা কয়েকবার এর উপর *ন জায়তে ম্রিয়তে শ্লোকে* বা এই জায়গাতেও আমরা আলোচনা করলাম কিভাবে আত্মা কর্তাও নন, কর্মের দ্বিতীয়াও নন। কর্তা ও কর্ম থাকা মানেই সেখানে একটা ক্রিয়া এই দুটোকে জুড়ে রেখেছে। আমি কলমকে দেখছি, আমি আলাদা কলম আলাদা, আমি কর্তা, কলম দ্বিতীয়; কিন্তু আত্মা অনন্ত। আত্মা কর্তা ও কর্মের মধ্যে যত রকম তফাৎ হতে পারে, সবটার ঊর্ধ্বে।

তার সাথে বলছেন, কোন জড় বস্তু কখনও কাউকে জানতে পারে না। আমরা এই কলমের কথা বলছি, কলম জড়। এখানে বলা হচ্ছে তুমিই সেই আত্মা। আত্মা যদি জড় বস্তু হত, তখন এই সমস্যাটা আসত। কিন্তু তা তো না, আত্মা চৈতন্য, আত্মা অনন্ত। ফলে আমি যখন তাঁকে জেনে গেলাম, এই জানাকে জগতের কোন বস্তুকে জানার সাথে তুলনা করা যাবে না। এই সমস্যা আমাদের সব সময়ই হয়, আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বরদর্শনকে আমরা জাগতিক বস্তুকে জানার মধ্যে গুলিয়ে ফেলি। আর তার সাথে সংশয় হয়, আমি যেভাবে সংসারকে জানছি, পাঁচটা জিনিসকে জানছি তাতে মুক্তি হচ্ছে না, কর্মমুক্তি হয় না, অথচ আত্মা বা ঈশ্বরকে জানলে আমি মুক্ত হয়ে যাব, কর্মমুক্তি হয়ে যাবে। এই ধারণাটা আমাদের ভুল। শুধু সাধারণ মানুষ না, যাঁরা বেদান্ত নিয়ে লেকচার দেন, তাঁরাও অনেক সময় এই ভুল করেন। তাঁরা মনে করেন অদ্বৈত বলতে বোঝায় এক। অদ্বৈত তা নয়, অদ্বৈত এক দুইয়ের পারে।

কথামৃতে বর্ণনা আছে, ঠাকুর নরেনকে জিজ্ঞেস করছেন, দশটি জলপূর্ণ পাত্র, সেখানে দশটি সূর্য প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, তাহলে কটি সূর্য? দশটি প্রতিবিম্ব সূর্য ও একটি আসল সূর্য, মোট এগারোটি সূর্য। একটি একটি করে পাত্র ভাঙতে ভাঙতে একটি পাত্র অবশিষ্ট থাকল, তাহলে কটি সূর্য? উপরে একটি আসল সূর্য ও নীচে একটি প্রতিবিম্বিত সূর্য, মোট দুটি সূর্য। শেষ পাত্রটিকেও ভেঙে দেওয়া হল, এবার কটি সূর্য থাকল? নরেন সঙ্গে সঙ্গে বলছে, একটি সূর্য। ঠাকুর বলছেন, কি আছে কে বলবে। এটা হল অদ্বৈত। যেমনি আমি বললাম, একটি সূর্য, আমি মুসলমান বা খ্রীশ্চান বা জুহুদি হয়ে গেলাম। এই তিনটে ধর্মে বলা হয় ঈশ্বর এক, এটাই একশ্বরবাদ। একেশ্বরবাদে বস্তু থেকে যাচ্ছে, কোথাও একটা মনের ভাবটা থেকে যায়। পাত্র ও জল হল মন, আসল সূর্য হল সেই চৈতন্য। সেই চৈতন্যই প্রতিবিম্বিত হচ্ছে পাত্রগুলিতে। যখন একটি পাত্রও নেই, তখন কে বলবে, কাকে নিয়ে বলবে। সেজন্য কি আছে মুখে বলা যাবে না। তাহলে কি ওটা এক? বলা যাবে না। তাহলে কি শূন্য? বলা যাবে না। এক দুইয়ের পার কি? টেকনিক্যালি সেটাও কিন্তু বলা যাবে না। কি আছে আর মুখে বলা যাবে না, কারণ মন জিনিসটাই তো নেই। বিদেশী পণ্ডিতরা এই ধরণের কথা নিতেই পারে না। অনেক সময় অদ্বৈতকে ইংরাজীতে অনুবাদ করছেন মনোইজিম্ (monisim), কিন্তু এটা

মনোইজিম্ না, ইংরাজীতে ঠিক শব্দ হল non-duality।, অদ্বৈত, 'অ'এর পর একটা হাইফেন আছে – অ-দ্বৈত, যেটা দ্বৈত নয়। যেটা দ্বৈত নয়, আসলে ওটা কি? এবার আপনি বুঝুন কি।

এখন প্রশ্ন ওঠে, আত্মা যখন কর্তাও নন, কর্মও নন, কারণ কোন জড় বস্তু কাউকে জানতে পারে না, আত্মাও জড় বস্তুর মত জানার কিছু নয়, তাহলে আত্মজ্ঞানী শব্দটা কেন ব্যবহার করা হচ্ছে? একদিকে আপনারা বলছেন আত্মা অনন্ত, অনন্তই যদি হয়ে থাকে, তাহলে আত্মা কর্তাও নন, কর্মের দ্বিতীয়াও নন, কর্তা ও কর্ম যদি না থাকে, তাহলে জ্ঞান, আত্মজ্ঞানী এই শব্দগুলি কেন আপনারা বারবার নিয়ে আসেন? আচার্য বলছেন, এটা উপাচার মাত্র। উপাচার মানে, একটা আর-একটার সঙ্গে যখন জড়িয়ে যায়, তখন এক অপরকে নিয়ে বলে। যেমন সংস্কৃত সাহিত্যে একটা শব্দ ওনারা প্রায়ই ব্যবহার করেন, কোন উদাহরণ দেওয়ার সময় 'ন্যায়' শব্দটা লাগিয়ে দেন। যেমন কাকতালীয় শব্দটা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি, সেখান থেকে ন্যায়শাস্ত্রে বলছে 'কাকতালীয় ন্যায়', যেমন কাক বসেছে বলে বেল পড়ে গেছে, সেখান থেকে এসে গেল 'কাকতালী ন্যায়'। তেমনি বলা হয়, 'দেহেলী ন্যায়', আগেকার দিনে বিদ্যুৎ ছিল না, প্রদীপের ব্যবহার হত, যদি প্রদীপকে দরজার মাঝখানে রেখে দেওয়া হয় তাহলে প্রদীপ ঘরের ভিতরেও আলো দেয়, বাইরেও আলো দেয়, এটা হয়ে গেল 'দেহেলি ন্যায়'। তেমনি আবার আছে 'ছত্রি ন্যায়'। আগেকার দিনে রাজা, জমিদার ও ব্রাহ্মণরাই ছাতা ব্যবহার করতে পারতেন। একজন বড়লোক ছাতা মাথায় যাচ্ছে, ওর সাথে সাথে যারা যাচ্ছে তাদের মাথায় ছাতা নেই, কিন্তু বলা হয় 'ছত্রি যাচ্ছে'। ছাতা মাথায় একজন যাচ্ছে, কিন্তু বাকি সবাইকে তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। এটাকে বলে উপাচার, একটাকে ধরে বাকি অনেক কিছুকে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। যেমন এখানে অনেক বয়স্ক ব্যক্তিরা আছেন, কিন্তু তাঁদেরও বলা হচ্ছে ছাত্র। এটাও উপচার, যারাই বিদ্যার্জন করতে আসছে, সবাইকেই ছাত্র বলা হয়।

এখানে বলছেন, মনে যে বৃত্তিগুলি ওঠে, যখন কোন জিনিসের জ্ঞান হচ্ছে, যেমন এই কলমকে যখন আমি জানছি, তার মানে আমার বুদ্ধি এই কলমকে নিচ্ছে, এটাকে বলে বৃত্তি। কিন্তু আত্মা বা অনাত্মা, চৈতন্য বা জড়, এই জিনিসটাকে তফাৎ করার যে বৃত্তি, আসলে এটা কিন্তু বুদ্ধি বৃত্তি নয়, কিন্তু এটাকে বলা হয় বুদ্ধি বৃত্তি। এর নামই হল, আত্মনাত্মক বুদ্ধি বৃত্তি। যখন আমরা তফাৎ করছি, চৈতন্য কি জড় কি, এটা বুদ্ধি বৃত্তি নয়, কারণ সেখানে কোন জ্ঞান গ্রহণ করা হয় না। ঠিক তেমনি বিশুদ্ধ আত্মা, যেটা মনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, সেই জড়ানোর জন্য, উপচারের জন্য বলা হয় জ্ঞান। জ্ঞান হয় বুদ্ধির, আত্মা এখানে নিজেকে বুদ্ধির সাথে জড়িয়ে রেখেছে বলে এটা কথার কথা, আসলে আত্মজ্ঞানী বলে কিছু হয় না। কারণ নূতন করে কোন জ্ঞান হয় না। জ্ঞান শব্দ বলতে আমরা বুঝি, আমি আগে জানতাম না, এখন জেনেছি। কিন্তু আত্মা সব সময় আছে, আর আমি সেই আত্মা, তাহলে নূতন করে কোন জ্ঞান হচ্ছে না। অথচ আত্মজ্ঞানী বলা হয়, এটা কথার কথা। যিনি আত্মজ্ঞানী তিনি জানেন, আমার কখন জন্ম হয়নি, আমার কখন মৃত্যু হয় না, আমি কখন অজ্ঞানে ছিলামই না। উদাহরণ বা বোঝানর জন্য স্বপ্নের কথা বলা হয়, স্বপ্নে আমি বিদেশে গেলাম, বিদেশ থেকে একটা ডিগ্রি নিয়ে এলাম। ঘুম ভাঙার পর দেখছি, যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি। বিদেশে আমি যাইনি, বিদেশ থেকে ফেরতও আসিনি, কিন্তু স্বপ্নে আমার বিদেশ ভ্রমণ হয়ে গেল। স্বপ্নে কত কিছু আসছে, আবার চলে যাচ্ছে, আসলে কিছুই হচ্ছে না। ঠিক তেমনি, আত্মজ্ঞানী জানেন আমার কখন জন্মও হয়নি, মৃত্যুও হবে না, আর কোন অবস্থাতেই অজ্ঞানে ছিলাম না। আত্মজ্ঞানী বাস্তবিক এটাই দেখেন। যাঁদের আত্মার এই বোধ হয়ে গেছে, আত্মার ব্যাপারটা যাঁরা বুঝে নিয়েছেন, একমাত্রা তাঁরাই ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক পথে যেতে পারেন।

কিন্তু যারা যজ্ঞাদি করতে চাইছে, যারা গৃহস্থ ধর্ম পালন করতে চাইছে, যারা সংসারে থেকে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে, তারা কেন এই পথের পথিক হতে পারে না? ঠাকুরকেও অনেকে জিজ্ঞেস করতেন, সংসারে কি হয় না? ঠাকুরও বলে দিচ্ছেন, কেন হবে না। কিন্তু তারপরেই

যা যা করতে বলে দিচ্ছেন, সেগুলো সব সন্ন্যাসীদের ধর্ম। আচার্যও স্পষ্ট বলে দিচ্ছেন সংসারীদের জন্য কখনই আত্মবিদ্যা হতে পারে না। এখানে সংসারে যারা বিয়ে করে স্ত্রী সন্তানাদি নিয়ে আছে, তাদের কথা বলা হচ্ছে না। এখানে তাদের কথাই বলা হচ্ছে, যার মনে দ্বৈত ভাব আছে। কথামৃতে ঠাকুর একটা চিঠির কথা বলছেন, চিঠিতে লেখা আছে একটা কাপড় ও পাঁচ সের সন্দেশ পাঠাবে। চিঠি পড়ার পর জেনে গেল তাকে কি কি করতে হবে। এবার সে নেমে পড়ে কোথা থেকে ধুতি কিনতে হবে, কোন দোকান থেকে ভাল সন্দেশ আনতে হবে। যাদের মনে সংসার সত্য হয়ে বাসে আছে, যেমনি তারা কোন কর্মের খবর পেয়ে গেল, যেমন কোন যজ্ঞের কথা শুনল, এই যজ্ঞ করলে তুমি অবশ্যই স্বর্গে যাবে; তেমনি তারা ওই যজ্ঞ সম্পাদন করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে। যজ্ঞের উপকরণ জোগার করতে, যজ্ঞের জন্য উপযুক্ত পুরোহিত সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। পাড়াতে যখন দূর্গাপূজা হয় সেখানেও কত কিছু আয়োজন করতে হয়, কত খাটাখাটনি।

আত্মজ্ঞানে তা হয় না, একটু আগে এষণা ত্যাগের কথা বলা হল, যিনি জেনে গেলেন আমিই সেই অনন্ত আত্মা, এরপর প্রথম যেটা করেন, তা হল, সব কিছু ত্যাগ করতে শুরু করেন। তার মানে, কর্ম ও জ্ঞান স্বভাবেই এরা বিপরীত। কারণ যেমনি কর্মের ব্যাপারটা জানা হয়ে গেল, এরপর আমাকে সব কিছু জোগার-যন্ত্র করতে হবে, আয়োজন করতে হবে, সেই কর্মের একটা ফল হবে। আচার্যের সময় পূর্বমীমাংসকদের দর্শন খুব শক্তিশালী ছিল, আর ওনাদের কাছে ছিল যজ্ঞই শেষ কথা। আচার্য এটাকে নাকচ করছেন, কর্ম ও জ্ঞান দুটো একসাথে চলতে পারে না। আমাদের মনে প্রশ্ন হতে পারে, স্বামীজী কর্মের কথা, উপাসনার দ্বারা জ্ঞান লাভের কথা বলছেন। ওই জায়গাতে জ্ঞান মানে নিত্যানিত্যবস্তু বিবেক, আত্মা ও অনাত্মার বিবেক, স্বামীজী শেষ জ্ঞানের কথা এখানে বলছেন না।

অনেকে আবার বলতে পারেন, আত্মাকে কেন আমি সত্য বলে মানব? এই প্রশ্ন খুব পুরনো প্রশ্ন, আগেও আমরা এই প্রশ্নকে নিয়ে আলোচনা করেছি। অনেক সময় আমাদের মনে হয়, যে জিনিসটা আমি দেখতে পাইনা, সেটাকে কেন আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? আগের আলোচনায় বলা হয়েছিল, মন কখন অনন্ত জিনিসকে ধারণা করতে পারে না, সেইজন্য মন কখনই আত্মাকে জানতে পারবে না, জানা সম্ভবই না। আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, কারণ আত্মা ইন্দ্রিয়ের পারে। আত্মা অনন্ত, সেই জায়গায় ইন্দ্রিয়গুলি একেবারেই সীমিত। তর্ক দিয়ে আত্মাকে বোঝা যাবে না, কারণ তর্ক বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। যে মানুষের যত বুদ্ধি, সে তত ক্ষুরধার তর্ক দিয়ে একটা কিছু প্রমাণ করে দিতে পারে। আমাদের দেশে যত ঝামেলা হয় নিম্ন আদালতে মামলা করে, নিম্ন আদালতে না হলে হাইকোর্ট যাবে, হাইকোর্টেও না হলে সুপ্রীম কোর্টে যাবে। সুপ্রীম কোর্টে এই উকিল একভাবে প্রমাণিত করে দেবে, সেই উকিল আরেক ভাবে প্রমাণিত করে দেবে, জজ সাহেব আবার আর-একটা অন্য কিছু বলে দিলেন। সবটাই বুদ্ধির খেলা, সত্যটা কি, মিথ্যাট কি, আমরা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারি না। যার যেমন বুদ্ধি, সে তেমন বুদ্ধি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাবে। যার বুদ্ধি আছে, সে বলে দিয়ে গেল আত্মা আছেন। পরে যার আরও বেশী বুদ্ধি আছে, সে বুঝিয়ে দিয়ে গেল, আত্মা বলে কিছু নেই। সেইজন্য বলা হয় শাস্ত্র প্রমাণ।

কিন্তু শাস্ত্র-প্রণেতাদের কথা কেন আমরা মানতে যাব? না মানার কোন কারণ নেই। কারণ ওনারা সবাই নিজেদের জীবন ত্যাগ তপস্যায় ঢেলে দিয়েছিলেন, যাঁদের কোন নিজস্ব স্বার্থ ছিল না। যেমন, যে লোক কোন ভুল কথা বলছে, তার কোন স্বার্থ থাকা চাই; যার কোন স্বার্থ নেই, সে কেন আমাদের ভুল পথে পরিচালিত করতে চাইবে। যখন কেউ চুরি করে, মিথ্যা কথা বলে, তার স্বার্থ রয়েছে। এনাদের কোন স্বার্থ ছিল না, যীশু নিজের প্রাণ দিয়ে দিলেন, ঠাকুর অভাবগ্রস্থ সারা জীবন থেকে গেলেন, ভগবান বুদ্ধ নিজের সাম্রাজ্য ছেড়ে দিলেন। যদি বলেন, ওনাদের মাথাটা খারাপ ছিল। মাথা খারাপ হতেই পারে না, কারণ তাঁরা যে কথাগুলি বলে গেছেন, সব কথা যুক্তিতে পুরোটা

প্রতিষ্ঠিত। তোমার কথা আমাকে মানতে হবে, আর তাঁদের কথা আমি মানব না, এটা কি ধরণের যুক্তি। স্টিফেন হকিং বলছেন, ঈশ্বর বলে কিছু নেই, তাঁর কথা মানব কিন্তু ভগবান বুদ্ধ, যীশু খ্রীষ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ, চৈতন্য মহাপ্রভু, শঙ্করাচার্য, এনাদের কথা মানব না? ইদানিং ফিল্ম স্টার থেকে শুরু করে বড় বড় সেলিব্রেটিরা হিন্দু ধর্মকে নিয়ে দিনরাত কত বিরোধিতা করে যাচ্ছে, এদের কথা আমি মানব, আর ঋষিদের কথা আমি মানব না?

যদি না মানতে হয়, আমি কোনটাই মানব না। যদি মানতে হয়, আমাকে দুটোই মানতে হবে, দুটোকে মানতে গেলে আমাকে বিচার করতে হবে। বিচার করতে গিয়ে দেখছি, তোমার তো স্বার্থ আছে, তোমার ভিতরে লোভ আছে। যখন তোমার নিজের ব্যাপার আসে, তখন তো তুমি একটুও ডানদিক বামদিক কর না। তোমার যত জ্ঞান ধর্মের বেলাতেই বেরিয়ে আসে। তোমার কথা আমি কি শুনব! ঠাকুর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে ঠিক এই কথাই বলছেন, তোমার কথা আমি কী শুনব, তুমি কামী, লোভী, অহঙ্কারী। স্বার্থপর লোকের কাছে কি শুনব ধর্মের কথা? যে লোকটি কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত, তার কাছ থেকে আমি শুনব ধর্মের কথা?

এরপর আবার বলবেন, আচ্ছা ঠিক আছে মানলাম আত্মা আছে, কিন্তু আত্মজ্ঞান হয় না। আজকাল যত গুরু ও বাবাজী হয়েছে, সব কজন অদ্বৈত বিরোধী। কেউ গান করছে, কেউ নাচছে, কেউ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া শেখাচ্ছে। আর ঘুরে ফিরে বলতে থাকবে, অদ্বৈত বলতে কিছু নেই। আচার্য শঙ্কর অত্যন্ত সহজ যুক্তি দিচ্ছেন। যে শাস্ত্র আত্মার কথা বলছেন, যে শাস্ত্র কৃষ্ণের কথা বলছেন, যে শাস্ত্র স্বর্গলোকের কথা, বৈকুণ্ঠলোকের কথা বলছেন, সেই শাস্ত্রই আত্মজ্ঞানের কথা বলছেন। তাহলে তুমি selective হবে কেন? ভাগবত থেকে তুমি কৃষ্ণের কথা নেবে, ভাগবত থেকে বৈকুণ্ঠের কথা নিতে পারবে, ভাগবত থেকে ভক্তির কথা নেবে, আর ভাগবত থেকে তুমি আত্মজ্ঞানের কথা নেবে না, এটা তোমার কেমন ধারা! মানুষ যখন কাউকে কিছু উপদেশ দিতে চায়, তখন বেছে বেছে উপদেশ দেয়। আবার স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার সময় বেছে বেছে একজন একজনকে কথা বলবে। সবাই বেছে বেছে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি হবে, এমন কথাগুলো মনে রেখে দেয়। তোমার এমন selective memory কেন, নিতে হলে পুরোটাই নাও।

আচার্য শঙ্করের যত ভাষ্য আছে, তাঁর সব রচনায় একটি সহজ যুক্তি – যদি বলতে হয় পুরোটাকে নাও, খাপাছাড়া কিছু চলবে না। বেছে বেছে কোটেশান দেবে, এখানে তার অনুমতি দেওয়া হয় না। নিতে হলে তোমাকে পুরোটাকে নিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে। যদি কেউ বলে এটা তো মিলছে না। তাকে বলতে হবে, তুমি তো বলে দিলে মিলছে না, আগে তুমি এর পরিবর্তে কিছু দাও। আচার্য পর পর যুক্তি দিয়ে সব দেখাচ্ছেন, না মেলার কিছু নেই। *নাসতো বিদ্যতে ভাবো* শ্লোক থেকে শুরু হয়েছে আত্মা অনন্ত। অনন্ত তাই ষড়্‌বিকার নেই, এগুলো আগে আমরা আলোচনা করে নিয়েছি। সেখান থেকে আসছেন, আত্মাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অনুমান প্রমাণ দিয়ে জানা যায় না, আত্মার ব্যাপারে জানতে হলে শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়ে জানতে হবে। তখন রামানুজ, মাধ্বাচার্য, বৈষ্ণবরা বলছেন, হ্যাঁ আমরাও শাস্ত্রপ্রমাণের কথা বলি। কিন্তু তার সাথে বলে দেন শাস্ত্রে যেখানে অদ্বৈতের কথা আসবে সেখানে কানে আঙুল দিয়ে রাখবে। নিতে হলে তুমি পুরোটা নাও, একটা নেব, আরেকটা নেব না, এই বেছে বেছে নেওয়াটা আগে ছাড়ো।

ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য লেখার সময়েও আচার্য বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, মীমাংসা সবাইকে যুক্তি দিয়ে উড়িয়ে দিলেন। একা শঙ্কারাচার্য বৌদ্ধ ধর্মকে ভারতবর্ষ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। আচার্য পরিষ্কার যুক্তি দিয়ে দেখাচ্ছেন, তোমার যুক্তিতে কোন দম নেই। আস্তে আস্তে এখানে বৌদ্ধ ধর্মই শেষ হয়ে গেল; তবে ভারতে সব ধর্মের লোক থাকে, সেই হিসাবে কোথাও কোথাও বৌদ্ধ ধর্ম থেকে যেতে

পারে। তথাগতের জন্ম ভারতে, ভগবান বুদ্ধকে আচার্য কোথাও অস্বীকার করছেন না, তিনি মহাপুরুষ এটাও আচার্য সব সময় মানছেন; কিন্তু তাঁর দর্শনকে আচার্য শেষ কথা রূপে নিচ্ছেন না।

ঠিক আছে, তুমি বলছ শাস্ত্রে এই রকম কথা আছে, মানছি। কিন্তু শাস্ত্রই আবার বলছে, আত্মা মন বুদ্ধির পারে। মন বুদ্ধির পারেই যদি আত্মা হন, তাহলে কি করে জ্ঞান হচ্ছে? তখন বলছেন, ঠিকই, আত্মা মন বুদ্ধির পারে এতে কোন সন্দেহ নেই। আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *শাস্ত্রাচার্যোপদেশশমদমাদিসংস্কৃতং মন আত্মদর্শনে কারণম্,* শাস্ত্র আর আচার্য, এই দুজনের কাছ থেকে যখন উপদেশ পায়, সেই উপদেশকে আধার করে মানুষ যখন শম, দমাদির দ্বারা নিজের উপর আত্মনিয়ন্ত্রণের অনুশীলন করে, তাতে বুদ্ধি সংস্কৃত হয়ে যায়। আত্মদর্শনেরও একটা কারণ দরকার পরে। কি দরকার? শাস্ত্রের কথা আচার্যে মুখ থেকে আসতে হবে, সেই উপদেশ অনুসারে শম, দম, আত্মনিয়ন্ত্রণ অনুশীলন করতে হবে, এই অনুশীলনের ফলে তার মন শুদ্ধ হবে। ঠাকুর বলছেন, শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ আত্মা এক। শম হল মনের ইন্দ্রিয়গুলির নিয়ন্ত্রণ, দম হল বহিরিন্দ্রিয়গুলির নিয়ন্ত্রণ। এই নিয়ন্ত্রণ না হলে মন শুদ্ধ হবে না। মন শুদ্ধ না হলে আত্মজ্ঞান কোন দিন হবে না। আত্মাকে নিয়ে যত তত্ত্ব আছে, সব তত্ত্বগুলি বলে যেতে পারবে, কিন্তু আত্মজ্ঞান হবে না। *কারণম্* বলছেন এই জন্য যে, কথাটা ঠিকই, আত্মা মন বুদ্ধির পারে। কিন্তু এই মন আর বুদ্ধিই যখন সংস্কৃত বা শুদ্ধ হয়ে যায়, তখন এটাই আত্মজ্ঞানের কারণ হয়। ঠাকুরও খুব সুন্দর ভাবে বলছেন, শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা এক।

বর্তমান কালে কাউকে যদি বলা হয় গীতা কোর্সে ভর্তি হতে, সঙ্গে সঙ্গে বলবে, এখন কি আমার গীতা পড়ার বয়স হয়েছে? বয়সকালে দেখা যাবে। ঠিক তেমনি আগেকার দিনে ভারতে খুব প্রচলিত কথা ছিল, সন্ন্যাস বলে কিছু হয় না। মানুষ যখন মৃত্যুর মুখে, তখন তাকে সন্ন্যাস দিতে হত। এই প্রথা অনেক জায়গাতেই আছে। আসলে সন্ন্যাসীর যদি পতন হয়ে যায়, সেটা খুবই জঘন্য ব্যাপার, মৃত্যুর সময় সন্ন্যাস দিলে পতনের আর ভয় থাকে না। আগেকার দিনে কুলীন ব্রাহ্মণের অবিবাহিত কন্যা বাড়িতে থাকা মানে সামাজিক ভাবে সে খুব হীন হয়ে গেল। ব্রাহ্মণরা মেয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্য খোঁজ নিতেন কোথা ঘাটের মড়া কুলীন ব্রাহ্মণ আছে, দুদিন পরেই হয়ত মরে যাবে, দিয়ে দাও তার সাথে মেয়ের বিয়ে। দুদিনের মধ্যে স্বামী মরে গেলে সম্পত্তি চাইবে? সেইজন্য সতীপ্রথা দিয়ে তাকে পুড়িয়ে দাও, সব ঝামেলা চুকে যাবে। বিচিত্র বিচিত্র সব প্রথা, শাস্ত্র না পড়লে, শাস্ত্রের অধ্যয়ন না করলে যা হয়।

আচার্য শঙ্কর বলছেন, তা হবে না। গীতাতে পরে পঞ্চম অধ্যায়ে বলবেন, *নবদ্বারে পুরে দেহি,* এই শরীরের মধ্যে যে আত্মা অবস্থান করেন, এই জ্ঞানে যিনি প্রতিষ্ঠিত, তাঁর আচরণ কেমন হয় গীতাতেই পরে সেখানে বলবেন। সেইজন্য কেউ বলবে, যে একটু পরে বা কদিনের মধ্যে মরে যাচ্ছে, সে আত্মজ্ঞান নিয়ে কি করবে! স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী যখনই গীতা নিয়ে কথা বলতেন, তিনি বারবার এই কথা উপর জোর দিতেন, *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো,* এই জগৎকে এইখানে এই শরীরেই তোমাকে জয় করতে হবে। এটাই বেদান্ত, বেদান্তে মৃত্যুর সময় সন্ন্যাস হয় না, সন্ন্যাস জীবদ্দশায় হয়। কেন হয়? কারণ আত্মা অনন্ত।

যার এই বোধ হয়ে গেছে, সে কাকে মারবে, কেই বা তাকে মারবে। যার এই বোধ হয়ে গেছে, তার আর কিসের কর্তব্য। তাহলে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা কাজ করেন কেন? ফাঁকা সময় যতটুকু আছে, ততটুকু সময় নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করে দিচ্ছেন; এর বাইরে সন্ন্যাসীদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। তাহলে সন্ন্যাসীরা কি আত্মজ্ঞান পেয়ে গেছেন? সবাই পান না, তবে সন্ন্যাসীরা সবাই এই পথেই চলেছেন, চলতে গিয়ে পাঁচবার হোঁচট খাবেন, আবার উঠে চলতে থাকবেন। কিন্তু এই আদর্শের সাথে যিনি আপোষ করে নেন, তাহলে তিনি শেষ হয়ে গেলেন, আর কোন দিন উঠতে

পারবেন না। আদর্শটাকে সব সময় সামনে রাখতে হবে, এরপর পাঁচবার হোঁচট খাবেন, পাঁচবার উঠে দাঁড়াবেন, একদিন এই করে লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন। কিন্তু যদি আমি পারব না বলে আদর্শটাকেই ছেড়ে দেন, তাহলে তাঁর আর কোন গতিই থাকল না, কোন দিন আর পৌঁছাতে পারবেন না। এই হল একুশ নম্বর শ্লোক।

বাইশ নম্বরে একটু সাধারণ স্তরে নিয়ে আসছেন। এতক্ষণ অবিনাশী, সর্বব্যাপী আত্মার আলোচনা হচ্ছিল, সেখান থেকে এবার একটু জীবাত্মার দিকে নিয়ে আসছেন। আসলে বাইশ, তেইশ, চব্বিশ নম্বর শ্লোক মিলেমিশে আছে। কোন জায়গায় জীবাত্মার কথা বলছেন, কোন জায়গায় শুদ্ধ আত্মার কথা বলছেন। যদিও জীবাত্মা আর শুদ্ধ আত্মার কোন তফাৎ নেই। যেমন, রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একজন ভদ্রলোককে দেখলাম, আমি বলছি ভদ্রলোক। যদি দেখি ভদ্রলোকের সাথে তার ছেলে আছে, ছেলে দুষ্টুমি করছে, বাবা ছেলেকে বকছে, আমি বলব, দেখ দেখ বাবা কেমন ছেলেকে বকছে। ভদ্রলোক থেকে ইনি হয়ে গেলেন বাবা, কারণ সাথে ছেলে আছে। ঠিক তেমনি, আত্মা ও জীবাত্মার এই সম্পর্ক। আত্মা সব সময় আত্মা, কিন্তু যেমনি বুদ্ধির সাথে আত্মার একটা যোগ হয়ে যায়, যোগ মানে মিলেমিশে এক হয়ে যায় না, আসলে যোগ হওয়ার কিছু নেই, দুটোই বিপরীত ধর্মী। কিন্তু মনে করে আমি ওর সাথে এক হয়ে গেছি।

পিজি উডহাউস, খুব নামকরা লেখক, ইংরাজী সাহিত্যের খুব নামকরা humorous writer। ইয়ং বয়সের লোকেরা খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ে, একটা বয়সে পর লেখাগুলো একঘেঁয়ে লাগে। সবটাই প্রেম নিয়ে, ওর মধ্যে খুব নামকরা Jeeves series, Blinding Castle, প্রায় আশি নব্বইটা বই লিখেছেন। যাঁরা ইংরাজী শেখেন তাঁরা পিজি উডহাউসের বই পড়েন। ওনার একটা কাহিনীতে একজন ভদ্রলোক, তাঁর প্রথম স্ত্রী থেকে এক সন্তান আছে। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর ভদ্রলোক দ্বিতীয় বিবাহ করেছেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রী তার সন্তানের নামে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড একটা ট্রাস্টের কাছে রেখে দিয়ে গেছেন। একুশ বছর হয়ে গেলে সে এই বিপুল অর্থের মালিক হবে। ইতিমধ্যে সে মালিক হয়েও গেছে। কিন্তু ছোটবেলা থেকে সে তার সৎমার কাছে লালিত পালিত হয়ে এসেছে, সৎমাও তাকে খুব কড়া শাসনে রেখে নিজের মুঠোয় রাখত। ছেলেটি বড় হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও সৎমা যা বলে ছেলেটি তাই করে, ছোটবেলা থেকে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

ছেলেটি আবার একটা মেয়ের সাথে প্রেম করতে শুরু করেছে, বিয়ে করে মেয়েটিকে নিয়ে সে পালাতে চাইছে। কিন্তু সৎমায়ের ভয়ে সে আর পালাতে পারছে না। ছেলেটির এক বন্ধু ভেবে পাচ্ছে না, ওর মাকে সে এত ভয় পায় কেন। ছেলেটির সাথে অনেক ভাবে কথাবার্তা, আলাপ আলোচনা করে বুঝতে চাইল, কি রহস্য, 'তুমি তোমার সৎমাকে এত ভয় পাও কেন'।

ছেলেটি ভেবে বলছে, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, ঠিক কি কারণে ভয় পাই'।

বন্ধুটি বলল, 'তোমার টাকার তো তুমিই মালিক। লক্ষ লক্ষ পাউণ্ডের তুমি মালিক, আর কোথা থেকে কে একজন উড়ে এসে জুড়ে বসে তোমাকে হুমুক দিয়ে যাচ্ছে, আর তুমি তাকে ভয় করে আসছ'।

'তাই তো এটা তো আমি কখন ভেবে দেখিনি'।

পুরুষ আর প্রকৃতি, চৈতন্য আর জড়ের ঠিক এই সম্পর্ক। চৈতন্য জড়ের সাথে মিশতে পারে না, জড় চৈতন্যের সাথে মিশতে পারে না। কিন্তু চৈতন্য থেকে জড় চেতনা পেয়ে যায়, চেতনা পেয়েই প্রকৃতি তার নাচ শুরু করে দেয়। প্রকৃতির নাচ দেখে পুরুষ মুগ্ধ হয়ে নিজের স্বরূপকে ভুলে যায়। পুরুষ মনে করে এই সব কিছু আমারই জন্য, প্রকৃতি আমার, আমি প্রকৃতির। বাংলায় একটা

ফিল্মের গান চারিদিকে মাইকে বাজত, 'আমি যে তোমার, তুমি যে আমার'। সবাই তাই মনে করে, কিন্তু কেউই কারু না। প্রকৃতি পুরুষের না, পুরুষও প্রকৃতির না, কিন্তু এমন কি একটা করে দেয় যে, মন্ত্রমুগ্ধের মত সবাই মনে করে, 'আমি যে তোমার তুমি যে আমার', এর মধ্যেই আমরা সবাই ঘুর ঘুর করতে থাকি। যেমনি একটু বিচার করতে যাবে, কে কার? কেউ কারু নয়, কিসের সম্পর্ক, কারু সাথে কারু কোন সম্পর্ক নেই।

আত্মা যখন বোকার মত সম্পর্কটা নিয়ে আসে, তখন সে মনে করে তুমিই আমার সব। কিন্তু তাতেও আত্মার পুরো স্বভাবটা চলে যায় না, পুরো স্বভাবটা তখনই চলে যায়, যখন সে আরেক ধাপ নীচে নেমে নিজেকে শরীরের সাথে জুড়ে দেয়। আমরা আগে একবার আলোচনা করেছিলাম, মোটামুটি আত্মার তিনটে স্তর, দেহাত্মা, যখন দেহের সাথে জুড়ে রেখেছে, জীবাত্মা, মনের সাথে বা অজ্ঞানের সাথে জুড়ে রেখেছে আর শুদ্ধাত্মা। এবার এটাকে বাইশ নম্বর শ্লোকে বর্ণনা করছেন –

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।২২।।

(মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে অন্য নূতন বস্ত্র ধারণ করে, আত্মা সেই রকম জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নূতন শরীর ধারণ করে।)

বাইশ নম্বর শ্লোকে জীবাত্মার বর্ণনা করা হচ্ছে। হে অর্জুন, তুমি যদি আত্মার এই তত্ত্ব নাও নিতে পার। তা তুমি জীবাত্মা রূপেই নাও, যে রূপে তুমি এখন নিতে চাইছ; মৃত্যুর পর এই আত্মা দেহকে ছেড়ে চলে যায়। ভগবান তেরো নম্বর শ্লোকে অবস্থার পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন, বাল্যাবস্থা, কৌমারাবস্থা, বৃদ্ধাবস্থা, ঠিক তেমনি মৃত্যুটাও একটা অবস্থার পরিবর্তন। শরীর আর বস্ত্র যেমন আলাদা, ঠিক তেমনি জীবাত্মা আর শরীর আলাদা। ছোট্ট বাচ্চাকে তার বাবা তাকে একটা নূতন জামা দিয়েছে, খুব আনন্দ। জামা গায়ে পরে ছুটোছুটি করে খেলছে। কেউ যদি একবার জামাটা একটু টেনে দেয়, তারপর আর তাকে দেখে কে; মারামারি, চেঁচামেচি, কান্নাকাটি শুরু হয়ে যাবে – আমার জামা কেন ছুঁলে। বাচ্চাদের এটাই স্বভাব, ছোট ছোট সাধারণ জিনিসের সাথে নিজের আমিত্বকে এক করে ফেলে। একটা কিছু হাত থেকে নিয়ে নিলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে তুলবে। যেমন যেমন বড় হয় তেমন তেমন সে এই জিনিসগুলি থেকে তার আমিত্বকে বার করে নিয়ে আসে।

একজন নামকরা মনস্তাত্ত্বিকের একটা লেখাতে তিনি লিখছেন, তাঁর সাত বছরের একটা ছোট্ট মেয়ে আছে। তিনি মেয়েকে শিক্ষা দিতে চাইছিলেন আমিত্বের ভাব যেন তার না থাকে। মেয়েটির বন্ধু এসেছে, দুজনের জন্য কুকিস বানানো হল। সব দিক থেকে সমান, সাইজ, আকার দুজনের সমান। মেয়েটিকে বোঝানর জন্য, দেখ তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তোমার বন্ধুকেও তাই দেওয়া হয়েছে। মেয়েটি বন্ধুকে বলছে, 'আমার বিস্কুটটা তোমার বিস্কুটের মত, কিন্তু তোমার বিস্কুটটা আমার বিস্কুটের মত নয়'। আমিত্বটা কিছুতেই ছাড়বে না, আমিত্ব, এই যে শ্রেষ্ঠ ভাব এটা আনবেই। মানে, তোমার যা কিছু আছে তা আমার মধ্যে আছে, আমার যা কিছু আছে তোমার মধ্যে নেই।

অর্জুনকে ভগবান বোঝাচ্ছেন, তুমি যে এত কান্নাকাটি করছ, শোক করছ, তুমি এটা বুঝে নাও যে, তুমি যেমন পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র ফেলে দিয়ে নূতন বস্ত্র গ্রহণ কর, জীবাত্মার যখন সময় হয়ে যায়, তখন সেও এই শরীরটা ছেড়ে দেয়। সেইজন্য তুমি স্বধর্ম কেন ত্যাগ করতে যাবে, আজ হোক কি কাল হোক জীবাত্মা এই শরীরটাকে ছাড়বে। আমার আপনার সবারই সমস্যা যেটা হয় তা হল, সংস্কৃতে একটা শব্দ আছে, *আত্যন্তিক নাশ*, যার অর্থ পুরোপুরি শেষ; মৃত্যুকে আমরা *আত্যন্তিক নাশ*

রূপে দেখি। আমরা মনে করি মৃত্যু মানে সব শেষ; কিন্তু মৃত্যুতে কিছুই শেষ হয়ে যায় না। মানুষ যেমন পোষাক পালটায়, তেমনি জীবাত্মা দেহ পালটায়। পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান বলবেন, *বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ*, যাঁরা যোগী, যাঁদের মন শুদ্ধ হয়ে গেছে, তাঁরা পরিষ্কার দেখতে পান মৃত্যুর সময় দেহ থেকে জীবাত্মা কিভাবে আলাদা হয়ে যায়; যারা বিমূঢ়, যারা সাধারণ তারা এটা দেখতে পায় না। ঠাকুরও বলছেন, তিনি পরিষ্কার দেখছেন, খাপ থেকে যেমন তলোয়ার বার করা হয়, জীবাত্মা সেই ভাবে দেহ থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে।

আমরা পড়ছি, আচার্য তাঁর ভাষ্যে ধারালো যুক্তি দিয়ে দেখাচ্ছেন কথাগুলি কিভাবে যুক্তি সঙ্গত, কিভাবে প্রত্যেকটি কথা একেবারে সত্য। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হয় না, সাধারণ লোকেরা গীতার কথাগুলি গাঁজাখুরি বলে মনে করে। একটা আশ্রমে সুন্দরবন থেকে একটি ছেলে কাজ করতে এসেছিল। আশ্রমে একটা রেফ্রিজারেটর ও একটা হটকেস ছিল। গ্রামে গিয়ে সে বলছে, ‘আমাদের আশ্রমে একটা বাক্স আছে যেটাতে জিনিস রাখলে ঠাণ্ডা থাকে, আরেকটা বাক্স আছে সেখানে জিনিস রাখলে গরম হয়’। ওর কথা শুনে গ্রামের সব লোক হেসে গড়াগড়ি দিতে শুরু করেছে। ‘তুই গাঁজাখুরি গল্প বলার আর জায়গা পেলি না, একটা বাক্সে জিনিস রাখলে নাকি সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়, আর-একটা বাক্সে জিনিস রাখলে সব গরম হয়ে যায়’!

বিজ্ঞান যেমন অজ্ঞানীদের কাছে একটা চমৎকার বলে মনে হয়, আধ্যাত্মিক সত্যগুলি ঠিক তেমনি সাধারণ লোকের কাছে শুধু চমৎকারের না, তিরস্কারের জিনিস বলে মনে হয়। ভগবান এখানে অর্জুনকে বলছেন, এটা তুমি বোঝ। আর এটা যে শুধু আমার কথা তা না, এটাই সত্য। আর আমরা অতি ভাগ্যবান যে, ঠাকুর আসাতে আমরা এগুলোকে এখন সত্যি বলে মানতে পারছি, কেন না, ঠাকুর এই সব কটা সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

মানুষ কি সত্যিই দিন দিন বোকা হয়ে যাচ্ছে? আগে অবস্থা অবশ্যই খারাপ ছিল, কিন্তু বর্তমান কালে এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে যে, দেখে সত্যিই আতঙ্ক লাগে। কি নিয়ে মানুষ প্রতিবাদ করছে, কেন বলছে, নিজেরা একটু ভেবে দেখে না। বিশেষ করে হিন্দুদের যে কোন জিনিসকে নিয়ে শুধু হাসিঠাট্টা। ধৈর্য ধরে একটু শাস্ত্রের কথা শুনবে সেটাও নেই, আর বলবে, হিন্দুদের যা কিছু আছে সবটাই খারাপ। অথচ এই একটা সাধারণ কথা জানে না যে, হিন্দু ধর্ম বাদে বিশ্বের কোন ধর্মই সেকুলার না। একমাত্র হিন্দু ধর্মই সেকুলার, যে ধর্ম তাদের ধর্মীয় শাস্ত্র থেকে সাধারণ জীবন চলে না। অন্যান্য ধর্মে তাদের ধর্মশাস্ত্র যা বলছে, ওদের সাধারণ জীবন তেমন ভাবেই চলবে। হিন্দু ধর্মে হল, সিদ্ধান্ত যেটা বলছে, সেই অনুসারে শাস্ত্র পাল্টাবে, সেই মত তোমার জীবন পাল্টাবে। এরা আবার সেকুলারের অর্থও বোঝে না।

সেকুলারের অর্থ হল, চার্চের যে নিয়ম, সেটা স্টেটে যাবে না। পশ্চিম ইউরোপে চার্চ সব কিছুর বিধান দিতেন, আমরা কি করব আর কি করব না। ফ্রান্স প্রথম চার্চের বিধান মত চলার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। ওরা বলল, চার্চের বিধান চার্চের, চার্চের কথায় আমরা চলব না; চার্চের নির্দেশ আমাদের ক্ষেত্রে চলবে না, সেটা হল state of political levelএ। হিন্দুদের সাধারণ জীবন কখন একটি বই দিয়ে চলে না। অন্য দিকে মুসলমানরা কোরানের বাইরে কিছু করবে কল্পনাই করতে পারে না। খ্রীশ্চানদের চার্চ বাইবেলকে আধার করে যেটা বলে দেবে, সেই মত সবাইকে চলতে হবে। পার্সিদেরও তাই, বৌদ্ধদেরও তাই। একমাত্র হিন্দু ধর্ম বলে সিদ্ধান্ত যা বলছে, সেই অনুসারে শাস্ত্র ও জীবনকে সাজাতে হবে। হিন্দু ধর্মের স্বভাবেই সেকুলার, অন্য ধর্ম স্বভাবেই নন-সেকুলার। সেইজন্য রাজ্যগুলি বলে ধর্মের কথা দিয়ে আমাদের চালাতে যেও না, আমরা তোমাদের থেকে আলাদা। হিন্দুরা প্রথমেই বলে দেয়, শাস্ত্র দিয়ে তোমার চলার কথা নয়, তুমি তোমার নিজের মত চল। এটাও বলছেন না যে, তুমি তোমার মত চল, আমি আমার মত চলছি, আমার চলার মধ্যে যদি

নাক গলাও তোমার নাকটা ফাটিয়ে দেব। এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তুমি উন্নতি করতে চাও কি চাও না, সেটা তোমার ব্যাপার। এরা এসে এখন আমাদের সেকুলারিজম্ শেখাচ্ছেন।

গীতাতে যা কিছু বলছেন, এতে কোন কাব্য নেই, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে কিছু বলছেন না, এটাই সত্য। আগে যেটা বলা হয়েছিল, সেটাকেই এখানে এবার পরের শ্লোকে বোঝাচ্ছেন, তবে অন্য ভাবে। তুমি যে মনে করছ, তুমি মারা যাবে, তুমি কাউকে মারবে, তা নয়। কি বলছেন –

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।।২৩।।

(কোন শাস্ত্র এই আত্মাকে ছেদন করতে পারে না। অগ্নি এঁকে দহন করতে পারে না। জল এঁকে আর্দ্র করতে পারে না এবং বায়ু এঁকে শুষ্ক করতে পারে না।)

শস্ত্র এঁকে ছেদন করতে পারে না, আগুন এঁকে দগ্ধ করতে পারে না, জল এঁকে সিক্ত করতে পারে না, বায়ু এঁকে শুষ্ক করতে পারে না। কারণ খুব সহজ, আত্মার কোন অবয়ব নেই, আত্মা কোন মিশ্র পদার্থ নয়। ছেদন করা, দগ্ধ করা, সিক্ত করা, শুষ্ক করা, এই ক্রিয়াগুলো শুধু মিশ্র পদার্থের মিশ্রণের উপরেই হয়। যেমন কয়লা একটা মিশ্র পদার্থ, কয়লাকে পোড়ালে অন্য একটা মিশ্র পদার্থে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। ভেজা কাপড় বাইরে শুকোতে দেওয়া হয়েছে, ভেজা কাপড়ও একটা মিশ্র পদার্থ, সূর্যের তাপ কাপড়ের জলকে বাষ্প করে দিচ্ছে, বাতাস সেই বাষ্পকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কোন কিছুকে কাটা মানে, ওই বস্তু বিভিন্ন জিনিস দিয়ে জোরা দেওয়া বলে কাটা যাচ্ছে। যদি একটা একক পদার্থ হত, তাহলে কাটা যেত না।

যেমন এ্যটম, এ্যটমকে প্রথমে ভাঙতে পারছিল না। ডাল্টন যখন এ্যটমিক থিয়োরি দিলেন, তখন তিনি বললেন, এ্যটম হল Smallest indivisble। পরে যেখন এ্যটমকে ভেঙে দিল, তখন সবাই অবাক হয়ে গেল। তারপর দেখছে এ্যটমের ভিতরেও অনেক parts রয়েছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, parts হলেও ওর property পুরো পাল্টে যায়। যেটা পুরো ইউনিফর্ম, যেখানে কোন পার্টস নেই, ওটাকে কিছু করা যাবে না। যদি দেখা যায় জিনিসটা জ্বলছে, ভিজে যাচ্ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে, বুঝতে হবে ওই জিনিসটা অনেকগুলি পার্টস দ্বারা নির্মিত। দূর্গা প্রতিমা, সরস্বতী প্রতিমা বিসর্জনের পর দেখা যায়, প্রতিমার কোন হাত খুলে বেরিয়ে গেছে, কোন প্রতিমার মুণ্ডু আলাদা হয়ে গেছে, কারণ প্রতিমা বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে তৈরী। যে কোন বস্তুর যদি একাধিক অঙ্গ থাকে, অবয়ব থাকে তবেই এই ক্রিয়াগুলো হবে। পরের শ্লোকেও একই ভাবে বলছেন –

অচ্ছেদ্যোহমদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ।।২৪।।

(এই অপরোক্ষ আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থির, অচল এবং সনাতন।)

যে জিনিসগুলো আগে বলা হয়েছে, এটাকে এবার ধীরে ধীরে একটা উপসংহারের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। খুব সহজে এই বিষয়টা আসবে না, অনেক পরে পরে আসবে। আত্মাকে ছেদন করা যায় না, জ্বালা যায় না, ভেজানো না, শুষ্ক করা যায় না। আকাশ, বায়ু, জল, অগ্নি ও পৃথিবী, এই যে পঞ্চভূত, এর ধর্মই হল এক অপরকে নাশ করে। এক অপরক যেমন দাঁড় করায়, তেমনি এক অপরকে নাশ করে দেয়। বাচ্চাদের মধ্যে বন্ধুত্বও যেমন, ঝগড়াও তেমন। এই পঞ্চভূত কাউকে ছেড়েও থাকতে পারবে না, আবার কারু সঙ্গে থাকতেও পারবে না। বাচ্চারাও ঠিক তাই।

একটা প্রবাদ আছে, ভাইয়ের মত বন্ধু নেই, ভাইয়ের মত শত্রু নেই। রাম আর লক্ষ্মণ দুই ভাই, এদের মত বন্ধু নেই; রাবণ আর বিভীষণও দু ভাই, এদের মত শত্রু নেই। একই কাহিনীতে দুই সহোদর, কিন্তু দুটো আলাদা কাহিনী রূপে একটা সম্পূর্ণ বিপরীত সম্পর্ক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পঞ্চভূতও ঠিক তাই, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবীর জন্ম। এরা এক অপরকে ছেড়ে থাকতে পারে না, অথচ এক অপরকে নাশ করে। যেখানে কাটাকাটি হয়, যেখানে জ্বলন হয়, যেখানে ভেজানো হয়, যেখানে শুকনো হয়, এগুলো সব সেই পঞ্চতত্ত্ব, যেখানে এক অপরকে নাশ করছে। আত্মা এগুলোর বাইরে, আত্মার নিয়ম এখানে খাটবে না।

হ্যারি পটারের কাহিনীতে আছে, একবার হ্যারি পটার একটা ম্যাজিকের মধ্যে ফেঁসে গেছে। ওখানে তাকে তার এ্যাসিস্টান্ট উদ্ধার করতে এসেছে। পটার ওকে জিজ্ঞেস করছে, আরে ম্যাজিকটা তোমার উপর কাজ করছে না? বলছে, এটা আপনাদের ম্যাজিক, আপনাদের উপরেই কাজ করে, আমাদের উপর কাজ করে না। এই বলে হ্যারি পটারকে ওখান থেকে বার করে নিয়ে চলে গেল। পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চতত্ত্বের উপরে কাজ করে, এর বাইরে ওর কোন এক্তিয়ার নেই। আগেকার দিনে একজন মহিলা কম্প্যুটারে কাজ করছে। আর কম্প্যুটারের ওখান থেকে গোমড়া মুখে উত্তর দিচ্ছে, আমি তোমার স্বামী না, উল্টোপাল্টা কমাণ্ড দিও না। তোমার এক্তিয়ার যত দূর, তার বাইরে যেও না। পঞ্চতত্ত্বের এক্তিয়ার পঞ্চতত্ত্বের ভিতরে, তার বাইরে তুমি যেও না, সাবধান করে দিচ্ছে। আত্মা এর এক্তিয়ারের বাইরে, সেইজন্য পঞ্চতত্ত্বের কোন কিছুই আত্মার উপর খাটবে না।

বলছেন, নিত্য, সর্বগতঃ, স্থানু, স্থানু একটা খুব সুন্দর শব্দ। স্থানু বলতে আমরা বুঝি পাথরের মত বা মরা একটা গাছের মত, কিন্তু স্থানু শব্দের অর্থ হল, যাকে নাড়ানো যায় না। যার জন্য শিবের একটা নাম স্থানু, পরে বিষ্ণুরও একটা নাম হয়ে যায় স্থানু। আত্মা সব জায়গাতেই আছে, সেইজন্য আত্মা স্থানু। আত্মা যেহেতু স্থানু, সেইজন্য এটা অচল, কোথাও চলাফেরা করতে পারে না, কোথাও যাওয়ার নেই। যাবেটা কোথায়, আত্মা তো সর্বব্যাপী হয়ে আছেন। সেইজন্য বলছেন *সর্বতঃ*। আত্মা তাই সনাতন, সব সময়ই আছে। কারণ কোন কিছুর থেকে আত্মা উৎপন্ন হয়নি। উৎপন্ন হলে আমরা বলতাম নবীন। আত্মাকে পুরনো এই জন্য বলা হয়, আত্মা চিরদিন, আদি অনন্তকাল ধরে আত্মা আছে সেইজন্য পুরাতন। নবীন এই জন্য বলা হয়, মনে হয় সদ্য তার জন্ম হয়েছে। যেই অর্থ আমরা নবীন বা পুরাতন বলি, সেই অর্থে বলা হচ্ছে না, কারণ এটা সনাতন। *সর্বগতঃ*, সব জায়গায় আত্মা বিদ্যমান।

আত্মাকে নিয়ে যে এত কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে, এর একটাই key word, তা হল আত্মা অনন্ত। বাকি সব কিছু এই একটা শব্দ অনন্ত থেকে বেরিয়ে আসে, অনন্তেরই এগুলো নানান ভাব। কোথাও শব্দ দিয়ে, কোথাও বিচার দিয়ে পুনরুক্তি করে যাচ্ছেন। আত্মার ব্যাপার অত্যন্ত কঠিন, তাই নানা ভাবে বর্ণনা করতে হয়, একই ভাবকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করে যাচ্ছেন। পরের শ্লোকে এই জিনিসটার ইতি টানছেন –

অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি।।২৫।।

(শাস্ত্রে এই আত্মাকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকারী বলে উক্ত করা হয়েছে। অতএব (হে অর্জুন) আত্মার এই সনাতন স্বরূপ অবগত হও এবং শোক পরিত্যাগ কর।)

হে অর্জুন তুমি ভাল করে বুঝে নাও, যাদের নিয়ে তুমি শোক করছ, এই ভীষ্ম, দ্রোণ বা অন্যান্যরা, এনারা সবাই আসলে আত্মা; আত্মার স্বরূপ অবগত হও এবং শোক পরিত্যাগ কর।

যে জিনিসটাকে বুদ্ধি ধরতে পারে সেটাকে বলে ব্যক্ত। ব্যক্ত মানে, যে জিনিসটা বেরিয়ে এসেছে এবং দেখা যাচ্ছে, জানা যাচ্ছে। কোন জিনিস কখন বেরিয়ে আসে? বুদ্ধি যখন ওটাকে গিয়ে ধরে। কিন্তু বুদ্ধি আত্মাকে ধরতে পারে না, কারণ বুদ্ধি সীমিত আর আত্মা অসীম। এক সের ঘটিতে পাঁচ সের দুধ ধরে না। সেইজন্য বলছেন আত্মা অব্যক্ত। আত্মাকে কোন দিন জানা যাবে না, সম্ভবই না। অন্ধকারে আমরা কোন জিনিসকে হয়ত দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু স্পর্শ দিয়ে জিনিসটার অনুভব পাওয়া যায়, জিনিসটার বিশেষ কোন গন্ধ থাকলে, সেই গন্ধ দিয়েও জিনিসটার উপস্থিতি অনুভব করা যায়। ঠিক তেমনি বুদ্ধি যখন শুদ্ধ হয়ে যায়, তখন আত্মার সাথে এক হয়ে অনুভব করে এই রকম কিছু একটা আছে।

অচিন্ত্যঃ অয়ম্, ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন জিনিসকে দেখার পর, শোনার পর, ওটাকে নিয়ে আমরা চিন্তা করি। ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মাকে কোন দিন জানা যাবে না, সেইজন্য আত্মা *অচিন্ত্যঃ*। আসলে অব্যক্ত এবং অচিন্ত্য একই অর্থে হয়, এখানে অব্যক্ত বুদ্ধিকে নিয়ে বলছেন আর অচিন্ত্য ইন্দ্রিয়কে নিয়ে বলছেন।

অবিকার্যঃ অয়ম্, আত্মা অবিকারী। ষড়্‌বিকারের আলোচনাতে বলা হয়েছিল, একটা জিনিস যখন আরেকটা জিনিসে পরিবর্তিত হয়, দুধ যেমন দইয়ে পরিবর্তিত হয়ে যায়, আত্মার এই ধরণের কোন পরিবর্তন নেই। আগেও বলা হল, তাঁর কোন অবয়ব নেই, সেইজন্য সে অবিকারী থাকে।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং, অর্জুন তুমি এই জিনিসটাকে খুব ভাল করে বোঝ, ভীষ্ম দ্রোণের আসলটা হলেন আত্মা। আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, তার বিকার নেই। *নানুশোচিতুমর্হসি,* এটা বুঝে নিয়ে তুমি আর শোক করো না, উঠে দাঁড়াও এবং যুদ্ধ কর।

আমরা পঁচিশ নম্বর শ্লোকের আলোচনা করলাম, এরপর ছাব্বিশ ও সাতাশ এই দুটো শ্লোকও পঁচিশ নম্বর শ্লোকের সাথে সংযোগ আছে এবং তিনটে খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক, হিন্দুদের তিনটে জীবনদর্শনকে এর মধ্যে নিয়ে আসছেন। পঁচিশ নম্বর ঘোর অদ্বৈত, ছাব্বিশ নম্বর যেন মীমাংসাকে নিয়ে আসছেন, হিন্দুদের যেটা খুব প্রাচীন মত। আর সাতাশ নম্বর নিয়ে আসছেন সাধারণ মানুষের ধারণা, যারা মনে করে মরে গেলেই সব শেষ। জীবনে যা কিছুই হয়ে থাকুক না কেন, এই তিনটেই সম্ভবনা, এই তিনটে সম্ভবনার বাইরে কিছু থাকতে পারে না। তবে চতুর্থ আরেকটা মত আছে, যেটা মুসলিম, খ্রীশ্চানরা মানেন, এনাদের কাছে হল, জন্ম একবারই হবে, আর মৃত্যুর পর সে চিরদিনের জন্য স্বর্গ বা নরকে চলে যাবে। পরের শ্লোকে বলছেন –

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি।।২৬।।

(অর্জুন, এরপরেও তুমি যদি মনে কর যে, আত্মা প্রত্যেক শরীরের উৎপত্তির সঙ্গে জাত হন এবং প্রত্যেক শরীরের বিনাশের সঙ্গে মৃত হন, তবুও হে মহাবাহো, এর জন্য তোমার অনুশোচনা করা উচিত নয়।)

মূল শ্লোকে যাওয়ার আগে আমাদের একটু পিছনে যেতে হবে। প্রথমেই অর্জুন বলেছিলেন, আমি যুদ্ধ করব না। যুদ্ধ কেন করবেন না? এতগুলো লোক মারা যাবে, এরা সবাই আমার আপনজন, পিতামহ আছেন, আচার্যরা আছেন, মামা আছেন, ভাইয়েরা সবাই আছে। অর্জুনের দ্বিতীয় সমস্যা ধর্মকে নিয়ে। যেগুলোকে আমরা শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে জানি, তাঁরা বলছেন হিংসা করো না। নীতি শাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্রের একটু নীচে যারা, তারা বলছে, যারা আততায়ী তাদের বধ করতে পারো। নিয়ম হল, যদি ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়, তাহলে ধর্মশাস্ত্রের কথাই মান্যতা পাবে।

ভগবান অর্জুনের কথা শুনে অবাক হয়ে গেছেন। ভগবান অর্জুনকে একসাথে দুটোকে মিলিয়ে বলছেন, তোমার বাস্তব স্বরূপ আত্মা, আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, আত্মা সর্বব্যাপী, আত্মা নিত্য, *কং ঘাতয়তি হন্তি কম্‌,* কে কাকে মারে, কে কাকে কিভাবে মারান। এই শ্লোকগুলির আলোচনার সময় বলা হয়েছিল, এটাই ঠিক ঠিক হিন্দুদের ধর্ম দর্শন ও জীবনদর্শন। আমরা হরিবোল হরিবোল করতে পারি, জয়রাম সিয়ারাম করতে পারি, জয় হনুমান জ্ঞানগুণ সাগর করতে পারি, আমরা চণ্ডী পাঠ করতে পারি, কিন্তু আমাদের মূল ভাব হল ওই একটা –আত্মা অনন্ত। যে হিন্দুরা এটা বোঝেন না, পালন করেন না, তাদের জন্য একটাই শব্দ –অভাগা। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, A Hindu, who is not spiritual, I do not consider him as a Hindu। যে হিন্দু সচেতন হয়ে মুক্তির জন্য চেষ্টা করছেন না, তিনি কিন্তু হিন্দু নন। তুমি নিজেকে নাস্তিক বল, ভোগবাদী বল, তুমি নিজে কিন্তু হিন্দু না। হিন্দু মানেই, সে এই ব্যাপারে সচেতন থাকবে –তোমার বাস্তবিক সত্তা আত্মা, যার জন্ম নেই, যার মৃত্যু নেই, যে অজর, অমর, নিত্য, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান আর সর্বজ্ঞ।

তাহলে আমার এই দুরবস্থা কেন? কারণ তুমি ঐ রকম ভাবছ বলে তোমার এই দুরবস্থা। একজন বড়লোক কোন কারণে গরীব হয়ে গেছে, সে এখন চেষ্টা করবে কিভাবে আবার বড়লোক হতে পারে। আঠারো মাস আগে ইয়েস ব্যাঙ্ক সেরা ব্যাঙ্ক ছিল, গতকাল সেই ব্যাঙ্ককে বন্ধ করে দিয়েছে। অন্য দিকে তাকে আবার উপরে তোলার চেষ্টা হবে। যদি তুমি মানুষ হও, যদি তোমার এই অহঙ্কার থাকে আমি একজন মানুষ, তাহলে তোমাকে চেষ্টা করতে হবে। যেটা তোমার মনে হচ্ছে এটা ঠিক, সেই ব্যাপারে তোমাকে চেষ্টা করতে হবে। যে অনন্ত স্তর থেকে তোমার পতন হয়ে গেছে, এবার সেখান থেকে নিজেকে তোলো। তোমার টাকা-পয়সা যদি চলে গিয়ে থাকে, তাহলে অর্থোপার্জন করো। সীতাকে রাবণ হরণ করে নিয়েছিল। শ্রীরাম যুদ্ধ করে রাবণকে বধ করে সীতাকে উদ্ধার করলেন। যুদ্ধের পর শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, আমি ক্ষত্রিয়, আমার স্ত্রীর উপর যে হাত দেবে তাকে আমি উড়িয়ে দেব। আমি তাই রাবণকে উড়িয়ে দিলাম, এর মধ্যে অন্য আর কোন ব্যাপার নেই। এটাই বাল্মীকি রামায়ণের মত। আমার যে আসল সত্তা, যেটা আমি, কোন কারণে যদি নিজের স্বরূপ থেকে নড়ে যাই, আমাকে এবার প্রাণপন চেষ্টা করতে হবে, যাতে আমি আবার আমার আসল সত্তাতে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। পঁচিশ নম্বর পর্যন্ত এই ভাবকে কেন্দ্র করেই ভগবান অর্জুনকে বলে গেছেন। ছাব্বিশ থেকে এবার অন্য বিষয়কে নিয়ে বলবেন। আবার দশটা শ্লোক পরে আবার এই টপিকে চলে আসবেন।

ছাব্বিশ নম্বর শ্লোকে যেটা বলছেন, এটাও একটা জীবনদর্শন। প্রসঙ্গ থেকে সরে আমরা একটা অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। আমাদের জীবনে কেন এত সমস্যা, কেন আমরা দুর্বল প্রকৃতির, কেন আমাদের জ্ঞান লাভ হচ্ছে না, কেন আমাদের শক্তি নেই, কেন আমরা সব সময় নিজেকে অসহায় মনে করছি? এই প্রশ্নগুলিকে অনেক ভাবনা চিন্তা করার পর যেটা পাওয়া যায়, তা হল –আমাদের সমস্যা একটা জায়গায়। তা হল –আমাদের জীবনে কোন আদর্শ নেই বলে এত সমস্যা। জীবনে আদর্শ সব সময় আসে জীবনদর্শন থেকে। আগে জীবনদর্শন থাকতে হবে। যদি আমরা না বুঝি জীবনটা কি, তাহলে আমরা আদর্শ তৈরী করব কিভাবে। মুখে আমরা অনেক বড় বড় কথা বলে দিতে পারি। ঠাকুর ওই দেশে গেছেন, ওখানকার তাঁতিরা জিজ্ঞেস করছে, উনি কোন কৃষ্ণ মানেন। ঠাকুর বলছেন, এদিকে তাঁতি অন্য দিকে লম্বা লম্বা কথা। ভক্তদেরও সবার লম্বা লম্বা কথা – ঠাকুর সব দেখছেন, ঠাকুরের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে।

একজন নূতন ব্রহ্মচারী এক আশ্রমে জয়েন করেছেন। আশ্রমের অধ্যক্ষ সব সময় বলতেন, 'আমাদের স্বামীজীর আদর্শ পালন করে চলতে হবে'। একদিন ব্রহ্মচারী জিজ্ঞেস করছেন, আচ্ছা মহারাজ, 'স্বামীজীর ঠিক ঠিক আদর্শটা কি'? অধ্যক্ষ বলছেন, 'সেটা ভাববার বিষয়'। উনি নিজেও

জানেন না, স্বামীজীর ঠিক ঠিক আদর্শ কি। শুধু মুখে বলে যাচ্ছেন। সকালে এসে প্রথমে ওটাই বলবেন, আমাদের জীবনকে ঠিক ঠিক স্বামীজীর আদর্শে চালাতে হবে। আর যদি জিজ্ঞেস করা হয়, স্বামীজীর আদর্শটা কি? তখন বলবেন, সেটা ভাববার বিষয়। সারা দেশে এই দুরবস্থা। সবাই উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে। একবার জিজ্ঞেস করুন, আপনার জীবনের আদর্শটা কি? এটা গেল প্রথম।

দ্বিতীয়, আপনি কি সেটাকে নিয়ে চেষ্টা করছেন যে, এই জীবনে সেই আদর্শকে ধরে রাখবেন? আপনি অসফল না হতে পারেন, আপনার পদস্খলন হতে পারে, আপনি হোঁচট খেতে পারেন, কিন্তু আপনি কি আপনার জীবনের আদর্শের ব্যাপারে সচেতন?

এখানে ভগবান জীবনের প্রথম আদর্শ বললেন, তুমিই সেই আত্মা, তুমি অজর, অমর। আমরা এখানে দেখব একজন মানুষের জন্য কত প্রকার জীবনদর্শন হতে পারে। প্রথম জীবনদর্শন হল খুব নামকরা জড়বাদীদের, যারা বস্তুবাদী। গ্রীক ফিলজফিতে এপিক্যুরাস ছিলেন একজন বিরাট বড় সাধু, ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কিভাবে কিভাবে ওনার অনুগামীদের মধ্যে কোথাও একটা এলেমেলো হয়ে যায়, তাতে লোকেরা ভুল বুঝলেন, বলতে শুরু করলেন তোমরা ভোগ কর। আসলে উনি বলতে চাইছিলেন, ত্যাগ কর, ভোগে কিছু নেই। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে, কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি থেকে এলেমেলো হয়ে গেছে। ফিলজফারসরা এদের ভোগবাদকে নিয়ে অনেক লেখালেখি করেছেন। আগেকার বিজ্ঞান না, বর্তমান কালের বিজ্ঞানের কি দর্শন, বোঝা যায় না, সবটাই এলেমেলো। আর হিন্দুদের প্রাচীন দর্শন চার্বাক হল ভোগবাদী।

ভোগবাদী বা জড়বাদী হল, আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা কিছু জানছি, চোখের সামনে যা কিছু দেখতে পাচ্ছি, এই কলম আছে, আমি দেখছি এটা কলম, আর আমি জানি কলম একটা পদার্থ। যদি পদার্থকে গুছিয়ে একটা জায়গায় নিয়ে আসা হয়, তখন সব কটা হয়ে যায় এ্যটম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এ্যটম ছাড়া কিছু নেই। এই এ্যটমগুলি মিলেমিশে বিভিন্ন বস্তু তৈরী হয়। বিশ্বের যত পশু, পাখি, মানুষ আছে, এরাও এ্যটম থেকেই তৈরী হয়। একটা ইঞ্জিনের মধ্যে এনার্জি বিশেষ ভাবে কাজ করে, তাই ইঞ্জিন চলে। ঠিক সেইভাবে এনার্জি আমাদের ভিতরে একটা বিশেষ ভাবে কাজ করছে, এটাই প্রাণ। তাহলে আত্মা কি? জড়বাদী বলবে, এ্যটম যখন একটা বিশেষ ভাবে অর্গানাইজড হয়, এটাই একটা sense of consciousness create করে, consciousness হল product of matter। এটাই জড়বাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী।

যেখানেই বলা হবে, পদার্থ থেকে মন এসেছে, সেখানেই বুঝতে হবে আসলে এরা জড়বাদী। আর স্বাভাবিক ভাবে এটাকে যদি আরও টেনে আনা যায়, তখন বেরিয়ে আসবে –আমার জন্ম হয়েছে, আমি মরে যাব। আমি আগে কখন ছিলাম না, কোন না কোন ভাবে এমন কিছু একটা হয়েছে, বাবা-মার সংযোগে হতে পারে, কিংবা কোন না কোন ভাবে এ্যটমসগুলি এক সঙ্গে পরস্পরের সংযুক্তিতে কোন ভাবে আমার এই সত্তা এসেছে। একদিন এমন হবে সেই শক্তিটা চলে যাবে, এ্যটমসগুলো আবার degenerate করে নিজের নিজের basic formএ চলে যাবে, সেদিন আমি শেষ। যেদিন আমি শেষ হয়ে যাব, চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যাব। এটা হল খুব সাধারণ এবং একেবারে lowest form।

সেখান থেকে আমরা ধর্মের দিকে আসছি, সেখানে অন্য একটা দর্শন চলে আসে। যারা আত্মাকে মানে, আত্মাকে মানা মানে, এই যে তুমি যেটা আছ, এই তুমি মৃত্যুর পর কোন না কোন ভাবে বেঁচে থাকবে, তুমি চলতে থাকবে। Materialist মানে মৃত্যুর সাথে সব শেষ, non-materialst মানে মৃত্যুর পরেও সত্তা কোন না কোন ভাবে চলতে থাকে। সমস্ত ধর্ম হল non-

materialist। Non-materialistরা মনে করে, তোমার যে আসল আমি, এই আমি মৃত্যুর পরেও কোন না কোন রূপে চলতে থাকবে।

কোন না কোন রূপে, এটা কত রূপ হতে পারে? এর মধ্যে প্রথম আসে সেমেটিক ধর্ম, যে ধর্মে জুহুদিরা, মুসলমানরা এবং খ্রীশ্চানরা আছেন। সেমেটিক ধর্ম বলতে মূলতঃ এই তিনটি ধর্ম, এর মধ্যে পার্সিদেরও কিছুটা ধরা যেতে পারে। এনারা বলেন, ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই জগৎ আছে, এ্যটম দিয়ে মানুষ তৈরী কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এর ভিতরে যে স্পিরিট, যে চেতনা, সেটা ভগবান দিয়েছেন। ফুঁ মেরে দিয়ে থাকুন বা যে ভাবেই দিয়ে থাকুন, এটা তিনি দিয়েছেন। এই স্পিরিট শব্দ থেকে স্পিরিচুয়ালিটি শব্দ এসেছে। স্পিরিচুয়ালিটি মানে ভিতরে আত্মা আছেন। তাহলে মৃত্যুর পর কি হবে? মৃত্যুর পর স্পিরিট তার এই শরীরটাকে ছেড়ে বেরিয়ে যাবে।

এখানে এসে খ্রীশ্চান, জিউস ও ইসলামে একটু তফাৎ হয়। একটা সময় আসবে যখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শেষ হয়ে যাবে, তখন যিনি আমাদের স্রষ্টা, সেই স্রষ্টার সামনে আমাদের সবার বিচার হবে। বিচারের পর আমাদের কারু চিরদিনের জন্য স্বর্গ বা চিরদিনের জন্য নরকে চলে যেতে হবে। এই দুটোই জায়গা, তৃতীয় কোন জায়গা নেই, নূতন আর কোন কর্মও হবে না, এই দুটোর একটাতে চিরদিনের মত তুমি চলে যাবে। তোমার ভিতরে যে আমিত্ব রয়েছে, এ নূতন শরীর পাবে। এই নূতন শরীরে গিয়ে নরকের জ্বালা চিরদিনের জন্য ভোগ করতে থাকবে। যারা স্বর্গে যাবে, তারা এই নূতন শরীরে চিরদিনের জন্য স্বর্গসুখ ভোগ করতে থাকবে। এটা কতটা ঠিক, কতটা ভুল, সেটা কোন ব্যাপার না, এই হল এদের দর্শন।

হিন্দুদের ছয়টি মূল দর্শন। ছয়টির মধ্যে খুব নামকরা হল মীমাংসা। সব হিন্দুরাই মীমাংসা দর্শন না বুঝেই পালন করে। সেমেটিক ধর্মে যেভাবে বলছেন, মীমাংসাও সেভাবেই মানেন –এই শরীর আছে, শরীরের ভিতর আত্মা আছেন, মৃত্যুর পর এই আত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে যান। বেরিয়ে কোথায় যান? এই মতে আত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে কোথাও প্রতিক্ষা করেন না, যেমন কর্ম করেছে, সেই কর্মানুসারে হয় স্বর্গে যাবেন, নয়তো নরকে যাবেন কিংবা অন্যান্য প্রাণীর শরীরে ঢুকবেন, নয়তো অনেক ধরণের স্বর্গ আছে, সেখানে ঘুর ঘুর করবেন, ঘুরে ঘুরে আবার সে মনুষ্যলোকে এসে একটা শরীরে ঢুকবেন, সেখান থেকে মৃত্যুর পর আবার স্বর্গে যাবেন। এভাবে কত দিন চলবে? এটাই চলতে থাকবে। মুসলমানরা যেমন চিরন্তন স্বর্গের কথা বলে, মীমাংসা তেমন এই চিরন্তন আসা যাওয়াকে নিয়ে বলে। পরে এটাই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কারণ সৃষ্টি অনন্ত, সৃষ্টির মধ্যে আসা যাওয়াটাও চলতে থাকবে।

সমস্যা হয়ে যাওয়ার জন্য পরে মীমাংসা তার নিজের দর্শনকে একটু সাজালেন। ওদের মতে ব্রহ্মলোক যদি কেউ চলে যায়, যেটা শ্রেষ্ঠ স্বর্গ, তাহলে সহজে খুব তাড়াতাড়ি নামতে হবে না, অনেক অনেক কাল পর্যন্ত সে ব্রহ্মলোকের বাসিন্দা হয়ে থাকবে।

কিন্তু ব্রহ্মলোকও সৃষ্টির মধ্যে পড়ে, কারণ মীমাংসা ঈশ্বর মানে না। হিন্দুদের যে মূল দর্শন, সেই মীমাংসা ঈশ্বর মানে না, ভগবান মানে না। তারা মানে আত্মাকে, তারা মানে বিভিন্ন লোক, তারা মানে শরীর। আমরা বিচার করে নিজেকে দেখি, আমি নিজেকে কিভাবে দেখি? একজন হিন্দু রূপে দেখছি। আমি কথায় কথায় কর্মফলের কথা বলি, কথা কথায় পরজন্মের কথা বলি। কিন্তু কখন কি আমি আপনি সচেতন ভাবে বলি মুক্তিই আমার উদ্দেশ্য, আর এই জন্মেই, এইখানেই যে করে হোক আমাকে মুক্তি লাভ করতে হবে? কখনই তা বলি না। মুখের কথা হিসাবে ভক্তরা বলতে পারেন, মৃত্যুর পর ঠাকুর এসে নিয়ে যাবেন। ঠাকুরের ভারি বয়ে গেছে কাউকে নিয়ে যেতে, কেন তিনি নিয়ে যাবেন। আমাদের মত দু-চারটে আহাম্মক নিয়ে তিনি কি করবেন। কিন্তু মনে মনে আমরা

ধরে নিয়েছি, তিনি নিয়ে যাবেন। কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবেন, কেন নিয়ে যাবেন, সে ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না। আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, *পুনরপি জননং পুনরপি মরণং। পুনরপি জননি জঠরে শয়নম্। ইহ সংসারে খলু দুস্তারে কৃপয়াপারে পাহি মুরারে*। আবার জন্ম, আবার মৃত্যু, আবার মাতৃগর্ভে বাস, ভগবান যদি পার করেন, এ ছাড়া গতি নেই। আমরা বেদান্তের কথা বলি, অদ্বৈত বেদন্তের কথা বলি, বড় বড় কথা বলি, লম্বা লম্বা কথা বলি, কিন্তু ঘুরে ফিরে আমাদের সব কথা একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়, আমরা জন্ম-মৃত্যুর চক্রের মধ্যে ঘুরে চলেছি।

সেখান থেকে আরেক ধাপ এগিয়ে গেলে এসে যাবে সাংখ্য দর্শন ও যোগ দর্শন। সাংখ্য ও যোগের দর্শন কিছুটা মীমাংসার মত, আর বাকিটা সেমেটিক ধর্মের সাথে মিলে যায়, শুধু হেভেনের পরিভাষাটা পাল্টে যায়। সাংখ্য আর যোগ দর্শন বলে, আত্মার জন্ম হচ্ছে, মৃত্যু হচ্ছে; যেমন তার কর্ম হবে সেই অনুসারে সে শরীর পাবে। জন্ম-মৃত্যুর এই চক্রের মধ্যে বিভিন্ন শরীরের মধ্যে আসা যাওয়া করতে করতে, যখন তার মন পুরোপুরি মুক্তির দিকে, ঈশ্বরের দিকে যাবে, তখন সব কিছু ছেড়ে মুক্তির পথে নেমে গিয়ে বলবে, আমি আর কিছু চাই না, আমি মুক্তি চাই। একবার মুক্তি হয়ে গেলে সে চিরদিনের জন্য মুক্ত হয়ে গেল, তাকে আর জন্ম নিয়ে কোন লোকে গিয়ে কোন শরীর ধারণ করতে হবে না; ঠিক যেমন সেমেটিক ধর্মে বলা হয় তুমি যখন eternal heavenএ চলে যাবে, আর তোমাকে ফেরৎ আসতে হবে না, দুটো একই জিনিস।

বেদান্ত হল হিন্দুদের শেষ দৃষ্টিভঙ্গী, যেটা আমরা এগারো থেকে পঁচিশ নম্বর শ্লোক পর্যন্ত আলোচনা করলাম। বেদান্তের কথা হল, তোমার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই, জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, পাপ-পূণ্য এগুলো সব তোমার কল্পনা। কেন কল্পনা? কারণ তুমি শুদ্ধ আত্মা, তুমি সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। তুমি ভেবে নিয়েছ তুমি বন্ধনে আছ, তুমি নিজেকে শরীর রূপে কল্পনা করে ভাবছ আমি শরীর, তুমি নিজেকে মন ভাবছ। সেইজন্য তুমি কল্পনা করছ, তোমার জন্ম আছে, তোমার মৃত্যু আছে, তোমার দুর্বলতা আছে। যেদিন তুমি ঠিক করবে, আমার এসব কিছুই লাগবে না, তারপর তুমি চেষ্টা করতে থাক। যেদিন বেরিয়ে এলে, সেদিনই তুমি মুক্ত, চিরদিনের জন্য মুক্ত। চিরদিনের জন্য মুক্ত, এটাও তো যোগের সাথে, ইসলাম, খ্রীশ্চানের সাথে মিলে গেল। না, মিলবে না। কারণ তখন তুমি দেখবে, আদপে তোমার কখনই জন্মই হয়নি, জন্ম যদি না হয়, তাহলে মৃত্যুরও কোন প্রশ্ন ওঠে না, মুক্তিরও কোন প্রশ্ন নেই।

ঠাকুর এই জিনিসটাকে খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন, একজন জাদুকর রাজসভাতে খেলা দেখাতে গেছে, রাজাকে দেখিয়ে একটা আঙুল নাড়তে শুরু করেছে। আঙুল নাড়ছে নাড়ছে, দুম্ করে সবাই দেখছে, কোথা থেকে ঘোড় সওয়ার এলো, যুদ্ধ হচ্ছে, কাটাকাটি হচ্ছে। তারপর দেখছে কিছুই হচ্ছে না, শুধু আঙুলটা নেড়ে যাচ্ছে, তাতেই সবাই সম্মোহিত হয়ে কত কি দেখে যাচ্ছে। আগেকার দিনে সিনেমা হলে প্রোজেক্টরে রীল ঘুরত আর সাদা কাপড়ের পর্দার উপর ছবি প্রতিফলত হয়ে কত কিছু দেখাচ্ছে। রীল ঘুরতে ঘুরতে শেষ হয়ে গেল, তারপর সাদা পর্দাটা ছাড়া আর কিছুই নেই। আমরা হিরো, হিরোইনের সাথে নিজেকে জড়িয়ে রেখে কখন হাসছি, কখন কাঁদছি। রীল শেষ হয়ে গেল, দেখছি পর্দায় সাদা আলোটুকু ছাড়া আর কিছু নেই। আগেও আলো ছিল, শেষেও আলো, মাঝখান থেকে কয়েকজন হেসে খেলে কেঁদে চলে গেল। আসল পরিবর্তন কোথাও হয়নি।

আমরা এই পাঁচখানা জীবনদর্শনের কথা বললাম, এই পাঁচটি ছাড়া ছ-নম্বর কোন জীবনদর্শন হতে পারে না। এই পাঁচটির মধ্যে মীমাংসা কিন্তু এখন আর নেই, যদিও আমাদের মাথায় মীমাংসার দর্শনটা এখনও বেশী জেঁকে বসে আছে। এই পাঁচটির মধ্যে, আপনি কোন জীবনদর্শনকে মানেন? যখন লম্বা লম্বা কথা বলে লেকচার দিতে হবে, তখন আমরা বেদান্তী হয়ে যাই। ভোগ করবার সময় আমরা চার্বাক হয়ে যাই, লুটেপুটে খাও, খিমচে খামচে যত পারো নিজের জন্য টেনে নাও। যখন যে

রকম সুবিধা পাওয়া যাবে, সেই অনুসারে জীবনকে চালিত কর। বলা হয় দুই নৌকায় পা রাখতে নেই। আমাদের এখানে নৌকা দুটো না, অনেকগুলো নৌকা, একটাতে ডান হাত, আরেকটাতে বাঁ হাত, একটাতে বাঁ পা, আরেকটাতে ডান পা, আর মাথাটা আরেকটা নৌকায়। ফলে একটা নৌকা যদি কোন রকমে দোলা শুরু করে, তখন সব এক সঙ্গে কুমিরে ভরা নদীতে পড়ে শেষ।

আমরা যে পাঁচটা দর্শনের কথা বললাম, এই পাঁচটির কোন দর্শনই কিন্তু মৃত্যুকে কোন দাম দেয় না। অথচ সারা বিশ্বকে বাদ দিন, ভারতকে ছেড়ে দিন, কলকাতাও থাক, নিজের পাড়াতে গিয়ে দেখুন, সবাই মৃত্যুকে নিয়ে কাঁদছে। ঠাকুরের কাছে একজন বলছেন, আমি পুনর্জন্মকে ভয় পাই না। ঠাকুর বলছেন, তুমি বলো না, তোমার এখনও ভোগ করার ইচ্ছা আছে। ভোগ করার ইচ্ছা আছে, সেইজন্য বলছে, আমার আরেকটা জন্ম হোক। একটু বিচার করলে দেখা যাবে, কোন দর্শনে মৃত্যুর কোন স্থান নেই, অথচ আমরা সবাই সব থেকে বেশী ভয় পাই মৃত্যুকে। এখনও অনেক জায়গায় চার প্রজন্ম ধরে মানুষ বেঁচে আছে। ঠাকুরদার বাবা মারা গেছে, সেখানেও চোখের জল।

ভগবান গীতাতে তিনটে জীবনদর্শনে নিয়ে আসছেন। সেমেটিকদের যে দৃষ্টিভঙ্গী, এটা একটা বেমানান ধারণা। কারণ একটা জীবনে আমি ভাল মন্দ যাই করি না কেন, তার জন্য চিরদিনের জন্য স্বর্গ বা চিরদিনের জন্য নরক বাস হবে, এটা হিন্দুরা কখনই মানে না। আর যোগের যে ধারণা, এটা মীমাংসা ও বেদান্তের মাঝামাঝি পড়ে বলে সেটাকেও আর আলোচনা করা হয় না। সেইজন্য বেদান্ত, মীমাংসক আর চার্বাক এই তিনটে জীবনদর্শনকে নিয়ে গীতা আলোচনা করছেন। বেদান্ত আগেই বলে দিয়েছেন, তুমি আত্মা, তোমার জন্ম নেই, তোমার মৃত্যু নেই।

এবার ভগবান নিয়ে আসছেন, *অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্*, যদি তুমি মনে কর তোমার জন্ম হচ্ছে, তোমার মৃত্যু হচ্ছে, জন্ম-মৃত্যু তোমার লেগেই আছে, তাহলেও তো তোমার শোক করার কিছু নেই, *তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি*। এখানে আচার্য বলছেন, *লোকপ্রসিদ্ধয়া*, আচার্য শঙ্করের এত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর জীবনকে এমন স্পষ্ট দেখছেন, অবাক হয়ে ভাবতে হয় মাত্র ষোল বছর বয়সে এই ভাষ্য রচনা করেছেন, এটা কি বিশ্বাস করা যায়। বলছেন, *লোকপ্রসিদ্ধয়া*, এই সংসারে লোকেরা এভাবেই মনে করে, আমার জন্ম হয়েছে, আমার মৃত্যু হবে, আবার আমার জন্ম হবে, আবার আমি মারা যাব, যদি তুমি এটাই মনে কর তাহলে –

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।।২৭।।

(যেহেতু জাত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত এবং স্বীয় কর্মানুসারে মৃত ব্যক্তির পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী, সেইহেতু এই অপরিহার্য বিষয়ে শোক করা তোমার উচিত নয়।)

যার জন্ম হয়েছে সে মরবে, যে মরেছে সে আবার জন্মাবে, এটা অপরিহার্য, তাই এটাকে নিয়ে এতো ভাবার কি আছে। নাগরদোলায় চেপে ঘুরছে, যেটা নীচে আছে সেটা উপরে যাবে, যেটা উপরে আছে সেটা নীচে যাবে, এই নিয়ে তোমার মাথা ব্যাথা করার কি আছে! সাতাশ নম্বর শ্লোককে অনেকে ভুল করে মনে করে এটা গীতার মত, কিন্তু এটা গীতার মত নয়। এখানে বলছেন, যদি তুমি এই রকম মনে করো। গীতার মত পঁচিশ নম্বর শ্লোক পর্যন্ত ছিল। ছাব্বিশ, সাতাশ আর আটাশ এই তিনটে শ্লোক গীতার মত না, সাধারণ ভাবে লোকেদের মনের যে ভাব, সেটাকে কেন্দ্র করে বলছেন, যদি তুমি এই রকম মনে কর। তার মানে তুমি যদি মীমাংসা দর্শনের মতাবলম্বী হও, তোমার জন্ম হয়েছে তুমি মরবে, মরে আবার জন্ম নেবে। জন্ম-মৃত্যু মানে এই ঘর আর ওই ঘর, এই ঘর থেকে ওই ঘরে গেলে, আবার ওই ঘর থেকে এই ঘরে এলে। মৃত্যুর জন্য এত কান্নাকাটি করার কি আছে! গীতায় আমরা প্রথম দিকে আলোচনা করেছিলাম, গীতার একটাই উপদেশ, শোক

আর মোহ এই দুটো থেকে বেরিয়ে আসা। তোমার মৃত্যুর জন্য এত শোক কেন, আর জন্মকে নিয়ে এত মোহ কিসের? যেমন গতকাল, তেমন আজকে, তেমনই আগামীকাল থাকবে, যেমন গত জন্ম, তেমন এই জন্ম, তেমন পরে জন্ম হবে। এত কান্না কিসের?

এখানে একটা শব্দ আছে অপরিহার্য, কোনটা পরিহার্য আর কোনটা অপরিহার্য, এই দুটোকে নিয়ে মাঝে মাঝে খুব ভাল করে বিচার করতে হয়। জীবনে যেটা আমার অপরিহার্য, সেটাকে নিয়ে এত কান্নাকাটি করতে নেই, বিচার করতে হয় যে এটা আমার জীবনে অপরিহার্য, মানে এটাকে কোন ভাবেই কাটানো যাবে না। যদি একবার ভাল করে বুঝে নেওয়া যায়, যেটাকে কখন কাটানো যাবে না, সেটাকে নিয়ে বেশী অস্থির হতে নেই। বাচ্চারা বোঝে না বলে চেঁচামেচি, কান্নাকাটি করে। এক আশ্রমে সাত-আট বছরের বাচ্চাদের নিয়ে একটা কম্পিটিশান হয়েছিল। তার মধ্যে ছবি আঁকা, কবিতা পাঠ, আরও কিছু আইটেম ছিল। যা হয়, একটা বাচ্চা ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে, আর-একটি বাচ্চা কোন প্রাইজ পায়নি। তারপর বাচ্চাটির সেকি কান্না, ও কেন প্রাইজ পেল, আমি কেন পেলাম না। কেউ ওকে বোঝাতে পারছে না। বড় হয়ে যাওয়ার পরেও আমাদের এই স্বভাবটা থেকে যায়।

যে কোন একটা সমস্যা, দেখতে হবে এই সমস্যার কোন সমাধান আছে কিনা। এখন যেমন করোনা ভাইরাস এসেছে, এটা একটা সমস্যা। আলবার্ট কামু, একজন খুব নামকরা লেখক, সাহিত্যে নোবেল প্রাইজও পেয়েছিলেন। তার বিখ্যাত একটা বইয়ের নাম 'দা প্লেগ'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল, সেটাকে আধার করে এই কাহিনীটা লিখেছিলেন। কাহিনীতে দেখাচ্ছেন, প্লেগের মহামারী ঠেকাতে কিছুই করা যাচ্ছে না, পুরো শহরকে কোয়ারেন্টাইন করে দিয়েছে। ওর মধ্যেই লোক মরছে, ওই মৃত্যুর মধ্যেও সব কাজকর্ম চলছে। তার মধ্যে অন্য শহরের একজন লোক সেই শহরে এসেছে, এসে সেও ফেঁসে গেছে। দিনের পর দিন শহরের সব কিছু বন্ধ। আলবার্ট কামু একজন কত উচ্চমানের লেখক এখানেই বোঝা যায়, বর্ণনা হচ্ছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের, নিয়ে এলেন প্লেগ। একটা সময় ফ্লু ইংল্যাণ্ডে হাজারে হাজারে লোক মেরেছে। ওখানে একটা হলে নাটক হচ্ছে, সেখানে একজন হাঁচি দিয়েছে, হাঁচি দেওয়ার জন্য নিমেষে পুরো হল ফাঁকা হয়ে গেল।

আজকে করোন ভাইরাস এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে দেশ উপায় বার করে নিয়েছে কিভাবে মানুষকে বাঁচাতে হয়। চীনে করোনা ধরা পড়তেই দশ দিনের মধ্যে একটা সুপার স্পেশালিটির আইসোলেশান হসপিটাল বানিয়ে দিয়েছে। যদি পরিহার্য হয়, তাহলে পরিহার কর, আর এটা যদি সমস্যা, তাহলে এর সমাধান বার কর। সমস্যার যদি কোন সমাধান না থাকে, তাহলে এটা সমস্যা নয়, এটা একটা পরিস্থিতি। পরিস্থিতির সমাধান হয় না, ওটাকে মোকাবিলা করতে হয়। সমস্যা আর পরিস্থিতিকে আমরা প্রায়ই গুলিয়ে ফেলি।

একজনের চোখে চশমা আছে, শুধু চশমা না, তার সাথে আবার চোখে ছানি পড়তে শুরু হয়েছে। চোখে ভাল দেখতে পারছে না। ডাক্তার দেখে বলল, ছানি এখনও ম্যাচিওর করেনি, আরও কিছু দিন যাক। এখন সে কি করবে? চোখে ঝাপসা দেখছে, তাই বলে সেকি লেখাপড়া বন্ধ করে, কাজকর্ম শিকেয় তুলে দিয়ে কাঁদতে শুরু করবে। ধৈর্য ধরে বসে থাক, সময় হলে হবে। কারণ এটা সমস্যা না, এটা পরিস্থিতি। একটা সময় আসবে, পরিস্থিতিটা পাল্টে সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে, তখন ভাবতে হবে এর সমাধান কি। একজন কোন কারণে অন্ধ হয়ে গেল। এখন সে কি করবে। সারা জীবন যদি কাঁদতে থাকে, অন্ধ চোখটা তো আর ভাল হয়ে যাবে না।

মানুষ সব সময় নূতনকে পছন্দ করে, পুরনোকে যত তাড়াতাড়ি ছেড়ে নূতনকে আয়ত্ত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সুখের ক্ষেত্রেও তাই, একই রকমের সুখ যদি হয়, বিরিয়ানি খেতে খুব ভাল লাগে, রোজ যদি বিরিয়ানি খেতে দেওয়া হয়, কদিন পরে বিরিয়ানিতে বিরক্ত ধরে যাবে।

একটা খুব সুন্দর গল্প আছে। বড়লোক বাড়ির একটি যুবক কোরান পড়ে তার মাথায় ঢুকে গেছে, এই জীবনে কিছু নেই, আমাকে স্বর্গে যেতে হবে। আসলে ছেলেটির মানসিক ভারসাম্য ছিল না। অনেক চিকিৎসা করেও ঠিক করা যাচ্ছিল না। শেষে একজন হাকিমের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। হাকিম সব দেখে বললেন, 'আমি ঠিক করে দেব'। তারপর তিনি একটা নাটক করলেন। হাকিম চ্যাম্বারে ঢুকে ছেলেটির বাবাকে বলছে, 'আপনি কার চিকিৎসা করাতে এসেছেন, এতো মরে গেছে'।

ছেলেটি এতদিন চাইছিল আমি মরে যাব, মরে গিয়ে স্বর্গে যাব। হাকিম বলছে 'ওতো মরে গেছে, খেলা শেষ, আমার কিছু করার নেই'। এবার আল্লার দূতরা এসে একে স্বর্গে নিয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পরে চারজন লোক সাদা কাপড় পড়ে চ্যাম্বারে ঢুকে বলছে, 'এই সেই ব্যক্তি, যাকে স্বর্গে নিয়ে যেতে হবে'।

চোখ বেঁধে ছেলেটিকে নিয়ে ওই বাড়িতেই অনেক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন ওকে স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছে। অনেক ঘুরিয়ে একটা ঘরে এনে ঢুকিয়েছে। খুব সুন্দর ঘর বানিয়েছে। ছেলেটি এবার পুরোদমে জেগে উঠেছে, ভিতরে শক্তি এসেছে কিনা, আমি স্বর্গে এসে গেছি। খাওয়ার জন্য ওকে ভাত আর পেপে সেদ্ধ দিয়েছে।

'এটা আবার কি খাবার? আমি বাড়িতেও এই খাবার কোন দিন খাই না'। ওকে বলা হল, 'আসল স্বর্গে যখন যাবেন, তখন হয়ত ভাল খাবার পাবেন। এখন আপনাকে এখানে অপেক্ষা করতে হবে'। 'কত দিন অপেক্ষা করতে হবে'? 'যতদিন আপনি যাদের সাথে ছিলেন, বাবা, মা, ঠাকুরদা এরা সবাই না আসছেন'। ছেলেটির মাথা ঘুরে গেছে। রাত্রিবেলা আবার সেই ভাত আর পেপে সেদ্ধ। দ্বিতীয় দিন দুবেলা সেই ভাত আর পেপে সেদ্ধ, তৃতীয় দিনও সেই ভাত আর পেপে সেদ্ধ। এইভাবে সাত দিন কেটে গেল।

ছেলেটির এবার সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বলছে, 'আর কত দিন এই খাবার খেতে হবে'? 'আপনি কি চান, আপনার বাবা মা সবাই ওখানে মরে যাক'? 'না হয় মরেই যাক। কিন্তু মরছে না তো'। শেষে বলছে, 'তবে একটা উপায় আছে, আপনি যদি প্রার্থনা করেন আপনি আবার ফেরত যেতে চান, তাহলে আপনি আরেকটা সুযোগ পেতে পারেন'। 'এক্ষুণি আমাকে ফেরত নিয়ে চলে যাওয়া হবে? তাহলে ঠিক আছে'।

আবার ওর চোখ বেঁধে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওখানে নিয়ে এসেছে। আগে থেকেই পুরোটা সাজানো আছে। হাকিম দেখেই বলছে, আরে এর প্রাণ কি করে ফিরে এলো। সেই দিন থেকে আর কোন দিন ছেলেটি মৃত্যুর কথা বলল না। এখানে অর্থটা হল, একই খাবার যদি আমাকে দিনের পর দিনে খেতে হয়, তাহলে কি হতে পারে।

কিছু দিন আগে একটা কার্টুন বেরিয়েছিল, প্লেনে একজন বয়স্ক ভদ্রলোককে ব্রেকফাস্ট দেওয়া হয়েছে। ব্রেকফাস্ট দেখে এয়ারহোস্টেসের উপর চেঁচাতে শুরু করে দিয়েছে, 'সরিয়ে নিয়ে যাও, সরিয়ে নিয়ে যাও, রোজ রোজ আমি একই ব্রেকফাস্ট করতে পারব না'। বেচারি রোজ ফ্লাইটে ব্যাঙ্গালোর থেকে বম্বে, বম্বে থেকে ব্যাঙ্গালোর করে। এয়ারলাইনসে সব ফিক্সড, একই জিনিস রোজ খেতে হচ্ছে।

কোথাও গিয়ে মানুষ এক সময় বিরক্ত হয়ে যায়। সুখ হোক আর দুঃখ হোক, মানুষের জন্য চাই সব সময় নূতন কিছু। আমার দুঃখের কাহিনী, আমার কান্না লোকে শুনবে, একদিন শুনবে, দুদিন শুনবে। আস্তে আস্তে যারা আমার কান্না শুনতে আসছে তাদের সংখ্যা কমে যাবে। কারণ ততদিনে তারা বুঝে গেছে, এটা আমার কোন সমস্যা না, এটা একটা পরিস্থিতি। পরিস্থিতির কোন

সমাধান হয় না, পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এটাই বলছেন, যে কোন অপরিহার্য জিনিসের মুখোমুখি হও। পরের শ্লোকে এর থেকে আরও নীচে নামিয়ে জড়বাদীদের মতে নিয়ে আসছেন; যদি তুমি মনে কর পদার্থ থেকে আমি এসেছি, বিজ্ঞানীরা যেমন বলেন।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধানান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।।২৮।।

(হে ভারত, শরীর উৎপত্তির আগে জীব সমুদয় অপ্রকাশিত থাকে, স্থিতিকালে মাত্র প্রকাশিত এবং বিনাশের পরেও অপ্রকাশিত থাকে। এতে শোকের কি আছে?)

খুব সহজ অর্থ। জন্মের আগে তুমি ছিলে না, অব্যক্ত ছিলে। মৃত্যুর পরেও থাকবে না, আবার অব্যক্তে চলে যাবে। মাঝখানে এই কটা দিনের জন্য এত কান্নাকাটি কেন? আমরা যদি বর্তমান ফিজিক্সকে মানি, তবে ফিজিক্স প্রত্যেক দিনই গতকালের থিয়োরি পাল্টে নূতন অন্য একটা থিয়োরি নিয়ে আসছে। যত দিনে ভাবছি এই ফিজিক্স বইটা পড়ে নেব, তত দিনে দেখছি বইটা শেষ করতে না করতে আর-একটা নূতন থিয়োরি এসে গেছে। আমরা জানি ভদ্রলোকের এক কথা, সেই হিসাবে আর যাই হোক বৈজ্ঞানিকরা ভদ্রলোক না। তাও যদি এদের কথা মানি, তাহলে সৃষ্টি হয়েছে পনের'শ কোটি বছর আগে। আর আমরা নাকি এখন সৃষ্টির মাঝখানটায় আছি। মানুষের এটা পুরনো স্বভাব, সব সময় নিজেকে মাঝখানে রাখে। গ্রীক গণিতজ্ঞরা বলতেন, পৃথিবীটা ব্রহ্মাণ্ডের ঠিক মাঝখানে। এখন পদার্থ বিজ্ঞানীরা বলছেন, আমরা হলাম সময়ের মাঝামাঝি।

নিজেকে কেন্দ্রে না রাখতে পারলে মানুষ থাকতেই পারবে না। সমস্ত বিশ্বের আমি কেন্দ্র। বাইরে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিক তাকালে দেখা যাবে, আকাশ আমাকে কেন্দ্র করে বেঁকে রয়েছে। আমাদের এটা জানা নেই যে, সামনে যে লোকটা আমার মত দাঁড়িয়ে আছে, তারও মাথার উপর কেন্দ্র করে আকাশ বেঁকে রয়েছে কিনা। এ্যস্ট্রোফিজিক্সে বলা হয়, যত গ্যালাক্সি আছে, এর কোন পূব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ নেই, তার যে কোন পয়েন্টটাই সেন্টার। আমরাও বাস্তবে সেন্টারে আছি, কারণ সবটাই সেন্টার। আমি পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন, সব সময় আমি টপে আছি, কারণ পৃথিবী আমাকে কেন্দ্র করে ঝুঁকছে, কারণ পৃথিবীটা গোল।

কিন্তু টাইমের ব্যাপারে এভাবে বলা যাবে না, যেহেতু বিজ্ঞানীরা বলছেন, তাই আমরা মেনে নিচ্ছি আমরা সময়ের মাঝখানে আছি। তার মানে পনেরশ কোটি বছর পেরিয়ে এসেছি আর ওদিকে আরও পনেরশ কোটি বছর পড়ে রয়েছে, তার মানে মোট তিন হাজার কোটি বছর দাঁড়ায়। আপনার একটা জীবনের আয়ু ধরলাম একশ বছর। এবার ওদিকে পনেরশ কোটি আর এদিকে পনেরশ কোটি, মাঝখানে আপনার একশ বছর। এবার মাইক্রোস্কোপ, টেলিস্কোপ বা পেরিস্কোপ, সব স্কোপ লাগিয়ে যদি দেখা হয়, তাহলেও কি আপনার অস্তিত্ব ওর মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে? কোটিতে সাত খানা শূন্য হয় আর তার সাথে এক হাজারকে ধরলে আরও তিন খানা শূন্য। একের উপর দশ খানা শূন্য আর ওদিকেও একের উপর দশ খানা শূন্য, মাঝখানে একশ বছর। কোথায় আর কি করে ওই একশ বছরকে আপনি খুঁজে বার করবেন। গীতার কি simple logic। তুমি যদি মনে কর, জন্মের আগে তুমি ছিলে না, মৃত্যুর পরেও তুমি থাকবে না। বর্তমান কালের ইয়ং ছেলেমেয়েরা বলে YOLO, you only live ones। তাহলে এত বেঁচে থাকার কি দরকার। এক হাজার কোটি বছরে একশ বছরও যা, পঞ্চাশ বছরও তাই। তুমি যদি সুইসাইড করে নাও, সবারই শান্তি হবে। তোমার জন্য কোন ব্যাপার না, তুমি মরে গেলে তো তুমি শেষ, তোমারও শান্তি বাকিদেরও শান্তি। চারিদিকে যে পাগলামোগুলি করে বেড়াচ্ছ, তাতে তুমিও মরবে, সবারই শান্তি। কিন্তু আমরা তা মনে করি না, আমাদের সমস্যা আছে। কারণ আমি জানি আমাকে আবার ঘুরে আসতে হবে। আর মুক্তি যতদিন না হয়, আমাকে এই এক হাজার কোটি বছর পর্যন্ত চলতে হবে।

আবাসিক স্কুলে হস্টেল গুলিতে ছেলেরা সব সময় খাবার নিয়ে অভিযোগ করে। দেওঘর আশ্রমে মহারাজরা ছাত্রদের সাথে একসাথে বসে খাওয়া-দাওয়া করেন। একদিন ক্লাশ টেনের একটি ছেলে দুঃখ করে বলছে, 'মহারাজ, এই খাবার খাওয়া যায় বলুন'! যে মহারাজকে বলছে, সেই মহারাজ তাকে আরও দুঃখ করে বলছেন, 'তুমি তো আর তিন কি চার মাস পর ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেলে এই হস্টেল ছেড়ে বেরিয়ে চলে যাবে, কিন্তু আমাকে সারা জীবন এই খাবার খেয়ে থাকতে হবে, এটা একবার ভেবে দেখ'। ছেলেটি খুব করুণার দৃষ্টি নিয়ে মহারাজের দিকে তাকালো, সত্যিই তো এই লোকটার খুবই দুরবস্থা। যে মনে করছে, মরে গেলে সব শেষ, তার তো শান্তি। কিন্তু আমরা তো জানি এক হাজার কোটি বছর ধরে আমাকে জন্ম নিতে হবে, মরতে হবে, আবার জন্ম নিতে হবে, আবার মরতে হবে, জন্ম মৃত্যু চলতেই থাকবে।

সেইজন্য ভগবান অর্জুনকে বলছেন, তুমি আগে ঠিক কর তুমি কোন থিয়োরিটা মান। যদি তুমি মনে কর আত্মা অবিনাশী, আত্মা অমর, আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই; আর যদি মনে কর তুমি জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আছ, জন্মেছ, মরবে, মরার পর আবার জন্ম নেবে, তাই এত ভাবার কি আছে। আর যদি মনে কর বাইচান্স জন্ম হয়েছে, মরে গেলে সব শেষ, তাহলে কয়েক বছর আগে আর পিছনে, *তত্র কা পরিদেবনা*, এটাকে নিয়ে এত ভাবার কি আছে। সেইজন্য অর্জুন তোমাকে বলছি, তুমি ভাবাভাবি করো না, তুমি স্বধর্ম পালন কর। স্বধর্ম নিয়ে ভগবান পরে বলবেন, তার আগে পুরো টপিকটা আরও একবার গুছিয়ে আনছেন। কারণ গীতা মূলতঃ বেদান্ত দর্শন, কিন্তু মাঝ মধ্যে অন্যান্য দর্শনকেও নিয়ে আসছেন জিনিসটাকে স্পষ্ট করার জন্য। এবার উনত্রিশ নম্বর শ্লোকে ভগবান বেদান্তের একটা খুব দারুণ সত্যকে নিয়ে আসছেন। তার আগে একটা খুব মর্মস্পর্শী ঘটনার কথা বলা দরকার।

অনেক আগেকার ঘটনা, সেই সময় বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী তেজসানন্দজী মহারাজ। তখনকার দিনে বিদ্যামন্দিরে ফুলটাইম প্রফেসার বেশী ছিলেন না। কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে একজন ফিজিক্সের প্রফেসর সপ্তাহে একদিন বিদ্যামন্দিরে ছেলেদের বিশেষ করে ফিজিক্স পড়াতে আসতেন। উনি সব সময় শেষ পিরিয়ডে ক্লাশ নিতেন। ক্লাশের পর উনি স্বামী তেজেসানন্দ মহারাজের অফিসে এক সঙ্গে বসে এক কাপ চা খেতেন। চা খাওয়ার পর উনি বাসে করে বাড়ি চলে যেতেন। পড়ানোর জন্য তিনি কোন অর্থ নিতেন না, সমাজসেবা হিসাবে পড়াতেন।

একদিন ক্লাশ নিয়েছেন, নেওয়ার পর মহারাজের চেম্বারে গিয়ে চায়ের জন্য বসেছেন। মহারাজ প্রফেসারের দিকে এক নজর তাকিয়ে বলছেন –

'আপনার মুখটা আজ খুব শুকনো লাগছে। এখান থেকে বাড়ি যাবেন তো'?

'না, এখান থেকে আমাকে শ্মশানে যেতে হবে'।

'শ্মশানে কেন যেতে হবে'? অধ্যাপকের একটাই ছেলে, সেদিনই ছেলেটি মারা গেছে। সেই খবর দিয়ে বলছেন, 'শ্মশানে গিয়ে ছেলেকে এখন দাহ করাতে হবে'।

স্বামী তেজেসানন্দজী একজন সন্ন্যাসী, কিন্তু তিনিও কেঁপে উঠলেন। 'ছেলে মারা গেছে? কি বলছেন? কখন'?

'আজ সকালে'।

'এই অবস্থায় আপনি আজ এখানে পড়াতে এলেন'?

'না, আমি ভাবলাম, ছেলেগুলো আমার অপেক্ষায় থাকবে, ছেলে তো চলে গেছে, ওখানে আমার তো এখন কিছু করার নেই, তাই ভাবলাম ছেলেগুলিকে পড়িয়ে দাহ করতে যাব'।

তারপর তিনি ওখান থেকে উঠে চলে গেলেন, ছেলেকে দাহ করতে।

এটাই ঠিক ঠিক Indian outlook, এটা ঠিক ইণ্ডিয়ানও নয়, ইণ্ডিয়ান বলাটা একেবারেই ভুল। পার্ক সার্কাসে প্রচুর মুসলমানরা থাকে, অনেক বছর আগেকার কথা। একটা কি অঘটন ঘটে একটা মুসলিম বাচ্চা মারা যায়। কাগজেও এই খবরটা বেরিয়েছিল। বাচ্চাটির বাবার চোখ ছলছল করছে। তার মধ্যে রিপোর্টাররা জিজ্ঞেস করছে, ভদ্রলোক বলছেন, 'আল্লা দিয়েছেন, আল্লাই নিয়ে নিলেন, কোন ব্যাপার না'। একবার ভাবুন, সন্তান শোক সামলাবার জন্য কতটা শক্তি লাগে। শ্রীকৃষ্ণের সব সময় হাসিমুখ। এই যে তিনটে দর্শনের কথা বলা হল, এর যে কোন একটিকে যদি ধরে থাকে, তাহলে তার দুঃখ কেটে যাবে। কিন্তু ধরা সম্ভব না। আদৌ কি সম্ভব? তিনটে দর্শনের এই টপিকটা এখানে শেষ। ভগবান আবার আত্মার টপিকে ফেরত চলে গেছেন। উনত্রিশ নম্বর শ্লোকে ভগবান বলছে –

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চার্যবচ্চৈনমন্যাঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।।২৯।।

(কেউ কেউ এই আত্মাকে আশ্চর্যতুল্য দেখেন। অন্য কেউ আত্মাকে আশ্চর্যরূপে বর্ণনা করেন। অপর কেউ এই আত্মাকে আশ্চর্যরূপে শ্রবণ করেন এবং কেউ কেউ এনাকে শুনে, বলে বা দেখেও জানতে পারেন না। কারণ আত্মা দুর্বিজ্ঞেয়।)

(দ্বিতীয় ব্যাখ্যা –যিনি আত্মাকে দর্শন করেন, তিনিই আশ্চর্য (দুর্লভ)। যিনি আত্মতত্ত্ব উপদেশ দেন বা শ্রবণ করেন, তিনিও আশ্চর্য। এরূপ আত্মদর্শী, আত্মোপদেষ্টা বা আত্মতত্ত্ব-শ্রোতা অনেক সহস্রের মধ্যে কদাচিৎ দুই-একজনই হয়। কারণ, আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত দুর্বোধ্য। –শঙ্করভাষ্য।)

এর সহজ অর্থ, আত্মাকে কেউ আশ্চর্যের মত দেখে, কেউ আশ্চর্যের মত শ্রবণ করে, কেউ আশ্চর্যের মত বলে, আবার কেউ আছে এর ব্যাপারে কিছু শুনে বুঝতে পারে না। এই যে আত্মতত্ত্ব, আত্মা অনন্ত, আত্মা সর্বজ্ঞ, আর তুমিই সেই। আমরা বুঝতে পারছি না যে, এর কি সাংঘাতিক দাম। আমরা এভাবে কল্পনা করতে পারি; স্বামীজী বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় লেকচার দিয়ে বলতে শুরু করলেন, ওঠো ভারত ওঠো, তোমার শক্তিকে প্রকাশ করো। স্বামীজীর এই আহ্বাণে সারা দেশটা কেমন চার্জড্ হয়ে গেল। অবাক হয়ে সারা দেশ স্বামীজীর কথা শুনছে। কিন্তু দেশ বুঝতে পারছে না যে, স্বামীজী কোন নূতন কথা কিছু বলছেন না। কারণ এটাই ভারতের জীবনদর্শন।

গীতা বলছেন, *আশ্চর্যবৎ*, আশ্চর্য কোন জিনিসটা লাগে? যেটা অদ্ভূৎ জিনিস, আগে কখন দেখা যায়নি। আমরা অনেক সময় বলি, তোমার ব্যবহার দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, আবার কখন বলি, কি আশ্চর্য! কেন আশ্চর্য? এ-রকম কখন আগে দেখিনি। অদ্ভুৎ কিছু হতে হবে, আর তার মত, মানে *আশ্চর্যবৎ*। যেটা আগে দেখা হয়নি, শোনা হয়নি, বলা হয়নি, সেটাই *আশ্চর্যবৎ*, *আশ্চর্যবৎ*, *আশ্চর্যবৎ*।

আত্মতত্ত্ব ছেড়ে দিন, ঠাকুর কথামৃতে বর্ণনা করছেন, যাঁরা জপধ্যান করে, সাধনা করে, তপস্যা করে, তাদের ভিতরে একটা শক্তি জেগে ওঠে। ভিতরের সেই শক্তিকে বলা হয় কুণ্ডলীনি।

কুণ্ডলীনি নীচের দিকে থাকে, তার প্রথম তিনটি নীচে, তার চতুর্থ স্থান হৃদয়। কুণ্ডলীনি হৃদয়ে যখন ওঠে, তখন তাঁর জ্যোতি দর্শন হতে থাকে। তখন অবাক হয়ে বলে 'একি! একি'! ঠাকুর বলছেন, জ্যোতি দর্শনেই বলে 'একি একি'। তাহলে আত্মাকে যদি দর্শন করে, তখন কি হবে?

তুলসীদাস খুব উচ্চমানের কবি, আবার তিনি একজন সন্ত। রামচরিতমানসে অনেক কাহিনী তাঁর নিজের সৃষ্টি। একটা দ্বীপে এক রানী আছে হনুমানকে সেখানে যেতে হবে। মহাবীর হনুমান সেখানে গিয়ে দেখছেন একজন মহিলা প্রচণ্ড ঐশ্বর্যময়ী, দেখতে খুব রূপসী, জাম কাপড়, সোনা, গয়নাতে ভরপুর। হনুমান হাতজোড় করে বলছেন, আপনিই কি এখানকার রানী? মহিলা খুব বিরক্ত হয়ে বলছে, রানী কি দাসী কি দাসী উসকি ম্যায় দাসী বিশ্বাসী। রানীর যে দাসী, সেই দাসীর যে দাসী, সেই দাসীর হলাম আমি বিশ্বস্ত দাসী। কতগুলি ধাপে নামছে, রানী, রানীর দাসী, তার দাসী, সেই দাসীর আমি হলাম বিশ্বাসী দাসী। তার মানে, তুলসীদাসও বর্ণনা করতে পারছেন না, সেই রানীর ঐশ্বর্য কেমন। বর্ণনা কিভাবে করছেন? রানীর দাসীর দাসীর দাসী, রানীর ঐশ্বর্যের বর্ণনা দিয়ে বলবেন, এবার বাকিটা আপনি বুঝে নিন। রাম আর সীতার বিয়ের যে জাঁকজমক, সেটা বর্ণনা দিয়ে বোঝান যাবে না। বোঝানর জন্য তুলসীদাস শিব আর পার্বতীর বিয়ের বর্ণনা করার পর বলছেন, এর থেকে হাজার গুণ জাঁকজমক রাম আর সীতার বিয়েতে হয়েছিল।

একটা বিরাট শক্তিকে বোঝাতে হলে, যেমন শ্রীরামচন্দ্র ভগবান, তাঁর শক্তিকে বোঝাতে হলে কি করে বোঝাবেন? বোঝান যাবে না। সুগ্রীব বলছেন, আমার দাদা বালির এত শক্তি ছিল যে, বিশাল শাল গাছকে এমন নাড়িয়ে দিতেন যে গাছের সব পাতা ঝরে যেত। গাছের সবুজ পাতা কখন কি ঝরে পড়তে পারে, কিন্তু বালির এত শক্তি ছিল যে তিনি বিশাল গাছকে ঝাঁকিয়ে দিলেই সব সবুজ পাতা ঝরে পড়ত। এবার বলছেন, ওখানে পর পর সাত খানা বিশাল শাল গাছ ছিল। বালি একটা বাণেই সাতখানা বিশাল শালগাছকে বিদ্ধ করে দিতেন। সুগ্রীবের কথা শেষ হওয়ার পরেই রাম তূণীর থেকে একটা বাণ নিলেন, ধনুতে সংযোজন করে তীর চালালেন, তীর সাতটা গাছকে ভেদ করে সমস্ত পৃথিবী পরিক্রমা করে আবার তূণীরের মধ্যে ঢুকে গেল। মাঝখান থেকে সাতটা গাছের সমস্ত পাতা ঝরে পড়ে গেল। রামের কত শক্তি বোঝানর জন্য বলা হল।

রামের শক্তি বোঝান হচ্ছে না, ঈশ্বরের শক্তি। ঈশ্বরের শক্তি এই রকম। যে কোন ধর্মে, তা ইসলাম হোক, খ্রীশ্চান হোক, যখন ঈশ্বরকে নিয়ে বর্ণনা করে, তখন এই রকম একটা উপমা দিয়ে বোঝানর চেষ্টা করানো হয় ঈশ্বরের শক্তি কেমন। হৃদয়ে যদি কুলকুণ্ডলীনি জেগে যায়, তখন জ্যোতি দর্শন হয় তাতেই বলছে, 'একি একি'।

ঠাকুর আবার বলছেন, সাত দেউড়ির পারে রাজা। প্রথম দেউড়িতে যে বসে আছে, তাকে দেখেই বলছে, 'এই কি রাজা'? 'ধুস্, এটা তো প্রথম দেউড়ি; রাজাকে যখন দেখবে তখন নিজেই বুঝতে পারবে, তোমাকে আর জিজ্ঞেস করতে হবে না। তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করতে হয়, তার মানে ও রাজা না'। একটার পর একটা দেউড়ি অতিক্রম করে যখন রাজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন সে আর বর্ণনা করতে পারছে না, হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। কেনোপনিষদেও খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, সেই ব্রহ্ম, সেই আত্মতত্ত্ব একটা যক্ষ রূপে দেবতাদের দেখা দিলেন। যক্ষ রূপে মানে, আসলে বর্ণনা করা যাবে না যে জিনিসটা কি। দেবতারা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, এ কে?

এটাই শ্লোকে বলছেন, *আশ্চর্যবৎ পশ্যতি*, আত্মার যখন দর্শন হয়, শুদ্ধ চৈতন্যের যখন সরাসরি অনুভূতি হয় তখন অবাক হয়ে যায়। *আশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ*, যাঁরা আত্মার কথা বলেন, তাঁদেরও চোখে বিস্ময়ের ছটা লেগে থাকে, চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। বাচ্চারাও যখন কোন

আশ্চর্যের কিছু দেখে, স্কুলে যাওয়ার পথে হয়ত দেখেছে, বাড়িতে এসে বড়দের যখন বলে তখন তার চোখগুলো বড় বড় করে বলবে। বাচ্চাদের জগৎটা ছোট্ট কিনা।

আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি, আর যিনি আত্মার কথা শ্রবণ করেন, তিনিও অবাক হয়ে শুনতে থাকেন। সামান্যতম চেতনা যদি আমাদের থাকে, গীতার এই শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা যখন শুনবেন তখন অবাক হয়ে বলবেন, গীতায় এই জিনিসগুলো বলা হয়েছে! বাকিরা শুনে বলবে, যত রাজ্যের গাঁজাখুরি গল্প বলছে। আগেকার দিনের সাধুরা গাঁজা ভাং খেয়ে বুঁদ হয়ে আবোলতাবোল ভাবত, সেগুলোই এখানে বলছে।

কঠোপনিষদে এটাই একটু অন্য ভাবে বলছেন, *আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা*, আত্মতত্ত্বের কথা সবাই বলতে পারে না, যিনি আত্মতত্ত্বের বক্তা, তিনি এক আশ্চর্য পুরুষ। গীতাও সবাই বলতে পারবে না, একটু যদি না বুঝে থাকে বলতে পারবে না। আর আত্মতত্ত্বের কথা শুনে সবাই ধারণা করতে পারবে না। তাঁরাই ধারণা করত পারবেন, যাঁদের কিছু প্রস্তুতি আছে। ঠাকুর খুব সহজ ভাবে বলছেন, উঁচু জায়গায় জল জমে না। একটা বাচ্চাকে বলা হল, এই পাত্রটা করে কল থেকে জল নিয়ে এসো। বাচ্চাটা ট্যাপের তলায় পাত্রটা উল্টো করে রেখেছে, জল আর পাত্রে জমছে না। পাত্রটা সোজা করে রাখলে তবেই না জল জমবে। আমরাও যখন শাস্ত্রের কথা শুনি, পাত্রটা আমরা আস্তে করে উল্টে রেখে দিই। বিষয় ভোগের ব্যাপার যখন আসে তখন পাত্রটা আবার সোজা করে রাখি। ফলে ভোগের সব উপকরণ দিয়ে আমাদের মাথাটা বোঝাই হয়ে আছে। আর যোগের সমস্ত জিনিস পড়ছে ঠিকই, কিন্তু সব বাইরে বেরিয়ে যায়।

এই শ্লোককে এভাবেও বলা যেতে পারে –যিনি আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি একজন আশ্চর্য পুরুষ, (দুর্লভ ব্যক্তি)। যিনি আত্মার কথা শুনেছেন বা উপদেশ দেন তিনিও একজন আশ্চর্য পুরুষ। তার মানে যিনি আত্মতত্ত্ব বোঝাতে পারদর্শি, তিনি কোন সাধারণ জন নন। যিনি শুনে বুঝতে পারছেন তিনিও কোন সাধারণ ব্যক্তি নন। একজন মহারাজের সাথে কথা হচ্ছিল, বেদ অপৌরুষেয় কেন। অন্যান্য ধর্মে অপৌরুষেয় বলা হয় না ঠিকই, কিন্তু ঘুরিয়ে বলেন। যেমন প্রফেট মহম্মদ বলছেন আল্লা এই কথাগুলো বলেছেন, বক্তব্য হল এই কথাগুলো আমার কথা না, ঈশ্বরীয় কথা। বাইবেলে যীশুকে মনে করা হয় তিনি ঈশ্বরের সন্তান। যীশু যা কিছু বলেছেন, সেটাও ঈশ্বরীয় কথা। অপৌরুষেয় কথার অর্থ হয়, এই কথা কারুর মুখের কথা না, মন বা বুদ্ধির কথা না। এই কথা এমনই সত্য যে, এই কথা সবার উপর প্রযোজ্য।

স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, I am a voice without form, কেন বলছেন? স্বামী বিবেকানন্দ যদি ওই কথা না বলে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আর-একজন বলে থাকবেন। আসলে স্বামীজী কোন কথাই নূতন কিছু বলছেন না, স্বামীজীর কথাগুলোকে যদি একটু নাড়াচাড়া করা হয়, তাহলে দেখা যাবে স্বামীজীর কথাগুলো চলে যাবে আমাদের কোন না কোন শাস্ত্রে। যেমন স্বামীজীর কর্মযোগের উপর ভাষণ, যেখান থেকে আমরা পেলাম বিখ্যাত বই কর্মযোগ। কর্মযোগ গীতার তৃতীয় অধ্যায় ও কিছুটা চতুর্থ অধ্যায়ের কথাই বলছেন। মূলতঃ তৃতীয় অধ্যায়কে স্বামীজী শুধু নিজের ভাষায় বলেছেন, এটাই হয়ে গেল কর্মযোগ। স্বামীজীর জ্ঞানযোগ হল পুরোপুরি কঠোপনিষদের বক্তব্য, ঠিক তেমনি ভক্তিযোগ – নারদীয় ভক্তিসূত্র। স্বামীজী এই শাস্ত্রগুলিকে আধার করে ভাষণ দিয়েছেন, কিন্তু নিজের ভাবে ও নিজের ভাষায়।

স্বামীজী একজন ঋষি, শাস্ত্রগুলি যদি ঋষিবাক্য হয়, সেদিক দিয়ে স্বামীজীর প্রতিটি কথাও ঋষিবাক্য। স্বামীজী যে voice without form বলছেন, আসলে স্বামীজী কিছু সত্যকে বলে চলে যাচ্ছেন, এই সত্য কেবলমাত্র স্বামীজীর উপর নির্ভর করে না। আমি বলছি, অমুক আমার বাবা, এটা

একটা conditional truth, এই সত্যটা শুধু আমার উপরই খাটবে, অন্যের উপর খাটবে না। কিন্তু যদি বলা হয়, ভগবান জগতের পরম পিতা, এটা হয়ে গেল অপৌরুষেয় সত্য। কারণ খ্রীশ্চানরাও এই কথা বলছে, জুহুদিরাও এই কথা বলছে, মুসলমানরাও বলে, হিন্দুরাও বলে। কিন্তু হিন্দুরা যখন বলছে, ঈশ্বর; মুসলমানরা যখন বলছে আল্লা, এটা তখন conditional truth হয়ে গেল। আমাদের সব সময় অপৌরুষেয় সত্যে, যেটা unconditional truth সেটাতে focus করতে হয়। যেটা conditional truth, সেটাতে অত focus করার দরকার নেই।

গীতার *আশ্চর্যবৎ পশ্যতি* যেমন আমরা বললাম, কঠোপনিষদে এটাই অন্য ভাবে আসে, আরও যেটা আশ্চর্যের, বাইবেলে যীশুও একই কথা বলছেন। বাইবেল মোটামুটি চারটে অংশে আছে, তার মধ্যে সেন্ট ম্যাথু যীশুর কথাগুলো বলছেন। তেরো নম্বর অধ্যায়ে যীশু নিজের শিষ্যদের বলছেন –অনেক প্রফেট হয়েছেন, অনেক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত মানুষ হয়েছেন, তোমরা যেটা দেখছ, সেটা ওনারাও দেখতে চেয়েছেন, কিন্তু তা তাঁরা দেখতে পারেননি; ওনারা এই কথাগুলো, যে কথাগুলো তোমরা আমার কাছে শুনছ, শুনতে চেয়েছেন, কিন্তু শুনতে পারেননি। ঠিক ঠিক ঈশ্বরীয় কথা, আত্মতত্ত্ব সবাই শোনার সুযোগ পায় না, সবাই দেখার সুযোগ পায় না। যীশু নিজের শিষ্যদের বলছেন, তোমরা এই সুযোগটা পেয়েছ। আবার ওখানকার লোকেরাই যারা এই কথাগুলো শুনেছে, তারা বলছে, যীশু আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, ওকে ক্রুশিফাই কর; তারা শুনেও বুঝতে পারল না। এরপর ভগবান তিরিশ নম্বর শ্লোকে এই প্রসঙ্গের ইতি টানছেন –

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।।৩০।।

(হে ভারত, সমস্ত প্রাণীর দেহে অবস্থিত আত্মা সদা অবধ্য। সেইজন্য কোন প্রাণীর দেহনাশে তোমার শোক করা উচিত নয়।)

অর্জুনের প্রশ্ন ছিল, আমি এদের মারব বা এরা আমাকে মারবে, এতে কার কি হবে? ভগবান বলছেন, হে অর্জুন, তুমি জেনে রেখো, তুমি নিজেকে যে দেহ মনে করছ, সেই দেহের ভিতর যিনি আছেন, তিনি হলেন দেহী। দেহী হলেন মালিক, দেহ হল তার ভৃত্য। যেমন রথ আর রথী, রথী হলেন মালিক, রথ একটা যন্ত্র। এই দেহী যিনি, তিনি সর্বব্যাপী, এর মধ্যে কোন অবয়ব নেই, সেইজন্য দেহীকে কেউ বধ করতে পারে না। আগে যেমন বলা হল, কোন শস্ত্র একে ছেদন করতে পারে না। কি করে ছেদন করবে, দেহী অনন্ত কিনা। অগ্নি এঁকে দগ্ধ করতে পারে না, কি করে দগ্ধ করবে, এনার তো কোন অঙ্গ নেই। আর বলছেন, জল এনাকে সিক্ত করতে পারে না, বাতাস এনাকে শুষ্ক করতে পারে না। সেইজন্য ভিতরে যিনি দেহী আছেন, তিনি *নিত্যমবধ্যোঽয়ং*। তুমি যে মনে করছ এদের তুমি মারবে; না, তুমি মারতে পারবে না। তুমি আমাকে ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন করেছ, আমিও ধর্ম দিয়ে উত্তর দিচ্ছি। ভগবান ধর্মের আবার তিনটে দৃষ্টিভঙ্গীকে নিলেন, কিছু আগে আমরা তিনটে জীবনদর্শনের মাধ্যমে যার আলোচনা করলাম।

তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি, শুধু তুমি না, জগতে যত প্রাণী আছে সবার সামনে দুটো সত্য; একটা সত্য হল যেটা চোখের সামনে আছে, আরেকটা সত্য হল যেটা ভিতরে আছে। আগেকার দিনে কোন স্কুলে বা চাকরির ফর্ম ভরার সময় বলত, নাম, বাবার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, বর্তমান ঠিকানা। ঠিকানা দুই প্রকার হয়, permanent and present, আপনার দুটো ঠিকানা হয়ত এক হতে পারে, কিন্তু দুটো ঠিকানাই জিজ্ঞেস করবে। ঠিক তেমনি আমাদের যে অস্তিত্ব, এই অস্তিত্বও দুটো, একটা permanent আরেকটা present। আমার Present যে অস্তিত্ব, সেটা হল, আমি স্বামী সমর্পণানন্দ, আমার permanent অস্তিত্ব হল শুদ্ধ পবিত্র আত্মা। আমি কোনটার সাথে নিজেকে জুড়ে রাখব, সেটা আমার ব্যাপার। কিন্তু ভগবান আগে দেখালেন, তুমি যদি নিজের দেহের সাথেও

জুড়ে রাখ, তাতেও তোমার শোক করার কিছু নেই, সৃষ্টির পর পনেরশ কোটি বছর চলে গেছে, সামনে পনেরশ কোটি বছর পড়ে আছে, মাঝখানে মাত্র কয়েকটা মুহূর্তের জন্য তোমার অস্তিত্ব, এর জন্য এত কান্নাকাটি করার কি আছে।

এই বলে ভগবান এখানে আত্মতত্ত্বের আলোচনা শেষ করলেন। এরপর সপ্তম অধ্যায়ে অল্প একটু আত্মতত্ত্বকে নিয়ে বলবেন, তারপর ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আবার পুরোদমে আত্মার আলোচনা আসবে। এখান থেকে ভগবান লৌকিক ধর্ম, তুমি ক্ষত্রিয়, নিজের ধর্ম ত্যাগ করো না, এই জিনিসটাকে বোঝাবেন। আর সেখান থেকে শুরু হবে কর্মযোগ।

এতক্ষণ আমরা যা আলোচনা করছিলাম, এটাকে বলে সাংখ্যযোগ, এই সাংখ্যযোগকে আবার কপিলের সাংখ্য দর্শনের সাথে গুলিয়ে ফেলা যাবে না, কারণ কপিলের সাংখ্য দর্শন পুরো আলাদা। গীতার সাংখ্যযোগ মানে শুদ্ধ বেদান্ত, সাংখ্য মানে ঠিক ঠিক; সত্য যেমনটি তেমনটি দেখা, এটাকেই সাংখ্যযোগ বলা হয়। গীতাতে সাংখ্যযোগ আর কর্মযোগ, এই দুটো যোগের কথা বলছেন। সাংখ্য হল তত্ত্ব, কর্মযোগ হল তত্ত্বকে পাওয়ার উপায়। কর্মযোগ একটু পরে আসবে, কিন্তু তার আগে আমরা আলোচনা করব স্বধর্মকে নিয়ে। ভগবান অর্জুনকে বলছেন, তুমি যদি স্বধর্মের দিকেও তাকাও, তাও তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে।

এগারো থেকে কুড়ি নম্বর শ্লোক, এই কুড়িটি শ্লোক হল হিন্দু ধর্মের অধ্যাত্ম দর্শন, হিন্দু ধর্মের প্রাণ। যিনি এই কুড়িটি শ্লোক ভাল ভাবে বুঝে নিতে পারবেন, তাহলে তাঁর হিন্দু ধর্মের ধর্মকে নিয়ে যে মূল আদর্শ, সেটা একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই কুড়িটি শ্লোক এমনিতে সহজ মনে হবে, কিন্তু খুব সূক্ষ্ম, তাই সহজে ধারণা করা যায় না। সেইজন্য গীতা আস্তে আস্তে এটাকে বিস্তারে নিয়ে যাচ্ছেন।

অর্জুনের যে প্রশ্ন ছিল, সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান পারমার্থিক দৃষ্টিতে বললেন, অর্জুন, তোমার জীবনদর্শন যাই থাকুক, তুমি জন্মেছ তুমি মরবে, এই মতে যদি তুমি বিশ্বাস করো, তাতেও তুমি স্বধর্মকে কেন ছাড়বে। যদি তুমি মীমাংসক এবং সাধারণ লোকেদের মত মনে কর, তোমার নিত্য জন্ম, নিত্য মৃত্যু; তাতেও কোন দোষ নেই। আর যদি শুদ্ধ বেদান্তের দিক থেকে মনে কর, তাহলে তো আর কোন প্রশ্নই নেই, কিসের জন্ম, কিসের মৃত্যু! আমাদের উপনিষদ এই ভাবকে নিয়েই চলেন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে আবার এই আত্মতত্ত্বের পুনরাবৃত্তি করবেন। সেখানে বলবেন, *যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে,* আমিত্ব বোধ যার নাশ হয়ে গেছে, বুদ্ধি যার কোন কিছুতেই লিপ্ত হয় না; *হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে,* সে সমস্ত বিশ্বকে নাশ করে দিলেও তার কোন বোধ হয় না, আর নিজের নাশ হয়ে গেলেও কোন কিছুর নাশ হয় না। এটাই গীতার সার। বুদ্ধিটা যেন কোন কিছুতে লিপ্ত না হয়, বুদ্ধি যেখানে লিপ্ত হবে আপনি সেটাই। বুদ্ধি যখন আত্মতত্ত্বে লিপ্ত হয়, তখন কোন কিছুই তাকে নাশ করতে পারবে না, সেও কোন কিছু নাশ করতে পারবে না।

একত্রিশ নম্বর শ্লোক থেকে ভগবান একেবারে অন্য একটা পন্থা নিচ্ছেন। এই পন্থাটাই পরে ধীরে ধীরে ধর্মতত্ত্বে ঢুকে যাবে, অর্থাৎ কর্ম, এবং কর্ম থেকে কর্মযোগে ঢুকবেন। ভগবান বলছেন, পারমার্থিক ব্যাপারটা আমরা ছেড়ে দিলাম, এবার সবটাকে তুমি পুরো জাগতিক দৃষ্টিতে দেখ। গীতা যদিও মূলতঃ পারমার্থিক, কিন্তু জগতে সব কিছুকে যেভাবে দেখা হয়, সেটাকেও জানা দরকার, ভগবান তাই ওই লৌকিক দৃষ্টিতে এখন বলছেন। ইদানিং ম্যানেজমেন্ট ক্লাশে গীতার উপর অনেক স্টাডি করতে হয়, তাঁরা মূলতঃ গীতার এই অংশ থেকেই যুক্তি ও শিক্ষা নেন।

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।।৩১।।

(আর স্বধর্মের দিক থেকে যদি লক্ষ্য করো, তাতেও তোমার ভীত হওয়া উচিত নয়। কারণ, ধর্মসঙ্গত যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মঙ্গলকার কিছুই নাই।)

তুমি পারমার্থিক দৃষ্টিকে ছেড়ে দাও, যদিও তোমার প্রশ্ন পারমার্থিক ছিল; কিন্তু তুমি যদি নিজের স্বধর্মেকেই দেখ, মৃত্যুকে ছেড়ে যদি তোমার এই জীবনটাকেই শুধু নাও, তাহলেও ধর্ম থেকে তোমার বিচলিত হওয়াটা ঠিক নয়। তুমি ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের জন্য ধর্মযুদ্ধ, ধর্মযুদ্ধ থেকে ভাল জিনিস তোমার জন্য আর কিছু হতে পারে না। এখানে *স্বধর্মমপি* বলছেন, তৃতীয় অধ্যায়ে আবার বলবেন, *স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ*, পরের ধর্ম নেওয়া থেকে নিজের স্বধর্মে মৃত্যু বরণ করা অনেক ভাল। স্বধর্ম কথাটা খুব নামকরা কথা, আর ইদানিং রাজনৈতিক নেতারাও রাজধর্ম, স্বধর্ম শব্দগুলি প্রচুর ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। এখানে একটা ছোট ব্যাখ্যার দরকার।

ধর্ম মানে, যেটা আমাদের ধরে আছে। যেমন অগ্নির ধর্ম হল দাহিকা শক্তি। বাইবেলে যীশুও বলছেন, লবণের যদি লবণত্ব চলে যায়, সেটা আর কোন কাজে লাগে না, পাথর মনে করে ফেলে দিতে হয়। জলের ধর্ম আর্দ্রতা, সব কিছুকে ভিজিয়ে দিতে পারে। আর্দ্রতা ভাব যদি চলে যায়, সেটাকে আর জল বলা যাবে না। এই হিসাবে তাহলে মানুষের কি ধর্ম? আমরা সহজে এর অনেকগুলো ব্যাখ্যা করে দিই; তুমি মানুষ তোমার এই এই করা উচিৎ, তুমি মানুষ তোমার এই করা উচিৎ নয়। আরও সহজে বলে দেওয়া যায়, স্বধর্ম। জিনিসটাকে যদি বুঝতে হয়, আমাদের আরেকটু গভীরে যেতে হবে।

আমরা অনেক আগে একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম, collectivism, individualism and universalism, আমরা যদি এটাকে ভাল করে একবার বুঝে নিতে পারি, তাহলে স্বধর্ম জিনিসটা বুঝতে অনেক সুবিধা হবে। যখন একটা জিনিসকে আরেকটা জিনিস থেকে আলাদা করা যায় না, ওটাকে তখন বলে collectivism, পুরো জিনিসটা এক হয়ে আছে। কাঠের গোলাতে সব কাঠের টুকরো জড়ো করা আছে, সব কাঠ একই রকম দেখতে; এটাকে বলে collectivism। একটা কাঠের টুকরো বদলে আরেকটা কাঠের টুকরো নিলাম, কিন্তু দুটোই সমান। একই গাছ থেকে এসেছে, একই ভাবে কাটা হয়েছে, একই ভাবে সিজিনিং করা হয়েছে, সবটাই এক। এবার ওই কাঠ দিয়ে একটা চেয়ার বানানো হল, চেয়ারটা আর ওই collectivity তে নেই, কাঠ আলাদা, চেয়ার আলাদা। চেয়ার সেটাও কিন্তু কাঠ। আগেকার দিনে কাঠকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হত; চাইলে চেয়ারকেও আমরা জ্বালানি হিসাবে লাগাতেই পারি। চেয়ারকে কাঠ হিসাবেও ব্যবহার করা যায়, আবার চেয়ারকে চেয়ার হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। কিন্তু কাঠের যে দাম তার থেকে চেয়ারের দাম বেড়ে গেছে, তার একটা individuality এসে গেছে।

চেয়ার শুধু এক রকমের হয় না, অনেক রকমের ডিজাইনের হতে পারে। কিন্তু সব চেয়ার যখন একসাথে রাখা থাকে, তখন একটা চেয়ার আরেকটা চেয়ারের সাথে সমান। এখন একজন বিশেষ দক্ষ কারিগর একটা চেয়ারকে খুব সুন্দর ডিজাইন করে একটা অর্নামেন্টাল চেয়ার তৈরী করল। ওই সূক্ষ্ম কাজের জন্য এই চেয়ারটার দাম বেড়ে গেল। দেখে মনে হবে ওর individuality বেড়ে গেল, কিন্তু individuality বাড়ে না, individuality বাড়া মানেই হয় universality বাড়া, ওর universality বাড়ছে। কারণ এই চেয়ার এখন ornamental groupএর সাথে থাকতে পারে, ওকে আমরা চেয়ার হিসাবে কাজে লাগাতে পারি, ওটাকে আমরা কাঠ হিসাবেও কাজে লাগাতে পারি। কাঠ এখন তিনটে অবস্থায় চলে গেল।

এটাকে এবার যদি রাজসিংহাসন রূপে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়, তখন এর individuality আরও বেড়ে গেল। কিন্তু তার সাথে সাথে বেড়ে গেল তার universality। রাজসিংহাসন যদি কাঠের হয়, সেটা একদিকে রাজসিংহাসন, আবার ornamental চেয়ার, আবার শুধু চেয়ার, আবার কাঠ, সবটাই হতে পারে।

একটা খুব সুন্দর গল্প আছে। ইউরোপে, বিশেষ করে ইতালিতে আগেকার দিনে অনেক রকম খুব সূক্ষ্ম সংস্কৃতি ছিল। প্রাচীন রোমের সংস্কৃতি খুব উচ্চমানের ছিল। রোমে একজন খুব বড় শিল্পী ছিলেন, অনেক কিছুতে তিনি খুব সূক্ষ্ম কাজের মাধ্যমে তিনি নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে গেছেন, কিছুটা চিত্রকলায়, কিছুটা কার্ভিংএর কাজ করেছিলেন। একজন খুব সাধারণ মানুষ, আগে তার দিনকাল ভাল ছিল, এখন খুব খারাপ অবস্থা। তার বাড়িতে একবার এক খুব নামকরা শিল্পী এসেছেন, টেবিলটা দেখে বলছেন, 'আরে এই টেবিলটা তো অমুক শিল্পীর করা; এই শিল্পটার এক জায়গায় বর্ণনা আছে, এর দাম তো লক্ষ লক্ষ টাকা। তবে এটা প্রমাণ করতে হবে যে এই শিল্প অমুক শিল্পীই করেছেন'। বলছেন, 'এই শিল্পী তাঁর প্রত্যেকটি কাজে, নিজের নামটা লিখে রাখেন, যেমন এই টেবিলের পায়াতে খুব সূক্ষ্ম ভাবে উনি নিজের নামটা লিখে রেখেছেন। ওই নামটাই প্রমাণ যে এটা ওনার রচনা'।

বলতে বলতে তাঁর নজর টেবিলের পায়ার দিকে গেছে। 'টেবিলের একটা পায়া দেখছি না, পায়াটা কোথায়'? বাড়ির গিন্নী বলল, 'আপনি খেতে আসবেন, বাড়িতে কাঠ ছিল না, ওটাকে উনুনের কাজে লাগিয়ে দিয়েছি'। যেটা প্রমাণ সেটাই শেষ হয়ে গেছে। এত দামী জিনিস, এটাকে কেউ জ্বালানি হিসাবে লাগাতেই পারে, কোন আপত্তি নেই। মানুষের এটাই বৈশিষ্ট্য। একটা ছোট্ট ইউনিসেলুলার এ্যমিবা বা করোনা ভাইরাস, যখন ঢুকছে সব শেষ করে দিচ্ছে। মানুষও তাই, যখন ঢুকবে শেষ করে দেবে। মানুষ নিজেকে কখন ভাইরাস রূপে, এ্যমিবা রূপে ব্যবহার করতে পারে, বাঘ, সিংহ, কুকুর বেড়াল, ছাগলের মতও ব্যবহার করতে পারে। বেশীর ভাগই ছাগলের মতই ব্যবহার করে।

এটা হল মানুষের collectivity, সেখান থেকে মানুষ আস্তে আস্তে উপরে দিকে উঠছে। আরও উপরে উঠতে উঠতে শেষ যেটা উঠতে পারে, তা হল, মানুষ ঈশ্বর দর্শন করতে পারে। এটা তার individuality, এটাই তার ঠিক ঠিক personality, এটাই তার uniqueness, এই uniqenessটা হওয়ার পিছনে একটা জিনিস আছে, কারণ তার রয়েছে universality। Individuality আর universality, আসলে দুটো এক।

ওরহান পামুর একজন নামকরা সাহিত্যিক, তাঁর My Name Is Redএ উনি ঠিক উলটো বলছেন। Styleকে তিনি বলছেন, এটা হল তার defect, একটা জিনিস আছে, তার একটা সিস্টেমে কিছু defect হয়ে গেল, লোকেরা সেটাকেই defect বলে চালাতে শুরু করে দিল। প্যান্ট বানাতে গিয়ে কাপড় কম পড়ল, আরেকটা কাপড় জুড়ে দিল, লোকেরা ওটাকেই ফ্যাশান বলে চালিয়ে দিল। এই ফ্যাশান জিনিসটা কি universal? না। আমি বলছি আমি আলাদা, আমরা সবাই মনে করি আমি আলাদা। একদম ঠিক, আপনি সবার থেকে আলাদা, কারণ আপনার মধ্যে defects অনেক বেশী রয়েছে। এত বেশী defects রয়েছে যে, আপনি নিজেকে যে individual মনে করছেন, আসলে আপনি individual না, আসলে আপনি অনেক নীচু স্তরে আছেন। কারণ যার মধ্যে ঠিক ঠিক individuality রয়েছে, আপনি যদি আলাদা কিছু হন, universalityর যে পিরামিড তাতে আপনি সবচেয়ে উপরে থাকবেন। আপনি সব কটার সঙ্গে এক থাকবেন। উপর থেকে নীচ পর্যন্ত, যে রাজসিংহাসনের কথা বলা হল, ওখান থেকে শুরু করে কাঠের যে টুকরো, সব কটার সঙ্গে আপনি এক।

কিন্তু আমরা বেশীর ভাগই হলাম defective জিনিস। Defective জিনিস কারু সঙ্গে ফিট করে না। গাড়ির একটা পার্ট ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করছে, ওটাকে খুলে ফেলে দিয়ে একটা নূতন পার্ট লাগিয়ে দেওয়া হল। এখন ওই খুলে দেওয়া পার্ট বলছে, দেখেছো আমি কত আলাদা, আমি ওদের মত না, ওরা সবাই গাড়ির মধ্যেই পড়ে আছে। তুমি আলাদা করে কেন ভাবছ, তুমি তো এখন বাতিলের দলে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমরা সবাই ফেলে দেওয়া মাল, কিন্তু মনে করছি আমরা ইউনিক। কিন্তু ভাবছি, I am unique in every sense, সমাজ আমাকে চিনতে পারল না। সমাজ তোমাকে ঠিক চিনেছে, চেনার পর তোমাকে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে।

এর verification কোথায় হয়? Verificationটা হয় স্বধর্মে এসে। স্বধর্মকে পরিভাষিত করার সময় হিন্দুরা সব সময় colecetive level থেকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে indivudality leveleএ নিয়ে যাবে, individual level থেকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে universalর শেষ সীমাতে নিয়ে চলে যান। অন্যান্য ধর্মে বিশেষ করে ইসলাম, খ্রীশ্চান ধর্মে একটি মাত্র বই আছে, সেই বইতে বলে দিয়েছে তুমি কি করবে কি করবে না। হিন্দুদের সবটাই open system। হিন্দুদের কিছু কিছু আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত রয়েছে। তাহলে মানুষ হিসাবে আমরা কি কি হতে পারি? মানুষ হিসাবে আমরা সমস্ত প্রাণীর সাথে এক, মানুষ হিসাবে যে কোন দেশের, *বসুধৈব কুটুম্বকম্*, তার সাথে এক; ভারতের নাগরকি হিসাবে আমি এক, বাঙ্গালী তাই বাংলার লোকেদের সাথে আমি এক, পরিবারের লোক বলে আমি পরিবারের সবার সাথে এক, সমাজে আছি তাই সমাজের সাথে এক। কিন্তু সবচেয়ে বেশী হল, আমি আমার নিজের জন্য এক। দরকার আমার নিজের উন্নতি। তার সাথে দরকার, এই যে এত কিছুর সাথে আমি জড়িয়ে আছি, সেইজন্য সবারই প্রতি আমার কর্তব্য রয়েছে। আমার বাড়ির লোকের প্রতি, মা-বাবার প্রতি কর্তব্য রয়েছে। বিয়ে করে থাকলে স্ত্রীর প্রতি, সন্তানের প্রতি কর্তব্য রয়েছে। তাছাড়া সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি আর সমস্ত মানবজাতির প্রতি আমার কর্তব্য রয়েছে। এই সমস্ত কর্তব্যকে একটা জায়গাতে হিন্দুরা গুছিয়ে আনছেন, সেটাকে এনারা বলছেন বর্ণাশ্রম।

হিন্দু ধর্মের চারটি আশ্রম, প্রথম ব্রহ্মচর্য আশ্রম। ব্রহ্মচর্য আশ্রমে কেউ স্বাধীন ভাবে অর্থোপার্জন করে না। দ্বিতীয়, বিবাহ করার পর সংসারে প্রবেশ করা। বিবাহও যদি না করেন, অনেকে অকৃতদারও থাকেন, তাকেও একটা সময়ের পর গৃহস্থ মনে করা যেতে পারে, যদি সে স্বাধীন ভাবে অর্থোপার্জন করে। বাণপ্রস্থ গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী আশ্রমের মাঝামাঝারি। তার আয় কিছুটা আসে গৃহাস্থাশ্রম থেকে, কিন্তু অন্য দিকে সে ত্যাগের পথে চলে গেছে। চতুর্থ ও শেষ আশ্রম সন্ন্যাসী, তার কোন জাগতিক উপার্জন থাকবে না। ব্রহ্মচর্য আশ্রম ও সন্ন্যাস আশ্রমে কোন আয় নেই, সেইজন্য এরা সবাই গৃহস্থের উপর নির্ভর করে। আর ঠিক এই কারণেই গৃহস্থকে খুব সম্মানের চোখে দেখা হয়। কারণ গৃহস্থ যদি না থাকে তাহলে ব্রহ্মচারীও থাকবে না, সন্ন্যাসীও থাকবে না। আর বাণপ্রস্থীরা গৃহস্থাবস্থায় এককালে যে আয় করেছিল, সেই আয় দিয়ে এখন চলছে।

ব্রহ্মচারীরা কিভাবে থাকবেন, গৃহস্থরা কিভাবে থাকবেন, বাণপ্রস্থী বা সন্ন্যাসীরা কিভাবে থাকবেন, এগুলিকে মনু কোডিফাই করে দিয়েছেন। মহাভারত ও আমাদের অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রেও এর আলোচনা রয়েছে। কিন্তু এগুলো গতিশীল, মনু নিজেও বলেছেন দেশ ও কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে এগুলোও একটু একটু করে পাল্টাবে, নূতন করে ধর্মশাস্ত্র রচনা হবে। আশ্রম ধর্মই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখান থেকে নিজের নিজের উন্নতি সাধন হয়ে থাকে। হিন্দুদের জীবনের উদ্দেশ্য হল মুক্তি, আমরা সবাই মুক্তির পথে এগোচ্ছি। কিন্তু সচেতন ভাবে মুক্তির দিকে এগোতে হলে এই চারটে অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, আমাদের এগোতে হবে। নিজের প্রতি, পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি আমাদের সবারই কর্তব্য আছে, এটাকে বলে বর্ণ।

খড়্গাপুরের মত বড় বড় আইআইটিতে মাঝে মাঝে Pre placement counseling হয়, সেখানে সেকেণ্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার, ফোর্থ ইয়ারের হাজার হাজার স্টুডেন্টসরা অংশ নেয়, এটা চাকরিও না, চাকরির আগে কাউন্সেলিং। একজন প্রফেসর খুব দুঃখ করে বলছিলেন, কোন ছেলে জিজ্ঞেস করে না, আমাকে কি কি কাজ করতে হবে, আমার দায়ীত্ব কি হবে, সবাই জানতে চায় আমার স্যালারি কত, আর কি কি প্যাকেজে পাবো। এটাই দেশের দুর্ভাগ্য। আমরা এইসব প্রতিষ্ঠানে ছেলেদের শিক্ষা নিতে পাঠাই, আর ওখানে গিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে মাথার মধ্যে হিসাব ঘুরতে থাকে, পাশ করে বেরিয়ে আমি কত টাকা আয় করব। এই কাজটা বৈশ্যদের, টাকা অর্জন করা।

আমাদের দেশের বর্তমান যে শিক্ষা ব্যবস্থা, তাতে শিক্ষা কম ব্যবস্থা বেশী। ব্যবস্থা মানে, যিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন তিনি নিজের ব্যবস্থা করে নেন, আর যারা করছে তাদেরও একটা ব্যবস্থা করে দেন। বলে না, আমার একটা ব্যবস্থা করে দাও। এখানেও শিক্ষা গেছে, ব্যবস্থাটাই আছে। হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা কখনই এভাবে ছিল না। হিন্দুদের ব্যবস্থা ছিল, সমাজের প্রতি তোমার এই এই দায়ীত্ব, তুমি দায়ীত্ব পালন করবে। বদলে তোমার জীবন চালানোর জন্য কিছু দেওয়া হবে, যাতে সবারই চলে যায়। এই ভাবে আমাদের সমাজে শত শত জাতি উদ্ভব হয়েছে। একটা জাতি ছিল, যাদের কাজ ছিল শুধু মাটি খুঁড়ে কুয়ো থেকে জল বার করা। এই একটা কাজেই তারা বংশ পরম্পরায় দক্ষ ছিল। একটা জাতি ছিল, যারা এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় পাল্কিতে লোকদের বহন করে নিয়ে যেত। একটা জাতি ছিল, যারা শুধু নৌকা চালাতো। তারা ওই কাজ করে করে দক্ষতা অর্জন করে, নূতন নূতন উদ্ভাবন দিয়ে ওই জিনিসটার আরও উন্নত করে যেত। আর বংশ পরম্পরায় ধরে শুধু এই কাজই করে যাচ্ছে। ওই জাতির জ্যেষ্ঠরা যা করতেন সেটাই ধর্ম, কিন্তু ওই ধর্ম আমাদের বেদ থেকেই আসত।

পরে পরে আমাদের ঋষিরা দেখলেন, হাজার হাজার জাতি, হাজার হাজার ধর্ম তো হতে পারে না, সব কটাকে চারটেতে নিয়ে এসো। এসে গেল, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। যারা শুধু বিদ্যাকে নিয়ে থাকবে, তারা ব্রাহ্মণ। সমাজ ব্যবস্থাকে রক্ষার জন্য এবং অপরের রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য যারা প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, আর বাইরের কোন আক্রমণ হলে দেশ ও সমাজকে প্রতিরক্ষা করবে, রক্ষা ও প্রতিরক্ষা ক্ষত্রিয়ের জন্য এই দুটো কাজ। অর্থ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করা বৈশ্যের কাজ। এর বাইরে বাকি যা কিছু আছে, পরচর্যাদি, এগুলো শূদ্রের কাজ।

এবার আমাদের পুরো জিনিসটাকে বিচার করতে হবে। ধরুন একজন ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু সে চালাচ্ছে রেল, এখানে টেকনিক্যালি সে কিন্তু একজন শূদ্র, কারণ ওটা পরিচর্যাত্মক কর্ম, সে একটা service sectorএ আছে। কিন্তু একজন ইঞ্জিনিয়ার, সে বলছে, আমি শুধু গবেষণা নিয়ে থাকব, ওই ইঞ্জিনিয়ার চলে যাবে ব্রাহ্মণ বর্ণে। একজন রেল চালাচ্ছে, সে হয়ে গেল শূদ্র। যে বলছে, আমি ব্যবসা করে জীবন চালাবো, সে হয়ে গেল বৈশ্য। আর যে মনে করছে আমি চুরি চামারি করে টাকা কামাব, সে শূদ্র থেকেও নীচে চণ্ডালে চলে গেল। পুরো ভারতবর্ষ জাতিটাই এখন চণ্ডাল জাতিতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আজকে এই ব্যঙ্ক বন্ধ হয়ে গেল, কাল অমুক ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আর দেখা যাচ্ছে সবাই টাকা মেরে বসে আছে। এগুলো সবই চণ্ডালের কাজ। ঋষিরা এই চারটে বর্ণ তৈরী করে বলে দিলেন –তোমার সমাজের প্রতি এই এই দায়ীত্ব। হিন্দুরা যখন ধর্মের কথা বলে তখন তারা বর্ণাশ্রম ধর্মের কথাই বলে। এই বর্ণাশ্রম ধর্মকে কোডিফাই করেছেন, মনু, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্যের মত মহান ঋষিরা। এই ধরণের অনেক ঋষিরা ছিলেন, যাঁরা তাঁদের সময় বিভিন্ন স্মৃতি দিয়ে গেছেন। বাংলায় যেমন রঘুনন্দন স্মৃতি চলে। কিন্তু পরে দেখা গেল, বেশীর ভাগ স্মৃতি বিয়ে কিভাবে হবে, শ্রাদ্ধ কিভাবে হবে, এই জিনিসগুলির দিকে বেশি চলে গেছে। দায়ীত্ব জিনিসটা কোন

ভাবে চলছে; এখনও পুরোটাকে কোডিফাই করে এনে কেউ যে বলবেন, হিন্দু ধর্ম বলতে এই; এই এই সিদ্ধান্ত, জিনিসটা এভাবে হবে, সেভাবে এখনও কিছু হয়নি।

স্বধর্মে আশ্রম ধর্ম ও বর্ণধর্ম এই দুটো প্রথম আসে। এরপর তৃতীয় যেটা আসে তার নাম বর্ণাশ্রম ধর্ম, এটাও একটা টেকনিক্যাল শব্দ; যেখানে বর্ণ আর আশ্রম দুটো মিলে গিয়ে একটা ধর্ম হয়। যেমন একজন ক্ষত্রিয়, তার বয়স হয়ে গেছে, এখন তিনি আর লড়াই করতে পারবেন না। তিনি এখন ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যুবকদের শিক্ষা দেবেন। এখনও সেনাবাহিনীতে এই সিস্টেম আছে, যখন তরুণ থাকে তখন লড়াই করছে। একটা বয়সের পর তাঁরা আর যুদ্ধ করেন না, সৈন্য বাহিনীতে যারা নূতন আসে তাঁরা তাদের ট্রেনিং দিতে শুরু করেন। একটা বিশেষ বয়স হয়ে যাওয়ার পর দায়ীত্বটাও পাল্টে যায়। ব্রাহ্মণ যদি গৃহস্থ হন তাঁর এক রকম কর্তব্য, ব্রাহ্মণ যদি বাণপ্রস্থি হন, তখন তাঁকে অন্য রকম দায়ীত্ব পালন করতে হয়। ক্ষত্রিয় গৃহস্থ হলে তার এক রকম দায়ীত্ব, সেই ক্ষত্রিয়ই যখন বাণপ্রস্থি হয়ে গেল, তখন তার দায়ীত্বও অন্য রকম হয়ে যাবে। তার মানে, বয়সের সাথে সাথে ওই বর্ণের মধ্যে থাকলেও তার দায়ীত্ব পাল্টাতে থাকে।

স্বধর্মের সাথে চার নম্বর থাকে নিমিত্তধর্ম। নিমিত্তধর্মের অর্থ প্রায়শ্চিত্ত কর্ম করা। যারা বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যে থেকে বিভিন্ন দায়ীত্ব পালন করছে, সেখানে জান্তা-অজান্তায় সবাই অনেক ভুলভ্রান্তি করবেই। সেইজন্য আমাদের হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত করার বিধান দেওয়া হয়েছে, যেমন একাদশী ব্রত পালন করা, তীর্থে যাওয়া, গঙ্গাস্নান করা, গঙ্গাজল মুখে দেওয়া, কুম্ভে যাওয়া, এগুলো নিমিত্তধর্মের মধ্যে পড়ে। পাঁচ নম্বর হল গুণধর্ম। গুণধর্ম হল, একটা বর্ণে আছে এবং কোন একটা আশ্রমে আছে, সেখানে তাকে বর্ণধর্ম পালন করতে হচ্ছে, তার সঙ্গে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করতে হচ্ছে, কিন্তু ওই বর্ণাশ্রমে সে একটা বিশেষ পদমর্যাদায় এসে গেছে; যেমন একজন ক্ষত্রিয় রাজা, রাজা এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছে। ফলে ওই ক্ষেত্রে তাঁর কর্তব্যগুলি একটু পাল্টাবে কিন্তু রাজা হিসাবে দায়ীত্বটা ঠিক থাকবে। একজন ক্ষত্রিয় রাজা, তার এখন কত রকমের দায়ীত্ব, যেমন ক্ষত্রিয় হিসাবে তার কিছু কর্তব্য আছে, আবার সে একজনের স্বামী, স্বামী রূপে তার কিছু কর্তব্য আছে; সন্তান আছে, বাবা হিসাবে কিছু দায়ীত্ব আছে এবং সে রাজা, রাজা হিসাবে তার কিছু দায়ীত্ব আছে।

সীতাকে বনবাসে পাঠানোর পিছনে শ্রীরামের এই দ্বন্দ্বটা তৈরী হয়েছিল। গুণধর্ম আর শ্রীরামের আশ্রম ধর্ম, এই দুটো ধর্মের মধ্যে বিরোধ লেগেছে। গুণধর্ম বলছে, তুমি রাজা, তোমাকে রাজার মত আচরণ করতে হবে। আশ্রম ধর্ম বলছে, সীতার ভালমন্দ তোমাকে দেখতে হবে। দুটো ধর্মের এই দ্বন্দ্ব গীতার বিষয় না, এটা মহাভারতের বিষয়। দুটো ধর্মের মধ্যে বিরোধ হয়ে গেলে কোন ধর্মটা নিতে হবে, এই জিনিসটাকে বুঝতে হলে আমাদের মহাভারত ও বাল্মীকি রামায়ণে যেতে হবে। মানুষের জীবনে এই দ্বন্দ্ব প্রায়ই লেগে থাকে। একজন শিক্ষক, তার ছেলেও সেই স্কুলে পড়ে; একদিকে সে শিক্ষক, অন্য দিকে সে সন্তানের পিতা। গার্হস্থ্য ধর্ম বলছে, তুমি সন্তানকে এভাবে দেখবে, অন্য দিকে গুণধর্ম বলছে, তুমি এর শিক্ষক, তুমি একে এভাবে দেখবে। ফলে কিছু দ্বন্দ্ব আসবে। তবে সবটা মিলিয়েই ধর্ম তৈরী হয়। শেষ ধর্ম হল সামান্য ধর্ম, সামান্য ধর্ম মানে, মানবজাতির প্রতি আমাদের সবারই কিছু দায়ীত্ব আছে।

ক্ষত্রিয়রা ক্ষমতার শীর্ষে রয়েছে। কোন রাজার কাছে অনেক সময় কেউ এসে বলত, আমি আপনার শরণাগত। রাজা বলে দিল, ঠিক আছে, তুমি আমার রাজ্যে আশ্রয় নাও। এবার যে রাজার হাত থেকে বাঁচার জন্য সে পালিয়ে এসেছে, সে তাকে আক্রমণ করতে এসেছে, রাজা কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাকে কোন দিন ছাড়বে না। কারণ সামান্য ধর্ম তাকে বলছে, তুমি শরণাগতের রক্ষা করবে, অন্য দিকে তার গুণধর্ম বলছে, নিজের প্রজাকে রক্ষা কর, গৃহস্থ ধর্ম বলছে, পরিবারের সদস্যদের রক্ষা কর। ওনারা সামান্য ধর্মকে সব সময় সবার উপরে রাখতেন। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে এই

জিনিসগুলিকে তাঁরা বিভিন্ন ভাবে বলেছেন। আমরা এর বিস্তারে যাচ্ছি না, আর এটা আমাদের বিষয়ও না। এই ছটিকে মিলিয়ে স্বধর্ম।

বর্তমান যুগের নিরিখে স্বধর্ম হল, যে দায়ীত্ব আপনি নিয়েছেন, সেই দায়ীত্ব পালন করাটা আপনার স্বধর্ম। এবার অর্জুনকে ভগবান বলছেন, *স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য*, অন্য ধর্মকে বাদ দাও, আমরা যে আত্মার কথাগুলো বললাম এগুলোকেও যদি বাদ দিয়ে শুধু যদি স্বধর্মের দিকে তাকাও, তাহলেও *ন বিকম্পিতুমর্হসি*, তোমার বিচলিত হওয়া উচিত নয়। *ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে*, ধর্মের জন্য যে যুদ্ধ, আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *ধর্মার্থং প্রজারক্ষণার্থং চ*, ধর্মের জন্য আর প্রজা রক্ষণের জন্য। কৌরব পাণ্ডবের এই যুদ্ধ ধর্মের লড়াই, এখানে ধর্ম আর অধর্মের লড়াই না। কৌরবরা বলছে তারা ঠিক, পাণ্ডবরা বলছে তারা ঠিক। অর্জুনকে তাই বলছেন, তুমি তো কোন লোভে পড়ে যুদ্ধ করছ না, তুমি মনে করছ এটা ধর্মের লড়াই। ক্ষত্রিয়ের জন্য এর থেকে ভাল আর কিছু হতে পারে না। এই ভাবটাই পরের শ্লোকে টেনে নিয়ে বলছেন –

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়ঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্।।৩২।।

(হে পার্থ, অনায়াসপ্রাপ্ত, উন্মুক্ত স্বর্গদ্বারসদৃশ এই প্রকার ধর্মযুদ্ধ ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়রাই লাভ করেন।)

যে জিনিসটা পাওয়ার জন্য আপনি সারাটা জীবন বসে আছেন, সেটা এখন না চাইতেই এসে গেছে। *যদৃচ্ছয়া,* তুমি তো এটা চাওনি, নিজে থেকে এসেছে, অর্থাৎ এমন এক পরিস্থিতি হয়ে গেছে যে, তোমার সামনে যেন নিজে থেকেই এসে গেছে। যে জিনিসটার জন্য আমি অপেক্ষা করে আছি, যদি যোগাযোগ হয়ে ওটা সামনে এসে যায়, ওখান থেকে পিছিয়ে আসতে নেই; কারণ আমি তো এটাই চাইছিলাম। যদি না চেয়ে থাকি, কিন্তু ঘটে যাচ্ছে, সেটা অন্য জিনিস। চাইছি কিন্তু ঘটছে না, সেটাও অন্য জিনিস। কিন্তু চাইছি, কিন্তু আমার চেষ্টা ছাড়াই সেটা ঘটছে, এর জন্য তো তোমার নিজেকে সুখী মনে করা উচিত। আর বলছেন, এই ধরণের সুযোগ যখন আসে, তখন *স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্,* স্বর্গদ্বার খুলে যায়। কারণ বর্ণাশ্রম যখন পালন করা হয়, মানুষ যখন ধর্ম জীবন পালন করে, তার জন্য তখন স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। যার ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়, তারাই এই ধরণের যুদ্ধ করার সুযোগ পায়। সব ক্ষত্রিয় নিজের জীবনে ধর্মযুদ্ধ করার সুযোগ পায় না।

তাহলে জেহাদের সাথে এর কি তফাৎ? মুসলমানী জেহাদীরাও তাই বলছে। তফাৎ আছে, মুসলমানরাও আসলে যুদ্ধ করে না। তবে অনেক সময় কোন একটা কারণে বলে দেয়, জেহাদ, ধর্মযুদ্ধ। ইসলামের বিরুদ্ধে, কিংবা কোরাণের বিরুদ্ধে বা প্রফেট মহম্মদের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলে দিলে বা কিছু করলে যদি সেটাকে জেহাদ বলে দেওয়া হয়, তখন সমস্ত মুসলমানদের এটাই ডিউটি হয়ে যায়। কিন্তু এখানে একটা তফাৎ হয়ে যায়। ক্ষত্রিয়দের জীবনটাই হল একটা ধর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রজা রক্ষণের দায়ীত্ব পালন করা। এখানে মারামারির কোন স্থান নেই। যদি যুদ্ধ করতেই হয়, তার আগে তারা পরস্পর আলোচনা করেন। বিভিন্ন পক্ষের লোকেরা এসে বিবাদটাকে আগে মিটমাট করার চেষ্টা করবেন। মিটমাট না হলে চারিদিকে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে, আমাদের লড়াই অপরিহার্য। তারপর লড়াই করতে নামবে। লুকিয়ে, চুরিয়ে, চোরাগোপ্তা বোমা মেরে দেওয়া, কাউকে খুন করে দেওয়া, এই জিনিসের অনুমোদন কখনই ক্ষত্রিয়দের ধর্মযুদ্ধে দেওয়া হত না।

ধর্মযুদ্ধে সব থেকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, দু পক্ষের সেনা মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে, পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হবে যুদ্ধ এই এই ভাবে হবে, এই এই ভাবে যুদ্ধ করা যাবে না। সাধারণ মানুষ সেখানে কোন ভাবেই জড়িত হয় না। এমন কি যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম, খাদ্য-পানীয় বহনকারীদের উপরেও যেন আক্রমণ করা না হয়। কিন্তু বিশ্বের সর্বত্র সন্ত্রাসবাদীরা সাধারণ নিরীহ

লোকের উপর বোমা মেরে দিয়ে চলে যাচ্ছে, শিশু মহিলা কাউকে ছাড়ে না, তাও আবার চোরগোপ্তা ভাবে। এটা কিসের জেহাদ! ঠিক ঠিক জেহাদ যদি করতে হয়, তুমি সামনা সামনি এসো। গীতার এই যুদ্ধ সেইজন্য জেহাদের সাথে কখনই তুলনা করা যাবে না, দুটো পুরোপুরি আলাদা জিনিস। শুধু বলে দিচ্ছেন যে, ক্ষত্রিয় হিসাবে তোমার এই যুদ্ধ করা কর্তব্য।

সেখান থেকে বলছেন, যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না করো তাহলে কি হবে? সেটাকে তেত্রিশ নম্বর শ্লোকে ভগবান এর উত্তর দিচ্ছেন। যে মুহুর্তে তুমি বুঝে গেলে যে, তোমাকে ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করতে হবে, যদি না কর তখন কি হবে?

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি।।৩৩।।

(আর যদি এই ধর্মযুদ্ধ না কর, তাহলে নিজ ক্ষত্রিয়ধর্ম ও কীর্তি পরিত্যাগের কারণে তুমি প্রত্যবায়ভাগী হবে।)

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং, এই যুদ্ধ ধর্মের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে, এখানে অধর্মের কিছু নেই, কোন লোভ নেই, কোন কামনা বাসনা নেই। ক্ষত্রিয় হিসাবে তোমার এই ধর্মযুদ্ধে অংশ নেওয়াটা কর্তব্য, এটা তোমার দায়ীত্ব। যদি যুদ্ধ না করো, তাহলে এতদিন যে তুমি কীর্তি অর্জন করে এসেছ; তুমি মহাদের সাথে যুদ্ধ করেছিলে, যদিও সেখানে তোমার জয় আসেনি, কিন্তু মহাদেবের সাথে যুদ্ধ করে জোর টক্কর দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করে পাশুপত অস্ত্র লাভ করাটা একটা বিরাট কীর্তি, বা পরে পরে তুমি ইন্দ্রের সাথে গিয়ে অনেক জায়গায় যুদ্ধ করেছ, বা পরে তুমি বিরাটের রাজ্যে দিব্য অস্ত্র দিয়ে সমস্ত কৌরবদের পরাস্ত করেছিলে, এইভাবে এতদিন তুমি যত কীর্তি অর্জন করেছ, তোমার অর্জিত সমস্ত কীর্তিই নাশ হয়ে যাবে। স্বধর্ম থেকে সরে আসা এবং কীর্তি নাশের জন্য তুমি প্রত্যবায়ভাগী হবে।

অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়ষ্যন্তি তেহব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে।।৩৪।।

(আরও কি হবে, সবাই চিরকাল তোমার অখ্যাতি ঘোষণা করবে। সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে অখ্যাতি মৃত্যু অপেক্ষাও অধিকতর দুঃখদায়ক।)

এরপর লোকেরা তোমার নিন্দা করবে, তোমার নামে সবাই হাসবে। *সম্ভাবিতস্য* মানে সমাজে যাঁর প্রতিষ্ঠা আছে, প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির যদি অকীর্তি বা দুর্নাম হয়, সেটা তার জন্য মৃত্যুর থেকেও ভয়ঙ্কর। অনেক সময় লোকেরা যদি কোন ভুল কাজ করে ফেলে, তখন তার মনে হয়, বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই, আত্মহত্যা করে নিই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের খুব সুন্দর সুন্দর বর্ণনা আছে। ভারত থেকে প্রচুর সৈন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। একজনের একটা খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। যৌথ বাহিনী আর ইতালীর মুসোলিনির সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। সেখানে ভারতের লোক বিভিন্ন পদে কাজ করছিল, সৈন্য বাহিনীতেও ছিল, আবার রেডক্রশের হয়েও কাজ করছিল। যুদ্ধে যারা আহত হয়ে পড়ে থাকত, তাদের স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসতে হত। চারিদিকে গুলি চলছে, সেখানে ভারতীয় সৈনিকরা নির্বিকার, স্ট্রেচার নিয়ে যাচ্ছে, আহতদের তুলে নিয়ে আসছে। জীবনের কোন পরোয়া নেই, এটাই আমার ধর্ম, ওই গোলাগুলির মধ্যে স্ট্রেচার নিয়ে যাচ্ছেন, আহত সৈন্যদের স্ট্রেচারে তুলছেন আর নিয়ে আসছেন।

একজন বড় অফিসার, আইএএস ট্রেনিং একাডেমির উনি ডেপুটি ডিরেক্টর, তিনি এক জায়গায় বর্ণনা করছিলেন। যারা নূতন আইএএস হয়, তাদের সব জায়গায় ট্রেনিং এর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। আর্মির যে ফ্রন্টলাইন আছে, সেখানেও তাদের নিয়ে যাওয়া হয়। পাকিস্থান বর্ডারের একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখানে একটা ছোট্ট নদী, নদীর ওপার পাকিস্থান এপার ভারত। সেখানকার একজন ইনচার্জ হলেন একজন ক্যাপ্টেন। বর্তমান ক্যাপ্টেন দু-তিন দিন হয়েছে এখানে নূতন এসেছেন। ওনার আগে যিনি এখানে ক্যাপ্টেন ছিলেন, একদিন পাকিস্থান ওপার থেকে গুলি চালাতে শুরু করে, জানলাটার একটা পাল্লা খোলা ছিল, সেখান দিয়ে গুলি এসে আমার আগের ক্যাপ্টেন মারা যান। তারপর আমি এখানে কদিন আগে এসেছি। সেই অফিসার, উনি নিজেও একজন আইএএস অফিসের, তিনি বলছেন, ক্যাপ্টেনের বয়স খুব জোর সাতাশ আটাশ হবে, কিন্তু এমন ভাবে মৃত্যুর বর্ণনা করছেন, যেন matter of fact। পাকিস্থান আর্মি ওই জায়গাতে আছে জানে, গুলি চালালে যে কোন সময় মরে যেতে পারে। বলছেন, আইএএস ট্রেনিরা জনা কুড়ি পঁচিশ জন, ওই জায়গায় তাদের একটা ব্রীজ পার করতে হবে। ক্যাপ্টেন বলছেন, ওরা যদি জানতে পারে, এমনিতে জানা আছে, কিন্তু টাইমটা যদি জেনে যায়, অবধারিত যে ওরা গুলি চালাবেই চালাবে। তারপর একটা বিশেষ ব্যবস্থা করে, রাত্রির মধ্যে, চুপচাপ যাতে কোন আওয়াজ না হয়, বিরাট লম্বা বর্ণনা। এই যে ভাব, আমি ডিউটি করছি, ডিউটি করতে করতে মারা গেলাম, এটা নিয়ে অত হৈ চৈ করার কি আছে।

সম্ভাবিতস্য চাকীর্তিঃ, এক দেশ আরেক দেশের উপর যে গুপ্তচর বৃত্তি করে, জার্মানরা আমেরিকানদের ব্যবহার করে গুপ্তচর বৃত্তি করে, আমেরিকানরা জার্মানদের ব্যবহার করে গুপ্তচর বৃত্তি করত, ভারত পাকিস্থানে গিয়ে গুপ্তচর বৃত্তি করে, পাকিস্থানরা ভারতে এসে গুপ্তচর বৃত্তি করে। আবার নিজের লোকের উপর লক্ষ্য রাখার জন্যও কাউন্টার গুপ্তচর লাগানো হয়। কোন অফিসার গুপ্তচর বৃত্তি করতে গিয়ে যদি কখন ধরা পড়ে যায়, তখন একজন এসে বলবে, সব প্রমাণ সামনে রেখে দেওয়া হল। ওর সিনিয়র অফিসার ওকে একটা ঘরে ডেকে নেবে। চেয়ারে বসতে বলল, চেয়ারে বসল। ওর পুরো ফাইল, তার অকীর্তির পুরো ইতিহাস সামনে রেখে দেওয়া হত। ফাইলের সাথে একটা রিভলবার, রিভলবারে মাত্র একটা গুলি, রেখে দিত। অর্থ হল তুমি নিজে সুইসাইড করে নাও, তোমার জন্য এটা সম্মানীয় মৃত্যু। যদি তুমি নিজে না কর, তাহলে কোর্ট মার্শাল করতে হবে, তাতে তোমার চাকরিটাও যাবে, পেনশানটাও চলে যাবে। আর এটা হলে বলা যাবে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে সে সুইসাইড করে নিয়েছে, ফাইলটা ওরা চেপে দেবে। বাড়ির লোকেরা পেনশানটা পাবে। সবচেয়ে বড় হল, বাড়ির লোকেদের জন্য সম্মান। কিন্তু তোমার অকীর্তি যদি ফাঁস হয়ে যায়, সব দিক দিয়ে তুমি শেষ। এই ধরণের যত কেস আছে, invariably সবাই নিজেকে গুলি মেরে উড়িয়ে দিত।

আর-একটা ঘটনার বর্ণনা আছে, কিভাবে একজন জানতে পেরেছে, জানার পর একটা গাড়ি নিয়ে ফুল স্পীডে চালিয়ে পাহাড়ে চলে গেছে। তারপর ওখানে একটা খাদের কাছে গিয়ে গাড়ি শুদ্ধু নিজেকে খাদে ফেলে দিয়ে সুইসাইড করে নেয়। সত্যিকারের যারা খুব সম্মানীয় আর্মি অফিসার, যদি কোন কারণে ধরা পড়ে যায়, ওরা সুইসাইড করে নেয়।

ইজরাইল দেশটা চারিদিক দিয়ে মুসলিম দেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। ইজরাইলি মুসাদ জানে আমাদের খুব বিপদ, বত্রিশ দাঁতের মধ্যে যেমন জিহ্বা। মুসাদের একজন চীফ জানতেন, একদিন না একদিন ইজরাইলের উপর আক্রমণ আসবে। তিনি তাঁদের প্রধাণ শক্রদের মধ্যে স্পাই লাগিয়ে ওদের সব স্ক্যাণ্ডালগুলো বার করলেন, কে কে কোন কোন মেয়ের সাথে জড়িত। মুসাদের কাছে খবর এসে গেছে, অমুক দিনে নটি দেশ মিলে আমাদের আক্রমণ করতে আসছে। তার ঠিক দুদিন আগে ওদের এয়ারফোর্সের সব নামকরা অফিসারদের কাছে বড় বড় খামে চিঠি গেল, সাথে ডকুমেন্টস, কে কোন মেয়ের সাথে জড়িয়ে আছে, ছবি সহ। অর্থটা স্পষ্ট, হয় এয়ারফোর্স থেকে

রেজিগনেশান দাও, নয়তো গুলি করে নিজেকে শেষ করো, আর তা নাহলে তোমার ফ্যামিলিতে সব খবর পৌঁছে যাবে। প্রত্যেকটা অফিসার রিজাইন করে দিল। ঠিক যুদ্ধের সময় ওরা দেখছে, ওদের সমস্ত অফিসার রিজাইন করে দিচ্ছে। সমাজে যাদের একটা সম্মান আছে, বাড়িতে সম্মান আছে, হঠাৎ বাড়ির লোকেরা যদি শোনে, আমার বাবার, আমার স্বামীর, আমার ছেলের মহিলা সংক্রান্ত একটা অবৈধ সম্পর্ক আছে, তার থেকে এটাই ভাল তার আগে যেন আমি মরে যাই।

এই মানসিকতা সব ক্ষেত্রেই হতে পারে। একটা বাচ্চা ছেলেও যদি মনে করে, স্কুলে এমন কোন ঘটনার সাথে সে জড়িয়ে গেছে, যার জন্য সে সবার কাছে ছোট হয়ে যাবে, সে খালি ভাবতে থাকে, আমি পালিয়ে যাবো, আমি এই করব, সেই করব। ইদানিং কত ইয়ং ছেলে মেয়েরা সুইসাইড করছে। বন্ধুর কাছে দামী মোবাইল, তার কাছে নেই, বাবার কাছে চেয়েছে, বাবা কিনে দেয়নি, সুইসাইড করে দিল। ভেবেছে বাবা-মা আমাকে সম্মান দিল না। দুজনের প্রেম ভেঙে গেল, একজন গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে গেল। আমার যা পাওয়ার আমি পেলাম না। সব কটার পিছনে হল, *সম্ভাবিতস্য চাকীর্তিঃ*। যারা প্রতিষ্ঠিত, তারা নিজের অকীর্তি নিতে পারে না।

হে অর্জুন, তুমি এত দিন ধরে নিজের কীর্তিকে দাঁড় করিয়েছ, তোমার এত সম্মান, তুমি এই অকীর্তি কি করে নেবে! আর যুদ্ধ ভূমি থেকে যদি তুমি পালিয়ে যাও, লোকেরা তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্।।৩৫।।

(কর্ণ প্রমুখ মহারথীর মনে করবে, তুমি ভয় পেয়েই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হয়েছ এবং তুমি যাঁদের কাছে সম্মানিত ছিলে তাঁদের কাছেই তুমি হেয় প্রতিপন্ন হবে।)

সবাই মনে করবে ভয় পেয়ে তুমি কাপুরুষের মত পালিয়ে গেছ। এই মহারথীরা, যাঁরা সামনে যুদ্ধ করার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরা বলবেন, অর্জুন ভয়ে পালিয়ে গেছে। বিরাট রাজার ছেলে উত্তর, বারো তেরো বয়সের, অন্দরমহলে মেয়েদের সঙ্গেই থাকত। মেয়ের সঙ্গে থাকলে যা হয়, নিজেকে মেয়েদের সামনে খুব বড় করে দেখাতে চাইবে। উত্তরও দেখাত, আমি বিরাট বীর, আমি এই করতে পারে, সেই করতে পারি। ইতিমধ্যে একদিন বিরাট রাজার গোধন লুট করার জন্য কৌরবরা বিরাটের রাজ্য আক্রমণ করেছে। কায়দা করে এমন ভাবে আক্রমণ করেছে যে, বিরাট রাজা সব সৈন্যরা সেই দিকে চলে গেছে। এদের আসল উদ্দেশ্য ছিল, সব সেনা নিয়ে বেরিয়ে গেলে সমস্ত গোধন নিয়ে চলে যাওয়া। খবর এসেছে, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্যোধন এরা তাদের আসল সেনা নিয়ে সব গরু নিয়ে চলে যাচ্ছে। উত্তর বলছে, কোন ব্যাপারই না, আমি সব কটাকে দেখে নেব। দ্রৌপদী সেখানে সৈরিন্ধ্রী নামে আছে, সে বলল তুমি বৃহন্নলাকে সারথি রূপে নিয়ে যাও। অর্জুন বৃহন্নলা সেজে বিরাটের মেয়েকে নাচ গান শেখায়। অন্দরমহলে উত্তরা বলছে, ভাই তুমি আমার পুতুলের জন্য ওদের জামার কাপড় গুলো কেটে নিয়ে আসবে।

বৃহন্নলাকে নিয়ে উত্তর রথে করে বেরিয়ে এসেছে, রাস্তায় বেরিয়েই বলছে, আমি এই করব, সেই করব। ওখানে গিয়ে যেমনি কৌরব সৈন্যদের দেখেছে, সঙ্গে সঙ্গে রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। কৌরবরা দেখে হাসতে শুরু করেছে। উত্তর বৃহন্নলার কথা শুনবে না, প্রাণ ছেড়ে দৌড় মেরেছে। অর্জুনকে দেখে সবাই এখন এটাই মনে করবে। পিছনে তুমি নিজেকে বিরাট কিছু মনে করতে পারো, সামনে যখন এসেছো তখন বুঝতে পারলে তোমার মুরদ কত দূর।

পয়ত্রিশ নম্বর শ্লোকের দ্বিতীয় লাইন, *যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্,* যারা এতদিন তোমাকে বিরাট কিছু মনে করেছে, যারা মনে করেছে তোমার মধ্যে প্রচুর ক্ষমতা, তোমার

মধ্যে অনেক গুণ, তাদের চোখে তুমি এখন ছোট হয়ে যাবে। আমরা অনেক সময় বলে থাকি, তোমার কাছে আমি এমনটি আশা করিনি। মজা করে একজন বলছে, প্রথম ভুল করলে জানা যায় লোকেরা তোমাকে কত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখত। এটা আমাদের সব সময় মনে রাখা দরকার, যারা আজকে আমায় সম্মান দিচ্ছে, এতদিন সম্মান দিয়ে এসেছে, এদের দৃষ্টিতে কিন্তু আপনি যে কোন দিন, যে কোন সময় পড়ে যাবেন, এই জিনিসটা যেন কখন না হয়। লোকে যেন আপনার পিছনে হাসাহাসি না করে।

মহাভারতে এই ধরণের প্রচুর কাহিনী আছে। কেউ একটু কাপুরুষ হয়ে গেছে, তার মা তাকে বলছে, 'এমন কিছু করো না, যেটা দেখে তোমার শত্রু যেন না হাসে, যারা তোমাকে সম্মান দিয়ে এসেছে, তার যেন না হাসে। তোমার একান্ত আপনজনেরা কষ্ট পাবে। একবার যদি তুমি হাসির পাত্র হয়ে যাও, তাহলে তো তোমার সব শেষ'। ভগবান পুরো লৌকিক দৃষ্টিতে অর্জুনকে বোঝাচ্ছেন। প্রথমে শুদ্ধ বেদান্তের দৃষ্টিতে বোঝালেন, সেখান থেকে আরও নীচে নামতে নামতে, ধর্মের যত রকম দৃষ্টি হতে পারে, যত দিক হতে পারে সব ভাবে বোঝালেন। এখন পুরো সামাজিক দৃষ্টিতে বোঝাচ্ছেন।

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্।।৩৬।।

(আর তাই না, তোমার শত্রুরাও তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করে প্রচুর অকথ্য বাক্য বলবে। এর থেকে অধিকতর দুঃখকর আর কি হতে পারে?)

তুমি যে আগে যত বড় বড় যুদ্ধ করে তোমার বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলে, সেটাকে ভুলে গিয়ে সবাই তোমার এই বলে নিন্দাই করবে –এই যে অর্জুনকে দেখছ, ও কিছুই না, ফাঁকা আওয়াজ, ঢপের শাঁক। তোমার যে সামর্থ্য, তোমার যে ক্ষমতা, সেটাকে নিয়ে সবাই নিন্দা করবে, *ততো দুঃখতরং নু কিম্*, তুমি যদি নাও মারা যাও, তাও এটা কত নিন্দার। এর চাইতে দুঃখ আর কিছুতে হতে পারে না। যদি কেউ কিছু অঘটন করে, মানুষ সেটা ভুলে যায় না, ওটা মনে রেখে দেয়। সেইজন্য অর্জুন, তুমি এই রকমটি করো না।

অর্জুন এর আগে প্রশ্ন করেছিল – *ন চৈতদ্‌বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ* – হে ভগবান, আপনি আমাকে বলুন আমার পক্ষে কোনটা ভালো, যুদ্ধে জয়লাভ করাটা, না কৌরবদের কাছে পরাজিত হওয়া। এই প্রশ্নের পরিসমাপ্তি টেনে ভগবান উত্তর দিচ্ছেন –

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা মোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়।।৩৭।।

(হে কৌন্তেয়, এই যুদ্ধে নিহত হলে তুমি স্বর্গলাভ করবে; আর জয়ী হলে রাজ্য ভোগ করবে। অতএব যুদ্ধের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে উত্থিত হও।)

এই অধ্যায়ের প্রথমের দিকে অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন, *ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ*, আমি বুঝতে পারছি না কোনটা ঠিক, যুদ্ধ করে মরা যাওয়াটা ভাল, নাকি আমরা ওদের মেরে জয়ী হই। অর্জুন পুরো সংশয়াচ্ছন্ন। এবার ভগবান একবারে পরিষ্কার করে বলছেন, স্বধর্ম পালন করে যুদ্ধ করতে করতে তুমি যদি মরে যাও, তুমি স্বর্গে যাবে। কারণ স্বর্গপ্রাপ্তি তখন হবে যখন মানুষ ঠিক ঠিক কর্তব্য পালনের পথে থাকে। সেইজন্য ভারত সরকারের কোন পুলিশ বা সৈন্য ডিউটি করতে করতে মারা গেলে তাদের একটা বিশেষ সম্মান দেয়, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করে দেয়। ভগবান এখানে বলছেন, তুমি স্বর্গে যাবে। এখানে তোমার হারার প্রশ্ন

নেই, হয় তুমি জিতবে, না হয় তুমি মরবে। হারার প্রশ্নই উঠছে না, যদি জয়লাভ করো, তাহলে তুমি এই সাম্রাজ্য পাবে এবং রাজ্যলাভের সুখ ভোগ করবে। তুমি যে প্রশ্ন করেছিলে, এখানে পরিষ্কার, ধর্মযুদ্ধ অন্যায়ের কিছু হচ্ছে না। যুদ্ধে জয়ী হলে তুমি পৃথিবী ভোগ করবে, আর যুদ্ধে মারা গেলে স্বর্গ তোমার নিশ্চিত। হে অর্জুন, তুমি উঠে দাঁড়াও, যুদ্ধ করো। অর্জুনের মধ্যে যে প্রশ্ন ছিল, ভগবান সেটা পরিষ্কার করে দিলেন। আর স্বধর্ম যাঁরা পালন করেন, এবার তাঁদের জন্য পরিষ্কার করে বলছেন। এতক্ষণ কর্মের কথা বলছিলেন, ভগবান এবার আস্তে আস্তে সেটাকে কর্মযোগের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। আটত্রিশ নম্বর শ্লোক হল এর পরের টপিকের সাথে যোগসূত্র।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।।৩৮।।

(তুমি ক্ষত্রিয়; ধর্মযুদ্ধই তোমার স্বধর্ম। সুতরাং তুমি সুখে অনুরাগ ও দুঃখে দ্বেষ না করে এবং লাভ ও ক্ষতি, জয় ও পরাজয় তুল্য জ্ঞান করে ধর্মযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। এই রকম করলে গুরুজনাদি-বধজনিত প্রত্যবায় তোমার হবে না।)

অর্জুনের মনে হচ্ছিল, আমার পাপ লাগবে, এই হবে, সেই হবে। ভগবান বলছেন, কিসের পাপ লাগবে; সুখ হোক দুঃখ হোক, লাভ হোক অলাভ হোক, জয় হোক পরাজয় হোক, সব কিছুকে তুমি সমান দৃষ্টিতে রাখো। মনকে স্থির করে সমান দৃষ্টি রেখে যেটাই করো, তোমার কোন পাপ হবে না। এটাকেই কর্মযোগ বলে। তার মানে বুদ্ধি কোন কিছুতে আসক্ত হবে না। এর অর্থ হল, আমিত্ব ভাব কোন কিছুর সাথে জড়াবে না। স্বামীজীও কর্মযোগ বলছেন, duty for duty sake, এটা আমার কর্তব্য, তাই করলাম। কিভাবে করব? শ্রেষ্ঠতম উপায়ে আমি আমার কর্তব্য সম্পাদন করব। এরপর কর্মের ফল যাই হোক না কেন, আমার তাতে কিছু যায় আসে না। ঠাকুর জাত চাষার কথা বলছেন, সেই চাষা প্রাণ দিয়ে চাষ করছে। বৃষ্টি যদি না হয় আমি কি করব, আমার কিছু করার নেই। আমি সব কিছুই করলাম, আমার যদি কিছু দোষ থাকে বলতে পারেন। যুদ্ধ করাটা তোমার স্বধর্ম, তুমি কোন বিচার করতে যেও না, যুদ্ধে তুমি সুখ দুঃখের ভাব আনবে না, যুদ্ধে লাভ অলাভের ভাব আনবে না, জয় পরাজয়ের ভাব আনবে না। এটাই কর্মযোগ। এরপরের শ্লোক থেকে ভগবান মূল কর্মযোগের উপর বলতে শুরু করবেন।

উনচল্লিশ থেকে তিপ্পান্ন নম্বর শ্লোক পর্যন্ত ভগবান অনেক কিছু কথা বলছেন, সব কথাই তিনি কর্মকে নিয়ে বলছেন। এই পনেরটি শ্লোকের মধ্যে ভগবান কর্মযোগের একটা ভূমিকা দিচ্ছেন, যেটাকে তিনি তৃতীয় অধ্যায়ে এবং কিছুটা চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারে বলবেন। চতুর্থ অধ্যায় যদিও সরাসরি ঠিক কর্মযোগ না, কিন্তু এখানে যে আলোচনা করছেন, সেটা কোন না কোন ভাবে চতুর্থ অধ্যায়ের সাথেও জড়িয়ে আছে।

গীতার শুরু দ্বিতীয় অধ্যায়ের এগারো নম্বর শ্লোক থেকে, এর আগে যা কিছু আছে, ওটা ভূমিকা শুধু। হিন্দু ধর্মের যে মূল ধর্ম দর্শন, বা বলা যেতে পারে হিন্দু ধর্মের যে সিদ্ধান্ত, সেখান থেকে একটু একটু করে জীবনদর্শন বেরিয়ে আসে, যেটা এর আগে বলা হল। প্রথমে ভগবান অর্জুনকে একটু উপহাস করে বললেন, তুমি পণ্ডিতের মত কথা বলছ, অথচ তোমার বিচার মুর্খদের মত। তারপর আত্মার ব্যাপারটা বললেন, সেখান থেকে নেমে তিনি বাস্তবিকতায় এলেন। প্রশ্ন হল, অর্জুন যুদ্ধ করবে কি করবে না, তোমার জীবনদর্শন যাই হোক, তুমি মরে গেলে সব শেষ, তাতেও তোমার যুদ্ধ করা উচিৎ। যদি তুমি মনে কর, তোমার জন্ম জন্মান্তর চলতে থাকবে, তাতেও তোমার যুদ্ধ করা উচিৎ। কিন্তু ওই দুটি শ্লোক, *অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত*, হিন্দুদের মত নয়। ইদানিং অনেকে বলে, নাস্তিক হলেও সে হিন্দু। ভারত সবাইকে স্থান দিয়ে আসছে, ইরানে পার্সিরা যখন মুসলমানদের হাতে মার খেলেন, তারাও ভারতে এসে স্থান পেলেন। ইজরাইলে জুহুদিরা মার

খেলেন, তাঁরাও এখানে স্থান পেয়েছেন। সারা বিশ্ব থেকে কম্যুনিস্টরা মার খেয়ে এখন ভারতে স্থান পেয়েছে। এখানে সবাই স্থান পায়। সেইভাবে নাস্তিকরাও এখানে স্থান পেয়েছে। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে কোথাও নাস্তিকের ভাব নেই। কদিন আগেও কোর্ট বলেছে, Hindu is a way of life। যার যা মুখে আসছে কিছু একটা বলে দিচ্ছে।

হিন্দু ধর্ম বেদে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দু ধর্মের আধার বেদ, বেদের কোথাও নাস্তিক ভাব পাওয়া যাবে না। বাড়িতে কোন ছেলে কুলাঙ্গার হয়ে গেলে, কোন মেয়ে অসতী হয়ে গেলে বাড়ির লোকেরা কি তাকে বাড়ি থেকে বার করে দেবে? মা কি বলবে, আমি মনে করব আমার একটা সন্তান কম? মা বলবে, থাকো, কি আর করবে। সব বংশেই গোলমাল হয়, বাবা ঘর ছাড়া করে দিতে পারে, মা কিন্তু কোন দিন তা করবে না। তুমি থাকো, কিন্তু জানবে তোমার এটা ধর্ম নয়। *অব্যক্তাদীনি ভূতানি*, এটা গীতার মত নয়, তাই হিন্দুদেরও মত নয়। ভগবান অর্জুনকে বলছেন, যদি তুমি তাই মনে কর, তাতেও তোমার শোক করা উচিত নয়। *অথ চৈনং নিত্যজাতং*, এটা হিন্দুদের মত কিন্তু গীতার মত নয়। গীতার ঠিক ঠিক মত, যেটা হিন্দুদেরও মত –মুক্তি। এমন কি *অথ চৈনং নিত্যজাতং*, এই শ্লোকটি মীমাংসকরা যখন বলন, সেখানেও তাঁরা বলেন যদি ব্রহ্মলোকে চলে যাওয়া যায়, তাহলে এই আসা-যাওয়াটা একটা দীর্ঘকালীন সময়ের জন্য থামবে। মূল ভাব এই আসা-যাওয়াটাকে থামাতে হবে। যদিও এটা সাময়িক মুক্তি, কিন্তু মুক্তি। হিন্দুদের জীবনদর্শন একমাত্র মুক্তির উপর আধারিত। ক্রিকেটের ব্যাট নিয়ে বল পেটাতে পেটাতে এক সময় শচীন তেণ্ডুলকার হয়ে যাবে, কিন্তু ব্যাট দিয়ে বল মারা জানলে সবাই কি শচীন তেণ্ডুলকার হয়ে যাবে? হয় না, অনুশীলন করতে হয়। এমনকি মীমাংসা দর্শনকে যদি আমরা মানি, সেখানেও যজ্ঞ করে করে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়ে যাবে। অদ্বৈত জ্ঞানে তা হয় না, অদ্বৈত হল জ্ঞান, এটা কোন কর্মের ফল না, উপলব্ধিও কিছু হয় না, এটা জ্ঞান। আমি ভুলে গেছি আমি কে, আমাকে জানতে হবে আমি কে, জেনে গেলেই হয়ে গেল, সব শেষ। সেটা অবশ্য আলাদা জিনিস। কিন্তু সেটা যদি আমাকে জানতেও হয়, বা করতে যদি হয়, আমাকে মাঠে নামতে হবে। এই মাঠে নামা থেকে গীতার যে বৈশিষ্ট্য, সেটা পুরোদমে শুরু হয়ে যায়, এ অদ্বৈত জ্ঞান প্রাপ্ত করবে কি করে?

বিদেশীরা ট্রেজার আইল্যাণ্ডের মত খুব সুন্দর সুন্দর গল্প লেখেন। আমি জেনে গেলাম সমুদ্রের এই জায়গাতে একটা জাহাজ ডুবি হয়েছিল, এখানে প্রচুর ধন-সম্পদ পড়ে আছে। কিংবা কোন আইল্যাণ্ডে বিশাল গুপ্তধন লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এটা জেনে গেলেই তো সব হাতে এসে যাবে না। আমাকে এবার প্রস্তুতি নিতে হবে, জাহাজ জোগাড় কর, লোকজন সংগ্রহ কর, বন্দুক, পিস্তল, রিভলবার জোগাড় কর, সব জুটিয়ে নিয়ে এবার যেতে হবে। গেলেই যে সাফল্য আসবে, আমাদের জানা নেই। এখান থেকে গীতা এবার এটাই বলবেন, তোমার জানা হয়ে গেছে যে, জিনিসটা সত্য, এবার তুমি নেমে পড়ো। কাজে যে সাফল্য আসবে, সেটাকে নিয়েও এখানে আলোচনা করবেন। সেই অবস্থায় পৌঁছে, তা উপলব্ধির ব্যাপারই হোক আর জ্ঞানেরই ব্যাপার হোক, এই জিনিসটাকেই এবার বলতে যাচ্ছেন। সাংখ্য শব্দের অর্থ, জিনিসটাকে ঠিক ঠিক জানা। আর ওই জিনিসটাকে উপলব্ধি করার জন্য যে খাটাখাটনি করতে হয়, সেটাকে বলে যোগ –সাংখ্য আর যোগ, এই দুটি শব্দ। সিদ্ধান্তকে জানা এবং ওটাকে কার্যকরী করা, কার্যকরী করাটাকেই বলা হয় যোগ। যোগ হল সেই পদ্ধতি, যে পদ্ধতি দিয়ে সাংখ্যে নিয়ে যাবে।

আমরা বলতে পারি, কেন আমরা তো ষড়দর্শনে দেখি সাংখ্য দর্শন আছে, যোগ দর্শন আছে, আলাদা করে এই দর্শনগুলো তাহলে কি? তার উত্তর হল –ওগুলো পুরো আলাদা। গীতাতে যে সাংখ্য দর্শনের কথা বলছে, এই সাংখ্য দর্শন নিজেকে সাংখ্য এইজন্যই বলেন যে, তিনি মনে করেন আমি তোমাদের ঠিক ঠিক জ্ঞানের দিকে অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। গীতার যোগ দর্শন নিজেকে যোগ দর্শন এই জন্যই বলে, আমরা আপনাকে ক্রিয়ার মাধ্যমে ওই আত্মজ্ঞানের

অবস্থায় পৌঁছে দিচ্ছি। কিন্তু আসলে আমরা যা কিছুই করি না কেন, সবটাই যোগ। পূজা করছি, সেটাও যোগ; সমাজ সেবা করছি, সেটাও যোগ; বিচার যখন করছি, সেটাও যোগ; শাস্ত্র অধ্যয়ন করছে, সেটাও যোগ, সবটাই যোগ। কারণ এই সব কিছুই আমাদের নিয়ে যাচ্ছে সেই জ্ঞানের দিকে, সাংখ্যের দিকে। সাংখ্য হল সেই অবস্থা, যেখানে গেলে মুক্তি। এই জিনিসটাকেই এবার ভগবান ঊনচল্লিশ নম্বর শ্লোকে বলছেন।

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি।।৩৯।।

(হে পার্থ, এতক্ষণ তোমাকে সাক্ষাৎ শোকমোহাদি সংসারহেতু-নাশক সাংখ্য নামক তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেওয়া হল। এবার কর্মযোগের কথা তোমাকে বলছি; শ্রবণ কর। নিষ্কাম কর্মযোগবিষয়ক এই জ্ঞানলাভ করলে তুমি ধর্ম ও অধর্মরূপ কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হবে।)

এগারো থেকে আটত্রিশ শ্লোক পর্যন্ত ভগবান অর্জুনকে সাংখ্যের কথা বললেন। তবে মাঝখানে তিনটে শ্লোক, যেখানে *অব্যক্তাদীনি ভূতানি, অথ চৈনং নিত্যজাতম্,* এগুলোকে বাদ দিয়ে ধরতে হবে। এগারো নম্বর শ্লোককেও যদি বাদ দেওয়া হয়, তাহলে বারো, তেরোটা শ্লোকে হিন্দু ধর্ম দর্শনের যে আত্মা, সেটাকে বিস্তারে রেখে দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে শুরু করে পুরো আঠারো অধ্যায়ের কিছুটা পর্যন্ত বলবেন। কিন্তু এই সাংখ্যের অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের উপলব্ধিটা কিভাবে হবে? ভগবান এক এক করে উপায়গুলো বলছেন।

আমাদের জীবনে বন্ধন কি, আমরা কোথায় আটকে আছি? কর্মবন্ধন। অবিদ্যা, কাম ও কর্ম এই তিনটেকে নিয়ে আগে আগে বলা হয়েছিল। কোন কারণে আত্মা তাঁর স্বরূপ ভুলে গেছে, স্বরূপ ভুলে যাওয়ার জন্য মনে কামনা আসে, কামনা আসার জন্য তাঁকে কাজ করতে হয়। কাজ করলে তার ফল আছে, সেই ফল কখন পছন্দের হয়, কখন অপছন্দের হয়। পছন্দ হলে আমরা আরও সেদিকে এগিয়ে যাই, অপছন্দ হলে সেখান থেকে সরে আসি; এখান থেকেই আমাদের উপর বন্ধন চাপতে শুরু হয়ে গেল। যে মুহুর্তে, তাত্ত্বিক ভাবে না, প্রত্যক্ষ জেনে গেলাম আমি কে, সেই মুহুর্তে আমার যত দুঃখ-কষ্ট আছে, শোক আছে, সব নিবারণ হয়ে যাবে। কিন্তু সেখানে পৌঁছানর জন্য সবাইকে অনেক খাটতে হবে। ঠাকুর বলছেন, সিদ্ধি সিদ্ধি বললেই নেশা হয় না, গায়ে সিদ্ধি মাখলেও নেশা হয় না, সিদ্ধি খেলে তবে গিয়ে নেশা হবে। আত্মা আছেন, আত্মা অনন্ত, আত্মা অব্যয়, আত্মার জন্ম-মৃত্যু নেই, এটা আমি জেনে গেলাম, কিন্তু তাতে কিছু হবে না, ওটাকে আমাকে প্রত্যক্ষ করতে হবে।

এখানে এসেই আমাদের দেশের সর্বনাশ হয়ে গেল। দিল্লী আশ্রমে এক পণ্ডিত মঠের মহারাজদের পড়াতে আসতেন। কিছু দিন পড়ানোর পর বলছেন, 'রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজদের কোন দিন পড়ানো যাবে না। পূর্বপক্ষ জানার আগেই আপনাদের সিদ্ধান্ত জানা হয়ে গেছে। খেটে খেটে যে ওখানে যেতে হয়, সেটা জানার আগেই আপনারা সিদ্ধান্ত জেনে গেছেন'। কথামৃতে ঠাকুর বলে দিয়েছেন, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, ঠাকুর বলে দিয়েছেন, ঈশ্বর দর্শন জীবনের উদ্দেশ্য। এই কথাগুলো আপনারা জেনে গেছেন, ফলে আপনি আর কিছু শিখবেন না। তাহলে কি আপনি মহাপুরুষ? কিছুই না, কারণ আপনার তো উপলব্ধি হয়নি। যতক্ষণ না জ্ঞান হয়ে যায়, ততক্ষণ আমরা কেউই কিছু না। আপনাকে একবার জ্ঞানটা জানিয়ে দেওয়া হল, এরপর আপনাকে খাটতে হবে, খেটে খেটে ওই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করতে হবে, জ্ঞানোপলব্ধির জন্য। যদি না খাটা হয়, তখন এই একটু আত্মবিষয়ক জ্ঞানই সর্বনাশের কারণ হয়ে যাবে। আগে তাও কিছুই জানতাম না, বোকা মুর্খ ছিলাম, নিজেকে খুব সাধারণ মনে হত। এখন আত্মার বিষয়ে একটু শোনা ও জানার জন্য এবার সেই খাটাটুকুও বন্ধ হয়ে গেল।

ঈশোপনিষদে এগারো নম্বর মন্ত্রে বলছেন, *অন্ধং তমঃ প্রবিশ্যন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে। তত ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।।* তুমি কর্ম করছ না, তুমি সাধনা করছ না, উপাসনা করছ না, আর মুখে ফরর ফরর করে সংস্কৃতে শাস্ত্রের মন্ত্র আওড়ে যাচ্ছ, এতে তুমি আরও গোল্লায় যাবে। হিন্দুরা এই ফরর ফরর করে মন্ত্র বলাকে মানেন না। পুরো ভারতের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে দেওয়ার কারণ, ফরর ফরর করে মন্ত্র শুনিয়ে যাওয়া। স্বামীজী এই জিনিসটাকে দূর করলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করে। তোমাকে কাজ করতে হবে, স্কুল চালাও, ডিসপেন্সারি চালাও, হাসপাতাল চালাও। সমাজে কত ভাল ভাল স্কুল আছে, তাতে রামকৃষ্ণ মিশনের কিছু আসে যায় না, তাও আমরা স্কুল চালাচ্ছি কারণ ছেলেদের মঙ্গলের জন্য, আমার নিজের মঙ্গলের জন্য। কলকাতা ও তার আশেপাশে এত নামী দামী হাসপাতাল আছে, সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের হাসপাতালের কি দাম। দাম এই জন্য যে, হাসপাতালে সেবাকার্যের দ্বারা সন্ন্যাসীদের মুক্তি হবে। সন্ন্যাসী যখন কোন কাজ করে, তা যে কাজই হয়ে থাকুক, সন্ন্যাসী সমাজের মঙ্গলের জন্য কোন কাজ করে না, নিজের মঙ্গলের জন্যই করে। কারণ মনের মধ্যে যে আবর্জনার ঢিপি জমে আছে, ওই আবর্জনাকে যদি পোড়াতে হয়, তাহলে পোড়াবার একমাত্র উপায় কাজ দিয়ে পোড়ানো।

একবার একটা টিভি চ্যানেলে একজন মহারাজের সাক্ষাৎকার ছিল, সেখানে মহারাজকে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনাদের সন্ন্যাসীদের মধ্যে কারুর কি ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, তাঁরা কি আপনাদের সাথে নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন'?

মহারাজ উত্তর দিলেন, 'শেয়ার করলে প্রথমেই আমরা তাঁকে পাগলা গারদে ঢুকিয়ে দেব। যদি কোন মহারাজ বলেন, আমার ঈশ্বরদর্শন হয়েছে, আমরা তাঁকে সোজা নিয়ে গিয়ে পাগলা গারদে ঢুকিয়ে দেব'।

শুনে ওই সাংবাদিক বলছেন, 'এটা আপনি কি বলছেন'!

'কারণ যাঁদের ঈশ্বরদর্শন হয়, তাঁদের ওই ক্ষমতাটাও এসে যায় সবাইকে নিজের ঈশ্বরদর্শনের কথা বলাকে আটকানোর। আর অন্যান্য জিনিস দিয়ে বোঝা যায়, উনি একজন উচ্চমানের সন্ন্যাসী'।

তারপর প্রশ্ন করেছেন, 'আপনার তো সন্ন্যাস জীবন পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর হয়ে গেল, আপনার কি কিছু উপলব্ধি হয়েছে'?

'হ্যাঁ, এতদিনে আমার মনে হয় শাস্ত্রের যে কথাগুলো শুনে এসেছি, এগুলো সব সত্য'।

'এত বছরে আপনার শুধু এতটুকু উপলব্ধি'?

'আমার কপাল খারাপ, আমি আর কি করতে পারি। বাকিরা সৌভাগ্যবান, ওনারা আগেই বুঝে গেছেন এগুলো সত্য'।

আমাদের মন একটা অনাবাদী জমি, যেখানে দুনিয়ার সব আবর্জনা আর আগাছা ভর্তি। ওই জঞ্জাল, আগাছা কেটে সাফ করুন, ট্রাক্টর লাগান, লাঙল চালান, গোবর দিয়ে যান, সার দিয়ে যান, তারপরে ঠাকুরের কথাগুলি বীজ রূপে সেখানে পড়বে, তখন গিয়ে কিছু হবে।

কথামৃতের সব কথাগুলো হল অমৃত বীজ। সেই বীজ আপনি ছড়িয়ে দিলেন, কিন্তু সারা জমিতে পার্থেনিয়াম গাছের জঙ্গল হয়ে আছে, বীজ ওর মধ্যে কোথায় বছরের পর বছর পড়ে থেকে থেকে হারিয়ে যাবে। আগে ওই জমি থেকে সব আগাছা পরিষ্কার করতে হবে, জমিতে জল দিতে

হবে। আবার আগাছা বেরোবে। আবার পরিষ্কার করতে হবে। এই খাটনি যদি না থাকে, কোন দিন কিছু হবে না। ওই খাটনিটাকে নিয়ে ভগবান এবার এই শ্লোক থেকে বলতে শুরু করলেন।

আমরা বলতে পারি, আমরা তো সবাই বাড়িতে কত খাটা খাটনি করি। রান্নাবান্না করছি, বাজার করছি, ঘরে কত কাজ করছি, ছেলেকে বড় করছি। সেটাও ভগবান দেখাবেন কিভাবে ওটা তোমার সর্বনাশ করবে। তাহলে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পূজারী, কালীঘাটের পূজারী তারাও তো কত কিছু করছে। সেটাও ভগবান দেখাবেন, ওদেরও কত defects আছে, serious problems সেখানে আছে। কাজ করলেই তো হল না, এ্যটলাস পুরো পৃথিবীকে কাঁধের উপর ধারণ করে আছে, সেও তো কত কাজ করছে, তাই বলে কি সে মুক্তির পথে যাবে! কিছুই না, পাথরের মত ওখানেই পড়ে থাকবে। আর মন্ত্র জপ করলেই যদি মুক্তি হয়ে যেত, তাহলে আজকাল টেপরেকর্ডে, সিডি প্লেয়ারে গায়ত্রী মন্ত্র *ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ* বাজানো যায়, ট্যাক্সিতেও শোনা যায়, টেপরেকর্ডারটারও মুক্তি হয়ে যেত, ট্যাক্সিটারও মুক্তি হয়ে যেত। এই পুরো জিনিসটা কি, পনেরোটা শ্লোকে ভগবান ব্যাখ্যা করছেন। পরের পনেরটি অধ্যায়ে এটাকে আরও বিস্তারে বলবেন।

মানুষ যদি যোগে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, তা হলে তার জন্য কি কি দরকার? আচার্য বলছেন, *যোগে তু তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ে নিঃসঙ্গতয়া,* যোগে প্রথম শর্ত হল নিঃসঙ্গ, এটা আমার কর্তব্য এটা আমাকে করতে হবে, এটাই প্রথম শর্ত। কর্মযোগের প্রথম শর্ত হল নিঃসঙ্গ, নিঃসঙ্গ মানে, আমার এটা দায়ীত্ব তাই আমি করছি। একটু আগে যে বলা হল, রামকৃষ্ণ মিশনের যে কাজগুলো করতে হয়, তার উদ্দেশ্য হল আমার নিজের উন্নতি। সমাজে তাতে দুটো লোকের ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে সেদিকে আমার দৃষ্টি নেই, ভাল কিছু যদি হয়, সেটা সমাজের লোকেদের সৌভাগ্য। কিন্তু কাজটা হবে সম্পূর্ণ অনাসক্ত ভাবে, সেখানে কোন প্রকার স্বার্থ থাকবে না। এমনকি আমার মুক্তি হোক, এই কামনাও যেন না থাকে।

আচার্য তাঁর ব্যাখ্যায় দ্বিতীয় শর্ত বলছেন, *দ্বন্দ্ব প্রহাণপূর্বকম্,* কোন দ্বন্দ্ব থাকবে না, সর্ব প্রকার দ্বন্দ্ব ত্যাগ করতে হবে। দ্বন্দ্ব মানে, যেখানে সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয় এই জিনিসগুলি জড়িয়ে আছে, দ্বন্দ্ব মানে দুটো বিপরীত জিনিস। যেখানে দ্বন্দ্ব জড়িয়ে আছে, সেখানে কর্মযোগ হবে না।

তৃতীয় শর্ত বলছেন, *ঈশ্বরারাধনার্থে,* সমস্ত কাজ হবে ঈশ্বরের আরাধনার জন্য। তিনটে শর্ত বলে দিলেন – প্রথম অনাসক্ত, দ্বিতীয় দ্বন্দ্ব ত্যাগ এবং তৃতীয় ঈশ্বরের আরাধনার্থে। এটাকে বলে সমাধিযোগ। কর্মযোগ আর সমাধিযোগ দুটো একই, কারণ সেখানে বুদ্ধিটা গিয়ে এক হয়ে যায়, ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত রয়েছে বলে। এই যে চেষ্টা করা হচ্ছে, তাই এটাকে সমাধিযোগ বলেন। তোমার মন এমন উচ্চ অবস্থায় চলে গেছে যে, তুমি যা কিছু করছে, কোন কাজেই তোমার নিজের কোন স্বার্থের মনোভাব নেই। দ্বিতীয় সেখান কোন সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতির চিন্তাও থাকবে না। তৃতীয়, যা কিছু হবে সব ঈশ্বরের পূজা রূপে হবে। এর ফলে, তোমার মধ্যে যে কর্মবন্ধন আছে, যেটা তোমাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে, সেই বন্ধনটা আলগা হতে শুরু হবে।

এক রাজার একজন খুব দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসার ছিল, তার জ্বালায় রাজা বিরক্ত হয়ে গেছে। সেই কর্মচারীকে রাজা বলে দিলেন, তুমি ওই নদীর ঢেউগুলো গুনতে থাকো; যাতে চুরি না করতে পারে। রাজার আদেশে সে এবার নদীর পারে একটা চেয়ার লাগিয়ে বসে কোন নৌকাকে আর নদীতে ঢুকতে দিচ্ছে না। কেন দিচ্ছে না? রাজা আমাকে ঢেউ গুনতে বলেছে, তোমার নৌকা এলে আমার গুনতে গোলমাল হয়ে যাবে। আরে ভাই আমাকে মাল নামাতে হবে। টাকা ছাড়ো, মাল নামাও। ঢেউ গুনতে গিয়ে সেখানেও টাকা আয় করছে। বিরাট লম্বা কাহিনী। কি করে রাজা ও

রানীর মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছে। শেষে বিরক্ত হয়ে রাজা বললেন, তোমার পদে থেকে তুমি যা চুরি চামারি করছিলে, তুমি সেই পদে থেকে তাই কর, তোমাকে আর এগুলো করতে হবে না।

হিন্দীতে একটা খুব সুন্দর প্রবাদ আছে, চোর চোরিসে যায় হেরাফেরিসে না যায়। একজন জুতো চোর কিভাবে সাধু হয়ে গেছে, তাকে বারণ করা হয়েছে, সে আর চুরি করে না। একবার ওদের আশ্রমে এক ভাণ্ডারা হয়েছে। সেখানে অনেক সাধুরা এসেছে। সেই জুতো চোর থেকে সাধু হওয়া লোকটি সবারই জুতোর এক পাটি নিয়ে আরেকটা জুতোর পাটির সঙ্গে রেখে দিয়েছে। সাধুরা এসে কেউ আর জুতো খুঁজে পায় না, এক পায়ের জুতো পাচ্ছে তো, আর-এক পায়ের জুতো পাচ্ছে না। স্বভাবটা এখনও ছাড়তে পারেনি। সেইজন্য বলছেন চোর চুরি করা ছেড়ে দেয়, কিন্তু উল্টোপাল্টা করে দেওয়ার স্বভাবটা ছাড়তে পারে না।

আমি আপনি সবাই এমন আসক্ত, সংসার থেকে টেনে হিঁচড়ে সব কিছু লুট করে নিতে চাই। গুরু বলে দিয়েছেন, এই নে কৃষ্ণ তোর ইষ্ট, এই নে ঠাকুর তোর ইষ্ট। পরের দিন থেকে ঠাকুরের কাছে হাজির হয়ে গেলাম একটা লম্বা লিস্ট নিয়ে, ঠাকুর আমার ছেলের যেন একটা চাকরি হয়, আমার মেয়ের যেন একটা ভাল পাত্রে বিয়ে দিতে পারি। কর্মের যে বন্ধন, সেখান থেকে আমরা বেরোতে পারব না। উপায় নেই, সেই মানসিকতাই নেই। এবার সে হয়ত কেঁদে কুঁকে বলতে শুরু করল, আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, কিছু একটা করুন।

তখন ভগবান বলছেন, তুমি কাজ কর, তোমার যেটা রোগ সেটাই কর। কাজ করো, কিন্তু তিনটে শর্ত লাগিয়ে দিলেন, কোন স্বার্থ থাকবে না, মনের মধ্যে সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতির ভাব থাকবে না, আর যাবতীয় কাজ ঈশ্বরের পূজা রূপে করো। এভাবে কাজ করলে কি হবে? আচার্য বলছেন, *ঈশ্বরপ্রসাদনিমিত্তজ্ঞানপ্রাপ্তেঃ*, ঈশ্বরের কৃপায় তখন তার জ্ঞান প্রাপ্তি হবে। অনেকে বলেন আচার্য অদ্বৈত বেদান্তী, তিনি ঈশ্বর মানেন না, কত বোকা বোকা কথা। কর্মযোগে আচার্য পরিষ্কার বলছেন, ঈশ্বর কৃপা করেন। কঠোপনিষদেও তাই বলছেন, *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ*, আত্মা যাকে বরণ করেন, আত্মা আর ঈশ্বর এক। এইভাবে কাজ করে করে মন যখন একেবারে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেল, ভগবান এবার তাঁকে কৃপা করবেন।

আসল ধর্ম আর নকল ধর্ম। নকল ধর্মকে আমরা ইংরাজীতে বলি religion। আসল ধর্ম মানে spirituality। আগে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক আলাদা ছিল না, আসলে আগে আমরা আধ্যাত্মিক শব্দ বলতাম না, পরে পরে এটা এসেছে, আগে সবটাকে ধর্মই বলা হত। কিন্তু এখন ঠিক ঠিক ধর্ম বলতে একটা বোঝায়, আর চলতি ধর্ম বলতে আর-একটা বোঝায়। চলতি ধর্ম হল, যেখানে আমি পাঁচটা জিনিস দিয়ে ভগবানকে ধরার চেষ্টা করছি। আসল ধর্ম হল, ভগবান যখন নিজে আমাকে ধরে নেন। Spirituality মানে ভগবান যেখানে আপনাকে ধরে নিয়েছেন, এরপর তিনি আপনাকে তাঁর মত চালাচ্ছেন। ধর্ম মানে, ঈশ্বরের সেবা করা, পূজা করা, তীর্থাদিতে যাওয়া, তাঁকে খুশী করার জন্য কর্ম করা, শাস্ত্র পাঠ করা, মন্ত্র জপ করা, ধ্যান করার চেষ্টা করা ইত্যাদি এই সমস্ত কিছুই হল নকল ধর্ম। আসল ধর্ম হয়, এগুলো করে করে মন যখন শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেল, তখন ভগবান আপনাকে ধরবেন, ধরে আপনাকে দিয়েই সব করাবেন। শেষে যা কিছু হয়, তা ঈশ্বরীয় কৃপাতেই হয়, আমার আপনার চেষ্টায় কিছু হয় না। তার আগে পর্যন্ত যা কিছু আছে, কর্মযোগ, সেখান থেকে সমাধিযোগ, সমাধিযোগ মানে মন যেখানে পুরো সমাহিত হয়ে একটা বিন্দুতে চলে এলো। তারপরে আসে ঈশ্বরীয় কৃপা।

এর আগে বলা হয়েছিল, আগাছার মধ্যে আমি যদি বীজ ফেলতে যাই বীজগুলো সব নষ্ট হয়ে যাবে। বেদের কর্মগুলি যদি করা হয়, কর্ম করতে গিয়ে যদি কোন ত্রুটি হয়ে যায়, তার জন্য পাপ লাগবে; তখন মনে হবে, না করলেই ভাল হত।

এক গ্রামে একটা শিব মন্দির ছিল। একটা ভিল আদিবাসী শিকার করে, সব মাংস নিয়ে শিব মন্দিরে গিয়ে উঠত, আর ওখানে শিবলিঙ্গের উপর পা তুলে ঘুমিয়ে থাকত। সেই মন্দিরেই এক শিবের ভক্ত যেত, সে আবার বেলপাতা, গঙ্গাজল দিয়ে শিবের পূজা করত। একদিন পূজা করতে গিয়ে সেই ভক্তের পা কিভাবে শিবলিঙ্গে ঠেকে যায়। তখন ভগবান শিব খুব রেগে ত্রিশূল দিয়ে ভক্তকে এই মারে কি সেই মারে। ভক্ত অনেক অনুনয় বিনয় করে বলতে লাগল, 'প্রভু এবারের মত ক্ষমা করুন, আর এই ভুল হবে না, এবার থেকে খুব সাবধান থাকব'। এই রকম কাতর ভাবে প্রার্থনা করাতে শিব তুষ্ট হয়ে বললেন, 'যা, এবারের মত ক্ষমা করে দিলাম'। তখন সেই ভক্ত একটু সাহস করে হাতজোড় করে বলতে লাগল, 'একটু আমার পা লেগে গেল আর তাতেই আপনি আমার প্রতি এত রুষ্ট হয়ে গেলেন? আর ওই ভিলটা রোজ আপনার মাথায় পা রেখে শুয়ে বিড়ি খায়, তার বেলায় আপনি কিছুই করেন না'। 'আরে ওই ব্যাটা তো আমাকে মানেই না, ওকে আমি কি করব। তুই আমাকে মানিস বলে তোকে চমকাচ্ছি'। তাহলে তো না মানাই ভাল। বেদের যজ্ঞ করে, পূজা করে যদি আমার দোষই হয়, তাহলে এই রইল তোমার যজ্ঞ, আমার লাগবে না।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।।৪০।।

(এই মোক্ষমার্গরূপ নিষ্কাম কর্মযোগে কোন প্রকার প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয় না এবং বৈগুণ্যজনিত প্রত্যবায়ও হয় না। এই নিষ্কাম কর্মযোগের অল্পমাত্র অনুষ্ঠানও জন্মমরণরূপ সংসারের মহাভয় থেকে পরিত্রাণ করে।)

অভিক্রম নাশ মানে, ধীরে ধীরে জিনিসটা নাশ হয়ে যায়। যেমন মানুষের শরীর ধীরে ধীরে নাশ হয়। কিংবা আপনার ক্ষেত আছে, ক্ষেতে আপনি বীজ বপন করলেন। কিন্তু ঠিক ভাবে জল দিলেন না, ঠিক ভাবে সার বা সেই বছর খরা বা বন্যা হয়ে গেল, আস্তে আস্তে বীজ হয় শুকিয়ে যাবে নয়তো পচে যাবে। যে কোন সম্পর্কে যদি নিয়মিত জল ঢালা না হয়, সম্পর্কটা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাবে। মা আর সন্তানের সম্পর্কটাই একমাত্র টিকে থাকে, বাকি যত সম্পর্ক আছে, এমনকি দুই ভাই, তাদেরও সম্পর্ক আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাবে, যদি তাতে নিয়মিত জল না ঢালা হয়। কিন্তু কর্মযোগে এটা হয় না, কর্মযোগে *অভিক্রম নাশ* হয় না। কর্মযোগ তুমি যতটা করলে, ততটা থেকে যাবে। এরপর যখন আবার আসবে, ওখান থেকে আবার শুরু হবে। জন্মজন্মান্তর ধরে এটা এক ভাবে পড়ে থাকবে। এমন কি এক জন্ম করলে, তারপর চার জন্ম কিছুই করলে না, পঞ্চম জন্মে গিয়ে যদি আবার করতে শুরু করো, ওখানেই ওটা দাঁড়িয়ে থাকবে, শুরু হবে ওখান থেকে, কর্মযোগে কিছু নাশ হয় না।

প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে, বেদে যজ্ঞ করতে গিয়ে যদি কোন ত্রুটি হয়ে যায়, তাতে পাপ হয়ে যাবে; আবার বলা হয় মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে জপধ্যান না করলে পাপ লাগবে। কর্মযোগে কোন পাপ লাগে না, যতটা করা গেল, ততটা থাকল। যদি বলেন, আমি আর পারছি না, ছেড়ে দিন কোন সমস্যা নেই। কিছু দিন পর ইচ্ছে হল, আবার করতে থাকুন। যতটা ভাল করে এসেছেন, ঠিক সেখান থেকে এবার শুরু হবে।

আমরা এর একটা খুব স্থূল উদাহরণ দিতে পারি। বলা হয় যে, বাচ্চা বয়সে যদি সাইকেল চালানো শেখে, সে নাকি আর কোন দিন ভুলে যায় না। সাঁতার কাটা যদি শিখে নেয়, সেও নাকি জীবনে আর সাঁতার ভোলে না। ঠিক তেমনি কর্মযোগ যদি একবার শিখে নেওয়া যায়, তাহলে কোন

দিন আর যাবে না। তিরিশ বছর কেউ আর সাইকেল চালালো না, তারপর যেমনি সাইকেল চালাতে যাবে, একটু টালমাটাল খেয়ে চালাতে থাকবে।

স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য, কর্মযোগের একটু যদি অভ্যাস করে, তাতেই *ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*, এই যে সংসার ভয়, এটা নাশ হয়ে যায়। স্বামীজী কর্মযোগের বক্তৃতাগুলিতে নিষ্কাম কর্মকে unselfish বলতেন। স্বামীজী এই কথা খুব বলতেন – Unselfishness is more paying, only people do not have the patience to practice it। নিঃস্বার্থ ভাবে যদি কাজ করা হয়, কর্মযোগ যদি করা হয়, আসক্তি ত্যাগ করে যদি কাজ করে, সব সময় ওর ফল অনেক বেশী হয়। কারণ তখন পুরো দমে কাজ করে কিনা। কিন্তু ফলের আকাঙ্খা নিয়ে যদি কাজ করে, তখন মনের মধ্যে এটা সব সময় জেগে থাকে যে, আমার এতে লাভ হবে কিনা। আমি যদি একটা কাজ করি, আর সেখানে যদি ভাবতে থাকি এই কাজের জন্য লোকেরা আমার প্রশংসা করবে কিনা, লোকেরা কি দারুণ করেছ, বলবে কিনা; মনের একটা ছোট্ট অংশ চলে যায় ওই চিন্তা করতে। কিন্তু যিনি ফলের দিকে না তাকান, তাঁর পুরো মনটাই কাজের প্রতি নিবিষ্ট থাকে, ফলে কাজটাও অনেক ভাল হয়।

আমাদের যখন সমালোচনা করা হয়, তখন এটাই বলা হয়, কি বাচ্চাদের মত কাজ করছ। কারণ বাচ্চারা কাজ করে না, তারা শুধু appreciation চায়, আমি কি দারুণ করলাম। মায়েরা বাড়িতে রান্নাবান্না করছেন, সেখানেও তাঁরা কোন appreciation চান না, কারণ তাঁরা নিজের ভালবাসার জন্য করছেন, সন্তান, স্বামী সবাইকে ভালবাসেন কিনা, প্রাণ ঢেলে রান্নার সব কাজ করেন। গতকালের রান্না আজ থেকে ভাল ছিল, এই ধরণের চিন্তা-ভাবনা তাঁদের আসে না। কিন্তু যেদিন পার্টি হবে, বাড়িতে অনেক অতিথি আসবে, সেদিন রান্না করতে গিয়ে নার্ভাস লাগে, ভাল করে রান্না করতে হবে, কি জানি খেয়ে কি বলবে, ওই চিন্তাতেই মনের শক্তিটা অনেক ক্ষয় হয়ে যায়, তার মানে পাত্রে একটা ফুটো হয়ে গেল।

চল্লিশ নম্বর শ্লোকে কর্মযোগের ফল কি হয় আগেই বলে দিলেন। কি ফল? কোথাও যদি কোন ত্রুটি হয়ে যায়, তাতে কোন পাপ হয় না। কর্মযোগের অভ্যাস যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাতে অভিক্রম নাশ হয় না। একটু অভ্যাস যদি করা হয়, তাতেই জীবনে অনেক শান্তি আসে। ওষুধ যদি ঠিক ভাবে সেবন না করা হয়, ফল দেবে না। অনেক সময় ভুল ওষুধ সেবন করলে বিপরীত ফল হবে। কর্মযোগে এসব কিছু হয় না। কর্মযোগ, সেখান থেকে সমাধি যোগ, এটাকে বলছেন, one pointedness। শুধু একটা জিনিসকে নিয়ে আছে, এটাই সমাধি যোগ। একচল্লিশ নম্বর শ্লোকে এটাকে নিয়েই বলছেন –

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যসায়িনাম্।।৪১।।

(হে অর্জুন, এই নিষ্কাম কর্মযোগে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠ (সকাম বুদ্ধির বহুমুখী ভাবনাশক) হয়। অস্থির চিত্ত সকাম ব্যক্তিদের বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট ও বহুমুখী।)

এখানে দুটো শব্দ আনছেন, *ব্যবসায়ি* আর *অব্যবসায়ি*। চল্লিশ নম্বর শ্লোকের শেষাংশে বলছেন, *স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*। কিসের থেকে আমাদের ভয়? জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে। আমাদের সমস্যা হল, আমরা শুধু এই জন্মটুকুই দেখছি, সেইজন্য আমরা আমাদের সমস্যা বুঝতে পারি না। যারা একটু উন্নত, তারা বুঝতে পারেন, জন্মেছি মরতে হবে, আবার জন্ম হবে, আবার মরতে হবে, এই চক্রটা ঘুরছে তো ঘুরছেই, এটা থেকে আমাকে বেরোতে হবে। তার একটা যে আভাস পাই, সেটা হল শোক আর মোহ। নিত্য আমাদের কষ্ট লেগে আছে, আজকে এই দুঃখ, কাল এটার জন্য মোহ, এর থেকে আমরা একটা আভাস পাই, সব কিছুর মূলে কি রয়েছে – জন্ম-

মৃত্যু চক্র। ভগবান বুদ্ধও জন্ম-মৃত্যু চক্রের উপর বেশী জোর দিয়েছেন। এটা থেকে বেরনোর উপায় বলছেন কর্মযোগ।

কর্মযোগের তিনটে শর্ত বলা হয়েছিল, নিঃসঙ্গ, অনাসক্ত; অনাসক্ত মানে যেখানে নিজের কোন স্বার্থ থাকবে না। আর *দ্বন্দ্বপ্রহারণ*, মনের মধ্যে সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতির চিন্তা, সেটাকেও ছেড়ে দেওয়া। শেষে বলছেন, সব কাজ ঈশ্বরের পূজা রূপে করা। এই তিনটে জিনিস যেটা করছেন, এর পিছনে রয়েছে একটা সিদ্ধান্ত, *ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ*। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হল one pointedness। আমার একটাই জিনিস চাই, সেটা হল এই জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে বেরোন বা এই শোক মোহ থেকে বেরোন। ক্রিমিনালদের মনে একটা জিনিস থাকে –বদলা নেওয়া, আমাকে একে মারতে হবে। বড় বড় যুদ্ধে আর্মি ইউনিটকে বলে দেওয়া হল, go ahead and capture this, ওদের মাথায় এখন একটাই জিনিস, যত লোক মরে মরুক, যত যাই হোক, আমাকে এটাই করতে হবে, I have to capture this এর বাইরে আর কিছু চাই না। যাঁরা নিজেকে যোগী বলেন, যোগী বলতে কিন্তু সবাই, যারা ঠাকুরের মন্ত্রে দীক্ষিত, যারা ঠাকুরের ভক্ত, যাঁরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন, সবারই উদ্দেশ্য একটাই, এই জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে আমি কিভাবে বেরিয়ে আসতে পারব –এটাই যোগীর কাছে I have to capture this, এটাই কর্মযোগের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি।

এর বিপরীত হল *অব্যবসায়িনাম্*। অব্যবসায়ির বুদ্ধি, বলছেন *বহুশাখা হ্যনন্ত্যশ্চ*, বুদ্ধির অনেকগুলো শাখা বেরিয়ে থাকে। অনেকগুলো শাখা কি রকম? এরা যে কোন কাজ যখন করে, একটা চাকরি করছে, একটা পূজা করছে, তখন তাদের মন লেগে থাকে অনেক কিছুতে –নিজের ভাল চাই, স্ত্রী পুত্রের ভাল চাই, পরের জন্মটা ভাল চাই, ভাল চাই ভাল চাই, এটাও চাই, সেটাও চাই, একটার পর একটা জিনিসে লেগে থাকে। আমরা কি করে বুঝব, একটা লোক সত্যিকারের আধ্যাত্মিক, নাকি জাগতিক? ওর জীবনের লক্ষ্যটা দেখতে হবে। যে বলছে, আমার জীবনের লক্ষ্য হল টাকা আয় করা, মানছি টাকা আয় করাটা apparently মনে হয় single point devotion to goal। আমরা অনেক সময় বলি, লোকটা এত স্বার্থপর যে, নিজের ক্যারিয়ার ছাড়া আর কিচ্ছু জানে না। যদি তার ক্যারিয়ারটাই সব হয়, তাহলে perfectly alright, you are one pointed। এবার প্রশ্ন আসে, ক্যারিয়ারটা নিয়ে আপনি কি করবেন? টাকা আয় করব। টাকা তো গোল হতে পারে না, টাকাটা নিয়ে আপনি কি করবেন? সঙ্গে সঙ্গে শাখা বেরিয়ে এলো, আমেরিকা যাব, ইউরোপ যাব, ইতালি যাব, তার সাথে ভাল গাড়ি থাকবে, সুন্দর একটা বাড়ি থাকবে, সুন্দরী স্ত্রী থাকবে; বহু শাখা বেরিয়ে এলো। তাই না, যখন কাজ করেন, যাঁরা যোগী তাঁরা তখন ওই একটা কাজই করেন। যোগীদের multi branching, multi tasking দুটোর মধ্যে কোনটাই থাকে না।

একবার আইআইএম, ইন্দোরে একটা ক্লাশ সেসানে একজন মহারাজ ছাত্রদের বোঝাচ্ছিলেন কেন multi tasking করতে নেই। ছাত্ররা তখন বলছে, এর আগে আমাদের এক প্রফেসর ক্লাশে বলে গেলেন ম্যানেজমেন্টে multi tasking কত important। মহারাজ তখন বললেন, হ্যাঁ, তোমরা multi tasking করতে পারে, কিন্তু you will end up being a second grade managers। Multi tasking মানে, এটাও করছি, সেটাও করছি; multi branching মানে, এটার জন্যও করছি, সেটার জন্যও করছি। জীবনে টাকাও চাই, জীবনে নামও চাই, জীবনে নিরাপত্তাও চাই, জীবনে ভাল পার্টনার চাই, ভাল সন্তান চাই। তোমার মন এত কিছু জিনিসের দিকে যাচ্ছে, তার মানেই তুমি সংসারী। দিনের পর দিন একজন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে যাচ্ছে। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করুক, ঠাকুরের কাছে আপনি কি প্রার্থনা করছেন? নিজের ভিতর থেকে কি চাইছেন? যদি দেখা যায়, সে আজকে এটা চাইছে, কাল সেটা চাইছে; তার মানেই সে অবশ্যই সংসারী, সে যোগী কোন ভাবেই নয়। সংসারবৃক্ষকে যদি উপড়ে ফেলতে হয়, তাহলে তাকে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি নিয়ে আসতে হবে। ব্যবসায়ি বুদ্ধি হল, one single goal। তাহলে কি সবাই সন্ন্যাসী হয়ে যাবে?

কখনই না, কারণ যে সংসারে আছে, তারও উদ্দেশ্য হল কর্মযোগ, তারও উদ্দেশ্য হল কিভাবে আমি ঠিক ভাবে কর্মযোগ করব, আমার যে বাড়ি, আমার যে স্ত্রী, আমার যে সন্তান, আমার যে চাকরি, সব কিছুরই উদ্দেশ্য হল একটাই, কিভাবে ধীরে ধীরে আমি নিজেকে মুক্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে; সংসাররূপ যে বন্ধন, এই বন্ধনকে ছিন্ন করার দিকে, এর বাইরে অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

ভারতকে নিয়ে বলার সময়, স্বামীজী এই কথা অনেকবার বলছেন, তোমার যে বিবাহ, এই বিবাহ তোমার ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নয়। যা কিছু তুমি করছ, কোনটাই তোমার সুখের জন্য নয়, এটা তোমাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে। আত্মা স্বভাবেই নিত্য-বুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্ত। কোন কারণে এখন সংসারে এসে গেছে। সংসারের যে বিস্তার, তাতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ রয়েছে। তাহলে আত্মা কেন এই সংসারে এসেছে? কোন কারণে তার মধ্যে কাম ভাবের জন্ম হয়েছে, তবেই না এসেছে। যে কাম এসেছে, সেই কামের পুর্তি করে বেরিয়ে যাওয়া, এটাই উদ্দেশ্য। কাম ভোগের মধ্যে যদি জড়িয়ে পড়ে, তাহলে মরবে। যদি না করে, তাতেও মরবে, কারণ কাম পুর্তির জন্যই এখানে আসা।

যদিও এটা খুব স্থূল উদাহরণ, কিন্তু একেবারে সঠিক –কারুর পেটের গণ্ডগোল, স্টেশনে তার টয়লেটে যাওয়ার বেগ এসেছে। স্টেশনের টয়লেট কি রকম হয় সবার জানা, প্রচণ্ড নোংরা, ঢুকলেই গা গুলিয়ে আসে। কিন্তু যতই নোংরা হোক, এখন তাকে সেখানেই কাজ সারতে হবে, অন্য কোন উপায় নেই। টয়লেট সেরে কোন রকমে যত তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বেরিয়ে আসা। সেখানে বসে বসে সে সাহিত্য, কবিতা, নৈসর্গিক কোন কিছুর চিন্তা করতে পারবে না। ইতালিয়ান বাথের মত সেখানে বসে আছে তো বসেই আছে, সেটাও হবে না। অন্য দিকে তাকে সেই টয়লেটেই যেতে হবে। সংসারটাও তাই, বিয়ে করতে হবে, সন্তান আনতে হবে, টাকা আয় করতে হবে, বাড়ি করতে হবে, যা কিছু করতে হবে, সবটার উদ্দেশ্য হল, যে ভোগের ইচ্ছাটা এসেছে সেটাকে কোন ভাবে মিটিয়ে যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে আসা। যা কিছুই আমরা করি না কেন, টাকা আয় করতে হচ্ছে, উদ্দেশ্য জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে বেরোতে হবে। আমার ভিতর কাম-বাসনা আছে, সন্ন্যাসী আমি হতে পারব না, একা একা আমি থাকতে পারব না, আমার সঙ্গ দরকার, খুব ভাল, তুমি বিবাহ কর। কিন্তু সেখানেই শেষ, কারণ উদ্দেশ্য হল, জন্ম-মৃত্যুর চক্র পার করা। আমার খুব ইচ্ছা, দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াব; ঠিক আছে তুমি ঘুরে নাও। উদ্দেশ্য হল, অল্প একটু ভোগ হয়ে গেলে সমস্ত কিছু ত্যাগ করে বেরিয়ে চলে যাওয়া। এটাকে বলছেন ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। বুদ্ধি সব সময় একটাতে লেগে আছে –কি করে এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে বেরিয়ে আসা যায়।

এর বিপরীত হল অব্যবসায়ি বুদ্ধি। বিজনেস ওয়ার্ল্ডে আমেরিকা আসার পর নানা রকমের বিজনেস মডেল নিয়ে আজ এই কোম্পানী দাঁড় করাচ্ছে, কাল সেই কোম্পানীকে দেউলিয়া করে দিচ্ছে, পরশু সেই কোম্পানীকে খেয়ে নিচ্ছে, কত কি হচ্ছে ভগবানই জানেন। কিসের জন্য করছে, কার জন্য করছে, কদিন পর তুমি মরে যাবে; মাঝখান থেকে কত লোককে তুমি কষ্ট দিলে, লোকগুলো আজ ফেঁসে গেল। এখানে যে শুধু নিজের মুক্তির কথা বলা হচ্ছে তা তো না, আপনার আমার আশেপাশে যারা আছে, তাদেরকেও ঈশ্বরের পথে নিয়ে যাওয়াটা আপনার কর্তব্য, তাদেরকেও জন্ম-মৃত্যু চক্রের বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আপনার যে স্ত্রী বা স্বামী আছে, আপনার যে সন্তান আছে, আপনার যে ভাই বোন আছে, সবাইকে আপনি সেই পথে নিয়ে যাবেন। জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে বেরিয়ে আসার পথটা যাতে তার সহজ হয়, সেই চেষ্টা করুন।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী খুব সুন্দর কথা বলতেন। বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারীদের ট্রেনিং সেন্টার উনি ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ব্রহ্মচারীদের বলছেন, একবার একজন মহারাজকে এসে বলল, 'আমাকে কিছু টাকা সাহায্য করুন, আমার মেয়ের বিয়ে দেব'। উনি সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিলাম। মহারাজের এই ভাব –আমি সন্ন্যাসী, আমি বিয়ে করব না, আমার লাগবে না। কিন্তু তোমার

মেয়ের বিয়ে দেওয়া দরকার, এতে তোমারও শান্তি হবে, এই টাকা কটা তুমি নাও, আর ভাল করে মেয়ের বিয়ে দাও। তারপর আবার বলছেন, এক ইয়ং ছেলে একবার মহারাজের কাছে একটা চাকরির জন্য এসেছে, মহারাজ যদি একটা সুপারিশ করে চিঠি লিখে দেন তাহলে তার এই চাকরটি হয়ে যায়। উনি বলছেন, 'আমি সন্ন্যাসি আমার চাকরি লাগবে না, কিন্তু আমার একটা সুপারিশে যদি কারুর চাকরি হয়ে যায় খুব ভাল, এই নাও আমার সুপারিশ'। বলে একটা প্যাডে লিখে দিলেন, I will be very happy, if he gets this job।

অন্যস্য পুর্তিবিধান, অন্যদের মনে যে কামনা-বাসনা আছে, সেগুলোর পুর্তির জন্য তাদের সাহায্য করুন, যাতে তার মন থেকে যদি ওই খিচখিচানি বেরিয়ে যায়, সেখান থেকে সে যদি আবার মুক্তির পথে এগোতে শুরু করে। শুধু আপনি মুক্তির দিকে যাবেন না, আপনার আশেপাশে যারা আছে, তাদেরও মুক্তির দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করুন। আমাদের এখানে এখন হয়েছে, big fish eat small fish, আমি খাবো, যা বাঁচবে সেটাকে মাটিতে ফেলে দেব, অন্য কেউ যেন না পায়, ভারতে আগে কখন এই মনোভাব ছিল না। এই কামনাগুলো এমন বিস্তার লাভ করে যে, যার ফলে মানুষের বুদ্ধিটাও চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। বুদ্ধি ছড়িয়ে গিয়ে অব্যবসায়ি হয়ে যায়। আমরা প্রথমের দিকে যখন গীতার আলোচনা শুরু করেছিলাম, তাতে বলা হয়েছিল – কর্ম, কর্মযোগ ও তার ফল। আর সেখান থেকে হয় sacred religious duties, যা কিনা হিন্দুদের জন্য way।

এর পরের তিন চারটে শ্লোক ভগবান বেদকে নিয়ে বলছেন। বেদের উপর খুব সংক্ষেপে বলা যাবে না, তাও মোটামুটি সংক্ষেপে একটু বলে নিতে হচ্ছে। কর্ম বলতে বোঝায় বেদের কর্ম। ইদানিং কালে সাংসারিক কর্ম আর পূজা আমাদের মধ্যে কোথাও একটা তফাৎ হয়ে গেছে। আমরা মনে করি পূজা আলাদা জিনিস আর সংসারের কাজকর্ম গুলি আলাদা জিনিস। এই সমস্যা এসেছে খ্রীশ্চান ধর্ম থেকে। খ্রীশ্চানিটি হল সমস্ত সমস্যার মূলে। খ্রীশ্চান ধর্মের কাছে কিছু জিনিস হল ঈশ্বরীয় কাজ, কিছু জিনিস হল জাগতিক কাজ। আর ওদের eternal problem হল কার্টিশান ডিভাইড। একটা গ্রাফে এটা এক্স এক্সিস আর এটা ওয়াই এক্সিস, ওয়াই এক্সিস হল গড্ আর এক্স এক্সিস হল জগৎ, এটা সেকুলার, ওটা সেক্রেড; একা খ্রীশ্চান ফিলজফি কিভাবে পুরো সংসারকে damage করেছে কল্পনা করা যায় না। হিন্দু ধর্মে সেকুলার বলে কিছু হয় না, সাংসারিক কাজ, জাগতিক কাজ বলে কিছু হয় না, সমস্ত কাজ বেদের নির্দেশে হয়ে থাকে। বাচ্চার জন্ম থেকে তার পড়াশোনা, তার বিবাহ, তার সন্তান হওয়া সব কিছু বেদ থেকে হয়। বেদকে যে মানবে না, সে হিন্দু না; সে নাস্তিক হোক, কম্যুনিস্ট হোক, যাই হোক, অন্তত হিন্দু না। কিন্তু একজন আছেন, যিনি বেদকে মানেন না, তিনি সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী বেদকে পার করে যান। কেন বেদকে পার করে যান, এটাই আমরা এবার আলোচনা করব।

এখন আলোচ্য হল দুটো –বেদ আর বেদের পারে। যারা বেদকে অগ্রাহ্য করে, বেদের কথা ধরে না, এনাদের কাছে এরা হল চণ্ডাল। তখনও এনাদের কাছে 'চণ্ডাল' শব্দ আসেনি। আচার্য শঙ্করের সময় তখনও মুসলমানরা ভারতে প্রবেশ করেনি, তখন ওনারা এটা জানতেন না। ওনারা বলতেন এরা বর্ণ ব্যবস্থার বাইরে। তার মানে তুমি কিছুই না। পরে তন্ত্রের প্রচলন ও মহানির্বাণ তন্ত্র আদি আসার পর ওনারা আলাদা একটা জাতি করে দিলেন, তার নাম হল 'সামান্য'। সামান্য হল, যারা কোন কিছু মানে না, এরা কিছুই না। হিন্দু বাবা-মার কাছে জন্ম নিয়েছ, পাসপোর্টে ধর্মের জায়গায় লেখা আছে হিন্দু, এর বেশী কিছু না। বিদেশে গিয়ে বিদেশী হয়ে যায়, হরিদ্বারে গিয়ে হিন্দু হয়ে যায়, এরা কিছুই না। একজন হিন্দুকে তখনই হিন্দু বলা হবে, যখন সে বেদকে মানে, এবং বেদের সব কাজকে সে মানে। বেদ ঠিক সেভাবে মুক্তির দিকে নিয়ে যান না, কিন্তু বেদ সমস্ত কাজকে ঈশ্বরীয় ভাবে নেন। খ্রীশ্চানদের আছে, দৈনন্দিন সব কাজে আধ্যাত্মিকতা। হিন্দুদের

spiritualizing in everydays action হয় না, হিন্দুদের সমস্ত actionই হচ্ছে spiritual। হিন্দুরা জানেই না, বেদের বাইরে কোন কাজ হতে পারে, কারণ বেদ সমস্ত কিছুকে ঘিরে রেখেছেন।

বেদ কিভাবে ঘিরে রাখে? একটা হল সেই শুদ্ধ চৈতন্য আত্মা, যেটা দেশ, কাল, বস্তু, মনের পারে। এর বাইরে হল জগৎ; জগৎ দেশ, কাল, বস্তু, মনের ভিতরে। এই যে দেশ, কাল, মন, যেখানে world of mind and reality of Atman এই যে দুটো সত্য, এর মধ্যে মন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এনারা বলছেন, মনকে সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণের অবস্থা দিয়ে বর্ণনা করা যায়। যেমন বলছেন, মন যখন রজোগুণে তখন মন সক্রিয়, মন যখন তমোগুণে তখন মন নিস্তেজ, আর যখন সত্ত্বগুণে মন তখন শান্ত। রজো তমসের বিপরীত; রজো সপ্রভ এবং তমস হল নিষ্প্রভ। সত্ত্ব হল শান্ত, স্নিগ্ধ।

বেদ ঠিক ঠিক মনের জগতেই ঘুর ঘুর করে, মনের জগতের বাইরে যায় না। তার অর্থ দাঁড়ায়, বেদের মধ্যে যাবতীয় যা কিছু আছে, সব সত্ত্ব, রজো ও তমোগুণের মধ্যেই ঘুর ঘুর করছে। মনের সাম্রাজ্য বেদের মধ্যে ঘুর ঘুর করছে। কিভাবে? বেদ বলবে, এই যজ্ঞ করলে তুমি টাকা পাবে, এই যজ্ঞ করলে তুমি অনেক পশু পাবে, এই যজ্ঞ করলে তুমি সন্তান পাবে, এই যজ্ঞ করলে তুমি বৃষ্টি পাবে, এই যজ্ঞ করলে তুমি তোমার শত্রুকে দমন করতে পারবে, এই যজ্ঞ করলে তুমি স্বর্গ পাবে, এই যজ্ঞ করলে তুমি ব্রহ্মলোক পাবে, যজ্ঞ কর এটা পাও, যজ্ঞ কর সেটা পাও। যেখানেই কার্য কারণের সম্পর্ক সেটাই হয়ে গেল মনের সাম্রাজ্য। মনের সাম্রাজ্য মানেই, তিনটে গুণের মধ্যে বাঁধা। তার সাথে, বেদের ব্রাহ্মণরা, যাঁরা যজ্ঞাদি করাতেন, বেদকে আধার করে বিভিন্ন যে বিধান দিতেন, এই ব্রাহ্মণরা মনে করতেন, আমাদের মত আর কেউ না। ব্রাহ্মণরা বলবে, তুমি জীবনে টাকা চাও? এই নাও বেদ তোমাকে এই যজ্ঞের বিধান দিয়েছে। সন্তান চাও, এই নাও এই যজ্ঞ কর। অখণ্ড সাম্রাজ্য চাও, এই নাও, তোমার জন্য এই যজ্ঞ রাখা আছে, নিয়ে এলেন অশ্বমেধ যজ্ঞ। তুমি স্বর্গে যেতে চাও, আমরা তোমাকে সব দেব। সেটাই পরের মন্ত্রে ভগবান বলছেন –

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ।।৪২।।

(হে পার্থ, অবিবেকী পুরুষরা বেদোক্ত কর্মের প্রশংসায় অনুরক্ত। স্বর্গাদিফলজনক কর্ম ছাড়া অন্য কিছুই নাই, এটাই তাঁদের বিশ্বাস।)

বেদের যারা পণ্ডিত, যাঁরা বেদের যজ্ঞ করেন, তাঁরা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেন, এটা পাওয়া যাবে, সেটা পাওয়া যাবে। ইদানিং একটা নূতন শব্দ এসেছে, spiritual tourism, আজ কোথায় যাচ্ছেন? অমুক জায়গায় যাচ্ছি। ওখানে গেলে কি হয়? আরে, যা প্রার্থনা করা যায় তাই পাওয়া যায়। আজকে তিরুপতী যাচ্ছে, আগামীকাল সিরিডি যাচ্ছে, পরশু হরিদ্বার যাচ্ছে। আর ওখানকার পাণ্ডারা এজেন্টদের মত বলতে থাকবে। আর বাবাজীরা আছে, শুধু একবার দাঁড়ালেই হল, বোল বাচ্চা কেয়া চাহিয়ে, সব মিলেগা। সব মিলেগা তো বুঝলাম, তাহলে আপনি এখানে কষ্ট করে খালি গায়ে কেন বসে আছেন, একটু ভাল করে থাকুন। যত রকমের চালবাজি, ধাপ্পাবাজি; পুরো ধর্মটাকে একটা রিলিজিয়াস মাফিয়াদের গ্যাং চালাচ্ছে। এটাই এখানে ভগবান বলছেন, বেদ এই রকম মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে। এই অবিবেকীরা, যারা ভোগের মধ্যে পড়ে আছে, সব সময় শুধু এটা চাই সেটা চাই করে যাচ্ছে; বেদ কিন্তু সেটাই তোমাকে দিচ্ছে। বেদের প্রার্থনাগুলিতে ঘুরে ফিরে সেই এক জিনিস, প্রভু আমার খুব কষ্ট, কষ্ট দূর করে দাও। প্রভু আমার এই নেই, সেই নেই; ব্যবস্থা করে দাও। সবাই এর মধ্যে ঘুর ঘুর করছে।

কিন্তু বেদান্ত আমাদের বেদের বাইরে নিয়ে চলে যান। তবে সাধারণ মানুষ বেদ থেকে বেরোতে পারে না। আজকের দিনের সমাজের দিকে তাকিয়ে যদি বলতে হয়, আমরা দেখছি আজকের সমাজের বেশীর ভাগ লোক ধর্ম জানে না, ধর্মের ব্যাপারের তাদের কোন আগ্রহ নেই। দ্বিতীয়তঃ, যারা ধর্মকে মানে, কিন্তু তারা ধর্মকে কামধেনুর মত মনে করে, নিজের ইচ্ছে মত দুয়ে নাও, যা পাওয়া যায়। একদিকে রয়েছে সেই সব ভক্তকুল, যারা ঠাকুরের সামনে হাতজোড় করে বলে যাচ্ছে, ঠাকুর এটা দাও, সেটা দাও। অন্য দিকে আছে সেইসব ভক্তের দল, ঠাকুরের গল্পে আছে, সোনার ব্যবসা করে, কয়েকজন খদ্দের সেখানে এসেছে, তাদের দেখে একজন বলছে কেশব কেশব, এরা কারা; আর-একজন বলছে গোপাল গোপাল, এরা সব গরুর পাল, একেবারে বোকা। আর-একজন বলছে, হরি হরি, তাহলে কি একে হরণ করা যাবে? সাথে সাথে আর-একজন বলছে হর হর, সব হরণ কর। চারিদিকে বাবাজিরা বসে আছে, ভক্তরা সব আসবে, আর বলবে, কেশব কেশব, তার চ্যালা বলছে, গোপাল গোপাল, এ বোকা কিন্তু মালদার ভক্ত। তাহলে হরি হরি। হর হর, সব ট্যাঁক ফাঁকা করে দাও।

এক অপরের জন্য সব কামধেনু। ভক্ত মনে করছে, এই বাবাজির আশীর্বাদ নিয়ে আমি দুনিয়াকে দুয়ে নেব; আর বাবাজী দেখছে, এক মালদার ভক্ত এসেছে, একে ভাল করে দুয়ে নেব। এর মধ্যে যে বেশী চালু সে বেশী দুয়ে নিচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন ভক্তকে আমরা ধনী হতে দেখিনি, সাধুবাবাদেরই বড় হতে দেখেছি। সাধুবাবাদের বুদ্ধি অনেক ভাল, হিন্দীতে প্রবাদ আছে, ভকৎ জগৎ কো ঠকৎ হ্যায়, ভকৎ ঠকই সো সন্ত; ভক্ত জগৎকে বোকা বানায়, আর ভক্তকে যে বোকা বানাতে পারে সেই হল সন্ত। এখানে এটাই বলছে, বেদ ঠিক এটাই করছে। তুমি নিজে খেটে যেটা করতে পারবে, সেটাই তুমি বেদে গিয়ে শর্টকাটে করতে চাইছ। তুমি যদি ঠিক ঠিক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে চাও, তুমি যদি যোগী হতে চাও, যদি তুমি জন্ম-মৃত্যুর চক্রের বাইরে যেতে চাও, এগুলো বন্ধ কর।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং, বেদ মিষ্টি মিষ্টি করে বলে যাবে, আমি তোমাকে এটা করে দেব, সেটা করে দেব। আমাদের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি দীক্ষা দেওয়ার আগে প্রথমেই দীক্ষার্থিদের বলে দিতেন, 'দেখ বাপু আমি তোমাদের দীক্ষা দিলাম, এরপর এসে আমাকে বলো না যে, নরেন্দ্রপুরে আমার ছেলেকে এ্যাডমিশান করিয়ে দেবেন, আর সেবাপ্রতিষ্ঠানে একটা বেড পাইয়ে দেবেন, আমার দ্বারা এগুলো হবে না'।

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্চর্যগতিং প্রতি।।৪৩।।
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।।৪৪

(এনারা সবাই কামনাযুক্ত ও স্বর্গকামী। তাঁরা জন্মরূপ কর্মফলপ্রদানকারী এবং ভোগপ্রাপ্তি ও ঐশ্বর্যলাভের উপযোগী বহু ক্রিয়াকলাপের প্রশংসা করে থাকেন। যাদের চিত্ত সেই সব পুষ্পিত (আপাতমনোরম) বাক্যে বিমুগ্ধ এবং ভোগ ও ঐশ্বর্যে আসক্ত, তাদের অন্তঃকরণে পূর্বশ্লোকক্ত নিশ্চয়াত্মিকা (শাস্ত্রানুসারিণী) শুদ্ধ বুদ্ধি (বিবেকপ্রজ্ঞা) স্থির হয় না।)

বেদের উদ্দেশ্য হল স্বর্গ, সাধারণ স্বর্গ থেকে শুরু করে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত। *কামাত্মানঃ স্বর্গপরা*, যাদের মন কামনা-বাসনায় গিজগিজ করছে। *কামাত্মা*, আত্মা অনেক প্রকার হয়, অবিনাশী আত্মা, দেহাত্মা, তার সঙ্গে বলছেন কামাত্মা, যার চেতনা পুরোপুরি কামের মধ্যে ভোগের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আছে, ভোগ ছাড়া আর আমি কিছু চাই না। বলছেন, ভোগ কামনা এটা তার স্বভাব, ভোগ ছাড়া আর কিছু বুঝতে পারে না। এই সংসার কিসের জন্য? ভোগের জন্য। মৃত্যুর পর আমি যেন

স্বর্গে যেতে পারি। কেন স্বর্গে যাবে? সেখানে আরও ভোগ করতে পারব। ওখান থেকে যখন নেমে আসব, তখন এই শরীর দিয়ে ভোগ করব। কখন স্থূল শরীর দিয়ে ভোগ, কখন সূক্ষ্ম শরীর দিয়ে ভোগ। ভোগ ছাড়া আর কিছু বোঝে না। বলছেন, এরা কোন দিন যোগী হতে পারে না, কারণ এদের বুদ্ধি অব্যবসায়ি বুদ্ধি। এদের বুদ্ধি বহুশাখা, অনেক দিকে ছড়িয়ে গেছে। আর যাই হোক, যোগী এরা হতে পারবে না।

এই ধরণের কাজ যারা করে, বলছেন, *জন্মকর্মফলপ্রদাম্*, এই কাজগুলিই কর্মের ফল রূপে একটা পর একটা জন্ম দিতে থাকে, এইভাবে জন্ম-মৃত্যুর চক্র চলতে থাকবে। জন্ম নিল, কর্ম করল, সেই কর্মের আবার ফল হবে, সেই ফলের জন্য আবার একটা জন্ম নেবে। আর বলছেন *ক্রিয়াবিশেষবহুলাং*, অব্যবসায়ি বুদ্ধির জন্য নানা রকমের ক্রিয়া করে যাচ্ছে, এটাও করছে, সেটাও করছে। কিন্তু যিনি যোগী, তিনি একটা জিনিস নিয়েই থাকেন, তার উদ্দেশ্য একটাই, আমাকে জন্ম-মৃত্যুর পারে যেতে হবে। মহাভারতে খুব সুন্দর একটা গল্প আছে। মহাভারত যুদ্ধের সময় শল্য কর্ণের সারথি ছিলেন। শল্য নানা ভাবে কর্ণকে তাঁতিয়ে যাচ্ছেন।

সেই সময় শল্য একটা গল্প বলেন। একটা হাঁস আর একটা কাকের গল্প। একটা কাক সমুদ্রের ধারে থাকত। ওখানে শেঠজীরা কাককে খাওয়া দিত আর কাকটাও নানা রকমের খেলা দেখাত। তাতে শেঠেরা আরও কিছু খাবার ছুড়ে দিত। একদিন ওখানে একটা হাঁস এসেছে। হাঁসের রাজকীয় ওড়া দেখে কাক বলছে 'আমি একশ রকমের উড়তে জানি, তুমি কিছুই না আমার সামনে'। হাঁস বলছেন, 'ঠিকই বলছ, আমি সত্যিই একটা ওড়াই জানি, সোজা ওড়া ছাড়া আমি আর কিছু জানি না'। কাক বলছেন, 'তুমি স্বীকার করো, তুমি আমার কাছে কিছুই না। এসো আমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হোক, কে কত রকম উড়তে জানে'। 'ঠিক আছে, চলো, ওড়া যাক'।

সমুদ্রের উপর উড়তে শুরু করেছে, হাঁস একেবারে সোজা সরল রেখায় উড়ে যাচ্ছে, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি, এক ভাবে সোজা উড়ে যাচ্ছে। আর কাক অনেক রকম কায়দা দেখাচ্ছে। কত দূর আর কায়দা দেখাবে, সমুদ্রে গিয়ে কায়দা দেখাতে দেখাতে কাকের দম ফুরিয়ে এসেছে, শক্তিটাও কমে আসছে। এবার সে নীচের দিকে পড়তে শুরু করেছে। সমুদ্রের জলের কাছে চলে এসেছে, প্রায় ডুবে যাচ্ছে, জলটা একটু ছুঁয়ে আবার ওড়ার চেষ্টা করছে। উপর থেকে হাঁস বলছে, 'আরে ভাই তুমি তো একশ রকমের ওড়ার কথা বলেছিলে, এটা তো বলোনি যে এটাও একটা ওড়ার কায়দা'। হাঁস সত্যিকারের ভাবছে, এটাও একটা ওড়ার কৌশল, নেমে জল খাবে আবার উঠে আসবে। কাক তো বুঝতে পারছে তার দম শেষ হয়ে এসেছে, এবার সমুদ্রে ডুবে শেষ হয়ে যাবে।

সে কোন রকমে হাঁসকে বলছে, ভাই অপরের এঁটো খেয়ে খেয়ে আমার বুদ্ধিটা ভোঁতা হয়ে গেছে। আমি মরে যাচ্ছি, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি, তুমি আমাকে বাঁচাও। হাঁস খুব সরল মনের। সে নিজের ডানা দিয়ে কাকটাকে ধরে উপরের দিকে ছুড়ে দিয়েছে, তারপর কায়দা করে কাকের নীচে এসে ওর পিঠে বসিয়ে নিল। তারপর তাকে সমুদ্রের পারে নিয়ে এসে নামিয়ে দিল। সেদিন থেকে কাক বাতেলা মারা বন্ধ করে দিল। ব্যবসায়ি বুদ্ধি আর অব্যবসায়ি বুদ্ধি, one pointed এবং multi branchএর মধ্যে এই হচ্ছে তফাৎ। এদের মন শুধু *ভোগৈশ্চর্যপ্রসক্তনাং*, মন সর্বদা ভোগৈশ্চর্যের দিকে ছুটছে। ইহজগতে, এখানে আমার ভোগ চাই আর ঐশ্বর্য চাই। ফলে এদের মন ঘুরতে থাকে।

সমাধৌ ন বিধীয়তে, সমাধি মানে মন। আমরা সাধারণ ভাবে সমাধি মানে জানি সমাহিত করা, আর তার সাথে যেখানে সমাহিত করা হয়, সেটাকেও সমাধি বলেন। যাদের মন ভোগ আর ঐশ্বর্যের মধ্যে ডুবে আছে, আর এটার প্রতি যাদের প্রেম আছে, তাদের বিবেক বুদ্ধি, অর্থাৎ কোনটা

করা উচিৎ, কোনটা করা উচিৎ নয়, এই বুদ্ধিটা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে এদের মন সাংখ্য আর যোগে সমাহিত হয় না। সাংখ্য মানে, thorough theoretical knowledge of God or of Atman, এই যে আমরা প্রায়ই বলে থাকি, শাস্ত্রের কথা তো শুনছি, কিন্তু মনে থাকছে না। কেন মনে থাকে না? কারণ আমাদের মন ভোগে ডুবে আছে। ভক্তরা বলে, জপ করতে মন বসে না। কি করে জপ হবে? মন তো ভোগে ডুবে আছে। আচ্ছা এত বছর ধরে জপধ্যান করে যাচ্ছি, কিন্তু কিছুই তো হচ্ছে না। হবে কি করে, মন তো ভোগে ডুবে আছে। মনে মনে আপনি ভোগ করছেন, ভোগ ছাড়া কিছু বোঝেননি, one pointedness বুদ্ধি কি করে হবে!

বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্ বুদ্ধি বহু শাখাযুক্ত হয়ে আছে, এটাই অব্যবসায়ি বুদ্ধি, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হবে না। যখন কবিতা পড়ছেন তখনও মনে মনে ভোগ করছেন, যখন কোন বই পড়ছেন, উপন্যাস পড়ছেন, সিনেমা দেখছেন সেখানেও ভোগ করছেন। ঠাকুরের কাছে যাচ্ছেন, সেখানেও ভোগ চাইছেন, স্বর্গের কামনা করছেন। আর শাস্ত্রের কথা শোনার সময় বলবেন, কিছু বুঝতে পারছি না। বুঝবেন কি করে, পাত্রতা নেই, যা অল্প একটু আছে সেটা ভোগে চলে গেছে। সমস্ত কিছু ভোগের মধ্যে ডুবে আছে, ফলে বুদ্ধির পাত্রতটা পুরো নষ্ট হয়ে যায়। বুদ্ধি স্থির হয় না, যোগ ও সাংখ্য দুটোর কোনটাই সে পায় না। ঠাকুর বলছেন, বিষয়ীদের কাছে ঈশ্বরীয় কথা বলতে যাই, ওরা শুনতে চায় না। বলছেন, এই ধরণের মানুষদের মধ্যে বিবেক বুদ্ধি হয় না, সেইজন্য অর্জুন তোমাকে বলছি, তুমি –

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।।৪৫।।

(হে অর্জুন, বেদের কর্মকাণ্ড কামনামূলক ও সংসারপ্রকাশক। তুমি নিষ্কাম হও এবং ঈশ্বরার্থ কর্ম কর। তুমি সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত ও সদা সত্ত্বগুণাশ্রিত হও এবং যোগ (অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি) এবং ক্ষেমের (প্রাপ্তের রক্ষণের) আকাঙ্ক্ষারহিত ও অপ্রমত্ত হও।)

যুদ্ধ ভূমিতে ভগবান অর্জুনকে বোঝাচ্ছেন, অর্জুন তুমি এই ভুলটা করো না, তুমি এই মিষ্টি মিষ্টি কথাতে, যা কিনা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘোরাতে থাকবে, ভুলেও ওর মধ্যে ফেঁসে যেয়ো না। তুমি ওখান থেকে বেরিয়ে এসো। কিভাবে? যে কোন জিনিস যা সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণের মধ্যে ঘুর ঘুর করছে, যেটা মনের এলাকা, সেখান থেকে তুমি বেরিয়ে এসো। সন্ন্যাসী তিন গুণের পারে যাওয়ার চেষ্টা করেন, কারণ তাঁরা জানেন আত্মজ্ঞান তিন গুণের পার, ঈশ্বর দর্শন তিন গুণের পার। মনের জগৎ তিন গুণের মধ্যে।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা, বেদ এই তিনটে গুণের মধ্যে, অর্থাৎ মনের এলাকার মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। *নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন*, হে অর্জুন, এই তিন গুণের এলাকা থেকে বেরিয়ে চলে এসে ত্রিগুণাতীত হও। *নির্দ্বন্দ্বো*, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত হও। *নিত্যসত্ত্বস্থো*, তোমার মন সর্বদা যেন শুদ্ধ পবিত্র থাকে, কখন রজোগুণে বা তমোগুণের দিকে, অর্থাৎ অপবিত্রতার দিকে তোমার মন না যায়। তার সাথে বলছেন, *নির্যোগক্ষেম আত্মবান্*, যোগ আর ক্ষেম এই দুটো শব্দ আমাদের শাস্ত্রে প্রায়ই উচ্চারিত হয়। যোগ মানে, একটা জিনিস আমার কাছে নেই, সেটা পাওয়ার চেষ্টা করাটা যোগ, আর যেটা আছে সেটাকে নিজের কাছে ধরে রাখা, এটাকে বলে ক্ষেম। পরে ভগবান বলবেন, *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*, এলআইসির লোগোতে এটা লেখা থাকে। যোগ মানে, যেটা নেই সেটা পাইয়ে দেবে, ক্ষেম মানে যেটা আছে, সেটাকে ধরে রাখবে। কিন্তু এখানে অর্জুনকে ভগবান বলছেন, *নির্যোগক্ষেম্*, যোগ আর ক্ষেম এই দুটো থেকেই তুমি বেরিয়ে এসো। কোন কিছু পাওয়ার চেষ্টা করবে না, যেটা আছে সেটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করবে না। *আত্মবান্*, তোমার মন যেন সব সময় আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত

থাকে। আমাদের জন্য সহজ ভাবে বলতে গেলে এটাই বলা যায় –যে কোন ভোগ থেকে বেরিয়ে এসো, এবং যোগে প্রতিষ্ঠিত হও। এরপর বেদ ও আত্মজ্ঞান এই দুটোকে তুলনা করে বলছেন –

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।।৪৬।।

(সব জায়গা জলপ্লাবিত হলে যেমন কূপাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ের স্নানপানাদিরূপ প্রয়োজনসমূহ প্লাবনের জলরাশিতে সিদ্ধ হয়, সেরূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের (পূর্ণোদকস্থানীয়) ব্রহ্মানন্দরূপ যে ফল তাতে (ক্ষুদ্র জলাশয়স্থানীয়) বেদোক্ত সকল কাম্য কর্মের ফল অন্তর্ভুক্ত হয়।)

গ্রাম দেশে ঘরে ঘরে অনেক ধরণের জল থাকে, কোনটা খাওয়ার জল, কোন জল স্নানের জন্য, কোন জল রান্নার জন্য, বাসন মাজার জল, কাপড় কাচার জল, পূজার জল। ইদানিং কালে এখনও বলে, এটা বাথরুমের জল, এটা ফিল্টারের জল, এটা মুখ ধোয়ার জল। কিন্তু কোন কারণে চারিদিকে যদি শুধু জল আর জল হয়ে যায়, তখন কিসের জন্য আর কি ভাবে আলাদা করে জল রাখবে। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে প্রথমের দিকে খুব বাজে জল ছিল। সেইজন্য তখন জলের বিভিন্ন নাম ছিল, এটা বাগানের জল, এটা স্নানের জল, এটা খাওয়ার জল। এখন বেলুড় মঠ থেকে লাইন টেনে নেওয়ার পর ভাল জল আসছে। এখন তাই আলাদা করে কোন জলের ব্যবস্থা নেই। যে জল খাচ্ছি, সেই জল দিয়েই স্নান করছি, সেই জলেই মুখ ধোওয়া হয়, ওই জলই বাগানে যাচ্ছে, সব এক জল।

আত্মজ্ঞান এই জলের মত। আত্মজ্ঞান সব কিছুকে বন্যার মত ভাসিয়ে দেয়। আত্মজ্ঞান যাঁর হয়ে গেল, যেমন ঠাকুর সেই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত, এরপর ঠাকুর এটাকে খুব সহজ ভাবে দেখাচ্ছেন, আত্মজ্ঞানের পরেও তিনি সব কিছুর জন্য মা কালীর কাছেই যাচ্ছেন। হাত ভেঙে গেছে, মা কালী; নরেন কালী মানছে না, মা কালী; মনে সংশয়, মা কালী; কে এখানকার মত উল্টে দিচ্ছে, তাকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে, মা কালী। বেদ এটা করবে না, বেদ বলবে, বৃষ্টি চাই এই যজ্ঞ কর, সন্তান চাই এই যজ্ঞ কর, সব কিছুর জন্য আলাদা আলাদা যজ্ঞের ব্যবস্থা। এত আলাদা আলাদা কেন তুমি রাখবে, একটাই রাখো। একটা কি? আত্মজ্ঞানের দিকে যদি চলে যাও, ওই একটাই তোমার সমস্ত কামনা পুর্তি করে দেবে।

এখন পর পর যে সাতটি শ্লোক ভগবান বলবেন পুরোপুরি কর্মযোগের উপর বলছেন, আমরা এই সাতটি শ্লোককে নিয়ে এবার আলোচনা করতে যাচ্ছি। ভগবান এই আলোচনটাই আবার তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারে নিয়ে আসবেন। স্বামীজীর বিখ্যাত বই কর্মযোগ, এই সাতটি শ্লোক ও তৃতীয় অধ্যায়কে আধার করেই বলেছেন। স্বামীজীর কর্মযোগ সবারই একবার অন্তত পড়া উচিৎ। একটা ছোট্ট ঘটনা এখানে বলা যেতে পারে। একবার এক ভদ্রলোক, উনি রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্তও নন, তিনি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। একটা সময় তিনি প্রচণ্ড খারাপ অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, চারিদিকে প্রচুর সমস্যাতে তিনি জড়িয়ে গেছেন। যাই হোক কোন ভাবে তাঁর কাছে স্বামীজীর কর্মযোগ বইটা ছিল। পরে তিনি বন্ধুদের কাছে বলেছিলেন, আমার জীবনে ওই প্রচুর সমস্যার মধ্যে, ওই কষ্টের সময় স্বামীজীর এই বইটাই আমাকে ধরে রেখেছিল। ভদ্রলোক স্বামীজীকে পছন্দ করেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্ত নন। স্বামীজীর বইগুলির এটাই বৈশিষ্ট্য, একটা শক্তি দেয়।

বেয়াল্লিশ আর তেতাল্লিশ নম্বর শ্লোকে ভগবান বললেন, বেদের কর্মগুলির উদ্দেশ্য হল মানুষকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া বা একটা শুভ জন্ম দেওয়া। উপনিষদের যে সিদ্ধান্ত, বা গীতার যে

সিদ্ধান্ত বা ভগবান বুদ্ধের যে সিদ্ধান্ত, এই ভাবকে ছাড়িয়ে যায়। পুনর্জন্ম, স্বর্গপ্রাপ্তি, এগুলো ধর্মের শেষ কথা না, ধর্মের শেষ কথা মুক্তি, ধর্মের শেষ কথা আত্মজ্ঞান। এরও আগের কয়েকটা শ্লোকে ভগবান বলছেন, বেদই হিন্দুদের ঠিক ঠিক ধর্মশাস্ত্র, কিন্তু বেদ সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণে বাঁধা। এর আগে আমরা এর উপর বিস্তারে আলোচনা করে নিয়েছি। সেখান থেকে ভগবান এবার আসল জায়গায় অর্জুনকে নিয়ে যাচ্ছেন।

মানবের জীবনের পথ হল তপস্যা, সবাইকে তপস্যা করতে হয়। মহাবীর জৈন, ভগবান বুদ্ধ, তুলসীদাস এনারা সবাই তপস্যা করেছিলেন। তপস্যা হল একটা জায়গায় শান্ত হয়ে বসে মনকে কোন কিছুতে স্থির করা। পরিচিত অপরিচিত ভক্তরা প্রায়ই মহারাজদের কাছে এসে বলেন, মহারাজ, আমাকে একটু ধ্যান করা শেখান, একটু বলে দিন ধ্যান কিভাবে করব। সোশ্যাল মিডিয়াতে, টিভি চ্যানেলে আজকাল কত বড় বড় বাবাজীরা ধ্যান শেখাচ্ছেন, এভাবে বসবে, এভাবে নিঃশ্বাস নেবে, দিনে একবার অন্তত পনের মিনিট স্থির হয়ে বসে মনকে একাগ্র করবে। আমরাও ধরে নিই, দিনে পনের মিনিট ধ্যান করলাম, জপ করলাম, তাতে আমাদের আত্মোন্নতি হয়ে যাবে। কিন্তু এভাবে কখনই কিছু হয় না। ধর্ম পথে ঠিক ঠিক যে এগোতে চাইছে, ওই পনের মিনিট কিছু না, ধর্ম পথে এগোতে হলে চব্বিশ ঘন্টা সময় দিতে হবে।

কিন্তু ঠাকুর তো বলছেন, কিছু যদি না করতে পার, সকাল সন্ধ্যা বড় করে দুটো প্রমাণ করবে। ঠাকুর কেন এই কথা বলছেন? যখন কিছুই করতে চাইছে না, তখন তাকে দিয়ে একটু কিছু করিয়ে নেওয়ার জন্য এই কথা বলছেন। ধর্মের নামে কখন কেউ উপোস করতে চাইবে না, বিয়ের সময় জোর করে তাকে উপোস করিয়ে নেয়। উদ্দেশ্য একটাই, একটু কিছু তো করো, কোথাও তোমার শুরু তো করতে হবে। তপস্যা করুন, সাধন-ভজন যাই করুন, যতক্ষণ না কেউ চব্বিশ ঘন্টা সময় দিতে পারছে, মন যদি তাতে পুরোপুরি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত না থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্ম পথে এগোতে পারবে না। কেউ যদি মনে করে সন্ধ্যেবেলা বা সকালবেলায় আমি একটু জপধ্যান করব আর তাতেই আমার হবে, এটা ভুল ধারণা। ধর্ম পথে চলার জন্য প্রস্তুতি লাগে, চব্বিশ ঘন্টা যে মন ওই এক ভাবে থাকছে, তাতেই প্রস্তুতি হয়।

আর মনের জন্য যে প্রস্তুতি, তার জন্য দরকার কর্মযোগ, আচার্য এটাকে বলছেন, বহিরঙ্গ সাধন। প্রথমের দিকে স্থূল কাজগুলি বেশি বেশি করতে হয়। ঠাকুর যেমন বলছেন, যে তীর চালানো শেখে, প্রথমে সে কলাগাছ বিঁধতে শেখে, সেখান থেকে অভ্যাস করে করে উড়ন্ত পাখীকে তীর মারে। প্রথম দিন তীর হাতে নিয়ে কেউ উড়ন্ত পাখী মারতে পারবে না। তার আগে অনেক অভ্যাস চাই। ধ্যান করা মানে উড়ন্ত পাখিকে মারা, সেইজন্য প্রথম দিন থেকেই ধ্যান করা যায় না, তার জন্য প্রস্তুতি দরকার।

এনারা বলছেন, তপস্যা করে যেটা হয়, সাধন-ভজন করে যেটা হয়, ধ্যানে বসে যা হয়, সেটা কাজ করেও হয়। মহাভারতে খুব নামকরা একটা কাহিনী আছে। কৌশিক নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। অনেক দিন ধরে তপস্যা করার ফলে তাঁর একটা যোগশক্তি এসে গেছে। একদিন গাছের নীচে বসে তপস্যা করছেন, ডালে বসে একটা বক মলত্যাগ করেছে, সেটা ব্রাহ্মণের গায়ে পড়েছে। তিনি রেগে উপরের দিকে তাকিয়েছেন, বকটা ভস্ম হয়ে গেল। তারপর ভিক্ষা করতে এক বাড়িতে গেছেন। বাড়ির মহিলা একজন পতিব্রতা স্ত্রী, শুধু স্বামীর সেবা করে সেই নারী যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন। সেই মহিলা ব্রাহ্মণকে বললেন, 'মিথিলায় যাও, সেখানে ধর্মব্যাধ আছেন, যিনি মাংস বিক্রী করে ওই একই অবস্থায় পৌঁছেছেন'। হিন্দুদের বক্তব্য হল, এই মনের সংযমে বিভিন্ন ভাবে পৌঁছান যায়, তার মধ্যে কর্মযোগও একটি মাধ্যম।

কেন কর্মযোগের গুরুত্ব? কারণ মানুষ কাজ করবেই, কাজ ছাড়া মানুষ থাকতে পারবে না। এটাকে আমরা দুর্বলতা বলতে পারি, শক্তিও বলতে পারি। যদি মনের দিক থেকে দেখা হয়, তখন দেখা যাবে, মনের কাছে পজিটিভ নেগেটিভ বলে কিছু হয় না। যেমন দাড়িপাল্লাতে ওজন করার সময় ওটা লোহা না সোনা দাড়িপাল্ল বিচার করে না, তার কাছে ওটা ওজন। ঠিক তেমনি মনের কাছে চিন্তা, চিন্তা চিন্তাই, মন দুর্বল সবল বোঝে না, ও বোঝে তীব্রতা। কাজ ছাড়া আমরা থাকতে পারব না, পরিস্থিতি এমন যে কাজ ছাড়া থাকা যাবে না। স্বভাব এমন যে, মানুষ বলে আমি কাজ ছাড়া থাকতে পারি না। তখন বলছেন, এই যে তোমার দুর্বলতা, যেটা তোমার অপরিহার্য, এটাকে তুমি এবার তোমার সুবিধার জন্য ঘুরিয়ে নাও। জুডো খেলায় অনেক রকমের যে মার্শাল আর্টস আছে, সেখানে যার সাথে ওর লড়াই হচ্ছে, সেখানে সে বিপক্ষের যে শক্তি সেটাকেই সে কাজে লাগায়। ফলে বিপক্ষের যত শক্তি বেশী হবে, তত তাকে হারানো সহজ হয়ে যায়। জুডোতে যারা দক্ষ, তার বিপক্ষ যখন তেড়ে এলো, তখন সে একটু সরে যায়। আর এত তাড়াতাড়ি সরে যায় যে, নিজের স্পীডকে কন্ট্রোল করতে পারে না। সেইজন্য স্পীডের খুব গুরুত্ব। ওর গতিকে কাজে লাগিয়ে তাকেই ফেলে দিচ্ছে। অবশ্য এই কৌশল একদিনেই রপ্ত হয় না, প্রচুর অনুশীলন করতে হয়।

কর্মযোগ এটাই বলে, তোমার যেটা শক্তি, যেটা তোমাকে নাশ করছে, সেই শক্তিটাকেই তুমি কাজ লাগাও তোমার মঙ্গলের জন্য, তোমার আত্মোন্নতির জন্য। কাজ আমরা অল্পবিস্তর সবাই করি, কিন্তু এই কর্মই আমাদের বন্ধনের কারণ হয়ে যায়, আমাকে শুভ অশুভ যোনিতে নিয়ে যায়। কাজ ভাল হলে, সাফল্য পেলে আমরা আনন্দ পাই, উৎফুল্ল হই, হর্ষোল্লাস করি। কাজের ফল যদি না পাই তখন আমরা ভেঙে পড়ি, আমাদের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। কর্মযোগ এই ইমোশানস্গুলিকে নাশ করে দেয় এবং মনকে শক্তি দেয়।

আমার কাছে যা যন্ত্রপাতি আছে, উপকরণ যা আছে, তাই দিয়েই তো আমাকে যা কিছু করার করতে হবে। বাড়িতে যা আনাজপাতি আছে, তাই দিয়েই আমাকে রান্না করতে হবে। অপরের কাছে কি আছে, ওর বাগানে কি আছে, তা দিয়ে তো হবে না। আমরা সাধারণ ভাবে এই জিনিসটা ভাবতে পারি; ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরের কাছে জ্ঞান ভক্তি চাইতে হয়। আমরা একটা কথা বলি ঠিকই, কিন্তু তার পিছনে যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দর্শন রয়েছে, সেটাকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে ভিতরে যে ঢুকতে হয়, সেই চেষ্টাটা আমরা করিনা। ঈশ্বর হলেন অন্তর্যামী, তিনি আমার ভিতরে আছেন, তিনি আমাকে চালাবেন, আমার মনকে চালাবেন, তিনি আমাকে শক্তি দেবেন, আমাকে জ্ঞান দেবেন, তিনি কিন্তু অপরের উপর কাজ করবেন না।

যদিও আমরা বলি সবারই অন্তর্যামী এক, কিন্তু সেটা অনেক পরে, আরও গভীরে যাওয়ার পর বুঝতে পারা যায় সবই এক। আমরা ওই জায়গায় যাচ্ছি না, আমি নিজের অবস্থায় আছি; অন্তর্যামী আমার মন, আমার শরীর দিয়ে কাজ করছেন। যিনি আমার ভিতর আছেন, তিনি আমার মন আমার শরীরের উপরেই কাজ করবেন। এই জিনিসটাকে বোঝা আমাদের অত্যন্ত দরকার, এই জায়গাতে এসে আমার আপনার সবারই জীবনে অশান্তি লাগে। আমাদের সমস্যা হল, আমরা যখন প্রার্থনা করি তখন অজান্তায় না বুঝে এমন প্রার্থনা করছি, যেখানে প্রার্থনা করে বলছি, হে ভগবান ওই লোকটি যেন এই রকম করে। ধরুন একটা কথার কথা, আমি প্রার্থনা করছি, আমার যেন চাকরি হয়। তার মানে আমি বলতে চাইছি, হে ঠাকুর তুমি এমন করে দাও যাতে ওই কোম্পানির মালিক আমাকে যেন সিলেক্ট করে নেয়। ভগবান তা কোন দিন করবেন না। ভগবান আমার উপর কাজ করবেন। ভগবান আমাকে শক্তি দেবেন, আমাকে জ্ঞান দেবেন, আমাকে ভক্তি দেবেন; অপর কাউকে কোন ভাবেই করবেন না। অপরের জন্য আমরা প্রার্থনা করতে পারি, হে প্রভু, ওর মঙ্গল করো, ওকে শুভ বুদ্ধি দাও, ভগবান করবেন কি করবেন না, সেটা তাঁর ইচ্ছে। কিন্তু আমার যেটা দরকার,

অর্থাৎ আমার মন, আমার শরীরের উপর দিয়ে যেটা হবে, সেটা তিনি করবেনই করবেন। অপরের উপর যখন আসে, সেখানে তিনি নাও করতে পারেন।

বাচ্চা বয়সে আমরা কত শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে পরীক্ষার আগে প্রার্থনা করতাম, হে ঠাকুর, প্রশ্নগুলি যেন সহজ হয়। তখন বয়স কম ছিল কিছু বুঝতাম না যে, প্রশ্ন কি করে সহজ হবে, ওটা অপরের অধিকারের ক্ষেত্র। আমরা কল্পনা করছি, একটা জঙ্গলে একটা সিংহ আছে, আর একটা হরিণ আছে। সিংহ প্রার্থনা করবে, হে প্রভু, এই হরিণটাকে যেন আমি শিকার করতে পারি। হরিণ প্রার্থনা করবে, হে প্রভু, সিংহ যেন আমায় শিকার করতে না পারে। এখন ভগবান কার প্রার্থনায় সাড়া দেবেন?

একটা হাসির গল্পে একজন চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছে, সে কালী মন্দিরে খুব করে প্রার্থনা করছে, 'মা এই চাকরিটা যেন আমার হয়ে যায়'। মা কালী তাকে বললেন, 'কিছুক্ষণ আগে একজন এসেছিল, সেও আমাকে ওই চাকরির জন্য বলল'। ছেলেটি রেগে বলছে, 'তোমার যা খুশী তাই কর'। মা বলছেন, 'আমি তাই করি'। অপরের খুশীর মত তিনি করেন না, তিনি তাঁর খুশী মতই করেন। কারণ তাঁকে সিংহকেও দেখতে হয়, তাঁকে হরিণকেও দেখতে হয়। কিন্তু নিজের জন্য যে প্রার্থনাটা করবেন, সেটা তিনি শুনবেনই শুনবেন। মজা করে বলছি, একটা ছেলের অসুখ হয়েছে, ছেলেটি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছে অসুখটা যেন ভাল হয়ে যায়। ঠাকুরকে সবাইকে দেখতে হবে, ঠাকুরকে আপনার ছেলেকে দেখতে হবে, যে ওষুধ বিক্রী করছে তাকে দেখতে হবে; ওষুধ যারা তৈরী করছে তাদেরও দেখতে হয়; ওষুধ যারা প্রেসক্রাইপ করছে সেই ডাক্তারকেও দেখতে হয়; ডাক্তার তৈরী করার জন্য মেডিল্যাল কলেজগুলো রয়েছে তাদেরও দেখতে হয়। আমার বাড়িতে যেন অসুখ বিসুখ না হয় প্রার্থনা করলেই তো হবে না, অসুখ বিসুখ যদি না হয় ডাক্তাররা খাবে কি! ওষুধ প্রস্তুতকারক ও ওষুধ বিক্রেতারা কি খাবে? তাহলে ভগবান কি দেন? একমাত্র আমার নিজের সঙ্গে যেটা জড়িয়ে আছে, সেটাই ভগবান দেবেন। যদি প্রার্থনা করি, হে প্রভু, আমার মন যেন শুদ্ধ পবিত্র হয়; হে প্রভু আমার মনে যেন ভক্তি ভাব আসে, হে প্রভু কারুর প্রতি আমার যেন কোন বিদ্বেষ ভাব না আসে, এগুলো তিনি শুনবেন, এসবের বাইরে অন্য কোন কিছু তিনি শুনবেন না।

ঠিক একই নিয়মে এটাকে যদি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তখন এটাই কর্মযোগের সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। কর্মযোগের সিদ্ধান্তে কর্মটা আমি, আর তার ফল বাইরে হয়ে যায়। ফলে কি হয়, আমার অধিকার থাকবে শুধু কর্মের উপরে, ফলের উপর আমার কোন অধিকার নেই। ফল যেটা দেবে, সেটা প্রকৃতি দেবে। ধরুন একজন চাষ-আবাদ করল, চাষের জন্য যাবতীয় যা কিছু করার সে করল। কিন্তু ফসল যেটা হবে, তার সাথে ক্ষেত, বীজ, সার, বৃষ্টি, রোদ ইত্যাদি অনেক কিছু জড়িয়ে আছে। এর মধ্যে এত জটিলতা যে, যার জন্য আমরা বলি তিনি ফল দেন। তাহলে আমি কি করতে পারি? আমি শুধু কাজটুকু করে যেতে পারি। টেকনিক্যাল ভাষায় এটাকেই বলে অধিকার। অধিকার শুধু তোমার রয়েছে কর্মে, ফল তিনি দেবেন। সেই তুলনায় প্রার্থনা অনেক সোজা। প্রার্থনা যদি করা হয়, তা হবেই হবে। যে প্রার্থনাগুলো আপনার মন, আপনার শরীরকে কেন্দ্র করে চলে, সেই প্রার্থনা করুন, অবশ্যই হবে। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, আমাদের একজনের খুব জপধ্যান করার ইচ্ছে আছে, কিন্তু সময় পায় না। কিন্তু সত্যিই তার খুব ইচ্ছে, আমি জপধ্যান করব। সে এবার প্রার্থনা করতে শুরু করুক, হে ঠাকুর, আমার ঘুমটা একটু কমিয়ে দাও, হে ঠাকুর আমি যেন ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে উঠতে পারি। এবার সে প্রার্থনা করতে থাকুক, এক মাস, দু মাস, তিন মাস, দেখবে সত্যিই তার ঘুম কমে যাবে, আর ভোর চারটের সময় উঠতে পারছে।

আপনি প্রার্থনা করুন, প্রভু আমার ভিতরে অনেক লোভ আছে, হে প্রভু, আমার এই লোভ, আমার কামনা-বাসনা, কাম ভাব, এগুলো যেন চলে যায়। কিন্তু এই প্রার্থনাগুলো মরে গেলেও আমরা

করব না, আমরা প্রার্থনা অন্য রকম করি। যে ছেলে বিয়ে করতে চাইছে, সে প্রার্থনা করবে, হে ঠাকুর একটা ভাল মেয়ে যেন আমার কপালে জোটে। মেয়েরা বলবে, একটা ভাল ছেলে যেন আমার কপালে জোটে। ঠাকুর করবেন কি করবেন না, আমরা কি করে বলব, কেউই বা বলবে কি করে, অসম্ভব। কর্মযোগে ঠিক একই জিনিস হয়, কর্ম আমাকে করতে হবে, কর্মের ফল আমার এক্তিয়ারের বাইরে, আমার মন, বুদ্ধির এক্তিয়ারের বাইরে, ওই জায়গাতে আমার যাওয়া চলবে না।

এই যে অধিকারের কথা বলা হল, আমার সীমানা কত দূর? আমার সীমানা হল শুধু মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর, এর বাইরে তুমি কথা বলতে পার না। এই অধিকার শব্দটা পরে গীতায় আসবে। আমাদের জীবন পুরো ফলের উপর চলে। বর্তমান দিনের ছেলে মেয়েরা বলবে, গীতা আজকের দিনে চলে না। এখন এসেছে motivational speaker, শ্রোতাদের motive দিয়ে তুলছে। আমরা ঠিক উল্টো বলি, মটিভটাকে সরাও, কোন মটিভ নেই, তুমি এটাকে কর্তব্য হিসাবে করবে। এখনকার দিনে যাঁরা influential speaker, যাঁরা লেকচার দিয়ে যাচ্ছেন, how to control mind, how to increase power, সবটারই উদ্দেশ্য যাতে আপনি জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ পেতে পারেন, জীবনে সফল হতে পারেন।

গীতা বলছেন, এই যে ফলের প্রতি তোমার আসক্তি, এটাকে নিয়ন্ত্রণ কর। নিয়ন্ত্রণ করা মানেই শক্তি বেশী লাগবে, আগে তাই শক্তি অর্জন করতে হবে। যে কোন জিনিসকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শক্তি বেশী লাগে। ঝগড়া করা সোজা, কিন্তু ঝগড়া করার আগে যে ক্রোধ বা রাগ হয়, সেটাকে আটকে দেওয়া খুব কঠিন। বাল্মীকি রামায়ণে একটা বর্ণনা আছে, শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের সাথে যাচ্ছেন, পথে একটা শিবের আশ্রম আছে। বাল্মীকি ওই জায়গার খুব সুন্দর বর্ণনা করেছেন, বাল্মীকি ওখানে বলছেন, শিব নিজের শক্তি দিয়ে নিজের শক্তিকে ধারণ করলেন। আসলে দেখাতে চাইছেন, কাম ভাবকে ধরে রাখা। আপনার মধ্যে ভালবাসা এলো, আপনি ওটাকে নামিয়ে দিলেন। যারা নামাতে পারে না, তাদের বলা হয় বীর্যহীন, নপুংসক ইত্যাদি। কিন্তু যাদের আছে, তা সত্ত্বেও আটকে নিচ্ছে, সেখানে শক্তি অনেক বেশী লাগে। মানুষ যেখানে সেখানে নিজের ক্রোধকে বার করে অগ্নিশর্মা হয়ে যাচ্ছে।

একটা হাসির গল্প আছে, একজন ঘোড়ার পিঠে খুব জোরে দৌড়ে যাচ্ছে, একজন দৌড়ে দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করছে, 'বাবু, এত জোরে ঘোড়া চালিয়ে কোথায় যাচ্ছেন'? বাবু চেঁচিয়ে বলছেন, 'আমি জানি না, ঘোড়াকে জিজ্ঞেস করো'। ঘোড়াকে বাগে আনতে পারছে না। যে কুশল ঘোড় সওয়ার, সে ঘোড়াকে নিজের বশে রাখে। ঠিক তেমনি ফলের পিছনে দৌড়ানোর জন্য একটা শক্তি লাগে, কারণ কাজ করলে তবেই ফল আসবে। কিন্তু ওই ফলের প্রত্যাশাকে ত্যাগ করা; এটা বলা যে, আমার এটা ধর্ম তাই আমি এই কাজ করছি, এর জন্য অনেক বেশী শক্তি লাগে। সেইজন্য কর্ম সবাই করতে পারে, কর্মযোগ সবাই পারে না। কর্মযোগ না পারার জন্য কি হয়? বলে, যার সঙ্গে ঘর করিনি সে খুব ভাল গিন্নি। তার মানে যার সঙ্গে ঘর করছে, সেই গিন্নি ভাল না, কারণ তার ব্যাপারে অনেক কিছু জানা আছে কিনা, ফলে মনে হয়, যার সঙ্গে ঘর করিনি সে অনেক ভাল। এখন কাজ করতে গিয়ে কর্মযোগ হয় না, ফলে আমরা বলি, আমি ধ্যান করব, আমি জপ করব। জপধ্যান করতে নামছে, নেমে দেখছে সেটাও হচ্ছে না। কারণ সব পথই কঠিন, কোনটাই সহজ না। ঠাকুর বলছেন, ভক্তিপথ সহজ পথ, কিন্তু ভক্তি পথে একটু নামলেই বোঝা যায় কত সহজ, ভক্তি হতে হতেই কয়েক জন্ম লেগে যাবে। কারণ যোগ অভ্যাস করা, তা কর্মযোগই হোক, ভক্তিযোগই হোক প্রচণ্ড শক্তির দরকার। আর সব থেকে এটা ভাল বোঝা যায় কর্মযোগে, কারণ সেখানে জিনিসটা বাইরে প্রকাশ্যে রয়েছে। আপনি জপ করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছেন কিনা কে জানে, আপনি ধ্যান করার নামে ঘুমোচ্ছেন কিনা কে জানে। কিন্তু কাজ করার সময় পরিষ্কার বোঝা যাবে, আপনার আসক্তি আছে কিনা, আপনার লোভ আছে কিনা।

স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ খুব রসিক লোক ছিলেন, ওনার হাসিটাই ছিল চিত্তাকর্ষক। খুব মারাত্মক একটা সিরিয়াস কথাকে তিনি ছোট্ট একটা হাসি দিয়ে এমন ভাবে মিষ্টি করে, মজা করে বলতেন, মনে হবে যে তিনি নিছক রসিকতা করছেন; কিন্তু আসলে একটা গূঢ় জিনিসকে রসিকতার মোড়কে উপস্থাপন করে দিতেন। একবার একজন মহারাজ প্রণাম করতে এসে বলছেন, 'মহারাজ আপনি বলেন, এখন সাধুদের মধ্যে সেই ত্যাগ বৈরাগ্য নেই। কিন্তু সব মহন্তরাই তো বলে ঠাকুরের ইচ্ছায় এই মন্দির, এই বাড়ি, এই হাসপাতাল, এই স্কুল হয়েছে'। স্বামী ভূতেশানন্দজীও ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসি লাগিয়ে বলছেন, 'হ্যাঁ ঠিকই বলেছ, তাইই বলে; কিন্তু প্রথমে এটা জুড়ে দিয়ে তারপর ঠাকুরের ইচ্ছাটা লাগাবে, ''আমার সময়ে ঠাকুরের ইচ্ছায় এই মন্দির হয়েছে''। এটা থেকে বেরোন যায় না, বেরোন অসম্ভব'।

মূল কথা হল কর্মযোগ করার জন্য শক্তি দরকার, এবং কর্মযোগ করতে করতে শক্তি বাড়ে। এখন আমার মধ্যে শক্তি এসেছে কিনা কিভাবে বুঝব? যে কোন কাজ যখন effortless হয়ে যায়, কোথাও কোন চেষ্টা নেই, অনায়াসে কাজ হয়ে যাচ্ছে আর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে করছে, তখন বুঝতে হবে তার মধ্যে শক্তি এসেছে। ঠাকুর বর্ণনা করছেন, গ্রামের মেয়েরা ঢেঁকিতে চাল কাড়ে, একদিকে কাড়া ধান সরাচ্ছে, আবার আকাড়া ধান ঢেঁকিতে দিচ্ছে, ওরই মধ্যে খদ্দেরের সাথে দেনা-পাওনার হিসাব করছে, অন্য দিকে বাচ্চাকে মাই দিচ্ছে। যারা মাংস বিক্রী কয়রে, আরামসে মাংসে কেটে চলেছে, কোন বিকার নেই, আমি আপনি ওটা পারব না। তার মানে এরা ওই কাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। যদি আমি যে কোন কাজে ওই effortlessএ পোঁছাতে চাই, যদি আমি শক্তি চাই, যদি আমি গ্রামের মেয়েদের মত effortlessly কাজ করতে চাই, তাহলে প্রথম হল, আমাকে পুরোটা সেই কাজের মধ্যে ঢেলে দিতে হবে।

ঠাকুরের আরও একটা খুব সুন্দর একটা গল্প আছে, এক গোয়ালিনীর গুরু তাকে বলে দিয়েছে, তাঁর নাম করলে যদি ভবসাগর পেরিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে এই সামান্য নদীকে তো সে অনায়াসেই পেরিয়ে যাবে। গুরুর কথা বিশ্বাস করে গোয়ালিনী দুধ নিয়ে ভগবানের নাম করতে করতে সত্যিই নদীর উপর দিয়ে হেঁটে চলে এসেছে। সেটা শুনে গুরুও ভাবলেন তিনিও নদী পার করবেন, কিন্তু নদীতে নামবার আগে ধুতিটা গোটাচ্ছেন। ধুতি সামলাতে সামলাতেই গুরু নদীতে ডুবে গেলেন। পুরোটা দিতে পারছে না, ধুতিটুকু সামলে রাখছেন।

আমাদের জীবনেও তাই হয়, যে কোন জিনিসে, এমনকি ভালবাসা পর্যন্ত, ভালবাসা এমন জিনিস যেখানে মানুষ নিজেকেও ভুলে যায়, কিন্তু সেখানেও সে একটু ধরে রাখতে চাইবে। আর কাজকর্মে তো কোন প্রশ্নই নেই; এই যে মাইনে দিচ্ছেন, এর থেকে বেশী কাজ আশা করবেন না। মাইনের সঙ্গে কাজের কি সম্পর্ক! কাজ মানেই কাজ। কর্ম মানেই আমাকে সেখানে নিজেকে পুরোটা দিতে হবে, হয় পুরোটা দিতে হবে, না হলে কিছুই দিতে হবে না। কারণ যে কোন কাজের দুটো ফল হয়, একটা ফল বাইরে পরিষ্কার দেখা যায়, আরেকটা ফল হয়, যেটাতে তার ভিতরটা পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রাইমারি স্কুল থেকে উচ্চ বিদ্যালয়, সেখান থেকে কলেজ, কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটি, আমাদের পড়াশোনা করতে হচ্ছে। এই পড়াশোনার দুটো ফল, একটা ফল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, আরেকটা ফল, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়া। উদ্দেশ্য হল জ্ঞান বৃদ্ধি, কারণ পরীক্ষার ফলটা দুদিন পর তাৎপর্যহীন হয়ে যাবে, ওটার আর কোন দাম থাকবে না, কিন্তু জ্ঞান সারা জীবন থাকবে। পরে যখন নাতি-নাতনীদের পড়াবেন, তখনও ওই জ্ঞানটা কাজে লাগবে। ছোটবেলা বাংলা, ইংরাজী যা শিখেছি, এখনও শিক্ষা কাজে লাগছে, তখন কি নম্বর পেয়েছিলাম সেটার কোন দাম নেই, কত পেয়েছিলাম মনেও নেই।

হয় পুরো মন দিয়ে কাজ করতে হবে, তা নাহলে করবে না; যদি দম থাকে তাহলে বলো আমি করব না। একটা সাধারণ কাজ করার সময়েও পুরো মনটাকে ওই কাজে দিতে হবে। শ্রীশ্রীমা দেখছেন একজন ঝাড়ু দিয়ে ঝাঁটাটা ছুড়ে রাখছে। মা বলছেন, ঝাঁটাটারও একটা সম্মান আছে। মা সম্মানের কথা বলছেন, তুমি যে ঝাঁটাটা রাখছ, সেখানেও তোমার মনের সচেতনতা, মনের পুরো একাগ্রতা যেন থাকে।

এখন দেশে টাকা হয়েছে। আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন দেশে টাকা ছিল না। কারুর কাছেই ছিল না। সব্জী কিনতে গেলাম, মাছ কিনতে গেলাম, সব জায়গায় দু পয়সা, পাঁচ পয়সার জন্য কত দরদাম করতাম। ঠাকুর বলছেন, ফাউ থাকলে সেটাও চেয়ে নিয়ে আসতে হবে। তখনকার দিনে ফাউ যদি থাকত, তখন সেটার জন্য মানুষ খুব সচেতন থাকত, অভাব ছিল কিনা। এখনকার দিনে কে ফাউ দিচ্ছে, কে দিচ্ছে না, ওদিকে কেউ তাকায় না, মলে যাচ্ছে, যা দাম বলে দিচ্ছে, সেই দাম দিয়ে মাল নিয়ে চলে আসছে, কোন দরদামের সুযোগই নেই। কেন? কারণ আমাদের এখন টাকা হয়েছে। যখন টাকা ছিল না, যার কাছে এখনও টাকা নেই, সে এক টাকা দু টাকার জন্য দরদাম করে। আমি নিজেকে পুরো কখন দেব? যখন আমার মধ্যে শক্তি থাকবে। যার মধ্যে শক্তি নেই, সে দিতে পারবে না। পরে ভগবান বলবেন, *কৃপণাঃ ফল হেতবঃ,* ফলের পিছনে যারা দৌড়ায়, বুঝতে হবে তারা কৃপণ, ভিতরে তাদের দম নেই। যারা আসক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, আর যারা ফল ত্যাগ করেছে, বুঝতে হবে তাদের দম আছে।

এই দুটো জিনিস যদি আমরা মনে রাখি, এই জীবনেই আমরা দেবতা হয়ে যাব – passion and compassion। যে কোন জিনিস যখন করছি, সেখানে তখন পুরো নিজেকে ঢেলে দিয়ে করতে হবে, তার সাথে অপরের প্রতি করুণার ভাব, ভালবাসার ভাব যেন থাকে। Passion আর compassion যদি থাকে, অন্য আর কিছু লাগবে না, এই দুটো জিনিস আমাদের জীবনকে পার করে নিয়ে চলে যাবে। তার সাথে দৃঢ়তা, লেগে থাকার ভাব খুব দরকার।

ঠাকুর বলছেন, একজন কুয়ো খুড়বে, এক জায়গায় কুয়ো খুড়তে লেগেছে, দশ হাত খোঁড়ার পর বালি বেরোতে শুরু করল। সে জায়গা ছেড়ে আরেক জায়গায় খুড়তে গেল, দশ হাত খুড়েছে, পাথর বেরিয়ে এলো, সেটাও ছেড়ে দিয়ে আরেক জায়গায় খুড়তে চলে গেল। এভাবে হয় না, যেটা ধরেছো, ওটাকেই ধরে রাখতে হবে, একবার ধরলে আর ছাড়াছাড়ি নেই। ধরে নিয়েছি মানে ধরে নিয়েছি, আর ছাড়ার কোন প্রশ্নই নেই। আমাদের মুশকিল এটাই, আজ জপ, কাল ধ্যান, পরশু কর্মযোগ, আজ এই বাবাজী, আগামীকাল তমুক বাবাজী, আজ এই বাবাজীর শেখানো ধ্যান, কাল তমুক বাবাজীর ধ্যান, এভাবে কারুর কিছুই হয়নি, কোন দিন হবেও না।

এর আগের আলোচনায় বলা হয়েছিল, *বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যসায়িনাম্,* অব্যবসায়ি যারা, তারা অনেক কিছু নিয়ে ছটফট করে। শক্তি যদি সঞ্চয় করতে চান, তাহলে আপনি যদি কোন ভাল কাজ করে থাকেন, বা কোন কাজে আপনার যে সাফল্য এসেছে, সেটাকে নিয়ে চারিদিকে ঢাকঢোল পিটিয়ে বলতে যাবেন না। আত্মশ্লাঘা, নিজের ব্যপারে বলেই যাচ্ছে, এটা করতে নেই। আপনার ভিতর শক্তি সঞ্চয় হয়েছে, লোকেরা এমনিতেই আপনাকে দেখে বুঝে যাবে। নিজেকে নিয়ে যদি কেউ বেশী বলতে থাকে, বিজ্ঞাপন বেশী হলে মনে সন্দেহ হয়। একটা ভাল জিনিস করলে ইনফরমেশান দিতে হয়, সেটা অন্য জিনিস। নিউজপেপারে রোজ পাতার পর পাতা একই বিজ্ঞাপন ছেপে যাচ্ছে, বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে। সত্যিকারের যেটা ভাল জিনিস, ইনফরমেশানের জন্য একবার একটা ভাল জায়গায় বিজ্ঞাপন দিয়ে দিল, ওখানেই তার খেলা শেষ। যারা বোঝার তারা বুঝে নিচ্ছে জিনিসটা খাঁটি।

যখন নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ আসে, তখন এই লোক দেখানোর ভাব, আত্মশ্লাঘা চলে যায়। তার সাথে যেটা আসে, তা হল, নিজের বিদ্যার প্রতি বিনয়। বড় সাহিত্যিক, বড় শিল্পী, বড় গায়ক, বড় বিজ্ঞানী, এনারা সব সময় খুব বিনয়ী হন। যেখানে বিনয়ের ভাব নেই, বুঝতে হবে এখনও কর্মযোগ তো দূরের কথা, কর্মই শুরু হয়নি। কর্ম হবে, সাফল্য হবে, উন্নতি হবে, সব হওয়ার পর এগুলোর বাইরে চলে গেলেন, কর্মযোগে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তখনই আসে ঠিক ঠিক বিনয়ের ভাব। মানুষ তখন বোঝে, জীবনে যে সাফল্য, উন্নতি যা কিছু হয়েছে, এগুলো আমার ক্ষমতায় হয়নি। তখনই মানুষ বুঝতে পারে, ঈশ্বরীয় কৃপা না হলে কোন বড় কাজে সাফল্য আসে না, কোন মহৎ কাজ সম্পন্ন করা যায় না। সেইজন্য তখন মানুষ নিজের কাজ, সাফল্য এগুলো নিয়ে বেশী বলে বেড়ায় না, জানে এগুলো আমার ক্ষমতার বাইরে। এই জায়গাতে পৌঁছানর পরই মানুষ ওই ব্যাপারে বিনয়ী হয়। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যার প্রতি বিনয়, এই জিনিসগুলিই যখন মানুষ ধীরে ধীরে অনুশীলন করবে, এই জিনিসগুলি যখন ভিতরে আসতে শুরু হবে, তখন বুঝতে হবে যে, সে আস্তে আস্তে এখন কর্মযোগের পথে চলেছে।

কিন্তু কর্মযোগের মূল, এখন গীতার যে শ্লোকের উপর আলোচনা হবে তার মূল বক্তব্য হল, কর্মটাই আপনার, ফল আপনার নয়। যে কাজটা করা হচ্ছে, যেমন আমি একটা বই পড়ছি, তখন ওটাই পথ, ওটাই লক্ষ্য। যেটা করছে, এটাই তার প্রাপ্তি, বই পড়ছে, এটাই তার আনন্দ, এর বেশী আর কিছু না। যে কোন কাজ যখন করা হচ্ছে, পুরো মন সেই কাজে, পুরো প্রাণ সেখানে। এরপর কেউ প্রশংসা করল, একটু ভাল লাগল ঠিক আছে, ওখানেই ওটা শেষ, এর বেশী কিছু না। শাস্ত্রের কথা শুনছি, ওর মধ্যে ডুবে থাকছি, খুবই ভাল। সব জিনিস তো একদিনে অনুশীলন করা যায় না। ঠাকুরও বলছেন, সময় না হলে হয় না, তবে শুনে রাখা ভাল। শাস্ত্রের কথা শুনতে শুনতে মনের উপর একটা সংস্কার তৈরী হয়, এরপর সেখান থেকে ব্যক্তিত্ব পাল্টাতে শুরু হয়। এই হল কর্মযোগের মূল কয়েকটি কথা। এরপর আমরা সাতচল্লিশ শ্লোক থেকে শুরু করছি।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি।।৪৭।।

(কর্মে তোমার অধিকার, ফলে নয়। অতএব কর্ম কর। কিন্তু কর্মফলে যেন কখনও তোমার আসক্তি না হয়; কারণ, কর্মফলের তৃষ্ণাই কর্মফল-প্রাপ্তির হেতু হয়। সুতরাং কর্মফল-প্রাপ্তির হেতু হতে যেও না অর্থাৎ কর্ম সকামভাবে করতে যেও না। আবার কর্মত্যাগেও তোমার প্রবৃত্তি না হোক।)

কর্মণ্যেবাধিকারঃ এর সন্ধি ভাঙলে দাঁড়াবে, *কর্মণি এব অধিকারঃ*, ভগবান বলছেন, অর্জুন, কর্মেই তোমার অধিকার। আমরা প্রথম থেকে যেটা ব্যাখ্যা করলাম, ভগবানকে আপনি বলতে পারেন, terms dictate করতে পারেন না। ভগবান কোন সুপারি কিলার নন যে, আপনি বলবেন, অমুককে শেষ করে দাও, আমার যে শত্রু আছে তাকে শেষ করে দাও। আর ভগবান এমন কোন দুর্বল নন যে, ভগবানকে কিছু দিয়ে আপনি ব্ল্যাকমেল করতে পারবেন; ভগবান তোমাকে পাঁচ টাকার সন্দেশ দিয়েছিলাম, আমার এক কাজটা উদ্ধার করে দাও। ভগবান কোন দিন করবেন না। আবার আমরা যদি ভগবানকে কিছু নাও দিই, কিন্তু যদি প্রার্থনা করি; শুদ্ধ মনে, অশুদ্ধ মনে, দৌড়াতে দৌড়াতে, বসে বসে, শুয়ে শুয়ে, হে প্রভু আমার যেন এই হয়, কিন্তু এটা যেহেতু মনকে নিয়ে, তাই এটা অবশ্যই হবে।

প্রার্থনাতে আমরা প্রায়ই এই জায়গাতে এই ভুলটা করে বসি, আমরা মনে করি আমরা যা চাইব, তাই পাব, কিন্তু হবে না। বলছেন, অর্জুন তুমি কাজ করো, এর আগে আমরা এর ব্যাখ্যা করে দিলাম। *মা ফলেষু কদাচন*, কাজের ফল বেশী হতে পারে, কম হতে পারে, নাও হতে পারে,

ওটা তোমার হাতে নেই, ফলের আশা তুমি করো না, কারণ ফলে তোমার অধিকার নেই; একমাত্র কর্মেই তোমার অধিকার। পরীক্ষা যখন দিতাম, তখন পরীক্ষার খাতায় উত্তর লেখাটা আমার এক্তিয়ারে, নম্বর দেওয়াটা শিক্ষকের এক্তিয়ারে। একজন শিক্ষক ছিলেন, তিনি আমাদের সাহিত্য পড়াতেন, তিনি খুব সুন্দর বলতেন –অঙ্কে নম্বর দেওয়া হয়, সাহিত্য নম্বর awarded। অঙ্ক পরীক্ষায় অঙ্ক যদি ঠিক করে তাকে নম্বর দেওয়া হবে, ভুল করলে দেবে না। সাহিত্যে আপনি একটা প্রবন্ধ লিখেছেন, আপনার প্রবন্ধের মান দেখে শিক্ষক, he awards you। আমি মনে করলাম, তাই তোমাকে এই নম্বর দিলাম। ফল ঠিক তাই, ফলটা অন্য দিক থেকে আসে, ওখানে আপনার অধিকার নেই। আপনি কান্নাকাটি করুন, হাতে পায়ে ধরুন, কিছু হবে না, ওটা তাঁর এক্তিয়ার। সেইজন্য আপনি যেটা একমাত্র করতে পারেন, আপনার অধিকার হল, আপনি শুধু কাজ করে যেতে পারেন। ফল আপনার হাতে নেই। সাতচল্লিশ নম্বর শ্লোক হল কর্মযোগের প্রাণ।

প্রথমটা বললেন, কর্মেই তোমার অধিকার, কাজ শুধু কাজ করবে। ব্রহ্মচারীদের সব সময় আচার্যরা বলেন, কাজ কর, ফলের পিছনে দৌড়াবে না। কেন দৌড়াবে না? কারণ পরিষ্কার, যদি ফলের পিছনে দৌড়ায়, তার মানে তুমি দুর্বল। দুর্বল মানুষ ইহকাল পরকাল কোনটাই পায় না।

এখানে আসক্তি যেটা বলছে, এটা কামনা-বাসনাকে নিয়ে বলছেন, এটাকেই স্বামীজী বলছেন selfishness, নিষ্কাম কর্মকে স্বামীজী বলছেন, unselfish। স্বামীজী বলছেন, unselfishnees is more paying, only people do not have the patience to practice it। মানুষের ধৈর্য নেই, কারণ নিঃস্বার্থপরতার অনুশীলন করার জন্য শক্তি দরকার, স্বার্থপরতার জন্য বেশী শক্তির দরকার হয় না। স্বার্থপর যে কোন মানুষ হতে পারে, exclusive হওয়া খুব সহজ, inclusive হওয়া খুব কঠিন।

মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ, কর্মের প্রতি যদি আসক্তি থাকে, তখন আর-একটা সমস্যা তৈরী হয়ে যায়। ওই কর্মফলের তুমি কারণ হয়ে যাবে, সেখান থেকে আরও নূতন নূতন কর্মফলের হেতু বেরোতে শুরু হয়ে যাবে। যেমন, একটা বীজ বপন করলে তার গাছ হবে, সেই গাছের ফল হবে। বিষবৃক্ষের বীজ যদি বপন করা হয়, সেখান থেকে বিষবৃক্ষ হবে, এবং তার ফল হবে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ফলের কামনা করা, বিষবৃক্ষের বীজ বপন করা। কিন্তু আমরা তো ফলের কামনাকে ছাড়তে পারব না। পারবে না তা তো জানা কথা, কিন্তু কোথাও তো একটা শুরু করতে হবে। গীতা যখন তুমি শুনছ, তার মানেই তুমি পারবে। একটু একটু করে হবে, একদিনে কোন কিছুই হয় না। ইউনিভার্সিটিতে অনেক নূতন ব্রহ্মচারী মহারাজরা আছেন, প্রায় পাঁচ-ছয়জন আছেন, যাঁরা সবাই বিদেশ থেকে পড়াশোনা করা বড় বড় ডিগ্রিধারী।

সন্ন্যাসীরা মজা করে বলেন, ভাই, রামকৃষ্ণ মিশন এমনিতেই কর্মযোগ শিখিয়ে দেয়। প্রথমের দিকে যাঁরা জয়েন করেন, মনে করেন আমি এটা করব, সেটা করব। কিছু দিন একটা সেন্টারে খুব কাজ করার পর হঠাৎ একদিন বেলুড় মঠ বলে পাঠালেন, চলো তুমি অন্য জায়গায়, তোমাকে বদলি করা হল। প্রথমে মনটা হতাশ হয়ে গেল। ঠিক আছে, নূতন জায়গায় গিয়ে আবার পুরো উদ্যমে কাজ শুরু করে দিল। কয়েক বছরের মধ্যে আবার বদলির আদেশ এলো। এইভাবে দুবার তিনবার বদলির পর, বুঝতে পারেন, এটা এই রকমই। এরপর মঠ যে কাজ দিল, সেই কাজটা নিষ্ঠার সঙ্গে করে দিল, হয়ে গেল, এমনিতেই কর্মযোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

সংসারে যাঁরা আছেন, তাঁদেরও এই রকমই হয়। একটু সময় লাগে ঠিকই, কিন্তু নিজেকে একটু অনুশীলন করতে হয়। সংসারে অনেকে ঝড়-ঝাপ্টা আসে, অনেক দুঃখ কষ্ট আসতে থাকে, তখন বুঝে নেয় সংসার এই রকমই, এছাড়া সংসারে কিছু নেই। বলছেন, এমন কাজ কখন তুমি

করবে না, যাতে তোমাকে নূতন বীজ বপন করতে না হয়। নূতন বীজ বপন মানেই নূতন গাছ হবে, তার ফল হবে, এতে তুমি অনেক ঝামেলায় পড়ে যাবে।

অর্জুনের প্রশ্ন ছিল, আমার যুদ্ধ করাটা ঠিক হবে কিনা, আমার পাপ লাগবে কিনা ইত্যাদি, ভগবান সেটাই এখানে বলছেন, তুমি যদি এই জিনিসগুলোকে নিয়ে চিন্তা করো, তাহলে তুমি ঝামেলায় পড়বে। তুমি কাজ করে যাও, তুমি স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত, তুমি স্বধর্ম রূপে যুদ্ধ কর, আর ওটাই তোমাকে করতে হবে।

মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি, এক মুহুর্তের জন্য তুমি যেন কাজ ছাড়া না থাক। আমাদের মনে হতে পারে, এটা তো ঠাকুরের কথার সাথে মিলছে না। ঠাকুর যে প্রার্থনা করতে বলছেন, হে ঈশ্বর, আমার কাজ কমিয়ে দাও, বেশি কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে তোমাকে ভুলে যাই। ঠাকুর এখানে সকাম কর্মের কথা বলছেন। যখনই আমরা কামনা-বাসনা নিয়ে কাজ করি, তখন ওই বাসনাগুলি কর্ম করার সময় মাথায় নাড়া দিতে থাকে। ঠাকুর যত কথা বলতেন, তিনি সিদ্ধান্তের দিক থেকে বলতেন কিনা। আসল কর্মক্ষেত্রে নামার পর অনেক তফাৎ হয়ে যায়। হঠাৎ কেউ যদি বলে আমি জপধ্যান নিয়েই থাকব, আমি তপস্যাই করব, আমি হিমালয়ে নির্জন বাস করব। অনেকে যায় ঠিকই, কিন্তু উপরে গিয়ে আবার নেমে আসে। কর্মযোগ করা না থাকলে ক্ষেত্র তৈরী হবে না, আধ্যাত্মিক ভূমি তৈরী হয় না।

কর্মযোগ করার আগে প্রচুর কর্ম করতে হয়। সেইজন্য প্রথমে দরকার প্রাণ ঢেলে মন প্রাণ এক করে কাজ করা, সেখান থেকে আস্তে আস্তে ভিতরে সবার প্রতি করুণার ভাব, ভালবাসার ভাবটা বাড়াতে হয়। খুব আবেগ দিয়ে কাজ করলে মনের মধ্যে ওই ভাবটা আসে, সব কিছু আমার চাই। আমি খাটছি, কারণ আমার টাকা চাই; আমি খাটছি, কারণ আমি এটা পেতে চাইছি। সেখান থেকে আস্তে আস্তে শুরু হয়, না অপরের জন্য আমাকে কিছু করতে হবে। এই যে সবার প্রতি ভালবাসা জাগছে, এবার সে কর্মযোগের পথ নিল। কর্মযোগের পথে আসা মানে, মনটা নরম হতে শুরু হয়। এর পরের ধাপে আসে, আমার এটা কর্তব্য তাই আমি করছি। অনেক সময় আমরা দেখি, কাজ না করেই ফল পেতে চাইছে। *মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি*, এখানে গীতা বলতে চাইছেন, তুমি কাজ করো, কিন্তু ফল চেও না, নূতন করে কর্ম যেন সৃষ্টি না হয়, আর কোন সময় যেন তোমার ফাঁকা না যায়।

ভারতবর্ষের পুরো সমস্যা অন্য রকম, এর মধ্যে যেটা সব থেকে বেশী দেখা যায়, তা হল, কাজ করব না, কিন্তু ফল চাই। এখন করোনা নিয়ে সারা দেশে কত লোকের কত রকম চাহিদা। এটা কেন হচ্ছে না, ওটা কেন হচ্ছে না, কেউ আবার ওর মধ্যে ওই কোর্টে, কেউ সেই কোর্টে যাচ্ছে, কিন্তু এটা কেউ বলছে না, আমরা দশজন মিলে স্বেচ্ছাসেবকমূলক কাজে নামছি। আম্ফানের কবলে কলকাতায় কত গাছ পড়ল, বিদ্যুতের তার ছিড়ল, আলো নেই, জল নেই। মিস্ত্রিরা চেষ্টা করে যাচ্ছে, কিন্তু একা তারা এই মারাত্মক বিপর্যয়কে কি করে সামলাবে। একটা গাছ কাটার দল একটা পাড়ায় গেছে গাছ কাটতে, সেখানে সবাই দেখছে, দুই একজন লোকে এসে তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আগে আমার বাড়ির সামনের গাছটা কাটুন। ভাই তুমিও তো নিজে কেটে নিতে পারো। একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে গেছে, এখানে কারুর হাত নেই। দশজন মিলে যে এগিয়ে গিয়ে বলবে, আমরা সবাই মিলে এই দুর্যোগে মানুষের পাশে থেকে তাদের সেবা করছি, আমাদের বলতে হবে না, আমরা এমনিই করে দিচ্ছি। কিন্তু তা করবে না। কি করবে? আমাদের দাবী মানতে হবে। দাবী যে মানতে বলছ, কিন্তু তোমার কি কোন কর্তব্য নেই? 'কর্তব্য আবার কি, নেওয়ার সময় আমি আছি, দেওয়ার সময় নেই; বেশী জ্ঞান দেবেন না'।

যে দেশের মস্তিষ্ক থেকে গীতার মত এত উচ্চ চিন্তন বেরিয়েছে, যে দেশের ধর্মের প্রাণ গীতা, যে গীতার প্রাণ হল কর্মযোগ, সেখানে আমরা আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। খড়্গপুর আইআইটিতে যে মাঝে মাঝে Pre placement of counseling হয়, যার কথা আমরা আগেও একবার উল্লেখ করেছি, সেখান placement হচ্ছে না, হচ্ছে pre placement counseling। ওখানকার একজন প্রফেসর খুব দুঃখ করে বলছিলেন, 'কি দুঃখের কথা, ছেলেগুলো একবারও জানতে চাইছে না আমার কি দায়ীত্ব হবে, আমাকে কি কাজ করতে হবে। ওরা শুধু জানতে চাইছে, আমার salary কত হবে, আমার parks privilege কত হবে। কাজের দিকে দৃষ্টি নেই, কি পাব সেই দিকে নজর, ফলের দিকে দৃষ্টি'।

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে ভারতবর্ষের সমস্যা কি, আর তার কি সমাধান? গীতার এই একটি শ্লোকের পুরোটা না, শুধু এর শেষাংশের মর্মার্থ যদি আমরা আমাদের মাথার মধ্য বসিয়ে নিতে পারি, তাহলে ভারতের কি সমস্যা স্পষ্ট ভাবে জানা হয়ে যাবে, আর তার সমাধানও পাওয়া যাবে। কি সেই শ্লোক, *মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি*, এই একটি জিনিস যদি পালন করা হয়, দেশের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে –এক মুহুর্ত তুমি ফাঁকা থাকবে না, কিছু না কিছু কাজ যেন তুমি করতে থাক। কিন্তু কাজের কোন ফল তুমি চাইবে না, আর তার সাথে নূতন করে যে কর্মগুলির সৃষ্টি হবে, সেদিকেও যেন তোমার দৃষ্টি না থাকে। কারণ ফল চাইলেই টেনে তোমাকে ওখানে নিয়ে যাবে, যেখান থেকে তুমি জন্ম-মৃত্যুর এই চক্র থেকে কখন বেরিয়ে আসতে পারবে না।

বলতে পারেন, যদি ফলের ইচ্ছা আমার নাই থাকে, তাহলে আমি কাজ কেন করব? ভগবান বলছেন, না, কাজ তুমি করবে কিন্তু আসক্তি যেন না থাকে, স্বার্থপরতার ভাব যেন না থাকে। কাজ করলে তোমার উদ্ধার হবে। বর্তমান অধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ খুব সুন্দর একটা কথা বলতেন – সপুচ্ছবাদ। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, জগৎটা হল কুকুরের একটা বাঁকা লেজ। কুকুরের লেজ তুমি সোজা করার চেষ্টা কর, কোন দিন সোজা করতে পারবে না। জগতের মঙ্গল করে যাও, অপরের ভাল করতে যাও, কোন দিন জগতের মঙ্গল হবে না, কোন দিন অপর ভাল হবে না, মাঝখান থেকে তোমার মঙ্গলে হবে এবং তুমি ভাল হয়ে যাবে। কাজ তোমাকে করে যেতে হবে, তোমার কাজে কারুর মঙ্গল হবে না, মাঝখান থেকে তুমি সোজা হয়ে যাবে। সেইজন্য কাজ করতে হয়। উদ্দেশ্য যদি অপরের ভাল করা হয়, অপরের কোন দিন ভাল হবে না। ভাল তোমার নিজের হবে। কর্মযোগ এই সিদ্ধান্তকে নিয়ে চলে। তাহলে কি মাইনে নেব না? অবশ্যই নেবেন। কিন্তু সব সময় যদি চিন্তা করতে থাকি, কবে আমার মাইনে বাড়বে, প্রোমশন কবে হবে, এই চিন্তা আপনার ভিতরের শক্তিকে টেনে বার করে নিচ্ছে। লোভ, মোহ যদি এসে যায়, আপনার শক্তিকে ক্ষয় করে দেবে। জীবনের উদ্দেশ্য হল, শক্তি সঞ্চয় করা। ট্যাপের নীচে বালতি পাতা আছে, ট্যাপ থেকে জল বালতিতে পড়েই যাচ্ছে, কিন্তু বালতিতে জল থাকছে না, কারণ বালতিটা ফুঁটো, সব জল বেরিয়ে যাচ্ছে, জল জমতে পারছে না। কামনা, বাসনা, লোভ, মোহ, এগুলো হল সেই ছিদ্র। এই ছিদ্রগুলিকে আমাদের বন্ধ করতে হবে, তবে গিয়ে শক্তি সঞ্চয় হতে শুরু হবে।

এই জগৎটা হল একটা জিমনাসিয়াম, এখানে আপনি নিজেকে ঠিক করবেন, অপরকে ঠিক করার দায়ীত্ব আপনার নয়। আপনি একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন, আপনাকে মালিক নিংড়ে নিচ্ছে, নিতে দিন। যদি একটা জায়গায় ভাল সুযোগ পান, এই চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন। সুযোগ যত দিন না পাওয়া যাচ্ছে, চুপ করে ততদিন ওখানে বসে থাকতে হবে, শোষন সহ্য করুন। ইনক্লাব জিন্দাবাদ করে আপনার কোন লাভ হবে না। আপনি একবার দুবার বলতে পারেন, যেদিন সুযোগ হবে আপনি বেরিয়ে চলে যাবেন। এই হল সাতচল্লিশ নম্বর শ্লোকের ব্যাখ্যা। সাতচল্লিশ শ্লোক হল কর্মযোগের প্রাণ। তৃতীয় অধ্যায়ে এই শ্লোকটাকে আরও বিস্তারিত ভাবে বলবেন। এর পরে যে তিন চারটে শ্লোক, সেটা এরই সম্প্রসারণ –

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যাক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।।৪৮।।

(হে ধনঞ্জয়, যোগস্থ হয়ে অর্থাৎ কেবল ঈশ্বরের জন্য কর্ম কর। ঈশ্বরের জন্য কর্ম করার সময়েও 'ঈশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হন' –এই ধরণের আশাও ত্যাগ করতে হবে। কর্তৃত্বাদি-অভিনিবেশশূন্য হয়ে কার্য করলে সত্ত্বশুদ্ধিজনিত জ্ঞানপ্রাপ্তিরূপ সিদ্ধিতে হর্ষ এবং তার বিপর্যয়ে বিষাদ উপস্থিত হয়। হর্ষ এবং বিষাদে নির্বিকার থেকে কর্ম কর। ফলাফলে চিত্তের সমত্ব বা নির্বিকার ভাবই যোগ।)

ভগবান বলছেন, হে অর্জুন, তুমি যোগ অবস্থিত হয়ে কাজ করো। আচার্য যোগের সংজ্ঞা দিচ্ছেন, *কেবলং ঈশ্বরার্থং তত্র অপি ঈশ্বরো মে তুষ্যতু ইতি সঙ্গম্,* ঈশ্বরার্থে কর্ম করার সময় ঈশ্বর আমার উপর প্রসন্ন হন, এই কামনাটাও করবে না। আমরা প্রায়ই বলি, হে প্রভু কৃপা কর, এটাও যেন মাথায় না আসে। আমি ঠাকুরের কাজ করছি ঠাকুরকে খুশী করার জন্য, এই ভাবটাও যেন না আসে। কঠোপনিষদেও আচার্য এই কথা বলছেন, *ঈশ্বরো মে তুষ্যতু ইতি,* প্রভু আমার উপর খুশী হবেন, এই ভাবনাটাও যেন তোমার না থাকে; আমি কাজ করছি আমার ঈশ্বরের জন্য, এতে ঈশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হবেন, এই ভাবনাও থাকবে না। একেবারে পুরো অনাসক্ত ভাবে কাজ করতে হবে, এটাকেই বলছেন *যোগস্থ,* যোগে অবস্থিত। যোগে অবস্থিত মানে, সংসারে ফলের কামনা দূরে থাক, আমার আধ্যাত্মিক মঙ্গল বা উন্নতি হোক, এই চিন্তাটাও মাথায় থাকবে না।

এইভাবে সমস্ত রকম কামনারহিত হয়ে কাজ করলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। কামনা-বাসনা না থাকলে মন পরিষ্কার হয়ে যায়। হৃদয় বা অন্তঃকরণ যখন এভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়, তখনই জ্ঞান প্রাপ্তি হয়, এটাকে বলছেন সিদ্ধি। *যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি,* যোগে অবস্থিত হয়ে কর্ম কর, এবং *সঙ্গং ত্যাক্ত্বা ধনঞ্জয়,* কোন কিছুতে যেন আসক্তি না থাকে। *সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ,* কাজে সাফল্য এলো, অসাফল্য এলো, *সমো ভূত্বা,* দুটোতে শান্ত থাক। *সমত্বং যোগ উচ্যতে,* সব অবস্থাতেই সম ভাব ধরে রাখা। প্রাণ ঢেলে কাজ করে গেছে, কাজে কোথাও কোন ত্রুটি ছিল না, কিন্তু সাফল্য এলো না; ঠিক আছে, এখানেও মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। সাফল্য পাওয়া গেছে, তখনও উৎফুল্ল হওয়ার কিছু নেই, মাথা দুটো অবস্থাতেই ঠাণ্ডা। এটা তারই জন্য, যদি সে আধ্যাত্মিক জীবনে শ্রেষ্ঠত্ব পেতে চায়। বলছেন, যখন জ্ঞান প্রাপ্তি হয় তখন এটা সিদ্ধি, যখন জ্ঞান প্রাপ্তি হয় না, তখন এটা অসিদ্ধি, দুটোতেই মনের ভাব কে সমান রাখতে হবে।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।।৪৯।।

(হে ধনঞ্জয়, কাম্য কর্ম নিষ্কাম কর্ম অপেক্ষা নিতান্ত নিকৃষ্ট। অতএব তুমি কামনাশূন্য হয়ে সমত্ব বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ কর। যারা ফলাকাঙ্ক্ষী হয়ে কর্ম করে, তারা অতি হীন।)

সমত্ব বুদ্ধি হল শ্রেষ্ঠ, আর যাদের এই সমত্ব বুদ্ধি নেই, যারা কামনা-বাসনা যুক্ত হয়ে কাজ করে, এই শ্লোকে তাদের কথা বলছেন। সমত্ব বুদ্ধির তুলনায়, যারা কামনা-বাসনা নিয়ে কাজ করে, এরা নিকৃষ্ট। এরা কৃপণ, কৃপণ মনে ছোট মনের। সেইজন্য হে ধনঞ্জয়, তুমি এই যোগবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হও। কাজ করে করে তোমার বুদ্ধি যখন পাকা হয়ে যাবে, সেখান থেকে তুমি সাংখ্য বুদ্ধিতে যেতে পারবে। গীতা পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, আগে তুমি কাজ কর, কাজ করলে তোমার বুদ্ধি পরিষ্কার হবে, সেখান থেকে সাংখ্য বুদ্ধিতে পৌঁছাতে পারবে, সাংখ্য বুদ্ধি মানে, যেখানে সাধনাদি, জপধ্যান হবে। এগুলো করার পর তোমাকে পরমার্থ জ্ঞানের দিকে এগোতে হবে। কিন্তু তুমি যে পরমার্থ জ্ঞান লাভের সাধনা করবে, ঈশ্বরের দিকে যাবে, এর জন্য আগে তোমাকে কর্মযোগ দরকার। সমস্ত ভয়কে তুমি অতিক্রম করে যাবে, যখন তুমি একবার সাংখ্য বুদ্ধিতে যাবে।

কিন্তু সাংখ্য বুদ্ধিতে যাওয়ার আগে তোমার যোগবুদ্ধি লাগবে, অর্থাৎ আগে তোমাকে প্রচুর কাজ করতে হবে। প্রথম ধাপ হল, প্রচুর কাজ করতে হবে; দ্বিতীয় ধাপ হল কর্মযোগ, কর্মযোগ করতে করতে বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে জ্ঞানপ্রাপ্তির পথ তৈরী হয়ে যাবে, এরপর আসবে জ্ঞানযোগ। একবার বুদ্ধিটা তৈরী হয়ে গেলে, এরপর যে কোন দিক দিয়ে সে ঈশ্বর লাভ করতে পারে। কিন্তু সবার প্রথমে প্রচুর কাজ করে যেতে হয়। ঠাকুর বলছেন, সবটাই কাজ, জপ করাটাও কাজ, ধ্যান করাটাও কাজ, পূজা করাটাও কাজ। বলছেন, কি ফল পায়?

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।।৫০।।

(নিষ্কাম কর্মযোগী ঐহিক জীবনেই পাপ ও পূণ্য উভয় হতে মুক্ত হন। সুতরাং তুমি নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান কর। কর্মের কৌশলই যোগ।)

যোগঃ কর্মসু কৌশলম্, পঞ্চাশ নম্বর শ্লোকের এই চতুর্থ অংশ কর্মযোগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত। কর্মযোগের তিনটে মূল সিদ্ধান্ত, প্রথম *মা ফলেষু কদাচন,* দ্বিতীয় *সমত্বং যোগ উচ্যতে* আর তৃতীয় *যোগঃ কর্মসু কৌশলম্*। এই তিনটে বাক্যকে আমাদের মনের মধ্যে খুব ভাল করে বসিয়ে নিতে হবে, এবং চেষ্টা করতে জীবনে এগুলো যাতে আমরা নামাতে পারি। প্রথম বাক্য, ফলের দিকে তাকিও না, দ্বিতীয় বাক্য, মনের মধ্যে সমত্ব ভাব রাখা আর তৃতীয় বাক্য, কর্মের কৌশল। এই শ্লোকে কর্মের কৌশল নিয়ে বলছেন।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ, মনের শুদ্ধি থেকে যখন জ্ঞান প্রাপ্তি হয়, তখন তিনি ভাল-মন্দ দুটোরই পারে চলে যান। ভাল-মন্দের পারে যাওয়টাই তোমাকে শ্রেষ্ঠ জায়গায় নিয়ে যাবে, সেইজন্য এটাই চেষ্টা কর। এই সমত্ব বুদ্ধি কিভাবে পেতে পারো?

যোগ কি? যোগ হল, *কর্মের কৌশল*; যিনি কর্মে কুশল, তিনিই যোগী। সেটা কিভাবে হবে? এখানে তিনটে ধাপে নিয়ে যাচ্ছেন। প্রথম হল স্বধর্ম, তোমার যেটা দায়ীত্ব সেটা পালন কর। তুমি স্বামী, স্বামীর দায়ীত্ব পালন কর; তুমি স্ত্রী, তুমি স্ত্রীর দায়ীত্ব পালন কর; একজন শিক্ষক শিক্ষক রূপে তাঁর দায়ীত্ব পালন করবেন। এখন এটাই আমার স্বধর্ম, এই ধর্মে আমাকে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। স্বধর্ম পালন করতে করতে একটা বুদ্ধি তৈরী হয়, যে বুদ্ধিতে সে নিজেকে ধীরে ধীরে ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত করে দিতে চাইছে; এটাকে বলে স্বধর্ম –ঈশ্বরসমর্পিত বুদ্ধি, এই বুদ্ধি হল একেবারে পরিষ্কার। ওই পরিষ্কার বুদ্ধি থেকে সমত্ব ভাব এসে যায়, এখানে সে সিদ্ধি অসিদ্ধির পারে চলে যায়। এই তিনটে স্টেজ – স্বধর্ম পালন, দ্বিতীয় ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি, তৃতীয়, সেখান থেকে আসে সমত্বের ভাব; এটাকে বলছেন কুশল। কর্মে কুশল কে? যে এই তিনটে জিনিস করে। যে কোন কাজে চটপট করে দিচ্ছে, এটাকে কুশল বলছেন না, চটপট কাজ করাটা প্রথমে, দ্বিতীয় স্বধর্ম ঠিক ভাবে পালন করছে, তৃতীয় ঈশ্বরের প্রতি নিজেকে সমর্পিত করে দিয়েছে, শেষে এই ভাব – হে ঠাকুর, ভালটাও তোমার, মন্দটাও তোমার; এই বোধ মনকে স্থির ও শান্ত করে দেয়, মন আর চঞ্চল হয় না।

এর ফলে কি হয়? কর্মের যে স্বভাব বন্ধন সৃষ্টি করা, এরপর যত কর্মই করুক, কোন কর্মই তাকে আর বাঁধতে পারবে না। বাঁধে কে? বাঁধে লোভ, বাঁধে মোহ। তার লোভ নেই, মোহ নেই, বাঁধবে কি করে! চুম্বক লোহাকে টেনে নেয়, সে এখন সোনা হয়ে গেছে, যত শক্তিশালী চুম্বক তার কাছে আসুক না কেন, এক চুলও টানতে পারবে না। পরশমণির স্পর্শে লোহা হয়ে গেছে সোনা। এতদিন সংসার তাকে টেনে রাখছিল, সে এখন সোনা, সোনাকে আর কি টানবে। ভগবান হলেন সেই পরশপাথর, তাঁর ভালবাসা এখন তার হৃদয়ে নেমে এসেছে, তাকে সংসার আর কি করবে!

এটি গীতার অত্যন্ত কঠিন তত্ত্ব, যে তত্ত্ব অনেকবার ঘুরে ঘুরে গীতাতে এসেছে। উদ্দেশ্য নিয়ে যখনই কোন কাজ করা হয় তখন সেই কাজটা আমাদের মনের উপর একটা ছাপ ফেলে সংস্কার রূপে মনের গভীরে চলে যায়। আর উদ্দেশ্য না নিয়ে যখন কোন কাজ করা হয় তখন সেই কাজ কোন দাগ ফেলে না। ছাপ না ফেললেও একটা খুব সূক্ষ্ম অবস্থাতে গিয়ে কিন্তু ছাপ রেখে যাবে। যেমন ধরুন আমি রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একটা ভিখারিকে দেখলাম সে কিছু একটা কষ্ট পাচ্ছে। আমি গিয়ে তাকে কিছু একটা করে দিয়ে তার কষ্টটা লাঘব করে আমি আমার কাজে যেমন যাচ্ছিলাম সেইভাবে চলে গেলাম। আমার মাথাতেও এর আর কিছু নেই। গীতার মতে, আমি এই যে একটা পূণ্য কাজ করলাম, এর ফল কিন্তু আমার আর আসবে না। কারণ আমার এখানে কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু স্বামীজী কর্মযোগ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, এই যে আমি একটা ভালো কাজ করলাম, এই কাজটাও খুব সূক্ষ্ম স্তরে গিয়ে একটা ছাপ রেখে যাবে। সেই ছাপটা হচ্ছে, মানবজাতির প্রতি আমার যে করুণা, ভালোবাসার সংস্কার যেটা আগে থেকেই ছিল, সেই সংস্কারটা আরও শক্তিশালী হয়ে গেল। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান যখন হয়ে যায় তখন তো আর কোন সংস্কারের প্রশ্নই থাকছে না, সংস্কার তো মনের, তখন তিনি মনকেও ছাড়িয়ে চলে গেছেন।

এখানে যেটা বলতে চাইছেন তা হল, এই যে তুমি কোন কিছুই চাইছ না, তাতে তোমার কোন ফলই আসবে না। কেন ফল হয় না, কি কারণে ফল আসে না আমাদের ঠিক জানা নেই। কিন্তু পুরো গীতাতেই এই জিনিসটা ঘুরে ঘুরে এসেছে, তুমি যদি ফলাকাঙ্খা রহিত হয়ে কোন কর্ম কর তাহলে সেই কর্মের ফল তোমাকে স্পর্শ করবে না, মানে তোমার মনের কোথাও ছাপ ফেলবে না। এর সাথে অন্যান্য জিনিসও হবে। আমি এখান থেকে কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই এমনিই দিল্লী যাচ্ছি। যেতে যেতে ট্রেনের দুর্ঘটনা হয়ে গেল, তখন আমি নানা ঝামেলায় পড়ে গেলাম, তখন বলবে, এই তো আমি ফল পেয়ে গেলাম। এখানে ঠিক এই অর্থে বলা হয় না, আরও গভীর অর্থে বলা হচ্ছে।

যতক্ষণ না ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভ হয়, ফলাকাঙ্খা না করে ভালো মন্দ আমি যাই করি না কেন, খুব গভীরে সূক্ষ্ম স্তরে গিয়ে ছাপ একটা ফেলবেই। ভগবান একটু পরেই বলবেন – *রসবর্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্টা নিবর্ততে*। খুব সূক্ষ্ম স্তরে যেটা ছাপ ফেলছে, এই ছাপটা ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত থেকে যাবে। কিন্তু তাই বলে যে বিরাটাকারে ফল দেবে সেটা হবে না। এটা একটা মতও হতে পারে। এখানে শাস্ত্র মতে বলা হচ্ছে ফল পাবে না। ফল পাওয়াটা হল, যেমন বেদ মতে আমি যখন একটা যজ্ঞ করছি, তখন আমি তার একটা ফল পাব, যেমন স্বর্গরূপী, ভালো জন্মরূপী ফল একটা পাব। গীতার মতে যখনই আমি একটা কাজ করছি তার একটা ভালো কিংবা মন্দ ফল হবে। এখন আমি যদি বলি আমার কোন ফল লাগবে না, তখন ঐ ফলটা আমার আসবে না।

কিন্তু এখানে অনেক প্রশ্ন আসতে পারে, কেন এই ফল ছাপ ফেলে না? স্বামীজী কিন্তু বারবার বলছেন, তুমি ভালো মন্দ যাই কর সেটা কিন্তু মনের মধ্যে একটা ছাপ ফেলবে। এই কথা গীতাও বলছে। আমি কাউকে একটা আম দিলাম, কর্মফলের মত কোন না কোন দিন আমাকে ঐ ফল দেবে। রাজসভায় যখন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ হতে যাচ্ছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে জিজ্ঞেস করছেন –তুমি মনে করে দেখ, তুমি কি কখন কাউকে কোন বস্ত্র দান করেছিলে? দ্রৌপদী তখন ভেবে বললেন – হ্যাঁ মনে পড়েছে, এক ঋষি স্নান করার সময় নদীর স্রোতে তাঁর কৌপিন ভেসে গিয়েছিল, আমি আমার শাড়ির আঁচল ছিড়ে তখন তাঁকে দান করেছিলাম। শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন, তাতেই হবে। এটা কি একটা নিছক কাহিনী, না কোন তত্ত্বকে প্রকাশ করতে চাইছে? এটা একটা কাহিনীই, কিন্তু অত্যন্ত একটা মূল্যবান কাহিনী। সাধারণ লোক যারা তারা এই কাহিনী থেকে নিজেদের অবস্থার কথা ভাবতে শুরু করে। সাধারণ মানুষ নিজের মা, বোন, স্ত্রীকে কখনই বিবস্ত্র দেখতে চাইবে না। তখন সে দান করতে শুরু করে।

কিন্তু এই কাহিনীটাকে যদি আরেকটু ভালো করে কাটা ছেঁড়া করা হয়, দ্রৌপদী কবে কোন্ সাধু বাবাকে একটা কাপড়ের ছেঁড়া টুকরো দিয়েছিলেন আর ভগবান তাকে শাড়ি দিতেই থাকলেন, এটা যেন ঠিক জমছে না। কেননা বেশির ভাগ মানুষ তার জীবদ্দশায় কিছু না কিছু দান করেই থাকে। তাহলে এদেরও এত কেন কষ্ট হচ্ছে? যে কোন কর্ম সূক্ষ্ম স্তরে আমার ব্যক্তিত্ব তৈরী করছে এটা বিশ্বাস না করে উপায় নেই, ব্যক্তিত্ব তৈরী হতে বাধ্য। আর যখন পরম জ্ঞান লাভ হয় তখন এই ছাপ পড়াটাও বন্ধ হয়ে যায়, এটাও খুবই যুক্তিযুক্ত, কেননা অনাসক্ত হয়ে যান বলে কর্মের কোন ফল তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। স্বামী ভূতেশানন্দজীকে একবার এক সিনিয়র মহারাজ কর্মফল নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। তার উত্তরে তিনি ঠিক এই জিনিসটাই উল্লেখ করে বলেছিলেন – লঙ্কা খেলে যেমন ঝাল লাগে ঠিক তেমনি কর্ম আর কর্মফলের সঙ্গে কোথাও কোন একটা সম্পর্ক আছে। এখন এটাকেই বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিয়ে গেলেই সব সন্দেহের অবসান হয়ে যাবে।

এখানে আমি একজন আচার্য রূপে আধ্যাত্ম শাস্ত্রের ক্লাশ নিচ্ছি, আর আপনারা সবাই শুনছেন। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় আমিই কেন ক্লাশ নিচ্ছি আর আপনারাই বা কেন শুনছে? এর উল্টোটাও তো হতে পারত। তখন এর উত্তরে সহজ ব্যাখ্যা করে বলে দেবেন – কর্মফলের জন্য। এটাই এই প্রশ্নের সহজতম সমাধান, বেশি কাঁটাছেড়া করে ভেতরের দিকে প্রবেশ করতে হল না। এই ক্লাশ নেওয়ার জন্য যিনি আচার্য রূপে নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁকে এর জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হতে হয়েছে, সমস্ত রকমের জাগতিক সুখ ত্যাগ করতে হয়েছে, বছরের পর বছর তাঁকে শাস্ত্রের পিছনে পরিশ্রম করতে হয়েছে, আর আজ তাঁকে আচার্যের পদে অভিষিক্ত করা হয়েছে। একটা কথাতে আমরা বলে দিচ্ছি তিনি কর্ম করেছিলেন বলে আজ এখানে পোঁছেছেন। যে কোন জিনিসের পেছনে হাজারটা কারণ থাকতে পারে, সেই কারণ গুলোকে কেউ দেখতে পায়না। তাই সবাই বলে দেয় সব কর্মফল। কর্মফল যেই বলে দেওয়া হবে তখন মনটাও শান্ত হয়ে যায়।

মুকেশ আম্বানির বাবা ধীরুভাই আম্বানি কোথা থেকে কোথায় উঠে গিয়ে কোটিপতি হয়ে গেলেন। কোটিপতি হতে গিয়ে কত রকমের চালাকি, মিথ্যে কথা আর কত ভালো মন্দ কাজ করতে হয়েছে। ধীরুভাই আম্বানি কেন এত বড়লোক হয়ে গেলেন, আমি কেন হতে পারলাম না? কিন্তু আম্বানির কর্মগুলো আমরা দেখতে পাইনা, আমরা বলি দিই তার কর্মে ছিল। কর্মফল বলে দিলে আর এত বিশ্লেষণ করতে হয় না। এখন যদি বিশ্লেষণ করে দেখি যে সে এত চুরি করেছিল, এত লোক ঠকিয়েছিল, ঠিক আছে আমিও তাই করে বড়লোক হব। এখানে কিন্তু তাঁর খারাপ কর্মগুলির কথা বলছেন না; কোন জন্মে হয়ত তিনি বড় দান করেছিলেন সেইজন্য তিনি, তাঁর পরিবার আজ এত বড়লোক হতে পেরেছে। এখন এই কথা শোনার পর সবাই দান পূণ্য করতে শুরু করে দেবে। এতে সমাজের একটা স্থিতিশীলতা এসে যাবে।

সেইজন্য হিন্দু ধর্মের দর্শনকে অত্যন্ত বাস্তব সম্মত দর্শন বলা হয়। যদি বলি আমার কপালে বড়লোক হওয়ার থাকলে এমনিতেই হব, এটাই নেতিবাচক মানসিক বৃত্তি হয়ে গেল, এই ধরণের বৃত্তি বশতঃ সে আর কোন কাজ করতে চাইবে না। গীতা কিন্তু কখনই এই কথা বলবে না, সেইজন্য গীতা বলছে –*মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি*, তোমার অকর্মণি যেন কখন না হয়, কাজ তোমাকে সব সময়ই করতে হবে। যখন হাতের কাজ তখন কাজ কর, যখন যেটা করার সেটা কর, যখন হাতে কাজ নেই তখন পড়াশুনা করে, উচ্চ চিন্তন নিয়ে নিজেকে ব্যাস্ত রাখ। যখন কোন কাজ নেই, উচ্চ চিন্তনও হচ্ছে না তখন মনের কাজ কর, মানে জপ-ধ্যান কর। এই তিনটে কাজ যেন সব সময় চলতে থাকে। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই আমরা কি করি, ঠাকুর বলছেন – কুমড়ো কাটা বট্ঠাকুর। সারাক্ষণ বসে বসে তামাক টানছে, মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নেই, তাই মাঝে মাঝে ঘরের ভেতরে গিয়ে কুমড়োটা কেটে দিয়ে আসে। কর্মের মাধ্যমে আমাকে ঈশ্বর লাভ করতে হবে এই বোধ কারুরই নেই।

বেলুড় মঠের মহারাজদের কত কাজ করতে হয় যে তাদের আমোদ ফুর্তি করার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই, সময়ই পাবে না, আমোদ ফুর্তি বলতে ঐ সন্ধ্যা আরতির সময়টুকু। গীতাতে আমোদ ফুর্তি একেবারে বন্ধ, লোকে তাই বলে গীতা এখন থাক। অফিস থেকে এসে একটু টিভি না দেখলে চলবে না, সপ্তাহে একদিন ছুটি, ঐদিন বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা মারা, তারপর বিয়ে বাড়ি, জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী এগুলো তো আছেই। আধ্যাত্মিক জীবন এভাবে চলে না, আধ্যাত্মিক জীবন অত্যন্ত কঠিন ও ক্ষুরধার। আধ্যাত্মিক জীবন আমাকে এক মুহূর্তের আমোদ প্রমোদের সময় দেবে না। আধ্যাত্মিক জীবনে যে কাজই করা হবে সেটাই ঈশ্বরের কাজ, অফিসের কাজই হোক, ঘরের কাজই হোক, কারুর গলা কাটা হোক সবই ঈশ্বরের কাজ মনে করে করতে হবে, এই বোধকে ধরে রাখতে হবে। আধ্যাত্মিক জীবনে জপ-ধ্যান, অধ্যয়ণ আর কাজ এর বাইরে আর কিছু নেই। সাধু সন্ন্যাসীদের এই কারণে অন্য কোন ধরণের আমোদ-প্রমোদের অবকাশ নেই, জপ-ধ্যান, অধ্যয়ণ আর কর্মই তাঁদের একমাত্র আমোদ-প্রমোদ ।

এখানে তাই বলছেন *যোগঃ কর্মসু কৌশলম্,* যোগ হচ্ছে কর্মের কৌশল। কর্মের কৌশল মানে, তুমি কর্মটা কিভাবে, কি কৌশলে করবে। কি কৌশল? সমত্ব বুদ্ধি নিয়ে এবং ফলাকাঙ্খা রহিত হয়ে কর্ম করা, এইটাই কৌশল। তুমি কত বড় কর্মযোগী, তোমার কাজ কত ভাল বোঝা যাবে তোমার বুদ্ধি কতটা শান্ত। বুদ্ধি যদি শান্ত না থাকে, সমত্ব বুদ্ধি যদি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে কোথাও তোমার গোলমাল আছে। সমত্ব বুদ্ধি তখনই হয়, যখন কর্মের ভালো মন্দ সব ফল ঈশ্বরকে অর্পণ করে দেওয়া হয়, হে প্রভু এটা তোমারই কাজ। আচার্য ক্লাশ নিতে আসছেন, তিনি বলছেন – ঠাকুর ক্লাশ নেওয়াটা তোমার কাজ। আচার্য তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা শিক্ষকতার কাজে লাগিয়ে দেবেন। তখন ভালো মন্দ কোনটাই তাঁকে স্পর্শ করবে না। ঠাকুর যেটা গিরিশ ঘোষকে বলছেন –কিছুই যদি না করতে পার তাহলে আমাকে বকলমা দিয়ে দাও। পরে গিরিশ ঘোষ যখন কোন কাজের ব্যাপারে বলছেন, এই কাজটা আমিই করব, তখন ঠাকুর বলছেন – খবরদার, 'আমি করব' বলার কোন এক্তিয়ার তোমার নেই, সব এখন আমার। ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার, রোজ কোটি কোটি টাকা নাড়াচাড়া করে যাচ্ছে, কিন্তু একটা টাকাতেও তার কোন অধিকার নেই। আমরা যাবতীয় যা কিছু করছি সবটাই ঈশ্বরের, জগতে আমার বলতে আমাদের কিছুই নেই। এখানে আমার বলতে যখন কিছুই নেই তাহলে আমার আসক্তি কোন্ জিনিসটার প্রতি হবে। কিন্তু মানুষের মন এই জিনিসটাকে বুঝতেই পারেনা, আমরা এখনও উচ্চ আদর্শের জন্য তৈরীই নই। উচ্চ আদর্শ যে কত কঠিন, যারা ধরে রেখেছেন তারাই বুঝতে পারেন। ফলে কি হয়, একান্ন নম্বর শ্লোকে বলছেন –

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্।।৫১।।

(নিষ্কাম কর্মযোগী মনীষিগণ কর্মজাত ফল ত্যাগ করে জন্মরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হন এবং সর্বপ্রকার উপদ্রবরহিত (সংসারস্পর্শশূন্য) ব্রহ্মপদ লাভ করেন।)

একবার এই ধরণের বুদ্ধি হয়ে গেলে, কর্মজনিত যে ফল; পাস-ফেল, সাফল্য-অসাফল্য এগুলো না; আরও উচ্চস্তরে নিয়ে গিয়ে বলছেন, শুভ দেহ অশুভ দেহ প্রাপ্তি, ওর পুরো বীজটাই নাশ হয়ে যায়। শুভ জন্ম, অশুভ জন্মের পারে তুমি চলে যাবে। পারে চলে গেলে কি হয়? এই শরীরেই, এই জীবনেই তোমার জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়ে যাবে। কাশীতে মারা গেলে মুক্তি হবে; অন্যান্য ধর্মে বলবে, মরলে স্বর্গে যাবে, এগুলো কিছু না; এখান এই শরীরে, এই জীবদ্দশাতেই তোমার মুক্তি হবে, বেঁচে থেকেই তুমি শ্রেষ্ঠ অবস্থা লাভ করবে। শ্রেষ্ঠ অবস্থা লাভ করার জন্য তোমাকে মরতে হবে না, এই স্থূল শরীরে থাকতে থাকতেই পেয়ে যাবে। পঞ্চম অধ্যায়ে ভগবান আবার বলবেন, *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো,* এখানেই তুমি সব কিছু জয় করবে। হিন্দুদের জীবনের ঠিক ঠিক আদর্শ, জীবদ্দশাতেই আমার

যেন আত্মজ্ঞান লাভ হয়। এই জীবদ্দশাতেই আমি যেন বুঝতে পারি আমার সমস্ত কর্মে আমার সমত্ব বুদ্ধি, জীবদ্দশাতেই আমি যেন বুঝতে পারি, লোভ, মোহ আমাকে নাড়াতে পারে না।

বলছেন, *জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্*, জন্ম-মৃত্যুর সমস্ত বন্ধন তার খুলে যায়, আর কর্মযোগের ফলে বুদ্ধি যে শুদ্ধ হয়েছে, এটাকে আচার্য বলছেন, *পরমার্থজ্ঞানরূপ বুদ্ধি*, এই বুদ্ধি পরমার্থ জ্ঞানকে এনে দেয়। তার মানে পরমার্থ জ্ঞানের জন্য আগে বুদ্ধি দরকার, ওই বুদ্ধির জন্য আগে সমত্ব বুদ্ধির দরকার, সেই সমত্ব বুদ্ধির জন্য আগে কর্মযোগ দরকার। বড় বড় জেট প্লেন যেখানে সেখানে নামতে পারে না, নামার জন্য তার বড় এয়ারফিল্ড লাগে। মশা, মাছি যেখানে খুশী নেমে যেতে পারে। ঈশ্বররূপী যে জেট প্লেন নামবে, তার জন্য আগে বিশাল এয়ারফিল্ড তৈরী করতে হবে। এয়ারফিল্ড তৈরী করা শুরু হয় কর্মযোগ দিয়ে।

হিন্দু ধর্মের এই দর্শন অন্য কোন ধর্মের সাথে মিলবে না। আমি যদি এই শরীর দিয়ে, যেটা আমি প্রত্যক্ষ অনুভব করছি, যেটাতে আমার বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে আছে, এই শরীরটা দিয়ে যদি ভোগ নাইই করলাম, তাহলে মৃত্যুর পর, যার সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নেই, কেউ স্পষ্ট করে কিছু বলেননি, সেই স্বর্গ পেয়ে আমার লাভটা কি? সেইজন্য স্বামীজী বলছেন – I don't believe in God who will give me eternal heaven after death, but cannot give me a piece of bread here, যে ভগবান এখানে আমাকে এক টুকরো রুটি দিতে পারেনা আর মরার পর আমাকে স্বর্গ দেবে এই রকম ভগবানে আমার বিশ্বাস নেই।

অন্যান সব ধর্মে যা কিছু সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠ সব মরার পর। আর স্বর্গের বর্ণনা কি রকম? দশ লক্ষ ধরণের ফল সেখানে আমার জন্য রাখা আছে, সুন্দর ঠাণ্ডা শুদ্ধ জল, ওখানে যত পুরুষ থাকবে তারা সব সময় তিরিশ বছরের যুবক হয়ে থাকবে, আর সবাইকে দেখতে সুন্দর হবে, যত মেয়েরা থাকবে তাদের সবাই বাইশ বছরের যুবতী। এক বিদেশী জার্নালিস্ট লিখছেন, কোরান পড়ে আমার মনে হচ্ছে আমি কেন খ্রীশ্চান হয়ে জন্মালাম, মুসলমান হয়ে জন্মালেই হত, তাহলে স্বর্গের যা বর্ণনা, তাতে মনে হচ্ছে এটাই ঠিক ঠিক বসবাসের উপযুক্ত স্থান। অথচ পাকিস্থান আফগানিস্থানের কত লোক না খেয়ে মরছে, এক অপরের গলা কাটছে। কেন কাটছে, মরার পরে আমি স্বর্গে যাব, স্বর্গে গিয়ে আমি হুড়িদের পাব, হুড়ি হচ্ছে আমাদের পরীর মত। আমাদের রামানুজম, মাধ্বাচার্য যত দর্শন দিয়েছেন তাতেও আমাকে মরতে হবে। একমাত্র অদ্বৈত বেদান্ত বলছে, না, এখানেই যা হবার হবে, এখানে যদি না হয় তাহলে আমার লাভ কি। এইটাই গীতা এই একান্ন নং শ্লোকে বলছে – *জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ*, এইখানেই জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে হবে। এটা বলার পর পরের শ্লোকে বলছেন –

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ।।৫২।।

(যখন তোমার বুদ্ধি মোহাত্মক অবিবেকরূপ কলুষ অতিক্রম করবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত কর্মফল-বিষয়ে বৈরাগ্যলাভ করবে অর্থাৎ শ্রোতব্য ও শ্রুত উভয়ই তোমার নিকট নিষ্ফল হবে।)

মোহকলিলং, *কলিল* মানে কলুষিত করে দেওয়া, তোমার অন্তঃকরণ, তোমার বুদ্ধিকে কলুষিত করে দিয়েছে। কিসের দ্বারা কলুষিত? অজ্ঞান আর মোহ। এই মোহ ও অজ্ঞানরূপ কলুষ দ্বারা যে বুদ্ধি নোংরা হয়ে আছে, এই বুদ্ধিকে তোমাকে অতিক্রম করে যেতে হবে। আমরা এখন যে অবস্থায় আছি, এই অবস্থায় আমরা সব সময় কামনা-বাসনাতে ডুবে আছি, আমরা মোহের মধ্যে পড়ে আছি, এটাই আমাদের বুদ্ধিকে কলুষিত করে রেখেছে। এই মোহ থেকে বেরিয়ে এলে তোমার বুদ্ধি শুদ্ধ হতে থাকবে, সেখান থেকে বেদ আদি সাধারণ জিনিসগুলির পারে চলে যাবে। শোক, মোহ

আদি মনের এই কলুষ যখন দূর হয়ে মন শুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন তুমি সব কিছুর পারে চলে যাবে, সমস্ত কর্মই তখন তোমার কাছে নিষ্ফল হয়ে যাবে। তুমি যদি জানতে চাও তুমি কবে পরামার্থ জ্ঞান লাভ করবে? তখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন –

শ্রুতিবিপ্রতিপন্নাতে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি।।৫৩।।

(নানা কর্মফলশ্রবণে বিক্ষিপ্ত তোমার চিত্ত যখন পরমাত্মাতে স্থির ও অচল হবে, তখন তুমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবে।)

আমার ভক্তি কবে হবে, কবে আমার জ্ঞান হবে, ঈশ্বর কবে কৃপা করবেন? এই প্রশ্নগুলো বেশির ভাগ ভক্তদের মনে আনোগোনা করে। ভগবান বলছেন, তোমার যে এই বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি, যেটা চারিদিকে দৌড়াচ্ছে, এটা চাই, সেটা চাই করে যাচ্ছে। কি কি চাই? জ্ঞান চাই, ঈশ্বরের ভক্তি চাই, টাকা চাই, কামিনী চাই, কাঞ্চন চাই, সব সময় চাই চাই চাই, চাই আর শেষ হতে চাইছে না। তোমার বুদ্ধির এই এটা চাই সেটা চাইএর চাঞ্চল্য যখন শান্ত হয়ে যাবে, তখন তোমার মন বুদ্ধিতে গিয়ে ঠিক ঠিক সমাহিত হবে। বুদ্ধির চাঞ্চল্য নাশ হলে বুদ্ধি স্থির হয়।

এই জায়গাতে আমরা রাজযোগে চলে এলাম, রাজযোগ চিত্তবৃত্তি নিরোধের কথা বলছেন। বুদ্ধিকে স্থির করতে হয়। কিভাবে স্থির হবে? মনে যে নানা রকমের চাঞ্চল্য, কামিনী, কাঞ্চন, টাকা-পয়সা, নামযশ, বন্ধুবান্ধব, পরিবার; সেখান থেকে স্বর্গপ্রাপ্তি, শুভ দেহ প্রাপ্তি; সেখান থেকে আরও উপরে, কি করে ঈশ্বরের ভক্তি পাবো, জ্ঞান প্রাপ্ত কি করে করব; চেষ্টা করে করে, কর্ম করে এই সব কিছুর যখন নাশ হবে, তখন তোমার বুদ্ধি স্থির হবে। *সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি*, মন যখন তোমার বুদ্ধিতে সমাহিত হয়ে সম্পূর্ণ স্থির হয়ে যাবে, তখন তুমি গিয়ে যোগে অবস্থিত হবে।

যোগ কি? বলছেন, বিবেক, বৈরাগ্য থেকে যে বুদ্ধির জন্ম হয়, সেই বুদ্ধির তখন সমাধিনিষ্ঠা হয়। ঠাকুর বলছেন ভক্তি পথ সহজ পথ, আমরাও মনে করি খুব সহজেই হয়ে যায়। সত্যিই কি সহজ? তাহলে আমাদের যত ঋষিরা ছিলেন, তাঁদের যখনই কোন বর্ণনা করছেন, তখনই দেখছি বলছেন, অমুক অমুক ঋষি হাজার হাজার বছর তপস্যা করেছিলেন। কারণ, এটাই পথ। মনকে স্থির করার জন্য প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়। এখানে বলছেন, সমাধিনিষ্ঠা; সমাধিনিষ্ঠা হওয়ার জন্য কি হয় –বিবেক বৈরাগ্য দিয়ে যে বুদ্ধির জন্ম হয়, সেই বুদ্ধিতে কোন ধরণের চাঞ্চল্য থাকবে না। এটার জন্য দরকার কর্মযোগ, কর্মযোগের আগে দরকার পড়ে কর্ম। এই হল কর্মযোগের একটা ছোট্ট ভূমিকা, এটাকেই আরও বড় রূপে আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে পাব। এরপর ভগবান স্থিতপ্রজ্ঞের কথা বলবেন, যা কিনা পুরো অন্য প্রসঙ্গ।

চুয়ান্ন নম্বর শ্লোক থেকে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোক পর্যন্ত যে বিষয়কে নিয়ে বলা হবে, এটাকে বলা হয় স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণ। এর আগে পর্যন্ত আমরা কর্মযোগ নিয়ে আলোচনা করলাম, স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণ সরাসরি কর্মযোগের সাথে জড়িয়ে আছে। নিষ্কাম কর্মের কথা যেখানে বলা হচ্ছে, যেখানে অনাসক্ত কর্মের কথা বলা হচ্ছে, যেখানে বলা হচ্ছে নিঃস্বার্থপর হয়ে কর্ম করতে, এর সবটার অর্থ হল, পুরোদমে কাজ কর। তোমার কাজের প্রচেষ্টা এমন হবে, যাতে তুমি নিজেই জানবে, you are the best। তার সাথে তোমার আশেপাশে যারা আছে, তারাও জানবে, you are the best।

আমরা এখানে একটা অত্যন্ত স্থূল উদাহরণ নিয়ে আসছি। এই যে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ, চুয়ান্ন নম্বর শ্লোক থেকে শুরু হচ্ছে, এই শ্লোকগুলো আমরা কবে থেকে পড়ছি এখন আর মনে নেই,

১৯৮২-৮৩ সাল থেকে হতে পারে। এটা আমার এবং অনেকেরই খুব প্রিয় section, পুরো হিন্দু ধর্মের সার, গীতার সার, সাধনার সার, সমস্ত কিছুর সার এই আঠারোটি শ্লোকে দেওয়া হয়েছে, সমস্ত কিছু এর মধ্যেই পাওয়া যাবে। সবারই উচিৎ পঞ্চান্ন নম্বর শ্লোক থেকে বাহাত্তর নম্বর শ্লোক পর্যন্ত এই আঠারোটি শ্লোক সবারই মুখস্ত করে নেওয়া। সম্ভব হলে, রোজ স্নানের পর রোজ এই আঠারোটি শ্লোক আবৃত্তি করা। এর উপর আমাকে অনেকবার অনেক জায়গায় ক্লাশ নিতে হয়েছে, নরেন্দ্রপুরে বলেছি, কানপুরে বলেছি, ছাপড়া মঠে বলেছি, ইউটিউবে হিন্দী ও ইংরাজী দুটো ভাষাতেই এই বিষয়ের উপর আমার লেকচার আপলোড করা আছে। আমাদের এখানকার কোর্সে দু-তিনবার এর উপর আমার ক্লাশ নেওয়া হয়ে গেছে। আশা করা যায় যে, আমার মত একজন সাধারণ কেউ যদি শুধু এটাকে নিয়ে সাত আটবার ক্লাশ নিয়ে থাকে, নিশ্চয়ই এই জিনিসটা তাঁর মাথায় বসে আছে। আর আমাকে দিনরাত এটাকে মাথায় নিয়ে চলতে হয়, তা সত্ত্বেও আজ ক্লাশে আসার আগে আমাকে নোটস তৈরী করে আসতে হয়েছে, কারণ আমার মাথায় আছে কোন পয়েন্ট যেন বাদ না চলে যায়। এটাকে বলে প্রস্তুতি, এটাকেই বলে কর্মযোগ।

কর্মযোগ মানে এটাই, আমার সব জানা আছে, আমাকে কি বলতে হবে, কি বলব না। কাগজ রাখতে হয়, যাতে বিস্তারে না যাই, এখানে বই আছে, শ্লোক আছে, আচার্য শঙ্করের ভাষ্য আছে, তা সত্ত্বেও আমার কাগজে অনেক কিছু লেখা আছে। কারণ, আমার নিজের যা ক্ষমতা, সেই ক্ষমতায় আমি আমার best possible দেব। এখন ধরুণ, উদাহরণ দিচ্ছি, আমি সব রকম প্রস্তুতি নিলাম, ক্লাশ শোনার জন্য অধীর আগ্রহে শ্রোতারা সবাই অপেক্ষা করছেন। এসে দেখছি এখানে কিছু সমস্যা হয়ে গেছে। ধরা যাক ইলেক্ট্রিসিটির সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেছে, বা ইন্টারনেট চলছে না বা অন্য কোন সিস্টেমে গণ্ডগোল হয়ে গেছে। এখন আমার কি হবে?

এই জায়গাতে কর্মযোগ কাজে লাগে। প্রথমে বলছেন, প্রস্তুতি তোমাকে নিয়ে রাখতে হবে, কিন্তু ফল যদি না আসে, মনকে বিচলিত হতে দিও না। কারণ ফল তোমার হাতে নেই, ফল অপরের হাতে। মানুষ যেমন তার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, লক্ষ্য থাকে আমার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সটা যেন ঠিক থাকে। কিন্তু মানুষের আসল ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স হল তার মস্তিষ্ক, এটাকে কখনই চঞ্চল হতে দেওয়া যাবে না। চঞ্চল মস্তিষ্ক নিয়ে কাজ করতে গেলে কাজ হবে না। আবার কাজের ফল যখন আসে, মানুষ তখন চঞ্চল হয়ে ওঠে। কর্মযোগ এটাই বলে, কাজ যখন করবে প্রাণ দিয়ে করবে। কোন বাচ্চা যদি কোন প্রতিযোগিতামূলক ব্যাপারে প্রস্তুতি নিতে চায়, তাহলে তাকে বলতে হবে, তুমি অবশ্যই প্রস্তুতি নেবে। এমন প্রস্তুতি নেবে যে তুমি সদর্পে বলতে পার, তোমার পাড়াতে, তোমার জেলাতে, তোমার রাজ্যে তোমার মত প্রস্তুতি কেউ নেয়নি। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তোমার নখদর্পণে। কিন্তু কোন কারণে তুমি যদি সফল না হওর, সেইজন্য মন খারাপ করবে না। কিন্তু যে জানে, বাংলার মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ, সে কি কখন চিন্তা করতে পারে যে, সে সিলেক্টেড হবে না?

আসলে আমরা কাজের চেষ্টা করি না, উপরন্তু মনটা আমাদের ফলের দিকে পড়ে থাকে, ফলস্বরূপ আমরা হতাশ হয়ে যাই। গীতা বলছেন, ফলের দিকে তাকিও না, কাজে মন দাও। যারা ম্যানেজমেন্ট পড়তে বড় বড় সংস্থায় প্রচুর টাকা দিয়ে ভর্তি হয়, তাদের লক্ষ্য হল রোলস রয়েস গাড়ির মালিক হওয়া, একটা দামী গাড়ি তার থাকবে। এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু কোন কারণে পরিস্থিতি এমন হয়ে গেল যে, রোলস রয়েস ছেড়ে আমাকে Maruti-800তে নামতে হবে, তখন মনকে চঞ্চল হতে দেওয়া যাবে না। শ্রীকৃষ্ণ এত শক্তিমান, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে জিতিয়ে দিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে মহাভারত যুদ্ধের পর গান্ধারী অভিশাপ দিলেন, আমি যেমন চোখের সামনে আমার বংশের সবাইকে নাশ হয়ে যেতে দেখলাম, তুমিও একদিন এইভাবে তোমার নিজের বংশের নাশ প্রত্যক্ষ করবে। শ্রীকৃষ্ণ মাথা পেতে সেই অভিশাপ গ্রহণ করলেন, একটা উচ্চবাচ্চও করলেন না।

একজন শত সন্তানের জননী, একটি সন্তানও বেঁচে নেই, সেই সন্তপ্ত মায়ের একটা আর্ত কথা মর্মস্থল থেকে বেরিয়ে এসেছে, শ্রীকৃষ্ণ চুপচাপ মাথা পেতে নিলেন। এটাকেই বলে কর্মযোগ।

কর্মযোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে দুটো ফল আসে। আমাদের আলোচনায় খুব সহজ করেই সব কিছুকে উপস্থাপন করা হয়, কিন্তু তার মধ্যে যে তত্ত্বগুলো আসে, সেগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম হওয়ার জন্য, এই কথাগুলো আমাদের বারবার শুনতে হবে, তা নাহলে মাথা থেকে সব বেরিয়ে যাবে। যোগ দুটো স্তরে চলে, প্রথমটা হল কর্মফলত্যাগ, যার কথা এতক্ষণ বলা হল। আমাকে সব প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে, এরপর হলে হবে, না হওয়ার থাকলে হবে না। আম্ফান ঝড়ে আমাদের ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে গেল, কতদিন অনলাইন ক্লাশ নেওয়া গেল না। কিছু করার নেই, কিন্তু আমরা আমাদের প্রস্তুতি চালিয়ে গেছি, এটাকে বলে কর্মফলত্যাগ।

কর্মফলত্যাগের পর যাঁরা ঈশ্বরের দিকে মন দিয়েছেন, একটা সময়ের পর তাঁদের কর্মত্যাগ হয়ে যায়। কথামৃতেও ঠাকুর বলছেন, কর্মকাণ্ড আদিকাণ্ড, প্রথমের দিকে প্রচুর কাজ করতে হয়। কাজ করতে করতে ফলের প্রতি যে লিপ্সা, সেটাকে ত্যাগ করতে হয়। আমি জয়ী হব, লোকে জানুক আমি শ্রেষ্ঠ, লোকে জানুক আমি কত বড়লোক, লোকে জানুক আমার কত ক্ষমতা, এই জিনিসটাকে মন থেকে পুরোপুরি চলে যেতে হবে। এটা চলে গেলে মন ধীরে ধীরে inclusive হয়, নিজেকে আরও বিস্তার করতে থাকে, হৃদয়টা সবার জন্য খুলে যেতে থাকে। সেখান থেকে কর্মত্যাগ হয়ে যায়। মানুষ কর্ম করে কিছু পাওয়ার জন্য। কিন্তু যে জেনে গেল আমি ঈশ্বরের সাথে এক, তার তো এখন চাওয়ার কিছু নেই, কেন সে কর্ম করতে যাবে!

যাদের কর্মফলত্যাগ হয়ে গেছে, তাদের জ্ঞাননিষ্ঠা বলছেন, জ্ঞাননিষ্ঠা মানে আত্মজ্ঞানের প্রতি তার নিষ্ঠা এসেছে। সহজ ভাষায় বলা যায়, তখন ঈশ্বরের প্রতি ঠিক ঠিক ভালবাসা আসে। আমরা এটা কিন্তু কথামৃতের ভাষায় বললাম। মন থেকে যখন সব কামনা-বাসনা চলে যায়, আমাকে সবাই জানুক মানুক, আমি জয়ী হব, এই ভাবনাগুলো মন থেকে যখন চলে যায়; আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন, তিনি আমাদের এই কথা বারবার বলতেন, আমি জয়ী হব, এই ভাবনটা ত্যাগ করতে হয়, তখনই ঠিক ঠিক ঈশ্বরের দিকে মন যাবে। এত লোক বিভিন্ন জায়গা থেকে দীক্ষা নিচ্ছে, কত জপ করছে, ফরর ফরর করে কত ঈশ্বরীয় কথা বলে যাচ্ছে; ঠাকুরও বলছেন, কলকাতার মেয়েগুলো লক্ষ লক্ষ জপ করছে, কিন্তু কিছুই তো হয় না।

কেন হয় না? কারণ আগে আগে কাজ করেনি। কাজ করলে তার ফল আসে, ফলের সাথে মান সম্মান এগুলোও আসে, অপবাদ আসে, কলঙ্ক আসে, এই সব কিছুকে ছাড়িয়ে উঠে আসার পর ঈশ্বরের দিকে মন যায়। ঠাকুর এটাই বলছেন, কর্মকাণ্ড আদিকাণ্ড। আচার্য এটাকে বলছেন জ্ঞাননিষ্ঠা; ঈশ্বরের প্রতি যে ভালবাসা, আত্মজ্ঞানের প্রতি যে নিষ্ঠা, এটাকে বলা হয় জ্ঞাননিষ্ঠা। তখন সে জ্ঞাননিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, বুদ্ধি স্থির হয়ে যায়। বুদ্ধি একবার স্থির হয়ে গেলে আর নড়বে না, এটাকে বলে কূটস্থ, এটাই *সোহম্ তত্ত্ব*, এটাই এখন আমরা আলোচনা করছি। ভগবান কর্মযোগের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, মানুষ কিভাবে কর্মফল ত্যাগ করে, কিভাবে কর্ম ত্যাগ করে; সব বলার পর এখানে বলছেন *সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি*, কর্মফল ত্যাগ, কর্মত্যাগ করে তোমার বুদ্ধি স্থির হয়ে যাবে, তখন তুমি যোগাবস্থা প্রাপ্ত হবে।

সব শোনার পর অর্জুন জানতে চাইছেন, আমি কি করে বুঝব যে, এই লোকটি যোগে প্রতিষ্ঠিত? অর্জুন এই যে যোগে প্রতিষ্ঠিতের কথা জিজ্ঞেস করলেন, এই যোগে যিনি প্রতিষ্ঠিত তাঁকে বলা হয় স্থিতপ্রজ্ঞ। এখানে স্থিতপ্রজ্ঞ বলতে দুটোই বোঝায়, যিনি চেষ্টা করে করে সেই অবস্থায়

গেছেন, তাঁকেও বোঝায়, আর যিনি স্বাভাবিক ভাবে সেই অবস্থায় গেছেন, তাঁকেও বলছেন। স্থিতপ্রজ্ঞ মানে, প্রজ্ঞা অর্থাৎ বুদ্ধি যাঁর কখন বিচলিত হয় না।

অর্জুন কেন এই রকম জানতে চাইছেন? কারণ ফাক্কা অনেকেই লেকচার দিয়ে দিতে পারে, খুব নামকরা কথা –ফলেন পরিচিয়তে। একটা গাছকে যদি জানতে হয়, সেই গাছের ফল দিয়েই আমি বিচার করতে পারব গাছটা কেমন। ঠাকুরের যাঁরা ভক্ত, তাঁদের আচার ব্যবহার, আচরণ দেখে অন্যরা জানতে পারবে ঠাকুরের ভক্তরা এই রকম হয়ে থাকে। একজন নিজেকে ঠাকুর ভক্ত বলছে, কিন্তু অন্য দিকে চুরি করে, মিথ্যা কথা বলে; তখন অন্যরা দেখে বলবে, শ্রীরামকৃষ্ণের চেলারা চোর হয়, ঠাকুরের চেলারা মিথ্যেবাদী হয়। লোকেরা আমাকে দিয়ে ঠাকুরকে জানবে। আমি কি রকম? আমি শ্রীরামকৃষ্ণ বৃক্ষের ফল। হিন্দু ধর্ম যা কিনা একটা বিরাট বৃক্ষ, যার মূল রয়েছে বেদে, তার ফল হল প্রত্যেক হিন্দু। হিন্দুকে বিদেশীরা কিভাবে দেখছে? সম্মানের দৃষ্টিতে কেউ তাকায় না। বিদেশীরা জানে, আমরা গেঁয়ো, অশিক্ষিত, আমরা কুসংস্কারচ্ছন্ন, আমরা দরিদ্র। মুখে আমরা যত যাই নিজেদের নিয়ে বড়াই করি না কেন, বিদেশীরা আমাদের এটাই ভাবে। যে যখন পারছে এসে আমাদের পিটিয় যাচ্ছে। এই ধরণের নানা রকম জিনিস হিন্দুদের নিয়ে হচ্ছে, কেন? কারণ কিছু লোক আছে যারা এই রকম। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা গেলেন, সেখানকার লোকেরাও তাঁকে সেই রকম একজন ভাবছে। পরে স্বামীজীর কথা শুনে, তাঁর কাজকর্ম দেখে সবাই অবাক! আরে হিন্দু ধর্মে এই রকম লোক হয়!

অর্জুনও তাই জানতে চাইছেন, আপনি যে জ্ঞাননিষ্ঠা, স্থিতপ্রজ্ঞ, যোগ এই ধরণের কথা বলছেন, এই ধরণের লোককে আমি কি করে জানব? কি করে বুঝব যে ইনি স্থিতপ্রজ্ঞ। আমাদের ভাষায়, একজন মহাপুরুষকে আমরা কি করে জানব। সত্যিই বিরাট সমস্যা। ঠাকুরকেও অনেক প্রশ্ন করতেন, সাধু কে, সাধুকে চিনব কি করে? আমাদের পরিচিত অনেকে আছেন, যাঁরা রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে জড়িত নন, তাঁরা মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেন, আপকে ইঁহা পৌঁছে হুয়ে মহাত্মা হ্যায়? মানে জানতে চাইছনে কোন মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ মিশনে আছেন কিনা। আমরাও মজা করে বলি, কেন আমিই তো আছি, আপনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করুন, কেন আমি মহাত্মা নই।

টাইমস ইণ্ডিয়াতে স্পিকিং ট্রীতে একটা আর্টিকেল বের হয়। মাঝে মাঝে কোন সংশয় হলে ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করে। একবার জিজ্ঞেস করলেন, জীবনমুক্তি জিনিসটা কি? স্থিতপ্রজ্ঞ আর জীবনমুক্তি একই। আমি মজা করে বললাম, আমি জীবনমুক্ত। আর ওরা ওটাই ছেপে দিল। তারপরে অবশ্য আমি বলি, আপনি প্রমাণ করুন আমি জীবনমুক্ত নই। কারণ, জীবনমুক্তের কোন লক্ষণ থাকে না। যে কোন প্রতারক বলে দিতে পারে আমি জীবনমুক্ত। প্রশ্নই নেই যে আমি জীবনমুক্ত, কিন্তু আমি যদি নিজেকে দাবী করে বলি, আমি জীবনমুক্ত, আমি যদি দাবী করি আমি একজন মহাত্মা, আপনি কি করে না বলবেন; জানার কোন পথ নেই।

যোগশাস্ত্রে, কথামৃতে বা যোগবাশিষ্ঠে কিছু কিছু লক্ষণের কথা বলছেন ঠিকই, কিন্তু এগুলোকে যে কেউ নকল করে নিজেকে জীবনমুক্ত বলে চালিয়ে দিতে পারে। আর সত্যিই লোকেরা তাই করে। হাতির দুই রকম দাঁত, মুখের ভিতরে আর মুখের বাইরে। সাধু বাবাজীরা মুখের বাইরের দাঁত দেখিয়ে লোকেদের আকর্ষণ করছে, কিন্তু তার ভিতরের দাঁত অন্য রকমের; ওই দাঁতের খবর কেউ পায় না। যার জন্য, সাধু সন্ন্যাসীদের পক্ষে লোকেদের প্রতারণা করা খুব সহজ হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও অর্জুন যখন প্রশ্ন করছেন, ভগবানও উত্তর দিচ্ছেন। আর জগৎকে কেউ ঠকায় না, মানুষ ঠকায় নিজেকে। তবে ঠাকুর যেমন বলছেন, সাধুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি, তবে সাধুকে বুঝবি। ভগবান এখানে যে কথাগুলো বলছেন, সেই কথা দিয়ে মোটামুটি বোঝা যায়, আধ্যাত্মিক চেতনায় কারা উপরে উঠেছেন। এটা হল একটা broad outline। কিন্তু অপরের বর্ণনা করে আমার

কি হবে। বিল গেটসের কত টাকা আছে, টাটা, বিড়লা, আম্বানির কত টাকা আছে জেনে আমার কি হবে, আমাকে জানতে হবে, আমি কিভাবে উপরে যাব।

আচার্য শঙ্কর বলছেন, সিদ্ধ পুরুষের যা যা লক্ষণ, এটাই সাধারণ মানুষের জন্য সাধনা হয়, খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। শাস্ত্র আমরা কেন পড়ি? আমরা কথামৃত কেন পড়ি, বিশেষ করে মাস্টারমশাই ঠাকুরের যে বর্ণনাগুলি দিচ্ছেন, সেগুলো আমরা কেন পড়ি? কারণ ওখানে আমরা সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ জানতে পারছি। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী আমরা কেন পড়ি? ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের জীবনী আমরা কেন পড়ছি? কারণ সেখান থেকে আমরা সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ জানতে পারছি। সিদ্ধ পুরুষদের যেটা লক্ষণ, সেটাই সাধারণ পুরুষদের জন্য সাধনা। সাধনাতে ওটাই করতে হয়, সিদ্ধ পুরুষরা যেটা করেন। পরে গীতাও বলবেন, *যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ*, বা মহাভারতেও বলছেন, *মহাজনো যে ন গতাঃ স পন্থা*, মহাপুরুষরা যে পথে গেছেন সেটাই ধর্ম।

কিন্তু গীতার এই জায়গায় ধর্মের কথা চলছে না, আমরা এখানে আলোচনা করছি একজন সিদ্ধপুরুষকে আমি কি করে জানব, সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ কি। আমি যাকে ভালবাসি, আমার দেখার খুব ইচ্ছে তিনি কিভাবে কথা বলেন, আমি দেখতে চাই তিনি কিভাবে কাজ করেন, আমি দেখতে চাই তাঁর দৈনন্দিন চর্চা কি রকম। এই যে সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ, এটাই একজন সাধকের জন্য হয়ে যায় সাধনা, আর এটাই সাধারণ লোকেদের জন্য হয়ে যায় মূল্যবোধ। যেমন বলা হয়, সত্য কথা বলবে। সত্য কথা কেন বলতে হয়? সত্য কথা কেন বলবে, এর উপর আমরা বিরাট ভাষণ দিয়ে দিতে পারি, সত্য কথা বললে এই হয়, সেই হয়। কিন্তু আসলে জিনিসটা তা না। আসল হল, যদি আমরা যীশু খ্রীষ্টের দিকে তাকাই, ভগবান বুদ্ধের দিকে তাকাই, ঠাকুরের কথা যদি দেখি, বার বার ঠাকুর বলছেন, সত্য কলির তপস্যা।

ঠাকুর দেখালেন তিনি সব সময় কিভাবে সত্যে প্রতিষ্ঠিত। গান্ধীজী সত্যের অনুশীলন করলেন, ঠাকুর সত্যের অনুশীলন করেননি, ঠাকুর সত্যে প্রতিষ্ঠিত। ঠাকুরের কাছে মিথ্যা বলে কিছু ছিল না; সূর্যে যেমন অন্ধকার হতে পারে না, সেইজন্য সূর্যে দিন আর রাত নেই। সূর্যলোকের যদি কোন বাসিন্দা হন, তিনি জানবেনই না দিন কাকে বলে, রাত বলে কিছু হয় কিনা। তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভবই না, কারণ সূর্যে সব সময় আলো। ঠিক তেমনি ঠাকুরের কাছে মিথ্যা জিনিসটার কোন ধারণাই নেই, কারণ তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত। গান্ধীজী কিন্তু সত্যের যে মূল্যবোধ, সেই বোধে প্রতিষ্ঠিত। সেখান থেকে যখন আমাদের কাছে আসছে, তখন সত্য আমাদের জন্য হয়ে যাচ্ছে একটা মূল্যবোধ। কিন্তু সাধকদের কাছে এটা হয়ে যায় সত্যের জন্য সাধনা। পরিস্থিত যদি এমন হয়ে যায়, আমি একটা কথা বলে দিয়েছি কিন্তু পালন করতে পারব না, তখন সত্য রক্ষার জন্য সামান্য একটু করে নিতে হয়, এই হল value system। তিনটে স্টেজে চলে, প্রথম হলেন সিদ্ধ, দ্বিতীয় হলেন সাধক এবং তৃতীয় স্টেজে আসে সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষ মূল্যবোধের অনুশীলন করে, যাঁরা সাধু মহাত্মা, তাঁরা সাধনা করেন, আর যাঁরা স্থিতপ্রজ্ঞ, যাঁরা সিদ্ধ পুরুষ, তাঁরা ওটাতেই প্রতিষ্ঠিত। একজন ভদ্রলোক ও আর-একজন সাধুর মধ্যে তফাৎ এটাই। ভদ্রলোক এই মূল্যবোধগুলি খুব সচেতন ভাবে অনুশীলন করেন, চেষ্টা করে করে মূল্যবোধগুলিকে পালন করেন। একজন মহাত্মা মূল্যবোধগুলিকে সাধনা রূপে নেন, তিনি মনে করেন এটা দিয়ে আমি ঈশ্বর পর্যন্ত পৌঁছে যাব। আর যিনি সিদ্ধ, তিনি ওটাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ভদ্রলোক, মহাত্মা ও সিদ্ধপুরুষ, এই তিনটে ধাপ, বাকীদের এখানে ধর্তব্যের মধ্যেই আনছেন না। এবার দেখব অর্জুন ঠিক কি কি জানতে চাইছেন –

অর্জুন উবাচ
স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্।।৫৪।।

(অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন –হে কেশব, ব্রহ্মসমাধিতে অবস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির কি লক্ষণ? স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কিভাবে কথা বলেন ও কিরূপে অবস্থা করেন এবং কিভাবেই বা তিনি বিচরণ করেন?)

স্থিতপ্রজ্ঞের কি পরিভাষা? আমরা কি করে বুঝব যে ইনি স্থিতপ্রজ্ঞ? শাস্ত্রে মন ও বুদ্ধির কথা বলছেন, বুদ্ধি যখন সম্পূর্ণ পরিষ্কৃত হয়ে যায়, কখন আর অশুদ্ধ হয় না, তখন এটাকে বলে ধী। ধী থেকে আসে প্রজ্ঞা, যেখান থেকে বিশেষ জ্ঞান আসে। প্রজ্ঞা হল শ্রেষ্ঠ, যে পরিষ্কৃত বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান আহরণ করে ধরে রাখতে পারা যায়, সেই বুদ্ধিকে বলছেন প্রজ্ঞা। স্থিতপ্রজ্ঞা আর স্থিতধী একই, যেখানে বুদ্ধি আর নড়ে না।

বলছেন *স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব*, সমাধি মানে মন নিজের মনের মধ্যে ঢুকে গেছে। মন দুই প্রকার, একটা মন বাইরের দিকে অর্থাৎ বহির্জগতের দিকে যায়, এটা হল সাধারণ মন, আমার আপনার মন। এই মনই যখন মনের ভিতরে ঢুকে যায়; সাপ যেমন কুণ্ডলি পাকিয়ে বসে থাকে, ঠিক সেইভাবে মন যখন নিজেকে গুটিয়ে বসে যায়, এটাকে বলে সমাধি। মন যেটা বহির্মুখী ছিল, সেই মনই অন্তর্মুখী হয়ে গেছে, এটাই সমাধি, এটা permanent, আর নিজের ইচ্ছায়।

দুঃখ পেলে আমরাও অন্তর্মুখী হয়ে যাই। আমরা তখন দিব্যি খেয়ে বলি, ওর কাছ থেকে আমি এত কষ্ট পেয়েছি, আর আমি ওর সাথে কথা বলব না। ও আমাকে অনেক ধোকা দিয়েছে, কোন দিন আর ওর দিকে ফিরেও তাকাব না। এই সংসার ধোঁকার টাটি, কার সঙ্গে মিশব, কার সঙ্গেই বা থাকব, তখন আমরা নিজেকে গুটিয়ে ফেলি। এটাকে সমাধি বলা যাবে না। নিজের ইচ্ছায়, যখন খুশী, যে কোন জায়গায় নিজের মনকে গুটিয়ে নেবে, এটাকে বলে সমাধি।

অর্জুন জানতে চাইছেন, যিনি সমাধিস্থ, নিজের মনকে যখন খুশী নিজের মনের মধ্যে গুটিয়ে নিতে পারেন; এই ধরণের স্থিতধী পুরুষরা যখন লোকের সঙ্গে থাকছেন, তখন তাঁরা কি ধরণের কথাবার্তা বলেন। তিনি কি ভোগের কথা বলেন? মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কথা বলেন? কাকে নিয়ে কথা বলেন? *কিমাসীত*, যখন একা থাকেন, চুপচাপ বসে আছেন, তখন তাঁর ব্যবহার কি রকম? *ব্রজেত কিম্*, সমাজের মধ্যে বা রাস্তাঘাটে যখন চলাফেরা করেন, তখন তাঁর ব্যবহার কি রকম? তিনটে অবস্থার কথা অর্জুন জিজ্ঞেস করছেন। যখন নিজের মধ্যে নিজে ডুবে আছেন, মানে যখন অন্তর্দশা, তখন তিনি কি করেন? দ্বিতীয় অর্দ্ধবাহ্য, যখন তিনি কথাবার্তা বলেন, তখন কি কথা বলেন? তৃতীয় পুরো বাহ্যদশা, এবার তিনি লোকেদের মধ্যে ঘুরছেন, তখন তিনি কি রকম ব্যবহার করেন? স্বামীজী যখন আমেরিকায় ছিলেন, তখন তাঁর ব্যবহার কি রকম ছিল? লোকেদের সাথে যখন কথাবার্তা করতেন তখন কি রকম? যখন কেউ নেই, তিনি একা আছেন, তখন কি রকম? এই হল অর্জুনের প্রশ্ন।

এবার ভগবান পঞ্চান্ন নম্বর শ্লোক থেকে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করছেন, গীতার এই অংশটাকে বলছেন স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ। আচার্য এখানে বলছেন, আচার্যের সংস্কৃত অত্যন্ত সহজ এবং অত্যন্ত মিষ্টি। জ্ঞানীপুরুষদের কথা অত্যন্ত সহজ ও সরল হয়। যেখানে পাণ্ডিত্যের বেশি প্রকাশ, বুঝতে হবে সেখানে জ্ঞানের অভাব আছে। যেখানে ভাষার খেলা দেখা যাবে, বুঝতে হবে লোকটার জ্ঞান নেই। ঈশ্বর সহজ, যিনি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা কথাবার্তা, তাঁর ব্যবহার অত্যন্ত সহজ ও সরল হয়ে যায়। আচার্য শঙ্করের ভাষাও অত্যন্ত সহজ সরল।

আচার্য বলছেন, *সর্বত্র এব হি অধ্যাত্মশাস্ত্রে কৃতার্থলক্ষণানি যানি তানি এব সাধনানি উপদিশ্যন্তে যত্নসাধ্যত্বাৎ*। অধ্যাত্মশাস্ত্রের সব জায়গায় যিনি কৃতার্থ, যাঁর জীবন ধন্য হয়ে গেছে, তাঁর যে লক্ষণ, সেটাই যত্ন দ্বারা, চেষ্টা করে অন্যদের জন্য সাধনা করার উপদেশ দেওয়া হয়। আমরা কি

নিয়ে সাধনা করব? যাঁকে আপনি মহাপুরুষ মনে করেন, তাঁকে দিনে দেখুন, রাতে দেখুন; আর তাঁর মত আচরণ করার চেষ্টা করুন। ভগবান এই লক্ষণগুলি এবার বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ
প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।।৫৫।।

(শ্রীভগবান বললেন –হে পার্থ, বাহ্যলাভে নিরেপেক্ষ ও পরমার্থদর্শনে প্রত্যগাত্মাতেই পরিতৃপ্ত হয়ে যখন যোগী সমস্ত মনোগত বাসনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলে উক্ত হন।)

সংসারে আমরা দৌড়ে চলেছি, সংসারের পিছনে দৌড়াচ্ছি, মানুষের পিছনে দৌড়াচ্ছি, বিষয়ের পিছনে দৌড়াচ্ছি। বাল্মীকি আমাদের জন্য কত সুন্দর একটা ধারণা নিয়ে এলেন, শ্রীরামচন্দ্র সীতার সাথে বনবাসে আছেন, সেখানে মারীচ রাক্ষস সোনার হরিণের রূপ নিয়ে সামনে চলে এলো। শ্রীরামচন্দ্র জানেন সোনার হরিণ হয় না, লক্ষ্মণ জানেন সোনার হরিণ হয় না। সীতার তখন তেরো বছর বনবাস হয়ে গেছে, জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছেন, সোনার হরিণ দেখার পর সীতার মন কিন্তু প্রলুব্ধ হয়ে গেল। শ্রীরামচন্দ্র জানতেন সোনার হরিণ হয় না, কিন্তু তিনি সোনার হরিণের পিছনে দৌড়ালেন। কারণ সীতার মন রাখতে হবে, তাঁকে খুশী রাখতে হবে, তিনি চান না সীতার মনে সোনার হরিণের জন্য কোন আক্ষেপ হোক। আমরাও ঠিক এই রকম সোনার হরিণের পিছনে দৌড়ে যাচ্ছি। কিন্তু ওটা মৃগ মরীচিকা, ওটা রাক্ষস, যে কিনা সোনার হরিণের রূপ ধারণ করে এসে আমাদের মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার সব কিছু অবলুপ্ত করে আমাদের সত্তাকে হরণ করে নেয়।

সোনার হরিণের পিছনে কে দৌড়াচ্ছে? আমার মনে হবে, আমি দৌড়াচ্ছি। আপনি বলবেন, আপনার ইন্দ্রিয় দৌড়াচ্ছে। না, সবটাই দৌড়ায় এই মন, কোথাও কিছু নেই, যা কিছু আছে সব এই মনে। অক্টোপাসকে যদি আমরা মাথায় রাখি, তাহলে বুঝতে পারব আমি কি। অক্টোপাসের ওই ছোট্ট একটা মাথা, আর তার লম্বা লম্বা অনেকগুলো হাত বেরিয়ে আছে, যেগুলোর সাহায্যে সে শিকার করে। আমাদের এই শরীরটাও এই অক্টোপাসের মত, এই মস্তিষ্কটাই আসল, বাকি ইন্দ্রিয়সমূহ, শরীরের অঙ্গসমূহ, সব অক্টোপাসের হাত পা, আর কিছু না। আমরা যখন দেখি, আসলে পুরোটা দেখি, কিন্তু জিনিসটা ঠিক তা নয়। এই ছোট্ট মস্তিষ্কটুকুই সত্যিকারের আসল আমি, এই 'আমি' যেটা চায় বাকিরা সেটাই করে। মনের মধ্যে কামনা-বাসনা গিজগিজ করছে, কামনা-বাসনার পুর্তির জন্য মন ইন্দ্রিয়গুলিকে আদেশ দেয়। ইন্দ্রিয়গুলি তখন আমাদের শরীরের অঙ্গগুলিকে আদেশ করে। যেমন আমাদের চোখ, চোখ শরীরের অঙ্গ, এটা ইন্দ্রিয় না, চোখের আসল যে ইন্দ্রিয় সেটা রয়েছে মস্তিষ্কের কেন্দ্রে। চোখ, কান, নাক, জিহ্বা এগুলোকে বলা হয় করণ। হাত দিয়ে কত কাজ করছি, খারাপ কাজ, ভাল কাজ, যে কাজই হাত দিয়ে করি না কেন, হাত কখনই কোন কাজের জন্য দায়ী না, আর হাতের পিছনে যে ইন্দ্রিয়গুলি ব্রেন সেন্টারে আছে, তারাও দায়ী না। দায়ী আসলে মন, ওখানেই সমস্ত কিছুর ঝড় চলছে, যত রকম অঙ্কট-বঙ্কট আছে, কাম-ক্রোধের যত পোকাগুলো আছে, সব মনের মধ্যে বাসা বেঁধে রেখেছে।

এটা আমরা একটা রূপক রূপে বললাম। মন মানেই নানান রকমের কামনা-বাসনা, এই কামনা-বাসনা কারুরই যায় না। ঠাকুর ভগবান, তিনি অবতার, তিনি জ্ঞানের আলো দিতে এসেছেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে আছেন, সাধনা করছেন, ওনারও একটা সময় কামবেগ এসেছিল। তিনি দেখাচ্ছেন, কিভাবে এই কামভাব মনের মধ্যে থাকে। তারপর তিনি মাটিতে মুখ রগড়ে রগড়ে মা কালীকে বলছেন, মা এরপর যদি আবার আসে আমি গলায় ছুরি দিব। ঠাকুরের মত এভাবে আমার আপনার পক্ষে করা সম্ভব না, কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করাটা খুব জরুরি। সব মনের মধ্য বাসা বেঁধে

আছে। থেকে থেকে মনের মধ্য থেকে একটা করে চাড়া মারে, সেখান থেকে ইন্দ্রিয়গুলি চঞ্চল হয়, সেখান থেকে অঙ্গগুলো কাজে নেমে পড়ে।

অরুণাচলে আলংএ রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম আছে, সেখানে স্থানীয় আদিবাসীদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে। ট্রাইবাল ছেলেরা খুব বুদ্ধিমান ও দক্ষ হয়। ওখানে আরশোলার মত দেখতে এক রকম পোকা হয়, ওর একটা আলাদা স্থানীয় নাম আছে। ছেলেরা ওই পোকা খেতে খুব ভালবাসে। একটু আগুনে সেঁকে নেয়, অনেক সময় কাঁচা কাঁচাই খেয়ে নেয়। দুটো ট্রাইবাল ছেলে একবার সন্ন্যাসীদের ঘরে এসেছে একটা কোন আমন্ত্রণ পত্র নিয়ে। সন্ন্যাসীদের কোয়ার্টারে দেওয়ালে দেখছে একটা বড় সাইজের সেই পোকা। পোকা দেখে বাচ্চাগুলোর হাত নিশপিশ করছে, নিজেকে সামলাতে পারছে না। সন্ন্যাসীর সাথে কথা বলছে, কিন্তু দৃষ্টিটা পোকার দিকে। মহারাজ ওদের মতলবটা বুঝতে পেরেছিলেন, ওনারও হাসি পাচ্ছিল। শেষে একটা বাচ্চা নিজেকে আর সামলাতে পারল না। ছেলেটা বলছেন, 'স্বামীজী, ওটাকে ধরব'। মহারাজ আর কি বলবেন, 'ধরো'। আমাদের মন ইন্দ্রিয় দিয়ে অঙ্গগুলিকে ঠিক এইভাবে কাজ করায়। মন বলছে এটা আমার চাই, অঙ্গ তখন ছটফট করতে থাকে। তখন আমার মনে হবে, আমার হাত আমার নিয়ন্ত্রণে নেই, আমার পা নিয়ন্ত্রণে নেই, শরীরটাও আর নিয়ন্ত্রণে নেই। আমাদের মনে হতে পারে সমাধিবান পুরুষের এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হয় কি করে, এটা পরে বলবেন। এখানে প্রথমে লক্ষণ বলে দিচ্ছেন। নারদীয় ভক্তিসূত্র, পতঞ্জলি যোগসূত্র এনারা প্রথমে সিদ্ধান্তের কথা বলে দেন, সাধনার কথা পরে বলেন। এখানেও সিদ্ধান্তের কথা প্রথমে বলে দিচ্ছেন, সাধনার কথা পরে বলবেন।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্, হে অর্জুন, মনে থেকে সমস্ত কামনাগুলো খসে পড়ে যায়। কি রকম খসে পড়ে যায়? যেমন জোঁকের মুখে লবণ দিলে জোঁকগুলো শরীর থেকে খসে পড়ে। ঠিক সেই রকম মন থেকে কামনা-বাসনাগুলি যদি খসে পড়ে, তখন কি হয়? *আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ*, নিজের ভিতর নিজের আনন্দে মশগুল হয়ে থাকে। একেবারে শিশুর মত হয়ে যায়। চার-পাঁচ মাসের শিশুর এখনও বুদ্ধি বিকশিত হয়নি, খিদে পেলে দুধ খাইয়ে দেওয়া হল, তৃপ্ত হয়ে গেল, তারপর নিজের মত থাকে। এই শিশুই দু-তিন মাসের হয়ে গেলে, ওই অবস্থায় সে নিজের মত হাসতে থাকে, হাত-পা ছুড়ে আনন্দ প্রকাশ করতে থাকে। ঘুম পুরে গেছে, পেট ভরে দুধ খেয়ে নিল, ব্যস, নিজের মত আনন্দ করতে থাকে। কিন্তু এটা হল ঘোর অজ্ঞানের অবস্থা, কারণ এখনও তার বুদ্ধি বিকশিত হয়নি; বুদ্ধি দূরের কথা মস্তিষ্ক এখনও উন্নত হয়নি। যিনি পরমহংস, তিনিও এভাবেই আচরণ করেন। একটা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন শিশু আর একজন শ্রেষ্ঠতম পরমহংস, দুজনের আচরণে কোন তফাৎ থাকে না।

শিশু যখন আরও বড় হয়ে যায়, তখন সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একটা পদার্থ রূপে দেখে। যাদের মন অজ্ঞানে পড়ে আছে, বুদ্ধি যাদের বিকশিত হয়নি, তারা পুরো জিনিসটাকে একটা পদার্থ রূপে দেখে, যেমন অন্ধকারে পুরো জিনিসটা এক হয়ে যায়। অজ্ঞানে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ওই এক রূপে দেখায়। বুদ্ধি যখন একটু একটু করে বিকশিত হতে থাকে, তখন বহু দেখতে শুরু করে। আমরা দেখি মা আলাদা, বাবা আলাদা, ভাই আলাদা, বোন আলাদা, এখান থেকে মনে অশান্তি শুরু হয়। সেখান থেকে যখন চৈতন্য হয়ে যায়, তখন আবার সব এক দেখে। তফাৎ হল, আগে যেটা পদার্থ রূপে এক দেখছিল, এখন চৈতন্য রূপে এক দেখছে। সাধনা আমাদের অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে নিয়ে যায়। অজ্ঞানে সমস্ত কিছুকে একটা পদার্থ দেখছে। বুদ্ধির একটু বিকাশ হলে, তখন ওর মধ্যে একটু তফাৎ দেখতে শুরু করে। কিন্তু সেখান থেকে আবার সেই একত্বে নিয়ে চলে যায়, তখন সব কিছুকে চৈতন্য রূপে দেখে। ওই চৈতন্যে মানুষ যখন পৌঁছে যায়, তখন সে নিজেতেই নিজে তুষ্ট থাকে, আনন্দে থাকে।

কথামৃতে বর্ণনা আছে, মাস্টারমশাই ঠাকুরকে দেখতে এসেছেন। ঠাকুর সেই সময় ভাবাবস্থায় আছেন। মাস্টারমশাই দেখছেন, ঠাকুর নিজে নিজেই হাসছেন। শিশুরাও ঠিক এই রকম নিজে থেকে হাসতে থাকে। কিন্তু শিশু অন্য অবস্থায় থাকে, কিন্তু পরমহংস, যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ তাঁর তুষ্টি নিজের মত থাকে। এই অবস্থাকে বলে *আত্মারাম*, এটাকেই বলে *আত্মক্রিড়ঃ*, এটাকেই বলে *আত্মরতি*। নারদীয় ভক্তিসূত্রে এই শব্দগুলির বর্ণনা আছে। আত্মারাম, আত্মক্রিড়া, আত্মরতি আলাদা আলাদা শব্দের ব্যবহার করা হয় ঠিকই, কিন্তু সব শব্দের মূল ভাব একই, আত্মার অর্থাৎ নিজের মনকে নিয়েই আনন্দে ডুবে থাকে। কিন্তু মনের মূল সেই চৈতন্যের সাথে একাত্ম হয়ে আছে।

আচার্য শঙ্কর এখানে খুব সুন্দর কথা বলছেন, মনের কামনা-বাসনাগুলি খসে পড়ে গেছে, কিন্তু শরীরতো আছে। অবতারদের কথা বাদ দিলে, সবারই কিছু কামনা থাকার জন্যই তো এই শরীরটা হয়েছে। আমারও অবশ্যই কিছু কামনা ছিল, তা নাহলে কেন আমাকে শরীর ধারণ করতে হবে। কোন সন্ন্যাসীকে যদি কেউ এসে বলে, আপনার মধ্যে এই গোলমাল আছে। সন্ন্যাসীও তার উত্তরে বলেন, 'আরে ভাই, যদি গোলমাল না থাকত, তাহলে তো আমার জন্মই হোত না। গোলমাল আছে বলেই না জন্ম নিতে হয়েছে'। এতটুকু আমাদের সবাইকে মেনে নিতে হবে। আমরা যে কজন এখানে আছি, আমাদের সবারই কিছু না কিছু দুর্বলতা আছে, দুর্বলতা যদি না থাকত, তাহলে কেন আমরা জন্ম নিতাম। এবার যদি আমি জেনে যাই আমার কোন দুর্বলতা আমাকে জন্ম দিয়েছে, ওই দুর্বলতা কিন্তু পরেও আমাকে জন্ম দেওয়াবে। আপনি কি আরও এই জন্ম-মৃত্যু চক্রে ঘুরতে চান? যদি চান, তাহলে ঠিক আছে। আর যদি না চান, তাহলে আপনার ভিতরে যে শুভ গুণগুলি আছে, শক্তি দিয়ে এই শুভ গুণ দিয়ে ওই অশুভ গুণকে কেটে দিন। যদি না কাটানো হয়, তাহলে ওই দুর্বলতা গুলি বাড়বে, আপনাকে বারবার এই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরপাক খাওয়াতে থাকবে।

যেমন যার ভিতর ক্রোধ আছে, তার ভিতর ভালবাসাও আছে, শক্তিও আছে; ওই ভালবাসা দিয়ে ধীরে ধীরে ক্রোধ রিপুকে জয় করুন। যদি না করেন, ওই ক্রোধই আপনাকে আবার একটা শরীর ধারণ করাবে এবং ঘোরাতে থাকবে। যে কোন জিনিসই হোক না কেন, যেমন কেউ হয়ত সঙ্গীত খুব ভালবাসে, সঙ্গীতকে ভালবাসা, সঙ্গীত শুনতে ভাল লাগা, এতে দোষের কিছু নেই; কিন্তু ওর প্রতি যদি আসক্তি থাকে, তার মানেই ওটার প্রতি বিশেষ দুর্বলতা আছে। এটাই তাকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘোরাতে থাকবে। কখন কোকিল হয়ে সব সময় কুহু কুহু করে গান করে যাবে, কখন টুনটুনি বা দোয়েল হয়ে শিস্ দিয়ে গান করবে, নয়তো ঝিঁঝি পোকা হয়ে সারা রাত একটা ছন্দে ঝিঁ ঝিঁ করতে থাকবে, আবার কখন মানুষ রূপে বড় শিল্পী হয়ে জন্মাবে আর জলসায় জলসায় গান করে বেড়াবে। জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে বেরোতে হলে প্রথমে আসক্তিটা ত্যাগ করতে হবে।

আচার্য বলছেন, আসক্তিটা না হয় ত্যাগ করল, আর এই জন্মেই ত্যাগ করল; কিন্তু শরীরটা তো থেকে গেছে, এই শরীরের পিছনে যে কামনাগুলো ছিল, যে কামনা-বাসনার জন্য এই শরীর ধারণ করতে হয়েছিল, সেগুলো তো থেকে গেল। তার মানে, একটা জিনিস সর্বদা আমাকে সামনের দিকে ঠেলে যাচ্ছে, আর অন্য দিকে সামনে আর কোথাও যাওয়ার নেই, তখন কি হবে? তাহলে তো সে পাগল হয়ে যাবে। কারণ তাঁর দেহটা আছে, কিন্তু দেহের কোন উদ্দেশ্য নেই। কোন লোককে যদি বাজারে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়, তখন পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সে কিছু কিনতে এসেছে। কিন্তু যার কেনার কিছু নেই, কিন্তু এমনিতেই বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কোন বন্ধু দেখলে তাকে জিজ্ঞেস করবে, 'কি! কোন কাজ নেই, এমনি হাওয়া খেতে ঘুরতে বেরিয়ে গেছ'? বড় বড় শপিং মলে অনেকেই এমনি ঘুরে বেড়ায়, কিছুই কিনবে না। বুঝতে হবে মাথায় গোলমাল আছে। মাথায় গোলমাল না থাকলে, কোন কিছু কেনার নেই, মিছি মিছি কেন সে ঘুরে বেড়াবে! যার কাজকর্ম নেই, সময় কাটতে চাইছে না, তারা ওই জল কাদায় প্যাচপ্যাচ করা, আঁষটে গন্ধ ছড়ানো মাছের বাজার, সবজীর বাজারে ওই ভীড়ের মধ্যে কেন ঘুরে বেড়াবে। বুঝতে হবে মাথায় নির্ঘাৎ কোন গোলমাল

আছে। কিন্তু যার দরকার আছে, সে যত অসুবিধাই হোক সেখানে যাবে। মর্গে, লাশকাটা ঘরে কে যেতে চাইবে? যার ওখানে কাজ থাকে, ডিউটি থাকে তারাই যাবে। বিনা কাজে যদি কেউ মর্গে যেতে চায়, তাহলে বুঝতে হবে তার মাথায় গণ্ডগোল আছে। ঠিক সেই রকম এই সংসারে যার কোন উদ্দেশ্য নেই, কোন অভিপ্রায় নেই, সে কেন সংসারে থাকতে যাবে, কি নিয়ে সংসারে থাকবে! আচার্য বলছেন, তাহলে বুঝতে হবে সে উন্মত্ত প্রমত্ত, ওর মাথাটা গেছে।

আচার্য তখন বলছেন, কিন্তু তা হয় না। স্থিতপ্রজ্ঞরা এই জগতে এই শরীরে থাকেন ঠিকই, কিন্তু *আত্মন্যেবা আত্মনা তুষ্টঃ*, সে নিজের আত্মাকে নিয়ে আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকে। আত্মার আনন্দে, আত্মার চৈতন্যে নিজেকে তিনি ডুবিয়ে রাখেন। ঘরবাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন, এবার তাঁর সময় কাটতে চাইবে না। উত্তরকাশীতে সন্ন্যাসীদের খাওয়া-পড়া জুটে যায়, নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই পেয়ে যাবেন, শুধু সময় কাটানোর উপায় পাবেন না। উত্তরকাশীতে একটা আশ্রমে শাস্ত্র পাঠ হত। শাস্ত্র পাঠ শোনাটা কারুর জন্যই বাধ্যতামূলক নয়, সব সাধুই স্বাধীন। ওদিকের লোকেরা হিন্দী ভাষী, ওনারা কথাগুলোকে ছন্দে বেঁধে একটু ছড়ার মত করে বলে। একজন পাঞ্জাবী সাধু সেখানে শাস্ত্র পাঠ শুনছিলেন। একজন সন্ন্যাসী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি নিয়মিত এখান শাস্ত্র পাঠ শুনতে আসেন'? উনি বললেন যে নিয়মিত এখানে আসেন। তার সাথে উনি মানছেন যে আমি সব কিছু বুঝতে পারি না। কিন্তু তারপরেই হিন্দীতে যে কথাটা বললেন, খুব সুন্দর কথা, 'পঠন পাঠন করনে সে ভটকন্ সে বাচ যাতে হ্যায়', নিয়মিত শাস্ত্র শ্রবণ, শাস্ত্র পাঠ, শাস্ত্র আবৃত্তি করলে মনের চঞ্চলতা থেকে বেঁচে যায়।

সাধুরও মন চঞ্চল হয়ে দৌড়াতে থাকে, কারণ ফাঁকা সময়, কোন কাজ করতে হচ্ছে না, অন্নছত্রে খাবার পেয়ে যাচ্ছে, এখান ওখান থেকে জামাকাপড় কম্বল পেয়ে যাচ্ছে; ভারতবর্ষ এমন একটা জায়গা, যেখানে মহামুর্খ সাধুও দু-চারজন ভক্ত পেয়ে যাবে। এভাবে তার খাওয়া-পরাটা চলে যায়। কিন্তু এরপর সারাটা দিন সে করবেটা কি? সেইজন্য পাঞ্জাবী সাধু বলছেন, 'পঠন পাঠন করনে সে ভটকন্ সে বাচ যাতে হ্যায়'। বয়স্ক মানুষরা এত অশান্তিতে কেন ভোগেন? কারণ তার কোন অবলম্বন নেই, যেটা দিয়ে মনটাকে ধরে রাখবেন। বাড়িতে, আশেপাশের পরিচিতদের একবার বলে দেখুন, চলুন গীতার আলোচনা হচ্ছে শুনি। শুনবে তো নাই, উল্টে বলবে, আরে ঠাকুর বলে দিয়েছেন দশবার গীতা বললে যা হয়, ত্যাগী, এই তো হয়ে গেল, আর কি গীতাতে জানার আছে! এতটুকুতেই যদি গীতা বুঝে নেওয়া যেত তাহলে তো হয়েই যেত, কিন্তু কোথাও কি কিছু ত্যাগের লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? কথামৃতও একটা কথাতেই বুঝে ফেলা যায়, ঈশ্বরই সত্য বাকি সব অসৎ। তাও লোকেরা এত কথামৃত পড়ছে কেন? পড়ছে যাতে মন ভটকনে না চলে যায়। শাস্ত্র পঠন পাঠন করলে ভটকন্ থেকে বেঁচে থাকে। সাধুদের এই ভটকনের জন্য মাথা খারাপ হয়ে যায়। আত্মারাম যদি না হয়, ঈশ্বর চিন্তনে মন যদি ডুবে না থাকে সাধুদের মাথার গোলমাল হবেই হবে। সাধুদেরই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে ভাবুন সংসারে যারা আছে, যারা বয়স্ক, তাদের কি দুরবস্থা!

চিকিৎসা বিজ্ঞানে এখন একটা নূতন শাখা এসেছে, যেমন বাচ্চাদের রোগের জন্য paediatric, ঠিক সেই রকম এখন এসেছে geriatric, যারা বৃদ্ধ মানুষ শুধু তাঁদের জন্য। তাঁদের জন্যও নাকি কাউনসেলিং দরকার। কিসের কাউনসেলিং, সারা জীবন আপনি কাটিয়ে এলেন, এখন বৃদ্ধ বয়সে এসে আপনার দরকার পড়ল কাউনসেলিংএর? কারণ ধর্মের কাজ বৃদ্ধ বয়সে হয় না, ধর্ম জীবন অনেক অল্প বয়স থেকে শুরু করতে হয়। গীতা শোনা, কথামৃত শোনা অনেক কম বয়স থেকে শুরু করতে হয়। বয়স বৃদ্ধির সাথে পঠন পাঠনের মাত্রাটাও বাড়িয়ে দিতে হয়। আচার্য এটাই বলছেন, সংসারে যা কিছু আছে, যা কিছু অনাত্ম বস্তু আছে, সেখান থেকে সন্ন্যাসীর অলং বুদ্ধি হয়ে যায়, সেখান থেকে সন্ন্যাসী সরে আসে। ফলে এই তিনটে এষণা; পুত্রৈষণা, বিত্তৈষেণা আর লোকৈষণা, ত্যাগ হয়ে যায়। পুত্রৈষণা, আমার সন্তান হোক, বৃদ্ধাবস্থায় যে আমার অবলম্বন হবে;

বিত্তৈষণা, আমার টাকা হোক, যাতে আমার সংসার নির্বাহ করতে পারি আর লোকৈষণা, মৃত্যুর পর আমি যেন উত্তম লোকে যেতে পারি। পুত্র আর বিত্ত এই সংসারের জন্য, লোকৈষণা মৃত্যুর পরে। সন্ন্যাসী ইহলোক আর পরলোক কোনটাই চায় না, সন্ন্যাসী এই দুটো লোকের পারে। তাহলে সন্ন্যাসী কি নিয়ে থাকবে? আত্মারাম হয়ে, নিজের মনের মধ্যেই তুষ্টি, ঈশ্বর চিন্তন নিয়ে, আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, যার কোন কামনা-বাসনা নেই, যার কোন বিকার নেই, যে সব কিছুর পারে, আমি সেই অনন্ত, আমি সেই ঈশ্বরের সঙ্গে এক; এই ভাবকে নিয়েই সে দৃঢ় হয়ে যায়, এই ভাবকে নিয়েই সে বসে থাকে।

অর্জুন জানতে চাইলেন, তিনি যখন একা থাকেন তখন কি করেন? তিনি চুপচাপ নিজের মধ্যে ডুবে থাকেন, মনে কোন কামনা-বাসনা নেই, মন থেকে তাঁর সব কামনা-বাসনা খসে পড়ে গেছে। সমস্ত কামনাগুলিকে তিনটে শ্রেনীতে ফেলে দিলেন, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা আর লোকৈষণা। সন্তান লাভের ইচ্ছা, টাকা-পয়সার ইচ্ছা, ভাল লোকে যাওয়া, এই ইচ্ছাগুলো যদি না থাকে আমরা তো পাগল হয়ে যাব। বলছেন তা না, স্থিতপ্রজ্ঞ ঈশ্বর চিন্তন নিয়ে ঈশ্বরে ডুবে থাকেন; আত্মাতে আত্মার আনন্দেই বুঁদ হয়ে থাকেন। তাঁর আর বাইরে কোন অবলম্বন দরকার পড়ে না। পরের মন্ত্রে দেখাচ্ছেন, আমরা আরও কিভাবে স্পষ্ট বুঝতে পারব, ইনি স্থিতপ্রজ্ঞ কিনা –

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।।৫৬।।

(দুঃখে উদ্বেগহীন, সুখে নিঃস্পৃহ এবং আসক্তিশূন্য, ভয়মুক্ত ও ক্রোধরিহিত মুনিই স্থিতপ্রজ্ঞ বলে উক্ত হন।)

আগের শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের কথা বললেন, এই শ্লোকে বলছেন স্থিতধীর কথা। দুঃখে যাঁর মন উদ্বিগ্ন হয় না, সুখে স্পৃহা শূন্য আর তার সাথে তিনটে জিনিস যাঁর চলে যায়, রাগ, ভয় ও ক্রোধ; এই ধরণের মানুষকে বলা হয় স্থিতধী। বলছেন দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, দুঃখ তিন প্রকার– আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। কিছু দুঃখ হয় যেটা ভিতর থেকে আসে, যেমন জ্বর, কারু যদি করোনা হয়, এটা তার ভিতরের দুঃখ। কারণ জ্বর হলে ভিতর থেকে তাপ সৃষ্টি করে। আধিভৌতিক মানে –কিছু দুঃখ বাইরের প্রাণীদের কাছ থেকে সমস্যা সৃষ্টি হয়। যেমন মানুষই মানুষের জন্য কিছু সমস্যা তৈরী করে; তাছাড়া সাপ, বিছে, বন্যপশুও সমস্যা সৃষ্টি করে। আর কিছু সমস্যা দেবতারা দেন, এটাকে বলছেন আধিদৈবিক। যেমন বন্যা, খরা, ভূমিকম্প হল। কিছু সমস্যা আছে যা দেবতাদের কাছ থেকে আসে; কিছু সমস্যা আসে আশপাশের মানুষ ও জীবজন্তু থেকে, এটাকে বলছেন আধিভৌতিক। আর কিছু আসছে ভিতর থেকে। করোনা প্রথমে আধিভৌতিক হয়ে আসছে, কারণ বাইরে থেকে একটা ভাইরাস থেকে আসছে। মানুষের ভিতরে এসে গেলে যার প্রতিরোধ ক্ষমতা ভাল সে করোনাকে absorb করে নিল, তার কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। যদি সেই ক্ষমতা না থাকে তখন তার জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি হয়ে যাবে, তখন করোনা আধ্যাত্মিক হয়ে গেল।

বলছেন, সাধু সন্ন্যাসীদেরও এই তিন প্রকার দুঃখ আসে। আম্ফান চলে যাওয়ার পর মঠের সন্ন্যাসীরাও চারদিন বিদ্যুৎ বিহীন ছিলেন; জল নেই, আলো নেই; আম্ফান একটা দুর্যোগ, এটা আধিদৈবিক। সন্ন্যাসীদেরও গালাগাল শুনতে হয়, তাঁদেরও সমালোচনা হয়, ঝগড়াঝাটি হয়। এই তিন প্রকার দুঃখ সাধুদেরও আসে, আবার যাঁরা স্থিতপ্রজ্ঞ তাঁদেরও আসে, কিন্তু এই দুঃখের জন্য তাঁরা উদ্বিগ্ন হন না। ঠিক তেমনি যখন সুখ আসে, ভাল কিছু হয়ে গেল, তাঁরা মনে করেন, এসেছে আসুক। এতে আহামরি কিছু হয়ে যায় না।

দুঃখকে বলে অনিষ্টপ্রাপ্তি, সুখকে বলে ইষ্টপ্রাপ্তি। মনের মত কিছু হয়ে গেলে সেটা হয়ে যাবে সুখপ্রাপ্তি, মনের বিপরীত কিছু হয়ে গেলে সেটাকে বলছে দুঃখ। ছোটবেলা একবার যদি জ্বর হয়ে

যেত, সবাই খুব খুশী হয়ে যেতাম, আজ আর স্কুল যেতে হবে না। বড় হওয়ার পর জ্বর হলে বিরক্ত লাগত। আর এখন হলে তো আতঙ্ক লেগে যাবে, কি জানি করোনা হয়নি তো। বলার আগেই হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ আর একজন সাধুপুরুষ, এই দুজনের মাঝখানে তফাৎ কোথায় হয়? কারণ দুঃখ সবারই আসে, আর সুখও সবারই আসে। সাধারণ মানুষ এটা বোঝে না যে, আমার যে দুঃখ এসেছে আমার কর্মের জন্য এসেছে, কিংবা পরিস্থিতি আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। গ্রামে একজন একটা বাড়ি বানালো, ঝড়ে সেই বাড়ি উড়ে গেল। বাড়িটা রক্ষা করার জন্য সব রকম চেষ্টাই করেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাড়ি রক্ষা করতে পারল না। এখন তার টাকা-পয়সাও সে-রকম নেই যে আরেকটা বাড়ি বানাবে, কিন্তু যে কারণেই হোক একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। জ্ঞানী পুরুষ বলবেন, ভাই বাড়ির যা হবার হয়ে গেছে কি করা যাবে, এখন চলো কিছু একটা ব্যবস্থা করা যাক। অজ্ঞানী পুরুষ কান্নাকাটি শুরু করে দেবে। আমার মত অভাগা আর কেউ নেই, হে ঠাকুর আমারই কেন এই দুরবস্থা হল। তারপর এখানে মাথা ঠুকছে, ওখানে মাথা ঠুকছে।

একজন ভাষ্যকার বলছেন, জ্ঞানীরা একটা শাস্তি পান, আর অজ্ঞানীরা ডবল শাস্তি পায়। কিভাবে ডবল শাস্তি পায়? একেই তো তার সমস্যা হয়ে গেছে, সেটার জন্য দুঃখ আছে, তার সাথে এবার দৌড় করতে শুরু করে দিল। এই মন্দিরে যাচ্ছে, ওই বাবাজীর কাছে যাচ্ছে, এর-ওর কাছে থেকে মাদুলি আদি জোগাড় করতে যাচ্ছে, এটাকে বলছেন ডবল শাস্তি। দুঃখ এসেছে, ধৈর্য ধারণ করে সহ্য কর, কিছু দিন পর চলে যাবে। কারণ এই জগতে কোন কিছুই স্থায়ী নয়, এই দুঃখও একটা সময়ের পর চলে যাবে, ধৈর্য ধরো। যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ তিনি ধৈর্য ধরে বসে থাকেন। যারা অজ্ঞানী, তারা ছটফট করে, ফলে তাদের কষ্টটাও দ্বিগুণ হয়ে যায়।

যখন সুখ আসে তখনও তাই। জ্ঞানী জানেন, আমার কর্মে ছিল তাই এই সুখ এসেছে। কিন্তু অজ্ঞানীর আর আনন্দের সীমা থাকে না, আমার মত ভাগ্যবান, আমার মত সুখী কেউ নেই। একটা পঞ্চায়েত ইলেকশান জিতে আসার পর এক বিশাল বিজয় মিছিল বার করবে। ইলেকশানে জেতাতে তোমার কি আছে! মানুষ ভোট দিয়েছে, ঠাকুরের কৃপা আছে, তোমার কর্ম আছে, তুমি জিতেছ। কিন্তু এবার বিজয় মিছিল বার করতে হবে। যারা হেরে গেছে, তারা মনে রাখে, এবার না হয় জিতে গেলে, সামনের বার যখন তুমি হারবে, তখন তোমাকে আমি শিক্ষা দেব।

১৯৮৮-৮৯ সালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এক এক করে যখন কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলির পতন হতে লাগল, তখন লোকেরা বাড়ি থেকে কম্যুনিস্ট ক্যাডারসদের টেনে হিঁচড়ে বার করে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল। কারণ যখন ক্ষমতায় ছিল তখন এত লাফিয়েছে, নিজের আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে সাধারণ মানুষদের তারা এত কষ্ট দিয়েছে যে, তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ার পর পাবলিক রাস্তায় টেনে এনে পিটিয়ে মেরেছে। এমন বাজে ভাবে মেরেছে, এটাকে কেউ আমরা অনুমোদন করতে পারি না, কিন্তু এই রকমই সব জায়গায় হয়ে থাকে।

যারা ভদ্রলোক, বিশেষ করে যাদের আমরা বনেদী বলি, যারা সত্যিকারের শিক্ষিত, সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারের লোক, তারা কখন তাদের টাকা, ঐশ্বর্যকে দেখিয়ে বেড়ায় না। একটা বিশেষ কোন ক্ষেত্রে, মেয়ের বিয়ে দিল, একটা ভাল অনুষ্ঠান করে দিল, লোকেরা বুঝতে পারে এর ঐশ্বর্য আছে। কিন্তু যার কাঁচা টাকা, সে সবাইকে দেখিয়ে বেড়াবে। তারপর যখন অবস্থা পড়ে গেল, তাকে দেখে তখন সবাই হাসাহাসি করে। স্থিতপ্রজ্ঞ জানেন, দুঃখ যেটা এসেছে, এটা আমার জন্য আসেনি; সুখ যেটা এসেছে, এটাও আমার জন্য আসেনি। সেইজন্য তিনি উভয় ক্ষেত্রেই শান্ত থাকেন। আমাদের সমস্যা হল, আমাদের মন একমাত্র বর্তমানকে নিতে পারে, মন অতীতকেও নিতে পারে না, ভবিষ্যতকেও নিতে পারে না।

আগেকার দিনে সিনেমায় যে প্রজেক্টর থাকত, তাতে রিল ঘুরছে, আলোর সামনে যে ফ্রেম আসছে, সেই ফ্রেমটাই পর্দায় দেখাবে। যে ফ্রেম বেরিয়ে গেল, সেটারও দাম নেই, যে ফ্রেম আসছে, সেটারও দাম নেই। মন হল সেই প্রজেক্টরের মত, যেখানে রীলগুলো চলছে। আমাদের কাছে বর্তমানটাই সত্য, আর বর্তমানকে অনন্ত বলে বোধ হয়। দুঃখ এলে আমাদের মনে হয়, কোন দিন আমার এই দুঃখ যাবে না। তেমনি সুখ যখন আসে, তখন মনে হয়, কোন দিন আমার এই সুখ যাবে না। কিন্তু পিছনে একটা শঙ্কা লেগে থাকে, তাই মন্দিরে মন্দিরে দৌড়ায়, হে ঠাকুর তোমার কৃপায় এই সুখ এসেছে, এই সুখ যেন আমার জীবন থেকে চলে না যায়। তাদের এই বোধ নেই যে, এই জগতে চিরস্থায়ী বলতে কিছু নেই। জ্ঞানী এই সত্য সম্বন্ধে সজাগ, সেইজন্য তিনি ধৈর্য ধরে সুখে ও দুঃখে সমানভাবে অবিচল থাকেন।

ফলে কি হয়, *বীতরাগভয়ক্রোধঃ*, এই তিনটে ইমোশান রাগ, ভয় আর ক্রোধ আমাদের সবাইকে নাচিয়ে বেড়ায়। রাগ মানে এখানে অনুরাগ, ভালবাসা, আসক্তি, যার জন্য সব কিছুকে ধরে রাখতে চায়। সব সময় আশঙ্কা, আমার ভালবাসার জন যেন হাতছাড়া না হয়ে যায়। আর সত্যিই যখন হাতছাড়া হয়ে যায় তখন ক্রোধের উৎপত্তি হয়। গীতাতেই পরে শ্লোক আসবে, যেখানে বলবেন মানুষের কেন ক্রোধ হয়। আসক্তি আছে বলে ভয়, আর চলে গেল, তখন হবে ক্রোধ। ওর জন্য আমার এটা হয়েছে, আমি ওকে দেখে নেব, এর বদলা আমি নিয়ে ছাড়ব। নিজে যদি না পারে, তখন বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে নিয়ে বদলা নেওয়ার চেষ্টা করে যাবে। যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, তিনি রাগ, ভয়, ক্রোধ এই তিনটের পারে চলে যান, এগুলোতে তাঁর কিছুই হয় না। তখন বলা হয় স্থিতধী।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভাবধারায় এবং পরম্পরাতে সবাইকে গীতা মুখস্থ করতে বলা হয়। শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ চাইতেন, যাঁরা ব্রহ্মচারী হয়ে সঙ্ঘে এসেছেন, তাঁরা যেন পুরো গীতা মুখস্থ করে নেন। ব্রহ্মচারী ট্রেনিং সেন্টারে ট্রেনিং শেষ করা পর্যন্ত যদি কোন ব্রহ্মচারী পুরো গীতা মুখস্থ করে নিতেন, উনি ওনার তরফ থেকে সেই ব্রহ্মচারীকে স্বামীজীর সমগ্র রচনাবলীর একটা পুরো সেট উপহার স্বরূপ দিতেন। তখনকার দিনে কোন সাধু ব্রহ্মচারী যদি স্বামীজীর কমপ্লিট ওয়ার্ক্স পেয়ে যায়, তাও আবার স্বামী রঙ্গনাথানন্দের হাত থেকে, তাঁর কাছে একটা বিরাট ব্যাপার। সাধু, সন্ন্যাসীদের কাছে তখন এত টাকা-পয়সা থাকত না, এখনও নেই, কিন্তু তখনকার দিনে একেবারেই ছিল না। অনুষ্ঠান করে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর হাত থেকে স্বামীজীর সমগ্র রচনাবলী পাওয়াটা যে কোন ব্রহ্মচারীর কাছে একটা বিরাট ব্যাপার ছিল। এটা গেল সাধু ব্রহ্মচারীদের জন্য।

কিন্তু যাঁরা গীতা শুনতে আগ্রহী, গীতা কি বলছেন জানতে আগ্রহী, তাঁদের জন্যও বলা হয় গীতা পুরোটাই মুখস্ত করে নিতে। তবে পুরো গীতা যদি না মুখস্থ করা যায়, তবে খুব কম করে স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণের আঠারোটা শ্লোক অবশ্যই সবার মুখস্থ করে রাখা দরকার। এরপর হল পঞ্চোদশ অধ্যায়, ছোট্ট এই অধ্যায়টাই একটা সম্পূর্ণ শাস্ত্র। হিন্দুদের আধ্যাত্মিক পরম্পরার যে সারতত্ত্ব, তার পুরোটাই এর মধ্যে দেওয়া আছে। পঞ্চোদশ অধ্যায়ের পর দ্বাদশ অধ্যায়ও খুব মূল্যবান অধ্যায়। পুরো গীতা মুখস্ত করা সম্ভব না হলে, এই তিনটেকে –দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণের আঠারোটি শ্লোক, পঞ্চোদশ অধ্যায় আর দ্বাদশ অধ্যায় সবাইকে মুখস্ত করতে বলা হয়।

আমরা আলোচনা করলাম ভগবান বলছেন দুঃখে উদ্বিগ্ন হয়ো না। দুঃখ সবারই জীবনে আসে, সাধু মহাত্মাদেরও আসে, ঠাকুরেরও এসেছে, স্বামীজীরও এসেছে, দুঃখের মত সুখও সবারই জীবনে আসে। একটা প্রচলিত কথা আছে, This too shall pass, কিন্তু আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলি না। অপরকে উপদেশ দেওয়া সহজ, লেকচার বাজীও সোজা, কিন্তু যার হয় সে বোঝে। আমরা যদি বিচার করি, জীবনে সবচেয়ে বেশী কষ্ট আমাকে কে দিয়েছে? দেখা যাবে যারা আমার ভাল চেয়েছেন, তারাই সব থেকে বেশী আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। বাবা-মা তাঁদের আশা-আকাঙ্খা

মেটাতে আমার ঘাড়ে ধরে আমাকে দিয়ে সব করিয়ে গেছেন। তারপর স্কুলের শিক্ষকদের কড়া শাসন, এরপর সমাজ তার শৃঙ্খলার বেড়াজালে আটকে রেখে আমাকে ভাল করতে চেয়েছে, আর ইদানিং বুদ্ধিজীবিরা, যুক্তিবাদীরা আমার ভালর জন্য কত কথা বলে যাচ্ছে।

যুক্তিবাদী বন্ধুরা বলছে, সূর্যগ্রহণে 'এই করতে হবে, সেই করতে হবে' বলা সব কুসংস্কার। কিসের কুসংস্কার? তোমার বিজ্ঞান বলবে racial memori; তোমরা বলবে collective unconscious; আর আমরা দুটোকে মিলিয়ে বলি racial consciousness, একজন মানুষের চিন্তা-ভাবনা আরেকজন মানুষকে ছোঁবে, এটা সবাই জানে। সবাই যেখানে খুশী আছে, সেখানে আপনিও যদি যান, আপনি মনমরা হলেও আপনার খুশী খুশী লাগবে। একজনের মন আরেকজনকে প্রভাবিত করে এটা জানা কথা। এর সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই, বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই, এটা বাস্তব। একটা জাতি সাত হাজার আট হাজার বছর ধরে জানে, এই নক্ষত্র, এই গ্রহ আর এই ক্ষণ, এটা অশুভ। আমরা এটা মানি, মানি বলেই আমরা হিন্দু। যারা মানবে না, তারা অন্য কিছু হয়ে যাবে। আপনি একদিকে বলবেন আমি হিন্দু, অন্য দিকে মানবেন না, সেটা হয় না। একজন খ্রীশ্চান, সে বলছে আমি খ্রীষ্ট ধর্মের এগুলো মানি, কিন্তু এই জিনিসগুলিকে মানি না। এভাবে হয় না, তাহলে আপনি আলাদা একটা ধর্ম তৈরী করুন। যেমন মার্টিন লুথার কিং, তিনি বলছেন, আমি খ্রীশ্চান কিন্তু আমি চার্চকে মানব না। তিনি অন্য ধর্ম দাঁড় করিয়ে দিলেন, প্রোটেস্টান্ট। সেইজন্য ধর্মের জিনিসগুলোকে নিয়ে চেঁচামেচি করার কোন অর্থ হয় না।

আর এটা হচ্ছে, collective consciousness। একটা জাতি এগুলোকে যে কোন কারণেই হোক, হাজার হাজার বছর ধরে মেনে আসছে। তার মধ্যে ভুল থাকতে পারে, সেটা কোন মহাপুরুষ এসে ঠিক করে দেবেন। আমাদের মধ্যে সেই ক্ষমতা নেই যে, ধর্মের চেতনাকে আমরা চাইলেই অন্য খাতে নিয়ে যেতে পারব, এখানে সামাজিক চেতনার কথা বলা হচ্ছে না, এটা ধার্মিক চেতনা। আগে আপনি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হন, আগে সেই অবস্থায় যান, তারপর আপনি নিজের ক্ষমতায় পাল্টে দেবেন, স্বামীজী যেমন অনেক কিছু পাল্টে দিয়ে গেছেন। এখানে কোন উপদেশ দিচ্ছেন না, গীতা কোন উপদেশ দিচ্ছেন না, গীতা একবারও বলছেন না যে, তুমি এটা কর, সেটা কর।

হিন্দু ধর্ম অন্য ধর্ম থেকে আলাদা। এই আলাদার পিছনে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, হিন্দু ধর্ম কাউকে উপদেশ দেয় না। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, তোমাকে এই রকম করতে হবে, যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন, তোমাকে এটাই করতে হবে; হিন্দুরা কখন উপদেশ দিয়ে কাউকে বলে না যে, তোমাকে এটাই করতে হবে। আমরা যখন বলছি গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই রকম বলেছেন, তার মানে এই নয় যে তোমাকে এই কথা মানতে হবে। হিন্দুরা বলতে চাইছেন, এই সত্যটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে এসেছে, তুমি যদি অনুশীলন কর, তুমিও এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবে।

একজন হঠাৎ উদয় হয়ে বললেন, 'ভগবান আমাকে আদেশ করেছেন, তোমাদের আদেশ দেওয়ার জন্য'। তোমাকে ভগবান আদেশ দিয়েছেন, আমি কি করে জানব? একবার এক সাধু আমাদের জেনারেল সেক্রেটারিকে গিয়ে বলছেন, 'ঠাকুর আমাকে বলেছেন, এই রকম করতে'। জেনারেল সেক্রেটারি মহারাজ হেসে বললেন, 'ঠাকুর আমাকে এ-রকম কিছু বলেননি, এরপর ঠাকুর যদি আপনাকে কিছু বলতে আসেন, বলবেন আমাকে এসে বলতে'। যে কোন প্রফেট যখন বলেন, ঈশ্বর তাঁকে এটা আদেশ করেছেন অপরকে বলার জন্য। তাহলে বলতে হবে, ঈশ্বরকে বলবেন, আগে আমাকে এসে যেন বলেন। হিন্দু ধর্ম শাশ্বত সত্য নিয়ে চলে, এখানে এভাবে কেউ বলতে যাবেন না যে, ভগবান বলেছেন, তুমি শোন। আমি বলছি তুমি শোন, এই ভাবে হিন্দু ধর্ম একেবারেই চলে না। হিন্দু ধর্ম বলে, এটাই সত্য, তুমি সাধনা কর, তুমিও জানতে পারবে। এই সত্যটা কার মুখ দিয়ে এসেছে? শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে। এই সত্য কার মুখ দিয়ে এলো? শ্রীরামকৃষ্ণের

মুখ দিয়ে। এই সত্য কোথা থেকে এলো? বেদ থেকে এসেছে, উপনিষদ থেকে এসেছে; এ-ছাড়া আর কিছু না। উপনিষদ যখন বলছেন, *ইত্যাদেশঃ,* সেখানে এটা বলছেন না যে, আমি বলছি তুমি শোন। আমি কেন শুনব আপনার কথা, আপনি যা আমিও তাই, ঊনিশ বিশের তফাৎ। আপনার বয়স বেশী, আপনার পড়াশোনা বেশী কিন্তু তাই বলে আপনার কথা মত আমি আমার জীবনটাকে কেন দিয়ে দেব! হিন্দু ধর্ম কখন এভাবে কাউকে আদেশ দেয় না, হিন্দু ধর্ম বলে, এটা শাশ্বত চিরন্তন সত্য। গীতা আমরা যা কিছু আলোচনা করছি, এগুলো সব হল সেই শাশ্বত সত্য। যাই হোক, পরের শ্লোকে ভগবান বলছেন –

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৫৭।।

(যিনি সব বস্তু ও ব্যক্তিতে স্নেহবর্জিত এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয় উপস্থিত হলে যিনি যথাক্রমে আনন্দিত বা দুঃখিত হন না, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হয়েছেন।)

এতক্ষণ দুঃখের কথা, সুখের কথা বললেন; বলার পর বলছেন, *বীতরাগভয়ক্রোধঃ,* অনুরাগ, আসক্তি, ভয় আর ক্রোধ এই তিনটে থেকে বেরিয়ে এসো। এই তিনটে থেকে যে বেরিয়ে গেল, যার কোন কিছুর প্রতি অনুরাগ নেই, আসক্তি নেই, ভয় নেই, ক্রোধ নেই, তিনি তো এমনিতেই একজন মহাত্মা হয়ে গেলেন। গীতা বলছেন বলে এটা শুধু সত্য না, এটাই শ্বাশত সত্য। গীতা কেবল আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন, যে মানুষ এই ধরণের, সংসার তাঁর মনে কোন ভাবেই ছাপ ছাড়তে পারে না। সংসার আমার আপনার উপর কেন ছাপ ফেলতে পারে? কারণ আমাদের ভিতর এই তিনটে জিনিস আছে –কিছু জিনিসকে ভালবাসি, কিছু মানুষকে ভালবাসি। তারা আমার জীবন থেকে চলে যেতে পারে, আমি তাদের জীবন থেকে চলে যেতে পারি, ভাবলেই ভয় হয়। যার ক্ষমতা নেই, তার মনে ভয়, যার ক্ষমতা আছে তার ভিতর ক্রোধ। এরপর তো বাকি সব কিছুই জুটে যাবে, সংসারখেলা পুরো জমে উঠবে।

গীতা দু-ভাবে এটাকে আমাদের কাছে নিয়ে আসছেন। প্রথম হল, মহাপুরুষরা এর বাইরে। তা এসব শুনে আমার কি হবে! বিল গেটসের কত টাকা আছে জেনে আমার কি হবে? তখন বলছেন, তা না, তুমিও এর অভ্যাস করতে পার। প্রথম প্রথম তোমার কষ্ট হবে ঠিকই, কিন্তু তাও কর। সিদ্ধপুরুষ যাঁরা, মহাত্মা যাঁরা, তাঁদের কাছে যে জিনিসটা স্বাভাবিক, সেটাই সাধারণ মানুষদের চেষ্টা করে করতে হয়। শচীন তেণ্ডুলকার চোখ বন্ধ করে খেললেও চার ছয় মারবে, আমি আপনি পারব না। কিন্তু যে সত্যিই ক্রিকেট খেলতে চাইছে, তাকে কোথাও তো একটা শুরু করতে হবে। শচীন, সৌরভের খেলা দেখে কেউ যদি চায়, আমিও একজন ক্রিকেটার হতে চাই। কেন হবে না, তুমিও ক্রিকেটার হতে পারবে, কোন অসুবিধা নেই। কোথাও তো তাকে একটা জায়গায় শুরু করতে হবে। তখন তাকে বলতে হয়, শচীন তেণ্ডুলকারের ক্রিকেটের মধ্যে কি কি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। এবার তার প্র্যাক্টিস করে করে সেখানে তাকে পৌঁছাতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা আজ ভগবান বলছি। আজ আমাদের এখানে সূর্যগ্রহণ ছিল, ঠাকুরকে যে নির্দিষ্ট সময়ে নৈবেদ্য আদি নিবেদন করা হয়, গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের আগে নিবেদন করা হয়েছে। কারণ গ্রহণে সমস্ত কিছু অশুদ্ধ হয়ে যায়। গ্রহণ চলাকালীন ভজন-কীর্তন ছাড়া কোন ধর্মীয় কাজ হয় না। সেইজন্য ঠাকুরের ভোগ গ্রহণ লাগার আগেই নিবেদন করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঠাকুর যখন প্রথমের দিকে দক্ষিণেশ্বর ছিলেন, তখন কে জানত যে তিনি ভগবান। কেশব সেন, বিদ্যাসাগর ওনাদের ছেড়ে দিন, সাধারণ মানুষ যাঁরা যেমন নরেন এসেছেন, মাস্টারমশাই এসেছেন। এনারা এসে ঠাকুরের কিছু ব্যবহার, আচরণ, কথাবার্তা দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছেন। অবাক হয়ে ভাবতেন, একজন মানুষ এ-রকম কি করে হতে পারেন! ওনাদের ভিতর কোথাও একটা নাড়া

পড়েছে, আমিও তো এই রকম হতে চাই, প্রকাশ্যে বলছেন না। কিন্তু আমরা যখন বলি, আপনার কথা আরও শুনতে চাই, আসলে বলতে চাইছি আমরা আপনার মত হতে চাই। ঠাকুর বলছেন, ভক্তি লাভ কর, সাধনা কর। আমাদের বলে দিলেন, কলিযুগে ভক্তিই সহজ পথ। আর অন্য দিকে সেই সময় নরেনাদি ছোকড়া শিষ্যদের দিয়ে ঠাকুর মুণ্ডু কাটা সাধনা করিয়ে নিচ্ছিলেন। সবাইকে কোথাও তো শুরু করতে হবে, গীতা আমাদের এটাই বলছেন। দুটোই বলছেন, যাঁরা সিদ্ধ পুরুষ, তাঁরা যে জায়গায় প্রতিষ্ঠিত, তাঁর যে স্বাভাবিক গুণগুলি, সেটা বলে দিয়ে বলছেন, এখান থেকে শুরু কর।

এখানে বলছেন, *যঃ সর্বত্রানভিস্নেহঃ*। মায়াবতীতে প্রচুর জোঁক আছে। সন্ন্যাসীরা মায়াবতীতে লম্বা রাস্তায় হাঁটাচলা করেন। একদিন মহারাজরা হাঁটতে হাঁটতে চলেছেন, হঠাৎ দেখতে পান রাস্তার মাঝখানে একটা জোঁক পিছনের অংশটাকে মাটিতে লাগিয়ে সামনের অংশটাকে ঘোরাচ্ছে, যদি কোন জিনিসের আশ্রয় পেয়ে যায়, মুখটা চট করে সেখানে লেগে যাবে। যদি ওটা লোহা বা কাঠ হয়, তখন ওটা ছেড়ে দেবে। কিন্তু কোন বড় প্রাণী, মানুষ, গরু কিংবা মোষের শরীর হয়, তখন জোঁকের মুখটা ওর শরীরে লেগে যাবে। জোঁকের মুখ দিয়ে এক ধরণের কেমিক্যাল বেরোয়, যেটা চামড়ায় লাগার পর লোকাল এ্যনাস্থেসিয়ার মত জায়গাটা অবশ করে দেয়। তারপর চামড়াটা ফুটো করে ওখান থেকে জোঁক রক্ত শুষতে শুরু করে। লোকাল এ্যনাস্থেসিয়ার জন্য যার শরীর থেকে রক্ত টেনে নিচ্ছে সে টেরও পায় না যে, জোঁক তার শরীর থেকে রক্ত টেনে নিচ্ছে। এরপর ওর পেট ভরে গেলে আপনা থেকেই খসে পড়ে যাবে। চামড়ার যে জায়গাতে ফুটো করেছিল, সেখান থেকে রক্ত বেরোতে থাকবে।

আমরা মনে করি, বস্তুগুলি আমাদের কাছে আসে, এসে আমাদের প্রভাবিত করে। হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে তা হয় না। হিন্দু দর্শনে বলা হয়, বস্তু থেকে সিগনালগুলো আসতে থাকে আর চেতনাটা ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। একটা জিনিসের প্রতি যে আকর্ষণ হয়, এই আকর্ষণটা ভিতর থেকে আসে। তখন মনে হল, আমাদের যে ইন্দ্রিয়গুলি, পঞ্চেন্দ্রিয়, যেমন চক্ষু ইন্দ্রিয়, আমাদের যে চেতনা, চক্ষু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বেরিয়ে ওই জোঁকের মত চক্কর মারতে থাকে। যেমনি দেখার মত একটা কিছু পেল, চট করে ওখানে এঁটে গেল। এবার আমি ওটাকে শুষতে শুরু করব। আমরা সবাই জোঁক, আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় জোঁকের মত ঘুরছে। আর মনও জোঁকের মত চক্কর মারছে, ভাল পুরনো স্মৃতি, ভাল কথাগুলোকে ধরার চেষ্টা করছে। এরপর আমাদের আর কষ্টের শেষ নেই। আমাদের সমস্ত কষ্টের সাধারণ কারণ এটাই। জোঁক একটা জীবন্ত প্রাণী, সে নিজের লেজের উপর দাঁড়িয়ে শুরটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চক্কর দেয়, যেখানেই যেমনি লেগে গেল, খট্ করে ধরে নেবে। যেখানে আমরা ভালবাসার জিনিস পাই, যেটা আমার ইন্দ্রিয়ের ভাল লাগে, মনের যেটা ভাল লাগে; আমাদের ইন্দ্রিয়, মন ঠিক এভাবে খট্ করে বিষয়কে ধরে নেয়। বলছেন, যাঁরা জ্ঞানী পুরুষ, স্থিতপ্রজ্ঞ, তাঁরাও ঘোরেন, কিন্তু কোন কিছুর সঙ্গে জোঁকের মত এঁটে যান না।

তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্, উনিও দেখছেন এটা শুভ, এটা অশুভ। উনি যে শুধু শুভই দেখেন, অশুভ দেখেন না, তা না। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, রাবণের মা নিকষা রাম আসছেন দেখে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁকে ধরা হল। ধরে আনার পর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, 'তোমার এত বয়স হয়ে গেছে, এখনও তোমার এত মৃত্যু ভয় কেন'? নিকষা বলছেন, 'হে রাম, আমি এতদিন বেঁচে ছিলাম তাই তোমার এত লীলা দেখলাম, বেঁচে থাকলে আরও কত তোমার লীলা দেখতে পাবো'। নিকষা জগতের সব কিছুতে ঈশ্বরের লীলাকে দেখে আনন্দ উপভোগ করছেন, যেখানে ভাল সেখানে আনন্দ করছেন, যেখানে খারাপ সেখানে দুঃখ পাচ্ছেন; কিন্তু কোন কিছুতে নিজেকে জড়াচ্ছেন না, এঁটে যাচ্ছেন না। এটাই তাঁর জীবন। ঠাকুরও শুভ অশুভ দেখছেন, স্বামীজীও দেখছেন, কিন্তু যেখানে যা কিছু আছে সবটাই স্নেহ বর্জিত হয়ে যায়, তার মধ্যে কোন স্নেহ থাকে না; ওখানে এঁটে যাওয়ার

কোন ব্যাপার থাকে না। এটা যেন জোঁক লোহার উপর দিয়ে শুড়টা ঘোরাচ্ছে, কোন কিছুতে এঁটে যাবে না, বেরিয়ে চলে যাবে।

নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা, তাঁর কোন কিছুর প্রতি কোন অভিনন্দনও নেই, কোন দ্বেষ ভাবও নেই। *অভিস্নেহ,* কি রকম অভিস্নেহ? আচার্য এখানে বলছেন, *দেহজীবিতাদিষু,* নিজের শরীর, নিজের জীবন, এগুলোর প্রতিও তাঁর আসক্তি থাকে না। আমি বেঁচে থাকব, এই বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে যোগের ভাষায় বলা হয় অভিনিবেশ। প্রত্যেকের কাছে নিজের শরীর অত্যন্ত প্রিয় জিনিস। আর জীবন, বলা হয় বড় বড় সাধুরাও মরতে চান না। করোনার আতঙ্কে সবাই কেমন ভিতরে সিঁদিয়ে আছে, কেউই মরতে চায় না। আচার্য বলছেন, যাঁরা স্থিতপ্রজ্ঞ, তাঁদের এসবের কোনটাই হয় না।

একটা খুব সুন্দর ঘটনা দিয়ে বোঝালে জিনিসটাকে আমরা খুব সহজে বুঝে নিতে পারব। এমনিতেও এটা না বোঝার কিছু নেই। যে কোন গীতা পড়ি না কেন, অনুবাদ পড়ি, যে ভাবেই পড়ি না কেন, সহজে বুঝে নিতে পারব। কোন ইংরাজী বই বোঝার তুলনায় গীতা বোঝা অনেক সহজ। কিন্তু জীবনে আমরা নামাতে পারছি না কেন? কারণ গীতার কথাগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সেই তুলনায় আমাদের বুদ্ধি অত সূক্ষ্ম নয়। ফলে ঘটনা দিয়ে, কাহিনী দিয়ে, উপমা দিয়ে, উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে হয়। এই ভাবে বুঝতে বুঝতে মনটা তৈরী হতে থাকে। এই শ্লোকটাকে ব্যাখ্যা করার অনেক উপায় আছে, চারিদিকে অনেক ঘটনা আছে, যেটাকে দিয়ে এই শ্লোকটাকে খুব সহজে বোঝান যেতে পারে।

এ্যলবার্ট স্প্যাল্ডিং আমেরিকার একজন নামকরা বেহালা বাদক ছিলেন। ওনাকে বলা হয় শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ বাদ্যযন্ত্রী। এক সময় ওনার বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ গিয়েছিলেন। এ্যলবার্ট স্প্যাল্ডিং নিজের আত্মকথা লিখেছেন, যার নাম Rise to Follows, যদিও বইটা সহজে পাওয়া যায় না। তবে যাঁরা বইটা পড়েছেন, তাঁরা খুবই ভাগ্যবান, কারণ বইটা এক কথায় অপূর্ব। স্বামী বিবেকানন্দ ওনাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন, এবং কয়েক দিন ছিলেন। উনি তখন ছোট ছিলেন, আর ছোটবেলা থেকেই তিনি বেহালা বাজাতেন। কিন্তু তাঁর সব ঘটনা মনে ছিল। উনিও খুব সুন্দর লিখছেন, আমাদের বংশের পরম্পরার মধ্যে বসে গেছে যে, আমাদের বাড়িতে স্বামীজী ছিলেন। স্বামীজীকে কেন্দ্র করে উনি দু-চারটে ঘটনা লিখেছিলেন, যেটা পরে পরে স্বামীজীর জীবনীতেও লেখা হয়। স্পাল্ডিং খুব শান্ত-শিষ্ট, অত্যন্ত ভদ্র মানুষ ছিলেন। ওনার জীবনের অনেক ঘটনা তিনি এই বইতে লিখেছেন, প্রত্যেকটি ঘটনাই পাঠকের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়, খুব ভাল লাগে। এখানে আমরা দুটি ঘটনা বলছি।

তখনকার দিনে ইউরোপ ছিল শিল্পকলার কেন্দ্র। তিনি ইউরোপের একটা শহরের এক কলাকেন্দ্রে বেহালা বাজিয়েছেন। পরের দিন কাগজে ওনার বাজনাকে নিয়ে খুব সমালোচনা করা হয়েছে। সমালোচনা হওয়াতে তিনি খুব ভেঙে পড়লেন, ঠিক করলেন আর বেহালা বাজাবেন না। ওই শহরে তাঁর গুরুর মত একজন ছিলেন, উনি তাঁর কাছে গিয়ে একেবারে ভেঙে পড়লেন। গুরু স্থানীয় যিনি, তিনি অবাক হয়ে বলছেন, But I thought you are a musician। খুব সুন্দর কথা, এর অর্থ হল, তুমি একজন মিউজিসিয়ান্, তোমার কাজ হল মিউজিকে নিজেকে পুরো ঢেলে দেওয়া, কে তোমার নিন্দা করল, কে তোমার প্রশংসা করল, তাতে তোমার কি আসে যায়। তোমার তো সঙ্গীতকে নিয়েই থাকার কথা।

আলবার্ট স্পাল্ডিংএর আর-একটা ঘটনা হল, অন্য একটা শহরে তিনি গেছেন। সেই শহরের যিনি তাঁর এজেন্ট, তিনি সব কিছু ঠিকঠাক ভাবে অর্গানাইজ করেছেন। আলবার্ট স্পাল্ডিং সব

জায়গায় নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। স্ত্রী খুব বুদ্ধমতি, অতি সুন্দরী আর খুব পরিশীলিত এবং একজন সত্যিকারের সংস্কৃতিসম্পন্না মহিলা। তখনকার দিনে তাঁরও চারিদিকে খুব প্রশংসা ছিল। সকালবেলা উনি একটা জায়গায় বাজাবেন ঠিক আছে। ঘুম থেকে উঠে উনি কাগজ খুলতেই দেখেন কোথাও কোন ঘোষণা নেই যে, আজ সকালে আলবার্ট স্পাল্ডিং এই শহরের এই হলে বেহালা বাজাবেন। স্পাল্ডিং তো রেগে আগুন হয়ে গেছেন। ভোরবেলা এজেন্ট চলে এসেছেন, এজেন্টকে দেখেই উনি বকাবকি করতে লাগলেন। One of the rarest যে স্পাল্ডিং রাগারাগি করছেন। এজেন্টকে অনেক কথা বলে যাচ্ছেন, এজেন্ট কিন্তু শান্ত মনে শুনে যাচ্ছেন, কিছু বলছেন না, কিন্তু মিষ্টি মিষ্টি করে হাসছেন। উনি আরও রেগে গিয়ে বলছেন, 'আমি এই রকম সিরিয়াস হয়ে তোমাকে বলে যাচ্ছি আর তুমি হাসছ? আমি কি এইজন্য এত দূর থেকে এসেছি? পুরো অনুষ্ঠানটাই দেখছি নষ্ট হয়ে যাবে'। স্পাল্ডিং চেঁচিয়েই যাচ্ছেন। উনি যত চেঁচাচ্ছেন, এজন্টও মিষ্টি করে হেসে যাচ্ছেন। রাগ একটু যখন কমল, তখন এজেন্ট খুব শান্ত ভাবে বলছেন, 'স্যার, আমরা এক মাস আগে ছোট করে একটা announcement করেছিলাম – আলবার্ট স্পাল্ডিং এই তারিখে এই শহরের এই হলে অনুষ্ঠান করবেন। এক দিনে আমাদের সমস্ত টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে। হলে কোন টিকিট, এমন কি একটা পাসও অবশিষ্ট নেই। সেইজন্য আমরা আর কোন বিজ্ঞাপন দিইনি'। স্পাল্ডিং তাঁর আত্মকথায় বলছেন, আমার তো লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল।

এখানে আমরা স্পাল্ডিংকে নিয়ে বলছি না, বলতে চাইছি ওনার এজেন্টকে নিয়ে। এজেন্টের চরিত্রে আমরা দুটো জিনিস দেখছি। প্রথম, তিনি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত; কি জ্ঞান, একদিন মাত্র স্পাল্ডিংএর নাম দিয়েছি, আর মুহুর্তে সমস্ত টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে। তখনও স্পাল্ডিংএর সে-ভাবে নামডাক হয়নি। তিনি এমন জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত যে, স্পাল্ডিংএর চেঁচামেচিতেও তাঁর কিছু হচ্ছে না। দ্বিতীয়, আমার একটা জানা জিনিসকে নিয়ে কেউ যদি প্রতিবাদ করতে আসে, তখন আমরা কি বলব? এত ফটর ফটর করছেন কেন, আসল ব্যাপারটা জানলে আপনি চুপসে যাবেন। এজেন্ট কিন্তু সে-ভাবে বলছেন না। এজেন্ট স্পাল্ডিংকে খুব ভালবাসেন, ওই ভালবাসার জন্য ঠাকুরমা তাঁর নাতিকে যে-ভাবে দেখবেন, indulgent love, যেখানে আপনি সবাইকে ভালবাসছেন, total inclusive love। এজেন্ট সেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, উনি জানেন ইনি যা বলছেন সবটাই বকওয়াস্, অন্য দিকে তাঁর প্রতি ভালবাসা, সব সহ্য করে যাচ্ছেন। এই যে বলছেন, *যঃ সর্বত্রানভিস্নেহঃ*, পরে পরে শ্লোকে বলবেন, ঈশ্বর ব্যাতিরেকে আর কিছু নেই – তুমি যখন সেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন কি হবে? আমি কেন আপনাকে ভালবাসি? কারণ আপনি আর আমি আলাদা, আর আমি চাইছি আপনাকে টেনে আমার নিজের করে নিতে। আর কাউকে দেখলে কেন আমি অসন্তুষ্ট হই? কারণ আমি মনে করি, সে আমার লোক নয়, সে আমি নই। যাকে বা যে কোন বস্তুকে যে আমি ভালবাসি, তার কারণ আমার ভালবাসাটা গিয়ে তার উপর পড়ে যায়।

এই কলমটা আমি প্রায়ই উদাহরণের জন্য ব্যবহার করি। যাঁরা দেখা করতে আসেন, তাঁরা এই পেনটা দেখে বলেন, আপনি কতবার আপনার লেকচারে এই পেনটাকে দেখিয়েছেন। অনেকে আবার এই পেনটাকে স্মৃতি হিসাবে রাখার জন্য বলে, 'আমাকে এই পেনটা দেবেন'? ইতিমধ্যে কয়েকটা পেন আমার দেওয়া হয়ে গেছে। যদি এই কলমের কোন বৈশিষ্ট্য থাকত, তাহলে সবাই এই কলমটকেই কিনত, কিন্তু কলমটার কোন বৈশিষ্ট্য নেই। যাঁরা এই কলমটা চাইছেন, তাঁরা কোথাও আমাকে ভালবেসেছেন, কোথাও আমার talksগুলো তিনি পছন্দ করেছেন। তার মানে ওনার নিজের যে ভালবাসা, সেটা এই কলমের উপরে এসে পড়ছে, সেখান থেকে তাঁর ইচ্ছা, এটাকে নিজের কাছে রাখা। তার মানে objective reality বলে কিছু হয় না। যা হয়, সব subjective reality।

এ্যরিস্টটল খুব নামকরা গ্রীক ফিলজফার ছিলেন, তিনি objectivismকে খুব দাম দিতেন। পরে Ayan Rand খুব নামকরা লেখিকা তিনিও objectivismকে খুব দাম দিয়েছিলেন;

পাশ্চাত্যে objectivismএর খুব দাম। আমার ভালবাসা তার উপর বা বস্তুর উপর গিয়ে পড়ছে, এই subjectivismএরই যে শুধু দাম আছে তা না। এমন অনেক জিনিস আছে, যেটাকে সবাই ভালবাসে। যেমন তাজমহল, ওটা কি একটা objective reality, নাকি একটা subjective reality? যারা objectivismকে বিশ্বাস করে, তারা বলবেন, একটা বস্তুকে, যেমন তাজমহলকে সবাই ভালবাসে। কিন্তু আমার কাছে এটা একেবারেই ঠিক না, আমি যখন তাজমহল গেলাম, আমার মাথায় সব সময় ঘুরছিল, এটা একটা কবরস্থান। দেখতে সুন্দর হোক, যাই হোক, কিন্তু কবরস্থান তো। শ্মাশানকে কেউ ভালবাসে না, কবরকেও কেউ ভালবাসে না। এই কথা শুনলে লোকেরা আমার দিকে তেড়ে আসবে। তারা বলবে, তাজমহল একটা ভালবাসার প্রতীক।

যে জায়গাটাকে তাঁরা objectivism বলছেন, সেই জায়গাতেও objectivism থাকে না, থাকে subjectivism। *যঃ সর্বত্রানাভিস্নেহঃ,* এটা subjectivismকে দেখাচ্ছে যে, একটা বস্তুতে যে তোমার ভালবাসা যাচ্ছে, সেই ভালবাসাকে আগে তো তুমি রাঙিয়ে দিয়েছ, ওর উপরে ভাল করে মধু লাগিয়ে দিয়েছ, তারপর তুমি সেই মধুকেই চাটছ। যোগীরা এই জিনিস কখনই করেন না। যোগীদের কাছে বস্তু যেমন বস্তু তেমন, ওখানেই শেষ, আর এগোবেন না। নিজের ভিতর থেকে ভালবাসা গিয়ে আগে তাকে ঢাকা দেবে, তাকে মধুর বানাবে, তারপর ওটাকে টেনে নেবে; এই যে আপন করে নেওয়া, এই জিনিস যোগীরা করেন না। ফলে কি হয়, *নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টী* তিনি কোন জিনিসের অভিনন্দনও করেন না, নিন্দাও করেন না। এই হল যোগীদের স্বভাব।

যদা সংহরতে চায়ং কর্মোহঙ্গনীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৫৮।।

(ভয় পেলে কূর্ম যেমন মস্তক ও হস্তপদাদি অঙ্গসমূহ সঙ্কুচিত করে, ঠিক সেই রকম যে জ্ঞাননিষ্ঠ যোগী শব্দাদি বিষয়পঞ্চক থেকে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার করেন, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হন।)

এক্ষুণি আমরা ব্যাখ্যা করলাম, কিভাবে আমাদের মন গিয়ে একটা বস্তুকে বা ব্যক্তিকে ঢেকে নেয়। এই শ্লোকে দুটো শব্দ আসছে – প্রথম শব্দ ইন্দ্রিয়, দ্বিতীয় শব্দ ইন্দ্রিয়ার্থ। ইন্দ্রিয় আমরা সবাই জানি, আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। জগতে যত পদার্থ থাকুক, ১১০ কিংবা ১২০ যত পদার্থই থাকুক, আগে যদিও এর সংখ্যা অনেক কম ছিল, তাতে আমাদের হিন্দুদের কিছু আসে যায় না। হিন্দুদের বক্তব্য, তোমার একশ পদার্থ থাকুক আর হাজারটা পদার্থ থাকুক, আমি যেটাকে নেব, আমি আমার এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়েই সেটা নেব। সেইজন্য আমি যে জিনিসটাকে দেখতে পারব, শুঁকতে পারব, যেটাকে আস্বাদ করতে পারব, শুনতে পারব এবং বলতে পারব –এই হল জগৎ আর এই হল বস্তু; সেটাকেই আমি নেব। আমাদের শাস্ত্র বলেন, তোমরা বস্তুকে বস্তু বলছেন ঠিকই, কিন্তু যেখানে আধ্যাত্মিক ব্যাপার এসে যায়, তখন এই বস্তুকে আমরা বলি ইন্দ্রিয়ার্থ, অর্থাৎ এই বস্তুগুলো হল ইন্দ্রিয়ের জন্য। বাংলায় আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলি। বলছেন, এই জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে, সব ইন্দ্রিয়ের জন্য। আমরা ফেঁসে যাই এই ইন্দ্রিয়ার্থগুলিকে নিয়ে। যেগুলো মনের জিনিস, সেগুলোতে আমরা ফাঁসি না। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা পড়ে মনে মনে যে আনন্দ নিচ্ছি, সেটা আমাকে ফাঁসাবে না।

কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো জোঁকের মত ঘুর ঘুর করছে, আর এই ইন্দ্রিয়ার্থ, ইন্দ্রিয়ের জন্য যে বস্তুগুলো রয়েছে, সেখানে গিয়ে এঁটে যাচ্ছে। কচ্ছপ যখন বুঝতে পারে এখান থেকে তার বিপদের সম্ভবনা আছে, তখন সে নিজের হাত, পা, মুখ ভিতরে গুটিয়ে নেয়। একবার গুটিয়ে নেওয়ার পর, কচ্ছপকে কেটে দিলেও নিজের অঙ্গগুলি আর বার করবে না। আমাদের অঙ্গগুলি সব সময় বেরিয়েই আছে। যেখানে অপছন্দের ব্যক্তি বা বস্তু থাকে সেখানে আমরা অঙ্গগুলি গুটিয়ে নিই। কিন্তু ততক্ষণে তার পছন্দ অন্য দিকে থাকে, ভিতরে মন তখন ছটফট করতে থাকে। আমাদের পঞ্চ

ইন্দ্রিয়গুলি গ্রহণ করে, আর বাকি পাঁচটি বাহ্যেন্দ্রিয় দিয়ে আমরা কাজ করি। বাজারে গিয়ে ভাল জিনিস দেখলে আমাদের ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে, একটু দেখি তো জিনিসটা কেমন। অনেক সময় মনে হয়, আমার হাতটা যেন আমার শরীর অঙ্গই নয়, তার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। বাচ্চারা যেমন, সামনে খেলনা দেখলে, না চাইলেও আস্তে আস্তে তার হাত খেলনার দিকে এগিয়ে যায়, এটা তার স্বাভাবিক আকর্ষণ।

একটা গল্প শুনেছিলাম, যদিও এই বিষয়ের সাথে সম্পর্ক নেই, কিন্তু আইডিয়াটা বুঝতে সুবিধা হবে। একটা চোর ছিল, কপাল এমন তার স্ত্রীও নামকরা চোর। বিয়ের পর ওদের সন্তান হয়েছে। বাচ্চার জন্মের পর নার্স, আয়ারা দেখছে বাচ্চাটার একটা হাত মুঠো করা। কিছুতেই তার মুঠিটা আলগা করা যাচ্ছিল না। অনেক রকম চেষ্টা করা হচ্ছে, মুঠিটা কেউ খুলতে পারছেন না। একজন বিজ্ঞ ডাক্তারকে নিয়ে আসা হয়েছে। ডাক্তার এসে বাচ্চার পুরো ব্যাকগ্রাউণ্ডটা নিলেন; পরিবারের ইতিহাস জানলেন। জানতে পারলেন, স্বামী আর স্ত্রী দুজনেই চোর, চুরিতে সিদ্ধহস্ত। সব ইতিহাস জানার পর, ডাক্তার বাচ্চাটার সামনে একটা পিতলের খেলনা দিলেন, দেখলেন কিছুই হল না। তারপর রূপোর খেলনা দিলেন, ডাক্তার দেখছেন, বাচ্চাটার হাতটা যেন একটু আলগা হয়েছে। এরপর উনি একটা সোনার খেলনা দিলেন। তখন দেখা গেল, বাচ্চাটার হাতটা খুলে গেল, আর বাচ্চাটার হাত থেকে একটা কানের দুল ঢং করে পরে মেঝেতে গিয়ে পড়ল। বাচ্চাটা যখন জন্ম নিয়েছে, আর জন্মজাত সংস্কার এমন প্রবল যে, জন্ম নিতেই নার্সের কানের দুলটা খুলে হাতের মুঠোটা বন্ধ করে দিয়েছে। বাচ্চাটার সেই বোধ নেই, ইচ্ছে নেই, কিন্তু তার বাহ্য ইন্দ্রিয় এমন কাজ করল যে, গপ্ করে নার্সের কানের দুলটা ধরে খুলে নিয়ে হাতের মুঠটা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু আরও বেশী দামী জিনিস যেমনি দেখল, তখন তার হাতটা খুলে গেল। এটা একটা কাহিনী, বোঝানর জন্য বলা হল। আমরা সংসাররূপী বাজারে ঘুরছি, ইন্দ্রিয়গুলি ছটফট করে যাচ্ছে —এ-রকম দেখছি, এ-রকম গন্ধ আসছে, তখন আমাদের বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলি বস্তুগুলোর উপর কাজ করতে চায়।

ইদানিং একটা নূতন শব্দ এসেছে, compulsive shopping। এটা এক ধরণের মানসিক ব্যাধি। বাজারে, শপিং মলে ঘুরতে যাওয়া, কোন দরকার নেই, তাও তাকে কিছু কিনতে হবে; এটাই এই ব্যাধির লক্ষণ। বাড়ির মায়েদের ধারণা নেই যে, তার আলমারিতে কত শাড়ি আছে, কত অন্য জিনিস আছে। ঠাকুর বলছেন, কুবের রাজার ভাণ্ডারে কত রত্ন পড়ে আছে, কুবের নিজেও জানে না। ছোটবেলা আমরা একটা গল্প পড়েছিলাম, জানি না এটা কতটা সত্যি। এথেন্সে সক্রেটিস থাকতেন, তিনি প্রায়ই বাজারে যেতেন, কিন্তু কিছু কিনতেন না। অনেকেই তাঁকে বলতেন, 'কিছুই কেনাকাটা করেন না, বাজারে ঘুরে ঘুরে কি দেখেন'? সক্রেটিস বলছেন, 'আমি দেখছি জগতে কত কি জিনিস আছে, কোন জিনিসটা আমার কাছে না থাকলেও আমার কাজ চলে যাবে'। খুব মজার কথা। বাজারে কত কি জিনিস আসছে, বিক্রী হয়ে যাচ্ছে, অথচ আমার কিছু লাগবে না।

যাঁরা প্রকৃত সন্ন্যাসী, যাঁরা স্থিতপ্রজ্ঞ, সংসার বাজারের মাঝখান দিয়ে চলে যাবেন, কিন্তু কামিনী-কাঞ্চন, নামযশ, রূপ, রস, গন্ধ কোন কিছুই তাঁকে স্পর্শ করবে না। চারিদিকে চুম্বক পাথর ঝুলছে, লোহার বল একবার এদিকে যায়, আরেকবার ওদিকে যায়। গঙ্গোত্রির ওদিকে বাসে করে যাওয়ার সময় থ্রী-সিটার বাসের সিটের মাঝখানে যদি কেউ বসে, রাস্থায় এত টার্নিং পড়ে যে, তাকে একবার এপাশের যাত্রীর ঘাড়ে, আরেকবার ওপাশেরর যাত্রীর ঘাড়ে গিয়ে পড়তে হয়। জগৎ ঠিক তাই, একবার এর দিকে পড়ছি, আরেকবার ওর দিকে পড়ছি। কিন্তু যাঁর মন ধীর, স্থির, শান্ত হয়ে গেছে, যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, তিনি তো সোনা হয়ে গেছেন, সমস্ত পাওয়ারফুল চুম্বকের মাঝখান দিয়ে চলে যাবেন, চুম্বক তাঁকে টানতে পারবে না। কেন টানতে পারবে না, পরে বলবেন।

আমরা বিখ্যাত বেহালা-বাদক স্পাল্ডিংএর গল্প বললাম। তাঁর সেই এজেন্টের কথা ভাবুন, তিনি সেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে কেউ আর তাঁকে টলাতে পারছে না। স্পাল্ডিংএর তিরস্কার, চেঁচামেচি, ভর্ৎসনা, কোনটাই তাঁকে এক চুলও নড়াতে পারছে না। দ্বিতীয়তঃ স্পাল্ডিংর প্রতি তাঁর যে ভালবাসা, সেই ভালবাসার জন্য সে আরও বেশী শান্ত ভাব অবলম্বন করে আছেন। কিন্তু আমি যাকে পছন্দ করি না, তাকে বলি, এই থুতু ফেললাম তোমার মুখে, আর তোমার মুখদর্শন করতে চাই না, তোমাকে এই আমি ত্যাগ করলাম। উর্দুতে একটা খুব সুন্দর সায়ের আছে, কভি জান কে কসম খাতে থে, অব জনাজে মে সামিল হোনি কি কসম খাতে হ্যায়। এক সময় এমন প্রেম ছিল যে, তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার জীবন বলে মাথা খারাপ করে দিত। আর এখন ঝগড়া হয়ে গেছে, এক অপরকে সহ্য করতে পারছে না, তখন বলছে, তুমি মরো, তোমার শবযাত্রায় আমি সামিল হব, বলতে চাইছে তুমি মরো; এই হল আমাদের প্রকৃতি। আমাদের ত্যাগ কখন হয়? কারুর উপর রেগে গিয়ে যখন থুতু ফেলি। কখনই এই মনোভাব থাকা ভাল না। যাঁরা স্থিতপ্রজ্ঞ, তুমি আমাকে পছন্দ করো না, ঠিক আছে; তুমি আমাকে পছন্দ করো, আমাকে ভালবাসো, কোন সমস্যা নেই। ঠাকুর, স্বামীজী এনারা স্থিতপ্রজ্ঞ ছিলেন।

গান্ধীজী সত্যাগ্রহ, অসহযোগ আন্দোলন করলেন, স্বদেশী আন্দোলন যদিও ওনার আগে শুরু হয়েছিল, কিন্তু তিনি এটাকে একটা অন্য মাত্রায় নিয়ে গেলেন। স্বদেশী আন্দোলনে বিদেশী কাপড় বর্জন হল, অনেক বিদেশী কাপড় পোড়ান হল। ফলে ম্যাঞ্চেস্টারের অনেক কাপড়ের কল বন্ধ হয়ে গেল। শ্রমিকদের অনশনে দিন কাটানো শুরু হল, কারণ কাজ বন্ধ, মাইনে বন্ধ, খাবার-দাবার পাবে কোথায়! গান্ধীজী সেই সময় ইংল্যাণ্ডে সেকেণ্ড রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগ দিতে গেলেন। তিনি বললেন, আমি ম্যাঞ্চেস্টার যাব। ওখানকার প্রশাসনের কর্তৃপক্ষ বললেন, ‘ম্যাঞ্চেস্টারে আপনার একেবারেই যাওয়া চলবে না, ওখানে গেলে আপনি খুন হয়ে যেতে পারেন, ম্যাঞ্চেস্টারের সব শ্রমিক আপনার উপর প্রচণ্ড খাপ্পা হয়ে আছে। ওদের বিশ্বাস, আপনার জন্যই আজকে ওদের অনাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে’। গান্ধীজী তখন বললেন, ‘আমার তো ওদের সাথে কোন বিবাদ নেই, আমি যাবো’। গান্ধীজী শেষ পর্যন্ত ম্যাঞ্চেস্টার গেলেন, এবং ওখানকার লোকেরা গান্ধীজীকে দেখে পুরো violent হয়ে উঠেছে, এই লোকটার জন্য আমাদের আজ এই দুরবস্থা। গান্ধীজী খুব শান্ত ভাবে ওদের বোঝালেন, ‘দেখুন আমার দেশের যারা কর্মি আছে, তারাও আপনাদের ভাই বোন। কিন্তু আপনারা তাদের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন, তাদের কি দুরবস্থা ছিল। তূলা আসছে ভারত থেকে ম্যাঞ্চেস্টারে, আপনারা সেই তূলা দিয়ে কাপড় মেশিনে বানাচ্ছেন, সেই কাপড় আমার দেশে গিয়ে চার গুণ, পাঁচ গুণ বেশী দামে বিক্রী হয়। গান্ধীজী খুব শান্ত ভাবে তাদের যখন বোঝাতে লাগলেন, আস্তে আস্তে সবাই কিন্তু ব্যাপারটা বুঝে গেল। তারাও শান্ত হয়ে গেল, আর গান্ধীজীর প্রতি রাগ, কিংবা ভারতের শ্রমিকদের উপর রাগ, কোনটাই আর থাকল না।

এই হচ্ছে একটা গুণ, তোমাদের প্রতি আমার কোন রাগ নেই, তোমাদের আমি মানতে পারছি না বলে যে রাগ হবে তা না। তোমাকে আমি পছন্দ করি না, তাই তুমি মরো, আর তোমার মুখে গিয়ে থুতু ফেলে আসব, এই ধরণের মনোভাবকে কখনই আসতে দেওয়া যাবে না। বলছেন, কচ্ছপ যেমন নিজের হাত, পা, অঙ্গগুলিকে গুটিয়ে নেয়; জ্ঞানীরা, স্থিতপ্রজ্ঞ যিনি, তিনি এভাবে নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে গুটিয়ে নেন। সক্রেটিস যেমন বলছেন, আমার কিছু লাগবে না। অন্য দিকে compulsive shopper, পকেটে পয়সা আছে, চোখের সামনে পছন্দের কিছু দেখল, গপ্ করে ধরে নিয়ে ব্যাগে পুরে দিল। স্থিতপ্রজ্ঞ আর সাধারণ মানুষের মধ্যে এই দুটি তফাৎ। কিন্তু যাঁরা তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে টেনে নিয়েছেন, তাদের এবার সাবধান করে বলছেন –

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোপহস্য পরং দৃষ্টা নিবর্ততে।।৫৯।।

(বিষয় গ্রহণে অসমর্থ আতুর ব্যক্তি বা বিষয়ভোগপরাঙ্মুখ কঠোর তপস্বী ইন্দ্রিয়-বিষয় থেকে নিবৃত্ত হন বটে কিন্তু তাঁর বিষয়াসক্তি দূর হয় না। আর পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হলে বিষয় ও বিষয়তৃষ্ণা উভয়ই চিরতরে নিবৃত্ত হয়।)

বলছেন, শুধু স্থিতপ্রজ্ঞের কথা কেন বলছ; যে রোগী বিছানায় পড়ে আছে, সেও তো কোন কিছু ভোগ করতে চায় না। একজন মহারাজ আমাদের বলতেন, 'ষাট, পয়ষট্টি বয়স হয়ে যাওয়ার পর শরীর ও ইন্দ্রিয়ের এমনিতেই আর ক্ষমতা থাকে না যে ভোগ করবে। কিন্তু ভিতরে যে কামনা-বাসনার বীজ জমে আছে, এগুলো তো যাবার না। বয়স্ক মানুষদের আগে থেকে যদি ইন্দ্রিয়নিগ্রহ না হয়ে থাকে, এই বয়সে যে তাদের ভিতরে কি জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়, কল্পনা করা যায় না'। যারা আত্মহত্যা করে, এদের প্রেতাত্মাদেরও এই দুরবস্থা হয়। কারণে তার মনটা তো থেকে গেছে, সেখানে সমস্ত কামনা-বাসনাগুলো রয়েছে, কথা বলতে চাইছে, কিন্তু কথা বলতে পারছে না, কাউকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু পারছে না, কারণ তার অঙ্গগুলি নেই। আবার বিশেষ ধরণের রোগ হলে, যেমন ডায়বেটিস হলে আর মিষ্টি খেতে পারে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মিষ্টির প্রতি প্রবল আসক্তিটা থেকে গেছে। এখানে 'বিষয়' এই শব্দটাকে নিয়ে আসবেন, বিষয় মানে ইন্দ্রিয় যে জিনিসগুলির প্রতি ধাবিত হয়, ইন্দ্রিয়ার্থ যা, বিষয়ও তাই, দুটো একই।

এবার এই শ্লোকে সাবধান করছেন, জোর করে তুমি ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ার্থ থেকে অর্থাৎ বিষয় থেকে টেনে আনতে হয়ত সমর্থ হলে, কিন্তু তাই বলে তুমি মনে করো না যে, তুমি একজন মহাত্মা হয়ে গেলে; উল্টে তুমি অনেক বিপদে পড়ে যেতে পার। এটা ঠিক যে লোকে দেখে বলবে, বাঃ আপনি তো খুব ইন্দ্রিয় সংযম করেছেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলির যে রস, সেই রসটা তোমার ভিতরে যে থেকে গেছে, সেটা বাইরের কেউ বুঝতে পারছে না, তুমি নিজেও বুঝতে পারবে না। বিশ্বামিত্রের কাহিনী আমরা সবাই জানি। বিশ্বামিত্র বিরাট তপস্বী, জোর তপস্যা করে যাচ্ছেন। কিন্তু স্বর্গের অপ্সরা মেনকা এসে এমন নৃত্য করতে শুরু করল, বিশ্বামিত্র অপ্সরা আর তার নৃত্য দেখে আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না, মুগ্ধ হয়ে ভোগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি ঋষি, একজন বড় সাধু, তপস্বী, সবটাই ঠিক; কিন্তু কামভাব, কামভোগের যে রস, সেই রসটা তাঁর ভিতরে থেকে গিয়েছিল। তিনি একজন রাজা ছিলেন, স্ত্রী ছিল, পুত্র ছিল; স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য সব ত্যাগ করে দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু কাম রিপু, তার যে রস, সেটা থেকে গেছে।

বিষয়রস একেবারে কখন যায় না। আর যেমনি সুযোগ পায়, ঠিক সময়, ঠিক জায়গায় গাছের ডালপালা বেরিয়ে আসে। ঠাকুর অশ্বত্থ গাছের উপমা দিচ্ছেন। একটা পোড়ো বাড়ি, সেখানে একটা ছোট্ট অশ্বত্থ গাছ মাথা চাড়া দিয়ে উঁকি মারছে। কবে একটা ছোট্ট বীজ সেখানে পড়েছিল, সেই বীজ থেকে এখন একটা গাছ বেরিয়েছে, কালে এক বিশাল বৃক্ষে পরিণত হবে। যারা জোর পূর্বক ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে টেনে নিয়েছে, এটাকে কেউ নিন্দা করছে না, যত দিন টেনে রাখছে এটাই তার কৃতিত্ব। কিন্তু সাবধান করছেন, তুমি যদি নিজেকে জোর করে বিষয় থেকে টেনে নিয়েছ, তার মানে এই নয় যে তুমি মহান্ হয়ে গেলে। কারণ, *বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ*, যে নিরাহারী, বিষয় থেকে যে কোন কারণে সরে এসেছে, সে একজন মহৎ কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু বিষয়ের রস তার থেকে যায়।

রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্টা নিবর্ততে, এই একটা লাইনে সত্যটাকে কিভাবে রাখছেন কল্পনা করা যায় না। ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন, মিছরির শরবৎ খেলে চিটে গুড়ের পানা ভাল লাগে না। চিটে গুড় মানে, আখের রস জাল দিয়ে রিফাইন করার পর যে বর্জ্য অংশটা পড়ে থাকে, সেটাকে চিটে গুড় বলে। চিটে গুড় গরুকে খাওয়ানো হয়। চিটে গুড়ের পানা, মানে এক বালতি জলে হয়ত দু চামচ চিটে গুড় গুলে দেওয়া হয়েছে, হাল্কা একটু মিষ্টি মিষ্টি লাগবে।

অশ্বত্থামার বাবা দ্রোণাচার্য খুব গরীব ব্রাহ্মণ ছিলেন। অশ্বত্থামার বন্ধুরা দুধ খাচ্ছে, তারও ইচ্ছে হল সে দুধ খাবে। মায়ের কাছে গিয়ে দুধ খাওয়ার আবদার করল। মা কোথা থেকে ছেলেকে দুধ দেবে, তাদের গরু নেই, টাকা নেই। মা জলে একটু আটা গুলে দিয়ে বললেন, এই নাও বাবা দুধ খাও। বাচ্চা ছেলে, সেও বলতে লাগল, আমি দুধ খাচ্ছি। বন্ধুরা বলছে, ওটা দুধ না, ওটা আটা গোলা জল। সেই সময় দ্রোণাচার্য ওখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এই ঘটনাটা দেখে ওনার মনটা ভেঙে গেল, আমি আমার ছেলেকে দুধ পর্যন্ত খাওয়াতে পারছি না। তখন উনি চাকরির জন্য কৌরবদের কাছে গেলেন।

যে একবার দুধ খেয়েছে, তাকে আর আটা গোলা জলকে দুধ বলে খাওয়ানো যাবে না। যে একবার মিছরির শরবৎ খেয়েছে, সে আর চিটে গুড়ের পানা খেতে চাইবে না। যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেছে, যিনি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন, তিনি এই ইন্দ্রিয় জগতের আনন্দে কখনই থাকবেন না। ঠাকুর একেবারে নিজের উপলব্ধি থেকে বলছেন, ঈশ্বর দর্শনের পর রম্ভা, তিলোত্তমাকে চিতার ভস্মের মত মনে হয়। যে কোন ভাল জিনিসের কেউ যদি আস্বাদ করে নেয়, এখন যদি তাকে কম্প্রোমাইজ করতে হয় করবে, কিন্তু রমতে, রমণ করা অর্থাৎ আহা কি সুখ, কি আনন্দ; এই জিনিস আর হবে না, এগুলো আর ভাল লাগবে না। মজা করার জন্য হয় বলতে পারে, হ্যাঁ এই নিয়ে কত কি করেছি। যেমন আগেকার দিনে গরুগাড়ি চলত, ছোটবেলায় গরুগাড়িতে চড়াটাও খুব মজা লাগার ব্যাপার ছিল। একবার যেই ট্রেন, প্লেন, বাস, ট্যাক্সি চড়া শুরু করলাম, তারপর সখ করে কখন সখন গরুগাড়িতে উঠলাম সেটা আলাদা, কিন্তু গরুগাড়ি যানবাহনের একটা প্রধান অবলম্বন কোন দিন আমার কাছে তা আর মনে হবে না। আমাকে কেউ যদি বলে, চলুন গরুগাড়ি করে আপনাকে এখান থেকে দিল্লী নিয়ে যাচ্ছি, এতে রাজী হওয়া অসম্ভব আমার কাছে ।

রসবর্জং রসোঽপ্যস্য, বিষয়ের যে রস, সেটাও ত্যাগ হয়ে যায়। কবে? *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্তন্তে*, পরম্, মানে সবার উপরে, সব কিছুর পারে। সব কিছুর পারে, সবার উপরে কে? একমাত্র ঈশ্বর, যাঁকে আমরা ব্রহ্ম বলি; ব্রহ্মই একমাত্র সব কিছুর পারে। ওই পরমের জ্ঞান যখন হয়ে যায়, ওই পরমের জ্ঞান আর তাঁর প্রতি ভালবাসায় যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন জাগতিক ছোটখাটো কোন ভালবাসা, কোন কিছুই তাকে আর আকর্ষিত করতে পারে না, এগুলো একদিকে পড়ে থেকে যায়। এই যে বোধ, ব্রহ্মই শেষ কথা, আর আমিই সেই ব্রহ্ম, এই জ্ঞানে একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, সে আর কোন দিকে যায় না।

আমরা যখন প্রথম মঠে জয়েন করি, তখন নূতন একটা কথা শুনতাম, Religious Management, Swami Vivekananda and Management, সবাইকে দেখতাম ম্যানেজমেন্টের উপর লেকচার দিয়ে যাচ্ছেন। তারপর এলো বিজ্ঞান, Vedanta and Science, ইদানিং এসেছে mind control। সবাই এখন mind controlএর উপর লেকচার দিয়ে যাচ্ছেন, এনাদের নিজের মন কত নিয়ন্ত্রণে আছে আমাদের ভাল জানা আছে, কারণ আমরা একই জাতের কিনা। আর-একজন ছিলেন, তিনি শুরু করলেন stress management নিয়ে। ওনার আশপাশে যাঁরা থাকতেন, ওনাকে যাঁরা জানতেন, তাঁরা ভাল করে জানতেন উনি সব সময় কি পরিমাণ stress নিয়ে থাকতেন। ওনার কাছের লোকেরাও ওনার stress দেখে stressed হয়ে যেতেন, অথচ সব জায়গায় উনি stress management নিয়ে বলতেন। এখন কত কি ম্যানেজমেন্ট এসেছে, stress management, anger management, time management, যদি দেখতাম একজনেরও কারুর এই সব লেকচার শুনে তার ম্যানেজমেন্ট ভাল হয়েছে। গীতার কথা জিজ্ঞেস করলে বলবে, গীতার জ্ঞান! all nonsense। কেন, এখানে একটু পরেই পরপর বলবেন, ধাপে ধাপে মনের অধঃপতন কি করে হয়, কেন হয়। এত মানুষ কেন আত্মহত্যা করছে? আসলে

মনের নিয়ন্ত্রণ এমনি এমনি মুখে বললেই হয়ে যায় না, মনের নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা ঠিক ঠিক আদর্শ দরকার। একটা উচ্চ আদর্শ যদি না থাকে সেটা হবে একটা এ্যডহক ম্যানেজমেন্টের মত; একটা কিছু হল আর জোড়াতাপ্পি মেরে দিলেন।

অনেক আগেকার কথা, দেওঘর বিদ্যাপীঠে একজন ইলেক্ট্রিসিয়ান ছিলেন। বিদ্যাপীঠের আর্থিক অবস্থায়ও তখন ভাল ছিল না, সন্ন্যাসী, ছাত্র কারুর ঘরে তখন পাখাও ছিল না, টিউব লাইট ছিল। কিন্তু ওখানে ভোল্টেজ খুব ফ্লাকচুয়েট করত, টিউব লাইটগুলো ভল্টেজ কম থাকলে ভুক্ ভুক্ করে জ্বলত আর নিবত। একটা টিউব লাইট অনেক দিন ধরে খারাপ হয়ে গিয়েছিল, ভুক্ ভুক্ করে যাচ্ছিল। ইলেক্ট্রিসিয়ানকে কমপ্লেন করে জানাতে হবে। প্রথমে তো ওকে ধরা যাবে না, যদি একবার ধরে আনা হয়, প্রথম দিন একবার দেখে চলে যাবে। তারপর আবার তাকে ধরা হল, কিছু করুন। এবার একটা সিড়ি এনে টিউব লাইটটাই খুলে নিয়ে চলে যেত। আর কোন সমস্যা থাকল না, মাঝখান থেকে আমাদের টিউব লাইটটাই চলে গেল। এরপর তিন চার বার কমপ্লেন করার পর কিছু একটা করবে। সমাধান সহজে করবে না, একটা এ্যডহক করে দেবে। বেশী হলে টিউব লাইটই খুলে নাও, আর কারুর চোখে পড়বে না। বিদ্যাপীঠের ক্যাম্পাসের রাস্তায় যত টিউব লাইট ছিল, তার একটা যদি ভুক্ ভুক্ করত, খুলে নিয়ে চলে যেত।

এভাবে হয় না, treatment যদি করতে হয় পুরোটাই treatment করতে হবে। কিভাবে treat করবে? *পরং দৃষ্টা নিবর্ততে*, যখন তুমি যা, যখন তুমি সেই তুমি হয়ে বসবে, তোমার সব চাঞ্চল্য ওখানেই শেষ হয়ে গেল। আমাদের সমস্যা, আমরা জানি না আমরা আসলে কি। মুখে বলে দিচ্ছে *অহং ব্রহ্মাস্মি*, মুখে বলে দিলেই অহং ব্রহ্ম হয়ে যাবে না। সাধনা করে, গুরুর কাছে শাস্ত্রের কথা শুনে অনুধ্যান করে, গুরুর মুখ থেকে যখন জানলেন আপনি ঈশ্বরের সন্তান, যখন জানলেন আপনি ঈশ্বরের সাথে এক, যখন জানলেন ঈশ্বরের পরম সত্তা, যথার্থ যে সত্তা, শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্ম, আপনি সেই শুদ্ধ চৈতন্যের সাথে এক, তখন সংসারের যত দু পয়সার ঝামেলা সব খসে পড়ে যায়।

বলছেন, *রসবর্জং রসোহপ্যস্য*, আমরা দৌড়াচ্ছি, এটা ভাল লাগে, সেটা ভাল লাগে; বিষয়রস ভিতরে আমাদের টগবগ করছে। যিনি সন্ন্যাসী, সংসার থেকে তিনি সরে এসেছেন ঠিকই, কিন্তু সংসারের কিছু কিছু বস্তুর প্রতি যে আকর্ষণ, সেটা কি চলে গেছে? না যায়নি। কিন্তু তিনি যদি চান, এই আকর্ষণ গুলি চলে যাক, তখন একটাই পথ –ঈশ্বরের সাধনায় ডুবে যাওয়া। ঈশ্বরের সাধনায় ডুবে থাকলে মন বিষয়ের থেকে কিছুটা সরে আসে। বিষয়ানন্দকে সরানো যাবে ভজনানন্দ দিয়ে। তাতেও কিন্তু পুরোটা ঠিক হয় না। কিন্তু সেখান থেকে যখন ঈশ্বরের জ্ঞান প্রাপ্তি হয়, তখন হয় ব্রহ্মানন্দ। ঠাকুর এই তিন প্রকার আনন্দের ঠিকানা দিলেন, বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ। এই ব্রহ্মানন্দের আনন্দ যখন পায় তখন বিষয়ানন্দ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়।

সাংসারিক ভাব থেকে যাঁরা নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন, শাস্ত্রে বলছে খুবই ভাল। কিন্তু তখন প্রশ্ন ওঠে, কেন, আমরা তো দেখেছি তাঁদের মধ্যে অনেকের পতন হয়ে যায়, পুরাণেই আমরা বিশ্বামিত্র আদির ঘটনা পাই, তাহলে এভাবে সরিয়ে নিয়ে কি লাভ হল? সাধনা করতে গিয়ে আমি যদি সফল নাই হতে পারি, তাহলে কেন আমি সাধনা করব? ভগবান তখন বলছেন, মানুষ যখন জোর করে নিজেকে সরিয়ে নেয় এবং সরেও আসে, কিন্তু মনের ভিতরে ওই জিনিসগুলোর চাহিদাটা থেকে যায়। যতক্ষণ ঈশ্বর দর্শন বা আত্মজ্ঞান না হয়, ততক্ষণ ভয় থেকেই যায়। ঠাকুর বার বার বলছেন, আগে ঈশ্বর লাভ কর, তারপর নির্ভয়ে সংসার কর। ঈশ্বর জ্ঞান যদি না থাকে, মানুষকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে বুঝতেই পারবে না। মানুষ যদি নিজেকে জোর করেও সরিয়ে নেয়, ঘরসংসার ভাল লাগছে না, অশান্তি লেগেই আছে, চলে গেল হিমালয়ে। এভাবে হয় না, কারণ নেউলের লেজে ইট বাঁধা আছে, আবার তাকে টেনে নামিয়ে আনে।

এই বিষয়রস আমার আপনার সবারই ভিতরে থাকে, ফলে যেমনি ইন্দ্রিয় আর তার বিষয় কাছাকাছি চলে আসবে, সব কিছু এলেমেলো হয়ে যাবে। বলে যে, পুরুষ মানুষ ভাল, নারীও ভাল, কিন্তু যখন কাছাকাছি আসে, সব এলেমেলো হয়ে যায়। কি রকম? মাটি ভাল, জলও ভাল, কিন্তু দুটো যখন মিলে যায় তখন কাদা হয়ে যায়। সেইজন্য বলা হয়, যেটা ভোগ্য বস্তু, ইন্দ্রিয়ার্থ যেটা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের জন্য যে জিনিসগুলো রয়েছে, সংসারের যা কিছু ভোগবস্তু আছে, এর থেকে সরে আসতে হয়।

স্বামী অদ্ভুতানন্দ মহারাজ, ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান, লাটু মহারাজ নামেই বেশী পরিচিত, তিনি বিহারের ছাপড়া জেলার ভূমিপুত্র। সেখানে গ্রাম দেশে তাড়ি খাওয়ার একটা রেওয়াজ ছিল, তিনিও হয়ত কোন সময় গ্রামের লোকেদের খেতে দেখে থাকবেন বা নিজেও কোন সময় খেয়ে থাকবেন। ঠাকুরের কাছে এসে তিনি আশ্রয় পেয়েছেন, ঠাকুরের অনেক কথা শুনছেন। যেদিন তিনি এই কথা শুনলেন, তারপর থেকে যে রাস্তায় মদ বিক্রী হয়, সেই রাস্তাকে পরিহার করার জন্য বিরাট লম্বা ঘুরে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসতেন। যাঁরা ঈশ্বরের জন্য সাধনা করছেন, জ্ঞানলাভ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের বিষয় থেকে দূরে থাকা অত্যন্ত দরকার। যদি দূরে না থাকেন তাহলে কি হতে পারে? এখান থেকে আমরা এখন শুরু করছি। পরের শ্লোকে বলছেন –

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ।।৬০।।

(হে কুন্তীপুত্র, বিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয়গুলি অতি যত্নশীল মেধাবী (শাস্ত্রজ্ঞ) পুরুষের মনকেও বলপূর্বক বিষয়াভিমুখে আকর্ষণ করে।)

যাঁরা সাধন-ভজন করছেন, একটা ভাল জীবন-যাপন করছেন, তাঁদের জন্য এই ষাট নম্বর শ্লোক খুব মূল্যবান। এটাকে তাঁদের মুখস্ত করে মাথার মধ্যে বসিয়ে রাখাটা খুব দরকার।

যততো হ্যপি, খুব প্রযত্ন করে যাচ্ছেন, অর্থাৎ খুব জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তার সাথে তাঁর বুদ্ধিও রয়েছে, এই শ্লোকে তাঁদের কথা বলছেন। যারা মন্দ বুদ্ধির তাদের দ্বারা ধর্ম হয় না, মুর্খদের দ্বারা ধর্ম হয় না। এই সংসারে যাঁরাই ধর্ম জগতে বড় বড় গুরু হয়েছেন, তাঁরা হয়ত খাতা কলমে শিক্ষা পাননি, যেমন প্রফেট মহম্মদ, ঠাকুরও পাননি, কিন্তু সবাই প্রচণ্ড মেধাবী ছিলেন, আর সাংঘাতিক বুদ্ধি ধরতেন। যাঁরা চেষ্টা করছেন, বলছেন *বিপশ্চিতঃ*, তাঁরা আবার মেধাবী, বুদ্ধি খুব ভাল। কিন্তু তাঁরাও যদি ভোগ বস্তুর মধ্যে থাকেন, তাঁদের ইন্দ্রিয়কে প্রমথন করে দেয়, ক্ষুভিত করে দেয়। দইকে মন্থন করে মাখন বা ঘি তৈরী করা যদি কেউ দেখে থাকেন, তাহলে তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, দইকে যখন মন্থন করা হয়, তখন কিভাবে একটা ঘুর্নির মত তৈরী হয়ে যায়। আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় তার বিষয়গুলোকে যখন ভিতরে নিতে থাকে, তখন সেখানে এমন মন্থন শুরু হয়ে যে কল্পনা করা যায় না। আর বাকি পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়কে আদেশ করতে থাকে, তোমাকে এটা করতেই হবে। কারুর হয়ত গান খুব ভাল লাগে, একটা কোথাও গান হচ্ছে, সেটা তার কানে এসে একটু ধাক্কা মেরেছে, তাতেই তার কর্ণেন্দ্রিয় এমন মন্থন হয়ে যাবে যে, সে তার পদযুগলকে বলবে, তুমি আমাকে ওখানে নিয়ে চল। পা বেচারী আর কি করবে, সে চলতে শুরু করে দেবে। আমরা বলি, মন ইন্দ্রিয়কে নাচিয়ে দেয়, না, নাচানো না, নাচানো অত্যন্ত সাধারণ শব্দ, ওটা হয়ে যায় মন্থন। নদীতে যখন স্পীড বোট চলে, তখন তার পিছনের দিকে জল কি প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে থাকে, ঐটা দেখলে বুঝতে পারা যাবে ইন্দ্রিয়গুলির কি দুরবস্থা হয়।

এখানে যাঁরা বিবেকযুক্ত, সাধারণ লোকেদের থেকে যাঁরা উপরে, তাঁদেরকে নিয়ে বলছেন। আমাদের প্রায়ই প্রশ্ন করে, আমি তো চেষ্টা করেও পারছি না। তুমি কি পারবে, বিশ্বামিত্রের মত অত বড় ঋষিও পারলেন না। স্বর্গের অপ্সরা মেনকা এসে নাচ শুরু করতেই বিশ্বামিত্রের ভিতরে যে রসবোধ সঞ্চিত হয়ে ছিল, সেটা বেরিয়ে এল, বেরিয়ে এসে বিশ্বামিত্রের মনকে মন্থন করে দিল। কিন্তু পরে তিনি নিজেকে সামলে নিয়েছেন। এরপর রম্ভা যখন এলো, তাকে দেখেই বিশ্বামিত্র বললেন, ভাগ্ এখান থেকে, তা নাহলে তোকে আমি এক্ষুণি ভস্ম করে দেব। রম্ভা ভয়ে প্রাণ নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

ভিতরের এই রস থেকে কোন উপায় নেই বাঁচার। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ নিজেকেই করতে হবে, কেউ অপরের হয়ে করে দিতে পারবে না। যদি মনে করি, ঠাকুর আছেন ঠাকুরই আমার ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়ে দেবেন, ঠাকুর না হোক আমার গুরু করে দেবেন; কিংবা কৃষ্ণ এসে করবেন। কেউ করবেন না, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করতে হবে নিজেকে। বাচ্চাদের যেমন আমরা উৎসাহ দিয়ে থাকি, সেই রকম আমাদেরও বলা হয়, ঠাকুর আছেন, তিনি সব শুনছেন, তিনি সব দেখছেন, তিনি সব জানেন, শেষে তিনিই রক্ষা করবেন। কিন্তু তা হয় না, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ আপনাকে নিজেকেই করতে হবে। কেউ যদি এই আশায় বসে থাকেন, তিনি রক্ষা করবেন, তাহলে তিনি খুব ভুল পথ বেছে নিলেন। শাস্ত্রও এই কথা বলছেন না যে, তিনি আমার ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করে দেবেন। এখন কোন গুরু যদি বলে থাকেন, 'তোমার কোন চিন্তা নেই, আমি আছি, আমিই সব কিছু দেখব'; সেখানে আমাদের বলার কিছু নেই। আমরা এখানে শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি, শাস্ত্রের ভাষ্যকাররা যেভাবে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে গেছেন, আমাদের সেটাই অনুসরণ করতে হবে।

ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথিনী, আচার্য এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, *আকুলীকুর্বন্তি*, বিষয় থেকে যে পুরুষ বিমুখ হয়ে আছে, তার মনকেও ব্যাকুল করে দেয়। বাচ্চা যেমন কোন কিছু না পেলে, ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করে, আমাদের ভিতরের ইন্দ্রিয়গুলোর অবস্থা ঠিক সেই রকম হয়। সেইজন্য সাবধান করে দিচ্ছেন, ইন্দ্রিয়ের যে বস্তুগুলো আছে, যাকে আমরা ইন্দ্রিয়ার্থ বা বিষয় বলছি, তার ধারে কাছে যেতে নেই। ঠাকুর বলছেন, যত সেয়ানাই হও না কেন, কাজলের ঘরে ঢুকলে একটু না একটু দাগ লাগবেই। বিষয়ের ধারে কাছে ঘুর ঘুর করলেই ইন্দ্রিয়ের এই দশা হবেই। পরে এই ভাবটাকেই গীতায় আবার পুনরাবৃত্তি করা হবে। সেইজন্য এখানে বলছেন –

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৬১।।

(অতএব, যোগী সেই ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করে সমাহিতভাবে আত্মস্থ হয়ে অবস্থান করবেন। কারণ যাঁর ইন্দ্রিয়সমুদয় বশীভূত হয়েছে, তাঁরই বিবেকজা (ঋতম্ভরা) প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ।)

অর্জুনের প্রশ্ন ছিল স্থিতপ্রজ্ঞ কে? ভগবান একেবারে পরিষ্কার করে বলছেন; প্রজ্ঞা কার প্রতিষ্ঠিত হয়? ইন্দ্রিয় যাঁর সংযমে আছে। কিন্তু আমরা কি পারব ইন্দ্রিয়ের সংযম করতে? পারব না। কেন পারব না? এই যে আগে বলা হল, *রসবর্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্টা নিবর্ততে*, আমি ইন্দ্রিয়গুলির চোখে ঠুলি লাগিয়ে দিলাম, তাতেও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হবে না। কারণ আমাদের মনের ভিতরে আগে থেকেই যে স্মৃতিগুলি রয়েছে, সেই স্মৃতিগুলি জলের তল দেশ থেকে ভুরভুরি উঠে জলের উপরি ভাগে যেমন তরঙ্গ সৃষ্টি করে, তেমনি মনের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবে। জোর করে কখন কিছু হয় না, বিশেষ করে ইন্দ্রিয় সংযম তো জোর করে একেবারেই হবে না। ইন্দ্রিয়কে প্রথমে একটু একটু করে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি থেকে টেনে নিয়ে আসতে হয়, এবং তার সাথে একটা উদ্দেশ্য রাখতে হয়। যেমন ঠাকুর বলছেন, তুমি যত পূব দিকে যাবে, তত তুমি পশ্চিম দিক থেকে সরে আসবে।

এখানে একটা স্থূল উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যদিও এটা শাস্ত্রের সাথে মিলবে না। একজন পরিচিত এসে বললেন, আমাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকে, আমরা ডিভোর্স নেব। আমি তাকে বললাম, 'ডিভোর্স নিয়ে তুমি কি করবে, তোমার লাভ কি হবে? তোমার চোখে তোমার স্ত্রীর থেকে আরেকজন কেউ ভাল আছে'? 'না নেই'। 'তাহলে তুমি ডিভোর্স নিয়ে স্ত্রীর কাছ থেকে বেরিয়ে করবেটা কি'? যাই হোক, একটা লম্বা আলোচনা হল। উনি বুঝতে পেরেছেন আমি কি বলতে চাইছি।

আমরা প্রায়ই অনেক সময় বলি, আমি আর এই জিনিস সহ্য করতে পারছি না; আমি বাড়ির লোকদের সহ্য করতে পারছি না, আমি আমার কর্মস্থলের লোকগুলিকে সহ্য করতে পারছি না। চাকরি সহ্য করতে পারছে না, তাহলে ছেড়ে দাও চাকরি। কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিলে তোমাকে মাসের শেষে মাইনেটা কে দেবে, ভেবে দেখেছ? তবে যদি কেউ দেখে, একটা ভাল চাকরি তার জন্য অপেক্ষা করছে, চলে যাও সেখানে। কিন্তু তোমার সামনে এই চাকরি ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই, তখন যতই তোমার রাগ হোক, যতই তোমার মন খারাপ হোক, তোমাকে ওই চাকরিতেই পড়ে থাকতে হবে, বোকার মত চাকরি ছেড়ে দিও না। ঠাকুর এক জায়গায় সাঙ্গপাঙ্গোদের সঙ্গে গেছেন। সেখানে তাঁদের ঠিক ভাবে সমাদর করা হয়নি। রাখাল রেগে গিয়ে বলছেন, 'চলুন আমরা চলে যাই'। ঠাকুর রাখালকে বলছেন, 'ফাক্কা রোখ করে কি হবে, গাড়ি ভাড়া কে দেবে, আর দক্ষিণেশ্বরে এত রাতে গিয়ে খাবোটা কি'? কথাগুলো শুনতে অত্যন্ত সহজ মনে হয়, কিন্তু অত সহজ না, অনেক গভীর তত্ত্ব আছে। আপনি এই চাকরিটা ছেড়ে দেবেন বলছেন, এর পিছনে আপনার কি কোন সাপোর্ট আছে? চাকরি ছেড়ে আপনি করবেনটা কি?

আপনার ভিতর খুব রোখ আছে, আপনি ইন্দ্রিয় সংযম করে নিলেন। কিন্তু এবার ইন্দ্রিয়গুলি কি নিয়ে থাকবে? আপনি নিজেকে জগৎ থেকে টেনে নিলেন, সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে আনলেন। কিন্তু ভেবে দেখেছেন, এরপর কি নিয়ে থাকবেন? এখানে এসে গোলমাল বাঁধে। আমরা অনেক সাধু, অনেক গৃহস্থদের দেখেছি, তাঁরা নিজেকে সংসার থেকে টেনে নিয়েছেন, স্বাভাবিক ভাবে ইন্দ্রিয়গুলিও বিষয় থেকে সরে আসে। কিন্তু কিছু দিন পরেই ছটফট করতে শুরু করে, এবং পরিণতি স্বরূপ ভিতরের রাগ আদি রিপুগুলি অনেক বেড়ে যায়, নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন না। তার থেকেও যেটা মারাত্মক, মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। মাথা খারাপ হওয়ার জন্য মানুষের সঙ্গে তার ব্যবহারটাও রুক্ষ হয়ে যায়। এর মূল কারণ হল, একটাকে তো ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আর-একটাকে যে ধরবে, সেটার দিকে একেবারেই নজর দেওয়া হয়নি। বানর একটা ডাল থেকে ঝাঁপ মারতে যায়, তখন সে জানে আমাকে এই ডাল ছেড়ে ওই ডালটা ধরতে হবে। যদি না ধরতে পারে, ধপাস করে নীচে পড়ে মারা যাবে।

সেইজন্য বলছেন, *তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ*। গীতার এই *মৎপরঃ* শব্দটা অত্যন্ত সুন্দর একটা শব্দ, আর এই শব্দ গীতায় অনেকবার আসবে। আচার্য *মৎ* শব্দের খুব সুন্দর বিশ্লেষণ করছেন। *মৎ* শব্দের সাথে জুড়ে আছে শ্রীকৃষ্ণের এই কথা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে এখানে এনে বলছেন, *অহং বাসুদেবঃ সর্বপ্রত্যগাত্মা পরো যস্য মৎপরঃ*, অর্থ হল, সবারই অন্তরাত্মা আমি সেই বাসুদেব। আর *পরঃ* মানে শ্রেষ্ঠতম। প্রথম তাঁকে বুঝতে হবে, ঈশ্বর হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই ঈশ্বর সবারই অন্তরাত্মা, দ্বিতীয় সেই ঈশ্বর সবারই হৃদয়ে বাস করেন। আর তৃতীয় হল, সাধক বলবে, আমি তাঁর সাথে অভিন্ন। এখানে যার যেমন ভাব, কেউ বলতে পারে, আমি ঈশ্বরের ভক্ত, কেউ বলতে পারে আমি ঈশ্বরের সন্তান, আমি ঈশ্বরের সাথে এক, সবটাই ঠিক, তাতে কিছু আসে যায় না। চৈতন্যের সাথে যতক্ষণ আমি নিজেকে এক মনে করছি, ততক্ষণ ঠিক আছে। তিনটে ভাব আনতে হয়, প্রথম জগতে যা কিছু আছে, জগতে যত ভোগের বস্তু আছে, জগতে সম্মানের যত বস্তু আছে, জগতে পাওয়ার মত যা কিছু আছে, সব কিছুর থেকে শ্রেষ্ঠ ভগবান।

পরে এক জায়গায় আচার্য ব্যাখ্যা করে বলবেন, একজন কামাসক্ত পুরুষ রমণীতে মনটা পুরো দিয়ে রেখেছে, কিন্তু সেও জানে ঈশ্বর এই রমণী থেকে উপরে। এই জিনিসটাকে বোঝা – সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম কে, ভগবান; এটা বুঝতে হয়। সেই ভগবান কে? যিনি সবারই হৃদয়ে বাস করেন। আমার সাথে সেই ভগবানের কি সম্পর্ক? কোন না কোন রূপে তুমি তার সাথে এক। এই ভাবের মধ্যে মনকে পুরো বসিয়ে দিতে হয়। মন বসে গেলে কি হয়? ইন্দ্রিয়গুলোর মনমড়া হয়ে নিজের জায়গায় বসে থাকে, তার সব দাপাদাপি বন্ধ হয়ে যায়। কথায় বলে, ফাঁকা মন মানে চঞ্চল মন। বাচ্চা ছেলেকে যদি কোন কিছুতে ব্যস্ত না রাখা হয়, তা নাহলে সে সারা বাড়ি দাপিয়ে বেড়াবে, তার দুরন্তপনায় বাড়ির লোকরা নাজেহাল হয়ে যাবে। কিন্তু বাচ্চাকে যদি একটা খেলার মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হয়, বা কোন হাতে কাজের মধ্যে বা তার যে কোন পছন্দের কাজের মধ্যে আটকে রাখা হয়, তখন সে ঠিক থাকে। আমাদের মনের অবস্থাও বাচ্চার মত, একটা সুনিশ্চিত ভাবে যদি কিছু না দেওয়া থাকে মন চঞ্চল হয়ে থাকবে। যেমন ইন্দ্রিয়ের বস্তুগুলো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আসবে, তখন মন চঞ্চল হয়ে উঠবে। ঈশ্বর আছেন, আমি সেই ঈশ্বরের সাথে এক, এই ভাবটাকে নিয়ে মন যদি পুরো স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে, ইন্দ্রিয়গুলিকে যদি পুরো সংযম করে রাখতে পারে, তখন কিন্তু ফাঁকা থাকলেও মন আর চঞ্চল হবে না।

সবাই এসে বলে, মহারাজ মন স্থির হয় না; কি করে মন স্থির করব? মন তো তোমার স্থির আছে, মন যদি স্থির না থাকত, তাহলে তো তোমাকে পাগলা গারদে ভরে দিত। যারা বলে, আমি কি করে মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখব, তাদের জন্য এটাই বলতে হয়, পাগল বাদে সবারই মন নিয়ন্ত্রণে থাকে। বাচ্চা মানেই চঞ্চল, কিন্তু তাকেও যদি টিভিটে তার মনের মত কার্টুন চালিয়ে দেওয়া হয়, সে মন দিয়ে সেটাই স্থির হয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে থাকবে। আমাদেরও আমাদের মনের মত কোন কিছু, কোন সিরিয়াল, সিনেমা, ক্রিকেট ম্যাচ চালিয়ে দেওয়া হয়, একেবারে একাগ্র মন দিয়ে আমরা দেখতে থাকব। মনের একাগ্রতা না হওয়াটা সমস্যা না, সমস্যা হল, যে কাজগুলো আমার কাছে আসছে, সেই কাজে আমার মন যায় না। যেমন খেলার সময় বাচ্চারা পুরো মন লাগিয়ে খেলে, কিন্ত পড়াশোনা করার সময় সেই মনটাকে লাগাতে পারে না, কারণ পড়াশোনাতে তার মন যায় না। একাগ্রতার সমস্যা নেই, আমাদের এটা ভুল ধারণা, আমরা প্রায়ই বলি, আমার একাগ্রতার বড় অভাব, কিছুতেই মনটাকে একাগ্র করতে পারি না। যে বলে আমার একাগ্রতা নেই, তাহলে তাকে কোন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। পাগল ছাড়া একাগ্রতার অভাব কারুর হয় না, শুধু যে কাজটা আমার করা দরকার, সেই কাজটা আমার করতে ইচ্ছা করে না। এখানে একাগ্রতার জন্য ট্রেনিংএর দরকার পড়ে না, দরকার সেই ট্রেনিংএর যে ট্রেনিংএ আমাকে শেখাবে কি করে কাজকে ভাল লাগাতে হবে। যদি তাকে বোঝান যায় যে, কেন এই কাজ করাটা তার জন্য দরকার, কেন সেই কাজ মন দেওয়াটা দরকার, নিজে থেকেই তখন কাজে মন চলে যাবে।

সমস্যা কখন একাগ্রতাকে নিয়ে না, সমস্যা হল যে জিনিসটা করা হচ্ছে, সেটাকে নিয়ে। মন যখন বুঝে নেয় আমাকে ঈশ্বরের ভাবে থাকতে হবে, তখন তার মন নড়বে না। কোন মানুষ যদি নিজের স্ত্রীকে ঠিক ঠিক ভালবাসে, সে কখন অন্য নারীর দিকে মন দেবে না। যদি ভালবাসা না থাকে, তখন এদিকে সেদিক মন যাবে। আমিও যদি আমার অন্তরাত্মাকে ঠিক ঠিক ভালবাসি, ঈশ্বরকে যদি ঠিক ঠিক ভালবাসতে পারি, জগতের দিকে কক্ষণ মন যাবে না।

তাহলে ইন্দ্রিয় সংযম কিভাবে হবে? সবার আগে বুঝতে হবে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের স্বরূপ কি। ঈশ্বর, তাঁর স্বরূপ কি? তিনি শুধু আমার আপনার না, সবারই অন্তরাত্মা; সেই জায়গাতে মনকে স্থির করে দেওয়া। যখন মন পুরোপুরি স্থির হয়ে যায়, সেই অবস্থায় কোন দিন আর ইন্দ্রিয় চঞ্চল হবে না,

তাকে বলা হয় স্থিতপ্রজ্ঞ। যদি এটা আমরা না করি, যেটা আমরা কেউই করি না; জানেন সবাই কিন্তু কেউ করে না। এখান থেকে ভগবান একটা নূতন বিষয়কে নিয়ে এবার বলতে যাচ্ছেন।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।।৬২।।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।।৬৩।।

(বিষয়সমূহ চিন্তা করতে করতে সেই বিষয়গুলিতে মানুষের আসক্তি জন্মায়, আসক্তি থেকে কামনা (তৃষ্ণা) হয়, কামনা প্রতিহত হয়ে ক্রোধে পরিণত হয়, ক্রোধ থেকে কর্তব্যাকর্তব্যরূপ বিবেকনাশ এবং বিবেকনাশ থেকে শাস্ত্র এবং আচার্যের উপদেশজনিত সংস্কারের স্মৃতিবিলোপ, স্মৃতিবিভ্রম থেকে পুরুষের সদসদ্‌বিচারবুদ্ধি বিনষ্ট হয় এবং বিচারবুদ্ধি বিনষ্ট হলে মানুষ পুরুষার্থের অযোগ্য হয়।)

এতক্ষণ একটা উচ্চ দর্শন ও উচ্চ চিন্তন নিয়ে বলে যাচ্ছিলেন –ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান নিয়ে বলছিলেন। সেখান থেকে এবার একেবারে ব্যবহারিক জীবনে চলে আসছেন। এই অংশটাকে আমরা বলতে পারি সর্বনাশের কারণ আর তার নিদান। জীবনে সর্বনাশ কেন নেমে আসে? আমার আপনার জীবনে বা আমাদের কোন না কোন পরিচিত ব্যক্তি অবশ্যই এই কথা বলেছে, আমার জীবনের সর্বনাশ হয়ে গেছে, আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি, আমারা সব শেষ হয়ে গেল। গীতা এই দুটি শ্লোকে পুরো বিশ্লেষণ করে দেখাচ্ছেন, মানুষের জীবনে কিভাবে চূড়ান্ত সর্বনাশ নেমে আসে, কেন হয়। তারপরে আবার এর নিদানের উপায় বলবেন, কি করে এর থেকে বাঁচা যায়।

আপনার জীবনে কি দুঃখ আছে? আপনার কি মনে হয় আপনার জীবন প্রায় শেষ? আপনি কি মনে করছেন আপনার জীবন নাশ হয়ে গেছে? আপনি কি মনে করছেন আপনার জীবনে শান্তি নেই বা শান্তি খুঁজে পাচ্ছেন না? আপনি কি মনে করেন, চিতায় ওঠার পরেই আপনার শান্তি হবে? আপনি কি কাউকে জানেন যার depression আছে? আপনি কি কাউকে জানেন কারুর মধ্যে আত্মহত্যা করার প্রবণতা আছে? জীবনে মনের যত রকম সমস্যা হতে পারে, সাইকলজি, সাইকেয়েট্রি, সমস্ত কিছুকে ভগবান মাত্র এই দুটি শ্লোকের মধ্যে রেখে দিয়েছেন।

যাদের অবসাদ আছে, আত্মহত্যার প্রবণতা আছে, এদের দুটো জিনিস হয় – একটাকে বলে এণ্ডোজেনিক, যাতে বলা হয় যে তার মস্তিষ্ক ম্যাল ফাংশানিং করছে। আর দ্বিতীয়টা হল, যেটা চিন্তা-ভাবনা থেকে হয়। এই চিন্তা-ভাবনাটাই ধীরে ধীরে মস্তিষ্কে সত্যিকারের ডিস-অর্ডার এনে দেয়। যেমন আমার হাতের উপর যদি রোজ জোরে জোরে আঘাত করতে থাকি, প্রথমে ব্যাথা হতে শুরু হবে, ব্যাথা হতে হতে একদিন হাতটা ভেঙে যাবে। মনেও ঠিক তাই হয়, মারতে মারতে একদিন ভেঙে যায়। মন ভেঙে গেলে ডাক্তারের ওষুধ ছাড়া ওটা আর ঠিক হয় না। কিন্তু পুরো যদি না ভেঙে থাকে, তখন মনোবিদের কাছে গিয়ে কাউন্সেলিং করাতে বলে। এই সব কিছুকে পুরো দুটি শ্লোকের মধ্যে বলে দিয়েছেন। ফ্রয়েডের যত থিয়োরী, মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানে যা কিছু আছে সবটাই এই দুটি শ্লোকে বলে দেওয়া হয়েছে। মানুষের সমস্ত নাশের যে মূল, এই দুটি শ্লোকে দেখিয়ে দিয়েছেন।

এখানে ক্রোধকে নিয়ে আলোচনা করবেন। ঠাকুর একবার মথুরবাবুর সঙ্গে ঘোড়াগাড়ি করে যাচ্ছেন। ঠাকুর বেশীর ভাগ সময় বিভিন্ন ভাবে থাকতেন। ঘোড়াগাড়ি করে যাচ্ছেন, সেই সময় হঠাৎ তাঁর ভাব হল যে, রাবণ সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে, জটায়ু রাবণকে আক্রমণ করেছে, রাবণের রথকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। উনি ওই ভাবাবস্থায় গিয়ে এসব ভাবছেন। সেই সময় একটা দুর্ঘটনা হয়ে ঘোড়াগাড়িটা ভেঙে গেল। ঠাকুর তখন মথুরবাবুকে বললেন, এতক্ষণ তাঁর মনের ভিতর

কি হচ্ছিল। মথুরবাবু ঠাকুরকে বলছেন, বাবা, আপনার সাথে আমার গাড়ি চাপা যাবে না। আপনি কখন কি ভাবে চলে যাবেন, আর সেই ভাব থেকে কি অঘটন ঘটবে কোন ঠিক নেই।

ঘটনাটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা যখন কারুর উপর ক্রোধ করি, সেই ক্রোধটা ঘুরে আমাদের কাছে চলে আসে। এই দুটি শ্লোক ক্রোধকে কেন্দ্র করে ক্রোধের পিছনটা আর ক্রোধের সামনের দিকটা নিয়ে আসবেন। ইদানিং anger managementএর আলোচনাতে এই কথাগুলো প্রচুর আসে। যেমন বলা হয়, ক্রোধ এলে এক থেকে দশ পর্যন্ত গুণতে থাকবে, এই ধরণের আরও অনেক কথা বলা হয়। গীতা এই জিনিসগুলিকে আনবেন না, গীতা পুরো মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে দেখাচ্ছেন, জিনিসগুলো কিভাবে হয়। জিনিসটাকে একবার বুঝে নিলে, তারপর তাকে সামলানো সহজ হয়। বলা হয়, শত্রুর বাসস্থানটা যদি জানা যায়, শত্রুকে নাশ করা সহজ হয়ে যায়।

ধ্যায়তো বিষয়ান্, বিষয় মানে ইন্দ্রিয়ার্থ যাকে বলা হল, বস্তু যাকে বলা হল। এই বস্তুর যদি ধ্যান করা হয়, একটা জিনিসের বারবার চিন্তা করে যাচ্ছি, বস্তুটা মাথার মধ্যে ঘুরঘুর করে যাচ্ছে, তখন সেই বস্তুর প্রতি একটা সঙ্গ, একটা আকর্ষণ জন্মায়। এই বস্তু যে কোন জিনিস হতে পারে। প্রথমে শুরু হয় আমাদের নিজের শরীর দিয়ে। সেখান থেকে আসে আমাদের মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব। সেখান থেকে খেলনা, পছন্দের খাবার, সেখান থেকে বাড়ি, গাড়ি ইত্যাদিতে। একটা জিনিসকে দেখলাম, ভাল লাগল। আবার ভাবলাম, আরও ভাল লাগল। আরও ভাবলাম, আরও ভাল লাগল। এরপর জোঁকের মত সেই বস্তুর সাথে আমি এঁটে গেলাম। একজন মহারাজ বলতেন, একটা জিনিস দেখলে তোমার চোখে পড়ে যেতেই পারে। চোখে পড়লে ভাল লাগতেই পারে, মুখেও বললাম, 'বাঃ খুব সুন্দর তো', এটা হতেই পারে। কিন্তু এরপর যদি ওটাকে স্মৃতিতে নিয়ে আসা হয়, দ্বিতীয়বার যখন দেখার ইচ্ছা করবে, তখন বুঝতে হবে এবার কিছু গোলমাল হতে যাচ্ছে।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের সেবকের কাছে একটা ঘটনা আমরা শুনেছিলাম। একদিন মহারাজ ভক্তদের প্রণাম নিচ্ছেন, ভক্তরা প্রণাম করতে এসেছেন। একটা চার পাঁচ বছরের বাচ্চা তার মা-বাবার সাথে এসেছে। বাচ্চাটি একেবারে পুতুলের মত। একজন সেবক বাচ্চাটির থুতনি বা গালে হাত দিয়ে বলছে, 'বাঃ কি সুন্দর দেখতে'। মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে খুব জোর নিষেধ করে উঠলেন। আইডিয়াটা হল, তুমি সন্ন্যাসী, তোমার মনে এই ভাব আসা উচিৎ না। আমাদের শাস্ত্রে এটাকে বলে *শোভন অধ্যাস*, একটা দৃশ্য বা বস্তু বা কোন ব্যক্তিকে দেখে খুব সুন্দর লাগল, ভাল লেগে গেল, এরপর এই ভাল লাগাটাই বস্তুতে গিয়ে একটা attachment তৈরী হয়ে যায়। একজন যুবক একটা চাকরি চায়, সে আগে থেকেই মন ঠিক করে রেখেছে, আমি ডাক্তার হব। আমি ডাক্তার হব, এটাকে সে এতবার ভেবেছে যে, সে আর তার কামনা এক হয়ে গেছে। একজন চাইছে, আমাকে একটা গাড়ি কিনতে হবে, আমার এই কোম্পানির এই মডেলের গাড়ি চাই, সেও এই ভেবে ভেবে তার কামনার সাথে এক হয়ে যায়। মা সীতা সোনার হরিণ দেখে ফেললেন, দেখেই ভালবেসে ফেললেন। সীতা মাকে আর বোঝান যাচ্ছে না যে, সোনার হরিণ হয় না। এরপর শ্রীরামচন্দ্র গিয়ে মারীচকে তীর মারতেই, মারীচ শ্রীরামচন্দ্রের কণ্ঠস্বর নকল করে 'হা লক্ষ্মণ হা লক্ষ্মণ' বলে চিৎকার করতে লাগল। শ্রীরামচন্দ্রের ওই আর্তনাদ শুনে সীতা নিজেকে আর সামলাতে পারছেন না, এমনকি লক্ষ্মণকে গালাগাল দিতেও বাকি রাখলেন না।

একটা জিনিসকে নিয়ে একবারের বেশী যদি চিন্তা করা হয়, তখন সেই জিনিসের প্রতি একটা আকর্ষণ জন্মে যায়। *সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ*, সঙ্গ মন থেকে হয়, ফিজিক্যাল হয় না। এই সঙ্গ থেকে আসে কামনা, আমার এটা চাই, মা সীতা যেমন বলছেন, আমার সোনার হরিণ চাই। এটা আমরা বুঝতেও পারি না। একটা হাল্কা বাতাস থেকে কখন সাইক্লোন হয়ে গেল আমরা যেমন টের পাই না, তেমনি একটু সঙ্গ থেকে কামনার ঝড় কখন উঠল আমরা টের পাই না। তখন আমরা যে

কোন কিছু করতে রাজী হয়ে যাই। ব্যক্তিগত ভাবে আমরা তাই করি, সম্প্রদায়গত ভাবেও আমরা তাই করি, সমাজেও আমরা তাই করি, জাতি রূপেও আমরা তাই করি। একজনের উপর আমার রাগ হল, সেই রাগের প্রতি আমার সঙ্গ হয়ে গেল, সেখান থেকে বলতে শুরু করলাম, লোকটাকে একটা উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষা দিতে হবে এতবার বলতে থাকবে যে, সেখান থেকে একটা কাম উৎপন্ন হবে, ওকে শিক্ষা দিতে হবে।

ওই কামে যদি কোন বিঘ্ন হয়, তখন ক্রোধের জন্ম হবে। কাউকে যদি কেউ কটূ কথা বলে থাকে, বুঝতে হবে তার ভিতরে ক্রোধ আছে। কতটা ক্রোধ আছে? আপনার ভিতরে কি আগ্নেয়গিরি সব সময় অগ্ন্যুৎপাৎ করছে? ভিতরে জ্বালা এত বেশী যে, মুখ দিয়ে বিষবাণ বেরোতেই থাকে? তখন বুঝতে হয়, আপনার ভিতরে প্রচুর অপূর্ণ কামনা-বাসনা আছে। যে একটুতে রেগে যায়, একটুতেই যে সবার নিন্দা করে, ঝগড়া করে, বুঝতে হবে এর ভিতরে অফুরন্ত অপূর্ণ কামনা-বাসনা জমে আছে। শুধু এক জন্মের না, জন্মজন্মান্তরের অপূর্ণ কামনা-বাসনা গুলি বাসা বেঁধে আছে। এই জন্মেও এত বেশী রয়েছে যে, নিজেকে আর সামলাতে পারছে না। ভিতরে দাউ দাউ করে দাবানল জ্বলছে।

আর-একটা খুব সাধারণ জিনিস হল অহঙ্কার, সামান্য একটু অহঙ্কার। জান আমি কে? জান আমি কে, এই ভাবতে ভাবতে এমন হয়ে যাবে যে, পুরো সংসারকেই পুড়িয়ে শেষ করে দিতে চাইবে। আমাকে সম্মান দিল না, আমি দেখিয়ে দেব তাকে, তোমার মজা আমি দেখাচ্ছি; নিজের উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়। কিভাবে?

বলছেন, *ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ*, আমরা জানি ক্রোধ কাম থেকে আসে। কাম কোথা থেকে আসে? একটা জিনিসকে নিয়ে বার বার ভাবতে ভাবতে কামের আবির্ভাব হয়। বলছেন ক্রোধ হলে সম্মোহ হয়; মনে মোহ তৈরী হয়। বলা হয়, মোহ হলে মানুষ কর্তব্য ও অকর্তব্যের যে বিবেক, এই বিবেককে সে হারিয়ে ফেলে। আমার জন্য কোনটা করা উচিৎ আর আমার জন্য কোনটা করা অনুচিত, এই বিচারটা তার হারিয়ে যায়। আমরা ছোটবেলা থেকে শিখে এসেছি; বাবা-মা, বাড়ির বড়রা, বন্ধুরা, স্কুলের শিক্ষকরা, সবাই আমাদের বলেছেন কোনটা করতে হয়, কোনটা করতে নেই। কিন্তু যার ভিতর ক্রোধের জন্ম হয়েছে, ক্রোধে যে বশীভূত হয়ে আছে, সে কর্তব্য ও অকর্তব্য ভুলে যায়।

আচার্য এটাকে কি সুন্দর ভাবে যে ব্যাখ্যা করছেন, অবাক হয়ে যেতে হয়; *ক্রুদ্ধো হি সংমূঢ়ঃ সন্ গুরুম্ অপি আক্রোশতি*, আচার্যার ভাষা অত্যন্ত সহজ, একটা ছোট্ট কথাতে পরিষ্কার করে দেন। একটা লোক রেগে আছে কিনা আমরা কি করে বুঝব? আমার ভিতরে রাগ আছে কিনা কি করে বুঝব? দেখতে হবে, মনে মনে, কিংবা মুখের বাক্য দিয়ে আমি কি আমার কোন গুরুজনকে, যিনি আমার সম্মান পাওয়ার যোগ্য, তাঁকে আমি অপমানিত করেছি কিনা। শুধু মুখে না, মুখে অপমানজনক বাক্য বলা মানে আমি শেষ হয়ে গেলাম, মনে মনেও যদি তাঁকে কটূ কথা বলি, তার মানে আমার ভিতর ক্রোধ আছে। ভিতরে ক্রোধ থাকা মানেই, এমন কিছু একটা কামনা আছে, যেটা তাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। ইদানিং সোশ্যাল মিডিয়া হয়ে, হোয়াটস্ আপ, ফেসবুকে যা যা কথাবার্তা বেরিয়ে আসছে, বোঝাই যাচ্ছে কারুর কোথাও কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে গান্ধীজী, নেতাজী কাউকেই কটূ কথা বলতে ছাড়ছে না। এমনকি স্বামীজীর নামে, সাধু সন্ন্যাসীদের নামে যা নয় তাই গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে। যাঁরা সম্মানের যোগ্য, যাঁদের সম্মান করার কথা তাঁদের সম্বন্ধে যে ধরণের সব উক্তি করা হয়, যে ভাষায় কটূ কথা বলে, লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়। কাউকে ছাড়ছে না। এই কথা বললে আবার সঙ্গে সঙ্গে লিখে পাঠাবে, আপনি আমাকে শিক্ষা দেবেন না, কাকে সম্মান দিতে হবে। একবারও কেউ ভেবে দেখছে

না, ভিতরে কত অপূর্ণ কামনা-বাসনা জমে আছে। কেন? কারণ সম্মোহ, সম্মোহ মানে বুদ্ধি যেটা সব সময় পিউরিফাইড ওয়াটারের মত স্বচ্ছ থাকার কথা, সেটা রঙিন হয়ে গেছে।

সম্মোহ যখন বাড়তে থাকে তখন কি হয়? *সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ*, স্মৃতিটা খারাপ হয়ে যায়। এই স্মৃতি বাংলা স্মৃতি না, এই 'স্মৃতি' শব্দ গীতায় অনেকবার আসবে, স্মৃতির সংজ্ঞায় বলছেন, *শাস্ত্র আচার্যঃ উপদেশাহিত সংস্কার*, শাস্ত্র ও আচার্য, এই দুজনের কাছ থেকে যে উপদেশ আসে এবং যে প্রশিক্ষণ এনারা দেন, সেই উপদেশ ও প্রশিক্ষণ থেকে যে সংস্কার তৈরী হয়, সেটাকে বলা হয় স্মৃতি। সংস্কার এখানে কালচার অর্থে বলছেন। অনেক সময় আমরা রেগেমেগে বলি, তুমি কেমন বাড়ির ছেলে, তোমার মুখের ভাষা এই রকম নোংরা! একজন ভদ্রলোক, তাঁরা আগেকার দিনে কোন রাজা ছিলেন। ওদের পাঁচ-ছয় বছরের একটা বাচ্চা ছেলে তাদের মালিকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছে। তাতেই ছেলেটির বাবা তিনবার বললেন, 'তুমি তাকে তুমি বলে ডাকলে'? তার মানে, আমরা যে কালচারে বড় হয়েছে, সেই কালচারে সবাইকে সম্মান দিতে হয়। যারা সম্মান দিতে জানে না, দিতে চায় না; ইদানিং যেমন সন্ন্যাসীদের দেখলেই বলবে, সন্ন্যাসীরা কত ঢপ হয় আমার সব জানা আছে; তার মানে তার স্মৃতি হারিয়ে গেছে। তাকে তার কালচারে যে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল, কাকে সম্মান দিতে হবে, সেটা ভুলে গেছে, তার স্মৃতি বিভ্রম হয়ে গেছে। স্মৃতি বিভ্রম মানে মেমরি চলে যাওয়া না, এখানে হল সংস্কার, কালচারটা তার হারিয়ে গেছে।

স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো, স্মৃতি যেমনি চলে গেল, বুদ্ধিটাও তার শেষ হয়ে গেল। রাজযোগে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারটে জিনিসকে নিয়ে খুব বিস্তারিত ভাবে বলা হয়। এখানে আমরা অত বিস্তারে না গিয়ে শুধু মন আর বুদ্ধিকে নিচ্ছি। মন হল, যে ভাবছে এটা করব কি, করব না; আর বুদ্ধি হল, যে বলছে, এটা কর। এই বুদ্ধিটা সংস্কার থেকে আসে। এই সংস্কারটা আসে শাস্ত্র ও আচার্য থেকে। বাবা-মা, আমাদের গুরুজনরা আমাদের ছোটবেলা থেকে যে ট্রেনিং দিয়ে আমাদের বড় করেছেন, সেখান থেকে আমাদের ভিতর একটা সংস্কার তৈরী হয়। জাপানের কালচার যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানবেন, জাপানীরা বয়স্ক মানুষদের খুব সম্মান দেন, একেবারে পরিবারের লোকের মত সম্মান দেন। ছোটবেলায় আমরা একটা খুব মজার কথা শুনেছিলাম, মিথিলার নামে বলা হয় যে, মিথিলার দুজন মহিলা যদি ঝগড়া করে, আর সেই সময় বাইরের কোন লোক, যে মৈথিলী ভাষা জানে না, যদি এসে যায়, সে মনে করবে দুজন মহিলার মধ্যে যেন প্রেমালাপ চলছে। মৈথিলী ভাষা এমন একটা ভাষা যেখানে কোন কটূ শব্দই নেই। উর্দুতেও তেমনি, কটূ শব্দ নেই। ওরা যদি রেগেও যায়, কিন্তু ভাষাটা এত মার্জিত, লঘু, কটূ কোন শব্দই নেই, তাই কথাবার্তা এত নিয়ন্ত্রণে থাকে। যার জন্য মৈথিলী কালচার এত সমৃদ্ধ যে হাজার হাজার বছর ধরে চলছে। রাজা জনক, যাজ্ঞবল্ক্যের সময় থেকে সেই ট্রাডিশান সমানে চলছে। শাস্ত্র আর আচার্য থেকে যে বুদ্ধি আসছে, যে বুদ্ধি বলে দেয় কোনটা কর্তব্য, কোনটা অকর্তব্য, এই বুদ্ধিটাই নাশ হয়ে যায়।

শেষে কি হয়? বলছেন *বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি*, যার বুদ্ধি নাশ হয়ে গেছে, তার বিনাশ হয়ে গেল। কারুর জীবনে সর্বনাশ কেন আসে? কারণ তার বুদ্ধিটাই নাশ হয়ে গেছে। বুদ্ধি নাশ মানে, বিবেক, বিচারটাই সে হারিয়ে ফেলেছে। বিবেক বুদ্ধি কেন হারিয়ে যায়? কারণ তার স্মৃতিটা নষ্ট হয়ে গেছে। স্মৃতিটা কেন নষ্ট হয়ে গেছে? কারণ একটা সম্মোহ হয়ে গেছে, কামনা-বাসনার জন্য মনটা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। মনটা কেন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল? কারণ ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছিল। ক্রোধ কেন হল? কামনা থেকে হয়েছে। আসলে কামনা যদি পুর্তি হয়ে যায়, তখন কামনা বাড়ে। আর কামনাতে যদি কোন বিঘ্ন হয়, তখন ক্রোধের জন্ম হয়। ক্রোধ হলে তখন তার কোন কিছুতে নিয়ন্ত্রণ থাকে না; তার লঘু-গুরু কোন জ্ঞান থাকে না, গুরুজনকেও কটূ কথা শুনিয়ে দেবে।

আচার্য এখানে খুব সুন্দর বলছেন, *তাবৎ এব হি পুরুষো যাবদ্ অন্তঃকরণং তদীয়ং কার্যাকার্যবিষয়বিবেকযোগ্যং তদযোগ্যত্বে নষ্ট এব পুরুষো ভবতি*। ঠাকুর যেমন বলছেন, মানুষ কে, যার মানে হুঁশ আছে, আমিত্বে যার হুঁশ আছে। আমিত্বে যার হুঁশ নেই সে কিসের মানুষ! আচার্য এখানে সেই আমিকে নিয়ে বলছেন, আমি কে, যার বুদ্ধি আছে। এই বুদ্ধি দাঁড়িয়ে আছে আমাদের ভিতর যে শুভ সংস্কারগুলি আছে, তার উপর। এই সংস্কার বলতে, আমরা জন্ম জন্ম থেকে সংস্কারের পুঁটলি নিয়ে আসছি, এখানে সেই সংস্কারের কথা বলছেন না, এই সংস্কারটা হল কালচার। আবার অনেক সময় বলা হয়, বুদ্ধি আছে, কিন্তু কোথায় লাগাতে হয় জানে না। এটাই হয় বুদ্ধির অভাব। বুদ্ধি মানে তা নয়, খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কিন্তু জানে না কোথায় লাগাতে হবে, এটা তা না। বুদ্ধি মানে কোথায় একে প্রয়োগ করতে হবে এই ক্ষমতাটা তার থাকবে। যার এই বুদ্ধি আছে, তার ভাষা অত্যন্ত মার্জিত, গুরুজনকে কক্ষণ কোন পরিস্থিতিতে কটূ কথা বলবে না।

মহাভারতে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, অর্জুন একবার রেগে গিয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে কটূ কথা বলছেন। শুনে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, 'অর্জুন তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি কখন বৃদ্ধজনের সেবা করোনি, তুমি বয়ঃজ্যেষ্ঠদের সঙ্গ করোনি'। ক্রোধ হল একমাত্র লক্ষণ, যেটা বলে দিচ্ছে তার সংস্কৃতির অভাব। যার ক্রোধ হয়, বুঝতে হবে তার কালচার নেই, হয় তোমার বাড়িরই কালচার ছিল না, আর তা নাহলে তোমার স্মৃতিবিভ্রম হয়ে গেছে। বাচ্চা যখন খুব চেঁচামেচি করে, তখন আমরা আদর করে বলি, 'বাবুসোনা এ-রকম করো না, লোকে কি ভাববে, বলবে তুমি পাগল হয়ে গেছ'। কারণ পাগলরা ঠিক এই রকমই আচরণ করে, কারণ তাদের মনের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। একটা মুহুর্তের জন্য কারুর যখন ক্রোধে মাথাটা খারাপ হয়ে যায়, তখন সে ঠিক এই ভাবেই আচরণ করে।

আচার্য এটাই বলছেন, *তাবৎ এব হি পুরুষো,* মানুষ ততক্ষণই মানুষ, যতক্ষণ *যাবদ্ কার্যাকার্যবিষয়,* কোনটা করতে হবে, কোনটা করা যাবে না, এই ব্যাপারে *বিবেকযোগ্যং,* এই বিবেকটা যতক্ষণ আছে। কি করতে হবে আর কি করতে নেই; যার এই বিবেক নেই; যার বিবেক নেই কাকে কি বলতে হয়, সে তাহলে কিসের মানুষ! সে পুরুষও না নারীও না, সে নপুংসক। স্বামী মোক্ষদানন্দজী মহারাজ বলতেন, 'যিনি সত্যিকারের ভদ্রলোক, তাঁর সাথে কারুর যদি কখন বন্ধুত্ব বা পরিচয় হয়, তিনি তার কোন দোষ কক্ষণ কোন পরিস্থিতিতে অপরকে বলবেন না; সামনেও না, পিছনেও না'। আমরা যখন কারুর দোষ ধরি, তখন তাকে তার দোষটাকে শোধরাবার জন্য বলি না, নিন্দা করার জন্যই বলি। মহারাজ ওটা নিন্দা করার অর্থে বলছিলেন। তিনি এই কথা বলে, সবাইকে বলতেন, 'সবার আগে একজন ভদ্রলোক হও'। ভদ্রলোককে পরিভাষিত করছেন – যে কারুর নিন্দা করে না, সামনেও না আড়ালেও না। নিন্দা করছে, তার মানে ভিতরে ক্রোধ গজগজ করছে। যদি সত্যিই আমি তার ভাল চাই, তাহলে আমাকে একান্তে গিয়ে তাকে ডেকে ফিসফিস করে বলতে হবে, 'আপনি এ-রকম করলেন! এটা ভাল লাগল না'। এটাকে কিন্তু নিন্দা করা বলে না। ভালবেসে আমি তাকে সামলাচ্ছি। আড়ালে বা পিছনে নিন্দা করাকে বলা হয় পিশুনিবৃত্তি। সামনে করলে বলা হয় ঔদ্ধত। যারা বলে, আমি স্পষ্ট কথা বলতে ভয় পাই না, বুঝতে হবে এ সত্যিকারের একজন ঔদ্ধত, এর জীবন শেষ হয়ে গেছে। যেমন বললেন, *বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি, প্রণশ্যতি* মানে বিশেষ রূপে নাশ, কারণ তার বুদ্ধি নাশ হয়ে গেছে।

বুদ্ধি নাশ কেন হল? এত বিরাট ঝড় আম্ফান কেন এসেছিল? যখন শুরু হয়েছিল, তখন তো কিছুই ছিল না, অল্প একটু হাল্কা হাওয়া দিচ্ছিল। একটা জিনিসকে দেখেছিলাম, একটা জিনিসকে অনুভব করেছিলাম, সেটার প্রতি আমার আসক্তি হয়ে গেল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 'আমার অহঙ্কার', তুমি জানো আমি কে, তুমি জানো আমি কি করতে পারি। আচার্য বলছেন, *অতঃ তস্য অন্তঃকরণস্য বুদ্ধেঃ নাশাৎ প্রণশ্যতি পুরুষার্থযোগ্য ইত্যর্থঃ,* চারটে যে পুরুষার্থ, ধর্ম, অর্থ, কাম ও

মোক্ষ, এদের এই চারটেকে পাওয়ার যোগ্যতা নেই, এই চারটের কোনটাই সে পেতে পারে না। পুরুষার্থ যার চলে যাবে, সে আর জীবনে কোন দিন সাফল্য পাবে না। জীবনে যদি সাফল্য পেতে হয়, তার বুদ্ধিকে ঠিক রাখতে হবে। বুদ্ধি ঠিক রাখতে হলে ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা চাই। একটা বাচ্চাকে শাসন করছেন, সেখানে একটু ক্রোধ দেখানো যেতে পারে, ওই ক্রোধের মধ্যেও আপনার ওই বাচ্চার প্রতি ভালবাসাটা আছে। সেখানে সে নিন্দা করছে না। কোন মা অপরের কাছে নিজের সন্তানের নিন্দা করে না। আপনজনের সম্বন্ধে কেউ নিন্দা করে না। যার নিন্দা করছেন, তার মানে আপনি তাকে দূরে করে দিয়েছেন। দূরে করেছেন সেটা আলাদা, কিন্তু আপনার নিজের বুদ্ধি নাশ হয়ে গেছে।

সব কিছুর শুরু হয় ক্রোধ থেকে, ক্রোধের জন্ম হয় কাম থেকে। এই কাম হল, যখন আমরা কোন জিনিসকে চাই বা আমরা কোন কিছু থেকে যখন সরে আসতে চাই, এটা রাগ আর দ্বেষ। রাগ মানে বাংলা রাগ না, এটা সংস্কৃতের রাগ, সংস্কৃতে রাগ মানে ভালবাসা বা অনুরাগ আর দ্বেষ মানে বিদ্বেষ, তার থেকে সরে আসা। এই রাগ আর দ্বেষকে পরের শ্লোকে টেনে নিয়ে যাবেন। যাদের জীবনে প্রচুর অশান্তি, ভাল করে দেখলে দেখা যাবে, কোথাও তারা এমন একটা কামনার মধ্যে ডুবে আছে, যেটাকে অনেক দিন ধরে তারা পুষে রেখেছে।

এখানে আমার নিজের একটা ঘটনার কথা বলা যেতে পারে, একবার আমার পায়ে একটা পাথরের কণা ঢুকে গিয়েছিল। আমিও প্রথমে বুঝতে পারিনি। কিন্তু অনেক বছর ধরে ব্যাথা হচ্ছিল। বোঝা যাচ্ছে না, কিসের থেকে ব্যাথা হচ্ছে। একজন পরিচিত অর্থোপেডিক সার্জেনের সাথে দেখা হতে আমি তাকে পায়ের ব্যাথার কথাটা বললাম। উনি দেখটেখে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এটা কত দিন পুষে রেখেছেন'? পুষে রাখা কথাটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। তারপর তিনি লোকাল এ্যনাস্থেসিয়া করে অপারেশন করে একটা বালির কণা বার করলেন। যেখানেই দেখা যাবে প্রচুর অশান্তি লেগে আছে, সেখানে বুঝতে হয় অনেক দিন ধরে আমরা একটা কোন কামনাকে পুষে রেখেছি। এই যে পুষে রাখা হয়েছে, এবার ওখান থেকে আস্তে আস্তে ফেরৎ আসতে হবে।

গীতা এতক্ষণ দুটো শ্লোকে মানুষের বিনাশের কারণ এবং কিভাবে ধাপে ধাপে মানুষ বিনাশের দিকে চলে যায় বললেন। এরপর এর বিপরীতে সুখ শান্তি কিভাবে হয় বলবেন। এখানে একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমি একজন চিকিৎসককে জানতাম, উনি অনেক কিছু মিলিয়ে চিকিৎসা করতেন। ঠিক হোমিওপ্যাথি না, আবার কিছুটা হোমিওপ্যাথির মত একটা চিকিৎসা। উনি আট দশ রকমের গ্লোবিউলস্ রাখতেন। প্রচুর লোক ওনার কাছে ওষুধ নিতে আসত। কিন্তু রোগ ভাল হত কিনা আমার জানা নেই। একদিন আমি ওনার কাছে বসেছিলাম, সেই সময় একজন কেউ ফোন করেছে। ফোনে জিজ্ঞেস করছে, 'আপনি আমাকে হাঁটু ব্যাথার ওষুধ দিয়েছিলেন, কিন্তু এখন আমার পেটেও একটু ব্যাথা হচ্ছে'। এ প্রান্ত থেকে উনি বলে দিলেন, 'ওই ওষুধই কাজে দেবে'। আবার ওই প্রান্ত থেকে বলল, 'কিন্তু জানেন, আমার একটু জ্বর জ্বর ভাবও লাগছে'। এখান থেকে বলে দিলেন, 'ওই ওষুধেই কাজ হয়ে যাবে'। ওখানে আমরা দু-তিনজন ছিলাম, শুনে আমরা খুব হাসতে শুরু করেছি। সব কিছুতেই ওনার একটাই ওষুধ কাজ করবে। কারো ভাল হয় কিনা ভগবান জানেন। এভাবে যদি সব রোগ ভাল হয়ে যেত তাহলে তো কেউ এত টাকা খরচ করে, এত খেটে এমবিবিএস ডিগ্রি নেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগত না।

গীতা হল মহা ঔষধ, সমস্ত সমস্যার নিদান দেন। কিন্তু একই কথা, বা একটা কথাই বলেন না, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করছেন। তাছাড়া গীতা হল মায়ের মত। তিন চার বছরের বাচ্চার কত রকম আবদার, তাকে নিয়ে কত রকম সমস্যা, বাবা অতটা সহ্য করবে না, কিন্তু মা বাচ্চার সব সহ্য করে নেয়। বাচ্চার আধো আধো কথা, যে কথাকে বাচ্চা মনে করে এর উপর

আমার সব কিছু দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তার কোন কথারই দাম নেই, মা সব কথা মন দিয়ে শোনে। একটু ব্যাথা লাগলে, একটু মন মত কিছু না হলে, সবাটাই দৌড়ে মাকে গিয়ে বলে। মা সবটাই দেখেন, যার জন্য সমাজে, শাস্ত্রে মাকে খুব উচ্চ সম্মান দেওয়া হয়। যিনি অধ্যাত্ম শিক্ষা দেন, গুরু যিনি, তাঁর পরেই মায়ের স্থান। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে গুরুকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে, কারণ তিনি ভববন্ধন, জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন থেকে মুক্তি দেন। মা এই জীবনের সমস্যাগুলি থেকে মুক্তি দেন। গীতা মায়ের মত, গীতা জগজ্জননীর মত। গীতা এই জীবনের সমস্যাকেও মিটিয়ে দেন, জন্ম জন্মান্তরের যে সমস্যা, সেখান থেকেও আমাদের উদ্ধার করেন। গীতার বাণী জীবনে লাগাতে পারলে, জীবনের অনেক সমস্যা আমাদের কমে যাবে।

একজন প্রশ্ন করলেন, গীতা পড়লে কি আমার সমস্যা মিটে যাবে? যিনি জগৎকে গীতার বাণী দিলেন, সেই অর্জুনেরই জাগতিক সমস্যা মিটল না, সেখানে আমরা কি করে আশা করতে পারি, আমাদের সব সমস্যা মিটে যাবে। তাঁর চোখের সামনে তাঁর সমস্ত জ্ঞাতি, আত্মীয়স্বজন এক অপরের সাথে যুদ্ধ করে মারা গেল। কিন্তু ভগবানের ঠোঁটের ফাঁকে সেই জগৎ ভোলান হাসিটা শেষ দিন পর্যন্ত লেগেছিল। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা, সংসারের নানা রকম সমস্যা, এগুলো আসবে; গীতা কেন কেউই এটাকে আটকাতে পারবে না। আমরা মুখে বলে দিতে পারি, ভগবান আছেন, তিনি সব সমস্যা আটকে দেবেন। ভগবান আটকান না। ভগবান যেটা করেন, তা হল, তিনি ভিতরে সেই শক্তিটা দিয়ে দেন, যে শক্তি দিয়ে জগতের সর্বপ্রকার জ্বালা যন্ত্রণার মোকাবিলা করে জীবন যুদ্ধে এগিয়ে যায়। প্রত্যেক জ্বালা যন্ত্রণা, সমস্যার প্রতি আমাদের প্রত্যেকের একটা প্রতিক্রিয়া থাকে, এই শক্তির জন্য প্রতিক্রিয়াকে আটকাবার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে আসে।

দুঃখ কখন বাইরে থেকে আসে না, সমস্যা বাইরে থেকে আসে। এই জিনিসটাকে আমাদের একটু ভাল করে বুঝতে হবে। ভগবান, শাস্ত্র, আচার্য, এনারা সমস্যাকে আটকান না। সমস্যা নিজের মত আসতে থাকে। রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, শীত, গ্রীষ্ম সব নিজের মত আসে, নিজের মত চলে যায়। কিন্তু আমাদের ভিতর থেকে যে প্রতিক্রিয়া আসে, যেটাতে আমরা কষ্ট পাই, আমরা যে কষ্ট পাই, শোক পাই, তাপ পাই, এগুলো ভিতর থেকে আসে, বাইরে থেকে আসে না, সমস্যা বাইরে থেকে আসে। এই শাস্ত্রগুলি বা গুরুকৃপা, ঈশ্বরকৃপা, এরা সমস্যাকে আটকায় না। তাহলে এনারা কি করেন? ভিতরের শক্তিটাকে বাড়িয়ে দিয়ে দুঃখ, কষ্টের প্রতি যে প্রতিক্রিয়াটা হয়, সেটাকে আটকে দেন। গীতা হল এক অমৃতময়ী জননী। যিনি জগজ্জননী তিনিই গুরু রূপে আমাদের সামনে আসেন, তিনিই মাতৃরূপে আমাদের গর্ভে ধারণ করেন। জন্মের পর তিনিই প্রথম গুরু, যিনি আমাদের শিক্ষা দেওয়া শুরু করেন। গীতা জীবনের শিক্ষা দেয়, গীতা মোক্ষদায়িনী, গীতা মোক্ষশাস্ত্র, জন্মমৃত্যুর সমস্যা থেকেও মুক্তি দান করেন।

এখানে কয়েকটা শ্লোকের মাধ্যমে গীতা জীবনের সমস্যার সমাধান দিচ্ছেন। আর সেখান থেকে কিভাবে জন্মমৃত্যুর সমস্যার বাইরে নিয়ে চলে যাচ্ছেন। বলছেন –

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি।।৬৪।।

(কিন্তু সংযতচিত্ত পুরুষ প্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক আসক্তি ও অপ্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক বিদ্বেষ হতে মুক্ত হয়ে স্ববশীভূত ইন্দ্রিয় দ্বারা অবর্জনীয় (দেহস্থিতিহেতু অপরিহার্য) বিষয়সমূহ পতিত তৃণের ন্যায় অনাসক্তভাবে গ্রহণ করে চির-প্রসন্নতা লাভ করেন।)

আমরা কি কখন একবারও ভেবে দেখার অবসর পেয়েছি যে, আমাদের মনকে কে চালায়? যাঁরা উপর উপর দু-একটা শাস্ত্র পড়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা উত্তর দেবেন –ঈশ্বরের ইচ্ছা বিনা

গাছের পাতাটিও নড়ে না, ঈশ্বরই মনকে চালান। যাঁরা ভক্তিশাস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, তাঁরা বলবেন, তিনিই সদ্বুদ্ধি দেন, তিনিই অসদ্বুদ্ধি দেন। গীতা এই ধরণের কথা বলবেন না, গীতার approach একেবারে practical approach। বেশীর ভাগ সময় গীতার approach, রাজযোগের approachএর সাথে মিলে যায়। রাজযোগ পুরো যৌক্তিকতার উপর চলে। রাজযোগে আপনাকে কোন কিছু বিশ্বাস করার দরকার হয় না, A সমান সমান B, B সমান সমান C, তাই A সমান সমান C, এই যুক্তিতে চলে।

বলছেন মন দুই প্রকার – একটা হল স্বাধীন মন, স্ব-অধীন, অর্থাৎ নিজের নিয়ন্ত্রণে, আর-একটা হল পরাধীন মন। পরাধীন মানে অপরের নিয়ন্ত্রণে চলে। অপর মানে? রাগ আর দ্বেষ। সংসারে যত বস্তু আছে, সেই বস্তুর প্রতি যে আকর্ষণ, সেটা হয়ে গেল রাগ। আর যে বস্তু থেকে আমাদের যে সরে আসার ইচ্ছা, পছন্দ হচ্ছে না, সরে আসছি, এটা হল দ্বেষ। কিছু লোকের নাম শুনলেই আমরা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠি। কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলে বেগুন দিলে যেমন ঝং করে ওঠে, নাম শুনলেই সেই রকম জ্বলে যাই। 'তোমাদের পার্টিতে ওকেও নিমন্ত্রণ করেছ? ও যদি থাকে আমি কোন মতেই তোমাদের পার্টিতে আসছি না'। এটাকে বলে দ্বেষ। তাহলে মনের মালিক কে? রাগ আর দ্বেষ। যাকে ভালবাসি, মন বলল চলো ওর দিকে, চললাম; তার পিছন পিছন দৌড়ালাম। যাকে পছন্দ করি না, তাকে যদি কোথাও দেখে নিই, অন্য রাস্থা ধরে তাকে এড়িয়ে যাব। মন ইন্দ্রিয়গুলির মালিক, ইন্দ্রিয়গুলো শরীরের মালিক। আর মনের মালিক, রাগ আর দ্বেষ। স্বামীজী সেইজন্য বলছেন, Avoid not seek not।, কোন কিছু থেকে সরে আসবে না, কোন কিছুর দিকে দৌড়ে যাবে না। কুড়ি পঁচিশ বছর আগে টেলিভিশন যখন ঘরে ঘরে সব সময় চলত, তখন বলা হত, বাড়ির মালিক কে, এটা যদি বুঝতে হয়, তাহলে দেখতে হবে বাড়িতে টিভির রিমোট কার হাতে আছে। টিভির রিমোট যার হাতে, সে হল বাড়ির ঠিক ঠিক মালিক। মালিক কে, এই নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অনেক জোকস্ আছে।

মালিক কে? আমার রাগ আর দ্বেষ। আমার জীবনে ভাল মন্দ যা কিছু হচ্ছে, জীবনে যা সুখ পাচ্ছি, যা কষ্ট পাচ্ছি, আমাদের চোখে যত জল, মুখে যত হাসি – সব কা দাতা দো, রাগ ঔর দ্বেষ। আসলে দুই না, দুটো একই। আমাদের মুখে হাসি ভগবান ফোটান না, আমাদের চোখ দিয়ে জল ভগবান ফেলান না, সব দেয় আমাদের মনের কামনা। কামনা এই দুটি রূপে আসে – রাগ আর দ্বেষ, কিছু জিনিসের দিকে আমাদের টেনে নিয়ে যায়, কিছু জিনিসের থেকে আমাদের সরিয়ে নিয়ে আসে। এরা হল এক ধরণের মানুষ।

আর অন্য ধরণের মানুষ হল, যাঁরা পরাধীন নন। আচার্য স্বাধীন মনকে এভাবে বলছেন, স্বাধীন অন্তঃকরণ, এই হল সত্যিকারের স্বাধীনতা। সত্যিকারের স্বাধীন কে? যে রাগ আর দ্বেষ থেকে মুক্ত। রাগ আর দ্বেষ থেকে কে মুক্ত? এই যে আগে বাষট্টি আর তেষট্টি শ্লোকে বলা হল, *ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ* থেকে শুরু করে *বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি* পর্যন্ত বলে তারপর বলছেন *রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্, আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছিত,* এখানে আত্মা বলতে অন্তঃকরণ অর্থাৎ মনের কথা বলছেন। আত্মা অনেকগুলো অর্থে আসে, আত্মার একটি অর্থ হয় দেহ, আর-একটা অর্থ হয় বুদ্ধি; এখানে বুদ্ধির অর্থে বলছেন। বলছেন, যার বুদ্ধি নিজের নিয়ন্ত্রণে সেই হল প্রকৃত স্বাধীন।

আপনি কি স্বাধীন হতে চান? আপনি কি বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে চাইছেন? দাসত্ব, গোলামী থেকে মুক্ত হতে চাইছেন? তাহলে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসুন। নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে বলছেন, তাহলে এখন কার নিয়ন্ত্রণে আছে? এখন তো মন আপনার গোলাম। কার গোলাম? রাগ আর দ্বেষের। গীতাতেই পরে বলবেন, রাগ আর দ্বেষ এরা শত্রু, সেখানে ভগবান বলবেন, *মহাশনো মহাপাপ্মা,* রাগ আর দ্বেষ আগুনের মত সব পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। *বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্,*

এরা আমাদের শত্রু, মনেতে বাস করে আর মনকেই পোড়াতে থাকে। আমাদের জীবনে যত দুঃখ, যত কষ্ট, যত ব্যাথা যন্ত্রণা সব এখান থেকে আসে, উপর থেকেও কিছু আসে না, বাইরে থেকেও কিছু আসে না। কিছু পরিস্থিতি বাইরে হয়, যেমন রোদ বৃষ্টির কথা বলা হল। একজন কিছু হয়ত বলে দিল, বদমাইশি করে হয়ত বলেছে বা ভুলেই বলেছে, কিন্তু তারপরেই বলতে শুরু করে দেবে, 'কি কি কি, কি বললি, আবার বল! তোর এই দুঃসাহস এই কথা আমাকে বললি, তোর বংশের আমি নাশ করে দেব, তোর জিভ টেনে ছিঁড়ে নেব'।

টলস্টয়ের খুব সুন্দর একটা গল্প আছে। একজনের একটা মুরগী তার প্রতিবেশীদের উঠোনে গিয়ে ডিম দিয়েছে। এই ডিমের মালিক এখন কে হবে? এই নিয়ে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। সেখান থেকে আস্তে আস্তে দুটো বংশেরই বিনাশ হয়ে গেল। একটা দিন যদি আমরা নিজেদের বিশ্লেষণ করে দেখি, যেমন আজকে সারাদিনে আমি কি কি করেছি, তার মধ্যে কোন কোন কাজ আমার রাগপ্রেরিত ছিল, আবার কোন কোন কাজ আমার দ্বেষপ্রেরিত ছিল আর তার সাথে কোন কোন কাজ আমার কামনা-বাসনা প্রেরিত। আমি কিছু ভাল খেতে চাইছি – কামনা। আমি কোথাও বেড়াতে যেতে চাইছি –কামনা। কারু সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলেছি –কামনা। সারা দিনে একটি মিনিটও নেই, যেখানে আমি বলতে পারব, এই এক মিনিট আমি স্বাধীন। অনেকে এসে প্রায়ই আমাদের কাছে অভিযোগ করে, বাড়িতে থাকা খুব কষ্ট, এদের সঙ্গে থাকা যায় না, কি করে থাকব একবার বলবেন? এসব না ভেবে আগে আপনি নিজের মনটাকে ঠিক করুন, মনকে রাগ-দ্বেষের বাইরে নিয়ে যান। যদি রাগ-দ্বেষ থেকে মুক্ত হতে পারেন, যদি আপনি স্বাধীন হয়ে যেতে পারে, তখন কি হবে?

আত্মবশৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি, মানুষ তখন প্রসাদ লাভ করে। স্বামীজী চারটে যোগ দিয়ে গেছেন, এখন ভক্তরা তার সাথে আরেকটা যোগ নিয়ে এসেছেন, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ আর ভক্তিযোগের সাথে এখন এসেছে খিচুরিযোগ। খিচুরি পেয়ে গেলেই সব হয়ে গেল, প্রসাদ যদি পেয়ে যাই, সব দুঃখ কষ্ট ঘুচে যাবে। গীতার এই 'প্রসাদ' মানে তা নয়। গীতাতে যে প্রসাদ বলছেন, আচার্য তার অর্থটা বলছেন, *প্রসাদঃ প্রসন্নতা স্বাস্থ্যম্*। প্রসাদ মানে মনের প্রসন্নতা, মনের আনন্দ আর মনের স্বাস্থ্য।

এই প্রসাদ কার হয়? যে রাগ আর দ্বেষ থেকে মুক্ত। প্রসন্ন কে থাকে? যে রাগ-দ্বেষ থেকে মুক্ত। আর মন থেকে স্বস্থ কে? যে রাগ-দ্বেষ থেকে মুক্ত। তাহলে আমি, আপনি কি? মানসিক ভাবে অসুস্থ। যারা মানসিক ভাবে অসুস্থ তারা কি ধ্যান করতে পারবে? সম্ভবই না। যারা মানসিক ভাবে অসুস্থ, তারা কি জীবনে বড় কিছু পাবে? কোন দিন না। আমরা সবাই করছি গোলামী, গোলামের কি কখন আনন্দ হতে পারে! ঠাকুর বলছেন, চাকরি! সে তো সাহবের বুটের গোজা খাওয়া। আমার আপনার সাহেব কে? রাগ আর দ্বেষ। দিনরাত আমাদের গোজা মারছে। চল ব্যাটা এইদিকে, আমরাও সেই দিকে চলতে লাগলাম। সরে যা ওখান থেকে, সরে গেলাম। আমরাও সাধু সন্ন্যাসীদের প্রণাম করে বলি, মহারাজ শান্তি কি করে পাবো একটু বলে দিন। একজন পাশ থেকে উত্তর দিল, চিতায় শান্তি। চিতায় কি করে শান্তি পাবে! চিতায় কি কখন শান্তি হয়! চিতা গেটটা খুলে দিল, যাতে আগামী জন্মেও আপনি অশান্তিতে থাকেন। এটা কি একবারও ভেবে দেখেছেন কেউ, যেমনটি আছি তেমনটি পরের জন্মেও চলতে থাকবে? যা করার এই জন্মে এখানেই করে নিতে হবে, আর তা নাহলে আপনি চিতার পর চিতায় উঠতেই থাকবেন, অশান্তিতে ভুগতেই থাকবেন। কোন দিন এই প্রসাদ আসবে না।

প্রসাদম্ কিভাবে আসবে? *আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা*, যার মন নিজের নিয়ন্ত্রণে। মনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা মানেই সে স্বাধীন, তা নাহলে পরাধীন। প্রসাদ পেলে কি হবে?

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হ্যানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে।।৬৫।।

(প্রসন্নতালাভ হলে স্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তির সর্বদুঃখের বিনাশ হয়; কারণ তাঁর বুদ্ধি আত্মস্বরূপে শীঘ্র নিশ্চল হয়।)

জীবের দুঃখ তিন প্রকার, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, আগে আগে আমরা এই তিন প্রকার দুঃখকে নিয়ে আলোচনা করেছি। তিনটেই সমস্যা, এর জন্য যে প্রতিক্রিয়া হয় সেটা আপনার নিজের। বাইরে থেকে যেটা আসছে সেটা দুঃখ না, দুঃখটা আমাদের প্রতিক্রিয়া। বাইরে থেকে যেটা আসে, সেটা সমস্যা। বাইরে থেকে যেটা আসে সেটা পরিস্থিতি, দুঃখটা হল আমার ভিতরের প্রতিক্রিয়াটা।

বলছেন, যখন প্রসাদ হয়, অর্থাৎ রাগ আর দ্বেষ থেকে যখন মুক্ত হয়ে গেল, তখন কি হবে? *প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হ্যানিরস্যোপজায়তে*। জীবনে যে আমাদের এত দুঃখ, এই প্রসাদ দুঃখকে নাশ করে দেয়। আপনি কি জীবনে সুখ চান, জীবনে শান্তি চান? গীতা খুব স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন কিভাবে করতে হবে, *প্রসাদে সর্বদুঃখানাং*, সমস্ত দুঃখকে নাশ করে দেবে, যদি প্রসাদ হয়। আজ খুব ঠাণ্ডা পড়েছে, খুব শীত করছে, উলের যত পোষাক আছে সব চাপাচ্ছি, কিন্তু শীতে শরীরটা ঠক ঠক করে কাঁপছে। আচার্য এটাকে অন্য জায়গায় বলছেন, আগুন যেমন শীতের নাশ করে দেয়, আগুন হল হিমনাশক। ঠিক তেমনি *প্রসাদম্* হল প্রসন্নতা আর স্বাস্থ্য, মানে রাগ আর দ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে গেলে সমস্ত দুঃখ থেকে সে মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা দিব্যি খেয়ে রেখেছি, আমি শোধরাব না।

প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে, হ্যাশু মানে শীঘ্র, যার মন প্রসন্ন, শান্ত, তাদের মন আকাশের মত স্থির হয়ে যায়। আমরা কজন গর্ব করে বলতে পারি, আমার জপধ্যান ভাল হয়? সবাই বলবে, আমার জপধ্যান ভাল হয় না। ঈশ্বরে মন ঠিক ঠিক বসে এ-রকম কজন পাওয়া যাবে? আমরা মুখে ঈশ্বরের কথা বলতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরে মন বসে না, মনে ভক্তির উদয় হয় না, ধ্যান করতে ইচ্ছে করে না, আধ ঘন্টা জপ করলেই ক্লান্তি এসে যায়। দিনে আধ কি এক ঘন্টা জপ করলে কি ঈশ্বরে মনে যাবে! দিনে ছয় থেকে আট ঘন্টা কিছু না করলে কখন কি কিছু হয়! কেন আমরা জপধ্যানে বসতে পারি না, কেন শাস্ত্রের কথা শ্রবণ করার পরেও ধারণা করতে পারি না? কারণ মন আমাদের সব সময় চঞ্চল। চঞ্চল মনকে বলা হয় অস্থির মন। অস্থির মনকে আকাশের মত স্থির করতে হবে। আকাশ নড়ে না, চরে না, যেমন আছে তেমনই আছে। এই অবস্থা কখন হয়? যে প্রসন্ন একমাত্র তার হয়। তার মানে, জপধ্যান কে করতে পারে? যার মন শান্ত। অশান্ত মন দিয়ে জপধ্যান কখনই হয় না।

সবাই এসে বলে, আমাকে ধ্যান শিখিয়ে দিন; আরে ভাই ধ্যান হল তাদের জন্য, যাদের মন পুরোপুরি শান্ত। এখানে উলটো, যাদের মন অশান্ত তারাই বলছে, আমি ধ্যান করব। একজনের জীবনে প্রচুর অঘটন হয়েছিল, তারপর থেকে তার খুব অশান্তি হয়েছিল। তাকে কে একজন শিখিয়ে দিয়েছে, তুমি ধ্যান কর, সব অশান্তি কেটে যাবে। তারপর থেকে সে ধীরে ধীরে পাগলের মত হয়ে যাচ্ছিল। কিভাবে কিভাবে আমার সাথে তার যোগাযোগ হয়। আমি সব শুনে বললাম, এক্ষুণি আপনি ধ্যান বন্ধ করুন। উনি একজন সর্দারজী। আপনি এক্ষুণি গুরুদোয়ারে যান, সেখান বড় বড় হাণ্ডাগুলো মাজতে থাকুন। উনি যেতে শুরু করলেন, এবং দিনের পর দিন যেতে লাগলেন। প্রচুর কাজ করতে হবে, তার সাথে সেবা কাজ। এখন তিনি একেবারে ঠিক আছেন। উনি যদি ধ্যান করতে থাকতেন, একটা সময় এমন হত যে তাকে আত্মহত্যা করতে হত।

আগে প্রচুর কাজ করতে হবে, প্রচুর কাজ করতে করতে মন যখন স্থির হয়, শান্ত হয়, তখন গিয়ে ধ্যান হবে। কিন্তু এখন ইন্টারনেট, টিভি হয়েছে, সেখানে রোজই প্রচুর বাবাজীদের আবির্ভাব

হচ্ছে, বাবাজীদের টাকার দরকার, তারও টাকার দরকার। কি আর করবে, বাবাজীরাও সব ধর্মের নামে entertainment দিয়ে যাচ্ছেন, আর চেলাগুলোও গুরুর পর গুরু পাল্টাতে থাকে। ট্রেন যেমন স্টেশন থেকে স্টেশন পাল্টাতে থাকে, চেলাগুলোও গুরু থেকে গুরু পাল্টাতে থাকে। ঠাকুর বলছেন, ইত্যাদি গুরুর ইত্যাদি চেলা, এইজন্যই কিছু হয় না। একবার শাস্ত্র খুলে পড়ুন, দেখুন কি বলছে শাস্ত্র। শাস্ত্র বলছেন, রাগ দ্বেষ নিয়ন্ত্রণ কর, সেখান থেকে তোমার বুদ্ধি স্বাধীন হবে, বুদ্ধি স্বাধীন হলে সেই বুদ্ধি স্থির হবে, তখন গিয়ে ধ্যান করতে পারবে।

বুদ্ধি তোমার স্থির হয়ে গেলে, এবার তুমি কৃতকৃত্য হবে। আচার্য বলছেন, *তস্মাদ্ রাগদ্বেষবিযুক্তৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ শাস্ত্রাবিরুদ্ধেষু অবর্জনীয়েষু যুক্তঃ সমাচরেদ্ ইতি বাক্যার্থঃ,* যদি জীবনে তুমি শান্তি চাও, তোমার প্রথম কাজ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা। কোন শাস্ত্র পড়ব? যে কোন শাস্ত্র, যে হিন্দু সে হিন্দু শাস্ত্র পড়বে, গীতা পড়বে। শাস্ত্রে যে জিনিসগুলি নিষেধ করা হয়েছে, আগে ওটাকে বন্ধ কর। স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজকে খুব কাছ থেকে আমাদের দেখার সৌভাগ হয়েছিল। ভক্তরা এসে তাঁর কাছে অশান্তির কথা বলতেন। মহারাজ সবাইকে কিছু কথা বলার পরেই এই কথা বলতেন, দেখো অনৈতিক কিছু করবে না। বলতে চাইছেন, অনৈতিক, মানে চরিত্রের মর্যাদা লঙ্ঘন হয়, এমন কোন কাজ করবে না। আমাদের জীবনে যদি কোন দুঃখ আসে, বুঝতে হবে কোথাও আমরা মর্যাদ লঙ্ঘন করেছি। চরিত্র বলতে, একটা লক্ষণ রেখা দিয়ে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, লক্ষণ রেখাকে উল্লঙ্ঘন করলেই রাবণ এসে অপহরণ করে নিয়ে যাবে। টিয়া পাখি যতক্ষণ খাঁচায় আছে ততক্ষণ ঠিক আছে, খাঁচা থেকে বেরোলেই তাকে বিড়ালে ধরবে। রাগ আর দ্বেষ আমাদের এই লক্ষণ রেখার বাইরে নিয়ে চলে যায়, তখন রাবণ গপ্ করে ধরে নেয়। আমাদের জীবনে যে অশান্তি, এই অশান্তি হল সেই রাবণ। রাবণ বাইরে অপেক্ষা করে বসে আছে, কখন আমি লক্ষণ রেখা ডিঙোব, যেমনি লক্ষণ রেখার বাইরে বেরিয়ে এলো, রাবণ এসে খপ্ করে ধরে নিল। কটূ কথা বলা, মিথ্যা কথা বলা, অপরের জিনিসের প্রতি লোভ করা, পরস্ত্রী বা পরপুরুষের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, এগুলো সব হল মর্যাদা লঙ্ঘন। করেছে কি মরেছে। ধর্ম জীবনে বা জীবনে শান্তি পাওয়ার জন্য কোন শর্টকাট মেথড নেই, কঠিন পথ। সহজ পথ যদি চাও, তাহলে পাঁকে নেমে পড়, তারপর বাচ্চারা যেমন একে অপরের প্রতি কাদা ছুঁড়ে আনন্দ পায়, তুমিও সেই ভাবে কাদা ছোড়াছুড়ি করে যাও। শূয়োরও ঐ ভাবেই থাকে, কাদার মধ্যে ঘ্যোঁৎ ঘ্যোঁৎ করে ওদের কি আনন্দ। এরপর বলছেন –

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।।৬৬।।

(অসমাহিত ব্যক্তির আত্মস্বরূবিষয়িণী শুদ্ধাবুদ্ধি নাই এবং তার পরমার্থবিষয়ে অভিনেবেশও হয়নি। আর পরমার্থ-চিন্তাশূন্য ব্যক্তির বিষয়তৃষ্ণায় বিরতি নাই। এই প্রকার বিষয়তৃষ্ণার্ত পুরুষের প্রকৃত সুখ কোথায়?)

মা যেমন বাচ্চাকে বোঝায়, গীতাও ঠিক মায়ের মত আমাদের বুঝিয়ে যাচ্ছেন, গীতা আমাদের প্রাণদায়িনী মা, শক্তিদায়িনী মা, জ্ঞানদায়িনী মা, মুক্তিদায়িনী মা।

জীবনে আমাদের কেন সুখ নেই? কোথা থেকে তোমার সুখ আসবে! *নাস্তি বুদ্ধিঃ অযুক্তস্য,* যে অযুক্ত, ঈশ্বরের সঙ্গে যে নিজেকে জুড়ে রাখেনি, আত্মার সঙ্গে যে জুড়ে রাখেনি, নিজের মনকে যে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি; সুখ তার কোথা থেকে আসবে। আচার্য বলছেন, *বুদ্ধিঃ আত্মস্বরূপবিষয়া।* আমি কে? আমি আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছি আমি কে? আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, আমি ঈশ্বরের সন্তান। এই চেতনাটা যদি সদা সর্বদা জাগ্রত না রাখতে পারি, এই ভাবের সাথে সর্বক্ষণ যদি যুক্ত না থাকতে পারি, তাহলে তখন আমি হয়ে গেলাম অযুক্ত। এর বিপরীতে, আমি শুদ্ধ আত্মা, আমি ঈশ্বরের সন্তান; এই চেতনাটা যার সব সময় জাগ্রত, তিনি যুক্ত। পাড়ার উঠতি মস্তানরাও বলে, জানো আমি কে! আমি অমুক মস্তানের চামচা। জানো আমি কে, আমি তমুক মস্তানের চামচা। মস্তান

কে? রাগ আর দ্বেষ। আমি আপনি, সবাই তা না, আমরা সবাই সেই শুদ্ধ আত্মা। এই বোধটাকে জাগিয়ে রাখতে হবে।

বলছেন, যদি তুমি অযুক্ত হয়ে থাক, *ন চাযুক্তস্য ভাবনা,* অর্থাৎ সর্বব্যাপী চৈতন্যের সাথে যে যুক্ত নয়, আচার্য বলছেন, *আত্মজ্ঞান অভিনিবেশেম্,* আত্মজ্ঞানের প্রতি তার নিষ্ঠা হয় না। ঈশ্বরের দিকে মন কেন যায় না, জপধ্যানে কেন মন লাগে না, কেন আমরা ভাল হতে চাই না, সুখ-শান্তি পাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও কেন পাই না? কারণ *ন চাযুক্তস্য ভাবনা,* তোমার যে আসল স্বরূপ, সেই আসল সর্বব্যাপী চৈতন্য স্বরূপের সাথে তুমি যুক্ত নও বলে তোমার মনে এই ভাবনার উদয় হয় না। এই ভাবনা বাংলার ভাবনা না, এটা গীতার টেকনিক্যাল ভাবনা।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য, যে অযুক্ত তার বুদ্ধিই নেই, এই বুদ্ধি মানে সাধারণ অর্থে যে বুদ্ধি মনে করি সেটা না। আমরা আগে বুদ্ধির উপর আলোচনা করেছি। এই বুদ্ধি হল, কার্য কি আর অকার্য কি জেনে সেই মত করা। ফলে কি হয়, *আত্মস্বরূপবিষয়া,* শাস্ত্র আর আচার্য যে উপদেশ দিয়েছেন, সেই উপদেশ ঠিক ঠিক ধারণা করার পর সেই উপদেশ অনুযায়ী যে আচরণ করা হয়।

ন চাভাবয়তঃ শান্তিঃ, যার ভাবনা নেই, যে আত্মবিষয়কে নিয়ে, ঈশ্বরকে নিয়ে ধ্যান করে না, সে কোথা থেকে শান্তি পাবে! রাগ আর দ্বেষের জন্য তার মন সব সময় চঞ্চল হয়ে থাকবে। *অশান্তস্য কুতঃ সুখম্,* যার মন অশান্ত, যার শান্তি নেই, সে সুখ কোথা থেকে পাবে! তার মানে, সুখ পেতে গেলে আগে চাই শান্তি, শান্তি পাওয়ার জন্য চাই ভাবনা, ভাবনা পাওয়ার জন্য চাই যুক্ত হওয়া। যুক্ত হওয়ার জন্য চাই বুদ্ধি। শাস্ত্রের এই সব অমূল্য কথা আমাদের মন দিয়ে শুনতে হয়। এখন তো তাও ইন্টারনেট যুগ এসে গেছে বলে আমরা এইসব কথা শুনতে পাচ্ছি। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে মানুষ গীতার কথা, শাস্ত্রের কথা শোনার সুযোগও পেত না। শাস্ত্রের কথা শুনতে হবে, শুনে গ্রহণ করতে হবে, গ্রহণ করার পর ধারণা করতে হবে। গরু যদি ঘাস না খায় দুধ দেবে কোথা থেকে! শাস্ত্র পড়ুন, এখন কত বই, রামকৃষ্ণ মিশন, অদ্বৈত আশ্রম কত বই বার করে দিয়েছেন। এগুলো পড়ুন, গরুর পেটে একটু ঘাস যেতে দিন।

অশান্তস্য কুতঃ সুখম্, এর উপর আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, *ইন্দ্রিয়াণাং হি বিষয়সেবাতৃষ্ণাতো নিবৃত্তিঃ যা তৎ সুখম্,* সুখকে পরিভাষিত করতে গিয়ে আচার্য বলছেন, ইন্দ্রিয়সুখ থেকে যখন নিবৃত্ত হয়, ইন্দ্রিয়সুখ থেকে মানুষ যখন বেরিয়ে আসে, এই যে নিবৃত্তি, এই যে বেরিয়ে আসা, এটাই সুখ। সুখের কি পরিভাষা? বিষয়তৃষ্ণা থেকে বেরিয়ে আসাটাই সুখ, বিষয়তৃষ্ণা থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত সুখ হবে না।

দুঃখ কি? বলছেন, *ন বিষয়বিষয়া তৃষ্ণা, দুঃখম্ এব হি সা,* বিষয়ের প্রতি যে তৃষ্ণা, এটাই দুঃখ। আর তার সাথে বলছেন, *ন তৃষ্ণায়াং সত্যং সুখস্য গন্ধমাত্রম্ অপি উপপদ্যতে,* খুব সহজ ভাষায় আচার্য বলছেন, তৃষ্ণাতে সুখের গন্ধমাত্র নেই; মানে, সুখের কথা ছেড়ে দাও, সুখের গন্ধটুকুও নেই। বিরিয়ানির মত কিছু কিছু রান্না আছে, যাতে একটু মশলা ছড়িয়ে দেওয়া হয়, মশলার গন্ধটাই এমন দারুণ যে, ওই রান্নাটা খাওয়ার জন্য মানুষ এক শহর থেকে আরেক শহরে দৌড়ে আসে। আচার্য বলছেন, এই সংসারে যে বিষয়তৃষ্ণা, মনে হয় এই বিষয়টা পেয়ে গেলে আমার জীবন সুখের বন্যা হয়ে যাবে, কিন্তু বুঝতে পারছে না যে, এতে সুখের গন্ধটুকুও নেই।

জীবনে যদি সুখ চাও, শান্তি চাও, তাহলে এই বিষয়তৃষ্ণা থেকে সরে এসো, রাগ-দ্বেষ থেকে বেরিয়ে এসো। তুমি কে, এই ভাবটাকে বোঝ। মনটাকে এবার ভিতরে গিয়ে তোমার ওই আসল যে ভাব, তাতে মনকে সমাহিত কর। সেখান থেকে তুমি ধীরে ধীরে চরম জ্ঞানের দিকে এগোতে শুরু করবে। পরপর এই তিনটে শ্লোক, চৌষট্টি, পয়ষট্টি আর ছেষট্টি শ্লোকে গীতা বলে দিলেন সুখ আর

শান্তির উপায়। এই উপায়কে যদি না কাজে লাগাতে পারি, তাহলে অশান্তি ছাড়া কিছু আসবে না। কি রকম অশান্তি –

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি।।৬৭।।

(ঘূর্ণয়মান বায়ু যেমন জলস্থিত নৌকাকে উন্মার্গগামী করে, সেই রকম স্ব স্ব বিষয়ে ধাবমান ইন্দ্রিয়গুলির যেটাকে মন অনুসরণ করে, সেই ইন্দ্রিয়টিই অসংযত ব্যক্তির আত্মানাত্ম বিবেকবুদ্ধি হরণ করে ও তার মনকে বিষয়াভিমুখী করে।)

ইন্দ্রিয় জগতে যার মন বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, *তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং*, তার সব প্রজ্ঞা হরণ করে নেয়। যখন ক্লাশ ফোর ফাইভে আমরা পড়ছি, তখন চরিত্রগত ভাবে যা যা করা দরকার সব জেনে গেছি। কি কি জেনে গেছি? সত্য কথা বলতে হয়, কাউকে কষ্ট দিতে নেই, পরের দ্রব্যে লোভ করতে নেই। বড় হয়ে আরও নীতিকথা জেনেছি, যেমন, চুরি করতে নেই, পরস্ত্রীর দিকে দৃষ্টি দিতে নেই। সব নীতিকথা আমাদের জানা আছে, কিন্তু পালন করতে পারি না কেন? কারণ মন আমাদের বিষয়ের জগতে ঘুরঘুর করে যাচ্ছে। তাহলে কোথায় ঘুরঘুর করতে হবে? স্থিতপ্রজ্ঞ আলোচনা করা সময় বলা হয়েছিল, *তৎ তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্*, মহাপুরুষরাও এই জগতে বিচরণ করছেন, ঠাকুরও কলকাতার রাস্তায় চলাফেরা করছেন, স্বামীজীও আমেরিকার রাস্তায় ঘুরছেন, প্যারিসের রাস্তায়, লণ্ডনের রাস্তায় ঘুরছেন; তাঁদের দৃষ্টিতে শুভও আসছে, অশুভও আসছে, কিন্তু তাঁরা যেমন আছে তেমনটা দেখে এগিয়ে গেলেন। আমরা কিন্তু তা করি না, আমাদের মন কিছু ভাল দেখলেই ওর আশেপাশে ঘুরঘুর করবে। এর ফলে কি হয়? *তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং*, তাদের বুদ্ধিকে টেনে অন্য দিকে নিয়ে যাবে। কি রকম ভাবে টেনে নেয়? উপমা দিচ্ছেন নৌকার, *বায়ুঃ নাবম্ ইব অম্ভসি*, ঝড় যেমন নৌকাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। জগৎ এমনই এক জিনিস, যে জগতের বিষয়গুলি, বস্তুগুলি আমাদের মনকে টেনে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে।

সারা জগৎ এই ভাবেই একবার এদিকে ধাক্কা খাচ্ছে, আরেকবার ঐদিকে ধাক্কা খাচ্ছে। আমরা এই ভব সাগরে সবাই একটা ছোট ছোট ডিঙি নৌকার মত, আর এই সাগরে কামনা-বাসনা, শোক-মোহের ঝড় লেগেই রয়েছে, এই ঝড় নৌকাকে উড়িয়ে নিয়ে এই কুলে ফেলছে আরেকবার ঐ কুলে নিয়ে ফেলছে। এর থেকে বাঁচার কি উপায় কোন উপায় নেই? নিশ্চয়ই আছে; শান্তি আর সুখ, শান্তি আর সুখের জন্য চাই বুদ্ধি ভাবনা, বুদ্ধি ভাবনার জন্য নিত্য বস্তু, যেটা আমার আসল সত্তা, তার সাথে যুক্ত হতে হবে, মনটাকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যেতে হবে বা আত্মচিন্তনে মনকে সর্বদা যুক্ত করে রাখতে হবে। আত্মচিন্তনের জন্য চাই মনের প্রশান্তি ভাব, চঞ্চলতার অভাব হতে হবে। চঞ্চলতার অভাব কখন হবে? যখন রাগ আর দ্বেষ থেকে সরে আসব। রাগ আর দ্বেষ যদি থাকে তখন কি হবে সেটাই এই শ্লোকে বলছেন, *ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে*, রাগ আর দ্বেষ থেকে প্রেরিত হয়ে যারা ইন্দ্রিয়ের পেছনে দৌড়াচ্ছে তাদের মধ্যে যার গান ভালো লাগছে সে গান শুনবার জন্য দৌড়াচ্ছে, যে খেতে ভালোবাসে সেই ভোজবাড়ি আর রেস্টুরেন্টের খোঁজে দৌড়াচ্ছে, এদের বুদ্ধি ঝড়ের নৌকার মত হারিয়ে যায়। সেইজন্য হে অর্জুন তুমি কি করবে? এর থেকে রক্ষা পেতে হলে মনকে ইন্দ্রিয় জগতে বেশী ঘুরতে দেওয়া একেবারেই চলবে না।

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৬৮।।

(হে মহাবাহো, সেইহেতু যাঁর ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদি বিষয় থেকে সর্বপ্রকার নিবৃত্ত হয়েছে, তাঁর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।)

ভগবান অর্জুনকে আবার পিছনের দিকে নিয়ে গেলেন। অর্জুন, তুমি প্রশ্ন করেছিলে স্থিতপ্রজ্ঞ কে? এটাই তার উত্তর –*তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ,* যিনি সব দিক থেকে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রতি করে নিয়েছেন, যিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে টেনে নিয়ে এসেছেন, তিনিই হলেন স্থিতপ্রজ্ঞ। এর আগে বলে দিলেন, শান্তি পাওয়ার কি উপায়, সুখ পাওয়ার কি উপায়, তার সাথে বিনাশের কি কি কারণ বললেন। এবার এই টপিকটা শেষ করতে যাচ্ছেন, শেষ করার আগে ভগবান দেখাচ্ছেন একজন জ্ঞানী পুরুষ আর একজন সংসারীর মধ্যে তফাৎ কোথায়। আচার্য এই জায়গাতে একটা বড় ভাষ্য দিয়েছেন।

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।।৬৯।।

(সর্বভূতের পক্ষে যা রাত্রিস্বরূপ (অজ্ঞাত), সেই ব্রহ্মে স্থিতপ্রজ্ঞ জাগ্রত থাকেন (সর্বদা ব্রহ্মদর্শন করেন)। আর, যে অজ্ঞানরূপ রাত্রিতে ভূতগণ জাগ্রত থাকে (সংসারদর্শন করে) স্থিতপ্রজ্ঞের পক্ষে তা রাত্রিস্বরূপ অর্থাৎ ইনি সংসার অনুভব করেন না।)

মুনি শব্দের অর্থ, যিনি মননশীল, ঈশ্বরকে নিয়ে যিনি মনন করেন, ঈশ্বরে তাঁর মন সব সময় ডুবে থাকে। এই ধরণের পুরুষ, যাঁদের মুনি বলছেন, তাঁদের সাথে সাধারণ মানুষের কি তফাৎ? বলছেন, যে জায়গাতে সাধারণ মানুষ রাত দেখে, মুনিরা সেখানে দিন দেখেন, আর যেখানে বাকিরা দিন দেখে, মুনিরা সেখানে দেখেন রাত। এই রাত আর দিন হল, ইন্দ্রিয়জগৎ আর আত্মার জগৎ। মুনিরা আত্মার জগতে বিচরণ করেন, তাঁদের আলোচনা চলে একমাত্র আত্মাকে নিয়ে, শুধু ঈশ্বরকে নিয়ে। আত্মা, ঈশ্বর; এর বাইরে অন্য কোন কিছুর দিকে মুনিদের দৃষ্টি নেই। আত্মজ্ঞানের জন্য যে চেষ্টা, আত্মজ্ঞানে যে বিচরণ করা, এটাকে বলা হয় দিন।

ইন্দ্রিয়জগৎকে বলা হয় রাত। আচার্য বলছেন পেঁচারা রাত্রি জেগে যেমন অন্ধকারে তাদের সব কাজ করতে থাকে; মানুষ ঠিক পেঁচার মত, যেখানে আত্মার অন্ধকার সেখানেই তারা আলো দেখে। যোগীরা দিনের পাখির মত, তাঁরা শুধু আত্মার আলো দেখেন। একটা পায়রা আর আর-একটা পেঁচা, পায়রা দিনের আলো দেখে, আর দিনের আলোতে পেঁচার চোখ বন্ধ হয়ে যায়। রাত্রিবেলা অন্ধকারে পেঁচা সব দেখতে পায়, কিন্তু পায়রার চোখ বন্ধ হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়জগৎ অন্ধকারের মত, আত্মজ্ঞান দিনের আলোর মত। পুরো যে world of mind, মনের যে পুরো এলাকা, এটাই ইন্দ্রিয়ের এলাকা, এটাই *সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ,* এটাই মুনি, যোগীদের কাছে রাত। যেখানে মন সেখানেই রাত, আর মনের পারে আত্মা, যেখানে আত্মা, সেটাই তাঁদের কাছে দিন।

এখানে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। বলছেন, যত শাস্ত্র আছে সবটাই মনের এলাকার। ঠাকুর বলছেন, এখানকার অনুভূতি বেদা-বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছে। কেন এই কথা ঠাকুর বলছেন? কারণ বেদ-বেদান্ত এগুলো সব মনের এলাকা। তবে মনের এলাকা হলেও, এনারা পথ দেখিয়ে দেন, কিভাবে তুমি মনের এলাকার বাইরে যাবে। যতক্ষণ মানুষ মনের এলাকায় আছে, আমরা যেমন আছি, আমরা কখনই শাস্ত্রকে, বেদ-বেদান্তকে অবিদ্যা বলতে পারব না। ইদানিং কালে যাঁরা অদ্বৈত জ্ঞান নিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলে বেড়াচ্ছেন, তাঁরা একটা ভুল করেন। আচার্য শঙ্কর পরিষ্কার বলছেন, যতক্ষণ তুমি মায়ার রাজ্যে আছ, ততক্ষণ এটাকে অবিদ্যা বলা যাবে না। মায়ার রাজ্যে সবটাই সত্য, আমার সমস্যা সত্য, শাস্ত্র সত্য, সাধনা সত্য। এই মনের এলাকার বাইরে যখন বেরিয়ে যায়, তখন দেখে যে, সত্যিই এগুলোর দরকার ছিল না। মন যখন পবিত্র হয়ে যায়, তার মানে রাগ আর দ্বেষ থেকে যখন মুক্ত হয়ে যায়, তখন আত্মজ্ঞান আসে।

আত্মজ্ঞান আসাটা কি নূতন কোন জ্ঞান হওয়া, যেমন ফিজিক্স কেমেস্ট্রি পড়ে জ্ঞান হয়? বলছেন, তা না, আত্মা আপনার স্বরূপ। আত্মা স্বতঃ প্রমাণ, আমার গায়ে জামা আছে, আমি পরিষ্কার জামা দেখতে পাচ্ছি, এর জন্য কোন প্রমাণ লাগবে না। মানুষ যখন ওই আত্মজ্ঞানের অবস্থায় পৌঁছে যায় তখন দেখে, অবিদ্যা কি, আর দেখে শাস্ত্রগুলি কেমন একধারে পড়ে আছে। ঠাকুর কেমন বলছেন, আমার মন যখন একশ হাত নেমে আসে তখন ওঁম্ আসে। এদিকে কঠোপনিষদ বলছেন, সমস্ত বেদ, উপনিষদের বক্তব্য হল ওঁম্। তার মানে, মানুষ যখন ঈশ্বর জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সব কিছু কোথায় ছাড়িয়ে চলে যায়, তিনি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না। এইসব কথা আমরা এখন কিছুই বুঝতে পারব না। দিনে ছয় থেকে সাত ঘন্টা জপ কিছু না হোক, আট থেকে দশ বছর ধরে জপ না করলে ধারণা হবে না। তবে আমাদের শুনে যেতে হবে, শুনে যাওয়াটাও সাধনা, শাস্ত্র শুনতে শুনতে ভিতরে একটা ভাল সংস্কার তৈরী হয়।

ইন্দ্রিয়ের জগতেই সব মানুষ সুখ পায়, সেটাই তাদের কাছে দিনের আলোর মত। মানুষ যখন ওই ইন্দ্রিয় জগতের সুখ বিসর্জন দিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে এসে বলে, আমি যতি হব, আমি তপস্বী হব, তখন কি হয়?

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।।৭০।।

(যেমন জলরাশি পরিপূর্যমাণ সমুদ্রে প্রবেশ করলেও সমুদ্র স্ফীত হয় না এবং বেলাভূমি লঙ্ঘন না করে অবিকৃত থাকে, সেই রকম অজ্ঞ ব্যক্তির কাম শব্দাদি-বিষয়সমূহ ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠ পুরুষে প্রবেশ করে বিলীন হয়, অর্থাৎ যাকে বিচলিত করতে পারে না, তিনিই চির শান্তিলাভ করেন। কিন্তু যিনি বিষয় কামনা করেন, তাঁর পক্ষে শান্তিলাভ অসম্ভব।)

গীতা এই শ্লোকে সমুদ্রের উপমা নিচ্ছেন। বলছেন, কত নদী, কত খাল দিয়ে কত জলরাশি প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে এসে পড়ছে, এসে তারা সবাই সমুদ্রেই মিশে যাচ্ছে, সমুদ্রে মিশে সব নদী, খাল একেবারে হারিয়ে যাচ্ছে। কত নদী এইভাবে সমুদ্রে ঢুকে একেবারে হারিয়ে যাচ্ছে। এত জলরাশি এনে সমুদ্রে ঢালছে, কিন্তু তাতে সমুদ্রে এক বিন্দুও ক্ষোভণ হয় না, সমুদ্র যেমনটি ছিল, তেমনটিই থাকে।

আপূর্যমাণম্, একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে *অচলপ্রতিষ্ঠং*, নিজের অচল ভাবের উপর পুরো প্রতিষ্ঠিত, *সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ*, এই ধরণের সমুদ্রে নদীর জল যেভাবে প্রবেশ করে হারিয়ে যায়, *তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে*, ঠিক সেই ভাবে ইন্দ্রিয়জগৎ থেকে যে অনবরত টোকা মেরে যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে সব হারিয়ে যাচ্ছে। যে মানুষ নিজের ইন্দ্রিয়কে পুরো সংযম করে নিয়েছে, তাকেও বাইরের ইন্দ্রিয়জগৎ টোকা মেরে যাচ্ছে, কিন্তু ওখানে গিয়ে সব হারিয়ে যায়, তাঁর ভিতর কোন ক্ষোভণ হয় না।

বাল্মীকি রামায়ণে মহাবীর হনুমানের খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। মহাবীর হনুমান হয় গদা নিয়ে, আর তা নাহলে খালি হাতেই যুদ্ধ করতেন। রাক্ষসগুলো হনুমানকে বাণ মারছে, উনি সেই বাণগুলি হাত দিয়ে ধরে গিলে ফেলছেন। কামদেব হলেন কামের মূর্ত রূপ, তিনি যখন কামের ইচ্ছা করেন, তখন জগতের সবার ভিতরে কামের ইচ্ছা জেগে ওঠে। শিব গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছেন। ওনার মনকে চঞ্চল করতে হবে। কামদেব ওখানে পৌঁছে গেলেন, পৌছাতেই সেখানে বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব হয়ে গেল, মিষ্টি মিষ্টি বাতাস, পাখীর কুজন, পাতা ঝরা গাছ আবার নূতন কিশলয়ে পল্লবিত হয়ে

উঠেছে, বাল্মীকি খুব সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছেন। কামদেব এবার কামবাণ চালাতে শুরু করলেন। পুরো জগৎ কাম ভাবে উদ্বেলিত হয়ে উঠল, যোগীদেরও ভিতরে কাম ভাব জেগে উঠল। কামদেব এবার বাণ চালালেন শিবের উপর, তাঁর পাঁচ পাঁচটি বাণ চালিয়ে দিয়েছেন, শিবের তাতে কিছুই হল না। কিন্তু শিব বুঝতে পারছেন যে, কোথাও কিছু গোলমাল হচ্ছে। শিব তাঁর তৃতীয় নেত্রটা একটু খুলে দেখলেন সামনে কামদেব। শিব খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, এগুলো কি হচ্ছে, এটা কি বাঁদরামো করার জায়গা, তিনি চোখ পুরো খুললেন, কামদেব সেখানেই ভস্ম হয়ে গেলেন। যে কামদেবের ইচ্ছামাত্রেই জগতে কামের ভাব জেগে ওঠে, বাণ চালাবার কোন দরকারই হয় না, আর সেখানে শিবের উপর কামদের তাঁর সব বাণ চালিয়ে দিলেন। শিব বুঝতেও পারলেন না কি হয়েছে। গণ্ডারকে যাই চালানো হোক কিছু হয় না। তবে গণ্ডারের ক্ষেত্রে যেটা চালাবে সেটা ঠিকরে ফেরত চলে আসে, কিন্তু সমুদ্রে গেলে হারিয়ে যায়। এই জগতের বিষয়রূপ বাণ একবার ঢুকে গেলে আর কিছু হয় না, নদীর জল যেমন সমুদ্রে গিয়ে হারিয়ে যায়, সেই রকম হারিয়ে যায়।

বলছেন *তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি*, যার ভিতরে কাম প্রবেশ করে হারিয়ে যায়, কোন ক্ষোভণ হয় না, *স শান্তিমাপ্নোতি*, সেই একমাত্র শান্তি পায়; *ন কামকামী*, যার মধ্যে কামের ইচ্ছা আছে, ভোগের ইচ্ছা আছে, তার কোন দিন শান্তি হয় না। যে বলছে, আমি শান্তি চাই, তাহলে তুমি আগে কাম থেকে বেরিয়ে এসো। পরের শ্লোকে এটাকেই একটু অন্য ভাবে বলছেন –

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।।৭১।।

(যিনি নিঃশেষরূপে সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করেন, শরীর ও জীবনধারণার্থ প্রয়োজনীয় বিষয়েও ‘মমত্ব’ভাববর্জিত ও বিদ্যাবত্তাদি অহঙ্কাররহিত হন এবং শরীরের ও জীবনে স্পৃহাশূন্য এবং জীবনধারণমাত্রে চেষ্টাযুক্ত হয়ে পর্যটন করেন, তিনি সকল সংসারদুঃখের নিবৃত্তিরূপ পরম শান্তি (ব্রহ্মনির্বাণ) লাভ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হন।)

আবার পুনরাবৃত্তি করে বলছেন, *বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্*, সমস্ত কামনা-বাসনাকে মানুষ যখন ত্যাগ করে দেয়, এবং *পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহ*, ত্যাগ করে এই জগতে বিচরণ করে, তখন তার কোন কিছুর প্রতি কোন স্পৃহা থাকে না। *নির্মমঃ*, মমত্বের ভাব, এটা আমার, এই ভাব কোথাও তার নেই, আর *নিরহঙ্কারঃ*, কোথাও কোন আমিত্বের ভাব থাকে না। মমত্ব আর আমিত্ব, আমি ও আমার এই দুটোই তো মায়া। আমি ও আমার এই ভাবটা তো থাকেই না, এমনকি নিজের দেহ এত প্রিয়, সেই দেহের প্রতিও তার কোন মমতার ভাব থাকে না।

তাহলে কিভাবে থাকে? আচার্য বলছেন, *শরীরজীবনমাত্রক্ষিপ্তপরিগ্রহে*, শরীর ও জীবন চালানোর জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই রাখেন, তার বেশী রাখেন না। আমার কাছে বিশেষ কিছু নেই, কিছু বই আর টুকটাক কিছু কাগজপত্র আছে। তাও আমি মনে করার চেষ্টা করি, আমার তাকের কোন র‍্যাকে কোথায় কি রাখা আছে। যে জিনিসটার ব্যাপারে আমার কিছু মনে নেই, সঙ্গে সঙ্গে সেই জিনিসটা বার করে আমি বিদায় করে দিই। যেটার ব্যাপারে আমার মনে নেই, তার মানে এটার আমার কোন প্রয়োজন নেই, এটাকে সরিয়ে ফেলতে হবে। আপনারাও দেখুন আপনাদের ঘরে কত রকম জিনিসে ভর্তি আছে, বেশিরভাগ জিনিসই হল, যেগুলোর ব্যাপারে আপনি জানেন না। ঠাকুর বলতেন, কুবের রাজা জানেন না, তাঁর ভাণ্ডারে কত কি আছে। তাঁর যে জ্ঞান, বিদ্বত্ব, এগুলোর জন্যও তাঁর কোন অহঙ্কার নেই, এগুলো থেকে তিনি একেবারে মুক্ত।

এই ধরণের যিনি জ্ঞানী, আচার্য বলছেন, *সর্বসংসারদুঃখোপরমলক্ষণাং নির্বাণাখ্যাম্*, নির্বাণ কাকে বলে, মোক্ষ কাকে বলে, মুক্তি কাকে বলে, বলছেন, এই সংসারে যাবতীয় যা কিছু হচ্ছে, যত

দুঃখ আছে, এটার নাশ হয়ে যাওয়া। নাশ কিভাবে হবে? রাগ আর দ্বেষ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে হয়, মনের মধ্যে নিজেকে ঢোকাতে হয়, ঈশ্বর চিন্তন, আত্ম চিন্তনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, সেখান থেকে আর সে নড়ে না। জগতের মাঝে সে বিচরণ করে, কিন্তু জগতের কোন কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারে না, এটাকেই বলে নির্বাণ। ঈশ্বর দর্শন মানে কি? ঈশ্বর দর্শন মানে এই নয় যে, ঠাকুর ম্যাজিকের মত আমাদের সামনে হাজির হয়ে বলবেন, বল বৎস কি চাও। ঈশ্বরদর্শনের অর্থ হল, রাগ আর দ্বেষ থেকে প্রথমে মুক্তি, সেখান থেকে এবার সে ঘন্টার পর ঘন্টা ধ্যানে বসতে পারবে। সেখান থেকে যিনি তার ইষ্ট, বা আত্মা হন, ঈশ্বর হন, সেখান থেকে সে আর নড়বে না। সেখান থেকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, যে ইন্দ্রিয়জগৎ তার কাছে অন্ধকারের মত হয়ে যাবে আর আত্মার জগৎ দিনের আলোর মত হয়ে যাবে।

অর্জুনের প্রশ্ন ছিল স্থিতপ্রজ্ঞকে কিভাবে আমরা চিনতে পারব, স্থিতপ্রজ্ঞের কি লক্ষণ দেখে আমরা বুঝতে পারব যে ইনি একজন স্থিতপ্রজ্ঞ। ভগবান পরপর অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণগুলো এক এক করে বলে দিলেন। এখন আমরা আমাদের আশপাশের লোকদের দেখে কি করে বুঝব যে, ইনি একজন স্থিতপ্রজ্ঞ? এখানে আমি আমার একটা অভিজ্ঞতা ও বিশ্বসের কথা বলতে চাই। আমাদের মধ্যে অনেকেরই পূজ্যপাদ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল। স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ খুব মিষ্টি স্বভাবের মানুষ ছিলেন, ব্যবহার ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তিনি হয়তো অফিসে বসে কাজ করছেন, বা কোন কিছু বই বা প্রবন্ধ রচনা করছেন, সেই সময় যখনই কেউ তাঁর কাছে যেত, তিনি সঙ্গে সঙ্গে কলম বন্ধ করে এমন ভাবে আপ্যায়ন করতে এগিয়ে আসতেন যেন ওনার যত সময় সব আগন্তুকের জন্যই তুলে রাখা হয়েছে।

সামনে বসিয়ে বলতেন – বলো কি খাবে, চা খাবে না কফি দেব, নাকি কোল্ডড্রিঙ্কস খাবে? না বললেও তাকে জোর করে খাওয়াবেন। আর সেই ব্যক্তি দশ মিনিট, আধ ঘন্টা, এক ঘন্টা যতক্ষণ খুশি বসে থাকলেও কখনই তিনি বলতেন না যে, এবার তুমি এসো। এর মধ্যে যত ফোন আসছে সব তাঁকেই যেন ধরতে হবে, কখন না করতেন না, সবার সাথেই ফোনে কথা বলতেন। কিন্তু কোন ধরণের চঞ্চলতা, বিরক্তিভাব, তুমি আমার সময় নষ্ট করছ, আমি এখন ব্যস্ত আছি এই ধরণের মন্তব্য কখনই তাঁর মুখ থেকে বেরোত না।

আমরা সাধুরা ভাবতাম কি করে যে তিনি এত সময় পান, সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার। কেউ এসে কান্নাকাটি করছে, কেউ ছেলের ভর্তির ব্যাপার নিয়ে গেছে, কেউ খোশ গপ্প করতে গেছে, কারুর ছেলে অবাধ্য হয়ে গেছে, কেউ সুখের কথা বলছে, কেউ দুঃখের কথা বলছে, কেউ শুধু চা খাওয়ার জন্য বসে আছে, সব তিনি নির্বিকার চিত্তে শুনে যেতেন, কারুর প্রতি একটা কোন ধরণের কটূ মন্তব্য করে আঘাত দিতেন না। এরই মধ্যে তিনি বই লিখে যাচ্ছেন, প্রবন্ধ রচনা করছেন, বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন আবার গোলপার্কের ইনস্টিট্যুট অফ কালচারের মত একটা বিশাল প্রতিষ্ঠানকে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করে যাচ্ছেন। কোন সময় তাঁর ভেতরে কোন ধরণের আলোড়ন কারুর চোখে পড়েনি। আমার মনে হত গীতার স্থিতপ্রজ্ঞের সাক্ষাৎ মুর্তরূপ হচ্ছেন যেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বলছেন –

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাহস্যামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি।।৭২।।

(হে পৃথাপুত্র, এই অবস্থাই ব্রাহ্মী স্থিতি। এই অবস্থা লাভ করলে আর কেউ মোহগ্রস্থ হন না। অন্তিম সময়েও যিনি এই অবস্থা লাভ করেন, তিনি ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন।)

গীতা বলছেন, এটাকেই ব্রাহ্মী স্থিতি বলে, ব্রহ্মজ্ঞান বলতে এটাই। এই জ্ঞান একবার যদি কারুর হয়ে যায়, এখান থেকে আর কক্ষণ তার স্খলন হবে না। যে একবার আত্মস্বরূপকে জেনে যায়, তার আর কোন দিন পতন হবে না। *স্থিত্বাহস্যামন্তকালেহপি*, মৃত্যুর সময়েও যদি এই জ্ঞান কারুর হয়ে যায়, সেও *ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি*, তারও ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে যায়। একবার যদি এই জ্ঞান লাভ হয়ে যায়, তার মোক্ষপ্রাপ্তি হয়ে যায়, মুক্তি হয়ে যায়, জন্ম-মৃত্যুর সংসারে তার আর ঘুরে ঘুরে আসতে হবে না। জীবদ্দশায় যদি কেউ এই জ্ঞান পেয়ে যায়, তাহলে তো আর বলার কিছু থাকে না। মৃত্যুর সময়েও যদি কেউ পেয়ে যায়, তারও মোক্ষপ্রাপ্তি হয়ে যাচ্ছে, আর এই জীবদ্দশায় পেয়ে গেলে তো কোন কথাই থাকে না।

মৃত্যুর পরের জিনিসকে হিন্দু ধর্ম কখনই দাম দেয় না। কাশীতে মরলে মুক্তি হবে, শেষ সময়ে ঠাকুর এসে নিয়ে যাবেন, এগুলো আমাদের কাছে অত্যন্ত নিকৃষ্ট কথা। গীতাও বারবার বলছেন, *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো*, এখানেই, এই শরীরেই তোমাকে মন, বুদ্ধির পারে যেতে হবে, তোমাকে এই শরীরেই আত্মজ্ঞান অর্জন করতে হবে, মৃত্যুর পরে না। বিদ্যার স্তুতি করার জন্য এখানে বলছেন, মৃত্যুর সময়েও যদি তোমার এই জ্ঞান হয়, তোমার মুক্তি হয়ে যাবে। বলছেন, যে ব্রহ্মচর্য থেকে সরাসরি সন্ন্যাসে চলে গেছে, আর সারা জীবন এই ভাবে আছে, তার আর বলার কি কথা, তিনি শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম। এই বলে আমরা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়র আলোচনা শেষ করছি। এরপর আমরা কর্মযোগ নিয়ে আলোচনা করব।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগ নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

তৃতীয় অধ্যায়
কর্মযোগ

গীতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতের পণ্ডিতরা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে, ন্যায় শাস্ত্রের বিভিন্ন নিয়ম ও ব্যাখ্যার সাহায্যে তাঁদের নিজস্ব দর্শনকে সামনে রেখে বোঝাতে চাইবেন গীতা তাঁর দর্শনের কথাই বলছে। একজন একটা যুক্তি নিয়ে আসবেন, আর-একজন আর-একটি যুক্তি এনে আগের যুক্তিকে নস্যাৎ করে দেবেন, তিনি আবার একটা পাল্টা যুক্তি আনবেন, এইভাবে বিতর্ক চলতেই থাকবে। এখানে আমরা ঐ ধরণের কোন আলোচনাতেই যাব না। আমরা শুধু দেখব গীতা কি বলতে চাইছে, শুধু গীতার মূল ভাবকে তুলে ধরার চেষ্টাই করা হবে। অবশ্য গীতার অনেক জায়গা বোঝা ও ধারণা করা সত্যিই খুব কঠিন, যেখানে সঠিক ভাবকে ধরে রাখা খুব মুশকিল।

টানা পনের-কুড়ি বছর ধরে কোন ভাষ্যাদিকে অবলম্বন করে নিয়মিত যদি গীতা একটু একটু করে প্রতিদিন অধ্যয়ন করা যায় তখন কোথাও কোথাও গিয়ে গীতার আসল ভাবটা স্পষ্ট হতে শুরু হয়। যে কোন আচার্যের পক্ষেই গীতার সারতত্ত্ব কারুর মাথার মধ্যে বসিয়ে দেওয়ার কাজ প্রায় অসম্ভব, যতক্ষণ না নিজে থেকে ধারণা না হবে ততক্ষণ কিছুই বোঝা যাবে না। আচার্য শুধু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে যাবেন, কিন্তু গীতা বুঝতে হলে নিজেকেই বুঝতে হবে, তারজন্য আগে চাই অন্তর্মুখীনতা, নিয়মিত জপ-ধ্যান করে করে মনকে অন্তর্মুখী করতে হবে। শৈশবকাল থেকে আমরা এই চোখ, কান, নাক ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই জগতকে গ্রহণ করার শিক্ষা পেয়ে এসেছি, কিন্তু ভিতর থেকেও আমাদের যে জ্ঞান হয় এই ব্যাপারটা আমাদের মন বুদ্ধি কিছুতেই মানতে চায় না। এই কারণেই গীতা বোঝা বা ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন বলা হয়।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের নাম কর্মযোগ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান এক জায়গায় বলছেন *কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন*। কর্মযোগ কি? কাজ কর কিন্তু ফলে আসক্তি রাখবে না। এতটুকু বুঝে নিলেই তো পুরো গীতা বুঝে গেলে। তা কি কখন হয়? আচার্য শঙ্কর গীতা ভাষ্যের প্রথমের দিকে এক জায়গায় বলছেন, গীতায় খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে, সেইজন্য গীতাকে বুঝে নেওয়া এবং ধারণা করে ধরে রাখাটা খুব কঠিন। তার থেকেও বেশি, গীতা সমন্বয় শাস্ত্র, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন তত্ত্বকে গীতায় একটা জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে, ফলে গীতা বোঝা বা ধারণা করা খুব কঠিন। পরম্পরা গত বিদ্যায় বলা হয়, সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান যদি ভাল থাকে, প্রকরণ গ্রন্থ, অর্থাৎ যে যে শাস্ত্রগুলি দিয়ে শাস্ত্রের অধ্যয়ন শুরু হয়, যেমন বিবেকচূড়ামণি, দৃক্-দৃশ্য বিবেক এই ধরণের গ্রন্থগুলো একটু অধ্যয়ন করে নেওয়ার পর বেদের উপর কিছু ধারণা থাকা দরকার, উপনিষদের ভাল জ্ঞান থাকা দরকার, তবে গিয়ে যদি গীতা বোঝা যায়। গীতা একদিকে উপনিষদের সার, অন্য দিকে সমন্বয় শাস্ত্র। *কর্মণ্যেবাধিকারস্তে* বলে ভগবান সূত্রাকারে ছেড়ে দিলেন। আমরা আগে বলেছি যে, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে গীতার যে দর্শন তার পুরো বীজাকারে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের এক-একটা বীজকে পরে পরে এক-একটা অধ্যায়ে বিস্তারে বলা হয়েছে। বিস্তারে বলা হলেও কোথাও কোন পুনরাবৃত্তি নেই। পুনরাবৃত্তি থাকুক বা নাই থাকুক তত্ত্ব কিন্তু একই থাকবে, তত্ত্ব তো আর পাল্টে যেতে পারে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের যেখানে স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণের কথা শুরু করছেন *প্রজহাতি যদা কামান্ দিয়ে*, তার একটু আগে ভগবান বলছেন, *কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন*। আমরা সাধারণ ভাবে গীতাকে ভক্তি ভাবে নিয়ে থাকি, আমরা মনে করি গীতা ভগবানের কথা, ঠাকুর বলেছেন সন্ন্যাসীর

কাছে আর কিছু না থাক গীতা সঙ্গে থাকবে, ঠাকুর আবার বলছেন, গীতা তিনবার বললে যা হয়, গীতা মানেই তাই, গীতা বলতে বলতে ত্যাগী হয়ে যায়, গীতা বলছেন সব ত্যাগ কর। এটুকু শুনে নিয়ে আমরা মনে করি, গীতাতে কি আছে আমার জানা হয়ে গেল।

কারুর বুদ্ধি যদি একটু তীক্ষ্ণ হয়, সে তখন বলবে গীতার এই দুটো শ্লোকের মধ্যে তো বিরোধ দেখা যাচ্ছে। একদিকে ভগবান বলে দিলেন, কাজ কর, কর্মেই তোমার অধিকার কিন্তু ফলের প্রত্যাশা করবে না। আবার বলছেন *যোগঃ কর্মসু কৌশলম্*, কাজের যে কৌশল এটাই যোগ। আবার তার আগে বলছেন, *প্রজহাতি যদা কামান্*, যার কাম খসে পড়ে গেছে সে কেন কাজ করবে। সৃষ্টিকে নিয়ে অদ্বৈতবাদীরা খুব মজা করে বলেন, *আপ্তকামস্য কা স্পৃহা*, যিনি আপ্তকাম, যার কোন কামনা নেই, তিনি সৃষ্টি কেন করবেন! আপনারাই বলছেন, ঈশ্বর পূর্ণকাম, তবে তিনি কেন সৃষ্টি করতে গেলেন? কারণ যে কোন কাজ করার জন্য একটা ইচ্ছা লাগে। ইচ্ছা হওয়া মানেই সে অপূর্ণ, তাহলে ভগবান কি অপূর্ণ? তাহলে তিনি সৃষ্টি কেন করলেন? তখন বলবে, বাচ্চা যেমন করে। ও, তাহলে আপনার ভগবান কি বাচ্চা? বিনা কোন উদ্দেশ্য, বিনা কোন ইচ্ছা ছাড়া একমাত্র পাগল কাজ করে। আপনার ভগবান কি পাগল? প্রকৃতপক্ষে এগুলোর কোন উত্তর নেই।

ধর্মীয় শাস্ত্রে এই ধরণের গভীর প্রশ্ন আসে, আর এ-সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বড় বড় ঋষি মহাত্মাদেরও ঘাম ছুটে যায়। রামানুজাচার্য, মাধ্বাচার্য, খ্রীশ্চান ফিলজফি, ইসলামিক ফিলজফ, জুইস ফিলজফি, কেউই ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারেন না। কিন্তু উত্তর তো একটা দিতে হবে, তাই বলে দেন, ঠাকুরের ইচ্ছা, আল্লার মর্জি, প্রভুর ইচ্ছা, তাঁর ইচ্ছা ইত্যাদি। তাঁর ইচ্ছা মানে, তুমি সোজাসুজি বল না ভাই, আমি জানি না, আমার জানা নেই। বেদান্ত এটাই বলে, দেখ ভাই, আমার জানা নেই সৃষ্টি কেন হল, কিভাবে হল, এরই নাম মায়া। কিন্তু যাঁরা ঘোর অদ্বৈতবাদী, তাঁরা বলবেন, সৃষ্টি আদপেই হয়নি, এ যা কিছু দেখছ সব নাম আর রূপের খেলা। স্বামীজীর দেববাণীতে খুব সুন্দর ভাবে বেদান্ত, ভক্তি, দ্বৈত সব কিছুকে একটা প্ল্যাটফরমে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। সেইজন্য দেববাণী সবারই একবার পড়া দরকার। এই যে গীতায় দুটি বিপরীত কথা, একদিকে বলছেন তুমি কাজ কর, অন্য দিকে বলছেন, *বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহ*, যার মন থেকে সব কামনা পড়ে গেছে, সে নিস্পৃহ হয়ে জগতে বিচরণ করে, আর আপনি বলছেন এটাই শ্রেষ্ঠ। তাহলে আমি কোনটা করব?

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে সাংখ্যযোগ আর বুদ্ধিযোগের অথবা বলতে পারি সাংখ্যবুদ্ধি ও যোগবুদ্ধির কথা বলে দিলেন। একটা হচ্ছে জ্ঞানের অবস্থা আরেকটি হচ্ছে কর্মের অবস্থা। যাঁর এই বোধ হয়ে গেছে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই, আত্মাই কেবল আছেন তিনি সাংখ্য বুদ্ধি অবলম্বন করেন। আর যাদের এই সাংখ্য বুদ্ধি হয়নি তাদেরকে বললেন তোমরা কর্মযোগ কর। অর্জুনকে পরিষ্কার বলে দিলেন –*কর্মণ্যেবাধিকারস্তে*, কর্মেই তোমার অধিকার, সাংখ্য বুদ্ধির জন্য তুমি এখনও প্রস্তুত নও। মা সরষে বাটা দিয়ে মাছের ঝাল করেছেন, সেই একই মাছকে কাঁচা লঙ্কা, আদা আর জিরের ফোড়ন দিয়ে একটা পাতলা ঝোল করেছেন। এক ছেলেকে মা এই পাতলা ঝোল দিতেই ছেলে রেগেমেগে বলছে 'আমাকে মাছের ঝাল কেন দিলে না'? মা বলছে, 'ওরে তোর পেটে ঐ ঝাল সইবে না'। ছেলের রেগে যাওয়াটাই স্বাভাবিক, তুমি ভালো জিনিসটা অপরকে দেবে আর আমাকে শুধু এই পাতলা ট্যালট্যালে ঝোল কেন দেবে? অর্জুনও ঠিক এই প্রশ্নই করছেন।

ধর্ম জগতে এটা একটা খুব পুরনো বিবাদ, এটাকে বলে জ্ঞান-কর্ম বিরোধ। জ্ঞান হল আত্মজ্ঞান, বেদান্ত; আর কর্মযোগ মানে কাজ করা। মাঝে মাঝে সব প্রশ্ন করে, আমি গৃহবধূ, আমি কি করে জীবন চালাব? আপনি কোথা থেকে শুনে নিয়েছেন যে, গৃহবধূর জীবন চালানো যায় না? আগামীকাল একজন রেল ইঞ্জিনের ড্রাইভার বলবে, আমি ইঞ্জিন ড্রাইভার, আমি কি করে জীবন

চালাব? পরশু একজন সন্ন্যাসী বলবে, আমি সন্ন্যাসী, আমি কিভাবে জীবন চালাব? আরে ভাই, যে যেভাবে চলেছে, তাকে সেভাবেই জীবনটা চালাতে হবে। কিন্তু মানুষের স্বভাবই হল, গ্ল্যামারের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া।

একজন একটা চাকরি পেয়েছে, নূতন চাকরি, কাজের কোন অভিজ্ঞতা নেই। বিরাট বড় কোম্পানীতে প্রথম চাকরি করতে গিয়ে মালিককে জিজ্ঞেস করেছে, 'এখানে কি কি কাজ আছে'? সব শোনার পর বলল, 'আমাকে আপনি ভাইস প্রেসিডেন্টের কাজটা দিন'। মালিক শুনে হেসে বলছেন, 'ইতিমধ্যে আমাদের বারোজন ভাইস প্রেসিডেন্ট আছে'। ছেলেটি বলল, 'তের সংখ্যায় আমার কোন আপত্তি নেই'। ছেলেটি বুঝতেই পারছে না যে, এভাবে দুম্ করে কাউকে ভাইস প্রেসিডেন্ট করে দেওয়া যায় না। জন্ম নিয়েই সবাই বলছে আমার আত্মজ্ঞান চাই। কিছু দিন আগে কমেন্টে একজন লিখলেন, অষ্টাবক্র গীতার যদি ব্যাখ্যা করেন। ভদ্রলোক আদৌ জানেন কিনা জানি না, অষ্টাবক্র গীতা কোথায় আছে। অষ্টাবক্র গীতা মহাভারতের একটা ছোট্ট অংশ, আর প্রামাণিক গ্রন্থও না, এগুলো প্রকরণ গ্রন্থ। কোথাও অষ্টাবক্র গীতার নাম শুনে নিয়েছেন। আর-একজন লিখে পাঠালো বিবেকচূড়ামণী যদি পড়ান। এই গ্রন্থগুলির নাম কোথাও শুনে নিয়েছে, একটা গ্ল্যামার বোধ হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

এই গ্ল্যামার বোধকে কেন্দ্র করে অর্জুনেরও ঠিক এই একই সমস্যা হয়েছে। অর্জুন মনে করেছেন, জ্ঞানই যদি সব কিছু হয়, তাহলে আমি কেন কাজ করতে যাব! এই সমস্যা সব জায়গায় হয়। একটা সময় রামকৃষ্ণ মিশনেরও এটা একটা বিরাট বড় সমস্যা ছিল। ঠাকুর কথামৃতের পাতায় পাতায় বলছেন, আগে ঈশ্বর লাভ, তারপর সংসার। মাস্টারমশাইও এই কথাগুলোর উপর অনেক জোর দিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করে স্বামীজী যখন কাজ করতে শুরু করলেন, তখন সেটাকে নিয়ে ঘোর আপত্তি উঠেছিল। সবাই মিলে শ্রীশ্রীমায়ের দরবারে গেছেন। মা একবার শুনেই বলে দিলেন, নরেন যা করছে সেটাই ঠিক।

হরিদ্বারে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা সেবা করতে গেছেন, ওখানে সবাই সাধুদের নাম দিলেন 'ভাঙ্গী সাধু'। অনেক বছর আগে একটা জায়গায় আমাকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করেছিল। সেখানে এক ভদ্রলোক, তিনি একটা আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত, তিনিও একই কথা আমাকে বলতে শুরু করলেন, আমাদের যে গুরু মহারাজ, তিনি বলছেন 'কাজ কিছু না, আত্মজ্ঞানটাই সব'। আমি হেসে বললাম, 'এমন গাড্ডায় গিয়ে পড়বেন যে, চোখে, মুখে সরষে ফুল দেখতে শুরু করবেন'।

একবার আমাদের দিল্লীর আশ্রমে একজন পণ্ডিতকে আনা হয়েছিল, সন্ন্যাসীদের শাস্ত্র পড়াবেন। কিছু দিন পড়িয়ে বললেন, 'মহারাজ আপনাদের শাস্ত্র পড়ানো যাবে না। আপনারা কথামৃত দিয়ে শুরু করেন, কথামৃত হল তত্ত্ববাক্য, শেষ কথা। শেষ কথা আপনারা আগেই জেনে গেছেন, তারপর শুরুর কথা আপনি কেন শিখতে যাবেন'। শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করা খুব কঠিন হবে, যদি তত্ত্ব জ্ঞান আগেই জেনে যায়। অর্জুন এখন তত্ত্ব জ্ঞান আগে জেনে গেলেন, এখন বলছেন, আমি কাজ কেন করব! আমরা এই উপমা আগেও নিয়েছিলাম, অঙ্ক পরীক্ষায় বন্ধুদের জিজ্ঞেস করবে, 'অমুক নম্বর প্রশ্নের উত্তর কত রে'? পাশ থেকে সে হয় ফিস্ ফিস্ করে কোন রকমে উত্তরটা বলে দিল। আর সেও জোর করে মিলিয়ে ওই উত্তরটা লিখে দিল। হয়ত কোন রকমে লেগে গেল, নম্বরও পেয়ে গেল, পাশও হয়ত করে গেল, কিন্তু মাঝখান থেকে তার অঙ্ক শেখাটা আর হল না। এটাকেই ঠাকুর বলছেন, টিয়া পাখী এমনি সময় রাম রাম বলে, বেড়ালে ধরলে ট্যাঁ ট্যাঁ করে। তত্ত্ব কথা শোনা হয়ে গেছে, কিন্তু সেটার উপর যে খাটনি হবে, সেটা ঠিক ভাবে হয়নি; আসল সমস্যা যখন আসবে তখন মুখ থেকে ট্যাঁ ট্যাঁ বেরোবে। অর্জুন ঠিক এই সমস্যায় পড়েছেন।

ভগবান তখন বলছেন, না, এভাবে কখন হয় না; তোমাকে আগে কাজ করতে হবে। ভগবান অর্জুনকে উপলক্ষ করে আমাদের সবাইকে এই কর্মযোগের উপদেশ দিচ্ছেন। কিছু দিন আগে একজন আমাকে লিখলেন, 'গীতা বুঝতে কি কি দরকার'? আমিও সঙ্গে সঙ্গে লিখে পাঠালাম, 'কোয়ন্টাম ফিজিক্স বুঝতে যা যা লাগে, গীতা বুঝতেও একই জিনিস লাগে। কোয়ান্টাম ফিজিক্স বুঝতে যে খাটনি লাগে, গীতা বুঝতে ঠিক একই খাটনি লাগে। সেই সূক্ষ্ম বুদ্ধি লাগে, সেই জ্ঞানের বিস্তার লাগে, সেই আচার্য লাগে আর বছরের পর বছর খাটনি লাগে'। গীতা যাঁরা প্রথম শুনবেন তাঁদের কাছে এগুলো কঠিন লাগাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু দুবার তিনবার শুনলে আস্তে আস্তে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ব্যাকরণ পড়ার সময় আমাদের সবাইকে 'কারকের বিভক্তি' ভাল করে বুঝতে হয়। আমরা সব সময় যে কাজ করি, আমরা মনে করি কাজ মানে কাজ, আমি এই কাজ করলাম। কিন্তু কাজের যে বিস্তার, এটা বোঝা যায় কারকের বিভক্তি দিয়ে। যেমন, আমি খেলাম। খুব সহজে বুঝে গেলাম খাওয়াটা একটা কাজ। কিন্তু তার সাথে যোগ হয়, আমি ভাত খেলাম। 'ভাত' এখানে হয়ে গেল দ্বিতীয়া, 'আমি' হয়ে গেল প্রথমা, প্রথমা আর দ্বিতীয়া এসে গেল। এবার বলছি, আমি হাত দিয়ে ভাত খেলাম, তৃতীয়া এসে গেল; সংস্কৃতে বলে করণ। এইভাবে আসে কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, আপাদান, এক এক করে শেষে আট খানা কারকের বিভক্তি হয়ে যায়। কাজের বেলায় সাত খানা থাকে। এই যে কারক, কারকের চিহ্ন যদি একটু কোথাও থাকে, তার মানেই বুঝতে হবে ওখানে ক্রিয়া হচ্ছে। ওখানে হয়ত কর্তা বলা হচ্ছে না, কর্তা হয়ত উহ্য থাকছে, কিন্তু কর্তা, কর্ম, করণ, প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়, সম্প্রদান, আপাদান, এগুলোর একটা যদি কোন না কোন ভাবে থাকে, তাহলেই ওটা হয়ে যাবে কর্ম।

তার সঙ্গে, যে কোন কর্মই একটা ক্রিয়া, আর ক্রিয়া হলেই তার একটা ফল হবে। তার মানে কারকের আটটি, তার সঙ্গে ক্রিয়া নিজে, সব মিলিয়ে একটা ক্রিয়া চলছে, আর তার সাথে ক্রিয়ার ফল। কারক, ক্রিয়া ও ফল এই নটি কি দশটি, এটাই কর্মের বিস্তার। এর একটা যদি থাকে, তাহলে বুঝতে হবে সবটাই আছে। ধুয়ো যদি দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে আগুন আছে, আগুন যদি থাকে ইন্ধন থাকবে। এইভাবে পিছনের দিকে যাচ্ছি, একটি যদি থাকে, তাহলে দ্বিতীয় থাকবে, দ্বিতীয় থাকলে তৃতীয় থাকবে। হিন্দু শাস্ত্রে এই নটির মধ্যে কোন একটা যদি থাকে, ওটাকে তখন বলছেন কর্ম। তাহলে কর্ম কি? কারকের সাতটি এবং ক্রিয়া ও তার ফল, এই নটির মধ্যে যে কোন একটা যদি দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে ওটা কর্ম। এটাই তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলবেন, কর্ম থেকে মানুষ কোন দিন বেরোতে পারে না।

আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করতে চান? আপনি কি ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করতে চান? আমি বললাম, অবশ্যই আমি ঈশ্বরদর্শন পেতে চাই, আমি ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করতে চাই। তার মানে, আপনার কোন দিন ঈশ্বরজ্ঞান হবে না। কেন হবে না? কারণ 'আমি চাইছি', এটা একটা কর্ম হয়ে গেল। কি ভাবে কর্ম? 'আমি চাইছি', আমি কর্তা, প্রথমা এসে গেল, প্রথমা যেমনি এসে গেল, তার মানে এটা কর্ম। আমার কি কোন দিন ঈশ্বরজ্ঞান হবে? কোন দিন হবে না। কারণ ঈশ্বরজ্ঞান মানেই, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এক হয়ে যাওয়া। যেখানে কারকের বিস্তার, ক্রিয়ার বিস্তার, ক্রিয়ার যে ফল, তার যে বিস্তার, সেখানে আত্মজ্ঞান হবে না। সেইজন্য আত্মজ্ঞান কদাচিৎ কখন কারুর হয়। একজন কমেন্টে লিখলেন, 'আপনি গীতা পড়াচ্ছেন খুব ভাল, আপনি ভগবানের ভক্ত। গেরুয়া তো আপনার আছে, কিন্তু বাকি চিহ্ন কোথায়'? আমি জানালাম, 'আমি বেদান্তী সন্ন্যাসী, আমার কোন চিহ্ন লাগে না'। বেদান্তী সন্ন্যাসী জামা-কাপড়ও পরে না, সমাজে আছি বলে পরতে হয়। বেদান্তী সন্ন্যাসীরা যে কোন ধরণের লিঙ্গের বাইরে থাকেন। কারণ এনাদের চেষ্টাই হল, কারক, ক্রিয়া কর্মের বাইরে যাওয়া।

আমি ধ্যান করি, আমি ভক্তি করি, আমি ভক্ত। যেমনি বললাম আমি ধ্যান করি বা ভক্তি করি, আমি কর্মের এলাকার মধ্যে পড়ে গেলাম। ঠাকুরও বলছেন, জপ করাটাও কর্ম, ধ্যান করাটাও কর্ম। সেইজন্য কেউ যদি বলে, আমি কর্ম করব না, এটা কোন মতেই সম্ভব না। যখনই কেউ বলে, আমি গৃহবধূ আমি কি করব? আপনার উদ্দেশ্য যদি আধ্যাত্মিক উত্থান হয়, সেখানে সামাজিক উত্থান, আর্থিক উত্থান আলাদা জিনিস। শ্রীশ্রীমা কি ছিলেন? সারাটা জীবন একজন গৃহবধূ হয়েই ছিলেন। ভক্তরা আসছেন, লোকজন আসছেন, খাওয়াচ্ছেন, দুটি কথা বলছেন, এছাড়া তো আর কিছুই ছিল না। তবুও শ্রীশ্রীমা আমাদের জীবনের আদর্শ। উদ্দেশ্য যদি আধ্যাত্মিক উত্থান হয়, তাহলে one work is as good as another work। একটি কাজের সাথে আরেকটি কাজের কোন তফাৎ নেই। উদ্দেশ্য যদি থাকে সম্মান পাওয়া, নাম-যশ পাওয়া, তাহলে কাজে কাজে তফাৎ হবে। দাঁড়িপাল্লার কাছে সোনা আর লোহার কোন তফাৎ হয় না, মনের কাছেও কাজের কোন তফাৎ হয় না। আমরা যখন বলি, আমরা বেদান্ত জানতে চাই, অদ্বৈত বেদান্ত জানতে চাই, এগুলো হল গ্ল্যামারের জন্য। এদের আর যাই হোক কোন গভীরতা নেই, গভীরতা থাকলে কখনই এ-রকম কথা বলবে না। যার ভিতর গভীরতা আছে, তার কোন একটা শুনলেই হবে। অর্জুনের এই যে হাল্কা ভাব, একটা অগভীর মনোভাব, ভগবান এটাকে কাটাচ্ছেন। এখানে ভগবান অনেকগুলো কারণ দেখাবেন, কেন তোমার কর্ম করা দরকার।

প্রথমে বলছেন, এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে সব কিছু ঠিক ঠিক ভাবে চলছে, এটা চলছে কর্মের জন্য। সূর্যোদয় হচ্ছে, সূর্যাস্ত হচ্ছে, পৃথিবী ঘুরছে, গ্রহ নক্ষত্র নিজের কক্ষ পথে নিয়ম মেনে ঘুরপাক খেয়ে যাচ্ছে, এখানে একটা কর্ম চলছে। বাব-মা সন্তানকে স্নেহ মমতা দিয়ে পরিপালন করছেন, স্বামী স্ত্রীকে দেখছে, স্ত্রী স্বামীকে দেখছে, গরু দুধ দিচ্ছে, ক্ষেতে ফসল ফলছে, এই সমস্ত কিছুকে কর্ম নিয়মন করে। কর্ম যদি না থাকত সব বিশৃঙ্খল হয়ে যেত। দ্বিতীয় বলছেন, হিন্দুদের পবিত্রতম গ্রন্থ বেদ, সেই বেদে সর্বত্র কর্মের কথা বলা হয়েছে, বেদ মানেই তুমি কাজ কর, কাজ তোমাকে করতে হবে। বেদে শুধু বিধি-নিষেধের কথা বলা হয়েছে, কোনটা করবে আর কোনটা করবে না। ঠাকুরের ভক্তরা যেমন কথায় কথায় বলেন, কথামৃতে ঠাকুর এই কথা বলেছেন। হিন্দুদের কাছে এটাই হয়ে যায়, বেদে কি বলা হয়েছে? বেদে কর্মের কথা বলছেন। এমনকি বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটা জায়গায় বর্ণনা আছে, দুজন ঋষি খুব নিবিষ্ট ভাবে পরস্পর আলোচনা করছেন, সেখানে বলছেন, তাঁরা কর্মেরই প্রশংসা করলেন। তৃতীয় বলছেন, জনকাদি মহাপুরুষরাও কাজ করেছিলেন। মহাপুরুষ বলতে এখানে গান্ধীজী বা নেতাজীর কথা বলা হচ্ছে না, আধ্যাত্মিক জগতের মহাপুরুষদের কথা বলছেন। আমরাও অন্যদের বলি, দেখ, স্বামীজী কত কাজ করেছিলেন। স্বামীজী বলছেন, কাজ করে করে মুখ থেকে রক্ত উঠে এসেছে। এরপরে ভগবান বলবেন, অর্জুন আমি নিজেও কাজ ছাড়া এক মুহূর্ত বসে থাকি না। আমি যদি এক ক্ষণের জন্য কাজ বন্ধ করে দিই, জগৎ উৎসন্নে চলে যাবে।

এখানে চারটে বলা হল, জগৎ কর্মের উপর চলছে, দ্বিতীয় বেদ কর্ম করতে বলছে, তৃতীয় মহাপুরুষরাও কাজ করেছেন এবং চতুর্থ ভগবান নিজেও কাজ করছেন। পাঁচ নম্বরে বলছেন, অর্জুন তুমি প্রারব্ধ কর্মের অধীন। শুধু অর্জুন না, আমরা সবাই প্রারব্ধ কর্মের অধীন। যারাই প্রারব্ধ কর্মের অধীন, তাদের সবাইকে কাজ করতে হয়। যদি কাজ না করে, তাহলে ওই কর্মগুলো বোঝার মত তোমার উপর পড়ে থাকবে। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, যতক্ষণ আমি আছে, ততক্ষণ জগৎ আছে; আমি থাকা মানেই তুমি কর্মের অধীন। সেইজন্য ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে বললেন, *কর্মণ্যেবাধিকারস্তে*, কর্মেই তোমার অধিকার, জ্ঞানে তোমার অধিকার নেই। রামকৃষ্ণ মিশনে কাজের প্রাধান্য সব সময় আছে। যাঁরা নূতন জয়েন করতে আসেন, সিনিয়র মহারাজরা তাঁদের সব সময় বলেন, কাজ কর, কাজ কর, কাজ করে যাও। কাজ করলে যে মানুষের কামনা, বাসনাগুলি খসে

পড়ে যেতে থাকে, এখানে সেই যুক্তি দিচ্ছেন না, এখানে যে যুক্তগুলি দেওয়া হচ্ছে, সবই আধ্যাত্মিক যুক্তি। গীতা আধ্যাত্মিক গ্রন্থ, আধ্যাত্মিক গ্রন্থে জাগতিক কোন যুক্তি দেওয়া হয় না। এই পাঁচটি কারণের উপর তৃতীয় অধ্যায় পর পর চলতে থাকবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই যে *প্রজহাতি যদা কামান্* বলে দিলেন, যেটা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, এটাকে এখানে কিভাবে মেলানো যাবে? এই কথা বলা হচ্ছে তাঁদেরই জন্য, যাঁদের আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, একমাত্র তাঁরাই কাজ করেন না। তুমিও যদি চাও কর্মের এই যে বিস্তার, এর বাইরে যাব, কাজের সীমানার বাইরে যাব, তাহলে প্রথমে তুমি কাজ করতে থাক। কাজ করতে করতে নিষ্কাম কর্ম করতে শেখ। নিষ্কাম কর্ম মানে, যে কাজটাই করছে, সেই কাজটাই ফল। যেমন যে রান্না করছে, তার উদ্দেশ্য শ্রেষ্ঠতম সুস্বাদু রান্না করা। ভাগবতে রাসলীলার শেষে ভগবান গোপীদের বলছেন, হে গোপীরা, তোমাদের যে আমার প্রতি এই ভালবাসা, এর প্রতিদান আমি কোন দিন তোমাদের দিতে পারব না, সেইজন্য তোমাদের এই ভালবাসাটাই তোমাদের হৃদয়ে থাকুক, এটাই ভালবাসার ফল হোক। যেটাই কর্ম সেটাই ফল, এটাই নিষ্কাম কর্ম, এটাই ভক্তি, এটাই জ্ঞান।

পড়াশোনা করা মানেই জ্ঞান অর্জন করা, লোকে বলবে উনি কত জ্ঞানী, সেটা উদ্দেশ্য না। পড়াশোনা করে ভাল নম্বর পাওয়া, চাকরি পাওয়াটা উদ্দেশ্য না, এগুলো বাইপ্রোডাক্ট। পড়াশোনা করার একমাত্র উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জন করা। নিষ্কাম কর্ম মানে, কাজটাই একমাত্র গুরুত্ব, আমাকে এই কাজ করতে হবে, ওটাই কাজের ফল। কিন্তু আমরা কাজ করার আগে দেখে নেব, এই কাজ করলে আমার কি কি লাভ হবে, অর্থাৎ ফলটা আগে জেনে নিয়ে তারপর কাজে নামি। এরা যদি বলে আমার আধ্যাত্মিক উন্নতি কিভাবে হবে বুঝিয়ে দিন, সেটা কি কোন দিন সম্ভব?

এখানে পরিষ্কার বলছেন, যদি তুমি তোমার আধ্যাত্মিক উত্থান চাও, তাহলে তোমাকে কাজ করতে হবে, সেখান থেকে ধীরে ধীরে কাজগুলিকে নিষ্কাম কর্মের দিকে নিয়ে যেতে হবে। নিষ্কাম কর্ম করলে মনের সব আবর্জনাগুলি পরিষ্কার হয়ে যায়। মনের আবর্জন পরিষ্কার হয়ে গেলে মন শুদ্ধ, নির্মল হবে। মন শুদ্ধ হলে তখনই মনের শক্তির বিকাশ হয়। আমাদের মনে কেন শক্তি নেই? আমরা নিজেদের কেন দুর্বল মনে করছি? কারণ আমাদের মন পরিষ্কার নয়। মন যদি পরিষ্কার করতে হয়, তাহলে জন্মজন্মান্তর ধরে আমরা যত পাপকর্ম করে এসেছি, সব পাপকর্মের আবর্জনাকে পোড়াতে হবে। এই আবর্জনা পোড়ান যাবে শুধু নিষ্কাম কর্ম করে। Work as duty, এটা আমার দায়ীত্ব তাই করলাম। নিষ্কাম কর্ম করার জন্য আগে করতে হবে কাজ। প্রথমে কাজ সকাম, বাসনাযুক্ত হয়েই সবাই কাজ করে, তা নাহলে মানুষ কাজ করতে পারবে না। সেখান থেকে ধীরে ধীরে নিষ্কাম কর্ম করা শুরু হয়, সেখান থেকে মনের পাপ নাশ হয়, সেখান থেকে মন শুদ্ধ হয়, শুদ্ধ মনই শক্তিশালী মন।

দিনে অন্তত একটি ভাল কথা বলতেও আমাদের মনে ইচ্ছে হয় না, কারণ সব সময় আমরা হতাশার মধ্যে পড়ে আছি। সকাল হলেই আমরা শুধু এই অভিযোগ সেই অভিযোগ করে দিন শুরু করি। বৃষ্টি হলে কমপ্লেন, বৃষ্টি না হলে কমপ্লেন, রোদ হলে কমপ্লেন, সারাদিন ফোন আসছে কমপ্লেন, ফোনের টাওয়ার না থাকলে কমপ্লেন, কারণ ফোন আসছে না, জীবনে আমাদের কমপ্লেনের শেষ নেই। এত হতাশা, এত অভিযোগ, সব কিছুর কারণ একটাই, মন স্থির নেই, মন শক্তিহীন হয়ে আছে। কেন মনে শক্তি নেই? কারণ মন শুদ্ধ পবিত্র নয়। মন পবিত্র নয় কেন? মনের ভিতর জন্মজন্মান্তরের পাপকর্মের বোঝা পুটলি হয়ে জমে আছে। এই পাপের পুটলি যদি পরিষ্কার করতে হয়, তাহলে নিষ্কাম কর্ম করতে হবে। বাচ্চার খিদে পেলে মা শত শরীর খারাপ থাক, কোন রকমে উঠে এসে বাচ্চাকে খাওয়াবেই। মা জানে যত শরীর খারাপ থাকুক, এটা আমার দায়ীত্ব, এই কাজ আমাকেই করতে হবে। যত যা কিছু হয়ে থাকুক, মা সন্তানকে দেখবেই। ঠিক তেমনি আমাদের

যখন কোন কাজ এসে যায়, তখন এভাবেই সব কাজ করতে হবে, এতে জন্মজন্মান্তর ধরে মনের মধ্যে সঞ্চিত পাপের বোঝা হাল্কা হতে শুরু করে। এই হল কর্মযোগের উপর একটা ভূমিকা। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম দুটি শ্লোকে অর্জুন ভগবানকে বলছেন –

অর্জুন উবাচ
জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব।।১।।
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্।।২।।

(*অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন –হে জনার্দন, যদি আপনার মতে কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আমাকে এই হিংসাত্মক কর্মে(যুদ্ধে) কেন নিযুক্ত করছেন? আপনি সন্দেহজনক রূপে প্রতীয়মান বাক্য দ্বারা আমর মনকে যেন ভ্রান্ত করছেন। এই উভয়ের একটি আমাকে নিশ্চয় করে বলুন, যার দ্বারা আমি শ্রেয়োলাভ করতে পারি।*)

এই যে যুদ্ধ হতে যাচ্ছে, এটা ঘোর কর্ম, এই কর্ম থেকে কত অশান্তি, আরও কত কি হয়; আপনি এতক্ষণ ধরে আমাকে প্রবচন দিচ্ছিলেন, *প্রজহাতি যদা কামান্* থেকে শুরু করে *আপূর্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং*, তারপরেও *তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং*, আমাকে কেন আপনি এই ঘোর কর্মে নিয়োজিত করছেন। আপনি এই বলছেন, কাজ কর; আবার একটু পরেই কর্মত্যাগের কথাও বলছেন, অর্থাৎ জ্ঞানের কথা বলছেন। কথাগুলি পরস্পর বিরোধী, আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে, আপনি ঠিক করে বলুন তো আমাকে কি করতে হবে? অর্জুনের প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক।

আমরা জানি ধ্যানযোগ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু ধ্যান হচ্ছে dignified laziness, যদি কেউ খুব করে জপধ্যান করে তাতে তার শুধু লাভই লাভ। প্রথম লাভ হচ্ছে কোন কাজ করতে হবে না, কারণ যখনই তাকে জপধ্যান করতে দেখবে তখন তাকে কেউ বিরক্ত করে কোন কাজ করতে বলবে না। দ্বিতীয় যে ধ্যান করছে তার মুখ বন্ধ, সেইজন্য কারুর সাথে বেশি বাক্যালাপ করতে হবে না। লোকের সাথে যত ঝামেলা এই বাক্যালাপ থেকেই সূত্রপাত হয়। তৃতীয়, ধ্যান করতে গিয়ে ঘুমে ঢুলতে থাকে, এতে ভালো বিশ্রামও হয়ে যাবে, বিছানায় শুয়ে যদি ঘুমোয় তাহলে লোকে বলবে ব্যাটা কাজে ফাঁকি দিয়ে ঘরে এসে পড়ে পড়ে খালি ঘুমোচ্ছে। আর ধ্যান করতে করতে ঝিমোতে থাকলে লোকে বলবে, আহা রে ধ্যান করতে করতে ভাবের ঘোরে চোখটা বন্ধ হয়ে গেছে। ধ্যান করাতে শুধু লাভই লাভ। অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন আপনি কেন আমাকে dignified laziness হতে দেবেন না?

কাজ করা মানে খালি খেটে মরা ছাড়া আর কিছুই না। মেরি আর মার্থা দুই বোন ছিল। ওদের বাড়িতে একবার যীশু গেছেন। মার্থা বেচারী একাই ছুটোছুটি করে এঘর সেঘর করে রান্নাবান্না থেকে সব কিছুর ব্যবস্থা করে যাচ্ছে যাতে যীশু আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গোদের সেবার কোন ত্রুটি না হয়। অন্য দিকে মেরী যীশুর কাছে চুপচাপ বসে যীশুর মুখনিঃসৃত অমৃতবাণী শুনে যাচ্ছে। মার্থা এসে যীশুকে বলছেন – আপনি একটু মেরীকে বলুন না আমাকে সাহায্য করতে। যীশু আবার মেরীকে খুব স্নেহ করতেন। যীশু তখন মার্থাকে বলছেন –মেরী যা করছে ঠিকই করছে। এই ব্যাপারটাই পরে আলস্যে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। ঈশ্বরে ঠিক ঠিক ভক্তি আর আলস্য ভাব এই দুটোকে পার্থক্য করা খুব মুশকিল। পার্থক্য শুধু একটা জায়গায়, বাইরে থেকে সেই পার্থক্য বোঝা যায় না। তৃতীয় অধ্যায়েই ভগবান বলবেন –*কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্* - তুমি কাজ না করে হাত পা গুটিয়ে বসে আছ কিন্তু তোমার মনের মধ্যে বিষয় বাসনা ঘুরঘুর করছে। এই জিনিস কখনই করতে নেই। আধ্যাত্মিক জীবনে সেইজন্য বেশির ভাগ মানুষই প্রবঞ্চক হয়ে ওঠে। পঞ্চম অধ্যায়েই আবার

বলবেন –সন্ন্যাস জিনিসটা ভালো নয়, কারণ যারা প্রথমে কাজ কর্ম করে প্রস্তুতির পর্ব পার না করেই সন্ন্যাস নিয়ে নেয় তাহলে তার সর্বনাশ হতে বেশি দিন লাগবে না, সত্ত্বগুণী হওয়ার বদলে সে তমোগুণী হয়ে যাবে। যারাই কোন কাজ কর্ম না করে শুধুই জপধ্যান করে যায়, তাদেরকে বাইরে থেকে যে রকমই লাগুক না কেন, ভিতর থেকে বিশ্বাস করা খুব সমস্যা হয়ে যায়। তবে হ্যাঁ যারা কাজ আসছে কাজ করে দিচ্ছেন আবার কাজ নেই ঠাকুরের নাম করছেন তাঁদের কথা আলাদা; তাঁরাই মহৎ। কিন্তু যারা নিজেদের কর্তব্য কাজকর্ম ছেড়ে খালি জপ আর ধ্যান নিয়েই পড়ে থাকে, একটা সময়ের পর এদের ব্যক্তিত্বে অনেক রকম গোলমাল ধরা পড়ে।

আমরা আচার্য শঙ্করের গীতা ভাষ্যকে অনুসরণ করে চলেছি। আচার্য মাঝে মাঝে কিছু আলোচনা করেন, যেটা আমাদের সরাসরি দরকার নেই। কিন্তু এগুলো আমাদের জেনে রাখা খুব ভাল। এগুলোই ভারতের আধ্যাত্মিক পরম্পরা। ভারতে আগে অনেকগুলো দর্শন ছিল। বিদ্যারণ্য সর্বদর্শন সংগ্রহ লিখলেন, সেখান থেকে ধীরে ধীরে ষড়দর্শন হয়ে গেল, ছয়টি দর্শনের নামই হয়ে গেল ষড়দর্শন। কিন্তু ছটির থেকে আরও বেশি দর্শন ছিল। বেদান্তেরই অনেকগুলো দর্শন ছিল, তার মধ্যে একটি খুব নামকরার দর্শন হল *জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়*, এই দর্শনের বক্তব্য হল, আত্মজ্ঞানের দিকেও যাবে, তার সাথে কাজও করবে। আচার্য শঙ্কর এই দর্শনকে আক্রমণ করে বিভিন্ন জায়গায় দেখাচ্ছেন, জ্ঞান জ্ঞানই, আত্মজ্ঞানের সঙ্গে কোন কিছুর তুলনা হয়, কোন গাঁট বন্ধন হয় না, আত্মজ্ঞান কারুর সাথে লেজ জুড়ে নেই। তিনি খুব পরিষ্কার করে বলছেন, যদি জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয় ঠিক হত, তাহলে অর্জুনের এই প্রশ্ন উত্থাপিত হত না, আর ভগবানও এটাকে নিয়ে উত্তর দিতে যেতেন না। আমরা এখানে এটা একটা তথ্য হিসাবে উল্লেখ করলাম।

পরের শ্লোকে যাওয়ার আগে কয়েকটা কথা আমাদের বোঝার দরকার আছে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের নাম কর্মযোগ, এর মূল বক্তব্য ঈশোপনিষদেও বলা হয়েছে। সেখানেও প্রথমে বলছেন, তুমি যদি উপলব্ধি চাও তাহলে তুমি সব কিছুতেই ঈশ্বরকে দর্শন কর –*ঈশা বাস্যমিদং সর্বং*, এই জগতে যা কিছু আছে সব তিনিই হয়েছেন। এটাকে যদি না বোধ করতে পার তাহলে –*কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ*, তুমি কাজ করে যাও। কিভাবে কাজ করবে? *ন কর্ম লিপ্যতে নরে* – কর্ম করবে কিন্তু কোন কিছুতে লিপ্ত হবে না। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ঠিক এই উচ্চ আদর্শকেই ভগবান অর্জুনের সামনে রাখছেন। কাজ করা মানেই একটা মানসিক প্রতিক্রিয়া থাকবে। আমার খিদে পেয়েছে, খিদে পাওয়া মানেই একটা বাহ্যিক উদ্দীপনা, তবে পেটের ভেতর থেকে আসে বলে বাহ্যিক ব্যাপার অতটা বোঝা যায় না। খিদে পেতেই আমার মস্তিষ্কে সঙ্কেত গেল, আমাকে কিছু খেতে হবে। যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁদেরও খিদে পায়, আর খিদে পেলে তাঁরা কি না খেয়ে থাকবেন? তাঁরাও খাওয়া-দাওয়া করেন। অবশ্যই খাবেন।

ঠাকুরের জীবনে এর খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে –দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ গিয়েছেন কামারপুকুরে। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী আর লক্ষ্মীদিদিও কামারপুকুরে তখন আছেন। রোজ সকালে উঠেই ঠাকুর জিজ্ঞেস করতেন –হ্যাঁগা, আজ তোমাদের কি ব্যান্নুন হচ্ছে? কয়েক দিন পরেই ঠাকুর নিজে থেকেই বলছেন –ছিঃ একি! রোজ সকাল হলেই খাবার কথা মাথায় আসছে, রোজ রোজ একি জিজ্ঞেস করছি কি ব্যান্নুন হবে জিজ্ঞেস করছি; বলেই ধিক্! যেমনি এই ভাবনা এলো তখনই বলছেন, তোমরা যা রান্না করবে আমি তাই খাবো। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন পরমহংস, আধ্যাত্মিকতার সমস্ত রকমের চরম উপলব্ধি তাঁর হয়ে গেছে। এখন তিনি যে খাওয়া দাওয়ার কথা ভাবছেন, তিনি কি ভুল করছেন? না, এটাই হচ্ছে ব্যবহারিক জীবনের বেদান্ত। আমরা প্রশ্ন করতে পারি বেদান্ত কি দুই রকমের? ব্যবহারিক বেদান্ত আর অব্যবহারিক বেদান্ত? হ্যাঁ, দুই রকমেরই বেদান্ত হয়। যে বেদান্ত ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ হয় না, সেই বেদান্তের কোন দাম নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন রোজ সকালে উঠে জিজ্ঞেস করছেন – ওগো আজ তোমাদের কি রান্না হবে। তখন ওটা impractical ছিল। কিন্তু

যে মুহূর্তে তাঁর মাথায় এসেছে এটা impractical তৎক্ষণাৎ সেটাকে ত্যাগ করে দিয়ে বলছেন – তোমরা যা রান্না করবে আমি তাই খাব। যে অবেদান্তী, যে এখনও সিদ্ধ হয়নি, এমনকি যে সাধকও নয়, সে বলবে আজ থেকে আমি মাছ খাবো না, বলেই পরের দিন থেকেই মাছ খাওয়া শুরু করবে। এদের কোন আঁট নেই। যিনি বেদান্তী, সিদ্ধ পুরুষ, সাধক, তিনি একবার যখন যা বলে দিলেন সেখান থেকে তাঁর মন আর নড়বে না।

কর্মে লিপ্ত না হওয়া মানে, কর্মের সরাসরি ও আনুষাঙ্গিক কোন ফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা না থাকা। আমি একজন শিক্ষক, আমাকে ছাত্রদের পড়াতে হবে, পড়াতে গিয়ে আমাকে কত মাইনে দিচ্ছে, ছাত্ররা আমাকে কতটা সম্মান করছে, ছেলেরা পাশ করে চলে যাওয়ার পর আমাকে মনে রাখবে কিনা, আমাকে বিভিন্ন দিনে উপহার দেবে কিনা, এই সব নিয়ে আমি কখনই ভাবব না, যদি আমি আমার কর্মে লিপ্ত হতে না চাই। শিক্ষকের ছাত্রদের পড়ানটাই তার স্বধর্ম, ভালো ভাবে নিজকে প্রস্তুতি করে যত্ন নিয়ে পড়ানোটাই তার স্বধর্ম, এর বাইরে তার আর কিছু নিয়ে না ভাবাটাই কর্মে লিপ্ত না হওয়া। আমি কি কাজ করছি সেটা বড় কথা নয়, আমি চাপরাশির কাজ করতে পারি, রেললাইনের পাথর ভাঙতে পারি, মুটেগিরি করতে পারি, কিন্তু যেটাই করছি সবটাই ভগবানের পূজো, এটাই তার কাছে স্বধর্ম। উচ্চতম স্বধর্ম হল যখন ভগবান আমার উপর প্রসন্ন হন, এই ভাবটাও তার থাকবে না। সুফি সম্প্রদায়ে রাবাইয়া একজন খুব নামকরা সাধিকা ছিলেন। রাবাইয়া খুব সুন্দর প্রার্থনা করতেন – "হে আল্লা, আমি যদি নরকের ভয়েও তোমার প্রার্থনা করি, তুমি চিরকালের জন্য আমাকে নরকে রেখে দিও। আর স্বর্গ কামনা করে যদি তোমাকে প্রার্থনা করি তাহলে তুমি আমাকে স্বর্গে ঢুকতে দিও না। আর তোমাকে যেন ভালোবাসতে পারি, এই ভাবনা নিয়ে তোমাকে প্রার্থনা করি তাহলে তুমি অবশ্যই আমাকে কৃপা কর"।

কর্মযোগের এই অধ্যায়কে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। আমরা কাজ কেন করব, কয়েকটা শ্লোকে বলেছেন। তারপর কয়েকটি শ্লোকে বলবেন কিভাবে কাজ করব, এরপর বেদের সময়ে যজ্ঞাদি কর্মের সাথে ইদানিং কালে যেভাবে কর্ম করা হয়ে থাকে, কয়েকটি শ্লোকে তার সমন্বয় করা হবে। আর যারা পরমহংস পরিব্রাজক যাদের কোন কাজ করতে হয় না, তারা যখন কাজ করবেন তখন কি কাজ করবেন। এই অধ্যায়েই ভগবান বলছেন সবাইকেই কাজ করতে হবে, শুধু পরমহংস পরিব্রাজক তিনিই কাজ করবেন না। এমনকি যাঁরা সিদ্ধ পুরুষ তাঁরাও কিন্তু লোকশিক্ষার জন্য কাজ করেন।

যাঁরা কাজ করছেন এদের মধ্যে দুই ধরণের লোক হয়, একজন জ্ঞানী আরেকজন অজ্ঞানী। আমরা যে কাজটা করব সেটা জ্ঞানীর মত করব, অজ্ঞানীর মত কাজ করব না, কারণ আমরা শাস্ত্র অধ্যয়ণ করছি। তারপর কর্মই ঈশ্বরের পূজা এই মনোভাবে কর্ম করা, মানে কর্মকে কিভাবে পূজা ও উপাসনাতে রূপান্তরিত করা যাবে। সব শেষে বলবেন কর্মযোগে কি ধরণের বিঘ্ন আসে। ভালো কাজ করতে গেলে ঠিক ঠিক কি ধরণের সমস্যা আসে। মানুষ নিজেকে ধন্য করার জন্য, কৃতার্থ করার জন্যই কাজ করছে, কৃতার্থ করার জন্যই যদি কাজ করে থাকে তাহলে কিভাবে কৃতার্থ হবে সেটাই অধ্যায়ের একেবারে শেষ পর্যায়ে গিয়ে ব্যাখ্যা করবেন। তিন নম্বর শ্লোক খুব সুন্দর শ্লোক, এর একটা বৈশিষ্ট্য আছে –

শ্রীভগবানুবাচ
লোকেঽস্মিন দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্।।৩।।

(শ্রীভগবান বললেন –হে অনঘ অর্জুন, ইহলোকে জ্ঞানাধিকারিদের জন্য জ্ঞানযোগ এবং নিষ্কাম কর্মিদের জন্য কর্মযোগ –এই দুই প্রকার নিষ্ঠার বিষয় সৃষ্টির প্রারম্ভে আমি বেদমুখে বলেছি।)

এই শ্লোকের বৈশিষ্ট্য হল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই প্রথম গীতাতে বলছেন, আমি ভগবান। *লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা,* সৃষ্টির প্রারম্ভে বেদমুখে আমি এই কথা বলেছি। ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের শুরুতে এই কথাই একটু অন্য ভাবে বলবেন, তখন অর্জুন বলবেন, আরে আপনি এটা কি বলছেন। কিন্তু এখানে অর্জুন ধরতেও পারেননি যে ভগবান বলছেন, আমি ভগবান। কেন বলেছেন? যখন সৃষ্টি হয় তখন আমিই দুই প্রকার পথের বিধান দিয়েছিলাম –একটা জ্ঞানীদের পথ, আর-একটা যোগীদের পথ। গীতার প্রথম দিকে আমরা এর উপর বিস্তারে আলোচনা করেছি। সেখানে বলা হয়েছিল, সৃষ্টি হওয়ার পর প্রথমে সনক, সনন্দন আদি চারজন ঋষিদের আমি সৃষ্টি করলাম, তাঁরা নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম অবলম্বন করে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের পথ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তারপর আমি সপ্তর্ষ মণ্ডলের ঋষি ও প্রজাপতিদের সৃষ্টি করলাম, যাঁদের প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের শিক্ষা দেওয়া হল, কিভাবে সংসার ধর্ম পালন করতে হয়। এখান থেকেই সৃষ্টি হল যোগের পথ।

আচার্য শঙ্কর বলছেন, সেই দিন থেকে এই দুটি ধর্ম – নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম বৈদিক ধর্ম, সনাতন ধর্ম বা হিন্দু ধর্ম রূপে চলে আসছে। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম মানে মানুষ যেখানে কাজ করে আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম হল, মানুষ যখন সব কিছু ত্যাগ করে দেয়। সমস্ত কিছুর ত্যাগে একমাত্র সন্ন্যাসীদের অধিকার। আর কাদের দরকার? যাঁর চিত্ত শুদ্ধ হয়ে গেছে, মন যাঁর শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেছে, গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে শুদ্ধ পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে, একমাত্র তিনিই সব কিছু ত্যাগ করতে পারেন, অন্য কেউ পারে না। ঠাকুর যখন বলছেন, আগে ঈশ্বর দর্শন, তার উদ্দেশ্য আলাদা; এই ব্যাপারে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি।

ভগবান বলছেন, তুমি শাস্ত্রকে মেনে চল; শাস্ত্রে বলা হয়েছে, জ্ঞান ও কর্মে দুই ধরণের অধিকারী হয়, অর্থাৎ জ্ঞান আর কর্ম মানুষের দুটি পথ। কিছু মানুষ জ্ঞানের জন্য উপযুক্ত, আবার কিছু মানুষ কর্মের জন্য উপযুক্ত। আজ থেকে প্রায় দশ-বার বছর আগে, একজন নূতন ব্রহ্মচারীর একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পোস্টিং হয়েছে। ব্রহ্মচারী তার আগে কোন কাজ করেননি। তাঁকে একজন মহারাজ বললেন, 'যাক ভাল হল, এবার তোমার কাজের অনুভব হবে'। ব্রহ্মচারী সেই মহারাজকে একটু যেন গর্বের ভাব নিয়ে বলছেন, 'সবাইকে কাজ করতে হয় না মহারাজ, অনেকে আছেন যাঁদের আগের আগের জন্মে কাজ করা হয়ে গেছে'। মহারাজ আর কি বলবেন, মনে মনে ব্রহ্মচারীকে প্রণাম জানিয়ে চলে এলেন। ভারতবর্ষে আমরা দুই ধরণের লোক পাই, এক ধরণের মানুষের অজ্ঞানের একটা মনুমেন্ট, তার সাথে বিশাল অহঙ্কার। অনেক সময় অজ্ঞানীদের অহঙ্কার হয়, আর কখন অল্প একটু জ্ঞান আছে বলে অহঙ্কার হয়। বেশির ভাগেরই অল্প একটু জ্ঞান আছে বলে অহঙ্কার থাকে। ভারতের উপর ভগবানের এমনই কৃপা যে, অজ্ঞানী আর অহঙ্কারীর বৃষ্টি ভারতবর্ষে তিনি দিতেই থাকেন। ভারতের মানুষ যেন বিশাল বিশাল বটবৃক্ষ, হয় অহঙ্কারের, নয়তো অজ্ঞানের। সেই ব্রহ্মচারীর মত মানুষই বলতে পারে, আগের আগের জন্ম অনেক কাজ করা আছে। তার কিছু দিন পরেই দেখা গেল, সেই ব্রহ্মচারীকে কর্মের মধ্যে এমন জুতে দিয়েছে যে, দম ফেলার সময় পাচ্ছেন না, কাজ করেই যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়, কি ভাই, তোমার না আগের আগের জন্মে অনেক কাজ করা আছে! মুখে শুধু ফটর ফটর, কিছু একটা শুনে নিয়েছে, সবাইকে এই জন্মে কাজ করতে হয় না, আগের জন্মে অনেক কাজ করা হয়ে গেছে।

ভগবান স্পষ্ট করে বলছেন, সাংখ্যদের জন্য জ্ঞানযোগ; *জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং,* যাদের বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে গেছে, তাদের জন্য জ্ঞানপথ। *কর্মযোগেন যোগীনাম্,* আর বাকীদের জন্য কর্মযোগ। এটাকে পরে আরও বিস্তারে বলবেন। অর্জুনকে সম্বোধন করে বলছেন *ময়ানঘ,* অনঘ মানে, যাঁর মধ্য কোন পাপ নেই; হে নিষ্পাপ অর্জুন, আমি সর্বজ্ঞ, আমি ঈশ্বর, পূর্বে আমি শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির এই দুই প্রকার উপায় বলেছি। এই জ্ঞানযোগ, জ্ঞানমার্গের যিনি, তিনি সমস্ত কিছু ত্যাগ করে পুরোপুরি

নিজেকে ঈশ্বরে সমর্পণ করে দিয়েছেন। এখানেই পরিষ্কার যে, এই পথ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জন্য। সন্ন্যাসী এখানে কেবল গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী বোঝাচ্ছেন না, সন্ন্যাসী মানে মন থেকে যাঁর সব কিছু ত্যাগ হয়ে গেছে, যাঁর মনে জগতের কোন কিছুর প্রতি কোন প্রকার কামনা-বাসনা নেই, চিত্ত যাঁর পুরো শুদ্ধ।

বলছেন, এই যে কর্ম, এই কর্ম সরাসরি মুক্তি দেয় না, দেওয়া সম্ভবই না। স্বামীজী যে জ্ঞান ও কর্মের কথা বলছেন, সেখানে প্রস্তুতির কথা বলছেন। স্বামীজী যে জ্ঞানযোগের কথা বলছেন, সেটা হল নিত্য অনিত্যের বিচার। আর আচার্য যে জ্ঞান বলছেন, এটা হল knowledge, জিনিসটাকে জানা।

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।।৪।।

(কর্মের অনুষ্ঠান না করে কেউ নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় আত্মা-রূপে অবস্থিতি, মোক্ষ লাভ করতে পারে না। কর্মযোগে চিত্তশুদ্ধি ও আত্মবিবেক না হলে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি হয় না।। কেবলমাত্র জ্ঞানশূন্য কর্মত্যাগ দ্বারা উক্ত অবস্থালাভ অসম্ভব।)

এই শ্লোকে কর্মের মহিমা, কর্মযোগ কেন করতে হয় বলা হচ্ছে। স্বামীজী এসে এত যে কর্মের উপর জোর দিলেন, যার জন্য লোকের বুঝতে পারছিল না, সন্ন্যাসী হয়ে কেন তিনি এত কাজের কথা বলছেন। কারণ ভারত তখন পুরোপুরি তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। তমোগুণ আত্মজ্ঞানের জন্মগত দুষমন। কর্ম না করলে মানুষ তমোগুণ থেকে রজোগুণে যেতে পারবে না। স্বামীজী তাই এত কর্মের কথা বললেন।

আচার্য শঙ্কর বলছেন, *ন কর্মণাম্ অনারম্ভাদ্ অপ্রারম্ভাৎ কর্মাণাং ক্রিয়াণাং যজ্ঞাদীনাম্ ইহ জন্মনি জন্মান্তরে বা*। কর্ম মানে যে কোন কাজ না, আচার্য এখানে যজ্ঞাদি কর্মের কথা বলছেন। কর্ম কিভাবে যজ্ঞ হয়ে যায়? এটাকে চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান আরও বিস্তারে বলবেন। বেদে যখনই যজ্ঞের কথা বলা হয়, তখন সেখানে সাধারণ ভাবে অর্থ করা হয়, পবিত্র অগ্নি স্থাপন করে মন্ত্র দিয়ে বিভিন্ন দেবতা ও দেবীর যজ্ঞ করতে থাকা। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে দেখাচ্ছেন, কিভাবে সমস্ত কর্মকেই যজ্ঞে রূপান্তরিত করা যায়।

আচার্য বলছেন, যতক্ষণ এই জন্মে বা অন্তত আগের আগের জন্মে যজ্ঞাদি কর্ম না করে বা যজ্ঞ-রূপে কর্ম যদি না করে থাকে, তাহলে এই জন্মে তোমার ক্রিয়াকর্মাদি দিয়ে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, তোমার সমস্ত ক্রিয়াকর্ম যজ্ঞ রূপে হচ্ছে কি হচ্ছে না। মানুষ যখন যজ্ঞ রূপে কর্ম করে, কর্মকে যখন পবিত্র ভাবে করে, স্বার্থশূন্য হয়ে যখন কাজ করে, তখন তার হৃদয় মন পরিষ্কার হয়। হৃদয় পরিষ্কার হলে তখন তার পাপের নাশ হয়। পাপের নাশ হওয়ার পরেই মানুষ জ্ঞানমার্গের জন্য প্রস্তুত হয়। আচার্য শঙ্কর ব্যাখ্যা করছেন, এই জন্মে, না হলে আগের জন্মে, আগের জন্মে করা থাকলে এই জন্মেও করার প্রবৃত্তি থাকবে, এটা যে কাউকে দেখলেই বোঝা যায়। কাজ করার সময় দেখতে হয়, সে এই কাজ লোভে পড়ে করছে, নাকি কোন কামনার দ্বারা প্রেরিত হয়ে কাজ করছে, নাকি দায়ীত্ব বোধে কাজ করছে, না ভক্তি ভাবে, ভালবেসে কাজ করছে, তার চেয়ে বড় যজ্ঞ রূপে কাজ করছে কিনা।

আমাদের পূজ্যপাদ স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজ, শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য; খুব উচ্চমানের সন্ন্যাসী ছিলেন, গোপেশ মহারাজ নামেই তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন। প্রচুর জপধ্যান করতেন। মাঝে মাঝে উনি আশ্রমের অধ্যক্ষকে বলতেন, ‘দেখ আমার মধ্যে একটু রজোগুণ জাগছে, আমাকে

কিছু কাজ করতে হবে'। উনি যখন যে সেন্টারে থাকতেন, তখন সেই সেন্টারের অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে সেন্টারের এক ফালি জমিতে কখন ভুট্টা চাষ, কখন ছোলা চাষ, কখন ফুলের গাছ লাগাতেন। গাছ লাগানোর পর উনি বলে দিতেন, 'আমার ভিতরে রজোগুণ এসেছে, তাই আমি এই কাজটা করছি। আগামীকাল যদি তোমাদের মনে হয় আশ্রমের কাজের জন্য এই জমিটা পরিষ্কার করা দরকার, তোমরা গাছ কেটে দিও। রজোগুণ থেকে আমার মনে যে চাঞ্চল্য এসেছে, সেটাকে নাশ করার জন্য আমি এই কাজ করছি'।

কাজ সব সময় করা হয় মনের চাঞ্চল্যকে নাশ করার জন্য, আর সেইজন্য ওই কাজ যজ্ঞ রূপেই করতে হয়। আমি কেন কাজ করি, কারণ আমার মনের মধ্যে চাঞ্চল্য আছে। অথবা কোন একটা সময় আমার চাঞ্চল্য হয়েছিল, যার খেসারত আমাকে সারা জীবন দিয়ে যেতে হচ্ছে। তাই বলছেন, যদি যজ্ঞাদি কর্ম না করে থাক, তাহলে তোমার চিত্তশুদ্ধি হবে না। আর যতক্ষণ নিষ্কাম ভাবে কর্ম না করছ, ততক্ষণ কর্মত্যাগ হবে না। অর্জুন, তুমি যে মনে করছ, আমি যুদ্ধ করব না, আমি বৈরাগী হব; বৈরাগী হওয়া, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা তোমার দ্বারা হবে না। কারণ ওই ভাবে কখনও তুমি কর্ম করোনি; যার জন্য তোমার চিত্ত, তোমার মন এখনও পরিশুদ্ধ হয়নি। যেহেতু তোমার চিত্ত ও মন শুদ্ধ হয়নি, সেইহেতু *প্রজহাতি যদা কামান্* যতই তোমার ইচ্ছা থাকুক, যতই তোমার আকর্ষণ থাকুক, যুদ্ধ না করে তুমি থাকতে পারবে না, নৈষ্কর্ম্য তুমি হতে পারবে না। উত্তরাখণ্ডের সাধুরা সারাদিন শুধু নৈষ্কর্ম্য, জ্ঞান আর অদ্বৈতের বড় বড় কথা বলে যাচ্ছে। তার সাথে ইদানিং ইউটিউব হয়ে সবাই অষ্টাবক্র, অহং ব্রহ্মাস্মির বড় বড় কথা বলে যাচ্ছে, দেখে হাসি পায়। স্বামীজী ইয়ং ছেলেদের বলছেন, গীতা পড়ার থেকে তোমার ফুটবল খেলা বেশি ভাল, কারণ ফুটবল খেললে তোমার ভিতর একটু শক্তি জাগবে, ভিতরে শক্তি এলে তবেই তুমি গীতা বুঝতে পারবে।

আমাদের সবারই উদ্দেশ্য নিবৃত্তিমার্গ, কিন্তু নিবৃত্তিমার্গের জন্য তুমি এখন প্রস্তুত নও। কারণ তুমি কর্মই করোনি, শুধু তাই নয়, তোমার স্বধর্ম যুদ্ধ করা, সেই যুদ্ধই তুমি করতে চাইছ না, এতেই পরিষ্কার যে তুমি নিবৃত্তিমার্গে অনুপযুক্ত। যাঁরা সন্ন্যাসী তাঁরাও যখন দেখেন যে লোকশিক্ষার জন্য কাজ করা দরকার, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কাজে নেমে পড়েন, যদিও সন্ন্যাস আর কর্ম এক সঙ্গে চলে না। যার জন্য আমরা দেখি, স্বামী বিবেকানন্দ জগৎকে শিক্ষা দিতে নেমে গেলেন, শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করতে নেমে গেলেন, শ্রীরামচন্দ্র এত বড় লঙ্কাকাণ্ড করলেন, মহম্মদ তরোয়াল নিয়ে নেমে গেলেন। যাঁরা জ্ঞানী পুরুষ তাঁরাও দরকার হলে কাজে নেমে পড়েন। কিন্তু অজ্ঞানী যদি প্রথমেই উচ্চতম আদর্শের দোহাই দিয়ে বলে আমি কাজ করব না, কারণ উচ্চতম অবস্থা হল কাজ না করা, আর এই ভেবে শুধু সন্ন্যাস নিয়ে কর্মত্যাগ করে চুপচাপ বসে যদি মনে করে এতেই আমার সিদ্ধি হয়ে যাবে, এতে ভাল তো কিছুই হবে না, উল্টে অনেক বিপত্তি হবে। কাজ সবাইকে করতেই হবে। জগৎ নশ্বর আর ঈশ্বরই সত্য এই জ্ঞান উপলব্ধি হওয়ার আগেই যদি তুমি কর্মসন্ন্যাস নিয়ে নাও তাহলে তোমার কোন কিছুই হবে না।

জাতিটা আজ নির্জীব হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ছেড়ে দিন, আমাদের কুড়ি পঁচিশটা ভাষা, ভাবতে গেলে অবাক হয়ে যেতে হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া সাহিত্যে আমাদের একটি নোবেল প্রাইজ নেই। বিশ্বের চিকিৎসা বিজ্ঞানে আমাদের জাতির একটা কোন অবদান নেই। আমাদের শত শত ইউনিভার্সিটি, অথচ বিশ্বের ইঞ্জিনিয়ারিংএ আমাদের একটি অবদান নেই। ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, বায়োলজি নিয়ে আমাদের দেশে কত কি হচ্ছে, কিন্তু কোন নোবেল প্রাইজ নেই। এমন কোন একটা প্রোডাক্ট নেই, যেটা বিশ্বের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। কেন এই অবস্থা? শক্তিবিহীন জাত। এই শক্তিবিহীন জাতি গীতা বুঝবে, না ধর্ম বুঝবে?

এই কারণে স্বামীজী বারবার বলছেন, কাজ কর, কাজ কর, দেশকে ভালবাস, তোমরা তমোগুণে ডুবে আছ, ভিতরে রজোগুণকে জাগাও। শক্তির বিকাশ হলে মানুষ ধারণা করতে পারবে, আমাদের শাস্ত্র কি বলছে, গীতা কি বলছে। গীতা উপনিষদ বোঝার জন্য শক্তি দরকার। কাজ না করে, নিষ্কাম কর্ম না করে গীতা উপনিষদ কোন দিন কেউ ধারণা করা দূরে থাক, একটু যে বুঝবে সেটাও হবে না। কারণ ভগবান নিজে এই কথা এখানে বলছেন, *ন কর্ম্যণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যাং পুরুষোহশ্নুতে*। প্রচুর কর্ম না করে কেউ কর্মবন্ধন থেকে, দায়িত্ব থেকে মুক্তি পায় না, আত্মার জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। *ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি,* শুধুমাত্র সন্ন্যাস নিয়ে নিলে, শুধুমাত্র কর্মত্যাগ করলে সিদ্ধি লাভ হয় না।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।।৫।।

(কর্ম না করে কেউই ক্ষণকালও থাকতে পারবে না। অ-স্বতন্ত্র হয়ে সকলেই মায়াজাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের প্রভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়।)

এই সংসারে কোন মানুষ কর্ম ছাড়া এক ক্ষণও থাকতে পারে না। এরপরেই বলবেন, তুমি যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছ, এটাও কর্ম। আমরা আগে কারকের বিস্তার দেখিয়েছিলাম, সাতটি কারক আর ক্রিয়া ও ফল, এর একটি থাকা মানেই সেটা কর্ম। আমরা যে বেঁচে আছি, এই বেঁচে থাকার মধ্যেই একটা ক্রিয়া জড়িয়ে আছে। ক্রিয়া থাকা মানে, একটা ফলও জড়িয়ে আছে, তার মানে আমরা সবাই কর্মে বাঁধা হয়ে আছি। আমরা এক অপরকে বলি, আপনার মধ্যে এই এই দোষ আছে। আমি মানছি আমার মধ্যে এই এই দোষ, একটু রেগে যাওয়া, অধৈর্য হওয়া, এগুলো আছে। কিন্তু এবার ভেবে দেখুন তো, এই সব দোষ যদি আমার না থাকত তাহলে আমি কেন জন্ম নিতাম? আমার ব্যক্তিত্বে অনেক দোষ আছে, অনেক দুর্বলতা আছে বলেই তো আমাকে জন্ম নিতে হয়েছে। এত কিছুর পরেও আমি যদি পুরো সত্ত্বগুণী হতাম, তাহলে জন্মাবার পর হিমালয়ের কোন গুহায় চলে গিয়ে ধ্যান করতাম, সেটাও তো পারলাম না।

আমরা স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, স্বামী গম্ভীরানন্দজী, স্বামী ভূতেশানন্দজী, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজদের দেখেছি, এনারা হলেন আচার্য। অবতারের যাঁরা পার্ষদ, এনাদের পরেই হলেন আচার্যরা, আমরা সেই স্তরের লোকও না। কারণ আমাদের ভিতর অনেক দুর্বলতা আছে, তাই তো আমাদের এই শরীর ধারণ করতে হয়েছে। এই যে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, এখানে এসে আমরা আমাদের নিজেদের পরিষ্কার করছি। আমাদের মধ্যে যে দুর্বলতা আছে, যে দোষ আছে, এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। স্বামীজী সেইজন্য সঙ্ঘের নাম দিয়েছেন রামকৃষ্ণ মুষা। সোনা-রূপার যারা কাজ করে, তাদের একটা পাত্র থাকে, যার মধ্যে এ্যাসিড ও অন্যান্য কেমিক্যাল থাকে, যা দিয়ে সোনা রূপা পরিষ্কার করা হয়, তাকে মুষা বলা হয়। রামকৃষ্ণ মুষাতে আমাকে ফেলে রেখে আমাকে পরিষ্কার করা হচ্ছে, আমার যে স্বাভাবিক স্বরূপ, আমি যে সেই প্রকৃত সোনা, সেই স্তরে আমাকে নিয়ে যেতে হবে। জন্ম নিয়েছ মানেই তোমার মধ্যে দোষ আছে, দুর্বলতা আছে; তাই কাজ করতে হবে, কাজ করাটাই তোমার স্বাভাবিক ধর্ম। যদি তোমার কোন দুর্বলতা, কোন দোষ না থাকত তোমাকে জন্মই নিতে হত না, জন্ম নিয়েছ মানেই তোমাকে কাজ করতে হবে।

আর তুমি যদি গায়ের জোরে সন্ন্যাসী হয়ে যাও, তুমি ঘোর তমোগুণী হয়ে যাবে। স্বামীজীর একটা ঘটনা আছে, একবার তিনি হিমালয়ের দিকে যাচ্ছেন, দেখছেন রাস্থার পাশে একজন সাধু কম্বল চাপা দিয়ে গভীর ভাবে ঘুমোচ্ছে আর ঘ্যোঁৎ ঘ্যোঁৎ করে নাক ডাকছে। স্বামীজী তখন ইয়ং, রেগে গিয়ে বলছেন, দে ব্যাটাকে লাঙলে জুতে। চাষের কাজে বলদ দিয়ে লাঙল টানা হয়, বলছেন

বলদ সরিয়ে একে লাঙলের সাথে জুতে দিতে, লাঙল টানলে যদি তমোগুণটা কাটে। কাজ না করে সন্ন্যাসী হয়ে গেলে এই রকম তমোগুণী হয়ে যায়, তমোগুণীরা কি করে –

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।।৬।।

(যে মূঢ় ব্যক্তি হাত, পা ও বাক্যাদি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় সংযত করে মনে মনে শব্দরসাদি ইন্দ্রিয়বিষয় স্মরণপূর্বক অবস্থান করে, তাকে মিথ্যাচারী বলে।)

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য, বাইরে থেকে ইন্দ্রিয়গুলি, হাত-পা সব ভিতরে গুটিয়ে রেখেছে, *য আস্তে মনসা স্মরণ্*, কিন্তু মনে মনে অনেক কিছু ভাবছে, ভোগের চিন্তা করে যাচ্ছে। বয়স্করা শুধু বলবে, আজকালকার ছেলেরা বয়স্কদের সম্মান দিতে জানে না। আপনি যখন ইয়ং ছিলেন, আপনিও তখন কাউকে সম্মান দিতেন না। মনে মনে সম্মান পাওয়ার খুব ইচ্ছা, কিন্তু সারা জীবন একটি কাজ করলেন না, যেটার জন্য আপনাকে লোকে আজকে সম্মান দেবে। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের যিনি প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট হন, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ভক্তরা লাইন দিয়ে তাঁদের প্রণাম করতে যান, প্রণিপাত হয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। কারণ, তিনি তাঁর জীবনটা সেই ভাবে চালিয়ে আজ এখানে এসেছেন।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে, এই ধরণের মানুষ যারা হয়, তারা মিথ্যাচারী; কত কটূ ভাষায় ভগবান বলছেন। তুমি ত্যাগী, সন্ন্যাসীর ভাণ করছ, অথচ মনে মনে ইন্দ্রিয়ের যে ভোগসাম্রাজ্য, সেখানে ঘুরঘুর করে যাচ্ছে। ঠাকুর যেমন বলছেন মনের পাপ পাপ নয়, কিন্তু সন্ন্যাসীর জন্য মনের পাপও পাপ। সন্ন্যাসী মনে মনেও যদি কামনা করে, সেটা পাপ। বলছেন, তুমি কাজ করছ না, কিন্তু মনে মনে ভোগের বস্তু কামনা করছ, সোজাসুজি ভগবান এদেরকে বলছেন, তুমি মিথ্যাচারী। এর বিপরীতটাও ভগবান এবার বলছেন –

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে।।৭।।

(কিন্তু যিনি বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযত করে অনাসক্তভাবে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি পূর্বোক্ত মিথ্যাচারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।)

কিন্তু যিনি কাজ করছেন, তখনও তিনি মনে মনে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযমে রেখেছেন। ইন্দ্রিয়কে সংযমে রাখা মানে, কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে তিনি দৌড়াতে দিচ্ছেন না, শুধু কাজ করে যাচ্ছেন, কাজ কাজের মত হয়ে যাচ্ছে। এনারা হলেন বিশিষ্ট পুরুষ। কাজের দুটো option বলছেন। একটা হল, কর্মেন্দ্রিয়কে গুটিয়ে রেখেছে, আর জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে অনেক কিছুর চিন্তা করে যাচ্ছে। আর-একজন হলেন, জ্ঞানেন্দ্রিয়কে আটকে রেখেছেন, কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। ভগবান সাত নম্বর শ্লোকে বলছেন, এনারা শ্রেষ্ঠ। নিয়ন্ত্রণ যদি করতে হয়, মনকে নিয়ন্ত্রণ কর।

একজন মহারাজ মজা করে আমাদের বলতেন, 'বুঝলে ভাই ধ্যান কর, শুধু ধ্যান করতে শেখ। মন্দিরে গিয়ে বসবে, চোখ, কান, মুখ সব বন্ধ করে শুধু ধ্যান করবে, তাহলে তুমি অনেক সমস্যা থেকে বেঁচে যাবে'। কি কি সমস্যা হবে না? প্রথম হল, কারুর সাথে কথা বলতে হবে না, ঝগড়া-ঝাটি হবে না। দ্বিতীয় ঘরে যদি ঘুমোও, বলবে, ব্যাটা সাধু হয়েছে শুধু ঘুমোবার জন্য, কিন্তু ওখানে যদি ঘুমিয়ে পড়ো, সবাই বলবে, আহা ধ্যান করতে করতে ঢুলে পড়ছে। তৃতীয়, সবাই বলবে কত ভক্তি। চতুর্থ তোমাকে কাজ করতে হবে না। এভাবে কি কিছু হয়, কিছুই হয় না। কাজ করা থেকে বেঁচে যাবে ঠিকই, কিন্তু আধ্যাত্মিক উত্থান হবে না।

গীতা এই ধরণের বেনিয়ম আচরণ নিয়ে বেশি আলোচনা করছেন না, শুধু বলছেন অজ্ঞানী হাত পা গুটিয়ে ইন্দ্রিয়ের সংযম করছে কিন্তু মনকে ঢালাও স্বাধীনতা দিয়ে দেয়; আর জ্ঞানী ঠিক উল্টোটা করেন, তাঁরা মনকে সংযত করে অনাসক্ত ভাবে কর্মেন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা পুরোদমে কাজ করেন। এই কথা বলার পর অর্জুনকে ভগবান বলছেন, তুমি আমার প্রিয় বলে তোমাকে বলছি –

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ।।৮।।

(তুমি শাস্ত্রোপদিষ্ট নিত্যকর্ম কর। কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেয়ঃ। কর্মহীন হলে তোমার দেহযাত্রাও নির্বাহ হবে না।)

হে অর্জুন, নিয়ত তুমি কর্ম করে যাও; শাস্ত্রে যে কর্ম তোমাকে করতে বলা হয়েছে, সেই কর্ম অবশ্যই করবে। কর্ম ব্যতিরেকে তোমার এই শরীরও চলবে না। এখান থেকে আমরা ধীরে ধীরে গীতার গভীরে প্রবেশ করতে শুরু করি। যে জিনিসগুলিকে প্রথমের দিকে সংক্ষেপে বলা হয়েছিল, সেগুলোকে আরও বিস্তার করছেন, পুরো বিস্তার অবশ্য হয় না। কারণ প্রথমের দিকে আমরা বলেছিলাম, পুরো বেদ উপনিষদের সার হল গীতা, এমনকি আমরা যে এত ব্যাখ্যা করে যাচ্ছি, তাতেও এর পুরো বিস্তার হয় না। নিজে থেকে যিনি যত পড়াশোনা করবেন, চিন্তন, মনন ও ধ্যান করবেন, তত তিনি ভাল বুঝবেন। এখানে ভগবান অর্জুনকে বলছেন, তুমি নিত্য কাজ কর, নিত্য কাজ মানে নিত্যকর্ম করা।

নিত্যকর্ম হল, সমাজ আমাকে যে দায়ীত্ব দিয়েছে, পরিবারের প্রতি আমার যে দায়ীত্ব আছে এবং আমার নিজের উত্থানের জন্য যে কর্ম করতে হবে, সেই কর্মকে বলছেন নিত্যকর্ম। বর্ণাশ্রম ধর্ম বললেই আমাদের মনে হয় বর্ণপ্রথাকে নিয়ে চলা। বর্ণ বলতে আমরা জানি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটে বর্ণ। এই চারটে বর্ণ হল, সমাজের প্রতি যার যার যে যে কর্তব্য, সেই কর্তব্যগুলি পালন করা। আশ্রমধর্ম হল, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এই চারটে আশ্রমধর্ম পালনের উদ্দেশ্য হল নিজের উত্থানের জন্য। বর্ণ এবং আশ্রম এই দুটো দায়ীত্বকে মিলিয়ে বলা হয় বর্ণাশ্রম ধর্ম। এই বর্ণাশ্রম ধর্ম আমাদের সবাইকে পালন করতে হবে, অর্জুনকে ভগবান এই কথা খুব জোর দিয়ে বলছেন। কারণ *শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ*, এই যে শরীর দেখছ, এই শরীরটাও কাজ ছাড়া এক মুহূর্তও চলে না। তুমি যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছ, এটাও কাজ। তুমি দেহাভিমানী, দেহের সাথে তুমি নিজেকে জুড়ে রেখেছ।

পরের শ্লোকটাও খুব সুন্দর শ্লোক। এই শ্লোকটাকে আমরা যদি মুখস্ত করে চিন্তন করতে থাকি, জীবনে তাহলে এটা আমাদের খুব কাজে দেবে। এটা ঠিকই যে, গীতা পুরোটাই মুখস্ত করা দরকার। যদি কেউ পুরোটা মুখস্ত না করতে পারেন, তাহলে অন্ততঃ দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বাদশ অধ্যায় ও পঞ্চোদশ অধ্যায় অবশ্যই মুখস্ত করা উচিত। এটাও যদি কেউ না করতে পারেন, তাহলে বেছে বেছে কিছু শ্লোক মুখস্ত করতে হবে, মন্দের ভাল, যার মধ্যে এই শ্লোকটিকেও রাখতে হবে।

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচার।।৯।।

(ঈশ্বরের প্রীত্যার্থে অনুষ্ঠিত কর্ম ছাড়া অন্য সব কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। অতএব, তুমি ভগবানের উদ্দেশে অনাসক্ত হয়ে বর্ণাশ্রমোচিত সব কর্ম কর।)

ভগবান বলছেন, তুমি যখন বুঝে গেলে যে, কাজ তোমাকে করতেই হবে, তাহলে এখন থেকে সমস্ত কাজ তুমি যজ্ঞ রূপেই কর; যে কাজই কর না কেন, সেই কাজকে যজ্ঞ রূপে সম্পন্ন কর। যজ্ঞ রূপে কাজ করলে, তুমি ধীরে ধীরে মুক্তির দিকে এগোতে শুরু করবে। যদি তুমি যজ্ঞ রূপে কর্ম না কর, তাহলে ঐ কর্মটাই বন্ধন রূপে তোমাকে বেঁধে নেবে। এখানে ভগবান বলছেন, কাজ তুমি কেন করবে। কাজ থেকে কর্মযোগের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।

আমাদের মনে অনেক সময় প্রশ্ন ওঠে, মনে অনেক রকম সংশয় হয়, ঈশ্বর কি সত্যিই আছেন, নাকি ঈশ্বর বলে কিছু নেই; এই ধরণের অনেক রকম প্রশ্ন ওঠে। অনেকে বলেন, তোমার কর্মই তোমার ভাগ্য তৈরী করে দেবে, বলতে চাইছেন, কাজ দ্বারাই ভাগ্য সৃষ্টি হয়। অনেকে আবার বলেন, ঈশ্বর সব ঠিক করে রেখেছেন, সব পূর্ব নির্ধারিত; বিশেষ করে খ্রীশ্চানরা এই কথা বলেন। যদি সব কিছু কর্ম দিয়েই পাওয়া যায়, তাহলে তো সবাইকে কাজ করতেই হবে, এতে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়। যদি আমরা কপালে বিশ্বাস করি, বেশির ভাগ হিন্দুরা তাই মনে করেন; কপাল মানে হল, আগে যেমনটি কর্ম আমি করেছি, আজ সেই কর্মের ফলই পাচ্ছি। ঠিক তেমনি, আজকে যে কর্ম করছি, আগামী দিনে সেই কর্ম অনুসারেই ফল পাবো। এই কার্য-কারণ সম্পর্কে যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে, তাহলে আমাদের কাজ করতেই হবে। আর যদি আমরা মনে করি ঈশ্বর আমার জন্য সব আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন, যদিও এটা হিন্দুদের মত নয়; বিশেষ করে প্রাচীনতম শাস্ত্রগুলিতে এই মত পাওয়া যাবে না, কিন্তু পরে পরে কিভাবে কিভাবে এই মত হিন্দুদের মধ্যে ঢুকে গেছে, হিন্দুরাও এখন সবটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে মেনে নিয়েছে।

ইংরাজীতে একটা কথা প্রায়শই বলা হয়, I need to fulfill my destiny, ভগবান যদি আমার জন্য কিছু ঠিক করে রাখেন, আমাকে তাহলে চেষ্টা করে সেখানে পৌঁছাতে হবে। প্রথম যুক্তি হল কার্য-কারণ সম্পর্ক। দ্বিতীয় যুক্তি, ঈশ্বর যদি আমার জন্য সব ঠিক করে থাকেন, তাহলে আমাকে সেটাকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। আমি তো বলতে পারি যে, সব কিছু যদি ঠিক করাই থাকে, তাহলে কাজ না করলেও সেটা আমি পেয়ে যাবো। এই জায়গাতে এসে সমস্যা হয়। আমি করি আর নাই করি, সব তো ঠিক করাই আছে, এমনিতেই এসে যাবে। কপালে যদি থাকে আমার আসবেই, সেইজন্য আমি কাজ কেন করতে যাব, কিছু দিন আগে পর্যন্ত এটাই ভারতবর্ষের ফাঁকিবাজদের ঠিক ঠিক দর্শন ছিল।

গীতা এখানে কয়েকটি শ্লোকে এই জিনিসটাকে পরিষ্কার করছেন। তোমার জন্য যদি এটা ঠিক করাও থাকে, তাও তোমার কাজ করা দরকার। কারণ তুমি কাজ তো করছই, তোমার শরীর তো কাজ করছেই। তুমি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছ, খাওয়া-দাওয়া করছ, কথা বলছ, ঘুমোচ্ছ, সব কিছু করছ, কিন্তু কাজ করার সময় বলছ, আমি কাজ করব না। যদি তুমি বল, কাজ না করলেও আমার হবে, কিন্তু সেটা তোমার এই জন্য হবে না, কারণ তোমার যে স্বভাব, তোমার মনের যেমন প্রবৃত্তি, স্বাভাবিক যে প্রস্তুতি, সেটাই তোমাকে দিয়ে কাজ করাবে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে গিয়ে ভগবান এটাই অর্জুনকে বলবেন, তোমার স্বভাবই তোমাকে দিয়ে যুদ্ধ করাবে।

কাজ ছাড়া কেউ বসে থাকতে পারবে না। যেমন একজন পিয়ানো বাজান, তিনি একজনের বাড়িতে গেছেন। বাড়িতে যার কাছে গেছেন, সে তখন বাড়িতে নেই। তাকে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। তিনি বসে বসে দেখছেন ঘরের কোণে একটা পিয়ানো রাখা আছে। তিনি নিজের জায়গা থেকে উঠে গিয়ে পিয়ানোতে টুং টাং করে বাজাতে শুরু করবেন। কারণ তার স্বভাবে আছে। আমাদের স্বভাবেই আছে কাজ করা, ঠেলে আমাদের দিয়ে কাজ করাবে। তার থেকে আরও সহজে বোঝা যায়, আমাদের শরীরটাই চলবে না, যদি আমরা কাজ না করি। সব কিছুই করছি, কিন্তু ঐ

জায়গাতে কেন বলব, পূর্ব নির্ধারিত ভাবে আমার সব ঠিক করা আছে, কাজ না করলেও আমি পেয়ে যাব? কিন্তু না, কাজ আমাদের করতে হবে, স্বভাবে কাজ করাবে।

আমি যদি ত্যাগ নাও করতে চাই, মৃত্যু যখন আসবে, তখন আমার পায়ে দড়ি বাঁধবে, তারপর টেনে আমাকে নিয়ে চলে যাবে, আমাকে সব কিছু ত্যাগ করতে বাধ্য করাবে। কিন্তু আমরা ঠেকেও শিখতে চাই না, আমরা সব কিছুকে ধরে রাখতে চাই। ধর্ম আমাদের এই শিক্ষাই দিতে চাইছেন –একটা কয়েদীর মত তোমাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলে যাবে, এই জিনিস হতে দিও না। তোমার আত্মসম্মানকে ধুলায় লুটিয়ে দিও না, নিজে থেকেই তুমি ত্যাগ করে দাও। তুমি যদি ত্যাগ করতে শেখ, তাহলে ধীরে ধীরে তুমি একজন আধ্যাত্মিক পুরুষ হয়ে যাবে, তখন এই মৃত্যুর ব্যাপারটা তোমার কিছুই মনে হবে না। মৃত্যু তোমাকে আর ভয় দেখাতে পারবে না, শুধু মৃত্যুই না, কোন কিছুই আর তোমাকে ভয় দেখাতে পারবে না, কারণ তুমি ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত। গীতা যে কর্মের কথা বলছেন, সেই কর্মকে এই অর্থেই নিতে হয়। তোমার প্রকৃতি, তোমার ভিতরের যে স্বভাব, সেটা তোমাকে দিয়ে কাজ করাবেই। তাহলে আমরা নিজে থেকেই কাজ করি না কেন। কি দরকার অন্য কেউ আমাকে দিয়ে কাজ করাতে আসবে, আমি আমার সম্মান বজায় রেখে কাজ করব, তোমার কথা মত কিছু করব না।

দুটো দেশের মধ্যে যুদ্ধ হলে যুদ্ধে অনেক সৈন্য বন্দী হয়ে যায়, এরা সাধারণ বন্দী না, এরা হল যুদ্ধবন্দী। অনেক সময় যুদ্ধবন্দীদের দিয়ে তারা কাজ করায়, যেহেতু কয়েদী। সেখানেও যারা বন্দী হয়েছে, তাদের অফিসাররা পরিষ্কার বলে দেয়, দুষমনের আদেশে তুমি কাজ করবে না, আমার আদেশে কাজ করবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই ধরণের অনেক ঘটনা আছে। আমেরিকা বা বৃটেনের অনেক সৈনিক দুষমন দেশে বন্দী হয়ে যেত। এখন শত্রু পক্ষের ইনচার্জ বন্দীদের আদেশ করছে, তুমি এখানে রাস্তা তৈরীর কাজে লেগে যাও। সৈন্যরা কাজ করবে না, ওকে শাস্তি দিয়ে দিক, যাই করে দিক, ও কাজ করবে না। কিন্তু যখন আমেরিকার কমাণ্ডারকে আদেশ করা হচ্ছে, তুমি তোমার সৈন্যদের দিয়ে এই কাজ করিয়ে দাও। ওই কমাণ্ড যখন আদেশ করে তখন ওরা কাজ করে দিচ্ছে। জাপানী সৈন্যরা দেখল, আমেরিকার সৈনিকরা যুদ্ধে বন্দী হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আত্মসম্মানের সাথে কখন আপোষ করবে না। আমরাও কেন আমাদের আত্মসম্মানের সাথে আপোষ করতে চাইব? যদি আমরা আমাদের আত্মসম্মানের সাথে আপোষ না করতে চাই, তাহলে আমাদের স্বভাব ঠেলে কেন করাবে, আমি স্বেচ্ছায় করব, আমি আমার ইচ্ছায় করব।

এই জায়গাতে এসে একটা brandingএর ব্যাপার পাওয়া যায়। আগে আমরা জানতাম বাটা কোম্পানী বাজারে যে জুতা বিক্রী করে, সেটা তারা নিজেরা ফ্যাক্টরিতে বানায়। পরে আমরা জানলাম ব্যাপারটা তা না, কলকাতার আশেপাশে যারা ভাল জুতা বানায়, বাটা কোম্পানী তাদের দায়ীত্ব দিয়ে দেয়, তার সাথে কোম্পানী কোয়ালিটি কন্ট্রোল করে, তারপর সেই জুতাতে বাটা কোম্পানীর স্ট্যাম্প মেরে দেয়। অনেক আগে কোন ম্যাগাজিনে একটা ঘটনা বেরিয়েছিল।

ইতালি হল ফ্যাশান মার্কেট। সারা বিশ্বে পোশাকের যে ডিজাইনগুলো দেখা যায়, এগুলো ইতালির একটা বিশেষ অঞ্চল থেকে বের হয়। ঘটনার বিরাট বর্ণনা আছে, ব্যাপারটা হল, যারা কোন পোশাকের ডিজাইন চায়, তারা ওই অঞ্চলের পোশাক নির্মাতাদের ওই ডিজাইনটা দেয়, তৈরী হয়ে যাওয়ার পর পোশাকের উপর নিজের কোম্পানীর ছাপ মেরে দেয়। বিশ্বে যত নামকরা পোশাক নির্মাতা, জুতা নির্মাতা আছে, কোম্পানীগুলো কোন জিনিসই তৈরী করে না। কোন বিশেষ অঞ্চলে ওদের পছন্দ মত ভাল কারিগররা আছে, তারা স্বাধীন ভাবে কাজ করে; এরা শুধু ওদের তৈরী জিনিসগুলোর উপর branding করে দেয়।

জীবনে যদি কেউ ভাল হতে চায়, কাজ করে যদি মুক্তি পেতে চায়, কর্ম করে যদি কেউ মহাপুরুষ হতে চায়, তাহলে তাকে এই brandingটা করে দিতে হবে। এই brandingটা হল যজ্ঞ। সমস্ত কাজকে যদি যজ্ঞ রূপে করা হয়, সব কাজকে যদি যজ্ঞ রূপে করা হয়, কাজটা branding হয়ে গেল। এবার এই কাজ তাকে মুক্তির দিকে নিয়ে চলে যাবে। তাকে আলাদা করে কিছু করতে হবে না, সবই তো সে করছে, শুধু ভাবটা পাল্টে দিতে হবে। নিজের ঘর ঝাড়পোছ করছে। আপনি কেন ঝাড়ু দিচ্ছেন, বাড়িতে আর কেউ নেই নাকি? কেন থাকবে না, সবাই আছে, কিন্তু কাজ কেউ করতে চায় না, আমাকেই তাই বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে। কাজ করছে ঠিকই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিরক্তির ভাব। এই কাজটাই তখন একটা বন্ধন হয়ে তাকে বেঁধে ফেলছে। কিন্তু এতে যজ্ঞের brandingটা লাগিয়ে দিলে এই কাজটারই একটা বিরাট দাম হয়ে যাবে।

ভারত সরকার কিছু দিন আগে স্বচ্ছ ভারত প্রকল্প নিয়ে এলেন। আমরা প্রকল্প বলি না, আমরা বলি যজ্ঞ। মায়েদের বাড়িতে রোজই রান্না করতে হয়, ওই রান্নাটাই যজ্ঞে রূপে করে দিক। মা কি করছেন এখন? তিনি এখন রন্ধন যজ্ঞ করছেন। কার জন্য এই যজ্ঞ করছেন? ঈশ্বরের জন্য করছি। এই রান্না কারা খাবে? ঈশ্বরের সন্তানরা খাবেন। কারা ঈশ্বরের সন্তান? আমার স্বামী, আমার পুত্র-কন্যা, আমার শ্বশুর শাশুড়ি, আমার ভাসুর, দেওর, ননদ, আমি, সবাই আমরা ঈশ্বরের সন্তান। যে রান্না করাটা মায়েদের মাথা ব্যাথার কারণ ছিল, সেই রান্নাটাই এবার যজ্ঞে বা পূজাতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। হিন্দুদের যে বিবাহ অনুষ্ঠান, এটাও যজ্ঞ করে এবং যজ্ঞ রূপে করা হয়। আমাদের বিভিন্ন শাস্ত্রে বর্ণনা পাওয়া যায়, যেখানে বলছেন, এই যে সন্তানোৎপাদন প্রক্রিয়া, এটাও যজ্ঞ।

এই কথাই ভগবান এই শ্লোকে বলছেন, *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকহয়ং কর্মবন্ধনঃ*, এই সংসারে সমস্ত কর্মই কর্ম বন্ধন, কর্ম আমাদের সংসারে বেঁধে দেবে। প্রায়ই লোকেরা জিজ্ঞেস করে, দয়া করে বলে দিন, আমাকে কি করতে হবে? কিছুই করতে হবে না, সবটাই তো আপনি করছেন, বাটা কোম্পানী যেমন জুতাতে নিজের নামটা মেরে দিয়ে branding করে দেয়, আপনাকেও শুধু brandingটা করতে হবে, এখানে যজ্ঞের ছাপটা মেরে দিতে হবে। শুধু branding করলেই হবে না, branding করতে গেলে কিন্তু কোয়ালিটি কন্ট্রোল অবশ্যই করতে হয়। নামকরা কোম্পানীরা যে কোন জিনিসে কিন্তু নিজের কোম্পানীর নামের ছাপ মারতে দেবে না। যে কেউ একটা জুতা বানিয়ে এনে দিলে বাটা কোম্পানী branding করবে না। ওই কোয়ালিটি কন্ট্রোলটা আমাদের নিজেদের করে নিতে হবে, তারপর যজ্ঞের branding। স্নান করছি, যজ্ঞ; স্নান করার পর তারে কাপড় শুকোতে মেলছি, যজ্ঞ; ঠাকুরের পূজা অর্চনা করছি, যজ্ঞ; রান্না করছি, যজ্ঞ; খাওয়া-দাওয়া করছি, যজ্ঞ। রামকৃষ্ণ মিশনের যে কোন সেন্টারে খাওয়ার আগে সবাই বলবেন, *ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্*, তখন খাওয়াটাই হয়ে গেল আহার-যজ্ঞ।

যজ্ঞ রূপে সব কাজ যখন হয়, তখন এটাই মুক্তির কারণ হয়। যদি কাজ যজ্ঞ রূপে না হয়, তখন ওই কাজটাই বন্ধনের কারণ হয়। কারণ সেখান থেকে ভোগ এসে যায়, ভোগ এসে গেলেই রাগ আর দ্বেষ এসে গেল। রাগ – প্রিয় জিনিসের প্রতি আকর্ষণ, দ্বেষ – যেটা অপ্রিয়, সেটার থেক পালানো, এটাই বন্ধন হয়ে গেল। যদি বন্ধন থেকে বাঁচতে চাও, কয়েদী হওয়া থেকে যদি বাঁচতে চাও, সমস্ত কাজ যজ্ঞ রূপে কর। হে অর্জুন, এই যে যুদ্ধ হতে যাচ্ছে, এটা যুদ্ধ যজ্ঞ; যজ্ঞে লোকেরা বলিদান দেবে, এটাই যজ্ঞ। যুদ্ধের আগে মহাভারতের একটা জায়গায় কর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে এই যুদ্ধের যে বর্ণনা করছেন, সেখানেও তিনি যুদ্ধকে যজ্ঞ রূপে বর্ণনা করছেন।

তদর্থং কর্ম কৌন্তেয়, হে অর্জুন, সেইজন্য তুমি কাজ কর। কিভাবে কাজ করবে? যে কোন কাজ যখন করবে, ঈশ্বরের জন্য আমি এই কাজ করছি, এই ভাব নিয়ে সব কাজ করবে। একটু পরেই ভগবান বলবেন, কেন কাজ করবে? অপরের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য কাজ করবে।

ছোটবেলায় আমরা দেখতাম, ঠাকুরমা, দিদিমা, জ্যেঠিমারা সারাদিন কত কাজ করতেন। তাঁদের সেই কাজের মধ্যে ডুবে থাকাটা আমাদের মনের মধ্যে এখনও জ্বলজ্বল করছে। যদি আমরা কাজে ফাঁকি দিই, কাজ ঠিক ভাবে না করি, তার থেকেও খারাপ, যজ্ঞ রূপে করছি না, এতে অত্যন্ত খারাপ প্রভাব পড়ে। যদি কেউ সৎপুরুষ হন, তবে তাঁর বংশে দু চারজন খারাপ বেরোতে পারে; কিন্তু সে যদি খারাপ হয়, তাহলে কোন সম্ভবনা নেই যে, ভাল কেউ সেই বংশ থেকে বেরোবে। আম গাছের বীজ লাগালে, চারটে গাছ ভাল হবে, চারটা গাছ মন্দ হবে। আমের জায়গায় যদি বাবলা গাছের বীজ লাগানো হয়ে, সেখানে কোন দিন ভাল আম গাছ জন্মাবে না, কোন সম্ভবনাই নেই।

আমরা কিসের প্রার্থনা করি? যেটা আমাদের অভাব, সেটারই আমরা প্রার্থনা করি। যেটার অভাব নেই সেটার জন্য কেন আমরা প্রার্থনা করতে যাব! খ্রীশ্চান ফাদারকে নিয়ে একটা মজার গল্প আছে। ফাদার একজনকে জিজ্ঞেস করছে, ‘ঈশ্বরের কাছে তুমি কি চাইবে’? সে বলছে, ‘টাকা-পয়সা চাইব, বড় বাড়ি চাইব, একজন ভাল জীবনসঙ্গিনী চাইব’। ফাদার বলছেন, ‘ছি ছি, ঈশ্বরের কাছে এসব জিনিস কি চাইতে হয়! তাঁর কাছে চাইতে হয়, জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য’। ছেলেটি বলছে, ‘যার যেটার অভাব, সে তো সেটাই চাইবে’। আমাদের কি শিক্ষা দেওয়া হয়? যে শিক্ষা বা জ্ঞানের আমার অভাব, সেটারই শিক্ষা আমাদের দেওয়া হয়।

গীতা কেন এত বারবার কর্ম করার কথা বলছেন? কারণ ভারতের লোকেরা প্রথম থেকেই কাজে ফাঁকি মারত। শিক্ষা ওটারই দেওয়া হয়, যেটা তার অভাব। যীশু ভালবাসার কথা বলছেন, প্রেমের কথা বলছেন। কেন বলছেন? তিনি জানেন, ওরা ওই রকমই, সারা দিন হিংসা করছে। যখনই শাস্ত্রে একটা জিনিসের শিক্ষা দেওয়া হয়, আর একটা জিনিস বারবার করে বলা হয়, তখন বুঝতে হয় ওই সমাজে ওটার অভাব আছে। আজও ভারতবর্ষে কেউ কাজ করতে চায় না, কিন্তু কাজের ফল চায়। ভোট এলেই নেতারা গিয়ে লোকেদের বলতে শুরু করবে, আমি আপনাদের এটা করে দেব, সেটা করে দেব। আমরা কি ভিখারী নাকি? আপনি কি মনে করছেন যে, আপনি না করলে আমাদের এসব কিছুই হবে না? আমরা নিজেরাই খেটে করে নেব। কিন্তু আমরা সবাই কাঙালীর মত চেয়েই যাচ্ছি। এই কমিউনিটি বলছে আমাদের জন্য সংরক্ষণ চাই, যাতে সহজে চাকরি পেয়ে যেতে পারে। অন্য এক কমিউনিটি বলছে, আমাদের জন্য এই জিনিসগুলো ফ্রীতে করে দেওয়া হোক। সবাই সব কিছু ফ্রীতে পেতে চাইছে। দেশটা যেন কাঙালীর দেশ হয়ে গেছে, কাজ কেউ করব না, কিন্তু সব কিছু চাই।

বাইবেলে যীশু খ্রীষ্ট খুব সুন্দর একটা গল্প বলছেন, Story of twenty talents। একজন বড়লোক, তার দুজন সেবক ছিল। একবার উনি দুজনকেই twenty talents দিলেন, একটা বড় অঙ্কের টাকা, কুড়ি হাজার কি, কুড়ি লাখ টাকা দিলেন। তুমি এই টাকাটা তোমার কাছে রাখ, আমি পরে চেয়ে নেব। এক বছর পর, উনি দুজনকেই ডেকে পাঠালেন, আমার টাকাটা ফেরত দাও। একজন সেবক ওই twenty talentsকে দ্বিগুণ করে দিয়েছে। বড়লোক খুব খুশী, দ্বিগুণ কি করে হলো? ‘আপনি টাকাটা রাখতে দিয়েছিলেন, আমি সেটা ব্যবসাতে লাগিয়ে দিয়েছিলাম, সেখান থেকে মুনাফা মিলিয়ে এটা দ্বিগুণ হয়েছে’। মালিক তো খুব খুশী, তুমি পুরোটাই তোমার কাছে রেখে দাও। দ্বিতীয় সেবককে বলতে, সে সঙ্গে সঙ্গে দশটা দু হাজার টাকার নোট বার করে এনেছে। বড়লোকটি বলছে, ‘কি ব্যাপার, একেবারে সেই নোটগুলোই ফেরত দিলে, যে নোটগুলো আমি তোমাকে দিয়েছিলাম’! ‘না, আপনার দেওয়া জিনিস কিনা, তাই খুব সামলে সিন্দুকে রেখে দিয়েছিলাম’। ‘তুমি একটা ফাঁকিবাজ, তুমি সব টাকা আমার ফেরত দাও’। যীশু তখন এটাই বলছেন, ‘ভগবান আমাদের যেটা দিয়েছেন, সেটাকে যদি কাজে লাগানো হয়, তাহলে কাজে লাগিয়ে যেটা লাভ হল, সেটা সমেত সবটাই তার কাছে থাকবে। যদি কাজে না লাগানো হয়, তাহলে যেটা দেওয়া হয়েছে, সেটাও কেড়ে নেওয়া হয়’।

আমাকে আপনাকে সবাইকে ভগবান যে সুযোগ দিয়েছেন, সেই সুযোগকে ঠিক ভাবে কাজে না লাগাতে পারলে ভগবান পুরোটাই কেড়ে নেবেন। মানবজীবনে কর্মকে যদি যজ্ঞ-রূপে না সম্পন্ন করা হয়, ভগবান যেটা দিয়েছিলেন সেটাও কেড়ে নেবেন। কিন্তু আমাদের ভাব, ভগবান কেড়ে নিন, আমার কর্ম কেড়ে নিন, আমার কিন্তু তাতেও চলে যাবে। এই জিনিসটাকে বোঝানর জন্যই এই শাস্ত্রগুলি। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম বাবুকে ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, জীবনের উদ্দেশ্য কি? তিনিও মজা করে উত্তর দিলেন, আহার, নিদ্রা, মৈথুন। এটা তো একটা পশুও জানে, তারাও তো আহার, নিদ্রা, মৈথুন সব সময় করছে। অন্য দিকে বুদ্ধিজীবিরা, যুক্তিবাদীরা বলবেন ভগবান বলে কিছু নেই, ভগবানকে কোথাও দেখা যায় না। এটা তো সবাই দেখছে, ভগবানকে কোথাও দেখা যায় না, এটাকে জানার জন্য কেন আমাকে শাস্ত্র জানতে হবে? শাস্ত্র সেই জিনিসটাকে নিয়েই বলে, যেটা ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না।

ভগবান অর্জুনকে বলছেন, ইন্দ্রিয় সংযম করে, ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, ভোগ-বাসনাতে না গিয়ে, ভিতরে কোন তৃষ্ণা না রেখে, হে অর্জুন, তুমি যজ্ঞ মনে করে সব কাজ কর। আমার আপনার সবার জন্য এটাই, যা কিছু আমরা করছি, সবটাই যজ্ঞ রূপে করতে হবে। একজন সন্ন্যাসী ভাই আমাকে সেদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি যে রোজ ক্লাশ নিচ্ছেন, ক্লাশ নেওয়ার আগে আপনি কি প্রস্তুতি নিয়ে যান'? আমি তাঁকে বললাম, 'দেখুন, ক্লাশগুলো আমার কাছে পূজা, আমি লেকচার দেওয়ার জন্য ক্লাশ নিই না, এটা আমার কাছে যজ্ঞ। যাঁরা শুনছেন ভাল, আমার শ্রোতা যদি কেউ না থাকে, তাতেও আমার কিছু আসে যায় না। এই ক্লাশ আমার কাছে পূজা, আমার কাছে যজ্ঞ, কারণ এর মাধ্যমে আমি নিজেকে উত্থান করছি'।

আমাদের শাস্ত্রও বলছে, শাস্ত্র পাঠ, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করা, এগুলোর দ্বারাও মানুষের আধ্যাত্মিক উত্থান হয়। যা কিছু করছি, দাঁত ব্রাশ করছি, যজ্ঞ; সবটাই যজ্ঞ। এইভাবে সব কাজ করলে আমাদের জীবন অন্য রকম হয়ে যাবে। এই যে জীবনের অন্ধকার বা অন্ধকারময় জীবন, হঠাৎ দেখা যাবে অন্ধকার সরে গিয়ে শুধু আলো আর আলো। এখন মনে যে এত কষ্ট, এত দ্বন্দ্ব, এত বিরোধ, সব কেটে যাবে। এখান থেকে ভগবান এবার নিয়ে আসছেন বেদের কর্ম, দেবতাদের কর্ম। এই জায়গাতে কিছু কিছু টেকনিক্যাল জিনিস থাকাতে বুঝতে অসুবিধা হবে।

সহযজ্ঞাঃ প্রজা সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্।।১০।।

(সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা যজ্ঞের সাথে ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ সৃষ্টি করে বলেছিলেন –এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা সদা সমৃদ্ধ হও; এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্টপ্রদানে কামধেনুর তুল্য হোক।)

প্রজাপতি যখন জগৎ সৃষ্টি করলেন, মানুষ সৃষ্টি করলেন; তিনি তখন এক সঙ্গে অনেক কিছু সৃজন করলেন। প্রথমে তিনি প্রজা সৃষ্টি করলেন, অর্থাৎ বিভিন্ন ধরণের মানুষ, তার সাথে অন্যান্য প্রাণী এবং এর সঙ্গে তিনি যজ্ঞের জন্ম দিলেন, যে যজ্ঞ আগেকার দিনে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে সম্পাদন করা হত। যজ্ঞ সৃষ্টি করে ভগবান বললেন, কামধেনু যেমন সমস্ত ইচ্ছাকে পূর্ণ করে, কল্পতরু যেমন সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করে, ঠিক তেমনি এই যজ্ঞ তোমাদের সমস্ত ইচ্ছাকে পূরণ করবে। মানুষ সৃষ্টি করে ভগবান বলে দিলেন, তোমাকে এই সংসারে দিয়ে দিলাম। তোমার ইচ্ছা কিভাবে পূরণ হবে? তখন তিনি তাদের বললেন, তোমরা যজ্ঞ কর, কামধেনু যেমন সব ইচ্ছা পূরণ করে, এই যজ্ঞও কামধেনুর মত তোমাদের সব ইচ্ছাকে পূর্ণ করবে।

হিন্দুদের মতে ভগবান যখন সৃষ্টি করেন, তখন তিনটে জিনিস একসাথে হয়। ভগবানের সৃষ্টি আমাদের মত না। আমরা যদি বাড়ি বানাতে চাই, বাড়ি বানাবার আগে মনে একটা ইচ্ছার উদয় হয়, তারপর একটা প্ল্যানিং হয়, একটা নক্সা বানানো হয়, বাড়ি বানাবার সরঞ্জাম জোগার করা হয়, তারপর একটার পর একট ইট গেঁথে বাড়ি তৈরী করা হল। ভগবান এভাবে সৃষ্টি করেন না। তিনি সর্বশক্তিমান, তাঁর ইচ্ছাটাই কার্যে পরিণত হয়ে যায়। এই ইচ্ছাটা এক সঙ্গে তিনটে আকার নেয় –একটা জ্ঞানরূপ বা চিন্তন রূপ, দ্বিতীয় শব্দ রূপ, তৃতীয় বস্তু রূপ। আমার হাতে কলম, এই কলম একটা বস্তু, কলম একটা শব্দ এবং কলম একটা বিচার বা আইডিয়া বা জ্ঞান। যিনি কলম কখন দেখেননি, তাকে যদি কলম বলি, সে বুঝতে পারবে না। Idea, word and object, এই তিনটে এক, শুধু তিনটে স্তরে চলে। বস্তু হল এই সংসার, শব্দ হল আরেকটু উচ্চতর আর আইডিয়া, জ্ঞান হল আরও গভীরে।

সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে জ্ঞানরাশি, এটাকে বলা হয় বেদ। বেদ বলতে আমরা জানি চারটে বেদ, ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব; কিন্তু বেদ তা না, যে কোন জ্ঞানকে, এমনকি স্বামীজী বলছেন, সমস্ত ধর্মের জ্ঞান বেদ। বেদ শব্দের ব্যুৎপত্তি করলে আসে বিদ্ ধাতু, বিদ্ শব্দের মানে বিদ্যা বা জানা। ভগবানের নিঃশ্বাসের সাথে, মানে স্বতঃস্ফূর্ত, অত্যন্ত সহজ ভাবে সেই জ্ঞান বেরিয়ে আসে, সেটাই বেদ। বেদের দুটো রূপ, শব্দ রূপ ও জ্ঞান রূপ, দুটো মিশে আছে, বেদের যত মন্ত্র আছে তাতে দুটোই মিশে আছে। শব্দরাশিটা বেদ না, শব্দের পিছনে যে জ্ঞান রয়েছে, সেটাই আসল বেদ। আর সেখান থেকেই বেরিয়ে আসে বস্তু সমুদয়। এই বস্তু সমুদয় জ্ঞান রূপে ঈশ্বরের মনে অবস্থিত ছিল। ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি শুধু বললেন, হোক, সব হয়ে গেল। আমরাও যদি সেই জ্ঞানের অবস্থায় পৌঁছাতে পারি, তখন বস্তু ছাড়াই সৃষ্টি করা যাবে। যোগশাস্ত্রও বলছেন, উচ্চমানের যোগীদের এই ক্ষমতা হয়ে যায়, ইচ্ছা মাত্রই তিনি বস্তু সৃষ্টি করে দিতে পারেন। ভগবান যেটা ইচ্ছা করেন, সেটাই হয়ে যায়, কোন কোন উচ্চমানের যোগীরাও পারেন, কিন্তু তোমরা তো আর এভাবে সৃষ্টি করতে পারবে না। তাহলে তোমরা কি করে পারবে? বলছেন, যজ্ঞের দ্বারা তোমরা সেই ক্ষমতা পেয়ে যাবে। যজ্ঞ যেন কামধেনু গাভী, কামধেনুর কাছে যা চাওয়া হয়, তাই পাওয়া যায়।

সৃষ্টির প্রথম ভগবান বা প্রজাপতি কি করলেন, তিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টি করলেন, তার সাথে বেদেরও সৃষ্টি হল। সেই বেদের মধ্যে যজ্ঞ রয়েছে, আর মানুষকে বলে দিলেন, তুমি যজ্ঞ কর। গীতার এখানে যে যজ্ঞের কথা বলা হচ্ছে, বৈদিক যজ্ঞের কথা বলা হচ্ছে। আমরা যে সমস্ত কর্মকে যজ্ঞ রূপে করার কথা বলছি, এই যজ্ঞ তা না। পরে পরে গীতা এর অর্থকে পাল্টে দিয়ে বলে দিলেন, সমস্ত কর্মকে তুমি যজ্ঞ রূপে কর। কিন্তু আগেকার দিনে, বিশেষ করে বৈদিক যুগে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কামনা বা কামনাশূন্য হয়ে অগ্নিতে আহুতি দিতেন, সেই আহুতিকে বলা হত যজ্ঞ। যজ্ঞ কিন্তু দুটো অর্থেই হয়, কোথায় কোন অর্থে বলা হয়েছে, সেটাকে বুঝে অর্থ বার করতে হয়। কামধেনু রূপী এই যজ্ঞ তোমাদের সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ করবে। সেইজন্য কি করবে?

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।।১১।।

(এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা ইন্দ্রাদি দেবতাদের সংবর্ধনা কর এবং দেবতারাও তোমাদের বৃষ্ট্যাদি দ্বারা শস্যাদি উৎপাদনপূর্বক অনুগৃহীত করুন। এইরূপে পরস্পরের ভাবনা দ্বারা তোমরা পরম মঙ্গল লাভ করবে।)

ভগবান যখন মানুষদের সৃষ্টি করলেন, তখন দেবতাদেরও সৃষ্টি করলেন, অন্যান্য প্রাণীদেরও সৃষ্টি করলেন। বিভিন্ন সময় আমরা পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা বলেছি, সেই পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যে একটা হল দেবযজ্ঞ। দেবযজ্ঞ কেন করতে বলছেন? আমাদের আশেপাশে যাবতীয় যা কিছু চলে, সমস্ত কিছুর পিছনে এক আত্মা রয়েছেন। যেমন আমার এই শরীরের পিছনে এক আত্মা আছে, যেটা

আমাকে আমি বানায়। আমি মরে যাওয়া মানে, এই শরীরের ভিতরে যিনি জীবাত্মা, যিনি এই মনের সাথে নিজেকে জুড়ে রেখেছেন, তিনি এই শরীরটা ছেড়ে বেরিয়ে চলে যান। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সর্বব্যাপী আত্মা, জীবাত্মা ও দেহাত্মাকে নিয়ে আমরা বিরাট আলোচনা করেছি।

এই শরীরের পিছনে যেমন এক জীবাত্মা রয়েছেন; সর্বব্যাপী আত্মা তো রয়েইছেন, সর্বব্যাপী আত্মা তো সবারই সমান, কিন্তু আমাদের সূক্ষ্ম শরীরের সাথে যে জিনিসটা নিজেকে যুক্ত করেন, তিনি হলেন জীবাত্মা। ঠিক তেমনি, বৃষ্টি হচ্ছে, রোদ উঠছে, চন্দ্র কিরণ দিচ্ছে, এদের সবার পিছনে যে ঈশ্বরীয় শক্তি আছেন, এনাদের বলা হয় দেবতা। এই দেবতাদের সব সময় প্রসন্ন করতে হয়। দেবতারা এক-একজন ব্যক্তি না, এনার সবাই সেই ঈশ্বরীয় শক্তি, যে শক্তি ওই বিশেষ জায়গায় মূর্ত হয়ে রয়েছে। আমি, আপনি, তিনি সবাই আমরা নিজেদের এক একজন একক ব্যক্তি বলে মনে করি ঠিকই, কিন্তু আসলে তো তা না, আসলে সবাই সেই ঈশ্বরীয় সত্তা। সেই ঈশ্বরীয় সত্তা আমার মনকে আশ্রয় করে সেই সত্তা 'আমি' অমুক হয়ে রয়েছি, সেই ঈশ্বরীয় সত্তা আপনার মনকে আশ্রয় করে আপনি অমুক হয়ে রয়েছেন। সেই ঈশ্বরীয় সত্তা আরেকটি মনকে আশ্রয় করে ইন্দ্র হয়ে রয়েছেন, সূর্য হয়ে রয়েছেন, অগ্নি, চন্দ্র আদি হয়ে রয়েছেন। এই দেবতারা আমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ। আগে আগে তাঁরা অনেক যজ্ঞ করেছেন, পূণ্য করেছেন, আজকে তিনি তাই আমার আপনার মালিক। আজকে যাঁরা মন্ত্রী হন, প্রধানমন্ত্রী হন, তাঁরাও নিশ্চয় কোন পূণ্য কর্ম করেছিলেন বলেই আজ ক্ষমতার এই জায়গায় আসতে পেরেছেন। এই মুহুর্তে আমরা তাঁদের গালাগাল দিই আর যাই করি, আজকে তো তাঁরা আমার রাজা, তাঁর ইচ্ছা মতই আমাকে চলতে হবে।

ভগবান বলছেন, *দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ,* এই দেবতারা আর তোমরা পরস্পর জুড়ে রয়েছ। তোমরা দেবতাদের সমৃদ্ধ কর। কিভাবে? যজ্ঞ করে। যদি যজ্ঞ করতে থাক, তাতে দেবতাদের সমৃদ্ধি হবে। তখন দেবতারাও বিনিময়ে তোমাদের সমৃদ্ধ করবে। আমাদের ভাষায় এভাবে বলা যেতে পারে, যত ফ্যাক্টরি আছে, তার মালিক ও তার শ্রমিক, সবাই পরস্পর জুড়ে আছে, যেমন মা আর সন্তান জুড়ে থাকে, স্বামী আর স্ত্রী জুড়ে থাকে, গুরু আর শিষ্য জুড়ে আছে। এক অপরকে সমৃদ্ধ কর। শিষ্য যদি গুরুকে সমৃদ্ধ করে, পাল্টা গুরু শিষ্যকে সমৃদ্ধ করবেন। মা যদি সন্তানকে সমৃদ্ধ করে, সন্তানও মাকে সমৃদ্ধ করবে। ঠিক তেমনি তোমরা যদি দেবতাদের সমৃদ্ধ কর, দেবতারাও তোমাদের সমৃদ্ধ করবেন। এই শ্লোকের সাথে আরও কয়েকটা শ্লোক জুড়ে আছে, পরে তাই এর আরও ব্যাখ্যা আসবে।

পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ, এক অপরের চিন্তা কর, পরস্পর পরস্পরের সমৃদ্ধি কিভাবে আসবে, সেই চিন্তা কর, তবেই তোমরা শ্রেয় পাবে। জীবনে আমরা শ্রেয় পাই না কেন, শুভ কেন জীবনে আসছে না? কারণ যাঁরা আমাদের মালিক, যাঁদের উপর নির্ভর করে আমাদের জীবন চলছে, তাঁদের আমরা আরও সমৃদ্ধ করছি না। দিনরাত আমরা স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া শুনছি, এরা কি কেউ পরস্পরের সমৃদ্ধি চায়?

আমরা সন্ন্যাসীরা বহু বছর যাবৎ রামকৃষ্ণ মিশনে আছেন। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সেন্টারে তাঁদের কাজ করতে হয়েছে। যেখানেই যান, সব জায়গায় আলাদা আলাদা রকম পরিস্থিতির সাথে তাঁদের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তার মধ্যেও একটা জিনিস, সেন্টারের যিনি সেক্রেটারি বা অধ্যক্ষ, সেন্টারকে নিয়ে তাঁর যেটা ইচ্ছা, সেটাকে সমৃদ্ধ করার জন্য তাঁরা সব কিছু করেন। হয়ত ব্যক্তিগত ভাবে অধ্যক্ষের কোন কাজ কারুর পছন্দ না হতে পারে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ অধ্যক্ষের সমৃদ্ধিতে সব আশ্রমবাসীদের সমৃদ্ধি। একজন সন্ন্যাসীর যে আধ্যাত্মিক উত্থান হবে, যে কোন উত্থান সেন্টারের অধ্যক্ষের উপর নির্ভর করে। তার জন্য একজন সন্ন্যাসীকেও তাঁকে সমৃদ্ধ করতে হবে। ভগবান বলছেন, সৃষ্টি করে প্রজাপতি, যিনি ব্রহ্মা, তিনি এটাই বিধান দিলেন,

তোমাদের যজ্ঞে দেবতাদের সমৃদ্ধি হবে, বিনিময়ে দেবতারা তোমাদের সমৃদ্ধি দেবেন। এই *পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ* যদি না হয়, তাহলে দুজনেরই ক্ষতি হবে। এই *পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ*, অপরের কি করে মঙ্গল হতে পারে, এই চিন্তা-ভাবনা আজকাল নেই বলেই বর্তমান সমাজে বিভিন্ন সমস্যা।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙক্তে স্তেন এব সঃ।।১২।।

(দেবতাগণ যজ্ঞ দ্বারা আরাধিত হয়ে তোমাদের বাঞ্ছিত ভোগ্যবস্তু প্রদান করবেন। সুতরাং এই দেবতাপ্রদত্ত বস্তু দেবতাদের নিবেদন না করে যিনি ভোগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই চোর।) (অনিবেদিত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি অপবিত্র)

জেনে রেখো যা কিছু তুমি পেয়েছ, তা তুমি নিজের ক্ষমতায় বা কৃতিত্বে পাওনি, এটা দেবতাদের আশীর্বাদ; দেবতাদের আশীর্বাদেই মানুষ সব কিছু পায়। দেবতাদের এই ঋণ আমাদের সবাইকে দেবযজ্ঞের দ্বারা পরিশোধ করতে হয়। পরিশোধ যদি না কর, তাহলে তুমি যে দেবতাদের আশীর্বাদে এখন যা কিছু করতে পারছ, সেই আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে।

আমরা তিনটে স্তরে চলি, মানুষ, দেবতা আর ঈশ্বর। পরে পরে দেবতাদের ভাবটা অনেক ম্লান হয়ে গেল। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করা হয়, দেবতারা কি আছেন? আমরা বলব, অবশ্যই আছেন, সমস্ত কিছুতে আছেন। সেইজন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যে দেবযজ্ঞের একটা বিরাট স্থান এখনও আছে। এখনও পূজার সময় পঞ্চ দেবতার পূজা করা হয়, পঞ্চ দেবতাদের জন্য আলাদা নৈবেদ্য দেওয়া হয়। দেবতারা কোন কারণে যদি কুপিত হন, সংসারে অনেক রকম সমস্যা দেখা যাবে, সবাই এটা আমরা মানি। আবার অনেকে মনে করেন, আমি যদি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারি, তাতেই আমার সব হয়ে যাবে। এতে কোন অসুবিধা নেই। নবম অধ্যায়ে ভগবানও বলবেন, আমাকেই যদি তুমি উপাসনা কর, তাতে সব দেবতারাও সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। শিকড়ে জল দিলে পুরো বৃক্ষ জল পেয়ে যায়, কোন সন্দেহ নেই।

আমরা আগেও বলেছি, গীতা হল বেদের সার, বেদে যত দর্শন আছে, সমস্ত দর্শন এখানে আছে। উপনিষদের যত দর্শন আছে, সব এখানে রয়েছে। মহাভারতে যত দর্শন, সব এখানে রয়েছে। এর বাইরে অন্যান্য যে দর্শন, সাংখ্য, যোগ ইত্যাদি, গীতাতে রয়েছে। গীতা সমন্বয় শাস্ত্র, সব রকম মতবাদ, দর্শনকে সমন্বয় করে এই একটা জায়গা গীতাতে নিয়ে আসা হয়েছে। গীতা কোন কিছুকে বাদ দেন না। এই শ্লোকে যে কথা বলছেন, এটা বেদের ধর্ম। আমরা সব সময় প্রশ্ন করি বেদে কি আছে? বেদের মূল এটাই, ঈশ্বর আছেন, কিন্তু তার সাথে দেবতারাও আছেন। যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের তুষ্ট করলে, দেবতারা আমাদের সমৃদ্ধি দেন। দেবতাদের সমৃদ্ধি ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়।

ঠাকুর অধর সেনকে বারবার বলছেন, তুমি যে ডেপুটি হয়েছ, এটা তাঁর ইচ্ছাতেই হয়েছ। সমাজে যখন কারুর কৃপাতে আমরা যদি অনেক কিছু পাই, তখন আমরাও চেষ্টা করি তাঁকে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কিছু উপহার দিতে। এখন একটা নূতন শব্দ এসেছে, আমিও আগে জানতাম না, এটাকে বলছেন, return gift। দূর্গাপূজায়, নববর্ষে আমাকে কেউ উপহার দিল, আমিও তাকে পাল্টা কিছু উপহার দিলাম। ভগবান যখন আমাদের কৃপা করছেন, তখন কি আমরা প্রতিদানে ভগবানের পূজা করছি? এখানে ভগবানকে নিয়ে বলছেন না, দেবতাদের নিয়ে বলছেন, তবে এটা ভগবানের উপরেও যায়। আমরাও ছোটবেলা দেখতাম, গ্রামের কিছু ভাল হলে, গ্রামের সবাই মিলে গ্রামের যে বিশেষ দেবতা, তাঁর মন্দিরে গিয়ে পূজা দিতে যেতাম। বেলুড় মঠেও বিশেষ ভাল কিছু হলে সন্ন্যাসীদের উদ্যোগে মন্দিরে ঠাকুরকে বিশেষ পূজা নিবেদন করা হয়।

ভগবান বলছেন, *তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো*, তুমি যদি এটা না করো, শুধু যদি তোমার ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, দেহের তৃপ্তির জন্য কর, তাহলে তোমার এটা চুরি করা হয়ে যাবে, তুমি তখন হয়ে যাবে চোর। ভারতবর্ষের যে আজকে এত সমস্যা, কেন এই সমস্যা? কেন সবাই এত জ্বলেপুড়ে মরছে? একজন খুব সিনিয়র মহারাজ, পণ্ডিত মানুষ, উনি খুব মজা করে বলতেন, 'সবাই সবার থেকে পুড়ছে, গৃহস্থ গৃহস্থকে দেখে পুড়ছে, গৃহস্থ সন্ন্যাসীকে দেখে পুড়ছে, সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীকে দেখে পুড়ছে, সন্ন্যাসী গৃহস্থকে দেখে পুড়ছে। সবাই সবাইকে দেখে পুড়ছে'। কারুর জীবনে কি শান্তি নেই? তখন আবার বলে, মরলে শান্তি। মরলে কোথায় শান্তি! প্রেতলোক তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। এক একজনের যা কর্ম, নিন্দুকগুলো মরে ছারপোকা হবে না কি হবে ভগবান জানেন, মশা হবে না ছারপোকা হবে কে জানে, তখন পিছন থেকে সবাইকে কামড়াতে থাকবে।

ভগবান এখানে বলছেন, যার যেটা প্রাপ্য সেটা যদি তুমি তাকে না দাও, তাহলে তুমি একজন চোর। শ্রীশ্রীমা কত সহজ ভাবে দেখিয়ে দিচ্ছেন, একজন ঝাঁটা দিয়ে ঝাড়ু দেওয়ার পর রাখার সময় ঝাঁটাকে ছুড়ে ফেলছে; শ্রীশ্রীমা সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলছেন, দেখো, যার যেটা প্রাপ্য সেটা তাকে দিতে হয়, ঝাঁটাটারও একটা সম্মান আছে, ওরও একটা স্থান আছে, ওটাকেও ঠিক ভাবে রাখতে হয়। যার যেটা প্রাপ্য, তাকে যদি আমি না দিই, তাহলে কিন্তু আমি চুরি করছি, আমি চোর হয়ে যাব। চুরি করাটা যেমন পাপ, তেমনি যার যেটা প্রাপ্য সেটা তাকে না দিয়ে আমিও যেটা করছি, এটাও একটা বড় পাপ।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।।১৩।।

(যে সদাচারগণ যজ্ঞাবশেষ ভোজন করেন, তাঁরা সকল পাপ থেকে মুক্ত হন। যে পাপাচারগণ কেবল নিজের জন্য অন্নপাক করে, তারা পাপান্ন ভোজন করে।)

এই জগতে যত ভোগ আছে, সব আমার জন্য চাই; মনের মধ্যে যাদের এই ভাব, তারা পাপী। ভগবান অর্জুনকে বলছেন, হে অর্জুন, এই পাপ থেকে তুমি যদি বাঁচতে চাও, তাহলে তুমি যা কিছু ভোগ করবে, খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে যে কোন ধরণের ভোগ, সেটা *যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ*, যজ্ঞের অবশিষ্ঠ রূপে ভোগ করবে। ভারতের এটা খুব প্রাচীন প্রথা, যজ্ঞ শেষ যেটা, সেটাই তুমি গ্রহণ করবে। যজ্ঞ শেষকে বলা হয় অমৃত, এই অমৃত যদি নিতে পার তোমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে, কারণ এই অমৃতই তোমাকে পবিত্র করবে। বাকি সমস্ত জিনিস তোমার জন্য পাপ।

আমাদের জীবনে কেন এত কষ্ট, কেন এত জ্বালা যন্ত্রণা? কারণ সারাদিন আমরা পাপ করে যাচ্ছি। এখানে আরও পাঁচ রকম পাপের কথা বলছেন। আগেকার দিনে জাতাতে গম পেষাই করা হত, এখন যেমন শিল-নোড়াতে মশলা পেশাই হয়, বা বাজার থেকে যে কোন জিনিস কিনছি, এতে প্রাণী হত্যা হচ্ছে। আমরা মাছ খাচ্ছি, মাংস খাচ্ছি, ডিম খাচ্ছি, প্রাণী হত্যা হচ্ছে। আমরা ভাত খাচ্ছি, রুটি খাচ্ছি, এতেও প্রাণী হত্যা হচ্ছে। রান্না করতে গিয়ে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী পুড়ে মারা যাচ্ছে, আমরা জানতেও পারছি না। বর্ষাকালে ডেঙ্গু হবে, তার জন্য মশা নিধন করতে হবে, মশা একটা প্রাণী, প্রাণী হত্যার জন্য পাপ হবে। কিন্তু কিছু করারও নেই, আমাদের বাঁচার জন্য মশা মারতে হবে। এই জান্তা-অজান্তা পাপ থেকে বাঁচার জন্য যজ্ঞ করতে হয়। পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা এই জায়গাতেই আসে। আটা পেষাই, উনুন জ্বালানো, পাত্রে জল ভরা, মশলা পেষাই করা, এই ধরণের কাজ করতে গেলে কিছু না কিছু জীবহত্যা জনিত পাপ হয়। এই পাপ থেকে বাঁচার জন্য ঋষিরা পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা করে দিলেন। যে কোন জিনিস, যা কিছু আমরা ভোগের জন্য করি, তাতে আমরা জান্তা-অজান্তায় অনেক প্রাণীর ক্ষতি সাধন করি, এটাকে কাটাবার জন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞ যদি না

করা হয়, তাহলে কিন্তু পাপ লাগবে। তোমার জীবনে এত দুঃখ-কষ্ট কেন, এত হতাশা কেন, কারণ তুমি পঞ্চ মহাযজ্ঞ করছ না।

আমরা যখন ভাত, ডাল, রুটি খাই, তখন খাওয়ার শেষে পাতে যদি একটি শস্য দানা পড়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যজ্ঞ ভাব নিয়ে খাওয়া হয়নি। ঠাকুরের ভোগের বোঁদে, পায়েস যখন হাতে নিয়ে খাই তখন কত সাবধানে প্রসাদ গ্রহণ করি, আমাদের নজর থাকে হাত থেকে যেন গড়িয়ে একটিও বোঁদের দানা বা পায়েসের রস মাটিতে না পড়ে। কারণ এটা হচ্ছে ঈশ্বরের ভোগের জিনিস, মাটিতে পড়লে কেউ পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে যাবে। তাই কত যত্ন করে সাবধানে আর শ্রদ্ধাভক্তির সাথে আমরা প্রসাদ গ্রহণ করি। এখন আমরা যখন আহার করি তখন কি আমরা এই ভাব মাথায় রেখে খাচ্ছি যে এটা ঈশ্বরের প্রসাদ, নাকি আমি আমার ভোগের জন্যই খাচ্ছি?

যখনই আমি খাওয়ার আগে *ব্রহ্মার্পণং* করে গ্রহণ করছি তখন সেটা যজ্ঞ হয়ে গেল, তখন আর কিন্তু এটা ভোগের জন্য খাওয়া হচ্ছে না, খাওয়াটা পূজাতে রূপান্তরিত হয়ে গেল, এখন এর একটি দানাও আর ডাস্টবিন বা নর্দমাতে যাতে না চলে যায় সেই দিকে আমাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। এই ভাব নিয়ে যদি না করা হয় তাহলেই বুঝতে হবে আমাদের জীবনকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছি। মঠে খাওয়ার সময় দেখা যায় যখন মহারাজদের দ্বিতীয়বার ভাত দেওয়া হয় মহারাজরা বলবেন – 'এই দেখবি দু'দানার বেশি যেন না পড়ে'। ব্রহ্মচারীরা, যাঁরা পরিবেশন করেন, তাঁরাও এত চৌখস হয়ে যায় যে, ঠিক ততটুকুই দেবেন যতটুকু হাত দিয়ে মহারাজরা দেখাবেন। তার থেকে কয়েকটা দানা যদি বেশি পড়ে যায় মহারাজরা এমন চেঁচিয়ে উঠবেন যে কি একটা মহা অন্যায় কার্য হয়ে গেছে – 'বাঁদরামো করছ, ঠিক করে দিতে জান না'? ব্রহ্মচারী অবস্থায় আমাদেরও মনে হত দুটো কি তিনটে দানা বেশি হয়েছে তার জন্য এত চেঁচামেচির কি আছে? কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার পর আমাদেরও একই অবস্থা হয়ে গেছে। ব্রেন এমন হয়ে যায় যে একটা দানা ভাত যদি পাতে ফেলতে হয় তখন যে কি প্রচণ্ড কষ্ট হয় চিন্তা করা যায় না। এটাই হচ্ছে ঠিক ঠিক যজ্ঞ।

প্রকৃতির নিয়ম, যতটুকু দরকার তার থেকে এক চুল বেশি নেওয়া চলবে না। প্রয়োজনের বেশি যদি তুমি নিয়েছ তাহলে কিন্তু সেটা আর *যজ্ঞশিষ্ট-অশিনঃ* হল না। দ্বিতীয় হচ্ছে, *কিল্বিষঃ*, একটা কিছু খাওয়া মানেই তুমি কিছু পাপ করছ, মাছ খাচ্ছি মানে একটা মাছের প্রাণ গেল, ছাগল খাচ্ছি ছাগলের প্রাণ গেল; চাল, ডাল, আনাজ সবারই প্রাণ আছে, এতগুলো জিনিসের প্রাণ যাচ্ছে। শুধু এটুকুই নয়; ধান, গম, তরিতরকারী চাষ করতে কত গরীব লোককে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে কত পরিশ্রম করতে হয়েছে। তারপর আমাদের মায়েরা কত কষ্ট করে যত্ন নিয়ে রান্না করেছে, আমার মুখের একটা গ্রাসের পেছনে কত হাজার হাজার লোকের পরিশ্রম লেগে আছে। আমার প্রতিটি গ্রাসে এত পাপ লাগছে, এই পাপ থেকে আমি কিভাবে মুক্তি পেতে পারি? তখন গীতা বলছে, *যজ্ঞশিষ্ট-অশিনঃ*, তুমি যা কিছু গ্রহণ করছ সেটাকে যজ্ঞ রূপে গ্রহণ কর। আমার একটা নতুন জামা হয়েছে, আগে ঠাকুরকে নিবেদন করে বলা 'হে প্রভু, এই নূতন জামাটা তোমারই জিনিস, তুমিই আমার প্রয়োজনে পাঠিয়েছ, তুমি আগে গ্রহণ কর, তারপর আমি এর ব্যবহার করব'। তখনই ওই জামাটা প্রসাদী জামা হয়ে গেল, এটাই হয়ে যাবে যজ্ঞের অবশিষ্ট, যজ্ঞের অবশিষ্ট আমি গ্রহণ করলাম। এই মনোভাব নিয়ে শুধু জামা কাপড়ই নয়, যা কিছু নিজের প্রয়োজনে গ্রহণ করছি সেটাই এই ভাব নিয়ে গ্রহণ করলে আর পাপ লাগবে না।

আমি যখন ভাত খেতে যাচ্ছি, খাওয়া শুরু করার আগে কিছু খাবার পাত থেকে আলাদ করে পশুপাখিদের জন্য রেখে দিলে সেটাও যজ্ঞ, ওটাও যজ্ঞের অংশ হয়ে গেল। দেখতে হবে এখানে কোন কিছুই যেন নষ্ট না হয়ে যায়। জীবন চালাতে গেলে আমাদের পাঁচ রকম ভাবে পাপ করা হয়, এই পাঁচ রকম পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য মনুস্মৃতিতে পাঁচ রকম যজ্ঞের বিধান দেওয়া

আছে। বেদের যাবতীয় যত যজ্ঞ ছিল পরের দিকে গিয়ে এগুলো সব পাল্টে গেল, আর গৃহস্থদের জন্য এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা কর হল। প্রথম হচ্ছে ব্রহ্মযজ্ঞ –উপাসনা, জপধ্যান বা শাস্ত্র পাঠ করা, এগুলো ব্রহ্মযজ্ঞ। দ্বিতীয় দেবযজ্ঞ –পূজা, অর্চনা ইত্যাদি করা, কোন দেবতাকে ফুল চন্দন দিয়ে অর্ঘ্য দেওয়া, ভোগ নিবেদন করা এগুলো হল দেবযজ্ঞ। তৃতীয় পিতৃযজ্ঞ –পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে অর্পণ করা, খাবার আগে কিছু পিতৃদের নামে অর্পণ করে দেওয়া হয়, এটা অবশ্য আজকাল উঠে গেছে। চতুর্থ নৃযজ্ঞ; অতিথি সেবা, কাউকে যখন নিমন্ত্রণ করে সেবাদি করান হয় তখন সেটাই যজ্ঞ রূপে করা। শেষে পঞ্চম হল ভূতযজ্ঞ, যা কিছু রান্না হয়েছে তার থেকে কিছু গরু, কুকুর, বেড়াল, পাখিদের খেতে দেওয়া। কুকুর বেড়াল পাখিদের খাওয়ার জন্য কিছু দেওয়াকে নষ্ট বলা হয় না, এটাও যজ্ঞের অঙ্গ। আমাদের মানবজীবন এই পাঁচটা যজ্ঞ দিয়ে বাঁধা, এর মধ্যে কুকুর, বেড়াল, পাখিদেরও স্থান আছে। এর পরের দুটো শ্লোক এক সঙ্গে চলে –

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ।।১৪।।
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবঃ।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।।১৫।।

(অন্ন থেকে প্রাণীদের শরীর উৎপন্ন হয়, মেঘ থেকে অন্নের উৎপত্তি হয়, যজ্ঞধূম থেকে মেঘ সৃষ্ট হয় এবং যজ্ঞ (অপূর্ব, অদৃষ্ট বা কর্মফল) বেদবিধি থেকে উৎপন্ন হয়। যজ্ঞাদি কর্ম বেদ হতে উৎপন্ন জানবে। বেদ অক্ষর পরমাত্মা হতে সমুদ্ভূত। অতএব সর্বার্থ-প্রকাশক বেদ সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।)

সেই যে ভগবান, তিনি অক্ষর, তাঁর কখন কোন ক্ষয় হয় না। তিনি যখন সৃষ্টি করলেন, সেই সময় তাঁর নিঃশ্বাসের সাথে বেদের জন্ম হল, আর এই বেদ নিজেই ব্রহ্ম। বেদকে তাই বলা হয়, বেদরূপী ব্রহ্ম। এখানে বলছেন *কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি*, বেদকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। বেদ হল সমস্ত জ্ঞানের প্রকাশক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত রকমের জ্ঞান হতে পারে, বেদ সমস্ত জ্ঞানের প্রকাশক, সেইজন্য বেদ সর্বগত। অন্যান্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থ সর্বগত নয়। যেমন বাইবেল, বাইবেল সমগ্র জ্ঞানরাশির একটা ছোট্ট অংশকে কেবল ব্যাখ্যা করে। কিন্তু বেদ, এটাই জ্ঞান, সেইজন্য সর্বগত। একমাত্র বেদই সর্বগত, সব জায়গায় যায়, সব কিছুর অর্থ প্রকাশ করে। ঋক, সাম, যজু, অথর্ব, এগুলোতে যখন আমরা নামছি, এনারা সেই জায়গাতে এসে কর্ম জিনিসটাকে পরিভাষিত করেন।

বেদের কাজই হল মানুষকে ধর্মের দিকে নিয়ে যাওয়া। এই ধর্ম আসে কর্মের মাধ্যমে, কর্ম আসে বিধি ও নিষেধ রূপে। বিধি – যেটা করতে বলা হয়, আর নিষেধ – যেটা করতে বারণ করা হয়। যত রকম কর্ম হতে পারে, যত রকম কাজের আমরা কল্পনা করতে পারি, বেদ সেটাকে প্রকাশিত করে। এর মধ্যে ঋত্বিক ও যজমান, এই দুজন মিলে যখন বিশেষ কোন কার্য করে, সেটাকে বলা হয় যজ্ঞ; মানে যজ্ঞ হল কর্মের একটা ছোট্ট অংশ। যার জন্য পরের দিকে এসে ওনারা সমস্ত কর্মকেই যজ্ঞ রূপে ঘুরিয়ে দিচ্ছেন।

তাহলে তিনটে স্তর এসে যাচ্ছে, প্রথম স্তর ভগবান, দ্বিতীয় স্তর ভগবান থেকে বেদ এবং তৃতীয় স্তর বেদ সমস্ত কর্মের প্রকাশক, কিন্তু তার মধ্যে একটা বিশেষ যে কর্ম, সেটা হল যজ্ঞ। যজ্ঞের যে একটা বৈশিষ্ট্য, এটাকে বলা হয় অপূর্ব। কর্ম সঙ্গে সঙ্গে ফল দেয় না। আমরা কোন কর্ম করলে সেই কর্মের ফল আমরা দেখতে পাই। যেমন একটা বীজ মাটিতে রোপণ করা হল, সঙ্গে সঙ্গে বীজ রোপণের ফল দেখা যাবে না। কিন্তু মাটিতে না রেখে যদি অন্য জায়গায় রাখা হয়, যেমন ছোলা ভিজিয়ে যদি রাখা হয়, দেখা যাবে দু-একদিনের মধ্যে ছোলাটা আকারে বড় হচ্ছে। তারপর দেখা গেল সেখান থেকে অঙ্কুরোদ্গমন হয়ে আস্তে আস্তে গাছের মত হয়ে গেল। মাটির তলায় যখন থাকছে, তখনও কিন্তু পর পর ফল দিয়ে চলে যাচ্ছে। এই জগতে সমস্ত কর্মই ফল দেয়। যে বিষ

অনেক দিন পরে বিষক্রিয়া শুরু করে, যেমন আর্সেনিক আদি, সেখানেও কিন্তু কিছু কিছু ফল হতে থাকে।

যজ্ঞের ফল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না। তাহলে ফল দেওয়ার আগে পর্যন্ত যজ্ঞের ফল কোথায় থাকে? যজ্ঞ করার পর সেই যজ্ঞের ফল কর্মের ভাণ্ডারে গিয়ে জমা হয়, এটাকেই বলা হয় অপূর্বতা। কর্মফল প্রসবের পরিস্থিতি যখন অনুকূল হয়, তখন কর্ম ভাণ্ডার থেকে ফল দিতে থাকে। পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে, এদের সবার প্রাণ অন্নগত। এরা অন্ন গ্রহণ করে, তাই এদের প্রাণন ক্রিয়া চলছে। অন্ন হওয়ার জন্য বৃষ্টি খুব দরকার, বৃষ্টি না হলে অন্ন হবে না। বৃষ্টি হয় মেঘ থেকে, এটাকে বলা হয় পর্জন্য। এই পর্জন্যের সৃষ্টি হয় যজ্ঞ থেকে। বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র, তিনি প্রসন্ন হলে প্রাণীদের বৃষ্টি দেন। এই কথা শুনে অনেকেই লাফিয়ে উঠে বলবে, আপনি কি আজগুবি কথা বলছেন, ইন্দ্র বৃষ্টি দেন! সবাই জানে সমুদ্র থেকে মেঘের উৎপত্তি, সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি, এর মধ্যে ইন্দ্র আবার কি করে ঢুকে পড়ল? ঋষিরাও জানতেন সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে মেঘ তৈরী হয়। এই যে পুরো পদ্ধতির পিছনে যে শক্তি, সূর্যের তাপ সমুদ্রের জলকে বাষ্প করে টেনে নিচ্ছে, সেই বাষ্প থেকে মেঘ হয়ে বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি দিচ্ছে, এই পুরোটার পিছনে যে দিব্য শক্তি, সেই শক্তিকে বলছেন ইন্দ্র। আমরা এখানে শাস্ত্রের কথা বলছি, শাস্ত্র হল ঋষিদের মুখের কথা। ঋষিরা এভাবে সব কিছু দেখেছেন, আমাদেরকেও এভাবেই নিতে হবে, এখানে প্রশ্ন করার কিছু নেই।

এটাই এখানে বলছেন *অন্নাদ্ভবতি ভূতানি*, সমস্ত প্রাণীকুল এই অন্ন থেকে হয়েছে। *পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ*, এই অন্ন উৎপন্ন হয় মেঘের বর্ষণ থেকে। *যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো*, এই যে যজ্ঞ করা হচ্ছে, যে শুভ কর্ম করা হয়, সেখানে যে আহুতি দেওয়া হয়, এই যজ্ঞধূম থেকে মেঘের সৃষ্টি হয়। যজ্ঞ হল অপূর্ব, যজ্ঞের ফল সাথে সাথে পাওয়া যায় না, যজ্ঞ করতে থাকতে হয়। সেইজন্য দেখা যায়, শুভকর্ম করলে তার ফল সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না, সময় লাগে। *যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ*, সমুদ্ভবঃ মানে উদ্ভব, যজ্ঞের উদ্ভব কর্ম থেকে। *কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি*, যে সমগ্র কর্মের কথা বলা হল, এই কর্ম ব্রহ্ম থেকে উদ্ভব হয়। এই ব্রহ্ম মানে বেদ, বেদরূপী ব্রহ্মাতে কর্মের বর্ণনা করা হয়েছে। *ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্*, এই বেদ অক্ষর থেকে, পরমাত্মা থেকে উদ্ভব হয়েছে। বেদ কেন সত্য? কারণ বেদ পরমাত্মা থেকে এসেছে। যদিও আমরা জানি বেদ ঋষিরা রচনা করেছেন, কিন্তু সবটাই ঈশ্বরীয় কথা। যে ঈশ্বরীয় কথাগুলোকে ঋষিরা ধ্যানের গভীরে জানতে পারেন, শিষ্য পরম্পরায় তাঁরা যেটা আমাদের জানিয়ে দেন, আমরা সেটাকেই বেদ বলি। কিন্তু অন্য দিকে বেদ হল সমস্ত জ্ঞানরাশি। *তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম*, সেইজন্য ব্রহ্ম *সর্বগতং*, সর্বব্যাপী। *নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্*, এই বেদরূপী ব্রহ্ম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। আর তাই ভগবান নিজেই প্রতিষ্ঠিত। কারণ যজ্ঞে বলাই হয়, বিষ্ণুই হলেন যজ্ঞ।

তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্, এই বেদ সব সময় যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। এখন ব্রহ্ম বলতে যদি বেদকে ধরা হয় আবার ব্রহ্ম বলতে যদি বেদান্তবাদীদের ব্রহ্মকে নেওয়া হয় তাও একই অর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু অর্থের ধারাবাহিকতাকে যদি ধরে রাখতে হয় তাহলে এখানে ব্রহ্ম বলতে বেদকেই বুঝতে হবে। কি অর্থ বলছেন? বেদ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত, তাই যজ্ঞ কর। ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃতিগ্রন্থ হচ্ছে বেদ। বেদ যজ্ঞকে জন্ম দিচ্ছে, যজ্ঞ মেঘকে জন্ম দিচ্ছে, মেঘ থেকে জল আসছে, জল থেকে অন্ন, অন্ন থেকেই তোমার এই অস্তিত্ব রক্ষা হচ্ছে। সেইজন্য তোমার এই অস্তিত্বের মূলে কে? সেই বেদ, এই বেদ আবার যজ্ঞে কর্ম রূপে অবস্থিত, তাই তুমি কর্ম কর। সেই বেদ কোথায়? পরমাত্মাতে। পরমাত্মাই সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই তুমি পরমাত্মাতে অবস্থিত হও।

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।।১৬।।

(হে পার্থ, যে ব্যক্তি এই প্রকারে ঈশ্বরকর্তৃক প্রবর্তিত কর্মচক্রের অনুগামী না হয়, সেই ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপী ব্যক্তি বৃথা জীবনধারণ করে।)

এই যে বিশাল চক্র, চক্রটা কি? আমি কথা বলছি, কেন কথা বলতে পারছি? খাওয়া-দাওয়া করছি বলে। খাওয়া-দাওয়া কি করে সম্ভব হচ্ছে? চাষীরা চাষবাশ করে আমাদের খাদ্যের যোগান দিচ্ছে বলে। চাষবাশ কি করে সম্ভব হচ্ছে? বৃষ্টি হয় বলে। বৃষ্টি কার জন্য সম্ভব হচ্ছে? ইন্দ্রের জন্য সম্ভব হচ্ছে। ইন্দ্র কোথা থেকে শক্তি পাচ্ছেন? যজ্ঞ থেকে। যজ্ঞের কথা কোথায় বলা আছে? বেদে বলা আছে। বেদ কোথা থেকে জন্ম নিয়েছে? পরমাত্মা থেকে। যা কিছু হবে সব পরমাত্মা থেকে আসতে হবে। যদি কোন কিছু শেষ পর্যন্ত পরমাত্মাতে না নিয়ে যাওয়া যাবে, তখন সেটা আর যজ্ঞ হবে না। কিন্তু এই যে এত কথা বলা হল সব পরমাত্মাতে চলে গেল। তার আগে বললেন এই দুটো পথ, প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গকে কে দেখিয়েছেন? তখন ভগবান বলছেন, আমিই এই দুটো পথের কথা বলেছি, তখনই এই দুটো পথ স্বীকৃতি পেয়ে গেল। ঈশ্বর থেকে যদি না এসে থাকে তাহলে কিন্তু তার কোন দাম নেই।

সেইজন্য বলছেন, এই যে চক্র ঈশ্বর থেকে প্রবর্তিত হয়েছে, এই কর্মচক্রকে যে অনুসরণ না করে শুধু ইন্দ্রিয়ের মধ্যে রমণ করে, তাহলে তার জীবন ধারণ বৃথা হয়ে যায়, এইটাই এখানে বলছেন *মোঘং পার্থ স জীব*তি। আমরা এর আগে যে জাগতিক মার্গের লোকের কথা বলেছিলাম এরা হচ্ছে ঠিক সেই অর্থে পুরোপুরি জাগতিক মার্গের লোক। যারা এই যজ্ঞের মাহাত্ম্যকে মানে না, বেদের মাহাত্ম্যকে অস্বীকার করে, আর ঈশ্বর প্রবর্তিত চক্রের অনুসরণ করে না আর আমরা আজকে চক্র বলতে খাদ্য খাদকের যে চক্র সেটাকে মানছি, কিন্তু যারা এই চক্রকে মানে না, তাদের সমগ্র জীবনটা ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপপূর্ণ জীবনে পর্যবসিত হয়ে যায়। আমাদের কাছে এই চক্র হচ্ছে, ঈশ্বর, ঈশ্বর থেকে বেদ, বেদ থেকে যজ্ঞ, যজ্ঞ থেকে বৃষ্টি আদি, বৃষ্টি থেকে অন্ন, অন্ন থেকে আমার শরীর। এই চক্রটাকে আমরা বেশি অনুসরণ করি। ইদানিং ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সের কথা বলা হয়, কিন্তু এখানে অনেক আগেই এই ইকোলজিক্যালের যে ঠাকুর্দা তার ব্যালেন্সের কথা বলা হয়েছে। পরিবেশবিদরা এখন ইকোলজিক্যাল ব্যালন্সের কথা বলছেন। কিন্তু এই ইকোলজিক্যালের কথা এরা তো সেদিন আবিষ্কার করল, ছাগল ঘাস খায়, ছাগলকে আবার বাঘ খায়, বাঘকে জঙ্গল রক্ষা করছে, বন থেকে আবার বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টির জলে আবার গাছ জন্মাচ্ছে, সবারই অস্তিত্ব পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে।

কিন্তু এখানে সুপার ব্যালন্সের কথা কত আগেই বলা হয়েছে। আর শুধু এই দৃশ্যমান জগতকে নিয়েই নয়, অদৃশ্যমান জগতকে নিয়েও চলার কথা বলা হচ্ছে। তোমার আমার বুদ্ধি কতটুকু, এইটুকু তো বুদ্ধি, এই দৃশ্যমান জগতের বাইরেও এক বিশাল জগতের অস্তিত্ব রয়েছে তার খবর আমাদের কাছে নেই, সেই জগতের অনুসন্ধান কর, তারপর তুমি সেই জগতটাকেও সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চল। এই দৃশ্যমান জগতকে এখানে কি বলছেন? তুমি এখন যেভাবে জীবন চালাচ্ছ, এতে তুমি পাপ করছ। জীবন চালাতে গেলে সবাইকে পাপ করতেই হবে। এই পাপ থেকে মুক্তি কিভাবে পাবে? যা কিছু করছ, খাচ্ছ, সব যজ্ঞরূপে কর এবং যজ্ঞের অবশিষ্টকে প্রসাদ রূপে গ্রহণ কর। আর দ্বিতীয় কথা, তোমরা যে যজ্ঞ করছ সেটা ঈশ্বরের সাথে সরাসরি যুক্ত। তাই শেষ প্রান্তে যারা নীচে আছে আর উপর প্রান্তে যারা আছে এদের দুজনকেই তোমাকে দেখতে হবে। এখন যারা ভোগবৃত্তির মধ্যে পড়ে আছেন তারা বেশি ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সের কথা বলে, এর উপরে বেশি কথা বলে না। যতটুকু দরকার তার বেশি নেওয়া ঠিক নয়, এটাকে এরা কিছুতেই চাইবে না, এরা বলে দরকার থাকুক আর নাই থাকুক সংগ্রহ করে রাখ পরে কাজে লাগবে। এর ফলে কারুর একদিকে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বেড়েই যাচ্ছে, ঘরের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মজুত বেড়েই যাচ্ছে, অথচ এগুলো একজনের একার পক্ষে ভোগ করা কখনই সম্ভব নয়। অন্য দিকে লুটেপুটে নিচ্ছে, আবার

ইন্দ্রিয়াতীত জগতকে মানেই না। সেইজন্য আমাদের এত কষ্ট। এত কিছু বলার পর বলছেন – *অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো* – *অঘ-আয়ুঃ*, এদের জীবনটা হচ্ছে পাপজীবন, *ইন্দ্রিয়ারামো*, যারা ইন্দ্রিয়াসক্ত তারা বৃথাই জীবন ধারণ করে। তাহলে কি সবাইকে কাজ করতে হবে? না, সবাইকে কাজ করতে হয় না। ভগবান পরের শ্লোকে বলছেন কাদের কাজ করতে হয় না।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে।।১৭।।

(কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁর কোন কর্তব্য নাই।)

এই শ্লোকটা সন্ন্যাসীদের জন্য, গৃহস্থদের জন্য না। কাজ কে করবে না? অর্জুনকে ভগবান বলছেন, অর্জুন, তুমি বলছ তুমি যুদ্ধ করবে না, কিন্তু তোমাকে তো যুদ্ধ করতেই হবে বাপু। কর্ম একমাত্র কে করে না? কথামৃতে মাঝে মাঝে বর্ণনা আছে, ঠাকুর সমাধিতে আছেন, নিজে নিজেই হাসছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়েও স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণ বলতে গিয়ে ভগবান বলছেন *আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ*, তিনি নিজেতেই নিজে তুষ্ট। গাঁজা খেয়ে গাঁজাখোড় যেমন বুঁদ হয়ে থাকে, ঈশ্বর জ্ঞানে যিনি ঈশ্বরকে নিয়ে বুঁদ হয়ে আছেন, আত্মজ্ঞানে যিনি আত্মাকে নিয়ে বুঁদ হয়ে আছেন, একমাত্র তাঁদেরই আর কোন কর্ম থাকে না। কারণ তিনি আত্মাকে নিয়েই তুষ্ট, জগতে তাঁর আর কোন চাহিদা নেই। *স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ*, আমাদের তৃপ্তি কিসে হয়, খাওয়া-দাওয়া, ইন্দ্রিয়ের ভোগ দিয়ে আমাদের তৃপ্তি হয়। আর আমাদের মধ্যে তৃষ্ণা রয়েছে, সেই তৃষ্ণার পুর্তি হলে আমাদের সন্তুষ্টি হয়। বলছেন, এনারা এই সব কিছুর বাইরে, আহার, নিদ্রা, মৈথুন এগুলোর বাইরে। আর তার কোন কিছুর তৃষ্ণা নেই, ইচ্ছা, কামনা কোন কিছু নেই। তাহলে তিনি কি নিয়ে আছেন? সেই চৈতন্য, শুদ্ধ আত্মার জ্ঞানে একেবারে ডুবে আছেন, আত্মার আনন্দে মত্ত হয়ে আছেন। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন, ভ্রমন যখন ফুলের উপরে বসে মধু পান করে তখন সে একটু গুন্ গুন্ করে, কিন্তু মধুপানে ডুবে একেবারে বুঁদ হয়ে গেছে। এনারা বাইরের জগতের কোন কিছুর উপর নির্ভর করেন না। যারা গাঁজা খায়, ড্রাগস নেয়, এরাও বুঁদ হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু বাইরের একটা জিনিসকে অবলম্বন করে বুঁদ হচ্ছে। কিন্তু আত্মজ্ঞানীরা ভিতরে যিনি আত্মা, তাঁকে নিয়েই বুঁদ হয়ে আছেন।

নৈব তস্য কৃতেনার্থ নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যাপাশ্রয়ঃ।।১৮।।

(আত্মজ্ঞানীর ইহজগতের কর্মানুষ্ঠানের কোনও প্রয়োজন নাই। কর্ম না করলেও তাঁর কোন প্রত্যবায় হয় না; এবং ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত কোন প্রাণীতে তাঁর কোন প্রয়োজন-সম্বন্ধ নাই।)

এখানেও আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসীর বর্ণনা করছেন। গীতা যেহেতু সবারই জন্য, সেইহেতু সবার জন্যই গীতাতে কিছু না কিছু বর্ণনা আছে। এই ধরণের যাঁরা আত্মজ্ঞানী, যেমন ঠাকুর ছিলেন, বলছেন, এই জগতে তাঁদের জন্য কোন কর্ম আর অবশিষ্ট থেকে যায় না, কোন দায়ীত্ব থেকে যায় না। তা সত্ত্বেও তাঁরা কাজ করেন, পরে বর্ণনা আসবে, কেন তাঁরা কাজ করেন। সবচেয়ে বড় হল, কর্ম না করলে তাঁদের কোন পাপ হয় না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেখানে আমরা আলোচনা করছিলাম, সেখানে এসেছিল *প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে*। যাদের আত্মজ্ঞান হয়নি, তারা কিছু কিছু কর্ম যদি না করে, তাহলে তাদের পাপ হয়। এটাই বলছেন *অকরণে প্রত্যবায়*, যদি না করা হয় তাহলে পাপ হবে। কিছু জিনিস আছে করলে পাপ, যেমন হিংসা, হিংসা করলে পাপ আর জপধ্যান যদি না করা হয় তাহলে সেটাও পাপ। তেমনি পূজা যদি না করে, তাহলে সেটা পাপ, পঞ্চ মহাযজ্ঞ যদি না করা হয়, সেটাও পাপ। কিন্তু এই ধরণের আত্মজ্ঞানীর জন্য আর কোন পাপ থাকে না। তাঁরা কিছু করলেও কিছু না, না করলেও কিছু হয় না, তিনি সব কিছুর পারে –*প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে*।

ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যাপাশ্রয়ঃ, ব্যাপাশ্রয়ঃ শব্দের অর্থ হয়, যখন আমরা কিছু ফল চাই, তখন অনেক কিছুর বিস্তার করতে হয় – ক্রিয়ার বিস্তার, কর্মের বিস্তার, কর্তার বিস্তার। আমি খেতে চাই, খাওয়ার জন্য আমাকে অনেক কিছু করতে হবে, এই যে বিস্তার, এটাকে বলে *ব্যাপশ্রয়ঃ*। *ন চাস্য সর্বভূতেষু*, এই জগতে যখনই আমরা কোন কিছু করতে যাই, তখন এর ওর অনেকের সাহায্য দরকার হয়, এই ধরণের আত্মজ্ঞানীর কারুর থেকে কোন সাহায্যের দরকার হয় না। এমনকি যদি ধর্মশিক্ষাও দিতে হয়, তখনও তাঁদের শিষ্যর দরকার পড়ে না, কিন্তু তিনি নিয়ে নেন। এটাকে শেষ করছেন এই বলে,

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচার।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।।১৯।।

(অতএব তুমি অনাসক্ত হয়ে সর্বদা কর্তব্য (নিত্য) কর্মের অনুষ্ঠান কর। কামনাশূন্য হয়ে কর্ম করলে মানুষ নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করে।)

হে অর্জুন, এই যে তোমাকে যুক্তিগুলি দেওয়া হল, পরে পরে এই ধরণের যুক্তি আরও আসবে। অনাসক্ত হয়ে, তার মানে কোন লোভে পড়ে, কোন মোহে পড়ে কাজ করবে না; কাজ করবে, এটা আমার দায়ীত্ব ভেবে। দেশের ইদানিং নেতাদের দিকে তাকালে মনে হয়, এরা কজন যে দেশের জন্য চিন্তা করে, কজন যে সমাজের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করে, আমাদের জানা নেই। সবাই মনে করে, রাজনীতি করা হল আমার কিছু প্রাপ্তির সাধনা। তা নয়, এটা আপনার দায়ীত্ব, দেশের ও সমাজের মঙ্গল কিভাবে করা যায়। আপনাকে যখন একজন মন্ত্রীর দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে, বা একজনকে এসপি পদের দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে, একজনকে ডিএম পদের দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে, এখন আপনার এটা দায়ীত্ব, দায়ীত্ব বোধেই কাজ করুন। এরপরে ভগবান লোকসংগ্রহার্থে, আচার্য রূপে কাজ করতে বলবেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে অনেক রকম যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝাচ্ছেন, অর্জুন এই যে তুমি বলছ বৈরাগ্য নিয়ে সন্ন্যাস নেবে, তোমার এই সিদ্ধান্ত সব দিক থেকে ভুল, এই কাজ তুমি করতে যেও না। এর আগে বলা হয়েছিল, ভারতবর্ষ যেন তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কেন ভারতের ক্ষেত্রে তমোগুণের কথা বলা হচ্ছে? করোনার জন্য এখন যে লকডাউন চলছে, বোঝাবার জন্য এটা ভাল উদাহরণ। আমরা কি কেউ এই লকডাউনের সময়টাকে কাজে লাগাচ্ছি? খুব জপধ্যান করছি, কিংবা অন্য কোন কাজে, কিংবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পড়াশোনা করে জ্ঞান সমৃদ্ধি করার কাজ, কিংবা কোন একটা ভাষা শিখে নেওয়া, কোন একটা ভাল বইয়ের মধ্যে ডুবে যাওয়া? কোন কিছুতেই সময়টাকে কাজে লাগাচ্ছি না। পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। সারাদিন টিভি সিরিয়ালের মধ্যে ডুবে থাকা, আর তা নাহলে করোনার নিউজ নিয়ে পড়ে থাকা। একই কথা রোজ টিভিতে শুনে যাচ্ছি।

আপনি জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে সফল কিনা কি করে বুঝবেন? বলা হয়, ওই ব্যাপারে যখন আপনি কাউন্টিং ছেড়ে দেবেন। একজন সফল লেখকের মনে থাকে না, আজ পর্যন্ত তাঁর কটা বই পাবলিশ হয়েছে। কিন্তু লেখক যদি বলে দিতে পারেন, জীবনে আজ পর্যন্ত কটা বই তিনি লিখেছেন, তাহলে বুঝতে হবে লেখক হিসাবে তিনি একজন সফল লেখক নন। করোনার এত কেস হচ্ছে যে, কারুরই মনে থাকছে না, সেইজন্য করোন আজকে সফল। ছেড়ে দিন, করোনার দিকে তাকাবার দরকার নেই, নিজের মত আপনি এগিয়ে যান। আমরা কেন এগোচ্ছি না? কারণ আমরা তমোগুণী, তমোগুণী হওয়ার জন্য আমাদের আজ এই অবস্থা। নিজের মত অনেক কিছু করে নেওয়া যায়। এখন তো আগেকার দিন না, ঘরে বন্দী হয়ে যাওয়া মানে একেবারে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

কয়েদী হয়ে গেলেন তা তো না। সবারই ফোন আছে, ইন্টারনেট আছে, ইচ্ছে হলে অনেক কিছুই করা যায়। গীতা মুখস্ত করা যায়, চণ্ডী মুখস্ত করা যায়, উপনিষদ মুখস্ত করা যায়। চাইলে নূতন একটা ভাষা শিখে নেওয়া যায়। আমরা বাঙালী, আমরা ইংরাজী ভাষাটা আরও আয়ত্ত করতে পারি, হিন্দী শিখতে পারি, সংস্কৃত শিখতে পারি। একটু চেষ্টা করলে কিছু না কিছু অবশ্যই করে নেওয়া যায়।

ভগবান এটাই বলছেন, কাজ কর, কাজ করে যাও। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁরাই একমাত্র কাজ করেন না। আমরা কেউই ব্রহ্মজ্ঞানী নই, তাই আমাদের অনাসক্ত হয়ে কাজ করে যেতে হবে। অনাসক্ত হয়ে করা মানে, করতে বলেছি তাই করে দিলাম, খুব দায়সারা ভাবে করে দিলাম, অনাসক্ত ভাবে কাজ করা মানে তা না। অনাসক্ত মানে, যখন আমি কাজ করছি, এই কাজে আমি হলাম শ্রেষ্ঠ, কাজে আমার সেরাটা দেব। যখন আমি মনে করছি আমি এই কাজে শ্রেষ্ঠ, তখন আমি কোন দিকে আর তাকাব না। স্বামীজী তাঁর গুরুভাইকে একটা চিঠিতে লিখছেন, ভাই আমার মধ্যে যাই দোষ থাকুক, ঈর্ষা আমার মধ্যে নেই। কারণ তিনি এত গ্রেট হয়ে গেছেন যে, সেখানে কারুর সঙ্গে কোন হিংসা বা ঈর্ষার কোন ব্যাপারই আসতে পারে না। আপনি যে কোন একটা ফিল্ডে কি বলতে পারেন, আমি এই ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ? যেখানে দেখছেন আপনার সাথে কারুর কোন প্রতিযোগিতা নেই, তার মানে আপনি কর্মযোগ করেননি। কর্মযোগ ঠিক ভাবে করা থাকলে আপনি এত বড় হয়ে যাবেন যে, অন্য কারুর দিকে তাকাতে যাবেন না। বরঞ্চ আরও পাঁচজনকে আপনি আশ্রয় দেবেন। আমাদের ক্ষমতা যখন সীমিত থাকে তখনই আমরা অন্যদের ঈর্ষা করি। কিন্তু যখন আপনি গ্রেট হয়ে গেছেন, তখন আপনি চিন্তা করার অবসরই পাবেন না যে, ও আমার থেকে এগিয়ে গেল কি করে?

শচীন তেণ্ডুলকার ক্রিকেটের এমন উচ্চতায় চলে গেছেন, সেখানে কে কটা সেঞ্চুরি করল, কত বলে করল, তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। পেলে এত গ্রেট যে, কোন নূতন প্লেয়ারকে নিয়ে ফুটবল জগৎ মাতামাতি করছে, তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। অর্জুনকে তাই ভগবান বলছেন, অনাসক্ত হও। কর্মে আসক্তি বলতে বোঝায় কর্ম ফলে আসক্তি। আমি সফল হব কিনা, আমি বেস্ট কিনা, সবাই আমাকে মানবে কিনা, সম্মান দেবে কিনা, এটার জন্য আমি কত টাকা পেলাম, খবরের কাগজে আমার নামটা হাইলাইট করল কিন, এগুলো বাচ্চারা করে। নূতন নূতন লিখতে শিখলে বাচ্চারা এবিসিডি লিখে মাকে চারবার, পাঁচবার করে দেখাবে, 'মা এটা আমি দারুণ লিখেছি কিনা বল'? এগুলো ছেলে মানুষী, বাচ্চারা এই রকম করে, তাদের জন্য ঠিক আছে। তুমি ওই ছেলে মানুষী ভাব থেকে বেরিয়ে এসো, বড় হও।

ভগবান এরপরেই রোল মডেলের উপর কয়েকটা কথা বলবেন। তুমি যদি শ্রেষ্ঠ হয়ে গিয়ে থাক, তাহলে রোল মডেল হও। তুমি যদি শ্রেষ্ঠ না হয়ে থাক, তাহলে তোমার নিজের উন্নতির জন্য চিত্তশুদ্ধির জন্য অনাসক্ত হয়ে কাজ কর। ইদানিং positivity নিয়ে, self improvement নিয়ে এত বই আসছে, কিন্তু সেখানে তারা একটা কথা বলে না, যেটা মূল কথা, তুমি কাজ কর। কাজ করতে নামলেই তোমার দশটা দোষ হবে, কাজ করলেই লোকেরা নিন্দা করে দশ রকম কথা বলবে। তোমার দশটা নিন্দা হচ্ছে মানেই, তুমি কাজ করছ। পাথরের কোন নিন্দা হয় না, যে কাজ করছে তারই নিন্দা হয়। যে কাজ করছে, তার প্রতি সবাই হিংসাগ্রস্থ হয়। আপনার কাজ নিয়ে, আপনাকে নিয়ে কজন হিংসাগ্রস্থ? আপনি কতজনকে জ্বালাতে পেরেছেন? লোকে বিরক্ত হয়ে বলবে, আপনার কি কোন কাজ নেই? সেটা হল আপনার success। এটাই আপনাকে ধীরে ধীরে চিত্তশুদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে।

এরপর ভগবান আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবেন, তিনি নিজেও কাজ করেন। তিনি কাজ করেন বলেই এই সংসার স্থির আছে। তার সাথে বলবেন, তুমি যদি জ্ঞানীও হয়ে যাও,

সাধারণ লোকেদের বলো না যে, কাজ করতে নেই। এই ব্যাপারটা রামকৃষ্ণ মিশনে আগে ছিল, এখনও অল্প একটু আছে। সব মিলিয়ে কিভাবে কাজ করবে, কাজ কর, আর ঈশ্বরকে কাজের সব ফল অর্পণ করে দাও। আমি ঈশ্বরের দাস, এই ভাব নিয়ে সব কাজ কর। বক্তব্য এটাই, কাজ কর। কেন কাজ করবে আর কিভাবে কাজ করবে, এই দুটো জিনিসের উপর এবার আলোচনা করবেন –

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রেহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি।।২০।।

(জনক, অশ্বপতি প্রভৃতি রাজর্ষি নিষ্কাম কর্ম করেই মোক্ষ লাভ করেছিলেন। সুতরাং লোসংগ্রহের নিমিত্তও তোমার নিষ্কাম কর্ম করা উচিত।)

লোকসংগ্রহ এটি একটি খুব সুন্দর শব্দ। লোকসংগ্রহ মানে হয় লোকশিক্ষা, আমরা যে inclusiveness এর কথা বলি, inclusiveness মানেই হয় লোকসংগ্রহ, স্বামীজী বলছেন be and make, তুমি মহান হও আরও দশজনকে মহৎ কর। আরও দশজনকে সেই পথে নিয়ে চল। দেওঘর বিদ্যাপীঠে আসাম, মণিপুর উত্তরপূর্বাঞ্চল থেকে ছেলেরা পড়তে আসে। আসামের একটি ছাত্রকে ওখানকার অধ্যক্ষ একবার জিজ্ঞেস করলেন ‘অত দূর থেকে কি করে তুমি এখানে ভর্তি হলে’? ছেলেটি খুব সুন্দর একটা ঘটনা বলল, ওর বাবা পুলিশে কাজ করতেন। বাবার যে ব্যাঙ্কে এ্যাকাউন্ট ছিল, সেই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার কাজে কর্মে খুব দক্ষ এবং তাঁর ব্যবহারটাও খুব ভাল। বাবা সেই ব্যাঙ্ক অফিসারকে একদিন জিজ্ঞেস করেছেন, ‘স্যার আপনি কোথায় পড়াশোনা করেছেন? আপনার এত কর্ম কুশলতা, আপনার এত ভদ্র ব্যবহার’। ব্যাঙ্কের অফিসার বললেন, ‘আমি দেওঘরে রামকৃষ্ণ মিশনে পড়াশোনা করেছি’। তখন ছেলেটির বাবা অফিসারকে বলছেন, ‘আমার ছেলে এখন ছোট, আমিও ওকে ওই স্কুলেই পড়াতে চাই। আমার খুব ইচ্ছে আমার ছেলেও যেন কর্মে, ব্যবহারে আপনার মত হয়’।

তারপর বাবা খোঁজখবর নিয়ে ছেলেকে দেওঘর বিদ্যাপিঠে ভর্তির পরীক্ষায় বসাল। বিদ্যাপীঠে ভর্তির জন্য বিভিন্ন প্রান্তের ট্রাইবাল ছেলেদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। পরে ছেলেটি ভাল রেজাল্ট করে স্কুল থেকে বেরিয়েছে। এটাকে বলে লোকসংগ্রহ। আমার আপনার জীবনধারা এমন হবে, লোকে দেখে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে, আপনি কোন বংশের, আপনি কোথা থেকে পড়াশোনা করেছেন, আপনি আপনার এই গুণগুলি কি করে অর্জন করলেন? তখন বলবে, আমিও এই রকম হতে চাই, আমার ছেলেকেও এই রকম ভাবে তৈরী করতে চাই।

হিন্দুদের এটাই ঠিক ঠিক ধর্ম। মহাভারতে যক্ষ-যুধিষ্ঠিরের সংলাপে যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করছেন, *কঃ পন্থা*, জীবনের পথ কি? যুধিষ্ঠির উত্তর দিচ্ছেন, *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা*, মহাপুরুষরা যে পথ দিয়ে গেছেন, সেটাই পথ। যীশু খ্রীষ্ট যে পথ দিয়ে গেছেন, সেটাই ধর্ম; ওনার কথাগুলিই বাইবেলে লিপিবদ্ধ আছে। ভগবান বুদ্ধ যে পথ দিয়ে গেলেন, সেটাই পথ। অন্যান্য ধর্মে একজন দুজন করে ঋষি হয়েছেন, কিন্তু হিন্দু ধর্ম হল ধর্মের সমুদ্র, এখানে হাজার হাজার ঋষি হয়েছেন। কিন্তু তার মধ্যেও একটা মূল ভাব রয়েছে। হিন্দুদের এত ঋষি, এত মত, এত পথ, তা সত্ত্বেও সবাইকে নিয়ে একটাই ধর্ম, হিন্দু ধর্ম। কারণ *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা*, মহাপুরুষের দেখানো পথকে অবলম্বন করে আমরা চলি।

ভগবান অর্জুনকে বোঝানর জন্য এটাই বলছেন, দেখো, তোমার আগে আগে যে মহাপুরুষরা এসেছিলেন, তাঁরাও এই পথ অবলম্বন করে গেছেন। কঠোপনিষদে নচিকেতা তাঁর বাবাকে এই একই কথা বলছেন, *অনুপশ্যযথা পূর্বে প্রতিপশ্য তথাহপরে*, আপনি পিছনের দিকে একটু তাকিয়ে দেখুন আপনার আগের আগের লোকেরা কেমন ধারা কর্ম করেছেন। ভগবান এখানে জনক রাজার

নাম বলছেন। আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বলছেন জনক, অশ্বপতি আদি নামে রাজা ছিলেন, এনারা সবাই কর্ম করতেন। স্বামীজী বলছেন, আমাদের বৃন্দাবনের কৃষ্ণ চাই না, আমাদের চাই কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ, যিনি শুধু কাজ আর কাজ, সব ফেলে আগে কাজ করার কথা বলতেন।

মানুষের স্বভাবই এমন যে, সে ভক্তি করবেই, মানুষ প্রেম করবেই, ভগবানের সামনে মানুষ নতজানু হয়ে হাতজোড় করে প্রার্থনা করে বলবেই, হে প্রভু আমাকে এটা দাও, সেটা দাও; কারণ আমরা স্বভাবেই কাঙালী। আজকাল ইয়ং ছেলেমেয়েরা আজকে বিয়ে করছে, পরের দিন ডিভোর্স করে দিচ্ছে। আমেরিকাতে একটা ঘটনা আছে, যেখানে বিয়ে করল, ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডিভোর্স করে দিল। কারণ, যখন মেলামেশা শুরু করছে, তখন দুজনই কাঙালী। ছেলেটাও ভালবাসা চাইছে, মেয়েটাও এ্যটেনশান চাইছে, তারপর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর দেখছে এক অপরকে নিংড়ে নিতে পারছে না; ঝামেলা শুরু হয়ে যায়। আগেকার দিনে এই কাঙালীপনাটা ছিল না। শক্তি থাকতে হবে, আমি কাঙালী না। আমি এই পথে চলছি, তুমি যদি আমার সাথে চল খুব ভাল, যদি না চল, আমি একাই চলব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান করছি, একলা চল রে, কিন্তু জীবনে যখন নামাতে হয়, তখন বলবে, তোমাকে ছাড়া আমার জীবন চলবে না। তাহলে একলা চল রে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গানটাকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হোক। গান গাওয়ার সময় বলবে, কি সুন্দর গান, যেমন সুর, তেমন বাণী; কিন্তু জীবনে যখন পালন করতে যাবে তখন বলবে, তোমাকে ছাড়া জীবনে আমি অন্ধকার দেখছি, ভণ্ডামীর একটা সীমা থাকা দরকার।

ভগবান এটাই আটকাচ্ছেন, দেখ অর্জুন, জনক রাজা, অশ্বপতির মত যাঁরা মহাপুরুষ ছিলেন, তাঁরা সবাই কাজ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সব কিছু ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কুরুক্ষেত্রে ওই এত বড় যুদ্ধের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত শান্ত মনে, ঠাণ্ডা মাথায় সব কিছু পরিচালনা করে নিজের সখা অর্জুনকে যুদ্ধে জয়ী করে চলে গেলেন, এটাই শক্তি। *কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিম্,* জনকাদি পুরুষরা কর্মের দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এখানে আচার্য বলছেন, এর দুটো অর্থ হতে পারে, একটা হতে পারে কর্মযোগের পথ অবলম্বন করেই তাঁরা এগিয়ে গিয়েছিলেন, আর সেখান থেকেই তাঁদের আত্মজ্ঞান হয়েছিল; আরেকটা অর্থ হতে পারে, আত্মজ্ঞান যদি আগে হয়েও থাকে, তাও তাঁরা কাজ করতে থাকলেন। যেমন ভগবান কৃষ্ণ, তিনি অবতার, তাও তিনি কাজ করতে থাকলেন। স্বামীজী, তাঁর সমস্ত জ্ঞান হয়ে গেছে, তাও তিনি কাজ করা ছাড়লেন না। ঠাকুর, তাঁর সমস্ত জ্ঞান হয়ে গেছে, তাও তিনি লোকশিক্ষা দিতে থাকলেন। তুমিও যদি আত্মজ্ঞানী হয়ে থাক বা অবতারও যদি তুমি হও, *লোকসংগ্রহমেবাপি,* লোকশিক্ষার জন্য *সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি,* তোমাকে কাজ করে যেতে হবে। শ্রীরামচন্দ্র রাজ্য পরিচালনা করে দেখিয়ে গেছেন, শ্রীকৃষ্ণ নিজের জীবন দিয়ে এটাই দেখিয়ে গেলেন। ঠাকুর, মা, স্বামীজী এনাদের জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখুন। অর্জুন তুমি কেন বলছ যে, তুমি কাজ করবে না?

রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শকে স্বামীজী এই জন্যই আমাদের সামনে নিয়ে এলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের কেউ কেউ এদিক সেদিক দু চারটে কথা শুনে মনে করেন কর্ম থেকে বন্ধন আসে, উত্তরাখণ্ডের সাধুরা এখনও এই কথা বলে যাচ্ছেন। এগুলোই অপরিপক্ক মনের লক্ষণ। ভগবান অর্জুনকে সাবধান করে বলছেন, অর্জুন, তোমার এখন দুটি অবস্থা, তোমার এখনও আত্মজ্ঞান হয়নি; যদি আত্মজ্ঞান না হয়ে থাকে, তাহলে কর্মের মাধ্যমে তোমার চিত্ত শুদ্ধ কর। যখন আত্মজ্ঞান হয়ে যাবে, তখন আদর্শ হিসাবে, রোল মডেল হওয়ার জন্য তোমাকে কাজ করতে হবে। তুমি এই যে চিত্ত শুদ্ধি করছ, মনকে অপবিত্র হতে দিচ্ছ না, সেই সময়েও তোমাকে এত উচ্চমানের, শ্রেষ্ঠ কাজ করতে হবে, যাতে লোকেরা তোমাকে দেখে বলবে, আমি আপনার মত হতে চাই।

ভাগবতের তথ্য অনুযায়ী আমরা জানতে পারি; রাজা জনকের বংশে আশীর্বাদ ছিল, এই বংশের সবাই আত্মজ্ঞানী হবেন, তাদের সবাইকেই জনক বলা হত। আচার্য শঙ্কর এখানে দুটো সম্ভবনাই নিয়ে আসছেন। যাঁদের আত্মজ্ঞান হয়নি, তাঁরা কর্মযোগের পথ অবলম্বন করে সিদ্ধি পেয়েছিলেন, আর আত্মজ্ঞান যদি হয়ে যায়, তারপরেও তাঁরা লোকশিক্ষার জন্য কাজ করতেন। তবে কিছু কিছু ব্রহ্মজ্ঞানী আছেন, যাঁরা আর কোন কিছুতেই থাকেন না, এর অবশ্য অন্য কারণ আছে। কিন্তু তুমি একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তোমার উপর দায়ীত্ব আছে, লোকেরা তোমাকে দেখে প্রেরণা পাবে। যেখানে একটা গ্রুপ থাকে, যেমন ফ্যাক্টরিতে কাজ করছে, কেউ রাজনীতিতে আছে; সমভাবাপন্ন মন যেখানে একটা জায়গায় সমবেত হয়, তখন ওই দলটা তৈরী হয়। মহাভারতের যুদ্ধে যারা শৌর্য দেখাতে চাইছে, যুদ্ধের মাধ্যমে কীর্তি অর্জন করতে চাইছে, তারা সবাই সেখানে সমবেত হয়েছে। অর্জুন যদি হঠাৎ বলে, আমি এই যুদ্ধভূমি ত্যাগ করে চললাম, এটা খুব খারাপ দৃষ্টান্ত হয়ে থেকে যাবে, এ কাজ করা যায় না। যারা বলে আমি কিছু করি না, এটা ভাল না। কিছু একটা কর, নিজের আত্মসম্মান ত্যাগ করে যে কোন কাজ কর, যে কোন একটা কজে নেমে যাও; দরকার হলে ঠেলাগাড়ি চালাও, রাস্থায় ভুট্টা বিক্রী কর। খালি থাকতে নেই, এক সেকেণ্ডও খালি থাকতে নেই, কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে। চুপচাপ যে বসে আছে, তার থেকে ফ্রীতে কাজ করে দেওয়া ভাল। লোকসংগ্রহেরও প্রয়োজন আছে, নিজের মত ওটা করে নিতে হয়। কেন লোকসংগ্রহ করতে হয়?

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।।২১।।

(কোন সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা যা আচরণ করেন, সেই সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকেরা তাই অনুসরণ করে। তিনি যে লৌকিক বা বৈদিক কর্ম প্রামাণিক বলে অনুষ্ঠান করেন, অন্য লোকেরাও তাই অনুসরণ করে।)

শ্রেষ্ঠ পুরুষ, *মহাজনো যেনঃ,* যে মহাজনদের কথা বলা হল, তাঁরা যে রকম আচরণ করেন, বাকিরা সেই রকমই করে। ঠাকুর সেইজন্য খুব সাবধান থাকতেন, এমনকি বলছেন, আমি যদি দাঁড়িয়ে প্রস্বাব করি, তোরা তাহলে ঘুরে ঘুরে করবি। বড়দের দেখে সবাই শেখে, সেইজন্য খুব সাবধান থাকতে হয়। আপনি যদি এক পয়সা সরে যান, পিছনে যারা আছে তারা দশ পয়সা সরবে। সমাজে যাঁরা সম্মানিত, পরিবারে যাঁরা বড়, তাঁদের খুব বেশি সাবধান থাকতে হয়। তার সাথে আপনাকে নিজেকে সবার সামনে একটা আদর্শ রূপে দাঁড় করাতে হবে। ঈশ্বরদর্শন ছেড়ে দিন, গীতার জ্ঞান ছেড়ে দিন, কর্মযোগ-ভক্তিযোগ ছেড়ে দিন, তার জায়গায় একটা সামান্য প্রতিজ্ঞা, আমি জীবনে অন্তত পাঁচ জনের জন্য রোল মডেল হব। কিন্তু আমরা সবাই ছোটদের বলি, জানো তোমার বয়সে আমি এই রকম ছিলাম।

একটা খুব মজার ঘটনা, দাদু নাতিকে বলছেন, জানো তোমার বয়সে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ক্লাশে ফাস্ট হতেন। ছেলেটাও পাল্টা জবাব দিয়েছে, দাদু, তোমার বয়সে উনি ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। আমরা বাচ্চাদের নানা রকম উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আপনি নিজে কি করছেন সেটা দেখুন। একটা পার্কে দুটো বাচ্চা ছেলে নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি করছে। পার্কে একজন খ্রীশ্চান ফাদারও ছিল। ফাদার গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা দুজনে কি নিয়ে তর্ক করছ? একজন বলছে, আমরা প্রতিযোগিতা করছি কে কত বড় মিথ্যা কথা বলতে পারে। ফাদার বলছেন, ছিঃ ছিঃ তোমার খ্রীশ্চান ছেলে হয়ে মিথ্যা কথার লড়াই করছ? আমি যখন বাচ্চা ছিলাম, কক্ষণ আমি মিথ্যা কথা বলতাম না। ছেলেটি বলল, এই প্রতিযোগিতাটা আপনিই জিতলেন। এই বলে ফাদারকে এক ডলার দিয়ে দিল। বাচ্চা ছেলে কোন দিন মিথ্যা কথা বলেনি, এর থেকে বড় মিথ্যা কথা হতে পারে না। দুমদাম কিছু বলতে নেই, রোল মডেল মানে রোল মডেল, একটা আদর্শকে নিয়ে থাকতে হবে। যেখানে যে পরিস্থিতিতে আছেন, চেষ্টা করুন, যদি ওই পথ না হয় এই পথ, এই পথ না হলে সেই

পথ। খালি ফাক্কা উপদেশে কিছু হয় না। যখন ভাবি আমি আর তো কিছু পারব না, তাহলে ঈশ্বরের পথেই যাই। সেখানেও তমোগুণী, বসে বসে ঘুমোচ্ছে।

এরপর ভগবান নিজের কথা বলছেন; আমি এমনি এমনি তোমাকে বলছি না, আমি নিজেও রোল মডেল, আমি নিজেও সব সময় কাজ করছি –

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি।।২২।।

(হে পার্থ, স্বর্গমর্ত্যাদি তিন লোকে আমার কোন কর্তব্য নেই এবং আমার অপ্রাপ্তব্য বা প্রাপ্তব্য বস্তু নাই। তথাপি আমি লোক-কল্যাণের নিমিত্ত সর্বদা কর্মে ব্যপৃত আছি; কর্মত্যাগ করিনি।)

এই বাইশ নম্বর শ্লোক হল আমাদের সবার জীবনের আদর্শ। এই শ্লোকটাকে জীবনে যদি আনতে পারেন, আপনি মহৎ। মহত্ত্ব অনেক কিছু দিয়ে মাপা হয়, মহত্ত্ব অনেক কিছু দিয়ে হয়। নিবেদিতার নাম ছিল মার্গারেট নোবল, স্বামীজী মার্গট বলে ডাকতেন, স্বামীজী বলছেন, Margot tell me how much you have suffered then I tell you how great you are, জীবনে তুমি কত দুঃখ কষ্ট পেয়েছ, তাই দেখে আমি বলব তুমি কত মহৎ। কারণ কষ্ট সহ্য করে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, তাই তুমি মহৎ। এই শ্লোক হল জীবনের আদর্শ, এটাই মানুষকে আদর্শ পুরুষ বানায়, এটাই মানুষকে মহাপুরুষ বানায়।

ভগবান নিজেকে নিয়ে বলছেন, আমি কেন মহান। ভগবান তো মহান হবেন এতে কি আর বাহাদুরী, কিন্তু কাজের দিক থেকে দেখলে তখন অন্য রকম হয়ে যায়। এই তিন লোকে, স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে আমার কোন কর্তব্য নেই, আমি কারুর প্রতি দায়বদ্ধ নই, এবং আমি কোন বন্ধনে নেই। আমরা সবাই হাজারটা বন্ধনে আছি। কারণ এই সংসারে আমরা সবাই সবার সাথে নিজেকে জুড়ে রেখেছি। আমরা নিজেদের গায়ের জোরে এর ওর দিকে ঠেলে দিয়ে জুড়ে যাচ্ছি। গায়ের জোরে বলছি, তোমাকে আমি ভালবাসি, ভালবাসা মানেই তোমার বন্ধনে আমি পড়ে আছি। সন্তানের প্রতি একটা দায়ীত্ব হতে পারে, ঠাকুর বলছেন সন্তানের প্রতি কর্তব্য কত দিন, যত দিন তারা সাবালক না হয়ে যায়। বড় হয়ে গেছে, এখন আবার আপনার কিসের দায়ীত্ব, রিটায়ার করে বাড়ী এসেও আপনার দায়ীত্ব! আপনিও কি ধরণের মানুষ আর আপনার সন্তানও কি ধরণের মানুষ! কিসের দায়ীত্ব, কোন দায়ীত্ব নেই।

ভগবান বলছেন, তিন লোকে আমার কোন দায়ীত্ব নেই, অথচ *নানবাপ্তমবাপ্তব্যং*, এই শব্দটা খুব সুন্দর একটা শব্দ, এই জগতে এমন কিছু নেই, যেটা আমি পেতে চাই, আর এমন কিছু নেই যেটা আমি চাইলে পেতে পারি না। আমরা কেন নিচ্ছি না? কারণ আঙুর ফল টক, আমার পাওয়ার ক্ষমতা নেই, তাই টক। স্বামীজীর নামে তখন কলকাতায় বলা হত, উনি তো স্বভাবে সন্ন্যাসী না, অভাবে সন্ন্যাসী। বলতে চাইছে, লোকটা কিছু করতে পারল না, তাই সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। একেবারেই তা নয়। ভগবান এই কথাকে দমিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে? জগতে কিছু নেই যেটা আমি পেতে পারি না। আমাদের ভিতরে কোন দম নেই, কোন ক্ষমতা নেই, কিন্তু মুখে বড় বড় কথা। এই মানসিকতা দেশের সর্বনাশ করে রেখেছে। বাইশ নম্বরে ভগবান পরিষ্কার বলছেন, আমার কোন কর্তব্য নেই, দ্বিতীয় এই জগতে আমি কিছু চাই না। আমরাও খুব সহজে বলতে পারি, আমার কোন কর্তব্য নেই, কিন্তু এটাই আমাদের তমোগুণীর লক্ষণ। আমি কিছু পেতে চাই না, আমাদের জন্য এটা হল কাঙালীর ত্যাগ। যে কোন লোক বলতে পারে, আমার কিছু লাগবে না, কারণ আঙুর ফল টক।

তৃতীয় যেটা ভগবান বলছেন, কর্মযোগ মানে এটাই। *নানবাপ্তবমবাপ্তব্যং*, জগতে কোন জিনিস নেই, যেটা আমি পেতে চাই কিন্তু পেতে পারি না। আমি কোটিপতি হতে চাই, আমি কি

পারব কোটিপতি হতে? আগে তুমি কাজ কর, কাজ করে আগে ধর্মপথে তোমার শহরে সবচেয়ে বড় একজন ব্যবসায়ী হয়ে দেখাও। যদি তোমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে, আপনি কি করে এত বড় বিজনেসম্যান হলেন? তুমি বলতে পারবে, ধর্মপথ অবলম্বন করে। আগে তুমি এটা করে দেখাও তো, তখন বুঝব ধর্ম তোমার জীবনে ফলপ্রসু হয়েছে।

ছোটবেলায় আমরা একটা কাহিনী পড়েছিলাম, তবে কতটা সত্যি আমার জানা নেই। জাপানে প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে একজন ভিক্ষু গেছেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের জন্য। জাপানের রাজা সেই বৌদ্ধ ভিক্ষুকে বললেন, 'ইনি আমার মন্ত্রী, আগে তুমি এনাকে বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা দাও। ছয় মাস পরে আমরা এনাকে দেখব, তখন যদি তাঁর সাংসারিক অভ্যুদয় হয়ে থাকে, তবে আমরা বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করব। যদি না হয়, তোমাকে জাপান থেকে বার করে দেওয়া হবে'। তারপর সেই বৌদ্ধ ভিক্ষু মন্ত্রীকে বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। আর্য সত্য, অষ্টাঙ্গ মার্গ ইত্যাদি বৌদ্ধ ধর্মের যা যা আছে সব শিক্ষা মন্ত্রীকে দেওয়া হল। তারপর দেখা গেল সত্যিই তাঁর ভাল হতে শুরু হয়েছে। তখন জাপানের রাজা বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করলেন।

এই কাহিনী সত্য নাও হতে পারে, সেটা কোন ব্যাপার না, কিন্তু কাহিনীর ভাবটাই আসল। আচার্য শঙ্কর গীতা-ভাষ্যের ভূমিকাতে, যেটাকে বলা হয় উপোদ্‌ঘাৎ, সেখানে আচার্য বলছেন, হিন্দু ধর্ম পরিষ্কার বলে দেয় ধর্মের কাজ অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স। ধর্ম মানে শুধু ত্যাগ নয়, হিন্দু ধর্ম মানেই এই দুটো –অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স। হিন্দু ধর্ম অবলম্বন করে আপনার কি জাগতিক উত্থান হচ্ছে? এই ধর্মকে অবলম্বন করে আপনি কি নিজেকে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ রূপে প্রতিপন্ন করতে পারছেন? এই ধর্ম অবলম্বন করে আপনি কি জ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পেরেছেন?

অনেকে মনে করতে পারেন, আমি বড় বড় কথা বলছি। একেবারেই না, আমি এখানে আমার নিজের দু একটা কথা বলছি। আজকে আমার আট খানা বই লেখা হয়ে গেছে। এই বইগুলি এমন উচ্চ মানের যে, আমি জানি এই বই লেখা আমার পক্ষে সম্ভব না, এবং আমিও এটা আমার লেখা মনে করি না। ডঃ এপিজে আবদুল কালাম টিয়া বই পড়ে অভিভূত হয়ে গেছেন। তিনি খুঁজে খুঁজে বার করলেন এই বইটা কে লিখেছেন। উনি আমাকে ফোন করলেন। ফোন করে খুব মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করলেন, Are you the author of Tiya? ডঃ কালাম ফোন করছেন, আমিও খুব খুশী। কিছু কথা বলতে বলতে উনি বললেন, Only a beautiful mind can write such a beautiful book। আমিও সঙ্গে সঙ্গে বললাম, It is God's creation and God has beautiful mind। আমি কখন আমার বইএর জন্য কৃতিত্ব নিই না, আমি জানি এই বই লেখার ক্ষমতা আমার নেই। এটা আমি জানি, আমি একজন সন্ন্যাসী, আমি ধর্ম পথে আছি এবং ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ভাবধারাতে বড় হয়েছি বলেই লিখতে পেরেছি। আমি ভাল করে জানি, এই ভাবধারার বাইরে থাকলে আমি কখনই এই বই লিখতে পারতাম না। আর যা কিছু হয়ে যেতে পারতাম, লেখক হতে পারতাম না।

আজ আমি রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সন্ন্যাসী, আমার জন্য এটা বিরাট বড় সম্মানের বিষয়; ঠিক তার নীচে রয়েছে আমার লেখালেখি। এই সৃজনশীলতা এসেছে শুধুমাত্র ধর্ম পথে থাকার জন্য। আপনি কি বলতে পারবেন ধর্মের কথা শুনে, ধর্ম পথে এসে আপনার কি কি ভাল হয়েছে? আপনি কি বলতে পারবেন আপনাকে দেখে আরও পাঁচজন অনুপ্রাণিত হচ্ছে? অনুপ্রাণিত হয়ে কেউ যখন আপনাকে জিজ্ঞেস করে, দাদা আপনি কিভাবে এই জায়গায় পৌঁছালেন? তখন আপনি বলবেন, গীতা পড়ে, ধর্ম পথ অবলম্বন করে আজকে আমি এই জায়গায় পৌঁছেছি। ভগবান কর্মযোগে এটাই বলছেন, আমার কোন দায়ীত্ব নেই, আর নিজের জন্য আমি কিছু চাই না। এটা তামসিক অপদার্থের জন্য নয়, যার জন্য সে বলতে পারবে, আমার শক্তি দেখতে চাও, এই দেখ আমার শক্তি।

মহাভারতের যুদ্ধে তৃতীয় দিন ভীষ্ম যখন ভয়ঙ্কর সংহার শুরু করলেন, অর্জুন আর কোন প্রতিরোধ করে ভীষ্মকে আটকাতে পারছেন না। শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন, এবার দেখ আমার শক্তি। তিনি রথ থেকে নেমে পড়লেন, এই আমি ভীষ্মকে শেষ করে দিচ্ছি। এমন কোন কিছু নেই যেটা শ্রীকৃষ্ণ করতে চাইলে করতে পারবেন না।

এই জিনিসটা আমার আপনার জীবনে হওয়া খুব দরকার। শ্রীকৃষ্ণ নিজের তিনটে বৈশিষ্ট্য বলছেন, প্রথম কোন দায়ীত্ব নেই আমার, দ্বিতীয় আমার কোন কিছু লাগবে না এবং তৃতীয়, এই জগতে কোন কিছু নেই যেটা আমি চাইলে পেতে পারি না। তা সত্ত্বেও আমি কাজ করা বন্ধ করি না, *বর্ত এব চ কর্মণি*, তবুও আমি কাজ করি। কারণ আমি যদি কাজ না করি –

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।২৩।।

(হে পার্থ, যদি আমি অনলস হয়ে শুভ কর্মে প্রবৃত্ত না হই, তবে মানবগণ সর্বপ্রকারে আমার অবলম্বিত পথেরই অনুবর্তী হবে –অর্থাৎ অলস হয়ে কর্মত্যাগ করবে।)

আমার কোন দায়ীত্ব নেই, তবুও আমি কাজি করি, কারণ আমি রোল মডেল। আমি যদি কাজ না করি, বাকি জগৎও কাজ করা ছেড়ে দেবে। ঠাকুর বলছেন, অবতারের একটাই কাজ, জ্ঞান ভক্তির শিক্ষা দেওয়া। আচার্য শঙ্করও একই কথা বলছেন, ভগবান আসেন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ধর্ম প্রতিষ্ঠা আর জ্ঞান ভক্তি শেখানো, একই জিনিস। ধর্মে জ্ঞান ভক্তি ছাড়া আর তো কিছু নেই। হয় লোকে দেখে আত্মাই আছেন, বাকি সব নাম আর রূপের খেলা, আর তা নাহলে দেখে ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। মায়াকে যদি মানে, তাহলে দেখে ঈশ্বর বাদে সবই মায়া। আর যদি মায়াকে শক্তি রূপে দেখে, তখন দেখে ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, এটাই ভক্তি। ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছু নেই, এটাই জ্ঞান। সমস্ত শাস্ত্রের সার এই একটা সামান্য বাক্যে। ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, এটাই জ্ঞান; আর ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, এটাই ভক্তি। এই দুটো ভাবই কথামৃতে ঘুরে ঘুরে আসে।

জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ, আমি যদি বিচার করি, জীবনে বড় হতে আমাকে কে আটকালো, মহাপুরুষ হতে কে আমাকে আজকে আটকাচ্ছে? অন্যেরটা আমি বলতে পারব না, কিন্তু আমি নিজেরটা জানি, আমার জীবনে বড় হওয়া থেকে আমাকে বেশি আটকেছে আলস্য। আলস্য আমাকে অনেক কিছু হতে দেয়নি, আলস্য ছাড়া আর কিছু নেই যা আমাকে বড় হতে, মহাপুরুষ হতে আটকেছে। আমরা ঈশ্বরের সন্তান, ভারত ভূমিতে আমাদের জন্ম, সেই ভারত ভূমিতে, যে পবিত্র ভূমিকে নিয়ে স্বামীজী বলছেন, যে কোন জীবাত্মা যখন মুক্তির পথে এগিয়ে চলে, সেই জীবাত্মাকে ভারতবর্ষে শরীর ধারণ করতে হয়। অন্য দেশে মুক্তি হয় না, মুক্তি হয় ভারতের পূণ্য ভূমিতে। আমাদের শাস্ত্র বারবার বলছে, তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, *অমৃতস্য পুত্রা*, তোমরা অমৃতের সন্তান। তোমাকে কে মারবে, করোনা তোমাকে মারবে? করোনার মত একটা ভাইরাস, হাফ ডেড হাফ লিভিং, এর দম আছে তোমাকে মারবার? সমাজ তোমাকে মারবে, দম আছে? বাইরের লোক তোমাকে মারবে, দম আছে? কে তোমাকে মারে? তুমি নিজেই নিজেকে মারো। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান বলবেন, তুমিই তোমার বন্ধু, তুমি তোমার শত্রু। আলস্যকে ত্যাগ করে দিলে, তুমিই তোমার বন্ধু হয়ে গেলে; আলস্যকে ধরে রাখছ, তুমিই তোমার শত্রু হয়ে গেলে। ভগবান বলছেন, আমি কক্ষণ আলস্য আসতে দিই না, আমি সব সময় কাজ করছি। যদিও আমার কোন দায়ীত্ব নেই, কোন আকাঙ্খা নেই, এমন কিছু নেই যেটা আমি চাইলে পেতে পারি না, তাও আমি কাজ করি।

মানুষ কিসের জন্য কাজ করে? কিছু পাওয়ার আশায়। পাওয়ার আশাটা না হয় ছেড়ে দাও, যদি তোমার কোন দায়ীত্ব না থাকে, যদি তোমার কোন লোভ না থাকে, তাহলে দেখো তুমি কি রকম মহাপুরুষ হয়ে যাও। ঠাকুর বলছেন, দুই পয়সার সন্দেশ আনতে দিলে, সেটাও চুষতে চুষতে নিয়ে আসবে। ঠাকুরের কাছে বসে দু-বেলা একটু জপ করেই পাঁচ খানা কামনা জানাবে; হে ঠাকুর আমার যেন এটা হয়, আমার যেন সেটা হয়। কেন আমরা এত কাঙালী? একে আলস্যে পড়ে আছি, আর একটু আলস্য ছেড়ে ঠাকুরের দুটো নাম যদি করি, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কামনাগুলি জানাতে শুরু করে দিই।

মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ, সব মানুষ আমাকেই অনুসরণ করে। আমরা কথায় কথায় বলি, ঠাকুর এই রকম করেছিলেন, স্বামীজী এই রকম করেছিলেন। এরাই যখন কামারপুকুরে যাবে তখন খোঁজ করবে ঠাকুর কোন দোকানের জিলিপি খেতে ভালবাসতেন, সেখান থেকে জিলিপি আর সাদা বোঁদে অবশ্যই কিনবে। জিলিপি আর সাদা বোঁদে কিনলে কামারপুকুর ভ্রমণ সার্থক হবে। দেওঘর গিয়েছিলেন? সেখানে মন্দিরে জপ করল কি করল না, সেটা কোন গুরুত্বপূর্ণ না, পেড়া নিয়ে এসেছেন কিনা সেটা আগে দেখা চাই। ঠাকুরের জীবন, স্বামীজীর জীবনকে আদর্শ করে জীবনে এগিয়ে যাওয়া, সেই দিকে কারুর দৃষ্টি নেই।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।।২৪।।

(যদি আমি কর্ম না করি, লোকস্থিতিকর কর্মের অভাবে এই সকল লোক উৎসন্ন হয়ে যাবে। আমি তখন বর্ণসঙ্করাদি সামাজিক বিশৃঙ্খলার হেতু এবং সেই জন্য প্রজাগণের বিনাশের কারণ হব।)

হে অর্জুন, আমি যদি কাজ করা বন্ধ করে দিই, এই সংসার উৎসন্নে চলে যাবে। এর দুটো অর্থ হয়, দশম অধ্যায়ের আলোচনার সময় আমরা দেখতে পাবো, ভগবান সেখানে অনেক কিছু বলবেন। সেখানে বলবেন, এই জগতে যা কিছু আছে, সব কিছুর সার আমি। শ্রেষ্ঠ যা কিছু আছে, সেখানে আমি আছি বলে এই শ্রেষ্ঠত্ব এসেছে। পঞ্চম অধ্যায়েও ভগবান আবার বলবেন, সমস্ত কিছুতে আমি আছি, এমনকি খাওয়া-দাওয়া যে হজম হয়, সেটাও ঈশ্বরীয় শক্তিতেই হয়। পৃথিবী যে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে না, ঈশ্বরীয় শক্তি পৃথিবীকে ধারণ করে আছে বলে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে না। তিনি আছেন বলেই সব কিছু ঠিকঠাক ভাবে চলছে, তা নাহলে সব কিছু এলেমেলো হয়ে যেত। সৃষ্টিটা ভগবানের তৈরী, এর দায়ীত্ব তাঁর, এই দায়ীত্ব সাংসারিক অর্থে না। অন্যান্য ধর্মে কোথায় ভগবান একবার পাঠিয়েছেন, আবার কোথাও তিনি কাউকে দূত করে পাঠিয়েছেন। হিন্দু ধর্মই একমাত্র বলে, সৃষ্টি ভগবানের, তিনিই এই সৃষ্টিকে ধারণ করে আছেন। এই সৃষ্টিকে সংরক্ষণ করার জন্য ভগবান নিজেই নানা রকম লীলা করেন, কখন দেবলীলা, কখন মনুষ্যলীলা, কখন ঈশ্বরলীলা, আবার কখন অবতার লীলা। জাতক কথাতেও আমরা এই ভাব পাই, সেখানে দেখাচ্ছেন বিভিন্ন যোনিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। হিন্দুদেরও কুর্মাবতার, মৎস্যাবতার আছেন; এর মধ্যে আবার কিছু পণ্ডিতরা বিবর্তনবাদের থিয়োরী নিয়ে আসেন। বলতে চাইছেন সবটাই ঈশ্বরের সৃষ্টি, ঈশ্বরই সব কিছুকে ধারণ করে আছেন।

সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ, ধর্ম স্থাপন যদি আমি না করি, তাহলে বর্ণসঙ্কর হয়ে যাবে, কোন কিছুরই স্বকীয়তা বজায় থাকবে না, জিনিসগুলোর পবিত্র ভাবটাই চলে যাবে। ভগবানের কাজ হল সব কিছুকে শুদ্ধ পবিত্র রাখা, জিনিসটা যেমন ঠিক তেমন একেবারে শুদ্ধ থাকতে হবে। ব্রাহ্মণের কাজ জ্ঞানার্জন, ক্ষত্রিয়ের কাজ রক্ষা করা। ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয়ের কাজ করে, ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণের কাজ করে, বর্ণসঙ্কর হয়ে যাবে, সব এলেমেলো হয়ে যাবে। দেশের সীমান্তে যে সৈন্যরা অস্ত্র নিয়ে দিনরাত পাহারা দিয়ে দেশকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করছে, তারা যদি বলে

সিনেমার অভিনেতারা অভিনয় করে প্রচুর সম্মান পায়, অর্থও প্রচুর পায়, আমরাও অভিনয় করব। সব সৈন্যরা যদি বলে আমরা সিনেমায় এ্যক্টিং করব, তাহলে দেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে। ভগবান কখন শাস্ত্র রূপে, কখন অবতার রূপে মানুষকে তার নিজ নিজ দায়ীত্ব সম্বন্ধে সজাগ করে দেন। এটা না করলে সৃষ্টিটাই এলেমেলো হয়ে যাবে। এই এলেমেলো যাতে না হয়ে যায়, সেইজন্য ভগবানকে সব সময় কাজ করে যেতে হয়।

এখন কোথায় আছেন ভগবান? সব জায়গায় আছেন, *যো রাম দশরথ কা বেটা, ওহি রাম ঘট ঘট মে লেটা*। অণুতে অণুতে তিনি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, তিনিই আবার দশরথের বেটা। এখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন গ্রহে কোন অবতার হয়ে শরীর ধারণ করে কি লীলা করছেন, আমরা জানি না। এতটুকু জানি এই পৃথিবীতে তিনি স্থূল শরীরে নেই। কিন্তু আগে আগে বহুবার তিনি শরীর ধারণ করে পৃথিবীতে লীলা করে গেছেন। এখন কোন যোনিতে কোথায় কি করছেন আমরা জানি না। যদি খুব বেশি এলেমেলো, বিশৃঙ্খলা হয়ে যায়, তখন তিনি এসে নাশ করেন।

করোনা কেন এসেছে? গ্লোবালাইজেশান আদি করে পৃথিবীতে দৈত্যকে ছেড়ে দিয়েছিলাম, এবার সামলাও। পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য কিছু লোককে মরতে হবে, কারুর কিছু করার নেই। একাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলবেন *কালোহস্মি লোকক্ষয়ংকৃৎ প্রবৃদ্ধঃ*, আমি কাল, লোকক্ষয় করার জন্য আমি এই রূপ ধারণ করেছি। অন্যান্য মতে, অন্যান্য ধর্মে যে যাই বলুক, আমাদের এখানে মৃত্যু ভগবানেরই রূপ। অনেক অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা বেশি হয়ে গেলে, তিনি কিছু লোককে মেরে সব আগের মত ঠিক রাস্তায় নিয়ে আসেন। এটা কি করে হতে পারে, ভগবান একদিকে সৃষ্টি করছেন, আর-একদিকে রক্ষণ করছেন আর আবার তাঁকেই এখন সংহার করতে হচ্ছে। ফলে এই যে বিরোধ হয়ে যায়, ভগবান কক্ষণ এটা চান না। জগতে যদি পাপের বৃদ্ধি হয়ে যায়, অধর্ম যদি বেশি মাত্রায় হয়ে যায়, তখন ভগবানকে নিজে এসে নাশ করতে হয়ে। কিন্তু ভগবান কখনই এ-ভাবে সব কিছু নাশ করে দিতে চান না। তিনি তাই সব সময় লেগে থাকেন, যাতে সব কিছু ঠিক মত চলে।

এরপরে ভগবান বলবেন, জগতের এটা স্বভাব যে, বিষয়ের দিকে মন সব সময় ধাবিত হবে। গীতা ভাষ্যের প্রথমের দিকে আচার্য শঙ্কর সেইজন্য বলেছেন, জগতের স্থিতির জন্য ভগবান এসে নিজে সব ঠিক করে দেন। কিন্তু কিছু দিন পর মানুষের মনে লোভ, কামাদি আবার চাগিয়ে ওঠে, যার ফলে মানুষ আবার অধর্মের পথ অবলম্বন করে। ভগবান আবার এসে তখন সব ঠিক করে দেন। ভগবান যদি সব সময় আমাদের পিছনে লেগে না থাকতেন, তাহলে এক অপরকে কেটে শেষ করে দিত। যেমন সবাই সবাইকে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে, কখন আমেরিকা হুমকি দিচ্ছে, কখন চীন হুমকি দিচ্ছে, কখন পাকিস্থান হুমকি দিচ্ছে, বলছে আমি এ্যটম বোমা ছেড়ে দেব। তার কারণ সবার মধ্যে আসুরিক বৃত্তি রয়েছে, সুযোগ পেলেই ওই আসুরিক বৃত্তিটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। একমাত্র ভগবানই পারেন এভাবে সেভাবে ঠিক করে দিতে, এবং তিনি সব সময় করছেনও; কখন শান্তির বাণী দিয়ে, কখন করোনার মত মহামারী দিয়ে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও এই কথাই বার বার বলছেন, এটা মায়েরই রূপ, তিনি আবার রক্ষাও করেন। আর বলছেন, সেইজন্য যিনি আত্মবেত্তা হন, তাঁর কোন কর্তব্য থাকে না। তাঁর পাওয়ারও কিছু থাকে না, এমন কিছু নেই যে সে পেতে পারে না। তা সত্ত্বেও তিনি কাজ করেন। কিসের জন্য কাজ করেন? রোল মডেল, আদর্শ স্থাপনের জন্য কাজ করেন।

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকির্ষুর্লোকসংগ্রহম্।।২৫।।

(হে ভারত, অজ্ঞানিগণ আসক্ত হয়ে যেভাবে কর্ম করে, জ্ঞানিগণ অনাসক্ত হয়ে লোকশিক্ষার জন্য সেইভাবে কর্ম করবেন।

সক্তাঃ মানে আসক্ত, বলছেন, আসক্ত পুরুষ যেভাবে কাজ করে, *চিকির্ষুঃ* মানে ইচ্ছা, আত্মবেত্তা লোকসংগ্রহের ইচ্ছাতে সেইভাবেই কাজ করেন। সাধারণ মানুষ, সাধক, সিদ্ধ আর অবতার, এই চারজনের মধ্যে কি তফাৎ? সাধারণ মানুষ ঘোর সংসারে পড়ে আছে, ওখান থেকে বেরোতে চায় না, সাধক হলেন যিনি ওঠার চেষ্টা করছেন, সিদ্ধ হলেন যিনি উঠে একটা উচ্চ অবস্থায় পৌঁছে গেছেন, অবতার হলেন, যিনি উপর থেকে নেমে সেই অবস্থায় আসেন। সিদ্ধ পুরুষ নীচে থেকে চেষ্টা করে একটা অবস্থায় পৌঁছান, অবতার চেষ্টা করে উপর থেকে নীচে এতটুকু নেমে আসেন, এটাই তফাৎ।

বড় বড় বিশাল আকারের বেলুন দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়, যদি বেঁধে না রাখা হয় বেলুন উড়ে বেরিয়ে যাবে। বেলুনের ভিতর বিশেষ গ্যাস এত ভরা আছে যে, ওকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে। কিন্তু কোন উঁচু জায়গা থেকে পাথর যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, পাথর সোজা নীচের দিকে নেমে আসবে। অবতার পুরুষ কোন একটা ভাবকে অবলম্বন করে, এটা সেটা করে কোন রকমে নিজেকে টেনে নীচে ধরে রাখেন। জ্ঞানীদের জন্য এটাই বলছেন, তোমার এটা দায়ীত্ব উপর থেকে টেনে নীচে নামিয়ে নিজেকে বসিয়ে রাখবে। আর একজন আসক্ত পুরুষ যেভাবে কাজ করে, জ্ঞানী পুরুষ সেভাবেই কাজ করবেন, যেমন স্বামীজী, তিনিও সেভাবেই কাজ করেছেন। আমরা নামযশের জন্য কাজ করি, কিন্তু তিনি লোকশিক্ষার জন্য কাজ করছেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ঠাকুর ঠিক সেই ভাবেই উপদেশ দিচ্ছেন লোকশিক্ষার জন্য, যেভাবে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মদের উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন বা তখনকার দিনের অন্যান্য নামকরা লোকেরা যেভাবে উপদেশ দিতেন, ঠাকুরও সেই ভাবেই উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু তিনি যেটা করছেন, ঠিক ঠিক লোকশিক্ষার জন্য করছেন। আমরা যেটা করি, আমরা ঠিক লোকশিক্ষার জন্য করি না, কিন্তু উদ্দেশ্য হল আমরা যাতে রোল মডেল হতে পারি।

অর্জুন প্রথমের দিকে ঘোষণা করেছিল যে, সে যুদ্ধ করবে না, যুদ্ধ না করে বরং সে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবে। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে মনে করিয়ে দিয়ে বলছেন, তুমি এই ভাবে ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করার সঙ্কল্প ত্যাগ কর; আমার কোন কিছুই পাওয়ার নেই, আমার কোন কর্তব্য নেই, তা সত্ত্বেও আমি নিজেও এক মুহূর্ত কাজ ছাড়া থাকি না। মানুষের মঙ্গলের জন্য, যাতে এই জগতটা স্থিতিশীল থাকে, সেইজন্য আমি কাজ করি। তুমিও লোকসংগ্রহের জন্য কাজ কর, এটা আমার কাজ নয়, ঠাকুরের কাজ, ঈশ্বরের কাজ ভেবে কর। তার মানে, তুমি যদি নিজেকে কাঁচা লোক মনে কর তাহলেও তোমাকে কাজ করতে হবে, তুমি যদি নিজেকে পূর্ণজ্ঞানী মনে কর তাহলেও তোমাকে কাজ করতে হবে, আর যদি তুমি অর্ধ কাঁচা মনে কর তাও তোমাকে কাজ করতে হবে। কাজ ছাড়া এক মুহূর্তও থাকবে না, তুমি শ্রেষ্ঠ পুরুষ, লোকেদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোমাকে অবশ্যই কাজ করতে হবে। দেশ, সমাজ, জাতির কাছে আদর্শ স্থাপনের জন্য কাজ কর।

পরের শ্লোকে অর্জুনকে ভগবান বলছেন, অর্জুন তোমার দায়ীত্ব, আসক্ত হয়ে যারা কাজ করছে, তাদের উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে দিও না যে, 'সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাও', 'কর্ম ত্যাগ কর', 'তুমি সেই আত্মা', এইসব কথা বলে তাদের বুদ্ধিভেদ করো না।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্।।২৬।।

(জ্ঞানিগণ কর্মাসক্ত জ্ঞানহীনগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাবেন না। তাঁরা অবহিতচিত্তে সকল কর্ম অনুষ্ঠান করে জ্ঞানহীনদের কর্মে প্রবৃত্ত করবেন।)

আমাদের শাস্ত্রে *বুদ্ধিভেদ* একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। বুদ্ধভেদ হল, মানুষের যে বুদ্ধি অর্থাৎ মন যেখানে বসে রয়েছে, ওটাকে হঠাৎ দুমদাম্ করে নাড়িয়ে দিতে নেই। তুমি অপদার্থ, তোমার

দ্বারা এটা হবে না, তুমি এটার যোগ্য না, তুমি পুরো ভুল পথে আছ, এই ধরণের কথা কখনই বলতে নেই। যদি কাউকে আমি সত্যিকারের ভাল করতে চাই, আগে তার স্তরে আমাকে নেমে আসতে হবে। অনেক আগেকার কথা, একজন বড় আইএএস অফিসার ছিলেন, সাধুদের খুব সম্মান করেতেন। আমরা কলেজে একসাথে পড়তাম। তিনি আমাকে বলতেন, 'স্বামীজী, আমরা জানি আমরা পাঁকে পড়ে আছি। আপনি যদি আমাকে বলেন, আরে ভাই তুমি তো পাঁকে পড়ে আছ। আমি তো জানি আমি পাঁকে পড়ে আছি, সেটা আবার নূতন করে শুনে কি হবে! আপনি যদি আমার পাঁকে নেমে আমাকে তুলে বার করে নিয়ে আসতে পারেন, তাতেই আপনার সুখ্যতি'।

যারা অজ্ঞ পুরুষ, ধর্ম তত্ত্ব যারা জানে না, তাদের মধ্যে তুমি নামো, তাদের মতই কাজ কর, সেখান থেকে আস্তে আস্তে তাকে উপরে নিয়ে আসো। স্বামীজী শিক্ষকের গুণের বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, একজন ভাল শিক্ষক ছাত্রের স্তরে নেমে যান, সেখান থেকে তাকে উপরে তুলে নিয়ে আসেন। বেশির ভাগ শিক্ষক উপরেই দাঁড়িয়ে থাকবেন, নীচে কিছুতেই নামবেন না, ওখান থেকেই শিক্ষা দিতে থাকবেন।

জিম করবেটের জীবনের একটা খুব সুন্দর ঘটনা আছে। জিম করবেটের বয়স তখন দশ এগারো হবে, তখনই তাঁর খুব সুনাম হয়ে গিয়েছিল যে তিনি ভাল শুটিং করতে পারেন। সেই সময় তিনি স্কাউটের মত কোন একটা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একবার প্যারেডে একজন বড় আর্মি অফিসার উপস্থিত ছিলেন। সেখানে এদের যিনি ট্রেনার ছিলেন, তিনি জিম করবেটের দিকে ইশারা করে বলতে চাইছেন, 'এই ছেলেটি আমাদের খুব ভাল শ্যুটার'। আর্মি অফিসার রাইফেল ধরিয়ে দিলেন। জিম করবেটা রাইফেল নিয়ে মাটিতে শুয়ে শ্যুট করছে, কিন্তু একটাও লক্ষ্যে বিদ্ধ করতে পারছেন না। সঙ্গে সঙ্গে ওই অত বড় আর্মি অফিসার এসে জিম করবেটের পাশে শুয়ে পড়লেন, ওর রাইফেলটা নিজের হাতে নিলেন এবং সাইটটাকে ঠিক করে দিলেন। বন্দুকে সাইট থাকে, তাতে দূরত্বটা মাপতে হয়, আমার টার্গেট একশ মিটারে নাকি দেড়শ মিটারে আছে। জিম করবেটের লক্ষ্যটা ভাল, কিন্তু এখনও দূরত্ব মাপার কৌশলটা রপ্ত করতে পারেনি। উনি জিম করবেটের পাশে শুয়ে পড়লেন, রাইফেলটা নিলেন, নিয়ে ওর সাইটটা ঠিক করে দিলেন, এবার জিম করবেট গুলি চালালেন, ধাঁই করে লক্ষ্যে গিয়ে লেগে গেল। এই হচ্ছে শিক্ষক, এই নয় যে তিনি হেসে বলছেন, দেখলে তো তুমি পারলে না, এই জিনিস শিক্ষককে কখনই করতে নেই। তুমি ওর স্তরে নেমে যাও। কিন্তু ওই আর্মি অফিসার কোন রকম নিন্দা না করে, ওর বন্দুকটা নিলেন, সাইট ঠিক করে দিলেন, তারপর সোজা লক্ষ্যে গুলি পৌঁছে গেল। *জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি*, কাজে নেমে পড়, ওর জায়গায় নামো, নেমে সেখান থেকে তাকে তুলে নিয়ে এসো।

উপদেশ দেওয়া যাদের অভ্যাস, যদিও উপদেশ দিতে সবারই ভালো লাগে, তাদের এই শ্লোকটিকে সব সময় মাথায় বসিয়ে নিয়ে উপদেশ দিতে হবে। স্বামীজী ভালো আচার্যের লক্ষণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন, শ্রেষ্ঠ আচার্য শিষ্য যেখানে পড়ে আছে আগে নিজে সেখানে নেমে আসেন, সেখানে নেমে আগে শিষ্যের হাত ধরেন, তারপর ধীরে ধীরে তাকে উপরের দিকে নিয়ে আসতে থাকেন। আর প্রথম দিনেই যে আচার্য শিষ্যকে বলে দিল, তুমি এতদিন যাবৎ যা কিছু শিখে এসেছ সবটাই ভুল, তখনই বোঝা যাবে যে এই আচার্যের যারা শিষ্য তাদের কপাল মন্দ। একটা ক্লাশ ওয়ান/টুয়ের বাচ্চাকেও যখন কিছু শেখাতে যাবে সেখানেও এই শ্লোকটা প্রযোজ্য হবে।

অনেকেই হিরণ ম্যাক্সিনের নাম শুনে থাকবেন, যিনি মেশিনগান আবিষ্কার করেছিলেন। হিরণ ম্যাক্সিন আসলে খুব ভালো মানুষ ছিলেন। পরে যখন দেখলেন এই মেশিনগানের সাহায্যে মানুষকে নির্বিচারে মারা হচ্ছে, তখন তিনি প্রায়ই দুঃখ করে আফশোষ করতেন, কেন যে আমি এই মেশিনগানের মত একটা জঘন্য মারণাস্ত্র আবিষ্কার করতে গেলাম। উনি নিজে একজন খুব বড়

বিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিন্তু খ্যাতির সেই রকম উচ্চ পর্যায়ে যেতে পারেনি। ছোট খাটো অনেক জিনিস তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। ওনার স্ত্রী ছিলেন খুবই ধর্মপরায়ণ খ্রীশ্চান মহিলা। স্বামীজীর সাথেও এই ম্যাক্সিন পরিবারের দেখা হয়েছিল। হিরণ ম্যাক্সিন স্বামীজীকে দেখে খুব অনুপ্রাণিতও হয়েছিলেন। ম্যাক্সিনদের বাড়িতে স্বামীজী খাওয়া দাওয়াও করেছিলেন। ওনার ছেলে পরে তার বাবার জীবনী লিখেছিলেন। ছেলেও পরে খুব নাম করেছিল, কিন্তু বাবার মত অত বিখ্যাত হননি।

হিরণ ম্যাক্সিনের এই ছেলে ছোটবেলায়, যখন তার ছয় কি সাত বছর বয়স, একদিন এক দোকানে গেছে, গিয়ে দেখে সেই দোকানদারের পোষা কুকুর খুব সুন্দর ফুটফুটে কয়েকটা বাচ্চা দিয়েছে। একটা ধব্ধবে সাদা বাচ্চাকে ছেলের খুব পছন্দ হয়েছে। দোকানদারকে বলছে –এই বাচ্চাটা আমাকে দেবে? এটার কত দাম হবে? ছোট শিশু অত কিছু বোঝেও না। দোকানদার বলছে –হ্যাঁ, আমি তোমাকে বিক্রী করব, এর দাম এক ডলার, কিন্তু সেই একটি ডলারের দুদিকেই মাথা থাকতে হবে। মানে ডলারের দুদিকে হেড, টেল থাকলে হবে না। আসলে দোকানদারের ঐ কুকুরের বাচ্চাটা বিক্রী করবার ইচ্ছে নেই। বাচ্চাটাকে কাটিয়ে দেবার জন্য ঐ রকম অবাস্তব কথা বলেছে।

ছেলে তো আনন্দে খুব উত্তেজিত হয়ে গেছে। যাক, একটি তো ডলার, আর দুদিকেই হেড ঐ রকম একটা ডলার নিশ্চয় কখনও না কখন পাওয়া যাবে। বাড়িতে মাকে গিয়ে বলেছে, 'মা, আমাকে একটা ডলার দেবে যার দুদিকে মাথা আছে'? মা ছেলেকে খুব বকে দিয়েছে। ছেলের মন খারাপ হয়ে গেছে। সন্ধ্যে বেলা বাবা কাজ থেকে বাড়িতে এসেছেন, 'ছেলে গিয়ে বাবাকে ধরেছে, বাবা এক ডলারের একটা কয়েন হবে যার দুদিকে মাথা আছে, মা বলেছে ওরকম কয়েন নাকি হয় না'। বাবা ছেলেকে বলছেন – 'মা ঠিক জানে না, আচ্ছা দেখছি'। বলে তিনি পকেটে হাতড়ে খুচরো পয়সা গুলো নিয়ে এসে দেখছেন ওর মধ্যে ঐ রকম কোন কয়েন আছে কিনা। দেখে টেখে ছেলেকে বললেন, 'এখন এই যা খুচরো কয়েন আছে এর মধ্যে তো নেই, আচ্ছা কালকে আমি দেখব পাওয়া যায় কিনা'।

পরের দিন বাবা আবার কাজ থেকে সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরেছেন। ছেলে তো সারা দিন না ঘুমিয়ে, না খেয়ে কাটিয়েছে, ওর মাথায় খালি কুকুরের বাচ্চাই ঘুরছে। বাবাকে গিয়ে আবার ধরেছে, 'বাবা পেয়েছ'? বাবা – 'ও, ও, দেখছি দেখছি'। আবার পকেট থেকে খুচরো পয়সা গুলো ঘাটতে লাগলেন, ঘাটতে ঘাটতে হঠাৎ বললেন, 'এই তো এর মধ্যে একটা কয়েন রয়েছে দেখছি যার দুদিকেই মাথা'। ছেলেকে আর কে পায়, আনন্দে লাফাতে আরম্ভ করেছে। তারপর বাবা আর ছেলে দুজনে মিলে গেছে দোকানে, দোকানে গিয়ে দোকানদারকে ছেলে বলছে – 'এই যে দুদিকে মাথাওয়ালা এক ডলার নিয়ে এসেছি'। দোকানদার হাতে কয়েনটা নিয়ে দুদিকে উল্টেপাল্টে দেখে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না, সত্যিই একটা ডলার যার দুদিকেই মাথা। দোকানদার তখন হিরন ম্যাক্সিনকে বলছে, এই কুকুরটাতো বিক্রীর জন্য রাখা হয়নি। হিরন ম্যাক্সিন খুব রেগে গেছে, আপনি তাহলে একটা বাচ্চার সাথে কেন এই ধরণের মজা করতে গেলেন, পরিষ্কার বলে দিতে পারতেন যে এটা বিক্রী করবেন না। দোকানদার ক্ষমাটমা চাইল, কুকুরটা আর পাওয়া হল না। বাচ্চাটাও বাবার সাথে ফেরত চলে এসেছে।

এই ছেলে বড় হয়ে বাবার জীবনী লিখতে গিয়ে বলছেন, বাবা বাচ্চার মনটাকে ভাঙবেন না। বাবা ছিলেন আসলে ইঞ্জিনিয়ার, তিনি দুটো কয়েনকে নিয়ে লেদ মেশিন দিয়ে মাঝখান দিয়ে চিড়েছেন, আর মেটালিক ফ্লুয়েড দিয়ে দুটো মাথাকে সেঁটে দিয়েছেন। এমন ভাবে দুটো কয়েনকে জুড়েছেন যে কারুর ক্ষমতা নেই ধরার। ঐভাবে জুড়ে পকেটে করে নিয়ে এসেছেন, কিন্তু একবারও বললেন না যে আমি দুদিকে মাথাওয়ালা কয়েন নিয়ে এসেছি। যেই ছেলে ধরেছে তখন – ও, ও, আচ্ছা আচ্ছা, তুমি বলেছিলে না, আচ্ছা দেখছি আজকে পকেটে পাওয়া যায় কিনা। এই হচ্ছে *ন*

বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ, বাচ্চাকে বাচ্চার নিজের ঐ অবস্থা থেকে তুলছেন। এরাই হচ্ছে ঠিক ঠিক মহৎ শিক্ষক। নিজের সন্তান, নিজের শিষ্যকে যতক্ষণ এই রকম প্রশিক্ষণ না দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ তার কোন উন্নতি হবে না।

রাজনৈতিক নেতারা সাধারণ গরীব মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য অনেক রেভলিউশারি আইডিয়ার কথা বলেন। আসলে Revolutionary Idea বলে কিছু হয় না, যারাই বলছে আমি একটা Revolutionary Idea দিচ্ছি, তখন বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে। তোমার যদি আইডিয়া রেভলিউশানারি হয় তাহলে তোমাকে আগে ওদের স্তরে যেতে হবে, ঐ স্তর থেকে ওদের তুলে নিয়ে আসতে হবে। তার আগেই যদি রক্তারক্তি বিপ্লব করে দিয়ে কোন ভাবে ক্ষমতায় চলে আসে তাহলে সেই ক্ষমতা বেশি দিন স্থায়ী হয় না। এইভাবে যত ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে সব ক্ষেত্রেই তার উল্টো প্রতিক্রিয়া এদেরকেই ইতিহাসের পাতা থেকে সরিয়ে দিয়েছে। অনেক উগ্র বিপ্লবী নেতারাই পরে তাদের ভুলকে স্বীকার করেছেন।

মেঘালয় রাজ্য পুরো মাতৃতান্ত্রিক সমাজ, ওখানে ছেলেরা বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ি চলে যায়, মানে ঘরজামাই হয়ে থাকে, আর সন্তানের পরিচয় মায়ের নামেই হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের চেরাপুঞ্জী স্কুলে কলকাতা থেকে কয়েকজন শিক্ষক এসেছেন। এরা এসে এই সব দেখে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমালোচনা করে উপদেশ দিতে শুরু করেছেন। স্কুলের ছেলেরা শুনে ঘাবড়ে গেছে। কিছু দিন পরে দেখা গেলে সব ট্রাইবাল মেয়েরা কাটারি হাতে স্কুলে এসে বলছে, 'কই সেই মাস্টার যে আমাদের হাজার বছরের প্রথাকে উল্টে দিতে চাইছে'। তারপর সেই শিক্ষককে কোন রকমে লুকিয়ে চুরিয়ে ওখান থেকে অন্যত্র পাচার করে দেওয়া হয়েছিল। এগুলো কখনই করতে নেই, গীতায় এই জিনিসটাকেই করতে নিষেধ করা হচ্ছে, বুদ্ধিভেদ খুব খারাপ জিনিস, ইংরাজীতে বলা হয় unsettlement of faith। পুরনো বিশ্বাসের জায়গাটাকে একদিনেই কখন ভেঙ্গে দিতে নেই। সবারই একটা নিজস্ব চিন্তা ভাবনা ধ্যান-ধারণা থাকে, অনেক দিন ধরে তারা সেই চিন্তা ভাবনাটা করে আসছে, সেটাকে একদিনেই দুম্ করে উল্টে দেওয়াটা খুব বিপজ্জনক।

তাহলে কি ভাবে করবে? ওই যে আগে যেমনটি বলা হল; *জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি*, বাঃ বাঃ, দারুণ হয়েছে। এদের সমস্ত কাজে উৎসাহ দিয়ে নিজেকেও ঐ রকম কাজ করা শুরু করতে হয়। তারপর ধাপে ধাপে ওদেরকে উপরে তুলে নিয়ে আসতে হবে। স্বামীজীর আদর্শ শিক্ষক কি রকম হবে? শিক্ষক আগে ছাত্র যে অবস্থায় যে স্তরে আছে সেখানে যেতে হবে, সেখানে গিয়ে তাকে তুলে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু এখন বেশির ভাব শিক্ষকরা ঐ স্তরে যেতেই চান না, আর যারা যদিও বা যান তারা ছাত্রদের ঐ স্তরে নেমে গিয়ে ঐখানেই নিজে থেকে যান, ছাত্রকেও ওপরে আনেন না, নিজেও আর ওপরে আসেন না। একটা লোক যদি পাঁকের মধ্যে পড়ে থাকে, তাকে কখনই বলা উচিৎ নয় যে তুমি তো পাঁকের মধ্যে পড়ে আছে, দরকার হলে তুমিও ঐ পাঁকের মধ্যে নেমে পড়ে ওকে সেই পাঁক থেকে বার করে নিয়ে এসো।

তার আগে বলছেন, কারুর বুদ্ধিভেদ করো না, তার চিন্তা-ভাবনায় আঘাত দিয়ে হঠাৎ করে বলা যে, তোমার এগুলো একেবারেই ঠিক না। আগে তার মত তোমাকে হতে হবে, তার স্তরে তোমাকে নামতে হবে, তারপর সেই স্তর থেকে তাকে আস্তে আস্তে উপরে তুলে আনো। পরের শ্লোকে বলছেন, আসক্ত পুরুষ কে –

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।।২৭।।

(প্রকৃতির গুণত্রয় শরীরেন্দ্রিয়াদিসংঘাতে পরিণত হয়ে লৌকিক ও বৈদিক সমস্ত কর্ম সম্পাদন করে। অহঙ্কার দ্বারা যাঁর চিত্ত বিমূঢ় হয়েছে, তিনি 'আমি কর্তা' এ-রূপ মনে করেন।)

সাংখ্য দর্শন মতে পুরুষ আছেন, অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্য আর তার সঙ্গে প্রকৃতি রয়েছেন; এই প্রকৃতি জড় এবং পুরুষ চৈতন্য। প্রকৃতিতে প্রথম আসে মহৎ (cosmic mind), মহতের পরে আসে অহঙ্কার (cosmic ego), অহঙ্কার থেকে পর পর বেরিয়ে আসে পঞ্চ মহাভূত, ইন্দ্রিয়াদি ও মন। সাংখ্য দর্শনের সৃষ্টি তত্ত্বকে বেদান্তও মানে। আমাদের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের নিজস্ব বিষয় আছে, ইন্দ্রিয় তার নিজের বিষয়ের দিকে ধাবিত হবে। ইন্দ্রিয়গুলির বিষয় (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ) আকাশ, অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী ও জল এই পঞ্চ ভূতাদি থেকে নির্মিত। যেমন আকাশ থেকে শব্দের উৎপত্তি, আকাশ দিয়ে আমাদের কর্ণেন্দ্রিয় তৈরী, সেইজন্য কানের স্বভাবই হল শব্দের দিকে যাওয়া। চোখ অগ্নি থেকে তৈরী, রূপ অগ্নি থেকে আসছে, তাই চোখের স্বভাব রূপের দিকে ধাবিত হওয়া। এইভাবে ইন্দ্রিয়গুলি নিজের নিজের বিষয়ের দিকে ছুটছে।

এটাকেই স্বামীজী বলছেন, puppy's play, কুকুরের বাচ্চাগুলি নিজেদের মত খেলতে থাকে, আমরা যদি ওই খেলার মধ্যে জড়িয়ে যাই, আমরাই মাঝখান থেকে কুকুরের কামড় খেয়ে যাব। ট্রেনে দুজনের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে। ঝগড়া হতে হতে একজন আর-একজনকে বলছে, 'তোমাকে এমন ঘুষি মারব যে, তোমার চৌষট্টি পাটির দাঁত খুলে যাবে'। পাশ থেকে একজন বলে উঠল, 'আপনি ভুল করছেন, দাঁত বত্রিশটা হয়'। তখন তাকে বলছে, 'আমি জানতাম তুমি আমাদের ঝগড়ার মধ্যে ঢুকবে, সেইজন্য আগে থেকেই আমি তোমার বত্রিশটা দাঁত যোগ করে নিয়েছিলাম'। আমরাও অকারণে যেখানে সেখানে জড়িয়ে পড়ি। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, ওর মধ্যে যদি তুমি দুটো মিষ্টি কথা বলে বোঝাতে যাও, দেখবে দুজনে মিলে তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ইন্দ্রিয় আর তার বিষয়, এক অপরের পিছনে দৌড়াদৌড়ি করে যাচ্ছে। তুমি ইন্দ্রিয় নও, তুমি বিষয়ও নও, তুমি কেন ওর মধ্যে জড়াতে চাইছ! কিন্তু যে ওর মধ্যে জড়িয়ে ফেলে, যে মনে করে আমি করছি, এরাই আসক্ত পুরুষ, এরাই *বিমূঢ়াত্মা*, মূঢ়; এখনও তার জ্ঞান হয়নি। যিনি জ্ঞানী পুরুষ তিনি জানেন, ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের উপর খেলা করছে।

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী আর তাদের যে নিজ নিজ জিনিসগুলো শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এগুলোকে বলা হয় কার্য। আর এগুলোকে একত্রে নিয়ে আমাদের কর্মেন্দ্রিয়গুলি তার সাথে মন, সবটাকে বলে করণ –এই বিষয় আর ইন্দ্রিয় এক অপরের উপর লেগে আছে। *অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা*, যে এগুলোর সাথে নিজেকে জুড়ে দেয়, আর মনে করে এটা আমি করছি, সে নিজেকে মনে করে কর্তা। এটাই সমস্ত অশান্তির মূল।

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে।।২৮।।

(হে মহাবাহো, সত্ত্বগুণের পরিণাম চক্ষু ও কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সকল, তমোগুণের পরিণাম রূপ ও রসাদি বিষয়সকলে প্রবৃত্ত আছে। কিন্তু আত্মা নিঃসঙ্গ –এটা জেনে গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করেন।)

কিন্তু যিনি তত্ত্ববিদ্, যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, তিনি জানেন কোন কাজই আমি করছি না, এখানে ইন্দ্রিয় আর বিষয়ের খেলা চলছে। পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, আকাশাদি পাঁচটি মহাভূত, তার সাথে শব্দাদি পাঁচটি বিষয়; মন, অহঙ্কার এবং মহৎ, প্রকৃতি বাদে এই মোট তেইশটা তত্ত্ব হয়, প্রকৃতিকে নিয়ে চব্বিশটি তত্ত। এই তেইশটি তত্ত্বকে বলে গুণবিভাগ। আর এদের যে এক অপরের উপর যে কাজ হয়, সেটাকে বলে কর্মবিভাগ। তত্ত্ববেত্তা জানেন, *গুণা গুণেষু বর্তন্ত*, গুণ গুণের উপর

কাজ করে। এই সংসার প্রকৃতির রাজ্যে, এই রাজ্যে এক অপরের সাথে খেলা করছে। এই খেলার মধ্যে তুমি কেন জড়াতে যাচ্ছ, ওরা ওদের মত খেলা করুক, তুমি ওখান থেকে নিজেকে বার করে নিয়ে এসো। যিনি তত্ত্ববিদ, তিনি এই জিনিসটা ভাল করে জেনে গেছেন যে, গুণ গুণের উপর, বিষয় বিষয়ের উপর খেলা করছে, সেইজন্য তাঁরা এতে একেবারেই জড়ান না।

গরমের সময় মিষ্টি ঠাণ্ডা শরবৎ পান করে আমি বলছি, আঃ, প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। এখানেও সেই তিন গুণের খেলা, শরবৎ হচ্ছে রসতত্ত্ব থেকে তৈরী, আর জিহ্বা সেও রসতত্ত্ব দিয়ে তৈরী, রসতত্ত্ব রসতত্ত্বকে আস্বাদ করছে, আমি এখানে কোথায় জড়াচ্ছি! যিনি আত্মা, যিনি চৈতন্য স্বরূপ, তাঁর সাথে রসতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব এদের কোন সম্পর্কই নেই। চৈতন্য নিজেকে বোকার মত এগুলোর সাথে নিজেকে একাত্ম করে কখন আনন্দে আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাচ্ছে আবার কখন দুঃখ পেয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। চৈতন্য এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরকে আশ্রয় করে প্রকৃতির সব কিছু খেলার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে প্রকৃতির ধর্মকেই নিজের ধর্ম বলে মনে করছেন। চৈতন্য সর্বব্যাপী, সব জায়গাতেই চৈতন্য আছেন, কিন্তু জীবের শরীরে আশ্রয় করেন বলে তাঁর প্রকাশটা বেশি মনে হয়। এখন কোন কারণে চৈতন্য যদি এই শরীরের আশ্রয়টা ছেড়ে দেন তখন এই শরীর আর জড় পদার্থের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। এই চৈতন্যই যখন গাছের মধ্যে আশ্রয় করবেন তখন তিনি গাছের মতই আচরণ করবেন, যখন একটা পশুর শরীরকে আশ্রয় করবেন তখন পশুর মত ব্যবহার করবেন, মানুষের শরীরে আশ্রয় করবেন তখন মানুষের মত কাজ করবেন।

কিন্তু প্রাণ সেভাবে কাজ করবে না, যেমন টিউবলাইটেও ইলেক্ট্রিসিটি আছে পাখাতেও ইলেক্ট্রিসিটি আছে, কিন্তু ইলেক্ট্রিসিটি টিউবলাইটে পাখার মত কাজ করবে না, পাখাতে টিউবলাইটের মত কাজ করবে না। আমাদের শরীরে অঙ্গপ্রত্যাঙ্গাদি যেভাবে রয়েছে এখানে প্রাণ যেভাবে কাজ করবে গাছের মধ্যে সেইভাবে কাজ করবে না। এখন যদি আমার শরীরটাকে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয় তখন চৈতন্য শক্তি সেই শরীরের আশ্রয় ছেড়ে দেবেন কেননা এই শরীরটা তাঁর যন্ত্রস্বরূপ ছিল এখন সে যন্ত্রটা বিকল হয়ে গেল, তাই এই যন্ত্রটাকে ছেড়ে দেবেন। ছেড়ে দিয়ে কোথায় যাবেন? কোথাও যাবেন না, যেখানে ছিলেন সেখানেই থাকবেন।

চৈতন্য যে শুধু এই স্থূল শরীরের সাথে নিজেকে একাত্ম করে রেখেছেন তাতো নয়, এই শরীরের পেছনে যে সূক্ষ্ম শরীর আছে, যার সাহায্যে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হয়, সেই সূক্ষ্ম শরীরের সাথে আরও বেশি করে নিজেকে একাত্ম করে রেখেছেন। যখনই স্থূল শরীরটা দিয়ে কোন কাজ করতে পারবেন না, তখনই সূক্ষ্ম শরীরটা সেই স্থূল শরীরটাকে ছেড়ে দিয়ে আরেকটা শরীরকে নিজের অপূর্ণ কামনা বাসনাকে মেটাবার জন্য দাঁড় করিয়ে নেবেন। আমার এই জামা প্যাণ্ট যদি ছিঁড়ে যায় তখন তো আমি উলঙ্গ ঘুরে বেড়াব না, আমি আর-একটা জামা প্যাণ্ট বানিয়ে নেব, এও ঠিক তেমনি আর-একটা শরীর বানিয়ে নেবে। কিন্তু শরীর বানাবার ক্ষমতা খুব কম, তাই একটা গর্ভকে বেছে নিয়ে সেখানে ঢুকে যেতে হয়। যোগীদের সূক্ষ্ম শরীরের ক্ষমতা অনেক বেশি, সেইজন্য তাঁদের গর্ভে ঢোকার দরকার পড়ে না। উনি দেখছেন একটা পাথর পড়ে রয়েছে, ঐ পাথরকে কেউ বিরক্ত করতে আসবে না, তিনি ঐ পাথরকে আশ্রয় করে নিজের জীবাত্মাকে ঐখানে ঢুকিয়ে নিয়ে তপস্যাতে ডুব দেবেন। এখন ঐ পাথর হাজার হাজার বছর ধরে পড়ে আছে, যোগী ওর মধ্যেই ঢুকে গিয়ে ধ্যান করে যাচ্ছেন। অহল্যা যেমন পাথরের শরীরকে আশ্রয় করে পড়েছিলেন।

যোগীর উদ্দেশ্য ওই যে সূক্ষ্ম শরীর, যার মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলো রয়েছে, প্রাণ রয়েছে, সেই শরীরটাকে বিনাশ করে দেওয়া। এই সূক্ষ্ম শরীরের বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু কিছুই হবে না। চৈতন্য কখনই সূক্ষ্ম শরীরকে ছাড়তে পারেন না, কারণ তিনি এমন মায়া, মমতার সংস্কারে নিজেকে সূক্ষ্ম শরীরের সাথে এমন একাত্ম করে রেখেছেন যে, যত দিন না ঐ সংস্কারের বীজ পুড়ে ছাই হয়ে

যাচ্ছে তত দিন তিনি সূক্ষ্ম শরীর থেকে বেরোতে পারবেন না। মানুষ মারা যাওয়ার পর যে বলা হয় চৈতন্য বেরিয়ে গেল, আসলে চৈতন্য বেরোয় না, বেরোয় সূক্ষ্ম শরীরটা। যেদিন চৈতন্য সূক্ষ্ম শরীরকে ছেড়ে বেরিয়ে যান, তখন যে সূক্ষ্ম শরীর সমস্ত জড়ের উপাদান গুলিকে ধরে রেখেছিল সেগুলো আলাদা হয়ে যে যেখান থেকে এসেছিল সে সেখানে চলে যায়। প্রতি মুহুর্তে আমি যে নিঃশ্বাস ছাড়ছি তখন এই নিঃশ্বাসের বায়ু কোথায় যাচ্ছে? সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। সূক্ষ্ম শরীরকে যখন আত্মা ছেড়ে দিচ্ছে তখন সূক্ষ্ম শরীরের সূক্ষ্ম উপাদান গুলি কোথায় যাবে? সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সেগুলো আবার একজন কেউ নিয়ে নেবে। আর আত্মা কোথায় যাবেন? কোথাও যাবেন না, যেখানে ছিলেন সেখানেই থাকবেন। মুক্তি বলতে এটাকেই বোঝায়, শুদ্ধ আত্মা বা চৈতন্য যখন এই সূক্ষ্ম শরীরটাকে ছেড়ে দেন তখনই তিনি মুক্ত হয়ে গেলেন।

সূক্ষ্ম শরীরটা আসলে কি? হাজারটা সূক্ষ্ম উপাদান দিয়ে এই সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হয়েছে, যেমন মন, মনের আবার হাজারটা সূক্ষ্ম উপাদান আছে, সেই রকম প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়ের হাজারটা সূক্ষ্ম উপাদান, বুদ্ধির হাজারটা উপাদান, প্রাণের হাজারটা উপাদান, সব উপাদান নিয়ে সূক্ষ্ম শরীরটা তৈরী হয়েছে। এই সূক্ষ্ম শরীরের সাথে চৈতন্য নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছেন। যতক্ষণ চৈতন্য সূক্ষ্ম শরীরের সাথে একাত্ম হয়ে থাকেবন ততক্ষণ এই সূক্ষ্ম শরীর যেমন যেমন চিন্তা ভাবনা করতে থাকবে সেই অনুযায়ী বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন স্থূল শরীরের মধ্যে ঘুরতে থাকবেন। এই ঘোরার সময় তিনি কিছু উপাদানকে ছেড়ে দেবেন আবার কিছু নতুন উপাদানকে গ্রহণ করবেন। যেমন যেমন ভালো কাজ করতে থাকবেন তেমন তেমন তাঁর সূক্ষ্ম শরীর পাল্টাতে থাকবে। যেদিন জ্ঞান হয়ে যাবে তখন যে উপাদানকে এতদিন ধরে রেখেছিলেন সেই উপাদানগুলো তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। যেমন একটা ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট লোহার ছোট ছোট টুকরোকে ধরে রেখেছে।

মনে করা যাক ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট হল চৈতন্য, তাঁর হঠাৎ জ্ঞান হল, জ্ঞান হতেই তাঁর মনে হতে লাগল –আরে আমি একি করছি কতকগুলো লোহাকে আমি ধরে রেখেছি! এখন যদি সুইচ অফ্ করে দেওয়া হয় তখন লোহার টুকরো গুলো কোথায় যাবে? ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে। এখন ঐ টুকরো গুলোকে কে ধরবে? অন্য কোন ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট ধরে নেবে। অন্য ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট না ধরলে কোথায় যাবে? কোথাও যাবে না, ঐখানেই পড়ে থাকবে। আজ হোক কাল হোক কোন না কোন ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট ঐগুলোকে ধরে নেবে। এই রকম হাজার হাজার কোটি কোটি অনন্ত লোহার সমস্ত টুকরো সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে পড়ে আছে। আর অসংখ্য ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট ঘুরে চলেছে, এখন এরা নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী লোহার টুকরোগুলোকে ধরে নেবে। যদি নাই ধরে তাহলে বলা হবে প্রকৃতি নিজের মত আছে। এটাই অপরা প্রকৃতি আর পরা প্রকৃতি, যেটা সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান আলোচনা করবেন। এই পরা প্রকৃতি মানে ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটও লোহা দিয়েই তৈরী, লোহার টুকরোও লোহা দিয়েই তৈরী হয়েছে, আবার একে অপরকে টানছে। ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট আর লোহাকে উপমার জন্য ব্যবহার করা হল।

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ।।২৯।।

(প্রকৃতির গুণ দ্বারা ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ দেহেন্দ্রিয়সজ্ঘাতের কর্মে আসক্ত হন, অর্থাৎ ফলের জন্য আমরা কর্ম করি –এইরূপ অভিমান করেন। সর্বজ্ঞ আত্মবিৎ সেই অজ্ঞ অনাত্মবিৎ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদের বিচলিত করবেন না।)

যারা মূঢ়, যারা অজ্ঞানী তারা প্রকৃতির এই গুণের খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। সিনেমা দেখতে দেখতে আমরা সেই সিনেমার চরিত্রে অভিনেতার অভিনয়, সিনেমার দৃশ্য, সিনেমার কাহিনীর মধ্যে আমরা এমন ডুবে যাই যে, ভুলে যাই যে আমরা সিনেমা দেখছি। কোন কিছুর চিন্তা করতে করতে আমরা সেই চিন্তার মধ্যে হারিয়ে যাই। হিমালয়ের সুন্দর দৃশ্য দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে

হারিয়ে যাই। তখন পাশ থেকে কেউ বলল, 'কি ভাবছ, কোথায় হারিয়ে গেছ'? ঠিক তেমনি, মহাপুরুষরা এসে আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন, তুমি তো প্রকৃতির খেলায় মোহিত হয়ে আছ। কোন ইয়ং ছেলে একটা সুন্দরী মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল, কেউ তাকে সাবধান করার জন্য মনে করিয়ে দেবে –মোহিনীর মায়ায় তুমি কিন্তু ফাঁসতে চলেছ, সাবধান হয়ে যাও।

তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ, যাঁরা তত্ত্ববিদ, যাঁরা জ্ঞানী, তাঁরাও যেন এদের বিচলিত না করে। তার মানে বলতে চাইছেন, আপনিও ওদের মত কাজ করুন, সেখান থেকে আস্তে করে অজ্ঞ অনাত্মবিৎ মানুষকে তুলে নিয়ে আসুন। আমার কোন ডাক্তারী সমস্যা হয়েছে, কোন ডাক্তারের কাছে গেলাম, ডাক্তার ওষুধ দিলেন, হয়ত ভুল ওষুধ দিয়েছেন। রোগ সারছে না দেখে আর-একজন ডাক্তারের কাছে গেলাম, তিনি আগের ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান দেখেই বলে উঠবেন, 'এ কি করেছেন আপনি, এইসব ভুলভাল ওষুধ খেয়েছেন'? একজন ডাক্তারকে আমরা জানতাম, খুব ভাল ডাক্তার ছিলেন। উনি যখনই দেখতেন ভুল চিকিৎসা হয়েছে, উনি সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, 'এই ওষুধ অনেক দিন খাওয়া হয়েছে, এই ওষুধ এখন থাক, আজ থেকে আমি যে ওষুধগুলো দিচ্ছি সেগুলো খান'। উনি এত ভাল ডাক্তার ছিলেন যে, ওনার দেওয়া ওষুধ খেলে রোগী ভাল হয়ে যেত। কিন্তু কোন দিন বলতেন না, আপনার ভুল চিকিৎসা হয়েছে। খুব সুন্দর করে বলতেন, এই ওষুধ অনেক দিন খাওয়া হল, ঠিক আছে আজ থেকে এই ওষুধটা খাও। এটাই অর্জুনকে ভগবান বলছেন, অর্জুন, তুমি নিজেও কাজ কর, সাথে সাথে যাদের মন এই প্রকৃতির খেলাতে মুগ্ধ হয়ে আছে, তাদেরকেও তাদের অবস্থায় গিয়ে তুলে নিয়ে এসো। তা যদি না পারো, কখনই অন্তত তার বুদ্ধিকে বিচলিত করতে যেও না। এই শুদ্ধিটা কিভাবে হবে?

মযি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।।৩০।।

(পরমেশ্বরের জন্য ভৃত্যবৎ কর্ম করছি –এই বুদ্ধি দ্বারা আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করে ফলাভিসন্ধিরহিত, মমত্বহীন ও শোকশূন্য হয়ে তুমি যুদ্ধ কর।)

হে অর্জুন, তোমার সমস্ত কাজের ফল আমার উপর অর্পণ করে দাও। ছোটবেলায় আমরা সবাই কম-বেশি খুব ফাঁকিবাজ ছিলাম, এমনিতেও বাচ্চারা বাড়ির কোন কাজ করতে চায় না। কোন কাজ যদি করতে বলা হত, বা কোন কিছু আনতে বললে জিনিসটা হয়ত নিয়ে আসবে, কিন্তু আনার পর জিনিসটাকে সামনে ফেলে বলবে, এই নাও তোমার জিনিস। তার ভাবটা এই –আমাকে দিয়ে কাজ করাতে চেয়েছ, কাজ তো আমাকে করতেই হবে, তুমি বড়, আমাকে আদেশ করেছ, তাই এনে দিলাম। আনবে, কিন্তু ফেলে দিয়ে বলবে, এই নাও তুমি আনতে বলেছ এনে দিলাম। ঠিক তেমনি, কর্মফলটাও ভগবানের পায়ে ফেলে দিতে হয়। তুমি আমাকে এখানে নাচাচ্ছ? শ্রীরামচন্দ্রের নামে তুলসীদাস খুব সুন্দর বলছেন, হে রাম অনেক নাচিয়েছ, আর নাচিও না।

এই নাচ থেকে কিভাবে বাঁচতে হয়? প্রথমে কর্মের ফল ভগবানের চরণে অর্পণ করে দিতে হয়, প্রভু, ভাল-মন্দ যা ফলই হোক না কেন, তোমার চরণে অর্পণ করলাম, আমি আর ওখানে আসক্ত হব না। সেখান থেকে আস্তে আস্তে কর্ম থেকেও অনাসক্ত হয়ে যায়। পরে লোকসংগ্রহের জন্য এনারা কাজ করেন। এই ভাবটা কি? এখানে আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *অহং কর্তা ঈশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমি*, কাজ করার সময় সব সময় তোমার এই ভাব থাকবে, আমিই এই কাজের কর্তা, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য চাকরের মত কাজ করছি। ভৃত্য বা চাকর যদি খুব ভালভাবে কাজ করে, তাতে মালিক খুশী হন। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, এই রকম ভগবান খুশী হলে আমাদেরও বলবেন, তুই আমার কাছে আয়, আমার পাশে বোস। ভগবান খুশী হয়ে গেলে, সালোক্য, সামীপ্য এই মুক্তিও দিয়ে দিতে পারেন। তার জন্য কি ভাব থাকতে হবে? আমিই কর্তা, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য ভৃত্যবৎ করছি।

ঠাকুর বড়লোকের বাড়ির দাসীর কথা বলছেন, দাসী সব কাজই করে। বাবুর ছেলেকে বলবে, আমার রাম। কিন্তু জানে, আমার নিজের সন্তান দেশের বাড়িতে আছে। আমরা যে মহারাজের কাছে অনেক শিক্ষা পেয়েছি, তিনি আমাদের বলতেন, এই বাক্যটা সব সময় মনে রাখবে –*অহং কর্তা ঈশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমি*। আমি কর্তা অবশ্যই, কিন্তু প্রভুর ভৃত্য –এটাই হল ভক্তি ভাবে কর্মযোগ। জ্ঞান ভাবে কর্মযোগ তাহলে কোনটা? যেটা ভগবান আগে বললেন। প্রকৃতি প্রকৃতির নিজের মত কাজ করছে, আমি হলাম শুদ্ধ আত্মা, প্রকৃতির কাজের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, এটাই জ্ঞান ভাবে কর্মযোগ। কিন্তু এটাই যখন ভক্তি ভাবে আসে, তখন আমিই কর্তা।

এক সন্ন্যাসী তাঁর পূর্বাশ্রমের বাড়িতে গেছেন, ওনারা বিরাট বড়লোক, তাদের বাড়িটাও রাজবাড়ির মত। মহারাজ যাওয়ার পরই বাড়ির মালিক বলছেন – আরে তোরা কে আছিস, মহারাজ এসছেন ভালো করে এক কাপ চা নিয়ে আয়। মালিক যে চাকরকে বলেছে, সেই চাকর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে বলল –এই, মহারাজ এসেছেন, দু’কাপ চা চাই। রান্নাঘরের চাকর তখন বাইরে যে দারোয়ান ছিল তাকে বলল –এই, মহারাজ এসেছেন, দু’কাপ চা নিয়ে আয় তো। দারোয়ান সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভারকে বলল –এই মহারাজ এসেছে, তাড়াতাড়ি গিয়ে দু’কাপ চা নিয়ে আয়। ড্রাইভার একটা ফ্লাস্ক নিল, গাড়ি স্টার্ট করে একটা দোকানে গিয়ে বলল –এই ভালো করে দু’কাপ চা বানিয়ে এই ফ্লাস্কে ঢেলে দে। ড্রাইভার চা নিয়ে ঠিক একই অনুক্রমে, দারোয়ানকে দিল, দারোয়ান রান্নঘরের চাকরকে দিল, রান্নঘরের চাকর মালিকের নিজস্ব চাকরকে দিল। মালিক কিন্তু এত কিছু জানেই না, সে জানে আমার রান্নাঘর থেকে চা এসেছে। দু’কাপ চায়ের জন্য কত টাকার তেল পুড়িয়ে, কত ঘুরে চা নিয়ে আসা হল। সরকারি অফিসে এই একই অবস্থা, বেশির ভাগ কর্মচারিরা বলে সরকারের কাছ থেকে তো সবাই মাইনে পাচ্ছে আমি কেন একা খেটে মরব। দ্বিতীয় হচ্ছে ভক্তরা বলে, সবই ভগবানের কাজ, তা ভগবানের অনেক লোক আছে, ভগবানের কাজ করার লোকের অভাব হবে না। বাড়িতে যদি তিন মহিলা থাকে তাহলে সে বাড়িতে কোন কাজ হয় না, তিনজনই বলবে আমি কেন করব, ওরাও তো আছে।

কিন্তু এখানে এই কথাগুলো কাকে বলা হচ্ছে? তুমি যদি মহৎ হতে চাও, তাহলে তোমার কখনই এই ধরণের মনোভাব থাকা উচিৎ হবে না। তোমার কাছে যে কাজটা এসে গেছে, বা যে কাজটা তুমি করবে বলে ঠিক করেছ, তখন সেই কাজে এটা ঈশ্বরের কাজ এই ভাব আনতে হবে, কাজের কর্তা আমি, আমাকে নিশ্চিত করতে হবে যে এই কাজটাকে দায়সারা ভাবে না; ভালো ভাবে নিখুঁত ও ত্রুটিবিহীন ভাবে করতে হবে। যখন জপধ্যান করছি তখনও ঠিক এই একই ভাবে করতে হবে। জপধ্যানটাও ঠাকুরের কাজ, তাই আমাকে জো সো করে জপধ্যান করতে হবে। এক ভক্ত প্রায়ই মঠে আসতেন। অনেক দিন মঠে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। এক মহারাজের সঙ্গে দেখা হতেই ভক্তটিকে জিজ্ঞেস করছেন, ‘কি হল, অনেক দিন মঠে আসছেন না’। ভক্তটি বলছে, ‘তিনি ডাকলেই যাব’। তিনি ডাকলেই যাব বলা মানে? তার কিন্তু আর কর্তাবোধটাই নেই। গীতাতে স্পষ্ট করে বলছেন যে, তোমার কর্তবোধ থাকতে হবে, কিন্তু কি কর্তাবোধ? আমি ঈশ্বরের দাস। কথামৃতে ঠাকুরও বলছেন –আমি ঈশ্বরের দাস, এই ভাবটাকে ধরে রাখতে হয়। আমি ঈশ্বরের দাস এই ভাবটাকে ঠিক ঠিক ধরে রাখতে পারলে তবেই আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। ঈশ্বরের দাস এই ভাবের মধ্যে কাজের মধ্যে আমি কর্তা এই ভাবটাই লুকিয়ে আছে।

যশোদা বলছেন, আমি কৃষ্ণকে না দেখলে কে দেখবে? এই দুটো জিনিস খুব তাৎপর্যপূর্ণ – আমি ঈশ্বরের দাস আর দ্বিতীয় আমি কর্তা। কাজ করার সময় আমার বোধ থাকবে আমি কর্তা, কাজ করব প্রভুর মত, ক্রীতদাসের মত কাজ করতে বলা হচ্ছে না। আগেকার দিনে বড় বড় জমিদারদের কিছু গোলাম থাকত, গোলামদের যা যা আদেশ করা হত, কারুর গলা কেটে দিতে হবে, কাউকে

গুম্ করে দিতে হবে, নির্বিশেষ চিত্তে গোলামরা সেই কাজ হাসিল করে দিত, গোলাম জানে আমি এই কাজ না করলে জমিদারের খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। সেইজন্য কবিরের ভজনে বলছে – প্রভু ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম তেরা।

বাড়িতে খুব গণমান্য কোন অতিথি এসেছেন, বাড়ির মেয়ে চা বানাতে গেছে, মা দৌড়ে এসে বলছে – তুই সরে যা, গোলমাল করে দিবি, আমাকে বানাতে দে। মায়ের এই যে আমি কর্তা এই বোধটার কথাই ভগবান বলছেন, তার সাথে আর-একটা বোধ এটা ঠাকুরের কাজ, এই দুটো বোধ যদি যুগপৎ না থাকে তাহলে কিন্তু কর্ম বন্ধন হয়ে যাবে। সেইজন্য বলছেন *ময়ি সর্বাণি কর্মাণি* সব কাজ তাঁরই, *সংন্যস্য অধ্যাত্ম-চেতসঃ,* মনে প্রাণে সচেতন ভাবে তুমি সব কর্ম আমাকেই সমর্পণ করে শোক মোহ ত্যাগ করে যুদ্ধ কর। যুদ্ধটা আমার জন্যই করছ, যুদ্ধের যা ভালো মন্দ হবে সব আমারই হবে এই ভেবে তুমি শোক মোহ শূন্য হয়ে কাজে নেমে পর। যখন তুমি বুঝে নেবে যে এটা ঈশ্বরের কাজ তখন তুমি কাজটাকে ত্রুটিমুক্ত ভাবে করার জন্য কত সজাগ হয়ে যাবে। অথচ আমরা একটা সাধারণ পুলিশ কনস্টেবল থেকে ভয়ে কত সতর্ক থাকি, অথচ ঈশ্বরের মত এত বড় একজন বস্ সর্বক্ষণ আমাদের মাথার উপর বসে আছেন তাঁকে কোন ভয়ই পাইনা।

এখনও হয় কিনা জানা নেই, কিন্তু আগেকার দিনে যে কোন সরকারী দপ্তরে যাঁরা খুব নিষ্ঠার সাথে কাজ করতেন, তাঁরা নিজেকে মনে করতেন এই কাজের আমিই কর্তা, কিন্তু জানেন আমি সরকারের জন্য এই কাজ করছি, আমিই সেই ভারত সরকার। এখনও এই অনুভূতিটা সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে আছে কিনা জানা নেই। এরপর ভগবান খুব সুন্দর কথা বলছেন –

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোহনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেহপি কর্মভিঃ।।৩১।।

(যাঁরা নিষ্কাম কর্মবিষয়ে শ্রদ্ধাবান ও অসূয়াশূন্য হয়ে আমার এই মত সর্বদা অনুষ্ঠান করেন, তাঁরাও ধর্ম ও অধর্মাদি কর্মের কর্তৃত্ববুদ্ধিরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হন।)

যে এই ভাব নিয়ে কাজ করে আর জ্ঞানমার্গ ভক্তিমার্গ এত কিছু নাও করে, শুধু আমার প্রতি শ্রদ্ধা রাখে, কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান, শুধু কৃষ্ণ না, যিনি শ্রীরামের ভক্ত তাঁর জন্যও তাই, শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তের জন্যও তাই, ভগবান বুদ্ধের ভক্তের জন্যও তাই, তাঁর কথার প্রতি আমার শ্রদ্ধা। তার সাথে বলছেন *অনসূয়ন্তঃ,* সংস্কৃতের '*অনসূয়ন্তঃ*' শব্দের ব্যাখ্যা আচার্য এইভাবে করছেন – যে গুণগুলো থাকে সেটার প্রতি দোষদৃষ্টি না থাকা। আমাদের সমস্যা হল, যাদের মধ্যে গুণ থাকে, তাদের মধ্যেও দোষ দেখি, এই দোষদৃষ্টি ত্যাগ করতে হয়। কেউ হয়ত ভাল গান করে, তাকে বলবে, গান করে ঠিকই কিন্তু ভাল জায়গায় তালিম পায়নি, একটা না একটা দোষ বার করবেই। গুণে দোষ দেখা আমাদের স্বভাব। ভগবান বলছেন, যাঁরা আমার প্রতি শ্রদ্ধাবান, তাঁরা আমার মধ্যে দোষ দেখেন না। শ্রদ্ধার সাথে তাঁরা আমার এই মতকে মানেন এবং এই পথে চলার জন্য নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করে যান, এনারাও মুক্তি পেয়ে যান। যারা আমার মতকে মানে না, এবার ভগবান তাদের কথা বলছেন –

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ।।৩২।।

(কিন্তু যে অশ্রদ্ধাবান ব্যক্তিগণ আমার এই বাক্যের নিন্দা করে এব তা পালন করে না, সেই বিবেকহীন ব্যক্তিগণকে সর্বজ্ঞান-মূঢ় ও পরমার্থভ্রষ্ট বলে জানবে।)

যাদের মধ্যে নিন্দার ভাব আছে, এই মতের বিপরীত ভাবে আছে, *নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্,* তারা ঈশ্বরীয় কথা পালন করে না, ধর্মটর্ম সব ফালতু বলে উড়িয়ে দেবে। *সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্,* এরাই

আসল জ্ঞানরহিত; *বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ*, এদের বুদ্ধি নাশ হয়ে গেছে। শুভ বুদ্ধি ধর্ম থেকেই উদয় হয়, বই পড়ে শুভ বুদ্ধি হয় না, শুধু বিচার করে শুভ বুদ্ধি আসবে না, লোভ মোহের মধ্যে পড়ে থাকলে শুভ বুদ্ধি কখনই হবে না। অবিবেকীরা এভাবেই নাশপ্রাপ্ত হয়।

মূল বক্তব্য, অর্জুন তুমি কাজ কর, আর অপরের জন্য আদর্শ পুরুষ হও, তোমাকে দেখে যেন সবাই শিখতে পারে, উৎসাহ পায়। দ্বিতীয়, কিভাবে কাজ করবে? জ্ঞানমার্গে যদি কর্মযোগ কর, তাহলে তোমাকে জানতে হবে যে, প্রকৃতিই সব কিছু করে, তোমার ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়দের বিষয়ের উপর কাজ করে যাচ্ছে, তুমি ওর মধ্যে নিজেকে জড়াতে যেও না, সব সময় অনাসক্ত থাক। আর ভক্তি ভাবে যদি কর্মযোগ করতে চাও, তাহলে কাজ তুমি করবে, কিন্তু কর্মের সব ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করে দেবে, প্রভু তোমার চরণে সব অর্পণ করে দিলাম। এরপর যদি বাজে ফল হয়, তাতে তোমার মন খারাপ করার কিছু নেই, আর ফল ভাল হলে উৎফুল্ল হওয়ারও কিছু নেই, কারণ কর্মের সব ফল তো তুমি আগেই আমাকে অর্পণ করে দিয়েছ।

তেত্রিশ নম্বর শ্লোক থেকে তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোক পর্যন্ত পাপ কি, মানুষ পাপ কেন করে, পাপ থেকে কি মুক্তি পাওয়া যায়, এই প্রশ্নগুলিকে নিয়ে ভগবান আলোচনা করতে যাচ্ছেন। সাধারণ মানুষ পাপকে খুব ভয় করে, বিশেষ করে অন্যান্য ধর্ম থেকে পাপের ভাবনা আমাদের মধ্যে এত বেশি ঢুকে গেছে যে, সব সময় আমরা দুশ্চিন্তায় থাকি। ধর্মকে যদি দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়, তাহলে একটা ধর্মের জন্ম ভারতে আর অন্য ধর্মটির জন্ম আরব, ইরান, ইজরাইল মিলিয়ে যে পশ্চিম এশিয়া, সেখানে। পশ্চিম এশিয়ার ধর্মগুলি হল, জহুদি, খ্রীশ্চান, ইসলাম ও পার্সি। এই ধর্মগুলিতে, বিশেষ করে জহুদি, খ্রীশ্চান ও ইসলাম, এই তিনটি ধর্মে পাপ আর পূণ্যকে পরিষ্কার একটা লাইন দিয়ে টেনে দেওয়া হয়েছে। সব কটা ধর্মের মূল হল জহুদি ধর্ম, জহুদি ধর্মকে আধার করেই বাকি দুটি ধর্ম বেরিয়েছে। জহুদি ধর্মের মূল হল, ঈশ্বরের যে আদেশ, সেই আদেশকে যদি পালন না করা হয়, তাদের কাছে এটাই পাপ। আদম আর ঈভ স্বর্গে ছিলেন, ভগবান বলে দিয়েছিলেন, তোমরা এই আপেল বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করবে না। কিন্তু তাঁরা ভগবানের আদেশ উল্লঙ্ঘন করে ফল ভক্ষণ করলেন, সেইজন্য তাঁদের স্বর্গ থেকে নিষ্কাশিত হয়ে যেতে হল।

সেখান থেকে পরে পরে ওনাদের যে ভগবান জেহোবা, জহুদিদের যত ধর্মগুরু আছেন, তাঁদের সাথে ভগবান জেহোবার একটা চুক্তি হল, যেটাকে ওনারা covenant বলেন; ভগবান বলে দিলেন, তুমি যদি আমার এই কথা মান, তাহলে তোমাকেও আমি এই রকম করে দেব। কথা দিয়ে কথা না রাখা, এটা একটা দোষ। জহুদিদের কাছে এটাই হয়ে গেল, তোমার পূর্বপুরুষরা ভগবানকে কথা দিয়েছিলেন, সেইজন্য এটা যদি না মান, এটাই পাপ। সেখান থেকে পরে এলো খ্রীশ্চান ধর্ম, ওনারা নিয়ে এলেন original sin, আদম আর ঈভ যে পাপ করেছিলেন, এটাই original sin, আর সবাই হল born sinner, জন্ম থেকেই সবাই পাপী। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, যীশু এগুলোকে নিয়ে কোথাও কোন কথা বলেননি। নিউ টেস্টামেন্টের কোথাও যীশু এগুলোর উপর একটুও জোর দিচ্ছেন না। পরে খ্রীশ্চান ফাদাররা এসে original sinএর উপর খুব জোর দিতে শুরু করেন। এমনকি মার্টিন লুথার, যিনি প্রোটেস্টান্ট ধর্মের প্রবর্তক, আমাদের দৃষ্টিতে যিনি একজন ভাল সাধু ছিলেন, ভাল ক্যাথলিক ছিলেন; তিনিও চার্চগুলির দুর্নীতি ও অব্যবস্থা দেখে চুপ থাকতে পারলেন না। এরপর তিনি ধর্মকে নিয়ে, পাপকে নিয়ে, মুক্তিকে নিয়ে, যীশু কিভাবে মানুষকে উদ্ধার করেন, এসব নিয়ে বলতে শুরু করলেন। এটাই আস্তে আস্তে হয়ে গেল অন্য একটি ধর্ম। যুক্তি তর্ক দিয়ে যে একটা ধর্ম দাঁড়াতে পারে, চিন্তাই করা যায় না; তবে ভিত্তিটা মূল বাইবেল ছিল বলে বেঁচে গেল।

ইসলামের ক্ষেত্রেও একই জিনিস, কোরানে যে কথাগুলো বলা হয়েছে, সেটাকে পালন না করাটাই পাপ। হিন্দুদের শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে আমরা দেখি, যে অর্থে বিদেশী ধর্মে পাপ জিনিসটাকে

দেখা হয়, হিন্দুরা ওই ভাবে পাপকে দেখেন না। কারণ আমি যেটাকে ঠিক মনে করি, আপনি সেটাকে ঠিক নাও মনে করতে পারেন; আমার যে জীবনধারা, সেটা আপনার জীবনধারা নয়। যেমন, আপনারা যাঁরা এখানে গীতার কথা শুনছেন, বেশির ভাগই গৃহস্থ ধর্ম পালন করছেন। আপনাদের কাছে স্বামী-স্ত্রীর যে সম্পর্ক, এটা পাপের কিছু নয়। ধর্ম আগেই এর অনুমতি দিয়ে রেখেছে। কিন্তু সন্ন্যাসী তা করতে পারেন না। তার মানে সন্ন্যাসীর জন্য যেটা পাপ, আপনাদের জন্য সেটা পাপ নয়। আবার অনেক কিছু আছে, যেটা আপনার কাছে পাপ, সেটা সন্ন্যাসীর কাছে পাপ না। তাহলে কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল?

মহাভারত যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা দেখে থাকবেন মহাভারত বারবার এই জিনিসটাকে নিয়ে এসেছে –ধর্ম কি। ওনারা তখন বলবেন, *মহাজনো যেন গতাঃ স পন্থা*, মহাপুরুষরা যেটা করে গেছেন সেটাই ধর্ম। তাহলে ধর্ম কি, পাপ কি, ঠিক কি, ভুল কি? যদি আমরা বলে দিতে পারি পাপ কি, তাহলে আমরা পাপ থেকে মুক্তির উপায়ও বার করতে পারব। পাপ বলতে আমরা মনে করি, বাচ্চা বয়স থেকে আমরা সবাই তিনটে জিনিস করি, এখানে হিন্দুদের কথাই বলা হচ্ছে, আমরা অন্য ধর্মে যাচ্ছি না; মা-বাবা বড়রা আমাদের কি শিখিয়ে দিয়েছেন, সমাজের যাঁরা গুরুজন, যাঁরা আদর্শ পুরুষ তাঁরা কি শিখিয়েছেন, এটা হল প্রথম। দ্বিতীয়, যদিও বেশির ভাগ লোকই শাস্ত্র পড়ে না, তাতে কিছু আসে যায় না, আপনি যে শাস্ত্র পড়েন, আমরা ধরেই নিচ্ছি এই কথাগুলো হল তাঁদের জন্য যাঁরা আধ্যাত্মিক মানসিকতা সম্পন্ন, যাঁরা ধর্ম পথে আছেন; যে শাস্ত্র আপনি পড়লেন বা পড়ছেন, সেখান থেকেও শাস্ত্রের কিছু কিছু জিনিস আপনার বোধগম্য হল।

শেষে গুরুর কাছে গিয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন, মন্ত্র দীক্ষা নিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ, স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ, এনারা important না, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারাই এখানে গুরু। এখানে যে 'গুরু মহারাজজী' বলা হয়, ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়। রামকৃষ্ণ মিশনে যাঁরা মন্ত্রদীক্ষা দিচ্ছেন, এনারা হলেন সেই মুখ, যেখান থেকে মন্ত্রটা বেরিয়ে এল। এই যে ঠাকুরের ভাবধারা, বা যেখান থেকে, যে কোন সম্প্রদায় থেকেই আপনি দীক্ষা নিয়ে থাকুন না কেন, তাঁদের ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও তাঁদের নিজস্ব অনুশীলনের উপর কিছু কথা থাকে, সেগুলোকে নিষ্ঠার সাথে পালন করা, এটাই হল তৃতীয়।

এবার এই তিনটেকে মেলাতে হবে। কাদের সাথে বা কিসের সাথে মেলাতে হবে? সমাজের যাঁরা আদর্শ পুরুষ, মা-বাবা বা বড়দের কাছে থেকে ছোটবেলা থেকে যা শিখেছি, শাস্ত্র অধ্যয়ন করে মনের মধ্যে যে ভাব তৈরী হয়েছে এবং শেষে, আমরা যেখান থেকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করে অনুপ্রাণিত হয়েছি এবং যেটা আমরা পালন করছি; এই তিনটেকে মিলিয়ে মানুষ নিজের মত একটা ভাব তৈরী করে নেয়।

এই জায়গাতে এসে হিন্দু ধর্ম অন্য ধর্ম থেকে পুরো আলাদা হয়ে যায়। একজন মুসলমানকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, ভাই, এটা করা কি পাপ? সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তর দেবে, আমরা কোরানে বলা আছে এটা পাপ, তাই এটা পাপ। যদি তার কোন সংশয় হয়, তখন দেওবান্দাদির মত যেসব জায়গা আছে, সেখানে তার সংশয়ের ব্যাপারে জানাবে, আমার এই সমস্যা হয়েছে, বলুন কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক না? ওনারা তখন কোরান, হাদিস এবং ওদের অন্যান যা যা ধর্মগ্রন্থ আছে, সেগুলোকে দেখে একটা বিচার দিয়ে দেবেন, এই সমস্যার ক্ষেত্রে এই এই বিচার। তখন বলবে, এই যে বিচার হল, এসব ক্ষেত্রে তোমার এই এই রকমটি করা ঠিক, আর এর বিপরীত করাটা পাপ।

হিন্দুদের এভাবে কোন কিছু ঠিক করা হয় না। আর হিন্দুদের তো একটা শাস্ত্র নেই, অনেক শাস্ত্র আছে। যেমন যাঁরা তন্ত্র মতে চলেন, তাঁরা আমিষ আহার করেন, শক্তি মতে যাঁরা চলেন তাঁরা

মাংস খান। পঞ্চ মকার সাধনে তাঁরা মদ মাংস সবই খান। কিন্তু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরা এগুলোর কোনটাই খান না। মূল হল, আমার যিনি গুরুজন, আমি যে শাস্ত্রকে পালন করি, আমি যাঁর কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছি, এই তিনজনকে মিলিয়ে আমার মনে নিজের মত একটা ভাব তৈরী হয়ে যায়। আমি জানি আমার জন্য কোনটা ঠিক, আমি জানি আমার জন্য কোনটা ভুল। কদাচিৎ কখন সন্দেহ হয়, এটা কি ঠিক, এটা কি ভুল, তখন যাঁরা আমার পরিচিত গুরুজন তাঁদের আমি জিজ্ঞেস করি। যেমনি আমি উত্তর পেয়ে গেলাম, আমার যে বুদ্ধি, সে বিচার করবে, বিচার করে নিজের মত একটা আইডিয়া করে নেবে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, ব্যক্তিগত ভাবে এটা শুনে অনেকের হয়ত ভাল নাও লাগতে পারে। ঠাকুর বলছেন সত্য কলির তপস্যা, তাই ঠাকুরের ভক্তকে সত্য কথা বলতে হয় বা সত্যের অনুশীলন করতে হয়। আবার ঠাকুরের অনেক ভক্ত আছেন, যাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে মনে করেন, কারুর ভাল করার জন্য আরামসে মিথ্যা কথা বলে দেওয়া যেতে পারে। মোদ্দা কথা, এই মিথ্যা কথা বলাতে নিজের কোন স্বার্থ না থাকলেই হল। অনেকে হয়ত মনে করতে পারে, যেহেতু উনি মিথ্যার আশ্রয় নিলেন, সেইহেতু তিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ নন। ঠিকই তিনিও মনে করছেন, আমি আধ্যাত্মিক পুরুষ নই, কিন্তু আমি এই রকমই। এখানে আইডিয়াটা কি? আইডিয়াটা হল, যে আইডিয়াটা আপনি ভিতরে তৈরী করে নিয়েছেন, আপনার মধ্যে যে ভাব তৈরী হয়ে গেছে, যেখানে গিয়ে আপনার বাবা-মার দেওয়া ট্রেনিং, গুরুজনদের কথাগুলো, তার সাথে শাস্ত্র, যেটাকে আপনি অনুসরণ করেন এবং যাঁকে আপনি গুরুর আসনে বসিয়েছেন, তিনি দীক্ষা গুরু হন, শিক্ষা গুরু হন, তাঁদের কথাগুলো, এই সব কিছুকে মিলিয়ে মনের মধ্যে একটা ভাব তৈরী হয়, এটাই হল আপনার আমার জন্য standard। এই standarকে যখন কেউ অতিক্রম করে তখন সেটা পাপ হয়। আশা করা যায় এই জিনিসটাকে আমি পরিষ্কার করতে পেরেছি।

হিন্দু মতে পাপ কি? আমার মনে যে ভাব, যেমনি ওই ভাবকে কেউ অতিক্রম করবে, ওটাই পাপ। ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন, যেটা করলে মন খুঁত খুঁত করে সেটাই পাপ। আপনি বলতে পারেন, কেন, যে খুনী, খুন করতে তার মন তো খুঁত খুঁত করে না। ঠিক বলছেন, তার কাছে ওটা কোন পাপ না। কিন্তু এখন সে যেটা করছে, তার একটা ফল সে পাবে, আজ পাক কিংবা কাল পাক। দেখা যায়, যারা নামকরা ক্রিমিনাল, তারা অনেক সময় খুব কষ্ট পায়। আমরা এক জন্মের থিয়োরিকে মানি না, আমরা জন্মজন্মান্তর কে মানি। নামতে নামতে এতটাই অধঃপতন তার হয় যে, যখন সে বলে, নাঃ, আমি আর এই কাজ করব না। তখন তার সৎ পথে আসা শুরু হয়। সৎ পথে যখন আসা শুরু হয়, তখন তার ওই ভাবটাও ধীরে ধীরে আসতে শুরু হয়, যেখান থেকে সে পতন হয়ে হয়ে কোথায় পড়ে গিয়েছিল। ঠাকুর বলছেন, কেল্লায় যেতে যেতে কত নীচে চলে এসেছেন, বোঝাই গেল না কত নীচে চলে গেছেন। আচার্য শঙ্কর বলছেন, একটা সিঁড়িতে যদি বল ফেলে দেওয়া হয়, বলটা ড্রপ খেতে খেতে কোথায় যে নেমে চলে যায় বুঝতেই পারে না, নীচে পড়তেই থাকে। যে ডুবতে থাকে সে বুঝতে পারে না, কতটা ডুবে গেলাম।

কিন্তু আমরা এখানে এদেরকে নিয়ে আলোচনা করছি না, আমাদের আলোচনা হল, যাঁরা ধর্ম পথে আছেন তাঁদের কথা। আপনার মনে একটা ভাব আছে, ওই ভাবটা পাল্টাতে থাকে। আপনি পাঁচ বছর আগে যে রকম ছিলেন, আজকে আপনি তা নন। এমনকি আপনি যেদিন থেকে গীতা শুনতে শুরু করলেন, তখন যেমন ছিলেন, আজ আপনি সেই রকম নন। যীশু বাইবেলে খুব সুন্দর বলছেন, It is better to marry than to burn, যীশু চাইতেন না তাঁর শিষ্যরা বিয়ে করুক। কিন্তু তার সাথে উনি বলে দিচ্ছেন, বিয়ে করে নাও বাবা, কামের জ্বালায় ভিতরে পুড়তে থেক না। উদ্দেশ্য হল, ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাওয়া, অন্য কিছু না। এই ভাবটা আপনার মনে তৈরী হয়ে গেলে, এই ভাবটাই আপনাকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাবে। যেমনি কোন পরিস্থিতির কারণে এই

ভাবের সাথে যদি আপনাকে আপোষ করতে হয়, তখনই মন খুঁত খুঁত করতে থাকবে। মন একবার খুঁত খুঁত করতে শুরু করলে মন আপনাকে আর শান্তিতে থাকতে দেবে না, এটাই পাপ।

কিন্তু এই যে আমরা মাঝে মাঝে আমার ভাব যেটা, সেটাকে অতিক্রম করে ফেলি, এটা কেন হয়? এই লক্ষণরেখাকে যাতে আমরা অতিক্রম না করি, তার জন্য আমরা কি কি করতে পারি? এবার তেত্রিশ চৌত্রিশ থেকে শেষ পর্যন্ত ভগবান এই জিনিসটাকে নিয়েই আলোচনা করবেন। আমরা জানি কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল, কিন্তু ডাকাত যেমন সব ছিনতাই করে নিয়ে চলে যায়, ঠিক তেমনি কোন একটা অদৃশ্য শক্তি এসে আমাদের মনকে টেনে ভুল পথে নিয়ে চলে যায়। পাপ কি? পাপ হল নিজের পথকে ছেড়ে দেওয়া? তাহলে কি আমরা নরকে যাব?

হিন্দুরা নরক বলে কিছু আছে কিনা জানেই না। প্রথমে মুসলিমরা এবং পরে খ্রীশ্চানরা আসার পর তাদের কাছ থেকে শিখে আমরা নরকের একটা ধারণা তৈরী করে নিয়েছি। বিধর্মীরা তো আমাদের পাতাল লোককে নরকের সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। আমরা জানিই না নরক কি। আমাদের কাছে পাপ জিনিসটা হল অনেকটা এই রকম –হাওড়া স্টেশনে কিছু ট্রেন আছে যেগুলো পুরীর দিকে যায়, আবার কিছু ট্রেন আছে দিল্লীর দিকে যায়, কিছু ট্রেন আছে যেগুলো উত্তর ভারত, আসামের দিকে যায়। হাওড়া স্টেশন থেকে জামসেদপুর যে ট্রেন যায়, সেটা ইস্টার্ন রেলওয়েজের প্ল্যাটফরম থেকেই ছাড়ে, তার পাশেই আবার দিল্লীর ট্রেন ছাড়ছে, তার পাশেই আবার আসামের ট্রেন ছাড়ছে। পাশাপাশি তিনটে প্ল্যাটফরমে তিনটে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, একটা আমাদের দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাবে, একটা পশ্চিম দিকে নিয়ে যাবে, একটা উত্তর দিকে নিয়ে যাবে। পাপ মানে কি? আমি যেতে চাইছিলাম পুরী, কিন্তু আমার মনে হল এই ট্রেনটা দেখতে খুব সুন্দর, আমি চেপে বসলাম।

আমার নিজেরই একবার এই জিনিস হয়েছিল, তখন ব্রহ্মচারী ছিলাম, বয়স অল্প, মাঝে মাঝে বিচিত্র জিনিস করে ফেলতাম। রাঁচি থেকে নিজের জায়গা দেওঘর আসছি। আমি জানি কোন বাস দেওঘর যাবে, তখনকার দিনের রাজ্য পরিবহনের লড়ঝড়ে বাস। দেখলাম একটা খুব ভাল লাক্সারি বাস দাঁড়িয়ে আছে, সেটা আবার অন্য রুট দিয়ে যাবে। ভাল বাস দেখে উঠে পড়লাম, আরাম করে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যাব। দেওঘর পৌঁছাতে যেখানে আমার আট ঘন্টা লাগার কথা, সেখানে লাগল ষোল ঘন্টা। অনেক রাস্থা ঘুরে ঘুরে পৌঁছাল। তারপর আমি কান ধরলাম, আর না। এগুলোই হল রাস্থা পাল্টে নেওয়া। একটা ভাল কিছু দেখলাম উঠে পড়লাম, তারপর দেখছি কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেছে, ফিরে আসতে আবার সময় লাগবে। মাঝখান থেকে যন্ত্রণা, আট ঘন্টার জায়গায় ষোল ঘন্টা, খাওয়া নেই দাওয়া নেই। পাপ মানে এটাই। আমি জানি এটা ঠিক, আমি যে এটা করতে চাইনা, তাও না; কিন্তু কি এমন একটা হয়ে যায়, টেনে অন্য দিকে নিয়ে চলে যায়। আমি এমনটা করতে চাইছি না, কিন্তু মন টেনে সেই কাজটাই করতে ঠেলে দেবে। অনেক ইয়ং ছেলে তাদের সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে আসে, এসে বলবে আমি ওর দিকে মন দিতে চাই না, কিন্তু কি করব আমি পেরে উঠছি না। এটাকেই ভগবান তেত্রিশ নম্বর শ্লোক দিয়ে বলয়র শুরু করছেন –

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।।৩৩।।

(জ্ঞানীও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কার্য করেন, অজ্ঞের কি কথা? প্রাণিগণ স্ব স্ব প্রকৃতিকে অনুসরণ করে; [এজন্যই মদুপদিষ্ট স্বধর্মাচরণ করতে পারে না] সুতরাং আমার বা অন্যের শাসন বা নিষেধে কি ফল হবে?)

মানুষ নিজের প্রকৃতির মত সব কিছু করতে থাকে। প্রকৃতি কি? স্বীয় প্রকৃতিকে আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর পরিভাষিত করছেন, *পূর্বকৃৎধর্মাধর্মাদিসংস্কারো বর্তমানজন্মাদৌ অভিব্যক্তঃ সা প্রকৃতিঃ*। আমাদের হিন্দুদের আধ্যাত্মিক জগতের অনেক কিছু ঘটনা আমাদের সত্যিই খুব আশ্চর্যের মনে হয়।

তার মধ্যে একটা হল, আচার্য শঙ্করের জীবন, যিনি তাঁর ষোল বছর বয়সের মধ্যে সমস্ত ভাষ্য লিখে দিয়েছিলেন। এটা আমাদের কাছে অসম্ভব লাগে। ষোল বছর বয়সে জগৎ ও আধ্যাত্মিকতার এত পরিপক্কতা কি কারুর হতে পারে? ষোল বছর না হোক যদি তিরিশ বছরও ধরে নেওয়া হয়, কারণ এটা সবাই মানছে যে বত্রিশ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেছেন, সেখানে তিরিশ বছরকেও যদি মানা হয়, তাহলেও এই তিরিশ বছর বয়সে এত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা কি করে সম্ভব? এক হয় ঈশ্বর যদি নিজে এসে থাকেন, কিংবা ঈশ্বর নিজে যদি বিশেষ শক্তি দিয়ে থাকেন, তবেই মানুষ এই বয়সে বৌদ্ধিকতায় ও জ্ঞানে এত বিচক্ষণ ও পরিপক্কতা লাভ করতে পারেন।

কি বলছেন আচার্য? *পূর্বকৃৎ*, আগের আগের জন্মে আপনি যে ধর্ম-অধর্মাদি পালন করেছেন; ধর্ম হল গুরুর কথা শুনে সেই অনুসারে এগিয়ে যাওয়া, অধর্ম হল সেই অনুসারে না করা; জগতে কোন মানুষ নেই যে ধর্ম পালন করে না, আর কোন মানুষ হয় না, যে অধর্ম পালন করে না। আজকে আমরা ঠাকুরকে বলছি অবতার, আমরা মানছি তিনি অবতার, আমরা এও মানছি, তিনি আমাদের উদ্ধার করবেন। কিন্তু ঠাকুরের ছোটবেলার দুষ্টুমির দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন, ওই দুষ্টুমিকে আমরা অধর্ম বলছি না, কারণ তখন তাঁর বয়স কম ছিল, কিন্তু এ-রকম অনেকেই অনেক কিছু করে থাকেন। এই ধর্ম ও অধর্ম মিলিয়ে মানুষের পুরো একটা সংস্কার তৈরী হয়। বলছেন, আগের আগের জন্মে আপনি যে ধর্ম ও অধর্মাদি পালন করে আপনার যে সংস্কারের পুঁটলিটা তৈরী হয়েছে, বর্তমান জন্মে এসে ওই সংস্কারের পুঁটলিটা অভিব্যক্ত হয়। আমার আগের আগের জন্মের ধর্ম ও অধর্ম কৃত সংস্কারের সবটাই কি এই জন্মে অভিব্যক্ত হচ্ছে? তা কখনই হয় না। আমার পিঠে একটা বড় বোচকা চাপানো আছে, যেটা চোখে দেখা যায় না।

এই শরীর একটা এটিএম কার্ড আর আমার যে সংস্কার বা প্রকৃতি, এটা হল ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স। এটিএম কার্ড লাগালে যেমনটি ব্যালেন্স আছে তেমনটিই বেরিয়ে আসবে। আবার অন্য দিকে আমি টাকা জমাচ্ছি, টাকা তুলছি, আবার জমা দিচ্ছি, সব জমছে। এটিএম লাগালে টাকা যদি থাকে টাকা বেরিয়ে আসবে। আমি চাইছি ভাল কাজ করতে, কিন্তু করতে পারছি না, ইচ্ছেই হচ্ছে না, কেন? কারণ ওই ব্যাপারে আগে এত বেশি অধর্ম করে রেখেছি, ধর্ম করতে চাইলেও আমি পারব না। আড় চোখে বদমাইশি করার দিকে তাকাবোই তাকাবো, উপায় থাকে না। এই ধর্ম আর অধর্ম, এটা প্লাস মাইনাস না, সমষ্টি রূপে একটা পোটলাতে জমিয়ে রাখা হয়েছে, যেটা এই জন্মে অভিব্যক্ত হচ্ছে। অনেক কিছু আছে, যেটা এই জন্মে অভিব্যক্ত হবে না। কারণ এত প্রচুর পরিমাণে মজুত হয়ে আছে যে, এক জন্মে সব অভিব্যক্ত হবার সুযোগই পাবে না। প্রচুর পরিমাণটা কি রকম?

জয়ললিতার বাড়িতে সিবিআই তল্লাশী করতে এসে সাতশ জোড়া জুতা পেয়েছিল, তার মানে শাড়ি কত আছে ভগবান জানেন। কিন্তু বাড়ির বাইরে কোথাও যখন যান, একটা কি দুটো সুটকেশ নিয়ে যাবেন, সেটাতে করে সীমিত সংখ্যক শাড়ি জুতো নিয়ে যাবে। তার মানে এই নয় যে, তার স্টক শেষ হয়ে গেছে। এই শরীরটার কাজ হল সুটকেশটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া। তার মানে সুটকেশটাই সব না, বাড়ির আলমারিতে বা গোডাউনে এখনও অনেক স্টক আছে। বাড়ি ফিরে আবার যখন নূতন যাত্রায় বেরোবে তখন সুটকেশে আরও নূতন ডিজাইনের, নূতন ফ্যাশানের শাড়ি ভরে বেরোবে। এটাকে বলে প্রকৃতি। সুটকেশের শাড়ি বা ড্রেসগুলিকে মনে রাখতে হবে, যেগুলো নিয়ে বেরিয়েছি, ওগুলোর মধ্যেই আমাকে ঘুর ঘুর করতে হবে। এরপর আবার নূতন জন্ম যখন আসবে, তখন নূতন প্রকৃতি আসবে। এই প্রকৃতিই আমাদের জ্বালিয়ে যাচ্ছে। আপনার অনেক কিছু থাকতে পারবে, কিন্তু ওটা অভিব্যক্ত হবে না; কর্ম মানে এটাই। কিছু কর্ম এই জন্মে বেরিয়ে যাবে, কিছু কর্ম আগামী জন্মে বেরোবে, কিছু কর্ম আছে যেগুলো গত জন্মে বেরিয়ে গেছে। আমি যদি চাই আমার এই জিনিসগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করব, তাতেও আমি পারব না। কারণ আমার সুটকেশে ঐটাই আছে, ঐটাই আমাকে এই জন্মে বার করে নিয়ে এসেছে। এখানে জিনিসটাকে বোঝার আছে।

হিন্দু মতে স্বর্গ, পুনর্জন্ম, মুক্তির জ্ঞান আসে ঋষিদের কথা থেকে। ঋষি হলেন, যাঁর মন পবিত্র, যিনি ধ্যানের গভীরে গিয়ে যে সত্যগুলিকে প্রত্যক্ষ করেন, সেই সত্যগুলিকেই তিনি আমাদের দিয়ে যান। ঋষিদের এই সত্যগুলিকে নিয়ে প্রশ্ন করার উপায় নেই, আর করতেও নেই। কারণ আমরা যদি প্রশ্ন করতে শুরু করি, তাহলে আমাদের পায়ের তলায় দাঁড়াবার কোন মাটি থাকবে না। আমরা নিউটনের কথাকে বিশ্বাস করতে পারি, ডারউইনের কথাকে বিশ্বাস করতে পারি, কার্ল মার্ক্সের কথাকে বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু ঋষিদের কথাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। অন্যদের মনে তাও কিছু লোভ ছিল, কিছু প্রত্যাশা ছিল। ঋষিদের মনে লোভ দূরে থাক, কোন প্রত্যাশাই ছিল না।

আমাদের একবার ভেবে দেখা উচিৎ, আজকের বিশ্বের ইতিহাসে বড় বড় বিখ্যাত যত ব্যক্তিদের নাম আমরা জানি, প্রত্যেকটি ব্যক্তি হলেন খুনী। আলেকজাণ্ডার একজন খুনী, জুলিয়াস সিজার একজন খুনী, চেঙ্গিস খাঁ একজন খুনী, স্ট্যালিন একজন খুনী, মাও একজন খুনী, এরাই হলেন জনসাধারণদের লীডার। এদের কথা শুনে এদের দেশ ও সমাজ লাফালাফি করছে। চেঙ্গিস খাঁ নিজের দেশে একজন আদর্শ পুরুষ। আর যাঁরা ঋষি, যাঁরা সবারই জীবনে শান্তি দিয়ে গেছেন, তাঁদেরকে মানব না?

চার্চিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ডকে জয় এনে দিয়েছিলেন, একটা গৌরবের জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৫০ সালে টাইম ম্যাগাজিন তাঁকে বিশ্বের দ্বিতীয় সম্মানিত ব্যক্তির স্থান দিয়েছিল। সেই চার্চিল গান্ধীজীকে বলতেন naked Fakir, কোন দিন গান্ধীজীর সাথে দেখাই করলেন না। সেই বৃটেন সরকার আজ গান্ধীজীর নামে মুদ্রা বার করতে যাচ্ছে। কারণ গান্ধীজী ছিলেন শান্তির দূত, সর্বজনস্বীকৃত। আমরা কেন এই ঋষিদের কথা শুনব না! ঋষিদের কথা যে শুনতে চাইবে না, ধর্ম তার জন্য নয়।

কেউ যদি ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা করতে চায়, তবে তাকে নিউটন, আইনস্টাইনকে মেনে তারপর তাকে ফিজিক্সে এগোতে হবে। যে কোন বিষয়কে নিয়ে যদি কেউ পড়াশোনা করতে চায়, তাহলে সেই বিষয়ের যাঁরা ফাউণ্ডারস বা অথরিটি, সেই বিষয়ের যাঁরা বড় বড় পণ্ডিত, তাঁদেরকে আগে পড়তে হবে। পরে যখন সেও একজন বড় পণ্ডিত হয়ে যাবে, তখন সে বলতে পারবে যে, এই জায়গাতে আমি মানতে পারছি না, বদলে তখন সে একটা নূতন থিয়োরী নিয়ে আসবে।

ধর্মের ক্ষেত্রেও একই জিনিস প্রযোজ্য, ঋষিরা যা যা বলে গেছেন, সবাইকে সেটা মানতে হবে। আপনিও যেদিন একজন মহাপুরুষ হয়ে যাবেন; যেমন ঠাকুর, তিনি প্রথম শুরু করছেন আমাদের সেই প্রচলিত মতকে অবলম্বন করেই, এরপর তিনি আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যকে জয় করে নিলেন, তখন তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক জগতের আরও অনেক কিছু জিনিস দিলেন, আপনিও তখন দেবেন। প্রথমেই যদি কেউ প্রশ্ন করতে শুরু করে, তাহলে বুঝতে হবে, ধর্ম পথ তার জন্য নয়। ধর্ম পথে আগে গুরুর পাদপদ্মে মাথা নত করতে হয়। বাইবেলে যীশু একা বলে গেছেন, কোরানে মহম্মদ আল্লার কথা একাই বলে গেছেন। কিন্তু এখানে বিভিন্ন ঋষিরা একই কথা বিভিন্ন ভাবে বলে গেছেন। শুধু পতঞ্জলি যোগ দর্শনেই না, বেদান্তেও সেই একই কথা, অন্যান্য দর্শনেও সেই একই কথা ঋষিরা বলছেন। কি সেই কথা?

সৃষ্টিতে যবে থেকে আপনি এসেছেন, সেই থেকে আজ পর্যন্ত যা ভাল-মন্দ করেছেন, সবটারই সংস্কার আপনার কাঁধে পুটলি করে চাপিয়ে দেওয়া আছে। এক-একটা জীবন যখন আসে, তখন কিছু সংস্কার যেটা সেই দেহের উপযোগী এবং সমাজের জন্য যেটা উপযোগী, সেই সংস্কারগুলিই বেরোবে। আপনার ভিতর যে হিংস্র ভাব, সেটা এই দেহে বেরোবে না। কিন্তু কদাচিৎ যদি আপনি সিংহ দেহ নিয়ে জন্মান, তখন আপনার জমে থাকা হিংস্র ভাবটা বেরিয়ে আসবে।

অনেক সময় দেখা যায়, যে পরিবারে, যে সমাজে আমি আছি, সেখানে আমার কিছুই ভাল লাগে না। কারণ আমার যে সংস্কারগুলো জমে আছে সেটা সেখানে খাপ খাচ্ছে না বলে বেরোতে পারছে না। এতে অনেক মানসিক সমস্যা তৈরী হয়। তখন কায়দা করে তার মনের ইচ্ছাটা বার করতে হয়ে, তোমার কি ভাল লাগে, বুঝে নিয়ে সেই অনুযায়ী তার আচরণ করার সুযোগ করে দিতে হয়। কারণ আমরা তো পরিস্থিতিকে পাল্টাতে পারব না, কিন্তু তার ভিতরের শুভ সংস্কার যা আছে, সেটাকে বার করার ব্যবস্থা করে নেওয়া যায়।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এটাই বলছেন, তোমার প্রকৃতিই এই রকম, তুমি চাইলেও এর অন্যথা কিছু করতে পারবে না। শেষে অষ্টম অধ্যায়ে গিয়ে ভগবান আবার এই কথাই বলবেন, *প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি*, তুমি যে বলছ তুমি সন্ন্যাস নিয়ে নেবে, তুমি যে বলছ ব্রাহ্মণদের মত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবে, এখন হয়ত তুমি সাময়িক উত্তেজনায় এই পথে যাবে, কিন্তু দুদিন পরেই তুমি তোমার স্বভাবে আবার ফিরে আসবে। কারণ তোমার প্রকৃতিতেই আছে যুদ্ধ করা। বেড়াল বলে মাছ খাব না কাশী যাব। কিছু দূর গিয়ে যখন খিদে পাবে তখন সে কি খাবে, ওই মাছের দিকেই তাকে যেতে হবে। প্রকৃতি কখন পাল্টায় না।

প্রকৃতি যদি নাই পাল্টায় তাহলে আমরা সবাই ভাল কি করে হব? তাহলে আমি কি চক্রের মধ্যে বাঁধা হয়ে পড়ে থাকব? নাগরদোলায় যেমন ঘুরতেই থাকে, এভাবেও কি আমাদের সবাইকে ঘুরতে হবে? আমি নাগরদোলা থেকে নামতে চাইছি, কিন্তু ঘুরেই যাচ্ছে। *পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্*। আমি বেরোতে চাইলেও এর থেকে বেরোতে পারব না। সেই সুখ-দুঃখ আমাকে নাচাতে থাকবে, শুভ-অশুভ আমাকে দিয়ে কাজ করাতে থাকবে, বেরিয়ে আসতে পারব না। আর এই প্রকৃতি, যেটা আমাকে বেঁধে দিয়েছে, এই প্রকৃতি আমারই সৃষ্টি করা। ভগবান কিছু দেন না, কেউ কিছু দেয় না। কথা কথায় আমরা বলি, তুমি আমার জীবনটা সর্বনাশ করে দিয়েছ, কেউ কারুর সর্বনাশ করে না। মেয়েরা বিয়ের পর বলে, এই বাড়িতে বিয়ে হয়ে আমার জীবনটা বিফলে গেল। একজন আবার মজা করে বলছেন, তোমাকে বিয়ে করার থেকে ভাল হত, যদি একটা রাক্ষসকে আমি বিয়ে করতাম। স্বামীও খুব রসিক লোক, সে তার প্রত্যুত্তরে বলছে, আপনজনের মধ্যে কি বিয়ে হয় গা? আমি মনে করছি এই লোকটা আমার শেষ করে দিয়েছে; কেউ শেষ করে না, নিজেই নিজেকে শেষ করে। জন্মজন্মান্তর ধরে যে ধর্ম-অধর্ম আমরা নিয়ে এসেছি, কিছুটা এই জন্ম থেকে এনেছি, এই প্রকৃতি আমাদের আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে। এই প্রকৃতি নাকে দড়ি দিয়ে আমাদের নাচিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা বাঁচব কি করে? গীতাই বলে দিচ্ছেন –

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি, হে অর্জুন, তুমি চেষ্টা করলেও এই প্রকৃতির হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। ঠাকুরও বলছেন, জীব একেবারে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। তারপর আবার বলছনে, ইস্ক্রুপ মারা, যাতে খুলতেও না পারে। কোথায় বাঁধা? কামিনী-কাঞ্চনে? না, আমার প্রকৃতিতে, আমার স্বভাবে। তাহলে উপায় কি, বাঁচব কি করে? তখন বলছেন, উপায় আছে, এটা থেকে বাঁচা যায়। কি ভাবে –

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ।।৩৪।।

(সকল ইন্দ্রিয়েরই অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ভেদে যথাক্রমে আসক্তি ও বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। কিছুতেই এদের বশীভূত হবে না। কারণ, এই দুটি জীবের শ্রেয়োমার্গের প্রতিকূল।)

আমরা সবাই ইন্দ্রিয় দিয়েই সব কাজ করি, চোখ দিয়ে দেখছি, কান দিয়ে শুনছি; ইন্দ্রিয়গুলি সব সময় নিজের নিজের বিষয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। খুব সাধারণ উদাহরণ, একজন

গান খুব ভালবাসেন। তিনি এখন সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। সন্ন্যাসী হয়ে তিনি বললেন, 'আমি আর গান করব না, আমি আমার পুরো মনটাকে ঈশ্বরের দিকে দেব'। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে একজন গণিতজ্ঞ সন্ন্যাসী ছিলেন, তিনি গণিত ছাড়া কিছুই করতে পারতেন না। আরে ভাই, তাহলে তুমি সন্ন্যাসী হলে কেন? সন্ন্যাসী হয়েছ মানেই, ফিজিক্স, ম্যাথমেটিক্স, বায়োলজি, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং সব কিছু ছেড়ে এখন বলবে, আমি ঠাকুরের পায়ে এলাম। তোমাকে যদি ওই লাইনেই বড় কিছু হতে হয়, তাহলে তুমি এখানে এলে কেন? যিনি গান খুব ভালবাসতেন, সন্ন্যাসী হওয়ার পর তাঁর কানে যদি কোন ভাল গান ভেসে আসে, ওনার মনটা স্বাভাবিক ভাবেই সেই গানের দিকে যাবে। কারণ তাঁর প্রকৃতিতেই রয়েছে গানের প্রতি আকর্ষণ, গানের দিকে মন যাবেই। গান একটা ধ্বণি, সেই ধ্বণি তাঁর যে ইন্দ্রিয় কর্ণ, সেখানে যখন স্পর্শ করবে, ভাল গান হলে সে তখন মনে মনে নিজেকেই বলবে, বাঃ খুব সুন্দর গান তো।

আমার চোখ দৃশ্য দেখতে ভালবাসে, সুন্দর চেহারা দেখতে ভালবাসে, যাকে ভালবাসি তার দিকে দৃষ্টি যাবেই। *ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে*, এই যে ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের এক অপরের প্রতি আকর্ষণ, এর মাঝখানে বসে আছে সমস্ত সমস্যার মূল – রাগ আর দ্বেষ। রাগ মানে আসক্তি, একটা জিনিসকে ভাল লাগা; দ্বেষ মানে একটা জিনিসকে অপছন্দ করা। আমরা জন্মজন্মান্তর ধরে যে ধর্ম ও অধর্ম করে আসছি, এর ফল হল – কিছু জিনিস আমাদের ভাল লাগে, কিছু জিনিস আমাদের খারাপ লাগে। খারাপ জিনিস থেকে আমি দূরে থাকতে চাই, আমার খারাপ লাগা জিনিস অন্যের হয়ত ভাল লাগে। যেমন অনেকের মদ্যপান করতে ভাল লাগে, অনেকে তো কল্পনাই করতে পারে না। অনেকের কাছে শুটকি মাছ খুবই উপাদেয় একটা খাদ্য, আবার অনেকের নাকে গন্ধ গেলেই বমি করতে শুরু করে দেবে। এক-একজনের এক-এক রকমের প্রবৃত্তি।

তাই বলে শুটকি মাছ যাদের খুব উপাদেয় তারা কি ভাল? একেবারেই না। শুটকি মাছের গন্ধে যাদের বমি আসে, তারা কি ভাল? একেবারেই না। তারা এক রকম, ওরা আর-এক রকম। সেখানে বসে আছে ভাল লাগা আর ভাল না লাগা। একটা ভাব তৈরী হয়ে যায়, এর উপর আগে আমরা আলোচনা করছিলাম। যেমন আমি ঘরবাড়ি ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গেলাম, আমার এবার একটা ভাব তৈরী হয়ে গেল। সন্ন্যাস হওয়ার আগে কিছু জিনিস আমি আমার বাড়িতে শিক্ষা পেয়েছিলাম, সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার পর আরও কিছু শিখলাম, ঠাকুরের ভাবধারায় থেকে, সাধু সঙ্গ করে আরও কিছু শিখলাম। সব কিছু মিলিয়ে আমার একটা ভাব দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু আমার যে বর্তমান জীবনযাত্রা চলছে, সেখানে ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলো রয়েছে, আর আমার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বসে আছে রাগ আর দ্বেষ, কিছু জিনিসের প্রতি প্রীতি, কিছু জিনিসের প্রতি অপ্রীতি। রাগ আর দ্বেষ, প্রীতি আর অপ্রীতি – এটা হয় কামের জন্য, যার আর-একটা নাম কামনা বা তৃষ্ণা।

যাঁরা শাস্ত্রের কথা শুনছেন, সাধুসঙ্গ করছেন, তাঁরা বুঝতে পারেন, আমি যে পথে যাচ্ছি, সেখানে এই পথে এই জিনিসটা করা যায় না। কিন্তু এটাও জানেন, আমি যে পথে যাচ্ছি, সেই পথে আমার প্রলোভন তৈরী করতে অনেক উপকরণ আসবে। তখন সেখানে কি করতে হয়? নিজের রাগ ও দ্বেষকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। এই জিনিসটা বুঝতে আমাদের হয়ত অসুবিধা হচ্ছে। একটা খুব সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

অনেক আগেকার কথা, আমাদের এখানে একজন খুব জ্ঞানী মহারাজ ছিলেন। তিনি একটা বড় সেন্টারে বদলি হয়ে যাচ্ছেন, ওই মঠে প্রচুর মহিলা ভক্তরা আসে, আর খুব সম্ভ্রান্ত লোকেদের জায়গা। তখন যিনি যাচ্ছিলেন তাঁকে বলে দেওয়া হল, দেখ তুমি ওই সেন্টারে যাচ্ছ, ওখানে অনেক মেয়ে মহিলারা আসে। তারা দেখতে সুন্দরী, ওদের উপর তোমার যে চোখ পড়বে এটা বাইচান্স, কারণ এটা তোমার প্রকৃতি। কিন্তু দ্বিতীয়বার আমি ফিরে দেখতে চাই, এটা হল তোমার কাম –এই

জায়গাটাকে আটকাতে হবে। চোখে পড়ে যাওয়াটা হতেই পারে, ভাল লাগল, হতেই পারে; কিন্তু দ্বিতীয়বার ঘুরে দেখাটা হবে কাম থেকে। এটাকে কিভাবে আটকানো হয়? শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, গুরুর কথা শুনে এই জীবনে সেই শক্তিটাকে অর্জন করতে হয়।

যাঁরা স্বামীজীর জীবনী খুব ভাল ভাবে পড়েছেন, সেখানে স্বামীজী তাঁর জীবনের একটা ঘটনা মজা করে লিখেছেন। তিনি মজা করে লিখেছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই, তবে আমরা ওটাকে সত্যি ভাবেই নিই। স্বামীজী প্যারিসে গেছেন। প্যারিসের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একজন মহিলাকে দেখলেন, মহিলা দেখতে এত সুন্দর যে, স্বামীজী নিজেই বলছেন, এত রূপসী মেয়ে আমি কোন দিন দেখিনি। স্বামীজীর মন এমন ট্রেনিং প্রাপ্ত যে, যতক্ষণে তিনি ভেবেছেন মেয়েটি অত্যন্ত রূপসী, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির মুখটা একটা বানরের মুখে পাল্টে দিয়েছে। উনি যে ঘুরে দ্বিতীয়বার দেখবেন, মন সেই অনুমতিটা দিল না। স্বামীজী কলকাতায় বড় হয়েছেন, সৌন্দর্য বোধ আছে, সবই আছে। শেষে যখন দেখলেন একজন সত্যিকারের রূপসী, মন মেয়েটির রূপটাই পাল্টে দিয়েছে।

ভগবান এখানে বলতে চাইছেন, এই যে জগৎ, জগৎকে তুমি পাল্টে দিতে পারবে না। এই জগৎ পাঁচটি তত্ত্ব দিয়ে তৈরী, তুমি এটাকে পাল্টাতে পারবে না। তোমার ইন্দ্রিয়ও পাঁচটি তত্ত্বকে দিয়ে তৈরী, এটাকেও তুমি পাল্টাতে পারবে না। পাঁচটি ইন্দ্রিয় এই পাঁচটি তত্ত্বের দিকে দৌড়াবে, এটাকেও তুমি আটকাতে পারবে না। ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়, এদের পরস্পরের যে ভালবাসা, এটাকেও তুমি আটকাতে পারবে না। আটকাতে পারবে তোমার রাগ আর দ্বেষকে। এর জন্য তোমাকে চেষ্টা করতে হবে, খাটতে হবে, যদি তোমার ধর্ম পথে চলার আগ্রহ থাকে, এক উচ্চতর জীবনের প্রতি তোমার যদি আগ্রহ থাকে, তুমি যদি জীবনে মহৎ হতে চাও, তাহলে তোমাকে এই রাগ আর দ্বেষকে যেভাবেই হোক আটকাতে হবে। কারণ *তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ*, এই দুটো পরিপন্থি, এরা ডাকাত, তোমার সব কিছু ছিনতাই করে নিয়ে চলে যায়।

বেশ কয়েক বছর আগে, এখনও মাঝে মাঝে খবর পাওয়া যায় যে, ট্রেনে হঠাৎ ডাকাত উঠে যাত্রীদের কাছ থেকে সব ছিনতাই করে নিয়েছে। রাজধানীর মত ট্রেনে ডাকাতি করা সম্ভব না। তারও অনেক আগে, লোকেরা পায়ে হেঁটে, ঘোড়া করে, রথে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যাতায়ত করত। পথে ডাকাতরা তাদের সর্বস্ব ছিনতাই করে নিত। রাস্তা থেকে টেনে অন্য দিকে নিয়ে চলে যাবে। এটাই এখানে বলছেন *পরিপন্থিনৌ*, তোমার পথ থেকে টেনে অন্য পথে নিয়ে যাবে। *তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ*, ধারে কাছে এই রাগ আর দ্বেষকে আসতে দিয়ো না। জগৎ তোমার হাতে নেই, ইন্দ্রিয় তোমার হাতে নেই, এদের স্বভাব হল এরা নিজের বিষয়ের দিকে যাবেই। কিন্তু শাস্ত্র যদি তুমি নিয়মিত শ্রবণ করে থাক, সাধু-মহাত্মাদের কথা যদি তুমি নিয়মিত পালন করে চলো, এতে তোমার মধ্যে একটা শক্তি তৈরী হবে, যে শক্তি দিয়ে তুমি এই রাগ আর দ্বেষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। আমরা ওই মহারাজের যে কথা বললাম, প্রথম বার চোখ পড়তেই পারে, তাকে তুমি প্রশংসা করতেই পার। দ্বিতীয়বার দেখার ইচ্ছা মানে, এবার তুমি বিপদে পড়ে গেলে।

একবার এক মহারাজ অন্য এক মহারাজের কাছে একটা সুন্দর পেন দেখেছেন। দেখে উনি বললেন, 'বাঃ পেনটা খুব সুন্দর তো'। সুন্দর বলাতে উনি মহারাজকে বললেন, 'তোমার পেনটা পছন্দ হয়েছে, ঠিক আছে তুমি নিয়ে যাও'। শুনে এই মহারাজ বলছেন, 'মহারাজ আমি ওই বয়স পেরিয়ে এসেছি যে, কোন জিনিস যদি ভাল লাগে সেটা আমাকে নিয়ে নিতে হবে'। আমাদের এই সমস্যা হয়, আমরা impersonally একটা বস্তুকে appreciate করতে পারি না। Appreciate করা মানেই এই নয় যে, ওটাকে নিয়ে নিতে হবে। এক সময় আমি ছাপড়াতে ছিলাম, সেখানে কোন মেয়ের পোষাক দেখে হয়ত বলে দিলাম, 'বাঃ খুব সুন্দর তো ড্রেসটা'। একজন আমাকে সাবধান করে দিলেন, 'মহারাজ এভাবে মেয়েদের পোষাকের appreciate করতে যাবেন না, এতে ওরা

প্রশ্রয় পেয়ে যাবে'। তারপর থেকে বলাই বন্ধ করে দিলাম। বুঝতেই পারছিলাম না, কিভাবে কথা বলতে হয়, আমাদের সেই ট্রেনিংটাই নেই। কারণ লোকে মনে করে, আপনি কিছুর appreciate করেছেন মানেই, আপনি ওটাকে ধরে নিতে চান।

শাস্ত্র এখানে আমাদের সবাইকে সাবধান করার জন্য এটাই বলতে চাইছেন, রাগ আর দ্বেষ থেকে যদি নিজেকে না বাঁচাতে পার, তুমি খুব বিপদে পড়বে। এই রাগ আর দ্বেষের দুটোরই বাবা-মা হল তৃষ্ণা। আচার্য এখানে খুব সুন্দর প্রতিপক্ষ ভাবনার কথা বলছেন। প্রতিপক্ষ ভাবনা মানে, যে জিনিসটা আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সেটাকে তার বিপরীত জিনিস দিয়ে আটকানো।

আচার্য বলছেন, *তদা শাস্ত্রদৃষ্টিঃ*, আচার্যের ভাষা এত সরল, এত সুন্দর যে, কিছু বলার নেই। যিনি আধ্যাত্মিক জীবনে সংগ্রাম করছেন, তাঁর নাম *শাস্ত্রদৃষ্টিঃ*। তিনি এখন গীতা জানেন, কথামৃত জানেন, তাঁর দৃষ্টি এখন শাস্ত্রে চলে গেছে। ফলে তিনি যখন যে কোন জিনিসকে বিচার করবেন তখন বিচার করবেন শাস্ত্রের দৃষ্টি দিয়ে। তখন আপনাকে বলতে হবে, আমার শাস্ত্র এটা নিষেধ করছে, আমি এই কাজ করতে পারি না। মনে যদি চাঞ্চল্য আসে, আসুক। সন্ন্যাসীদের মনেও অনেক ধরণের চাঞ্চল্য আসতে পারে, অনেক রকম বাসনা আসতে পারে, এগুলো কোন ব্যাপারই না, তখন তাঁকে এগুলোকে শুধু সাক্ষী হয়ে লক্ষ্য করতে হয়, এটাই একমাত্র পথ।

মনের মধ্যে অনেক রকম বাসনার উদয় হতেই পারে, যেমন আমার মনে হঠাৎ ইচ্ছে হল আমি হিমালয়ে যাব। আমি জানি হিমালয়ে যাওয়া আমার পক্ষে এখন আর সম্ভব নয়। মনের এই ধরণের চিন্তা-ভাবনা গুলিকে শুধু লক্ষ্য করে যেতে হয়। কিছুক্ষণ পরে ওই বাসনা নিজে থেকেই চলে যাবে। কিন্তু যদি আমি ওই বাসনাকে রাগের সঙ্গে লেজুড় করে জুড়ে দিই, এবার ওই চিন্তা আমাকে টেনে আমাকে দিয়ে অনেক কিছু করাবে। টাকা জোগড় কর, টিকিটের বন্দোবস্ত কর, যাওয়ার ব্যবস্থা কর, থাকার ব্যবস্থা, কত কিছু এসে জুটে যাবে। আর এটাই হয়ে যাবে অশাস্ত্রীয়, কারণ, আমার উপর যে কাজের দায়ীত্ব দেওয়া আছে, সেই দায়ীত্বকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে যেতে হচ্ছে হিমালয়ে।

ভগবান বলছেন, এই জীবনযাত্রার যাত্রাপথে ঠিক ঠিক পরিপন্থি হল রাগ আর দ্বেষ। জীবন আমাদের এভাবেই চলবে, সংসার এভাবেই চলবে, আমাদের ইন্দ্রিয় এভাবেই চলবে। এই রাগ আর দ্বেষ বসে আছে আমাদের মনের মধ্যে, এই দুটোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। কেন পারবেন না? কারণ আপনি শাস্ত্রদৃষ্টি নন। নিয়মিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করুন, নিয়মিত সাধুসঙ্গ করুন, এইভাবে করতে করতে যখন আপনি শাস্ত্রদৃষ্টি হয়ে যাবেন, তখন আপনার মধ্যে সেই শক্তি হবে, যে শক্তি দিয়ে এই দুটোকে বশে আনতে পারবেন। ঘোড়ার পিঠে চেপে চলতে শুরু করলে, ঘোড়া লাফালাফি করে আপনাকে পিঠ থেকে ছুড়ে ফেলে দেবে। অনুশীলন করে করে ঘোড়ার লাগাম টানার শক্তি যখন হবে, তখন আপনি দুর্দান্ত ঘোড়াকেও বশে এনে আরামসে ঘোড়াকে নিজের ইচ্ছামত চালাতে পারবেন। রাগ আর দ্বেষ দুর্দান্ত ঘোড়াও না, এরা হল ডাকাত; ডাকাত শব্দকে ইংলিশে বলে হাইওয়ে মেন্, ওয়ে লেন, *পরিপন্থিনৌ* শব্দটাই চলে গেছে। অন্য রাস্তায় নিয়ে যাবে, তারপর গলায় দড়ি দিয়ে একটা টান মারবে, সব শেষ। আপনি কি এটা চান? ভাল করে বিচার করে দেখুন, মনে কি কখন কোন জিনিসের প্রতি বা কোন ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ উদয় হয়েছে? দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা পেয়েছিলাম এই শ্লোক –*ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে। তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি*, ইন্দ্রিয় জগতে যে বিচরণ করে, তাকে টেনে নিয়ে চলে যায়। কেন টেনে নিয়ে চলে যায়? কারণ আপনার প্রকৃতি ওই বস্তুর প্রতি আকর্ষণ নিয়ে আসছে। বাঁচব কি করে? রাগ আর দ্বেষকে নিয়ন্ত্রণ কর। যেমনি দেখলাম জোর বাতাস উঠেছে, সামাল সামাল রব ওঠাও, তখনই প্রতিপক্ষ ভাবনা নিয়ে আসতে হবে। কারণ আর-একটু যদি বড় হয়ে যায়, আর এদের হাত থেকে বাঁচতে পারবেন না।

আচার্য বলছেন, *তত্র রাগদ্বেষপ্রযুক্তো মন্যতে শাস্ত্রার্থম্ অপি অন্যথা,* মানুষ যখন রাগ আর দ্বেষের খপ্পরে পড়ে যায়, মানুষ তখন শাস্ত্রের অর্থটাকেও বিপরীত ভাবে দেখে। শ্রীশ্রীমাকে একজন এসে বলছেন, 'মা বিয়ে করাটা কি খারাপ? ঠাকুরও তো বারণ করেননি'। মা শুনে বলছেন, 'না না বাবা, বিয়ে করা খুব ভাল'। ছেলেটি চলে যাবার পর একজন বলছেন, 'মা আপনি কি করে এই কথা বলতে পারলেন'। মা বলছেন, 'বাবা পুরো কথামৃতে বিয়ে করা নিয়ে সে ওই একটা কথাই দেখলে! ঠাকুর যে এত ত্যাগের কথা, সন্ন্যাসের কথা বলছেন, সেটার দিকে তার দৃষ্টি নেই'। কারণ ওখানে গিয়ে ওর মনটা বসে গেছে। রাগ আর দ্বেষকে মনের মধ্যে বেশি খেলা করতে দিতে নেই। রাগ আর দ্বেষ যখন চেপে বসে, মনে যখন এই ভাব এসে যায়, তখন কি হয়? আমাকে দিয়ে অধর্ম করাবে। এখন অধর্ম আমরা যে অর্থে বলি, অধর্ম ঠিক সেই অর্থে হয় না। প্রথমের দিকে আমরা বললাম, যে অর্থে পাপকে বোঝা হয়, হিন্দুদের ক্ষেত্রে সেই অর্থে পাপ হয় না। ঠিক তেমনি অধর্ম জিনিসটা আমরা বলছি ঠিকই, ধর্মের বিপরীত মানেই অধর্ম। কিন্তু ঠিক ঠিক অধর্ম যে অর্থে আমরা মনে করছি, অধর্ম সেই অর্থে হয় না, অধর্ম আসলে পরধর্ম।

যে কোন পরধর্ম সেটা অধর্ম। আমরা যেমন প্রথমের দিকে বললাম, গৃহস্থরা যারা সংসারী, বিয়ে করেছে, স্ত্রী সঙ্গ করছে, সন্তানোৎপাদন করছে, এতে তো কোন দোষ নেই, এটাই সংসারের ধর্ম। একজন সন্ন্যাসী সমস্ত কিছু ত্যাগ করে সংসারকে ছেড়ে দিয়েছেন। সামারসেট মঙ নিজে খ্রীশ্চান ছিলেন, কিন্তু খ্রীশ্চানদের উপর খুব খাপ্পা ছিলেন। তাঁর উপন্যাস Of Human Bondage, খুব বিখ্যাত বই; সেখানে যে হিরো সে কিভাবে ধর্ম থেকে সরে এসেছে দেখানো হয়েছে। একজন খ্রীশ্চান ফাদারের বর্ণনা করছেন। একজন মা বাচ্চাকে কোলে করে ব্যাপ্টিজিম করাতে নিয়ে গেছে। বিরাট লম্বা কাহিনী। শেষে বাড়ি ফিরে এসে মা বাচ্চাটাকে খুঁজে পাচ্ছে না। কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, হৈ হৈ পড়ে গেছে। তখন দেখে ওদের ঘরের ভিতরেই বাচ্চাটা বিছানায় শুয়ে আছে, আর ওই ফাদার খাটে মাথা দিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদছে। কাহিনীটা এখানেই শেষ। অর্থ হল, সে খ্রীশ্চানদের ক্যাথলিক ফাদার হয়ে গেছে, বিয়ে করতে পারবে না, প্রোটেস্টান্টদের তাও বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কোথাও তার মনে থেকে গেছে পুত্রৈষণা, আমার সন্তান হোক। কিন্তু সে খ্রীশ্চান ফাদার, বিয়ে করতে পারবে না। ওই রকম ফুটফুটে বাচ্চাকে দেখে, ওই ইচ্ছাটা ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে, হাউ হাউ করে কাঁদছে।

তাহলে কি সন্তান পাওয়ার ইচ্ছাটা কি খারাপ? প্রায়ই লোকেরা বলে সংসার কি খারাপ? সংসার কেন খারাপ হতে যাবে। এটা একটা ধর্ম, ওটাও আর-একটা ধর্ম। গান্ধীজী দেশের স্বাধীনতার জন্য সত্যাগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু তিনি একবারও বলেননি যে, দেশের মিলিটারিরাও শত্রুর আক্রমণের সময় সত্যাগ্রহ করবে। মিলিটারির কাজ যুদ্ধ করা, সরকার চেষ্টা করবে যাতে যুদ্ধ না হয়। কিন্তু একবার যুদ্ধ লেগে গেলে সেখানে আর কোনও ছাড়াছাড়ি নেই। যুদ্ধ করাটা হল সৈনিকদের ধর্ম, শান্ত ভাবে থাকা এটা সাধারণ মানুষের ধর্ম। সাধারণ মানুষ কখনই আইনকে নিজের হাতে তুলে নিতে পারে না। কারণ এটা পরধর্ম। আইন পালন করবে পুলিশ, আইন পালন করবে আদালত। ওরা যদি না করে, তাহলে মানুষই চেষ্টা করবে ব্যবস্থাকে পাল্টাতে। আইন নিজের হাতে তুলে নিলে কেউ কাউকে মানবে না, আইন এই জন্যই হয়েছে, যাতে মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা যায়। সেইজন্য ঠিক ঠিক অধর্ম বলে কিছু হয় না।

শত শত হাজার হাজার ধর্ম হতে পারে। যে গুপ্তচর ভারতের হয়ে পাকিস্থান বা চীনে গুপ্তচরবৃত্তি করছে, তার কাজ মিথ্যা কথা বলা, তার কাজ ধরা না পড়া। আমরা কি তার ধর্ম নিতে পারি? কখনই পারি না। আমাদের ভারতীয় গুপ্তচররা যদি পাকিস্থানে গিয়ে সত্যবাদী হরিশ্চন্দ্র হয়ে যায়, তখন তার কি অবস্থা হবে? আগামীকালই কাশ্মীর ভারতের হাত থেকে বেরিয়ে যাবে, শুধু কাশ্মীর যাবে না, আরও কত কিছু অঘটন হয়ে যাবে। সত্যি কথা বলা একজনের ধর্ম, মিথ্যা কথা

বলা আর-একজনের ধর্ম। আমার যেটা ধর্ম, আমাকে সেই ধর্মকে ধরে রাখতে হবে। রাগ আর দ্বেষের তোড় যখন আসে, তখন এই দুটো মানুষকে স্বধর্ম ত্যাগ করিয়ে পরধর্ম পালন করার দিকে নিয়ে যায়।

অর্জুনেরও ঠিক এই অবস্থা হয়েছে, অর্জুন এখন স্বধর্ম ছাড়তে চাইছেন। কেন চাইছেন? জীবনের প্রতি তাঁর মায়া এসে গেছে, দ্রোণ, ভীষ্ম এনারা আমার আপনজন, আমি কি করে এদের বধ করব! আমি এনাদের বধ করতে পারি না। রাগ-দ্বেষ অর্জুনকে গ্রাস করে নিয়েছে, আর তাতেই তাঁর স্বধর্ম শেষ। স্বধর্ম ত্যাগ করে অর্জুন পরধর্ম নিতে চাইছেন, এটাই পাপ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বধর্ম শব্দটা একবার এসেছিল, এখানে আবার এসেছে। কর্তব্য কি, দায়ীত্ব কি? এই প্রশ্ন অনেকের মধ্যেই আসে। কর্তব্য হল আমার আপনার ধর্ম। তার মধ্যে একটা বিশেষ সময়ে যেটা করণীয়, সেটাকে দায়ীত্ব বলে। আমার কর্তব্য হল সমগ্র মানবজাতির প্রতি, সেখান থেকে নিজের দেশের প্রতি, রাজ্যের প্রতি, নিজের অঞ্চলের প্রতি, নিজের পরিবারের প্রতি এবং নিজের প্রতি। যিনি ঘরবাড়ি ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যান, তাঁর কোন দায়ীত্ব থাকে না।

মনু বলছেন, উপর থেকে নীচে যদি এমন হয়ে যায় যে, দেখা যাচ্ছে কোন বাড়ির স্বার্থে একটা গ্রামের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, তাহলে তখন সেই বাড়িকে ত্যাগ করতে হবে। একজনের জন্য যদি বাড়ির সর্বনাশ হয়ে যায়, তাহলে সেই বাড়ির সদস্যকে ত্যাগ করতে হবে। যদি দ্বন্দ্বের পরিস্থিতি আসে, যেখানে মানবিকতা রয়েছে আর আমার নিজের স্বার্থ রয়েছে, সেখানে তুমি মানবিকতার জন্য কর। আগেকার দিনে যুদ্ধভূমিতে যুদ্ধ চলছে, একজন শত্রুপক্ষের সৈনিক মারা যাচ্ছে, কিন্তু সে একটু জল চাইছে, যে সৈন্য তার সাথে যুদ্ধ করছিল, সেই এগিয়ে গিয়ে তাকে জল খাইয়ে দিল। মহাভারতের কৌরব পাণ্ডব দু পক্ষ যুদ্ধ করছে, কিন্তু সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যে হয়ে গেলে যুদ্ধ বন্ধ রাখতে হবে, তখন এদিককার বৈদ্য ঐদিকে যাবে। এমনকি রাম রাবণের যুদ্ধে, সুষেণ রাবণের যে বৈদ্য, তিনি রামের দিকে এসে চিকিৎসা করে যাচ্ছেন। তার মানে, যুদ্ধ যুদ্ধের জায়গায় আছে, মানবধর্ম নিজের জায়গায় আছে। এটা থেকে স্বধর্ম পরিভাষিত হয়। আমরা স্বধর্মে যাচ্ছি না, খুব সহজ ব্যাপার, আমার মন জানে কি করণীয়, আমার শরীরও সেই রকম করে। আমার চিন্তা-ভাবনা, আমার কথাবার্তা আর আমার ক্রিয়াকর্ম, এই তিনটে যেন এক লাইনে থাকে, এটাই ডিউটি।

একজন একটা চাকরি করছে, চাকরি করা হয় অর্থ উপার্জনের জন্য, কিন্তু সেখানেও কিছু দায়ীত্ব এসে যায়। যেমন একজন পুলিশ, পুলিশের দায়ীত্ব সমাজে আইনশৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রণ করা। তার সাথে তার দায়ীত্ব হল, নিজের বাড়ির লোকজনদের দেখাশোনা করা, তার সাথে নিজের ভাল করা। এর মধ্যে একটা ডাকাতি হয়ে গেল। পুলিশ অফিসার এসে তাকে বলে দিল, তোমাকে ভার দেওয়া হল এই ডাকাতকে ধরার, তখন এটা হয়ে গেল দায়ীত্ব। দায়ীত্ব আসে, আমি আগে আগে যা করেছি, সেটাকে বেঁধে একটা জায়গায় নিয়ে আসা; কর্তব্য আমাকে জীবনে এগিয়ে নিয়ে চলে যায়। সমস্ত দায়ীত্ব মিলে হয় কর্তব্য, তার মধ্যে একটা দায়ীত্ব পালন করাটা হল দায়ীত্ব। কামনা-বাসনার তোড়, রাগ-দ্বেষের তোড় যখন জোর ধাক্কা মারে তখন মানুষ, দায়ীত্ব, কর্তব্য, সব ভুলে যায়। অর্জুনের কর্তব্য হলে ক্ষত্রিয়ের, দায়ীত্ব হল যুদ্ধ করা, দুটোই তার উড়ে গেল; আমি যুদ্ধ করব না, আমি বৈরাগী হব। তার মানে, অর্জুনের স্বধর্ম চলে গেল, কর্তব্য ও দায়ীত্বও উভয়েই স্বধর্ম ত্যাগের সাথে সাথে চলে গেল। ভগবান সেইজন্য অর্জুনকে সাবধান করার জন্য বলছেন –

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।।৩৫।।

(স্বধর্মের অনুষ্ঠান দোষযুক্ত হলেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বর্ণাশ্রমবিহিত স্বধর্মসাধনে নিধনও কল্যাণকর; কিন্তু অন্যের বর্ণাশ্রমোচিত ধর্মের অনুষ্ঠান অধোগতির কারণ বলে বিপজ্জনক।)

তোমার স্বধর্মে যদি দোষও থাকে, তুমি জানবে, সব ধর্মেই কিছু না কিছু দোষ আছে; আর অপরের ধর্মের হয়ত অনেক কিছু ভাল আছে। কবিতায় বলছেন, নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওপারে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস। আমি যে মহারাজের কথা বলেছিলাম, গৃহস্থ গৃহস্থকে দেখে জ্বলছে, গৃহস্থ সন্ন্যাসীকে দেখে জ্বলছে, সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীকে দেখে জ্বলছে, সন্ন্যাসী গৃহস্থকে দেখে জ্বলছে, মনে হয় সে কত ভাল আছে, তার কত সুখ। এগুলো বাচ্চা বয়সে হয়। বাচ্চারা বলে আমি ডাক্তার হব, আমি ফাইটার প্লেনের পাইলট হব, আমি অমুক হব। তুমি আর বাচ্চা নেই, তোমার একটা বয়স হয়ে গেছে, একটা পথ তুমি বেছে নিয়েছ, এই পথে হয়ত দোষ আছে, অনেক দুর্গুণও আছে, স্বধর্মে যত দোষ থাকুক, যত দুর্গুণ থাকুক; আর অপরের ধর্মকে যত ভাল মনে হোক, তুমি তোমার স্বধর্মকে কখনও ত্যাগ করতে যেও না।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, স্বধর্মে তুমি যে পথ নিয়েছ, নিজের ধর্ম পালন করতে করতে মরে যাও তাও অনেক ভাল, death in the line of duty; *পরধর্মো ভয়াবহঃ*, তোমার জন্য পরধর্ম হল ভয়াবহ, ওই দিকে তুমি যেও না। কারণ পরধর্ম নিয়েছ মানেই তোমার জন্য নরকের সদর দরজা খুলে গেল। নরকের সদর দরজা কেন খুলে যাবে? আগে বল তুমি নিজের ধর্ম ছাড়ছ কেন? কারণ রাগ আর দ্বেষ, কোন কিছু তোমার খুব ভাল লাগছে, কোন কিছু থেকে তুমি পালিয়ে যেতে চাইছ। রাগ সব সময় আসে কাম থেকে, তোমার ভিতরে কামনা-বাসনা গিজ্ গিজ্ করছে। কাম আসে অবিদ্যা থেকে, অবিদ্যা, কাম ও কর্ম। ভিতরে অজ্ঞান তাই মনে কামনা জাগে, কামনা জাগলে, ওই কামনা পুর্তির জন্য মানুষ কাজ করে। তুমি নিজের ধর্ম ছেড়ে পরধর্মে যে যাচ্ছ, ঠাকুর বলছেন, পরের স্বামী রসরাজ; নিজের স্বামীকে ছেড়ে পরের স্বামীকে যদি রসরাজ বলে মনে হয়, তাহলে বুঝতে হবে তোমার মনে কামনা আছে। নিজের স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ, স্বামীকে ভাল লাগছে না, তার মধ্যে রস নেই। পরের স্বামী রসরাজ, রসে টগবগ করছে। কেন? তার প্রতি তোমার অনুরাগ হয়ে গেছে। এটা ঠাকুরের বর্ণনা। নিজের স্বামীর প্রতি দ্বেষ, অপরের স্বামীর প্রতি রাগ কেন হয়েছে? তোমার ভিতরে কামনা রয়েছে।

কাম মানেই অবিদ্যা ভরে আছে, অবিদ্যা মানেই এবার তোমাকে নাচাবে। অবিদ্যা কক্ষণ তোমাকে উঁচু যোনিতে নিয়ে যাবে না, স্বাভাবিক ভাবেই নিম্ন যোনিতে নিয়ে যাবে; সাপ হবে, বিছে হবে। অবিদ্যা নরকের দিকে নিয়ে যাবে, মুক্তির দিকে না নিয়ে এই সংসারের মধ্যেই ঘোরাতে থাকবে। আমাদের কর্ম আমাদের নিয়ে যায় না, আমি যত বাজে কর্মই করি না, সেই কর্ম কক্ষণ আমাকে নিয়ে যাবে না, নিয়ে যাবে অবিদ্যা। মানুষের যে দুরবস্থা, যে দুর্গতি হয়, কর্মফলের জন্য হয় না, হয় অবিদ্যার জন্য। ঈশোপনিষদে বলছেন, *অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাহহবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ*, যিনি নিজের হনন করেন, তিনি *অসূর্যা* নামের লোকে গমন করেন। হনন করার অর্থে বলছেন, তিনি অবিদ্যার মধ্যে পড়ে আছেন। জন্ম নিল, ধর্ম অধর্ম করে জীবন কাটিয়ে দিল, তারপর একদিন মরে গেল, তার মানে নিজেকে হনন করল। তুমি যদি বিদ্যা অর্জন করে নিতে তাহলে তোমার মুক্তি হয়ে যেত। বিদ্যা অর্জন করলে না, আত্মজ্ঞান লাভ করলে না, সেইজন্য যতবার জন্ম নিয়ে মরছ, এরজন্য দায়ী তুমি নিজে, এটাই আত্মহত্যা। গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে গেলাম বা বিষ খেয়ে মরে গেলাম, এটাই আত্মহত্যা।

আত্মহত্যা কেন পাপ? আত্মহত্যা মানেই রাগ আর দ্বেষ, যদি না কোন medical condition থাকে। কিছু লোকের medical conditionএর জন্য অনেক কিছু হয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করে, এখানে আমরা medical conditionsকে আনছি না। আমরা আলোচনা করছি, যেখানে রাগ আর দ্বেষ থেকে মানুষ আত্মহত্যা করে। প্রায়ই দেখা যায়, বাবা ছেলে কিংবা মেয়েকে ফোন দিল না, গলায় দড়ি দিয়ে দিল। রাগ দ্বেষ মানেই কাম, জোরাল কাম মানে জোরাল অবিদ্যা,

জোরাল অবিদ্যা মানেই তার জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই, সে মরবেই। অবিদ্যা খুব বেশি থাকলে সে এবার exclusive হয়ে গেল, inclusive আর থাকছে না। বিদ্যা মানেই সে inclusive, আত্মজ্ঞান মানেই সে inclusive। বাকি সবটাই exclusive। আত্মহত্যা করেছে মানেই সে exclusive, সে যেই হোক। কেন exclusive? হয় সে কোন জিনিস থেকে পালাতে চাইছে বা কোন জিনিস পেতে চাইছিল, পেল না বলে হতাশা, হতাশা থেকে আত্মহত্যা। আগেও বলা হয়েছে যে, এই রাগ দ্বেষ সব সময় হয় কাম থেকে; কাম সব সময় হয় অবিদ্যা থেকে। অবিদ্যা হওয়া মানে সে দেহসর্বস্ব, দেহকে নিয়ে সে নাচানাচি করবেই, তা নিজের দেহই হোক বা অপরের দেহ হোক। এরা এই নিজেকে মারবে, আবার এই জন্মাবে। সেইজন্য ভগবান অর্জুনকে সাবধান করছেন, *শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।।* পাপ থেকে যদি বাঁচতে চাও, স্বধর্মে সর্ব অবস্থায় অবস্থান করে থাক।

এতক্ষণ আমরা বিস্তারিত ভাবে পাপ জিনিসটা কি, আলোচনা করলাম। আমরা আলোচনা করলাম অন্যান্য ধর্মে পাপকে কিভাবে দেখা হয় এবং পাপের কি নিদান হতে পারে, পাপ থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়। অর্জুন আবার প্রশ্ন করছেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ দিকে প্রশ্ন করেছিলেন, এই অধ্যায়ের শেষ দিকেও অর্জুন প্রশ্ন করছেন। এই নয় যে তিনি প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষ দিকে প্রশ্ন করবেন। এর পরের অধ্যায়ে প্রথমের দিকেই প্রশ্ন করবেন। একটা বিষয়কে শুরু করার জন্য প্রশ্ন করা। যদি কেউ ভাল প্রশ্ন করেন, সেখানে আচার্য যে উত্তর দেন, সেটা তাঁর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। যে কোন আচার্য, যত ভালই আচার্য হন, উনি সবটাকে মিলিয়ে উত্তর দিতে চান। ভাল প্রশ্ন মানে ভাল মন, ভাল মন মানে শ্রোতা খুব ভাল। ভাল শ্রোতা না থাকলে বক্তাও সেই রকম বক্তব্য রাখতে পারেন না। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

স্বামীজীর বক্তৃতার মধ্যে দুটো সিরিজ বোঝা খুব কঠিন, একটা হল দেববাণী (Inspired Talks), যেটা বাছাই করা কয়েকজন শিষ্যদের সামনে বলেছেন। আর দ্বিতীয় হল জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ তিনি লণ্ডনে বলেছিলেন। সেই সময় বৃটিশদের প্রচুর পড়াশোনা ছিল, চিন্তা-ভাবনাও গভীর ছিল, স্বামীজী তাই বলতে পেরেছিলেন। ভারতীয়দের সামনে উনি বলতেই পারতেন না। প্রশ্ন করার জন্য একটা প্রস্তুতি লাগে। বিষয়টা যদি আগে জানা থাকে, সেখানে কোথাও গিয়ে কোন জিনিস তার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না, আচার্য তখন তাকে ঢেলে দেন। এখানেও ঠিক তাই হচ্ছে। ভগবান পাপ নিয়ে, জীবন নিয়ে বলে যাচ্ছেন, অর্জুন শুনে যাচ্ছেন। এবার তার মনে একটা প্রশ্ন উঠল –

অর্জুন উবাচ
অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ।।৩৬।।

(অর্জুন জিজ্ঞেস করলেন, হে কৃষ্ণ, মানুষ কার দ্বারা চালিত হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে বলপূর্বক নিয়োজিত হয়েই পাপানুচরণে প্রবৃত্ত হয়?)

অর্জুন ভগবানের কাছে জানতে চাইছেন, হে ভগবান মানুষ কিভাবে, কোন শক্তির দ্বারা চালিত হয়ে পাপানুচরণে প্রবৃত্ত হয়? *প্রযুক্তঃ* শব্দের মানে, নিযুক্তি যেভাবে হয় সেইভাবে প্রযুক্তি। আচার্য এটাকে বর্ণনা করছেন এইভাবে – *রাজা ইব ইতি উক্তো*, রাজা যেমন আদেশ করেন, রাজা আদেশ করলে তাঁর কর্মচারীর ক্ষমতা নেই যে না করবে। ঠিক তেমনি, ওটা কি এমন সেই শক্তি, যে শক্তি মানুষকে পাপক কর্মে নিয়োজিত করে? শুধু এই উত্তর জানলেই হবে না, এই পাপ থেকে বাঁচার উপায় কি, সেটাও অর্জুন স্বাভাবিক ভাবেই জানতে চাইবেন।

প্রশ্নের মধ্যেই আর-একটি প্রশ্ন সমাহিত রয়েছে। আমরা খুব সহজেই বলে দিই, ঠাকুরের নাম কর, কৃষ্ণের নাম কর সব পাপ কেটে যাবে। ঠাকুরও বলছেন, হাততালি দিয়ে হরিনাম কর সব

পাপ পাখি উড়ে যাবে, ঠিকই বলছেন। কিন্তু গীতা শাস্ত্র যখন চলে, তখন দেখা যাবে এনারা পদে পদে যুক্তি দিয়ে চলেন। কোন কাজ করার পর আমাদের অনেকেরই মনে হয়, যে কাজটা করলাম, এটা ভুল কাজ। করতে চাই না, তবু করে বসি। অথচ আমরা ভক্ত, আমরা জপধ্যান করি, তা সত্ত্বেও কেন এ-রকম হয়? আমি করতে চাই না, তবুও কিছু একটা এমন আছে, যেটা আমাদের ঠেলে করিয়ে দেয়। সন্ন্যাসীদের কাছে এসে ভক্তরা প্রশ্ন করেন, আমি এ-রকম করে ফেলেছি, কি করব একটু বলে দিন। সন্ন্যাসীরাও বুঝতে পারছেন, তার করার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু করে ফেলেছে। তার এই পাপ বোধ ভিতরে থাকলে তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে শেষ করে দেবে। সেইজন্য ওনারাও কিছু একটা বলে দেন, রোজ একটা অধ্যায় করে চণ্ডী পাঠ কর, পাপ কেটে যাবে; বা হনুমান চালিশা পাঠ কর পাপ কেটে যাবে; বা গীতা পাঠ কর কেটে যাবে। কই কাটে না তো।

একটা প্রচলিত শ্লোক আছে, ঠাকুরও বলছেন, যদিও এটা মহাভারতে নেই, সেটা হল দুর্যোধনের খুব নামকরা কথা, *জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি, জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তি,* হে কৃষ্ণ আমি জানি ধর্ম কি, মানে কোনটা ঠিক, কিন্তু ওই দিকে যাওয়ার আমার প্রবৃত্তি হয় না। প্রযুক্ত হল যখন অন্য কেউ করায়, আর প্রবৃত্তি হল যখন নিজে থেকে করে। আর অধর্ম জিনিসটা কি সেটাও আমি জানি, কিন্তু মন ওই অধর্ম থেকে সরে আসতে চায় না। মহাভারতে এই শ্লোকটা নেই, বরঞ্চ মহাভারতে পদে পদে দুর্যোধন বলছে, আমি যা করছি ঠিক করেছি। কিন্তু পরে পরে আমরা কাহিনীটা এমন বানিয়ে দিলাম যে, মনে হবে যেন দুর্যোধনের মত এমন পাপী আর হয় না। কিন্তু দুর্যোধনের চিন্তাধারা অন্য রকম ছিল, আর তার যুক্তিও ছিল কেন সে ঠিক।

যাই হোক, এখানে খুব সুন্দর কথা বলছেন, *অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।* 'প্রযুক্ত' শব্দটা এত সুন্দর আর এত উপযুক্ত যে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আমি চাইছি না, কিন্তু কোন একটা শক্তি আমাকে দিয়ে পাপ কাজ করিয়ে নিচ্ছে। এখানে তাদের কথা বলছেন, যারা পাপ করতে চায় না, অথচ তাকে দিয়ে করাচ্ছে। পরে তাঁদের কথা বলবেন, জ্ঞানী পুরুষ, যিনি আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরাও পাপ করেন, এটা ভুল করা না, পাপ। আমরা এর আগে ব্যাখ্যা করেছিলাম অন্যান্য ধর্মে পাপ মানে, ঈশ্বরের যে আদেশ, সেই আদেশকে লঙ্ঘন করা। হিন্দু ধর্মে ঈশ্বর থেকে আদেশ হয় না, আদেশ গুরু থেকে হয়। উপনিষদে বলছেন, *ইত্যাদেশ,* গুরু এই আদেশ করছেন, ভগবানের আদেশ না। গুরু আমাদের কাছে সেই ঈশ্বরীয় কথা বলেন, সেই শাস্ত্রীয় কথা বলেন, সেইজন্য গুরুর কথা অমান্য করা যায় না। গুরুর কথাকে লঙ্ঘন করাই পাপ, অধর্ম। গুরু বললেই আমাদের বিরাট একটা সার্কেল হয়ে যায়, বাবা, মা, জ্যেঠা, কাকা, জ্যেঠিমা, কাকিমা, দাদা, দিদি, যাঁদের আমরা সম্মান করি; আবার যাঁরা আমাদের শিক্ষাগুরু, দীক্ষা গুরু, সবাইকে মিলিয়েই আমরা গুরু বলি। আমরা খুব খোলাখুলি এবং আমরা খুব বেশি ডায়নামিক। এর একটা আবার ডায়নামিক ইক্যুউলিব্রিয়াম আছে, যেমন সাইকেল, সাইকেল যদি কোন কিছুর সাপোর্টে না দাঁড় করানো হয়, সাইকেল উল্টে পড়ে যাবে। কিন্তু সাইকেল যখন চলছে, তখন পড়ে না, ডায়নামিক ইক্যুউলিব্রিয়াম। হিন্দু ধর্ম হল ডায়নামিক ইক্যুউলিব্রিয়াম, অন্যান্য ধর্ম হল স্ট্যাটিক, বাড়ির মত দাঁড়িয়ে আছে। ফলে লোকেরা হিন্দু ধর্মকে বুঝতে না পেরে নিন্দা করে। যাঁরা এই কথাগুলো প্রথম শুনছেন, তাঁদের আগে থেকে হয়ত অনেক কিছুর ধারণা হয়ে আছে, সেই ধারণার সাথে এই কথাগুলো খাঁচে খাঁচে বসবে না, ফলে মনে অনেক রকম প্রশ্ন আসবে। সেইজন্য আমরা বারবার এই কথা আলোচনা করছি।

প্রথম কথা হল, অজান্তে আমার কিছু একটা ভুল হয়ে গেল, কিংবা আমি একটা জিনিস জানি না বলে ভুল হয়ে গেল, এটা খুব সহজ ব্যাপার। অন্য দিকে হল, ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করলাম বলে পাপ হয়ে গেল। অন্য ধর্মে পাপ, এদিকে হয়ে গেল ভুল। হিন্দুরা যখন পাপ বা অধর্মের কথা বলেন, এটা হয়ে যায় মাঝামাঝারি। হিন্দুদের কাছে ঈশ্বরের কোন আদেশ কখন লঙ্ঘন

হয় না, কারণ হিন্দুদের কাছে ঈশ্বরের কোন আদেশ নেই। তার সাথে বলছেন, এটা ভুল বশতঃ করছি না, আমি জানি এটা ঠিক করছি না, আমি করতেও চাই না, মন যেন বুঝতেও চায় না। এ-রকম কেন হয়? ভগবান এবার এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন –

প্রথম হল আমরা যখন ভুল করি, একটা হল অজান্তায় ভুল; দ্বিতীয়টা হল জানতামই না যে এই জিনিসটা ভুল। আমাদের ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডে এত আইন আছে যে, মজা করে বলা হয়, আপনি রাস্তা পার হচ্ছেন, পুলিশ চাইলে এমনিই আপনার নামে দশটা কেস ঠুকে দিতে পারে। বেশির ভাগ মানুষ জানেও না যে, এই ধরণের কোন আইন আছে। অন্য দিকে বলা হচ্ছে, ঈশ্বরের আদেশের বিরুদ্ধে কিছু করা। এখানে দুটোর কোনটাই বলা হচ্ছে না। যেটা আমি জানি, অজান্তায় হচ্ছে না, তা সত্ত্বেও পথ থেকে সরে আসছি। আমরা আগেও আলোচনা করেছি, হিন্দুদের কাছে পাপ বা অধর্ম হল – আপনি একটা পথ নিয়েছেন, সেই পথটা আপনি ছেড়ে দিলেন। ঠাকুরের সন্তান স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কাছে একজন দীক্ষা নিয়েছেন। দীক্ষা নেওয়ার পর মহারাজকে জিজ্ঞেস করছেন, ‘মহারাজা আমি যদি একশ আটবার করে জপ না করি, তাহলে কি হবে’? মহারাজ বলছেন, ‘যেটা হওয়ার ছিল, সেটা হবে না’। জপধ্যান করলে আপনার মন শুদ্ধ হবে, মনে বৈরাগ্যের উদয় হবে, আপনার জ্ঞান ভক্তি বৃদ্ধি হবে। আপনি করলেন না, আপনার মন শুদ্ধ হবে না, আপনার জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য কোনটাই হবে না। আমরা যাতে জপ করি, সেইজন্য গুরু বলে দেন, জপ না করলে পাপ।

আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়, *অকরণে প্রত্যবায়*, যদি না কর তাহলে সেটা পাপ। কিন্তু বিজ্ঞান মহারাজ আর-এক ভাবে বলছেন; জিনিসটা একই। তুমি চাইলে তুমি ধর্ম পথে এগিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু তুমি চেষ্টা করছ না, এটাই অধর্ম, এটাই পাপ। আবার সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে অন্য অনেক কিছু হয়ে যায়। যেমন খুন করা, শীলহানি করা, ইত্যাদি, এগুলো আরও অনেক গভীর হয়ে যায়। বিভিন্ন সময়ে আমরা এগুলোকে নিয়ে আলোচনা করেছি। আসলে কিন্তু সবটাই পথভ্রষ্ট। পাপকে যে অর্থে আমরা মনে করি, হিন্দুরা ওই অর্থে পাপকে পাপ মনে করে না। আমাদের কাছে সবটাই ভুল, কোনটা বড় ভুল, কোনটা ছোট ভুল। আমি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, যেতে যেতে রাস্তা ভুল হয়ে গেল, আধ ঘন্টার জায়গায় এক ঘন্টা পর গন্তব্যস্থলে পৌঁছালাম, এটা একটা ছোট ভুল হয়ে গেল। একটা হাইওয়ে দিয়ে যাচ্ছি, গাড়িটা ডিগবাজী খেয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে গেল, এখানেও পথ ছেড়ে দেওয়া হল, কিন্তু ওই গাড়িকে ঠিক করতে আমার দম বেরিয়ে যাবে। দুটোই পথভ্রষ্ট, পথভ্রষ্ট বিভিন্ন ভাবে হতে পারে।

এখানে ভগবান এবার বলছেন। ‘ভগবান’ শব্দটাকে নিয়ে আচার্য এখানে ব্যাখ্যা করছেন, ভগবান বলতে কি বোঝায়। প্রথমের দিকে অবতার তত্ত্ব আলোচনা করার সময় আমরা ‘ভগবান’ শব্দকে নিয়ে কিছু আলোচনা করেছিলাম। এখানে বিষ্ণুপুরাণ থেকে আচার্য উদ্ধৃত করছেন, *ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য ধর্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। বৈরাগ্যস্যাধ মোক্ষস্য ষণ্ণাং ভগ ইতিরণা।।* ‘ভগ’ মানে ঐশ্বর্য, ‘বান’ মানে আছে, ভগবান মানে যাঁর ঐশ্বর্য আছে। কয়টি ভগ? ছয়টি ভগ বা ঐশ্বর্য। কি কি? ‘ঐশ্বর্যস্য’, তাঁর সব সময় ঐশ্বর্য থাকবে; ‘সমগ্রস্য’, তাঁর ঐশ্বর্য কখন ক্ষয় হয় না। তার সাথে ‘ধর্মস্য’, ‘যশসঃ’, ‘শ্রিয়ঃ’, ধর্ম, যশ ও শ্রী। শ্রী শব্দের একটা অর্থ লক্ষ্মী, সাধারণ অর্থে শ্রী বলতে আমরা মনে করি, যেখানে একটা শ্রী ভাব বিদ্যমান, যেখানে সত্ত্বগুণের প্রকাশ। ঠাকুর বলতেন দারিদ্রী যেন না থাকে, অভাব থাকতে পারে কিন্তু সেখানে একটা শ্রী আছে। আর তার সাথে রয়েছে বৈরাগ্য ও মোক্ষ, এই ছয়টি জিনিস ভগবানের সঙ্গে সব সময় থাকে। একদিকে তাঁর ঐশ্বর্য আছে, অন্য দিকে রয়েছে তাঁর বৈরাগ্য। রাজা জনক অনেকটা এই রকমই, তাঁর একদিকে অঢেল ঐশ্বর্য, অন্য দিকে বৈরাগ্য আছে।

আমি যদি নিজেকে ঈশ্বরের সন্তান মনে করি, আর গীতার কথা শুনে শুনে যদি মনে হয় আমিও ভগবানের সন্তান, তাহলে কিন্তু আমারও এই ছয়টি ঐশ্বর্য থাকতে হবে। কেউ যদি মনে করে সে ঠিক ঠিক ঈশ্বরের ভক্ত, যদি সে ঠিক ঠিক মনে করে আমি ঈশ্বরের সন্তান, ঠিক ঠিক যদি মনে করে গীতা শুনছে, ঠিক ঠিক যদি মনে করে আমি হিন্দু, তাহলে কিন্তু তার এই ছয়টি ভগ থাকতে হবে। প্রথমে তার ঐশ্বর্য থাকতে হবে, সে হয়ত অভাবগ্রস্ত, কাঙালী, কিন্তু তার ঐশ্বর্য থাকবে। তার সঙ্গে তার ধর্ম থাকবে, যশ থাকবে। লোকেরা জানবে, সে সবার থেকে আলাদা, তার পিছনে যে লোকেরা দৌড়াবে তা না, মানুষ তার সঙ্গ লাভ করতে চাইবে, তার সঙ্গ লাভ করে নিজেকে ধন্য মনে করবে। তার সঙ্গে থাকবে শ্রী, দেখলেই মনে হবে ইনি একজন শ্রীযুক্ত, শ্রীমান; তার চেহারা যেমনই হোক, তাকালেই মানুষ ওই চেহারার প্রতি আকর্ষিত হবে, ইনি শ্রীমান, বিশ্রী না। আর বৈরাগ্য ও মোক্ষ, তার ঐশ্বর্য আছে, কিন্তু কোন কিছুতে আসক্তি নেই, ভিতরে বৈরাগ্যের ভাব।

রাজা জনকের কাছে ব্রহ্মজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করার জন্য ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গেছেন। শুকদেবের মনে হচ্ছে, রাজা জনক সব সময় এত ঐশ্বর্যের মধ্যে আছেন, ইনি আর কি ব্রহ্মজ্ঞানী হবেন। একদিন রাজা জনক শুকদেবের সাথে অদ্বৈত জ্ঞানের আলোচনা করছেন। সেই সময় একটা শোরগোল পড়ে গেল, রাজমহলে আগুন লেগে গেছে, রাজা জনকই এই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। খুব জোর রব উঠেছে আগুন আগুন করে। শুকদেব শুধু একটা কৌপিন পরে থাকতেন। একটা কৌপিন পরতেন আর আর-একটা কৌপিন শুকোত। সাধু সন্ন্যাসীরাও তাই, তাঁরা একটা ধুতি পরেন, আর আর-একটা ধুতি শুকোয়, সাধুদের এটাই সম্পত্তি। শুকদেব ওই রব শুনে উঠে দৌড় লাগাতে গেলেন কৌপিনটাকে বাঁচানোর জন্য। রাজা জনক জিজ্ঞেস করছেন, 'কোথায় চললেন'? শুকদেব বলছেন, 'আমার কৌপিনটা শুকোচ্ছে, ওটাকে গিয়ে আগে বাঁচাই'। রাজা জনক খুব হেসে এই কথা বলেছিলেন – *মিথিলায়াম্ প্রদগ্ধায়াম্ ন মে দহ্যতি কিঞ্চন*। পুরো মিথিলা যদি পুড়ে পুরো ছাই হয়ে যায়, আমার তাতে কিচ্ছু যায় আসে না। অর্থ হল, হে শুকদেব, তুমি একটা কৌপিনকে নিয়ে চিন্তা করছ, সেখানে পুরো মিথিলাও যদি পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়, আমার তাতে কিছু আসে যায় না। এটাই হয়ে গেল – ঐশ্বর্য এবং তার সাথে বৈরাগ্য। আমাদের হল কাঙালীর বৈরাগ্য, ভিখারী দুটো টাকা চাইতে এলে মনে হবে যেন আমার সব কেড়ে নিতে এসেছে। বাজারে এক আঁটি শাক কিনবে, সব্জীওয়ালীর সাথে একটা টাকার জন্য এমন দরাদরি করবে যে মনে হবে, ওই একটা টাকা বাঁচাতে পারলে আমার প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। রিক্সাওয়ালার সাথে এক টাকা, দু টাকার জন্য খিচির মিচির থেকে ঝগড়া, গালাগালি শুরু করে দেবে। এরা কিসের হিন্দু, কোথায় তোমার ঐশ্বর্য, কোথায় তোমার বৈরাগ্য! কোনটাই নেই।

বলে যে, শাস্ত্র শুনলে কিছু দক্ষিণা দিতে হয়, কারণ শাস্ত্র অধ্যয়নটাও একটা যজ্ঞ কিনা। যজ্ঞে যখন দক্ষিণা প্রদান করা হয়, তখন যজ্ঞ পূর্ণ হয়, তবেই ওই যজ্ঞ ফল দেয়। ইন্টারনেটে যাঁরা শাস্ত্রের কথা শুনছেন, তাঁরা কি করে দক্ষিণা দেবেন, দেওয়া যায় না। তাহলে কি দক্ষিণা দেওয়া হয়? *যৎ পঠিতং তৎ গুরুয়ে সমর্পিতম্*, হে আচার্য, আপনার কাছে যা শিখলাম, দক্ষিণা রূপে আপনাকে এটা ফেরত দিলাম। দক্ষিণা দেওয়া হয়ে গেল, নিজের উপর কোন বোঝা চাপা থাকল না। একটা মজার প্রচলিত কাহিনী আছে, এক গ্রামে ভাগবৎ পাঠ হত, সেই গ্রামের এক বৃদ্ধা এক হাতে লণ্ঠন আর আরেক হাতে একটা লাঠি নিয়ে ঠক ঠক করে ভাগবৎ শুনতে যেত। ঝগড়া চেঁচামেচি করে সবাইকে ঠেলে সামনে গিয়ে বসত। বসে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ত। একদিন পাঠক মহাশয় বৃদ্ধাকে বলছেন, 'বুড়িমা, তুমি তো রোজ এসেই ঘুমিয়ে পড়ো, কিছুই তো শোন না'। বৃদ্ধা বলছে, 'তাতে কি হয়েছে বাবা, কানে ভগবানের দুটি কথা তো যাচ্ছে'।

গীতার এই কথাগুলো শুধু কর্ণকুহরে প্রবেশের জন্য নয়, এগুলো বাস্তবিক জীবনে নামানোর জন্য। কোথায় আপনার ঐশ্বর্য, কোথায় আপনার যশ? পাড়ার লোকেরাও আপনাকে জানে কিনা ঠিক

নেই, কোথায় গেল আপনার যশ? আরও উচ্চস্তরে যদি বলেন আপনি সাধন ভজন করছেন, সাধনা করছেন; লোকেরা এসে বলে, 'মহারাজ আমার না এই এই অনুভূতি হচ্ছে'। মহারাজরা রেগে বলে দেন, 'আপনি একজন ভাল মাথা খারাপ রোগের ডাক্তারকে দেখান। অনুভূতি হচ্ছে না ঘেচু হচ্ছে। যদি কিছু অনুভূতি হয়, তাহলে কি হবে?

উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি।। প্রথমটা হল আপনি আধ্যাত্মিক নন, আপনি একজন হিন্দু। এবারে আপনি যদি একজন আধ্যাত্মিক হিন্দু হন, তাহলে আপনার কি কি থাকতে হবে? এর আগে ভগবানের ছয়টি ঐশ্বর্যের কথা বললেন, এখন ভগবানের ছয়টি গুণ বলছেন। কি কি গুণ? ভগবান জানেন সৃষ্টি কিভাবে হয়, প্রলয় কিভাবে হয়, আপনিও এটা জানবেন। আর *ভূতানামাগতিং গতিম্*, জীবের যে জন্ম, মৃত্যু, জীবের যে পরলোক গমন এটাও ভগবান জানেন, আপনিও জানবেন। আর তার সাথে আপনি জানবেন মায়া কি, অবিদ্যা কি, বিদ্যা কি, মোক্ষ কি।

'ভগবান' বলতে আমরা কি বুঝি, এটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য আচার্য শঙ্কর বিষ্ণু পুরাণের ষষ্ঠ কাণ্ড থেকে এই দুটি শ্লোক নিয়েছেন। যদি জাগতিক দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহলে সেটা হবে প্রথম শ্লোক, আর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখতে হলে দ্বিতীয় শ্লোক। যিনি আধ্যাত্মিকতার সাধন-ভজনের স্তরে আছেন তাঁর জন্য প্রথম শ্লোক, আর সাধন-ভজন করে করে যিনি আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছে গেছেন তাঁর জন্য দ্বিতীয় শ্লোক। কি বলছেন দ্বিতীয় শ্লোকে, সৃষ্টির উৎপত্তি ও সৃষ্টির বিনাশ, জীবের উৎপত্তি ও জীবের মৃত্যু, আর তার সঙ্গে অবিদ্যা কি, বিদ্যা কি, মোক্ষ কি, এই ছয়টিকে জানা। আধ্যাত্মিক হলে এই ছয়টি জিনিস জানা যায়।

রাজযোগেও এই একই কথা বলা হয়েছে, যেমন যেমন ধ্যানের ভিতর দিয়ে এগোতে থাকবেন, তাঁর মধ্যে এই শক্তিগুলি এসে যাবে। এই শক্তি গুলি কারুর মধ্যে আসার আগে তাঁকে অবশ্যই, ঠাকুর আর মা ঘনঘন দর্শন দিচ্ছেন, চোখের সামনে আলো দেখা, জ্যোতি দেখা, কানে ঘন্টাধ্বণি শোনা, এগুলোকে মাথা থেকে পুরোপুরি নামিয়ে দিতে হবে। এই ধরণের কথাগুলো শুনলে আমাদের কাছে আজব লাগতে পারে, কিন্তু এটাই বাস্তব। আচার্য এই দুটি শ্লোক বলার পর বলে দিচ্ছেন, যিনি এটাকে জানেন, *স বাসুদেব ভগবানিতি*, তিনিই হলেন বাসুদেব, তিনিই ভগবান কৃষ্ণ। এই অর্থে ঠাকুরও বাসুদেব। এবার ভগবান খুব সুন্দর ও স্পষ্ট ভাবে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, পাপ কেন হয়, আসলে বলতে যাচ্ছেন কোন শক্তি, আমি করতে চাই না, তাও যে শক্তি ঠেলে আমাদের দিয়ে পাপ করায়। ঠাকুর বলছেন, মা আমাকে জ্ঞানের রাশ ঠেলে দেন; আর আমাদের জীবনে কে যেন পাপের রাশ ঠেলে দেয়; শ্রীভগবান বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।।৩৭।।

(শ্রীভগবান বললেন –এটা রজোগুণজাত, দুষ্পূরণীয় ও অত্যুগ্র কাম এবং এটাই ক্রোধ। এই সংসারে কাম আর ক্রোধকে মহাশত্রু বলে জানবে।)

ইহ মানে এই সংসারে, কারণ ভগবানের উপর পাপ কোন কাজ করে না। সৃষ্টিতে, এই সংসারেই পাপ কাজ করে। *কাম এষ ক্রোধ এষ*, দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেখানে আমরা আলোচনা করেছিলাম *ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে। সঙ্গাৎ সংজ্ঞায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধহ-ভিজায়তে*, বাষট্টি, তেষট্টি এই দুটি শ্লোকে কাম আর ক্রোধের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কামনা, মনের ভিতরে যে ইচ্ছাগুলি জমে আছে, এটাই মানুষকে দিয়ে পাপ করায়। আর ওই কামে যখন বাধা পড়ে মানুষ তখন ফোঁস করে ওঠে, এটাই ক্রোধ। কামে বাধা পড়লে দুটো

জিনিস হয় –তার যদি ক্ষমতা না থাকে মন বিষন্নতায় ভরে যাবে, অবসাদ এসে যাবে আর ক্ষমতা যদি থাকে তাহলে সে ফোঁস করে উঠবে।

এই কাম আর ক্রোধ কোথা থেকে আসে? বলছেন *রজোগুণসমুদ্ভবঃ*, রজোগুণ থেকে এই কাম আর ক্রোধ আসে। আমরা আগে আগে সত্ত্ব, রজো ও তমোগুণ নিয়ে একটু একটু আলোচনা করেছি। খুব সংক্ষেপে হল, তমোগুণীরা নিদ্রা আলস্যে পড়ে থাকে। কিন্তু সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে সব সময় এক সঙ্গে থাকে, সব কিছুতে থাকে, সবারই মধ্যে থাকে। ঠাকুরকে আমরা শুদ্ধ সত্ত্বগুণী বলি ঠিকই, কিন্তু একটু হলেও পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান তমোগুণ থাকতেই হবে, না থাকলে ঘুমই হবে না। ঘুম সাধারণ ভাবে তমোগুণের জন্যই হয়। যাঁরা প্রচুর জপধ্যান করেন তাঁদের ঘুম কমে যায়, কারণ জপধ্যান করার ফলে সত্ত্বগুণ বেড়ে যায়। তমোগুণে মানুষ কোন কাজ করতে চাইবে না, কিন্তু হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা, এই ধরণের লম্বা লম্বা চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। রজোগুণী জগৎ জয় করার জন্য কাজে নেমে পড়ে।

কাম জিনিসটা, ইচ্ছা জিনিসটা খুব আশ্চর্যের। মানুষের মনে যখন কোন কিছুর জন্য কাম হয়, তখন সে রজোগুণকে বাড়ায়। মানুষের মনে কিছু পাওয়ার ইচ্ছা জাগলে তবেই সে কাজে নামে। জীবন ধারণের জন্য এই দুটো জিনিস লাগে, হয় ইচ্ছা বা কাম আর নয়তো কর্তব্য। এই ইচ্ছা থেকেই শুরু হয় কর্ম, কর্ম করা মানেই কামের আরও বৃদ্ধি হবে। অনেক আগে আমরা অবিদ্যা, কাম ও কর্মের উপর আলোচনা করেছিলাম। তীর্থ করার ইচ্ছা এটা একটা শুভ কামনা, কিন্তু এটাও মানুষকে দিয়ে কর্ম করায়। একমাত্র আমি যখন নিজের দিকে এগোতে চাইছি, অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকে যেতে চাইছি, তখন এটা কামনার মধ্যে আসবে না। কামনা মানে সব সময়ই হয়, আমি যেটা নই, সেটাকে পেতে চাইছি। ঈশ্বর তো আমার ভিতরের, তিনি তো বাইরের কিছু না। কর্ম মানেই রজোগুণ, কাম বাড়তেই থাকে। ঠাকুর গল্প বলছেন, একজন সাধুর কৌপিন ইঁদুরে কেটে দেয়, খুব সমস্যা হয়ে গেছে। ইঁদুরকে শায়েস্তা করার জন্য একটা বিড়াল পুষলেন। বিড়ালের জন্য রোজ দুধ চাই, দুধের জন্য একটা গরু আনতে হল, এই করে করে দেখা গেল এক কৌপিন কে ওয়াস্তে পুরো একটা মহল বানিয়ে ফেলল। সেইজন্য বলছেন, কাম এটা হল *মহাশনো*, প্রচণ্ড খিদে, এর কখন পেট ভরে না। আচার্য বলছেন, এই যে রজোগুণ, সংসারী লোকেরা বলে, *তৃষ্ণায়া হি অহং কারিত ইতি দুঃখিতানাং*, যারা সেবা কাজে লেগে আছে, তারা খুব দুঃখ করে বলে, তৃষ্ণার জন্যই আজ আমার এই দুরবস্থা। যে যাই বলুক, এই তৃষ্ণার শেষ হয় না, এটা *মহাশনো*। এর পেট এমনই যে, এর পেট কখন ভরে না, যতই দিতে থাক, ওর পেট ভরবে না। আর এই কাম মহাপাপী। কারণ মানুষ যখন কাম দিয়ে প্রেরিত হয়, তখনই সে পাপ করে। আমরা দেখছি মানুষ পাপ করছে, কিন্তু এই পাপ করাচ্ছে কাম, সেইজন্য কাম হল পাপী। হিন্দীতে খুব সুন্দর বলে, পাপী পেট কে লিয়ে। পেট কি করে পাপী হবে, পাপী হল কাম।

শুধু যে পাপী তাই না, *বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্*, এই কামকেই তুমি তোমার শত্রু মনে করবে। তোমার মনে যে ইচ্ছাগুলো আছে, এটাকেই শত্রু মনে করবে। কেন শত্রু মনে করবে –

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্।।৩৮।।

(যেমন ধূম দ্বারা অগ্নি, ময়লা দ্বারা দর্পণ এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ আচ্ছন্ন থাকে, সেই রকম কামনা দ্বারা এই বিবেকবুদ্ধি আবৃত থাকে।)

এখানে তিনটে উদাহরণ নিয়ে এসে বলছেন, কাঠে আগুন দিলে সেখানে আগুন জন্মায় ঠিকই, কিন্তু সেই আগুন ধুয়ো দিয়ে ঢাকা থাকে; আবার আয়না, অনেক দিন ব্যবহার হয়নি, ধুলোতে

আর্শি ঢাকা পড়ে যায়, ফলে দর্পণে আমরা আমাদের মুখ বা চেহারা পরিষ্কার দেখতে পারব না। আর গর্ভ জরা দিয়ে ঢাকা থাকে, সংস্কৃতে এটাকে বলে *উল্বেন্*। বলছেন, আসল জিনিসটা অন্য কিছু দিয়ে ঢাকা থাকে, ঠিক তেমনি আসল যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান ঢাকা থাকে কাম দিয়ে। তার মানে, আমার আপনার, এর ওর সবার ভিতরে সেই জ্ঞান পূর্ণ রূপে বিদ্যমান, আত্মজ্ঞান সবারই ভিতরে আছে। কিন্তু সবারই এই জ্ঞান কাম দিয়ে, ইচ্ছা দিয়ে আবৃত। ইচ্ছা যদি না থাকত, কামশূন্য, বাসনাশূন্য যদি হত, তাহলে আমরা সবাই আত্মজ্ঞানী হয়ে যেতাম। সৃষ্টি যে আছে, তার মানেই তার ভিতর কোন কামনা আছে। এই কামনা আছে মানেই, আমাকে আপনাকে পাপের দিকে নিয়ে যাবে। কারণ আমরা জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছি, আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছি, ঈশ্বর জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছি, আত্মা, ঈশ্বর, জ্ঞান কোনটাই তো বাইরে নেই, সব আমাদের ভিতরেই। কিন্তু ওটাকে ঢেকে দিয়েছে কামনা দিয়ে। ফলে মানুষ নিজের স্বরূপকে জানতে পারে না। কামনা পুর্তির জন্য মানুষ বস্তুর পিছনে, ব্যক্তির পিছনে, নামযশের পিছনে দৌড়েই চলেছে। এই দৌড়ানর ফলে সে পথভ্রষ্ট হয়ে পাপ করছে।

পাপ থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, এর উপর একটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, পরে ভগবান আবার বলবেন। আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু কে? এখানে যেমন বলছেন, *বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্*, একেই তুমি শত্রু বলে জানবে; আসলে আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হয় আলস্য। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমের দিকে ভগবান বলছেন, *কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্*, ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযম করে আছে, কিন্তু মনে মনে অনেক কিছু ভেবে যাচ্ছে, যাদের আলস্য আছে তারা সবাই এই রকমই হয়, কোন কাজ না করে বসে বসে শুধু বড় বড় স্বপ্ন দেখে। এটা থেকে মানুষ যদি বেরিয়ে আসতে পারে, তখন সে আমার আপনার মত হয়ে যায়। আমি, আপনি কি রকম? আমি আপনি হলাম, যারা দিনগত কর্মক্ষয় করে যায়। একটু বিচার করে দেখতে হবে, আমরা আলস্য ছেড়ে দিয়েছি কোন সন্দেহ নেই। আলস্য যদি না ছাড়তে পারতাম, ঠিক টাইমে এই ক্লাশ শুরু করতে পারতাম না, ঠিক টাইমে আপনারাও শুনতে আসতে পারতেন না। কিন্তু আমরা সবাই দিনগত কর্মক্ষয় করে চলেছি। আমরা সবাই এটাই করি, সকালে উঠলাম, দাঁত ব্রাশ করলাম, চা খেলাম, খবর কাগজ পড়লাম, যা যা রোজ করতে হয় যতটুকু দরকার করলাম, মায়েরা যাঁরা আছেন তাঁরা একটু রান্না করলেন, দাদারা বাজার থেকে সবজি কিনে এলেন, খাওয়া দাওয়া করল, অফিসে গেল, বাড়ি এলো, টিভি দেখল, খেয়ে শুয়ে পড়ল, আবার আগামী দিনের জন্য প্রস্তুত। সবাই মোটামুটি এইভাবে দিনগত ভাবে কর্মক্ষয় করে চলেছে। যারা আলস্যে আছে, যারা দিনগত কর্মক্ষয়ে আছে, এদের পক্ষে পাপ নাশ অসম্ভব। কারণ আলস্যে যারা আছে, তারা পাপ করবেই, আর দিনগত কর্মক্ষয়ে যারা আছে তারাও পাপ করবেই। এদের কোন উপায় নেই, শুনতে হয়ত অত্যন্ত খারাপ লাগবে, কিন্তু এটাই সত্য।

তৃতীয় আরেকটা হয়, একটা আদর্শকে নিয়ে জীবনে যখন মানুষ এগোতে শুরু করে। আমাদের চারটে পুরুষার্থ – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এই চারটে পুরুষার্থকে আমরা এখন নূতন ভাবে সাজিয়েছি – বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগ। 'বিদ্যা' মানে, যে কোন বিদ্যার প্রতি পুরোপুরি সমর্পিত হয়ে এগিয়ে যাওয়া। 'সম্পদ', সমাজ ও দেশের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করা। 'সেবা', সবার প্রতি সেবার ভাব; ঠাকুর বলছেন দয়ার ভাব। আর রইল 'ত্যাগ', ঈশ্বরের জন্য সব কিছু ত্যাগ করে দেওয়া। এই চারটেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, সেবা করার আগে জানতে হয় কিভাবে সেবা করতে হয়। আমি তখন বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারী হয়ে ট্রেনিং সেন্টারে ছিলাম। একদিন দেখছি মন্দিরের পাশে ট্যাপ খোলা, জল বেরিয়ে যাচ্ছে। দেখলাম, আমাকে সেবা করতে হবে, গিয়ে ট্যাপটা বন্ধ করে দিয়েছি। বন্ধ করতেই দেখছি, ওদিক থেকে একজন এসে চেঁচাতে শুরু করেছে, 'আপনাকে কে বলেছে ট্যাপ বন্ধ করতে'? আমি বললাম 'ট্যাপ থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে'। তখন বুঝলাম, মন্দিরের চারিপাশে

যে ড্রেন গুলো আছে, সেগুলোকে পরিষ্কার করা হচ্ছে, তাই জল ছাড়া হয়েছে। আমি ট্রেনিং সেন্টারে গিয়ে আচার্যকে বললাম, 'দেখুন সেবা করতে গেলাম, বকুনি খেয়ে গেলাম'। উনি বললেন, 'মুর্খের মত সেবা করতে গেলে কেন? মুর্খের মত সেবা করতে গেলে এই রকমই হবে'।

সেবার জন্যও জ্ঞান দরকার। জ্ঞান অনেক রকম আছে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হল আত্মজ্ঞান। যিনি আত্মজ্ঞানকে আদর্শ করে নিয়েছেন, তিনি সেই জ্ঞানের দিকে এগোলেন। সেখান থেকে নামতে নামতে সবটাই জ্ঞান। এই চারটে পুরুষার্থ বা বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগ, যেমন ধরুন বিদ্যা, যে কোন বিদ্যা, যে গান ভালবাসে, সে নিজেকে গানের মধ্যে উৎসর্গ করে দিক, আপনি আঁকতে জানেন, আপনি বাজনা বাজাতে পারেন, গ্রাফিক ডিজাইন জানেন, ফটোগ্রাফি জানেন, কম্প্যুটারের প্রতি আগ্রহ আছে, নিজেকে উৎসর্গ করে দিন। একটা কোন আদর্শ যদি জীবনে এসে যায়, এবার পাপের সাথে লড়াই হবে। জীবনে যদি কোন একটা আদর্শ না থাকে, কেন বেঁচে আছি, এই প্রশ্নের উত্তর যদি আপনার কাছে পরিষ্কার না থাকে, তাহলে জানবেন পাপকে আপনি কোন দিন অতিক্রম করতে পারবেন না। পাপকে জয় করার প্রথম উপায় আলস্য ত্যাগ, দ্বিতীয় দিনগত কর্মক্ষয় ত্যাগ এবং তৃতীয় একটা আদর্শ গ্রহণ। আদর্শ যদি গ্রহণ না করা হয়, তাহলে পাপের সাথে লড়াই করে পেরে উঠবেন না।

আদর্শকে নিয়ে যখন এগোতে শুরু করল, আর তখনই কিন্তু সত্ত্বগুণ এবং রজোগুণের মধ্যে বাচ খেলতে থাকবে। এবার এর মধ্যে যখন কোন কাম আসবে, কোন প্রলোভন আসবে, তখন নিজেকে মনে করাতে হবে, এটা মারাত্মক বিপজ্জনক, আমাকে গিলে নেবে, *মহাশনো*। ঠাকুর সেইজন্য বলতেন, যারা একটা পথ নিয়ে নিয়েছে, তাদের জন্য কামিনী হল বিঘ্ন। তার উল্টোদিকে, মেয়েরা যারা একটা পথ নিয়ে নিয়েছে, তাদের জন্য বিঘ্ন হল পুরুষ, খেয়ে ফেলবে।

দেওঘরে একবার আমার এক ছাত্র জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি কখন মনে হয়নি, ঘর-সংসার করলে কেমন হত'? আমি বললাম, 'এখন তো কোন প্রশ্নই উঠছে না। দশ বছর আগের কথা যদি বল, যেটাকে তুমি কামাদি বলছ, এলে প্রথমেই আমার মাথায় আসবে, ওরা যে প্রাইস ডিমাণ্ড করবে, তা যে কোন জিনিস হতে পারে, যেমন আমি একটা ভাল জুতো কিনতে চাইছি, কিন্তু ওর একটা দাম আছে, আমাক টাকা জোগাড় করতে হবে, কোথা থেকে আমি এত টাকা পাব'। ঠিক তেমনি জগতে প্রত্যেকটি জিনিসের উপর একটা প্রাইস ট্যাগ থাকবে। যেমন আলু কিনতে গেলে তারও একটা প্রাইস ট্যাগ আছে। ঠিক তেমনি সংসার যদি করতে চায়, তার একটা প্রাইস ট্যাগ আছে, সন্ন্যাস যদি করতে চান, তারও একটা প্রাইস ট্যাগ আছে। এবার যখন কেউ একটা আদর্শকে নিয়ে শুরু করল, এবারে সে পথ ছেড়ে যে একটু কামের দিকে যাবে, মনে করতে হবে ওখানে একটা প্রাইস ট্যাগ আছে। আপনি কি সেই মূল্যটা দিতে রাজি আছেন? আপনার মনে হবে, এটা সম্ভব না। আমেরিকাতে Tuskegee University আছে, ওখানে প্রথমের দিকে জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার প্রফেসর ছিলেন। উনি নিগ্রো ছিলেন, গাছপালা ভালবাসেন। আমেরিকাতে চিনা বাদামে উনি বিপ্লব এনে দিলেন। আজকের দিনে চিনা বাদামের যা কিছু আমরা পাই, সব ওনারই করা। উনি সারা জীবন অকৃতদার থেকে গেলেন, আর তিনি এই কথাই বলতেন, গাছপালা আমার প্রাণ; গাছপালার দিকেও মন দেব আবার আমার স্ত্রীর দিকেও মন দেব, আমার পক্ষে সম্ভব না। আদর্শবান পুরুষ, যার একটা আদর্শ আছে, আমরা এখানে ধর্মের আদর্শের কথা বলছি না, যেমন এই জর্জ ওয়শিংটন কার্ভার, গাছপালা ছাড়া কিছু জানেন না, যেমন আইনস্টাইন, ফিজিক্সের জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করে দিলেন, এটাই আদর্শ।

রিচার্ড ফাইনম্যান খুব নামকরা বড় পদার্থ বিজ্ঞানী। উনি ক্যালিফোর্নিয়ার ইনস্টিট্যুইট অফ টেকনলজিতে ফিজিক্স পড়াতেন। ওনার একবার ইচ্ছে হল, এখানে মাইনে কম অন্য জায়গায় চলে

যাব। খুব কম বয়সে ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়সে তিনি প্রফেসর হয়ে গিয়েছিলেন, খুব ট্যালেন্টেড ছিলেন, আমেরিকার এ্যাটমিক বোম্ব প্রজেক্টে ছিলেন, পরে নোবেল প্রাইজ পান। তিনি তখন ক্যালিফোর্নিয়ায় আটশ ডলার পেতেন। তিনি এক বন্ধুকে লিখলেন, বন্ধু যে ইউনিভার্সিটিতে আছেন তারা সঙ্গে সঙ্গে বলল আমরা এক হাজার ডলার দেব, তুমি চলে এসো। ফাইনম্যান নিজের হেডকে গিয়ে বললেন, হেড শুনে বলে দিলেন, এখানে কাজ করা মানে বিয়ে করে নেওয়া, এখান থেকে তুমি ছেড়ে যেতে পার না। তোমাকে আমরা বারশ ডলার দেব। ওকে জানালো, ওখান থেকে জানালো চৌদ্দশ ডলার দেব। এখানে জানাতে বলল পনেরশ ডলার দেব। ফাইনম্যান খুব সুন্দর একটা বর্ণনা দিচ্ছেন। গ্রীকদের একটা কাহিনী আছে Balaam's Ass, রাস্থা দিয়ে একটা গাধা যাচ্ছে, দুদিকে ঘাস দেখছে। যখন রাস্থার ওইদিকে যায় তখন দেখছে অন্য দিকটায় ঘাস বেশি আছে, তখন গাধাটা সেদিকে চলে আসে। এখানে এসে যখন ঐ দিকে তাকায় তখন মনে করে ঐ দিকেই বেশি ঘাস আছে। সারাটা দিন গাধাটা রাস্থার এধার আর ওধার করে যাচ্ছে, খাওয়া আর হয় না। ফাইনম্যান বলছেন, এখানে কিন্তু ওই গাধার মত অবস্থা নয়, এখানে সত্যি সত্যি টাকার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে।

তখন তিনি ভাবছেন, এত টাকা নিয়ে আমি কি করব? আমি হয়ত একটা ভাল বাড়ি ভাড়া নেব, সেখানে কোন একজন মিস্ট্রেসকে রাখব। আর সারাদিন ওকে নিয়ে চিন্তা করতে থাকব, বিশ্বাসী কিনা, নাকি অবিশ্বাসী। এই করে করে আমার ফিজিক্স করাটা বন্ধ হয়ে যাবে, মাথায় খালি ওই মেয়েটি ঘুরতে থাকবে। উনি সঙ্গে সঙ্গে ওনার ডিপার্টমেন্টাল হেডকে গিয়ে বললেন, আমি কোথাও যাচ্ছি না, অতিরিক্ত একটা পয়সাও আমার লাগবে না। ওই আটশ ডলারেই তিনি ওখানে থেকে গেলেন। ওনার প্রাণের জিনিস হল ফিজিক্সের জ্ঞান আহরণ করা, উনি সমস্ত কিছুর সাথে আপোষ করবেন এই ফিজিক্সের জন্য। তা সত্ত্বেও কাম আসছে, কিন্তু তখন বিচার আনছেন, আমার যেটা প্রিয় সেটাই আমার আসল, ওটাকে ভেবে ভেবে তিনি ওখান থেকে পিছিয়ে আসছেন। গীতার এখানে যে আলোচনা চলছে, এই আলোচনা কিন্তু সাধারণ লোকেদের জন্য হচ্ছে না। এটা হচ্ছে, যাঁরা একটা আদর্শ নিয়ে নিয়েছেন। কেন?

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চল।।৩৯।।

(হে কৌন্তেয়, এই কাম জ্ঞানীর চিরশত্রু। এটা অনলের মত দুষ্পূরণীয়। এই তৃষ্ণারূপ কাম দ্বারা বিবেকবুদ্ধি আবৃত থাকে।)

এটা কার জন্য বৈরী? বলছেন, জ্ঞানীদের জন্য বৈরী। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে যে মুর্খ, সে তৃষ্ণাকে কখন শত্রু মনে করে না। যাঁরা শাস্ত্র কথা শুনছেন, তাঁদের দেখে সাধারণ মানুষ হাসে, সারাদিন কি সব শুনছে। আপনাদেরই হয়ত বাড়ির লোকেদের কাছ থেকে শুনতে হয় –আরে ভাই এটা তো সবার জানা আছে ভগবান আছেন, তিনি দেখছেন, সকাল বিকেল একটু তুলসী বাতাসা জল দিয়ে দিলে, একটু ধূপধুনো দিয়ে দিলে, এরপর আর কি দরকার! এদের তৃষ্ণার পুর্তি হলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। আজকাল তো পাড়াতে হিন্দু ধর্ম নাম শুনলেই হা হা করে সব হাসবে, হিন্দু ধর্ম নিয়ে কেউ যদি কিছু বলে, ওর পিছনে সবাই ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে যাবে, এই দেখ একজন মুর্খ পাওয়া গেছে। অযোধ্যার রামজন্মভূমিতে প্রধানমন্ত্রী যখন ভূমি পূজা করলেন, সেটাকে নিয়ে লোকেরা বলতে শুরু করল secularism is dead। Secularism is dead, এই কথা যে আমরা প্রথম শুনছি তা না, কদিন বাদে বাদেই এই কথা বলা হয়। আমরা ভাবি secularismএর কত দম, কিছু দিন বাদে বাদেই আবার বেঁচে উঠছে। বাবরি মসজিদ যখন ভাঙা হল তখনও বলল, secularism is dead, মোদি যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন, তখনও বললেন secularism is dead, সুপ্রীম কোর্টের রায়

যখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে গেল, তখনও বলল secularism is dead। কি সাংঘাতিক জিনিস, secularism মরে যাচ্ছে আবার দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। আমিও মজা করে লিখলাম, অন্যান্য ধর্মের ফেস্টিভেলেসে আর ওদের পবিত্র জিনিসে যদি যান, তখন কিন্তু secularism মরে না। কিন্তু হিন্দুদের ফেস্টিভেলসে বা মন্দিরে যদি যান, secularism is dead। ঠিক তেমনি কেউ যদি হিন্দুদের কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে, তখন ব্যঙ্গ করে বলবে, চলো চলো দেখবে চলো, আলিপুর চিড়িয়াখানায় যেমন অনেক জন্তু আছে, আমাদের পাড়াতেও অনেক জন্তু আছে, যারা ধর্ম করছে।

এদের তৃষ্ণার পুর্তি হলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। এদের কাছে সুখ হল কামিনী কাঞ্চনের সুখ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সুখ। এরা স্পর্শ সুখ পেতে চায়, গন্ধের সুখ পেতে চায়, রসের সুখ পেতে চায়। চোখ দিয়ে প্রিয়জনকে দেখবে, সুন্দরকে উপভোগ করবে, প্রিয়জনের কন্ঠস্বর শুনবে, মধুর সঙ্গীত শুনবে। কিন্তু যাঁরা জ্ঞানী? পরে আর-এক জায়গায় বলবেন, জ্ঞানী অনেক প্রকার হয়, যাঁরা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন করেছেন, তাঁকেও জ্ঞানী বলা হয়; যাঁরা বিচার করে করে বুঝেছেন ঈশ্বর কি, তাঁরাও জ্ঞানী; আবার যাঁরা এই পথে সদ্য নেমেছেন, তাঁরাও জ্ঞানী। যাঁরা এখন এই শাস্ত্র কথা, গীতার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন, তাঁরাও কিন্তু জ্ঞানী। জ্ঞানী না হলে এ-সব কথা শুনতেই চাইবেন না। আমরা এমনিতে মনে করি, জ্ঞানী মানে যার সমস্ত জ্ঞান আছে। জ্ঞানী মানে তা না, যাঁরা এই পথ নিয়েছেন তাঁদেরও জ্ঞানী বলা হয়, চতুর্থ অধ্যায়ে আচার্য ঠিক এই কথাই বলবেন। যিনি আত্মজ্ঞানী, যিনি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ করে নিয়েছেন, তাঁর কাছে কাম কেন বৈরী হতে যাবে, তাঁর কিসের ভয়! তাহলে এই কথা কাদের জন্য বলছেন? যাঁরা জ্ঞানপথের পথিক, জ্ঞানের চেষ্টায় যাঁরা লেগে আছেন, আমি আপনি সবাই, তাঁদের জন্য বলা হচ্ছে। এনাদেরই শত্রু কাম। যে আলস্যে পড়ে আছে, তমোগুণী, তার জন্য কাম শত্রু নয়। যারা ভোগ করতে চায়, ইন্দ্রিয় সুখ, কামিনী কাঞ্চনের সুখ যে পেতে চায়, তার জন্য কাম তো মিত্র। এই কাম জ্ঞানীদের জন্য শত্রু।

যদি আপনি সত্যিকারের মনে করেন, আমি প্রায়ই ভুল কাজ করে ফেলি, মাঝে মাঝে পাপ কাজ করে ফেলি; তাহলে আপনার জন্য প্রথম হল আলস্য ত্যাগ, দিনগত কর্মক্ষয় থেকে বেরিয়ে এসে জীবনে একটা আদর্শ নিয়ে আসতে হবে। আদর্শকে নিয়ে যখন চলতে শুরু করবেন, তখন দেখবেন বিভিন্ন দিক থেকে আপনাকে আদর্শচ্যুত করার চেষ্টা চলতে থাকবে। রিচার্ড ফাইনম্যানের যে গল্পটা বলা হল, ঠিক তেমনি আমাদের এদিকে একবার টানছে, আবার ওদিক থেকে টানছে। তখন মনকে মনে করাতে হয়, আমি কিন্তু কোন অজুহাতেই আদর্শকে ছাড়তে পারব না, নিজেকে এটা বারবার মনে করাতে থাকলে তখন আপনি আস্তে আস্তে আগের জায়গায় ফেরৎ চলে আসবেন।

আর এই পাপ জিনিসটা, আমরা এখানে যেটার আলোচনা করছি, এটা সাধারণ লোকেদের জন্য নয়। সাধারণ লোকেদের কাছে কামিনী কাঞ্চনের সুখ, ইন্দ্রিয়ের সুখ, আলস্য, দিনগত পাপক্ষয়, এগুলো পাপ নয়। যেমন একজন ক্রিমিনাল, যে খুন করে বেড়াচ্ছে, তার কাছে এটা পাপ নয়, সে মনে করছে আমি ঠিকই করছি। একজন লম্পট চরিত্রহীন লোক যখন মেয়েদের শীলহানি করে, তখন সে মনে করে না যে, আমি কোন ভুল কাজ করছি, তার কাছ এটাই আনন্দের। এখানে গীতায় যে জ্ঞানীর কথা বলছেন, এই জ্ঞানী হলেন যাঁরা ধর্মপথের পথিক। বিশেষ করে যাঁরাই জ্ঞানের সাধক, এটা তাঁদের জন্য।

যে কোন জিনিস যেটা বিঘ্ন রূপে সামনে আসে, সেটাকে সরিয়ে দিতে হয়। আপনি বুঝতে পারছেন এই কাজটা করলে আমার জ্ঞানলাভের পথে বিঘ্ন হবে; কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি আপনি সেই কাজ করেন, আচার্য বলছেন, *জ্ঞানী হি জানাতি অনেন অহম্ অনর্থে প্রযুক্তঃ পূর্বম্ এব ইতি*, জ্ঞানী পূর্ব থেকেই জানেন, এই কাম আমাকে অনর্থের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, আমি করতে চাই না। যদি আপনার মনে এই বোধ এসে থাকে, আমি করতে চাই না, তাও আমি করছি, আপনি জানবেন

আপনি আধ্যাত্মিক পথে অনেক এগিয়ে গেছেন, কারণ বাকিরা এটাও বুঝতে পারে না। সে যে জানে না, তা না, সে মনে করে আমি যা করছি ঠিকই করছি, যা হবার হবে। একদিকে স্বার্থপর, অন্য দিকে মিথ্যে কথা বলবে, লোকেদের ঠকাবে, বলবে, বেশ করেছি। 'আরে ভাই, জীবন এভাবে চলে', এটাই তাদের ভাষা। কিন্তু যিনি জ্ঞানী, জ্ঞানী মানে যিনি এই পথে চলতে শুরু করেছেন, তিনি হা হুতাশ করেন আর মনে মনে বলেন, আমার পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্ম এত খারাপ যে, এখনও আমার ভিতরে এমন কাম, আমাকে দিয়ে এইসব ভুল কাজ করিয়ে যাচ্ছে। এই কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর মধ্যে ইচ্ছা শক্তিটা বাড়ে, ওই ইচ্ছা শক্তি দিয়েই কাম দমন হয়।

কেউ যদি মনে করেন যে, একটা খুব উচ্চমানের কথা শুনবে আর সব ঠিক হয় যাবে, এভাবে হয় না। আধ্যাত্মিক জমিতে এই ইঞ্চি মাটি দখলের জন্য চাই তীব্র সংঘর্ষ, তীব্র সংগ্রাম। কিসের জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে, এটাকে জানতে হয়। তার সাথে কিভাবে সংগ্রাম করতে হয়, সেটাকেও জানতে হয়, তবেই আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়া যায়। আপনি যদি এটা বুঝে থাকেন যে, আপনার দ্বারা মাঝে মাঝে ভুল কাজ হয়ে যায়, তাহলে বুঝবেন আপনি অনেকটাই এগিয়ে গেছেন। জীবনে একটা আদর্শ থাকলে ভুল কাজগুলো আরও বেশি ভিতরে বাজে। যারা মুর্খ তারাই মনে করে তৃষ্ণা আমার বন্ধু। যাঁরা জ্ঞানী, তাঁরা মনে করে এই তৃষ্ণাই আমার সর্বনাশ করছে, কবে যে এই তৃষ্ণা থেকে মুক্তি পাব! এবার কামনা জিনিসটাকে নিয়ে বলছেন।

কামের রূপটা কি রকম? কাম জিনিসটাকে আচার্য পরিভাষিত করছেন। প্রথমে বলছেন, ইচ্ছা হল কামের স্বরূপ, দ্বিতীয় কাম বহু কষ্টে পূর্ণ হয়। যে কোন জিনিস যদি আমি পেতে চাই, একটা সন্তানও যদি কেউ পেতে চায়, কত রকমের ঝামেলা, ডাক্তারের কাছে যাওয়া, এই টেস্ট, সেই টেস্ট, কত রকমের ওষুধ, তারপর দুশ্চিন্তা স্ত্রী সুস্থ থাকবে কিনা, সন্তানের জন্মটা ঠিক ঠিক ভাবে হবে কিনা ইত্যাদি। আর কাম হল অনলের মত দুষ্পূরেণ, সহজে এর পূরণ হয় না, তৃপ্তি হয় না। আগুনে যত যাই দেওয়া হোক তার আর ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না, খেয়েই যাবে আর জ্বালিয়ে যাবে। বলছেন, এই যে জ্ঞান, এই যে আত্মজ্ঞান, বা যে কোন জ্ঞান যদি কেউ পেতে চায়, এই জ্ঞানকে কামনা-বাসনা চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। ফলে মানুষ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। জ্ঞানীদের জন্য এটা নিত্য বৈরী, চিরশত্রু।

শ্রেয়োকে যদি পেতে হয়, তাহলে প্রেয়কে ত্যাগ করতে হবে। কঠোপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায়ে যমরাজ প্রথমেই নচিকেতাকে বলছেন, শ্রেয়ো আর প্রেয়ো এই দুটো সবারই জীবনে আসে, প্রেয়ো মানে যেটা আমার ভাল লাগে; শ্রেয়ো মানে যেটা আমার জন্য ভাল। যাঁরা ধীর পুরুষ তাঁরাই শ্রেয়োকে বরণ করেন। আর প্রেয়ো? সবাই এর মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। শ্রেয়োর পথ সবার জন্য নয়। পাপ থেকে মুক্তি পেতে চান কি? তাহলে জ্ঞানের পথ অবলম্বন করুন, আর হা হুতাশ করুন, কেন আমার সঙ্গে এমনটা হল। সেইজন্য খ্রীশ্চান পরম্পরায় অনুশোচনা ও স্বীকারোক্তির ধারণা নিয়ে আসা হয়েছে। যখন কেউ গিয়ে যীশুর সামনে স্বীকারোক্তি করছে, তার মানে তার মনে একটা গ্লানি বোধ হচ্ছে। এই করেই মানুষ ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসে।

প্রথমে দেখালেন কাম, পরের ধাপে দেখালেন কোথা থেকে পাপ জন্ম নিচ্ছে, কাম থেকে জন্ম নিচ্ছে। আচার্য বলছেন, *কিমধিষ্ঠানঃ পুনঃ কামো,* এই কাম থাকে কোথায়? আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, *জ্ঞাতে হি শত্রোঃ অধিষ্ঠানে সুখেন শত্রুনিবর্হণং কর্তুং শক্যতে,* শত্রুর লুকোন আস্থানাটা যদি জানা থাকে, তবে গিয়ে শত্রুকে নাশ করা সহজ। আমাদের আগে জানতে হবে শত্রু কোথায় লুকিয়ে আছে। সাপ কোন গর্তে ঢুকে আছে জানলে, ওকে মারা সহজ। তেমনি এই কামকে যদি নাশ করতে হয়, তাহলে আগে জানতে হবে ব্যাটা কোথায় ঘাপটি মেরে বসে আছে। এবার ভগবান বলছেন –

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানামুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষা জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্।।৪০।।

(পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, সংকল্পবিকল্পাত্মক মন এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি কামের আশ্রয় বলে কথিত হয়। এদের দ্বারা বিবেকজ্ঞান আবৃত করে কাম দেহাভিমানী জীবকে ভ্রান্ত করে।)

আমাদের যে বিভিন্ন কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি রয়েছে, আর তার সাথে মন আর বুদ্ধি, আমাদের পুরো পদ্ধতিটা চলে এই তিনটেকে নিয়ে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। যার কাছে সব রকম তথ্য এসে পৌঁছায়, সে হল মন, আর ওই তথ্যটা ঠিক না বেঠিক, এটাকে যে নিশ্চিত করে বলে দেয়, সে হল বুদ্ধি। মনকে বলা হয় সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা, আর বুদ্ধিকে বলে নিশ্চয়াত্মিকা, নিশ্চিত করে বলে দিচ্ছে এটা আমাকে করতে হবে বা এটা আমার করা উচিৎ হবে না। মনে একটা চিন্তা এলো, আজ বাজার যেতে হবে, আবার চিন্তা এলো, না, আজ না গিয়ে কাল গেলে হবে, আবার চিন্তা করতে লাগল, নাঃ বাজারে গেলেই হয়, যাব কি যাব না, এটাই সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক, এটাই মন। আর যখন বলছে যেতেই হবে, বা বলছে এই কাজ একেবারেই করা যাবে না, যে এটা ঠিক করে দিচ্ছে তার নাম বুদ্ধি। বুদ্ধি তৈরী হয় বিচার দিয়ে, শাস্ত্র শ্রবণ করে এবং গুরুজনের কথা শুনে। মন পুরোপুরি চলে তথ্য সরবারহের উপর, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তথ্য যেমন যেমন আসছে, সেই তথ্য দিয়ে মন কাজ করে। বুদ্ধি কাজ করে, যেটা আগে থেকে তৈরী হয়ে আছে, সেটার উপরে।

তাহলে আমরা কি বুঝলাম? কাম আর ক্রোধের তিনটে বাসস্থান, ইন্দ্রিয়, মন আর বুদ্ধি। আমাদের এই বাইরের চোখ, কান, নাক এগুলো ইন্দ্রিয় নয়, আসল ইন্দ্রিয় হচ্ছে মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্নায়ু কেন্দ্রে অবস্থিত, আর এগুলো হচ্ছে তার যন্ত্র। মন আর বুদ্ধিরও কেন্দ্র হচ্ছে মস্তিষ্কে। ইন্দ্রিয়ের যত যন্ত্র এগুলো নার্ভ সেন্টারের মাধ্যমে মস্তিষ্কে গিয়ে বসে আছে। এই মস্তিষ্কেরই একটা বিশেষ কাজকে ইন্দ্রিয় বলা হচ্ছে, আর-একটা বিশেষ ধরণের কাজকে মন বলছে, সেই মস্তিষ্কেরই আর-একটা বিশেষ কাজকে বুদ্ধি বলা হচ্ছে। এই মস্তিষ্কই যখন স্থূল শরীরের মাধ্যমে বাইরে থেকে তথ্য আহরণ করে মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রে পাঠাবার কাজ করছে তখন তাকে বলছে ইন্দ্রিয়। মস্তিষ্ক যখন চিন্তা ভাবনা রূপে কাজ করছে, এটা করব কি করব না, ওখানে যাবো কি যাবো না, এই ধরণের যে চিন্তাগুলি করছে এটাকে বলা হচ্ছে মন। এরাও তথ্য আহরণ করছে, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরের মাধ্যমে যে তথ্য সংগ্রহ হচ্ছে তাকেই বলা হচ্ছে চিত্ত। আর মনকে যখন বলে দিচ্ছে এটাই করতে হবে, এটাই ঠিক, এই ঠিক করে দেওয়ার কাজটা হচ্ছে বুদ্ধির। এই চিত্ত, মন, বুদ্ধি আর অহঙ্কার, এদের মধ্যে অহঙ্কার সব সময় রাগ আর দ্বেষ থেকেই আসে। অহঙ্কার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির মাধ্যমে কাজ করায়। যদি অহঙ্কারের নাশ করতে বলা হয় তখন ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। কেননা অহঙ্কারের কিছু করার নেই, আর চিত্তের কাজ শুধু বৃত্তি তৈরী করা। অহঙ্কারটা হচ্ছে আমাদের সমস্যা, এর বাস হচ্ছে এই তিনটেতে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতে।

যে খেতে খুব ভালোবাসে, সে বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্ন পেলেই সেখানে চলে যাবে। বিয়ে বাড়িতে নিয়ে যাওয়াতে কার বড় ভূমিকা? তার দুটো পায়ের। পা দুটো যদি বলে দেয় আমি যাবো না, তখন তো আর তার বিয়ে বাড়িতে যাওয়া হবে না। এখন সে যদি বলে আমি আর ভোজ খেতে যাব না, তখন পাকে বলে দেবে আমার পা যাবে না। রাগ আর দ্বেষ কোথায় ঢুকে আছে? মন আর বুদ্ধিতে। মন বলছে যাবো কি যাবো না, বুদ্ধি বলছে এবারের মত চল। বুদ্ধি যখন বলে দিল তখন আর কোন সমস্যাই নেই। এখন যদি কোন কারণে পা খোঁড়া হয়ে যায় তখন বুদ্ধি বললেও যেতে পারবে না, এগুলো হচ্ছে স্থূল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার। এখন যিনি সাধক তাঁকে বলা হচ্ছে তোমার ইন্দ্রিয়গুলোর ছুটোছুটি দাপাদাপি বন্ধ করতে হবে। তাহলে কি সাধক চোখে ফেট্টি দিয়ে, কানে সিসা ঢেলে, পা খোঁড়া করে চুপ করে বসে থাকবে? না, এগুলো করতে বলা হচ্ছে না। মস্তিষ্কে যে

প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ঐটাকে আটকে দিতে বলা হচ্ছে, যেমন বাইরে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উত্তেজনা আসছে, সেই উত্তেজনা নার্ভের মাধ্যমে মস্তিষ্কে যাচ্ছে, মস্তিষ্কে গিয়ে সে ঠিক সেই উত্তেজনাটা বাইরে ছুঁড়ে দিচ্ছে, এই বাইরে ছুঁড়ে দেওয়াটাকে আটকাবার কথা বলা হচ্ছে। তার থেকে আরও বড় ব্যাপার হল এই প্রতিক্রিয়ার সাথে যখন কামনা বাসনাগুলো জুড়ে যায় তখন সাধককে পুরো বিধ্বস্ত করে দেয়। তাহলে উপায় কি?

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানাং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনম্।।৪১।।

(হে ভরতবংশশ্রেষ্ঠ, তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করে জ্ঞান ও বিজ্ঞান-নাশক পাপরূ এই কামকে পরিহার কর।)

পাপ থেকে কিভাবে আমরা বাঁচব? আগে একটা আদর্শ রাখার কথা বলা হয়েছিল, জীবনে একটা আদর্শ রাখলে পাপ থেকে বেরোন যায়। গীতা এখানে বলছে, *তস্মাৎ ত্বম্*, হে অর্জুন তুমি যদি এটা থেকে বাঁচতে চাও, তাহলে *ইন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য*, আদৌ মানে সবার আগে, সবার আগে তুমি ইন্দ্রিয়ের নিয়মন্ কর। একটা সুন্দর ফুটফুটে বাচ্চাকে দেখলাম, ইচ্ছে হল গালটা টিপে আদর করি, তার মানে তোমার মধ্যে শোভন অধ্যাস আছে, সুন্দর জিনিসের প্রতি আকর্ষণ আছে। চোখের সামনে সুন্দর একটা বাচ্চা এসে যেতে পারে, আসতেই পারে। এবার আমার ইচ্ছে হল ওকে আদর করি, প্রথমে চোখের মাধ্যমে বাচ্চার চেহারাটা ভিতরে গেল, মনকে সে বলল, কি সুন্দর বাচ্চা। মন এবার হাতকে বলল, একটু ছুঁয়ে দেখ। এতক্ষণ সবটাই মনের মধ্যে চলছে, দ্বিতীয় ধাপে হস্তেন্দ্রিয় এগিয়ে গিয়ে বাচ্চার গালে হাত দিল, এবার কিন্তু বিপদে পড়ে গেল। জ্ঞানেন্দ্রিয় পর্যন্ত ঠিক আছে, কিছু করার নেই, কারণ একটা তথ্য এসে গেছে, তথ্য অনবরত আসতেই পারে। পরের ধাপটাই আসল, কর্মেন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়, কর্মেন্দ্রিয় যেন না এগোয়। এমন যেন মনে না হয় যে, হাত-পা যেন আপনার না। আপনার ইচ্ছা বিনাই হাত-পা চলছে, যেমনি শুনল ওই পাড়াতে মারামারি হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে দৌড় লাগাবে। এটাকেই নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বলছেন, আত্মনিয়ন্ত্রণ করুন। প্রথমে কর্মেন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, তারপর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ।

এখান জ্ঞান মানে, শাস্ত্র পড়েছেন, পড়ার পর যখন আত্ম-অনাত্ম, বিদ্যা-অবিদ্য এই তফাৎ গুলো বুঝে নিলেন, এটাকে বলে জ্ঞান। আর এটাকেই যখন বিশেষ ভাবে জানা হয়, অর্থাৎ যখন প্রত্যক্ষ হয়ে যায়, তখন সেটা হয়ে যায় বিজ্ঞান। ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন, দুধের কথা কেউ শুনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে; খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়াটা বিজ্ঞান। যে জিনিসটাকে শুধু দেখেছে, এটা জ্ঞান। বলছেন, তুমি এটা বুঝে নাও, এই পাপ তোমার যেটা কল্যাণপ্রাপ্তি হওয়ার পথে বাধক, সেটাকে নাশ করবে।

কামেরও একটা প্রাইস ট্যাগ আছে। এখানে আবার আমাদের একটু পিছনের দিকে যেতে হবে, যেখানে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে, বিষয়ী লোকেরা মুর্খ, তারা বিষয় সেবন করতে পারলে খুব খুশী হয়। অসুররা গন্ধ শুঁকে খায়, মদের গন্ধেই অনেকের নেশা ধরে যায়, এটা আসুরিক বৃত্তি। মানুষ জিহ্বা দিয়ে খায়, স্বাদকে আস্বাদ করে। দেবতারা দৃষ্টি দিয়ে খায়। স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের একটা ঘটনা আছে। তখন তিনি সঙ্ঘের অধ্যক্ষ। একদিন ওনার সেবক কলকাতায় গেছেন। এদিকে মহারাজের দুপুরের খাবার সময় হতে যাচ্ছে, এখনও দশ মিনিট বাকি আছে। মহারাজ বলছেন, 'কলকাতায় গেছে, আমাকে বলে গেছে সময়ের মধ্যে ফিরে আসবে, কিন্তু এখনও ফিরছে না তাই চিন্তা হল, কারণ, আমি কতটুকু খাই ওই জানে'। কল্পনা করা যায়, উনি জানেন না উনি কতটুকু খান। কি খান সেটা তাঁর পাচকরা জানে। কিন্তু কতটুকু খান এটা জানে ওনার সেবক।

ওনার খাওয়াটা পুরোপুরি ডিউটির মধ্যে চলে গেছে, সেখানে যে কোন গন্ধ বোধ, রূপ বোধ থাকবে, কোন কিছুই নেই।

তাই বলে কি জ্ঞানীর কাম ও ক্রোধ থাকবে না? নিশ্চয়ই থাকবে। সাধারণ মানুষের কাম ক্রোধ আর জ্ঞানীর কাম ক্রোধের পার্থক্য শুধু গভীরতা আর স্থায়ীত্বে। জ্ঞানী বুঝতে পারেন আমি রেগে গেছি, অজ্ঞানী বা সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারেনা যে আমি রেগে গেছি। কাম নেই ক্রোধ নেই একমাত্র মরা মানুষের। জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীরও ক্রোধ হবে, স্বয়ং ভগবান অর্জুনকে এতো উপদেশ দিলেন, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে একদিন পিতামহ ভীষ্ম এমন প্রবল পরাক্রমে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলেন যে অর্জুন সামলাতেই পারছিল না, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রেগে গিয়ে পিতামহ ভীষ্মকে 'আজকেই ভীষ্মদেবকে শেষ করে দেব' বলে রথ থেকে যেই নেমে পড়েছেন, অর্জুন গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, 'আপনি এ কি করতে যাচ্ছেন প্রভু'। অর্জুন যেমনি বললেন শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলেন। আর অর্জুন যদি নাও বলত তাহলে কি হত? কিছুই হত না, আরও দু'পা গিয়ে নিজেই ঠাণ্ডা হয়ে ফিরে চলে আসতেন। কাম ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করা মানে এটাই। কাম আর ক্রোধ যে কখনই আসবে না সেটা বলা হচ্ছে না। কাম আর ক্রোধ উঠবে না যে বলা হচ্ছে, এর অর্থ হচ্ছে উঠলেই জ্ঞানী সজাগ হয়ে যান।

আবার অনেক সময় এনাদের ক্রোধ যখন ওঠে তখন প্রয়োজনে সেই ক্রোধকেও প্রকাশ করতে হয়। শ্রীরামচন্দ্রও ক্রোধকে প্রকাশ করেছেন, মহম্মদও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেটার পেছনে অন্য কারণ আছে। লোভ জনিত, স্বার্থজনিত কোন ক্রোধের প্রকাশ হচ্ছে না, এখানে সবটাই হচ্ছে পরমার্থের জন্য, এই যে যুদ্ধ হচ্ছে ঈশ্বরের জন্যই আমাকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে এবং যুদ্ধে আমার ক্রোধকেও প্রকাশ করতে হচ্ছে। এই জিনিস গুলোকে কেউ মুখে বলে দিলে ধরতে পারবে না। যেমন যেমন সে সাধন জীবন যাপন করবে তেমন তেমন এগুলোও পরিষ্কার হয়ে যাবে। সব উত্তর কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠাকুরের কাছ থেকেই আসে। ভালো করে জপ ধ্যান করলে ঠাকুরই সব উত্তর দিয়ে দেবেন। আর এটা অত্যন্ত বাস্তব কথা।

কারণ যে কোন উত্তর যদি ঠাকুরের মুখ থেকে সাক্ষাৎ না আসে ওই উত্তরে কোন দিনই আমাদের সংশয় দূর হবে না। যেদিন ঠাকুর সামনে বসে শিক্ষা দেবেন সেই শিক্ষাটাই শিক্ষা আর বাকি সব অসার, সেইজন্যই বলা হয় সব বিদ্যাই অপরা বিদ্যা, একমাত্র পরা বিদ্যা সেটাই যেটা ভগবান নিজে শিক্ষা দেন। বেদ, গীতা, উপনিষদ, কথামৃত সবই অপরা বিদ্যা। তার মানে আগে গুরু যেটা বলে দিয়েছেন, শাস্ত্র যেটা বলছেন সেই কথাতে আপাততঃ বিশ্বাস রেখে সাধনার পথে এগিয়ে যেতে হবে, সাধনা করে করে ঠাকুরের দর্শন করে, দর্শন মানে চোখ বন্ধ করে বাইরেও অন্ধকার ভেতরেও অন্ধকার দেখা নয়, সামনে এসে ঠাকুর বলবেন – বল তোমার আজ কি প্রশ্ন। আমার এই প্রশ্ন। ঠাকুর বলবেন এই প্রশ্নের এই উত্তর, তখন পরিষ্কার হবে, তার আগে হবে না।

সুফি সাধকদের জীবনী পড়লে, খ্রীশ্চান মিস্টিক সাধকদের জীবনী পড়লে দেখা যাবে, সবাই এই একই কথা বলছেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাতেও শঙ্করাচার্য এই কথাই বলছেন। গীতা পড়ে গীতা কি বলতে চাইছে এটাকে ধারণা করার নাম জ্ঞান, আর ঠাকুর এসে যখন নিজে বলবেন তখন ওটাই বিজ্ঞান। ঠাকুর না আসা পর্যন্ত বিজ্ঞান হবে না। ঠাকুরই বলছেন জ্ঞানী ভয় তরাসে, জ্ঞানী সব সময় ভয়ে থাকে কখন পতন হয়ে যাবে ঠিক নেই। এই দেখছি বিরাট সাধু, কত লেকচার, কত ভক্ত, কি সুন্দর সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন; তার কিছু দিন পরে খবরের কাগজে ঐ সাধুর নামে একটা কেচ্ছা বেরিয়ে গেল। এটাই স্বাভাবিক, বিজ্ঞানী যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ পতনের সম্ভবনা থাকবেই, তবে হ্যাঁ, অজ্ঞানীর থেকে তিনি অনেক উপরে। যারা জ্ঞানীদের পতন দেখে তির্যক দৃষ্টিপাত করে, তাদের বোঝা দরকার যে তারা বহু জন্মেও ঐ অবস্থায় পৌঁছাতে পারবে না যেখানে উনি পৌঁছে

গেছেন। এই পতনের পর জ্ঞানী এবার যেখানে এগিয়ে যাবেন, সেখানে পৌঁছান আমাদের মত সাধারণের লোকের পক্ষে সম্ভবই নয়।

জ্ঞানী যত উপরে উঠবেন ততই তাঁর পা টলমল করে পড়ে যাবার সম্ভবনা বেশি হবে। আমরা যখন পায়ে হাঁটছি তখন পা স্লিপ করে পড়ে যেতে পারি। এখন যদি চার ফুটের রণপা নিয়ে হাঁটি তখন পড়ে যাওয়ার ভয়টা আরও বেড়ে গেল। আর যদি পনের ফুট লম্বা রণপা নিয়ে হাঁটি, তখন ব্যালেন্স আরও কঠিন হয়ে যাবে। যদিও আমাকে বিরাট উঁচু দেখাচ্ছে কিন্তু যে কোন মুহুর্তে আমার পড়ে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। আর রণপাটাকে যদি একশ ফুট করে দেওয়া হয়, তাহলে আমার ব্যালেন্স কিন্তু তখন পুরো টলমল করবে, যখন তখন পড়ে যেতে পারি, আর পড়া মানে মুখ থুবড়ে পড়ে কি হবে ভাবাই যাবে না। আমার উদ্দেশ্য এই রণপা দিয়ে বিরাট উঁচু একটা পঁচিলকে ডিঙিয়ে ওই আনন্দের ফোয়ারার কাছে যাওয়া। পাঁচিলটাকে যদি কোন রকমে টপকে যেতে পারি তাহলে তো কেল্লা ফতে হয়ে গেল; কিন্তু শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত আমার ভয় থাকবে। এটাই জ্ঞানীদের সমস্যা। এই সমস্যার ব্যাপারটা সাধারণ লোকেদের ধারণার বাইরে। এই যে এখানে ভগবান বললেন *-পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্; জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্*, বলতে চাইছেন এই ধরণের পাপ কর্ম তোমার জ্ঞানকে তো নাশ করেই দেবে আর সাথে সাথে *বিজ্ঞান নাশনম্* মানে বিজ্ঞানী হতে দেবে না। বিজ্ঞানীর কখন নাশ হয় না, যাঁর প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়ে গেছে আর তাঁর কখন নাশ হবে না।

এই পাপ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ে বসে আছে, মন ও বুদ্ধিতে বসে আছে। একটা কোন কিছুর আইডিয়া এলেই মনের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে যায়। স্মৃতিতে এসে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে জ্বালা ধরিয়ে দেয়, স্বপ্নে এসে জ্বালায়। আমরা সাধু সঙ্গ করি না, শাস্ত্র আমরা পড়ি না, ঈশ্বর চিন্তন করি না বলে বুদ্ধিও সেই রকম তীক্ষ্ণ হতে পারে না; বুদ্ধিতেও সেই রকম জোর নেই। ঠাকুর দুই চাষার গল্প বলছেন। দুই চাষা ক্ষেতে জল আনার জন্য সকাল থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছে। একজনের স্ত্রী এসে বলল, 'তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি, এত বেলা গড়িয়ে গেছে, এখন স্নান করে খেয়ে নেবে চলো, পরে করলে হবে'। সেই চাষা সব শুনে বলল, 'তুই যখন বলছিস, তাহলে চল বাড়ি যাওয়া যাক'। এই চাষার আর ক্ষেতে জল আনা হল না। অন্য চাষার স্ত্রীও এসে এই কথা বলতেই, সে কোদাল তুলে বউকে তেড়ে গিয়ে বলছে, 'তোকে কেটেই ফেলব; জানিস না, দু বছর খরাতে জলের জন্য চাষ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে, এ বছর ছেলে মেয়ে কি না খেয়ে মরবে'? এটা হল স্থির বুদ্ধির দৃষ্টান্ত। না মানে না, সেখানে আর কোন কথা চলবে না।

এসব কথা শুধু জানা থাকলেই হবে না, এই কথাগুলিকে কি আপনি কাজে লাগাতে পারছেন? যদি না লাগাতে পারেন, তার মানে আপনার বুদ্ধি দুর্বল। বুদ্ধিকে সবল করার জন্য আপনার নিয়মিত সাধুসঙ্গ দরকার, নিয়মিত শাস্ত্র অধ্যয়ন দরকার, নিয়মিত আপনার জপধ্যান দরকার, আর জীবনে প্রচুর মার খাওয়া দরকার, প্রচুর মার যদি না খান, পথে কোন দিন আসবেন না। বলছেন প্রথমে ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ কর, আর কামরূপ শত্রুকে ভাল করে চিনে রাখ। আমরা বুঝতে পারি, আমার মনে চাঞ্চল্য আসছে। আসলে যাঁরা দীর্ঘ দিন প্রচুর জপধ্যান করেন, একটা সেশনে অন্ততঃ দেড় ঘন্টা দু ঘন্টা যদি নিত্য বসা হয়, তাহলে পরিষ্কার বোঝা যায় আমার মনে এই চিন্তা উঠছে, যেমনি চিন্তা উঠল সঙ্গে সঙ্গে সেই চিন্তাকে উড়িয়ে দিতে হয়, তবে গিয়ে শক্তি বাড়ে।

স্বামী তুরিয়ানন্দজীর একটা বর্ণনা আছে, একদিন তিনি বসে নিজের মত হেসে যাচ্ছেন। একজন দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহারাজ হাসছেন কেন'? মহারাজ বলছেন, 'আমি মনের খেলা দেখছি, মনের খেলাগুলিকে লক্ষ্য করে যাচ্ছি'। জিনিসটা সত্যিই খুব মজার, আমরাও এই জিনিসটা করতে পারি। মনকে লক্ষ্য করতে থাকছি, এক্ষুণি কি ভাবছিলাম, তার আগে কি

ভাবছিলাম, তারও আগে কি চিন্তা এসেছিল, এটা করতে করতে এক সময় দেখছি মনটা আবার ছুটে পালিয়ে গেছে। আবার মনকে টেনে এনে মনের লীলাখেলা দেখতে লাগলাম। এইভাবে কিছু দিন অভ্যাস করলে বোঝা যায়, মন কিভাবে লীলা করে। পরের শ্লোকে বলছেন এগুলোকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করব কিভাবে?

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।।৪২।।

(স্থূল দেহ থেকে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয় থেকে মন এবং মন থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। যিনি দেহাদিবুদ্ধ্যন্ত সকলের অভ্যন্তরে অবস্থিত, তিনিই বুদ্ধির দ্রষ্টা শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা।)

এটি একটি খুব উল্লেখযোগ্য শ্লোক। ইন্দ্রিয় থেকে মন সূক্ষ্ম, মন থেকেও সূক্ষ্ম হল বুদ্ধি, বুদ্ধি থেকে সূক্ষ্ম প্রকৃতি আর প্রকৃতি থেকেও সূক্ষ্ম হলেন সেই ঈশ্বর। বেদান্ত যে সৃষ্টিতত্ত্ব গ্রহণ করে, তাতে বলা হয় ঈশ্বরই আছেন, তাঁরই দুটো প্রকৃতি পরা ও অপরা বা চৈতন্য বা জড় রূপে বলা হয়, যার কথা ভগবান সপ্তম অধ্যায়ে বলবেন। এই জগতে প্রকৃতি প্রথম যখন খেলা শুরু করে তখন সমষ্টি মন সবার উপরে। সেখান থেকে সৃষ্টি ক্রমে ক্রমে নামতে শুরু করে, এবং ক্রমশ স্থূল হতে থাকে। আমাদের যে ব্যষ্টি মন, এই মন অত্যন্ত স্থূল, ফলে আমরা যে ভোগ করি সেটাও অত্যন্ত স্থূল। আমাদের যে সমস্যাগুলি আসে, সেই সমস্যাগুলিও অত্যন্ত স্থূল। সাধনা শুরু করার পর মন ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম হতে শুরু হয়, সেখান থেকে আরও যত সূক্ষ্ম হয়, তখন প্রকৃতির সব কিছুকে একটা একটা করে জয় করতে করতে এগিয়ে যেতে হয়। এখন যে অবস্থায় আমরা আছি, এটা অত্যন্ত স্থূল অবস্থা, সেইজন্য এই অবস্থায় প্রথমে ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করতে হয়। সবাই বলে, আমার মন খুব চঞ্চল, আমি মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই, কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করব বলে দিন। প্রথম ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। ইন্দ্রিয় নিগ্রহের মধ্যে প্রথম হল বাণী, সবার আগে বাকসংযম দরকার। বাকসংযম থেকে বাকি ইন্দ্রিয়গুলির সংযম, আহার সংযম, নিদ্রা সংযম ইত্যাদি। প্রত্যেকটা জিনিসকে একটা একটা করে সংযম করতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে এগোতে শুরু করে। প্রথমেই মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। মাউন্ট এভারেস্টে এমনি এমনি ওঠা যায় না, ধাপে ধাপে উঠতে হয়।

ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন, বুদ্ধি এই সব কিছুর মালিক আত্মা। তোমার প্রধান সমস্যা তৈরী করছে তোমার রাগ আর দ্বেষ। তাই এই রাগ ও দ্বেষকে নিয়ন্ত্রণ কর। আপাতদৃষ্টিতে এই রাগ ও দ্বেষকে সংযত করার সহজ উপায় বিষয় থেকে সরে আসা। কিন্তু এটা কোন স্থায়ী সমাধান নয়, এই রাগ ও দ্বেষই আবার রূপ পাল্টে অন্য ভাবে আসবে। তাই বলা হচ্ছে আগে ইন্দ্রিয় সংযম কর। ইন্দ্রিয় সংযম হল, যেমনি খবর পেলাম ওখানে ভালো খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তখনই জিহ্বা ইন্দ্রিয়কে আটকে দাও। এটা যদি করতে না পার তাহলে মনের মধ্যে যা সঙ্কল্প বিকল্প আসছে আসুক, কিন্তু আমি এটা করব না। এটাকেও যদি না আটকাতে পার তাহলে তুমি যেটা শেষে ঠিক করে নিয়েছ যে ওখানে যাব, এই ঠিক করাটাকে আটকাও।

আগেকার দিনের শিক্ষিত মার্জিত পুরুষ যাঁরা ছিলেন তাঁদের বুদ্ধিটা ছিল পরিমার্জিত। বুদ্ধি মানে আমরা যে অর্থে বিষয়ীর বুদ্ধি মনে করি সেই intelligence এর কথা বলা হচ্ছে না। শাস্ত্র আর আচার্যের কাছে শুনে শুনে যে পরিমার্জিত বুদ্ধি, যে বুদ্ধিকে বলছে decision making faculty, এত পরিষ্কার ছিল যে তাঁদের বুদ্ধি কোন অনিয়ম বেনিয়মের মধ্যে কখন যাবেই না। যেমন আমরা এখানে যারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে এসেছি, আমাদের যদি বলা হয় গরুর মাংস খেতে, তাহলে আমরা আঁৎকে উঠব, তার মানে গরুর মাংস খাওয়া না খাওয়ার ব্যাপারে আমাদের যে বুদ্ধি সেটা পরিষ্কার, এখানে সঙ্কল্প-বিকল্প কখনই উঠবে না, ইন্দ্রিয় এই ব্যাপারে কোন স্বাধীনতাই পাবে না, ইন্দ্রিয়ের সামনে বিষয় থাকুক আর নাই থাকুক গরুর মাংসের ব্যাপারে কোন প্রশ্নই নেই। অথচ

নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, বিদেশ বিভুঁইয়ে গিয়ে তারা এখন চুটিয়ে গরুর মাংস খেতে শুরু করেছে। এখানে এদের কাছে শাস্ত্রের কথাতে শ্রদ্ধা নেই, বুদ্ধি দুর্বল হয়ে গেছে। কিন্তু প্রথমবার বীফ্ মুখে দিতে তারও মন অবশ্যই চঞ্চল হবে। একবার যখন মুখে তুলে নিয়েছে, তখন বুদ্ধির উপর তার সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চলে গেল। অথচ এদেরই বাবা মা যাঁরা ভারতে আছেন তাঁরা বীফ্ খাওয়ার কথা চিন্তাই করতে পারেন না। ভারতবর্ষে বীফ্ খাওয়ার নামে সরকারের পতন হয়ে যাবে। ভারত যখন কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজন করেছিল, তখন সেখানে সেখানে ক্রীড়া মন্ত্রীকে লিখিত ভাবে নোটিশ দিতে হয়েছিল যে, No beef will be served, অথচ আমাদের সন্তানরা আমেরিকাতে গিয়ে বীফ্ খাচ্ছে।

কিন্তু বুদ্ধি যদি নিয়ন্ত্রণে এসে যায়, শাস্ত্র যেটা বলে দিয়েছে আমি তার বাইরে যাব না, তখন ইন্দ্রিয়, রাগ, দ্বেষ, কামক্রোধাদি আমাকে কিছুই করতে পারবে না। আর এই শাস্ত্র প্রমাণের উপর একটাই আছে, সেটা হল আত্মজ্ঞান। আমি যদি সব সময় আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকি, প্রতিষ্ঠিত না হলেও যদি আত্মজ্ঞানের চিন্তন মনন নিয়ে সব সময় থাকতে পারি, তাহলে কখনই এই শত্রুগুলো আমাকে কোন গোলমালের মধ্যে নিয়ে যেতে পারবে না। আমি তো বিশুদ্ধ আত্মা, আমি এগুলো কেন করতে যাব, এই ভাবকে যদি ধরে রাখা যায় তাহলে কখনই কোন গোলমাল হবে না।

বুদ্ধি হচ্ছে সবার মা। একটা ছাগল, তার দুটো তিনটে বাচ্চা, ছাগলকে যদি ধরে নিই তখন বাচ্চাগুলো নিজে থেকেই তাদের মায়ের পেছনে পেছনে যাবে। ইন্দ্রিয়গুলি হল মনের বাচ্চা, মনের মা হল বুদ্ধি। বুদ্ধিকে যদি একবার ধরে নেওয়া যায় তাহলে সব কটা পথে এসে যাবে। কিন্তু যদি আমরা আত্মজ্ঞানকে সব সময় ধরে রাখি, এখানে আত্মজ্ঞান বলতে আত্মোপলব্ধির কথা বলা হচ্ছে না, আত্মজ্ঞানকে এখানে আত্মবুদ্ধি রূপেই বলা হচ্ছে –আরে আরে আমি এগুলো কি করছি, আমি তো সেই বিশুদ্ধ চৈতন্য; এই বুদ্ধি করা। বিশুদ্ধ আত্মা কখনই রাগ ও দ্বেষ দ্বারা প্রেরিত হবেন না। যখনই মনে হবে আমি যে এই কাজটা করছি, এটা আমি রাগ ও দ্বেষের দ্বারা প্রেরিত হয়ে করছি, যেমন আমার বাড়ির দরকার নেই কিন্তু একটা বাড়ি কিনছি, গাড়ির দরকার নেই গাড়ি কিনছি, তখন আমি চিন্তা করছি কি করব, কিনব কি কিনব না, কেনাটা কি ঠিক হবে, তখনই স্মরণ করতে হবে আরে এগুলো আমি কি করতে যাচ্ছি, আমি তো আত্মজ্ঞানের পথিক, আমি কেন রাগ ও দ্বেষ থেকে প্রেরিত হয়ে এগুলো কিনতে যাব। যিনি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছেন তার এগুলো শোভা দেয় না। এই চিন্তা যখন হতে থাকবে তখন সঙ্গে সঙ্গে মনের ছবিটা পুরো পাল্টে যাবে, তখন কেউ আমাকে নাড়াতে পারবে না। যাঁরা আত্মজ্ঞানী তাঁদের কথাই শাস্ত্রে আছে, তাই শাস্ত্র আর আত্মজ্ঞানী একই জিনিস।

আমাদের মধ্যে যে প্রতিনিয়ত সংশয় উপস্থিত হয়, আমি এটা করব কি করব না, আমি সেখানে যাব কি যাব না, এই ধরণের সংশয় হওয়া মানে আমি decision making faculty তে এখনও পিছিয়ে আছি। এই decision making খুব সহজ ভাবে হয় যদি আমি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হই, আমি বিশুদ্ধ আত্মা, আমার এখন সেই বোধ হয়নি, কিন্তু আমি ঐ পথের পথিক, তাই আমি আমার মনকে চঞ্চল হতে দেব না। কিসের থেকে চঞ্চল হতে দেব না? রাগ আর দ্বেষ থেকে, কারণ আত্মাতে রাগ আর দ্বেষের কোন স্থান নেই। আমি এমন কোন কাজ করব না যেটা রাগ আর দ্বেষ দ্বারা প্রেরিত।

এই সব বলার পর ভগবান বলছেন, অর্জুন তুমি এটা জানো, সমস্ত কিছুর পিছনে রয়েছেন আত্মা। মনকে আস্তে আস্তে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতরের দিকে নিয়ে যাও, তবেই ঠিক ঠিক কাম জয় হবে; আর এই ভাবে যখন তুমি এগোতে থাকবে, তখন কি হবে –

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।।৪৩।।

(হে অর্জুন, শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা মনকে সমাহিত করে বুদ্ধির দ্রষ্টা পরমাত্মাকে এইরূপে জেনেই অজ্ঞানমূলক দুর্জয় শত্রু কামকে জ্ঞান দ্বারা মূলোচ্ছেদপূর্বক বিনাশ কর।)

কামের এত বিশেষণ রয়েছে যে, *দুরাসদম্,* বোঝা যায় না, জানা যায় না; কামের আর-একটা বিশেষণ। এটাও কাম, ওটাও কাম, সেটাও কাম; তার সাথে বলছেন, কাম এভাবে নাশ হয় না। যদি কামকে নাশ করতে চাও, তাহলে আগে তোমার ইন্দ্রিয়কে জয় কর, তারপর মনকে জয় কর, তারপর তোমার বুদ্ধিকে জয় কর, সেখান থেকে সমষ্টি মনকে জয় কর। সেখান থেকে তোমাকে প্রকৃতিকে অতিক্রম করে আত্মাতে গিয়ে নিবাস করবে। যেদিন তুমি আত্মাতে গিয়ে অবস্থান করবে সেদিনই তোমার কাম নাশ হবে। সেইজন্য ভক্তিশাস্ত্রে বলা হয়, প্রভুর নাম করে যাও। কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক প্রভুর নাম করেই যাচ্ছে, কিন্তু কারুরই কিছুই তো হচ্ছে না। কারণ প্রভুর নামের সাথে সংযমের পদ্ধতিটাও সেই একই।

কি সেই পদ্ধতি? *এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা,* আগে তুমি ভাল করে বুঝে নাও আত্মাই শেষ কথা, ঈশ্বরই শেষ কথা। তখন আত্মা দিয়ে আত্মাকে স্তম্ভন কর, নদীতে বাঁধ দিয়ে নদীর জলকে যেমন আটকে দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আত্মা দিয়ে আত্মাকে মানে, শুদ্ধ মন দিয়ে অশুদ্ধ মনকে নিয়ন্ত্রণ কর। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই জিনিসটাকে নিয়ে আবার আলোচনা করবেন। মনকে আত্মাতে সমাধিস্থ কর। বলতে চাইছেন, মনকে যদি একটা উচ্চ আদর্শের দিকে না নিয়ে যেতে পার, মন পাপ করবেই। মন যদি সব সময় ঈশ্বরে সমাহিত না থাকে, মন যদি সর্বদা আত্মজ্ঞানে সমাহিত না থাকে, মন যদি একটা উচ্চ আদর্শ না নিয়ে থাকে; পাপ হবেই, কিছু করার নেই।

মনকে পাপ কাজ থেকে সরিয়ে এনে একটা কোন উচ্চ আদর্শে যদি না রাখা হয়, মন এদিক সেদিক দৌড়াবেই। বাচ্চাদের যদি একটা দায়ীত্ব না দেওয়া হয়, বাচ্চা বাড়িতে উৎপাত করবেই। মন হল অত্যন্ত দুর্দান্ত দুরন্ত বাচ্চা ছেলে, ওকে তাই কোন না কোন কাজে লাগিয়ে রাখতে হয়, না লাগালে মন পাপ করবেই। পাপকে যদি জয় করতে হয়, তার একটাই উপায়। আত্মার ব্যাপারে জানো, ঈশ্বরের ব্যাপারে জানো, সেখানে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এসো, আর ওখানে মনকে লাগিয়ে রাখো। এর শুরু হয়, ইন্দ্রিয় জয় করা থেকে, ইন্দ্রিয় জয়ের পর চঞ্চল মনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়। সেই নিয়ন্ত্রিত মনকে ঈশ্বরে লাগিয়ে রাখতে হয়, সেখান থেকেই পাপের নাশ হয়। তার আগে পাপ কমে ঠিকই, কিন্তু পুরো নিয়ন্ত্রণ হয় না।

যারা প্রথম প্রথম শাস্ত্র অধ্যয়ণ করতে আসেন তাঁদের কাছে শাস্ত্রের সব কথা নূতন মনে হলেও তাঁদের মনে এই বোধ হয় যে, যা কথা শুনছি এগুলো যেন অন্য কোন উচ্চ জগতের কথা। এনারা বোধ করে থাকুন আর নাই থাকুন, মানুন নাই মানুন কিন্তু এটা মনে হবে যে এগুলো যা শুনছি সব অন্য জগতের কথা। আর যারা অনেক দিন ধরে শাস্ত্রের কথা শুনছেন তাদের কাছে তো সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেছে। তারা বুঝতে পারছেন যে একটা উচ্চ সত্তা কিছু আছে যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমার শরীর, মন, ইন্দ্রিয়কে চালাচ্ছে। এখন তাদের যদি কোন সমস্যা আসে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে সংশয় আসে, এই কাজটা করব কি করব না, তখন কি হবে - *এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা,* এই বুদ্ধিকে *পরং* দিয়ে, *পরং* হচ্ছেন আত্মা, আত্মা দিয়ে বুদ্ধিকে একেবারে *সংস্তভ্যাত্মাননাত্মনা,* নিজের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসবে, আত্মা যেন বুদ্ধিকে গলা টিপে ধরে বলে দিচ্ছে এটাই করতে হবে। এই আত্মভাবটাকে দৃঢ় করার কথাই বলা হচ্ছে। আত্মভাব দৃঢ় হয়ে গেলে যে বুদ্ধি বলছিল করব কি করব না, সে তক্ষুণি বলে দেবে কি করতে হবে। বুদ্ধির পরে যে মন রয়েছে সে তো এই আত্মভাবের কাছে দাঁড়াতেই পারবে না, ফুঁ মেরেই উড়িয়ে দেবে।

এখানে বলছেন *জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্*, দুর্জয় শত্রু হচ্ছে কামনা-বাসনা, এই কামনা-বাসনাগুলোকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দাও। কিভাবে ভস্ম করবে? ইন্দ্রিয় সংযম কর, ইন্দ্রিয় সংযমে ভস্ম হবে না, তবুও মন্দের ভালো। ইন্দ্রিয় সংযমের থেকে আরও ভালো হবে তোমার মনকে বশে নিয়ে এসো। মনকে বশ করলেও সমস্যা থেকে যাবে, এরও উপরে আছে বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ কর। কিন্তু আত্মজ্ঞানের অনুশীলন যদি তুমি কর তাহলে এই পুরো ব্যাপারটাই চিরদিনের মত মিটে যাবে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কোন দিন আর তোমাকে বিরক্ত করতে আসবে না, বিরক্ত করবে কিন্তু তোমাকে কাবু করে দিতে পারবে না, বিজ্ঞানীর অবস্থায় যতক্ষণ না যাবে, প্রত্যক্ষ দর্শন যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত পতনের সম্ভবনা থাকবে। পতন হয়ে গেলেও তুমি শেষ হয়ে যাবে না, ওখান থেকেই উঠে দাঁড়িয়ে আবার তুমি চলতে থাকবে।

এরপর আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে প্রবেশ করব। চতুর্থ অধ্যায়ে কর্মসন্ন্যাসের ধারণাটাকে নিয়ে আসবেন। এতক্ষণ দেখান হল কাজ কিভাবে হয়, কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে কখনই কাজের প্রশংসা করা হয় না। পুরো গীতার উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান। কিন্তু জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের কখন যোগ হয় না। কিন্তু এই জগতে যত লোক আছে তাদের ৯৯.৯৯৯% লোক জ্ঞানের জন্য প্রস্তুত নয়। সেইজন্য তাদেরকে বলা হচ্ছে কর্ম করতে। কর্ম করতে গেলে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে পুরো আসক্ত হয়ে কাজ করতে হবে। এর পর শাস্ত্র নির্দেশিত স্বধর্মে যে কর্ম করার কথা বলছে সেগুলো করা। স্বধর্ম করতে করতে যখন মন আর-একটু পরিষ্কার হল তখন অনাসক্ত ভাব নিয়ে কাজ করা শুরু করতে হবে। অনাসক্ত ভাবে কর্ম করতে করতে যখন মন আরও পরিষ্কার হয়ে গেল এইবার তুমি কাজ কমাতে শুরু কর। কাজ কর্মে বেশি না জড়িয়ে তোমার মনটাকে এবার আত্মজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। মন যখন আত্মজ্ঞানে পুরো বসে গেল, তখন তোমার জ্ঞান লাভ হবে। জ্ঞান লাভের পর এবার তুমি সাধারণ লোককে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, তাদের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তোমাকে কিন্তু আবার কাজ করতে হবে। তোমাকে কিন্তু পুরোপুরি কাজকর্ম ছেড়ে হাত-পা গুটিয়ে ত্রৈলঙ্গস্বামী হয়ে থাকতে বলা হচ্ছে না। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামীজী, যীশু, মহম্মদ এনারা সবাই কাজ করে গেছেন। তুমিও কাজ ছাড়বে না, কিন্তু এটা তোমাকে জেনে রাখতে হবে যে কাজটা হচ্ছে সিঁড়ি মাত্র, কাজ কখনই উদ্দেশ্য নয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যবুদ্ধির আর যোগবুদ্ধির কথা বলেছিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ে কিন্তু এই যোগবুদ্ধিটাকে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হল।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মযোগ নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞানযোগ

গীতা ঠিক ঠিক বুঝতে হলে গীতার ক্লাশগুলো প্রথম থেকে শুনতে হবে, কারণ প্রত্যেকটা অধ্যায় এক অপরের সাথে জুড়ে রয়েছে। অনেক কিছু আছে যেগুলো আগে সংক্ষেপে বলা হবে, এবং পরে বিস্তারে বলা হবে। আবার কিছু আছে যেগুলো আগে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে এখন সংক্ষেপে বলা হচ্ছে। গীতা হল সমস্ত বেদের সার, গীতা হল Mannual of Spirituality, Mannual of Hindu Religion। সেইজন্য গীতার সব কথা মনে রাখা সম্ভব না, সব কথা মনেও থাকে না। তাহলে কি সব কথা জানা দরকার আছে? অবশ্যই দরকার। এটাই আমাদের সংস্কৃতি, আমরা এই ধর্মে জন্মেছি, এই ধর্মেই মরব, আমাদের পূর্বপুরুষরা এই ধর্মে ছিলেন, আমাদের পরের প্রজন্মে যারা আসবে তারাও এই ধর্মে থাকবে। সেইজন্য গীতার সব কিছুই জানা দরকার। জ্ঞান জিনিসটা নিজেই একটা ফল। অনেকে বলে গীতা পড়ে কি হবে? গীতা পড়ে গীতার জ্ঞান হবে। জ্ঞান মানুষকে যতটা পবিত্র করে, অন্য কিছু পবিত্র করে না। গঙ্গা জল, জগন্নাথ প্রভুর আটকে প্রসাদ, বৃন্দাবনের রজ যেভাবে পবিত্র করে; এদের থেকে ঢের বেশি পবিত্র করে জ্ঞান। যার জন্য আমরা দেখতে পাই, পুরো বিশ্বে জ্ঞানীদের সম্মান অনেক বেশি। জ্ঞানই মানবজাতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অন্যান্য যে পশুপাখি আছে, তারাও হিংস্র হতে পারে, তারাও নিজের এলাকায় রাজা হতে পারে; কিন্তু জ্ঞান জিনিসটা একমাত্র মানুষেরই হয়।

প্রথমের দিকে আচার্য শঙ্করের কথা আলোচনা করার সময় বলা হয়েছিল, হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ বেদ। সেই বেদ কি বলতে চাইছেন? বেদের বক্তব্য খুব সংক্ষেপে গুছিয়ে যদি আনা হয়, তাহলে দেখা যাবে বেদ দুই প্রকার ধর্মের কথা বলছেন, প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম এবং নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মে বেদ আমাদের সেই শিক্ষা দেন, সেই আদেশ দেন, যেখানে মানুষ যজ্ঞযাগ করে, পূজা-অর্চনা করে, প্রার্থনা করে ঈশ্বরের দিকে এগোবে। দ্বিতীয় হল নিবৃত্তিলক্ষণ, যেখানে মানুষ সমস্ত কিছু ত্যাগ করে ঈশ্বরলাভের দিকে, মুক্তির দিকে এগিয়ে যাবে। কিন্তু সবার আগে প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি করতে করতে ধীরে ধীরে মানুষ নিবৃত্তির দিকে চলে যায়। প্রথমে সবাইকে পুরো দমে কাজ করতে হবে। এরপর কর্মফলের প্রতি যে ইচ্ছা, সেটাকে ত্যাগ করার কথা বলা হয়। বেলুড় মঠ থেকে যাঁরা দীক্ষা নেন, তাঁদের গুরু বলে দেন, সকাল বিকাল দু বেলা জপ করবে। যারা জানে না, বোঝে না, তারা প্রশ্ন করবে, দীক্ষা নিয়ে কি হবে, দীক্ষা নিয়ে আমার কি লাভ হবে? বাড়ীতে অনেক অসুখ বিসুখ চলছে, দীক্ষা নিলে কি সব অসুখ সেরে যাবে? যাঁরা দীক্ষা নিয়েছেন, তাঁরা জানবেন, গুরু তাঁদের এই ধরণের কোন কথা বলে দেননি। এমনকি গুরু দীক্ষা দিয়ে বলে দেন, মন্ত্র জপ করবে, জপ করার পর জপের ফল প্রভুর চরণে সমর্পণ করে দেবে। হে ঠাকুর, আমি এই একশ আট জপ করলাম, আমার যেন এটা হয়ে যায়, এই ভাব নিয়ে কেউ জপ করে না। যাঁরা কুলগুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে থাকেন, তাঁরাও এ-রকম করেন না। এটাই ফলের আশা না করে, নিষ্কাম ভাবে জপ করা। গুরু বলে দিয়েছেন জপ করতে, জপ করছি; দ্বিতীয় আমার জপ করতে ভাল লাগে, তাই জপ করছি। এটাকেই বলে কর্মযোগ। যে কোন কাজ, অফিসে কাজ করছি, ডাক্তারখানায় রোগী দেখছি, ইঞ্জিনিয়ারিংএর কাজ, সব কাজে এই মনোভাব –আমাকে করতে হবে, দুটো টাকা আয় করতে হচ্ছে, সেইজন্য করছি, এর বেশি আর কিছু না।

সেখান থেকে ধীরে ধীরে যখন ফলত্যাগ হয়ে যায়, ফলত্যাগ থেকে মন শুদ্ধ হয়ে যায়। মন শুদ্ধ হয়ে গেলে, সেখান থেকে ধীরে ধীরে কর্মত্যাগ হয়ে যায়। মানুষ তখন জ্ঞাননিষ্ঠায় চলে যায়।

জ্ঞাননিষ্ঠা মানে, ঈশ্বরের প্রতি একটা ভালবাসা জন্মায়, ঈশ্বর ভিন্ন সে আর কিছু চায় না। এখান থেকেই আসে জ্ঞান, আর এই জ্ঞান থেকেই আসে বিজ্ঞান। এগুলোকেই বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে, কিন্তু জিনিসটা যা হওয়ার, তা এটাই হয়। আগে জোর কদমে কাজ, কাজ করতে করতে কর্মফল ত্যাগ, কর্মফল ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ। সেখান থেকে কর্মের প্রতি যে আসক্তি বা দায়ীত্ব বোধ, এটা কমে যায়। তার মানে কাজ করাটা কমিয়ে দেয়। কাজ করা যদি বন্ধ করে দেয়, মানুষ পাগল হয়ে যাবে। করোনার সময় কোন কাজ ছিল না, সবাই কেমন পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল। কাজ না করে মানুষ থাকতে পারে না। মন আমাদের এত চঞ্চল যে, বাহ্যিক কোন অবলম্বন না থাকলে আমরা শান্তিতে থাকতে পারব না। কিন্তু যাঁরা সাধক তাঁদের এ-জিনিস হবে না। তাঁরাও কাজ করেন, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি একটা নিষ্ঠা আছে, সেই নিষ্ঠা বাড়তে বাড়তে এত দৃঢ় হয়ে যায় যে, মানুষ ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

ঠাকুর খুব সহজ উপমা দিয়ে জিনিসটাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, বাড়ির বউমা অন্তঃসত্ত্বা হলে শাশুড়ি ধীরে ধীরে তার কাজ কমিয়ে দেয়। এখানে কাজের প্রতি স্পৃহা, কাজের মাধ্যমে আমি এটা পাব, সেটা পাব, এই মনোভাবটা শেষ হয়ে যায়। আশির দশকে আমাকে নরেন্দ্রপুর সেন্টারে কাজ করতে হয়েছিল। তখন আমার বয়স কম। ওখানে একজন খুব সিনিয়র মহারাজ ছিলেন, নরেন্দ্রপুর সেন্টার গড়ে তোলার পিছনে তাঁর বিরাট বড় অবদান। আমি শুনেছিলাম উনি নরেন্দ্রপুর সেন্টারের গোড়াপত্তনে প্রচুর কাজ করে গেছেন। বর্তমানে তাঁর শরীর চলে গেছে। কর্ম থেকে অবসর নেওয়ার পরেও উনি সপ্তাহে একদিন সেন্টারে আসতেন। ওনাকে অনুরোধ করা হয়েছিল, এখানকার কাজকর্ম গুলো একটু দেখে দিতে। উনি বলে দিলেন, আমি আর এর মধ্যে থাকতে চাই না। তখন আমার মাথায় শুধু এই চিন্তা আসত, উনি কাজ ছাড়া থাকেন কি করে! এখন সেই কথা ভেবে নিজের উপর হাসি পায়। তখন বয়স কম ছিল, রজোগুণ ভিতরে টগবগ করে ফুটছে, ভাবছি মানুষ কাজ ছাড়া থাকে কি করে। এখন এই বয়সে এসে পিছনের দিকে তাকালে অবাক হয়ে যাই, এত কাজ করতাম কি করে। কিন্তু ঈশ্বরের দিকে যদি মন না যায়, আত্মজ্ঞান লাভের দিকে যদি মন না যায়, তাহলে মন কিন্তু এলেমেলো হয়ে যেতে বাধ্য।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ, প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম দুটোরই বর্ণনা করলেন। ভগবান দুটি অধ্যায়ে বলতে চাইছিলেন, তুমি কাজ কর, কাজকে যজ্ঞ রূপে কর, ফলের প্রতি আসক্তি রেখো না, এভাবে চললে তোমার মন শুদ্ধ হয়ে যাবে। শুদ্ধ মনের একটা প্রচণ্ড শক্তি থাকে, এই মন ইচ্ছে করলে যে কোন জিনিস করায়ত্ত করে নিতে পারে। মন শুদ্ধ হওয়ার পর এবার আত্মজ্ঞানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, এই জিনিসটাই ভগবান আগের দুটো অধ্যায়ে বললেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে এসে ভগবান এবার জ্ঞানযোগের স্তুতি করছেন। হঠাৎ জ্ঞানযোগ কেন এসে গেল? কারণ কর্মযোগ মানুষকে সন্ন্যাসের প্রতি, সব কিছু ত্যাগের প্রতি একটা প্রস্তুতি করিয়ে দেয়। যখন সব কিছু ত্যাগ হয়ে গেল, কাজ করল, ফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করল, সব ফল ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত করা হল; এরপর ধীরে ধীরে ঈশ্বরে পুরোপুরি মনকে নিয়ে গেল। আমি অনেক ভক্তকে দেখেছি, এত শাস্ত্র পড়ে, এত কথামৃত পড়ার পর কোন মহারাজের সঙ্গে দেখা হলে আনন্দে বলতে থাকেন, মহারাজ আমার নাতি ক্লাশে ফার্স্ট হয়েছে। নাতি ক্লাশ থ্রীতে পড়ে। একজন ভক্তের জন্য এটা কি কোন কথা হল? ক্লাশ থ্রী, ক্লাশ ফোর, মাধ্যমিকে ফার্স্ট হল, এট একটা কোন কথা হল? আপনার সন্তান হয়েছে, আপনার পবিত্র দায়ীত্ব হল তাকে উচ্চতম শিক্ষা দেওয়া, আপনি তাকে শ্রেষ্ঠতম ট্রেনিং দেবেন, গান, বাজনা, খেলা, জুডো, মারপিট সব কিছুর শিক্ষাই দেবেন। এরপর তার যেমন জ্ঞান, তার যেমন সংস্কার, সেভাবে তার জীবন তৈরী হবে।

এই যে আপনি বলছেন, আমার নাতি ক্লাশে ফার্স্ট হয়েছে, আপনি কি বলতে চাইছেন? স্বামীজী আমি এমন কাজ করেছি, তার কি সাংঘাতিক ফল দেখুন। আপনি আশা করেছিলেন যে, আপনি আপনার জপধ্যানের ফল একদিন পাবেন; এদিকে আপনি চাইছেন, আমার মন যেন ঠাকুরের দিকে যায়। আপনার যদি কোন কষ্ট হয় অবশ্যই ঠাকুরকে বলবেন, ঠাকুর বড় কষ্ট চলছে। সন্ন্যাসীদেরও অনেক কষ্ট আসে। কিন্তু এই সাধারণ সাধারণ জিনিস নিয়ে, ছেলেকে তৈরী করে নরেন্দ্রপুরে, দেওঘরে ভর্তি করে দিলেন, তাতেই মনে করছেন বিরাট বড় কিছু একটা করে ফেলেছি। বাবা-মার এটা দায়ীত্ব। কর্মফল ত্যাগে এটাই বলতে চাইছেন। কর্মফল ত্যাগ মানে, যিনি কর্ম করলেন, তাঁর কর্মফলের দিকে আর দৃষ্টি নেই। দেখতে হবে, কাজ করার সময় সে মন প্রাণ দিয়ে কাজ করেছে কিনা, এটাই কর্মযোগ। ছোট ছোট ঘটনাতে কখন লাফাচ্ছে, কখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে বসে পড়ছে। আজকে ফার্স্ট হল বলে লাফাচ্ছে, কাল যখন ফার্স্ট হতে পারবে না, তখন ভেঙে পড়বে।

গীতাতে এই উপদেশই দিচ্ছেন, কাজ কর, কাজকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করে মন প্রাণ দিয়ে করতে হবে; ফল যাই হোক, সেটার দিকে তাকাতে যেও না। কারণ তোমার উদ্দেশ্য হল, জ্ঞাননিষ্ঠা অর্জন করা। জ্ঞাননিষ্ঠা মানে, ওই জ্ঞানের প্রতি ভালবাসা, ওই জ্ঞানে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া, যেখান থেকে ওই জ্ঞানটা তুমি পাবে; আর ওই জ্ঞান পেলে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য এটাই, বাকিগুলো কোন উদ্দেশ্যই না।

এই জ্ঞানের কথা কি ভগবান অর্জুনকে নূতন কিছু বলছেন? না, এটা পরম্পরাতে চলে আসছে। পরের দিকে এটাকেই বলা শুরু হল, পরম্পরা বিদ্যা। যে কোন বিদ্যা যদি ভগবান থেকে না এসে থাকে, মানুষ সেই বিদ্যা গ্রহণ করতে চাইবে না। ইদানিং চারিদিকে অনেক গুরুর আবির্ভাব হয়েছে, টিভি, সোস্যাল মিডিয়াতে সবাই অনেক কথা বলে বেড়াচ্ছেন। আগেও এ-রকম স্বঘোষিত গুরু ছিলেন। এঁদেরকে প্রথমে জিজ্ঞেস করতে হয়, 'আপনি যে কথাগুলো বলছেন, যে মতের কথা বলছেন, এর শুরু কোথা থেকে? আপনি কার কাছ থেকে এই কথা শিখেছেন'? 'আমি আমার ধ্যানের গভীরে গিয়ে শিখেছি'। আমরাও হাতজোড় করে বলে দেব, 'আপনার বিদ্যা আপনার কাছেই থাক, আমার লাগবে না'। বিদ্যা যদি সাক্ষাৎ ভগবানের কাছ থেকে না এসে থাকে, চিরন্তন কাল থেকে যদি না চলে এসে থাকে, তাহলে এই বিদ্যাকে বিশ্বাস করা যাবে না। কারণ যে বিদ্যা ভগবানের কাছ থেকে আসেনি, বুঝতে হবে সেই বিদ্যা মানুষের মন থেকে এসেছে। পুরো পাশ্চাত্য দর্শন, পুরো পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মানুষের মন থেকে জন্ম নিয়েছে। যে বিদ্যা মানুষের মন থেকে জন্ম নিয়েছে, সেই বিদ্যাতে একটা অভাব থাকে, অনেক দোষ থাকে, ভরসা করা যায় না, আগামীকাল এই বিদ্যা পাল্টে যাবে। যে বিদ্যা ভগবান থেকে এসেছে, সেটাই একমাত্র সত্য, সেটাই একমাত্র ঠিক, সেটাই গুরু পরম্পরায় চলতে থাকবে। এই জিনিসটাকেই ভগবান প্রথম শ্লোকে বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ
ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ।।১।।

(শ্রীভগবান বললেন –আগের অধ্যায়ে উক্ত নিষ্ঠাদ্বয়াত্মক এই অব্যয় যোগ আমি সূর্যকে বলেছিলাম; সূর্য স্বীয় পুত্র মনুকে এবং মনু তার পুত্র ইক্ষ্বাকুকে এটা বলেছিলেন।)

হে অর্জুন দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আমি যে যোগের কথা তোমাকে বললাম, আগে আমি এই বিদ্যার কথা সূর্যকে বলেছিলাম। সূর্য হলেন বেদে দ্বাদশ আদিত্যের একজন। ভগবান তাঁকে এই যোগের শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই জন্যই তাকে এই শিক্ষা দিয়েছিলাম, সৃষ্টি যখন করেছি, তাই সৃষ্টির দায়ীত্বটাও আমার। মা-বাবা সন্তানের জন্ম দেন, সন্তানের প্রতিপালনের দায়ীত্ব বাবা-মায়ের। সন্তান ভাল কাজ করলে তাদের লাফালাফি করার কিছু নেই। খারাপ কিছু হয়ে গেলে দেখতে হবে বাবা-মা

কোন দোষ করেছিল কিনা, ভুল কিছু করেছিল কিনা, কিছু খামতি থেকে গিয়েছিল কিনা। ভগবান বলছেন, ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শক্তি স্থাপন করার জন্য আমি এই বিদ্যাটা দিয়েছিলাম।

আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন যুদ্ধ জয় করল, তাতে বৈজ্ঞানিকদের বিরাট বড় অবদান ছিল। এমনকি বর্তমান কালেও যত যুদ্ধ হয়, সেখানেও বৈজ্ঞানিকদের বা টেকনোক্র্যাট, ইঞ্জিনিয়ারদের বিরাট ভূমিকা থাকে। যত স্যাটেলাইটস, বন্দুক, তোপখানা, মিসাইল থেকে এ্যারোপ্ল্যান পর্যন্ত যা কিছু আছে সব কিছুতে বৈজ্ঞানিকদের অবদান রয়েছে। আগেকার দিনের মত ঘোড়ার পিঠে লড়াই করার দিন চলে গেছে। ইরাকের যুদ্ধে আমেরিকা দেখাল, তারা দূরে সমুদ্রের মাঝখানে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে, সেখান থেকে একটা করে মিসাইল ছুঁড়ে যাচ্ছে, আর একটা একটা করে ইরাকের শহর ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। এগুলো সবই ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক পরে আমেরিকার বড় বড় সংস্থা, যারা রিসার্চ করে, তাদের টাকা দরকার, সরকার সাহায্য না করলে হবে না। ফিনেন্স মিনিস্ট্রিতে গেছে টাকার জন্য, টাকা না হলে রিসার্চ করা যাবে না। মিনিস্ট্রি থেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, এই যে সরকার থেকে এত টাকা দেওয়া হবে, এতে সরকারের কি লাভ হবে? আমাদের দেশের যে সেনাবাহিনী, এতে এদের কি কিছু উপকার হবে? যিনি মিনিস্ট্রিতে গিয়েছিলেন, তিনি খুব নামকরা বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি খুব সুন্দর কথা বলেছিলেন, আমরা যে রিসার্চ করছি, এই রিসার্চ যুদ্ধে কোন সাহায্য করবে কিনা আমার জানা নেই, কিন্তু যে বিদ্যার আমরা চর্চা করছি, বিদ্যার যে স্তরে আমরা আছি, এই বিদ্যাকে রক্ষা করার জন্যই যুদ্ধ করা হয়। খুব দামী কথা। যুদ্ধ কেন করা হয়? এই যে বিদ্যার সংস্কৃতি, এই সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করা হয়। কারণ যদি এই বিদ্যাকে রক্ষা করা না হয়, এই বিদ্যা একদিন নাশ হয়ে যাবে। বিদ্যা একবার নাশ হয়ে গেলে পুনরায় ফিরে আসতে অনেক সময় অপেক্ষা করতে হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন চলছিল, সেই সময় ব্রাটার্ণ্ড রাসেলের ঠিক একই কথা আছে। একজন ইয়ং সোলজার এসে ব্রাট্রার্ণ্ড রাসেলকে বলছে, 'আমরা ওখানে যুদ্ধ করছি, আপনি এখানে বসে বসে কি করছেন'? ওই ইয়ং সৈনিকের সাথে ব্রাট্রার্ণ্ড রাসেলের একটা বিরাট আলোচনা আছে। তিনি সেই সৈন্যকে বলছেন, 'তুমি কিসের জন্য যুদ্ধ করছ'? এখান থেকে আলোচনা শুরু করে অনেক কথা বলতে বলতে শেষে বলছেন, 'তুমি যুদ্ধ করছ সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য, The idea of Britain এটা রক্ষা করার জন্য, আমি সেটাতেই যোগ দিচ্ছি'। কেউ যদি এসে বলে, গীতা পড়লে, জানলে আমার কি পেট ভরবে? কোন ভাবেই পেট ভরবে না। কিন্তু পেট ভরা হয় যাতে আমরা গীতাটা ভাল করে পড়তে পারি। বাইরের লোকেরা এটাই বলবে, গীতা পড়লে কি আমার পেট ভরবে? খালি পেটে কি ধর্ম হয়? কখনই খালি পেটে ধর্ম হয় না, ভুখে ভজন ন হোয়ে গোপালা, পেটে খিদে নিয়ে গোপালের ভজন করা যায় না। পেটের খিদে মেটানো হয় এই জন্য, যাতে আমরা এই সংস্কৃতির রক্ষা করতে পারি, এবং এই সংস্কৃতিকে যাতে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। লে আর লাদাকে কি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সবাই জানে, ওই ঠাণ্ডার মধ্যে ভারতীয় সৈন্যরা কিসের জন্য এত কষ্ট করে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ওখানে পড়ে আছে? The idea of India, ভারতের যে সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য। শুধু এক খণ্ড ভূমির জন্য নয়, কটা প্রাণের রক্ষার জন্য নয়। প্রাণের বলিদান যখন দেওয়া হয়, সমস্ত রকম সুখ, আরামকে যখন বিসর্জন দেওয়া হয়, তখন একটা আদর্শের জন্যই দেওয়া হয়। সেই আদর্শ হল একটা সংস্কৃতি।

এই সংস্কৃতির যাঁরা ধারক ও বাহক, যাঁরা এই সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করেন, তাঁদেরকে বলা হয় ব্রাহ্মণ। আমরা এখানে এই আলোচনায় যাচ্ছি না, কে জন্ম থেকে ব্রাহ্মণ, কে কর্ম থেকে ব্রাহ্মণ। লিবারাল, সেকুলারিস্ট অনেক আছে, দুনিয়ার সব প্রতারকরা জুটে কত কি বলে যাচ্ছে। কিছু দিন আগে একটা বই বেরিয়েছে, সেখানে তুলোধুনো করে দেখিয়েছেন, যত জন নামকরা লিবারাল

আছে, এরা কত দুষ্ট লোক ছিল। যারা লিবারাল শব্দ ব্যবহার করে এরা প্রত্যেকে ভিতরে ভিতরে অনেক দুর্নীতি ও ধান্দা চালিয়ে যাচ্ছিল। বর্তমান কালের লিবারালরাও তাই। তারা বলবে, ব্রাহ্মণ জিনিসটা খারাপ; আমরা ওই বিতর্কে যাচ্ছি না। আমাদের কাছে হল সংস্কৃতি, তা বিজ্ঞানের সংস্কৃতিই হোক আর ইট তৈরী করার সংস্কৃতি হোক, যাঁরা এই সংস্কৃতিতে অবদান রেখে যান, তাঁরাই ব্রাহ্মণ।

সংস্কৃতি জিনিসটা কি? যে কীর্তি স্থাপন হয়, তা দেশকালকে ছাপিয়ে যায়। খোজা নাসিরুদ্দিনের গল্পগুলো খুব সুন্দর। খোজা নাসিরুদ্দিন একদিন বাথরুমে গান করছিল। গান করতে করতে তার মনে হল সে খুব সুন্দর গান করে। একদিন বলল 'আমি গান করব'। একটা সভা হল, লোকজন অনেক এসেছে। এবার সে গান করবে। গান শুরু করতে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে, 'আরে বাথরুমটা কোথায়, বাথরুম না হলে আমি তো গান করতে পারব না। এখানে আগে একটা বাথরুম দাঁড় করাও, তবেই না আমি গান করব'। বাথরুমে সবাই গান করতে পারে, বাথরুমের গান মানে বাথরুমেই আবদ্ধ, এটা আর যাই হোক, সংস্কৃতি না। সংস্কৃতি মানে মেঘমল্লার, দীপক রাগ, বা আরও আগে থেকে পরম্পরা ধরে যে রাগ চলে আসছে। কোন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন যিনি আজ থেকে পনেরশ বা দু হাজার বছর আগে একটা রাগের সৃষ্টি করলেন, পরম্পরা ধরে আজ একজন শিল্পীর কণ্ঠ দিয়ে সেই রাগের মুর্ছনা শ্রোতার হৃদয়কে অনুরণিত করছে। কোথায় কোন জঙ্গলে তিনি এক সময় যে সঙ্গীতের রচনা করলেন, সেই সঙ্গীত আজ দেশ কালকে ছাপিয়ে গেল। তখন এই কলকাতা শহরের জন্ম হয়নি, সেই কলকাতার লোকেরা আজও সেই গান করছে, সেই গান শোনার জন্য রাত জেগে বসে থাকে। কীর্তি যেটা দেশকালকে ছাপিয়ে যায়, এটাই সংস্কৃতি, এছাড়া আর কিছু সংস্কৃতি হয় না। আমি আজ যা কিছু করে থাকি, ওটাই যদি দেশকালকে ছাপিয়ে যায়, তবেই ওটা হবে সংস্কৃতি, তা নাহলে ওটা একটা সাধারণ কর্ম, এর কোন দাম নেই।

এই সংস্কৃতিতে যিনি অবদান রাখেন, সমৃদ্ধ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ। এনারা বিদ্যার প্রতি এমন ভাবে সমর্পিত থাকেন যে, নিজের রক্ষাটুকু নিজে করতে পারেন না। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে, সমৃদ্ধ করতে হলে তাঁকে তো রক্ষা করতে হবে, এই রক্ষাটা করেন ক্ষত্রিয়রা। বৈশ্য, শূদ্র এনারা খালি জোগান দেন। ঠিক ঠিক জাতি বলতে দুটি, ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় শব্দটা প্রথমের দিকে ছিল না, বেদে শব্দটা হল রাজন্য। ব্রাহ্মণ হল যিনি সংস্কৃতি দিচ্ছেন, আর ক্ষত্রিয় যিনি এই ব্রাহ্মণকে রক্ষা করছেন। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়, এছাড়া তৃতীয় আর কোন জাতি হয় না। আমাদের যত বিজ্ঞানীরা আছেন, সবাই ব্রাহ্মণ; যত ডাক্তার আছেন, সবাই ব্রাহ্মণ; অবশ্য যদি তিনি বিদ্যার প্রতি সমর্পিত থাকেন। মূল হল যিনি সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। এনাদের রক্ষা করার জন্য ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণদের খাওয়া-পড়া যেন ঠিক ভাবে চলে, এই জিনিসটার দেখার কাজ বৈশ্যদের, আর অন্যান্য আনুষাঙ্গিক সব কিছু দেখাশোনার কাজ যারা করে, তারা শূদ্র, এর এখন নূতন নাম হয়েছে Service Sector।

ক্ষত্রিয়ের যদি শক্তি না থাকে, ব্রাহ্মণদের রক্ষা হবে কোথা থেকে! যার পরিণাম আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই, বাইরের দেশগুলি থেকে মুসলমানরা এসে মন্দির ধ্বংস করল, এর ওর গলা কাটল; উদ্দেশ্য, ভারতের সংস্কৃতিকে নাশ করে দেওয়া। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত তখনকার দিনে অত বড় বিশ্ববিদ্যালয় ছয় মাস ধরে পুড়তে থাকল। শুধু যে মানুষের গলা কেটেছে তা না, পুরো একটা সংস্কৃতিকে উড়িয়ে শেষ করে দিল। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সেই শক্তি যদি থাকত, তাহলে কি ভারতের এই পরিস্থিতি কখন হতে পারত! ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যে এই শক্তি আসবে, ভগবান শিক্ষা দিয়ে ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই শক্তিকে দাঁড় করিয়ে দেন। কি ভাবে?

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্, বলছেন যোগের ফল *অব্যয়ম্*, এই ফলের কখন নাশ হয় না, যোগের ফল অবিনাশী। যাঁরা গীতার কথা মন দিয়ে শুনছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা জীবনে

একটুও যদি নামানোর চেষ্টা করেন, দেখবেন এর ফল অব্যর্থ, ফল দেবেই দেবে। ভগবান নিজের মুখে বলছেন, এর ফল অব্যয়, কখন নাশ হয় না। এমন কি এর শেষ যে পর্যায় মোক্ষ, সেই মোক্ষফল দেবেই দেবে। ভগবান বলছেন, আমি এই বিদ্যা সূর্য দেবতাকে দিয়েছিলাম। তিনি আবার তাঁর পুত্র মনুকে এই বিদ্যা শেখালেন। মনু নাম বললেই আমাদের অনেক সংশয় উপস্থিত হয়। আমাদের শাস্ত্রে এবং আমাদের পরম্পরায় অনেক মনুর নাম পাওয়া যায়। মনুস্মৃতিতে মনু আসছে, সৃষ্টির কাজকে তরাণ্বিত করার জন্য ব্রহ্মা মনু ও শতরূপা নামে দু-ভাগে নিজেক বিভক্ত করেছিলেন, সেখানেও এক মনুকে আমরা পাই, আবার সূর্য পুত্র সেও মনু। সেই মনুর পুত্র হলেন ইক্ষ্বাকু। পুরাণে অনেক পরম্পরার উল্লেখ আছে, সেখানেও একজন মনু আছেন। এখানে ভগবান সূর্যের পুত্র মনুর কথা আমাদের বলছেন।

ভগবান বলছেন, *বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ*, এই পরম্পরাতে চলছে। বুদ্ধি দিয়ে মানুষ একটা স্তর পর্যন্তই যেতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিদ্যা বলতে আমরা যা বুঝি, সেই বিদ্যা ভগবান থেকেই আসে। দ্বিতীয় যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কোন একটা সময়, কোন একটা জায়গায় হঠাৎ দুম্ করে কারুর মাথায় একটা জ্ঞান এসে গেল, অন্যান্য ধর্মে যেমন হয়ে থাকে, যেখান থেকে বলা হয়, এই ধর্ম কে জন্ম দিয়েছেন, অমুক লোক। হিন্দু ধর্ম এভাবে হয় না, হিন্দু ধর্ম সনাতন ধর্ম, সনাতন কাল থেকে এই ধর্ম চলে আসছে। যবে থেকে সৃষ্টি হয়েছে, সেই সময় থেকেই এগুলো সনাতন সত্য। সনাতন সত্য হওয়ার জন্য, এই সত্য ভারতবর্ষে যেমন সত্য, আফ্রিকাতেও সত্য, আমেরিকাতেও সত্য, এই সত্য বিশ্বের সমস্ত জায়গায় সত্য। খ্রীশ্চানরা বলছেন, যীশু ভগবানের পুত্র, আমি যদি না মানি তাহলে কি হবে? কাহিনী সেখানেই শেষ। কিন্তু এই কর্মযোগ, এটা একটা সিদ্ধান্ত, নিউটনের সূত্রগুলি যেমন একটা শাশ্বত সত্য, তেমনি এগুলোও সনাতন সত্য। হিন্দু ধর্ম কারুর কথার উপর চলে না, এমনকি ভগবানের কথার উপরেও চলে না, হিন্দু ধর্ম একমাত্র চলে সনাতন সত্যের উপর। ভগবান শুধু এই সনাতন সত্যকে বলে দিলেন, বাপু এটা সনাতন সত্য, এই সত্যকে পালন করলে তোমার মঙ্গল হবে।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপঃ।।২।।

(হে পরন্তপ, ক্ষত্রিয়-পরম্পরাগত এই যোগ রাজর্ষিগণ বিদিত হয়েছিলেন। ইহলোকে এই যোগ কালক্রমে বিনষ্ট হয়ে গেছে, অর্থাৎ এর সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হয়েছে।)

ভারতবর্ষের ঠিক ঠিক আদর্শ রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি, এর নীচে আর কোন কথা চলে না। যিনি ব্রহ্মর্ষি তিনি বিদ্যাতে প্রতিষ্ঠিত, তার সাথে তিনি ঋষি। তাঁরা নীচে যাঁরা রাজা, তাঁরাও ঋষি ছিলেন, যেমন রাজা জনক ছিলেন। ব্রহ্মর্ষি আর রাজর্ষির নীচে আর কোন ঋষি হয় না। আমরা যাঁরা এই কথা শুনছি, আমাদের সবার দায়ীত্ব হয় আমাকে রাজর্ষি হতে হবে, নয়তো ব্রহ্মর্ষি হতে হবে। এই কর্মযোগের বিদ্যা ও তার মন্ত্র রাজর্ষিদের কাছে ছিল। কিন্তু পরে পরে সব রাজা আমাদের মতই হয়ে গেছে, ভিতরে সেই শক্তি নেই, দম নেই। তাই *স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপঃ*, কালের গতিতে এই বিদ্যা নাশ হয়ে যায়। শুধু আধ্যাত্মিক বিদ্যাতেই না, প্রত্যেক বিদ্যাই একটা সময় নাশ হয়ে যায়। সন্ন্যাসীদের প্রায়ই বাইরে থেকে শুনতে হয়, আপনাদের মধ্যে কজন বিবেকানন্দ হয়েছেন? আমি যখন রামকৃষ্ণ মঠে জয়েন করি, বাড়ি লোকেরা আমাকে বলতে শুরু করলেন, কজন তোমাদের এখানে বিবেকানন্দ হয়েছে? তখন অত বুদ্ধি ছিল না বলে কোন জবাব দিতে পারিনি। এখন হলে বলে দিতাম, ফিজিক্স পড়ে কজন আইনস্টাইন হয়েছে? একজন বিরাট কিছু হয়ে যান, তারপর সবাই বিদ্যাটা তাঁকে ভাঙিয়ে খেতে থাকে, তারপর বিদ্যাটা একটা সময়ের পর নষ্ট হয়ে যায়। প্রথমের দিকে এই বিষয়ের উপর আমরা আলোচনা করেছি। মানুষের মনে লোভ, মোহ এসে

যায়, যার ফলে শক্তিটা নাশ হয়ে যায়। ভগবান বলছেন, বিদ্যাটা আমি দিয়েছিলাম বাপু, কিন্তু যাঁরা নিয়ে গেছেন, তাঁরা দুর্বল, দুর্বল বলে তাঁরা বিদ্যাটা ধরে রাখতে পারলেন না।

পরন্তপঃ মানে যিনি পরকে তাপ দেন, এখানে অর্জুনকে বলছেন *পরন্তপঃ*, পর মানে শত্রু। যারা আমাদের শত্রু, তাদের তাপ দিতে হয়, যে আমার শত্রু তাকে সব সময় দাবিয়ে রাখতে হবে, তাপ দিতে হবে। এসব কথা শুনলে আমাদের বিচিত্র মনে হবে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রই এই কথা বলছেন, যে শত্রু তাকে কোন ভাবে ছাড় দিতে নেই, সব সময় তাপ দিতে হবে, *পরন্তপঃ*। অর্জুনের একটা নাম পরন্তপ, কৃষ্ণেরও নাম পরন্তপ, কারণ তিনিও পরকে তাপ দিতেন। দুর্বল কে? আচার্য দুর্বলের পরিভাষা দিতে গিয়ে বলছেন, *দুর্বলান্ অজিতেন্দ্রিয়ান্*, ঠিক ঠিক দুর্বল তারাই যারা অজিতেন্দ্রিয়। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় যাদের নিয়ন্ত্রণে নেই, তাদের কাছে যখন এই উচ্চ ধারণাগুলি যাবে, তারা সেটা ধরে রাখতে পারবে না। ঠাকুর বলছেন, সিংহীর দুধ যদি এমনি হাড়িতে রাখা হয়, হাড়ি ফেটে যায়। শোনা যায় যে, সিংহীর দুধের ঘনত্ব খুব ভারী, কাঁচা হাড়িতে রাখলে হাড়ি ফেটে যায়। আমাদের মন হল কাঁচা হাড়ি, এইসব উচ্চ ধারণাগুলি এলে আমাদের মনটা ফেটে যাবে। লোকেরা হল পুরুষার্থরহিত, তাদের মধ্যে পুরুষার্থ নেই। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটে পুরুষার্থের প্রতি যাদের জীবন সমর্পিত নয়; অজিতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ন্ত্রণে নেই, মনের নিয়ন্ত্রণ নেই, আর জীবনে কোন আদর্শ নেই; এই ধরণের লোকেরা যখন শাস্ত্র পড়ে, তখন পুরো জিনিসটাই নষ্ট হয়ে যায়।

স্বামীজী যে বলছেন, গীতা পড়া থেকে ফুটবল খেলা অনেক ভাল, ফুটবল খেললে তবে তুমি গীতা কিছু বুঝতে পারবে, আসলে এখানে স্বামীজী শক্তির কথা বলতে চাইছেন। শক্তি যদি না থাকে, ইন্দ্রিয়ের উপর কোন সংযম নেই, মন নিয়ন্ত্রণে নেই, আর জীবনে কোন আদর্শ নেই, সে কি শাস্ত্র বুঝবে! এসব কথা শুনলে আমাদের মন খারাপ হবে ঠিকই, কিন্তু এটাই সত্য। আমাদের কাছে এসে বলবে, মহারাজ বিবেকচূড়ামনি পড়ালে হয় না। কি হবে বিবেকচূড়ামণি পড়ে, আপনার বোঝার ক্ষমতা আছে? বোঝার যদি ক্ষমতা থাকতে, এই শাস্ত্র পড়ানোর আর দরকার হত না। এই শাস্ত্রগুলি সব গুরুমুখী বিদ্যা। বিবেকচূড়ামণি গুরুমুখী বিদ্যাই না, প্রকরণ গ্রন্থ। উপনিষদ, গীতা এগুলো গুরুমুখী বিদ্যা, গুরু ছাড়া বোঝা যায় না। যে কোন শাস্ত্র বুঝতে হলে আগে দেখুন এই কটি জিনিস আপনার মধ্যে আছে কিনা, প্রথম আপনার জীবনে কি কোন আদর্শ আছে, দ্বিতীয় আপনি কি জিতেন্দ্রিয়, আপনার মধ্যে কি সেই শক্তি আছে, মনে জোর আছে। এই তিনটে গুণ আপনার মধ্যে আগে নিয়ে আসুন। ভগবান নিজে দুঃখ করছেন, দেখ, আমি এই শিক্ষা দিয়েছিলাম, তাতেও নষ্ট হয়ে গেছে। আমি আবার এসেছি, তোমার মধ্যে এই গুণগুলি আছে, তাই তোমাকে আমি দিচ্ছি।

স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্।।৩।।

(তুমি আমার ভক্ত ও সখা। এইজন্য তোমাকে আজ এই পুরাতন যোগই বললাম। কারণ এ অতি গূঢ় রহস্য।)

হে অর্জুন, আগে আগে যে যোগের শিক্ষা আমি সূর্যকে দিয়েছিলাম, সেই বিদ্যা শোনাবার জন্য আমি আবার এসেছি। তুমি আমার ভক্ত; ভক্ত মানে যেখানে ভালবাসা আছে, তুমি আমাকে ভালবাস, আর তুমি আমার সখা। গুরু উপরে শিষ্য নীচে, এখানে তা না, এখানে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। ঠাকুর ও স্বামীজীর যে সম্পর্ক, সেখানে গুরু ও শিষ্য, কিন্তু তার সাথে দুজন দুজনের বন্ধু। আমি একজন মহারাজের কাছে একটা বর্ণনা শুনেছিলাম, ঘটনাটা আমি কোথাও পড়িনি, আমার জানাও নেই। উনি কোথায় শুনেছিলেন, পরম্পরায় শুনেছিলেন কিনা, তাও জানা নেই। বলছেন, স্বামীজী তখন বেলুড় মঠে আছেন। একদিন কোন কারণে তিনি নৌকা করে কলকাতায় যাচ্ছেন। নৌকা করে

বরানগর ঘাটে নেমে কলকাতায় যাবেন। বরানগর ঘাটে নেমেছেন, সেখান থেকে বড় রাস্থার উপর বরানগরে ফাগুর বিখ্যাত কচুরির দোকান আছে। ঠাকুরের নাকি ফাগুর দোকানের কচুরি খুব পছন্দের ছিল। স্বামীজী দেখছনে তখন ফাগুর দোকানে গরম গরম কচুরি ভাজা হচ্ছে। সেই দেখে স্বামীজী এক চ্যাঙাড়ি কচুরি কিনে কলকাতায় না গিয়ে আবার বেলুড় মঠে ফিরে এলেন। মঠের সাধুরা দেখে অবাক হয়ে গেলেন, স্বামীজী কলকাতায় না গিয়ে আবার ফিরে এলেন কেন? স্বামীজী কাউকে কিছু না বলে সোজা পুরনো মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরের সামনে কচুরির চ্যাঙাড়ি রাখলেন, কোন মন্ত্র নেই, কিছু নেই ঠাকুরের সামনে রেখে বলছেন, 'খাও ইয়ার'। এই ঘটনাটা যখন শুনলাম তখন আমার এতো ভাল লেগেছিল যে, কি আর বলব।

এটাই এখানে বলছেন, *ভক্তোহসি মে সখা চেতি*, গুরু আর শিষ্য কিন্তু দুজনের মধ্যে বন্ধুর ভাব। জোসেফিন ম্যাকলাউড স্বামীজীর নামে বলতেন my friend, অবশ্য তিনি দীক্ষা নেননি, কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত বলে গেছেন, স্বামীজী আমার বন্ধু। পুরো গীতার বক্তব্য হল জ্ঞানযোগ; বলছেন এই জ্ঞানযোগ অত্যন্ত গুহ্য, ধারণা করা যায় না। হে অর্জুন, তোমাকে আমি ভালবাসি, তুমি আমার সখা আবার তুমি আমার শিষ্যও। ভালবাসা মানে, যেখানে ভাল বাসা বাঁধে, পাখি যেমন বাসা বাঁধে, যেখানে ভাল, সবটাই শুভ, সবটাই ভাল যেখানে বাসা বাঁধে সেটাই ভালবাসা। বন্ধু যিনি হন, যিনি সখা, সেখানে ভালবাসা সবচেয়ে বেশি। সন্তান মাকে সব কথা বলে না, বাবাকে তো বলবেই না, স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে সব কথা বলে না, মাও সন্তানকে সব কথা বলে না, বন্ধুকে সব কথা বলে। মা যদি বন্ধু হন, স্ত্রী যদি বন্ধু হয়, স্ত্রী অবশ্য সব কথা স্বামীকে কক্ষণ বলে না, বলা ঠিকও নয়; বন্ধু হলে সব কথা বলা যায়, বন্ধুর মত জিনিস হয় না। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই যদি বন্ধু হয়, বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। মা মনে করে আমার সন্তান বন্ধু, কিন্তু ওটা হয় না, বন্ধু পুরো আলাদা জিনিস। ভাগবতে উদ্ধব সংবাদে আছে, সেখানে উদ্ধব বলছেন, কৃষ্ণের সব গুহ্য কাজ আমি করি, মায়েরা সন্তানের কোন গুহ্য কাজ করে না, ভাই বোনের জন্য, বোন ভাইয়ের জন্য করে না, বন্ধুরা করে। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য ও সখা দুটোই।

চার নম্বর শ্লোক থেকে শুরু হয় অবতার তত্ত্ব। প্রথমের দিকে আমরা অবতার তত্ত্বকে নিয়ে হাল্কা একটু আলোচনা করেছিলাম, এবার পুরোদমে অবতার তত্ত্বকে নিয়ে বলবেন। পরে সপ্তম অধ্যায়ে আবার অবতার তত্ত্বে ঢুকে যাবেন। অর্জুন সব কিছু মেলাতে পারছেন না, থেকে থেকে ভগবান দুম্ দুম্ করে অনেক কথা বলে যাচ্ছেন, অর্জুনও তাই জিজ্ঞেস করছেন –

অর্জুন উবাচ
অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্ বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি।।৪।।

(অর্জুন বললেন –আপনার জন্ম তো অনেক পরে এবং সূর্যের জন্ম বহু পূর্বে হয়েছিল। আপনি সৃষ্টির প্রারম্ভে সূর্যকে এই যোগ বলেছিলেন, তা কি করে বুঝব?)

হে কৃষ্ণ, আপনি আমার সখা, আমি আপনার শিষ্য, সব ঠিক আছে, কিন্তু ইক্ষ্বাকু সেই কবেকার লোক, মনু তাঁরও আগেকার, সূর্য দেবতা তারও অনেক আগেকার। আমরা জানি এই সেদিন আপনার জন্ম হয়েছে, আপনি বসুদেবের সন্তান, আপনি দেবকীনন্দন, কিন্তু আপনি কি এই এলেমেলো কথা বলছেন, আপনি নাকি সূর্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন! *অপরং অর্বাগ্ বসুদেবগৃহে ভবতো জন্ম*, আমরা সবাই জানি বসুদেবের গৃহে আপনার জন্ম, আর আপনি বলছেন আপনি নাকি সূর্যকে এই যোগের শিক্ষা দিয়েছিলেন, এটা কি করে সম্ভব?

অনেকেই বলে থাকেন, আচার্য ঘোর অদ্বৈতবাদী। অদ্বৈতই ভারতবর্ষের ঠিক ঠিক ধর্ম। অদ্বৈত, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত নিয়ে লোকেদের মাথায় অনেক ভুল ধারণা বসে আছে। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত সবটাই অদ্বৈতের মধ্যেই আছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আচার্য শঙ্কর একজন শ্রেষ্ঠতম ভক্ত। একবার গীতা পড়লে বোঝা যায় আচার্য শঙ্কর কত বড় ভক্ত। আচার্য বলছেন, *যা বাসুদেবে অনীশ্বরাসর্বজ্ঞশঙ্কা মূর্খানাং*, যারা মুর্খ, বর্তমান কালের মুর্খ, যারা ইউনিভারসিটিতে পোস্টার লাগিয়ে হিন্দু ধর্ম আর হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের নামে নোংরা নোংরা কথা বলে যাচ্ছে, এই মুর্খদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি? এই যে বাসুদেব, বসুদেবের সন্তানকে বাসুদেব বলা হয়, এই শ্রীকৃষ্ণ অনীশ্বর, ঈশ্বর নন, আর তিনি সর্বজ্ঞ নন। যিনি সর্বজ্ঞ, তিনি সবটাই জানেন। এই আশঙ্কা মুর্খদেরই হয়। এটাকে নিবারণ করার জন্য অর্জুনের এই প্রশ্ন। ভগবান নিজে যদি না বলেন তিনি ভগবান, ততক্ষণ তিনি ভগবান না। আমরা কি করে জানব তিনি অবতার কিনা? অবতারের একটাই লক্ষণ, অবতার বুক ঠুকে বলেন, আমি অবতার। একমাত্র ভগবানই বলেন, হ্যাঁ আমি ভগবান। এ ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ হয় না। আর তিনি এটা ঢাকঢোল পিটিয়ে বলেন না, তাঁর বিশিষ্ট কয়েকজনকেই বলেন। সেই সময়কার যাঁরা জ্ঞানী পুরুষ, তাঁরা জানেন, ইনি অবতার। এছাড়া তিনি বিভিন্ন লোককে তাঁদের ধ্যানের গভীরে বা ধ্যানের বাইরে তাঁর ঈশ্বরীয় রূপ প্রকাশ করেন।

একাদশ অধ্যায়ে আমরা দেখব, শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে অর্জুনকে বিভিন্ন রূপ দেখিয়ে জানিয়ে দিচ্ছেন, এই দেখ আমি ঈশ্বর। ঠাকুরও কত মানুষকে ধ্যানের সময়, ধ্যানের বাইরে দর্শন দিচ্ছেন। আর যেখানে সেখানে বলে বেড়াচ্ছেন না যে, আমি অবতার। নিজের কয়েকজন বাছাই করা শিষ্যকে বলছেন, যেমন নরেনকে বলছেন, যে রাম সেই কৃষ্ণ, সেই ইদানিং এই দেহে রামকৃষ্ণ। ঠাকুর একেবারে পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন, দেখ, যে রাম সেই কৃষ্ণ, সেই ইদানিং রামকৃষ্ণ। নরেন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন, ঠাকুর তাঁকে ছুঁয়ে দিয়েছেন, তারপর একটা অবস্থায় ঠাকুর নরেনের সামনে হাঁটু গেড়ে হাতজোড় করে বলে যাচ্ছেন, আমি জানি আপনি সেই নরঋষি, যিনি যুগে যুগে আসেন মানব কল্যাণের জন্য। বলে ঠাকুর কাঁদছেন। আর নরেন মনে মনে বলছেন, লোকটি নির্ঘাৎ বদ্ধ পাগল, এই ছিল নরেনের সিদ্ধান্ত, শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে না। অর্জুনেরও একই অবস্থা, পরে গিয়ে বলবেন, আপনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন, আমার মনে নেই, আর-একবার একটু বলবেন? যাই হোক ভগবান এবার বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ
বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।।৫।।

(শ্রীভগবান বললেন –হে পরন্তপ অর্জুন, আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে। আমি সেই সকল জানি; কিন্তু তুমি তৎসমুদয় বিস্মৃত হয়েছ।) [কারণ ধর্মাধর্মাদি দ্বারা তোমার জ্ঞানশক্তি সমাবৃত এবং মায়াধীন; কিন্তু আমি নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব ও মায়াধীশ বলে আমার জ্ঞানশক্তি সর্বদা অনাবৃত]

হে অর্জুন, তোমার অনেক জন্ম হয়েছে, আমারও অনেক জন্ম হয়েছে। আমার সব জন্মের কথা মনে আছে, তোমার কিন্তু কোন জন্মের কথা মনে নেই। আমি জানি কারণ আমি ভগবান। এই সৃষ্টিতে আমি অনেকবার এসেছি, তুমিও অনেকবার এসেছ, তোমার কিছু মনে নেই, কারণ তোমার মন মায়া মেঘে আবৃত। কিন্তু আমি ভগবান, আমাকে কেউ আবৃত করতে পারে না, *তান্যহং বেদ সর্বাণি*, আমি তাই আমার আগের আগের সব জন্মের কথা জানি। সেইজন্য ঠাকুর নরেনকে বলতে পারছেন, আমি জানি তুমি সেই নরঋষি; নরেন জানেন না। হে অর্জুন, তোমার মন পূণ্য আর পাপ, এই জ্ঞানে আচ্ছাদিত হয়ে আছে, আমার ক্ষেত্রে সেটা হয় না। তাই না, আমার মন বলে কিছু নেই,

আমি শুদ্ধ চৈতন্য। শুদ্ধ চৈতন্য হওয়ার জন্য আমার পূণ্য পাপ হয় না, ধর্ম অধর্ম হয় না। সেইজন্য আমার জ্ঞান সব সময় যেমনটি আছে তেমনটিই থাকে।

আচার্য দেখাচ্ছেন ভগবান জিনিসটা ঠিক কি, *অহং পুনঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবত্বাদ্ অনাবরণজ্ঞানশক্তিঃ,* আচার্য এত কম শব্দের মধ্যে এত আইডিয়াস ঠেসে দিতেন যে কল্পনাই করা যায় না। গদ্যের মাধ্যমে যেন পদ্য রচনা করে যাচ্ছেন। তার আগে অর্জুনের নামে বলছেন, *ধর্মাধর্মাদিপ্রতিবদ্ধজ্ঞানশক্তিত্বাৎ,* তোমার যে জ্ঞানশক্তি ধর্ম ও অধর্ম দিয়ে প্রতিবদ্ধ, বাঁধা আছে। *অহং পুনঃ* আর আমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাবসম্পন্ন, এই কারণে আমার জ্ঞানশক্তি আবরণরহিত, সেইজন্য আমি সব কিছু জানি।

আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্যে অনেকবার বলছেন, ধর্মের কথা যুক্তি দিয়ে, ন্যায় শাস্ত্র দিয়ে বোঝান যায় না। ধর্মের কথা জানার একমাত্র উপায় শাস্ত্র প্রমাণ। আমাদের যদি কেউ জিজ্ঞেস করে পুনর্জন্ম আছে কি নেই? আমাদের কাছেও এর কোন সঠিক যুক্তিযুক্ত উত্তর নেই? কেন নেই? যুক্তি দিয়ে জন্মান্তরকে কখনই প্রমাণ করা যাবে না। এর একমাত্র প্রমাণ শাস্ত্র। এখন যদি কেউ এসে বলে আমি শাস্ত্র মানি না, তখন তাকে বলতে হয়, ভাই তোমাকে শাস্ত্র মানতে হবে না, আর পুনর্জন্মও মানতে হবে না। পুনর্জন্ম মানলে আর পুনর্জন্ম না মানলে জীবনের এমন কোন পরিবর্তন আসবে না ঠিকই; তবে হ্যাঁ, যদি তুমি ধর্ম পথে এগোতে চাও তাহলে কিন্তু তোমাকে পুনর্জন্ম মানতে হবে। যদি পুনর্জন্ম না মান তাহলে ধর্ম পথে আসার তোমার কোন প্রয়োজনই নেই। মৃত্যুতেই সব কিছু শেষ হয়ে যায়, এই মতকেই যারা বিশ্বাস করে তারা ধর্ম পথে কেন আসবে? মানুষের বয়স হয়ে গেলে রাত্রে ঘুম হয় না, চোখে কম দেখে, কানে শোনে না, খেলে হজম করতে পারে না, কাশতে পারে না, কাশলে বুকের দম ফুরিয়ে যায়, তার উপর বাড়ির লোকের নানান রকমের গঞ্জনা। এই যে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা, মৃত্যুতেই যদি সব শেষ হয়ে যায়, তাহলে বেঁচে থেকে এত কষ্ট পাওয়ার কি আছে?

কেন মরতে চাইছে না? কারণ কোথাও তার মনে একটা চিন্তা ধাক্কা মারছে, মরে গেলে আবার হয়ত আমাকে জন্মাতে হবে। এই চিন্তা কোথা থেকে আসছে? শাস্ত্র থেকে আসছে। ধর্ম প্রমাণ, অধ্যাত্ম প্রমাণ, পুনর্জন্ম প্রমাণ এই সব কিছু দাঁড়িয়ে আছে শাস্ত্রকে ভিত্তি করে। এখন আমি আপনি যদি শাস্ত্রের কথা বিশ্বাস না করি তাহলে এগুলোও আমাদের মানতে হবে না। পশুরাও তো কিছু মানে না, তাদের শরীর ইন্দ্রিয়ের নির্দেশেই চলছে। তাই বলে কুকুর বেড়ালরা কি আনন্দে নেই, তারাও দিব্যি আনন্দে খাওয়া-দাওয়া করছে, সন্তান উৎপাদন করে যাচ্ছে। তাদের না আছে টেনশান, না আছে ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের চিন্তা, না আছে অসুখ বিসুখের চিন্তা, খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে, জন্মালে মরতে হবে মরে আবার জন্ম নিতে হবে এই নিয়ে তাদেরও কোন মাথা ব্যাথা নেই। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে, আমার যদি ধর্ম অধর্ম নাই থাকে, পূণ্য পাপ যদি নাই থাকে, তাহলে আমার জন্ম হল কি করে? সেই রকম প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে, ভগবান অবতার হন কি করে? পরের শ্লোকে ভগবান পরিষ্কার করে দিচ্ছেন, ধর্মাধর্মাতীত নিত্য ঈশ্বরের জন্ম কিভাবে সম্ভব।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।।৬।।

(আমি জন্মরহিত, অলুপ্তজ্ঞানশক্তি-স্বভাব এবং ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও সমস্ত জগৎ যার বশীভূত আমার সেই ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিকে আশ্রয় করে নিজের মায়া দ্বারা যেন দেহধারণ করি।)

এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে যাওয়ার আগে একটা খুব সহজ উদাহরণ দিলে বুঝতে সুবিধা হবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি যখন কোথাও যান, তখন তাঁদের আগে পিছে অনেক সিপাহী থাকে। প্রধানমন্ত্রী যেদিকে যাবেন, তাঁর দেহরক্ষী সিপাহীরা সেইদিকেই যাবে। মৌমাছিদের ক্ষেত্রেও তাই

হয়, রানী মৌমাছি যেদিকে যাবে বাকি মৌমাছিরা সেদিকে যাবে। একজন কুখ্যাত কট্টর আতঙ্কবাদীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার সাথেও অনেক সিপাহী আছে। কিন্তু সিপাহীরা যেদিকে যাবে কয়েদীকে সেই দিকেই যেতে হবে। সিপাহী দুটো ক্ষেত্রেই আছে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও আছে, কয়েদীর সঙ্গেও আছে। কয়েদীকে সেই দিকেই যেতে হবে, পুলিশ তাকে যেদিকে নিয়ে যাবে। আর প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে, পুলিশকে সেইদিকেই যেতে হবে, যেদিকে প্রধানমন্ত্রী যাবেন। অবতার আর জীবের মধ্যে এই তফাৎ। অবতার যেদিকে যাবেন, মায়া তাঁর পিছনে পিছনে চলবে। জীবের ক্ষেত্রে, মায়া যেদিকে যাবে জীবকে মায়ার পিছনে পিছনে যেতে হবে। মায়া কি? পাপ পূণ্যের বন্ধন, ধর্ম ও অধর্মের বন্ধন; এই মায়া কোমড়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে জীবকে টানতে টানতে নিয়ে যায়। আমরা না যেতে চাইলেও যেতে হবে।

কর্মের ব্যাপারে জীব আর ঈশ্বরের কি তফাৎ? ধরুন একজন কোন একটা দোষ করেছে। জজ সাহেবের সামনে বিচার চলছে। বিচার শেষে জজ সাহেব বলে দিলেন, ছ-মাসের জেল হল তোমার অথবা দু হাজার টাকা জরিমানা। দোষী ব্যক্তি কি বলবে? হয় ছ-মাসের জেল দিয়ে দিন, বা দু হাজার টাকার জরিমানা নিয়ে নিন। আমরা সবাই এই ধর্ম অধর্মে বাঁধা, আমাদের কর্ম বলে দেয়, হয় এটা নয় ওটা। কিন্তু যিনি আধ্যাত্মিক ভাবে মুক্ত, তাঁর উপর এটা খাটবে না। ঠাকুরের উপর এটা খাটবে না, তাঁর ধর্ম নেই, তাঁর অধর্ম নেই, শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও তাই, শ্রীরামের ক্ষেত্রেও তাই। কম্প্যুটারে যেমন জিরো আর ওয়ান, হয় জিরো নয় ওয়ান, তৃতীয় কিছু নেই। অবতারের ক্ষেত্রে এগুলোর কোনটাই খাটবে না। শ্রীরামচন্দ্র বালি বধ করলেন, সীতাকে বনবাসে পাঠালেন, এতে শ্রীরামচন্দ্রের পূণ্যও হবে না, পাপও হবে না। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সাথে কি করলেন, কাকে মারলেন, কাকে মারতে সাহায্য করলেন, এসবে তাঁর কিছু হয় না, তিনি অবতার। আমাদের দৃষ্টিতে পাপ পূণ্য হয়। সেইজন্য তিনি প্রাণপন চেষ্টা করেন, যাতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী তেমনই থাকে, যেমনটা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা আছি। কিন্তু মাঝে মাঝে ওটা ভাঙতে হয়।

এবারে এটা বুঝতে সুবিধা হবে। *অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্*, হে অর্জুন আমি হলাম যত জীব আছে, সমস্ত জীব, সমস্ত ভূতের ঈশ্বর। *অজোহপি*, আমার কখন জন্ম হয় না, আমি অজ। ধর্ম, অধর্ম, পাপ, পূণ্যের শক্তিগুলো পিছনে ঠেলে আমাদের দিয়ে যেমন সব কিছু করাচ্ছে, ভগবানের ক্ষেত্রে সেরকম কিছু হয় না। তিনি ইচ্ছা করলে যেখানে খুশী, যে কোন গর্ভে জন্ম নিতে পারেন। তিনি মৎস্যাবতার হয়েছেন, তিনি বরাহ অবতার হয়েছেন, নরসিংহ অবতার হয়েছেন, যে কোন অবতার হতে পারেন, তাঁর কাছে এটা কোন ব্যাপারই না। তিনি কখন রাজপ্রাসাদে জন্ম নিতে পারেন, কখন কারাগারে জন্ম নিতে পারেন, আবার কখন দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটিরে জন্ম নিতে পারেন।

তার সাথে তিনি ঘাসের ছোট্ট একটা টুকরো থেকে ব্রহ্মা পর্যন্ত যা কিছু আছে, সব কিছুর 'আমি'র নিয়ন্তা। *অব্যয়াত্মা*, আমার জ্ঞানশক্তি কক্ষণ ক্ষয় হয় না। জ্ঞান সব সময় আমার জাগ্রত থাকে। তা সত্ত্বেও আমি আমার মায়া, যে মায়া সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে চালায়, সেই মায়াকে আমি নিজের অধীনে রেখে জন্মগ্রহণ করি। জীব হল মায়াধীন, আর ঈশ্বর হলেন মায়াধীশ। ঈশ্বর হলেন মায়ার মালিক, তিনি শুধু বলে দিলেন, মায়া আমি একটু ভিতরে যাচ্ছি, মায়াও সঙ্গে সঙ্গে আপ্যায়ন করে বলবেন, প্রভু আসুন আসুন। মায়ার ফলে কি হয়, মানুষ স্বয়ং বাসুদেব স্বরূপ, কিন্তু মায়ার জন্য সে নিজের স্বরূপকে জানতে পারে না। আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, কিন্তু জানতে পারছি না, কারণ মায়া আবরণ দিয়ে রেখেছে। ফলে কি হয়, আমি যে শরীর ধারণ করি, এটা আমার লীলা।

আচার্য বলছেন, *দেহবান্ ইব ভবামি জাত ইব আত্মমায়য়া আত্মনো মায়য়া ন পরমার্থতো লোকবৎ*, সাধারণ মানুষের যেভাবে জন্ম হয়, আমার সেভাবে জন্ম হয় না। তাহলে কি এটা মিথ্যা?

একেবারেই মিথ্যা না। যিনি অনন্ত তাঁর কি কখন জন্ম হতে পারে, যিনি অনন্ত তাঁর কি কখন মৃত্যু হতে পারে? তিনি চিরন্তন, এটা সত্যও না, মিথ্যাও না। সত্য এই জন্য নয়, অনন্ত কখন জন্ম নেবে না। মিথ্যা কেন নয়? কারণ বাস্তবিক দেখা যাচ্ছে। সেইজন্য এটাকে বলা হয় লীলা। তিনি কখন শরীর ধারণ করেন; আর তিনি কেন আসেন?

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।৭।।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।৮।।

(হে ভারত, যখন প্রাণিদের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের কারণ বর্ণাশ্রমাদি ধর্মের অধঃপতন ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি স্বীয় মায়াবলে যেন দেহবান্ হই, যেন জাত হই। সাধুদের রক্ষার জন্য, দুষ্টদের বিনাশের জন্য এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে নরাদিরূপে অবতীর্ণ হই।)

আচার্য ধর্ম কি পরিভাষিত করতে গিয়ে বলছেন, *বর্ণাশ্রমাধিলক্ষণস্য প্রাণিনাম্ অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসাধনস্য,* যেটা মানুষের কল্যাণ করে; অর্থ, কাম আর তার সাথে ধর্ম, যার দ্বারা এই জগতে মানুষের সাক্ষাৎ উন্নতির কারণ হয়। ধর্ম পালন করে যদি কারুর সাংসারিক ক্ষতি হচ্ছে দেখা যায়, তাহলে এটা কখনই ধর্ম হতে পারে না। ধর্ম পালন করে যদি ভাল উপার্জন না করতে পারে, নিজেকে যদি রক্ষা করতে না পারে, তাহলে এটা ধর্ম নয়। ধর্ম মানেই অভ্যুদয়, ধর্ম পালন করলে এখন যে অবস্থায় আছে তার থেকে অনেক ভাল হবে। যদি ভাল না হয়, তাহলে বুঝতে হবে তার ধর্মে কিছু গোলমাল আছে। আর তার সঙ্গে নিঃশ্রেয়স, সব কিছু ত্যাগ করে ঈশ্বরের জন্য বেরিয়ে এসেছে। অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স, এটাকেই বলে ধর্ম। এই ধর্মে যখন গ্লানি হয়, যখন দেখা যায় মানুষ অভ্যুদয়ের দিকে যাচ্ছে না, নিঃশ্রেয়সের দিকে যাচ্ছে না, তখনই এটা হয়ে যায় মৃত্যুধর্মা। মৃত্যুধর্মা মানে, জন্মাল আর মরল, মরে আবার জন্ম নিল, আবার মরল। তার সাথে মনে করে মৃত্যুতেই সব শেষ।

ধর্মের এই দুরবস্থা যখন হয়, তখন *অভ্যুত্থানমধর্মস্য,* অধর্ম মানে এটাই, অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স হয় দুটোই, নয়তো দুটোর মধ্যে কোন একটা যখন নীচে নেমে যায়, ভগবান তখন অবতার হয়ে আসেন। যেমন আমেরিকা, অভ্যুদয় করেই যাচ্ছে, নিঃশ্রেয়সটা পুরো উড়ে গেছে। ভারতবর্ষে অভ্যুদয়ও নেই, নিঃশ্রেয়সও নেই। ভগবানকে তখন আসতে হয়। ভগবান যখন আসেন, তখন *তদাত্মানং সৃজাম্যহম্,* তখন আমি নিজেকে রচনা করি। সাধারণ জীবের মত তাঁর জন্ম হয় না। আবার হঠাৎ ম্যাজিকের মত দাঁড়িয়ে গিয়ে বলবেন, 'আমি ভগবান তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমি আবির্ভূত হলাম', এভাবেও তিনি আসেন না। সাধারণ ভাবে মানুষ যেভাবে আসে, তিনিও সেই একই পদ্ধতিতে গর্ভ দিয়েই আসেন। তাঁকেও ছোটবেলা অ-আ-ক-খ শিখতে হয়।

এসে তিনি কি করেন? ধর্মের যখন গ্লানি হয়, ধর্ম বলতে, যেটা মানুষের জন্য অভ্যুদয়, আর যেটা মানুষের জন্য নিঃশ্রেয়স, সাংসারিক উত্থান আর সন্ন্যাস, দুটোই সমান ভাবে চলতে হবে; দুটোরই যখন হানি হয় তখনই ধর্মের গ্লানি হয়। *বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্,* যে শক্তি এই দুটোকে নাশ করছে, সেই শক্তিটাকে ঈশ্বর অবতার হয়ে এসে দাবিয়ে দেন। সংসার মানে সব কিছুই থাকবে, আম গাছও থাকবে, বিষবৃক্ষও থাকবে; মানুষের মধ্যে ভাল মানুষও আছে, দুষ্ট মানুষও আছে, আবার সিংহ, বাঘ, সাপ, বিছে সব ধরণের প্রাণী আছে। কিন্তু এমন কিছু হয়ে যায়, যার জন্য মানব সমাজে, প্রকৃতিতে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ ত্যাগের ভাব কমে গিয়ে শুধুই ভোগের মধ্যে মানুষ ডুবে যায়। কিংবা প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, যার দ্বারা অভ্যুদয় আসবে, সেই অভ্যুদয় কমে যাচ্ছে, ভগবান তখন নিজেই আসেন, এসে জিনিসটাকে ঠিক করে দেন। কপিল মুনিকে আমরা

অবতার মনে করি, তিনি এলেন সাংখ্য দর্শনের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এমন একটা practical method হবে, যেটা দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের দিকে এগোতে পারবে, কপিল মুনির আসে সেটা ছিল না, তিনি এসে ওটা দিয়ে দিলেন। আবার অসুরগুলো যখন খুব শক্তিশালী হয়ে গেল, সমুদ্র মন্থন করে অমৃত বার করতে হবে, ভগবান তখন কুর্মাবতার হয়ে এলেন, তিনি সমুদ্রের নীচে গিয়ে বসলেন, সমুদ্র মন্থন করে অমৃত বার করে আনলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে তিনি ত্যাগ জিনিসটাকে আবার প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন। কিভাবে?

স্বামীজী ঠাকুরের নামে স্তোত্রে বলছেন, *সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রং যামি গুরু শরণং ভববৈদ্যম্‌*, সংশয়রূপ রাক্ষসকে তিনি মহাস্ত্র দিয়ে বধ করলেন। যেভাবে রাম রাবণকে বধ করলেন, যেভাবে কৃষ্ণ কংসকে বধ করলেন, ঠাকুরও সেইভাবে এই সংশয়রাক্ষসকে বধ করলেন। ভবিষ্যতে যদি কোন পুরাণকার আসেন, তিনি এই সংশয়কে একটা অসুর রূপ তৈরী করে দেবেন, কোন একটা চরিত্র দাঁড় করিয়ে তাকে অসুরের রূপ দিয়ে দিলেন, আর ঠাকুর এসে সেই অসুরবধ করবেন। কিভাবে বধ করবেন? জ্ঞানশক্তি দিয়ে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মা শুধু অস্ত্র দিয়েই অসুর নিধন করছেন না, মাঝে মাঝে ‘হুম্‌’ এই বীজমন্ত্রের এই হুঙ্কার দিয়েই কত অসুর বধ করে দিলেন। ঠাকুরও জ্ঞানশক্তি দিয়ে শুধু হুম্‌ করলেন, নাশ হয়ে গেল সংশয় রাক্ষস।

ইদানিং কালের যে লিবারাল, যুক্তিবাদীরা গলা ফাটিয়ে ধর্মের নামে কত গালাগালি দিয়ে যাচ্ছে, এদেরই পূর্বজরা ঠাকুরের সময়েও ছিল, তখন এনারাও ধর্মের সব কিছুতে সংশয় করত। ঠাকুরের কোন প্রথাগত লেখাপড়া নেই, অতি সাধারণ এক জীবন, সেই জ্ঞানশক্তি দিয়ে তিনি আর-একবার প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন যে, ধর্মই সত্য, অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স; এই দুটি ধর্মকে আবার প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন। কথামৃতে বিভিন্ন জায়গায় ঠাকুর গৃহস্থের মঙ্গলটা যে কত জরুরী এবং কিভাবে তাদের মঙ্গল হবে, সেটাকে নিয়ে কত ভাবে আলোচনা করছেন।

সম্ভবামি যুগে যুগে, কারণ মানুষ লোভে পড়ে, মোহে পড়ে একটা সময় ধর্মকে ছাড়বেই। ধর্মকে ছাড়লেই বিনাশের রাস্তা অবশ্যই খুলে যাবে। সাথে সাথে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। যে মানুষ নিজেকেই কোন রকমে চালিয়ে নিয়ে যেতে হিমসিম খেয়ে যায়, সেখানে সমাজকে, ধর্মকে কি করে সেই মানুষ সামলাবে! ঈশ্বরের শক্তি ছাড়া কি সামলানো যায়; বিশেষ করে শিক্ষা, ঈশ্বর ছাড়া সামলানো যায় না। সমস্যা যদি একটা স্তর থেকে বেশি হয়ে যায়, মানুষ আর সামলাতে পারে না। যুগে যুগে ভগবানকে তাই এসে ধর্মকে রক্ষা করতে হয়।

পরিত্রাণায় সাধুনাং, সাধু শব্দের মাধ্যমে শুভ শক্তির কথা বলছেন। অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স, এই বিদ্যাকে যাঁরা ধরে আছেন এবং এই বিদ্যাকে যাঁরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, এনারাই সেই শুভশক্তির প্রতিভু, এনারাই সাধু। এই পুরো জিনিসটাকে, অর্থাৎ আমার জন্ম, আমার কর্ম সমূহকে যাঁরা বুঝতে পারেন, তাঁদের কি হয়? পরের শ্লোকে ভগবান তাঁদের কথাই বলছেন।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন।।৯।।

(হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার অলৌকিক মায়িক জন্ম ও সাধুপরিত্রাণাদি অপ্রাকৃত কর্ম তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি আমাকেই লাভ করেন এবং দেহান্তে আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না।)

মুক্তির সহজ উপায় কি? যিনি জেনে গেলেন, আমার যত জন্ম, আমার যত কর্ম, সবটাই দিব্য, সবটাই লীলা, দেহান্তে তিনি আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না। আমরা ঠাকুরের জপ করছি, ঠাকুরের ধ্যান করছি, এতে কি আমাদের মুক্তি হয়ে যাবে? কোন দিন হবে না। গুরু আমাদের বলে দিয়েছেন

ইষ্টের ধ্যান করতে। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির ধ্যান করতে বলেননি, শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তির উপরেও ধ্যান করতে বলেননি। সাধনা মানেই মনকে নিয়ন্ত্রণ করে আমার ভিতরে যে শুদ্ধ আত্মা আছেন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে আমার সামনে প্রকট হবেন। ছবির ধ্যান করলে মরে আমি ছবিই হব। মূর্তির ধ্যান করলে মরে একটা ফসিল হব আর চৈতন্যের চিন্তা করলে চৈতন্য হবে। জপধ্যান করছে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে এখনও চৈতন্য রূপে না দেখে ছবি রূপে, মূর্তি রূপে দেখছে, এই কথা বললে অনেকে বুঝতেও পারেন না, কি বলতে চাইছি।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্, আমার জন্ম দিব্য, আমার কর্ম দিব্য, এটাকে যিনি তত্ত্বতঃ জানেন, ভাসা ভাসা জানলে হবে না। আমরা তো জানি শ্রীরামচন্দ্র ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, কই আমাদের তো মুক্তি হচ্ছে না। মুক্তি হচ্ছে না, কারণ তত্ত্বতঃ আমরা জানি না। ঈশ্বরীয় তত্ত্ব জিনিসটা কি, অবতার তত্ত্ব জিনিসটা কি, এটা যেন বোধ হয়। এই জন্যই গীতা শাস্ত্রাদি পড়া। সাধনা কেন করছি? জপধ্যান কেন করা হয়? যাতে এই তত্ত্ব বোধ হয়। এটাই ভগবান বলছেন, *যো বেত্তি তত্ত্বতঃ,* যে ব্যক্তি এটা ঠিক ঠিক জেনেছে। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বসে আছেন, সামনে কয়েকজন ভক্ত বসে আছেন, ঠাকুর সেখানে বলছেন, এই ছোকরাদের শুধু এটুকু জানলেই হবে, তারা কে আর আমি কে, এবং এদের সাথে আমার কি সম্পর্ক। খুব সহজ কথা, আমি তো জানি আমি কে, আমি জানি ঠাকুর কে, এই তো হয়ে গেল, আর কি লাগবে। মুক্তি তো আমার হয়ে গেল। না, এগুলো সব মুখের কথা, তত্ত্বতঃ আমাদের জানা নেই। সাধনা কিভাবে হয় রাজযোগে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন, অর্জুন তুমি ভাল করে জেনে নাও যে, যিনি আমার জন্ম দিব্য, আমার কর্ম দিব্য, এটাকে তত্ত্বতঃ জেনে গেছেন, তাঁর এই দেহের নাশ হয়ে যাওয়ার পর আর জন্ম নিতে হয় না। কারণ দেহান্তে তিনি আমাকেই পেয়ে যান, চৈতন্যের চিন্তা করে করে চৈতন্য হয়ে গেছেন কিনা। যতক্ষণ মনের এলাকায় আছে, ততক্ষণই জন্মমৃত্যুর খেলা চলবে। চৈতন্যের সাথে যখন এক হয়ে গেল, তখন আর কিসের জন্ম, কিসের মৃত্যু। উপনিষদে যেমন আছে, ভগবানকে যিনি আত্মা রূপে ধ্যান করেন, তাতেও তাঁর মুক্তি হয়। সেই আত্মা জগৎকে ভগবান রূপে যখন নিয়মন করেন, সেই ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন, সেই অবতারকে যদি কেউ তত্ত্ব রূপে জেনে যায়, ভগবানের তত্ত্বটাকে যদি জেনে যায়, তাতেও তাঁর মুক্তি হয়ে যায়। উপনিষদের উপর গীতার এটাই বৈশিষ্ট্য, উপনিষদে সোপাধিক ঈশ্বরের বর্ণনা নেই। অবতারের পূজা করে মানুষ যে মুক্তি পেতে পারে, উপনিষদে আমরা এটা পাই না, এই জিনিসটা গীতাতেই আসে। হিন্দুদের জীবনে অবতারের পূজা অর্চনা এখন একটা খুব আবশ্যিক অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নয় নম্বর শ্লোকের মূল ভাব হল, যে আমাকে ঈশ্বর রূপে জানে, যে জানে আমার জন্ম নেই, আমার মৃত্যু নেই, আমি সব সময় বিদ্যমান, যে জানে আমার সমস্ত কর্ম দিব্য। দিব্য মানে, যেখানে ভগবানের কোন অহং ভাব নেই। এই দুটো – জাগতিক আর দিব্য। ভারতে মায়েদের স্থান অনেক উপরে, সেখানে একজন সুন্দরী যুবতী মেয়ে কলেজে পড়ে, লেখাপড়ায় ভাল, তার রূপের, গুণের, বিদ্যার সবাই প্রশংসা করবে, কিন্তু সম্মানের ক্ষেত্রে উচ্চ স্থান দেবে না। কিন্তু ওই মেয়েই যখন মা হয়ে যাবে, এবার সমাজে, পরিবারে সে একটা উচ্চ সম্মান পাবে। কারণ মাতৃভাবের মাধ্যমে তার মধ্যে দিব্য ভাব এসে গেছে। একজন সত্যিকারের সাধক, সাধনা করে করে যিনি উপরে উঠে গুরুর স্থানে পৌঁছে গেছেন, তার সাথে ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন আর যে কোন মা, এই তিনজনের মধ্যে দিব্য ভাব থাকে, অন্য আর কারু মধ্যে থাকে না। কেন দিব্য ভাব থাকে? কারণ এই কয়জনের কাজে অহংতা আর মমতা, অর্থাৎ আমিত্ব জুড়ে থাকে না। মা যখন তার ছোট্ট শিশুকে খাওয়াচ্ছে, দেখাশোনা করছে, তখন সেখানে কোন আমিত্ব থাকে না। আমিত্ব না থাকার জন্য, নিজের ব্যক্তিত্বটা সন্তানের দেখাশোনায় পুরো ঢেলে দেয়। এটা একমাত্র ঈশ্বর পারেন, আর খুব উচ্চমানের সন্ত মহাত্মারা পারেন। সাধারণ স্তরের সাধুরা পারবেন না, আর মানুষ তো পারবেই না।

মা তখনই পারে, যখন সে তার সন্তানকে দেখছে। সেই মহিলার যদি কারুর প্রতি মাতৃভাব এসে যায়, এই মাতৃভাব যে কোন মানুষের প্রতি আসতে পারে, তার বাবার প্রতি আসতে পারে, তার স্বামীর প্রতি থাকতে পারে, তার নিজের গুরুর প্রতিও মাতৃভাব থাকতে পারে; গুরুকে সন্তান রূপে দেখছেন, তার ভালমন্দ সব দেখাশোনা করছেন, এনারা হয়ে গেলেন দিব্য।

শুধু একটা তফাৎ থাকে, অন্যান্য জায়গায় এনাদের দিব্য ভাব নাও থাকতে পারে, কিন্তু যিনি অবতার, তাঁর কোন কাজে কোথাও কোন আমিত্ব থাকে না। রাজযোগে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মনকে বিশ্লেষণ করা হয়, সেখানে মনকে আবার চারটে ভাগে ভাগ করে বলছেন, মন, চিত্ত, অহঙ্কার ও বুদ্ধি। এই অহঙ্কার মানে যখন কোন কিছুর সাথে আমরা জুড়ে যাই। আমি তোমাকে ভালবাসি, ভালবাসলে তোমার সাথে জুড়ে যাব। আমি তোমাকে পছন্দ করি না, পছন্দ না করলে তোমার কাছ থেকে সরে চলে আসব। আমি জীবনে এটা চাই, সেটা চাই; এগুলো সব অহঙ্কার। অহঙ্কার এটা একটা টেকনিক্যাল শব্দ, বাংলা অহঙ্কারের সাথে মেলালে হবে না। যিনি এটা বুঝতে পারেন, তাঁর এই শরীরের নাশ হয়ে গেল, মৃত্যুর পর আর তাঁর পুনরাগমন হয় না, মুক্ত হয়ে যায়। শেষ সময়, অর্থাৎ মৃত্যুর সময়েও যদি এই জ্ঞান হয়, তাহলেও সে মুক্ত হয়ে যাবে। সেইজন্য শ্রীশ্রীমা বলছেন, শেষ সময়ে ঠাকুর এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন। এর অর্থ হল, যদি আপনি ঠাকুরকে ঈশ্বর ভাবে সাধনা করে থাকেন, সারা জীবন যদি নাও হয়, শেষ সময়ে আপনার হবেই। কিন্তু যদি মনে করেন, আপনি বেলুড় মঠ থেকে দীক্ষা নিয়েছেন, বেলুড় মঠে আসেন, খিচুরি প্রসাদ খাচ্ছেন, বাতাসা প্রসাদ নিয়ে যাচ্ছেন, পাঁচ টাকার প্রণামী দিয়ে যাচ্ছেন, এভাবে কোন সম্ভবনা নেই। যিনি ঠাকুরকে *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্,* যাঁর এই বোধ আছে যে, ঠাকুর দিব্য, তাঁর জন্ম দিব্য, তাঁর কর্ম দিব্য, তাঁর সব কিছু দিব্য, ঠাকুর ভগবান, এই ভাব নিয়ে যে সারা জীবন সাধনা করে আসছেন, তাঁর সারা জীবনে কিছু না হলেও মৃত্যুর সময় অবশ্যই তাঁর মুক্তি হবে।

দিব্য বললে বুঝতে হবে অনন্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ অনন্ত। শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে, যিনি ভগবান, তিনি এই রকম দেহ ধারণ করেছিলেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তিনি শুধু এই ছবিটুকুই নন; তিনি অনন্ত, ঠাকুরের ধ্যান করা মানে এই ছবির ধ্যান না, শ্রীরামকৃষ্ণ যে অনন্ত, ওই অনন্তের ধ্যান করতে হবে। ঠাকুরের যে অনন্ত ভাব, তাঁর যে অনন্ত মূর্তরূপ, যেটাকে বর্তমান কালে ছবি তুলে রাখা হয়েছে, এই ছবি মনে করানোর জন্য, ইনিই সেই। শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামের ছবি বা মূর্তি কল্পনা দিয়ে নির্মিত, কিন্তু ব্যাপারটা সেই একই। শ্রীরামের কত প্রকার মূর্তি, শ্রীকৃষ্ণের কত রকম মূর্তি, শিবের কত রকম মূর্তি, কোনটা ঠিক? সবটাই ঠিক, কারণ উদ্দেশ্য হল সেই অনন্তে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিও সেই একই জিনিস। যাঁরা শ্রীরামের বা শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির উপর ধ্যান করেন, যে যার ধ্যান করে সে সেটাই হয়। ঠাকুরও বলছেন, যে যার চিন্তা করে সে তার সত্তা পায়। ছবি বা মূর্তির ধ্যান করলে, সেও ছবি হয়ে যাবে বা একটা ফসিল হয়ে যাবে। তাহলে কি করতে হবে? তুমি দিব্যকে জানো। ছবি বা মূর্তিটা দিব্য নয়, অনন্ত নয়, বিগ্রহ অনন্ত নয়, ছবি বা বিগ্রহ শুধু আমাদের সেই অনন্তকে মনে করিয়ে দেয়। এরপর দশ নম্বর শ্লোকে বলছেন –

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ।।১০।।

(আসক্তিরহিত, ভয়শূন্য ও ক্রোধবর্জিত, মদ্গতচিত্ত ও আমারই শরণাগত (কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ) বহু ব্যক্তি জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পরাশুদ্ধি লাভ করে ব্রহ্মভাব বা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েছেন।)

নয় আর দশ নম্বর শ্লোক দুটো একসাথে চলে। আমরা নয় নম্বর শ্লোক নিয়ে এতক্ষণ বলে এসেছি। যে কোন মানুষের এই তিনটে জিনিস থাকে, ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব এবং সিদ্ধান্ত; আমার আপনার সবারই এই তিনটে জিনিস থাকবে। ব্যক্তি কোন কাজে আসে না, আমি যাকে ভালবাসি তাকে ব্যক্তি

রূপে দেখছি, এই পর্যন্ত ঠিক আছে। বাচ্চা তার মাকে ব্যক্তি রূপে দেখে। সেই বাচ্চা বড় হওয়ার পর বলে, জানো আমার মা এই রকম বলতেন, বা আমার বাবা এই রকম করতেন, অথবা বলছে আমার মার মত মা নেই বা আমার বাবার মত বাবা হয় না। এবার কিন্তু ব্যক্তিত্বের উপর চলে এসেছে। এখান থেকে আরও উপরে চলে গেল, যেটা খুব কম ক্ষেত্রে হয়, তখন সে সিদ্ধান্তের উপর চলে আসে। আজকেই একটা খবর আছে, যদিও এই টপিকের উপর কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু বললে জিনিসটা পরিষ্কার হবে।

গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকার থাকার সময় তাঁর একটা চশমা, সেই বিখ্যাত রাউণ্ড রিমের চশমা কোন একজন ইঞ্জিনিয়ারকে উপহার হিসাবে দিয়েছিলেন। সেই ইঞ্জিনিয়ার গান্ধীজীকে কোন ব্যাপারে উপকার করেছিলেন, সেই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তিনি এই উপহার দিয়েছিলেন, মনে রাখার জন্য অনেকেই এই রকম নিজের ব্যবহৃত কিছু জিনিস দিয়ে থাকেন। সেই চশমাটা এতদিন পড়েছিল, যার কাছে ছিল সে জানতও না, এটা কি, কার এটা। তবে একটা নোট ছিল, সেখানে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এই নামটা লেখা ছিল। কিভাবে কিভাবে এই চশমা অকশানে গেছে, আজকে সেই চশমা আড়াই কোটি টাকায় বিক্রী হয়েছে। যার কাছে চশমাটা ছিল, সে প্রায় ডাস্টবিনে ফেলতে যাচ্ছিল, কিভাবে কিভাবে ওই লেখাটার দিকে তার নজর পড়ে যায়। একটা মানুষ নিজেকে তুলে এমন সিদ্ধান্তের উপরে নিয়ে গেছেন যে, দেড়শ বছর পর তার ওই চশমার দাম আড়াই কোটি টাকা।

শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামকৃষ্ণ কি সিদ্ধান্তের প্রতিনিধিত্ব করেন? আমি যখন ধ্যান করব কিসের উপর ধ্যান করব? এখানে বলছেন, *বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুশ্রিতাঃ*, অনেক আগেকার যেসব ঋষিরা শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা আমার চিন্তন করে করে আমাতে চলে এলেন বা আমার সঙ্গে মিশে গেলেন। তার মানে দাঁড়ায়, তাঁরা কৃষ্ণ ভাবকে পেলেন। শ্রীকৃষ্ণ তো সেদিনকার, অর্জুন বলছেন, সূর্যের জন্ম কত আগে আর আপনার জন্ম তো আমার জন্মের কয়েক বছর আগে হয়েছে। কিন্তু এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আগের আগের ঋষিরা আমার চিন্তন করে করে আমার ভাবকে প্রাপ্ত হয়েছে। তার মানে, শ্রীকৃষ্ণের যে ভাব, এই ভাব তাঁর আবির্ভাবের আগে থেকেই আছে। তাহলে এটা বুঝতে হবে যে, ইদানিং শ্রীকৃষ্ণের যে ছবি বা মূর্তি বেরোচ্ছে, এর সাথে কোন সম্পর্ক নেই, কারণ ওই রূপে বসুদেবের বাড়িত শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন। কিন্তু এখানে যা বলা হচ্ছে, তাতে এটা পরিষ্কার যে, তিনি তারও অনেক আগে থেকেই আছেন।

এখানে আমাদের মাথায় রাখতে হবে, গীতা মোক্ষশাস্ত্র, এর প্রত্যেকটি শ্লোক আমাদের মোক্ষে নিয়ে চলে যেতে পারে। স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজ বলতেন, গীতার এক একটি শ্লোকের উপর এক মাস ধ্যান করলে তবে সেই শ্লোকের অর্থ স্পষ্ট হবে। যদি কেউ গীতা বুঝতে চায়, একটা বই কিনে অর্থটা দেখে নিল, নিজের মত বুঝে নিল, হয়ে গেল। ব্যাখ্যা যদি চায়, গীতার উপর অনেকের ব্যাখ্যা আছে, যে কোন একটা ব্যাখ্যা ধরে ধরে পড়ে নিলেই হয়ে গেল। আর ধারণা যদি করতে চায়, তাহলে আগে নিজেকে শান্ত করতে হবে, মনে প্রশ্ন ওঠাটা বন্ধ করতে হবে। যেটা শুনছেন, সেটাকে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা অনুধ্যান করুন, তবে যদি গীতার কৃপায় শ্লোকের অর্থ ধারণাটা স্পষ্ট হয়। আমাদের রাম মহারাজ ছিলেন, যাঁর কাছে আমি অনেক কিছু শিখেছি। কি একটা কথায় আমি বললাম, ‘বিভিন্ন কারণে এখন অত পড়াশোনা করতে পারছি না’। তিনি শুনে বললেন, ‘বইগুলোকে ঝাড়তে থাকবে, তাতেও শাস্ত্র কৃপা হবে’। মূল কথা, শাস্ত্র যদি কৃপা না করে, আমরা কোন দিন ধারণা করতে পারব না। মোক্ষশাস্ত্র কোন ফিজিক্স, বায়োলজি না যে, আমি পড়লাম, শিক্ষক বুঝিয়ে দিলেন আর সব বুঝে গেলাম। গীতা যদি আমাদের উপর কৃপা করেন, উপনিষদ যদি আমাদের কৃপা করেন, তবেই আমরা ধারণা করতে পারব। সাধনা তার অনেক পরে শুরু হয়।

তাহলে কি করতে হবে? প্রথমে শ্রদ্ধার সাথে শুনে যাও। কারুর কৃপা পেতে গেলে আগে তার পায়ে গিয়ে পড়তে হয়। গীতাতেই ভগবান পরে বলবেন, *তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া*, তাঁর পায়ে গিয়ে লম্বা একটা সাষ্টাঙ্গ দাও, তাঁর সেবা কর, তারপরে প্রশ্ন করবে। একটা ঘটিকে ট্যাপের তলায় উল্টো করে রেখে দিয়ে বলে যাচ্ছে, ঘটিতে জল ভরছে না কেন। পাত্রটাকে একটু সোজা করে রাখুন। এই সোজা করে রাখাটা হল শ্রদ্ধা। ভগবান বলছেন, আগে আগে লোকেরা আমার ভাবকে নিয়ে মুক্ত হয়ে গেছে। তার মানে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন, ওই কৃষ্ণ নন। তাহলে কোন কৃষ্ণ? যিনি সিদ্ধান্তকে প্রতিনিধিত্ব করেন। ভগবানের সিদ্ধান্ত একটাই, তিনি অনন্ত। ঈশ্বরের একটাই পরিভাষা, ঈশ্বর অনন্ত, এছাড়া আর কিছু পরিভাষা হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ আগেও অনন্ত ছিলেন, যখন দেহ ধারণ করলেন, তখনও অনন্ত, যখন লীলা সম্বরণ করলেন, তারপরেও তিনি অনন্ত। শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত, শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত, এত অনন্ত কোথা থেকে হল? এনারা সবাই এক একটা অনন্তের মুখ। শ্রীরামচন্দ্র সেই অনন্তের উপর একটা মুখোস, শ্রীকৃষ্ণও তাই, শ্রীরামকৃষ্ণও তাই। দিব্য বলতে এটাই, নয় নম্বর শ্লোকে যখন বলছেন *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্*, দিব্য মানেই বলতে চাইছেন, তুমি জানো তিনি অনন্ত। যিনি অনন্ত, তাঁর কখন জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কুড়ি নম্বর শ্লোক থেকে বলতে শুরু করেছেন, *ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং ভূত্বাভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।* তাঁর জন্ম নেই, তাঁর মৃত্যু নেই, এটাই এখানে নয় নম্বর শ্লোকে বলছেন। ওখানে আত্মার কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, এখানে অবতার তত্ত্ব বলতে গিয়ে বলছেন, কিন্তু দুটো একই কথা, দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। এর পরে পরেও একই কথা বলবেন। আর আমরা যখন বলি শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব, তখনও আমরা এই একই কথা বলি। ঈশ্বর অনন্ত, আত্মা অনন্ত, এই অনন্ত ভাবকে যদি ধরা হয়, তাহলে অনন্তের জন্ম কোথায় হবে! অনন্ত কি কাজ করবে, কোথায় কাজ করবে? এই ভাব যদি দৃঢ় না হয়, ততক্ষণ ঈশ্বরদর্শন থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতে হবে। আমরা বেশির ভাগ ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যক্তির উপর ঘুর ঘুর করছি, খুব হলে ব্যক্তিত্ব। যেমনি বলছি 'শ্রীমা এই কথা বলেছেন', তেমনি এটা ব্যক্তিত্বে চলে গেল; একটা গুণ নিজের উপর এলো। কিন্তু ঈশ্বরদর্শন যদি পেতে চাই, তাহলে অনন্ত রূপে যদি চিন্তা করা হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান করার সময় শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভাবের উপর যদি চিন্তা করা হয়, যে ভাবটা ধ্যাতার মনকে আস্তে আস্তে অনন্তের দিকে নিয়ে যাবে। এভাবে না হলে ঈশ্বর দর্শনের দিকে এগোন যাবে না। এই কথা আমরা বলছি না, শাস্ত্র এই কথা বলছেন, ঠাকুরও বলছেন, স্বামীজীও বলছেন।

দশ নম্বর শ্লোকে পরম্পরার কথা বলছেন, *বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ*, যদি আপনি ঈশ্বর দর্শন করতে চান, যদি আত্মজ্ঞান পেতে চান তাহলে আগের আগের ঋষিরা যেভাবে পেয়েছেন, আপনাকেও সেই ভাবে পেতে হবে। বলছেন, রাগ, এই রাগ বাংলা রাগ না, রাগ মানে অনুরাগ; ভয় আর ক্রোধ, মানুষের মধ্যে যদি ক্ষমতা থাকে আর সে যেটা পেতে চাইছে কিন্তু পাচ্ছে না, তখন ক্রোধ হয় আর ক্ষমতা না থাকলে ভয় হয়। বলছেন, এই তিনটে, অনুরাগ, ভয় আর ক্রোধ যার চলে গেছে, কোন কিছুতে আসক্তি নেই, কারুর প্রতি ক্রোধ নেই, আর কাউকে সে ভয় করে না, তার থেকেও কেউ ভয় পায় না; এই ধরণের *বীতরাগভয়ক্রোধা* ঋষিরা আমাকেই অর্থাৎ আমার ভাবকেই আশ্রয় করেছিলেন। আমি কাউকে ভয় করি না, এখানে একটা ঔদ্ধতের ভাব আছে, কিন্তু তার মধ্যে কোন ঔদ্ধত থাকে না।

দেওঘরে মণিপুরের এক ছাত্র ছিল, মণিপুরের অনেক ছেলে দেওঘরে বিদ্যাপীঠে পড়তে আসত। এই ছেলেটি পরে আইএএস হয়েছিল। দেওঘর থেকে আমি যখন চলে আসি, ঠিক সেই বছরই দেওঘরে ভর্তি হয়েছিল। ২০১১ সালে ইম্ফলে আমাকে একটা আমন্ত্রণে যেতে হয়েছিল, সেখানে ওই ছেলেটিও এসেছে, তখন সে আইএএস হয়ে গেছে। ছেলেটি এসে আমাকে জড়িয়ে

ধরল। পরে ওর অনেক কাহিনী শুনলাম। ছেলেটি যে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, সেই জেলা ছিল জঙ্গি অধিষ্যুত, জঙ্গিদের উৎপাত লেগেই থাকত। এই ছেলেটি কোন সিকিউরিটি ছাড়া চলাফেরা করত, অফিসে কেউ না এলে নিজে গিয়ে অফিস খুলত। ওকে যদি কেউ বলত, তুমি এভাবে কোন সিকিউরিটি ছাড়া চলাফেরা করছ, জঙ্গিরা যখন খুশী তোমার জীবন নিয়ে নিতে পারে। ও একটা কথাই সবাইকে বলত, আমি তো ওদের ভালর জন্যই কাজ করছি, আমাকে কেন মারতে যাবে! মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত সিকিউরিটি নিয়ে চলাফেরা করার কথা বললে তাঁকেও একই কথা বলত। ছেলেটিকে দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল, পুরোপুরি কাজের প্রতি উৎসর্গিকৃত। কোন জঙ্গি যদি ছেলেটির কোন ক্ষতি করে, অন্য জঙ্গিরা সেই জঙ্গিকে মেরে দেবে।

মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলায় নারায়ণপুরে আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের একটা সেন্টার আছে, ওটা হল বিরাট নকশাল বেল্ট। ওই সেন্টার থেকে আদিবাসীদের জন্য প্রচুর কাজ হয়। প্রথমের দিকে কিছু কিছু অশান্তি হয়েছিল। কিন্তু পরে ওরা বুঝে গেল, সন্ন্যাসীরা আমাদের ভালর জন্য আছেন। তারপর থেকে নকশালরা আমাদের কোন বিরক্ত করত না। সেই নিয়ে আবার পুলিশ কর্তৃপক্ষ উলটে সন্ন্যাসীদের সন্দেহ করত। নকশালরাও আমাদের অনেক সময় সন্দেহ করে। কিন্তু সবাই বুঝে গেছে, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা নিউট্রাল। সন্ন্যাসীরা কোন কিছুতেই নেই, কংগ্রেস সরকার তাতেও আমরা, কম্যুনিস্ট সরকার তাতেও আমরা, বিজেপি সরকার তাতেও আমরা। কারণ জনসাধারণের মধ্যে আমরা যে কাজ করি, সেটা সবার ভালর জন্য, সেখানে আমাদের কোন স্বার্থ নেই। সেইজন্য ভয়ের কিছু থাকে না, তুমি যদি আমাকে মেরে দাও, তোমারই ক্ষতি, আমাদের কোন ক্ষতি হয় না। তখন কোন ভয় কাজ করে না। ভয় থাকে সেখানে, যেখানে স্বার্থ আছে; যার স্বার্থ নেই তার কিসের ভয়! স্বার্থ না থাকলে ক্রোধ কোথা থেকে আসবে! আমরা প্রায়ই শুদ্ধ মনের কথা বলি, শুদ্ধ মন বলতে কি বোঝায়? শুদ্ধ মন মানে, কোন বিশেষ জিনিসের প্রতি আকর্ষণ নেই, কোন কিছুর প্রতি ক্রোধ নেই, কোন জিনিসের থেকে ভয় নেই। এই ধরণের মন যাঁদের হয়, এনারাই হলেন সাত্ত্বিক মানুষ, ভাল মানুষ। এই ধরণের মনই মানুষকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়।

ঈশ্বর দর্শন কি রকম? বলছেন, *মন্ময়া*, আমার দিকে যাঁর পুরো মন চলে এসেছে। কি রকম চলে এসেছে? আচার্য বলছেন, *ব্রহ্মবিদ্ ঈশ্বরাভেদদর্শিনঃ, ব্রহ্মবিদ্*, যাঁর এই জ্ঞান হয়ে গেছে, আমিই সেই ব্রহ্ম, যাঁর এই বোধ হয়ে গেছে, আমি ঈশ্বরের সাথে পুরো এক। আপনি শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্র নিয়েছেন মানে, আপনি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে এক, তা সে সন্তান রূপেই হোক, শিষ্য রূপেই হোক, যে রূপেই হোক। নবম অধ্যায়ে গিয়ে ভগবান বলবেন, *পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ*, ভগবান বলছেন, আমি এই জগতের মা, আমি এই জগতের বাবা, আমি এই জগতের পিতামহ। আপনি এর মধ্য থেকে যে কোন একটা ভাব নিয়ে নিন, তবে আপনার গুরু আপনাকে যে ভাবের কথা বলে দিয়েছেন, সেই ভাবকে ধরে রাখাটাই উচিৎ।

সন্ন্যাসীদের কাছে এসে অনেকেই দুঃখ করে বলেন, জীবনে খুব অশান্তি, এই রোগে ভুগছি, এই শোকে জর্জরিত, এর থেকে বেরোবার উপায় কি? ঠিকই, জীবনে অনেক অশান্তি। কি উপায় আপনাকে বলব, আমারই খাওয়া-পড়া কোন রকমে জোটে, আমি কি আর বলব? আমার যিনি ইষ্ট তিনি ক্যান্সারে মারা গেলেন। স্বামীজীর হাজারটা রোগ, উনচল্লিশ বছরে চলে গেলেন। শ্রীশ্রীমা পায়ের বাতে এমন কষ্ট পেতেন যে, তাঁকে পা টেনে টেনে চলত হত, বসার সময় পা ছড়িয়ে বসতে হত। আমার জীবনের এই তিনজনই আদর্শ, তাঁদেরই এই অবস্থা, আপনাকে আমি কি বলব! কিন্তু যেটা আমি বলতে পারি, এনাদের তিনজনরই বৈশিষ্ট্য হল, ঈশ্বরে পুরোপুরি তন্ময়। শ্রীরামকৃষ্ণ চেতনা, শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভাব, ওর মধ্যে ডুবে থাকা। আমরা সবাই দেখেছি, মা যত অসুস্থই থাকুন, সন্তানের যদি কিছু দরকার পড়ে, ওই কষ্টের মধ্যেও কোন রকমে উঠে, সন্তানের জন্য একটা কিছু

করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। আপনার শরীর খারাপ, আপনার অভাব আছে, কিন্তু আপনার মনটা তো ফ্রী, আপনি তো পাগল নন।

জর্জ অরওয়েল, বিরাট বড় লেখক, কম্যুনিজমের উপর লেখা ওনার একটা বিরাট স্যাটায়ার আছে। কিন্তু তার থেকেও ওনার বিখ্যাত বই হল '1984'। সেই বইতে তিনি একটা ধারণা নিয়ে এলেন, thought পুলিশ। কম্যুনিস্ট শাসিত রাজ্যে কোন কিছুকে নিয়ে কোন কথা কেউ বলতে চায় না, সাধারণ জিনিসকে নিয়েও বলতে যাবে না। কিন্তু জর্জ অরওয়েল আর-এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন, সেখানে নিয়ে এলেন থট পুলিশ। কারুর মনের মধ্যেও যদি কিছু গোলমাল থাকে, সেটাকেও পুলিশ ধরে নিচ্ছে যে এরা বিপ্লবের চিন্তা-ভাবনা করছে। তাতেই সবাইকে গ্রেফতার করে নিচ্ছে। এই রকম কি আমাদের জীবনে কিছু আছে? কিছু নেই, আমরা ফ্রী। আপনার মধ্যে ঈশ্বরের চেতনা আনতে কে নিষেধ করেছে! আপনি জপধ্যান করতে পারছেন না, মানলাম, না পারারই কথা। বল, বুদ্ধি, ভরসা, তিরিশ পেরোলে ফর্সা। তিরিশ বছরের মধ্যে জপধ্যান করা যদি না শুরু করে থাকে, তাহলে কিছুই হবে না। লোকেরা এখানে দীক্ষাই নিতে আসেন সত্তর বছর বয়সে। তারপর জিজ্ঞেস করবেন, মন কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করব? যখন নিয়ন্ত্রণ করার কথা ছিল, তখন মনকে পুরো ছেড়ে রেখেছিলেন। যখন যৌবন ছিল, জোশ ছিল, তেজ ছিল, তখন কোন জপধ্যান, সাধন-ভজন করলেন না আর বৃদ্ধাবস্থায় এসে বলছেন, মন কি করে নিয়ন্ত্রণ করব।

একজনকে আমরা জানতাম, উনি কম বয়সে ইংল্যাণ্ড চলে গিয়েছিলেন। ব্যাচেলার ছিলেন, একটা ইন্টেলেকচুয়াল জীবন-যাপন করলেন, গ্রাহাম গ্রীনের মত ইংল্যাণ্ডের খুব নামকরা লেখকদের সাথে তাঁর পরিচিতি ছিল। তারপর ইংল্যাণ্ডের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। বেশি টাকা-পয়সাও নিয়ে আসতে পারেননি, কিভাবে সব টাকা-পয়সা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কলকাতায় এসে এখন এখানে-সেখানে খুঁজছেন কোথায় থাকা যেতে পারে, কোথায় একটা কাজের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিভাবে কিভাবে আমার সাথে পরিচয় হয়। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কলকাতায় আপনার কি পরিচিত কেউ নেই'? 'হ্যাঁ আছে, ভাইরা আছে, ভাইপোরা আছে। কিন্তু ছোটবেলা দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম, ভাইপোরা শুনেছে কেউ একজন ছিল। ভাই দেখিয়ে দিল, আমাদের ছোট ফ্ল্যাট, কোথায় তোমাকে রাখব'? ওনার এখন পচাত্তর মত বয়স, এই বয়সে উনি চাকরি খুঁজছেন। সময় থাকতে থাকতে জীবনকে আমরা গড়ে তুললাম না, পরে বলছি, আমার এই সমস্যা কেন? সমস্যা তো আজকে না, এই বিষবৃক্ষ রোপণ করেছেন অনেক বছর আগে, সেই বিষবৃক্ষ এখন ফল দিচ্ছে। আপনি জপধ্যান হয়ত করতে পারবেন না, কিন্তু ঈশ্বর চেতনাটা কেন জাগিয়ে রাখতে পারবেন না?

সারাদিনে যে কাজই করবেন, ঠাকুরের নাম করতে করতে করুন। ঠাকুরের কোন গান, রামকৃষ্ণ শরণম্ রামকৃষ্ণ শরণম্ করুন, রামকৃষ্ণ চেতনা থেকে যেন সরে থাকতে না হয়। আচার্য বলছেন, *ঈশ্বরাভেদদর্শিনঃ*, আপনি ঈশ্বরের সাথে অভেদ। নিজেকে পুরো অভেদ মনে না করতে পারলেও, একটু তো চেষ্টা করতে হবে। গীতা মোক্ষশাস্ত্র, গীতার কথা শুনে একটু যদি চেতনা না জাগে, তাহলে এসব কথা শোনা বৃথা। দ্বিতীয় কথা, গীতা হিন্দু ধর্মের সার, গীতা বেদের সার। সেইজন্য গীতা ধারণা করা তো দূরের কথা, বোঝা অত্যন্ত কঠিন। গীতাকে যত বিস্তারে নিয়ে যাওয়া হবে, ততই বাড়তে থাকবে, কারণ সমস্ত বেদের সার হল গীতা। আমরা তাও চেষ্টা করছি খুব সংক্ষেপে যতটা বলা যায়।

মদ্ভাবমাগতাঃ, ভগবান বলছেন, আমার ভাব প্রাপ্ত হয়। কবে প্রাপ্ত হয়? *বীতরাগভয়ক্রোধা*, আসক্তি, ভয়, ক্রোধ বর্জিত; *মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ*, আমার প্রতি মদ্গত চিত্ত আর আমাকেই আশ্রয় করে থাকে, আমাকে ছাড়া অন্য কোন দিকে যায় না, শুধু জ্ঞাননিষ্ঠাতে থাকে। জ্ঞাননিষ্ঠা মানে, যার

ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। এটা করলে কি হয়? ভগবান এখানে তপস্বীদের কথা বলছেন, যাঁরা অনেক আগে কম বয়স থেকে শুরু করেছেন। *মদ্ভাবমাগতাঃ,* তারা আমার ভাব প্রাপ্ত হয়ে যায়। ঈশ্বরের ভাব কি? অনন্ত, ঈশ্বরের একটাই পরিভাষা, ঈশ্বর অনন্ত। রামকৃষ্ণলোক কি? অনন্ত। ব্রহ্মালোক কি? অনন্ত। বৈকুণ্ঠধাম কি? অনন্ত। আর সালোক্য সামীপ্য? না, একেবারে সাযুজ্য, ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যায়। ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া, এটাই মুক্তি। এই ব্যবস্থা কি কৃষ্ণের জন্মের পর থেকে হয়েছে? না, চিরদিন এভাবেই চলে আসছে। *বহবো,* আগের আগের ঋষিরা এই ভাবকে আশ্রয় করে এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব অনেক আগে থেকেই চলে আসছে। কি চলছে? ঈশ্বর অনন্ত, যিনি অনন্ত, তাঁর সাধনা করতে হলে তাকেও অনন্ত হতে হবে। যেমন বলা হয়, *শিবভূত্বা শিবেম যজেৎ,* যদি আপনি জীবসেবা করতে চান, তাহলে নিজেকে শিবজ্ঞান করুন, অপরকেও শিবজ্ঞানে সেবা করুন। সেই রকম, অনন্তের পূজা যখন করা হবে, তখন নিজেকেও অনন্ত মনে করতে হবে। যিনি অনন্ত, তাঁর কি কখন, আসক্তি, ভয়, ক্রোধ থাকতে পারে, তার কি কখন আলস্য থাকতে পারে! একদিকে ব্যক্তি, আর-একদিকে ব্যক্তিত্ব, অন্য দিকে সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত একটাই, তিনি অনন্ত। এটা আগে থেকেই চলে আসছে, আর এই ভাবে কত লোক মুক্তি পেয়ে গেছেন।

এখন তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, হে প্রভু, আপনি পক্ষপাত করেন। যার মধ্যে রাগদ্বেষ নেই, যে আপনাকে আশ্রয় করে আছে, তাকে আপনি মুক্তি দিচ্ছেন, বাকিদের কি আপনি মরার জন্য ছেড়ে রেখেছেন? ঠাকুরকে একজন বলছেন, মহাশয় ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ আছে। ঠাকুর রেগে গিয়ে বলছেন, তোমার তো খুব বেণে বুদ্ধি। আচার্যও এখানে প্রশ্ন তুলছেন, আপনার তো বৈষম্য দোষ আছে। সে ভাল বলে আপনি তার মুক্তির ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, আর আমি ভাল না বলে আমাকে গোল্লায় ফেলছেন? আমার কি হবে? ভগবান তখন বলছেন, আমার কেন বৈষম্য দোষ হবে, সবাই আমার কাছে সমান। আমি সূর্যের আলো, সূর্যের আলোতে কেউ ভাল কাজ করছে, আবার এই সূর্যের আলোতে কেউ মন্দ কাজও করছে কিন্তু সূর্য সবাইকে সমান ভাবে আলো বিকিরণ করে যাচ্ছে। সূর্যের মধ্যে যেমন কোন বৈষম্য দোষ থাকতে পারে না, তেমনি ভগবানও কোন পক্ষপাত করেন না। পরের শ্লোকে ভগবান বলছেন –

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।১১।।

(যিনি যে প্রকারে (মোক্ষ, জ্ঞান, কাম্য বস্তু, অথবা আর্তি-নিবারণের জন্য) আমার উপাসনা করেন, আমি (সর্বফলদাতা পরমেশ্বর) তাঁকে সেই ফলপ্রদান দ্বারাই অনুগৃহীত করি, অর্থাৎ সকামকে তাঁর কাম্যফল এবং নিষ্কামকে মুক্তি প্রদান করি। হে পার্থ, বর্ণাশ্রমাদি-ধর্মনিষ্ঠ মানুষরা সকল প্রকারে আমার পথের অনুসরণ করেন। যাঁরা যে প্রকারে ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা করেন, তাঁরা সেই সকল প্রকারে সর্বাত্মক, সর্বাবস্থ আমারই মোক্ষমার্গের অনুবর্তন করেন; কারণ আমিই ইন্দ্রাদি সর্বদেবরূপধারী।)

এই শ্লোকের বিশেষ একটা দাম আছে, কারণ গভীরে গেলে এর অনেক অর্থ বেরিয়ে আসে। ভগবান বলছেন, আমি সেই অনন্ত, আমি কামধেনু, আমি সেই কল্পতরু। আমি কাউকে নিজে থেকে কিছু দিই না, যে যা চায় সে সেটা পায়। আমি নিজে থেকে কাউকে কিছু করে দিই না। ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বর কল্পতরু, কল্পতরুর মূলে গিয়ে কি তুমি লাউ কুমড়ো চাইবে? ঈশ্বরজ্ঞানের তুলনায় কামিনী-কাঞ্চন হল লাউ কুমড়ো।

বলছেন, *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্,* আমার কাছে যে যেমনটি চায়, আমি তাকে তেমনটি দিয়ে দিই। এর উপসংহার খুব মারাত্মক হয়। আমার বর্তমানে যে দুরবস্থা চলছে এটা কি তাহলে ভগবান দিয়েছেন? অবশ্যই ভগবান দিয়েছেন। কেন দিলেন ভগবান? রেলওয়ের টিকিট কাউন্টারে গিয়ে বর্দ্ধমানের টিকিট চাইলে কাউন্টার থেকে বর্দ্ধমানের টিকিটই দেওয়া হবে, আর

আসানসোলের টিকিট চাইলে আসানসোলের টিকিটই দেওয়া হবে। কারণ তিনি কল্পতরু। আপনি বর্দ্ধমানের টিকিট চাইলেন, এবার ট্রেনে চেপে চললেন। কিন্তু ভুলেই গেলেন যে, আপনি বর্দ্ধমানের টিকিট চেয়েছিলেন। বর্দ্ধমান ছাড়িয়ে ট্রেন চলছে। এবার টিটি এসে আপনার টিকিট চাইল, টিকিট দেখেই টিটি আপনাকে ধরবে। আপনি বলছেন, আমাকে তো আসানসোল যেতে হবে। টিটি কিন্তু আপনাকে আর ছাড়বে না। আপনি কখন, কোন এক সময় কোন কিছু চেয়েছেন, যেটার ফল আজকে আপনাকে পেতে হচ্ছে।

কেন ফল পেতে হচ্ছে? কারণ জীবনের সব কিছুই হল প্যাকেজ ডীল। বিয়ে থা একটা প্যাকেজ ডীল, সন্তান হওয়া একটা প্যাকেজ ডীল, চাকরি একটা প্যাকেজ ডীল, সন্ন্যাস একটা প্যাকেজ ডীল। একজন মজা করে লিখলেন, এই লকডাউনে বাড়ির লোকদের খুশী রাখার জন্য আমি রান্নায় এই এই আইটেম বানালাম। যে যে আইটেমের কথা উনি বললেন, সেই নামগুলি আমি শুনেছি, কিন্তু চেখে দেখার সুযোগ কখন হয়নি। রামকৃষ্ণ মিশনে আমার চল্লিশ বছর হল, বেলুড় মঠে আমাদের রুটিন খাওয়া ঝোল চচ্চড়ি। সারা বছর ওই এক আইটেম চলে, চচ্চড়িতে কি শাক দেওয়া হয়েছে দেখে বোঝার উপায় নেই এখন কোন সিজন চলছে। তারপর আজ বৃষ্টি পড়ছে, আজ খিচুরি আর ইলিশ মাছ হলে বেশ জমবে। ছোটবেলা বাড়িতে এই রকম আবদার করলে পেয়ে যেতাম। কিন্তু এখন প্রশ্নই নেই। এখানে ব্রেকফাস্ট মুরি আর মুরি, আর দুপুরে চচ্চড়ি, আর বিশেষ দিন হলে খিচুরি। এখানে মজা করে বলা হয়, এই তিনটকে যদি আপনি ভালবেসে ফেলতে পারেন, মুরি, চচ্চড়ি আর খিচুরি, বুঝে নিন আপনি এখন ঠিক ঠিক রামাকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী। এটা প্যাকেজ ডীল, আপনি সন্ন্যাসী হয়েছেন, এটা নিয়েই থাকতে হবে। কোন একটা সময় ভগবানের কাছে কিছু একটা চেয়েছিলেন, যার ফলস্বরূপ আপনাকে আজকে এটা ভুগতে হচ্ছে।

তার সাথে বলছেন, *মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ*, মানুষ আমার দেওয়া পথের বাইরে এই জগতে কিছু করতে পারে না। যে ভাল করছে, সেই পথটাও আমার দেওয়া; যে মন্দ করছে সেটাও আমার দেওয়া পথ। এই শ্লোকের অর্থটা স্পষ্ট, অল্প কথা দিয়েই বলে দেওয়া যায়, প্রথম হল আমার কাছে যে যা চায় তাকে আমি সেটাই দিই, আর দ্বিতীয় হল, যে যেই পথে চলছে, সেই পথ আমারই দেওয়া। জিনিসটা ঠিক তা নয়, এর অর্থ অনেক গভীরে যায়। কথায় কথায় আমরা বলি, সব ঠাকুরের ইচ্ছা। ঠাকুরের ইচ্ছা পরে হয়, আমার নিজের চেষ্টা আগে হয়। আগে আমাকে চেষ্টা করতে হবে, প্রভু পরে ওটাই আমাকে দেবেন। এই নীতি কাদের জন্য? যাদের 'আমি' বোধ আছে, আমিত্ব বোধ যাদের আছে তাদের জন্য এটা প্রযোজ্য। যার আমিত্ব বোধ নেই, তার আমিই কোথায় আর ঈশ্বরই বা কোথায়। তার পুরুষকার নেই, ঈশ্বর ছাড়া তার কিছু নেই, সেইজন্য এই প্রশ্ন ওঠে না। আমিত্ব বোধ যদি একটুও থাকে, সুতোতে একটু যদি আঁশ থাকে ছুঁচের মধ্য দিয়ে সুতোকে প্রবেশ করানো যাবে না, এই আঁশ হল আমিত্ব বোধ। আমি বোধ যদি একটু থাকে, তাহলে জানবেন, পুরুষকার আগে, ঈশ্বরের ইচ্ছা পরে। আমি যেমনটি চাইব, তেমনটি পাব। চেষ্টা আমাকে সেটার জন্যই করতে হবে, যেটা আমি চাইছি। ভগবান কি কি দেন?

তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্, আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, যারা ফল চায় আমি তাদের ফল দিই। কেউ যদি চাকরি চায়, আমি তাকে চাকরি দিই, কিন্তু সেটার জন্য যোগ্য হতে হবে। একটা চার বছরের বাচ্চা ছেলে যদি বলে, মা আমাকে বিয়ে দিয়ে দাও, তাই বলে তাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে না, উপযুক্ত হতে হবে। ওই চেষ্টা করে যখন উপযুক্ত হয়ে গেল, তখন ভগবান ফল দিয়ে বলছেন, যাঁরা শাস্ত্রোক্ত কর্ম করে, কিন্তু ফল চায় না, নিষ্কাম ভাবে কর্ম করে যাচ্ছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেমন বলা হয়েছিল *যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি*, তাঁকে আমি জ্ঞান দিই। এই জ্ঞান আত্মজ্ঞান না।

এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। প্রথমটা হল, আমি কাজ করছি ফল চাইছি, ভগবান আমাকে ফল দেবেন। তার জন্য আমাকে কিন্তু কাজ করতে হবে, কাজ না করলে ঈশ্বর কক্ষণ আমাকে ফল দেবেন না। এবার আমি কাজ করছি, কাজ করে আমি বলছি, হে ঠাকুর, আমি যে এই শাস্ত্রবিধির কাজ করলাম, এর ফল আমি তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করে দিলাম। আমার দেহ, মন ও বাণী দিয়ে যা কিছু করলাম, এর সব ফল আপনার চরণে সমর্পিত করলাম। আমার শুধু চাই শুদ্ধ জ্ঞান, শুদ্ধা ভক্তি; ভগবান তখন জ্ঞান দেন, ভক্তি দেন। কি জ্ঞান দেন? ঈশ্বরই কর্তা এই জ্ঞান, ঈশ্বরই আছেন এই জ্ঞান, ঈশ্বর অনন্ত এই জ্ঞান দেন; এটা কিন্তু মুক্তি না।

সাধনা এরপর থেকে শুরু হয়। যারা শাস্ত্রবিধিতে কাজ করছে না, বর্তমান কালের প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যে নানা রকম অনৈতিক কাজ করে যাচ্ছে, এখানে এদের আলোচনাতেই আনা হচ্ছে না। এরা আলোচনার বাইরে। শাস্ত্রবিধিতেই কাজ করছে, ধর্ম, অর্থ, কাম এই তিনটের মধ্যেই চলছে, কিন্তু ফল চাইছে, ভগবান তাকে ফল অবশ্যই দেবেন। তার মানে, যজ্ঞ করছেন পূজা করছেন, শাস্ত্র আবৃত্তি করছেন, সবই করছেন, কিন্তু ফল চাইছেন না, ভিতরে তাঁর ভাব হল, হে প্রভু, তোমার ভালবাসাটুকু শুধু চাই, তোমাকে বুঝতে চাই, তোমাকে জানতে চাই, তোমাকে পেতে চাই। ভগবান তখন তাঁকে জ্ঞান দেন। এই বোধটা করিয়ে দেন যে, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য। আমি আপনিও মনে করছি ঈশ্বর সত্য, কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখুন, ঈশ্বর কি আমার আপনার জন্য সত্য? সারাদিন মিথ্যা কথা বলছি, অপরকে ঠাকাচ্ছি, অপরের ক্ষতি চাইছি, ঈশ্বর সত্য জানলে এগুলো কি করা যায়? দুদিন আগে একটা খবরে দেখলাম, বিহারে পয়ষট্টি বছরের এক মহিলা নাকি আঠারো মাসে পাঁচটি বাচ্চার জন্ম দিয়েছে। এটা কি কখন সম্ভব। বাচ্চা হলে সরকার থেকে কি একটা অনুদান পায়, তাই লোকেরা জাল করে তার নামে সরকার থেকে টাকা নিয়ে যাচ্ছে। কত gross levelএ এই চুরি হচ্ছে ভেবে দেখুন। আমাদের একটা নিরাপত্তা আছে বলে আমরা এভাবে মিথ্যা বলে টাকা আদায় করি না। দরকার পড়ে না বলে আমরা চুরি করি না। চুরি করা সুযোগ নেই বলে চুরি করি না। ভিতরে কিন্তু সেই ভাব থেকে যায়। কিন্তু যিনি ঠিক ঠিক বুঝে গেছেন ঈশ্বরই আছেন, তিনি কি কখন ডান দিক বাম দিক করবেন?

যে জানে আমার ঘরে একটা বিষধর সাপ ঢুকেছে, সে কি ওই ঘরে ঢুকতে পারবে? সংসারে যত দুষ্কর্ম, এগুলো হল সব সাপ, সংসারের ঘরে এই সাপগুলো ঝুলছে, জানার পর এখানে কি কেউ থাকতে চাইবে? ঠাকুর বলছেন, এই সংসার হল পাতকুয়া, আর আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব সব হল কালসর্প। কিন্তু আমরা কত আনন্দে, কত খুশী হয়ে নিজের লোকদের বুকে জড়িয়ে ধরছি। ঈশ্বরই আছেন, এই জ্ঞান যার হয়ে গেছে, সে কখন কি কারুর সাথে জড়াতে চাইবে? কোন প্রশ্নই নেই। এসব কথা শুনলে আমাদের আতঙ্ক লাগে, কিন্তু এটাই একেবারে রুঢ় বাস্তব। ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর দেখছেন, এই কথাগুলো আপনি জানেন, বিশ্বাস করেন, তা সত্ত্বেও আপনি ডান দিক বাম দিক করছেন, এটা কি কখন সম্ভব! এই বোধ কখন আসে?

শাস্ত্রবিধিতে কাজ করতে করতে মন একেবারে শুদ্ধ হয়ে যায়, যেখানে সে কোন ফলের আকাঙ্খা করছে না। ফলের কামনা করলে আপনার মন অশুদ্ধ হয়ে গেল। আপনি শাস্ত্র পালনও করছেন, আর তার সাথে ফলও চাইছেন। এই ধরণের ফলাকাঙ্ক্ষীদের দিয়েই সংসার চলে, এদেরকেই আমরা বলি ধার্মিক পুরুষ। যারা আচারি, যারা ধর্ম পথে ভাল কাজ করেন, ঈশ্বরের পূজা অর্চনাও করেন, কিন্তু ফল চান।

কিন্তু সাধক যিনি, তিনি কাজ করে যান, কিন্তু ফল চান না। ভগবান এই সাধকদের জ্ঞান দিয়ে দেন। এনারাই হলেন মুমুক্ষু, এনারাই সাধক। আর যাঁরা জ্ঞানী সন্ন্যাসী, সমস্ত ত্যাগ করে মুক্তি চাইছেন, যিনি বলছেন ঈশ্বর বৈ আমার আর কিছু লাগবে না, আমার কোন কর্ম লাগবে না। ভগবান

তাঁকে মুক্তি দিয়ে দেন, এটাই বিজ্ঞান। এটাকেই পরে সপ্তম অধ্যায়ে আরও বিস্তারে বলবেন, যেখানে আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থাথি আর জ্ঞানীদের কথা আসবে। সেখানে এটাই আবার বলবেন, যারা আর্ত, তাদের আমি দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিই। কিন্তু আমরা যে প্রতিনিয়ত দুঃখ-কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করে যাচ্ছি, কই আমাদের তো দুঃখ-কষ্ট দূর হচ্ছে না। এখানে সেই পাঁচ বছরের বাচ্চার কথা মনে করতে হবে, যে বলছে, মা আমাকে বিয়ে দিয়ে দাও। মা বিয়ে দেবেন না। আমরা এত কিছু করে রেখেছি যে, ভগবান কিছুই করছেন না।

এর পরের লাইনে আরও পরিষ্কার হবে। *মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ সর্বশঃ*, এই জগতে যারাই আছে, সবাই ঈশ্বরের মার্গকেই অনুসরণ করছে, যে ভাল কাজ করে সেও, আর যে ভুল কাজ করছে সেও। হিন্দু ধর্ম আর অন্যান্য ধর্মের সাথে এটাই একটা বড় তফাৎ। অন্যান্য ধর্মে এটা ভুল, এটা ঠিক, এইভাবে পরিষ্কার একটা বিভাজন রেখা টেনে দেওয়া হয়েছে। এটা ঈশ্বর আর এটা ডেভিল, পরিষ্কার লাইন টেনে দেওয়া হয়েছে। হিন্দুদের কাছে ঈশ্বরই আছেন, এখানে ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন সত্তা নেই। খ্রীশ্চান, ইসলাম ধর্মে যে শয়তানের কথা বলা হয়ে, হিন্দুদের কাছে সেটা নেই। ভাল আর মন্দের যে দ্বৈত ভাব, ঈশ্বরের মধ্যে তা একেবারেই নেই। আমাদের কাছে এক ঈশ্বরই আছেন। সেই ঈশ্বরের ভাল নেই, মন্দ নেই; সেই ঈশ্বরের পূণ্য নেই, পাপ নেই; সেই ঈশ্বরের ধর্ম নেই, অধর্ম নেই। ফলে আমাদের সব পথ ঈশ্বরের দিকে যায়। আজকের খবরে আছে, দুই ভাই আছে, ওদের ভ্রমণ জিনিসটা খুব পছন্দের। ওরা একটা প্ল্যান তৈরী করেছে, দিল্লী থেকে লণ্ডন বাসে করে নিয়ে যাবে। কুড়ি জনের সিট থাকবে, টিকিটের মূল্য কত লক্ষ টাকা, আমার ঠিক জানা নেই। আমি এদের রুটটা দেখছিলাম, এখান থেকে কোথায় বার্মা, কোথায় চায়না হয়ে উজবেকিস্থান, প্যারিস হয়ে লণ্ডন নিয়ে যাবে। ফ্লাইটে গেলে রাস্থাটা অন্য রকম হবে। কলকাতা থেকে দিল্লী যাওয়ার অনেকগুলো রাস্থা আছে। রোডেও অনেক রাস্থা, ট্রেনে গেলেও অনেক রাস্থা। আর যদি পূব দিকে চলে যায়, বার্মা হয়ে ঘুরে ঘুরে সারা বিশ্ব চক্কর দিয়ে ওখানে গিয়ে পৌঁছাবে। সমস্ত পথ ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছে।

একজন যে অলস ব্যক্তি, সেও ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছে। ভগবান তাকে জিজ্ঞেস করবেন, ‘বাবা, তোমার কি আলস্য খুব ভাল লাগে’**?** ‘হ্যাঁ খুবই ভাল লাগে’। ‘খুব ভাল কথা, তোমার কি এই অলসতার মধ্যে হিংস্র ভাবও আছে’**?** ‘হ্যাঁ, তা একটু আছে’। ‘তাহলে এই নাও, তুমি এবার অজগর সাপ হয়ে থাক’। থাকল কয়েক জন্ম অজগর সাপ হয়ে। ও বাবা তাতেও স্বভাবটা বদলাল না, ঠিক আছে, পাথর হয়ে পড়ে থাক। এবার সে লক্ষ লক্ষ কোটি বছর একটা পাথর হয়ে পড়ে থাকবে। তারপর কোন এক সময় কোন মহাত্মার নজরে আসবে, মহাত্মা পাথর দেখে বুঝতে পারবেন এর মধ্যে কোন জীবাত্মা আছে। তিনি কৃপা করবেন, সেখান থেকে আস্তে আস্তে আবার এগোতে থাকবে। কেউ কেউ আছে, মেয়েদের দেখলেই তাদের চোখ ঝলসে যায়। খুব ভাল, এবার মেয়েদের পিছনে দৌড়াতে থাক। একবার এর পিছনে, আর-একবার ওর পিছনে দৌড়াবে। এরপর প্রথমে বাবা-মা মারবে, তারপর পাড়ার লোকেরা মারবে, তারপর পুলিশের মার খাবে। এরপর একটা সময় বলবে, অনেক হয়েছে, আমার আর লাগবে না। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে মানুষের চেতনাটা ফিরে আসে, তখন বলে আমি আর পথভ্রষ্ট হব না।

এই কথা গুলো খুবই নেগেটিভ কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এর পজিটিভ দিক হল, মানুষ চাইছে শাস্ত্রকে অনুসরণ করে জীবন চালাতে। শাস্ত্রকে যখন অনুসরণ করে, তখনও মানুষ ভোগ চাইতে পারে, দুঃখ-কষ্টের নিবারণ চাইতে পারে, জ্ঞান চাইতে পারে, মুক্তি চাইতে পারে। এগুলো সমস্ত ভগবানেরই দেওয়া। এমন কোন কিছু নেই, যেটা ভগবান নিজেই সেই পথটা করে দেন।

যখন বলছেন, *মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ,* তখন এই কথাতেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হিন্দু ধর্মে পাপ বলে কিছু হয় না। অন্যান্য ধর্মে পাপের অর্থ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করা। কিন্তু এখানে আমরা হিন্দুরা যেটাই করি সেটাই ঈশ্বরের আদেশের মধ্যে পড়বে; ঈশ্বরের আদেশের বাইরে কোন কিছুই হয় না। কারণ ঈশ্বরের বাইরে তো কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। অস্তিত্ব মানেই ঈশ্বর, কারণ ঈশ্বরের বাইরে কখনই কেউ যেতে পারে না। যে খুনী, যে লম্পট, যে জোচ্চর, যে প্রতারক, সবাই ঈশ্বরের মধ্যেই ঘুর ঘুর করছে। তফাৎ হল, এরা যে পথ নিয়েছে, এটা অনেক লম্বা পথ, লম্বা পথ নেওয়ার জন্য একটু মার তো খেতেই হবে। ঠাকুর বলছেন, হাসপাতালে নাম লেখালে যতক্ষণ রোগের কসুর না হয় ততক্ষণ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার উপায় নেই। পাহাড়ে যখন আমরা উঠি, চলতে চলতে যদি উপরের দিকে যাই তখনও সামনের দিকে যাচ্ছি, যখন নীচের দিকে নামতে থাকি তখনও সামনের দিকে এগোতে থাকি। আমরাও সবাই ঈশ্বরের দিকেই এগোচ্ছি। একজন যে চিররুগ্ন, সব সময় রোগে ভুগছে, সেও ঈশ্বরের দিকে এগোচ্ছে; যে সুস্থ, সেও এগোচ্ছে; যে এখনও শিশু আর যে এখন বৃদ্ধ, দুজনেই ঈশ্বরের দিকে এগোচ্ছে। একটা অল্প বয়সী ছেলে জানতে চাইল, আমার জীবনে এই সময় কি আদর্শ হওয়া উচিৎ? তুমি এখন স্কুলে পড়াশোনা করছ, পড়াশোনা করাটাই তোমার এখন জীবনের আদর্শ। *ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ,* অধ্যয়ন করাটাই তোমার এখন তপস্যা, এখানে জিজ্ঞেস করার কিছু নেই। কারণ অধ্যয়ন করার যে পথ, এই পথটা ভগবানই দিয়েছেন। জপধ্যান করা, এই পথটাও ভগবানই দিয়েছেন। বাড়ির লোকেদের দেখাশোনা করা, এই পথটাও ভগবানরই দেওয়া। ভগবানই পথ দিয়ে রেখেছেন, কিভাবে তুমি একটার পর একটা পথ অতিক্রম করে এগিয়ে যাবে। তবে কারুর পথ লম্বা, কারুর পথ ছোট। জোর করে কেউ যদি পথ ছোট করতে যায়, তাহলে তাকে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে।

যে কথাগুলো এতক্ষণ আলোচনা হল, এগুলো যদি সত্য হয়, সমস্ত বিশ্ব যদি বাসুদেবের স্বরূপ হয়, তাহলে তো ঈশ্বর ছাড়া কিছু হতে পারে না, কোন পথ নেই যে বলা যাবে এটা ঈশ্বরের পথ নয়। তাহলে মানুষ সব কিছু ছেড়ে ঈশ্বরের পথে চলছে না কেন? হে কৃষ্ণ, কোথাও তুমি একটা গোলমাল করছ, লোকেদের ভিতর কোথাও এই চেতনাটা missing। কেন এই রকম? তুমি যখন সৃষ্টি করেছ, আর এই সৃষ্টিটা যদি তুমিই হয়ে থাক, মানুষ তাহলে তোমাকেই কেন ভজনা না করে অন্য কিছুর ভজনা করছে? ভগবান বলছেন, এটা কখনই সম্ভব হবে না, কারণ সংসার মানেই লোভ মোহ। সংসারে কাম ক্রোধ থাকবেই, লোভ মোহ থাকবেই, এই সংসারে যে আসবে, তাকেও এগুলোকে নিয়ে থাকতে হবে। এই সংসারে মানুষ যা কিছু করে সব লোভে পড়ে করে, কামনার অধীনে করবে। তাহলে সংসার কেন? আমি যদি নিত্য-বুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্ত হতাম, তাহলে তো আমার জন্মই হত না। জন্ম হওয়া মানেই আমার অবিদ্যা, কিছু বাসনা থেকে গেছে। আর যদি একেবারে শুদ্ধ থাকতাম, ছুঁই ছুঁই অবস্থায় থাকতাম, তাহলে তো আমি হিমালয়ের কোন গুহায় গিয়ে তপস্যা করতাম। অনেক গোলমাল আছে, অনেক দুর্বলতা আছে বলেই প্রথম জন্ম হল, আর রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী হয়ে এলাম। এখানে গোলমাল আছে বলেই তো আমি আছি। কোন গোলমাল যদি না থাকত আমার জন্মই হত না। তবে এটা ঠিক যে, সদ্‌গুণ আছে বলে সংসারে গিয়ে পড়িনি। দুর্বলতা আছে বলেই এই সংসারে আসা। দুর্বলতা আছে বলে মানুষ কি করবে?

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা।।১২।।

(তবে শ্রৌত ও স্মার্ত কর্মের ফল কামনা করে অনেকে ইহলোকে ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করেন; কিন্তু মুক্তির জন্য সাক্ষাৎভাবে আমার শরণাগত হয় না। কারণ, মনুষ্যলোকে কাম্য কর্মের ফল শীঘ্র লাভ হয়।)

এই সংসারে যখন আছে, তখন এখানে তার কর্মের ফল চাই। কর্মের ফল যখন চাই, তখন একবার এটা চাইবে, একবার ওটা চাইবে। আগেকার দিনে ইন্দ্র, অগ্নি আদি দেবতারা ছিলেন, ইদানিং এই বাবাজী সেই বাবাজীরা আছেন। মানুষও তাই দেবতাদের ছেড়ে এখন এই বাবাজী, সেই বাবাজীর কাছে যাচ্ছে, আর বলছে ওই বাবাজীর কাছে গেলে সিদ্ধি হবেই হবে। ভগবান পরে বলবেন, বড় দুঃখের কথা, তারা মনে করে ওখানে গেলে আমি সব পেয়ে যাব, পায় না যে তা না, পায় ঠিকই। কারণ, *ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে*, এই যে মনুষ্যলোক, এখানে মানুষ সিদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যায়। কারণ এখানে কর্মের অধিকার আছে; স্বর্গে দেবতাদের কর্মের অধিকার নেই। দেবলোক আদি হল ভোগের জায়গা। যে কর্মটা আগে করা হয়েছে, সেই কর্মের ভোগটা স্বর্গে গিয়ে পাবে। মনুষ্যলোক হল কর্মভূমি, এখানে সঙ্গে সঙ্গে ফল পায়। ফলে, কেউ অমুক দেবতার পূজা করল, কেউ তমুক দেবতার পূজা করল, এর ফল সে কিন্তু পাবে। আর মানুষ তার স্বভাববশতঃ সব সময় ছটফট করছে, এটা চাই, সেটা চাই, আর এক্ষুণি চাই। ফলে মানুষ ভগবানকে ছেড়ে বাকি সব কিছুতে লেগে আছে।

প্রাইভেট অফিসে যে বসের আণ্ডারে কাজ করতে হচ্ছে, আমি জানি লোকটা একটা বদমাইশ লোক। কিন্তু আমাকে হাতজোড় করে দু-বেলা তার সামনে দাঁড়াতে হয়, কারণ সে আমাকে দুটো পয়সা দিয়ে আমার পেট ভরাবে। আর সত্যিই সে দেয়। অন্য দিকে ভগবান হলেন সর্বশক্তিমান, তার সামনে হাতজোড় করে দাঁড়ালে তিনি দেবেন ঠিকই, কিন্তু কবে দেবেন, কতটা দেবেন আমরা জানি না বলে আমরা ভগবানের কাছে যাই না। সেইজন্য ঈশ্বরের পথে যাওয়া খুব কঠিন। কিন্তু এই সংসারে ফল চটপট পাওয়া যায়। আমি যদি ঠাকুরকে বলি, হে ঠাকুর আমার চাল দরকার, ভাত হলে খেতে পাব। ভগবান অবশ্যই দেবেন, কিন্তু কবে দেবেন ঠিক নেই। তার থেকে কম সময়ে ধানের বীজ পুতে আমি চাল পেয়ে যাব। তার থেকে আরও কম সময়ে দুটো টাকা আয় করে চাল কিনে আমি খেয়ে নিতে পারব। কারণ *ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে*, মন্যুষলোকে সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া যায়। *সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা*, কর্ম থেকে সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া যায়।

দস্তভস্কি খুব নামকরা রাশিয়ান লেখক। কি একটা ভুল বোঝাবুঝির জন্য আঠারো-উনিশ বয়সে রাজা মনে করল দস্তভস্কি বিপ্লবীদের সাথে জড়িয়ে আছে। তখন তাঁকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হল। রাশিয়ায় তখন ফাঁসি মানে গুলি করেই মেরে দেওয়া হত। দস্তভস্কিকে দেওয়ালে দাঁড় করানো হয়েছে, এবার ফায়ারিং অর্ডার দিতে যাচ্ছে। ওয়ান, টু, থ্রী বলা শুরু করেছে, ওয়ান বলে দেওয়া হয়ে গেছে, ততক্ষণে রাজার এক ঘোড় সওয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে এসে বলছে, ভুল হয়ে গেছে, ওর কোন দোষ নেই, ওকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। দস্তভস্কি প্রস্তুত, শুধু বন্দুকের বুলেট এসে ওকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে। দস্তভস্কি তখন বমি করে দিয়েছে। সেখান থেকে পরে তিনি একজন বিরাট লেখক হয়ে গেলেন। দস্তভস্কির লেখাগুলো খুব গভীর ও উচ্চমানের।

উনি এক জায়গায় খুব মজা করে বলছেন, একজন মাতাল বলছে, একটা লোক এক অফিসারের কাছে সাহায্য চাইতে গেছে, সাহায্য না পেয়ে চলে এসেছে। তখন আমি অফিসারকে বললাম, 'দেখ ভগবান তাকে ফল দিল না বলেই তো তোমার কাছে সাহায্যের জন্য এসেছে, তুমিও যদি তাকে ফিরিয়ে দাও, বেচারা কোথায় আর যাবে'। ব্যঙ্গ করে লিখছেন। দস্তভস্কি অত্যন্ত উচ্চমানের লেখক। যিনি কোন সময় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন, জীবন পরে অন্য রকম হয়ে যায়।

ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে, মনুষ্যলোকে কর্ম থেকে যে ফল জন্ম নেয়, সেই ফল খুব শীঘ্র পাওয়া যায়। মানুষ সেইজন্য আমার কাছে আসতে চায় না। কারণ আমার কাছে ফল পেতে দেরী হবে। শুধু দেরী হবে না, ভগবান আদৌ দেবেন কিনা জানা নেই। কারণ বেশি ভক্তি যদি থাকে,

ভগবান তখন চাইবেন না যে তাঁর ভক্ত বিনাশের পথে যাক। এরপর বলছেন, কেন এই রকম হয়, কারণ একমাত্র মনুষ্যলোকে অনেক তফাৎ আছে, যেখানে বিভিন্ন রকমের ফল পাওয়া যায় –

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারামব্যয়ম্।।১৩।।

(তাঁরা আমারই কর্মাত্মক মার্গের অনুবর্তন করেন; কারণ] সত্ত্বাদিগুণ ও শমাদি কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি ব্রাহ্মণাদি চারবর্ণের সৃষ্টি করেছি। আমি মায়িক ব্যবহারে চতুবর্ণের সৃষ্টিকর্তা হলেও আমাকে পরমার্থদৃষ্টিতে অব্যয় অকর্তা ও অসংসারী বলে জানবে।)

এই যে চতুর্বর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, বর্ণের এই বিভাজন আমিই করেছি। কিভাবে করা হয়েছে? গুণ আর কর্ম বিভাগ অনুসারে, জন্ম দিয়ে এই বিভাজন করা হয়নি। *তস্য কর্তারমপি মাং*, এর কর্তা অবশ্যই আমি, কিন্তু জানবে আমি সব সময় অকর্তা, অর্থাৎ আমি অনাসক্ত।

আমরা দুটো খুব প্রচলিত শব্দ শুনে থাকি, সাম্য ও স্বাধীনতা। আমাদের সংবিধানেও, সমতা ও স্বাধীনতার কথা বলা হয়। কিন্তু সমতা ও স্বাধীনতা কখনই এক সঙ্গে হয় না, এটা একটা ভুল ধারণা। যেখানে স্বাধীনতা আছে সেখানে সাম্য থাকবে না, যেখানে সাম্য থাকবে সেখানে স্বাধীনতা থাকবে না। কম্যুনিস্টরা সাম্যের কথা বলে কিন্তু স্বাধীনতা নেই। আমেরিকাতে স্বাধীনতা আছে, অনেক বাঁদরামও আছে, ফলে সাম্য নেই। সাম্য আর স্বাধীনতা দুটো এক সঙ্গে চলে না। ভারতবর্ষে, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক জীবনে আমরা বেছে নিয়েছি স্বাধীনতাকে। আপনি যদি স্বাধীনতাকে নেন, আপনাকে তাহলে সাম্য ছাড়তে হবে। সমতাকে যদি বেছে নেন তাহলে স্বাধীনতাকে ছাড়তে হবে। কিছু কিছু ধর্ম আছে, বইয়ে বাঁধা; ফলে ওখানে সবাই সমান। শুনতে দারুণ লাগে, কিন্তু বুঝতে হবে ওখানে স্বাধীনতা নেই।

হিন্দু সমাজ অনেক আগেই মেনে নিল বৈষম্যই জীবনের সত্য, সবাই সমান থাকে না, সবার জন্ম সমান হয় না, সবাই সমান ভাবে মরে না। এগুলোকে নিয়ে তর্কাতর্কি করার দরকার নেই, একটু বুদ্ধি থাকলেই বুঝতে পারবেন। সমতা বলে কোন কিছু হয় না। হিন্দু সমাজ একটা adjustment নিয়ে এলেন, equality তো হবে না, inequality যেন আমেরিকার মত না হয়ে যায়। একজন লক্ষ কোটিপতি আর আরেকজন যার কিছু নেই, এই ধরণের জিনিস যেন না হয়। ওনারা একটা বাঁধন দিয়ে দিলেন। হিন্দুদের বর্ণপ্রথাকে নিয়ে এত নিন্দা করা হয়, কিন্তু পুরো বিশ্বে একমতার হিন্দুদের system এত দিন টিকে ছিল। এখানে জাতিপ্রথাকে নিয়ে বলছেন না। জাতি মানে যার যার জীবিকা। আজকে দেশে যে এত বেকারত্ব, তারপর করোনার জন্য কত সমস্যা হয়েছে। আগে যে জাতিপ্রথা ছিল, তখন ওরা কাউকে না খেয়ে মরতে দিত না। যিনি ওই জাতির প্রধান মাথা, তিনি সবারই জন্য কিছু না কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিতেন। তবে এখন আর সম্ভব না, ওই দিন চলে গেছে, ওই অধ্যায় শেষ।

ব্যাসদেব এবং অন্যান্য যাঁরা ছিলেন, তাঁরা চারটে জাতি করে দিলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। গীতা ব্যাসদেবের রচনা, তিনি সেখানে লিখছেন, *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং*। বেদের পুরুষসূক্তমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কথা আছে, কিন্তু অনেকে বলেন, বেদে যে চারটে বর্ণের কথা বলা হয়েছে, এটা বেদের অন্যান্য জায়গায় কোথাও নেই, সেইজন্য মনে হয় পরে পরে কেউ ওই মন্ত্রটা ওখানে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ভগবান এখানে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, গুণ আর কর্ম দিয়ে আমি এই চারটে বর্ণ সৃষ্টি করেছি, এখানে জন্মের কোন সম্পর্ক নেই। তাহলে কি হিন্দুরা এটা মেনেছিল যে, ব্রাহ্মণ জন্ম থেকে হয় না, কর্ম থেকে হয়? হিন্দুরা চিরদিন এটা মেনে এসেছে। ইদানিং কালে বামপন্থী লিবারালরা দেশটাকে টুকরো করে দেওয়ার জন্য, সব কিছুকে খারাপ দেখিয়ে দেন। যারা

নির্বাচিত সরকার, তাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছে। তাদের ইচ্ছা মত না করলেই বলবে, এরা চোর, এরা মিথ্যাবাদী। এরাই সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, হিন্দুরা এই দোষ করেছিল, সেই দোষ করেছিল। হিন্দুরা একটা দোষ করেছিল, যেটা সব জায়গায় হয়, অধিকার নেওয়া। ব্রাহ্মণরা অধিকার নিতে শুরু করল। স্বামীজী বার বার এই কথা বলছেন, অধিকার নেওয়াটা বন্ধ কর। অধিকার নেওয়াটা যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই যে বর্ণ, এর মত সুবন্দোবস্ত system হয় না, এই যে বর্ণাশ্রম প্রথা, এর মত বিজ্ঞানসম্মত system হয় না। কিন্তু মানুষ সুযোগ আর অধিকার নেবেই। অধিকার যদি না নেওয়া হয়, তাহলে বিশ্বে কোন সামাজিক ব্যবস্থা আছে যেটাকে ভাল বলা যাবে?

এখানে *গুণকর্মবিভাগশঃ* বলছেন, গুণকর্মবিভাগ মানে মানুষ যেখানে সত্ত্ব প্রধান হয়, সাত্ত্বিক গুণ যাঁর বেশি, তাঁকে বলছেন ব্রাহ্মণ। সত্ত্ব প্রধান হলে তাঁর জ্ঞানের প্রতি স্পৃহা আসবে, আর যাঁদেরই জ্ঞানের প্রতি স্পৃহা তিনিই ব্রাহ্মণ। যাঁদের মধ্যে রজোগুণ বেশি থাকে, অন্য দিকে সত্ত্বগুণটা একটু কমে যায়, তাঁদের মধ্যে শৌর্য বীর্যটা বেশি দেখা যায়। এনারা হলেন ক্ষত্রিয়। যে মানুষের মধ্যে তেজ আছে, কিন্তু জ্ঞানের স্পৃহাটা কমে গেছে, এনারা হলেন ক্ষত্রিয়। যাঁদের আবার রজোগুণটা একটু কমে গিয়ে তমোগুণটা বেড়ে গেল, এনারা হলেন বৈশ্য। বৈশ্যদের রজো আর তমোগুণ মিশে থাকে, যার মধ্যে রজোগুণটা একটু বেশি থাকে। আর চতুর্থ হল তমোগুণটাই প্রধান, রজোগুণ কমে গেছে, এনাদের বলছেন শূদ্র। শূদ্রের মধ্যে তমোগুণটা বেশি থাকে, রজোগুণ একটু কম আর সত্ত্বগুণ আরও কম থাকে। এইভাবে এই চারটেকে ওনারা একটা system করে দিলেন।

আমরা যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারটে নাম সরিয়ে দিই, এবং অন্য যে কোন নাম নিয়ে আসা হয়, দেখা যাবে এই বৈশিষ্ট্যটা থাকবেই। কোথাও সত্ত্বগুণের আধিক্য, কোথাও রজোগুণের আধিক বেশি, সত্ত্বগুণ একটু কম; আবার কারুর মধ্যে রজোগুণ বেশি কিন্তু তার মধ্যে তমোগুণ একটু ঢুকে গেছে। আবার কেউ আছেন, যাঁদের তমোগুণটা বেশি। সমাজে যত মানুষ আছে, সংসারে যত মানুষ আছে, এদের সবাইকে এই চারটে শ্রেণীতেই রাখা যায়। কিন্তু এই তিনটে গুণ সত্ত্ব, রজো আর তমো, ভগবান নিজে করেছেন। এই গুণের উপর আলোচনা আবার সপ্তম অধ্যায়ে আসবে। ভগবানের শ্রেষ্ঠ যে প্রকৃতি, সেটা হল আত্মা, পরা প্রকৃতি। আর অপরা প্রকৃতি হল এই জগৎ। জগৎ মানেই ত্রিগুণাত্মিকা, সত্ত্ব, রজ ও তমের খেলা। আমাদের সবার মধ্যে যে সত্ত্ব, রজো ও তমের খেলা চলছে, এটা ভগবান নিজেই হয়ে আছেন, এটা ভগবানেরই দেওয়া। আমি যদি ঠিক করি, আমি জপধ্যান বেশি করে করব, জ্ঞান চর্চা বেশি করে করব, আমি ব্রাহ্মণ হয়ে গেলাম।

এই যে চারটে বর্ণ তিনটে গুণের মধ্যে বেঁধে যে কাজ করছে, ভগবান বলছেন, এটা আমারই দেওয়া। এটাকেই যখন ধর্ম রূপে করে, তখন সঙ্গে সঙ্গে ফল পায়, আগের শ্লোকে যেটা বলা হল। ফলে মানুষ ফলটা তাড়াতাড়ি পেতে চায়। ঠাকুর বলছেন, এ যুগে ডি গুপ্তের ফিভার মিকশ্চার, এখন আর পাচন চলে না। মানুষ তাড়াতাড়ি ফল চায়। ভগবান বলছেন, এতে কোন দোষ নেই। এই যে মানুষ নিজের মত কর্ম করছে, বর্ণাশ্রমকে আশ্রয় করে লোকেরা কর্ম করছে, আর সেখান থেকে ফল ভোগ করছে, কোনটাই দোষের মধ্যে পড়ে না। কারণ এগুলো আমারই দেওয়া। এদের মধ্যে কিছু কিছু আছেন, যাঁরা ডিউটি রূপে এই কর্মগুলি করেন, অন্য কিছু ফল চান না। আবার কিছু আছেন, যাঁরা সব কিছু ছেড়ে আমার দিকে আসেন। সবটা আমারই দেওয়া। এর আগে বলছিলেন, ভগবান আপনার তো বৈষম্য দোষ আছে; এবার আসবে, আপনিই যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র করে থাকেন, তাহলে এদের মধ্যে যত গোলমাল হচ্ছে, তার দোষ তো আপনার উপর আসবে। ভগবান বলছেন, না, আমার কাছে কোন কিছুই আসবে না, কারণ আমি যা কিছু করি, কোনটাতেই আমি লিপ্ত হই না, আমি সব কিছুর উর্ধ্বে।

তেরো নম্বর শ্লোকের এটা বলা উদ্দেশ্য নয় যে, ভগবান এই চারটে বর্ণকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের ভিতরে যে নানা রকমের গুণ থাকে, সেই গুণানুসারেই মানুষ নিজের নিজের কর্ম করে। কোন বাড়িতে বাবা-মায়ের হয়ত চারটে সন্তান, ওই চারটে সন্তানের প্রবণতা দেখে বলে দেওয়া যায় ওরা বড় হয়ে কে কোন দিকে যাবে। সবার এক ধরণের প্রবণতা থাকে না, এক একজনের এক এক রকম প্রবণতা থাকে। আমাদের ঋষিরা তখনকার দিনে মানুষ বিভিন্ন ধরণের যে কাজ করতেন, যে পেশায় নিযুক্ত থাকতেন, সেই পেশা বা কাজ অনুসারে চারটে বর্ণ করে দিলেন। আমরা অনেক সময় ভুল মনে করি যে, এই জাতিপ্রথা সিস্টেমটা যেন পাথরে বাঁধা। দেশে যদি সম্পদ কম থাকে, সমাজে যদি অভাব থাকে, তখন সেখানে মানুষ নিজেকে বাঁচাতে চায়। যেমন করোনার জন্য মানুষের আয় কমে গেছে। আমরা এখন কেউ বাজে খরচ করছি না, আমরা অর্থ বাঁচাতে চাইছি। ঠিক তেমনি সমাজে যখন অভাব থাকে তখন নিজের জ্ঞাতি, আত্মীয়দের বাঁচানোর চেষ্টা করে, সেই থেকেই guild আসে। এইভাবে জাতিটা হয়ে গেল বাঁধা, তবে একেবারেই যে পাল্টাতো তা না, পাল্টাতো। পরে যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটে বর্ণ নিয়ে এলেন, এটা কিন্তু গতিশীল ছিল। সেই সময়কার কোন মহাপুরুষ হয়ত কোন নীচু বর্ণের লোককে বলে দিলেন, যা, তোরা আজ থেকে ব্রাহ্মণ। স্বামীজীর বর্ণনাতে আমরা পাই, কিভাবে শঙ্করাচার্য কেরলে যারা মাছ ধরে তাদের ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করে উপরে তুলে আনলেন।

তেরো নম্বর শ্লোকের মূল বক্তব্য হল, এর আগের আগের জন্মে তুমি যেমন যেমন কর্ম করেছ, যেমন জ্ঞান সঞ্চয় করেছে, সেই সঞ্চয়ের পুটলি নিয়েই তুমি এবার জন্মেছ। এটাকে তুমি তোমার নিজের যে প্রবৃত্তি সেই রূপে নিতে পার, বা বলতে পার ঈশ্বরই তোমাকে এই প্রবণতা দিয়েছেন। ঠাকুরও অনেক জায়গায় বলছেন, মা ওকে অতটুকু কেন দিলি। এটা তাঁর নিজের ভাব। যিনি সর্বত্র ঈশ্বরকে দেখেন, তিনি বলবেন, এটা ঈশ্বর দিয়েছেন। আর যিনি সব জায়গায় নিজের ক্ষমতা দেখেন, তিনি বলবেন, এটা আমার জন্য হল। অনেকে শুনে থাকবেন, আজকাল carrier consultant হয়, ইয়ং ছেলেমেয়েদের সাথে কথা বলে তারা বলে দেয় তোমার জন্য কোন ক্যারিয়ারটা ভাল। ভগবান এটাই এখানে বলছেন, তোমার মনের যে ভাব, এটা তুমি নিজে নিয়ে এসেছ, সেই অনুসারে এই চতুর্বর্ণ এসেছে। আপনি বলতে পারেন, এটা তো জন্মের সাথে বাঁধা। এগুলো আমরা আগে বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করেছি। আমাদের আজকে মনে প্রশ্ন ওঠে, জাতি জন্ম থেকে কেন হয়? এগুলোকে নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়। একটা স্থির সামাজিক ব্যবস্থা কিভাবে করা যেতে পারে, এর উপর অনেক আলোচনা হয়, কিন্তু কারুর কাছে কোন সঠিক উত্তর নেই। আমি আপনি যেটাই আনব, দুদিন পরে দেখা যাবে সেখানেও অনেক সমস্যা দাঁড়িয়ে গেছে। যে করেই হোক, হিন্দুরা এটাই নিয়েছিলেন।

স্বামীজী বলছেন, ভারতের যে বর্ণ ব্যবস্থা ছিল, এর সময় ফুরিয়ে এসেছে, এর দুর্গন্ধ সমাজে এখন ছড়িয়ে পড়েছে, এই বর্ণপ্রথাকে ভাঙা দরকার। সত্যিই তাই হল, ভারতে বর্ণ ব্যবস্থা ভেঙে গেল, স্বাধীন ভারতে সংরক্ষণ ছাড়া আর কোথাও বর্ণপ্রথার স্থান নেই। বিবাহ আদিতে কিছু ব্যবহার করে, তাও যাদের পয়সা ও ক্ষমতা আছে, তারা আবার এগুলোকে গ্রাহ্য করে না। তার সাথে সাথে টেকনলজি ক্ষেত্রে যে অগ্রগতির জোয়ার এসেছে, তাতে trade guild ভেঙে শেষ হয়ে গেছে। আগে আমরা এর কিছু আলোচনা করেছিলাম।

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে।।১৪।।

(অতএব আমার অহংকার এবং কর্মফলে আকাঙ্ক্ষা না থাকায় কোন কর্ম আমাকে বদ্ধ করতে পারে না। এ-রূপে যিনি আমাকে পরমাত্মা থেকে অভিন্ন এবং কর্তৃত্বরহিত ও কর্মফলে স্পৃহাশূন্য বলে জানেন, তিনি কর্ম

দ্বারা কখনও আবদ্ধ হন না; কর্ম তাঁর জন্মান্তরের আরম্ভক হয় না। কর্ম যে আমার বন্ধনের কারণ হয় না তা বলাই বাহুল্য।)

ভগবান চারটে বর্ণ সৃষ্টি করলেন, এই চতুর্বর্ণ করার ফলে সমাজে যে দোষ হয়েছে, যে দোষের কারণে মানুষের মধ্যে অশান্তি হচ্ছে, এই দোষটা তাহলে ভগবানের উপর যাওয়ার কথা। সাধারণ ভাবে কর্মের যিনি কর্তা, কর্মের দোষ কর্তার উপর বর্তায়। বর্ণাশ্রম জনিত যত রকমের দোষ হতে পারে, যেমন বলা হচ্ছে শূদ্রের উপর অত্যাচার হচ্ছে, কার জন্য এই অত্যাচার হচ্ছে, ভগবানের জন্য, কারণ তিনিই এই বর্ণ বিভাজন করেছেন। দোষ কার? ভগবানের। কিন্তু ভগবান বলছেন, না, আমার উপর দোষ পড়বে না। কারণ *ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা*। গীতা মোক্ষশাস্ত্র এই কথা অনেকবার বলেছি, আরও অনেকবার বলব। আপনি কি যোগী হতে চান? এখানে ভগবান দেখাবেন, আপনি কিভাবে যোগী হবেন। কিছু কিছু যোগী আছেন, টিভি চ্যানেলে, সোস্যাল মিডিয়াতে এসে কত লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করে যাচ্ছে। সেই রকম যোগী তো এখানে আপনি হতে পারবেন না, এখানে বলা হচ্ছে কিভাবে ভিতর থেকে যোগী হওয়া যায়। অনেক সময় বাইরের লোকেরা সাধুদের রেগে গিয়ে বলে, 'বাইরে গেরুয়া না, নিজের ভিতরটা গেরুয়া করুন'। যিনি ভিতর থেকে যোগী হতে চান, তাদের জন্য এই শ্লোকে ভগবান বলছেন।

বাচ্চা ছেলে যেমন বাবাকে নকল করে বাবার মত হতে চায়, সাধকরাও তেমনি সিদ্ধ পুরুষকে নকল করেন। ভগবানের বা শ্রীকৃষ্ণের কি গুণ? আমি কর্মতেও জড়িয়ে পড়ি না আর কর্মফলেও আমার কোন স্পৃহা নেই, তাই আমি কোন কর্মবন্ধনে পড়ি না। একটু পরেই মহাভারতের যুদ্ধ আরম্ভ হতে যাচ্ছে, আর এই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জেতাবেন। দেখে তো মনে হবে, শ্রীকৃষ্ণের কর্মফলে স্পৃহা আছে, তিনি চাইছেন অর্জুন এই যুদ্ধে জয়লাভ করুক, তারপর সেই দিয়ে ধর্ম সংস্থাপন হবে। কিন্তু না, ভগবানের কর্মফলে কোন স্পৃহা নেই, আর কোন কর্মে আমি জড়িয়ে নেই। ভগবান হলেন পাঁকাল মাছের মত, গায়ে কিছু লাগে না; ভগবান হলেন পদ্মপাতার মত, যে পাতা জলে সিক্ত হয়ে যায় না, জল গড়িয়ে পড়ে যায়। পদ্মপাতায় জল দিলে যতক্ষণ জল ততক্ষণ জল, পাতা হাওয়ায় একটু নড়চড়া করলে জল আর নেই, out of sight out of mind, চোখের পলক পড়তে না পড়তে পুরোটাই বেরিয়ে গেল। এটা কোন নেগেটিভ দৃষ্টিতে বলছেন না, পুরো পজিটিভ দৃষ্টিতে। যখন কাজ করছেন তখন পুরোদমে সেই কাজের মধ্যে ঢুকে পুরো কাজটা শেষ করে বেরিয়ে আসছেন। কিন্তু তখনও তাঁর কর্মফলে কোন স্পৃহা থাকে না, সাথে সাথে কর্মের প্রতিও কোন আসক্তি নেই। তার সাথে বলছেন, যে আমার এই ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে; আপনিও যদি বুঝে নেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ যা যা করেছেন, সেখানে কর্মের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি নেই, কর্মফলের প্রতি তাঁর কোন স্পৃহা নেই; আপনি যোগী হয়ে যাবেন, আপনিও কোন কর্মবন্ধনে পড়বেন না।

স্বামীজী বিদেশে থাকার সময় সব দেখে মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছেন, মনে করছেন সব ফেলে দিয়ে হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করবেন। কোন কিছুতে স্পৃহা নেই। তখনকার দিনে জাতিভেদ ভাবটা খুব প্রবল ছিল, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরেও এই ভাব অনেকের বেশি ছিল। নরেন রাখাল এরা সব কায়স্থ আর ঠাকুর হলেন একজন আচারী ব্রাহ্মণ। ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরের কিছু ব্রাহ্মণ বলছেন, তুমি এই দুটো কায়েতের ছেলের উপর এত মন দিয়েছ কেন? ঠাকুর বলছেন, সে কিগো, আমি যে ওদের সাক্ষাৎ নারায়াণ দেখি। বলেই ঠাকুর তাঁদের বলছেন, এই দেখ আমি ওদের উপর থেকে মন তুলে নিচ্ছি। বলতে বলতেই তিনি সমাধিতে চলে গেলেন, আর ওনার চুল, দাড়ি, লোম সব শজারুর কাঁটার মত দাঁড়িয়ে গেল। নরেন, রাখাল, লাটু, এদেরকে ঠাকুর শিক্ষা দিচ্ছেন, সেখানেও তাঁর কোন স্পৃহা নেই। কর্মেও কোন স্পৃহা নেই, আর কর্মফলেও কোন স্পৃহা নেই।

যারা বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে কাজের আশায় বসে আছে এদের মধ্যে কিছু আছে যাদের বলতে দেখা যায়, আমার টাকা পয়সা কে কি দেবে তাতে কোন আগ্রহ নেই, আমার job satisfaction হলেই হল। এইটাই ভগবান এখানে বলছেন, এই যারা job satisfaction বলছে তারা কিন্তু মহা বন্ধনে পড়ে আছে। আর যারা job satisfaction চাইছে না, তারা কি বলছে? কাজ যাই করি না কেন তাতে আমার কোন মাথা ব্যাথা নেই আমার package টা কেমন হবে? মানে আমাকে কত মাইনে দিতে যাচ্ছে। একজন বলছে I don’t care for perks, I want job satisfaction, আর-একজন বলছে, যে কাজই আমাকে করতে হোক না কেন তাতে আমার কোন মাথা ব্যাথা নেই, আমার কত মাইনে হবে সেটাই আমার লক্ষ্য। দুজনেই কিন্তু গীতার দৃষ্টিতে, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমান মহা বন্ধনে পড়ে গেল। যে পয়সার প্রতি আসক্ত সে যেমনটি বন্ধনে পড়ে আছে, ঠিক সেই একই বন্ধনে পড়ে আছে যে কর্মের প্রতি আসক্ত। কিন্তু ভগবান বলছেন –আমার কাজের প্রতিও আসক্তি নেই আর কাজ যদি কখনও করি তাহলেও সেই কাজের ফলের প্রতিও আমি আসক্তি শূন্য, করতে হবে তাই করলাম।

ভারতে আগেকার দিনে রান্নাঘরে চিমনির সিস্টেম ছিল না, এখনও নেই; বিদেশে ছিল। আগেকার দিনে কাঠের উনুনে রান্না হত, উনুনে কাঠ ধরালেই ধুয়ো হয়ে পুরো ঘরটাকে ঢেকে দিয়ে কালো করে দিত। কিন্তু খাঁটি কর্পূর যদি পোড়ান হয়, অগ্নির শিখা ছাড়া কিছু থাকে না, ধুয়া তাতে একটুও থাকে না, পোড়ার পর কর্পূরের কোন ছাই অবশিষ্ট থাকে না। সাধারণ কর্পূরের হাল্কা একটু ধুয়ো হয়, কিন্তু তাতেও সব কিছু পরিষ্কার থাকে। এনারা যে কর্ম করেন, কর্মফলটা ভিতরে নিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেন, ফলের কোন অবশিষ্ট থাকে না। অনেকের মনে প্রশ্ন ওঠে, এনারা যে কর্ম করছেন, এই কর্মের ফল কোথায় যায়? কর্ম শেষ হয়ে গেলে, কর্মের ফলটাও সেখানেই শেষ হয়ে যায়। আবার এই রকমও অনেক সময় দেখা যায়, যেমন শ্রীশ্রীমা বাগবাজারের গঙ্গার ঘাটে একজনকে একটা ফলে দিয়ে বলছেন, এই ফলটা তোমার, এর ফলটাও তোমার। এগুলো তাঁরা করেন, একেবারে যে করেন না, তা না। আবার অনেক সময় জগতের কল্যাণের জন্য কাজ করেন। স্বামী সারদানন্দজী যেমন লীলাপ্রসঙ্গে বলছেন, ঠাকুর ভারতের কুলকুণ্ডলীনিকে জাগিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু কোথাও কোন স্পৃহা নেই।

বলছেন, *ইতি মাং যোঽভিজানাতি*, যিনি এই জিনিসটাকে ভাল ভাবে বোঝেন, তিনিও সব কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। সাধারণ মানুষের কর্মের প্রতি প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকে, আর কর্মফলের প্রতিও তার প্রচণ্ড স্পৃহা থাকে। ম্যানেজমেন্টে মাসলো একজন বড় ম্যানেজমেন্ট গুরু ছিলেন। তিনি ম্যানেজমেন্টের একটা পিরামিড বানিয়েছেন। মানুষ জীবনে কি চায়? প্রথমে টাকা-পয়সা চায়, নিরাপত্তা চায়, করতে করতে পিরামিডের সবচেয়ে উপরে রাখছেন self actualisation। আমরা এসব অনেক আগে থেকেই জানি, তফাৎ হল এরা নূতন নূতন শব্দ নিয়ে আসে, নূতন করে প্যাকেজিং করে। পটেটো চিপসের যে প্যাকেট হয়, তাতে শুধু বাতাস আর বাতাস, ভিতরে কিছু নেই। এমনিতে আলু ভেজে দিলে বাচ্চারা খেতে চাইবে না, এখানেই প্যাকেজিংএর মহিমা। আমেরিকানসরা এই ব্যাপারে মাস্টার, প্যাকেজিং আমেরিকানসদের কাছে শিখতে হয়, সব প্যাকেজিং করে দিয়েছে। Self actualisationএ এসে বলে, ওর সব কিছু হয়ে গেছে, টাকা-পয়সা হয়ে গেছে, নামযশ হয়ে গেছে, এবার চায় সে সম্মান। এরপর তাকে যদি দুটো পয়সাও দেওয়া হয়, নিয়ে নেবে। কিন্তু সম্মানটা চাইবে। বৃদ্ধ পুরুষরা সম্মান চান, কারণ তার জীবনের বাকি সব কিছু হয়ে গেছে। বলছেন, এটাই কর্মফলের স্পৃহা। আর যে কোন কাজ করে, সব সময় বলছে, এই কর্মের ফলটা যেন ভাল হয়। কর্মে আসক্তি আর কর্মফলে স্পৃহা, এই দুটো জিনিস থেকে মানুষ বেরোতে পারে না। ভগবানের কিন্তু এই দুটোর কোনটাই থাকে না, কারণ তিনি জ্ঞানী। যিনি এই জিনিসটাকে জেনে গেছেন, তিনিও জ্ঞানী।

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্।।১৫।।

('আমি অকর্তা, অভোক্তা ও কর্মফলে নিঃস্পৃহ' –এই ভাবে আমাকে জেনে জনকাদি পূর্বতন মুমুক্ষরাও নিষ্কাম কর্ম করেছিলেন। যেহেতু প্রাচীনগণ পূর্বকালে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করেছিলেন, অতএব তুমিও নিষ্কাম কর্ম কর, কর্মত্যাগ করো না।)

অর্জুনকে তাঁর আগেকার কথা বলছেন। এর আগে আগে মুমুক্ষু যাঁরা ছিলেন, এনারাও এভাবেই কর্ম করেছিলেন, যেভাবে ভগবান কর্ম করেছিলেন। তাহলে তিনটে ধাপ হয়ে যাচ্ছে, এক হল ভগবান নিজে বা আমরা বলতে পারি সিদ্ধ পুরুষ। দ্বিতীয় হল, আগেকার যাঁরা মুমুক্ষু ছিলেন এবং পরে সিদ্ধ হয়েছেন। আর তৃতীয় হল, ইদানিং কালের যাঁরা মুমুক্ষ। অর্জুনকে বলছেন, তোমার যদি মোক্ষ লাভের ইচ্ছা হয়, তুমি যদি একজন মহাপুরুষ হতে চাও, তুমি যদি যোগী হতে চাও, তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? *কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতং*, আগের আগের মুমুক্ষুরা যেভাবে কর্ম করেছেন, তোমাকেও সেইভাবে কর্ম করতে হবে। এই আধুনিক কালে তুমি নিজের মত কিছু নূতন পথ বার করতে যেও না, আগেকার ঋষিরা, মুমুক্ষুরা যেভাবে কাজ করেছেন তোমাকেও সেভাবেই কাজ করতে হবে।

হিন্দুদের ধর্ম হল, মহাপুরুষরা যে পথে চলেছেন, আমাদেরও ঠিক সেই পথে চলা। আমাদের এত শাস্ত্র আছে, বেদ আছে, উপনিষদ আছে, পুরাণ আছে, মহাভারত আছে, কিন্তু এত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা কে করবে, আমাদের বোঝাবে কে? আপনি বলবেন, 'কেন শঙ্করাচার্যের ভাষ্য তো আছে'। পড়ে কেউ বুঝতে পারে? নিজে পড়ে কেউ বুঝতে পারে না। তাহলে কে বোঝাবেন? এই শাস্ত্র বোঝান মহাপুরুষদের জীবন। যাঁকে আমরা মহাপুরুষ মনে করি, তাঁর জীবন হল living commentary of scriptures। এই living commentary of scriptures যদি না থাকে শাস্ত্র কখনই বোঝা যাবে না। স্বামীজীও বলছেন, আর রামকৃষ্ণ মিশনের রুল বুকেও আছে, আমাদের যত শাস্ত্র আছে, এই শাস্ত্রকে শ্রীরামকৃষ্ণের যে জীবন, সেই জীবনের মাধ্যমে দেখতে হবে। ভাগবতের রাসলীলা বোঝা যাবে না, যতক্ষণ না আমরা ঠাকুরের মধুর ভাব না পড়ছি। শ্রীরামকৃষ্ণ কোন ভাষ্য রচনা করেননি, কিন্তু তাঁর জীবনটাই হল গীতা, উপনিষদ, মহাভারত, পূরাণ, সমস্ত শাস্ত্রের জীবন্ত ভাষ্য। হিন্দুরা এটা প্রথম দিন থেকে জানে, শাস্ত্র যাই বলে থাকুক, গীতা মে লিখা হ্যায়, এর কোন দাম নেই।

একজন মহারাজ মজা করে বলতেন, কেউ সরকারি অফিসে গেলে ওরা তাকে কথায় কথায় আইন শুনিয়ে দেবে। পুলিশ, উকিল, যার কাছেই যাবে আইনের কথা শুনিয়ে দেবে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি শোনায় অফিসাররা। সরকারি অফিসে অফিসারের কাছে কোন কাজের কথা বলতে গেলে দেখিয়ে দেবে, এই আইনে এই কাজ করা যাবে না। আর সাধুদের কাছে যদি যান, ওনারা ফরর ফরর করে সংস্কৃতে দুটো শাস্ত্রের কথা বলে আমাদের একটা কিছু প্রতিপাদন করে দেবেন। তাহলে উপায় কি? উপায় মহাপুরুষদের জীবন। হিন্দু ধর্মের নিন্দুকরা হিন্দুদের নিন্দা করে বলে, হিন্দু ধর্ম কোন ধর্মই না। কিন্তু জানে না যে, হিন্দু ধর্মই ধর্ম। কারণ হিন্দুদের ধর্ম চিরন্তন সত্যের উপর আধারিত। কিন্তু আমরা হিন্দু ধর্মের সব সত্য নিতে পারব না, আমার নেওয়ার দরকারও নেই। ঠাকুর খুব সহজ উদাহরণ দিয়ে সুন্দর বলছেন, একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিয়ে একটা দানা খেয়ে তার পেট ভরে গেছে, আরেকটা দানা মুখে করে এবার সে বাড়ি যাচ্ছে, আর বলছে, পরের বার এসে পুরো পাহাড়টা নিয়ে যাব। এটা আমাদের জন্য নয়।

আমাকে দেখতে হবে, আমি মহাপুরুষদের মধ্যে কাকে ভালবাসি। শ্রীকৃষ্ণ আছেন, চৈতন্য মহাপ্রভু আছেন, শ্রীরামচন্দ্র আছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন, আমাকে নিজে দেখতে হবে এনাদের মধ্যে আমার মনের মত কে। এবার তাঁর জীবনের ছাঁচে আমাকে ঢালতে হবে। ওনাদের জীবনে কখন বেতালা পা পড়ে না। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, কোন কিছুতে তাঁর বেতালা পা পড়বে না। ওনারা কক্ষণ কাউকে বলবেন না, আমি যেটা বলছি তুমি শোন, আমি যেটা করি সেটা কক্ষণ করবে না। এনারা বলবেন, আমি ষোল আনা করেছি, তুমি এক আনা কর। এই বুকের পাটা যদি থাকে তাহলে, উপনিষদের ঋষির মত বলতে পারবেন, *বেদাহমতং পুরুষং মহান্তম্*, আমি এটা দেখেছি, তুমি এসো তুমিও দেখতে পারবে। এই যে জোশ, আমি দেখেছি, তুমিও দেখবে, এটাই আসল ধর্ম। আমাদের বাইবেলে আছে, আমাদের বেদে আছে, আমাদের কোরাণে আছে; আছে তো আছে, নিকুচি করেছে, আমি বিশ্বাস করি না তোমার কথা। তুমি একজনকে নিয়ে এসো, ওইটাকে পালন করে কে মহাপুরুষ হয়েছেন?

অনেক আগেকার কথা। একজন মহারাজ একটা ইয়ুথ কনফারেন্সে ভাষণ দিতে যাচ্ছিলেন। আর-একজন মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কিসের উপর লেকচার দেবেন মহারাজ'? উনি বললেন, 'স্বামীজী হলেন যুবকদের আদর্শ'। 'খুব ভাল কথা, আচ্ছা মহারাজ যদি কোন যুবক আপনাকে জিজ্ঞেস করে, আমি কোটিপতি হতে চাই, আজ একশ বছরে কেউ কি আছেন যিনি স্বামীজীর আদর্শকে নিয়ে কোটিপতি হয়েছেন? আপনি কি উত্তর দেবেন'? বক্তা মহারাজ ওই মহারাজের উপর প্রচণ্ড রেগে গেলেন। কারণ আমরা এ-রকম কাউকে জানি না, যিনি গর্ব করে বলতে পারবেন, স্বামীজীর আদর্শকে নিয়ে আমি একজন ব্যবসায়ী হয়ে কোটিপতি হয়েছি। অথচ এটা খুব সহজে হওয়া যায়। গুজরাতের একজন সফল ব্যবসায়ীকে আমরা জানি, যিনি স্বামীজীর আদর্শকে নিয়ে বিরাট ধনী ব্যবসায়ী হয়েছিলেন। লোকেরা যদিও এটা করে না, কিন্তু খুব সহজে হতে পারে। কারণ স্বামীজীর আদর্শে যত বেশি ঢুকতে যাবে, ওরা ত্যাগ বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

মানুষ জীবন্ত আদর্শ দেখতে চায়। ঠাকুরের কথামৃত পড়ে মনে দাগ কাটতে পারে, কিন্তু কেউ যদি বলে, আমি একটু দেখতে চাই কথামৃত পড়ে আপনাদের এখানে কি ফল হয়েছে? এই রামকৃষ্ণরূপী যে বৃক্ষ, এর ফল কি? এই আদর্শ পালন করে আপনার কি হয়েছে? ঠিক তেমনি শাস্ত্রকে যিনি গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেছেন, শাস্ত্রকে আধার করে জীবন চালিয়েছেন, তার ফল কি? শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন তার ফল, শ্রীকৃষ্ণ তার ফল, চৈতন্য মহাপ্রভু তার ফল, শঙ্করাচার্য তার ফল। এবার আপনি ঠিক করুন, আপনি কাকে নেবেন। আপনাকেও পরে এই আদর্শ হতে হবে।

অর্জুনকে ভগবান বলছেন, অর্জুন তুমি এই জিনিসটা ভাল করে বোঝ। বুঝে নিয়ে নিজের জীবনকে ধন্য কর, তোমাকে যোগী হতে হবে। আগে আগে মুমুক্ষুরা যাঁরা ছিলেন, যাঁরা জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরা সবাই দুই প্রকার কাজ করেছিলেন। প্রথমে আত্মশুদ্ধির জন্য কাজ করেছিলেন, দ্বিতীয়, যখন অনেকটা উন্নত হয়ে গেছেন, কিংবা যদি জ্ঞান হয়ে থাকে, তখন তাঁরা লোকসংগ্রহের জন্য কাজ করতেন। লোকসংগ্রহ মানে, চারজনকে শিক্ষা দেওয়া, যাতে পিছিয়ে থাকা মানুষরাও এই পথে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে পারে। এরপর বলছেন, যদি তুমি যোগী হতে চাও, তাহলে তোমাকে তিনটে জিনিস বুঝতে হবে।

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ।।১৬।।

(কর্ম কি এবং অকর্ম (কর্মের অভাব) কি – এই বিষয়ে পণ্ডিতরাও ভ্রান্ত হন। অতএব যেটা জানলে সংসাররূপ অশুভ থেকে মুক্ত হবে, সেই কর্ম ও অকর্ম তোমাকে বলব।)

কর্ম কি, অকর্ম কি, কবি অর্থাৎ মহাপুরুষরাও বুঝতে পারেন না, মোহিত হয়ে যান। *তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি*, আমি তোমাকে সেই কর্মরহস্য বলব, যেটাকে জেনে তুমিও একজন মহাপুরুষ হয়ে যাবে। *যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ*, মুক্তি কি? অশুভ থেকে মুক্তি। অশুভ কি? সবটাই, জন্ম-মৃত্যু, পাপ-পূণ্য, ধর্ম-অধর্ম, সবটাই অশুভ। শেষ অবস্থায় গিয়ে মানুষ যখন মুক্তির দিকে যায়, সেখানে ধর্মও বন্ধন, পূণ্যও বন্ধন। খ্রীশ্চানরা এগুলো শুনলে ঘাবড়ে যায়, কি সব বলছে! পরের শ্লোকে ভগবান খুব মজার কথা বলছেন –

কর্মণো হ্যাপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ।।১৭।।

(শাস্ত্রবিহিত কর্মের, নিষিদ্ধ কর্মের ও অকর্মের তত্ত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক। কারণ শাস্ত্রবিহিত কর্ম, অকর্ম ও নিষিদ্ধ কর্মের স্বরূপ (তত্ত্ব) অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়।)

আগের শ্লোকে ভগবান বললেন, অর্জুন তোমাকে আমি তিনটে জিনিস বলব, কর্ম কি, বিকর্ম কি এবং অকর্ম কি। তোমাকে বলার দুটো কারণ, একটা কারণ হল, কর্মের গতি কেউ বুঝতে পারে না, মানুষ বুঝতে পারে না কর্ম জিনিসটা কি। আর যদি তুমি একবার বুঝে নিতে পার, আর সেই রকম আচরণ যদি তুমি কর, তাহলে তুমি যোগী হয়ে যাবে, অশুভ থেকে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। পর পর সাত আটটা শ্লোকে ভগবান যা বলবেন, সেটার একটা ছোট্ট ভূমিকা যদি দিয়ে দেওয়া হয়, এই শ্লোকগুলিতে ভগবান কি বলতে চাইছেন, তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে।

প্রত্যেক ধর্মে কর্ম বিভিন্ন ধরণের হয়, হিন্দুদেরও রয়েছে, তার সাথে কিছু টেকনিক্যাল শব্দও রয়েছে। হিন্দু ধর্মেও চার-পাঁচ ধরণের কর্মের কথা বলা হয়। প্রথমটাকে বলে নিত্যকর্ম, যে কর্ম আমাদের রোজ করতে হবে। যেমন জপ, ধ্যান, পূজা, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, এগুলো সব নিত্যকর্ম; রোজ করতে হয়। দ্বিতীয় হল নৈমিত্তিক কর্ম, যখন দিন দেখে, সময় দেখে আর ঋতু দেখে কিছু পূজা পার্বণ করা হয়। যেমন শরৎকাল আসছে, দূর্গাপূজা হবে, এটা হয়ে গেল নৈমিত্তিক কর্ম। ছেলের উপনয়ন করাতে হবে, ষোড়শ সংস্কার করতে হবে, এগুলো নৈমিত্তিক কর্ম। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম ধর্মজীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যাঁরা গৃহস্থ ধর্মে আছেন, তাঁদের আর-একটা কর্ম থাকে, যাকে কাম্য কর্ম বলা হয়। কামনা ও বাসনা নিয়ে যখন কিছু কর্ম করা হয়, এটা কাম্য কর্মের মধ্যে পড়ে। আমার টাকা পয়সা চাই, এটা চাই, সেটা চাই। কাম্য কর্ম হল তৃতীয়। চতুর্থ হল প্রায়শ্চিত্ত কর্ম, তীর্থাদিতে যাওয়া, একাদশী করা, ব্রত পালন করা, এগুলো সব প্রায়শ্চিত্ত কর্ম। জান্তা অজান্তায় যে পাপকর্ম হয়েছে, প্রায়শ্চিত্ত কর্মের দ্বারা সেগুলোর শুদ্ধি হয়ে যায়। পঞ্চম একটা আছে, এটা কর্ম না, এটাকে বলে নিষিদ্ধ কর্ম, যে কর্ম করতে নেই। মানুষ যে গ্রন্থ বা শাস্ত্রকে নিয়ে চলে, সেই শাস্ত্র বলে দেয় কোন কোন কর্ম নিষিদ্ধ কর্ম।

বিভিন্ন শাস্ত্রে কর্ম, বিকর্ম, অকর্মের ব্যাখ্যা বিভিন্ন রকমের হয়। এখানে বিকর্ম বলতে নিষিদ্ধ কর্মকে বলতে চাইছেন। আচার্য বিকর্মকে বলছেন শাস্ত্রবর্জিত, *বিকর্মণঃ শাস্ত্রপ্রতিসিদ্ধস্য*, প্রতিসিদ্ধ শব্দের অর্থ নিষিদ্ধ কর্ম। শাস্ত্রে যে কর্ম করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেই কর্মকে বলছেন বিকর্ম। কর্ম হল, যে কর্ম তোমার করা দরকার। অকর্ম হল, আত্মজ্ঞানের দর্শনটা বুঝে নেওয়া। আত্মজ্ঞানের দর্শনকে যদি বুঝে নেওয়া যায়, তখন বোঝা যায় পুরো জিনিসটা কি। কর্ম করছে, অথচ ওটা কর্ম না, এটা কখন হয়?

যে কোন কাজের আগে থাকে স্পৃহা। স্পৃহা থেকে কামনা বাড়তে শুরু হয়, সে কামনা বৃদ্ধি হলে মানুষ তখন কর্ম করতে প্রবৃত্ত হয়। একটা পাগল রোজ সকালবেলা একটা লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। রাস্তার ধারে যত মাটির চায়ের ভাড় পড়ে আছে, সেগুলোকে সে লাঠি দিয়ে ভাঙতে থাকে।

সারা দিন ভাঙার পর বিকাল হলে বলে, 'উঃ আর পারি না'। তোমাকে কে বলেছে চায়ের ভাড় ভাঙতে? পাগল সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একটা লাঠি নিয়ে রাস্থার পাশে, নর্দমার পাশে যত মাটির ভাড়, হাড়ি পড়ে আছে, সেগুলো ভেঙে বেড়াচ্ছে। আমরা যদি বিচার করে দেখি, আমরা বেশির ভাগ সময় রাস্থার ভাড় ভেঙে বেড়াচ্ছি, আর মনে করছি কত কি করছি। রাস্থায় পড়ে থাকা মাটির চায়ের ভাড় ভাঙা ছাড়া আমরা আর কিছু করি না।

কিন্তু তার একটু উপর যেটা করছি, সেখানে থাকে স্পৃহা। মনে একটা হাল্কা ইচ্ছা জাগল, সেই ইচ্ছা কামনাতে পরিবর্তিত হয়ে যায়, তারপর সেই কামনা কর্মে রূপান্তরিত হয়। যখন কাজ করতে শুরু করি, তখন সেই কর্মে আমরা পুরোদমে ডুবে যাই। যে কোন কাজ যখন করব, তখন সেই কাজ ভাল মন্দ ফল দেবেই। জপ করছি, সেও ফল দেবে, কারুর ক্ষতি করছি, সেও ফল দেবে, কাউকে গালাগাল দিচ্ছি, তাও ফল দেবে। আর সেই ফল, তা ভাল ফলই হোক আর মন্দ ফলই হোক, আমাকে বাঁধবেই। উচ্চ পর্যায়ে ধর্মটাও বন্ধন, আমি শুভ কাজ করছি, সেটাও আমাকে বাঁধবে। এখানে আমরা সাধারণ লোকের কথা বলছি না, এখানে খুব উচ্চমানের কথা বলা হচ্ছে – যোগী কিভাবে হয়, কর্মযোগী কিভাবে হওয়া যায়।

তাহলে আমরা এই কর্মবন্ধন থেকে বাঁচব কি করে? পুরো গীতার আলোচনা এটাকে কেন্দ্র করেই চলে। সংসার হল কর্মবন্ধন, মোক্ষ হল সংসার থেকে, অর্থাৎ কর্মবন্ধন থেকে বেরিয়ে যাওয়া। সংসার থেকে বেরিয়ে আসা মানেই, এই কর্মবন্ধন থেকে বেরিয়ে আসা। আগের একটা শ্লোকে বলা হয়েছিল, *কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি*, তোমার কর্মবন্ধন কেটে যাবে। কর্মবন্ধন আমরা কাটব কি করে? যোগী কি করে হব? আমি শ্রেষ্ঠ পুরুষ কিভাবে হব? এই জগতের একজন বন্দনীয়, স্মরণীয় পুরুষ আমি কি করে হব? ভগবান তখন বলছেন, অর্জুন তুমি শোন, জগতের যিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তিনি যে পথ দিয়ে চলেছেন, তুমিও সেই পথকে অনুসরণ কর। কয়েকটা শ্লোক আগে যেমন ভগবান বললেন, *কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্*, আগেকার ঋষিরা যেভাবে সব কিছু করেছেন, তোমাকেও সেই ভাবে সব কিছু করতে হবে। প্রথম কথা হল, গীতা মোক্ষশাস্ত্র, দ্বিতীয় কথা হল, আমি শ্রেষ্ঠ পুরুষ হতে চাইছি, আমি যোগী হতে চাইছি।

ভগবান এখানে বলছেন, যদি তুমি যোগী হতে চাও, তাহলে তোমাকে আগে কর্মরহস্য বুঝতে হবে। কর্মরহস্য তোমাকে এইজন্য বুঝতে হবে, প্রত্যেক কর্মের পিছনে কামনা আছে, স্পৃহা আছে। কামনা ও স্পৃহা আছে বলে, কর্ম যখন ফল দেবে, সেই ফল ভাল হবে, মন্দ হবে; তুমি যাই কর, এই ভাল ও মন্দ ফল তোমাকে বাঁধবে। দেববাণীতে স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, তুমি একজন ভাল মানুষ, সেইজন্য তুমি গর্ব করো না, তোমার প্রবৃত্তি তোমাকে করাচ্ছে বলেই তুমি আজ একজন ভাল মানুষ। প্রবৃত্তি কিভাবে আমাকে দিয়ে করায়? আমি অনেকদিন ধরে কিছু করছি, করতে করতে ওটাই আমার প্রবৃত্তি হয়ে গেছে, এরপর আমি মন্দ কাজ করতেই পারব না, এটাই বন্ধন। আর যে মন্দ কাজ করছে, মন্দ কাজ করে করে সে এমন হয়ে গেছে যে, ভাল কাজে তার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। যদি তুমি ভাল হও, এতে তোমার গর্ব করার কিছু নেই। যদি আমি কাউকে দেখি যে সে একটা মন্দ লোক, সেইজন্য তার নিন্দা করার কোন কিছু নেই, কারণ সে তার নিজের সংস্কারে আবদ্ধ। তার যে সংস্কার, এটা ঠিক যে সেটা তার নিজের চেষ্টা দিয়েই তৈরী হয়েছে, কিন্তু বাঁধা। আমি এখন এই বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে চাইছি, শুভ ও অশুভ দুটো থেকেই মুক্তি। আর শেষ যে মুক্তি, সংসার থেকে, জন্মমৃত্যু চক্র থেকে মুক্তি, তার জন্য ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পূণ্য সবটাই অশুভ। উপায় হল, আগেকার যাঁরা মুমুক্ষু, তাঁদের পথে চল। একই কথা কয়েকবার করে বলতে হচ্ছে, তা নাহলে ধারণা হবে না।

তাঁরা কিভাবে কাজ করেছিলেন? এখানে মুক্ত পুরুষদের কথা বলছেন, মুমুক্ষুদের কথা বলছেন, যাঁরা মুক্তির চেষ্টায় লেগে আছেন। বলছেন আগেকার দিনের মুমুক্ষুরা নিরন্তর কাজ করতেন। তাঁরা দুটি কারণে নিরন্তর কাজ করতেন। প্রথমতঃ তাঁরা আত্মশুদ্ধির জন্য কাজ করতেন। বেশির ভাগ লোকেদের মধ্যে কিছু আছে যারা কোন কাজ করে না, আর যারা কাজ করে তারা আত্মশুদ্ধির জন্য কাজ করে না। আত্মশুদ্ধি এমন কিছু কঠিন না। খুব কম করে সাত দিন আর তা নাহলে তিন দিনও এই জিনিসটা করুন। আপনার বাড়িতে যিনি আপনার ইষ্ট, যদি ইষ্ট না থাকে, ঘরে ঠাকুর বা স্বামীজীর একটা ছবি লাগিয়ে নিন। তারপর বলুন, গীতার কথা শুনে আমি একটা পরীক্ষা করছি, আমি এখন থেকে যত কাজ করব, সব কাজ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে করব। রান্না করব, ঠাকুরের উদ্দেশ্য, রান্নার পর আগে ঠাকুরকে অর্পণ করব, তারপর আমরা সবাই খেতে বসব। যারা মদ খায় তারা কি করবে? ঠাকুর মা স্বামীজী তো মদ খেতেন না। ঠাকুরের কাছে অনেকে আসতেন যাদের মদের নেশ ছিল, তাদের ঠাকুর বলতেন, যেটাই খাবে মা কালীকে নিবেদন করে খাবে, আর অতটাই খাবে যাতে পা যেন না টলে। সেইভাবে আপনিও বলুন, হে প্রভু, তুমি তো জগৎস্রষ্টা, তোমার চরণে আমি নিবেদন করে এইটুকু খাচ্ছি। আপনি তামাক খান, সিগারেট খান, ড্রাগস খান, ঠাকুরের পায়ে অর্পণ করে গ্রহণ করুন। যা কিছু করছেন, ঠাকুরকে অর্পণ করে করুন, তিন দিন করে দেখুন। যার উপর রেগে আছেন, তাকে গালাগাল দিয়ে যে আনন্দ হয়, তার থেকেই এটা করে বেশি আনন্দ পাবেন। কারণ এটা মুক্তির আনন্দ। কাউকে গালাগাল দিয়ে কেন আনন্দ হয়? এখানে সেই মুক্তির আনন্দ। তার উপর রাগে ভিতরটা যে হাঁসফাস করছে, গালাগালি দিয়ে যেমনি রাগটা বেরিয়ে গেল, শান্তি হয়ে গেল। ভিতরে খুব বেদনা, হঠাৎ যদি চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে, তারপর খুব ভাল লাগে। কেন? ওই বেদনা থেকে মুক্তির আনন্দের জন্য ভাল লাগে।

গীতায় পরে আসবে, কর্মকে কিভাবে যজ্ঞে পরিণত করতে হয়। ভগবান বলছেন, আগেকার মুমুক্ষুরা আত্মশুদ্ধির জন্য নিরন্তর এটাই করতেন। এখান থেকে আত্মোন্নতির খুব উপরের স্তরে চলে যাওয়ার পর এনারা লোকসংগ্রহের জন্য কাজ করতেন। এই দুটোর বাইরে যদি কোন কাজ করা হয়, সেটাই কর্মবন্ধনের কারণ হয়ে যাবে। যে কোন কাজ যদি আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে করা না হয়ে থাকে, কিংবা লোকসংগ্রহের জন্য যদি না করা হয়, তাহলে জানবেন এই কর্মটাই আপনার বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। নিরন্তর যদি না লেগে থাকা হয়, আমি যে কাজ করছি, এটা আমি আত্মশুদ্ধির জন্য করছি আর তা নাহলে অপরের মঙ্গলের জন্য করছি, এই দুটোকে সামনে রেখে যদি কাজ না করা হয়, সেটাই হয়ে যাবে বন্ধন। স্বামীজী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্থাপন করার পর, এই মঠ ও মিশনের জন্য ঠিক এই আদর্শই দিলেন, *আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ*। যে কোন কাজ যখন করা হবে, তখন এই দুটোকেই বা এর যে কোন একটাকে সামনে রাখতে হবে, হয় *আত্মনোমোক্ষার্থং*, নয় *জগদ্ধিতায়*; সিদ্ধির অন্য কোন পথ নেই।

আমাদের হাজার বছর আগে যেতে হবে না, ঠাকুর সময়ে যাঁরা ছিলেন, স্বামীজীর সময় তাঁরাও এভাবেই কাজ করেছেন। ভগবান বলছেন, যদি এভাবে কাজ না করা হয়, তাহলে আধ্যাত্মিক জীবনের বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে। প্রথমের দিকে মনে হতে পারে, জাগতিক দৃষ্টিতে আমরা বিরাট উপরে উঠে যাচ্ছি, আর ঠিকই হয়ত উঠছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে তার সর্বনাশ হয়ে যাবে। যার জন্য, পরের জন্মের কথা ছেড়ে দিন, এই জন্মেই বয়স হয়ে গেলে দেখবেন, প্রচুর কষ্ট পাচ্ছেন। এই রহস্য; কর্ম কি, অকর্ম কি, বিকর্ম কি, যাঁরা পণ্ডিত, পণ্ডিত মানে সমাজে যাঁদের আমরা প্রতিষ্ঠিত মনে করি, তাঁরাও বুঝতে পারেন না।

কথামৃতে ঠাকুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, বিদ্যাসাগরের ভিতরে সোনা চাপা আছে, খবর নাই। সত্ত্বগুণী যাঁরা, তাঁরা এই রকমই হয়। স্পৃহা সব সময় হয় মন থেকে, মন যখন কোন জিনিস করে, সে সব সময় ইন্দ্রিয়কে দিয়ে করায়; তার মানে যে কোন কাজে,

ঈশ্বরের ধ্যান যখন করছি, ঈশ্বরের জপ যখন করছি, তখন কে কাজ করছে? ইন্দ্রিয় আর মন। আর ইন্দ্রিয় এবং মনের পিছনে যে আসল সত্তা আত্মা, আত্মা কক্ষণ কোন জিনিসে কাজ করেন না। যদি আমি যোগী হতে চাই, তাহলে আগে আমাকে বুঝতে হবে জগৎটা হল বস্তু বা পদার্থ। এই বস্তুর উপর আমরা কাজ করি আমাদের অঙ্গগুলি দিয়ে, হাত দিয়ে, পা দিয়ে। আর সেই খবরটা আগে আমাদের কাছে আসে আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে। জ্ঞানেন্দ্রিয় আর কর্মেন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করে মন। তার মানে, আমরা যে কাজই করছি, সব কাজের আসল কর্তা হল মন, আত্মা নন। যখনই যেখানে যে কাজই হয়, ভাল কাজ হোক, মন্দ কাজ হোক, তার আসল কর্তা হল মন। আত্মা, যিনি আসল কর্তা, তিনি কোন কাজে জড়ান না। এই জিনিসটাকে আগে খুব ভাল করে বুঝে নিতে হয়।

কথামৃতে ঠাকুর এই জিনিসটাকে খুব সুন্দর একটা কাহিনী দিয়ে বলছেন। কাহিনীটা হল, ব্যাসদেব যমুনা পার হবেন, সেখানে গোপীরাও আছেন, তাঁরাও যমুনা পার হবেন। কিন্তু কোন মাঝি নেই। গোপীরা ব্যাসদেবকে বলছেন, কিছু উপায় করুন। ব্যাসদেব বলছেন, উপায় তো পরে হবে, কিন্তু এখন আমার খুব খিদে পেয়েছে, তোমাদের কাছে কি আছে খেতে দাও। গোপীরা তাঁদের কাছে যত ননী, ক্ষীর ছিল সব ব্যাসদেবকে খেতে দিলেন। ব্যাসদেব সব খাওয়ার পর বলছেন, 'হে যুমনে, আমি যদি কিছু খেয়ে না থাকি, তাহলে তুমি আমাকে পথ দিয়ে দাও'। বলতেই, যমুনা দু ভাগে ভাগ হয়ে গেল, মাঝখান দিয়ে সবাই যমুনা পার হয়ে গেলেন। গোপীরা ভাবছেন, এই মাত্র ইনি এত কিছু খেলেন, কিন্তু কেন বললেন, 'আমি যদি কিছু খেয়ে না থাকি'? প্রথম প্রথম কথামৃত যাঁরা পড়বেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন না, ঠাকুর এই কাহিনীর মাধ্যমে এখানে কি বলতে চাইছেন। যিনি সাধক, তিনি আহারকে মনে করেন, ভিতরে যে জঠরাগ্নি রয়েছে, সেখানে তিনি আহুতি দিচ্ছেন। ব্যাসদেবের মত জ্ঞানীরা জানেন তাঁরা শুদ্ধ আত্মা, তাঁরা এখানে দেখছেন ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ার্থের উপর কাজ করছে, ইন্দ্রিয়ার্থ হল এই জগৎ, বস্তু। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা একটা শ্লোক পেয়েছিলাম, যেখানে বলা হয়েছিল, *ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ*, ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের উপর দৌড়াচ্ছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এটাকে বিস্তারে আলোচনা করেছিলাম, যিনি এভাবে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সম্পর্ককে জানেন, আত্মা কখন এদের ব্যাপারে জড়ান না।

এবার আপনি কর্মরহস্যটা বুঝতে পারবেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেখানে বলা হয়েছিল, যাঁরা এটাকে জানেন *তস্য প্রজ্ঞাঃ প্রতিষ্ঠিতঃ*। গীতাতে মানুষ যখন এই জিনিসগুলো শোনেন, আত্মা কোন কাজ করেন না, এখানে এসে তাঁরা জিনিসটাকে ধারণা করতে না পেরে নানা রকম প্রশ্নে সংশায়চ্ছন্ন হয়ে পড়েন এবং জীবনটা তাঁদের এলেমেলো হয়ে যায়। দক্ষিণেশ্বরে একজন ছিল, যে অনেক অসৎ কাজ করে বেড়াত। ঠাকুর যখন তাঁকে বলছেন, লোকটি বলছেন, সবটাই মিথ্যা, আমার এগুলোও মিথ্যা। মিথ্যা বলতে, আমার আত্মা তো এগুলোতে জড়াচ্ছে না। তাঁর উত্তর শুনে ঠাকুর প্রচণ্ড রেগে গেলেন। এটাকে নিয়ে একটা নোংরা শব্দ আছে, বাইরে অনেকে বলে পাঞ্জাবী বেদান্ত। উত্তর ভারতে অনেক পাঞ্জাবী সাধু, ওরা ঠিক এই ভাষাই ব্যবহার করে। ওদের কাছে সব কিছুতেই জগৎ মিথ্যা। কোন সাধু কোন মেয়ের সাথে জড়িয়ে পড়ছে, সেটাকেও বলে মিথ্যা। কেন মিথ্যা? ত্রিকাল মে জগৎ নহি হ্যায়। এভাবে বেদান্ত হয় না, তুমি ভাবের ঘরে চুরি করছ, তোমার সততা নেই। যদি তোমার দম থাকে তাহলে তুমি বল, নারীসঙ্গের ব্যাপারে আমার এখনও দুর্বলতা আছে। কিন্তু এটা বলা কখনই ঠিক না যে, আমি তো এসব কিছু করছি না, আমি তো শুদ্ধ আত্মা। খিদে পাওয়ার সময় তো তোমার এটা মনে হচ্ছে না যে, খিদে আমার পাচ্ছে। খুব সূক্ষ্ম মন না হলে এই জিনিসটাকে ধরা যায় না।

আমরা যখন বলি কাজ না করা, কাজ না করা তো সবাই জানে, হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা। কিন্তু বলছেন, কাজ না করা মানে তা নয়। কাজ না করা মানে হয়, আত্মা কোন কাজ করেন না, এই জিনিসটাকে বুঝে নেওয়া। এই আলোচনাটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, আজকের এই আলোচনাটা

যিনি ঠিক ঠিক বুঝে নিতে পারবেন, তাহলে জানবেন, তিনি কর্মের রহস্যটা অনেকটাই বুঝে নিয়েছেন। তাহলে অর্জুন যখন বলছেন, আমি যুদ্ধ করব না, তখন বলতে চাইছেন, আমি কাজ করব না, কিন্তু এটাও কাজ। কারণ মন ওখানে একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, আমি কাজ করব না, এই সিদ্ধান্ত নেওয়াটাও একটা কাজ। আমরা প্রথমে স্পৃহার কথা বলেছিলাম, স্পৃহা, কামনা, সব মন দিয়েই হচ্ছে। ঠিক তেমনি, মন যখন বলছে আমি কাজ করব না, আমি হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকব, এটাও কিন্তু কাজ। আমার 'পরম' উপন্যাসে একজন মুচি ঠিক এই কথা বলছে, আমার যদি অনেক টাকা হয়ে যায়, তারপর আমাকে যদি আর কাজ না করতে হয়, সেটাও তো একটা কাজ। কাজ না করাটাও কাজ। আমি বলছি, এখন আমি চুপচাপ বসে থাকতে চাই, কোন কাজ করব না। চুপচাপ বসে থাকাটাও একটা কাজ। যিনি জ্ঞানী, একমাত্র তিনিই কাজ করেন না। কেন কাজ করেন না, তিনি জানেন তিনি আত্মা; তিনি নিজেকে আত্মার সঙ্গে আইডেন্টিফাই করে রেখেছেন, তিনি আত্মার সাথে এক। কোন আত্মার সঙ্গে? যে আত্মা কক্ষণ কাজ করেন না।

শ্রীকৃষ্ণ যে এত বড় যুদ্ধ করছেন, করাচ্ছেন, তিনিও কোন কাজ করছেন না, কারণ তিনি জানেন তিনি আত্মা। অন্য দিকে অর্জুন যখন বলছেন, আমি যুদ্ধ করব না, অর্জুন তখন কিন্তু কাজ করছেন। কারণ অর্জুন মন দিয়ে প্রভাবিত, মন চলছে বলে কাজ করছেন। এটাই আশ্চর্যের যে, অর্জুন যখন বলছেন, আমি যুদ্ধ করব না, তখন এটাও কাজ। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করাচ্ছেন, যুদ্ধে সারথির কাজ সামলাচ্ছেন, মানে যুদ্ধে সরাসরি লিপ্ত, অথচ তিনি কিন্তু কোন কাজ করছেন না। এখানে tricky কোন কিছু নেই, এটা অত্যন্ত সহজ জিনিস, যিনি জানেন আমি শুদ্ধ আত্মা, তিনি কোন কাজ করেন না। যাঁদের জ্ঞান হয়েছে, তাঁরা জানেন, তাঁরা কক্ষণ কোন কাজ করেন না। যাঁরা ওই অবস্থায় পৌঁছাননি, তাঁরা বুঝতে না পেরে এলেমেলো করে বসেন।

এটাকে বুঝতে হলে শুধু আমাদের মনে করতে হবে, শ্রীকৃষ্ণ আছেন আর শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করাচ্ছেন, আর শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে উপদেশ দিচ্ছেন। আমাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করাচ্ছেন আর শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন এক অপরকে দেখবেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ দেখবেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ণ আত্মা, তিনি কোন কাজ করছেন না, ঠিক তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখছেন, তিনি পূর্ণ আত্মা, তিনি কোন কাজ করছেন না। তাহলে কাজ কে করছে? তাঁর ইন্দ্রিয় কাজ করছে, তাঁর মন কাজ করছে, তিনি কোন কাজ করছেন না, তিনি এগুলো থেকে আলাদা। স্বামীজী বিদেশে গিয়ে কত কাজ করলেন, আসলে এগুলো কোনটাই কর্ম না, কারণ সেখানে স্বামীজীর ইন্দ্রিয়গুলি কাজ করছে, আসল যে তিনি, তিনি কখনই কোন কাজ করছেন না। এটাই হল কর্মরহস্য, এটাকে যিনি বুঝে নিলেন তিনি যোগী হয়ে গেলেন। সত্যিকারের যে অকর্ম, যেখানে কাজ করা হচ্ছে না, সেখানে দুটো জিনিস থাকে না, একটা হল কোন ধরণের স্পৃহা বা কামনা সেখানে থাকবে না। এটা তখনই সম্ভব, যখন তিনি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হলে এই জিনিস কখনই হবে না।

ইদানিং ছেলে মেয়ে উভয় উভয়কে দিনরাত বলে যাচ্ছে, জানো, আমি তোমাকে কেমন নিঃস্বার্থ ভালবাসি। ভালবাসা মানেই তো তোমার স্বার্থ আছে। ভালাবাসা মানেই সেখানে স্বার্থ আছে, নিঃস্বার্থ কি করে হবে? কিন্তু বলার সময় এই কথা বলবে, জানো, তোমার আমার প্রেম পুরো অন্য রকমের, পুরো আলাদা। প্রেম আবার আলাদা হয় নাকি, সব প্রেম সেই একই প্রেম। তার শরীর, মনের সেখানে কিছু একটা ভাল লেগে গেছে, জোঁকের মত এবার এঁটে গেছে। এরপর এই জোঁক আর ওই জোঁক দুজন দুজনকে শুষবে। যেখানেই মন সেখানেই স্বার্থ থাকবে, আর মনের বাইরে কিছু হয় না। যিনি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বা আত্মজ্ঞানে ছুঁই ছুঁই অবস্থা, তিনিই একমাত্র স্পৃহা শূন্য হন। আর যাঁরা সাধক, প্রাণপন চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তিনি যা করছেন আত্মশুদ্ধির জন্য করছেন, তখন সেটাকে আমরা আর স্পৃহা বলতে পারি না, কারণ তিনি বলে দিয়েছেন, আমি আত্মশুদ্ধির জন্য

করছি। ঠাকুর যেমন বলছেহ, মিছরি মিষ্টির মধ্যে না, তেমনি ঈশ্বর দর্শনের ইচ্ছা ইচ্ছার মধ্যে না। কারণ মানুষ তখন নিজের আসল অবস্থায়, নিজের স্বরূপে যেতে চাইছে, এটা স্পৃহার মধ্যে পড়ে না। যদি বলেন, না এটা স্পৃহা, তাহলে এই স্পৃহাটা হল আত্মজ্ঞানের প্রতি যাওয়া। ওনারা কিন্তু এখানে আত্মজ্ঞানের স্পৃহাকে স্পৃহার মধ্যে নিচ্ছেন না।

স্পৃহা হয় যেখানে মানুষ জাগতিক ক্ষেত্রে বড় হতে চায়, জাগতিক জিনিসকে পেতে চায়। সেইজন্য কোথাও যদি একটু 'আমি' লেগে যায়, ঋষিরা ওটা করতে পারেন না। এটা খুব সুন্দর দেখা যায়, ঠাকুর ইচ্ছে হল, তিনি তাঁর পূর্বজদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করবেন, গঙ্গায় নেমে জল দেবেন কিন্তু দেখছেন আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে সব জল গড়িয়ে পড়ছে, এটাকেই বলে গলিতহস্ত। ঋষিরা সবাই এই রকমই হন, কোথাও যদি আমিত্ব লাগায়, ওটা আর তাঁরা করতে পারেন না। এখন মুমুক্ষুরা যে কাজ করেন, আত্মশুদ্ধির জন্য, আর লোকসংগ্রহের জন্য, এটাই কাজ, এর বাইরে কোন কাজ হয় না। যাঁরা আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, তিনি জানেন তিনি আত্মা, আত্মা কোন কাজ করে না, তিনিও মনে করেন আমি কোন কাজ করছি না, ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের উপর কাজ করছে; যেমন জামা ছিঁড়ে গেলে আমরা বলি না যে আমি ছিঁড়ে গেছি, আমার জামা ছিঁড়ে গেছে। এই হল সতের ও আঠারো শ্লোকের মূল বক্তব্য। এখান থেকে আমরা মূল শ্লোকের আলোচনায় যাব।

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ।।১৮।।

(যিনি কর্মে অকর্ম ও অকর্মে কর্ম দর্শন করেন, তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে জ্ঞানী ও যোগযুক্ত এবং সর্ব কর্মের কর্তা। এটাই কর্ম ও অকর্মের বোদ্ধব্য রহস্য। এই জ্ঞানে মুক্তি লাভ হয়।)

কর্মের মধ্যে যিনি অকর্ম দেখেন আর অকর্মের মধ্যে যিনি কর্ম দেখেন, তিনিই হলেন বুদ্ধিমান মানুষ। আগের শ্লোকের আলোচনায় ব্যাসদেবের গল্প বলা হল, মাখন, ক্ষীর খেয়ে বলছেন আমি কিছু খাইনি। কেন এভাবে বলছেন? কারণ তিনি নিজেকে শুদ্ধ আত্মার সাথে অভেদ দেখছেন, সেই ব্যাসদেবের পেটের খিদে পেয়েছে, কিন্তু ওই পেট ব্যাসদেব নন, আমরা কিন্তু জানি পেট আমার। রাজযোগের সমাধিপাদে চার নম্বর সূত্রে বলছেন, *বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র*, আবার তার আগের সূত্রে বলছেন, *তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্;* সমস্ত বৃত্তি যখন শান্ত হয়ে যায়, নিরোধ হয়ে যায়, তখন যিনি দ্রষ্টা, তিনি নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন। বাকি সময় তিনি মনের বৃত্তির সঙ্গে এক হয়ে থাকেন। আমার যখন খিদে পাচ্ছে, তখন আমার ক্ষুধা আর আমি এক; আমি যখন রেগে যাচ্ছি, তখন আমি ও আমার রাগ এক। ঠাকুর কোন দিন বৃত্তির সঙ্গে এক হবেন না, শ্রীকৃষ্ণ বৃত্তির সঙ্গে কোন দিন এক হবেন না, কিন্তু জগৎ চলে বৃত্তিকে দিয়ে। ঠাকুর সব সময় জানেন, তিনি কক্ষণ রেগে যাবেন না, যদিও বা রেগে যান, সেটা লোকশিক্ষার জন্য, ওই রাগে নিজের আমিত্ব জড়িয়ে নেই। গীতাতে পরে বলবেন, *যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে*, আত্মজ্ঞানীর বুদ্ধি ওখানে লিপ্ত হয় না, আমাদের বুদ্ধি ওখানে লিপ্ত হয়েই আছে, আমাদের অনাসক্ত কক্ষণ হয় না।

একজন হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে আছে, আমরা বলছি ব্যাটা কোন কাজ করে না। কিন্তু এখানে তার অঙ্গগুলি কাজ করছে না, ইন্দ্রিয়গুলি কাজ করছে না ঠিকই, কিন্তু মন কাজ করে যাচ্ছে। মন বলছে, আমি কাজ করব না। মা বাচ্চাকে এবিসিডি শেখাতে চাইছেন, বাচ্চা সাফ্ সাফ্ বলে দিল, আমি শিখব না। সে শিখছে না ঠিকই, কিন্তু কাজ করছে। কি কাজ করছে? Will powerটা owned powerএ চলে গেছে। Will power দিয়ে মানুষ কাজ করে আর owned power দিয়ে মানুষ কাজ প্রত্যাখ্যান করে, দুটোতেই মানুষের মন কাজ করছে। আমরা যখন কাজ করছি না, তখন আমার owned power লেগে আছে, তার মানে ওটাও কাজ।

এবার মনে করুন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথে বসে সারথির কাজ করছেন আর অর্জুনকে বিভিন্ন নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন, আর অন্য দিকে সবাই যুদ্ধ করে চলেছে। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে সব দেখছেন, ঠাকুর বাকিদের বলছেন –দ্যাখো এরা সবাই যুদ্ধ করছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপারে কি বলবেন? ঠাকুর বলবেন, শ্রীকৃষ্ণ যত যাই করুন না কেন, তাঁর মনটা সেই আত্মাতেই পড়ে আছে, আত্মা কোন কাজ করেন না, শ্রীকৃষ্ণের ঠিক ঠিক যে বাস্তবিক সত্তা সে কিন্তু কোন কাজ করছে না। তাঁর দেহ ইন্দ্রিয় সব কাজ করছে, কিন্তু দেহ ইন্দ্রিয়ের সাথে তাঁর কোন সংযোগ নেই। এর বিপরীতে শ্রীকৃষ্ণ যদি দক্ষিণেশ্বরে দাঁড়িয়ে দেখেন তিনিও দেখবেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ কোন কাজ করছেন না, তাঁর দেহ ইন্দ্রিয়ই কাজ করছে, শ্রীরামকৃষ্ণের মন আত্মাতে সংলগ্ন হয়ে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের যে বাস্তবিক স্বরূপ সেই আত্মাতে তিনি পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

দক্ষিণেশ্বরে হাজরা কোন কাজ করছে না, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরের উত্তরের বারান্দায় চুপচাপ বসে জপ করছেন। ঠাকুর হাজরাকে বলছেন –ঢ্যাম্‌না শালা, বাড়িতে মা কান্নাকাটি করছে, টাকা-পয়সা নেই, দেনা শোধের চেষ্টা নেই। ঠাকুর এগুলোকে বলছেন ধাপ্পাবাজী। হাজরা জপ ধ্যান করছে কিন্তু ঠাকুর নিন্দা করছেন। কেন নিন্দা করছেন ঠাকুর? হাজরা এখানে নিষ্কর্মা হয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে আছে, কিন্তু মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করে ঘুরছে; কার থেকে কত টাকা ধার করব, কিভাবে দেনা শোধ করবে; এই সব চিন্তা ঘুরছে। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মনটাকে আত্মাতে স্থির করা। কিন্তু আত্মাতে স্থির করতে পারছে না অথচ হাত পা গুটিয়ে চুপ করে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছে। বাইরে থেকে দেখে সবার মনে হচ্ছে সে নিষ্ক্রিয় কিন্তু ভিতরে মন চরকির মত ঘুরছে, মানে মন সক্রিয়। কিন্তু আমি যদি আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত থাকি আর তখন আমার হাত পা যদি চলতেও থাকে তাতেও আমি কোন কর্মে যুক্ত হচ্ছি না, আমি স্থির আছি। কিরকম হয় ব্যাপারটা –বাতাসে আমার গায়ের চাদরটা নড়ছে, কিন্তু আমি কি নড়ছি? আমার চাদর নড়ছে আমি নড়ছি না, আমি স্থির আছি। ঠিক এই রকম আত্মজ্ঞ পুরুষের আত্মাটা স্থির আছে। যাঁর এই বোধ হয়ে গেছে, যিনি জ্ঞানী আর অজ্ঞানীর এই পার্থক্যটা নিরূপণ করে নিয়েছেন, *স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু*, তিনিই মনুষ্য জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান। সেই হচ্ছে *যুক্তঃ*, তিনিই যোগে প্রতিষ্ঠিত, সেই হচ্ছে *কৃৎস্নকর্মকৃৎ*, তিনিই সব কর্মের কর্তা হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেন, তাঁর আর কর্তব্য কর্ম বলে কিছু থাকে না, সমস্ত কর্ম থেকে সে মুক্ত হয়ে গেছে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যদি বলতেন – চল অর্জুন তোমাকে জগৎটা দেখিয়ে নিয়ে আসি, কে জ্ঞানী আর অজ্ঞানী তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তখন তিনি অর্জুনকে দেখাচ্ছেন – দ্যাখো দ্যাখো অর্জুন ঐ যে শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধ করছেন, উনি একজন জ্ঞানি, উনি কিন্তু যুদ্ধ করছেন না, ওনার দেহ ইন্দ্রিয় যুদ্ধ করছে। চিকাগোতে নিয়ে এসেছেন অর্জুনকে –ঐ দ্যাখো স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিচ্ছেন, এই আর-একজন জ্ঞানী পুরুষ, উনি কিন্তু এখানে কোন লেকচার দিচ্ছেন না, ওনার দেহ, বাগেন্দ্রিয় লেকচার দিচ্ছে। অর্জুনকে নিয়ে আমাদের মত কয়েকজনকে দেখিয়ে বলছেন –এই যে এরা ধ্যান করছে এরা কিন্তু সবাই অজ্ঞানী, চুপ করে হাত পা গুটিয়ে বসে আছে কিন্তু মনে মনে কাজ করে যাচ্ছে আর ভোগ করে যাচ্ছে, এদের দেহ ইন্দ্রিয় সব স্থির কিন্তু মনটা চঞ্চল, আত্মাতে স্থিত নয়। দেহ ইন্দ্রিয়কে ঠিক ঠিক গোটান তখনই হবে যখন তোমার মন আত্মাতে গিয়ে একেবারে স্থির হয়ে যাবে।

আমি এটা ত্যাগ করলাম, আমি কাজ করব না, এটাও কর্ম, কারণ মন থেকে বলা হচ্ছে আমি ত্যাগ করলাম, আমি কাজ করব না। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে এই ভাব তাঁর হচ্ছে না, এগুলো নিজে থেকেই খসে পড়ে গেছে, আলাদা করে কিছুই ফেলতে হচ্ছে না। অর্জুন বলছিল যে আমি যুদ্ধ করব না, আমি ভিক্ষুক হয়ে যাব, যুদ্ধ না করে কাজ করব না ভেবেছিল অর্জুন, সেটা আর হল না, কারণ ভিক্ষা করাটাও তো কাজ। আমরা যখন কাজ করব বলছি, তখন শরীর ইন্দ্রিয় কাজ করছে,

মনও বলছে কাজ করছি। ত্যাগের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার হয়। আমি যখন মুখে বললাম আমি কাজ করব না, তখন শরীর ইন্দ্রিয় হয়তো কাজ করছেন না, কিন্তু মনে মনে কাজ চলছে। হিন্দু শাস্ত্র মতে শরীর ও মনকে আলাদা করে দেখা হয় না। শরীর দিয়ে হয়তো কোন পাপ করছি না, কিন্তু মনে মনে কোন পাপ চিন্তা করলাম তখন সেটা পাপযুক্ত কর্মের মধ্যেই গণ্য হবে। মনে মনে যদি ভেবে থাকি আমি ওর ঐ জিনিসটা চুরি করব, আমি যদি চুরি না করেও থাকি তবুও তখন আমার কিন্তু চুরি করা হয়ে গেল। উচ্চ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে শরীর দিয়ে চুরি করলে যে পাপ হত, মনে মনে চিন্তা করে নেওয়ার পর সেই একই পাপ হল। ঠাকুর বলছেন, গৃহস্থের মনে ত্যাগ, বাইরে যা করার করুক। কিন্তু সন্ন্যাসীর মনে ত্যাগ আর বাইরে ত্যাগ দুটোই থাকতে হবে। কিন্তু যদি শাস্ত্রাদি পড়ে, সাধুসঙ্গ করার পর সংসারে এমন কিছু কাজ সামাজিক বা পারিবারিক কারণে আমাকে করতে হয় যেগুলো সাধুসঙ্গ করা বা শাস্ত্র অধ্যয়ণ করার আগে কিছুই মনে হত না, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ছিঃ এগুলো আমি কি করতে যাচ্ছি, এটাই হচ্ছে ঠিক ঠিক মনের ত্যাগের ক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। এই ভাবে ভাবতে ভাবতে এক সময় মনে হবে এগুলো এবার না করলেই বাঁচি কিন্তু সামাজিক কারণে আমাকে বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে।

আচার্য এখানে একটা লম্বা আলোচনা করছেন, এটাকে মানুষ তো জানে, বলছেন, না এটা মানুষ জানে না। এই জিনিসটা মানুষ জানে না বলেই জগতে এত অশান্তি, এত কষ্ট। এই ধরণের যাঁরা যুক্ত পুরুষ হন, যাঁদের আমরা মহাপুরুষ বলছি, তাঁদের স্বভাব কি রকম?

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণাং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ।।১৯।।

(যাঁর সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা কাম ও (তৎকারণে) সংকল্পরহিত এবং যাঁর শুভাশুভ কর্ম (কর্মে অকর্ম ও অকর্মে কর্মদর্শনরূপ) জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাঁকে জ্ঞানিগণ প্রকৃত পণ্ডিত বলে থাকেন।)

যে কোন কাজের শুরু করাকে বলা হয় *সমারম্ভাঃ*। যে কোন কাজ শুরু করার আগে এই ধরণের যুক্ত পুরুষের মধ্যে কোন কামসংকল্প থাকে না। আমরা আগে স্পৃহার কথা বললাম, ভগবানের কোন স্পৃহা নেই। বেলুড় মঠে একদিন কিছু ভাল আইটেমের রান্না হয়েছে। সেই সময় মহাপুরুষ মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ। তিনি একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রান্না কেমন হয়েছে'? বললেন, 'ভাল হয়েছে'। মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, 'ঠিক আছে আবার হবে'। তখন একজন সেবক বললেন, 'আপনার মনে যখন ইচ্ছা জেগেছে তখন অবশ্যই হবে'। সেবকের কথা শুনে মহাপুরুষ মহারাজ খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'আমার কোন ইচ্ছা নেই'। মহাপুরুষদের কখন কোন ইচ্ছা হয় না। এরপর ভেবে দেখতে হয়, স্বামীজী কি ধরণের ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কি ধরণের ছিলেন, কোথাও কোন কিছুর ইচ্ছা এনাদের মধ্যে থাকে না। ওনারা যেটা করেন, তা হল, একটু একে খুশী করে দিলেন, একটু তাকে খুশী করে দিলেন, তার জন্য যেটুকু করার করে দেন, তার বেশি কিছু না। শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীদের সাথে এত লীলা করলেন, এগুলো কিছু না, গোপীদের একটু খুশী করে দিলেন। সাধারণ লোক হলে বলবে, আমি ছাড়ব না, পায়ে দড়ি বেঁধে আমার কাছে ধরে রাখব। গোপীরাও তাই করলেন, কৃষ্ণের পায়ে দড়ি বাঁধার চেষ্টা করছেন, মাঝখান থেকে কৃষ্ণ গোপীদের মাঝখান থেকে উধাও হয়ে গেলেন।

কামসংকল্পবর্জিতাঃ, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কোন কামসংকল্প নেই, আমাকে আপনাকে খুশী করার জন্য করছেন, আমাদের উপর কৃপা করার জন্য করছেন। সামনের লোকেরা যখন শোনে তখন তাদের এই কথাগুলো খুব খারাপ লাগে, কিন্তু সে বুঝতেও চায় না, সে জালে না ফাঁসিয়ে ছাড়বে না। আর ওই জ্ঞানী পুরুষ এমন যে, তিনি জালে ফাঁসবেন না, সেখান থেকে যত অশান্তি। তখন আঙুর ফল টক বলে ছেড়ে বেরিয়ে যাবে, বেরিয়ে গিয়ে তার নামে গালাগাল দেবে। সেইজন্য আমরা

দেখি, ঠাকুরের নামে লোকেরা গালাগাল দেয়, স্বামীজীর নামে গালাগাল দেয়, ধর্মের নামে গালাগাল দেয়। বুঝতে পারে না বলেই গালাগাল দেয়।

জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণাং, এনাদের সমস্ত কর্ম জ্ঞানের অগ্নিতে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কোন জ্ঞান? যেটা আগে বলা হল, *কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদ*, কর্মের মধ্যে অকর্ম দেখা আর *অকর্মণি চ কর্ম যঃ*, অকর্মের মধ্যে কর্ম দেখা। ইন্দ্রিয় যে কর্মগুলি করছে, তাতে আত্মা অকর্ম। আর ইন্দ্রিয়গুলি যখন কাজ করে না, তখনও তার মন সক্রিয়, এই জ্ঞান যাঁর আছে তাঁর সমস্ত কর্ম এই জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মিভূত হয়ে যায়। তার মানে বলতে চাইছেন, বেড়াল বলে মাছ খাব না কাশী যাব, এই ধরণের ত্যাগ যখন আমরা অবলম্বন করি, এটাকে ত্যাগ বলা যাবে না, এটা কর্ম, এই জিনিসটাকেই এখানে বোঝাতে চাইছেন। যোগী হওয়ার আগে তাঁকে কাজের এই রহস্য বুঝতে হবে। কর্মের এই রহস্য বুঝে নিলেই সে যোগী। কিন্তু যখন বলছে, আমি সব ছেড়ে যোগী হব, সে কিন্তু তখন যোগী হচ্ছে না, কারণ সে যখন বলছে আমি সব ছাড়ব, এই ছাড়াটাও কাজ।

এখানে আচার্য ব্যাখ্যা করছেন, কোন কারণে আমাদের মত লোকেরাও কাজ ছাড়তে চাইলে ছাড়তে পারেন না। সন্ন্যাসীরা আশ্রমে আছেন, তাঁদেরও আশ্রমের কাজ করতে হয়। আচার্য এই ব্যাপারে বলছেন, *স কৃতশ্চিত নিমিত্তাৎ কর্মপরিত্যাগাসম্ভবে সতি*, অনেক সময় এমন পরিস্থিতি হয়ে যায়, যেখানে মানুষ কাজ ছাড়তে চাইলেও ছাড়তে পারে না। একজনের মন পুরোপুরি ঈশ্বরের দিকে চলে গেছে, কিন্তু বাড়িতে বৃদ্ধা মা আছেন, সে ছাড়া তাঁর দেখাশোনা করার কেউ নেই, একটা দায়ীত্ব আছে। সংসারে অনেকেরই দায়ীত্ব থাকে, সেইজন্য কাজ ছাড়তে পারে না। আচার্য তাঁদের জন্য বলছেন, *সতি কর্মণি তৎফলে চ সঙ্গরহিততয়া*, এনারা সেই ধরণের মানুষ, যাঁদের কর্মফলে কোন আসক্তি থাকে না। আর *স্বপ্রয়োজনাভাবাৎ*, নিজের কোন প্রয়োজন থাকে না। *লোকসংগ্রহার্থং*, লোকসংগ্রহের জন্য এনারা কাজ করেন। দুটো লোককে ভাল করার জন্য, কয়েকজনকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, উপদেশ দেওয়ার জন্য কাজ করেন, অন্য কোন উদ্দেশ্যে কাজ করেন না। আসলে কিন্তু তাঁদের কাজ করার কোন দরকার নেই।

স্বামীজী বার বার ঠাকুরকে গিয়ে বলছেন, আমি সমাধিতে ডুবে থাকতে চাই। কিন্তু ঠাকুর স্বামীজীকে ভর্ৎসনা করছেন, লোকসংগ্রহের জন্য, মানুষের মঙ্গলের জন্য তোকে মায়ের কাজ করে যেতে হবে। স্বামীজী এখন ফেঁসে গেছেন। স্বামীজীর কাজে কোন ইচ্ছে নেই, উনি আত্মজ্ঞানে ডুবে থাকতে চাইছেন, আমরা ডুবে থাকতে চাই আলস্যে। আমরা যখন বলি, আমি কাজ করতে চাই না, কারণ আমি আলস্যে পড়ে গেছি, আর স্বামীজী আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকতে চাইছেন। কিন্তু স্বামীজীকে ওই অবস্থায় ঠাকুর থাকতে দিচ্ছেন না, টেনে তাঁকে কাজে নামাচ্ছেন। বলছেন, যদি কোন কারণে কাজ করাটা আবশ্যিক হয়, কাজ তাঁকে করতেই হবে, তখন তিনি লোকসংগ্রহের জন্য কাজ করেন, স্বপ্রয়োজনাভাব, নিজের কোন প্রয়োজন নেই। আমেরিকাতে স্বামীজী চার বছর কাজ করে করে মুখ দিয়ে রক্ত উঠিয়ে দিচ্ছেন, সেখান ওনার কোন প্রয়োজন ছিল না। এই ধরণের মহাপুরুষরা ভগবানের সঙ্গে এক। এই অবস্থা যখন হয়ে যায়, তখন কুড়ি নম্বর শ্লোকে বলছেন –

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসংঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ।।২০।।

(যিনি কর্মে ও কর্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করেছেন, যিনি আপনাতেই নিত্যতৃপ্ত ও নিরাবলম্ব অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণে চেষ্টাশূন্য, তিনি সর্বতোভাবে (বিহিত) কর্মে প্রবৃত্ত হলে কিছু করেন না – অর্থাৎ তাঁর কর্মফলে কিছুমাত্র আসক্তি নেই।)

অকর্মের মধ্যে কর্ম আর কর্মের মধ্যে অকর্ম, এটা কখন হয়? বলছেন, *ত্যক্ত্ব কর্মফলাসংঙ্গং,* কর্মের ফলের জন্য কোন আসক্তি থাকে না। ঠাকুর স্বামীজীকে দায়ীত্ব দিয়ে গেলেন ঠাকুরের ভাব প্রচার করার জন্য। স্বামীজী চাইছেন, কোন রকমে এটাকে ফেলে দিয়ে বাঁচতে পারি। গ্রীক পুরাণে হারকিউলাসের কাহিনীতে আছে, হারকিউলাস কিভাবে কিভাবে এ্যটলাসের কাছে গেছে। জগতের বোঝা এ্যটলাসের ঘাড়ে চাপানো আছে, এ্যটলাস কোন রকমে ওটাকে ছাড়তে চাইছে। আমাদের কাছেও ঠিক সেই রকম, জগতের বোঝাটা আমরা কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এই বোঝাকে কিভাবে হাল্কা করতে হবে? বলছেন, *ত্যক্ত্বা কর্মফলাসংঙ্গং,* আমার কোন আগ্রহ নেই, আমার ঘাড়ে পড়েছে, কোন রকমে আমাকে এটা করে দিতে হবে।

নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ, নিজের মধ্যেই খুশী। এই তৃপ্তি হল জ্ঞানের তৃপ্তি, এ পুরো অন্য জিনিস। তার সাথে *নিরাশ্রয়ঃ,* কোন কিছুর উপর তিনি আশ্রিত নন। আমরা যে কাজ করি, ওই কাজ একটা আশ্রয় নিয়ে নেয়, ফলটা হল আশ্রয়। যেমন মানুষ যে চাকরি করে, চাকরি করে যে টাকা পায়, এই টাকাটা হল চাকরির আশ্রয়। *কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি,* আমার নামযশ হবে, মরার পর স্বর্গে যাব, এই ধরণের কোন ইচ্ছাই তাঁর থাকে না। এমন কি কাজ ত্যাগ করা যদি অসম্ভবও হয়, তখন লোকসংগ্রহের জন্য বা লোকেদের মনে নিন্দার ভাব আসতে পারে, এটার জন্য কাজ করেন, কিন্তু কাজের প্রতি তাঁর কোন প্রবৃত্তি নেই। মূল কথা হল, মহাপুরুষরাও কাজ করেন, অর্জুন তুমিও কাজ কর, সবাইকেই কাজ করতে হবে। কিন্তু প্রথমে কর্মফলের প্রতি স্পৃহাটা ছাড়ার চেষ্টা করতে হবে। দ্বিতীয় ধাপে কাজকে ছাড়তে হয়। কিন্তু কোন কারণ কাজ করা যদি ছাড়া সম্ভব না হয়, তখন এই ভাব নিয়ে কাজ করতে হবে যে, আমি লোকের মঙ্গলের জন্য, ভালর জন্য এই কাজটা করছি।

যিনি একেবারে কোন কাজই করেন না, ঠিক ঠিক জ্ঞানীরা; আগেকার দিনে এই ধরণের অনেক জ্ঞানী ছিলেন, যেমন তোতাপুরীর মত জ্ঞানীরা ছিলেন, এবার তাঁদের কথা বলছেন –

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।।২১।।

(যিনি নিষ্কাম ও সকল প্রকার ভোগ্যবস্তুত্যাগী এবং যাঁর অন্তঃকরণ ও দেহেন্দ্রিয় সংযত, তিনি জ্ঞান দ্বারা কর্তৃত্বাভিমানশূন্য হয়ে শরীরধারণ উপযোগী কর্ম মাত্র করেন; কিন্তু তাতে পাপপূণ্যভাগী হন না। এরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীই মুক্ত হন।)

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা, নিরাশী শব্দের অর্থ, যাদের সমস্ত আশা চলে গেছে, অর্থাৎ তারা কোন কিছুর সাথে কোন আশা রাখে না। আশা থাকে না বলে, নিরাশীদের কোন হতাশা হয় না। *যতচিত্তাত্মা,* চিত্তকে যিনি সব কিছু থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছেন, এনারা হলেন *চিত্তাত্মা*। এখানে যে আত্মা বলছেন, এই আত্মা শরীর অর্থে বলা হচ্ছে। আত্মা মানে হয় চেতনা, আমার চেতনা যেখানে সেখানেই আমার আত্মা, চেতনা যদি শরীরকে জড়িয়ে থাকে, তখন আত্মার একটা অর্থ হয়ে যায় শরীর। বলছেন, নিজেকে পুরো গুটিয়ে এনেছে, ফলে সমস্ত ভোগ সামগ্রী সে ত্যাগ করে দেয়। তখন *শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্,* শুধু শরীর নির্বাহ করার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই রাখেন, ভোগের প্রতি কোন স্পৃহা নেই। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদেরও জীবন অত্যন্ত সহজ সরল জীবন। সুস্থ ভাবে শরীরকে চালানোর জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই তাঁরা নেবেন, তার বাইরে না। নানান রকমের যে ভোগের উপকরণ থাকতে হবে, এসব কিছু নেই। শরীরকে ঠিক ঠিক ভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যেটা করা দরকার, সেটাই করেন। যখন এই রকম হয়ে যান, তখন তাঁর *কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্,* তখন কোন ধরণের পাপ তার গায়ে লাগে না।

এটা তাঁদের জন্যই বলা হচ্ছে, যাঁরা অনেক উচ্চাবস্থায় চলে গেছেন। অন্যরা অবশ্যই করতে পারেন, কিন্তু সমাজে থাকার জন্য এগুলোই অনেক সমস্যা তৈরী করে। সমাজে থাকলে দু-চারজন লোক আসবে, আর তাদের চোখে যদি পড়ে যায়, তখন অনেক সমস্যা হয়। আমি এসব গ্রাহ্য করি না, এই ভাবটাকে যদি আনতে হয়, তাহলে আগে তাকে অনেক বড় হতে হবে। টাটা, বিড়লার মত বড় বড় ধনীরা কি খাচ্ছেন, কি পড়ছেন তাতে কারুর কিছু এসে যায় না, তাঁকে নিয়ে আপনি কি ভাবছেন, তাই নিয়ে তাঁরা কোন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না, ডোন্ট কেয়ার। কিন্তু যারা সাধারণ মানুষ, সমাজে থাকার জন্য তাদের দরকার পড়ে। ঠাকুর সেইজন্য বলছেন, গৃহস্থের ভিতরে ত্যাগ রাখতে হয়, সন্ন্যাসীর বহিঃত্যাগ, ভিতর থেকেও ত্যাগ। সংসারে যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনে এগোতে চাইছেন, তাঁদের ভিতরে ত্যাগ করতে হয়। সমাজে থাকতে গেলে ভাল ভাল সামগ্রী রাখতে হবে। চারজন লোক আসছে, তার জন্য ভাল চেয়ার তাকে রাখতে হবে। চা দিয়ে আপ্যায়ন করার জন্য তাকে ভাল কাপ-ডিশ রাখতে হবে। কিন্তু গৃহস্থ যদি বলে, হাজার টাকার দামী কাপের সেটে হাজার টাকা দামের চা না আনলে আমি চা খাবই না, তাহলে কিন্তু বুঝতে হবে সে এই পথের পথিক নয়। অতিথির জন্য আমি সব থেকে ভাল ব্যবস্থা করব, কিন্তু আমার নিজের জন্য কিছু লাগবে না। এই ভাবটাকে develop করতে হবে। সন্ন্যাসীদের অনেক সময় প্রশ্ন করে, আমরা তো সংসারে আছি। সংসারে আছেন তো কি হয়েছে, সমস্যা কোথায়। এর পরের শ্লোকটা সন্ন্যাসীদের জন্য –

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে।।২২।।

(যিনি যদৃচ্ছালাভে পরিতুষ্ট, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব দ্বারা পীড়িত হলেও অবিষণ্ণচিত্ত, মাৎসর্যহীন (নির্বৈর) ও লাভালাভে হর্ষবিষাদরহিত, তিনি শরীরধারণের উপযোগী কর্ম করলেও সেই কর্মে বদ্ধ হন না।)

যদিও এই শ্লোকটা সন্ন্যাসীদের জন্য, তবে এই ভাবগুলো শুনে রাখতে হয়। *যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো*, যখন যা পাওয়া যাচ্ছে তাতেই সন্তুষ্ট। সন্ন্যাস হওয়ার পর তিন দিন ভিক্ষা করতে হয়, ভিক্ষায় যা পাওয়া যায় তাতেই খুশী। *দ্বন্দ্বাতীতো*, সুখদুঃখের পারে, *বিমৎসরঃ*, কারুর প্রতি কোন ক্ষোভ নেই, রাগ নেই। *সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ*, সাফল্য, অসাফল্য, যা হল সবটাই তাঁর কাছে সমান। *কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে*, ফলে তাঁর কোন বন্ধন হয় না।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে।।২৩।।

(আসক্তিশূন্য, ধর্মাধর্ম ও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদির বন্ধন থেকে বিমুক্ত ও ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি দ্বারা যজ্ঞার্থ কর্ম অনুষ্ঠিত হলেও তার সমগ্র কর্ম বিনষ্ট হয় অর্থাৎ ফলপ্রসব করে না।)

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য, সমস্ত সঙ্গ বা আসক্তি থেকে মুক্ত। কোন কিছুর প্রতি, কোন ব্যক্তির প্রতি, বাবা, মা, বন্ধুর কারুর প্রতি আসক্তি নেই। *জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ*, পাগল ছাড়া এটা সম্ভব হয় না, কিন্তু যিনি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তাঁরা এটা পারেন। একমাত্র যদি তিনি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন, তবেই তিনি সমস্ত দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হতে পারেন, সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। *যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে*, এই ধরণের মানুষ যখন যজ্ঞ রূপে সমস্ত কর্ম করেন, তখন সেই কর্মের যে ফল হয়, সব ফল কর্মের সঙ্গে বিলীন হয়ে যায়।

কর্মের ফল কর্মের সাথে নাশ হওয়ার জন্য কতকগুলি শর্ত আরোপ করছেন, *গতসঙ্গস্য মুক্তস্য*, কোন ধরণের আসক্তি নেই, সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্ত; *জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ*, আমার উদ্দেশ্য ঈশ্বর প্রাপ্তি, আমার উদ্দেশ্য ঠাকুরকে পাওয়া, আমার মন শ্রীরামকৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত; এই ভাব সব সময় ধরে রাখতে হয়। আর *যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম*, যা কিছু কর্ম করা হচ্ছে, সবটাই যজ্ঞ রূপে করছে। এরপর

সাত আটটা শ্লোকে বিস্তারে বলবেন, কিভাবে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসটাও যজ্ঞ রূপে করতে হয়। তখন তার কর্মের যে ফল কর্মের সঙ্গেই বিলীন হয়ে যায়। কর্ম আর কর্মের ফল আলাদা তার হয় না। কর্পূর পোড়ানর মত, কর্পূর পোড়ালে ধুয়ো হয় না, তার ছাইও হয় না। ধীরে ধীরে তার সমস্ত দায়ীত্ব শেষ হয়ে যায়। কর্মবন্ধন শেষ হয়ে যায় বলে তার আর দায়ীত্ব বলে কিছু থাকে না। যদি কোন কারণে দায়ীত্ব থাকে, যদি কারুর মধ্যে দায়ীত্ব বোধ থেকে থাকে, তখন তাকে এটাই করতে হবে, ঠিক আছে এই দায়ীত্ব আমার উপরে এসে গেছে, লোকে যাতে আমার উপর না হাসে, লোকে যাতে আমার নিন্দা না করতে পারে, লোকের কাছে একটা বাজে দৃষ্টান্ত যাতে না হয়ে যায়, সেইজন্য আমি করছি, কিন্তু এটাও আমি যজ্ঞ রূপে করছি।

যোগী যদি হতে চান, অর্থাৎ কর্মযোগী হতে যদি চান, তাহলে সবার আগে নিষিদ্ধ কর্ম করাটা বন্ধ করতে হবে। তারপর philosophy of karma বুঝতে হবে, তার মানে এটা বুঝতে হবে, আমি সেই আত্মা, আত্মা কোন কাজে লিপ্ত হন না, কাজ ইন্দ্রিয় বস্তুর উপরে করে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, রথ চালানো ইন্দ্রিয়ের কাজ, এটা শ্রীকৃষ্ণের কাজ না। যতক্ষণ এই বোধ না হয় যে, আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, ততক্ষন তাকে সব কাজ যজ্ঞ রূপে করতে হবে, ঠাকুরের পূজা রূপে কাজ করতে হবে, নিজের শুদ্ধির জন্য কাজ করতে হয়। আর যদি মনে করেন, জ্ঞানীরা তো কাজ করতেন না, আমিও কাজ করব না, এই না করাটাও একটা কাজ। যতক্ষণ তোমার জ্ঞান না হয়ে যায়, ততক্ষণ তোমাকে কাজ করতে হবে। কাজ করতে গিয়ে সব কাজ যজ্ঞ রূপে করতে হবে। আসক্ত হওয়া চলবে না। যে কোন কাজ নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য বা লোকের মঙ্গলের জন্য করতে হবে, এটাই রামকৃষ্ণের মিশনে মোটো, *আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ*।

আমরা এতক্ষণ আলোচনার মাধ্যমে দেখলাম যাঁরা কর্ম করেন, তাঁরা কিভাবে অনাসক্ত থাকেন। অনাসক্ত হয়ে কর্ম না করলে, কিভাবে ওই কর্মই তাঁর বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এর উপর আমরা বিস্তারে আলোচনা করলাম। আমরা থিয়োরেটিক্যাল আলোচনা অনেক করেছি, কিন্তু জীবনে এই জিনিসগুলোকে কিভাবে করা যায়, সেটাই এবার চব্বিশ থেকে তেত্রিশ শ্লোকে বলতে যাচ্ছেন। ঠাকুর স্বামীজী আসার পর থেকে কিছু কিছু শব্দ খুব প্রচলিত হয়ে গেছে, তার মধ্যে একটা হল মুক্তি, সবারই মুক্তি চাই; তার সাথে সবারই মুখে এখন অদ্বৈত বেদান্ত। অদ্বৈত বেদান্তের নীচে কেউ কথাই বলবেন না। এভাবে শুধু ধর্ম কেন, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও কিছু হয় না। ইউটিউবে কোন মহাত্মা বা কোন বড় বাবাজীর একটা লেকচার শুনে খুব ভাল লেগেছে, কিন্তু তারপরই এক গুচ্ছ প্রশ্ন নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। মনে প্রশ্ন ওঠা মানেই, এখনও সে এর জন্য প্রস্তুত হয়নি। আমেরিকার এক জায়গায় স্বামীজী লেকচার দিচ্ছিলেন, একজন শ্রোতা উঠে স্বামীজীকে বলছেন, 'আমি আপনার এই মতের সাথে একমত হতে পারছি না'। স্বামীজী তাঁকে বলছেন, 'তাহলে এই কথাগুলো তোমার জন্য নয়'। হিন্দুরা অনেক দিন ধরে এটা জানে যে, ঋষিরা জানতেন সব জিনিস সবার জন্য নয়। ঠাকুর বলছেন, যার পেটে যেটা সয়। আবার অন্য ভাবেও বলছেন, প্রথমে উড়ন্ত পাখি তীর দিয়ে মারতে গেলে পারবে না, তাই আগে কলাগাছ বিঁধতে হয়। সবাইকেই ধাপে ধাপে এগোতে হয়। গীতা এই জিনিসটা বরাবর মাথায় রেখেছে।

যাঁরা ইউটিউবে আমাদের কথা মন দিয়ে শুনছেন, তাঁদেরকে একটা কথা জেনে রাখা দরকার, যেটা আপনি স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারছেন, ওটাই আপনার সাধনা। তার থেকেও বেশি, আপনার গুরু আপনাকে যেটা বলে দিয়েছেন, সাধনা একমাত্র সেটারই হবে। কোথায় কে অদ্বৈত বেদান্ত বলছে, সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, কোথায় আবার কে বিবেকচূড়ামণি নিয়ে বলছে, সেখানে দৌড়ে গেলাম, আবার কোথায় কে মাণ্ডুক্যকারিকা নিয়ে বলছে, সেখানেও গিয়ে হাজির হলাম, এভাবে কোন কিছুই হবে না। এগুলো শোনার জন্য, আপনার জ্ঞানরাশি বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু ওটা আপনার সাধনা নয়। গীতা পদে পদে, যখনই কিছু আলোচনা করতে যাচ্ছেন, মায়ের মত আমাদের

সাবধান করে দিচ্ছেন। গীতা আগাগোড়া বলবে দুটি পথ –প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি। আমরা প্রথম থেকে যখনই সুযোগ আসছে তখনই বলছি, নিবৃত্তি সবার জন্য নয়, অষ্টাবক্র গীতা সবার জন্য নয়, প্রথমে নীচে থেকে শুরু করতে হয়। তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান বললেন, *ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ অজ্ঞানাং কর্মসংঙ্গিনাম্*, কারুর বুদ্ধি বিচলিত করতে নেই। বুদ্ধি বিচলিত করে দিলে সব কিছু গোলমাল হয়ে যাবে।

গীতা এখানে বলবেন, তোমার জীবন কিভাবে ধন্য করবে, কিভাবে কৃতার্থ করবে। তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছিলেন, সমস্ত কাজকে, যত ধরণের কাজ আছে সব কিছুকে যজ্ঞ রূপে দেখবে। পরের দশটি শ্লোকে ভগবান দেখাচ্ছেন, জীবনের সব কিছু, যে কোন কর্ম কিভাবে যজ্ঞ হয়ে যায়। শুরু করছেন একটা আদর্শকে দিয়ে। যিনি সন্ন্যাসী, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মবেত্তা, তাঁরা জিনিসটাকে কিভাবে দেখেন? এই জগতে যত ক্রিয়া হচ্ছে, সেটাকে তিনি কিভাবে দেখেন? বেদে বলছেন, *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি*, হে প্রভু তুমিই নারী হয়েছ, তুমিই পুরুষ হয়েছ, তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী, তুমিই স্খলিত পদে হেঁটে চলা বৃদ্ধ।

ঠাকুরের সময় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ছাগ বলি হত। ঠাকুর একদিন দেখছেন, যে ছাগকে বলি দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেটাও সচ্চিদানন্দ; যার উপরে রেখে বলি দেওয়া হবে, সেই বলিকাঠ, সেটাও সচ্চিদানন্দ; যেটা দিয়ে বলি দেওয়া হবে, সেই খড়্গও সচ্চিদানন্দ; যে বলি দেবে সেও সচ্চিদানন্দ। ঠাকুর আলাদা করে ছাগ দেখছেন, খড়্গও দেখছেন, যূপকাঠ দেখছেন, কিন্তু সবটাই চৈতন্য দেখছেন, আমাদের ভাষায় ব্রহ্ম। যিনি বলি দিতে যাচ্ছেন, তিনি ব্রহ্ম, ছাগটাও ব্রহ্ম, খড়্গটাও ব্রহ্ম। বলির পর ছাগলের মুণ্ডু আর ধর যখন আলাদা হয়ে যাবে, তখন কি হবে? মুণ্ডুটাও ব্রহ্ম, ধরটাও ব্রহ্ম। ঠাকুর এটা সাক্ষাৎ দেখছেন। একবার দেখছেন, তা না। এটাই মানবজীবনের শেষ উপলব্ধি, এই উপলব্ধির পর মানুষ জ্ঞানী হয়ে যায় এবং মুক্ত হয়ে যায়।

আমরা দেখছি, ছাগ আলাদা, খড়্গ আলাদা, বলি যে দিচ্ছে সে আলাদা। তার মানে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন এই দৃশ্য দেখছিলেন, একবার দেখেননি, তিনি ওটাতেই, ওই জ্ঞানেই সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকতেন। আমাদের মত অন্য অনেকে সেখানে উপস্থিত ছিল, তারাও ঘটনাটা দেখছে, কিন্তু সব কিছুকে আলাদা আলাদা দেখছে। এই দুটো দৃষ্টিভঙ্গীকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। বেদান্তে এটাকে খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। বেদান্ত বলেন, যখনই কোন ক্রিয়া হয়, যে কোন ক্রিয়া, ক্রিয়া হলেই তিনটে জিনিস এসে যায় – কারকের বিভক্তি, ক্রিয়া ও ফল। আসলে থাকে কর্তা, কিন্তু এই যে কর্তা, যাকে প্রথমা বলা হয়, এর বিস্তার হয়ে যায়। বিস্তার হয়ে সাত কি আটটা কারকের বিভক্তি হয়ে যায়, সংস্কৃতে বলা হয় কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, প্রথমা, দ্বিতীয়, তৃতীয়া ইত্যাদি। এটাকে বলে কারক, বেদান্তে কারক ঘুরে ঘুরে আসবে। যেখানেই ক্রিয়া হবে সেখানে কারক থাকবেই, ক্রিয়া থাকবেই আর কর্মের একটা ফল থাকবেই, ভাল ফল, মন্দ ফল যাই হোক। আমার আপনার মত সাধারণ মানুষের জন্য এই সংসারে কারক আর তার যে আটখানা বিভক্তি, এটা পুরো আলাদা। ওদিকে আট আর এদিকে যোগ হয় ক্রিয়া আর ফল, মোট দশটি জিনিস, আমাদের কাছে সব সময় আলাদা ভাবে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, তাঁর কাছে এগুলো সব এক হয়ে যায়। জ্ঞান আর অজ্ঞানের এটাই তফাৎ, অদ্বৈত জ্ঞান আর দ্বৈত জ্ঞানে এটাই তফাৎ। দ্বৈত জ্ঞান যেখানে দশ দেখছে, অদ্বৈত জ্ঞান সেখানে এক দেখে।

যেমন, আমি ভাত খাচ্ছি। আমি হয়ে গেলাম প্রথমা, ভাত হয়ে গেল দ্বিতীয়া, হাত দিয়ে খাচ্ছি, এসে গেল তৃতীয়া। থালা থেকে খাচ্ছি, আরেকটা বিভক্তি বেড়ে গেল। আর খাওয়াটা একটা ক্রিয়া, খাওয়ার পর পেট ভরল, এটা হয়ে গেল ফল। সবটাই আলাদা। এই যে কারকের বিস্তার আর তার সাথে ক্রিয়া ও ফল, দশ হয়ে গেল, এটাই সংসার। সংসার মানেই, কারক-ক্রিয়া-ফল, সবটাই

আলাদা হয়ে যায়। যেমন একটা বৃক্ষের অনেক ডালপালা, শাখাপ্রশাখা, তেমনি সংসারে আর কিছু নেই, সেই এক এই দশটি হয়ে আমাদের সামনে আসে। ভগবান, যিনি অবতার, যিনি জ্ঞানী, সাধনা করে করে যাঁরা জ্ঞান লাভ করেছেন, যাঁরা জন্ম থেকে জ্ঞানী, তাঁরা এই বিস্তার দেখেন না, এমনি মনে মনে চিন্তা করে কিছু দেখছেন না, তাঁরা সাক্ষাৎ দেখেন। আমরা যেমন বলি, আমি নিজের চোখে তোমাকে বদমাইশি করতে দেখেছি। এনারা পরিষ্কার ওই ভাবে দেখেন, সব এক, চৈতন্য ছাড়া আর কিছু নেই। এখন এই যে ছাগকে বলি দেওয়া হচ্ছে, মা কালীর কাছে অর্পণ করা হচ্ছে, সেখানে ঠাকুর দেখছেন, যাবতীয় যা কিছু হচ্ছে, সবটাই সচ্চিদানন্দ।

এবার ঠাকুরের মত কেউ যদি যজ্ঞ করতে চান? আমরা সবাই এত বেদ-বেদান্ত অধ্যয়ন করছি, গীতা উপনিষদ পাঠ করছি, এত ঠাকুরের কথা বলছি, কিন্তু আমাদের সবারই জীবনের প্রতি আসক্তি রয়েছে। ব্রহ্মজ্ঞানী ছাড়া জীবনের প্রতি আসক্তি সবারই থাকে। এর সাথে, পরের জন্মে তোমাকেই যেন পাই, এই ভাবটা থাকবেই থাকবে। এর থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি না। এক ব্রহ্মজ্ঞানী ছাড়া, যিনি বহুকে এক দেখে নিয়েছেন, তাঁকে ছাড়া বাকি সবারই মনে কোথাও না কোথাও এই ভাবটা থাকবেই থাকবে। অনেক পরিচিতরা এসে সাধুদের বলেন, আশীর্বাদ করুন পরের জন্মে আমি যে সন্ন্যাসী হয়ে জন্মাই। তার মানে পরের জন্মটা থেকেই যাচ্ছে।

বেদ হল মায়ের মত, বেদ জানেন, মানুষ সব সময় নিজের ভাল চায় আর তার যারা প্রিয়জন, তাদের ভাল চায়। মানুষ এর বাইরে যেতে পারে না। সেইজন্য ঋষিরা বিধান দিলেন, তুমি যজ্ঞ কর। যজ্ঞ করে তোমার যে ক্ষুদ্র আমি, এই ছোট্ট আমিকে বৃহতের সাথে এক করার চেষ্টা কর। ঠাকুরের পূজা করার সময়, আমরা ঠাকুরের পায়ে ফুল অর্পণ করলাম। ফুল অর্পণ করে আমরা কি করছি? নিজেকে ঠাকুরের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছি, এছাড়া তো আর কিছু হচ্ছে না। যারা ঠাকুরের পূজা করছে, হয়ত কদাচিৎ কখন তাদের মনে আসে, হে ঠাকুর আমার এটা যেন ভাল হয়; কিন্তু যাঁরা নিয়মিত পূজা করেন, যদি তাঁদের মধ্যে ভক্তি থাকে, হয়ত একটা মন্ত্রোচ্চারণ করার মাধ্যমে একটা ভাবে এসে বলেন, হে ঠাকুর তুমিই আমার সব, এই বলে ঠাকুরের চরণে পুষ্প অর্পণ করছেন। আমরা এটাকে পূজা বলছি। কিন্তু আসলে কি এটা? আমার যে ক্ষুদ্র আমি, তাঁর পাদপদ্মে ফুল দিয়ে, আর ফুল অর্পণের ক্রিয়া করে, ফুলটা একটা বস্তু আর অর্পণ করাটা একটা ক্রিয়া, এইভাবে তিনি বৃহৎ, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন বৃহৎ, এই বৃহতের সাথে নিজেকে জুড়ে দিচ্ছেন। উপনিষদেও বলছেন, *যোবৈ ভূমাঃ তৎ সুখম্,* মানুষ যখন নিজেকে বৃহৎ মনে করে তখনই সে সুখী হয়, কারণ সেখানে নিজের বিস্তার হয়। কাউকে কটূ কথা বললে, তার স্পেসটা ছোট হয়ে যায়, কষ্ট হয়।

যখন আমরা পূজা করছি, ঠাকুর যিনি অনন্ত, যাঁর ভাব অনন্ত, সেই অনন্তের সাথে কোন না কোন ভাবে আমরা জুড়ে যাচ্ছি। কোন মন্ত্রী বা বড় কোন লোকের সাথে যদি কারুর পরিচয় থাকে, সে গর্ব করে বলবে, আরে ওনার সাথে আমার পরিচিতি আছে। বংশের কেউ যদি ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার বা কোন বড় কিছু হয়, তখন গর্ব করে বলে, জানো আমাদেরই বংশের একজন ওখানে আছে। পাড়া বা গ্রামের কেউ সন্ন্যাসী হয়ে গেলে, সেই পাড়া বা গ্রামের কোন লোকের সাথে সেই সন্ন্যাসীর দেখা হলে খুব গর্ব ও আনন্দ সহকারে বলে, আমি আপনাকে জানি, আপনি আমাদের গ্রামে থাকতেন। কারণ সে নিজেকে সেই বৃহতের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছে। আমরা যখন পূজা করছি, তখনও আমরা সেই বৃহতের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছি। সমুদ্র দেখে আমাদের আনন্দ হয় কেন? কারণ সমুদ্রের সামনে দাঁড়ালেই আমাদের মন কোথাও গিয়ে সেই বৃহতের সাথে জুড়ে যাচ্ছে। শ্রীশ্রীমাও বলছেন, খোলামেলা জায়গায় থাকলে মন ভাল থাকে, ধ্যানও ভাল হয়। সারাদিন একটা ঘরের মধ্যে বদ্ধ থাকলে ধ্যান হবে না। দিনে কিছু সময় ছাদে গিয়ে পায়চারি করলে মন খুলে যাবে। মুক্ত আকাশের নীচে কিছুক্ষণ সময় কাটান। হিমালয়ে গিয়ে কোন নির্জন খোলামেলা জায়গায় থাকলে প্রাণ এমনিই খুলে যাবে। সাধনা মানেই, নিজের ক্ষুদ্রতাকে বৃহতের কাছে খুলে দেওয়া।

বেদ মায়ের মত, বেদ এই জিনিসটাকে জানেন, তিনি একটু শুধু টোপ খাইয়ে দিচ্ছেন, এই যজ্ঞ করলে তোমার এই লাভ হবে, অমুক যজ্ঞ করলে অমুক হবে। সব সময় শুধু যে টোপ দিচ্ছেন তা না, বেদে দেবতাদের উদ্দেশ্য বিখ্যাত স্তুতিগুলিও আছে। শুধু ফুল অর্পণ না, ফল অর্পণ না, মিষ্টি অর্পণ না, যখন স্তুতি করছেন, যে কোন স্তুতি, সেখানে শব্দ দিয়ে নিজেকে সেই বৃহতের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছেন। গীতার আলোচনার শুরুতে আমরা যে স্তুতি করে, বলছি *কৃষ্ণং বন্দে জগৎগুরুম্*, শব্দ দিয়ে নিজেকে আমরা জুড়ে দিচ্ছি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে। আমরা কি ভগবানের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশায় প্রার্থনা করি? একেবারেই তা নয়, প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা নিজেকে জুড়ে দিচ্ছি সেই বৃহতের সঙ্গে। রোজ সন্ধ্যেবেলা আমরা যে ঠাকুরের সামনে খণ্ডন ভব বন্ধন করছি, সেই সময় আমাদের মন একটা অনাবিল আনন্দের মধ্যে, গভীর শান্তির মধ্যে ডুবে যায়। কারণ, সেই সময়ও আমরা বৃহতের সাথে জুড়ে যাচ্ছি। বেদ অন্য ভাবে বৃহতের সাথে আমাদের জুড়ে দিচ্ছেন। বেদ এটাকে বলছেন যজ্ঞ; বেদী বানাও, অগ্নি স্থাপন কর, সেই অগ্নিতে আহুত দাও, আহুতি দেওয়ার জন্য আবার অনেক উপকরণ দরকার, বেদের সময় এই জিনিসগুলোর খুব প্রচল ছিল, এখন অনেক কমে গেছে, তবে যজ্ঞাদি কমে গেলেও এটাই এখন অন্য রূপে করা হয়।

অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হচ্ছে, তার মানে সেখানে একটা ক্রিয়া হয়ে গেল। ক্রিয়া হয়ে গেল মানে, কারকের বিস্তার হবে, তার সাথে ক্রিয়ার একটা ফল হবে। ফল মানে, মৃত্যুর পর যেন ভাল জন্ম পাই বা মৃত্যুর পর যেন স্বর্গে যেতে পারি বা ইহজগতে আমার যেন এটা হয়, সেটা হয়। যজ্ঞ একটা পূজার কার্য, তাতেই কত বিস্তার হয়ে গেল –আটটি কারক, ক্রিয়া এবং ফল। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, যেমন ঠাকুরের কথা বর্ণনা করা হল, তিনি দেখছেন ছাগ, খড়্গ, বলিকাঠ সবই সচ্চিদানন্দ, এই ধরণের আত্মজ্ঞানী যদি যজ্ঞ করেন, তখন তিনি কি দেখবেন? চব্বিশ নম্বর শ্লোকে ভগবান বলছেন –

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।।২৪।।

(কারণ, ব্রহ্মবিৎ হবনীয় দ্রব্যের অর্পণকে, ঘৃতকে, হোমাগ্নিকে, আহুতিদানের কর্তাকে এবং হোমক্রিয়াকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন। তাঁর দৃষ্টিতে ব্রহ্মরূপ কর্মে সমাহিতচিত্ত ব্যক্তির প্রাপ্তব্য ফলও ব্রহ্ম।)

যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মবেত্তা, তিনি যখন যজ্ঞ করেন, এটা ঠিক যে ব্রহ্মজ্ঞানী কখন যজ্ঞ করবেন না, কিন্তু এখানে আদর্শ রূপে বলা হচ্ছে, ঠাকুরের যেমন গলিতহস্থ হয়ে যাচ্ছে, পূর্বজদের তর্পণ করতে যাচ্ছেন, আঙুলের ফাঁক দিয়ে তাঁর জল গলে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী যদি যজ্ঞ করেন, তখন তিনি কি দেখবেন? তিনি দেখবেন যে জিনিস দিয়ে যজ্ঞ করা হচ্ছে সেটা ব্রহ্ম, যেটা দিয়ে আহুতি দেওয়া হবে, সেটা ব্রহ্ম; যিনি যজ্ঞ করছেন (কর্তা), তিনি ব্রহ্ম; যে অগ্নি স্থাপনা করা হয়েছে, সেই অগ্নি ব্রহ্ম; আর এই যে হবন ক্রিয়া, এই ক্রিয়াটাও ব্রহ্ম এবং এই ক্রিয়ার যে ফল হবে সেটাও ব্রহ্ম, সবটাই ব্রহ্ম।

ব্রহ্মকর্মসমাধিনা, যে ব্যক্তির সমস্ত কর্ম মনের ভিতরে এই অর্থে বসে গেছে যে, ব্রহ্মই আছেন; তিনি যে সমস্ত কর্ম করেন, তাঁর কাছে সবটাই ব্রহ্ম। একটা ক্রিয়ার যত রকমের অঙ্গ হতে পারে, কারক রূপী যত অঙ্গ থাকতে পারে, তার সাথে ক্রিয়া এবং তার সঙ্গে ক্রিয়ার ফল, সব এক হয়ে যায়। এটাই আবার ধ্যানে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এক হয়ে যায়। আমরা একটা জিনিসকে যখন জানছি, যেমন এই কলম আছে, আমি এই কলমকে জানছি, তখন আমি আলাদা, চশমা দিয়ে দেখছি এটাও একটা কারক, কলম হল দ্বিতীয়া, সংস্কৃতে বলে কর্ম আর দেখাটা হল ক্রিয়া। ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেলে, এই তিনটে মিলে এক হয়ে যায়। সেই যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, যিনি অনন্ত, সেখানে কার উপর কে ক্রিয়া করবে, যেটা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারে আলোচনা করেছি। ক্রিয়া কি করে হবে,

অনন্ত কিনা। ক্রিয়া করার জন্য একটা জায়গা দরকার, তারপর কর্তা ও কর্ম, সংস্কৃতে প্রথমা ও দ্বিতীয়া, এই দুটোকে আলাদা হতে হবে। ফলে এক হয়ে যায়। ঠাকুরও কথামৃতে অনেক জায়গায় বলছেন, ধ্যাতা, ধ্যেয় ও ধ্যান এক। এক হওয়া মানে, যিনি ধ্যান করছেন, যাঁর ধ্যান করছেন আর ধ্যান রূপ ক্রিয়া, তিনটেই এক হয়ে যায়। আমরা যাঁরা এই লেকচার ফোনে বা কম্প্যুটারে দেখছি, আমাদের সামনে একটা স্ক্রীন আছে, দৃশ্য গুলি সরে সরে যাচ্ছে।

এই জগতকে যখন দেখছি, দেখার সময় চোখের উপরে যদি একটা ঠুলি লাগিয়ে দেওয়া হয়, তখন ওই ঠুলি দিয়ে যে দৃশ্য দেখব সেটা সম্পূর্ণ একটা দৃশ্যের অংশ দেখব, আমরা টুকরো টুকরো দৃশ্য দেখি। কিন্তু ঠুলিটা যদি খুলে দেওয়া হয়, তখন কোন মুভমেন্ট নেই, কিছু নেই, একটা সলিড। চোখের উপর একটা পাইপ লাগিয়ে পাইপের ভিতর দিয়ে একটা পাহাড় দেখছি, আর আস্তে আস্তে মাথাটা ঘোরাচ্ছি, দৃশ্যগুলো তখন পাল্টাতে থাকে। চোখের উপর থেকে পাইপটা সরিয়ে দিলে সব এক দেখাবে, আলাদা কিছু দেখাবে না, কোন মুভমেন্ট নেই, কোন ক্রিয়া নেই, কোন কর্তা নেই, কোন কর্ম নেই, মানে দ্বিতীয়া নেই।

ব্রহ্মজ্ঞানীকে নিয়ে বলতে গিয়ে এই যে বলছেন, কর্তা নেই, কর্ম নেই। কর্তা আর কর্ম না থাকলে সেখানে ক্রিয়া কি করে হবে! তাই বলছেন, আত্মজ্ঞানে সমস্ত ক্রিয়ার অভাব হয়ে যায়। কেন অভাব হয়ে যায়? কারণ সব মিলে এক হয়ে যায়, আসলে যেহেতু আমিটাও থাকে না, সেইজন্য এক বলাটাও ঠিক হবে না, ঠিক ঠিক হল এক দুয়ের পারে। অদ্বৈত মানেই তাই, অদ্বৈত মানে এক দুয়ের পারে, কি আছে সেটা মুখে বলা যাবে না। এক যদি বলি, তাহলে তো মুখে বলে দেওয়া হল, বৌদ্ধদের মত শূন্য যদি বলি, সেখানেও মুখে বলে দেওয়া হল। মুসলমানদের মত যদি বলি এক, সেই আল্লা, মুখে বলে দিলেন। অদ্বৈত তা নয়, অদ্বৈত এক দুয়ের পার। কেন? সেখানে কর্তা নেই, ক্রিয়া নেই, কর্ম নেই, তাই ফলও নেই, এক আসবে কোথা থেকে। তাহলে কি এক আছে? তাও নেই, কি আছে মুখে বলা যাবে না। ওটাকে হয় আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হবে, নয়তো ধারণা করতে হবে। একটা ধারণা হয়ে গেলে অনেকটা শান্তি। বলছেন, যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁদের ভাব এটাই।

রামকৃষ্ণ মিশনের সমস্ত সেন্টারে খাওয়ার সময় এই মন্ত্রোচ্চারণ করে অন্ন গ্রহণ করা হয়। মিশনের সিনিয়র মহারাজরা সবাইকে আমরা যে অন্ন গ্রহণ করি, এটাকে যজ্ঞ রূপে নিতে বলে দিয়েছেন। খাওয়ার সময় এই জন্যই গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের এই চব্বিশ নম্বর শ্লোক পাঠ করা হয়, নিজেকে মনে করাবার জন্য, যিনি খাচ্ছেন তিনিও ব্রহ্ম, যেটা খাওয়া হচ্ছে সেটাও ব্রহ্ম, খাওয়ার যে ক্রিয়া এটাও ব্রহ্ম, ক্রিয়ার যে ফল পেট ভরে যাওয়া, এটাও ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। ব্রহ্মজ্ঞানীদের কথা বলার পর এবার আমাদের মত লোকেদের জন্য বলছেন। তোমার সবাই তোমাদের জীবন ধন্য কর। কিভাবে করবে? জীবনে যত ক্রিয়া আছে সব ক্রিয়াকে যজ্ঞ রূপে কর।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি।।২৫।।

(অন্য যোগিগণ দেবতাপূজারূপে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। আর কেউ কেউ নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে জীবাত্মাকে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে আহুতি প্রদান করেন, অর্থাৎ সোপাধিক জীবাত্মাকে নিরুপাধিক পরমাত্মারূপে দর্শন করেন।)

বিভিন্ন রকমের যজ্ঞের কথা বলছেন, সব মিলিয়ে প্রায় বারো রকম যজ্ঞের কথা বলছেন। এই যে ব্রহ্মজ্ঞানীদের জন্য বললেন *ব্রহ্মার্পণং*, এটাই যাঁরা জ্ঞানী নন তাঁরা কিভাবে করেন? পঁচিশ নম্বর শ্লোকে বলছেন পূজা রূপে যেটাই করছেন, ওটা যজ্ঞ। আমরা পঞ্চ যজ্ঞের কথা অনেকবার অনেক জায়গায় আলোচনা করেছি। সেখানে বলা হয়েছে, ব্রহ্মযজ্ঞের পর হল দেবযজ্ঞ। কিন্তু

তখনকার দিনের ব্রাহ্মণরা, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা এই যজ্ঞ করতেন, শূদ্রের অধিকার ছিল না। এখন কোন শূদ্র নেই, এখন হয় সবাই ব্রাহ্মণ, নয়তো সবাই শূদ্র। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সবাই ব্রাহ্মণ। মনু বলে গিয়েছিলেন, শুদ্ধ আচরণ করলে শূদ্ররাও ব্রাহ্মণ। এখন ভারতবর্ষের সবারই আচরণ শুদ্ধ হয়ে গেছে। চুরি-চামারি সবাই করে, এগুলো কোন কিছু না। আমরা এখন নূতন জাতি, এখন নূতন ক্ষমতা পেয়েছি, একটু কেউ চুরি করে, একটু বদমাইশি করে, ওগুলোর দিকে অত তাকাতে নেই। হিন্দুরা একটা বিশুদ্ধ জাতি, এখানে সবাই ব্রাহ্মণ। এখন যজ্ঞ হয় না, কিন্তু পূজা হয়, একই জিনিস।

দৈবমেবপরে যজ্ঞং, অন্যরা যখন করে, তখন তাঁরা যজ্ঞ দিয়ে দেবতাদের পূজা করেন। তাঁদের জীবনটা পুরো যজ্ঞে সমর্পিত। আগেকার ঋষিদের তাকালে আমরা দেখতে পাই, সারাটা সময় তাঁরা যজ্ঞ করে যাচ্ছেন। মহাভারতে বর্ণনা আছে, নৈমিষ্যারণ্যে একটা যজ্ঞ হচ্ছে, বারো বছর ধরে নাকি সেই যজ্ঞ চলছে। শৌণক ঋষি সেই যজ্ঞ দেখতে গেছেন। তাঁকে ঋষিরা সবাই মিলে ঘিরে ধরে অনুরোধ করে বলছেন, সন্ধ্যেবেলা আমাদের একটু অবসর হয়, সেই সময় যদি আপনি পুরাণের কাহিনীগুলি আমাদের বলেন। শৌনক ঋষিও পুরাণ-কাহিনী বলছেন। জীবনটাই একটা পুরো যজ্ঞ, দেবতাদের জন্য যজ্ঞ করছেন। আর বলছেন, *ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি*, অনেকে আবার যজ্ঞ দিয়ে যজ্ঞের পূজা করছেন। এখানে কোন দেবতার পূজা করছেন, সেই যজ্ঞেরই পূজা করছেন।

এটাকে আচার্য শঙ্কর তাঁর গীতার ভাষ্যে অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করছেন, তিনি বলছেন, যজ্ঞের একটা অর্থ হয় আত্মা। সংস্কৃতে এই এক সমস্যা, একটা শব্দের অনেকগুলো অর্থ হয়, বিভিন্ন ভাষ্যকাররাও এটাকে বিভিন্ন ভবে ব্যাখ্যা করেন। আচার্য এখানে বলছেন, যজ্ঞের একটা অর্থ হয় আত্মা, আত্মা দুই প্রকার – শুদ্ধ আত্মা এবং উপাধিসহিত আত্মা। উপাধি সহিত আত্মা মানে, যেমন আমি, আমি অমুক ব্যক্তি, আমি শুদ্ধ আত্মা, কিন্তু উপাধি লাগানো আছে। কি রকম উপাধি? আমি এই দেহ মনের সঙ্গে যুক্ত, আমি একজন সন্ন্যাসী, আমি আচার্য রূপে ক্লাশ নিচ্ছি, এই উপাধিগুলো লেগে গেছে। উপাধি লেগে যাওয়ার জন্য এটাকে আমরা অশুদ্ধ আত্মা বলি না, আমরা বলি সোপাধিক, উপাধি সহিত। বলছেন, যখন এনারা আত্মজ্ঞানের চেষ্টা করছেন বা যে যোগীরা আত্মজ্ঞানের চেষ্টা করছেন, তখন তাঁরা কি করছেন? সোপাধিক আত্মাকে নিরুপাধিক আত্মাতে আহুতি দিচ্ছেন।

আগেকার দিনে দেওয়ালীর সময় আর দোলের সময় সব পুরনো আবর্জনা জড়ো করে পোড়ান হত। সব নোংরা আবর্জনাকে পুড়িয়ে দাও। সোপাধিক আত্মা, দেহ মনের সঙ্গে আত্মা জড়িয়ে আছে, ওর এই জড়ানোটা, এটাই অশুদ্ধ ভাব, এটাকে আহুতি দিয়ে দাও। কোথায়? নিরুপাধিক আত্মাতে, যাতে ও বুঝে নিতে পারে, আমি আসলে শুদ্ধ আত্মা। সোপাধিক আত্মা জগতের সাথে, এটার সাথে, সেটার সাথে জড়িয়ে আছে, সব আহুতি দিয়ে দাও, লাগিয়ে দাও আগুন, এই অশুদ্ধিকে পুড়িয়ে দাও। এই যজ্ঞ সন্ন্যাসীরা করেন, বা যে কোন লোক যিনি আত্মজ্ঞানের দিকে এগোচ্ছেন তাঁরা এটাই করেন, *ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং* , ব্রহ্মরূপী অগ্নিতে, কোন ব্রহ্ম? নিরুপাধিক ব্রহ্ম, সেই অগ্নিতে সোপাধিক ব্রহ্মকে আহুতি দিয়ে দেন, যাতে সব উপাধি পুড়ে ভস্মিভূত হয়ে যায়। তার সাথে বলছেন, আত্মাই ব্রহ্ম এই জ্ঞানের উপলব্ধিটাই এই যজ্ঞের ফল। যজ্ঞটা হল যেটা সাধনা করা হচ্ছে, আত্মাই যে ব্রহ্ম, এই জ্ঞান যাতে আসে। এখান থেকে আরও সহজে নিয়ে যাচ্ছেন –

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি।।২৬।।

(অন্য কোন কোন যোগী কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সকলকে সংযম-অগ্নিতে আহুতি দেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম করেন। অপর কোন কোন যোগী শব্দাদি বিষয়সমূহ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন [শ্রোত্রাদি দ্বারা শাস্ত্রবিহিত বিষয়গ্রহণকে হোম মনে করেন।])

আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখছি, ইন্দ্রিয় দিয়ে শুনছি, আস্বাদ করছি; যোগীরা ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযম করে নেন। আমরা ব্রহ্মচর্যের কথা শুনেছি, ব্রহ্মচর্য মানে সব কিছুকে সংযম করে নেওয়া। সাধনা রূপে আমি হয়ত একটা বিশেষ কোন খাবার খাই না, তার মানে ইন্দ্রিয়কে সংযম করে নিলাম। ইউপি বা উত্তরাঞ্চলে দেখা যায়, অনেকে তীর্থাদিতে গিয়ে কোন একটা বিশেষ ফল কোন দেবতার নামে অর্পণ করে দেন; হয়ত কেউ কলা অর্পণ করে দিলেন, শিবের মাথায় কলা অর্পণ করে দিয়ে বলে দিলাম, আমি আর কলা খাব না। এই যে সংযম, এই সংযম একটা অগ্নি; সংযমরূপী যে অগ্নি, এতে ইন্দ্রিয়ের যে বিষয়গুলি আছে, সেগুলিকে আহুতি দিয়ে দেওয়া হল। আমাদের সহজ ভাষায়, যোগী নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযম করে নেন বা নিয়ন্ত্রণ করে নেন। এটাকেই গীতা যজ্ঞের সাথে তুলনা করে বলছেন, এই যে সংযমরূপী অগ্নি, তাতে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিকে আহুতি দিয়ে দিচ্ছেন।

শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি। কোন কোন যোগীরা আবার কি করেন? ইন্দ্রিয় দিয়ে শাস্ত্র সম্মত ভাবে অল্প একটু যে গ্রহণ করছেন, সেটাকে এনারা মনে করেন, এই বিষয়গুলিকে আমি ইন্দ্রিয়ে আহুতি দিচ্ছি। কথামৃতে এক জায়গায় আছে, ঠাকুর খাচ্ছিলেন, তখন একজন জিজ্ঞেস করছেন, বাবা তুমি কি খাচ্ছ, নাকি আহুতি দিচ্ছ? খেতে বসে আমরা সবাই মনে করি আমরা খাচ্ছি, কিন্তু যিনি যোগী, তিনি মনে করছেন, এই যে আমার খাবার, এটাকে আমি জিহ্বার উপর আহুতি দিলাম। ইন্দ্রিয় একটা অগ্নি, এই অগ্নিতে বিষয়গুলিকে আহুতি দেওয়া হচ্ছে। আর ইন্দ্রিয়কে যখন সংযম করে নেওয়া হচ্ছে, তখন সংযমকে বলছেন অগ্নি। আমরা যদি একটা অগ্নিকুণ্ডের কল্পনা করি, যেখানে হোম হচ্ছে, এই আগুনটা হল সংযম, সেই অগ্নিতে ইন্দ্রিয়ের আহুতি দেওয়া হল। আমি সিনেমার গান শুনব না, আমি পপুলার মিউজিক শুনব না, এটাই ইন্দ্রিয়ের সংযম, সংযম রূপী অগ্নিতে আমি আমার শ্রবণেন্দ্রিয়কে আহুতি দিয়ে দিলাম। তেমনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে যেটা দিয়ে ইন্দ্রিয়ের ভোগ হচ্ছে, এখানে ইন্দ্রিয় রূপী অগ্নিতে বিষয়কে আহুতি দেওয়া হচ্ছে। গীতা আমাদের জন্য কত সহজ করে দিচ্ছে, আমি যে খাওয়া-দাওয়া করছি, এটাকেও যজ্ঞ রূপে পরিবর্তিত করে দেওয়া যায়। যখনই কিছু খাচ্ছি, *ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ* যেটা বলা হল, এটা ব্রহ্মজ্ঞানীদের জন্য। আচার্য যদিও বলছেন, ঐ রূপে সাধনা করে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, সেটা অন্য জিনিস, কিন্তু শুদ্ধি তো হবেই। কিন্তু এই বোধ করা, আমি খাচ্ছি না, আমি আহুতি দিচ্ছি।

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে।।২৭।।

(আত্মাতে সংযমরূপ বিবেক-বিজ্ঞান প্রদীপ্ত যে যোগাগ্নি তাতে অপর যোগিগণ সব ইন্দ্রিয়কর্ম এবং প্রাণাদি দশ বায়ুর কার্য আহুতি দেন বা লয় করেন।)

যত রকমের কর্ম আছে, আর শরীরের ভিতর যে প্রাণশক্তি রয়েছে, যে প্রাণশক্তি আমাদের সব রকম ক্রিয়াকে চালনা করে, ওখানে বললেন ইন্দ্রিয় সংযম, আর এখানে বলছেন আত্মসংযম, অর্থাৎ সমস্ত কর্মের সংযম করে নিচ্ছেন। যিনি যোগী, তিনি যত রকম কর্ম করেন, সেখানে তিনি নিজেকে আটকে দিলেন। কোন দিকে তাঁর বিস্তার নেই। বলছেন, *আত্মসংযমযোগাগ্নৌ*, ওখানে ছিল শুধু সংযম অগ্নি আর এখানে আত্মসংযম রূপ অগ্নি, এখানে সমস্ত কিছুকে সংযম করে নিচ্ছেন। কারা এই যজ্ঞ করেন? বলছেন, *জ্ঞানদীপিতে*, যাঁদের বিবেক বিজ্ঞান প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে, যিনি বুঝে গেছেন আমাকে আত্মজ্ঞান পেতে হবে, যিনি জেনে গেছেন এই সংসারে আমার হারাবার কিছু নেই আর এই সংসার থেকে আমার পাওয়ারও কিছু নেই। এই বোধ যাঁর এসে গেছে, তিনি শুধু ইন্দ্রিয় সংযম করেন না, তিনি সব কিছুকে সংযম করে নেন। তাঁর শুধু পঞ্চেন্দ্রিয় না, দশটি ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ সব কিছুকে সংযম করে নেন।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাহপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।।২৮।।

(অন্য কেউ কেউ দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ করেন। কেউ কেউ তপোরূপ যজ্ঞ এবং কেউ কেউ প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারাদি যোগরূপ যজ্ঞ করেন। অপর কোন কোন দৃঢ়ব্রত যত্নশীল যোগী বেদাভ্যাস (শাস্ত্রপাঠ) ও শাস্ত্রার্থনিশ্চয়স্বরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে থাকেন।)

সংশিতব্রতাঃ, যাঁরা দৃঢ় ভাবে চেষ্টা করছেন। এখানে পর পর বলছেন, কিভাবে বিভিন্ন রকমের যজ্ঞ হয়। প্রথমে দ্রব্যযজ্ঞের কথা বলছেন, আমরা যখন কোন জিনিস দিয়ে যে দান করছি, এটা হল দ্রব্যযজ্ঞ। শ্রীশ্রীমা গ্রাম্য ভাষায় খুব সুন্দর বলছেন, যার আছে মাপো, যার নেই জাপো। তোমার যদি অনেক টাকা-পয়সা থাকে তাহলে তুমি দান কর, তোমার টাকা পয়সা সেই রকম নেই, তুমি জপ করে যাও। তীর্থে গেলে দান করতে হয়, কোন শুভক্ষণ হলে দান করতে হয়। প্রতি বছর দূর্গাপূজা আসে, দূর্গাপূজাতে আমরা কত টাকা নিজের উপর খরচ করি। নূতন জামা-কাপড়, নূতন ধরণের ডিজাইনের শাড়ী, পোশাকের জন্য কত টাকা খরচ করছি, কিন্তু আমাদের যে দান করতে হবে, সেটার দিকে আমাদের দৃষ্টি থাকে না। কত রিলিফ ফাণ্ড আছে, প্রাইমিনিস্টার রিলিফ ফাণ্ড আছে, রামকৃষ্ণ মিশনের রিলিফ ফাণ্ড আছে। আচ্ছা না হয় ওখানে দান করলে কেউ আমার নাম জানতে পারবে না, আপনি পাড়াতেই দিন। যেখানে দশ হাজার টাকার জামা কাপড় কিনতে যাচ্ছেন, সেখানা টাকাটা একটু কম করে দিন, নয় হাজার টাকার মধ্যে বাজেট করে এক হাজার টাকা বাঁচিয়ে রাখুন। সেই টাকায় সস্তা শাড়ি কেনে লোকেদের উপহার দিন। কিন্তু কেউ করে না। টাকা-পয়সা থাকলে দ্রব্যযজ্ঞ সবাইকে করতে হয়। দ্রব্যযজ্ঞ করলেও আপনি শুদ্ধ হবেন। জীবনকে যদি ধন্য করতে চান, দ্রব্যযজ্ঞ করুন।

দ্রব্যযজ্ঞের পর আসছে তপোযজ্ঞ। বিভিন্ন ভাবে তপস্যা করা যায়, রাজযোগে অনেক রকম তপস্যার কথা বলা হয়েছে, প্রাণায়ম করা, প্রত্যাহার কর, নিজের ইন্দ্রিয়াদিকে সংযম করা। এগুলো অবশ্য তপস্বীরা করেন, সবাই পারবেন না। তবে যতটা পারা যায় করা ভাল। বেলুড় মঠে মাঝে মাঝে ইয়ং সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা বলেন, আমরা আজ জপযজ্ঞ করছি। বেলুড় মঠের ট্রেনিং সেন্টারের ব্রহ্মচারীরা জপযজ্ঞে সারা রাত, বিশেষ করে শীতের সময় জপ করবেন। তবে বাই টার্ন করেন, একটা দল দু ঘন্টা করল, এরপর আরেকটা দল দু ঘন্টা করল, এইভাবে সন্ধ্যে থেকে সকাল পর্যন্ত জপযজ্ঞ চলতে থাকে। তার মধ্যে অনেকে টানা সারা রাত বসে থাকেন। কিন্তু এখানে তপোযজ্ঞ বলছেন, তপোযজ্ঞ হল সারা জীবন তপস্যা করে যাচ্ছেন।

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ, সারাদিনে নির্দিষ্ট একটা সময় নিয়মিত রোজ শাস্ত্র পাঠ করা, এটাকে বলে *স্বাধ্যায়যজ্ঞ*। সকাল আটটা বাজল, এখন আমি গীতা পাঠ করব, বা চণ্ডী পাঠ করব, বা কথামৃত পাঠ করব বা যিনি যে শাস্ত্রকে অনুসরণ করে থাকেন সেই শাস্ত্র রোজ নিয়মিত পাঠ করছেন, এটা হল *স্বাধ্যায়যজ্ঞ*। দিনের পর দিন এই স্বাধ্যায়যজ্ঞ যদি করে যান, এতেও জীবন ধন্য হয়ে যায়। নিজের জীবন যদি ধন্য করতে চান, নিজেকে যদি কৃতার্থ করতে চান, কৃতকৃত্য যদি করতে চান, তাহলে স্বাধ্যায়যজ্ঞ করলেও হবে। তার সাথে বলছেন, *জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ*, শাস্ত্রের অর্থ অনুধাবন করা, ধারণা করা, আমরা যে গীতার ব্যাখ্যা শুনছি, এটা স্বাধ্যায়যজ্ঞ না, এটা জ্ঞানযজ্ঞ, যেখানে আমরা গীতার অর্থ বোঝার চেষ্টা করছেন। এখন নিয়মিত যদি না হয়, একদিনই হল, মন্দের ভাল। *সংশিতব্রতাঃ*, যাঁরা এগুলো পারেন না, তখন তাঁরা বিভিন্ন ব্রত করছেন, যেমন বিহারের লোকেরা ছট করে, ছট একটা ব্রত, এটা পূজা না। কেউ একাদশী ব্রত করছেন, চান্দ্রায়ণ ব্রত করছেন, এই ধরণের নানা রকমের ব্রত করছেন, এদেরকে বলছেন *সংশিতব্রতা*।

এই আটাশ নম্বর শ্লোকটা সবারই মুখস্ত করে নেওয়া উচিৎ, নিজের জন্য তো বটেই অপরের জন্যও খুব দরকার। আমরা এটাকে পঞ্চ মহাযজ্ঞ রূপে খুব সহজ করে বলেছি ঠিকই। *সংশিতব্রতাঃ*, যাঁরা যত্নশীল। এটা আমাদের দেখতে হবে যে, এগুলো যেন নিয়মিত হয়। বা আরও সহজ ভাবে নিতে হলে পঞ্চ মহাযজ্ঞের যে কথা বলা হয়েছিল, সেটাও করা যেতে পারে। যজ্ঞ যদি না করা হয়, তাহলে আমাদের জীবনটা বৃথা হয়ে যাবে। জীবনকে যদি ধন্য করতে হয়, আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনকে যদি একটা মহৎ জীবনে রূপান্তরিত করতে চাই, আমরা যদি আধ্যাত্মিক জীবনের পথে যেতে চাই, তাহলে যজ্ঞ করতে হবে।

লোকেরা কথায় কথায় বলে, কবে ঠাকুর কৃপা করবেন, কোন দিন করবেন না। কিছু কি করেছেন জীবনে? ঠাকুর হলেন বড় হাওয়াই জাহাজ, জাম্বো জেট প্লেন, এই প্লেন যে নামবে, তার জন্য দরকার একটা বড় রানওয়ে। বড় প্লেনকে যেখানে সেখানে নামানো যাবে না। জিটি রোডে কি প্লেন নামানো যাবে? কত অটো, টোটো, রিক্সা, স্কুটার এই ভিড়ের মধ্যে প্লেন কি কর নামবে, প্রশ্নই নেই! প্লেন আসবে, মাথার উপর কয়েকটা চক্কড় মেরে বলবে, এখানে নামা যাবে না, ঘুরে চলে যাবে। ঠাকুর আসেন, কিন্তু আমাদের মনের রানওয়েটা দেখে আবার উড়ে ফেরত চলে যান। যেখানে যুদ্ধ হওয়ার সম্ভবনা থাকে, সৈন্যরা গিয়ে প্রথমে ওখানে একটা রানওয়ে তৈরী করে, যুদ্ধের প্লেনগুলো যাতে ওঠা-নামা করতে পারে। আত্মজ্ঞান বা ঠাকুর হলেন বড় জাম্বো প্লেন, যেখানে সেখানে নামতে পারেন না। নামার জন্য লম্বা রানওয়ে দরকার। আমার আপনার যে সঙ্কীর্ণ মন, এখানে বাচ্চাদের যে কাগজের প্লেন ছাড়া হয়, এটাই নামতে পারবে।

যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ, নিজেকে যে তৈরী করবেন, সেই চেষ্টা কোথায় করছেন? আপনাকে যতি হতে হবে, ব্রত উপোস করে করে নিজেকে শুদ্ধ করতে হবে। দ্রব্যযজ্ঞ করতে হবে, তপযজ্ঞ করতে হবে, জ্ঞানযজ্ঞ করতে হবে, স্বাধ্যায়যজ্ঞ করতে হবে, এর মধ্যে যে কোন একটা করুন, কিছু একটা তো করুন। কিছু একটা করে আগে আপনার রানওয়েটা তৈরী করুন। ঠাকুর সব সময় আসছেন, কিন্তু তিনি নামার জায়গা পাচ্ছেন না, কয়েকটা চক্কর দিয়ে চলে যাচ্ছেন। এটা ঠিক যে, ঠাকুরের জ্ঞান যাঁর হয়ে যাবে, তিনি অনেকেরই উদ্ধার করতে পারবেন। ঠাকুর বাহাদুরী কাঠের কথা বলছেন, বাহাদুরী কাঠ না হলে কাউকে উদ্ধার করতে পারবেন না।

ছাব্বিশ নম্বর শ্লোকে ইন্দ্রিয়ের সংযমের কথা বললেন, বা বিষয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আহুতি রূপে দেওয়া হচ্ছে বা সমস্ত কিছুকে নিজের ভিতরে নিয়ন্ত্রণ করে নিচ্ছে বা এই আটাশ নম্বর শ্লোকে যেটা বলছেন, দ্রব্যযজ্ঞ, তপযজ্ঞ, তার সাথে স্বাধ্যায়যজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, *যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ*; জীবনকে যিনি ধন্য করতে চাইছেন, তাহলে এগুলো করুন। এগুলো সব কটা একসাথে করার দরকার নেই, যে কোন একটাকে ঠিক করে সেটাই করতে থাকুন। আরও যজ্ঞ আছে, আগেকার দিনে যোগী অনেক ছিলেন, বিভিন্ন যোগী বিভিন্ন ভাবে যজ্ঞ করতেন, এটাই পরের শ্লোকে বলছেন –

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।।২৯।।

(অন্যান্য যোগী অপানবায়ুতে প্রাণবায়ু (পূরক প্রাণায়াম) এবং প্রাণবায়ুতে অপানবায়ু আহুতি দিয়ে (রেচকনামক প্রাণায়াম করে) প্রাণ ও অপানবায়ুর গতি রোধপূর্বক কুম্ভকরূপ প্রাণায়াম করেন।)

কোন কোন যোগী আবার প্রাণায়ামের সময় নিঃশ্বাস যখন নিচ্ছেন, তখন সেই নিঃশ্বাসকেও তিনি আহুতি দিচ্ছেন, যজ্ঞ হয়ে গেল। বাইরে নিঃশ্বাসকে ফেলছেন, এটাও একটা যজ্ঞ। প্রাণ বায়ু হল যেটা বেরিয়ে যায়, যে বায়ু ভিতরে যায় সেটাকে অপান বায়ু বলে। প্রাণায়ামের তিনটে ধাপ পূরক, রেচক ও কুম্ভক – শ্বাস ছাড়া, শ্বাস ভিতরে নেওয়া আর বায়ুকে ভিতরে বা বাইরে ধরে

রাখা। কেউ রেচক করে, কেউ পূরক করে আবার কেউ কুম্ভক করে। যোগীরা বিশেষ করে যাঁরা হঠযোগ করেন, তাঁরা এগুলোর অনুশীলন করেন। ভগবান বলছেন, যাঁরা প্রাণায়ামাদি করেন তাঁরাও এটাই করেন। নিঃশ্বাস ছাড়ছেন, এটা একটা আহুতি; যে নিঃশ্বাসটা নিচ্ছেন সেটাও একটা আহুতি, শ্বাস নেওয়া ও ছাড়া দুটোকেই যদি বন্ধ করে দেন, সেটাও একটা আহুতি।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষঃ।।৩০।।

(অন্য কোন কোন যোগী আহার-সংযমপূর্বক প্রাণবায়ুসমূহে অন্যান্য প্রাণবায়ু আহুতি দেন অর্থাৎ যে যে প্রাণবায়ু জয় করেন, সেই সেই প্রাণবায়ুতে অন্যান্য প্রাণবায়ু হোম করেন। এই সকল যজ্ঞের জ্ঞাতা ও কর্তা যজ্ঞ দ্বারা পাপমুক্ত হন।)

আবারা অনেকে আছেন, যাঁরা এসব কিছু না করে শুধু নিজের আহার, খাওয়া-দাওয়াকে সংযমিত করেন, এই ধরণের যোগীদের বলা হয় *নিয়তাহারাঃ*; খাওয়া-দাওয়াটা খুব মেপে করেন। প্রাণশক্তি যেটা শরীরের ভিতরে কাজ করে, অনেক যোগী আছেন যাঁরা ওটাকেই হবন করেন। আমাদের শরীরে প্রাণশক্তি বিভিন্ন ভাবে কাজ করে, বিশেষ করে পাঁচ ভাবে প্রাণশক্তি শরীরে কাজ করে, এবং সেই প্রাণশক্তির আলাদা আলাদা নাম, যেমন, প্রাণ, আপান, সমান, উদান এবং ব্যায়ান। এই যোগীরা এইভাবে হবন ক্রিয়া দ্বারা এক একটা প্রাণশক্তিকে জয় করে নেন। এই পাঁচটি প্রাণশক্তিকে জয় করে নেওয়ার ফলে তাঁদের শক্তিও সেই রকম হয়ে যায়। এই দুটো শ্লোকে যোগীদের কথা বলছেন।

সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ, এই ধরণের যোগীরা, যাঁরা এই সব যজ্ঞ করেন, তাঁরা সবাই যজ্ঞের মর্ম বোঝেন। সেইজন্য তাঁরা ক্রিয়া দ্বারা যা কিছু করেন, এই ধরণের যজ্ঞ করে তাঁদের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে গেছে। আপনি কি চান আপনার পাপের নাশ হয়ে যাক? আপনি হয়ত বলতে পারেন, আমি তো কোন পাপ করি না, পাপের আবার নাশ কি করে হবে। খুব ভাল, এই বোধ থাকাটাও ভাল। কিন্তু যদি মনে হয়, আপনার ভিতরে কিছু কল্মষ রয়েছে, আপনি কি সেটাকে নাশ করতে চান? তাহলে পর পর এতক্ষণ যত যজ্ঞের কথা বলা হলে, তার মধ্যে অন্ততঃ একটা যজ্ঞকে ঠিক করে বলুন, আমি এই যজ্ঞ রোজ করবই করব। রোজ দান করুন, রোজ দান করে দানধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান; কর্ণ যেমন দানধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সকালে এসে ব্রাহ্মণ যা চাইবে আমি দান করে দেব, এটাই তো দ্রব্যযজ্ঞ; রোজ একটা শাস্ত্রকে পারায়ণ করে পাঠ করুন, এটাই হয়ে যাবে স্বাধ্যায়যজ্ঞ, বা শাস্ত্রের অর্থ বুঝে সেই অর্থের উপর গভীর ভাবে চিন্তন করুন, নয়তো ধ্যান করুন, এটাই হয়ে যাবে জ্ঞানযজ্ঞ। একটা কোন যজ্ঞে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন। যদি না প্রতিষ্ঠিত হন, তাহলে ওই বিশাল বড় বড় জাম্বো জেট প্লেন নামতে পারার মত লম্বা রানওয়ে তৈরী হবে না, যেখানে আত্মজ্ঞান রূপী প্লেন নামতে পারবে।

যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ, এই যজ্ঞ দিয়ে যাঁদের সমস্ত পাপ নাশ হয়ে গেছে এবং তাঁরা শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেছেন। ঠাকুর প্রচলিত ভক্তিভাবে বলছেন, একবার দূর্গা নাম করেছি আমি শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেছি। ভক্তির স্তুতির জন্য এসব কথা বলা হয়, কিন্তু ঠিক ঠিক শুদ্ধ পবিত্র হওয়ার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। একজন প্রশ্ন করলেন, আমি যদি শুদ্ধ আত্মা হই, আমি যদি সচ্চিদানন্দ হই, তাহলে আমার সাধন-ভজন করার কি দরকার? আপনি তাহলে নিজের দিকে তাকিয়ে ভাবুন তো, আমি জানি আমি শুদ্ধ আত্মা, কিন্তু বহির্জগতের সাথে আমার আচরণ কি সেইভাবে হচ্ছে? দেখবেন, হচ্ছে না। এগুলো সব মুখের কথা, মুখের কথা দিয়ে আত্মজ্ঞান হয় না। একটা বড় বিল্ডিং দেখে আমরা ভুলে যাই, মাটির তলাতেও সে কত বিস্তৃত হয়ে আছে। আত্মজ্ঞান হল সেই রাজপ্রাসাদের

বিল্ডিং, ওর পিছনে কত আত্মত্যাগ, কত তপস্যা, কত বলিদানের ইতিহাস হয়ে আছে আমাদের জানা নেই, আমরা শুধু উপরটা দেখে যাচ্ছি। মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হল বলিদান।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোহস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম।।৩১।।

(যথোক্ত যজ্ঞসমূহ সম্পাদনপূর্বক অন্তে বিহিত অমৃত নামক অন্ন যাঁরা শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভোজন করেন, তাঁরা সনাতন ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, যজ্ঞহীন ব্যক্তির ইহলোকই নাই, সর্ব-লোকাতীত আত্মজ্ঞান লাভ তো দূরের কথা।)

যজ্ঞ সম্পাদন করার পর যেটা অবশিষ্ট থাকে, তাকে যজ্ঞশিষ্ট বলে আবার অমৃতও বলে, ইদানিং কালে এটাই হয়ে গেছে প্রসাদ, পূজার পর আমরা যেটা প্রসাদ রূপে গ্রহণ করি। আগে প্রসাদের এই ধারণা ছিল না, তখন ছিল যজ্ঞ এবং যজ্ঞের অবশিষ্ট বা যজ্ঞশিষ্ট। এটাকেই আবার যজ্ঞশেষ বলা হয়, যজ্ঞশেষ যা অমৃতও তাই। আপনি সাধনা রূপে যজ্ঞ করলেন, যে যে যজ্ঞের কথা বলা হল, সেই সাধনা বা যজ্ঞের যে ফল, এই ফলকে বলা হয় অমৃত। মানুষ যখন ওই অমৃতকে গ্রহণ করে আস্বাদ করে, তখনই সে ব্রহ্মকে লাভ করে। চিত্তশুদ্ধি না হলে আধ্যাত্মিক জীবনে এগোন যায় না। চিত্তশুদ্ধি করা মানে, নিজেকে বৃহতের সাথে জুড়ে দেওয়া। নিজেকে যদি কেউ বৃহতের সাথে জুড়তে চায়, সেইজন্য তার দরকার অমৃত সেবন করা। শাস্ত্রে বা পুরাণে বর্ণনা আছে, দেবতারা অমৃত লাভ করলেন, দেবতারা অমৃত পান করে অমর হয়ে গেলেন। স্বর্গের এই অমৃত বলে কিছু হয় না, যজ্ঞের যে অবশিষ্ট, এটাই অমৃত। এই অমৃত পান করলে অমরত্ব লাভ হয়। মহাভারতে কচ ও দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠার কাহিনী আছে, সেখানে অসুরদের গুরু শুক্রাচার্য বলছেন, আমি দানবদের জন্য অমৃত পেয়েছিলাম। কিন্তু নিজের মেয়ে দেবযানীকে বলছেন, দেখো, আমার কাছে একমাত্র আত্মজ্ঞানই আছে, আত্মজ্ঞান ছাড়া আমার আর কিছু নেই। আত্মজ্ঞানকেই বলছেন অমৃত, যেটা যজ্ঞ অবশিষ্ট। যে যজ্ঞ করে না তাদের কি হয়?

নায়ং লোকোহস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম, সে এই জীবনেই সুখ পায় না। আমাদের জীবনে এত দুঃখ কেন, জীবনে এত অশান্তি কেন? আমরা হলাম বাঁধন ছাড়া বাছুর, শুধু দৌড়ে বেড়াচ্ছি, এছাড়া কিছু নেই, কোন যজ্ঞ নেই, তার সাথে কোথাও কোন সংযম নেই। এতদিন আমরা বলে এসেছি, আমার সময় কোথায় যে কিছু করব, কিন্তু করোনার দৌলতে ভগবান যখন আমাদের অফুরন্ত সময় দিয়েছিলেন, আমরা তখন কি কিছু করেছিলাম? কিছুই করিনি, কারণ আগেও আমাদের কিছু ছিল না। আমাদের পুরো জীবনটা হয়ে আছে বহির্মুখী, ঘরবন্দী হয়ে তাই আমাদের এত কষ্ট পেতে হয়েছিল। ইয়ং ছেলেমেয়েদের জন্য বহির্মুখী হওয়াটা ঠিক আছে, তারা নিজেদের অভিব্যক্ত করতে চায়, চাকরী করতে চায়, বাইরে যেতে চায়। কিন্তু যাদের পঞ্চাশ ষাট বছর হয়ে গেছে, খেলে হজম হয় না, আপনি কিসের জন্য দৌড়াতে চাইছেন? লকডাউনের জন্য বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের সাথে দেখা করতে পারছিলেন না, মন খারাপ। আসলে আপনার সেই ট্রেনিং নেই, যে ট্রেনিং দিয়ে প্রথম জীবনেই নিজেকে তৈরী করে নিতে হয়। ট্রেনিং নেই বলে শাস্ত্র পড়েননি, শাস্ত্রের অর্থকে নিয়ে চিন্তন করেননি, চিন্তন করার পর সেই অনুসারে যে জীবন চালানোর কথা, সেইভাবে জীবনকে চালাননি, কোন চেষ্টাও করেননি। আজকে যখন বিপদ এসে গেছে, তখন আপনি কান্নাকাটি করছেন।

ভগবান বলছেন, যে যজ্ঞ করে না, *নায়ং লোকহস্ত্যযজ্ঞস্য*, সে এই জীবনেই সুখ পায় না। যে এই জীবনেই সুখ পায় না, *কুতোহন্যঃ কুরুসত্তমঃ*, পরলোকে গিয়েও তার কিছু হয় না। আমরা ভাবি মৃত্যুর পর ঠাকুর আমাদের নিয়ে যাবেন, ভাল কোথাও রাখবে, এই আশাতেই থাকুন। ইংরাজীতে খুব সুন্দর বলা হয়, fool's paradise, মুর্খের স্বর্গ, ঠাকুর একটা মুর্খদের স্বর্গ তৈরী

রেখেছেন, সেখানে সব মুর্খদের নিয়ে একসাথে রেখে দেবেন, নে তোরা খুব আনন্দ কর। যে যজ্ঞ করে না, পরলোকের কথা ছেড়ে দাও, এই জীবনেই সে কোন সুখ পায় না।

ব্যাধ প্রতিদিন জাল বিছিয়ে ফাঁদ পাতে, আর ওই ফাঁদে পড়ে টিয়া পাখিগুলো ব্যাধের হাতে ধরা পড়ে যায়। এক সাধুবাবা সব দেখার পর টিয়া পাখিগুলির জন্য তাঁর করুণার উদ্রেক হয়েছে। তিনি টিয়া পাখিগুলিকে শিখিয়ে দিলেন, 'দেখ, শিকারী আসবে, জাল বিছাবে, ওর মধ্যে দানা ছড়াবে, দানার লোভে তোমরা ফেঁসে যেও না'। টিয়া পাখিরা শুনে নিজেদের খুব ধন্য মনে করতে লাগল, আমাদের আগের বন্ধুরা ভুল করে ফেঁসে গিয়েছিল, আমরা আর ফাঁসব না। সবাই সাধুবাবার কথা খুব ভাল করে মুখস্ত করে নিয়েছে। পরের দিন যথারীতি ব্যাধ এসেছে। পাখিগুলি একসাথে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে শুরু করল, 'শিকারী আসবে'। ব্যাধ শুনে ভয় পেয়ে গেছে, পাখিরা সব জেনে গেল। ব্যাধ জাল বিছিয় দিতে গেল, পাখিরাও একসুরে বলতে লাগল, 'জাল ছড়াবে'। ব্যাধ খুব ঘাবড়ে গেছে, 'পাখিগুলি সব জেনে গেল কি করে'? তারপর বলল, 'দানা ছড়াবে'। ব্যাধও দানা ছড়াতে লাগল। পাখিরা তারস্বরে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'লোভে পড়ে ফেঁসো না'। বলেই, সব পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে দানা খেতে জালের মধ্যে নেমে গেল। পরে সাধুবাবা এসে দেখছেন সব টিয়া পাখিগুলি ব্যাধের জালে ফেঁসে আছে, আর জোরে জোরে বলে যাচ্ছে, 'শিকারী আসবে, জাল বিছাবে, দানা ছড়াবে, লোভে পড়ে ফেঁসো না'। শাস্ত্র পড়ে, শাস্ত্র শুনে আমাদেরও টিয়া পাখির মত অবস্থা।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে।।৩২।।

(বেদমুখে এরূপ বহুবিধ যজ্ঞ ব্যাখ্যাত হয়েছে। সেই সকলকে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্মজাত বলে জানবে। ''আত্মা নিষ্ক্রিয়; আমি সেই উদাসীন আত্মা, এসব ব্যাপারে আমার নয়'' –এরূপ আত্মজ্ঞান হলে শুভাশুভরূপ সংসার থেকে মুক্ত হবে। আত্মজ্ঞ পুরুষ নৈষ্কর্ম-সিদ্ধ।)

বারো ধরণের যজ্ঞের কথা বলে ভগবান এবার বলছেন, এই যে এত ধরণের যজ্ঞ, *ব্রহ্মণো মুখে*, অর্থাৎ বেদে এই ধরণের অনেক রকম যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, যেমন অগ্নিতে যে যজ্ঞের আহুতি দেওয়া হয়, যেটাকে দৈবযজ্ঞ বলা হল, সেটাতো আছেই, তাছাড়াও অনেক ধরণের যজ্ঞের কথা বলা আছে। কিন্তু এই সমস্ত যজ্ঞ, *কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে*, তিন ভাবে করা হয়, কায়িক, মানসিক ও বাচিক; শরীর দিয়ে করা হয়, মন দিয়ে করা হয় আর বাক্ দিয়ে করা হয়। আত্মা দিয়ে কোন যজ্ঞ হয় না, অর্জুন তুমি এই জিনিসটাকে ভাল করে বোঝ। সব যজ্ঞ ক্রিয়া দ্বারা হয়, ক্রিয়া থাকলে সেখানে কারক থাকবে, ক্রিয়া থাকবে আর তার একটা ফলও থাকবে। আত্মা এগুলোর পারে। যত যজ্ঞের কথা বলা হয়, এবং এর বাইরে আরও যত যজ্ঞ বেদে বলা হয়েছে, আত্মা এগুলোর পারে। আত্মজ্ঞান আসে একমাত্র জ্ঞান দিয়ে। তাহলে এত যজ্ঞের কথা কেন বলা হল? এগুলো হল শুদ্ধির জন্য, শুদ্ধি যদি না হয় মানুষ ঈশ্বর লাভের পথে, আত্মজ্ঞানের পথে এগোতে পারবে না। যজ্ঞের বর্ণনা করা গীতার উদ্দেশ্য না, এটা বেদের কাজ। কিন্তু মাঝে মাঝে এগুলোকেও আনতে হয়। তাহলে যজ্ঞ করা কেন? এর উত্তর তেত্রিশ নম্বর শ্লোকে বলে এখানে বিষয়টাকে শেষ করছেন।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।।৩৩।।

(হে পরন্তপ, সংসার-ফলারম্ভক দ্রব্যসাধ্য যজ্ঞ অপেক্ষা মোক্ষদায়ক জ্ঞান-যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। কারণ হে পার্থ, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ এবং সমস্ত শ্রৌত ও স্মার্ত যজ্ঞোপসনাদি ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়।)

গীতা আবার নিজের স্বরূপে, গীতার যেটা মূল, সেখানে এসে গেলেন। শ্রীশ্রীমা যেমন বলছেন, যার আছে মাপো, যার নেই জাপো, এখানেও তাই বলছেন। *শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ,* সাধনার দ্বারা যে যজ্ঞগুলি সিদ্ধ হয়, সেগুলো দ্রব্যযজ্ঞ থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ। আপনার অনেক আছে আপনি দান করুন, ঠিক আছে; কিন্তু মন দিয়ে যে যজ্ঞগুলি হয়, উদ্দেশ্য হল সেটার দিকে দৃষ্টি দেওয়া। জ্ঞানযজ্ঞ হল শাস্ত্রের অর্থটা বোঝা, কারণ শাস্ত্রের অর্থটা যদি বুঝে নেওয়া হয়, তাহলে সাধনা করা অনেক সুগম হয়। শ্রীশ্রীমা বলছেন, জপাৎ সিদ্ধি। কি সিদ্ধি হয়? জপ করতে করতে মনের শুদ্ধি হয়, সেই শুদ্ধ মন দিয়ে তখন ধ্যান হয়। সেই ধ্যান থেকে ঠাকুরের স্বরূপ জ্ঞান হয়, স্বরূপ জ্ঞান যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ মুক্তি হয় না, সিদ্ধি হয় না। ঠাকুরও বলছেন, কলকাতার ওই মেয়েরা লক্ষ লক্ষ জপ করে, কিন্তু কই কারুর তো কিছু হয় না। এখানে এটাই বলছেন, দ্রব্যযজ্ঞ বা আরও যে যজ্ঞ আছে, সবার থেকে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানযজ্ঞ কি? শাস্ত্র অধ্যয়ন করে শাস্ত্রের অর্থটা বোঝা, বুঝে ধারণা করা এবং ধারণা করে অর্থকে মনন করা।

তার সাথে বলছেন, *সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে,* যত যজ্ঞ রয়েছে, যত জপ রয়েছে, যত ধ্যানের চেষ্টা রয়েছে, সব কিছু পরিপূর্ণ হয়ে যায় জ্ঞানে এসে। কোন জ্ঞানে? ব্রহ্মজ্ঞানে, ২৪ নং শ্লোকে যে যজ্ঞের কথা বলা হয়েছিল সেটাই হচ্ছে মূল জ্ঞানযজ্ঞ, যেখানে বলা হয়েছিল – *ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্,* যে অবস্থায় গিয়ে দেখে সব কিছুই ব্রহ্ম –আমি কথা বলছি, আমি ব্রহ্ম, আমার কথা গুলো ব্রহ্ম, এই মাইক্রোফোনটা ব্রহ্ম, মাইক্রোফোনে যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে সেটাও ব্রহ্ম, যারা শুনছেন তাঁরাও ব্রহ্ম, এই যে কর্ম করা হচ্ছে এটাও ব্রহ্ম, এই পুরো কর্মের যে ফল হবে শ্রোতা আর বক্তার উভয়ের, সেটাও ব্রহ্ম। এটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতম যজ্ঞ। যিনি জ্ঞানযজ্ঞ করে যাচ্ছেন, তাঁর এই যজ্ঞ সব কিছুর উপরে চলে যায়, সমস্ত কিছুকে তিনি জয় করে নেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে রৈক্ক মুনির খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, আগেকার দিনে একটা খেলা হত, সেখানে যে সত্যযুগের ঘুঁটি পেয়ে যে, সে সব কিছু পেয়ে যেত এবং খেলা জিতে নিত। জ্ঞানযজ্ঞ করলে এই যে বিভিন্ন রকম যজ্ঞের কথা বলা হয়, এগুলোর কোনটাই আর করতে হয় না। শাস্ত্রের অর্থ যদি কেউ ঠিক ঠিক বুঝে নিতে পারে, তাহলে যত যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, বেদে যত যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, সব কটার ফল স্বাভাবিক ভাবেই সে পেয়ে যাবে।

অর্জুনের মনে হতে পারে যে, ভগবান তো সেই দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে খুব জ্ঞানের কথা বলে যাচ্ছেন, কিন্তু এই জ্ঞান পাওয়া যাবে কি করে? তাই ভগবান বলছেন –

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।৩৪।।

(যে বিধি দ্বারা সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তা বলছি, অবগত হও। প্রণিপাত, সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসা ও গুরুসেবা দ্বারা প্রসন্ন হয়ে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী তোমাকে সেই ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করবেন।)

এই শ্লোক থেকে আমরা আলোচনা করব আত্মজ্ঞান কিভাবে হয়, এবং আত্মজ্ঞান হলে কি হয়। আগে আগে আলোচনা হয়েছিল, আগেকার দিনে মঠ, আশ্রমাদি কম ছিল, সেইজন্য যাঁরা সন্ন্যাসী হতেন, তাঁরা বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। বলা হয় যে, শরীর চালানোর জন্য যতটুকু দরকার, ঠিক ততটুকু সন্ন্যাসীরা ভিক্ষা করে নিতেন, সেখানেও তাঁরা কোন সঞ্চয় করতেন না। ঠাকুরও কথামৃতে বলছেন, পঞ্ছি অউর দরবেশ সঞ্চয় করে না, সন্ন্যাসী সঞ্চয় করবে না। এই শরীর নির্বাহ সবাইকেই করতে হবে, একজন গৃহস্থকেও করতে হবে, একজন সন্ন্যাসীকেও করতে হবে। যিনি ঠিক ঠিক হিন্দু, যিনি ঠিক ঠিক শাস্ত্র বোঝেন, এই সংসারে তাঁর কোন কিছুর প্রতি স্পৃহা থাকবে না। টাকা-পয়সার প্রতি স্পৃহা থাকবে না, জীবনের প্রতি স্পৃহা থাকবে না। জীবনের প্রতি স্পৃহা যদি না থাকে তাহলে কি মরে যেতে চাইছি? কখনই না, মৃত্যুর প্রতিও কোন স্পৃহা থাকবে

না। যিনি জ্ঞানী, আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত তাঁর কাছে জীবন যেমন, মৃত্যুও তেমন। আর আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে জীবনও যা, মৃত্যুও তাই।

তাহলে সাধারণ মানুষ যারা তারা কেন কাজ করেন? আসলে প্রত্যেকটি কাজের একটিই উদ্দেশ্য, তা যে কোন কাজই হোক না কেন –জ্ঞান অর্জন। বাচ্চারা খেলনা নিয়ে খেলতে খেলতে একটা সময় তার আর ওই খেলনা নিয়ে খেলতে ভাল লাগে না, নূতন একটা খেলনা দেখলে পুরনো খেলনাটা ফেলে নূতন খেলনার দিকে চলে যাবে। আমরা মনে করি বাচ্চাদের মন চঞ্চল, তাই নূতন নূতন খেলনা চায়। আজকালকার ছেলেমেয়েরাও একজনের সাথে থাকতে পারে না, কিছু দিন পর পরই সঙ্গী বদলাতে থাকে। কোন সন্দেহ নেই যে এদের মন চঞ্চল, কিন্তু এর আর-একটা দিক আছে, সেই দিকটা হল, সমস্ত কাজের উদ্দেশ্য একটাই, জ্ঞান লাভ। আমরা মনে করি, আমরা কাজ করছি অর্থ উপার্জনের জন্য, উপার্জনের জন্য বলছি, আসলে আমরা সঞ্চয় করি। আমরা যে ভালবাসি, সেখানে বলি আমার যে ইমোশান ডানদিক বামদিক যাচ্ছে, এটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। কিন্তু না, সেখানেও উদ্দেশ্য হল জ্ঞান লাভ। এই সংসারে জ্ঞান লাভের জন্য আমাদের শরীরটাকে রাখতে হয়। শরীরটা ঠিক রাখার জন্য মন ঠিক রাখতে হয়। শরীর আর মন ঠিক রাখার জন্য কিছু কিছু জিনিস দরকার হয়। কিন্তু সেখানেও উদ্দেশ্য হল জ্ঞান লাভ। এই জিনিসটাকে বুঝে নিতে পারলে, আমাদের জীবনে অনেক শান্তি আসবে। যে কোন কাজ করার উদ্দেশ্য একটাই জ্ঞান লাভ।

বাচ্চার কাছে একটা নূতন খেলনা এসেছে, সে দেখতে চাইছে জিনিসটা কিভাবে হয়। যেমনি ভাল করে খেলনার কারুকুরি বুঝে গেল তখন ওই খেলনাই তার কাছে একঘেঁয়ে লাগবে। যে কোন কর্মের উদ্দেশ্যই হল জ্ঞান লাভ। আর যিনি জ্ঞানী হয়ে যান, আত্মজ্ঞান যাঁর হয়ে যায়, তিনি সমস্ত কর্মকে জয় করে নেন। আচার্য এখানে ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে একটা উদাহরণ নিয়ে আসছেন – রৈক্ক নামে একজন ঋষি ছিলেন, ওখানকার রাজা একদিন শুনছেন পাখিগুলো '*অথ রৈক্ক*', '*অথ রৈক্ক*' বলতে বলতে উড়ে যাচ্ছে। পাখিরা বলতে চাইছে, যত পূণ্য হচ্ছে সব পূণ্য রৈক্ক মুনির কাছে যাচ্ছে। বিভিন্ন কর্মের যে ফল হয়, সেই ফল থেকে মানুষ অনেক কিছু করে। আমরাও প্রায়ই মনে করি, জীবনের উদ্দেশ্য কর্ম। স্বামীজীও যখন বলছেন, কাজ করে যা, খেটে খেটে মরে যা, সেখানে স্বামীজী আত্মশুদ্ধির জন্য কাজ করতে বলছেন। সেখানেও কাজটা উদ্দেশ্য না, সেবাটা উদ্দেশ্য, সেবাকার্যের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধিটা উদ্দেশ্য।

সেবা কেন? জ্ঞান লাভ করার জন্য। জ্ঞান অর্জন যদি না হয়, আত্মজ্ঞান যদি না হয়, তাহলে এগুলো সব বেকার। কারণ যে কোন ধর্ম যখন চলে, যে কোন জীবন যখন চলে, তখন সেই ধর্ম বা জীবন একটা সত্যের উপর আধারিত থাকে। সংসারী মানুষ যারা, যাদের কাছে ভোগ হল কুকুর বেড়ালের মত আহার, নিদ্রা আর মৈথুন। এটাই বেশির ভাগ মানুষের জীবনধারা। তারাই এভাবে বলে, আমি কাজ করতে করতে মরে যেতে চাই। কাজটা উদ্দেশ্য না, আমাদের ঋষিরা বলে গেছেন, সত্য হল আত্মা, যেখানে দুই নেই, যেটা এক দুইয়ের পারে। কিন্তু যে কোন কর্মে কারকের বিস্তার থাকবে, ক্রিয়া থাকবে আর তার ফল থাকবে, আগে আমরা এর উপর বিস্তারে আলোচনা করেছি। কর্ম মানে বহু এসে যাচ্ছে, যেটা কখন জীবন-দর্শনের জন্য ঠিক হতে পারে না। সেইজন্য কর্ম কখন জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তাহলে কর্ম করাটা বন্ধ করে দেওয়াটাই ঠিক? একেবারেই না। এর আগে আমরা আলোচনা করলাম, বিভিন্ন রকম যে কর্ম করি, প্রত্যেকটা কর্ম যেন এক একটা যজ্ঞ। এই যজ্ঞ থেকে মন শুদ্ধ হয়, সেই শুদ্ধি থেকে জ্ঞান লাভ হয়, জ্ঞান লাভটাই উদ্দেশ্য। যিনি জ্ঞানী হয়ে যান, তাঁর ভিতরে সমস্ত কর্ম সমাহিত হয়ে যায়। তাঁকে আর কাজ করতে হয় না, কাজের যা যা ফল সেটা তিনি এমনিই পেয়ে যান, তাঁর আর কোন কিছু লাগে না।

ওই জ্ঞানটা কি, যেটাকে লাভ করলে মানুষ পরিপূর্ণ হয়ে যায়? ওই জ্ঞানটা কি, যেটাকে লাভ করলে মানুষ সব কর্মকে জয় করে নেয়, কর্মের আর কোন স্পৃহা থাকে না, আর কাজ করার কোন দরকার হয় না? আমরা আগে বলেছিলাম, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে গীতার যাবতীয় যত ভাব, সব সূত্রাকারে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে পুরোপুরি কর্মযোগের উপর বললেন। চতুর্থ অধ্যায়ে সন্ন্যাসের দিক থেকে কর্ম কিভাবে ধীরে ধীরে জ্ঞানের দিকে যাচ্ছে, সেটাকে দেখাচ্ছেন। আর পঞ্চম অধ্যায়ে পুরোপুরি সন্ন্যাসে ঢুকে যাবেন। এখান থেকে গীতা এবার কর্মযোগ থেকে কর্মত্যাগের দিকে এগোতে শুরু করছেন। বলছেন, *সর্বং কর্মাখিলং*, অখিল কর্ম অর্থাৎ যত কর্ম আছে সব জ্ঞানে *পরিসমাপ্যতে*, জ্ঞানে গিয়ে তার পরিসমাপ্তি হয়ে যায়।

সেই জ্ঞানটা কি? সেই জ্ঞান কিভাবে পাওয়া যাবে? গীতার মূল উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান। যদিও অনেক চিন্তকরা, যাঁরা গীতাকে নিয়ে লিখেছেন, অনেকে তাঁরা মনে করেন গীতার উদ্দেশ্য কর্মযোগ; কিন্তু তা না। গীতার উদ্দেশ্য হল, হয় তুমি জ্ঞান পথ অবলম্বন করে; আমি সেই আত্মা, এই জ্ঞান লাভ কর। আর তা নাহলে, ঈশ্বরই সব কিছু হয়ে আছেন, এই জ্ঞান লাভ করে, ভক্তিভাব অবলম্বন করে সমস্ত কিছু ঈশ্বরে সমর্পণ কর। চৌত্রিশ নম্বর থেকে এবার জ্ঞানকর্মসন্ন্যাস, কিভাবে কর্মকে জ্ঞানে পরিসমাপন করতে হবে, কিভাবে সেই জ্ঞান হবে, এবার পর পর বলতে থাকবেন।

চৌত্রিশ নম্বর শ্লোকে বলছেন, সবাই কি জ্ঞান লাভ করতে পারে, আমি কি ধর্ম লাভ করতে পারি? প্রায়ই আমরা এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞেস করে থাকি, আমাদের মন বসে না, ধ্যান হয় না, জপ হয় না কেন, ইত্যাদি। তাদের জন্য এই শ্লোক। *তদ্বিদ্ধি*, ওটাকে জানো, তোমাকে আগে ওটার ব্যাপারে জানতে হবে। প্রথমে তত্ত্বতঃ জানতে হবে, তারপর উপলব্ধি করতে হবে। তত্ত্বতঃ জানতে হলে আগে গুরু বা আচার্যের সামনে গিয়ে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম কর। তারপর হাতজোড় করে প্রশ্ন কর, আর গুরুর সেবা কর। এই তিনটে কাজ তোমাকে আগে করতে হবে, প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবা। পরিপ্রশ্ন, যে প্রশ্নগুলি অনেক দিন ধরে আমার ভিতর তোলপাড় করছে।

বেলুড় মঠের একজন খুব নামকরা মহারাজ ছিলেন, খুব বড় পণ্ডিত। ওনাকে কেউ প্রশ্ন করলে উনি বলতেন, 'এগুলো হল technicalities of religion, এটা জেনে তোমার কি হবে, তোমার কি সমস্যা বল'। ধরুন কেউ যদি প্রশ্ন করে, \মহারাজ ঈশ্বর আছেন কি'? এগুলোই হল technicalities of religion, এগুলো জেনে কি হবে? আপনার কি সমস্যা বলুন। স্বামীজী যখন ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন, মহাশয় আপনার কি ঈশ্বর দর্শন হয়েছে? ওখানে technicalities কিছু ছিল না। আপনি যদি আমাকে এই প্রশ্ন করেন তখন technicalities ব্যাপার এসে যাবে, meaningless questions।

'মহারাজ পঞ্চদশীটা একটু আলোচনা করবেন'? পঞ্চদশী জেনে আপনার কি হবে? আপনার কি সমস্যা সেটা বলুন। 'মহারাজ একটু বিবেকচূড়ামণী যদি আলোচনা করেন'? বিবেকচূড়ামণী, পঞ্চদশী এগুলো আপনি খুলে কোন দিন দেখেছেন? দেখেননি। এগুলো হচ্ছে মুর্খোত্তমদের প্রশ্ন। আগেকার দিনে দোলের সময় কাশীতে একটা প্রতিযোগিতা হত, তাতে মুর্খোত্তম উপাধি দেওয়া হত।

পরিপ্রশ্ন, relevant question, এখানে আচার্য বলছেন, *দীর্ঘনমস্কারঃ তেন কথং বন্ধঃ কথং মোক্ষঃ কা বিদ্যা কা চ অবিদ্যা*, হে গুরু বন্ধন জিনিসটা কি, মোক্ষ জিনিসটা কি, বিদ্যা কি, অবিদ্যা কি, এই ধরণের যে প্রশ্নগুলো এটাই পরিপ্রশ্ন। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণদের ছেলেরাই গুরুগৃহে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে যেত, বাচ্চা বয়স থেকে তারা এই শব্দগুলো বাড়িতে শুনে আসছে, তারাও গুরুর কাছে সেই প্রশ্ন করছে।

সেবয়া, গুরুর শুশ্রুষা করা। উপনিষদে, মহাভারতে সত্যকামের গল্প আছে। সত্যকাম গুরুর কাছে এসেছেন, তাঁর বিধবা মা পাঠিয়েছেন। গুরু সত্যকামকে কয়েকটা মূল কথা বলে দিয়ে কিছু গরু দিয়ে বলে দিলেন, এই কটা গরু নিয়ে জঙ্গলে চলে যাও, যখন হাজারটা গরু হয়ে যাবে তখন তুমি আমার কাছে ফেরত আসবে। আরুণীর গল্প আছে, আগেকার দিনে গুরুদের চাষবাশ করার জন্য সামান্য জমি থাকত। একদিন রাত্রিবেলা প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে, গুরু আরুণিকে বললেন, 'তুমি এখন ক্ষেতে যাও, দেখ আল ভেঙে ক্ষেতে জল ঢুকে ফসল নষ্ট না হয়ে যায়'। আরুণি গিয়ে দেখছে, আল এমন ভাবে ভেঙে গেছে যে, কোন ভাবে জল ঢোকাটাকে আটকানো যাবে না। আরুণি আলের ভাঙা অংশে শুয়ে পড়ল যাতে গুরুর ক্ষেত রক্ষা হয়। সে সারা রাত আশ্রমে ফেরেনি। সকালে গুরু খবর পেলেন, ক্ষেত থেকে আরুণি ফেরেনি। গুরু বাকি শিষ্যদের নিয়ে ক্ষেতে গেলেন। আরুণি ততক্ষণে ঠাণ্ডায় বেহুঁশ হয়ে সেই আলে শুয়ে আছে। গুরু আরুণি আরুণি করে ডাকতে শুরু করলেন। গুরুর আওয়াজ একটু কানে আসতেই কোন রকমে সে আল থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। এমন ভাবে উঠে দাঁড়িয়েছে যে মনে হচ্ছে যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। সেই থেকে তার নাম হয়ে গেল উদ্দালক। গুরু তাকে এমন আশীর্বাদ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞান হয়ে গেল।

সত্যকামকে আশীর্বাদও করতে হল না, সত্যকাম নিজে থেকেই সব জ্ঞান পেয়ে গেলেন। তাঁকে ষাঁড়, অগ্নি, পাখি এনারা ব্রহ্মবিদ্যা দিয়ে দিলেন। গুরু সত্যকামকে দেখে বলছেন, 'তুমি কাকে গুরু করেছ, তোমার চেহারা ব্রহ্মজ্ঞানীর মত ঝকঝক করছে'? সত্যকাম খুব বিনীত ভাবে বলছেন, আমি তো আপনাকে ছাড়া আর কাউকে জানি না'। সত্যকাম, উদ্দালক এনাদের সবার কি করে জ্ঞান হল? যখন কাজ করা হয়, বিশেষ করে সেবা আদি যখন করা হয়, তখন মনের ময়লাগুলি পুড়ে যায়। আমাদের মনের ভিতরে এত আবর্জনা জমে আছে, আমরা নিজেরাও বুঝতে পারি না।

বেলুড় মঠে আমরা যখন জয়েন করতে আসি, তখন আমাদের বেশির ভাগেরই বয়স কুড়ি একুশ হবে, ওই বয়সে ধর্ম আমরা কি আর বুঝব। মহারাজদের জানতাম, মহারাজদের ভালবাসতাম, নিজেদের কেমন স্বাধীন স্বাধীন মনে হত, আনন্দে মহারাজদের সাথে থেকে গেলাম। ধর্ম-টর্ম কিছুই বুঝতাম না, মহারাজরা যা বলতেন অবাক হয়ে শুনতাম। প্রশ্ন কোন দিন করতাম না, কিছু বুঝতামই না, প্রশ্ন কি করব! এতটা বুদ্ধি ছিল যে, প্রশ্ন করতে নেই। কেবল শুনে যেতাম। তখন আরোগ্য ভবন হয়ে গিয়েছিল, যেখানে মঠের খুব প্রবীণ সাধুরা থাকেন। ওনারা বলতেন, 'যে সাধুরা জীবনে প্রচুর কাজ করেছেন, শেষ বয়সে ওনারা অনেক শান্ত হয়ে যান। যাঁরা কাজ করেননি, তাঁরা অশান্ত থাকেন'। তখন আমরা এগুলো বুঝতাম না। পরে বয়সের সাথে সাথে জীবনের অভিজ্ঞতা হয়েছে, শাস্ত্র পাঠ করেছি, এখন সব কিছু পরিষ্কার, যা শুনেছিলাম এখন সব ঠিক মনে হয়।

দেওঘরে তখন আমি ব্রহ্মচারী ছিলাম, বিদ্যাপীঠে সপ্তাহে তিরিশটা করে ক্লাশ নিতে হত, তার সাথে মঠের দুনিয়ার কাজ। সিনিয়র স্টুডেন্টসদের হস্টেলের ওয়ার্ডেন ছিলাম; স্কুলের পরীক্ষার সিস্টেম, যেটা ওখানকার খুব জটিল ব্যাপার ছিল, সেটা আমাকে পুরোটাই দেখতে হত; ছেলেদের মর্ণিং স্টাডি পুরোটা দেখতাম; তার সাথে কয়লা, সিমেন্ট মঠে সব নিয়ে আনার ব্যাপার আমাকেই দেখতে হত; কোন মহারাজ সেন্টারে আসবেন দেওঘর থেকে যশিডি স্টেশনে গিয়ে তাঁকে রিসিভ করা, সি অফ্ করা, এই করে করে সব আবর্জনাগুলো পুড়েছে। আমি এখন আতঙ্কিত হয়ে যাই এই চিন্তা করে যে, তখন যদি কাজ না করতাম কি দুরবস্থাটাই না এখন হত। সেবা করলে আবর্জনা গুলি পুড়ে যায়।

আপনি বলবেন, 'গুরু তো আমার কাছে নেই, কি করে আমি গুরু সেবা করব'? সেই ঈশ্বর বহুরূপে আপনার পরিবারে, আপনার সমাজে ছড়িয়ে আছেন, তাদের সেবা করুন। মন্ত্র দীক্ষা পেয়ে

গেছেন, করোনার দৌলতে ঘরে বসে এখন শাস্ত্রের কথা শুনতে পারছেন। এটাই তো সময় সমাজের জন্য কিছু করার। শ্রীশ্রীমা বার বার বলছেন, বাবা কাজ করতে হয়। স্বামীজীর সেবামূলক কাজ নিয়ে ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে একটা সময় খুব অশান্তি লেগেছিল। কারণ কথামৃত পড়ে সবাই মনে করতেন, আগে ঈশ্বর দর্শন, কাজ পরে। শ্রীশ্রীমা সেখানে খুব কড়া ভাবে বলে দিলেন, নরেন যা বলছে সেটাই ঠিক।

যাদেরই মধ্যে হতাশার ভাব দেখা যাবে, বুঝতে হবে সে কাজ করেনি। কিন্তু প্রচুর কাজ করেছে, তা সত্ত্বেও ভিতরে হতাশার ভাব রয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে মনে তার অদম্য কামনা-বাসনা। আগে বলা হল, কর্মের উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ, কাজ যদি তাকে উপরের দিকে না নিয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে তার কাজে কোন গোলমাল আছে। গুরুর সান্নিধ্য যদি পাওয়া যায়, গুরুর যদি সেবা করা হয়, তাহলে মনের আবর্জনা গুলি পুড়ে যায়। আপনি বলতে পারেন, গুরুর সেবা করতে রাজী আছি, সমাজসেবা আমার দ্বারা হবে না। রামকৃষ্ণ ভাবধারায় ব্যক্তি গুরু হন না, এখানে সঙ্ঘই গুরু। সেই সঙ্ঘের সাধুরা সমাজের সেবা করছেন, আপনি কেন করবেন না? আপনার গুরু যাঁর সেবা করছেন, আপনি কেন তাঁর সেবা করবেন না? আপনি যাঁরই শিষ্য হয়ে থাকুন, স্বামী ভূতেশানন্দজী বলুন, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী বলুন, স্বামী গহনানন্দজী বলুন, সবাই কাজ করেছেন।

স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ এক সময় উত্তরকাশীতে দু বছর তপস্যা করলেন। তপস্যা থেকে বেলুড় মঠে ফিরে আসার পর তাঁকে চেরাপুঞ্জী পাঠিয়ে দেওয়া হল। চেরাপুঞ্জীতে তখন কিছু নেই, একটা শেড আছে, সেখানে মাস্টাররাও আছেন, ছাত্ররাও আছে, উনি একটু আলাদা থাকতেন। একান্তে জপধ্যান করার কোন সুযোগ নেই, খাওয়া-দাওয়া নেই। মহারাজ শিলংএ গিয়ে সপ্তাহে একদিন ক্লাশ নিতেন, সেখানে যা প্রণামী বা দক্ষিণা পেতেন, সেটা দিয়ে ছেলেদের থাকা-খাওয়া চালাতেন। আর চেরাপুঞ্জী থেকে শিলং পুরো রাস্তাটা হেঁটে যেতেন। আজকে আমরা রাজকোটে ঠাকুরের কত সুন্দর মন্দির দেখছি। এই মন্দির তৈরী করতে গিয়ে মহারাজ একটা একটা করে পয়সা জমিয়ে জমিয়ে এই মন্দির দাঁড় করিয়েছেন। উদ্দেশ্য, এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে লোকেদের অনেক মঙ্গল হবে। আপনার গুরুই যদি এত কাজ করতে পারলেন, আপনি কেন করবেন না? উনি তো বিশেষ কোন ব্যক্তির সেবা করতেন না, করতেন শুধু সমাজের সেবা। সমাজের সেবা, বিশেষ করে অপরের সেবা করলে মনের আবর্জনাগুলি চলে যায়। আমরা আসলে প্রচণ্ড অলস, কাজ করতে চাই না। কাজ না করতে চাওয়ার জন্য আমরা কিছু না কিছু একটা বাহানা তৈরী করে নিই। কিছুই যদি না পারেন, পাড়ার চারটে দুস্থ বাচ্চাকে এনে দুধ বিস্কুট খেতে দিন আর তার সাথে এক ঘন্টা বাড়িতে বসিয়ে পড়িয়ে দিন। আপনি অ আ ক খ তো জানেন, সেটাই ওদের শিখিয়ে দিন। দেখবেন কিছু দিনের মধ্যেই আপনার ব্যক্তিত্বের বিকাশ হতে শুরু হবে। এই শাস্ত্রগুলি তখন বেশি ভাল বুঝবেন। দিনে দু ঘন্টা করে অপরের যদি এই জ্ঞানে সেবা করেন, আমার যিনি গুরু তিনিও সেবা করেছেন, তাই আমি সমাজের সেবা করছি। এতে আপনার ব্যক্তিত্ব খুলবে, জপধ্যান বেশি ভাল হবে। সেবা করলে মানুষ inclusive হয়, হৃদয় খোলে, হৃদয় খুললে তবেই জপধ্যান ভাল হয়।

তখনকার দিনে গুরুর আশ্রমে গিয়ে অধ্যয়ন করতে হত, এখানে তাই গুরুর সেবার কথা বলছেন। তার সাথে বলছেন, আপনার সেবা দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করতে পারলে, তিনি তখন আপনাকে উপদেশ দেবেন। আগেকার দিনে শিষ্যরা গুরুর কাছে থাকত, সারাদিন নানা রকম ফাইফরমাস খাটছে, নিয়মিত শাস্ত্র পাঠ থাকত, তারই মাঝে মাঝে গুরু একটা দুটো তত্ত্ব কথা বলে দিলেন, তাতেই শিষ্যদের জ্ঞানের দরজাটা খুলে যেত। বৃষ্টির সময় বাইরে যদি একটা বালতি রেখে দেওয়া হয়, কিছুক্ষণের মধ্যেই বালতিটা ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির জলে ভরে যাবে। তারপর যত বৃষ্টি পড়বে, সব জলটাই বাইরে উপচে পড়বে। পাত্রতা আমাদের এত কম যে, জ্ঞান বর্ষণ হলেও আমাদের কোন লাভ হবে না। এই পাত্রতা বাড়ানোর একটা খুব ভাল উপায় হল – গুরুসেবা। যাঁর

কাছ থেকে এই পার্থিব জগতের কিছু পাব না, যেখানে কোন প্রত্যাশা নেই, কিছু পাওয়ার আশা নেই সেখানে সেবা করতে হয়। আমরা যাকে ভালবাসি তাকে সেবা করি, মনে কোথাও একটা প্রত্যাশা আছে, সে বলবে থ্যাঙ্ক ইউ, সে বলবে, আহা তুমি আমাকে কত ভালবাস, এগুলো শোনার জন্য আমরা কাজ করি। যেখান থেকে কোন কিছু পাওয়ার সম্ভবনা নেই, কিছু প্রত্যাশা নেই, সেখানে কাজ করুন। এর ফলস্বরূপ আপনার মধ্যে পাত্রতা বাড়বে।

লিও টলস্টয় এগুলোকে নিয়ে খুব সুন্দর সুন্দর কাহিনী রচনা করেছিলেন। টলস্টয় কম বয়সে বিরাট বড় জমিদার ছিলেন, বিরাট এ্যাস্টেটের মালিক, আর অনেক সার্ফ, মানে কাজের লোক ছিল। কত মেয়ের সঙ্গে যে তিনি জড়িয়ে ছিলেন তার ঠিক নেই। তার সাথে ছিল জুয়ার নেশা। জুয়া খেলে খেলে উনি সমস্ত সম্পত্তি হারিয়ে ফেললেন। পৈতৃক সম্পত্তি পুরোপুরি নাশ হয়ে গেল। কোন এমন দুর্গুণ নেই যে, যেটা ওনার মধ্যে ছিল না। রাজপ্রাসাদের মত অত বিশাল বাড়িটা বিক্রী হয়ে গেল, চোখের সামনে একজন এসে কিনে নিলেন, ঘরছাড়া হতে হল। তখন ওনার বয়স মাত্র কুড়ি কি একুশ হবে, এই বয়সেই অত বিশাল সম্পত্তি শেষ করে দিলেন। তারপর তাঁর খুব অনুতাপ হতে শুরু হল, এ আমি কি করলাম। এরপরেই টলস্টয়ের জীবনে পরিবর্তন এসে গেল। তারপর তিনি সার্ফদের জন্য, সার্ফ হল বণ্ডেড লেবারের মত, স্কুল চালাতে শুরু করলেন। তাদের বেশির ভাগ বাচ্চাই হল তাঁর নিজেরই বাচ্চা। টলস্টয়ের যতগুলো বই, ওয়ার এণ্ড পিস্, আন্না কেরিনা, ওনার ভিতরে যে জ্বালা জমে ছিল, যে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেছিলেন, তারই অভিব্যক্তি এই বইগুলোর মধ্যে তিনি ঢেলে দিয়েছেন। টলস্টয়কে বলা হয়, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ঔপনাস্যিক। আর পরের দিকে তিনি একজন সেন্ট হয়ে গেলেন। খ্রীশ্চান মূল্যবোধগুলি তাঁর মধ্যে গভীর ভাবে ঢুকে গেল। কিভাবে ঢুকল? তিনি সেবা করতে শুরু করলেন, বিভিন্ন স্তরে সেবা করতে লাগলেন। আর সত্যিই, তাঁর জীবনে এক বিন্দু স্বার্থপরতা ছিল না। তখনকার দিনে তিনি বিশ্বের একজন আদর্শ পুরুষ হয়ে উঠলেন। স্বামীজীর রাজযোগ তিনি পড়েছিলেন। রাজযোগ পড়ে টলস্টয় মুগ্ধ হয়ে গেলেন, বলছেন, 'দেখো এই লোকটির চিন্তা-ভাবনা সব কেমন আমার মত'।

এই পরিবর্তনটা তখনই আসে, যখন ধর্ম বিভিন্ন ভাবে আমাদের মধ্যে ঢুকে যায়। *উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং*, তখন তোমাকে গুরু উপদেশ দিতে শুরু করবেন। কারণ এই যে সেবা করতে শুরু করলেন, সেখান থেকে পাত্রতা এসে গেল, গুরু বুঝে গেলেন একে উপদেশ দিলে এখন ধারণা করতে পারবে।

গুরু কেমন হবেন? *জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ*, যিনি গুরু হবেন, তিনি অবশ্যই জ্ঞানী হবেন, তার মানে শাস্ত্রের জ্ঞান তাঁর থাকতে হবে। জ্ঞানী অনেকই হন, আমরা বই পড়ে কিছু জ্ঞান অর্জন করেছি। বলছেন, যদি আত্মজ্ঞান লাভ করতে চাও, তাহলে তত্ত্বদর্শি হতে হবে। তত্ত্বদর্শি মানে, যাঁর নিজের আত্মজ্ঞান হয়েছে, যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে। ঠিক ঠিক মুক্তি, এক অবতার যখন আসেন তিনি অনেককে মুক্তি দেন, আর অবতারের যাঁরা অন্তরঙ্গ সঙ্গী তাঁরা মুক্তি দেন। ঠাকুর বলে গেছেন, আর-একবার আসতে হবে। এসে চলে গেছেন কিনা আমরা জানি না। বলছেন, তারপরে অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে। ফেসবুকে প্রায়ই অনেকে লেখেন, গুরু কোথায় পাবো? ভাই তোমার এখনও পাত্রতা হয়নি, এখন আমাদের মত লোকদের দিয়েই তোমাকে চালাতে হবে।

উপনিষদ অবতার মানেন না, ওনারা বলেন তত্ত্বদর্শি। এখন আমরা তত্ত্বদর্শি কিভাবে বিচার করব? বিচার করতে গেলে আবার লোম বাছতে গিয়ে কম্বল চলে যাবে, অমুক ভাল না, তমুক ভাল না, করতে গিয়ে কপালে গুরুই জুটবে না। ওদিক দিয়ে না গিয়ে বরং দেখুন যাঁকে আপনার ভাল লাগে, যাঁকে আপনার পছন্দ হয় তাঁকেই গুরু রূপে বরণ করুন; আর তার সাথে যাঁর আপনার প্রতি কোন স্বার্থ নেই, যিনি কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত নন আর যাঁর জীবন শাস্ত্রকে আধার করে চলছে,

উনিই আপনার গুরু, তত্ত্বদর্শি কিনা বিচার করার দরকার নেই। কিন্তু গীতা এভাবে আপোষ করবেন না, গীতা যখন বলবেন, তখন উচ্চতম আদর্শ দেবেন – *জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ,* গুরু যিনি হবেন তাঁকে জ্ঞানী হতে হবে, তার সাথে তত্ত্বদর্শি হতে হবে। মুণ্ডকোপনিষদেরও একই ভাব, সেখানেও বলছেন, *তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্,* এখানে তৎ বলছেন, সেই নিত্যপদ, যেটা তত্ত্ব, সেটাকে জানার জন্য তুমি একজন শ্রোত্রিয়, শাস্ত্রজ্ঞ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠম্, যিনি ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু জানেন না, এই রকম একজন গুরুর কাছে যজ্ঞকাষ্ঠ হাতে নিয়ে যাবে।

জ্ঞানী মানে নিজের মত চিন্তা-ভাবনা করে একটা থিয়োরী দাঁড় করিয়েছে, এই জ্ঞান না, শাস্ত্রের জ্ঞান থাকতে হবে। আর সেই জ্ঞান পরম্পরাগত হতে হবে। পরম্পরাগত মানে, আপনি যে আদর্শ বা মতের অনুগামী, আপনি রামানুজের হন, শঙ্করাচার্যের হন বা মাধ্বাচার্যের হন, সেই পরম্পরার গুরুর কাছেই জ্ঞান লাভের জন্য আপনাকে যেতে হবে। হঠাৎ করে একজন বলল, আমার ঠাকুরদাও গীতার একটা অনুবাদ করেছিলেন, ওই জ্ঞানটা চলবে না। একমাত্র আচার্য রূপে যাঁকে গ্রহণ করা হয়েছে, তাঁর কাছেই যেতে হবে। বেদান্তের মতে আচার্যের একটা পরিভাষা আছে, যিনি গীতা, উপনিষদ, অন্তত দশটি উপনিষদ আর ব্রহ্মসূত্রের উপর ভাষ্য রচনা করে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করেছেন, এবং যে মতকে লোকেরা মানে, তবেই তাঁকে আচার্য বলা যাবে। এমনি কেউ গীতার উপর একটা বই লিখে দিল, বা অনুবাদ করে দিল, তাতে আচার্য হয় না। আচার্য এখানে খুব সুন্দর বলছেন – *জ্ঞানবন্তঃ অপি কেচিদ্ যথাবৎ তত্ত্বদর্শনশীলা অপরে ন অতো বিশিনষ্টি,* জ্ঞানবান অনেকেই হন, তবে জ্ঞান যেমনটি ঠিক ঠিক তেমনটি খুব কম লোকই জানে। যিনি *সম্যগ্‌দর্শিনঃ,* যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, তিনিই আপনাকে জ্ঞান দিতে পারবেন। যে যতটুকু জানে সে ততটুকুই জ্ঞান দিতে পারবে। বলছেন, যদি তিনি এই জ্ঞান দিয়ে দেন, এই জ্ঞান যদি হয়ে যায়, তাহলে কি হবে?

যজ্‌জ্ঞাত্বা পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি।।৩৫।।

(হে পাণ্ডব, আমার দ্বারা উপদিষ্ট জ্ঞান লাভ করলে তুমি আর এরূপ মোহগ্রস্ত হবে না; কারণ একবার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে পুনরায় অজ্ঞান আসে না। সেই জ্ঞান দ্বারা তুমি ব্রহ্মা থেকে স্থাবর পর্যন্ত ভূতসমূহকে স্বীয় আত্মাতে (প্রত্যগাত্মাতে) এবং আমাতে (পরমেশ্বরে, পরব্রহ্মে) দেখতে পাবে।)

হে অর্জুন, এই জ্ঞান যদি তুমি পেয়ে যাও, তাহলে তোমার মধ্যে আর কোন দিন কোন আসবে না। এই যে তোমার মধ্যে মোহ এসেছে, আমি যুদ্ধ করলে আমার আপনজনরা মারা যাবে, এটা আমি সহ্য করতে পারছি না, এতে তোমার ধর্মের হানি হবে; এগুলো হল মোহ। এই যে তোমার ভিতরে তমোগুণ, এই জ্ঞান হয়ে গেলে, এই তমোগুণ আর তোমার ভিতরে আসবে না, তখন তোমার সব মোহের নাশ হয়ে যাবে। তুমি তখন স্পষ্টতঃ জিনিসটা যেমন ঠিক তেমনটা জেনে যাবে। একবার যদি আপনি বুঝে যান, এই জীবনটাই শেষ নয়, এটুকু বুঝতে পারলে বিরাট বড় কৃতিত্ব অর্জন করে নিলেন। মৃত্যুর পরেও কিছু একটা আছে, মৃত্যুর পরে আমি কোন না কোন ভাবে থাকব, এই বোধটা যদি কারুর এসে যায়, সে বিরাট কিছু হয়ে গেল, এখন সে আর সাধারণ কেউ নয়। আর একজন জ্ঞানীর মত যদি আচরণ করতে শুরু করে, তাহলে সে একজন সাধুপুরুষ। তার হয়ত আত্মজ্ঞান না হতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে গুণগত পরিবর্তন এসে গেছে।

একটা হরিণ খুব বেগে দৌড়াতে পারে, চিতাবাঘও খুব বেগে ছুটতে পারে, সেখানে একটা ছোট্ট পাখি প্রথমবার ডানায় ভর করে উড়তে শুরু করল, কিন্তু একটু গিয়েই পড়ে গেল, সেই পাখির উপর হরিণ হাসতে পারে, কিন্তু পাখিটার গুণগত পরিবর্তন হয়ে গেছে, কারণ সে মাটিকে ছেড়ে দিয়েছে। এরপরে সে সুপারসনিক জেট বা ভারতের যে নূতন মিসাইল সিক্স ম্যাক, ধ্বণির গতির ছয় গুণ বেশি গতিতে যাচ্ছে, তাই না, এসকেপ ভেলসিটি রকেট বানিয়ে দেবে, কারণ সে মাটিকে ছেড়ে

দিয়েছে। সেও মাটি ছেড়ে দিয়েছে, সে এখন নূতন উড়ছে এবং পড়বেও, গতি থাকবে না, যারা মাটিতে আছে তারা তাকে দেখে হাসবে। বলবে, কেন মাটি ছাড়ার চেষ্টা করতে গেলে বাপু। কিন্তু তারা জানে না, তার জাতটাই আলাদা হয়ে গেছে। কারণ তার মধ্যে অসীম শক্তি জাগ্রত হওয়ার সম্ভবনা এসে গেছে। সেই দরজাটা খুলে গেছে, যেখান দিয়ে সে অসীম শক্তিকে প্রাপ্ত করে নিতে পারবে। সেই জ্ঞানটা কি?

এখানে আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, *কিং চ ভূতানি অশেষেণ,* সমস্ত যত ভূত, যত প্রাণী আছে, কি রকম, *ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্যন্তানি,* সেই ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ঘাসের একটা ছোট্ট টুকরো পর্যন্ত যা কিছু আছে *দ্রক্ষ্যসি আত্মনি প্রত্যগাত্মনি মৎসংস্থানি ইমানি ভূতানি ইতি,* সাক্ষাৎ তুমি দেখবে সব তোমার হৃদয়ে বাস করে, তুমি সাক্ষাৎ দেখবে, তোমার থেকেই সব কিছু বেরিয়েছে। আমি বলতে পারব না, যাঁরা এই আলোচনা শুনছেন তাঁদের চিন্তা-ভাবনায় শঙ্করাচার্যের এই কথা কতটা স্পর্শ করেছে। মন শান্ত করে, একান্তে বসে যদি একটু গভীরে গিয়ে এই কথাগুলো চিন্তা করেন, আপনার শরীর মনে ইলেক্ট্রিক শক্ লাগবে। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে, ইন্দ্রাদি দেবতাদের থেকে শুরু করে, ইদানিং ভারতের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে যত নামকরা ক্রিমিনাল আছে, সন্ত্রাসবাদী আছে, যত ধর্ষণকারী আছে, সবাই আপনার হৃদয়ে বাস করে। যত সাপ আছে, বিছে আছে, সিংহ আছে, বাঘ আছে, সব এই হৃদয়ে বাস করে। শুধু বাস করে না, এখান থেকেই সব কিছু বেরিয়েছে। জগতে যত দুষ্ট লোক সবাই আপনার থেকেই বেরিয়েছে। যত ভাল মানুষ আছেন, সবাই আপনার থেকেই বেরিয়েছে। সেইজন্যই তো ভগবান কাউকে পছন্দ করেন না, আবার কাউকে অপছন্দও করেন না, সবটাই তাঁর কিনা। শুধু এই কথাই আচার্য বলে থামছেন না, তার সাথে বলছেন, *অথো অপি ময়ি বাসুদেবে পরমেশ্বরে চ ইমানি ইতি,* ভগবান বাসুদেব, যিনি পরমেশ্বর, তাঁর ভিতরেও এরা বাস করছে। আচার্য শেষ করছেন এই বলে, *ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরৈকত্বং সর্বোপনিষৎপ্রসিদ্ধং দ্রক্ষ্যসি ইত্যর্থঃ,* সব উপনিষদে যে বলছেন, ক্ষেত্রজ্ঞ, তোমার ভিতরে যিনি অন্তর্যামী, যিনি আত্মা আর বাসুদেব কৃষ্ণ, দুটো এক। আপনি কৃষ্ণ নন, যখন *অহং ব্রহ্মাস্মি* বলা হয়, তখন প্রত্যগাত্মাকে নিয়ে বলা হয়। বলতে চাইছেন, আপনি আসল যেটা, তাঁর ভিতরে সমস্ত কিছু, *ভূতানি অশেষেণ,* যত যা কিছু আছে, জীব, জন্তু, জঙ্গম, স্থাবর, অস্থাবর সব আপনার ওই আসল যেটা তার মধ্যে বাস করছে। যাকে আমরা ভালবাসি, সেও আমার ভিতরে; যাকে সহ্য করতে পারি না, সেও আমার ভিতরে বাস করছে। আর সব সেই ভগবানের হৃদয়েই বাস করে। আমার যে প্রত্যগাত্মা, শুদ্ধ আত্মা, যিনি অন্তর্যামী আর শ্রীকৃষ্ণ এক। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আবার এই বিষয়টা আসবে।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।।৩৬।।

(যদি তুমি সকল পাপী থেকে অধিক পাপিষ্ঠ হও, তথাপি এই জ্ঞানের পোত দ্বারা সমুদয় ধর্মাধর্মরূপ সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হবে, ব্রহ্মজ্ঞানের এরূপ মাহাত্ম্য।)

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ, এই বিষয়টা বার বার ঘুরে ঘুরে আসে। তুমি যদি এমনই পাপী হয়ে থাক যে, তোমার মত পাপ কেউ আগে করেনি, তুমি যাই করে থাক, যে পাপই করে থাক, নৌকা যেমন মানুষকে সমুদ্রের পারে নিয়ে চলে যায়, এই জ্ঞান তোমাকে সমস্ত কিছুর পারে নিয়ে চলে যাবে। এই জ্ঞান হয়ে গেলে তোমার কাছে পাপ আর পাপ থাকবে না, পূণ্য পূণ্য থাকবে না। আচার্য বলছেন, *ধর্মঃ অপি ইহ মুমুক্ষোঃ পাপম্ উচ্যতে,* মুমুক্ষ যাঁরা, যাঁরা আত্মজ্ঞানের দিকে নিজেকে নিয়ে যাচ্ছেন, এই শ্লোকের বক্তব্য অনুযায়ী তাঁদের জন্য ধর্মটাও পাপ। এর আগে আমরা এই বিষয়ের উপর বিরাট আলোচনা করেছিলাম, পবিত্র স্থানে যদি কোন জিনিস পড়ে থাকে, ওটা পবিত্র স্থানকে অশুদ্ধ করে, ওখান থেকে ওটাকে তুলে নেওয়া হয়।

রাজযোগে পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তি নিরোধের কথা বলছেন। মন হল দাঁড়িপাল্লার মত, দাঁড়িপাল্লা বিচার করে না এটা সোনা না লোহা, সে খালি জানে ওজন। আপনার মনে পাপ চিন্তন আছে, না ঈশ্বর চিন্তন আছে, মন কোন তফাৎ করে না। তফাৎ হল, পাপ চিন্তন হয় তমোগুণ রজোগুণ থেকে, সমাধি হয় না। ঈশ্বর চিন্তন সত্ত্বগুণ থেকে হয়, সমাধি হয়। কিন্তু যেখানে আত্মার জ্ঞান হবে সেখানে ঈশ্বর চিন্তনটাও বাধক। ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধির যে বর্ণনা আছে, সেখানে এই একই জিনিস পাই। পাপ হল একটা subjective জিনিস, সমাজ ঠিক করে দিচ্ছে, এটাকে পাপ বলে। যেমন মানুষ খুন, যুদ্ধের সময় সৈন্যরা মানুষ খুন করছে তখন সেই সৈন্যদের কোন পাপ হয় না। এগুলো কিছু না, আত্মজ্ঞানের দৃষ্টিতে পাপ বলে কিছু হয় না। কিন্তু পূণ্য বলেও কিছু হয় না, আত্মজ্ঞান পাপপূণ্যের পারে। এটা কি করে সম্ভব যে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে? হ্যাঁ সম্ভব।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।।৩৭।।

(হে অর্জুন, যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেই রকম ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নি সমস্ত শুভাশুভ কর্ম ভস্মসাৎ করে। ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নির দ্বারা বিদগ্ধ হলে কোন কর্মই ফল প্রসব করতে পারে না।)

খবরে দেখাচ্ছিল, ক্যালিফোর্ণিয়ার জঙ্গলে আগুন লেগেছে, জঙ্গলের সব গাছকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। কোথা থেকে আগুন লাগল? একটা ছোট্ট দেশলাইয়ের কাঠি কেউ ঠুকে দিয়েছে। সারা বিশ্ব জুড়ে যদি কাঠ দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়, আর তাতে একটা ছোট্ট দেশলাইয়ের কাঠি মেরে দিলে সব ছাই হয়ে যাবে। যখন দাবানল লাগে, তখন দাবানলের আগুন সব কিছুকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দেয়। *যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নি*, আগুন যদি একবার জ্বলে ওঠে, সেই আগুন সব কিছুকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়। ঠাকুর বলছেন ওর মধ্যে কলাগাচ ফেলে দিলে সেটাকেও পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। ঠিক সেই ভাবে জ্ঞানরূপী অগ্নি সব কিছুকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। ঠাকুর বলছেন, একটা ঘর, হাজার বছরের অন্ধকার, ওখানে একটা আলো জ্বেলে দিলে অন্ধকার কি একটু একটু করে যাবে? না, তৎক্ষণাৎ অন্ধকার চলে যাবে। আত্মজ্ঞানেও ঠিক তাই হয়। আত্মজ্ঞান কি? যাবতীয় যা কিছু আছে, সব আমার হৃদয়ে অবস্থিত। নেতারা ভাষণ দেওয়ার সময় বলে, ভাইয়ো ঔর বহিনো, তারপর দেখে নিজের স্ত্রীও সেখানে আছে, তাকে তো আর বোন বলা যাবে না, তখন আবার বলে মুন্নি কি ম্যাম্মি কো ছোড়কর, কেম মুন্নির মাকে কি বোন বলা যাবে না। আমেরিকাতে স্বামীজী যখন বলছেন, Sisters and brothers of America, তখন সবাই স্বামীজীর জন্য ভাই আর বোন, এটাই তফাৎ। গীতার কথা শুনে আমি বলছি, সবাই আমার হৃদয়, কিন্তু ওই লোকটা একটা বদমাইশ, ওকে বাদ দিয়ে বলছি, ও আমার ভিতরে নেই। এভাবে হয় না। জ্ঞান, সেই একত্বের জ্ঞান যত পাপপূণ্য আছে সব কিছুকে উড়িয়ে দেয়, কারণ সমদৃষ্টি এসে যায়।

আরেকটা ব্যাপারে এনারা বলেন, যে কর্ম দিয়ে এই শরীরের জন্ম হয়েছে, জ্ঞান লাভ হলে সেই কর্মগুলি থাকে, বাকি সব কিছুকে পুড়িয়ে দেয়। এনারা কর্মের উপর অনেক সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছেন, তার মধ্যে একটা হল, যিনি জ্ঞানী তিনি কিছু কর্ম দিয়ে তাঁর এই জন্ম পেয়েছেন। পূর্ব পূর্ব সংস্কার, পূর্ব পূর্ব কর্মগুলি জ্ঞানের পরেও কাজ করতে থাকে। কর্মবাদ একটা মডেল, এই মডেলে কিছু জিনিসকে ব্যাখ্যা করা হয়, এটাও সেই রকম একটা ব্যাখ্যা। তবে ঠাকুর বলছেন, লোহার তরবারকে যদি পরশমণি দিয়ে স্পর্শ করিয়ে দেওয়া হয়, ওই তরবার সোনা হয়ে যাবে, ওই তরবার দিয়ে আর হিংসা করা যাবে না। আবার বলছেন, একটা দড়িকে পুড়িয়ে দেওয়ার পর দড়ির আকারটা থেকে যায়, কিন্তু সেই দড়ি দিয়ে বাঁধার কাজ হয় না। ঠিক তেমনি যিনি জ্ঞানী হয়ে গেলেন, তিনি যে কর্মগুলি জ্ঞান লাভের পর করছেন, তাতে তিনি জানেন আমার পূর্ব পূর্ব জন্মের যে সঞ্চিত কর্মগুলি আছে, সেই কর্ম এখন আমার চলছে, শরীর পড়ে গেলেই শেষ। তিনি যদি

আত্মহত্যাও করে নেন, তাতেও ওনার কোন পাপ লাগবে না। কিন্তু উনি এখন নির্বিকার হয়ে গেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে *তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্*, এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করার সময় এটার উপর আলোচনা করা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে শুভ-অশুভ, পাপ-পূণ্য এই জিনিসগুলো আর কোন প্রভাব ফেলে না, ভাল এলেও ঠিক আছে, মন্দ এলেও ঠিক আছে। আত্মজ্ঞানী এগুলোর দিকে আর তাকান না। ভগবান এবার জ্ঞানের স্তুতি করে বলছেন –

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।।৩৮।।

(ব্রহ্মজ্ঞান অজ্ঞান-নাশক ও অত্যন্ত শুদ্ধিকর। এর তুল্য পবিত্র বস্তু ইহলোকে বা পরলোকে আর কিছু নাই। দীর্ঘকাল প্রযত্ন দ্বারা কর্মযোগে চিত্ত শুদ্ধ হলে মুমুক্ষু স্বীয় আত্মাতে সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।)

আগুন যেমন সব কিছুকে পবিত্র করে দেয়, ঠিক তেমনি জ্ঞান সমস্ত কিছুকে পবিত্র করে দেয়। জগতে মানুষকে এবং মানুষের মনকে পবিত্র করার জন্য জ্ঞানের মত আর কিছু হয় না। *তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ*, যোগসংসিদ্ধ কে? আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *তৎ জ্ঞানং স্বয়ম্ এব যোগসিংসিদ্ধো যোগেন কর্মযোগেন সমাধিযোগেন চ সংসিদ্ধঃ সংস্কৃতো যোগ্যতাম্ আপন্নো মুমুক্ষুঃ*, বহিরঙ্গ দিয়ে যখন কাজ হয় তখন হয় কর্মযোগ, আর অন্তরঙ্গ কর্ম হয় মনের ভিতরে; আচার্য বলছেন, ধ্যানযোগ ও কর্মযোগ বা একটা বা দুটোকে দিয়েই যখন করা হয়, তখনই সংসিদ্ধ হয়। সংসিদ্ধ হয়ে যাওয়া মানে, *সংস্কৃতো যোগ্যতাম্ আপন্নো*, আত্মজ্ঞান লাভের যোগ্যতাটা সে পেয়ে যায়, এনারা হলেন মুমুক্ষু। যাঁরা ভাবছেন আমি ঠাকুরের ভক্ত, ভক্ত আপনি ঠিকই। কিন্তু আপনি কি মুমুক্ষ? মুমুক্ষু হওয়ার জন্য অনেক দিন ধরে কর্মযোগ বা ধ্যানযোগ করতে হয়, জপ করাটাও কর্মযোগ। কর্মযোগ ও ধ্যানযোগ করে সংস্কৃত হয়ে গেছেন, শুদ্ধ হয়ে গেছেন, যোগ্যতা পেয়ে গেছেন, এবার ইনি মুমুক্ষু। তখন তাঁদের কি হয়?

কালেনাত্মনি বিন্দতি, নিজের ভিতরেই আত্মার জ্ঞান লাভ করেন। আত্মার জ্ঞান বা ঈশ্বর দর্শন বাইরে কোথাও হয় না, আত্মার ভিতরেই আত্মার জ্ঞান হয়। *কালেনাত্মনি বিন্দতি*, এটা একদিনে হয় না, দিনের পর দিন কর্মযোগ, ধ্যানযোগের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখতে হবে, তারপর সময় হলে আপনিই জ্ঞান হয়ে যাবে। শ্রীশ্রীমা খুব সুন্দর বলছেন, যদি কেউ জপধ্যান করতে থাকে, ঠাকুরের প্রতি যদি সমর্পিত থাকে, মৃত্যুর সময় ঠাকুর তাকে নিয়ে যাবেন। আমাদের পরম্পরা বিদ্যাতে বলা হয় *কালেনাত্মনি বিন্দতি*। আপনাকে আগে দেখতে হবে আপনি যোগসংসিদ্ধ কিনা, মন সুসংস্কৃত হয়েছে কিনা; যদি হয়ে থাকে তখন স্বয়ং, নিজে থেকেই নিজের ভিতরে *কালেনাত্মনি বিন্দতি*। যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত তাঁদের এই বিশ্বাসটা ধরে রাখতে হবে। আপনি শ্রীরামকৃষ্ণরূপী জাহাজে উঠে পড়েছেন, পাড়ে আপনি যাবেনই। কিন্তু আমরা কি ঠিক ঠিক জাহাজে উঠেছি? জাহাজে ওঠার জন্য শুধু এটা বিচার করতে হবে, আমি যোগসিংসদ্ধ কিনা, অন্তঃকরণ আমার সংস্কৃত হয়ে গেছে কি? আমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়েছে কিনা দেখতে হবে।

গুরুকে পাওয়ার কথা বলে দিলেন, তুমি গুরুকে পেয়ে গেছ, জ্ঞান কি করে পাবে সেটাও বলে দিয়েছেন। এবার বলছেন উপায় কি?

শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।।৩৯।।

(গুরুবাক্যে ও বেদান্তোপদেশে বিশ্বাসী, জ্ঞাননিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় মুমুক্ষু অবশ্যই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে জন্মান্তরগ্রহণ বা লোকান্তরগমন না করেই শাশ্বতী শান্তি বা মোক্ষ প্রাপ্ত হন।)

স্বামীজী বার বার বলছেন, শ্রদ্ধাবান হও বীর্যবান হও, আর যাহা কিছু আসিবেই আসিবে। শ্রদ্ধাবান হলে তুমি জ্ঞান লাভ করবে। তার সাথে *তৎপরঃ,* লেগে থাকতে হবে, সেই চেষ্টায় তোমাকে তৎপর থাকতে হবে। *সংযতেন্দ্রিয়ঃ,* শ্রদ্ধা আছে, লেগেও থাকছ, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সংযম নেই, তাহলেও তোমার জ্ঞান লাভ হবে না, ইন্দ্রিয়ের সংযম দরকার। এভাবে শ্রদ্ধাবান হয়ে ইন্দ্রিয় সংযম করে লেগে থাকলে তুমি জ্ঞান লাভ করবেই করবে আর জ্ঞান লাভ করে *পরাং শান্তিম্,* পরম শান্তি লাভ করবে। আচার্য এখানে বলছেন, *শ্রদ্ধালুত্বে অপি ভবতি কশ্চিদ্ মন্দপ্রস্থানঃ,* শ্রদ্ধাবান অনেকেই হয়, ঠাকুরের প্রতি অনেকেরই শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু খাটবে না, অলস, তমোগুণী, এদের দ্বারা হবে না, তৎপর হতে হবে। *গুরুপাসনাদৌ অভিযুক্তঃ,* গুরুর সেবাতে, গুরুর উপাসনাতে তোমাকে লেগে থাকতে হবে।

মূল কথা, খাটতে হবে; ঠাকুর বলছেন, আগেকার ঋষিরা কত খাটতেন, সেই সকালবেলা কুটির থেকে বেরিয়ে সারাদিন ধ্যান করতেন, সন্ধ্যেবেলা ফিরে একটু ফলমূল খেতেন। আমরা একদিন একাদশী করলে, কয়েকদিন উপোস করলে আমাদের শরীর খারাপ হয়ে যায়, অথচ ঋষিরা দিনের পর দিন এই ভাবেই জীবন যাপন করতেন। অভ্যাস করে করে শরীর সাধন ভজনের জন্য তৈরী হয়ে গেছে।

তার সাথে বলছেন, *মন্দপ্রস্থানঃ,* আমাদের প্রধান শত্রু কামিনী-কাঞ্চন নয়, আমাদের মূল শত্রু মন্দপ্রস্থান, আলস্য। আর দীর্ঘসূত্রতা, আজকের দিনটা থাক কাল থেকে করা যাবে। এখন দূর্গাপূজা চলছে, পূজা কেটে যাক তারপর নামব। কত পূজা চলে গেল, নামাই আর হয় না। বলছেন, শ্রদ্ধাবান আছে, তৎপরও আছে, কিন্তু *অজিতেন্দ্রিয়,* এখানে এসেই সবাই আটকে যায়। মানুষ প্রথম কোন কাজ করতে যখন শুরু করে, তখন ওই কাজের প্রতি আগে তার শ্রদ্ধাটা আসে। কাজ করতে শুরু করল, তারপর সে কাজে কর্মে খুব তৎপর হয়ে গেল। কিন্তু দেখা যায় কখন যে অজিতেন্দ্রিয় হয়ে গেল, বোঝাই যায় না। হৃদয়রামের সবই ছিল, ঠাকুরের প্রতি বিশ্বাস, সেবাতে তৎপর, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। পরে তাই তাঁর সব কিছু এলেমেলো হয়ে গেল। এই তিনটে জিনিস যদি থাকে, শ্রদ্ধা আছে, তৎপর এবং জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞান তার হবেই হবে।

আচার্য খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন, *প্রণিপাতাদিঃ তু বাহ্যঃ, প্রণিপাত,* সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, এগুলো সব বাহ্য আচরণ। *অনৈকান্তিকঃ অপি ভবতি মায়াবিতাদিসম্ভবাদ্,* কপট প্রকৃতির যারা, যারা চালাকি করে, প্রণামাদি তারাও করতে পারে। অফিসের কর্মচারীরা নিজের বসকে পছন্দ করে না, কিন্তু রোজ সকালে এক গাল হাসি দিয়ে বলবে, 'গুড মর্ণিং স্যার'। এরা কপট, আচার্য মায়াবী বলছেন। তুমি গুরুকে ঠকিয়ে দিতে পার, আচার্যকেও বাহ্য আচরণ দিয়ে বোকা বানিয়ে দিতে পার, কিন্তু শ্রদ্ধা এমন একটা জিনিস, যেটাকে ঠকানো যায় না, শ্রদ্ধা পুরোপুরি ভিতরের ব্যাপার। আগে তাই বলা হল, প্রণিপাত করে আগে তাঁকে খুশী কর। তিনি খুশী হয়ে গেলেন, আর তুমিও মন্ত্র পেয়ে গেলে। এবার শ্রদ্ধা, যেটা তোমার নিজের, সেটাকে নিয়ে এসো। আগেও আমরা বলেছি, জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত পূণ্য যদি থাকে, তবেই শাস্ত্রের কথা শুনতে ইচ্ছে জাগবে, তা নাহলে শুনতে ইচ্ছা করবে না। যদি তোমার শুনতে ইচ্ছে করে, তাহলে বুঝতে হবে তুমি অনেক এগিয়ে গেছ। যদি কোন আচার্য পেয়ে যাও, যিনি তোমাকে শাস্ত্রের কথা শোনাচ্ছেন, তাহলে তুমি সত্যিই একজন ভাগ্যবান। এরপর তাঁর সান্নিধ্য লাভ করলে, তাঁর কথাগুলো গ্রহণ করতে পারলে, তুমি আরেক ধাপ এগিয়ে গেলে। এরপর উনি যে কথাগুলো বলবেন, সেই কথার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে যায়, যদি মনে হয় এগুলো সব সত্য, তাহলে তো you are great। তারপর যদি তুমি খাটতে শুরু করে দাও, তাহলে তোমার আর বেশি দেরী নেই। আর তোমার ইন্দ্রিয়গুলি সব সংযমে আছে, তখন ভগবান বলছেন, *অচিরেণাধিগচ্ছতি,* তোমার তো হয়ে গেল, সব মুঠোয়। সাধুর সাক্ষাৎ পেয়ে গেলেই যে সবাই তাঁর কাছে শাস্ত্রের কথা শুনতে চাইবে, তা কখন দেখা যায় না। ঠাকুর বলছেন, লোকেরা সাধু সঙ্গ করে গাঁজা খাওয়ার জন্য। আমাদের এখানে বেশির ভাগ ভক্তরা সাধু সঙ্গ করে বলার জন্য, মহারাজ

একটু প্রসাদ রেখে দেবেন, মহারাজ আমি বেড়াতে যাচ্ছি অমুক সেন্টারে একটা চিঠি লিখে দেবেন, মহারাজ নরেন্দ্রপুরে ছেলেটাকে ভর্তি করিয়ে দেবেন। এগুলো সাধুদের কাজ না, সাধু সঙ্গের উদ্দেশ্য অন্য কিছু, নিজের জাগতিক সুবিধা আদায় করার জন্য না।

পর পর ধাপ সাজানো আছে, প্রথমে সাধুসঙ্গের ধাপ, দ্বিতীয় ধাপ তাঁর কথায় বা শাস্ত্র বাক্যে পুরো শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে, তৃতীয় ধাপ সেই কথা অনুসারে তৎপর হয়ে চেষ্টা, চতুর্থ ধাপ ইন্দ্রিয় সংযম। ইন্দ্রিয় সংযম অনেক পরে আসে, প্রথমের দিকে ইন্দ্রিয়ের সংযমের অতটা দরকার পড়ে না। কারণ প্রথমের দিকে ওই কথাগুলো মন দিয়ে শুনতে হয়, শুনতে শুনতে প্রস্তুতি নিতে হয়, সেখান থেকে আসে ইন্দ্রিয়ের সংযম। ইন্দ্রিয় সংযমে যখন এসে গেল, তখন আসলে শেষ ধাপে এসে গেছে। এই চারটে ধাপ যদি হয়ে তাহলে জ্ঞান লাভে তাকে কে আর আটকাবে।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।।৪০।।

(অজ্ঞ, শাস্ত্রে শ্রদ্ধাহীন, (জ্ঞান ও কর্মের অনুষ্ঠানবিষয়ে) সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি পরমার্থের অযোগ্য হয়। সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই এবং ঐহিক সুখও নাই।)

এই আত্মজ্ঞানকে নিয়ে, ধর্মকে নিয়ে যে সংশয় করে, যেমন আজকেই একজন বললেন এটা হিন্দুত্ব হতে পারে, হিন্দু ধর্ম না। আরে ভাই হিন্দুত্ব আর হিন্দু ধর্ম আলাদা কিছু নাকি, যা খুশী মনে হবে বলে দেবে। একটু পড়াশোনা জানে, শব্দের একটা ভাণ্ডার বানিয়ে নেয়, সেখান থেকে শব্দ নিয়ে যা খুশী একটা বলে দেয়; রাজযোগে একে বিকল্প বলে। *অজ্ঞঃ,* আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে যার কোন ধারণা নেই, যে জানে কিন্তু সে মানে না, এরাই অজ্ঞ। *অশ্রদ্ধঃ,* যে আত্মজ্ঞান জানে, কিন্তু তার প্রতি শ্রদ্ধা নেই। *সংশয়াত্মনঃ,* গুরু বাক্যে ও শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস করে না। প্রথম হল আত্মজ্ঞানের ব্যাপারে যদি কোন ধারণা না থাকে, দ্বিতীয়, শ্রদ্ধা যদি না থাকে আর তৃতীয় সংশয়াত্মা, আত্মজ্ঞানের ব্যাপারে যদি সংশয় কর; এই তিনটে যদি হয় তাহলে কি হবে?

নায়ং লোকহস্তি ন পরো, এই জীবনেই সে সুখ পাবে না, পরের জন্মে তো আরও সুখ পাবে না। ধর্মে যাদের বিশ্বাস নেই, সংশয়াত্মাদের পরের জন্ম ছেড়ে দিন, এই জন্মেই তারা সুখ পায় না। টাকা-পয়সা হলেই কি সুখ হয়? হয় না। যাঁদের ধর্মে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে, যাঁরা আত্মজ্ঞানের পথিক, তাঁরাই সুখ পান। আমরা মনে করি, টাকা, বাড়ি, গাড়ি হলে, ভাল স্ত্রী হলে, ভাল এক স্বামী হলে আমরা সুখী হব। কিন্তু সুখ নাগালের বাইরেই থাকে, কারণ সমস্ত সুখ ভিতর থেকে আসে। ভিতরটা চলে আত্মজ্ঞান থেকে, আত্মজ্ঞান যদি নাও হয়ে থাকে, কিন্তু সেই জ্ঞানের প্রতি যদি শ্রদ্ধা থাকে, তবেই সুখ হয়, তা নাহলে হয় না।

যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।।৪১।।

(স্বীয় আত্মাকে ব্রহ্মরূপে দর্শন দ্বারা যাঁর সংশয় ছিন্ন এবং ধর্মাধর্মত্যাগ হয়েছে, সেই আত্মবান্ অপ্রমত্ত ব্যক্তিকে দৃষ্ট কর্মরাশি আবদ্ধ করতে পারে না, অর্থাৎ তাঁর কর্ম নিষ্কাম হওয়াতে অনিষ্ট, ইষ্ট বা মিশ্র কোন প্রকার ফল উৎপন্ন করে না।)

যিনি পরমার্থ জ্ঞানরূপী যোগ জেনে গেলেন, যখন জেনে গেলেন আত্মার ব্যাপারটা কি, তখন তিনি পূণ্য ও পাপ রূপ যত কর্ম আছে, সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে দেন। খুব উচ্চ অবস্থার কথা বলছেন। আমাদের স্তরে আসবে, কর্মের প্রতি স্পৃহা নেই, কর্ম ফলের প্রতিও স্পৃহা নেই। এই স্তরে যখন যায় তখন বলে *যোগসংন্যস্তকর্মণাং,* যিনি বুঝে গেছেন আত্মা কি, পরমার্থ তত্ত্ব কি, ঈশ্বর কি। তখন কি

হয়? আমার আরও চাই, এটা চাই, সেটা চাই, না পেলে লুটেপুটে খাব, এই ভাবটা চলে যায়। এনাদের বলছেন *যোগসংন্যস্তকর্ম*। এই অধ্যায়ের নাম জ্ঞানকর্ম সন্ন্যাস যোগ, এই যোগের উদ্দেশ্য হল *যোগসংন্যস্তকর্ম*। তাঁর বিশ্বাস হয়ে গেছে, এগুলো সব সত্য। আমরা প্রথমের দিকে আলোচনা করলাম, শরীর ধারণের জন্য কিছু করতে হয় আর সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ।

আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়, যিনি এটা খুব ভাল করে বুঝে গেছেন, আমি ঈশ্বরের সাথে এক, যে রূপেই ঈশ্বরকে নিন, সন্তান রূপে দেখুন বা এমনকি সেবক রূপে নিন, হে প্রভু আমি তোমার সেবক; কিংবা ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে নিন, আমার ভিতরে যিনি অন্তর্যামী আর ঈশ্বর এক, যিনি ঈশ্বর তিনিই আমার ভিতরে আছেন, কোন না কোন ভাবে বুঝে গেছেন আপনি ঈশ্বরের সাথে এক, এই সংশয় যাঁর মিটে গেছে, অর্থাৎ এই জীবনটাই শেষ এটা তাঁর কাছে আর সত্য বলে থাকছে না। এই ধরণের মানুষকে বলছেন, *জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্,* জ্ঞানের দ্বারা তাঁর সব সংশয়ের নাশ হয়ে গেছে। এই দুটো শব্দ –*যোগসংন্যস্তকর্মা,* যিনি বুঝে গেছেন যে, ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, সেইজন্য এটা সেটার পিছনে দৌড়ানটা তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন, এটা হল প্রথম; আর মনের সংশয় নাশ, এনাদের *আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়,* এনারা যে কাজ করেন সেই কাজ তাঁর ভিতর কোন সংস্কারের ছাপ ফেলে না, ভবিষ্যতে যে কর্মের ফল দেবে, এটা আর হবে না। অনেকে প্রশ্ন করেন, তিনি যে কর্ম করলেন, সেই কর্মের যে ফল হবে সেটার কি হবে? তিনি যে কর্ম করেন, সেই কর্মের ফল কর্মের সঙ্গে নাশ হয়ে যায়। কর্পূর পোড়ালে যেমন কিছু অবশিষ্ট থাকে না, ঠিক তেমনি কর্মগুলিরও কিছু অবশিষ্ট থাকে না। বলছেন, কর্মযোগের অনুষ্ঠান করতে করতে অন্তঃকরণ, মনের যত অশুদ্ধি নাশ হয়ে গেছে, আর সেখান থেকে আত্মার জ্ঞানের ব্যাপারে সব সংশয় দূরীভূত হয়ে গেছে। সেইজন্য অর্জুনকে বলছেন –

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত।।৪২।।

(অতএব হে ভারত, অজ্ঞানজাত বুদ্ধিস্থিত, আত্মবিষয়ক এই সংশয়কে জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা ছেদন করে ব্রহ্মদর্শনের শ্রেষ্ঠ মার্গ নিষ্কাম কর্মযোগ অবলম্বন কর এবং যুদ্ধার্থে উত্থিত হও।)

ঈশ্বরকে না জানাটাই অবিবেক। অবিবেকর জন্য কি হয়, ভিতরে সংশয় আসে, ভিতরে মোহ আসে। ভগবান বলছেন, তোমার ভিতরে যে শোক আর মোহ আছে, এই শোক আর মোহ কেন এসেছে এটাকে ভাল করে বোঝ। তোমার আত্মজ্ঞান নেই, তাই তোমার মধ্যে সংশয় আছে, ঈশ্বরের সত্তায় তোমার বিশ্বাস নেই, সেইজন্য তোমার মধ্যে সংশয় আছে। আর এই সংসারে থাকলে শোক মোহ আসবেই। ঠাকুরের বর্ণনা করতে গিয়ে স্বামীজী স্তবে বলছেন, *সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রং,* ঠাকুর এই যুগে অবতার রূপে এসে মানবজাতির মধ্যে যে সংশয়রূপী রাক্ষস আছে, সেই রাক্ষসকে নাশ করে দিয়েছেন। ভগবান বলছেন, এই আত্মজ্ঞন হল সেই খড়্গ, যে খড়্গ দিয়ে সংশয়কে নাশ করা হয়। হে অর্জুন, তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু সংশয়, এই শত্রুকে নাশ কর।

আমাদের ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বাস নেই, আত্মজ্ঞানে বিশ্বাস নেই, যদি বিশ্বাস আসে, তখন জগতের পিছনে যে আমরা দৌড়াচ্ছি, এটা বন্ধ হয়ে যাবে, তমোগুণ নাশ হয়ে যাবে, অতৎপর অর্থাৎ লেগে থাকতে পারে না, এটা নাশ হয়ে যাবে; আর ইন্দ্রিয়ের উপর সংযম নেই, এই দুর্বলতা কেটে যাবে। ফলে শোক আর মোহ এই দুটো নাশ হয়ে যাবে। আচার্য বলছেন, *ছিত্ত্বা এনং সংশয়ং স্ববিনাষহেতুভূতং যোগং সম্যগ্দর্শনোপায়কর্মানুষ্ঠানম্ আতিষ্ঠ,* এই জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় কর; অর্জুন তুমি ওঠো। তুমি যে মোহে পড়ে আছ, এই মোহকে ছেড়ে বেরিয়ে উঠে দাঁড়াও আর যে যোগের কথা বলা হল, সেই যোগকে পাওয়ার চেষ্টা কর। এই যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তুমি আত্মজ্ঞানের দিকে এগোবে। এর ফলে তোমার মনের ভিতর যত সংশয় আছে নাশ হয়ে যাবে, আর ফলে তোমার মধ্যে

যে শোক আর মোহ এসেছে, এগুলো সব নাশ হয়ে যাবে। সেইজন্য বলছেন, *উত্তিষ্ঠ ইদানিং যুদ্ধায়*, এই যুদ্ধের জন্য তুমি ওঠো। এখানেই চতুর্থ অধ্যায় শেষ হয়ে যায়। পঞ্চম অধ্যায় সন্ন্যাসযোগ, যেখানে ত্যাগের উপর খুব জোর দিচ্ছেন আর সেখান থেকে দেখাবেন জীবনমুক্তিটা কি।

সংক্ষেপে চতুর্থ অধ্যায়ের মূল বক্তব্য হল, নিজেকে পশুস্তর থেকে উপরে আনার জন্য প্রথমে তাকে যজ্ঞভাব নিয়ে সব কাজ করতে হবে। কি যজ্ঞ করবে? তুমি কিছু করতে পারছ না, ঠিক আছে গরীবকে কিছু দান কর। এর থেকে আর-একটু উপরে হলে আরও বড় যজ্ঞ করতে পার, এরও উপরে উঠলে তুমি প্রাণায়ামাদি কর, আরও উপরে উঠলে শাস্ত্রাদি পাঠ কর, এইভাবে পর পর বলা হয়েছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠতম যজ্ঞ তখনই হবে যখন তুমি মনে করবে যা কিছু আছে সবই ঈশ্বর। ঠাকুর দেখছেন কোশাকুশিও চৈতন্য, সর্বত্র তিনি সেই চৈতন্যকেই দেখছেন, চারিদিকেই ফুল ছুড়ছেন। এই অধ্যায়ে এটাই বলা হল, দ্রব্যযজ্ঞ, তপযজ্ঞ, যত যজ্ঞই করা হোক না কেন, সব যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযজ্ঞ। খাওয়ার সময়েও তিনি তখন দেখেন যেটা খাচ্ছি সেটাও ব্রহ্ম, থালাটাও ব্রহ্ম, আমার জঠরাগ্নিও ব্রহ্ম, আমার হাত, মুখ, জিহ্বা সব ব্রহ্ম, যিনি পরিবেশন করছেন তিনিও ব্রহ্ম, খাওয়াটাও ব্রহ্ম, খাওয়ার যে ফল পেট ভরা, তৃপ্ত হওয়া, এটাও ব্রহ্ম। এই কারণে খাওয়ার সময় হাসিঠাট্টা করা উচিৎ নয়, কারণ *ব্রহ্মার্পণং* করে যখনই কিছু খাওয়া হয় তখন সেটা আর শুধু খাওয়া থাকছে না, যজ্ঞ হয়ে যাচ্ছে। হাসিঠাট্টা জাগতিক জিনিষ, পূজা করার সময় যেমন হাসিঠাট্টা করাটা অশোভনীয়, ঠিক তেমনি খাওয়ার সময়েও যে কোন ধরণের মজা করা, ঠাট্টা ইয়ার্কি করা খুবই নিন্দনীয়। যদি তুমি এই ভাব নিয়ে সব কাজ কর তাহলে তোমার জ্ঞান উদয় হবে। এটাই হল শ্রেষ্ঠতম যজ্ঞ।

এটা যদি না করতে পার তাহলে ধাপে ধাপে নিজেকে উন্নীত কর, সেটাও যদি না পার তাহলে দ্রব্যযজ্ঞ কর। তোমাকে কোন যজ্ঞই করতে বারণ করা হচ্ছে না, সব যজ্ঞই তুমি করতে পার। কিন্তু জ্ঞানযজ্ঞের মাহাত্ম্যকে মাথায় রেখে তাতেই তোমাকে বেশি জোর দিতে হবে। এখন জ্ঞানযজ্ঞ করতে গিয়ে যদি দ্রব্যযজ্ঞ বন্ধ হয়ে যায় তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি তুমি জ্ঞানযজ্ঞও করছ না আর দ্রব্যযজ্ঞ এবং তার মাঝখানে যত যজ্ঞের কথা বলা হল কোন যজ্ঞই করছ না তাহলে তোমার অবস্থার কোন পরিবর্তনই হবে না, যে পশুস্তরে তমোগুণে পড়েছিলে, সেই তমোতেই পড়ে থাকবে। ঠাকুর যেমন বলছেন, তামসিক লোকের বাড়ি থেকে যদি কেউ চুরি করে তখন তাকে ধরবে, ধরে প্রথমে তার সব জিনিসপত্রগুলো কেড়ে নেবে, তারপর খুব করে মারধোর করে পুলিশে দেবে, আর বলবে – জানেনা কার বাড়িতে চুরি করতে এসেছ! এরাই হল ঠিক ঠিক আসুরিক বৃত্তি সম্পন্ন মানুষ।

মূল কথা যজ্ঞের উপরে আধারিত করে যদি তোমার জীবনকে প্রতিষ্ঠিত না করতে পার তাহলে তুমি পশুস্তরে, যেটা তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছিলেন –*যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ*, যজ্ঞার্থে যখন তুমি কর্ম করবে তবেই তুমি কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাবে। যজ্ঞ তুমি কিভাবে করবে? তোমার অত বুদ্ধি নেই, ঠিক আছে তুমি দানধ্যান কর। এই কথাটাই আমরা এর আগেও বলেছিলাম যে, শ্রীশ্রীমা বলছেন – যার আছে সে মাপো যার নেই সে জপো। তোমার কিছু নেই তুমি খুব করে জপ করে যাও তাতেই তোমার মঙ্গল হবে, আর তোমার প্রচুর অর্থ আছে, প্রাচুর্য আছে তাহলে তুমি দান করতে থাক।

তৃতীয় অধ্যায় আর চতুর্থ অধ্যায় হল কর্মকে নিয়ে। তুমি যদি পারমার্থিক সত্যকে ঠিক ঠিক জেনে থাক, তাহলে তোমাকে আর কোন কাজ করতে হবে না, তুমি সব কিছু থেকে মুক্ত। কিন্তু তার লক্ষণ কি? যদি তুমি কারুর গলা কেটে দাও তাহলে তোমার মনে কোন পাপ বোধ হবে না, উল্টে যদি তোমার গলা কেউ কেটে দেয় তাতে তোমারও কোন বোধই হবে না যে তোমার গলা কাটছে। তোমার কি এই অবস্থা হয়েছে? না হয়নি, হাতে একটু ছুঁচ ফুটলেই চিৎকার করে উঠি। তাহলে তুমি

কর্ম করতে থাক। কিভাবে কর্ম করবে? এমন ভাবে কাজ করবে যাতে কর্মফলে তোমার কোন স্পৃহা না থাকে। দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে, কর্তব্য রূপে যেটুকু কর্ম তোমার কাছে এসেছে, ততটুকুই কাজ করবে তার বেশি অতিরিক্ত কোন কাজে নিজেকে জড়াবে না। যদি কর্মফল ত্যাগ করতে পারছ না তাহলে তখন তুমি সব কাজ যজ্ঞ রূপে কর। আমি পড়ছি এটাও যজ্ঞ, আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছি যজ্ঞ, খাওয়া, কথা বলা, চিন্তা করা, ইন্দ্রিয় সংযম করা সবটাই যজ্ঞ। এই ধরণের নানা রকমের যজ্ঞের কথা এখানে বলা হয়েছে। এই যজ্ঞ রূপে তুমি যদি কর্ম না করতে পার তাহলে তোমার আর কোন গতি নেই। এই রকম যজ্ঞ করার পর যদি তোমার তত্ত্বজ্ঞান লাভের বাসনা উদয় হয় তাহলে তোমাকে গুরুর কাছে যেতে হবে। গুরু কি রকম হবে? তিনি শ্রোত্রিয়, তত্ত্ববিৎ, কোন কামনার দ্বারা বশীভূত হয়ে তিনি শিষ্যকে উপদেশ দেননা। যারা বলছে আমি কাজ করছি না তারাও কিন্তু কাজ করছে। কারণ কাজ থেকে যে নিজেকে টেনে আনছে সেটাও কাজ হয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায়ে কর্মসন্ন্যাসযোগের সার সংক্ষেপ। এরপর আমরা সন্ন্যাসযোগে প্রবেশ করব।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়ং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মসন্ন্যাসযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

পঞ্চমোধ্যায়ঃ

সন্ন্যাসযোগ

পঞ্চম অধ্যায় সন্ন্যাসীদের জন্য, এই অধ্যায়ের নামই সন্ন্যাসযোগ। কিন্তু আমরা এর আলোচনার মধ্যে যত ঢুকবো, তত দেখতে পাবো কিভাবে এই অধ্যায় আমাদের সবারই নিত্য অনুশীলনের বিষয়। এই অধ্যায়ের প্রত্যেকটি বাক্য আমাদের রোজ অভ্যাস করা দরকার। পঞ্চমোধ্যায়ের আলোচনা শুরু করার আগে কয়েকটা কথা বলে নেওয়া খুব দরকার।

অজান্তাতেই এই অধ্যায় আমার খুব প্রিয়। কি করে, কেন এই অধ্যায় আমার প্রিয় হল আমার জানা নেই। আমরা মনে আছে, প্রথম যখন রামকৃষ্ণ মিশনে জয়েন করি তখন স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজের কাছে আমি গীতার পাঠ নেওয়া শুরু করি। গীতা মুখস্ত করার যখন কথা হল, তখন আমি প্রথমে এই পঞ্চম অধ্যায় দিয়েই মুখস্ত করতে শুরু করেছিলাম। পঞ্চম অধ্যায়ের সাথে আমার একটা বিশেষ যোগ। তখন অতটা বুঝতাম না, এটা বুঝেছিলাম যে এই অধ্যায় সন্ন্যাসীদের জন্য, তাই আমি ঠিক করলাম, এই অধ্যায়টাই আগে মুখস্ত করব। পরে পরে বুঝলাম, গীতা যে উচ্চতম আদর্শের কথা বলছেন, অধ্যাত্মের যে শেষ কথা আত্মজ্ঞান, এই পুরো বিষয়টাই এই অধ্যায়ে ছেয়ে আছে। এরই একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আমরা পেয়েছি দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণে। স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণে যেটা বলা হয়েছে, সেই জিনিসটাই এখানে আরও বিস্তারে বলা হয়েছে। সন্ন্যাসযোগ এই নাম শুনলে সবাই স্বাভাবিক ভাবেই মনে করবেন, এই অধ্যায় শুধু সন্ন্যাসীদেরই জন্য; কিন্তু না, সবারই জন্য পঞ্চম অধ্যায় খুবই প্রয়োজনীয়। কেন প্রয়োজনীয়, এটা বোঝার জন্য খুব সাধারণ একটা জিনিসকে বুঝে নিলে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

পপুলার জিনিসটা কি? মানুষ কিভাবে পপুলার হয়? মানুষ কেন পপুলার হয়? V.S.Naipaulএর নাম অনেকেই শুনে থাকবেন, খুব নামকরা সাহিত্যিক, নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। একটা ইন্টারভিউতে সাহিত্য নিয়ে বলতে গিয়ে উনি বলেছিলেন, যে কোন উপন্যাস দেশ কালের যত কাছে থাকবে, মানুষ তত সেই উপন্যাসকে গ্রহণ করে। আমি এই কথাটা আজ থেকে প্রায় কুড়ি পঁচিশ বছর আগে শুনেছিলাম। তখন শুনে মনে হয়েছিল, আমার মত লোক তো কোন দিন লেখক হতেই পারবে না। কারণ এত কাছে আমরা কি করে যাব। কিন্তু কোথাও মনে হচ্ছিল, এই কথার মধ্যে এমন কিছু একটা আছে, যেটা বাদ চলে যাচ্ছে, যেটাকে আমরা ধরতে পারছি না। যে কোন একজন নেতা বা সমাজসেবী, বা কোন শিক্ষক, বা একজন লেখক নিজের সময় খুব প্রসিদ্ধ থাকেন। যেমন কেশবচন্দ্র সেন, সেই সময় কলকাতার সবাই তাঁর নাম জানতেন, কিন্তু ঠাকুরকে কে আর জানত। এমনকি কেশবচন্দ্র সেন তাঁর কাগজে ঠাকুরের নামে কিছু লেখা ছাপালেন বলে সেই সময়কার কিছু লোক ঠাকুরের নাম জানলেন। যীশু খ্রীষ্ট, ভগবান বুদ্ধকে তাঁদের সময় কেউ জানতেন না। কিন্তু তৎকালীন যে রাজা ছিলেন, তাঁকে সবাই জানতেন। বর্তমান কালে প্রধানমন্ত্রীর নাম গোটা দেশ জানে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাম সারা রাজ্যের লোকেরা জানে। কিন্তু বর্তমান কালের যিনি বড় চিন্তক বা একজন মহাত্মা, তাঁর নাম আর কজন জানে! কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায়, যাঁরা চিন্তক, যিনি অবতার, যিনি মানুষকে ধর্ম শেখাচ্ছেন, সময়ের সাথে সাথে তাঁদের নাম ধীরে ধীরে ছড়াতে থাকে। এটা একটা রহস্য।

আবার একজন মহাত্মা আর একজন অবতার, মহাত্মার নাম নিজের সময় খুব ছড়িয়ে যায়, কিন্তু একজন অবতারের নাম ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়। এটা কেন হয়? তেমনি কিছু রচনা, কিছু শিল্পকর্ম আছে যেগুলো নিজের সময় কোন দাম পায় না। যেমন ভ্যান গগ্, ভ্যান গগ্ যত দিন

বেঁচে ছিলেন তাঁর শিল্পকর্মের কেউ দাম দেয়নি। এমনকি একজনকে তিনি ফ্রীতে একটা ছবি উপহার দিয়েছেন, সেও সেই ছবি পেয়ে নিজের মুরগীখানায় ঝুলিয়ে রেখেছে। কিন্তু এখন ভ্যান গগের একটা ছবির কি দাম, আমরা কল্পনাই করতে পারব না। নিজের সময় মানুষ স্বীকৃতি পায় না, এটা সাধারণ লোকেদের ক্ষেত্রে হয় না, বড় কোন মহাপুরুষ বা মহাত্মাদের ক্ষেত্রেই এটা হয়।

এটাকেই মাথায় রেখে অনেকে বলতে থাকেন, আজ তুমি আমাকে বুঝতে পারছ না, পরে একদিন ঠিক বুঝবে। সাধারণরাই এই ধরণের কথা বলে, এগুলোর কোন দাম নেই। মহাপুরুষরা নিজের মত নীরবে চুপচাপ কাজ করে যান, জগৎ তাঁকে জানে না, আর তিনি চানও না যে জগৎ তাঁকে জানুক। সেটা গুরুত্ব নয়, প্রত্যেক মায়েরাই এই রকম হন। বেশির ভাগ মায়েরা চুপচাপই কাজ করেন, সব মাকে কি সবাই জেনে যায়, জানতে পারে না। কারণ যাঁরা সত্যিকারের মহৎ, ধর্ম জগতেই হন আর সাহিত্যের জগতেই হন কিংবা ছবি আঁকা, গান-বাজনার জগতের কেউ হন, যত তাঁরা সময় থেকে এগিয়ে, নিজের কাল থেকে এগিয়ে থাকেন, তাঁদের প্রসিদ্ধি তত বেশি হয়।

সময়ের আগে যেটা চলে সেটা আরও মজার। যিনি নিজের সময়ের থেকে এগিয়ে থাকেন, তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন তাঁর নাম হবে না। তিনি চলে যাবার বেশ কিছু দিন পর থেকে তাঁর নাম হতে শুরু হয়ে যায়। গণিতের জগতে এই ধরণের ঘটনা প্রচুর দেখা যায়, কেউ একটা থিয়োরী দিয়েছে, তখন কেউ মানতে চাইল না, কেউ বুঝতেই পারল না। তারপর দেখা গেল ওটাই পরে গণিতের জগতে একটা বিরাট অবদান রূপে স্বীকৃতি পেয়ে গেল। কোন জিনিস যদি নিজের সময় থেকে এগিয়ে থাকে, সেটাকে বোঝার ক্ষমতা বেশি লোকের থাকে না।

আইনস্টাইন তাঁর থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি দেওয়ার পর সেই সময় একটা জোক বাজারে ছড়িয়ে পড়ে। আর্থার এডিংটন এ্যস্ট্রনমিক্যাল ফিজিক্সের লোক ছিলেন, আইনস্টাইনের সিদ্ধান্তগুলি যখন ফিজিক্সের কেউ মানতে চাইছিল না, তখন উনিই প্রথম সূর্যগ্রহণের সময় ছবি তুলে দেখালেন যে, আইনস্টাইনই ঠিক। এটাকে নিয়ে একটা জোক আছে, অনেক বলে যে এটা সত্য ঘটনা হতে পারে না, কিন্তু আইডিয়াটা খুব সুন্দর। এডিংটন সূর্যগ্রহণের সময়ের ছবিগুলি দিয়ে দেখাচ্ছেন, আকাশে তারাগুলি যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই। তার মানে তারা থেকে দিনের বেলায় যে আলো আসে, সূর্য সেই আলো নিজের দিকে টেনে নেয়, আর এটাই আইনস্টাইনের সিদ্ধান্তে বলা হয়। ফলে রাত্রে তারাগুলিকে এক জায়গায় দেখা যায়, দিনের বেলায় অন্য জায়গায় দেখায়। সূর্যগ্রহণের ছবি তুলে এডিংটন দেখালেন, আইনস্টাইন যেটা বলেছেন সেটা ঠিক। এডিংটন এই কথা বলার পর খুব হৈ হৈ পড়ে গেল, কারণ নিজের সময়ে এডিংটন এ্যস্ট্রোনমিক্যাল ফিজিক্সের জগতে একজন নামকরা বিজ্ঞানী ছিলেন। আইনস্টাইনের থিয়োরী বেরিয়েছে ১৯০৪ সালে, এডিংটন এটা বললেন ১৯১৬ সালে, তার মানে বারো বছর হয়ে গেছে।

এডিংটনকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করছেন, 'আমরা জানি বিশ্বে মাত্র তিনজন আছেন, যাঁরা থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি বোঝেন'। এডিংটন সাংবাদিকদের এই কথা শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। এতক্ষণ চুপ করে আছেন দেখে সাংবাদিকরা আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন আরও বেশি আছে কি'? তখন এডিংটন বলছেন, 'না, আমি ভাবছি তৃতীয়জন কে'? তার মানে এডিংটন বলতে চাইছেন, আইনস্টাইন বোঝেন আর এডিংটন বোঝেন, তৃতীয় এই রকম কেউ নেই যে আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত বুঝবে। লোকেদের মত যে, এটা বানানো গল্প, এডিংটন এ-রকম কথা বলতে পারেন না। কিন্তু এখানে আইডিয়াটা দেখতে হবে, আইনস্টাইন নিজের সময় এত বেশি এগিয়ে যে, তাঁকে বোঝার ক্ষমতা সেই সময় কারুর নেই। অথচ আজকের দিনে গ্রাজুয়েশান লেভেলে থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি পড়ানো হচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখছি রবার্ট পেনরোজ আইনস্টাইনের থিয়োরী অফ রিলেটিভিটিকে আধার করে নোবেল প্রাইজ পেলেন। এটাই একটা

রহস্য, আইনস্টাইনের সময় কেউ তাঁর সিদ্ধান্ত বুঝতে পারল না, আজকে এত লোক বুঝতে পারছে। টাইম ম্যাগাজিনে গত হাজার বছরে যাঁরা শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হয়েছেন তাঁদের নামের তালিকায় আইনস্টাইনের নাম দু নম্বরে, আমেরিকা রুজভেল্টের নাম সব কিছুর আগে রাখে বলে, ওই নামটা এক নম্বরে রাখা হয়েছে। কিন্তু আইনস্টাইন হলেন আসল, পুরো জগৎকে পাল্টে দিলেন। যখন কোন আইডিয়া বা ভাব নিজের সময় থেকে এগিয়ে থাকে, ওটাকে সেই সময় ধরা বা বোঝা খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব।

কিন্তু বিবর্তনের জন্য আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি, আমরা আরও মহৎ থেকে মহত্তর হচ্ছি। ডারউইন তাঁর বিবর্তনবাদে এক একটা প্রজাতির যে evolve হয়, তার কথা বলছেন। আমরা এটা মানি যে, প্রত্যেকটা জীব, আমি আপনি সবাই ওই অর্থে এগিয়ে যাচ্ছি, তার মানে আজকে যে আমাদের সমষ্টি জ্ঞান, চার হাজার বছর আগে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের থেকে অনেক বেশি। চার পাঁচ হাজার বছর আগে ব্যাসদেব, বাল্মীকির মত মহাপুরুষরা ছিলেন, ঋষিরা ছিলেন, কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু সমাজে জ্ঞানের প্রবাহ তখন অনেক কম ছিল, আমরা আজকে তার থেকে অনেক এগিয়ে আছি। এখানে কোন একজনকে দিয়ে বিচার করা যাবে না।

বাল্মীকি ছিলেন বিরাট কবি। বাল্মীকির কবি প্রতিভার কাছাকাছি কালিদাস হয়ত একটু যেতে পারেন, অন্য আর কেউ যেতে পারেননি। কিন্তু বাল্মীকি বা ব্যাসদেবের কীর্তির যে সমঝদার হবে, সমাজে তার সংখ্যা সেই সময় অত্যন্ত কম ছিল। কিন্তু যেমন যেমন সমাজ এগিয়ে চলে, তত বেশি সংখ্যায় মানুষ ওনাদের সৃষ্টিকে ধরতে পারছে। যেমন যেমন সমাজ এগোতে থাকে মানুষের বুদ্ধিও তত বিকাশিত হয় এবং তত এর প্রকাশ পায়। আর সেই সময় যিনি খ্যাতির চূড়ায় ছিলেন, তিনি দেশ আর কালের মধ্যে এমনটাই বাঁধা ছিলেন যে, সবাই যেমনি এগিয়ে গেল উনি আর ওনার কীর্তি পিছিয়ে পড়ে থেকে গেল। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন দেশে যে নেতারা খ্যাতির চূড়ায় ছিলেন, আজকে তাঁদের কেউ নামও শোনেনি। অথচ একটা সময় সাধারণ জ্ঞানে তাঁদের নাম আমাদের মুখস্ত করতে হত। ক্লাশ ফোর ফাইভে আমাদের সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নাম মুখস্ত রাখতে হত। এখন রাজ্যের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে, আর মুখ্যমন্ত্রী এত ঘন ঘন পাল্টায় যে নাম মুখস্ত রাখা খুব মুশকিল, কিন্তু সাধারণ জ্ঞানের জন্য জানতে হয়। এখন তো কেউ নামই শোনেনি, কোথায় হারিয়ে গেল, কেউ খোঁজও রাখে না।

সক্রেটিস নিজের সময় খুব বিখ্যাত ছিলেন, যীশু খ্রীষ্টের নাম তখন কেউ শোনেনি। খ্রীশ্চান জগতে আজকে যীশু খ্রীষ্টের নাম সবাই জানে, ঘরে ঘরে তিনি পূজিত হচ্ছেন। অন্য দিকে সক্রেটিস আজকে কয়েকটা বইয়ের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছেন। কারণ যীশু খ্রীষ্ট নিজের সময় থেকে অনেক বেশি এগিয়ে ছিলেন। যেমন যেমন সময় এগোচ্ছে লোকেরা তত যীশু খ্রীষ্টকে তারিফ করছে। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের সময় থেকে অনেক বেশি এগিয়ে। যার জন্য আমাদের আগে যাঁরা ছিলেন, একে তো তাঁরা খবর পাননি, দ্বিতীয় তাঁকে বোঝার মত ক্ষমতা ছিল না। আমরা তাঁদের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে।

সময় থেকে এগিয়ে থাকা মানে, জিনিসটা সত্যের খুব কাছাকছি। কিছু কিছু জিনিস হয় যেটা দেশ কালের খুব কাছাকাছি থাকে, যেটা নইপাল বলছেন। যেটা আসল সত্য, জিনিসটা যদি সেই আসল সত্যের কাছে হয়, জিনিসটাকে মনে হবে দেশ ও কাল থেকে যেন এগিয়ে আছে। কারণ এই বিশ্ব, এই সৃষ্টি হল জটিল, জটিল থেকে ধীরে ধীরে সে এগিয়ে যাচ্ছে সেই সত্যের দিকে। সৃষ্টি যখন হয়েছিল, ভগবান যখন সৃষ্টি করলেন, তখন জিনিসটা সহজ থেকে জটিল হয়ে গেল। সেখান থেকে সে আবার ধীরে ধীরে সহজের দিকে এগোচ্ছে। জিনিসটা যত সহজ হয়, তত সেটা সময় থেকে এগিয়ে থাকে। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর সময়ে যে কথাগুলো বলছিলেন, সেগুলো আধ্যাত্মিক জগতের

কয়েকটা খুব সহজ ও সত্য কথা ছিল। তখনকার লোকেদের যীশুর সেই কথাগুলো নেওয়ার ক্ষমতা ছিল না, কারণ তাদের মন জটিল। স্বামীজী যখন বলছেন, আমি চিন্তন জগতের জন্য পনেরশ বছরের খোরাক দিয়ে গেলাম, তখন এর এটাই অর্থ হয় যে, স্বামীজী যে কথাগুলো বলে গেছেন তার অনেক কথাই আমরা এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছি না। আমাদের পরে যাঁরা আসবেন, তাঁদের বুদ্ধি, বোঝার ক্ষমতা এত বেশি থাকবে যে, তাঁরা স্বামীজীর কথাগুলো ঠিক ঠিক বুঝতে পারবেন। তত দিনে আবার নূতন মন্ত্রদ্রষ্টা কোন মহাপুরুষ এসে যাবেন।

এই কথাগুলো বলা এই জন্য যে, উপনিষদ হল হিন্দুদের ঠিক ঠিক গ্রন্থ। আমরা বেদ বেদ বলি ঠিকই, বেদ হল হিন্দু ধর্মের উৎস, উপনিষদ আবার সেই বেদের অঙ্গ। সেইজন্য আমরা বলি বেদ সবচেয়ে বড় ধর্মগ্রন্থ। কিন্তু হিন্দুদের ঠিক ঠিক ধর্মগ্রন্থ হল উপনিষদ। উপনিষদ নিজের সময় থেকে এত বেশি এগিয়ে, তার মানে উপনিষদের ঋষিরা তাঁদের সময় থেকে এত বেশি এগিয়ে যে, আজ সাত থেকে আট হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, এখনও সমাজে উপনিষদকে ছড়িয়ে যেতে পারেনি, এমনকি বড় বড় বোদ্ধারা, চিন্তকরাও উপনিষদকে বোধগম্য করতে পারছেন না। কারণ উপনিষদ হল বিশুদ্ধ বেদান্ত।

যে কোন জ্ঞান যদি জীবনে না নামানো যেতে পারে, যদি practical না হয়ে থাকে, ওই জ্ঞানের কোন দাম নেই। যে কোন মানুষ একটা থিয়োরী দিয়ে দিতে পারে, কিন্তু যদি ওই থিয়োরীর কোন পরীক্ষা করা না যায়, দ্বিতীয় ওই থিয়োরীকে যদি কোন কাজে লাগানো না যায়, তবে ওই থিয়োরীর কোন দাম নেই। যে জ্ঞানকে কাজেই না লাগানো যায়, ওই জ্ঞান নিয়ে আমি কি করব। যে গরু বাছুর দেবে না, দুধ দেবে না, সেই গরু আমার কোন কাজে লাগবে? উপনিষদ সেই সত্যগুলিকে বলছেন, ফলে নিজের দেশ কাল থেকে এত বেশি এগিয়ে যে, ওটাকে দৈনিন্দিন জীবনে নামানো যায়; ঋষিদের যে শিষ্যরা ছিলেন, তাঁদেরও এই জিনিসটা বোঝার ক্ষমতা ছিল না। ঈশোপনিষদে ঋষি বলছেন, যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, তাঁর আর কিসের শোক, কিসের মোহ। এটাই প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত।

মুসলমানরা মনে করে আমার ধর্ম সত্য, এটাকে বিশ্বাস করে তারা যে কোন জিনিস করার জন্য প্রস্তুত। জুহুদিদের ব্যাপারটা আরও মজার, ওরা বলে We are the chosen people of God। শুধু এই বিশ্বাস, যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর পর গত দু হাজার বছরে ওদের উপর এত অত্যাচার হয়েছে, হিটলারের সময় কত কি হয়েছে, কিন্তু জুহুদিদের চিরদিন এই বিশ্বাস যে, ঈশ্বরের আমরা বিশেষ। শুধু এই বিশ্বাসকে ধরে আজকে ইজরায়েল কোন জায়গায় চলে গেছে। ওই ছোট্ট একটা দেশকে চারিদিক দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্ররা ঘিরে রেখেছে, কিন্তু একা সব কটা দেশকে আটকে রেখেছে। নিজের ধর্মগ্রন্থের শুধু একটি বাক্যকে বিশ্বাস, আমরা হলাম ঈশ্বরের বিশেষ, We are the chosen people of God।

এটাকে মাথায় রেখে এবার আমাদের কথা একটু ভাবুন। আপনার আমার যে ধর্মগ্রন্থ উপনিষদ, উপনিষদের একটিই কথা, তুমিই সেই ব্রহ্ম, তুমি ঈশ্বরের সাথে এক। এই কথার উপর আমার আপনার বিশ্বাস আছে? শুধু ধাপ্পাবাজী আমাদের। কারণ এই একটি বাক্য, **‘তুমি সেই ব্রহ্ম, তুমি ঈশ্বরের সাথে এক’**, এই একটি বাক্যে যদি কারুর বিশ্বাস হয়ে যায়, রাতারাতি তার জীবনটাই আমূল পাল্টে যাবে। স্বামীজীর বাণী ও রচনা আমাদের সবার বাড়িতে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা থাকে, কিন্তু একটা খণ্ডও পুরোটা কেউ পড়ে দেখেননি। না পড়ারই কথা, অত ধৈর্য কোথায় আমাদের, আর অত উচ্চ ধারণা করার ক্ষমতাও নেই। তবে আমাদের মঙ্গলের জন্য একটা কাজ আমরা করতে পারি, স্বামীজীর বাণী ও রচনার প্রত্যেকটি খণ্ডের প্রত্যকেটি পাতার প্রথম ও শেষ শব্দটা শুধু পড়বেন, তাতেই মনে হবে জীবনে কিছু একটা করলাম, জীবনকে ধন্য মনে করবেন।

স্বামীজীর সমগ্র বাণী ও রচনা একটি কথাই বলছে, তুমি সেই ব্রহ্ম। স্বামীজী যখন বলছেন, শক্তিমান হও, বীর্যবান হও, তিনি আসলে কি বলতে চাইছেন? ঐ সত্যটাকে জানার জন্য তোমাকে আগে শক্তিমান হতে হবে, বীর্যবান হতে হবে। স্বামীজী যখন বলছেন, গীতা পড়ার থেকে ফুটবল খেলা অনেক ভাল, তার মানে আগে তোমার শরীর গঠন কর, পেশী মজবুত কর, তমোগুণকে কাটিয়ে নিজেকে রজোগুণে নিয়ে এসো, যাতে তোমার সেই প্রস্তুতিটা হয়। তবে গিয়ে গীতা তুমি অনেক ভাল বুঝতে পারবে।

স্বামীজী যখন বলছেন, তোমার মধ্যে অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, তখন তিনি কি বলতে চাইছেন? আসলে বলতে চাইছেন, তুমি সেই ব্রহ্ম। স্বামীজী তাঁর লেকচারে বার বার বলছেন, বেদান্ত শুধু কোন তত্ত্ব না, এটা কার্যকরী, জীবনে নামানোর জন্য। শঙ্করাচার্য এত বড় ভাষ্যকার, তিনিও এত জোর দিয়ে বলেননি, যেটা স্বামীজী বলেছেন। শঙ্করাচার্যের চোদ্দশ বছর পর স্বামীজী এসেছেন, তত দিনে সমাজ অনেক এগিয়ে গেছে, স্বামীজীও তাই এই শব্দটা আনতে পারলেন – **প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত**। নূতন কিছু কি স্বামীজী বলেছেন? একেবারেই না, প্রত্যেকটি উপনিষদ প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত, একটু আগে আমরা ঈশোপনিষদের যে মন্ত্র বললাম, *তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতি*, এটাই প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত। পুরো গীতার সাতশটি শ্লোক প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত। এই সাতশ শ্লোকের মধ্যে আবার এই পঞ্চম অধ্যায় হল একেবারে সরাসরি প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত। সন্ন্যাসযোগ বা পঞ্চম অধ্যায় হল দৈনন্দিন জীবনে বেদান্ত। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী তাঁর লেকচারে পঞ্চম অধ্যায় থেকে প্রচুর শ্লোক উল্লেখ করতেন, তিনিও দেখাচ্ছেন পঞ্চম অধ্যায় কিভাবে প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত, living Vedant এবং এটাই তোমার আসল ধর্ম।

সাপের মাথায় মণি কিন্তু সাপ মরা ব্যাঙ খেয়ে মরে, আমাদের ঠিক এই দুরবস্থা। ঘুরে ফিরে আমাদের সব চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু আমাদের শরীর, মনের টানাপোড়েন। দেহের চিন্তা, মনের টানাপোড়েনের চিন্তা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে চিন্তা, এর বাইরে আমাদের আর কোন চিন্তা-ভাবনা নেই, এর বাইরে আমরা যেতেই পারছি না। তাহলে অন্ততঃ এটা বলুন, আমি পতিত হিন্দু। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, আপনার ধর্ম কি? বলবেন আমি পতিত হিন্দু, গর্ব করে বলতে যাবেন না যে আমি হিন্দু। ধর্মের যে একটি মূল কথা, সেটাতেই এক বিন্দু বিশ্বাস নেই, কিসের হিন্দু আপনি? স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, I do not consider a Hindu a Hindu, if he is not spiritual। ধর্মের কথা যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, আপনি কিসের হিন্দু? প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্তের শেষ কথা সন্ন্যাস, সন্ন্যাসের যে আদর্শ, সন্ন্যাস জীবন যেটা, এটাই প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত।

আমাদের ঋষিরা চারটে আশ্রম ঠিক করে দিলেন – ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ব্রহ্মচর্য আশ্রমে তুমি শিখবে বেদান্ত জিনিসটা কি, গার্হস্থে কর্মযোগের মাধ্যমে তুমি নিজেকে গড়ে তুলবে, বাণপ্রস্থে চিন্তন করে করে তোমার মনকে বেদান্তের ভাবে দৃঢ় করবে আর সন্ন্যাস আশ্রমে শুধু এই চেষ্টাই থাকবে যাতে চব্বিশ ঘন্টা বেদান্তের অনুশীলন করতে পার এবং ওই জ্ঞান প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে এই জীবনেই যেন মুক্ত হয়ে যেতে পার। হিন্দুরা মৃত্যুর পর মুক্তির কথা কখনই বলে না, হিন্দুরা বলে *ইহৈব তৈর্জিতঃ*, এখানে এই শরীরে তোমাকে মুক্তি পেতে হবে। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রত্যেকটি শ্লোক শুধু এই কথা বলছে – প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত।

ইদানিং সবাই বলে আমি অদ্বৈত বেদান্ত জানতে চাই। কোন ছোটবেলা থেকে আমরা বেদান্তের কথা শুনে শুনে বড় হয়েছি, কিন্তু প্রতিদিনের জীবনে বেদান্তকে নামাতে গিয়ে আমরা কোথায় ছিটকে বেরিয়ে যাই। হিন্দুদের আজ এই দুরবস্থার মূল কারণ এটাই, এত বড় যে একটা আধ্যাত্মিক সত্য, যে সত্য বিশ্বের অন্য কোন ধর্মে নেই; সেই সত্যকে আমরা জীবনে নামাতে পারছি না। এই বিদ্যা আমরা পরম্পরায় পেয়েছি। আমাদের ঋষিরা তখনকার সমাজে কত হাজার বছর

এগিয়ে ছিলেন কল্পনা করা যায় না। ব্যাসদেব পুরো সেই জিনিসটাকে গুছিয়ে গীতায় রাখলেন, this is practical Vedant। তার মধ্যে আবার এই পঞ্চম অধ্যায়ে practical Vedantaকে পুরো ঠেসে রেখে দিলেন। প্রথম একটা কি দুটো শ্লোক প্রশ্ন আর তার উত্তর নিয়ে আছে, কিন্তু পরের প্রত্যেকটি শ্লোক জীবনের সর্ব অবস্থায়, প্রতিটি দিন, প্রতি মুহূর্তে কাজে লাগানোর জন্য।

তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্তকে একভাবে এনেছেন, পঞ্চম অধ্যায়ে পুরো ঢেলে রেখে দিচ্ছেন, এখানে কোন ঢাকাঢাকি চাপাচাপির কিছু নেই –এই হল তোমার জীবনের আদর্শ। পঞ্চম অধ্যায় হল হিন্দুদের জীবনের আদর্শ। পঞ্চম অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে এটাই তোমার জন্য শেষ কথা, এটাই তোমাকে সারা জীবন কঠোর ভাবে অনুশীলন করে যেতে হবে। দিনে তুমি এর কথা ভাববে, রাত্রে তুমি এটাকে নিয়ে ভাববে, এটাকে নিয়ে তুমি চিন্তন কর, চিন্তন আর অনুশীলন করে এটার সঙ্গে তুমি এক হয়ে যাও। এটাই হবে তোমার ধর্ম জীবন। যদি এটা না করতে পারো, সারা জীবন তোমাকে কাঁদতে হবে। এখনও তো কাঁদছ, করোনা নিয়ে কাঁদছ, ঘরবন্দী হয়ে কাঁদছ, রোগ-শোকে কাঁদছ, অজানা ভয়-ভীতিতে কাঁদছ। কেন তোমাদের জীবনে এত কান্না, কারণ যে আধ্যাত্মিক সত্য আমাদের পূর্বজরা দিয়ে গেছেন, সেই সত্য থেকে তোমরা এত বেশি পিছিয়ে আছ যে, তোমরা কিছুই ধরতে পারছ না। তোমাদের পূর্বজরা কত তপস্যা, কত সংগ্রাম করে এই সত্যগুলিকে ধরলেন, ধরে আমাদের সামনে রেখে দিয়ে গেলেন যাতে আমরাও এই সত্যকে ধরতে পারি। কিন্তু আমরা ধরব না।

অহং ব্রহ্মাস্মি এই সত্যকে দৈনন্দিন জীবনে কিভাবে নামানো যেতে পারে? এই ভাবনাটা দেশ ও কাল থেকে অনেক অনেক বেশি এগিয়ে। ব্যাসদেব জীবনের এই আদর্শকে গীতাতে সাজিয়ে দিয়ে গেলেন, শঙ্করাচার্য এর উপর ব্যাখ্যা দিয়ে গেলেন, স্বামীজী লেকচারের মাধ্যমে এটাকে আরও যুগোপযুগি করে আমাদের সামনে রেখে দিলেন। স্বামীজীকে এক জায়গায় একজন বলছেন, স্বামীজী আপনি যে বিদেশে ওদের বেদান্তের কথা বলছেন ওরা বেদান্তের কি বুঝবে! স্বামীজী বলছেন, ওরা আরও ভাল বুঝবে। কারণ ওদের শক্তি আছে, ভারতে শক্তি কোথায়, তমোগুণী সব। ঠাকুর বলছেন, ও দেশে লোকেরা গরু কিনতে গেলে গরুর লেজে হাত দেয়, গরু যদি শুয়ে পড়ে ওই গরু তারা কেনে না। আমরা হলাম ওই রকম, লেজে হাত দিলেই শুয়ে পড়া গরু। তিড়িং বিড়িং করে লাফানোর জন্য শক্তি দরকার, সেই শক্তিটাও আমাদের নেই।

আমরা সন্ন্যাস বলতে কি মনে করি? সন্ন্যাস মানে মাথা কামিয়ে গেরুয়া পরে ঘুরে বেড়ানো, সন্ন্যাস মানে লোকেদের উপদেশ দেওয়া, সন্ন্যাস মানে নিরামিষ খাওয়া। আর যারা কোন কিছু পারে না, কোথায় কিছু সুযোগ পায় না, তারা সন্ন্যাসী হয়ে যায়। তার সাথে মনে করা, সন্ন্যাসীরা হল সমাজের প্যারাসাইটস আর এই সব কিছুর ঊর্ধ্বে আর-একটা বড় বিশেষণ হল, সন্ন্যাসী মানেই ঢপবাজ। অথচ অবাক লাগে যে, হিন্দু জীবনধারাই হল সন্ন্যাসের জীবনধারা। গীতার পঞ্চম অধ্যায় দেখিয়ে দিচ্ছেন সন্ন্যাস মানে কি। যখন বলছেন *অহং ব্রহ্মাস্মি*, তার মানে তুমি সত্যিকারের জেনে গেলে যে তুমি ঈশ্বরের সাথে এক। এখানে কল্পনার কিছু নেই, সত্যিকারের যখন তুমি জেনে গেলে তুমিই সেই শুদ্ধ চৈতন্য, যাঁর ভিতরে সমস্ত জ্ঞান রয়েছে, সমস্ত শক্তি রয়েছে আর যাঁর ভিতর থেকে সব কিছু বেরিয়েছে। বাঘ, সিংহ, সাপ, বিছে বেরিয়েছে; সেই একই জায়গা থেকে গান্ধীজী, নাথুরাম, যীশু, ল্যাজারাস সবাই বেরিয়েছে, জগতের সমস্ত শুভ জিনিস, সমস্ত অশুভ জিনিস তোমার ভিতর থেকেই বেরিয়েছে; কারণ তুমি ছাড়া তো এখানে আর কেউ নেই; এই জ্ঞান যাঁর হয়ে যাবে, তখন তাঁর মধ্যে কিসের অপূর্ণতা থাকবে, কিসের জন্য সে কাজ করবে; কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ কিছুই তাঁর থাকবে না। এই অবস্থাকেই বলে সন্ন্যাস। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই অবস্থাকেই বলেছেন স্থিতপ্রজ্ঞ। যদিও এটা জীবনের আদর্শ, যে কোন মানুষ এই পথে যেতে পারে, কিন্তু সবাই পারে না; মুষ্টিমেয় কয়েকজনই সন্ন্যাসের পথে আসেন।

এটাই দুর্ভাগ্য যে, যারা এখনও প্রস্তুত নয়, যারা এখনও শারীরিক ও মানসিক ভাবে প্রস্তুত হয়নি, যাদের কথা তৃতীয় অধ্যায়ে বললেন, *য আস্তে মনসা স্মরণ,* মনে মনে ভোগ করতে চাইছে, কিন্তু বাইরে নিজেকে গুটিয়ে রেখে ঢপবাজি করে যাচ্ছে, এদের সংখ্যাই সমাজে বেশি। বাইরে নিজেকে কেন গুটিয়ে রেখেছে? কারণ তারা জানে যে সন্ন্যাসের একটা বিরাট সম্মান আছে, সন্ন্যাসের ভাব দেখাতে পারলে আমিও সম্মান পাব। যার বিদ্যা আছে সে সম্মান পায়, বিদেশের ডিগ্রি যার আছে সে সম্মান পায়, ঠিক তেমনি বেদান্তের শেষ অবস্থায় যিনি পৌঁছে গেছেন তাঁর অবশ্যই একটা সম্মান থাকবে। আর যেখানে আসল আছে, সেখানে নকল থাকবে। কিছু দিন আগে জানা গেল, দু হাজার টাকার নোটের নকল বেশি হচ্ছে, কারণ দু হাজার টাকার দাম অনেক বেশি। নকল যদি করতেই হয়, একশ টাকার নকল কেন করতে যাব, দু হাজার টাকার নোটই নকল করব। নকল যদি করতেই হয় সন্ন্যাসের নকলই করব, তাই ঢপ সন্ন্যাসী কিছু থাকবেই। ঢপ সন্ন্যাসী কিছু থাকার জন্য সন্ন্যাসীকুলের দুর্নাম হয়ে গেছে যে, সন্ন্যাসী মানেই ঢপ। কিন্তু যত দুর্নামই হোক, এটাই জীবনের আদর্শ। গীতা বলছেন, এটাই তোমার জীবনের আদর্শ, এটাই তোমার জন্য স্বাভাবিক।

কিন্তু তুমি যদি না পার, তাহলে এর থেকে এক ধাপ নীচে যেটা, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আপন জ্ঞান করার চেষ্টা কর। কিভাবে করবে? এর জন্য বলছেন নিষ্কাম কর্মযোগ। নিষ্কাম কর্মযোগে তোমার উপর যে দায়ীত্ব এসে গেছে, নিঃস্বার্থ ভাবে আমার এটা কর্তব্য তাই আমি করে দিলাম। যেভাবে রোজ সকালে উঠে আমরা দাঁত ব্রাশ করি, স্নান করি, জানি এটা আমার কর্তব্য, এটাই আমাকে করতে হবে, এই ভাব নিয়ে যখন সব কাজ করা হয়, সেটাই তখন নিষ্কাম কর্মযোগ হয়ে যায়। মায়েরা বাড়িতে কত নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন, সকালে উঠে বিছানা তুলছেন, চাদর, বালিশ সব সাজিয়ে রেখে ঝাঁটা দিয়ে বিছানা পরিষ্কার করছেন, তারপর রান্নাঘরে গিয়ে রান্নার আয়োজন করেন, এখানে কোন চাহিদা নেই, কোন প্রত্যাশা নেই। ঠিক তেমনি সমস্ত কর্ম এই মানসিকতাকে নিয়ে করতে হবে, আমার এটা কর্তব্য তাই করছি। আমি চাকরি করছি, চাকরি করে দুটো টাকা পাচ্ছি, এই টাকায় আমার ঘর সংসার চলছে, আমার দেহ চলছে, সবচেয়ে বড় হল আমার জীবনের যে উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যকে এটা দিয়ে পূরণ করতে পারছি।

দেওঘর বিদ্যাপীঠে আমার এক ছাত্র ছিল, খুব ইন্টেলিজেন্ট, জিআরই পরীক্ষায় চব্বিশ নম্বরে চব্বিশ পেয়েছিল। ভারত যবে থেকে স্বাধীন হয়েছে, তারপর থেকে সে হল দ্বিতীয় ভারতীয় যে চব্বিশ নম্বরে চব্বিশ পেয়েছে। দিল্লী গেলে ছেলেটি পুরো সময় আমার সঙ্গে থাকত। সেই সময় উপমন্যু চ্যাটার্জী আইএএস হয়ে ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের ডিরেক্টর পদে ছিলেন, অন্য দিকে তিনি আবার একজন খুব নামকরা ইংরাজী সাহিত্যের লেখক। কাজে কর্মে তাঁর সাথে আমাকে দেখা করতে যেতে হত, এমনিতেও ওনার সাথে আমার কলেজ লাইফ থেকেই পরিচয়, কলেজে আমরা এক সঙ্গে ছিলাম, ভাল বন্ধু।

একবার এই ছেলেটিকে নিয়ে আমি উপমন্যু চ্যাটার্জীর সাথে দেখা করতে গেছি। ছেলেটি খুব বুদ্ধিমান, ওনার সাথে দেখা করে বেরিয়ে এসে আমাকে বলছে, 'আমি যত আইএএস অফিসার দেখেছি উনি হলেন সব থেকে ব্যালেন্সড লোক। কিন্তু এই ভদ্রলোক এখানে বসে কি করছেন, এটা ওনার জন্য নয়'। আমি ওকে বললাম, 'তুমি গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসো, পরিচয় তো হয়েই গেছে'। আবার আমার সাথে উপমন্যু চ্যাটার্জীর চেম্বারে গেল। ঢুকে বলছে, 'Sir you do not belong here, আপনার জন্য এটা না, আপনি এখানে কেন আছেন'? উপমন্যু চ্যাটার্জী সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'পেটের জন্য'। আমি তখন বাইরে ছিলাম, ছেলেটি শুনে অবাক হয়ে বেরিয়ে এসেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি বলল'? বললেন, 'পেটের জন্য'। আমি বললাম, 'এটাই ঠিক উত্তর'।

উপমন্যু চ্যাটার্জী আমাকে বলেছিলেন, লেখাটা আমার সাধনা। আমাদের জীবনে কি কিছু আছে যে বলতে পারব, এই জিনিসটা আমার সাধনা? কিছুই নেই। উপমন্যু চ্যাটার্জী জানেন তিনি আসলে লেখক, কিন্তু তাঁকে তো পেটটা চালাতে হবে। ভারতে এখন আর আগেকার দিন নেই যে ব্রাক্ষ্মণরা পেট চালাবার জন্য এখানে সেখানে গিয়ে ভিক্ষা চাইবেন, ভিক্ষা না পেলে নিজেও অভুক্ত থাকবেন, নিজের সন্তানকেও অভুক্ত রাখবেন, সাথে তাঁর স্ত্রীও অভুক্ত থাকবেন। এখন একটা চাকরি চাই। আইএএস হয়েছেন, যতটুকু কাজ ততটুকু করে দেন, ফাঁকা সময়, ছুটিতে নিজের লেখার সাধনা করে যান। আজকে তাঁকে ভারতে ইংরাজী সাহিত্যিকদের প্রথম সারিতে গণ্য করা হয়। এই হচ্ছে জীবনে একটা উদ্দেশ্যকে নিয়ে চলা। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি বা যে ইয়ং ছেলেরা চারিদিকে দৌড়ে বেড়াচ্ছে এদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? কিছুই জানে না, কোথায় দৌড়াচ্ছে, কোথায় থামছে, কিছুই জানে না। কুকুরের লেজে যদি কেউ স্পিরিট বা পেট্রল লাগিয়ে দেয়, দেওয়ার ফলে ওর লেজে ঠাণ্ডা লাগে তাতে ভয়ের চোটে কুকুরটা দৌড়াতে থাকে, ভাবে কি হয়ে গেল রে ভাই। কুকুরটা দৌড়াতেই থাকে, হাওয়া লাগার জন্য আরও ঠাণ্ডা বেশি লাগে, ভয়ে আরও জোরে দৌড়াতে থাকে। কেউ জানে না, কোথায় দৌড়ে পালাতে চাইছে। পুরো মানবজাতি আজ এভাবে দৌড়াচ্ছে।

হনুমানজীর লেজে এখন আগুন লেগে আছে। হনুমানজী এখন লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন, লঙ্কা পুড়িয়ে যাচ্ছেন। আমরাও আমাদের চারিদিকে যে লঙ্কা রয়েছে পুড়িয়ে বেড়াচ্ছি, আমাদের জীবনে কোন আদর্শ নেই, উদ্দেশ্য নেই। যে মুহুর্তে জীবনে একটা আদর্শ নিয়ে নেবে, যে কোন আদর্শ, এই আদর্শই একদিন তাকে *অহং ব্রক্ষ্মাস্মি*র দিকে নিয়ে যাবে। তখন এটা বুঝতে পারবে, আমি যে কাজই করছি, চাকরি করি বা ব্যবসা করি, এটা আমি করছি আমার ঘর সংসার চালানোর জন্য। গীতা এটাই বলছেন, তোমার উদ্দেশ্য হল *অহং ব্রক্ষ্মাস্মি* এই জ্ঞানের সঙ্গে এক হওয়া। যতক্ষণ এর সাথে এক হতে না পারছ, ততক্ষণ নিষ্কাম ভাবে কর্তব্য কর্ম করে যাও, অর্থাৎ অন্য কোন ধরণের স্বার্থ তার মধ্যে থাকবে না। আমি এই কাজ করছি, কাজ করে যে কটা টাকা পাব তাই দিয়ে আমার ঘর সংসার চালাবো, আমি এটার দায়ীত্ব নিয়েছি, তাই এর দায়ীত্ব পালন করছি। আপনার সন্তান হয়েছে, ভগবান আপনাকে একটা উপহার দিলেন। কেন নিজেকে তার সাথে জুড়ে দিচ্ছেন? জুড়বেন না, কষ্ট পাবেন। এই ভাবেই আমরা পাঁচজনের সাথে জুড়ে যাই, আর সেখান থেকে কষ্ট নিতেই থাকি।

হিন্দু জীবনে এটা কখনই আদর্শ না, হিন্দু জীবনে কখন এর অনুমতি দেয় না। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে শুরু করে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত শুধু এই দুটো জিনিস –একটা হল সন্ন্যাস, এটা হল আদর্শ; দ্বিতীয় হল, যারা সমস্ত ত্যাগ পারবেন না, তাদের জন্য কর্মফল ত্যাগ। কর্মফল ত্যাগ মানে ফলের প্রতি আসক্তি না থাকা। প্রথম হল কর্মত্যাগ, মানে সন্ন্যাসী, প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্তের শেষ কথা; দ্বিতীয় এটা যদি না পারো তাহলে কর্মফল ত্যাগ। সমগ্র গীতাতে এই দুটো জিনিসই বিভিন্ন ভাবে ঘুরে ঘুরে আসতে থাকে। আর এর ফল কি হয়, এটাই আমরা গীতাতে দেখে যাচ্ছি।

পঞ্চম অধ্যায় পড়ার সময় মনে হবে, কি সুন্দর সুন্দর আদর্শ, কিন্তু জীবনে লাগানো যাবে না। ঠাকুর যদি না আসতেন, স্বামীজী না আসতেন, শ্রীশ্রীমা যদি না আসতেন, নিজের জীবনে এনারা যদি না দেখাতেন, তাহলে আমাদের এটাই মনে হত যে, গীতার এই কথাগুলো সত্যিই খুব সুন্দর সুন্দর কথা, কিন্তু আজকালকার দিনে এসব কথা চলে না। কিন্তু পুরো বিপরীত, গীতা, বেদান্ত আজকের দিনেই চলবে, কারণ সমাজ এখন অনেক এগিয়ে এসেছে। পাঁচ হাজার বছর আগে এই কথা যত লোক বুঝতে পারতেন, আজকের দিনে তার থেকে অনেক বেশি লোকের বোঝার ক্ষমতা হয়ে গেছে। এই অধ্যায়ের আলোচনা শুরু করার আগে খুব সংক্ষেপে এই দুটি কথা জেনে রাখা দরকার – সন্ন্যাস নেবে তাঁরাই, যাঁদের এই বোধটা এসে গেছে আর সেখান থেকে আত্মজ্ঞানও হয়ে গেছে যে, আত্মাই একমাত্র সত্য; কিন্তু যাঁদের এই বোধ হয়নি, আমাদের মত লোক যাঁরা, তাঁরা কাজ করবেন, কাজ করার সময় ফলের প্রতি তাঁর অনাসক্তি থাকবে।

পঞ্চম অধ্যায়ের ভূমিকাতে আচার্য শুরু করতে গিয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় থেকে অনেকগুলো শ্লোক উল্লেখ করছেন, যেমন *কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ, স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ, জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণম্, শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্, যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ, ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ, জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি,* এই শ্লোকগুলিতে বোঝাচ্ছেন, যাঁরা আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের কোন কর্ম থাকে না। যেটা আমরা সন্ন্যাসের আদর্শের কথাতে বললাম, এটাই ঠিক ঠিক হিন্দুদের আদর্শ। হিন্দুদের একমাত্র আদর্শ হল সন্ন্যাস। হিন্দুদের একমাত্র আদর্শ হল বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। হিন্দুদের একমাত্র আদর্শ তুমি ঈশ্বরের সাথে এক। যত দিন এই অবস্থায় আপনি না যেতে পারছেন, তত দিন আপনি নিজেকে ঈশ্বরের সন্তান মনে করুন, ঈশ্বরের সেবক মনে করুন, বা অন্য যাই মনে করুন, কিন্তু এই সত্যটাকে সব সময় মাথায় রাখতে হবে। অবতাররা যখন আসেন তখন তাঁরা এর শিক্ষাই দেন। অবতার একটা শিক্ষাই দেন, তুমি সেই ব্রহ্ম।

কিন্তু তার সাথে ভগবান অর্জুনকে বলছেন, *ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠ,* ওঠো, যোগে প্রতিষ্ঠিত হও। কিন্তু দুটো পরস্পর বিরোধী হয়ে যাচ্ছে না? তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতে অর্জুন সেই একই প্রশ্ন করেছিলেন। এখানে মিলছে না তো। দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরে যে প্রশ্ন জেগেছিল, চতুর্থ অধ্যায়ের পর অর্জুনের মনে সেই একই প্রশ্ন জেগেছে। আপনি যে এগুলো বলছেন, একটু বলুন তো এই দুটোর মধ্যে কোনটা ভাল? তার মানে অর্জুন জানতে চাইছেন, সন্ন্যাস ভাল, নাকি কাজ করা ভাল? এটাকে আচার্য এখানে খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করছেন।

আগে আচার্য যেটা বলেছিলেন সেখানে অন্যান্য দর্শনকে আটকানোর জন্য তাঁকে বলতে হয়েছিল। যাঁদের আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার ঠিকই, কিন্তু আমরা যদি আমাদের দৃষ্টিতে দেখি যে শ্রীরামকৃষ্ণ একজন আত্মজ্ঞানী, বা এই ধরণের আরও যাঁরা ছিলেন, যেমন ত্রৈলঙ্গ স্বামী ছিলেন, যিনি একত্ব দেখে নিয়েছেন তাঁদের আর কিসের কর্তব্য! সামনে দেখলেন কেউ কষ্টে আছে, তার কষ্টটা দূর করে দিলেন, এই যা। আবার তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান জনকাদির কথা বললেন, তাঁরা লোকসংগ্রহের জন্য কাজ করেছেন। যেমন স্বামীজী, তাঁর আত্মজ্ঞান ছিল, কিন্তু মানুষের মঙ্গলের জন্য তিনি উপদেশ দিচ্ছেন, শিক্ষা দিচ্ছেন আর দেশের কি করে ভাল হয়, সেটার ব্যবস্থা করলেন। এনারা হলেন আচার্য, অবতার আচার্যের মাধ্যমে মানবজাতিকে শিক্ষা দেন। অবতার যে উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন, আচার্য সেটারই প্রচার প্রসার করেন।

প্রথমের দিকে আমরা আচার্যের যে কথা নিয়ে আলোচনা করছিলাম, আচার্য সেখানে বলছেন, উত্তম শিষ্য পেলে শিক্ষার প্রসার হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মধ্যে সেই উত্তম শিষ্য পেয়েছিলেন। আচার্য যাঁরা, অবতারের সঙ্গে যাঁরা আসেন, তাঁদের ভিতর একটা শক্তি থাকে, ফলে অবতারের কথাগুলোকে তিনি যুগোপযুগী করে এবং সামাজিক অবস্থাটাকে মাথায় রেখে, অবতারের শিক্ষাকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে যান। অবতার ও অবতারের সঙ্গী যাঁরা, এই শ্রেনীটাকে ছেড়ে রাখতে হয়। এনাদের বাইরে আমরা দুই শ্রেণীর মানুষ পাই, যেমন ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মত যাঁরা ছিলেন, বা যাঁরা আরও উচ্চতর, তাঁরা দেখেন, ঈশ্বর বৈ কিছু নেই, আমার আর কিছু লাগবে না, আর কারুর প্রতি আমার কোন কর্তব্য নেই, এনারা সবাই খুব উন্নতমানের মহাত্মা। ওনারা নিজের জন্যও কিছু চেষ্টা করেন না, অপরের জন্যও বেশি কিছু করতে যান না। যেটা চোখে পড়ে গেল, সেটা করে দিয়ে বেরিয়ে যান। এনাদের বাইরে বাকি যাঁরা আছেন, তাঁদের সবাইকে কর্ম করতে হয়, খাটতে হয়।

কিন্তু গুরু বা আচার্যকে দেখে অনেক সময় তাঁর শিষ্যরাও কাজ করা ছেড়ে দেন। অনেকে এসে আমাদের বলেন, আমি সন্ন্যাস নিতে চাই। সন্ন্যাস কেন নিতে চাইছে? হয় গ্ল্যামার আছে বলে, নয়তো তার জীবনে অনেক হতাশা আছে বলে। বেশির ভাগ লোক সন্ন্যাস নিতে চায় এই দুটো কারণে। কিন্তু যার জীবনের সব কিছু ভাল চলছে, সব ঠিকঠাক আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলছে, আমি

আমার আন্তরিক উত্থান চাই, আমি ভিতর থেকে বড় হতে চাই; এই ধরণের যাঁরা সন্ন্যাস জীবন বেছে নিতে চাইছেন, তাঁদের সংখ্যা খুব কম। গীতা এখানে এটাই বলছেন, যাদের আধ্যাত্মিক বুদ্ধি এখনও পরিপক্ক হয়নি, তারাও সন্ন্যাস নিতে পারে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এদের জন্য এটা মঙ্গলদায়ক না, এদের জন্য এখন কাজ করাটাই মঙ্গল। আচার্য তাঁর ভূমিকাতে এটাকে নিয়েই বলছেন, আর এখান থেকেই অর্জুনের প্রশ্ন দিয়ে শুরু হয় এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক।

অর্জুন উবাচ
সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্।।১।।

(অর্জুন জিজ্ঞেস করলেন – হে কৃষ্ণ, আপনি শাস্ত্রীয় কর্মের ত্যাগ আবার শাস্ত্রীয় কর্মের অনুষ্ঠান করতে বলছেন। এই দুটোর মধ্যে যেটা প্রকৃতপক্ষে মোক্ষদায়ক সেটা আমাকে নিশ্চয় করে বলুন।)

হে কৃষ্ণ, আপনি কখন কর্মসন্ন্যাসের প্রশংসা করছেন, আবার কখন কর্মযোগের প্রশংসা করছেন, যেমন আচার্য কিছু শ্লোক উল্লেখ করছেন, একবার বলছেন *ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ*, সন্ন্যাসের কথা বললেন, আবার সেখান থেকে বলছেন *ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠ*, অর্জুন তুমি ওঠো, যোগে প্রতিষ্ঠিত হও। *যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং*, এই দুটোর মধ্যে যেটা বেশি ভাল, *তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্*, সেটা নিশ্চিত করে আমাকে বলুন। হে প্রভু, আপনার কথা শুনে আমার ভিতরটা পুরো সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে গেছে, আমাকে সুনিশ্চিত করে বলে দিন তো আমাকে কি করতে হবে। এই ধরণের সংশয় সবারই হয়। অনেক সময় যাঁরা জ্ঞানীগুণী, তাঁদের কাছে গেলে তাঁরা অনেক কিছু কথা যখন বললে, যে কথাগুলো শুনে আমাদের সব কিছু গুলিয়ে যায়। বেলুড় মঠে স্বামীজীর একটা ঘটনা আছে।

একজন বয়স্ক মানুষ এসে একদিন স্বামীজীকে বলছেন, 'স্বামীজী আমি ধর্মকর্ম সেরকম কিছু করি না, তবে আমি রোজ গঙ্গাস্নান করি, আর মনে করি গঙ্গাস্নান আদি করলেই আমার সব হবে'। স্বামীজী বললেন, 'গঙ্গাস্নান করে কিছু হয় না, ওই দিয়ে ধর্মটর্ম হয় না, সাধনা করুন'। কিছুক্ষণ পরে এমনই কপাল যে, একজন যুবক এসে স্বামীজীকে বলছে, 'আমি এই গঙ্গাস্নান আদি এসব মানি না, ওতে কিছু হয় না, এগুলো বেকার'। স্বামীজী সেই যুবককে বলছেন, 'না না, গঙ্গাস্নান অবশ্যই করা উচিত, রোজ গঙ্গাস্নান করবে, এতেই সব ধর্মকর্ম হবে'। ওখানে একজন ছিল, যুবকটি চলে যাওয়ার পর সে বলছে, 'স্বামীজী আপনি দুজনকে পুরো বিপরীত কথা বললেন, আপনি একটু ঠিক করে বলুন তো কোনটা ঠিক'? স্বামীজী হেসে বলছেন, 'আমি আচার্য, যার যেটা দরকার তাকে আমি তার মত বলি। তোমার কি দরকার বল'।

ঘটনাটা প্রথম যখন একজন মহারাজের কাছে শুনেছিলাম তখন আমার এত সুন্দর লেগেছিল যে কি বলব। এই হলেন আচার্য। আচার্য পুরো চিত্রটা নেন, পুরো চিত্রটাই তাঁর কাছে থাকার জন্য একে এক রকম বলবেন, এক রকম ভালবাসবেন; আর তাকে আর-এক রকম বলবেন, আর-এক রকম ভালবাসবেন। কোন আচার্য সবার প্রতি সমান হবেন না। এমনকি দ্রোণাচার্য, যিনি ধনুর্বেদের আচার্য, তাঁর কাছেও সব শিষ্য সমান ছিল না, আচার্য কখন সব শিষ্যকে সমান ভাবে শিক্ষা দেন না, দিতেই পারেন না। যার যেমন দরকার আচার্য তাকে তেমনটা দেন। যার যেখানে ছিদ্র আছে, যেখানে দুর্বলতা আছে, আচার্য সেটাকে ঠিক করে এগিয়ে দেন। আচার্যের অন্তর্দৃষ্টি এত গভীর যে, শিষ্য দুটো কথা বললেই বুঝে যান এর কি লাগবে।

আচার্য এখানে বলছেন, *প্রশস্যতরং চ অনুষ্ঠেয়ম্*, যেটা শ্রেষ্ঠ মানুষ সেটাই করতে চায়। বাজারে গেলে প্রথমেই দোকানদারকে বলি, ভাল থেকে দেবেন। কারণ খারাপ জিনিস কেউ নিতে চায় না। বাড়িতে যখন মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কথা ওঠে, তখন বলে, ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দিতে

হবে। সব কিছুতেই আমরা ভালটা খুঁজি। জীবনের আদর্শ যখন আসে, সেখানেও আমরা ভালটাই বাছতে চাই, অর্জুনও তাই বলছেন। অর্জুনকে আগে বললেন, তুমি যুদ্ধ কর, তারপর হঠাৎ সন্ন্যাসের কথা বলতে শুরু করে দিলেন, সেখান থেকে আবার বলছেন, তুমি ওঠো, উঠে যুদ্ধ কর। কারণ একই মানুষ এক সঙ্গে দুটো জিনিস করতে পারে না। একই সঙ্গে কর্মযোগও করব আবার কর্মসন্ন্যাসও করব, তা হয় না। একই সঙ্গে হাসব আবার কাঁদব, দুটো জিনিস একসাথে হয় না। ঠিক তেমনি কর্মে সন্ন্যাস আর কর্ম করব, দুটো এক সঙ্গে হতে পারে না। তাহলে আপনি বলুন আমার জন্য কোনটা ঠিক। কর্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগ নিয়ে অর্জুনের মনে একটা সংশয় এসেছে। এই সংশয়ের নিরসন করার জন্য ভগবান এবার অর্জুনকে বলতে শুরু করলেন।

শ্রীভগবানুবাচ
সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগ বিশিষ্যতে।।২।।

(উত্তরে ভগবান বললেন – কর্মের ত্যাগ ও কর্মের অনুষ্ঠান উভয়ই মুক্তিমার্গ; কিন্তু তাদের মধ্যে জ্ঞানহীন কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ।)

ভগবান বলছেন, কর্মসন্ন্যাস থেকে কর্মযোগ অনেক ভাল। এই কথা কিন্তু ভগবান যারা জ্ঞানী তাদের সম্বন্ধে বলছেন না, যারা অজ্ঞানী, যাদের এখনও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি হয়নি, তাদের জন্য এই কথা বলছেন। তবে দুটোই আত্মজ্ঞানের দিকে নিয়ে যাবে। সমস্ত কর্মের ত্যাগ যেমন নিঃশ্রেয়সের দিকে নিয়ে যায়, তেমনি কর্মও নিয়ে যায়। সন্ন্যাসীরা যে বাড়িঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন, বাবা-মা, আত্মীয় পরিজনদের ত্যাগ করেছেন, এটাও তঁদের আত্মজ্ঞানের দিকে নিয়ে যাবে। আর যারা সংসারে থেকে গৃহস্থ ধর্ম পালন করছেন, তাঁকেও এই গৃহস্থ ধর্ম নিঃশ্রেয়সের দিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু তার জন্য বিশেষ কিছু করতে হবে, কি করতে হবে, সেটাই এবার আমরা এখানে আলোচনা করব। আচার্য বলছেন, *জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন উভৌ যদ্যপি নিঃশ্রেয়সকরৌ*, জ্ঞানের উৎপত্তির জন্য দুটোই ভাল, কর্মত্যাগ আর কর্ম দুটোই ভাল। তবে যারা অজ্ঞানী তাদের জন্য কর্মযোগ সব সময়ই ভাল। কর্ম করলে কি হয়, কর্ম করলে মনের আবর্জনাগুলি পুড়ে যায়।

এক সময় আমাকে দেওঘর বিদ্যাপীঠের প্রিন্সিপাল পদের দায়ীত্ব সামলাতে হত। তখন আমার বয়স চৌত্রিশ পয়ত্রিশ। আমি কিছু দিন ধরে চাইছিলাম সব কাজ ছেড়ে উত্তরাখণ্ডে তপস্যা করব। একজন সিনিয়র মহারাজ, এখন গত হয়েছেন, খুব জ্ঞানীগুণী ছিলেন, তিনি আমার কথা জানতে পেরে বললেন, ‘যোগশাস্ত্রে যে সত্য, অহিংসা, অস্তেয়, অপরিগ্রহ কথাগুলো বলা হয়েছে, একবার ভেবে দেখ তো সত্য কথা বলা, কাউকে হিংসা না করা, চুরি না করা, উপহার না নেওয়া, এগুলোর অনুশীলন হিমালয়ের গুহায় বসে হবে, নাকি সমাজের মাঝখানে থেকে অনুশীলন হবে? কাজকর্ম যদি নাই কর, পাঁচজনের মধ্যে যদি নাই থাক তাহলে এগুলোর অনুশীলন কোথায় করবে? যে বোবা, তার সত্য কি আর মিথ্যা কি, অন্ধের দিবা কি আর রাত কি’।

আমরা আসলে বুঝতে পারি না, মানতে চাই না যে, আমাদের পুরো মাথাটা আবর্জনায় ভরা। ধাপায় যেমন কলকাতার সমস্ত আবর্জনা পড়ে, আমাদের মাথাটা হল সমস্ত আবর্জনার ধাপা। এই মেন্টাল ডাস্টবিন যদি পরিষ্কার না হয়, কি করে এখানে ফুল ফুটবে! আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ফুল ফোটানর জন্য আগে এই আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। আমাদের মনের ভিতর আগাছা হয়ে আছে, একদিকে আগাছা উপড়ে ফেলছি, অন্য দিকে আগাছার বীজ পড়ছে, আবার আগাছা জন্মাচ্ছে। উপায় হল আগাছাকে পুড়িয়ে দাও, একেবারে বীজ সমেত পুড়িয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। পোড়ানটা হয় – মানুষ যখন কাজ করে, মানুষ যখন অবিশ্রান্ত ভাবে হাড়ভাঙা খাটে। আপনারা দেখবেন বাড়িতে ছেলের বউ আছে, সে শাশুড়িকে সহ্য করতে পারে না, আবার শাশুড়ি পুত্রবধূকে

সহ্য করতে পারে না। এই যে সহ্য হয় না, একটা উপায় বার করতে হবে, যেটা দিয়ে এক অপরকে সহ্য করবে, এটাই মনের আবর্জনাকে পোড়ায়। সত্য কথা বললে অশান্তি লাগবে, মিথ্যা কথা বললে বিবেক দংশন হয়, ফলে ধীরে ধীরে নিজের চরিত্রের পরিবর্তন হয়।

দেওঘর বিদ্যাপীঠে এক ছাত্রকে জানতাম, পরে ছেলেটি নিজের কর্মক্ষেত্রে বিরাট বড় হয়েছে। ওর সাথে একবার দেখা হওয়ার পর ওকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাকে আমি দুষ্টুমি করতে, মিথ্যা কথা বলতে কোন দিন ধরতে পারলাম না'। ছেলেটি ছাত্র অবস্থায় ক্লাশে ফার্স্ট সেকেণ্ডের মধ্যে থাকত। খুব ভাল ছেলে, কক্ষণ দুষ্টুমি করত না, মিথ্যা কথা বলত না। ছেলেটি তখন আমাকে বলল, 'দেখুন মহারাজ, বদমাইশি করতে আমারও খুব ইচ্ছে করত, অন্যরা যা বদমাইশি করে তার থেকে আমি অনেক বেশি বদমাইশি করতে পারতাম, মিথ্যা কথা বলাতে এদের থেকে আমি অনেক পটু। কিন্তু পরে ভাবি, আপনি যখন জিজ্ঞেস করবেন, এটা কি তুমি করেছিলে? তখন আমি সত্যি কথা বলতে পারব না, আবার মিথ্যা কথা বললে বিবেকের দংশন হবে, আপনাকে ভালবাসি কিনা। এই দ্বন্দ্ব থেকে বাঁচার জন্য আমি বদমাইশি করতাম না'। একটা ক্লাশ টেনের ছেলের কি level of matuirity! ওর উত্তরটা শুনে আমি চমকে উঠেছি। আমি নিজেও কখন ভাবিনি যে সত্য এভাবেও অনুশীলন করা যায়।

সত্য বলতে যদি কারুর কষ্ট হয়, তাহলে তার সত্য থেকে দূরে থাকা দরকার। মিথ্যে বললে যদি বিবেক দংশন হয়, তাহলে উপায় কি? নিজে সৎ হয়ে যাওয়া। নিজে সৎ হয়ে গেলে আর মিথ্যে কথা বলতে হবে না। একদিনেই তো সৎ হয়ে যাওয়া যাবে না, লড়াই করতে হবে। ঠাকুর বলছেন, সত্য কলির তপস্যা। সত্য কথা শুধু বলা না, ও জিনিস পারা যায় না, সমাজে চলতে গিয়ে অনেক সঙ্কটের মধ্যে পড়ে যাবেন। আমার আপনার ভিতর হাজারটা দুর্বলতা রয়েছে, সেই দুর্বলতাকে যখন পূরণ করতে যাওয়া হবে, তখন কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে সত্য বলতে পারব না, আবার মিথ্যে বললে মন এমন খুঁত খুঁত করবে যে মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে। উপায় হল, নিজের চরিত্রের পরিবর্তন। যদি কেউ সত্যকে ধরে ধীরে ধীরে সে সৎ হয়ে যায়। সৎ হলেই সে সাত্ত্বিক গুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, সাত্ত্বিক গুণে প্রতিষ্ঠিত হলে আধ্যাত্মিক হতে আর বেশি সময় লাগবে না।

সাধনা হবে কি করে, মনের আবর্জনা যেমন তেমনই; ভিতরে আবর্জনা নিয়ে কি সাধনা করা যায়! নর্মদার তীরেও এক দৃশ্য, হিমালয়ে গঙ্গোত্রিতেও সেই এক দৃশ্য, যেমন আবর্জনা তেমন আবর্জনা নিয়েই সব ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অবশ্য তাঁদের মধ্যেও একজন দুজন মহাপুরুষ আছেন, এনারাই হিন্দু ধর্মকে ধরে রেখেছেন কোন সন্দেহ নেই। আমি একটা সময় উত্তরকাশীতে ছিলাম। ওখানে অনেক কুঠিয়ায়, আখরায় শাস্ত্রপাঠ হয়। দেখতাম বেশ কিছু সাধু অনেক দূর থেকে পাঠ শুনতে আসতেন। একবার আমি একজন সাধুকে এমনি কৌতূহল বশতঃ বললাম, 'অধ্যয়ন আপকা বহুত আচ্ছা লাগতা হ্যায়'। দেখেই বোঝা যায় পড়াশোনা করা না, কিন্তু শাস্ত্র পাঠ শুনতে সব জায়গায় যেতেন। আমার কথা শুনে তিনি খুব সুন্দর কথা বললেন, 'পঠন পাঠন মে রহেঙ্গে তো ভটকন্ সে বাচ জায়েঙ্গে'। পড়াশোনা আর শাস্ত্র আলোচনা নিয়ে যদি থাকা যায় মনের চাঞ্চল্য অবস্থা থেকে বেঁচে যাবে। এই যে আমরা গীতার আলোচনা করছি, যাঁরা আলোচনা শুনছেন, তাতে তাঁর উন্নতি না হতে পারে, এগিয়ে যেতে না পারেন, কিন্তু ওই যে মনের চাঞ্চল্য, কি করব, কি করা যায়, কি করব না, এটা থেকে তাঁরা বেঁচে যাচ্ছেন।

কিন্তু একা যদি একটা গুহায় বা ঘরে বন্ধ হয়ে থাকেন, কোন দিন আপনার গ্রোথ হবে না। নিজের উত্থানের জন্য সঙ্গ দরকার। একটা স্তরে চলে যাওয়ার পর বলা যেতে পারে, একলা চল রে। কিন্তু তার আগে সঙ্গ দরকার। একটা কাগজকে আগুনে ধরিয়ে মেঝেতে ফেলে দেওয়ার পর কাগজের টুকরোটা পুড়তে পুড়তে নিভে যাবে, দেখা যাবে কাগজ পুরোটা পোড়েনি, অল্প একটু

পোড়া বাকি থেকে গেছে। কাগজ, কাঠ, কয়লা পুরোটা পুড়বে না, একটু থেকে যাবে। এগুলোকে আগুনের মধ্যে দিলে পুরোটাই পুড়ে যাবে। কারণ একা যখন থাকে তখন একশ ভাগ পূড়বে না। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, তার মধ্যে দিয়ে দিলে পুরোটাই পুড়ে যাবে। আগুনও যখন নিজের কোম্পানির সাথে থাকে তখন দাউ দাউ করে জ্বলবে, আগুনের পুরো শক্তি বেরিয়ে আসবে। একা হয়ে গেলে আগুনেরও শক্তি কমে যায়। আগুন একা কাগজকে পুরোটা পোড়াতে পারে না।

তাহলে সন্ন্যাসী কে? আমরা এর আগে সন্ন্যাসের উপর লম্বা আলোচনা করলাম, সেখানে বলা হল, সন্ন্যাস হল প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্তের শেষ কথা। প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্তের জীবন্ত আদর্শ হল সন্ন্যাসী, সেইজন্য ভারতবর্ষ সন্ন্যাসীকে দেখলে মাথা নত করে। যে কোন সন্ন্যাসীকে যখন প্রণাম করা হয়, তখন সেই ব্যক্তিকে প্রণাম করা হয় না, সেখানে অজান্তায় প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্তের আদর্শকে প্রণাম করা হয়। বড়দের প্রণাম করা, গুরুজনদের প্রণাম করতে বলা, সেটা আলাদা।

মনুস্মৃতিতে মনু বলছেন, ব্রাহ্মণরা জ্ঞানীদের বেশি সম্মান দেয়, প্রণাম করে; ক্ষত্রিয়রা যার ভিতর বেশি শক্তি ও ক্ষমতা আছে তাকে বেশি সম্মান দেয়; বৈশ্যরা তাদেরই সম্মান দেয় যাদের টাকা বেশি আর শূদ্ররা সম্মান দেয় যাদের বয়স বেশি। যদি দেখা যায়, শুধু বয়স বেশি হওয়ার জন্য কাউকে সম্মান দিচ্ছে, বুঝতে হবে সে শূদ্র। মনু ওখানে সন্ন্যাসীর কথা বলছেন না, আমরা এখানে অন্য ভাবে দেখালাম। সন্ন্যাসী আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, শঙ্করাচার্য মাত্র বত্রিশ বছর পৃথিবীতে ছিলেন, কিন্তু সেই সময় সারা ভারত তাঁকে নতমস্তকে সম্মান জানিয়েছে। স্বামীজী মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সে চিকাগো ধর্মসভায় যে জ্ঞানের ফোয়ারা দেখালেন গোটা বিশ্ব তাঁর সামনে মাথা নত করে সম্মান দিল, এটা দেখাচ্ছে যে আত্মজ্ঞানে বয়স দেখা হয় না। এবার গীতা সেই সন্ন্যাসীর বর্ণনা করছেন। হিন্দু রাষ্ট্র, হিন্দু জাতি, হিন্দু ধর্ম, হিন্দু অধ্যাত্ম, এর সবার যে মুকুট, যেটা মানবজন্মের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি, সেই সন্ন্যাসীর বর্ণনা করে বলছেন –

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে।।৩।।

(যিনি দুঃখ ও দুঃখের সাধনকে দ্বেষ করেন না এবং সুখ ও সুখের সাধনকে আকাঙ্ক্ষা করেন না, সেই রাগদ্বেষাদি শূন্য কর্মযোগীকে নিত্যসন্ন্যাসী বলেই জানবে। কারণ হে মহাবাহো, রাগদ্বেষাদি-দ্বন্দ্বহীন ব্যক্তি সংসারবন্ধন থেকে অনায়াসে মুক্ত হন।)

নিত্যসন্ন্যাসী, মানে পাক্কা সন্ন্যাসী। একশ ভাগ সন্ন্যাসী কে? বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত কে? তার আগে বলতে হয় সন্ন্যাসী দুই প্রকারের, এক যাঁদের আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, এনাদের বলা হয় বিদ্বৎ সন্ন্যাসী। দ্বিতীয় বিবিদীষা সন্ন্যাসী, যিনি আত্মজ্ঞান এখনো পাননি, কিন্তু ভিতরে একটা নিষ্ঠা তৈরী হয়ে গেছে, একটা স্থির বিশ্বাস হয়ে গেছে এবং ঐ পথে উনি এখন চলতে শুরু করেছেন। আমরা এখনও বিবিদীষা, আমরা এই পথে চলতে শুরু করেছি। কিন্তু সম্মান দুজনকেই দেওয়া হয়। সম্মান কেন দেওয়া হয়? যিনি ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করছেন তিনিও ছাত্র আর যে ক্লাশ টুতে পড়ছে সেও ছাত্র। ছাত্রদের একটা সম্মান থাকে। রেলওয়েজ স্টুডেন্টসদের একটা কনসেশান দেয়, সে তফাৎ করে না যে, আপনি পিএইচডির স্টুডেন্ট নাকি আপনি ক্লাশ টুয়ের স্টুডেন্ট। আর ক্লাশে আপনি টপারে আছেন নাকি বটমে আছেন, রেলওয়েজ এই তফাৎ করে না। ঠিক তেমনি সন্ন্যাসীদের মধ্যে যাঁদের এখনও আত্মজ্ঞান হয়নি তাঁরাও গেরুয়া পরে আর যাঁরা ওই অবস্থায় চলে গেছেন তাঁরাও গেরুয়া পরেন। তবে তাঁরা গেরুয়া না পরতে পারেন; যেমন ঠাকুর গেরুয়া না পরলেও কিছু আসে যায় না। স্বামীজীও বিদেশে যখন ছিলেন, গেরুয়া পরতেন না। আবার ভারতে থাকার সময় সব সময় গেরুয়া পরতেন। নিত্যসন্ন্যাসীর আলোচনায় কাপড় নিয়ে আলোচনা হবে না, আলোচনা হবে মন নিয়ে।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী, তাহলে নিত্যসন্ন্যাসী কে? একশ ভাগ সন্ন্যাসী কে? *যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি*, এই জগতে কোন কিছু নেই যেটা তিনি পেতে চাইছেন আর এই জগতে কোন কিছু নেই যেটার প্রতি তাঁর দ্বেষ আছে। নিত্যসন্ন্যাসী কোন জিনিসকে পাওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগে থাকেন না; আর কোন জিনিসকে ছাড়ার জন্য তিনি উঠেপড়ে আছেন, তাও না – *যৎ আয়াতু তৎ আয়াতু, যৎ প্রয়াতু প্রয়াতু তৎ*; যেটা আসছে আসুক, যেটা চলে যাচ্ছে, যাক। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণে ঠিক এই কথাগুলো বলা হয়েছিল। পুরো জগৎটা তোমার, পুরো জগৎটা তুমি নিজে হয়েছ, এরপর তুমি কাকে চাইবে, কাকে ছাড়বে! সব কিছু তো তুমিই হয়েছ, সব কিছুই তো তোমার; কোন কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যেমন নেই, তেমন কোন কিছু প্রতি দ্বেষ থাকার হেতু সেখান থেকে সরে আসারও কিছু নেই।

নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে, যে মানুষ এই অবস্থায় চলে গেছে তার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব থাকবে না, কোন দ্বৈত ভাব থাকবে না। দ্বৈত না থাকাটা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হওয়া থেকেই চলছে। কোন ধরণের duality নেই, সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ, জীবন-মৃত্যু, ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পূণ্য, শুচি-অশুচি কোন দ্বন্দ্ব নেই। দ্বন্দ্ব ঠিক করে মন, কিন্তু যিনি নিত্যসন্ন্যাসী, তিনি মনের উর্ধ্বে চলে গেছেন, ফলে তাঁর ভিতর কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। দ্বিতীয় অধ্যায়েই ভগবান অর্জুনকে বলছিলেন, অর্জুন তুমি নির্দ্বন্দ্বো হও। নির্দ্বন্দ্বো মানে সব রকম দ্বন্দ্বের পারে। নির্দ্বন্দ্বের একটা হল ভাল ও মন্দ, তিনি ভাল-মন্দ দেখেন না। দাঁড়িপাল্লা যেমন চাল আর ডালের তফাৎ করে না, সোন আর লোহার তফাৎ করে না, দাঁড়িপাল্লা নির্বিকার। আমার কাছে সোনার দাম আছে, দোকানদারের কাছে সোনার দাম আছে, দাঁড়িপাল্লার কাছে সোনাও যা লোহাও তাই। নিত্যসন্ন্যাসীর মন ঠিক এই রকম হয়ে যায়, নির্বিকার। ফলে কি হয়?

সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে, সমস্ত রকম বন্ধন থেকে অনায়াসে মুক্ত হয়ে যান। এখানে বন্ধন মানে জীবন-মৃত্যুর বন্ধন, এই বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। মুক্তি কিভাবে হয়? মানুষ যখন নির্দ্বন্দ্বো হয়ে যায়, তখনই মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। নির্দ্বন্দ্বো মানে ভাল মন্দের আর কোন তফাৎ থাকে না, জীবন-মৃত্যু তাঁর কাছে সমান। জীবন আমাদের কিছু পাওয়ার জন্য সুযোগ করে দেয়, কিন্তু মরে যদি যাই, তাতে হলোটা কি, হবে পরে হবে, একটু দেরী হবে। বেঁচে থাকলে একটু ভাল হত, কিন্তু তাই বলে মৃত্যু এসে গেলে যে একেবারে কেঁদে ভেঙে পড়বে, তা কখনই হবে না। এগুলো শুধু কান দিয়ে শুনলাম আর মুখে বলে গেলাম, এতে কিছু হবে না; অনুশীলন করতে হয়। সেইজন্য বলা হল পঞ্চম অধ্যায় হল প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত, পঞ্চম অধ্যায়ের প্রত্যেকটা জিনিস অনুশীলন সাপেক্ষ।

একজন অফিসে যাবে, খেতে বসেছে। খেতে খেতে মাকে মেজাজ দেখিয়ে বলছে, 'এটা কি রান্না হয়েছে, ডালে নুন নেই, তরকারীটা পুড়ে গেছে'। পিছন থেকে তার গিন্নী খুব গম্ভীর গলায় বলছে, 'মা আজ রান্না করেনি, আমি করেছি'। ভদ্রলোক বলছেন, 'খেতে খেতে ভালই লাগছে'। সঙ্গে সঙ্গে সুর পাল্টে গেল। মায়ের উপর জোর চালাচ্ছিল, গিন্নী বলতেই সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে গেছে। যিনি সন্ন্যাসী, তিনি সুখ-দুঃখের পারে। তাঁকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, মহারাজ রান্নাটা কেমন হয়েছে? তিনি যেটা ঠিক সেটাই বলে দেবেন, বলবেন নুনটা কম হয়েছে। কিন্তু বলার মধ্যে অভিযোগের সুর নেই, একটু হয়ত নুন চেয়ে নেবেন। উচ্ছসিত প্রশংসাতেও তিনি যাবেন না। তিনি যে জড় বুদ্ধির তা না, তিনি যে জানছেন না তা না, তিনি যে পাষাণ হয়ে গেছেন তাও না। বরং অন্যদের থেকে তিনি অনেক বেশি সংবেদনশীল, তাঁর যে কোন বোধ-শোধ নেই তাও না; সব কিছুর বোধ আছে, ভাল-মন্দের বোধ আছে, শীত-উষ্ণের বোধ আছে, সুন্দর-অসুন্দরের বোধ আছে। বরং অন্যদের থেকে অনেক ভাল জানবেন, ভাল বুঝবেন; কারণ মন এখন তাঁর প্রবল অনুভূতি সম্পন্ন হয়ে গেছে। স্বামীজী তাই বলছেন, যে ভাল রান্না করতে পারে না, সে কক্ষণ ধর্ম জীবনে এগোতে

পারে না। অনুভূতি সম্পন্ন মানুষরাই এগুলো পারে, একটু ডান দিক বাম দিক হলেই ধরে নেবেন যে, জিনিসটা ঠিকমত হয়নি। কিন্তু তাঁদের কোন চাহিদা নেই, কোন নালিশ নেই।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্।।৪।।

(অজ্ঞ লোকেরা সাংখ্য ও যোগকে পরস্পর বিরুদ্ধ ও ভিন্ন-ফল-বিশিষ্ট বলে থাকেন; কিন্তু পণ্ডিতগণ তা বলেন না। কারণ উভয়ের ফল এক মোক্ষ। সেইজন্য একটি সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত হলে উভয়ের ফল মোক্ষ লাভ হয়।)

সাংখ্য মানে সাংখ্য দর্শনের কথা বলছেন না, সাংখ্য মানে সম্যক্ জ্ঞান, বর্তমান কালে আমরা যাকে জ্ঞানযোগ বলছি। আর যোগ বলতে বোঝাচ্ছেন যে কোন ধরণের চেষ্টাকে, এখানে ভক্তি করাটাও যোগ, কর্মটাও যোগ আর ধ্যান করাটাও যোগ, যোগ মানেই জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়। সাংখ্য হল সন্ন্যাস আর যোগ হল কর্ম। বলছেন, যাদের বালবুদ্ধি তারাই বলে সাংখ্য আলাদা, যোগ আলাদা। কিন্তু যাঁরা পণ্ডিত, যাঁরা জ্ঞানী, তাঁরা কক্ষণ সাংখ্য আর কর্মকে আলাদা বলেন না।

একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্, একটাতে যদি কেউ অবস্থিত থাকেন, অন্যটার ফলও তিনি পেয়ে যান। পঞ্চম অধ্যায়ের এই চার নম্বর শ্লোকটা খুব interesting এই জন্য যে, বিশেষ করে এর দ্বিতীয় লাইনটা ব্যাখ্যা করা খুব মুশকিল, যদি না কারুর ঠাকুর স্বামীজীর ভাবধারাকে খুব ভাল ভাবে জানা থাকে। ঠাকুর স্বামীজীর যে জীবন, তাঁদের কথাগুলো খুব ভাল ভাবে জানা না থাকলে হিন্দু শাস্ত্রকে বোঝা অসম্ভব। স্বামীজী নিজে বলে গেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সমস্ত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, এটাই ভাষ্য। কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ যদি ভাল ভাবে পড়া থাকে তবেই হিন্দু শাস্ত্র বুঝতে পারবেন, তা নাহলে বুঝতে পারবেন না। হিন্দু শাস্ত্রের অনেক খিটিমিটি আছে, কারণ দেশ ও কাল থেকে হিন্দু শাস্ত্র এত এগিয়ে আর এত গভীর, মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব না।

ইদানিং কালে একটা সম্প্রদায় হয়েছে, এরা দিনরাত ঠাকুর স্বামীজীর নিন্দা করে যাচ্ছে। আমি এদের কথা কিছুই জানতাম না। একজনের কাছ থেকে শুনে এদের একজনের কয়েকটা পয়েন্ট পড়ে আমার হাসতে হাসতে দম বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। এত বোকা বোকা কথা, আর এই নিয়ে একটা সম্প্রদায় দাঁড়িয়েছে! এই যে বলা হয় শুধু খোল করতাল বাজালে বুদ্ধিটা ওই রকম হয়ে যায়, দেখছি সত্যিই তাই।

যাদের কোন বুদ্ধি নেই, কোন ধারণা নেই, এরা কোথা থেকে এই শ্লোকের দ্বিতীয় লাইনের ব্যাখ্যা করবে! *একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্,* যিনি সন্ন্যাসে অবস্থিত তিনি কর্মযোগী হয়ে যান। এর ব্যাখ্যা করার উপায় নেই। স্বামীজীকে আমরা সাক্ষাৎ দেখছি। স্বামীজী ঠাকুরের কৃপায় সমাধিলাভ করেছিলেন, যিনি চেয়েছিলেন, সব সময় নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকতে। ঠাকুর যখন সমাধি থেকে তাঁকে নামিয়ে আনলেন, তিনি কর্মযোগী হয়ে গেলেন। কিভাবে স্বামীজী কাজ করলেন? যেভাবে কর্মযোগীদের কাজ করার কথা–নির্বিকার, নির্দ্বন্দ্বো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীদের সাথে লীলা করছেন, তখনও তিনি কর্মযোগী। অর্জুনকে গীতার উপদেশ যখন দিচ্ছেন, তখনও তিনি কর্মযোগী। কুরুক্ষেত্রের ওই ঘোর যুদ্ধের মাঝখানে রথ পরিচালনা করছেন, তখনও তিনি কর্মযোগী। ঠিক ঠিক কর্মযোগী তাহলে কে হতে পারেন? যিনি সন্ন্যাসী। স্বামীজীও বলছেন, ভগবান বুদ্ধ হলেন শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী, যীশু একজন শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী। কেন বলছেন? ঠিক ঠিক কর্মযোগী যদি হতে হয়, ঠিক ঠিক কর্মযোগ যদি করতে হবে, ঈশ্বরজ্ঞান ছাড়া কর্মযোগ হয় না। ঈশ্বরজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে কর্মযোগী হয়, সেইজন্য কর্মযোগীরা ঈশ্বরজ্ঞান পর্যন্ত পেতে পারেন, যদি ঠিক ঠিক তাঁরা কর্মযোগকে ধরে রাখতে সক্ষম হন।

হিন্দু শাস্ত্রে সাধ্য ও সাধনার মধ্যে কোন তফাৎ থাকে না, পথ আর লক্ষ্যে কোন তফাৎ নেই। ঈশ্বরজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মানুষ যদি ঠিক ঠিক সেবা করতে পারে, যেমন ভগবান বুদ্ধ করলেন, তার মানে ঠিক ঠিক সেবা করলে তার ঈশ্বরদর্শন হবে, কারণ দুটোই এক। আমরা অবাক হয়ে দেখি, অনেক আগে পাশ্চাত্য দর্শনেও এই জিনিসটাকে তাঁরা করেছিলেন। জুল, তাঁর নামে জুল কনস্ট্যান্ট হয়েছে, তিনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন, যেটা থেকে যেটার জন্ম, A থেকে যদি B বেরোয় তাহলে B থেকে A বেরোবে, inter connected যদি থাকে। সেখান থেকে তিনি বললেন, আমরা যদি হাতে হাত ঘষি, হাতের চেটো গরম হয়ে যাবে, এটা প্রমাণ করছে তাপ আর বেগ দুটো related। বেগ থেকে যদি তাপ হয়, তাহলে তাপ থেকে বেগ হবে। এখান থেকে নামকরা ইক্যুয়েশান দিলেন, ক্লাশ সেভেন এইটে পড়ানো হয়, W=JH। J হচ্ছে জুল কনস্ট্যান্ট, Work done = Heat into J। ফিজিক্সেও এটা চলে। দুটোর যদি সম্পর্ক থাকে, তাহলে দুটো কিন্তু আসলে এক। বেদান্তে এই কথা ঘুরে ঘুরে আসে। ঈশ্বরজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে যদি কর্মযোগী হয়, তাহলে যারা কর্মযোগী তারা ঈশ্বরজ্ঞানে যাবে। যাঁরা পাক্কা সন্ন্যাসী, তাঁরা যদি কর্মযোগী হন, তাহলে যাঁরা পাক্কা কর্মযোগী তাঁরা পাক্কা সন্ন্যাসী হবেন, দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

গীতা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বার বার একটা কথা বলে যাচ্ছি, গীতার উদ্দেশ্য হল, এই যে আমরা মানবজীবন পেয়েছি, এই মানবজীবনকে কিভাবে ধন্য করা যাবে, মানবজীবনের যে উদ্দেশ্য সেটার পূর্তি কিভাবে হবে। কথামৃতের পাঠকরা বলবেন, ঠাকুর বলেছেন মানবজীবনের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বর লাভ। ঠিকই বলছেন, কিন্তু সবাই তো সব কিছু ছেড়ে ঈশ্বর লাভের দিকে যেতে পারে না। সন্ন্যাসীরা সব কিছু ছেড়ে এসেছেন, আবার অনেকে কখন নর্মদার তীরে, কখন হিমালয়ে কত তপস্যা করছেন, কিন্তু ঈশ্বর লাভ হয়ে ওঠে না। ইচ্ছে থাকলেও সেই শক্তি নেই যে, এগিয়ে চলে যাবেন। পুরো জিনিসটার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, হিন্দু ধর্মের যে পরম্পরা, তাতে এনারা দুটো পথ করে দিলেন – এক হল ঈশ্বরের জন্য সমস্ত কিছু ত্যাগ আর দুই হল কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের দিকে এগোনো।

কথামৃতেও এই জিনিসটা ঘুরে ঘুরে আসে। যেমন ঠাকুর বলছেন, বড়লোকের বাড়ির দাসীর মত থাকবে; সে বাড়ির সমস্ত কাজ করে, মালিকের বাচ্চাকে এমন ভাবে আদর যত্ন করে যে মনে হয় তার নিজের সন্তান, কিন্তু সে জানে আমার যে আসল সন্তান সে দেশের বাড়িতে আছে। আমরা যদি একটু গভীর ভাবে নিজেদের দিকে তাকাই, তখন দেখতে পাই ঘুরে ফিরে আমাদের মন সারাটা দিন, সারাটা মাস, সারাটা জীবন আহার, নিদ্রা আর মৈথুনের মধ্যে ঘুরতে থাকে, জীবনটাকে কোন ভাবে চালিয়ে নিতে হবে, এর বাইরে আমরা আর কিছু চিন্তা করতে পারি না। সত্যিই কি মানবজীবন শুধু এতটুকুর জন্য? এর থেকে যারা নিজের চেষ্টাতে ফিল্মস্টার হয়েছে অনেক ভাল, কারণ কিছু তো শক্তি দেখাচ্ছে। যদি কোন দিন বৈরাগ্য এসে যায়, এই ভিতরের শক্তি তাকে অন্য দিকে নিয়ে যাবে। ফিল্মের জগতে, খেলার জগতে যাঁরা স্টার হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কামনা-বাসনা অনেক বেশি থাকে ঠিকই, কিন্তু একটা শক্তির প্রকাশ ঘটাতে তাঁরা সক্ষম হয়েছেন।

অন্য কিছু নাই হোক, সবারই এই চেষ্টা থাকা দরকার যে, জীবনে একটা শক্তির প্রকাশ হতে পারে। আমাদের বেদ উপনিষদের ঋষিরা এই জিনিসটা বুঝেছিলেন, সেইজন্য তাঁরা বলে দিলেন, সাংসারিক উপলব্ধি যদি নাও হয়, যে কাজটা করছ, যেখানে তুমি কাজ করছ সেখান থেকেই তুমি মহৎ হওয়ার চেষ্টা কর। ফলে ধর্মজীবনের পথ পরিষ্কার দুটি হয়ে যায়। এই দুটি পথের কথা আমরা গীতার আলোচনার প্রথমের দিকে অনেক বিস্তারে বলেছিলাম। আচার্য শঙ্করও বললেন বেদের দুটি ধর্ম, একটা হল নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, যেখানে সন্ন্যাসের কথা বলা হয় আর দ্বিতীয় প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, যেখানে কর্ম রয়েছে।

নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের সমস্যা হল, যাঁরা সন্ন্যাসের জন্য উপযুক্ত নন তাঁরা যদি সন্ন্যাসের পথ অবলম্বন করেন, জীবনে তাঁদের অনেক ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে। সন্ন্যাস হল ত্যাগের পথ, সমস্ত কিছুর ত্যাগ। ঠাকুর মর্কট বৈরাগ্যের কথা বলছেন। বাড়িত অভাব অশান্তি লেগে আছে। সব ছেড়ে ছুড়ে চলে গেল কাশী। কিছু দিন পর ওখান থেকে বাড়িতে চিঠি লিখছে, আমার একটি কর্ম হইয়াছে। মানুষ সমস্যার জ্বালায় সব সময় জ্বলে পুড়ে মরছে। সব সংসারে কিছু না কিছু একটা সমস্যা, স্ত্রী হয়ত উপপতি করেছে, ছেলেটা অবাধ্য, বখাটে হয়ে গেছে, স্বামী হয়ত অন্য কোথাও বাসা করে আছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে সমাধি বৈশ্যের বর্ণনা আছে, তার স্ত্রী আর ছেলে মিলে সব টাকা-পয়সা কেড়ে তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে। সমাধির আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, তার মধ্যে বৈরাগ্য এসে গেল। শাস্ত্র এই ধরণের ত্যাগকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে না। তবে ত্যাগ মানেই ত্যাগ, যে কোন কারণেই ত্যাগ করে থাকুক, অভাবেই করুক আর স্বভাবেই করুক। ত্যাগ নিজেই একটা সাংঘাতিক জিনিস। গীতা বলছেন, কর্মফল ত্যাগ যদি কর তাও ভাল, কর্মত্যাগ যদি কর তাও ভাল।

তবে সব কিছুকে গুছিয়ে একটা প্ল্যাটফর্মে যদি নিয়ে আসা হয় তখন দেখা যাবে, স্বামী বিবেকানন্দের মত শ্রেষ্ঠতম পুরুষরা অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁরা নিত্যই প্রতিষ্ঠিত হন; এক ঘণ্টা কি দু ঘণ্টার জন্য বা এক মাস কি দু মাসের জন্য প্রতিষ্ঠিত হন না। দ্বিতীয়, যাঁরা সব কিছু ভাল করে বুঝে নিয়ে ঈশ্বরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, ভাল করে বুঝে নিয়েছেন ঈশ্বর বলতে এই, ত্যাগ বলতে এই, সংসার আমার কেন চাই না, এই জিনিসগুলো ভাল ভাবে বুঝে নেওয়ার পর সব কিছু ত্যাগ করে বেরিয়ে এসে ঈশ্বরের প্রতি নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পিত করে দিয়েছেন, এটা হল এই জগতের শ্রেষ্ঠতম ত্যাগ।

যত শ্রদ্ধয়া করোতি বিদ্যায়া করোতি তত বীর্যতর ভবতি, যে কোন কাজ যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে করা হয় এবং জেনে বুঝে নিয়ে করা হয়, তবেই সেই কাজ ফল দেয়। দীক্ষার সময় মন্ত্র দেওয়া হয়, সেই সময় বলে দেওয়া হয় মন্ত্রের অর্থ এই, ধ্যান এইভাবে করতে হয়। সেই নির্দেশ অনুসারে করতে করতে মন্ত্রের প্রতি, জপধ্যানের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাবে। যদিও প্রথমের দিকে শ্রদ্ধা হয় না, প্রথমে ইমোশানস থাকে, কিন্তু ঠিক ঠিক শ্রদ্ধা যখন জন্মায় তখন সেই শ্রদ্ধা থেকে আসে বীর্য। প্রথম হল বিদ্যা, জিনিসটাকে বোঝা, সেখান থেকে আসে শ্রদ্ধা, ঐ শ্রদ্ধা থেকে জন্মায় বীর্য বা শক্তি, ঐ জিনিসটাকে করার ক্ষমতা। তারপর ওখান থেকে ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করে। প্রায়ই ভক্তেরা এসে সাধুদের প্রশ্ন করেন, মহারাজ, জপের সময় ঠাকুরের দিকে মন বসে না। না বসারই তো কথা, কার বসে, সাধু সন্ন্যাসীদেরই বসে না। লীলাপ্রসঙ্গে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, ঠাকুর ধ্যানে বসেছেন, দেখছেন একজন ভৈরব ত্রিশূল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মন যদি ইষ্ট থেকে সরে আসে এই ত্রিশূল বুকের উপর দেব বিঁধে। প্রথমের দিকে ঠাকুরও পারছেন না। লেগে থাকতে, লেগে থাকতে, ভালবাসতে ভালবাসতে ভালবাসা জন্মায়। আগেকার দিনে বিবাহের সময় স্বামী স্ত্রীকে জানত না, স্ত্রী স্বামীকে জানত না। একসঙ্গে থাকতে থাকতে ভালবাসা জন্মে যেত, একজন আর-একজনের পরিপূরক হয়ে যেত। এখন সবাই পরস্পরকে জেনেশুনে, অনেক ঘোরাঘুরি সেরে তবে গিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসে, কিন্তু কদিনের মধ্যেই সেই বিয়ে ভেঙে যায়। জানাজানিটা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু যাকে জানছে তার প্রতি শ্রদ্ধাটা আনতে পারছে না।

সবার উপরে হল সন্ন্যাসী, যিনি তত্ত্বগত ভাবে ঈশ্বরতত্ত্বটা বোঝেন, ত্যাগের ব্যাপারটাও তত্ত্বগত ভাবে বোঝেন, আর ওইটাকে পাওয়ার সত্যিকারের আগ্রহ আছে। তাঁর নীচে হলেন, যাঁরা ঘরবাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। ত্যাগও করেছেন, কিন্তু বোঝার ব্যাপারটা এখনও পরিষ্কার হয়নি। কোন একটা ইমোশানের তোড়ে এসে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। গীতা এনাদের খুব একটা সম্মান

দৃষ্টিতে দেখেন না। এটা হল সন্ন্যাসের দ্বিতীয় শ্রেনী। অন্য দিকে যারা কাজ কর্ম করছে, তারা হয় নিষ্কাম ভাবে করছে, নয়তো সব কিছু ঈশ্বরে অর্পণ করে কাজ করছে। এদেরকে গীতা যোগী বা কর্মযোগী বলছেন। যোগী মানেই তাই, হয় সে নিষ্কাম ভাবে সব কর্ম করছে, অর্থাৎ কর্মফলের প্রতি তার কোন আসক্তি নেই, ভালমন্দ যা কিছু করছেন সব ঈশ্বরের পাদপদ্মে অর্পণ করে দিচ্ছেন। তাঁর নীচে হলেন, যাঁরা কাজ করে যাচ্ছেন। তারও নীচে হল, যারা ফাঁকি মেরে যাচ্ছে। ফাঁকি মারা দুদিকেই হয়। সন্ন্যাসীদের বলা হচ্ছে সাংখ্যযোগী, বুদ্ধি তাঁর পরিষ্কার, তাঁর বুদ্ধি ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত। অন্য দিকে দু নম্বরে হলেন, তিনি কর্ম করছেন, কিন্তু কর্মফল ত্যাগ করে দিচ্ছেন, ফল ভালমন্দ কিছু হয়ে গেলে মন তাঁর চঞ্চল হয় না। তার ঠিক নীচে হল, যারা কর্মে আসক্ত, তিন নম্বরে হল যারা কর্মে ফাঁকিবাজ। সব মিলিয়ে পাঁচ শ্রেনীর লোক হয়। এই তালিকায় স্বামী বিবেকানন্দের মত ঈশ্বরকোটিদের আনা হচ্ছে না, এনারা জ্ঞানী, লোকশিক্ষার জন্য এনারা আসেন।

যাঁরা সাধক তাঁদের এই পাঁচটা শ্রেনীতে ফেলা যায়। প্রথম নিষ্ঠাবান সন্ন্যাসী, দ্বিতীয় ফাঁকিবাজ সন্ন্যাসী, এনারা ঈশ্বরতত্ত্ব ও ত্যাগের ব্যাপারটা বোঝেন না, তৃতীয় যাঁরা নিষ্কাম কর্মযোগী, নিষ্কাম ভাবে কর্ম করেন বা ঈশ্বরকে সব ফল অর্পণ করে কাজ করেন। চতুর্থ হল, যারা কর্মের প্রতি আসক্ত এবং কর্মফলের প্রতি আসক্ত। তারও নীচে পঞ্চম হল, ফলের প্রতি আসক্তি আছে, কিন্তু নিজে কোন কাজ করতে চায় না।

একজন কাঠুরিয়া ছিল। বনে কাঠ কাটতে গিয়ে সামান্য কয়েকটা কাঠ কেটেই শুয়ে থাকত। আর-একজন কাঠুরিয়া তাকে বলল, 'তুমি এভাবে সব সময় শুয়ে শুয়ে সময় নষ্ট করে যাচ্ছ, একটু কাজটাজ করলে তোমার কিছু টাকা তো হত'। তখন কাঠুরিয়াটা জিজ্ঞেস করতে শুরু করেছে, 'কাজ করলে কি হবে'? 'তোমার টাকা-পয়সা হবে'। 'তারপরে কি হবে'? 'টাকা-পয়সা হলে তুমি আরামসে শুয়ে থাকতে পারবে'। 'আমি তো তাই করছি'। এগুলো হল তমোগুণের শেষ কথা, একেবারে নিকৃষ্টতম। ঠাকুর এদেরকে বলছেন, কুমড়ো কাটা বরঠাকুর। আগেকার দিনে নিয়ম ছিল মেয়েদের নাকি কুমড়ো কাটতে নেই। বরঠাকুর সারাদিন বৈঠকখানায় বসে বসে তামাক খায়, আর কুমরো কাটার সময় অন্দরমহল থেকে তার ডাক পড়ে, ভিতরে গিয়ে কুমরোটা কেটে দিয়ে আসে। অনেক বাড়িতে এই রকম অনেক আছে, যারা সবাই কুমরো কাটা বরঠাকুর। এদের উঠতে যে কত জন্ম লাগবে ভগবান জানেন। তমোগুণ কমে একটু রজোগুণ জাগলে তখন এরা একটু কাজ করবে। অন্য দিকে সন্ন্যাসী, যাঁরা না বুঝে সব কিছু ত্যাগ করেছেন, এই দুজনের মধ্যে আসলে খুব বেশি তফাৎ নেই। এরাও তমোগুণী, ওরাও তমোগুণী।

স্বামীজী সেইজন্য একটা মধ্যম পথ বার করলেন। যাঁরা সন্ন্যাসী হবেন, তাঁরা সবাই কাজ করবে, এই ধারণাটা ভারতবর্ষে বা অন্য কোথাও আগে ছিল না। বিদেশে তো সন্ন্যাসীর ধারণাই নেই, খ্রীশ্চান ফাদাররা ঠিক সন্ন্যাসী না, ওনারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর মত। আমাদের এখানে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যেমন হন, খ্রীশ্চান ফাদাররা এবং পোপও সন্ন্যাসী না, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর মত। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা কিছু ব্রত নেন, খ্রীশ্চান ফাদাররা এবং পোপ কিছু ব্রত নেন। সন্ন্যাসী কোন ব্রত নেন না, সন্ন্যাসী সব কিছুকে ত্যাগ করে দেন। দুটোর মধ্যে খুব সূক্ষ্ম তফাৎ, এগুলো না জানলেও চলে, তবে প্রসঙ্গ এসেছে বলে উল্লেখ করা হল। এই তামসিক ভাবাপন্ন লোক, সে সন্ন্যাসীই হোক বা গৃহস্থই হোক, এদের থেকে উপরে কর্মে আসক্ত লোকেরা, এরা কাজ করছে ফলও চাইছে। এদের থেকে উপরে হলেন, একটা দায়ীত্ব বোধে কাজ করছে, আমার এটা দায়ীত্ব তাই কাজটা করে দিলাম, দায়ীত্ব শেষ হয়ে গেলে আমি মুক্ত হয়ে যাব। সেখান থেকে আসেন সন্ন্যাসী, যিনি সব কিছু বুঝে গেছেন। এই জিনিসটারই এখন আলোচনা চলছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের শুরুতে অর্জুন ভগবানকে প্রশ্ন করলেন, আপনি একদিকে আমাকে বলছেন সাংখ্যযোগী হতে, আবার অন্য দিকে বলছেন তুমি কাজ কর। পরিষ্কার করে বলুন তো আমাকে কি করতে হবে? ভগবান তখন বললেন, *জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি,* সেই ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী, যিনি কাউকে দ্বেষ করেন না, কাউকে চানও না। এখান থেকে এবার বললেন সাংখ্যযোগ আর কর্মযোগে কোন তফাৎ নেই। উদ্দেশ্য যদি ঈশ্বর লাভ হয়, উদ্দেশ্য যদি আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি হয়, সেখানে এই দুটো পথে কোন তফাৎ নেই –

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানম্ তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।৫।।

(জ্ঞানমার্গ অনুশীলনকারী সন্ন্যাসি যে মোক্ষপদ লাভ করেন, নিষ্কাম কর্মিও সে স্থান প্রাপ্ত হন। সাংখ্য ও যোগের ফল একই মোক্ষ বলে উভয়কে যিনি অভিন্ন দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী, সম্যক্ জ্ঞানী।)

সাংখ্যযোগ, তার মানে জ্ঞানযুক্ত সন্ন্যাস, আর কর্মযোগ, নিষ্কাম কর্ম বা ঈশ্বরকে সব ফল অর্পণ করছি, এই বুদ্ধি দিয়ে কাজ করা, এই দুটো সমান। কেন দুটো সমান বলছেন? তাহলে তো সন্ন্যাসী আর আমরা সমান হয়ে গেলাম। সেভাবে সমান হয় না, অনেক তফাৎ থাকে। কিন্তু ঈশ্বর লাভের জন্য দুটোই সমান হয়ে যায়। যিনি সংসারে থেকে সব ত্যাগ করে দিয়েছেন, তাঁরও মধ্যে আমিত্বের ভাব থাকে না, যিনি সন্ন্যাসী তিনিও আমিত্বকে ছেড়ে দেন। কিন্তু দুটো ক্ষেত্রেই জ্ঞান যেটা আসবে, সেটা প্রভুর ইচ্ছার উপর আসবে। এই জ্ঞান কে পাবেন কেউ বলতে পারবে না। হয়ত দশ জন একসাথে সাধনা শুরু করেছেন, দশজনের মধ্যে কে এই জ্ঞান পাবেন, এটা কারুর জানা নেই, কেউ বলতে পারবে না। কারণ আত্মজ্ঞানে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে না। তাহলে তফাৎ কোথায় হয়? তফাৎ এটাই হয়, যিনি জ্ঞানপথের সন্ন্যাসী, যিনি সব কিছু বুঝে নিয়ে সন্ন্যাস নিয়েছেন, তাঁর পতনের সম্ভবনা অনেক কমে যায়, হয়ত শতকরা এক ভাগ থাকে। কিন্তু যিনি কর্ম করছেন, সংসারে যিনি আছেন, ওনার পতনের সম্ভবনা প্রায় নিরানব্বই শতাংশ। কারণ কোথায় কখন কিভাবে আসক্তি এসে তাঁকে জড়িয়ে নেবে ঠিক নেই। ঠাকুর এদের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, জ্ঞানী ভয়তরাসে।

তবে সংসারে থাকার অনেক সুবিধাও আছে, খাওয়া-পরার ব্যবস্থা হয়ে যায়, বাড়ির লোকেরা দেখাশোনা করতে পারছে, এ-ছাড়া আরও অনেক সুবিধা আছে। সন্ন্যাসী তো রিক্ত হস্তে খোলা আকাশের নীচে বেরিয়ে গেল, সন্ন্যাসীর কিছু নেই। বেলুড় মঠে কোন সন্ন্যাসীর যদি শরীর খারাপ করে, দরজা বন্ধ করে আমরা ঘরের মধ্যে পড়ে থাকি, আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। আর শরীর যদি খুবই খারাপ হয়, সেবাপ্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করিয়ে দেবে। সবাই এটা নিতে পারে না। আমরা আবার অন্যটা নিতে পারি না, পাঁচ মিনিট পরে পরে এসে জিজ্ঞেস করবে এখন কেমন আছেন, জল লাগবে কিনা, খাওয়া লাগবে কিনা, চা খাবেন কিনা, আমরা বিরক্ত হয়ে যাই। সন্ন্যাসীরা স্বভাবে স্বাধীন। সংসারে যাঁরা আছেন, স্বভাবেই তাঁরা পরনির্ভর। সংসারীরা পরাধীন নয়, কিন্তু কারুর না কারুর উপর নির্ভর করে চলতে হয়। তার যদি নির্ভরতা নাই থাকে, তাহলে সে সংসারে থাকবেই বা কেন, সে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে যাবে।

ভগবান এখানে বলছেন, যাঁরা সাংখ্যযোগী, যিনি সমস্ত কিছু বুঝে নিয়ে সব ত্যাগ করে দিয়েছেন, তিনি ঈশ্বর তত্ত্ব বোঝেন, ত্যাগের মহিমা বোঝেন, এনারা স্বার্থহীনতার এমন অবস্থায় চলে যান, যেখানে তাঁর উপর ঈশ্বরের কৃপা যে কোন সময় হয়ে যেতে পারে। আর যিনি কর্মযোগী, যেমন বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র আদি, এনারা সংসারেই ছিলেন, এনারাও এমন অবস্থায় চলে যান, যেখানে যে কোন অবস্থায় তাঁর উপর ঈশ্বরীয় কৃপা আসতে পারে। ঈশ্বর জ্ঞানের জন্য বা আত্মজ্ঞানের জন্য দুটো পথই সমান, এই জিনিসটাকে খুব ভাল করে বুঝতে হবে। আমরা এখানে জ্ঞানরহিত সন্ন্যাসীর কথা বলছি না। আর ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই, ত্যাগ সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, এদের কথাও

এখানে বলা হচ্ছে না, এরা হল তামসিক। কিন্তু যিনি জিনিসটাকে বোঝেন, অথচ কর্মযোগী; যেমন রাজা জনকাদিরা কর্মযোগী ছিলেন, তাঁরাও একই জায়গায় গিয়েছিলেন। যাঁরা এটা বোঝেন, তাঁরা ঠিক ঠিক বোঝেন। তাঁরা সংসারে থেকে সমস্ত কর্তব্য কর্ম নিষ্ঠার সাথে ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হয়ে করেন।

যেমন নবরাত্রির সময় অনেকে নবরাত্রি উদ্‌যাপন করেন। নবরাত্রির বিভিন্ন বিধি আছে, কেউ পুরোটা চণ্ডী পাঠ করেন, কেউ উপোস করেন, কেউ সামান্য একটু ফলাহার করে থাকেন; বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ভাবে নবরাত্রি উদ্‌যাপন করেন। গৃহস্থদের বিশেষ করে এগুলো করতে হয়, করলে দেহ মনের শুদ্ধি হয়। আমাদের যে মন সব সময় দেহের উপরে পড়ে আছে, এগুলো করলে শরীরের থেকে মনটা কিছু সময়ের জন্য সরে আসে। এগুলো করতে হয়, করলে সংসার থেকে মনটা একটু সরে আসে, সংসার থেকে মন সরে এলে শক্তি বাড়ে। শাস্ত্র পাঠ, পূজা অর্চনা, উপোস এগুলো সব গৃহস্থদেরই একটু একটু করতে হয়, করলে শরীরের থেকে মন একটু সরে আসে।

তাহলে অর্জুন কেন এমন জিজ্ঞেস করলেন দুটোর মধ্যে কোনটা ভাল? তখন বলা হল, না বুঝে কর্মসন্ন্যাস করার থেকে কর্মযোগ করা ভাল। এখানে কিন্তু সন্ন্যাসীর নিন্দা করা হচ্ছে না, যিনি ঈশ্বরের দিকে এগোবেন, এখানে তাঁকে সাবধান করা হচ্ছে। জ্ঞানরহিত সন্ন্যাস নিলে তুমি তামসিক হয়ে যাবে, তার থেকে কাজ করলে তোমার ঢের উপকার হবে। স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনে যখন কাজকর্মের ব্যবস্থা করলেন, তখনও সমস্যা হয়েছিল। শ্রীশ্রীমা সেই সময় বললেন, স্বামীজী মহারাজ যে কাজের কথা বলছেন, এটা তিনি ঠিক করছেন। তখন কত ইয়ং ছেলেরা সন্ন্যাসী হতে আসছে, সন্ন্যাসী হওয়ার পর এরা সারাটা দিন কি করে সময় কাটাবে? কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হয়। দিনে সবাইকে কিছুক্ষণ কাজ অবশ্যই করতে হয়। তার সাথে দিনে কিছুক্ষণ শাস্ত্র পাঠ, অধ্যয়ন, জপধ্যান অবশ্যই করতে হয়, এতে মাথাটা ব্যালেন্সে থাকে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে কর্মের তোড়টা একটু কাটিয়ে আরও বেশি করে জপধ্যানের দিকে জোর দিতে হয়, যাতে তামসিকতা যেন গ্রাস না করতে পারে।

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্ত মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি।।৬।।

(হে মহাবাহো, নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান ছাড়া প্রথমেই কর্মসন্ন্যাস দুঃখেরই কারণ হয়; কিন্তু নিষ্কাম কর্মযোগী কর্মসন্ন্যাস করে অবিলম্বে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন।)

কর্মযোগ যদি না করে থাক, বা কর্ম যদি না করে থাক, তাহলে পারমার্থিক সন্ন্যাস পাওয়া খুব মুশকিল। আমরা যখন রামকৃষ্ণ মিশনে জয়েন করি, তখন বয়স মাত্র কুড়ি বছর। সিনিয়র মহারাজরা আমাদের বলতেন, 'খুব খেটে যদি কাজ না কর, বুড়ো বয়সে খিটখিটে হয়ে যাবে'। কোন বৃদ্ধ যদি খিটখিটে স্বভাবের হয়, বুঝতে হবে তিনি জীবনে কোন কাজ করেননি। যিনি প্রচুর কাজ করেছেন, বয়স হতে হতে তাঁর মন শান্ত হয়ে যায়। ধর্ম ভাবে যদি কাজ করে থাকেন, বৃদ্ধাবস্থায় তাঁর মন পুরোপুরি ঈশ্বরের দিকে চলে যায়। যদি দেখেন বৃদ্ধাবস্থায় মন ঈশ্বরের দিকে যায়নি, তাহলে বুঝতে হবে তিনি কর্তব্য ভাবে কর্ম করেননি, ধর্ম ভাবে কর্ম করেননি। খিটখিটে যদি হয়, তাহলে বুঝতে হবে, কাজই করেননি, সারা জীবন ফাঁকি মেরে গেছেন।

আমাদের একজন মহারাজ প্রায়ই বলতেন, 'সন্ন্যাসী বৃদ্ধ হলে বোঝা যায়, তিনি নোঙর তুলে নৌকা চালিয়েছেন নাকি নোঙর ফেলে সারা জীবন নৌকা চালিয়েছেন'। একজন মাতাল সারা রাত নৌকা চালিয়েছে, সকাল হতে দেখে নৌকা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। কারণ নৌকার নোঙরটা ফেলা আছে। সারা জীবন সাধনা করে গেলেন, বয়স কালে এসে দেখছেন, কিছুই এগোল না, নোঙরটাই তোলা হয়নি। কাজ করলে নোঙর তোলা হয়, তখন বোঝা যায় কোথায় কি গোলমাল

আছে। পাঁচজনের সাথে মেলামেশা করতে হয়, ক্ষেত্র বিশেষে নিজের অহঙ্কারটা চাপা দিতে হয়, উপায় থাকে না। এক যুবতী মেয়ে সে যত সুন্দরী হোক, যত অহঙ্কারী হোক, সবাইকে অঙুলি হেলনে নাচিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যখন সন্তান হয়, তখন সন্তানের সামনে তার মাথা নত হয়ে যায়। সেখানে তার সব অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে যায়। সন্তানের জন্ম হওয়াতে শুধু সন্তানের জন্ম হয় না, এক যুবতীর মাতৃত্বের জন্ম হয়। সন্ন্যাসের পর মাতৃত্ব হল শ্রেষ্ঠতম। কারণ মানুষের যত গুণ হতে পারে, সমস্ত গুণ একজন মায়ের মধ্যে থাকে। সাধু সন্ন্যাসীর যা যা গুণ থাকে, ঠিক ঠিক মা যিনি, সেই সব গুণ তিনি স্বাভাবিক ভাবে পান। সেইজন্য কাজ করতে হয়। যাঁরা আজ ঠাকুরমা, দিদিমা হয়ে গেছেন, তাঁদের মাথায় রাখতে হবে, একজন মা রূপে আপনি আপনার সন্তানের জন্য জীবনে কি কি করেছেন। ঠাকুরমা হয়ে আপনাকে সেটাই করতে হবে সবারই জন্য, তবেই আপনি ধর্ম জীবনে এগোতে পারবেন।

আচার্য বলছেন, *ঈশ্বরসমর্পিতরূপেণ ফলনিরপেক্ষেণ যুক্তো মুনি*, যা কিছু করা হচ্ছে সব ঈশ্বরকে সমর্পিত করে দিচ্ছে বা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে, আমি কোন কিছুর অপেক্ষা রেখে কর্ম করছি না, আমার এটা কর্তব্য, তাই আমি করছি। এই ভাব নিয়ে যিনি সমস্ত কাজ করেন তিনিই মুনি। মুনি মানে যিনি ঈশ্বরের স্বরূপকে মনন করতে থাকেন, তখন তিনি পারমার্থিক সন্ন্যাস, যেটা পরমজ্ঞাননিষ্ঠা রূপ, সন্ন্যাস মানেই পরমজ্ঞাননিষ্ঠা, আত্মার যে স্বরূপ সেটাতে থিয়োরেটিক্যালি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান। একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, এই যে আমরা ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করছি, শুরু করার সময় বলা হয়েছিল, বেদান্ত মানে আত্মাই যে সব কিছু, এটাকে জানা; তাঁদের জীবনকে বলা হয় বেদান্তিক প্র্যাক্টিস, কার্যকরী বেদান্ত। মহাপুরুষদের যে জীবনধারা, এটাই আমাদের জন্য সাধনা; তিনি যেটা অনায়াসে করেন, এটাই আমাদের সাধনা। গীতা আদি গ্রন্থে এই জিনিসটা রয়েছে, যখন এটা সাধনা রূপে করা হয়, তার মানে যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা কিভাবে ছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে জীবন-যাপন করলেন, স্বামীজী কিভাবে জীবন-যাপন করলেন, এই জিনিসগুলিকে চেষ্টা করে পালন করা, মানুষ তখন ধীরে ধীরে উপরে উঠে যায়।

পারমার্থিক সন্ন্যাস হল উদ্দেশ্য। যিনি সত্যিকারে সন্ন্যাসী তিনি কিভাবে থাকবেন? *জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি*, যাঁরা সাধক তাঁকেও এটাই করতে হবে। কারুর প্রতি দ্বেষ থাকবে না, কারুর কাছ থেকে কোন অপেক্ষা থাকবে না। এই অবস্থা যাঁর হয়, তাঁর জীবনটা কৃতকৃত্য হয়ে যাবে। যাঁরা মুনি, ঈশ্বরের স্বরূপকে যাঁরা মনন করেন, অন্য দিকে কর্মযোগ করে যাচ্ছেন, বেদের যজ্ঞাদি করে যাচ্ছেন বা যে দায়ীত্ব তাঁর উপর এসেছে, সেটা পালন করছেন, এনারা পরম জ্ঞাননিষ্ঠায় চলে যান। স্বামীজী এবং স্বামীজীর মত ব্যক্তিরা যে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই জ্ঞানে এনারা থিয়োরেটিক্যালি পৌঁছে যান। এগুলোতে থিয়োরেটিক্যাল আর প্র্যাক্টিক্যালে খুব বেশি তফাৎ থাকে না, কারণ তাঁর জীবনধারা পাক্কা সন্ন্যাসীর মতই হয়। তবে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ছোট্ট একটা তফাৎ থাকে। যারা ফিজিক্স থিয়োরেটিক্যালি খুব ভাল বুঝে থাকেন, প্র্যাক্টিক্যালি ওটা একবার দেখে নিলে ওই জ্ঞানটা চিরস্থায়ী হয়ে যায়। এই সাংখ্যযোগী, জ্ঞানীদের কি হয়?

যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে।।৭।।

(যিনি নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা শুদ্ধচিত্ত, অতএব সংযতদেহ ও জিতেন্দ্রিয় এবং এইভাবে যিনি ব্রহ্ম থেকে স্তম্ব পর্যন্ত সর্বভূতের আত্মাকে স্বীয় আত্মারূপে দর্শন করেন, তিনি স্বাভাবিক বা লোকসংগ্রহার্থ কর্ম করেও লিপ্ত হন না।)

এই শ্লোকটা শুনলে মনে হবে যিনি পরম জ্ঞানী, তাঁর কথা বলছেন। কিন্তু এটাও একটা সাধনার পথ। কারণ সিদ্ধি আর সাধনাতে কোন তফাৎ থাকে না। খাওয়ার পর আমার পেট ভরে

যায়, আমার একটা শান্তি হয়; এখানে খাওয়া একটা, পেট ভরাটা আর-একটা, দুটো আলাদা। কিন্তু ধর্ম জীবনে তা হয় না, ধর্ম জীবনে সাধনাও যা সিদ্ধিও তাই। বলছেন, যিনি যোগযুক্ত হয়ে কর্মযোগ করে করে একেবারে বিশুদ্ধ আত্মা হয়ে গেছেন, এখানে এই আত্মার অর্থ মন। এমন বিশুদ্ধ মন যে, সেখানে স্বার্থের গন্ধ পর্যন্ত নেই। শুধু কাম গন্ধ না, কাঞ্চনের গন্ধ না, কোন ধরণের স্বার্থ নেই। জীবনের প্রতি আসক্তি নেই, মৃত্যুর প্রতিও কোন আসক্তি নেই, সম্পূর্ণ আসক্তি রহিত। *বিজিতাত্মা*, এই আত্মার অর্থ দেহ, বিশুদ্ধাত্মার আত্মা অর্থ মন। আত্মার অনেক রকম অর্থ হয়, এক আত্মার অর্থ সর্বব্যাপী আত্মা, এক আত্মার অর্থ জীবাত্মা, এক আত্মার অর্থ মন, এক আত্মার অর্থ দেহ। আত্মা মানে আমি নিজে যেটা, individuality। যখন আমি নিজেকে দেহ মনে করছি আমি তখন দেহাত্মা, যখন মনকে মনে করছি আমি, তখন আত্মা মন, আমার ভিতরে যে আত্মা, তাঁকে মনে করছি আমি জীবাত্মা।

বলছেন *যোগযুক্ত*, যিনি নিষ্কাম কর্মযোগী, তিনি নিজের দেহকে জয় করেছেন, নিজের মনকে জয় করেছেন আর সমস্ত ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন। তার সাথে *সর্বভূতাত্মভূতাত্মা*, সবার মধ্যে নিজেকে দেখছেন। আমরা যখন মায়াতে বিমোহিত হয়ে যাই, তখন যাকে ভালবাসি তার মধ্যে আমি নিজেকে দেখি। আর যখন মায়া বিমোহিত থাকি না, তখন আমরা কাউকে পাত্তা দিই না। কিন্তু যিনি সত্যিকারের জ্ঞানী তিনি সবার মধ্যে, একটা ক্ষুদ্র পিঁপড়ের মধ্যেও নিজেকে দেখেন। এগুলোই প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত। *কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে*, তিনি জানেন, আমি যা কিছু করি না কেন, কোথাও আমার লিপ্ত হওয়ার কিছু নেই। আমরাও তো সব সময় কত কিছু করছি, প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত বলছে, মাঝে মাঝে তুমি ভাববে, আমি এগুলো কিছু করছি না, ইন্দ্রিয় তার নিজের বিষয়কে ভোগ করছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই এই টপিকটা চলছে। যিনি যোগযুক্ত, যিনি নিষ্কাম কর্মযোগী তিনি জানেন আমি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, থেকে আলাদা। কি করে জানছেন আমি আলাদা? কারণ তিনি ইন্দ্রিয়কে জয় করে নিয়েছেন, দেহকে জয় করে নিয়েছেন, মনকেও জয় করে নিয়েছেন। *কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে*, সব কিছু করছেন, কিন্তু ভাল করে জানেন আমি কোন কিছুতেই লিপ্ত নই। পরে বলবেন, পদ্ম পাতায় জল পড়ছে, জল সেখানে এসে জমছে, দেখে মনে হবে পদ্ম পাতাটা জলে সিক্ত হয়ে আছে। কিন্তু হাওয়াতে পাতায় একটা নাড়া পড়লেই সরাৎ করে পুরো জলটা নীচে গড়িয়ে পড়ে যাবে, এখন দেখুন পদ্ম পাতার কোথাও জলের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। জীবনের উদ্দেশ্য হল জলে পদ্ম পাতার মত থাকা। পদ্ম পাতা জলের উপর ভাসছে, তার নীচে জল, বৃষ্টির জল, মাছেরা লাফালাফি করাতে ছিটকে জল পদ্ম পাতার উপর পড়ছে, একটু বাতাসে পাতাটা নড়ে উঠল, সমস্ত জল থেকে সে মুক্ত হয়ে গেল, কোথাও জলের কোন চিহ্ন নেই। ঠাকুর পাঁকাল মাছের কথা বলছেন, পাঁকের মধ্যে থাকে, কিন্তু তার শরীর ঝকঝকে, কোথাও একটু কাদার দাগ নেই। সংসারের সব দায়ীত্ব পালন করতে হবে, কিন্তু কোথাও জড়াতে নেই, নিজের দেহের প্রতিও তাই।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃন্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্।।৮।।
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্।।৯।।

(নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা ক্রমে তত্ত্বদর্শী হয়ে কর্মযোগী দর্শনে, শ্রবণে, স্পর্শনে, আঘ্রাণে, ভোজনে, গমনে, নিদ্রায়, নিঃশ্বাস গ্রহণে, কথনে, মলমূত্রাদি ত্যাগে, গ্রহণে, চক্ষুর উন্মেষে এবং নিমিষেও ইন্দ্রিয়গুলি স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত – এরূপ দৃঢ় ধারণা করে 'আমি অকর্তা, কিছুই করি না' – এটা নিশ্চিত জানেন।)

দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, ঘ্রাণ নেওয়া, খাওয়া, গমন করা, ঘুমানো আর নিঃশ্বাস নেওয়া, তার সাথে বলছেন কথা বলা, মলমুত্রাদি ত্যাগ করা, গ্রহণ করা, চোখের পাতা ফেলা, চোখের পাতা

খোলা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের যত রকমের কাজ আছে, দেহের যত রকমের কাজ আছে, দশটি ইন্দ্রিয়ের দশ রকমের কাজ, আবার কিছু কিছু কাজ আছে যেটা শরীরের কাজ, যেমন ঘুমনো; যিনি জ্ঞানী তিনি জানেন, ইন্দ্রিয়গুলো নিজের মত কাজ করছে, আমি আমার মত আছি।

আমরা যদি এক মিনিট মনটাকে শান্ত করে একটু ভাবি, আচ্ছা আমরা এখানে এখন গীতার আলোচনা শুনছি, এই সময়ের মধ্যে আমার ইন্দ্রিয়গুলো নিজের মত কত কাজ করে যাচ্ছে; আমার চোখের পাতা নড়ছে, নাক দিয়ে নিঃশ্বাস পড়ছে, এগুলো তো আমি নই, আমি আলাদা, আমার চোখ আলাদা, নাক আলাদা, কান আলাদা। নিঃশ্বাস নেওয়া আর ছাড়া যেমন নিজের মত হচ্ছে, চোখের পাতা খোলা আর বন্ধ হওয়াটাও নিজের মতে হয়ে যাচ্ছে, আমি এগুলো থেকে আলাদা। যিনি ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন, দেহকে জয় করেছেন, মনকে জয় করেছেন, তাঁদের এই বোধটা সব সময় থাকে। কিন্তু আমার আপনার মত মানুষ সব সময় এই বোধ রাখতে পারব না। এই জিনিসটাকে বোধ করার জন্য মাঝে মাঝে চুপচাপ বসে একটু এটার উপর চিন্তা করতে হয়।

বলছেন, এনারা কর্মের অভাব দেখেন। আচার্য এখানে খুব সুন্দর কথা বলছেন, *ন হি মৃগতৃষ্ণিকায়াম্ উদকবুদ্ধয়া পানায় প্রবৃত্ত উদকাভাবজ্ঞানে অপি তত্র এব পানপ্রয়োজনায় প্রবর্ততে,* মরুভূমিতে বা রাস্তায় যেতে যেতে যদি কেউ জলের মরীচিকা দেখে একবার যদি জেনে যায় এটা মরীচিকা, দ্বিতীয়বার সে ওখানে গিয়ে জল নেওয়ার চেষ্টা করতে যাবে না। স্বামীজীর একটা খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। তিনি তখন গুজরাতের একটা জায়গায় ছিলেন, সেখানে তিনি দূরে একটা পুকুর দেখতে পেতেন আছে। একদিন তাঁর কি মনে হল ওই পুকুরের কাছে যেতে হবে। তিনি হাঁটতে শুরু করলেন, যত যাচ্ছেন দেখছেন তত পুকুরটা দূরে সরে যাচ্ছে। আসলে ওই জায়গাটা মরুভূমির মত ছিল। উনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন, এটা মরীচিকা। উনি ওখান থেকে ফিরে ঘরে চলে এলেন। পরের দিন আবার তিনি সেই মরীচিকা দেখছেন, কিন্তু আর পুকুর, পুকুরের জল বলে বোধ হয়নি। তিনি বুঝে গেলেন এটা সেই মরীচিকা।

বড় রাস্তায় গাড়ি করে যাওয়ার সময় সোজা রাস্তার দিকে তাকালে মনে হবে রাস্তার উপর অনেক জল জমে আছে। কিন্তু যত ওর কাছে এগিয়ে আসছি তত সেই জল উধাও, কিন্তু আবার দূরে জল দেখা যাচ্ছে। পরে বুঝতে পারা যায় যে এটাই মরীচিকা। তাই বলে অন্য মরীচিকা দেখে আমি যে ভুল করব না তা তো হয় না, ভুল হবেই। যেটাকে আমরা জেনে গেলাম এটা মরীচিকা, সেটাকে নিয়ে আর ভুল হবে না। জ্ঞানী যখন একবার বুঝে গেলেন ইন্দ্রিয়গুলি নিজের মত কাজ করে, তখন আর তিনি এগুলোতে লিপ্ত হবেন না। ইন্দ্রিয়গুলিকে তুষ্ট করার জন্য তিনি আর লাফালাফি করবেন না। একজন তত্ত্বজ্ঞানী, যিনি পুরো জিনিসটাকে জেনে গেছেন বা যাঁরা থিয়োরেটিক্যালি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, এটাই তাঁদের আচরণ। কিন্তু কাউকে যদি কাজ করতে হয়, তখন তিনিও এভাবেই কাজ করেন; কিভাবে কাজ করেন?

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।।১০।।

(যে মুমুক্ষু কর্মফলের আসক্তি ত্যাগ করে পরমেশ্বরের উদ্দেশে সব কর্ম করেন, জল যেমন পদ্মপত্রকে আর্দ্র করতে পারে না, পাপপূণ্য সেই রকম তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।)

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি, মুমুক্ষু ব্যক্তি সমস্ত কর্মকে যদি *ব্রহ্মার্পণং* করে সব কর্ম করেন, তাঁর কি হয় বলছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে যে *ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ* বলা হয়েছিল, ওটা ছিল জ্ঞানীর ভাব, জ্ঞানী ওই ভাবেই সব কিছু দেখেন, কিন্তু এখানে সাধনা রূপে বলছেন। *সঙ্গং ত্যক্ত্বা,* সমস্ত রকম স্বার্থ ভাবনা ত্যাগ করে, আমিত্বের সাথে যা কিছু জুড়ে আছে, সব কিছু থেকে আমিত্ব ভাব সরিয়ে দিয়ে সমস্ত

কাজ করেন এবং *ব্রহ্মণ্যাধায়*, সব কিছু করে *ব্রহ্মার্পণং* করে দিচ্ছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা এবং রামকৃষ্ণ ভাবধারার ভক্তরা কোন কাজকর্ম করার পর শেষে বলেন *শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু,* অর্থাৎ এই কর্মের সব ফল শ্রীরামকৃষ্ণকে অর্পণ করলাম। প্রথমে এটা থিওরেটিক্যালি করা হয়, এইভাবে করতে করতে একটা ভাব জন্মায়, সেই ভাব থেকে এই বোধ আসে, আমি যাবতীয় যা কিছু করি, কি কি, *পশ্যন্ শৃন্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি,* যা কিছু করছি সব *ব্রহ্মার্পণং, শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু* বলে ঠাকুরকে অর্পণ করে দিচ্ছি।

লিপ্যতে ন স পাপেন, বলছেন, এইভাবে সব অর্পণ করে দিলে কি হয়? কোন দিন আর কর্মজনিত পাপ তার লাগবে না। পাঁকাল মাছের মত তার গায়ে কাদা লাগবে না। *পদ্মপত্রমিবাম্ভসা,* এই জিনিসটাকে এখানে পদ্মপত্রে জলের সাথে তুলনা করা হচ্ছে। বাচ্চারা প্রথম যখন পদ্ম পাতা দেখে তাদের দেখে খুব মজা লাগে। পদ্ম পাতায় জল ঢালল, তারপর একটু নেড়ে দিল, সব জল সড়াৎ করে গড়িয়ে গেল। যাঁরা কর্মযোগ করছেন, সংসারে যাঁরা আছেন তাঁদের এটাই জীবনধারা – *পদ্ম পত্র ইব অম্ভসা,* পদ্ম পাতা জলে যেভাবে থাকে সংসারেও আমাকে ঠিক সেইভাবে থাকতে হবে, কোন কিছু যেন আমাকে স্পর্শ না করে। কিভাবে স্পর্শ না করে থাকবে? আমারও তো ভালমন্দ জিনিস খেতে ইচ্ছে করবে, আমারও তো ভোগ করার ইচ্ছা হবে, যাকে ভালবাসি তাকে স্পর্শ করতে ইচ্ছে করবে, ভাল গন্ধ পেতে, ভাল গান শুনতে ইচ্ছে করবে। অবশ্যই করতে পারে, কিন্তু এই চেতনায় সর্বদা নিজেকে জাগ্রত রাখতে হবে যে, এগুলো আমি চাইছি না, আমার ইন্দ্রিয়গুলো চাইছে। আমি ইন্দ্রিয়ের সাথে জড়িয়ে আছি, তাই আমার মনে হচ্ছে আমি চাইছি। আসলে আমি জানি, ইন্দ্রিয়গুলিই সব কিছু চাইছে। এরপর কর্মযোগের যখন অনুশীলন করা হয়, সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরকে অর্পণ করে যখন সব কর্ম করা হয়, তখন ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়গুলির খেলা সত্যিকারের বুঝতে পারা যায়।

ঠাকুর বলছেন, যখন আত্মজ্ঞান হয়, শুকনো নারকল নাড়লে যেমন বোঝা যায় ভিতরে আলাদা কিছু একটা আছে, যেটা ঢপর ঢপর করে নড়ছে, ঠিক সেই ভাবে পরিষ্কার বুঝতে পারে দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা। এনারাই খুব উচ্চমানের কর্মযোগী। আর আমাদের এটা না মানার কোন কারণ নেই যে, কেন আমরা উচ্চমানের কর্মযোগী হব না। এত ধৈর্য ধরে নিষ্ঠার সাথে আমরা এত উচ্চমানের শাস্ত্রের আলোচনা শুনছি, শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি, কত ধর্মীয় কাজে মন যুক্ত হয়ে আছে; কেন আমরা কর্মযোগী হব না, আমরা সবাই কর্মযোগী। হতে পারে কর্মযোগে আমরা প্রথম পা রেখেছি, এরপর কেন আমরা শ্রেষ্ঠতম কর্মযোগী হতে পারব না! শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী হতে গেলে খুব সাধারণ কয়েকটা জিনিস করতে হবে। সেটাই পরের শ্লোকে ভগবান বলছেন –

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।।**১১**।।

(নিষ্কাম কর্মযোগী ফলাসক্তি বর্জনপূর্বক মমত্ব-ভাবশূন্য হয়ে কায়, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম করেন।)

কর্মযোগী হওয়ার খুব সহজ উপায় বলে দিচ্ছেন। *কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা,* শরীর দিয়ে, মন দিয়ে আর বুদ্ধি দিয়ে, তার সাথে ইন্দ্রিয় দিয়ে কর্ম করা। মোটামুটি চার রকমের কর্ম হয়, ইন্দ্রিয় দিয়ে কর্ম হয়, শরীর দিয়ে হয়, মন দিয় আর বুদ্ধি দিয়ে কর্ম হয়। মন আর বুদ্ধি আলাদা করার অর্থ হল, মন হল যেখানে নানা রকমের চাঞ্চল্য রয়েছে, আর বুদ্ধি স্থির। ইন্দ্রিয় দিয়ে ভোগ হয়, দেহ দিয়ে বিশেষ কার্য হয়, মন দিয়ে সংসার চলে, বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরে মন যায়। সমস্ত কিছুতে *কেবলৈঃ,* মমত্ব বর্জিত, আমিত্ব ত্যাগ। এমনকি যখন জপধ্যান করছি, সেখানেও আমি মুক্তি পাব, আমি ঈশ্বর দর্শন পাব, এটাও ত্যাগ। *যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি,* যোগী যখন কাজ করে *সঙ্গং ত্যক্ত্বা,* সমস্ত রকম

আসক্তি শূন্য হয়ে করে। কিসের জন্য করে? *আত্মশুদ্ধয়ে*, যা কিছু কর্ম যোগীরা করেন, তাঁরা আত্মশুদ্ধির জন্যই করেন। যে নূতন বিবাহ করে সংসারে প্রবেশ করেছে, সেও এসে যদি বলে আমি যোগী হতে চাই, নিশ্চয় সে যোগী হতে পারবে। সংসারে আজ থেকে সব কাজ তুমি নিষ্কাম ভাবে করতে শুরু করে দাও।

মহাভারতে অগস্ত্য মুনির কথা আছে, সেখানে অগস্ত্য মুনি পরিষ্কার বলছেন, আমাকে সন্তান পেতে হবে, সেইজন্য আমি এগুলো করছি, না হলে আমি করতাম না। নিজের পূর্বজদের অগস্ত্য মুনি দেখেছেন মাথা উল্টো করে গর্তে পড়ে যাচ্ছেন। মুনির মনে এখন চাঞ্চল্য এসে গেছে, আমার পূর্বজদের পূত নামক নরক থেকে উদ্ধার করতে হবে। মনে চাঞ্চল্য আসার জন্য, মন এখন অশুদ্ধ হয়ে গেছে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজী যিনি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র। ওনার বিবাহ হল, পুত্রবধূ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে বলছেন, টাকা দিয়ে পুত্রবধূর মুখ দেখবে; এটা ভারতের খুব প্রাচীন প্রথা। এরপর রাজা মহারাজের এক সন্তান হয়। ঠাকুর সন্তান হওয়ার খবর শুনে বলছেন, ভাল হল, ওর অতটুকু বাকি ছিল, বেরিয়ে গেল। খুব তাৎপর্যপূর্ণ ঠাকুরের এই কথা। যিনি পরবর্তি কালে এত বড় সন্ন্যাসী হলেন, যিনি সব সময় ঈশ্বরের ভাবে ডুবে থাকতেন, যাঁর নামে ঠাকুর বলছেন, ওর অতটুকু বাকি ছিল, মিটে গেছে। তার মানে, তিনি স্ত্রীসঙ্গ করছেন, কেন করছেন, যতটুকু বাকি ছিল সেটুকু বার করার জন্য। এর এটাই তাৎপর্য, যেটাই করছেন, আত্মশুদ্ধির জন্য। এই ভাবটাকে আমাদের জাগিয়ে রাখতে হবে, আমি যা কিছু করছি আত্মশুদ্ধির জন্য। ঠাকুর তখন সাধনায় রত, তাঁর ইচ্ছে হল রূপোর গড়গড়াতে তামাক খাবেন। যদি না খান মনটা চঞ্চল থাকবে। ব্যবস্থা করা হল, তারপর একবার ডানদিকে কাত হয়ে, একবার বামদিকে কাত হয়ে তামাক খেলেন। ওই প্রথম, ওই শেষ রূপোর গড়গড়াতে তামাক খাওয়া।

যে কোন কাজ করার সময়, যে কোন কিছু ভোগ করার সময়, এই ভাবটাকে জাগিয়ে রাখতে হবে, আমি এগুলো আত্মশুদ্ধির জন্য করছি। সেইজন্য সব কিছুই করতে হবে মমত্ব বর্জিত হয়ে। আমি এটাকে আমার মুঠোয় ধরে রাখতে চাই, এই ভাব থাকলে আত্মশুদ্ধি হওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। যদি আত্মশুদ্ধির জন্যই করা হয়, তাহলে তুমি কেন এটাকে ধরে রাখতে চাইছ? ভিতরে যে নোংরাটা জমে আছে, সেটাকে ফেলে দেওয়ার জন্য তুমি এটা করছ। আমার জামা ছিড়ে গেছে, আমি ওটা ফেলে দিতে চাইছি, ফেলে দেওয়ার জন্যও একটা ক্রিয়া লাগে, ধরে আনাটাও একটা ক্রিয়া। আগে আগে আমরা আলোচনা করেছি, ত্যাগটাও একটা কাজ। সেখানেও মনে একটা বৃত্তি আসে, সেই বৃত্তিটা ক্রিয়াবৃত্তি। আমি বলছি, এটা আমি ফেলে দিতে চাই, আবার বলছি আমি এটাকে ধরে রাখতে চাইছি, সেকি হয়! আপনি জামাটা ফেলে দিতে চাইছেন, ত্যাগ করতে চাইছেন, তার সাথে বলছেন আমি ধরে রাখতে চাইছি, তা কি কখন হয়! ঠিক তেমনি আত্মশুদ্ধি, ভিতরের সমস্ত নোংরাকে ফেলে দিতে চাইছি। ফেলে দেওয়াতে মমত্ব কি করে থাকবে? মমত্ব থাকলে শুদ্ধি হবে না, শুদ্ধি চাইলে মমত্ব থাকবে না, অত্যন্ত সহজ ব্যাপার, জটিলতার কিছুই নেই।

আপনি বলছেন, এই ভোগটা হাজার বার না করা পর্যন্ত আমার মন শান্ত হবে না, করুন হাজার বার ভোগ। তার মানে আপনার এখনও অনেক দেরী আছে। সবারই যে এক সঙ্গে হবে তার কোন মানে নেই, সময় লাগবে, লাগুক, কোন সমস্যা নেই। সেখানেও যদি এই ভাব জাগিয়ে রাখা যায়, এই ভোগটা আমাকে এখনও হাজার হাজার বার ভোগ করতে হবে; কোন ক্ষতি নেই। ঠিক আছে, আপনি এই ব্যাপারে সচেতন থাকুন। নিজেকে সজাগ রাখুন, আমি যে এই ভোগ করছি, উদ্দেশ্য হল ত্যাগ। যে কোন ভোগে উদ্দেশ্য থাকবে ত্যাগ, উদ্দেশ্য থাকবে আত্মশুদ্ধি।

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে।।১২।।

(ঈশ্বরের নিমিত্ত কর্ম করছি, ফললাভের জন্য না –এইভাবে কর্মফল ত্যাগ করে নিষ্কাম কর্মযোগী জ্ঞাননিষ্ঠার ফলস্বরূপ চিরশান্তির (মোক্ষের) অধিকারী হন; কিন্তু সকাম কর্মী কর্মফলে আসক্তিবশাৎ সংসারে আবদ্ধ হন।)

আগে বলা হল, আমার ঈশ্বর দর্শন হোক, মোক্ষপ্রাপ্তি হোক, এই ভাবও কোন কাজের মধ্যে লেগে থাকবে না। ফলে যিনি যোগী, যিনি যুক্ত, *কর্মফলং ত্যক্ত্বা,* তিনি কর্মফলকে ত্যাগ করে দেন। আমার দায়ীত্ব, আমাকে এটা করতে হবে, আর আমার শুদ্ধির জন্য এই কাজ করছি। আমাদের একজন মহারাজ আছেন, উনি খুব ভাল কাজ করেন। এত কাজ করেন যে অবাক হয়ে যেতে হয়, তার সাথে জপ, ধ্যান, তপস্যাও করছেন, অন্য কেউ হলে দম বেরিয়ে যেত। কিন্তু সব সময় হাসি মুখ। আমি ওনার খুব প্রশংসা করি। প্রায়ই আমি ওনাকে বলি, 'আপনি কি নিষ্ঠার সঙ্গে এত বছর ধরে কত কাজ করে যাচ্ছেন'। উনি সব সময় বলবেন, 'আরে ভাই! আমাকে তো সময় কাটাতে হবে, তাই কাজ করে সময় কাটাই'। যখনই কেউ ওনার কাছে যাবেন, সবার সাথে হাসি মুখে কথা বলবেন। আমি হয়ত বললাম, 'আপনার কাজে ব্যাঘাত ঘটালাম'। উনি সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, 'আরে এমনিও তো আমি টাইম পাস করছি'। বলছেন টাইম পাস করছেন, কিন্তু মহারাজ একদিন কাজ বন্ধ করে দিলে ওনার পুরো ডিপার্টমেন্ট চোখে সরষে ফুল দেখবে। সময় তো সবাইকেই কাটাতে হয়, একজন যোগী যখন সময় কাটান তখন তিনি এভাবে কাজ করে সময় কাটান।

কিন্তু যাঁরা যোগী নন, *অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে,* ফলে এমন আসক্ত হয়ে যান যে, কর্মফল প্রাপ্তির জন্যই তাঁর কাজ করা। একজন বলছে, যাই নাতির চাঁদমুখটা একবার দেখে আসি। ঠাকুর শুনে এত রেগে গেছেন যে, বলছেন, চাঁদমুখ না পোড়ামুখ।

কয়েক বছর আগে প্রায় পয়ষট্টি বছরের এক ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রীর সাথে মঠে আমার কি করে দেখা হল। আমাকে দেখেই বলছেন, 'আমরা দুজনে আত্মহত্যা করতে চাই'। শুনে তো আমার মেজাজ প্রচণ্ড গরম হয়ে গেছে। কেন আত্মহত্যা করতে চাইছেন? কাহিনীটা হল ওনাদের অনেক টাকা-পয়সা আছে, ছোটখাটো একটা ইণ্ডাস্ট্রি আছে। পুত্রবধূর সাথে ভদ্রমহিলার ঝামেলা। আমি মজা করে জিজ্ঞেস করলাম, 'মারধোর করে নাকি'? বললেন 'হ্যাঁ তাও করে'। কথা শুনে আমি অস্বস্থিতে পড়ে গেলাম। আমি বললাম, 'আপনারা আলাদা একটা বাড়ি করে নিলেই তো পারেন'। এই কথা বলার পর বুঝলাম আসল সমস্যা কোথায়। ওনাদের এক নাতি আছে, নাতিকে ভদ্রমহিলা এত ভালবাসেন যে, ওকে ছেড়ে ঠাকুরমা থাকতে পারেন না। অন্য দিকে স্ত্রীকে ছেড়ে ভদ্রলোক থাকতে পারবেন না। ফলে পুত্রবধূর সমস্ত লাঞ্ছনা সহ্য করতে হচ্ছে। আমি বললাম, আপনাদের আর কি পথ আছে বলুন, এইভাবেই থাকুন। সুইসাইড করে কি হবে, মরে ভূত প্রেতনী হয়ে ওদের বাড়ির কাছে ঘুর ঘুর করতে থাকবেন। চোখের সামনে নাতিকে দেখবেন কিন্তু নাতিকে আদর তো দূরের কথা, স্পর্শও করতে পারবেন না, সে আরেক তীব্র যন্ত্রণা। বরঞ্চ এখন লাঞ্ছনা সহ্য করেও নাতিকে আদর করতে পারছেন। নিজের ফলের ফল কিনা, নিজের সন্তানের সন্তান। শুধু যে নিজের ফলে আসক্তি তা না, ফলের ফলে আসক্তি। আসল থেকে সূদ অনেক বেশি প্রিয়। আগেকার দিনে গ্রামদেশের বুড়িরা সুদে টাকা দিত। মূল টাকাটা ছেড়ে দেবে, কিন্তু সূদ ছাড়বে না, সূদের প্রতি এমন আসক্তি। এরপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দেখাচ্ছেন, যোগ আর সন্ন্যাস কেমন মিলেমিশে রয়েছে।

সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্নকারয়ন্।।১৩।।

(কিন্তু যিনি পরমার্থদর্শী, সেই জিতেন্দ্রিয় পুরুষ বিবেক বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত রকমের কর্ম ত্যাগপূর্বক নিজে কিছু না করে দেহেন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাতে আত্মাভিমানশূন্য, নিরায়াস ও প্রসন্নচিত্তে নবদ্বার বিশিষ্ট দেহনগরে অবস্থান করেন।)

আমাদের এই শরীর হল নবদ্বার যুক্ত। শরীরটা যেন একটা নগরী, আর চোখ, কান, নাক, মুখ এবং নীচে দুটি, সব মিলিয়ে নগরীর নয়টি দরজা। এর মধ্যে বসে আছেন সেই জীবাত্মা। *সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী*, মন থেকে সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে আত্মা সুখে বসে আছেন। কারুর মাথার উপর যদি একটা বিশাল ভারী বোঝা চাপানো থাকে, আর সেটাকে সে কোন রকমে যদি ফেলে দিতে পারে, বোঝাটা হাল্কা হওয়ার পর স্বাভাবিক ভাবেই সে সুখী হয়ে নিজেকে স্বচ্ছন্দ মনে করবে। ঠাকুরও বার বার বলছেন, তোমরা গৃহস্থ, তোমাদের মনে ত্যাগ। সন্ন্যাসীর মনের ত্যাগ বহিঃত্যাগ দুটোই চাই। *নবদ্বারে পুরে দেহী*, তিনি এই শরীরের মালিক, *নৈব কুর্বন্নকারয়ন্*, তিনি নিজেও কোন কাজ করেন না, কাউকে দিয়েও কোন কাজ করান না। এনারাই হলেন সুখী।

এখানে একটা সুন্দর প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে। একজন প্রশ্ন করছেন, 'এটা সন্ন্যাসীদের নিয়ে কেন বলছেন? নবদ্বারের যে শরীর এর মধ্যে সুখে বসে আছেন, সবাই তো এভাবেই থাকে'। আচার্য তখন বলছেন, না, *যঃ তু অজ্ঞো দেহী দেহেন্দ্রিয়সংঘাতমাত্রাত্মদর্শী* যারা অজ্ঞ হয়, সাধারণ যারা, তারা শরীর আর ইন্দ্রিয়ের যে সংঘাত, এটাকেই আত্মা মনে করে। সেইজন্য সে কখন মনে করে না, এই দেহে আমি বাস করছি। কিন্তু যিনি জ্ঞানী, যিনি জ্ঞানের পথে পা ফেলে এগিয়ে পড়েছেন, তিনি পরিষ্কার জানেন, আমি আলাদা দেহ আলাদা। আজ এই দেহে আছি, কাল আমি অন্য দেহে থাকব। সেইজন্য এনাদের এই বোধটা থাকে যে, আমি নিজেও কিছু করি না, অপরকে দিয়েও কিছু করাই না। আজকে আমি এই শরীরে বাস করছি, এখন আমি এই শরীরের মালিক; আগে অন্য শরীরে বাস করছিলাম। শরীর আলাদা আমি আলাদা, এই বোধটা এনাদের সব সময় থাকে। কেন থাকে? এরপর আমরা পরের দুটো শ্লোকের উপর আলোচনা করতে যাচ্ছি।

আপনাদের সবাইকে সাবধান করে দিতে চাই, কারণ পরের এই দুটো শ্লোকে বেদান্তের একেবারে শেষ কথা বলা হয়েছে, কেউ যেন ঘাবড়ে না যান। বেদান্ত সবার জন্য নয়। যাদের হৃদয় দুর্বল, যাদের মন আরও দুর্বল, তাদের জন্য গীতা নয়, বেদান্ত নয়, এমনকি হিন্দু ধর্মও তাদের জন্য নয়। হিন্দু ধর্ম দুর্বলদের জন্য নয়। এটা সত্যিই খুব দুর্ভাগ্যের যে, হিন্দু ধর্মে এখন যত কাপুরুষ, যত দুর্বল, অজিতেন্দ্রিয়রা জন্ম নিয়েছে।

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে।।১৪।।

(কারণ আত্মা মানুষের কর্তৃত্ব, কর্ম ও কর্মফলপ্রাপ্তি সৃষ্টি করেন না; কিন্তু অবিদ্যারূপিণী মায়াশক্তি কর্তৃত্বাদিরূপে প্রবর্তিত হয়; অর্থাৎ অবিদ্যাপ্রভাবে কর্তৃত্ব ও কারয়িতৃত্বাদি আত্মাতে আরোপিত হয়।)

আর-একবার বলছি, এই শ্লোকের অর্থ ও ব্যাখ্যা শুনে বিচলিত হবেন না, কিন্তু এটাই সত্য। যিনি সব কিছুর প্রভু, যিনি আপনার আমার ভিতরে আত্মা রূপে রয়েছেন, ইনি কোন কিছু করেন না, কাউকে দিয়েও কিছু করান না। *ন কর্তৃত্বং*, আমরা যে সব সময় বলে যাচ্ছি, ভিতরে যিনি আছেন তিনিই সব কিছু আমাদের দিয়ে করাচ্ছেন, কিচ্ছু তিনি করান না। তিনি মুক্ত, কেন তিনি করাতে যাবেন!

ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ, ভিতরে যিনি প্রভু আছেন, আর বাইরে যিনি সব কিছুর প্রভু, দুজন আলাদা নন; কেউ কিছু করেন না। আমার আপনার যিনি আত্মা, তিনি কাউকে কোন আদেশ দেন না, কোন নির্দেশ দেন না, কাউকে দিয়ে কিছু করান না, নিজেও কিছু করেন না।

ন কর্মফলসংযোগং, কর্ম করলে কর্মের যে ফল হবে, তিনি সেই কর্ম আর তার ফলের কোন সংযোগ করে দেন না। তাহলে কিভাবে সব কিছু হয়?

স্বভাবস্তু প্রবর্ততে। প্রকৃতি প্রকৃতির উপর কাজ করছে। দেহটা প্রকৃতি, ইন্দ্রিয়টা প্রকৃতি, বিষয়গুলি প্রকৃতি, প্রকৃতি প্রকৃতির উপর কার্য করে চলছে। এটা সত্য যে, আত্মা আছেন বলেই এই সব কিছু হচ্ছে। কিন্তু আত্মা কোন কিছুই করেন না, তিনি নির্বিকার। তাহলে ভগবান, যিনি উপরে আছেন, তিনিই কি সব করছেন? না তিনিও কিছু করেন না।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।।১৫।।

(পরমার্থতঃ আত্মা কারও পাপ বা পূজা জপহোমাদি কর্মের পূণ্যও গ্রহণ করেন না। অবিদ্যা দ্বারা বিবেকজ্ঞান, আত্মজ্ঞান আবৃত বলে প্রাণীগণ মোহগ্রস্ত হয়ে মনে করে 'আমিই করি ও করাই', 'আমি ভোগ করি ও করাই' – ইত্যাদি ভ্রম করে থাকে।)

বিভূঃ, যিনি ভগবান, শ্রীরামকৃষ্ণ, *নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং*, আমি কোন ভুল করলে, অন্যায় করলে ঠাকুর আমাকে কোন পাপ দেন না। *ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ*, তার সাথে আমি ভাল যা কিছু করছি, সেটাও ঠাকুর নেন না। কি করে নেবেন! যদি নিতে শুরু করেন তাহলে জগতে যত পাপ আছে সব পাপ তাঁর কাছে চলে যাবে, তিনি তো পাপের সমুদ্র হয়ে দাঁড়াবেন। তাহলে লোকেরা যে বলছে, আমি ঠাকুরকে সব অর্পণ করলাম, আমি এই দিলাম, সেই দিলাম?

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ, যারা অজ্ঞানী, আসলে তাদের স্বরূপজ্ঞান অজ্ঞান দিয়ে আবৃত হয়ে আছে, মোহিত হয়ে তারা মনে করে 'আমি তাঁকে সব অর্পণ করলাম'। বেদান্তের শেষ কথা, *তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ*, যত প্রাণী আছে তাদের আসল জ্ঞান অজ্ঞানে ঢাকা পড়ে আছে, সেইজন্য তারা মনে করে, ঠাকুরই আমাদের দেখছেন, করোনা ঠাকুরই দিয়েছেন, ঠাকুরই আবার করোনা থেকে মুক্তি দেবেন। ঠাকুরের ভারি বয়ে গেছে সারা বিশ্বে করোনা ছড়িয়ে দিতে। তাহলে ঠাকুরকে পূজা করে কি হবে? পূজা না করে করবেনই বা কি; ঠাকুর আপনার স্বরূপ, যদি পূজা না করেন, মাঠে বসে যাবেন, আরও বেশি বেশি করে জগতের সঙ্গে জড়িয়ে যাবেন।

ভগবান তাহলে আমাদের কি দেন? ভগবান আর কি দেবেন, তিনি আমাদের স্বরূপ জ্ঞান দেন। স্বরূপ জ্ঞান পেয়ে গেলে তো আপনি রাজা, সব কিছুর মালিক হয়ে গেলেন। এই যে আপনি কুকুরের মত জিভ বার করে জগতের পিছনে দৌড়াচ্ছেন, এটা আপনার দোষ, ভগবানের তাতে কি আছে। যদি আপনি প্রার্থনা করতে শুরু করে, ভগবান তখন আপনাকে আপনার স্বরূপ জ্ঞান দিয়ে দেবেন, স্বরূপ জ্ঞানের উপর আর কিছু হয় না।

অন্তর্যামী রূপে যিনি প্রভু, আমার মধ্যে যে আমিত্ব আছে, সেটাও তিনি দেন না, তিনি যে কোন কর্মের সৃষ্টি করছেন, তাও না। তাহলে কি কর্মগুলি নিজে থেকে এক অপর থেকে হয়ে যাচ্ছে? তাও না। তাহলে কি করে হয়? *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে*, প্রকৃতি প্রকৃতির উপর কাজ করে যাচ্ছে। *নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং*, ঠাকুর তুমি আমার দোষটা নিয়ে নাও, কোন দিন ঠাকুর নেবেন না। *ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ*, আমি রোজ চণ্ডী পাঠ করছি, গীতা পাঠ করছি, ঠাকুর আমার যেন পূণ্য হয়, ঠাকুরের ভারি বয়ে গেছে পূণ্য দিতে। ভগবান এদিকেও নেই, সেদিকেও নেই। কারা এই রকম ভাবে? অজ্ঞানীরা এই ভেবে সব কাজ করে। আমি আপনি অজ্ঞানী, সেইজন্য যা করছি মনে করছি ঠাকুর আমাকে পূণ্য দেবেন, আমার সব পাপ নিয়ে নেবেন। তাহলে কি হয়? এই ভাবে করতে করতে কোন একটা সময় আমরা ধীরে ধীরে স্বরূপ জ্ঞানের দিকে এগোতে শুরু করব।

আচার্য সংসারী মানুষদের নিয়ে বলছেন, আমরা সবাই সংসারী, আমরাই বলি, *করোমি কারযামি ভোক্ষ্যে ভোজয়ামি*, করছি, করাচ্ছি, খাচ্ছি, খাওয়াচ্ছি। আচার্য বলছেন *কিমর্থং তর্হি ভক্তৈঃ পূজাদিলক্ষণং যাগদানহোমাদিকং চ সুকৃতং প্রযুচ্যতে*, তাহলে ভক্তরা যে পূজা করে, শুভ কর্ম করে, যজ্ঞ করে, দান করে, হোম করে, সুকৃত কর্ম করে, এত কিছু কিসের জন্য অর্পণ করে? আচার্য বলছেন, অজ্ঞানীরা অজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানকে অর্পণ করে। এটাই বেদান্তের শেষ কথা, এটাই আদর্শ, এই অবস্থায় আমরা সবাই যেন পৌঁছাতে পারি। কিন্তু প্রথমেই যদি সব কিছু করা বন্ধ করে দেন, তাহলে, ঐ যে আগে বললেন, জ্ঞানরহিত সন্ন্যাস হয়ে যাবে। আপনি প্রচুর কাজ করেছেন, কাজ করে করে কর্মযোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন, কর্মযোগ থেকে যখন *ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা* হয়ে গেছে, তখন ঈশ্বরের প্রতি কে অর্পণ করবেন, যিনি জ্ঞানী তিনিই অর্পণ করবেন। আমি আপনি সবাই অজ্ঞানী, কোন সন্দেহ নেই। এটা হল ভক্তি পথের থেকে একটা বিরাট তফাৎ, একেবারে বিশুদ্ধ বেদান্তের কথা। যতক্ষণ মনের এলাকায় আছি ততক্ষণ ঈশ্বর আছেন, ততক্ষণ এগুলো সব আছে। কিন্তু মনের এলাকাটাই তো অজ্ঞানের এলাকা।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্।।১৬।।

(আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁদের অনাদি অজ্ঞান বিনষ্ট হয়ে গেছে, সূর্য যেমন সমস্ত বস্তুকে অবভাসিত করেন, তেমন তাঁদের আত্মজ্ঞান শ্রুতিস্মৃতি-প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকে সর্বস্তুতে প্রকাশিত করে।)

যখন আত্মজ্ঞান হয়, তখন এই আত্মার জ্ঞান অনাদি অজ্ঞানকে নাশ করে দেয়। অন্তঃকরণে, আমাদের মনের ভিতরে যে অনাদি অজ্ঞান রয়েছে, যে অজ্ঞানের দরুণ জীব মোহিত হয়ে আছে। এই যে আত্মবিষয়ক বিজ্ঞান, আমি কে, এই জ্ঞান রাত্রির অবসানে ভোরের পূব আকাশে সূর্যোদয়ের সাথে আলো প্রস্ফুটিত হয়ে রাত্রির অন্ধকারের সমস্ত কালিমা সরে গিয়ে সব কিছু যেমন পরিষ্কার দেখা যায়, ঠিক তেমনি এই জ্ঞানের উন্মেষের সাথে সাথেই তার সমস্ত অনাদি অজ্ঞান দুরীভূত হয়ে আত্মার ব্যাপারে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। আমি আপনি এটা থিওরেটিক্যালি বললে পাপ হবে, কারণ আমরা অজ্ঞানে আছি। যতক্ষণ নিজে খাচ্ছি এই বোধ থাকবে, ততক্ষণ প্রভুকে অর্পণ করে খেতে হবে। আত্মার ব্যাপারে সব কিছু যখন পরিষ্কার হয়ে যায় তখন কি হয়?

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মনস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ।।১৭।।

(পরমাত্মাতেই যাঁদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, তাঁতেই যাঁদের চিত্ত নিবিষ্ট, তাঁতেই যাঁদের পরম প্রীতি, তিনিই যাঁদের পরম আশ্রয় – এই জ্ঞানদ্বারা বিধৌতপাপ যোগীরা ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়ে মুক্তি লাভ করেন, তাঁদের আর পুনর্জন্ম হয় না।)

আপনি যদি সেই অবস্থায় পৌঁছাতে চান, যে অবস্থায় আপনার সমস্ত অপবিত্রতা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, জ্ঞানে আপনি পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবেন, তার জন্য আপনাকে কি করতে হবে? *তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মনস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ*, বলছেন, যে পরমার্থ তত্ত্ব, যে তত্ত্বে বলছেন আত্মাই সত্য, ঈশ্বরই সত্য, এই তত্ত্বে যাঁর বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তাঁরা হলেন *তদ্বুদ্ধি*। *তদ্বুদ্ধি* মানে, যিনি এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন –আত্মাই সত্য।

আর পরব্রহ্ম যাঁর আত্মা, এই বোধ যাঁর হয়ে গেছে, তিনি হলেন *তদাত্মনঃ*।

ঐ আত্ম ভাবনাতে যাঁর মন নিবিষ্ট হয়ে গেছে, মানে দৃঢ় হয়ে গেছে, ফলে যেখানে সমস্ত কর্মকে সন্ন্যাস করে দিলেন, এটাকে বলছেন *তন্নিষ্ঠাঃ*।

তৎপরায়ণাঃ, ফলে কি হয়, এনারা যাবতীয় যা কিছু করে থাকুন, তিনি জানেন আমার পরমগতি হল সেই পরমাত্মা, সেই পরমব্রহ্ম এবং আমার সব কিছু পরমব্রহ্মে সমর্পিত, তখন এটাকে বলছেন, *তৎপরায়ণাঃ*।

মন, বুদ্ধি, প্রাণ সব আত্মাতে বিলীন হয়ে গেছে, যখন এই অবস্থা হয়, তখন *জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ*, যত পাপ আদি আছে সব নাশ হয়ে গেল।

গচ্ছ্যন্তি অপুনরাবৃত্তিং, সন্ধি করে বলছেন *গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং*, মৃত্যুর পর তাঁর আর জন্ম হয় না, মুক্ত হয়ে গেলেন। যিনি এই অবস্থায় পৌঁছে যাওয়ার পর তাঁর দেহটা যখন পড়ে গেল, তখন তাঁকে আর এই জন্ম-মৃত্যুরূপী সংসারে আর ফিরে আসতে হয় না।

এই জ্ঞান যে মৃত্যুর পরে পেতে হয়, তা না, এই জ্ঞানটা পেতে হবে এই শরীর থাকতে থাকতেই। একমাত্র হিন্দু ধর্মই বলে, জীবদ্দশায় এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করতে হবে, এই জীবদ্দশায় ঈশ্বর দর্শন লাভ করতে হবে, জীবদ্দশায় নিজের জীবনকে ধন্য করে নিতে হয়; পরের জন্মের জন্য অপেক্ষা করা চলবে না। এটাকেই বলা হয় জীবনমুক্তি। বিশ্বে একমাত্র হিন্দুরাই জীবনমুক্তির কথা বলেন।

পঞ্চম অধ্যায় শুরু করার সময় আমরা আলোচনা করেছিলাম, ব্রহ্মজ্ঞান দুটো সময় হতে পারে, এক জীবদ্দশায়, আর এক মৃত্যুকালে। আমাদের খুব প্রচলিত বিশ্বাস যে মৃত্যুকালে জ্ঞান হয়। শ্রীশ্রীমাও অনেক ভক্তকে বলছেন, চিন্তা করো না, শেষ সময়ে ঠাকুর এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন। কিন্তু ওটা ঠিক ঠিক হিন্দু ধর্মের ভাব না। কাশীতে মরলে মুক্তি হবে, এটাও ঠিক ঠিক হিন্দু ধর্মের ভাব নয়। মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবে, অনন্ত সুখ ভোগ করতে পারবে, এই ভাবও হিন্দু ধর্মের একেবারেই ঠিক ঠিক ভাব না। ঠিক ঠিক হিন্দু ধর্ম কি, এর বর্ণনা গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে ঊনিশ নম্বর শ্লোকে করছেন।

যাঁরা পুরো গীতা মুখস্ত করতে পারবেন না, তাঁরা অন্ততঃ এই দুটি শ্লোক, পঞ্চম অধ্যায়ের আঠারো আর ঊনিশ নম্বর শ্লোক অবশ্যই মুখস্ত করবেন। ঊনিশ নম্বরে শ্লোকে আধ্যাত্মিক জীবনের উদ্দেশ্যকে নিয়ে বলছেন। গ্রাম্য লোকাচার, দেশাচার আর পরিবারের যে আচার, এটা কোন ধর্ম না। ধর্ম আসে শাস্ত্র থেকে, শাস্ত্র মানে ঋষিদের কথা, ভগবানের কথা। বিদেশ থেকে ফিরে এসে স্বামীজী ভারতে বিভিন্ন জায়গায় যে লেকচার দিচ্ছিলেন, সেখানে তিনি কত কঠোর ও কড়া ভাষায় বলছেন, লিখছেন, তোমাদের ধর্ম এখন রান্নাঘরে ঢুকে গেছে। ঘটিকে বাটি ছুলে ঘটি অশুদ্ধ হল, না বাটি অশুদ্ধ হল এই বিচার করে করেই তোমাদের এই দুর্লভ মনুষ্যজীবনটা কাটিয়ে দিলে।

স্বামীজীর লেকচারগুলো সেই সময় সাঙ্কেতিক লিপিতে গুডউইন লিপিবদ্ধ করছিলেন। গুডউইন একটা চিঠিতে স্বামীজীর এই কথাকে উল্লেখ করে তাঁর মাকে খুব দুঃখ করে লিখছেন, ‘এই হিন্দুদের কোন দিন উত্থান হবে না’। প্রতি বছর পাড়ায় পাড়ায়, দূর্গাপূজা হচ্ছে, কালীপূজা হচ্ছে, বাড়ি বাড়ি লক্ষ্মীপূজা হচ্ছে, আর সারা বছর ধরে তের পার্বণ লেগে আছে। কিন্তু তাতে আধ্যাত্মিক উত্থানের জন্য যে জিনিসগুলির বেশি প্রয়োজন, সেই পূজা, জপ, ধ্যানে কত জনের মন আছে? কি কি রান্না হবে, রান্না কত রকমের ভোগ থালায় কত ভাবে সাজানো হবে, এগুলোতেই সব মনটা লেগে আছে। আর যে যাই বলুক এটা কখনই হিন্দু ধর্ম হতে পারে না। এসবের জন্যই সমস্ত বিশ্ব হিন্দু ধর্মকে নিয়ে এত হাসাহাসি করে। যেগুলোর কোন দাম নেই, সেগুলোই আমাদের কাছে সব মুখ্য হয়ে গেছে। শুধু আঠার আর ঊনিশ নম্বর এই দুটি শ্লোক মুখস্ত করে নিতে পারলে জীবন ধন্য হয়ে যাবে। লিখে নিন, এটাই জীবনের আদর্শ। কারণ এটাই হিন্দু ধর্মের মূল ভাব।

উনিশ নম্বরে বলছেন জীবনের আদর্শ কি আর আঠারো নম্বর শ্লোকে বলছেন সেই আদর্শে যিনি পৌঁছে গেছেন, তাঁর আচরণ কি রকম হবে। আগে বলা হল, ব্রহ্মজ্ঞান দুটো অবস্থায় হয়, এক জীবদ্দশায় আর মৃত্যুর সময়ে, গীতাও বার বার এই কথা বলবেন। হিন্দুদের ঠিক ঠিক ধর্ম হল জীবনমুক্তির ধর্ম, আত্মজ্ঞানের ধর্ম। এই ধর্ম আমাকে জীবদ্দশায় পেতে হবে, জীবদ্দশায় না পাওয়া গেলে ওটা মন্দের ভাল। কারণ মৃত্যুর পর কি আছে কে জানে।

মহাভারতে একটা কাহিনীতে বলছেন, কোন এক দুর্ভিক্ষের সময় বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষুধার জ্বালায় এক চণ্ডালের বাড়িতে ঢুকে তার মরা কুকুরের মাংস চুরি করতে গেছেন। চণ্ডাল টের পেতেই বলছে, 'কে এই হতভাগা, যে চণ্ডালের বাড়িতে ঢুকে কুকুরের মাংস চুরি করতে এসেছে'? বিশ্বামিত্রের নাম সবাই জানত, তিনি পরিচয় দিতে চণ্ডাল চমকে বলছেন, 'আপনি একি করছেন'? বিশ্বামিত্র বলছেন, 'আমি যদি এই ক্ষুধার্থ অবস্থায় মাংস না খাই আমি এই মুহুর্তে মারা যেতে পারি। মৃত্যুর পরে স্বর্গ আছে কিনা কে দেখেছে, আর কে জানে! এই মাংস খেয়ে বেঁচে থাকলে, এতে আমার যা পাপ হবে এর জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করে নেওয়ার অনেক সুযোগ পেয়ে যাব। কিন্তু আমি যদি মরেই যাই তাতে আমার কি লাভ হবে'! জীবনে তখনই compromise করতে হয়, যেটা না করলে আমার প্রাণ চলে যাবে। এর বাইরে compromise করতে নেই, এমনিতে হাসি ঠাট্টা মজাতে আমরা যে compromise করে থাকি, সেটাও করতে নেই; মূল কথা ধর্ম জীবনকে কখন ছাড়তে নেই।

যখন জীবন-মরণ সমস্যায় আছেন তখনও উদ্দেশ্য হবে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ওখান থেকে বেরিয়ে আসা। জীবদ্দশায় যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী হন, এনাদের বর্ণনা দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই শুরু হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে এটাকে আরও বিস্তারে বলছেন, পঞ্চম অধ্যায়ের শুরুতেও আমরা এই কথা বলেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেখানে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণের কথা বলা হয়েছিল, সেখানেও এই কথাগুলো বলা হয়েছিল, এখানেও বলছেন। তবে এই দুটি শ্লোকে জীবনের উদ্দেশ্য কি এবং তাঁর বাহ্য আচরণ কেমন হবে বলছেন।

আমরা এখন মন নিয়ে কিছু কথা বলব। স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণের আলোচনায় আচার্যের একটা কথা বলা হয়েছিল, আচার্য সেখানে খুব নামকরা কথা বলেছিলেন – সিদ্ধ পুরুষের যেটা আচরণ, সাধারণ মানুষকে সেটাই কষ্ট করে অনুশীলন করতে হয় বলে সেটাই সাধনা হয়ে যায়। সাধনা মানে, আমার আপনার দৃষ্টিতে যিনি সিদ্ধ পুরুষ, যেমন আমাদের কাছে ঠাকুর সিদ্ধ পুরুষ, স্বামীজী একজন সিদ্ধ পুরুষ; এনাদের যে আচরণ ছিল, সেটাকেই আমাদের কষ্ট করে জীবনে নামাতে হবে। গীতা আদি গ্রন্থে মুক্ত পুরুষদের আচরণের বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন এই আঠার নম্বর শ্লোক; আমাকে আপনাকে এটাই পালন করার চেষ্টা করতে হবে।

হিন্দু ধর্মে সাধনা আর সিদ্ধিতে কোন তফাৎ হয় না। সিদ্ধির পরে আমি যেটা করব, সাধনার সময় একই জিনিস করতে হবে। বেলুড় মঠ থেকে দীক্ষা নিয়ে দুদিন পরে এসেই মহারাজদের প্রশ্ন করতে শুরু করেন, ঠাকুরের দর্শন কেন হচ্ছে না, কবে দর্শন হবে, ইত্যাদি। ঈশ্বরদর্শন হলে মাথায় কি দুটো শিং বেরিয়ে যাবে? তা নয়, ঈশ্বরদর্শন হলে জীবনের সত্যটা স্পষ্ট হয়ে যায়। শ্রীশ্রীমা বলছেন, ঠাকুর যেন আলু পটল, আমি এত জপ করব আর ঠাকুরের দর্শন হয়ে যাবে! না, তা হবে না। এই যে জগৎ যেটা দেখছি, জগতের প্রতি দৃষ্টিটা আমাদের পাল্টে যাবে, আসল যেটা সেটাকে আমরা দেখতে পাবো। কারণ সমুদ্রের ঢেউ দেখে দেখে আমাদের ঢেউ দেখার অভ্যাস হয়ে গেছে; মাঝখান থেকে সমুদ্র দেখাটা আমরা ভুলেই গেছি। এই ঢেউগুলো যে সমুদ্র থেকে আসছে, সমুদ্রে লয় হচ্ছে, সমুদ্রেই এর স্থিতি, এটা ভুলে যাই। সৃষ্টিকে দেখে দেখে, সংসারের বস্তুকে দেখে দেখে ভুলে গেছি, এই যা কিছু আছে সমস্ত কিছু সেই আত্মা, সেই ব্রহ্ম, সেই ঈশ্বরের উপর খেলা করছে।

ঈশ্বর দর্শন বা আত্মজ্ঞান হলে, ঢেউ থেকে দৃষ্টিটা সরে সমুদ্রে চলে যায়। ঢেউয়ে যখন দৃষ্টি থাকে তখন আমরা সব সময় বিচার করতে থাকি এটা বড় ঢেউ, এটা ছোট ঢেউ, এটা এই রকম ঢেউ, ওটা সেই রকম ঢেউ। ঢেউ থেকে সমুদ্রের দিকে চোখ চলে গেলে তখন এই যে পৃথকীকরণ, ভাল-মন্দ, ছোট-বড়, পাপ-পূণ্য, জীবন-মৃত্যু যত রকম পৃথকীভাব রয়েছে, যত রকমের ভেদভাব আছে, সব কিছুর সমাপ্তি হয়ে যায়।

সংসারে এই পার্থক্যগুলি কিভাবে আসে? সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণ দিয়ে। সত্ত্বগুণীর মধ্যে জ্ঞানের স্পৃহা থাকে, তিনি জ্ঞানী হন, তবে এই জ্ঞান আত্মজ্ঞানের জ্ঞান নয়। আমার কয়েকজন বন্ধু আছেন, যাঁদের সাথে জ্ঞান সংক্রান্ত অনেক কথাবার্তা হয়। এনারাও হোয়টস্ আপ, ফেসবুক করেন, কিন্তু ওনাদের সব সময় নজর থাকে কোন ভাল খবরের দিকে, যেটা জ্ঞান সংক্রান্ত। বলা হয় যে, যাঁরা ফেসবুক করেন, যাঁরা সত্যিকারের ভাল মানুষ তাঁরা যখন ফেসবুকে কোন কিছু পোস্ট করেন, সব সময় জ্ঞান সম্পর্কিত পোস্ট করেন। এইভাবে এক এক করে দেখানো হয়, যারা অধম তারা শুধু নিজের ছবিগুলো দিয়ে বেড়ায়। অনেকে সারাক্ষণ সেলফি নিতে থাকে, বলে, সেলফি নেওয়াটা নাকি একটা মানসিক ব্যাধি। যাঁদের জ্ঞানের প্রতি স্পৃহা থাকে, তাঁরা সত্ত্বগুণী। মন তাঁদের ধীর, শান্ত, সবারই প্রতি প্রেম ও করুণা থাকে আর উদার স্বভাব। আমি লুটেপুটে খাব, এই ভাব একেবারেই থাকে না।

রজোগুণীরা সব সময় আমি আমি করতে থাকে। তমোগুণীদের বাইরে থেকে দেখতে সত্ত্বগুণীর মত মনে হয়, কিন্তু পুরোপুরি তামসিক। কাজ করতে চাইবে না, কোন কিছুর প্রতি উৎসাহ নেই, দীর্ঘসূত্রী, কোন কাজ করতে বললে, এক ঘন্টার কাজকে এক সপ্তাহ ধরে বলতে থাকবে, এই তো করে দিচ্ছি। আর যে কাজই করবে দায়সারা ভাবে করবে। সত্ত্বগুণী এরকম হয় না, সত্ত্বগুণীকে কোন কাজ করতে বললে, চটপট আর নিখুঁত ভাবে করে দেবে।

শাস্ত্র আমাদের বুঝিয়ে দেয় জগতে কিভাবে এই তিনটে গুণের জন্য কত রকমের বিভাজন হয়ে আছে। যাকে আমি পছন্দ করি না, আমি তার নামে কি কি বলি? কেন পছন্দ করি না? তার মধ্যে এই এই দুর্গুণ থাকার জন্য তাকে আমি পছন্দ করি না। কি কি দুর্গুণ? প্রথম সে একটা বদমাইশ, দ্বিতীয় বলব, সে নিন্দুক, সে কামী, সে লোভী, সে অহঙ্কারী, সে স্বার্থপর; এই ধরণের অনেক দুর্গুণের কথা বলব। এই সব কটা দুর্গুণ তামসিক আর রাজসিক লোকের মধ্যে থাকবে। সাত্ত্বিক লোকের নিন্দা হয় না। শ্রীশ্রীমা যখন বলছেন, কারুর মধ্যে দোষ দেখবে না, তখন এর দুটো অর্থ হয়। একটা অর্থ হল, জগতে পর তো কেউ নেই, ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। কেন কারুর দোষ দেখতে নেই, যেটা এই আঠার নম্বর শ্লোকে বলবেন। দ্বিতীয় অর্থ হয়, কারুর গুণের মধ্যে দোষ দেখতে যেও না। আচার্য শঙ্করও এর আগে এই কথা বলেছেন। আমাদের দুর্বলতাটা কি? আমরা অপরের নিন্দা কেন করি? যার গুণটাকে আমার কাছে দোষ বলে মনে হয়। নিজের ছেলে যদি ভাল কথা বলে, অমনি সে বলবে, 'দেখেছ আমার ছেলেটা কত সুন্দর কথা বলতে শিখেছে, কি সুন্দর গুছিয়ে কথা বলে'। অন্যের ছেলে বললে বলবে, 'এই বয়সেই একটা ডেঁপো হয়ে গেছে, বেশি ফটর ফটর করে'। নিজের ছেলে যদি আগ বাড়িয়ে চটফট করে সব কাজ করতে থাকে, সে বলবে 'আমার ছেলেটা কি কাজের ছেলে হয়েছে'। অপরের ছেলে করলে বলবে, 'বেশি মাতব্বর হয়ে গেছে, সব সময় ছটফট করে যাচ্ছে'। এটাই হল গুণে দোষ দেখা।

যেটা তার সত্যিকার দোষ, সেই দোষ যদি আপনি দেখতে পান, তাহলে তো আপনি আচার্য। এই দোষ দেখাটা আচার্যের কাজ, আপনি তো আচার্য নন। সবার মধ্যে যে আমরা দোষ দেখে বেরাই, এটা আচার্যের কাজ। আমরা সাধারণ মানুষ বলে গুণের মধ্যে দোষ দেখি। কিন্তু

সত্ত্বগুণী মানুষ এই রকম গুণের মধ্যে দোষ দেখেন না। আর যিনি আত্মজ্ঞানী, দোষ দেখবেন, কোন প্রশ্নই নেই। আত্মজ্ঞানীর কাছে আলাদা বলে কিছু নেই।

বেদ, উপনিষদ, গীতা সব শাস্ত্রে এই কথা বার বার আসবে। আত্মজ্ঞানীর মধ্যে inclusiveness এসে যায়। আমাদের মধ্যে inclusiveness আনার জন্য অনুশীলন দরকার, আর ঠাকুরের কৃপায় যদি আত্মজ্ঞান হয়ে যায়, ঈশ্বর দর্শন হয়ে যায়, তখন আপনিও দেখবেন সব এক। তখন আর দেখতে যাবেন না, কার ভাল, কিসের ভাল, কিসের মন্দ। এটাকেই এবার আঠার নম্বর শ্লোকে উদাহরণ দিয়ে বলছেন –

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।১৮।।

(বিদ্বান ও বিনয়ী ব্রাহ্মণ, গরু, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালে ব্রহ্মজ্ঞানীগণ সমদর্শী হন, অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন করেন।)

পণ্ডিত কে? আচার্য শঙ্কর পণ্ডিতের সংজ্ঞা দিচ্ছেন, আত্মার বিষয়ে যাঁদের বুদ্ধি স্থিত হয়ে গেছে, এনারাই হলেন পাণ্ডা বা পণ্ডিত, সব কিছুকে আত্মা রূপে দেখছেন, তিনি পণ্ডিত। পণ্ডিত মানে সংস্কৃতের পণ্ডিত না, শাস্ত্রের পণ্ডিত না, ইংরাজীর পণ্ডিত না, ফিলজফির পণ্ডিত না। শাস্ত্রে পণ্ডিতের অর্থ, যাঁদের বুদ্ধি আত্মাতে গিয়ে বসে গেছে। এর আগের শ্লোকে যেমন বলা হয়েছ, *তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মনস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ*, তৎ হল সর্বনাম, তৎ মানে সেই ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মে যাঁদের বুদ্ধি বসে গেছে, এর আগে আমরা আলোচনা করেছি। আত্মজ্ঞান একবার হয়ে গেলে, বুদ্ধি আত্মাতে বসে গেলে, নিষ্ঠা একমাত্র আত্মাতেই থাকলে, সব আচরণ ওর মধ্যে ঢুকে গেলে, তখন আর কিসের তফাৎ, কোথায় আলাদা কিছু! এই পণ্ডিতদের তখন জগতের প্রতি, সবার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী কি রকম হয় এবং কি করেন?

আগেকার দিন ব্রাহ্মণরা বাচ্চা বয়সে উপনয়ন হয়ে গেলেই গুরুগৃহে বেদ অধ্যয়ন করতে চলে যেতেন। সেখানে যে শুধু বেদের জ্ঞান অর্জন করতে যেতেন তা না, গুরুগৃহে গুরুর সঙ্গ করে করে তাঁরা একটা ভাল আচরণ শিখতেন। ছোটবেলাতে আমরা বাড়িতে কোন দুষ্টুমি করলে বাড়ির বড়রা বকুনি দিয়ে বলতেন, 'স্কুলে গিয়ে তুমি এই শিখছ'। কিন্তু এখন তো স্কুলে সদাচার শেখানো হয় না, জোর করে একটা ভ্যালু এডুকেশান দেওয়া হয়। কারণ বর্তমান কালে শিক্ষকরা ওখানে পয়সার জন্য আছে। আগেকার দিনে গুরুরা বিনা পয়সায় শিক্ষা দিতেন, এমনকি ছাত্রদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা গুরুরাই করতেন। সরকার থেকে শুরু করে আমরা সবাই স্বামীজীর শিক্ষার আদর্শ নিয়ে অনেক লম্বা লম্বা কথা বলি, কিন্তু সেখানে আমরা কেউ স্বামীজীর শিক্ষার দুটো আদর্শকে নিয়ে কোন কথা বলি না, যে দুটো আদর্শ খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটা আদর্শের কথা স্বামীজী দিয়ে গেলেন, শিক্ষার দায়ীত্ব ত্যাগীদের উপর অর্পণ করতে হবে। দ্বিতীয় আদর্শ হল –শিক্ষার ব্যয়ভার সমাজকেই বহন করতে হবে। স্বামীজীর এই দুটো আদর্শের কোনটাই রূপায়িত হয়নি।

সমাজে যতক্ষণ কেউ নিজেকে বলিদান না দেয়, ততক্ষণ সমাজ বড় হয় না। এই দায়ীত্ব আগে ব্রাহ্মণদের উপর ছিল। তুমি নিজেকে বিদ্যাতে সমর্পিত করে দাও। তবেই সমাজ বড় হবে। শিক্ষাটা তাহলে ফ্রী হতে হবে। সমাজই শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সোশালিস্টিক আইডিয়া নিয়ে এলেন। তখন শিক্ষা ছিল ফ্রী, সব রকম শিক্ষাতে খুব সামান্য একটা অর্থ দিতে হত, তা স্কুল হোক, কলেজ হোক, আইআইটি হোক, মেডিকেল হোক। ১৯৯১ সাল থেকে যখন লিবারাইজেশন শুরু হল, তখন থেকে সব কিছুতে শুধু টাকা আর টাকা। আমেরিকায় যেমন পুরো বিজনেস লাইফ, আমাদের এখানেও সবটাই বিজনেস লাইফ হয়ে গেছে। আইআইএমে এক একটা কোর্স ফী পনের লক্ষ টাকা, কুড়ি লক্ষ টাকা। শিক্ষা

দিনে দিনে হয়ে যাচ্ছে বড়লোকেদের জন্য। স্বামীজী বারবার বলছেন, শিক্ষার দায়ীত্ব সমাজকে নিতে হবে। তার মানে, শিক্ষা সব সময় ফ্রী হবে। তখনকার দিনে আচার্য যা বলতেন, ছাত্ররা সেটা শুনত, এখন ছাত্ররা শুনবে না।

বেলুড় মঠে একজন পণ্ডিত মহারাজ আছেন, তখনকার দিনের উনি এমডি ছিলেন, খুব ভাল ডাক্তার ছিলেন। তবে পরে উনি ডাক্তারিটা কম আর বিদ্যাচর্চাটা বেশি করতেন। ওনাকে একটা নামকরা মেডিক্যাল কলেজে লেকচার দেওয়ার জন্য ইনভাইট করা হয়েছিল। এক সময় ঐ কলেজ থেকেই তিনি পড়াশোনা করেছিলেন। উনি ওখানে গিয়ে যখন ওদের পড়াশোনা করার ফীজ্-এর কথা শুনলেন, শুনে উনি বলছেন, 'আমি এদের কি করে লেকচার দেব! তোমরা এই ছেলেগুলিকে দিয়ে টাকা আয় করছ, আমি ওদের ভ্যালু শেখাব কি করে? যে ছেলে এত টাকা দিয়ে এখানে ভর্তি হয়েছে, সেই ছেলে বেরিয়ে গিয়ে শুধু ভাবতে থাকবে কি করে আমি টাকা রিটার্ন পেতে পারি'। মহারাজ তাঁর প্রোগ্রামটাই বাতিল করে দিলেন। 'আমি ওখানে কিছু বলতে যাব না, আমার কথা ওরা কোন দিন শুনবেই না'। পুরো দেশটা আমেরিকার মডেলে একেবারে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষাকে যদি ফ্রী না করা হয়, তার থেকেও বেশি, যেটা স্বামীজী বলেছিলেন, শিক্ষার দায়ীত্ব থাকবে ত্যাগীদের উপর। সেইজন্য আজকালকার ছেলেমেয়েরা কোন ভ্যালু শিখছে না।

এখানে বলছেন *বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে*, বিদ্যার সাথে সাথে তার মধ্যে যথার্থ বিনয় আছে। বর্তমানের কালের ছেলেরা বিদ্যা পেয়ে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বিনয় নেই, চরিত্র নেই। কেন নেই? শেখাবে কে? মা-বাবা ব্যাঙ্ক থেকে মোটা টাকা লোন করে ছেলেকে বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যার্জনের জন্য পাঠাচ্ছে, আর ভিতরে ভিতরে ছটফট করছে, ছেলে কবে পাশ করে টাকা আয় করে আমাকে ঋণ মুক্ত করবে। শিক্ষকরা যাঁরা পড়াচ্ছেন, তাঁদের কাছে শিক্ষকতাটা ক্যারিয়ার। তাঁরা আরও টাকার জন্য আন্দোলন করছেন, বলছেন আমরা কেন তোমাদের জন্য sacrifice করব। ঠিকই বলছেন, যেখানে সবাই এই রকম হয়ে গেছে, সেখানে তো আর করার কিছু নেই।

আগে ছিল একটা জাতীয় আদর্শ, সমাজ এভাবেই তখন চলত, তোমাকে আমরা সম্মান দেব, টাকা দেব না। শিক্ষকরা এখন দুটোই চাইছে, টাকাও দিতে হবে, সম্মানও দিতে হবে। এভাবে হয় না, দুটোর মধ্যে একটাকে নিতে হবে। *বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে*, আগেকার দিনের ব্রাহ্মণদের সম্মান বেশি দেওয়া হত। এখন সেটা উঠে গেছে, কিন্তু পড়াশোনা করা মানুষকে এখনও সম্মান দেওয়া হয়। রিচার্ড ফাইনম্যানের একটা ঘটনা আছে। উনি খুব অল্প বয়সে প্রফেসর হয়েছিলেন। রিচার্ড ফাইনম্যন জিউস্ ছিলেন। তিনি একবার এক জিউস্ ফ্যামিলির সাথে দেখা করতে গেছেন। সেখানে চা ও অন্যান্য খাওয়া-দাওয়ার পর যখন ফাইনম্যানকে বিদায় জানানো হচ্ছে, তখন ফ্যামিলির বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা ফাইনম্যানের হাতে হাত মিলিয়ে বলছেন, 'আজকে আমার পরম সৌভাগ্যের দিন, আজ সকালে একজন আর্মি জেনারেলের সাথে দেখা হল আর এখন একজন প্রফেসারের সঙ্গে দেখা হল'। ফাইনম্যান বলছেন, 'যে সমাজ বিদ্যাকে এত সম্মান দেয় যে, একজন আর্মি জেনারেল আর একজন প্রফেসারকে সমান দেখছেন; সম্মানের দৃষ্টিতে সেই সমাজ কোন দিন মার খেতে পারে না'। এটা ফাইনম্যানের কথা, আমাদের কথা না, হিন্দুরা এটা অনেক আগে থেকেই মানত। ব্রাহ্মণ যদি বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন হয় তবেই তাঁকে সম্মান দেবে, শুধু বিদ্যা সম্পন্ন হলে একটু কম আর শুধু ব্রাহ্মণ হলে আরও কম। কারণ এই ব্রাহ্মণের যে বংশ, এই বংশই সেই বিদ্যাকে ধরে রেখেছে।

গবি, হস্তিনি আর তার সাথে *শুনি, শ্বপাক* অর্থাৎ গরু, হাতি, কুকুর ও চণ্ডালের কথা বলছেন। চণ্ডালের সমস্যা ছিল, এরা একটা মিশ্র জাতি, অন্ত্যজ শ্রেণীর। মনুস্মৃতিতে বর্ণনা আছে চণ্ডাল কাকে বলা হয়, যারা শ্মশানে মরা পোড়ানর কাজ করত। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর এগুলোর

অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটে গুণ দিয়ে এখানে শ্রেনীবিন্যাস করা হয়েছে। যেমন বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, ইনি হলেন সত্ত্বগুণী; প্রথমে উত্তম প্রাণীর কথা বলার পর একটু নীচে গরুর কথা বললেন, গরুকে রজো গুণের প্রতীক বলছেন, বাকিদের মধ্যে তমোগুণ এবং তমোগুণেরও তমোগুণ। বলছেন, আত্মজ্ঞানী এদের সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন। এটাই হিন্দুদের জীবনের আদর্শ, কাউকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করো না।

আচার্য বলছেন, *অত্যন্তম্ এব অস্পৃষ্টং*, যাদের মধ্যে কোন সংস্কার নেই, যেমন চণ্ডাল আদির মধ্যে কোন সংস্কার নেই, না আছে বিদ্যার সংস্কার, না আছে কোন আচারের সংস্কার, একেবারে সংস্কারবিহীন। পরে আবার দেখা গেল, আমাদের নিজেদের মধ্যে যারা সংস্কারবিহীন তাদেরকেও বলছেন চণ্ডাল, আর আমাদের ধর্ম ও সমাজের বাইরের যারা সংস্কারবিহীন তাদেরকে বলছেন ম্লেচ্ছ। যার জন্য অন্য ধর্মের কেউ খাবার ছুঁয়ে দিলে সেই খাবার তখনকার দিনের লোকেরা খেত না। মানুষের মধ্যে যারা উত্তম, যাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ, আবার সাধারণ প্রাণীর মধ্যে যে রজোগুণ, তমোগুণ, কোথাও আত্মজ্ঞানী এই ভেদ দেখেন না, সত্ত্বগুণী হোক, রজোগুণী হোক আর তমোগুণী হোক সবাইকে সমান দেখেন। এখানে সংস্কারের দিক থেকে কুকুরকে নীচে নিয়ে আসছেন, গরু শান্ত শিষ্ট বলে সংস্কারের দিক থেকে বেশি ভাল।

আচার্য বলছেন, *একম্ অবিক্রীয়ং ব্রহ্ম দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ*, যাদের মধ্যে শীল স্বভাব, কি সেই স্বভাব, সব কিছুতে সেই নির্বিকার ব্রহ্মকে দেখাই যার স্বভাব, এই রকম পণ্ডিত সমদর্শি। ঠাকুরকে একবার হলধারী বলছেন, 'তুমি কাঙালী ভিখারীর এঁটো পাতা কুড়োচ্ছ, তোমার ছেলেমেয়ের বিয়ে কিভাবে হবে ভেবেছ'? ঠাকুর খুব রেগে গেলেন, শাস্ত্র পড়ে তোমার এই বুদ্ধি হল? ব্রহ্মজ্ঞানে যিনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন, তাঁর কাছে এগুলো কিছুই না। সমাজে থাকার সময় আত্মজ্ঞানী কিছু কিছু লোকাচার করেন ঠিকই, কিন্তু ঐটুকুই, তিনি সমদর্শি। অনেক সময় ব্যবহারিক জীবনে অনেক কিছু করা যায় না, যেমন শঙ্করাচার্য নিজেই একবার কাশীতে দেখছেন শিব এক চণ্ডাল হয়ে মাংসের ভাঁড় নিয়ে যাচ্ছেন, আচার্য সেই চণ্ডালকে বলছেন তুমি আমার থেকে দূরে থাক। শিব তখন বলছেন, আমি যদি দেহ হই, দেহ তো জড়, সরবে কি করে। আর আমি যদি আত্মা হই, আমি তো সর্বত্র বিরাজমান, আমি যাব কোথায়? দুটোরই সম্ভবনা, হয় আমি আত্মা, নয় দেহ। দেহ কোথায় যাবে, কারণ সে জড়, আর আত্মা তো সর্বব্যাপী, কোথায় সরবে। শঙ্করাচার্য বলছেন, এ কোন সাধারণ লোকের কথা না। স্বয়ং শিব চণ্ডাল রূপে শঙ্করাচার্যকে শিক্ষা দিতে এসেছেন বুঝতেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি পায়ে পড়ে গেলেন।

স্বামীজী পরিব্রাজক হয়ে উত্তর ভারতে ঘুরছেন। যেতে যেতে দেখছেন একজন তামাক খাচ্ছে। তামাক খেতে দেখে স্বামীজীরও তামাক খাওয়ার ইচ্ছা হল। তামাকে টান দিতে চাইতে লোকটি বলল, 'আমি মেথর'। স্বামীজী শুনে চলে গেলেন। কিছু দূর গিয়ে ভাবছেন, আমি এটা কি করলাম, আমি তো সন্ন্যাসী। আবার তিনি ফিরে এলেন। এই হল ব্রহ্মজ্ঞানীর স্বভাব, সমদর্শি। পর আপন বোধ আমাদের থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদেরও পর আপন বোধ করাটা কম করতে হবে। ছোট বড় দেখব, কিন্তু কম করতে হবে। ভেদ ভাব কম করতে হবে। ঠিক ঠিক হিন্দুদের এই হল জীবনধারা।

আচার্য তখন নিজের তরফ থেকেই প্রশ্ন তুলছেন, কেন স্মৃতিশাস্ত্রে (গৌতম স্মৃতি) তো আছে, *সমসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ*, সমান সমানকে যদি বিষম দেখা হয়, আর বিষমকে যদি সম করে দেখা হয়, তাহলে পূজা আদিতে দোষ হয়। আমি একটা পূজা বা যজ্ঞ করলাম, সেখানে চারজন সন্ন্যাসী গেলেন আর সেখানে চারজন সাধারণ মানুষ আছে, এখানে সন্ন্যাসী এবং সাধারণ মানুষ দুজনকে আমি সমান করতে পারি না। হিন্দুদের যত শাস্ত্র আছে, এনাদের প্রত্যেকের কথাগুলো

ইউনিফর্ম, কথার মধ্যে কোন ভেদ নেই। বেদ যা বলে উপনিষদও তাই বলে, উপনিষদ যা বলে মহাভারতও তাই বলে, মহাভারতও যা বলে স্মৃতিশাস্ত্রও তাই বলে। আচার্য শঙ্কর এই কথাটা বারবার নিয়ে আসছেন। উনি যখন একটা ব্যাখ্যা দেন, তখন কখন মহাভারত থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে আসছেন, কখন মনুস্মৃতি থেকে উল্লেখ করছেন আবার কখনও গৌতম স্মৃতি থেকে উল্লেখ করছেন।

আচার্য ছিলেন একজন বিশাল পণ্ডিত, বিশ্বকে ভারতের যে অবদান তা হল শঙ্করাচার্যের মত একজন শ্রেষ্ঠ মন। এই রকম মন ভারতবর্ষে আর আসেনি। পুরো ভারতকে তিনি এক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এই কাজ অন্য কোন আচার্য করতে পারেননি; রামানুজ, মাধ্বাচার্যরাও পারেননি। সেই সময়ে ভারতে কত দর্শন, কত বিধি ছিল, আচার্য সেগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে এলেন। উনি দেখাচ্ছেন, তফাৎ কিছু নেই। কেন তফাৎ নেই বলছেন? গৌতম স্মৃতিতেই বলছে, যদি সমকে বিষম আর বিষমকে সম করে দেখা হয় তাহলে পূজাতে দোষ হয়। বলছেন, এতে দোষ হবে না। কেন দোষ হবে না? তার উত্তর হল উনিশ নম্বর শ্লোক।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ এই উনিশ নম্বর শ্লোক খুব উল্লেখ করতেন। বেদান্ত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে কি রকম এনার্জেটিক হয়, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীকে দেখলে বোঝা যেত। জীবনে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ফুল অফ এনার্জি ছিলেন। একবার মুসৌরীতে আইএএস একাডেমীতে লেকচার দিতে যাচ্ছিলেন। প্রত্যেকে বছর তিনি ওখানে লেকচার দিতে যেতেন। একবার গাড়ি করে যেতে যেতে দেখছেন একটা মাঠে ইয়ং ছেলেরা ভলিবল খেলছে। তখন ওনার ষাট পয়ষট্টি বয়স হবে। উনি গাড়ি থামালেন। একটা ইয়ং ছেলে টিপ্পণি কেটে বলছে, 'কেয়া বাবাজী ভলিবল খেলনা হ্যায়'। উনি বললেন, 'হাঁ খেলনা হ্যায়'। উনি গেরুয়া ধুতিটা মালকোচা করে বেঁধে নিলেন, সোজা ভলিবল কোর্টে নেমে খেলতে শুরু করলেন। ভলিবলে উনি ভাল স্যাশার ছিলেন। দেওঘরেও উনি এসেছিলেন, আমরা অবাক হয়ে দেখতাম ওই বয়সে নেটের কাছে লাফিয়ে কিভাবে বলগুলিকে স্যাশ করছেন, ভিতরে এত এনার্জি যে আমরা কল্পনাই করতে পারি না। উনি যখন আঙুল নেড়ে নেড়ে লেকচার দিতেন মনে হত যেন ইলেক্ট্রিফাইড করে দিচ্ছেন। আমি ওনার কাছেই প্রথম এই উনিশ নম্বর শ্লোকটা শুনেছিলাম। মহারাজ বলতেন এটাই বেদান্ত –

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।।১৯।।

(যাঁদের মন সর্বভূতস্থ ব্রহ্মে নিশ্চল, এই জীবনেই তাঁরা সংসার জয় করেন – অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর প্রবাহ থেকে মুক্ত হয়ে যান; যেহেতু ব্রহ্মই সম ও নির্দোষ তাই সমদর্শিগণ ব্রহ্মভাবে অবস্থিত থাকেন।)

সর্গঃ মানে সৃষ্টি, যেখানে জন্ম-মৃত্যুর চক্র চলছে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। *ইহৈব তৈর্জিতঃ*, এখানেই জয় করা যায়, এখানেই জীবনমুক্ত হওয়া যায়। আমরা মাঝে মাঝেই 'জীবনমুক্তি' শব্দটা ব্যবহার করছি, 'জীবনমুক্তি' শব্দের অর্থ জীবদ্দশায় আত্মজ্ঞান লাভ, শরীর থাকতে থাকতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ। কাশীতে মরলে মুক্তি না; মরার সময় ঠাকুরে এসে নিয়ে যাবেন, সেটাও না; মরার পর স্বর্গে যাব, এগুলো কিছুই না; এখানেই সব কিছুকে জয় করতে হবে। *ইহৈব তৈর্জিতঃ*, here and right now, এখানেই এই শরীর থাকা অবস্থাতেই আমাকে আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে।

কে জয় করেন? *যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ*, যাঁদের মনে এই সাম্য অবস্থা এসে গেছে, যে সাম্য অবস্থার কথা আঠার নম্বর শ্লোকে বলা হল। আঠার নম্বরে কিন্তু বলা হচ্ছে না যে, গুরু লঘুকে এক করে দাও। আমাদের গুরু লঘুর ভাব এত বেশি প্রবল যে, ফলস্বরূপ পছন্দ, অপছন্দ, রাগ, দ্বেষ এগুলো আমাদের প্রচণ্ড মাত্রায় বেশি। তা না, গুরু লঘুর প্রতি সমান ভাব, সাম্য ভাব এসে যায়।

আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেন, আপনি তো অনেক বই লিখেছেন, 'আপনার নিজের প্রিয় বই কোনটা'? 'সমস্ত সৃষ্টি সন্তানের মত, প্রিয় অপ্রিয় হয় নাকি'!

জীবনের উদ্দেশ্য *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো*, এই জীবনেই জয় করতে হবে। কিভাবে বুঝব জয় করতে পেরেছি কিনা? যেটা আঠার নম্বর শ্লোকে আগে বলে দিলেন, *বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি*, বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গরু, হাতি, কুকুর, চণ্ডাল এদের সবার মধ্যে সেই নির্বিকার ব্রহ্মকে দর্শন করছি কিনা। ভারতের দুর্ভাগ্য, কোন দিন এই প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্তের অনুশীলন করল না ভারত। আরব দেশের পত্রিকা আল জাজিরা সুযোগ পেলেই ভারতকে গালাগাল দেবে আর হিন্দু ধর্মকে গালাগাল দেবে। কিছু দিন আগে একটা লেখা বেরিয়েছে যার হেডলাইন হল, Complex hierarchical nature of Hindu cast system, ওরা খুঁজতে থাকে হিন্দু ধর্মে কোথায় কি গোলমাল আছে। যে ধর্মের ধর্মশাস্ত্র গীতা বলছে, *বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ*, যেখানে সমদর্শিতার কথা বলা হচ্ছে, সমদর্শিতা যাদের জীবনধারা, সেখানে এত সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, সেইজন্য আজকে ভারতের এই দুরবস্থা, হিন্দুদের এই পরিণতি। তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি চণ্ডাল, তুমি অমুক, এই করে দেশটা রসাতলে গেল।

স্বামীজী ভারত পরিক্রমার সময় সব জায়গায় এই জিনিসটার উপর জোর দিয়ে বলে গেলেন –তোমরা সমদর্শি হও। সমাজে বড় ছোট থাকবেই, বড়লোক সাধারণ লোক থাকবেই, কিন্তু তাই বলে এত বিভাজন? দু হাজার থেকে তিন হাজার কত cast আছে কেউ জানে না। ভারত সরকার কিছু দিন পর পর সেনসাস করছে, তাতেও কিছুই হচ্ছে না, এ বলছে ওকে মানব না, সে বলছে তাকে মানব না; ভারতের জন্য সত্যিই খুব দুর্ভাগ্য। এই সমদর্শিতা যদি তোমার না থাকে, তুমি কিসের হিন্দু! সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, A Hindu, who is not spiritual, I do not consider him as a Hindu, আধ্যাত্মিক যদি আপনি না হন, তাহলে আপনি হিন্দু নন। আধ্যাত্মিক যদি হন, তাহলে আপনার জীবনের উদ্দেশ্য হবে *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো*, এখানেই আধ্যাত্মিক সাম্র্যজ্যকে জয় করতে হবে। কিভাবে? *যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ*, মনের মধ্যে একটা সাম্য ভাব আনতে হবে, যেটা বাইরে দেখা যাবে সমদর্শিতা রূপে। যেখানে ব্রাহ্মণ হোক, গরু হোক, কুকুর হোক, চণ্ডাল হোক সবাই সমান।

আচার্য বলছেন, *জিতো বশীকৃতঃ সর্গো জন্ম*, এই জন্মেই জীবনকে জয় করে নিয়েছেন। *যেষাং সাম্যে সর্বভূতেষু ব্রহ্মণি সমভাবে*, এই বোধ, সবার প্রতি সম ভাব। ঠাকুর বাঘ নারায়ণের কথা বলছেন, সবই নারায়ণ কিন্তু বাঘ নারায়ণকে দূর থেকে প্রণাম করতে হয়, কিন্তু ভিতরে এই জ্ঞান থাকবে যে, সেও নারায়ণ। দুষ্ট নারায়ণকে দূর থেকে প্রণাম, কিন্তু বোধ রাখতে হবে, সেও নারায়ণ। দেওঘরে বিদ্যাপীঠে ভব মহারাজ এক সময় সেক্রেটারী ছিলেন, খুব উচ্চমানের সাধু। আমরা যাঁরা পরে দেওঘরে জয়েন করেছি, ওনাকে অনেকেই আমরা দেখিনি, কিন্তু ওনার অনেক গল্প শুনেছি, দেওঘরেও শুনেছি, আর বেলুড় মঠেও। ছুটির পর যেদিন দেওঘরের স্কুল খুলত, তার আগের দিন সমস্ত সাধুদের একত্রে ডেকে খুব মিষ্টি করে বলতেন, 'দেখো, বালক নারায়ণরা সবাই ছুটির পর কালকে আসছেন, ওনাদের সেবায় যেন কোন ত্রুটি না হয়। আপনার সংস্থায় ছাত্ররা যারা পড়ছে, এরা নারায়ণ, বালক নারায়ণ। দুষ্টুমি করলে অবশ্যই তাকে বকতে হবে, কিন্তু সে নারায়ণ এই বোধটা থাকতে হবে'।

আমাদের ক্লাশে একজন ভদ্রলোক লেকচার শুনতে আসতেন, খুব নিষ্ঠার সঙ্গে ক্লাশ করতেন। তাঁকে শুধু আমি বলেছিলাম, 'অন্ততঃ তিন দিন এই ভাবটা ধরে রাখার চেষ্টা করুন যে, সব নারায়ণ, নারায়ণ জ্ঞানে সবাইকে দেখবেন; স্ত্রী, সন্তান, বাবা, মা, ভাই, বোন সবাইকে তিন দিন নারায়ণ জ্ঞানে দেখুন'। কিছু দিন পর তিনি ক্লাশে এসে আমাকে বলছেন, 'মহারাজ অনেক চেষ্টা

করলাম, কিন্তু একদিনও পারলাম না’। আমি উৎসাহ দিয়ে বললাম, ‘এই যে মনে আছে, চেষ্টা করেছেন, এটাই অনেক’। আপনার স্বামী মাতাল হোক, লম্পট হোক, যাই হোক, নারায়ণ রূপে দেখুন; সন্তান যেমনই হোক বালক নারায়ণ রূপে দেখুন। দেখবেন আপনার ভিতরে যে তিক্ততা, জ্বালা আছে সব চলে যাবে।

একজন ভক্ত একবার শ্রীশ্রীমাকে এসে প্রণাম করে বলছে, ‘মা আশীর্বাদ করুন ঠাকুরের নামে যেন পাগল হয়ে যেতে পারি’। মা সেই ভক্তকে বলছেন, ‘বাবা ও রকম বলতে নেই, কত পাপ করলে তবে গিয়ে মানুষ পাগল হয়’। মায়ের এই কথা পড়ার পর আমার খুব অবাক লেগেছিল – কত পাপ করলে গিয়ে মানুষ পাগল হয়। তার মানে যে পাগল হয়ে গেছে সে কত পাপ করেছে বলেই পাগল হয়েছে। কত মর্ম বেদনাদায়ক কথা! বর্তমান কালে মনস্তাত্ত্বিদের কাছে এই ধরণের কত রোগীকে নিয়ে যাওয়া হয়, যাদের ঘুম হয় না, মন সব সময় বিষণ্ণ, খুব আক্রমাণাত্মক, ঝগড়ুটে, এগুলো সব পাগলামীর লক্ষণ।

ভারতে এখন একটা নূতন রোগ এসেছে, আগে আমেরিকাতে ছিল, রোগটার নাম BPD, Borderline Personality Disorder। ইয়ং ছেলেমেয়েদের মধ্যে এটা বেশি দেখা যায়। Personality disorder মানেই পাগল, কিন্তু এরা হল borderline case। ঠিক পাগলও না আবার পুরোপুরি ব্যালেন্সেও নেই। এরা কি করে? বাড়ির সমস্ত রকম সুবিধা নেবে, কিন্তু দায়ীত্ব পালনের সময় যখন আসে তখন ওরা কেউ সেটা পালন করবে না। কিছু বললে, এমন চেঁচামেচি, চিৎকার, ভাঙচুর করতে শুরু করবে যে, বাবা-মা পিছিয়ে যায়। একটা সেলফোন দিল না, সুইসাইড করে দিল। মা একটু বকুনি দিল, সুইসাইড করে নিচ্ছে। স্বাভাবিক মানুষ কখন সুইসাইড করবে না, পাগল না হলে কখন সুইসাইড করতে যাবে না। ব্রেন ফেল করে গেছে, ব্রেন ফেল না করলে সুইসাইড করে না, সুইসাইডের চিন্তাও সে করবে না। ডিপ্রেশানের একটা চরম পর্যায়ে না গেল কখন সুইসাইড করবে না। আমি দেখেছি, যাদের অল্প অল্প সমস্যা, হাল্কা ঘুমের সমস্যা, ডিপ্রেশান, সব কজনই কিন্তু গোলমেলে লোক। যখন পাপের ফল পেকে ফেটে যায় তখনই আক্রমণাত্মক ভাব, বিষণ্ণতা, হতাশা এগুলো আসতে থাকে। বাচ্চা বয়স থেকে যাদের মধ্যে বিপিডি দেখা যায়, বুঝতে হবে আগের জন্মে অনেক পাপ করে এসেছে।

বলছেন, *নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম*, ব্রহ্ম নির্দোষ, নির্দোষ মানে আত্মা কোন কিছুর সাথে লিপ্ত হয় না। আত্মাকে দোষযুক্ত মনে হয়। কেউ তামসিক লোক, কেউ রাজসিক লোক, সেখানে দেখে মনে হয় আত্মাই যেন দোষযুক্ত। কিন্তু আত্মা নির্লিপ্ত, পরে গীতাতেই এর উপর অনেক সুন্দর সুন্দর শ্লোক আসবে। আগেকার দিনে কিছু কিছু ফিলজফার ছিলেন, যাঁরা এগুলোকে আত্মার ধর্ম বলে মনে করতেন। আচার্য বলছেন, এগুলো আত্মার ধর্ম না, এগুলো মনের ধর্ম, মন আত্মা নয়। *সমং ব্রহ্ম*, ব্রহ্ম সব সময় সমান।

ঠাকুর বলছেন, দীপের আলোতে কেউ ভাগবত পড়ছে, কেউ আবার নোট জাল করছে, কিন্তু দীপ নির্বিকার। পরে গীতাতেও এই নির্বিকারকে নিয়ে বলবেন। জ্ঞানী পুরুষরা ওই *সমং ব্রহ্ম*তে প্রতিষ্ঠিত থাকেন বলে কখন তাঁদের মধ্যে ভেদ ভাব আসে না। সেইজন্য আর কি হয়? এই ধরণের মানুষকে দোষের গন্ধ পর্যন্ত স্পর্শ করে না। দেহ, মন, বুদ্ধি এদের যে সংঘাত, এটাকে এনারা আত্মা রূপে দেখেন। দুটো জগৎ - একটা আত্মার, আর-একটা মনের। এটা সত্য যে আত্মা থেকেই মনের সৃষ্টি, কিন্তু জগৎ আলাদা। মনের জগৎ ত্রিগুণাত্মিকা, সত্ত্ব, রজো ও তমোর খেলা; ভাল মন্দ, বড় ছোট সব এইখানেই। কিন্তু এর পারে যেটা, সেখানে এসব কিছু নেই। সমুদ্রের ধারে ধারে অনেক জায়গায় পাহাড় থাকে, সমুদ্রের পারে কোথাও উঁচু জমি, কোথাও নীচু জমি, কিন্তু সমুদ্রের ভিতরে চলে গেলে সব সমান।

তাহলে গৌতম স্মৃতিতে এই যে বলছেন, *সমসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ,* পূজার সময়ে সম আর বিষম, গুরু চণ্ডাল এক করা যাবে না। আচার্য বলছেন, ঠিকই বলছেন, তখন ওটা এক করা যাবে না। পূজার সময় পরিষ্কার বলা হচ্ছে, যখন দান আদি করা হয়, তখন বলাই হয় যে *ব্রহ্মবেত্তা বেদাদি,* ষড়াঙ্গকে জানেন এমন ব্রহ্মবেত্তাকে দান করবে। এখানে এই তফাৎগুলো থাকবে। অর্থ হল, স্মৃতি আদি গ্রন্থে যা বলা হয়েছে, এগুলো ব্রহ্মবেত্তার জন্য না; আমার আপনার মত লোকেদের জন্য, যাদের এখনও ব্রহ্মজ্ঞান হয়। স্মৃতির এই কথাগুলো তাঁদের জন্যই বলা হয়েছে, যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী নন। যারা ব্রহ্মজ্ঞানী না, তাদের সবাইকে গীতা অজ্ঞানী বলে। অজ্ঞানী বলতে যে কেউ, যারই ব্রহ্মজ্ঞানী হয়নি সবাই তারা অজ্ঞানী। বলছেন, গৌতম স্মৃতি সূত্রে যেটা বলা হয়েছে, এটা অজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। কারণ সেখানে এই ভেদাভেদ গুলো নিয়ে আসা হয়। আর তাছাড়া ব্রহ্ম সমস্ত পাপ, সমস্ত দোষের পারে, সেইজন্য এই জিনিসগুলো ব্রহ্মবেত্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না।

তেরো নম্বর শ্লোকে বলে দিয়েছেন –*সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী;* সমস্ত কর্মকে তিনি ত্যাগ করে দিয়েছেন, এরপর তাঁর আর কোন কিছুতেই কিছু আসে যায় না। মূল বক্তব্য হল, যত লৌকিক আচার আছে, যত রকম পূজার আচার আছে, এগুলো যিনি ব্রহ্মবিদ, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁকে বাঁধতে পারে না। ঠাকুরকে একজন বলছেন, আপনি নরেন, রাখাল এসব ছোকড়াদের এত ভালবাসেন কেন? সেই সময় নরেনের পিতৃদেব গত হয়েছেন, টাকা-পয়সা কিছু নেই, সংসারে খুব দুর্দিন চলছে। ঠাকুর বলছেন, নরেনের ভাতে নুনটাও জোটে না, ওকে ভালবাসছি বিশেষ কারণ আছে। ঠাকুর নরেনকে যেমন ভালবাসছেন, অন্য দিকে নিরক্ষর লাটুকেও ভালবাসছেন, আবার শশী মহারাজ, হরি মহারাজকেও ভালবাসছেন। যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁরা এভাবেই সবাইকে দেখেন, কোন তফাৎ করেন না। *বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন* যেটা বললেন, এটাকেই পরের শ্লোকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। বলছেন এই ব্রহ্মজ্ঞানীদের স্বভাব কি রকম হয় –

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ।।২০।।

(নির্দোষ ব্রহ্মই সর্বভূতে এক আত্মারূপে বিরাজিত –এই প্রকার স্থির বুদ্ধি ও জ্ঞান দ্বারা মোহশূন্য ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ প্রিয় বস্তু পেয়ে উৎফুল্ল বা অপ্রিয় বস্তু পেয়ে উদ্বিগ্ন হন না।)

প্রিয় বস্তু পেলে আনন্দে ব্রহ্মবেত্তা আটখানা হয়ে যান না, অপ্রিয় সংযোগ হলে তিনি ভেঙে পড়েন না। সেইজন্য সাধারণ মানুষদেরও প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে উৎফুল্ল এবং অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্তিতে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিৎ না। এই সমস্যাগুলি তাদেরই মধ্যে হয়, যারা আত্মা বলতে নিজের দেহকে মনে করে, অর্থাৎ যারা দেহাত্মবুদ্ধি। দেহ, মন, বুদ্ধিকে যখন আমরা আত্মা মনে করছি, এই আত্মা হলেন উপাধিসহিত আত্মা বা সোপাধিক আত্মা। উদ্দেশ্য হলে নিরুপাধিক আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, যেখানে কোন উপাধি নেই। উপাধি বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। মূল হলেন আত্মা, আত্মা আছেন বলেই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সব কাজ করছে, সেই আত্মার উপর অনেক উপাধি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই রকম সোপাধিক আত্মাতে যিনি প্রতিষ্ঠিত তিনি, *ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য,* প্রিয় জিনিস পেয়ে তিনি আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠেন না, আবার *নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্,* অপ্রিয় কিছু হয়ে গেলে, বা কোন অপ্রিয় বস্তু পেয়ে গেলে তিনি উদ্বিগ্ন হন না। কারণ *স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ঃ,* তাঁর বুদ্ধি স্থির হয়ে গেছে, কোন কাজের দিকে যান না। মানুষ তখনই কোন কাজ করে, যখন তার মনে হয় আমার এই অভাব আছে। অভাবের পূরণ করার জন্য আমার এই এই লাগবে, এবার সেটাকে পাওয়ার জন্য কাজ করতে হবে। কিন্তু যিনি পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত, তাঁর আর কিসের অভাব, কেন তিনি কাজ করতে যাবেন। অনেক সময় মানুষের মঙ্গলের জন্য কিছু করে দেন। আর তার সঙ্গে বলছেন –

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে।।২১।।

(যিনি শব্দাদি বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত, তিনি প্রত্যগাত্মাতে বাহ্যবিষয় নিরপেক্ষ শাশ্বত সুখ অনুভব করেন এবং ব্রহ্মযোগযুক্ত হয়ে অক্ষর ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হন।)

ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু ধরা হয়, এটাকে বলা হয় স্পর্শ, কারণ তাকে স্পর্শ করা হচ্ছে। আমার কাছে এই কলম আছে, আমি দেখছি, আপনারও দেখছেন এখানে কলম আছে। যাঁরা ফিজিক্স পড়েছেন, তাঁরা জানবেন, কলমের উপর আলো পড়েছে, সেই আলোর প্রতিফলন আমার চোখে আসছে, সেখান থেকে আমি জানছি এটা কলম। আমাদের ঋষিরা এটা মানবেন না, আমরাও মানিনা। তবে আমরাও বলছি যে এটা ঠিকই বলা হচ্ছে। আলো কলমের গায়ে প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখে যাচ্ছে, চোখ থেকে মনে যাচ্ছে। আমার ইন্দ্রিয়গুলি নড়ে উঠছে। মন তখন একটা প্রতিক্রিয়া ছুড়ে দেয়। বাইরে থেকে যেভাবে ভিতরে এসেছে, ঠিক সেই একই ভাবে ভিতর থেকে চেতনা বাইরে যায়, বাইরে গিয়ে ওই জিনিসটাকে স্পর্শ করে।

উদাহরণ দিয়ে বলা হয়, অন্ধকারে যখন কিছু খুঁজি, তখন কোন সিগন্যাল নেই, আমিই চোখটা নাড়ছি, ওটাকে খোঁজার চেষ্টা করছি বা পাশের ঘরে কেউ কথা বলছে, কান পেতে শুনতে চেষ্টা করি কি বলছে। কেন চেষ্টা করছি? দৃষ্টিটা ওখানে ঘুর ঘুর করছে, যে জিনিসটাকে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি ছুঁয়ে নেয়, এটাকে বলছেন স্পর্শ। সব জিনিসগুলি বাইরে রয়েছে। বাইরের জিনিসগুলি যখন টোকা দেয় তখন ভিতর থেকে আমাদের জ্ঞান বেরিয়ে আসে, এটাকে বৃত্তি হলা হয়। এটাই আমাদের জ্ঞান দেয়। এগুলো কোনটাই মনের ভিতরে নেই, আসলে বাইরে রয়েছে। যার জন্য ইন্দ্রিয়গুলি বাইরে ঘুর ঘুর করতে থাকে। *বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা*, বাইরের এই স্পর্শ থেকে আত্মা সব সময় অসক্ত, কোন কিছুতে আত্মা জড়ায় না। বাইরে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ যা কিছু আছে, এগুলো হল ইন্দ্রিয়ের বিষয়, এই বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়গুলি জড়ায়, আত্মা কোন ভাবে জড়ায় না।

বিন্দতি আত্মনি যৎ সুখম্, নিজের ভিতরে যে সুখ, সেই সুখ পায়। বাইরে দিকে দৌড়ানটা যখন মানুষের বন্ধ হয়ে যায়, তখনই সে ভিতরে সুখের দিকে এগিয়ে যায়। *ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা*, ব্রহ্মকে জানা, যিনি এটাকেই যোগ করে নিয়েছেন, তাকে বলছেন ব্রহ্মযোগ। *যুক্তাত্মা*, ব্রহ্মে নিজের মনকে লাগিয়ে দেওয়া, এটাই হয় ব্রহ্মযোগ। যাঁদের মন এই ভাবে ব্রহ্মে যুক্ত হয়ে যায়, তাঁরা অক্ষয় সুখ পান। এই অক্ষয় সুখ কেউ যদি পেতে চান, যে সুখের কখন ক্ষয় হয় না, তাহলে বাইরের সুখের আস্বাদ নেওয়াটা তাঁকে বন্ধ করতে হবে। ইন্দ্রিয়গুলো জোঁকের মত সুর বার করে খুঁজছে কাকে ধরা যায়। বড় একটা বিয়ে বাড়ির পার্টিতে ছেলেগুলো দেখতে থাকে কোথায় ভাল মেয়ে পাওয়া যায়, মেয়েগুলো আড় চোখে দেখতে থাকে কোন ছেলেটাকে পাকড়াও করতে হবে। ইন্দ্রিয়গুলি এদের মত নাচতে থাকে, মনটাও ইন্দ্রিয়ের পিছন পিছন দৌড়ায়। মনের সঙ্গে আবার আমিত্বটা যায়। যেটার জন্য দৌড়াচ্ছিল সেটা যদি না পায়, আর পেয়ে যদি হারিয়ে যায়, তখন ঘটি ঘটি কাঁদে। ঠাকুর বলছেন, লোকে মাগের জন্য, টাকার জন্য ঘটি ঘটি কাঁদে, ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদে বলো। পাচ্ছি না বলে কাঁদে, হাত থেকে চলে গেছে বলে কাঁদে। এটাই ভগবান পরের শ্লোকে বলছেন –

যে হি সংস্পর্জা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ।।২২।।

(হে কৌন্তেয়, রূপরসাদি বিষয় থেকে উৎপন্ন সকল সুখ সর্বদা দুঃখেরই কারণ; কারণ এগুলোর আদি আছে, অন্ত আছে, অতএব ক্ষণিক। এটা ইহলোকে যেমন সত্য, পরলোকেও তেমন সত্য। সেইজন্য জ্ঞানিগণ এতে প্রীতিলাভ করেন না।)

ইন্দ্রিয়ের যে সুখ, এর আদি আছে, অন্ত আছে। একটা সময়ে শুরু হয়েছিল, একটা সময় শেষ হয়ে যাবে। যে জিনিসটা শুরু হয়েছে, শেষ হয়ে যাবে, সেটা মাঝেও থাকে না। আমরা এই শ্লোকটাকে কুড়ি ও একুশ নম্বর শ্লোককে একসাথে মিলিয়ে আলোচনা করব।

মৃত্যুর পর আমার কি হবে, কি হবে না, এ-সবের দিকে হিন্দু ধর্ম তাকায় না। হিন্দু ধর্ম এই কথা বলে –আমাকে যা করার এখানেই করতে হবে। পঞ্চম অধ্যায়ের বাইশ নম্বর পর্যন্ত আমরা আলোচনা করলাম, এরপরে আরও সাতটা শ্লোক আসবে। এই সাতটা শ্লোকেও বেশ কিছু জিনিসকে নিয়ে আলোচনা করবেন। তার মধ্যে একটা হল দুঃখের পারে যাওয়া। ভগবান বুদ্ধও জগতে শুধু দুঃখই দেখে গেছেন। বৌদ্ধ ধর্মের কাছে এই জগতে একমাত্র দুঃখই হল আর্যসত্য। গীতা প্রথম থেকে শোক আর মোহকে নিয়ে বলে যাচ্ছেন। বেদান্ত পড়তে গেলে বলা হয়, *তপ্তশিরোবৎ* যদি তোমার না হয় তাহলে তোমার এখনও বেদান্ত পড়ার সময় হয়নি। মাথার চুলে আগুন লেগে গেছে, পাগলের মত জলের সন্ধানে দৌড়াচ্ছে, জল দেখলেই সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাথার আগুনটাকে নিভিয়ে দেবে। এই ভাব যদি থাকে তবেই তার জন্য বেদান্ত, এই অবস্থা না হলে বেদান্ত তাদের জন্য নয়।

ঠাকুর বলছেন, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে বসে গোঁফে তা দিচ্ছে, এদের দ্বারা ধর্ম হয় না। গীতা এই জিনিসটাকে আমাদের কাছে তুলে ধরছেন, তুমি বোঝ তুমি দুঃখে আছ, আরও বেশি বুঝে নাও যে, এই জগতে সুখের বিন্দু মাত্র আশা নেই। এই ধরণের কথা শুনলে অনেকের মনে হতে পারে, খুব নেগেটিভ কথাবার্তা। একটুও নেগেটিভ না। কারণ যাঁরা আধ্যাত্মিক মানসিকতার হন তাঁদের মত পজেটিভ মানুষ আর কেউ হতে পারে না। আর সত্যিই যার জন্য আজ আমরা দেখছি বিশ্ব ইতিহাসে মানবজাতির জীবনে যাঁরা একটু যে আনন্দ দিয়েছেন, মানবজাতির জীবনে একটু যে শান্তি দিয়েছেন, তাঁরা সবাই হলেন আধ্যাত্মিক পুরুষ। আর বিশ্বের তাবড় তাবড় নেতারা শুধু হানাহানি, কাটাকাটি করে পৃথিবীর মাটির রঙ লাল করে দিয়েছেন রক্তপাতের মাধ্যমে। অবতার পুরুষরা এই মাটির রঙ সবুজ করে দেন নিজেদের ভালবাসা দিয়ে। ভালবাসা তখনই হয় যখন তিনি সবাইকে ভালবাসতে পারবেন।

গীতায় ভগবান একটু পরেই আবার বলবেন *সর্বভূতহিতে রতাঃ*, সবাইকে ভালবাসার কথা বলছেন। অন্যান্য ধর্মের লোকেরা বলে, আমার ধর্মের লোকেদের আমি দেখাশোনা করব, এর বাইরে যারা আছে তারা মর। হিন্দু ধর্ম কক্ষণ আমাদের এই ধরণের কাজ করতেও দেবে না, মুখেও বলতে দেবে না। আমাদের শাস্ত্র বারবার বলবেন, তুমি দুঃখকে অতিক্রম কর, কিংবা আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির কথা বলবেন।

তিন প্রকার দুঃখের কথা বলা হয় – আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক আর আধিদৈবিক। কিছু দুঃখ শরীরের ভিতর থেকে আসে, যেমন ব্যধি, যেমন করোনা; করোনার ঝামেলাটা বাইরে থেকে আসে ঠিকই, কিন্তু আসল কষ্টটা ভিতর থেকে আসে। আধিভৌতিক মানে, জীবজন্তু থেকে যে দুঃখ আসে, সাপ, বিছে, বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ ইত্যাদি থেকে যে দুঃখ-বিপদ আসে। আধিদৈবিক, যেগুলো আমাদের হাতে নেই; যেমন বন্যা, ভূমিকম্প, আম্ফানের মত ঝড়। বলা হয় এগুলো দেবতারা দেন। করোনা আবার বিচিত্র, কখন মনে হয় আধিদৈবিক, দেবতারা পাঠিয়েছেন; আবার কখন মনে হয় আধিভৌতিক, কারণ করোনা ভাইরাস আমাদের শরীরকে আক্রমণ করছে, কিন্তু আসল দুর্ভোগটা হয় ভিতর থেকে। ঠিক ঠিক দেখলে, সমস্ত দুঃখ ভিতর থেকেই আসে। ঘটনা যা বাইরেই ঘটে, কিন্তু আসল জিনিসগুলো সব ভিতরেই হয়।

এই দুঃখ জিনিসটা কেন হয়? একটু টাকা-পয়সার অভাব হলে কত দুর্ভাবনা, কত চোখে জল চলে আসে। চাকরিতে প্রমোশন না হলে চোখে জল চলে আসে। একজন ইতিহাসবিদ জীবনকে

বিশ্লেষণ করতে গিয়ে খুব সুন্দর লিখছেন। আগেকার দিনে যোদ্ধাদের জন্যই এই পৃথিবী ছিল, যারা যোদ্ধা ছিল তারাই পৃথিবীকে জয় করতেন। আবার বিভিন্ন সময় দেখা গেছে, পণ্ডিতরা এই সভ্যতাকে সামলেছেন। যেমন স্বামীজী বলছেন, ভারতে এক সময় ব্রাহ্মণদের যুগ ছিল, কখন ক্ষত্রিয়দের যুগ ছিল, আবার বৈশ্যদের যুগও ছিল। তিনি মজা করে লিখছেন, গত একশ বছরটা হল আমলাদের জগৎ। সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে অফিসে যায়, সেখানে গিয়ে ফাইলে সই করতে থাকে। সারা বিশ্ব এখন ফাইল দিয়েই চলছে। ফাইলে ওরা কিসের জন্য সই করে ওরা নিজেরাও জানে না। ওদের মাথায় কেবল ঘুরতে থাকে, আমার প্রমোশন কবে হবে। প্রমোশন পেয়ে পেয়ে যতটা উপরে যাওয়া যেতে পারে। আর যখন দেখে আর প্রমোশন হবে না, তখন তার কাজেকর্ম কেমন একটা গয়ং গচ্ছ ভাব এসে যায়।

একটা সময় বছরে এক-দুবার লেকচার দিতে আমাকে আইআইএম ইন্দোরে যেতে হত। একবার আমি গিয়েছিলাম, সেবার ওরা ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের বড় বড় Executivesদের একটা ইন-হাউস ট্রেনিংএ এনেছেন। তাদের সবারই কাজ থেকে অবসরের নেওয়ার সময় এসে গেছে, আর বেশি দিন চাকরি নেই। যারা ম্যানেজমেন্ট পড়াবে তারা সব ছোকড়া। ওদের যে কোর্স-কোর্ডিনেটার ছিলেন, তিনি আমাকে এসে বলছেন, 'স্বামীজী আপনাকে আমাদের একটু সাহায্য করতে হবে। চল্লিশ জনের মত Executives, সবার রিটায়রমেন্টের সময় এসে গেছে, ওদের আর কিসের ইনসেন্টিভ আর কিসের প্রমোশন'! আমাকে বলছেন, 'যখনই ক্লাশে ঢুকি মনে হয় mass of negativity আমাকে ধাক্কা মেরে ক্লাশ থেকে বার করে দিচ্ছে'। ঠিক এই শব্দটাই বলেছিলেন, mass of negativity। 'স্বামীজী কোন রকমে আপনি যদি এটাকে ভেঙে দিতে পারেন, আপনার প্রতি বড় কৃতজ্ঞ থাকব'। আমি বললাম, 'কোন ব্যপারই না'। 'স্বামীজী আপনি এক ঘন্টা বলতে পারবেন তো'? 'আমি দু ঘন্টা বলে দিতে পারব, আপনার কোন চিন্তা নেই'। 'কি বলছেন, দু ঘন্টা ওদের ক্লাশে আপনি থাকবেন'? 'আমার কাছে কোন ব্যাপারই না'। ঢুকলাম, বলতে শুরু করলাম। দু ঘন্টার পরেও ক্লাশ নেওয়া শেষ হচ্ছে না। সেই কোর্ডিনেটার ভদ্রলোক যিনি বিদেশে হার্ভার্ড ইউনিভারসিটিতে পড়াশোনা করা, তিনি অবাক হয়ে গেলেন, কি করে আমি এতক্ষণ ক্লাশ নিলাম। যে লোকটি যেখানে পৌঁছাবার ক্ষমতা সেখানে পৌঁছে গেছে, তার আর কিসের ইনিসিয়েটিভ, তার কিসের ইনসেন্টিভ, আমি কি বলব তাকে, সে জানে আমি এবার রিটায়ার হতে যাচ্ছি।

বর্তমান কালে পুরো জগৎ শুধু প্রমোশন, প্রমোশন, এই জিনিসটার উপর চলছে। কিন্তু একটু ভাল ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, এদের মধ্যেও যে একটু শান্তি রয়েছে, এটা রয়েছে এই ভগবানের কথাতে। আমিও যখন ভগবানের কথা, উচ্চ আদর্শের কথা বলতে শুরু করলাম, তাঁরা মন দিয়ে শুনলেন। শেষে ঘুরে ফিরে দেখবেন শুধু দুঃখ আর দুঃখ। ভগবান যে কথা বলছেন, শাস্ত্র যেটা বলছে, যে যেখানে আছে সবাই সেই দুঃখে আছে। এখন দুঃখ জিনিসটা কি? আধ্যাত্মিক, আধিভৌতি, আধিদৈবিকের কথা যেটা বলা হল, তার সাথে আর-একটা হয়; শাস্ত্রে যা যা বলা হয়েছে, অর্থাৎ শাস্ত্রের বক্তব্যটাকে যদি একটু বুঝে নেওয়া যায়, জীবনে আপনার অনেক জটিল ব্যাপার, অনেক কঠিন সমস্যা সহজ হয়ে যাবে। গীতার শ্লোকগুলি ঠিক এই একই কথা বলবেন। আমরা সবাই সাধারণ, সাধারণ মানে একটা সাধারণ বুদ্ধিকে নিয়ে চলছি।

যে কোন মানুষকে দেখে কি করে বুঝব এর সাধারণ বুদ্ধি? যে কোন মানুষ মানে, বড় অফিসার হতে পারেন, বড় সাহিত্যিক কিংবা বড় বিজ্ঞানী হতে পারেন, তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন, কিন্তু তাঁর সাধারণ বুদ্ধি। সাধারণ বুদ্ধির মানুষ কিনা বুঝতে হলে দেখতে হবে, ওনার যে চেতনা, এই চেতনাটা কোথায়? এটা দেহে, না মনে? সারা বিশ্বে বেশির ভাগ মানুষের চেতনা থাকে দেহে; আমার, আপনার, এর, ওর সবারই চেতনা নিবদ্ধ থাকে দেহে। খিদে দেহ থেকে পায়, তৃষ্ণা দেহ থেকে পায়, ইচ্ছা-আকাঙ্খা দেহ থেকে হয়, শীত-উষ্ণ দেহ থেকে হয়। আমার এক হিতৈষী বন্ধু

দেখছেন ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে, আমাকে লিখছেন, একটু সামলে থাকবেন, মাথায় টুপি লাগাবেন, পায়ে মোজা দেবেন। দেহ ছাড়া আমরা কিছু বুঝি না। সকাল থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত, খাওয়া থেকে ঘুমনো পর্যন্ত আমাদের পুরো চেতনা শরীরকেন্দ্রিক। চেতনাটাকে আমাদের দেহের উপর না দিয়ে দেহের পারে নিয়ে যেতে হবে। দেহকে যত ভুলে থাকা যাবে, শান্তি তত বেশি পাওয়া যাবে। কিন্তু এখানে বলার উদ্দেশ্যটা অন্য।

দেহের উপর চেতনা দিতে গিয়ে আমরা ভুলে যাই যে আমাদের মন বলে একটা জিনিস আছে। যদিও আমরা সারাদিন মন মন করে যাচ্ছি, তুমি আমাকে মনে বড় কষ্ট দিলে, তোমাকে দেখে আমার মনে খুব আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু মন জিনিসটা কি, মন কিভাবে আমাদের চালায়, আমরা এই মন জিনিসটাকে অতটা খেয়াল করি না। মনের ব্যাপারগুলি যদি আমরা একটু নিরীক্ষণ করি এবং বুঝতে পারি, দেখবেন আমাদের জীবনের অনেক সমস্যার খুব সহজ সমাধান হয়ে যাবে। আমাদের শরীর, শরীরের যে অঙ্গগুলি রয়েছে, যে ইন্দ্রিয়গুলি রয়েছে, এই শরীর, শরীরের অঙ্গ, ইন্দ্রিয়গুলি চলে বাহ্য জগতে, যে জগতে আমরা এখন আছি, ঘরবাড়ি, সংসারে চলে। আর এই জগৎ থেকে শরীর আর ইন্দ্রিয়গুলি যা যা গ্রহণ করে, যেমন আমি খেলাম, খাওয়ার পর একটা তুষ্টি হল; মনও তুষ্টি পায়। এই তুষ্টি শরীর ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মনকে জানিয়ে দেয় খুব ভাল খেলাম, মন তখন তুষ্ট হয়ে যায়। সেখান থেকে আমরা মনে করি, আমাদের শরীর আর মন যেন এক।

এই পয়েন্টটাকে আমাদের খুব ভাল করে বোঝা দরকার। এখানেই আমরা প্রায়ই ভুল করে বসি; কারণ আমরা কোন কিছুকে নিয়ে সেভাবে চিন্তা-ভাবনা করি না, ধ্যান-ধারণা করি না। এই আলোচনা শেষ হয়ে গেলে এই জিনিসটাকে একটু ভেবে দেখবেন, আমাদের অজান্তায় ইন্দ্রিয় দিয়ে শরীরের মাধ্যমে যা যা ইনপুটস আসে, আমরা মনে করি আমাদের মন যেন সেটাই। আর এই বাহ্য জগৎ এবং মন, সব যেন মিলেমিশে রয়েছে। কিন্তু জিনিসটা তা না। খুব সহজ করে, অত্যন্ত সহজীকরণ করে যদি বলা হয়, যদিও সহজীকরণ করে সব কিছু ঠিক হয় না, বেশির ভাগ যে পাওয়ার অফ পজিটিভ থিঙ্কিং বইগুলি হয়, বা যাঁরা উপদেশ দিয়ে বেড়ান, এনারা সবার চড়কাতে তেল দিয়ে বেড়ান, এনারা সবাই হলেন simplistic ideal। যেমন কম্যুনিজম্ খুব simplistic একটা আইডিয়া, সবাইকে সমান দেখতে হবে, সবাইকে এক করে দিতে হবে, এইসব আইডিয়ার পিছনে কোন গভীর চিন্তা-ভাবনা নেই। শেষে দেখা যায়, নিজেদের ক্ষমতা নিয়ে বাকিরা যেমন ছিল তাদের সবাইকে তেমন রেখে দিয়েছে। তবে যে কোন পরিবর্তনে কিছু লোকের ভাল হবে, কিছু লোকের খারাপ হবে। সবারই যে একেবারে সব ভাল হবে বা সবারই যে একেবারে সব খারাপ হবে, তা কখনই হবে না। আমরা এখানে পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করছি না, আমরা বলছি, যে কোন বিচারে যখন তুমি যাচ্ছ, ভাল করে অনুধাবন কর, তার পিছনে তোমার চিন্তা কত গভীর। এগুলো হল সব simplistic আইডিয়াস।

এই জায়গাতে বোঝানর জন্য আমরা simplistic আইডিয়াসকে নিয়ে আসছি। তিনটে জগৎ আমাদের কছে পরিষ্কার, যদিও মাত্র তিনটে হয় না, আরও বেশি হয়, কিন্তু বোঝার জন্য তিনটে জগতের কথা বলা হচ্ছে। প্রথম হল দেহের জগৎ, দ্বিতীয় হল যত বস্তু আছে, আমার দেহ একটা বস্তু, এই পেন একটা বস্তু, এই ঘর বাড়ি, নদী, পাহাড়, গাছপালা, জীবজন্তু এটা একটা জগৎ, এটাকে বলে ফিজিক্যাল জগৎ। তৃতীয় হল, আমাদের মনের একটা নিজস্ব জগৎ আছে। এই তিনটে জগতের বাইরে একটা সূক্ষ্ম জগৎ আছে, যে জগৎ আমাদের সবাইকে সব দিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে, এটা হল আধ্যাত্মিক জগৎ। আধ্যাত্মিক জগৎ ঈশ্বরের জগৎ, আত্মার জগৎ, ব্রহ্মের জগৎ, শুদ্ধ চৈতন্যের জগৎ। মনের জগৎ সূক্ষ্ম পদার্থের জগৎ। যে বস্তু যত সূক্ষ্ম হবে সেই বস্তুর তত ক্ষমতা হবে। সেইজন্য মনের ক্ষমতা অনেক বেশি। আর আমাদের যে শরীর, এটা স্থূল জগৎ। এনারা যখন স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ জগতের কথা বলেন, তার সাথে এর অনেকটা মিল পাওয়া যাবে, কিন্তু পুরো মিল

পাওয়া যাবে না। এখানে বোঝানর জন্য কথাটা বলা হল, পরে আমাদের কাজে লাগবে। মনের জগতে আমাদের অজান্তায়, আমরা জানতেও পারি না একটা অদ্ভূৎ জিনিস হয়, মনের জগৎ আমাকে নিয়ে আর আমার এই দৃশ্যমান জগৎকে নিয়ে আরেকটা জগৎ সৃষ্টি করে দেয়, এই জগৎকেই আমরা অন্তর্জগত বলি। এই অন্তর্জগৎ ব্যাপারটা একটা সাংঘাতিক জিনিস আর এর বিশাল ব্যাপ্তি।

আমরা এই জগৎকে দেখছি, আমি আছি, আপনারা আছেন, এই টেবিল, টেবিলের উপর বই আছে, বস্তুগুলো আছে, আর আমি এর সব কিছুর সাথে জড়িয়ে আছি। আমি সব কিছুর ভোক্তা, এগুলো সব আমার ভোগের জন্য আছে। আবার অনেক সময় আমি যাকে ভালবাসি, সেখানে আমি তার ভোগের পদার্থ। কিন্তু এগুলো অত্যন্ত স্থূল, এগুলোর বেশি দাম নেই। আসল যেটা হয় সেটা মনের জগতে হয়। মনের জগতে কি হয়, এই দিকটায় আমরা ভাল করে তাকাই না, মনের গভীরে গিয়ে মনের জগতে অন্বেষণ করি না। আমরা প্রায়ই এই কথা বলি, আমি যাকে ভালবাসি, সেই আমাকে চুষে নিচ্ছে। কিন্তু আমিও যে তাকে চুষে নিচ্ছি, আমরা এটা বুঝতে পারি না। যার জন্য যখন বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ভালবাসার সম্পর্ক ভেঙে যায়, তখন আমরা বলি, আমাকে শেষ করে দিল বা আমাকে বোকা বানিয়ে দিল। তুমি এতদিন ছিল কেন তার সাথে? কেন তুমি তোমাকে তার শিকার হতে দিয়েছিলে? তোমাকে সবাই এত সাবধান করে দিয়েছে, মা-বাবা সাবধান করেছে, বন্ধু-বান্ধবরা নিষেধ করেছে, তাও তুমি কেন গেলে?

এখানে কারুর কিছু করার নেই, তার কারণ আমার মনের জগতে আমি রাজা, ওখানে আমি ছাড়া কেউ কোন দিন রাজা হতে পারবে না। সেই মনের জগতে যাকে আমি ভালবাসি, সে আমার আসল হয়ে বসে আছে, আর মনে করছি আমার আসল সুখ ওখান থেকে আসছে। এখানে বাহ্য জগতে কি হচ্ছে আর কি হচ্ছে না, তার কোন দাম থাকে না। আপনার স্ত্রী আছেন, আপনার স্বামী আছেন, আপনার যে বন্ধু আছেন, কিন্তু আপনি দেখবেন আপনার যে অন্তর্জগৎ, মনের জগৎ, সেখানে আপনিই হলেন রাজা। সেখানে আপনাকে আটকাবার কেউ নেই, আশেপাশে এনারা সবাই মূর্তি হয়ে রয়েছেন। আপনি যাঁকে ভালবাসেন, সে আপনার বেশি কাছের। আসলে হয়ত সে এই জগতেই নেই, না থাকুক, সে কিন্তু আপনার মনের জগতে বসে আছে।

মনের জগতে আরেকটা সমস্যা হল, মনের জগৎ হল ডায়নামিক, অবিরত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। বহির্জগৎ যেমন সব সময় পরিবর্তিত হতে থাকে, মনের জগৎও সব সময় পরিবর্তিত হতে থাকে। আমাদের পুরনো যে স্মৃতিগুলো রয়েছে, আমাদের যে স্বপ্নগুলো হয়, যে কল্পনাগুলো হয়, আর এই জগৎ থেকে যা কিছু আমরা পাই, এই সমস্ত কিছু আমাদের মনে সঞ্চিত থাকে –মনের জগতে বেশির ভাগ পরিবর্তন আসে এগুলো থেকে। হিন্দুরা মনে করেন, এই স্মৃতি জন্মজন্মান্তর থেকে সংস্কার রূপে আমাদের চলে আসছে। এই সংস্কারকে যদি যোগ করে দেওয়া হয়, আমরা কল্পনা করতে পারব না যে, মনের জগৎ কত বিশাল এক জগৎ। বহির্জগতে স্মৃতির কোন দাম নেই, কিন্তু মনের জগতে স্মৃতির বিরাট দাম। নামকরা ইংরেজ কবি শেলি এক জায়গায় বলছেন, Memory mixed with desires, স্মৃতিটাও মনের, বাসনাটাও মনের। আমি যাকে ভালবাসি, সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি, কেন? কারণ Memory mixed with desires। বহির্জগতে না আছে বাসনা, না আছে স্মৃতি। তাই বহির্জগতে বাস করা অনেক সহজ।

আমরা বলছি জগতে কত কষ্ট, কিন্তু আপনি মানুন আর নাই মানুন, জগতে আসলে কোন কষ্ট নেই; আসল কষ্ট তো মনের জগতে; আরও মজার ব্যাপার হল, আমরা এটা বুঝতেও পারি না। কেন কষ্ট হয়? মনের জগতে স্বাধীনতা আছে, ওখানে আপনাকে আটকাবার কেউ নেই। যার জন্য দেখা যায়, মনের জগতে যারা বেশি বাস করে, তারা একটা সময়ের পর পাগল হয়ে যায়। ঠাকুরের ওই কঠোর সাধনা যখন চলছে, লোকেরা মনে করছে, উনি পাগল হয়ে গেছেন, ওরা এটা বুঝতে

পারেনি যে, ঠাকুর মনের জগৎ ছাড়িয়ে চলে গেছেন আধ্যাত্মিক জগতে। চৈতন্যের জগতে যিনি চলে যান, তিনি কখন পাগল হবেন না। কিন্তু যে সব সময় মনের জগতে বাস করে, সে একটা সময় পাগল হয়ে যাবে, মুর্খ গোঁয়ার হয়ে যাবে, অবাস্তববাদী হয়ে যাবে। জীবন চালানোর জন্য তাই স্থূল জগৎ আর মনের জগতের মধ্যে সব সময় সমন্বয় করে রাখতে হয়।

মনের জগতে সমস্যা হল, মন হল স্বাধীন, প্রচণ্ড গতিতে চলতে পারে। সেইজন্য যে কোন ব্যাপারে, জিনিসটা কেমন হবে, সেটাকে সে নিজেই বানিয়ে নেয়। নিজেকে খুব ভাল করে লক্ষ্য করলে অনেক সময় দেখতে পাবেন, যার সাথে আপনার ঝগড়া আছে, তাকে নিয়ে আপনি অনবরত ভাবতে থাকেন, ওর সাথে দেখা হলে আমি এই এই বলব, ও তখন আমাকে এটা বলবে, আমি তখন এটা বলব। যাকে ভালবাসেন, তাকে নিয়েও ঠিক এভাবেই ভাবতে থাকেবেন। ছেলে অনেক দিন পর হয়ত বাড়ি আসছে, মা সব সময় ভেবে যাচ্ছে, ছেলে আসছে, ছেলের জন্য এটা বানাবো, এটা করবো, ছেলেকে এইভাবে আদর করব, ছেলেকে এই এই কথা বলব ইত্যাদি। মাঝখান থেকে খবর এলো, ছেলে এখন আসতে পারছে না, দু সপ্তাহ পরে আসবে। মা রাত্রিতে রান্না করে বসে আছে, ছেলে আসবে, এসে মায়ের হাতে খাবে; এদিকে ছেলে বন্ধুদের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মা জানতে পেরে রেগে গেলেন। কেন রেগে গেলেন? এটাই যদি বলত, মা আমি দু ঘন্টা পরে আসব, মা তো রাগতেন না। ছেলে রাত আটটায় আসুক, রাত দশটায় আসুক, মা রাগবে না, যদি আগে থেকে মা জানে। এই যে আমরা প্রায়ই বলে থাকি, আগে থেকে জানিয়ে দিতে পারতে। কেন বলি? কারণ মন যে সংসার তৈরী করে, সেখানে পরিষ্কার হয়ে আছে যে, ইনি আটটার সময় আসবেন।

অন্য দিকে পদার্থ জগৎ নিজের মত চলে, মনের জগতের সাথে ওর কোন সম্পর্ক নেই। চার মাস পরে, তিন মাস পরে একটা জিনিস করব, মন এখন থেকেই এগিয়ে গিয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে গেল, দাঁড়িয়ে গিয়ে সেখানে মন নিজের সংসার সৃষ্টি করে নেবে। স্থূল জগৎ আবার অন্য ডায়নামিকসে চলে, মনের জগতের সাথে এটা মেলে না। ইতিমধ্যে স্থূল জগৎ তিন মাস পরে অন্য রকম কিছু একটা হয়ে গেল, মন তিন মাস আগে থেকে যেটা করবে বলে ঠিক করেছিল, মন সেটা করতে পারছে না। যেমনি মনের জগতের সাথে স্থূল জগতের সংঘাত হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মনের জগৎটা বিগড়ে গেল।

২০২০ সালের মার্চ মাসে আমাদের কয়েকজন বন্ধুদের সাথে বাইরে ঘুরতে যাওয়ার কথা ছিল। তিন মাস আগে থেকে ট্রেনের টিকিট, প্লেনের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। অনেক রকম প্ল্যান প্রোগ্রাম করা হয়ে গেছে। দুম্ করে মার্চ মাসে করোনা মহামারীর জন্য লকডাউন হয়ে যাওয়াতে সব প্রোগ্রাম বাতিল করতে হল। স্বাভাবিক ভাবে মনটা পুরো ভেঙে গেল। মনের জগৎ যখন ভেঙে যায়, স্বাভাবিক ভাবে তখনই দুঃখ আসে। মনের জগতে আগে থেকে যদি কিছু শুনে থাকি বা কিছু দেখে থাকি, সেটাকে পাওয়ার যদি ইচ্ছা হয়, এটাকে বলে কামনা। যদি না পাই, আমরা রেগে যাই। যদি পাওয়ার পর চলে যায়, শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ি। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য, এই যা কিছু আছে এগুলো সব মনের জগতের, যেখানে আমি রাজা, আমার আজ্ঞাতেই সব কিছু হয়। বাইরে আমরা কেউ রাজা হতে পারছি না, কিন্তু মনের রাজ্যে আমরা সবাই রাজা। বহির্জগতের সাথে মনের জগতের মেলে না। যখন মেলে না, তখন কাম হয়, ক্রোধ হয়, লোভ হয়, পাওয়ার ইচ্ছা হয়, মোহ হয়। আর যদি পেয়ে গেলাম, তখন মদ, অর্থাৎ অহঙ্কার হবে আর অপরে যদি বেশি ভাল পেয়ে থাকে তখন আসবে মাৎসর্য। এই জিনিসগুলো তখনই হবে, যখন মনের জগতের সাথে বহির্জগৎ মিলবে না। কারণ মনের জগৎ সব সময় এগিয়ে এগিয়ে চলে।

তাহলে এখন উপায় কি? যদি আমাদের শোক থেকে বেরোতে হয়, কষ্ট থেকে বেরোতে হয়, কাম, ক্রোধ থেকে যদি বেরোতে হয়, তাহলে উপায় কি? সবাই বলে বাস্তববাদী হয়ে যাও। এই

জগতে কি আদৌ বাস্তববাদী হওয়া যায়? কখনই সম্ভব না। আমাদের বলা হয়, অতীত চলে গেছে, ভবিষ্যত এখনও দূরে, বর্তমানটা কাছে আছে, বর্তমানকে ধরেই বাঁচতে শেখ, live in present। Live in present কি কখন সম্ভব? এগুলো হল খুব সহজ উপদেশ। বর্তমানকে আঁকড়ে কেউ কি থাকতে পারে? তাহলে তো আমাদের সব শাস্ত্র মিথ্যা হয়ে গেল। যোগশাস্ত্র যখন বলছেন, প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি, এগুলোকে মানুষ চিন্তা-ভাবনা করে নেয়, জিনিসগুলো ঘুরে ঘুরে স্মৃতিতে এসে মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করে দেয়। স্মৃতিতে কত কিছু জমে আছে, এগুলো কোথায় যাবে, যাওয়ার জায়গা নেই, ওখানেই ঘুরে ঘুরে আসতে থাকবে। Live in present যদি হয়, তাহলে কবিরা কবিতা লেখাই ছেড়ে দেবেন। শিল্পীরা গান গাওয়া বন্ধ করে দেবেন, ছবি আঁকা বন্ধ হয়ে যাবে, বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণা বন্ধ করে দেবেন, এনার কেউ বর্তমানকে নিয়ে চলেন না। সৃজনশীল মানুষরা কেই বর্তমানে বাস করেন না। বর্তমানে বাস করেন না বলেই তাঁরা কলা, সাহিত্য, বিজ্ঞানে একজন সৃজনশীল ব্যক্তি হতে পারেন। সেইজন্য সৃজনশীল লোকেরা একটু abnormal হন, আরও বাজে, এনাদের চরিত্র সব সময় এলেমেলো হয়। এনারা সংসারের নিয়ম মেনে চলেন না, সৎ পুরুষ হওয়া, চরিত্র গঠন করা, ওনারা এগুলো নিয়ে মাথা ঘামান না। কারণ ওনারা সবাই নিজের জগতে বাস করেন, যেখানে তিনিই রাজা। উপায় হল, মনের জগৎ আর বহির্জগৎ, এই দুটো যতটা সম্ভব সামঞ্জস্য করে চলা।

আমরা একটা উদাহরণ প্রায়ই দিয়ে থাকি। আপনি আপনার প্রিয় কুকুরকে নিয়ে সকাল-বিকাল রোজ বেড়াতে যান। কুকুর জানে আমার প্রভু রোজ এই পথ দিয়ে যান। কুকুর আগে আগে যাবে আর তার পিছন পিছন আপনি চলতে থাকবেন। হঠাৎ কোন কারণে আপনি রাস্থাটা পাল্টে নিলেন। কুকুরটা এবার মনমরা হয়ে আস্তে আস্তে আপনার পিছন পিছন আসতে থাকবে। একবার যখন রাস্থাটা বুঝে নিল, আবার সে দৌড়ে আপনার সামনে সামনে চলতে থাকবে। আবার আপনি রাস্থা পাল্টে নিলেন। কুকুরটা আবার মনমরা হয়ে আপনার পিছন পিছন আসতে থাকে। পদার্থ জগতে আমরা যখন বিচরণ করি, তখন মন কুকুরের মত আমাদের সামনে এগিয়ে এগিয়ে চলতে থাকবে। পদার্থ জগৎ নিজের মত চলে, হঠাৎ এখানে একটু পাল্টে গেল, হঠাৎ ওখানে গিয়ে পাল্টে গেল, তখন মনকে মনমরা হয়ে তার পিছনে আসতে হয়, সে পদার্থ জগতের সাথে পেরে ওঠে না, মন কান্নাকাটি করতে থাকে। উপায়, যতটা পারা যায় পদার্থ জগতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলা।

আর-একটা উপায় আছে। মন হল দালালের মত, মন করে দালালি; পদার্থ জগৎ আধ্যাত্মিক জগতের সাথে থাকে। এই মনের সাহায্যে কেউ যদি আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করে যায়, ঈশ্বরের জগতে যদি কেউ প্রবেশ করে যায়, এটাও ঈশ্বরের জগৎ, এটাও আত্মার জগৎ, কিন্তু পুরোপুরি যদি ওই জগতে চলে যায়, তখন পদার্থ জগতের সব কিছুকে খড়কুটো বলে বোধ হবে। ঠাকুরের খুব সহজ কথা, যে মিছরির শরবৎ খেয়েছে তার আর চিটেগুড়ের পানা ভাল লাগবে না। একবার যদি আত্মার ঐশ্বর্য, আত্মজ্ঞান লাভের যে আনন্দ, আত্মাকে লাভ করার যে সন্তুষ্টি, সেই সন্তুষ্টি পেয়ে গেলে পদার্থ জগৎ, মনের জগৎ সব খড়কুটোর মত উড়ে যাবে। এ্যাপেলো-১১ তে চেপে মানুষ প্রথম চাঁদে গিয়েছিল। নিল আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিন্স ও এডউইন এ্যালভিন এই তিনজন ছিলেন। মাইকেল কলিন্স চাঁদে নামেননি। মাইকেল কলিন্স ফিরে এসে একটা বই লিখেছিলেন। পরে অবশ্য তিনি এ্যাবনর্মাল হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলছেন, অন্তরীক্ষে অত উপর থেকে পৃথিবীকে দেখলাম, সে যা সৌন্দর্য দেখলাম, ওই দেখার পর কোন কিছুই আর মনে ধরে না, সব পানসে হয়ে গেছে। তার সাথে ওনার এই দুঃখটাও ছিল, উনি চাঁদের মাটিতে নামতে পারেননি, ইতিহাসের পাতায় ওনার নাম থাকল না। এখানেও সেই আইডিয়াটা, যদি একবার কেউ অপরূপ রূপ দেখে নেয়, তখন আর কোন কিছুই তার চোখে ভাল লাগবে না।

দুঃখ নিদানের উপায় দুটি, এক নম্বর হল, মনকে বেশি দৌড়াতে না দেওয়া, যতটা সম্ভব বাস্তব জগতে পায়ে পা মিলিয়ে চলা। কিন্তু তার থেকেও শক্তিশালী উপায় হল; আমরা হলাম দেহাভিমানী, আমাদের সমস্ত চেতনা দেহে ঢুকে আছে, এই চেতনাকে দেহ থেকে সরিয়ে আস্তে আস্তে ঈশ্বরের দিকে, আত্মজ্ঞানের দিকে নিয়ে যাওয়া। চেতনা যত আত্মজ্ঞানের দিকে যাবে, তত আমাদের অবসাদ কমে আসবে। আমাদের মনে হতে পারে দেহ থেকে কি করে চেতনাকে ঈশ্বর চেতনায় নিয়ে যাবো? কিন্তু তাই বলে বসে থাকলে কোন দিন কিছু হবে না। চেষ্টা করে করে দেহ থেকে মন ওঠানো যায়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এর উপর আরও পরিষ্কার করে বলবেন, মনকে কিভাবে সরানো যায়। চেষ্টা করাটা তো শুরু করতে হবে, শুরু করে ছেড়ে দিলে হবে না। শুরু করে একেবারে লেগে থাকতে হবে –আমি ঠিক করে নিয়েছি, আমি যখন একবার ধরে নিয়েছি, আর আমি একে ছাড়ছি না, এটাকে বলে ধৃতি। গীতায় বার বার ধৃতিকে নিয়ে বলছেন। ঠাকুর বলছেন, আঁট চাই। একটা জিনিস আপনি ধরেছেন, আর ছাড়া যাবে না, এইটাই আমি করে যাব। এই আঁট না থাকলে কোন কিছুই হবে না। ঠাকুর বলছেন, ঢিমে তেতালা দিয়ে কিছু হবে না। ধরার পর আর ছাড়াছাড়ি নেই, ওটাতেই লেগে থাকতে হবে। এই হল সংক্ষেপ কাম, ক্রোধ, দুঃখ, অবসাদ, এগুলো থেকে বেরোনর উপায়টা কি। এখান থেকে আমরা এবার ঢুকবো গীতার মূল শ্লোকে, যেখানে এনারা এই জিনিসটার ব্যাখ্যা করবেন।

কাম, ক্রোধ কেন হয়? আপনার মন এগিয়ে গেছে। আমরা অনেক সময় অন্যদের বলি, বেশি স্বপ্নবিলাসী হয়ো না, কষ্ট পাবে। পথ চলতি আমরা এই কথাগুলো বলি ঠিকই, কিন্তু জীবনে লাগাই না। যাঁরা বলেন তাঁরাও লাগান না, যাঁকে বলা হচ্ছে, তিনিও লাগান না। লাগাতে পারলে এত কষ্ট হত না। যাঁরা এই গীতা আলোচনা শুনছেন, তাঁদের অবশ্যই একটা শুভ সংস্কার আছে, শুভ সংস্কার না থাকলে কেউ শাস্ত্রের কথা শুনতে চাইবে না। এই কথাগুলো মহাপুরুষদের কথা, যাঁরা মহাপুরুষ হন, যাঁরা মহাপুরুষ হতে চলেছেন, তাঁরাই একান্তে এভাবে ধর্মের কথা শুনবেন।

দ্বিতীয় হল, আপনি শুনছেন, দিনের পর দিন শুনে যাচ্ছেন, আপনার অজান্তায় আপনার উপর একটা শুভ প্রভাব পড়ছে, আপনি বুঝতেও পারবেন না। স্বামীজী খুব সুন্দর বলছেন, সারা রাত ধরে হিম পড়ে, সকালে প্রস্ফুটিত গোলাপের উপর হিমের বিন্দুগুলিকে দেখে বোঝা যায় হিম পড়েছিল। ধর্মতত্ত্ব ঠিক এভাবেই চলে, চুপচাপ আপনার উপর প্রভাব ফেলে যাচ্ছে, ফেলেই যাচ্ছে। এর প্রভাব কিছু বছর পরে বোঝা যাবে। সেইজন্য ধরে রাখতে হয়, শুনে যেতে হয় আর মাঝে মাঝে নির্জনে একান্তে বসে শাস্ত্রের কথা, ঈশ্বর, জগৎ, জীব এগুলোকে নিয়ে ভাবতে হবে, আর কিছু করতে হবে না। আমাদের মাঝে মাঝে অনেকে বলে, এত শাস্ত্রের কথা শুনছে, কিছু কাজে লাগাতে পারছে? আরে ভাই, এগুলো কাজে লাগাবার নয়। আপনি তো কলেজে এত ফিজিক্স কেমেস্ট্রি পড়েছিলেন, কটা এ্যটম বোমা বানাতে পেরেছেন? স্কুলে যখন ছিলেন, কলেজে যখন ছিলেন, তখন কত কি পড়েছিলেন, ফিজিক্সের এই নিয়ম, সেই নিয়ম, জীবনে লাগিয়েছেন কখন? তাহলে কেন পড়ানো হয়? জ্ঞান অর্জন করা, জ্ঞানটাই একটা উদ্দেশ্য, মন তাতে প্রসারিত হয়। এখানে আমরা যে আলোচনা করছি, এই জিনিসগুলো হল জীবন-পরিবর্তনকারী জ্ঞান। আপনি বুঝতেও পারবেন না, কখন অজান্তায় আপনার জীবনটা পাল্টে গেছে।

এই কথা বলার পর বলছেন, যিনি জ্ঞানী তিনি দেখেন আত্মাই আছেন, আত্মা ছাড়া কিছু নেই। আমরা অনেকবার এর উপর আলোচনা করেছি। জ্ঞানী যখন নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় পৌঁছে যান, তখন তিনি দেখেন আত্মা ছাড়া কিছু নেই, বাকি সব নাম আর রূপের খেলা। নাম-রূপ মিথ্যা আত্মাই সত্য। ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, এই সমস্ত রূপ মিথ্যা, ঈশ্বরই সত্য, ঈশ্বরই আসল।

এবারে আমরা দেখব কুড়ি নম্বর শ্লোকে ভগবান কি বললেন, *ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্। স্থিরবুদ্ধিসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ,* আমারা যে মনের জগতের কথা বললাম, সেখানে মনের জগৎ আর পদার্থের জগৎ যখন মিলে যাচ্ছে, তখন আমাদের খুব আনন্দ হয়। আমরা আশা করিনি কিন্তু হঠাৎ পেয়ে গেলাম, তাতে আরও বেশি আনন্দ হয়। লটারি লেগে গেলে কি আনন্দই না হয়। বলছেন, যাঁরা আত্মজ্ঞানের পথিক, তাঁরা যখন এটা বুঝে নিলেন, আত্মা ছাড়া কিছু নেই, তখন তাঁরা প্রিয় কিছু পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে যান না, অপ্রিয় কিছু হয়ে গেলে মন খারাপ করে হতাশায় ভেঙে পড়েন না। এগুলোই জীবনে অনুশীলন করতে হয়।

তাহলে কি ঠাকুর স্বামীজী আনন্দে আটখানা হতেন না, তাঁদের কি মন খারাপ হত না? অবশ্যই হত। ঠাকুর বলছেন, ঘোড়াওয়ালা বলেছিল চারটের সময় আসবে, চারটের সময় আসেনি, আমার খুব রাগ হল। ঠাকুরের ওই রাগের কারণে কারুর অনিষ্ট হয় না। কিন্তু ঠাকুরের যে মন, সেই মনটা এগিয়ে রয়েছে চারটের সময় কোথাও যাওয়ার আছে, যাওয়া হল না, রেগে যাচ্ছেন। কিন্তু ওই রাগ ঠাকুরের উপর কোন দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলতে পারবে না। যদি আধ ঘন্টা পরে ঘোড়াওয়ালা এসে বলে, একটা কাজে আটকে যাওয়ার জন্য সময়ে আসতে পারিনি, আমাকে ক্ষমা করে দিন। ঠাকুরও খুশী মনে বলে দেবেন, ও ঠিক আছে। আমার আপনার স্বভাব এমন, যার উপর একবার রেগে গেলাম, তার আর মুখ দেখতে চাইব না। মনের জগৎ আর পদার্থের জগৎএর ফাঁক যত কমান হবে, কাম ক্রোধের বেগ তত কমে যাবে। যাঁরা আত্মজ্ঞানের পথিক, যাঁরা আত্মজ্ঞানী, তাঁদের কাছে পদার্থ জগতের কোন দাম নেই, কারণ তাঁরা জানেন আত্মাই সব কিছু হয়েছেন।

আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, *দেহমাত্রাত্মদর্শিনাং হি প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্তী হর্ষবিষাদস্থানে ন কেবলাত্মদর্শিনঃ,* যারা দেহাভিমানী আত্মা, যারা নিজের দেহকেই আত্মা বলে জানে, নিজের দেহতেই কেবল আত্মাকে দেখে; একমাত্র তাদেরই প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে হর্ষ হয় আর অপ্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে বিষাদ হয়। আত্মাকে বিভিন্ন ভাবে দেখা হয়, বহির্বস্তুতে যার খুব লোভ থাকে, যে খুব লোভী পুরুষ, সে নিজের টাকা-পয়সা, গয়না, বাড়ি, গাড়ি, জমি এগুলোকেই মনে করে এটাই আমি। তার এই জিনিসগুলো যদি নাশ হয়ে যায়, তখন সে মনে করে, আমি শেষ হয়ে গেলাম। যে অত্যন্ত কামী পুরুষ, সে তার কামের বস্তুকে আমি দেখে। যার জন্য প্রায়ই দেখা যায়, প্রেমিকা যদি ছেড়ে চলে যায়, প্রেমিক সুইসাইড করে নেয়, নয়তো পাগল হয়ে যায়। টাকা-পয়সা, বাড়ি, গাড়ি, জমি, মেয়ে এগুলো সব বহির্বস্তু, এগুলোকে বলা হয় পরাগাত্মন। দেহ মাঝামাঝারি, পরাগও না, প্রত্যগও না। আমরা প্রায় সবাই দেহকে আত্মা মনে করি। দেহকে আত্মা বলে যারা মনে করে তাদেরই এই হর্ষ বিষাদ হয়। যারা কামী পুরুষ, এরাও কোথাও না কোথাও নিজের দেহের সাথে তার কামের বস্তুকে জড়িয়ে রাখে বলে তাদেরও প্রিয় বস্তু প্রাপ্তিতে হর্ষ আর অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্তিতে বিষাদ হয়।

কিন্তু যাঁরা কেবল আত্মাকেই দেখেন, আত্মা ছাড়া আর কিছু দেখেন না, আচার্য বলছন, *ন কেবলাত্মদর্শিনঃ তস্য প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্তসম্ভবাৎ,* তাঁর কাছে প্রিয় অপ্রিয় কি করে হবে! কারণ সব কিছু তো মনকে নিয়ে, মন যদি সব সময় আত্মাতে পরিপূর্ণ থাকে, আত্মাতে সমরসতা যদি হয়ে যায়, তাহলে বহির্জগতে কি হচ্ছে না হচ্ছে, কিছুই তো তাঁর ভিতরে ঢুকবে না। যাঁরা অনন্তে সেই আত্মাকে দেখেন, তাঁদের প্রিয় অপ্রিয় বস্তুতে হর্ষ ও বিষাদ হওয়ার কোন প্রশ্নই থাকে না। আমাদের সবার এত দুঃখ কেন? কারণ হল বিষাদ। বিষাদ কেন হয়? অপ্রিয় বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রিয় বস্তুর সঙ্গে সংযোগ না হওয়া। বাঁচার উপায় কি? ঈশ্বরে মন দিন, ঠাকুরের নাম করুন। ঠাকুর বলছেন, সন্ধ্যাবেলা হাততালি দিয়ে হরিনাম কর। আপনি বলবেন, 'কেন, গুরু যে বলে দিয়েছেন একশ আটবার করে নাম করতে, আর নাম জপ করার সময় ঠোঁট যেন না নড়ে'? অবশ্যই তাই করবেন। করে সংখ্যা না রেখে মনে মনে হাততালি দিয়ে রাম রাম গুনগুন করতে থাকুন, কেউ বুঝতেও পারবে না আপনি ভিতরে ভিতরে কি বলছেন। যখনই ফাঁকা থাকবেন তখনই এইভাবে ঈশ্বরের নাম

করতে থাকুন। কারণ মন যদি ফাঁকা থাকে, তখন প্রিয় অপ্রিয় বস্তুগুলি ভিতরে নাড়া দিত থাকবে। বলছেন, সমস্ত ভূত, সমস্ত বস্তু রূপে, সমস্ত প্রাণী রূপে সেই আত্মাই বিরাজ করে আছেন। ঠাকুর বলছেন, গঙ্গার ঢেউ উঠছে নামছে, তাতে যেন বালিশ ভেসে যাচ্ছে, গঙ্গার ঢেউটা সমান। এই একটা ঢেউ উঠল, এই আরেকটা ঢেউ মিলিয়ে গেল; তাতে গঙ্গার জল, গঙ্গার প্রবাহের কোন হেরফের হয় না।

এই জ্ঞানের ফলে তাঁর মধ্যে কর্মের কোন স্পৃহা থাকে না। কর্ম হল কিছু পাওয়ার জন্য। আত্মজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞানীদেরও কিছু পাওয়ার থাকে না। দেহকে চালানোর জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু তাঁরা মিটিয়ে দেন। খবরে দেখলাম, কেরলে ইনকাম ট্যাক্সের হানায় এক আর্চ বিশপ ধরা পড়েছে, সে কিভাবে কিভাবে কত কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি জমা করেছে। কিসের তুমি ম্যান অফ্ গড্! আর সেও নাকি পুরো ফেক্, কেউ বানায়নি, নিজে থেকেই সেলফ প্রোক্লেইম।

আত্মজ্ঞানী পুরুষরাই আমাদের অনুকরণীয়, আমাদের জীবনধার তৈরী হয় এই ধরণের মানুষের পদচিহ্নে চলতে চলতে। একুশ নম্বর শ্লোকে বলছেন, অক্ষয় সুখ কিভাবে পাওয়া যাবে, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি কিভাবে হবে। কারণ দুঃখের নিবৃত্তি না হলে সুখ কোন দিন পাওয়া যাবে না। বলছেন, *বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা*, এখানে এই আত্মা বলতে মন বা অন্তঃকরণ; আমাদের মন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাইরের বিষয়গুলিকে গিয়ে স্পর্শ করে নেয়। বাইরের থেকে যখন কোন সিগন্যাল আসে, ধরুন কান দিয়ে কিছু একটা শব্দ শুনতে পেলাম, মধুর লাগল, তখন আমাদের চেতনা কর্ণেন্দ্রিয় দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ওই বস্তুকে ছুঁয়ে নেয়। একটা জিনিস দেখতে ভাল লাগল, ওটার দিকে চক্ষু এগিয়ে যায়। আবার অনেকে বলে ইন্দ্রিয়গুলি এগিয়ে গিয়ে সব সময় স্পর্শ করার চেষ্টা করছে, অক্টোপাস যেমন সুরগুলিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছোঁওয়ার চেষ্টা করে, ইন্দ্রিয়গুলিও সেইভাবে সব কিছুকে ছোঁওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে, সেইজন্য বলছেন বাহ্যস্পর্শ। জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে সব কিছুকেই ইন্দ্রিয় দিয়ে স্পর্শ করে নেওয়া যায়। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে যেটাকেই পাওয়া যায় সেটাকেই বলা হয় স্পর্শ। তার মানে আপনি আমার জন্য স্পর্শ, আবার আমি আপনার জন্য স্পর্শ। আর কোনটাই আমাদের ভিতরে নেই, সব বাইরে আছে, সেইজন্য বলছেন বাহ্যস্পর্শ। বাইরের যে কোন জিনিসের প্রতি আমাদের মন চলে যায়, সেখানে গিয়ে আমরা আসক্ত হয়ে যাই – *বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা*।

যিনি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, তাঁর মন কোন বস্তু, কোন ব্যক্তি, জগতের কোন কিছুর প্রতি আসক্ত হবে না। এই আসক্ত না হওয়ার জন্য যে সুখ হয়, এই সুখটাই ভিতরের সুখ, *বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্*। বাইরে সুখের সন্ধান করতে করতে আমরা ভুলেই গেছি যে, আসল যে সুখ, সেই সুখের এক বিশাল ভাণ্ডার আমাদের ভিতরেই। বাইরে যেখানেই আমরা সুখ পাই মনে করছি, আসলে আমাদের ভিতরের সুখটাই বাইরে গিয়ে সেখানে বসে যায়। আমরা কাকে ভালবাসি? আসলে আমরা কাউকেই ভালবাসি না, আমরা শুধু নিজেকেই ভালবাসি। আমাদের সবারই মনের জগতে যার যার নিজের একটা আইডিয়া আছে, যেমন আইডিয়া অফ বিউটি, আইডিয়া অফ লাভ, আইডিয়া অফ লার্নিং, আইডিয়া অফ কম্পাশান্। যেখানে মনে হয়ে এখানে ভালবাসা হতে পারে, তখন আমার নিজের ভিতরে যে ভালবাসা আছে, সেই ভালবাসা আমার ভিতর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওখানে একটা আবরণ সৃষ্টি করে, তখন আমি ওটাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে চেটে চেটে খাই। আমরা এটা বুঝতেও পারি না যে, যদি ওই বস্তুর মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য থাকত, তাহলে সবাই ওকে ভালবাসত। কই, সবাই তো ওকে ভালবাসে না। ছেলেমেয়েরা প্রেম করে, মা-বাবারা অনেক সময় বিরক্ত হয়ে যান। যদি ওই ছেলে বা মেয়ের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য থাকত, তাহলে মা-বাবারাও রাজী হয়ে যেতেন। বৈশিষ্ট্য ছেলের মধ্যে নেই, তোমার নিজের বৈশিষ্ট্যতা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বেরিয়ে গিয়ে তাকে আবৃত করে ধরে নিচ্ছে। কিন্তু আপনার নিজের যে ভালবাসা সেটাই বেরিয়ে যাচ্ছে। আর যত বেরিয়ে যাচ্ছে, ভিতরে তত কমে

যাচ্ছে। কি করে কমে যাচ্ছে? কারণ বহির্জগতে যিনি যত সুখ পান, অন্তর্জগতে তিনি তত কম সুখ পান। বাইরে ভালবাসা দিতে গিয়ে অনেক সময় হাত থেকে বেরিয়ে যায়, তখন দুঃখের আর শেষ হতে চায় না।

বলছেন, যখন বহির্জগতের কোন বস্তুকে স্পর্শ করার জন্য ভিতর থেকে কোন চেষ্টা থাকে না, করতেও চায় না, তখনই সে ভিতরের সেই সুখটা পায়। তিনিই *ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা*, ব্রহ্ম যা আত্মাও তাই, ঈশ্বরও তাই, ওই যোগকে নিয়ে যিনি *যুক্তাত্মা*, অর্থাৎ নিজের মনটাকে ওখানে লাগিয়ে রেখেছেন, *সুখমক্ষয়মশ্নুতে*, তিনি অক্ষয় সুখ পান। যদি কেউ সুখ পেতে চায়, আগে তাকে বহির্জগৎকে ছাড়তে হবে, বাইরের সুখকে ছাড়তে হবে। ঠাকুর বলছেন, ভিতরে সোনা চাপা আছে, খবর নাই। সমস্ত সুখ যে আমাদের ভিতরেই, আমাদেরও এই খবর নাই।

আত্মার ব্যাপার, ঈশ্বরের ব্যাপার ছেড়ে দিন, সাধারণ লৌকিক বুদ্ধি যদি লাগানো হয়, সেটাই বাইশ নম্বর শ্লোকে বলছেন, *যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে। আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ*, যে সুখ পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে জন্ম নিচ্ছে, সেই সুখকে বলছেন *সংস্পর্শ+জা*, কোন শব্দের শেষে যদি 'জ' লেগে যায়, বুঝতে হবে ওই জিনিসটা থেকে জন্ম হয়েছে, যেমন জলজ, জল থেকে যার জন্ম, পদ্মকে বলা হয়। বলছেন *সংস্পর্শজা*, স্পর্শ থেকে যে সুখ জন্ম নেয়, সেই সুখটা কি রকম? *আদ্যন্তবন্তঃ*, এর আদি আছে এর অন্ত আছে। খুব সহজ যুক্তি, যে আগেও ছিল না, পরেও থাকবে না, মাঝখানে সে কোথা থেকে আসবে? এই যুক্তি বেদান্তে ঘুরে ঘুরে আসে। বেদান্ত খুব সহজ যুক্তি নিয়ে চলে। যেমন বলেন কোনটা পরিবর্তনশীল আর কোনটা অপরিবর্তনশীল? তখন বলছেন, যেটা আছে, যেমন ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরই বস্তু; বস্তু মানে তিনটে কালেই যেটা আছে। যেটা গতকাল ছিল, আজকে আছে, আগামীকাল থাকবে না, সেটা অবস্তু।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ষোল নম্বর শ্লোকে যেখানে বলছেন *নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ*, সেখানে এই বিষয়টাকে আমরা বিস্তারে আলোচনা করেছি। যদি সৎ বস্তু হয়, তাহলে তার কোন দিন অভাব হবে না। যেটা আজকে আছে, গতকাল ছিল না, আগামীকাল থাকবে কিনা জানা নেই, তার মানে এটা অবস্তু। মাণ্ডুক্যকারিকাতে খুব সুন্দর বলছেন, যেটা গতকাল ছিল না, আগামীকালও থাকবে না, বুঝে নাও বাপু ওটা আজকেও নেই। খুব মজার argument। আমি একজনকে ভালবাসি, ভালবাসার একদিন জন্ম হল। আগামীকাল সে আমাকে ছেড়ে আর-একজনের কাছে চলে যেতে পারে, কিংবা মরে যেতে পারে; ভালবাসা শেষ। এনাদের খুব সহজ যুক্তি, এটাই মায়া। মায়া কোনটা? দেশ, কাল ও বস্তু এই তিনটেতে যে আবদ্ধ, পরিচ্ছিন্ন; এটাই অসৎ।

কিন্তু সেখানেই থামছেন না, সেখান থেকে আরেক ধাপ যাচ্ছেন। বলছেন, গতকাল ছিল না, আগামীকাল থাকবে না, তার মানে, এটা এখনও নেই, এর কোন অস্তিত্বই নেই। যদি ওটা সত্যি হত, তাহলে তিন কালে সব সময় থাকত। সত্য নয় বলেই থাকছে না। অত্যন্ত সহজ যুক্তি, কিন্তু খুব গভীর যুক্তি; সাধারণ মানুষ এগুলোকে ধারণাই করতে পারবে না। বলছেন, *আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ*, অর্থাৎ যিনি বুদ্ধিমান তিনি কখনই এই ধরণের বস্তুর দিকে যাবেন না – যেটা গতকাল ছিল না, এখন আছে কিন্তু আগামীকাল থাকবে না। যে কোন বস্তুর যার আদি আছে বা যার অন্ত হতে যাচ্ছে, সেই বস্তুকে বুদ্ধিমানরা কক্ষণ ভালবাসতে যাবেন না।

আচার্য তাঁর খুব প্রিয় উক্তিটা আবার এখানে নিয়ে আসছেন, *ন সংসারে সুখস্য গন্ধমাত্রম্ অপি অস্তি, ইতি বুদ্ধা বিষয়মৃগতৃষ্ণিকায়া ইন্দ্রিয়াণি নিবর্তয়েৎ*, মৃগতৃষ্ণা, মরীচিকার মত বুঝতে হয়, মরীচিকার যেমন আদি আছে অন্ত আছে, ঠিক সেই রকম এই সংসারের যত সুখ আছে, সব সুখ ত্যাগ করতে হয়। যে জিনিসটার শুরু আছে, যে জিনিসটা একদিন শেষ হয়ে যাবে, তার মানে সেই

জিনিসটা বর্তমানেও নেই। আমরা এটাকে খুব সহজ ভাবে বলে দিই, এভাবে বলে দিলে এর কোন দাম বোঝা যাবে না, বেদান্ত এত সহজ ভাবে বলবেন না, বেদান্ত বলবেন, সেটা আদপেই নেই, এরপর দাম-অদামের কোন প্রশ্নই নেই। যদি গতকালও থাকত, আগামীকালেও যদি থাকে, তবেই ওটা সৎ হবে। গতকাল যদি না থেকে থাকে, তাহলে ওটা আজকেও নেই। এর উপরেই বেদান্ত তাঁর পুরো যুক্তিতর্ক দাঁড় করান। আমরা হয়ত মানতে পারব না, বুঝতেও পারব না, আপাততঃ আমাদের শুনে রাখতে হবে। মাণ্ডুক্যকারিকাতে এটার উপর আচার্য খুব সুন্দর ভাষ্য লিখেছেন।

বলছেন, আসলে এটা অনিত্য, অসৎ; অনিত্য বস্তুর দিকে কখন যেতে নেই। আমাদের মনে সংশয় আসতে পারে, তাহলে লোকেরা যে এত খাটাখাটনি করছে, জীবন থেকে যে এত কিছু চলে যাচ্ছে, জীবনে যে এত কিছু আসছে, এগুলো তাহলে কি হচ্ছে? যিনি গীতা বুঝে নিয়েছেন তিনিই বুদ্ধিমান, আর বিশ্বের বাকি সবাই বোকা? পুরো সংসার যে দৌড়াচ্ছে, সবাই কি বোকা? বলছেন, তা নয়, আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *অত্যন্তমূঢ়ানাম্ এব হি বিষয়েষু রতিঃ দৃশ্যতে*, আচার্যের ভাষা এত সুন্দর যে কল্পনা করা যায় না। যে অত্যন্ত মূঢ়, মনটা যাদের ভোগের মধ্যে থেকে একেবারে বিষয়রসে রঞ্জিত হয়ে গেছে, একমাত্র তাদেরই দেখা যায় বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণ; কুকুর যেমন মাংস দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক সেই রকম এরা বিষয়ের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ে। একমাত্র এই অত্যন্ত মূঢ় ব্যক্তিরাই *বিষয়েষু রতিঃ*। কঠোপনিষদে নচিকেতা যমরাজকে বলছেন, *অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত*, কে অনেকদিন জীবিত থাকতে চায়? আচার্য শঙ্কর উত্তরে বলছেন, অবিবেকী। যারা অবিবেকী, বিবেকহীন যারা তারাই মনে করে আমি অনেকদিন বাঁচব, অনেক ভোগ করতে পারব। এরাই পশুতুল্য।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ।।২৩।।

(এই জীবনেই যিনি আমরণ কাম ও ক্রোধের বেগধারণ করতে পারেন, তিনিই প্রকৃত যোগী, তিনিই বস্তুত সুখী।)

এখান থেকে পরের যে অধ্যায় আসবে সেটার ভূমিকা তৈরী করে দিচ্ছেন। ষষ্ঠ অধ্যায় হল ঠিক ঠিক যোগের উপর। ওটারই প্রস্তুতি পঞ্চম অধ্যায়ের এখান থেকে নিতে শুরু করলেন। *শক্নোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ*, জীবিত অবস্থায়, শরীর ত্যাগের আগেই যিনি *কামক্রোধোদ্ভবং বেগং*, কাম আর ক্রোধের দুর্নিবার বেগকে সহ্য করে নেন, আর দ্বিতীয় যিনি সহ্য করতে চাইছেন; এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ, যিনি কাম ক্রোধ জয় করে নিয়েছেন, আর দ্বিতীয় যিনি জয় করার ইচ্ছা রাখেন। আচার্য শঙ্করের এখানে ভাষাটা হল, যেটা একটু পরেই এক জায়গায় বলবেন, *উৎসহতে*, অর্থাৎ যে সহ্য করে এবং উৎসাহ রাখে। যার উৎসাহ আছে, আমি কাম ক্রোধের বেগ সহ্য করতে চাইছি, সেও একজন মহৎ, আজ হোক কাল হোক সে এটাকে জয় করবেই। যারা একেবারেই চায় না, তাদের কথা বাদ দিন, আপনি পারবেন। বলছেন, কাম ক্রোধের যে তোড় আসে, এটাকে তিনি সহ্য করে নেন। ঠাকুর, স্বামীজী, এনার সহ্য করে নিয়েছেন। আমি, আপনি সহ্য করতে চাইছি। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যেখানে জ্ঞানীর কথা বলা হয়েছিল, সেখানেও বলেছিলেন যাঁরা জ্ঞানের পথ নিয়েছেন তাঁরাও জ্ঞানী। আপনারাও জ্ঞানী। যার মধ্যে এই ইচ্ছা জেগেছে, আমি কাম ক্রোধের বেগকে জয় করতে চাইছি, সেও জ্ঞানী। যিনি কাম ক্রোধের বেগকে জয় করতে ইচ্ছা করেন, বা যিনি জয় করতে সফল হয়ে যান, *স যুক্তঃ স সুখী নরঃ*, তিনি যোগী, তিনিই সুখী। সুখী কে? যিনি কাম ক্রোধের বেগকে আটকে দিয়েছেন, বা আটকাতে চাইছেন, সেই সুখী, সেই পারে দুঃখকে জয় করে নিতে। তবে বলা হয়ে থাকে, কাম ক্রোধের বেগকে ভরসা করা যায় না, মৃত্যুর সময়েও আসতে পারে।

এখানে আচার্য কাম জিনিসটা কি ব্যাখ্যা করে বলছেন, *ইন্দ্রিয়গোচরপ্রাপ্তে ইষ্টে বিষয়ে শ্রূয়মাণে স্মর্যমাণে বা অনুভূতে সুখতেতৌ যা গর্ধিঃ তৃষ্ণা স কামঃ,* যে বস্তুকে আপনি আগে অনুভব করেছেন, ইন্দ্রিয় দিয়ে জেনেছেন, ওই বস্তুর ব্যাপারে পরে আবার শুনে নিলে বা স্মৃতিতে যদি এসে যায়, তখন সেটাকে পাওয়ার যে ইচ্ছা জাগে, এটাকে বলে কামনা। প্রথম কথা, ওই জিনিসটার ব্যাপারে আগে থেকে মনে থাকতে হবে, দ্বিতীয় কথা, ওটাকে টোকা দিতে হবে। সেইজন্য বলা হয় বিষয়ী লোকের সঙ্গ করতে নেই। কারণ আমাদের মনে অনেক অঙ্কটবঙ্কট আছে, বিষয়ী লোকদের সঙ্গ করার সময় তারা যখন ভোগের কথা বলবে, তখন আমাদের মনে টোকা মেরে ভোগের ইচ্ছা জাগিয়ে দেবে। ভোগের ইচ্ছা একবার জেগে উঠলে, সেই ইচ্ছাকে সামলানো খুব কষ্টকর।

যখন পাওয়া যাবে না তখন ক্রোধ হবে, ক্রোধের ব্যাখ্যা করে আচার্য বলছেন, *ক্রোধঃ চ আত্মনঃ প্রতিকুলেষু দুঃখহেতুষু ইষ্টমানেষু শ্রূয়মাণেষু স্মর্যমানেষু বা যো দ্বেষঃ স ক্রোধঃ,* প্রতিকূল দুঃখদায়ক বিষয়কে দেখে, শুনে বা স্মরণ হওয়ার পর ভিতরে যে দ্বেষ উৎপন্ন হয় এটাকেই ক্রোধ বলে। সেই দ্বেষের ফলে কি হয়? *রোমাঞ্চন ইষ্টনেত্রবদনাদিলিঙ্গঃ,* যখন সুখ হয় তখন চোখমুখ প্রফুল্ল হয়ে ওঠে, শরীরে রোমাঞ্চ হয়, চোখ মুখ বড় বড় হয়ে যায়। আর যখন রেগে যায়, *গাত্রপ্রকম্পপ্রস্বেদসংদষ্টৌষ্ঠপুটরক্তনেত্রাদিলিঙ্গঃ ক্রোধোদ্ভবঃ,* শরীর কাঁপতে শুরু হয়, ঘাম বেরোতে থাকে, ঠোঁট কামড়াতে থাকে, চোখ ও বদন লাল হয়ে যায়, বুঝতে হবে তার মধ্যে ক্রোধের বেগ এসেছে। আর বলছেন, *তং কামক্রোধোদ্ভবং বেগং য উৎসহতে প্রসহতে,* যে এটাকে সহ্য করার উৎসাহ রাখে সে যোগী। আপনারা সবাই যোগী, কারণ এই কাম ক্রোধের যে বেগ, এটা সহ্য করার ইচ্ছা আপনাদের আছে, উৎসাহ আছে। একজন পানওয়ালাও বিজনেস করছে, বিল গেটসও বিজনেস করছে, দুজনই বিজনেসম্যান। যোগীও সাধারণ স্তরের হয় আবার উচ্চমানেরও হয়। ভগবান বুদ্ধও যোগী, ওই স্তরেও যোগী হয়, আবার আমার আপনার স্তরেও যোগী হয়। একজন লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন, অন্যজন ব্রহ্মপ্রাপ্তির লক্ষ্যের পথে পা রেখেছেন, দুজনেই যোগী। কিভাবে তিনি ব্রহ্মকে পান?

যোহন্তঃসুখোহন্তরারমস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি।।২৪।।

(যিনি আত্মাতেই সুখ অনুভব করেন, বাহ্যবিষয়ে নয়; যিনি আত্মাতেই ক্রীড়াযুক্ত, বাহ্যবিষয়ে নয়, এবং যিনি অন্তর্জ্যোতি ও ব্রহ্মস্বরূপ, তিনি এই জীবনেই ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন।)

ভিতরে যিনি সুখ পান, তিনি *অন্তঃসুখঃ;* যাঁর যত ক্রিয়া, যত চিন্তা-ভাবনা সব ভিতরকে নিয়ে, এটাকে বলছেন *অন্তরারামঃ,* আর যিনি ভিতর থেকেই সমস্ত জ্ঞানের আলো পান, তিনি হলেন *অন্তর্জ্যোতিঃ*। তিনটে শব্দ বলছেন, '*অন্তঃসুখঃ*', '*অন্তরারামঃ*' আর '*অন্তর্জ্যোতিঃ*'। *স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং,* সেই যোগীই ব্রহ্মকে পায়, কারণ তিনি সব কিছুকে ভিতরে নিয়ে চলে গেছেন। এনারাই জীবিত অবস্থায় মোক্ষ লাভ করে পরম ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন। মৃত্যুর পরে যে মোক্ষ পায় তা নয়, জীবিত অবস্থাতেই, এই দেহে থাকা অবস্থাতেই এনারা মোক্ষ লাভ করেন। মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবো, মৃত্যুর পর মুক্তি হবে, এগুলো তাঁদের কাছে কিছুই না। তার জন্য কি করতে হয়? *অন্তঃসুখঃ, অন্তরারামঃ* এবং *অন্তর্জ্যোতিঃ,* সমস্ত রকম সুখ ভিতর থেকে পান, সমস্ত রকম চিন্তা-ভাবনা ভিতরকে নিয়ে, সমস্ত জ্ঞান সব ভিতরেই এনারা পান।

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ।।২৫।।

(যাঁরা নিষ্কাম কর্ম দ্বারা পাপমুক্ত; শ্রবণ ও মনন দ্বারা সংশয়রহিত; নিদিধ্যাসন দ্বারা জিতেন্দ্রিয় এবং সমস্ত জীবের কল্যাণে নিরত, সেই সমগ্যদর্শী সন্ন্যাসীগণ এই জীবনেই ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।)

একবার যদি কাম ক্রোধের বেগ সহ্য করার ক্ষমতা এসে যায়, তখন আর একটুতেই তাঁর ভিতরে তোলপাড় হবে না, যোগী হওয়া এবার সহজ হয়ে গেল। তাহলে তো বৃদ্ধ বৃদ্ধারা সহজেই ব্রহ্মনির্বাণ পেয়ে যাবেন? না, পাবেন না, কারণ ওনাদের মধ্যেও কাম ক্রোধ আছে। আমাদের দেখা আছে, চা দিতে একটু দেরী হলে রেগে চেঁচামেচি করতে শুরু করে দিচ্ছেন, ওই বয়সেও কত ক্রোধ। তার মানে ভিতরে এখনও কাম ক্রোধ ঠাসা আছে। সেইজন্য আমাদের পরম্পরাতে বলা হয়, একটা বয়সের পর অবশ্যই সব কিছু ছেড়ে ধর্মে মন দিতে হয়। পঞ্চাশ পেরিয়ে গেলে কাম ক্রোধের বেগ সামলানো অনেক সহজ হয়ে যায়। কারণ এতদিনে ভাদ্র মাসের জল অনেক বেরিয়ে গেছে।

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণং ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ, ক্ষীণকল্মষাঃ, যাদের পাপ আদি সমস্ত দোষ নাশ হয়ে গেছে; মনের মধ্যে যত সংশয় আছে, সব ক্ষীণ হয়ে গেছে; যিনি জিতেন্দ্রিয় আর সমস্ত ভূতের প্রতি যাঁর করুণা রয়েছে, ভালবাসা রয়েছে, তার সাথে অহিংসক; এই ধরণের যাঁরা ঋষি, সম্যক্ জ্ঞানী, এনারা এই জীবনেই ব্রহ্মনির্বাণ বা মোক্ষ পেয়ে যান। এই ধরণের ঋষিদের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তি সহজ হয়ে যায়। *ঋষয়ঃ* মানে সম্যক জ্ঞানী, এই পথে যিনি চলতে শুরু করবেন, তিনিও ঋষি। আমাদের মহারাজ ছিলেন স্বামী মোক্ষানন্দজী, ওনার লম্বা লম্বা দাড়ি ছিল, ট্রেনিং সেন্টারে থাকাকালীন আমরা ওনার কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলাম। উনি প্রায়ই স্বামীজীর সমাধি মন্দিরের পাশে যে বেল গাছ আছে, সেখানে বসে থাকতেন, হাতে পাখা থাকত। একদিন একটা বাচ্চা মায়ের হাত ধরে যেতে যেতে বলছে, ‘মা মা দেখ দেখ ঋষির মত’। উনি খুব রেগে গেছেন, ‘ঋষির মত কিরে, আমি ঋষিই’। আমাদের বয়স তখন কম, আমরা উত্তরটা শুনে হাসলাম। কিন্তু পরে পরে মনে হতে লাগল, কি সুন্দর উত্তর, ঋষির মত কি, আমি তো ঋষিই।

আর আপনিও পুরোদমে ঋষি, কারণ আপনার ধর্মে মন গেছে, চেষ্টা চলছে। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র হয়ত আপনি একদিনে হবে না, সময় লাগবে, কিন্তু পথে তো নেমে পড়েছেন। এবার আপনি ঋষির মত থাকুন। কি রকম? *ক্ষীণকল্মষাঃ,* পাপ আদি করবেন না, চিন্তাতেও পাপ জিনিসটাকে আনবেন না; *ছিন্নদ্বৈধা,* কোন দ্বিধা, সংশয় থাকবে না; *যতাত্মানঃ,* এই পথে লেগে থাকতে হবে, শুধু সকাল সন্ধ্যে আসনে বসে জপ করলাম, ধ্যান করলাম তা করলে হবে না, সারাদিন এতেই লেগে থাকতে হবে। আর *সর্বভূতহিতে রতাঃ,* সবাইকে নিজের সন্তান মনে করে মায়ের মত তাদের মঙ্গল চিন্তা করতে হবে। মা তার ছোট সন্তানের কোন জিনিসের প্রতি লোভ করে না, মায়ের যেমন সবারই প্রতি সমান ভালবাসা, সমস্ত ভূতের প্রতিও আপনার সমান ভালবাসা হবে, *সর্বভূতহিতে রতাঃ,* সবারই মঙ্গলে রত। তাহলে বাঘ যদি আমাকে খেতে আসে? নিজেকে রক্ষা করতে হবে, কারণ আমার তো এখনও জ্ঞান হয়নি, আত্মজ্ঞান হলে তখন দেখা যাবে। আমাকেও বাঁচতে হবে, কিন্তু কারুর কোন ক্ষতি আমি চাইব না।

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্।।২৬।।

(কামক্রোধ থেকে মুক্ত, সংযত চিত্ত, আত্মজ্ঞ সন্ন্যাসীরা জীবিতাবস্থায় ও মৃত্যুর পর উভয়তঃ ব্রাহ্মী স্থিতি বা মোক্ষ লাভ করেন; মৃত্যুর পর তাঁদের আর দেহধারণ হয় না।)

এখানে আরও কিছু যুক্ত করছেন। *কামক্রোধবিযুক্তানাং,* কাম ক্রোধ, এই যে দোষ, এটাকে যিনি জয় করে নিয়েছেন, মানে কাম ক্রোধ থেকে যিনি মুক্তি পেয়ে গেছেন, অন্তঃকরণ, অর্থাৎ মনকে যিনি বশে নিয়ে এসেছেন, আত্মার স্বরূপকে যিনি জেনে গেছেন, এই ধরণের যিনি জ্ঞানী, তিনি জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরে দুটো অবস্থাতেই মুক্তি পেয়ে যান। *যতীনাং যতচেতসাম্,* যতি যিনি চেষ্টা করছেন, তিনি চিত্তকে বশে করে নিয়েছেন, সংযতচিত্ত।

অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্, অভিতো মানে উভয়ে, জীবদ্দশায় আর মৃত্যুর পর, দুটো অবস্থাতেই তিনি আত্মাকে জয় করে নেন। এখানে বলছেন, যাঁরা জ্ঞানযোগী, যাঁরা কর্মযোগী, সবাই মুক্তি পান। কিভাবে? আচার্য শঙ্কর এখানে ব্যাখ্যা করে বলছেন, এই ধরণের যাঁদের নিষ্ঠা, যেটা এই অধ্যায়ের আগেই বললেন, এনাদের তো সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি হয়ে যাবে। ঈশ্বরার্পিত ভাবে যিনি সমস্ত কর্মের ফল অর্পণ করে দিলেন, সেখান থেকে সমস্ত কর্মকেও ত্যাগ করে দেন। আর যিনি কাজ করছেন, তিনিও সমস্ত কর্মের ফল ঈশ্বরকে অর্পণ করে দিলেন, তাঁরও মন শুদ্ধ হয়ে যায়। প্রথমে হয় অন্তঃকরণ শুদ্ধি, এই শুদ্ধি থেকে হয় জ্ঞানপ্রাপ্তি। জ্ঞানপ্রাপ্তি বা আত্মজ্ঞান থেকে হয়ে যায় সর্বকর্মসন্ন্যাস। প্রথমে হয় কর্মফলসন্ন্যাস, তারপরে হয়ে যায় কর্মসন্ন্যাস, আর কর্মসন্ন্যাস থেকে মোক্ষ।

এতক্ষণ জ্ঞানযোগীদের কথা বলছিলেন, জ্ঞানযোগী সমস্ত জয় করে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে গেছেন। এরপর কর্মযোগীদের কথা বলছেন। কর্মযোগীরা সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে কাজ করছেন, সেইজন্য এনাদের মুক্তির জন্য ধ্যানযোগ খুব দরকার। আমরা যারা সংসারে আছি, আমাদের ধ্যান করা খুব দরকার। জপধ্যান যদি না করা থাকে, কর্মযোগীরা মুক্তি পান না, জপধ্যান না করলে মন নিয়ন্ত্রণে আসবে না। সাতাশ ও আটাশ নম্বর শ্লোক থেকে শুরু হচ্ছে পরের অধ্যায়ের অর্থাৎ ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভূমিকা।

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ।।২৭।।
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ।।২৮।।

(মন থেকে রূপ, রস, স্পর্শাদি বাহ্য বিষয়সকলের চিন্তা ত্যাগ করে এবং চক্ষুকে ভ্রূযুগলের মধ্যে স্থির করে, প্রাণ ও অপান বায়ুকে নাসাভ্যন্তরচারী করে যিনি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত রেখে মোক্ষপরায়ণ ও ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধ পরিশূন্য হন, সেই মুনি সদাই মুক্ত অর্থাৎ দেহে অবস্থান করেও তিনি মুক্ত।)

বাইরের জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে, সব কিছুকে মন থেকে বার করে দিতে হবে। আচার্য এখানে এটার উপর খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, একটা জিনিসের চিন্তন না করা, এটাই হল তাকে বার করে দেওয়া। জোর করে ত্যাগ করার কথা বলছেন না, যে জিনিসটা আমার ভিতরে এসে গেছে, নানা রকমের কাম ক্রোধাদির ভাব, এগুলোকে চিন্তন না করা। আমরা যখনই ফাঁকা বসে থাকি, তখন শুধু ভাবতে থাকি কি হারালাম, কি পেলাম, কি পাওয়া যেতে পারে। এই ধরণের সমস্ত কিছুকে বাইরে বের করে কি করতে হবে?

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা, প্রাণ আর অপান বায়ুকে সমান করে *নাসাভ্যন্তরচারিণৌ*। বলছেন চোখের দৃষ্টি ভ্রুর মধ্যস্থলে নিবদ্ধ করতে হয়। এগুলো আমাদের জন্য না, আমাদের পরম্পরাতে হৃদয়ে ধ্যান করতে বলা হয়। তখনকার দিনে এগুলো বেশি প্রচলিত ছিল। অনেক স্থানে ধ্যান করা যায়, নাকে ধ্যান করা যায়, ভ্রুর মাঝখানে ধ্যান করা যায়, ব্রহ্মতালুতে ধ্যান করা যায়, হৃদয়ে তো করাই যায়, সব ধ্যানের ফল একই। প্রাণ আর অপানকে সমান করতে বলছেন। আমরা এখন চারিদিকে প্রাণায়ামের কথা শুনছি, প্রাণায়াম কিছু না, নিঃশ্বাস ছাড়া আর নিঃশ্বাস নেওয়া দুটোকে সমান করা। ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচনায় প্রসঙ্গ ক্রমে প্রাণায়ামের উপর যতটুকু আসবে ততটুকু আমরা বলে দেব।

আটাশ নম্বর শ্লোকেও একই চিন্তা-ভাবনাকে ঘুরিয়ে আবার নিয়ে এসে বলছেন, এইভাবে মন থেকে সব চিন্তা ত্যাগ করে, ভ্রুযুগলে চক্ষু স্থির করে এবং প্রাণ ও অপান বায়ুকে নাসাভ্যন্তরচারী করে

যিনি নিজের ইন্দ্রিয়কে, মনকে, বুদ্ধিকে বশে করে নিয়েছেন, এই ধরণের মুনিরা জীবদ্দশাতেই মুক্ত হয়ে যান, এনারাই হলেন জীবনমুক্ত পুরুষ। আমরা প্রথমে যেখানে শুরু করলাম মন দৌড়ে দৌড়ে এগিয়ে যায়, কিন্তু মুনি মনকে একটা জায়গায় স্থির করে রেখেছেন। কিভাবে? সব সময় ঈশ্বরের চিন্তন মনন করে। যিনি সব সময় মনন করেন, তাঁকে বলা হয় মুনি। তাহলে মুনি কাকে বলা হয়? ঈশ্বরের স্বরূপকে যিনি সব সময় মনন করেন। সন্ন্যাসীকেও মুনি বলা হয়, কারণ একজন সন্ন্যাসী সব সময় ঈশ্বরের চিন্তন করেন। আর বলছেন, তিনি শরীরে আছেন কিন্তু *মোক্ষপরায়ণঃ,* জীবনের একটাই উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন। যিনি জানেন মোক্ষ বা মুক্তিই হল আমার একমাত্র গতি, মুক্তি ছাড়া আমি আর কিছু চাই না, ফলে তিনি ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধাদি থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন। তাঁর কোন কিছু চাওয়ার নেই, কাউকে ভয় করারও কিছু নেই, সেইজন্য কারুর উপর তিনি কোন প্রকার ক্রোধ করেন না। এইভাবে মন যাঁদের নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে, এনারাই হলেন সমাহিত চিত্ত। এনারাই মুক্ত, নূতন করে এনাদের আর মুক্ত হতে হয় না।

এই শ্লোকে যে গুণগুলির কথা বলা হল, তার মধ্যে প্রথম হল ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে বশ করে নেওয়া হয়েছে, দ্বিতীয় যিনি সদা সর্বদা ঈশ্বরের স্বরূপের মনন করেন, অর্থাৎ যিনি মুনি, যিনি সন্ন্যাসী, আর তৃতীয় তিনি মোক্ষ পরায়ণ, তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, আমি মুক্তি চাই, চতুর্থ হল, কামনা, বাসনা, ক্রোধ, ভয় আদির পারে চলে গেছেন। এই গুণগুলি থাকা মানে, এটাই মুক্তি। কারণ যাঁরা মুক্ত পুরুষ, যাঁদের আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, তাঁরা এটাতেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা তাঁদের ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিকে বশে নিয়ে এসেছেন, তাঁরা সব সময় ঈশ্বর চিন্তন করেন, তাঁরা কামনা-বাসনা, লোভ, ভয় এগুলো থেকে সদা মুক্ত। তফাৎ হল, আটাশ নম্বর শ্লোকে যেটা বলছেন আর বাস্তব জ্ঞানীর মধ্যে শুধু উপলব্ধির ক্ষেত্রে তফাৎ, জীবনধারা দুটোতেই সমান। ভগবান এবার ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরিসূচনা করার জন্য বলছেন –

ভোক্তারাং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।।২৯।।

(কর্তা ও দেবতা রূপে আমি যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের আমি মহেশ্বর এবং সকলের উপকারী সুহৃদ্ এই প্রকারে আমাকে স্বীয় আত্মরূপে জেনে যোগী শান্তি লাভ করেন।)

এতক্ষণ মুক্তি, মোক্ষের কথা বলছিলেন, এবার ভগবান তাঁর স্বরূপ বর্ণনা করছেন। এখানে বলছেন, আমি কে। আগে চৌদ্দ নম্বর শ্লোকে ভগবান বললেন, *ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ* আবার পনের নম্বর শ্লোকে বললেন, *নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ,* একমাত্র অজ্ঞানীরাই আমাকে এর বিপরীত মনে করে। এই শ্লোকে ভগবান চৌদ্দ ও পনের নম্বর শ্লোকের পুরো বিপরীত কথা বলছেন। কি রকম বিপরীত বলছেন, *ভোক্তারাং যজ্ঞতপসাং,* যত যজ্ঞ করা হয় সব যজ্ঞের ফল আমিই গ্রহণ করি। *সর্বলোকমহেশ্বরম্,* যত প্রকার লোক আছে, সমস্ত লোকের আমিই মহেশ্বর। *সুহৃদং সর্বভূতানাং,* যত প্রাণী আছে সবারই আমি সুহৃদ। হে অর্জুন, তুমি এই জিনিসটাকে ভাল করে বুঝে নাও, বুঝে নিয়ে সব কিছু থেকে বেরিয়ে এসে শান্তি লাভ কর।

এখানে বিপরীত ভাব কেন? কোন বিপরীত ভাব নেই। চোদ্দ ও পনের নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছিল জ্ঞানীর দৃষ্টিতে। যিনি জ্ঞানী, যিনি জ্ঞানমার্গের পথিক, তিনি দেখেন আত্মা ব্যতিরেকে সমস্ত কিছু অজ্ঞান প্রসুত, মায়া। আগেও আমরা বলেছি, ঈশ্বর হলেন, ব্রহ্মকে যখন মনের জগতে দেখা হয়। ভক্তি আর জ্ঞানে কোন তফাৎ নেই। উনত্রিশ নম্বর শ্লোকে একজন নিষ্ঠাবান ভক্তের দৃষ্টিতে বলা হচ্ছে। যিনি ভক্তি কামনা করছেন, তিনি মনে করেন, তিনি যা পূজা করছেন, যা যজ্ঞ করছেন সব ঈশ্বরের উদ্দেশ্য করছেন। জ্ঞানী বলবেন, তুমি অজ্ঞানে আছ। ভক্ত বলবে, হ্যাঁ ভাই আমি অজ্ঞানেই আছি, তার জন্য আমার কোন সমস্যা নেই। তুমি জেনে রাখো, আমি যাঁর পূজা করছি, তুমি জ্ঞানী

হয়ে তাঁরই চিন্তন করছ। তুমি তোমার মনের এলাকার বাইরে চলে যেতে চাইছ, আমার এতে কোন আগ্রহ নেই।

ভোক্তারাং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্, আমি সব কিছুর ভগবান, আমিই দেবতা রূপে সমস্ত ভোগ গ্রহণ করি আর ঈশ্বর রূপে সব লোকের নিয়ন্ত্রণ করি। *সুহৃদং সর্বভূতানাং*, আমি কারুর প্রত্যুৎকার চাই না। আমি যে মানুষের ভাল করি, প্রত্যেক জীবকে যে ভালবাসি, তা আমি নিজে থেকেই করি। আমাকে প্রসাদ দিয়ে যে বলবে, হে ঠাকুর তোমাকে প্রসাদ দিলাম, আমার ভাল কর; না, ওই প্রসাদের বিনিময়ে আমি কারুর কিছু করি না, আমি যা করার নিজে থেকেই করি।

আচার্য বলছেন, *সর্বকর্মফলাধ্যক্ষং সর্বপ্রত্যয়সাক্ষিণং*, এই সংসারে যত কর্ম হয় তার অধ্যক্ষ আমি, আমি যদি অধ্যক্ষ না হই তাহলে আপনি ভাল কর্ম করলেন, তার ফল আমি পেয়ে যাব। ভগবান সব কর্মের অধ্যক্ষ, তিনি আছেন বলে সবাই ঠিক ভাবে কাজ করে। আর তার সাথে বলছেন, *সর্বপ্রত্যয়সাক্ষি*, তোমার বুদ্ধিতে যা কিছু চলে সব কিছুর সাক্ষি আমি। ভগবান সবার অন্তর্যামীর রূপে ভিতরে আছেন, তিনি সরাসরি কোন কিছুতে জড়ান না, কিন্তু তিনি আছেন বলেই এই বুদ্ধি বৃত্তি গুলি কাজ করে।

জ্ঞাত্বা শান্তিং সর্বসংসারোপরতিম্, এই জিনিসটা যখন বুঝে নেবে, সমস্ত দেবতা রূপে আমি যজ্ঞাদির ফল গ্রহণ করি আর আমি হলাম সবারই সুহৃদ্, *সর্বকর্মফলাধ্যক্ষ*, আর আমি সাক্ষি রূপে আছি বলে, আমি কোন কিছুতে হস্তক্ষেপ করি না, সব কিছু ঠিক ঠিক ভাবে চলছে –এই জিনিসটাকে বুঝে নিলে এই সংসার থেকে তোমার নিবৃত্তি হয়ে যাবে। এবার আপনি ঠিক করুন কোন মার্গ নেবেন, জ্ঞানমার্গ নেবেন, নাকি ভক্তিমার্গ নেবেন। কিন্তু দুটোতেই আপনাকে এই জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, সংসার থেকে নিবৃত্ত হয়ে আসল শান্তির দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আর যদি জ্ঞানযোগী না হয়ে কর্মযোগী হন, তাহলে ধ্যানযোগ আপনার জন্য অত্যন্ত দরকার। জ্ঞানীদেরও প্রথমের দিকে ধ্যানযোগ দরকার, কিন্তু তাঁরা সেখান থেকে আরও এগিয়ে যান। এরপর আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগ নিয়ে আলোচনা করব।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চোমহধ্যায়ঃ।।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধ্যানযোগ

এই অধ্যায়ের নাম ধ্যানযোগ। ধ্যান জিনিসটা কার জন্য, ধ্যান কিভাবে করা হয়, ধ্যানের জন্য অন্যান্য কি কি আনুষাঙ্গিক আয়োজন দরকার, ধ্যানের জন্য মনের অবস্থা কেমন হওয়া দরকার এবং ধ্যানের ফল কি, এই জিনিসগুলিকে নিয়ে এই অধ্যায়ে খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করা হবে। তার সঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনা করা হবে –যদি পূর্ণতা লাভ না হয়, আত্মজ্ঞান যদি না হয়, তাহলে এই ধরণের যোগীদের স্থূল শরীর ত্যাগের পর কি গতি হয়। রাজযোগে বক্তব্য অত্যন্ত সাধারণ ভাবে রাখা হয়েছে, রাজযোগ পুরো টেকনিক্যাল জিনিস, সেইজন্য রাজযোগের সঙ্গে কারুরই তুলনা চলে না। সাধারণ মানুষের জন্য যতটুকু জানা দরকার, তার সবটাই ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন রাজযোগের নিজস্ব একটা দর্শন রয়েছে, সেটাকে নিয়ে এখানে আলোচনা করছেন না। কারণ গীতারই নিজস্ব একটা দর্শন আছে। গীতার আলোচনার শুরুর করার সময় প্রথমের দিকেই আমরা বলেছিলাম, গীতা হল সমন্বয় শাস্ত্র। আসলে আমরা প্রথমের দিকে দুটি কথা বলেছিলাম, একটা হল গীতা মোক্ষশাস্ত্র, গীতা আমাদের মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। মোক্ষশাস্ত্র আরও অনেক আছে, যেমন উপনিষদ, রাজযোগ এরাও মোক্ষশাস্ত্র। কিন্তু তার সঙ্গে গীতার বৈশিষ্ট্য হল, গীতা সমন্বয় শাস্ত্র। ভারতবর্ষে ধর্ম ও অধ্যাত্মের উপর যত রকম দর্শন ও চিন্তা-ভাবনা আছে, সব রকম দর্শন ও চিন্তা-ভাবনাকে গীতায় এক জায়গায় এনে খুব সুন্দর সমন্বয় করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

আগেও বলা হয়েছিল, প্রথমে নিয়ম ছিল সবার আগে প্রকরণ গ্রন্থ পড়তে হত, যেমন বিবেকচূড়ামণি, অষ্টাবক্র সংহিতা, এই ধরনের বইগুলো আগে পড়ানো হত। প্রকরণ গ্রন্থ পড়ার পর একটা প্রস্তুতি হলে ওনারা উপনিষদ পড়াতেন। উপনিষদ পড়ার পর ব্রহ্মসূত্র পড়তে দিতেন, যেখানে উপনিষদ কি বলতে চাইছে, সেটাকে সূত্রাকারে বলা হয়েছে। ভাল আচার্যের কাছে যদি উপনিষদ অধ্যয়ন করে উপনিষদের বক্তব্য বুঝে নেওয়া যায়, তাহলে ব্রহ্মসূত্র না পড়লেও চলে। প্রকরণ গ্রন্থ, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র সমস্ত কিছু পড়ার পর গীতা পড়তে হত। শুধু এইটুকু দিয়েই বোঝা যায় গীতা কত কঠিন শাস্ত্র, যা কিনা আজ থেকে চার-পাঁচ হাজার বছর আগে লেখা। সেইজন্য গীতা পড়ার জন্য একজন ভাল আচার্য দরকার।

গীতা আরও কঠিন এই কারণে, গীতা সমন্বয় শাস্ত্র। ব্যাসদেব যে সময়কালে গীতা রচনা করেন, সেই সময় ভারতে যত দর্শন ছিল, যত রকমের চিন্তাধারা ছিল, সব কিছুকে তিনি এক জায়গায় এনে গেঁথে দিয়েছেন। বিভিন্ন ধর্ম যেমন বলে, আমরা যেটা বলেছি সেটাই ঠিক, আমাদের ধর্মের বাইরে সব ভুল। হিন্দু দার্শনিকরাও একই জিনিস করেন। রামানুজের অনুগামীরা বলেন, তাঁরা বাদে সবাই ভুল। আচার্য শঙ্করের শিষ্যরাও একই কথা বলেন। ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় এক কথায় বলছেন, সবাই বলে তার ঘড়িই ঠিক। গীতা একবারও বলছে না, আমি ঠিক তুমি ভুল, গীতা এটাও বলছে না যে, আমিও ঠিক তুমিও ঠিক। গীতা সব রকম চিন্তা-ভাবনা, মত, দর্শনকে এক জায়গায় এনে এমন ভাবে উপস্থাপনা করে দিয়েছেন যে, অন্য আর কোন ঘড়িই থাকল না। ঠাকুর বলছেন, নিজের ঘড়িকে সূর্যের সাথে মিলিয়ে নিতে হয়। গীতা হল ওই সূর্যের মত। এখান থেকে এক একটা ভাবকে নিয়ে বলে দেওয়া যায়, গীতাতেও এই রকম বলা আছে। তবে গীতা মূলতঃ সমন্বয় শাস্ত্র। ফলে রাজযোগের যে বক্তব্য, তার সাধনা বিধি, যোগ সাধনার ফল, সমস্ত কিছু এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে রাখা হয়েছে।

আচার্য ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভাষ্যের ভূমিকা খুব সংক্ষেপে করছেন। ভেবে দেখুন আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে যে চিন্তকরা, পণ্ডিতরা ছিলেন, তাঁদের চিন্তা-ভাবনাতে বিভিন্ন রকম যে মতবাদ ছিল, আচার্য সমস্ত মতবাদকে শুরুতেই ক্ষুরধার যুক্তিতর্ক দিয়ে কেটে একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন। এ-কথা আজ আমরা সবাই জানি যে, গীতা কখনই যুগোপযোগী নয়, গীতা সর্বকালোপযোগী; গীতা সর্বকালের জন্য। তৎকালীন হিন্দু জাতি এবং বর্তমান হিন্দু জাতি, বর্তমান মানবজাতি এবং সর্বকালের মানবজাতির জন্য আচার্য তাঁর অসাধারণ ভাষ্য রচনার মাধ্যেম গীতাকে সুন্দর ভাবে গুছিয়ে রেখে দিয়ে গেলেন। গুছিয়ে রাখতে গিয়ে তাঁকে কয়েকটা জিনিসকে নিয়ে আলোচনা করতে হয়েছে, যেটা আজকের দিনে বেশি দরকার পড়ে না, কারণ যে জিনিসগুলিকে যুক্তি দিয়ে উত্তর দিচ্ছেন, সেই জিনিসগুলিই এখন মুছে গেছে বলা যায়।

আচার্য বলছেন, একটা সাধারণ ধারণা আগেও ছিল, বর্তমানেও আছে, তা হল, ধ্যান জিনিসটা বা ধ্যানযোগ শুধুমাত্র যাঁরা যোগী, যাঁরা সন্ন্যাসী, তাঁদের জন্য। যাঁরা সন্ন্যাসী তাঁরা ধ্যান করবেন, যাঁরা যোগী তাঁরাই ধ্যান করবেন; গীতা এই কথা কক্ষণ বলছেন না। গীতা এখানে পরিষ্কার করে বলছেন, ধ্যান সবারই জন্য। ধ্যান শুধু যোগীদের জন্য, সন্ন্যাসীদের জন্য; আচার্য এই পুরানো ধারণাটাকে অতিক্রম করে গেলেন। যে কোন মানুষ যদি আধ্যাত্মিক জীবনে এগোতে চায়, তাহলে তাকে এই ধ্যানযোগের অভ্যাস করতে হবে। ঠাকুরকে একজন জিজ্ঞেস করছেন, সংসারে থেকে কি হবে না? ঠাকুর বলছেন, কেন হবে না, নিশ্চয়ই হবে। গীতাও এখানে একই কথা বলছেন। তবে কাদের দ্বারা ধ্যান হবে না?

যিনি গৃহস্থাশ্রমে আছেন, যাঁর মানসিকতায় সংসার বাসা বেঁধে আছে, যিনি কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত, তাঁর দ্বারা ধ্যান হবে না। আচার্য বলবেন, যার কাছে তার স্ত্রী শুধু ভোগের বস্তু, এরা হল কামী পুরুষ, এদের দ্বারা ধ্যান হবে না। যারা আবার বিষয়ের পিছনে সারাদিন দৌড়াচ্ছে, টাকা-পয়সার জন্য দৌড়াচ্ছে, নামযশের পিছনে দৌড়াচ্ছে, এবং এই নিয়েই সব সময় চিন্তা ভাবনা করে যাচ্ছে, কিংবা মনে কোন একটা ব্যাপারে চাঞ্চল্য আছে, এদের দ্বারা ধ্যান কখনই হবে না। আপনি যে অবস্থায় থাকুন, আপনি সন্ন্যাসী, আপনি যোগী, আপনি গৃহস্থ যাই হয়ে থাকুন, ধ্যান যে কোন মানুষ করতে পারে, যদি তার জীবনের উদ্দেশ্য হয় আধ্যাত্মিক উত্থান। আধ্যাত্মিক উত্থান ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে যদি কেউ ধ্যান করতে চায়, যেমন কেউ বলছে আমার স্ট্রেস হচ্ছে, আমার টেনশান হচ্ছে, এদের জন্য ধ্যান নয়, ধ্যানটা এদের কাছে হল রিলাক্সেশান। মেন্টাল রিলাক্সেশান এটা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। আজকাল শহরে মফঃস্বলে ব্যাঙের ছাতার মত কত সংস্থা গজিয়ে উঠেছে, সবাই ধ্যান শেখাচ্ছে। এরা মেন্টাল রিলাক্সেশান হয়ত দিতে পারবে, কিন্তু ধ্যানের ওই স্তরে নিয়ে গিয়ে কখনই আধ্যাত্মিক উত্থানের দিকে নিয়ে যেতে পারবে না। সাত দিন কি একুশ দিনের ধ্যান শিবিরে ধ্যানের কোর্স করতে যারা ওখানে যায়, সেখান থেকে যখন তারা ফিরে আসে, তাদের বেশির ভাগই যে কলু ছিল সেই কলুই থেকে যায়। কয়েকদিন খুব ভাল লাগবে, কটা দিন শিবিরে শান্তিতে ছিল কিনা। বাড়িতেও চুপচাপ কিছুক্ষণ বসলে ভাল লাগবে, মনের একটা বিশ্রাম হয়। দুদিন পর যে কলুরে সেই কলুরে, যা ছিল তাই আছে।

ধ্যানযোগ তা না, ধ্যানযোগ হল জীবন পরিবর্তন। ধ্যান করে মানুষ এত উপরে উঠে যাবে যে, লোকেরা তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে। ঠাকুর কেশব সেনের নামে বলছেন, কেশবের ধ্যানটুকু ছিল বলে তাঁর এত মান-সম্মান। ঠিক ঠিক যার ধ্যান হয়, ঠিক ঠিক যদি কারুর জপ হয়, তখন তার ভিতরের সুপ্ত শক্তিগুলো জেগে ওঠে। ভিতরের শক্তি যখন জেগে ওঠে তখন সবই হয়। জীবনে যতটুকু চাহিদা থাকে জুটে যায়, যতটুকু নামযশ দরকার জুটে যায়। এই শক্তির জাগরণ হলে, লোকেরা তাঁকে মানতে শুরু করে। কিছু লোক মানবে না ঠিকই, সে তো যীশুকেও কয়েকজন

লোক মিলে ক্রুশিফাই করে দিল। ঠাকুরকেও অনেকে মানত না, এখনও অনেকে মানে না। কিন্তু যাঁরা আপনাকে মানে তাঁদের সংখ্যা, আপনাকে না মানার সংখ্যা থেকে অনেক বেশি হবে।

ধ্যানকে বলা হয় অন্তরঙ্গ সাধন, ভিতরের সাধনা, ধ্যানে বাইরের কিছু নেই। বহিরঙ্গ সাধন হল কর্ম। তৃতীয় অধ্যায় ও চতুর্থ অধ্যায়ে দেখান হয়েছে কর্মযোগ কত জরুরী। বেশির ভাগ লোকেরা যখন প্রশ্ন নিয়ে আমাদের কাছে আসেন, এনাদের প্রশ্নে কোন সার থাকে না। সমস্যা হল, এনারা সেভাবে কাজ করেননি। রামকৃষ্ণ মিশনে আমরা নূতন যখন জয়েন করেছিলাম, মঠের গুরুজনরা আমাদের এই উপদেশই বারবার দিয়ে গেছেন, 'কাজ কর, কাজ করে যাও ভাই'। যাঁরা চাকরি করছেন, সৎ ভাবে তাঁরা নিজের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সেবা করুন, যাঁরা চাকরি করেন না, তাঁরা সমাজের সেবা করবেন। রজোগুণ, তমোগুণের জন্য মনের মধ্যে যে আবর্জনাগুলো জমেছে, কাজ করলে এগুলো পুড়ে যাবে। মাথার মধ্যে এই জিনিসটাকে রাখতে হবে, জীবনে আমাকে এগোতে হবে। এই হল ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচনা শুরু করার আগে একটা ছোট্ট ভূমিকা। এবার আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়, যে অধ্যায়ের নাম ধ্যানযোগ, তার মূল আলোচনাতে প্রবেশ করছি।

পঞ্চম অধ্যায়ের শেষের দিকে আলোচনা করার সময় আমরা একটা শ্লোক পেয়েছিলাম, যেখানে সাতাশ নম্বর শ্লোকে বলছেন, *স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ*, প্রথমে বহির্জগৎ থেকে মনকে কুড়িয়ে আনতে হবে, কুড়িয়ে আনার পর মনকে ভ্রুর মধ্যে, পরে নাসিকাগ্রে বলবেন, একাগ্র করতে হবে। সাধারণ ভাবে বলা হয় সমস্ত মনটাকে হৃদয়ে নিয়ে আসতে হয়। পঞ্চম অধ্যায়ের সাতাশ নম্বর শ্লোকে এটাকে সূত্রাকারে বলা হল, এবার ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারে বলা হবে। গীতায় মাঝে মাঝে হঠাৎ ভগবান একটা কথা বলে দিচ্ছেন, আবার সেটাকেই অন্য জায়গায় গিয়ে তিনি বিস্তার করে বলে দেবেন। ভগবান আবার যে বিস্তারগুলি ছেড়ে গেছেন, আচার্য শঙ্কর সেটাকে সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন, আমরা যাতে বুঝতে পারি। আমরা এগুলোর ব্যাখ্যা করছি ঠিকই, কিন্তু নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রবণ করা এবং তার মধ্যে যে মূল কথাগুলোকে আছে, সেটাকে মনে রাখাটা শ্রোতা বা পাঠকদের দায়ীত্ব। মূল কথাগুলি যদি মন থেকে হারিয়ে যায় তাহলে বাকি দরকারী কথাগুলো বুঝতে পারা যাবে না, তার থেকেও বেশি ওটাকে relate করতে পারবে না।

আচার্য এই অধ্যায়ের শুরু করতে গিয়ে বলছেন, *ধ্যানযোগস্য সম্যগ্দর্শনঃ প্রতি অন্তরঙ্গস্য সূত্রভূতাঃ শ্লোকাঃ 'স্পর্শান্ কৃত্বা বহিঃ'*, পঞ্চম অধ্যায়ে *স্পর্শান্ কৃত্বা* যেটা বলা হয়েছিল, সেটা হল ঠিক ঠিক আত্মজ্ঞানের জন্য ধ্যান কেন খুব আবশ্যক। কিন্তু সেই ধ্যানেরই বহিরঙ্গ সাধন হল কর্ম, এটা আচার্যই বলছেন। আচার্য শঙ্করকে নিয়ে লোকেদের অনেক ভুল ধারণা, তিনি নাকি শুধু জ্ঞানের কথাই বলে গেছেন, কর্মকে বাদ দিয়ে গেছেন। কিন্তু এই ধারণাটা কত মারাত্মক ভুল, এখানেই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কি বলছেন আচার্য? *তত্র ধ্যানযোগস্য বহিরঙ্গ কর্ম*। ধ্যানযোগ অন্তরঙ্গ সাধন, কর্মযোগ বহিরঙ্গ সাধন। আগে থেকে কর্মযোগ যদি ঠিক ঠিক না করা থাকে তার ধ্যান কোন ভাবেই হবে না। আর ধ্যানযোগ যদি না করা হয়, তাহলে তার এতদিনের কর্মযোগের সাধনা বেকার। বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়, কর্ম দিয়েও হয়, স্বামীজীও বলছেন কর্মযোগ দিয়েও হয়, ধ্যানযোগ দিয়েও হয়। ঠিকই বলছেন, এগুলো প্রস্তুতির জন্য বলা হয়। কিন্তু প্রস্তুতি হয়ে যাওয়ার পর দেখা যায় যে, একটা উচ্চস্তরে চলে গেলে, যাঁরা ঠিক ঠিক কর্মযোগ করছেন, অর্থাৎ নিষ্কাম ভাবে কর্ম করছেন বা ঈশ্বরকে অর্পণ করে কর্ম করছেন, মন তখন এত শুদ্ধ হয়ে যায় যে, মনটা নিজে থেকেই লয় হয়ে যায়। লক্ষ্য করলে এটা দেখা যাবে যে, অনেকক্ষণ চুপচাপ নিজের মনে কোন কাজ করে যাচ্ছেন, বা কোন ভাল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনতে শুনতে ওর মধ্যে ডুবে গেছেন, তখন হঠাৎ যদি কোন কথা বলতে হয়, গলা দিয়ে তক্ষুণি কথা বেরোতে চাইবে না, একবার দুবার গলাটা কেশে পরিষ্কার করে কথা বলতে হবে। কর্মযোগীরাও কর্ম করে করে ঈশ্বরের প্রতি তাঁদের এমন নিষ্ঠা হয়ে যায় যে, আস্তে আস্তে মনটা ভিতরে ঢুকে যায়। ভিতরের দিকে মন চলে আসার পরই শুরু হয় ধ্যান। এরপর

ধ্যান যদি না করা হয়, তাহলে কর্মযোগের দ্বারা এই যে প্রস্তুতিটা নেওয়া হল, এটা আর কোন কাজে লাগবে না। আর কর্ম যদি আদপে না করা থাকে, ধ্যান করা সম্ভবই হবে না। যদি নিষ্কাম ভাবে কর্ম না করা হয়, ঈশ্বরকে অর্পণ করে যদি কর্ম না করা হয়, তাহলেও ধ্যান হবে না। প্রায়ই লোকেরা বলে, পনের মিনিট পরেই পায়ে ঝিনঝিন ধরে, ধ্যান করতে গিয়ে মন চঞ্চল হয়ে যায়। এগুলো কেন হয়? কর্ম করা হয়নি বলে। কর্ম বলতে আমরা প্রত্যকে ক্ষেত্রে কর্মযোগকে বলছি। কর্মযোগ কিভাবে হয়, তৃতীয় অধ্যায়ে ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারে বলা হয়েছে। এই অধ্যায়েও যখন যেমন যেমন প্রয়োজন হবে একটু একটু বলা হবে।

আচার্য পরিষ্কার বলছেন, *যাবদ্ ধ্যানযোগারোহণাসমর্থঃ তাবদ্ গৃহস্থেন অধিকৃতেন কর্তব্যং কর্ম ইতি*, গৃহস্থ যিনি, তিনি যতক্ষণ ধ্যানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করতে না পারছেন, ততদিন তাঁকে কর্ম করে যেতে হবে। স্বামীজী সেইজন্য বারবার বলছেন, কাজ, শুধু কাজ করে যাও। জীবনের উদ্দেশ্য কাজ করা নয়। জীবনের উদ্দেশ্য জ্ঞান, ভক্তি লাভ করা। জ্ঞান, ভক্তি লাভ করার জন্য ধ্যান করা প্রয়োজন। ধ্যান করার জন্য আগে কর্ম করতে হয়। ঠাকুর বলছেন কর্মকাণ্ড আদিকাণ্ড। প্রথমে কাজ করতে হয়, কাজ করে করে যখন মনের আবর্জনাগুলো পুড়ে গেল, যখন বলে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি; তখন মনটা আস্তে আস্তে নিজে থেকেই ভিতরে চলে আসতে চাইবে। যদি কাজ না করেই মনকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে মনের অঙ্কট বঙ্কট গুলো বেরিয়ে আসবে। মন পাঁচটা বিষয়ে চলে যাবে, ওটাকেও জানতে হবে, সেটাকেও জানতে হবে, ওটা কেমন, সেটা কেমন; আসল কথা মনটা চঞ্চল হয়ে যাবে।

আলোচনা করে করে আচার্য একটা খুব সুন্দর কথা বলছেন, *ন চ অত্র ধ্যানকালে স্ত্রীসহায়ত্বাশঙ্কা যেন একাকিত্বং বিধিয়তে*, ধ্যানযোগে স্ত্রীর কোন সহায়তার দরকার পড়ে না। গৃহস্থাশ্রমে যত রকমের বৈদিক কর্ম হয়, আগেকার দিনে অগ্নিহোত্রাদি, আজকের দিনে বিভিন্ন রকম পূজাপার্বণ, সবেতেই স্ত্রীর সহায়তা দরকার পড়ত বা পড়ে। কিন্তু ধ্যানযোগের ক্ষেত্রে তুমি পুরোপুরি একা, ঠাকুর বলছেন, ধ্যান হবে মনে বনে কোণে। যিনি ভার্যা, তিনি পরিবারের সব কিছুতে, সব রকম পূজা পার্বণে স্বামীর সঙ্গে থাকেন। কিন্তু ধ্যানযোগে ভার্যা নেই, স্বামী একা বা স্বামী নেই, স্ত্রী একা। সেইজন্য যাদের সেই রকম প্রস্তুতি হয়ে গেছে, আমি এখন সব কিছু থেকে আলাদা হয়ে গেছি, সংসারের কিছুতে আমি আর থাকব না; তবেই ধ্যান হবে, নচেৎ হবে না।

আচার্য আরও বলছেন –ধ্যানের জন্য সন্ন্যাসীকে কি অগ্নিরহিত, ক্রিয়ারহিত হতে হবে? কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়, যে কোন মানুষ যদি কর্মফলের স্পৃহা ছেড়ে দিয়ে থাকেন, তাঁর জন্যও ধ্যান প্রশস্ত। অথচ কাজ করছে, যেমন সংসারীরা চাকরি করছেন, বিভিন্ন কর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন, কিন্তু আমার আরও চাই, কর্মফলের স্পৃহা মানে এটাই, আরও চাই আরও চাই। আমি খাবো, এই জন্যই তো রান্না করা –এটাকে কর্মফল বলে না। এটা হল স্বাভাবিক কার্য-কারণ সম্পর্ক। বাড়িতে অতিথি এসেছেন, চা বানাবেন, রান্না করবেন, এটা স্বাভাবিক কার্য-কারণ সম্পর্ক। কিন্তু রান্না খেয়ে অতিথি আমার রান্নার প্রশংসা করবেন কিনা, এটাই এবার কর্মফল হয়ে ঢুকে গেল। আমার নামযশ চাই, আমার টাকা-পয়সা চাই, আরও চাই আরও চাই, এবার সবটাই কর্মফলের মধ্যে ঢুকে গেল। কিন্তু যখন বলছি, আমার পেট ভরবে, শরীরের রক্ষা হবে সেইজন্যই আমি খাই, এটাকে এনারা কর্মফলের মধ্যে নেন না। কর্মফল মানে, যেখানে বিষয়তৃষ্ণা রয়েছে। তৃষ্ণা নাশটাই কর্মফল ত্যাগ। বলছেন, যাঁরা কর্মফলকে অতিক্রম করে গেছেন, কিন্তু তারপরেও কাজ করছেন, কারণ এখনও তিনি সমাজে আছেন, সংসারে আছেন; তাঁরাও ধ্যান করতে পারেন, যদি কর্মফলকে ত্যাগ করে থাকেন।

আচার্য পর পর বিভিন্ন জায়গা থেকে শ্লোক এনে বলছেন, শাস্ত্রে এটা পরিষ্কার বিধান আছে, যে কোন মানুষ, যাঁর মন থেকে সঙ্কল্প চলে গেছে, তবে শরীর ধারণটা সঙ্কল্পের মধ্যে পড়ে না;

ভূমিকাতে তিনি এটাকে নিয়েই বলছেন, *তস্মাদ্ মুনেঃ যোগম্ আরুরুক্ষো প্রতিপন্নগার্হস্থ্যস্য অগ্নিহোত্রাদি ফলনিরপেক্ষম্ অনুষ্ঠীয়মানং,* গৃহস্থাশ্রমে আছেন, এই রকম একজন মানুষের খুব ইচ্ছা তিনি যোগারূঢ় হবেন বা যোগাভ্যাস করবেন। প্রথম হল আমার ইচ্ছা চাই, আমি ধ্যানযোগ অভ্যাস করব আত্মজ্ঞানের জন্য, তার মানে তাঁর মন চঞ্চল না, চারিদিকে মন দৌড়াচ্ছে না; এই ধরণের লোকেরাও ধ্যানাভ্যাস করতে পারেন। এই ফেসবুকে, এই ইউটিউবে, এই হোয়াটসাপে, চারিদিকে সব সময় মন দৌড়াচ্ছে। এদের দ্বারা ধ্যান হবে না। কিন্তু যিনি মননশীল, মুনি, ঈশ্বরীয় চিন্তা ছাড়া মনের মধ্যে আর কিছু নেই, নিজেকে সমাহিত করা, মনকে ভিতরে নিয়ে আসা ছাড়া অন্য চিন্তা থাকে না, এই ধরণের মানুষরা যে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করেছেন, বা যাঁর যেমন কর্ম করা হয়েছে, এখানে যদি কর্মফলের তৃষ্ণা না থাকে, এনারা খুব সহজে এই পথে এগোতে পারেন।

সংক্ষেপে মূল কথা হল, কাজ করে করে মনের আবর্জনাগুলিকে পোড়ান হয়েছে, কর্মফল-প্রাপ্তির ইচ্ছাকে ত্যাগ করে মনকে শুদ্ধ করা হয়েছে, সেখান থেকে মনকে অন্তর্মুখী করে মননশীল হয়েছেন; আর তার সাথে তিনি ধ্যান করতে চাইছেন, যোগের পথে এগোতে চাইছেন, এনাদের জন্য ধ্যান। এর মধ্যে যদি একটা পয়েন্ট মিসিং হয়, তাহলে কার জন্য ধ্যান নয়? অন্তর্মুখী যদি না হয়ে থাকেন, অন্তঃশুদ্ধি যদি না হয়ে থাকে, মনে যদি নানা রকমের কামনা-বাসনা থাকে, ধ্যান তাঁর জন্য নয়। ধ্যানযোগ শুরু করার আগে এই কটি মূল কথা জানিয়ে দেওয়া হল। এবার আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ের মূল শ্লোকের আলোচনায় প্রবেশ করছি। ভগবান বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ
অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্য কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ।।১।।

(শ্রীভগবান বললেন –কর্মফলের আশা না করে যিনি কর্তব্য (অগ্নিহোত্রাদি) নিত্যকর্ম করেন, তিনিও সন্ন্যাসী, তিনিও কর্মযোগী। অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌত ও তপ, দান আদি স্মার্ত কর্ম যিনি ত্যাগ করেছেন, কেবল তিনিই সন্ন্যাসী বা যোগী নন।)

আগেকার দিনে, বিশেষ করে ব্যাসদেবের এই রচনাকালে, যাঁরা পুরোপুরি ধর্ম পথে যেতেন তাঁদের দুটো ভাব ছিল। আমরা ব্যাসদেবের কাল জানি না, কিছু দিন আগে একটা লেখা পড়লাম, যেখানে বলছেন ব্যাসদেবের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে যে নক্ষত্রাদির বর্ণনা আছে, সেগুলো দেখে অনুমান করা যেতে পারে যে, ব্যাসদেব তিন হাজার বিসি-তে ছিলেন, তার মানে আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে গীতা রচিত হয়েছিল। আমরা তারিখ নিয়ে কিছু জানি না। এটা ঠিক যে গীতা খুব প্রাচীন গ্রন্থ। কিছু মুর্খ লোক আছে, যারা বলে ভগবান বুদ্ধের পরে গীতার রচনা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমরা সন্ন্যাসীরাও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি, আমরাও জানি এটা কখন হতেই পারে না। এনারা বলতে চাইছেন গীতা ভগবান বুদ্ধ থেকে নির্বাণ শব্দ কপি করেছেন। ভগবান বুদ্ধ থেকে গীতা কেন নির্বাণ শব্দ কপি করতে যাবেন, ভগবান বুদ্ধই গীতা থেকে কপি করেছেন।

আমরা দুটো ভাবের কথা বলছিলাম। তার আগে এখানে কিছু ঐতিহাসিক বর্ণনা করতে হচ্ছে, সব কথা একবারে মনে থাকবে না ঠিকই, কিন্তু জেনে রাখা ভাল। বৈদিক কালে যাঁরা সংসারে থাকতেন তাঁরা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করতেন, *অগ্নিহোত্রম্ জুহুয়াৎ,* খুব নামকরা আদেশ, যত দিন বেঁচে থাকবে তত দিন অগ্নিহোত্র করবে। এখন যেমন যাঁরা দীক্ষা নিয়ে থাকেন, গুরু তাঁদের বলে দেন, সকাল সন্ধ্যা জপধ্যান করবে। ঠিক তেমনি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম আগেকার দিনের লোকেরা সকাল-সন্ধ্যা করতেন যাতে মৃত্যুর পর স্বর্গে যেতে পারেন। এটাকেই সংস্কৃতে বলে *লোকৈষণা*, মৃত্যুর পর আমি যেন আরও শুভ লোকে যেতে পারি। তখনকার দিনে পুরো গৃহস্থ ধর্ম লোকৈষণাকে নিয়ে চলত, বর্তমান কালে গৃহস্থ ধর্ম যেমন শুধু *বিত্তৈষণাতে* চলছে। ঋষিরা তিনটে এষণার কথা বলে এসেছেন

–পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা আর লোকৈষণা –সন্তানের ইচ্ছা, টাকা-পয়সার ইচ্ছা আর মৃত্যুর পর উচ্চ স্বর্গে যাওয়ার ইচ্ছা। লোকেরা এখন স্বর্গ বিশ্বাস করে না, তাই লোকৈষণা উড়ে গেছে। টাকা-পয়সার অভাব থাকায় অনেক সমস্যা হয়ে যাচ্ছে, তাই বিত্তৈষণাটা আছে। পুত্রৈষণাও আগের মত সেই ভাবে নেই, একটা দুটো সন্তান হয়ে গেলেই হল, থেকে গেল শুধু বিত্তৈষণা। কিন্তু আগেকার দিনে সমাজে, বিশেষ করে ব্রাহ্মণরা লোকৈষণাতে বেশি থাকতেন। যজ্ঞ কেন করব? মৃত্যুর পর আমি যাতে ভাল স্বর্গে যেতে পারি।

এনাদের মধ্য থেকে আবার কিছু মানুষ সন্ন্যাসী হয়ে যেতেন, হয় কম বয়সে, নয়তো বেশি বয়সে। যাঁরা সন্ন্যাসী হয়ে যেতেন তাঁরা আর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করতেন না। এনাদের বলা হত *নিরগ্নি*, নিরগ্নি শব্দের অর্থ যিনি আগুন স্পর্শ করেন না, আসল অর্থ যিনি যজ্ঞাদি কর্ম ত্যাগ করেছেন। নিত্য নৈমিত্তিক যত রকম যজ্ঞ আছে, বিশেষ করে আগেকার দিনে উপনয়নের সময় বলে দেওয়া হত, সকাল সন্ধ্যে এই অগ্নি তুমি রক্ষা করবে। সন্ন্যাসী সেটাকেও ত্যাগ করে দেন। হিন্দু ধর্মের যে প্রতীক শিখাসূত্র, সেটাকেও তিনি ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যেতেন। আমরাও শিখাসূত্র রাখি না, যজ্ঞাদি কর্ম আমরাও করি না। পূজা উপলক্ষে যে যজ্ঞ বা হোম হয় সেটা আলাদা জিনিস। আবার অনেক হতেন কর্মযোগী বা কর্মী, তাঁরা প্রচুর দানধ্যান, তীর্থাদিতে যাওয়া এগুলো করতেন যাতে মৃত্যুর পর স্বর্গে যেতে পারেন।

এই দুটি পথ, একটা যজ্ঞ করে আর-একটা যজ্ঞ দান করে, যজ্ঞ দান ঘুরে ঘুরে আমাদের শাস্ত্রে আসে। যাঁরা এই ক্রিয়াটাও বন্ধ করে দিলেন, দানাদি করা, তপস্যা করা সব কিছু ছেড়ে দিলেন, এটাকে বলা হয় অক্রিয়, এনাদের অনেক সময় যোগীও বলা হয়। যিনি অক্রিয় তিনি সমস্ত রকম বৈদিক ক্রিয়াকর্ম ছেড়ে দিয়েছেন। নিরগ্নি আর যোগী, এই দুটো শব্দকে আধার করে বলছেন – *অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ*, কর্মফলের আশ্রয়কে ত্যাগ করে যিনি কর্ম করছেন। আবার বলছি, আপনি যখন চাকরি করছেন, তখন আপনার কটা টাকা দরকার, কারণ বাড়িতে আপনার দায়ীত্ব আছে, বাবা-মা আছেন, স্ত্রী সন্তান আছে, এটাকে কর্মফলের স্পৃহা বলে না। কর্মফলের স্পৃহা হল, যে পথেই হোক, ন্যায় পথে হোক, অন্যায় পথে হোক আমাকে অনেক টাকা আয় করত হবে, এটা হয়ে গেল কর্মফলে স্পৃহা। সংসারে দায়ীত্ব পালনের জন্য সবাইকে অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে কিছু না কিছু কর্ম করতে হয়, কিন্তু একটা বয়স হয়ে যাওয়ার পর, পঞ্চাশ পেরিয়ে ষাঠের কাছাকাছি এসে গেলেন, নিজেকে তখন টেনে সংসার থেকে সরিয়া আনতে হয়। সংসার চালানোর জন্য যা করার হয়ে গেছে, বিবাহ করেছেন, সন্তানাদি হয়েছে, সন্তানরা দাঁড়িয়ে গেছে, এরপর সংসারে আপনার আর কোন দায়ীত্ব নেই। পেনশানে যে দুটো টাকা পাবেন, ব্যাঙ্কে বা পোস্ট অফিসে যে টাকা আছে তার সুদে আপনার আরামসে চলে যাবে। এরপর আপনার একটাই কর্তব্য –ঈশ্বরে মন দেওয়া, এটা যদি না করেন তাহলে আপনি খুব অন্যায় করছেন। মূল কথা একটা বয়সের পর নিজেকে সংসার থেকে সরিয়ে নিতে হয়। মানুষ পারে না, তাই বয়স হয়ে গেলেও পরনিন্দা, পরচর্চা, টিভি দেখা, এসব করে সময় কাটায়।

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং, যে কোন কাজ করার সময় আমরা কর্মফলকে আশ্রয় করেই কাজ করে থাকি। কিন্তু যোগী যাঁরা, তাঁদের কর্মফলে কোন স্পৃহা থাকে না। আমাকে এই কাজ করতে হবে তাই করছি, এর বেশি কিছু না। আহা কি দারুণ খেলাম, আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম, তৃপ্ত হয়ে গেলাম, এগুলো হল কর্মফলকে আশ্রয় করা। আগেকার দিনে বিয়ে বাড়ি, শ্রাদ্ধ বাড়িতে খাওয়ানো হত তার আগে থেকে কত রকমের পরিকল্পনা চলত। ঠিক ঠিক যদি কর্মফলে অনাশ্রিত থাকা হয়, তখন বলবেন, দেহ ধারণের জন্য খেতে হবে তাই খাচ্ছি। এই ধরণের মানুষ সংসারে থেকেও *স সন্ন্যাসী চ যোগী*, তিনি সন্ন্যাসী তিনিই যোগী। *ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ*, নিরগ্নির কথা আগে বলা হল, সন্ন্যাসীকে নিরগ্নি বলা হয়, কারণ তিনি আর কোন যজ্ঞাদি ক্রিয়া করেন না। আর অক্রিয় বলা হয়, যিনি সমস্ত

রকমের ক্রিয়াকে, মানুষ স্বর্গ কামনা করে যে ক্রিয়া সমূহ করে, বিত্তলাভের কামনা করে যে কর্ম করে, সন্তানাদি প্রাপ্তির জন্য যে কর্ম করে, তিনি এই ধরণের সমস্থ ক্রিয়া ছেড়ে দিয়েছেন। নিরগ্নি আর অক্রিয়, এনারাই হলেন ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী।

কিন্তু গীতা এই মত থেকে সরে আসছেন। ব্যাসদেব একজন খুব বড় ঋষি ছিলেন, তাঁর অধিকার ছিল সমাজ, ধর্ম ও মানবজাতিকে নূতন পথ দেওয়ার। ঠাকুর, স্বামীজী এনারা যেমন নূতন পথ দিলেন, তেমনি ব্যাসদেবও নূতন একটা পথ দিলেন। তিনি বললেন *অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ*। ব্যাপারটা কি রকম? যাঁরা এই গীতার কথা শুনছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য মন দিয়ে গীতার কথা শ্রবণ করা। কিন্তু তার বদলে যদি তাঁরা মনে করতে থাকেন, ভগবানের দুটি কথা আমার কানে যাচ্ছে, আমার পূণ্য হচ্ছে, যে পূণ্যের ফলে আমি স্বর্গে যাব; এইবার কর্মফল এসে গেল, অর্থাৎ কর্ম ও কর্মফল দুটো আলাদা হয়ে গেল –কর্ম একটা, সেই কর্মের ফল আর-একটা। যে ক্রিয়া করা হচ্ছে, সেই ক্রিয়াটাই যখন ফল হয়ে যায়, এটাই তখন হয়ে যায় অনাসক্ত কর্ম। আমি পড়ছি, কেন না আমি পড়তে চাইছি, এটা একটা দিক। আর-একটা দিক হল, আমি পড়তি চাইছি, কারণ আমি জ্ঞানী হতে চাই, পরীক্ষায় যেন ভাল নম্বর পাই। দ্বিতীয়টায় কর্মফলকে আশ্রয় করে পড়ছে। গীতা শুনছি, আমি শুনতে চাইছি, উদ্দেশ্য গীতায় কি বলা হয়েছে জানা, এটা হয়ে গেল অনাসক্ত কর্ম। অনাসক্ত কর্ম মানে যেটা ক্রিয়া সেটাই ফল। ক্রিয়া আর ফল এই দুটো যদি আলাদা হয়ে যায়, তখন সেটা আর অনাসক্ত থাকবে না। আমি খাচ্ছি, 'খাওয়া' বলছি ঠিকই, কিন্তু আসলে পেট ভরছে; ক্রিয়াটা হল পেট ভরা, ফল হল পেট ভরানো, অনাসক্ত হয়ে গেল। এটা এমন কিছু জটিল না, একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে।

বলছেন, কর্মফলের তৃষ্ণা যার নেই, এটাই *অনাশ্রিতঃ কর্মফলং*। কিন্তু যখন এটা চাই, সেটা চাই মনে করে কাম্য কর্ম করছে, তখন সেই কর্মের কর্তা হয়ে গেলেন কর্মফলাশ্রিত, কর্তা কর্মফলকে আশ্রয় করে কর্ম করছে। যিনি কর্মফলকে আশ্রয় না করে কর্ম করেন, তিনিই আসল যোগী, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। এখানে স্তুতির জন্য বলছেন, পরেও গীতা আবার এটাকে নিয়ে আলোচনা করবেন। গীতা এখানে এই কথাই বলতে চাইছেন যে, শুধু অগ্নি ত্যাগ করলেই কেউ সন্ন্যাসী হয়ে যায় না, বা ক্রিয়া বন্ধ করে দিলে কেউ অক্রিয় হয় না। সব কথাতে ঘুরে ঘুরে ওনারা এই কর্মফলের মধ্যে ঘুরঘুর করবেন, যেটা দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। *কর্মণ্যেবাধিকারস্তে* থেকে এই ভাবটা শুরু হয়েছিল, ওটাই ঘুরে ঘুরে চলছে। যারা এর বিরোধী পক্ষের তাঁরা আগের চিন্তা-ভাবনাকে প্রশ্ন করছেন। যেমন বলছেন, কোন একটা গুণ বিশেষকে নিয়ে এই যে কর্মফলত্যাগ, এটাকেই কেন সন্ন্যাসী বলা হচ্ছে, এটাকেই কেন যোগী বলা হচ্ছে? কারণ ওখানেও কর্মফল ত্যাগ রয়েছে, যাঁরা ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী তাঁরা কর্ম ত্যাগ করেন। কিন্তু যাঁরা এখনও এই ধরণের সাধনা করছেন, তাঁদের জন্য কর্ম ত্যাগ না, তাঁদের জন্য কর্মফলের ত্যাগ। তার মানে ত্যাগ দুটোর ক্ষেত্রেই হচ্ছে, একজনের ক্ষেত্রে কর্মফল ত্যাগ, আরেকজনের জন্য কর্ম ত্যাগ। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় ধ্যানযোগ কর্মত্যাগী ও কর্মফলত্যাগী সবারই জন্য খুলে দিচ্ছেন।

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
স হ্যসংন্যেস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন।।২।।

(হে পাণ্ডব, শাস্ত্র যাকে সর্বকর্ম ও তার ফলত্যাগরূপ সন্ন্যাস বলেন, নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানরূপ যোগকে তুমি সেই সন্ন্যাস বলেই জানবে। কারণ, সংকল্পশূন্য না হলে, অর্থাৎ কর্মফলের বাসনা ত্যাগ না করলে কেউ কর্মযোগী হতে পারে না।)

সন্ন্যাস আর যোগ এই দুটোকে এখানে ব্যাখ্যা করছেন। আসলে এটা ভূমিকা, এরপর ধীরে ধীরে ধ্যানযোগে প্রবেশ করবেন। পরমার্থ সন্ন্যাসী মানে, যিনি সমস্ত কর্মকে ত্যাগ করে দিয়েছেন,

নিশ্চেষ্ট। ঠাকুর এই নিশ্চেষ্ট ভাবটাকে একেবারে চরম পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন –তালগাছ থেকে পড়বে, কিন্তু হাত পা পর্যন্ত কিছু নাড়বে না। বিদ্বৎ সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠতম সন্ন্যাসী, তিনি সব কিছুর চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে গেছেন, একমাত্র ঈশ্বর চিন্তন ছাড়া আর কিছু তিনি করবেন না। এনাদের নিয়েই ঠাকুর বলছেন, তালগাছ থেকে পড়লে হাত পাও পর্যন্ত নাড়বেন না। যেমন প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদকে মেরে ফেলার জন্য বাবা হিরণ্যকশ্যপু কখন পাহাড় থেকে ফেলে দিচ্ছেন, কখন সমুদ্রে ফেলে দিচ্ছেন, আগুনে পুড়িয়ে মারতে চাইছেন, প্রহ্লাদ কোনটাতেই বাঁচার জন্য কোন চেষ্টা করছেন না, তাও তিনি বেঁচে যাচ্ছেন।

কর্মযোগীদের সম্বন্ধে আচার্য বলছেন, *ফলবিষয়ঃ সঙ্কল্পঃ,* কর্মের ফল সম্পর্কিত যত বিষয় হতে পারে, যত সঙ্কল্প হতে পারে, কর্মযোগী তার সবটাই ত্যাগ করে দেন। এই সঙ্কল্পগুলি যদি ত্যাগ না করেন, তাহলে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী না, যোগী যোগী না। মন থেকে সেই সঙ্কল্পগুলিকে ছেড়ে দাও। সঙ্কল্প যদি থাকে? আচার্য বলছেন, *ফলসঙ্কল্পস্য চিত্তবিক্ষেপহেতুত্বাৎ,* মন শান্ত হয় না কেন? কারণ মনের মধ্যে সঙ্কল্পগুলি রয়েছে। প্রায়ই অনেকে এসে আমাদের জিজ্ঞেস করে, মন চঞ্চল কেন, ধ্যান হয় না কেন? জপ হয় না কেন? কারণ একটাই চিত্তবিক্ষেপ। চিত্তবেক্ষেপ হয় কেন? কারণ ভিতরে ফলসঙ্কল্প রয়েছে। এখানে সবাই শাস্ত্র কথা শুনছেন, খুবই ভাল কথা। কিন্তু এই একই লোক গীতাও শুনছেন, উপনিষদও শুনছেন, বিবেকচূড়ামণীও শুনছেন, এটাও শুনছেন, সেটাও শুনছেন, কারণ আসলে এখানেও সেই চিত্তবিক্ষেপ, চিত্ত চঞ্চল হয়ে আছে। শাস্ত্রের কথা শুনে একটু যে মনন করবেন, ধ্যান করবেন, চিত্তবিক্ষেপের দরুণ তা হয় না। এর থেকেও বড় হল ফলসঙ্কল্প, চিত্তবিক্ষেপের সবচেয়ে বড় কারণ ফলসঙ্কল্প। ধ্যানের প্রস্তুতির জন্য দরকার ফলসঙ্কল্প ত্যাগ। মন থেকে কামনা যদি ত্যাগ না হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু ধ্যান করা যাবে না।

ফলের ইচ্ছা হয়ত চলে গেছে, কিন্তু তাও কাজ করছেন। কেন করছেন? সংসারে আছেন তাই কাজ করতে হচ্ছে। তখন এনাদের জন্য অন্তরঙ্গ সাধন হবে ধ্যান। যাঁরা ধ্যান করছেন তাঁদের জন্য বহিরঙ্গ সাধন হল কর্ম। যাঁরা কর্ম করছেন, তাঁদের জন্য অন্তরঙ্গ সাধন হল ধ্যান। এটাকে ভগবান এবার পরের শ্লোকে বলছেন।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে।।৩।।

(যিনি কর্মফলত্যাগী ও ধ্যানযোগে আরোহণ করতে ইচ্ছুক, অর্থাৎ ধ্যানযোগে অনারূঢ় (ধ্যানযোগে অবস্থানে অশক্ত), তাঁর পক্ষে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানই উৎকৃষ্ট সাধন। সেই নিষ্কাম কর্মী যখন যোগারূঢ় হন, তখন সমস্ত কর্ম থেকে নিবৃত্তিই তাঁর যোগারূঢ়ত্বের সাধন হয়। অর্থাৎ যেমন যেমন তিনি কর্ম থেকে উপরত হন, তেমন তেমন তাঁর চিত্ত সমাহিত হয় এবং তিনি শীঘ্র যোগারূঢ় হন।)

দুটো শ্লোকে যেটা বলা হল, সেটাকে তৃতীয় শ্লোকেও নিয়ে আসছেন। যিনি ধ্যানের পথে উপরে উঠতে চেষ্টা করছেন, যিনি যোগারূঢ় হতে চাইছেন, তাঁদের জন্য কর্ম হল উপায়। যাঁরা উঠে গেছেন তাঁদের জন্য *শমঃ কারণমুচ্যতে,* নিজের মনকে, ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করাটাই উপায়। পরিষ্কার দুটো অবস্থার কথা বলা হচ্ছে। ধ্যানের পথে যিনি এগোতে চাইছেন, আধ্যাত্মিক পথে যিনি এগোতে চাইছেন বা ঈশ্বর পথে যিনি এগোতে চাইছেন, অর্থাৎ প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাঁদের জন্য কর্ম করা খুব দরকার। এখানে বলতে চাইছেন; কাজ করে যাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে কর্মফলের সঙ্কল্পও ত্যাগ করে যাচ্ছেন; এভাবে করতে করতে মন যখন একটু শুদ্ধ হয়ে গেল, তখন তিনি এই ধ্যানের পথে এগোবেন। একবার যখন যোগারূঢ় হওয়ার দিকে এগিয়ে গেলেন, তখন ধরেই নেওয়া যায় যে, এবার তার কর্মফলসঙ্কল্প চলে গেছে। কর্মফলসঙ্কল্প চলে যাওয়ার পর তাঁর সাধনা হবে *শমঃ,* শম মানে ইন্দ্রিয়ের সংযম, ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা, তখন তাঁর সংযম করা ছাড়া আর কিছু থাকে না।

এই সংযমকে নিয়েই ষষ্ঠ অধ্যায় বর্ণনা করে যাবেন। এখানে আচার্য শমকে বলছেন, *উপশমঃ*, জিনিসটাকে ছেড়ে দেওয়া, জিনিসটা থেকে নিবৃত্ত হয়ে যাওয়া।

আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *যাবৎ যাবৎ কর্মস্য উপরমতে তাবৎ তাবৎ নিরায়াসস্য জিতেন্দ্রিয়স্য চিত্তং সমাধীয়তে। তথা সতি স ঝটিতি যোগারূঢ়ো ভবতি*, আচার্যের সংস্কৃত অত্যন্ত সহজ সরল, কোন জটিলতা নেই। বলছেন, যেমন যেমন তিনি কর্ম থেকে উপরত হন, যেমন যেমন কাজ থেকে সরে আসেন, তেমন তেমন এই যে জিতেন্দ্রিয় পরিশ্রম রহিত হয়ে যায়, তাঁকে খাটাখাটনি করতে হচ্ছে না; ফলে *ঝটিতি*, চটপট যোগারূঢ় হয়ে যান। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের নামে অনেকে মজা করে বলে, মঠর খাউছি খট্টর শুইছি, মঠে খাচ্ছ খাটে শুচ্ছ, তোমাদের আর কিসের চিন্তা-ভাবনা। আমাদের অনেক বন্ধুরাও বলেন, 'স্বামীজী আপনার আর কি, আপনাকে তো কিছু করতে হয় না। ঘুম থেকে উঠলেন, ঠাকুরের কাছে চলে গেলেন, চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে একটু জপ করলেন, আর ভাল মন্দ যা হোক দুটো খেয়ে নেবেন, তারপর বই পড়তে শুরু করবেন আর বই লিখতে শুরু করবেন, এর বাইরে তো আপনাদের আর কিছু করার নেই। আর আমাদের ভেবে দেখুন কত কি করতে হয়। ঘর সংসার দেখতে হয়, রোজ বাজারে দৌড়াতে হয়'। মজা করেই বলছিলেন। আমি তাঁকে হেসে বললাম, 'আপনাকে কে সন্ন্যাসী হতে বারণ করেছিল, এই নয় যে আপনি এই লাইনের কথা জানতেন না'। এই হচ্ছে সমস্যা, জ্বলেপুড়ে মরবে, সাধু-সন্ন্যাসীদের গালাগাল দেবে, কিন্তু নিজের ওই জায়গাটা ছেড়ে বেরিয়ে আসবে না। আপনি সংসারে যে এই বিশাল জাল ছড়িয়ে রেখেছেন, কে বলেছে আপনাকে ছড়াতে? ঠিক আছে, এখন না হয় একটু গুটিয়ে নিন। কিন্তু তাও করবেন না।

বলছেন, যেমন যেমন পরিশ্রম কমে আসে, কথামৃতেও ঠাকুর বারবার বলছেন, খাওয়ার তেমন আয়োজন নেই, ঝোল-ভাত হলেই হয়ে যায়। কিন্তু সংসারীদের খাওয়ার আয়োজন লাগে, বিশেষ দিনে আবার বিশেষ আয়োজন। ভিতরের যে শক্তিটা আছে, সংসারে গাধার খাটুনিতে সব শক্তি বেরিয়ে চলে যায়। এর জন্য কেউ নিন্দা করছে না, এতে দোষ কিছু নেই, কিন্তু এসে বলবেন না যে, আমার ধ্যান কেন হয় না, জপ কেন হয় না। একজনকে আমরা জানি, সকালে প্রথমে উনি মোবাইলে অমুক আশ্রমের লেকচার গুলো শুনবেন। দু ঘন্টা পর আরেকটা আশ্রমের লেকচার শুনবেন। তার দু ঘন্টা পর আবার আরেকটা শুনবেন। সারাটা দিন লেকচার শুনেই চলে যায়, আপনি ধ্যান করবেন কখন?

ইংল্যাণ্ডের একজন লেখক ছিলেন, তিনি একজনকে নিজের রোজনামচা বলছেন, সকালে উঠে আমি এই ভাষা পড়ি, দু ঘন্টা আমি এই বিষয়ের উপর পড়াশোনা করি, দেখাতে চাইছেন সারাদিন তিনি কত ব্যস্ত থাকেন। ওনার বন্ধু, যাঁকে কথাগুলো শোনাচ্ছিলেন, তিনি অবাক হয়ে বলছেন, 'চিন্তা-ভাবনা করার সময় কখন পান'? সারাদিন আপনার হোয়টসাপ চলছে, সারাদিন আপনার ফেসবুক চলছে, সারাদিন আপনার ইউটিউব চ্যানেলগুলো চলছে, চিন্তা-ভাবনা করবেন কখন? ভিতরে সব শক্তি তো ওই দিক দিয়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। বেরিয়ে যাক, তাতে কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু কোন অভিযোগ করবেন না।

যদি যোগারূঢ় হতে চান, আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *যাবৎ যাবৎ কর্মভ্য উপরমতে*, যেমন যেমন কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনবেন, তেমন তেমন যোগে আরূঢ় হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ঠাকুরও এই কথা বারবার বলছেন। ঠাকুর আবার বলছেন, শাশুড়ি তার বৌমার কাজ কমিয়ে দেন। আপনি নিজেও একটু চেষ্টা করুন। শাশুড়ি সব বৌমার কাজ কমায় কি? না, কমায় না। যে বৌমা অন্তঃসত্ত্বা তার কাজ কমিয়ে দেন। আধ্যাত্মিক গর্ভ কি আপনার হয়েছে? হয়নি। আধ্যাত্মিক গর্ভ হলে ঠাকুর নিজেই আপনার কাজ কমিয়ে দেবেন। উপনিষদে বলছেন, *গর্ভো ইব সুভৃতো*

গর্ভিনীভিঃ, গর্ভিনী যে ভাবে নিজের গর্ভ রক্ষা করে; ঠাকুর এটাই বলছেন, শাশুড়ি কাজ কমিয়ে দেন। আপনার কাজ কমছে না কেন? কারণ আপনার ভিতরে আধ্যাত্মিক গর্ভ এখনও সঞ্চারিত হয়নি। এটা আপনাকে নিজেকে করতে হবে। এখন চারিদিকে ইনফার্টিলিট ক্লিনিক হয়েছে, আগে আমরা জানতামও না, এখানে কি হয়। একবার আধ্যাত্মিক গর্ভ যদি হয়ে যায়, তখন ঠাকুর নিজে দেখবেন। কাজ থেকে যদি নিজেকে একটু সরিয়ে নিয়ে আসতে পারেন, মনটাকে যদি একটু ঈশ্বরের দিকে দেন, ঠিক ঠিক যদি ঈশ্বরের দিকে যান, তখন আধ্যাত্মিক গর্ভ তৈরী হয়, তারপর ঠাকুর ধীরে ধীরে এগুলো করেন। কিন্তু তার আগে আপনাকে এটাতে লাগতে হবে, লেগে থাকতে হবে। যোগারূঢ় কখন হয়, ঠিক ঠিক যোগে প্রস্তুতি কাদের হয়?

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্যতে।
সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে।।৪।।

(যখন চিত্ত-সমাধান-অভ্যাসকারী যোগী ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ে সমস্ত সঙ্কল্প ত্যাগ করে শব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে ও নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মে প্রয়োজনাভাবে কর্তব্যবুদ্ধিশূন্য হন, তখন তাঁকে যোগারূঢ় বলা হয়।)

যোগারূঢ়ঃ, যোগের পথে কে উঠেছেন? *যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে,* যাঁরা জাগতিক যে কাজ হয়, সেই কাজ করে যাচ্ছেন; আগেকার দিনে যাঁরা বেদের যজ্ঞাদি করতেন, তাঁরা সেটাই করে যেতেন। একটা সময়ের পর তাঁরা দেখছেন, এসব করে আমার কোন প্রয়োজন সিদ্ধি হবে না। হাওড়া স্টেশনে আমি ট্রেন ধরার জন্য এসেছি, লাউড স্পীকারে ঘোষণা হল, আমি যে ট্রেনে যাব সেই ট্রেন অন্য প্ল্যাটফরম থেকে ছাড়বে, আমি যে প্ল্যাটফরমে এখন দাঁড়িয়ে আছি, সেই প্ল্যাটফরম যত ভাল, যত সাজানো গোছানই হোক, আমি আর ওই প্ল্যাটফরমে এক মুহুর্তও দাঁড়াবো না। এই সংসার আমাকে অনেক কিছু দিচ্ছে, সংসার থেকে আমার অনেক প্রয়োজন সিদ্ধি হচ্ছে মানছি; কিন্তু যখন আমার মনে হবে এই সংসারে আমার কোন প্রয়োজনসিদ্ধি হবে না, তখনই মানুষ যোগের দিকে এগোতে চাইবে।

প্রয়োজনসিদ্ধি কি রকম, আচার্য বলছেন, *নিত্যনৈমিত্তিককাম্যনিষিদ্ধেষু প্রয়োজনাভাববুদ্ধ্যা,* নিত্যকর্ম রোজ করতে হয়, নৈমিত্তিক কর্ম যেমন বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদি, কাম্য কর্ম মানে সন্তান চাই, টাকা চাই, চাকরি চাই, এগুলোর জন্য যে পূজা করা হয়, যে বিশেষ চেষ্টা করা হয় আর নিষিদ্ধ কর্ম, শাস্ত্রে যে কর্মকে নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। যখন দেখে আমার এর কোনটাই লাগবে না, আমি এটাও চাই না, ওটাও চাই না। আমার যা আছে এতেই আমার চলে যাবে, আমার আর দৌড়াদৌড়ি করার দরকার নেই –এই বুদ্ধি যাঁর হয়ে গেছে, যাঁর *প্রয়োজনাভাববুদ্ধ্যা* হয়ে গেছে, তাঁদের কথা এখানে বলছেন, এনারাই যোগের পথে পা রেখেছেন।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু, আগে আমরা ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়ের অর্থের ব্যাখ্যা করেছি। ইন্দ্রিয়ের বিষয় যেটা, সেটাকেই বলছেন ইন্দ্রিয়ের অর্থ – শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বিষয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অর্থে রয়েছে। *ন কর্মস্বনুষজ্জতে,* এগুলো দিয়ে এখানে আমার কোন কার্য সিদ্ধি হয় না, এই জগতে আমার আর কিছু লাগবে না। একটা ছেলে যখন বিবাহের যোগ্য হয়, তখন তার বাবা-মা চারিদিকে একটা ভাল পাত্রীর অনুসন্ধানের জন্য দৌড়াতে শুরু করে। আর পাত্রীর বাবা-মা তারাও চারিদিকে দৌড়াচ্ছে ভাল পাত্রের সন্ধানে। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর কোন বাবা-মা আর দৌড়াবে না, ওখানেই সব শেষ। ঠিক তেমনি সিদ্ধি হয়ে গেলে বলবে, আমার আর কিছু লাগবে না।

সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী, সমস্ত সঙ্কল্পের সন্ন্যাস করে দিয়েছেন। আধ্যাত্মিক জীবনে এগোনর জন্য সবচেয়ে বড় হল, সমস্ত সঙ্কল্প ত্যাগ। সমস্ত সঙ্কল্প ত্যাগটাই হল মূল কথা। আচার্য বলছেন, *সর্বান্ সঙ্কল্পান্ ইহামুত্রার্থকামহেতুন্*, এই লোকের বা পরলোকের, কোন লোকেরই কামনা থাকবে না। যেমন আমরা অনেক সময় বলি, শেষ সময় ঠাকুর আমাকে নিয়ে যাবেন। এমনি যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'আপনার কি স্বর্গের যাওয়ার ইচ্ছা আছে'? 'কই, কোন ইচ্ছা নেই'। কিন্তু যখন বলছি ঠাকুর আমাকে শেষ সময়ে নিয়ে যাবেন, তখন কিন্তু স্বর্গের ব্যাপারটা ঢুকে যাচ্ছে। *অমুত্র* মানে মৃত্যুর পরে, মৃত্যুর পরে ভাল জন্ম, ভাল জায়গায়, ভাল যোনিতে যাওয়ার ইচ্ছা, এই কামনাটা থাকবেই। এই ইচ্ছা থেকে মানুষ কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারে না। বয়স বাড়ার সাথে সাথে কোথাও একটা মৃত্যু ভয় মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখন ভাবে মৃত্যুর পর আমার কি জানি কি হবে। সন্ন্যাসী মৃত্যুভয়কে জয় করে নেন, তাঁর এই লোকও লাগে না, ঐ লোকও লাগে না। কোন কিছু আমার লাগবে না, এটাই তাঁদের স্বভাব হয়ে যায়। এই জন্মেও কিছু লাগবে না, পরের জন্মেও কিছু লাগবে না। মনুস্মৃতিতে আছে, জীবনে যা কিছু হয়, সমস্ত কিছুর মূলে রয়েছে সঙ্কল্প। সঙ্কল্প যদি নাই থাকে, কেন সে কিছু করতে চাইবে! ঈশ্বর আমার উপর তুষ্ট হন, এই কামনাও সঙ্কল্পের মধ্যে পড়ে, এই সঙ্কল্পও ত্যাগ করতে হবে।

একদিন মন্দিরে ঠাকুর প্রণাম করে বাইরে পায়চারি করছি, দেখছি একজন ইয়ং মহারাজ মন্দিরে প্রণাম করে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর দেখছি উনি আবার হন্তদন্ত হয়ে মন্দিরের দিকে আসছেন। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার এই তো মন্দিরে প্রণাম করে গেলেন, আবার মন্দিরে যাচ্ছেন'? মহারাজ বললেন, 'তখন দেখলাম খুব সুন্দর দুটো ফুল ফুটে আছে, ইচ্ছে হল যাই ঠাকুরকে ফুল দুটো দিয়ে আসি'। মহারাজ ফুল দেখলেন, তাঁর ভাল লাগল, নিয়ে এলেন ঠাকুরকে দেবেন বলে। কোন কামনা নেই, শুধু ভালবাসার জন্য ফুল দুটো নিয়ে আবার মন্দিরে গেলেন। ঠাকুর তোমাকে ভালবাসি, ফুল দুটো ভাল লাগল, তোমার জন্য নিয়ে এলাম। এর পিছনে কোন কামনা নেই।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে খুব নামকরা মন্ত্র আছে, *স যথা কাম ভবতি তৎ ক্রতুর ভবতি যৎ ক্রতুর ভবতি তৎ কর্ম কুরুতে*, যেমন কামনা হয় তেমন করার ইচ্ছে হয়, যেমন করার ইচ্ছে হয় তেমনই কাজ করে। আচার্য এই জিনিসটাকেই নিজের মত করে বলছেন, *ন হি সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসে কশ্চিৎ স্পন্দিতুম্ অপি শক্তঃ*, কামনা যদি না থাকে বাইরে ভিতরে কোথাও স্পন্দন পর্যন্ত হবে না। মন যদি চঞ্চল না হয়, তার মানে মনে যদি কোন কামনা না থাকে, শরীরও নড়বে না। আমরা কেন ধ্যানে স্থির হয়ে বেশিক্ষণ বসতে পারি না? কারণ আমাদের মন সঙ্কল্প-বিকল্পে ভরে আছে। অনবরত বিচার করে করে সঙ্কল্প যখন ত্যাগ হয়, তখন ধ্যানে বসতে পারে। যদি কেউ বলে আমার সঙ্কল্প নেই, তাহলে বুঝতে হবে তার কামনাও নেই। এখন দেহ ধারণের জন্য যতটুকু দরকার, কারণ এই দেহ দিয়েই আমাদের সব কিছু করতে হবে, এই দেহকে রক্ষা করার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু সঙ্কল্প থাকতে পারে, তার বেশি না। এরপর পাঁচ নম্বর শ্লোক খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি শ্লোক, সবাইকে এই শ্লোকটা মুখস্ত করে নেওয়া দরকার।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।।৫।।

(মানুষ বিবেকযুক্ত মন দ্বারা আপনিই আপনাকে সংসার থেকে উদ্ধার করবে। (যোগারূঢ় করবে); কখনও নিজেকে বিষয়াসক্ত করবে না। কারণ, শুদ্ধ মনই মানুষের প্রকৃত হিতকারী, মুক্তির হেতু এবং বিষয়াসক্ত মনই মানুষের পরম শত্রু, বন্ধনের কারণ।)

সংসার সাগরে আমরা নিমজ্জিত হয়ে আছি, এই সংসার সাগর থেকে নিজেকে নিজে তোল, কেউ কাউকে তুলতে পারবে না। তোলা মানে যোগারূঢ় অবস্থা প্রাপ্ত কর, বাকিটা যোগই তোমাকে নিয়ে যাবে। কোন পরিস্থিতিতে নিজের অধঃপতন হতে দেওয়া যাবে না। একবার যখন সংসার সাগর থেকে নিজেকে তুলে নেওয়া হয়ে গেছে, আর যেন ওতে না নামা হয়। শ্রীশ্রীমা খুব সুন্দর বলছেন, থুতু ফেলে থুতু চেটে নেওয়ার মত। এই যে সংসার সাগর, এই সংসারকে কিভাবে পরিভাষিত করবেন সেটা আপনার ব্যাপার।

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুঃ, আমিই আমার বন্ধু; আমার একমাত্র বন্ধু আমি নিজে, আর কোন বন্ধু নেই। *আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ,* আর আমি ছাড়া আমার আর কোন শত্রু নেই। এই জগতে আমিই আমার একমাত্র বন্ধু, আর এই জগতে আমার কোন শত্রু নেই, আমিই আমার একমাত্র শত্রু। এটাই গীতার কথা, গীতার কথা মানে ভগবানের কথা। এর মধ্যে কোন ইমোশান জড়িয়ে নেই। আমাদের শাস্ত্রে কোথাও কোন ধরণের ইমোশানালিজম্ নেই, এই ইমোশানালিজমটাই পরে ধর্মান্ধতায় দাঁড়িয়ে যায়। কিছু কিছু ধর্মের লোকেরা ধর্মান্ধ হয়ে যায়, কারণ সেই সব ধর্মে ইমোশানালিজম রয়েছে। যুক্তি নেই, বিচার নেই, একটা কিছু ধরে নিয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে।

আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, *বন্ধু অপি তাবদ্ মোক্ষং প্রতি প্রতিকূল এব স্নেহাদিবন্ধনায়তনত্বাদ্ তস্মাদ্ যুক্তম্ অবধারণম্,* মোক্ষ পথে যাঁরা আপনার বন্ধু, যাঁদের প্রতি আপনার প্রেম ভাব আছে, স্নেহ বন্ধন রয়েছে, তাঁরাও বিঘ্ন। ভাগবতে জড় ভরতের গল্পে এটাকে খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে। জড় ভরত একটা হরিণ শাবককে ভালবেসে স্নেহের বন্ধনে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। এই স্নেহই পরে তাকে সংসার বন্ধনে নিয়ে গেল, আবার তাঁকে জন্ম নিতে হল। স্বামী, স্ত্রী, সন্তানাদির কথা ভুলে যান, একটা অনাথ হরিণ শাবককে ভালবেসে জড় ভরত আবার সংসার সাগরে নিমজ্জমান হয়ে গেলেন, সেখান থেকে আবার তাঁকে জন্ম নিতে হল। শাস্ত্রের এই কাহিনীগুলি হল এই ভাবগুলিকে বোঝানর জন্য। মোক্ষ পথের পথিকের যে ভালবাসাই হোক, সেটাই বন্ধন। তবে সেই ভালবাসা যদি কাউকে মুক্তির দিকে নিয়ে চলে যায়, যেমন স্বামীজী বলছেন, বন্ধুত্ব দিয়েও মানুষ মুক্তি পেতে পারে। সেই বন্ধুত্ব বন্ধন নয়, জড় ভরতের এটা হল বন্ধন। এখানে আচার্য শব্দটা বলছেন, *স্নেহাদিবন্ধন*। আমরা অনেক সময় বলি, তোমার আমার ভালবাসাটা বন্ধন না। কিন্তু না, সব কটাই বন্ধন, ভালবাসা মানেই বন্ধন। আমরা অতি সাধারণ মানুষ, আধ্যাত্মিক ভাষায় নিকৃষ্ট। যেখানেই ভালবাসা দেখা যাবে, বুঝবেন পায়ে ভাল করে শিকল বাঁধা আছে, এগোতে পারবে না।

এই স্নেহ বন্ধনকে ত্যাগ করে মানুষ যোগের পথে এলে inclusive হয়ে যায়, তখন সে সবাইকে ভালবাসে। ঠাকুর এটাকে দয়া আর মায়া দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন। নিজের স্বামী বা স্ত্রী, পুত্র, মা-বাবা, ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজনদের ভালবাসা মায়া দিয়ে হয়, আর সবার প্রতি ভালবাসা দয়া থেকে হয়। মায়া দিয়ে বন্ধন হয়, সংসার হয়, মায়া দিয়ে কখন মুক্তির পথে যেতে পারবে না। এই মায়াকে ত্যাগ করে মানুষ যখন ধ্যান, ধারণা, যোগ করে তখন সে দয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, সবাইকে ভালবাসে। তখন ঐ ভালবাসা দিয়ে মানুষ মোক্ষের দিকে এগোতে পারে।

আচার্য বলছেন, সেইজন্য গীতা এখানে জোর দিয়ে বলছেন, তোমার ঠিক ঠিক বন্ধু একমাত্র তুমি নিজে, আর বলছেন, *আত্মা এব রিপুঃ যঃ অন্যঃ অপকারী বাহ্যঃ শত্রুঃ সঃ অপি আত্মপ্রযুক্ত এব ইতি,* আচার্যের যে তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার বুদ্ধি, নাহলে কি এভবে কাঁটাছেড়া করা যায়! বলছেন আপনার যে বাইরে শত্রু আছে তাকে আপনি নিজে বানিয়েছেন, ইউনিভার্সাল শত্রু কখন হয় না। আজকে পাকিস্থানের সাথে, চীনের সাথে ভারতের অনেক সমস্যা, এই ব্যাপারে কোন না কোন ভাবে দায়ী আমরা নিজেরা। দায়ী বলতে এখানে দোষী বলা হচ্ছে না, যে কোন কারণেই হোক, রাজনীতি, অর্থনীতি যে কারণই থাকুক। আপনার কি শত্রু আছে? কেউ আছে যার উপর আপনার রাগ আছে?

কে তাদের বানিয়েছে? আপনি নিজে দায়ী। যার উপর আপনি রাগ করেন, যার উপর আপনার ক্রোধ হয়, ফোনে যাকে ব্লক করে দেন, সবাইকে আপনি নিজে বানিয়েছেন। বাহ্য শত্রু যত আছে সব আমার নিজের সৃষ্টি।

রিপুরাত্মনঃ, আত্মজ্ঞানের দিকে যদি না এগোন তাহলে সরাসরি আপনি নিজে আপনার শত্রু। আর বাহ্য শত্রু যদি আপনার থাকে, আপনার যদি কেউ নিন্দুক থাকে, জানবেন কোন না কোন ভাবে আপনি নিজেই এদের আপনার শত্রু বা নিন্দুক তৈরী করেছেন। একজন ভাল লেখক, দু-চারজন পাঠক থাকবেন যাঁরা তাঁর লেখার সমালোচনা করবেন। আপনি লিখছেন বলেই তাঁরা সমালোচনা করতে পারছেন, তাই এই সমালোচনার কারণ আপনি নিজে। কেউ সমালোচনা করছেন বলে কি আপনি সাহিত্যচর্চা বন্ধ করে দেবেন? কখনই না, প্রশংসা, সমালোচনা এগুলো থাকবে। এই জিনিসটা কিন্তু ভাল করে বুঝতে হয় –আপনি নিজেই আপনার একমাত্র বন্ধু, আর আপনিই নিজে আপনার শত্রু। আর সংসারে যে কজন আপনার শত্রু আছে, যাদের নাম শুনলেই আপনার গাত্র দাহ হতে শুরু করে, সবাইকে আপনি নিজে বানিয়েছেন। এখানে উদ্দেশ্য মনস্তত্ত্বের আলোচনা করা না, আরও এগিয়ে নিয়ে বলছেন –

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ।।৬।।

(যে বিবেকযুক্ত মন দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদি বশীভূত হয়েছে, সেই সংযত মনই আত্মার বন্ধু, কারণ উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি রহিত হয়ে সেই মনই মুক্তির সহায়ক হয়। কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির বিবেকশূন্য মন উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিবশে শত্রুর ন্যায় স্বীয় অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয়।)

যিনি দেহরূপী আত্মাকে জয় করে নিয়েছেন, অর্থাৎ শরীরকে জয় করে নিয়েছেন, দেহসুখের জন্য, ইন্দ্রিয়সুখের জন্য বাইরে ছোটাছুটি করছেন না, তাঁর আত্মাই তাঁর বন্ধু। এখানে আত্মা বলতে শুদ্ধ মন আর শরীরকে বলছেন। শুদ্ধ মন হল, যে মন শরীরকে নিয়ন্ত্রিত করে। যদিও আমরা মন বলি ঠিকই, আর এটাও ঠিক যে সব কিছুর পিছনে মন লেগে থাকে, কিন্তু আসলে দেহ দিয়েই সব কিছু হয় কিনা। যে দেহকে জয় করেছে, দেহের সাথে ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে, তার এই দেহ, তার এই ইন্দ্রিয়, তার এই মন তার বন্ধু। যে জয় করতে পারেনি, এই দেহ, ইন্দ্রিয়, এই মন তার শত্রু। কঠোপনিষদে এটাকেই *সদশ্বা* আর *দুষ্টাশ্বা* বলছেন। রথ ছুটে চলেছে, ঘোড়া রথকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, যাঁর ইন্দ্রিয় ও মন পুরো নিয়ন্ত্রণে, ঘোড়াগুলো তাঁর বশে ও আজ্ঞাবহ থাকে; যাঁর ইন্দ্রিয় ও মন নিয়ন্ত্রণে নেই তাঁর ঘোড়াগুলো দুষ্ট ঘোড়া। ফলে, শত্রু যেভাবে আপনার অনিষ্ট করে, ঠিক সেইভাবে অজিতেন্দ্রিয় পুরুষকে তার শরীর মন অনিষ্ট করে ছেড়ে দেয়। কেউ কারুর অনিষ্ট করে না, তুমিই তোমার নিজের অনিষ্ট নিজেই কর। তোমার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই, তোমার নিজের উপর যদি নিয়ন্ত্রণ থাকত, তাহলে তোমার এত শত্রু হত না। এটাই এখানে বলছেন, *বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ,* আত্মা তাঁরই বন্ধু, যিনি নিজেকে দিয়ে নিজেকে জয় করেছেন। যিনি জয় করতে পারেননি, তাঁর আত্মাই তাঁর শত্রু হয়ে যায়। এখান থেকে আরও গভীরে চলে যাচ্ছেন। যিনি জয় করেছেন, তাঁর লক্ষণ বলছেন –

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ।।৭।।

(ব্রহ্ম জিতেন্দ্রিয় ও প্রশান্ত যোগারূঢ় ব্যক্তির সাক্ষাৎ আত্মভাবে বর্তমান থাকেন। এইরূপ জীবনমুক্ত ব্যক্তি শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখে এবং সম্মান ও অপমানে অবিচলিত।)

জিতাত্মনঃ, আপনি কি নিজেকে জয় করেছেন? আমরা সবাই এর নামে, তার নামে, নিজের জীবনকে নিয়ে, পরিবেশকে নিয়ে, সমাজকে নিয়ে সব সময় নালিশ করে যাচ্ছি। তার মানে নিজেকে আমরা জয় করিনি, আমরা তাই জিতাত্মা নই। যদি নিজেকে জয় করে থাকতেন তাহলে লক্ষণ কি হত? *প্রশান্তস্য,* শান্ত, ধীর স্বভাব। *পরমাত্মা সমাহিতঃ,* ভিতরটা সব সময় আনন্দে পরিপূর্ণ, সব সময় হাসি মুখ, আর সব সময় তাঁর মন আত্মজ্ঞান নিয়ে চিন্তন করে যাচ্ছে, ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন চিন্তা করছেন না। এটা করতে হবে, ওটা পেতে হবে, সেটা ধরতে হবে, এই অস্থির ভাব নেই; সংসার চালানোর জন্য, দেহ চালানোর জন্য যতটুকু করা দরকার, ততটুকুই করবেন।

আর বলছেন, *শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ,* আধ্যত্মিক জীবনের একটা নামকরা বৈশিষ্ট্য হল, যিনি যোগী, যিনি জিতাত্মা, তিনি সমস্ত রকম দ্বন্দ্বভাবকে জয় করে নেন। শীত আর উষ্ণ, সুখ আর দুঃখ, মান আর অপমান, যত রকম এই দুই ভাব আছে, সব দ্বৈতভাবকে জয় করে নেন। যেগুলো দরকার, শীতের সময় শীত থেকে নিজেকে রক্ষা করা, গরমের সময় উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া, এগুলো অবশ্যই নিতে হবে। এটা বলছেন না যে, শীতের সময় তুমি খালি গায়ে ঘুরে বেড়াও। গরম লাগছে, গরমে হাসফাস করছেন, যদি ক্ষমতায় কুলোয় একটা এসি লাগিয়ে নিয়ে শান্তিতে থাকুন। মনকে কোন ভাবেই চঞ্চল হতে দেওয়া চলবে না। সুখ-দুঃখ দিয়ে মনকে চঞ্চল হতে দেবেন না। মান-অপমান দিয়ে মনকে চঞ্চল হতে দেবেন না। শীত-গ্রীষ্ম থেকে মনকে চঞ্চল হতে দেবেন না। যাঁরা মনকে এই রকম চঞ্চল হতে দিচ্ছেন না, তাঁরা হলেন *জিতাত্মানঃ,* নিজের আত্মাকে, আত্মা এখানে মন, মনকে জয় করেছেন; দেহ-মন-ইন্দ্রিয়ের এই সংঘাতকে জয় করে নিয়েছেন। আত্মার অর্থ হয় অস্তিত্ব, সত্তা যেটা। আমরা মনে করি আমাদের দেহটাই সব, দেহই আত্মা। আবার অনেকে মনে করেন মনই সব, মনটাই আত্মা। গীতা এগুলোক থেকে তুলে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন যিনি সর্বব্যাপী, চৈতন্য আত্মা, যেটা আসল আত্মা, ওই আত্মার অবস্থায়।

আমরা এতক্ষণ দেখলাম, ধ্যান কে করতে পারে, কার জন্য ধ্যান। আট নম্বর শ্লোকেও ধ্যানের উপর কিছু কথা বলবেন, যেমন বলবেন ধ্যানের ফল কি এবং পর পর বলতে থাকবেন ধ্যান কিভাবে করতে হয়। এখানে গীতার মতে ধ্যানের পদ্ধতি বলা হবে। অন্যান্য যে মত আছে, বিভিন্ন যে শাস্ত্র আছে, তাদের মতানুযায়ী ধ্যানের বিধিতে গীতার সাথে একটু তফাৎ আছে। ভক্তি মতে তফাৎ হয়, রাজযোগ ধ্যানের ব্যাপারে অন্য কিছু জিনিসের উপর জোর দেন। গীতা অন্য ভাবে জিনিসটাকে দেখেন এবং দেখাচ্ছেন।

ধ্যান জিনিসটা কি, কিভাবে ধ্যান করতে হয়, খুব সংক্ষেপে প্রথমে আলোচনা করে গীতার মূল শ্লোকে গেলে আমাদের জিনিসগুলো বুঝতে সুবিধা হবে। ইদানিং সারা বিশ্বের কাছে ধ্যান জিনিসটা খুব চর্চিত একটি বিষয়। যেহেতু যোগ সারা বিশ্বে খুব বেশি ছড়িয়ে গেছে, যদিও বেশির ভাগ লোক 'যোগ' না বলে 'যোগা' বলে। 'যোগা' শব্দ একটা অশুদ্ধ শব্দ, আসলে 'যোগা' বলে কোন শব্দই হয় না। যোগের সাথে ধ্যান জিনিসটাও খুব জড়িয়ে থাকার জন্য ধ্যানও আজকাল খুব চর্চিত হচ্ছে। আমাদের ভিতর যে আত্মশক্তি বিদ্যমান, এই আত্মশক্তির অভিব্যক্ত হওয়ার জন্য যত পথ আছে, তার মধ্যে সব থেকে ভাল পথ হল ধ্যান। সবার ভিতর অনন্ত শক্তি, আমিই সেই শুদ্ধ আত্মা, হিন্দু ধর্মের সমস্ত শাস্ত্রের পাতায় পাতায় শুধু এই কথাই বলছেন। আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, ধ্যানের মাধ্যমে আমরা আমাদের স্বরূপ আত্মার প্রত্যক্ষ ভাবে সাক্ষাৎ পেতে পারি।

শুদ্ধ আত্মাকে আমাদের বেদান্ত খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি। স্বামীজী যখন বলছেন, সমস্ত শক্তি তোমার ভিতরে, সমস্ত জ্ঞান তোমার ভিতরে বা বলছেন, each soul is potentially divine, তখন তিনি বারবার বেদান্তের সেই সত্যকেই আমাদের সামনে অন্য ভাষায়, অন্য আঙ্গিকে রাখছেন, যাতে আমরা আরও সহজে বুঝতে পারি। ধ্যান করা মানে আমার নিজস্ব

শক্তির উন্মেষ। বাইরে থেকে আমাদের কিছু আসে না, যা আছে সব আমাদের ভিতরেই আছে। এই কথাগুলো বিশ্বাস করা যায় না, বিশেষ করে অন্যান্য ধর্মে যাঁরা আছেন, তাঁরা এসব কথা বুঝতেও পারেন না, মানতেও চান না। তাঁদের কাছে হল, উপরে যে ভগবান বসে আছেন, তিনি আমাদের এই শক্তি দেন। কিন্তু সত্য হল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শক্তি আমার ভিতরে। আমাদের ঋষি পরম্পরায় হাজার হাজার বছর ধরে শত শত ঋষিরা এই একই কথা বলে এসেছেন, এই কথাকে মিথ্যা বলার উপায় নেই। ঠাকুরও সেই কথা বলছেন, স্বামীজীও সেই কথা বলছেন, ঠাকুরের ত্যাগী পার্ষদরাও তাই বলছেন, কারণ এনারাও সবাই ঋষি পরম্পরার।

আমরা যখন কাজ করি, যেমন আমেরিকা, ইউরোপের লোকেরা প্রচুর কাজ করে, এদের সমস্ত শক্তি এরা কাজের মধ্যে ঢেলে দিচ্ছে, কাজ করার দরুন আত্মার উপর যে আবরণগুলি পড়ে আছে, কর্মের মাধ্যমেই সেগুলোকে কেটে সরিয়ে দেওয়া হয়। ঠাকুর এর উপমা দিচ্ছেন, পাথর চাপা ফোয়ারা। মনে করা যাক, একটা সুন্দর বাগান বাড়ি, কিন্তু পুরো বাড়িটা জঙ্গল, আবর্জনায় ভরে আছে, সেই বাড়ির কোন একটা ঘরের কোন এক সিন্দুকে অত্যন্ত দামী একটা মণি রাখা আছে। সেই মণি উদ্ধার করতে হলে কত খাটতে হবে, ভেবে দেখুন। দক্ষিণ ভারতে কিছু দিন আগে যে ঘুর্ণি ঝড় হয়ে গেল, সেই ঝড়ের খবরের সাথে আর-একটা মজার খবরও এসেছিল। তামিলনাড়ুতে যখন ঝড় আছড়ে পড়ে তখন সমুদ্রের ধারে জলের সাথে ছোট ছোট সোনার কণা এসে বালিতে আছড়ে পড়তে থাকে। শত শত লোক খবর পেয়ে সোনা সংগ্রহ করতে নেমে পড়ল। খবর ছড়িয়ে পড়ে। সরকারের তরফ থেকে এক্সপার্টরা এসে খোঁজ নিয়ে বললেন, এখানে আশেপাশে বহুকাল আগে কোন মন্দির আদি কিছু ছিল, বিভিন্ন কারণে মন্দিরকে সমুদ্র গ্রাস করে নেয়। মন্দিরে গচ্ছিত সোনাগুলিই কিভাবে কিভাবে জলের স্রোতের ধাক্কায় ঘুরে ঘুরে এখানে এসেছে। তবে সেই সোনা বার করতে খুব খাটতে হয়েছিল, কিছু লোকে চার হাজার, পাঁচ হাজার টাকার সোনা পেয়েছে। ওই সোনা মন্দিরে পড়ে ছিল, কেউ জানতও না মন্দিরের ভগ্নাবশেষ সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিল।

আমাদের সবারই ভিতরে অমূল্য মণি চাপা পড়ে আছে। যে জিনিসগুলি দিয়ে চাপা পড়ে আছে, সেগুলোর মধ্যে কিছু জিনিস আছে অত্যন্ত স্থূল জিনিস, লোহা, কাঠ, পাথর এগুলো পড়ে আছে; কর্ম এই স্থূল জিনিসগুলোকে সরিয়ে দেয়। এরপর থেকে যায় সূক্ষ্ম আবরণ গুলি। যেমন পোড়ো বাড়ির জঙ্গল কেটে সাফ হল, আবর্জনাগুলো পুড়িয়ে ফেলা হল, এরপর আরও অনেক ছোট খাটো জিনিস আছে, ওগুলোকে এবার সরানো দরকার, তবে গিয়ে মণিটা বের করা যাবে। এগুলো আমরা উপমা রূপে নিচ্ছি। মানুষ যখন খাটাখাটনি করে, প্রচুর কাজ করতে থাকে তখন আত্মার শক্তি বেরোতে শুরু করে। নিষ্কাম কর্ম যখন করে, আমার এটা কর্তব্য, আমি এটা করব, এটাই তখন নিষ্কাম কর্ম হয়ে যায়। সরকারী কর্মচারীরা যদি মনে করেন, সরকার আমাকে টাকা দিচ্ছে কাজ করার জন্য, আমি আমার কর্তব্য পালন করছি, এটাই নিষ্কাম কর্ম।

কিন্তু কাজ করতে গিয়ে আমি বলছি, আমাকে ঘুষ না দিলে কাজ করব না, এটা তখন সকাম কর্ম হয়ে গেল। লোকেরা প্রায়ই বলে, আমার যদি একটা কামনা না থাকে, আমি কাজ করব কি করে? সেটার কথা বলছেন না, কামনা না থাকলে সত্যিই তো কি করে কাজ করবে। একমাত্র জ্ঞানী পুরুষ, অবতার পুরুষরাই ঠিক ঠিক কর্মযোগী হন। আমি, আপনি সবাই এনাদের থেকে একশ ধাপ নীচের কর্মযোগী। আমাদের হল, আমাদের দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা দায়ীত্ব কেন নিয়েছি? কারণ এরও আমাদের দরকার আছে। যেমন আমি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, রামকৃষ্ণ মিশন আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, তাঁরা আমাকে এখানে রেখেছেন, তাঁরা যা বলবেন আমাকে তাই করতে হবে। বলতে পারেন, এটাও তো সকাম। ঠিক বলছেন, এটাও সকাম। কিন্তু এরপরেও যদি আমার চাহিদা বাড়তে থাকে, তখনই ওটা আসল কর্মভোগ হয়ে যাবে। কিন্তু এতটুকু কর্মযোগ। সকাম কর্ম

যদি করা হয়, খাটনি যদি হয়, সেখানে নিজের শক্তির প্রকাশ হতে শুরু হয়। নিষ্কাম কর্ম মানে, আমি এটা দায়ীত্ব রূপে করছি, এখানে আমার চাওয়া-পাওয়া কিছু নেই।

যদি আদর্শের কথা বলতে হয়, তাহলে বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগ এই চারটে আদর্শ আমাদের সামনে আসে। বিদ্যার আদর্শ মানে, নিজেকে বিদ্যার প্রতি সমর্পিত করে দেওয়া। সম্পদের আদর্শ মানে, নিজেকে এই সমাজে সম্পদ তৈরী করার জন্য সমর্পিত করে দেওয়া বা সেবার আদর্শে সমর্পিত করে দেওয়া। বদলে যতটুকু আসবে নিলাম। তা নাহলে, সাধু সন্ন্যাসী, মহাত্মাদের মত পূর্ণ ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া। এটাই হল নিষ্কাম কর্ম। এই আদর্শকে কেন্দ্র করে যে কর্মই করা হোক, সেটাই নিষ্কাম কর্ম। কিন্তু যেখানেই মনে হবে আমি আমার আত্মতুষ্টির জন্য, আমার স্বার্থের জন্য কাজ করছি, আমার আরও বেশি টাকা যাতে হয় সেইজন্য ঘুষ নিচ্ছি, তখন সেই কর্ম সাধারণ কর্ম হয়ে গেল। এই কর্ম আত্মার উপর যে আবরণ পড়ে আছে, সেটাকে সরাতে পারবে না। সেইজন্য ওটা তখন আর কর্মযোগ থাকল না।

নিষ্কাম ভাবে কর্ম করার পর এবার যেই ভিতরে ঢুকতে শুরু করা হবে, তখন এটাকে বলাই যেতে পারে সূক্ষ্ম আবরণগুলিকে ছিঁড়ে সরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হল। সেইজন্য ধ্যানের ঠিক ঠিক ফল হল আত্মজ্ঞান। কিন্তু আত্মার সেই অনন্ত শক্তি রয়েছে, আত্মার সেই অনন্ত জ্ঞান, ফলে যারা সকাম ব্যক্তি, যাদের মনে কামনা বাসনা আছে, তারা যদি ধ্যান করেন তারাও ফল পাবে, ফল যে একেবারে পাবে না, তা না। সেই ফল কিভাবে পান? মনের শক্তি একটু বেড়ে যাবে, মন একটু শান্ত হবে। শান্ত মন মানেই শক্তিমান মন। বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়েরা খুব বেশি দুরন্তপনা করতে থাকলে বাড়ির বড়রা বলেন, 'এই তোরা একটু শান্ত হয়ে চুপ করে বস তো'। ওরাও শান্ত হয়ে বসে পড়ে। আমরাও যদি চুপচাপ শুধু বসে থাকতে পারি, আমি ধ্যান না করতে পারি, জপ করতে না পারি, শাস্ত্রাদি পড়তে যদি না পারি, সকাল-সন্ধ্যা লাইট অফ্ করে চুপচাপ চেয়ারে বা মাটিতে কিছুক্ষণ বসে থাকতে তো পারি, তাতেও আমাদের মন শান্ত হবে। এতে অনেক কিছু জিনিস, জীবনের অনেক রহস্য আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এতেও শক্তি বাড়ে।

ঠাকুর কেশব সেনের নামে বলেছিলেন, কেশবের এত নামযশ হল, কারণ কেশবের ধ্যানটুকু ছিল। কেশব সেন তখনকার দিনে কলকাতার খুব নামকরা লোক ছিলেন, তাঁর ব্যাপারে ঠাকুর বলছেন, ধ্যানটুকু ছিল তাই এত কিছু হল। সেখান থেকে যদি আমরা আরও এগিয়ে যাই, গীতাতেই বলবেন *ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি*, ধ্যান করলে আত্মজ্ঞান হয়। এই দুটো জিনিস ধ্যানে ফল রূপে আসে, কেশবের নামযশ এটা ধ্যানের জন্য, আর আত্মজ্ঞান যেটা হয় এটাও ধ্যানের জন্য। ধ্যান সব কিছু দিতে পারে। আবার যদি চুপচাপ বসে থাকা যায়, ইদানিং যাঁরা পপুলার ধর্মগুরু হয়েছেন, তাঁরা ধ্যানের নামে রিলাক্সেশান সেখান। তাতেও তাঁদের মনটা শান্ত হয়, শান্ত মন শক্তি পেয়ে যায়। অনেক সময় আমরা কোন কঠিন কাজ করতে যাওয়ার আগে চুপ করে শান্ত ভাবে একটু বসে যাই। শক্তি এসে যায়, তারপর পুরোদমে ওই কাজে নেমে পড়ি।

ধ্যান কিভাবে হয়, এই ব্যাপারে আমরা মূল কয়েকটা কথা বলে দিচ্ছি, পরে গীতায় যেমন যেমন আসবে আমরা বলতে থাকব। এখানে আমরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে এসেছি, সাত দিনের ধ্যানশিবির বা একুশ দিনের ধ্যানশিবির যেভাবে ধ্যানের কথা বলা হয়, এখানে তা না। আমরা এখানে খুব সিরিয়াস বিষয়ে আছি। ধ্যানে প্রথম লাগে পবিত্রতা, পবিত্রতা যদি না থাকে ধ্যান হবে না। কিন্তু কোন কারণে পবিত্রতা ছাড়াই যদি ধ্যান হয়, তাহলে ওটা আসুরী ধ্যান হবে। অসুরদের সমস্ত শক্তি ইন্দ্রিয়ে থাকে, ফলে তারা যখন ধ্যান করে ওদের ইন্দ্রিয়ের শক্তি বেড়ে যায়, আমাদের সবারই বাড়ে। আগে যেমন বলা হল, কেউ যদি চুপচাপ বসে থাকতে পারে, তাতেও মন শান্ত হয় এবং শান্ত মনে আমরা একটা শক্তি পাই। কারুর সাথে যদি বেশিক্ষণ ঝগড়া করে যদি মনে হয়

ক্লান্ত হয়ে গেছে, তখন কিছুক্ষণ চুপ করে যায়। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার পুরোদমে ঝগড়া, চেঁচামেচি শুরু হয়।

আমাদের উদ্দেশ্য ধ্যানের মাধ্যমে জীবনে আধ্যাত্মিক উত্থান। এই বিষয়ের উপরেই আমরা আলোচনা করছি, এর জন্য লাগে পবিত্রতা। পবিত্রতা যদি না থাকে, তাহলে কিন্তু ইন্দ্রিয়ের শক্তি বেড়ে যাবে। ইন্দ্রিয়ের শক্তি বাড়লে কি হবে বুঝতে হলে আমাকে একটা চুম্বকের কল্পনা করতে হবে। একটা চুম্বকের ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেল। এবার দূরের জিনিসকেও সে কাছে টেনে আনবে। এগুলোকে নিয়ে অনেক গল্প, উপন্যাস, সিনেমা তৈরী হয়, বাস্তব জীবনে কতটা ঠিক আমাদের জানা নেই। তবে এটা ঠিক, চুম্বক যদি শক্তিশালী হয়, দূরের জিনিসকে সে টানবে। পবিত্রতা যদি না থাকে এই ক্ষমতাবান মন তার আশেপাশে যা কিছু আছে, সব কিছুকে টানতে থাকবে। এই ক্ষমতাবান মন তখন কামিনী-কাঞ্চনে চলে যাবে, বিষয় ভোগের দিকে চলে যাবে। ওই মনকে ফেরত আনার আর তখন ক্ষমতা থাকে না। আমরা বিশ্বামিত্রের কাহিনী জানি, বিশ্বামিত্র ধ্যান করছেন, জগৎকে দেখাতে চাইছেন তাঁর মত ঋষি কেউ নেই। কিন্তু ভিতরে কামনাগুলো থেকে গেছে, অশুদ্ধ মন, কিন্তু মনকে একাগ্র করে চলে যাচ্ছেন, ফলে ক্ষমতা বেড়ে যাচ্ছে অন্য দিকে পবিত্রতা নেই, পরিণাম স্বরূপ সামনে মেনকার মত এক রূপসী এগিয়ে এলো, পতন হয়ে গেল। টিভিতে, কাগজে আমরা প্রায়ই দেখে থাকি, অমুক বাবাজীর পতন, অমুক সাধিকার পতন, এগুলো হয় এই কারণেই। শুদ্ধ পবিত্র মন না হওয়ার জন্য, মনের একাগ্র শক্তি বেড়ে গেলে মনের ভিতর যে কাম, ক্রোধ, লোভ রয়েছে, এগুলো অনেক গুণ বেড়ে যায়। সেইজন্য বলা হয় ধ্যানের জন্য প্রথম দরকার একটা পবিত্রতা। তার সাথে যেখানে ধ্যান করা হয়, সেই স্থানটা যেন অবশ্যই পবিত্র স্থান হয়।

স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ এক সময় স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের সেবক ছিলেন। এনারা ঘড়ি ধরে, আসনে বসে ধ্যান করার লোক নন, এনারা হলেন সিদ্ধ পুরুষ। আমরা সেই সময় ব্রহ্মচারী ট্রেনিং সেন্টারে ছিলাম, সেখানে পূজনীয় আত্মস্থানন্দজী মহারাজ একটা খুব সুন্দর ঘটনার কথা বলেছিলেন। স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ, যখন তখন, যেখানে সেখানে ধ্যানের গভীরে ডুবে যেতেন। সেই সময় ওখান থেকে ওনাকে উঠিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে আসাটা খুব মুশকিল ছিল। একদিন সকালে উনি টয়লেটে কমটে গিয়ে বসে আছেন, কমট থেকে উঠছেনই না। দু ঘন্টা, তিন ঘন্টা বসে আছেন তো বসেই আছেন। ইতিমধ্যে বেলুড় মঠে প্রেসিডেন্ট মহারাজকে প্রণামের সময় হয়ে গেছে, ভক্তরা প্রণাম করতে আসবেন। সেবক গিয়ে দেখেন উনি কমটের উপর বসেই পুরো ধ্যানস্থ। সেবক বলছেন, 'মহারাজ এবার তৈরী হয়ে উঠে আসুন'। মহারাজ ওদিক থেকে বলছেন, 'আমার এখন উঠতে ইচ্ছে করছে না'। সেবক খুব আস্তে মিষ্টি করে বলছেন, 'মহারাজ ভক্তরা অপেক্ষা করছেন, প্রণাম করবেন'। উনি বলছেন, 'এখানেই ভক্তদের পাঠিয়ে দাও প্রণাম করার জন্য'। সেবক বলছেন, 'এখানে টয়লেটে কি করে এত ভক্তরা আসবেন'? যাই হোক, বহু কষ্টে ওনাকে টয়লেট থেকে আনা হল। এনাদের কথা আলাদা, এনারা ধ্যানসিদ্ধ, এই জিনিস সবাই পারে না। ধ্যানসিদ্ধ পুরুষ যেখানে বসবেন ওখানেই ধ্যানে ডুবে যাওয়ার ক্ষমতা রাখেন। এই জিনিস আমার আপনার পক্ষে সম্ভব না। সিনেমা হলে গিয়ে, বা কোন বারে গিয়ে আমি বলব, আমি এখানে ধ্যান করব, সেটা যেমন কখনই সম্ভব না; তেমনি বাড়িতেও যেখানে সেখানে রান্নাঘরে, বিছানায় বসে ধ্যান করা যায় না, জপ করা যাবে, কিন্তু ধ্যান হবে না। ধ্যানের জন্য একটা পবিত্র জায়গা দরকার, একান্ত জায়গা লাগে। যদি পবিত্র জায়গা না হয়, একান্ত জায়গা না হয়, ধ্যান হবে না। এই স্থানের ব্যাপারটাকে নিয়ে গীতাতেও বলবেন।

ধ্যানের একটি প্রধান অঙ্গ হল আসন। রাজযোগের অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে একটা অঙ্গ হল আসন। আসনের সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল, মেরুদণ্ড ও গ্রীবা এক সরল রেখায় থাকতে হবে। মেরুদণ্ড একেবারে সোজা থাকতে হবে। আমরা যেখানেই বসি না কেন, পালকি মেরে মাটিতে

বসছি, কিংবা চেয়ারে বসছি, বা বিছানায় বসছি, মেরুদণ্ড যেন সোজা থাকে। মেরুদণ্ড আর গ্রীবা এক সরল রেখায় একেবারে সোজা না থাকলে উচ্চ চিন্তন হবে না। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, খুব জরুরী কোন খবর এলে শোনার জন্য মানুষ আস্তে করে সোজা হয়ে বসে। সোজা হয়ে বসল মানে, এবার আমি মন দিয়ে শুনছি তুমি কি বল। কোন লেখক, কোন গায়ক যখন উচ্চমানের কিছু সৃষ্টি করেন, সোজা হয়ে বসেন। যাঁরা বেলুড় মঠে আসা যাওয়া করেন, তাঁরা যদি লক্ষ্য করেন দেখবেন, কোন মহারাজ যদি শারীরিক ভাবে অসুস্থ না হয়ে থাকেন, যত বয়সেরই হয়ে থাকুন, ওনারা কিন্তু সব সময় সোজা হাঁটেন। দেওঘরে স্বামী পাবনানন্দজী মহারাজ ছিলেন, শম্ভু মহারাজ বলেই সবাই জানতেন। খুব নামকরা মহারাজ, বিদেশী ছিলেন, রোগা, লম্বা ও টকটকে ফর্সা রঙ। ওনার তখন নব্বই বছর বয়স, তখনও একেবারে সোজা একটা ডাণ্ডার মত চলতেন। ওই বয়সেও ওনার হাঁটাচলাটা দেখার মত ছিল। যখনই ওনার ঘরে যেতাম, চেয়ারে খুব কম দেখতাম; বিছানায় বসে আছেন একেবারে সোজা; কথা বলছেন একেবারে সোজা হয়ে কথা বলছেন। আমাদের অনেক নামকরা মহারাজ ছিলেন, তাঁদের সবারই একই বর্ণনা শুনেছি। ক্লাশ নিচ্ছেন, একেবারে সোজা বসে ক্লাশ নিচ্ছেন। দেখে মনে হবে সব সময় যেন ধ্যানের জন্য প্রস্তুত।

তৃতীয় হল, আসন যদিও ঠিক থাকে, কিন্তু বারবার যদি আসন পাল্টাতে হয়, তার মানে শরীর মন এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি। অনেক সময় দশ পনের মিনিট পরে পায়ে ঝিন্ ধরে যায়, তার মানে প্র্যাক্টিস নেই। কিছু দিন প্র্যাক্টিস করলে এগুলো ঠিক হয়ে যায়। দুই থেকে ছয় মাস প্রথম প্রথম এই সমস্যাগুলো হয়, প্র্যাক্টিস করে গেলে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসটা ঠিক করতে হয়, তবে ওটা খুব গুরুত্বপূর্ণ না। রাজযোগে পতঞ্জলি শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর বেশি জোর দেননি, গীতা একেবারেই জোর দেননি। বর্তমান কালে যাঁরা ধ্যান শেখান, তাঁরা প্রথমেই প্রাণায়ামের উপর জোর দেন। তবে এটা ঠিক, সারাদিন কাজ কর্ম করার পর মন চঞ্চল থাকে, একটু প্রাণায়াম করে নিলে মন শান্ত হয়ে যায়। ধ্যানের জন্য প্রাণায়াম খুব একটা জরুরি না। যদি একটা শুদ্ধ পবিত্র জীবন থাকে, শরীর যদি শুদ্ধ পবিত্র থাকে, সকালে স্নান করে ধ্যানে বসা হল, সন্ধ্যে বেলা হাত পা ধুয়ে, জামা-কাপড় ছেড়ে বসা হল, একটা পবিত্র ঘরে, যে ঘরকে অন্য কাজে লাগানো হয় না, আসন যেটা অন্য কাজে ব্যবহার করা হয় না, শুধু ধ্যানজপের জন্যই রাখা, তখন ওই শান্ত ভাবটা নিজে থেকেই আসে। এরপর ধ্যান শুরু করা হল, প্রথমে মনটা চঞ্চল থাকে, সেখান থেকে আস্তে আস্তে মনটাকে টেনে ভিতরে আনতে হয়, মনকে ছোট শিশুর মত বোঝাতে হয়, ওদিকে যেতে নেই, ওটা আমার বিষয় না।

এবার ধ্যানের বিষয়টা কি হবে? শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেল, পুরোপুরি না, মোটামুটি যতটা পারা গেল বিভিন্ন জায়গা থেকে মনকে কুড়িয়ে আনা হল। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে বিভিন্ন জায়গায় ধ্যান করার কথা বলা হয়েছে, যেমন হৃদয়ের উপরে, কন্ঠে, নাসিকাগ্রে, ভ্রু মধ্যে, মস্তকে। গীতাতে বলছেন নাসিকাগ্রে, এই প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্কর পরে খুব সুন্দর কথা বলবেন, ধ্যানটা নাসিকাগ্রে করার কথা না, এর সাহায্যে মনকে কেন্দ্রিত করতে হয়, ধ্যান সব সময় করতে হয় আত্মার। এখান থেকে ধ্যানের মূল বিষয়টা শুরু হয়। আমি যাঁর ধ্যান করব বা যে বিষয়ের ধ্যান করব, আমি সেটাই হব। ধ্যান যদি নাসিকাগ্রে করা হয়, ধ্যান যদি ভ্রু মধ্যে করা হয়, বা অন্য কোন কিছুতে ধ্যান করা হয়, তাহলে এটাই হব। ধ্যানের উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান, ধ্যানের উদ্দেশ্য ইষ্টের সঙ্গে এক হওয়া। ধ্যানের উদ্দেশ্য ইষ্টের কৃপা লাভ করা, ধ্যানের উদ্দেশ্য ইষ্টের ভালবাসা পাওয়া। সেইজন্য ধ্যান করতে হয় আত্মতত্ত্বের উপর। গীতা বারবার বলছেন, চিন্তন আত্মার করতে হয়, চৈতন্যের করতে হয়।

আমরা অনেকবার বলেছি, যাঁরা কৃষ্ণ মন্ত্র পেয়েছেন বা রাম মন্ত্র পেয়েছেন, গুরু শিষ্যকে একটা ছবি বা মূর্তি দেখিয়ে দিয়ে বলে দেন, ইনিই হলেন তোমার ইষ্ট। গুরু কখন ছবির উপর ধ্যান করতে বলে দেন না, মূর্তির উপর ধ্যান করতে বলেন না। ওটা একটা আকার দেখিয়ে দেওয়া হল,

এবার যখন ধ্যান হবে, গুরু যেখানেই ধ্যান করতে বলে থাকুন, গুরু হৃদয়ে ধ্যান করতে বলতে পারেন, কোন গুরু হয়ত ভ্রূ মধ্যে ধ্যান করতে বলবেন, কেউ বলবেন মস্তকে ধ্যান করতে; যেখানেই ধ্যান করুন ধ্যানের বিষয় হবে চৈতন্যস্বরূপ ইষ্টের। তবে মস্তকে ধ্যান খুব বিপজ্জনক, বলা হয় যে ওতে মাথা গরম হয়ে গিয়ে মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে। ঠাকুর বলতেন, হৃদয় হল ডঙ্কা মারা জায়গা। যিনি হৃদয়ে ধ্যান করবেন তাঁকে প্রথমে হৃদয়ে সেই চৈতন্যের কল্পনা করতে হয়।

শব্দটা হল কল্পনা, এই কল্পনা করতে করতে, যেমন ধরুন কেউ ঠাকুরের মন্ত্র পেয়েছেন, বা কেউ মা কালীর মন্ত্র পেয়েছেন, বা শিবের মন্ত্র পেয়েছেন, হুশ্ করে একদিনে তো হবে না, এগুলো দীর্ঘকাল ব্যাপী সাধন সাপেক্ষ, রাজযোগে পতঞ্জলি বলছে, *স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য*, পাঁচ বছর, দশ বছর লাগতে পারে; তখন কি হয়, এই যে কল্পনা করা হচ্ছে, এটা ধীরে ধীরে চিন্তনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। অনেকে মনে করে ধ্যান মানে কল্পনা, কিন্তু ধ্যান বাস্তবিকই কোন কল্পনা নয়। ধ্যান মানে, আমার আপনার যে বাস্তব স্বরূপ, সেই বাস্তব স্বরূপের দিকে যাওয়া।

শ্রীকৃষ্ণের যে ছবি, এই ছবিকে ধীরে ধীরে আমাকে মনে করতে হবে, এই যে ছবি এটা আসলে জীবন্ত কৃষ্ণ। কেউ হয়ত বলবেন, আমি তো কোন দিন জীবন্ত কৃষ্ণকে দেখিনি, আমি কি করে ভাবব? তাহলে ভাই ধ্যান তোমার জন্য নয়। কে বলেছে সবাইকে ধ্যান করতে হবে। প্রথমে কল্পনা করতে হবে, এই হলেন জীবন্ত কৃষ্ণ। সেখান থেকে আস্তে আস্তে কল্পনা যখন আরও গভীর ও স্থায়ী হয়, তখন ওটা চিন্তনে পরিবর্তিত হতে শুরু হয়। এবার আমি যে জীবন্ত কৃষ্ণকে চিন্তন করছি, এই চিন্তাটা কিন্তু আমার চিন্তার জগতে হচ্ছে। চিন্তা করতে করতে মন যত গভীরে যাবে, গীতায় এই অধ্যায়েই পরে বলবেন, *শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ বুদ্ধ্যা ধৃতি গৃহিতয়া*, দিনের পর দিন লেগে আছে, তখন হঠাৎ একদিন এই কল্পনার জগৎ, চিন্তনের জগৎ খসে পড়ে যায়, আর বাস্তব জগৎটা খুলে যায়।

ঈশ্বর তখন কৃপা করেন, সেই সময় যিনি আত্মার উপর চিন্তন করছিলেন, তখন তাঁর ভিতরে সেই অন্তর্জ্যোতি জ্যোতি রূপে দর্শন দেন। যিনি ইষ্টের চিন্তনে ডুবে ছিলেন, তিনি তাঁর হৃদয়ে ইষ্ট রূপে দর্শন দেন। হৃদয়ে যে হৃৎপদ্ম, সেখানে জ্যোতির্ময় হয়ে জ্বলে ওঠেন, এটা পুরোপুরি বাস্তব। কি রকম বাস্তব? নরেন যখন ঠাকুরকে এসে বলছেন, 'মশাই আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন'? 'হ্যাঁ দেখেছি, তোমাকে যেমন দেখছি, ঠিক এই ভাবে, কিন্তু আরও স্পষ্ট ভাবে'। যাঁরই ঈশ্বর দর্শন হয়, তিনি এই জগৎকে যেমনটি দেখছিলেন, তার থেকে স্পষ্ট দেখতে পান। তখন জগৎকে দেখে মন হয়, জগৎ যেন কেমন ছায়া ছায়া মত। কঠোপনিষদেও যমরাজ নচিকেতাকে একই কথা বলছেন, এই জগৎকে কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া মনে হয়। এখন আমাদের কাছে বিরাট আলোময় জগৎ, কারণ আমরা অন্ধকারে অভ্যস্ত, অন্ধকারে অভ্যস্ত বলে জগৎ যেন বিরাট কিছু। আর ধ্যানে *ছায়াতপোরিব ব্রহ্মলোকে*, মনে হবে সেখানে সূর্য যেন জ্বলে উঠেছে।

এই যে ধ্যানের বিভিন্ন বিধি, নাসিকাগ্রে ধ্যান, ভ্রূ মধ্যে ধ্যান ইত্যাদি, এর মধ্যে সবচেয়ে ভাল বলা হয় হৃদয়ের মধ্যে যখন ইষ্টের চিন্তন করা হয়, এবং ইষ্টকে সজীব রূপে চিন্তন। লীলাপ্রসঙ্গে ধ্যান প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, প্রথম অবস্থায় জপধ্যান করতে বসেই ইষ্টের পূর্ণ রূপের ধ্যান করা যায় না; সেইজন্য প্রথমে ইষ্টের চরণযুগল, ইষ্টের স্মিত হাস্য মুখের চিন্তন করতে হয়। প্রথমেই একসঙ্গে পূর্ণাবয়বের ধ্যান হয় না, একটা অঙ্গ থাকলে আরেকটা অঙ্গ ছিটকে যাবে। আপনি তো ছবির চিন্তন করছেন না, ইষ্টের জীবন্ত রূপ চিন্তন করছেন। অনুশীলন করতে করতে পুরো জীবন্ত রূপটা চিন্তনে আসবে। এখনও ইষ্ট কল্পনা আর চিন্তনের জগতে আছেন। এবার যত ওই জীবন্ত রূপটাকে নিয়ে চিন্তন করতে থাকবে, জপ করতে থাকবে, যত ধ্যান করতে থাকবে,

তখন একটা সময় চৈতন্যের জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশিত হয়ে যান। যখন জ্যোতিঃস্বরূপে প্রকাশিত হন, তখন আর কোন সংশয় থাকে না, কাউকে জিজ্ঞেস করতেও যেতে হয় না।

যাদের দীক্ষা হয়নি, স্বামীজী তাদের জন্য বলছেন, সূর্যোদয়ের কল্পনা করা কিংবা হৃদয়টা যেন একটা সরোবর, সরোবরের স্নিগ্ধ জলে একটা প্রস্ফুটিত পদ্ম যেন ভাসছে। যে কোন জিনিস, যেটা ভাল লাগে, স্বপ্নে ভাল কিছু একটা দেখেছেন, শুভ কিছু দেখেছেন, সেটার উপরেও ধ্যান করা যায়। পতঞ্জলিও একই কথা বলছেন, স্বপ্নে কোন একটা কোন জ্ঞান হয়েছে, এটা মন্ত্র হবে না, কিন্তু ধ্যান করা যায়। তাতেও মন ধীরে ধীরে শান্ত হয়, স্নিগ্ধ হয়, শক্তি বাড়ে, শক্তির প্রকাশ দেখলে নিজেরই উৎসাহ বাড়ে, বিশ্বাদ দৃঢ় হয়, বিশ্বাস দৃঢ় হলে নিষ্ঠাও বাড়বে। তার থেকে বড়, আত্মজ্ঞানের দিকে, ভক্তির দিকে এগোতে শুরু করে। আমরা অত্যন্ত সংক্ষেপে ধ্যান সম্বন্ধীয় মূল কয়েকটি কথা আলোচনা করলাম, ধ্যান কি এবং ধ্যান কিভাবে করতে হয়। আমরা আবার গীতার মূল শ্লোকে প্রবেশ করছি। সাত নম্বর শ্লোক পর্যন্ত আলোচনা হয়ে গেছে, এবার আট নম্বর থেকে শুরু করা হচ্ছে।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচতে যোগী সমলোষ্টশ্মকাঞ্চনঃ।।৮।।

(কে যোগারূঢ় বলে কথিত হন? যে যোগী শাস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্বানুভূতিতে পরিতৃপ্ত, যিনি শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বে নির্বিকার ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি মৃৎখণ্ড, প্রস্তর ও সুবর্ণে সমদর্শী (হেয়-উপাদেয়-বুদ্ধিশূন্য), তিনি যোগারূঢ় বলে কথিত হন।)

এখানে সিদ্ধ যোগীর বর্ণনা করছেন। আচার্য পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, *জ্ঞানং শস্ত্রোক্তপদার্থানাং পরিজ্ঞানং বিজ্ঞানং তু শাস্ত্রতো জ্ঞাতানাং তথা এব স্বানুভবকরণং,* জ্ঞান কি আর বিজ্ঞান কি, আচার্য বলছেন, শাস্ত্রে যে কথাগুলো বলা হয়েছে, সেটাকে ভাল ভাবে জানা ও ধারণা করা, এটাকে জ্ঞান বলা হয়। আর এই জ্ঞানকে সাক্ষাৎ যখন অনুভব করা হয়, তখন এটাকে বলা হয় বিজ্ঞান। বেদান্তে জ্ঞান আর বিজ্ঞানে কোন তফাৎ করা হয় না। জ্ঞান হল theoretical knowledge, বিজ্ঞান হল practical knowledge। আচার্য শঙ্কর তিনিও বিজ্ঞানবাদী, শ্রীরামকৃষ্ণ তিনিও বিজ্ঞানবাদী। কারণ সব জায়গায়, সব সময় এনারা প্রত্যক্ষ কথাটা বলছেন। ঠাকুর খুব সহজ করে বলছেন, কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দুধ চোখে দেখেছে, কেউ দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। তেমনি আত্মার কথা কেউ শুনেছে, কেউ প্রত্যক্ষ করেছে।

সাধুবাবারা আত্মা আত্মা করে কি একটা বলতে চান, সবাই শুনে যান, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেন না। হৃষিকেশে প্রচুর আশ্রম আছে যেখানে সাধুরা বেদান্ত নিয়ে দিনরাত আলোচনা করেন। বেদান্ত নিয়ে আলোচনা মানে তাতে রজ্জু সর্প ভ্রমের ব্যাপারটা থাকবেই। আশ্রমের সাধুরা রজ্জুসর্প ভ্রম বলে বলে সারাক্ষণ বিচার করতে থাকেন। আশ্রমের বাইরে দুটো ভিখারী বসে থাকত। একজন ভিখারী আরেকজন ভিখারীকে বলছে, 'সাধুরা সব সময় কি রজ্জু-সর্প করে'? অন্য ভিখারীটা বলছে, 'আরে এখানে রোজ একটা সাপ আসে, সাধুবাবারা মিলে সাপটাকে রোজ তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু সাপটাও এমন বদমাইস, পরের দিন আবার কোথা থেকে চলে আসে'। যখনই আত্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হয়, সেখানে রজ্জুসর্প ভ্রম এই উপমাটা অবশ্যই আনা হবে। রজ্জু সর্প, দড়ি আর সাপ। মহাত্মারা যখন ব্যাখ্যা করেন, তখন বলেন দড়িতে সাপের ভ্রম হয়ে গেছে। দূর থেকে ভিখারী শুনছে, সাধুরা সাপটাকে ভাগিয়ে দিচ্ছে, আবার কোথা থেকে সাপটা এসে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের বেশির ভাগ লোকেদের, বিদেশীদের কথা ছেড়েই দিন, বেদান্ত নিয়ে যে ধারণা, তা হল এই সাপ তাড়ানো বুদ্ধি। এখানে যাঁরা গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্রের কথা শুনছেন, তাঁরা অনেকটা এগিয়ে গেছেন। কারণ তাঁরা জ্ঞানের একটা জায়গায় চলে গেছেন। এই জ্ঞানে যদি কেউ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান, এবং

তার মত আচরণ করতে যদি শুরু করেন, তিনি তো বিজ্ঞানী হয়ে গেলেন। এরপর শুধু বাকি থেকে যাবে আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা। সেটা আমাদের হাতে নেই, তিনি কৃপা করলে ওটা হবে।

এই প্রত্যক্ষ হয়ে যাওয়ার পর তিনি আগের মতই জীবন যাপন করবেন। জীবন যাপনে কোন পরিবর্তন হয় না, এতদিন শুধু চিন্তা-ভাবনা করে তিনি যে জায়গাতে পৌঁছে ছিলেন, সেটা এবার প্রত্যক্ষ হয়ে গেল। *জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থঃ*, সর্বাবস্থায় একেবারে তৃপ্ত থাকেন, আর কূটস্থ, মন কখন বিচলিত হয় না। তার সাথে তিনি *বিজিতেন্দ্রিয়ঃ*, সব ইন্দ্রিয়কে জয় করে নিয়েছেন, কোন কিছু করলেও মন চঞ্চল হবে না। তৃপ্ত হয়ে যাওয়া মানে, তিনি বুঝে গেছেন এই জগতে আমার আর কিছু করার নেই, জগৎ থেকে কিছু পাওয়ারও নেই। আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল, আমার কিছু জানার নেই। যখনই কিছু জানার আগ্রহ থাকবে, এই দুটো ব্যাপারে আমাকে জানতে হবে, একটু ওটা জানতে হবে, একটু সেটা জানতে হবে, তার মানে এখনও সে তৃপ্ত নয়। কথামৃতে ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, জ্ঞানীর আর-একটি লক্ষণ আছে, সঙ্গে কোন গ্রন্থ থাকে না। তৃপ্ত হয়ে গেছেন কিনা, কিসের জন্য আর তাঁর গ্রন্থ লাগবে! স্বামীজী যখন আমেরিকায় ছিলেন, সেখানেও তাঁর সঙ্গে কোন বই থাকত না; তবে অনেক সময় টেক্সটের জন্য বই লাগত। সেটা অন্য জিনিস, পড়ানোর জন্য লাগতে পারে; নিজের জন্য না।

আর *সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ*, পাথর হোক, সোনা হোক, মাটি হোক, ঠাকুর যেমন বলতেন টাকা মাটি মাটি টাকা, সব বস্তুতেই সমবুদ্ধি। মাটি যে টাকা, আর টাকা যে মাটি এটা কিন্তু তা না, এই নিয়ে লোকেরা প্রায়ই ভুল মনে করে। ঠাকুর কখনই বলছেন না যে, টাকাও যা মাটিও তাই, ঠাকুর বলতে চাইছেন, লোষ্ট ও কাঞ্চনে ওনার সমদৃষ্টি। ঠাকুরের কাছে মাটির ঢেলার যতটুকু দাম, টাকার দাম ঠিক ততটুকু। আমার আপনার জন্য তফাৎ থাকবে। ইয়ং ছেলেরা কাজকর্ম করছে, তাদের মজা করে বলি, ঠাকুর মাটি টাকা টাকা মাটি করে দুটোকেই গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলেন, সেই টাকাগুলো কলকাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, ভগবানের ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া টাকা, যাবে আর কোথায়; তোমরা এবার এগুলো কুড়িয়ে বেড়াও। অর্থের প্রয়োজন থেকেই জীবন শুরু হয়, এতে কোন দোষ নেই। অর্থোপার্জন, সংসার চালানো কোন দোষের নয়। এখানে যোগীর কথা বলছেন, ঠাকুর, স্বামীজীর মত মহাত্মাদের স্তরের কথা বলছেন। এনারা আমাদের জীবনের আদর্শ, আমরা একদিনে ঐ জায়গায় পৌঁছাতে পারব না ঠিকই, তার মানে এই নয় যে লক্ষ্যকে ছেড়ে দেব। আদর্শকে ছেড়ে দেওয়া চলবে না, এটা মাথায় রাখতে হবে। তাই লোভ একটু একটু করে কমাতে হবে, চাহিদা একটু একটু করে কমিয়ে আনতে হবে। যদি একশটা শাড়ি থাকে, ওটাকে নব্বইতে নামান, পঞ্চাশ খানা শাড়ি যদি থাকে, ওটাকে চল্লিশে নামান। পঁচিশ, তিরিশ, পয়ত্রিশ বয়স পর্যন্ত শখ থাকে, এখন পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছেন, শখ সব মিটে গেছে, এখন ভদ্র সমাজে একটা চলার মত হলেই হল।

সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে।।৯।।

(সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যাস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সদাচারী ও পাপীতে যাঁর সমবুদ্ধি (ব্রহ্মবুদ্ধি) সুদৃঢ় হয়েছে, তিনিই যোগারূঢ় কথিত হন।)

যোগীরা যে ধ্যান করেন, এই শ্লোকে সেই যোগীদের ধ্যানের ফল বলছেন। আচার্য প্রত্যেকটা শব্দের খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করছেন, 'সুহৃৎ' শব্দের অর্থ বলছেন, *সুহৃদ্ ইতি প্রত্যুপকারম্ অনপেক্ষ উপকর্তা*। সুহৃদ কে? যে কারুর কাছে কোন প্রত্যুপকার চায় না, সুহৃদ যখন কারুর ভাল করে তখন এই প্রত্যাশা নিয়ে ভাল করে না যে, সেও প্রতিদানে আমার জন্য ভাল কিছু করবে। মায়েদেরও সন্তানের কাছে প্রত্যাশা থাকে, ছেলে বড় হয়ে আমাকে দেখবে। কিন্তু সাধুদের যে ভালবাসা, সেখানে কোন প্রত্যাশা থাকে না। অবতার পুরুষদের কোন প্রত্যাশা থাকে না, আর

সমাজে কিছু ভাল মানুষ থাকেন, তাঁদেরও কোন প্রত্যাশা থাকে না। আমাদের অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন, যাঁদের মধ্যে কোন প্রত্যাশা ছিল না। যেমন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, তাঁর মনে এই আশা ছিল না যে, ভারত স্বাধীন হলে আমি দেশের প্রধানমন্ত্রী হব। তাঁর একটাই প্রত্যাশা, আমার দেশ স্বাধীন হোক। দেশের জন্য নিজের জীবনটা দিয়ে দিলেন। ভারতবর্ষের ইনি সুহৃদ।

মিত্রকে আচার্য বলছেন, *মিত্র স্নেহবান্*, তৈলাক্ত বস্তুকে বলা হয় স্নেহ জাতীয় পদার্থ, অর্থাৎ যেখানে জিনিসটা খুব মসৃন্। স্নেহবান মানে যার সাথে আমার সম্পর্কটা মসৃন। আচার্য শঙ্করের কি ভাষা, একটা শব্দ দিয়ে পুরো জিনিসটাকে পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। মিত্র কে? যিনি স্নেহবান। যিনি স্নেহবান, তিনি আপনার মিত্র। *অরি* শব্দের অর্থ শত্রু। *মধ্যস্থ*, এই শব্দের সংজ্ঞাতে আচার্য বলছেন, *মধ্যস্থো যো বিরুদ্ধয়োঃ উভয়ো হিতৈষী*, মধ্যস্থ কাকে বলা হবে, যিনি মধ্যস্থতা করেছেন; উভয় পক্ষের হিতৈষী, কারুর পক্ষ নেন না। আমরা কি রকম? সংস্কৃতে সুন্দর একটা গল্প আছে। দুটো বিড়াল একটা রুটি পেয়েছে। ওদের মধ্যে রুটি নিয়ে ঝগড়া লেগেছে, রুটি সমান ভাগ করতে হবে। একটা বানরের কাছে গেছে মধ্যস্থতা করার জন্য। বানর বলল, 'দেখ আমি কারুর পক্ষ নেব না'। 'না, আপনি রুটি সমান ভাগ করে দিন'। বানর দাঁড়িপাল্লা নিল, রুটিকে টুকরো করল, পাল্লায় দেওয়া হল। দেখছে একটা দিকে একটু ভারী লাগছে। বানরকে বলা হল, 'এই দিকটা বেশি ভারী হয়ে গেছে'। বানর একটু ছিঁড়ে নিজে খেয়ে নিয়েছে। ইতিমধ্যে অন্য দিকটা ভারী হয়ে গেছে। তখন বলল, 'ঐ দিকটা ভারী হয়ে গেছে'। বানর ওই দিকটার রুটি একটু ছিঁড়ে খেয়ে নিয়েছে। এই করতে করতে পুরো রুটিটাই বানর খেয়ে ফেলেছে। কারণ বানরকে রুটি সমান ভাবে ভাগ করতে হবে। বেশির ভাগ মধ্যস্থাকারীরা এই রকমই হয়। এর নামই হল বানর বিভাজন, নিজের স্বার্থটা রাখবে। ইংরেজরা যখন ভারত ছাড়ল, ভারত পাকিস্থান বিভাজন করল ঠিকই, কিন্তু কমনওয়েলথ্ করে দুটো দেশকে ধরে রাখল, যাতে নিজের স্বার্থটা না চলে যায়।

দ্বেষ হল, যে আমাকে পছন্দ করে না। আচার্য বন্ধু ও সাধুর সংজ্ঞা নিরূপণ করছেন – *সম্বন্ধী ইতি এতেষু*, সম্বন্ধী যারা তাদের বন্ধু বলে। *সাধুষু শাস্ত্রানুবর্তিষু*, সাধু কে, শাস্ত্র মতে যাঁর জীবন চলে। ঠাকুর বলছেন, যার মন ঈশ্বরে পড়ে আছে। আচার্য বলছেন, শাস্ত্র মতে যিনি চলেন, তিনি সাধু। *পাপেষু, প্রতিসিদ্ধকারিষু*, পাপী কে, শাস্ত্রের বিরুদ্ধে যে চলে। যিনি যোগী, যিনি ধ্যান করেন, যোগীর সবার প্রতি সমবুদ্ধি। সমবুদ্ধিকে আচার্য পরিভাষিত করে বলছেন, *কঃ কিংকর্মা ইতি অব্যাপৃবুদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ*, কে কি করছে তাতে আমার কিছু আসে যায় না, এটাকে বলে সমবুদ্ধি। *কঃ কিংকর্ম*, কে কি করছে, *ইতি অব্যাপৃতবুদ্ধি*, নিজের বুদ্ধিকে তিনি ওখানে লাগাতে যান না।

রাজযোগের একটা সূত্রে পতঞ্জলি চারটি গুণের কথা বলছেন – মৈত্রী, করুণা, মুদিত ও উপেক্ষা। এই উপেক্ষা বাংলা উপেক্ষা না, এটা একটা টেকনিক্যাল শব্দ, উপেক্ষার অর্থ হয়, যেখানে অপূণ্য কিছু হচ্ছে, কিছু খারাপ কাজ হচ্ছে, সেখান থেকে সরে আসা। কে কি করছে তাতে আপনার কি আসে যায়, এই বুদ্ধি না থাকলে যোগী হওয়া যায় না। যেখানে অন্যায় কিছু হচ্ছে, সেখানে বলছি, 'আমার চোখের সামনে অন্যায় হবে আর আমি চুপচাপ মেনে নেব? এ হতে পারে না, আমাকে এর কিছু একটা করতে হবে'। ঠিকই বলছেন, তবে আপনি যোগী কোন দিন হতে পারবেন না। যোগী মানে, আপনি সব কিছু থেকে সরে এসেছেন, আপনার কাছে এখন একটাই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আর তা হল আত্মজ্ঞান।

আপনি আমাকে বলতে পারেন, 'আপনি তো মহা স্বার্থপর মশাই'। ঠিক, আমি স্বার্থপর, আপনিও তো স্বার্থপর। আপনার স্বার্থ শুধু কামিনী-কাঞ্চনে লেগে আছে, আমার স্বার্থ জ্ঞানে লেগে আছে, আপনার স্বার্থ তমোগুণে লেগে আছে, আমার স্বার্থ ত্রিগুণাতীতে লেগে আছে, এই তফাৎ। এগুলো কিছু না, ঝগড়ুটে যারা হয়, যারা অপরকে ছোট করে, অপরকে ছোট না করলে যাদের

খাওয়া হজম হয় না, তারাই এই সব কথা বলে। আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, কেউ ভাল কিছু করলে তার মধ্যে দোষ খুঁজে বেড়াই, আর খারাপ কিছু করলে তার এমন নিন্দা করবে যে, কুড়ি বছর পরেও সেই নিন্দার বাজনা বাজতে থাকবে।

কোন বংশে যদি এই ধরণের লোক আসে, সত্যিকারের আত্মজ্ঞানের দিকে, ঈশ্বরের পথে যাচ্ছে, সেই বংশ কত ধন্য হয়ে যায়। জয়রামবাটী পাঁচ থেক ছটা পরিবার নিয়ে একটা গ্রাম, সারা দেশে এই রকম হাজার হাজার গ্রাম আছে। শ্রীশ্রীমা ওখানে জন্ম নিয়েছিলেন, আজ তাই জয়রামবাটী পূণ্যভূমি হয়ে গেছে, সবাই আজ সেখানে তীর্থ করতে যাচ্ছে। ঠাকুর যখন মা মা করে কাঁদছেন, সমাজের লোকেরা তাঁকে পাগল আখ্যা দিল, হালদার পুরোহিত তাঁকে বদমাইশ বলছে, 'ঢংঢাং করে মথুরবাবুকে বশে করেছ', এই বলে ঠাকুরকে বুটের গোঁজা মারলেন। সবারই জীবনে এই ধরণের অনেক কিছু হয়, এসবের দিকে না তাকিয়ে আসল লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হয়।

এই ধরণের সমবুদ্ধি যাঁদের হয়ে গেছে, *বিশিষ্যতে*, এনারাই হলেন বিশেষ পুরুষ। এখানে আচার্য *পাঠান্তরম্* খুব সুন্দর বলছেন। *পাঠান্তরম্* মানে আচার্য নিজে বলছেন না, আচার্য বলছেন, অন্য কোন পুঁথিতে *বিশিষ্যতে* না বলে *বিমুচ্যতে* বলা হয়েছে। *বিমুচ্যতে* মানে তিনি মুক্ত হয়ে যান, আর *বিশিষ্যতে*, যে শব্দ গীতাতে আছে, এর অর্থ হয় এই ধরণের পুরুষরাই যোগারূঢ় পুরুষদের মধ্যে উত্তম। এইসব কারণে অনেকেই বলেন যে, গীতা আসলে আচার্য শঙ্করেরই রচিত। আমাদের এখানকার একজন অঙ্কের বিরাট পণ্ডিত একবার খুব তর্ক করছিলেন, তিনি বলতে চাইছিলেন, গীতা আচার্য শঙ্করের লেখা। গীতা আচার্য শঙ্করের লেখা কি করে হবে, তিনি নিজে বলছেন *পাঠ্যান্তরম্*, তিনি কেন গীতা লিখতে যাবেন। এগুলো হল খ্রীশ্চানদের থিয়োরী, ওদের মাথাব্যাথার কারণ হল, গীতা যদি এত দিন আগেকার লেখা হয়, তাহলে আমাদের বাইবেল কে শুনবে! খ্রীশ্চানরা যে করেই হোক দেখাতে চাইবে গীতা অনেক পরে লেখা হয়েছে। এখন আবার একটা নূতন থিয়োরী দিয়ে বলা হচ্ছে, গীতা বুদ্ধের পরে লেখা হয়েছে, কারণ গীতা 'নির্বাণ' শব্দ নিয়ে এসেছে। এর উল্টোটাও যে হতে পারে, বুদ্ধ গীতা থেকে 'নির্বাণ' কপি করেছেন; এটাকে নিয়ে কেউ ভাবছে না। এমন এমন সব এক-একটা কথা বলে, অবাক হয়ে যেতে হয়। শাস্ত্র পড়োনি, চিন্তন করোনি, শাস্ত্রের ইতিহাস পড়োনি, যে ইতিহাসের বইগুলো পড়েছ সেগুলো আবার সব হয় কম্যুনিস্টদের লেখা, না হলে খ্রীশ্চানদের লেখা। আগাগোড়া এরা হিন্দুদের শত্রু। এদের বই পড়ে তুমি বড় হয়েছ, চোখের সামনে যে সত্যটা রয়েছে সেটাকে শুনতে চাইছ না, বুঝতে চাইছ না।

বলছেন, যদি তুমি এই ধরণের ফল পেতে চাও, কি ধরণের ফল? সাত, আট, নয় নম্বর শ্লোকে যা যা বলা হয়েছে, আত্মজ্ঞান না হলে এই অবস্থায় পৌঁছান যায় না। আত্মজ্ঞান অবস্থায় পৌঁছানর জন্য তোমাকে যোগ সাধনা করতে হবে, যোগ সাধনা করতে হলে ধ্যান করতে হবে। আমরা প্রথমের দিকে ধ্যানের ফল নিয়ে আলোচনা করেছি, এখানে সেই ফলের কথা বলে দেওয়া হল। এরপর কয়েকটা শ্লোকে ধ্যানের বিধির উপর বলবেন।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ।।১০।।

(নির্জন স্থানে যোগী একাকী (নিঃসঙ্গ), নিরাকাঙ্ক্ষ ও পরিগ্রহশূন্য হয়ে দেহ ও মন সংযমপূর্বক অন্তঃকরণ সর্বদা সমাহিত করবেন।)

যোগের জন্য, যোগী হওয়ার জন্য, ধ্যানের জন্য কয়েকটা জিনিসের অনুশীলন করতে হবে। যে যোগী হতে চাইছে, যে ধ্যান করতে চাইছে, সে কাউকে সঙ্গে নেবে না, একেবারে একাকী চলতে হবে তাকে। আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *একান্তে গিরিগুহাদি স্থিত*, বলছেন যাঁরা সব কিছু ছেড়ে

বেরিয়ে গিয়ে গিরিগুহাদিতে অবস্থান করছেন। কিন্তু আমাদের তো গিরিগুহায় একাকী থাকা সম্ভব না, আমাকে আশ্রমে থাকতে হবে, আপনাদের গৃহস্থাশ্রমে থাকতে হবে; কিন্তু ওখানেই আমাদের যা করার করতে হবে। তবে একা হয়ে গেলে জিনিসটা অনেক সহজ হয়। একা থাকলে পাঁচজনের সাথে থাকার জন্য যে সব সময় খ্যাটর ম্যাটর লাগে, সেটা আর হবে না, কাঁধে পাঁচ রকম জিনিসের দায়ীত্ব থাকবে না। ঠাকুর সেইজন্য সবাইকে সব সময় নির্জন বাসের কথা বলতেন। গীতাতেও ভগবান তাই বলছেন –*রহসি স্থিতঃ,* নির্জনে থাকতে হবে।

যোগী যুঞ্জীত সততম্, একটি মুহুর্তও নিজেকে ফাঁকা রাখা যাবে না। সকাল বিকাল কোন রকমে নমো নমো করে একশ আটবার জপ করে উঠে গেলাম, কেন না গুরু বলে দিয়েছেন সকাল সন্ধ্যা একশ আট বার জপ করতে। গীতা বলছে, সমস্ত শাস্ত্রও বলছে, সারাদিন ওতেই ডুবে থাকতে হবে, *সততম্*। *রহসি স্থিতঃ,* একেবারে ভিতরে টেনে নিয়ে গিয়ে ডুবে থাকতে হবে। একান্তে গিয়ে অন্তঃকরণে স্থিত হয়ে থাকতে হবে, বাইরের কোন দিকে মন যাবে না। এই যে দুটো অবস্থার কথা বললেন, *একাকী যতচিত্তাত্মা,* এগুলো বলা হয় যাঁরা সন্ন্যাসী, সমস্ত কিছু যিনি ত্যাগ করে দিয়েছেন, এনাদের জন্য জিনিসটা সহজ হয়ে যায়। *যতচিত্তাত্মা,* বলছেন, যাঁদের চিত্ত বা মন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে। ইন্দ্রিয় আর শরীর, এখানে আত্মা বলতে শরীরকে বলছেন। আত্মা মানে যেটাকে আমি আপন মনে করি, সাধারণ মানুষ নিজের দেহকেই আপন মনে করে, যারা এর থেকে একটু উপরে উঠে গেছেন তাঁরা মনকে আপন মনে করেন, আবার যারা শাস্ত্রের অর্থকে নিয়ে চিন্তন করেন, তাঁরা ভিতরে যে দেহী আছেন, অর্থাৎ যিনি জীবাত্মা, তাঁকে আপন মনে করেন; আর বেদান্তে সর্বব্যাপী অসীম, অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকেই আত্মা মনে করা হয়। এখানে বলছেন *যতচিত্তাত্মা,* চিত্ত ও আত্মা, অর্থাৎ মন আর শরীরকে বলছেন, যিনি যোগী তিনি এই দুটোকে নিয়ন্ত্রণে এনেছেন।

আর *নিরাশিরপরিগ্রহঃ,* কোন কিছুর প্রত্যাশা করবেন না। সেইজন্য সন্ন্যাসী ছাড়া যে কোন মানুষে পক্ষে ধ্যান বা যোগ সাধনা কঠিন হয়; কিন্তু অসম্ভব না, জীবন থেকে কোন কিছু আশা করাটা ছাড়তে হয়। যতটুকু দরকার ততটুকু রাখলাম, যতটা পারা যায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, এই আর কি। *অপরিগ্রহঃ,* কারুর কাছ থেকে কোন রকম উপহার নেওয়া যাবে না। কারণ উপহার নিলেই উপহার দিতে হবে। উপহার যদি না দেন, সেটা খারাপ দেখাবে, আমার পূণ্য খসে যাবে। আরও বাজে, উপহার নেওয়ার পর যদি প্রতি-উপহার না দেওয়া হয়, সমাজের সাথে আমার সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে। সমাজের সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেলে, সমাজে আমি টিকতেই পারব না। সেইজন্য কারুর কাছ থেকে কিছু নিতে নেই। সমাজে থেকে অপরিগ্রহের অভ্যাস করা যায় না, খুব কঠিন, কিন্তু যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা যেতে পারে।

সেইজন্য যাঁরা যোগের পথ বেছে নেন, প্রথমের দিকে তাঁদের অনেক বিরুদ্ধ অবস্থার, নানা রকম বিঘ্নাদির সম্মুখীন হতে হয়। ধীরে ধীরে লোকেরা বুঝে যায়, মানুষটা তপস্যা করতে চাইছে, একে ছেড়ে দাও, বিরক্ত করো না। তখন আর আপনাকে কেউ বিরক্ত করবে না, প্রথমের দিকে অনেক সমস্যা হবে, হতে বাধ্য। সন্ন্যাসী হয়ে যাঁরা চলে আসেন, তাঁদেরও প্রথমের দিকে অনেক সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়, সমস্যা পরিবারের দিক থেকে হয়, সমাজের দিক থেকে হয়। এ ছাড়া মন একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া করে, কারণ মনের অভ্যাস সমাজের ও সংসারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ পাওয়া। সমস্ত রকম সুখ, শখ-আহ্লাদ ছেড়ে আশ্রমের কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের মধ্যে নিজেকে সঁপে দেওয়ার ফলে শরীর খারাপ হওয়া, শরীরে এখানে ওখানে ব্যাথা, প্রথম অবস্থায় প্রচুর হয়।

ব্রহ্মচারী ট্রেনিং সেন্টারে থাকার সময় আমাদের অনেকেরই জ্বর, পেট খারাপ ইত্যাদি লেগে থাকত। যে ডাক্তার মহারাজ আমাদের দেখাশোনা করতেন, তিনি তাঁর সময়কার একজন এমডি ছিলেন। শরীর খারাপ নিয়ে তাঁর কাছে গেলে উনি হেসে আমাদের বলতেন, 'দু-বছর ট্রেনিং নিয়ে

ট্রেনিং সেন্টার থেকে চলে যাওয়ার পর সব রোগ নিজে থেকেই ভাল হয়ে যাবে'। কারণ ট্রেনিং সেন্টারে আরও শৃঙ্খলা, আরও কঠোর জীবন। যার ফলে মন তখন প্রতিক্রিয়া দিতে থাকে। ব্রক্ষ্মচারীরা এতদিন কেউ কলেজে ছিলেন, কেউ অধ্যাপনা করতেন, কেউ অন্য কোন পেশায় যুক্ত ছিলেন, একটা মুক্ত জীবন ছিল। সেখান থেকে হঠাৎ এক কঠিন জীবন, সব কিছু এখন কঠোর অনুশাসন ও নিয়মের মধ্যে বাঁধা। কখন পিঠে ব্যাথা, কখন কোমড়ে ব্যাথা এগুলো হতে থাকে, আর সত্যি সত্যিই দু-এক বছরের মধ্যে সব আপনা থেকেই ঠিকও হয়ে যায়। এই বিরুদ্ধতা, বিঘ্নগুলিকে একবার সামলে নেওয়ার পর সব স্বাভাবিক হয়ে যায়। তার সাথে বলছেন, কোন কিছু সঞ্চয় করবে না। কারুর কাছে কোন কিছু চাইবে না, আর কেউ কোন কিছু দিতে এলে নেবে না।

পরের শ্লোকে বলছেন, ধ্যান করার সময় আমরা কিভাবে বসব। ধ্যানে বসার ব্যাপারে গীতার এটা একেবারে অনেক পুরনো কথা, আর তখনকার দিনে গৃহস্থাশ্রমে থেকে ধ্যান আদির প্রচলন ছিল না। এই রচনা ব্যাসদেবের, কিছু না হোক চার থেকে পাঁচ হাজার বছরের পুরনো গ্রন্থ –

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্।।**১১**।।

(স্বভাবতঃ বা সংস্কারবশতঃ শুদ্ধ (ও বিবিক্ত) স্থানে যোগী প্রথমে কুশ, তদুপরি যথাক্রমে মৃগচর্ম ও বস্ত্র দ্বারা রচিত না অতি উচ্চ বা না অতি নিম্ন স্থানে নিজের স্থির আসন স্থাপন করবেন।)

একটা পবিত্র স্থান নির্বাচন করতে হবে। কি রকম পবিত্র? আচার্য বলছেন, *স্বভাবতঃ সংস্কারতো*, স্বভাবে যেটা শুদ্ধ পবিত্র স্থান, যেমন গঙ্গার তীরে একটা নির্জন স্থান বেছে নিলেন। এটা ঠিক যে, বর্তমান গঙ্গার তীরকে সবাই অপবিত্র করে রেখেছে, আর কলকাতায় গঙ্গার পার সব ইয়ং ছেলেমেয়েদের দখলে চলে গেছে, সবাই গঙ্গার পারে হাত ধরে ঘুরে বেড়ায়, সত্যিই তো ওখানে মানুষ কি ধ্যান করবে! আগেকার দিনে এসব ছিল না, কোন নদীর তীরে সাধু সন্ন্যাসীরা একটা গাছের তলায় বসে ধ্যান করতে বসে যেতেন। তার সাথে বলছেন, জায়গাটা স্বভাবে পবিত্র হতে হবে। যেমন নিজের বাড়ীতে যদি আলাদা কোন ঠাকুর ঘর থাকে, সেখানে ধ্যান করা যেতে পারে। বেলুড় মঠের মন্দির অত্যন্ত পবিত্র স্থান, কোন তীর্থে গেলেন সেখানকার মন্দিরে বসে ধ্যান করা যেতে পারে। *স্থিরমাসনমাত্মনঃ*, আসন এমন হবে যাতে স্থির ভাবে অনেকক্ষণ বসে থাকা যায়।

নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং, আসন এমন জায়গায় স্থাপন করতে হবে যে জায়গাটা খুব উঁচুও হবে না, আবার খুব নিচুও হবে না। টেবিলের উপর যদি বসে ধ্যান করতে হয়, হঠাৎ মনে হবে যেন পড়ে গেলাম। আবার একান্ত ভাবে থাকতে বলছেন, তাই আবার বেশি নিচু জায়গা হলে জলটল এসে কোন বিপদ ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকতে পারে, সাপ বিছে ঢুকে যেতে পারে। এমন জায়গায় আসন পাততে হবে, যেখানে কোন বিঘ্ন না হয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন, সত্ত্বগুণী মশারীর ভিতর ধ্যান করে। আমি এমন জায়গায় ধ্যান করছি সেখানে অনবরত মশা কামড়ে যাচ্ছে, মশার কামড়ে কিসের ধ্যান করবে! বক্তব্য হল, পবিত্র জায়গা হবে আর আসনের জন্য মনে যেন কোন অস্থির ভাব না আসে। সেইজন্য বলছেন, *শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনাত্মনঃ*। পবিত্র স্থান, আর এমন ভূমি হবে যেটা বেশি উঁচুও না, খুব নিচুও না, সমভূমি।

চৈলাজিনকুশোত্তরম্, আগেকার দিনে প্রথমে কুশ ঘাসের আসন বিছিয়ে নিতেন, তার উপর মৃগচর্ম বা ব্যাঘ্রচর্মের আসন রাখতেন আর তার উপর একটা পাতলা বস্ত্র দিতেন। এটাই ছিল তখনকার দিনের বিধি। এখন ভাল ভাল আসন এসে গেছে। বেশির ভাগ আসনই এখন পশমের তৈরী। আগেকার দিনের মত অত কিছু প্রয়োজন এখন আর নেই, এগুলো ছিল তখনকার বিধি, এখন একটা ভাল আসন হলেই হল, যার উপর আরাম করে বসা যায়। আগেকার দিনে সাধুবাবারা

পাথরে উপর বা মাটিতে বসতেন, সেইজন্য তখন এগুলোর দরকার ছিল। কুশ ঘাস সহজে নোংরা হবে না, চর্মও সহজে নোংরা হবে না, এটাই ছিল কারণ, অন্য কোন বৈশিষ্ট্য নেই। সবার উপরে একটা বস্ত্র দেওয়ার কারণ হল, কুশ ঘাসের উপর সরাসরি বসলে পায়ে খোঁচা খোঁচা লাগবে, আর মৃগচর্মাদিতে সরাসরি বসলে চর্মের লোমে কুট কুট করতে পারে, তাই উপরে একটা নরম বস্ত্র দিয়ে দেওয়া হত, বস্ত্র হল আমাদের স্বাভাবিক পরিধান, তাই স্বভাবেই ওর উপর বসা যায়। এবার আপনার আসন স্থির হয়ে গেল।

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে।।১২।।

(যোগী সেই আসনে বসে বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়ের কার্য সংযমপূর্বক চিত্তশুদ্ধির জিন্য একাগ্র মনে যোগাভ্যাস করবেন।)

স্থান নির্বাচন হয়ে গেছে, আসন তৈরী, এবার ওখানে বসে *তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা*, মনকে একাগ্র করতে হবে। *যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ*, এবার মনের যত ক্রিয়া, ইন্দ্রিয়গুলির যে ক্রিয়া, সব ক্রিয়াকে আটকে দিতে হবে। *উপবিশ্যাসনে*, এই যে আমি আসনে বসলাম, এবার আত্মশুদ্ধির জন্য আমার সমস্ত চেষ্টাকে ঢেলে দিতে হবে, *যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে*। আত্মশুদ্ধি কি? যোগ এটাকেই বলছেন, চিত্তবৃত্তি নিরোধ, চিত্তবৃত্তির নিরোধ মানেই হয় আত্মশুদ্ধি। আত্মশুদ্ধি, একাগ্র মন, চিত্তবৃত্তি নিরোধ, সব একই শব্দ। আচার্য বলছেন, *তত্র তস্মিন্ আসনে উপবিশ্য যোগং যুঞ্জ্যাৎ* ওখানে আসনে স্থির ভাবে বসে যোগের চেষ্টা করবে। উদ্দেশ্য নিজেকে শুদ্ধ পবিত্র করা। এই যে বহির্মুখী মন, এটাই অশুদ্ধ মন; অন্তর্মুখী মন, এটাই শুদ্ধ মন। মনে অনেক ধরণের চিন্তা-ভাবনা, এটাই অশুদ্ধ মন; চিন্তা-ভাবনা যত কমে আসে ততই মন তখন শুদ্ধ হতে থাকে। আসনে কিভাবে বসতে হবে?

সমং কায়শিরোগ্রীবাং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রাং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্।।১৩।।

(মেরুদণ্ড, গ্রীবা ও মস্তক সরল ও নিশ্চলভাবে ধারণপূর্বক স্থির হয়ে এবং কোন দিকে না তাকিয়ে নিজের নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন।)

বর্ণনা করছেন আসনে কিভাবে বসতে হবে; *কায়-শিরঃ-গ্রীবাং*, অর্থাৎ শরীর, মস্তক ও গ্রীবা যেন সমান অর্থাৎ এক সরল রেখায় থাকে। *ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ*, নিশ্চলভাব ধারণ করে স্থির ভাবে বসতে হবে। পতঞ্জলিও যোগশাস্ত্রে এটাই বলছেন – *স্থিরসুখামাসনম্*, যেভাবে যেখানে বসলে মন স্থির হয়ে, সুখে বসা যায় এবং অনেকক্ষণ বসা যায়, এটাই আসন। এটাকেই ব্যাখ্যা করে বলছেন, শরীর, গ্রীবা, মাথা যেন সোজা থাকে। *সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং*, নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখা, এটা কোন বাধ্যতামূলক কিছু না, যে কোন জায়গায় ধ্যান করা যায়, গীতা এভাবে বলছেন। *দিশশ্চানবলোকয়ন্*, অন্য কোন দিকে যেন দৃষ্টি না যায়। আচার্য এখানে বলছেন, এই জায়গাতে '*ইব*' শব্দটা লুপ্ত আছে, *ইব* মানে যেন। কবিতাতে ছন্দ মেলানোর জন্য কিছু শব্দ যোগ করতে হয়, কিছু শব্দ সরাতে হয়। সেইজন্যই শব্দের সঠিক অর্থ ও ভাব বোঝবার জন্য ভাষ্যকারদের দরকার হয়। বলছেন, আমি যেন নাসিকাগ্রে আমার দৃষ্টিকে একাগ্র করছি। কেন? আচার্য বলছেন, নাসিকাগ্রে দৃষ্টি দিলে মন আত্মাতে স্থিত না হয়ে নাসিকাগ্রেই স্থিত হবে। ঠাকুরের ছবির উপর যদি কেউ ধ্যান করতে থাকে, তাহলে ঠাকুরের ছবিতেই তার মন স্থিত হবে, ঠাকুরের যে বাস্তবিক স্বরূপ, সেই স্বরূপে স্থিত হবে না। আচার্য বলছেন, *স্বনাসিকাগ্রসংপ্রেক্ষণম্ এব চেদ্ বিবক্ষিতং মনঃ তত্র এব সমাধীয়তে ন আত্মনি*, ধ্যানের উদ্দেশ্য হল আত্মাতে স্থিত হওয়া, আত্মাতে স্থিত না হলে আত্মার ধ্যান হবে না।

আচার্য সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, পরে যে বলা হবে *আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা*, গীতায় বারংবার এই জিনিসটাকে বলছেন, আত্মাতে মনকে স্থির কর। আমরাও অনেক সাধুবাবাকে দেখি চোখ খুলে নাসিকাগ্রে তাকিয়ে আছেন। নাসিকার অগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করাটা উদ্দেশ্য নয়। এখানে বলতে চাইছেন, দৃষ্টি যেভাবে একাগ্র হয়, ঠিক সেইভাবে মনকে ধ্যানের সেই বিষয়ের উপর একাগ্র করতে হয়, যেটার উপর ধ্যান করা হচ্ছে। কিসের উপর? আমার যিনি ইষ্ট, তাঁর জীবন্ত বিগ্রহের উপর। আমার ভিতর আমার ইষ্টদেবতা জীবন্ত বিগ্রহ হয়ে বসে আছেন। আগে যেমন বলা হল –প্রথমে হয় কল্পনা, সেখান থেকে হয় চিন্তন, চিন্তন থেকে হয় আসল দর্শন। একদিনে হবে না, বছর পর বছর করে যাচ্ছেন, সারা জীবনে হয়ত হল না, এত দিন যদি করা থাকে শেষ সময়ে দর্শন হবে। এইভাবে ধ্যান করে যেতে হবে।

তাহলে এই শ্লোকের সারাংশ কি দাঁড়ালো? প্রথম কথা মেরুদণ্ড সোজা রেখে বসতে হবে। মেরুদণ্ড সোজা না থাকলে কখন উচ্চ চিন্তন হয় না। যাদের কোমরে ব্যাথা আছে তাদেরকেও সোজা হয়ে বসতে হবে, দরকার হলে কোমরে বেল্ট বেঁধেও বসা যেতে পারে। *সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্*, কোন দিকে দৃষ্টি থাকবে না, একমাত্র নাসিকার অগ্রে দৃষ্টি থাকবে। আচার্য শঙ্কর বলছেন, এখানে নাকের অগ্রভাগেই দৃষ্টি রাখার কথা বলা হচ্ছে না; বলা হচ্ছে বাইরের জগৎ থেকে মনটাকে টেনে অন্তর্মুখী করতে। নাকের ডগায় ধ্যান করলে মন ঐ নাকের ডগাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে ওখানেই আটকে থাকবে, কিন্তু যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে আত্মাতে একাগ্র করা। সেইজন্য শাস্ত্র কখনই বলতে পারেনা যে নাকের ডগাতে ধ্যান করতে হবে। অথচ ইদানিং দেখা যায় যোগ শিক্ষকদের অনেকেই যোগের ছাত্রদের নাকের অগ্রভাগে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করতে বলে। শুধু তাই নয়, এরা আবার বিধান দেয়, এখানে তাকিয়ে ধ্যান করলে এই হবে, অমুক জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ধ্যান করলে তমুক হবে। এই ধরণের পদ্ধতি পুরোপুরি শাস্ত্র বিরোধী। শাস্ত্র না পড়ে কিছু এদিক ওদিক শুনে নিয়ে যোগ শিক্ষক হয়ে বোকাদের ধ্যান শেখাচ্ছে। বক্তব্য হচ্ছে বাইরের জগৎ থেকে মনটাকে গুটিয়ে ভেতরের দিকে অন্তর্মুখী করা। তাহলে কি করতে হবে? পরের শ্লোক থেকে আমরা ধীরে ধীরে ধ্যানের আরও গভীরে ঢুকছি –

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ।।১৪।।

(প্রশান্তচিত্ত, ভয়রহিত, ব্রহ্মচর্য পালন ও গুরুসেবাদি ব্রতে স্থিত, মদ্‌গতচিত্ত ও মৎপরায়ণ যোগী মন একাগ্র করে নিত্য ধ্যানাভ্যাস করবেন।)

যাঁরা সত্যিকারের মন থেকে ধ্যান করতে ইচ্ছুক, তাঁদের জন্য চৌদ্দ নম্বর শ্লোক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *প্রশান্তাত্মা*, মন আপনাকে শান্ত রাখতে হবে। দিনে চব্বিশ ঘন্টা, মাসে তিরিশ দিন মনকে শান্ত রাখতে হবে। যে কোন কারণে কারুর চিত্ত যদি চঞ্চল হয়; তা সে ক্রোধের জন্য হোক, কামের জন্য হোক, লোভের জন্য হোক, কোন কিছু দরকারের জন্য হোক; দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার জন্য হোক; ধ্যান তার জন্য নয়। 'জঙ্গলজেন শেরু' বইতে দেখানো হয়েছে, একটা কাঠবিড়ালীর মুস্তক নামে একটা হাতির সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে। মুস্তককে দেখে কাঠবিড়ালী সব সময় মনে মনে ভাবে, এত বড় শরীর যদি আমার হত, কি দারুণই না হত। বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে, 'দাদা, আপনার এত বড় শরীর কি করে হল'? হাতি বলছে, 'খেয়ে'। কাঠবিড়ালীটা একদিন যতটা খেতে পারে তার তিন গুণ খেয়ে নিয়েছে। তারপর পেট খারাপ হয়ে উল্টে পড়ে থাকল। সবাই হাতি হতে পারে না। এই সৃষ্টিতে কাঠবিড়ালীর যেমন নিজস্ব একটা স্থান আছে, হাতিরও একটা নিজস্ব স্থান আছে। এখানে একটা উচ্চতত্ত্বকে নিয়ে বলছেন। ক্লাশ ফোরে ভর্তি হয়েই বলছে, আমাকে থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি বুঝিয়ে

দিন। এভাবে কখন হয় না। প্রথমে মন দিয়ে শুনতে হবে, শুনতে শুনতে মনের আবর্জনা পরিষ্কার হবে, বুদ্ধি বিকশিত হবে, এরপর ধীরে ধীরে বোঝার ক্ষমতা হবে।

বিগতভীঃ, নির্ভিক, মনে কোন ধরণের ভয়-ভীতি থাকবে না। জীবনে যদি কারুর কোন কিছু থেকে একটু ভয় থাকে, তার দ্বারা ধ্যান হবে না। মেয়ের বিয়ে দিতে যাচ্ছেন, সব সময় আশঙ্কা, বর কেমন হবে কে জানে; আপনার দ্বারা ধ্যান হবে না। চিত্তে কোন চাঞ্চল্য যদি থাকে, মনে কোন ভয় যদি থাকে, তার দ্বারা ধ্যান কখনই হবে না। ধ্যান হবে না ঠিক আছে, তার জন্য চিন্তা করার কিছু নেই, আপনি খুব করে জপ করুন। তাও যদি না করতে পারেন, সকাল সন্ধ্যা দুবেলা হাততালি দিয়ে জোরে জোরে হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে করুন। এতে আস্তে আস্তে ভয় কেটে যাবে। ঠাকুর বলছেন, হাততালি দিলে পাখি উড়ে যায়, ঠিক তেমনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করলে মনের পাপ পাখি উড়ে যায়। আপনাকে ধ্যানই করতে হবে, কেউ বলছে না। আগেকার দিনে বলত, সাইন্স নিয়ে সবাই পড়তে পারে না, কেউ আর্টসে যায়, কেউ আর্টস পারে না, কমার্সে যায়, কেউ কমার্স পারে না, কোন হাতের কাজ শেখে। সবাই সব কিছু পারে না। উদ্দেশ্য যদি আত্মজ্ঞান হয়, সবাইকে ধ্যান করতে হবে না। আমরা আগের দিকে যেমন বললাম, কর্ম করলে স্থূল বিঘ্নগুলি সরে যায়, তেমনি ধ্যান করলে সূক্ষ্ম বিঘ্নগুলি সরে যায়। কিন্তু মন দিয়ে যদি ভক্তি করা হয়, হরিনাম যদি করা হয় তাতেও সেই একই ফল দেবে।

গীতা একটার পর একটা পথ বলে যাচ্ছেন, এখন ধ্যানযোগ নিয়ে বলছেন বলে ধ্যানকে এত উপরে নিয়ে যাচ্ছেন, আবার দ্বাদশ অধ্যায়ে গিয়ে ভক্তিযোগ নিয়ে আসবেন; সেখানে ভক্তিকে উপরে তুলে ধরবেন। গীতা আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ; আমাদের পিতামহ, প্রপিতমহরা এই গীতার ধর্মকে আশ্রয় করে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। সেই গীতা কি বলছেন একটু জেনে রাখুন, এর বেশি আর কিছু না।

ব্রহ্মচারীব্রতে স্থিতঃ, ব্রহ্মচারীকে এখানে ব্যাখ্যা করে বলছেন যে, ব্রহ্মচর্য পালন করছেন বলে ব্রহ্মচারী বলছেন না; দীক্ষা হয়ে গেছে, গুরুসেবা করছেন, গুরুর প্রতি ভক্তিভাব নিয়ে একটা পবিত্র জীবন অতিবাহিত করছেন; *স্থিতঃ*, অর্থাৎ গুরুর প্রতি ভক্তি, নিষ্ঠাতে স্থিত। *মনঃ সংযম্য*, মনকে সব সময় সংযমে রাখছেন।

মচ্চিত্তঃ, আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *ময়ি পরমেশ্বরে চিত্তং যস্য সঃ অয়ং মচ্চিত্তো যুক্তঃ*, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমি পরমেশ্বর, স্বয়ং ভগবান, আমাতে যার মন সব সময় ডুবে আছে, সে হল মচ্চিত্ত। মচ্চিত্ত যদি না হয়ে থাকেন, ধ্যান আপনার হবে না। হয় আত্মচিত্ত, আত্মাতে চিত্তকে সব সময় লাগিয়ে রাখা, উপনিষদের ঋষিরা তাই করতেন, আর তা নাহলে *মচ্চিত্তঃ* পরমেশ্বরে মনকে ডুবিয়ে রাখা। *মচ্চিত্তঃ*, পরমেশ্বর মন যদি ডুবে না থাকে ধ্যান হবে না। শিব, কালী, দূর্গা, কৃষ্ণ, রাম যিনিই হন, যাঁকে খুশী ধ্যান করা যেতে পারে, যাঁতে খুশী মনকে ডুবিয়ে রেখে মচ্চিত্ত হয়ে যেতে পারে। আমরা আগে যেমন বললাম, যিনি ইষ্টমন্ত্র নেননি, তিনি সূর্যোদয় হচ্ছে এর উপরেও ধ্যান করতে পারেন, এতে অবশ্য যোগ হবে না, কিন্তু মন শান্ত হবে।

যোগী হতে গেলে গুরু পরম্পরা থেকে কোন ইষ্টমন্ত্র ও ইষ্টের একটা রূপকে জেনে নিতে হয়। দীক্ষার সময় গুরু বলে দেবেন কিভাবে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে হবে এবং জপের সাথে সাথে কিভাবে ধ্যান করতে হয়। ওই ভাবে করতে করতে জপ আর ধ্যান মিলেমিশে এক হয়ে যায়। যিনি শিবের মন্ত্র পেয়েছেন, তিনি *ওঁ নমঃ শিবায়* জপ করে যাচ্ছেন। জপ করতে করতে খুব গভীরে যখন চলে গেলেন, শিবের ধ্যানও করছেন, ধীরে ধীরে *ওঁ নমঃ শিবায়* এই মন্ত্রটা আপনার অন্তঃকরণে ছেয়ে যাবে, তখন চেষ্টা করে আর জপ করতে হবে না, নিজে থেকেই ভিতরে মন্ত্রের জপ হতে

থাকবে। এটাই অজপা জপ, নিজে থেকেই জপ হতে থাকে, চব্বিশ ঘন্টা হতে থাকে, আর-এদিকে আপনি আপনার সেই যে ইষ্টমূর্তি তাতে ডুবে আছেন। তখন জপের মালাও নড়ে না, হাতও নড়ে না, জিহ্বাও নড়ে না, অনর্গল জপ চলতে থাকে। জপ আর ধ্যান দুটো এক হয়ে যায়।

তার সাথে বলছেন, *যুক্ত আসীত মৎপরঃ*, এই দুটো শব্দ *মচ্চিত্ত* আর *মৎপরঃ*, এই দুটো শব্দ ধ্যানের জন্য খুবই আবশ্যক। *মৎপরঃ* শব্দের আচার্য খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করছেন, *কশ্চিদ্ রাগী স্ত্রীচিত্তো ন তু স্ত্রিয়ম্ এব পরত্বেন গৃহ্ণাতি, কিং তর্হি রাজানং মহাদেবং বা অয়ং তু মচ্চিত্তো মৎপরঃ চ*, একজন যে কামী পুরুষ, তার মন ডুবে আছে স্ত্রীর মধ্যে, যুবকের মন এক যুবতীর শরীরের মধ্যে ডুবে থাকে, চিত্ত তার সব সময় ঘুরছে তার কামের বস্তুতে, সেই নারী বা মেয়েতে, যাকে পেতে চাইছে; আচার্য বলছেন, কিন্তু সেই লোকটাও জানে, যিনি রাজা তিনি এই যুবতী মেয়ে থেকে শ্রেষ্ঠ, কিংবা মহাদেব, ঈশ্বর এই মেয়েটির থেকে শ্রেষ্ঠ। এই ভাবটা সব সময় মাথার মধ্যে রাখতে হয় – ঈশ্বর সর্বোপরি, তিনি সবার উপরে। গানে, সিনেমাতে, কাহিনীতে আপনি মাকে ঈশ্বর বানাতে পারেন, বাবাকে ঈশ্বর বানাতে পারেন, আপনার প্রেয়সীকেও ঈশ্বর বানাতে পারেন, কিন্তু লোকজীবনে ঈশ্বর বই অন্য কেউ শ্রেষ্ঠ হয় না। আমি মনে করতে পারি ঠাকুর শ্রেষ্ঠতম, কিন্তু মন কামিনী-কাঞ্চনে পড়ে আছে, সেটাও চলবে না, ম*ৎপরঃ* যিনি, অর্থাৎ যাঁকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ জানছি; *মচ্চিত্ত*, অর্থাৎ মন তাঁতেই ডুবে থাকবে, অন্য কোন কিছুতে মন যাবে না।

স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের অন্য একটা ঘটনা আমরা শুনেছিলাম। তখন উনি মঠাধ্যক্ষ। সালটা আমার মনে নেই, বেলুড় মঠের পুরনো মন্দিরে স্বামীজীর উপরে একটা ডকুমেন্টারি সিনেমা দেখানো হবে। স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আগেকার দিনের প্রজেক্টর, সিনেমা চলছে। ওখানে বসেই মাঝে মাঝে সেবককে জিজ্ঞেস করছেন, 'হ্যাঁগো, স্বামীজী কি এসেছেন'? জানতে চাইছেন সিনেমা চলছে কিনা। এই কথা বলতে বলতেই তিনি ধ্যানে ডুবে গেছেন। সিনেম চলছে, বিবেকানন্দের ছোটবেলা, নরেন, বিলের কাহিনী চলছে, আর উনি থেকে থেকে জিজ্ঞেস করছেন, 'স্বামীজী কি এসেছেন'। ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ চলে গেছে, সিনেমা বন্ধ। প্রোগ্রাম বন্ধ করে দিতে হল। উনি কিন্তু খালি জিজ্ঞেস করছেন, 'হ্যাঁগো, স্বামীজী এলেন'? সেবকও বলছেন, 'মহারাজ আমরা এখন ঘরে যাবো, চলুন'। যেতে যেতেও রাস্থায় অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছেন, 'স্বামীজী কি এসেছেন'? স্বামীজীতে মন তাঁর এমন ডুবে আছে, এমন ডুবে আছে যে, স্বামীজী ছাড়া আর অন্য কোন কিছু তাঁর মাথায় আসছে না। সিনেমা চলতে চলতে পাওয়ার অফ্ হয়ে গেছে, সিনেমা বন্ধ হয়ে গেছে, ওনার কোন হুঁশ নেই, শুধু একটাই কথা, 'স্বামীজী কি এলেন', এই হল *মচ্চিত্ত মৎপরঃ*। এইভাবে যখন যোগ করা হয়, তখন কি হয় –

যুঞ্জনেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি।।১৫।।

([যোগের ফল বলছেন –] যোগী এইভাবে সদা সংযতভাবে মন সমাহিত করে আমার স্বরূপভূত মোক্ষপ্রদ পরম শান্তি প্রাপ্ত হন।)

এই ভাবে যাঁর মন জয় হয়ে গেছে, যিনি সব সময় পরমাত্মাতে মন দিয়ে আছেন, আর আমার (শ্রীকৃষ্ণের) মধ্যে মনটা পড়ে আছে, তিনি সেই শান্তিটা পেয়ে যান, যে শান্তিটা নির্বাণদায়িনী। বেদান্তের দৃষ্টিতে নির্বাণ আলাদা জিনিস, বৌদ্ধ ধর্মের নির্বাণ আবার পুরো আলাদা জিনিস। সেইজন্য যে বলা হয় বৌদ্ধ ধর্ম থেকে বেদান্ত কপি করেছে, একেবারে ভুল। বেদান্ত কারু থেকে কপি করে না, বেদন্তকেই সবাই কপি করে। বলছেন সেই শান্তিটা পায়, যেটা নির্বাণে পায়।

যোগসূত্রে বলছেন চিত্তবৃত্তি নিরোধ হলে কি হয়, *তদাদ্রষ্টুঃস্বরূপে অবস্থানম্*, স্বরূপে অবস্থান করা মানে, তিনি জেনে গেলেন আমি শুদ্ধ চৈতন্য, আমি সেই পুরুষ। আর কি হয়? *মৎসংস্থামধিগচ্ছতি*, শেষ স্থিতি মোক্ষ, যেটা আমাতে অবস্থিত, এই অবস্থিতিটা তিনি তখন পেয়ে যান। ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যাওয়া যা, মুক্তি পাওয়াও তাই। গীতা বারবার এই কথা বলে যাচ্ছেন, ঠাকুরও বলছেন জ্ঞান ভক্তি এক, আচার্য শঙ্করও একই কথা বলছেন। আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) অবস্থিতি, এটাই হল মোক্ষ। মোক্ষ আসে যখন পুরোপুরি শান্তি এসে যায়, শান্তি আসে যখন মানুষ ধ্যান করে। ধ্যান করতে গেলে কি কি করতে হয় বলা হল, পরেও আবার বলবেন। যিনি ধ্যান করতে চাইছেন, যিনি যোগী হতে চাইছেন, তাঁর জন্য কি কি দরকার, তাঁর খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া-বসা কিরকম হবে বলছেন –

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন।।১৬।।

(অতিভোজীর, একান্ত অনাহারীর, অত্যন্ত নিদ্রালুর এবং অতি অনিদ্রা-অভ্যাসীর ধ্যান হয় না।)

হে অর্জুন যিনি যোগী হতে চাইছেন, তিনি বেশি পরিমাণে খাবেন না, আবার একেবারে অল্পও খাবেন না। তিনি বেশি ঘুমোবেন না, আবার একেবারে কমও ঘুমোবেন না। আচার্য এখানে একটা প্রাচীন শাস্ত্র শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে উল্লেখ করে বলছেন, যদি ঠিক মত খাওয়া-দাওয়া করে, তাতে তার শরীরের রক্ষা হয়। যিনি যোগী হতে চাইছেন, তাঁর শরীরের রক্ষা অত্যন্ত জরুরী। যে ঠিক ঠিক খাওয়া-দাওয়া করছে, তার মানে সে শরীরকে কষ্ট দিচ্ছে না। আর যদি বেশি পরিমাণে খাওয়া-দাওয়া করে, তার মানে সে শরীরকে কষ্ট দিচ্ছে।

আমাদের এক মহারাজ ছিলেন, এক সময় আমরা দুজন একটা সেন্টারে একসাথে ছিলাম। সেই সেন্টারে একবার একজন ভিআইপি গেস্ট আসবেন, তাঁর জন্য রান্নাবান্না হচ্ছে। রান্না করতে করতে অনেক বেলা হয়ে গেছে। আমি মহারাজকে বারবার বলে যাচ্ছি, 'মহারাজ আপনি খেয়ে নিন, অনেক বেলা হয়ে গেল'। উনি রান্না করেই যাচ্ছেন, ভিআইপি আসছেন, রান্না তাঁকে করতেই হবে। উনি বলছেন, 'দুটো বেজে গেছে, অবেলা হয়ে গেছে এখন আর খাব না'। 'খাবেন না মানে, সারাদিন না খেয়ে থাকবেন'? উনি বলছেন, 'দেখ, অবেলা হয়ে গেলে না খাওয়াই ভাল। এখন খেলে শরীর খারাপ হবে, না খেলে একটু দুর্বল লাগবে, কিন্তু শরীর খারাপ করবে না, শরীরটা বেশি দরকারী, অবেলা হয়ে গেলে খেতে নেই'। কম যদি খান খিদে পাবে, বেশি খেলে শরীর খারাপ করবে। শতপথ ব্রাহ্মণ, খুব পুরনো শাস্ত্র, তাতে এটাই বলছেন। বলছেন, কম খেলে সেই খাওয়া শরীরের রক্ষা করতে পারে না, বেশি খেলে শরীরকে কষ্ট দেওয়া হয়। *ন চাতিস্বপ্নশীলস্য*, ঠিক তেমনি বেশি ঘুমোতে নেই, আবার খুব কম ঘুমোতেও নেই।

আচার্য খাওয়ার পরিমাণের একটা মাপ দিচ্ছেন, কোথা থেকে তিনি এটা এনেছেন আমাদের জানা নেই, কিন্তু পরিষ্কার বলছেন, আপনার পেট কতটা জায়গা নিয়ে, সেটার একটা আইডিয়া করে নিতে হবে। পেটকে যদি একটা পাত্র মনে করা হয়, তাহলে *অর্ধমশনস্য সব্যঞ্জনস্য*, ব্যঞ্জনাদি দিয়ে পাত্রের অর্ধভাগ পূরণ করতে হবে। শুধু প্রচুর পরিমাণে মাংস, মাছ, ডিম দিয়ে ভর্তি করলাম তা করা চলবে না, ব্যঞ্জনাদি দিয়ে অর্ধভাগ ভরাতে হয়, বাকি অর্ধভাগ যেটা থাকল তার অর্ধভাগ জল দিয়ে ভরাতে হয়। মানে চার ভাগের এক ভাগ জল দিয়ে ভরাতে হয়। আর চার ভাগের এক ভাগ ফাঁকা ছেড়ে দিতে হয় বাতাস চলাচলের জন্য। এই ভাবে খাওয়া-দাওয়া করলে কোন দিন পেট খারাপ বা পেটের কোন রোগ হবে না, শরীর স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে। আর যতটুকু খেলে মনে হবে পেট ভরে যাবে, তার থেকে একটু কম খেতে হবে। এখানে আমাদের একজন মহারাজ আছেন, সব সময় তিনি

বাটি করে খাবেন। বাটিটা ওনার মাপ, উনি গীতার এই মন্ত্রটাকে মাথা রেখে মেপে মেপে খাওয়া-দাওয়া করেন।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।।১৭।।

(যিনি পরিমিত আহার ও বিহার করেন এবং মন্ত্রজপ, শাস্ত্রপাঠাদি কর্মে পরিমিত প্রচেষ্টা করেন, যাঁর নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত [কালে ও পরিমাণে নির্দিষ্ট], তাঁর ধ্যান সংসারদুঃখের নাশক হয়।)

এই যোগ দুঃখ হরণ করে। কার দুঃখ হরণ করে? যিনি যুক্ত আহার করেন, যুক্ত বিহার করেন, খুব বেশি কাজ করতে যান না। কিছু মানুষ আছে সব সময় কাজের হিরিক লাগিয়ে দিচ্ছে। তাঁর ঘুমানো যুক্ত, জাগাও তাঁর যুক্ত, কাজকর্ম যেটা করবেন সেটাও যুক্ত; যুক্ত মানে সব কিছু মাপা, এই ধরণের যোগীই যোগে সফল হন। কোনটাই অতিরিক্ত হবে না। খাওয়া অতি, ঘুম অতি, কাজ অতি, আপনি কোন দিন যোগী হতে পারবেন না। এই ধরণের যোগী যাঁর খাওয়া, ঘুমনো, জাগরণ, কর্ম সব পরিমিত, তাঁর সব দুঃখ নাশ হয়ে যাবে। এই হল ধ্যানের কয়েকটা মূল জিনিস।

যাঁরা আধ্যাত্মিক পুরুষ তাঁদের সব কিছুই যুক্ত, যুক্ত বলতে আচার্য বলছেন, নিয়ত পরিমাণ, সব কিছু পরিমিত ও নিয়মিত। আহার, কথা বলা, হাঁটাচলা, পরিশ্রম করা সবটাই পরিমিত, কোনটাই অতিরিক্ত নয়। যারা সব সময় কাজে কর্মে মেতে থাকে, প্রচুর খাওয়া-দাওয়া করছে, ভোজনবিলাসী, সারাক্ষণ বকবক করে যাচ্ছে, এদের দ্বারা যোগী হওয়া কখনই সম্ভব নয়।

কিসের দুঃখ নাশ হয়? সংসারের দুঃখ। শঙ্করাচার্য আগেও বলেছেন যে এই সংসার হচ্ছে দুঃখময়, সংসারই দুঃখের উৎপত্তি। আমাদের দুঃখের শেষ নেই কারণ আমরা কোন ব্যাপারেই যুক্ত নই; খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম, কথাবার্তা, ঘোরা-ফেরা কোন কিছুই যুক্ত হয়ে করি না। আবার গর্ব করে বলি আমি যেটাতে লেগে আছি সেটাতেই লেগে থাকি, এখানে কিন্তু সেটাতেই লেগে থাকতে বলা হচ্ছে না। সব কিছুই নিয়মিত করতে হবে। যখন কাজ করা হবে, একটা সময় গিয়ে আমাকে থেমে যেতে হবে, তারপর অন্য একটা, সেখান থেকে আর-একটা সব কিছুই সুনিয়ন্ত্রিত আর সুনিয়মিত ভাবে করতে হবে। অনিয়ন্ত্রিত আর অসংযত জীবন যাপনে যারা অভ্যস্ত তারা কখনই যোগী হতে পারেনা। যোগী হওয়ার জন্য জীবন পরিচর্যার সব কিছুকে গভীর ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করতে হবে। এরপর আরও গভীরে নিয়ে গিয়ে দেখাবেন কিভাবে আস্তে আস্তে সব কিছুকে গুটিয়ে আনতে হয়।

ইদানিং মানুষ দুটো ব্যাপারে বেশি জানতে চায়, একটা হল বেদান্তের 'অহং ব্রহ্মাস্মি' আর দ্বিতীয় হল 'যোগের ধ্যান'। আমাদের পক্ষে এদের অহং ব্রহ্মাস্মি আর ধ্যান বোঝান খুব মুশকিল। কারণ এই দুটো অত সহজে হয় না, বিশেষ করে অহং ব্রহ্মাস্মি অনেক অনেক দূরের ব্যাপার। যদিও এর আগে ধ্যান নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে, তবে ধ্যানের গভীরে কি হয়, গভীর ধ্যান কিভাবে হয়, এর জন্য কি কি প্রস্তুতি লাগে, এই আলোচনাগুলি এখন করা হবে। কিন্তু তার আগে সামান্য কয়েকটা কথা বলে রাখা দরকার, যদিও গীতার আলোচনা শুনে শুনে অনেকে জেনে গেছেন, বা অন্যান্য জায়গা থেকে জেনে থাকবেন। তাহলেও আর-একবার শুনে রাখলে ভাল। বেশির ভাগ মানুষ মনে করে ধ্যান মানে রিলাক্সেশান, এরা জিনিসটা বোঝেও না, অথচ মনে করে আমার সব জানা আছে। দ্বিতীয় আর-একটা মনে করে, ধ্যান করলে মনের একাগ্রত বাড়বে। ঠিকই, স্বামীজীও বলেছেন, জগতের সমস্ত জ্ঞান মনের একাগ্রতা দিয়ে পাওয়া যায়, এই একাগ্রতা ধ্যানের দ্বারা অর্জন করা যায়। যাদের মন চঞ্চল, বিক্ষিপ্ত, তারা মনে করে ধ্যান করলে ঠিক হয়ে যাবে। আর তৃতীয় কথা হল, যাঁরা সত্যিই ধ্যান করতে চান, তাঁরা মনে করেন আমি ধ্যান করছি আধ্যাত্মিক জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

প্রথম যে দুটির কথার বলা হল, বর্তমান কালে দিল্লী মুম্বাইয়ের হাই সোসাইটির বাড়ির মহিলারা এই দুটোকেই অনুশীলনের জন্য বেছে নিয়েছেন, গীতার এটা উদ্দেশ্য না। আর বিক্ষিপ্ত মনকে কুড়িয়ে নিয়ে আসা, এটাও গীতার উদ্দেশ্য না। গীতা এখানে তাঁদেরই জন্য আলোচনা করছেন, যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনে এগোতে চাইছেন। যাঁরা গীতার এই আলোচনা মন দিয়ে শুনছেন, তাঁদের মনে অবশ্যই এই উদ্দেশ্য আছে বলেই শুনছেন, তা নাহলে কেনই বা শুনতেন।

যদি কেউ সত্যিকারের ধ্যান করতে চান, আগে তাঁদের ঠিক করতে হবে, জীবনে তাঁদের উদ্দেশ্য কি। ধ্যান করে আমার মন একাগ্র হবে, আমার ঈশ্বর দর্শন হবে, তারপর আমাকে দেখতে হবে আমি কি উপলব্ধি করতে চাইছি। এটা যে একেবারে অজানা জগৎ, তা না, পুরোটাই জানা। আমি কি দেখতে চাইছি, জগৎ মিথ্যা? আমি কি দেখতে চাইছি আত্মাই আছেন, বাকি সব নাম আর রূপের খেলা? আমি কি দেখতে চাইছি, ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন? আমরা মনে করি ধ্যান করলে ম্যাজিকালি ঠাকুর আমার সামনে এসে যাবেন, আমি কি তাই চাইছি? কিন্তু ধ্যানের ঠিক ঠিক উদ্দেশ্য হল জীবনদর্শনকে আমূল পাল্টে দেওয়া। ঠিক ঠিক ধ্যান করলে জীবনদর্শনটাই পাল্টে যায়। আসলে আমি কি দেখতে চাইছি? এই জিনিসটাকে আগে ঠিক করতে হবে।

ভক্তি পথের যাঁরা, তাঁরা দেখতে চান ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। জ্ঞান পথের পথিক দেখতে চান, আত্মাই আছেন, শুদ্ধ চৈতন্য বই কিছু নেই। যাঁরা যোগ পথে যান, তাঁরা দেখতে চান, প্রকৃতি আমার থেকে আলাদা, আমি এগুলো থেকে আলাদা। এটার জন্য প্রথমেই যেটা দরকার, তা হল, জগতের প্রতি নিজের দৃষ্টিভঙ্গীটা পাল্টে ফেলতে হবে। এগুলো ধ্যানের একেবারে বেসিক জিনিস। বেশির ভাগ লোক এগুলোর দিকে তাকান না, বুঝতে চান না, শুনতে চান না, জীবনে নামাতে চান না বলেই ধর্ম জীবনে, অধ্যাত্ম জীবনে সাফল্য পান না। প্রথম হল, আমি যে ফলটাই পেতে চাই না কেন, আমাকে আগে থেকে তার অনুশীলন করতে হবে। ধ্যান শুধু ওই জ্ঞানটাকে পাকা করে দেয়। যদি আমি দেখতে চাই, আমার চারপাশে যাঁরা আছেন, তাঁরা সবাই সেই সত্যের রূপ; যদি আমি চৈতন্য দেখতে চাই, তাহলে প্রথমে আমাকে নিজের বাড়ি থেকে শুরু করতে হবে। আমার বাড়িতে যাঁরা আছেন, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বাবা-মা, ভাই-বোন এরা সবাই সেই চৈতন্যের উপর নাম-রূপের খেলা। যারা আমার শত্রু, যাদের আমি কোন ভাবেই পছন্দ করি না, চোখ বন্ধ করেও আমি যাকে দেখতে চাই না, তাকেও আমাকে ঐ ভাবেই দেখতে হবে। যদি আমি ঈশ্বর দর্শন করতে চাই, সেখানেও আমাকে এই ভাবেই সবাইকে দেখতে হবে। একটা কাগজে লিখুন, কাকে কাকে আমি অপছন্দ করি, প্রত্যেকটা নামের পাশে লিখুন, তিনিও শ্রীকৃষ্ণেরই রূপ বা তিনিও শ্রীরামকৃষ্ণেরই রূপ। এই দৃষ্টিভঙ্গী দিনরাত আমাদের রাখতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী যদি আমরা না রাখি, কোন দিন ধ্যানে সফল হওয়া যাবে না।

ধ্যানে ইমোশানলিজিমের কোন স্থান নেই, ইমোশানলিজিমই যদি করতে হয়, তাহলে ধ্যান করার কি দরকার! যিনি এটা বুঝে গেছেন, ঠাকুরই সব করছেন; যিনি বুঝে গেছেন ঠাকুর আমাকে শেষ সময়ে নিয়ে যাবেন, তাঁর তো আর জপধ্যান, তপস্যা করার দরকার নেই। এই গীতাগ্রন্থ তাহলে তাঁর জন্য নয়। গ্রন্থ শুনে যদি জীবনে সত্যিকারের সাফল্য লাভ করতে চান, তাহলে এটা বুঝতে হবে যে, ঠাকুর আছেন বা কৃষ্ণ আছেন, শেষ সময়ে তিনি নিয়ে যাবেন, তাহলে তাঁর আর গ্রন্থের দরকার নেই। গ্রন্থ দরকার তাঁদের জন্য, যাঁরা চাইছেন জীবনের উত্থান। আচার্য বারবার এই কথা বলবেন। আচার্যের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে – সৃষ্টি যদি মিথ্যা হয়, মুক্তির সাথে সাধনার যদি কোন সম্পর্ক না থাকে, তাহলে এত কিছু করা কেন? আচার্য উত্তরে বলছেন, যারা অতিপ্রাকৃত, যাদের মন পুরোপুরি সংসারে ডুবে আছে, তারা এই কথাগুলো শুনবে না, যাঁরা মুক্ত পুরুষ তাঁদের আবার এটা লাগে না। কিন্তু এই দু-জনের মাঝখানে যাঁরা আছেন, যাঁরা মনে করছেন আমি বন্ধনে

আছি, যেমন আমরা সবাই মনে করছি আমরা বন্ধনে আছি। আর এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার একটা পথ আছে, আমি মুক্ত হতে চাই – এটা তাঁদের জন্য।

সেইজন্য বলা হয় *কন্টেক কন্টকম্*, শরীরের কোথাও যদি কাঁটা ফুটে যায়, আর-একটি কাঁটা দিয়ে সেই কাঁটা বার করতে হয়। এই যে অজ্ঞান, এই অজ্ঞানকে শাস্ত্ররূপী অজ্ঞান দিয়ে বার করতে হয়। ধ্যানটাও অবিদ্যার এলাকার, জপও অবিদ্যার মধ্যে, শাস্ত্রও অবিদ্যার মধ্যে, সব অবিদ্যার মধ্যে। কিন্তু যখন একটা কাঁটা দিয়ে আরেকটা কাঁটাকে বার করে দেওয়া হল, সরিয়ে দেওয়া হল, তখন দেখে, আরে এই ব্যাপার। আমাদের মুশকিল হল, বেশির ভাগ মানুষ মনে করে জপধ্যান বিদ্যার এলাকার, শাস্ত্র মানেই জ্ঞানের এলাকা; আমি তো অবিদ্যায় পড়ে আছি, অজ্ঞানে পড়ে আছি। কিন্তু তা না, বেদান্তের দিক থেকে সবটাই অজ্ঞান। এই ব্যাপারটা একদিনে বোঝা যাবে না, ধীরে ধীরে পরিষ্কার হবে।

তাহলে শাস্ত্রের কথা, এই কথাগুলো কাদের জন্য? যাঁরা মনে করে আমি অজ্ঞানী, কিন্তু জ্ঞানের একটা পথ আছে, যে পথ দিয়ে চললে আমি স্বরূপে অবস্থান করতে পারব –এটা তাঁদের জন্য। প্রথমে আমাকে দৃষ্টভঙ্গীটা পাল্টাতে হবে। কি দৃষ্টিভঙ্গী? আমার যিনি আপনজন, যেমন মায়েরা যাঁরা গীতার কথা শুনছেন, তিনি দেখবেন আমার স্বামী ঠাকুরেরই রূপ, অন্য দিকে, পুরুষরা যাঁরা গীতার কথা মন দিয়ে শুনছেন, তিনি দেখবেন আমার যিনি স্ত্রী, তিনি সেই শ্রীশ্রীমায়েরই রূপ। এই দৃষ্টিভঙ্গী না আনলে ধ্যান কিন্তু হবে না। আরও সহজ ভাবে যদি নেওয়া হয়, গীতাতেও পরে বলবেন –আমার ভিতরে যিনি আছেন, এই যে আত্মতত্ত্ব, এই আত্মতত্ত্ব সবারই ভিতরে আছে। সেইজন্য আমি যে কাউকে বেশি ভালবাসব, কাউকে অবহেলা করব, তা না, সবাইকেই ভালবাসব। আমি যদি ঠিক ঠিক একজন ভক্ত হই, ঠাকুরের প্রতি যদি আমার নিষ্ঠা থাকে, তাহলে আমাকে মনে করতে হবে, সবাই ঠাকুরেরই সন্তান। যে ভাবকে নিয়ে আমি শুরু করব, ধ্যানে সিদ্ধি হলে আমি সেই ফলটাই পাবো, এই জিনিসটাকে খুব ভাল করে বুঝতে হবে। এটা হল প্রথম ধাপ, যেখানে সব মানুষের প্রতি আমার যে দৃষ্টিভঙ্গী হবে সেটাকে আমাদের দৈনন্দিন আচার ব্যবহারে, কার্যে নিয়ে আসতে হবে।

আর নিজের প্রতি সংসারের যে ব্যবহার, যে মানসিকতা এটাকে পাল্টাতে হয়। অনেক আগে আমি একটা সেন্টারে ছিলাম, সেখানে আমার সাথে একটু খিটিমিটি লাগত, সেন্টারগুলিতে এ-রকম একটু আধটু লেগেই থাকে। শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ তখন মঠের সহ সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ওনাকে আমার সমস্যার কথা বললাম। যে কোন সমস্যা নিয়ে যখনই ওনাকে কিছু বলতে যাই না কেন, সব সময় হেসে উত্তর দেবেন। অনেক সময় নিজেরই হাসি পাবে, কিন্তু ওই হাসির মধ্যে লুকিয়ে থাকে এক গভীর তত্ত্ব। ওনার বক্তব্য হল, কথামৃতে ঠাকুর যেভাবে বলছেন, এই সংসারে বড়লোকের বাড়ির দাসীর মত থাকতে হবে। বর্তমানে কাজের মেয়েরা এক ঘন্টা বা দু ঘন্টার জন্য এসে কাজ করে বেরিয়ে যাবে, কিন্তু আগেকার দিনে কাজের মেয়েরা সারাদিন থাকত। বাড়িতে কাজ করছে, মনিবের সন্তানকে কোলে নিয়ে আদর করছে, আমার রাম, আমার হরি বলে নাচাচ্ছে, কিন্তু মনে মনে জানে আমার সন্তান দেশের বাড়িতে আছে। যেখানেই আমাকে থাকতে হোক, সব সময় সব জায়গায় এই ভাবটা রাখা। এই বাড়িতে আমি আছি, এখানে আমি আশ্রয় পেয়েছি, খেতে পাচ্ছি, শুতে পাচ্ছি, তার বিনিময়ে যতটুকু করতে বলল ততটুকু করে দিলাম, কিন্তু আমার হরি, আমার রাম এখন দেশের বাড়িতে আছে। আমার আসল আপনজন হলেন আমার ইষ্ট; শ্রীকৃষ্ণ হন, শ্রীরাম হন, শ্রীরামকৃষ্ণ হন, যিনিই হন, এটাকে মনে রাখা যে, এই সংসারে আমার যতটুকু দেওয়ার আমি দিলাম, বাকিটা নিয়ে আমি ভাবছি না। এখন সংসারে আমাকে নিয়ে অশান্তি লাগবে, স্ত্রী, স্বামী, সন্তান এরা ঝামেলা করবে। আগে মন থেকে আলাদা হতে হয়, পরে এই শরীর দিয়েও আলাদা হয়ে যেতে হয়। ঠাকুর তাই বার বার বলছেন, তোমাদের মনে ত্যাগ। কারণ মনে

ত্যাগ হলে, ওখান থেকেই বেড়ে ওঠা শুরু হয়ে যায়। বাহ্যিক ত্যাগ না হলেও কোন সমস্যা হয় না, কিন্তু মনে ত্যাগ খুব জরুরী। বলে, বন্য পশুকে আমি খাঁচায় বন্দী করে নিয়ে আসতে পারি, কিন্তু তার মন থেকে বনকে সরানো যাবে না। সন্ন্যাসী হয়ে গেলাম, তাই বলে আমার সংসার চলে যাবে, তা তো হবে না। মন থেকে সংসারকে তাড়াতে অনেক দীর্ঘ সময় লাগে আর অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়।

সেইজন্য যাঁরা ধ্যান করতে চাইছেন, তাঁদের জন্য দুটি কথা –প্রথম, জগতের ব্যাপারে মানসকিতার পরিবর্তন করা, সব সময় মনে রাখা, সবার ভিতরে সেই আত্মা আছেন, যিনি আমার ভিতরেও আছেন। কলের পুতুলগুলো এক-একটা এক এক রকম করে নাচছে, ঘুরছে, কিন্তু সব কটার ভিতরে ব্যাটারি আছে বলে চলছে, সব পুতুলের ভিতরে সেই এক এনার্জি তত্ত্ব। দ্বিতীয়, বড়লোকের বাড়ির দাসী ভাব, এই বাড়ি আমাকে থাকতে দিয়েছে, খেতে দিচ্ছে, যতটুকু বলা হল, যতটুকু দরকার করে দিলাম। এই দৃষ্টিভঙ্গী যদি না আসে, একটা অনাসক্ত ভাব যদি না আসে, তাহলে কিন্তু ধ্যান হবে না। এটা গেল বাহ্যিক দিক থেকে।

মনের দিক থেকে হবে, ভুলভাল যে দৃষ্টিভঙ্গীগুলি নিয়ে এত কাল ধরে চলে এসেছি, যেখানে ষড়রিপুর কথা বলা হয়, সেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য, এগুলোকে মন থেকে সরাতে হবে। ষড়রিপুর একটাও যদি ভিতরে থাকে, গীতায় এই অধ্যায়েই পরে বলবেন, *সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামান্*, মনে কোন সঙ্কল্প যেন না থাকে। আমাকে তীর্থে যেতে হবে, এই সঙ্কল্পও যদি মনে আসে, মন কিন্তু চঞ্চল হয়ে যাবে, ধ্যানে বসতে দেবে না। প্রায়ই উদাহরণ দেওয়া হয়, দুধ জাল দেওয়ার জন্য ওভেনে দুধ বসালাম, দুধ বসিয়ে ধ্যানে বসলাম, এরপর ভাবুন কি রকম ধ্যান হবে। একবার ভাবুন, আমরা যারা শুনছি, সবারই পঁচিশ তিরিশটা গ্যাসের ওভেন জ্বলছে, সবটাতেই দুধ বসানো আছে, এরপর বলছি আমাকে ধ্যান করতে হবে, বলে ধ্যানে বসে গেলাম। এরপর বুঝে নিতে হবে, কি রকম ধ্যান হবে। একটা ব্যবস্থা করে নিতে হয়। ধ্যানের জন্য যখন বসছি, মন তখন সম্পূর্ণ ফাঁকা, কোন কিছু তার মধ্যে থাকবে না। কিন্তু আগে যে দুটো বলা হল, জগতের প্রতি আমার ভাবটা পাল্টানো, তার সাথে নিজের প্রতি ভাব, আমি এদের থেকে আলাদা, আমার আসল বাড়ি অন্য জায়গায়, এরা কেউ আমার আপনজন না, আমার আপনজন অন্য। এই ভাব না আনলে কিন্তু ধ্যান হবে না।

এর সাথে আর-একটা হল, আমাকে ধরে নিতে হবে, এই সাধনা আমাকে অনেকদিন করতে হবে, হয়ত নিজেকে একাই করে যেতে হবে; এই ভেবে নিয়েই আমাকে এগোতে হবে। আট বছর, দশ বছর যদি সাধনা করা যায়, তবে গিয়ে একটু ফল পাওয়া যায়। আমেরিকাতে আমাদের এক সেন্টারে একজন আমেরিকান মহিলা এসে সেখানকার অধ্যক্ষের কাছ থেকে দীক্ষা নিলেন। এক মাস পরে এসে মহিলা বলছেন, Swami, I practiced this Mantra for one month, but there is no result। ওখানকার অধ্যক্ষ মহারাজ মহিলাকে বলছেন, I have been practicing this Mantr for fifty years now। মহিলা তো অবাক হয়ে বলছেন, ওয়া, ফিফটি ইয়ারস্! চঞ্চল মন, ওদের ব্যাপার হল, যা হওয়ার এক্ষুণি হতে হবে, উঠ ছুড়ি তোর বিয়ে, এক্ষুণি উঠতে হবে, উঠেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হবে, সব কিছু এক্ষুণি চাই। এই ধরণের চঞ্চল মন যাদের, তাদের জন্য ধ্যান তো দূর অস্ত, জাগতিক কোন কিছুই হয় না।

যাঁরা গীতার এই আলোচনা শুনছেন, ধরে নিচ্ছি সবাই আপনারা ভক্ত। আমি এখন যেটা বলতে চাইছি সেটা হয়ত ষষ্ঠ অধ্যায়ে এর বর্ণনা নেই, কিন্তু আপনাদের সুবিধার্থে বলছি। ঈশ্বর অনন্ত; অনন্তের কল্পনা করা যায় না, সম্ভব না। মন দিয়ে অনন্তের অবধারণা করা যায় না। ঋষিরা সেইজন্য ঈশ্বরের উপর কিছু কিছু গুণ আরোপ করে দিলেন। সেই গুণকে আধার করে তাঁর কিছু

কিছু রূপ দিয়ে দিলেন। যেমন, ভগবান হলেন চৈতন্য, তার মানে তিনি জ্ঞানের ভাণ্ডার, জ্ঞানের যিনি ভাণ্ডার, সেটাকে আবার একটা রূপ দিয়ে দেওয়া হল – মা সরস্বতী। ভগবান ঐশ্বর্যবান, ঐশ্বর্যের একটা রূপ দিয়ে দেওয়া হল – মা লক্ষ্মী। এভাবে এক-একটা গুণের এক-একটা রূপ দিয়ে দেওয়া হল। প্রথমে আনা হল গুণ, সেখান থেকে এলো রূপ, এবার সেখান থেকে স্বাভাবিক ভাবেই এসে গেল লীলা; তিনি এই করলেন, সেই করলেন। যেমন ভগবান বিষ্ণু, তিনি অমুক অসুরকে মারছেন, তমুককে পাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, কাউকে স্বর্গে নিয়ে বসিয়ে দিলেন। যেমন মা দূর্গা, প্রথমে এলো শক্তি, সেখান থেকে এলো রূপ, সেখান থেকে এসে যাচ্ছে মা দূর্গার বিভিন্ন লীলা। এই তিনটেকে মিলিয়ে আসে নাম। অনেক সময় এনারা নামকে আলাদা করেন বটে, কিন্তু আসলে গুণ, রূপ ও লীলা এই তিনটেকে মিলিয়েই নাম আসে। যেখান থেকে দীক্ষা নিয়েছেন, গুরু নিশ্চয়ই আপনাকে বলে দিয়েছেন, এই হল মন্ত্র আর ইনি তোমার ইষ্ট। তার মানে একটা রূপ আর একটি নাম দিয়ে দিলেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই নাম আসলে একটা ভাব, যে ভাবের মধ্যে লীলা রয়েছে, রূপ রয়েছে, তার থেকেও সবচেয়ে বেশি হল, তিনি গুণনিধি, তাঁর গুণ রয়েছে। গুণ আছে বলেই এই লীলারূপ আসে।

ধ্যান করার আগে প্রথমে প্রচুর জপ করতে হয়, দিনে দশ-পনের হাজার, মন্ত্র কত লম্বা তার উপর নির্ভর করে। জপ করতে করতে মন যখন স্থির হতে শুরু হয়, তখন গুরু যেমন যেমন করতে বলেছেন, যেমন যেমন ভাবে করতে বলেছেন, সেই ভাবে ইষ্টের ধ্যান করতে হয়। আমাকে একজন বলছেন, ঠাকুরকে তো দেখিনি, কি করে তাঁর ধ্যান করব? আমি বারবার বলি, ছবির ধ্যান হয় না। এর আগে নাসিকাগ্রের কথা বললেন, ওখানে নাকের উপর ধ্যান করতে বলছেন না, ওখানে বোঝান হচ্ছে, মনকে কিভাবে একাগ্র করতে হয়। চিন্তন সব সময় আত্মারই করতে হয়। ঠিক তেমনি চিন্তন ঈশ্বরের করতে হয়। মায়েরা গর্ভবতী হওয়ার পর তিনি পরিষ্কার কল্পনা করতে পারেন, আমার গর্ভস্থ শিশু, যে শিশু জীবন্ত, হাড়-মাংসের, তখনও কিন্তু মা সন্তানকে দেখেননি; গর্ভস্থ শিশুকে কেউ দেখে না। আল্ট্রা সোনোগ্রাফি করলে তাতে একটা আকৃতি আসবে, একটা ছবি আসবে। কিন্তু মায়েদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলবেন, পরিষ্কার তাঁরা কল্পনা করতে পারেন, দেখতে পান। আত্মতত্ত্বের রক্ষা কিভাবে করতে হয় বলতে গিয়ে কঠোপনিষদে খুব সুন্দর বলছেন, একজন গর্ভিণী যেভাবে নিজের গর্ভের রক্ষা করেন। ধ্যান ঠিক সেইভাবে করতে হবে। গর্ভিণী পরিষ্কার বুঝতে পারেন, আমার গর্ভস্থ সন্তান এই রকম। হৃদয়ে যখন ধ্যান করতে বলা হয়, বা গুরু যেখানে ধ্যান করতে বলে দিয়েছেন, সেইখানে ঠিক এইভাবে ধ্যান করতে হয়। দীক্ষার সময় ইষ্টের যে ছবি দেখানো হয়, ওটা আকৃতিটা বোঝানর জন্য। এবার কল্পনা করা, কল্পনা থেকে ধীরে ধীরে ওটা 2-D থেকে 3-D হয়ে যায়, এটা বাস্তবিক হয়। গর্ভিণী যেভাবে নিজের গর্ভ রক্ষা করেন, গর্ভের কল্পনা করেন, চিন্তন করেন; ইষ্টের ধ্যান ঠিক সেই ভাবে করতে হয়।

এখানে গীতা সাকার ধ্যানের কথা বলছেন না, সাকার ধ্যান আসবে একাদশ অধ্যায়ে। সেখানে ভগবান অর্জুনকে নিজের বিশ্বরূপ দেখাচ্ছেন, এই দেখ আমার রূপ, তখন ঐ রূপের ধ্যান করা যায়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে গীতা আত্মচিন্তনের কথা বলছেন। কিন্তু আত্মচিন্তনের পথ সবার জন্য নয়। আত্মচিন্তন পথের জন্য যাঁদের উপযুক্ত মনে করেন, গুরু তাঁদের বলে দেন আত্মচিন্তন কিভাবে করতে হয়ে। বেদান্ত মতেও প্রথমে একটা মন্ত্র দিয়ে দেন বা চিন্তন করার জন্য একটা বাক্য দিয়ে দেন। তখন সে ধীরে ধীরে মনে করে, এই যে আমরা বললাম আত্মার একটা গুণ আছে, ফলে একটা রূপও আছে, রূপ থাকলে লীলাও এসে যাবে, আত্মচিন্তনে তো লীলা হবে না, কারণ আত্মা নিষ্ক্রিয়। রূপ কিছুটা কল্পনা করা যায়, গুণেরও অবশ্যই কল্পনা করা যায়।

আত্মার আবার রূপ কি? চৈতন্যজ্যোতি। আলো সবারই দেখা আছে, এবার সেই আলোকে আধার করে নিয়ে এলেন চৈতন্যজ্যোতি। তখন মনে করতে হয়, আমি ধ্যানে বসেছি, আমি আমার

শরীরটাকে পুরো চৈতন্যজ্যোতি রূপে কল্পনা করছি। ভক্তরা যেভাবে ধ্যান করেন, আমিও ঠিক সেভাবেই ধ্যান করছি, কিন্তু আমি নিজে এখানে যেন দেবতা হয়ে গেছি, আমার পুরো শরীরটা আলোময় বা আমার হৃদয়ে যে পদ্ম আছে, যাকে হৃৎপদ্ম বলছেন, তন্ত্রে বলছেন হৃদয়ে অষ্টদল পদ্ম আছে, সেই পদ্মে জ্যোতি রয়েছে। কি রকম জ্যোতি, সূর্যোদয়ের সময় যে রকম জ্যোতি দেখায়। কিন্তু এই জ্যোতি জাগতিক জ্যোতি না, চৈতন্যজ্যোতি। ভগবান এখানে বলবেন, এবং আচার্য এর ব্যাখ্যাও করবেন। আবারও বলছি, এগুলো গুরু যেমন বলে দিয়েছেন, সেইভাবে করতে হয়; এগুলো কোনটাই আমার কথা না, আমাদের শাস্ত্রে বা পরম্পরায় বিভিন্ন যে ধ্যানের বিধি আছে, আমি সেগুলোকে বলে যাচ্ছি। এটা কি একদিনে হয়? না, দীর্ঘদিনের চেষ্টা, সাধনা লাগে।

এই কটি মূল কথা বলে আমরা এবার গীতার সেই অংশে ডুবে যাচ্ছি, যেখান থেকে গীতা আমাদের আস্তে আস্তে ধ্যানের আরও গভীরে নিয়ে যাচ্ছেন। এর আগে বললেন, *শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য*, একটা পবিত্র স্থানে একান্তে মেরুদণ্ড, গ্রীবা, মস্তক সোজা করে বসতে হবে। খাওয়া অতিরিক্তও হবে না, আবার খুব কমও হবে না, ঘুমটাও বেশি ঘুমোলে হবে না, আবার একেবারে না ঘুমোলেও হবে না। ধ্যানের জন্য কয়েকটা মূল করণীয় কথা বলে এবার বলছেন, সাধক পুরুষ কিভাবে সমাধিস্থ হবেন, কিভাবে সিদ্ধি লাভ করবেন –

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচতে তদা।।১৮।।

(যখন যোগী সমস্ত রকম কামনা থেকে মুক্ত হন এবং তাঁর চিত্ত বাহ্য চিন্তা পরিত্যাগপূর্বক বৃত্তিরহিত হয়ে আত্মাতে অবস্থান করে, তখন তাঁর সমাধি হয়।)

ধ্যানের শেষে কি হয়, তার বর্ণনা করছেন। সমস্ত প্রকার বাহ্য চিন্তন থেকে সরে এসে মন পুরোপুরি আত্মাতে অবস্থিত হয়ে যায়। গীতা ধ্যান করছেন আত্মার উপর। হৃদয় গুহায় সেই আত্মা, যিনি চৈতন্যজ্যোতি স্বরূপ, ঐ চৈতন্যজ্যোতিতে মন পুরোপুরি স্থিত হয়ে গেছে। এরপর তাঁর সমস্ত বাহ্য চিন্তন বন্ধ হয়ে গেল, সংসার উড়ে গেল, আপনজন উড়ে গেল, বাড়ি উড়ে গেল, যে স্থানে বসে ধ্যান করছেন, সেই স্থানটাও উড়ে গেল, নিজের শরীরটা উড়ে গেল, তাই দেহবোধটাও চলে গেল। ধ্যান ঠিক ঠিক হচ্ছে কিনা কি করে বোঝা যাবে? মশা কামড়ালে বুঝতে পারবেন না যে, মশা কামড়াচ্ছে। ঠাকুর বর্ণনা করছেন, ঠাকুর ধ্যান করছেন, পাখি এসে মাথার চুলে দানা খুঁজছে। ঠাকুরেরও কোন বোধ নেই, পাখিদেরও কোন বোধ নেই এটা জড় পদার্থ নাকি কোন চেতন পদার্থ। সাপ ঠাকুরের শরীরের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, সাপ মনে করছে কোন জড় পদার্থ। গিরিশ ঘোষের একটা বর্ণনা পাওয়া যায়, উনি আর নরেন দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে একদিন ধ্যান করছেন। মশার কামড়ে গিরিশ ঘোষ স্থির হয়ে বসতে পারছেন না, কিন্তু দেখছেন নরেনের সারা শরীরে এত মশা বসে আছে যে, মনে হচ্ছে যেন কম্বল চাপা দিয়ে নরেন বসে আছে, স্বামীজীর কোন হুঁশ নেই। আমাদের বিশ্বাস হতে চায় না, আপনার বলবেন, এ-রকম কি হতে পারে? হ্যাঁ, এটাই হতে হবে।

একদিনে হবে না। *যদা বিনিয়তং চিত্তম্,* ভাল করে মনকে নিয়ন্ত্রণ করে নিয়েছেন। তখন কি হয়? *নিঃস্পৃহ সর্বকামেভ্যো,* মনে কোন ধরণের কামনা থাকবে না, নিঃস্পৃহ, সম্পূর্ণ কামনারহিত। গীতা এই কামনারহিতকে নিয়ে বারবার বলবেন। আপনার মনে কোন কামনা আছে কি? অনেক সময় প্রশ্ন করেন, ঈশ্বর দর্শন এটা কি কোন কামনার মধ্যে পড়ে? হ্যাঁ, কামনার মধ্যে, যদি আপনি মনে করেন আমি ঈশ্বরকে সামনে দর্শন করব, তাহলে ওটাও কামনার মধ্যে আসবে। কিন্তু ঈশ্বরকে যখন মনে করছি আমার স্বরূপ, আমার ভিতরে তিনি বাস করেন, আমি তাঁর সাথে এক, তখন এটা আর কামনা থাকে না। এই কথা আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি, আরও অনেকবার বলতে হবে। আচার্য বলছেন, শাস্ত্র হলেন মায়ের মত, কখন শব্দ দিয়ে, কখন ভাব দিয়ে, একই কথা

বারবার বলতে থাকেন। ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয়রাম ঠাকুরকে বলছেন, 'মামা তুমি একই কথা বারবার বল কেন'? ঠাকুর বলছেন, হাজারবার বলব, বেশ করব, তাতে তোর কিরে শালা। নিজের ভাগ্নে হৃদুকে বলছেন, তাতে তোর কিরে শালা। যিনি গুরু তিনিও মায়ের মত, আমাদের ভালবেসে একই কথা বিভিন্ন ভাবে বারবার বলবেন। স্বরূপে অবস্থিত হতে চাওয়াটা কামনা না।

কামনা মানে, আমার শরীর মনের বাইরে আমি কিছু চাইছি। এমন কি ঈশ্বরদর্শন যদি বাইরে চাই, সেটাও কামনার মধ্যে পড়বে। ঈশ্বরকে যদি আমার স্বরূপ রূপে ভাবি, তাহলে ওটা কামনার মধ্যে পড়বে না। যখন বলছি, আমি ভাল হতে চাই, এটা কামনার মধ্যে নয়। কেন কামনার মধ্যে নয়? কারণ আমার স্বরূপ ভাল। খারাপ হবে তখন, যখন বাইরে থেকে কোন কিছু নিজের জন্য টেনে নিতে চাইছি। যতক্ষণ আমি টেনে নিতে চাইছি না, ততক্ষণ সব ঠিক। আমি তো ভাল হতে চাইছি। মিথ্যা কথা আমরা কেন বলি? অপরকে খুশী করার জন্য, অপরের কাছে আমি ভাল হতে চাই বলে মিথ্যা কথা বলি। আমি কেন চাই অন্যরা আমার উপর খুশী থাকুক? যাতে এখন বা পরে তার কাছ থেকে কোন কাজ আদায় করতে পারি। তার মানেই স্বার্থ লেগে গেল, বহির্জগৎ থেকে আমি কিছু চাইছি। এগুলোই হল কামনা। *নিঃস্পৃহ সর্বকামেভ্যঃ*, সমস্ত ধরণের কামনা থেকে বেরিয়ে আসা। এই ধরণের যোগী কেমন হন, এর উপমা দিয়ে বলছেন –

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ।।১৯।।

(বায়ুবর্জিত স্থানে অবস্থিত দীপশিখা যেমন কম্পিত হয় না, চিত্তবৃত্তির নিরোধ-অভ্যাসকারী যোগীর একাগ্রীভূত চিত্তেরও সেই উপমা জানবে, অর্থাৎ যোগীর নিরুদ্ধ চিত্ত সবিকল্প সমাধিতে সেইরূপ নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থিত থাকে।)

বায়ু বিবর্জিত স্থানে যদি একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয় তখন প্রদীপের শিখার দিকে তাকালে দেখা যায় প্রদীপের শিখা একটুও কম্পিত হয় না, সোজা স্থির হয়ে জ্বলতে থাকে। বাতাসে প্রদীপের শিখাটা নড়ে কেন? প্রদীপের মধ্যে তেল আছে আর সলতে আছে। তেল তরল পদার্থ, আর ক্যাবিলারি প্রথায় সলতে তেলটাকে টানতে থাকে। এখন সলতেতে আগুন দিলে সেই আগুনের তাপে প্রদীপের তেলটা গ্যাসে রূপান্তরিত হয়, ঐ গ্যাসটা সলতের আগুনের সংস্পর্শে এসে জ্বলতে থাকে বলে প্রদীপের শিখা তৈরী হয়। গ্যাস মানে বায়বীয় পদার্থ, গ্যাস আর বাতাস একই। এখন ঘরে যে বাতাস বইছে, সেই বাতাসের মলিক্যুলস্‌গুলি গ্যাসের মলিক্যুলসকে ধাক্কা মারতে থাকলে প্রদীপের শিখাটা নড়তে থাকে। এই কারণেই প্রদীপের শিখাটা কম্পিত হয়। আগুনের তাপে তেল যখন গ্যাসে রূপান্তরিত হচ্ছে তখন গ্যাসের কয়েকটা মলিক্যুলস্‌ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়, কয়েকটা মলিক্যুলস্‌ পালিয়ে যাচ্ছে বলেই আমরা প্রদীপের গন্ধে বুঝতে পারে এটা ঘিয়ের প্রদীপ, নাকি কেরোসিনের প্রদীপ। কি করে বুঝতে পারছি? কিছু পার্টিকেলস্‌ যে পালিয়ে যাচ্ছে তাদের গন্ধ থেকেই আমরা বুঝতে পারি কোনটা ঘিয়ের প্রদীপ আর কোনটা কেরোসিনের প্রদীপ।

পেট্রোল ডিজেলের গাড়ি থেকে যে ধোঁয়া বেরিয়ে আসে, এই ধোঁয়াগুলো আসলে ডিজেলের যে গ্যাসটা জ্বলছে না সেই গ্যাসেরই না জ্বলা পার্টিকেলস্‌। গ্যাস পার্টিকেলস্‌ যদি না পুড়তে পারে তখন ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে আসে। একটা গাড়ির ইঞ্জিনের ক্ষমতা এই ভাবেই বোঝা যায়, যে গাড়ির ইঞ্জিন পুরো গ্যাসকে পুড়িয়ে দিতে পারে সেই গাড়ির ক্ষমতা সব থেকে বেশি। কিন্তু পুরো গ্যাসকে পুড়িয়ে দেওয়া ইঞ্জিনের পক্ষে অসম্ভব।

ঘরে যদি পাখা চলে বা জোরে বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে তখন প্রদীপের শিখা নিবু নিবু হয়ে যায়। কারণ তখন হাওয়ার মলিক্যুলস্‌গুলি চলতে চলতে প্রদীপের তেলের মলিক্যুলস্‌গুলিকে

ধাক্কা মারে, ফলে শিখাটা নড়ে ওঠে। এই কারণে হ্যারিকেনের আলোর চারপাশে একটা কাঁচের আবরণ দিয়ে দেওয়া হয়, তখন বাতাস আর সরাসরি এসে আঘাত করতে পারবে না, হ্যারিকেনের আলোটা স্থির থাকে। আমরা যখন ধ্যান করতে বসি তখন এই মনকে নিয়েই ধ্যান করতে হবে। মন জড় পদার্থ, আর জগতের যা কিছু আছে সবই জড়। এই জড় পদার্থ মনকে সব সময় ধাক্কা মারছে, আর তাতেই মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু ধ্যানে মনটাকে এমন ভাবে সব কিছু থেকে গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে যে জাগতিক যা কিছু আছে মনের কাছে পৌঁছাতেই পারছে না, যার ফলে মনটা স্থির হয়ে যায়। প্রদীপের আলোটাও গ্যাস আর বাতাসটাও গ্যাস, গ্যাস যখন গ্যাসকে ধাক্কা মারছে তখন শিখাটা চঞ্চল হয়ে ওঠে।

প্রদীপের শিখার এই চাঞ্চল্যকে কিভাবে আটকানো যাবে? বাইরের বাতাসকে প্রদীপের শিখার কাছে আসতে না দিলেই শিখা আর চঞ্চল হবে না। ঠিক একই ব্যাপার হয় মনকে সমাহিত করার ক্ষেত্রে। মনটাও জড় আর বাইরে যা আছে সেটাও জড়; চোখ, কান, নাক সব সময় জড় পদার্থ ছেড়েই যাচ্ছে, আর এগুলো গিয়ে মনকে ধাক্কা মারছে, আর মনও চঞ্চল হয়ে উঠছে। মন যখন চঞ্চল হয়ে গেল তখন সেই মনকে আর অন্তরের দিকে ফেরান যাবে না। ফেরানোর উপায় কি? বাইরের থেকে যেগুলো ধাক্কা মারছে ঐ ধাক্কা মারাটাকে আটকে দেওয়া। আটকে দিলে জাগতিক বস্তু সমূহের যে প্রবাহ চলছিল সেটা থেমে যাবে। যেই থেমে যাবে তখন মন আর চঞ্চল হবে না।

এই যে যোগী, যিনি শ্রেষ্ঠ মানের যোগী, যেমন ঠাকুর, স্বামীজীর বর্ণনা করা হল; ভাগ্যিস এনারা এসেছিলেন, আমাদের চোখের সামনে আছেন বলে উদাহরণগুলি দিতে পারছি। যেখানে বাতাস নেই, সেখানে যদি একটা প্রদীপ রাখা হয়, প্রদীপের শিখা একটুও নড়ে না। দীপ জ্বালানোর জন্য দরজা জানলা একটু খুলে রাখতে হয়, তা নাহলে কার্বনডাই অক্সাইড বেরোয় না। তাতেই বাতাস এসে প্রদীপের শিখাকে একটু নাড়িয়ে দেয়। একবার একটা নূতন জায়গায় গিয়েছিলাম, সেখানে একটা প্রদীপ জ্বলছিল, আর ঠিক এই *যথা দীপো নিবাতস্থো* এই জিনিসটা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম এটা কোন ইলেক্ট্রিক লাইট। বাচ্চার মনে যদি কোন আবদার ঢুকে যায়, সে ওই আবদার থেকে আর সরবে না। বাচ্চা যদি বলে আমি সন্দেশ খাব বা আমি চকলেট খাব, ওকে যতই ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখার চেষ্টা করা হোক না কেন, ঘুরে ফিরে চকলেটে গিয়ে বসে যাবে। যোগীর মন যখন সেই অবস্থিতিতে যায়, তখন মনের একটা মলিক্যুলও নড়বে না।

ভক্তিশাস্ত্রে এই অবস্থাকেই অন্য ভাবে বলছেন, *অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ*। তেলের বড় বড় টিন থেকে যখন তেল ঢালা হয়, তেল ঢালার ধারাকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে একটা কোন তরল পদার্থ চলছে। ধ্যানের সময়ও মন চলে, চলে না যে তা নয়, কিন্তু তেলের ধারা এমন ভাবে চলে যে, দেখে মনে হয় একটা স্বচ্ছ ধাতব রড। এটাই সমাধির অবস্থা। বলছেন, যোগবেত্তা পুরুষ, যাঁরা প্রত্যক্ষ অনুভব করেছেন, তাঁরা এটাই বলেছেন, ঐ অবস্থায় মন ঠিক এই রকম থাকে। এখানে পরিষ্কার বলছেন, যার সঙ্গে উপমা করা হয়, তাকে বলে *সোপমা*। এই উপমা দেওয়া হচ্ছে বোঝনর জন্য যে, তাঁর মন কি রকম স্থির থাকে। অনুশীলন করে, সাধনা করে করে মন যখন এই রকম একাগ্র হয়ে যায়, তখন তিনি যদি বেলুড় মঠের ঠাকুরের বিগ্রহের ধ্যান করে থাকেন, তিনি তখন দেখছেন ঠাকুরের জ্যোতিঃরূপ বিগ্রহ। মনে কোন প্রকার চাঞ্চল্য নেই, মন পুরো ওখানে ডুবে আছে। তখন কি হয়?

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি।।২০।।

(যে অবস্থায় ধ্যানাভ্যাস দ্বারা চিত্ত সর্ববৃত্তিশূন্য হয় এবং যে অবস্থায় শুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা পরম চৈতন্য জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করে যোগী প্রত্যগ্যাত্মাতেই পরিতুষ্ট হন –)

আলোচনায় প্রথমের দিকে বলা হল দৃষ্টিভঙ্গীকে পাল্টাতে হবে; তা নাহলে ধ্যানের সময় সব ঐ হিজিবিজি জিনিসগুলো এসে যাবে। যাকে ভাল লাগে তার দিকে মন যাবে, যাকে পছন্দ করি না, তার দিকেও মন যাবে। ধরুন একজন কৃষ্ণের ধ্যান করছেন, কৃষ্ণের জ্যোতির্ময় রূপে মনকে লাগিয়ে দিয়েছেন, হঠাৎ দেখছেন শ্রীকৃষ্ণের মুখের উপর একটা মাছি এসে বসে গেল। এটা বাস্তবিক হয়, সবটাই অবশ্য কল্পনা। ধ্যানের সময় সেই মাছিকে সরাতে চাইলেও সরে না। বহির্জগতে আর অন্তর্জগতে ঠিক এই দ্বন্দ্ব এসে যায়। যাকে পছন্দ করি না, মন গিয়ে সেখানে আটকে যায়। আটকে গিয়ে তার সর্বনাশ চিন্তন করবে, আরও অনেক কিছু করবে, মন ওখান থেকে সরাতে পারবে না।

বিশ্বামত্রের মত ঋষিদের যে পতন হত, এই একই কারণে হত। বিশ্বামিত্র ধ্যান করছেন, কিন্তু মাথায় ঘুরছে, বশিষ্ঠ মুনিকে শেষ করতে হবে। ধ্যান করে শক্তি পেলেন, সেই শক্তি থেকে একটা রাক্ষস তৈরী করে দিলেন, তাকে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বশিষ্ঠের সন্তানকে মারিয়ে দিলেন। এক সময় তিনি রাজা ছিলেন, মনে কোন বাসনা থেকে গিয়েছিল, মেনকাকে দেখলেন সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মন নিয়ন্ত্রণে নেই, নিয়ন্ত্রণে থাকে না। এগুলো আমরা খুব উচ্চস্তরের ধ্যানের কথা আলোচনা করছি। *যত্র উপরমতে,* যখন সব কিছু সরিয়ে নেওয়া হয়, *নিরুদ্ধং যোগসেবয়া,* পতঞ্জলি রাজযোগে বলছেন *স তু দীর্ঘকাল-নৈরন্তর্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ,* অনেক দিন ধরে খুব নিষ্ঠার সাথে সেবা করে যাচ্ছেন, গীতাও একই শব্দ নিচ্ছেন, *যোগসেবয়া,* যোগের সেবা করে যাচ্ছেন। চল্লিশ বছর, পঞ্চাশ বছর স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে থাকে, তাও এক অপরকে খুশী করতে পারে না। স্ত্রী স্বামীকে, স্বামী স্ত্রীকে অনুযোগ করে বলে, এত বছর তোমার সঙ্গে কাটালাম তাও তুমি আমাকে চিনলে না, বুঝলে না। যোগের চাহিদা আরও অনেক বেশি। চল্লিশ বছর ধরে যোগের সেবা করে যাচ্ছেন, তাতেও যে ফল পাবেন, কোন গ্যারান্টি নেই। তবে ঠিক ঠিক সব কিছু থেকে যদি নিজেকে সরিয়া আনা হয়, তবে হয়। তখন কি হয়?

যত্র চৈবাত্মনাত্মানং, আত্মার ভিতরে অর্থাৎ নিজের ভিতরে, অন্তঃকরণে; বাইরে না, হৃদয়ের মধ্যেই দর্শন হয়। কি দর্শন হয়? আচার্য শঙ্কর বলছেন, *অন্তঃকরেণ আত্মন পরং চৈতন্যজ্যোতিঃস্বরূপং,* যোগ সাধন দ্বারা যখন চিত্তকে নিরুদ্ধ করা হল, কিভাবে নিরুদ্ধ করা হল প্রথম থেকে আলোচনা করে আসছি, চরিত্র ঠিক করতে হয়, খাওয়া-দাওয়া ঠিক করতে হয়, একান্তে থাকতে হয়, একটা পবিত্র জায়গায় সোজা হয়ে বসে সাধনার চেষ্টা করতে হয় মনে যেন পাঁচ জায়গায় না যায়। ছড়ানো মন কুড়িয়ে টেনে ভিতরে নিয়ে আসা হল, সমস্ত কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে মন যখন পুরোপুরি নিরুদ্ধ হয়ে গেল, মন আর কোন দিকে দৌড়াচ্ছে না; তখনই ধ্যানের ফল আসে। কি ফল? *পরং চৈতন্যজ্যোতিঃস্বরূপ* এর সাক্ষাৎ, এটাই আচার্য শঙ্করের ব্যাখ্যা, আর এটাই হয়। মহারাজদের মধ্যে যাঁদের জ্ঞান হয়ে গেছে, তাঁদের জিজ্ঞেস করলে তাঁরাও এটাই বলেন, এটাকেই জ্যোতিদর্শন বলে। এই জ্যোতি জাগতিক কোন আলো না। এই চৈতন্যজ্যোতিঃস্বরূপ চব্বিশ ঘন্টা থাকে, এটা যে শুধু ধ্যানের সময়ই হবে তা না, চব্বিশ ঘন্টা থাকে। যাঁরা ইষ্টের ধ্যান করেন, তাঁরাও পরিষ্কার দেখেন ইষ্ট জ্যোতিঃস্বরূপ হয়ে আছেন।

ফলে কি হয়, *পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি, আত্মনি,* নিজের ভিতরেই সন্তুষ্টি হয়ে যায়। চারটে জিনিসের পিছনে তিনি আর দৌড়াতে যাবেন না। টাকা-পয়সা, সুখ, শান্তি, জ্ঞান, ভক্তি কোন দিকেই আর যাবেন না। তিনি জানেন আমি কৃতকৃত্য হয়ে গেছি। কারুর ঈশ্বরদর্শন হয়েছে কিনা, পরম চৈতন্যজ্যোতির দর্শন হয়েছে কিনা, এর পরিষ্কার লক্ষণ হল *আত্মনি তুষ্যতি,* নিজের ভিতরেই সন্তোষ; বহির্জগতের কোন কিছুই তাঁকে আর কোন সন্তুষ্টি দিতে পারে না। এই সন্তুষ্টি কি রকম –

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ।।২১।।

(যে অবস্থায় আত্মাকারা বুদ্ধি দ্বারা গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়-গোচরাতীত অর্থাৎ অবিষয়জনিত ব্রহ্মানন্দস্বরূপ পরমসুখ যোগী অনুভব করেন, এবং যাতে অবস্থিত হলে আত্মস্বরূপে সংস্থিতি থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না, –)

এই সুখ আত্যন্তিক, আত্যন্তিক মানে যার অন্ত হয় না, ফলে এই সুখানুভূতি কোন ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা রাখে না। আমি যদি কাউকে ভালবাসি, তাকে দেখে আমার আনন্দ হবে, তার কথা শুনে আনন্দ হবে, তাকে স্পর্শ করে আনন্দ হবে। আমার সুখ হচ্ছে। কিন্তু পঞ্চম অধ্যায়ে এই সুখের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, এই সুখ, *আদ্যন্তবন্তঃ*, প্রিয়জনকে দেখলাম আনন্দ হল; চলে গেল, আনন্দ শেষ। তাহলে এটা সুখ কোথায় হল? সুখ যেটা হবে সেটা আত্যন্তিক, এর অন্ত কখন হবে না। *বুদ্ধিগ্রাহ্যম্* এই সুখ শুধুমাত্র বুদ্ধি দিয়ে পায়। অনেক সময় বলা হয়, যাকে ভালবাসি, তার কথা ভাবলেও আনন্দ; এখানে ভাবতে হয় না, বুদ্ধি দিয়ে চব্বিশ ঘন্টা গ্রহণ হয়। তার সাথে বলছেন *অতীন্দ্রিয়ম্*, এই সুখ ইন্দ্রিয়ের পারের। যাঁর হয় তিনিই এটা বুঝতে পারেন। আসলে বলতে চাইছেন সংসারে যত বস্তু আছে, এর কোন বস্তু থেকেই সুখের জন্ম হয় না।

বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ, একবার যখন এই সত্যকে তিনি জেনে গেলেন তখন তিনি নিজের স্বরূপে তত্ত্বতঃ অবস্থিত হয়ে যান। এই যে বললেন, *পরম্ চৈতন্যজ্যোতিঃস্বরূপ*, এটাই আমার স্বরূপ, শ্রীরামকৃষ্ণ আমার স্বরূপ। সেইজন্য বলা হয়, ছবির ধ্যান হয় না, মূর্তির ধ্যান হয় না, ধ্যান হয় চৈতন্যজ্যোতিঃস্বরূপের। *বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং*, এরপর আর ওখান থেকে মন ডান দিক, বাম দিক, কোন দিকে সরবে না। কারণ তত্ত্বতঃ, নিজের স্বরূপকে ভাল ভাবে বুঝে গেছে, স্বরূপ থেকে আর সরবে না। ঠাকুর খুব সহজ করে বলছেন, যে মিছরির সরবৎ খেয়েছে, সে আর কক্ষণ চিটে গুড়ের পানা খেতে চাইবে না। যিনি আত্মার এই সুখ তত্ত্বতঃ জেনে গেছেন, তিনি আর সংসারের কোন কিছুতেই আকর্ষিত হবেন না, সংসার তাঁর কাছে চিটে গুড়ের পানা হয়ে গেছে।

সংসারে আছেটা কি, বেশির ভাগ লোক কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে মুখ জুবড়ে পড়ে আছে, সব দু-পয়সার খদ্দের। ঠাকুর বলছেন, যদি দেখি কারুর মধ্যে বিবেক বৈরাগ্য আছে, তখন পণ্ডিতকে পণ্ডিত বলে মনে হয়, তা নাহলে পণ্ডিতকে মনে হয় খড়কুটো। আমি তো দু-পয়সার বললাম, ঠাকুর আরও নীচে নিয়ে যাচ্ছেন, বলছেন খড়কুটো, বাস্তবিক তাই। কিসের পিছনে মানুষ দৌড়াচ্ছে, নিজেরাও ভাল জানে না। কিন্তু আমাদের মন কেন দৌড়ায়? কারণ সংসার যে তন্মাত্রা দিয়ে তৈরী, আমাদের মন, আমাদের ইন্দ্রিয় একই তন্মাত্রা দিয়ে তৈরী। এদের ভাই-ভাইয়ের সম্পর্ক, সেইজন্য এক অপরের প্রতি দৌড়াচ্ছে। আমি কিন্তু আসলে ইন্দ্রিয় নই, মনও নই, ভ্রমবশতঃ মনে করছি, আমি ইন্দ্রিয়, আমি মন।

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।।২২।।

(যা লাভ করার পর যোগী অন্য লাভ তদপেক্ষা অধিক মনে করেন না এবং যে আত্মতত্ত্বে অবস্থিত হয়ে শস্ত্রনিপাদতাদিরূপ মহাদুঃখেও বিচলিত হন না, –)

কোন এক সময় ছেলে মায়ের কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল, মা খুব মনঃকষ্টে আছে। ছেলে একদিন হঠাৎ ফিরে এসেছে। মা ছেলেকে পেয়ে বলছেন, 'তুমি এসো গেছ বাবা, আমি এবার সব সহ্য করে নেব'। শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস হয়েছে, শ্রীরামচন্দ্রের মনে দুঃখ। মা সীতা শুনে বলছেন, 'আমিও আপনার সাথে বনে যাব'। শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে বোঝাচ্ছেন, 'বনে তুমি যেও না, সেখানে পদে পদে বিপদ এবং খুব কষ্টের জীবন'। সীতা বারবার বলছেন, 'আমি যদি আপনার সাথে থাকি,

তাহলে আমার কিসের কষ্ট, আমার কোন কষ্ট হবে না'। এই হল ভালবাসা। যেখানে ভালবাসা থাকে সেখানে সব কষ্ট মেনে নেয়। নিজের অন্তঃকরণে যিনি ঈশ্বরকে পরম চৈতন্যজ্যোতিঃস্বরূপ দেখে নিয়েছেন, তার আর কিসের থেকে কষ্ট হবে। ছোট শিশু তার যতই শরীর খারাপ থাকুক, একবার যদি সে মায়ের কোলে থাকতে পারে, তখন তার মুখটা হাসিতে ভরে যায়। খেলনা পেলেও তার মুখে খুশীর ভাব ফুটে ওঠে, কিন্তু মা মা, মা বেশি দামী। আত্মজ্ঞানী যিনি, যিনি ঈশ্বরদর্শন করেছেন, ঈশ্বরদর্শন যে একবার হয়ে গেছে তা না, নিত্যদর্শন; তিনিও এই রকম হয়ে যান। এটাকেই এখানে বলছেন, *যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ,* আত্মজ্ঞানীর আত্মজ্ঞান লাভের পর বিরাট কিছু লাভ হয়ে গেলেও ওটাকে তাঁর আর লাভ বলে মনে হয় না। *যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে,* অন্য দিকে যত বড় দুঃখই আসুক, কোন দুঃখকেই দুঃখ বলে বোধ হয় না। কারণ তিনি তাঁর স্বরূপকে জেনে গেছেন। লাভটাও জগতের, দুঃখটাও জগতের, তিনি এখন স্বরূপে অবস্থিত, জগৎ তাঁর খসে পড়ে গেছে।

খুব সাধারণ একটা উপমা নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হবে। সিনেমাতে অনেক সময় দেখা যায়, নায়ক কোন গুণ্ডাদের খপ্পড়ে পড়ে গেছে। হঠাৎ কোথা থেকে একটা গাড়ি এসে গেল, নায়ক কোন রকমে গাড়িতে উঠে পড়েছে, গাড়ি ওকে নিয়ে পালাচ্ছে। পিছন থেকে গুণ্ডারা পাথর ছুড়ছে, গালাগাল দিচ্ছে। নায়ক গাড়ি থেকেই বাচ্চাদের মত ওদের ভ্যাংচি কাটছে। আমাকে কিছু করতে পারবে না। গাড়ি নিয়ে সাঁ করে পালিয়ে গেল। সংযুক্তার স্বয়ম্বর চলছে, পৃথ্বিরাজ ঘোড়ায় করে এসে সংযুক্তাকে সেখান থেকে তুলে পালিয়ে গেলেন। পিছন থেকে সবাই চেঁচিয়ে যাচ্ছে। আর চেঁচিয়ে কি করবে। যা করার করে নিয়েছে। সুখটাও পড়ে থেকে যায়, দুঃখটাও পড়ে থেকে যায়। থেকে যায় শুধু – আত্মস্বরূপে অবস্থান।

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্নচেতসা।।২৩।।

(নিখিল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ সেই আত্মস্থিতিকে (ব্রাহ্মী-স্থিতিকে) অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে জানবে। নির্বেদশূন্য চিত্তে অধ্যবসায় সহকারে এই সমাধি অভ্যাস করা উচিত।)

এবার যোগকে এখানে উল্টো দিক থেকে পরিভাষিত করছেন। দুঃখের সংযোগই দুঃখের কারণ। আমাদের দুঃখ কেন হয়? কারণ দুঃখের সঙ্গে আমাদের সংযোগ হয়ে যায়। যোগ কি করে, এই যে দুঃখের সংযোগ হয়, এই সংযোগকে বিয়োগ করে দেয়। এটা বলছেন না যে, যোগ দুঃখের নাশ করে দেয়। মনের যে জায়গাতে সংযোগ হয়ে দুঃখের মিলন হয় সেই জায়গাটাকে কেটে উড়িয়ে আলাদা করে দেওয়া হল। রেলের ইঞ্জিনের সাথে কোচগুলোকে কাপ্লিং এর সাহায্যে আটকে রাখা হয়। এখন কাপ্লিংটা যদি খুলে দেওয়া হয় ইঞ্জিন বেরিয়ে চলে যাবে, কোচগুলো এক সময় চলতে চলতে থেমে যাবে। দুঃখ-সংযোগের এই কাপলিংটা যেই খুলে যাবে জগৎটা একটা জায়গাতে এসে থেমে থমকে পড়ে থাকবে, ইঞ্জিন নিজের মত বেরিয়ে চলে যাবে। কোচগুলোই জগৎ। গীতা একাধারে শাস্ত্র আবার এক অনবদ্য কাব্য, কাব্যিক ভাব নিয়ে বলছেন, এই যে দুঃখের সংযোগ, এটাকে বিয়োগ করে দিন। আমাদের মন যখন জগতে বিচরণ করে, তখন তার দুঃখের সঙ্গে সংযোগ হয়ে যায়। বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক হয় বলে দুঃখের সংযোগ, আত্মজ্ঞান এই সংযোগটাকে কেটে দেয়। সেইজন্য আর দুঃখ হবে না। সুখও সেই ভাবেই হয়, সুখের সংযোগটাও কেটে দেয়। এটাই তখন হয়ে গেল সুখ-দুঃখের পারে।

দুঃখ শব্দের উৎপত্তি নিয়ে একটা খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। এই সব বর্ণনা বিদেশীরাই দিয়ে থাকেন। সব সময় এদের সাথে এক মত হওয়া যায় না, কিন্তু কিছু কিছু বর্ণনা মজার। আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে আর্যরা রথে চলাচল করতেন। রথের চাকার যে ছিদ্র থাকে, যেখানে একটা

ডাণ্ডা লাগানো থাকে, ওটাকে বলে 'খ', 'খ' মানে আকাশ, 'খ'এর অর্থ হয় ছিদ্র। ইংরেজ পণ্ডিতরা লোকেদের বোঝাতে চাইতেন যে, তখনকার দিনে আর্যদের টেকনলজি উন্নত ছিল না, কিন্তু মনিয়র উইলিয়মস, এদের সাথে একমত ছিলেন না। কিন্তু বর্ণনাটা খুব মজার। বলতেন, ওই ছিদ্রটা যদি ঠিক না হয়, তাহলে রথ চলার সময় আরোহির ঝাঁকুনি লাগত, এটাকে তখনকার লোকেরা বলত 'দু', মানে খারাপ, 'খ' মানে ছিদ্র, ছিদ্রটা ভাল হয়নি বলে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। ছিদ্রটা যদি ভাল হত, রথ মসৃণ ভাবে চলত, ওটাকে বলতেন সুখ। এই থিয়োরীতে অনেকেই এক মত হবেন না, কারণ আগেকার দিনে রাস্তা এত মসৃণ ছিল না, যত ভাল ছিদ্র থাকুক, ঝাঁকুনি হবেই। কিন্তু গাড়িটাও ওঠা-নামা একটু অন্য ভাবে করবে। বলছেন, দুঃখ এখান থেকে এসেছে। মনিয়র উইলিয়মসও এটা মানছেন না, তিনি বলছেন, 'না, এটা প্রাকৃত থেকে এসেছে, বাংলায় দুঃস্থ যেটা বলা হয়, সেখান থেকে দুঃখ শব্দ এসেছে'। যাই হোক, আসল কথা জীবন যদি মসৃণ ভাবে না চলে, ওটাই হয়ে যায় দুঃখ। মসৃণ ভাবে জীবন চললে সুখ অনুভব হয়। দুটো ক্ষেত্রেই মন বস্তুর সঙ্গে জুড়ে যায় বলেই এই দুরবস্থা হয়, আত্মজ্ঞান এই সংযোগটাকে কেটে দিচ্ছে।

তং বিদ্যাৎ, ভাল করে এটা জান, এটাকে বোঝ অর্জুন। কি বুঝবে? *দুঃখসংযোগবিয়োগম্*, এই যে বলছেন, দুঃখসংযোগের বিয়োগ, এটাই যোগ। রাজযোগ যোগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছেন, *যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ*, চিত্তবৃত্তি নিরোধটাই যোগ। এখানে গীতায় বলছেন, যোগ মানে দুঃখসংযোগের বিয়োগ, গীতার যোগ আসলে বিয়োগ করে। মন যে জগতের সাথে জুড়ে রয়েছে, যোগ এই জুড়ে থাকাটা কেটে দেয়। *স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্নচেতসা*, এই যোগের জন্য যে চেষ্টা, যে সাধনা, এতে ছটফটানি চলে না। ধীর, স্থির ভাবে দীর্ঘকাল ব্যাপি নির্বেদশূন্য চিত্ত দ্বারা যোগের জন্য চেষ্টা করে যেতে হয়, এই যে আগে বলা হল, *স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য*।

তাহলে সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি কিসে হবে? আত্মস্থিতি হলে সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হবে। আত্মস্থিতি যা, ব্রাহ্মী-স্থিতিও তাই; যোগ এটাকেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলছেন। এই ভাব নিয়ে নির্বেদশূন্য হয়ে অধ্যবসায় সহকারে এই দুঃখ-সংযোগের আত্যন্তিক নিবৃত্তির অভ্যাস অর্থাৎ যোগ সাধনা করে যেতে হবে।

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ।।২৪।।

(সংকল্প জাত সমস্ত কামনা নিঃশেষে ত্যাগ করে মনের দ্বারাই ইন্দ্রিয় সমূহকে সব বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে, –।)

এই শ্লোকটিও অত্যান্ত মূল্যবান একটি শ্লোক। বেশির ভাগ লোকেরা এই জায়গাতেই গোলমাল করেন। যাদের মনে কোন সংকল্প আছে, আমি বড়লোক হব, আমি মন্ত্রী হব, আমি জয়ী হব, আমি সুখী হতে চাই; এদের দ্বারা ধ্যান হবে না। *সংকল্পপ্রভবান্ কামান্*, *প্রভবান্*, মানে উৎপত্তি হওয়া, সংকল্প থেকেই যত কামনার উৎপত্তি। আমাদের যত রকমের সংকল্প আছে, বলছেন, সমস্ত সংকল্প নিঃশেষ ভাবে, সংকল্পের বিন্দুমাত্র আঁশ না রেখে ছেড়ে দিতে হয়। *মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং*, এখানে গ্রাম মানে 'সমূহ', আমাদের গ্রাম শব্দও এখান থেকেই এসেছে, গ্রাম মানে যেখানে অনেকগুলো পরিবার একসাথে বাস করছে, এই পরিবার সমূহ থেকে তৈরী হয় গ্রাম। আমাদের মনে যে কামনা-বাসনাগুলি, আমাদের মনে যে সংকল্পগুলি, সবটা মিলে একসাথে যেন একটা বিশাল গ্রাম। গ্রাম মানে একটা দুটো পরিবার না, অনেক পরিবারে গ্রাম ভর্তি হয়ে আছে। *মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং*, ইন্দ্রিয় সমূহের গ্রাম, দশখানা ইন্দ্রিয় আর মনকে নিয়ে একাদশ, কিন্তু তারা সম্মিলিত ভাবে যে কাণ্ড ঘটায়, এদের এই সম্মিলিত কাণ্ডটাই তো আমাদের সামনে এক বিশাল

জগৎ সংসার রূপে দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে কি করতে হবে? *বিনিয়ম্য সমন্ততঃ*, এই ইন্দ্রিয়গ্রামকে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে।

সন্ন্যাসীরা যেভাবে ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন, ঠিক সেইভাবে মন দিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রামকে ত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে হবে। মূল কথা মনকে সংযম করতে হয়, নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। একদিনে মনকে, দশটা ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তাহলে কি করতে হবে? পরের শ্লোকে সেই কথাই বলছেন –

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহিতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।।২৫।।

(*ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা মনকে ধীরে ধীরে উপরত করতে হবে এবং আত্মাতে মনকে বিলীন করে অন্য কিছুই চিন্তা করবে না। এটাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ সাধন।*)

মঠের একজন মহারাজ, দেওঘর বিদ্যাপীঠে আমার ছাত্রাবস্থায় উনি ব্রহ্মচারী ছিলেন, এখনও আছেন, অনেক সিনিয়র মহারাজ, ওনার এই শ্লোকটা অত্যন্ত প্রিয় ছিল, প্রায়ই উনি এই শ্লোকটা বলতেন। যোগ কিভাবে হয়? *শনৈঃ শনৈঃ*, ধীরে ধীরে। আচার্য বলছেন *শনৈঃ শনৈঃ ন সহসা*, জ্ঞান অর্জন হুট্ করে হয় না, ধীরে ধীরে হয়। *উপরমেদ্*, আচার্য এটাকে বলছেন, *উপরতিং কুর্যাৎ*, নিজেকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে টেনে আনা, মনকে সংসার থেকে তুলে আনা। হঠাৎ একদিন ঠিক করলাম আজকে আমি নেপাল যাব; বাংলা প্রবাদের মত –উঠলো বাই তো কটক যাই; না, যোগ এভাবে হয় না, ধীরে ধীরে। রোজ সকাল আটটার সময় ঘুম থেকে ওঠা অভ্যাস, তাহলে কি করে জপধ্যান করব? ঠিক আছে, আটটাকে আগে সাড়ে সাতটায় নিয়ে আসুন। পনের দিন বা এক মাস সাড়ে সাতটায় উঠলেন, এবার এটাকে সাতটায় আনুন। কিন্তু তা না করে বলছেন, আমাকে জপধ্যান করতে হবে, কাল থেকে আমি ভোর চারটের সময় উঠব। দু দিন মনের একটা জেদে উঠে যাবেন ঠিকই, কিন্তু তৃতীয় দিন থেকে শরীর খারাপ হতে শুরু করবে। *বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহিতয়া*, এই উপরতি কিভাবে হয়, বুদ্ধির দ্বারা। কি ধরণের বুদ্ধি? বলছেন বুদ্ধিকে ধৃতি দিয়ে, ধৈর্য সহায়ে বুদ্ধি দ্বারা মনকে ধীরে ধীরে নিরুদ্ধ করার চেষ্টা করে যেতে হবে। যাঁদের ধ্যানের প্রতি একটু আগ্রহ আছে, তাঁরা অবশ্যই এই শ্লোকটাকে মুখস্ত করে এর অর্থকে মাথার মধ্যে ভাল করে বসিয়ে রাখলে খুব উপকার হবে।

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ, মনকে আত্মাতে নিবিষ্ট করে আত্মা ছাড়া আর অন্য কোন কিছুর চিন্তা করবে না। যাঁরা ইষ্টমন্ত্র জপ করেন, তাঁরা জপ করতে করতে ইষ্টের ভাবে লয় হয়ে যাবেন। আচার্য এই জিনিসটাকে নিয়েই বলছেন, *আত্মসংস্থম্ আত্মনি সংস্থিতম্ আত্মা এব সর্ব ন ততঃ অন্যৎ কিঞ্চিদ্ অস্তি*, আত্মা ছাড়া অন্য কিছু নেই, একমাত্র এই জিনিসটাকে চিন্তন করে করে বাকি সব কিছুকে মন থেকে একেবারে উড়িয়ে দিতে হয়। ঠাকুরের ইচ্ছা, ঠাকুরের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে, এই ভাব এনে জগৎকে মাথা থেকে নামিয়ে দিতে হবে।

স্বামী প্রমেয়ানন্দজী মহারাজ মঠের এক সময় ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। অনেক দিন আগে উনি একটা ঘটনার কথা আমাকে বলেছিলেন। মহারাষ্ট্রে একবার ভূমিকম্পে অনেক লোক মারা যায়, সেই সময় স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। স্বামী প্রমেয়ানন্দজী মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কি কর্ম যে সবাইকে এক সঙ্গে মরতে হল'? স্বামী ভূতেশানন্দজী উত্তর দিতে গিয়ে বললেন, 'যদি এগুলো বিচার করতে যাও, কেন মরল, কি কর্মের জন্য মরল, কিভাবে মরল; সারা জীবন খুঁজতে থাকলেও তুমি এর উত্তর পাবে না। ওটাকে তখন কর্মের উপর ফেলে দিতে হয়। মাথা থেকে নেমে গেল, এবার এগিয়ে যাও'। যাঁরা সাধনা করছেন, আমাদের মত লোকেদের জন্য এই

একই জিনিস প্রযোজ্য হবে। ওর এত নামযশ কেন, আমার কেন নেই? এগুলোকে ঠাকুরের ইচ্ছা বলে মন থেকে নামিয়ে দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়।

আমাদের এক খুব জ্ঞানী মহারাজ ছিলেন, গত হয়েছেন; উনি সব সময় বলতেন, চেষ্টা আর ঠাকুরের ইচ্ছা, এই দুটোকে ধরে এগিয়ে যাও। ধ্যানের ব্যাপারে, আধ্যাত্মিক ব্যাপারে নিজের চেষ্টা চালাতে হয়; সংসারের ব্যাপারে, নিজের শরীরের ব্যাপারে ঠাকুরের ইচ্ছার উপরে চালাতে হয়। আমরা ঠিক এর উল্টোটা করি। নিজের আহার, নিদ্রা, শারীরিক সুস্থতা ইত্যাদির ব্যাপারে আমরা সব সময় আমাদের চেষ্টা লাগাই। ওই লোকটা কি করে এত টাকা কামিয়ে নিল, আমাকেও কামাতে হবে। আর যখন জপধ্যানের ব্যাপার আসে, তখন বলি, প্রভু তুমি দেখবে, শেষ সময় তুমি নিয়ে যাবে এই প্রার্থনা করি। আধ্যাত্মিক জীবনে নিজের চেষ্টাটা হল প্রধান, আর সংসারের সব কিছু ঠাকুরের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিতে হয়।

এখানে আচার্য এটাই বলছেন, *আত্মা এব সর্ব ন ততঃ অন্যৎ কিঞ্চিদ্ অস্তি,* যাঁরা আত্মজ্ঞানের পথ নিয়েছেন, তাঁরা এই ভাবকেই আশ্রয় করে নিয়ে চলেন। আত্মাই আছেন, সব আত্মা, বাকি *বাচারম্ভাণাং বিকারোণামভিদয়েৎ,* বাকি শব্দের খেলা আর বিকার। আচার্য এখানে শেষে খুব সুন্দর কথা বলছেন, *ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েদ্ এষ যোগস্য পরমো বিধিঃ,* এটাই যোগের পরম বিধি। যদি জানতেন চান ধ্যান কিভাবে হয়, যদি জানতে চান যোগ কিভাবে হয় –তাহলে আপনাদের জন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঁচিশ নম্বর শ্লোক। *শনৈঃ শনৈঃ,* ধীরে ধীরে ধৈর্যপূর্বক, একদিন ধ্যান ভাল হল, আর-একদিন ধ্যান ভাল হল না, মন খারাপ করার কিছু নেই, লেগে থাকতে হবে। বরশি দিয়ে যারা মাছ ধরে, ছিপ ফেলে বসে আছে তো বসেই আছে, ঘন্টার পর ঘন্টা কোথা দিয়ে সময় চলে যায় টেরই পায় না। কোন দিন হয়তে অনেক মাছ ধরা পড়ল, কোন দিন হয়ত কোন মাছই পেল না।

আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে খুব নামকরা লেখক, সাহিত্যে নোবেল প্রাইজও পেয়েছিলেন। The Old Man in the Sea তাঁর খুব বিখ্যাত উপন্যাস। একাত্তর বছরের বৃদ্ধ জেলে, সে একাত্তর দিন মাছ ধরতে পারেনি। সবাই তাকে অভাগা বলছে। ওর এক চেলার মত একটা ছোকড়া ছিল, সেও তাকে ছেড়ে চলে গেছে। তারপরে যেদিন সে মাছ ধরতে সমুদ্রে বেরিয়ে গেল, সেদিন সে এত বড় এক মাছ ধরল যে, সে ওই মাছকে নৌকায় তুলতে পারছে না। ইতিমধ্যে অনেক দিন হয়ে গেল, এখনও ফিরে আসছে না দেখে লোকেরা মনে করছে সে মরে গেছে বা হারিয়ে গেছে। হেলিকপ্টার নিয়ে সার্চ করা হল, কোথাও পাওয়া গেল না। শেষে অবশ্য সে মাছটার কোন অবশিষ্টই পেল না, হেমিংওয়ের লেখাতে একটু নেগেটিভ দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, পরে তিনি সুইসাইডও করলেন। বৃদ্ধ জেলে, মাছ ধরতে পারছে না, কিন্তু জানে আমাকে এটাই করতে হবে, সেও মাছ ধরা ছাড়ছে না। আমি ধ্যানটুকুই জানি, আমাকেও এটাই করতে হবে। ধ্যানের জন্য আমি সব কিছু ত্যাগ করলাম। আচার্য বলছেন, *এষ যোগস্য পরমো বিধিঃ,* এটাই যোগের বা ধ্যানের পরম বিধি।

আমরা যে শাস্ত্রের কথা শুনছি, বা গুরুমুখে যে কথা শুনছেন, শাস্ত্রের এসব কথা শুনতে শুনতে মনে একটা ভাব তৈরী হয়। সেই ভাব ধীরে ধীরে একদিন পাকা হয়ে যায়। ভাব পাকা হয়ে গেলে মনের উপর একটা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হয়, যে মন এত দিন এত ডান দিক বাম দিক যাচ্ছিল, সেই মনকে তখন সেখান থেকে তুলে নিয়ে আসা যায়। এই যে মনকে তুলে আনা হল, এরপর মনকে *আত্মসংস্থম্,* আত্মচিন্তনে মনকে নিবদ্ধ করতে হয়। আমরা অনেকেই ছোটবেলা থেকে ঠাকুরের ভক্ত, ভক্ত পরিবারের সবাই ঠাকুরের ভক্ত হওয়াতে ছোটরাও বাচ্চা বয়স থেকেই ঠাকুরকে জানে। তারা বাচ্চা বয়স থেকে জানে শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান, কিন্তু তাতে হলটা কি! বাচ্চা বয়স থেকেই আমরা শুনে আসছি শ্রীরামচন্দ্র ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, কিন্তু তাতে হলটা কি! কিছুই হয় না, যেমন

ছিলাম তেমনই আছি। কিন্তু যখন শাস্ত্র অধ্যয়ন করা হয়, এই যে আমরা বারবার শাস্ত্র অনুধ্যানের কথা বলছি; শাস্ত্র অধ্যয়ন, শাস্ত্রের অনুধ্যান, এগুলো করে গেলে ধীরে ধীরে মনে একটা ছাপ পড়ে। ছাপ পড়তে পড়তে মন এত পাওয়ারফুল হয়ে যায় যে, যে মনের স্বভাব ডান দিক বাম দিকে যাওয়া, সেই মনকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার ক্ষমতা এসে যায়। একটা বাচ্চাকে যদি বিরাট একটা হাতিকে চালাতে দেওয়া হয়, সে কি কখন সেই হাতিকে চালাতে পারবে?

এক সময় আমি দেওঘর বিদ্যাপীঠে ব্রহ্মচারী ছিলাম। সেখান থেকে ট্রেনিং সেন্টারে চলে আসি। তখন আমাদের দেওঘর আশ্রমে গরুগাড়ি ছিল। গাড়ির বলদগুলো দেখতে খুব সুন্দর ছিল, ঝকঝকে স্বাস্থ্য। দেওঘর আশ্রমে যে ছেলেটি কাজ করত, কাজের জন্য তাকে গরুগাড়ি শহরের এদিক সেদিক নিয়ে যেত হত। গরুগাড়ি শহরে নিয়ে গেলে লোকেরা হাঁ করে বলদগুলিকে দেখত। একদিন আমি ওকে বললাম গরুগাড়িটা একটু দিতে, আমি চালাব। ছেলেটি গরুগাড়ি থেকে নেমে গিয়ে আমাকে দড়িটা দিয়ে দিল। যেমনি চালাতে শুরু করলাম সঙ্গে সঙ্গে বলদ দুটো বুঝে গেছে যে, এ আনাড়ি। ওরা দুজন এবার আমাকেই টেনে নিয়ে চলল, আমি যতই দড়ি টানছি আর যাই করছি, কিছুতেই বাগে আনতে পারছি না। গ্রীক মিথলজিতে এগুলোকে নিয়ে খুব সুন্দর কাহিনী আছে। যাই হোক, এবার রীতিমত দৌড়াতে শুরু করেছে। তখন যে ছেলেটি গরুগাড়ি চালায়, সে পিছন থেকে দৌড়ে এসে লাফ দিয়ে গরুগাড়িতে উঠে আমার হাত থেকে দড়িটা নিয়ে বলদ দুটোকে দুটো ডাণ্ডা মেরেছে, সঙ্গে সঙ্গে ওরা সোজা হয়ে গেছে।

এই যে ঘটনা, এতে আমি যেমন, আমাদের মনটাও তেমন। চঞ্চল মন, কিন্তু এই চঞ্চল মনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য উপযুক্ত ট্রেনিং দরকার। শাস্ত্র অধ্যয়ন করেনি, সাধুসঙ্গ করেনি, চেষ্টা করেনি, আচার্য সঙ্গ করেনি; ইউটিউবে দুটো লেকচার শুনে, বস্তাপচা টিভি সিরিয়াল দেখে, আর কয়েকটা থার্ড গ্রেড নিউজপেপার পড়ে মনটা আবর্জনায় ভরে গেছে। লোকেরা এটাই পছন্দ করে, রসালো খবর আর সহজ কথাই মানুষ গোগ্রাসে গিলে নিতে চায়, বুদ্ধি লাগাতে হয় না, কিন্তু এভাবে মন নিয়ন্ত্রণ হয় না। আগে আমাকে ঠিক করতে হবে, আমি যোগী হতে চাই, কি চাই না। যদি একেবারেই চাই না, তাহলে গীতা বা শাস্ত্রের এই ব্যখ্যাগুলো শোনার দরকার নেই, তবে একটু জানার জন্য শুনে নেওয়া যেতে পারে। যদি দোনমোনা করেন, তাহলে অবশ্যই শুনবেন। কারণ মন যাদের দোনমোনা করে, এই মুহূর্তে মন সংসারের দিকে যাচ্ছে, পর মুহূর্তে মন হাল্কা জিনিসের প্রতি চলে যাচ্ছে, আবার কোন সময় কোন শুভ জিনিসের প্রতি চলে যাচ্ছে, এদের জন্য শাস্ত্রের কথা শ্রবণ করা খুব দরকার। এতে ওজন বাড়ে, এবং ওজন যখন বাড়ে তখন শাস্ত্রের কৃপা হয়, তখন শাস্ত্র নিজেই নিজেকে প্রকট করে দিয়ে বলে দেন, বাপু আমার আসল অর্থ এই। এটা বাস্তবিক হয়। সেইজন্য ভগবান বলছেন, *শনৈঃ শনৈঃ*, ধীরে ধীরে। এখান থেকে আমরা এবার ধ্যানের ফল কি হয় দেখব।

এখানে পুরো জিনিসটাকে গুছিয়ে কয়েকটা কথা বলতে হচ্ছে, কারণ শাস্ত্রের জিনিসগুলোকে পুনরাবৃত্তি করতে হয়, বারবার আবৃত্তি না করলে শাস্ত্রের কথা মাথায় থাকে না। রাজযোগে পরিষ্কার দুটি সত্তাকে আনা হয়, একটা আত্মা বা ভগবান বা ব্রহ্ম, যোগ যাঁকে পুরুষ বলছেন, আর দ্বিতীয় মনের সত্তা। মনের সত্তাকে প্রকৃতি বা মায়া বলা হয়, আরও অন্যান্য শব্দ রয়েছে। আমরা সহজ ভাবে বলতে পারি মনের জগৎ। এই মনের জগৎ সত্যি না মিথ্যা এগুলোতে গিয়ে আমাদের কাজ নেই, কারণ অন্য জায়গায় আমরা এর বিস্তারিত আলোচনা করেছি, এখানে আর দরকার পড়বে না, চতুর্দশ অধ্যায়ে হয়ত একটু দরকার হতে পারে। একদিকে মূল কথা হল আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য। কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গে ঠাকুর বারবার শুদ্ধ চৈতন্যের কথা বলছেন, যেখানে আমি নেই, তুমি নেই, পাপ নেই, পূণ্য নেই, জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, শুধু আছে অস্তিত্ব আর আনন্দ। আবার অন্য দিকে মনের জগৎ বাস্তবিক সৃষ্টি হয়ে থাকুক, কিংবা মায়া হোক, মিথ্যা হোক, তাতে কিছু আসে যায় না।

মূল কথা হল, মনের জগৎ যেটাকে ‘আমি’ বোধ করছি, যাতে আমি একটা অঙ্গ, আমার আশেপাশে যারা আছে তারাও ওটার একটা অঙ্গ, ছোট অঙ্গ বড় অঙ্গ যাই হোক, কিন্তু অঙ্গ। এরা সবাই সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিন গুণের সংমিশ্রণ। এই তিনটি গুণ ধীরে ধীরে বায়ু, আকাশ আদি পরমাণুতে পাল্টে যায়, যেটাকে আমরা পঞ্চ তন্মাত্রা বলছি, বা পঞ্চভূতও বলি। এই পঞ্চভূত দিয়েই সব কিছু তৈরী। আমার শরীর, আমার ইন্দ্রিয় সবই এই পঞ্চভূত দিয়ে তৈরী, যেটা আবার আদিতে সত্ত্ব, রজো ও তমো দিয়ে তৈরী হয়েছে। আমি, আপনি, এই জগৎ, যা কিছু আছে, মন দিয়ে যা কিছু জানা যায় সব কিছু সত্ত্ব, রজো ও তমো দিয়ে তৈরী, এর পারে কেউ যেতে পারে না। একমাত্র শুদ্ধ চৈতন্য এর পারে, শুদ্ধ চৈতন্য ছাড়া বাকি সব কিছু এখানে রয়েছে।

আমরা মনে করি, আমার আসল সত্তা আমার শরীর, আমার মন, আমার অহঙ্কার। কিন্তু আমাদের প্রকৃত সত্তা শুদ্ধ আত্মার সত্তা। এটাই আশ্চর্য, দুটো পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, কোথাও কোন মিল নেই। যেটাকে আমি জল মনে করছি, আসলে সেটা ফুটন্ত লাভা বা এ্যসিড। স্কুলে পড়ার সময় আমাদের একটা তরল পদার্থ দেখিয়ে বলে দেওয়া হত, এটা সালফিউরিক এ্যসিড, এতে জল মিশিয়ে ডাইলিউট করতে হবে, কিন্তু এ্যসিড আর জল দুটো দেখতে এক রকম। ভুলে যদি একটু সালফিউরিক এ্যসিড হাতে পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে হাত পুড়ে যাবে। সংসারটা হল এ্যসিড, এ্যসিডকে যদি ডাইলিউট করতে হয়, তার একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। এটা শুধু উপমা দেওয়ার জন্য বলা হল। আমরা সবাই এই ভুলটা করে বসি। বেদান্তের দুটি পথ, একটা জ্ঞানের পথ আরেকটা ভক্তির পথ। দুটোই বেদান্তের পথ, লোকেরা প্রায়ই ভুল মনে করে যে, বেদান্ত শুধু আত্মার কথাই বলে। কিন্তু না, বেদান্ত মানে পরিষ্কার দুটি মত, একটা আচার্য শঙ্করের জ্ঞান পথ, যদিও আচার্য শঙ্কর সবটাই নেন; আর মাধ্বাচার্য, রামানুজাচার্য এনাদের ভক্তি পথ। জ্ঞান পথে এনারা দেখেন আত্মাই আছেন, বাকি সব আত্মার উপর নাম রূপের খেলা। ভক্ত দেখেন, কৃষ্ণই সব হয়েছেন, ঠাকুরই সব হয়েছেন, বাকিটা নাম রূপের খেলা। তাহলে দুটো জিনিস এসে যাচ্ছে, appearance and reality।

পাশ্চাত্য দর্শনে ব্রাডলি খুব নামকরা ফিলজফার, ওনার বই আছে Appearance and Reality। খ্রীশ্চানরা এই জিনিসটাকে কোন দিন বুঝতেই পারবে না, থিওরেটিক্যালি হয়ত ধরতে পারবে; কিন্তু ব্যবহারিক জীবনেও যে এটা সম্ভব, ওরা ধারণাই করতে পারবে না। কিন্তু আমাদের কাছে এটা ডাল-ভাত। আমাদের এখানে হিন্দুরা বাচ্চা বয়স থেকে শুনে আসছে, সব মায়া। Reality হল আত্মা, আর appearance হল মায়া, বাচ্চা বয়স থেকে আমরা এটা জেনে আসছি। তাহলে আমি যদি কোন জিনিসকে ভালবাসি, যারা সংসারে আছে তারা বাবা, মা, ভাই, বোন, স্বামী, স্ত্রী, সন্তান সবাইকে ভালবাসছে। আবার অনেক লোক আছে যাদের আমি পছন্দ করি না। কিছু লোকের প্রতি আমার আকর্ষণ, কিছু লোকের প্রতি আমার অনীহা। এটা কি ঠিক না ভুল? সম্পূর্ণ ঠিক। কারণ মন হল সত্ত্ব, রজো আর তমোগুণ দিয়ে তৈরী। যাকে পছন্দ করছি সেও সত্ত্ব রজো তমো দিয়ে তৈরী; যাকে পছন্দ করি না, সেও সত্ত্ব রজো ও তমো দিয়ে তৈরী। দুটো পাত্রে তেল আর জল মেশানো জল আছে, যদি দুটো পাত্রের জল একটা পাত্রে ঢেলে দেওয়া হয়, তখন তেল তেলের দিকে যাবে, জল জলের দিকে যাবে। ঠিক তেমনি যেটা আপনার পছন্দের আপনি তার দিকে যাবেন, যেটা আপনার পছন্দের না, যেটা আপনার স্বরূপ না, আপনি সেদিকে যাবেন না। মনের এটাই কাজ, রাগ আর দ্বেষ এই দুটো মনের এলাকা। আমাদের সবাইকে মনের এলাকাতেই থাকতে হবে। সেইজন্য যাকে ভালবাসি তার দিকে দৌড়ে যাব, যাকে ভালবাসি না, যাকে পছন্দ করি না, তার কাছ থেকে আমি সরে আসব, তার উপস্থিতি আমার সহ্য হবে না। কিন্তু আমাদের শাস্ত্র বারবার বলছেন, কথামৃত বলছেন, গীতা বলছেন, উপনিষদ বলছেন, তোমার আসল সত্তা আলাদা। কিন্তু আমরা ধরতে পারছি না। কেন ধরতে পারছি না?

কারণ যখন আমরা বিচার করছি, আমাদের মনে কোথাও একটু এই নিষ্ঠা জেগেছে যে, সত্যিই তো, গীতা বারবার এত করে যখন বলছেন আত্মাই সব হয়েছেন, ঠাকুরই সব হয়েছেন, তাহলে তিনিই সত্যি সব কিছু হয়েছেন, শত্রু মিত্র সব তিনিই হয়েছেন। কিন্তু কতক্ষণ এই ভাবটা আমরা ধরে রাখতে সক্ষম হচ্ছি? ঠাকুর উদাহরণ দিচ্ছেন তপ্ত লোহা, তাতে একটু জল ছিটিয়ে দিলে ছ্যাঁৎ করে সব জল উড়ে যায়। আত্মাই সব হয়েছেন, সব নাম রূপের খেলা, সব কিছু সমুদ্রের ঢেউএর মত, সমুদ্রই সত্য, ঢেউটা মিথ্যা, এই ভাব যতক্ষণে আসছে, আসতে আসতে ততক্ষণেই এই ভাবটা উড়ে যায়। ব্যবহারিক জীবনে, বাস্তব জগতে যখনই নামছি, তখন কিছুতেই এই ভাবটা ধরে রাখা যায় না, কখন উড়ে বেরিয়ে যায় বোঝারও কোন উপায় নেই। এই ভাবটাকে তখন আমাদের মন কিছুতেই মানতে চায় না। অথচ জিনিসটা অত্যন্ত সামান্য, অতি সাধারণ জিনিস।

বেদে বলছেন, *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি*, হে প্রভু তুমিই নারী হয়েছ, তুমিই পুরুষ হয়েছ, তুমিই যুবক, তুমিই যুবতী, তুমিই বৃদ্ধ, তুমিই শিশু, সব তুমিই হয়েছ। আর এই কথা একবার দুবার নয়, বারবার বলছেন। উপনিষদ বলছেন, আত্মা ছাড়া কিছু নেই, ভক্তিশাস্ত্র বলছেন, ভগবানই এই সব কিছু হয়েছেন, ঠাকুর তো কথামৃতের পাতায় পাতায় এই কথা বলছেন। আমাদেরও কোথাও মনে জেগে উঠেছে এটা সত্য, কিন্তু পালন করতে গেলে ধরে রাখতে পারি না। ঠাকুর বলছেন, তবলার বোল মুখে বলা সোজা, হাতে আনা খুব কঠিন। কেন আমরা ধরে রাখতে পারি না? কারণ সত্ত্ব, রজো আর তমো এদের খেলা চলছে। বুদ্ধি পাওয়ারফুল হওয়া মানেই বুদ্ধি সাত্ত্বিক, যাদের সাত্ত্বিক বুদ্ধি এদের মন সত্যিকারের পাওয়ারফুল। এরা যেটা করতে চাইবে, সেটাই করবে। আমাদের মন রাজসিক আর তামসিক। রজো তমো যেখানে থাকবে সেখানে সত্ত্ব কিছুটা থাকবেই, সত্ত্ব না থাকলে লোকেরা কোন পড়াশোনা করতে পারবে না, কোন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না। তমস না থাকলে তার ঘুমই হবে না। রজস না থাকলে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও নিতে পারবে না। তিনটে গুণ একসাথে থাকবে ঠিকই, কিন্তু দেখতে হবে প্রাধান্য কার, প্রভাব কার বেশি।

মনে যখন সত্ত্বের প্রাধান্য আসে তখন তার জ্ঞাননিষ্ঠা আসে, আর জ্ঞাননিষ্ঠা থেকে জ্ঞান আসে। এই যে আমরা ধর্ম পালন করতে পারছি না, জপ করতে পারছি না, ধ্যান করতে পারছি না, শত্রু-মিত্রের বিভেদ সরাতে পারছি না, কাম-ক্রোধ থেকে সরে আসতে পারছি না, কেন? মনে সত্ত্বগুণের অভাব, অল্প একটু রজোগুণ, বেশির ভাগটা তমোগুন। চল্লিশ পেরিয়ে গেলে তমোগুণের প্রাধান্য বেড়ে যায়, কারণ রজোগুণ আর থাকবে না, ইন্দ্রিয়ের জোর কমে যায়। পঞ্চাশ পেরিয়ে যাওয়ার পর সত্ত্বগুণে থাকার চেষ্টা যদি না করা হয়, তমোগুণে অবশ্যই চলে যাবে, কারণ রজোগুণ একেবারে তলানিতে চলে গেছে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে রজোগুণের পরিণামও আস্তে আস্তে কমতে শুরু করে। তিন ভাগের এক ভাগ করে তিনটে গুণ থাকবে, কিন্তু রজোগুণের তিন ভাগের এক ভাগ থেকে যেটা কমে যাচ্ছে, সেই ফাঁকা জায়গাটা তমোগুণ এসে দখল করে নেয়। আর আপনি সারা জীবন শাস্ত্র পড়েননি, যৌবন অবস্থায় যখন আপনাকে শাস্ত্র পড়তে বলা হয়েছিল, তখন বলেছিলেন, আমার এখনও গীতা পড়ার বয়স হয়নি, বৃদ্ধাবস্থায় শাস্ত্র পড়ব। তাই সত্ত্বগুণের ঘাটতি আগে থেকেই হয়ে আছে। ফলে যত বয়স বাড়ে তমোগুণও বৃদ্ধি পেতে পেতে প্রায় শতকরা নব্বইএর কাছে চলে যায়। রজোগুণ সাত থেকে আট শতাংশ আর সত্ত্বগুণ এক শতাংশ পড়ে থাকে। ওই এক শতাংশ সত্ত্বগুণ আছে বলে কোন রকমে নিউজপেপারটা পড়ছেন। আর যারা সারাদিন টিভি সিরিয়াল, নিউজ চ্যানেল দেখে যাচ্ছে, এরা সবাই তমোগুণের খদ্দের।

গীতা এখানে শুদ্ধ বেদান্তের ভাব, অর্থাৎ শুদ্ধ জ্ঞানের ভাব নিয়ে চলছেন। এনারা বারবার বলবেন, এই সংসার অনিত্য, বস্তু অনিত্য। এই অনিত্য জিনিসটাকে, বস্তুর অনিত্যতাকে আমাদের বারবার ভাবতে হয়, বিচার করতে হয়। আচার্য শঙ্করের বিখ্যাত *ভজগোবিন্দম ভজগোবিন্দম*

গোবিন্দম্ ভজ মূঢ়মতে স্তোত্রে বলছেন, *বিশ্বং ত্যাক্ত্বা স্বপ্নং বিচারম্*, এই বিশ্ব একটা স্বপ্ন, এটাকে সব সময় বিচার কর, বিচার করে করে এই জগৎকে ত্যাগ কর। ঠাকুর বলছেন, জগৎ যদি সত্য হত, কামারপুকুরকে সোনা দিয়ে মুড়ে দিতাম। আমাদের এক সন্ন্যাসী ভাই, তিনি বিরাট বড়লোক বাড়ি থেকে এসেছেন, প্রচণ্ড গুণী। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। অদ্বৈত আশ্রমে তখন আমি ব্রহ্মচারী ছিলাম, তখন থেকে আমার কাছে আসা যাওয়া করত। তখনও সে কলেজে পড়ছে, তখনই বলছে, একবার যদি আমার বিশ্বাস হয়ে যায় জগৎটা সত্য, তাহলে জগতে হেন ক্রাইম নেই যেটা আমি করব না, হেন ভোগ নেই যেটা আমি করতে ছাড়ব না, কিন্তু চেষ্টা করেও জগৎ আমার কাছে সত্য মনে হচ্ছে না। সে তখন লোকেদের জিজ্ঞেস করতে শুরু করল, এমন কোন জীবনধারা আছে যেখানে আমাকে কোন চুরি চামারি না করে, মিথ্যা কথা না বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। ওকে বলা হল, হ্যাঁ মিউজিকে হবে। তখন সে মিউজিক শিখতে শুরু করল। তারপর কিভাবে কিভাবে ঠাকুরের ভাবধারার সংস্পর্শে এসে বেলুড় মঠের সঙ্গে যুক্ত হল, এখন তো খুব উচ্চমানের সন্ন্যাসী। অথচ কি বিরাট বাড়ির ছেলে।

এই যে অনিত্য ভাব, জগতের এই অনিত্য ভাবকে আমরা অনেক ভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিচার করতে পারি –ঈশ্বরই যদি সত্য হন, তাহলে যাঁরা কৃষ্ণভক্ত, যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত; তাঁরা যদি ধরে নেন কৃষ্ণই সত্য, শ্রীরামকৃষ্ণই সত্য, তাহলে এসব ভোগ করার কি কোন অর্থ হয়? আর ঠাকুর যদি সত্য না হন, কৃষ্ণ যদি সত্য না হন, তাহলে ভোগ করে কি হবে, মৃত্যুর পর তো সব শেষ। পুনর্জন্ম যদি আমাদের নাই হয়, তাহলেও এত কিছু ভোগ করে কি লাভ, টাকা সঞ্চয় করে কি লাভ? আর পুনর্জন্ম যদি সত্য হয়, তাতেও টাকা সঞ্চয় করে কি লাভ? তাহলে তো আমাকে মুক্তির দিকে এগোতে হবে। এই জিনিসগুলিকে বারবার বিচার করতে হয়। বিচার করতে করতে যখন একটা দৃঢ় বিশ্বাস এসে গেল, গীতা যেখানে বলছেন *বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া*, তখন ধীরে ধীরে জপধ্যানে মন বসে। এবার ঠিক ঠিক যদি জপ হয়, ঠিক ঠিক যদি ধ্যান হতে শুরু হয়, যেগুলো আগে আমরা ব্যাখ্যা করে এসেছি, তখন মনের শক্তি বাড়তে শুরু হয়।

প্রথম অবস্থায় আমরা চেষ্টা করলেও ধ্যানের দিকে মনকে নিয়ে যেতে পারব না, ভগবান যদিও বললেন *শনৈঃ শনৈঃ উপরমেদ্*, তাতেও ধ্যানকে বেশিক্ষণ টেনে ধরে রাখতে পারব না। কারণ গাড়ি চালানোর জন্য যে ক্লাচ থাকে, ঐ ক্লাচটাই আমাদের দুর্বল, ফলে ওটাকে ধরে রাখতে পারছে না, ক্লাচ গীয়ারবক্সকে ধরে রাখতে পারছে না। ধরে রাখার এই শক্তিটা আসে, যার কথা ঠাকুর বার বার বলছেন, সাধুসঙ্গে, একান্ত বাসে আর তার সাথে অনিত্যের বিচার। অনেকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে, ইদানিং যুক্তিবাদীরাও এই ধরণের প্রশ্ন নিয়ে আসে, 'আপনাদের কি মনে হয় না যে, ধর্ম আত্মসম্মোহন, নিজেকেই আপনি সম্মোহিত করেছেন'? তাদের তখন এটাই বলতে হয়, 'ভাই জগৎটাই যে আত্মসম্মোহন নয়, কি প্রমাণ আছে তোমার কাছে'? খুবই সাধারণ যুক্তি, it cuts both ways। ধর্ম যদি সমাজের আফিং হয়, তাহলে কম্যুনিজম্ কি আফিং না? চীন, রাশিয়া, উত্তর কোরিয়ায় আজ তো এটাই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। শুধু কম্যুনিজমই না, যে কোন পলিটিক্যাল আইডিয়া, যে কোন চিন্তাধারাকে নিয়েই এই কথা বলা যায়। কি প্রমাণ আছে যে, ওটা সমাজের আফিং না? সমস্যা হল, আমরা মনে করি, আমি যেটাতে আছি সেটাই ঠিক, বাকি সব আফিং। আমরা এক অপরকে গালাগালি দিতে পারি, আর এর ওর গায়ে থুতু ছেটাতে পারি।

ধর্ম জীবন আমাদের এগুলো থেকে একটু আলাদা দিকে নিয়ে যায়। ধর্ম জীবন বলে, সংসার থেকে একটু আলাদা হও, একটু সংসার জীবন থেকে সরে এসো, শাস্ত্রের কথা একটু শোন, একটু সাধুসঙ্গ কর। এসব করলে কি হবে? মনে তোমার শুভ সংস্কার তৈরী হবে। আমাকে এক বন্ধু বলে, 'এই যে আপনি এত ক্লাশ নেন, আপনার কথা শুনে কি কারুর লাভ হয়েছে'? 'লাভ হওয়ার জন্য তো এই ক্লাশগুলো নয়, লাভ হবে না। লাভ হতে কত জন্ম লাগবে কেউ জানে না, এখন সবে

ছাপ পড়তে শুরু হয়েছে’। ট্যাপ দিয়ে টিপ্‌টিপ্‌ করে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে, তার নীচে একটা বড় বালতি দিলে সেই বালতিতে জল ভর্তি হতে কত সময় লাগবে ভেবে দেখুন। বালতি ভরতে যত মিনিট লাগবে, কারুর অত জন্ম, কারুর অত বছর লাগবে মনটাকে তৈরী করতে। কিন্তু জলের সাপ্লাইটা ঠিক মত এসে গেলে বালতি ভর্তি হতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। সাপ্লাই মানে, পুরো নিষ্ঠার সাথে শাস্ত্রের মধ্যে ডুবে গেল, পুরো নিষ্ঠার সাথে শাস্ত্রের কথা, শাস্ত্রের অর্থ চিন্তন করতে লাগল, চিন্তনটা হল প্রধান। তখন গভীর ধ্যানে জিনিসগুলো যথাবৎ প্রকাশ হয়ে যায়, জিনিসটা যেমন আছে ঠিক তেমনটা দেখতে পায়। এই কলম আমার হাতে আছে, তখন এই কলমটা আর কোন বিশেষ কলম থাকবে না, তখন এটা হয়ে যাবে লেখার একটা সরঞ্জাম।

বিয়ে বাড়িতে খাওয়ার সময় নিমন্ত্রিতদের জিজ্ঞেস করা হয়, রান্না কেমন হয়েছে, এই আইটেমটা কেমন হয়েছে। সবাই বলবে দারুণ, খুব ভাল, ইত্যাদি। কিন্তু কোন সন্ন্যাসীকে কোথাও কোন অনুষ্ঠানে খাওয়ার পর বা খেতে খেতে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, মহারাজ কেমন হয়েছে খেতে? বেশির ভাগ সন্ন্যাসী উত্তর দেবেন, ‘জানি না’। কারণ তিনি জানেন, আমাকে খেতে দেওয়া হয়েছে, আমাকে খেতে হবে, তাই খেয়ে নিচ্ছি, নুন কম হলেও খেয়ে নেবেন, নুন বেশি হলেও কিছু বলবেন না। সন্ন্যাসীর মনটাই ঐভাবে তৈরী হয়ে গেছে। আবার ভক্তরা সন্ন্যাসীদের বলে, ‘মহারাজ আপনার জন্য কি খাবার নিয়ে আসব, আপনি কি খেতে ভালবাসেন’? মহারাজরাও খুব অস্বস্থির মধ্যে পড়ে যান; মঠের ডাল, ভাত, চচ্চড়ি খেয়ে বড় হয়েছেন, এর বাইরে খাবারের ব্যাপারে তাঁদের কোন অভিজ্ঞতাই নেই; কিছুই জানেন না, কোন আগ্রহও নেই, স্বাদ গ্রহণের সূক্ষ্ম অনুভূতিটাই ভোঁতা হয়ে গেছে। অবশ্য সব সন্ন্যাসীরা এক রকম নন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী খুবই রসিক মানুষ ছিলেন। ওনার জীবনে প্রচুর ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। ষাটের দশকে তিনি রাজকোটে ছিলেন। গুজরাটের একজন ভক্ত মহারাজের খুব কাছের ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। ওনার খুব ইচ্ছা যে, মহারাজকে একদিন ওখানকার একটা নামকরা পান খাওয়াবেন। মহারাজ আবার পান খেতেন না, এই ধরণের তাঁর কোন নেশাই ছিল না। একদিন মহারাজের জন্য সেই ভক্তটি তখনকার দিনের পঁচিশ টাকা দামের একটা পান নিয়ে এসেছেন। ভক্তটি খুব আবদার করে মহারাজকে খেতে বলছেন। মহারাজও নিয়েছেন, মুখে দিয়ে চিবোতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর গুজরাটী ভক্ত জিজ্ঞেস করেছেন, ‘স্বামীজী কেমন লাগছে’? মহারাজ হেসে মজা করে বলছেন, ‘ছাগলের মত নিজেকে মনে হচ্ছে, ঘাস চিবোচ্ছি’। ভক্তটি হাতজোড় করে বলছেন, ‘আর কোন দিন আপনাকে পান খেতে বলব না’। এই যে কোন বস্তু বা কোন ব্যক্তির প্রতি যে special feeling থাকে, বিচার করে করে এটাকে উড়িয়ে দিতে হয়।

যখন জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন এটাকে বলে *ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা*, বুদ্ধি কানায় কানায় জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। মন তখন কিছুই না, হাতে বা পায়ের তলায় যেন সিংহের বদলে একটা ইঁদুর এসে গেছে। ধ্যানের ফল এটাই। ধ্যান মনকে পুরো সাত্ত্বিক তৈরী করে দেয়। সাত্ত্বিক হয়ে যাওয়ার ফলে ইন্দ্রিয়ের পিছন পিছন মন যে এতদিন দৌড়াচ্ছিল, এই দৌড়ানটা বন্ধ হয়ে যায়। মনের এই দৌড়ানটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে কি হয়? মন ঈশ্বরের দিকে চলে যায়, গীতায় যেহেতু আত্মতত্ত্বের আলোচনা চলছে, সেইহেতু এখানে বলবেন –মন সেই আত্মতত্ত্বের দিকে চলে যায়। কিন্তু যাঁরা ভক্ত, যিনি কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত, যিনি ঠাকুরের মন্ত্রে দীক্ষিত, তিনি তখন দেখতে শুরু করেন, আমার কৃষ্ণই সব কিছু হয়েছেন বা আমার ঠাকুরই এই সব কিছু হয়েছেন। প্রথমে হল বিচার করা, বিচার করাটা খুব দরকার, বিচার যদি না করা হয়, ধ্যান কোন কাজে লাগবে না; বিচার ছাড়া ধ্যান মানে ধ্যানে মনের একটু বিশ্রাম হবে আর আমি ধ্যান করছি, এর বেশি কিছু হবে না। বিচার করে করে সেই সত্যের উপর মনকে যখন বসিয়ে দেবেন, আস্তে আস্তে মন শক্তিশালী হতে শুরু হবে।

আমরা যেখানে সত্ত্ব, রজো ও তমো থেকে শুরু করেছিলাম; সেখানে বলা হয়েছিল প্রথমে তমোকে কাটাতে হয়, তারপর শাস্ত্র অধ্যয়ন করে করে রজোকে দাবাতে হয়। যাঁরা গীতার আলোচনা শুনছেন, ওনারা যদি নিজেদের বন্ধুবান্ধবদের বা পাড়ার পরিচিতদের বা এমনকি বাড়ির লোকেদের বলেন – ইউটিউবে গীতার আলোচনা হচ্ছে একটু শুনে দেখ না। কেউ শুনতে চাইবে না। এনারা কি সবাই রজোগুণী? একেবারেই না, সব তমোগুণী; গীতার এসব কথা নিতেই পারবে না। ধর্ম একটু কম বয়স থেকেই শুরু করতে হয়। কারণ কম বয়সে রজোগুণটা বেশি থাকে, বেশি বয়সে রজোগুণ কমে গিয়ে তমোগুণ এসে সেই জায়গাটা দখল করে নেয়। যাই হোক, আমরা আবার গীতার মূল শ্লোকের উপর আলোচনা শুরু করছি।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ।।২৬।।

(ধ্যান দ্বারা সমাধি পাওয়ার চেষ্টায় রত যোগী চঞ্চল ও অস্থির মন যে যে বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় সেই সেই বিষয় থেকে টেনে এনে মনকে আত্মাতেই স্থিত করবেন।)

আগের শ্লোকে *শনৈঃ শনৈরুপমেদ্* বললেন, ধীরে ধীরে মনকে নিয়ন্ত্রণে আনা হচ্ছে, তারপর বলছেন, *যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্,* মন সব সময় চঞ্চল, স্বাভাবিক ভাবেই মন অস্থির। সবাই এসে প্রশ্ন করেন, মনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণে আনব, আরে ভাই মন নিয়ন্ত্রণে আসার নয়, স্বভাবেই মন অস্থির। যখন পাকা বুদ্ধি হয়; বড় বিজনেসম্যান, যেমন বিল গেটস্ ঠিক করে রেখেছে আমাকে টাকা আয় করতে হবে, এই ব্যাপারে বুদ্ধিটা ওনার পাকা; ভুল দিকে আছে, তা থাকুক, কিন্তু পাকা। একজন বড় বৈজ্ঞানিক, তিনি বলছেন, আমাকে এর শেষ দেখতে হবে, এই ব্যাপারে তাঁর পাকা বুদ্ধি। পাকা বুদ্ধি এখানেও করতে হবে। কিন্তু চঞ্চল মন কি করে, পড়ার সময় খেলার কথা, খেলার সময় পড়ার কথা মনে পড়ছে, ক্লাশে গিয়ে ভাবছে, ঘন্টাটা কখন পড়বে, এই ক্লাশটা কখন শেষ হবে। কারণ তার কাছে আইডিয়াটা পরিষ্কার না।

যতো যতো নিশ্চরতি, মন স্বভাবত চঞ্চল, *অস্থিরম্;* সেইজন্য বলছেন, যেমন যেমন মন চঞ্চল হবে, মনকে ধ্যেয় বস্তুতে স্থির করানো যাচ্ছে না, *ততস্ততো নিয়ম্যৈতদ্,* তেমন তেমন তত অভ্যাস করে করে, অনুশীলন করে করে এই চঞ্চল মনকে নিয়ন্ত্রণ করে মনের মোড়টা ফিরিয়ে দিতে হয় আত্মজ্ঞানের দিকে। আচার্য এখানে *যতো যতো* এটাকে নিয়ে বলছেন, *যস্মাদ্ যস্মাদ্ নিমিত্তাৎ শব্দাদেঃ নিশ্চরতি,* শব্দ দিয়ে পাঁচটি ইন্দ্রিয়কেই বলে দিলেন, পাঁচ ইন্দ্রিয় দিয়ে বাইরে থেকে যাবতীয় যা কিছু ভিতরে আসে, আপনি একটু বিচার করে দেখুন পঞ্চ ইন্দ্রিয় বা দশ ইন্দ্রিয়ের কোন জিনিস আছে, যেটা আপনার মনকে চঞ্চল করে। আপনি যাকে ভালবাসেন তাকে দেখতে ইচ্ছে করে। ঠাকুর বর্ণনা করছেন, দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে এসে একজন বলছে, যাই আমার নাতির চাঁদ মুখটা একবার দেখে আসি। গঙ্গার ঘাটে এসেছ, একটু গায়ত্রী জপ করো, না হয় একটু ঈশ্বরের নাম করো, সামনেই মা ভবতারিণীর মন্দির সেখানে বসে একটু মা কালীর ধ্যান করো। তা না, মন চঞ্চল হয়ে গেছে, আমার নাতির চাঁদ মুখ দেখব।

আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, যে বিষয় থেকে মনের মধ্যে চাঞ্চল্য তৈরী হয় সেটাকে বিচার করতে হয়, *যথাত্ম্যনিরুপণেন আভাসীকৃত্য বৈরাগ্যভাবনয়া,* যখনই কোন শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বিষয় মনকে টানে, তখনই দেখতে হয় *যথাত্ম্যনিরুপণেন,* এই যে এর আগে আমরা এত লম্বা আলোচনা করে এলাম, কোন বস্তুকে আমরা যখন পেতে চাই, তাতে মনটা আমাদের চঞ্চল হয়ে ওঠে, আর বুঝতে পারছি এই বস্তুটা ধ্যানে আমাকে বারবার ব্যাঘাত ঘটায়, তখন এই বিচার আনতে হয়, *আত্মনিরুপণেন,* আসলে এটা তো আত্মাই, আত্মা এই রূপ ধারণ করে

আমার কাছে আসছেন, কিন্তু আমি এখন ধ্যান করব, এই রূপ আমার এখন লাগবে না, এখন আমার লাগবে আত্মা।

ঈশাবাস্যোপনিষদের সেই তেজী ব্রাহ্মণ, যিনি সারা জীবন নিষ্ঠার সাথে অগ্নিহোত্রাদি করে এসেছেন, তিনি তাঁর জীবনের অন্তিম মুহুর্তে বলছেন, *হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।।* হে সূর্য, তোমার সেই আদিত্য রূপ, যে রূপের আলো দিয়ে তুমি নিজেকে আবৃত করে রেখেছ, এই আবরণ তুমি সরিয়ে নাও। *যত্তে রূপং কল্যাণতমং*, তোমার যে কল্যাণতম রূপ, সেই রূপ আমি দেখতে চাইছি। আমি সমুদ্র দেখতে চাইছি, আমি ঢেউ দেখতে চাই না। আচার্য বলছেন, বারবার এইভাবে বিচার করে করে মনকে আত্মাতে নিরোধ করতে হয়। যাঁরা ভক্ত, যাঁরা সত্যিই চাইছেন সাধনা করে মনুষ্য জীবনের চরম সার্থকতাতে নিজেকে নিয়ে যেতে, তাঁদের মনকে যখনই কোন দিকে টানে, তখন এটাই তাঁদের বলতে হয়, এটাও ঠাকুরের একটা রূপ, ঠাকুরই এই রূপে আসছেন; কিন্তু আমি তো এই রূপ চাই না, আমি ঠাকুরকে চাই।

দু-তিন সপ্তাহের পর নূতন বছর আসবে। নূতন বছরে আমরা কত সংকল্প করব, কত প্রতিজ্ঞা করব। আমি সঙ্কল্প করলাম নূতন বছর থেকে আমি এই রকম হব। কিন্তু প্রথম দিনের দুপুর হতে হতেই সব সঙ্কল্প উড়ে যায় বা হদ্দ একদিন চলে। কেন? এই সঙ্কল্পকে ধরে রাখার জন্য আঁট চাই, আঁট আসে সত্ত্বগুণ থেকে। রজোগুণ ক্রোধ নিয়ে আসে, অহঙ্কার এনে দেয়। এই মুহূর্তে আমি ভাবছি, আমি দেখব সব কিছু আত্মার উপর খেলা চলছে, ভগবানই সব হয়েছেন; পর মুহুর্তেই এই ভাবটা চলে যায়। কেন? সত্ত্বগুণের অভাব। সত্ত্বগুণে আঁট হয়, ধরে রাখার ক্ষমতা হয়। আচার্য এটাই বলছেন, *বৈরাগ্যভাবনয়া...... যোগাভ্যাসবলাদ্*, বৈরাগ্য ভাবনা আর যোগ অভ্যাস, দুটোকে সব সময় অনুশীলন করতে হয়। সেইজন্য যোগ কোন part-time job না, ধ্যান full time job। যদি জপধ্যান করতে চাইছেন, তাহলে পরিষ্কার, সারাটা দিন ঐ ভাব, ঐ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলতে হবে। ঐ ভাব আর ঐ দৃষ্টিভঙ্গী যদি না থাকে, আপনি মনে করলেন সন্ধ্যেবেলা ধ্যানে বসবেন আর ধ্যান হয়ে যাবে? কখনই ধ্যান হবে না। ধ্যান করতে বসলে কাজের কথা মনে পড়বে, তাতে দোষের কিছু নেই, কিন্তু মন যে চঞ্চল হয়ে আছে; মনের মধ্যে সব সময় এই ভাব চলছে –আমি জয়ী হতে চাই, আমি কাজ করতে চাই না, টিভির এই সিরিয়ালটা আমাকে দেখতে হবে, যাই একটু আড্ডা মেরে আসি। বার বার বিচার করে করে মনের মাথায় ডাণ্ডা মেরে মেরে আত্মচিন্তনে মনকে নিরোধ করতে হবে। খুব সহজ কথায় বলছেন, হাতি পরের কলাগাছে মুখ বাড়ালে মাহুত হাতির মাথায় ড্যাঙস মারে। এই ড্যাঙস মারার শক্তিটা আসে বৈরাগ্য আর অভ্যাস দিয়ে।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্।।২৭।।

(প্রশান্তচিত্ত, মোহাদি ক্লেশরূপ রজোবৃত্তিশূন্য, নিষ্পাপ ও ব্রহ্মভাব-প্রাপ্ত যোগীই পরম সুখ লাভ করেন।)

মনে রাখবেন এখনও ধ্যান হচ্ছে না, মন এখন শান্ত করা হচ্ছে। বারবার বিচার করে করে মনকে শান্ত করা হচ্ছে, বিচার করে করে শব্দাদি থেকে মনকে সরিয়ে শান্ত করা হচ্ছে। যত বিচার করা হবে ধ্যান তত ভাল হবে, ধ্যান যত ভাল হবে মনের শক্তিও তত বাড়বে। এই পদ্ধতি একদিনের না, এক মাস কি এক বছরের জন্যও না। আচার্য পরিষ্কার বলছেন, *শান্তরজসং প্রক্ষীণমোহাদিক্লেশরজসম্,* রজোগুণ যার নিয়ন্ত্রণে এসেছে, রজোগুণ নিয়ন্ত্রণে আসা মানে *প্রক্ষীণমোহাদিক্লেশ,* ক্রোধ, মোহ এগুলো আমাদের পীড়া দেয়, আর এগুলো রজোগুণ থেকে জন্ম নেয়। *অকল্মষম্* মানে নিষ্পাপ, এর আগে তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জুনের প্রশ্ন ছিল মানুষকে কোন শক্তি পাপ কর্মে প্রবৃত্ত করে, সেখানেও ভগবান বলেছিলেন *কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভব*। রজোগুণ

নিয়ন্ত্রণ করার ফলে কাম, ক্রোধ মোহ সব আস্তে আস্তে *প্রক্ষীণ* অর্থাৎ ক্ষীণ হয়ে আসে, এবং সে নিষ্পাপ হয়ে যায়। যেমন যেমন মোহাদি ক্ষীণ হয়ে আসবে, যত নিষ্পাপ হয়ে বিচার ও ধ্যানের মধ্য দিয়ে এগোতে শুরু করবে, ততো ততো এই ভাব আসতে থাকবে –*ব্রহ্মভূতং জীবন্মুক্তং ব্রহ্ম এব সর্বম্*, ব্রহ্মই সব হয়েছেন, ঠাকুরই সব হয়েছেন। বিচার করে, ধ্যান করে এই ভাব যত আমাদের ভিতর দৃঢ় হবে, *যোগিনং সুখমুত্তমম্*, এই ধরণের যোগী তত সুখ পাবেন।

তাহলে ধ্যানের ফল কি হল? উত্তম সুখ। উত্তম সুখ কি? এই জিনিসটাকে জানা –ব্রহ্মই আছেন, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই। এটা কেবল বিশ্বাস করা না, এই ভাবকে দৃঢ় করা, ধারণা করা, তখন মন এই ভাবের উপর বসে যায়। ফলে রজোগুণের যে কার্য –কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি এগুলো কমে যায়। এই সুখই সত্ত্বগুণ থেকে আসে, সুখ হল সত্ত্বগুণের লক্ষণ। *সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ*।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে।।২৮।।

(*এই ভাবে মনকে সর্বদা যোগযুক্ত করে নিষ্পাপ যোগী অনায়াসে ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন আত্যন্তিক শান্তি লাভ করেন।*)

অশ্নন্ মানে খাওয়া, কয়েকটা শ্লোক আগে বলা হয়েছিল। আচার্য বলছেন, *যুঞ্জন্ এবং যথোক্তেন ক্রমেণ যোগী যোগান্তরায়বর্জিতঃ*, রাজযোগে যোগের বিঘ্ন নিয়ে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে, ব্যাধি, স্ত্যান, নিদ্রা, আলস্য, প্রমাদ, এগুলো হল সব যোগের বিঘ্ন। যোগের পথে চলতে গেলে এই বিঘ্নগুলি আসবেই, কিছু না কিছু হবে। যোগে যদি নাও নামে, তাও এগুলো বিঘ্ন ঘটাবে। শরীরে ব্যাধি হওয়া, বেশি ঘুম পাওয়া, আলস্য তমোগুণের লক্ষণ; এগুলো কাজকর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। আচার্য বলছেন, যেমন যেমন যোগের বিঘ্নগুলো কমে আসবে, ধীরে ধীরে যোগী যখন নিষ্পাপ হবে, অর্থাৎ যোগীর রজোগুণ, তমোগুণ আর নেই; তখন তাঁর চিত্ত সমাহিত হতে শুরু করে। আর তখন কি হয়, ব্রহ্মপ্রাপ্তি রূপ যে সুখ, এখানে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ধারণা দেওয়া হচ্ছে, এটা আসল ব্রহ্মজ্ঞান নয়, যেটা নিজে থেকে পরে হয়; বলছেন এই ব্রহ্মসুখ উৎকৃষ্ট সুখ, এর মত সুখ আর হয় না। এই যে ব্রহ্মসুখের কথা বলছেন, এখনও কিন্তু তিনি মনের জগতেই আছেন, আসল ব্রহ্মজ্ঞানটা হয়নি, আর এটাকে নিয়ে এখানে আলোচনাও করছেন না। আসল জ্ঞান তাঁর হাতে, তিনি কবে কৃপা করে দেবেন, কিভাবে দেবেন কেউ জানে না।

যুঞ্জন্নেবং, যিনি চব্বিশ ঘন্টা মনকে সেই আত্মাতে যুক্ত করে রেখেছেন, সকাল বিকেল একশ আটবার জপ করা আধ্যাত্মিক জীবন নয়, যিনি চব্বিশ ঘন্টা লেগে আছেন, এক মিনিটেরও ফাঁক থাকবে না। বলবেন, তাহলে যখন দেহের যে কর্মাদি করা হচ্ছে তখন কি করে হবে, দাঁত ব্রাশ করছি, স্নান করছি, শৌচাদি করছি? ভগবান পঞ্চম অধ্যায়ে এই ব্যাপারটাকে একটা শ্লোকে পেরিয়ে এসেছেন –*পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্*; তখন আমি দেখছি ইন্দ্রিয়গুলো যার যার নিজের কাজ করে যাচ্ছে, আমি তো ইন্দ্রিয়গুলো থেকে আলাদা। এই হচ্ছে যোগের অবস্থা। আর ভোগের অবস্থায় হবে, আমার বিরিয়ানি চাই, আমার চাউমিন চাই, আমার এই চাই সেই চাই, তার মানে আমার যখন সংকল্প এসে গেলে এটা চাই ওটা চাই করে, তখন এগুলো কে করছে বলবে? তখন আর ইন্দ্রিয় কিছুই করছে না, আমিই সব করছি, ইন্দ্রিয়ের সাথে অহংতা আর মমতা মিশে গেছে। আমি যদি কাউকে খুব ভালোবাসি আর তার দিকে যদি হাঁ করে তাকিয়ে থাকি, এবার ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের কাজ করছে না, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আমি জড়িয়ে গেছে, সঙ্গে সংকল্প ঢুকে গেছে। আমি আর সংকল্প যখন ঢুকে গেল তখন এই কাজটা আর যোগ হবে না, তখন এটাই হয়ে যাবে ভোগ।

যখন কর্ম হচ্ছে তখন কর্মের যত ক্রিয়া হচ্ছে তা যোগ আর ভোগের ক্রিয়া, এই ক্ষেত্রে একই ভাবে হবে, কোন পার্থক্য করা যাবে না। একজন মহাভোগী আর ভগবান বুদ্ধের মত একজন মহাযোগীকে একসাথে দাঁড় করিয়ে দিলে দুজনের মধ্যে কোন তফাৎ পাওয়া যাবে না। তফাৎটা কোথায় থাকে? মাথায়। কিসের তফাৎ? একজনের সংকল্প আছে, আর-একজনের সংকল্প নেই, ব্যস্ এতটুকুই পার্থক্য। অগস্ত্য মুনি লোপমুদ্রাকে বিয়ে করলেন। অনেক দিন পরে অগস্ত্য মুনি লোপমুদ্রাকে বলছেন, 'তোমাকে আমি বিয়ে করেছিলাম যাতে আমাদের সন্তান হয়, যাতে আমার পূর্বজরা পূত নামক নরক থেকে উদ্ধার হন। সেইজন্য আমাদের গৃহস্থ কর্ম করতে হবে'। লোপমুদ্রা বলছেন, 'ঠিকই, এর জন্যই আপনি আমাকে বিবাহ করেছিলেন, অবশ্যই গৃহস্থ কর্ম করবেন'। এখানেও কিন্তু সেই ধরণের কোন সংকল্প নেই, নারীকে বিয়ে করার পরে যে গ্রহণ করা হচ্ছে, এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু এখানেও কোন সংকল্প নেই, এটাই হচ্ছে উচ্চ অবস্থা। আমার এটা কর্তব্য, আমি করে দিলাম। কিন্তু এখন সব উল্টো, তুমি আমাকে বিয়ে কর না কর, সন্তান দাও না দাও, আমার ভালোবাসা চাই। এখন ভোগটাই চূড়ান্ত হয়ে গেছে, দুদিন পাঁচ দিন ভোগটা করে যে মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসবে, তাও হয় না।

কিন্তু এই উচ্চ অবস্থায় যোগ আর শরীর ধারণের জন্য যেটুকু ভোগ করতে হয়, খাওয়া পড়া, শোওয়া, বসা সবটাই এক রকম। কিন্তু এখানে যোগ আর ভোগের তফাৎ হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গিতে। ভোগের ক্ষেত্রে সংকল্প থাকে যোগের ক্ষেত্রে সংকল্প থাকে না। সংকল্পহীন যখন ক্রিয়া হয় তখন যোগ হয়ে যাবে আর সংকল্পযুক্ত ক্রিয়া হচ্ছে ভোগ। এই যে এতক্ষণ ধরে যে কথাগুলো বলা হল এতে কি হবে? পরের শ্লোকে বলছেন ধারণাতেও যদি এই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, তখন কি হয়?

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ।।২৯।।

(এই রূপ যোগাবস্থাতে আরূঢ় পুরুষ সর্বত্র ব্রহ্মদর্শী হয়ে শুদ্ধ পরমাত্মাকে সর্বভূতে এবং সমস্ত ভূতকে নিজ আত্মাতে অভেদরূপে দর্শন করেন।)

যোগীর অন্তঃকরণ যদি সমাহিত হয়ে যায়, তার মানে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে গেছে, মনকেও নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে, তখন এই প্রকার যোগীর সর্বত্র সমদৃষ্টি এসে যায়। এটা কিন্তু তিনি অনুশীলন করে করে এই অবস্থায় পৌঁছেছেন। তখন কি হয়, মন থেকে তার সমস্ত ভেদ বুদ্ধি চলে যায়, তখন সমস্ত জীব, জগতের সব কিছুকে নিজের ভিতরে দেখেন। উপনিষদে খুব সুন্দর মন্ত্রে বলছেন, *মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*, তিনি দেখেন আমার থেকেই সব কিছু বেরিয়েছে। শুধু তাই না, যত জীব আছে সবার মধ্যে তিনি নিজেকেই দেখেন। ধ্যানের শেষে কি ফল হয়? পর পর ধ্যানের ফল বলে যাচ্ছেন। ধ্যানে আরূঢ় যোগী একত্ব লাভ করেন, সমরসত্ব প্রাপ্ত হন। সত্ত্বগুণ দিয়ে রজোগুণ ও তমোগুণের দাপাদাপিটাকে দমিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে, ফলে যোগী তাঁর মনকে সহজে স্থির করতে পারছেন, ধ্যানের গভীরতা বাড়ছে। ধ্যানের গভীরতা আসার জন্য মনের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বেড়ে যায়, সেখান থেকে আস্তে আস্তে সমত্ব বুদ্ধি আসে। এই সমরসত্ব যদি এসে যায়, তাহলে কি হবে? সমত্ব বুদ্ধি এসে গেলে যোগী পুরোপুরি ঈশ্বরের দিকে চলে যান।

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।।৩০।।

(যিনি আমাকে সর্বত্র দেখেন এবং আমাতে সমস্ত প্রাণীকে অবস্থিত দেখেন, আমি সেই আত্মৈকত্বদর্শীর অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার অদৃশ্য হন না।)

এর অর্থ খুব সহজ। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *যো মাং পশ্যতি সর্বত্র*, যে আমাকে সব জায়গায় দেখে, সাপের মধ্যে, সিংহের মধ্যে, বিছের মধ্যে, কেঁচোর মধ্যে সবার ভিতর আমাকেই সে দেখে। রুডিয়ার্ড কিপ্লিং খুব সুন্দর একটা গল্প লিখেছিলেন, যে গল্পে একজন খুব ক্ষমতাশালী মন্ত্রী সব কিছু ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। হিমালয়ের একটা নির্জন জায়গায় তিনি সাধনা করছেন। সেখানে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে; সেখানকার যত পশুপাখি, সাপ, বিছে, হরিণ, সিংহ সব প্রাণীর সাথে তাঁর কি রকম একটা একাত্ম ভাব হয়ে গিয়েছিল। ভগবান বলছেন, যে আমাকে সব জায়গায় দেখে, *তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি*, এই রকম লোককে আমি কখন নাশ করি না, অর্থাৎ ভুলে যাই না; আর সেও আমাকে কক্ষণ ভুলে যায় না।

আমি কি চাই ঠাকুর সব সময় আমাকে মনে রাখুন, তাহলে আমিও যেন কখন ঠাকুরের নাশ না করি। ঠাকুরের নাশ কখন হয়? যখন মনে অন্য চিন্তা ঢুকে যায়, মন যখন দেহসুখে নেমে পড়ে, কাম-ক্রোধে মন যখন রঞ্জিত হয়ে ওঠে। কাম-ক্রোধে কখন নামি? যখন আমি সামনের মানুষকে ঠাকুর না দেখে মানুষ রূপে দেখি, তখনই ঠাকুরকে নাশ করে দেওয়া হল। আমরা কি কখন ভেবে দেখেছি সারাদিন কতবার ঠাকুরকে নাশ করছি, মানে কতবার ঠাকুরকে মুছে ফেলেছি আর কতবার ঠাকুরকে জীইয়ে তুলছি? এসব কথা শুনলে আমাদের আতঙ্ক লেগে যাবে, কিন্তু কিছু করার নেই, এটাই বাস্তব। ঈশোপনিষদে আত্মহন্তা নিয়ে বলছেন। আমার আত্মজ্ঞান হচ্ছে না বলে বারবার আমাকে দেহ ধারণ করতে হচ্ছে, আমি বারবার দেহ নিয়ে জন্ম নিচ্ছি, বারবার দেহটা নাশ হয়ে যাচ্ছে। আমি মরছি মানে আমি যে দেহটা তৈরী করেছিলাম সেই দেহটাকে হত্যা করে দিলাম, এটাই আত্মহন্তা। আত্মজ্ঞান না হওয়া অবধি আমি প্রত্যেক জন্মে একটা করে দেহকে নাশ করে যাচ্ছি, আমি আত্মহন্তা। এখানে বলছেন *ন প্রণশ্যামি*, প্রণশ্যামি হয় নাশের দিক থেকে, কিন্তু আচার্য শঙ্কর এখানে বলছেন, *ন পরোক্ষতাং গমিষ্যামি, পরোক্ষতাং* মানে পরোক্ষ ভাবে দেখা, প্রত্যক্ষ দেখে না। প্রত্যক্ষ না থাকাই হল ঠাকুরের মুণ্ডু কেটে দেওয়া। একবার ভাবলে আতঙ্ক লাগবারই কথা। কতবার আমরা ঠাকুরের মুণ্ডু কাটছি, তারপরেও এসে বলছি, মহারাজ ধ্যান কেন হয় না। আবার বলছি, শেষ সময় ঠাকুর এসে নিয়ে যাবেন। সারাদিন যাঁর মুণ্ডু কাটছি, তিনি নাকি আমাকে তাঁর কাছে শেষ সময় নিয়ে যাবেন।

একটা হাসির গল্প আছে। একজনের নৌকাডুবি হচ্ছে, সে মা দূর্গার খুব ভক্ত, মা দূর্গার কাছে খুব করে প্রার্থনা করছে, জয় মা দূর্গা, মাগো আমাকে রক্ষা কর। প্রার্থনা শুনে মা দূর্গা এসে গেলেন। মা এসে নৌকার দুদিকে পা রেখে নৌকাকে খুব করে দোলাতে লাগলেন। সে বলছে, 'মা এটা তুমি কি করছ, আমি যে ডুবে যাব'। মা বলছেন, 'ব্যাটা প্রত্যেক বছর ঢাক ঢোল পিটিয়ে আমাকে জলে ডোবাও, তখন তোমার কিছু মনে থাকে না, আমি ডোবালে তোমার যত আপত্তি'? এটা একটা জোক, এগুলোকে সিরিয়াসলি নিতে নেই। কিন্তু আইডিয়াটা এটাই, সারা জীবন ঠাকুরের মুণ্ডু কেটে এলাম, যদিও বা কোন ভাবে ঠাকুরের ভাব মনে এসে যায়, সঙ্গে সঙ্গে মনটা অন্য দিকে চলে যাবে, মন হয়ত চলে গেল কোন লোভের বস্তুর দিকে, মন হয়ত চলে গেল নাতির দিকে, মন হয়ত চলে গেল স্বামীর দিকে বা স্ত্রীর দিকে, বা যার উপর রাগ আছে, ক্রোধ আছে তার দিকে মনটা চলে গেল।

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে।।৩১।।

(যে ব্যক্তি সর্বভূতস্থিত আমাকে নিজ আত্মার সঙ্গে অভেদ জ্ঞানে ভজনা করেন, সে যোগী যে অবস্থায় থাকুন না কেন – আমাতেই অবস্থান করেন।)

আগের শ্লোকের ভাব এখানেও চলছে। যে সব সময়, সব জায়গায় আমাকে প্রত্যক্ষ করছে, ভক্তিশাস্ত্রে এটাকেই সাযুজ্য বলছেন, ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যাওয়া। মরার পর স্বর্গে যাব, রামকৃষ্ণলোকে যাব, কোথাও আর তাকে যেতে হয় না, এখানেই সব দেখতে পায়। পঞ্চম অধ্যায়ে যে কথা বলেছিলেন, *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো*, সেটাই এখানেও বলছেন। *সর্বভূতস্থিতং যো মাং*, সর্বভূতে সে আমাকে দেখছে, *ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ*, আর এভাবে আমার ভজনা করে সে নিত্যমুক্ত হয়ে যায়। আচার্যও বলছেন, *নিত্যমুক্ত এব স ন মোক্ষং প্রতি কেনচিৎ প্রতিবধ্যতে*, এই প্রকার নিত্যমুক্ত যিনি হয়ে যান, তাঁর মোক্ষপ্রাপ্তিকে আর কেউ আটকাতে পারবে না।

এতক্ষণ বলা হচ্ছিল, যিনি ধারণা করে করে মনকে ঐ অবস্থায় নিয়ে গেছেন। এখানে আত্মজ্ঞানের কথা কিন্তু বলা হচ্ছে না। আত্মজ্ঞানের কথা একত্রিশ নম্বর শ্লোকে বলছেন। বেলুড় মঠে পূজ্যপাদ স্বামী মোক্ষদানন্দজী মহারাজ ছিলেন, রাম মহারাজ নামে বেশি পরিচিত। ১৯৮৫ সালে উনি ট্রেনিং সেন্টারে আমাদের আচার্য ছিলেন। সেই সময় পাটনাতে স্বামী সোমেশ্বরানন্দজী ছিলেন। পাটনাতে যাওয়ার পর স্বামী সোমেশ্বরানন্দজীর সাথে পরিচয় হল। দু-তিনদিন পাটনা আশ্রমে ছিলাম, মহারাজের সাথে অনেক গল্পটল্প হল। উনিই আমাকে রাম মহারাজের কথা বললেন, 'ট্রেনিং সেন্টারে রাম মহারাজ আছেন, ওনার সঙ্গ পাওয়ার চেষ্টা করবেন'। ১৯৮৫ থেকে ২০০৯, তখন আমার টিয়া বই বেরোল, মহারাজ তখন খুব অসুস্থ, ভাগ্যিস তিনি আমার একটা কিছু দেখে যেতে পেরেছিলেন। টানা প্রায় চব্বিশ বছর ওনার সাথে আমার একটা গভীর সম্পর্ক ছিল। এমন কত দিন হয়েছে, তিনি আমাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছেন। না বুঝে উল্টোপাল্টা প্রশ্নটশ্ন করতাম, বার করে দিয়ে বলে দিতেন, আর তোমাকে এখানে কোন দিন আসতে হবে না, কতবার এই রকম হয়েছে। একটা সময় উনি আমাকে গীতার এই আলোচ্য শ্লোকটা না বলে এর ভাবটা বলেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, 'আত্মজ্ঞানীরা যেটা করেন, আত্মাই আছেন, কিংবা ঠাকুরই আছেন, এইভাবে যদি তুমি ব্যবহার করতে শুরু করো এবং পুরোপুরি যদি এতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও, তুমি তো জ্ঞানী হয়েই গেলে'। আচার্য শঙ্কর জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন – ধারণা করে করে যিনি ওই অবস্থায় চলে গেছেন, তিনি জ্ঞানী। আর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয়ে গেলে তিনি বিজ্ঞানী হয়ে গেলেন। একই ব্যাপার, জ্ঞানী বিজ্ঞানীতে কোন তফাৎ নেই। তবে ঠাকুর বলছেন, জ্ঞানী ভয়তরাসে, কারণ ঐ অবস্থা থেকেও নেমে যেতে পারেন। নিয়মিত অনুশীলনের মধ্যে না থাকলে ওখান থেকেও পতন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানীর প্রত্যক্ষ হয়ে গেছে, এসবের আর কোন প্রশ্নই নেই। ভগবান এখানে বলছেন, *সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে*, সে আমার মধ্যে অবস্থান করছে; এটাই তো সাযুজ্য, আমার সাথে এক হয়ে গেছে, তার তো মুক্তি হয়ে গেল। ভগবান বলছেন, ওর মোক্ষকে কেউ আর আটকাতে পারবে না। ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে গেছেন কিনা। এখানে যে পর পর দুটি শ্লোক গেল, তাতে ভগবান জ্ঞান আর ভক্তিতে কোন তফাৎ করছেন না। আচার্য শঙ্করও আত্মচিন্তন আর শ্রীকৃষ্ণের সাথে এক হয়ে যাওয়া, দুটোকে এক করে দিচ্ছেন। জ্ঞানের পরম অবস্থা আর ভক্তির পরম অবস্থা এক।

এতটা বলার পর ভগবানের যেন মনে হল, না, আর-একটু ভালো করে বলে দিই, পুনরাবৃত্তি করেই বলি, যাতে ভাল ভাবে অর্জুনের মনে ঢোকে, যাতে আর কোন রকম প্রশ্ন বা সংশয় না থাকে।

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।।৩২।।

(হে অর্জুন, যিনি সকল ভূতের সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখ বলে অনুভব করেন, আমার মতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।)

ধ্যান করে করে, যোগের সেবা করে যিনি একেবারে উচ্চাবস্থায় চলে গেছেন, তিনি এখন পরমযোগী। কাকে পরমযোগী বলে? যিনি সবাইকে নিজের মত দেখেন, সবাইকে নিজের মতন দেখেন বলে সুখ-দুঃখ কোনটাতেই তাঁর কিছু হয় না। পরমযোগীর কি হয়? *আত্মৌপম্যেন,* যাঁর তুলনা দেওয়া হচ্ছে তাঁর সঙ্গে যখন এক হয়; যখন মনে করে, এই যে সামনে লোকটা আছে, ওতো আমিই আছি, ওই লোকটা তো আমার মধ্যেও আছে। আমার যা যা কষ্ট হচ্ছে, তারও তো সেই সেই কষ্ট হচ্ছে, আমার যা যা সুখ হচ্ছে, তারও তো সেই সেই সুখ হচ্ছে। খ্রীশ্চানদের জুইস ট্রাডিশানে আছে, তুমি যেমনটি অপরের কাছ থেকে প্রত্যাশা কর, অপরের সাথে তুমি তেমনটি ব্যবহার কর, এটা মূলতঃ ethical code। কিন্তু এখানে এটাই spiritual code।

হিংসা ভাব যে কত সূক্ষ্ম ভাবে করা হয় আমরা চিন্তাই করতে পারিনা। আমার সাথে তুমি দুর্ব্যবহার করেছ, আমি এক সেকেণ্ডের জন্য মনে মনে চাইলাম তোমার নাশ হোক, তাতেই কিন্তু আমার হিংসা করা হয়ে গেল। মানুষ যখন দেখে সবই আমি, তখন কাকে সে হিংসা করবে। খাওয়ার সময় আমার দাঁতের মাঝখানে জিভের কামড় পড়েছে, জিভ থেকে রক্ত ঝরছে। এখন কি আমি আমার দাঁতের উপর আক্রোশ মেটাতে পাথর দিয়ে দাঁত ভাঙতে শুরু করব? কিন্তু আমার সাথে যখন কেউ খারাপ ব্যবহার করে, তখন তার প্রতি পাল্টা দুর্ব্যবহার না করতে পারলেও মনে মনে তাকে গালাগাল দেব, নয়তো তার সর্বনাশ যাতে হয় সেই প্রার্থনা করতে শুরু করব। কিন্তু যে দেখছে সব আমিই, আমারই সব রূপ, তখন তার কি কোন হিংসা ভাব আসতে পারবে? কখনই আসবে না। দাঁতটাও আমার জিভটাও আমার, দাঁতটাও আমি জিভটাও আমি। কেউ যদি আমার কোন ক্ষতি করল তখন আমি দেখছি আমার জিভটা দাঁতের মাঝখানে পড়ে গেল। তখন কি আর করা যাবে? ভবিষ্যতে সাবধানে চিবোতে হবে, যাতে দাঁতে আর কামড় না পড়ে। আমার ক্ষতি করেছ, এর ফল ভগবান তোমাকে একদিন না একদিন দেবেনই দেবেন, মনের মধ্যে এই চিন্তাটাও যেন না আসে। যোগীর মনে এই চিন্তা আসবেই না।

সমং পশ্যতি যোঽর্জুন, হে অর্জুন, যোগী সবাইকে সমান দেখে। আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *যথা মম সুখম্ ইষ্টং তথা সর্বপ্রাণিনাং সুখম্ অনুকূলম্,* সুখ যেমন আমার প্রিয়, তেমনি সমস্ত প্রাণীরই সুখ ভাল লাগে। ঠাকুর কথায় কথায় এই কথাই বলেছিলেন। একজন কোথায় তীর্থাদি করতে গিয়েছিল, সাধুরা, পাণ্ডারা টাকা চাইছিল, পরে দেবো বলে পালিয়ে এসেছে। এই কথা আবার ঠাকুরকে মজা করে বলতে গেছে। ঠাকুর শুনে খুব রেগে গেছেন। ঠাকুর এই কথাটাই তখন তাকে বলছেন, জগতের সব সুখ বুঝি তোমরাই একা ভোগ করবে।

লোকেদের একটা ধারণা হয়ে গেছে, সন্ন্যাসী মানে একটা মোষের মত বা গণ্ডারের মত, তাঁর শীত লাগে না, গরম লাগে না, খাওয়া লাগে না, সন্ন্যাসীদের যেন কোন কিছুর দরকার হয় না। আমরা যখন ট্রেনিং সেন্টারে, সেই সময় আমাদের যিনি প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন। শীতকালে ওনার পা খুব ফাটতো। একদিন খুব বিনয় করে মহারাজকে বললাম, 'মহারাজ আপনার পায়ের গোড়ালিটা খুব ফেটে গেছে'। উনি মজা করে বলছেন, 'তুমি কি চাও, পা না ফেটে আমার মাথাটা ফেটে যাক'? এই বলে আবার বলছেন, 'এটা তো গণ্ডারের শরীর না, মানুষের শরীর, মানুষের শরীরেই পা ফাটে'। লোকেরা জানে না বোঝে না, কিছু একটা কথা বলে দিয়েই খালাস। সন্ন্যাসীরও কষ্ট হয়, গৃহীরও কষ্ট হয়। *আত্মৌপম্যেন,* তোমার সাথে অপরের তুলনাটাও করো, তোমার যদি কষ্ট লাগে অপরেরও কষ্ট লাগবে। তোমার যদি না লাগে, তাহলে অপরের কষ্ট লাগছে কি লাগছে না, তাতে তোমার কিছু যায় আসে না।

অনেক আগে একবার আমি কাশীতে গিয়েছিলাম। একদিন একটা ফোন করার জন্য টেলিফোন বুথে বসে ছিলাম, বুথের মালিক অল্প বয়সী ছোকড়া, মদ খেয়ে বসে ছিল। আমাকে দেখেই আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, হিন্দীতে বলতে শুরু করল, 'বাবা-মার সেবা না করে, বাবা-মার দেখাশোনা না করে সন্ন্যাসী হয়েছেন, আপনার লজ্জা করছে না'। আমি দেখছি বুথে আমাকে অনেকক্ষণ বসতে হবে, কারণ তখনও লম্বা লাইন। তখনকার দিনে টেলিফোন বুথ মানেই অনেক সময় হাতে নিয়ে গিয়ে ফোন করতে যেতে হত। আমি তাকে বললাম, 'শুনুন দাদা, বাইরে যারা চাকরী করে তাদের কেউ দু হাজার টাকা মাইনে পায়, কেউ আবার দু লক্ষ টাকাও মাইনে পায়, আপনি এটা মানছেন তো'। 'ও তো ঠিকিই হ্যায়'। 'তাহলে যে যেমন মাইনে পাবে সে তেমনই তো বাবা মাকে পাঠাবে। যে দু হাজার পাচ্ছে সে বাবা মাকে মাসে দশ হাজার টাকে দেবে না'। 'একদম ঠিক বোলা'। 'তাহলে ভাই, আমার ইনকাম তো জিরো, আমি বাবা-মাকে জিরো দিচ্ছি, তাতে কি দোষ হল'। সেই ছেলেটা উঠে আমার পা ধরে বলছে, 'স্বামীজী আপনে মেরে মুহ্ বন্ধ কর্ দিয়া'। সমাজে কত ভিখারী আছে, কত সাধারণ স্তরের পিওন আছে, কর্মচারী আছে, যারা সামান্য কটা টাকা দিয়ে কোন রকমে সংসার চালাচ্ছে, তার মধ্যেও বাবা মাকে অল্প একটু দেয়। বিল গেটস্ নিজের পরিবারকে অনেক দেয়। আমি আরও নীচে, আমার জিরো ইনকাম, তাই দিচ্ছি না। নিজের যদি লাগে অপরেরও লাগে, এই বোধ যেন থাকে।

এটা বলার পর বলছেন, আমার যেমন অপ্রিয়, তেমনি সমস্ত প্রাণীর অপ্রিয়, এই বোধটা জাগাতে হবে। শুধু নিজের আপনজনদের প্রতি না, সমস্ত প্রাণীকে তিনি এইভাবে দেখেন, তখন মানুষ অহিংসাতে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ভগবান বুদ্ধও যখন অহিংসাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তিনিও এই অবস্থায় গিয়ে হয়েছিলেন। ভগবান বলছেন, এরাই হল ঠিক ঠিক যোগী। এখনও কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হয়নি, এনারা আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করে করে এই জায়গাতে পৌঁছে গেছেন।

এতক্ষণ এসব কথা শোনার পর অনেকেরই মনে হবে, এগুলো কি করা সম্ভব? ভক্তরা এসে আমাদের কাছে দুঃখ করে বলে, মহারাজ ধ্যান করার চেষ্টা করি, কিন্তু হয় না। ব্যাসদেব আমাদের কথা বুঝতে পেরেছেন, তিনি জানতেন, আমরা বলব এগুলো আমাদের দ্বারা অসম্ভব। ব্যাসদেব তাই অর্জুনের মাধ্যমে প্রশ্ন নিয়ে এলেন। হে কৃষ্ণ, আপনার কথাগুলো শুনতে খুবই ভাল লাগছে, কিন্তু আপনি যে মনকে স্থির করার কথা বলছেন, এ কখনই সম্ভব না।

যে বিষয়ের উপর আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি, বিষয়টা তিনটে ভাগে বিভক্ত। প্রথম বিষয়, মনকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। মনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে? দ্বিতীয় হল, আমি আপনি যে সাধনা করে যাচ্ছি, এই জন্মোই যদি জ্ঞানপ্রাপ্তি না হয় তাহলে আমাদের কি গতি হবে? আর তৃতীয় হল, যোগীরা কেন শ্রেষ্ঠ? ভগবান ষষ্ঠ অধ্যায়ের এই অংশে এই তিনটে জিনিসকে নিয়ে বলতে যাচ্ছেন। এর শ্লোক খুবই সহজ, এখানে কোন দর্শন নেই বলে বুঝতে সহজ হয়। ফিলজফি থাকলে বুঝতে একটু কঠিন হয়। অভ্যাস ও সংস্কার না থাকার জন্য উচ্চ চিন্তনকে নেওয়া আমাদের পক্ষে খুব কঠিন। উচ্চ চিন্তন এমনই একটা জিনিস যে, উচ্চ চিন্তনে বেশি ঢুকলে মাথা ফেটে যাবে। সেইজন্য যাঁরা গল্পের মাধ্যমে, হাসি মজা করে তত্ত্ব কথা বলেন, তাঁদের কথা লোকেরা সহজে বুঝতে পারে। ঠাকুরও খুব উচ্চ তত্ত্বকে নানা রকমের কাহিনী দিয়ে বলতেন, যাতে লোকেরা একটু ধারণা করতে পারে। শুধু যদি শুদ্ধ তত্ত্ব বলা হয়, বেশির ভাগ মানুষ ওটা নিতে পারবে না। যেমন স্বামীজীর দেববাণী, দেববাণীর বক্তব্য এত উচ্চ দর্শন ও গভীর তত্ত্বে ঠাসা যে, কেউ যদি সরাসরি দেববাণীর কথাগুলো গ্রহণ করতে চেষ্টা করেন তাঁদের মস্তিষ্ক নিতে পারবে না, মাথা ফেটে যাবে। দেববাণীর উপর আমরা খুব গভীর ও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি, যাঁরা এখনও শোনেননি তাঁরা অবশ্যই শুনবেন। সমস্ত বাঙালীদের দেববাণীর উপর আলোচনাটা শোনা দরকার। আমি

দুজনকে জানি, যাঁদের আত্মহত্যার প্রবণতা ছিল। দেববাণী শুনে তাঁদের এত জোশ এসে গেছে যে, এনারা জীবনে আবার উঠে দাঁড়িয়েছেন।

আমরা এখন তেত্রিশ নম্বর শ্লোক থেকে শুরু করছি, এটি অনেক সহজ। তার আগে দুটো কথা তাঁদের জন্য বলা হচ্ছে, যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনে খুব সিরিয়াস। কিন্তু যাঁরা শুধু গীতা কি, গীতার বক্তব্য কি, গীতা কি বলতে চাইছেন জানতে চান, বুঝতে চান; ওনাদের এটা না জানলেও চলবে। কিন্তু যদি কেউ ধর্মের কথা জানতে চান, গুরুর কাছে মন্ত্র দীক্ষার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে জানতে চান, আর তার সঙ্গে গীতাকে মিলিয়ে জীবনে নামাতে চাইছেন, তখন তাঁদের তিনটে জিনিস জানা খুব দরকার।

প্রথম যেটা অত্যন্ত জরুরী কথা, আমি এই কথা সন্ন্যাসী ভাইদেরও বলি – যদি আমি পারফেক্ট হতাম, মনে আমার যদি কোন কামনা-বাসনা না থাকত, তাহলে তো আমার জন্মই হত না। যাঁরা সন্ন্যাসীদের নিন্দা করেন, তাঁরা এই জিনিসটা ভুলে যান। যদি তিনি পারফেক্ট হতেন, তাহলে তো তাঁর জন্মই হত না। যাঁরা পারফেক্ট অথচ জন্ম নিয়েছেন, বুঝতে হবে তিনি লোকশিক্ষার জন্য জন্ম নিয়েছেন, যেমন শঙ্করাচার্য, স্বামীজী এনারা পারফেক্ট, কিন্তু লোকশিক্ষা ও লোককল্যাণের নিমিত্তে মানব জীবনধারণ করেছেন। কিন্তু আমরা সন্ন্যাসীরা তো তা নয়।

দ্বিতীয়, পারফেক্ট থেকে একটু যদি নীচে থাকতাম, তাহলে জন্মের পরেই আমি হিমালয় বা নর্মদার পথে বেরিয়ে পড়তাম, সাধনার জন্য জীবনকে প্রথমেই উৎসর্গ করে দিতাম। সেটাও তো পারলাম না। তার মানে যাঁরা ধর্ম সাধনা করেন, তাঁদের মধ্যে আমরা হলাম সবার নীচে। এতে খারাপের কিছু নেই। আমরা খুব কাছ থেকে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, স্বামী ভূতেশানন্দজী, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীকে দেখেছি, এনারা এত উচ্চমানের লোক যে, রামকৃষ্ণ মিশন যদি নাও থাকত এনারা এটাই হতেন। যদি আমরা উপর থেকে দেখি, তাহলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে এনারা লোকশিক্ষার জন্য এসেছেন, ঠাকুরের একেবারে ত্যাগী সঙ্গী। স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর জীবনের একটা ঘটনা ওনার সেবকের মুখে আমরা শুনেছিলাম। এটা সত্যিকারে ঘটনা, হরলাল মহারাজ ওনার সেবক ছিলেন, উনি ওনার বিশেষ প্রিয় সেবক ছিলেন।

একদিন প্রভু মহারাজের সেবাদি করে হরলাল মহারাজ ওনার কাছেই ঘুরঘুর করছিলেন। প্রভু মহারাজ তখন একা, আশেপাশে আর কেউ ছিলেন না। উনি কথায় কথায় প্রভু মহারাজকে জিজ্ঞেস করছেন, 'মহারাজ আপনি কি আবার আসবেন'? বলতে চাইছেন, আপনাকে কি আবার জন্মগ্রহণ করতে হবে? মহারাজ খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'ঠাকুর, মা, স্বামীজী যদি আসেন আমাকে আবার আসতে হবে'। শরীর মনে শিহরণ দেওয়ার মত কথা, ঠাকুর, মা যদি আসেন, আমাকেও আসতে হবে। সেবক মহারাজ মজা করে সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, 'মহারাজ আপনাকে সেবা করার জন্য তাহলে তো আমাকেও আসতে হবে'। এনারা হলেন সেই আধ্যাত্মিক জায়েন্ট, হয় ঠাকুর এনাদের তাঁর কাজের জন্য নিয়ে এসেছেন, তা নাহলে লোকশিক্ষার জন্য এনারা এমনিও চলে আসেন। এনাদের সাথে আমাদের কোন দিক দিয়েই তুলনা হয় না।

যাঁরা এই আলোচনা শুনছেন, তাঁরাও এই ধরণের, তাঁদের মনে কোথাও এই চাহিদা আছে যে, আমি সত্যিকারের ধর্ম সাধন করতে চাই। ধর্মের খেলো কথা, ধর্মের পপুলার কথা নিয়ে ধর্মীয় আমোদ করার জন্য না, কোথাও তাঁদের মনে ইচ্ছা জেগেছে যে, জীবনে আমি একটু আধ্যাত্মিক পথে উঠি। যদি কেউ বুঝে গিয়ে থাকেন যে, আমার ভিতরে এখনও অনেক ভোগ বাসনা আছে, তাই আমার এই জন্ম হয়েছে, তার মানে সে অনেক উপরে উঠে এসেছে। দ্বিতীয় এই ভোগ বাসনা

এত জমে আছে যে, সমাজে বা সংসারে থেকে এই ভোগ-বাসনাকে ক্ষয় করতে হবে, নইলে অনেক কম বয়সে আমি সংসার ছেড়ে বেরিয়ে চলে যেতাম। এটাকে বলে reality check, এটাকে যদি একবার বুঝে নেওয়া যায় তাতেই জীবনে অনেক শান্তি এসে যাবে।

অনেকেই এসে প্রশ্ন করেন, জপে মন বসে না, ধ্যান হয় না। জপ হওয়ার তো কথা নয়, ধ্যান তো আরও হওয়ার কথা নয়। সাধু সন্ন্যাসীদেরও এত সহজে ধ্যান জপ হয় না। যাঁরা সংসারে আছেন, তাঁদের কত দায়ীত্ব। স্বামী আছেন, স্ত্রী আছেন, সন্তান আছে, বাবা-মা আছেন, সংসার আছে, এদের গ্রাসাচ্ছদনের জন্য উপার্জন করতে হবে। পঞ্চাশ বছর আগে যেভাবে সহজ-সরল ভাবে সংসারজীবন চলত, আজকের দিনে সেভাবে চলবে না। আমরা যখন স্কুলে যেতাম, সেই সময় কোন সরকারী স্কুলে টাকা লাগত না, ভর্তি হতেও তেমন কিছু টাকা লাগত না, প্রায় ফ্রী ছিল। শিক্ষকরাও দরদ দিয়ে, ভালবেসে ছাত্রদের পড়াতেন। এখন যেখানে ফ্রী দেয় সেখানে সেই আন্তরিকতা নেই, শিক্ষার মানও তাই নেমে গেছে। ভাল স্কুলে ভর্তি করাতে গেলে ফতুর হয়ে যেতে হবে। তাই সবাইকে এখন টাকা আয় করতে হবে। সেইজন্য মোটামুটি যখন কুড়ি পঁচিশ বয়স, এই বয়স থেকে অন্তত পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এই কথাগুলো শুনে যেতে হবে, দড়িটাকে টেনে ধরে রাখতে হবে।

পুলিশ অফিসারদের ট্রেনিং পিরিয়ডে দড়ির সাহায্যে একটা বড় প্রাচীরকে টপকে যেতে হয়। একজন পুলিশ অফিসার দড়ি ধরে লাফ দিতেই দেখছে আমার দ্বারা পুলিশের চাকরি করা হবে না। নীচ থেকে যিনি ট্রেনিং অফিসার ছিলেন, তিনিও বুঝে গেছেন যে এই ছোকড়া কোন রকমে এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। উনিও নীচ থেকে চেঁচিয়ে যাচ্ছেন, 'ঝুলে থাক, দড়িটাকে শক্ত করে ধরে ঝুলে থাক, তাতেও তোমার পেশী শক্তিশালী হবে'। আমাদেরও এখন এই দড়িটাকে শুধু ধরে রাখা। আধ্যাত্মিক যাত্রাতে এটাই কাজ, দড়িটাকে ধরে রাখা। পঞ্চাশ পেরিয়ে যাওয়ার পর নিজেকে ঐকান্তিক হতে হবে। সারা জীবনে কিছু না করে হঠাৎ পঞ্চাশ বছরে এসে বলছেন, 'আমি ধ্যান করব'; ধ্যান অসম্ভব, আসন করেই বসতে পারবেন না। কুড়ি পঁচিশ থেকে যদি একটু একটু অভ্যাস করা শুরু করা যায়, তখন পুরোদমে করতে পারবে। কম বয়সে সকাল সন্ধ্যে হাজার করে জপ যদি না করা থাকে, তখন পঞ্চান্ন ষাটে এসে যখন সময় পাবেন তখন জপ টানা করতে পারবেন না। এই জন্মেই যদি কেউ কিছু উপলব্ধি করতে চান, তাহলে ষাট হল সর্বশেষ রেখা, তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার মূল জিনিসগুলিকে ভিতরে বসিয়ে নিতে হবে। এখন আশি বছরে এসে কেউ যদি কিছু করতে চায়, তিনি করতে পারেন, কিন্তু করার জন্য সেই জোরটা আর পাবেন না। সেইজন্য প্রথমে শুনে যেতে হয়, আর অভ্যাসটা ধরে রাখতে হয়।

আর-একটা কথা, আধ্যাত্মিক জীবনে কখন অসফল বলে কিছু হয় না। লক্ষ্মীর ভাঁড়ে মাসে মাসে কিছু টাকা আমরা রেখে দিই, ওই টাকা ওখানেই থাকবে, বেরোবে না, জমে থাকবে। ভাঁড় যখন ভরে গেল, ভাঁড়টা ভেঙে দিলাম, সব জমানো টাকা বেরিয়ে এলো। এই গুটি কয়েক কথাকে যদি আমরা মনে রাখি, আমরা কেউ পারফেক্ট না, আমাদের সবারই একটা সীমাবদ্ধতা আছে; দ্বিতীয় এখন পারব না, কিন্তু ধরে রাখতে হবে, কোন ভাবেই ছেড়ে দেওয়া চলবে না। তৃতীয় আমরা যতটুকু করছি, ওটা জমে থাকবে, কোথাও হারিয়ে যাবে না। এই তিনটে কথা যদি মনে ভাল করে বসিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে আমরা এখন গীতার যে অংশটা আলোচনা করতে যাচ্ছি, সেটা বুঝতে খুব সুবিধা হবে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের বত্রিশ নম্বর শ্লোক পর্যন্ত ভগবান বলে গেলেন যোগ সাধনা কিভাবে করতে হয়। খাওয়া-দাওয়া, ঘুম এগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, আসনে বসবে, কিভাবে বসতে হবে, ধ্যান কিভাবে করবে, এগুলো আমরা বিস্তারে আলোচনা করে নিয়েছি।

ব্যাসদেব মানবজাতির বিশেষ কল্যাণের জন্য এসেছিলেন, তিনি জানতেন লোকেরা ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রিত করে মনকে শান্ত অবস্থায় নিয়ে গিয়ে এভাবে যোগ সাধনা বা ধ্যান করতে পারবে না, তিনি তাই আমাদের হয়ে ভগবানের কাছে অর্জুনের মুখ দিয়ে এই প্রশ্ন রাখছেন –

অর্জুন উবাচ
যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্।।৩৩।।

(অর্জুন বললেন – হে মধুসূদন, সম্যগ্-দর্শনরূপ যে সমত্বযোগ আপনি ব্যাখ্যা করলেন, আমি মনের চঞ্চল স্বভাববশত তার অচলা স্থিতি দেখতে পাচ্ছি না।)

ভগবানের কাছে অর্জুনের প্রশ্ন হল –হে মধুসূদন, আপনি এই যে সমত্ব ভাবের কথা বললেন *আত্মৌপম্যেন সর্বত্র*, নিজের মত সবাইকে দেখার কথা বললেন, সত্যিই খুব সুন্দর কথা। কিন্তু এই সমত্ব ভাব কি করে হবে, আমাদের মন যে চঞ্চল?

সমত্ব অবস্থায় পৌঁছানটা, এটা থিয়োরেটিক্যাল কিছু না, এটা পুরোপুরি বাস্তব; বাস্তব যদি না হয় এটার কোন দাম নেই। এর আগে আমরা আলোচনা করলাম এই সৃষ্টিতে সব কিছু কিভাবে সত্ত্ব, রজো ও তমো দিয়ে তৈরী। সমত্ব ভাব, একমাত্র যাঁর ঈশ্বর জ্ঞান হয়েছে তিনি পারেন, আর চেষ্টা করে কিছুটা পারেন, যাঁদের মন পুরোপুরি সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, ত্রিগুণাতীত হয়ে গেলে সমত্ব ভাবে এমনিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবেন। সত্ত্বগুণ ভিতরে না থাকলে সমত্ব হবে না। সত্ত্বগুণের অভাব থাকা মানেই ভিতরে রজোগুণ আর তমোগুণের দাপাদাপি আছে। তমোগুণ মানুষকে অত্যন্ত স্বার্থপর বানায়। রজোগুণ মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে। স্বার্থপর আর আত্মকেন্দ্রিক দুটো আলাদা জিনিস। সব আমারই চাই, আমিই জয়ী হব; ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান এদেরকে নিয়ে বলবেন, *আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া*, আমার মত ধনবান, উচ্চবংশজাত কে আছে, আমিই আমার তুলনা, আমার মত কে আর আছে, এরা হল আত্মকেন্দ্রিক। স্বার্থপর হল, আমি ছাড়া আর যেন কেউ না পায়। তমোগুণ মানুষকে একেবারে গহন অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়, অত্যন্ত স্বার্থপর বানায়, কামী বানায়, ভোগ ছাড়া আর কিছু জানে না। রজোগুণীর সামনে যদি হাতজোড় করে বলা হয়, আপনার মত লোক হয় না; তখন সে একটু করুণা করবে। তুমি আমার প্রশংসা করলে, ঠিক আছে, তুমিও একটু নাও। তমোগুণী এটাও করবে না, ও নিজেকে ছাড়া কাউকে চেনে না।

এই রজোগুণ আর তমোগুণের প্রভাবের জন্য অর্জুন বলছেন, হে মধুসূদন, মন চঞ্চল, মন বশে আসতে চায় না, মন বুঝতে চায় না, অবুঝ মন। কি করব বলুন। এখানে আবার আচার্য শঙ্কর যোগ করে দিচ্ছেন, *স্থিতিং প্রসিদ্ধম্ এতৎ*, এটা খুব প্রচলিত কথা যে, মন চঞ্চল। অর্জুন বলতে চাইছেন, এটা যে শুধু আমার কথা তা না, এটাই প্রসিদ্ধ, এই কথা জনসাধারণের সবারই জানা। কেন প্রসিদ্ধ?

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্।।৩৪।।

(হে কৃষ্ণ, যেহেতু মন স্বভাবত চঞ্চল ও প্রমথনশীল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের ক্ষোভকারক এবং প্রবল ও দৃঢ়, তাই আমি মনে করি বায়ু নিরোধ যেরূপ দুঃসাধ্য, সেইরূপ মনের নিরোধও দুঃসাধ্য।)

মন যে শুধু চঞ্চলই তা না, *প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্*, মন প্রচণ্ড বলবান, আর দৃঢ় (ভুল কাজের প্রতি দৃঢ়)। *তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে*, সেইজন্য মনের নিগ্রহ করা, নিয়ন্ত্রণ করা *বায়োরিব সুদুষ্করম্*, যেভাবে বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব, কারণ বায়ু নিজের মত চলে, ঠিক তেমনি মনের নিগ্রহ করা

সম্ভব না। আমি অনেকদিন অদ্বৈত আশ্রমে ছিলাম, অনেক বইমেলাতে যেতে হত। আমাদের একটা বই আছে, স্বামী বুধানন্দজী আগে অনেক দিন অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলে, তাঁর লেখা বই Mind and its Control। তিনি একটা আর্টিকেল লিখেছিলেন, সেটাই বই আকারে পরে প্রকাশিত হয়। এক সময় বইটার প্রচুর বিক্রি হয়েছিল। একবার আমি একটা বইমেলাতে অদ্বৈত আশ্রমের স্টলে ভলেন্টিয়ার ছিলাম। এক ভদ্রমহিলা এসে এই বইটা কিনে নিয়ে গেলেন। পরের দিন এসে আমাদের সামনে বইটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। কি ব্যাপার? Mind controlএর কিছু নেই বইটাতে, এই বই পড়ে মনের কোন নিয়ন্ত্রণ হবে না। ভদ্রমহিলার বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনও মন কত চঞ্চল। বই এর মধ্যে যে কথাগুলো রয়েছে, সেটাকে ধারণা করার ক্ষমতাও ভদ্রমহিলার নেই। সবারই এখন টু-মিনিটস নুডল্, এমন কিছু একটা দিন যাতে সঙ্গে সঙ্গে শিখে নিয়ে ধ্যানে বসতে পারি।

এটাই অর্জুন ভগবানকে বলছেন, *চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ*, আচার্য এখানে এর ব্যাখ্যা করছেন, *কৃষ্ণ ইতি কৃষ্ণতেঃ বিলেখনার্থস্য*, *কৃষ্ণ* যিনি আকর্ষণ করেন, *বিলেখন* মানে টেনে নেন। বলেন, *ভক্তজনপাপাদিদোষকর্ষণাৎ কৃষ্ণঃ*, কৃষ্ণ কেন বলা হয়, যিনি কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণ তাঁর ভক্তের পাপ আদি দোষ সব টেনে নেন, সেইজন্য তাঁর নাম কৃষ্ণ। আবার আছে আকর্ষণ থেকে কৃষ্ণ শব্দ এসেছে। কিন্তু আচার্য এখানে কৃষ্ণ শব্দের অর্থ করছেন, যিনি ভক্তদের পাপ আদি টেনে নেন। শুধু যে নিজের দিকে টেনে নেন, তা না, পাপগুলি তিনি টেনে সরিয়ে দেন।

আচার্য বলছেন, *ন কেবলম্ অত্যর্থ চঞ্চলং প্রমাথি চ প্রমথনশীলং*, এর আগেও দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণে *প্রমথন* শব্দ এসেছিল। *প্রমথনশীলং*, একেবারে ঘুর্ণির মত সৃষ্টি করে দেয়। গঙ্গা দিয়ে যখন লঞ্চ বা স্পীড বোট যায়, তখন ওর পিছনে কেমন জলের ঘুর্ণি হতে থাকে, মনটাও এই রকম প্রমথনশীল। ফলে ইন্দ্রিয়গুলো ক্ষোভিত হয়ে যায়, কারণ মন আর ইন্দ্রিয় জুড়ে রয়েছে কিনা। এখানে চঞ্চল না, চঞ্চল তো অনেক ভাল শব্দ, ইন্দ্রিয়গুলি উন্মত্ত হয়ে যায়। আমার এটা চাইই চাই। যাদের মধ্যে তমোগুণ খুব বেশি, খুব ডিপ্রেশানে ভোগে, এদের ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ন্ত্রণে থাকে না। রজোগুণীদের বরং নিয়ন্ত্রণে থাকে। *প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্*, গীতার বর্ণনা শুনলে আতঙ্ক ঢুকে যায়। মন শুধু যে চঞ্চল তা বলছেন না, একেবারে প্রমথনশীল, নাচিয়ে দেয়।

আর তাই না, *বলবদ্দৃঢ়ম্*, আচার্য এর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, জলে এক ধরণের প্রাণী থাকে, তন্তুনাগ বলে, তাকে ছেদ করা যায় না। যেমন গণ্ডারকে ছেদ করা যায় না, এটা হল *বলবদ্দৃঢ়ম্*। আমরা যদি তাকে ছেদ করতে চাই, পারব না, এত তার শরীরটা দৃঢ়। হে প্রভু, আপনি তো বলে যাচ্ছেন, মনকে নিগ্রহ কর, সমত্বে প্রতিষ্ঠিত হও, এই রকম মন যদি হয়, তাকে কি করে নিগ্রহ করব আর কি করেই বা সমত্ব অবস্থায় যাব? কথামৃতে আছে, ঠাকুরকেও এই কথা একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন। ঠাকুর তাকে বলছেন, কেন গীতায় দেখোনি, গীতায় অভ্যাস যোগের কথা আছে। ভগবান এবার এই অভ্যাস যোগের কথা বলছেন –

শ্রীভগবান্ উবাচ
অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।।৩৫।।

(শ্রীভগবান বললেন – হে মহাবাহো, সদাচঞ্চল মনকে নিরোধ করা যে কত দুঃসাধ্য তাতে সংশয়ের লেশমাত্র নেই; কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তা নিগৃহিত হয়।)

ভগবান বলছেন, অর্জুন, তোমার কথা মানছি, এতে কোন সংশয় নেই যে *মনো দুর্নিগ্রহং*, মনকে নিগ্রহ করা যায় না, *চলম্*, আর সব সময় মন চঞ্চল, একে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন। বাড়িতে কোন বাচ্চা কিছুর জন্য আবদার করে না পেয়ে যদি খুব চেঁচামেচি করতে থাকে, তখন মা

এসে বলে, বাবা তুমি কি পাগল হয়ে গেছ, লোকেরা দেখে কি ভাববে! মন এর থেকে অনেক গুণ বেশি চঞ্চল থাকে।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে, যাঁরা মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন, যাঁরা ঠিক ঠিক ধ্যান করার ইচ্ছা রাখেন, জপে যাঁরা মন বসাতে চান, তাঁদের জন্য এই শ্লোকের দ্বিতীয় লাইন হল চাবিকাঠি। গীতার যে পথ, সেই পথে কিভাবে এগোতে হবে, জীবনদর্শন, ধর্মদর্শন, সব কিছু এই শ্লোকের দ্বিতীয় অংশে দেওয়া হয়েছে।

অভ্যাসকে আচার্য পরিভাষিত করছেন, *অভ্যাসো নাম চিত্তভূমৌ কস্যাংচিত্ত সমানপ্রত্যয়াবৃত্তিঃ চিত্তস্চ*, একটা জিনিসকে ধরে নিয়ে সেটাকে বারবার টেনে চিত্তে বসানোর নাম অভ্যাস। আমাদের ভাষায় ব্যাখ্যা করলে বলা যেতে পারে, জপে বসে মন চঞ্চল হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারলাম মন চঞ্চল হয়ে গেছে, জপের দিকে মন থাকছে না, সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে এসে মনকে আবার জপে বসাচ্ছি। শুধু জপ করলে তো কিছু হবে না, যোগশাস্ত্রে বলছেন, *তজ্জপস্তদর্থভাবনম্*, মন্ত্রের অর্থ চিন্তনও করতে হয়। *সমানপ্রত্যয়*, একই বৃত্তি যেন থাকে। মন বার বার ছিটকে বেরিয়ে যাবে, কিন্তু তত বার টেনে আবার মনকে নিয়ে আসতে হবে, এর নাম অভ্যাস।

আচার্য বৈরাগ্যকে পরিভাষিত করছেন, *দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টভোগেষু দোষদর্শনাভ্যাসাদ্*, যে জিনিসগুলিকে আগে আমি দেখেছি, এখন পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে যে জিনিসগুলিকে নিচ্ছি, আর যে জিনিসগুলি আগে আমি দেখিনি; সব কিছুতে দোষদৃষ্টি নিয়ে আসার অভ্যাস করতে হবে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান পরে বলবেন, কিভাবে সব কিছুতে দোষদৃষ্টি আনতে হয়। দোষদৃষ্টি অত্যন্ত বাজে জিনিস। শ্রীশ্রীমার বিখ্যাত উক্তি –যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। কিন্তু যিনি যোগী হতে চাইছেন, তাঁকে সব কিছুতে দোষ দেখতে হবে, সবারই ভিতর দোষ দেখতে হবে। দোষদৃষ্টি নিয়ে এলে আসক্তি আসবে না। ব্যবহার কালে সবাইকে সমান দেখা, কিন্তু সাধনা কালে কেউ যেন ভিতরে না প্রবেশ করে। গরু যতই উপকারী প্রাণী হোক, শোবার ঘরে ঢুকলে আমি বার করে দেব। আমার যে প্রিয়, যে আমার মনকে টেনে নেয় বা যেটা আমার প্রিয় বস্তু, যাকে পাওয়ার জন্য আমি অনেক পথ যেতে রাজী আছি, বারবার চিন্তা করে দেখতে হয়, এর মধ্যে কি কি দোষ আছে। দোষের দিকে যদি বেশি নজর দেওয়া হয়, তখন ঐ বস্তু বা ব্যক্তি মন থেকে সরে যাবে।

মন শুধু দুটো জিনিস জানে, আকর্ষণ আর বিকর্ষণ, অনুরাগ আর বিদ্বেষ, এ-ছাড়া মন আর কিছু জানে না। তৃতীয় কিছু জানে না, জানে শুধু রাগ আর দ্বেষ। যেখানে মনটা আটকে আছে, যাকে ভালবাসছি, যাকে ছেড়ে থাকতে পারছি না, তার মধ্যেও দশটা দোষ থাকবেই। বৃন্দাবন থেকে চিরতরে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ চলে এলেন, এদিকে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালবাসার টানে থাকতে পারছেন না। কিন্তু অত বিরহকাতর অবস্থার মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের পাঁচটা দোষ দেখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। নিজেকে ভোলানর এটাই একমাত্র পথ। এখানে বলা হচ্ছে, যাঁরা যোগী তাঁদের জন্য এটা অত্যন্ত জরুরী। ঠাকুরও বর্ণনা করছেন, নারী শরীরে কি আছে বিচার কর। সেটা আমরা এখানে আর উল্লেখ করলাম না, তবে ঐ জিনিসগুলো বারবার চিন্তা করতে থাকলে নারী শরীরের প্রতি আকর্ষণ কমে যায়। ঠাকুর আবার বলছেন, যার প্রতি বেশি আকর্ষণ হয়, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে দুগুণ করে দেখতে হয়, মনে হবে যেন একটা রাক্ষস বা রাক্ষসী। এই করে করে মনকে বস্তু থেকে, ব্যক্তি থেকে সরিয়ে আনতে হয়। এই দুটো জিনিস, অভ্যাস আর বৈরাগ্য, মনকে নিগ্রহ করতে হলে, ইন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য পেতে হলে, বারবার এই দুটো জিনিস করে যেতে হবে – অভ্যাস আর বৈরাগ্য।

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপঃ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোহবাপ্তুমুপায়তঃ।।৩৬।।

(অসংযতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য, এই আমার মত। কিন্তু বশীভূতচিত্ত ও যত্নশীল পুরুষ উক্ত বিহিত উপায়ে যোগসিদ্ধ হতে অবশ্যই সমর্থ হন।)

বৈরাগ্যের অভ্যাস যদি নিয়মিত না করা হয়, মন নিয়ন্ত্রণে আসবে না। কিন্তু, যিনি বারবার অভ্যাস করে যাচ্ছেন, বৈরাগ্য আনার চেষ্টা করেছেন, তাঁর মন ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। পঁয়ত্রিশ নম্বর শ্লোকে মনকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতিটা বলে দিলেন, আর ছত্রিশ নম্বর শ্লোকে বলছেন, এর ফল এই হয়। কঠোপনিষদে যেখানে রথ ও রথীর উপমা নেওয়া হয়েছে, সেখানেও বলছেন, যার রথের ঘোড়া *সদশ্বা*, অর্থাৎ ঘোড়াগুলো ভাল, তার সব কিছু ঠিক ঠিক চলে। *দুষ্টাশ্বা*, দুষ্ট অশ্ব অনেক রকম ঝামেলা করে। আমরা যদি একটু বিচার করে দেখি, আমাদের মন কেন ধ্যানে বসতে চায় না, দেখা যাবে, আমি অভ্যাস করছি না, আমি বৈরাগ্যের অনুশীলন করছি না। কেউ যদি বলে, আমার আর কোন কিছু পছন্দ হয় না, আমি বৈরাগ্যতে প্রতিষ্ঠিত। তাহলে আপনি কিছু একটা অভ্যাস করুন। যেমন দেওয়ালে একটা গোল করে একটা বিন্দু আঁকুন, পনের মিনিট টানা ওই গোল বিন্দুর দিকে তাকিয়ে থাকুন আর মনে মনে বলুন ঐ বিন্দু ছাড়া আর কিছু আমি মনে আসতে দেব না। সেকেণ্ডের মধ্যে মন ওখান থেকে ছিটকে যাবে। ছিটকে গেলে আবার মনকে ওখানে ফেরৎ নিয়ে আসুন। অথবা সামনে একটা গোলাপ ফুল রেখে দিন, এই গোলাপ ফুলকেই আমি টানা পনের মিনিট ধরে দেখতে থাকব। এই গোলাপ ছাড়া মনে আর কিছু আসতে দেব না। এইভাবে করতে থাকলে কিছুক্ষণের মধ্যে মন আস্তে আস্তে নিগ্রহ হতে শুরু হয়ে যাবে। এগুলো খুব সহজ পথ। এই সহজ পথেও যদি না হয়, তাহলে একটা সাদা কাগজ নিন। কোন একটা শব্দ, ধরুন রাম, এই রাম শব্দ একশ আটবার লিখুন। অক্ষরগুলো যেন খুব সুন্দর হয়, লিখতে থাকুন, রাম, রাম, রাম, কিংবা কৃষ্ণ, কিংবা রামকৃষ্ণ, যে কোন ঠাকুরের নাম। একশ আটবার লিখেও মন যদি শান্ত না হয়, এক হাজার বার লিখুন।

একজন মহারাজকে আমরা জানতাম, লাইব্রেরীতে বসতেন, বয়স হয়েছিল, খুব বেশি কাজ তখন ওনাকে করতে হত না। যখনই লাইব্রেরীতে যেতাম, দেখতাম উনি একটা রাফ কাগজ নিয়ে তাতে পেন দিয়ে ঘিচির ঘিচির করেই যাচ্ছেন। একদিন আমি ওনাকে গিয়ে সরাসরি বলেই ফেললাম, 'মহারাজ আপনি জপ করছেন, তাই না'? উনি চমকে উঠে আমাকে বললেন, 'তুমি কি করে এটা ধরলে'? আমি বললাম, 'আপনার অতটা মাথার গণ্ডগোল হয়ে যায়নি যে, আপনি কাগজের মধ্যে সার্কেল করতে থাকবেন'। উনি একটা সার্কেল যখন টানছেন, তখন একবার ইষ্টমন্ত্র জপ করছেন। উনি হেসে বললেন, 'সবাই মনে করে আমি কাগজে হিজিবিজি করছি'। আমি হেসে বললাম, 'আমি এতটা স্টুপিড নই যে, এটা বুঝতে পারব না'। উনিও আবার সেই আগের মত করতে লাগলেন। অফিসে বসে উনি করে কিংবা মালায় জপ করতে থাকলে লোকেরা মনে করবে, কাজের সময় কাজ না করে উনি এখানে জপ করে যাচ্ছেন। কিন্তু এই ভাবে জপ করলে লোকেরা দূর থেকে দেখলে মনে করবে উনি কাজ করছেন। এটাকে বলে লিখিত জপম্, দীক্ষার মন্ত্র তো লেখা যায় না, নিষেধ আছে। সিম্বল আঁকতে আঁকতে টানা ওনার দু ঘন্টা জপ হয়ে যাচ্ছে, কেউ বিরক্ত করছে না। কেউ গিয়ে কথা বললে, আমি যেমন কথা বললাম, তখন ছেড়ে দিচ্ছেন। দুটো কথা বলে বিদায় দিয়ে আবার একই জিনিস করে যাচ্ছেন। এটাকে বলে অভ্যাস। এখানেই আমরা মনকে নিয়ন্ত্রণ করার কতগুলি অভ্যাসের পদ্ধতি পেয়ে গেলাম।

ধ্যানের উদ্দেশ্য হল মনকে একাগ্র করা। মনকে একাগ্র করার অনেক ধরণের পদ্ধতি আছে। অনেকে হাঁটতে হাঁটতেও জপের অভ্যাস করেন। ধীর গতিতে হাঁটতে হবে, একটা করে পা ফেলছেন একবার ইষ্টমন্ত্রের জপ করছেন। বাসে, ট্রেনে যাচ্ছেন, হাতটা কায়দা করে ঢুকিয়ে আরামসে জপ করে যাচ্ছেন। রাস্থাঘাটে, বাসে-ট্রেনে করে জপ না করে, মনে মনেও জপ করা যেতে পারে। লোক দেখানো ব্যাপার না, কেউ যেন জানতে না পারে। অভ্যাস এমন কিছু কঠিন না, লোকেরা যতটা খুব

কঠিন মনে করে, সে-রকম কিছু কঠিন নয়। কিন্তু আমাদের অভ্যাস করার ইচ্ছাটাই নেই, ভিতরে তমোগুণ রজোগুণের প্রভাব আছে কিনা। আমরা কেউই পারফেক্ট নই, আমাদের সমস্যা হবেই – সেইজন্য অভ্যাস আর বৈরাগ্যই আমাদের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। দ্বিতীয় হল এই অভ্যাস আর বৈরাগ্যকে ধরে রাখা। এখান থেকে তৃতীয়টাতে ঢুকছেন। যিনি যোগ অভ্যাস গ্রহণ করে নিয়েছেন, আগেকার দিনে যজ্ঞ-যাগের খুব ধুম ছিল; বলছেন এই যজ্ঞ-যাগগুলোকে ছাড়তে হবে, কারণ এখন আপনি যোগ অভ্যাস শুরু করে দিয়েছেন। আচার্য অবশ্য এখানে বারবার বলবেন, যোগী মানে সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী সব কিছু ত্যাগ করে দিয়েছেন।

যোগ সাধনা করে যাচ্ছেন, কিন্তু মাঝখান থেকে তাঁর জ্ঞানপ্রাপ্তি হল না, শরীরটাও ছাড়ার সময় হয়ে গেছে, মৃত্যুর তাহলে এবার তাঁর কি হবে? *এতো নষ্টঃ ততো ভ্রষ্টঃ,* এই যে বলা হয় কৃষ্ণ রাখতে কুল গেল, কিন্তু মাঝখান থেকে কৃষ্ণও গেল কুলও গেল, তখন কি হবে? ভগবান তো এত করে বলে দিলেন, এগিয়ে পড়, এগিয়ে চল, এগিয়ে যাও। আমি তো সব ছেড়ে এগিয়ে পড়লাম, কিন্তু চিত্তের চাঞ্চলতা হেতু যদি সিদ্ধিলাভ না করতে পারি, তাহলে আমার কি গতি হবে বা জ্ঞানপ্রাপ্তির আগেই আমার যদি দেহান্তর হয়ে যায়; তাহলে এরপর আমার কি হবে? এই জিনিসটাকে নিয়ে অর্জুন এবার ভগবানের কাছে আমাদের হয়ে প্রশ্ন করছেন –

অর্জুন উবাচ
অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি।।৩৭।।

(অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন – হে কৃষ্ণ, প্রথমে শ্রদ্ধাবান, পরে যত্নশূন্য হবার ফলে যিনি চিত্তচাঞ্চল্যবশত যোগে সিদ্ধিলাভ করতে পারলেন না, তাঁর কি গতি হবে?)

আমাদের মত যিনি সাধক, তিনি যোগ সাধনা করছিলেন। সংসার থেকে মন তুলে নিলেন, ভোগেও তাঁর হয়ত মন গেল না, কিন্তু কোন কারণে মন চঞ্চল হয়ে গেল। চঞ্চল হয়ে যাওয়াতে তাঁর আর সিদ্ধি হল না, তিনি হয়ে গেলেন যোগভ্রষ্ট। দুটোই তাঁর গেল, না হল সংসার, না পেলেন সিদ্ধি। হে কৃষ্ণ, এবার তাঁর কি গতি হবে?

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি।।৩৮।।

(হে মহাবাহো কৃষ্ণ, ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথে কর্মমার্গ ও ধ্যানমার্গ থেকে বিভ্রষ্ট, বিমূঢ় ও নিরাশ্রয় যোগী ভোগ ও মোক্ষ উভয় পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে ছিন্ন মেঘখণ্ডের মতো নষ্ট হয়ে যান কি?)

শরৎকালের মেঘে কোন জল নেই, ছিন্নভিন্ন হয়ে আকাশে ভেসে বেড়ায়। সংসার ছেড়ে, সুখভোগ ছেড়ে দিয়ে, সব কিছু ছেড়ে ব্রহ্মের পথে, যোগ সাধনায় যাঁরা এগিয়ে গিয়েছিলেন, মাঝখান থেকে তাঁদের সিদ্ধিলাভ হল না। এবার তাঁর কি হবে? শরৎকালের মেঘ যেমন কোন কাজের না, টুকরো টুকরো হয়ে ভেসে বেড়ায়। সব মেঘ একসাথে না হলে বৃষ্টি হবে না। তাঁরা কি শরতের মেঘের মত ভেসে বেড়াবে? তাঁর তো সব চেষ্টা নষ্ট হয়ে গেল।

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে।।৩৯।।

(হে কৃষ্ণ, আপনি আমার এ সংশয় নিঃশেষে ছেদন করে দিন। কারণ আপনি ছাড়া আর কেউই আমার এই সংশয় নিরাকরণ করতে পারবে বলে বোধ হয় না।)

হে কৃষ্ণ, আমার এই সংশয়টা আপনি ছেদন করুন, কারণ আপনার মত সংশয় ছেদনকারী ব্যক্তি আমি এই জগতে এই মুহূর্তে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। মাস্টারমশাই ব্রাহ্মসমাজে গেছেন, সেখানে মা দূর্গার ব্যাখ্যা শুনে এসেছেন, সেটা আবার দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরকে শোনালেন। ঠাকুর সব শুনলেন, শুনেটুনে মাস্টারমশাইকে বলছেন, তুমি যেখানে সেখানে যেও না, এখানেই আসবে। কারণ ঠাকুর হলেন, *সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রং*। কৃষ্ণকে অর্জুন এটাই বলছেন। আমার মনে এই যে সংশয় উঠেছে, বুঝি এ-কুল ও-কুল দুটোই গেল। হিন্দীতে একটা কথা আছে, যার বাংলা করলে হয়, দুই নৌকাতে পা রাখতে গেলাম, রামকেও পেলাম না, মায়াকেও পেলাম না, আমার দু-কুল গেল। ভগবান এখানে চল্লিশ নম্বর শ্লোক থেকে যেটা শুরু করছেন, এটা আমার আপনার যাদেরই মনে এই ধরণের সংশয় আছে তাদের সবার জন্য। পর পর কয়েকটা শ্লোক খুব সুন্দর শ্লোক। মনে গেঁথে নিলে মন শান্ত ও প্রসন্ন হয়ে যাবে।

শ্রীভগবানুবাচ
পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।।৪০।।

(*শ্রীভগবান বললেন – হে পার্থ, বৈদিক কর্মত্যাগ করা সত্ত্বেও যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ইহলোকে পতিত বা নিন্দিত হন না, পরলোকেও নিকৃষ্ট শরীর প্রাপ্ত হন না। হে বৎস, এর কারণ, কল্যাণকারীর কখনও অধোগতি হয় না।*)

এই ধরণের যে যোগী, যাঁরা যোগ সাধন করে গেছেন, কিন্তু সিদ্ধিলাভ হয়নি, এনারা হলেন যোগভ্রষ্ট। কিন্তু এই যোগীদের কখনই নাশ হয় না, এই লোকেও নাশ হয় না, পরলোকেও নাশ হয় না। আচার্য এখানে নাশের অর্থ বলছেন, *পূর্বস্মাদ্ হীনজন্মপ্রাপ্তিঃ*, যে জন্মটা তার ছিল, সেই জন্ম থেকে আরও হীন জন্ম হয়ে যাওয়াকে নাশ বলছেন। যেমন, সে এই জন্মে মানুষ আছে, কিন্তু পরের জন্মে হয়ত কুকুর হয়ে জন্ম নিল। যোগভ্রষ্ট যিনি, এই জিনিস তাঁর কখনই হবে না। যে জায়গাতে তিনি ছিলেন, সেই জায়গার তুলনায় কোন খারাপ জায়গায় তাঁর জন্ম হবে না। আমরা এখানে যে কজন গীতার আলোচনা শুনছি, সবাই আমরা যোগভ্রষ্ট, যোগভ্রষ্ট না হলে গীতার কথা, শাস্ত্রের কথা আমরা শুনতামই না। পরে এক জায়গায় আচার্য বলবেন, অনেক জন্মের পূণ্য সঞ্চয় হলে, তবেই মানুষ এদিকে আসে। অনেক জন্ম ধরে জলের ফোঁটার মত টিপ টিপ করে পূণ্য সঞ্চয় হয়। পূণ্য সঞ্চয় হলে সাধুসঙ্গ হয়। সাধুসঙ্গ করতে করতে শাস্ত্রের প্রতি ভালবাসা জাগে। সেখান থেকে যোগ সাধনার প্রতি রুচি হয়। এই যে আমাদের শাস্ত্রের প্রতি প্রীতি এসেছে, গীতার কথা শোনার আগ্রহ হয়েছে, অনেক জন্মের সঞ্চিত পূণ্য এখন ফল দিতে শুরু করেছে। ভগবান আশ্বাস দিয়ে বলছেন, হে অর্জুন, *ন ইহ, ন আমুত্র*, এখানে বা পরলোকে কোথাও যোগীর নাশ হয় না।

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্, তিনি যে শুভকার্য করছেন, এই যে যোগ সাধনা করছেন, *দুর্গতিং তাত গচ্ছতি*, হে বৎস, কোন দিন তাঁর নীচ গতিপ্রাপ্ত হবে না। আচার্য '*তাত*' শব্দের খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করছেন, *তনোতি আত্মানং*, বিস্তার পায়; মানুষ নিজের বিস্তার সন্তানে পায়, সেইজন্য সন্তানকে তাত বলা হয়। আর বাবা স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করে সন্তান হয়ে বেরিয়ে আসে। মহাভারতে শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত সংবাদে এর খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। বাবা নিজেই গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসেন বলে বাবাকেও তাত বলে। আর শিষ্য সন্তানের মত, সেইজন্য শিষ্যকেও তাত বলে। তাত শব্দটা খুব মজার শব্দ, বাবাকেও তাত বলে, ছেলেকেও তাত বলে আবার শিষ্যকেও তাত বলে। আর আচার্য তাত শব্দকে বলছেন, *তনোতি*, বিস্তার করা। তাহলে যাঁরা যোগভ্রষ্ট, তাঁদের কি হয়? পরের শ্লোকে ভগবান বলছেন –

প্রাপ্য পূণ্যাকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।।৪১।।

(যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পূণ্যকারিগণের প্রাপ্য ব্রহ্মলোকাদি উর্ধ্বলোক লাভ করে সেখানে বহু বৎসর বাস করেন। অনন্তর সদাচারসম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।)

ব্রহ্মচারী রূপে আমি যখন দেওঘরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে জয়েন করি তখন আমার কুড়ি বছর বয়স। শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ তখন দেওঘর বিদ্যাপীঠের প্রিন্সিপাল ছিলেন। দেওঘর বিদ্যাপীঠে আমার ছাত্রাবস্থাতেও আমি ওনাকে প্রিন্সিপাল রূপে পেয়েছিলাম। উনি আমাকে প্রায়ই এই শ্লোকটা বলতেন। যাঁরা যোগভ্রষ্ট হন, তাঁদের সব সময় জন্ম হবে *শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে*। শুচী, সদাচার সম্পন্ন একটা ভাল পরিবার, এই ধরণের বাড়িতেই যোগভ্রষ্ট জন্ম নেবেন। চোর ছ্যাঁচড়, সদাচারহীন, অভক্তদের বাড়িতে কোন ভাবেই এনারা জন্মগ্রহণ করবেন না। *শ্রীমতাং*, এমন পরিবারে গিয়ে জন্ম নেবেন, যেখানে খাওয়া-পরা ভালভাবে চলে যাবে, কোন কিছুর অভাব নেই।

প্রাপ্য পূণ্যকৃতাং লোকান্, আগে আগে তিনি যে পূণ্যগুলি করেছিলেন, সেই পূণ্যের ফলগুলো আগে পাবেন, সেই পূণ্যের ফল ভোগ করার পর তিনি মনুষ্যলোকে নেমে আসবেন। তিনি কোথায় নামবেন? টাটা, বিড়লা, আম্বানি, ফিল্মস্টারদের বাড়িতে? কখনই না। যার জন্য এই ধরণের লোকেদের বাড়ি থেকে কাউকে কখন সন্ন্যাসী হতে দেখা যায় না। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন; কেন, ভগবান বুদ্ধ তো রাজার বাড়িতে জন্ম নিয়েছিলেন। ভগবান বুদ্ধের বাবা ছিলেন সেই সময়ে ওখানকার একটা ছোট্ট রাজা, আমাদের এখানে আমরা জমিদার বলি, আবার অনেক জমিদার রাজা উপাধি পেতেন। কপিলাবস্তু অত্যন্ত ছোট্ট জায়গা, জমিদার থেকেও ছোট। সেই দিক থেকে শ্রীরামচন্দ্রকে বলতে পারি তিনি রাজা, রাজবংশে জন্ম নিয়েছিলেন। কিন্তু যত অবতার, যত আধ্যাত্মিক পুরুষ, যত মহাপুরুষ আছেন, এনারা সবাই *শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে*, জন্মগ্রহণ করেন। *শুচীনাং* মানে সদাচারী; রাজা দশরথ যেমন শুচীর দিকে বেশি ছিলেন, আর তা নাহলে *শ্রীমতাং*, শ্রী সম্পন্নের দিক দিয়ে বড়, দুটোর মধ্যে একটা বড় হবে। পবিত্রতা যদিও বা থাকে, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় টাকা-পয়সা ততটা থাকে না, আবার একেবারেই যে কিছু নেই তাও না, থাকবে দুটোই। একটু টাকা-পয়সা থাকবে, যাতে খাওয়া-পরাটা চলে যেতে পারে, আর পবিত্রতা। ঠাকুর নিজে বলছেন, আমার বাবা খুব ধার্মিক ছিলেন। যাঁরা গীতার কথা শুনছেন, আপনারাও নিজেদের দিকে তাকান, দেখবেন বেশির ভাগই আপনাদের হয় বাবা বা মা, কিংবা ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, না হলে দাদু দিদা, সবাই না হলেও এনাদের মধ্যে অন্ততঃ একজনকে দেখবেন অত্যন্ত পবিত্র মানের মানুষ, একজনকে থাকতেই হবে। বেশি দূরের না, একেবারে কাছের কেউ হতে হবে। *শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে*, বড়লোকের বাড়িতেও জন্মাবেন না, দরিদ্রের বাড়িতেও জন্মাবেন না। কিন্তু যাঁরা আরও উচ্চমানের যোগী, তাঁদের কি হয়?

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্।।৪২।।

(যোগভ্রষ্ট পুরুষ জ্ঞানবান্ যোগীদের কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ঈদৃশ জন্ম জগতে অতি দুর্লভ।)

কদাচিৎ কখন খুব উচ্চমানের যোগীর জন্ম হয় জ্ঞানবান্ যোগীদের বংশে। বলছেন, এই রকম জন্ম খুব দুর্লভ। কারণ যোগী এমনিতেই কম হয়, যোগী বেশি হন না। এনাদের বাড়িতে যাঁরাই জন্ম নেবেন, সবাই যে ধর্মপ্রাণ হবেন, তার কোন মানে নেই। কিন্তু যাঁরা যোগের পথ নিচ্ছেন,

তাঁরা একচল্লিশ বিয়াল্লিশ শ্লোকের কোন একটাতে জন্ম নেবেন। একচল্লিশ হল, *শুচীনাং শ্রীমতাং* আর বিয়াল্লিশ হল যোগীর বংশে।

আচার্য এখানে আবার যোগ করছেন, *এতদ্ হি জন্ম যদ্ দরিদ্রাণাং যোগিনাং কুলে,* দরিদ্র বংশে, ঠাকুর দরিদ্র বংশে জন্ম নিয়েছিলেন। ঠাকুরের বাবা শুধু শুচী তা না, যোগী কিন্তু দরিদ্র; আচার্য এটা নিজে থেকে যোগ করছেন। আচার্য নিজেও দরিদ্র বংশে ছিলেন বলে হয়ত যোগ করেছেন। যোগী মানেই দরিদ্র, তাঁর টাকা-পয়সা নেই। বলছেন যোগীর বংশে জন্ম নেওয়া, এটা অত্যন্ত দুর্লভ। *এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্, ঈদৃশম্,* এই ধরণের যোগীর বংশে জন্ম নেওয়া এই লোকে সাধারণ ভাবে দেখা যায় না। বেশির ভাগই *শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে* জন্ম নিতে দেখা যায়।

কেন দরিদ্র বংশে যোগীদের কম জন্ম নিতে দেখা যায়? কারণ এনারা সবাই যোগভ্রষ্ট, কোন একটা এমন বাসনা ছিল, যেটার জন্য তাঁদের জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি যদি দরিদ্র বংশে জন্ম নেন, তাহলে তাঁর সেই বাসনার পুর্তি হবে কি করে, ঐ বাসনার পুর্তির জন্য তাঁকে এমন জায়গায় জন্ম নিতে হবে, যেখানে দুটো টাকা-পয়সা থাকবে যাতে খাওয়া-পরাটা চলে যেতে পারে আর সাথে সাথে বাসনা পুর্তি হয়ে যাওয়ার জন্য বাসনার নিবৃত্তি হয়ে যাবে। সেইজন্য অত্যন্ত উচ্চমানের যাঁরা যোগী হন, যাঁদের কোন কারণে অল্প একটু বাসনা হয়ত বাকি থেকে গেছে, এনারাই একমাত্র যোগীদের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। যোগীরা সাধারণ ভাবে গৃহস্থ কার্যে লিপ্ত হন না, বিবাহ করলেও সন্তানোৎপত্তিতে থাকতে চান না। এই ধরণের পরিবারের সংখ্যা অত্যন্ত কম, সবটা মিলিয়ে বলছেন *এতদ্ধি দুর্লভতরং*। কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, যিনি যোগভ্রষ্ট তাঁর মনে কিছু কামনা-বাসনা বাকি থেকে গেছে, সেই কামনা-বাসনাগুলি ওখানে জন্ম নিলে পুর্তি হবে না। একচল্লিশ আর বিয়াল্লিশ শ্লোক অনুযায়ী যোগী জন্ম নেওয়ার পর কি হয়?

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন।।৪৩।।

(হে কুরুনন্দন, যোগী পুরুষ সেই নবজন্মে পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে ব্রহ্মবিষয়ক বুদ্ধির সংযোগলাভ করেন এবং পরে ব্রহ্মবিজ্ঞানরূপ যোগে সিদ্ধিলাভের জন্য অধিকতর প্রযত্ন হন।)

যোগীরা এবার যে বংশে জন্ম নিলেন, সেখানে আগের জন্মে যে যোগ সাধনা করেছিলেন, কোন না কোন ভাবে তাঁর সেই সাধনার সাথে সংযোগ ঘটে যায়, ঘটবেই। এই জন্মে বাবা-মার থেকে শরীর পেলেন, মন পেলেন, বুদ্ধি পেলেন, এটাই গিয়ে তাঁর নিজের যেটা আসল হাই টেনশান তার, তার সাথে সংযোগ হয়ে যায়। এরপর পূর্বজন্মের বুদ্ধিটা তিনি পেয়ে যান। তখন পূর্ব পূর্ব জন্মের তাঁর সংস্কার তাঁকে টেনে সিদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে চলে যায়। একটা ঘটনা এখানে বলা যেতে পারে।

আমাদের একজন সন্ন্যাসী আছেন, তিনি সম্পূর্ণ অন্য কালচারের। বিরাট বড় বাড়ির সন্তান। এখন তো উনি একজন বিরাট বড় মাপের সাধু। আমি আমার ব্রহ্মচারী অবস্থা থেকেই ওনাকে জানতাম। একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাই তুমি কি করে আমাদের সঙ্ঘে এলে'? মহারাজ একবার গুজরাতে ওনার ভগ্নিপতির বাড়ি গিয়েছিলেন। সেখানে থেকে উনি আর-একজনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন, সেখানে উনি যোগের উপর একটা বই দেখলেন। বইটা পড়ে ওনার খুব ভাল লাগে। ওই বাড়ির ভদ্রলোক মহারাজকে বললেন, 'এই বইটা পড়ে তোমার যদি ভাল লাগে, তাহলে তুমি স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ পড়'। নামটা মনে করে রেখে দিলেন।

কলকাতার ময়দানে তখন বইমেল হত। অদ্বৈত আশ্রম থেকেও বুকস্টল দেওয়া হত। সেখানে স্বামীজীর ছবি দেখে ঢুকে পড়ে রাজযোগ বইএর খোঁজ নিলেন। বাড়িতে এসে বইটা পুরোটা পড়লেন, পড়ার পর কয়েকদিনের মধ্যে আবার স্টলে গেলেন, স্বামীজীর পুরো রচনাবলীর সেট্ কিনে আনলেন। তারপর অদ্বৈত আশ্রমে আসা-যাওয়া শুরু করলেন। কিছু দিনের মধ্যে সব কিছু ছেড়ে আশ্রমে এসে যোগ দিলেন। এখন তো উনি একজন খুব বড় সন্ন্যাসী, এটাই ভগবান বলছেন *তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং*।

আমার যেখানে জন্ম, যেভাবে জীবন চলছিল, সেখানে আমারও ঠাকুর, মা, স্বামীজীর কথা কিছুই জানার কথা না। কিন্তু এমন পরিস্থিতি হয়ে গেল, কিভাবে কিভাবে আমি রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে যুক্ত হয়ে গেলাম। সংস্কারগুলো এমন ভাবে থাকে যে, ঐ যোগটা করিয়ে দেয়। এরপরের শ্লোকটা সাংঘাতিক –

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে।।৪৪।।

(যোগভ্রষ্ট পূর্বজন্মের পূর্ব অভ্যাসবশত যেন অবশ হয়ে যোগসাধনে প্রবৃত্ত হন। যোগের স্বরূপ জানার ইচ্ছা নিয়ে যোগমার্গে প্রবৃত্ত যোগভ্রষ্ট বেদোক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল অতিক্রম করেন। আর যিনি যোগের স্বরূপ জেনে একনিষ্ঠ ভাবে যোগাভ্যাস করেন, তাঁর সাফল্যের নিশ্চয়তা বলাই বাহুল্য।)

দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে ভগবান একটা শ্লোকে বলেছিলেন, *যততো হ্যাপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ। ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ।।* যোগী, যিনি সাধনা করছেন, একটু যদি সংসারে তিনি মন দেন, তাঁর মনকে টেনে নিয়ে চলে যাবে। এখানে ঠিক তার বিপরীত বলছেন। যোগী যোগভ্রষ্ট হয়েছিলেন, ফলে তাঁর আবার জন্ম নিতে হল। পূর্বজন্মের কথা তাঁর কিছু মনে নেই, কিন্তু যোগাযোগ ঘটে গেল। এবার তাঁর পূর্বজন্মের শুভসংস্কার তাঁকে টোকা দেবে না, মনে করিয়ে দেবে না, *হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ,* তিনি যদি নাও যেতে চান, তাঁকে নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে চলে যাবে। এমন কিছু অঘটন, বা এমন কোন সর্বনাশ তাঁর জীবনে ঘটিয়ে দেবে, তাঁকে ওখানে থাকতে দেবে না। তিনি যদি চান নদের হাট বসাবেন, তাঁর পূর্বসংস্কার বসাতে দেবে না, ধাক্কা মেরে তাঁকে ওখান থেকে বার করে দেবে। পুরনো অভ্যাস, পুরনো সংস্কার তাঁকে বলপূর্বক টেনে বার করে আনবে।

যাঁরা খুব নামকরা শিল্পী, ছোটবেলা থেকেই ওনারা গান করেন, ছবি আঁকেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোট বয়স থেকে কবিতা লিখতেন। আগের আগের জন্মে কত অভ্যাস করেছেন। শচীন তেণ্ডুলকারের মত ব্যাটসম্যান, এক জন্মে কখন এই রকম ক্রিকেটার হওয়া যায়? যে কোন প্রতিভা কি এক জন্মে স্ফূরণ হয়? যদি হয়, তাহলে তো জেনেটিক থিয়োরী, বিজ্ঞানের যেটা মূল ভিত্তি, সেটাই ভুল প্রমাণিত হয়ে যাবে। সারা বিশ্বে হাজার হাজার ছুতোর মিস্ত্রি, হঠাৎ তাদের মাঝখান থেকে যীশু খ্রীষ্ট এসে গেলেন। আপনি বলবেন এটা একটা এ্যক্সিডেন্ট, এ্যক্সিডেন্ট এটা কোন উত্তর হল! এটা কি বিজ্ঞান! অথচ এরাই বলে যাচ্ছে, be scientific, religion is not scientific, যারা এই ধরণের কথা বলে তারা কত unscientific কল্পনা করা যায় না।

আচার্য এখানে বলছেন, *ন কৃতং চেদ্ যোগাভ্যাসসংস্কারাদ্ বলবত্তরম্ অধর্মাদিলক্ষণং,* যোগী যোগ করছেন, আর ঐদিকে কোন একটা পাপ কর্ম করেছেন বা কোন একটা দিকে তাঁর মন বেশি চলে গিয়েছিল। এখানে এবার ব্যালেন্সের ব্যাপার আছে। কি রকম ব্যালেন্স? যোগ সাধনা যদি বেশি করা থাকে আর সংসারের প্রতি আকর্ষণ যদি কম থাকে, তাহলে জন্ম নেওয়ার পর কিছু দিনের মধ্যে ওই আকর্ষণটাকে মিটিয়ে দিয়ে যোগ পথে চলে যাবেন। সেটা যদি না হয়ে থাকে, তাহলে

তাঁকে আর-একটু অপেক্ষা করতে হয়। কারণ যোগের সংস্কার যেটা আছে, সেটা চাপা পরে যায়। যাঁরা এই গীতার আলোচনা শুনছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়ত যোগী আছেন, কিন্তু কোন একটা কিছুতে এমন প্রলোভন হয়ে গিয়েছিল, বা খুব বড় একটা অধর্ম হয়ে গিয়েছিল, যেটার জন্য যোগীর শুভ সংস্কারটা চাপা পড়ে গেছে। একটু চেষ্টা করলেই সংস্কারটা আবার বেরিয়ে আসবে।

কিভাবে বেরিয়ে আসবে? আচার্য বলছেন, *তৎক্ষয়ে তু যোগজঃ সংস্কারঃ স্বয়ম্ এব কার্যম্ আরভ্যতে,* যত বড় পাপ করে থাকুন, যত অধর্মই করে থাকুন, এবার নূতন জন্ম; ঐ পাপ যেমনি ক্ষয় হয়ে যাবে, ভিতরে যোগাভ্যাসের যে সংস্কার চাপা ছিল, তেড়েফুড়ে তখন বেরিয়ে আসবে। সন্ন্যাসীরা সেইজন্য খুব কষ্ট পান, কারণ আগের জন্মে হয়ত কিছু অধর্ম করা হয়েছিল বলেই আজ এই শরীরধারণ করতে হয়েছে। কিন্তু সন্ন্যাসীরও যেমনি ওটা নাশ হয়ে যাবে, ভিতরের সংস্কার নিজে থেকেই বেরিয়ে আসবে। মাটিতে সোনা চাপা আছে কিনা। এই সংসার এমন, এখানকার কাজকর্মও এমন, সেইজন্য নিজেই মাটি সরিয়ে দিচ্ছে, যাতে সোনাটা বেরিয়ে চলে আসে। সংসারীদের মধ্যে অনেকের বয়স হলে মনকে পুরোপুরি ধর্মের দিকে দিয়ে দেন, আগের জন্মে একটু হয়ত যোগাভ্যাসের সংস্কার ছিল। অন্যান কর্ম অনেক বেশি ছিল বলে এত দিন ধর্মের দিকে মন যায়নি, সেগুলো ক্ষয় হয়ে গেছে, এবার সংস্কারগুলো বেরিয়ে আসছে। যার জন্য দেখা যায়, কম বয়সে সহজে যোগের দিকে কেউ যায় না। কারণ জন্ম হয়েছে মানেই তার ভিতর কোন একটা দুর্বলতা ছিল, কিংবা খুব বাজে একটা কর্ম ছিল, যেটাকে ক্ষয় করার জন্য এখানে আসা।

আমরা যদি নিজেদের জীবনের পিছনের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো, আমাদের জীবনের যত ঘটনা, যে কজন গুরুত্বপূর্ণ লোক আমাদের জীবনে এসেছে, যারা কেউ শুভ দিয়েছে, কেউ অশুভ দিয়েছে; পুরোটাই যেন কেমন সুন্দর ভাবে সাজান। আমাকে আপনাকে সবাইকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে একটা বিশেষ দিকে। ভারতে যাঁরা পুনর্জন্ম নেন, বেশির ভাগই সবাই যোগী। আর যাঁরা মুক্তির দিকে যাচ্ছেন, তাঁদের তো ভারত ভূমিতে জন্ম নিতেই হবে। আমরা কতজনকে জানি, যাঁরা সংসারে ছিলেন, এবং ভোগের মধ্যেই ছিলেন; কিন্তু একটা বয়সের পর দেখেছি তাঁরা পুরো কোন একটা ধর্মগ্রন্থের মধ্যে ঢুকে গেছেন, কেউ রামচরিতমানসে, কেউ ভাগবতে, কেউ গীতায়। অধর্মের সংস্কারগুলি, পাপকর্মগুলি সব মুছে গিয়ে জেগে উঠেছে স্বাভাবিক গুণগুলি।

বলছেন, *জিজ্ঞাসুরপি,* যোগীর কথা ছেড়ে দিন, যদি জিজ্ঞাসু হয়, মনে যদি একটু অনুসন্ধিৎসা থাকে, সেও যদি যোগমার্গে একটু লেগে থাকে, তাকেও আর কেউ আটকাতে পারবে না। আমি, আপনি সবাই হলাম জিজ্ঞাসু, গীতা সেই ছোটবেলা থেকে আমরা শুনে আসছি। কিন্তু আজ হঠাৎ মনের মধ্যে একটা জিজ্ঞাসু ভাব জেগে গেছে –দেখি তো গীতাতে কি আছে, তারপর আজ গীতার আলোচনা শুনে যাচ্ছি। একবার একটা অল্প বয়সী মেয়ে আমাদের গীতার কোর্সে ভর্তি হয়েছিল। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি করে এই কোর্সে এলে'? 'না, আমার একটু জানতে ইচ্ছে হয়েছে, গীতা কি, গীতাতে কি আছে'।

এই হল জিজ্ঞাসু, এরা একটু যদি যোগের অভ্যাস করে, *শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে;* শব্দব্রহ্ম হল সৃষ্টি, আর আচার্য এটাকে কর্মের দিক থেকে ব্যাখ্যা করছেন, *শব্দব্রহ্ম বেদোক্তকর্মানুষ্ঠানফলম্ অতিবর্ততে অপাকরিষ্যতি কিম্ উত বুদ্ধ্বা যো যোগং তন্নিষ্ঠঃ অভ্যাসং কুর্যাৎ,* এই জগৎ সংসার কর্মময়, কর্মই মানুষকে বেঁধে রাখে, নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে, জিজ্ঞাসুও এই শব্দব্রহ্মকে পেরিয়ে যায়। আচার্য বলছেন, যে শুধু জিজ্ঞাসু, যে শুধু জানতে চাইছে জিনিসটা কি, সেও যদি যোগ পথে চলে আসে, সেও বেদে যে কর্মফলের কথা বলা হয়েছে, সেটাকেও সে অতিক্রম করে যায়; আর যে জেনেশুনে যোগের পথে নেমে গেছে, তার কথার কোন অপেক্ষা রাখে না, সে তো বেরোবেই বেরোবে। যোগ কেন শ্রেষ্ঠ?

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।।৪৫।।

(যোগী এই জন্মে পূর্বজন্মকৃত যত্ন অপেক্ষা অধিকতর যত্ন করে পাপমুক্ত হয়ে পূর্ব পূর্ব জন্মের সাধনসঞ্চিত সংস্কার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করে মোক্ষপ্রাপ্ত হন।)

অনেক জন্ম ধরে একটু একটু করে যে পূণ্যের সঞ্চয় হয়েছে, পূণ্য যেমন যেমন সঞ্চয় হতে থেকেছে তত সে আগের আগের জন্ম থেকে আরও বেশি বেশি করে যোগের অভ্যাসে প্রযত্ন হয়েছে। এইভাবে যে মানুষ অনেক জন্ম ধরে চেষ্টা করে করে যোগ অভ্যাস করে যাচ্ছেন তাঁরাও পরে পরম গতি অর্থাৎ মোক্ষরূপ শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হন। সেইজন্য হে অর্জুন, তুমি যে মনে করছ যোগভ্রষ্টরা শরৎকালের মেঘের মত ছিন্নভিন্ন হয়ে ভেসে বেড়াবে, ব্যাপারটা আদৌ তা না। এইভাবে ভগবান অর্জুনের সংশয়ের অপনোদন করলেন।

এই পাপের বোঝা সৃষ্টির আদিকাল থেকে জমা হতে থেকেছে। এই বোঝাকে এক জন্মে নাশ করা খুব কঠিন, অসম্ভবই বলা যায়। যখন এক জন্মে পারছে না তখন অনেক জন্ম ধরে সাধনা করে করে ভালো সংস্কার জমিয়ে জমিয়ে এই পাপ সংস্কারগুলিকে শেষ করে দিচ্ছে। এটাও একটা পথ। হিন্দু দর্শনে এই কারণে পুনর্জন্মবাদের উপর এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়ে আসছে। মানুষের মনে যদি এই ধারণাটাই বদ্ধমূল হয়ে থাকে যে, এই জন্মটাই যদি শেষ হয়ে থাকে, আর আমি যদি মরেই যাই, আর সিদ্ধি যদি নাই পাই তাহলে এই জন্মেই যা কিছু ভোগ করার আছে সব ভোগ করেই মরি। কিন্তু যখন আমি জানছি যে এভাবে চলবে না, আমার আবার জন্ম হবে তখন মনে হবে যে বাজে জিনিসে মন দিয়ে কোন লাভ নেই, এর চেয়ে বরং মুক্তির পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়। যদি এক জন্মে মুক্তি নাও পাই তাতে কোন ক্ষতি নেই, একটু একটু করে জমাতে থাকি। এইভাবে একটু একটু করে জমতে জমতে আমার সিদ্ধি হয়ে যাবে। শেষ দুটো শ্লোকে ভগবান যোগ এবং যোগীর মাহাত্ম্য বলছেন।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন।।৪৬।।

(যোগী কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপোনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ অপেক্ষা এবং অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞপরায়ণ কর্মিগণ অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগী হও।)

তপস্বী মানে, যিনি বিভিন্ন রকম ভাবে কোন একটা জিনিসকে নিয়ে তপস্যা করে যাচ্ছেন। জ্ঞানী বলতে এখানে পরিষ্কার তাদের বলছেন, যিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে শাস্ত্রের অর্থটুকু বুঝেছেন, এই জ্ঞানী বলতে আত্মজ্ঞানীর কথা বলছেন না। কর্মি মানে, যিনি বেদের যজ্ঞ, যাগ কর্ম আদি করছেন, জপটাও কর্ম। তপস্বী, জ্ঞানী, কর্মী সবার থেকে শ্রেষ্ঠ হলেন যোগী, যিনি ধ্যানযোগের দ্বারা অভ্যাস করছেন। আমি যাই করি, দান করি, তীর্থে যাই, যজ্ঞ করি, কিন্তু যোগীর মত আর কেউ না। *তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন,* অর্জুন সেইজন্য তুমি যোগী হও। যাঁরা গীতার আলোচনা শুনছেন, তাঁরা অর্জুনের জায়গায় নিজের নামটা লাগিয়ে দিন, *তস্মাদ্ যোগী ভবা……,* ফাঁকা জায়গাতে নিজের নামটা লাগিয়ে দিন, ভগবান আপনাকে যোগী হতে বলছেন, কত গর্বের কথা। এবার যোগীদের মধ্যে শ্রেনীবিভাগ করছেন।

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।।৪৭।।

(যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত অন্তঃকরণে মদ্‌গতচিত্তে আমার (পরমেশ্বরের) ভজনা করেন তিনি বিভিন্ন দেবদেবীর ধ্যানপরায়ণ সব যোগীদের মধ্যে আমার সঙ্গে অধিক যুক্ত বলে শ্রেষ্ঠ, এই আমার অভিমত।)

যোগী বিভিন্ন রকমের হন, বেদে দেবতাদের নিয়ে অনেকে আগে যোগ ও ধ্যানধারণা করতেন। এনাদের তুলনায় মদ্‌গতচিত্তে আমার ভজনা বা যোগ করলে তার ফল আরও ভাল হয়। বেদের ইন্দ্রাদি দেবতাদের ধ্যান করার তুলনায় শ্রীকৃষ্ণের উপর যদি ধ্যান করা হয়, বা শ্রীরামকৃষ্ণের উপর যদি ধ্যান করা হয় কেন শ্রেষ্ঠতম হবে? সীমিত আর অনন্তের উপর ধ্যান করার যে তফাৎ, এখানেও সেই তফাৎ হয়। বেদের দেবতাদের মানুষ কোথাও সীমিত মনে করে। এই কথা দিয়ে ভগবান বেদের সব কিছুকে উড়িয়ে দিচ্ছেন না, শুধু বলছেন, যাঁরা অনন্তের উপাসনা করেন তাঁরাই শ্রেষ্ঠতম। তার মধ্যে যাঁরা আমার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত, *শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ*, আমার অনন্ত রূপকে ভালবেসে যে ভজনা করে, সে *যুক্ততম মতঃ*, এটাই আমার মত।

শরৎও যেমন আমার ছেলে, আমজাদও আমার ছেলে, আমাদের মনে হবে, এখানে একটা ভালবাসা জুড়ে আছে, এই মনে হওয়াতে কোন ভুল নেই। কিন্তু আসলে এটাই হল শ্রীশ্রীমায়ের অনন্ত রূপ। মায়ের এই অমূল্য বাক্য দিয়ে, মা যে আদ্যাশক্তি, এটাকে বোঝাচ্ছেন। সুতরাই এই ভাবকে নিয়ে যিনি সাধনা করছেন বা করবেন, তখন এটাই তাঁর মুক্তির কারণ হয়ে যাবে। বলছেন, যার মন আমাতে ডুবে আছে, শ্রদ্ধার সাথে যে আমার ভজনা করে, এরা হলেন যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যত সাধক আছেন, সবার মধ্যে যোগী শ্রেষ্ঠ। যোগীদের মধ্যে যিনি শ্রদ্ধা সহকারে কেবল আমারই ভজনা করেন, আমাতেই ডুবে থাকেন, তিনি শ্রেষ্ঠতম। ষষ্ঠ অধ্যায় এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। গীতার প্রথম এই ছয়টি অধ্যায়কে অনেকে জ্ঞানযোগ বলেন। সপ্তম অধ্যায় থেকে ধীরে ধীরে ভক্তিযোগের দিকে এগোবেন।

।।ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়ং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সপ্তম অধ্যায়

জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ

সপ্তম অধ্যায়ের নাম জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ। জ্ঞান হল থিওরেটিক্যাল নলেজ, ধর্মের ব্যাপারে জানা; বিজ্ঞান মানে আধ্যাত্মিক সত্যকে প্রত্যক্ষ করা। পরে ভগবান জ্ঞান ও বিজ্ঞান নিয়ে বলবেন, সেখানে আমরা এর আরও ব্যাখ্যা করব। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান যোগ সাধন নিয়ে বললেন, অধ্যায়ের শেষ করতে গিয়ে ভগবান বললেন, *যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।।* যোগীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ, যিনি শ্রদ্ধার সাথে আমার ভজনা করেন, আমাকে ভক্তি করেন এবং আমাতে মগ্ন হয়ে থাকেন। সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান এবার এটাকেই বিস্তারে বলছেন। ভক্তি কি, আমি কে, এগুলোকে নিয়ে এবার পরপর বলবেন।

কথামৃতে এক জায়গায় বর্ণনা আছে –দক্ষিণেশ্বরে নরেন আদি ছোকড়া ভক্তরা একদিন বসে আছেন, তাঁদের দিকে তাকিয়ে ঠাকুর বলছেন, এদের শুধু এতটুকু জানলেই হবে; আমি কে আর এরা কে, আর এদের সাথে আমার কি সম্পর্ক। একবার যদি আমরা বুঝতে পারি, আমি কে, অহং ব্রহ্মাস্মির স্তরে বলা হচ্ছে না; আমি যে শরীর, মনের পারে অন্য কিছু এবং তার সাথে ঈশ্বর কে, এই দুজনের যে সত্তা, এটাকে যদি একবার বুঝে নেওয়া যায় আর এই দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা কি, নিজের স্তরেও যদি বুঝে নেওয়া যায়, আর আচরণও সেই অনুসারে যদি করা হয়, তাহলে আমাদের আর বেশি কিছু করতে হবে না। যেমন আমি যদি মনে করি ঈশ্বর বলে কেউ নেই, মা-বাবার সম্পর্কে আমার জন্ম হয়েছে, তার মানে এই শরীরের বাইরে আমার সত্তা শূন্য, ঈশ্বর শূন্য; জীবনের শেষে আমার কি উপলব্ধি হবে? শূন্য। গুণ করার সময় দুটো সংখ্যার মধ্যে একটা যদি শূন্য হয়, গুণফলও শূন্য হবে। দুটোই যদি শূন্য হয়, গুণফল শূন্য হবে। পাঁচ গুণিতক শূন্য সমান শূন্য। আমি যত বড়ই হই না কেন, যদি ঈশ্বরকে আমি না মানি, নীট ফল হবে শূন্য। আর ঈশ্বরকে আমি যতই মহান থেকে মহানতর মনে করি না কেন, কিন্তু তার সাথে আমি যদি মনে করি আমি কিছুই না, আমি দীন-হীন, আমি কাঙালী, তারও নীট গুণফল শূন্য হবে। আমিও শূন্য, ভগবানও শূন্য। কেউ যদি শূন্যে বিলীন হতে চায়, তাহলে সে এভাবেই ভাবতে থাকুক। হয় ঈশ্বর শূন্য, নয় আমি শূন্য।

কিন্তু আমি যদি কিছু হতে চাই, বুঝতে চাই বা ঠিক ঠিক সত্তাকে যদি জানতে চাই, তাহলে আমার উদ্দেশ্য হবে নিজেকে নিত্য-বুদ্ধ-মুক্ত-শুদ্ধ রূপে জানা, উদ্দেশ্য নিজেকে অনন্ত রূপে জানা। স্বামীজী বারবার বলছেন, তোমার ভিতরেই সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত শক্তি তোমার মধ্যেই বিদ্যমান। কারণ তুমি সেই অনন্ত। এই অনন্ত রূপে যদি আমরা নিজেকে জানতে চাই, সত্যকে যদি অনন্ত রূপে জানতে হয়, তাহলে ঈশ্বর কে, আমি কে, ঈশ্বর ও আমার সঙ্গে কি সম্পর্ক, এই কটা জিনিস ভাল করে জানতে হবে। আর দুটোকেই অনন্ত হতে হবে, তা নাহলে হবে না। নিজেকে যদি অনন্ত নাও মনে করতে পারি, শূন্য কোন মতেই মনে করা চলবে না। অনন্তের সঙ্গে যেটাকেই গুণ করা হবে, সেটাই অনন্ত হবে। শূন্যের সাথে যেটাই গুণ করা হবে সেটাই শূন্য হবে। এই অধ্যায়ে ভগবান এটাই বলবেন, হে অর্জুন, আমিও অনন্ত তুমিও অনন্ত।

এই অধ্যায় শুরু করার আগে দর্শন সম্পর্কে কয়েকটা প্রয়োজনীয় কথা জেনে রাখা খুব দরকার। গীতাতে আমরা একটা কথা অনেকবার আলোচনা করেছি, বেদের ধর্ম সনাতন ধর্ম, ঠাকুর বলছেন ঋষিদের ধর্ম সনাতন ধর্ম, এই সনাতন ধর্মের আধ্যাত্মিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, সনাতন ধর্ম পুরো উন্মুক্ত, এক স্বাধীন ধর্ম। সনাতন ধর্মে কোন কিছু বাঁধা নেই, কোন বন্ধন

নেই। বেদের ঋষিরা একের পর এক এসে তাঁদের অনুভূতিগুলিকে পরম্পরায় ঢেলে দিয়ে চলে গেছেন। ব্যাসদেব এসে ঋষিদের দেওয়া সমস্ত জ্ঞানরাশিকে এক জায়গায় একত্রিত করে দিলেন। তার সঙ্গে তখনকার দিনের আচার আচরণ, বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, তৎকালীন বিভিন্ন ধর্ম দর্শন, সব কিছুকে ব্যাসদেব এক জায়গায় নিয়ে এলেন। ব্যাসদেবই প্রথম হিন্দু ধর্মকে একটা প্ল্যাটফরমে এনে দাঁড় করিয়ে হিন্দু ধর্মের সব কিছুকে সংরক্ষিত করে দিলেন। সেখান থেকে সনাতন ধর্মের ধারা এগিয়ে চলতে থাকল, এবং চলতে চলতে সনাতন ধর্মে আরও নূতন নূতন দর্শন এসে সংযুক্ত হলো। অষ্টম শতাব্দীতে এলেন শঙ্করাচার্য। তিনিও হিন্দু ধর্মের সব দর্শন, আচারের সব কিছুকে আবার এক জায়গাতে এনে দিলেন। এইভাবে প্রায় বার'শ বছর চলার পর এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। শঙ্করাচার্যের অন্তর্ধানের পর সনাতন ধর্ম যতটা আবার ছড়িয়ে গিয়েছিল, ঠাকুর এসে আবার সব কিছুকে এক জায়গায় নিয়ে এসে বললেন, মত পথ। ব্যাসদেব, শঙ্করাচার্য আর শ্রীরামকৃষ্ণ, এই তিনজন হলেন great unifiers of Hindu religion।

সমস্ত বেদরাশিকে এক জায়গায় করে ব্যাসদেব বলে দিলেন, এই পর্যন্ত বেদ, এরপর বেদে আর কোন কিছু সংযুক্ত হবে না। এরপরের যত রচনা আসবে সেটা অন্যান গ্রন্থ রূপে সংরক্ষিত থাকবে। ফলে বেদের পরবর্তিকালের ঋষিরা স্বাধীন কিছু কিছু যে চিন্তা-ভাবনা দিলেন, তার সঙ্গে বিভিন্ন যে দর্শন দিলেন, এই দর্শনগুলি সবই বৈদিক দর্শন রূপে স্বীকৃত। এই দর্শনকে বলা হয় আস্তিক দর্শন। এই আস্তিক মানে ঈশ্বরে বিশ্বাস নয়। আমাদের ষড়দর্শনের অনেক দর্শন আবার ঈশ্বরকে মানে না, কিন্তু তাও বলা হয় আস্তিক দর্শন। আস্তিক দর্শন মানে, যে দর্শন বেদের কথাকে শেষ কথা বলে স্বীকার করে। এই আস্তিকের সাথে ঈশ্বরে বিশ্বাসের কোন সম্পর্ক নেই। ষড়দর্শনের ছটি দর্শন খুব নামকরা – সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশাষিক, মীমাংসা এবং বেদান্ত। আচার্য শঙ্কর আবার বেদান্তকে সবার উপরে বসিয়ে দিলেন। বেদ থেকে উল্লেখ করে আচার্য শঙ্কর প্রখর যুক্তি দিয়ে প্রথমেই দেখিয়ে দিচ্ছেন, কিভাবে বেদান্তের বক্তব্য আর বেদ যা বলতে চাইছে, দুটো এক। দ্বিতীয় যেটা করলেন, তা হল, আচার্য শঙ্কর তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে বাকি পাঁচটি দর্শনকে কচ কচ করে কেটে রেখে দিলেন। যার জন্য আচার্য শঙ্করের দর্শন বোঝা খুব কঠিন, একটু প্রস্তুতি ও একটু জ্ঞান না থাকলে আচার্যকে বোঝা যায় না। কিন্তু এটাও ঠিক যে, আচার্যের বক্তব্য যদি না বোঝা যায়, তাহলে নিজের ধর্মের প্রতি আমাদের আস্থা হবে না। সেইজন্য আচার্যের ভাষ্যগুলি সব হিন্দুদের পড়া ও জানা অত্যন্ত আবশ্যক।

এই কাজ করতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর একটা খুব সুন্দর জিনিস করলেন। আমরা অতি সাধারণ মানুষ হওয়াতে, যখন যুক্তিতর্ক করি তখন তাকে মাটিতে ফেলে যতক্ষণ গলা টিপে তাকে শেষ না করে দিতে পারছি, ততক্ষণ ছাড়ি না। আচার্য শঙ্কর কিন্তু তা করলেন না, তিনি ছিলেন ইউনিফায়ার। শ্রীরামকৃষ্ণ যখনই কাউকে দেখতেন অন্য মত বা পথের নিন্দা করছে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাকে আটকে দিতেন। নরেন্দ্রনাথকে তিনি কতবার নিষেধ করেছেন, নরেন্দ্রনাথ যখনই কোন ধর্মপথের নিন্দা করতেন, ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিষেধ করতেন, কারণ ওটাও একটা পথ। ব্যাসদেবও ঠিক তাই করলেন, তিনি কোন মত, কোন পথকে বাদ দিলেন না, আচার্য শঙ্করও কিছু বাদ দিলেন না। আচার্য সাংখ্য থেকে সৃষ্টিতত্ত্বকে নিলেন। আচার্য এত বড় তত্ত্বদর্শি, তিনি ইচ্ছে করলে তাঁর মত করে একটা নূতন সৃষ্টিতত্ত্ব দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি সেটা করলেন না, না করে সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব যেমনটি আছে তেমনটি নিলেন, এবং বললেন সাংখ্যরা তত্ত্ব নিরুপণে ভাল। যোগ থেকে নিলেন সাধনার পদ্ধতি। লোকেরা মনে করে বেদান্ত মানে শুধু অহং ব্রহ্মাস্মি, কিন্তু তা না, বেদান্ত সবটাকেই নেই, সাংখ্যকেও নেয়, যোগকেও নেয়। ন্যায় ও বৈশাষিকের যে যুক্তিতর্কের পদ্ধতি, সেটাকে তিনি পুরোটাই নিলেন। যুক্তি ছাড়া ধর্ম চলে না, ধর্ম মানেই যুক্তিসঙ্গত হতে হবে, এই জিনিসটা তিনি ন্যায় ও বৈশাষিক থেকে নিলেন।

হিন্দুদের ঠিক ঠিক ধর্ম ও ধর্মদর্শন হল মীমাংসা, অনেক সময় পূর্বমীমাংসাও বলা হয়, আবার কর্মকাণ্ডও বলা হয়। হিন্দুদের ধর্ম বেদের ধর্ম। বেদে দেবতারা আছেন, কিছু দেবী আছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য যজ্ঞ করা, পূজা করা, যদিও হবনের মাধ্যমেই পূজা করা হত –হিন্দুদের এটাই ধর্ম। হিউয়েন সাংএর মত পর্যটকরা এসে হিন্দুদের নামে বললেন, হিন্দুরা অগ্নির উপাসক। ঠিকই, হিন্দুরা স্বভাবেই কর্মকাণ্ডী। আচার্য শঙ্কর পুরো কর্মকাণ্ডকে নিয়ে এলেন, আর সমস্ত দেবতা-দেবীদের পঞ্চদেবতায় দাঁড় করিয়ে তিনি বলে দিলেন যে কোন পূজায় সবার আগে হবে এই পঞ্চ দেবতার পূজা। কর্মকাণ্ডীদের যত উপাচার ছিল, সেগুলোকে তিনি নিয়ে এলেন, কিন্তু যজ্ঞকে বাদ দিয়ে দিলেন। আর সিদ্ধান্ত তিনি নিলেন বেদান্তের। আচার্যের কি সাংঘাতিক মনের শক্তি, আচার্যকে না পড়লে বোঝা যাবে না যে, তাঁর বুদ্ধি ও যুক্তি কত ক্ষুরধার। বেদের উপর আধারিত যত ধর্ম, যত দর্শন, যত রকম চিন্তা-ভাবনা, যাবতীয় যা কিছু আছে সব কটাকে তিনি একটা জায়গায় এনে সুন্দর করে দাঁড় করিয়ে এলেন।

গীতার রচনা ব্যাসদেবের, শ্লোক আকারে থাকার জন্য অনেক জায়গায় অর্থগুলি স্পষ্ট হয় না। যার ফলে কোথাও কোথাও যদি আমরা শাব্দিক ভাবে শ্লোকের অর্থ করতে যাই তখন মনে হবে কোন কোন শ্লোক বেদান্তের সাথে মিলছে না। গীতার এই শ্লোকগুলিকে আধার করে অনেকেই বেদান্তকে আক্রমণ করেন। কিন্তু আচার্য শঙ্কর পুরো যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন, এই শ্লোক কিভাবে বেদান্তের কথাকেই স্পষ্ট করছে। সপ্তম অধ্যায়ের চার নম্বর শ্লোকেই আমরা দেখব, গীতার এই শ্লোকের শাব্দিক অর্থ বেদান্তের সাথে মিলছে না। কিন্তু আচার্য শঙ্কর যুক্তি দিয়ে পরিষ্কার দেখিয়ে দিচ্ছেন, এই শ্লোক বেদান্তের মতকেই পুষ্টি করছে।

খুব সহজ কথায় ভগবান এই অধ্যায়ে বলবেন, সৃষ্টিতে দুটি তত্ত্ব চলে – একটাকে বলে প্রকৃতি, আর-একটাকে বলা হয় পুরুষ। একটু আগে আমরা বললাম, সাংখ্য দর্শন থেকে আচার্য নিলেন সৃষ্টিতত্ত্বকে। যোগ আর সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব এক। এই দুটো দর্শনের মতে চৈতন্যকে বলা হয় পুরুষ, আর জড়কে বলা হয় প্রকৃতি। অনেকে প্রশ্ন করেন, মেয়েদের কেন প্রকৃতি বলছে। মেয়ে প্রকৃতি নয়, মেয়ে পুরুষই। চৈতন্যকে বলা হয় পুরুষ আর জড়কে বলা হয় প্রকৃতি। মেয়েরা কি জড়? জড় কেন হতে যাবে, মেয়েরা কোন ভাবেই জড় নয়। কিছু কিছু ধর্মে অবশ্য মেয়েদের জড় বলা হয়। কিন্তু হিন্দু ধর্মে পুরুষ নারীতে কোন ভেদ নেই, শারীরিক ভাবে কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আকৃতির তফাৎ থাকতে পারে ঠিকই, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরে গেলে পুরুষ নারী সব এক, আত্মাতে তো পুরো এক।

প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা –সত্ত্ব, রজো আর তমো। সত্ত্ব স্থিতি দেয়, রজো গতি দেয় আর তমো পুরো বসিয়ে রেখে দেয়। মানুষের যত রকমের ইমোশান সব সত্ত্ব রজো তমো এই তিনটে গুণ থেকে আসে। আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও যাবতীয় যা কিছু আছে সব সত্ত্ব রজো ও তমো থেকে আসে। সাধনা করতে গেলে প্রথমে মনকে শান্ত করার চেষ্টা করতে হয়। মনকে ধীরে ধীরে শান্ত করলে তখন বোঝা যায় আমরা সবাই কিভাবে প্রকৃতির এলাকায় আছি। সাধারণ ভাবে মানুষ এটা বুঝতে পারে না। একবার যখন বুঝে গেল, আমি প্রকৃতির এলাকায় আছি, এরপর ধীরে ধীরে মনকে যখন আরও শান্ত করা হয়, *ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা,* তখন মানুষের যে প্রজ্ঞা, বুদ্ধি খুলে যায়। রাজযোগে একটা খুব সুন্দর সূত্র আছে, যেখানে বলছেন, যোগী ওই অবস্থায় পৌঁছানর পর জিনিসগুলিকে স্পষ্ট ভাবে দেখতে পান, জিনিসটা যেমন তেমন দেখতে পান। আমরা সচরাচর এভাবে দেখতে পাই না, কারণ আমাদের সাধন ভজন নেই। তার উপর আবার একজনকে স্ত্রী মনে করছি, একজনকে স্বামী মনে করছি, আর মনে করছি ইনিই আমার জীবন। আমার জীবন কেন একজন ব্যক্তি হতে যাবে, আমি একা এসেছি, একাই আমাকে যেতে হবে। কিন্তু মাঝখান থেকে প্রকৃতি বা মায়া যাই বলি না কেন,

এই প্রকৃতি দেখিয়ে দিচ্ছে এই স্ত্রী বা স্বামী আমার আপনজন। তারপর সেখান থেকে নানা রকম খেলা শুরু হয়ে যাচ্ছে।

ঋষিরা ধ্যানের গভীরে গিয়ে যখন এই তত্ত্বগুলিকে দেখলেন, তখন তাঁরা পরিষ্কার করে জানিয়ে দিলেন, এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি যখন পুরুষ বা চৈতন্যের কাছে আসে, তখন প্রকৃতির সাম্য ভাবটা নষ্ট হয়ে যায়। সত্ত্ব, রজো আর তমোর যে ভারসাম্য, সেটা বিগড়ে গিয়ে প্রথমে সৃষ্টি হয় মহৎ। মহৎ হল সমষ্টি মন। মহতের মধ্যে প্রথম যে অনুভূতিটা আসে, সেটা হল 'আমি আছি'। এটাই হয়ে গেল অহঙ্কার। প্রকৃতি থেকে মহৎ, মহতের থেকে এসে গেল অহঙ্কার। এখান থেকে শুরু হয়ে গেল সৃষ্টির খেলা। অহঙ্কার থেকে সৃষ্টি হয় পঞ্চ তন্মাত্রা – রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ। পঞ্চ তন্মাত্রা থেকে সৃষ্টি হয় ইন্দ্রিয়গুলি, পঞ্চ তন্মাত্র থেকেই সৃষ্টি হয় মনের। আর সেখান থেকেই সৃষ্টি হয় পঞ্চ মহাভূত –আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী। এই সব কিছুকে নিয়েই তৈরী হয় প্রকৃতির এলাকা।

সাংখ্য দর্শন ভারতের সব থেকে প্রাচীন দর্শন। সাংখ্য দর্শনের প্রবক্তা কপিল মুনিকে স্বামীজী বলছেন, Father of Indian philosophy, ভারতীয় দর্শনের জনক। সাংখ্য এবং যোগ মতে পুরুষ আলাদা, প্রকৃতি আলাদা। পুরুষ আর প্রকৃতি কেন যে এক অপরের কাছে চলে আসে, এর উত্তর কারুর কাছে নেই। প্রকৃতির কাছে এসে পুরুষ কেন ছটফট করে, কারুর জানা নেই। পুরুষ আর প্রকৃতির যে মিলন হয়, কেন হয়, কেউ জানে না। কিন্তু মাটি আর জল মিলে এমন পাঁক হয়ে যায় যে, একটাকে আর-একটা থেকে কিছুতেই আলাদা করা যায় না। একমাত্র মানুষই এর সমাধান খুঁজে বার করতে পারে। নিম্নযোনির প্রাণীরাও পারে না, মানুষের থেকে উপরে যে দেবতারা, তাঁরাও পারেন না। দেবতাদের মনে এত ভোগের ইচ্ছা যে তাঁদের মন ভোগেই ডুবে থাকে বলে এদিকে আসতে পারেন না। নিম্নযোনির প্রাণীদের বুদ্ধি এত অবিকশিত যে তাদের ক্ষমতাই নেই যে এগুলোকে নিয়ে চিন্তা করবে। মানুষ শ্রেষ্ঠ অন্য কোন কারণে না, মানুষ শ্রেষ্ঠ এই কারণে যে মানুষের বুদ্ধি নিম্নযোনির প্রাণীদের থেকে শত গুণ বিকশিত।

মানুষের মধ্যেও ভোগ আছে, মানুষের মধ্যেও কিছু ক্ষমতা আছে। কিন্তু মানুষের উপরে যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে ভোগের ইচ্ছা অনেক বেশি। মানুষ সব সময় মাঝা মাঝারিতে থাকে। সেইজন্য বলাই হয়, ধর্ম হল মিডল ক্লাশদের জন্য। বিশাল বড়লোকেরা ভোগে ডুবে থাকে বলে ধর্মের দিকে যায় না, যারা অত্যন্ত দরিদ্র মানুষ, তাদের পেটের চিন্তা এত বেশি যে ধর্মের দিকে মন যায় না। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, স্থাপত্য সব মধ্যবিত্তদের দখলে। দেশের অর্থনীতিও মধ্যবিত্তদের দিয়ে চলে। সারা দেশে মধ্যবিত্তরা যে উপার্জন করে, তার বেশির ভাগটা ধনী বণিক সম্প্রদায় চালাকি করে নিয়ে নেয়, আর নীচে যারা আছে, সেখান পর্যন্ত মধ্যবিত্তদের উপার্জিত টাকাটাই রোল করে। মধ্যবিত্তরাই দেশ ও সমাজের প্রধান, যাদের বুদ্ধি আছে, ক্ষমতা আছে, কিন্তু চাহিদা কম। চাহিদা বেশি হলে বড়লোক হয়ে গিয়ে সব কিছু থেকে আলাদা হয়ে যায়। আর ক্ষমতা একটু কম হলে নীচে পড়ে যায়। এখন মধ্যবিত্তদের যাদের খাওয়া-পরা মোটামুটি চলে যাচ্ছে, এদের যখন জন্মজন্মান্তরের পূণ্য অর্জন হয়, তখন তারা সাধনা করতে শুরু করে এবং চিত্তবৃত্তি নিরোধের দিকে এগোয়। শেষে জানতে পারে, আরে আমিই তো সেই পুরুষ।

সাংখ্য আর যোগ পুরুষ আর প্রকৃতিকে পুরো আলাদা করে দিলেন, দুজনের কোন সম্পর্ক নেই। ব্যাসদেব দুটোকে একটা প্ল্যাটফরমে এনে দেখাচ্ছেন, সবটাই ঈশ্বরের, চৈতন্যের। তিনি খুব সুন্দর করে প্রকৃতি শব্দটাকে নিলেন, নিয়ে তার আগে দুটো বিশেষণ জুড়ে দিলেন, পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতি। পরা প্রকৃতিকে তিনি বলছেন ক্ষেত্রজ্ঞ, অর্থাৎ ভিতরে সেই চৈতন্য যিনি অন্তর্জ্যোতি রূপে অন্তর্যামী হয়ে বিরাজ করছেন। পরা প্রকৃতিও ভগবান। অপরা প্রকৃতি হল জড়, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড,

যার মধ্যে রয়েছে আমাদের দেহ, মন, বুদ্ধি সহ সব কিছু। এবার ভগবান এখানে বলবেন, যাঁরা আমার ভক্ত, যাঁরা আমাকে ভালবাসে, যাঁরা শ্রেষ্ঠ যোগী, আগের অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে যাঁদের কথা বললেন, *যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা,* যাদের মন আমার মধ্যে ডুবে আছে, তারা এই অপরা প্রকৃতি থেকে বেরিয়ে পরা প্রকৃতিতে চলে আসে। এখানে খুব সূক্ষ্ম ভাবে দর্শনটা পাল্টে যাচ্ছে, কিন্তু পুরো জীবনদর্শনকে, ধর্মদর্শনকে পাল্টে দেয়। সাংখ্য দর্শন এই মতবাদকে মানবেন না, তাঁরা ঈশ্বরকেই মানেন না। মীমাংসা, যেটা হিন্দু ধর্মের মূল দর্শন, তাঁরাও ঈশ্বরকে মানেন না। যোগ একটু মানে, আবার মানেও না। যোগ দর্শনে বলা হয়, সৃষ্টিকর্তা বলে কেউ নেই, সংহার কর্তাও কেউ নেই, পালকও কেউ নেই। কিন্তু গুরু রূপে ঈশ্বর আছেন।

গীতা কোন মতবাদকেই ছেড়ে দিচ্ছে না, সব মতবাদকে এক জায়গায় নিয়ে আসছেন। অপরা প্রকৃতি, যেটা সংসার, এটাকে ত্যাগ করা দরকার; এই কারণেই ত্যাগ করা দরকার, অপরা প্রকৃতি হল ঈশ্বরের নিম্ন প্রকৃতি। যোগ প্রকৃতিকে আবর্জনা রূপে দেখছে, বেদান্ত প্রকৃতিকে আবর্জনা রূপে দেখছেন না, বেদান্ত দেখছেন এটা নিম্ন প্রকৃতি। যেমন, আমি স্কুলে পড়ছিলাম, ক্লাশ টুয়েলভের পরীক্ষা পাশ করে গেলাম, আমাকে সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হল। স্কুল আমার শেষ, এবার আমি কলেজে যাব। নিম্ন শ্রেনীর ক্লাশগুলিরও দরকার আছে। একটা বাচ্চা ছেলে স্কুলে ভর্তি হয়ে বলছে, আমার উদ্দেশ্য যদি কলেজে পড়াই হয়, তাহলে আমি কেন স্কুলে পড়তে যাব? সবাই ওকে বোঝাচ্ছে, প্রথমে স্কুলে সবাইকে পড়তে হয়। সে বেচারী কিছুতেই বুঝতে চাইছে না, তার একটাই বক্তব্য, উদ্দেশ্য যদি কলেজে পড়াই হয়, তাহলে কেন আমি স্কুলে পড়ব, আমাকে সরাসরি কলেজে নিয়ে চল। ঠাকুরকে এটাই একজন ভক্ত বলছে, মশাই, আমাকে সমাধিটুকু শিখিয়ে দিন। আমাদের মত সন্ন্যাসীদেরও এই ধরণের প্রশ্নের সামনে পড়তে হয়। পড়াশোনা নেই, চিন্তা-ভাবনা নেই, প্রস্তুতি নেই, শুধু প্রশ্ন করে যাবে। সবাইকে নীচে থেকে শুরু করতে হয়। যোগ আর বেদান্তের এটাই তফাৎ। যোগ প্রকৃতিকে আবর্জনা রূপে ফেলে দেয়, বেদান্ত বলে প্রকৃতিরও দরকার ছিল, হয়ে গেছে, এবার এখান থেকে এগিয়ে চল। ভগবান এটাকে বলবেন, যিনি আমার ভক্ত, যোগীদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি শুধু পরা প্রকৃতিকে চান, যেটা আমি নিজে। অপরা প্রকৃতিটাও তিনি, কিন্তু সেটার দিকে শ্রেষ্ঠ যোগী দৃষ্টি দেন না।

আমরা দেখলাম, সৃষ্টিতত্ত্বকে, সৃষ্টিকে কিভাবে সাংখ্য বর্ণনা করেন, বেদান্ত সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব পুরোটা নিয়েছেন। কিন্তু একটা জায়গায় ছোট্ট একটা পরিবর্তন করে দিলেন। এই পরিবর্তন করার কি ব্যাসদেবের অধিকার আছে? অবশ্যই আছে। কারণ তিনি ঋষি, কপিল মুনিও ঋষি, ব্যাসদেব তিনিও ঋষি। পরে পরে ঋষিরা যাঁরা এসেছেন, যেমন ঠাকুর, ঠাকুর দুটোই নিচ্ছেন। প্রকৃতি ত্যাজ্য এটাও নিচ্ছেন, কিন্তু তিনি বারবার বলছেন, ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, তিনিই এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। এই ভাব বেদান্তও নেয়। তাহলে কি কপিল মুনি ভুল ছিলেন, পতঞ্জলি ভুল ছিলেন? কখনই ভুল ছিলেন না। ওনারা ছিলেন evolved soul, যেমনটি তাঁরা দেখেছিলেন, তেমনটি বলে গেছেন। সাংখ্য ও বেদান্তের উপর লেকচার দিতে গিয়ে স্বামীজী বলছেন, ঐ একটা ধাপ বাকি থেকে যায়, ঐ ধাপটা পেরিয়ে গেলে সাংখ্য ও বেদান্ত এক হয়ে যায়, যেখানে বলা হয়, পুরুষ আর প্রকৃতি দুটোই ভগবানের। এবার আমরা সপ্তম অধ্যায়ের মূল শ্লোকের আলোচনায় প্রবেশ করব।

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু।।১।।

(শ্রীভগবান বললেন – হে পার্থ, কোন প্রকার কর্মের ফলাশ্রয় না করে তুমি সর্বতোভাবে আমার শরণাগত হয়ে আমাতে মনোনিবেশপূর্বক যোগাভ্যাস করলে বিভূতি, বল, শক্তি ও ঐশ্বর্যাদিসম্পন্ন পূর্ণরূপে আমাকে নিঃসংশয়ে যেভাবে জানতে পারবে, তা শ্রবণ কর।)

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান শ্রেষ্ঠ যোগীদের কথা বলতে গিয়ে বললেন, *যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা*। শ্রেষ্ঠ যোগী কাকে বলা যাবে? সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ভগবান এটাকে স্পষ্ট করছেন, *ময্যাসক্তমনাঃ*, আচার্য এর খুব সুন্দর অর্থ করছেন, *পরমেশ্বরে আসক্তং মনো যস্য*, পরমেশ্বরে যাঁর মন আসক্ত। মানুষের মন কোথায় আসক্ত থাকে? আচার্যের খুব বিখ্যাত স্তব চর্পটপঞ্জিকা স্তোত্র *ভজ গোবিন্দম্ ভজ গোবিন্দম্ গোবিন্দম্ ভজ মূঢ়মতে*, সেখানে বলছেন, *বালস্তাবৎক্রীড়াসক্ত-স্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ। বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্ন পরমিব্রহ্মহি কপি ন লগ্নঃ*, বাচ্চা অবস্থায় খেলায় আসক্ত, তরুণ তরুণীতে আসক্ত, আর বয়স কালে চিন্তামগ্ন। ভগবান বলছেন, যিনি শ্রেষ্ঠ যোগী, তিনি সব সময় *ময্যাসক্তমনাঃ*, তাঁর মন সব সময় আমাতে মগ্ন হয়ে আছে। কিন্তু তারপরে বলছেন, *যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ*, এর আগে দুটি শব্দ এসেছিল, *মচ্চিত্ত* আর *মৎপরঃ*, চিত্ত সব সময় আমাতে ডুবে আছে আর আমাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে। আচার্য এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, যেমন একজন তরুণ এক যুবতীতে আসক্ত, কিন্তু সেও জানে ভগবান এই যুবতী থেকে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যিনি ভক্ত, যিনি যোগী, তাঁর মন ডুবে আছে ঈশ্বরে, পরমাত্মাতে আর তার সাথে তিনি জানেন ঈশ্বরই শ্রেষ্ঠতম।

এখানে আরও দুটো নূতন শব্দ নিয়ে আসছেন – ঈশ্বরে মন আসক্ত, আর ঈশ্বরকে মনে করেন পরম আশ্রয়। আমরা যখন খুব কষ্টে পড়ি, অনেক সময় তখন আমরা বলি ঠাকুর দেখবেন। যখন ভাল ছিলাম, তখন কে আমাকে দেখছিলেন? ভালোটাও তো তিনিই দিয়েছিলেন। যে কোন কারণে যদি আমার সুখ, সুবিধা হয়ে থাকে, সেই সুখ সুবিধা তিনিই দিয়েছিলেন, আমার যে রোগ ব্যাধি, শোক হয়েছিল, সেটাও তিনিই দিয়েছিলেন। আজ বয়স হয়ে যাওয়ার পর বলছি, আমার এই সমস্যা, এই ঝামেলা; এও ভগবানই দিচ্ছেন। এক জায়গায় ঠাকুর বলছেন, আমার এখন এমন অবস্থা যে, হয় সবাইকে বিশ্বাস করি, নয় তো কাউকেই বিশ্বাস করি না। ঠাকুরের কোন অসুখ হয়েছে, সবাইকে গিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, হ্যাঁগা আমার একি হল বলো দিখি, হ্যাঁগা আমি কি করব বলো তো; এদের মধ্যে ডাক্তারও পড়ে; আবার কাউকেই বিশ্বাস নেই। যিনি পরমযোগী তিনি জানেন, আমাকে যে লাথি ঝাঁটা মারছে, অপমান করছে, ঠাকুরই আমাকে এগুলো দিচ্ছেন আমার কর্মফল রূপে। কেউ যদি তাঁকে ভালবেসে দুটি ভাল কথা বলতে আসে, সেটাও তিনি জানেন ঠাকুরই ওকে দিয়ে দুটো ভাল কথা বলিয়ে নিচ্ছেন। কারণ পরমযোগী জানেন আমার ঈশ্বর আমার পরম আশ্রয়; শুধু মাত্র একটা দুটো ক্ষেত্রে না, প্রত্যেকটি পরিস্থিতিতেই তিনি আমার পরম আশ্রয়। এই হল ঈশ্বরে আসক্ত মন আর ঈশ্বরে আশ্রিত মনের দৃষ্টান্ত।

ইদানিং সমাজের আচারবিধি ও আচরণবিধি অনেক পাল্টে গেছে, কিন্তু তিরিশ চল্লিশ বছর আগেও বাড়ির অবিবাহিত মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিল; যার সাথেই বিয়ে হোক, অন্ধ, খঞ্জ, বোবা, পাগল, লম্পট যাই হোক, মেয়েটিকে ওই পতিতেই মন আসক্ত রাখতে হবে আর তাকেই আশ্রয় করে থাকতে হবে। বড়রা বলে দিয়েছেন পতি পরমেশ্বর, সেটা মেনেই সে চলছে। পতি পরমেশ্বরের কি অর্থ যে বলছে সেও জানে না, যাকে উদ্দেশ্য করে পতি পরমেশ্বর বলা হয়েছে সেও বোঝে না। এখন দিনকাল অবশ্য অনেক পাল্টে গেছে। কিন্তু কোন মানুষের উপর আশ্রিত না হয়ে, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের উপর আশ্রিত না হয়ে এই ধরণের যোগীরা কেবলমাত্র ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে আছেন।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং, অর্জুন, এইভাবে যদি তুমি চল তাহলে তুমি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে। এটা কিভাবে হয় এবার আমি তোমাকে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করছি। আচার্য এখানে ব্যাখ্যা করে

বলছেন, *যো হি কশ্চিৎ পুরুষার্থেন কেনচিদ্ অর্থী ভবতি স তৎসাধনং কর্ম অগ্নিহোত্রাদি তপো দানং বা কিঞ্চিদ্ আশ্রয়ং প্রতিপদ্যতে,* ধর্ম জীবনেও যাঁরা আসেন তাঁরাও অগ্নিহোত্রাদি, বেদে যে যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি করতেন; এখন সকাল বিকাল যে জপ করা হয়, বিভিন্ন তপস্যা, দান কর্ম ইত্যাদি যে করা হয়, এগুলো করা হয় যাতে আমার ধর্ম জীবনটা ভাল থাকে। কিন্তু পরমযোগী যিনি, তিনি এগুলোর পারে চলে যান। এগুলো খারাপ কিছু না, করা ভাল। কিন্তু ঠিক ঠিক যোগী এই ধরণের সমস্ত কর্ম ও কর্মফলের আশ্রয়কে ছেড়ে দেন; তাঁর ভাল হোক, মন্দ হোক, সুস্থ থাকুন, অসুস্থ থাকুন সব অবস্থায় তিনি একমাত্র ঈশ্বরকে ধরে আছেন। তিন-চার মাসের শিশু যেমন মা ছাড়া কিছু বোঝে না, তিনিও ঈশ্বর ছাড়া কিছু জানেন না।

ভগবান বলছেন, হে অর্জুন তুমি যদি আমাকে জানত পার এবং আমার গুণগুলি যদি ঠিক ঠিক জানতে পার, তাহলে তোমার মুক্তি হয়ে যাবে। আর এই ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোন শঙ্কা না থাকে, কোন প্রকার সংশয় যেন না থাকে। তোমাকে পূর্ণ রূপে এই পুরো ব্যাপারটাকে বোঝানর জন্য আমি এই অধ্যায় শুরু করছি। *অসংশয়ং সমগ্রং,* ঈশ্বরের যত বিভূতি আছে, যত গুণ রয়েছে, এটাকে তুমি যেভাবে জানতে পারবে, ঠিক সেইভাবে আমি তোমাকে একেবারে সম্পূর্ণ ভাবে বলছি –

জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োহন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।।২।।

(আমি সবিজ্ঞান অর্থাৎ গুরুশাস্ত্রোপদেশ-জনিত অপরোক্ষ অনুভবের সঙ্গে এই শাস্ত্রীয় জ্ঞান নিঃশেষে তোমাকে বলব, স্বানুভূতির সাথে যা লাভ করলে এই অনিত্যলোকে শ্রেয়ঃপথে তোমার আর কিছু জানবার অবশিষ্ট থাকবে না অর্থাৎ মোক্ষমার্গ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করবে।)

ভগবান বলছেন, আমার ব্যাপারে যে জ্ঞান, আমি ঈশ্বর, আমার যে স্বরূপ, এটা এমনি তোমাকে বলব না, বিজ্ঞানসহিত বলব। ঠাকুর জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে পরিভাষিত করতে গিয়ে দুধের উপমা আনছেন, কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দুধ চোখে দেখেছে, আবার কেউ দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। আচার্য এখানে বিজ্ঞানসহিতকে ব্যাখ্যা করে বলছেন, *স্বানুভবসংযুক্তম্,* শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমার নিজের যে অনুভব হয়েছে, সেই অনুভবকে সঙ্গে নিয়ে তোমাকে সব বলব। ঠাকুর বলছেন, মাইরি বলছি, আমি ঈশ্বর বই কিছু জানি না। এটাই হল বিজ্ঞান। আমি যে তোমার কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে রেখে বলব, তা না, *বক্ষ্যাম্যশেষতঃ,* কোন কিছু অবশিষ্ট রাখব না, পুরোটাই তোমাকে বলব। এখানে জ্ঞানের স্তুতি করা হল, যিনি শুনছেন তিনি যাতে মন দিয়ে শোনেন। ভগবান অর্জুনকে বলছেন, অর্জুন তুমি যদি একবার ঈশ্বর তত্ত্বটা জেনে নিতে পার, তাহলে এই অনিত্য জগতের কোন কিছুই তোমার জানার জন্য অবশিষ্ঠ থেকে যাবে না। যিনি ঈশ্বরতত্ত্ব জেনে যান, তিনি সর্বজ্ঞ হয়ে যান। কারণ সমস্ত কিছু ঈশ্বর থেকেই বেরিয়েছে কিনা। উপনিষদে বলে *সর্ববিদ্,* যিনি ঈশ্বর তত্ত্ব জেনে গেছেন, তিনি সর্ববিদ হয়ে যান। কিভাবে সর্বজ্ঞ?

যে জেনে গেছে সোনা কি জিনিস, সে জানে যত ডিজাইনের গয়নাই হয়ে থাকুক, আসলে এর তত্ত্ব হল সোনা। মাঝে মাঝে কোন ভাল ডিজাইনের গয়না দেখে বলবে, বাঃ এর নক্শাটা খুব সুন্দর তো, যে তৈরী করেছে অবশ্যই সে একজন বড় মাপের শিল্পী, কিন্তু জানে এর সবটাই সোনা। ঠিক তেমনি যিনি ঈশ্বরতত্ত্বকে জেনে নিয়েছেন, এই জগতে তাঁর আর জানার কিছু অবশিষ্ট থাকে না। আমরা যে এত বই পড়ছি, এত লেকচার শুনছি, এত টিভি সিরিয়াল দেখছি, কেন দেখছি? কারণ আমাদের ঈশ্বরতত্ত্ব জানা নেই বলে। ঈশ্বরতত্ত্বকে একবার যিনি জেনে গেলেন, তিনি আর এসবের মধ্যে থাকবেন না, তিনি ঈশ্বরেই ডুবে যাবেন। এটা হল জ্ঞান স্তুতি।

তবে কি জান অর্জুন, ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান সহজে হয় না। ঈশ্বরতত্ত্বের যে জ্ঞান, ঈশ্বরতত্ত্বের যে বিদ্যা; এই জ্ঞান বা বিদ্যার যে উত্তম ফল, সর্বজ্ঞ, সর্ববিদ হয়ে যাওয়া, এই ফল সবাই পায় না, আর সহজে পাওয়া যায় না, কারণ –

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।।৩।।

(সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কেউ আত্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রযত্ন করেন; আর প্রযত্নশীল মুমুক্ষুগণের মধ্যেও কদাচিৎ কেউ আমাকে স্বরূপতঃ জানতে পারেন।)

ঈশ্বরতত্ত্বের জ্ঞান অতি দুর্লভ। Jesus will save you, Jesus loves you, এই ধরণের পপুলার ধর্মের কথা বিভিন্ন ধর্মেই শোনা যায়। আমরাও যে এই ধরণের কথা বলিনা, তা না; শেষ সময়ে ঠাকুর নিয়ে যাবেন, ঠাকুর দেখছেন ইত্যাদি। কোথায় নিয়ে রাখবেন সেটা অবশ্য বলে না। এভাবে কোন দিন ঈশ্বরতত্ত্বের জ্ঞান হয়নি, কোন দিন হবেও না। ভগবান নিজে বলছেন, হাজার হাজার মানুষের মধ্যে, এখন বিশ্বের জনসংখ্যা বেড়ে গেছে, হাজারের জায়গায় বলতে হবে কোটি কোটি। অবশ্য আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে সহস্র শব্দের অর্থ হয় প্রচুর সংখ্যায়, হাজারের থেকে অনেক গুণ বেশি। বলছেন সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কয়েকজন এই ধর্ম পথে আসেন, *কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে*। *যততামপি সিদ্ধানাং*, যাঁরা ধর্ম পথে লেগে আছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কদাচিৎ *কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ*, আমার আসল স্বরূপকে তত্ত্বতঃ জানতে পারে। প্রথমে ঈশ্বরের তত্ত্ব কথা শুধু শুনে যেতে হয়। তারপর ধীরে ধীরে চিন্তন করতে হয়। অনেক দিন চিন্তন করার পর এবার তত্ত্বকে উপলব্ধির চেষ্টায় নেমে যেতে হবে। ভগবান বলছেন, সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কেউ ধর্ম পথে আসে, আবার তাদের মধ্যে, (এই সংখ্যাটাই আর বলেননি) কয়েকজনের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। এই যে আপনাদের শাস্ত্রের কথা শোনার যে আগ্রহ জন্মেছে, এটাই অস্বাভাবিক। কত কত জন্মের পূণ্য সঞ্চিত হলে তবে গিয়ে একটা জন্মে এসে মানুষ শাস্ত্রের কথা শুনতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, সেখান থেকে মুক্তির চেষ্টা করে।

যততামহপি সিদ্ধানাং, সিদ্ধ বলতে বোঝাতে চাইছেন যাঁরা মোক্ষ পথে আছেন। মোক্ষ পথের যাঁরা পথিক গীতা তাঁদেরকেও সিদ্ধ বলছেন। বাউলদের পরম্পরাতে বলে কত রকমের সাধক আছে –প্রবর্তক, সিদ্ধ ও সিদ্ধের সিদ্ধ। শঙ্করাচার্যও বলছেন, যাঁরাই মোক্ষ পথে নেমেছেন তাঁরাও এক ধরণের সিদ্ধ পুরুষ। এই সিদ্ধ পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে জানতে পারেন। এখানে মনে রাখতে হবে, যেদিন আমি আধ্যাত্মিক পথে পা রেখেছি, সেই দিন থেকেই আমাকে সিদ্ধ বলে সম্বোধন করা হবে। সন্ন্যাস মানেও তাই, যিনি তত্ত্ব জেনে নিয়ে সব কিছু ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু সব সন্ন্যাসীরা তো তত্ত্ব জানেন না, কিন্তু তাও সন্ন্যাসী বলা হচ্ছে। তার পেছনে এটাই কারণ। যেদিন আমি বলে দিলাম আমি সব কিছু ত্যাগ করে শুধু ঈশ্বর তত্ত্ব জানতে চাই, সেদিনই আমি সিদ্ধ নামে সম্বোধিত হওয়ার উপযুক্ত হয়ে গেলাম। এই কথাগুলো আমাদের আচার্য পণ্ডিতরা বলে গেছেন।

ঈশ্বর কি, ঈশ্বরের তত্ত্বটা কি, যে তত্ত্বটা জানার পর আর কিছু জানতে হবে না, এই সব বলে ভগবান অর্জুনের আগ্রহটা একটু বাড়িয়ে দেওয়ার পর এইবার ঈশ্বরের তত্ত্ব কথা বলতে আরম্ভ করছেন। তত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে ভগবান প্রথমে প্রকৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে বলছেন। চার, পাঁচ ও ছয় নম্বর শ্লোকে ভগবানের প্রকৃতির বর্ণনা করা হচ্ছে। ভগবানের প্রকৃতি মানে তাঁর স্বরূপ। ভগবানের স্বরূপের বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দুটি স্বরূপের কথা বলছেন – অপরা প্রকৃতি আর পরা প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি মানে পদার্থ বা জড় জগৎ আর পরা প্রকৃতি হল চৈতন্য; জড় আর চৈতন্যের কথা বলা হচ্ছে। জড় জগৎ মানে পদার্থ জগৎ এটিও ভগবানের স্বরূপ আবার চৈতন্যও ভগবানের স্বরূপ। জড় জগতের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন –

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।।৪।।

(ভূমি, জল, বায়ু অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার – এই অষ্ট প্রকারে আমার ঐশ্বরী মায়াশক্তি বিভক্ত।)

ভগবান বলছেন, আমার যে প্রকৃতি, এই প্রকৃতি আট প্রকার। প্রথমে প্রকৃতির পাঁচটি তত্ত্ব বলছেন –ভূমি, অপো, অনল, বায়ু এবং আকাশ। আর তার সাথে আসছে, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। সপ্তম অধ্যায়ের ভূমিকাতে আমরা বলেছিলাম, প্রথমে প্রকৃতি আসে, প্রকৃতি থেকে মহৎ, মহৎ থেকে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার থেকে তন্মাত্রা গুলি। এখানে ভগবান পঞ্চ মহাভূত আর মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার মিলিয়ে অষ্টধা প্রকৃতির কথা বলছেন। কিছু কিছু দর্শন আছে, যাঁরা এই আটটা জিনিসকে নিয়েই চলেন। মনের যে তিনটে রূপ –মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার আর তার সঙ্গে এই জগৎ, সবটা মিলিয়ে প্রকৃতি। কিন্তু যেহেতু আচার্য শঙ্কর বেদান্তের ব্যাখ্যা করছেন, তাই তিনি একটা খুব সুন্দর যুক্তি দিচ্ছেন –ভাতে যদি বিষ মাখানো থাকে, ভাতটাকেও বিষ বলা হয়। এখানে যেটা কারণ, সেটা কার্যের সঙ্গে মিশে আছে। আসল হল, প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার এবং পাঁচটা তন্মাত্রা, এই আটটাই প্রকৃতি, ভগবান মূলতঃ এটাই বলতে চাইছেন। এটাকে নিয়ে লোকেরা বলতে পারে যে, গীতা এক রকম বলছেন, আপনি আর-এক রকম কেন বলছেন? কারণ ওটা যদি না নেওয়া হয়, তাহলে অন্য জায়গায় ভগবান যেটা বলেছেন তখন সেটার বিরোধিতা হয়ে যাবে।

আচার্য খুব সহজ যুক্তি দিচ্ছেন, মিশে আছে বলে দুটো এক। যেমন বিষ মাখানো অন্ন যেভাবে বিষ, ঠিক সেইভাবে এই যে পঞ্চভূতের কথা বলা হয়েছে, আসলে এগুলো সবই হল তন্মাত্রা, আর মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার পর পর তিনটে জিনিস চলে গেল; যেখানে অহঙ্কার বলতে বলছেন প্রকৃতি, বুদ্ধি বলতে বলছেন মহৎ তত্ত্ব আর মনকে বলা হচ্ছে অহঙ্কার। এটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়, শুধু এটা জেনে নিলে হল, সৃষ্টি যখন হয় তখন প্রথম আটটা – প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার আর সেখান থেকে পঞ্চ তন্মাত্রা আসছে। এই পঞ্চ তন্মাত্রা আবার পঞ্চ ভূতে থাকে – আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী, পঞ্চ তন্মাত্রা পাঁচটা ভূতের মধ্যে একটা বিশেষ অনুপাতে মিশে থাকে। ভগবান বলছেন, প্রথম যে আটটা এলো, এটাই মূল প্রকৃতি। সেখান থেকে বাকি মিলেমিশে ছড়ায়।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।।৫।।

(হে মহাবাহো, এটা আমার অনর্থকারী বন্ধনাত্মিকা নিকৃষ্টা প্রকৃতি। কিন্তু এর থেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র আমার প্রকৃষ্টা প্রকৃতি অবগত হও। জগতের অন্তঃপ্রবিষ্ট সে জীবভূতা প্রকৃতি এই জগৎপ্রপঞ্চ ধারণ করে আছেন।)

ভগবান বলছেন, চার নম্বর শ্লোকে যেটা বলা হল, এটাই আমার অপরা প্রকৃতি। আচার্য শঙ্কর অপরা প্রকৃতি ব্যাখ্যা করছেন, *অপরা ন পরা নিকৃষ্টা অশুদ্ধা অনর্থকারী সংসারবন্ধনাত্মিকা*। অপরা কেন বলা হয়? এইজন্য অপরা বলা হচ্ছে, এটা অশুদ্ধ, অনর্থকারী; কারণ মানুষকে সংসারে বেঁধে ফেলে, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সংসার থেকে বেরোন। এই অপরা প্রকৃতির মধ্যে, এই সংসারের মধ্যে, এই দেহের মধ্যে আমার আর-একটা প্রকৃতি ঢুকে আছে, সেটাই পরা প্রকৃতি, যা সব কিছুকে ধারণ করে আছে। ঈশ্বরের এই পরা প্রকৃতি এই শরীরকে ধারণ করে আছে, বিভিন্ন প্রাণীকে ধারণ করে আছে, জগতের সমস্ত বস্তুকে ধারণ করে আছে। আপনি বলবেন, এই পেনটা তো জড়। হ্যাঁ জড়, কিন্তু তারও একটা সার আছে, একটা মূল জিনিস আছে, সেটা ভগবান নিজে। একটু পরেই এর ব্যাখ্যা করবেন। এই যে কোন জিনিস উড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে না, ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে না, বুঝবে ওখানে আমি আছি। পঞ্চদশ অধ্যায়ে নামকরা একটা শ্লোক আছে, *গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়ম্যহমোজসা*, এই পৃথিবীকে আমি ধারণ করে আছি, যার জন্য পৃথিবী ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে

না, পৃথিবী তার কক্ষ পথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে না। যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সমস্ত কিছুকে ধরে আছে, সেটা আমি নিজে। এই কলমটা কলম কেন? কারণ ভগবান এর ভিতরে ঢুকে আছেন। ভগবান যদি না ঢুকে থাকেন, তাহলে এই পেন আর পেন থাকবে না। লবণ আর লবণ থাকবে না, লবণের লবণত্ব চলে গেলে ওটা পাথরের ঢেলা হয়ে থাকবে। বাইবেলেও যীশু এই কথা বলছেন।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ, বলছেন – ঈশ্বর নিজে প্রবেশ করেন। কোথায়? তাঁর নিজেরই প্রকৃতিতে। এই তত্ত্বটি আমরা বেদে আগেই পেয়েছি, তিনি নিজে এই জগতকে সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করে তিনি নিজেই এর মধ্যে প্রবেশ করে গেলেন। যেমন আমি একটা বাড়ি তৈরী করলাম, তৈরী হয়ে গেলে আমি এবার তার মধ্যে বসবাস করতে থাকলাম। ঈশ্বরই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু তাঁরই একটা খুব ছোট্ট অংশ অপরা প্রকৃতি হয়ে যায়। ঐ অপরা প্রকৃতিতে আবার তিনি নিজেই পরা প্রকৃতি হয়ে, চৈতন্য রূপে ঢুকে পড়েন। যেই ঢুকে পড়লেন সেখান থেকেই সৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। সৃষ্টি করতে গেলে দুটোই লাগবে, পরাও লাগবে অপরাও লাগবে। এই জিনিসটাকে কাহিনী রূপে পুরাণে বলবেন, প্রজাপতি নিজেকেই পুরুষ আর নারীতে বিভক্ত করে নিলেন। জড় আর চৈতন্য এই দুজন না হলে সৃষ্টি হবে না।

জড় আর চৈতন্যকেই সাংখ্যে প্রকৃতি আর পুরুষ নামে সম্বোধন করা হয়। পুরুষ আর প্রকৃতি, পরা আর অপরা, জড় আর চৈতন্য, বিদ্যা ও অবিদ্যা যেটাই বলা হোক না কেন, এই দুটোই অনাদি, অনন্ত কাল থেকে পর পর চলে আসছে। সাংখ্য মতে পুরুষ আর প্রকৃতি বা চৈতন্য আর জড় দুটো নদীর ধারার মত সমান ভাবে অনন্তকাল ধরে বয়ে চলে আসছে। মাঝে মাঝে এরা দুজন খুব কাছাকাছি এসে মিলে যাবে, তারপর একসাথে কিছু দিন চলার পর আলাদা হয়ে যাবে, আবার কোন রহস্যময় কারণে এরা দুজনে যখন কাছাকাছি চলে আসে তখনই আবার সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। বাংলা চার কিংবা ইংরাজী আটকে আড়াআড়ি করে লিখলে যে রকম দেখাবে (∞∞∞) এইভাবে জড় আর চৈতন্য একবার এক হয়ে যাচ্ছে, কিছু দিন একসাথে চলার পর আবার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে – পুরুষ আর প্রকৃতি মিলে গেল সৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, আবার দুজন যখন আলাদা হয়ে যায় তখন সৃষ্টি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আবার জুড়ে যাবে আবার সৃষ্টি হতে থাকবে, আবার আলাদা হয়ে যাবে সৃষ্টিও আবার লয়প্রাপ্ত হয়ে যাবে। এই ভাবে চলতেই থাকবে এর কোন সমাপ্তি নেই, সৃষ্টি হয়ে কিছুদিন চলবে আবার সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে এইটাই অনাদি কাল থেকে চলে আসছে আর অনাদি কাল ধরে চলতেই থাকবে।

সাংখ্যে আর বেদান্তে একটা জায়গায় তফাৎ আছে, আর তফাৎটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। গীতাতে সাংখ্য দর্শন আর বেদান্ত দর্শনকে সমন্বয় করা হয়েছে। সেইজন্য ভাসা ভাসা কেউ যদি গীতা পড়ে তাহলে গীতা কি বলতে চাইছে সেটা ধরতেই পারবে না। সাংখ্যের সাথে বেদান্তের অনেক কিছুই মিলবে না, কিন্তু গীতাতে সাংখ্য দর্শন দিয়েও বলা হয়েছে আবার বেদান্তের দৃষ্টি দিয়েও বলা হয়েছে। সেইজন্য উপযুক্ত আচার্যের কাছে গীতা না পড়লে সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যাবে। সাংখ্য বলছেন পুরুষ আর প্রকৃতি এই দুটো যদি থাকে তাহলেই আমার সব কিছু ব্যাখ্যা করে দেওয়া হল। বেদান্ত বলবে –হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলছ, সব কিছুই ব্যাখ্যা করে দেওয়া যাবে, কিন্তু একটা জায়গায় গোলমাল থেকে যাবে। তুমি পুরুষ আর প্রকৃতির কথা বলছ এটা তুমি শাস্ত্রকে আধার করে বলছ। যদি তাই হয়, তাহলে শাস্ত্র বলছেন ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, কিন্তু পুরুষ আর প্রকৃতিই যদি সব কিছু করে নেয় তাহলে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমানের তত্ত্বটা কোথায় যাবে? সাংখ্য বলবে, আমি যদি পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে দিতে পারি তাহলে তার জন্য ঈশ্বরের আর কি প্রয়োজন আছে। আমার হাতে যদি আমি নিজেই জোরে একটা ঘুষি মারি, তাতে আমার হাতে যদি ব্যাথা হয়ে যায়, তাহলে এর ব্যাখ্যা করার জন্য কি আর ঈশ্বরের দরকার হবে? এটা তো পরিষ্কার

নিউটনের ল'জ অফ মোশান, যদি জোরে মারা হয় তাহলে তত ব্যাথা লাগবে। আপনি রান্না করে খেলে আপনার পেট ভরবে এতে ঈশ্বরের ইচ্ছার কোথায় প্রয়োজন আছে? বেদান্তও এই একই কথা বলবে –তুমি যাকে আধার করে এই সব কথা বলে যাচ্ছ, সেখানে পরিষ্কার বলা আছে যে ঈশ্বর হলেন সর্বশক্তিমান, আর সৃষ্টির যে শেষ কথা তাতেই যদি ভগবানের কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকে তাহলে ভগবানের ভগবানত্ব কোথায় থাকল। ঠাকুর বলছেন – যে বাবুর বাগান নেই সেই বাবু কিসের বাবু। যে ভগবান সৃষ্টি-সংহার কিছুই করতে পারছেন না, তাহলে সেই ভগবান কিসের ভগবান?

তাহলে এই দুটোকে মেলানো হবে কিভাবে? সাংখ্যরা মানতে চায় না। বেদান্ত সাংখ্যের আরও কিছু কিছু ব্যাপারে আপত্তি জানায়। তখন তাঁরা নিয়ে আসেন যোগদর্শন। যোগদর্শনে ঈশ্বরের কথা বলবেন ঠিকই, কিন্তু এনারাও বলেন ঈশ্বরের কোন দরকার নেই। তিনি উপস্থিত থাকলেই এই সব হয়ে যায়। ঈশ্বর আছেন, আর আছেন বলেই তাঁর সন্নিধি মাত্রেই এই জিনিসগুলো হতে থাকে। সেই পুরুষ আর প্রকৃতি আছে, আর এই অষ্টধা প্রকৃতিও পাল্টাচ্ছে না, ভগবান কোথাও বাইরে রাজার মত বসে আছেন। তিনি আছেন বলেই এগুলো হচ্ছে। সাংখ্যের যোগদর্শনে ঈশ্বরের একটা গুরুত্ব দেওয়া হল, কিন্তু সম্পূর্ণ গুরুত্ব দেওয়া হল না। বেদান্ত আবার এটাকে আর-এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে, এগিয়ে নিয়ে সাংখ্যবাদীদের বলবে –এই যে তুমি পুরুষ আর প্রকৃতির কথা বলছ, এই দুটো ভগবানরই রূপ, যেটা এখানে গীতাতে ভগবান বলছেন –পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতি আমারই দুটো প্রকৃতি। ভগবানের উপস্থিতিতে সব হচ্ছে তা নয়, এগুলো ভগবানরই রূপ। ঈশ্বর থেকেই এই সব কিছু হচ্ছে। এই ব্যাপারটাকেই গীতা এখানে আলোচনা করছেন।

সাংখ্যের অনাদি তত্ত্ব মানে অনন্ত কাল ধরে সৃষ্টি, স্থিতি আর প্রলয় চলছে, অনন্ত কাল চলতে থাকবে; আর কোন কোন পুরুষ প্রকৃতির এলাকা থেকে বেরিয়ে এসে মুক্ত হয়ে যেতে পারবে। এই দুটো মত গীতাতে থেকে গেল, কোন আপত্তি নেই। কিন্তু প্রকৃতি থেকে বেরিয়ে পুরুষ মুক্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছে? ঈশ্বরের নির্গুণ নিরাকারে চলে যাচ্ছে। এই ঈশ্বর বেদান্তের ঈশ্বর, গীতারও ঈশ্বর। ঈশ্বর অনন্ত, এই অনন্তের মধ্যে অনন্ত পুরুষ অনন্ত প্রকৃতি। সাংখ্য মতে পুরুষ অসংখ্য। আমরা সবাই আলাদা আলাদা পুরুষ, এই পুরুষ মানে ব্যাটাছেলেকে বোঝাচ্ছে না, এই পুরুষের মধ্যে নারী-পুরুষের কোন ব্যাপার নেই। অনন্ত পুরুষের মধ্যে কোন এক পুরুষের হঠাৎ নজর পড়ল যে, এই প্রকৃতির পাল্লায় পড়ে আমি কি সব করছি। সে তখন বলছে প্রকৃতির কোন কিছুই আমার লাগবে না। তখন প্রকৃতির করাল গ্রাস থেকে বেরোবার জন্য পুরুষ আপ্রাণ চেষ্টা করতেই থাকবে। একদিন সত্যিই দেখা গেল যে, পুরুষ প্রকৃতির নদী থেকে উঠে বেরিয়ে যাচ্ছে। উঠে যেতেই দেখে তার সামনে অনন্ত, এই যে বিরাট অনন্ত, এই অনন্তের সঙ্গে সে এক। যখন সে দেখে নিল আমি এই বিরাটের সঙ্গে এক, তখন প্রকৃতি তাঁকে এরপর আর কোন মতেই ধরে রাখতে পারবে না।

দ্বিতীয় ব্যাপারটা, মানে প্রকৃতির বন্ধন থেকে বেরিয়ে এসে এই বিরাটের সঙ্গে নিজেকে এক দেখা, এটাও বেদান্ত শাস্ত্র মতেই বলা হচ্ছে। এতক্ষণ যে সে এই পুরুষ আর প্রকৃতিকে আলাদা আলদা দেখছিল, অসংখ্য পুরুষ, আদপে এগুলো কিছুই না, তিনি ছাড়া, আত্মা বা ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেই। আর তিনি হলেন অদ্বিতীয়, তিনি একও নন দুইও নন, এক দুইয়ের পার। আমাদের শাস্ত্র যখন কিছু বলছেন, তখন শুরু করেন আমরা যখন যেখানে যে অবস্থায় আছি সেখান থেকে, তারপর নিয়ে চলে যাচ্ছেন একেবারে অদ্বৈতে। কিভাবে? আমি আছি, জড় আছে, চৈতন্য আছে, আমি আর আপনি আলাদা, পুরুষ অসংখ্য, নদীর মত চলছে, প্রকৃতি হল জড়, সেও অনন্ত নদীর মত চলছে। প্রকৃতি আর পুরুষ যেখানে যেখানে এসে মিশছে সেখানে সেখানে সৃষ্টির খেলা চলছে। যখনই পুরুষ আর প্রকৃতি আলাদা হয়ে যাচ্ছে তখন কোথাও কোন সৃষ্টি নেই, সৃষ্টি থেমে যাচ্ছে।

এখন ধরা যাক একজনের মুক্তির ইচ্ছে হল, সেটা একজনেরই হতে হবে। যখন মুক্তির ইচ্ছা হল, আর যখন মুক্ত হয়ে গেল তখন সে দেখে, আমি যে এতক্ষণ ভাবছিলাম, পুরুষ আর প্রকৃতি আলাদা, এখন দেখছি ঈশ্বরই পুরুষ হয়েছেন, আর ঈশ্বরই প্রকৃতি হয়েছেন। আর এই যে অসংখ্য পুরুষ ছিল, কোথাও কোন অসংখ্য কিছু নেই, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। তিনি অনন্ত, এই অনন্তকেই অসংখ্য পুরুষ বলে আমার বোধ হচ্ছিল। কেন বোধ হচ্ছিল? মায়ার দরুণ, আমি মায়াতে আবদ্ধ ছিলাম বলে অসংখ্য দেখছিলাম। এখন দেখছে সব সেই এক, এক ছাড়া আর কিছু নেই, তুইও যা আমিও তাই। *নেহ নানাহস্তি কিঞ্চন*, এটাই আধ্যাত্মিক জগতের শেষ কথা। কঠোপনিষদে বলছেন –যে বহু দেখে, সে মৃত্যু থেকে মৃত্যুকে প্রাপ্ত করে, অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর চক্রটা চলতে থাকে।

এই জিনিসগুলো কিভাবে হয়, বিশেষ করে সৃষ্টি কেন হয়, কিভাবে হয়, এর উত্তর কোন ধর্ম কোন দিন দিতে পারবে না। একটা জায়গার পর তাঁরা আর কিছু বলতে পারেন না। কারণ আমাদের যা কিছু জানার সেটা মনের দ্বারাই জানতে পারি। মন আবার সীমিত, মনের বাইরে কি আছে সেটাকে কি করে মন বলবে? একটা বাচ্চা ছেলেকে জন্ম থেকে যদি একটা ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়, আর সেখানে সে বড় হচ্ছে। এখন এই ঘরের মধ্যে যা কিছু আছে সে বলে দিতে পারবে, কিন্তু ঘরের বাইরে কি আছে সে বলতে পারবে না। ঠিক তেমনি আমরা জন্ম জন্ম ধরে মনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি, মনের বাইরে কি আছে আমরা কি করে বলব। তবে এনারা ধরেই নেন যে এই ঘরের মধ্যে যা কিছু আছে, ঘরের বাইরে এই রকমই কিছু আছে। এইভাবে একটা যুক্তিতর্ক দিয়ে এটাকে ব্যাখ্যা করে দাঁড় করাতে যান। এর সাথে এটাও সত্য যে, কচিৎ এক আধ জন কেউ আছেন যাঁরা ঐ বদ্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। বাইরে যখন চলে আসছেন, তখন তাঁরা একটা কিছু দেখছেন কিন্তু বোঝাতে পারছেন না। কিছু আভাস মাত্র দিচ্ছেন, তাঁর অত্যন্ত কাছের শিষ্যরা যাঁরা আছে তারা সেই জিনিসটাকে শুনছেন। এখন এই শিষ্যদের মধ্যে আবার যাঁর তুখোড় বুদ্ধি তিনি তাঁর বুদ্ধি দিয়ে ঐ আভাসের কথা শুনে একটা তত্ত্বকে দাঁড় করিয়ে দেন। এখন এই তত্ত্বটা ঠিক না ভুল এটা কেউই বলতে পারবে না। কোন দার্শনিকই বলতে পারবেন না যে, এই তত্ত্বটা পুরোপুরি সঠিক না ভুল। সেইজন্য সৃষ্টি কেন হয়, কিভাবে হয়, কেউ বলতে পারেন না। নাসদীয় সূক্তে সরাসরি বলে দিচ্ছেন – সৃষ্টি কি করে হয়েছে কে জানবে? কারণ তখন দেবতাদেরই জন্ম হয়নি।

অধ্যাত্ম শাস্ত্রের একটাই লক্ষ্য মুক্তি। তুমি আছ এটা বুঝতে পারছ তো? তুমি এখানে কষ্টে আছ এটা অনুভব করতে পারছ তো? যদি কষ্টটা অনুভব করতে পার, আর এই কষ্ট থেকে রেহাই পেতে যদি চাও তাহলে বেরোবার উপায়টাকে জানবার চেষ্টা কর। তোমার উদ্দেশ্য এখান থেকে বেরিয়ে আসা, যখন বেরিয়ে আসবে তখন তোমার কাছে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে। তার আগে যদি তোমার দু'চারটে প্রশ্ন থাকে, তার উত্তর আমরা এইভাবেই ব্যাখ্যা করে দেব। এই প্রশ্নের উত্তরে তোমার মন শান্ত হয়েছে? যদি বল না হয়নি, তাহলে এই পথ তোমার জন্য নয়। আমাদের প্রত্যেকটি ধর্মশাস্ত্রে প্রথমেই বলে দেবে, যেমন এই গীতা যখন কেউ অধ্যয়ণ করতে আসবেন, প্রথমেই তাঁকে বলে দেওয়া হবে এই গীতা পাঠের অধিকারী কে। যে কোন শাস্ত্র যখন সৃষ্টি হয় তখন বলে দেওয়া হয় এই শাস্ত্রটা কার জন্য সৃষ্টি হয়েছে, এর বিষয় কি, তারপর সম্বন্ধ আর প্রয়োজন কি। এই শাস্ত্র পড়লে আমার কি লাভ হবে? বলবে এই শাস্ত্র পড়লে তোমার মোক্ষ প্রাপ্তি হবে। আমি বলতে পারি আমি মোক্ষ বা মুক্তি কিছুই চাইনা, তাহলে এই শাস্ত্র আমার জন্য নয়।

গীতা থেকে শুরু করে আমাদের যত শাস্ত্র আছে, কোথাও বলবে না যে আমি ভগবান থেকে আরম্ভ করে যা কিছু আছে সব ব্যাখ্যা করে দিয়েছি। কোথাও একটু হাল্কা ছুঁয়ে বুঝিয়ে দিয়ে বলে দেবেন আমরা এর বেশি আর কিছু বলতে পারছি না। কিন্তু আমাদের সাধারণ মন ব্যাখ্যা চায়, যুক্তি চায়। তখন সেটাকেই একটা কাহিনীর মাধ্যমে, যুক্তির দ্বারা এমন ভাবে বলে দেবেন যাতে আমাদের

মনের সংশয়, প্রশ্ন সব পরিষ্কার হয়ে মনটা শান্ত হয়ে যায়। এই যে পুরুষ আর প্রকৃতির কথা বলা হয়, এই পুরুষ আর প্রকৃতিকে কি কেউ কোন দিন দেখেছে? পুরুষ আর প্রকৃতি একটা মিলনের ব্যাপার, যখন মিলন হচ্ছে সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হল তারপর এক এক করে কি হচ্ছে সেটাকে দেখার কেউ না কেউ আছে, কিন্তু যখন পুরুষ আর প্রকৃতির ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে, আর ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর কি হচ্ছে সেটা তখন কে দেখবে, ভগবান ছাড়া তো আর কারুর দেখার কোন সুযোগ নেই। আমরা তো আর ভগবান নই, তাহলে আমরা জানব কি করে? যেটা হচ্ছে সেটাকে ধারণা করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। প্রাথমিক ভূমিকায় আমরা আমাদের সাধারণ যুক্তি দিয়ে যেটুকু বুঝি, আমরা যে যেভাবে জগৎকে দেখছি; সেই অনুসারে আমরা মনে করছি এটা যেন এভাবেই হয় আর এটাই নিয়ম, এর বাইরে আর কিছু জানিনা।

আর এই পুরুষ প্রকৃতির যে মিলনের কথা বলা হল এটা সাধারণ দার্শনিকদের নয়, এগুলো আমাদের ঋষিদের আবিষ্কার। তাঁরা সাধনা করে করে শুদ্ধ মনের অধিকারী হয়ে যেটা উপলব্ধি করে আমাদের বলেছেন সেটাকে আমরা মেনে নিয়েছি। ঋষি প্রদত্ত বাক্যকে মেনে নিয়ে তুমি যদি সেইভাবে চলতে পার তাহলে তোমারও মুক্তি হয়ে যাবে। আমাদের প্রকৃত প্রয়োজনটা কি? আমাদের প্রয়োজন হল এই দুঃখ-কষ্টের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি, জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি। ঋষিরা আমাদের পথটা দেখাচ্ছেন। আমার যখন প্রচণ্ড ক্ষুধা থাকে, ক্ষুধার সময় বাড়িতে মা তখন যা খেতে দেন তখন আমি মাকে পাঁচটা প্রশ্ন করিনা যে কিভাবে রান্না হল, সব্জীটা কোন দোকান থেকে কেনা হয়েছে। আর যদি মাকে বলি আমাকে ঠিক ঠিক উত্তর না দিলে আমি খাবোই না, তাতে কার কি হবে মাঝখান থেকে আমি অভুক্ত থেকে খিদের জ্বালায় কষ্ট পাব। আমাদের বেশির ভাগ প্রশ্নই অবান্তর, আর বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর সাধন সাপেক্ষ। ঠিক ঠিক সাধনা করলেই অনেক প্রশ্নের উত্তর নিজে থেকেই পাওয়া যায়।

অপরা প্রকৃতির আর-একটি নাম ক্ষেত্র, পরা প্রকৃতির আরেকটি নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের ব্যাপারে ভগবান আবার অর্জুনকে বলবেন। এখন ভগবান বলছেন যা কিছুই এই জগতে হচ্ছে সৃষ্টি, প্রলয়, যাইই হোক না কেন এই দুটো প্রকৃতি, পরা ও অপারার জন্যই সব হচ্ছে। এখন তাই বলছেন –

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।।৬।।

(আমার এই উভয় প্রকৃতি থেকেই জড় ও চেতন সমস্ত ভূত (স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকল জগৎ) উৎপন্ন হয় – এটি ধারণা কর। আমিই সমগ্র জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়রূপ অর্থাৎ উক্ত প্রকৃতিদ্বয় দ্বারা আমি সর্বজ্ঞ ঈশ্বর জগতের কারণস্বরূপ।)

পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতির কথা বলা হল, এই পরা প্রকৃতিই পুরুষ, তার মানে দেহ আর আত্মা। কিন্তু শুধু আমার আপনার আত্মা না, তিনি জড়, চেতন সব কিছুর আত্মা; এই কলমেরও আত্মা আছে, লেখনীর যে লেখার ক্ষমতা, এটাই ভগবান নিজে, তবেই আজ এই পেন পেন হয়েছে। *এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়*, আমার এই পরা শক্তি সমস্ত প্রাণীকে ধারণ করে আছে।

অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা, সব কিছুর জন্ম আমার থেকেই, সবার ধারণ আমিই করে আছি, আবার আমিই সব কিছুর সংহার করি। কোন বস্তু বা কোন প্রাণী থেকে ভগবান বেরিয়ে যাওয়া মানেই সেটার সংহার হয়ে গেল। আমরা বলি মানুষটা মারা গেল, মানে ভগবান সেই মানুষের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেছেন। তাহলে তার যে মলিক্যুলসগুলো আছে, সেগুলোতে কে আছে? ভগবানই এখন মলিক্যুলস্ রূপে আছেন, মানুষ রূপে আর নেই। অনু রূপে আছেন, পরমাণু রূপে

আছেন, কিন্তু মানুষ রূপে নেই। এই পেনটা যদি ভেঙে যায়, তখন এটা আর কলম থাকবে না। কলম রূপী ভগবান লেখনী শক্তি রূপে চলে গেলেন। কিন্তু পেনের প্লাস্টিক, রিফিল অন্য কাজে লাগবে, তখন ভগবান ঐ রূপে থাকবেন। ভগবান বলছেন, এই দুই প্রকৃতি মিলে আমি সমস্ত জগৎকে ধারণ করি।

সাংখ্য আর যোগের আলোচনায় আমরা বললাম, প্রকৃতি যখন পুরুষের কাছে আসে বা পুরুষ যখন প্রকৃতির কাছে আসে, তখন সৃষ্টি আরম্ভ হয়। গীতায় ভগবান বলছেন, পুরুষ আর প্রকৃতি, এই দুটোই কিন্তু আমার নিজের; সৃষ্টি এই দুটো দিয়েই চলে। সৃষ্টিকর্তা কে? ভগবান নিজে। কিভাবে সৃষ্টি করেন? ভগবান এই দুই প্রকার প্রকৃতি হয়ে যান –পরা প্রকৃতি এবং অপরা প্রকৃতি। সাংখ্য আর যোগ পরা প্রকৃতিকে পুরুষ আর অপরা প্রকৃতিকে প্রকৃতি বলছেন, সাংখ্য ও যোগের কাছে এই দুটো পুরো আলাদা সত্তা। ভগবানের বাইরে কিছু নেই, তিনিই সব কিছুকে জড়িয়ে আছেন, কিভাবে? সেটাই এবার পরের শ্লোকে বলছেন –

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।।৭।।

(হে ধনঞ্জয়, আমা অপেক্ষা জগতের অন্য শ্রেষ্ঠ কারণ নেই। যেমন সূত্রে মণিসমূহ গ্রথিত হয়ে থাকে, সেই প্রকার এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আত্মভূত আমাতে অনুস্যূত ও বিধৃত হয়ে আছে।)

হে অর্জুন, তোমার যদি মনে হয় এই পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতির বাইরে কিছু আছে, তাহলে জেনে নাও *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়*। তুমি আমার সখা, তুমি আমার শিষ্য, তুমি খুব শ্রদ্ধা সহকারে আমাকে বলেছিলে, *শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নাম্*, হে কৃষ্ণ আমি আপনার শিষ্য, আমি আপনার শ্রীচরণে প্রণিপাত হয়ে আপনার শরণ নিলাম, আমাকে পথ দেখান; হে অর্জুন আমি তোমাকে পথ দেখাচ্ছি, *অসংশয়ং সমগ্রং মাং*, তুমি যাতে নিঃসংশয় হতে পার, সেইজন্য আজ তোমাকে সব কথা বলব। কি কথা? *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়*। রাজসূয় যজ্ঞের সময় অর্জুন প্রচুর ধন সংগ্রহ করেছিলেন, সেইজন্য তাঁর একটা নাম ধনঞ্জয়। হে ধনঞ্জয়, আমার উপরে আর কিছু নেই, আমিই শেষ কথা। অনেক সময় লোকেরা প্রশ্ন করে, ভগবানকে কে জন্ম দিয়েছে? প্রশ্ন করার আগে একবারও ভাবে না যে, আমি কি প্রশ্ন করতে যাচ্ছি, শাস্ত্র পড়া নেই, প্রস্তুতি নেই, সব থেকে বড়, কোন পাত্রতা নেই, দুম্ করে প্রশ্ন করে বসে।

বলছেন, *ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব*। যে কোন মালাতে একটা সুতো থাকে, যতগুলো মণি বা মুক্তো আছে, সব মণি সেই সূত্রে গ্রথিত করা আছে। গাঁদা ফুলের মালাতে সব কটা গাঁদা ফুল আলাদা, কিন্তু সূত্রটা আছে বলে সব গাঁদা ফুলকে একসাথে ধরে রেখেছে। সমস্ত প্রাণী এবং স্থাবর জঙ্গম যা কিছু আছে, সব কিছুর ভিতরে সেই সূত্র রয়েছে, যিনি সব কিছুকে ধারণ করে একক রূপে সম্পূর্ণ হয়ে আছেন, সেই এক হলেন ঈশ্বর। লোকেরা প্রায়ই বলে, God is energy, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এনার্জি অনেক প্রকার হয়, কারণ ঈশ্বরই সব কিছুতে আছেন কিনা। ভগবান যে একটা কথাকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিলেন, তা তো না। ভগবান এটাকে এবার খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করছেন।

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু।।৮।।

(হে কৌন্তেয়, আমি জলে রস, চন্দ্রে ও সূর্যে জ্যোতিঃ, চার বেদে ওঁকার, আকাশে শব্দ এবং মনুষ্য মধ্যে পুরুষকার রূপে বিরাজ করি।)

এর আগে পঞ্চ তন্মাত্রা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের কথা বলা হয়েছিল। এই পঞ্চ তন্মাত্রা থেকে সৃষ্টি হয় পঞ্চভূত –আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী। এই যে পঞ্চ ভূত, এই পাঁচটি উপাদানে সমগ্র জগৎ নির্মিত হয়েছে এবং সৃষ্টিতে যাবতীয় যা কিছু আছে, সেটাকে আমরা যখন গ্রহণ করি তখন পঞ্চ ইন্দ্রিয় চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক দিয়ে গ্রহণ করছি। জিহ্বা যে রস নেয়, এই রস আসছে অপ তত্ত্ব থেকে। অপ এই জল না, শাস্ত্রে এটাকে বলছে অপঃ। জল তত্ত্বের সার হল রস, এই রস হলাম আমি। আমি আছি বলে জল জল হয়েছে। আমি যদি জলে না থাকি, তাহলে জল থাকবে না, জল তত্ত্বটাই নষ্ট হয়ে যাবে। সূর্য ও চন্দ্রের যে প্রভা, এটা আমি। সূর্য কেন সূর্য? কারণ তার প্রভা আছে। চন্দ্রও চন্দ্র হয়েছে, কারণ তার প্রভা আছে, প্রতিবিম্বিত আলোই হোক আর যে আলোই হোক না কেন, ভগবান এটা নিজে। দশম অধ্যায়ে এই জিনিসগুলিকে আরও বিস্তারে বলবেন, যে কোন জিনিসের যেটা মূল, যেটা সার, তার যেটা অস্তিত্ব, যেটা তাকে ধারণ করে আছে, এটাই তার সত্তা, এটাই তার আত্মা। জলের আত্মা কি? রস, সেই রসটাই হলেন ভগবান। চন্দ্র সূর্যের আত্মা কি? প্রভা, এটা ভগবান নিজে।

প্রণবঃ সর্ববেদেষু, সমস্ত বেদের প্রাণ হল প্রণব বা ওঁ। সমস্ত বেদরাশি বলতে চাইছে ওঁ, বেদের সার গায়ত্রী, গায়ত্রীর সার ওঁ। সমগ্র বেদ জুড়ে ভগবানই আছেন ওঁ রূপে। যেমন এখানে বললেন, জল তত্ত্বের মধ্যে আমি রস, ঠিক তেমন আকাশ তত্ত্বে আমি শব্দ, *শব্দঃ খে*। আকাশ মানে আমাদের মাথার উপর যে আকাশ দেখি, সেই আকাশ না, আকাশ হল সব থেকে সূক্ষ্ম পার্টিকেলস্। আকাশের প্রপার্টি হল শব্দ। আর *পৌরুষং নৃষু*, পুরুষ মানুষের মধ্যে যে পৌরুষ, সেটা আমি নিজে। যে মানুষের মধ্যে পৌরুষ নেই, সে তো নির্বীজ, আরও বাজে বাজে কথা বলা হয়, শব্দগুলো উচ্চারণ করা যাবে না। যার মধ্যে পৌরুষ দেখা যাবে, তার মানে সে নিজেকে ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে, মারপিট করার জন্য পৌরুষ না। ঠাকুর যেমন বলছেন, মানুষ কে, যার মানে হুঁশ আছে; আত্মসম্মানে যার হুঁশ আছে। ঠিক তেমনি পুরুষ মানে, যার মধ্যে পৌরুষ আছে। নারীর যে নারীত্ব, সেটা ভগবান নিজে। যে পুরুষের মধ্যে পৌরুষ নেই, যে নারীর মধ্যে নারীত্ব নেই, ভগবান তাদের ছেড়ে দিয়েছেন। কোন কারণে যদি নারীর অন্য সমস্যা থাকে, পুরুষের যদি অন্য সমস্যা থাকে, তাহলে সেখানে ভগবান অন্য শক্তি রূপে আছেন।

স্টিফেন হকিং এত বড় পদার্থ বিজ্ঞানী, কিছু দিন আগে তিনি মারা গেলেন, বাচ্চা বয়সে তাঁর নিউরোমর্টাডিজ্ হয়েছিল, তিনি চলাফেরা করতে পারতেন না, কিন্তু কত বড় বিজ্ঞানী। হকিংএর যে পৌরুষ, সেটা চলে গেছে পদার্থ বিদ্যাতে, ঐ পৌরুষ ভগবান নিজে। কিন্তু এখানে পৌরুষ বলতে পুং বুদ্ধি, নারী পুরুষের যে পৌরুষ, এটা ভগবান নিজে, যেখানে পৌরুষ নেই, ভগবান সেখানে নেই। ঠাকুর একজনকে বলছেন, তুমি যে ডেপুটি হয়েছ, এটা তাঁরই ইচ্ছা। শুধু তাঁর ইচ্ছাই না, এটা সাক্ষাৎ ভগবান নিজে। কাউকে যদি দেখতে খুব সুন্দর মনে হয়, যে সৌন্দর্যের জন্য সবাই তার দিকে আকর্ষিত হচ্ছে, প্রশংসিত হছে, এই সৌন্দর্যটা ভগবান নিজে। ভগবান প্রদত্ত সৌন্দর্য না, ভগবান নিজে। কারণ পরা প্রকৃতি, অপরা প্রকৃতির বাইরে আর কিছু নেই, আর এই দুটো প্রকৃতিই তিনি নিজে।

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু।।৯।।

(আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সর্বপ্রাণীর আয়ু ও তপস্বিগণের মধ্যে তপঃশক্তি রূপে বিরাজ করি।)

যেখানে যেটা শুভ, যেটা তার প্রাণ, যেটা তার মূল; হে অর্জুন আমি সেটা নিজে। যেমন আগে অপ বলা হল, আকাশ অর্থাৎ খ বলা হল; এরপর বলছেন পৃথিবী তত্ত্ব। পৃথিবীর গুণ হল পূণ্য

গন্ধ, সেটা আমি নিজে। রসের মধ্যে যে অপবিত্রতা চলে আসে বা পৃথিবীতে যে দুর্গন্ধ হয়, এটা এদের স্বভাব নয়, তার মানে ঈশ্বর ওটাকে ছেড়ে দিয়েছেন, যেহেতু তার মধ্যে অন্য জিনিস এসে মিশে গেছে, মানে ভেজাল। যেটা ভেজাল নয়, শুদ্ধ পবিত্র, ভগবান সেটা, সেইজন্য বলছেন *পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ*।

তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ, অগ্নির যে প্রকাশ, এটা আমি নিজে। *জীবনং সর্বভূতেষু*, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত জীব আছে, সমস্ত জীবের যে জীবন, সেটা আমি নিজে। সেইজন্য জীবন যখন চলে যায়, মানুষের যখন মৃত্যু হয়ে যায়, তার মানে ভগবান তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। যার জন্য বলা হয়, মৃতদেহ অপবিত্র, স্পর্শ করলে স্নান করতে হয়, কারণ ভগবান তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। যেখানেই জীবন সেখানেই ভগবান নিজে বিদ্যমান। তাহলে পাথরে কি ভগবান নেই? অবশ্যই আছেন, পাথরের যে কাঠিন্য, যেমন বলা হয় পাষাণের মত হৃদয়; এই কাঠিন্যও ভগবানের শক্তি, এই শক্তি রূপে ভগবান নিজে পাথরের মধ্যে আছেন। পাথরকে একটু আঘাত করলেই যদি মাটির ঢেলার মত চুরমার হয়ে যায়, তাহলে সে আর কিসের পাথর, পাথরের কাঠিন্যটা চলে গেছে, তার মানে ভগবানের সেই শক্তিটা আর ওখানে নেই।

তপশ্চাস্মি তপস্বিষু, যাঁরা তপস্বী, তাঁদের যে তপস্যা, সেটা আমি নিজে। যেমন বলা হল, কেউ যদি দেখতে খুব সুন্দর হয়, সেটা ভগবান নিজে। একজন বড় জ্ঞানী, তাঁর জ্ঞান দেখে অনেক মানুষ আকর্ষিত হয়ে তাঁর কাছে ছুটে আসছে, বুঝতে হবে সেই জ্ঞান ভগবান নিজে। কারুর শক্তি দেখে মানুষ আকর্ষিত হচ্ছে, সেই শক্তিটা ভগবান নিজে।

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।।১০।।

(হে পার্থ, আমাকে স্থাবর ও জঙ্গম সকল ভূতের সনাতন কারণ বলে জানবে। আমি বিবেকিগণের নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেকরূপ বুদ্ধি এবং তেজস্বিগণের তেজঃস্বরূপ।)

সেই প্রথম থেকে যেটা চলে আসছে, যেটা আদিতত্ত্ব, অর্থাৎ স্থাবর ও জঙ্গম সকল প্রাণীর যে উৎপত্তির আদি কারণ, সেটা আমি নিজে। তার মানে, যত রকম প্রাণী আছে, জীব আছে, সমস্ত জীবের সনাতন বীজ আমি। *বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি*, যারা বুদ্ধিমান, বিবেকবান, তাদের যে বিবেক শক্তি, সেটা আমি নিজে। বুদ্ধিমান মানে চালাক চতুর না, যার মধ্যে বিবেক শক্তি আছে, তাকেই বুদ্ধিমান বলে। যার বিবেক শক্তি আছে, সে জানে কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল। স্বামীজী যখন বলছেন, man making character building education, ম্যান হল যেখানে শক্তি দেয়, পৌরুষত্ব দেয়, আর চরিত্র গঠন মানে যেখানে বিবেক শক্তি দেয়। কোনটা ভুল, কোনটা ঠিক বিবেক বলে দেয়, কোনটা ঠিক জানার পর যেটা ঠিক সেটার উপর দৃঢ় থাকা, এটাই বুদ্ধি।

তেজস্তেজস্বিনামহম্, তেজবান মানুষের মধ্যে যে তেজ, ওটা আমি। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে তেজ ছিল, স্বামীজীর যে তেজ ছিল, এই তেজটা ভগবান নিজে। আমরা নিজেরা একবার ভেবে দেখতে পারি, আমার মধ্যে কোন বিশেষ গুণ আছে কিনা, যে গুণ আমাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে দেয়। যদি এই রকম কোন গুণ থাকে, বুঝতে হবে সেটা ভগবান নিজে। মায়েদের মধ্যে যে মাতৃত্বের ভাব, যে মাতৃস্নেহ না থাকলে সন্তানের লালন-পালন হত না; কিন্তু এই মাতৃস্নেহ যদি শুধু নিজের সন্তানের প্রতি না হয়ে সবার প্রতি থাকে, তখন এই মাতৃস্নেহ ভগবান নিজে। ভগবান এখানে জ্ঞানের কথা বলছেন, তপস্যার কথা বলছেন, বুদ্ধির কথা বলছেন; যেখানে যা কিছু শুভ আছে, সব ভগবান নিজে।

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম, কিভাবে ভগবান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু হয়ে আছেন। পঞ্চতত্ত্ব আর তার প্রত্যেকটির যে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য, সেটা তিনিই। ভগবান দশ নম্বর শ্লোকে বললেন, সমস্ত কিছুর যে বীজ, সেটা আমি। বুদ্ধিমানদের যে বুদ্ধি, যে বুদ্ধির জন্য বুদ্ধিমানদের সম্মান, সেই বুদ্ধিটাও আমি নিজে। এক ভদ্রলোক আমাদের চ্যানেলে চ্যাটে লিখলেন, 'ভগবানই তো সব হয়েছেন, এটাকে এত করে বলার কি আছে'। ঠিকই বলছেন, অনেক সময় বলে, যেটার সম্বন্ধে সব কিছু জানা আছে, সেটাকে নিয়ে এত বলা কেন? ঠাকুর খুব সহজ করে বলছেন, ঈশ্বরই সব করছেন, এই জ্ঞান হয়ে গেলে তো সে জীবনমুক্ত হয়ে গেল।

শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ আমাদের অধ্যক্ষ ছিলেন, আগে একটা সময় উনি জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। আমরা প্রথম তাঁকে এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি রূপে দেখেছি, সেখান থেকে জেনারেল সেক্রেটারি পরে সহাধ্যক্ষ থেকে অধ্যক্ষ হতেও দেখেছি। একবার একটা সমস্যা হয়েছিল, আমাকেও বাইচান্স ওনার কাছে যেতে হয়েছিল। স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ তুখোড় বুদ্ধিমান ছিলেন, যে কোন পরিস্থিতিকে খুব সহজে বুঝে নিতেন। এই মুহূর্তে কি করণীয়, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে দিতেন, তোমরা এখন এই কর। ছোট বড় সবার সাথেই তিনি কথা বলতেন। সমস্যা নিয়ে তিনি বলতে শুরু করেছেন, তিনি এত সুন্দর বললেন, 'দেখ আমি জানি সব ঠাকুরের ইচ্ছাতেই হচ্ছে, তোমরা বলতে পার তাহলে আমি এগুলি করছি কেন'। মহারাজ একটা সমস্যাকে আটকাবার চেষ্টা করছিলেন, যদি এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচানো যায়। কিন্তু বাঁচানো গেল না। উনি বলছেন, 'ঠাকুরের ঐ গানটার কথা ভাবো, জাহাজ সমুদ্রের অনেক দূরে চলে গেছে। পাখিটা একবার ওদিকে উড়ে যায়, একবার সেদিকে উড়ে যায়, ডানা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন তাকে সেই জাহাজের মাস্তুলে ফিরে আসতে হয়। আমাদের এই কাজগুলো করা হল, ডানা দুটোকে থকিয়ে দেওয়া। তখন একটা সময় বোঝা যায়, সব তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে'। মহারাজ প্রচুর কর্ম করতেন, আর প্রচণ্ড দক্ষ ছিলেন, সব কাজ চটপট করে দিতে পারতেন, তাঁর মত মানুষ এই কথা বলছেন।

যিনি ঠিক ঠিক বুঝে গেছেন, সব ঠাকুরের ইচ্ছাতেই, মায়ের ইচ্ছাতেই হয়, তিনি তো জীবনমুক্ত হয়ে গেলেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে ভগবানই সব কিছু হয়েছেন, তিনিই সব কিছু করেন, এই বোধ করানোর জন্যই এত শাস্ত্র হয়েছে। এটাকে কোথাও বলে শব্দ দিয়ে পুনরাবৃত্তি, আবার কোথাও বিচার দিয়ে। একবার এদিক থেকে বলেন, একবার ওদিক থেকে বলেন, একবার এভাবে বলবেন, আর-একবার অন্য ভাবে বলবেন। অনেক সময় বিভিন্ন শব্দ নিয়ে আসেন, কখন অন্য রকম ভাবনা-চিন্তা নিয়ে আসছেন। যে কোন শাস্ত্র কৃপাময়ী মা, সৎ মাও না; সত্য জননী। ছোট্ট শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, খেতে চাইছে না, ওষুধও খেতে চাইছে না। মা কত ভাবে সন্তানকে খাওয়াবার চেষ্টা করেন, ওষুধটাও বাচ্চা খেতে চাইছে না। স্নেহময়ী মা সন্তানকে কত স্নেহ করে, মিষ্টি কথা দিয়ে, প্রলোভন দিয়ে চেষ্টা করে যান, যাতে পথ্য আর ওষুধটা খেয়ে সন্তান তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে আবার তার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসতে পারে।

সব শাস্ত্র ঠিক এই স্নেহময়ী মায়ের মত, আমরা সবাই সংসাররূপী ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় পড়ে আছি, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার খাদ্যে আমাদের অরুচি এসে গেছে; শাস্ত্রগুলি তাই বিভিন্ন ভাবে আমাদের বোঝাতে থাকেন। এইজন্যই শাস্ত্রে একই কথা বারবার ঘুরে আসে। খুব সহজেই যদি ধর্ম হয়ে যেতে, অতি সহজেই যদি ধ্যান হত, এত সহজে মানুষ যদি জপধ্যান করে সিদ্ধি পেয়ে যেত, তাহলে তো ভারতের রাস্তায়, বাজারে, ট্রেনে, বাসে সর্বত্র ব্রহ্মজ্ঞানীরা ঘুরে বেড়াতেন। তাহলে তো ভারতে আর এত দুর্নীতি থাকত না, ক্ষমতা, টাকা-পয়সার জন্য এত মারামারি কাটাকাটিও হত না। ভগবানই সব হয়েছেন, এই জ্ঞান উপলব্ধি করার জন্য প্রচুর খাটতে হয়, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। সাধনার সাথে সাথে নিজের মনকে সচেতন ভাবে পাল্টাতে হয়, চিন্তা-ভাবনাকে পাল্টাতে হয়। জ্ঞানী পুরুষের মত চিন্তা-ভাবনা করতে হয়, জ্ঞানী পুরুষের মত

আচরণ করতে হয়। এই সব কিছু একদিনে হয় না, এর জন্য দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, জন্মের পর জন্ম লেগে থাকতে হয়। সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান সাধনাকে নিয়ে অনেক কিছু বলছেন।

আমরা যখন দশম অধ্যায়ে যাব, সেখানেও এই জিনিসটা আবার ঘুরে আসবে –ভগবান সেখানে প্রথমে শুভ যা কিছু আছে, সেই শুভ জিনিসগুলিকে আমাদের সামনে নিয়ে আসবেন। যে জিনিসগুলিকে দেখে আমাদের ভাল লাগে, যে জিনিসগুলি আমাদের মনকে টেনে নেয়; ভগবান বলবেন, আমি সেটা। সেখান থেকে ধীরে ধীরে তিনি দেখিয়ে দেবেন, সব কিছু তিনিই হয়ে আছেন। যেমন ভগবান নবম অধ্যায়ে বলছেন, *বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ*, বেদের যে পবিত্র ওঁ, সেটা আমি, ঋক্, সাম, যজু সব আমি। আবার একাদশ অধ্যায়ে বলবেন, *কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ*, আমি হলাম সাক্ষাৎ কাল, মৃত্যু; লোকক্ষয় করার জন্য আমাকে এই রূপ ধারণ করতে হয়েছে। করোনা ভাইরাস ভগবান সাক্ষাৎ নিজে, মৃত্যু রূপে এসেছেন। বিশ্বের জনসংখ্যা আজ সাতশ কোটি ছাড়িয়ে গেছে, যেখানে একশ কোটি লোককে ধারণ করার ক্ষমতা পৃথিবীর নেই। আর তার সঙ্গে রয়েছে ভোগবাদ; আরও চাই, আরও চাই; ভগবানকে তো আসতেই হবে। পুরাণে কতবার বর্ণনা করা হয়েছে, পৃথিবী বলছে, আমি আর পাপের ভার সামলাতে পারছি না। ভগবানও আশ্বস্ত করে বলে দেন, যাও, আমি আসছি। তিনি এসে হয়ত একটা যুদ্ধ লাগিয়ে দেবেন, কিংবা একটা মহামারী নিয়ে আসবেন। যুগে যুগে এটাই হয়ে আসছে, নিজের উপর মানবজাতির যদি নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তখন ভগবান বাইরে থেকে একটা শক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করিয়ে দেবেন। যাঁরা প্রথম প্রথম ঈশ্বরের দিকে মন দিতে চাইছেন, প্রথমের দিকে তাঁদের শুভ জিনিসগুলিকে দিয়েই বলতে হয়। ভগবান তাই এখানে সত্ত্বগুণের কথা বলে যাচ্ছেন।

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্।
ধর্মবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ।।**১১**।।

(হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, আমি বলবানদের কামরাগ-বর্জিত দেহধারণের উপযোগী সামর্থ্য। ধর্মশাস্ত্রের অবিরোধী কামনা-বাসনারূপে আমি প্রাণীদের মধ্যে বিরাজমান।)

যারা শক্তিমান, বলবান হন, তাদের সেই শক্তি, সেই বল আমি নিজে। কামী পুরুষের মধ্যে যে কাম ভাব, সেটাও আমি। বলবানের শক্তির একটা হয় যেটা কাম আর রাগ মেশানো; একটা কিছুর প্রতি আসক্তি আছে, সেই আসক্তিকে মেটানোর জন্য বা সেই জিনিস সংগ্রহের জন্য যে প্রচেষ্টা করা হয় তার জন্য একটা শক্তির দরকার। আর-একটা হয় দেহধারণ করার জন্য শক্তির দরকার হয়। এখানে *কামরাগবিবর্জিতম্* বলতে বোঝাচ্ছেন কাম আর রাগশূন্য শুদ্ধ বলকে। এমন একজন আছেন, যাঁর শরীরে সহজে কোন রোগ হয় না, সুস্বাস্থ্য, খুব ভালো ও সৎ লোক, তখন বুঝতে হবে তাঁর যে এই সুস্বাস্থ্য এখানে ভগবানের বিশেষ শক্তি আছে। আমাদের বেশির ভাগ লোকেরই সারা বছর নাক দিয়ে জল পড়ছে, একটু কিছু খেলেই বদহজম হয়, তার উপর মাঝে মাঝেই এই রোগ সেই রোগ লেগেই আছে, কাজ করলেই হাঁপিয়ে পড়ে, বুঝতে হবে এর মধ্যে ভগবানের বিশেষ শক্তির অভাব আছে।

ধর্মবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ, মানুষের মধ্যে যত রকম কামনা বাসনা আছে, এই কামনা যদি ধর্ম বিরুদ্ধ না হয়, তাহলে সেই কাম আমি। যদি ধর্ম বিরুদ্ধ হয়, তাহলে কিন্তু ওটা আমি নই। সেইজন্য আমাদের শাস্ত্রে চারটে পুরুষার্থের কথা বলা হয় –ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ধর্মে অবস্থিত হয়ে যে অর্থ আর কাম করা হয়, সেটাই ভগবান। যে অর্থ ও কামের পিছনে লোভ আছে, আসক্তি আছে, দ্বেষ আছে, স্বার্থ আছে, হিংসা আছে, ঘৃণা আছে, সেই অর্থ ও কাম ভগবান নন। তাহলে ওখানে কে আছেন? ওটাও ভগবান। প্রথমে সত্ত্বগুণ দিয়ে নিয়ে আসছেন, বারবার

সত্ত্বগুণী জিনিসগুলির কথা শুনে শুনে ভিতরে একটা শুভ সংস্কার তৈরী হয়। কুমিরের গায়ে যদি তলোয়ার দিয়ে আঘাত করা হয়, কুমিরের কিছু হয় না, গণ্ডারের গায়ে আঘাত করলে কিছু হয় না, তাদের চামড়া এত মোটা। আমাদের মনটাও ঠিক সেই রকম। আচার্য বলছেন, মানুষের মধ্যে ক্ষুধায় খাওয়ার ইচ্ছা, তৃষ্ণায় জল পান করার ইচ্ছা, ঘুম পেলে ঘুমোবার ইচ্ছা, এগুলোর কোনটাই কাম বিরোধী না, এগুলো শরীর ধারণের জন্য আবশ্যক, এগুলো ভগবান নিজে। আমাদের যে সময় মত খিদে পায়, পিপাসা পায়, সঠিক সময়ে ঘুম পায়, এই সব কিছু ভগবান নিজে।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি।।১২।।

(প্রাণীগণের যে সাত্ত্বিকভাব, রাজসিক ভাব এবং তামসিক ভাব স্বকর্মফলে উৎপন্ন হয়, তা আমার থেকেই উৎপন্ন জানবে। যদিও তারা আমা থেকে উৎপন্ন, তথাপি জীবের ন্যায় আমি সেই সকল ভাবের অধীন নই; কিন্তু সেই সকল ভাব আমার অধীন, আমার বশীভূত।)

বিশেষ কয়েকটি ঈশ্বরীয় গুণের কথা বলার পর ভগবান আবার দর্শনে ঢুকে যাচ্ছেন। বলছেন, সাত্ত্বিক ভাব থেকে যা কিছু জন্ম নিয়েছে, রজোগুণ থেকে যা কিছু জন্ম নিয়েছে আর তমোগুণ থেকে যাবতীয় যা কিছু জন্ম নিয়েছে, প্রত্যেকটি মানুষের যা যা স্বভাব; যেমন, কেউ আলস্যের জন্য কাজ করতে চায় না, কেউ হিংসুটে, কেউ বদমাইশ, কেউ কামী, ক্রোধী, লোভী; সবটাই আমি নিজে। সত্ত্ব, রজো, তমো এই তিন গুণের প্রভাবে জীবের যত রকম স্বভাব হয়েছে, *মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি,* জানবে সব আমার থেকেই জন্ম নিয়েছে। *ন ত্বহং তেষু তে ময়ি,* অথচ আমি এই তিনটে গুণের মধ্যে নেই, আমি সব কিছুর বাইরে। এই যে তিনটে গুণের কথা বললেন, সমস্ত মানুষের মধ্যে এই তিনটে গুণের ভাব রয়েছে, এটা আমি নিজে ঠিকই, কিন্তু এই তিন গুণের মধ্যে আমি নেই।

ভগবানের স্বরূপ হল, তিনি নিত্য-বুদ্ধ-মুক্ত-শুদ্ধ। তিনিই আবার সমস্ত ভূতের আত্মা। ভগবানের একটা বৈশিষ্ট্য হল তিনি এই যে সংসারদোষ, এটাকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম, *যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নিঃ,* জ্ঞান কিভাবে সমস্ত কর্মকে ভস্মসাৎ করে দেয়। ঠিক তেমনি ঈশ্বরজ্ঞান সমস্ত পাপকে পুড়িয়ে দেয়, আমাদের ভিতর যত রকম সাংসারিকতার ভাব আছে, ভগবান সব কিছুকে পুড়িয়ে দেন; অথচ সংসার তাঁকে জানতে পারে না। তাহলে এই অজ্ঞান এলো কোথা থেকে? ভগবান যদি অজ্ঞানকে পুড়িয়ে দেন, তাহলে ভগবান থেকে ওটা আলাদা? এই সমস্যা কিভাবে এলো? এটাকে এবার পরের শ্লোকে ভগবান ব্যাখ্যা করছেন।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্।।১৩।।

(সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ – এই ত্রিবিধ গুণজাত ভাবের দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত হয়ে আছে; তাই এই সকল ভাবের অতীত অব্যয় নির্বিকার আনন্দস্বরূপ আমাকে জগৎ স্বরূপত জানতে পারে না।)

প্রকৃতির এই তিনটে গুণ, সত্ত্ব, রজো ও তমো সমগ্র জগৎকে মোহিত করে রেখেছে। আমরা অপরকে বলি, তুমি কেন ওর মোহে পড়ে আছ, যুবক কেন যুবতীর মোহে পড়ে আছে, আমি টাকা-পয়সার মোহে কেন পড়ে আছি, মেয়েরা শাড়ি গয়নার মোহে কেন পড়ে আছে? আসলে বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি কারুর কোন মোহ হয় না, মোহ হয় নিজের ভিতরে যে সত্ত্ব, রজো, তমো আছে, এই তিনটে গুণ দিয়ে। কিভাবে এই তিনটে গুণ বাঁধে, পরে চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবান বিস্তারে এটাকে নিয়ে বলবেন। সত্ত্বগুণীকে যেমন সুখ আর জ্ঞান দিয়ে সত্ত্বগুণ বন্ধনে রাখে। রজোগুণ আসক্তি দিয়ে বাঁধে, তমোগুণ হিংসা বৃত্তি, লোভ, আলস্য দিয়ে বাঁধে। একজন সব সময় বই পড়তে চাইছে, সবাই

বলে ওর বই পড়াতে আসক্তি। বই পড়াতে তার আসক্তি না, আসলে সে সত্ত্বগুণে বাঁধা হয়ে আছে। আমাকে জয়ী হতে হবে, আমাকে এটা পেতে হবে, আমাকে খুব নামযশ পেতে হবে, এগুলো সে নিজে থেকে করতে চাইছে না, আসলে সে রজোগুণে বাঁধা হয়ে আছে। ভগবান তাই বলছেন, সমস্ত মানুষ সত্ত্ব, রজো, তমোতে এমন ভাবে বাঁধা হয়ে আছে যে, আমি যে পরমেশ্বর, আমি যে সেই অব্যয় ঈশ্বর, আমাকে তারা জানতে পারে না। অব্যয়, যার কোন ক্ষয় হয় না, যিনি এই তিনটে গুণের পারে।

একটা আলো আছে, আলোর কোন রঙ হয় না, আলো আলো। কিন্তু একটা গোলাকার পিচবোর্ড কেটে তিনটে ফুটো করে তাতে সাদা, লাল, কালো রঙের সেলোফিন লাগিয়ে দিয়ে আলোর সামনে ঘুরিয়ে যাচ্ছে। আলোটা এমন ভাবে সেট করা আছে যে, আলোকে ঐ তিনটে রঙের মধ্য দিয়েই আসতে হচ্ছে। ফলে সবাই ঐ তিনটে রঙকেই দেখে, তার পিছনে যে আসল আলো, যার কোন রঙ নেই, সেটাকে দেখতে পায় না। সত্ত্বটা হল একটু সাদা সেলোফিন, রজো হল যেন লাল সেলোফিন, তমস যেন কালো সেলোফিন। ভগবান এই তিনটে গুণের পারে, মানুষ তাই ভগবানকে জানতে পারে না, বুঝতেও পারে না।

ভগবান অবিনাশী, তাঁর কোন দিন নাশ হয় না; তাঁর মধ্যে কোন বিকার হয় না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা ষড়বিকারের উপর আলোচনা করেছিলাম। যার জন্ম হল, জায়তে; জন্মের পর সে থাকছে, অস্তিত্বে; বৃদ্ধি পায়, বর্ধতে; বিকার হয়, পরিণমতে; ক্ষয় হয়, ক্ষিয়তে; এবং শেষে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, বিনশ্যতে; এই ছটি বিকার। আমাদের কাছে ঠাকুর, ঈশ্বর, ভগবান এগুলো শব্দ মাত্র। আমার কাছে যেটা শব্দ মাত্র, সেটাকে অনুভূতি দিয়ে বাস্তব করতে হবে। অনুভূতি যখন বাস্তব হয়, তখনই আমার কাছে ওটার সঠিক মূল্য হয়। আমাদের অনেক সময় অনেকে এসে বলেন, 'এই যে এত সবাই লেকচার শুনছে, তাদের কি কিছু ভাল হচ্ছে, কথাগুলো কি নিতে পারছে'? সেখানে আমার একটাই উত্তর, 'কেন কথা নিতে হবে, তাদের নলেজ ব্যাঙ্ক বাড়ছে, এগুলো তারা কিছুই জানতেন না, এখন জানতে পারছেন'। জ্ঞানের মত পবিত্র কি কিছু আছে! সব কিছুকে লাভ লোকসান দিয়ে কেন মাপতে হবে! ঠাকুর এটাকে বলতেন বেণে বুদ্ধি। এই যে সত্ত্ব, রজো ও তমোর মধ্যে আমরা পড়ে আছি, এর থেকে বেরোব কি করে? ভগবান তখন চোদ্দ নম্বর শ্লোকে দৈবী মায়াকে নিয়ে বলছেন, আমাদের অনেকরই খুব প্রিয় শ্লোক, পারলে সবাই আপনারা মুখস্ত করে নেবেন, সংসার বন্ধন থেকে কিভাবে মুক্ত হবেন বলছেন –

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।১৪।।

(কারণ আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া নিতান্ত দুস্তরা, একে অতিক্রম করা অতিশয় কষ্টকর। কিন্তু যাঁরা ধর্মাধর্ম পরিত্যাগপূর্বক আমাকে আশ্রয় করেন এবং অন্য প্রকার সাধনের উপর নির্ভর করেন না, তাঁরাই কেবল আমার এই দুস্তর মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন, অর্থাৎ সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হন।)

জগৎ কি, ঈশ্বর কে, ভক্ত কে, ভক্তকে কি করতে হয়, সব কিছুকে একটি শ্লোকের মধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভগবান অর্জুনকে ঠিক কি বলেছিলেন আমাদের জানা নেই, আমরা জানি গীতা ব্যাসদেবের সংকলন। ব্যাসদেব হয়ত জানতেন, নিজের শিষ্যদেরও হয়ত তিনি নিশ্চয়ই বলেছিলেন। কিন্তু আমরা জানি ঠাকুর এসে তাঁর ত্যাগী সন্তানদের কিভাবে এই তত্ত্বগুলি শিখিয়েছিলেন। যাঁরা এই আলোচনা শুনছেন, তাঁরা একটু চোখ বুজে অন্তর দিয়ে দেখার চেষ্টা করুন, ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে, যিনি স্বামী বিবেকানন্দ হতে যাচ্ছেন, তাঁকে এই শিক্ষা দিচ্ছেন – যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানিং এই শরীরে রামকৃষ্ণ। *দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া*। হে নরেন, আমার যে মায়া, এই মায়াকে অতিক্রম করা খুব দুরূহ। অতিক্রম করা যায় না, দুষ্কর, দুঃসাধ্য। কিন্তু *মামেব যে প্রপদ্যন্তে*, যে

আমার শরণাগত হয়ে যায়, তাকে আমি এই মায়ার সমুদ্র পার করে দিই, আমার কৃপায় তারা মায়াকে অতিক্রম করে যায়।

একটা গল্প আছে, হাসির গল্প, কিন্তু এগুলোকে জীবনে লাগালে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। একজন লোক মাথায় ধামা করে খই নিয়ে যাচ্ছে। বাতাস চলতে শুরু হল, ধামা থেকে বাতাসে খইগুলো উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছে। দেখছে খই বাঁচানোর কোন উপায় নেই, লোকটি তখন বলছে, 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ'। ধামা থেকে যে খইগুলো উড়ে গেল, সেগুলো গোবিন্দকে দিয়ে দিলাম। কারণ পুরো ধামাটা যদি গোবিন্দকে দিয়ে দেয়, তাহলে তো সবটাই প্রসাদ হয়ে গেল, পয়সার বিনিময়ে বিক্রী করা যাবে না, সবাইকে খাইয়ে দিতে হবে। শুধু যে খইগুলো উড়ে উড়ে যাচ্ছে, সেগুলোকে বলছে, 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ'। আমাদের যে জপধ্যান, আমাদের যে তপস্যা, আমাদের যে প্রার্থনা, সবটাই 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ'। ভগবান কি এতই আহাম্মক, তিনি এই উড়ো খই গোবন্দায় নমঃ শুনে আমাদের কৃপা করবেন?

ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রে ব্রাহ্মণ অগ্নি দেবতাকে বলছেন, 'আমি রোজ সকাল সন্ধ্যা আপনার পূজা করে এসেছি, আমার এটা অধিকার, আমার এটা আবদার, আমার এই প্রার্থনা আপনাকে শুনতে হবে'। মায়ের কাছে সন্তান যেমন আবদার করে, আমি তোমার ছেলে, আমার কথা তোমাকে শুনতে হবে। কত উচ্চমানের কল্পনা করা যায় না। আজ সেই হিন্দু জাতির কত অধঃপতন হয়েছে আমরা কল্পনাই করতে পারি না। এই কি সেই দেশ, যে দেশ গার্গি, মৈত্রেয়ীর মত মহিয়ষী নারীর জন্ম দিয়েছিল। উইল ডুরাণ্ডের মত এত বড় ইতিহাসবিদ্, তিনি ইংরেজদের সময় ভারতে এসে তাঁর ছোট্ট চটি বই Case for Indiaতে লিখছেন যে, তিনি এই দেশে এসে হতবম্ব হয়ে গেছেন, ইংরেজরা কি দুরবস্থা করেছে এই দেশের, এই উচ্চমানের সংস্কৃতির কি দশা করে দিয়েছে। ইংরেজরা বইটাকে বাজায়েপ্ত করে দিলেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর বইটা পাওয়া যেতে শুরু হল। আজ হিন্দু ধর্মের উপর কত আক্রমণ আসছে, কেউ নিজেকে যুক্তিবাদী বলছে, কেউ নিজেকে বিজ্ঞানবাদী বলে, কেউ নিজেকে লিবারাল বলে, কেউ মার্ক্সিস্ট বলে, আর অন্যান্য ধর্মের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, এরা সবাই মিলে হিন্দু ধর্মকে এমন দুরবস্থায় পাঠিয়ে দিয়েছে যে কিছু বলার নেই, তার সাথে হিন্দু সংস্কৃতিকে দফারফা করে ছেড়েছে। ঠাকুর যেমন বলছেন, সাপের মাথায় মণি, কিন্তু সাপ মরা ব্যাঙ খেয়ে মরে। একেবারে ঠিক সেই দুরবস্থা হয়েছে হিন্দু ধর্মের। জ্ঞান নেই, জ্ঞান লাভের স্পৃহা নেই, জ্ঞান না হওয়ার জন্য সেই শ্রদ্ধাটুকুও নেই।

ভগবান যখন বলছেন, *মামেব যে প্রপদ্যন্তে*, ভগবান এখানে 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ', এদের কথা বলছেন না। যিনি তমোগুণকে ছেড়েছেন, রজোগুণকে ছেড়েছেন, সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভগবানের শরণাগত হয়ে বলছেন, প্রভু তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই, ভগবান শুধু তাঁকেই এই *দুরত্যয়া* মায়া থেকে পার করে দেন। উড়ো খই গোবিন্দায়দের কখন পার করেন না। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে যে কজন ব্রহ্মচারী আছেন, সবাই বড় বড় ডিগ্রীধারী। কিছু দিন আগে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের সেক্রেটারী এখানে এসেছিলেন। সব ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে পরিচয় করাতে তাঁর চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছে। সবাই বিদেশ থেকে পিএইচডি করা, কেউ কেউ আবার বিদেশের সব নামকরা ইউনিনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করছিলেন। সব ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরের নামে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। আমাদের এক ব্রহ্মচারী ভাই খুব সুন্দর একটা গল্প বানিয়েছিলেন।

এক রাজার সাম্রাজ্যে একটা বড় জেলখানা আছে। জেলখানাতে অনেক কয়েদী বন্দী হয়ে আছে। রাজা নিজের লোকেদের খুব ভালবাসে, যারা জেলে আছে তাদেরও খুব ভালবাসে। রাজার খুব ইচ্ছে একদিন জেলে গিয়ে দেখবে কয়েদীরা জেলে কেমন আছে। রাজা নিজের মন্ত্রীর সাথে দুজনেই কয়েদী হয়েই জেল দেখতে গেলেন। কারণ বন্দীদের অবস্থাটা ভাল করে জানতে হবে।

জেলরকে বলা আছে, কাউকে যেন কিছু না বলা হয়। রাজা ও মন্ত্রী এবার জেলে থাকতে লাগলেন। কয়েদীর মতই থাকছেন, কয়েদীর মতই ব্যবহার করছেন। কিন্তু তার মধ্যেই তিনি লক্ষ্য করে যাচ্ছেন, কোন কোন কয়েদী ভাল। তাঁরা থাকলেন, বেশ কিছু দিন থাকার পর বেরিয়ে এলেন। রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, দেখ, আমি দেখলাম অমুক অমুক কয়েদী ভাল মানুষ, ওদের মুক্ত করে দাও, কারুর মেয়াদ কমিয়ে দিতে বললেন। বাকিরা যেমন ছিল তেমনই থাকবে। অবতার হলেন এই রাজার মত। অবতারের এই উদাহরণটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। অবতার আসেন, এসে তিনি সংসাররূপী এই কয়েদখানায়, এই পাগলা গারদে আমাদের মত হয়ে ঘুরতে থাকেন। ঠাকুর বা শ্রীকৃষ্ণ আমাদের মাঝখানে এসে ঠিক তাই তাই করেছেন, আমরা যা যা করে থাকি। কিন্তু ঘুরে ঘুরে তিনি সবাইকে দেখছেন কে কি করছে। এটা একটা আইডিয়াকে বোঝানর জন্য এই গল্প বানানো হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে নেওয়া যাবে না।

আচার্য এখানে বলছেন, *তত্র এবং সতি সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য*, অষ্টাদশ অধ্যায়ে শেষের দিকে এসে ভগবান অর্জুনকে বলবেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*, হে অর্জুন! পাপ-পূণ্য, ধর্ম-অধর্ম সব ছেড়ে তুমি আমার শরণাপন্ন হও। তার মানে তমোগুণ, রজোগুণ ও সত্ত্বগুণ তিনটেকেই ছাড়তে হবে। যাঁরা প্রথম প্রথম এই কথ শুনবেন, তাঁদের অনেকেই শুনে অবাক হয়ে যাবেন, বলবেন, সত্ত্বগুণকে কেন ছাড়তে হবে? যোগের দৃষ্টিতে খুব সহজেই এটা বোঝা যায়। মূল কথা মনের চাঞ্চল্যকে থামাতে হবে। মনের চাঞ্চল্যকে এমনি থামানো যায় না, তিনটে গুণের আলাদা আলাদা চাঞ্চল্য, তমোগুণী চাঞ্চল্য, রজোগুণী চাঞ্চল্য ও সত্ত্বগুণী চাঞ্চল্য। সত্ত্বগুণী খুব ভাল মানুষ, সাধু পুরুষ। তাতেও তাঁর ঈশ্বর জ্ঞান হয় না। সত্ত্বগুণী ধ্যান করে, ধ্যান করে খুব গভীরে চলে যায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে আমার এক বন্ধুকে বাঁচাতে হবে, ঐ অতটুকু ইচ্ছা আবার তাঁকে জগতের মাঝখানে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। আচার্য তাই বলছেন, সব কিছু ছেড়ে মায়াধীশ পরমেশ্বরের যখন শরণাপন্ন হয়, তখন সে মায়া থেকে বেরিয়ে যায়।

এই মায়াকে অতিক্রম করার ব্যাপারে আমাদের শাস্ত্রাদিতে বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য শাস্ত্র যাই বলুক না কেন, গীতার মতে তখনই এই মায়ার হাতে থেকে কেউ মুক্ত হয়ে যেতে পারবে, যখন সে ঈশ্বরে ঠিক ঠিক শরণাগত হয়। তন্ত্র মতে এই মায়াকে শক্তি বলা হয়, তন্ত্র বলবে তুমি শক্তির আরাধনা কর, শক্তিকে প্রসন্ন কর। কিন্তু গীতায় মায়ার আরাধনা করতে কোথাও বলা হচ্ছে না, শক্তিকে প্রসন্ন করার কথাও বলছেন না; এখানে মায়াকে জয় করার কথা বলা হচ্ছে। গীতা আর তন্ত্রের মধ্যে এই ব্যাপারে বিরাট পার্থক্য এসে যায়। বেদান্ত মতে মায়াকে অতিক্রম করতে হয় কিন্তু তন্ত্র মতে শক্তির কাছে প্রার্থনা করতে হয়, গীতার মতে ঈশ্বরের শরণাগত হতে হবে। কিন্তু দুটো ক্ষেত্রেই এই মায়া দৈবী। ভগবান অর্জুনকে বললেন, যে আমার শরণ নেয় সে এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু মানুষ এত দুঃখ-কষ্ট আর যন্ত্রণাকে ভোগ করা সত্ত্বেও কেন ঈশ্বরের শরণ নিচ্ছে না? তখন ভগবান বলছেন –

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ।।১৫।।

(কিন্তু মনুষ্যগণের মধ্যে যারা পাপকর্মপরায়ণ, মোহগ্রস্ত ও বিবেকশূন্য নরাধম, তারা মায়া দ্বারা হতজ্ঞান হয়ে কেবল ইন্দ্রিয়ভোগরূপ অসুর স্বভাব প্রাপ্ত হওয়ার দরুন আমাকে ভজনা করে না।)

তমোগুণের প্রভাবে যারা পাপকর্ম করে, মন্দ কাজ করে, যারা মোহগ্রস্ত বিবেকহীন, যারা নরাধম এরা কখন আমার ভজনা করে না। নরাধম কাদের বলা হয়? আমাদের এক মহারাজ খুব সুন্দর একটা গল্প বলতেন। একজনের গায়ে চুলকানি হয়েছে, চুলকাতে চুলকাতে গায়ে জ্বালা ধরে যায়। একদিন রাত্রিবেলা ঘুমের মধ্যে খুব চুলকানোর জন্য সারা শরীরে জ্বালা ধরে গেছে। ঘুমোতে

পারছে না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে শ্মশানে পৌঁছে গেছে। সেখানে মা কালী প্রথমে তাকে খুব ভয়টয় দেখালেন। ভয় দেখিয়েও কিছু হল না দেখে, মা কালী তাকে দর্শন দিয়ে বললেন, 'বল বৎস তুমি কি বর চাও'? লোকটি বলল, 'আমার গ্রামের সবারই যেন এই চুলকানি হয়ে যায়'। এরা হল দুষ্ট লোক, কিন্তু নরাধম না। নরাধম হল, একজনের লম্বা দাড়ি, দাড়িতে তার আগুন লেগে গেছে। সে চেঁচাচ্ছে, বাঁচাও বাঁচাও। একজন দৌড়ে এসে বলছে, 'দাঁড়ান মশাই, দাড়িতে যখন আগুন লেগেছে, আগে আমার বিড়িটা ধরিয়ে নিতে দিন'। এরা হল নরাধম। অপরের কষ্টেতেও নিজের লাভ কি ভাবে করবে সেই চেষ্টা করতে থাকে। সবাই বলে, এই নরাধমদের কি হবে? কিছুই হবে না, এরা এভাবেই থাকবে। *মায়য়াপহৃতাজ্ঞানা*, তমোগুণ আর রজোগুণের প্রভাবে মায়াতে এরা এমন মুগ্ধ হয়ে আছে যে, যদি একটি কথা কেউ বলে দেয়, এ-রকম করো না, রেগে আগুন হয়ে যাবে। রেগে যাওয়ার পর আর তাকে সামলানো যাবে না। যে বলতে গিয়েছিল, সে অবাক হয়ে আপশোষ করতে থাকবে, কি করতে যে আমি বলতে গেলাম।

আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ, এদের ভিতর অসুরের ভাব। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান বিস্তারে বলবেন, দৈবীগুণ কি এবং আসুরীগুণ কি। স্বার্থপর যারা এরা হল আসুরী ভাবাপন্ন, অপরের জন্য যারা ভাবে, এরা দৈবীগুণ সম্পন্ন, সত্ত্বগুণ থাকলে দৈবীগুণ আসে। আর রজো থেকে তমো, আর তমোরও তমো হলে এরা হয়ে গেল নরাধম। এরা কি করে? হিংসা, মিথ্যা ভাষণ, অপরকে কষ্ট দেওয়া, আমরা বেশির ভাগ এই রকমই। কাউকে কষ্ট দিচ্ছি, হাতজোড় করে সে কাতর ভাবে বলছে, 'এবার দয়া করুন'। তখনও আমরা বলি, 'না, তোমার আরও শিক্ষা দরকার'।

ঠাকুর বলছেন, সত্ত্ব, রজো, তমো এই তিন গুণই ডাকাত। তমোগুণ বলে, এই ব্যাটাকে বাঁচিয়ে রেখে কোন দরকার নেই, একে চলো কেটে ফেলি। সমাজের দিকে তাকালে আজকে আমরা দেখছি, কি ভয়ানক হিংস্রতা চারিদিকে হচ্ছে। ইদানিং কালে ৪৯৮ একটা হয়েছে। দিনরাত বাড়িতে ঝগড়া করছে, দুদিন বাদে হয়ত ডিভোর্স দিয়ে দেবে। কিন্তু তার আগে বলছে, 'আগে এর পুরো গুষ্টিকে আমি জেলে ঢুকিয়ে যাব'। আবার বলবে, 'জানেন কি করেছিল আমার সাথে?' আরে ভাই, আমরা সবই জানি কে কি করেছে, আর তুমি কি করতে চাইছ! তাই বলে ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, পচাশি নব্বই বছর বয়স, তাঁদেরও জেলে ঢুকিয়ে দিতে চাইছ? কতটা হিংস্র ভাবা যায়! এরা কি মানুষ! এরা হল পাপকর্মা। ভাল মানুষ যারা, এরা হল পূণ্যকর্মা। পূণ্যকর্মা কি রকম, পরে এক জায়গায় বলবেন, জন্মজন্মান্তর ধরে একটু একটু যে পূণ্য কর্ম করছে, সেই পূণ্য সঞ্চিত হলে তখন ঈশ্বরের দিকে যাওয়ার ইচ্ছে হয়। এরা হলেন ভক্ত। ঈশ্বরের ভক্ত চার প্রকার হন –

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞসুরার্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।।১৬।।

(হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ অর্জুন, আর্তিযুক্ত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, অর্থকামী ও তত্ত্বজ্ঞানী – এই চার প্রকার পূণ্যকর্মা ব্যক্তি আমার ভজনা করেন।)

চার ধরণের মানুষ ঈশ্বরের ভজনা করেন। এই চার প্রকার মানুষ, যাঁদের সুকৃতি আছে, পূণ্যকর্ম করা আছে। যাঁরা গীতার আলোচনা শুনছেন, আপনাদের অবশ্যই পূণ্যকর্ম আছে, পূণ্যকর্ম না থাকলে গীতার কথা শুনতেই পারতেন না, সম্ভবই হত না। আপনার প্রতিবেশিদের, আপনার সম্বন্ধীদের, আপনার বন্ধুদের বলুন তো, ফ্রীতে গীতা শোনাচ্ছে, চল শুনবে। এরা গীতা শুনবে! প্রশ্নই নেই। 'আমার কি এখন গীতা শোনার বয়স হয়েছে'? দ্বিতীয়, 'আমি কি কোন পাপ করেছি যে, আমাকে গীতা শুনতে হবে'? কিন্তু বুঝতে পারছে না যে, পাপ করেছ বলেই সুযোগ পেয়েও তোমার গীতা শুনতে ইচ্ছা করছে না। রামানুজাচার্য এক জায়গায় খুব সুন্দর বলছেন, অনেক পাপ করলে

ঈশ্বরের কথা শুনতে ইচ্ছে করে না, মন্দিরে যেতে ইচ্ছে করে না। তবে কিছু পূণ্য করলে ঈশ্বরের কথা শুনতে ইচ্ছা হয়।

ভগবান বলছেন, চার প্রকার লোক আমার ভজনা করে। প্রথম, *আর্ত*, যারা খুব বিপদে পড়ে গেছে। কোন বিপদের পড়ে গেলে মানুষের তখন ঈশ্বরের কথা মনে পড়ে। আমাদের অনেক প্রফেটরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যেও এই ধরণের আমরা দেখতে পাই, যাঁরা আপদে বিপদে পড়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করেন। হিরণ্যকশ্যপু যখনই প্রহ্লাদকে অত্যাচার নিপীড়ন করতে যাচ্ছে, তখনই প্রহ্লাদ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে। আমার এক বাল্যবন্ধু ছিলেন, কোথা থেকে আমার নম্বর খুঁজে বার করে একদিন আমাকে ফোন করলেন। তাঁর পুত্রবধূর খুব কঠিন ব্যাধি হয়েছে, লান্সের কি অসুখ হয়েছে, অল্প বয়স, ডাক্তাররা বলে দিয়েছে আর বাঁচার আশা নেই। ফোনে তিনি হাউ হাউ করে কাঁদছেন, আমারই সমবয়সী। কাঁদতে কাঁদতেই বলছেন, 'দাদা আমরা বাল্যবন্ধু, আমার বউমা আর বাঁচবে না, তুমি একটু কৃপা কর, একটা কিছু কর'। আমার তো হাসি আর থামতে চাইছে না। আমার কি কোন সিদ্ধাই আছে? আমার তো সেই শক্তি নেই। কি আর বলব বন্ধুকে, বললাম, 'ঠিক আছে ভাল হয়ে যাবে, চিন্তা করো না'। কপাল এমন, পুত্রবধূ ঠিকও হয়ে গেল।

এখানে গল্পটা মজার, কিন্তু ঘটনাটা তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা যখনই দুঃখ কষ্টে পড়ি, অসহায় হয়ে পড়ি, কারুর অসুখ করল, বড় বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হল, ডাক্তাররা জবাব দিয়ে দিয়েছে, আর আটচল্লিশ ঘন্টা। তখন আর কিছু করার থাকে না, ভগবানের কাছে গিয়ে হত্যে হয়ে পড়ে যাই। সে দেখল আমার বাল্যবন্ধু সন্ন্যাসী, এই বিশ্বাস যে, সন্ন্যাসী মানেই তিনি অনেক ক্ষমতা রাখেন। যাই হোক, ভালও হয়ে গেল, কোনটা এখন কাজে লাগল জানার কোন উপায় নেই।

দ্বিতীয় *অর্থার্থী*, অর্থার্থী মানে যারা টাকা-পয়সা চাইছে। ধ্রুবকে তার সৎমা খুব কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে, সেও সাম্রাজ্য ফিরে পাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ল। ছোটবেলায় পরীক্ষার সময় আমাদের ভক্তি অনেক বেড়ে যেত, কত নিষ্ঠার সাথে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতাম। রেজাল্ট বেরোবার দিন মাথা ঠুকে ঠুকে প্রার্থনা করতাম। রেজাল্ট বেরোল, সেই ফেল করলাম, নয়ত খুব কম নম্বর পেয়ে কোন রকমে পাশ করলাম, লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারব না। তারপরেও এখনও ঠাকুরকে বিশ্বাস করে আছি, বিরাট ব্যাপার। অর্থার্থীতে সব রকমই আছে, কেউ চাকরি চাইছে, সেও অর্থার্থী, যে বিয়ে করতে চাইছে কিন্তু বিয়ে হচ্ছে না সেও অর্থার্থী, মানে যার মনে কোন কামনা-বাসনা আছে, সে জানে ভগবানই পারবেন আমার এই কামনা বাসনা পূরণ করতে, এই বিশ্বাসই তাকে ভগবানের আশ্রয়ে নিয়ে যায়।

তৃতীয় *জিজ্ঞাসু*, যিনি কিছু ঈশ্বরীয় কথা শুনেছেন, শোনার পর তাঁর মনে ইচ্ছা জেগেছে ঈশ্বরের ব্যাপারে আরও অনেক কিছু জানতে হবে। ঠাকুরের সাধনা শুরু হয় জিজ্ঞাসু রূপেই। ঠাকুর অবতার, কিন্তু কয়েদীর গল্পটা মনে করুন, ঠাকুর এসেছেন, তিনিও আমাদের মত আচরণ করছেন, তাঁকেও সাধনা করতে হচ্ছে, তখন এই সাধনাটা করার সময় তিনি জিজ্ঞাসুর ভাব নিয়ে সাধনা শুরু করলেন, কে জানে কালী কেমন। ঠাকুর মা কালীকে বলছেন, মা তুই কি সত্য? ধর্ম পথে আমরা বেশির ভাগই হলাম জিজ্ঞাসু।

চতুর্থ জ্ঞানী, যিনি ঈশ্বরের স্বরূপ জানেন। ঠাকুরের মা কালী দর্শন হয়ে গেল, মা কালীর জ্ঞান হয়ে গেছে। তারপরেও দিনরাত মা মা করে যাচ্ছেন, মাকে ভালবাসছেন, মার কাছে এটা ওটা আবদার করছেন। যিনি বিজ্ঞানী, তিনি ঈশ্বর তত্ত্ব জেনে গেছেন, তিনি শব্দ দিয়েও জানেন, তত্ত্বতঃও জানেন, তখন তিনি কেবলমাত্র ঈশ্বরকেই ভালবাসেন, ঈশ্বরকেই ভজনা করেন।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।।১৭।।

(এই চার প্রকার ভক্তের মধ্যে নিত্যযুক্ত, আমাতে একনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও আমার অত্যন্ত প্রিয়।)

এই যে চার প্রকার ভক্তের কথা বলা হল, এই চার প্রকার ভক্ত আমার ভজনা করেন। কিন্তু জ্ঞানীদের মধ্যেও যাঁরা আমার তত্ত্বটা ঠিক ঠিক জানেন, আর একনিষ্ঠ ভাবে নিত্যযুক্ত হয়ে আমাকে ভক্তি সহকারে ভজনা করে যাচ্ছেন, সেই রকম জ্ঞানী আমার অতীব প্রিয়। এই ভক্তের কাছে আমিও অত্যন্ত প্রিয়, সে আমাকে ছাড়া আর অন্য কোন দিকে তাকাবে না। এই কথা ভগবান এই শ্লোকে বলছেন, *তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত*, জ্ঞানীর কি লক্ষণ? নিত্যযুক্ত, সব সময়, চব্বিশ ঘন্টা তাঁর মন প্রাণ ঈশ্বরে ডুবে আছে। *একভক্তির্বিশিষ্যতে*, জ্ঞানীর ভক্তি তৈলধারাবৎ, এক সমান চলছে। কারণ তিনি তত্ত্ববেত্তা, যা তা কেউ নন, তিনি জানেন ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু। ভগবানের তত্ত্বটা জানেন বলে তাঁর কাছে ভজনা করার জন্য ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন কিছু নেই। যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসছেন, তিনি এই জগতে আর কাকে ভালবাসতে যাবেন! যে সন্তানের একজন ভালবাসার মা আছে, সে এটাও জানে আমার মা আমাকে ভালবাসে, সে অপর কোন মহিলাকে মা রূপে ভালবাসতে যাবে না। আমার এক বন্ধু খুব সুন্দর বলেছিলেন, একজন লোক কোন সুন্দরী মহিলার প্রশংসা করতে পারে, কোন সুন্দরী নারীকে মনে মনে কামনা করতে পারে, কিন্তু সে জানে, আমার মা আমারই মা। ঐ সুন্দরীকে সে যে কোন রূপে নিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু তার মা, মা রূপেই থাকবে, ওখানে কোন কিছুর সঙ্গে আপোষ করা যাবে না। তার মা তার কাছে চব্বিশ ঘন্টাই মা থাকবে, ঠিক তেমনি জ্ঞানীর কাছে ভগবান চব্বিশ ঘন্টা ভগবানই থাকবেন। এটাই জ্ঞানীর বৈশিষ্ট্য, *একভক্তির্বিশিষ্যতে*, আর তার সাথে নিত্যযুক্ত।

জ্ঞানীর এই যে অনন্যা ভক্তি, সেইজন্য *অহং স চ মম প্রিয়ঃ*, সে আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, আমিও তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। সত্যিকারের ভালবাসা কোথায়? এইখানে, ঈশ্বর আর জ্ঞানীভক্তের মধ্যে যে ভালবাসা। ঈশ্বর তাঁর জ্ঞানীভক্তকেই ভালবাসেন, আর জ্ঞানীভক্তও ঈশ্বরকেই কেবল ভালবাসে। এই ভালবাসায় কোন স্বার্থ নেই, কোন ফাঁক নেই, এই ভালবাসায় কোন দিন কোন প্রকার পরিবর্তন আসবে না। তাহলে কি ভগবানের বৈষম্য দোষ আছে? ঠাকুরকে একজন এসে বলছে, ভগবানের বৈষম্য দোষ আছে, কাউকে বড় করেছেন, কাউকে ছোট করেছেন। ঠাকুরে রেগে বলছেন, তোমার তো বড্ড বেণে বুদ্ধি। 'কিন্তু এখানে তো পরিষ্কার ভগবান বলে দিচ্ছেন, আমি এই প্রকার জ্ঞানীভক্তকেই বেশি ভালবাসি। তাহলে বলুন, আপনার বৈষম্য দোষ আছে। আপনি তো আমাকেও সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আপনি ওকে বেশি কেন ভালবাসেন? কি অন্যায় কথা বলছেন, গীতা নাকি আবার শাস্ত্র, সেখানেই ভগবান বলছেন, ও আমার বেশি প্রিয়'!

আচার্য শঙ্কর এখানে খুব সুন্দর এর ব্যাখ্যা করছেন, *প্রসিদ্ধং হি লোকে আত্মা প্রিয়ো ভবতি ইতি*, এই সংসারে এটা প্রসিদ্ধ যে আত্মা সবারই প্রিয়। জ্ঞানীর আত্মা আমি, আর আমার আত্মা সেই জ্ঞানীভক্ত। কারণ ঐ ভক্তের মধ্যে কোথাও আমিত্ব বা আমি ভাব নেই। সেইজন্যই প্রিয়, এখানে কোন স্বজন-পোষণ নেই। ঠাকুরের কাছে নরেন এসেছে, একজন বলছে, 'এই তো নরেন এসে গেছে, এবার নরেন নেরে, নরেন খারে, নরেন নরেন চলবে, আমরা যেন সব বানের জলে ভেসে এসেছি'। কেউ আমরা বানের জলে ভেসে আসিনি, নরেন ঠাকুরের আত্মা, আর ঠাকুর নরেনের আত্মা। ঐ ভালবাসায় অন্য কেউ কোন দিন আসতে পারবে না। ভগবান বাসুদেব জ্ঞানীর আত্মা, সেইজন্য জ্ঞানী আমার অত্যন্ত প্রিয় আর ঐ কারণে সে আমারও অত্যন্ত প্রিয়। এটা যে শুধু আচার্যের ব্যাখ্যা তা না, ভগবান নিজেও পরের শ্লোকে বলে দিচ্ছেন –

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্।।১৮।।

(এনারা সবাই মহান্ এবং এই চারজনই আমার প্রিয়। কোন ভক্তই আমার অপ্রিয় নন; কিন্তু জ্ঞানী আমার অত্যন্ত প্রিয়; কারণ জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ, এটাই আমার মত। বাসুদেবে সমাহিতচিত্ত জ্ঞানী উৎকৃষ্ট গতিস্বরূপ আমাকেই আশ্রয় করে থাকেন, অর্থাৎ 'আমি ভগবান বাসুদেব থেকে স্বরূপতঃ আলাদা নই' – এই বুদ্ধি জ্ঞানীর সর্বদা দৃঢ় থাকে।)

এই যে চার প্রকার ভক্তের কথা বলা হল, এনারা সবাই *উদারাঃ*, মহান্, সবাই শ্রেষ্ঠ। এই যে আপনারা সংসারের সুখ, সখ আহ্লাদ ছেড়ে গীতা শুনছেন, ঈশ্বরের কথা শুনছেন, শ্রেষ্ঠ না হলে কি এই ভাবে শুনতেন! আপনাদের কত পূণ্য সঞ্চিত হয়ে আছে, কত শ্রেষ্ঠ তবেই আজ গীতার কথা ধৈর্য ধরে শুনে যাচ্ছেন। ভগবান বলছেন, এনারা সবাই শ্রেষ্ঠ, সবাই এনারা মহান্ কোন সন্দেহ নেই। যে কোন কারণেই হোক, আমাকেই তো ভালবাসছে।

বেদের ঋষিরা দেখলেন, মানুষের সুখ-দুঃখ তো সব সময় লেগেই থাকবে, সেইজন্য ঋষিরা মানুষের সব চাওয়া-পাওয়া, রোগশোক থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা, সব কিছুকে ভগবানের সাথে জুড়ে দেওয়ার জন্য বলে দিলেন, তোমরা যজ্ঞ কর। আমার সর্দিকাশী হয়েছে, এই নাও মন্ত্র, এটা জপ কর ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে কি কোন ওষুধ খেতে হবে না? অবশ্যই ওষুধ খাবে, তার সাথে এই মন্ত্রটাও জপ কর। তোমার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না? ঠিক আছে, তুমি ভাল পাত্র সন্ধানের চেষ্টা করতে থাক, তার সাথে এই যজ্ঞটাও কর। এইভাবে সব কিছুকে ভগবানের সাথে জুড়ে দিচ্ছেন। যেটাই আমরা করব, সেটাকে ভগবানের সাথে জুড়ে দিয়ে করতে হবে। এই কারণেই হিন্দু জাতিকে বলা হয় ধর্মপ্রাণ জাতি। এই রকম ধর্মপ্রাণ জাতি অন্য কোথাও হয়নি, বিশ্বে কোন দিন হবে না। এখানে সব কিছু ঈশ্বরের সাথে জুড়ে আছে।

তবে কি জানো অর্জুন, *জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্*, জ্ঞানী আমার আত্মা। আমরা যখন জপধ্যান করছি, সাধনা করছি, তখন এই ভাব, হে ঈশ্বর, আমি যেন ঠাকুরের আত্মা হই, বা আমি যেন শ্রীকৃষ্ণের আত্মা হই। মৃত্যুর সময় ঠাকুর এসে নিয়ে যাবেন, শ্রীশ্রীমা এসে নিয়ে যাবেন, এগুলো হল যার হীনবুদ্ধি সম্পন্ন, তাদের জন্য। আত্মা সবারই প্রিয়, আমার আপনার সবারই প্রিয় আত্মা।

আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্, কারণ জ্ঞানী আমার স্বরূপ। ভগবানের যে একটা দেহ আছে, সেই দেহের ভিতর একটা আত্মা আছে, না, একেবারেই তা নয়। আমরা যেমন যেমন এগোব, এগুলো বারবার আলোচনায় আসবে। স্বরূপ, গুণ, নাম, এই জিনিসগুলিকে নিয়ে অনেকবার আলোচনা হবে। বলছেন জ্ঞানী আমার স্বরূপ। যে কোন মানুষের যেটা স্বরূপ, সেটাই তার আত্মা। জ্ঞানী ভগবানের স্বরূপ, তাই জ্ঞানী ভগবানের আত্মা, আত্মা সবারই প্রিয় হয়, সেইজন্য এই ধরণের জ্ঞানীভক্তরা ভগবানের বিশেষ প্রিয়। জ্ঞানীর এই বোধ হয় যে, আমি ঈশ্বরের সাথে এক। আচার্য শঙ্কর যে স্তরে নিয়ে গিয়ে কথা বলেন, অন্য আচার্যরা বলার সাহস পান না। আচার্য বলছেন, *অহম্ এব ভগবান্ বাসুদেবো*, আমি ভগবান বাসুদেব হয়েছি। রাসলীলায় গোপীরা বলছেন, 'আমি কৃষ্ণ হয়েছি'। কিন্তু ভক্তরা এই ভাব নিতে চান না। এখানে মনে রাখতে হবে, মানুষ রূপে তিনি ভগবানের সাথে এক নন। সমাধির সেই অবস্থায় গিয়ে দেখেন *অহম্ এব ভগবান্ বাসুদেবো*। শুধু অহং ব্রহ্মাস্মি বলছেন তা না, *অহম্ এব ভগবান্ বাসুদেবো*। নরদেহধারী যিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তিনি হলেন সেই শুদ্ধ চৈতন্য। যিনি সমাধিতে গিয়ে সেই জ্ঞানের অবস্থায় চলে গেলেন, তিনিও সেই শুদ্ধ চৈতন্য। যখন এই দুটো স্থুল শরীর, দুটো সূক্ষ্ম শরীরকে মিশিয়ে দেওয়া হল, তখন তিনি জানবেন, আমি ও তিনি এক। কত দিন, কত বছর, কত জন্ম লাগবে ঐ অবস্থায় পৌঁছাতে, একটু চেষ্টা করলে কি হয়ে যাবে?

বহূনাং জন্মনামান্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।।১৯।।

(জ্ঞানী আমার অত্যন্ত প্রিয়। কারণ বহু জন্মের সাধনার ফলে শেষ জন্মে 'বাসুদেবই জীবজগৎ সব কিছু হয়েছেন', এই জ্ঞান লাভ করে তিনি আমাকে নিরতিশয় প্রেমাস্পদরূপে ভজনা করেন। এই ধরণের মহাপুরুষ অতিশয় দুর্লভ।)

যিনি এই পথ নিয়ে নিলেন, আর্ত হয়ে, অর্থার্থি হয়, জিজ্ঞাসু হয়ে, এরপর ওতেই লেগে থেকে জন্ম জন্ম ধরে তাঁকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আচার্য এই জায়গাতে বলছেন, *জ্ঞানার্থসংস্কারার্জনাশ্রয়াণাম্,* জ্ঞান অর্জন করার যে সংস্কার দরকার, আগে অনেক জন্ম ধরে পূণ্য সঞ্চয় করে করে জ্ঞানার্জনের সংস্কার তৈরী হয়। একজন সাধুপুরুষ হয়ে যেতে পারেন, একজন সাধক হয়ে যেতে পারেন, একজন সিদ্ধ হয়ে যেতে পারেন কিন্তু ঈশ্বরীয় জ্ঞান, ভগবানের জ্ঞানের পরিপক্কতা পাওয়ার জন্য অনেক জন্মের সাধনা চাই। আমরা যখন কোন কথা বলি, আমাদের কাছে ওটা শব্দ মাত্র, একটু গভীরে গেলে সেটাই চিন্তন হয়ে যায়, আর তারপরেই হয় সাক্ষাৎ জ্ঞান, প্রত্যক্ষ জ্ঞান। জ্ঞান হলেই শক্তি আসে। কি করে বুঝব আমার সেই জ্ঞান হয়েছে? *বাসুদেবঃ সর্বমিতি,* ভগবানই এই সব কিছু হয়েছেন। ঠাকুর বলছেন, অধম ভক্ত বলে ঈশ্বর উপরে আছেন, মৃত্যুর সময় এসে আমাকে নিয়ে যাবেন, আমার ঝামেলা হলে তিনি নেমে এসে আমাকে বাঁচাবেন, এরা হল অধম ভক্ত। মধ্যম ভক্ত দেখেন, আমার ভিতরে ঈশ্বর আছেন, সবার ভিতরেই ঈশ্বর আছেন। উত্তম ভক্ত দেখেন, তিনিই এই সব কিছু হয়েছেন, তিনিই আছেন।

প্রথমের দিকে বলা হল, *জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্,* এটাকেই অন্য ভাবে, অন্য আঙ্গিকে এনে বলছেন *বাসুদেবঃ সর্বমিতি,* ভগবান কৃষ্ণই সব কিছু হয়েছেন, এটাই জ্ঞান, এটাই ভক্তি। ভক্তরা এটাই দেখতে চান, ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। ঈশ্বর বই কিছু নেই, ব্রহ্ম বই কিছু নেই। তাহলে যে কলমটা দেখছি এটা কি? এটাও বাসুদেব, কলমটা বাসুদেব নন, বাসুদেবই কলম হয়েছেন। কি করে তিনি এই কলম হলেন? কারণ কৃষ্ণ বই, বাসুদেব ছাড়া যে আর কিছু নেই কিনা। তাহলে এটাকে বাসুদেব রূপে না দেখে কলম রূপে কেন দেখাচ্ছে? ঈশ্বরের ইচ্ছা, এটাই তাঁর শক্তি, এটাই তাঁর লীলা বা খেলা। বেদান্তীরা বলবে, এটাই মায়া, ভক্তরা বলবে, ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের লীলা। বলছেন, *বাসুদেবঃ সর্বমিতি,* যাঁর এই জ্ঞান হয়েছে, তাঁর মত জ্ঞানী এই জগতে আর হয় না, জগতে তাঁর মত ভক্ত হয় না; *স মহাত্মা সুদুর্লভঃ,* এই ধরণের মহাত্মা শুধু দুর্লভ না, সুদুর্লভ। এই রকম মহাত্মার দর্শন পাওয়া খুব কঠিন।

জীবনের উদ্দেশ্য *বাসুদেবঃ সর্বমিতি* এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং এর পরের ধাপে আসে জ্ঞানী *ত্বাত্মৈব মে মতম্*। আমাদের উপেন মহারাজ ছিলেন। দেওঘর বিদ্যাপীঠের ছাত্র অবস্থায় ওনাকেই প্রথম সন্ন্যাসী রূপে পাই। খুব স্নেহ করতেন। কয়েক বছর আগে ওনার শরীর চলে গেল। ওনার তখন একশ কি একশ এক বয়স, নিয়মিত দেখা করতে যেতাম। গেলে খুব খুশী হতেন। ঘরে ঢুকলেই বলতেন, 'কেমন আছো'? আমিও বলতাম, 'ভালো আছি মহারাজ'। উনি তখন বলতেন, 'কাঁচকলা তুমি ভাল আছ। তোমার ঈশ্বর দর্শন হল না, তোমার জীবনমুক্তি হল না, তোমার আত্মজ্ঞান হল না, আর তুমি একটা সন্ন্যাসী হয়ে বলছ ভালো আছি!' তখন একশ এক বয়স, বিছানায় শয্যাশায়ী, তার কিছু দিন পরেই তিনি দেহত্যাগ করলেন। আমাকে শেষ সময়ে ঠাকুর নিয়ে যাবেন, এটা নিয়ে পরে থাকা না, এখানে এই দেহ থাকতে থাকতেই, *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো*। এই ভাবকে আধার করে কবীর দাসের একটা খুব সুন্দর দোহা আছে, কুশল কুশল হি পুস্তে কুশল ভয়ানক কোঈ, জরা ভুয়ি ন ভয়মোহ কুশল কাঁহা সে হোঈ, সবাই বলে কেমন আছ, বলে কুশল কুশল, কিন্তু মন থেকে একটুও মোহ গেল না, ভয় গেল না, কিসের কুশল!

আমাদের অনেকের জানার আগ্রহ হয়, ঈশ্বর কি, ঈশ্বর দর্শন কি এবং ঈশ্বর দর্শন কি ভাবে হয়? ব্রহ্মা কি, বিষ্ণু কি, শিব কি; ওনারা তিনজনই কি এক, নাকি আলাদা? এক যদি হন তাহলে আলাদা আলাদা নাম কেন? এগুলো আবার অন্য আর-এক ধরণের প্রশ্ন। এই ঊনিশ নম্বর শ্লোকে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। আমাদের সবারই ধারণা, আমি যখন জপধ্যান করব, ঠাকুর যেমন মা কালীকে দেখেছিলেন, আমিও সেইভাবে ঠাকুরকে সামনা সামনি দেখতে পাব। কথামৃতে কিন্তু ঠাকুর এই ব্যাপারে কোন উল্লেখই করছেন না। ঠাকুর সামনা সামনি দেখার ব্যাপারে কাউকে কোন উৎসাহও দিচ্ছেন না। ঈশ্বরদর্শন বলতে ঠাকুর এটাই বলছেন, যেটা এই শ্লোকে বলছেন, *বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদর্লভঃ।* বহু জন্মের সাধনার ফলে শেষ জন্মে এসে এটাই তিনি দেখেন –এই সংসারে, এই ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু ভগবান নিজেই হয়েছেন।

ইদানিং একটা নূতন চল হয়েছে, এটাকে অনেকে বিজ্ঞানবাদ না বিজ্ঞানযোগ কি বলছে। ঠাকুরই নাকি বলে গেছেন, আগে নাকি এটা ছিল না। অথচ গীতাতেই এই শ্লোক রয়েছে, যার ব্যাখ্যা আচার্য করে গেছেন। হিন্দুদের যে শেষ আধ্যাত্মিক সত্য, প্রত্যেক হিন্দু যিনি সাধন ভজন করছেন, যে পথেই করুন, শিব মন্ত্রেই করুন, রাম মন্ত্রেই করুন, কৃষ্ণ মন্ত্রেই করুন, তাতে হিন্দি বেল্টে খুব প্রচলিত একটা কথা বলা হয়, সিয়া রাম ম্যায় সব জগ জানু, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রাম আর সীতাই হয়েছেন, এছাড়া আর কিছু নেই। কোথা থেকে বিজ্ঞানবাদ নিয়ে আসছে ভগবানই জানেন। শাস্ত্র ঠিক ভাবে পড়া না থাকলে এই রকমই হয়।

শ্রীশ শ্যাটফিল্ড একজন বড় মহাকাশচারী বিজ্ঞানী, ওনার একটা খুব সুন্দর বই আছে, তাতে তিনি খুব সুন্দর কথা বলছেন, মহাকাশচারী হতে গেলে দুই রকম মহাকাশচারী হওয়া যায়। একজন হল যারা মহাকাশে একটু ঘুরে আসতে চায়, কসমো ট্যুরিস্ট, ছয় মাসের ট্রেনিং দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সত্যিকারে একজন মহাকাশচারী হওয়াটা পুরো আলাদা জিনিস। মহাকাশচারী পুরো একটা নূতন জ্ঞান ভিত্তিক বিষয়, নূতন টেকনিক শিখতে হয়, মানসিকতাকে পুরো নূতন ভাবে গঠন করার জন্য ট্রেনিং নিতে হয়। আর-একটা খুব দামী কথা বলছেন, তুমি যদি সত্যিই একজন মহাকাশচারী হতে চাও, তাহলে অবশ্যই You have to think like astronaut, you have to act like a astronaut।

যখন পড়েছিলাম, তখন কথাটা আমার দারুণ লেগেছিল। ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক জীবনে যদি কেউ আসতে চায়, তার জন্য তার একটা পুরো নলেজ বেস লাগবে। উড়ো উড়ো কথা শুনে আধ্যাত্মিক জীবনকে তৈরী করা যায় না। কাউকে ছোট করার জন্য বলা হচ্ছে না, এটাই বাস্তব। ঠাকুরকে যখন একজন বলছেন, 'মশাই আপনি কি জানেন, আপনি তো কোন পড়াশোনা করেননি'। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বলছেন, আমি শুনেছি কত। আপনি বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করেছেন, কি শুনে অর্জন করেছেন, তাতে কিছু আসে যায় না। এমন কি ঠাকুর বলছেন, পড়ার থেকে শোনা ভাল। যাঁরা গীতার কথা শুনছেন, আপনারা আগে নিজেরা ভেবে দেখুন, আপনারা কি স্পিরিচুয়াল ট্যুরিস্ট, কসমো ট্যুরিস্ট যেমন মহাকাশে একটু ঘুরে চলে এলো? একটু এটাও শুনলাম, একটু ওটাও শুনলাম, না আছে কোন নলেজ বেস, না আছে চেষ্টা, সব থেকে বড়, না আছে নিষ্ঠা, এ-ভাবে জ্ঞান অর্জন হয় না, আধ্যাত্মিক জীবনও গঠিত হয় না। ভগবান এখানে পরিষ্কার বলছেন, এ-ভাবে হয় না।

তাহলে কি ভাবে হবে? *বহূনাং জন্মনামান্তে*, আধ্যাত্মিক সাধনা, জ্ঞান অর্জন একদিনের জন্য না, এক বছরের জন্যও না। কিছু বছর ট্রেনিং নিলে কেউ একজন মহাকাশচারী হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আধ্যাত্মিক পুরুষ হওয়ার জন্য অনেক জন্ম ধরে লেগে থাকতে হয়। সেইজন্য বলছেন, *স*

মহাত্মা সুদুর্লভঃ। কত লোক এ্যাস্ট্রোনট হওয়ার জন্য ট্রেনিং কোর্সে ভর্তি হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে কদাচিৎ কখন একজন দুজন মহাকাশে যাওয়ার ছাড়পত্র পায়। বলছেন যারা এই ট্রেনিংটাকে ভালবাসে, এই লাইনটা তাদের জন্য। আধ্যাত্মিকতাতেও ঠিক তাই। যাদের ঈশ্বরের কথা, আত্মার ব্যাপারে শুনতে ভাল লাগছে, মন প্রাণ একেবারে ভরে যাচ্ছে, আহা এই কথাগুলো শুনে ধন্য হয়ে গেলাম, এই ভাব যাদের আছে, একমাত্র তারাই এই পথে ঠিক ঠিক আসার যোগ্য। এরপর তাকে লেগে থাকতে হবে, জন্মের পর জন্ম লেগে আছে। এরপর সে জ্ঞান অর্জন করবে। সেইজন্য বলছেন, যাঁর জ্ঞান হয়ে গেছে, যাঁর বিজ্ঞান হয়েছে, এই রকম মহাত্মা শুধু দুর্লভ না, একেবারে সুদর্লভ, বিশেষ ভাবে দুর্লভ। এই ধরণের মহাত্মার কি জ্ঞান হয়, যে জ্ঞান তাঁকে সুদর্লভ মহাত্মা বানিয়েছে? *বাসুদেবঃ সর্বমিতি*, ভগবানই সব কিছু হয়েছেন –এই জ্ঞান। সপ্তম অধ্যায়ের এটাই সারকথা, *বাসুদেবঃ সর্বমিতি*। এটাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য, ঠাকুর এটাকেই উত্তম ভক্ত বলছেন। যাঁদের ঠিক ঠিক এই বোধ হয়েছে, থিওরেটিক্যালি না, একেবারে প্রত্যক্ষ বোধ হয়েছে, ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, এনারাই হলেন সেই সুদুর্লভ মহাত্মা।

আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, অনেক জন্ম ধরে একটু একটু করে জ্ঞানপ্রাপ্ত করার সংস্কার তৈরী হয়। সংস্কার জমতে জমতে যখন একেবারে পরিপক্ক হয়ে যায়, বলছেন তখন তিনি প্রত্যক্ষ করেন বাসুদেবই সব কিছু হয়েছেন। ঊনিশ নম্বর শ্লোকে যেটা বলা হল, এটাই ভগবানের পরিভাষা। ঈশ্বর অনন্ত। কিভাবে অনন্ত? তিনিই এই সব কিছু হয়েছেন। এটাকে যদি আমরা তাত্ত্বিক ভাবেও বুঝে নিতে পারি, যেটা অন্য কোন ধর্মে নেই এবং বেদান্ত বাদে অন্য কোন দর্শনে এই কথা নেই, কিন্তু এটাই হিন্দুদের মত, এটাই হিন্দুদের ধর্ম দর্শন এবং জীবন দর্শন। জীবন আমাদের এটাকে কেন্দ্র করেই চালাতে হবে, এবং ধর্মে এই অনুভূতিটাই নিয়ে আসতে হবে। যত দিন এই অনুভূতি না হয়, তত দিন এটাকে মেনে, এটাকে আধার করে আমাদের জীবন চালাতে হবে। দৈনন্দিত জীবনে যতটা সম্ভব এটাকে অভ্যাস করে যেতে হবে। আর চেষ্টা করে যাওয়া, যাতে এটাকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

কিন্তু আমাদের মন সীমিত, আমাদের চাহিদার শেষ নেই, বিভিন্ন রকমের চাহিদা, দুটো টাকা চাই, একটু বুদ্ধি চাই, একটু জ্ঞান চাই, একটু ভালবাসা চাই, আরও কত কি চাই, শুধু চাই চাই চাই। হরিদ্বার, হৃষিকেশ, উত্তরকাশী আর গঙ্গোত্রী, এই চারটে জায়গায় প্রচুর সাধুরা থাকেন। আগেকার দিনে ঐ সব জায়গায় সাধুদের খাওয়া-দাওয়া জুটত না। বিভিন্ন জায়গায় অন্নসত্র রয়েছে। আমাদের সাধুরাও তপস্যার জন্য উত্তরকাশী, হৃষিকেশ আদি জায়গায় গিয়ে থাকেন। তাঁদেরও সেখানে ভিক্ষা করে খেতে হয়। অন্নসত্র থেকে রুটি আর ডাল দিয়ে দেয়, ঐ খেয়ে সারাদিন থাকতে হবে। হৃষিকেশে লোকজন প্রচুর থাকেন, ওখানে ভিক্ষাও ভাল পাওয়া যায়, অনেকগুলো অন্নসত্র আছে। উত্তরকাশীতে মাত্র তিনটে অন্নসত্র।

ওখানে একটা ঘটনা আছে, এই ধরণের ঘটনা ওখানে নিয়মিত হয়। একটা অন্নসত্রে সাধুরা লাইন করে দাঁড়িয়ে আছেন, লম্বা লাইন, রুটি আর ডাল নেবেন। হঠাৎ একটা রব উঠল, অমুক অন্নসত্রে রুটি ও ডালের সাথে লাড্ডুও দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পুরো লাইন ফাঁকা হয়ে গেল। সাধুরা ঐ লাইন ছেড়ে দৌড়াল যেখানে রুটি ও ডালের সাথে লাড্ডু দিচ্ছে। সাধুদের মধ্যে এটা একটা জোক হয়ে গেছে, ওঁহা লাড্ডু ভি মিল রহা হ্যায়। আমরা যারা ঈশ্বরের ভক্ত, আমাদেরও ঠিক এই দুরবস্থা। এখানে *বাসুদেবঃ সর্বমিতি*, এটাকে নিয়ে কি হবে! একজন হঠাৎ বলল, ঐ বাবাজী পঞ্চাশ টাকায় কি একটা অদ্ভূত তাবিজ দিচ্ছে তাতে নাকি অনেক কিছু হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে একজনকে ছেড়ে আর-একজনের দিকে দৌড়ে গেল। ওখানে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, কে একজন বলল, ওখানে আরেকটু বেশি পাওয়া যাবে। ঐ লাইন ছেড়ে সেদিকে দৌড় দিল।

আমাদের বেদে অত্যন্ত উচ্চমানের প্রার্থনাগুলি রয়েছে। বেদের সব প্রার্থনা সেই অনন্তের উদ্দেশ্যে, কিন্তু অনন্তের উপর একটা মুখোশ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনন্তের অবধারণা তোমরা কেউই করতে পারবে না, এই মুখোশের মাধ্যমে তুমি অনন্তের আরাধনা কর। এমনই দুর্ভাগ্য যে, লোকেরা অনন্ত জিনিসটাকে ভুলে গেল, মুখোশটাকে নিয়ে পড়ে থাকল। ঠাকুর বলছেন, অনন্তের পূজা করে, কিন্তু পূজা করে বিষ্ণুর। কিন্তু মাঝখান থেকে মানুষ অনন্তকে ভুলে যায়, থেকে যান শুধু বিষ্ণু। গীতা যে সময় রচনা হয়েছে, সেই সময় ভারতবর্ষে বেদের প্রভাব খুব গভীর ভাবে চলছিল। লোকেরা তখন ভুলেই গেছে, যে এরা সবাই অনন্তের মুখ। অনন্তের উপর মুখ আমি লাগাচ্ছি, উনি লাগাচ্ছেন না। আমারই লাগানো মুখোশ, যাতে আমি বুঝতে পারি, কারণ যাকে ভালবাসি তার ছবি আমি কাছে রাখতে চাই। ভগবান এবার এর নিন্দা করছেন। যদি তুমি ভগবানের ভজনা করতে চাও, যদি তুমি আদপে ঈশ্বরের পথে আসতে চাও, ধর্ম পথে আসতে চাও, তাহলে তুমি এই ভুলটা কেন করছ? বিষ্ণুর পুজাই যদি তুমি কর, তাহলেও তোমাকে মনে রাখতে হবে, বিষ্ণু হলেন সেই অনন্ত। যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত, তাঁরা যখন ঠাকুরের পূজা করছেন, তাঁকে মনে রাখতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অনন্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ মানে যিনি কামারপুকুরে জন্মে ছিলেন, আর যিনি জিলিপি খেতে ভালবাসতেন, তিনি এটা নন। শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সেই অনন্তের একটা মুখ।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া।।২০।।

(পুত্র, অর্থ ও স্বর্গাদি লাভের কামনা দ্বারা যাদের বিবেকবুদ্ধি অভিভূত হয়েছে, তাঁরা জপ ও উপাসনাদি নিয়ম পালনপূর্বক স্বীয় স্বভাবনুযায়ী বাসুদেব ভিন্ন অন্যান্য দেবতার ভজনা করেন।)

ভগবান এখানে বলছেন, মানুষের মনের ভিতর কত রকমের কামনা-বাসনা; সন্তান চাই, পশু চাই, স্বর্গ চাই, এই চাওয়া-পাওয়াগুলো চিরদিনই ছিল, এখনও আছে। এই কামনা-বাসনার জন্য আমার আপনার সবারই বিবেক বিজ্ঞানটা নষ্ট হয়ে গেছে। *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ*, ভিতর এত কামনা যে জ্ঞান অপহৃত হয়ে গেছে। যাঁরা সাত্ত্বিক, তাঁদেরও মধ্যে এমন কামনা-বাসনা ঢুকে যায় যে, তাঁদেরও, *বাসুদেবঃ সর্বমিতি*, ঈশ্বর যে অনন্ত, এই জ্ঞানটা বিস্মৃত হয়ে যায়। মনের মধ্যে এই ধরণের কামনা-বাসনা এসে গেলে সব কামনার পুর্তি কিভাবে করা যাবে আমরা তার চেষ্টায় নেমে পড়ি। তখন *প্রপদ্যন্তেহন্যদেবতাঃ*, সমস্ত দেবতার পূজা শুরু করে দিই। কখন ইন্দ্রের পূজা করছে, কখন অগ্নি দেবতার পূজা করছে; এখানে তখনকার দিনে যা করা হত, তার কথা বলছেন। এর থেকেও নীচে নেমে গিয়ে, এখন যেমন আমরা বড়লোকদের তোষামদ করি, ক্ষমতাবানদের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকি। ঠাকুর বলছেন, সাহেবের বুটের গোঁজা খায়, তাও কামনা ছাড়তে পারে না।

তাহলে এভাবে দেবতার পূজা করা কি ভুল? না, ভুল না। ভগবান বলছেন, *তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া*, মানুষের মধ্যে যে বিভিন্ন সংস্কার জমে আছে, কর্মাশয়ে যত কর্মের বোঝা জমে আছে, সেই সংস্কারবশতঃ পাশবদ্ধ হয়ে মানুষ বলছে, আমার এটা চাই, সেটা চাই। ভগবান তখন বলছেন, আমি যে ঈশ্বর, আমি যে সেই অনন্ত, আমাকে ছেড়ে এরা এই দেবতা, সেই দেবতাকে আশ্রয় করে। আমি একজনকে জানতাম তিনি বেলুড় মঠ থেকে দীক্ষা নিয়েছেন। কিছু দিন পরে দেখছি তিনি আর-একজন গুরুর সাথে ঘুরছেন। আমি তাঁকে দেখে বললাম, 'কি ব্যাপার'? বলছেন, 'কলিযুগ কিনা, একজন গুরু দিয়ে হয় না'। খুব ভাল; একজন গুরু দিয়ে যদি না হয়, হাজার গুরু সই। ভগবান বলছেন, এই যে বিভিন্ন দেবতারা আছেন, তাঁদের পূজার যে বিধি-বিধান করা আছে, তারা এই বিধি-বিধানের আশ্রয় নিয়েই সব কিছু করে।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্।।২১।।

(যে যে ভক্ত যে যে দেবমূর্তি শ্রদ্ধার সাথে অর্চনা করেন, সেই সেই দেবমূর্তিতে আমি তাঁদের অচলা ভক্তি প্রদান করি।)

ভগবান বলছেন, এরা যে এভাবে বিভিন্ন দেবতার আশ্রয় নেয়, এতে ভুল কিছু করছে না। অন্যান্য ধর্মের লোকেরা হিন্দুদের নিন্দা করে বলে হিন্দুরা পৌত্তলিক, হিন্দুরা নাকি মূর্তি পূজা করে। হিন্দুরা বলেন, 'না, এরা যে পূজা করছে, সেই পূজার বিধান ঈশ্বরই করেছেন'। ব্রাহ্ম সমাজেও এই সমস্যা হয়েছিল। কেশবচন্দ্র সেনের মত অত পড়াশোনা করা পণ্ডিতরাও দেবতাদের না মানা, সগুণ ঈশ্বরকে না মানা, অর্থাৎ হিন্দু ধর্মের একটা বৃহৎ ও মহৎ দৃষ্টিভঙ্গীকে এনারা নিতে পারলেন না। ঠাকুর, স্বামীজী এনারা এসে আমাদের দৃষ্টিটাকে সেই বৃহতের দিকে ফিরিয়ে দিলেন –যে কেউ যে কোন দেবতাকে শ্রদ্ধার সাথে যদি পূজা করে, মনসার পূজাই করুন, শীতলার পূজাই করুন, যাঁরই পূজা করুন; ভগবান তখন বলছেন, আমি তাদের সেই শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তিকে দৃঢ় করে দিই, ঐ ভক্তি আর কোন ভাবে চলে যাবে না। কারণ তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছিলেন, *ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদ্*, সাধারণ মানুষের বুদ্ধিকে কখন বিচলিত করা উচিত নয়। গীতা সমন্বয় শাস্ত্র, তখনকার দিনে যত রকম দর্শন ছিল, যত রকম ধর্মীয় মত ও দর্শন ছিল, ব্যাসদেব সব কটা মতকে, সব দর্শনকে এবং সবাইকে এক সঙ্গে নিয়ে চলছেন।

আমি একবার একটা কাজে জামসেদপুর গিয়েছিলাম, তখন সেখানে একটা জায়গায় টুসু মেলা হচ্ছিল। টুসু ওখানকার স্থানীয় আদিবাসীদের দেবতা। সেখানেও দেখতে পেলাম একজন পণ্ডিত টুসু দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা অর্চনা করে যাচ্ছেন। আমার দেখে খুব ভাল লাগল। এই হল হিন্দু ধর্ম। তুমি যাঁকেই পূজা কর না কেন, কোন আপত্তি নেই। এখানেও দেখলাম পণ্ডিত মশাই চণ্ডী থেকে দুটো মন্ত্র, গীতা থেকে দুটো মন্ত্র নিয়ে পূজা শুরু করে দিলেন। উদ্দেশ্য হল, মানুষকে যে করেই হোক অনন্তের দিকে নিয়ে যাওয়া। মানুষ যেন কোন মুখোশে না আটকে থাকে।

শ্রদ্ধা জিনিসটা বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রকমের হয়, আর শ্রদ্ধা সবারই ভিতর থাকতেই হবে। পরে সপ্তদশ, অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রদ্ধাকে নিয়ে আরও বিস্তারে ভগবান আলোচনা করবেন। সেখানে দেখাবেন তামসিক শ্রদ্ধা সম্পন্ন মানুষ কোন কোন দেবতার পূজা করে, রাজসিক শ্রদ্ধা ও সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা সম্পন্ন লোকেরা কোন কোন দেবতার পূজা করে। এখানে অত বিস্তারে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন মানুষ যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দেবতার পূজা করে বেড়াচ্ছে, এটাও ভগবানেরই দেওয়া। আর সব দেবতা ভগবানেরই রূপ। ভগবান তাদের এই বুদ্ধিটা স্থির করে দেন। তাহলে বিভিন্ন দেবতার পূজা করব কি করব না, পরের শ্লোকে ভগবান এটাকে নিয়ে বলছেন –

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্।।২২।।

(সেই দেবোপাসক ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সেই দেবতার আরাধনা করেন এবং সেই দেবতার কাছ থেকে যে কাম্যবস্তু লাভ করেন তার বিধান আমিই করে থাকি। কারণ আমিই একমাত্র কর্মফলদাতা প্রভু এবং দেবতারাও আমার অংশসম্ভূত।)

যে যে দেবতার প্রতি যার যার যে প্রকার শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, সেই অনুসারে আমি তাদের এই পূজার ফল প্রদান করে থাকি। কারণ আমি ঈশ্বর, আমি হলাম বিধাতা, সবাইকে আমি তাদের নিজ নিজ কর্মের ফল প্রদান করি। এর আগে আমরা 'উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমো' বলেছিলাম, কালীঘাটে দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে দশ টাকার প্রসাদ কিনে মাকে পূজা দিয়ে এলাম, এভাবে পূজা হয় না এবং

পূজার কোন ফলও পাওয়া যায় না। ভিতরে যদি শ্রদ্ধা থাকে তবেই সেই পূজার ফল হয়। আমি একবার দেরাদুন গিয়েছিলাম, সেখানে পাঞ্জাবের এক ভক্ত আমার কানে ফিস ফিস করে বলছে, 'আমাদের ওখানে কালী একজন সাধারণ দেবী, ঠাকুর কি করে এই কালীর আরাধনা করলেন'? ওর ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু মা কালীর ব্যাপারটা নিতে পারছে না। তাকে বোঝালাম, দেখুন আমরা সেই অনন্তেরই পূজা করি। কালী দুই, একজন কালী তিনি সীমিত, আরেকজন কালী তিনি সেই অনন্তের মুখ, দুটো আলাদা। রুদ্র আর শিবের কি তফাৎ, শিব আর শঙ্করের মধ্যে কিসের তফাৎ? আপনার যিনি ইষ্ট, তাঁকে আপনি সীমিত দেখছেন নাকি অসীম দেখছেন? শ্রীরামকৃষ্ণকে আপনি সীমিত দেখছেন, নাকি অসীম দেখছেন? যদি সীমিত দেখেন তাহলে আপনি পৌত্তলিক হয়ে গেলেন। কিন্তু ওই পূজার ফলও পাবেন, যদি শ্রদ্ধা আপনার ঠিক থাকে। শ্রদ্ধার সাথে নিয়মানুসারে যদি আরাধনা করা হয়, তার ফল অবশ্যই পাবেন। কারণ, ভগবান এটাই বলছেন, ধর্মের যত বিধান, যত নিয়ম সব আমিই ঠিক করে দিয়েছি।

আচার্যও বলছেন, আরাধিত দেববিগ্রহের পূজার ফল অবশ্যই আসে, কারণ ঈশ্বরই ঐ পূজার বিধান দিয়েছেন। তবে এই জিনিসটা তখনই ভাল না, যখন মানুষ যে পূজা অর্চনা করে তার পিছনে যদি ভোগ-বাসনা জুড়ে থাকে। বেলুড় মঠে কত লোক আসছে, ঠাকুরের কাছে হাতজোড় করে কত কি প্রার্থনা করছে। যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা করে থাকে, তার অবশ্যই ফল পাবে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ওর মধ্যে ভোগের কামনা লেগে থাকে, এই জিনিসটাই ভাল না। বেদের বেশির ভাগ প্রার্থনাতে এটাই বলছেন, আমি যেন অমুক পাই, আমার যেন এই রকম হয় ইত্যাদি। কিন্তু সেখানে যিনি প্রার্থনা করছেন, তিনি ভুলে যাচ্ছেন না যে, যাঁর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি সেই অনন্তেরই মুখ। তা সত্ত্বেও তিনি এটা সেটা চাইছেন, কারণ মন ভোগে পড়ে আছে। গীতাতে এর নিন্দা করা হচ্ছে, উপনিষদেও এর নিন্দা করা হয়েছে। কিন্তু বলার সময় আমরা বলি, এটা ভুল, ঠাকুর কথামৃতে বলছেন, অনেকে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলে কিন্তু নিম্ন জিনিস নিয়ে থাকে। আমরা সবাই ঠিক এই রকমই। মুখে আমরা বলছি *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব*, সব বেদ তিন গুণে বাঁধা, কিন্তু আমরা সবাই এর পিছনেই দৌড়াচ্ছি। মুখে নিন্দা করে বলছি বেদ ভোগের জন্য, কিন্তু নিজেও আমরা চাইছি ওটাই। আমরা বুঝতেও পারছি না যে, আমাদের কামনা-বাসনা গুলি আমাদের কিভাবে সীমিত করে দিচ্ছে।

আমাদের পূর্বজরা ইন্দ্রাদি দেবতাদের যে পূজা করতেন, যেখানে তাঁরা সেই দেবতার উপর একটা অনন্তের মুখোশ লাগিয়ে দিতেন; উপনিষদ, গীতার মত শাস্ত্র যার নিন্দা করছেন। তাহলে কি আমরা পূর্বজদের থেকে শ্রেষ্ঠ, কোন ভাবেই শ্রেষ্ঠ তো নয়ই, বরং আরও বাজে এই কারণে, যিনি সেই অনন্ত ঈশ্বর, তাঁকেও আমরা সীমিত বানিয়ে দিই। একজন গোয়ালা মন্দিরে পূজা দিতে গেলে এটাই বলবে, হে প্রভু আমার গরুগুলো যেন ভাল দুধ দেয়। ঈশ্বর আমাদের কাছে একজন কামধেনু গরুর মত, ঈশ্বরকেও আমরা সব সময় দুয়েই যাচ্ছি। আমাদের পূর্বজরা জানতেন ইন্দ্র সীমিত, কিন্তু আমরা আরও অভাগা, যিনি অসীম ঈশ্বর তাঁকেও আমরা সীমিত করে দিচ্ছি। কারণ আমাদের মনটাই সীমিত হয়ে আছে। মন কেন সীমিত হয়ে আছে? কারণ মনের মধ্যে কামনা-বাসনা গিজ্‌গিজ্ করছে। কামনা-বাসনা মন থেকে চলে গেলে, মন শুদ্ধ হয়ে যাবে; শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ আত্মা এক। এই যে কামী পুরুষ, অবিবেকী পুরুষ; এদেরকে নিয়ে ভগবান খুব দুঃখ প্রকাশ করে বলছেন –

অন্তবত্তু ফল তেষাং তদ্ভাবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।।২৩।।

(অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের আরাধনালব্ধ সেই ফল অস্থায়ী। দেবোপাসকগণের নিজ অভীষ্ট দেবলোকাদি প্রাপ্ত হন, আর আমার ভক্তগণ আমাকেই লাভ করে মোক্ষরূপ অনন্ত ফলের অধিকারী হয়ে থাকেন।)

এই ধরণের মানুষরা অল্প মেধাযুক্ত, বুদ্ধি এদের সীমিত। এরা যে খাটছে না তা না, খাটছে, সাধনা করছে, কিন্তু যেটাই করছে সীমিত মন দিয়ে করছে। সীমিত বুদ্ধি দিয়ে সীমিত জিনিসের জন্য প্রার্থনা করছে। কেন সীমিত? *অন্তবত্তু*, এদের আরাধনালব্ধ যে ফল, এই ফলের অন্ত আছে, আজ হোক কাল হোক এর নাশ হয়ে যাবে। যিনি যে দেবতার পূজা করেন, মৃত্যুর পর তিনি সেই দেবতাকেই প্রাপ্ত করবেন, সীমিত হয়েই থেকে যাবেন। যদি কেউ অনন্তের পূজা করে, যিনি ঠাকুরকে অনন্ত রূপে পূজা করছেন, জপধ্যান করছেন, তাহলে তিনি অনন্তই হয়ে যাবেন। অনন্ত হয়ে যাওয়া মানে, তার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, কোন কিছু নেই।

মদ্ভক্তা যান্তি মামপি, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমার যাঁরা ভক্ত তাঁরা আমার কাছেই আসবেন। শিবের ভক্ত শিবের কাছে যাবে, বিষ্ণুর ভক্ত বিষ্ণুর কাছে যাবে। কাছে যাওয়ার অর্থটা কি? সেই স্বরূপের সাথে এক হয়ে যাবে। কিন্তু অনন্ত রূপে যদি ভজনা না করে থাকে, তাহলে আবার তাকে জন্ম নিতে হবে। এই যে খুব প্রচলিত কথা, শেষ সময় ঠাকুর নিয়ে যাবেন, নিয়ে যাবেন ঠিকই কিন্তু আবার ফেরত পাঠিয়ে দেবেন।

আচার্য এখানে খুব সুন্দর কথা বলছেন – *এবং সমানে অপি আয়াসে*, দেবতার যে পূজা করছে, তাতে খাটা-খাটনিটা সমান। আচার্য আরও বলছেন, *মাম্ এব ন প্রপদ্যন্তে অনন্তফলায় অহো খলু কষ্টং বর্তন্তে*, ভগবান বলছেন, কি দুঃখের কথা, মানুষ এত খাটে, এত কষ্ট করে, এত দৌড়ঝাপ করে পূজা-অর্চনা করে, কিন্তু তার জন্য যে ফল পায় সেটা সীমিত ফল পায়। অথচ জানে না যে অনন্ত ফল কত সহজে পাওয়া যেতে পারে। একই খাটনি, একই তপস্যা, একই জপধ্যান; কিন্তু দুটো ফলে আকাশ-পাতাল তফাৎ হয়ে যায়। কত কষ্ট করে, পয়সা খরচ করে মানুষ অমুক বাবার আশ্রম, তমুক বাবার আশ্রমে যাচ্ছে, খাটনি সেই একই, কিন্তু যাচ্ছে সেই *অন্তবত্তু ফলং*, যে ফলের অন্ত আছে সেই ফল পাওয়ার জন্য এত দৌড়ঝাপ, খাটা-খাটনি। *ইতি অনুক্রোশং দর্শয়তি ভগবান্*, এটাই ভগবান দুঃখ করে বলছেন, এদের কি দুর্ভাগ্য। কিন্তু ভগবান এটাকে পাল্টাবেন না। কারণ ওটা ভগবানরই করা।

তাহলে গুরুত্ব কি, ঘুরে ফিরে আপনি নিজেই ইম্পর্টেন্ট, এখানে আর কেউই গুরুত্বপূর্ণ না। বারবার বলা হয়, জগতে আপনার জন্য মাত্র দুটি জিনিস, আপনার মন আর আপনার সময়, এর বাইরে আপনার নিজস্ব বলে আর কিছু নেই। মন আর সময়কে ঠিক ঠিক ভাবে ব্যবহার করতে হবে, যদি না করা হয়, তাহলে কিন্তু শেষ। কেউ আপনাকে রক্ষা করবে না, আপনার স্বামী, আপনার স্ত্রী, আপনার সন্তান, আপনার ইষ্ট, আপনার দেবতা, আপনার বিভিন্ন রকম যে সিদ্ধান্তগুলি রয়েছে, তা বিজ্ঞান হোক, কম্যুনিজম হোক, লিবারাল হোক, হিন্দু ধর্ম হোক, যেই হোক, কেউ আপনাকে রক্ষা করবে না। রক্ষা করবে একমাত্র আপনার মন, যেটাকে আপনি যখন ঠিক ভাবে সময়ের সাথে লাগাবেন, তখনই ঠিক ফল দেবে।

এটাই ভগবান বলছেন, কি দুঃখের কথা, একই খাটনি, সবটাই সমান, অথচ মানুষ মুর্খের মত অনন্ত ফলের দিকে না গিয়ে সীমিত ফলের দিকে যায়। ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন, কল্পতরু বৃক্ষের নীচে গিয়ে যা চাইবে তাই পাওয়া যাবে, ঈশ্বরের কাছে গিয়ে কি কেউ লাউ কুমড়ো চাইবে! কিন্তু আমরা অতি মুর্খ, তাই সব সময় লাউ কুমড়োই চাইছি। নরেন তখন খুব কষ্টের মধ্যে ছিলেন, বাড়িতে খাবার জুটছে না। ঠাকুর নরেনকে মা ভবতারিণীর কাছে পাঠালেন মার কাছে চাইতে যাতে নরেনের কষ্ট দূর হয়ে যায়। স্বামীজী চাইতেই পারলেন না, বদলে চাইলেন জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য। চার হাজার বছর ধরে হিন্দুরা গীতা পড়েই যাচ্ছে, ইউটিউবের কত চ্যানেলে গীতার কত ব্যাখ্যা চলছে, লোকেরা শুনছেও, অনন্তের দিকে গেলেই তো পারেন, কিন্তু কেউ তো যাচ্ছে না। কেন যায় না?

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্।।২৪।।

(অল্পবুদ্ধি মানব আমার অক্ষয়, অনুপম পরমাত্মস্বরূপ না জেনে প্রপঞ্চাতীত আমাকে প্রাকৃত মানব ভাবাপন্ন মনে করে অন্য দেবতাদের ভজনা করে।)

এই শ্লোকে অবতার তত্ত্বের বর্ণনা করছেন। *অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ,* আমি শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, অব্যক্ত, আমি অনন্ত, আমার স্বরূপকে মন বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় না; আমি অবিনাশী, আমি যে নিত্য-বুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্ত, এটা মানবকুল বুঝতে পারে না আর মনে করে আমি আগে ছিলাম না, এখন আছি, ভবিষ্যতে থাকব না। *অব্যক্তং* বলার পর বলছেন *ব্যক্তিমাপন্নং,* তিনি ব্যক্তির মত হয়ে গেছেন। ভগবানের বাস্তবিক স্বরূপ *অব্যাক্তং* অথচ ব্যক্ত হয়ে গেছেন, শ্রীকৃষ্ণ রূপধারি ব্যক্তি হয়ে গেছেন। এটা কি করে হয়, অব্যক্ত ব্যক্ত কি করে হতে পারে? ভগবান বলছেন, যারা মুর্খ তারা মনে করে যে আমি সেইদিন জন্ম গ্রহণ করেছি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ফাল্গুনীর শুক্লা দ্বিতীয়ায় জন্ম গ্রহণ করেছেন, তার মানে ঠাকুর জন্মের আগে থেকেই আমাদের মধ্যে ছিলেন না। তারপর তিনি জন্ম নিলেন, আমাদের মধ্যে প্রকাশ হলেন, আবার তিনি মারা গেলেন, মানে আমাদের মধ্য থেকে চলে গেলেন। এগুলো হচ্ছে মুর্খদের কথা। ঠাকুরের জন্ম শতবার্ষিকীতে স্বামী অখণ্ডানন্দ, তিনি তখন মঠের অধ্যক্ষ, তিনি লিখছেন, যিনি অনন্ত তাঁর কিসের আবার জন্মদিন। আবির্ভাব তিথি বলা যায়, যিনি অনন্ত তিনি এই দিন এই রূপে ব্যক্ত হয়েছিলেন। যিনি অনন্ত তাঁর জন্ম হয় না, কিসের জন্মতিথি। এই ভাবটা মনে রাখা। যখনই ঠাকুর বা যিনি যার ইষ্ট, তাকে সব সময় এই ভাবটা মনে রাখা, *বাসুদেবঃ সর্বমিতি,* তিনিই সব, গতকালও তিনি সব কিছু ছিলেন, আজও তিনি সব কিছু হয়ে আছেন, আগামী দিনেও তিনি তাই থাকবেন।

এরপর বলছেন *পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্,* আমার থেকে উত্তম আর কেউ নেই, আমার থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। আর *অব্যয়ম্,* আমার কখন কোন ক্ষয় হয় না। এই ভাবটা কেউ বুঝতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের হাত কেটে গেলে অবশ্যই রক্ত বেরোবে, আমরা দেখছি তাঁর হাত কেটে গেছে, হাত কেটে যাওয়ার জন্য তাঁর দেহের অবশ্যই কষ্ট হতে পারে, কিন্তু দেহের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। যারা ঠিক ঠিক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের হাত কেটে গেলে তাদেরও কিন্তু কষ্ট হবে। স্বামীজী জানতেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান, কিন্তু তিনিও ঠাকুরের শরীর চলে যাবার পর কাঁদছেন। কেন কাঁদছেন? কারণ এই নরদেহে আর ভগবানের লীলা হবে না। আবার কত কত বছর পর তিনি নরদেহ ধারণ করে মর্ত্তভূমিতে লীলা করবেন আমরা কেউই জানি না। তাই ঠাকুরের শরীর চলে যাবার সময় স্বামীজী দেখছেন ঠাকুরের কিছুই হয়নি কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণরূপী যে শরীর সেই শরীরে আর ঈশ্বরীয় লীলার আস্বাদন করা যাবে না।

বিয়ের পরের দিন মেয়ে যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ী চলে যায় তখন মা কত কাঁদে; মেয়ে মরে যায়নি, অসুখ হয়নি, একটা ভালো জায়গায় মেয়ে আনন্দে নূতন জীবনকে বরণ করতে চলেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মা কাঁদে, কারণ এই কন্যা রূপে এই ভাবে মেয়েকে মা আর পাবে না। ঠাকুরের শরীর চলে যাবার পর ঠাকুরকে আর স্থূল চোখে দেখা যাবে না, এরপর ভাব চক্ষু দিয়েই তাঁকে দেখা যাবে। নরেন, রাখাল, লাটু এনারা অজ্ঞানবশতঃ কাঁদছেন না, এই শরীরে ঈশ্বরের লীলাকে আর স্থূল ভাবে উপভোগ করা যাবে না বলেই এত কষ্ট। অধ্যাত্ম রামায়ণে এই ব্যাপারটার উপরে বিস্তৃত ভাবে আলোকপাত করা হয়েছে, সেখানে বলা হচ্ছে শ্রীরাম কোথাও যান না, শ্রীরাম কোন কথাও বলেন না। তাহলে সবাই কি দেখছে, এটাই মায়া, তিনি সাক্ষাৎ ভগবান। যিনি সাক্ষাৎ ভগবান তিনি আবার কেন কাঁদতে যাবেন, কেনই বা তিনি সীতা হরণে উদ্বিগ্ন হতে যাবেন। সাধারণ লোক দেখছে – সেদিন তাঁর জন্ম হয়েছে, সেদিন তাঁর জ্ঞান হয়েছে, সেদিন তিনি যুদ্ধ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ঠিক কবে থেকে জ্ঞান হয়েছে? শ্রীরামকৃষ্ণের আবার কি জ্ঞান হবে, তিনি তো পূর্ণজ্ঞানী, পূর্ণজ্ঞানীর আবার অজ্ঞান আসবে কোত্থেকে? কেন মানুষ এই রকম অজ্ঞানের মত আচরণ করে? ভগবান বলছেন, কারণ আমার স্বরূপকে এরা জানতে পারে না, ঈশ্বরতত্ত্ব এরা বুঝতে পারে না। জানতে পারে না, তাই পূজাও করে না। আমি যদি আপনাকে নাই জানি, আপনাকে আমি কি করে ভালবাসব? আপনি তো ভগবান, আপনি চাইলেই তো জানিয়ে দিতে পারেন। তখন ভগবান পরের শ্লোকে বলছেন –

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্।।২৫।।

(কারণ ত্রিগুণাত্মিকা মায়া দ্বারা আবৃত বলে আমি সকলের নিকট প্রকাশিত হই না, কেবলমাত্র কোন কোন ভক্তের নিকট অভিব্যক্ত হই। সেইজন্য এই মোহান্ধ জগৎ আমার জন্ম-মৃত্যুরহিত অব্যয় স্বরূপকে জানতে পারে না।)

আমাদের সবারই মন যোগমায়া দ্বারা এমন আবৃত যে, যে মন, বুদ্ধি দ্বারা আমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করি; সেই মন, বুদ্ধি এমন একটা যোগমায়াতে ঢাকা যে, ভগবান, যিনি *অজম্ অব্যয়ম্*, শ্রীকৃষ্ণের কোন দিন জন্ম হয়নি, তাঁর কোন কিছু ব্যয় হয়ে যায় না, এটাকে ধারণা করতে দেয় না। মূল কথা তিনি অনন্ত, অনন্তের জন্ম নেই, ক্ষয় নেই, মৃত্যু নেই, কিছু নেই, এই বোধটাকে জাগিয়ে রাখতে হয়। ভগবান কৃষ্ণকে যিনি ভজনা করছেন, তিনি যদি অনন্ত রূপে ভজনা করেন, তিনিও অনন্ত হয়ে যাবেন। আবার যাঁরা নাড়ুগোপাল বা বালগোপালের যে পূজা করেন, সেখানে যদি তিনি কয়েকটা কাহিনীকে আধার করে পূজা করেন তাতেই যদি আবদ্ধ হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি সীমিত হয়ে যাবেন। দেবতাদের নিয়ে আগে যা বলা হয়েছে, সেটা ভগবানের উপরেও খাটে।

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য, আমি সবার সামনে প্রকাশিত হই না। এই যে মন নিয়ে যে এত কথা বলা হয়, তার কারণ মনটাই সব। যে দুষ্কর্ম করছি সেটাও মন দিয়ে করছি, শুভকর্ম করতে চাইছি, সেটাও এই মন দিয়েই করতে হবে। জগতে প্রতিষ্ঠা পেতে চাই, এই মন দিয়েই পেতে হবে। সবটাই মন দিয়ে হয়, কিন্তু মন যোগমায়া দিয়ে আবৃত। সত্ত্ব, রজো ও তমো তিনটে গুণ যখন সমান সমান থাকে, এই তিনটের যে যোগ, এটাই হল যোগ। আর এই যোগটাই তিনটে গুণের যোগ, এটাই মায়া – এটাকে বলা হয় মায়া, মায়াও যা যোগমায়াও তাই। ঠাকুর বলছেন, এই দেখো, আমি গামছা দিয়ে মুখটা ঢেকে দিলাম, তুমি আর আমাকে দেখতে পাবে না। ভগবান বলছেন, এই যোগমায়ার জন্য আমাদের মন, বুদ্ধি তিনটে গুণের দ্বারা কলুষিত হয়ে আছে, অন্য দিকে ভগবান তাঁর স্বরূপকে মায়া দিয়ে ঢেকে রেখেছেন।

তবে কিছু কিছু ভক্ত আছেন, তাঁরা আমাকে জানতে পারেন। আগে যেমন বলা হল *বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে*, অনেক জন্ম ধরে একটু একটু করে সঞ্চিত জ্ঞানের সংস্কারে তাঁরা আমাকে জানতে পারেন। পরেও এই রকম আরও ব্যাখ্যা করা হবে, যেখানে বলা হবে কারা আমাকে জানতে পারেন, কেন জানতে পারেন। বলছেন, *মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি*, মূঢ় যে জনসমুদয়, এই মূঢ় প্রাণীরা আমাকে জানতে পারে না, যোগমায়া তাদের মন বুদ্ধিকে ঢেকে রেখেছেন। কারণ মানুষ নিজের কামনা-বাসনা নিয়ে এমন ডুবে আছে যে, ঈশ্বরের দিকে, সেই অনন্তের দিকে তাদের মন কিছুতেই যেতে চায় না। সেই কামনার দরুণ আবার বলে, কেন আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারি না, তিনি চাইলেই তো আমাদের দেখা দিতে পারেন। একজন আবার ঠাকুরকে বলছেন, 'ঈশ্বর যদি থাকেন তাহলে কেউ আমাকে দেখিয়ে দিক ঈশ্বর আছেন'। ঠাকুর বলছেন, তার ভারি বয়ে গেছে তোমাকে দেখাতে।

আমরা নিজেদের সীমিত করে রেখেছি, তার সাথে ঈশ্বরকেও সীমিত করে রেখেছি। সমস্ত সমস্যার মূলে এই একটি সাধারণ কথা। সীমিত কেন করে রাখি? কারণ আমাদের মন, বুদ্ধি অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে আছে। ভগবানকে দেখতে পাই না কেন? তিনি এই অজ্ঞানকে সৃষ্টি করে রেখেছেন, এটাই সংসার। বলছেন, এই যে মায়া, এটা আমারই শক্তি, বাইরে থেকে কিছু আসে না। কিন্তু এই মায়া ভগবানকে ছুঁতে পারে না। মায়া শুধু ভগবানকে না, যাঁরা জ্ঞানী পুরুষ, বিজ্ঞানী, যিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষরূপে জেনেছেন, তাঁকেও মায়া মুগ্ধ করতে পারে না। পরের শ্লোকটাও খুব সুন্দর –

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন।।২৬।।

(হে অর্জুন, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ - এই তিন কালের সমস্ত ভূতকেই আমি জানি। কিন্তু আমাকে কেউ জানতে পারে না।)

মানুষের সাথে বা তাঁর ভক্তের সাথে ভগবানের কি তফাৎ, কি বৈশিষ্ট্য? এই শ্লোকে ব্যাখ্যা করছেন। মানুষ এই মনের মধ্যে বাঁধা বলে ঈশ্বরকে জানতে পারে না। ভগবান সব কিছু জানেন। আমাদের চোখে যেন ঠুলি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঘোড়ার চোখে যেমন ঠুলি দেওয়া থাকে, আর সেই ঠুলির মধ্যে একটা ছোট্ট ছিদ্র করে দেওয়া হয়েছে, শুধু ঐ ছিদ্র দিয়ে যতটুকু দেখা যায়, ততটুকুই আমরা দেখতে পাই আর ততটুকুকেই আমরা বিশ্বাস করি। পিছনে যেটা আছে সেটাও জানি না, সামনে যেটা আছে সেটাও দুদিন পরে ভুলে যাব। ছোটবেলায় লেখাপড়া শুরু করার সময় প্রথম প্রথম আমরা বানান করে করে প্রত্যেকটা শব্দ উচ্চারণ করতাম, বড় হওয়ার পর শব্দগুলিকে এক সঙ্গে দেখতে পাই। যারা খুব দ্রুত পাঠ করতে পারেন, তাঁরা চারটে পাঁচটা শব্দকে এক সঙ্গে দেখেন। স্বামীজী এক সঙ্গে পুরো পাতা পড়ে নিতেন। আর ভগবান তিনটে কালকে পুরোটা একসাথে দেখে নেন।

বলছেন *বেদাহং*, বেদ মানে জানা, আমি জানি, *সমতীতানি*, অতীতে যারা ছিল, *ভবিষ্যাণি চ ভূতানি*, পরে যারা আসবে এবং *বর্তমানানি চার্জুন*, হে অর্জুন এখন যারা আছে, সবাইকেই আমি জানি। আমাদের কাছে এটা অতীত, ওটা ভবিষ্যৎ, এখন বর্তমান। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ মন নিজের মত করে তৈরী করে নেয়; আসলে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই, এটা একটা complete picture। আমরা যদি কল্পনা করে নিই, বাচ্চারা খেলা করছে, সবারই চোখে একটা ঠুলি আর তার মধ্যে একটা ছোট্ট ছিদ্র, যেটা দিয়ে ওরা দেখতে পাচ্ছে। জগতে আমরা সবাই এই খেলার মধ্যে মজে আছি। ঐ ছোট্ট একটা ছিদ্রের মধ্য দিয়ে দেখছি বলে পুরোটা দেখতে পাই না। যাঁর ঠুলি নেই, সে পুরোটা দেখতে পাচ্ছে। ভগবান বলছেন, আমাকে কিন্তু কেউ জানতে পারে না।

কিন্তু আচার্য বলছেন, *মদ্ভক্তং মচ্ছরণম্ একং মুক্ত্বা মত্তত্ত্ববেদনাভাবাদ্ এব ন মাং ভজতে*, আমার যাঁরা ভক্ত, আমার যাঁরা শরণাগত, তাঁরা কিন্তু আমাকে জানতে পারেন। বাকিরা কেউ আমাকে জানতে পারে না, কারণ আমার তত্ত্বটা তারা জানে না। এই শব্দটা, *মত্তত্ত্ববেদনাভাবাদ্*, ঈশ্বর তত্ত্ব আমরা বুঝি না, জ্ঞানই নেই, ধৈর্য ধরে যে শাস্ত্র পড়া হবে সেটাও নেই, ধৈর্য ধরে যে আচার্যের সঙ্গ করবে সেটাও নেই। প্রথমে সবাইকে আগে তত্ত্বটাকে জানতে হবে, কিন্তু আমরা জন্ম থেকেই নিজেকে জ্ঞানী মনে করি, ভারতভূমিতে জন্ম নিয়েছি, সবাই আমরা নিজেদের জন্ম থেকেই ব্রহ্মজ্ঞানী মনে করি, মায়ের কোল থেকে আমরা আত্মা কি, ব্রহ্ম কি, ঈশ্বর কি সব জানি। ঈশ্বরতত্ত্ব না জানলে ঈশ্বরের দিকে মনই যাবে না। ঈশ্বরের দিকে যদি মনই না যায়, তাহলে আমি তাঁকে জানব কি করে যে, তিনি ঠিক ঠিক এই? ভগবান একদিকে বলছেন আমাকে কেউ জানতে পারে না, আবার বলছেন

যোগমায়া ঢেকে রেখেছে; অন্য দিকে বলছেন, আমার যে ভক্ত, যে আমার শরণাগত সে আমাকে জানতে পারে। এই জিনিসটাকে পরের দুটো শ্লোকে ইতি টানছেন। আমরা কেন এত দুঃখ পাই, কেন আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারি না, আমাদের এত দুঃখ কষ্টের মূল কারণ আমরা ঈশ্বরকে জানি না। কেন আমরা ঈশ্বরকে জানি না? ভগবান নিজেই বলছেন, *যোগমায়াসমাবৃতঃ*, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ অধ্যায়ে অনেক ভাবে বলেছেন, এখানে এসে এবার অন্য ভাবে বলছেন –

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ।।২৭।।

(হে পরন্তপ অর্জুন, কারণ ইচ্ছাদ্বেষাদি অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় থেকে সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব সমুদ্ভূত। এই দ্বন্দ্বজাত মোহ প্রাণীর প্রজ্ঞাকে স্ববশীভূত করে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। এই মোহ দ্বারাই প্রাণীগণ উৎপত্তি কালে অভিভূত হয়। সেইজন্য পরমার্থ বিষয় প্রতিবন্ধক জ্ঞান নিয়েই প্রাণীগণ জন্মগ্রহণ করে।)

ভগবান বলছেন, সমস্ত সমস্যার মূলে ইচ্ছা আর দ্বেষ। ইচ্ছা আর দ্বেষ থেকে যেটা জন্ম নেয় তাকে বলছেন *ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থ*। ইচ্ছ আর দ্বেষ থেকে যেটা জন্ম নেয়, এটাতেই মানুষ মোহিত হয়। ইচ্ছা আর দ্বেষ থেকে কি জন্ম নেয়? বলছেন, দ্বন্দ্ব, যে কোন জিনিসের যেটার বিপরীত আছে, যেমন শোক, শোকের বিপরীত হর্ষ, জন্মের বিপরীত মৃত্যু। রাজযোগে পতঞ্জলি বলছেন, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ আর অভিনিবেশ, এই পাঁচটা ক্লেশ। রাগ আর দ্বেষ, রাগ মানে ভালবাসা আর দ্বেষ, যেটা আমরা পছন্দ করি না, বিদ্বেষ করি। এখানে রাগকে ইচ্ছা বলছেন, কাব্যিক সৌন্দর্য আর কিছুটা ছন্দ মেলানোর জন্য বিভিন্ন সমার্থক শব্দ আনা হয়। ইচ্ছা আর দ্বেষ থেকে যে দ্বন্দ্ব জন্ম নিচ্ছে, এই দ্বন্দ্ব প্রাণীকে মোহিত করে রাখে। আমরা যাদের ভালবাসি, আমরা চাই না তাদের কেউ যেন মারা যাক, চাই না তাদের যেন কোন কষ্ট হয়। বলছেন, ইচ্ছা আর দ্বেষ থেকে যে শোক আর মোহের জন্ম নেয়, এই শোক আর মোহ সমস্ত প্রাণীকে মোহিত করে রাখে, আর এটাই জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। লোকাল ট্রেনে যে প্রতিবন্ধী ভিখারীরা ভিক্ষা করতে আসে তখন এই ভেবে আমার হাসি পায় যে, এই ভিখারী শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী, কিন্তু আমরা সবাই মানসিক প্রতিবন্ধী, কারণ সবাই আমরা শোক আর মোহে মোহিত হয়ে আছি।

পরমার্থ তত্ত্বকে জানতে না পারাটাই হল শোক আর মোহের কারণ। এই শোক আর মোহ থেকে সমস্ত দ্বন্দ্ব তৈরী হয়। এই সব কিছুর মূলে ইচ্ছা আর দ্বেষ। আমরা কিছু জিনিসকে কামনা করছি, পেতে চাইছি, কিছু জিনিস থেকে সরে আসতে চাইছি। মাঝে মাঝে অবাক লাগে, আচার্য শঙ্কর এত কম বয়েসে কি করে এটা লিখছেন, আসলে ওই বয়সেই তিনি জগৎকে পরিষ্কার দেখছেন –*ন হি ইচ্ছাদ্বেষদোষবশীকৃতচিত্তস্য যথাভূতার্থবিষয়জ্ঞানম্ উৎপদ্যতে বহিঃ অপি, কিমু বক্তব্যং তাভ্যাম্ আবিষ্টবুদ্ধেঃ সংমূঢ়স্য প্রত্যগাত্মনি বহুপ্রতিবন্ধে জ্ঞানং ন উৎপদ্যতে ইতি,* অর্থাৎ বলতে চাইছেন যাদের মধ্যে শোক মোহ এসে গেছে, তারা যেখানে বাহ্য বিষয়কেও ভাল ভাবে বুঝতে পারে না, সেখানে প্রত্যগাত্মাকে জানা, ঈশ্বরকে জানা কি কখন সম্ভব! যেখানে ইচ্ছা, দ্বেষ, শোক-মোহ আদি এত রকমের প্রতিবন্ধক লেগে আছে, যেখানে আবার স্বয়ং ভগবান নিজেকে মায়া দ্বারা আবৃত করে রেখেছেন, সেখানে আমরা পরমার্থ তত্ত্ব কি জানব! ভিতরে শোক মোহ বেশি থাকলে ফিজিক্স কেমেস্ট্রিও জানা যাবে না। মানুষের স্বভাবই আমরা বুঝতে পারি না, তারপর আবার বলছি, আমি ঈশ্বরতত্ত্ব জানব।

আমরা অনেক সময় বলি, লোভে পড়ে এটা করে ফেলেছি। লোভে পড়ে গেলে মানুষের বুদ্ধি বাহ্য বিষয়কেও দেখতে পায় না। ঠাকুর আরও সহজ করে বলছেন –হারুকে পেত্নীতে পেয়েছে; হারুর কোন দিকে আর দৃষ্টি নেই, কোন কিছুতে মন নেই। ফলে হারু এখন কোন কিছুতেই নেই, তার হাসি উড়ে গেছে, তার আনন্দ উড়ে গেছে। বাচ্চা যদি একবার একটা কিছু চেয়ে বসে, তখন

ওটাতেই মন ঘুর ঘুর করতে থাকবে। ওকে যত করে বোঝান হোক, যাই দেওয়া হোক, ঘুরে ফিরে ওর চাহিদার বস্তুটির দিকেই আমাদের দৃষ্টিকে নিয়ে যাবে। বাচ্চার আবদার যতক্ষণ না মিটিয়ে দেওয়া হবে, ততক্ষণ বাচ্চা ঐ জিনিসটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। বলছেন, মনের ভিতরে যখনই এই কামনা ভাবের জন্ম হয়, তখন সে মূঢ় ভাবে ফেঁসে যায়, ওখানে আটকে থাকবে, আর এগোতে পারবে না। পরীক্ষায় আমরা কেন পাশ করতে পারতাম না? ওই কারণেই, বুদ্ধিটা ফেঁসে আছে। ঈশ্বরজ্ঞান কেন হয় না? বুদ্ধি ফেঁসে আছে। আমাদের এই দূরবস্থা ভগবান করেননি, এটা আমাদের নিজেদের তৈরী করা। আমরা নিজেরা খাটব না, কোনদিন খাটার চেষ্টা করব না, আর ইচ্ছা আর দ্বেষ থেকে বেরোনর চেষ্টা কখন করিনি বলে আজ আমাদের এই দুরবস্থা। তাহলে ঈশ্বরকে কে জানতে পারেন? ঈশ্বর দর্শন কার হয়?

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পূণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ।।২৮।।

(কিন্তু যে সকল পূণ্যশীল ব্যক্তির পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে, সেসব দৃঢ়ব্রত ব্যক্তি সমস্ত দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়ে নিষ্ঠার সাথে আমার ভজনা করে থাকে।)

বলছেন, যাদের পাপ প্রায় ক্ষয় হয়ে গেছে, পুরোটা তো ক্ষয় হবে না, তাই বলছেন প্রায় ক্ষয় হয়ে গেছে, এরা পূণ্যকর্মা। যা কিছু ভোগ করার ছিল সব ভোগ করা হয়ে গেছে, এখন আর ইচ্ছা-দ্বেষ নেই, এখন আর পাপকর্ম করেন না। এখন এনারা যা কিছু কর্ম করেন সেটা করেন অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য। মোহের বশে বা নিজের কোন লোভের জন্য কোন কর্ম আর করেন না। এঁরাই দ্বন্দ্ব মোহ থেকে মুক্ত হন। পূণ্যকর্ম কি? জপধ্যান করছেন, তীর্থে যাচ্ছেন, তীর্থে গিয়ে কৃচ্ছ সাধন করছেন, তীর্থের বিধি আদিগুলো পালন করছেন, এগুলো সব পূণ্যকর্ম। এ-ছাড়া দান করছেন, সাধুসেবা করছেন, ঠাকুর দেবতার পূজা করছেন, এগুলো সব পূণ্যকর্ম; ঈশ্বরলাভের পথে এগোতে হলে সবাইকেই পূণ্যকর্ম করতে হয়। এই যে পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা বলা হয়, পঞ্চ মহাযজ্ঞ রোজ করতে হয়; কারণ পঞ্চ মহাযজ্ঞ পূণ্যকর্ম।

ভগবান বলছেন, এরা দৃঢ়ব্রতা, এরা যে ব্রত করে ব্রতটা দৃঢ়। এরা জানে পরমার্থ তত্ত্ব এই রকম, ঈশ্বর তত্ত্ব এই রকম; এই যে বিশ্বাস, এই ব্যাপারে এরা দৃঢ়ব্রতী। দৃঢ়ব্রতী না হলে ঈশ্বরকে, ঈশ্বরতত্ত্বকে জানা যায় না। আমরা মহাকাশচারী বিজ্ঞানী খ্রীশ শ্যাটফিল্ডের কথা বললাম, you have to think like a astronaut, আপনাকে যোগীর মত ভাবতে হবে। ঠাকুর সাধনার সময় যে ভাবে ভাবতেন, আমাদেরও সেইভাবে ভাবতে হবে, জীবনটাকেও ঐ ভাবে চালাতে হবে, তা নাহলে যোগী হওয়া যাবে না। গুরু বলে দিয়েছেন, সকাল বিকাল একশ আটবার করে জপ করবে, কেন? যাতে মন্ত্রটা না ভুলে যায়। সকাল-বিকাল একশ আটবার জপ করে যাচ্ছি, এ-ভাবে কিছু হয়নি, হবেও না। দৃঢ়ব্রতী না হলে ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না। ঠাকুর বারবার বলছেন, খাটতে হয়। প্রচুর জপধ্যান করে করে, সাধনা করে করে, তপস্যা করে করে মাথার ঘাম যখন পায়ে নামে, তখন গিয়ে এগোতে শুরু করে, তখনও কিছু হয়ে যায় না, এগোনটা শুরু হয়।

যাঁরা বিজ্ঞানী, যাঁরা যখনই জেনে জান পরমার্থতত্ত্ব এই রকম, তখনই তাঁরা দ্বন্দ্ব-মোহ থেকে বেরিয়ে আসেন। যেহেতু আমাদের কাছে সংসারটা সত্য, সেইহেতু আমাদের এত দ্বন্দ্ব; যেহেতু সংসারকে সত্য বলে মনে করছি তাই ঈশ্বরের দিকে আমাদের মন যায় না। ঈশ্বরতত্ত্বকে আমরা বিশ্বাস করি না, আমাদের জ্ঞানের ভিত খুব দুর্বল। ভাসা ভাসা কোথাও শুনেছি ঈশ্বর এই রকম, ঠাকুর এই রকম। জীবনে যদি শান্তি পেতে চান, জীবনে যদি এগোতে চান, তাহলে ঠিক ঠিক বুঝতে হয় ঈশ্বরতত্ত্ব এই রকম। ঈশ্বরকে জেনে আমার কি হবে, ঈশ্বরকে ভজনা করে কি হবে?

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্ বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্।।২৯।।

(এইভাবে যাঁরা জরা ও মৃত্যু থেকে মুক্তিলাভের জন্য আমাকে আশ্রয় করে সাধনা করেন, তাঁরা সনাতন ব্রহ্ম, সমগ্র অধ্যাত্ম ও অখিল কর্ম অবগত হন।)

ঈশ্বরতত্ত্বকে যাঁরা ঠিক ঠিক বুঝে নিয়েছেন, ঈশ্বরতত্ত্ব যাঁরা জেনে গেছেন, তাঁরা জরা, অর্থাৎ বার্ধক্য অবস্থাজনিত কষ্ট আর মৃত্যু থেকে মুক্তি পেয়ে যান। জরা আর মৃত্যুতে যিনি দোষ দেখতে পান, তিনি জরা ও মৃত্যু থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সমস্ত রকম চেষ্টা শুরু করে দেন। ঊনত্রিশ আর ত্রিশ নম্বর শ্লোকে চারটে শব্দ আসবে –*অধ্যাত্মং, আধিভূতং, আধিদৈবং এবং আধিযজ্ঞং*। এই চারটে শব্দ দিয়ে পরের অধ্যায় শুরু হবে। ভগবান এই অধ্যায়ের শেষে এই কয়েকটি শব্দ অর্জুনকে আগে থেকেই শুনিয়ে রাখলেন। পরের অধ্যায়ে গিয়ে অর্জুন প্রথমেই এই শব্দগুলোকে নিয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন করবেন, হে ভগবান, এইমাত্র যে শব্দগুলো আপনি বললেন, এগুলো তো আমার শোনা নেই।

যিনি জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পেতে চাইছেন, প্রথমেই তাঁকে কয়েকটি জিনিসকে জানার চেষ্টা করতে হবে। এই কয়েকটি জিনিসকে ঠিক ঠিক জেনে গেলে তখন তিনি মুক্তির পথে অগ্রসর হতে সচেষ্ট হন। একটা বাড়ি তৈরী করার আগে যেমন কয়েকটা জিনিসের খবরাখবর তাকে নিতে হয়, যেমন একটা ভাল পরিবেশে ভাল জমির খোঁজ করতে হবে, বাড়ি নির্মাণ করতে কি রকম খরচ পড়বে, বাড়ি তৈরীতে কি কি জিনিস ও কি রকম গুণমানের জিনিস ব্যবহার করা হবে ইত্যাদি। ঠিক তেমনি যারা আধ্যাত্মিক পথে আসতে চাইছে তাদেরকেও প্রথমে কয়েকটি জিনিসকে ভাল করে বুঝে নিতে হয়। আমরা বেশির ভাগই মনে করি গুরুর কাছে মন্ত্র দীক্ষা নিয়ে দিনে দুবার সকাল সন্ধ্যা একশ আট বার জপ করলেই আমার সব হয়ে যাবে। কিন্তু এইটুকুতে কিছুই হবে না। যিনি ঠিক ঠিক মুক্তির পথে চলতে চান তাঁকে এই পথের অনেক কিছু জানতে হয়, বুঝতে হয়। এগুলো ভাল করে না বুঝে না জেনে মুক্তির পথে এগোবার চেষ্টা করতে গেলে লক্ষ্যে পৌঁছাবার আগেই সে হারিয়ে যাবে, যত এগোতে চাইবে ততই সে অথই জলে ডুবে যাবে।

জীব এবং জীবের যে সমষ্টি, এই বিষয়টাকে জানাকে বলে অধিভূত; যত পদার্থ রয়েছে, এর যে সমষ্টি, এটাকে জানার নাম সাধিযজ্ঞং; এই যে যজ্ঞাদি রয়েছে, পুরো সব কিছুকে সমষ্টি রূপে জানা। পরের অধ্যায়ে এর উপর বিরাট ব্যাখ্যা করা হবে। বলছেন, অধিভূত, অধিযজ্ঞ, অধদৈব এবং অধ্যাত্ম, এই পুরো জিনিসটাকে তাঁরা জানেন, তার মানে ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যকে তাঁরা জানেন। আমরা কি জানি? না, আমরা কেউ ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যর কিছুই জানি না। তাহলে আমরা কি আশা করব; আমি ঠাকুরের নাম করব, শেষ সময় এসে ঠাকুর নিয়ে যাবেন? না, সেটাও হবে না।

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ।।৩০।।

(এবং এভাবে যাঁরা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সাথে বিদ্যমান আমার উপাসনা করেন, সেই সব সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি মৃত্যুকালেও আমাকে প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হন।)

যিনি আমাকে তত্ত্বতঃ জানেন, ভগবান বলছেন, *প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ,* এনারা *যুক্তচেতসঃ,* এই ধরণের আমাতে সমাহিত চিত্ত ব্যক্তি তাঁর মৃত্যুকালে, অর্থাৎ আর কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি মারা যেতে চলেছেন, সেই সময়েও তিনি আমাকে জানতে সমর্থ হন। এটাকে আমরা এখন পাল্টে দিয়ে বলছি, মৃত্যুকালে আমরা জেনে যাব। আমাদের শাস্ত্র বলছে না যে, তুমি মৃত্যুকালেই জানতে পারবে, এই শ্লোকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন –মৃত্যুকালেও সে আমাকে ভুলে যায় না, কারণ সে আগে থেকে আমার তত্ত্বকে জেনে গেছে। আর ঈশ্বরের জ্ঞান এমন যে, মৃত্যুকালেও

এই জ্ঞানের বিস্মৃতি হয় না। আমরা বলে থাকি, মৃত্যুকালে শরীরের যে যন্ত্রণা, তখন কিছুই মনে পড়বে না। শরীরের যত যন্ত্রণাই হোক, যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুশিফাই করা হচ্ছে, ওই শারীরিক নির্যাতন, তখনও তিনি তাঁর স্বর্গস্থ পিতাকে ভুলে যাচ্ছেন না, বরঞ্চ বলছেন, প্রভু, এরা কিছু জানে না, তুমি এদের ক্ষমা করে দাও।

আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম, সংক্ষেপে এর মূল বক্তব্য হল, আমাদের ভিতরে কামনা-বাসনা বাসা বেঁধে আছে, সেখান থেকে যে শোক মোহের দ্বন্দ্ব তৈরী হয়, এই দ্বন্দ্ব আমাদের মনকে আবৃত করে দেয়, মনকে সীমিত বানিয়ে দেয়। মন তখন ঈশ্বরের দিকে না গিয়ে, সংসারের দিকে দৌড়াতে শুরু করি। দেবতারা সৃষ্টির অঙ্গ, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, আমরা দেবতাদের সাথে সাথে ঈশ্বরকেও সীমিত করে দেখি। ঈশ্বরকে সীমিত দেখা মানে, তাকে টেনে নীচে সংসারে নামিয়া আনা। তাই আমাদের দুঃখ কষ্টের শেষ নেই। কিন্তু ধর্ম জীবনের উদ্দেশ্য, যেটা দিয়ে শুরু করা হল, *বাসুদেবঃ সর্বমিতি*, এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এখানেই সপ্তম অধ্যায় শেষ হয়ে যায়।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়ং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ।।

শ্রীমদ্ভাগবত গীতা

অষ্টম অধ্যায়

অক্ষরব্রহ্ম যোগ

অষ্টম অধ্যায়ের নাম অক্ষরব্রহ্মযোগ। 'অক্ষর' শব্দের অর্থ যার কোন ক্ষয় নেই। 'ক্ষর' মানে যার ক্ষয় আছে। সেই একমেবমদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মকেই অক্ষর বলা হয়। ব্রহ্ম মানেই অক্ষর, অক্ষর ব্যাপারটা বোঝার জন্য দু-একটা মূল জিনিস আমাদের বুঝতে হবে। আগের অধ্যায়ে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগে ঈশ্বরের দু-রকম প্রকৃতি পরা ও অপরা প্রকৃতির কথা আলোচনা করা হয়েছে। এখন পরাকে নিয়ে সাধনা করলে কি রকম হয় আবার অপরাকে নিয়ে সাধনা করলে কি রকম হয় তারই বিস্তৃত আলোচনা এই অষ্টম অধ্যায়ে করা হবে। আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিভিন্ন রকমের সাধনার কথা আছে। মৃত্যু আমাদের অবশ্যাম্ভাবি, আমরা জীবনভর সাধনা করে যাচ্ছি, কিন্তু এই অবশ্যম্ভাবি মৃত্যু যখন শিয়রে এসে দাঁড়াবে তখন সাধকের সাধনা কি রকম হবে, সেই সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে খুব সুন্দর ও বিস্তৃত ভাবে বলা হয়েছে।

অক্ষরব্রহ্মযোগের আলোচনা শুরু করার আগে কয়েকটি জিনিস ভালো করে আমাদের বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। আমরা যত রকমের জ্ঞান লাভ করি সবই পরোক্ষ। পরোক্ষ মানে non-direct আর অপরোক্ষ হল non-non-direct। একটা কিছুর মাধ্যম ছাড়া আমরা জ্ঞান লাভ করতে পারি না। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি হল আমাদের জ্ঞান লাভের প্রধান মাধ্যম। কিন্তু ঈশ্বর বা ব্রহ্মের বা আত্মার জ্ঞান লাভ এগুলোর কোনটার মাধ্যমে কখনই সম্ভব নয়। ভগবান বলে একজন কেউ আছেন, এই এককে আমরা যে অদ্বৈত বলবো তা বলা যাবে না। তাহলে কি একেশ্বরবাদ হয়ে যাবে? তাহলে তো হিন্দু ধর্মের সাথে খ্রীশ্চান ধর্ম এবং অন্যান্য ধর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। অদ্বৈত হল দ্বৈত নয় (অ-দ্বৈত), এর মানে একের পরে কি আছে মুখে বলা যায় না। বোঝাবার জন্য ব্রহ্মকে অদ্বিতীয় বলা হয়। ভগবানকে এক বললে দুইও বলা যেতে পারে। একজন দ্রষ্টা আছে আর আছে দৃশ্য বস্তু, আমি দ্রষ্টা আর ভগবান দৃশ্য, এখানে এসে একে দুই বোধ হচ্ছে, জড় আর চৈতন্য দুই বোধ থেকে আসছে। অদ্বৈত বললেই বুঝে নিতে হবে দ্রষ্টাও নেই দৃশ্যও নেই। তাহলে কি শূন্য বলব? না, তাও বলা যাবে না। শূন্য নয়, একও নয়, দুইও নয়, ব্রহ্ম এই এক ও দুইয়ের পারে। এই এক দুইয়ের পারে যে অবস্থা –অস্তি মাত্র জ্ঞান, এই জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি দিয়ে ধরা যায় না, যা আছে তাই আছে, এই বোধটাকে বোধে বোধ করাই হল অপরোক্ষ অনুভূতি বা অপরোক্ষ জ্ঞান।

সৃষ্টি তত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে স্বামীজী দুটো জিনিস সামনে নিয়ে এসেছেন –আকাশ ও প্রাণ। আকাশ জড় আর প্রাণ হল শক্তি বা এনার্জি। আকাশে গিয়ে প্রাণ যখন আঘাত করে তখন সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয়। আকাশ ও প্রাণ মহৎ থেকে, অর্থাৎ সমষ্টি মন বা ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন। স্বামীজীর সময় আমেরিকাতে টেস্‌লা নামে একজন খুব বিখ্যাত electrical scientist ছিলেন। টেস্‌লা স্বামীজীর সৃষ্টিতত্ত্বের উপর বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাখ্যা শুনে খুব অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, মনে মনে তিনি ঠিক করে ফেললেন, ভবিষ্যতে এই জিনিসটাকে আমাকে গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করে দেখাতে হবে। আকাশ থেকে জড় বা এই স্থূল জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে, যে শক্তিতে এই সৃষ্টি কার্য হচ্ছে সেই শক্তি বা এনার্জি হল প্রাণেরই একটা রূপান্তর মাত্র। আকাশও পরিবর্তিত হতে হতে স্থূল জগতের রূপ নিচ্ছে, প্রাণও পাল্টাতে পাল্টাতে এই বিদ্যুৎ শক্তি, আমরা যে নিঃশ্বাস নিচ্ছি, হজম করছি, চিন্তা করছি এই শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। আমাদের শরীরের স্নায়ু, মন, বুদ্ধিতে যা কিছু হচ্ছে সবই সেই প্রাণেরই কার্য, প্রাণেরই একটি রূপান্তরিত প্রকাশ।

কিন্তু এই প্রাণ ও আকাশের একটা জায়গায় খুঁটি বাঁধা আছে। বেদান্ত বলছে এই আকাশ ও প্রাণ একই। ঠাকুর যেমন বলছেন ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, কালী ও ব্রহ্ম এক। স্বামীজীর খুব ইচ্ছে ছিল আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত দিয়ে বেদান্তের এই সিদ্ধান্তটিকে প্রমাণ করে একটা দৃঢ় ভিত্তির উপরে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। পরে অবশ্য আইনস্টাইন বিজ্ঞানের যে নূতন তত্ত্ব দাঁড় করালেন তাতে বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত দিয়ে প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কিন্তু বিজ্ঞান আমাদের শাস্ত্রের একটা মতবাদের হদিস এখনও দিতে পারেনি, তা হল – পরলোক সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদের যে মতবাদ, অর্থাৎ যোগীর মতে আত্মা মৃত্যুর পর কোথাও যায় না, যেমন ছিল তেমনই থাকে। কেননা অদ্বৈতবাদীরা বলেন যার জন্ম নেই মৃত্যু নেই সে কিভাবে অন্য কোথাও যাবে বা আসবে। কিন্তু দ্বৈতবাদীরা বলেন মৃত্যুর পর মানুষ প্রথমে আদিত্যলোকে, অর্থাৎ সূর্য লোকে যায়, সেখান থেকে চন্দ্রলোক, তারপর চন্দ্রলোক থেকে দ্যুতলোকে বা বিদ্যুৎলোকে যায়। সেখানে একজন পুরুষ এসে তাকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যায়। ব্রহ্মলোকে সে ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করে।

স্বামীজীর ইচ্ছে ছিল এই যে দ্বৈতবাদীরা বলছেন মৃত্যুর পর জীবাত্মা বিভিন্ন লোকে আসা-যাওয়া করতে থাকে, আর অদ্বৈতবাদীরা বলছেন আত্মা কোথাও যায় না –এই দুটো মতকে সমন্বয় করা। স্বামীজীর পত্রাবলীতে এই বিষয়ের উপর স্বামীজীর নিজস্ব কিছু আলোচনা পাওয়া যায়, সেখানে তিনি টেস্‌লার নামও করছেন। স্বামীজীর মতে সূর্যলোক বলতে যেটা বলা হয় সেটা হল আমাদের physical universe এখানে জড় আর চৈতন্যকে পৃথক রূপে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এবং এই সূর্যলোক একেবারে স্থূল জগৎ, আরও স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে –আমাদের এই পরিদৃশ্যমান জগৎ। এখানে প্রাণ জড়শক্তি রূপে আর আকাশ স্থূলভূত রূপে প্রকাশিত। এরপর আসছে চন্দ্রলোক, যা এই আদিত্যলোককে ঘিরে রেখেছে। আকাশে আমরা যে চাঁদ দেখি, এখানে কিন্তু সেই চাঁদের কথা বলা হচ্ছে না। এই চন্দ্র আদিত্যলোকেরই স্থূলভূত রূপ। শাস্ত্রে যে চন্দ্রলোকের কথা বলা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে যে, চন্দ্রলোক হল দেবতাদের আবাসভূমি। সূর্যের প্রাণীরা সেখানে যেতে পারে না। চন্দ্রলোকের অধিবাসীরা সূর্যলোকে আসতে পারবে না, মশারির মত নেটিং করা আছে, বাতাস আসা যাওয়া করতে পারবে কিন্তু মশা প্রবেশ করতে পারবে না। এখানে জড় আছে কিন্তু আরও সূক্ষ্ম রূপে তন্মাত্রা অবস্থায় আছে এবং প্রাণ মনঃশক্তি রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। এই মনঃশক্তি বা psychic energy বা দিব্যশক্তি থেকেই যা কিছু এণার্জি দেখছি তার জন্ম হচ্ছে।

এরপর দ্যুলোক বা বিদ্যুৎলোক – এখানে জড় আর শক্তি এক হয়ে যায়, তার মানে জড় আর শক্তিকে আলাদা করে বোঝা যাবে না। এই মুহুর্তে শক্তি জড়ের মত আচরণ করবে আবার পর মুহুর্তেই জড় শক্তির মত আচরণ করবে। দুটো এত অভিন্ন অবস্থায় থাকে যে বলা খুব কঠিন হয়ে যায় বিদ্যুৎ জড় না শক্তি। জীব ওখানে গেলে নিজেকে অমুর্ত অবস্থাতে দেখবে, সেখানে কোন স্থূলের ব্যাপারই যে থাকবে না তা নয়, সূক্ষ্মকেও বোঝা যাবে না।

তারপর আসছে ব্রহ্মলোক। জীব এই ব্রহ্মলোকে গেলে দেখতে পাবে এখানে প্রাণও নেই আকাশও নেই, জড় আর শক্তি উভয়েই মূল শুদ্ধ আত্মশক্তিতে সম্মিলিত হয়ে যায়। আর যেহেতু শক্তি আর জড় থাকছে না সেইহেতু জীব বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে দেখে বিরাট মন রূপে। বিরাট মন যখন দেখে তখন নিজেকে দেখে পুরুষ বা হিরণ্যগর্ভ রূপে। এই ঘরে অসংখ্য জল কণিকা বায়ুর মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে, জল কণিকাগুলিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। জল কণিকাগুলো যখন জলের আকার ধারণ করবে তখন তার একটা আকার আসবে, এই জলই আবার ঠাণ্ডাতে বরফের আকার ধারণ করবে। মনও এই জলকণার মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আমাদের মনই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এখন আমাদের কাছে শরীর, শরীরের বিভিন্ন শক্তি সব আলাদা হয়ে আছে, যখন ব্রহ্মলোকে যাবে তখন

সব এক হয়ে যাবে, সব কিছুই তখন বিরাট মন বা মহৎ বা হিরণ্যগর্ভ বা বিরাট পুরুষ রূপ নিয়ে থাকবে। দ্বৈত এখানে এসে শেষ হয়ে যায়।

অদ্বৈত বলছেন, আসলে এই বিরাট মন, বিরাট আমি বলে এগুলো কিছুই অদ্বৈতে থাকে না। সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক বলে কোন লোকই নেই। চিন্তা করছি আমি, ভাবছি শুদ্ধ আত্মা এর আগে কোথাও তো ছিল, হয় সূর্য্যলোকে নয়তো চন্দ্রলোকে। দ্বৈতবাদীদের কাছে এগুলো সব events, কিন্তু অদ্বৈতবাদীদের কাছে এগুলো দৃশ্য। সিনেমার পর্দায় একটার পর একটা দৃশ্য আসছে আবার চলে যাচ্ছে কিন্তু দৃশ্যগুলির সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ঠিক তেমনি অদ্বৈতবাদীরা বলে যে, আত্মার কাছেও এই সব বিভিন্ন লোক একটার পর একটা দৃশ্য আসছে আর যাচ্ছে। আমার কাছে এগুলো বাস্তব মনে হবে কিন্তু জ্ঞানীর কাছে সব দৃশ্য মাত্র। আমি একজন অভিনেতা, একটা দৃশ্যে আমাকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, আমি তাতে অভিনয় করছি। এই দৃশ্যটাই পরে যখন আমি পর্দায় দেখব তখন কি আমি চেঁচিয়ে বলব যে আমাকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে? কখনই চেঁচাব না, কারণ আমার কাছে এটা একটা দৃশ্য মাত্র। জ্ঞানীদের ক্ষেত্রে ঠিক এই ব্যাপারটাই হয়। বিজ্ঞানীর এই অবস্থাকে প্রাপ্ত হতে গেলে আমাদের সাধনা কি রকম হবে এই কথাই শ্রীকৃষ্ণ অষ্টম অধ্যায়ে বলবেন।

সপ্তম অধ্যায়ের শেষাংশে ভগবান অধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ এই শব্দগুলি বলেছিলেন। তখন আমরা বলেছিলাম, অষ্টম অধ্যায়ে আমরা এই শব্দগুলোর উপর বিস্তারে আলোচনা করব। বর্তমান কালে এই শব্দগুলো বেশি প্রচলিত নয়, কিন্তু আগেকার দিনে খুব বেশি প্রচলিত ছিল। অর্জুন একাধারে একজন দক্ষ যোদ্ধা এবং সুপণ্ডিত ছিলেন, শাস্ত্রটা তিনি ভাল জানতেন, বারো বছর বনবাসের আগে তাঁর বনবাসের অভিজ্ঞতা ছিল, নানা কারণে একাধিকবার তাঁকে জঙ্গলে যেতে হয়েছিল; সেখানেও তিনি অনেক সাধুসঙ্গ করেছিলেন, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন বা শ্রবণ করেছিলেন। কিন্তু গীতাতে এখন অর্জুনের প্রশ্ন দেখে আমাদের মনে হয়, এত কিছু করার পরেও তিনি যেন অনেক কিছুই জানতেন না। বিশেষ করে এই শব্দগুলি তিনি জানতেন না। তাই অষ্টম অধ্যায় শুরু হচ্ছে অর্জুনের কয়েকটা প্রশ্ন দিয়ে –

অর্জুন উবাচ
কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে।।১।।
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ।।২।।

(অর্জুন বললেন – হে পুরুষোত্তম, ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, কর্ম কি, অধিভূত এবং অধিদৈবই বা কাকে বলে? হে মধুসূদন, এই দেহে অধিযজ্ঞ কে এবং কিরূপে অবস্থিত? মৃত্যুকালে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কিরূপে আপনাকে জানতে পারেন?)

এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, এই শব্দগুলির বাংলায় যে প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করা হয়, বা বিভিন্ন ভক্ত সম্মেলনে ও সেমিনারে আমাদের যে আলাপ আলোচনাকালীন এই ধরণের যেসব শব্দের ব্যবহার হয়, সেইসব শব্দের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান ঊনত্রিশ আর ত্রিশ নম্বর শ্লোকে যে যে বিষয়গুলিকে অর্জুনের কাছে আগাম উত্থাপনা করেছিলেন, সেটাকেই এবার অর্জুন এখানে সাজিয়ে প্রশ্নাকারে ভগবানের সামনে রাখছেন। অষ্টম অধ্যায় শুরু হচ্ছে অর্জুনের এই সাতখানা প্রশ্ন দিয়ে।

১) *কিং তদ্ব্রহ্ম*, ব্রহ্ম কি?
২) *কিমধ্যাত্মং*, অধ্যাত্ম কি?

৩) *কিং কর্ম*, কর্ম জিনিসটা কি?
৪) *অধিভূতং চ কিং প্রোক্তম্*, অধিভূত জিনিসটা কি?
৫) *অধিদৈবং কিমুচ্যতে*, অধিদৈবটা কি?
৬) *অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্*, এই দেহে অধিযজ্ঞ কে?
৭) *প্রয়াণকালে চ কথং*, মৃত্যুকালে এই অধিযজ্ঞ কিভাবে থাকে?

এই হল অর্জুনের সাতটা প্রশ্ন। অষ্টম অধ্যায় জুড়ে এই সাতটি প্রশ্নকে নিয়েই ভগবান আলোচনা করবেন। আগের অধ্যায়ে ভগবান বললেন, যে যোগী মৃত্যুকালে আমাকে মনে রাখে, সে ঠিক ঠিক আমাকে জানতে পারে। মৃত্যুকে নিয়ে আমাদের সবারই মনে স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন জাগে, মৃত্যু জিনিসটা ঠিক কি। এখানে আচার্য কিন্তু আগেই পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন, মৃত্যুর সময় যিনি তিনি যেমনটি ঠিক তেমনটি নিজেকে জানেন, তাঁরই মুক্তি হয়। এই অধ্যায়কে অনেকে তারকব্রহ্ম যোগ বলেন। মুক্তির পথ কি সেটাকে নিয়ে এখানে ভগবান বলবেন।

ঠাকুর, স্বামীজী আসাতে আমাদের অনেক সুবিধা হয়ে গেছে, ধর্মতত্ত্ব অনেক সহজলব্ধ হয়ে গেছে। খুব সহজেই আমরা, ঈশ্বরদর্শন কি, মুক্তি কি, এই জিনিসগুলো জেনে যাচ্ছি। কিন্তু জিনিসটা অত সহজ নয়। ঠাকুর যাঁদের উপদেশ দিতেন, ধর্মতত্ত্বের কথাগুলো বলতেন, তাঁরা বেশির ভাগই খুব উচ্চমানের আধার ছিলেন। যার জন্য দেখা যায়, কলকাতাকে নিয়ে যত কথা ঠাকুর বলেছেন, সব কটা কথাই নেতিবাচক। এক জায়গায় বলছেন, কলকাতার রাস্তায় যাচ্ছি, দেখলাম সবারই নিম্নদৃষ্টি। এদের কবে হবে সেই নিয়ে ঠাকুরকে কিছু বলতে শোনা যাচ্ছে না। এমন কি শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুর বলছেন, লোকেরা জ্বলেপুড়ে মরছে, তুমি কি কিছুই করবে না?

আমরা জন্ম থেকে জানি আমি শরীর। শিক্ষার মাধ্যমে, স্কুল কলেজের মাধ্যমে সমাজ আমাদের শিখিয়ে যাচ্ছে, আমাকে একটা কিছু হতে হবে, বিএ, এমএ, বিটেক, এমটেক কিছু একটা হয়ে আমাকে এবার কিছু একটা করতে হবে, সমাজে নাম করতে হবে, বংশের মুখোজ্জ্বল করতে হবে ইত্যাদি। লোকেরা সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে বলে, 'মহারাজ, আপনার কাছে এসে প্রাণ জুড়িয়ে যায়, আপনার সাথে কথা বলে আমার অন্তরাত্মার কত শান্তি হয়'। অথচ এরাই যখন নিজের ছেলেমেয়ের ব্যাপার আসে, তখন বলে 'মহারাজ একটু আশীর্বাদ করে দিন যাতে ভাল করে পড়াশোনা করে বড় হয়ে বিটেক এমটেকটা পড়তে পারে'। আজ পর্যন্ত কোন ভক্ত দেখলাম না, যে এসে বলছে, 'মহারাজ আমার ছেলেটাকে একটু আশীর্বাদ করুন যাতে বড় হয়ে আপনার মত একজন সন্ন্যাসী হতে পারে'। আমাদের ভিতরে দুই ভাবের দ্বন্দ্ব সব সময় লেগেই আছে। সাধু সন্ন্যাসীদের সম্মান করছে, বলছে আপনার কাছে এসে মন প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে; অন্য দিকে সন্তান যাতে অর্থকরী বিদ্যায় সাফল্য লাভ করতে পারে, তার জন্য আশীর্বাদ করতে বলবে।

আমাদের সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে নিজেদের একটা মজার জোক আছে। ঘটনাটা যে সময়ের, সেই সময় তখন বালি থানাতে একজন বড়বাবু ছিলেন, তখন থানার বড়বাবুকে দারোগা বলা হত। একবার এক মহারাজকে কোন সমস্যা নিয়ে সেই দারোগা বাবুর কাছে যেতে হয়েছিল। দারোগা বাবু মহারাজকে পেয়ে নিজের দুঃখের কথা বলে যাচ্ছেন, 'মহারাজ জানেন না, পুলিশের চাকরি কত বাজে'। উনি বলছেন, 'আমি আমার ছেলেকে বলে দিয়েছি, যা খুশী কর কিন্তু পুলিশে কখন আসবি না; কিছু না পারিস বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী হয়ে থাকবি, তবুও পুলিশে আসবি না'। একেবারে সত্যি ঘটনা। অথচ এনারাই সন্ন্যাসীদের কাছে এসে বলেন, আপনার কথা শুনতে খুব ভাল লাগে, আপনার কাছে এলে শান্তি পাই, আপনাদের দেখলেই মন প্রাণ শীতল হয়ে যায়। আপনি কেন তাহলে সন্ন্যাসী হতে চাইছেন না, কে আপনাকে নিষেধ করছে?

ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্য ছিলেন আনন্দ। আনন্দ একদিন ভিক্ষা করতে গিয়ে খুব তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। দেখছেন একটু মেয়ে কুয়ো থেকে জল তুলছে। তৃষ্ণার্ত আনন্দ মেয়েটির কাছে জল চাইলেন। মেয়েটি বলছে, 'আমি তো নীচু জাতির'। আনন্দ বলছেন, 'আমি তো তোমার কাছে জল চেয়েছি, তোমার জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিনি'। মেয়েটি আনন্দের কথাতে এত মুগ্ধ হয়ে গেল যে সে আনন্দের পিছন পিছন চলতে শুরু করে দিল। মেয়েটি বলতে লাগল, 'আপনাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না'। আনন্দ এসে আশ্রমে প্রবেশ করলেন, মেয়েটিও তাঁর পিছন পিছন আশ্রমে এসে গেছে। আনন্দ সোজা ভগবান বুদ্ধের কাছে গিয়ে হাজির। ভগবান বুদ্ধ সব বুঝে গেছেন। তিনি মেয়েটিকে দেখে খুব শান্ত মনে বলছেন, 'আনন্দের কোন জিনিসটা তোমার ভাল লাগল? আনন্দের আচার ব্যবহার তো'? মেয়েটি বলল, 'হ্যাঁ'। ভগবান বুদ্ধ বলেন, 'তাহলে তুমি অন্যের মধ্যে কেন এটা দেখতে চাইছ, তুমি নিজের ভিতরেই এটাকে নিয়ে এসো। ঐ গুণ তোমার ভিতরে নিয়ে এসে তুমিই মহৎ হয়ে যাও'।

আমরা যাঁর সামনে মাথা নত করছি, এর অর্থ হল, আপনি আমার আদর্শ, আমি আপনার মত হতে চাই। নিজের ভিতর যে আকাঙ্খা থাকে, সেটা বোঝা যায় সে কাকে ভালবাসে। যদি কেউ রবীন্দ্রনাথের ভক্ত হয়, বোঝা যায় যে তার মধ্যে কোথাও একটা কবি হওয়ার আকাঙ্খা লুকিয়ে আছে, সেই ভাবটা বেরিয়ে আসতে চাইছে। আমার সাথে যাদেরই নূতন পরিচয় হয়, আমি তাদের সব সময় এই একটা কথাই বলি, আমার আপনার এমন কিছু একটা কর্ম ছিল, যেটা আমাদের দুজনকে আজ একসঙ্গে নিয়ে এসেছে। আমার আপনার দুজনেরই উদ্দেশ্য হল, এখান থেকে এই সম্পর্ককে আধার করে, আমিও যেন উপরের দিকে উঠতে পারি, সাথে সাথে আপনিও যেন উপরের দিকে যেতে পারেন।

কথামৃত খুব উচ্চমানের সাধকের জন্য। কথামৃত অত্যন্ত গভীর তত্ত্ব, তার একটা কারণ আমরা এই অষ্টম অধ্যায়ে পাব। আমাদের সমাজ, আমাদের পরিবার ছোটবেলা থেকে আমাদের এই শরীরের উপর বেশি জোর দিয়ে এসেছেন। শ্রীকৃষ্ণ এলেন, ঠাকুর এলেন, ভগবান বুদ্ধ এলেন, এত সাধুসন্ত মহাত্মারা এলেন, এনারা সবাই একই কথা বলেন, তুমি দেহ নও, তুমি সেই অবিনাশী ঈশ্বরের সন্তান। বেদান্ত আরেক ধাপ এগিয়ে বলে দিলেন, তুমি তাঁর সঙ্গে এক। এটা কৃষ্ণ-রাধার প্রেম নয়, এটা রাম-রাবণের যুদ্ধ নয়, শুধু এইটুকু –তুমি যা তুমি তাই হয়ে যাও। কিন্তু সমাজ আমাকে এক রকম শিখিয়েছে, ধর্মশাস্ত্র অন্য রকম শেখাচ্ছে, কোথাও একটা অমিল হয়ে যাচ্ছে। শাস্ত্র অনেক কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে এই কথাটা বারবার বলবেন –নিত্য ও অনিত্যের বিচার কর; নিত্যটা কি, অনিত্যটা কি, নিত্যের মধ্যে কি কি আছে, অনিত্যের মধ্যে কি কি আছে; ভাল করে বিচার কর। বিচার করে করে এই জিনিসগুলিকে যখন উত্তম রূপে বুঝে নেওয়া হয়, তখনই মানুষ ঠিক ঠিক এগোতে পারবে।

মাঝে মাঝে আমরা দেখতে পাই কিছু লোক বেলুড় মঠে ঘুরতে এসেছেন। তখন হয়ত গেট বন্ধ হয়ে গেছে। দৌড়ে এসে বলে, 'আমরা তো জানতাম না, এই সময় গেট বন্ধ হয়ে যায়'। একটা ট্রেন ধরতে যান, একটা বাস ধরতে যান, তার জন্য আগে থেকে কতজনের কাছে কত খবর নিয়ে তারপর ট্রেন বা বাস ধরতে যান। ট্রেন কটার সময় আসবে, কোন প্ল্যাটফরমে আসবে, কতক্ষণ দাঁড়াবে, আর বেলুড় মঠ আসার সময়, উঠল বাই নেপাল যাই। এরাই আবার উলটে আমাদের উপদেশ দেবে, 'ঠাকুরের দ্বার তো অবারিত, বন্ধ কেন হবে'। আরে ভাই যে ঠাকুরের অবারিত দ্বার, সেই ঠাকুর তো আপনার বাড়িতেও আছেন, তিনি তো আপনার হৃদয়েও আছেন, বেলুড় মঠে কেন এসেছেন? যখন বেলুড় মঠে ঠাকুরের দর্শন করতে এসেছেন, তখন বেলুড় মঠের নিয়ম মেনেই আপনাকে চলতে হবে। যিনি ঈশ্বরকে জানার জন্য এগোচ্ছেন, তাঁকেও ঠিক তেমনি আগে অনেক কিছু জেনে নিতে হয়।

যাঁরা প্রথমবার হিমালয়ে ঘুরতে যান, তাঁদের মনে কত প্রশ্ন, ট্রেনে কোথায় নামতে হবে, সেখান থেকে কিভাবে যেতে হবে, প্রথম হিমালয় দর্শন কোন জায়গা থেকে পাওয়া যাবে। কিন্তু ধর্ম পথে এসেই বলবে, আমি জানি আমার হৃদয়েই সেই ঈশ্বর আছেন, তিনিই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। তিনি দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু দেখিয়ে নিয়ে যেতেই এই দুরবস্থা। আমরা মজা করে বলি, যে ঠাকুর নিজের কোমড়ের ধুতি সামলাতে পারতেন না, তিনিই আবার এই জগৎ সামলাচ্ছেন, কি সামলাচ্ছেন বুঝে নিন, তাই আমাদের এই দুরবস্থা। কিন্তু আসল দুরবস্থা হল, আমরা শাস্ত্র জানি না। ঠাকুরকে একজন বলছেন, মশাই আপনি কি জানেন। ঠাকুর বলছেন, বলো কি, আমি শুনেছি কত।

সাংখ্য দর্শনে বা যোগ দর্শনে বা বেদান্তের যে নেতি নেতি সাধনা বিধি, তার সাথে এই অষ্টম অধ্যায়, সবটাই কিছু পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিচ্ছেন নিত্য কি, অনিত্য কি। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আবার এটাকে নিয়ে বলবেন। ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলে দিলেন, ঈশ্বরই নিত্য বাকি সব অনিত্য। এর থেকে সহজ ভাষায় কিছু বলা যায় না, কিন্তু তাও মানুষ নিতে পারছে না কেন? কারণ, detailingটা হয়নি, মূল কথার elaboration লাগে, সেটাই এতদিন হয়নি। যে কোন বিদ্যাতে মূল কথা বলে দিলে হয় না, বিস্তারে বলতে হয়। অষ্টম অধ্যায়ের এই দুটি শ্লোকে অর্জুন যে সাতটি প্রশ্ন রাখলেন, এখন এটাকে নিয়ে বিস্তারে বলছেন।

ব্রহ্ম কি, ব্রহ্ম ছাড়া যা কিছু আছে এই জিনিসগুলি কি, অধ্যাত্ম কি, অধিযজ্ঞ কি, অধিদৈব কি, অধিভূত কি, কর্ম কি আর মৃত্যুর সময় কি হয়, কিভাবে যোগীরা মৃত্যুর সময় আপনার কথা চিন্তন করে মুক্তি পান – এই জিনিসগুলির জ্ঞান বিস্তারে যদি না থাকে, তাহলে ধর্মের পথে এগোন খুব মুশকিল হয়ে যায়। ধর্মের পথ এক অজানা পথ। আপনারা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আপনাদের বলি, সকাল বিকাল যদি একশ আটবার ইষ্টমন্ত্র জপ করেন, যাঁরা ইষ্টমন্ত্র পাননি, তাঁরা যদি গায়ত্রী মন্ত্র সকাল বিকাল একশ আটবার জপ করেন, গায়ত্রী মন্ত্র যাঁদের করার ইচ্ছা নেই, তাঁরা শুধু ওঁ সকালে হাজার, বিকালে হাজার জপ করেন, মোটামুটি আধ ঘন্টা বা চল্লিশ মিনিট করেও জপ করেন, এক মাসের মধ্যে আপনার যোগশক্তি এসে যাবে। আপনি বুঝতেও পারবেন না, যোগশক্তি এসে আপনাকে বেঁধে আপনার পুঁজিটাকে নষ্ট করে দিয়ে কখন বেরিয়ে চলে যাবে আপনি টেরই পাবেন না। কারণ আপনি বুঝতেই পারছেন না যে আপনার মধ্যে যোগশক্তি এসেছে।

ছোটবেলা বড়রা বাচ্চাদের ভয় দেখান। আমারও ছোটবেলায় একটু বড় হওয়ার পর গ্রামের বাজারে বাজার করতে যেতে খুব ইচ্ছে করত। বড়রা ভয় দেখাত, তোকে ছোট দেখে সবাই ঠকিয়ে নেবে। আমরাই বড় হলে আবার ছোটদের বলব, ওরা তোমাকে ঠকিয়ে দেবে। তারপর মায়েরা ছেলেদের এক রকম বলে, মেয়েদের আর-এক রকম বলে, সে ঠকিয়ে নেবে, ও ঠকিয়ে নেবে। এই ঠকানো আর ঠকানির ফলে ঠক ঠক লেগেই আছে। আধ্যাত্মিক জগতে এই ঠকানো ব্যাপারটা বিরাট। আপনারা সকাল বিকাল করে দেখুন, যোগশক্তি আসবেই আসবে, মাত্র এক মাসে আসতে বাধ্য। কিন্তু যা হয়ে থাকে, দেশলাইতে যতটা বারুদ থাকবে ততটাই দেশলাই জ্বলবে। ওটা ডায়নামাইট হলে ডায়নমাইটের মত ফাটবে, আর এ্যটম বোমের মত হলে এ্যটম বোমের মত ফাটবে। আমাদের মনে হয়ত একটা সাধারণ ইচ্ছা, যেটা আমি জানিও না, যেই যোগশক্তি হল, ঐ সাধারণ ইচ্ছাটা মিটে যাবে, শক্তি শেষ। আবার নূতন করে শুরু করতে হবে।

এই জিনিসগুলো যদি জানা থাকে, পুরো ছবিটা যদি পরিষ্কার থাকে; জিনিসটা এই, সংসার এই, সাধনা এই, যজ্ঞ এই, জপধ্যান এই, ঈশ্বর এই, তখন গিয়ে এগোন সম্ভব হয়। আমাদের সন্ন্যাসী মহারাজরা জানেন, একটু জপধ্যান করেছেন কি যোগশক্তি এসে যাবে, আসার পর একটা

কিছু ফল দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। বাজারে একশ টাকা নিয়ে গিলেন, কেনাকাটা করে দেখছেন সব টাকা শেষ হয়ে গেছে। খুব সজাগ ও সাবধান না থাকলে যোগশক্তি সঞ্চয় হবে না, আর যোগশক্তির সঞ্চয় হয় না বলেই আমরা এগোতে পারছি না। ভক্তরা প্রায়ই এসে বলেন, এত তো জপধ্যান করছি, কিন্তু কিছুই তো হচ্ছে না। কিছু না হওয়ারই কথা, আপনার যোগশক্তি সাংসারিক জিনিসে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, আপনি টেরও পাচ্ছেন না। কারণ পুঁজি কম, বিনিময়ে যেটা পেলেন সেটাও কম পেলেন। পেলে আমরা বুঝতেও পারি না, মনে করছি এমনিই হয়ত পেয়েছি, আমার কর্মে পেয়েছি, কিংবা ঠাকুরের ইচ্ছায় হয়েছে। কিন্তু আমরা বুঝতেও পারছি না, যোগশক্তি কখন এসে আমার একটা ছোট্ট কোন ইচ্ছা মিটিয়ে যোগশক্তিটা ক্ষয় হয়ে গেছে।

এই সাতটি প্রশ্নের ব্যাখ্যা করার আগে খুব সংক্ষেপে বলছি, প্রথম প্রশ্ন ব্রহ্ম কি, ব্রহ্মকে এখানে অক্ষর ব্রহ্ম বলছেন, অক্ষর মানে যার কখন কোন ক্ষয় হয় না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এর বিস্তারে আলোচনা করেছি। *নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থানুরচলোঽয়ং সনাতনঃ*, দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিত্য, সর্বগত, স্থানু, অচল, সনাতন শব্দগুলির উপর বিস্তারে আমরা আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, অধ্যাত্ম কি। অধ্যাত্মের আর-একটা অর্থ হয় স্বভাব, নিজের ভাব। প্রত্যেক জীব এবং প্রত্যেকটি বস্তুর ভিতরে যে আসল সত্তা রয়েছে, সেটাই তার স্বভাব। যেমন জলের স্বভাব আর্দ্রতা, আর্দ্রতাটাই জলের আত্মা। সপ্তম অধ্যায়ে যেমন বললেন *রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ*, শশি আর সূর্যের যে প্রভা সেটাই তার সার। অধ্যাত্ম মানে স্বভাব, যেটা প্রত্যেক মানুষের ভিতরে আছে। মানুষের সত্তা হল আত্মা। এই যে সবার ভিতরে জীবাত্মা, এটাই অধ্যাত্ম, এটাকেই আবার বলা হয় স্বভাব। তৃতীয় চতুর্থ অধ্যায়েও স্বভাব শব্দটা এসেছিল, সেখানে স্বভাব বলতে বলা হয়েছিল প্রকৃতি। আমরা যেমন বলি, ওর প্রকৃতিটা পাল্টাবে না, এই প্রকৃতি হল স্বভাব, কিন্তু এখানে স্বভাব বলতে আত্মা, অধ্যাত্ম বলতে আত্মাকেই বোঝাচ্ছেন। যার জন্য তিন প্রকার দুঃখে আধ্যাত্মিক দুঃখগুলিকে ব্যাখ্যা করার সময় বলা হয়, যে দুঃখগুলি ভিতর থেকে আসে।

তৃতীয় প্রশ্ন কর্ম কি, আমরা এখানে গীতা আলোচন করছি, এই গীতা মহাভারতের সময়ের, আজ থেকে তিন কি চার হাজার বছর আগে যে গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তখনকার ভারত ছিল যজ্ঞ প্রধান ভারত, বেদের মন্ত্রেই বলছেন, *ত্র্যম্বকম্ যজামহে*, যজ্ঞ করে যাচ্ছেন, আহুতি দিয়ে যাচ্ছেন। তখনকার দিনে মানুষের কাছে ধর্ম মানে এই যজ্ঞ। কর্ম কি? যজ্ঞে যে কর্মগুলি হয়, এটাই কর্ম। আচার্য শঙ্কর বার বার বলছেন কর্ম দিয়ে আত্মজ্ঞান হয় না। কিন্তু স্বামীজী কর্মযোগ বইতে পরিষ্কার বলছেন, কর্ম দ্বারাও মানুষ শেষ অবস্থায় পৌঁছাতে পারে। স্বামীজী যে কর্মের কথা বলছেন, তার সাথে আচার্যের কর্মের এখানে তফাৎ আছে। আচার্য শঙ্কর যখনই কর্মের কথা বলছেন, তখন তিনি বেদের বিভিন্ন যজ্ঞের কথা বলছেন। স্বামীজী যখনই কর্মের কথা বলছেন, সেখানে তিনি নিষ্কাম কর্ম, নিঃস্বার্থ কর্ম বা সেবার কথা বলছেন। শব্দ এক, কিন্তু অর্থ আলাদা।

তৃতীয় প্রশ্নে যে কর্মের কথা বলা হচ্ছে, এটা হল, যজ্ঞে যে আহুতি দেওয়া হয়, যজ্ঞের যে ক্রিয়া হয়, এটাকে বলছেন কর্ম। এমনিতে যে কর্মবাদে যে কর্মের কথা বলা হয়, ভাল কর্ম করে ভাল হয়, এর সাথে কর্মবাদের কর্মের কোন সম্পর্ক নেই।

চতুর্থ প্রশ্ন হল অধিভূতকে নিয়ে। অধিভূত হল sum total, সব কিছু মিলিয়ে যে সমষ্টি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত পদার্থ আছে, সব কিছুর উৎপত্তি সেই আত্মা থেকে, সেই পরমাত্মা থেকে। যেখান থেকে এদের উৎপত্তি সেখানেই তারা অবস্থান করে, আর তাদের লয়ও সেখানেই হয়। তার মানে পরমাত্মার বাইরে কোন কিছু নেই। কিন্তু পরমাত্মাকে আমরা সেই রূপে চাই না। সমগ্র পদার্থের যে সমষ্টি, এটাকে প্রকৃতি বলা হয়।

তার সঙ্গে আসে অধিদৈব, পঞ্চম প্রশ্ন। অধিদৈবকে বুঝতে একটু কঠিন হবে। আমাদের পূর্বজরা মনে করতেন সব কিছুর পিছনে একজন দেবতা আছেন। যেমন আমাদের যত ইন্দ্রিয় আছে, প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের পিছনে একজন দেবতা আছেন, দেবতা আছেন বলেই ইন্দ্রিয়গুলি কাজ করছে। তাছাড়া, এই যে বৃষ্টি হচ্ছে, চন্দ্রমার উদয় হচ্ছে, সূর্য উঠছে, এদের পিছনেও একজন দেবতা আছেন। যেমন আমাদের যে চোখ, এই চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দেবতা হলেন সূর্য। আকাশে যে আমরা সূর্য দেখছি, এই সূর্যের দেবতাও তিনি, যিনি আমাদের চোখের দেবতা। ঈশোপনিষদের সেই ব্রাহ্মণ, যিনি সারা জীবন যজ্ঞযাগ করে এসেছেন, এবার তাঁর মৃত্যুর সময় এসে গেছে, তিনি তখন বলছেন, *যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি,* আদিত্য মণ্ডলে যিনি আছেন, সেটা আমি নিজে। আসলে নেত্রের যিনি দেবতা, সেটা তিনিই।

এই যে যত দেবতারা আছেন, বিভিন্ন যে বস্তুগুলো রয়েছে, বিভিন্ন যে ইন্দ্রিয়গুলি রয়েছে, আমাদের যে মন রয়েছে, এদের সমস্ত দেবতার যে এক রূপ, যে সমষ্টি রূপ, এই এক-রূপকে বলা হয় হিরণ্যগর্ভ বা পুরুষ। বলছেন, পুরুষ হল ভগবান নিজে, যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বর রূপে দেখান। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে যত যা কিছু আছে, এদের সবার পিছনে যে আধ্যাত্মিক শক্তি, যে দেবতা রয়েছেন, এর যে sum total, এটা হল ভগবান নিজে। যেভাবেই শুরু করা হোক, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসছেন এই একটা জায়গায়, কিভাবে সবটাই ভগবান। এই যে আগে কর্মের কথা বলা হল, কর্মের পিছনেও ভগবানই আছেন, পরে এর ব্যাখ্যা করবেন।

ষষ্ঠ প্রশ্ন অধিযজ্ঞকে নিয়ে, বলবেন, *যজ্ঞ বৈ বিষ্ণুঃ,* যজ্ঞ সাক্ষাৎ বিষ্ণু। যত যজ্ঞ করা হয়, যা কিছু যজ্ঞ করা হয়, যেমন চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছিল, আমরা যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি এটাও যজ্ঞ, স্বাধ্যায় করছেন এটাও যজ্ঞ, সবটাই যজ্ঞ, সমস্ত যজ্ঞের দেবতা হলেন ভগবান বিষ্ণু নিজে। সমস্ত যজ্ঞ আসছে সেই সাক্ষাৎ ভগবান থেকে। স্বামীজী বলছেন, unselfishness is God, মানুষ যে নিঃস্বার্থ হয়ে যাচ্ছে, এটাই ঈশ্বর। এখানে বলছেন, তুমি যে যজ্ঞ করছ এটাও ঈশ্বরের, একই জিনিস তফাৎ কিছু নেই। কারণ নিঃস্বার্থ কর্ম এটাও একটা যজ্ঞ। নিঃস্বার্থ ভাবে দেশসেবা, সমাজসেবা, গরীবের সেবা, আর্ত পীড়িতদের সেবা, এটা ভগবান নিজে। কিভাবে ভগবান নিজে? যেভাবে সমস্ত যজ্ঞগুলি সম্পন্ন হচ্ছে, সমস্ত যজ্ঞের অধিষ্ঠান দেবতা হলেন ভগবান নিজে।

আর মৃত্যুর পর যোগীরা কিভাবে ভগবানকে পান, এটাই শেষ প্রশ্ন। বলছেন, যিনি মৃত্যুর সময় ঈশ্বরকে বা ঈশ্বরের নাম মনে রাখেন তিনি ঈশ্বরের কাছেই যান, যেমন পরীক্ষিৎ মৃত্যুর সময় ঈশ্বরের কথা শ্রবণ মনন করে ঈশ্বরকে পেলেন। মৃত্যুর সময় আমি আপনি সবাই যে যা চিন্তা করব, মৃত্যুর পর আমরা সেটাকেই প্রাপ্ত করব। রাজযোগের একটা জায়গায় বলছেন, কোন লোকের যখন মৃত্যুর সময় হয়, তার আগে সে অনেক কিছু দেখতে শুরু করে, শুনতে শুরু করে। Scientific Journalএ কদিন আগে একটা লেখা পড়লাম। সেখানে বলছেন, বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, যার মৃত্যুর সময় হয়ে আসে তার একটা একটা করে ইন্দ্রিয় বন্ধ হতে শুরু হয়। সব শেষে তার কর্ণেন্দ্রিয় বন্ধ হয়। মানুষের সব ইন্দ্রিয়গুলি বন্ধ হয়ে গেছে, মৃত্যু হয়ে গেছে, তখনও তার কর্ণেন্দ্রিয় চলতে থাকে। লোকেরা ব্যঙ্গ করে বলে, মরণ কালে হরিনাম। কিন্তু বিজ্ঞানের এই সমীক্ষাকে যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে তো মরণ কালে হরিনাম করা খুব দরকার। কারণ যে লোক মারা যাচ্ছে, তার শেষ চেতনা কানে থাকে। আমাদের মনে কত আবর্জনা আছে যদি জানতে চাই, তাহলে নিজের স্বপ্নগুলিকে বিচার করতে হবে। স্বপ্নে যদি ভয়ঙ্কর কিছু দেখেন, বাজে বাজে জিনিসের দৃশ্য দেখেন, যে জিনিসগুলি পছন্দ করেন না যদি সেগুলো দেখেন, তাহলে বুঝতে হবে আপনার ভিতরে প্রচুর আবর্জনা জমে আছে। এই আবর্জনাগুলোকে পরিষ্কার করার জন্য আপনাকে প্রচুর জপধ্যান করতে হবে। আর এই আবর্জনাগুলোই মৃত্যুর সময় আবার পুরোদমে ফিরে আসবে। অর্জুনের এই সাতটি প্রশ্নের উত্তর আমরা সংক্ষেপে রাখলাম।

আমাদের সুবিধার্থে আরও সংক্ষেপে গুছিয়ে বলে দেওয়া হচ্ছে, অধ্যাত্ম কি – সবার ভিতর যে আত্মা। কর্ম কি – যজ্ঞাদি ক্রিয়া যা করা হয়। ঈশ্বরের নিমিত্তে যেটা করা হয় এটাই কর্ম, বাকি সব অকর্ম। অধিভূত – ব্রহ্মাণ্ডে যত পদার্থ আছে, ঈশ্বর থেকে সব কিছুর উৎপত্তি, আর এর সমস্ত কিছুকে বলা হয় প্রকৃতি, এটাই অধিভূত। উদ্দেশ্য এই অধিভূত থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা। অধিদৈব – সমস্ত কিছুর পিছনে এক-একজন দেবতা আছেন, এই দেবতারা নিজেরা যে শক্তি পান সেই শক্তি ঈশ্বর থেকে আসে। এগুলোকে আমাদের জানতে হয়। অধিযজ্ঞ – যত কর্ম করা হয়, যত যজ্ঞ করা হয়, সব ঈশ্বর থেকেই হয়। আর মৃত্যুর সময় যিনি ঈশ্বরের চিন্তন করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তিনি ঈশ্বরের কাছেই যান। ঈশ্বর রূপেই চিন্তন করতে হবে পদার্থ রূপে না, যেমন যে যাকে ভালবাসে সে তাকে বলে আমি তোমাকে ঈশ্বর দেখি, সন্তান যেমন মাকে বলে, মা তুমিই আমার দেবী, তুমিই আমার ঈশ্বর, খুব ভাল, কিন্তু ঈশ্বরের যে অনন্ত রূপ, সেই রূপে কি দেখছ? যদি না দেখ, তাহলে তোমার মা কোন দিন ঈশ্বর হবেন না। এই যে পতি পরমেশ্বর বলা হত, পতি কখনই পরমেশ্বর হবে না, যদি স্বামীকে সীমিত রূপে দেখা হয়। তিনি দেবতা হতে পারেন, কারণ দেবতারাও সীমিত। পরমেশ্বর রূপে দেখা মানেই, তাকে অনন্ত রূপে দেখা। এই বলে আমরা তিন নম্বর শ্লোক শুরু করছি, যেখানে প্রথমেই ব্রহ্মকে পরিভাষিত করছেন।

শ্রীভগবানুবাচ
অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ।।৩।।

(উত্তরে শ্রীভগবান বললেন – অক্ষরকে নিরতিশয় পরব্রহ্ম বলে। স্বভাবকে অর্থাৎ প্রতি দেহে সেই পরব্রহ্মের প্রত্যগাত্মভাবে অবস্থিতিকে অধ্যাত্ম বলে। ভূতবস্তুর উৎপত্তিকর দেবতাদের উদ্দেশ্যে দ্রব্যাদি ত্যাগরূপ যজ্ঞকে কর্ম বলে।)

একটি শ্লোকের মধ্যে ভগবান অনেক কিছু বলে দিচ্ছেন। *অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং*, পরমব্রহ্ম যিনি, তিনিই হলেন অক্ষর। ঈশ্বরের একটিই পরিভাষা। বিভিন্ন ধর্মে ঈশ্বরকে পরিভাষিত করতে গিয়ে কত কিছু বলা হয়, ঈশ্বর এই, ঈশ্বর সেই; কিন্তু ঈশ্বরের পরিভাষা একটাই – ঈশ্বর অনন্ত। এবার তাহলে আমাদের বুঝতে হবে অনন্ত জিনিসটা কি, অনন্তে কি কি হয়। প্রথম কথা, কোন পদার্থ কোন দিন অনন্ত হতে পারে না। দ্বিতীয়, যিনি অনন্ত, তাঁর কোন নাম হয় না, যে নামেই ডাকা হোক না কেন, অনন্তের নাম হয় না। তৃতীয়, যিনি অনন্ত তাঁর কোন রূপ হয় না। হিন্দুরা এই জিনিসটাকে খুব ভালভাবে জানেন। অন্যান্য ধর্মের ধর্মবিজ্ঞান ঈশ্বরের এই পরিভাষাকে ভাল ভাবে জানেন না, জানলেও মানতে চাইবেন না। অক্ষর মানে যার কখন ক্ষয় হয় না, অনন্তও তাই। সেইজন্য যিনি অনন্ত তাঁর কক্ষণ রাগ হবে না, তিনি আমাকে আপনাকে, কাউকে কোন দিন নরকে পাঠান না। কারণ নরক বলে তাঁর কাছে কিছু নেই। বিভিন্ন ধর্মে যেমন বলছেন, আমার ভগবানের এটাই আদেশ। কিন্তু যিনি অনন্ত তাঁর কোন আদেশ নেই। হিন্দুরাও তাই কোন দিন বলবে না, আমার ভগবানের এটাই আদেশ। কারণ যিনি পরমব্রহ্ম, তাঁর কখন ইচ্ছা হয় না।

স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে, স্বভাব মানে স্ব-ভাব, নিজের ভাব, আত্মাই আমাদের সবার নিজের ভাব। আর বলছেন, *ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ*, কর্ম সম্বন্ধে যেটা বলা হল, তা হল যেখান থেকে সমস্ত কিছুর উৎপত্তি। আগেও বলেছিলেন, এই যে বৃষ্টি হচ্ছে, পৃথিবী ঘুরে চলছে, ইন্দ্রিয়গুলি কাজ করছে, যা কিছু হচ্ছে সব যজ্ঞ থেকে চলছে। এখানে আচার্য শঙ্কর শুধু নিজের তরফ থেকে যোগ করে দিয়ে বলছেন, যদিও অক্ষরের একটা অর্থ হয় ওঁঙ্কার, কিন্তু এখানে এটা ওঁ নয়, এটা পরমাত্মা। যেমন বলছেন *অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং*, এই অক্ষরকে ভুল করেও যেন 'ওঁ' না বোঝা হয়। ব্রহ্ম বলতে ব্রহ্ম, যিনি অনন্ত, যেখান থেকে সমস্ত কিছুর উৎপত্তি।

এখানে আচার্য বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে একটা মন্ত্র নিয়ে আসছেন, *তস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি*, এই যে অক্ষর, তাঁর যে শাসন, তিনিই তাঁর শাসন দিয়ে সূর্য চন্দ্রকে ধরে রেখেছেন। কঠোপনিষদেও বলছেন, *ভয়াদস্য অগ্নিস্তপতি ভয়াদস্তপতি সূর্যঃ*, তিনি সব কিছুকে ধারণ করে আছেন। আর সেই পরমব্রহ্ম প্রত্যেকে জীবের শরীরে অন্তরাত্মা হয়ে আছেন, এটাকেই স্বভাব বলে, এটাকেই অধ্যাত্ম বলে। আমার আপনার শরীরের ভিতর যে আমিত্ব ভাব, এটাই আসলে সেই পরমব্রহ্ম। বিশ্বের কোন ধর্ম কোন দিন বলেনি, বলার সাহস নেই যে বলবে, আমি সেই পরমাত্মা। ভাবলে সারা শরীরে কাঁটা দেয়, কল্পনা করা যায়, you are Divine, তুমি সেই দিব্য! সিংহের শাবক ঘাস খেয়ে বলছে দিব্যি আছি। *ভূতভাবোদ্ভবকরো*, জগতে যা কিছুর উৎপত্তি, এবং তার জন্য যে ক্রিয়া করা হয়, অর্থাৎ যজ্ঞাদি যা করা হয়, তৃতীয় অধ্যায়ে যেমন বলা হয়েছিল, *যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ*, সমস্ত কিছু যজ্ঞ থেকে উৎপন্ন হয়, যজ্ঞের জন্য যে ক্রিয়া আদি করা হয়, এটাকেই বলা হয় কর্ম।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষাশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর।।৪।।

(হে নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, ক্ষর অর্থাৎ বিনশ্বর-ভাব অর্থাৎ দেহাদি পদর্থই অধিভূত। হিরণ্যগর্ভই অধিদেবতা এবং অন্তর্যামী রূপে আমিই এই দেহে অধিযজ্ঞ।)

ক্ষর আর অক্ষর, আমাদের শাস্ত্রে এই দুটো শব্দ প্রায়ই আসে। ক্ষর মানে যার ক্ষয় হয়, যে জিনিসটারই ক্ষয় হয় তাকে বলছেন ক্ষর, আর অক্ষর মানে ব্রহ্ম। অক্ষরের অন্য অর্থও পরে আসবে, কিন্তু আমরা এখন জেনে রাখছি অক্ষর মানে ব্রহ্ম আর ক্ষর মানে প্রকৃতি। আমার এই পেন আছে, ব্যবহার করতে করতে কিছু দিন পর খারাপ হয়ে যাবে, ক্ষর হয়ে গেল। বলছেন, *অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ*, অধিভূত জিনিসটা কি, যে জিনিসটার মধ্যে ক্ষয় হওয়ার ভাব আছে সেটাই অধিভূত। *পুরুষাশ্চধিদৈবতম্*, অধিদৈব আগে আমরা ব্যাখ্যা করেছি, আমাদের যত ইন্দ্রিয় আছে, প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ই জড় পদার্থ। তাহলে ইন্দ্রিয় কাজ করবে কি করে? তখন বলছেন, প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের পিছনে একজন চৈতন্য সত্তা আছে সেইজন্য ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করে। সেই চৈতন্য সত্তাটা কে? তিনি হলেন একজন দেবতা। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের একজন করে দেবতা আছেন।

যেমন এই চোখ, চোখ তেজ তন্মাত্রা দিয়ে তৈরী, তেজের আধিপুরুষ হলেন সূর্য, তাই চক্ষু ইন্দ্রিয়ের যে দেবতা তিনি হলেন সূর্য। আমরা আকাশে যে সূর্য দেখছি সেই সূর্য নয়, সূর্য একজন দেবতা, সেই সূর্য দেবতা আবার আমাদের ইন্দ্রিয়ে বাস করেন একজন দেবতা হিসেবে। এই দেবতাকে বলা হয় অধিদৈব, অধিদৈব আছেন বলে চোখ ইন্দ্রিয় কাজ করছে, অধিদৈব না থাকলে চোখ কোন কাজ করতে পারত না। ঠিক সেই রকম জিহ্বা রস তন্মাত্রার, জলের সার রস, আর বরুণ হলেন জলের দেবতা, তাই জিহ্বার অধিদৈব হলেন বরুণ। নাসিকার দেবতা অশ্বিনী, ত্বকের দেবতা বায়ু, বায়ু স্পর্শ ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত, কর্ণের দেবতা হলেন দিক্ বা দিশা, দিশা আবার আকাশের সঙ্গে সংযুক্ত। এই ভাবে মনের দেবতা হলেন চন্দ্রমা। যাদের মস্তিস্কে গোলমাল থাকে তাদের ইংরাজীতে বলা হয় লুনাটিক, এই লুনাসি শব্দ চাঁদ থেকে এসেছে। কারুর মনের দেবতা যদি দুর্বল থাকেন কিংবা রুষ্ট থাকেন, তার মন দুর্বল হয়, এমনকি বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়। সেইজন্য দেখা যায় পুর্ণিমা অমাবস্যাতে পাগলগুলোর পাগলামিটা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যায়। যিনি পুরুষ, সেই ভগবান, তিনি সমষ্টি রূপে সমস্ত দেবতা হয়ে আছেন, যাঁকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। মূল অর্থ হল, যে কোন জিনিস, যার জন্ম হয়, যেটা নাশ হয়ে যায়, সেটা অধিভূত।

অধিযজ্ঞোহহমেবাত্র, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, অধিযজ্ঞ আমি নিজে। কারণ বেদে বলছেন, *যজ্ঞ বৈ বিষ্ণুঃ*, হিন্দুদের কাছে বেদের কথাই শেষ কথা। বেদ বলে দিয়েছেন *যজ্ঞ বৈ বিষ্ণুঃ*, যদিও এই বিষ্ণু একজন দেবতা, ভগবান বিষ্ণু নন, যিনি ইন্দ্রের ছোট ভাই ছিলেন। আচার্য বলছেন, *স হি বিষ্ণুঃ অহম্ এব অত্র অস্মিন্ দেহে*, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সেই বিষ্ণু আমি নিজে এই শরীরে বাস করছি। ইনি হলেন অধিযজ্ঞ, সমস্ত যজ্ঞকে যিনি ধারণ করে আছেন। যত যজ্ঞ হচ্ছে, যেমন স্বামীজীর নিঃস্বার্থপরতার কথা বলা হল, এগুলোকে কে ধারণ করে আছেন? বিষ্ণু। সেই বিষ্ণু কে? আপনি নিজে। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে কে ধারণ করে আছেন? ভগবান। সেটা কে? আপনি নিজে। ভাবলে কাঁটা দেয়, মন মানতে চায় না।

সন্ন্যাস নেওয়ার সময় প্রত্যেক সন্ন্যাসীকে খুব সুন্দর একটা মন্ত্র দেওয়া হয়, *মত্তঃ সর্বং প্রবর্তন্তে*, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সব আমার থেকেই বেরিয়েছে। যাঁরা গীতা শুনছেন, তাঁদের থেকেও বেরিয়েছে। তাহলে confusion কেন লাগে না জগতে? কারণ এটা অনন্ত। আপনার আশপাশে কোথাও কখন গোলমাল দেখেছেন? আপনার সাথে কি কখন গোলমাল হয়? আপনার স্বামী আপনার কথা শুনতে চায় না, আপনার স্ত্রী আপনার কথা শুনতে চায় না, পাড়া প্রতিবেশিরা কথা শুনতে চায় না। সন্ত্রাসবাদীরা আছে, যারা বোমা মেরে যাচ্ছে; চোর বদমাইশরা আছে, ছেলে আপনার অবাধ্য কথা শুনতে চায় না। এত কিছুর জন্য কে দায়ী? আপনি নিজে, সব কিছুর জন্য আপনি ছাড়া জগতে আর কেউ দায়ী নয়।

সন্ন্যাসীদের সাথে ভক্তদের দেখা হলেই বলবে, 'মহারাজ আমার জীবনে অনেক দুঃখ'। এর জন্য কে দায়ী? আপনি নিজে। ঈশ্বর রূপে আপনিই দায়ী। আর কর্ম রূপে, পুরোপুরি আপনি দায়ী। আমাদের কাছে যখনই কোন ভক্ত জীবনের একগুচ্ছ দুঃখ নিয়ে এসে ওগরাতে থাকে, তখন ভাবি এই জন্মে জান্তা-অজান্তায় কত পাপ করেছে, এর আগের আগের জন্মে কত দুষ্কর্ম করেছ, জেনেশুনে কত লোককে কষ্ট দিয়েছ, কত লোককে ঠকিয়েছ, যার ফলস্বরূপ আজ তোমার এই দুরবস্থা। পুরো সিস্টেমটাই ঠকিয়ে যাওয়ার সিস্টেম হয়ে গেছে, আমি আপনার জন্য বলির ছাগ, আপনি আমার জন্য বলির ছাগ, দুজন দুজনকে কেটে যাচ্ছি। আমার টিয়া বইতে আমি এই রকম চরিত্রের একটা বর্ণনা নিয়ে এসেছি, সবারই আঙুলগুলো ব্লেডের। সবাই সবাইকে খামচে যাচ্ছে, ভালবাসতে গিয়েও রক্ত বার করছে, কষ্ট দিতে গিয়েও রক্ত বার করছে; সবাই সবার রক্ত বার করেই চলেছে, কেউ থামছে না। এই জন্মে, আগের আগের জন্মে কত লোকের, কত প্রাণীর রক্ত বার করেছেন, আজ তাই আপনার এই দুরবস্থা। এসে চোখের জল ফেলে বলে, মহারাজ একটু কিছু করুন। আমরা আর কি করতে পারি, সর্বনাশ তো তুমি নিজেই নিজের করে রেখেছ। কর্মের দিক থেকে যদি দেখা হয়, দায়ী আপনি; আর পারমার্থিক দৃষ্টিতে যদি দেখা হয়, *মত্তঃ সর্বং প্রপদ্যন্তে*, আপনার থেকেই সব কিছু বেরিয়েছে। যত খুনী, বদমাইশ, চোর, যারা শীলহানি করছে, সব আপনার থেকেই বেরিয়েছে, কারণ আপনিই সেই পরমাত্মা।

বলছেন, যজ্ঞ আর শরীর দুটো একসাথে জুড়ে রয়েছে। যজ্ঞের দেবতা হলেন বিষ্ণু, তাঁর সাথে শরীর জুড়ে আছে, সেইজন্য বিষ্ণু হলেন অধিযজ্ঞ। ঘুরে ফিরে দেখাতে চাইছেন সব কিছুতেই কিভাবে আসল জিনিসটা হলেন ঈশ্বর আর পদার্থ রূপে যা কিছু আমরা দেখছি, সেটা ত্যাজ্য। পাঁচ নম্বর শ্লোক থেকে বলতে শুরু করবেন মৃত্যুর পর কি হয়। সাতটা প্রশ্নের মধ্যে ছটা প্রশ্নের ব্যাখ্যা করা হল, এবার সাত নম্বর প্রশ্ন আসছে।

আমরা এখন গীতার যে জায়গাতে আছি, এখানে মানুষকে কয়েকটা শ্রেনীতে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সবার উপরে হলেন আত্মজ্ঞানী, যিনি তাঁর জীবদ্দশায় আত্মাকে জেনে গেছেন বা ঈশ্বরকে জেনেছেন। ঈশ্বরকে জানা মানে ঈশ্বর দর্শন না। আত্মাকে যিনি অনন্ত রূপে

জেনেছেন, নিজেকে যিনি অনন্ত রূপে জেনেছেন। এই ধরণের আত্মজ্ঞানীর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি, পঞ্চম অধ্যায়ে যেখানে বলছেন *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ*, যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে তাঁর সেখানেই মুক্তি, তাঁর আর কিছু করার অবশিষ্ট থাকে না। এনাদের থেকে এক ধাপ নীচে আসছেন, যাঁরা নির্গুণ উপাসক বা সগুণ উপাসক। যাঁরা মন্ত্র জপ করেন, শিবের হোক, কৃষ্ণের হোক, ঠাকুরের হোক, এনারা সগুণ উপাসাক। এনাদের জীবদ্দশায় আত্মজ্ঞান হল না, কিন্তু সারাটা জীবন উপাসনা করে গেছেন। বলছেন, এনারা মৃত্যুর পর দেবযানে, বেদে দেবযান হল একটা পথ, সেই পথে তাঁরা চলে যান ব্রহ্মলোকে। শিবলোক, বৈকুণ্ঠ বা বিষ্ণুলোক সব একই জিনিস।

ঠাকুর কথামৃতে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণের কথা বলছেন। স্থূল মানে এই দেহ, সূক্ষ্ম মানে মৃত্যুর পর জীবাত্মা আমাদের আমিত্বের কিছু কিছু, যেমন মন আর ইন্দ্রিয়কে সঙ্গে করে স্থূল শরীর থেকে বেরিয়ে যান, এটাকে বলে সূক্ষ্ম শরীর। কারণ শরীর হল, যেখানে ইন্দ্রিয়গুলিকেও ফেলে দেওয়া হয়েছে, থেকে গেছে শুধু শুদ্ধ পবিত্র মন। এটা হল লণ্ঠনের আলোর উপর খুব সূক্ষ্ম একটা কাঁচের ব্যবধান। কারণ শরীর মানে যেখানে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করছেন, ছুঁই ছুঁই অবস্থা; কিন্তু ঈশ্বরকে ছুঁতে পারছেন না। এনারা ব্রহ্মলোকে থাকেন, আমরা বলি বৈকুণ্ঠ বা রামকৃষ্ণলোক। আর অল্প, খুব সামান্য একটু যদি বাসনা থেকে থাকে, তাঁকে আবার এই মায়ার জগতে ফেরত আসতে হবে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে খুব সুন্দর বলছেন, সুরথ রাজা আর সমাধি বৈশ্য দুজনই মায়ের সাধনা করলেন। সমাধি বৈশ্য সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে গেলেন। কিন্তু সুরথের মনে বাসনা ছিলেন, আমি রাজা হব, এর পরের যে মণ্বন্তর সেখানে তিনি মনু হয়ে জন্মাবেন।

সামান্যতম বাসনাও যদি থাকে, তা সে যে কোন ধরণের বাসনাই হোক; অনেক যুগ, কোটি কোটি বছর ব্রহ্মলোকে থাকার পর ওই বাসনাই আবার তাঁকে জন্মমৃত্যুরূপী সংসারে ফেরত নিয়ে আসবে। সাপলুডো খেলায়, আটানব্বই এর ঘরে একটা সাপের মুখ থাকে, ওর মুখে ঘুটি পড়লে পুরোটা আবার নামিয়ে দেয়। আটানব্বই এর ঘরে গিয়েও যেমন অনেকের মুক্তি হয় না, তেমনি ব্রহ্মলোকে গিয়েও অনেকের মুক্তি হয় না, আটকে যায়। আর বলছেন, যাঁরা কর্মযোগী, যাঁরা যজ্ঞাদি করছেন, নিষ্কাম ভাবে সেবা করে যাচ্ছেন, যাঁরা দেশ সেবা, সমাজ সেবা করে যাচ্ছেন, এনাদের হয়ত আত্মজ্ঞান হয়নি, বা শুদ্ধিটাও সেই পর্যায়ে হয়নি, এনারা পিতৃযান; এটাও একটা পথ, এই পথে তাঁরা পিতৃলোকে যান, যেখানে তাঁদের পিতৃরা রয়েছেন। আসলে আমাদের ধর্ম খুব প্রাচীন ধর্ম, যজ্ঞ প্রধান ধর্ম; যজ্ঞে আহুতি আদি দেওয়া হত। বিভিন্ন রকমের আহুতি হত, সেখানে যদি পুরোপুরি স্বার্থশূন্য না থাকা যায়, তাহলে উচ্চমানের স্বর্গের বদলে তাঁদের সাধারণ স্বর্গে নিয়ে যাবে। পিতৃলোক অর্থাৎ পিতৃদের যে স্বর্গ সেটাও ভাল, কিন্তু সাধারণ, সেখানে ইন্দ্রাদি দেবতারা নেই, আর সেখান থেকে তাড়াতাড়ি নেমে আসেন।

এই তিনটে শ্রেনী বলা হল, প্রথম হল ভাল কর্ম করছেন, দ্বিতীয় বিরাটা সাধনা করেছেন, আর তৃতীয় তাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে। এই তিনটের পর আসে মিশ্রিত, আমাদের মত লোক, কিছু ভাল কর্ম করলাম আবার কিছু খারাপ কর্মও করলাম; এরা মায়ার রাজ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। নচিকেতা তাঁর বাবাকে বলছেন, *সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিব জায়তে পুনঃ*, ধান গমের মত এরা জন্মায় আর মরে, মরে জন্মায় আবার মরে, আবার জন্ম নেয়, এই অবস্থা চলতেই থাকে। কিছু কিছু পুরাণাদিতে বর্ণনা আছে, মৃত্যুর পর এরা প্রেতলোকে সূক্ষ্ম শরীরে থাকে, তারপর আবার কোথাও জন্ম নেয়। এদের আর স্বর্গ আর পিতৃলোক যাওয়া হয় না, এখানেই ঘুর ঘুর করতে থাকে। অনেক সময় ছোট শিশুকে দেখে বলে, দেখ দেখ ওর চোখটা কি রকম ওর দাদুর মত, ওর নাকটা ঠাকুরমার মত। এগুলোকে আমরা মনে করি জেনেটিক, শুধু যে জেনেটিকে হয় তা না, বাস্তবে ওদের আত্মা একই পরিবারে এসে জন্ম নেয়।

আমার একটা জানা ঘটনার কথা এখানে বলা যেতে পারে, আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক, বয়স হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সন্তান হচ্ছিল না। দুঃখ করে একদিন আমাকে বলছিলেন, 'মহারাজ, আমাদের বংশ রক্ষা মনে হয় আর হল না'। আমিও মুখ ফসকে সবাইকে যেমন বলে দিই, ওনাকেও বলে দিলাম, 'যান, আপনার এবার সন্তান হয়ে যাবে'। 'বলছেন, আমরা তো আশা ছেড়ে দিয়েছি'। 'আমি বলে দিয়েছি, হবে'। কিছু দিন পর একটা কারণে ওনাকে ফোন করলাম, ফোনে আমাকে জানালেন, 'আমার বাবা খুব অসুস্থ'। হতেই পারে, বয়স হয়ে গেছে। কয়েক দিন পর আমার ফোনে ওনার একটা মেসেজ এলো, বাবা গত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি ওনাকে ফোন করলাম, 'দেখুন তো আপনার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা কিনা'। জানলাম, ঠিকই তিনি অন্তঃসত্ত্বা। তারপর সন্তান হওয়ার খবর দিলেন। দিল্লীতে থাকেন, সেখান থেকে দেখা করতে এসেছিলেন। জানতাম, ওখানেই বাবা ঘুরঘুর করতে থাকবেন।

এরপর আসে নিষিদ্ধ কর্ম, শাস্ত্রে যে কর্ম করতে নিষেধ করে দিয়েছে, সেটাই করছে। এদেরও পুনর্জন্ম হতে থাকে, কিন্তু আরেকটু নিম্ন যোনিতে জন্ম নেয়। নিষিদ্ধ বলতে দুটো মিলিয়েই আছে, শুভও আছে নিষিদ্ধও আছে। তার নীচে বলছেন অতি নিষিদ্ধ কর্ম। কোন মতেই এই কর্ম করা চলবে না। নিষিদ্ধ কর্ম গর্হিত যোনিতে গিয়ে জন্ম নেওয়াবে, পাতাল লোকে জন্মাবে, নরকে জন্মাবে, সাপ বিছে হয়ে জন্মাবে। বেশির ভাগ লোক যাদের দেখি আর ভাবি, ভাই অনেক শুভকর্মে মানুষ হয়ে জন্মেছ, যেভাবে ব্যবহার করছ, সাপ বিছে হওয়া ছাড়া তোমার কোন গতি নেই। অনেক জন্ম ধরে শুভ কর্ম করে করে মানুষ যোনিতে এসে জন্ম নেয়।

এই হল মোটামুটি পাঁচটি শ্রেনী, কিংবা ছয় বলতে পারেন। ১) আত্মজ্ঞানী, ২) উচ্চমানের সাধক, ৩) সাধারণ সাধক, যাঁরা যজ্ঞাদি করেন, ৪) যাঁরা মিশ্রিত কর্ম করে, শুভ কর্মও করছেন তার সাথে নিষিদ্ধ কর্মও করেন, আর ৫) অতি নিষিদ্ধ বা গর্হিত কর্ম। মৃত্যুর পর সবাই এই কটার মধ্যে ঘুরতে থাকবে। কেউ যদি অত্যন্ত বাজে কাজ করে থাকে, আমাদের মধ্যে বেশির ভাগই করে থাকে, এদের গর্হিত যোনিতে, সাপ বিছে হয়ে জন্মাতে হবে। আমার একজন খুব পরিচিত ছিলেন, উনি খুব পরনিন্দা করতেন, আমি তাঁকে মিষ্টি করেই বললাম, 'আপনার ছারপোকা যোনি একেবারে নিশ্চিত'। যাদের মধ্যে প্রচুর কাম-বাসনা আছে, তারাও ঐ রকম যোনিতেই যাবে যেখানে মনের আনন্দে কাম-বাসনা মেটাতে পারবে। মাংস খেতে খুব ভালবাসে, সিংহ বাঘ কিছু একটা হয়ে জন্মাবে। একটু শুভ কর্ম করলে পিতৃলোক পর্যন্ত যাবে, জোর সাধন-ভজন করা থাকলে ব্রহ্মলোকে যাবে, আর এখানেই যদি জ্ঞান হয়ে যায়, তাঁকে আর কিছু করতে হবে না, এখানেই তাঁর মুক্তি হয়ে যাবে।

এই একটা কথা হিন্দু ধর্মকে বিশ্বের সমস্ত ধর্ম থেকে আলাদা করে রেখেছে – মৃত্যুর পরে জ্ঞান হবে হিন্দু ধর্ম মানে না, এখানে এই দেহেই, এই জীবদ্দশায় তুমি ঈশ্বরের সাথে, পরমাত্মার সাথে এক হয়ে যেতে পারো, এটাই হিন্দু ধর্মের শাশ্বত সত্য। কোন ধর্ম বলতে পারবে না যে, জীবদ্দশায় তোমার স্বর্গপ্রাপ্তি হয়ে যাবে, আর হিন্দুরা বলে, জীবদ্দশায় তোমার মুক্তি হতে পারে যদি তুমি আত্মজ্ঞান লাভ করে নিতে পার। বাল্মীকি রামায়ণে শরভঙ্গ ঋষি শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন, 'হে রাম আমি সমস্ত লোককে জয় করে নিয়েছি, তোমাকে সব লোক দিয়ে দিচ্ছি'। লোককে জয় করে নেওয়া মানে, আমার খুশী মত আমি সব লোকে যেতে পারি।

অন্তকালে চ মামেব স্মরণ্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।।৫।।

(যিনি মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তিনি আমাকেই লাভ করেন, এতে কোন সন্দেহ নেই।)

ভগবান বলছেন, মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করতে করতে যিনি এই শরীর ত্যাগ করেন, তিনি আমার কাছেই আসেন। বারাসত আশ্রমে আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন। শরীর খুব অসুস্থ হওয়াতে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ওনার দেহত্যাগের দুদিন আগে আমরা কয়েকজন দেখা করতে গিয়েছিলাম। তখন ওনার চেতনা প্রায় চলে গিয়েছিল। ঠাকুরের একটা ছবি দেখিয়ে তাঁকে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'মহারাজ চিনতে পারছেন'? কোন রকমে চোখটা খুলে দেখে বলছেন, 'আহা প্রাণটা জুড়িয়ে গেল'। চেতনার মধ্যে ঠাকুর বসে আছেন। যে আমাকে স্মরণ করে, সে আমার কাছে চলে আসে।

অর্জুনের প্রশ্ন ছিল, মৃত্যুকালে জিতেন্দ্রিয় যোগিরা কিভাবে আপনাকে লাভ করে? ভগবান বলছেন – *অন্তকালে চ মামেব স্মরণমুক্ত্বা কলেবরম্* –মৃত্যুর সময় যে আমার স্মরণ মনন ও ধ্যান করতে করতে দেহত্যাগ করে, সে *মদ্ভাবং যাতি*, সে আমারই ভাব পেয়ে যায়। *নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ*, এই ব্যাপারে তোমার যেন কোন সংশয় না থাকে। এখানে বলছে *স মদ্ভাবং*, আমার ভাব। শ্রীকৃষ্ণের ভাব মানে ভগবানের ভাব। ভগবানের ভাবটা কি? শুদ্ধ চৈতন্য, অনন্তের ভাব। এখানে শঙ্করাচার্য বলছেন –*মদ্ভাবং বৈষ্ণবম্*, বিষ্ণুর পরম তত্ত্বটা পেয়ে যান। এখন পরম তত্ত্বটা কি? যারা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ণ করেছেন, গুরুমুখে শাস্ত্র কথা শুনেছেন তাঁদের না হয় পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে। কিন্তু সাধারণ লোকেদের 'তিনি পরম তত্ত্ব লাভ করেন' বললে কি বুঝবে! তাই বলা হয় বিষ্ণুলোক আছে, বৈকুণ্ঠ আছে, যারা কৃষ্ণ ভক্ত তারা ওখানে যায়, সেখানে শুধু সুখ আর সুখ, আর ভোগের কত অফুরন্ত সামগ্রী। গীতায় কোথাও কিন্তু এই ধরণের কথা বলা হচ্ছে না। গীতা বলছে –সে আমার পরম তত্ত্ব পেয়ে যায়, আমার ভাব পেয়ে যায়, সে আমার কাছে চলে আসে। এখন যেমন ঠাকুরের কোন ভক্তের শরীর চলে গেলে আমরা বলি তিনি পরমধাম শ্রীরামকৃষ্ণলোকে চলে গেলেন। আসলে তা নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবটাকে পেয়ে গেলেন। ঠিক তেমনি শিবলোকে যাবেন, মানে শিবের ভাব পেয়ে যাচ্ছেন। যখনই কেউ বিষ্ণুর ভাব পেয়ে গেলেন, তারপর তাঁর আর পাওয়ার কিছু থাকল না, মানে তাঁর মুক্তি হয়ে গেল। এটাই সপ্তম প্রশ্নের উত্তর। যদি তুমি মৃত্যুর সময় আমার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তন করতে পার তাহলেই তুমি *মদ্ভাবং*, আমার ভাব পেয়ে যাবে।

সেইজন্য এখনও কারুর মরার সময় হলে বাড়ির লোকেদের বলা হয়, তোমরা সবাই মিলে হরিনাম কর। উদ্দেশ্য যদি তার কানে একটু হরিনাম যায়, যদি সেই সময় অন্য চিন্তা না করে হরির কথা মনে পড়ে। গীতা বলছে মৃত্যু কালে তুমি ভগবানের নাম কর, মানে তাঁর কথা চিন্তা কর। কে চিন্তা করবে? যিনি মারা যাচ্ছেন তাঁকে করতে হবে। কিন্তু তিনি তো করেন না, করে তাঁর বাড়ির লোকেরা, আর না হলে বন্ধু-বান্ধবরা করে। এতে কিছুই হয় না। আমরা মনে করি মৃত্যুর সময় ইন্দ্রিয়গুলো যখন ছেড়ে দিতে থাকে তখন এই হরিনাম কানে গিয়ে তাঁর মনে একটা কিছু হয়তো ছাপ পড়ে, হরিনাম শুনে যদি ভগবানের কথা মনে পড়ে, তখন হয়তো কিছু কাজ করে। এই ভেবে আমরা শান্তি পাই, আর আমরা একজন মৃত্যু পথযাত্রীর কানে হরিনাম দিয়ে মহৎ দায়ীত্ব পালন করছি। আমাদের আবার এও বলা হয় যে, সারা জীবন যদি তুমি ভগবানের কথা নাই ভাবো মরার সময় যতই হরিনাম করা হোক না কেন ভগবানের কথা কিছুতেই মনে আসবে না। কারণ মৃত্যুর সময় সবার আগে ইন্দ্রিয়গুলো অস্তমিত হয়ে যায়, মস্তিষ্ক আর মন যদিও বা তখন কাজ করে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলো আর কাজ করে না। এখন সবাই হরিনাম করছে, সেই হরিনাম তো তার কানে যাচ্ছেই না। তখন মস্তিষ্ক আর মন কি করবে? যে ভোগী মানুষ তার ভোগের কথাই মনে আসবে।

আমার আপনার জন্য গীতা কি বলছে? ঈশ্বরে জো সো করে আগে ভক্তি লাভ কর। প্রথমেই যদি এটা কি, ওটা কি প্রশ্ন নিয়ে সংশয় মেটাতে যাও তাহলে তোমার আর ভক্তি লাভ হবে না, প্রশ্ন আর সংশয়ের মধ্যেই ঘুরপাক খেতে খেতে এক সময় দেখবে মৃত্যুর ঘন্টা বেজে গেছে। ঠাকুর বলছেন জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের জ্ঞান, ভক্তির ঐশ্বর্য লাভ করা। তোমার মুক্তি আছে কি নেই এই

ব্যাপারে তুমি কি বুঝবে। তুমি তো জন্মান্তরেই বিশ্বাস করতে পারছ না, যতক্ষণ জন্মান্তরকে চোখে না দেখছ ততক্ষণ তুমি কি করে বিশ্বাস করবে! কারণ এগুলো তোমার সব শোনা কথা। যে জন্মান্তরকেই বুঝতে পারছে না, সে মুক্তি আছে কি নেই কি করে বিশ্বাস করবে। সেইজন্য বলছেন, আগে জ্ঞান অর্জন কর, ভক্তির ঐশ্বর্য অর্জন কর, ঐশ্বর্য মানে বিরাট সম্পত্তি। ঈশ্বরের প্রতি এমন জ্ঞান অর্জন করতে হবে যে জাগতিক জ্ঞানের যেটা অত্যন্ত দুরূহ সেটাও সহজ হয়ে যাবে, আর ঈশ্বরের প্রতি এমন ভালোবাসা আনতে হবে যে ওই ভালবাসায় জাগতিক সুখ সম্পদ সব কিছু তুচ্ছ হয়ে নিচে পড়ে থাকবে।

মানুষ সারা জীবনব্যাপী অনেক পরিশ্রম করে অনেক কিছু অর্জন করার পর খুব আশা করে শেষ জীবনে ঐ অর্জিত জিনিসই তাকে সাহায্য করবে। যে সারা জীবন প্রচুর টাকা পয়সা রোজগার করে গেছে সে ভাবছে শেষ জীবনে এই অর্জিত অর্থই আমাকে নিরাপত্তা দেবে। যে পরিবার, বন্ধু, বান্ধবদের নিয়ে সারা জীবন চলে এসেছে, অনেক সন্তান, নাতিপুতি, বন্ধু বান্ধব জুটিয়েছে, সে আশা করে এরাই আমার শেষ জীবনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু যে সারা জীবন ধরে ভগবানের জ্ঞান, ভক্তি, ঐশ্বর্যকে অবলম্বন করে চলেছে, শেষ বয়সে তাকে কে রক্ষা করে? এই জ্ঞান-ভক্তির ঐশ্বর্যই তাকে রক্ষা করে। তাই বলে মৃত্যুর সময় সে কি কষ্ট পাবে না? খুব পাবে। যার টাকা পয়সা আছে সে কি মৃত্যুর সময় কষ্ট পায় না; যার স্ত্রী, সন্তান, নাতিপুতি বন্ধু বান্ধব অনেক আছে সে কি কষ্ট পায় না? সেও খুব কষ্ট পায়। একটা অবস্থার পর কেউ কারুর কষ্ট ভাগ করে নিতে পারে না। আমার যখন শরীর খারাপ করে তখন ডাক্তার ভালো ভালো দামী ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করতে পারে কিন্তু আমার যে শারীরিক কষ্ট সেটা আমাকেই সহ্য করতে হবে। টাকা আমার যতই থাকুক আর সেই টাকা দিয়ে সেরা ডাক্তার, সেরা নার্সিংহোম সব করা যেতে পারে, কিন্তু কষ্টটা কেউ নিয়ে নিতে পারবে না।

যং যং বাপি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।।৬।।

(হে কৌন্তেয়, যিনি মৃত্যুকালে যে দেবতার চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করেন, সেই দেবতার নিষ্ঠাতে অভ্যস্ত তিনি সেই দেবতাকেই প্রাপ্ত হন।)

মৃত্যুর সময় যে যা চিন্তা করে, তার পুনর্জন্ম ঠিক সেই চিন্তানুসারে হয়। ভাগবতে জড়ভরতের খুব বিখ্যাত কাহিনী আছে। জড়ভরত সব কিছু ত্যাগ করে এক গভীর জঙ্গলে তপস্যা করছিলেন। সেখানে একটা হরিণ বাঘের তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে প্রসব হয়ে যায়, হরিণটা সেখানেই মারা যায়। জড়ভরতের নজরে আসে। তিনি সেই হরিণ শাবককে নিজের কাছে নিয়ে এসে খুব যত্ন করে লালন-পালন করতে লাগলেন। জড়ভরতের মন সব সময় ওই হরিণ শাবকের উপর পড়ে থাকত। যখন তিনি মারা যাচ্ছেন, তখন ভাবছেন, আমি মারা যাওয়ার পর এই হরিণ শাবকের কি হবে? হরিণের চিন্তা করতে করতে তিনি মারা গেলেন। মৃত্যুর পর তাই তাঁকে হরিণ হয়ে জন্ম নিতে হল। এটা কাহিনী, সত্যি কি হয়েছিল আমরা জানি না, কিন্তু গীতার অষ্টম অধ্যায়ের যে ভাব, সেই ভাবকে এই কাহিনী পুষ্টি করে দিচ্ছে।

ভারতবর্ষে প্রচলিত প্রথানুসারে সন্তানের নাম এতদিন যাবৎ কোন ঠাকুর দেবতার নামে রাখা হত, হরি, নারায়ণ, কৃষ্ণ, রাম ইত্যাদি এই ধরণের নাম রাখা হত। মৃত্যুর সময় সবাই নিজের আপনজনকে ডাকে, মৃত্যুর সময় ঠাকুর দেবতার নাম ধরে ডাকতে গিয়ে যদি সেই সময় চেতনাটা কোন রকমে জেগে যায়। মৃত্যুর সময় যে যেমন ভাব স্মরণ করতে করতে এই কলেবর ত্যাগ করে সে সেই ভাবকেই প্রাপ্ত করে। কথামৃতে ঠাকুর অসন্তুষ্ট হয়ে বলছেন, নাভিশ্বাস উঠে গেছে কিন্তু তখনও বলছে, ‘ওরে পিদ্দিমের সলতেটা কমিয়ে দে, তেল পুড়ছে’।

আমাদের প্রশ্ন হতে পারে যে, মরার সময় বাবা ছেলের চিন্তা করছে, এখন বাবা মৃত্যুর পর কি ছেলেকে প্রাপ্ত হবে? না, তা হবে না। এখানে বলা হচ্ছে, যে ভাব। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে গুরুত্ব হচ্ছে ভাবের। তার মানে, বিষয় চিন্তা করতে করতে সে যদি মারা যায় তাহলে কিন্তু সে ঐ বিষয়তেই গিয়ে জন্ম নেবে। ছেলের চিন্তা মানে সাংসারিক ভাব, মৃত্যুর পর বাবা আবার ফিরে এসে এই সাংসারিক ভাবকেই আশ্রয় করবে। আধ্যাত্মিক চিন্তন করতে করতে যদি মারা যায় তাহলে তার আধ্যাত্মিক ভাবে গিয়ে জন্ম হবে। আমরা মনে করি মৃত্যুর সময় যে চিন্তা নিয়ে মরবে সে তাই হবে, এখানে কিন্তু তা বলা হচ্ছে না, যে চিন্তাটা করছে তার ভাবটা পাবে।

একটা গল্প আছে। একজন লোক খেটেখুটে অনেক টাকা আয় করেছে। দেখছে, ছেলেগুলি কিছুই করছে না। মৃত্যুর আগে তার অর্জিত সমস্ত ধন একটা কলসীতে ভরে বাড়ির ভিতর মাটি খুঁড়ে একটা জায়গায় লুকিয়ে রেখে দিয়েছেন। ভদ্রলোক যখন মারা যাচ্ছেন তখনও তাঁর চিন্তা, ছেলেগুলোর ভাল কি করে হয়। একজন খুব উচ্চ সাধু-মহাত্মা লোকটির রকম সকম দেখে বুঝতে পেরেছেন, লোকটি কোন দিকে এগোচ্ছে। ঠিক তাই হল, মৃত্যুর পর লোকটি ঐ বাড়িতেই বলদ হয়ে জন্মাল। বলদ হয়ে সে শুধু চাষ করে যাচ্ছে, যাতে ছেলেদের একটু মঙ্গল হয়। ছেলেগুলো সব অপদার্থ, কোন পরিশ্রম করে না, বসে বসে খেয়ে আর ফুর্তি করে জীবন কাটিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা। ছেলেগুলো বলদটাকে খুব করে খাটায়। সেই সাধুবাবা একদিন বলদকে এসে বলছে, ‘তুমি এটা কি করছ? কাদের জন্য এত খাটছ’? বলদটাও একদিন মারা গেল, কিন্তু ছেলেদের জন্য চিন্তাকে ছাড়তে পারল না, এবার সে এক বিষধর সাপ হয়ে ঐ লুকনো ধন সম্পদ রক্ষা করে যাচ্ছে সন্তানদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে। এটা দেখে সাধুবাবা আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। আহা রে এত ভাল মানুষ কিন্তু কি দুরবস্থা। লোকটাকে বাঁচাতে হবে।

যথারীতি সেই সাধুবাবা একদিন ঐ বাড়িতে গিয়ে ছেলেগুলিকে বললেন, ‘তোমাদের বাবা তোমাদের জন্য অনেক ধন সম্পদ রেখে গেছেন’। ছেলেগুলো তো হাতে চাঁদ পেয়ে গেল। ‘বলুন বলুন কোথায় সেই ধন সম্পদ’। ‘একটা ঘরে মাটির নীচে লুকনো আছে, কিন্তু ওখানে এক বিষধর সাপ ঐ সম্পদকে রক্ষা করছে, কাছে গেলেই একটা ছোবলেই শেষ করে দেবে’। ‘তাই নাকি, দেখুন সাপকে কিভাবে শায়েস্তা করত হয়’। সব ছেলেরা লাঠি সোটা নিয়ে ঐ ঘরে ঢোকে, ওখানেই সাপটাকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলল। তখন গিয়ে সর্প যোনিতে সেই লোকটার চেতনা হল, যে ছেলেদের জন্য এত করলাম, এখনও যাদের জন্য এত চিন্তা করছি, তারাই আমাকে এভাবে পিটিয়ে মেরে ফেলল। সাধুর কৃপা ছিল। সেখান থেকে আস্তে আস্তে তার মনটা উপরে উঠে গেল।

সারাটা জীবন আমরা যা যা ভেবেছি, যা কিছু নিয়ে জীবন কাটিয়েছে, মৃত্যুর সময় ওগুলোই মনে আসবে। ঠাকুর কথামৃতে একটা ঘটনা বা গল্প বলছেন, এক বিধবা মহিলা, খুব ভাল মহিলা, মৃত্যুর সময় তাকে গঙ্গার পারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গঙ্গার ঢেউগুলো তার গায়ে লাগছিল, তাতে স্পর্শ সুখটা তার খুব ভাল লাগল। ঠাকুর বলছেন, সেখান থেকে ঐ মহিলা অমুক ধরণের মেয়ে হয়ে জন্ম নিল। এগুলো কাহিনী, আমরা এই ঘটনা আক্ষরিক অর্থে নিতে পারি না। কিন্তু শাস্ত্রে কি বলতে চাওয়া হয়েছে, এই কাহিনীতে পরিষ্কার হয়ে যায়।

তস্মাদ্ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যার্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্।।৭।।

(অতএব, সর্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং নিজের ক্ষাত্র ধর্ম পালনের জন্য যুদ্ধ কর। আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করলে আমাকে লাভ করবে। এতে কোন সন্দেহ নেই।)

এই শ্লোকটাকে কাগজে লিখে বা কম্প্যুটার থেকে প্রিন্ট নিয়ে বাড়ির দেওয়ালে কয়েক জায়গায় লাগিয়ে রাখুন। অধিভূত থেকে শুরু করে এত কথা বলার পর এখানে এসে এবার ভগবান বলছেন, *তস্মাদ্ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ*, সেইজন্য অর্জুন, সর্ব অবস্থায়, সর্বদা আমাকে স্মরণ করে যুদ্ধ করে যাও। আমাকে কক্ষণ ভুলে থাকবে না, তবেই তোমার মুক্তি নিশ্চিত, তা নাহলে তোমার মুক্তি হবে না। আমি একজন মহারাজের ঘরে দেখেছিলাম, এই শ্লোকটা বড় করে দেওয়ালে লাগানো ছিল।

মাম্ মানে আমাকে, *অনুস্মর* মানে আমাকে স্মরণ করে *যুধ্য চ*, যুদ্ধ কর। রান্না করছেন, রান্নাঘরে টাঙিয়ে রাখুন *মামনুস্মর*, আমাকে স্মরণ করে রান্না কর। ঝগড়া করছেন, *মামনুস্মর যুধ্য চ*, মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছেন, *মামনুস্মর যুধ্য চ*, যত রকম গোলমাল করছেন, শুভ অশুভ যা করছেন, *মামনুস্মর যুধ্য চ*, এখান থেকে জীবন একেবারে পাল্টে যাবে, চেতনা পাল্টে যাবে।

এখানে *যুধ্য চ* বলতে জেহাদীরা কথায় কথায় বোমা মেরে যাচ্ছে সেই রকম করতে বলছেন না, আচার্য বলছেন –*স্বধর্মং কুরু*। *যুধ্য চ* বলতে শুধু যুদ্ধ করার কথাই বলা হচ্ছে না, মায়েরা যেমন রান্না করেন, বিছানা পরিষ্কার করেন, কাপড় কাচছেন, ঝাঁটা দিচ্ছেন, এখানে সমস্ত রকমের কাজকেই ধরা হচ্ছে। যখনই যা কাজ করবে *মামনুস্মর যুধ্য চ*, আমাকে স্মরণ করে কাজ করবে, যুদ্ধ বলতে স্বধর্মের কথা বলা হচ্ছে, *যুধ্য চ* এই একটা শব্দ দিয়ে সব কর্মকেই বোঝান হচ্ছে, নিজে যা কিছু কর্ম করছে। তাহলে কি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে চুরি চামারি করা যাবে? আদপেই করা যাবে না। কেন করা যাবে না? কারণ চুরি চামারি করাটা স্বধর্মের মধ্যে পড়ছে না, যেটা স্বধর্মের মধ্যে পড়ে না, সেই ধরণের কোন কিছুই আলোচনার মধ্যে আসবে না। যেটা আমার ধর্ম, যে ধর্মানুসারে আমি এই শরীরে জন্ম নিয়েছি, সেই ধর্মানুসারে যে কর্মগুলো আসবে সেই কর্মের কথাই এখানে বলা হচ্ছে, আর আমার যিনি ইষ্ট, যে দেবতাকে আমার ভালো লাগছে সেই ইষ্ট বা দেবতার ভাবে ভাবিত হয়ে এই কর্মগুলো করতে হবে।

ময্যার্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্, মন-বুদ্ধি নিয়ে আগে আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি, মন মানে যেখানে সঙ্কল্প বিকল্প হতে থাকে; করব কি করব না; বুদ্ধি হল, যেটা স্থির ভাবে বলে দেয় এটাই করতে হবে। আমাতে তোমার মন আর বুদ্ধিকে লাগিয়ে রাখ, যদি এই রকম করতে পার *মাম্ এব এষ্যসি*, তুমি আমার কাছে আসবেই আসবে, কেউ তোমাকে আটকাতে পারবে না, আর *অসংশয়ম্*, এতে কোন সন্দেহ নেই। ঠাকুর বলছেন দশবার তাগী তাগী বললে গীতা গীতা হয়ে যাবে, তাগী মানে ত্যাগী। ত্যাগী কি? *মামনুস্মর যুধ্য চ*। ভাল মন্দ যা করতে ইচ্ছা হয় করুন।

কিন্তু পরের লাইনে বলছেন, *ময্যার্পিতমনোবুদ্ধিঃ*, তোমার মন, তোমার বুদ্ধি আমাকে অর্পণ কর। একদিকে আমি বলব, হে কৃষ্ণ যা কিছু আছে সব তুমিই; এরপর আমি কি কাউকে গিয়ে খুন করতে পারব? পারব না। প্রথমের দিকে স্বভাবে পারব, কিন্তু আস্তে আস্তে স্বভাবটা পাল্টে যাবে। *মাম্* বলতে আমার যিনি ইষ্ট। আমরা অনেক সময় সন্তানকে বলি, 'জানো, এই সমস্ত কিছু আমি তোমার জন্যই করেছি'। রত্নাকর দস্যু তার পরিবারের লোকদের বলছে, তোমাদের জন্য আমি ডাকাতি করতাম। যাকে ভালবাসি, তাকে মনে করেই আমরা সব কিছু করি। কাকে ভালবাসব? একমাত্র ঈশ্বরকে, আর কাউকে ভালবাসা যায় না। ঈশ্বরকে ভালবাসা মানেই সবাইকে ভালবাসা।

যাঁরা গীতা প্রথম শুনছেন তাঁরা গীতার অনেক কথা বুঝবেন না, না বোঝারই কথা। গীতা যাঁরা এর আগে ভাসা ভাসা শুনেছেন তাঁরাও গীতার অনেক কিছু বুঝতে পারবেন না, তাঁদেরও মনে অনেক প্রশ্ন আসবে। তবে এটা ঠিক যে, যে কোন বিষয়কে জানার জন্য দীর্ঘ দিন ধরে প্রচুর খাটতে হয়। গীতার অষ্টম অধ্যায়ের আট নম্বর শ্লোকে যাওয়ার আগে কয়েকটা মূল কথা আমাদের জেনে

রাখা দরকার। অর্জুনের সাতখানার প্রশ্নের শেষ প্রশ্ন ছিল, মানুষ মৃত্যুর সময় আপনাকে কিভাবে পায়। এই প্রশ্নের উপর আমরা বিস্তারে আলোচনা করেছি। তার সাথে সাত নম্বর শ্লোকের প্রথম পঙক্তির শেষ অংশ *মামনুস্মর যুধ্য চ* এটাকে লিখে দেওয়ালে লাগাতে বলা হয়েছে।

আগেকার দিনে যাঁরা গুরুগৃহে বেদ অধ্যয়ন করতে যেতেন, তাঁরা কত তপস্যা করতেন। গুরুর আশ্রমে সারাদিন প্রচুর পরিশ্রম করতে হত, গুরু একটা দুটো মন্ত্র শিখিয়ে দিতেন আর বছরের পর বছর বেদ মুখস্ত করে যেতেন। সেইজন্য ব্রাহ্মণদের তখন এত সম্মান ছিল। যাঁরা খাটতে পারবেন না, যাঁরা খাটবেন না, তাঁদেরকে এই বিদ্যা দেওয়া হত না। আজ ছাপাখানার দৌলতে, ইন্টারনেটের সৌজন্যে ঘরে বসে আমরা এই বিদ্যা সহজে পেয়ে যাচ্ছি। তার উপর আবার জানতে চাইছি, দেবনাগরীর বদলে বাংলা হরফে কি পাওয়া যাবে না? আমরা এতটুকুও খাটতে চাইছি না, একটু খেটে চেষ্টা করে সংস্কৃত হরফটা শিখে নেওয়া এমন কিছু না, সংস্কৃত ভাষাটা নাই বা শিখলেন কিন্তু হরফগুলি তো শিখে নেওয়া এমন কোন কষ্টের না, সেই কষ্টটাও আমরা করতে চাইছি না। আমরাই আবার আশা করছি গীতা বুঝব।

অনেকে হয়ত বলবেন, তাহলে উদ্বোধন থেকে কেন বাংলা হরফে গীতা ছাপা হয়েছে। কারণ তখনও আমাদের সেই সুযোগ তৈরী হয়নি, সবে আমরা একটা অবস্থা থেকে আরেকটা অবস্থায় পৌঁছানর চেষ্টা করছি। এখানে যাঁরা গীতা শুনছেন, তাঁদের কাছে আমরা আশা করছি, তাঁরা অল্প একটু খাটবেন। যে শ্লোকগুলো ভাল লাগছে সেই শ্লোকগুলো মুখস্ত করে নেবেন। আর শ্লোকগুলিকে সংস্কৃত হরফে পড়ার চেষ্টা করতে হবে। একটু চেষ্টা করলেই সংস্কৃত হরফটা শিখে নেওয়া যায়, এখানে সংস্কৃত ভাষা শেখার কথা বলা হচ্ছে না। পরিশ্রম করলে বিদ্যাটা থাকে। আজকে ইন্টারনেট এসে যাওয়াতে বিদ্যা এমনিই আমাদের কাছে সহজলভ্য হয়ে গেছে। সেইজন্য বিদ্যা টিকছে না, কোন প্রভাব ফেলতে পারছে না, আমাদের মন পাল্টাচ্ছে না, দিনে দিনে আমরা আরও কেমন পশুর মত হয়ে যাচ্ছি। বিদ্যার পিছনে প্রচুর খাটনি দিতে হয়, তবে গিয়ে বিদ্যা নিজেকে উন্মুক্ত করবেন।

এখানে অর্জুনকে ভগবান বলছেন, যে কাজই তুমি করবে, *মামনুস্মর যুধ্য চ*। যে কাজই করি না কেন, ঠাকুরেরই কাজ করছি, এই ভেবে কাজ করা। এভাবে সব কাজ করলে দেখা যাবে, জীবনের কষ্ট অনেক কমে যাবে। যে নিজের মন বুদ্ধি সব আমাতে সমর্পিত করে দিয়েছে, সে আমার কাছে আসবেই আসবে। পাঁচ নম্বর শ্লোকে বললেন শেষ সময়ে যে আমার কথা ভাবে সে আমার ভাব প্রাপ্ত হয় বা আমাকে প্রাপ্ত হয়, একই কথা। আর ছয় নম্বর শ্লোকে বলছেন, *যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্*, মৃত্যুর সময় যে যেমনটা ভাবে মৃত্যুর পর সে সেটাই হয়। মৃত্যুর সময় যদি ভাবে, আমি শূন্য থেকে এসেছি শূন্যে বিলীন হয়ে যাব, সে বাস্তবিক শূন্যেই বিলীন হয়ে যাবে। শূন্যে বিলীন মানে, তার অস্তিত্ব আবার নূতন করে শুরু করতে হবে। যদি কেউ ফিজিক্সের মতকে শেষ কথা মনে করে আমি বিগ্‌ব্যাঙ থেকে এসেছে, মৃত্যুর পর সে বিগ্‌ব্যাঙেই ফিরে আসবে, এসে ব্ল্যাকহোলে ঢুকে থাকবে। ওখানে কত সময় থাকতে হবে ভগবানই জানেন, লক্ষ না কোটি বছর কেউ জানে না। নিজের সন্তান বা নিজের নাতিকে যদি অত্যন্ত ভালবেসে থাকে আর মৃত্যুর সময় সন্তান বা নাতির কথা ভাবতে ভাবতে মরে যায়, মৃত্যুর পর আবার এই সংসারে তার পুত্রবধূর সন্তান হয়ে বা পুত্রবধূর যে পুত্রবধূ হবে, তার সন্তান হয়ে জন্ম নেবে। কি দুঃখের কথা। আমি নিজের কথা বলছি, আমার মনের কথা –আর না ঠাকুর, জন্মমৃত্যুর চক্রে আর যেন না ঢুকতে হয়।

স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ একবার কামরূপ কামাখ্যা দর্শন করতে গিয়েছিলেন। সেখানে যোনি স্থাপন করা আছে, যেখান থেকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবান বলবেন, *মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্*। সেখানে ভূতেশানন্দজী স্পর্শ করে বলছেন, মা, আর যেন জন্ম নিতে না হয়। কামাখ্যা মন্দিরের এটাই তাৎপর্য। আমাদের যেখানে যেখানে যত মন্দির আছে,

সব মন্দিরের উদ্দেশ্য এটাই, হে প্রভু আমি যেন তোমার মধ্যে লীন হয়ে যেতে পারি। লীন হয়ে যাব বললেই তো লীন হয়ে যেতে পারবে না। আমি যখন অদ্বৈত আশ্রমে ছিলাম, একটা ব্রাহ্মণ ছেলে সেখানে তখন কাজ করত। আমরা ছেলেটিকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, 'হ্যাঁরে রোজ গায়ত্রী জপ করিস'? বলল, 'না তো, আমি তো মন্ত্র গুরুকে ফেরৎ দিয়ে দিয়েছি'। 'কি করে ফেরৎ দিলি'? 'গুরু যেমন আমাকে মন্ত্র বলে আমাকে ছুঁয়ে দিলেন, মন্ত্র এসে গেল। আমিও ওনাকে না জানিয়ে ছুঁয়ে দিলাম, মন্ত্রটা ফেরৎ চলে গেল, সেইজন্য আমাকে আর জপ করতে হবে না'। আমরা সাধুরা আবার নূতন করে পৈতে দিয়ে সকাল বিকাল জপ করাতাম। এভাবে কোন সিদ্ধি লাভ হয় না, মনে একটা ইচ্ছা উঠল আর হয়ে গেল, এভাবে হয় না। এই যে ভক্তদের মধ্যে খুব প্রচলিত কথা, ঠাকুর এসে নিয়ে যাবেন, মা এসে নিয়ে যাবেন, এখানে এটাই বলছেন, *মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্*। কিন্তু কিভাবে তিনি আসেন, ভগবানের কাছে কিভাবে যায়, আট নম্বর মন্ত্রে বলছেন।

পারলে আপনারা আট, নয়, দশ আর এগারো চারটে শ্লোক মুখস্ত করে নেবেন। আমি তো চাইব আপনারা পুরো গীতা মুখস্ত করে নেবেন, সাতশটি শ্লোক এমন কিছু না। একটা করে শ্লোক দিনে মুখস্ত করলে, দু বছর লাগবে পুরো গীতা মুখস্ত হতে। গান্ধীজী স্নান করে গা মুছতে মুছতে গীতার শ্লোক মাথায় ঘোরাতেন, আর এই করে করে তিনি পুরো গীতা মুখস্ত করে নিয়েছিলেন। নেতাজীর বংশে গীতা পাঠ নিয়মিত হত, এটা আমার ঠিক যদিও জানা নেই, কিন্তু গান্ধীজীরটা আমি নিশ্চিত জানি। যদি পুরো গীতা মুখস্ত না করতে পারেন, তাহলে যে যে শ্লোকগুলো মুখস্ত করতে বলা হচ্ছে, সেগুলো অন্তত মুখস্ত করবেন।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্।।৮।।

(হে পার্থ, অভ্যাস-যোগে যুক্ত হয়ে অনন্য চিত্তে শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশানুসারে জ্যোতির্ময় পরম পুরুষ শ্রীভগবানের ধ্যান করতে করতে যোগী তাঁকেই প্রাপ্ত হন।)

যাঁরা ভাবছেন তিনি রামকৃষ্ণলোকে যাবেন, যাঁরা মনে করছেন, ঠাকুর এসে নিয়ে যাবেন, কৃষ্ণ এসে নিয়ে যাবেন, এই যে কথাগুলো আমরা শুনে আসছি; আর ঐ আশাতে বসে থেকে যত রকমের ফাঁকিবাজি করে যাচ্ছি, যত রকমের জোচ্চুরি করে যাচ্ছি, তাঁদের উদ্দেশ্য এটাই বলার, এভাবে হয় না। তাহলে কিভাবে হবে? সাত নম্বর শ্লোকের সাথে আট নম্বর শ্লোকের সরাসরি সম্পর্ক। সাত নম্বর শ্লোকে বলেছিলেন, *ময্যার্পিতমনোবুদ্ধিঃ*, যার মন, বুদ্ধি, চেতনা, সমস্ত চিন্তা-ভাবনা যে ভগবানে লীন হয়ে রয়েছে, সেই ভগবানের স্বরূপ আট আর নয় নম্বর শ্লোকে বলবেন। যিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভগবান ভাবছেন, তাহলে তাঁকে এই আট নম্বর আর নয় নম্বর শ্লোকে যেটা বলছেন, এই রূপে ভাবতে হবে। যাঁর ইষ্ট শিব, তাঁকেও এই রূপে ভাবতে হবে। যিনি যার ইষ্ট তাঁকে এই রূপেই দেখার অভ্যাস করতে হবে। *অভ্যাসযোগযুক্তেন*, তাঁকে ঐ ভাবে জেনে, ঐ ভাবে সাধনা করে, মন বুদ্ধিকে পুরোপুরি ঈশ্বরে নিবিষ্ট করে সারাটা জীবন অভ্যাস করে যেতে হবে।

চেতসা নান্যগামিনা, মনকে কোন মতে অন্য কিছুর দিকে যেতে দেওয়া চলবে না। তাহলে কি আমি বাজার-হাট, সংসারের কাজকর্ম করব না? অবশ্যই করবেন। কিভাবে করবেন? সাত নম্বর শ্লোকে যেটা বললেন, *মামনুস্মর যুধ্য চ*, আমাকে মনে করে সব কাজ কর। রান্না করছেন, বাসন মাজছেন, সন্তানের যত্ন নিচ্ছেন, সব কাজে *মামনুস্মর চ*। হিন্দুরা চিরদিন এটাই করে এসেছেন। নূতন প্রজন্ম আর এটা করছে না, করতে চাইছেও না। বাজারে আনাজ কিনছি, ঠাকুরের জন্য আনাজ কিনছি। কারণ রান্না করার পর সব কিছু ঠাকুরের সামনে অর্পণ করা হবে। মাছ, মাংস, ডিম যাই রান্না করা হয়ে থাকুক, আমরা যা খাব ঠাকুরও তাই খাবেন; তবে আমিষ খাবার না দেওয়াই ভাল, কিন্তু যেহেতু আমি খাচ্ছি ঠিক আছে, মনে মনে নিবেদন করে খাব। শ্রীকৃষ্ণকে যেমন ননী,

মাখন, মিঠাই দেওয়া হয়। ঠাকুর ডিম মাংসটা খেতে চাইতেন না, সেইজন্য না দিলেই ভাল। এমনকি ঠাকুর বলছেন, তুমি যদি মদ খাও, মাকে নিবেদন করে খাবে। শক্তি পূজায় মাছ, মাংস, মদিরা সব কিছু সাজিয়ে মাকে অর্পণ করা হয়। মনে যদি দ্বিধা থাকে ঠাকুরকে নিবেদন করতে, তাহলে মাংস, মদ খাওয়াটা আপনাকে বন্ধ করে দিতে হবে। যেটাই আপনি খাবেন আগে সেটাকে ঠাকুরের কাছে অর্পণ করুন, তারপর একটা মন্ত্র বলে নিবেদন করুন, মন্ত্র যদি না জানা থাকে কোন অসুবিধা নেই, বাংলাতেই বলুন –ঠাকুর এসো, আসনে বোসো, তোমাকে এই এই নিবেদন করলাম, তুমি গ্রহণ করো। এরপর সেই নিবেদিত খাবার প্রসাদ রূপে গ্রহণ করুন। জীবনটাকে একটু গুছিয়ে আনুন, সব কিছু এলেমেলো যেন না চলে।

এভাবে চলার অভ্যাস হয়ে যাওয়া পর এবার যখন বাজারে যাবেন, তখন আপনি চাল কিনছেন, ডাল কিনছেন, আনাজ কিনছেন, যা কিছু কিনছেন সব ঠাকুরে জন্য কেনা হচ্ছে, কারণ সব কিছু রান্না করে ঠাকুরকে নিবেদন করা হবে। এই কারণে অনেক নিরামিষী হয়ে যান, পেঁয়াজ, রসুন, মাংস কিছুই খান না। আপনি এগুলো খাচ্ছেন খান, কি আর করবেন, এটাই দেবেন। যেদিন মন খুঁত খুঁত করতে শুরু হবে, তখন এগুলো খাওয়া আপনি নিজে থেকেই বন্ধ করে দেবেন। আমাদের মনে রাখতে হবে ঠাকুর কি কি জিনিস খেতে চাইতেন না।

এরপর আপনার যা কিছু আছে, আপনার যে বাড়ী, এটা বাড়ী নয় মন্দির, এখানে ঠাকুর নিজে বাস করেন। বাকি যা কিছু গৃহস্থ কর্ম আছে, সব ওর মধ্যেই আছে, হিন্দুদের কোন নিষেধ নেই, ধর্ম, অর্থ, কাম সবটারই অনুমতি আছে। এই ভেবেই সব করতে হবে, এটা ঈশ্বরেরই আদেশ, এটা ঈশ্বরেরই কর্ম। সারা জীবন যদি এই ভাবে কেউ অভ্যাস করে যেতে থাকেন, মন তাঁর তখন পুরো নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে। *পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্,* হে অর্জুন, এইভাবে যদি জীবনকে তুমি সংগঠিত করতে পার, তাহলে তুমি সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত করবে।

এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম কত রকমের মৃত্যু হতে পারে। যাঁরা যোগী তাঁরা যেভাবে দেহত্যাগ করেন, এটা হল টাইপ ওয়ান। যাঁরা এই আলোচনা শুনছেন, তাঁরা অবশ্যই সবাই যোগী, যোগী না হলে গীতার এই আলোচনা কারুর শোনার ইচ্ছেই হবে না। পুরোপুরি যোগী নাও হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে আপনারা সবাই যোগী হতে যাচ্ছেন। হাতির যখন গর্ভ হয়, তখন সেই গর্ভ আছে তো আছেই, দু বছর, আড়াই বছর ধরে গর্ভ আছে তো আছেই। সংস্কৃতে একটা প্রবাদ হয়ে গেছে, গজগর্ভ, সে গর্ভ আর বেরোচ্ছে না। আপনারাও গজগর্ভ হয়ে আর কতদিন থাকবেন, যোগী হয়ে এবার বেরিয়ে আসুন, নিজের ক্ষমতাটা দেখান, অপরকে দেখাতে হবে না, নিজেকেই দেখান।

আচার্য এখানে অভ্যাসযোগকে ব্যাখ্যা করছেন। প্রথমটা হল যোগীরা কিভাবে প্রাণত্যাগ করেন। *ময়ি চিত্তসমর্পণবিষয়ভূতে একস্মিন্ তুল্যপ্রত্যয়াবৃত্তিলক্ষণো বিলক্ষণ প্রত্যয়ানন্তরিতঃ অভ্যাসঃ,* একটা বৃত্তি বা একটা ভাবকে ধরে বাকি সব বিজাতীয় বৃত্তিগুলিকে আটকে দেওয়া। এখানে চিত্তবৃত্তি নিরোধের কথা বলছেন না, এখানে বলছেন সমান প্রত্যয় প্রবাহ, *একস্মিন্ তুল্যপ্রত্যয়,* একমাত্র পরমাত্মাই আছেন, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই আছেন, একমাত্র ঠাকুরই আছেন, এই একটা ভাবকে মাথায় রেখে বাকি সব বৃত্তিকে আটকে দিতে হবে। নিজের জন্য খাওয়া নয়, নাতির জন্য মিষ্টি আনা নয়; মিষ্টি বা কেক আনলে ঠাকুরকে আগে নিবেদন করতে হবে। ঠাকুরকে নিবেদন করার পর প্রসাদ রূপে খাওয়া হবে। বলবেন, এগুলো করা কঠিন; অবশ্যই কঠিন।

পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ মিলিয়ে বাঙালী জনসংখ্যা হয় পনের কোটি বা তার থেকে কিছু বেশি হবে, তার মধ্যে এই আলোচনা এই মুহূর্তে শুনছেন মাত্র একশ সত্তর জন। মনে রাখবেন

আপনারা হলেন বিশেষ। ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা আছে তাই পনের থেকে কুড়ি কোটির মধ্যে মাত্র একশ সত্তর জন গীতার আলোচনা শুনছেন। এখানে কোন আবোলতাবোল কথা বলা হচ্ছে না, অত্যন্ত গভীর তত্ত্বের আলোচনা করা হচ্ছে, যা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু আপনারা হলেন বাছাই করা কয়েকজন। যীশু খ্রীষ্ট বাইবেলে বলছেন, Many are called, few are chosen, ঈশ্বরের পথে অনেকেই আসেন, কিন্তু তাদের থেকে মাত্র কয়েকজনকে বেছে নেওয়া হয়। সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বললেন *মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে*, এই যে পনের কুড়ি কোটি লোক, এদের মধ্যে দশ বারো কোটি হিন্দু আছেন, আশা করি সবাই এনারা গীতার নাম শুনেছেন। এদের কজন গীতা পাঠ করে, কজনেরই বা শোনার ইচ্ছা হয়? সেখানে আপনারা সত্যিই তো ব্যাতিক্রম, unusual।

আচার্য বলছেন, বিজাতীয় প্রকৃতিকে আটকে দিতে হবে। এই জিনিসটাকে বার বার অভ্যাস করা, এই অভ্যাসকেই বলছেন যোগ। অভ্যাস আর যোগ আলাদা কিছু না, অভ্যাস যেটা করা হচ্ছে এটাই যোগ, যোগ মানে যুক্ত থাকা, লেগে থাকা। অনেকবার হয়ত অসফল হব, অসফল হলেও আবার লাগব, যতবার অসফল হব ততবার লাগব, আবার উঠব। আবার অসফল হব, আবার উঠে দাঁড়াব, ছাড়ব না। ঠাকুর বলছেন, কারুর যদি চাকরি চলে যায়, সে অফিসে অফিসে ঘুরে জিজ্ঞেস করে কোন কর্ম খালি আছে কিনা, বলে দেয় কর্ম খালি নেই। পরের দিন আবার অফিসে পৌঁছে যায়, যদি কোন কর্ম খালি হয়ে থাকে। লেগে থাকতে হয়; জপ করতে বসে ঘুম পাচ্ছে, আমি উঠব না, এখানে বসেই আমি ঘুমোব। জপে মন বসছে না, ঠিক আছে মন যত খুশী ঘুরে বেড়াক, ঘুম পাক আমি উঠব না, দু ঘন্টা বসার কথা আমি দু ঘন্টাই বসে থাকব। এটাকেই বলে অভ্যাসযোগ। অভ্যাসযোগে কি হবে? আচার্য বলছেন, *শাস্ত্রাচার্যোপদেশম্ অনুধ্যায়ন্*, শাস্ত্রে যে কথাগুলো বলা হয়েছে, আচার্যের মুখ থেকে যে কথাগুলো শুনেছেন, সেটাকেই বারবার চিন্তন করে যাচ্ছেন। এই রকম যদি হয়, তবেই মৃত্যুকালে কি হয়, বলছেন –*দিবি সূর্যমণ্ডলে ভবং যাতি গচ্ছতি*। আকাশে যে আদিত্যমণ্ডল, স্বর্গলোক, সেখানে যেতে পারে। মৃত্যুর সময় সে পরিষ্কার জ্ঞানালোক দেখে।

ঈশোপনিষদেও ঠিক এই ভাবটাকে নিয়ে বলছেন, উপনিষদের ব্রাহ্মণ সারাটা জীবন এই রকম অভ্যাসযোগ করে গেছেন, তারপর তাঁর মৃত্যুর সময় এসে গেছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি দেহ ছাড়তে যাচ্ছেন, সেই সময় তিনি সূর্যের কাছে প্রার্থনা করছেন, *হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।।* হে সূর্য, হে পূষণ, তোমার ঐ কিরণসমূহ সংবরণ কর, তোমার তেজকে সরিয়ে দাও, তোমার যে সুশোভন রূপ সেটা আমি দেখতে চাই, আর আমি কোন কাঙালী ভিখারী না। ঋগ্বেদের প্রার্থনাতেও একই কথা ঋষি অগ্নিকে বলছেন, রোজ আমি তোমার উপাসনা করি, এখানেও বলছেন, আমি রোজ তোমার উপাসনা করেছি, *সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে*, সত্য ধর্মে আমি প্রতিষ্ঠিত, আর আদিত্যমণ্ডলে যে পুরুষ অবস্থিত, সেটা আমি নিজে। এই রকম হলে, তবে গিয়ে জ্যোতির্ময় পুরুষ ভগবানকে পায়।

এখানে যোগীর কথা বলছেন, এটাকে মুক্তি বলা যাবে না, মুক্তি থেকে এক ধাপ নীচে। বেশির ভাগ সাধক বা যোগীদের এটাই হয়। কদাচিৎ কখন কারুর আত্মজ্ঞান হয়। বাকি সবার আট নম্বর শ্লোকে যেটা বলা হল, এটা দিয়েই হয়। গীতার এই আলোচনা যাঁরা শুনছেন, তাঁদের জন্য এটাই কাম্য। এভাবেই যেন আমাদের মৃত্যু হয়, সেইজন্য এই শ্লোকের এত গুরুত্ব। জ্ঞানীদের যে মুক্তি সেটা খুব কঠিন, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কারুর হয়। সেই ভগবান কি রকম? নয় নম্বর শ্লোকে ঈশ্বরের স্বরূপের বর্ণনা করছেন। এই চারটে শ্লোক আট, নয়, দশ, এগারো মুখস্ত করতে বলা হয়েছিল। এই চারটে মুখস্ত যদি না করতে পারেন, নয় নম্বরটা অবশ্যই মুখস্ত করুন, কারণ নয় নম্বর শ্লোকে ভগবানের প্রকৃত স্বরূপের বর্ণনা করছেন। অনেক সময় লোকেরা প্রশ্ন করেন, ভগবান কি, তিনি কি রকম, ইত্যাদি। ভগবানের স্বরূপ নয় নম্বর শ্লোকে বলছেন। এই ভাবটা উপনিষদে অনেক জায়গায় বলা হয়েছে।

কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।।৯।।
প্রয়াণকালে মনসাহচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।।১০।।

(যিনি সর্বজ্ঞ, সনাতন, সর্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সকলের বিধাতা এবং তিনি অচিন্ত্যস্বরূপ, আদিত্যবর্ণ জ্যোতির্ময়, প্রকৃতির পার; সেই পরম পুরুষকে মৃত্যুকালে ভক্তিযুক্ত হয়ে যোগবলদ্বারা একাগ্র মনে ভ্রুযুগল মধ্যে সম্যক রূপে প্রাণধারণপূর্বক যিনি স্মরণ করেন, তিনি সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।)

কবিং, ভগবান হলেন কবি, কবি মানে ক্রান্তদর্শি, যিনি ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনটেকেই জানেন; সর্বজ্ঞ। একমাত্র ভগবানই তিনটে কালকে পুরোটা জানেন, তিন কালের সব কিছু পুরোটাই তিনি দেখতে পান। আমরা দেখতে পাই না, কারণ আমরা একটা ছোট্ট পিঁপড়ের মত, যখন যেখানে আছি তখন আমরা সেখানকার অতটুকুই জানি। আমরা ভবিষ্যৎকে জানি না, ভূতকে আমরা ভুলে যাই, শুধু বর্তমানকে একটু জানি। কিন্তু ভগবান পুরোটা জানেন, সেইজন্য ভগবানের একটা নাম কবি। কবি মানে সর্বজ্ঞ, পরে বাংলাতে কবি শব্দের অর্থ পাল্টে গেছে। শুধু বাংলাতেই না, ভারতের সমস্ত ভাষাতেই কবি শব্দের অর্থ পাল্টে গেছে। কারণ আগেকার দিনের ঋষিরা হতেন কবি, ঋষি মানে যিনি তিন কালকে জেনে গেছেন, সেখান থেকে ঋষিদের সম্মান করে কবি বলা হত। সেই কবি থেকেই বর্তমান কালে কবি শব্দের অর্থ যিনি কবিতা লেখেন, আর সেখান থেকে যারা লিখছে, 'আমার আছে হাত, আমি খাই ভাত', এরাও নিজেদের কবি বলেন।

ভগবানের আর-একটা নাম *পুরাণম্*, সেই আদিকাল, অর্থাৎ প্রথম থেকে যিনি আছেন, তিনি *পুরাণম্*। কারণ তিনি অনন্ত, অনন্তের জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। লোকেরা বোকা বোকা প্রশ্ন করে, ভগবানকে কে জন্ম দিয়েছেন? যিনি চিরদিনই ছিলেন, চিরদিন আছেন, আর চিরদিনই থাকবেন, তাঁকে আবার কে জন্ম দেবেন! *অনুশাসিতরম্*, তিনি সমস্ত জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনিই সব কিছুর নিয়ন্তা। তিনি আছেন বলে সব কিছু ঠিকঠাক থাকছে। কঠোপনিষদে বলছেন, *ভয়াদস্য অগ্নিস্তপতি ভয়াদ্ তপতি সূর্যঃ*, উপনিষদেরও একই ভাব, তিনি নিয়ন্তা, শাসক রূপে সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছেন বলে সব ঠিকঠাক চলছে, তা নাহলে সব কিছু এলেমেলো হয়ে যেত। বলতে পারেন, তাহলে জগতে, সমাজে এত যে গোলমাল চলছে, এত এলেমেলো কেন? ঠিকই বলছেন, এদেরকে আজ হোক কাল হোক তিনি মারবেন, মারার জন্য ভগবান প্রস্তুতি নিচ্ছেন। *অণোরণীয়াংসম্*, তিনি অণু থেকেও অণু, যত সূক্ষ্ম হতে পারা যায় তার থেকেও তিনি সূক্ষ্ম।

আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি, ঈশ্বর জ্ঞান কেন হয় না, মানুষ ঈশ্বরকে কেন জানতে পারে না, তার কারণ এটাই। কোন কিছুকে জানার জন্য সূক্ষ্ম দরকার, সূক্ষ্ম দিয়ে আমরা স্থূলকে জানতে পারি। দুইকে জানতে হলে আগে এক-কে জানতে হয়, এক যদি জানা না থাকে, দুইকে জানা যাবে না। যে কোন জিনিসকে জানতে হলে তার যে simple form, সেটাকে আগে জানতে হবে। ঈশ্বর হলেন সহজ, *অণোরণীয়াংসম্*, তিনি সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর। সেইজন্য মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় দিয়ে ঈশ্বরকে জানা যায় না। কারণ জ্ঞাতা হলেন একমাত্র ঈশ্বর। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, You can be one with God, but you can never know God, ঈশ্বরের সাথে আমি এক হয়ে যেতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরকে আমি কখনই জানতে পারব না। কারণ, যে মন দিয়ে আমরা

সব কিছু জানি, আমাদের সেই মন যতটা সূক্ষ্ম কল্পনা করতে পারি, ঈশ্বর তার থেকেও সূক্ষ্ম। তাঁকে চিন্তন করতে হয়, অনুধ্যান করতে হয়, সেইজন্য বলছেন *অনুস্মরেৎ*।

সর্বস্য ধাতারম্, গীতার এই একটি কথার অন্তর্নিহিত অর্থের কথা ভাবতে ভাবতে একটা লেখার কথা মনে পড়ে গেল। অনেকদিন আগে এই লেখাটা পড়েছিলাম, পরে অন্য ভাবে ওটাকে আমার পরম বইতে উপস্থাপন করেছিলাম। একজন বিদেশী ভদ্রলোক কলকাতায় এসেছিলেন, কলকাতার ভিড় দেখে ওনার মাথা ঘুরে গেছে। তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না যে, এখানকার কোন ট্রেনে ওঠা সম্ভব। সেখান থেকে আমি পরম বইতে লিখেছিলাম, পরম প্রথম ট্রেনে ওঠার জন্য রেল স্টেশনে গেছে। কিন্তু ঐ ভিড় ঠেলে যেতে যেতে পরম হারিয়ে গেছে। পরে একজন লোক তাকে কোন রকমে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়েছে। পরম ঐ ভিড় ঠেলে ওর নির্দিষ্ট কামরায় উঠে দেখছে তার বার্থ ফাঁকা পড়ে আছে। হাওড়া স্টেশনে লক্ষ লক্ষ লোকের এত ভিড়, কিন্তু ঐ লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে ঐ একটি ট্রেন, সেই ট্রেনের মধ্যে একটি কামরা, সেই কামরার মধ্যে আপনার বার্থ আপনার অপেক্ষায় বসে আছে। ট্রেনের বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা দেখে মানুষের স্বাভাবিক ভাবেই কর্মে বিশ্বাস হতে শুরু হয়ে যাবে। আপনি যাই করুন, এত লোক, এত কিছু তাও আপনার কর্ম ঠিক আপনার কাছে পোঁছে যাচ্ছে, যেভাবে একটা ট্রেনের একটা কামরায় আপনার বার্থ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে, ঠিক সেইভাবে আপনার কর্ম আপনার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। *সর্বস্য ধাতারম্*, আমি যা করছি তার ফল আমিই পাব, অন্য কেউ পাবে না। যত রকম প্রাণী আছে, কুকুর, বেড়াল, গরু, ছাগল, সাপ, বিছে সমস্ত প্রাণীর কর্ম ভগবান যার যার কর্ম তাকে দিয়ে যাচ্ছেন।

অচিন্ত্যরূপম্, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে জানা যাবে না, তাঁকে চিন্তন করা যাবে না। নাসদীয় সূক্তমে ঠিক এই জিনিসটাকে বলছেন, তাঁকে চিন্তন করা যায় না, ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে জানা যায় না। কারণ ইন্দ্রিয়গুলি অনেক স্থূল, স্থূল দিয়ে সূক্ষ্মকে জানা যায় না। এই পেনের খাপটা আমি খুলে দিলাম, পেনটা হয়ে গেল বড়, খাপটা হয়ে গেল ছোট। এবার যদি বলা হয় পেন দিয়ে মেপে বলো তো খাপটা কত বড়, পেন দিয়ে কি করে বলব খাপ কত বড়, কারণ পেনটা বড়, খাপটা ছোট। খাপ দিয়ে পেনটা মাপা যাবে, বলতে পারব এক খাপ, দুই খাপ, তিন খাপ, কিন্তু খাপটাকে মাপা যাবে না। ভগবান সূক্ষ্ম, সেইজন্য মন, ইন্দ্রিয় দিয়ে ভগবানকে মাপা যাবে না, কারণ মন ইন্দ্রিয় অত্যন্ত স্থূল। সেইজন্য ভগবান *অচিন্ত্যরূপম্*। আচার্য বলছেন, *ন অস্য রূপং নিয়তং বিদ্যমানম্ অপি কেনচিৎ চিন্তয়িতুং শক্যতে*, ঈশ্বরকে জানা কোন পরিস্থিতিতে মানুষ, দেবতা কারুর পক্ষে সম্ভব না, অথচ তিনি নিয়ত বিদ্যমান, তিনি সব সময় আছেন, এটাই আশ্চর্যের। সেইজন্য তিনি অচিন্ত্য, তিনি নেই বলে যে অচিন্ত্য তা একেবারেই না, তিনি আছেন কিন্তু তাঁর কল্পনা করা যায় না, এটাই আধ্যাত্মিক জগতের এক পরম বিস্ময়।

তাহলে কিছু তো ভগবানের ব্যাপারে বলুন। হ্যাঁ বলছি, তিনি *আদিত্যবর্ণং*, তিনি নিত্য চৈতন্যের প্রকাশ। সূর্য আজকে আছে ভবিষ্যতে ব্ল্যাকহোলে চলে যাবে। এই ঘরে এত আলো ঝলমল করছে, আমরা এই ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাব সব লাইটের সুইচগুলো অফ্ করে দেওয়া হবে ঘরটা অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যাবে। ভগবানের ক্ষেত্রে কখনই এই রকম হবে না, আজকে ভগবানের চৈতন্য আছে আগামীকাল তার মধ্যে জড়ত্ব এসে যাবে তা কোন দিন সম্ভব নয়। ভগবানের যে নিত্য চৈতন্যই আছে তা নয়, তাঁর মধ্যে সেই নিত্য চৈতন্যের প্রকাশ হচ্ছে। আমার খুব বুদ্ধি আছে, কিন্তু বুদ্ধি থাকলেই হবে না, সেই বুদ্ধির প্রকাশ চাই তবে গিয়ে সেই বুদ্ধির দাম হবে। আমার ব্যাঙ্কে একশ কোটি টাকা আছে, ব্যাঙ্কে স্ট্রাইক চলছে, আমার ছেলেকে হাসপাতেলে ভর্তি করা হয়েছে, এক্ষুণি এক লক্ষ টাকা অপারেশনের জন্য জমা দিতে হবে, কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে সেই টাকা আমি তুলতে পারছি না, এই টাকার কি দাম আছে এখন, না থাকারই মত। দাম কখন হবে? যখন প্রকাশ হবে। ভগবানের চৈতন্য সদাসর্বদা প্রকাশমান, নিত্য চৈতন্যের প্রকাশ।

তমসঃ পরস্তাৎ, সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত অজ্ঞানের পারে তিনি। আচার্য বলছেন, *আদিত্যস্য ইব নিত্যচৈতন্যপ্রকাশো*, সূর্য যেমন প্রকাশ দেয়, সূর্যের প্রকাশে যেমন সমস্ত কিছু প্রকাশিত হয়ে যায়, ঠিক তেমনি তিনি চৈতন্যস্বরূপ, তিনি চৈতন্যপ্রকাশ, তাঁর চৈতন্যের আলোতেই সব কিছুর প্রকাশ। উপনিষদে বলছেন, *ন তত্র সূর্য ভাতি ন চন্দ্রতারকম্*, সেখানে সূর্য নেই, চন্দ্র নেই, অথচ তিনি চৈতন্যের প্রকাশ, চৈতন্যের আলো পুরো আলাদা। এটা কোন কবির কল্পনা নয়, এটা কোন কবিতা নয়, একেবারে বাস্তব, ঋষিরা ধ্যানের গভীরে এই চৈতন্যপ্রকাশকে সাক্ষাৎ করেছেন, নিজেরা অনুভব করেছেন। ঋষিদের মত যে কেউ ধ্যানের গভীরে যদি যান, তিনিও এর অনুভব করতে পারবেন, কিন্তু কেউই মুখে বলতে পারবেন না। এই চৈতন্যের আলোই সব কিছুকে আলোকিত করে রেখেছে। সূর্যের আলো, বিদ্যুতের আলো সব সেই চৈতন্য থেকেই আলোকিত হয় বিচ্ছুরিত হচ্ছে। যাবতীয় যা কিছু আছে সব অজ্ঞানরূপমোহ, তিনি এর পারে।

ঈশ্বরের চিন্তন কিভাবে করব? এই রূপে –তিনি *কবি* তিনি সর্বজ্ঞ, *পুরাণম্*, তিনি চিরদিনই আছেন, *অনুশাসিতারম্*, তাঁর অনুশাসনে সব কিছু চলছে, তিনিই সব কিছুর নিয়ন্তা; *অণোরণীয়াংসম*, সূক্ষ্ম থেকেও তিনি সূক্ষ্মতর, *সর্বস্য ধাতারম্*, তিনি সবার কর্মফলদাতা, *অচিন্ত্য-রূপম্*, তিনি অচিন্ত্যস্বরূপ, *আদিত্যবর্ণং*, সূর্যের মত তিনি স্বপ্রকাশ, *তমসঃ পরস্তাৎ*, তিনি সমস্ত মোহ, অজ্ঞান, অন্ধকারের পারে, *অনুস্মরেৎ যঃ*, যিনি তাঁকে এইভাবে স্মরণ করেন, তাঁর কি হয়? সেটা এবার পরের শ্লোকে বলবেন।

যার চেতনা জেগে গেছে, সে-তো তখন গলা ছেড়ে বলবে, মাগো ছেড়ে দে কেঁদে বাঁচি; আর যেন জন্ম না হয়। জন্ম মানেই তো আবার একটা কারুর গর্ভে গিয়ে দশটা মাস বাস করতে হবে, *পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্*, অসম্ভব, আর না। এগুলোই ভাববার বিষয়; মাঝে মাঝে এগুলো একটু কল্পনা করা দরকার। এগুলো চিন্তা করলে মানুষের মনে তখন এই জগৎ থেকে বেরিয়ে আসার ইচ্ছা জাগে। ঈশ্বরকে যখন এইভাবে বারবার চিন্তন করা হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ কে, *কবিং পুরাণম্*, এটাই তাঁর বর্ণনা, তিনি সমস্ত অজ্ঞান অন্ধকারের পারে, তিনি সব কিছু ধারণ করে আছেন, তিনি সব কিছুর নিয়ন্তা, তিনি অচিন্ত্যরূপম্, তিনিই আমার সমস্ত কর্মের ফলদাতা। এই ভাবগুলি নিয়ে যদি শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তন না করা যায়, কোন দিন কিছু হবে না। এটাই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ মানে যিনি কামারপুকুরে জিলিপি খেতেন, ফাগুর দোকানের কচুরী খেতেন, এই রামকৃষ্ণ নন। এই রামকৃষ্ণ কোন দিন আমাদের মুক্তি দিতে পারবেন না, মুক্তি দেন ওই রামকৃষ্ণ। সব কিছুর জন্ম ওখান থেকে, ওখানেই স্থিত থাকে, সব কিছুর বিনাশ ওখানেই, তিনিই সব কিছুকে ধারণ করে আছেন, তিনিই সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, তাঁর বাইরে কিছু নেই। চব্বিশ ঘন্টা মনকে এই চিন্তনের মধ্যে লাগিয়ে রাখতে হয়। বার বার চিন্তন করে করে, মনে করে করে এটাকে মাথায় ভাল করে বসিয়ে নিতে হয়।

উপৈতি মানে পাওয়া, *পরং পুরুষমুপৈতি*, এই ভাব নিয়ে চব্বিশ ঘন্টা চিন্তনের মধ্যে মনকে বসিয়ে রাখলে, তবেই সেই পরম পুরুষকে তিনি পেয়ে যান। কিভাবে? নয় নম্বর শ্লোকে যেটা বর্ণনা করা হল, মৃত্যুর সময় সেই পুরষকে যদি পেতে হয়, মৃত্যুর পরে কিছু হবে না, যা হওয়ার এখানেই হয়। যা কিছু উপলব্ধি হওয়ার এখানেই হতে হবে। যদি কোন গর্হিত যোনিতে জন্ম হওয়ার থাকে, সেটা এখানেই নির্ধারিত হয়ে যাবে। যে স্বর্গে যাবে, সেটাও এখানেই ঠিক হয়ে যায়। পরম পুরুষকে পাব কিনা, সেটাও এখানেই সুনিশ্চিত হয়ে যায়, মুক্তি হবে কিনা, সেটাও এখানেই ঠিক হয়ে যায়। অন্যান্য ধর্মে যেমন বলা হয় মৃত্যুর পর ভগবান বিচার করবেন, তারপর ঠিক করবেন কাকে তিনি স্বর্গে পাঠাবেন, কাকে নরকে পাঠাবেন, হিন্দু ধর্মে এই ধরণের কিছু হয় না। আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, কেন হিন্দুদের তো চিত্রগুপ্ত, যমদূতের ব্যাপারগুলো আছে? এগুলো পৌরাণিক কাহিনী,

একটা জিনিসকে বোঝানর জন্য বলা হচ্ছে তোমার বিচার হবে, কিন্তু তোমার যেটা হওয়ার কথা সেটা ঠিক হয়ে গেছে এখানেই।

প্রয়াণকালে মনসাহচলেন, প্রয়াণকালে, মৃত্যুর সময় যোগীর মন একেবারে পুরো নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, মন অচল মানে একেবারে একাগ্র। শ্রীমৎ স্বামী প্রমেয়ানন্দজী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তার আগে বেলুড় মঠে ম্যানেজার পদের দায়ীত্ব সামলেছেন। উনি সকাল নটা নাগাদ মঠ অফিস থেকে বেরিয়ে মিশন অফিসে যেতেন। ঐ সময় আমিও মঠের ভিতর হাঁটতাম, এই আশায় যদি মহারাজের সাথে দুটো কথা বলার সুযোগ পাওয়া যায়। খুব জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। উনিও জানতেন আমি কায়দা করে ওনাকে ধরব। উনি প্রায়ই আমাকে বলতেন, মৃত্যুর সময় বোঝা যায় তাঁর ঈশ্বর জ্ঞান আছে কিনা। প্রয়াণকালে অচল অর্থাৎ একাগ্র মন দিয়ে, *ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব*, এতদিনের ধ্যানজপের অভ্যাসের দরুণ নিজের মনকে টেনে ধরে রেখেছেন। *ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক*, নিজের প্রাণশক্তি, নিজের যে শক্তিগুলো এতদিন কাজ করছিল, সেই প্রাণশক্তিকে টেনে ভ্রুর মধ্যে নিয়ে আসেন। *স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্*, তখন সেই যোগী দিব্য পরমপুরুষকে পান, যে দিব্য পরমপুরুষের কথা নয় নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে।

আচার্য এখানে কয়েকটা খুব সুন্দর কথা বলছেন, *অচলেন চলনবর্জিতেন ভক্ত্যা*, যে ভক্তির কোন চলন নেই, একেবারে স্থির। কিভাবে স্থির? বলছেন *যোগস্য বলং যোগবলং তেন সমাধিজসংস্কারপ্রচয়জনিতচিত্তস্থৈর্য-লক্ষণং যোগবলং তেন চ যুক্ত*, যোগবল কি রকম, বলছেন সমাধিজনিত সংস্কার, ধ্যান করে করে, বছরের পর বছর, সকাল সন্ধ্যে, পারলে মাঝ রাতে ধ্যান করে করে সংস্কার এমন তৈরী হয়ে গেছে আর মন এমন নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে যে, মৃত্যুর সময়ে ঐ সংস্কারটা এখন শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। যোগশাস্ত্রে যে সমাধির কথা বলা আছে, আচার্য হৃদয়কমলে ধ্যান করার কথা বলছেন, *হৃদয়পুণ্ডরীকে বশীকৃত্য চিত্তম্*, মনকে হৃদয়ে বসাতে হবে, *তত ঊর্ধ্বগামিন্যা নাড্যা*, সুষুম্না নাড়ি, যেটা উপরের দিকে যাচ্ছে, মৃত্যুর সময় সমাধির যে সংস্কার, সেই সংস্কার দিয়ে নিজের শক্তিকে ওটাকে টেনে উপরে নিয়ে যাবে। উপরে নিয়ে গিয়ে ভ্রুর মধ্যে সেই শক্তিকে স্থাপন করবেন, উনি কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই শরীর ত্যাগ করতে যাচ্ছেন, তখন তাঁর অন্য কোন চিন্তন নেই। তখন এই ধরণের যোগী যিনি তিনি নয় নম্বর শ্লোকে ভগবানের যে স্বরূপের বর্ণনা করা হয়েছে, সেই স্বরূপে তিনি তাঁর বুদ্ধিকে স্থির করে দেন, এনারাই মৃত্যুর সময় তাঁকে পান। যোগশাস্ত্রে যেভাবে আছে, তন্ত্র মতে যেমন আছে, স্বামীজী যেমন বলেছেন, ঠাকুর যা বলেছেন, আচার্য শঙ্করও ঠিক এক কথা এখানে বলছেন, হৃদয়কমলে ধ্যান করবে।

আমাদের আশেপাশে তাকালে দেখি, বেশির ভাগ মানুষ, যারা মরতে যাচ্ছে, মরার সময় নাতির কথা ভাবছে, নয়তো সন্তানের কথা ভাবছে, এর কথা তার কথা ভাবছে। মারা যাওয়ার পর কেঁদে কেঁদে আমাদের ফোন করে, মহারাজ আমার ঠাকুরমা মারা গেলেন। কত বয়স হয়েছিল? একশর কাছাকাছি। তাহলে আর কত দিন বাঁচবে, এই বয়সে জরাজীর্ণ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকার চেয়ে মারা গিয়ে নিজে শান্তি পেলেন, অন্যদের শান্তি দিলেন। এবার একটা নূতন শরীরে যাবেন, নূতন মডেলের একটা ভাল গাড়ি পাবেন, তার জন্য তোমাদের তো আনন্দ করা দরকার। অকালে কারুর মৃত্যু হয়ে গেলে খারাপ লাগাটা স্বাভাবিক, বিশেষ করে তার উপর যদি অনেকে নির্ভর করে থাকে, ছোট ছোট বাচ্চা আছে, স্ত্রী আছে, তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে দুশ্চিন্তা হয়। কিন্তু তার থেকেও বেশি, যদি অধর্ম না করে থাকে, তাহলে মন খারাপ করার কিছু নেই। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে তাঁদের কথা, *ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব*।

কিছু কিছু ঘটনা আমার চোখের সামনে হয়েছে, কিছু ঘটনা আমরা ঘটনা হওয়ার কিছু দিন পরেই শুনেছি। কাশীতে রামকৃষ্ণ আশ্রমে একজন সন্ন্যাসী ছিলেন, তিনি নিজের মত থাকতেন,

বাইরেও বেশি ঘোরাঘুরি করতেন না, বয়স হয়েছিল। হঠাৎ একদিন তিনি একজন মহারাজকে ডেকে বলছেন, 'আজকে আরতির পর আপনারা সাধুরা আমার ঘরে আসবেন'? সেই মহারাজ ওনাকে বললেন, 'আজ তো একাদশী, আরতির পর রামনাম আছে'। উনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে, আপনারা দয়া করে রামনামের পরেই আমার ঘরে আসবেন। আপনাদের জন্য একটু পায়েস রান্না করেছি'। মহারাজরা ভাবছেন, সন্ধ্যেবেলা ঘরে কোথায় একটু জপধ্যান করার সময়, ও-সব ছেড়ে ওনার ঘরে আসতে হবে। যাই হোক সবাই এসেছেন, একজন সিনিয়র মহারাজ আসার পর ওনাকে বলা হল, 'মহারাজরা সবাই এসে গেছেন'। উনি সবাইকে একটু একটু করে পায়েস দিলেন। দিয়ে বলছেন, আপনার এই ঘরে একটু বসুন। বলেই তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন, বয়স্ক মানুষ শুতেই পারেন। বিছানায় শুয়ে বলছেন, 'আমি এবার প্রাণত্যাগ করব, আপনার সবাই ঠাকুরের নাম করুন'। মহারাজরা বিশ্বাসই করতে পারছেন না, বলছেন কি উনি! যাই হোক সবাই মিলে ঠাকুরের ভজন গান শুরু করেছেন। গান শুনতে শুনতে টুক্ করে তিনি শরীরটা ছেড়ে দিলেন। যাঁরা ওখানে ছিলেন, তাঁরাই আমাকে ঘটনাটা বলে বলেছিলেন, 'আমিও ছিলাম ঐ ঘটনায়'।

বেলঘরিয়া আশ্রমে স্বামী নির্বেদানন্দজী মহারাজ ছিলেন। ওনারও অনেক বয়স হয়েছিল। মহারাজের একজন ছাত্র ডাক্তার ছিল। মহারাজের ঘরে উনি বসে আছেন, ছাত্রকে বলছেন, 'চলো এবার আমি দেহত্যাগ করব'। উনি নিজে একজন ডাক্তার, উনি ঘাবড়ে গেছেন, 'দাঁড়ান দাঁড়ান আমি ওষুধ দিচ্ছি'। 'এখন আর কোন ওষুধ কাজ করবে না, চুপচাপ বসে দেখ'। তারপর বলছেন, 'এই দেখ, আমার পা থেকে প্রাণ উঠে এসেছে'। ডাক্তার পা ছুঁয়ে দেখছেন, পা পুরো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, মৃত মানুষের যেমন হয়। 'এই দেখো আমার কোমড়ের নীচের অংশ পর্যন্ত প্রাণ ছেড়ে দিয়েছে, এবার শরীরটাই বন্ধ হয়ে আসছে'। বলেই চুপ হয়ে গেলেন। মহারাজ একেবারে দেখিয়ে দেখিয়ে দেহটাকে ছেড়ে দিলেন।

আর-একজন মহারাজকে জানতাম, কয়েক বছর আগের ঘটনা। মুম্বাইতে অনেক দিন ছিলেন। একজন মহারাজকে এসে বলছেন, 'শোন কাল আমার শরীর চলে যাবে, আজকে আমাকে একটু দক্ষিণেশ্বর, উদ্যানবাটী ঘুরিয়ে দেবে'? সবাই ভাবছে উনি মজা করছেন। উনি সব সময় হাসি মজা করে থাকতেন, আর খুব active ছিলেন। এটাকেও সবাই মজা মনে করেছেন। যাই হোক গাড়ি করে ওনাকে সব ঘুরিয়ে আনা হয়েছে। ঠিক তাই হল, পরের দিন শুয়ে পড়লেন, শেষ।

স্বামী মুমুক্ষানন্দজী মহারাজের খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, আমার ব্লগেও আমি বর্ণনা করেছি। উনি সেবককে জিজ্ঞেস করছেন, 'আচ্ছা সাধুদের দেহত্যাগ হলে কোন ঘরে রাখা হয়? কিভাবে পোড়ান হয়? কাঠ কোথা থেকে আনা হয়'? সব জিজ্ঞাসাদি করে বলছেন, 'তুমি তো এখন চা খেতে যাবে'? তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বলছেন, 'চা খেয়ে এসে আমাকে ডাকবে, আমি যদি সাড়া না দিই তাহলে ইনচার্জ মহারাজকে জানিয়ে দেবে আমার শরীর চলে গেছে'। ছেলেটিও ভাবল মহারাজ মজা করছেন। সেও সন্ধ্যেবেলা বাইরে চা মুরি খেতে গেছে। ফিরে এসে মহারাজকে ডাকল, কোন সাড়া নেই। সেবক দৌড়ে গিয়ে ইনচার্জ মহারাজকে বলল, 'মহারাজ আমাকে এই এই বলেছিলেন, এখন ফিরে এসে ডাকছি কিন্তু কোন সাড়া পাচ্ছি না'। ইনচার্জ মহারাজ এসে দেখেন, স্বামী মুমুক্ষানন্দজী মহারাজ চলে গেছেন। ভাবা যায়, মৃত্যুর উপর কি রকম পুরো নিয়ন্ত্রণ! কল্পনা করা যায় না। ঠাকুরের জীবনীতেও আছে, তিনি পঞ্জিকা আনিয়ে বলছেন, দেখ তো ভাল তিথি কবে? একটা দুটো তারিখ বলার পর বলছেন, থেমে যা, আর বলতে হবে না। সেই তিথিতেই শরীর চলে গেল। এই হল মৃত্যুর উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। যাই হোক, পরের শ্লোক থেকে আবার সেই ঈশ্বরের কথাই বলছেন –

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে।।১১।।

(বেদবিদ্গণ যাঁকে অক্ষর পুরুষ রূপে বর্ণনা করেন, নিঃস্পৃহ সন্ন্যাসীগণ যাঁকে লাভ করেন, ব্রহ্মচারিগণ যাঁকে লাভ করবার আকাঙ্ক্ষায় ব্রহ্মচর্য পালন করেন, তোমাকে সেই অক্ষর ব্রহ্মের কথা সংক্ষেপে বলব।

এই শ্লোকের ভাব কঠোপনিষদ থেকে আনা হয়েছে। ব্যাসদেব এখানে ঈশ্বরের যে বর্ণনা করছেন, তাতে তিনি দেখাচ্ছেন, কিভাবে বেদ উপনিষদে সেই একই কথা বলা হয়েছে যে, এটা ঈশ্বরেরই বর্ণনা। আগের শ্লোকে যাঁরা সগুণ সাকারের সাধনা করেন বা যাঁরা কর্মযোগী, তাঁদের সম্বন্ধে বললেন। এবারে বলছেন, যাঁরা অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন, যাঁরা জ্ঞানযোগী, নির্গুণ নিরাকারের ধ্যান করেন। আচার্য এই শ্লোকে তাঁর ভাষ্যে বেদ উপনিষদের বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেকগুলো কোটেশান নিয়ে এসে দেখাচ্ছেন এটাই হিন্দুদের কিভাবে মূল ভাবধারা।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি, যাঁরা বেদজ্ঞ, বেদবিৎ, বেদের পরম অর্থ যাঁরা জানেন, তাঁরা সেই অক্ষরকেই জানেন। আমাদের এখানে সব ভুলভাল ধারণা, বেদ মানে কর্মকাণ্ড। তা নয়, বেদ এক রকম বলবে আর বেদেরই অঙ্গ উপনিষদ আর-এক রকম কথা বলবে, তা কি কখন হয়! বেদ ও উপনিষদ একই কথা বলছেন। যেমন চণ্ডীর উপর ধ্যান করা যায়, চণ্ডীকে নিয়ে উপাসনা করা যায়, সেই চণ্ডীকে নিয়ে যে কেউ যজ্ঞও করতে পারেন। বেদ হল উপাসনার জন্য, বেদ হল ধ্যানের জন্য; ব্রাহ্মণরা সেই বেদকেই যজ্ঞে পাল্টে দিলেন, তাতে দোষের কিছু নেই। যেভাবেই হোক তাঁকে মনে রাখা নিয়ে কথা।

আগেও অনেকবার বলা হয়েছে, অক্ষর মানে যাঁর কখন নাশ হয় না, তাই একমাত্র পরমাত্মাকে অক্ষর বলা হয়। যাঁর সমস্ত আসক্তি নাশ হয়ে গেছে, সেই বেদজ্ঞরা অক্ষর ব্রহ্মের কথা বলতেন। *বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ*, যাদের মন থেকে সমস্ত বিষয়াসক্তি চলে গেছে, সব কামনা-বাসনাগুলি খসে পড়ে গেছে; বলছেন, এই ধরণের সন্ন্যাসীরা যাঁর মধ্যে প্রবেশ করে যান, যোগীরা যাঁর মধ্যে প্রবেশ করে যান, তিনি হলেন সেই অক্ষর, সেই ব্রহ্মের সাথে তাঁরা এক হয়ে যান।

ভগবান অর্জুনকে বলছেন –*যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি*, যেটাকে পাওয়ার জন্য মানুষ সন্ন্যাস নেয়, ব্রহ্মচারী হয়ে কত কঠোরতার সাথে ব্রহ্মচর্য পালন করেন; কেউ যখন বলে আমি সংসার কর্ম করব না, আমি নারী সঙ্গ করব না, আমি সঞ্চয় করব না, আমার কোন নিরাপত্তা চাই না, সন্ন্যাসীরা যেমন হন, তখন সে যে জিনিসটাকে পাওয়ার জন্য সব ত্যাগ করে দিতে চাইছে, অর্জুন, সেটা আমি তোমাকে খুব সংক্ষেপে বলছ, তৎ *তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে*। খুব সংক্ষেপ সেটা হল ওঁ। ওঁ হল প্রতীক, আচার্য এখানে অনেক কোটেশান দিয়ে বলছেন, *পরস্য ব্রহ্মণো বাচকরূপেণ প্রতিমাবৎ প্রতীকরূপেণ*, প্রতিমা যেমন ঈশ্বরের একটা প্রতীক, ওঁ হল সেই অক্ষর ব্রহ্মের প্রতীক। বেদেই আছে তাঁর কোন প্রতিমা নেই, *ন তস্য প্রতিমা অস্ত*। কিন্তু অনেক পণ্ডিতরা এই মন্ত্রের অর্থকে এমন ভাবে অন্য অর্থে পাল্টে দিয়েছেন যে সংশয় উৎপন্ন হয়ে যায়। অথচ আচার্য শঙ্কর নিজে বলছেন, ওঁ এটা হল চিহ্ন, যেমন প্রতিমা ঈশ্বরের প্রতীক, ওঁ তেমন ঈশ্বরের প্রতীক। বেলুড় মঠের গর্ভগৃহে যে ঠাকুরের মূর্তি, এটা ভগবানের প্রতীক। মূর্তি ঠাকুর নন, এই মূর্তি দেখলে ঠাকুরের উদ্দীপন হয়। ঠাকুর যেমন বলছেন, শোলার আতা দেখলে আসল আতার কথা মনে পড়ে; ঠাকুরের মূর্তি দেখলে আসল ঠাকুরের কথা মনে পড়ে। ঠিক তেমনি, ওঁ অক্ষর ব্রহ্ম। শ্রীশ্রীমা বলছেন, ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকলেও হবে। ছবির দিকে তাকিয়ে থাকা, জপ যদি নাও করা হয়, ঘন্টার পর ঘন্টা ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে আছেন, এটাও একটা সাধনা; তারপর দেখা যাবে নিজে থেকেই কখন জপ

হতে শুরু হয়ে গেছে। ঘন্টার পর ঘন্টা ওঁ জপ করে যাচ্ছেন, এটাও সাধনা। এই প্রসঙ্গে পরের শ্লোকে ভগবান বলছেন, এটাই অষ্টম অধ্যায়ের মূল কথা।

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্।।১২।।

(সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত করে এবং মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করে ভ্রূযুগলের মধ্যে নিজের প্রাণ স্থাপন করে যোগী অক্ষর ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ-ধারণার আশ্রয় গ্রহণ করবেন, অর্থাৎ যোগসাধনাকে অবলম্বন করবেন।)

আগের আগের শ্লোকে সাথে পরের শ্লোকগুলির যোগ আছে। যেমন দশ নম্বর শ্লোকে যেটা কর্মযোগীদের জন্য বলা হল, সেটাকেই এবার বারো নম্বর শ্লোকে জ্ঞান পথের সাধকদের জন্য বলছেন। যাঁরা নির্গুণ ব্রহ্মের সাধনা করেন, যাঁরা অক্ষর উপাসক, তাঁরা *সর্বদ্বারাণি সংযম্য*, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে দ্বার বলা হয়, ইন্দ্রিয়ের দরজাগুলিকে তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করে নেন, মহারাজদের মৃত্যুর যে ঘটনাগুলো বলা হল। *মনো হৃদি নিরুধ্য চ*, মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করে দেন, যেমন বলা হল কিভাবে প্রাণকে আস্তে আস্তে টেনে নিচ্ছেন। সেখান থেকে ধীরে ধীরে মস্তকে, যেটাকে ব্রহ্মরন্ধ্র বলা হয়, সেখানে স্থাপন করে দিলেন। বলছেন, এইভাবে দেহত্যাগ করলে যোগী পরম গতি পেয়ে যান। অনেক জায়গায় বলা হয় যে, এই জায়গা দিয়ে প্রাণ বেরোলে ব্রহ্মলোকে যায়, আর অমুক জায়গা দিয়ে প্রাণ বেরোলে মুক্তি, নানা রকম কথা আছে; আমরা এর মধ্যে যাচ্ছি না। কারণ, প্রথম কথা আমাদের জানা নেই, দ্বিতীয় কথা শাস্ত্রে যেমনটি বলা হয়েছে, আমরা তেমনটি বলে যাচ্ছি। এখানে প্রাণ ও মনকে স্থাপিত করে কি করেন –

ওমিত্যেক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যাজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্।।১৩।।

(ওঁ – এই ব্রহ্মাত্মক শব্দব্রহ্ম উচ্চারণপূর্বক আমাকে চিন্তা করতে করতে যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ঈশ্বরস্বরূপতা লাভ করেন।)

ওঁম্ ব্রহ্মের প্রতীক, যিনি ওঁম্ উচ্চারণ করতে করতে আর তার সাথে ওঁমের অর্থ চিন্তন করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেই পরমগতি প্রাপ্ত করেন। তাঁর আর জন্মমৃত্যুর চক্রে আসতে হবে না। তাঁর দেহের নাশ হয়ে যাবে, কিন্তু স্বরূপের নাশ কোন দিন হবে না।

প্রথমে ঈশ্বরকে দুটো রূপে বলা হল, এক হলেন অক্ষর, নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম, তিনি হলেন ওঁ, আর দ্বিতীয়, যাঁরা কর্মযোগী তাঁরাও ঈশ্বরের ধ্যান করেন, সেই ঈশ্বরের বর্ণনা নয় নম্বর শ্লোকে করা হয়েছে। যে পথই থাকুন, মৃত্যুর সময় সবাইকেই চিন্তন করতে হবে সেই ঈশ্বরের, যেমনটি ঈশ্বরের স্বরূপ, সেই রূপে ঈশ্বরের চিন্তন করতে হবে। সারা জীবন যদি সাধনা করা না থাকে, মৃত্যুর সময় এভাবে ঈশ্বর চিন্তন কখনই সম্ভব হবে না।

আমরা অনেকবার বলেছি, গীতা হল মোক্ষশাস্ত্র। ইদানিং গীতাকে নিয়ে অনেকে অনেক কিছু লিখছেন, যেমন কেউ লিখছেন, Gita for Management, সে কেউ লিখতেই পারেন। বাচ্চাদের যে সাধারণ গল্প হয়, সেই গল্প থেকেও ম্যানেজমেন্ট হয়, সেটাকে আদর্শ রূপে নেওয়া যায়, আধ্যাত্মিক জীবনেও লাগানো যেতে পারে। ঠাকুর এই ধরণের কত গল্প বলছেন। কিন্তু গীতার মূল উদ্দেশ্য মোক্ষ। গতকাল আমার এক মনিপুরী ছাত্র, ইম্ফলে থাকে, ওকে কথায় কথায় বললাম, অন্যান্য ধর্মে ভগবানের আদেশ বলা হয়েছে, তোমাকে এই এই করতে হবে। হিন্দু ধর্মে ভগবানের কোন আদেশ হয় না। হিন্দু ধর্মে ভগবানের একটাই কথা, এসো, আমার সাথে এক হয়ে যাও। যীশু বলছেন, আমার কাছে এসো, তোমার কাঁধে যে বোঝা চাপানো আছে আমি হাল্কা করে দেব। কিন্তু

এখানকার মূল ভাব হল, তুমি ঈশ্বরের সাথে এক। তুমি জগতে ঘুরছ, ফিরছ, যা কিছু করছ, সব কিছুর উদ্দেশ্য আমার কাছে চলে আসা, আর আমার সাথে এক হয়ে যাওয়া। চলে আসার জন্য তপস্যা করতে হয়। যাদের জীবনে কোন একটা আদর্শ আছে, তাদের কাছে যে কোন কাজ করাটাই একটা সাধনা। ওটাকেই তপস্যায় পরিবর্তিত করে দেওয়া যায়। যেমন আগেকার দিনে মূর্তিকার থাকত, তাদের কাছে ওটাই সাধনা, সাধনা থেকে ধীরে ধীরে ওটাই তপস্যায় চলে যেত। সাধনা মানে একটা জিনিসকে ধরে ঐ বিদ্যাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সেই বিদ্যাটাই যখন তার কাছে সব কিছু হয়ে যায়, ওটাই তখন ধীরে ধীরে তপস্যাতে চলে যায়, যার দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। যদি কোন বিদ্যা না থাকে, জীবনে যদি কোন উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে যা কিছুই করা হোক না কেন, সবটাই নিষ্ফল। আমার অনেক পরিচিতরা বিভিন্ন ফিল্ডে আছেন, অনেকে কম্প্যুটারসে আছে, স্বামী স্ত্রী দুজনেই কম্প্যুটারসে আছেন। একজন আছেন গ্রাফিক ডিজাইনার, আমাদের লোগোগুলো ওনারই তৈরী। এনারা এখন এটাকে তপস্যা রূপে নিয়ে নিতে পারেন, আজ থেকে এটাই আমার তপস্যা।

প্রথমে আসে সাধনা, সাধনা করে আমি এই বিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলাম। সেখান থেকে সেই অবস্থায় চলে যাওয়া, যেখানে ভগবান নিজে যদি এই লোগোটা বানাতেন, তাহলে এটা কেমন হত? কম্প্যুটারসে সেই একই জিনিস, ভগবান যদি এই প্রোগ্রামটা তৈরী করতেন, তিনি কিভাবে করতেন? যিনি গান করেন, তাঁর সাধনা হল, সা রে গা মা অনুশীলন করা। তপস্যা হয়ে যায় তখন, যখন সেই সুরের সাথে নিজের সুর মিলিয়ে দেন, যেটা সেই ভগবানের সুর। ভগবান যে সুরে এই সৃষ্টিকে বেঁধে রেখেছেন, সেই সুরের সাথে যখন নিজের সুর মিলিয়ে দেওয়া হয়, তখন তপস্যা হয়ে গেল। ক্রতু বইতে আমি এই ভাবটাকে বিভিন্ন ভাবে নিয়ে এসেছি। সৃষ্টি যেন ভগবানের কবিতা, এটা যেন নৃত্য, এটা যেন সঙ্গীত, এটা যেন এক বড় কারিগরের তৈরী শিল্প।

হিন্দুদের জীবনধর্ম বিভিন্ন ভাবে এসেছে। যখন নিজেকে ঢেলে এর সাথে এক করে দেওয়া হয়, সেটাই তপস্যা হয়ে যায়। যাদের কিছু নেই? গৃহবধূরা বলবেন, আমি তো প্রথম থেকে গৃহবধূ হয়ে আছি, আমার তো অন্য কোন বিদ্যা জানা নেই। আপনার জন্য গৃহস্থ জীবনটাই সাধনা, এটাই তপস্যা, এটাই আপনার কাছে একটা বিদ্যা। আমি আমার সেই মণিপুরী ছাত্রটিকে বললাম, তোমার স্ত্রী যদি রেগে যায়, তুমি গিয়ে হাতজোড় করে বল, হে দেবী, তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছে, আমার তপস্যা নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ জীবনের একটাই উদ্দেশ্য, মুক্তি। তোমার সন্তান কথা শুনছে না, তুমি ভাল করে বিচার করে দেখ গোলমালটা কোথায় হচ্ছে। তুমি প্রাণপন দিয়ে সব কাজ করে যাও, এটাই তোমার সাধনা। এই সাধনাটাই ধীরে ধীরে তপস্যার পর্যায়ে চলে যাবে। সাধনা হল পার্টটাইম, তপস্যা ফুলটাইম। তপস্যা দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায়। আমরা যখন যোগ সাধনা বলি, ওটা তখন পার্টটাইম এ্যাফেয়ার। গীতা অর্জুনকে বলছেন, তুমি যুদ্ধ কর; এখানে অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য উস্কানি দিচ্ছেন না। অর্জুনকে বলতে চাইছেন, এটাই তোমার জীবনধর্ম, এটা দিয়েই তুমি ঈশ্বর লাভ করবে, মুক্তি লাভ করবে।

অষ্টম অধ্যায় মূলতঃ জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ এই অর্থে – প্রকৃতিতে যাবতীয় যা কিছু আছে, সৃষ্টিতে যা কিছু আছে, এই অধ্যায়ে ভগবান সেটার বর্ণনা করছেন। অধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ আদি বর্ণনা করে ভগবান দেখাচ্ছেন, কিভাবে এই সমস্ত কিছুর পারে একজন যোগী হয়ে যান, যোগী হয়ে গিয়ে তাঁর নিজের মনের উপর এমন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এসে যায় যে, মৃত্যুর সময় *সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ*। মৃত্যুর সময় হাত পা নড়ে না, বাক্ রুদ্ধ হয়ে যায়, সেই অবস্থায় যোগী শরীর মনকে এক জায়গায় এনে নিরুদ্ধ করে দেন। নিরুদ্ধ করে যোগী কি করেন? *ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্*, ভ্রুযুগলের মধ্যে মন ও প্রাণশক্তিকে টেনে এনে ওঁ উচ্চারণ করেন বা ধ্যান করেন। ওঁ হল অক্ষরের বাচক, সেই স্বরূপকে ওঁ ইঙ্গিত করায়। ওঁ হল একাক্ষরী। বলছেন যাঁরা এভাবে দেহত্যাগ করেন, তাঁরা পরমগতি প্রাপ্ত হন। পরমগতি পাওয়া মানে, তাঁর আর

পুনর্জন্ম হয় না। যাঁরা ভক্ত, যাঁরা সগুণ ব্রহ্ম ঈশ্বরের আরাধনা করেন, তাঁদের জন্য চোদ্দ নম্বর শ্লোক খুব সুন্দর বর্ণনা করে। বলতে চাইছেন, মৃত্যুকালে ভক্তদের কিভাবে দেহত্যাগ হয়।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ।।১৪।।

(হে পার্থ, যিনি অনন্যচিত্তে আমাকে যাবজ্জীবন নিরন্তর স্মরণ করেন, সেই সদা স্মরণশীল যোগীর আমি সহজলভ্য।)

গীতা এখানে সাধকের কথা বলছেন না, যোগীর কথাই বলছেন। নিত্যযুক্ত মানেই যোগী; আমি, আপনি, যাঁরা শুনছেন, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সাধক হওয়া নয়, যোগী হওয়া, তপস্বী হওয়া। যোগী হওয়ার জন্য নিত্যযুক্ত হতে হবে, চব্বিশ ঘন্টা, তিরিশ দিন, বারো মাস এই একটাতেই লেগে থাকতে হবে। কামী পুরুষ যেমন তার কাম্য বস্তুকে প্রাপ্ত করার জন্য সব সময় লেগে থাকে, কি করে আরও আরও টাকা করা যায়, কৃপণ যেমন সব সময় ভাবে কি করে টাকা বাঁচানো যেতে পারে, যোগী ঠিক সেইভাবে চব্বিশ ঘন্টা তাঁর চেতনাতে ঈশ্বরকে জাগিয়ে রাখেন। কামী পুরুষ যেমন স্বপ্নেও কাম দেখে, তেমনি যোগী স্বপ্নেও ঈশ্বরকে দেখেন। একটি রাত হয় না, যোগী ঈশ্বরের স্বপ্ন দেখেন না। স্বপ্নেও যখন কারুর ধ্যান বা জপ হতে থাকবে, স্বপ্নেও যদি ঈশ্বরের দর্শন হতে থাকে, তখন বোঝা যায় তাঁর একটা কিছু হচ্ছে।

এটাই ভক্তদের উদ্দেশ্য, *অনন্যচেতাঃ*, যাদের মনটা পুরো আমাতে অনন্যচিত্ত হয়ে গেছে, অন্য কোন দিকে কোথাও তাঁর মন নেই। আর এটা *সততং*, সর্বদা আমাকে ছাড়া অন্য কোন বিষয় তাঁর চিত্তে ঢুকতে পারছে না। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *সততং*, সর্বদা শুধু আমাকেই ভাবে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলতে যার যার যে কোন ইষ্ট, বা যে কোন লীলাবতার, বা যে কোন মহাপুরুষ যাঁকে আপনি ভগবান মনে করছেন, তাঁর কথা ভাবতে পারেন। ইদানিং অনেকে বলেন, বাবা-মায়ই ভগবান; বাবা-মা অবশ্যই ভগবান, ঠাকুর যদি দেবী রূপে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা করতে পারেন, আপনিও আপনার বাবা-মার অবশ্যই পূজা করতে পারেন। কিন্তু আপনি কি আপনার বাবা-মাকে দেশ কালের বাইরে ভাবতে পারছেন? যদি না ভাবতে পারেন, তাহলে হৃদ্য তিনি দেবতা হতে পারেন। বাবা-মা আপনার জন্য অনেক কিছু করেছেন, খুব উচ্চমাপের মানুষ কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এর বেশি কিছু না। খুব হলে পিতৃগণের মধ্যে বা খুব বেশি হলে দেবতাদের মধ্যে গণ্য হতে পারেন। ঈশ্বর হতে হলে তাঁকে দেশ কালের পারে যেতে হবে। যাকে তাকে ভগবান ভাবা যায় না বা বলা যাবে না, যাকে তাকে ঋষি বলা যাবে না। ঋষি তিনি, যিনি চিন্তন করে ঈশ্বরের সত্যকে আবিষ্কার করেছেন। আর ভগবান হলেন তিনি, যিনি দেশকালের পারে।

যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ, সদা সর্বদা আমাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে যিনি স্মরণ করেন। আচার্য বলছেন, এখানে একটি শব্দ *মাং* বলতেই বোঝাবে পরমেশ্বরকেই বলছেন, *মাং* এখানে কৃষ্ণ নন। কৃষ্ণ যিনি দেবকীর পুত্র, কৃষ্ণ যিনি *বসুদেব সুতম্*, বসুদেবের পুত্র, সেই কৃষ্ণকে *মাং* বলছেন না, পরমেশ্বরকে বলছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যিনি কামারপুকুরে জন্ম নিলেন, দক্ষিণেশ্বরে সাধনা করলেন, কাশীপুর উদ্যানবাটীতে দেহত্যাগ করলেন, এটা তাঁর লীলা, তিনি পরমেশ্বর, তিনি দেশ ও কালের পারে, ম্যাটার এনার্জির পারে, তিনি বিশুদ্ধ চৈতন্য, তাঁকে সেই রূপে ধ্যান করতে হয়, তাঁকে সেই রূপে চিন্তন করতে হয়। গুণচিন্তন যখনই হবে, তখন পরমেশ্বর রূপে হবে। গুণচিন্তন তখনই হবে, যেটা দেশ কালের পারে, সেই রূপে। লীলাচিন্তন করতে যদি চান, তখন ভাবতে পারেন, ঠাকুর মানিকবাজারের আমবাগানে খেলা করছেন, ঠাকুর জিলিপি খেতে ভালবাসতেন, ঠাকুর এই এই করেছেন, তখন এই চিন্তনগুলো ঠিক আছে।

আমাদের ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে যদি সমাজের নামকরা কোন লোক, খুব বড় ধনীলোক বা স্কুলের হেডমাস্টার হঠাৎ করে এসে যান, ঘরে এসে বসলেন, হয়ত একটু জল মিষ্টি দিয়ে তাঁকে আপ্যায়ন করা হল, বা তিনি নিজেই বললেন, ঠিক আছে এক কাপ চা নিয়ে এসো। দৌড়ে বাড়ির ভিতর গিয়ে চা আনতে চলে গেলাম। হয়ত পাঁচ দশ মিনিটই ছিলেন, কিন্তু ঐ স্মৃতিটা আমাদের মন থেকে কোন দিন হারিয়ে যাবে না। আর আমি যাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছি, যাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে পারলে নিজেকে একজন ধন্য মানুষ মনে করি, সেই গুরুদেব কোন ভাবে যদি আমাদের বাড়িতে পাঁচ মিনিটের জন্যও এসে পড়েন, বা আমাদের স্কুলে এসেছেন, বা আমাদের পাড়ার লাইব্রেরিতে এসেছেন, আমি সেখানে ছিলাম, আমাকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন, সেই স্মৃতিটা কত মধুর স্মৃতি হয়ে মনের মণিকোঠায় আমৃত্যু সংরক্ষিত হয়ে থাকবে।

ভগবানকে ঠিক এ-ভাবেই মনে রাখতে হয়। পরমেশ্বর, যিনি অদ্বয় ব্রহ্ম, যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, যিনি আমাদের বাড়িতে; এই পৃথিবীলোকটা আমাদের বাড়ি, যে বাড়ির ধুলো বালি, মাটিতে আমরা খেলে বেড়াচ্ছি, সেই ধুলো বালিতে তিনি এলেন, আমাদের মতই থাকলেন, আমরা যে জিনিসগুলিকে পছন্দ করি, সেগুলোকে তিনি গ্রহণ করলেন। আমাদের মতই কত হাসাহাসি, কত রাগ অভিমান, কত আবদার, কত নাচগান করে একদিন স্বধামে চলে গেলেন। ঐ স্মৃতিটুকুকে ধরে রাখা, ধরে রেখে তাঁর চিন্তন করা। এই স্মৃতিটুকু হল শুধু যাতে সেই অদ্বয় অব্যয় অখণ্ড সচ্চিদানন্দের দিকে যাওয়া যায়।

তস্যাহং সুলভঃ পার্থ, এই ধরণের যিনি যোগী, যিনি সারা জীবন আমার স্বরূপের সাথে নিত্যযুক্ত হয়ে সাধনা করে এসেছেন, চব্বিশ ঘন্টা আমার স্বরূপের স্মরণ করে এসেছেন, মৃত্যুকালে তিনি অতি সহজেই আমাকে পেয়ে যান। আচার্য *সততং* শব্দের খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, *সততং ইতি নৈরন্তর্যম্ উচ্যতে*, *সততং* মানে নিরন্তর লেগে থাকা। তার সাথে বলছেন, *নিত্যশ ইতি দীর্ঘকালত্বম্ উচ্যতে*। দুটো শব্দ *সততং* আর *নিত্যশ*, *সততং* মানে নিরন্তর আর *নিত্যশ* শব্দের অর্থ দীর্ঘকাল, একটা কিছুতে নিরন্তর ভাবে দীর্ঘকাল লেগে থাকা। আমেরিকাতে আমাদের এক সেন্টারে একজন ভদ্রমহিল দীক্ষা নিয়েছেন। দীক্ষা নেওয়ার পনের দিন পর আশ্রমে এসে মহারাজকে বলছে, I repeated this mantra fifteen days, I did not get any result, তখন তাকে সেন্টারের অধ্যক্ষ মহারাজ বলছেন, I repeated this mantra for fifty years, পঞ্চাশ বছর ধরে আমি এই মন্ত্র জপ করে আসছি। মন্ত্র মাত্র একটা আর সেটাকে পঞ্চাশ বছর ধরে জপ করে আসছেন, ভাবা যায়। ধর্মজীবন *নিত্যশঃ*।

রাজযোগ খুব সহজ ভাষায় বলছেন, *স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ*, একই কথা, শ্রদ্ধার সাথে *সততং* আর *নৈরন্তর্য* ভাবে একটা জিনিসকে নিয়েই সাধনা করে যাচ্ছে, তখন গিয়ে ওটা দৃঢ় হয়। আচার্য বলছেন, *ন ষণ্মাসং সংবৎসরং বা কিং তর্হি যাবজ্জীবং নৈরন্তর্যেণ যো মাং স্মরতি*, ছয় মাস নয়, এক বৎসর নয়, সারাটা জীবন নিরন্তর লেগে থাকতে হবে। এক সপ্তাহ না, ছ মাস না, এক বছরও না, সারাটা জীবন, এটাই তাঁর জীবন ধারা। ঠাকুর গল্প বলছেন, বৃষ্টি হয়নি, খরা চলছে, তাই বলে যে জাত চাষী, সে চাষ আবাদ করা ছেড়ে দেবে না। নিজেই নেমে পড়ে চাষ করতে। এটাকে বলে সাধনা। আর ঠাকুর যদি নিজে চাষ করতেন, তাহলে তিনি কিভাবে চাষ করতেন? ঐ অবস্থায় চলে গেলে সেটা তখন তপস্যা হয়ে যাবে। তখন আর সে সাধক থাকবে না, স্রষ্টা হয়ে যাবে। বলছেন, *তস্যাহং সুলভঃ, সুখেন লভ্য*, খুব সহজে আমি তার লভ্য হয়ে যাই। নিরন্তর দীর্ঘকাল ব্যাপী আমাকে স্মরণ করে আসছে, আচার্য বলছেন, *যৎ এবম্ অতঃ অনন্যচেতাঃ সন্ ময়ি সদা সমাহিতো ভবেৎ*, সেইজন্য সব সময় মন আমাতে দিয়ে রাখো, সর্বদা আমাতে মনটা ঢুকিয়ে রাখো।

আমি সব ছেড়ে দেব, আমি স্বামী/স্ত্রী ছেড়ে দেব, সন্তান ছেড়ে দেব, জীবনে দৌড়ান ছেড়ে দেব, সমস্ত কিছু ছেড়ে আমি আপনাতে ঢুকে যাব, তাই করলাম; কিন্তু এতে আমার লাভটা কি হবে? আচার্য শঙ্কর এক জায়গায় বলছেন, কাজে যদি কোন প্রয়োজন সিদ্ধ না হয়, কোন লাভ যদি না থাকে, অত্যন্ত যে মুর্খ সেও ঐ কাজে নামবে না। আমরা অনেক সময় অভিযোগ করি, প্রয়োজন ছাড়া কি আমার কথা তোমার মনে পড়বে? প্রয়োজন ছাড়া কেন তোমাকে মনে পড়বে? ভালবেসে যদি মনে করে, সেটাও প্রয়োজন, ভাল লাগছে বলেই তোমার কথা মনে পড়ে। প্রয়োজন ছাড়া কিছু হয় না। তাহলে সব কিছু ছেড়ে আমি কেন তোমাতে সর্বদা মনকে ঢুকিয়ে রাখব? তুমি স্রষ্টা, তাতে আমার কি হবে, বিল গেটসের কথা ভেবে আমার কি হবে? প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীকে সারাদিন মনে করে আমার কি হবে? কারণ আমাদের ধারণা হল, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, বিল গেটস্ এদেরই বড় রূপ হলেন ভগবান। কিন্তু ভগবান একেবারেই তা নন। তাহলে ভগবানকে ভেবে কি লাভ? আর ভগবান লাভ হলেই বা আমাদের কি হয়? কথামৃতে ঠাকুর অনেকবার এই বিষয়ের উপর আলোচনা করেছেন। ভগবানকে ভাবলে জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্যের ঐশ্বর্য হয়। পরের শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই বিষয়টাকে নিয়েই বলছেন –

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ।।১৫।।

(আমার পূর্বোক্ত ভক্তিমান মহাত্মাগণ আমাকে লাভ করে দুঃখের আলয়স্বরূপ অনিত্য সংসারে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। কারণ তাঁরা আমার স্বরূপতা-প্রাপ্তিস্বরূপ পরম মোক্ষ লাভ করেন।)

বারো বা তের নম্বর শ্লোকে যেমনটা বলা হয়েছে, তেমনটা কেউ যদি হয়ে যান বা চোদ্দ নম্বর শ্লোক যেটা ভক্তদের জন্য, যার জন্য শ্লোকটির বেশি গুরুত্ব; এইভাবে কেউ যদি শিবের বা কৃষ্ণের বা রামের ভক্তি করে *অনন্যচেতাঃ* হয়ে যান, আর *সততং নিত্যশঃ*, অন্য কোন দিকে মন নেই, টানা দীর্ঘকাল ধরে অনন্যচিত্তে ভক্তি করে যাচ্ছেন, তখন কি হয়? প্রায়ই প্রশ্ন করা হয়, ভগবানকে ভক্তি করে কি লাভ হবে? এক কথায় ভগবান পনের নম্বর শ্লোকে এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না। সংসার হল দুঃখের আলয়, স্বর্গলোকটাও দুঃখের আলয়, পাতাললোকটাও দুঃখের আলয়, যে কোন লোক, দুঃখ ছাড়া কোথাও কিছু নেই। একটা জিনিসকে প্রাপ্ত করতে দুঃখ, সেটাকে ধরে রাখতে দুঃখ, চলে গেলে দুঃখ। যে কোন জিনিসকে পেতে চাওয়া মানেই আমরা দুঃখকে আহ্বাণ করে আনছি। মন দিয়ে খুব খাল কেটে যাচ্ছি, কিন্তু জানি না যে, ঐ খাল দিয়েই কুমির আমার কাছে সহজে চলে আসবে। সৃষ্টিটাই দুঃখের আলয়, *দুঃখালয়ম্*। *মামুপেত্য*, হে অর্জুন আমাকে যদি পেয়ে যাও তাহলে তোমার আর পুনর্জন্ম হবে না। দুঃখালয় পেতে হলে পুনর্জন্ম দরকার। পুনর্জন্ম মানেই দুঃখালয়ে গিয়ে পড়া।

দুঃখ তিন প্রকার – আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক। বাইরের জীবজন্তু, কোন প্রাণী থেকে যে দুঃখ আসে সেটাকে আধিভৌতিক বলা হয়। দেহ দিয়ে যে দুঃখ আসে, সেটাকে আধ্যাত্মিক বলে আর দেবতাদের থেকে যে দুঃখ-কষ্ট আসে সেটাকে বলছেন আধিদৈবিক। বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, নিজের ভিতর থেকে কষ্ট, বাইরে থেকে কষ্ট আর উপর থেকে কষ্ট। যেখানেই আমরা যাই, এই তিনটে দুঃখ আমাদের সঙ্গে থাকবেই। বিষম পরিস্থিতি যে কোন লোকের হতে পারে, যেমন ঠাকুর, ঠাকুরেরও বিষম পরিস্থিতি আসত, কিন্তু তার জন্য দুঃখ হত না। মা কালীর জন্য ব্যাকুলতা আছে, নরেনের জন্য ব্যাকুলতা আছে কিন্তু দুঃখ; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক কষ্টটা নেই, যে অর্থে বেদনা বলা হয়, সেই বেদনাটা তাঁর নেই। কিন্তু ব্যাকুলতা আছে, ছটফটানিটা আছে, কার সঙ্গে কথা বলবেন, এই নিয়ে চিন্তা আছে।

শুধু যে *দুঃখালয়ম্* তা না, *অশাশ্বতম্*। আমরা মনে করছি এখানে সব কিছু শাশ্বত, আমরা জন্ম নিয়েছি, মনে করছি আমি কোন দিন মারা যাব না। আপনারা হয়ত বিশ্বাস করবেন না, বলবেন আমি বাড়াবাড়ি করছি – আমি রোজ সকালে উঠেই ভাবি, আমি যদি আজ মারা যাই তাহলে আমার কি কি কাজ বাকি থেকে যাবে, আগে সেগুলোকে গুছিয়ে রেখে দিতে হবে, যাতে এখানকার মহারাজদের কোন অসুবিধা না হয়। সব কাজ হয়ে গেল, মনটা ফ্রেশ হয়ে গেল, এবার দিনটা শুরু করা যাবে। Ready for day, ready for death দুটোকেই তৈরী করে রাখতে হবে। কারণ *অশাশ্বতম্*, কিছুই থাকবে না, আর *দুঃখালয়ম্*, দুঃখের আলয়; এগুলোর পিছনে শক্তি হল পুনর্জন্ম।

পুনর্জন্ম ব্যাপারটা কতটা ঠিক? পুনর্জন্ম নিয়ে লোকেরা আমাদের প্রায়ই এই প্রশ্ন করে। পুনর্জন্মের উপর আমরাও অনেকবার বিভিন্ন ক্লাশে আলোচনা করেছি। প্রথম হল, আমাদের যে কোন জ্ঞান আমাদের বুদ্ধি দিয়ে হয়। বুদ্ধির কাছে যত ইনপুটস আসে সব ইন্দ্রিয় দিয়ে আসে। ফরাসী বিপ্লবের সময় কিছু কিছু লোক বলতে শুরু করলেন, আমরা এসব কিছু মানব না। এরা বিশেষ করে মারাত্মক ভাবে চার্চের বিরুদ্ধে চলে গেল, এমন কি কোন যুক্তিকেও তারা মানবে না। তাদের কাছে একটাই মানার জন্য আছে, তা হল, আমি ইন্দ্রিয় দিয়ে যেটা জানতে পারছি, মাপতে পারছি, একমাত্র সেটাকেই আমরা মানব, এর বাইরে আমরা কোন কিছু মানব না। এই করে বিজ্ঞান অনেক দূর পর্যন্ত পিছিয়ে গিয়েছিল, কত পিছিয়ে গিয়েছিল কল্পনাই করা যায় না।

অগস্ট কমটে সেই সময়কার একজন বড় দার্শনিক, তিনিই এটাকে নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। পরে ওনার কি মনে হল, জিনিসটা ঠিক না, তিনি তাঁদের থিয়োরিটাকে একটু ঠিকঠাক করলেন। ঠিকঠাক করলেন, এই যে শব্দটা আমরা বললাম, এটাই দেখিয়ে দেয় বুদ্ধি কত গোলমেলে। একজন এক রকম ভাবছেন, আর-একজন অন্য রকম ভাববেন। আমি নিজেই এক বছর আগে এক রকম ভাবতাম, আজকে এই জায়গায় এসে অন্য রকম ভাবছি। অনেক শ্রোতা আছেন, যাঁরা আমাদের এই লেকচার শুনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, দেখা করতে আসেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে আছেন, যাঁরা জীবনে নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন, জীবনটাকে অন্ধকারময় লাগছিল। এখানে এসে বলছেন, আপনাদের ক্লাশগুলো শুনতে ভাল লাগছে। এখানে ভাল লাগাটার কোন গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব হল, আপনার মন গতকাল এক রকম ছিল, আজ আর-এক রকম হয়ে গেছে। এই মনকে কি বিশ্বাস করা যায়? এই মন যদি আমাকে একটা সত্য বলে, এটাকে কি সত্য বলে বিশ্বাস করা যায়? না, বিশ্বাস করা যায় না। কারণ মনের কোন স্থায়ী অবস্থিতি নেই। তখন আমাদের যুক্তিতর্ক লাগাতে হয়। একটা জিনিসকে বোঝার জন্য আমরা প্রায়ই যুক্তিতর্কের আশ্রয় নিই।

হিন্দু শাস্ত্রের যত দর্শন আছে, এগুলোকে বলেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তার সঙ্গে বলেন অনুমান প্রমাণ, এই অনুমান বাংলা অনুমান না, অনুমান বলতে এখানে যুক্তির কথা বলছেন। কিন্তু যখন ভগবানের ব্যাপার আসে, তখন তাঁরা লাইন টেনে দেন। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যাবে না। এর আবার অনেকগুলো কারণ আছে। সূক্ষ্ম দিয়ে স্থূলকে জানা যায়, স্থূল দিয়ে সূক্ষ্মকে জানা যাবে না। ঈশ্বর হলেন সূক্ষ্মতম, কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয় মন এরা চৈতন্যের তুলনায় অনেক বেশি স্থূল, সেইজন্য চৈতন্যকে জানা যাবে না। গণিত শাস্ত্রে অনেকগুলো ইক্যুয়েশান আছে, যার কোন প্রমাণ নেই, গণিতের নিয়মে প্রত্যেকটা ইক্যুয়েশান ঠিক। ফিজিক্সে খুব মজার ব্যাপার আছে, নাইন টেনে এখন মিট্রিক্স পড়ানো হয়। মিট্রিক্স যখন গণিতে এলো তখন ওনারা জানতেনও না যে এর কি এ্যাপ্লিকেশান। মিট্রিক্সের সবচেয়ে বিচিত্র জিনিস যেটা, তা হল, A x B is not equal to B x A। মিট্রিক্স এখন আর হায়ার ম্যাথমেটিক্স না, এখন ক্লাশ নাইন টেনে পড়ানো হয়। আমরা জানি A x 3 x 4 = 4 x 3, A x B = B x A, কিন্তু মিট্রিক্সে তা হয় না, মিট্রিক্সে A x B is not equal to B x A। হতেও পারে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয় না।

তারপর এলো ফিজিক্স। ফিজিক্স এমন একটা পরিস্থিতিতে চলে গেছে যেখানে এখন হাইজেনবার্গের খুব নামকরা Uncertainity Principle এসে গেল। Uncertainity Principleএর একটা হল A x B is not equal to B x A। ইতিমধ্যে কোন একটা কনফারেন্সে এই বিষয়টার উপর ওনারা কিছু শুনেছিলেন, শোনার পর তখন ওনারা যোগাযোগ করলেন এবং পেপার পাঠাতে বললেন। পেপার পাওয়ার পর তখন জিনিসটা পুরো এগিয়ে গেল। অনেক সময় এই রকম হয়, চিন্তন করে একটা জিনিস এগিয়ে গেল, কিন্তু বাস্তবিক জগতে তার কোন প্রয়োগ নেই। কারণ মন অনেক বেশি সূক্ষ্ম। বর্তমান কালে গণিতে অনেক থিওরী আছে, যেটা গণিতের নিয়মে পুরো ঠিক, কিন্তু জগতে তার কোন দৃষ্টান্ত নেই। ঈশ্বর এই সমস্ত কিছুর থেকেও অনেক বেশি সূক্ষ্ম। সেইজন্য হিন্দুরা বলেন, ঋষিদের কথাকে প্রমাণ রূপে নিতে হবে। ঋষিবাক্যকে ওনারা বলেন, শব্দ প্রমাণ বা শ্রুতি প্রমাণ।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে, ঋষিদের কথা কেন আমরা মানব? একজন এসে বললেন, কার্ল মার্ক্স একজন ঋষি। কিন্তু বাস্তবে কার্ল মার্ক্স একজন অর্থনীতিবিদ্, সমাজবিদ্। ঋষি হলেন যাঁর দৃষ্টি সর্বদা ঈশ্বরের অনুসন্ধানে লেগে আছে। কার্ল মার্ক্স যদি বলতেন, আমার থিওরীকে প্র্যাক্টিস করে কেউ ঈশ্বরকে পেতে পারে, তখন আমরা ভেবে দেখতাম সত্যিই এই থিওরী দিয়ে ঈশ্বরলাভ হয় কিনা। তারপর কেউ যদি এসে বলেন, হ্যাঁ, এই থিওরীর প্র্যাক্টিস করে আমি ঈশ্বরকে পেয়েছি, তবে কার্ল মার্ক্সকে একজন ঋষি বলে মানা যাবে।

ঋষিরা ছিলেন একেবারে স্বচ্ছ পবিত্র। পুরাণে ঋষিদের নিয়ে যে কাহিনীগুলি পাওয়া যায়, আসলে এই কাহিনীগুলো হল মানুষকে সাবধান করার জন্য –সাধনার পথ কত কঠিন, যোগের পথ কত কঠিন, ঋষিরা এত উচ্চমানের কিন্তু তাঁরাও এই ভাবে প্রলোভনের ফাঁদে ফেঁসে যেতেন। ঋষিদেরই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে তোমার অবস্থা কি হবে ভেবে দেখ, তাই প্রথম থেকেই সমস্ত প্রলোভন থেকে সাবধান হয়ে যাও। প্রকৃতপক্ষে উচ্চমানের ঋষিদের কখন পতন হয় না, তাঁরা এতটাই উচ্চস্তরের ঋষি ছিলেন যে, তাঁদের এই ধরণের পতন কখনই সম্ভব না। কিন্তু আধ্যাত্মিক পথের সাধকদের সাবধান করার জন্য এই ধরণের কাহিনীগুলিকে তৈরী করা হয়েছে।

ঋষিরা একদিকে পবিত্র আবার অন্য দিকে তাঁদের কোন স্বার্থ ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ শেষ বয়সে দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে গেলেন, সেই সময় চাঁদা তুলে তাঁর দৈনন্দিন খরচ চালাতে হত, শ্রীরামকৃষ্ণের কিসের স্বার্থ। এনাদের একটাই স্বার্থ, মানুষের যাতে মঙ্গল হয়। এনাদের কথা না নেওয়াটা বিরাট ভুল। কারণ, আমরা যেখানে যে ভাবেই থাকি না কেন, আমরা সব সময় আমাদের থেকে কোন একজন উন্নত মনস্কের ব্যক্তিকে অনুসরণ করি। পাঁচ ছয় বছরের ছোট বাচ্চারা সব সময় প্রশ্ন করবে, কিন্তু সাধারণ ভাবে সে ওটাই মানবে যেটা মা বলে দিয়েছে বা বাবা যেটা বলে দিয়েছে। কারণ কোথাও তার মধ্যে এই বোধটা আছে যে, আমার বাবা সব জানে, আমার মার থেকে আর কেউ বেশি জানে না, এনারা উন্নত মনস্কের। উন্নত মনের অধিকারীকে সব সময় অনুসরণ করতে হয়। ঠাকুর খুব সহজ করে বলছেন, ভাল মানুষকে অছি করলে সে ক্ষতি হতে দেয় না। তার মানে, কোন ভাল লোককে যদি দায়ীত্ব দিয়ে দেওয়া হয়, তিনি কখন আমার ক্ষতি করবেন না। ঠাকুরকে কেউ অবতার রূপে দেখতে পারেন, কেউ ঋষি রূপে দেখতে পারেন, সিদ্ধ রূপে দেখতে পারেন, তাতে কিছু আসে যায় না, তিনি একজন ভাল মানুষ। সাধনা করে নিজের শরীর মনকে পবিত্র করেছেন, তার থেকেও বেশি, কোন স্বার্থ ছিল না। সেইজন্যই ঋষিদের কথাকে বিশ্বাস করতে হয়, তাঁদের কথাতে আস্থা রাখতে হয়, কারণ তাঁরা উন্নত মনস্কের, ভাল মানুষ।

আমাদের এক সন্ন্যসী ভাই স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর একটা ঘটনা বলেছিলেন। কোন একটা প্রোগ্রামে একজন মহারাজকে কিছু কাজের দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছিল, সেখানে তিনি কিছু গোলমাল

করে ফেলেছিলেন। স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, কখন রাগতেন না। কেউ কখন ওনাকে রেগে যেতে দেখেননি, অত্যন্ত মধুর ভাষী। যাঁর কাজে গোলমাল হয়েছে, সেই মহারাজ মাথা নিচু করে মহারাজের অফিসে ঢুকেছেন, খুব অস্বস্থি অনুভব করছেন। মহারাজ তাঁকে খুব মিষ্টি করে বলছেন, Two heads are always better than one head, মহারাজের বক্তব্য হল, তুমি যদি আগে আমার সাথে একটু পরামর্শ করে নিতে, আমি বলে দিতাম কোথায় কোথায় গোলমাল হতে পারে। তুমি তো সবটাই নিজের মত করতে গেলে। শুনে সেই মহারাজ খুব লজ্জিত হলেন।

আমরা ক্লাশে অনেকবার এই কথা বলি, জীবনে কোন একজন ভাল মানুষের কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে মাথা নত করতে হয়। যে জীবনে কোন ভাল মানুষ পায়নি, সে অভাগা। কিছু লোক আছে যাদের এই কথা বললেই তিড়িং করে ওঠে, কেন আমার মাথা একজনের পায়ে নত করতে যাব! আসলে এরা সবাই সাধারণ মানুষ! এরা সবাই এক-একটা অহঙ্কারের ঢিপি, আর ভিতরে এদের কত আগুন জ্বলছে নিজেরা টের পায় না। Two minds always better than one mind, তার মধ্যে second mindটা যদি অভিজ্ঞ মন হয়, যিনি জগৎকে অনুভব করেছেন, জগৎকে জানেন, এনারা সব সময় ভাল। বেশির ভাগ মানুষের মন বাচ্চাদের মত চঞ্চল, এই একবার এদিকে যাচ্ছে, এক মিনিট যেতে না যেতেই আবার অন্য দিকে চলে যাচ্ছে। বাচ্চাদের মধ্যে দেখা যায়, আজকে একজনের সাথে তার বন্ধুত্ব হল, কাল তার সাথে ঝগড়া হল, পরশু আর-একজনের সাথে বন্ধুত্ব করল। স্কুল থেকে ফিরে মাকে স্কুলের বন্ধুদের সব ইতিহাস শোনাতে থাকে, মা শুধু হাঁ হুঁ করতে থাকে, মা জানে এগুলো কিছুই না। গীতায় সেইজন্য বলছেন, *তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে,* শাস্ত্রকে প্রমাণ রূপে সামনে রাখবে, শাস্ত্রের উপর আস্থা রেখে চলতে হবে। তা যদি না কর, তোমার মন তোমার মালিক হয়ে যাবে, আর এই মন একটা দৈত্য। ঐ দৈত্যকে পথে আনার জন্য একজন গুরু দরকার, একজন দরকার যাঁর বুদ্ধি স্বচ্ছ, যাঁর নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে।

তখন প্রশ্ন আসবে, এত শাস্ত্র রয়েছে, কোন শাস্ত্রের উপর আস্থা রেখে চলব? এত ধর্ম রয়েছে, কোন ধর্মকে অনুসরণ করব? চোখ কান বন্ধ করে যে কোন একটা শাস্ত্রকে অনুসরণ করুন, গীতাকে অনুসরণ করুন, কথামৃত অনুসরণ করুন, যেটা আপনার খুশী অনুসরণ করতে পারেন। যখন একটা শাস্ত্রকে নিয়ে সাধনা শুরু করবেন, তখন মন যেমনি ডান দিক বাম দিক যেতে থাকবে, তখন মনকে, ঠাকুরের কথায়, ডাঙস্ মারতে হয়। হাতিকে নিয়ে মাহুত যখন যায় তখন মাহুতের হাতে এই ডাঙস্ থাকে, পরের গাছে মুখ বাড়ালে মাহুত হাতির মাথায় ডাঙস্ মারে, হাতি সোজা হয়ে যায়। হাতি যদি পাগল হয়ে যায়, তখন আর কোন ভাবেই হাতিকে সোজা করা যায় না, এদিক ওদিক দৌড়াতে শুরু করে, মাহুতকেও ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ইদানিং নূতন প্রজন্মের বেশির ভাগের Border line disorder (BPD) হতে শুরু হয়েছে। কথায় কথায় চেঁচাবে, নিজে কিছু করবে না, এদিকে সবার কাছ থেকে ইমোশানাল সাপোর্ট চাইবে। অন্য দিকে কোন দায়ীত্ব পালন করবে না। মানুষ যখন একটা আশ্রয়কে নিয়ে এগোতে শুরু করে, নিজেই সে জানতে পারবে, ঠিক কি বেঠিক কি। তখন যদি মনে হয় এটা ভুল, ছেড়ে দিতে হবে।

শাস্ত্র যখন বলছেন, পুনর্জন্ম আছে, আমাদের মেনে নিতে হবে পুনর্জন্ম আছে। ভুল তো হতে পারে, তাতে কি হবে! শাস্ত্র বলেছে, আমি মেনে নেব। যখন জ্ঞান হবে, ঠাকুর এসে বলে দেবেন, দেখ বাপু, পুনর্জন্ম বলে কিছু নেই; পুনর্জন্ম নেই, মিটে গেল, তখন ইচ্ছে করলে সেও একটা নূতন শাস্ত্র লিখে দিতে পারবে। ভগবান দুটো শ্লোক পরেই বলবেন, আমরাও তখন আবার বলব। সেখানে খুব সুন্দর বলছেন, হিন্দুরা কর্মবাদ মানে, কর্মবাদ মানে লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে; কোথাও একটা কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে। কার্য কারণ সম্পর্ককে আমরা হিন্দুরা সবাই মানি। আমি জীবনে যাঁর কাছে অনেক কিছু শিখেছি, তিনি আমাকে একটা কথা প্রায়ই বলতেন, কর্মবাদ সিদ্ধান্ত নয়, কর্মবাদ সত্য। তিনি জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, বার বার তিনি বলতেন কর্মবাদ সত্য। তাই যদি হয়, তাহলে যারা

বদমাইশি করছে, জনগণের টাকা চুরি করছে, তারপর দেশের এমএলএ, এমপি হয়ে রাজা হয়ে ক্ষমতার মাথায় বসে আছে। অথচ আমি কোন দোষ করিনি, কোন চুরি করিনি, দুর্নীতি করিনি, কিন্তু আমার জীবনে এত দুঃখ-কষ্ট কেন? এগুলো দেখে কি মনে হবে না যে, কর্মযোগ কেমন এলেমেলো হয়ে যাচ্ছে? দুষ্ট লোক ক্ষমতার শীর্ষে চলে যাচ্ছে, শিষ্ট লোককে পিষে দিচ্ছে, কেন? কোন উত্তর নেই। দায়ী তাহলে ভগবান, ভগবানের তো বৈষম্য দোষ এসে যাবে। যে ভগবানের বৈষম্য দোষ, তিনি কিসের ভগবান? আরও বাজে, ভগবানই সব কিছু করছেন, তিনি যদি কর্তা হয়ে থাকেন, তাহলে মানুষ যত পাপ করছে সেই পাপের ফল ভগবানের উপর যাবে? তাহলে তো ভগবানকে নরকে যেতে হবে।

এগুলো খুবই সহজ যুক্তি, বিরাট কিছু না। ঈশ্বর যদি আমার স্রষ্টা হন, ঈশ্বর যদি কর্তা হন, তাহলে আমি যে পাপকর্ম করছি তার দায় ভগবানের উপরেই যাবে। যে ভাল কাজ করছে তার ফল সে পাচ্ছে না, যে বাজে কাজ করছে, বাজে কাজ করার জন্য সে কোন শাস্তি পাচ্ছে না। আর আমি যে ভাল কাজ করছি, তার ভাল ফল আর-একজন নিয়ে নিচ্ছে। প্রকৃতি ব্লাইণ্ড কিনা, বস্তুবাদীদের কাছে সবটাই ব্লাইণ্ড। তাহলে করব আমি, আর ফল পাবে আর-একজন? ভাল ক্যারাম খেলোয়াড়, যেখানে গুটি ফেলতে বলবেন, বলে বলে গুটি ফেলে দেবেন। কিন্তু যারা ভাল খেলতে পারে না, তার গুটি ছিটকে একটা ওদিকে যাবে আর-একটা গুটি অন্য দিকে যাবে, হয়তো তার প্রতিপক্ষের গুটিই গর্তে ফেলে দিল।

ঋষিরা যে শাস্ত্রগুলি দিয়েছেন, সেখানে যে মুক্তির মার্গ সব দেওয়া হয়েছে, আমাদের জীবনে এর সার্থক হওয়া দরকার। আর যোগশাস্ত্রে পাঁচ রকমের ক্লেশের কথা বলা হয়েছে, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ আর অভিনিবেশ। এই সমস্ত কিছুর ফাঁদে আমরা পড়ে আছি, এগুলো অনেক জন্ম ধরে কাজ করে, এক জন্মে কিছু হয় না। সবাইকে আবার ঐ গর্তে পড়তে হবে, আমি পুনর্জন্ম মানি আর নাই মানি, সবাইকে ঐ গর্তে গিয়ে আবার পড়তে হবে। প্রথম কথা, শাস্ত্রকে মানতে হয়। যদি বলেন আমি শাস্ত্র মানি না, তাহলে শাস্ত্র আপনার জন্য নয়।

যখনই কোথাও দুঃখ কষ্ট দেখি তখন ভাবি, হে ভগবান গত জন্মে কি কর্ম করেছিল, যার জন্য এই জন্মে এই দুরবস্থা হয়েছে। একজন স্ত্রী যখন বলে, স্বামী আমাকে খুব কষ্ট দেয়, তখন ভাবি এও আগের জন্মে কত পাপ কর্ম করেছ যে, আজকে তাকে এই রকম স্বামী পেতে হল। এখানে এটা বলতে চাওয়া হচ্ছে না যে, তার স্বামী বিরাট ভাল মানুষ। এখনও তোমার সময় আছে, মেনে নাও, পুরনো পাপকে ক্ষয় কর, ক্ষয় করার জন্য তপস্যা কর, আজ থেকেই তপস্যা শুরু কর। আসলে আমাদের সমস্যা হল, যত সাধুসঙ্গ করি, যাত শাস্ত্র পড়ি, যত জপধ্যান করি, কিন্তু ঘুরে ফিরে সব আমাদের জীবনদর্শনে চলে যায়, অমুক দিনে জন্মে ছিলাম, মরে গেলে খেলা শেষ। এই ধরণের চিন্তার সংস্কার থেকে আমরা বেরোতে পারি না।

যারা নিজেদের নাস্তিক বলে, মুখে বলে নাস্তিক, আসলে ঠিক ঠিক নাস্তিক হয় না; স্বামীজী বলছেন যদি ঠিক ঠিক নাস্তিক হয়, তাহলে তার শরীরকেও না করতে হবে, খুব উঁচু জিনিস, এই রকম লোকের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি কুড়ি মাইল পায়ে হেঁটে যাব। আমাদের সবার একটাই জীবনদর্শন, না আমরা বেদান্তী, না আমরা সাংখ্যবাদী, না আমরা মীমাংসক, আমরা হলাম সুবিধাবাদী দর্শনের লোক, ধর্মটাও আমাদের সুবিধাবাদী ধর্ম। যেখানে ঠাকুরের ইচ্ছে লাগাতে হবে সেখানে ঠাকুরের ইচ্ছে লাগিয়ে দিচ্ছি, যেখানে কর্মফলের দোহাই দিতে হবে সেখানে কর্মফলের দোহাই দিচ্ছি, এই করেই আমাদের জীবন চলছে, সেইজন্য ধর্মপথে, ঈশ্বরের পথে আমরা এগোতে পারছি না। গীতার এই কথা শুনেও যদি জীবনের প্রতি মায়া না কমে, এইসব কথা শুনেও যদি মুক্তির ইচ্ছা না জাগে, তাহলে কি আর করা যাবে।

পুনর্জন্ম শুধু মানুষেরই হয় না, পুরো সৃষ্টিটাই পুনরাবৃত হয়ে চক্রাকারে চলেছে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পুনর্জন্ম হচ্ছে, দেবতাদের পুনর্জন্ম হচ্ছে। *পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্*।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।।১৬।।

(হে অর্জুন, পৃথিবী হতে আরম্ভ করে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সব লোকই পুনরাবর্তনশীল। কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে লাভ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না।)

সেই পুনর্জন্মের কথাই আসছে। *আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ*, চোদ্দটি ভুবন, উপরে সাতটি নীচে সাতটি, একদিকে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ আর নীচে তল, অতল, বিতল, পাতাল পর্যন্ত, অন্য দিকে ব্রহ্মলোক অবধি, যত লোক আছে সব লোকের পুনর্জন্ম হচ্ছে। সৃষ্টি, লয়, প্রলয়, মহাপ্রলয় আবার সৃষ্টি, আবার এক জিনিস, এর মধ্যেই সমস্ত প্রাণী ঘুরে চলেছে। অনেক জন্ম কষ্ট পেয়ে পেয়ে, দুঃখ ভোগ করে করে, মার খেয়ে খেয়ে কবে একটু হুঁশ আসবে কেউ জানে না। ঠাকুর বলছেন, গরুগুলোকে এত খাটতে হয়, সারাদিন রোদে জলে ক্ষেতে লাঙল টানছে, তাও সে হাম্বা হাম্বা করে। চামারের হাতে পড়ে কত পেটাই হয়। সব হয়ে হয়ে নাড়ি দিয়ে যখন তাঁত তৈয়ার হয়, তখন ধুনুরির হাতে পড়ে বলে তুঁহু তুঁহু। এখানে বলছেন, প্রাণীকুল যেখানে জন্ম নেয় সেটাকে ভুবন বলে। যাবতীয় যা কিছু আছে সব কিছুর পুনর্জন্ম হয়। শুধু যে মানুষের পুনর্জন্ম হয় তা না, সমস্ত লোক পুনরাবর্তিত হয়; এই পুনর্জন্ম কবে থেকে চলছে, কেউ জানে না।

এগুলো কেন এই রকম? আচার্য শঙ্কর উত্তর দিচ্ছেন, *কালপরিচ্ছিনত্বাৎ*, এই চতুর্দশ ভুবনের সব কিছু কাল দ্বারা বাধিত। বেদের নাসদীয় সূক্তে বলছেন, *ন মৃত্যুরাসীদমৃতং*, এইসব কথা, এত উচ্চ ভাব শুনলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায় আর অবাক হয়ে ভাবতে হয়, আট হাজার দশ হাজার বছর আগে আমাদের ঋষিরা ঈশ্বরকে নিয়ে চিন্তন করেছেন, সেই গভীরে গিয়ে ঈশ্বর দর্শন করেছেন, তখন বলছেন, *ন মৃত্যুরাসীদমৃতং*, আচার্য শঙ্কর সপ্তম শতাব্দীতে এসে সেই একই কথা বলছেন। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, কেন সব কিছুর পুনর্জন্ম হয়, *কালপরিচ্ছিনত্বাৎ*, কালে পরিচ্ছিন্ন বলে। সময়ের নিরিখে যে জিনিসটাই বাঁধা, তাকে এই চোদ্দটি লোকের মধ্যে ঘুর ঘুর করতেই হবে। কালী, তিনিই কালের পারে। কালীকে পেলে আর কালের মধ্যে পড়ে থাকতে হবে না।

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ।।১৭।।

(মানুষের গণনায় সহস্রচতুর্যুগ পর্যন্ত যে ব্রহ্মার একটি দিন এবং সহস্রচতুর্যুগব্যাপী যে তাঁর একটি রাত্রি যে যোগিগণ অবগত হন, তাঁরা দিবারাত্রের তত্ত্ববেত্তা।)

নাসদীয় সূক্তের শেষের দিকে এসে ঋষি বলছেন, কেউ জানে না সৃষ্টি কিভাবে এসেছে, কিভাবে হয়েছে, কি হল, কি না হল, কিচ্ছু জানা নেই। একটা জিনিস যেটা জানা যায়, পুরো জিনিসটাই বিরাট। কারণ আমরা দেখতেই পারছি সূর্য কবে থেকে আছে, তারা নক্ষত্র কবে থেকে আছে। ঋষিরা এটাকেই আরও বিস্তার করে দিয়ে বলছেন, *সহস্রযুগ*। সহস্রযুগ মানে একটা বিরাট লম্বা সময়। আমি অনেক খেটেখুটে একটা হিসাব করেছিলাম, মানুষের ৯,৫৮৮,১৬,০১,০০০ বছর সমান ব্রহ্মার একটা দিন। এই রকম একটা দিন আর একটা রাত এই হিসাবে ব্রহ্মা একশ বছর বেঁচে থাকেন। এবার হিসাব করে নিন, আমাদের কত দিন এর মধ্যে ঘুরপাক খেতে হবে। ব্রহ্মার এই রকম সহস্রযুগ চলে। মানুষের ৯,৫৮৮,১৬,০১,০০০ বছর সমান ব্রহ্মার একটা দিন আর

এতটাই একটি রাত, এটাকে এবার নিয়ে যেতে হবে একটি বছরে, এই একটি বছরের হিসাবে একশটা বছর। এই রকম করে বাড়তে বাড়তে পুরো একটা যুগ হয়, এই রকম সহস্রযুগ। ব্রহ্মার যে আয়ু, বলা হয় আয়ুকালে চোদ্দ জন মনু থাকেন। ভগবান বলছেন, যাঁরা এই দিন ও রাত্রির তত্ত্ব জানেন, তাঁরা যোগী। আচার্য শঙ্কর স্পষ্ট বলছেন, এই জিনিসগুলো জানা যায় না, যোগীরা জানেন। যোগীদের কথা, ঋষিদের কথা বিশ্বাস করতে হয়। কেন বিশ্বাস করতে হয়, আমরা আগে এর আলোচনা করেছি। সেখান থেকে বলছেন –

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে্য প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে।।১৮।।

(ব্রহ্মার দিবাগমে সমস্ত আকৃতিবিশিষ্ট বস্তু অব্যক্ত থেকে অভিব্যক্ত হয় এবং ব্রহ্মার রাত্রিসমাগমে সেই অব্যক্তেই তারা প্রলীন হয়।)

এই শ্লোকে অব্যক্ত অবস্থার কথা বর্ণনা করছেন। সৃষ্টিতে ব্রহ্মার যখন জন্ম হয়, তখন স্থাবর, জঙ্গম, প্রানীকুল সব কিছু অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। ভাগবতে বর্ণনা আছে, ভগবান যখন ইচ্ছা করলেন সৃষ্টি হোক, তখন সেই নির্গুণ নিরাকার, যেখানে সময় নেই, দেশ নেই, বস্তু নেই, সেখানে সেই নির্গুণ নিরাকারকে এবার সগুণ সাকার রূপে দেখা গেল। সেই সগুণ সাকার থেকে জন্ম নিলেন ব্রহ্মা। সৃষ্টি যখন শুরু হবে, তার ঠিক আগের অবস্থাটাকে বলছেন *অব্যক্তাদ্*। অব্যক্তের আরেকটা অর্থ নির্গুন নিরাকার ব্রহ্ম, কুড়ি নম্বর শ্লোকে এর বর্ণনা করবেন। দিনের যে আরম্ভ হয়, এটাকে বলে *অহরাগম্*। বলছেন, ব্রহ্মার যখন দিন হয় তখন সমস্ত প্রাণীর জন্ম হয়ে যায়। রাত্রির আগমনে ব্রহ্মা যখন ঘুমোতে যান তখন সমস্ত প্রাণী তাঁর মধ্যে লয় হয়ে যায়। তার মানে ব্রহ্মার দিন ও রাত্রির হিসাব মত আমরা রোজ মরছি, রোজ জন্মাচ্ছি, যদিও ব্রহ্মার একটা দিন মানে বিরাট লম্বা সময়, পৃথিবীর সময়ের পরিমাপে প্রায় নয় হাজার ছ'শ কোটি বছর। সকালে ব্রহ্মার ঘুম ভাঙার পর আবার সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টি হয়ে যায়। দিনাবসানে সমস্ত প্রাণী ব্রহ্মাতেই বিলীন হয়ে যায়, এগুলোকে বলে লয়। এই ভাবে দিন রাত্রি যেতে যেতে ব্রহ্মার একশ বছর হয়ে যায়, সেখান থেকে এক যুগ, সেখান থেকে হাজারটা যুগ চলছে। এরপর আবার যখন সৃষ্টি হবে, তখন আগের কল্পে যা যা ছিল, এই কল্পে আবার সেই একই জিনিস বেরিয়ে আসবে।

পনের নম্বর শ্লোকে ভগবান নিজেই বলছেন, এই সংসার *দুঃখালয়মশাশ্বতম্*, এই সংসার দুঃখময় আর কোন কিছুই চিরদিন থাকবে না। সৃষ্টির সব কিছু ভাল করে দেখার পর মানুষের মন যাতে বলতে পারে আমার আর এ-সব কোন কিছুই লাগবে না, জীবনের উদ্দেশ্য মুক্তি লাভ করা, ঠাকুর যাকে বলছেন, ঈশ্বরদর্শনই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য; শুধু এই বোধটা জাগাবার জন্য এই সৃষ্টিতত্ত্বের এত কিছু বলা। আমরা সবাই কিভাবে এরই মধ্যে জন্ম-মৃত্যুরূপী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘুরপাক করে যাচ্ছি। ব্রহ্মার যখন শয়ন, তখন বলছেন, এই যে প্রজাপতি, যিনি অব্যক্ত তিনি নিদ্রাবস্থায় চলে যাচ্ছেন, মানুষের বছরের হিসাবে কত হাজার কোটি বছর পর আবার নিদ্রা থেকে উঠছেন। সুতরাং শুধু যে আমাদের পুনর্জন্মই হচ্ছে তা না, যদি লয় হয়ে যায়, তাতেও আমরা বাঁচব না, ওখানেই অব্যক্ত অবস্থায় কত কোটি বছর যে পড়ে থাকতে হবে, আমরা কেউ জানিনা। আবার যখন সৃষ্টি হবে, ওখান থেকে টেনে আবার সৃষ্টিতে নামিয়ে এনে আগের সৃষ্টিতে যেখানে শেষ করেছিলাম, সেখান থেকে আবার ঘানি টানাতে থাকবেন।

ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন, আগেকার দিনে গ্রামের গিন্নীরা কুমড়োর বীজ, লাউয়ের বীজ, শশার বীজ সব পুঁটলি করে রেখে দিত। চাষের সময় সেই পুঁটলি থেকে বীজ বার করে আবার চাষ-আবাদ করতে শুরু করে দিল। ঠিক এভাবেই সৃষ্টি হয়। এই যে cyclic creation, এর মধ্যে সবাইকে ঘুরতে হবে। এরপরেও যদি এই বোধটা না জাগে, তাহলে আর কিছুর বলার নেই।

আমাদের একজন পরিচিত যিনি কানাডাতে থাকেন, উনি ক্রতু বইটা পড়ে লিখলেন, আমার যদি এই অনুভূতি হত, আমি প্রথম জিনিসটাই চাইতাম মুক্তি, আর যেন জন্ম না হয়। গীতা এই কাজটাই করছেন। গীতা আমাদের দেখাচ্ছেন, দেখো জীবন এই ভাবেই চলে, জন্ম-মৃত্যু এভাবেই চলে; তাই তোমরা মুক্তির চেষ্টা কর।

কেন গীতায় এই জিনিসটাকে নিয়ে আসছেন? এর চারটে মূল কারণ – (১) যে কর্মগুলি করা হয়েছে, সেই কর্মের ফল পেতে হবে, (২) যে কর্মগুলি করা হয়নি সেই কর্মের ফল যেন আর না পেতে হয়, (৩) শাস্ত্রের মূল কথা মুক্তি, মুক্তির পথ দেখানো আর তার সাথে (৪) পাঁচ প্রকার ক্লেশ; অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেশ আর অভিনিবেশ; এই পঞ্চক্লেশের মধ্যে পড়ে মানুষকে যে দুঃখ যন্ত্রণার ভোগ করতে হয়, এগুলোর থেকে যেন বৈরাগ্য আসে। এত কিছু বলার মূল উদ্দেশ্য আমাদের ভিতর বৈরাগ্য তৈরী করা।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে।।১৯।।

(হে পার্থ, সেই প্রাণীগণই কর্মফলের বশে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মার রাত্রিসমাগমে প্রলীন হয় এবং পুনরায় ব্রহ্মার দিবাসমাগমে নিজ নিজ কর্মের ফলানুসারে প্রাদুর্ভূত হয়।)

প্রানী জগতে গাছপালা, জীবজন্তু যা কিছু আছে, আমাদের সবাইকে টেনে সৃষ্টিতে নিয়ে আসা হচ্ছে। বলতে চাইছেন, আগের কল্পে যা ছিল, এই কল্পেও সেটাই হবে। ব্রহ্মা যখন ভোরবেলা ঘুম থেকে জাগবেন, তখন আবার সেই একই জিনিস হবে। ব্রহ্মার হিসাবে একশ বছর পর ব্রহ্মা যখন মারা যাবেন, আবার সব কিছুর লয় হয়ে ব্রহ্মাতেই অব্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকবে। এভাবেই চলতে থাকবে। স্বামীজী তাঁর লেকচারের এক জায়গায় বলছেন, আমি তোমাদের এই লেকচার কতবার দিয়েছি, তোমরা কতবার শুনেছ। এটাকে বলে, cyclic way of creation, সৃষ্টি হল, কিছুদিন সৃষ্টি থাকল, তারপর সৃষ্টির সব কিছু লয় হয়ে গেল; আবার একটা সময়ের পর নূতন করে সৃষ্টি হল, চক্রাকারে ঘুরছে। ব্রহ্মার বারবার দিন হচ্ছে, বারবার রাত হচ্ছে, বারবার আমাদের টেনে সৃষ্টিতে নিয়ে আসা হচ্ছে, বারবার আমাদের লয় হচ্ছে। এইজন্যই জো সো করে ভগবানকে পাওয়া দরকার। এই যে ঘুর্ণিপাকে পড়ে জীবকুল কষ্ট পাচ্ছে, পুনঃ পুনঃ জন্মের দরুণ যে কষ্ট, এই কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি? একটাই মাত্র উপায়, ঈশ্বরকে পেয়ে গেলে, ঈশ্বরজ্ঞান হয়ে গেলে এই ভোগান্তিটা আর হবে না।

ঠিক এই মুহুর্তে যদি সৃষ্টির সংহার হয়ে যায়, আমার তো মুক্তি হয়নি, তাহলে আমার যে সংস্কারগুলো আছে এগুলো কোথায় যাবে? সব বীজাকারে জমা থাকবে। ব্রহ্মার হাজার যুগ, মানে শত শত কোটি বছর এগুলো বীজাকারে পড়ে থাকবে। তারপর আবার যখন নূতন করে সৃষ্টি শুরু হবে, তখনও আমার সংস্কারগুলো বীজাকারে পড়ে রয়েছে। এরপর যখন আবার পৃথিবীর সৃষ্টি হবে, তারপর কিভাবে পৃথিবীত প্রথম জীবনের স্পন্দন শুরু হবে, তখন আমি আবার নূতন একটা শরীর নিয়ে জন্ম নেব, জন্মের পর ধীরে ধীরে সুপ্ত সংস্কারগুলো সক্রিয় হতে থাকবে। মাঝে মাঝে আমরা ভাবি কোথা থেকে আমাদের মধ্যে এই সংস্কারগুলো এল? আগের যে সহস্রযুগ ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়েছিল সেই সময় থেকে।

এখানে আচার্য খুব সুন্দর করে বলছেন – মানুষ এই জন্মে যে কর্ম করে দেখা যায় তার ফল সে পাচ্ছে না, আবার এমন জিনিস সে পেয়ে যায়, যার জন্য তাকে কোন কর্ম করতে হয়নি। এই যে অসঙ্গতি বা দোষ, এই দোষকে পরিহার করার জন্যে বলছেন – প্রথমত এই বক্তব্যের মাধ্যমে বন্ধন আর সেই বন্ধন থেকে মুক্তির পথ দেখান যাচ্ছে। দ্বিতীয়, নানান রকমের যে

কর্মসংস্কার রয়েছে, এই কর্মসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসার কথা, আর তৃতীয়, সব কিছু থেকে বৈরাগ্য। এতগুলো জিনিসকে মোকাবিলা করার জন্য এই তত্ত্বের ধারণা নিয়ে আসা হয়েছে। আমাদের যাতে এই সৃষ্টি থেকে বৈরাগ্য আসে, বন্ধন কি আর তার থেকে মুক্তির পথকে স্পষ্ট করে দেখানো আর আমি আজকে এই রকমটি কেন হয়েছি, এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা করার জন্য গীতাতে উনিশ নং শ্লোকের মাধ্যমে এই ধারণাকে নিয়ে আসা হয়েছে। আচার্য শঙ্করও বলছেন হাজার যুগ ব্রহ্মার দিন আর হাজার যুগ ব্রহ্মার রাত্রি, এই ধারণাটা কতটা ঠিক, আর এর কতটা বাস্তব, কতটা কাল্পনিক বলা খুব মুশকিল। তবে কাল্পনিক হলেও হিন্দুধর্ম এই কাল্পনিক ব্যাপারটাকে অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করে নিয়েছে।

অনেকে তাই প্রশ্ন করেন, আমাদের যে পুনর্জন্মের কথা বলা হয়, এই পুনর্জন্মবাদ কি সত্যি, না কাল্পনিক কিছু? এর উত্তর দেওয়া খুব মুশকিল। আচার্য শঙ্করও বলছেন, ধর্মে যত রকম ধারণা নিয়ে আসা হয়েছে, সব কিছুই আমাদের ব্যাখ্যা করতে হয়; এই তিন চারটে জিনিসকে ব্যাখ্যা করার জন্য এই শ্লোকটাকে আনা হয়েছে। এই তিন চারটে জিনিসকে যেমনি নিয়ে আসা হল, আর তখনই সব কিছুর উত্তর স্পষ্ট হয়ে মনটাও শান্ত হয়ে গেল। এ কেন গরীব, ও কেন এত ধনী, ওর কেন এত ক্ষমতা, আমার কোন ক্ষমতা নেই কেন, আমার স্বাস্থ্য খারাপ, ওর শরীরে কেন রোগ নেই, এই সব অসঙ্গতিগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে এই একটি ধারণাতে – কোটি কোটি জন্মজন্মান্তর ধরে তুমি যা যা করে এসেছ, যার ফলে তুমি আজ এই জন্মে এ-রকম সংস্কার নিয়ে এসেছ। সেই সংস্কার কোথা থেকে এল? এই সৃষ্টির আগে আর-একটা সৃষ্টি ছিল। তার আগে? সেই সৃষ্টির আগে আর-একটা সৃষ্টি ছিল। অনাদি কাল থেকে এভাবেই চলে আসছে। তার মানে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে তোমার আজকের এই অবস্থা হয়নি, এই জন্মে তোমার জীবনে যা কিছু হচ্ছে সব তোমারই জন্য হয়েছে, তুমিই তোমার বর্তমান অবস্থার জন্য একশ ভাগ দায়ী।

খ্রীশ্চানিটি আর আর ইসলামের সমস্যা হল, তারা মনে করে একটা নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি হয়ে গেছে, ব্যস্ এর পর আর কিছু নেই, ফলে আমি কেন গরীব হলাম, সে কেন বড়লোক হল এর কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। কিন্তু হিন্দুধর্মের কাছে এ ব্যাপারে কোন সমস্যা হয় না। বর্তমানে তুমি যা হয়েছ সেটা তোমার নিজের জন্যই হয়েছ। আমাদের হিন্দুধর্মে জগৎ সৃষ্টি হওয়ার পর কিছুদিন চলল, তারপর একটা সময়ের পর সংহার হয়ে গেল। সংহারের পর সব বীজাকারে কয়েক হাজার কোটি বছর পড়ে থাকল, তারপর আবার সৃষ্টি, সেই সৃষ্টিটা আবার কিছুদিন চলল, এইভাবে অনন্তকাল ধরে সৃষ্টি আর সংহার চলে আসছে। এই সব কিছুকে দেখেই মানুষের মধ্যে বৈরাগ্য আসে –এই পুরো ব্যাপারটা এভাবেই চলতে থাকবে? আর আমিও এর মধ্যে এভাবে ঘুরপাক খেতেই থাকব? আর দুঃখ কষ্টের মধ্যে হাবুডুবু খেতেই থাকব? তখন মানুষের মধ্যে মুক্তির ইচ্ছা জাগে।

আমরা কথায় কথায় বলি, আমি মুক্তি চাই। কিন্তু মুক্তি চাওয়ার আগে আমরা জানি না কিসের থেকে মুক্তি চাইছি। আমি তো বন্ধন থেকে মুক্তি চাইছি। কিন্তু আমরা কি জানি বন্ধন কি জিনিস? বন্ধন কি জানি না, আর বলছি, আমি মুক্তি চাই। সংসারকেই আমরা বুঝিনি, অথচ ঈশ্বরকে চাইছি, এভাবে কি কিছু হয়! এগুলো আমাদের কথার কথা। ঠাকুরের জীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, মায়ের সাধনায় ডুবে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি সংসারকে খুব ভাল করে বুঝে নিয়েছিলেন। অন্যান্য ধর্মকে যদি দেখা হয়, তাহলে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন লক্ষ্য। ধর্ম আমাদের অনন্ত স্বর্গে নিয়ে যাবে, ধর্মগুলিতে আবার অনন্ত স্বর্গ নিয়ে মতান্তর রয়েছে। তাদের কাছে ঈশ্বরের কাছে যাওয়াটাও স্বর্গ আবার স্বর্গে গিয়ে স্বর্গের সুখভোগ করাটাও স্বর্গ। ছোটবেলা থেকে আমরা যেমন শুনে এসেছি, ইদানিং বিভিন্ন আলোচনা শুনে, বইটই পড়ে আমাদের একটা ধারণা তৈরী হয়ে গেছে, মৃত্যু, মৃত্যুর পর স্বর্গ। অল্প একটু গভীরে গেলে দেখা যাবে হিন্দু সমাজ, হিন্দু ধর্ম, হিন্দু দর্শন একটাই কথা বলে – মুক্তি। মুক্তি ছাড়া হিন্দু ধর্ম, হিন্দু

ধর্মের দর্শন কোন কথা বলেন না। স্বামীজী কিন্তু বার বার শক্তির কথা বলছেন, মুক্তির কথা বলছেন। দশটা খণ্ডে স্বামীজীর যে বাণী ও রচনা আছে, তাতে স্বামীজী একটা জিনিসের উপর আগাগোড়া জোর দিয়ে গেছেন – শক্তি আর মুক্তি; শক্তি মানে মা কালী, মা দূর্গার কথা না, আমাদের ভিতরের অনন্ত শক্তির কথা বলছেন। কারণ মুক্তি পাওয়ার জন্য শক্তি দরকার। আবার মুক্তি হলে অনন্ত শক্তি হয়। শক্তি আর মুক্তি দুটো পরিপূরক, একটা ছাড়া অন্যটা হবে না। মানুষ যত মুক্ত হয় তত তার শক্তি বাড়ে, আর যত তার শক্তি বাড়ে তত সে মুক্ত হয়।

অন্য দিকে হিন্দুরা পরিষ্কার করে বলে দিলেন, সবাই মুক্তি পথের পথিক হতে পারবে না। সেইজন্য সবার জন্য নিয়ে এলেন চারটে পুরুষার্থ, জীবনের চারটে উদ্দেশ্য – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। অর্থ মুক্তি দেয়, অর্থ সঞ্চয়ের জন্য না, দারিদ্রতা থেকে অর্থ মুক্তি দেয়। স্বামীজী বারবার যুব সম্প্রদায়কে বলছেন, তোমরা সবাই দেশের জন্য কাজ কর, সমাজের জন্য কাজ কর। শুধু নিজের দারিদ্রতা থেকে মুক্তি না, অপরে যাতে দারিদ্রতা থেকে মুক্তি পেতে পারে তার জন্যও তোমাকে চেষ্টা করতে হবে। যাঁরা অনেক দিন ধরে আমাদের আলোচনা আগ্রহ নিয়ে শুনছেন, ধর্মের ব্যাপারে তাঁদের নিশ্চয় বুদ্ধি খুলেছে বলেই শুনছেন, তা নাহলে এত কথা শোনার আগ্রহই হত না, চেতনা কোথাও জেগেছে, সাধারণ লোকেদের তুলনায় ধারণা করার ক্ষমতাও আপনাদের অনেক বেশি, সেইজন্য আশা করি এই কথাগুলো আপনার গ্রহণ করতে পারবেন। সেটা হল, আমি আমার বইগুলিতে এই কথাগুলোই লিখেছি, বিভিন্ন লেকচারে এই কথাগুলিই বলেছি, তা হল – বেদের সময় যেমন হিন্দুদের অনেক ঋষি মুনিরা ছিলেন, তেমনি বেদের পরেও আমাদের অনেক সন্ত মহাত্মার এসেছেন কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু হিন্দু ধর্মের যে প্রাণ, হিন্দু ধর্মের যে আত্মা, এটা যেন ব্যাসদেব, শঙ্করাচার্য ও স্বামীজী, স্বামীজীর নামের সাথে স্বাভাবিক ভাবেই ঠাকুরও এসে যান, এনারাই যেন ঠিক ঠিক হিন্দু ধর্মের মূল সুরটাকে ধরতে পেরেছিলেন। শুধু যে তাঁরাই খুঁজে গেছেন তা না, শুধু যে তাঁরা এটাকে ধরতে পেরেছেন তা না, খুঁজে বার করে সেটাকে আমাদের সামনে এমন ভাবে উপস্থাপনা করে দিয়েছেন, যাতে আমরাও এই সুরটাকে ধরতে পারি। যার জন্য বলা হয়, জীবনে একবার অন্তত ব্যাসদেবের মূল মহাভারত গ্রন্থ পড়া দরকার, তখন বোঝা যায় হিন্দু ধর্ম ঠিক ঠিক কি। আচার্য শঙ্করের গীতার ভাষ্য, যাকে আধার করে আমরা এই আলোচনা করছি, অবশ্যই সবার পড়া দরকার। আর দরকার স্বামীজীর বাণী ও রচনা পড়া।

স্বামীজীর অনেক অসাধারণ কাজের মধ্যে একটি অন্যতম অসাধারণ কাজ হল – হিন্দু ধর্মের প্রাণ, হিন্দু ধর্মের যে আত্মা, হিন্দু ধর্মের যে মূল সুর, সেটাকে তিনি ধরতে পেরেছিলেন; ধরার পর তিনি বর্তমান কালের যে ভাষা, সেই ভাষায় আমাদের কাছে পরিবেশন করে দিলেন। স্বামীজী কিন্তু শুধু আত্যন্তিক মুক্তির কথা বলছেন না। তিনি অভাব থেকে মুক্তির কথা বলছেন, রোগব্যাধি থেকে মুক্তির কথা বলছেন, ইংরেজ সরকারের সেই সময় যে দমন-পীড়ন চলছিল, তার থেকে মুক্তির কথা বলছেন, সমাজে নিম্নবর্ণের উপর উচ্চবর্ণের অত্যাচার থেকে মুক্তির কথা বলছেন, ঘৃণা থেকে মুক্তির কথা বলছেন। স্বামীজী বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে এতটাই রেগে গিয়েছিলেন যে, কেরালার নামে স্বামীজী বলছেন whole Malawar coast is a lunatic assylam, এমনকি কেরলের স্কুলে পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হয়, মালাবার উপত্যকা একটা পাগলা গারদ কে বলেছেন? উত্তর হল, স্বামী বিবেকানন্দ। কারণ, তখন এত বর্ণবিদ্বেষ ছিল যে, ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের মানুষ বলেই গণ্য করত না। স্বামীজী শুধু আত্যন্তিক মুক্তি চাননি, তিনি সমস্ত কিছুর থেকে মুক্তি চেয়েছেন।

হিন্দী সাহিত্যে সূর্য্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালা একজন শ্রেষ্ঠতম কবি। কবি নিরালা ঠাকুরের বিরাট ভক্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত তিনি হিন্দীতে অনুবাদ করেন। আবার স্বামীজী বাণী ও রচনাকে হিন্দীতে অনুবাদের জন্য তখনকার দিনের বা বর্তমানে হিন্দী সাহিত্যের যে কজন নামকরা সাহিত্যিককে জানা হয়, সবাইকে উনি লাগিয়ে ছিলেন। কবি নিরালা স্বামী সারদানন্দজীর দীক্ষিত

ছিলেন। তিনি সরস্বতী দেবীকে বন্দনা করে একটা কবিতা লিখেছেন, যেটা আমাদের ইউনিভার্সিটির এমএ হিন্দী ছাত্রদের এখনও পড়ানো হয়। তিনি ঐ কবিতায় বলছেন, বরদে বীণাবাদিনী বরদে, হে মা বীণাবাদিনী সরস্বতী দেবী বর দাও। কবিতার শেষের দিকে বলছেন, নবগতি নবলয় তালছন্দ নব; গানে যেমন গতি, লয়, ছন্দ থাকে, সবটাই যেন নূতন আসুক। এই স্বাধীন ভারতের সব লোক যেন নূতন পাখি, এদের সুর যেন নূতন হয়, এদের লয়, গতি, তাল, ছন্দ সবটাই যেন নূতন হয়। এই ভাবটা উনি স্বামীজীর কাছে থেকে পেয়েছিলেন।

অর্থের পর আসে কাম। কাম থেকে মুক্তির জন্য যেমন অন্যরা লিবারিজিমের কথা বলেন, স্বামীজী কিন্তু একবারও তা বলছেন না, স্বামীজী বলছেন কাম থেকে মুক্তির জন্য নিজেকে জয় কর। কাম থেকে, ভোগ-বাসনা থেকে যে মুক্তি, তার জন্য স্বামীজী নিজেকে নিয়ন্ত্রণ বা আত্মনিয়ন্ত্রণ করার জন্য বলছেন। কিন্তু তার সাথে উনি বলছেন, diluted materialism। কম্যুনিস্টদের যে ফিলজফি তার নামই হল dialected materialism, স্বামীজী ঠিক এই শব্দটা নেননি। কিন্তু এর অর্থ এটাই, এই যে ভোগ জিনিসটা, অল্প মাত্রায় ভোগবাদের খুব দরকার।

স্বামীজী বিদেশে গিয়ে বারবার বলছেন, ভারত ধর্মের দিকে বেশি যেতে গিয়ে সমাজকে খুব বেশি অবহেলা করে ফেলেছিল, এটা উচিৎ হয়নি। এমনকি তিনি বলছেন, একটু ভোগবাদের দিকে গেলে, ভারতের ধর্মের অনেক কিছু হারিয়ে যাবে, তাতে কিন্তু কোন দোষ নেই, এটা দরকার। সত্যি কল্পনাই করা যায় না, আমি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, ঠাকুর, মা, স্বামীজীকে নিয়ে মনে হবে এটা সাংঘাতিক কিছু। কিন্তু আমার চেতনা আছে, নিজের বুদ্ধিও আছে। আমি যেদিন প্রথম মেরি লুই বার্কের বইতে স্বামীজীর ঐ লাইনটা পড়ি, যেখানে উনি বলছেন, পুরনো ধর্মের অনেক কিছু হারিয়ে যাবে, তা হারিয়ে যাক, আমি চমকে উঠেছিলাম। এই হলেন একজন যুগাবতার, একজন সত্যিকারের অবতার, যেটা হাজার হাজার বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে, সেটাকেও তিনি জোরের সাথে বলছেন, হারিয়ে যদি যায় তো যাক। মূল জিনিসটাকে কিন্তু তিনি ছাড়ছেন না। মূল জিনিসটাকে impact রেখে কিছু জিনিসকে ছেড়ে দিতে বলছেন।

কথাটা হল – ভোগ করতে পার, একটা সীমার মধ্যে, সীমা ছাড়িও না। অন্য দিকে যে পুরনো হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা, সেখানে কিছু করা যাবে না; সেটাকেও তিনি কেটে উড়িয়ে দিয়েছেন। ভগবান বুদ্ধের যেমন মধ্যম পন্থা, এখানেও একটা মধ্যম পন্থা নিলেন। আমাদের যে খারাপ জন্মগুলো হয়, সেটাকেও স্বামীজী নূতন ভাবে উপস্থাপন করছেন। অর্থহীন কতকগুলো উপাচার, ঘটিকে যদি বাটি ছুঁয়ে ফেলে, তাতে অশুদ্ধ ঘটি হল, না বাটি হল, এগুলো বন্ধ কর। অথচ পুরো হিন্দু ধর্ম আজও একই অবস্থায় এখনও দাঁড়িয়ে আছে। আমার এক পরিচিত বন্ধু কিছু দিন আগে বলছিলেন, ইউটিউবে আপনাদের ক্লাশগুলো শোনার আগে হিন্দু ধর্ম বলতে মনে করতাম এই কিছু আচার ব্যবহার, কিন্তু হিন্দু ধর্ম যে এত উচ্চমানের কখন কল্পনাই করতে পারিনি।

ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে। বাথটাবে একটা বাচ্চাকে স্নান করানো হয়েছে। বলা হল টাবটা ফাঁকা করে দিতে, মানে টাবের জল ফেলে দিতে হবে। কিন্তু জল ফেলতে গিয়ে বাচ্চা সমেত ফেলে দিয়েছে। প্রবাদে বলছেন, বাচ্চা সমেত ফেলবে না, শুধু জলটা ফেলবে। আমাদের ধর্মের ব্যাপারে বাচ্চাটাকে ফেলে দেয়, জলটাকে রেখে দেবে। আসল তত্ত্বটা আমরা ভুলে গেছি, আর যেটা দরকার নেই সেটাকে আমরা মনে করে রেখেছি, এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য।

অর্থ আর কামের পর আসে ধর্ম। ধর্মও আমাদের মুক্তি দেয়, অশুভ যোনিতে জন্ম নেওয়া থেকে মুক্তি দেয়। আর মোক্ষ মানে আত্যন্তিক মুক্তি। এই যে জন্মমৃত্যুর চক্র, এই চক্র থেকে আত্যন্তিক মুক্তি। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আত্যন্তিক মুক্তির কথা বলতে গিয়ে লোকেরা অনেক বেশি

কথা বলে ফেলেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান, আমরা যখন যোগের কথা বলি, আমরা যখন ভক্তির কথা বলি, আমরা যে কৃষ্ণভক্তির কথা বলছি, যশোদার ভালবাসার কথা বলছি, রাসলীলার কথা বলছি, এগুলো বলা হয় মুক্তির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই মুক্তির ইচ্ছা জাগে, মানুষ যখন নিজের চাহিদাটাকে বোঝে।

দুজন কাঠুরে জঙ্গলে কাঠ কাটে। একজন অনেকক্ষণ গাছ কেটে যাচ্ছে, আর-একজন একটু কাটার পর একটা গাছের তলায় শুয়ে আছে। যে করিৎকর্মা কাঠুরে, সে গিয়ে ওকে বলল 'তুমি কাঠ না কেটে শুয়ে আছ কেন'? এই কাঠুরিয়া বলছে, 'পরিশ্রম করে বেশি কাঠ কাটলে, তাতে আমার কি হবে'? 'তাতে তুমি একটা ছোট গাড়ী কিনে নেবে, তাতে আরও বেশি কাঠ বিক্রী করতে পারবে'। 'তারপর কি হবে'? 'আরও টাকা হবে, সেই টাকা দিয়ে ভাল একটা ঠেলা গাড়ী কিনতে পারবে, আরও কাঠ বাজারে নিয়ে বিক্রী করতে পারবে'। 'তারপর কি হবে'? একজন একটার পর একটা দেখিয়ে যাচ্ছে, আর-একজন বলে যাচ্ছে, তারপরে কি হবে। ঠাকুরের যেমন গল্প আছে, প্রথমে চন্দন কাঠ, তারপর রূপার খনি, তারপর সোনার খনি ইত্যাদি। এখানেও একজন বলে যাচ্ছে তারপরে কি হবে? আর-একজন বলছে, 'তুমি বিরাট বড়লোক হয়ে যাবে'। 'বিরাট বড়লোক হয়ে কি হবে'? 'তুমি তখন আরামসে শুতে পারবে'। এ বলল, 'এখন আমি তো তাই করছি'। এটা একটা গল্প। কিন্তু আইডিয়াটা হল, এই যে লোকটি, এর মনে চাহিদার ব্যাপারটাই এখনও আসেনি। আমার টাকা-পয়সার দরকার, আমার সুখ-সুবিধা দরকার, এই চাহিদাটাই তার ভিতরে জাগেনি, সেইজন্য সে কোন পরিশ্রম করতে চাইছে না। অর্থ যে তাকে মুক্তি দেবে, এই বোধটাই নেই, তাই তার টাকারও দরকার নেই। প্রথমে চাহিদাটা থাকতে হয়।

স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ, মঠের ভাইস প্রেসিডেন্ট, এক সময় মহারাজের সাথে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল, এখনও আছে। আগে ওনার সাথে কথা বলার অনেক সুযোগ হত, উনিও অনেক ঘটনা বলতেন। একটা ছেলের ভর্তির ব্যাপার নিয়ে কিছু একটা সমস্যা হয়েছে, ছেলেটির মা এসে কান্নাকাটি করছে, ছেলেটাও মার দেখাদেখি কাঁদছে। মহারাজ আলাদা করে ছেলেটাকে ডেকে বলছেন, 'পরীক্ষার খাতায় তো কিছু লিখিসনি, এখন কাঁদছিস কেন'? ছেলেটি বলছে, 'আমি এখানে ভর্তি হতে চাই না, সেইজন্য কিছু লিখিনি'। 'তাহলে মায়ের সামনে কাঁদছিলি কেন'? 'ওটা একটু দেখাতে হয়'। মা কাঁদছে, ছেলে পরীক্ষা পাশ করেনি, ভর্তি হতে পারছে না। সেই ছেলেটাও পাশ করতে পারলাম না বলে কেঁদে যাচ্ছে। জেনেশুনেই কিছু লেখেনি, বাড়ি ছেড়ে হস্টেলে সে থাকতে চাইছে না। মা কাঁদছে, মাকে দেখাতে হবে, তাই কাঁদছে। আমাদের ধর্মটাও ঠিক এই রকম, বাকি পাঁচজন করছে, আমাকেও দেখাতে হবে। এ-ভাবে মুক্তি পথের পথিক হওয়া যায় না। ভিতর থেকে যখন চাহিদা জাগে তখন হয়। গীতা সবার মধ্যে এই চাহিদাটা জাগিয়ে দিচ্ছেন – তুমি মৃত্যুর পর আবার যে জন্মাবে তাই না, এই চক্র চলতে থাকবে, চলতেই থাকবে। *সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ*, ব্রহ্মা সকালে ঘুম থেকে উঠছেন, রাত্রে ঘুমোচ্ছেন, আর সেটা কত লম্বা একটা সময়, আগে আমরা দেখিয়েছি। মুক্তির ইচ্ছা যদি না জাগে, ওর মধ্যেই তুমি ঘুরতে থাকবে।

শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে একটা কাহিনী আছে, এই কাহিনী অবশ্য আমাদের বাল্মীকি রামায়ণে কোথাও নেই, কিন্তু খুব প্রচলিত হয়ে গেছে। শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গা পার হবেন, নৌকা নেওয়া হয়েছে। মাঝি গঙ্গার মাঝখানে নিয়ে আসার পর নৌকটা খুব করে গঙ্গা বক্ষে ঘোরাতে লাগল। শ্রীরামচন্দ্র মাঝিকে বলছেন, 'তুমি এটা কি করছ, নৌকা পারে না নিয়ে তুমি মাঝ গঙ্গাতেই নৌকা ঘুরিয়ে যাচ্ছ কেন'? মাঝি তখন হেসে বলছে, 'প্রভু, কত জন্ম তুমি আমাকে এভাবে পাক খাইয়েছ, আজকে আমি সুযোগ পেয়েছি, আমিও আজ ছাড়ব না, আমিও তোমাকে ঘোরাব'। এই বোধ যখন আসে, আমি ঘুরে যাচ্ছি, ঘুরছি, ঘুরছি তো ঘুরছিই, তবেই মুক্তির ইচ্ছা জাগে। ঠাকুর বলছেন, মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন। ঈশ্বরদর্শন আর মুক্তি একই জিনিস।

রাজযোগে বলছেন, সাধনা করতে করতে একটা অবস্থা আসে, সাধক তখন জাতিস্মর হয়ে যান। এর আগে যত যত জন্ম হয়েছে, সব জন্ম তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ঐ দেখে তার আতঙ্ক লেগে যায়, তখন সে বলে, আমি আর কিছু চাই না, আমার মুক্তি চাই। যতক্ষণ ঐ আতঙ্ক না আসে ততক্ষণ ঠিক ঠিক মুক্তির ইচ্ছা আসবে না। আর যতক্ষণ ওই মুক্তির ইচ্ছাটা না হয় ততক্ষণ ঠিক ঠিক ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিও আসে না। বাকি সব মুখের কথা। তাও ভাল, আলতু ফালতু কথা মুখে বলার চাইতে ঈশ্বরের কথা বলা ভাল।

পুরো এই সেকশানটা বিভিন্ন লোকে, বিভিন্ন যোনিতে এই ঘুরপাক জিনিসটাকে নিয়েই বলছেন। হিন্দু ধর্মে যে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের কথা বলা হয়, এটা হল এই চারটের মাধ্যমে এক-একটা জিনিস থেকে আমাদের মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। পেঁয়াজের এক-একটা খোসাকে যেন সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে সরিয়ে দিতে দিতে শেষটাকে যখন সরিয়ে দেবেন, তখন অখণ্ডের সাথে এক হয়ে যাবে। অখণ্ডের সাথে এক হওয়া আর অখণ্ড হয়ে যাওয়া একই কথা। এতদিন খণ্ডিত ছিল, এখন অখণ্ড হয়ে গেল। স্বামীজী এটাকেই মুক্তি ও শক্তি রূপে বিভিন্ন দিক থেকে দেখিয়েছেন।

ভগবান এই পুরো জিনিসটাকেই বর্ণনা করে বলছেন, *ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে*, সব জীব, তার মধ্যে আমরা সবাই আছি, সবাই অবশ। কেন? আমি যদি বলি আমি মুক্তি চাই আর সৃষ্টিতে আসতে চাই না, আমার কথা কেউ শুনবে না, আমাকে টেনে নামিয়ে দেওয়া হবে। *রাত্র্যাগমেহবশঃ*, রাত কেটে যখন দিন শুরু হবে তখন যেন সবাই অবশ হয়ে থাকে, মানে কিছুই করার উপায় নেই, যদি নাও আসতে চায় তবুও তাকে টেনে অবশ করে সৃষ্টির কাজে নামিয়ে দেবে, যার যা সংস্কার ছিল সেই অনুসারে তাকে সব ভোগ করতে হবে। *প্রভবত্যহরাগমে*, দিন হলে, মানে সৃষ্টি হলে আবার জন্ম নিতে হবে।

ঠাকুর একদিন কথা প্রসঙ্গে তৎকালীন সমাজের বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, এক মহিলা উপপতি করেছে; আগেকার দিনে উপপতি করার ব্যাপারটা ছিল, আর ঠাকুর কি করে এত কিছু জানতেন ভগবান জানেন, যাই হোক, লোকটি যদি সেই মহিলাকে ভুলে যায়, তখন মহিলাটি রাস্তায় বেরিয়ে লোকটির জামার কলার ধরে টানতে থাকে, আর মুখে বলতে থাকে, 'তবে রে! তোর জন্য আমি নষ্টা হলাম, আমাকে দেখবি না মানে'! জীবাত্মার এই লোকটির মত অবস্থা হয়, প্রকৃতি তার জামার কলার ধরে বলে, তোমার জন্য আমি এত নাচানাচি করছি, আর তুমি কিনা আমাকে ছেড়ে বেরিয়ে যাবে বলছ! প্রকৃতি এখানে নারী না, প্রকৃতি হল পদার্থ, প্রকৃতি হল শক্তি, আর জীব বলতে যে কোন পশু, পাখি, মানুষ; জীব হল সেই পুরুষ। পুরুষ যতই বলে আমি আর সৃষ্টিতে আসতে চাই না, অনেক হয়েছে আর না; প্রকৃতি ততই তাকে বলে, তোমাকে ছাড়বে না, আমি তোমাকে ঘোরাব।

জগতের সব কিছু কোথা থেকে আসছে? আঠারো নম্বর শ্লোকে বলছেন *অব্যক্তাদ ব্যক্তয়ঃ*, অব্যক্ত থেকে সবাই ব্যক্ত হচ্ছে। পরের শ্লোকে এবার আর-একটা অব্যক্তের কথা বলবেন। শাস্ত্রে কিছু কিছু একই শব্দ আছে, যার আলাদা আলাদা অর্থ হয়; অনেক সময় বিপরীত অর্থও হয়। এখানে আমরা অব্যক্ত শব্দকে নিয়ে বলতে যাচ্ছি। আঠারো নম্বর শ্লোকে অব্যক্ত মানে প্রকৃতি; এবার কুড়ি নম্বর শ্লোকেও অব্যক্ত শব্দ আসছে, যার অর্থ হয়, যাকে মন বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় না। সংস্কৃত অনেক প্রাচীন ভাষা, একের পর এক ঋষিরা এসে পরম্পরায় অনেক কিছু ঢেলে গেছেন। এক-একজন ঋষি নিজের মত চিন্তা করে ঢেলে গেছেন। ঋষিদের শব্দগুলিকে ঠিক ঠিক ভাবে সম্পাদনা করা হয়নি, ফলে এই সমস্যাটা হয়। এই সমস্যা হওয়াটা স্বাভাবিক। তাতেই বোঝা যায়, এই ধর্ম, ধর্মের এই শাস্ত্র এখনও সচল, সজাগ। সমতা মানেই মৃত, মৃত্যুতে সবাই সমান হয়ে যায়। শ্মশানে

রাজা হোক, প্রজা হোক, বড়লোক হোক গরীব হোক, একই ট্রেতে শুইয়ে চুল্লীর ভিতর ঢুকিয়ে দেবে। বৈচিত্রই জীবন। আমাদের দেশে আজ এখানে হরতাল, কাল ওখানে অবরোধ, আজ কোথাও ঘেরাও, কোথাও প্রতিরোধ চলছে, পরশু মিছিল চলছে; এগুলো বলে দিচ্ছে আমাদের গণতন্ত্র জেগে আছে। এটা যদি মৃত গণতন্ত্র হোত, যদি একনায়কতন্ত্র হত কোথাও কোন প্রতিবাদ হত না। নবজাত শিশু যদি কান্নাকাটি না করে, হাত পা যদি না ছোড়ে, সবার সন্দেহ হবে বাচ্চাটা বেঁচে আছে তো। বাচ্চা যেমনি হাত পা ছুড়তে শুরু করল, সবাই বলবে ঐ তো বাচ্চা বেঁচে আছে। সমাজে যদি কোন আন্দোলন, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ না হয়, বোঝা যায় যে সমাজ মৃত।

পরস্তস্মাৎ তু ভাবোহন্যোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি।।২০।।

(সেই ভূতগ্রামের বীজভূত অবিদ্যারূপ অব্যক্ত থেকে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ ও ব্যতিরিক্ত এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর, স্বতন্ত্র যে অক্ষর-নামক পরব্রহ্ম, তিনি ব্রহ্মা থেকে স্থাবর জঙ্গমাদি সকল ভূত বিনষ্ট হয়ে গেলেও বিনষ্ট হন না।)

আগে যে অব্যক্তের কথা বলা হয়েছে, সেই অব্যক্ত পরিবর্তনশীল, সব সময় পাল্টাচ্ছে। ওই অব্যক্ত হল প্রকৃতি, প্রকৃতি সব সময় পাল্টাতে থাকে। বস্তুর জন্ম হচ্ছে নাশ হচ্ছে। বস্তুর মধ্যে জীবাত্মা ঢুকে গেলে তখনও তার নাশ হয়; এই অব্যক্ত নাশবান। কিন্তু কুড়ি নম্বর শ্লোকে যে অব্যক্তের কথা বলছেন এর নাশ হয় না। পুরো সৃষ্টি নাশ হয়ে যাওয়ার পরেও এই অব্যক্ত যেমনটি ছিল তেমনটাই থাকে। ইনিই ভগবান, এই ভগবানকেই বেদে অক্ষর বলা হয়েছে, তাঁকেই আমরা এখন ভগবান বলছি। *পরস্তস্মাৎ তু ভাবোহন্যঃ*, আগে যেটা বলা হয়েছিল, সেটা থেকে এই অব্যক্ত আলাদা। যদি ভগবানের দিকে না যাওয়া হয়, তাহলে শুধু নাশ আর নাশের মধ্যেই ঘুর ঘুর করতে থাকবে। ভগবান বলছেন, ওই অব্যক্তকে ছেড়ে আসল যেটা অব্যক্ত, সেটার দিকে যাও। কারণ এই অব্যক্তের কোন দিন নাশ হবে না। উপনিষদে এই কথাটা ঘুরে ঘুরে আসে, *চেতনশ্চেতনানাং*, চেতনেরও যিনি চেতনা, *একো বহুনাং*, যিনি বহু রূপে আসেন, আর *নিত্যোহনিত্যানাং*, অনিত্যের মধ্যে যেটা নিত্য। যদি একবার শান্ত হয়ে ভাবা যায় পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু দেখছি, অনুভব করছি, সব কিছু অনিত্য। কিন্তু অনিত্য তো এমনি নিজে থেকে চলবে না, অনিত্যের নীচে নিত্য একটা থাকতে হবে। সমুদ্র আছে বলে ঢেউ হচ্ছে, সমুদ্র নিত্য, ঢেউ অনিত্য। এই অব্যক্ত সনাতন, চিরন্তন। সেই নিত্যের সাথে আমি এক হতে চাই।

যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি, সমস্ত ভূতের মধ্যে সেই নিত্য আছেন। আমার আপনার সবার ভিতর সেই যে আত্মা আছেন, তিনি চিরন্তন, অনাদি কাল থেকে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে দেখে যাচ্ছেন, আমার ভক্তরা কিভাবে কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু তিনি নিজে কিছু করবেন না। আগেকার দিনে যৌথ পরিবার ছিল, অনেক বাচ্চা একসাথে বড় হত। একটা বয়সের পর বাচ্চা পড়ে গেলে কেউ পাত্তা দিত না, পড়ুক, শিক্ষা পাবে। এখনকার মায়েরা বাচ্চার একটু কিছু হলেই দৌড়ে যায়। আগেকার দিনে কেউ দৌড়ে যেত না – ভাল করে শিক্ষা পাক।

বলছেন ব্রহ্মা থেকে শুরু করে যত যা কিছু আছে, সমস্ত কিছুর নাশ হয়ে গেলেও এই অব্যক্তের নাশ হয় না। হে প্রাণীকুল, সেই নিত্যকে ধরার চেষ্টা কর, নিত্যের দিকে যাও। তোমার যে শুধু দুঃখ কষ্ট চলে যাবে, তা না, শাস্ত্র থেকে যে জ্ঞান পাবে, সেই জ্ঞানের সাহায্যে তুমি নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে। বাচ্চা বয়সে কারুরই পড়াশোনা করতে ইচ্ছে করে না, আমাদেরও করত না। যারা খুব বুদ্ধিমান বাচ্চা, তারাও পড়তে চায় না। তখন বাবা-মায়েরা সন্তানদের সামনে একটা চিত্র দাঁড় করান –এখন ভাল করে পড়াশোনা না করলে বড় হওয়ার পর কি ভয়ঙ্কর দুরবস্থা হবে ভাবতেই পারবে না। সেই ভয়ে অনেক বাচ্চা পড়াশোনা করতে শুরু করে। পুরাণে ওনারা এটাই

করলেন। সহজে তুমি মুক্তির পথে যাবে না, তাই ওনারা নরকের এমন বর্ণনা আর এমন চিত্রণ করলেন, যাতে ভয়ে মানুষ একটু ভালর দিকে, ধর্মের দিকে যাওয়ার জন্য মন দেয়। কিন্তু গীতা, উপনিষদে কোথাও নরকের বর্ণনা নেই, নরকের বর্ণনা পুরাণাদিতে পাওয়া যাবে। মানুষের সামনে এমন একটা ছবি দিয়ে দেবে, যা দেখে সে যেন আসল পথে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করে।

অনেকে বলবেন, এটা তো একটা মিথ্যা কথা বলা হল। অবশ্যই মিথ্যা কথা। কিন্তু শ্রীশ্রীমাও বলছেন, রোগীকে ওষুধ খাওয়াবার জন্য, বাচ্চাকে খাওয়াবার সময়, এক-আধটা মিথ্যা বলা যায়, এগুলো করতে হয়; তার ভালর জন্যই করা হয়। যারা এর নিন্দা করে, তারা সব কিছুরই নিন্দা করে। মানুষকে ভাল করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হল মানুষকে মুক্তির পথে নিয়ে যাওয়া। মানুষের ভাল করা শাস্ত্রের কাজ না, এটা সমাজের কাজ, শাস্ত্রের একমাত্র কাজ মানুষকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাওয়া। সন্ন্যাসী, সাধু পুরুষ, এনাদেরও একটাই কাজ, মানুষকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাওয়া, এ-ছাড়া অন্য কোন দায়ীত্ব এনাদের নেই। বিধাবার চোখের জল মোছান, অনাথকে খাওয়ানো, এগুলো সন্ন্যাসীদের কাজ না। সন্ন্যাসীদের অনেক ফাঁকা সময় থাকে, সমাজ তাঁকে একটু খেতে পড়তে দিচ্ছে, ফাঁকা সময়টা একটু সমাজসেবা করে দিলেন, এর বেশি কিছু না; এটা কিন্তু তাঁদের দায়ীত্ব না।

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।।২১।।

(ইন্দ্রিয়াতীত অক্ষর ব্রহ্ম বলে যিনি শাস্ত্রে কথিত হয়েছেন, তিনি জীবের শেষ গতি। সেই অক্ষরবিষয়ক জ্ঞান লাভ হলে কাউকে আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হতে হয় না; এটাই আমার (বিষ্ণুর) পরম পদ।)

একুশ নম্বর শ্লোক হল ভগবানের বর্ণনা। বেদে বলছেন, *তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্*, বিষ্ণু কোন দেবতা নন, বিষ্ণু ভগবান নন। মানুষকে বোঝানর জন্য দেবতা, ভগবান এ-ভাবে বলা হয়। তিনি হলেন পরমপদ। বিখ্যাত ভজন গানে বলছেন, ওহি পরম পদ পাওয়েগা, পরম পদ, পরম অবস্থান। শ্রীকৃষ্ণ শুধু যে বসুদেবের পুত্র তা না, তিনি যে শুধু অবতার তা না; শ্রীকৃষ্ণ এক অবস্থা, ভগবান বুদ্ধ এক অবস্থা, শ্রীরামকৃষ্ণ এক অবস্থা, এটাই পরম পদ। শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পেয়ে গেল, তাতে কি হবে! শ্রীশ্রীমা বলেছেন, ছায়া কায়া সমান; ঠাকুরের ছবি দেখলাম, ছায়া দেখে নিলাম, কায়া দেখা হয়ে গেল, ঠাকুরের দর্শন তো হয়েই গেল। এই রকম দর্শন তো আমাদের নিত্য হচ্ছে। ঠাকুরের জপ করা, শ্রীকৃষ্ণ বা শিবের জপ করার উদ্দেশ্য তাঁর দর্শন পাওয়া না, ঐ দর্শন তো একটা ম্যাজিক। আধ্যাত্মিক জ্ঞানটাই মূল উদ্দেশ্য, যেটা আমাদের নিয়ে যাবে সেই পরম পদে, সেই বৈষ্ণব পদে। যার বর্ণনা বেদ থেকে শুরু করে, উপনিষদ থেকে শুরু করে গীতাতে এসে ভগবান বলছেন, *তদ্ধাম পরমং মম*। ধাম বলতে ওখানে একটা বিরাট বাড়ি আছে, রাজমহলের মত, তা না, ধাম যেটা ওটাই পদ। বৈকুণ্ঠ ধাম বলতে যে একটা আবাস, ভগবানের নিবাসস্থল বোঝায় না, বোঝানর জন্য ঐ ভাবে বলা হয়। বৈকুণ্ঠ ধাম, বিষ্ণু ধাম, এটা একটা অবস্থা বিশেষ।

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্, এই যে অব্যক্ত, অক্ষর এই শব্দগুলির একটাই ভাব তা হল –*পরমাং গতিম্*, আসলে এই শব্দগুলি সেই পরম অবস্থা, যেটা শ্রেষ্ঠ গতি। ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে গেলে আর তাকে জন্ম-মৃত্যুরূপী সংসারে ফেরৎ আসতে হয় না। জপধ্যান করতে করতে মন যদি বসে যায়, সেখান থেকে যদি আরও গভীরে চলে যাওয়া যায়, সেখান থেকে যদি ঈশ্বরজ্ঞান হয়ে যায়, তখন *সহস্রযুগপর্যন্তম্*, কোটি কোটি বছর ধরে ঘূর্ণিপাকে ঘোরাটা বন্ধ হয়ে যাবে। সেই জায়গায় পৌঁছে যাবে, যেখান থেকে আর কাউকে ফেরৎ আসতে হবে না। গীতা মোক্ষশাস্ত্র, গীতার বলার উদ্দেশ্য এটাই, *যং প্রাপ্য নিবর্তন্তে*, যেটা পেয়ে মানুষ আর ফেরৎ আসে না, *তদ্ধাম পরমং মম*, সেটাই আমার পরম ধাম, এই কথা স্বয়ং ভগবান বলছেন।

ঠাকুর বলছেন, বাড়ির গিন্নি সকাল থেকে সব কাজ করে যাচ্ছেন, কিন্তু সব কাজ সারার পর বেলার দিকে একবার যখন স্নানের জন্য বেরিয়ে পড়েন তখন ডাকলেও আর ফেরৎ আসেন না। কথামৃত বুঝতে হলে, আগে বেদ, উপনিষদ, গীতা ভাল করে জানা চাই; তা নাহলে কথামৃত বুঝতে পারবেন না। স্বামীজীকে বুঝতে গেলে একটু ইতিহাস, ভূগোলও জানা দরকার, আর বেদ উপনিষদ জানার জন্য পুরো আলাদা বুদ্ধি দরকার। বেদ বুঝতে গেলে অনেক কিছু লাগে, যেদিন বেদ শুনতে হবে, সেদিন সকাল থেকে উপোস করে থাকতে হয়, তারপর শ্রদ্ধা সহকারে আমি বেদ শুনছি, এই ভেবে বেদ শুনতে হবে, তবে গিয়ে বেদ যদি একটু বোঝা যায়। এই পরম ধামকে কিভাবে পাওয়া যাবে –

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্।।২২।।

(হে পার্থ, এই জীবজগৎ সব কিছু পরমেশ্বরের মধ্যেই অবস্থিত। ঘটাদি যেমন আকাশ দ্বারা অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত, তেমনি এই সমগ্র জগৎ ঈশ্বর কর্তৃক পরিব্যাপ্ত। অনন্যা ভক্তি দ্বারা সেই পরম পুরুষকে লাভ করা যায়।)

এই শ্লোকগুলিতে ভগবানের স্বরূপের বা তত্ত্বের বর্ণনা করার সাথে সাথে বলে দিচ্ছেন – সেই পরম পুরুষকে কিভাবে লাভ করা যাবে। *পুরুষঃ স পরঃ পার্থ*, এই যে *তদ্ধাম পরমং মম* যেটা বলা হল, পুরুষ, এই পুরুষ ব্যাটাছেলে পুরুষ না, এই পুরুষ মানে যে কোন জীব, যার মধ্যে জীবাত্মা আছেন। মশা, মাছি, কুকুর, বেড়াল, সাপ, বিছে সবাই পুরুষ শব্দের মধ্যে পড়বে। পুরুষ শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়, এই শরীরটা একটা নগরী, মশার যে শরীর এটাও একটা নগরী, কুকুরের শরীরও একটা নগরী, ঐ নগরীতে তিনি বাস করেন। আচার্য শঙ্করের কি পাণ্ডিত্য কল্পনা করা যায় না, আচার্য একজন উজ্জ্বল আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ্ক; বাকিরা যেন মোমবাতি, টুনি বাল্ব আর আচার্য শঙ্কর যেন সেখানে একটা সার্চ লাইট। আচার্য বলছেন, *পূর্ণত্বাদ্ বা*, শরীরটা একটা পুর, পুর মানে নগরী, সেই পুরে শয়ন করেন সেইজন্য পুরুষ, বা *পূর্ণত্বাদ্ বা*; একই পুরুষের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে, যিনি শরীর রূপী নগরীতে বাস করেন বা *পূর্ণত্বাদ্*, যিনি সব সময়, চিরদিন পূর্ণ, অখণ্ড। যে যেভাবে খুশী যে কোন অর্থে নিতে পারেন। এই পরম পুরুষের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। যে পরম পদের কথা বলা হল, এর উপরে কোন পদ নেই।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গি সংবাদ আছে। সেখানে যাজ্ঞবল্ক্যকে গার্গি একটার পর একটা প্রশ্ন করেই যাচ্ছেন, এটার পর কি, ওটার পর কি, তারপর কি। এই রকম প্রশ্ন চলতে চলতে একটা জায়গায় গিয়ে গার্গি এমন একটা প্রশ্ন করেছেন, যেখানে এই প্রশ্নই হয় না। তখন যাজ্ঞবল্ক্য গার্গিকে সাবধান করে বলছেন, গার্গি, না বুঝে তুমি যদি প্রশ্ন কর তোমার মস্তক সহস্র খণ্ডে বিদির্ণ হয়ে যাবে। ভগবান এটাই বলছেন, এই পুরুষের পারে কিছু নেই, জগতে যা কিছু আছে, সব ঐ পুরুষের মধ্যেই।

এক মিনিট চোখটা বন্ধ করে যদি আমরা ভাবি, এই যে আমার শরীর, এর ভিতর জ্বল জ্বল করছেন সেই আত্মা, যাঁকে এই জায়গাতে পুরুষ বলা হচ্ছে, আমার আসল আমি এটাই। আর ওর ভিতরেই সমস্ত জীব, জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড, অথচ তিনি আমার এই শরীরের মধ্যেই বিরাজ করে আছেন। এক মুহূর্তের জন্যও যদি আমরা এভাবে চিন্তন করি, আমাদের হাত-পা সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। মহাকাশে কত তারার জন্ম হচ্ছে, কত তারা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, বিগ ব্যাঙ হচ্ছে, সব আমাদের ভিতরেই হচ্ছে। আর বলছেন, এই পুরুষই শ্রেষ্ঠ, *পুরুষঃ স পরঃ*, এই পুরুষের বাইরে কিছু নেই।

এই যে পরমাত্মা, যিনি আমাদের সবার ভিতর আছেন, এনাকে পাওয়া যায়। কিভাবে পাওয়া যায়? *ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া*, অনন্যা ভক্তির দ্বারা এই পুরুষকে পাওয়া যায়। এটাই গীতার বৈশিষ্ট্য, জ্ঞান আর ভক্তিকে এক জায়গায় এনে দুটোকে যেন মিলিয়ে দিচ্ছেন। যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, নির্গুণ নিরাকার, তিনিই পরমাত্মা রূপে আমাদের কাছে আছেন, তিনি আত্মা হয়ে সব জীবের ভিতরে আছেন, অনন্যা ভক্তি দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। অর্জুনের সাতটি প্রশ্ন ছিল, তার মধ্যে মুক্তি কিভাবে হয় প্রশ্নের উত্তরে বলছেন, অনন্যা ভক্তি দিয়ে মুক্তি হয়। যখন আমরা এটা বুঝে নিলাম, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, সব কিছু অব্যক্ত, সব কিছু প্রকৃতি, এর সব কিছুর পারে রয়েছেন পরম পদ, *তদ্ধাম পরমং মম*, এটাই আমার পরম ধাম। সেই পরম ধাম, যে পুরুষ সেই পুরুষের ধাম না, তিনি নিজেই সেই ধাম, সেটাই পরম অবস্থা, তিনি নিজে বাস করছেন সমস্ত জীবের শরীরে, আর যাঁর মধ্যে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে। ভাবলেই অবাক লাগে, আমার এই হৃদয়ে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত।

কাকভূষুণ্ডীর খুব সুন্দর গল্প আছে। কাকভূষুণ্ডী একজন ঋষি, শরীরটা কাকের। উনি শ্রীরামচন্দ্রকে জানতে চাইছেন, ঋষি দেখছেন শ্রীরামচন্দ্র তাঁর হাতটা ওনাকে ধরার জন্য বাড়িয়ে দিয়েছেন। উনি ধরা না দেওয়ার জন্য সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে এলেন। কিন্তু তাও শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে ধরে নিলেন, ধরে নিয়ে তিনি গিলে ফেললেন। গেলার পর শ্রীরামচন্দ্রের শরীরে মধ্যে ঢুকে ঋষি দেখছেন, তিনি যে গাছে বসে ছিলেন, সেই গাছেই বসে আছেন। এইসব আইডিয়া ধারণা করা খুব কঠিন, কিন্তু এটাই সত্য। আমাদের শরীরের মধ্যে যে চৈতন্য বাস করছেন, তাঁর ভিতরেই আবার সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, এ-সব ভাবা যায়? যাঁদের এই বোধ হয়েছে, তাঁরাই মুক্তির দিকে এগোন।

তার সাথে বলছেন, সেই পরমাত্মাকে অনন্যা ভক্তি দিয়ে পাওয়া যায়। এতক্ষণ যে আলোচনা চলছিল, তার মূল বক্তব্য হল, যাঁর এই বোধটা হয়ে গেছে, তাঁরা জ্ঞান পথ দিয়েই হোক আর ভক্তি পথ দিয়েই হোক, মুক্তির চেষ্টা করছেন। কিন্তু সবাই তো এই পথ নিতে পারবেন না, সবার পক্ষে সম্ভবও না। আমি ব্যক্তিগত ভাবে অনেক বড় বড় পণ্ডিতদের জানি, যাঁরা বেদান্তে বিশ্বাসই করেন না, এই সাধনাকে তাঁরা মানবেনই না। বেদের কর্মকাণ্ডগুলিই তাঁদের কাছে প্রধান, এনারা সবাই কর্মযোগী।

এরপর মৃত্যুর পর কি হয়, এটাকে তেইশ থেকে ছাব্বিশ চারটি শ্লোকে ব্যাখ্যা করবেন। খুব সংক্ষেপে বলার আগে আমি অকপটে বলে দিচ্ছি, গীতা এই অংশে যে ব্যাপারে বলতে যাচ্ছেন, আমিও এই ব্যাপারটা জানি না জিনিসটা কি। স্বামীজীও এক জায়গায় বলছেন, গীতার এই জায়গাটা ঠিক পরিষ্কার না। উত্তরায়ণ আর দক্ষিণায়নের কথা বলছেন, বলা হয় জীব যখন শরীর ত্যাগ করে, তখন তাদের জীবাত্মা হয় উত্তরায়ণ পথে আর নয় তো দক্ষিণায়ন পথে গমন করে। সাধারণ জীব জন্মাচ্ছে মরছে আবার জন্ম নিচ্ছে আবার মরছে, এদের নিয়ে এনারা কিছু বলছেন না। কিন্তু যাঁরা কর্মযোগী, যজ্ঞযাগ করেছেন, কিন্তু কর্মেই যাঁদের চেতনা রয়েছে, এনাদের পথ দক্ষিণায়নের পথ। দক্ষিণায়নের পথকে বলা হয়, একটু যেন ধূমাচ্ছাদিত পথ, এই পথ দিয়ে মানুষকে পিতৃলোক, স্বর্গলোক আদিতে নিয়ে যাওয়া হয়, এটা ভোগের পথ। সেখান কর্মফলানুসারে কিছু কাল বাস করার পর আবার তাঁকে ফেরৎ চলে আসতে হয়। যাঁরা ঠিক ঠিক যোগী, তাঁরা উত্তরায়ণ পথ নেন, এটাকে আলোর পথ বলা হয়। এনারা এই পথ দিয়ে ব্রহ্মলোক আদিতে চলে যান, সেখানে কিছু কাল বাস করার পর মুক্ত হয়ে যান। আর যদি একটু কোন কামনা বাসনা থাকে, তাঁকে আবার ওখান থেকে ফেরৎ আসতে হয়।

আচার্য তাঁর ভাষ্যে বলবেন, গীতা এখানে যে ভাব নিয়ে আসছেন, এই ভাবটা সনাতন কাল থেকে চলে আসছে, এই জিনিসগুলোকে আমাদের জানার কোন পথ নেই। এখান থেকে আমরা তিন

শ্রেনীর মানুষ পাই, একজন হল সাধারণ মানুষ, যারা সংসারে আছে, সমাজে আছে, এরা মৃত্যুর পর এই লোক সেই লোক ঘুরে এক বছরের মধ্যে তার কর্মের ফল অনুযায়ী কোন যোনিতে আবার জন্ম নিয়ে নেবে। সাধারণত নিজের বংশেই ঘুর ঘুর করতে দেখা যায়। কিন্তু যাঁরা ধর্মপ্রাণ, তাঁরা মৃত্যুর পর দক্ষিণায়ন পথ দিয়ে পিতৃলোকে চলে যান। যোগীরা উত্তর পথ দিয়ে অনেক উপরে চলে যান। যাঁরা আত্মজ্ঞানী, তাঁদের কোথাও আসা-যাওয়া নেই, অখণ্ডের সঙ্গে তাঁরা এক হয়ে গেছেন।

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ।।২৩।।

(হে ভরতশ্রেষ্ঠ, যে কালে মৃত্যু হলে উপাসকগণ ও কর্মীগণ যথাক্রমে মোক্ষ ও পুনর্জন্ম লাভ করেন, সেই কালের কথা তোমাকে বলব।)

ভগবান বলছেন, কিভাবে পুনর্জন্ম হয়, কিভাবে পুনর্জন্মের বাইরে চলে যায়। হে অর্জুন আগে আমি তোমাকে কর্মযোগী আর সাংখ্যযোগীদের কথা বলেছিলাম। এখন কারা জন্ম নেয় আর কাদের আর জন্ম নিতে হয় না, অর্থাৎ কে মোক্ষ লাভ করে আরে কে পুনর্জন্ম লাভ করে তোমাকে আবার ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি। দুটো আলাদা পথের কথা আগেই বলে দিয়েছিলেন, একটা পুরুষের ধ্যান আর-একটি ওঁকার সাধনা। তোমাকে এবার আমি এর বর্ণনা করছি। বলতে চাইছেন, মৃত্যুর পর কিভাবে যোগীকে আর পুনর্জন্ম নিতে হয় না।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।।২৪।।

(দেবযান মার্গে সগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণ অগ্নি, জ্যোতি, দিবা, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণের ছয় মাস অতিক্রমপূর্বক ব্রহ্মলোক গমন করেন। কিন্তু সদ্যোমুক্তিভাক্ যোগিগণ জীবৎকালেই ব্রহ্মময় হন। তাঁদের প্রাণ ব্রহ্মলীন হয়, উৎক্রান্ত হয়ে কোন লোকে যান না।)

প্রথমে জ্ঞানযোগীদের কথা বলছেন। যাঁরা *ব্রহ্মবিদো জনাঃ*, মৃত্যুর সময় যাঁরা ব্রহ্মের চিন্তন করছিলেন, মনে রাখতে হবে এখানে বলছেন চিন্তন করছিলেন, মানে একমাত্র ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেই, ব্রহ্মের স্বরূপ বা তত্ত্বের চিন্তনে গভীর ভাবে নিমগ্ন, আর ভ্রূ মধ্যে প্রাণসমূহকে কেন্দ্রীভূত করে নিয়েছেন, যেটা আগেই বলা হয়েছে, এইভাবে এনাদের শরীর যখন চলে যায় তখন এনাদের আত্মা যে রাস্থা দিয়ে মুক্তির পথে চলে যান সেই রাস্থার মালিক হলেন *অগ্নিঃ জ্যোতিঃ অহঃ শুক্লঃ*, এগুলো কয়েকজন দেবতার নাম। এটা একটা রাস্থা, এই রাস্থার মালিক কে, এই রাস্থাটা কি রকম, এখানে তার বর্ণনা করছেন। *ব্রহ্মবিদো জনাঃ*, যিনি ব্রহ্মকে জানেন, এখানে যাঁদের আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে তাঁদের কথা বলছেন না, যাঁরা অত্যন্ত উচ্চমানের যোগী তাঁদের কথা বলছেন। সূর্য যখন উত্তর দিকে যায়, বলা হয় যে, মকর সংক্রান্তির পর থেকে উত্তরায়ণ শুরু হয়; আসলে বলতে চাইছেন পুরো পথটাই আলোময়।

আচার্য এখানে বলছেন, অগ্নি হলেন একজন কাল অভিমানী দেবতা আর জ্যোতিও কাল অভিমানী দেবতা, দুজনকেই জ্যোতি রূপে দেখা হয়। তাই এই পথকে আলোকিত পথ বলছেন। ঈশাবাস্যোপনিষদে বলছেন, *অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্*, হে অগ্নি আমাকে উপরে নিয়ে চল। আচার্য বলছেন, এই জায়গাতে সময়কে নিয়ে বলা হচ্ছে, যিনি ব্রহ্মবেত্তা, যিনি উপাসনা করেছেন, যিনি যোগী, রাজযোগী হন, জ্ঞানযোগী হন, ভক্তিযোগী হন, যে মার্গেরই হন, সূর্য যখন উত্তরায়ণের পথে থাকে, তখন এনারা দেহত্যাগ করেন। এই নিয়ম ঠাকুর, স্বামীজীর উপর খাটবে না, কারণ এনারা যোগী নন, অবতার পুরুষ। এখানে যোগীদের কথা বলছেন। যেমন ভীষ্ম শরশয্যায় পড়ে আছেন, তিনি বলছেন, সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু না হওয়া পর্যন্ত আমি দেহত্যাগ করব না। এনারা বলেন

উচ্চমানের যোগীরা উত্তরমার্গ ধরে ব্রহ্মলোকে চলে যান। আর যাঁরা কর্মকাণ্ড করেন, পিতৃদের মানেন এবং পিতৃদের পূজা করেন তাঁরা দক্ষিণমার্গে গমন করেন।

এখানে উত্তর দক্ষিণ কোন ভাল-খারাপ অর্থে বলছেন না। শুধু বলছেন, উত্তর পথ যাঁরা নেন তাঁরা আর ফেরৎ আসেন না, দক্ষিণ পথ দিয়ে যাঁরা যান তাঁরা ফেরৎ আসেন। একজন ঠাকুরকে বলছেন, আমি আবার জন্ম নিতে ভয় পাই না। ঠাকুর বলছেন, তুমি বলো না, তোমার এখনও ভোগের ইচ্ছা আছে। লোকেদের এখনও প্রচুর ভোগের ইচ্ছা, সেইজন্য এই উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন নিয়ে আসছেন। প্রচুর সাধনা আদি করা থাকলে তবে গিয়ে এই সব শ্লোকের গভীরে যাওয়া যায়। এখন আমরা আমাদের বুদ্ধি দিয়ে এই পথ সম্বন্ধে আর বিশদ কিছু বলতে পারব না, এগুলো বাস্তবকিই এই রকম, নাকি কাল্পনিক কিছু বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; স্বামীজীর মত আধিকারিক পুরুষই বলে দিয়েছেন যে এই জিনিসগুলো পরিষ্কার নয়। তখনকার দিনে এরকম কোন ধারণা ছিল, বা যোগীরা এ-রকম কিছু দেখেও থাকতে পারেন, যে পথে অগ্নি দেবতা, জ্যোতির দেবতারা আছেন, যাঁরা ব্রহ্মবেত্তা তাঁরা যখন শরীর ছেড়ে দেন তখন তাঁদের জীবাত্মা ঐ পথ দিয়ে গমন করে উপরের দিকে উঠতে থাকেন। তারপর সেখান থেকে তাঁরা মুক্তির জন্য এগিয়ে যান।

বলছেন, যিনি পূর্ণ জ্ঞাননিষ্ঠ, তাঁর সদ্যমুক্তি, তাঁদের ক্ষেত্রে এগুলো প্রযোজ্য নয়। অন্যান্য যাঁরা এর থেকে একটু নীচু স্তরের পরের শ্লোকে তাঁদের কথা বলা হচ্ছে –

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাষা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে।।২৫।।

(পিতৃযানমার্গে কর্মী ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ এবং দক্ষিণায়নের ছয়মাস অতিক্রম করে চন্দ্রলোকে গমনপূর্বক স্ব স্ব কর্মের ফলস্বরূপ সুখভোগান্তে মর্ত্যলোকে প্রত্যাবৃত্ত হন।)

যখন সূর্যের দক্ষিণায়ন হয় তখন এনারা শরীর ত্যাগ করেন। মজার ব্যাপার হল, ঠাকুরের শরীর **১৬ই** আগস্ট দক্ষিণায়নেই গিয়েছিল। তাতে কিছু আসে না, অবতারের ক্ষেত্রে এগুলো কিছুই প্রযোজ্য নয়। এমনকি শ্রীশ্রীমায়ের শরীরও দক্ষিণায়নে গিয়েছিল। যাই হোক, সব ক্ষেত্রে এগুলোকে অত আক্ষরিক নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হয় না। যেহেতু গীতায় বলা হচ্ছে তাই ব্যাখ্যার দরকার হয়, এখানে বলছেন যাঁরা কর্মযোগী এনারা যে পথ দিয়ে যান সেই পথটা ধূম্রময়, এই পথের অভিমানী দেবতা হলেন রাত্রি, এই পথের মালিক হলেন চন্দ্রমা দেবতা। চন্দ্রমা মালিক হওয়াতে এনারা খুব উচ্চলোকে চলে যান, সেই উচ্চলোকে গিয়ে যেহেতু আগে আগে ভালো ভালো কর্ম করেছেন বলে তাঁরা অনেক ভোগ করার সুযোগ পান। এখন যদি কেউ সারা জীবন খুব দান, ধ্যান, আর প্রচুর সমাজসেবামূলক কাজ করেছেন আর মরার সময় ঈশ্বরের চিন্তন করতে করতে শরীর ত্যাগ করেন, মৃত্যুর পর এনারা দক্ষিণায়নে ধূম্রমার্গ দিয়ে খুব উচ্চ স্বর্গলোকে চলে গিয়ে প্রচুর ভোগ করতে পারবেন।

অষ্টম অধ্যায়ে আমরা মোট চার ধরণের পথ পাচ্ছি। প্রথম হচ্ছে জীবনমুক্ত, তাঁদের কোন আসা যাওয়া নেই। দ্বিতীয় হচ্ছে যাঁরা ব্রহ্মোপসাক, এনারা জ্যোতির্মার্গ দিয়ে মুক্তির দিকে এগিয়ে যান। তৃতীয় হচ্ছে যাঁরা কর্মযোগী, ইষ্টাপুর্তি আদি কর্ম করেন, অর্থাৎ নিষ্কাম ভাবে যাঁরা সমাজসেবা করেন, দেশের সেবা করছেন, তাঁরা সবাই এই পথে যান। এই পথে গিয়ে অনেক দিন স্বর্গে থাকবেন, পূণ্য ক্ষয় হয়ে যাওয়ার পর আবার সেখান থেকে ফেরৎ চলে আসবেন। যদি মুক্তির চেষ্টা না করেন, তাঁরা এই চক্রের মধ্যেই ঘুরতে থাকবেন। এনারা যেমন কর্ম করবেন তার ফল পাবেন, কিছু এই পৃথিবীতে, কিছু স্বর্গলোকে গিয়ে। এনারা ধূম্রমার্গ দিয়ে উচ্চলোকে গিয়ে ভোগ করার পর আবার ফিরে আসবেন। চতুর্থ হচ্ছে যারা অসাধক, তাদেরকে এর মধ্যে ধরাই হচ্ছে না, তারা

জন্মাবে মরবে, আবার জন্ম নেবে আবার মরবে। যাঁরা কর্মযোগী এনারা যদিও ফিরে আসেন, কিন্তু এনারা সাধারণ মানুষের ঘরে জন্ম নেন না। দু চারটে জন্ম নিতে নিতে এনারাও জ্ঞানমার্গী হয়ে যান। কিন্তু যাঁরা যোগী তাঁরা কোন পথকে মুক্তিলাভের পথ বলে মনে করেন?

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বত মতে।
একয়া যাত্যানাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ।।২৬।।

(দেবযান ও পিতৃযান – জগতের এই মার্গদ্বয় সনাতন বলে কথিত। দেবযানে গতি হলে মুক্তি লাভ হয় এবং পিতৃযানে গমন করলে পুনরায় দেহধারণ করতে হয়।)

এই যে দুটো পথের কথা বলা হল, শুক্লপথ আর কৃষ্ণপথ, এই দুটো পথ কিন্তু চিরন্তন, এই পথে কোন ছাড়োন-ছোড়ন নেই। এই পথের একটা পথে মানুষকে ফেরত আসতে হয়, অন্য পথে তাকে ফেরত আসতে হয় না। এই জগৎ অনাদি, সেইজন্য এই পথ দুটোও সনাতন, নিত্য। এই পথে যাতায়াত লেগেই থাকবে, কিছু কিছু মানুষ একটা পথে মুক্তির দিকে চলে যাবেন, কিন্তু বেশির ভাগই দ্বিতীয় পথে গিয়ে আবার জগৎ সংসারে ফেরত চলে আসেন। আর যারা সাধারণ লোক তাদের এই দুটো পথের কোনটার মধ্যেই ধরা হচ্ছে না, তারা এখানেই জন্মাবে আবার এখানেই মরবে, মৃত্যুর পর আবার এখানেই জন্মাবে। কিন্তু শাস্ত্র তো এদের জন্যও স্বর্গ নরকের কথা বলছেন? কিন্তু এদের স্বর্গ নরক অনেক নিম্ন স্তরের স্বর্গ নরক। সেই সব লোক থেকে এরা খুব কম সময়ের মধ্যে ফেরত চলে আসে। আচার্য শঙ্কর আবার এখানে নিজে থেকে যোগ করছেন – এই গতির কথা যে বলা হল, এটা সবার জন্য নয়, এগুলো মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্যই বলা হচ্ছে, যারা কর্মযোগী আর যারা জ্ঞানযোগী তাদের জন্যই বলা হচ্ছে। এদের বাইরে বাকী যারা আছে তাদের কথা এখানে বলাই হচ্ছে না।

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন।।২৭।।

(হে পার্থ, উত্তরমার্গে ক্রমমুক্তি ও দক্ষিণমার্গে সংসারে প্রত্যাবর্তন হয় – এই জ্ঞান থাকলে কোনও ধ্যানযোগী মোহগ্রস্ত হন না। অর্থাৎ তিনি দক্ষিণমার্গপ্রাপক উপাসনাবর্জিত কর্ম কর্তব্য বলে গ্রহণ করেন না। অতএব, হে অর্জুন, তুমি সর্বদা ব্রহ্মধ্যানে সমাহিত হও।)

এতক্ষণে এই অধ্যায়ের যে বৈশিষ্ট্য, সেটাকে এবার বলা হচ্ছে। গীতার এই অধ্যায় কেন বলা হয়েছে? যাতে মানুষ মুক্তির জন্য সচেষ্ট হয়। কারণ যিনি উত্তরমার্গ এবং দক্ষিণমার্গ, এই দুটি পথকে জানেন, আর জানেন দক্ষিণমার্গ আমাকে আবার জন্ম নিতে হবে, উত্তরমার্গ আমাকে আর জন্ম নিতে হবে না, স্বাভাবিক ভাবেই তিনি মুক্তির জন্য সচেষ্ট হবেন। এর থেকে তিনি জানতে পারেন, আমি যদি যজ্ঞাদি কর্ম করতেই থাকি, অপরের সেবাতেই যদি আমি লেগে থাকি এবং এটাকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করি, আমি যদি জ্ঞান ও ভক্তির চেষ্টা না করি; আমাকে আবার জন্ম নিতে হবে। জপধ্যানটাও কর্ম, লোকে মনে করে জপধ্যান করা মানে ভক্তি করা, কিন্তু তা না, এটাও কর্ম। ঠাকুরও বলছেন, জপধ্যানও কর্ম। ভক্তি কি যদি জানতে হয় তাহলে আমাদের ভাগবতে রাসলীলা বা যশোদার ভালবাসার যে বর্ণনা আছে, সেটা পড়লেই বোঝা যাবে। পূজা অর্চনা বিধি, সকাল বিকাল নমো নমো করে একশ আটবার জপ করা, সবই কর্ম, এরা সব দক্ষিণমার্গেই যাবে। একবার যদি ভাল করে বুঝে নেওয়া যায়, কোনটা আমার জন্মের কারণ আর কোনটা আমার মুক্তির কারণ, তখন যোগীরা আর মোহিত হন না। যোগীরা সব সময় মুক্তির কামনা করেন।

সেইজন্য ভগবান অর্জুনকে বলছেন, *তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্ত ভবার্জুন*। এটাই গীতার উপদেশ, সব সময়, ঘুমিয়ে পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত অর্থাৎ দিনের পুরো সময় যোগযুক্ত হয়ে

থাকতে হবে। *যোগযুক্ত ভবার্জুন*, হে অর্জুন যোগ থেকে এক ক্ষণের জন্যও সরবে না। এই যে যুদ্ধ হতে যাচ্ছে, তোমাকে যে যুদ্ধ করতে হবে, এখানেও তুমি যোগযুক্ত থাকবে। খাওয়া-দাওয়া করছ, তখনও যোগযুক্ত থাকবে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হয়েছিল, *যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু*, তোমার প্রত্যেকটি কর্মে যোগযুক্ত থাকবে, যোগ থেকে সরবে না। এই যে আমরা শাস্ত্রের আলোচনা করছি, তখনও যোগযুক্ত থাকতে হবে। এই আলোচনা শেষ হয়ে যাওয়ার পর চা বানাবেন, চা খাবেন, তখনও যোগযুক্ত। যিনি যোগের পথ নিয়ে নিয়েছেন, তাঁর কাছে relaxation বলে কিছু হয় না।

There is no holiday in morality, moralityতে কোন ছুটির দিন হয় না। যিনি বলছেন, আমি সচ্চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকব, তার মানে সপ্তাহে ছয় দিন আমি সচ্চরিত্রে থাকব, একদিন থাকব না; এভাবে হয় না। যোগের পথ যিনি অনুসরণ করছেন, তাঁর relaxationএর দরকার হয় না। যোগের পথ চব্বিশ ঘন্টার, বারো মাসের, সারা জীবনের পথ, কর্ম পাল্টাচ্ছেন এটাই তাঁর relaxation। শুয়ে ছিল, উঠে চা বানালো, চা বানানোর পরে চা খাওয়া হয়ে গেল, চা খাওয়ার পর কাপ, প্লেট, বাসন ধোয়া হচ্ছে। বেশির ভাগ সেন্টারে সন্ন্যাসীরা নিজেদের বাসনপত্র নিজেরাই পরিষ্কার করেন, কখন আমাদের মনেই হয় না যে এটা কাজ। এটাই আমাদের জীবনধারা। খাওয়ার পরে বাসন ধুতে হবে, কখন মনেই হয় না যে এটা কাজ। খাওয়াটাও একটা কাজ, খাওয়ার পরে বাসন ধোয়াটাও একটা কাজ, দুটোই কিন্তু যোগ সাধনা। বাসন ধোওয়ার সময় দেখতাম অপরের বাসন ধোওয়াটা যেন আমার থেকে ভাল না হয়, মনে এই ভাবটা থাকে। আমরা সন্ন্যাসীরা আমাদের ঘরদোর নিজেরাই পরিষ্কার করি, আমাদের সব কাজ সাধনার মধ্যেই পড়ে। এটা যে একটা ডিউটি, এটা যে একটা খাটনি, কখনই আমাদের তা মনে হয় না।

যোগযুক্ত হওয়া মানে সমাধিস্থ হওয়া, জপধ্যান উদ্দেশ্য না, উদ্দেশ্য সমাধিস্থ হওয়া; সেই পরমাত্মাতে ডুবে থাকা। এই যোগের মাহাত্ম্যকে আটাশ নম্বর শ্লোকে এনে পুরো জিনিসটাকে সমাপ্ত করছেন –

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পূণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্।।২৮।।

(বেদপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপশ্চর্যা ও দানকর্মের যে পূণ্যফলের কথা বলা হয়েছে, এই অধ্যায়ের সপ্ত প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত তত্ত্ব অবধারণ ও আচরণপূর্বক ধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণ সেই ফলরাশি অতিক্রম করে পরমকারণ ব্রহ্ম-পদ প্রাপ্ত হন।)

অধ্যায়ের প্রথমে সাতটি প্রশ্নের আলোচনা হয়েছিল, অধিভূত, অধিদৈব ইত্যাদি; বলছেন পুরো এই জিনিসটাকে বুঝে নিলে, জগৎ কি, জীব কি, ঈশ্বর কি, আত্মা কি, আমি কে; ভাল করে জানা হয়ে গেল, এরপর এর অনুষ্ঠান করে, তার সাথে সব যজ্ঞগুলি সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদন হচ্ছে, এইভাবে করে করে একেবারে পূণ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, এবার তুমি এখান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে যাচ্ছ এবং সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে যাচ্ছ। এরপর পাপ বল পূণ্য বল কোন কিছুই তোমাকে আর বাঁধতে পারবে না। তোমার আর কোন বন্ধন থাকবে না।

এই যে পরম পদ বলা হল, *অত্যেতি তৎ সর্বমিদিং বিদিত্বা*, সমস্ত কিছুকে যখন ভাল করে বুঝে নিলে, যজ্ঞ আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, জপধ্যান আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, এই সব কিছু যখন বুঝে গেলে, তখন সব কিছুর পারে যাওয়ার চেষ্টা। আর যখন ঠিক ঠিক পারে যাওয়ার চেষ্টা শুরু হয়ে গেল, *যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্*, পরম স্থান, পরম ধাম, পরম পদ, এটাকে যোগী

পেয়ে যান। এটাই হল ভক্তি, আচার্য বলছেন *পরং প্রকৃষ্টম্ ঐশ্বরং স্থানম্*, ঈশ্বরীয় যে ভাব, ঈশ্বরীয় যে স্থান সেটাকে যোগী পেয়ে যান। মৃত্যুর পর শিবলোক যাওয়া, বিষ্ণুলোক যাওয়া, কোথাও যাচ্ছে না, যেখানে আছে সেখানেই থাকছে। আত্মা এখন যে দেহভাব পেয়ে আছে, এই দেহভাবটা নাশ হয়ে গিয়ে ঈশ্বরের ভাব পেয়ে যায়। এই ঈশ্বরের ভাব পাওয়া, এটাই মুক্তি।

এত কিছু আলোচনাতে গীতার মূল বক্তব্য হচ্ছে –সংসার আছে আর এই সংসারে বন্ধন আছে, ভিতরে আমাদের জীবাত্মা আছেন, পরমাত্মা আছেন, ব্রহ্ম আছেন। এবার যে অতি সাধারণ জীবন-যাপন করছে তাতে কোন অসুবিধার কিছু নেই, এদের আবার পুনর্জন্মাদি হতে থাকবে। যখন এই সংসারের সংহার হয়ে যাবে, যে মুক্ত হয়নি তার যে সংস্কারগুলো রয়েছে, সমস্ত সংস্কার জীবাত্মার সাথে থেকে যাবে। যদিও বলা হয় জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক, তথাপি আপাত ভাবে একটা বন্ধন জীবাত্মার মধ্যে লেগে থাকে। এরপর আবার যখন সৃষ্টি হবে তখন আবার এই জীবাত্মাকে সৃষ্টির মধ্যে টেনে নিয়ে আসা হবে। এই চক্র চলতেই থাকবে। এই ভাবে চলতে চলতে একটা সময় এমন আসবে যে সে কর্মযোগী হয়ে যাবে। কিভাবে হবে?

যখন অবতারের আবির্ভাব হয়, তখন একটা তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে জগতে আধ্যাত্মিক জাগরণ আসে। অবতারের কথা শুনে শুনে বেশ কিছু মানুষের মনের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে, এই পরিবর্তন তাকে উন্নত মানুষে রূপান্তরিত করে, তখন সে কর্মযোগী হয়ে যায়, সমাজসেবা করা, লোকের ভালো করা, ধর্মের প্রচার করা, এই ধরণের কাজ করতে শুরু করে। এই কর্ম করতে করতে সে ঈশ্বরের তত্ত্বও কিছু কিছু বুঝতে থাকে। এরপর যখন সে শরীর ত্যাগ করে তখন মৃত্যুর পর সে খুব উচ্চ লোকে চলে যায়। সেখানে অনেক দিন ভোগ করার পর আবার সে এসে জন্ম নেয়। জন্ম নিলেও তার সংস্কারগুলো থেকে যাবে। এর পর সে যে পুরো ভোগী হয়ে জন্মাবে তা নয়, কর্মযোগী হয়েই আবার জন্মাবে। এইভাবে চলতে চলতে এক সময় তার মধ্যে একটা বিবেক জাগ্রত হবে যে বিবেকবশতঃ তার মনে ইচ্ছে হবে যে আমি আর কর্মবন্ধনে যেন না পড়ি। কর্মবন্ধন থেকে বেরোবার জন্য সে এবার সমস্ত কর্ম নিঃস্বার্থ ভাবে, নিষ্কাম ভাবে করার দিকে প্রবৃত্ত হয়।

কর্মবন্ধন থেকে বেরিয়ে এসে সে জ্ঞানযোগীর হওয়ার জন্য মন দেয়। তখন সে তার বেশির ভাগ সময় ওঁকার সাধনায় লেগে থাকবে বা ঈশ্বর চিন্তনে থাকবে। তার যা কাজ সবই করবে কিন্তু তার মনটা সব সময় ঈশ্বর চিন্তনেই লেগে থাকবে। ব্রহ্ম আর ঈশ্বর সেই একই বস্তু, এই চিন্তন যখন সে করতে থাকবে তখন তার দুটো সম্ভবনার পথ খুলে যাবে। এক হচ্ছে, শরীর থাকতে থাকতেই তার জ্ঞান হয়ে যেতে পারে, তখন সে এমনিতেই মুক্ত হয়ে যাবে, এতে কোন প্রশ্নই নেই। শরীরটা তখন যত দিন চলার চলতে থাকবে, তারপর এক সময় শরীরটাও খসে পড়ে যাবে। আর দ্বিতীয় যে সম্ভবনাটা আছে, সেটা হচ্ছে, শরীর থাকতে থাকতে জ্ঞান হয়তো তার হল না, কিন্তু শরীর ত্যাগের সময় তার ঐ ভাবটা মনের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে যায়। তখন তার যে জীবাত্মা ছিল, সেই জীবাত্মা শরীর ছেড়ে দিয়ে এগোতে শুরু করবে। কিন্তু নীচে যে ভোগাদির লোক আছে, পিতৃলোক, স্বর্গলোক এই সব লোকগুলিকে সাঁ সাঁ করে ফেলে দিয়ে উপরে দিকে চলে যায়। সমস্ত লোককে যখন নীচে ফেলে দিয়ে উপরের দিকে যেতে থাকে, তখন ঐ পথের যত দেবতারা আছেন, যেমন অগ্নির দেবতা, জ্যোতির দেবতা, এনারা আস্তে করে তাকে ওপরের দিকে ঠেলে দেন। এই জিনিসগুলোই আবার কাহিনী আকারেও দেওয়া হয়। যেমন বলা হয় কাশীতে যদি কেউ মারা যায়, শিব তখন তার কানে তারক মন্ত্র দিয়ে তাকে দেখিয়ে দেন এই দ্যাখ্ আমার অখণ্ড স্বরূপ। অখণ্ড স্বরূপ দেখিয়ে তাকে মুক্তির মার্গে ঠেলে দেন।

অষ্টম অধ্যায়ের মূল বক্তব্য হল, যে মানুষ জীবনমুক্ত নয় আবার ঘোর সংসারীও নয়, তাঁরা কিভাবে জীবন যাপন করেন আর মৃত্যুর সময় তাঁদের কি হয় এবং মৃত্যুর পরে কি হয়। এই

জিনিসটাকে একমাত্র এই অধ্যায়েই আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের যদিও নাম তারকব্রহ্ম যোগ, কিন্তু এখানে স্তুতি করা হয়েছে অক্ষর ব্রহ্মোপসনার, তাই এর আরেক নাম হল অক্ষরব্রহ্মযোগ। ওঁ এর উপাসনা করা হলে মানুষের আর পুনর্জন্ম হয় না, এই ব্যাপারটাকে এখানে স্তুতি করা হচ্ছে। অষ্টম অধ্যায়ের কয়েকটি জিনিসকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, যেমন *সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ ব্রহ্ম বিদুঃ*, এই শ্লোকটাকে যদি বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে এর পুরো দর্শন ইসলামিক ও খ্রীশ্চানিটি দর্শনের সাথে এক হয়ে যাবে। যদি এই জীবনে জ্ঞান উপলব্ধি হয়ে থাকে তাহলে এই জীবনেই সে মুক্ত হয়ে গেল, তার আর কোন চিন্তা নেই। কিন্তু শেষ অবস্থায়, মানে মৃত্যুর সময় তার আল্লার চিন্তন বা যীশুর চিন্তন কি রকম ছিল সেই অনুসারে তার স্বর্গ নরকের স্থান নির্ধারিত হয়ে যাবে। যারা সাধারণ লোক, যারা পাপ কর্মাদি করেছে তারা নরকে যাবে, যারা আল্লার চিন্তা করেছে বা যীশুর চিন্তা করেছে তারা সবাই স্বর্গে যাবে।

এখানে যে কর্মযোগীদের আর জ্ঞানযোগীদের এই দুটো পথের কথা বলা হয়েছে, এখন প্রশ্ন যে সবাইকে কি এই পথ দিয়েই যেতে হবে? না, এখানে একটা তৃতীয় পথ আছে যাঁরা এখানেই সব কিছু পেয়ে যান তাদের আর এই দুটো পথ দিয়ে যেতে হয় না, এই তৃতীয় পথের কথা নবম অধ্যায়ে গিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ের কিছু কিছু জিনিস বেদের সময় থেকে এসেছে, এর কিছু কিছু জিনিস আবার উপনিষদেও দেওয়া আছে। আর এই ধারণাগুলো এতো প্রাচীন যে ঠিক বোঝা যায় না কি বলতে চাইছেন। তবে যে জিনিসটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তা হল, মানুষ যেমন কর্ম করছে সেই অনুসারে তার গমনাগমনের পথ নির্ধারিত হয়, একটা পথে সে আবার ফেরত চলে আসে আরেকটা পথে তাকে আর ফিরে আসতে হয় না। আর যারা সাধারণ লোক তারা এই দুটো পথের ধারে কাছেই যেতে পারে না, তারা জন্মায় আর মরে, মরেই অল্প কিছু দিনের মধ্যে আবার জন্ম নেয়। কঠোপনিষদে নচিকেতা এদের কথাই বলছেন –*সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিব জায়তে পুনঃ*, ধান গমের মত এরা জন্মায় আর মরে, মরে জন্মায় আবার মরে, আবার জন্ম নেয়, এই অবস্থা চলতেই থাকে। আর এই ধারণাকে যুক্তির উপর দাঁড় করাবার জন্য আরও কয়েকটা ধারণাকে সংযুক্ত করা হয়েছে, যে ধারণাগুলো আমরা পরবর্তি কালে পুরাণে পেয়ে যাই। এই সব কিছু মিলিয়ে একটা সামগ্রিক দর্শনকে এখানে দাঁড় করানো হয়েছে।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়ং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অক্ষরব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ।।

শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা

নবম অধ্যায়

রাজবিদ্যারাজগুহ্য যোগ

নবম অধ্যায়ের নাম রাজবিদ্যারাজগুহ্য যোগ বা শুধু রাজযোগ। রাজবিদ্যা নাম শুনলেই বোঝা যায় এই বিদ্যাতে বিশেষ কিছু আছে। বিদ্যার মধ্যে রাজা, এবং রাজগুহ্য, বিদ্যাটা গুহ্য। ঈশ্বরীয় তত্ত্বের যে গুহ্য জিনিসগুলি, যেগুলো সহজে বোঝা যায় না, পাত্রতা ছাড়া সবাইকে বলাও যায় না, তাদের মধ্যে এটা রাজা। গীতা এমন কি গুহ্য জিনিস এই অধ্যায়ে বলছেন, আমরা এটাই এখন ধীরে ধীরে দেখব।

অষ্টম অধ্যায়ে আমরা খুব নামকরা একটা শ্লোক পেয়েছিলাম, যেখানে বলছেন, *সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ*, সেখানে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছিল, কিভাবে মৃত্যুর সময় সুষুম্না নাড়িকে ধারণা যোগ দ্বারা টেনে আস্তে আস্তে উপরে তুলে আনতে হয়। আর এই জীবাত্মা দেহকে যখন ত্যাগ করেন তখন অগ্নি জ্যোতির পথ দিয়ে ব্রহ্মলোকে যাবেন এবং সব কিছুর লয় হয়ে যাওয়ার পর জীবাত্মা মুক্তি পেয়ে যাবেন। খুব কঠিন ব্যাপার, সবার পক্ষে সম্ভব না। আমি, আপনি, যাঁরা গীতার কথা শুনছেন, আমরা তো এসব কিছুই করি না। তাহলে আমাদের কি হবে? আমরা কি *সহস্রযুগপর্যন্তম্* জন্মমৃত্যুর চক্রে ঘুরতে থাকব? আর অষ্টম অধ্যায়ের বর্ণিত যোগ সাধনা যদি না করা হয়, তাহলে মুক্তির কি আর কোন পথ নেই? ভগবান তখন আশ্বাস দিয়ে বলছেন, তা না, মুক্তির অন্য পথও আছে।

ঠাকুর কথামৃতে বলছেন, ভক্তি পথ সহজ পথ। কিন্তু ভক্তি পথে নামার পর আমরা টের পাই জিনিসটা কত কঠিন। দ্বাদশ অধ্যায়েও ভগবান দেখাবেন, ভক্তি পথ কত সহজ। কিন্তু সেখানেও ভক্তির জন্য ভগবান যে যে জিনিসগুলো নিয়ে আসছেন, আমরা দেখব সেগুলোও আমাদের জন্য কতটা কঠিন। এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে, *সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো নিরুধ্য চ*, এর বাইরেও আমাদের জন্য কিছু সহজ পথ আছে কিনা। ভগবান এবার যে পথের কথা বলবেন, সেটাও কিন্তু অতটা সহজ কিছু না। তবে এটাও একটা পথ, আলাদা পথ, ঠাকুর বলছেন, মত পথ। ঠাকুর কিন্তু বলেননি যত মত তত পথ, ঠাকুর বলছেন, মত পথ; যেটা মত সেটাও একটা পথ।

এই অধ্যায়ের শুরুতেই ভগবান এই বিদ্যার স্তুতি করছেন। ধর্মের কথা, ঈশ্বরের কথা শ্রোতারা সব সময় শুনতে চায় না। সেইজন্য বিভিন্ন শাস্ত্রে প্রথমেই বলে দেওয়া হয়, তুমি যদি এটা কর, তোমার এই এই লাভ হবে। এর মধ্যে দুটো ব্যাপার থাকে, একটা হল, তোমার যদি রুচি থাকে তুমি এই পথ নাও, দ্বিতীয়টা হল, মানুষের মনে উৎসাহ সৃষ্টি করার জন্য বলা। অনেক সময় এই ধরণের বক্তব্যকে গ্রন্থস্তুতি বলা হয়, বেদে এটাকেই অর্থবাদ বলা হয়।

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।।১।।

(ভগবান বললেন –হে অর্জুন, তোমার দোষদৃষ্টি নেই; সেইজন্য অতিগুহ্য অনুভবযুক্ত এই ব্রহ্মজ্ঞান তোমাকে বলব। এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে তুমি সংসারবন্ধন থেকে সদ্যোমুক্ত হবে।)

হে অর্জুন, এর আগে তোমাকে আপাত কঠিন যে ধারণা যোগ বলা হয়েছিল, এর থেকে আলাদা সহজ পথও আছে। তোমাকে এবার আমি সেই সহজ পথের কথা বলব। *ইদং তু তে*, যেটা

আগে বলা হয়েছিল, তার থেকে এটা আলাদা, তু শব্দের অর্থ কিন্তু। তু শব্দের আর-একটি অর্থ হয় —এর থেকে আলাদা। যেটা বলা হয়েছিল সেটা ভাল, তবে এর থেকেও ভাল একটা কিছু আছে। এই যে জ্ঞানের কথা তোমাকে বলতে যাচ্ছি, এই জ্ঞান তোমাকে মোক্ষপ্রাপ্তি করিয়ে দেবে; সেইজন্য তোমাকে আর ঐ লম্বা পথে যেতে হবে না। সেই পথটা কি?

সপ্তম অধ্যায়ে বলা হয়েছিল *বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ* বা উপনিষদে বলছেন *আত্মৈবেদং সর্বম্*, আত্মাই সব কিছু, বা বলছেন *একমেবাদ্বিতীয়ম্*, এমনকি কঠোপনিষদে বলছেন, *মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি*, যে এই জগতে নানা দেখে, সে এই জন্মমৃত্যুর চক্রে ঘুর ঘুর করতে থাকে। ভগবান বলছেন, তোমার কাছে কোন কিছু না লুকিয়ে, আড়াল না করে সমস্ত গুহ্য কথা তোমাকে আমি বলতে যাচ্ছি। আমি যে শুধু তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি তা না, আমার যে অনুভব হয়েছে, যেটা আমি প্রত্যক্ষ করেছি, সেই বিজ্ঞান তোমার কাছে আমি পুরোটাই বলব।

জ্ঞানবিজ্ঞান শব্দটা গীতাতে একাধিকবার এসেছে, কথামৃতেও অনেকবার এসেছে। জ্ঞান মানে একটা জিনিসকে তাত্ত্বিক ভাবে জেনে নেওয়া, আর এই জ্ঞান যখন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তখন এটাকে বলে বিজ্ঞান। যেমন দুধের কথা কেউ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে আবার কেউ দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। বিজ্ঞান মানে, জ্ঞানটাকে কাজে লাগানো। কিন্তু কোন কিছুকে কাজে লাগাবার আগে জিনিসটার ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করতে হয়, জিনিসটা কি জানতে হয়। আমাদের প্রায়ই শুনতে হয়, ঠাকুর তো পড়াশোনা করেননি, অত পড়ার কি দরকার, ভক্তি থাকলেই হবে। যে শিশু সবে হাঁটতে শিখেছে, সে যদি এক কিলোমিটার লম্বা রাস্তা হাঁটতে যায়, তা কি কখন সম্ভব।

এটা জেনে আমার কি হবে? *যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ*, যেটা জেনে মানুষ মোক্ষকে প্রাপ্ত করে। মানুষের জীবনে শুধু দুঃখ আর দুঃখ, জীবনে যে শোক মোহ, যে ক্রন্দন; কারুর টাকার অভাব, কারুর সংসারে অশান্তি, পরিবারের সদস্যদের মনের মিল নেই, এগুলোই অশুভ। অর্থের অভাব অভাগাদেরই হয়, মনে কামনা-বাসনা আছে, কিন্তু তার পূর্তি হচ্ছে না, এটা যে কত দুঃখের ব্যাপার কল্পনা করা যায় না। যারা অনুভব করেছেন, তারা কল্পনা করতে পারবেন। বলে, যার পা ফাটেনি সে কি করে জানবে পা ফাটলে কি কষ্টটাই না হয়। এখান থেকে যারা একটু উপরে উঠে এসেছেন, যাঁদের একটু চেতনা জেগেছে, যাঁদের দৃষ্টিটা খুলে গেছে, তাঁদের আবার আতঙ্ক অশুভ যোনি থেকে। তাঁরা দেখছেন মানুষ বারবার জন্মাচ্ছে, মরছে; মরে অশুভ যোনিতে যাচ্ছে, সেখানে কত কষ্ট পাচ্ছে। যাঁদের চেতনা জেগেছে একমাত্র তাঁরাই এই জিনিসটাকে বুঝতে পারেন, অন্যরা বুঝতে পারবেন না। ঋষি, মুনিরা জীবের দুঃখে কাতর হয়ে এদের ধরে জোর করে খাটিয়ে এদিকে ঠেলে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

স্বামী ধীরেশানন্দজী খুব জ্ঞানী ও উচ্চমানের সাধু ছিলেন। উনি একটা খুব সুন্দর গল্প বলেছিলেন, এই গল্প আমরা অনেকবার আলোচনায় বলেছি। কুকুরের গায়ে ঘা হলে কুকুর চেটে চেটে ঘা সারিয়ে নেয়। কিন্তু কোন ভাবে তার মাথায় যদি ঘা হয়ে যায়, সে তখন চেটে মাথার ঘা সারাতে পারে না। মাথার ঘা'টা যখন আরও বড় হয়ে যায়, তখন ঘায়ে পোকা হয়। সেই পোকাগুলি অন্ধকারে কুটুস কুটুস করে কামড়াতে থাকে। কুকুরটা তখন দৌড়ে আলোর দিকে যায়। আলোর মধ্যে গেলে পোকার কামড়ানোটা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু মাছিগুলো এসে ঘায়ের উপর বসতে শুরু করে। আলো না থাকলে মাছি আসে না। মাছির উপদ্রবে বিরক্ত হয়ে কুকুরটা আবার কোন ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। ছায়াতে গেলেই পোকাগুলো কামড়াতে থাকে, তখন আবার সে বাইরে আলোর মধ্যে বেরিয়ে আসে। এই করে করে একটা সময় কুকুরটা পাগল হয়ে যায়।

কুকুরের ঐ দুরবস্থা দেখে কোন সজ্জন দয়ালু পুরুষের মনে করুণার উদ্রেক হয়। তিনি গিয়ে কুকুরটাকে কায়দা করে ধরে নেন। কুকুরটা চিৎকার করে, যেন বলতে চাইছে আমাকে ছেড়ে দাও,

আমি চিকিৎসা করাব না। কিন্তু সজ্জন পুরুষ কুকুরটাকে জোর করে ধরে মাথার ঘা পরিষ্কার করে ওষুধ দিয়ে শুশ্রুষা করতে থাকেন। ধীরে ধীরে কুকুরটা ভাল হয়ে ওঠে। আমরা সন্ন্যাসীরা অন্য জগতে আছি, আমাদের কাছে লোকজন অনেক দুঃখ কষ্ট নিয়ে আসেন। কিন্তু ভাল কথা বললে শুনতে চান না, বিরক্ত হয়ে যান। আমরা কি আর সাহায্য করতে পারি মানুষের। আমরা মনে একটু শান্তি পাওয়া আর মনে শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে দিতে পারি। কিভাবে? আমরা বলতে পারি, সকাল সন্ধ্যা হাজার বার ইষ্টমন্ত্র জপ করুন। ছ-মাস বা তিন মাস, একেবারে না পারলে অন্তত এক মাস করুন। এর ফলে ভিতর থেকে একটা শক্তি আসবে, পরিস্থিতিকে মেনে নেওয়ার একটা ক্ষমতা তৈরী হবে। কারুর পরিস্থিতি এক রকম থাকবে না, সবারই পরিস্থিতি পাল্টাবেই। পরিস্থিতি পাল্টানোর আগেই আপনার জীবনে যাতে বিশৃঙ্খলা এসে সব কিছু এলেমেলো না হয়ে যায়। এর জন্য মনে শক্তি দরকার, শান্তি দরকার।

স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ, বর্তমানে তিনি মঠের ভাইস প্রেসিডেন্ট, ওনার কাছে জীবনে আমি অনেক কিছু শিখেছি। মহারাজরা কেউ কোন সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে গেলে বলতেন, ‘মুখ বুজে পড়ে থাক’। এই যে মাটি কামড়ে থাকা, এটাই মুখ বুজে থাকা। ঝড় এসেছে, ঝড় আবার চলে যাবে। এই ঝড় যদি আমাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়, তবে তো আর কিছুই থাকবে না, সব শেষ। ঝড় এসেছে মাথা নীচু করে মুখ বুজে পড়ে থাকতে হবে, ঝড় আমার মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে। কিন্তু এই শক্তিটা আসবে কিভাবে? ঠাকুরের শরণাগত হয়ে থাকলে আসে। জপধ্যান করলে এই শক্তি আসে। যাদের দীক্ষা হয়নি, তাদের যে রূপ ভাল লাগে, যে ঠাকুর ভাল লাগে, সেই ঠাকুরের কাছে কাতর হয়ে প্রার্থনা করতে হবে, হে ঠাকুর এই কঠিন পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার শক্তি দাও।

জগতে শুধু অশুভ, চারিদিকে অশুভ, যে কোন অভাব মানেই অশুভ; অর্থের অভাব, বাসনা পুর্তির অভাব আর শুভ যোনিতে না যেতে পারার অভাব, সবটাই অশুভ। অর্জুন ভগবানের শিষ্য, অর্জুন তাঁর সখা। হে অর্জুন, যে বিদ্যাটা আমি তোমাকে বলতে যাচ্ছি, এই রাজবিদ্যা রাজগুহ্যকে জেনে নিলে, এই বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত হলে তুমি অশুভ থেকে মুক্তি পাবে –*যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ* –এটাকে জেনে তুমি মোক্ষ প্রাপ্তি করবে। দুই নম্বর শ্লোকে এবার ভগবান এই বিদ্যার ঠিক ঠিক স্তুতি করছেন –

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্।।২।।

(এই ব্রহ্মবিদ্যা সমস্ত বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই বিদ্যা উত্তম, পবিত্র, সাক্ষাৎফলপ্রদ, ধর্মসঙ্গত, সহজসাধ্য ও অক্ষরফলযুক্ত।)

এই বিদ্যা রাজবিদ্যা, গভীর, রাজগুহ্য, পবিত্র এবং উত্তম। এই বিদ্যাকে রাজবিদ্যা কেন বলা হয়? আচার্য বলছেন, *বিদ্যানাং রাজা দীপ্ত্যতিশয়ত্বাৎ*, যত বিদ্যা আছে সমস্ত বিদ্যার রাজা এই বিদ্যা, কারণ এই বিদ্যায় লুকোচুরির কিছু নেই, আর পুরোটাই আলোময়। এই বিদ্যা ঈশ্বর, সৃষ্টি, সৃষ্টির রহস্য এবং অন্য সব কিছুকে উন্মোচন করে দিচ্ছেন। যে কোন দর্শনকে ঈশ্বর কি, সৃষ্টি কি, জগৎ কি, আমি কে, এই কয়েকটা জিনিসের ব্যাখ্যা অবশ্যই করতে হয়; বিশেষ করে, ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই তিনটে জিনিসকে ব্যাখ্যা করতে হয়; তা সে বিজ্ঞানের দর্শন হোক, বস্তুবাদী দর্শন হোক, কিংবা অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনই হোক, সব দর্শনকে এই তিনটের ব্যাপারে বলতেই হবে –ঈশ্বর কি, জগৎ কি আর আমি কে। গীতার নবম অধ্যায় এই তিনটে জিনিসের ব্যাখ্যাই একেবারে সুস্পষ্ট ভাবে করছেন।

তার সাথে বলছেন, *রাজগুহ্যং*, আচার্য বলছেন, *গুহ্যানাং রাজা*। কেন গুহ্য? কারণ লোকেরা এটা বুঝতে পারে না। এরপর যেমনি আমরা মূল বক্তব্যে যাব, তখন আমরাও বুঝতে পারব এই বিদ্যাকে ধারণা করা কত কঠিন। এই বিদ্যা শুধু গুহ্যই না, এই বিদ্যাকে গুহ্য রাখতে হয়। যেখানে সেখানে সবার কাছে এই বিদ্যার কথা বলতে নেই। কারণ লোকেরা এই বিদ্যা বুঝবে না, না বুঝে হাসবে। যে জিনিসগুলিকে গুহ্য রাখা হয়, সেই জিনিসগুলিই বৃদ্ধি পায়। জপধ্যান যত গুহ্য রাখা যাবে, তত জপধ্যান বাড়বে। পাপ যদি গুহ্য রাখা হয়, পাপের বৃদ্ধি হবে। সেইজন্য দোষ করলে বলে দিতে হয়। কেউ যদি দোষ থেকে মুক্তি চায়, তাহলে দোষ স্বীকার করে নিতে হয়। কেউ যদি নিজের তপস্যা বাড়াতে চায়, তাহলে তপস্যার কথা কাউকে বলা যাবে না। সম্পত্তি যদি বাড়াতে হয়, তাহলে আমার এত বিঘা জমি, এতগুলো বাড়ি, ব্যাঙ্কে আমার এত টাকা আছে, এগুলো কাউকে বলতে নেই। সম্পত্তি যত বাড়বে তত চেপে রাখতে হবে।

আর বলছেন, *পবিত্রমিদমুত্তমম্*। কেমন পবিত্র? আচার্য বলছেন, *অনেকজন্মসহস্রসঞ্চিতম্ অপি ধর্মাধর্মাদি সমূলং কর্ম ক্ষণমাত্রাদ্ ভস্মীকরোতি যতঃ*, গীতার ভাষা যেমন অত্যন্ত সহজ, আচার্য শঙ্করের ভাষাও অত্যন্ত সহজ। যিনি বিষয়টা স্পষ্ট জানেন তিনি বিষয়ের ব্যাপারটা সহজে বলে দেন, যিনি বিষয়কে জানেন না, তিনি বিষয়টাকে ঘুরিয়ে পেচিয়ে বোঝাতে যান। এখানে আচার্য অনেক জন্মের কথা বলছেন, হাজার হাজার মনুষ্য জন্মের কথা বলছেন। মানুষ রূপে ধরে নেওয়া যেতে পারে গড়ে পঞ্চাশ ষাট বছর বেঁচে ছিলেন, তাহলে হাজার জন্ম মানে পঞ্চাশ হাজার বছর। সেখানে বেদ মাত্র সাত আট হাজার, খুব বেশি হলে দশ হাজার বছরের পুরনো; নিন্দুকরা বলে বেদ পাঁচ হাজার বছর আগের। আর এখানে বলছেন, সহস্র জন্ম, বিবর্তনবাদের নিয়মে আমরা হয়ত বানর ছিলাম। হিন্দুরা বলে আমরা ভগবান থেকে এসেছি, কিন্তু ডারউইনের ভক্তরা বলে আমরা বানর থেকে এসেছি। হয়ত বানর থেকেই এসেছি। বানরের শরীরে থাকার সময়েও আমাদের সংস্কার সঞ্চিত হয়েছে, ভাল মন্দ দুটোই।

আমরা আগে আগে বিস্তারে আলোচনা করেছি, কিভাবে মন শুভ ও অশুভতে কোন তফাৎ করতে পারে না। মনের কাছে অশুভ চিন্তাটাও বন্ধন, শুভ চিন্তাটাও বন্ধন। শুভ চিন্তাও মুক্তি হতে দেবে না। বলছেন *ক্ষণমাত্রাদ্ ভস্মীকরোতি*, জ্ঞান এক সেকেণ্ডে শুভ অশুভের যে বন্ধন, পুরোটাকে ভস্ম করে দেয়। ঠাকুর বলছেন, হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যদি আলো জ্বেলে দেওয়া হয়, অন্ধকার কি একটু একটু করে চলে যাবে? না, যত বছর অন্ধকারে থাকুক, আলো জ্বাললে সেই ক্ষণেই অন্ধকার দুরীভূত হয়ে যাবে। মানুষ কত পুরশ্চরণ করে, অনেকে সকাল থেকে সন্ধ্যা এক মাস ধরে গায়ত্রী জপ করে যাচ্ছেন, বলছেন তাতেও নাকি পাপ, অশুভ সংস্কার এগুলো একটু একটু করে কমবে। কিন্তু এই বিদ্যার জ্ঞানে একটু একটু করে যাবে না। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখলাম, ভগবান বলছেন, *যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন*, যত কাঠ স্তুপীকৃত করা থাকুক, আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ দিলে নিমেষে সব কাঠ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। যত পাপ কর্ম থাকুক, যত শুভ অশুভের বন্ধন থাকুক, এই বিদ্যার জ্ঞান হয়ে গেলে সমস্ত কিছু মুহুর্তে নাশ হয়ে যায়।

কি নাশ হয়? ঠাকুর বলছেন, এক জানার নাম জ্ঞান, অনেক জানার নাম অজ্ঞান। অনেক জানাটাই অজ্ঞান। এই অজ্ঞান নাশ হয়। আপনি একজন খুব ভাল মানুষ, একজন সত্যিকারের সাত্ত্বিক মানুষ; কিন্তু তখনও আপনি বোধ করছেন আমি পূণ্য করছি, বা আমি পূণ্য কর্ম করছি; আর যারা মন্দ কাজ করে তাদের তুলনায় আমি ভাল, এখানেই বহু এসে অনেক জানা হয়ে গেল। এখানে আপনি আছেন, কাজ আছে, কাজ করাটা আছে, পূণ্য-অপূণ্য আছে, অন্য লোকেরা আছে – বহু এসে গেল। আপনি যত উচ্চ মানের লোক হয়ে থাকুন, এই বোধ যদি আপনার হয়ে থাকে যে, আমি একজন ভাল মানুষ, এটাও বন্ধন। কারণ সেখানে বহু রয়েছে, নানা রয়েছে। ঠাকুরও একই কথা বলছেন, গীতাও একই কথা বলছেন।

এই সমস্ত বন্ধন; শুভের বন্ধন হোক, অশুভের বন্ধন হোক, আপনি পাপ করে থাকুন, পূণ্য করে থাকুন, যাই করে থাকুন, এই জ্ঞান উপলব্ধিটা যদি হয়, সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। একত্ব জ্ঞান যেমনি হয়ে গেল, নানা ভাব যেই চলে গেল, আর এই ভাব একবার যদি চলে যায় দ্বিতীয়বার আর ওটা ফিরে আসবে না। একত্ব জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এমন যে, এই বিদ্যাটা কখন চলে যাবে না, চিরদিনের জন্য থেকে যাবে। গঙ্গাজল ছিটিয়ে পবিত্র করা হল, পরের দিন আবার গঙ্গাজল ছিটাতে হবে। এমনই পবিত্র করে যে, একদিন জল ছিটিয়ে পবিত্র করার পর আবার আগামী দিন জল ছিটাতে হয়। কিন্তু ভগবান যে জ্ঞান, যে বিদ্যার কথা বলতে যাচ্ছেন, এটা চিরস্থায়ী, চিরদিনের জন্য পবিত্র করে দেয়।

প্রত্যক্ষাবগমং, তুমি এই বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে, মৃত্যুর পরে তুমি স্বর্গ পাবে, ভাল যোনি পাবে, এগুলো এই বিদ্যার তুলনায় কিছুই না। একমাত্র বেদান্তই এই কথা বলে। বিশ্বে যত ধর্ম আছে, আমাদের হিন্দুদের মধ্যেও যত মত আছে, এদের মধ্যে একমাত্র বেদান্ত বলে, জ্ঞান এখানেই হবে, প্রত্যক্ষ এখানেই তুমি করবে। স্বামীজী বিদেশে অনেক জায়গায় অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন। এক জায়গায় স্বামীজী রেগেমেগে বলেছিলেন, যে ভগবান আমাকে এখানে রুটি দিতে পারেন না, আর মৃত্যুর পর অনন্ত স্বর্গ দেবেন; সেই ভগবানে আমি বিশ্বাস করি না। বলা হয়, কাশীতে মরলে মুক্তি হবে। আর কাশীতে যদি মৃত্যু না হয়, তখন কি হবে? জানার কোন উপায় নেই। যাঁর মুক্তি হয় তিনিও আর কিছু বলছেন না, কারণ তিনি তো আর নেই। আর যিনি বলছেন, তাঁর মুক্তি হয়নি, তিনিও মুক্তির আনন্দ কি জিনিস জানেন না। তাই কাশীতে মরে কি হবে, আমার কি লাভ? কাশীতে আমি মরে গিয়ে মুক্ত হয়ে গেলাম, মুক্তির আনন্দটা কোথায় পেলাম!

ব্যাঙ্কে আপনার প্রচুর টাকা আছে, কিন্তু ঐ টাকাটা আপনি তুলতে পারবেন না, তাহলে ওই টাকা থেকে আমার কি লাভ, না থেকেও কি লাভ। সংস্কৃতে খুব সুন্দর শ্লোক আছে, শাস্ত্রে যে বিদ্যা আছে, আর অপরের হাতে যে ধন আছে, দুটোই আমার কোন কাজে দেবে না। বিদ্যাটা আপন হওয়া চাই, অর্থটাও আপন হওয়া চাই। এই জ্ঞান, এই বিদ্যাও আপনা হওয়া চাই, আর এখানে বেঁচে থাকতে থাকতে হওয়া চাই। মৃত্যুর সময় ঠাকুর এসে আমাকে নিয়ে যাবেন; আমি সেখানে গিয়ে কি করব? সারাটা জীবন আমি ভাল থাকলাম, সব কিছু থেকে দূরে থাকলাম, মনকে সংযম করলাম, কিন্তু তার কোন ফলই এই শরীর থাকতে থাকতে পেলাম না, বলছেন মৃত্যুর পর তোমার ভাল হবে। মৃত্যুর পর আমার কি হবে আপনিও জানেন না, আমি তো জানিই না। পঞ্চম অধ্যায়ে ভগবানও বলছেন, *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো*, এখানে, এই শরীরে বেঁচে থাকতে থাকতেই এই ব্রহ্মবিদ্যা অর্জন করতে হবে। এটাই ভগবান অর্জুনকে বলছেন, *প্রত্যক্ষয়াবগমং*, এখানেই তুমি এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ করবে।

ধর্ম্যং, খুব মজার কথা বলছেন। আচার্য শঙ্কর না এলে আমরা এই সব শব্দের অর্থ ঠিক ঠিক কোন দিন বুঝতে পারতাম না। বেদ তো কিছুই বোঝা যায় না, সায়নাচার্য যা একটু অর্থ করে গেছেন বলে আমরা বেদ একটু বুঝতে পারছি। গীতা তাও অনেকে নিজের মত করে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর ভাবে গীতাকে গুছিয়ে রেখে দিয়ে গেছেন, আমাদের বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। বলছেন *ধর্ম্যং* –এই যে বিদ্যা, এটাই ধর্ম, ধর্ম বিরোধী কোন ভাবেই না। আচার্য ব্যাখ্যা করে বলছেন, *অনেকগুণবতঃ অপি ধর্মবিরুদ্ধত্বং দৃষ্টং ন তথা আত্মজ্ঞানং*, অনেক সময় দেখা যায়, এই সংসারে অনেক কিছু আছে যেটা অনেক প্রকার গুণে সমৃদ্ধ, কিন্তু সেটা ধর্মবিরোধী, ধর্মের বিরুদ্ধে যায়; আত্মজ্ঞান কিন্তু সেই রকম নয়।

এখানে আমরা উদাহরণ রূপে নিতে পারি –বর্তমান কালে পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্র যেভাবে এগিয়েছে, এই বিজ্ঞানচর্চার অগ্রগতিকে জানতে গেলে প্রচুর সাধনা লাগে। কেউ যদি

ফিজিক্স বুঝতে চান, গণিতের কোন ইক্যুয়েশান যদি বুঝতে চান, তার জন্যও অনেক সাধনা দরকার। যে কোন পদার্থ বিজ্ঞানী, কোন গণিতজ্ঞের জীবনী যদি পড়া হয়, কৃষি বিজ্ঞানীদের গল্প যদি পড়া হয়, তাঁরা বেশির ভাগই ঋষিতুল্য, কিন্তু ওনারা বেশির ভাগই ধর্ম বিরোধী। একটা নূতন বাদ এসেছে, মানববাদ। খুব ভাল জিনিস, মানুষের ভাল করার চেষ্টা করছেন। মার্কিস্টরা নিজেদের মানবিকতাবাদ বলেন, ওনাদের কাছে humanism is the religion। আবার অনেকে বলেন science is religion, এনার কিন্তু ধর্ম বলতে আমরা সবাই যেটা বুঝি তার বিরোধী। কিন্তু তার মধ্যে ভালটাও আছে, যেমন humanism, মানুষের কত ভাল করছে। আগে যেখানে মানুষ দু বেলা দু মুঠো ভাত খেতে পারত না, সেখানে আজ তাঁরা তাদের মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছেন, এর থেকে ভাল আর কি হতে পারে।

কিন্তু humanism ওখানে থেমে যায়, কারণ তাঁরা ধর্ম বিরোধী। বিজ্ঞান বলবে, যে জিনিসটা আমি চোখে দেখতে পাই না, মাপতে পারি না, ঐ জিনিসকে আমরা মানি না। Humanism বলে, সব ধর্ম মৃত্যুর পরের কথা বলে, তাঁদের কাছে ধর্ম হল আফিং, এর মানেই দাঁড়ায় এনারা ধর্ম বিরোধী হয়ে গেলেন। আত্মজ্ঞান সেই রকম না, আত্মজ্ঞান পুরোপুরি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। আচার্য বলছেন, *অনেকগুণবতঃ অপি ধর্মবিরুদ্ধত্বং*, অনেক সময় দেখা যায়, ভিতরে এনাদের প্রচুর গুণ আছে, কিন্তু সবাই ধর্মের বিরুদ্ধে। এই বিদ্যা তা নয়, *ধর্ম্যাং*।

তার সাথে আচার্য বলছেন, এই ধরণের জিনিসগুলো অনেক সময় *দুঃসম্পাদ্য* হয়, এর সম্পাদন করা খুব কঠিন। বলছেন, এই বিদ্যা সেই রকম কঠিন সাধ্য নয়; *সুসুখম্*, সহজেই সম্পাদন করা যায়। আচার্য এখানে উদাহরণ দিচ্ছেন, যথা *রত্নবিবেকবিজ্ঞানম্*, রত্নের বিবেকবিজ্ঞান যেমন স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়, আর বেশি কঠিন নয়, ঠিক সেই রকম এই বিদ্যাটাও সহজে বোঝা যায়। এখন রত্ন বিদ্যা কতটা কঠিন, কতটা সহজ আমার জানা নেই। আগেকার দিনে কোন সহজ পদ্ধতি ছিল, যার দ্বারা ওনারা হয়ত বুঝতে পারতেন কোনটা হীরা, কোনটা মুক্তা। এটা ঠিক যে, একেবারেই যে খুব সহজ তাও না, আবার একেবারেই যে অসম্ভব তাও না।

আচার্য তখন বলছেন, এই সংসারে সব সময় দেখা যায়, যে জিনিসটা মানুষ সহজে পায় তার ফল সব সময় অল্প হয়। সহজে যেটা পাওয়া যায়, সেটা চলেও যায় সহজে। যেটা অনেক কষ্ট করে পাওয়া হয়, যেটা কষ্টসাধ্য, সেটা অনেক দিন থাকে। এই বিদ্যা তো *সুসুখম্*, সহজে পেয়ে গেলাম, তাহলে এই বিদ্যা কি সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে? তার উত্তর বলছেন, না, এটা *কর্তুমব্যয়ম্*। অনায়াস সাধ্য, কিন্তু *অব্যয়ম্*। চিড়িয়াখানায় গিয়ে একটা বাঘ দেখে আমি জেনে গেলাম –ও এই ধরণের জন্তুকে বাঘ বলা হয়। স্মৃতি যদি খারাপ না থাকে, সে জানবে বাঘ বলতে কোন পশুকে বলতে চাইছে। কিন্তু যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেল, এই স্মৃতি তাঁর আর চলে যাবে না। আমরা কোথাও শুনিনি যে আত্মজ্ঞানীর স্মৃতি চলে যেতে পারে। কিন্তু তত্ত্বগত ভাবে যদি আমরা মেনে নিই, জাগতিক স্মৃতি চলে গেছে, তাহলেও আত্মজ্ঞানের স্মৃতি তাঁর কোন দিন হারিয়ে যাবে না, *অব্যয়ম্*। আত্মজ্ঞান স্মৃতি নির্ভর না। ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, বায়োলজি, এগুলো স্মৃতি নির্ভর, স্মৃতি চলে গেলে এই জ্ঞানগুলিও স্মৃতি থেকে হারিয়ে যাবে।

হে অর্জুন, এই যে আত্মবিদ্যা, যার কথা তোমাকে বলতে যাচ্ছি, এর প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হবে। যদিও মনে হতে পারে, আমরা এই বিদ্যার শুধু স্তুতি করে যাচ্ছি, কিন্তু স্তুতি করতে গিয়ে অনেক তত্ত্ব কথাও চলে আসছে। গীতা একটা উচ্চমানের গ্রন্থ, এই গ্রন্থ বুঝতে গেলে একটা প্রস্তুতি দরকার। হয় আগে থেকে তাঁর জ্ঞান থাকতে হবে, আর তা নাহলে অনেক দিন ধরে আচার্যের কাছে ভাষ্য সহ গীতার ব্যাখা শুনে যাচ্ছেন; শুনতে শুনতে ভিতরে একটা সংস্কার তৈরী হয়, একটা পাত্রতা জন্মায়, তখন ধারণা করা সহজ হয়ে যায়।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষঃ ধর্মাস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি।।৩।।

(হে অর্জুন, ব্রহ্মজ্ঞানসাধক এই ধর্মের স্বরূপ ও ফলের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিগণ আমাকে প্রাপ্ত না করে মৃত্যুময় সংসারপথে পুনঃপুনঃ যাতায়াত করে।)

যাদের আত্মজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, এদেরকে আচার্য বলছেন *নাস্তিকাঃ*, এরা হল নাস্তিক। নাস্তিক কারা? আচার্য বলছেন, *পাপকারিণঃ অসুরাণাম্ উপনিষদং দেহমাত্রাত্মদর্শনম্ এব প্রতিপন্না*, যারা দেহকেই আত্মা রূপে দেখে, মনকেই আত্মা রূপে দেখে, এরাই হল অসুর, এরাই হল নাস্তিক। নাস্তিক শব্দটা খুব interesting শব্দ।

দর্শনের ব্যাপারে আমাদের পরম্পরায় দুটো দর্শন চলে –আস্তিক দর্শন আর নাস্তিক দর্শন। আস্তিক দর্শন বেদের উপর আধারিত, এই দর্শন বেদকে প্রমাণ মনে করেন, বেদের কথাই যাঁদের কাছে শেষ কথা। ছয়টি আস্তিক দর্শনকে একসাথে বলা হয় ষড়্দর্শন – সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশাষিক, মীমাংসা এবং বেদান্ত। এর সাথে ঈশ্বরের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ সাংখ্য ঈশ্বর মানে না, মীমাংসকও ঈশ্বর মানে না। অনেকের ভুল ধারণা যে আস্তিক দর্শন মানে সব সময় ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে হবে, তা না। আস্তিক দর্শন মানেই, যাঁরা বেদকে শেষ কথা মনে করেন। অন্য দিকে স্বামীজী বলছেন, যার নিজের উপর বিশ্বাস নেই, তাকেই আমি নাস্তিক মনে করি; যার নিজের উপর বিশ্বাস আছে তাকেই আস্তিক বলা যাবে। যদি যুক্তি দিয়ে স্বামীজীর কথাকে টেনে টেনে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে দাঁড়ায়, আত্মবিশ্বাস মানে আত্মায় বিশ্বাস।

আত্মায় বিশ্বাস হলে তার কি পরিণাম? আমি সব কিছু করতে পারি, আমার ভিতরে অনন্ত জ্ঞান, আমার ভিতরে অনন্ত শক্তি। এই জ্ঞানের সামান্য একটু প্রকাশ যদি নিজের ভিতর আসে, সেটাই আমাদের আত্মবিশ্বাস দেবে। হিন্দু ধর্ম আত্মবিশ্বাসের ধর্ম, যারা নিজেদের দুর্বল মনে করে, এরা হিন্দু হওয়ার যোগ্য না। যার কুড়ে, অলস, এরা হিন্দু হওয়ার যোগ্য না। যারা দেহকেই সব কিছু মনে করে, যারা মনকে শেষ কথা মনে করে, এরা আদপেই হিন্দু না। স্বামীজী বলছেন, যে হিন্দু পুরোপুরি আধ্যাত্মিক নয়, ঈশ্বরকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না, তাকে আমি হিন্দু মনে করি না। যে যার মত পরিভাষা করে দিলেই তো হবে না। ফাইভ সিক্সের বাচ্চা ছেলে অল্প একটু পড়ে নিজের মত ফিজিক্স কেমেস্ট্রি বানিয়ে দেবে, সেটা তো হতে পারে না। বিজ্ঞান সেভাবে চলে না। ঠিক তেমনি ধর্ম বিজ্ঞানও এভাবে চলে না, ধর্ম বিজ্ঞানে ওটাই চলবে যেটা তার পরিভাষা।

এখানে আচার্য বলছেন, নাস্তিক কে, যে দেহকেই শেষ কথা মনে করে। এবার সারা বিশ্বের দিকে তাকিয়ে যদি হিসাব করি, কারা কারা দেহকেই শেষ কথা মনে করে, কারা কারা নাস্তিক, শুধু নাস্তিক না, আচার্যের ভাষায় এরা অসুর। এদের কাছে শুধু ভোগ আর ভোগ, এ-ছাড়া অন্য কিছু নেই। ঈশ্বরে বিশ্বাস বা আত্মবিশ্বাস এর সাথ ভোগের কোন সম্পর্ক নেই। যাঁরা আত্মাকে বিশ্বাস করেন, ঈশ্বরকে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁদেরও ভোগের দিকে মন যাবে, অবশ্যই যাবে, কারণ সে এখনও নিজের দেহের মধ্যে আবদ্ধ। দেহের কিছু চাহিদা আছে, মনের কিছু চাহিদা আছে, সেই চাহিদা মেটানোর জন্য ভোগের দিকে সে যাবে। কিন্তু সে সব সময় জানে, আমি দেহ নই। এই যে আগে বলা হল, যারা বলছে science is my religion, humanism is my religion, but these are not religions। এগুলোকে যখন তুমি ধর্ম বলছ, আসলে তুমি দেহকেই শেষ কথা বলছ, তুমি অসুর। আচার্য বলছেন, এরাই পাপ কর্ম করে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, এই ধরণের মানুষ কোন দিন আমাকে পাবে না। আমাকে না পাওয়ার জন্য এরা সবাই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরতে থাকবে। যাঁরা ঠিক ঠিক ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাঁরা কখনই পাপ কর্ম করে না।

ভগবান এবার যে বিদ্যার উপর আলোচনা করবেন, সেই বিদ্যার স্তুতি করার পর তিনি সেই বিদ্যার আলোচনায় ঢুকছেন। আলোচনা শুরু করার আগে একটু বলে দেওয়া ভাল যে, চার নম্বর থেকে শুরু করে নয় নম্বর শ্লোক পর্যন্ত, এই ছয়টি শ্লোক ধারণা করা খুব কঠিন; বিশেষ করে ভাষ্যসহ এই ছয়টি শ্লোকের অর্থকে যদি বুঝতে যাওয়া হয়, ব্যাপারটা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আসলে এই ছয়টি শ্লোক বেদান্তের শেষ কথা, ধারণা করা তাই অত্যন্ত কঠিন। সাধক না হলে ধারণা করা খুব কঠিন হবে। কিন্তু এটাই শেষ সত্য। আবার মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অষ্টম অধ্যায়ে যেখানে বলা হয়েছিল কিভাবে ধারণা যোগ করে নিজের প্রাণকে টেনে এনে নিজের দেহকে ছেড়ে দেন, ব্যাপারটা ধারণা করা কত কঠিন, কাজেও কঠিন। বর্তমান বিষয়টাও তারই সমতুল্য, মন থেকে এই জিনিসটা বুঝে নিতে হয়, সেইজন্য এই ছয়টি শ্লোক সহজে বোঝা বা ধারণা হয় না।

এখানে আসলে ঈশ্বরের স্বরূপ এবং সৃষ্টির সাথে ঈশ্বরের যে সম্পর্ক, এই জিনিসটাকে নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছেন। দুম্ করে এখানে অহং ব্রহ্মাস্মি বলে দিচ্ছেন না। অহং ব্রহ্মস্মি বলে দিলেই তো হয় না, তাহলে জগৎ কোত্থেকে এলো? অহং ব্রহ্মাস্মি যদি সত্য হয়, তাহলে আমি কোথা থেকে এলাম? প্রায়ই লোকেরা ইদানিং সোস্যাল মিডিয়ায়, বিভিন্ন সেমিনারে লেকচারাদি শুনে আমাদের এসে প্রশ্ন করেন, তাহলে আমি কোথা থেকে এলাম? আমাদের ঋষিরা জানতেন এই সমস্যা আসবে; সেইজন্য তাঁরা নিয়ে এলেন অরুন্ধতী ন্যায়। প্রথমে একটা বড় জিনিস নিতে হয়, সেখান থেকে সুক্ষ্ম, তারপর সেই সুক্ষ্ম থেকে আরও সূক্ষ্মতর, সেখানে থেকে সূক্ষ্মতমে নিয়ে যেতে হয়। আমাদের শাস্ত্র এই ব্যাপারে খুব দক্ষ। আমাদের শাস্ত্র দুম্ করে খুব সূক্ষ্মের কথা বলে দেন না, একটু একটু করে সূক্ষ্মের দিকে নিয়ে যান। তদুপরি এগুলো গুরুমুখী বিদ্যা, গুরুর মুখে এই জিনিসগুলি না শুনলে এই বিদ্যার সারতত্ত্ব বোঝা যায় না। চার ও পাঁচ নম্বর শ্লোকে কি বলছেন –

মযা ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ।।৪।।
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ।।৫।।

(আমি ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও অব্যক্তমূর্তি; আমার দ্বারা এই সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত। ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত সমস্ত ভূত আমাতে অবস্থিত; কিন্তু আমি আকাশবৎ অপরিচ্ছিন্ন ও অসংসর্গী বলে তৎসমুদয়ে আধেয়ভাবে অবস্থিত নই। আমার ঈশ্বরীয় যোগ, অর্থাৎ পরমাত্মার যথার্থ স্বরূপ দর্শন কর। বস্তুতঃ ব্রহ্মাদিস্তম্ভপর্যন্ত ভূতগণ সর্বসঙ্গবর্জিত আমাতে পারমার্থিক ভাবে অবস্থিত নয়; অসংসর্গিত্ব নিবন্ধন আমার আত্মা ভূতগণে অবস্থিত না হয়েও তাদের ধারক ও জনক।)

চার নম্বর শ্লোকে একটি কথা বলছেন, পাঁচ নম্বর শ্লোকে ঠিক তার বিপরীত কথা বলছেন। চার নম্বর শ্লোকে বলছেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় যা কিছু আছে সব কিছু আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি সেখানে নেই। সেখান থেকে আবার বলছেন, সব কিছুর ভরণ-পোষণ আমিই করি, কিন্তু আমি তাতে নেই। একবার বলছেন, সব কিছু আমাতেই আছে, কিন্তু আমি সেখানে নেই। আবার বলছেন, আমিই সবার ভরণ-পোষণ করি, কিন্তু আমার সাথে কোন কিছুর সম্পর্ক নেই। এ-সব কথার ভাবার্থ বোঝা খুব কঠিন। আসলে এখানে কি বলতে চাইছেন, পুরো জিনিসটাকে আমি সংক্ষেপে বলছি, এটা যদি বুঝে নেওয়া যায়, তাহলে শ্লোকের ব্যাখ্যা বুঝতে সুবিধা হবে।

যাবতীয় যা কিছু আছে, যেমন আমার এই কলম আছে, এই কলমটাকে ঈশ্বর চারিদিক থেকে ঘিরে আছেন, আবার কলমের ভিতরেও তিনি আছেন। কারণ ঈশ্বর ছাড়া তো কোথাও কিছু নেই। ঠাকুর যেমন বলছেন, মাইরি বলছি, ঈশ্বর বই আমি কিচ্ছু জানি না। এটা এই নয় যে, সংসার

আলাদা, ঈশ্বর আলাদ, আর ঠাকুর ঈশ্বর ছাড়া কিছু জানেন না, সেটা বলছেন না। ঈশ্বর ছাড়া তো কিছু নেই, সেইজন্য তিনি আর কিছু জানেন না। ঈশ্বর ছাড়া তিনি কিছু জানেন না বলছেন, তাহলে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যাঁরা ছিলেন, হৃদয়রাম ছিল, শ্রীমা ছিলেন, ঠাকুর তো ওনাদেরও জানছেন, তাহলে এই জানাটা কি? তিনি সবটাই ঈশ্বর দেখছেন, কারণ ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর কিছু নেই কিনা। তিনি যে জানেন না তা না, কিন্তু সবটাই ঈশ্বর।

মরুভূমিতে মরীচিকা দেখা যায়। গরমের সময় গাড়িতে বড় রাস্থা দিয়ে যাচ্ছি, দূরে রাস্থার দিকে তাকিয়ে দেখছি রাস্থার উপর জল থৈ থৈ করছে, কাছে আসতে আসতেই সেই জল মিলিয়ে যাচ্ছে। এটাই মরীচিকা। ছোটবেলা দেখতাম রাস্থার উপরে জল, আর কেবলই মনে হত জলটা পিছিয়ে যাচ্ছে কি করে। বড়রা বোঝাতেন ওটা জল না, মরীচিকা। মরুভূমিতে যে জল দেখা যায় বা রাস্থার মরীচিকায় যে জল দেখা যাচ্ছে, এই জলটা আসলে কোথায়? ওই জল মরুভূমির উপরেই আছে। এই মরুভূমিটা কি জলের মধ্যে অবস্থিত? আমার চোখের দৃষ্টিতে তো তাই মনে হচ্ছে। অথচ মরুভূমির সাথে জলের বাস্তবিক কোন সম্পর্ক নেই। যারা অজ্ঞানী তারা বলবে, ঐ মরুভূমিটা আছে বলেই জল আছে। যারা জ্ঞানী তারা বলবেন, জল বলে মরুভূমিতে কোথাও কিছুই নেই, শুধু মরুভূমিই আছে। এটা হল দৃষ্টির তফাৎ; আমি কিভাবে দেখছি।

বেদান্তের শেষ কথা যদি বুঝতে হয়, তাহলে নবম অধ্যায়ের চার আর পাঁচ নম্বর শ্লোক হল সেই বোঝার জন্য। বোঝাবার জন্য যেমন বলছেন, এই যে আকাশ, এই আকাশ মানে স্পেস, এই আকাশের মধ্যেই বাতাস চলছে, কিন্তু আকাশ বাতাসের মধ্যে নেই। মরুভূমি আর জল, জল আছে কারণ মরুভূমি আছে, মরুভূমি কিন্তু জলের মধ্যে নেই, তার থেকেও বড় ব্যাপার হল, আসলে জলটাও নেই। নাসদীয় সুক্তে বলছেন, তখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না। বলতে চাইছেন, ঈশ্বরে কোন দ্বৈত ভাব নেই, বিশিষ্টদ্বৈত ভাব, অদ্বৈত ভাব, কোন ভাব নেই; ঈশ্বরই আছেন। সেখানে কেউ নেই, বলার জন্যও কেউ নেই, যে বলবে এটা এক, না দুই, না শূন্য। সেইজন্য বেদে খুব সুন্দর করে বলে দিলেন, *নাসদসীন্নো সদাসীৎ*। যদি সৎ অসৎ কিছুই যদি না থাকে, কিন্তু সৃষ্টিকে তো আমি দেখছি। আমাদের শাস্ত্র বলে, আসল সম্পর্ক যেটাকে বলা হয়, ঈশ্বর আর সৃষ্টির মধ্যে সেই সম্পর্কটা নেই। পেনের খাপ আর বডি, এই দুটোর সাথে এখানে একটা আসল সম্পর্ক আছে, সত্যিকারের জুড়ে আছে। আমার হাতে পেন, পেন আর হাত সত্যিকারের জুড়ে আছে। কিন্তু ঈশ্বর আর সৃষ্টির মধ্যে আসল জুড়ে থাকাটা নেই। কি রকম জুড়ে আছে? মরুভূমি আর জলের মত। কারণ ঈশ্বর বই কিছু নেই, দ্বৈত আসবে কোথা থেকে! ভাল, মন্দ, জন্ম, মৃত্যু, সৃষ্টি, লয়, পাপ, পূণ্য, ধর্ম, অধর্ম কোন কিছু নেই।

এই যে আলোচনা করা হল, এখন আমরা আমাদের যে অবস্থায় আছি, এই অবস্থায় থেকে এই আলোচনাটা কখনই করা যাবে না। কারণ আমি আমার মানব ভাব বা জীব ভাব নিয়ে যখন ঈশ্বরের দিকে তাকাচ্ছি, তখন আমি আছি, জগৎ আছে, ঈশ্বর আছেন এবং ঈশ্বরের সাথে আমার একটা সম্পর্ক আছে। এই অবস্থায় অবস্থান করে ভগবান বলছেন, এই জগতে যাবাতীয় যা কিছু আছে সব আমাতেই অবস্থিত। কিন্তু যেমনি আগের অবস্থান থেকে সরে এসে ঈশ্বরের অবস্থান থেকে দেখা হবে, তখন কোথাও কিছু নেই; এটাই মায়া। স্বামী মোক্ষদানন্দজী মহারাজ, রাম মহারাজ, বিরাট শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, ওনার কাছে আমি অনেক কিছু শিখেছি। আমার জীবনে হিসাব করলে দেখা যাবে যে আমি হাজার হাজার ঘন্টা ওনার সঙ্গ করেছি। উনি একবার এই ধরণের একটা কথা বলছিলেন। আমি ওনাকে বার বার প্রশ্ন করে যাচ্ছিলাম। উনি বিরক্ত হচ্ছিলেন না। উনি একটা কথাই বললেন, যেটা আমার মাথায় চিরদিনের মত বসে গিয়েছিল। বললেন, তুমি বারবার একই গর্তে পড়ে যাচ্ছ। এই কথা আমাকে অনেকবার বলতেন, আমিও অসন্তুষ্ট হয়ে যেতাম। পরে বুঝতে পারলাম, কেন তিনি এই কথা বলছেন।

এই মুহূর্তে যাঁরা এই আলোচনা শুনছেন, তাঁদের মনেও হাজারটা প্রশ্ন উঠছে, কিন্তু প্রশ্ন উঠছে তাঁদের নিজেকে আধার করে। যখন নিজেকে আধার করে প্রশ্ন করা হয়, অদ্বৈত তখন বোঝা যায় না, বেদান্ত বোঝা যাবে না। বেদান্তকে বুঝতে হলে উপর থেকে দেখতে হয়। উপর থেকে দেখলে তখন বোঝা যায়, সবটাই এক। এই যে নীচে থেকে দেখলে বহু দেখাচ্ছে, উপর থেকে দেখলে এক দুয়ের পার, এটাই হল মায়া। মায়া জিনিসটা কি? আছে অথচ নেই। যদি সৃষ্টির দিক থেকে দেখি তাহলে সৃষ্টি আছে, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরের দিক থেকে যখন দেখছি, সৃষ্টি বলে কিছু নেই। এটাকেই বলছেন মায়া। কারণ আমাদের সাধারণ মন বলে, হয় জিনিসটা আছে, নয় তো জিনিসটা নেই। আমার হাতে পেন আছে, পেনটা আমি রেখে দিলাম, হাতে আমার এখন পেন নেই, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। হয় জিরো নয় তো ওয়ান, মাঝখানে মায়া জিনিসটা তাহলে কি?

ফিজিক্সে একটা মজার জিনিস আছে, যেখানে uncertainity principle দিয়ে দেখাচ্ছেন যে, একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে experiment করলে পুরো ব্যাপারটাই অন্য রকম দেখাবে, এটাকে বলে suspended animation, বেড়ালটা মরেও থাকতে পারে, বেড়ালটা জীবিতও থাকতে পারে। প্রথমের দিকে পদার্থবিদরা কিছুই বুঝতে পারতেন না কি বলতে চাইছেন। কিন্তু আমাদের কাছে স্বাভাবিক, হাজার হাজার বছর ধরে আমরা এই জিনিসগুলি নিয়েই আছি, জিনিসটা আছে অথচ নেই। কারণ যখন অণু স্তরে যায়, সেখানে পুরোপুরি গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় না যে, এটা আছে কি নেই। মায়া জিনিসটা এদের থেকে পুরো অন্য রকম, ওদের সঙ্গে কোন মিল নেই, এটাকে শুধু বোঝানর জন্য বলা হল। সৃষ্টির দিক থেকে দেখলে সবই সত্য, নিজেকে আধার করে দেখলে সবই সত্য। ঈশ্বরের দিক থেকে দেখলে কোথাও কিছু নেই। আঙুলের দিক থেকে দেখলে, আমার দশটি আঙুল আছে, আমার হাত আছে, পা আছে, কত কি আছে; কিন্তু কেবল 'আমি' থেকে দেখতে গেলে, আমিই আছি, আমি ছাড়া কিছু নেই।

ভগবান বলতে চাইছেন, হে অর্জুন, ভাল করে বুঝে নাও ঈশ্বর বই কিছু নেই, দ্বিতীয় বলে কোথাও কিছু নেই। তিনি আধারও না, আধেয়ও না। ধারণা করা একটু কঠিন ঠিকই। কয়েকবার এই জিনিসটাকে খুব গভীরে গিয়ে চিন্তা করলে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে শুরু হবে। *ময়া ততমিদিং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা*, এই যে অব্যক্ত পরমাত্মা, তিনি সর্বব্যাপী বলে তাঁকে দেখা যায় না। ভগবান বলছেন, এটাই আমার পরম ভাব। এটা আসলে প্রত্যক্ষ না, *অব্যক্তমূর্তি*, নাসদীয় সূক্তে যেমন বলছেন, *নাসদসীন্নো সদাসীৎ*, পরমাত্মার যে আসল স্বরূপ, পরমপদ যেটা, সেটা প্রত্যক্ষ করা যায় না, মন দিয়ে, ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে জানা যায় না। ভগবানের সেই রূপ সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যপ্ত হয়ে আছে। যেখানে যা কিছু আমরা অনুভব করছি, সেখানে ঈশ্বরই আছেন। সেই পরমাত্মাতে ব্রহ্মা থেকে শুরু করে স্তম্ভ পর্যন্ত, ঘাসের একটা টুকরো থেকে শুরু করে ব্রহ্মা পর্যন্ত, সব কিছু সেই পরমাত্মাতেই অবস্থিত। যেখানে ঈশ্বর নেই সেখানেই অনীশ্বর, নিরীশ্বর; কিন্তু এটাই বিস্ময়কর যে, সেটার আবার কোন অস্তিত্বই নেই।

বলছেন, এই যে সমস্ত জীব, এর বাস্তবিক স্বরূপ আমি নিজে। কারণ ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই কিনা। ফলে লোকেদের মনে হয়, বাসুদেব, এই যে ঈশ্বর, তার ভিতরে বাস করছেন, কারণ ঈশ্বর আমার ভিতরেই বাস করেন। বলছেন, জিনিসটা কিন্তু তা নয়। কারণ আমি বাসুদেব যদি এদের মধ্যে বাস করি, তাহলে আমার সংসর্গ দোষ এসে যাবে। যে যার সঙ্গে থাকে তার মধ্যে সংসর্গ দোষ এসে যায়। গমের মধ্যে যদি পোকা থাকে, গম পেষাই হলে পোকাটাও পিষে যাবে। এই দেহ যদি পাপ করে, এই মন যদি পাপ করে, এর মধ্যে যে ভগবান আছেন, তিনি সেই পাপের ভাগী হয়ে যাবেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সংসর্গটা নেই, আসল জুড়ে থাকাটা নেই, সেইজন্য সংসর্গ দোষ হবে না, ভগবানের তাই সংসর্গ দোষ নেই। বলছেন, আমি সর্বব্যাপী আকাশের মত। যেটা

সঙ্গহীন, যার আসল জুড়ে থাকাটা নেই, সেখানে কোন অবস্থিতি হতে পারে না। এই পেনটাকে আমি হাতে নিলাম, এখানে আসল জুড়ে থাকাটা আছে, আসল সংসর্গ হচ্ছে। যেখানে কোন সংসর্গ নেই, কোন কিছুর মিল নেই, সেখানে আধার আধেয় কি করে হবে। জীব দৃষ্টিতে দেখলে, মানুষের দৃষ্টিতে দেখলে তখন ঈশ্বর ভিতরে বাস করেন। ব্রহ্ম দৃষ্টি যখন নেওয়া হয়, তখন মনে হয় ঈশ্বর যেন এই আধার হয়ে রয়েছেন, কিন্তু আসলে কোন সংসর্গ নেই।

ভগবান আবার বলছেন, *ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্,* এই যে এক্ষুণি বললাম, এরা আমার ভিতরে আছে, অথচ *ন চ মৎস্থানি ভূতানি* ব্রহ্মা আদি কোন কিছু আমার ভিতরে অবস্থান করে না। আগের শ্লোকেই বলছেন, অবস্থান করেন; এখন বলছেন অবস্থান করে না। কোন জিনিসে ঈশ্বর যদি না থাকেন, সে বস্তুর অস্তিত্বই থাকবে না, সেটা নিরীশ্বর হয়ে যাবে। বোঝানর জন্য এটা বললেন। এবার আসল তত্ত্বটা বলবেন। কি সেই আসল তত্ত্ব?

ঈশ্বর আর তাঁর সৃষ্টির যে সম্পর্ক, এটা হল মরুভূমি আর মরীচিকার সম্পর্ক। মরুভূমিই আছে, মরুভূমি আছে বলেই মরীচিকা দেখা যাচ্ছে। মরুভূমির সাথে মরীচিকার আদৌ কোন সংসর্গ নেই। ঠিক সেই রকম ঈশ্বর বই কিছু নেই। যদি কিছু থাকত, ঈশ্বর যদি সত্য হত, সৃষ্টি যদি সত্য হত, আমি যদি সত্য হতাম, তাহলে সংসর্গের প্রশ্ন আসত, ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই তো, কার সাথে কার সংসর্গ হবে! এই যে *যোগমৈশ্বরম্,* হে অর্জুন, আমার ঈশ্বরীয় যোগ, এটাকে ঠিক ঠিক বোঝ, এটাই আত্মতত্ত্ব। আমার সাথে কারুর কোন সংসর্গ নেই, কিন্তু আমিই সবার ভরণ-পোষণ করি। আমি আছি বলেই এই জীব, পশু, পাখি, গাছপালা, পাহাড়, পর্বত, নদী, সব বস্তুগুলি আছে। বলছেন, অথচ এই পরমাত্মা কখন কারুর ভিতরে থাকে না, থাকলে সংসর্গ দোষ এসে যাবে।

কিন্তু আমরা তো দিনরাতই বলে যাচ্ছি, আমার আত্মা, তোমার আত্মা, তাহলে কি করে বলছেন ভিতরে আত্মা থাকেন না? বলছেন, এটা হল লৌকিক বুদ্ধি। জাগতিক বুদ্ধিতে মনে হয় আমার মধ্যে আত্মা আছেন, লৌকিক বুদ্ধিতে আমরা বলি, আমার ভিতর ঈশ্বর আছেন, আসলে কোন সম্পর্ক নেই। কি করে?

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়।।৬।।

(সর্বত্র বিচরণশীল মহাবায়ু যেরূপ আকাশে অসঙ্গভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ জানবে যে, সর্বব্যাপী ও অসংশ্লিষ্ট মৎস্বরূপে ভূতসমূহ স্থিতিকালে অবস্থিত থাকে।)

যেমন বায়ু সর্বত্র যাতায়াত করে, আকাশেও থাকে; কিন্তু আকাশ নির্বিকার, নির্লিপ্ত, ঠিক তেমন আমিও নির্বিকার, নির্লিপ্ত। কি রকম? মরুভূমি আর মরীচিকার মত। পরে আবার বলবেন, যত জীবজন্তু আছে, কল্প যখন শুরু হয় তখন আমার থেকেই তারা জন্ম নেয়, কল্প শেষে আবার আমার ভিতরেই চলে আসে। তারপরে আবার বলবেন, আমার প্রকৃতি থেকেই সব কিছু বেরোয়। এই যা কিছু আছে, এর কোন কিছুই আমাকে স্পর্শ করতে পারে না, কারণ আমার সাথে কারুর সংসর্গ নেই। এই জিনিসটাকে সাত, আট ও নয় নম্বর শ্লোকে বলবেন। সেখানে গিয়ে মরুভূমি ও মরীচিকার যে কথা বললাম, সেটা আরও পরিষ্কার হবে।

বক্তব্য হল, অর্জুন, ধারণা যোগ না করে তুমি যদি মুক্তি পেতে চাও, তাহলে আত্মজ্ঞান অবলম্বন কর। আত্মবিদ্যায় ঈশ্বরই আছেন, ঈশ্বর ছাড়া কোন কিছু নেই। এই সৃষ্টি যেটা দেখছ, সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু দেখছ, আমি আছি বলেই এই সব কিছু আছে। আসলে কিন্তু আমার সাথে এদের সরাসরি যোগাযোগ নেই। আমি আছি বলেই এরা আছে, যেমন মরুভূমি আর মরীচিকা। মরীচিকার যে জল, ঐ জলে মরুভূমি একটি বালি কণাও কোন দিন ভিজবে না। জলের যতই

হেলদোল হোক, মরুভূমির তাতে কিছু আসে যায় না। আমরা যাই করি না কেন, ঈশ্বরের তাতে কিছু যায় আসে না। এটা অত্যন্ত উচ্চমানের বেদান্তের আলোচনা।

নবম অধ্যায়ের চার থেকে দশ নম্বর শ্লোক গীতার সব থেকে কঠিন কয়েকটি শ্লোক। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মতত্ত্ব নিয়ে বলেছেন ঠিকই। আত্মতত্ত্ব যতই সূক্ষ্ম হোক না কেন, কিন্তু বুঝে নেওয়া বা ধারণা করে নেওয়াটা খুব তেমন কঠিন না। কিছু কিছু মূল জিনিস জানা থাকলে, ব্যাপারটা ধারণা করা সহজ হয়। যার জন্য দেখা যায়, গীতার যাঁরা বড় বড় পণ্ডিত, তাঁরাও এটাকে গুলিয়ে ফেলেন। বেদের নাসদীয় সূক্তমও অত্যন্ত কঠিন। স্বামীজীও এক জায়গায় বলছেন, হিন্দু ধর্ম আসলে সবার জন্য নয়। শিক্ষার দিক দিয়ে এবং আধ্যাত্মিক ভাবধারায় যারা একটু উন্নত, ঠিক ঠিক হিন্দু ধর্ম তাদের জন্য। যার জন্য হিন্দু ধর্ম সবার জন্য নয়। বিশ্বের যত পপুলার ধর্মগুলি আছে, এগুলো খুব simplistic, খুব সহজ কয়েকটা আচার উপাচারের কথা বলে দেন, ঈশ্বর আছেন, এটা করতে হবে, ওটা করা যাবে না, ইত্যাদি। হিন্দু ধর্ম একটা ধর্ম তত্ত্ব, ব্যাসদেব এই তত্ত্বকে খুব সুন্দর ভাবে যত্ন করে গীতাতে গুছিয়ে রেখে দিয়েছেন। আমরা আমাদের তরফ থেকে যত ভাবে বোঝান যেতে পারে বুঝিয়ে যাচ্ছি। যতটুকু বোঝার বুঝলেন, যাঁর যেমন সাধন-ভজন, যেমন তপস্যা করবেন, তিনি তত বুঝতে পারবেন।

দ্বিতীয় কথা হল, এই জিনিসগুলি পড়ে বা শুনে কোন দিন বোঝা যাবে না। আমাদের নিজেদেরই এর উত্তরগুলো জপধ্যান, সাধন-ভজন করে বার করতে হবে। উত্তর বার করতে পারলে তারপর দেখতে হবে এটা শাস্ত্রের সাথে মিলছে কিনা। যদি মেলে তাহলে ঠিক আছে। যদি না মেলে, তাহলে আরও বেশি গভীর ভাবে ভাবতে হবে। তারপর শ্রদ্ধা সহকারে কোন আচার্যের কাছে যেতে হবে। কোন আচার্য? যিনি সত্যিকারের শাস্ত্রজ্ঞ। আমাদের উপনিষদেও বারবার বলছেন, আচার্য মানে যিনি শাস্ত্র জানেন। শুধু মাত্র সন্ন্যাসী হলে হবে না। আমি যে কথাগুলো বলে যাচ্ছি সব শাস্ত্র থেকেই বলছি, শাস্ত্রে এই এই আছে। শাস্ত্রের কথা কেন মানব, সেগুলোও আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু সমাধান নিজেকেই বার করতে হবে। শুধু শাস্ত্র পড়ে গেলেই হয় না, মন্থনটা খুব দরকার, শাস্ত্রের একটা কথাকে নিয়ে অনেক দিন ধরে প্রচুর চিন্তন করতে হয়। গল্প করতে করতে, চা খেতে খেতে আমরা যে কথাবার্তা বলি, সেখানেও প্রত্যেকটা কথার পিছনে একটা দীর্ঘ সময়ের চিন্তা-ভাবনা জড়িয়ে থাকে। দুমদাম কথা আমরা বলি না। যে কথাই আমরা বলি, সেই কথা শাস্ত্রের সাথে, আচার্যের কথার সাথে মিলছে কিনা ভেবে দেখতে হয়।

এতক্ষণ যে আলোচনা করা হল এবং যে আলোচনা করা হবে, এর প্রত্যেকটি কথা হিন্দু দর্শনের শ্রেষ্ঠতম কথা। আর পুরো গীতাতে এর থেকে বেশি কঠিন অন্য আর কিছু নেই। আমরা এখন সব থেকে কঠিন একটা বিষয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। ধারণা করতে পারলে ভাল, ধারণা না করতে পারলেও গীতা বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না, কারণ এখানে সৃষ্টিতত্ত্বকে নিয়ে আলোচনা করছেন। স্বাভাবিক ভাবে আমাদের প্রশ্ন উঠতে পারে, এত কঠিন যদি হয়, তাহলে এই সৃষ্টতত্ত্ব জেনে আমার কি হবে? নাসদীয় সুক্তমেও বলছেন, কেইবা জানে সৃষ্টির আগে কি ছিল। আর জেনেও কি হবে? জেনে এই হবে, জীবনদর্শনটা ঠিক হয়। এই যে সৃষ্টি, এই যে সংসার, এর ব্লুপ্রিন্টটা কি, কিভাবে এটা তৈরী হয়েছে, কিভাবে এসেছে, এটা যদি বোঝা যায় তখন বোঝা যায়, এই ক্ষুদ্র জিনিসটাকে কিভাবে সামলানো যাবে।

ভারত পরিক্রমার সময় স্বামীজী আলমোড়ার কাছে কাঁকড়িঘাট নামে একটা জায়গায় আছেন। সেখানে তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন। হঠাৎ ধ্যানের মধ্যে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। তিনি গুরুভাইকে জড়িয়ে ধরে বলছেন, Microcosom আর Macrocosom একই প্রক্রিয়ায় নির্মিত, পিণ্ডাণ্ড আর ব্রহ্মাণ্ড এক। ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝতে গেলে পিণ্ডাণ্ডকে বুঝতে হবে। পিণ্ডাণ্ডকে বুঝতে

হলে ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝতে হবে। যে কোন একটাকে বুঝতে হবে। আমাদের জীবনে কত রকমের সমস্যা, সবারই চোখে জল, কদাচিৎ কেউ হয়ত সুখের কথা, ভাল কথা বলে। বিপরীত পরিস্থিতি আসতে পারে, বিষম পরিস্থিতি যে কোন লোকের জীবনে আসতে পারে, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়াতেই আমরা ভেঙে পড়ছি। কেন ভেঙে পড়ছি? কারণ এই জগতের নির্মাণবিধিটা আমরা জানি না। সৃষ্টির কাঠামোটা যদি জানা থাকে, তাহলে সৃষ্টির কোন জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে আছি, এটা বোঝা যায়। তখন সমস্যাগুলিকে সামলানো যায়।

সৃষ্টির আলোচনা করতে গেলেই বেশ কিছু জিনিস আমাদের মাথায় আসে। প্রথম, ঈশ্বর সৃষ্টি কিভাবে করলেন? দ্বিতীয়, ঈশ্বর সৃষ্টি কেন করলেন? আমাকে কেন তিনি রচনা করলেন? সৃষ্টি যখন করলেনই তখন তিনি জগতে কেন এত বৈষম্য রাখলেন? একজন বিরাট বড়লোকের বাড়িতে জন্ম নিল, আর-একজন রাস্তার ধারে ভাঙা ঝুপড়িতে জন্ম নিল, একজন জন্ম থেকে অসুস্থ, আর-একজন সারা জীবন সুস্থ সবল থেকে গেলেন, এত বৈষম্য কেন করলেন? আর-একটা বড় প্রশ্ন প্রায়ই আমাদের শুনতে হয় –ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই যদি সব কিছু হয়ে থাকে, তাহলে আমি যে পাপ করছি সেটাও তাঁর ইচ্ছাতেই করছি, তাই এই পাপ ঈশ্বরেরই লাগার কথা। আমরা কি ভেবে দেখেছি কখন, আমরা যে বলি ঠাকুরের কৃপা, ঠাকুরের ইচ্ছা, ঠাকুরের করুণা; তার মানে যত ভুল কাজ করছি, যত পাপ কাজ করছি, এগুলো সব তাঁর কৃপাতে, তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে, তাই সব পাপ ওনারই লাগার কথা।

তার সাথে বলা হয়, সব সময় অনাসক্ত হয়ে কাজ কর, কোন কিছুতে জড়াবে না। এই অনাসক্তের অর্থ কি? তাতে কি হয়? এই যে বলছি, আমার কর্মফল লাগবে না, তাহলে আমার কৃতকর্মের এই কর্মফল কোথায় যাবে? এই জিনিসগুলিকে নিয়ে এবার ভগবান দুটো তিনটে শ্লোকে আলোচনা করবেন। পরিষ্কার করে সব কিছু বলে দিচ্ছেন – সৃষ্টি কিভাবে হয়, সৃষ্টি কেন, বৈষম্যের ব্যাপারটা, তার সাথে ঈশ্বরের কর্তাপন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় যে সব হচ্ছে তাই পাপ কর্মের, পাপ বা দোষ তার লাগবে কি লাগবে না, আমরাই বা কতটা ওর মধ্যে দায়ী। এরপর আমরা সাত নম্বর শ্লোকের আলোচনায় যাচ্ছি –

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্।।৭।।

(হে কৌন্তেয়, প্রলয়কালে সমস্ত ভূত আমার ত্রিগুণাত্মিকা মায়াতে লীন হয়। আবার সৃষ্টিকালে আমি তাদের সৃষ্টি করি।)

অষ্টম অধ্যায়ে এই বিষয়টার উপরেই আমরা বিস্তারে আলোচনা করেছি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় যা কিছু আছে, এটা একবারের মত হয়ে গেছে আর হবে না, এ-রকম নয়। খ্রীশ্চানিটিতে যেমন বলা হয়, সৃষ্টি হয়ে গেছে, যত দিন চলার চলবে, একদিন এর নাশ হয়ে যাবে, এরপর আর সৃষ্টি হবে না। আমরা এই মত মানি না, আমরা মানি কল্প, চক্রাকারে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় চলতেই থাকবে। এখানে ভগবান বলছেন, প্রলয় হয়ে যাওয়ার পর, অর্থাৎ ব্রহ্মার একটি দিন যেই শেষ হয়ে গেল, *সর্বভূতানি কৌন্তেয়*, যাবতীয় যা কিছু আছে, *প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্*, সব আমার প্রকৃতিতে, যে প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে সব লয় হয়ে যায়। *কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্*, আবার যখন কল্প শুরু হয় তখন এই জিনিসগুলিই আবার প্রকৃতি থেকে বেরিয়ে আসে; আর এভাবে চলতেই থাকে। ঠাকুর এই জিনিসটাকে খুব সহজ ভাবে বলে দিচ্ছেন। আগেকার দিনে বাড়ির গিন্নিরা শশার বীজ, লাউ কুমড়োর বীজ কুড়িয়ে একটা পুটলি বেঁধে রেখে দিতেন। চাষের সময় পুটলি থেকে বীজগুলিকে বার করে মাটিতে রোপণ করে দেবে। কত সহজ করে ঠাকুর পুরো জিনিসটাকে বলে দিলেন কল্পনা করা যায় না। গিন্নি যেন প্রকৃতি হয়ে সব বীজগুলিকে পুটলি করে

একটা হাড়ির মধ্যে রেখে দিচ্ছেন, আবার যখন নূতন করে সৃষ্টি হবে, তখন এই হাড়ি থেকেই গিন্নি বীজগুলিকে পুটলি খুলে বার করে দেবেন।

এখানেই বোঝা যায় বুঝে জানা আর না বুঝে জানার মধ্যে কত তফাৎ। একজন বোঝেনি কিন্তু মনে করছে জেনে গেছি, তাকে সেই ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করা হলে এলেমেলো কথা বলবে। কিন্তু যিনি জিনিসটাকে দেখেছেন, যিনি জিনিসটা জানেন, তার প্রমাণ হল তিনি অত্যন্ত সহজ ভাবে জিনিসটাকে বুঝিয়ে দেবেন। যদি দেখা যায় কেউ আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলিকে খুব সহজ উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, তখন বুঝতে হবে ইনি তত্ত্বটা জানেন। সাধনা করার পর যীশু জেরুজালেমে আসছেন, সেখানে রাস্তায় কুয়ো থেকে গ্রামের মেয়েরা জল তুলছিল, সেখানেই তাদের সামনে যীশু ঈশ্বরীয় কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। মেয়েরা অবাক হয়ে পরস্পরকে বলছে, এতদিনে একজন প্রফেট দেখছি, He talks as if he knew, he had the authority। ঠাকুর পণ্ডিত বা যারা লেকচার দিয়ে বেড়াত, তাদের দেখলেই বলতেন, তুমি কি চাপরাশ পেয়েছ? বলতে চাইছেন, তুমি কি ঈশ্বরের আদেশ পেয়েছ ঈশ্বরীয় কথা বলার? এখন যদি আপনারা জিজ্ঞেস করেন, 'মহারাজ আপনি কি চাপরাশ পেয়েছেন'? অবশ্যই পেয়েছি, বেলুড় মঠ আমাকে আদেশ দিয়েছে শাস্ত্রে যেমনটি বলা আছে, তেমনটি বুঝিয়ে দেবে, নিজের বুদ্ধি লাগাতে যেও না। কিন্তু আমি যদি এমন কোন কথা বলি, যেটা গীতা বা উপনিষদে নেই, ওটার জন্য চাপরাশ লাগে, ঈশ্বর থেকে ঐ কথা আসতে হয়।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ।।৮।।

(স্বীয় অবিদ্যারূপ মায়াকে বশীভূত করে প্রকৃতিপরতন্ত্র এবং জন্মমৃত্যু-অধীন ভূতগণকে আমি পুনঃপুনঃ সৃষ্টি করি।)

ভগবান বলছেন, আমার এই প্রকৃতি দিয়ে, এই বিশেষ শক্তি দিয়ে আমি বারবার সৃষ্টি রচনা করি, আর বারবার সৃষ্টিকে নিজের মধ্যে টেনে নিই। সৃষ্টি কিভাবে হয়? এই প্রশ্নের উত্তর গীতার নবম অধ্যায়ে আট নং শ্লোকে দেওয়া হচ্ছে।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য, আমার যে প্রকৃতি তাকে আমি আমার নিয়ন্ত্রণে রাখি। যেমন চাষী, তার বলদ আছে, লাঙল আছে, বলদ দিয়ে ক্ষেতে লাঙল টানছে। চাষী বলদগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে লাঙল দিয়ে মাঠে চাষ করছে। *কৃৎস্নম্* মানে সমস্ত, *ভূতগ্রামমিং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ*, যত জীব আছে, যত জিনিস আছে সব নিজের প্রকৃতিতে অবশ হয়ে রয়েছে, অসহায়। সবার গলায় দড়ি, কোমরে দড়ি, পায়ে দড়ি, হাতে দড়ি, কখন এই দড়ি ধরে এক টান মারছেন, কখন সেই দড়ি ধরে এক টান মারছেন, কোন উপায় নেই। বলা হয় যে, কলকাতায় যত খাসির মাংস দোকান আছে, সব ছাগল নাকি খিদিরপুর হয়ে আসে। সেই থেকে একটা কথা খুব চালু হয়ে যায়, খিদিরপুরে নেমেছ (ছাগলের নামে) এবার তুমি কাটা যাবে। তখন আমি ব্রহ্মচারী ছিলাম, এই কথা শুনে আমার হাত পা কেমন কেঁপে উঠেছিল। সত্যিই তাই, এই জগতে আমরা আছি, মানে খিদিরপুরে আমরা নেমেছি, কাটা তো যাবই, যদি মুক্তির উপায় আমরা না বার করি। যাঁরা এই কথা শুনছেন, যাঁরা শুনছেন না, যাঁরা এগুলোকে মানেন না, যাঁরা এগুলো জানেন না; সবাইকে এই জিনিসটাকে খুব ভাল করে বুঝে নিতে হয় –আমি, আপনি সবাই নিজের প্রকৃতি আর তার সাথে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে প্রকৃতি, ওখানে অবশ হয়ে গিয়ে আমাদের বারবার মৃত্যু, বারবার জন্ম হচ্ছে। এই খেলা চলছে তো চলছেই, সবাই আমরা নিরুপায়, অসহায়।

তাহলে হে ঈশ্বর, আপনি যে এই জীব-জন্তু সৃষ্টি করছেন তার মধ্যে প্রথম কথা আপনার বৈষম্য দোষ আছে, কাউকে ভাল করছেন, কাউকে মন্দ করছেন; দ্বিতীয় এদের যে পাপ আর পূণ্য হচ্ছে সেটা তো আপনারও লাগবে? ঠাকুরও বলছেন, কত লোকের পাপ আমাকে নিতে হয়েছে। একদিন ধ্যানের অবস্থায় ঠাকুর দেখছেন, ওনার শরীর থেকে একজন বেরিয়ে এসেছে, দেখছেন তার সারা পিঠে ঘা। কত লোক কত কিছু করে এসে ঠাকুরকে স্পর্শ করছে, তাদের পাপ লাগছে। অবতারেরও পাপ লাগতে দেখা যাচ্ছে, ভগবানের কি এই রকম পাপ লাগে? যে কোন লোকের মনে এই প্রশ্ন আসতে পারে। গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দিলেন, সেই অভিশাপে যদুবংশের নাশ হয়ে গেল, শ্রীকৃষ্ণেরও তাহলে অভিশাপ লাগল। ঠিকই, কিন্তু এই অভিশাপ ভগবানের লাগেনি, শ্রীকৃষ্ণের; যিনি অবতার হয়ে এই রূপে লীলা করছেন, তাঁর লেগেছে। যদি ভগবানের লাগে, তাহলে আমি আপনি যে পাপ-পূণ্য করছি, এই দোষগুলো তাঁরও লাগবে।

আপনি সৃষ্টি করছেন, আপনি তাঁদের ভরণ পোষণ করছেন, আপনার ইচ্ছাতে সব কিছু হচ্ছে। সেইজন্য এই প্রশ্ন আসছে, আমাদের পাপ-পূণ্য ভগবানেরও লাগার কথা। ভগবান কিন্তু পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, আমি এর কোন কিছুতেই নেই। পঞ্চম অধ্যায়ে ভগবান বলে দিয়েছেন, কোন কিছুতে আমি নেই। কারুর সুকৃতিটাও আমি নিই না, কারুর দুষ্কৃতিটাও আমি নিই না। *অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ,* সব জীব অজ্ঞানে মোহিত হয়ে এই রকম করে। জগতে যে বৈষম্য রয়েছে, জগতে যত পাপ পূণ্য হয়, ভগবানের কোনটাতেই কিছু আসে যায় না। কেন কিছু আসে যায় না?

ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু।।৯।।

(হে ধনঞ্জয়, আমি অনাসক্ত ও উদাসীন পুরুষের ন্যায় অবস্থিত বলে আমাকে সেই সকল কর্ম আসক্ত করতে পারে না।)

সমস্ত জীবের যে কর্ম বা আমি যে সৃষ্টি রচনা করছি, এর নিমিত্ত যে কর্ম, সেই কর্ম আমাকে স্পর্শ করে না; কারণ আমি এই সমস্ত কিছুতে উদাসীন। উদাসীন বাংলার অর্থে না, আমার কোন কিছুতে মন নেই এখানে এই অর্থেও উদাসীন বলছেন না, উদাসীন শব্দের দ্বারা এখানে অনাসক্তের কথা বলছেন। এই শ্লোকের মাধ্যমে সবাইকে বলে দেওয়া হচ্ছে, আমরা যখন যা কিছু করব, সব কিছুই উদাসীন হয়ে করব। উদাসীন হয় neutral, ঠাকুর এই জিনিসটাকে খুব সহজ ভাবে বুঝিয়ে বলছেন, সংসারে বাড়ির দাসীর মত থাকবে। বাড়ির দাসী মনিবের সব কিছু করছে, মনিবের ছেলেকে 'আমার রাম', 'আমার হরি' বলে, কিন্তু জানে এরা আমার কেউ না। কোন ত্রুটি হয়ে গেলে মনিব রেগে বলে দেবে, কাল থেকে তোমাকে আর আসতে হবে না, ওখানেই সব সম্পর্ক শেষ। কিন্তু যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ মনে হবে সবার সাথে জড়িয়ে আছে, বেরিয়ে এলে কোথাও কিছু নেই, সব শেষ।

আত্মা নির্বিকার, আত্মাতে কোন বিকার আসে না। যিনি ঈশ্বর, তিনিই শুদ্ধ আত্মা। অশুদ্ধ আত্মা কি? অশুদ্ধ আত্মা বলে কিছু হয় না, আত্মা মাত্রই শুদ্ধ। আত্মা যেমনি মনের কাছে এসে পড়ে, মনের যেমন ব্যাপার-স্যাপার, মনের যেমন আচার ব্যবহার, তেমন আত্মা মনে করতে শুরু করে এটা আমার হচ্ছে। কিন্তু এই মনে করাটা সম্পূর্ণ ভুল, কারণ সেখানে একটা অজ্ঞানের আবরণ পড়ে গেছে বলে এই রকম মনে করে। পরিবর্তনটা মনের হয়, পরিবর্তনটা সত্য। মন যখন ভাল, আত্মা মনে করছে আমি সুখী, মন যখন খারাপ থাকে, আত্মা মনে করছে আমি দুখী। কিন্তু আত্মা তো নির্বিকার, তাহলে কেন এই রকম মনে করছে? কারণ ওখানে একটা অজ্ঞানের পর্দা পড়ে আছে, সেইজন্য জীবাত্মা হয়ে সংসারে ঘুর ঘুর করছে।

কিন্তু যিনি পরমাত্মা তাঁর উপর কোন পর্দা থাকে না। কেন থাকে না, কারণ এই যে বলছেন, *প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য*, আমি আমার প্রকৃতিকে বশীভূত করে আমার অধীনে রেখেছি। আমি আপনি কিন্তু প্রকৃতির অধীনে, প্রকৃতি আমাদের বশীভূত করে রেখেছে, এই হল তফাৎ। প্রকৃতি ভগবানের মুঠোতে, আর আমরা প্রকৃতির মুঠোতে, এটাই তফাৎ। আমরা আগেও অনেক জায়গায় কয়েদীর উদাহরণ দিয়েছি। একজন কয়েদীকে পুলিশ সব সময় ঘিরে রাখে, আবার দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীকেও পুলিশ ঘিরে রাখে। কিন্তু দুটোর মধ্যে তফাৎ হল, রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী যেদিকে যাবেন পুলিশকে সেই দিকে যেতে হবে, আর কয়েদীর ক্ষেত্রে পুলিশ যেদিকে যাবে কয়েদীকে সেদিকে যেতে হবে। কিন্তু দেশের নাগরিক হিসাবে দুজনেই সমান, রাষ্ট্রপতিও যা, কয়েদীও তাই; ভোট দিতে গেলে দুজনেরই সমান অধিকার। রাষ্ট্রপতি পদ থেকে সরে আসার পর, আর কয়েদীর মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর দুজনেই সমান, দুজনেই ভারতের নাগরিক। ভারতের যে সংবিধানে তাতে এই তফাৎ করা হয় না।

আমরা বলি রাষ্ট্রপতি দেশের first citizen, কিন্তু আমরা জানি নাগরিক হিসাবে আমরা সবাই সমান। আগামীকাল যদি কোন কেস হয়, আমাদের আইন দুজনকেই সমান দৃষ্টিতে দেখবে। যার পয়সা আছে সে ভাল উকিল নিয়ে আসবে, সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু আইন সবার জন্য সমান। দেশের সাধারণ নাগরিক হিসাবে আমরাও রাষ্ট্রপতির সমান। এই উদাহরণ দিয়ে জীবাত্মা পরমাত্মার সম্পর্কটা বোঝা যায়। পরমাত্মা ভারতের রাষ্ট্রপতির মত, তাঁর ইচ্ছায় সব চলে। কিন্তু রাষ্ট্রপতির উপাধি আর বাকিদের উপাধি যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, দুটো এক। জীবাত্মা প্রকৃতির মুঠোতে, প্রকৃতি যেমন চাইছে তাকে তেমনটাই করতে হচ্ছে। কল্পের শুরু হলে জীবাত্মাকে দেহ ধারণ করতে হয়, কল্প শেষ হয়ে গেলে আবার জীবাত্মা সেখানে পড়ে থাকে। ভগবান সব কিছু জানেন, কিন্তু কোন কিছুতে জড়ান না, তিনি উদাসীন।

গীতা যাদের উপর উপর পড়া আছে তারাও গীতার এই শ্লোকটা জানেন, *মা ফলেষু কদাচন*, কর্মেফলে তুমি যুক্ত হতে যেও না, এটাই তো নিঃস্বার্থপরতা। উদাসীন শব্দ দিয়ে ভগবান এটাই এখানে বলছেন, আমি অনাসক্ত। আত্মা কোন পরিস্থিতিতে কোন ফল পান না, তাঁর কোন পরিবর্তনও ঘটে না। পরিবর্তন ঘটে মনের। একজন মহারাজ আমাকে একটা কথা বলেছিলেন, উনি কোথাও গীতা পাঠ করতেন, ওনাকে এই প্রশ্নটা কেউ করেছিল। আমি যদি কাজ করি, আমি যদি অনাসক্ত হই, তাহলে এর ফলটা কোথায় যাবে? কোথাও যাবে না। গ্রাম দেশে রাস্তার পাশে আমি একটা আম গাছ লাগালাম; উদ্দেশ্য, আম গাছে যে ফল হবে গ্রামের সব লোকেরা খাবে। আমার কর্তাপন যদি এসে থাকে, এটা আমার আম গাছ, এই গাছের আম অন্য কেউ নিতে পারবে না; এই ভাব যদি মনের মধ্যে আসে; তখন এই জায়গাতে আমার মানসিকতাটাই পাল্টে গেল। আমি একটা স্বার্থপর হয়ে গেলাম, আমার আত্মা আমার সাথে জুড়ে রয়েছে বলে সেও বলছে, আমি এই রকম হয়ে গেলাম; এই কর্ম আমার মনের উপর একটা ছাপ ফেলবে। অনাসক্ত হয়ে যিনি কাজ করেন, তাঁর মনের উপর সেই কর্ম কোন ছাপ ফেলতে পারবে না।

তবে জগতের উপর এর একটা প্রভাব স্বাভাবিক ভাবে পড়ে, তবে ওই প্রভাবের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু পরে পরে কিছু কিছু দার্শনিকরা বলতে লাগলেন, ওনার যে শিষ্য, ভক্ত আছে এরা সবাই গুরুর পূণ্যগুলি পায়, যারা তাঁর নিন্দা করে তারা তাঁর পাপগুলি পায়। এগুলো বোকা বোকা কথা। বেদান্তের দৃষ্টিতে এই ধরণের কিছু হয় না, ওখানেই কর্মফলটা নাশ হয়ে যায়। বাহ্যিক ফল একটা হবে, আম গাছ লাগালে আম হবে, বাচ্চারা ঢিল ছুড়ে আম পাড়বে, এটা পুরো আলাদা জিনিস। ওখানে যদি নিজের ব্যাপার আসে, তিনি কর্তৃত্ব রাখতেও পারেন, নাও রাখতে পারেন। কর্তৃত্ব রাখলে তিনি আরও স্বার্থপর হয়ে গেলেন। কর্তৃত্ব যদি না রাখেন, হে জগৎ সব

তোমার জন্য রইল, তিনি নিঃস্বার্থপর হয়ে গেলেন, মুক্তির দিকে তিনি এগোতে শুরু করলেন। মূল বক্তব্য, ভগবান কোন কিছুতে জড়িয়ে নেই।

আট নম্বর শ্লোকে বলছেন, *প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য*, আমি আমার প্রকৃতির মাধ্যমে এগুলো করি। এখানে এসে বলছেন, আমি করি, কিন্তু অনাসক্ত ভাবে। দেখছেন, কি রকম পাল্টে গেল। সেইজন্য হে, অর্জুন, কর্ম আমাকে বাঁধতে পারে না। আমি উদাসীন হয়ে বসে থাকি; আমি কর্তা, আমি এটা করলাম, এই ধরণের ভাবও আমার মধ্যে আসে না। ফলে কর্ম আমাকে বাঁধতে পারে না। কর্ম তখনই বাঁধে, যখন আমি কর্ম করলাম, এই কর্মের ফল পাওয়া যাবে, এই কথাগুলো যখন বলি। আমাদের শাস্ত্রেই আছে, কর্মের ফল দেবেই; এগুলোকে নিয়ে আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি।

কিন্তু তার থেকেও বেশি যেটা হয়, স্বামীজীও বারবার বলছেন, আর রাজযোগেও এর বিস্তারে আলোচনা করেছেন, তা হল –কর্ম মনের মধ্যে একটা সংস্কার ছেড়ে দেয়। যদি তাঁর কর্তাপন থাকে, যদি তিনি মনে করেন, এটা আমার, তাহলে কর্মের ছাপ ভিতরে ফেলবেই। ঠাকুর বারবার বলছেন, 'আমি' আর 'আমার' অজ্ঞান থেকে হয়। কেন বলছেন? 'আমি' ও 'আমার' ভাব নিয়ে কর্ম করলে সেই কর্ম মনের মধ্যে সংস্কার অবশ্যই ছাড়বে। এরপর যখনই কিছু করতে যাবে, সেখানেও 'আমি' আর 'আমার' এই ভাবটা বাড়বে। 'আমি' ও 'আমার' ভাব বাড়তে বাড়তে একটা সময় মানুষ অত্যন্ত স্বার্থপর হয়ে যায়। স্বার্থপর মানুষ মানেই একেবারে বদ্ধ সাংসারিক মানুষ, এদের মুক্তি হতে অনেক দেরী হবে। পদে পদে আমাদের ভাবতে হয়, কিভাবে এই স্বার্থপরতাটা কমবে। স্বামীজী অনেক লেকচারে এই কথা বলছেন, প্রার্থনা করতে বলছেন, হে প্রভু, আমার কাপুরুষতা, আমার স্বার্থপরতা দূর কর।

আমি আপনি জানি আর না জানি, সবাই আমরা ভগবানের সাথে জুড়ে আছি। আগে বলা হল, ভারতের নাগরিক হিসাবে আমিও যা, ভারতের রাষ্ট্রপতিও তাই। আমাদের তাই সেই ভাবে কাজ করতে হবে, যেভাবে ঈশ্বর কাজ করেন। ভগবান যেমন আগের শ্লোকে বললেন, *প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য*, আমার প্রকৃতিকে আমি নিয়ন্ত্রণ করি। ঠিক তেমন, আমরা আমাদের ক্ষমতা দিয়ে আমাদের সব কাজ করব, লোকে বলবে, অমুক লোক এই কাজ করেছে। কিন্তু আমার মনে দ্বিতীয় একট ধাপ এসে যাবে, যার কথা এই শ্লোকে ভগবান বলছেন –*উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু*, উদাসীন ভাবে অনাসক্ত হয়ে সব কর্ম করতে হবে। 'এই কি করছ'? 'একটা আম গাছ লাগাচ্ছি'। 'কার জন্য'? 'সবারই জন্য, আমার সাথে এই আম গাছের কোন সম্পর্ক নেই'। বাইরে দেখাচ্ছি অনাসক্ত হয়ে কর্ম করছি, কিন্তু ভিতরে এই ভাব থাকবে, আমি কি সুন্দর অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলাম। এই ভাব মনের মধ্যে থাকবে, এই ভাব যাবে না। আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত, ঈশ্বরদর্শন না হওয়া পর্যন্ত এই ভাব যাবে না।

স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ আমাদের মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন, ওনার মত হিউমারাস মানুষ আমি জীবনে কাউকে দেখিনি। একদিকে খুব হিউমারাস আবার অন্য দিক তাঁর এত উপস্থিত বুদ্ধি ছিল, কল্পনা করা যায় না, তেমনি অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। উনি প্রত্যেক দিন সকালবেলা আধ ঘন্টার মত সাধু সন্ন্যাসীদের সাথে কথা বলতেন। একদিন একজন মহারাজ প্রণাম করে বলছেন, 'মহারাজ আপনি যে বলেন, আজকাল সাধু সন্ন্যাসীরা বলে, আমি এই করেছি, আমি সেই করেছি। কিন্তু দেখুন আমাদের সেন্টারের সেক্রেটারিরা এত কিছু করছেন, কিন্তু বলেন ঠাকুরের ইচ্ছায় এটা হয়েছে'। মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, 'হ্যাঁ বলেন ঠাকুরের ইচ্ছায় 'আমার সময়ে' হয়েছে'। সাধুরা শুনে সবাই হাসতে শুরু করেছেন। এটাও একটা সুপ্ত বাসনা, এটা যায় না। যিনি অনাসক্ত হয়ে করছেন, তাঁরও মনে হয়, আমি সবারই জন্য এটা করলাম; এই ভাবটা থাকে, এটাও কিন্তু এক প্রকার বাসনা। এই ভাবটা এমন কিছু খারাপ না, আপনি সবারই জন্য তো করলেন, এটাই একটা বিরাট

জিনিস। বাকিটা আত্মজ্ঞান হলে, সমাধি হলে, ঈশ্বরদর্শন হলে চলে যাবে, এমনিতে যায় না। অতটুকু আমাদের মেনে নিতে হয়।

ঠিক ঠিক কর্মযোগ, গীতায় যে নিষ্কাম কর্মযোগের কথা বলছেন, এই কর্মযোগ আত্মজ্ঞান না হলে হয় না। আচার্য বলছেন, *কর্তৃত্বাভিমানাভাবঃ* আর তার সাথে *ফলাসঙ্গাভাবঃ*, এই দুটো জিনিস – আমি কর্তা এই বোধটাকে উড়িয়ে দেওয়া আর এই কর্মের ফল আমি পাব, এই ইচ্ছাটাকে উড়িয়ে দেওয়া। আগে ফল পাওয়ার ইচ্ছাটা উড়িয়ে দিতে হয়। এই ভাব পুরোটা যায় না, ঠিক আছে থাক, দোষের কিছু না। কথামৃতে ভগবতী দাসীর কথা আছে। ভগবতী দাসীকে ঠাকুর বলছেন, অনেক তো হল, কিছু কি করলি? ভগবতী দাসী বলছে, 'হ্যাঁ করেছি, এই তো অমুক মন্দিরে পাথর বসিয়েছে'। ঠাকুর শুনে বলছেন, বলিস কি রে! 'হ্যাঁ, ওখানে লিখেছি, ভগবতী দাসী'। ঠাকুর চমকে উঠেছেন, সে কি রে! এ জিনিস যায় না, দান করছে, সেখানেও নিজের নামটা খোদাই করে দিচ্ছে। আমি ছাপড়া আশ্রমে ছিলাম। নূতন আশ্রম কিছু নেই। একজন ভক্ত একটা ফ্রিজ দান করলেন। ওনার পরিবারের সবার নাম লাল রঙে বড় বড় অক্ষরে লেখা। আমি হেসে বললাম, আরও কয়েকজন পূর্বপুরুষের নাম লিখে দিলে পুরো ফ্রিজটাই লাল রঙ করা হয়ে যেত।

এদের বাদ দিয়ে আর যারা আছে, এরা হল, ঠাকুর বলছেন, গুটি পোকার মত। গুটি পোকা, যেখান থেকে সিল্ক তৈয়ার হয়। গুটি পোকা কোকেন তৈরী করে, ওই কোকেনের মধ্যে থাকতে থাকতে আর বেরিয়ে আসতে পারে না, ওর মধ্যেই মারা যায়। আমরা সবাই এক-একটা গুটি পোকা। আমার জগৎ আমার কাছে আমার জগৎ, আপনার জগৎ আপনার কাছে আপনার জগৎ। আমরা মনে করছি এই জগৎ আমাদের সবারই জগৎ। যেমন ভারতবর্ষ, আমার আপনার সবারই ভারতবর্ষ। আসলে তা না, জগৎটা মনকে নিয়ে হয়, আমার জগৎ আমার জগৎ, আপনার জগৎ আপনার জগৎ। আমার জগতে আমি মরব, আপনার জগতে আপনি মরবেন। আমি মরলে আমার জগৎ শেষ, আপনি মরলে আপনার জগৎ শেষ। *ভূতগ্রামিমং কৃৎস্নম্*, মরে জন্ম নেবেন, জন্ম নিয়ে আবার মরবেন। এইভাবে চলতে চলতে প্রলয় হয়ে যাবে, সব প্রকৃতির মধ্যে চলে যাবে, আবার সৃষ্টি যখন হবে তখন আবার আমাদের সবাইকে টেনে সৃষ্টির মধ্যে এনে ফেলবেন। একমাত্র যিনি জ্ঞানী, ভগবান হলেন সব থেকে বড় জ্ঞানী, একমাত্র জ্ঞানী এগুলোতে জড়ান না। ওনার ফলের প্রতি পুরো অভাব, কোন সঙ্গ নেই, আর কর্তাপনেরও পুরো অভাব।

কথামৃতে ঠাকুর এটাকে নিয়ে খুব সুন্দর কথা বলছেন। কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ গভীরে গিয়ে যদি অনুধ্যান করা হয়, শুধু পড়লে হবে না, সাথে সাথে গভীর অনুধ্যান না করলে হবে না, অর্থগুলি স্পষ্ট হবে না। দিনে এক পাতার বেশি কথামৃত পড়বেন না। রোজ এক পাতা করে পড়তে হবে। সকালে উঠে হোক, সকালে হলে ভাল, কারণ সারাদিন ওটা ঘুরতে থাকে। বেশির ভাগ মহারাজরা সকালে রোজ এক পাতা দু পাতা করে কথামৃত পড়েন আবার রাত্রিতে শোওয়ার আগে এক পাতা দু পাতা পড়েন। সেটা কিন্তু অন্য কারণে। বেশির ভাগ সাধুরা সারাদিনে যা করার করেন, কিন্তু রাত্রিতে শোওয়ার আগে আবার জপধ্যান করেন। এতে কি হয়, উচ্চ চিন্তাগুলি, ঠাকুরের কথা, কথামৃতের কথা ঘুমের মধ্যেও ঘুরতে থাকে। এর ফলে সকালে উঠলে জপধ্যানের ইচ্ছাটা থাকে, তা নাহলে ইচ্ছা থাকে না।

সাধু জীবন, জপধ্যানের জীবন, এই জীবনটা হল demanding Mistressএর মত। ঠাকুর কথামৃতে উপপতির কথা বলছেন, এখানে উপপতি না, যাঁকে ভালবাসছেন, তিনি আবার খুব demanding, চব্বিশ ঘন্টা তাঁর চাই চাই লেগেই থাকে। জপধ্যান চব্বিশ ঘন্টা চাই, পার্টটাইমের ব্যাপার চলবে না। মায়েদের সন্তান হলে তাঁরা জানেন, প্রথম এক বছর কি দু-তিন বছর কিভাবে তাঁদের সমস্ত শক্তি, সমস্ত সময় সন্তানকে লালন-পালন করতেই চলে যায়। জপধ্যান, তপস্যা,

লেখালেখি, শাস্ত্র অধ্যয়ন ঠিক এই ভাবে হয়, এগুলো প্রাণকে একেবারে শুষে নেয়, তখন অন্য জিনিসগুলি বাধ্য হয়ে ছাড়তে হয়।

কথামৃত পড়ার সময় খুব চিন্তন করত হবে। প্রত্যেকটি কথা বুঝতে হবে এই কথা দিয়ে ঠাকুর কি বলতে চাইছেন। ঠাকুর বলছেন, মাইরি বলছি, আমি নিজের ভিতরে আমিটা খুঁজে পাই না। এই আমিত্বকে খুঁজে না পাওয়া, এটাই কর্তাপনের অভাব। আচার্য বলছেন, সাধারণ লোক, যারা মুর্খ এরা হল *কোশকারবদ্*, কোশকার হল গুটিপোকা, যেখান থেকে সিল্ক তৈয়ার হয়, এরা গুটিপোকার মত। আট নম্বর আর নয় নম্বর আবার পরস্পর বিরোধী বক্তব্য। আট নম্বরে বলছেন, আমি করি আর নয় নম্বরে বলছেন, আমি উদাসীন থাকি। সেখান থেকে তৃতীয় একটি শ্লোক, যেটা এই দুটি শ্লোক থেকে আলাদা, কিন্তু আবার দুটিকে জুড়ে দেয়। সেই শ্লোকে কি বলছেন?

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে।।১০।।

(কারণ হে কৌন্তেয়, আমার অধ্যক্ষতা দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। আমি সকলের স্রষ্টা, সত্তা, সাক্ষিস্বরূপে অধিষ্ঠিত বলে এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগৎ বিবিধ রূপে পরিবর্তিত হয়।)

আমি অধ্যক্ষ, আমার অধ্যক্ষতাতে প্রকৃতি সব কিছু করে, আমি কোথাও কিছু করি না। তিনটে শ্লোকে তিন-তিনটে আলাদা আইডিয়া এসে গেল। প্রথমে বললেন, আমি সব করছি, দ্বিতীয় বলছেন, করছি কিন্তু উদাসীন এবং তৃতীয় বলছেন, আমি কিছু করি না, প্রকৃতিই সব কিছু করে। এর ব্যাখ্যা করার আগে একটা অত্যন্ত সাধারণ উদাহরণ দিলে জিনিসটা বোঝা যাবে। অনেকে মনে করতে পারেন, শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতে এত ফিজিক্সের উদাহরণ কেন দেওয়া হয়, এই জন্যই দেওয়া হয়, আমাদের জীবন সবচেয়ে বেশি ফিজিক্সেই চলে, কেমেস্ট্রিতে চলে না, অন্যান্য সাবজেক্ট একেবারেই চলে না।

ট্রান্সফরমার জিনিসটার ব্যাপারে আমরা সবাই ভাল পরিচিত, টিভিতে ট্রান্সফরমার থাকে, টিভি ছাড়াও অন্য অনেক যন্ত্রাদিতেও ট্রান্সফরমার থাকে। আমাদের এলাকাতে যে ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই হয়, এই সাপ্লাই আসে পাড়ার নিকটস্থ কোন ট্রান্সফরমার থেকে। রাস্থার ধারে অনেক জায়গায় আমরা ট্রান্সফরমার দেখতে পাই। ট্রান্সফরমার খুব মজার জিনিস। টেক্সলা ইলেক্ট্রিসিটিতে এসি (Auxiliary current)র আইডিয়া দিয়েছিলেন, একদিকে ছিলেন টেক্সলা আর অন্য দিকে ছিলেন টমাস আলভা এডিসন। এই দুজন বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিরাট ঝগড়া ছিল। এডিসন প্রথমের দিকে পুরো আমেরিকাকে ডিসি কারেন্টে নিয়ে গিয়েছিলেন। কলকাতাতেও আগে ডিসি কারেন্ট ছিল। কিন্তু টেক্সলা বললেন, ডিসি কারেন্টে প্রচুর ইলেক্ট্রিসিটি অপচয় হয়, এসি কারেন্টে করা হলে অনেক সস্তায় ইলেক্ট্রিসিটি পাওয়া যাবে, এটা অবশ্য ফিজিক্সের ব্যাপার। তারপরা নায়াগ্রা ফলস্ থেকে তিনি এটাই করে দেখালেন। বর্তমান কালে সব জায়গায় এসি কারেন্টই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মোটরগুলি এখনও ডিসি কারেন্টের হয়।

এসি কারেন্টে কি হয়, মনে করুন মাইথন ড্যাম থেকে ইলেক্ট্রিসিটি আসছে, এই ইলেক্ট্রিসিটিটা ট্রান্সফর্মারে তারের যে কয়েলিং থাকে সেখানে পঞ্চাশ বার করে আসছে আর পঞ্চাশ বার করে চলে যাচ্ছে। এই আসা আর যাওয়ার ফলে কয়েলিংটা চুম্বকের মত হয়ে যায়। ঠিক তার পাশেই একই রকম আলাদা একটা তার কয়েলিং করে রাখা আছে। এই কয়েলে কারেন্টা আসছে যাচ্ছে এবং চুম্বক হয়ে যাওয়ার ফলে পাশের এই তারের কয়েলিং যেটাতে কোন কারেন্ট আসছে না, যাচ্ছেও না, সেটাও চুম্বক হয়ে যায়। চুম্বক হয়ে যাওয়ার জন্য আর পাশের কয়েলিংএ এই যে কারেন্ট আসা যাওয়া করছে আর এতেই এই কয়েলিংএ ইলেক্ট্রিসিটি তৈরী হয়ে যায়। আমাদের ঘরে

যে কারেন্ট আসছে, এই কারেন্ট আসছে মাইথন ড্যাম থেকে, অথচ মাইথন ড্যাম থেকে সরাসরি আসছে না, কারেন্ট আসছে আমাদের লোকাল ট্রান্সফরমার থেকে। লোকাল ট্রান্সফরমারে ঐ তার আর এই তারের মাঝখানে কোন সংযোগ থাকে না। এই তার আছে বলে পাশের তারে কারেন্ট তৈরী হয়ে যাচ্ছে, এই দুটো তারের কয়েলিংএর মধ্যে আসলে কিন্তু কোন সংযোগ নেই। আমাদের ইউনিভার্সিটি বিল্ডিংএর কোন ফিউজ যদি উড়ে যায়, এখানে কারেন্ট চলে যাবে। তার মানে এই নয় যে মাইথনে কোন সমস্যা হয়েছে। মাইথনে সমস্যা হলে ইউনিভার্সিটির কারেন্টেও সমস্যা হবে। এখানে কোন সমস্যা হলে বলবে লোকাল ফল্ট। আমাদের জীবনের সমস্যাগুলো হল লোকাল ফল্ট, ঈশ্বর এখানে কোথাও কোন কিছুতে জড়িয়ে নেই। কারণ ঈশ্বরের এখানে কোথাও সরাসরি কোন কানেকশান নেই। এটাই হল আসল তত্ত্ব।

ঈশ্বর আর প্রকৃতির আসল কানেকশান কখনও হয় না। রাজযোগে এর খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন, পুরুষ আছে আর প্রকৃতি আছে। প্রকৃতির কাছে পুরুষ এলেই প্রকৃতি নড়ে ওঠে। প্রকৃতি নড়ে উঠলেই সৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। এই সৃষ্টি যেটা হচ্ছে, এর মধ্যে পুরুষ কিন্তু সরাসরি জড়িয়ে নেই। আমরা যে ট্রান্সফরমারের কথা বললাম, পুরুষ আর প্রকৃতির সম্পর্ক ঠিক এই ট্রান্সফরমের মত। কাছে আছে বলে পুরুষের শক্তিটা প্রকৃতির মধ্যে চলে যায়, এর পাল্টা প্রকৃতির ভাবটা পুরুষের মধ্যে চলে আসে। কিন্তু সাংখ্য বা যোগ ঈশ্বরকে ঐ ভাবে মানেন না। কিন্তু আমরা এখানে বেদান্ত পড়ছি, বেদান্ত ঈশ্বরকে মানেন। ঈশ্বরের উপরে প্রকৃতির এই প্রভাবটা পড়ে না। ঈশ্বর আছেন বলে প্রকৃতি চঞ্চল, কিন্তু ঈশ্বর প্রকৃতির সঙ্গে কোথাও জড়িয়ে নেই। জড়িয়ে যদি থাকতেন তাহলে প্রভাবটা পড়ত। আমার ঘরে যে আলো জ্বলছে, এই আলো জ্বলার সাথে মাইথন জড়িয়ে নেই, এর ফিউজ উড়ে গেল কি কারেন্ট চলে গেল তাতে মাইথনের কিছু আসে যায় না।

আমাদের শাস্ত্রে এটাকে বলে অরুন্ধতি ন্যায়। অরুন্ধতি একটা অত্যন্ত ছোট তারা, আলো খুব ক্ষীণ, সরাসরি চোখে পড়ে না। সেইজন্য প্রথমেই অরুন্ধতি তারাকে দেখানো হয় না, প্রথমে ওর ধারে কাছে যে বড় তারাগুলো আছে সেগুলোকে দেখিয়ে বলবেন, ঐ যে তারাটা জ্বলজ্বল করছে, ওটা দেখতে পাচ্ছো, এবার ওর থেকে একটু এগিয়ে ডান দিকে দেখো আরেকটা উজ্জ্বল তারা দেখা যাচ্ছে, এবার ঐ তারার গায়েই দেখ একটা ছোট্ট তারা পিট্‌পিট্‌ করছে; এইভাবে শেষ সূক্ষ্মে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমটা বললেন সাধারণ লোকেদের যে ভাব, সব ঈশ্বরই করেন; সেখান থেকে নিয়ে এলেন ঈশ্বর করেন কিন্তু তিনি উদাসীন, ওখান থেকে নিয়ে এলেন ঈশ্বর কিছু করেন না, তিনি কোথাও কোন কিছুতে নেই। কেন কোন কিছুতে নেই? এটাই স্বভাব, তিনি কোন কিছুতে নেই। এবার আচার্য এটাকে ব্যখ্যা করবেন, কেন তিনি কোথাও কোন কিছুতে নেই।

আচার্য বলছেন, সব দিকে ঈশ্বর হলেন দ্রষ্টামাত্র। দ্রষ্টামাত্র বলতে, তিনি শুধু নাটক দেখে যাচ্ছেন, তা না। দ্রষ্টামাত্র মানে, তিনি সাক্ষী চৈতন্য, সব কিছু থেকে তিনি নির্লিপ্ত। সৃষ্টিতে যা কিছু হয় সব এই ত্রিগুণাত্মিকা, যার মধ্যে সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণ রয়েছে, সেই প্রকৃতিই সব কিছু করে। আচার্য শঙ্কর উপনিষদ, বেদ থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাচ্ছেন, আমাদের বেদ উপনিষদে বারবার এই কথাগুলোই এসেছে। সেইজন্য ভগবান বলছেন, হে কৌন্তেয়, এই যে প্রকৃতি, যে প্রকৃতি সব সময় পরিবর্তিত হচ্ছে, আমি তার অধ্যক্ষ, আমি কিন্তু এর কোন কিছুতে নেই।

যখন আমরা কোন objectivity বলি, তখন তার একটা subject থাকতেই হবে, subject না হলে object হবে না। পাশ্চাত্য দর্শনে লক নামে একজন দার্শনিক ছিলেন তিনি objectivismকে খুব জনপ্রিয় করে দিলেন, বিশেষ করে ফরাসী বিপ্লবের আগে এই মতবাদ খুব মাথা চাড়া দিয়েছিল। এখনও আছে, আমরা যে প্রায়ই materialismএর কথা বলি, এটা হল objectivism। এই মতবাদের মূল বক্তব্য হল, যে জিনিসটাকে আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ

করতে পারছি, সেই জিনিসটাই আমাদের কাছে সত্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের বাইরে কোন কিছু সত্য নেই। তার মানে একটা জঙ্গল আছে, সেখানে কোন দ্রষ্টা নেই, সেই জঙ্গলের গাছ থেকে একটা ফল মাটিতে পড়ল। তাহলে এই যে ফলটা পড়ল, এখন বলতে হবে এই ফলটা পড়ল কি পড়ল না। Objectivism বলবে ফলটা পড়েনি, কারণ দ্রষ্টা বলে কেউ ছিল না। এই objectivism যেটা পরে materialismএ এলো, যেটা Marxismএ গেলো, এই জিনিসটাই পরে গিয়ে প্রচণ্ড বিপজ্জনক হয়ে গেল, যে কারণে বিজ্ঞান অনেক পিছিয়ে গেল। যার জন্য ফিজিক্স গণিতের ইক্যুয়েশান এবং আরও অনেক কিছুকে মানতেন না। পরের দিকে এসে এনারা ধীরে ধীরে এই ধারণা থেকে অনেক পরিবর্তি হয়ে বলা শুরু করলেন, আচ্ছা ঠিক আছে যদি লজিক্যালি চলে তাহলেও সেটাকে মানা যাবে।

Objectivism বলতে চাইছে যদি subject না থাকে, ওটাকে দেখার যদি কেউ না থাকে, তাহলে ওটা সত্য না। এর বিপরীত হল Idealism, তাঁরা বলেন, কেউ না দেখুক, ঈশ্বর তো আছেন। তার মানে দাঁড়ায় একজন দ্রষ্টা না থাকলে বিষয় আসবে না, একজন subject যদি না হয়, object হয় না। আমরা যদি একটা খাওয়ার কথা বলি, রান্না করে একটা খাবার তৈরী করা হল, তার মানে একজন subject আছে, যার জন্য এই খাবারটা রান্না করা হল। যে কোন কাজ যখন হয় তখন সেই কাজে একজন কর্তাকে থাকতেই হবে। কর্তার উদ্দেশ্যে কর্ম করা হয়, শুধু কর্তার ইচ্ছাতে কর্ম হয় না, কর্তার উদ্দেশ্যে। কোন কর্ম যদি হয়ে থাকে, তাহলে সেই কর্মের অবশ্যই একজন কর্তা থাকতে হবে। এখন ঈশ্বরই একমাত্র চৈতন্য।

এখানে আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *এতদর্থম্ ইদং করিষ্যে ইদং জ্ঞাস্যামি ইত্যদ্যা অবগতিনিষ্ঠা অবগত্যাবসানা এব*, সাবজেক্ট মানে তার জ্ঞান হচ্ছে, যে কোন ভোগের বিষয়, ভোগ করতে গিয়ে ভোগের বিষয় সম্বন্ধে অবগত হচ্ছে, তার মানে তার জ্ঞান হচ্ছে। সাবজেক্ট না থাকলে জ্ঞান হবে না। জ্ঞানের বিষয় যদি না হয় তাহলে অবজেক্ট হবে না। কর্তা আর কর্ম, আমরা যে অবজেক্টের কথা বলছি, এই যে পেন আছে বলছি, এর অর্থই হল পেন অবজেক্ট, যেটাকে কর্মের দ্বিতীয়া বলা হয়, আর এর পিছনে একজন কর্তা আছে, যেমন এখানে আমি। যে কোন অবজেক্ট, এই যে দ্বিতীয়ার ভাব, এটা তখনই সম্ভব, যখন ওটা কোন কিছুর জ্ঞানের বিষয় হয়। যার জন্য আমাদের বেদান্তকে Idealism, Realismএ এভাবে ফেলে দেওয়া যায় না।

বেদান্ত পুরো আলাদা, যখন দরকার হয় তখন Objectivismকে পুরোদমে মানছেন। যখনই কোন ক্রিয়া হয়েছে, সংস্কৃতে যেটা দ্বিতীয় বলছেন, যাকে কর্ম বলা হয়, এটা ক্রিয়া নয়, আমরা বাংলায় কর্মকে ক্রিয়া বলি, কিন্তু এখানে কর্ম মানে কারকের দ্বিতীয়া বিভক্তি। এটা তখনই হবে যখন ওটা জ্ঞানের বিষয় হবে, চৈতন্যের বিষয় হবে। চৈতন্য একমাত্র ঈশ্বর। বেদের নাসদীয় সূক্তমে বলছেন, তখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, একমাত্র ভগবান আছেন। আর ভগবান সব কিছু থেকে নির্লিপ্ত, এখানে ভগবান বলছেন আমি ওতে জড়িয়ে নেই, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*। জ্ঞানের বিষয় না হলে, objectivity আসে না। একটা জিনিসের অস্তিত্ব ততক্ষণ হবে না, যতক্ষণ ওটা জ্ঞানের বিষয় না হয়। ঈশ্বরের বাইরে কিছু নেই, সেইজন্য জ্ঞান একমাত্র ঈশ্বরের। আমি, আপনি, আমরা যে কথা বলছি, আমরা তাহলে কি? ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, তুমি মান আর নাই মান তুমি সেই রাম। আমার যে চেতনা, যে চেতনা দিয়ে এই কলমকে আমি জানছি। আসলে এই পেনকে কে জানছেন? একমাত্র ঈশ্বরই জানছেন, আর কেউ জানে না। কারণ সেই ঈশ্বর আমার ভিতরে অন্তর্যামী হয়ে বসে আছেন। আমরা যে বলি ঈশ্বরই জানেন, ঠিকই বলা হয়, একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। কারণ চৈতন্য একমাত্র ঈশ্বরের, ঈশ্বর ছাড়া কারুর চৈতন্য নেই। আমি, আপনি যা কিছু জানছি, এইজন্যই জানছি, কারণ আমরা ঈশ্বরের অংশভূত, আমাদের সবার ভিতরে ঈশ্বরের অংশ রয়েছে। অংশ, পূর্ণ, কলা এগুলো কোন বিষয় না, চৈতন্যই বিষয়, একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া কারুর কোন

চৈতন্য নেই। সেইজন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া কিছু হয় না। কিন্তু ঈশ্বর কোন কিছুতে লিপ্ত নন, যেটা পরিষ্কার করে বলছেন।

এখন বলছেন, সমস্ত ভোগ থেকে ঈশ্বর আলাদা। কারণ এই জগতে যা কিছু হচ্ছে, প্রকৃতির জন্য হচ্ছে, ঈশ্বর এর মধ্যে কোথাও জড়িয়ে নেই। যে কোন ভোগের জন্য দরকার একজন কর্তা। কর্তা হওয়ার জন্য লাগে চেতনা, সেই চেতনা রয়েছে একমাত্র ঈশ্বরের। ঈশ্বরের বাইরে কোন কিছু নেই, সেই ঈশ্বর আবার সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। তাহলে এই সৃষ্টি কেন হল? কি উদ্দেশ্যে হল? সৃষ্টিতে এত দুঃখ কেন, এত বৈষম্য কেন? এরপর এই প্রশ্নগুলি আর হয় না, প্রশ্নগুলি contradictory।

তাহলে objectivism কোথায় গোলমাল করল? কারণ objectivism বলছে, কেউ যদি জঙ্গলে ফলটা পড়তে না দেখে, তাহলে ফলও নেই, গাছও নেই। এটা এনারা ঠিক বলছেন না। এনাদের যেটা বলার দরকার ছিল, এই প্রশ্নটা হয় না। বেদে এই জিনিসটাই বলছেন এবং আচার্যও এটাকে তাঁর ভাষ্যে উল্লেখ করছেন, *কো অদ্ধাবেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টি*, কে জানে কোথা থেকে এই জগৎ এলো, কোন কারণে জগৎ এলো, এটা বলা যাবে না। কেন বলা যাবে না? জগতে এত দুঃখ কষ্ট কেন? জগতে এত বৈষম্য কেন? আসলে এই প্রশ্নগুলির উত্তর হয় না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলছেন, চেঙ্গিস খাঁ এত লোককে মারল, ঈশ্বর কিছু করতে পারলেন না কেন? এই প্রশ্নটাই আসলে হয় না। এই প্রশ্ন কেন হয় না? কারণ ঈশ্বর এই জগতের কোন কিছুতে জড়িয়ে নেই। তাহলে এই ক্রিয়াটা কোথায় যাবে? ক্রিয়াটা কোথাও যাবে না। কারণ, এই প্রশ্নটাই হয় না। কেন প্রশ্ন হয় না? কারণ যে কোন ক্রিয়া যখন হয়, যেখানে দ্বিতীয়ার কর্ম আছে, তার জন্য দরকার একজন কর্তার। কর্তা মানে চৈতন্য, আর বারবার বলছেন চৈতন্য একমাত্র ঈশ্বর। সেই ঈশ্বর বলছেন, তিনি এটা থেকে আলাদা। যেহেতু কোথাও কোন সংযোগ নেই, সেইজন্য এই প্রশ্ন হয় না। এটাকেই অদ্বৈতের খুব একটা উচ্চ অবস্থায় নিয়ে গিয়ে বলবেন, সৃষ্টিই নেই। আমরা ওতে যাচ্ছি না, মাণ্ডুক্যকারিকাতে এই জিনিসটাকে দেখানো হয়েছে, বেদান্তে মাণ্ডুক্যকারিকাকে খুব ভাল চোখে দেখা হয় না। এটাও একটা মত, বেদান্ত যেহেতু সব কিছুকে নিয়ে চলে, এটাও তাই বেদান্তে স্থান পেয়েছে। ঠাকুরও বলছেন শক্তি মানতে হয়, শক্তি মানলে সৃষ্টি নেই, এই কথা বলাটা ঠিক না।

মানুষের মনে যে এত প্রশ্ন, সৃষ্টি কেন হল, জগতে এত দুঃখ কেন, জগতে এত বৈষম্য কেন, সব প্রশ্নের উত্তর আমরা খুব সহজ ভাষায় বলে দিই; আমি জানি না, আমার জানা নেই। কিন্তু ঠিক ঠিক উত্তর হল, এই প্রশ্নগুলিই হয় না। যেমন উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল খেলা শুরু হল, কোন গোল হয়নি, খেলার ফল হল শূন্য শূন্য। কিন্তু বৃষ্টির জন্য ম্যাচ বাতিল হয়ে গেল, খেলা শুরুই করা গেল না। তখন খেলার কি স্কোর হবে? এই প্রশ্নটাই হয় না। বাচ্চা ছেলে কিছু বোঝে না, বারবার জিজ্ঞেস করবে, বলো না কি স্কোর হয়েছে? কি করে বলবে, ম্যাচই তো শুরু হয়নি, স্কোর কোথা থেকে হবে। ম্যাচ যদি শুরু হত, রেফারীর বাঁশি যদি বাজত, তাহলে আমরা বলতে পারতাম খেলার স্কোর শূন্য শূন্য। প্রকৃতি বা জগতের সাথে ঈশ্বরের কোন সংযোগ নেই। ঈশ্বর বাদে কারুর চৈতন্য নেই। চৈতন্য ছাড়া কারকের দ্বিতীয়া কর্ম হয় না। তাহলে কি কাজ হচ্ছে না? কেন হবে না, এই তো আমি পেনটা তুললাম, এই তো কাজ হল, আমি চোখে দিয়ে এটা দেখতে পাচ্ছি। আর আমি দেখতে পাচ্ছি বলে এটা আছে। তাহলে উত্তরটা কি? এই প্রশ্নই হয় না। একবার যদি আমরা বুঝে নিতে পারি যে, ঈশ্বর এগুলোর কোন কিছুর সাথে জড়িয়ে নেই, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাহলে কে চলছে? প্রকৃতি নিজের মত চলছে। আমিও এর জন্য দায়ী নই, আপনিও এর জন্য দায়ী নন।

ডেনিস দা মিনেস নামে একটা কার্টুন বেরোয়, একদিনের একটা কার্টুনে দেখাচ্ছে, ডেনিসের বাচ্চা বন্ধুরা ছিল। ডেনিসের একটা বড় কুকুর ছিল রাফ্। ডেনিস আর ডেনিসের এই কুকুরকে নিয়ে

মজার মজার কার্টুন আছে। পাঁচ বছরের বাচ্চা ডেনিস একদিন বন্ধুদের গিয়ে বলছে, ‘আমি রাফকে এমন ট্রেনিং দিয়েছি, আমি যা ওকে করতে বলি, সঙ্গে সঙ্গে ও আমার আদেশ পালন করে সেটাই করবে’। বাচ্চারা সবাই হাঁ করে শুনছে। রাফ তখন উঠে দাঁড়ালো, সঙ্গে সঙ্গে ডেনিস বলছে ‘গেট আপ্’। রাফ্ একটু পরে চলতে শুরু করছে, ডেনিস বলে দিল, রাফ ‘ওয়াক’। কিছু দূর গিয়ে কুকুরটা বসে পড়ল, ডেনিস বলছেন, ‘রাফ সিট ডাউন’। বন্ধুরা ডেনিসকে বলছে, ‘ও যেটা করার করে দিচ্ছে, তারপর তো তুমি ওকে আদেশ করছ’। ডেনিস বলছে, ‘আমি এত সুন্দর ট্রেনিং দিয়েছি যে, আমার বলার আগেই জেনে যায় আমি কি বলতে যাচ্ছি, আর তাই সে আমি মুখে বলার আগেই ও সেটা করে দেয়’। আমাদের এই হল অবস্থা। প্রকৃতি নিজের মত চলছে। আমরা বোকা, লোকেদের বোকা বানাবার জন্য সমস্ত ক্রিয়ার সাথে জুড়ে রেখে আমরা বলতে থাকি, এটা আমার, ওটা আমার। আরে আমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই। কারণ আমি আত্মা, আত্মার সাথে প্রকৃতির কোন সম্পর্ক হয় না।

এর পরের শ্লোকে গিয়ে টপিকটা পাল্টে যায়। কারণ ভগবানের উদ্দেশ্য নয় সৃষ্টি আর জগতের ব্যাখ্যা করা। গীতার উদ্দেশ্য মানুষকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাওয়া। এই জ্ঞানটা আমাদের দেওয়ার পর ভগবান আবার আমাদের নিয়ে যাবেন মুক্তির পথে।

গীতার সব থেকে কঠিন অংশটা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম। একটা প্রস্তুতি না থাকলে, আগে থেকে শাস্ত্রের কথা কিছু কিছু শোনা না থাকলে, আর অদ্বৈত বেদান্ত সম্বন্ধে একটু যদি আইডিয়া না থাকে, গীতার এই অংশটা বোঝা বা ধারণা করা খুব মুশকিল। শাস্ত্রের সব কিছু তো আর বোঝা যায় না। শাস্ত্র আর বিজ্ঞানে বা ধর্ম আর বিজ্ঞানে এখানেই বড় একটা তফাৎ হয়ে যায়। বিজ্ঞান সব সময় কার্য-কারণ সম্পর্ক নিয়ে চলে, এটা থেকে ওটা, ওটা থেকে সেটা। ফলে অনেক সময় কোন থিয়োরামকে নিয়ে যখন খুব হায়ার লেভেলে যুক্তিতর্ক চলে, তখন সেটা কয়েক পাতা ধরে চলে। গণিতে কিছু কিছু থিয়োরী আছে, যেখানে কয়েক পাতা ধরে যুক্তিতর্ক চলতে থাকবে। সেখান থেকে যদি কেউ একটা দুটো লাইন বাদ দিয়ে দেন, তখন ওর যুক্তিতর্ক fall করে যাবে, আর বিজ্ঞানও এই ধরণের গ্যাপ গ্রহণ করবে না, ওরা সঙ্গে সঙ্গে ওটা নাকচ করে দেবে।

শাস্ত্র পুরো অন্য জিনিস, শাস্ত্র অনন্তের বর্ণনা করেন। অনন্তের বর্ণনা করেন বলে, ওনাদের কথা এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন, এভাবে চলে না। ঠাকুর এটাকে খুব সহজ ভাষায় বলছেন, মিছরির রুটি সোজা করে খাও আর আড় করে খাও সেই মিষ্টিই লাগবে। কথামৃত যেখান থেকেই পড়া হোক, সেই এক। উপনিষদ যেখান থেকেই পড়া হোক, বেদ যেখান থেকেই পড়া হোক, এটার পর এটা পড়তে হবে, প্রথম সূক্ত পড়ে দ্বিতীয় সূক্ত পড়তে হবে, তা না। গীতাতেও ঠিক এটাই, আগে তৃতীয় অধ্যায় পড়তে হবে, তারপর চতুর্থ অধ্যায় পড়তে হবে, কোন সম্পর্ক নেই। যে কোন একটা উপনিষদ যদি আমরা মুখস্ত করি, ঈশোপনিষদ খুব ছোট উপনিষদ, মাত্র আঠারোটি মন্ত্র। এই আঠারোটি মন্ত্রের মধ্যে পুরো হিন্দু ধর্মের দর্শনকে রাখা হয়েছে। যে কোন উপনিষদ ঐ একই কথা বলছে। আর যেখান থেকেই পড়া হোক মিছরি রুটির মত মিষ্টি লাগবে। আরও আশ্চর্যের, যেখান থেকে খুশী একটা বাক্যকে যদি নেওয়া হয়, ঐ একটা বাক্য থেকে পুরো একটা বিশাল গ্রন্থ বেরিয়ে আসবে। এটাই শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য।

ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, বায়োলজি থেকে যে কোন একটা জিনিসকে টেনে একটা বই বার করা যায় না। ওনারা ধাপে ধাপে উপরে নিয়ে যান। ধর্ম এভাবে চলে না। যতটুকু জানা যাবে, ততটুকু লাভ। বিজ্ঞানে এভাবে হবে না, বিজ্ঞানে আমাদের পুরোটাকে জানতে হবে। আর ধর্মের কথা যেভাবেই বলা হোক, যেখানেই বলা হোক, যত ভাবেই বলা হোক, উদ্দেশ্য একটাই, আমাদের মহৎ বানানো। যত ধর্মে যত শাস্ত্র আছে, সবারই এই এক উদ্দেশ্য। অনেক সময় লোকেরা ভুলবশতঃ

বলে, ধর্ম মানুষের মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে দেয়। ভয় কেন ঢোকাবে, ওটা তো আমাদের স্বরূপ। অন্যান্য ধর্মে বলে, তুমি ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের কথা যদি না শোনা হয় তিনি শাস্তি দেবেন। তিনি শাস্তি দিতেই পারেন, কারণ তিনি আমাদের পিতা, তিনি আমাদের রাজা, শাস্তি দিতেই পারেন। যে কোন শাস্ত্রের লক্ষ্য হল, আমাদের চৈতন্যকে জাগ্রত করে জানিয়ে দেওয়া –তুমি নিজেকে সীমিত করে রেখেছ, নিজেকে অসীমে বিস্তার করে তুমিও অসীম হয়ে যাও।

এই জগতে যদি তুমি নিজেকে দেখতে চাও, you are great, তাহলে তোমাকে খুব ভাল করে বুঝে নিতে হবে যে; এখন তুমি নিজেকে যা ভাবছ, তুমি কিন্তু তারও উপরে; এখন তুমি যেখানে পৌঁছেছ তুমি তারও উপরে। শাস্ত্রের আলোচনা শুনে যদি নিজের না মনে হয়, আমি আগের থেকে বড় হয়ে গেছি, অহঙ্কারবশতঃ না, উপলব্ধিতে; আমার মন আগের থেকে অনেক কেন্দ্রিত হয়ে গেছে, আমার হৃদয় আরও প্রসারিত হয়ে গেছে; তাহলে বুঝতে হবে আমার শাস্ত্র আলোচনা শোনার মধ্যে কোথাও গোলমাল আছে। বিদেশে যাওয়ার আগে স্বামীজী তাঁর গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে বলছেন, হরি ভাই আমি ধর্মটর্ম বুঝি না, কিন্তু আমি বুঝছি আমার হৃদয় বিরাট হয়ে গেছে। সবাইকে স্বামীজী নিতে পারছেন। ধর্ম এটাই করে আমাদের মহাপুরুষ বানিয়ে দেয়। আমাদের উপলব্ধি বাড়বে, যদি উপলব্ধি না বাড়ে, তাহলে বুঝতে হবে কিছু একটা গোলমাল আছে তার। কারণ ধর্ম মনের শক্তি বাড়ায়, মনের শক্তি বাড়লে উপলব্ধি বাড়বে। কাজ করার ক্ষমতা বেড়ে যাবে, কাজের গতি বাড়বে, কাজের গুণগত মান বাড়বে; শাস্ত্রের এটাই কাজ।

শাস্ত্র অন্য জগৎ নিয়ে বলে না। আমাদের যে মন, আমাদের যে হৃদয়, সেখানে যে নানা রকমের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, বন্ধন রয়েছে; ধর্ম এগুলোকে সরিয়ে দেয়। ফলে সংসারে আমাদের ক্ষমতা বেড়ে যাবে, সহ্যশক্তি বেড়ে যাবে। সহ্যশক্তি বাড়লে, রাগ, ক্রোধ, হিংসা এই ভাবগুলি কমে যাবে। ফলে মানুষের চেহারাটাই অন্য রকম হয়ে যাবে, চেহারের মধ্যে একটা কোমল ভাব, মাধুর্য আসবে। এগুলোর প্রকাশ যদি না দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে ধর্ম আমাদের ভিতর প্রবেশ করেনি। শাস্ত্রের প্রত্যেকটি কথা মোক্ষম ওষুধ, এগুলো অক্ষয় বীজ, পাথরে পড়লেও এই বীজ থেকে গাছ হবে, ঐ বৃক্ষই কালে একদিন অমরত্বের ফল দেবে। জীবনে লাগানোর কোন দরকারই নেই, নিজ থেকেই জীবনে লেগে যাবে। ঠাকুর বলছেন, অমৃত জেনে খাও, আর না জেনে খাও, অমর হবেই। শাস্ত্র আপনি জীবনে লাগান আর নাই লাগান, ফল দেবেই। শুধু দেখতে হয় শাস্ত্রের কথা আমার মধ্যে ঢুকছে কিনা। শাস্ত্র ঢোকে, কিন্তু আমাদের ভিতরে স্বার্থপরতা এত বেশি, এত বেশি আমরা আত্মকেন্দ্রিক যে, শাস্ত্র যখন শুনছি বা পড়ছি তখন শাস্ত্র আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে না। তাই বলে এই পড়া বা শোনা নিষ্ফল হয়ে যাবে না, পড়া বা শোনা চালিয়ে যেতে যাবে, অনেক দিন যাবৎ চালিয়ে যেতে হবে। শাস্ত্রের সাথে লেগে থাকতে থাকতে আলাদা একটা সংস্কার তৈরী হবে। আর এইভাবে চলতে চলতে একদিন হঠাৎ শাস্ত্রের কথা, শাস্ত্রের মর্ম হৃদয়ে ঢুকে যাবে।

কথামৃতে ঠাকুর খুব সুন্দর একটা গল্প বলছেন। এক ভাগবতের পণ্ডিত রাজাকে রোজ ভাগবত শোনাতে আসেন। পণ্ডিত থেকে থেকে বলেন, 'রাজা মশাই বুঝেছেন'? রাজাও রোজ বলে, 'আগে আপনি বুঝুন'। পণ্ডিত রোজ বাড়িতে এসে ভাবে, রাজা কেন রোজ বলে, আগে আপনি বুঝুন? একদিন পণ্ডিতের চেতনা জেগে গেছে। সে এখন আর রাজার কাছে যায় না। রাজা লোক পাঠিয়েছে। রাজার লোক এসে দেখে পণ্ডিত ভাগবত খুলে বসে এক মনে পড়ছেন আর দুই গাল বেয়ে চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে আসছে। পণ্ডিত রাজার লোককে বলে দিলেন, 'রাজাকে বলে দেবেন, আমি বুঝেছি'।

এটা হবেই। পরের অধ্যায়েই ভগবান বলবেন, *ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি*। শাস্ত্রকে যে ধরে রেখেছে, ঝোপঝাড়ে যেমন গাছপালা লতার মত ছড়িয়ে যায়, এটা অমর বীজ, ছড়াবেই। তবে সময়

লাগে, শাস্ত্রের কথাকে ভিতরে একটু প্রবেশ করতে দিতে হবে। কিন্তু আমাদের সমস্যা হল আমাদের ইচ্ছাশক্তির জায়গায় অনিচ্ছা শক্তিটা খুব বেশি জোরালো। আমাদের কিছু করতে হবে না, তবে জপধ্যান, তপস্যা করলে তাড়াতাড়ি হবে। যদি না করা হয়, একটু পরে হবে, কিন্তু হতে বাধ্য। এই জন্মে হয়ত হবে না, দশ জন্ম পরে হবে, কিন্তু হতে বাধ্য। কারণ *ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি*, আমার ভক্তের কখনই নাশ হয় না।

ভগবান বিভিন্ন ভাবে এত কথা আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য বলছেন না, এগুলো একেবারে বাস্তব কথা। শাস্ত্রের উদ্দেশ্য একটাই, আমরা যেন মহাপুরুষ হই, মহান থেকেও মহান যেন হই, এতটাই যেন বড় হয়ে যেতে পারি, এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তার যে মা প্রকৃতি, আমাদের কাছে খড়কুটো মনে হবে। এখন এই জগৎকে আমাদের কত বিশাল মনে হচ্ছে, জগতের কাছে নিজেকে কত সাধারণ মনে হয়। আমাদের অনেকে লেখেন, 'আমি একজন সাধারণ গৃহবধূ', কিসের সাধারণ আপনি, রানী লক্ষ্মীবাঈ একজন সাধারণ গৃহবধূ, অহল্যাবাঈ একজন সাধারণ গৃহবধূ, শ্রীশ্রীমা একজন সাধারণ গৃহবধূ, গার্গী, মৈত্রী সবাই গৃহবধূ, দেখুন তাঁরা কিভাবে নিজেকে কোথায় নিয়ে গেলেন। গৃহবধূ বলে প্রাণীর কোন আলাদা শ্রেনী নেই, হয়ও না। আর সাধারণ বলে কোন প্রাণীই হয় না, বিশেষ করে মানুষ, মানুষ কখনই সাধারণ হতে পারে না। কারণ তার মধ্যে দেবত্বের প্রকাশ এসে গেছে।

শাস্ত্রের কি উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে আমরা খুব সহজ ভাবে বলে দিই, শাস্ত্রের উদ্দেশ্য মুক্তি। কিন্তু মুক্তি না, এই জগৎ, এর পরের জগৎ এবং এই দুটো জগতের পারে – এই জগতের জন্য অর্থ আর কাম, এর সমৃদ্ধি হতে বাধ্য, কেউ যদি না চায় সেটা আলাদা। পরের জগৎ, অর্থাৎ স্বর্গের যে ভোগ, আসতে বাধ্য। আর তৃতীয় মুক্তি। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটে পুরুষার্থ শাস্ত্র দেবেই দেবে, কেবলমাত্র শাস্ত্রকে ধরে রাখতে হবে। যে শাস্ত্রকে ধরে রাখতে পারবে তার এই চারটেই আসতে বাধ্য। ভগবান গীতাতে অর্জুনের মাধ্যমে আমাদের উপদেশ দিতে গিয়ে বারবার শুধু এই জিনিসটাকে আমাদের কাছে পরিষ্কার করে দিচ্ছেন।

আমরা আগেও অনেকবার আলোচনা করেছি, যে কোন দর্শনকে জীব, জগৎ আর ঈশ্বর, এই তিনটের ব্যাখ্যা করতে হয়। বেদান্ত দর্শন ঈশ্বরের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরও দুটো জিনিস নিয়ে আসেন, যদিও ঈশ্বর হলেই হয়ে যায়, কিন্তু বেদান্ত ব্রহ্মকে নিয়ে আসেন, ব্রহ্ম আর ঈশ্বরে একটা বিরাট তফাৎ, আর দ্বিতীয় মায়া, এই দুটো – ব্রহ্ম আর মায়া। বেদান্ত দর্শন মানেই, জীব থাকবে, জগৎ থাকবে আর তার সাথে ঈশ্বরের তিনটে রূপ এসে যায় – ব্রহ্ম, মায়া এবং ঈশ্বর। বেদান্ত এবং বেদান্তের যত শাখা প্রশাখা আছে, সবাই এই তিনটে এবং তার সাথে জীব ও জগতের ব্যাখ্যা করেন। নবম অধ্যায়ের প্রথম দশটি শ্লোকে ব্রহ্ম কি, মায়া কি, ঈশ্বর কি, ভগবান সব বলে দিলেন। কিন্তু এগুলো তো কোন শুষ্ক আলোচনা না, উদ্দেশ্য আমাদের মহৎ করা। আমরা যে নিজেদের সঙ্কুচিত করে রেখেছি, নিজেদের ছোট মনে করছি, এই জিনিসটাকে ভগবান আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন। তোমাকে কিছু করতে হবে না, তুমি ছোট নও, জোর করে তুমি নিজেকে ছোট বলে মনে করছ। এই জিনিসটাকে দেখানোর জন্য আমাদের পুরাণাদিতে কত কাহিনী ছড়িয়ে আছে। আমরা আসলে মনে করছি, আমি এই রকম; কিন্তু তা তো নয়, আসলে জিনিসটা পুরো উল্টো। জগতের পিছনে দৌড়ানটা আগে বন্ধ করতে হয়। তাহলে কি ঈশ্বরের পিছনে দৌড়াতে হবে? একেবারেই না, কারণ আমরা তো ঈশ্বরের সাথে এক, কেন দৌড়াতে যাব!

ঠাকুর একবার নরেনাদি ছোকড়াদের দেখিয়ে খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন, এই যে এদের দেখছ, এদের কিচ্ছু করার দরকার নেই; এদের শুধু জানতে হবে, এরা কে, আমি কে আর এদের আমার সাথে কি সম্পর্ক। আমাদের কিছু করার দরকার নেই, শুধু এই তিনটে করলেই হবে, আমি

কে, ঠাকুর বা শ্রীকৃষ্ণ বা শিব কে, আমার সাথে ওনার কি সম্পর্ক। এটাই সাধনা, এর বাইরে আর কিছু নেই। যত জপ হয়, যত ধ্যান হয়, যত তপস্যা হয়, যত যজ্ঞ হয়, যত শাস্ত্র শ্রবণ পঠন হয় শুধু এই কটি জিনিসকে জানার জন্য – আমি কে, তিনি কে, আমার সাথে তাঁর কি সম্পর্ক।

তাহলে এত শাস্ত্র শোনার কি দরকার? এর উত্তরও ভগবান পরের অধ্যায়ে দেবেন, *কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ*। জীবনে যদি কোন মানুষ কাউকে ভালবেসে থাকে, বাবাকে, মাকে, যে কোন ব্যক্তিকে, তখন সে তার ব্যাপারে অনেক কিছু জানতে চাইবে। সে হয়ত তার মাকে খুব ভালবাসে। কদাচিৎ কোন ভাবে মায়ের কোন বাল্যবন্ধুর সাথে তার দেখা হয়ে গেল, তখন সে তার কাছে জানতে চাইবে, আমার মা ছোটবেলা কেমন ছিলেন, কি করতেন একটু বলুন তো। যাকে মানুষ ভালবাসে তার ব্যাপারে মানুষ আরও জানতে চায়, স্মৃতি রূপে কত কিছু রেখে দিতে চায়, এটাই স্বাভাবিক। সমস্যা হল, ভালবাসাতে মানুষ চাহিদা দিয়ে ভরিয়ে দেয়, আমার এটা চাই, সেটা চাই, সব সময় চাওয়াতেই লেগে থাকে। সত্যিকারের ভালবাসায়, মানুষ তাকে ছোট ছোট জিনিস দিতে চায়। আমরা তীর্থে গিয়ে তাই করি, যাঁকে ভালবাসছি স্মৃতি রূপে তীর্থ থেকে তাঁর জন্য একটা কিছু নিয়ে আসি। ওটাতে তার কোন পূণ্য হচ্ছে না, শুধু স্মৃতি, শুধু তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়াবে। যদি কোন সময় মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে তখন ঐ স্মৃতির দিকে তাকালে মনটা আবার উপরের দিকে উঠে যাবে। মনকে উপরে রাখতে হয়, কিন্তু আমরা জোর করে মনকে নীচে নামিয়ে রাখি। অনেক আলোচনায় আমরা অনেকবার এই কথাগুলো বলেছি। তবে কি, এই জিনিসগুলিকে ধারণা করার জন্য সূক্ষ্ম মন, সূক্ষ্ম বুদ্ধি লাগে। কারণ ভগবানের মায়া এমনই যে, আমরা ঐ মায়ার মধ্যে হারিয়ে যাই।

আচার্য কি সুন্দর বলছেন, *এবং মাং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্বজন্তুনাম্ আত্মানম্ অপি সন্তম্*, গীতার মত শাস্ত্র, তার ব্যাখ্যা করছেন আচার্য শঙ্করের মত একজন শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক। আজকেই ভারত মহাকাশে একটা উপগ্রহ পাঠিয়েছে, সেই উপগ্রহে একটা গীতা রেখে দেওয়া হয়েছে, মহাকাশে চিরদিনের জন্য গীতা থেকে যাবে। সেই গীতার কথা বলতে গিয়ে আচার্য বলছেন, ভগবান নিজে বলছেন, কী আশ্চর্য! এটাকেই আচার্য খুব সুন্দর করে বলছেন – হে অর্জুন আমি হলাম নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব।

নিত্য, যদি কেউ জিজ্ঞেস করে ঈশ্বর কি, শ্রীকৃষ্ণ কি, ঠাকুর কি, তার উত্তর হবে, তিনি নিত্য, সব সময় আছেন। এই নয় যে, তিনি কামারপুকুরে জন্ম নিলেন, তারপরেই তিনি ছিলেন, তার আগে ছিলেন না; না, চিরদিনই তিনি আছেন। যিনি ভগবান, তিনি নরদেহ ধারণ করে কিছু লীলা করে আবার যেমনটি ছিলেন তেমনটি হয়ে যান। *শুদ্ধ*, ভগবানের জন্ম শুদ্ধ, ভগবানের কর্ম কখনই অশুদ্ধ হয় না। সেইজন্য ভগবান বিভিন্ন বর্ণে এসে জন্ম গ্রহণ করেন, এবার যেমন ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিলেন আবার ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সব বর্ণেই তিনি জন্ম নেন। পশুপাখী, সাপ বিছে সব যোনিতেই তিনি জন্ম নেন। জাতক কথাতে আরও বেশি করে এগুলো দেখানো হয়েছে। যোনি কখন অশুদ্ধ হয় না, সবটাই ভগবানের কিনা। *বুদ্ধ*, তাঁর জ্ঞান কখন মলিন হয় না। আর *মুক্ত*, কেউ তাঁকে কোন ভাবেই বাঁধতে পারে না। কামিনী-কাঞ্চন, নাম-যশ কোন কিছুই তাঁকে বাঁধতে পারে না। এই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত এটা তাঁর স্বভাব, নিজের ভাব। এই ভাব তাঁকে আনতে হয় না।

কিন্তু তারপরেই আচার্য বলছেন, *সর্বজন্তুনাম্ আত্মানম্ অপি সন্তম্*, সমস্ত প্রাণীর আমি আত্মা। আমার আপনার সবার আত্মা তিনি। আত্মা মানে, সার, আপনি আমি আসল যেটা। আমরা আসলে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। ভগবান উপরে বৈকুণ্ঠে বা স্বর্গে কোথাও বসে আছেন, আর তিনি সেখানে বসে বসে আমাদের আদেশ করে যাচ্ছেন, ভগবান তা নন। ঈশ্বর আমার আপনার সবার আত্মা, আসলে আমি এটাই, এটাই আমার স্বরূপ। পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়ে এই যে আমি নানা রকমের আজেবাজে

কাজ করছি, এর সঙ্গে খ্যাঁটাখেটি, ওর সাথে মারামারি, এগুলো আমার স্বভাব না। আমি হলাম নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব।

আমি যে জিনিসটাকে নিয়ে আছি, যে জিনিসটাকে নিয়ে ভাবছি, যেটাকে নিয়ে আনন্দ করছি, এটাকে আমি নিজের উপর আরোপ করছি; এই জিনিসটাকে বোঝানর জন্য যত শাস্ত্র, এটাকে বোঝার জন্য যত তপস্যা, যত প্রার্থনা, যত দান-ধ্যান করা। ভগবান বলছেন, কি আশ্চর্য, এই হল আমার স্বরূপ, তার উপর আমি সবারই আত্মা, শুধু মানুষের না, *সর্বজন্তুনাম্*, যত কুকুর, বেড়াল, সাপ, বিছে, পিঁপড়ে, মশা, মাছি, এমনকি করোনার ভাইরাস, যত প্রাণী আছে, সবার আত্মা তিনি। কিন্তু একমাত্র মানুষ চেষ্টা করলে আমার এই স্বরূপ, আমার এই স্বভাবকে বুঝতে পারে, বাকি প্রাণীরা বুঝতে পারে না। সেইজন্য মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয়। কিন্তু তাও মানুষ আমাকে বুঝতে পারে না। কেন বুঝতে পারে না?

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।।১১।।

(আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব এবং সবার অন্তরাত্মা হলেও মনুষ্যদেহ আশ্রয়পূর্বক ব্যবহার করি বলে মূঢ়গণ আমার (আকাশকল্প) পরমাত্মতত্ত্ব না জেনে আমাকে অবজ্ঞা করে।)

মূঢ় মানে যাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান আচ্ছাদিত হয়ে আছে। *অবজানন্তি*, আচার্য এর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, *অবজ্ঞাং পরিভবং কুর্বন্তি*, মানুষ আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে), অবতারকে, শ্রীরামকৃষ্ণকে তুচ্ছ মনে করে। কে মনে করে? আমরা সবাই, আমরা মুখে বলি ঠাকুর অবতার। যিনি আমার ইষ্ট, তিনি যিনিই হোন, আমার কি এই চেতনা সব সময় থাকছে যে, তিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব? আর তিনি যে আমার আত্মা, তার মানে তিনি আমার নিজের স্বরূপ এই বোধটা কি আছে? এই বোধ যদি না থাকে, তখন আমরা তাঁকে মানুষ রূপেই মনে করি। যাঁরা বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ একজন বড় সাধু ছিলেন, ঠাকুরকে তাঁরা মানুষ রূপে দেখছেন। তাঁরা বুঝতে পারছেন না, চিনতে পারছেন না। ভগবান বলছেন, আমি হলাম যত যা কিছু আছে, সব কিছুর আমি ঈশ্বর, আমি সব কিছুর নিয়ন্তা, আর সমস্ত প্রাণীর ঈশন আমি করি। আচার্য ঈশ্বর শব্দকে এভাবেই ব্যাখ্যা করছেন, ঈশ্বর মানে যিনি সবারই ভিতরে আছেন, সেখান থেকে তিনি তার নিয়ন্ত্রণ করেন। তার সাথে বলছেন, আমি সব জায়গায়, সর্বত্র ব্যপ্ত, আকাশের মত সূক্ষ্ম। কিন্তু এই পরম তত্ত্বকে মানুষ জানে না বলে, মানুষ আমাকে সম্মান করে না। আমরা কথায় কথায় অপরকে বলি, You don't respect me, তুমি আমায় সম্মান করো না। আমরাও ভগবানকে সম্মান করি না, অবজ্ঞা করি, অনাদর করি; কারণ শ্রীকৃষ্ণকে, ঠাকুরকে বা যে কোন অবতারকে আমরা বুঝতে পারি না।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্, সমস্ত জীবের আমি মহেশ্বর। গীতাতে অবতার রূপে ভগবান, এই জিনিসটা বারবার ঘুরে ঘুরে আসবে। বেদের নাসদীয় সূক্তে বলছেন, প্রথমে কি ছিল এটাকে কেউ ধারণা করতে পারবে না, কারণ তখন তো কেউ ছিল না। কিন্তু তিনি যখন মায়াকে আশ্রয় করেন, তখন কবি, মণীষী, যাঁরা শুদ্ধ হৃদয়ের, তাঁরা নিজেদের হৃদয়ে তাঁকে দেখতে পান। কিন্তু আমাদের বুদ্ধি অনেক বেশি স্থূল, সেইজন্য তিনি অবতার রূপে যখন আসেন, তখন তাঁকে সহজে ধরা যায়।

ভগবান এখানে তিনটে স্তরে চলছেন – নির্গুণ নিরাকার, সগুণ সাকার এবং অবতার। নির্গুণ নিরাকারকে কেউ জানতে পারে না, নির্গুণ নিরাকারের সাথে এক হওয়া যায়, কিন্তু জানা যায় না। যাঁরা খুব উচ্চমানের ঋষি একমাত্র তাঁরা সগুণ সাকারকে শুদ্ধ হৃদয়ে দেখেন। ঠাকুরের কথা শুনে আমরাও মুখে বলি, ঈশ্বরদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য। মধ্যপ্রদেশের দুজন ভক্ত দেখা করতে এসে

কথায় কথায় বলছেন, যতই হোক আমরা তো ঠাকুরের ভক্ত। আমি হেসে বললাম, আপনি কি ঈশ্বরকে ভক্তি করবেন, আপনার পক্ষে কি সম্ভব ঈশ্বরকে ভক্তি করা! ঈশ্বরকে ভক্তি করতে পারেন বিশ্বামিত্র, ঈশ্বরকে ভক্তি করতে পারেন বশিষ্ঠ। বেদের মন্ত্রগুলি, সূক্তগুলি পড়ে অনুধ্যান করলে বোঝা যায়, কত উচ্চমানের ঋষি হলে গিয়ে তবেই এই ধরণের কথা তাঁদের মুখ থেকে বেরোতে পারে। অবতারের নীচে আচার্য, আচার্যের ঠিক নীচে ঐ স্তরের মানুষ ওনারা। আমরা শুধু পারি অবতারকে ভালবাসতে, ভক্তি করতে। অবতার যখন জ্ঞান ভক্তি শেখাতে আসেন, তখনই আমরা তাঁকে একটু ধরতে পারি। কিন্তু সাধারণ মানুষ এটাও ধরতে পারে না। আচার্য এটাই বলছেন, *ততঃ চ তস্য মম অবজ্ঞানভাবনেন আহতা বরাকাঃ তে, বরাকাঃ* শব্দের অর্থ সাধারণ জীব, যারা এই জন্মাচ্ছে, এই মরছে, আবার এই জন্মাচ্ছে। এই মানব জন্ম পেয়ে যদি কেউ অবতার তত্ত্বের দিকে মন না দিয়ে থাকে, তার জন্ম নিলেও যা, জন্ম না নিলেও তাই।

প্রায়ই লোকেরা বলে, গরীব লোকেরা খেতে পাচ্ছে না, চিকিৎসা পাচ্ছে না, আর তোমরা মন্দির তৈরী করছ। গরীবদের ঢাল করে মানুষ অনেক বড় বড় কথা বলতে পারে, বড় বড় কাজ করতে পারে। আমার ক্রতু বইতে আমি এটাকে বিদ্রুপ করে লিখেছি। সেখানে বলা হয়েছে, গরীব লোক না থাকলে সাহিত্য কোথা থেকে সৃষ্টি হবে, এনজিওগুলি কিভাবে চলবে, অর্থনীতিবিদরা কোথা থেকে থিয়োরী দেবে, রাজনীতির নেতারা কার কাছে ভোট চাইবে, গরীবরা আছে বলে তাই এত কিছু চলছে। বিবর্তনের মাধ্যমে আমরা মানুষ হয়েছি, আর এরা আমাদের টেনে আবার পশুস্তরে নামিয়ে দিতে চাইছেন, যেখানে আহার, নিদ্রা, মৈথুন ছাড়া কিছু থাকবে না। যত লিবারেল আছে, এদের জিজ্ঞেস করুন তোমাদের ফিলজফি কি, সবার ফিলজফি আহার, নিদ্রা, মৈথুনে গিয়ে শেষ হয়ে যায়। তাহলে মানুষ হলে কেন ভাই, পশু হলেই তো সব পেয়ে যেতে। লেখাপড়া করা লোকেরা কি করে এই ধরণের কথা বলে, বিশেষ করে ভারতবর্ষের মত দেশে, অবাক লাগে। এই মানুষগুলো যারা বুঝতে পারে না, ঠাকুর কে, ঠাকুর কি, শ্রীকৃষ্ণ কে শ্রীকৃষ্ণ কি, বেদ কি, এরা সবাই হল –

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ।।১২।।

(বৃথাশা বিফলকর্মা ও নিষ্ফলজ্ঞান অবিবেকিগণ স্বাত্মভূত আমাকে অবজ্ঞা করার জন্য তামসী ও রাজসী মোহিনী (দেহাত্মবুদ্ধিকরী) প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে।)

দেখাচ্ছেন কিভাবে মানুষের জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যায়, জীবনটা কিভাবে বৃথা চলে যায়। *মোঘ* মানে বৃথা, কোন জিনিস বেকার হয়ে যাওয়া, বিফলে চলে যাওয়া। *মোঘং পার্থ স জীবতি*, আগেও গীতাতে আমরা এই মোঘ শব্দ পেয়েছি। *মোঘাশা*, তোমার যত আশা সব বেকার। আমি যেখানে পড়াশোনা করেছি, সেখানে যাদের সাথে আমার বন্ধুত্ব তৈরী হয়েছিল, তাদের বেশির ভাগই আজ জীবনে একটা খুব উচ্চ পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিরাট বড়লোক হয়েছেন। *মোঘাশা মোঘকর্মাণো* এই শ্লোকটা আজ যখন মাথায় ঘুরছিল, তখন আমার সেই পুরানো বন্ধুদের কথা মনে হচ্ছিল। আমার বাল্যবন্ধু, কলেজের বন্ধুরা যাঁরা বড়লোক হয়েছেন, তাঁরা যদি একবার দাঁড়িয়ে ফেলে আসা দিনগুলি আর সামনে পড়ে থাকা বাকি জীবনটার দিকে তাকান, কি পেলাম, কি হারালাম, আর কি পেতে পারি, তখন তাঁদের এই বোধটা কি হবে, জীবনে কিছুই পেলাম না?

পাওয়া মানে হয়, সারাটা জীবন আপনি যেটা পেতে চান। একটা ভাল স্বচ্ছল ঘর-সংসার করলাম, একজন মহিলা ভাল একজন স্বামী পেল, একজন পুরুষ ভাল একজন স্ত্রী পেল, সেখান থেকে ওদের মধ্যে যে গাঢ় সম্পর্ক তৈরী হবে, এটাকে নিয়েই কি সারা জীবন চালাতে হবে? কোন মতেই না। সারাটা জীবন শুধু টাকার পিছনেই দৌড়াতে থাকবে? একটা বয়সের পর আর পারবে না। ইয়ংরা এসে তাকে ছিটকে ফেলে দিয়ে এগিয়ে যাবে, দ্বিতীয় কথা দরকারও থাকে না। মৃত্যুর

সময়, যখন তাকে আইসিসিইউতে ঢোকাতে যাচ্ছে, যদি তার চেতনা থাকে তখনও কি সে ভাববে এখনও আমার কামিনী-কাঞ্চন চাই, আমার এখনও নাম-যশ চাই, আমার প্রমোশনটা চাই? কোন মতেই না। যারা ঘোর সংসারী তারাও এতটা বাজে ভাববে না। কিন্তু স্কুল জীবনে ও কলেজ জীবনে কেউ সন্তানের জন্য দৌড়াবে না। কিন্তু বয়সের সাথে সাথে একটার পর একটা বিষয় আসতে থাকে, goal setting পাল্টাতে থাকে। পরীক্ষায় পাশ, ভাল চাকরি, ভাল স্ত্রী, ভাল সন্তান, অনবরত লক্ষ্য পাল্টাতে থাকে। ষাট পয়ষট্টি বয়স হয়ে গেলে কি গোল থাকবে? ভগবান জানেন।

সন্ন্যাসী বা ঈশ্বরের ভক্ত যিনি, তাঁর প্রথম লক্ষ্য ঈশ্বরে ভক্তি। দশ বছর পরেও এক লক্ষ্য, ঈশ্বরে ভক্তি। চল্লিশ বছর পরে – ঈশ্বরে ভক্তি। আইসিসিইউতে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখনও – ঈশ্বরে ভক্তি। শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছে – ঈশ্বরে ভক্তি। একটাই মাত্র লক্ষ্য সারা জীবনব্যাপী। আমাদের এক মহারাজ, এমন কিছু শাস্ত্রের বড় পণ্ডিত নন, বয়স হয়েছিল। উনি একদিন নিজের একটা গল্প বলছিলেন। ওনার এক বাল্যবন্ধু বড় হয়ে একজন বড় ডাক্তার হয়েছেন। বেলুড় মঠে কিভাবে এসেছিলেন, মহারাজের সাথে দেখা হয়েছে। ডাক্তার বন্ধু মহারাজকে মজা করে বলছেন, 'ভাই আমি তো ডাক্তার হলাম, এতো লোকের সেবা করলাম। তুমি যে সব ছেড়ে এত দিন ঠাকুরের কাছে আছো, এত দিনে তোমার কি উপলব্ধি হল'? উপলব্ধি বলতে লোকেরা মনে করে ঈশ্বরজ্ঞান, ঈশ্বরদর্শন ইত্যাদি। আমাদের এই মহারাজ তাঁর বাল্যবন্ধুকে, যিনি একজন বড় ডাক্তার হয়েছেন, খুব সুন্দর উত্তর দিলেন। বলছেন, 'ভাই, তোমার মত তো আমার উপলব্ধি নেই, কিন্তু তুমি যেভাবে নিজের সন্তানকে গভীর ভাবে ভালবাস, এই বয়সে এসে আমি ঠাকুরকে সেভাবেই ভালবাসি, আমার এতদিনের সাধনার ফল এটাই'।

কয়েক বছর আগে বেলুড় মঠে ডাইনিং হলে বসে এই কথোপকথনটা শুনেছিলাম। খেতে খেতে মহারাজের কথাটা শুনেই আমি চমকে উঠেছিলাম। My God! This is the answer। প্রত্যেক কয়েক বছর পর পর যদি আমাদের জীবনের লক্ষ্য পাল্টাতে হয়, তাহলে বুঝতে হবে মন আমার এখনও চঞ্চল। হিমালয়ে আমরা বেড়াতে যাই। এক বছর নৈনিতাল, পরের বছর মুসৌরী, তার পরের বছর হিমাচল, প্রত্যেক বছর আমাদের জায়গা পাল্টাতে হচ্ছে, এক জায়গায় আমরা যেতে পারছি না, এটাই তো চঞ্চল মনের লক্ষণ। যাঁরা বড় বড় ডাক্তার, বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার, বড় বড় বিজ্ঞানী, আইএএস, আইপিএস, যে নামই দেওয়া হোক, কেউই একটা জিনিসকে নিয়ে থাকতে পারছেন না। সাধু, সন্ন্যাসী, ঈশ্বরের ভক্ত, তাঁরা একটি জিনিসকে নিয়েই চলছেন।

তার মানে যখন ক্লাশ নাইন টেনে পড়ত, তখন তার উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া যাবে। এই যে আশা, আজকে ওই আশা করাটা বেকার হয়ে গেছে, *মোঘাশা*; সে যত রকমের আশা করছে, সবটাই ব্যর্থ। সংসারে যা কিছু করছে সব বেকার, একটু ভাল করে ভেবে দেখ। একটা জিনিসকে নিয়ে চল। সেইজন্য তো আমাদের ঋষিরা আমাদের জন্য নিয়ে এলেন – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ; বর্তমান কালের জন্য আমি বলি, বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগ। এর যে কোন একটাকে ধর, সেটাকে নিয়ে সমগ্র জীবনটা চালাও। সেটাও তোমার দ্বারা হচ্ছে না, সবটাই তাই *মোঘাশা*।

মোঘকর্মাণো, যত কাজকর্ম করছ সবটাই বেকার, নিষ্ফল হচ্ছে। তুমি বুঝতেও পারছ না যে, তুমি ভস্মে ঘি ঢেলে যাচ্ছ। যজ্ঞের সময়, যজ্ঞকুণ্ডের প্রজ্জ্বলিত আগুনে ঘি দেওয়া হয়। সেই আগুন নিভে ছাই হয়ে গেছে, তুমি সেই ভস্মে ঘি ঢেলে যাচ্ছ। এই যজ্ঞ কোন ফল দেবে না। নিজের জীবনের দিকে একটু তাকাও, তাকিয়ে দেখ কি করেছ সারা জীবনে তুমি। একটা জিনিসকে নিয়ে না চলার জন্য তোমার সমস্ত আশা বেকার, সমস্ত কর্মগুলি নিষ্ফল হয়ে গেছে। *মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ*, আর বলছেন, উনি যে জ্ঞান পেয়েছেন, সংসারের জ্ঞান হোক বা ঈশ্বরের জ্ঞান হোক, তাঁর এই জ্ঞান

কোন ফল দেয় না। আমরা যে ঈশ্বরের এত নাম করি, এত কিছু করি, কোন ফল পাই না কেন? কারণ আমরা এক মনে, এক লক্ষ্যের দিকে যাই না। বলছেন, ঈশ্বরই যে সত্য, ঈশ্বরই যে বস্তু, এই বোধটাই এদের নেই। তাহলে এদের কি গতি হবে?

আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *কিং চ তে ভবন্তি রাক্ষসীং রক্ষসাং প্রকৃতিং স্বভাবম্ আসুরীম্ অসুরাণাং চ প্রকৃতি মোহিনীং*, এনারা হলেন রাক্ষস, এনারা হলেন অসুর। একবারও কি আমরা কখন এই ভাবে ভেবে দেখেছি যে, আসলে আমরা রাক্ষস, আমরা অসুর? একজনের সাথে কথা হচ্ছিল, মজা করে তিনি রাক্ষস অসুর নিয়ে কথা বলছিলেন। অসুররাও ঈশ্বরকে ভক্তি করেন, অসুররাও যজ্ঞ করেন, কিন্তু অসুরদের জীবনের উদ্দেশ্য একটা। আচার্য এটাকে এত সুন্দর ভাষায় বলছেন যে, কল্পনাই করা যায় না, *ছিন্ধি ভিন্ধি পিব খাদ পরস্বম্ অপহর ইতি এবং বদনশীলাঃ ক্রুরকর্মাণো*, রাক্ষস কারা? যারা ক্রুর কর্ম করে। এদের মুখের ও ভিতরের ভাষা কি? *ছিন্ধি*, ভেঙে দাও, এই যেমন এখন রাস্থাঘাটে বলতে শোনা যায় –ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও, এটাই আচার্য শঙ্কর অষ্টম শতাব্দীতে লিখছেন। তার মানে তখনও লোকেদের মনে এই ভাব ছিল, তবেই তো তিনি লিখছেন। *ভিন্ধি*, ফাটিয়ে দাও, মেরে মাথা ফাটিয়ে দাও, যারাই এই ধরণের কথা বলে সবাই এক-একটা অসুর। *পিব খাদ*, ভাল করে চোব্যচোষ্য সব খাও, রোববার, ভাল করে মাংস ভাত খেতে হবে। ভাল ভাল খাবার ঠেসে খেয়ে নাও, মানুষ মরে গিয়ে ফেরত এসেছে কে দেখেছে? সেইজন্য *যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্যা ঘৃতং পিবেৎ*। ভাল করে মাংস, পোলাও, বিরিয়ানি খাও, দরকার হলে ক্রেডিট কার্ডে টাকা মিটিয়ে খাও। *পরস্বম্ অপহর*, অপরের যা আছে সব লুট করে নাও। বর্তমান কালের ম্যানেজমেন্ট যেটা শেখায় এটাকে বলে জিরো সাম্ গেম্। ম্যানেজার যারা হয় তাদের প্রোডাক্টিভিটি কিছু নেই। একটা ঘরে দশ জন আছেন, সবারই পকেটে একশ করে টাকা, ম্যানেজমেন্টের একটাই কাজ, আর তা হল কায়দা করে তোমার পকেটের টাকা কিভাবে আমার পকেটে চলে আসবে, কারণ এখানে জিরো সাম্ গেম্।

যারা চাষবাশ করে তাদের জিরো সাম্ গেম্ না, কৃষকরা পরিশ্রম করে নূতন একটা কিছু দিচ্ছেন। ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করছে, শ্রমিকরাও নূতন একটা কিছু তৈরী করছে। কিন্তু ম্যানেজমেন্ট হল জিরো সাম্ গেম্। এদের ট্রেনিংটাই হল অন্যকে কিভাবে তুমি বোকা বানাবে। মিষ্টি ভাবে বলতে হবে যাতে সে এটা না বুঝতে পারে যে তাকে বোকা বানানো হচ্ছে, *পরস্বম্ অপহর*, তার যা কিছু আছে সর্বস্ব অপহরণ করে নাও। এরাই রাক্ষস, এরাই সব অসুর। সেইজন্য দেখা যায়, পুরাণে যত কাহিনী আছে, সেখানে কোথাও দেবতারা অসুরদের আক্রমণ করেন না। রাক্ষস আর অসুররা থেকে থেকে বলে, আমাদের দাবী মানতে হবে। যদি সিনেমা দেখা থাকে, ইতিহাসের বই যদি পড়া থাকে, তাঁরা জেনে থাকবেন, কিভাবে আমেরিকা সারা বিশ্বে সবারই উপর গোলামী করছিল। আমেরিকার যারা আদিবাসী সেই রেড ইণ্ডিয়ানদের জমি জায়গা কিভাবে আমেরিকানসরা লুট করে নিয়েছিল। আমেরিকার অর্থনীতির পুরোটাই দাঁড়িয়ে আছে রেড ইণ্ডিয়ানদের জমি আর নিগ্রোদের পরিশ্রমের উপর। এরাই এখন জগৎকে উপদেশ দিয়ে বেড়াচ্ছে। ভারতবর্ষ কখনই এই রকম ছিল না, আমরা সবাইকে নিয়ে চলি। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের যে, আজ আমাদেরও মধ্যে এসে গেছে, *ছিন্ধি ভিন্ধি পিব খাদ পরস্বম্ অপহর ইতি এবং বদনশীলাঃ ক্রুরকর্মাণো*, ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও, লুটে নাও। আর এই সব করার পর ভাল করে খাওয়া-দাওয়া কর।

অসুর শব্দটা এসেছে অসু থেকে, অসু মানে প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের শক্তি, দেহের শক্তি, মনের শক্তি এই প্রাণশক্তি দিয়েই চলে। যারা একমাত্র এই ইন্দ্রিয়ের শক্তি, মনের শক্তির উপর নির্ভর করে, এরাই অসুর। যাঁদের মধ্যে দৈবী ভাব থাকে, যার কথা ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণনা হবে, তাঁরা আত্মার শক্তিতে চলেন। যারা ইন্দ্রিয়ের শক্তিতে চলে, মনের শক্তিতে চলে, এরা *অসূর্যা নাম তে লোকা*, ঈশোপনিষদে বলছেন, *অসূর্যলোক*, যেখানে আত্মার আলো নেই, তারা সেই লোকে বিচরণ করে। কি

হবে এদের ভগবানই জানেন। ঈশ্বর তো সব কিছু করতে পারেন, তিনি চাইলে কি এদের পাল্টে দিতে পারেন না। কেন তিনি পাল্টাতে যাবেন, ঈশ্বরের সৃষ্টি হল পাঁচ ফুলের সাজি, তাঁর এটাই ভাল লাগছে। জন্ম জন্মান্তরে মার খেতে খেতে এগোতে থাকবে, একটা জন্মে গিয়ে এমন মার খাবে যে, তখন তার একটু চেতনা আসবে। তারপর কিছু পূণ্য কর্ম, কিছু অপূণ্য কর্ম করতে করতে এই পথে আসতে থাকবে।

যাঁদের এই অসুর ভাব, রাক্ষস ভাব নেই, যাঁদের মধ্যে *ছিন্ধি ভিন্ধি পিব খাদ পরস্বম্ অপহর ইতি এবং বদনশীলাঃ ক্রুরকর্মাণো*, এই ভাব নেই, তাঁরা হলেন মহাত্মা। এরপর থেকে ভগবান বলবেন, আপনার জীবনের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, আপনি কি মহাত্মা হতে চান, আপনি জীবনে ঠিক পথে এগোচ্ছেন কিনা –

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্।।১৩।।

(কিন্তু হে পার্থ, মহাত্মাগণ শম, দম, দয়া ও শ্রদ্ধাদিযুক্ত সাত্ত্বিক স্বভাব আশ্রয় করে আমাকে সর্বভূতের কারণ ও অবিনাশী জেনে অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করেন।)

যাঁরা অসুর নন, রাক্ষসের ভাব নেই, যাঁরা মহাত্মা, তাঁদের মধ্যে সৎ গুণ থাকে, ক্ষমার ভাব থাকে, দয়ার ভাব থাকে, আচার্য বলছেন, *শমদমদয়াশ্রদ্ধাদিলক্ষণম্*, ঈশ্বর, ঈশ্বরীয় কথার প্রতি শ্রদ্ধা, এই ভাবগুলি থাকে। নিজের ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে। তাঁরা জানেন পঞ্চভূত থেকে জীবের উৎপত্তি হয় না, হাইড্রোজেন, কার্বন অক্সিজেন থেকে জীব আসেনি। বায়োলজি যেভাবে বলে, কিভাবে মলিক্যুলস এসেছে, জীব এসেছে; ঋষিরা বলবেন, এভাবে না। এনারা জানেন, এই পঞ্চভূতও ঈশ্বর থেকে এসেছে, আমরা সবাই ঈশ্বর থেকে এসেছি, এই তত্ত্বটা তাঁরা ভাল করে জানেন। তার সঙ্গে জানেন, এই ঈশ্বরতত্ত্ব অবিনাশী, তিনি সবার ভিতরে বাস করেন, এনারাই মহাত্মা। কারুর যদি বিশ্বাস হয়ে যায় যে, সমস্ত কিছুর আদিকর্তা ঈশ্বর, আবার বিনাশ হয়ে গেলে সব কিছু সেই ঈশ্বরেই প্রবেশ করে যাবে, বুঝতে হবে তার মধ্যে মহাত্মার ভাব আছে। এরপর তার যদি এই বোধ হয়ে যায়, আত্মাই সব, সবার মধ্যে সেই আত্মা, যিনি ঈশ্বর তিনিই আত্মা, সে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। তৃতীয়, আমার যত চিন্তা, আমার যত কর্ম সব কিছু আত্মার প্রতি, মানে নিজের জন্য। আমাকে কেউ ঈশ্বরকে ভজনা করতে বলছেন না, আত্মকেন্দ্রিত হতে বলা হচ্ছে।

আমরা যখন বলছি, আপনি খুব self-centered, আরে ভাই self-centered হলে তো মহাপুরুষ হয়ে যেতেন। আমরা সবাই হলাম body centered, দেহকেন্দ্রিত, নিজের শরীর ছাড়া আমরা কিছুই বুঝি না। কিন্তু যিনি আত্মাকেই কেন্দ্রিত করে নিয়েছেন, তাঁর জীবন তো আত্মকেন্দ্রিত হয়ে গেল, আত্মাকে কেন্দ্র করেই তাঁর জীবন এগিয়ে চলে। আমি একবার খুব দুঃখ করে আমার আচার্য রাম মহারাজকে বলেছিলাম, আমাদের self respect compromise হয়ে যাচ্ছে। মহারাজ আমার কথা শুনে বলছেন, 'তুমি selfকে জেনেছ যে self respect বলছ'? এগুলো কি হয়, ইউরেকা মোমেন্টস। অর্কিমিডিস যেমন জ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর রাস্থা দিয়ে কাপড় না পরে দৌড়াতে থাকলেন, আর ইউরেকা ইউরেকা বলে চেঁচাতে লাগলেন, আমি জেনেছি, জেনেছি। মন যখন প্রস্তুত হয়ে যায়, তখন হঠাৎ আলোটা জ্বলে ওঠে। 'তুমি selfকে জান না, কিসের self respect। তুমি selfকে জান না, কিসের self-centered, কিসের selfishness। তোমরা হলে body-centered'। দেহকেন্দ্রিক কারা? অসুররা, রাক্ষসরা, আমরা সবাই তাই। কিন্তু self বলতে শরীর না, self বলতে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব। ওটাই আমাদের হতে হবে।

বলছেন, *ভজন্ত্যনন্যমনসো,* মনকে ঐ একটি জায়গায় স্থির করা, *জ্ঞাত্বা ভূতাদিব্যয়ম্‌।* ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, সার্জেন্ট সাহেব আমি তোমার মুখটা দেখতে চাই, আলোটা তোমার মুখের দিকে ফেলো। ঈশোপনিষদের ব্রাহ্মণ মৃত্যুর সময় বলছেন, *তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে,* হে সূর্য আমি তোমাকে জানতে চাই, হে ঈশ্বর আমি তোমাকে জানতে চাই। সেইজন্য কি করতে হবে? *ভজন্ত্যনন্যমনসো,* একমাত্র ঈশ্বরের ভজনা করবে, অন্য কোন দিকে মন যাবে না। আর কিভাবে জানা যাবে, *জন্মাদস্য যতঃ,* ব্রহ্মসূত্রের মূল হল এই, যেখান থেকে সব কিছুর উৎপত্তি হয়েছে, যেখানে সব কিছুর লয় হয়। মূল হল উৎপত্তি, সব কিছু যেখান থেকে এসেছে, *জন্মাদস্য যতঃ।*

এই ভাবটাকে রেখে, আমার বাবা কে, আমার মা কে, সব ঈশ্বর, ঈশ্বর ছাড়া কেউ না। সন্ন্যাসীর কিসের বাবা, কিসের মা, সন্ন্যাসী হল কোকিলের জাত। কাকের বাসায় জন্ম হয়েছিল, ডানা গজিয়ে উড়তে শিখে ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছে। এরপর কিসের আর কর্তব্য! এরপর সন্ন্যাসীর একটাই কাজ –

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে।।১৪।।

(ব্রহ্মচর্যাদি ব্রতে দৃঢ়নিষ্ঠ ও যত্নশীল সেই ভক্তগণ সর্বদা আমার কীর্তন এবং ভক্তিপূর্বক নমস্কারাদি দ্বারা সমাহিত হয়ে আমার উপাসনা করেন।)

চোদ্দ নম্বর শ্লোক সাধনার বিধি, খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক, সবার এই শ্লোক মুখস্ত করে রাখা উচিত। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে একজন দীক্ষা নিয়েছেন, মহারাজ তাঁকে সকাল বিকেল একশ আটবার করে জপ করতে বলে দিয়েছেন। ভক্তটি তখন বিজ্ঞান মহারাজকে জিজ্ঞেস করছেন, 'আচ্ছা মহারাজ চুয়ান্ন বার করলে হবে'? মহারাজ প্রচণ্ড রেগে গেছেন, what nonsense, দীক্ষা নিলে কেন? আচ্ছা মহারাজ দাঁড়িয়ে করব না শুয়ে করব, দাঁত ব্রাশ করতে করতে করা যাবে, স্নান করতে করতে করা যাবে। আরে কিছু একটা করতে শুরু করুন। পরে আপনার মন শুদ্ধ হলে মনই বলে দেবে, কি করতে হবে। মনটা এমন অশুদ্ধ, দুনিয়ার আবর্জনা আর নোংরাতে ভরে আছে। যা পারেন, যেভাবে পারেন একটু করুন, শুয়ে করুন, দাঁড়িয়ে করুন, বাসে ট্রেনে যেতে যেতে করুন, যেখানে খুশী আপনি করুন, কিছু করুন, করলে মনটা শুদ্ধ হবে। শুদ্ধ মন আপনাকে বলে দেবে আপনি কি করবেন। কিসের এত প্রশ্ন আপনার। একটা সহজ কথা বুঝতে পারছেন না, মনটাকে আগে শুদ্ধ করুন, সেখান থেকে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আসবে, ঠাকুরের কথায়, কারুর কথায় কিছু হয় না; নিজের ভিতর থেকে উত্তর আসে। বাইরে থেকে আমাদের কাছ থেকে শুধু তথ্য আসে। আর কত তথ্য নেবেন, এবার একটু খাটুন, যার কথা ঠাকুর বার বার বলছেন। একটু নিজেকে শুদ্ধ পবিত্র করার চেষ্টা করুন।

কিভাবে নিজেকে শুদ্ধ পবিত্র করার চেষ্টা করতে হবে? এই চোদ্দ নম্বর শ্লোকে বলে দিচ্ছেন। *সততং কীর্তয়ন্তো মাং,* সর্বদা আমার কীর্তন করো, পাঁচ মিনিট নয়, পনের মিনিট না, দু ঘন্টা না; চব্বিশ ঘন্টা, তিরিশ দিন, বারো মাস, সারা জীবন। কেন? কারণ আপনি এটাই, যেমন নিঃশ্বাস আপনি নিচ্ছেন, তেমনি ঈশ্বরের নাম নিতে হবে। কারণ ঈশ্বর আপনার স্বরূপ। দেহের সাথে নিজেকে যেমন জড়িয়ে রেখেছেন, ঠিক সেইভাবে নিজের স্বরূপের সাথে জড়াতে হবে। আচার্য বলছেন, *সততং সর্বদা ভগবন্তং ব্রহ্মস্বরূপম্‌,* ভগবান ব্রহ্মস্বরূপ, আর বলছেন, *মাং কীর্তয়ন্তো যতন্তঃ, যতন্তঃ* মানে যিনি চেষ্টা করছেন। তার সাথে, *ইন্দ্রিয়োপসংহারশমদমদয়াহিংসাদিলক্ষণৈঃ,* ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা, বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলি যেন বহির্মুখী হয়ে বেরিয়ে না আসে; আর দয়া, অহিংসা এই লক্ষণগুলি থাকা, এগুলো হল তাঁদের জন্য, যাঁরা চেষ্টা করছেন। এইভাবে চেষ্টা করলে বাকসংযম হয়, অন্যান্য সব কিছু সংযম হয়, দয়া, অহিংস এই গুণগুলোও আসে।

দৃঢ়ব্রতাঃ, যাঁরা চেষ্টাদি করছেন, তাঁদের দৃঢ়ব্রতী হতে হবে। আচার্য *দৃঢ়ব্রতাঃ* শব্দের ব্যাখ্যা করে বলছেন, *দৃঢ়ং স্থিরম্ অচাঞ্চল্যং ব্রতং যেষাং তে দৃঢ়ব্রতাঃ,* এটা একাদশী ব্রত না, ঈশ্বরের ব্রত। সারা জীবনের মত এই ব্রতকে ধরে আছি, একেবারে স্থির, নড়া যাবে না; বহু কষ্টে তোমাকে আমি ধরেছি, আর ছাড়াছাড়ি নেই।

নমস্যন্তঃ চ মাং হৃদয়েশয়ম্ আত্মানং, যিনি হৃদয়ে বাস করছেন, সেই ভগবান, হৃদয়ের ঈশ্ যিনি, তাঁকে নমস্কার করা হচ্ছে। মন্দিরে যখন আমরা প্রণাম করি, সেখানে কখন কি উঠে নিজেকে প্রণাম করেছেন? আপনার ভিতরে তো সেই ভগবান বিরাজমান। আপনার নিজের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, আত্মশ্রদ্ধা আছে? অহঙ্কার আছে জানি। আমার ভিতর সেই ভগবান আছেন, এই ভাবকে সর্বদা জাগিয়ে রাখা। সেইজন্য আমি এমন কোন কাজ করব না, যাতে আমার হৃদয়ের স্বামীকে লজ্জিত না হতে হয়। মা-বাবা অনেক সময় ছেলেমেয়েদের শাসন করে বলেন, দেখো বাছা এমন কাজ করো না, যাতে আমাদের সবার কাছে মাথা হেঁট হয়ে না যায়। কিন্তু আমাদের আসল স্বামী তো *হৃদয়েশয়ম্,* আমাদের হৃদয়ে বাস করছেন, তাই আমাদের এমন কোন কাজ করা উচিত নয়, যাতে তাঁকে লজ্জিত হতে হয়। তিনি আমাদের কাণ্ড কারখানা দেখে মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নেবেন। মন্দিরে প্রণাম করে উঠে সেই হৃদয়ের স্বামীকে প্রণাম করা। এই হল ভক্তের লক্ষণ, *সততং কীর্তয়ন্তো,* কীর্তন, অর্থাৎ জপধ্যান, শাস্ত্রপাঠ, নামগুণগান সদা সর্বদা করতে হবে; *যতন্তশ্চ,* চেষ্টা সব সময় চলতে থাকবে, *দৃঢ়ব্রতাঃ,* এই সাধনাকে দৃঢ় ভাবে ধরে নিয়েছে, আর ছাড়া যাবে না। ভক্তিযুক্ত ভাবে *হৃদয়েশয়ম্*কে প্রণাম করবে, আর *নিত্যযুক্ত উপাসতে,* নিত্যযুক্ত হয়ে উপাসনা করবে, সব সময় এতেই লেগে আছে, ঈশ্বর থেকে মন কক্ষণ সরবে না। নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত এই ভাব নিয়ে সব সময় উপাসনাতে লেগে আছেন।

এই একটা শ্লোকে দেখালেন, যাঁরা ভক্ত তাঁরা কিভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করেন। বলছেন, আসুরিক বৃত্তির যারা, তারা তো ঈশ্বরকেই মানে না। ফলে তাদের সমস্ত কর্ম, কর্মপ্রচেষ্টা – *মোঘাশা মোঘকর্মাণো।* কিন্তু এর বিপরীত যাঁরা, তাঁরাই মহাত্মা। এই মহাত্মারা কিভাবে স্তুতি করেন? *সততং কীর্তয়ন্তশ্চ মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়াব্রতাঃ,* লেগে আছে, ছাড়ছে না, আর আমাকে (বাসুদেবকে) প্রণাম করে, বাইরে না, হৃদয়ে যিনি আছেন, তাঁকে নিত্যযুক্ত হয়ে উপাসনা করেন। কিভাবে করেন এটা পনের নম্বর শ্লোকে বলবেন, ভগবানকে তিনি কিভাবে দেখেন। এটা হল ভক্তের স্বরূপ, এরপর ভগবানের স্বরূপ কেমন, সেটাকে বলবেন। এই যে জীব, জগৎ ঈশ্বর বলা হল; জীবের থেকে একটু বেশি উপরের থাকের হলেন যাঁরা ঈশ্বরের ভক্ত, এরপর আসবেন ঈশ্বর।

হিন্দুরা ছোটবেলা থেকে বড়দের কাছে হিন্দু ধর্মের অনেক কথা শুনে থাকে। সেখান থেকে তাদের ভগবান সম্বন্ধে, নিজের ব্যাপারে এবং ভক্তির ব্যাপারে নিজস্ব একটা ধারণা তৈরী হয়। সেই ধারণা অনেক সময় ঠিক হতে পারে, অনেক সময় ঠিক নাও হতে পারে। ঠিক না বেঠিক এটা জানা যাবে কিভাবে? সেইজন্য হিন্দু ধর্মের পরিষ্কার এই তিনটেকে নিয়ে চলে – শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি। শ্রুতি মানে শাস্ত্রে জিনিসটা আছে কিনা, দ্বিতীয় জিনিসটা যুক্তি সঙ্গত কিনা এবং তৃতীয় এই রকম কারুর উপলব্ধি হয়েছে কিনা। কিন্তু কেউ যদি বলে, এটা শাস্ত্রে নেই ঠিকই, কিন্তু আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করে এই জিনিসটা বার করেছি –তখন এই জিনিসটাকে আমাদের হিন্দু ধর্মে কোন দাম দেওয়া হয় না। অন্যান্য ধর্মে, যেমন ইসলামে বলবে, এটা কোরাণে আছে কিনা বা কোরাণে না থাকলে হাদিসে আছে কিনা বা কোরাণ হাদিস মিলিয়ে অন্য কোথাও আছে কিনা। আমরা হিন্দুরা কিন্তু নূতন কথাকে মান্যতা দিই, যদি তা শাস্ত্র বিরোধী না হয়। যেমন স্বামীজী, পুরো নূতন ভাবে হিন্দু ধর্ম আমাদের সামনে দিলেন এবং ভারত তা গ্রহণ করল।

যদিও এই বিষয়ের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু খুব মজার জিনিস। দক্ষিণ ভারত প্রচণ্ড গোঁড়া, যার জন্য ভারতের বড় বড় ধর্ম প্রচারকরা, যাঁরা আশা করেছিলেন দক্ষিণ ভারত তাঁদের গ্রহণ করবেন, কিন্তু কাউকেই তাঁরা গ্রহণ করল না। দক্ষিণ ভারত নূতন কোন কিছু কিছুতেই নেবে না, প্রচণ্ড orthodox কিনা। কিন্তু খুব আশ্চর্যের যে, তাঁরা কিন্তু স্বামীজীকে নিলেন। যাঁরা কোন মতে নূতন কোন চিন্তা-ভাবনা নেবেন না, তুলসিদাস থেকে শুরু করে, ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য সমাজ যাঁরাই এসেছিলেন, কাউকে নিলেন না। কিন্তু স্বামীজীকে নিলেন, স্বামীজীর মাধ্যমে ঠাকুরকে নিলেন। কারণ তাঁরা বুঝলেন, স্বামীজী হিন্দু ধর্মের কথাই বলছেন। প্রথম কথা হল দেখতে হবে, আমাদের পরম্পরাতে এই ধরণের কথা আছে কিনা। এই পরম্পরাকে নিয়ে একটু পরে একটা শ্লোক আসবে।

দ্বিতীয় যেটা বললেন, তা হল – আপনি যেটা বলছেন, সেটা যুক্তি সঙ্গত কিনা, আর তৃতীয় এটা আপনি নিজে উপলব্ধি করেছেন কিনা। তার মানে আপনার মন থেকে যেটা বেরোচ্ছে, সেই কথাকে এনারা কোন দাম দেবেন না। যার জন্য গত একশ বছরে অনেকেই দেখে থাকবেন অনেক বাবাজী, গুরুজী খুব বিখ্যাত হয়ে গেছেন। এত বিখ্যাত হয়েছেন যে, মনে হবে একজন অবতার, অবতার না হোক হাফ অবতার তো বটেই। কিন্তু শরীর চলে গেলে তাঁকে আর কেউ মনে রাখছে না। আর দক্ষিণ ভারত তো কোন ভাবেই নেবে না, যদি না কথাগুলো পুরো orthodox হয়। গীতা, উপনিষদ পড়লে, নিজের মনে যে চিন্তা-ভাবনা, ধারণাগুলি রয়েছে, বাবা ঠাকুরদার কাছ থেকে যে কথাগুলো শোনা হয়েছে, সেগুলো verification হয়ে যায়। যেমন ঠাকুর বলছেন, এখানে সব চেক পাশ করিয়ে নিতে হয়। আমার চিন্তা-ভাবনায় এখানকার পাশ করার একটা স্ট্যাম্প যদি লাগানো হয়, তাহলে বোঝা যাবে আমার চিন্তা-ভাবনা ঠিক কিনা।

গীতা এতক্ষণ ভক্তের কথা বললেন। যাঁরা কোন না কোন সম্প্রদায় থেকে দীক্ষা নিয়েছেন, তার মানে তাঁরা ভক্ত। তাঁরা মনে করেন, ভগবান তাঁদের কৃপা করবেন। যখন দেখে কৃপা হচ্ছে না, তখন কষ্ট হয়। আমাদের কাছে লোকেরা কথা বলতে আসেন, একদিকে তাঁদের ভক্তি আছে, কিন্তু অন্য দিকে দেখা যায়, সন্তান, পরিবারের দিকে এত বেশি মন, কথা শুনলেই আমাদের অস্বস্থি লাগে। কিন্তু গীতা এখানে এই ধরণের ভক্তদের কথা বলছেন না, ভক্ত মানে, ঈশ্বর বই তাঁর আর কিছু লাগবে না, *সততং কীর্তয়ন্তো মাং*, আর ঈশ্বরের ভাবে দৃঢ়, সব সময় নিয়মতি ভাবে ঈশ্বরকে ভক্তি ও উপাসনা করে যান। কার উপাসনা করেন, কিভাবে উপাসনা করে, এটাকে বোঝাবার জন্য ঈশ্বর তত্ত্বকে সামনে নিয়ে আসছেন।

ঈশ্বরতত্ত্ব আগেও অনেকবার আমাদের আলোচনায় এসেছে, এখানে আরও-একবার অন্য ভাবে বলছেন। এখান থেকে দশম ও একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ঈশ্বরতত্ত্ব, ভগবানের স্বরূপ কি, ভগবান কেমন, এই আলোচনাই চলবে। ভগবানের গুণের কথা, তাঁর লীলার কথা, তাঁর স্বরূপের কথা, এটাই চলতে থাকবে। উপাসনা কিভাবে করা হবে, এই প্রসঙ্গে ঠাকুর খুব সহজ করে বলে দিচ্ছেন, যে রূপ তোমার ভাল লাগে, সেই রূপকেই অবলম্বন করে তুমি উপাসনা কর। ছোট বাচ্চা এখনও বাবা বলতে পারে না, সে 'বা' কি 'পা' বলে ডাকে। বাবা কিন্তু বুঝতে পারেন, সন্তান আমাকেই ডাকছে। এটা হল যারা জানে না, কিন্তু একবার উপাসনা বিধি জেনে গেলে তখন ঠিক ভাবে করতে হয়, তা নাহলে সময় লাগবে। হবে সবারই, কিন্তু সময় লাগবে।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথকত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্।।১৫।।

(অন্য কেউ কেউ ভাগবদ্বিষয়ক জ্ঞানরূপ যজ্ঞ দ্বারা আমার উপাসনা করেন। যেমন –কেউবা ব্রহ্মাত্মৈকত্বরূপ পরমার্থ দর্শন দ্বারা, কেউ কেউ বা পৃথক পৃথকভাবে ভগবানই চন্দ্রাদিত্যাদিরূপে অবস্থিত জেনে, কেউ কেউবা আমাকে বিশ্বমূর্তি ভগবান ভেবে –বহুপ্রকারে উপাসনা করেন।)

উপাসনা কত ভাবে এবং কিভাবে করা হয়, এই একটি শ্লোকে পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন। এখানে উপাসনার তিনটে বিধি বলে দিচ্ছেন। যাঁরা ধর্মতত্ত্ব জানতে চান, তাঁদের জন্য এই শ্লোকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। *জ্ঞানযজ্ঞেন*, জ্ঞান মানে জ্ঞানযোগ না, এটা হল জ্ঞানযজ্ঞ। জ্ঞানযজ্ঞ হল, উপাসনার যত রকম বিধি আছে, যত রকম আচার আছে, সব ছেড়ে দিয়ে একমাত্র আমাকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে, শ্রীকৃষ্ণ বলতে যিনি আমার আপনার ইষ্ট; আমার ইষ্ট আর সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা এক, এই মনে করে তাঁর ভজনা করেন।

আচার্য তাঁর ভাষ্যে বলছেন, *একম্ এব পরং ব্রহ্ম ইতি পরমার্থদর্শনেন যজন্ত উপাসতে*, যেমন যিনি ঠাকুরের বা শিবের ইষ্টমন্ত্র নিয়েছেন, *একম্ এব পরং ব্রহ্ম*, তাঁর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণই পরমব্রহ্ম, শিবই পরমব্রহ্ম, এই রূপে উপাসনা করা। শ্রীকৃষ্ণ যে রূপের আকার, সেই রূপে না, পরমব্রহ্ম রূপে। আগে যেমন বললেন, লোকে মনে করে আমি তো আগে ছিলাম না, এই জন্ম নিয়েছি; এই রূপে না। শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে জন্ম নিলেন, কাশীপুরে দেহ রাখলেন, এই রূপে না। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শিবকে ব্রহ্ম রূপে উপাসনা করতে হবে। ব্রহ্ম কি, আগেও আলোচনা হয়েছে, পরেও আলোচনা হবে। সচ্চিদানন্দ যিনি, সমাধিতে যাঁর জ্ঞান উপলব্ধি হয়, যেটাকে বোধে বোধ করা হয়। মনের জগতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে আমাদের কাছে এসেছেন। তিনিই শ্রীকৃষ্ণ রূপে এসেছেন, তিনিই শ্রীরামচন্দ্র রূপে এসেছেন। আমরা যাকে খুশী ইষ্ট করতে পারি; যিনি সন্তানকে খুব ভালবাসেন, তিনিও সন্তানকে সেইভাবে উপাসনা করতে পারেন, কোন অসুবিধা নেই; তাঁর জন্য তাঁর সন্তানই ঈশ্বর, কিংবা সন্তানকে পরমব্রহ্ম রূপে দেখতে হবে। যাকেই আমরা ভালবাসি, স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, একজন পুরুষ নারীকে ভালবাসে, কোন অসুবিধা নেই, যাকে ভালবাসছে তাকে পরমব্রহ্ম দেখতে হবে। এই যে বলা হয় পতি পরমেশ্বর, সমাজে এসে সম্পর্কটা কলুষিত হয়ে গেছে। কিন্তু পতিকে সেই পরমেশ্বর রূপে যদি কোন স্ত্রী দেখেন, তাতে আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভে কোন সমস্যা হবে না। যাকে খুশী আমরা সেই পরমব্রহ্ম রূপে উপাসনা করতে পারি, শুধু হল *একম্ এব পরং ব্রহ্ম*। সব কিছুকে ছেড়ে দেওয়ার পর শুধু ঐ এক বস্তুতে যখন মন যায়, তখন এটাকে বলছেন জ্ঞানযজ্ঞ।

কিন্তু সবাই এভাবে উপাসনা করতে পারে না, তারা তখন বিভিন্ন দেবী দেবতার উপাসনা করে। গীতা অনেক প্রাচীন গ্রন্থ, আর সেই সময় সমাজে বেদের সংস্কৃতি ছিল বলে এখানে দেবী দেবতার কথা নিয়ে আসছেন। *একত্বেন পৃথকত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্*, *একত্বেন*-এর আগে যেটা বলা হল, *একম্ এব পরং ব্রহ্ম*, যিনি পরমব্রহ্ম রূপে দেখছেন। এবার বলছেন, *পৃথকত্বেন*, এক রূপে যেমন সাধনা করা যায়, যিনি সেই তিনিই এক, তিনিই আবার পৃথক রূপেও আছেন। আচার্য *পৃথকত্বেণ* শব্দের ব্যাখ্যাতে বলছেন, *আদিত্যচন্দ্রাদিভেদেন স এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ আদিত্যাদিরূপেণ অবস্থিত*, এখানে কিন্তু বিষ্ণুর কথা আনছেন, শ্রীকৃষ্ণের কথা আনছেন না; গোঁড়া বৈষ্ণবরা এটাকেই এলেমেলো করে দেন। যিনি ভগবান বিষ্ণু, হিন্দুরা ভগবান বলতে বিষ্ণুকেই বলে, কিন্তু সেখানে বাধ্যতামূলক কিছু নেই। আপনি ভগবানকে যে শব্দ দিয়েই সম্বোধন করুন তাতে কোন অসুবিধা নেই, শুধু তাঁর যে গুণাবলী আছে সেই গুণগুলিকে সেই জায়গায় লাগিয়ে দিতে হয়। সেই ভগবান বিষ্ণুই কৃষ্ণ হয়েছেন, তিনিই শিব, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ হয়েছেন। এটা হল একটা ভাব। যে ভাবটাকে ধরা হল সেটাকে নিয়েই সাধনা করে যাওয়া।

দ্বিতীয় হল, বিভিন্ন যে দেবতারা আছেন, আদিত্য, চন্দ্রমা, আগেকার দিনে এইসব দেবতাদের নিয়ে বেদের ব্রাহ্মণরা সাধনা করতেন, যজ্ঞাদি করতেন। যিনি এক তিনিই বহু হয়েছেন, *একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি*, বেদেও তাই বলছেন, কিন্তু আলাদা আলাদা। অগ্নিও যিনি, ইন্দ্রও তিনি; এক সঙ্গে কিন্তু দুই আছে। প্রথমটাতে বলা হচ্ছে ঈশ্বর এক, মুসলমানরা যেমন বলেন আল্লাই

আছেন। *পৃথকত্বেন বহুধা,* এখানে বলছেন বহু হয়ে তিনি আলাদা আলাদা, কিন্তু সবটাই তিনি হয়েছেন।

কিন্তু তারপরেই বলছেন, *বিশ্বতোমুখম্*। আচার্য তাঁর ভাষ্যে বলছেন, *কেচিদ্ বহুধা অবস্থিতঃ স এব ভগবান্ সর্বতোমুখো,* জগতে যত মুখ আছে সব ঈশ্বরেরই মুখ। একাদশ অধ্যায়ে বলবেন, সেই এক ভগবান, কিন্তু তাঁর অনেক মুখ দেখাচ্ছে। আমরা বোঝানর জন্য এটা কল্পনা করে নিতে পারি যে, এই ভারত দেশ আছে, ভারত দেশটা যেন সেই ভগবান বিষ্ণু, ভারতে যে একশ চল্লিশ কোটি মানুষ আছে, সব মানুষ যেন ভগবান বিষ্ণুরই এক একটি মুখ। পুরুষসূক্তমে এটাই বলছেন, *সহস্রশিরসা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ*। এটাই *বিশ্বতোমুখম্,* বিশ্বরূপ, বিশ্বের প্রত্যেকটি প্রাণী ভগবানেরই এক একটি মুখ।

স্বামীজী আমেরিকা থেকে গুরুভাইদের চিঠি লিখতে শুরু করলেন, সেই চিঠিতে, নিজের বিভিন্ন লেখায় এবং তাঁর বিভিন্ন ভাষণে মানুষদের শুধু উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন, তোমরা দেশের জন্য কিছু কর। এই যে বলছেন, দেশের জন্য কিছু কর, এই কথা বলার মধ্যে একটা ইমোশানাল ভাব আছে। আমরা সবাই এখন সমাজসেবা করতে চাই, বিশেষ করে বাংলায় এর বিরাট প্রচলন আছে। দূর্গাপূজা, কালীপূজা বিভিন্ন উৎসবে গরীবদের কম্বল বিতরণ, বস্ত্র বিতরণ করা হয় বা সম্মানীয় ব্যক্তিদের সম্মানার্থে কিছু করা, এর মধ্যে যেমন একটা সামাজিক দিক থাকে, তেমনি অন্য দিকে এর একটা বৃহতের উপাসনার ভাব চলে আসে। এটাকেই স্বামীজী spiritual aspectএ নিয়ে গেলেন। এখান থেকেই স্বামীজী নিয়ে এলেন তাঁর খুব বিখ্যাত আইডিয়া ‘শিবজ্ঞানে জীবসেবা’। যতগুলো মুখ আছে, সব মুখ সেই ভগবানেরই মুখ। পরে যে শাস্ত্রগুলি এসেছে সেখানে *বিশ্বতোমুখম্* বা বিশ্বরূপ উপাসনার বর্ণনা পাই না, কিন্তু একাদশ অধ্যায়ে রয়েছে। স্বামীজী এসে এটাকে কার্যে পরিণত করার উপর খুব জোর দিলেন। কারুর সেবা যখন করা হচ্ছে তখন এই ভাবটা রাখতে হয় –*বিশ্বতোমুখম্,* সব মুখ সেই ঈশ্বরেরই মুখ। সন্তানকে মায়েরা ভালবেসেন, খুব ভাল কথা; সেই সন্তানকেই যদি ভগবান রূপে বা ছোট শ্রীকৃষ্ণ রূপে দেখা যায়, তাহলে সেটা আরও ভাল। আরও ভাল আমার পাড়াতে যত শিশু আছে, সবাইকে দেখছি সেই বালগোপাল রূপে।

আমাদের খুব নামকরা পূজনীয় ভব মহারাজ ছিলেন। অনেক আগেকার কথা, ১৯৫০ সাল হবে হয়ত, সেই সময় তিনি দেওঘরের সেক্রেটারি ছিলেন। খুবই উচ্চমানের সাধু ছিলেন। পরে যখন বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারীদের জন্য ট্রেনিং সেন্টার হয়, যেখানে নবাগত ব্রহ্মচারীদের দু বছর ট্রেনিংএ থাকতে হয়; সেখানে অনেকদিন তিনি আচার্য ছিলেন। অনেক দিন দেখা যেত, রাত নটার সময় কোন গাছের তলায় ভব মহারাজ ধ্যানে বসলেন, ভোর চারটে পর্যন্ত টানা বসে থাকতেন। ব্রাহ্ম মুহুর্তে সেখান থেকে উঠে তিনি মঙ্গল আরতিতে যেতেন। ভব মহারাজের অনেক কথা আমরা শুনেছি, যদিও আমি তাঁকে দেখিনি, কিন্তু তাঁর কথা অনেক শুনেছি। ছুটির পর যেদিন দেওঘর বিদ্যাপীঠ খুলত, তার আগের দিন উনি সমস্ত সাধু ব্রহ্মচারীদের ডেকে বলতেন, ‘বালকরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ আগামীকাল আসছেন, দেখবেন সেবায় যেন কোন ত্রুটি না হয়’। এই ভাব জাগিয়ে রাখা। সেবা তো আমরা সবাই করছি, সোস্যাল সার্ভিস যখন করছি, গরীবদের কম্বল, শাড়ি যখন দিচ্ছি, সেবাই করছি। সন্তানের সেবা তো সব বাবা-মায়েরা করছেনই, মায়েরা বাড়ির সেবা তো করছেনই; রান্নাবান্না, ঘর ঝাড় দেওয়া সবই তো করছেন, শুধু ভাবটা পাল্টে দিলেই হল।

কি ভাব, *বিশ্বতোমুখম্,* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনিই সব কিছু হয়ে আছেন, আমার এই কাজের মাধ্যমে আমি তাঁরই সেবা করছি। কেউ হয়ত জপধ্যান করতে পারেন না, তপস্যা করতে পারেন না, যদি সবাই এগুলো করতে পারতেন, তাহলে তো তাঁরা সংসারে থাকতেন না। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠের প্রথম অধ্যক্ষ। একজন ব্রহ্মচারী মহারাজের কাছে সন্ন্যাস চাইতে এলেন, রাজা

মহারাজ তাঁকে সন্ন্যাস দিলেন। উনি মঠে কাজকর্ম করতে চাইতেন না। 'আমি কাজকর্ম করব না, জপধ্যান নিয়েই থাকতে চাই'। রাজা মহারাজ তাঁকে বলছেন, 'এটাই যদি করার ছিল, তাহলে ঠাকুরের সময় আমরা যখন ছিলাম তখন আসনি কেন? তখন যদি আসতে তাহলে ঠাকুরের কথা মত চলতে। এখন এসেছ মানে আমাদের কথা মত চলতে হবে'।

যদি আমাদের মধ্যে সেই পূণ্য থাকত, সেই গুণ থাকত, তাহলে আমরা ঠাকুরের সময় এসে সাধনা করে মুক্ত হয়ে যেতাম। তা তো হয়নি, তার মানে আমাদের মধ্যে সেই পাত্রতা নেই। সংসারে যাঁরা আছেন, কোন একটা বন্ধন নিশ্চয় আছে, যে কারণে তাঁরা এখন সংসারে আছেন। সেটাতে কারুর চয়েস নেই, কিন্তু কাজটা কিভাবে করব সেটাতে চয়েস আছে। গৃহবধূ যে, তার কোন চয়েস নেই, তাকে সেখানে রান্না করতেই হবে, স্বামী, সন্তান ও পরিবারের দেখভাল করতেই হবে। কিন্তু কিভাবে করা হবে, তার দৃষ্টিভঙ্গী কি থাকবে, সেটা যে কোন সময় সে পাল্টে নিতে পারে, এটা তার হাতে। আচার্য বলছেন, *তং বিশ্বরূপং সর্বতোমুখম্ বহুধা বহুপ্রকারেণ উপাসতে,* যেমন ভাবে উপাসনা করা যেতে পারে, নরনারায়ণ সেবা যেভাবে খুশী করা যায়। কিভাবে করা যায়? বিভিন্ন ভাবে করা যেতে পারে, ষোল নম্বর থেকে শুরু করছেন, বিভিন্ন ভাবে কি ভাবে উপাসনা করা যায়।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোহহমহমেবাজ্যবহমগ্নিরহং হুতম্।।১৬।।

(আমি অগ্নিষ্টোমাদি শ্রৌত যজ্ঞ, আমি পঞ্চ স্মার্ত যজ্ঞ, আমি পিত্রর্থ শ্রাদ্ধাদি, আমি ভেষজ, আমি মন্ত্র, আমি হোমের ঘৃত, আমি হোমাগ্নি এবং আমিই হোমক্রিয়া।)

বেদের সময় দুই প্রকার যজ্ঞ ছিল, এখনও দক্ষিণ ভারতে এই প্রথা মেনে যজ্ঞ করা হয়, উত্তর ভারতে যজ্ঞ অন্য রূপ নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু বেদের অনেক পণ্ডিত আছেন, যারাঁ দুই প্রকার যজ্ঞ করেন – শ্রৌত যজ্ঞ এবং স্মার্ত যজ্ঞ। বেদে যা কিছু নিত্য কর্মাদি রয়েছে, এটাকে বলে শ্রৌত যজ্ঞ। স্মার্ত যজ্ঞ হল যে যজ্ঞ বিশেষ বিশেষ সময় করা হত, যেমন অশ্বমেধ যজ্ঞ এটা স্মার্ত যজ্ঞের মধ্যে পড়বে। এখানে ক্রতু বলতে শ্রৌত কর্ম আর যজ্ঞ বলতে স্মার্ত কর্ম বোঝাচ্ছেন। শ্রৌত কর্ম এবং স্মার্ত কর্ম, এগুলোর জন্য আছে শ্রৌত সূত্র এবং স্মার্ত সূত্র। স্মার্ত সূত্র পরে আবার গৃহ্যসূত্র হয়ে গেল, গৃহ্যসূত্রই পরে স্মৃতি রূপে এসেছে। লোকেরা কথায় কথায় মনুকে গালাগাল দেয়, ওরা জানে না যে, মনুস্মৃতি মনু নিজে তাঁর মন থেকে বানিয়ে মনগড়া কিছু লেখেননি। যেমন প্রফেট মহম্মদ কোরাণে আল্লার সব কথা বললেন, কিন্তু কথাগুলো প্রফেট মহম্মদের আগে ছিল না। মনুস্মৃতির সম্বন্ধে এই কথা বলা যাবে না, কারণ মনুস্মৃতিতে মনু যা কিছু লিখেছেন, এগুলো আগেই গৃহ্যসূত্রে ছিল। গৃহ্যসূত্রে যা কিছু ছিল, এগুলোও বেদ থেকেই এসেছে। মনু শুধু ওগুলোকে গুছিয়ে রাখার কাজটা করে দিলেন।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ, আমি নিজে সেই ক্রতু, আমিই যজ্ঞ। ভগবান বলছেন, *স্বধাহহমৌষধম্, স্বধা* পিতৃদের উদ্দেশ্য যেটা অর্পণ করা হয়। শ্রৌত কর্ম আর স্মার্ত কর্ম দেবতাদের দেওয়া হয়, আর *স্বধা* পিতৃদের দেওয়া হয়। হিন্দুদের যাঁরা নিয়মিত পঞ্চ মহাযজ্ঞ করেন, দ্বিপ্রহরে খাওয়ার সময় একটু অন্ন ও জল থালার বাইরে রেখে দেন, পরে সেটা পাখিদের খাইয়ে দেওয়া হয়। এটাও পিতৃ কর্মের মধ্যে পড়ে। তবে সেখানে মন্ত্রের কোন দরকার পড়ে না। পিতৃদের নামে যে আহুতি দেওয়া হত তখন স্বাহা না বলে স্বধা বল হত। চণ্ডীতে যেমন বলছেন, *ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা,* এই স্বধা পিতৃদের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। *অহমৌষধম্,* ঔষধ দুটো অর্থে হয়, একটা ঔষধ শরীরের ব্যাধি লাঘবের জন্য যেটা সেবন করা হয়, আবার যে কোন বৃক্ষকেও ঔষধ বলা হয়, তার মানে আমরা যে চাল-ডাল-আনাজ খাচ্ছি এটাকেও ঔষধ বলা হয়। ঔষধ বলতে সমস্ত বনস্পতি জগৎ, আবার ঔষধ বলতে রোগ ব্যাধি সারাবার জন্য যেটা সেবন করা হয়।

মন্ত্রোহহমহমেবাজ্যবহমগ্নিরহং হুতম্‌, যজ্ঞাদির সময় যে মন্ত্র দিয়ে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, সেই মন্ত্র ভগবান নিজে। যেটা আহুতি রূপে দেওয়া হচ্ছে, সেটাও ভগবান নিজে। যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হচ্ছে, সেই অগ্নি ভগবান নিজে। চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান বলেছিলেন *ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্‌,* এখানেও একই জিনিস বলছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে চব্বিশ নম্বর শ্লোকে ব্রহ্মকে নিয়ে বলছেন, সবটাই ব্রহ্ম। এই শ্লোকে ভগবানকে সাকার রূপে বলছেন। যত শ্রৌত কর্ম হয় সেটা আমি, যত স্মার্ত কর্ম হয় সেটাও আমি। যত পিতৃকর্ম হয় সেটাও আমি, যত রকমের আহুতি দেওয়া হয়, সেটাও আমি। আহুতির মন্ত্রগুলি আমি, যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয় সেই অগ্নিটাও আমি নিজে। যে কোন মন্ত্র আমরা যে পাঠ করি সেটা ভগবান নিজে। যদিও তন্ত্র বেদ থেকে স্বাধীন ভাবে বড় হয়েছে, কিন্তু তন্ত্রে মন্ত্রকে সাক্ষাৎ দেবী রূপে দেখা হয়। বেদ মন্ত্র গায়ত্রী মন্ত্রকে সাক্ষাৎ গায়ত্রী দেবী মনে করা হয়। আর সত্যিকারের যখন ধ্যানের গভীরে যান, তখন মন্ত্রগুলি জীবন্ত হয়ে দর্শন দেন।

সতের নম্বর শ্লোকটা খুব সুন্দর। নিজেকে কিভাবে ঈশ্বরের সাথে জুড়ে দেওয়া যায়, কারণ আজকাল যজ্ঞাদি সব বন্ধ হয়ে গেছে –

পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ।।১৭।।

(আমিই এই জগতের পিতা, মাতা ও সর্বপ্রাণীর কর্মফলদাতা, পিতামহ এবং একমাত্র জ্ঞেয় ও পরিশুদ্ধিকর বস্তু। আমি ওঙ্কার এবং আমিই ঋগ্‌বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদস্বরূপ।)

ভগবানের সাক্ষাৎ স্বরূপের বর্ণনা করা হচ্ছে। *পিতাহহমস্য জগতঃ,* এই জগতের আমি বাবা, আগেই বলেছেন *অহং বীজপ্রদঃ পিতা,* কারণ চৈতন্যটা তিনিই দেন। *মাতা,* যার মধ্যে বীজ প্রদান করছেন, সেই প্রকৃতি তো ভগবান নিজে। ভগবান অষ্টম অধ্যায়ে বললেন, আমি পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি যেন ক্ষেত, পরা প্রকৃতি যেন বীজ। অপরা প্রকৃতিও ভগবান, পরা প্রকৃতিটাও ভগবান, সেইজন্য ভগবান হলেন মা, আবার ভগবানই বাবা। বিখ্যাত গানে যখন বলা হয় *ত্বমেব মাতা পিতা ত্বমেব,* তখন এই কারণেই বলা হয়। প্রকৃতি তিনি, পুরুষ তিনি, জীব তিনি, চৈতন্যও তিনি। এই জগতে যা কিছু আছে, সব আমিই ধারণ করে আছি, সেইজন্য আমি *ধাতা*। যত জীবজন্তু আছে, এরা যে খাওয়া-দাওয়া পাচ্ছে, হজম হচ্ছে, বেঁচে আছে, ভগবান আছেন বলেই সব সম্ভব হচ্ছে। শুধু তাই না, তিনি আবার বিধাতা। বিধাতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আচার্য বলছেন, *কর্মফলস্য প্রাণিভ্যো বিধাতা,* যে যেমন কর্ম করছে, সে সেই কর্মের ফলটা পায়। তিনি *ধাতা,* তাই সবাই যে যার নিজের কর্মফলটা পেয়ে যায়, তিনি যদি ধাতা রূপে না থাকতেন, তাহলে এই জিনিস সম্ভব হত না। আমি যে কর্মটা করেছি, আমি সেই কর্মের ফল পাব; আপনি যে কর্ম করেছেন, আপনি সেই কর্মের ফলটা পাবেন।

তার সাথে তিনি আবার *পিতামহ,* অর্থাৎ বাবারও বাবা। আমার যিনি বাবা, তিনি তাঁরও বাবা। কিছু কিছু ভাষ্যকাররা এর আর-একটা অর্থ করেন, প্রকৃতিকে যদি মা রূপে দেখা হয়, প্রকৃতির বাবা হলেন ভগবান, সেইজন্য তিনি পিতামহ। ভগবান সবার শুধু বাবা না, তিনি আবার সকলের ঠাকুরদা, দাদু। ভগবানকে পিতামহ রূপে দেখা, এটা আর কোথাও পাওয়া যায় না। খুব মধুর একটা সম্পর্ক। ভগবান প্রকৃতির অধ্যক্ষ কিনা, প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব, তিনি হলেন পরা প্রকৃতি, তিনিই আবার অপরা প্রকৃতি, তিনি হলেন অধ্যক্ষ, যার জন্য সবাই যে যার নিজের কর্মফল পেয়ে যায়। আর প্রকৃতিকে তিনি সৃষ্টি করেছেন বলে তিনি পিতামহ।

বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার, বেদ্যং মানে *বেদিতব্যং*, এই জগতে জানার মত একটাই জিনিস আছে, সেটা হল ভগবান। ঠাকুর বলছেন, এক জানার নাম জ্ঞান, সেই এক ভগবান। বহু জানার নাম অজ্ঞান। ঈশ্বর ছাড়া জানার কিছু নেই কিনা। আমরা কি করব, আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, এগুলোর মধ্যে আমরা এমন জড়িয়ে আছি, কিছু করার থাকে না। আমাদের টাকা-পয়সার দরকার, আমাদের আহার নিদ্রা দরকার। অনেক চেতনা হলে গিয়ে তবে মনে হয়, ঈশ্বরকেই জানতে হবে, ঈশ্বর ছাড়া জানার কিছু নেই। *পবিত্রম্*, একমাত্র ঈশ্বরের নামই সব পবিত্র করে দেয়। গঙ্গাজল যেভাবে পবিত্র করে, ঠিক সেইভাবে ঈশ্বরের নাম পবিত্র করে। ওঁ, ওঙ্কার, অ, উ আর ম মিলে যে ওঁ, ওঁ ভগবান নিজে। ঋক্, সাম ও যজু এই তিনটে বেদও ভগবান নিজে। যজ্ঞে ঋক্, সাম ও যজু তিনটে বেদই দরকার, আর অথর্ব বেদের যিনি পণ্ডিত তাঁকে যজ্ঞে সুপারভাইজ করার জন্য থাকতে হয়, তাঁকে বলা হয় ব্রহ্মা। অথর্ব বেদ সরাসরি যজ্ঞে লাগে না, সেইজন্য প্রায়ই অথর্ব বেদের নাম থাকে না, এবং তাই বেদকে অনেক সময় ত্রয়ী বলা হয়। একটি শ্লোকের মধ্যে ভগবান কত কিছু বলে দিচ্ছেন, তিনি বাবা, তিনি মা, তিনি বিধাতা, তিনি ঠাকুরদা, তিনিই বেদ্য, তিনিই পবিত্রকর্তা, তিনি ওঙ্কার আবার তিনি ঋক্, সাম ও যজু। জগতে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, পবিত্র সেটা তিনি। দশম অধ্যায়ে এই জিনিসগুলিকে আরও বিস্তারে বলবেন।

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।।১৮।।

(আমি প্রাণীর পরা গতি ও পরিপালক। আমি প্রভু ও সকল প্রাণীর বাসস্থান ও তাদের কৃতাকৃতের সাক্ষী। আমিই রক্ষক ও প্রত্যুপকারনিরপেক্ষ হিতকারী। আমিই স্রষ্টা ও সংহর্তা। আমিই আধার ও প্রলয়স্থান এবং আমিই জগতের অক্ষয় কারণ।)

এতক্ষণ সমষ্টির দৃষ্টি থেকে বলা হল, এবার ব্যষ্টির দৃষ্টি থেকে বলছেন। *গতিঃ*, কর্মফলকে গতি বলে, যত কর্মফল আছে, সেটা তিনি। যিনি পোষণ করেন তাঁকে বলা হয় *ভর্তা*, যেখান থেকে ভাতার শব্দ এসেছে। *প্রভুঃ*, তিনি সবারই মালিক, সবারই স্বামী। তিনি সবারই ভিতর অন্তর্যামী হয়ে *সাক্ষী* রূপে আছেন। তিনি সবাইকে দেখে যাচ্ছেন, যে যত কর্ম করছে, সাক্ষী রূপে সবার কর্মকে দেখে যাচ্ছেন, কিন্তু কোথাও তিনি হস্তক্ষেপ করবেন না, কারণ তিনি সাক্ষী। *নিবাসঃ*, যেখানে সবাই বাস করে, তিনি সমস্ত প্রাণীর নিবাস। এটা খুব মজার, একদিকে ভগবান সবারই ভিতরে আছেন, আবার আমরা সবাই ভগবানের মধ্যে বাস করি। যদি আমরা কল্পনা করি, বরফের একটা গ্লাশ আছে, সেই গ্লাশের মধ্যে জল আছে, সেই বরফের গ্লাশ আর জল নদী বা সমুদ্রের মধ্যে ডুবানো আছে। তখন জিনিসটা এই রকমই হবে, গ্লাশের ভিতরেও জল, গ্লাশের বাইরেও জল। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা হল, বাকিটা একটু চিন্তন করলেই আমরা পেয়ে যাব। *শরণং*, সবাইকে যিনি শরণ দেন, বা মানুষ যাঁর কাছে গিয়ে নিশ্চিন্তে শরণ নেয়। যাঁরা আর্ত, খুব কষ্টে আছেন, তাঁরা ঈশ্বরের শরণ নেন। *সুহৃৎ* শব্দটা খুব নামকরা শব্দ, যিনি ভাল করেন। আচার্য সুহৃৎ শব্দের সংজ্ঞায় বলছেন, *প্রত্যুপকারানপেক্ষ*। আমরা কারুর ভাল করার সময় আশা করি তিনিও আমার ভাল করবেন। কাউকে ভালবাসলে আমরা আশা করি, সেও আমাকে ভালবাসবে। সুহৃৎ এমন একজন, যিনি ভাল করে যাবেন, কিন্তু কোন প্রত্যাশা থাকে না। যেমন মা, মায়েদেরও চাহিদা থাকে, বড় হয়ে আমাকে দেখবে। কিন্তু কিছু মানুষ থাকেন, যিনি সত্যিকারের আমার আপনার সবার ভাল করতে চান, বিনিময়ে কিছু চান না, এনারাই প্রকৃত সুহৃৎ। আগেকার দিনে গ্রাম দেশের বড়রা সত্যিকারের সবারই ভাল চাইতেন; সব সময় খোঁজ নিচ্ছেন, কেমন আছ, কেমন চলছে, এনারা সুহৃৎ।

প্রভবঃ, থেকে থেকে যেখান থেকে জগতের উৎপত্তি হয় আর *প্রলয়ঃ*, যেখানে সব কিছুর লয় হয়। একটি শ্লোকের মধ্যে কত আইডিয়া দিচ্ছেন। *স্থানম্*, নিবাস যেমন ঠিক তেমনি স্থান, যেখানে

সবাই নির্ভাবনায় স্থিত হয়ে থাকতে পারছে। *নিধানং*, নিধানের সংজ্ঞায় আচার্য বলছেন, *কালান্তরোপভোগ্যং প্রাণিনাম্*। মানুষ নানান রকম যে কর্ম করে, সেই কর্মের যে ফল, এটা যেন কর্মফলের একটা ভাণ্ডার, ঐ ভাণ্ডার থেকে সব প্রাণীরা নিজের নিজের কর্মফল পায়। আমি যে আজ দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছি, আগে আমার যেমন কর্ম করা ছিল, সব কর্মের ফল ভগবানের কাছে রাখা আছে। আবার যারা এখন ভাল যা কিছু পাচ্ছে, যার আজকে টাকা-পয়সা আছে, মান-সম্মান আছে, তার আগে আগে অনেক ভাল কাজ করেছিল, সেটা ভগবানের ভাণ্ডারে রাখা আছে, এই ভাণ্ডারকে বলে *নিধানম্*। এখন যার টাকা-পয়সা আছে, কিন্তু দান দক্ষিণাদি যদি না করে, যদি অপরের জন্য চিন্তা-ভাবনা না করে, আস্তে আস্তে এই টাকা-পয়সা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু দান ধ্যান যদি করতে থাকে, তাহলে ওটা বাড়বে। আর বলছেন, *বীজমব্যয়ম্*, তিনি হলেন বীজ, যে বীজের নাশ হয় না। প্রলয় হয়ে যায়, আবার সেই অব্যয় বীজ থেকে সৃষ্টি এসে যায়। এই হল ভগবানের স্বরূপ, কত রকম আইডিয়া নিয়ে আসছেন।

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন।।১৯।।

(সূর্যরূপে আমি উত্তাপ বিকিরণ করি এবং জল আকর্ষণ ও বর্ষণ করি। আমি অমরগণের অমৃত ও মর্ত্যগণের মৃত্যু এবং আমি স্থূল ও সূক্ষ্ম বস্তু।)

এই যে বললেন *বীজমব্যয়ম্*, সৃষ্টির পরম্পরা কখন নাশ হয় না। এই সৃষ্টি কিভাবে চলে? বলছেন, *তপাম্যহমহং*, আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, আট মাস ধরে আমি জলকে শোষণ করি, চার মাস ধরে আমি সেই জলকে বৃষ্টির ধারাতে ধরাতে নামাই। এনারাও পর্যবেক্ষণ করে দেখেছিলেন, চার মাস হল বৃষ্টির মাস, বাকি আট মাস পুকুর, খাল, বিল, নদী, সমুদ্র থেকে শুধু জল শোষণ করে যায়। *নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ*, *নিগৃহ্ণামি* মানে টেনে নেওয়া, আর *উৎসৃজামি* মানে ছেড়ে দেওয়া। ভগবান বলছেন, আমিই এই জলকে শোষণ করে টেনে নিচ্ছি, আর বৃষ্টি রূপে যে বারিধারা নেমে আসছে সেই বর্ষণটাও আমিই করে থাকি। লোকেরা বলে জীবনে কত দুঃখ-কষ্ট। একবার ভেবে দেখুন, সুখটাও তিনিই দিচ্ছেন, দুঃখটাও তিনিই দিচ্ছেন। প্রখর গ্রীষ্মের দাবদাহ, সেটাও ভগবান, আবার অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় ধরার বুকে যে শান্তির বারি সিঞ্চন করছেন, সেটাও ভগবান, আবার ঋতুরাজ বসন্ত, সেটাও ভগবান। সমস্যা হল, আমাদের এগুলো বোধ হয় না।

বাড়িতে শিশুর জন্ম হলে কত আনন্দ, কারুর মৃত্যু হলে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। এটাও ভগবান দিয়েছেন, ওটাও ভগবান দিয়েছেন। বোঝার ক্ষমতাটাই আমাদের নেই। ইমোশানালি আমরা এত ঠুনকো যে, একটুতে ভেঙে পড়ি, আবার একটুতেই উচ্ছসিত হয়ে উঠি। ঈশ্বরকে বিশ্বাস করার জন্য বুকের পাটা লাগে, সাধনা করার জন্য বুকের পাটা লাগে। মেয়েরা এসে বলে, আমি নিতান্ত এক গৃহবধূ। গৃহবধূ নিতান্ত হবে কেন, তার কি বুকের পাটা নেই, তাহলে শ্রীশ্রীমা কি ছিলেন, তিনিও তো গৃহবধূ, আবার গ্রামের লেখাপড়া না জানা একজন গৃহবধূ ছিলেন। কিন্তু আজ ভক্তরা তাঁর পূজা করছেন। আমরা আসলে একটা ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছি, স্বামী, স্ত্রী, সন্তান নিয়ে একটা ছোট্ট পরিবার, টুনটুনি পাখির ছোট্ট একটা বাসা, ওর মধ্যে আমরা বাস করছি। বাইরে গিয়ে পরিবারের জন্য এক দানা খাবার এনে মনে করছি জগৎ জয় করে এনেছি। ঋষি, মুনিরা এত কথা বলেছেন, শাস্ত্র এত কথা বলেছেন, শোনার ইচ্ছেই হয় না।

অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ, দেবতারা যে অমৃত পান করে আপেক্ষিক অমরত্ব পান, এই অমৃত আমি। আর মর্ত্যলোকের যে মৃত্যু, এই মৃত্যু ভগবান নিজে। আগেকার দিনে গুটি বসন্ত হলে শীতলা মায়ের থানে লোকেরা পূজা দিতেন, ইদানিং কালেও জল বসন্ত বা বাচ্চাদের হাম হলে শীতলা মার পূজা দেন, বসন্ত হয়েছে মানে মা এসেছেন, মৃত্যুরূপিণী মা। আর বলছেন, *সদসচ্চাহমর্জুন*, সৎ আর অসৎ

দুটো শব্দ আনছেন। সৎ মানে, সব কিছুর মধ্যে সত্যিকারের যে একটা সম্পর্ক, আর অসৎ মানে যেখানে কোন সম্পর্ক নেই, সৎএর বিপরীত। আচার্য তাঁর ব্যাখ্যাতে সৎ আর অসৎকে নিয়ে বলছেন, *ন পুনঃ অত্যন্তম্ এব অসদ্ ভগবান্ স্বয়ং*, সৎ বলতে বোঝায় একটা বস্তুর সাথে আরেকটা বস্তুর সম্পর্ক, আবার এমন আছে যার একটার সাথে আরেকটার কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক যেটা হয় এটাও যেমন ঈশ্বরের জন্য আর সম্পর্ক নেই এটাও ঈশ্বরের জন্য, এটা ভগবান নিজে। কিন্তু ভগবান কখন অত্যন্ত অসৎ নন, বলতে চাইছেন ভগবান নেই এটা কখনই হয় না।

যাঁরা জ্ঞানী, যাঁরা উপাসক, এই যতগুলো জিনিসের কথা বলা হল, এর মধ্যে একটাকে নিয়ে বা সব কটাকে নিয়ে যখন কেউ উপাসনা করে এগোন, তখন তাঁরা বিজ্ঞান রূপে আমাকে পান। আমাদের কাছে এসে অনেক ভক্ত বলেন, মহারাজ ঠাকুরের দর্শন পাচ্ছি। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে বলে দিই, একজন ভাল মাথার ডাক্তার দেখান। ঈশ্বরদর্শন হল বিজ্ঞান রূপে। নির্বিকল্প সমাধি ছাড়া, খুব হলে সবিকল্প সমাধিতে যে ঈশ্বরীয় জ্ঞান হয়, এই ঈশ্বরজ্ঞান ছাড়া আর যত ঈশ্বর জ্ঞান হয়, সবটাই হল mental projection। কখন হয় মনের প্রজেকশান, আর কখন হয় মনের পাগলামিতে। আমাদের এত সাধু সন্ন্যাসীরা সব কিছু ছেড়ে এসে এত কিছু করছেন, আমরা কারুর শুনিনি যে তাঁদের কারুর ঠাকুরের দর্শন হয়েছে। কি করে যে ভক্তরা এসে বলে, আমার ঠাকুরের দর্শন হয়েছে। ঠাকুর বলছেন, একদিকে তাঁতি আবার লম্বা লম্বা কথা। আমাদের এখানেও কারুর কারুর হতে শুনি, তাঁদেরকে পাগলদের ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কারণ যাঁর দর্শন হয়, তাঁর এটা ধরে রাখারও ক্ষমতা আসে। তাঁর জীবন দেখে, কথাবার্তা শুনে বোঝা যায় যে তাঁর হচ্ছে। তাঁকে বলে বেড়াতে হয় না। আবার অনেক আছেন, পূজা অর্চনা করেন, কিন্তু বাসনা যুক্ত। আমাদের বেশির ভাগই যে পূজা অর্চনা, এটা বাসনা যুক্ত।

আগেকার দিনে ব্রাহ্মণরা, ক্ষত্রিয়রা, বৈশ্যরা, অনেকেই ছিলেন, তাঁরা যে যাগযজ্ঞ ও উপাসনাদি করতেন, এই সব করার পিছনে তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল স্বর্গপ্রাপ্তি। এখানে যা ভোগ করলাম, সেই ভোগ একটু ত্যাগ করছি যাতে আমরা স্বর্গে আরও ভোগ করতে পারি। পরের শ্লোকে ভগবান তাদের কথাই বলছেন।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পূণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্।।২০।।

(ত্রিবেদজ্ঞগণ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমাকে আরাধনা করে যজ্ঞাবশিষ্ট সোমরসপানে পাপমুক্ত হন এবং স্বর্গকামনা করেন। তাঁরা পূণ্যকর্মের ফলস্বরূপ ইন্দ্রলোক লাভ করে অপ্রাকৃত দেবভোগ উপভোগ করেন।)

যাঁরা বেদ জানতেন, ঋক্, সাম্, যজু জানতেন, তাঁরা কি করতেন? তাঁরা বেদের বিভিন্ন যজ্ঞ করতেন, যজ্ঞে দেবতাদের উদ্দেশ্যে সোমরস আহুতি দিতেন। দেবতারা সেই সোমরস পান করতেন, সোমরস পান করার জন্য তাঁরা শক্তি পেতেন। আর ঋষিরা যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও সোমরস পান করতেন, সোমরাস পানে দুজনেরই সব পাপ নষ্ট হয়ে যেত। এখানে বলছেন, *ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা*, সোমরস পান করে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে গেছে। সোমরস কি ছিল এখন আর কারুর জানার উপায় নেই, আগেকার দিনে হয়ত কিছু ভেষজ জাতীয় কোন পানীয় ছিল। যজ্ঞের সময় সোমরস পান করে দেবতারা, ঋষিরা পবিত্র হয়ে যেতেন। এনারা ছিলেন সকাম পুরুষ, আমরা যেমন বাসনা সহিত পূজা অর্চনা করি। অন্য দিকে দেবতারা ছিলেন, তাঁরা সোমরস পান করে শক্তি পেতেন।

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণরা এই যে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি করতেন, দেবতাদের যে পূজা আদি করা হত; সব কিছুতে এনাদের উদ্দেশ্য ছিল স্বর্গপ্রাপ্তি। বেদে কর্মকাণ্ড আছে, আবার জ্ঞানকাণ্ডও আছে। কর্মকাণ্ড দিয়ে যজ্ঞাদি হত, এই যজ্ঞ দিয়ে মানুষ স্বর্গে যাওয়ার কামনা করতেন। আমরা যে এখন জপধ্যান করছি, ভক্তি করছি, আমরাও একই গ্রুপের, অজান্তায় আমরা এই পৃথিবীতেই স্বর্গ চাইছি। যখন ঠাকুরকে বলছি, হে ঠাকুর বড় কষ্টে আছি, সেখানে আমরা অজান্তায় এই পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ চাইছি। ভগবান আমাদের কৃপা করবেন কিনা জানা নেই, তিনি আমাদের টাকা-পয়সা দেবেন কিনা জানা নেই, তিনি আমাদের রোগমুক্ত করে সুস্বাস্থ্য দেবেন কিনা জানা নেই, কিন্তু অজান্তেই আমাদের মন কামনার মধ্যে ঢুকে আছে, স্বর্গটা যেন এই পৃথিবীতে নেমে আসে। তারপর অনেক দিন পর বলব, এত দিন জপধ্যান করলাম কিছুই তো হল না। হবে কোথা থেকে! আমাদের চাহিদাটাই তো ভুল, *ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে*, এখানে প্রার্থনাটাই হল স্বর্গে যাওয়ার জন্য, আর আমাদের প্রার্থনা হল স্বর্গটা যেন এখানে নেমে আসে। তখন কি হয়?

তে পূণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্, এই যে যজ্ঞ করছেন, দেবতাদের আরাধনা করছেন, এই সব করে তাঁরা যে পূণ্য লাভ করেন, সেই পূণ্যের জোরে তাঁরা মৃত্যুর পর স্বর্গে অবশ্যই পৌঁছে যান। কিন্তু স্বর্গ কারুর permanent address হতে পারে না। পূণ্য যত দিন আছে তত দিন থাকবে। স্বর্গ সুখ ভোগ করতে করতে পূণ্যটা যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন স্বর্গ থেকে থেকে তার আবার পতন হয়ে যাবে।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পূণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামাকামা লভন্তে।।২১।।

(তাঁরা সেই বিপুল স্বর্গলোক উপভোগ করে পূণ্যক্ষয় হয়ে গেলে মর্ত্যলোকে ফিরে আসেন। এই ভাবে ত্রিবেদোক্ত ধর্মের অনুষ্ঠান করে ভোগকামী ব্যক্তিগণ সংসারে যাতায়াত করেন।)

স্বর্গে গিয়ে অনেক দিন ধরে তাঁরা সুখভোগ করেন। স্বর্গে কেউ নূতন করে কর্ম করতে পারে না, কর্ম একমাত্র মর্ত্যলোকেই হয়, পৃথিবীতেই মানুষ পূণ্য কর্ম করে পূণ্য সঞ্চয় করতে পারে। স্বর্গে নূতন করে আর পূণ্য সঞ্চয় করার উপায় নেই। তাই যে পূণ্যের জোরে স্বর্গে গিয়েছিলেন, সেই অর্জিত পূণ্যটাও ক্ষয় হতে হতে এক সময় নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন সেখান থেকে আস্তে করে তাঁর পতন হতে শুরু হয়ে। যখন পতন হয়, তখন তাঁর দুঃখ হতে থাকে। এই মর্ত্যলোকে ফিরে আবার যজ্ঞ করতে শুরু করে, পূণ্য সঞ্চয় করে আবার স্বর্গে যায়, আবার সেখান থেকে পতন হয়, এই জিনিস চলতেই থাকে। এই চক্রটা কখন শেষ হয় না, ফলে এনারাও কোন দিন মুক্ত হতে পারেন না। যজ্ঞের যে ফল স্বর্গপ্রাপ্তি রূপে, এটাও ভগবান দেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে ভগবান অবশ্যই ফলে দেবেন, যদি তাঁর অতটুকু পূণ্য থাকে। কখন তিনি এ্যাড্ভান্স দিয়ে দেন, পরে কেটে নেন। কিভাবে কি হয়, আমরা কিছু জানি না; শাস্ত্রে যতটুকু আছে ততটুকুই বলা হচ্ছে। জগতের সাথে মেলাতে গেলে কোনটার সাথেই কোনটা মেলানো যাবে না। যদি কেউ বলেন কিছু হয়, তারও উত্তর দিয়ে দেওয়া যাবে; আর যদি কেউ বলেন কিছু হয় না, তারও উত্তর দিয়ে দেওয়া যাবে। এগুলোকে খুব বেশি আক্ষরিক ভাবে নিতে নেই, শাস্ত্রে যেমনটি আছে তেমনটি রেখে আসল উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া। উদ্দেশ্য কি?

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।২২।।

(আমাকেই (শ্রীভগবানকেই) আত্মভাবে চিন্তাপূর্বক যে সর্বত্যাগিগণ আমার ধ্যান করেন, সেই নিত্য-সমাহিত মুমুক্ষুগণের যোগ ও ক্ষেম আমি বহন করি।)

এটিও খুব সুন্দর শ্লোক, বাইশ নম্বর শ্লোক অবশ্যই আমাদের সবার মুখস্ত করে রাখা উচিৎ। এতক্ষণ যে বলা হল, স্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা, পূজা করা, আমার রোগব্যাধির নিরাময় হোক, আর্থিক সচ্ছলতা হোক, ছেলের চাকরি হোক, মেয়ের সুপাত্রে বিবাহ হোক, করোনা থেকে বিশ্ব মুক্ত হোক –এগুলো সব বন্ধ করে *অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং*, একমাত্র ঈশ্বরের চিন্তন করা।

যে জনাঃ পর্যুপাসতে, যে অনন্য চিত্তে একমাত্র আমার চিন্তা করে, ঠাকুর যেমন বলছেন, মাইরি বলছি আমি ঈশ্বর বই কিছু জানি না; *তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং*, এই ধরণের যাঁরা নিত্যযুক্ত, যাঁরা পরমার্থ জ্ঞানী, তাঁদের *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*, যোগের জন্য তাঁর যা কিছু দরকার, আমি তা আমার কাঁধে বহন করে নিয়ে যাই। ভগবান বলছেন, আমি নিজে বহন করে নিয়ে যাই। যোগ মানে, অপ্রাপ্ত বস্তু, যেটাকে পাওয়া হয়নি, ওই অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তিকে বলে যোগ। আর যেটা পেয়ে গেছি, সেটাকে ধরে রাখাকে বলে ক্ষেম –এই হল যোগক্ষেম শব্দের অর্থ। যোগ মানে পাওয়া, আর ক্ষেম মানে সেটাকে ধরে রাখা। আমরা অনেক সময় খেটেখুটে একটা কিছু পেলাম, কিন্তু ওটা কখন হাত থেকে চলে যায় টেরও পাওয়া যায় না; কারণ ক্ষেম নেই। পাওয়া আর ধরে রাখা, ভগবান বলছেন, *অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং*, যার মন সব সময় ঈশ্বরে থাকে, তার যোগ আর ক্ষেম আমি নিজে বহন করে নিয়ে যাই।

যাঁরা উচ্চমার্গের ভক্ত, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁদের যোগ আর ক্ষেম ভগবান নিজে বয়ে নিয়ে যান। তাহলে সাধারণ ভক্ত, সাধারণ মানুষ যারা আছে, তাদের কে দেন? বলছেন, তাঁদেরও ভগবানই দেন। একজন রিক্সাচালক, রিক্সা চালিয়ে যে আয় করছে, সেটাও ভগবানই দিচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা হল, পঞ্চবটীতে যদি একটা কুঠিয়া হত বেশ নিরালায় সাধন ভজন করা যেত। একদিন দেখেন কুঠিয়া তৈরীর যা যা দরকার, বাঁশ-বাখারি, দড়ি সব সরঞ্জাম বানের জলে ভেসে পঞ্চবটীর ঘাটে এসে লেগে আছে। ভগবান বাকিদের যা দেন, কর্মফল রূপে দেন, তুমি কর্ম করলে পাবে। শিশু তিন চার বছর হয়ে গেলে নিজের হাত দিয়ে খায়, বেশি আবদার করলে, মা কখন সখন নিজে খাইয়ে দেন। কিন্তু যে একেবারে অবোধ শিশু, তাকে মা সব সময় নিজের হাতে সরাসরি খাইয়ে দেন। ঠিক এই জিনিসটাকে এখানে বলছেন।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে, মন যাদের পুরোপুরি ভগবানে ঢুকে গেছে, ভগবান নিজেই তাদের যোগ আর ক্ষেম বহন করে নিয়ে যান। তাকে বলতে হবে না, হে ভগবান আমার এটা লাগবে, তিনি নিজেই সেটা নিয়ে আসবেন। ঠাকুর বলছেন, ঠিক ঠিক ভক্ত সে যেন রাজার ব্যাটা, তার মাসোয়ারা ঠিক ঠিক সময় চলে আসে, তার যা যা দরকার নিজে থেকেই সব চলে আসে। আসছে না মানে, তার ভক্তির অভাব আছে। ভগবানের কাছে তাকে চাইতে হচ্ছে, তার মানে ভক্তির অভাব। যদি ঠিক ঠিক ভক্তি থাকে, তাহলে তাকে চাইতে হবে না, তিনি তার যা দরকার দিয়ে দেবেন।

এই শ্লোককে আধার করে খুব সুন্দর একটা কাহিনী আছে। অনেক আগেকার কাহিনী। তখনকার দিনে হাতে পাণ্ডুলিপি লেখা হত। একবার এক পণ্ডিত গীতার উপর টীকা লিখছিলেন। *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*, আমার ভক্তের যা কিছু দরকার আমি নিজে বয়ে নিয়ে যাই, এই শ্লোকে এসে পণ্ডিত ধন্দে পড়ে গেছেন। পণ্ডিতের মনে হল এই লাইনটাতে নিশ্চয় একটা ভুল আছে, *বহাম্যহম্* কি করে হবে, *দদাম্যহম্* হবে, মানে আমি তাকে দিয়ে থাকি। পণ্ডিত *বহাম্যহম্* শব্দটা কেটে ঐ জায়গায় *দদাম্যহম্* বসিয়ে দিলেন; পণ্ডিত নিশ্চিত হয়ে ভাবছেন, এবার ঠিক আছে।

আগেকার দিনের ব্রাহ্মণ মানে বাড়িতে আনাজপাতি, খাবার-দাবার কিছু থাকত না। পণ্ডিত ব্রাহ্মণীকে বললেন, ‘ঘরে তো কিছু নেই, দেখি পাশের গ্রামে যজমানদের কাছে গিয়ে যদি কিছু পাই’। আগেকার দিনের সৎ ব্রাহ্মণ, ভিক্ষা করেই দিন চলত। ব্রাহ্মণ দূরে এক গ্রামে চলে গেলেন, কিছু যদি পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণী দেখছেন, সুন্দর দেখতে একটি অল্প বয়সী ছেলে মাথায় একটা টুকরি করে চাল, ডাল, আনাজ সব বয়ে নিয়ে ব্রাহ্মণের দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। ব্রাহ্মণী জিজ্ঞেস করেছেন, ‘এগুলো কি, কে দিয়েছে’? ছেলেটি বলল, ‘আপনার স্বামী এগুলো পাঠিয়েছেন, আমি মুটে, এগুলো বয়ে নিয়ে আসছি’। ব্রাহ্মণী ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না, এত সুন্দর ছেলে মুটেগিরি করে। টুকরিটা নামাতে গিয়ে ব্রাহ্মণী দেখছেন, ছেলেটির পিঠে লম্বা লম্বা আঘাতের চিহ্ন। ব্রাহ্মণী জিজ্ঞেস করলেন, ‘বাবা তোমার পিঠে এই দাগগুলো কিসের’? ছেলেটি বলছে, ‘আমি কথা শুনছিলাম না, আপনার স্বামী তাই আমাকে মেরেছেন, এটা সেই মারের দাগ’। ‘এ হতেই পারে না, আমার স্বামী কাউকে কক্ষণ মারতে পারেন না, প্রশ্নই নেই’। ‘না না, সত্যিই তিনি আমাকে মেরেছেন’। যাই হোক, সব জিনিসপত্র রেখে ছেলেটি চলে গেল।

বিকেল বেলা ব্রাহ্মণ ফিরে এসেছেন। খুব হতাশ হয়ে ব্রাহ্মণীকে ডেকে বলছেন, ‘শুনছো আমি তো কিছুই পেলাম না’। ব্রাহ্মণী অবাক, ‘পেলাম না মানে, এত জিনিসপত্র পাঠালে’। সংক্ষেপে ব্রাহ্মণী সব কিছু বলে বলছেন, ‘ছেলেটাকে তুমি কত মেরেছ, ওর পিঠে কালশিটে দাগ পড়ে গেছে’। এই কথা শুনে পণ্ডিতের চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরতে শুরু হল। ভগবান নিজে সব কিছু বহন করে এনেছিলেন, আর আমি যে কলম দিয়ে কেটে *বহাম্যহমকে দদাম্যহম্* করেছিলাম, এই কলমের আঁচড়টাই তাঁর শরীরে ক্ষত তৈরী করে দিয়েছে। এগুলো আমাদের পরম্পরাগত কাহিনী, এর সত্যি মিথ্যে আমাদের জানা নেই। যাঁরা ঋষি ছিলেন, যাঁরা শাস্ত্রের উপর এই রকম টিকা-টিপ্পণি লিখেছেন, তাঁদেরকে ঐ সম্মানের দৃষ্টিতেই দেখা হয়। কিন্তু এই কাহিনী খুব সুন্দর ভাবে গীতার এই বাইশ নম্বর শ্লোকের ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে, ভগবান তাঁর নিজের অনন্যচিত্ত ভক্তকে কিভাবে দেখেন।

এই যে অন্যান্য দেবতাদের পূজা করা হয়, আর ভগবানও মাঝে মাঝে বলছেন, এই দেবতারাও আমি। তাহলে অন্যান্য দেবতাদের পূজা করাটা কি ঠিক? এই বিষয়ের উপরেই পরের শ্লোক শুরু হয়।

পরের শ্লোক শুরু করার আগে সংক্ষেপে একটা দুটো সহজ কথা বলে নিতে হয়। সন্ন্যাসী হোক, সংসারী হোক, ভারতের লোক হোক, আমেরিকার লোক হোক, আমরা সবাই যদি একটু বিচার করে দেখি, তাহলে দেখা যাবে; জীবনে যা কিছু পাওয়ার আমরা তিরিশ পয়ত্রিশ বয়স হতে হতেই সব উপলব্ধি করে নিই, চল্লিশ পর্যন্তও যায় না। এই যে বলা হয়, বল বুদ্ধি ভরসা তিরিশ পেরোলেই ফর্সা, একেবারে ঠিক বলছেন। কারণ আমাদের জীবনে যা কিছু পাওয়ার তিরিশের মধ্যেই পেতে হবে, বর্তমান কালে পয়ত্রিশ বলা যেতে পারে। ইদানিং দেখা যায় চল্লিশ বছরেও অনেকে বিবাহ করছে, সেটাও একটা উপলব্ধি। সেইজন্য পয়ত্রিশ পর্যন্ত ধরা যেতে পারে। এরপরে মানুষ যেটা করে, এটা পুরোপুরি নিউটনের গতির সিদ্ধান্তে চলে, একটা জিনিস যখন চলতে থাকে তখন সেটা মোমেন্টামে চলতে থাকে, তার inertiaতে চলতে থাকে, inertia of motion চলতেই থাকে। নিজের জীবনেই যদি আমরা বিচার করে দেখি, যাঁরা চল্লিশ পেরিয়ে গেছেন, আর যাঁরা চল্লিশের উপরে আছেন, তাঁরা পয়ত্রিশের পরে কি উপলব্ধি করেছেন? সন্তান যদি হয়ে থাকে, সেটাও চল্লিশের আগেই হয়েছে। এরপরে আসে সন্তানকে বড় করা, সেখান থেকে আসে সন্তানের পড়াশোনার ব্যবস্থা করা, সন্তানকে সংসারে একটা স্থিতিশীল অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া, এগুলো সবই সে নিজের মোমেন্টামে করছে, তার নিজের জন্য আর কিছু হচ্ছে না। নিজের জন্য যা কিছু, বিদ্যার্জন, টাকা-পয়সা আয় করা, চল্লিশ হতে হতেই যথেষ্ট। এরপরে যেটা হয়, সেটা পুরোটাই মোমেন্টামে চলে।

মোমেন্টামে চলার অর্থ হল, ঠাকুর খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন, ঠাকুরের বর্ণনা এত সুন্দর, এত সহজ, এত ভাল ভাবে বোঝা যায়, অন্য কিছু দিয়ে এমনটা বোঝান যাবে না। গ্রাম দেশে আগেকার দিনে যাত্রা হত। যাত্রা দেখার জন্য টিকিট লাগত না, কিন্তু প্যালা দিতে হত। গ্রামের একজন যাত্রা দেখতে গেছে, সে শুনল এখানে প্যালা দিতে হয়। লোকটি মুখ লুকিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে অন্য জায়গায় যাত্রা দেখতে চলে গেল। সেখানে গিয়ে শুনল, এখানে প্যালা দিতে হবে না। সে তখন সবাইকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে সামনে গিয়ে বসল। কারণ ফ্রীতে যাত্রা দেখবে। এই তিরিশ পয়ত্রিশ হল ফ্রীতে যাত্রা দেখার মত। তাকে যে করেই হোক, ধাক্কাধাক্কি করে, যো সো করে হোক সামনে গিয়ে বসতে হবে।

লোকেরা যখন বলে, আমি কি বুড়ো হয়ে গেছি যে গীতা শুনব! ঠিকই বলে, ভুল কিছু বলছে না। কিন্তু লোকেরা এটা বুঝতে পারে না যে, তিরিশ থেকে পয়ত্রিশ হয়ে যাওয়া মানে সে বুড়োদের দলে চলে গেল। এখন তো চল্লিশ বছরের লোকেদের মাঝবয়সী বলাই হয়, আর কিসের ইয়ং। আগে তিরিশ ছিল, এখন খুব বেশি হলে পয়ত্রিশ, লোকেদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে আর বেশি উপার্জন করছে বলে। পয়ত্রিশে জীবনকে যদি অন্তর্মুখী না শুরু করা হয়, বাকী জীবনে কান্না ছাড়া আর কিছু থাকবে না। খেলাতে ইয়েলো কার্ড, রেড কার্ড দেখানো হয়, পয়ত্রিশ থেকে কার্ড দেখানো শুরু হয়ে গেল। চল্লিশে যদি অন্তর্মুখী জীবন না ধরে নেওয়া হয়, তার জন্য রেড কার্ড এসে গেছে। আমরা বেশ কিছু বয়স্ক মানুষদের জানি, যাঁরা ধর্মপ্রাণ, ঠাকুরের প্রতি বিরাট শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, নিয়মিত জপধ্যান, শাস্ত্র পাঠ করা আছে। কিন্তু জীবনে তাঁর অশান্তির শেষ নেই। কারণ সময় থাকতে জীবনকে অন্তর্মুখী করেননি।

আমি অনেক মহারাজের সাথে মিশতাম, ফলে অনেকের কাছেই বিভিন্ন কথা শিখেছি। তবে সব কথা তো জীবনে লাগানো যায় না। তবে শুনেছি প্রচুর। আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন, উনি এটাই অন্য ভাবে বলতেন। দেখো ভাই, 'তোমার ভিতরে যে রজোগুণটা আছে, যে রজোগুণ মানুষকে কাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, এটা চল্লিশ পর্যন্ত তোলপাড় করবে। চল্লিশ পর্যন্ত সাধু সন্ন্যাসীরা সহজে ধ্যান করতে পারেন না। করেন বটে, গুরু আদেশ করেছেন, সেটা পালন করে চলেছেন। কিন্তু সাধনা বলতে ঠিক ঠিক যেটা বোঝায়, সেটা যাঁরা খুব উচ্চমার্গের সাধু, স্বামী ভূতেশানন্দজী এবং অন্যান্য অনেক মহারাজদের কথা আমরা জানি, তাঁরাই ঐ সাধনা করতে পারেন, সবাই পারেন না'। সেই মহারাজ বলছেন, 'যেই চল্লিশ হয়ে গেল, রজোগুণের তোড় তখন কমে গেল, এরপর কিন্তু ভিতরে ঢুকতে শুরু করো। আর এটা সব সময় মনে রাখবে, বাইরের জগতে তোমার পাওয়ার আর কিছু নেই। বিদ্যার্জন যা করার করে নিয়েছ, কাজকর্ম যেটা করতে হত সেটাও হয়ে গেছে, এরপরে কিন্তু তোমাকে অন্তর্মুখী হতে হবে। অন্তর্মুখী যদি না হও, খুব কষ্ট পেতে হবে ভায়া'। কথাগুলো মহারাজ খুব মিষ্টি করে বলতেন। কিন্তু এই কথাগুলো শুধু সন্ন্যাসীর জন্য না, সবারই জন্য প্রযোজ্য। আমি মজা করে সন্ন্যাসী বন্ধুদের বলি, চল্লিশের পরেও যে সন্ন্যাসীর কাজের বাই আছে, বুঝতে হবে ভিতরে কিছু গোলমাল আছে।

তাহলে চল্লিশের পর কি করবে? যে কাজের দায়ীত্ব নেওয়া আছে, সেই কাজ নিষ্ঠার সাথে করবেন আর তার সাথে এই ভাব, এটা আমার দায়ীত্ব, তাই আমি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সাথে করছি, এর মধ্যে আমি কিন্তু জড়িয়ে নেই। আর ঠাকুরের সহজ ভাষায়, কাজ যখন করবে তখন এক হাতে কাজ করবে, আরেক হাত দিয়ে ঈশ্বরকে ধরে রাখবে, আর যখন কাজ থাকবে না, তখন দু হাত দিয়ে ঈশ্বরকে ধরতে হবে। চল্লিশের মধ্যে এইভাবে যদি চলা শুরু না হয়, বুঝতে হবে পয়ষট্টির পর তাঁকে কাঁদতে হবে। আজ চারিদিকে জীবনে দুঃখ-কষ্ট, অবসাদ, একটু কান পাতলে চারিদিকে শুধু একটাই কথা শোনা যাবে, অবসাদ, অবসাদ; হতাশা আর হতাশা। এর কারণ একটাই, সময়

থাকতে থাকতে জীবনকে অন্তর্মুখী করা হয়নি। কিছু করার নেই, জীবন এখন এভাবেই যাবে। এই কথা শোনার পর পরের জন্মে গিয়ে যদি শোধরায়।

এই ব্যাপারটাকে আমাদের আচার্যরা খুব ভাল করে জানতেন, শুধু আজকেই না, সেই আদিমকাল থেকেই জানতেন। মনুস্মৃতিতে বলছেন, মাথার চুল যখন একটু সাদা হতে শুরু হবে, কিংবা নাতির মুখ দেখে নিয়েছে, তখনকার দিনে পঞ্চাশ হতে হতেই নাতির মুখ দেখে নিত, তখন তুমি বাণপ্রস্থী হয়ে যাবে। এখন তো বাণপ্রস্থী হওয়া মুশকিল, কিন্তু বাড়িতেই বাণপ্রস্থী হয়ে থাকা যায়। এখনও চাকরি করতে হচ্ছে, অবসর না হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই চাকরি করতে হবে। কিন্তু ঐ বয়সে জগৎকে উন্মত্তের মত ভোগ করতে হবে, এই ভাবটা যেন একেবারেই না থাকে। একজনের কথা জানা আছে, ভাল উপার্জন করেন, বয়স বেশি না, কিন্তু বলেন, এখন কাজকর্ম না করে কোন এনজিওর সাথে যুক্ত হয়ে সমাজসেবার জন্য নিজেকে দিয়ে দেব। খুব ভাল, কিন্তু মনকে বাইরে থেকে টেনে ভিতরের দিকে না নিয়ে গেলে খুব সমস্যা হবে।

কঠোপনিষদে খুব সুন্দর বলছেন *কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মনমৈক্ষদ্ আবৃতচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্*, চোখে যদি ঠুলি না দিয়ে দেওয়া, ইন্দ্রিয়গুলিকে যদি আবৃত না করা হয়, এটা নিশ্চিত যে চোখ দিয়ে জল বেরোবে। আচার্যরা তাই বার বার বলেন, শাস্ত্রের কথা বারবার শ্রবণ কর, যাতে তোমার মনে একটা ভাব জাগে। বাচ্চা বয়স থেকে এগুলো পড়ানো হত, কারণ বাচ্চা বয়সে মনে একটা ছাপ পড়বে, মনে কথাগুলো গেঁথে যাবে। তারপর পয়ত্রিশ পেরিয়ে চল্লিশের দিকে এগোতে যাচ্ছ, তখন মনকে অন্তর্মুখী করো। কাজ করো, সংসারে অবশ্যই কাজ করবে। কিন্তু যেখানে প্যালা দিতে হয় না, সেখানে লোকেরা যেমন ধস্তাধস্তি করে কোন রকমে সামনে গিয়ে বসতে চাইছে, এই ভাবটাকে এবার ছাড়তে হবে। এবার ভদ্রলোক হও, ভদ্রলোক হওয়া মানে জীবনকে অন্তর্মুখী করো।

শাস্ত্রের কথা লোকেরা অত বিশ্বাস করবে না। সেইজন্য মানুষের উপর কৃপা করার জন্য ভগবান স্থূল শরীর ধারণ করে আসেন। যিনি কৃষ্ণ, তিনিই রাম, তিনিই রামকৃষ্ণ হয়ে এলেন, হে মানবজাতি, তুমি কষ্ট পাচ্ছ, দেখ, শোন, শেখো, আর জীবনে একটা শান্তি নিয়ে এসো। কত দিন আর উপলব্ধির পিছনে ছুটবে। কারণ চল্লিশের পর তুমি যে দৌড়াচ্ছ, তুমি নিজে আর দৌড়াচ্ছ না, জীবন তোমাকে দৌড় করাচ্ছে, ঐ মোমেন্টামে তুমি দৌড়ে চলেছ। সবাই শাস্ত্রের কথা জানে না, সবাইর শাস্ত্রের কথার উপর বিশ্বাসও নেই, কিন্তু কোথাও একটা ভক্তি ভাব আছে। কি রকম ভক্তি? গীতা কিছু না হোক তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার পুরানো। এখনও কত এই বাবাজী, সেই বাবাজীরা আছেন, তাঁদের ভক্তকুল আছে। ভক্তরাও এসে বলেন, আমি অমুক বাবাজীকে শুনি, তমুক স্বামীকে শুনি। শাস্ত্র বাদে সব কিছুই শোনেন। এই বাবাজী, এই স্বামীরা যে কথাগুলো বলছেন, তাঁরা কি কোন শাস্ত্রকে আধার করে বলছেন, নাকি নিজের মনের কথাগুলি বলছেন? বেশির ভাগই নিজের মনের কথা বলেন। যেখানে শাস্ত্রের কথা বলছেন, সেখানে তুমি একটু সরাসরি বোঝার চেষ্টা করো, কিন্তু লোকেরা তা করে না।

ঠিক তেমনি, যখন পূজার ব্যাপার আসে, তখন এর পূজা, তার পূজা করে। আগেকার দিনে এগুলো আরও বেশি ছিল। এই যে সচ্চিদানন্দ, যিনি অনন্ত, যিনি সমস্ত অণু পরমাণুতে ঢুকে আছেন, যিনি বিধাতা রূপে সব কিছু দেখছেন, মানুষ তাঁর উপাসনা না করে তাঁর যে সীমিত বিভিন্ন রূপ, তাঁর উপাসনা করেন। যার জন্য বেদের ঋষি এই সত্যকে সাক্ষাৎ করে বললেন, *একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি*। ঋষিরা যাঁদের বহু বলছেন, সেখান ইন্দ্র আছেন, অগ্নি আছেন, বায়ু আছেন, বরুণ আছেন, যম আছেন। এনাদের পূজা করাটা কি তাহলে ভুল? মুসলমানরা এটা সব থেকে বেশি বলে বেড়ায়, হিন্দুরা পৌত্তলিক। তাহলে হিন্দুরা এটাকে কিভাবে দেখেন? হিন্দুদের খুব সহজ ব্যাপার, ভগবানই যদি আছেন, তাহলে পূজা যখন হবে, তখন স্বাভাবিক ভাবে ঐ পূজা ভগবানের কাছেই যাবে।

কৃষ্ণভক্তরা বলেন, তুমি যদি কৃষ্ণের ভজনা না করো, তাহলে তোমার কিছুই হবে না। এটাই এনাদের ভুল হয়ে যাচ্ছে। গীতা এটাকে পুরো অন্য ভাবে দেখেন। যদি কেউ শিবের পূজা করে থাকেন, কেউ শ্রীরামকৃষ্ণের যদি পূজা করেন, কিন্তু ভাব সাধারণ, শিব সেই অনন্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অনন্ত, তখন কোন সমস্যাই থাকে না। কিন্তু যেখানে সীমিত রূপে দেবী দেবতাদের পূজা করা হয়, যেটা আগে ইন্দ্র, অগ্নি আদি দেবতাদের করা হত, সেটাকে নিয়ে এবার আলোচনা করছেন।

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াঽন্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্।।২৩।।

(হে কৌন্তেয়, যাঁরা আস্তিক্যবুদ্ধিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়ে ভক্তিপূর্বক অন্য দেবতার পূজা করেন, তাঁরাও অজ্ঞানপূর্বক আমারই পূজা করেন।)

পূজা যেন শ্রদ্ধার সাথে করা হয়। বেশির ভাগ মানুষ শ্রদ্ধার সাথে তো পূজা করেই না, উপরন্তু কামনা জুড়ে থাকে পূজার সাথে –ঠাকুর তোমাকে এই মিষ্টি দিলাম, আমার যেন এই এই হয়। এখানে *অবিধিপূর্বকম্* শব্দের অর্থ হয় অজ্ঞান। অজান্তায় যখন যে কোন দেবী দেবতার পূজা হয়, তখন হে কৌন্তেয়, জানবে সমস্ত পূজা আমারই হয়। একটা মজার ব্যাপার আছে। ভারতে যখন মোঘল রাজত্ব চলছিল, তখন বিশ্বে ভারত সবচেয়ে ধনী দেশ ছিল। ইংরেজরা এসে কিছু দিনের মধ্যেই ভারতবর্ষকে কাঙালী বানিয়ে দিয়েছিল। তখন ভারতকে বলা হত, Golden sink of the world। বাসন-পত্র মাজার সময় সিঙ্কের ড্রেন দিয়ে জল বেরিয়ে আসে, জল যেখানেই থাকুক সিঙ্ক সমস্ত জল টেনে নেয়। বলা হত যে, বিশ্বের যেখানেই সোনা উৎপাদন হত, ঘুরে ঘুরে সেই সোনা ঠিক ভারতে এসে পৌঁছে যেত। ঠিক তেমনি মানুষ যাঁরই পূজা করুক, পূজাটা শ্রীকৃষ্ণের কাছেই যাবে। কিন্তু এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলতে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ নন, শ্রীকৃষ্ণ এখানে সেই সচ্চিদানন্দ। আমরা ঠাকুরের ভক্ত, আমরা বলব, পূজো তুমি যাঁরই কর, পূজো সেই শ্রীরামকৃষ্ণরই হবে। কিভাবে হবে?

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে।।২৪।।

(দেবতাগণের আত্মরূপে আমি সকল শ্রৌত ও স্মার্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা; কিন্তু অন্য দেবতার ভক্তগণ আমাকে স্বরূপতঃ জানেন না বলে তাঁরা আবার সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন।)

যত রকমের যজ্ঞ হতে পারে, আগে শ্রৌত যজ্ঞ, স্মার্ত যজ্ঞের কথা বলা হয়েছিল, যজ্ঞের ইন্দ্রাদি দেবতারা আছেন, কিন্তু সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা হলাম আমি। *অহং হি সর্বযজ্ঞানাং*, যত রকমের যজ্ঞ হয়, যা কিছু যজ্ঞ হচ্ছে, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ যত দেবতাদের পূজা হচ্ছে, অন্য দিকে কালী, শিব, গণেশ, সন্তোষীমা, যাঁরই পূজা হচ্ছে, যত ভাবে যত রকমের যজ্ঞ ও পূজা হচ্ছে, শরীরের যে যজ্ঞ হচ্ছে, শরীরের বাইরে যে যজ্ঞ হচ্ছে, সব যজ্ঞের প্রভু হলাম আমি। অষ্টম অধ্যায়েও ভগবান বলেছিলেন, *অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র*, যজ্ঞের অধিদেবতা আমি। যজ্ঞে যে আহুতিই দেওয়া হোক না কেন সব আহুতি শ্রীকৃষ্ণের কাছেই যাচ্ছে। কিন্তু যারা যজ্ঞ করছে তারা মনে করছে আমি ইন্দ্রের নামে আহুতি দিচ্ছি, *ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে*, তারা ঠিক ঠিক তত্ত্বতঃ জানে না যে এই আহুতি আমাকেই দেওয়া হচ্ছে, সব আহুতি আসলে আমার কাছে আসছে। যেমন সমস্ত নদীর জল সমুদ্রে গিয়ে মিলে যায়, তেমনি সব যজ্ঞের সব আহুতি আমার কাছেই আসে। এই জিনিসটা তারা তত্ত্বতঃ জানে না। তত্ত্বতঃ জানেনা বলে কি হচ্ছে? *অতঃ চ্যবন্তি তে*, তাদের স্বর্গ থেকে পতন হয়ে যায়, আবার এই সংসারে প্রত্যাবর্তন করে। যদিও যা কিছু যাগযজ্ঞ করা হচ্ছে তার সব কিছু ভগবানের কাছেই যাচ্ছে, কিন্তু যে করছে তার মনটা আসলে কোথায় পড়ে আছে দেখতে হবে, মন যেখানে পড়ে আছে মৃত্যুর পর সেখানেই যাবে, কেননা সে ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানে না। এখন যারা

যজ্ঞ করছে, সেখানে ঈশ্বর রূপে করছে না, অজ্ঞান রূপেই করে যাচ্ছে, তখন কি হয়? উচ্চ উপলব্ধি যেটা হওয়ার কথা, সেটা না হয়ে পতন হয়ে যায়। কেন পতন হয়ে যায়?

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্।।২৫।।

(দেবোপাসকগণ ইন্দ্রাদি দেবগণকে প্রাপ্ত হন, শ্রাদ্ধাদিনিষ্ঠ পিতৃভক্তগণ অগ্নিষ্বাত্ত ও অর্যমা পিতৃগণকে প্রাপ্ত হন, ভূতোপসাকগণ বিনায়ক ও চতুর্ভগিন্যাদি ভূতগণকে লাভ করেন এবং আমার উপাসকগণ আমাকেই লাভ করেন।)

একটা কথা আমরা খুব শুনে থাকি, যেমন ভাব তেমন লাভ। চেষ্টা আমরা যাই করি না কেন, যেমন ভাব তেমন লাভ। পূজা যখন করছি, সেখানে চেষ্টা, পরিশ্রম সব রয়েছে। এখন দেবতাদের যদি পূজা করে তাহলে সে দেবতাদের কাছে যাবে, আর যে পিতৃদের পূজা করছে সে পিতৃদের কাছে যাবে। যারা ভূত প্রেতের পূজা করে তাহলে তারা তাদের কাছেই যাবে। তেমনি যারা আমার পূজা করে তারা আমার কাছে আসবে।

প্রায়ই অনেক ভক্তরা এসে জিজ্ঞেস করেন, ঠাকুর বলেছেন শ্রাদ্ধ বাড়ির অন্ন খেতে নেই, খাওয়া যাবে কি? আরে ভাই, তোমার বাবা-মা মারা যাওয়ার পর যে শ্রাদ্ধ হবে, তুমি সেখানে খাওয়া-দাওয়া করবে না? সব বোকা বোকা প্রশ্ন। আগেকার দিনে যে শ্রাদ্ধ হত, সেখানে শ্রাদ্ধটা করা হত দেখানোর জন্য, আমার কত পয়সা আছে। দেশে তখন অভাব ছিল, খাওয়া ছিল না, লোকেরা সবাই শ্রাদ্ধবাড়ি যেত একটা দিন পেট ভরে খাওয়ার জন্য। মনুস্মৃতিতে স্পষ্ট নিষেধ করা আছে, শ্রাদ্ধের সময় যেন বেশি লোককে না ডাকা হয়। স্মৃতিতে এটা নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, শ্রাদ্ধের অন্ন পিতৃদের উদ্দেশ্য দেওয়া হয়। এই যেমন বলা হল, যেমন ভাব তেমন লাভ। আমি সাধনা করছি শ্রীরামকৃষ্ণের, সাধনা করছেন কৃষ্ণের, সাধনা করছেন ভগবান বিষ্ণুর আর অন্ন খাচ্ছেন পিতৃদের, এখানেই তো সব এলেমেলো হয়ে যাচ্ছে। আগেকার দিনে গ্রামে কেউ মারা গেলে সবাই খুশী হত, শ্রাদ্ধবাড়ির খাওয়া জুটবে, একদিন পেট ভরে খাওয়া যাবে। মূল হল, দেবতাদের পূজা করলে, দেবতাদের অন্ন খেলে দেবতাদের কাছে যাবে। পিতৃদের অন্ন হলে পিতৃদের কাছে, ভূতদের অন্ন হলে ভূতেদের কাছে যাবে।

স্বামী তপস্যানন্দজী মহারাজ মঠের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তিনি ছিলেন বিরাট পণ্ডিত। ওনার গর্ভধারিনী রাজা মহারাজের আশ্রিতা ছিলেন। আমি তখন এন্টালী অদ্বৈত আশ্রমে ব্রহ্মচারী ছিলাম। প্রায় প্রত্যেক রবিবার আমি বেলুড় মঠে আসতাম। স্বামী তপস্যানন্দজী সেই সময় বেলুড় মঠে এসেছিলেন। ওনাকে প্রণাম করতে গেছি। ঐ সময় যা হয়, পরিপক্কতা কম থাকে। এটা যে অনধিকার চর্চা তখনও সেই বুদ্ধিটা হয়নি, প্রণাম করে মহারাজকে বলে ফেললাম, 'মহারাজ, একবার অদ্বৈত আশ্রমে আসুন'? এই অনুরোধ করার আমার কোন অধিকারই নেই। আমি একজন সামান্য ব্রহ্মচারী, মহারাজকে আমন্ত্রণ করার হলে অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ করবেন। তিনি খুব মিষ্টি করে বললেন, 'ওখানে তুমি আমাকে ঠাকুরের প্রসাদ খাওয়াতে পারবে'? স্বামীজী মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতার অদ্বৈত আশ্রম হল তারই বিজনেস সেন্টার। অদ্বৈত আশ্রমে কোন পূজা হয় না। যদিও সবাই *ব্রহ্মার্পণং* করে অন্ন গ্রহণ করেন, তবে আলাদা ঠাকুরের অন্ন বলে কিছু হয় না, তার মানে কোন প্রসাদ হয় না। তখন আমার একটা ধাক্কা লাগল, অদ্বৈত আশ্রমে তো কোন পূজা হয় না, সেই অর্থে কোন প্রসাদ তো হবে না।

মহারাজ আমাকে খুব মিষ্টি করেই বলেছিলেন, 'তুমি কি ওখানে আমাকে প্রসাদ খাওয়াতে পারবে'? স্বামী তপস্যানন্দজী ঐ বয়সে ঠাকুরের প্রসাদ ছাড়া আর কিছু খেতেন না। জোর একটা

ধাক্কা পেয়েছিলাম। প্রসাদ খেলে দেহ মন শুদ্ধ হয়। বেলুড় মঠে এসে এক চামচ খিচুরি বা দু দানা অন্ন যদি খাওয়া যায়, শরীর মন শুদ্ধ হয়ে যাবে, কারণ সাক্ষাৎ ভগবানকে নিবেদন করা হয়েছে।

বলছেন, শ্রাদ্ধাদি যে ক্রিয়া হয়, এরা হল পিতৃভক্ত, এরা তাই পিতৃদের পায়। যিনি বিষ্ণুর উপাসনা করছেন, তাঁর উদ্দেশ্য এক রকম; অন্য দিকে তিনি শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া দ্বারা পিতৃ উপসনা করছেন, দুটোতে সংঘাত হয়ে যায়। তাহলে শ্রাদ্ধের অন্ন কি খাওয়া যাবে না? খুব আপনজন হলে কিছু করার থাকে না, সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতে খেতে হয়, কম করে খেতে হবে। মনে মনেও ঠাকুরকে অর্পণ করে খাওয়া যায় না, কারণ ঐ খাবার পিতৃদের দেওয়ার জন্য এঁটো হয়ে গেছে। এই সমস্যা একটু থাকবে, মেনে নিতে হয়। কিন্তু ঘুরে ঘুরে শ্রাদ্ধ বাড়ি খেয়ে যাচ্ছে, এটাকে নিষেধ করছেন, অবশ্য এই জিনিস ইদানিং আর দেখাও যায় না।

আগেকার দিনে পিছিয়ে পড়া আদিবাসীদের মধ্যে বিনায়ক, ষোড়শ মাতৃকাদি উপদেবতার পূজার প্রচলন ছিল। এই বিনায়ক আমাদের অতি পরিচিত সিদ্ধিদাতা গণেশ নন, আদিবাসীদের অনেক রকম উপদেবতা থাকত, তাদের মধ্যে একজন হল বিনায়ক। যাঁর পূজা করবে, যাঁর চিন্তা করবে, যাঁকে ভালবাসবে, মানুষ তারই সত্তা পাবে। সেইজন্য এত সাধুসঙ্গ করার কথা বলা হয়। সত্তা পাবে মানে, তার ভাব পাবে। আচার্য বলছেন, *সমানে অপি আয়াসে মাম্ এব ন ভজন্তে অজ্ঞানাৎ*, খাটনি সেই এক, কিন্তু অজ্ঞানে পড়ে আমার ভজনা করে না; *তেন তে অল্পফলভাজো ভবন্তি ইত্যর্থঃ*। ভগবান দুঃখ করে বলছেন, একই খাটনি করে কিন্তু ফলটা অল্প। এখানে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে সবার উপরে বলছেন না, অন্যান্য ধর্মে যেমন নিজের ভগবানকে সুপিরিয়র বলা হয়, সেটা এখানে বলা হচ্ছে না।

এখানে লোকেদের ভুল বোঝার সম্ভবনা আছে। এখানে এটাও বলতে চাইছেন না যে, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু এই দেবতাদের থেকে আমি সুপিরিয়র। ইন্দ্র, অগ্নি আদি দেবতাদের আমরা যে ভজনা করি, এই প্রকৃতির পিছনে যে শক্তিগুলি আছে, এনারা হলেন সেই শক্তিগুলির দেবতা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হলেন সেই সচ্চিদানন্দ। যদি ইন্দ্রকে সচ্চিদানন্দ রূপে দেখা হয় তাহলে আর কোন সমস্যা থাকে না। কিন্তু সেভাবে তো দেখা হয় না, বেদে যদিও কিছু মন্ত্র আছে, যেখানে ইন্দ্রকে সচ্চিদানন্দ রূপে দেখা হয়, কিন্তু in general তাঁকে সেই ভাবে দেখা হয় না। সেইজন্য ইন্দ্র থেকে মন সরানোর জন্য ইন্দ্রের নামে অনেক আজেবাজে কাহিনী তৈরী করা হয়েছে, যাতে মানুষ ইন্দ্র দেবতা থেকে সরে গিয়ে সচ্চিদানন্দের যে ভাব, যে ভাব নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্রকে দেখা হয়, সেই ভাব নিয়ে পূজন করে। অনেকে বলে বেদের সময় তো শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ না থাকতে পারেন, কিন্তু বেদের সময় সচ্চিদানন্দ তো ছিলেন, সেই সচ্চিদানন্দই তো কৃষ্ণ।

আবার অন্য দিক দিয়ে বলছেন, ইন্দ্রের যদি আরাধনা কর, অগ্নির আরাধনা যদি কর, কত ঝামেলা। দূর্গাপূজা করতে গেলে আমাদের কত আয়োজন করতে হয়। কিন্তু ভগবানের পূজাতে কোন আয়োজন করতে হয় না। কি রকম সেটা?

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।।২৬।।

(যে শুভবুদ্ধি নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তাঁর সেই ভুক্তিপূত উপহার প্রীতির সাথে গ্রহণ করি।)

এই শ্লোকটি আমাদের সারা জীবনের মত মুখস্ত করে নিতে হবে, জীবনে পালন করতে হবে। বেল পাতা হোক, তুলসী পাতা হোক, বা যার এলাকায় যে গাছই আছে সেই গাছার পাতাই

হোক, ওই সামান্য একটা পাতা আমাকে ভক্তি সহকারে নিবেদন করলে আমি তা সানন্দে গ্রহণ করি। আমি এক সময় অরুণাচলের আলংএ ছিলাম, ওখানে তুলসী গাছ হবেই না। ওখানে একটা গাছ হয়, যারা পাতা তুলসী পাতার মতই আকার এবং গন্ধও কিছুটা তুলসী পাতার মত, সবাই ওখানে ঐ পাতা দিয়েই পূজা করছেন। ওটা দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল, এই হল হিন্দু ভাব। আমরা বিষ্ণু পূজার উপর যে বইগুলি দেখি, ওখানে তুলসীর কথা বলছেন, সেখান থেকে তুলসীর বিবাহ, তুলসীর এই, তুলসীর সেই কত কিছু। কিন্তু আসল হিন্দু ধর্ম যেখানে তত্ত্ব বলছেন, তত্ত্বটা হল, *পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি,* যেটাই দেওয়া হবে শ্রদ্ধার সাথে যদি দাও, আমি সেটা গ্রহণ করি। ঠাকুর বলছেন, সাধুর কাছে যাওয়ার সময় খালি হাতে যেতে নেই, কিছু না হলে দু পয়সার আমলকি নিয়ে যাবে। কারণ সাধুকে যদি মানুষ রূপে দেখা হয়, তার পতন অবশ্যম্ভাবি; সাধুকে দেখে যদি নারায়ণের কথা মনে পড়ে, তবেই সাধুর কাছে যেতে হয়, তা নাহলে যেতে নেই।

ঠাকুরকে একজন দেখা হতেই বলেছিল, 'কি ভট্টচাজ্জি মশাই, বলি আছ কেমন'? সন্ন্যাসীদেরও দেখে বলে, কি মহারাজ কেমন আছেন, আজকাল কেমন চলছে? আরে ভাই, মহারাজের আর কি হবে, তোমারই সর্বনাশ হচ্ছে। একজন সন্ন্যাসীকে দেখে, গেরুয়া দেখে যদি ঈশ্বরীয় ভাব না আসে, এর থেকে বেশি দুর্ভাগ্য তার আর কি হতে পারে! পত্র দিয়ে, ফুল দিয়ে, ফল দিয়ে, জল দিয়ে, যেটা দিয়ে খুশী পুজো কর। গঙ্গার জল যদি না পাও, যমুনার জল দিয়ে পূজা কর, যমুনার জল না পেলে ট্যাপের জল দিয়েও পূজা কর। মন্ত্র যদি বলতে চাও, মন্ত্র বল; মন্ত্র যদি না জানা থাকে, তাহলে বল, হে ঠাকুর আমার এই সামান্য নিবেদন তুমি গ্রহণ কর, ব্যস, হয়ে গেল, এতেই হবে।

ভগবান বলছেন, *তদহং ভক্ত্যুপহৃতম্,* ভক্তির সাথে যদি নিবেদন করা হয়, *অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ,* শুভবুদ্ধি নিষ্কাম ভক্তের এই নিবেদতি উপহার দ্রব্য অবশ্যই আমি গ্রহণ করি। জাঁকজমক দিয়ে পূজা করা আর এই ছোট্ট পূজার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। বড়লোকের পূজা আর সাধারণ লোকের পূজায় কোন তফাৎ নেই। ইসলাম ধর্মে বলা হয়, religion of brotherhood, যেখানে সবাই সমান। তত্ত্বের দিক থেকে হিন্দুদেরও তাই। কেউ জাঁকজমক করে পূজা করছে, কেউ সামান্য ফুল, পাতা, ফল আর জল দিয়ে, কিছু না থাকলে শুধু জল দিয়ে পূজা করছে, দুটো পূজায় কোন তফাৎ নেই। শিবের উপাসনায় এই আইডিয়াটাকে খুব সুন্দর নিয়ে আসা হয়েছে। শিবের উপাসনায় কিছু লাগে না, একটা বেলপাতা আর একটু জল, আর কিছু লাগে না। ফুল দিতে চাইছেন, কোন ফুল পাওয়া যাচ্ছে না, জংলী ফুল ধুতরা ফুল নিয়ে আসুন, তাতেই হবে। দূর্গা পূজায় কি এলাহি আয়োজন, এত রকমের ভোগ, এত রকমের রান্না, এত রকমের উপাচার, শিবের পূজায় এসব কিছু লাগবে না। সেইজন্য মজা করে বলা হয়, মা দূর্গার পূজাতে এত কিছু লাগে, আর তাঁর স্বামী, যিনি জগৎস্বামী তাঁর পূজাতে কিছুই লাগে না। আমি ছয় সাত বয়সেই এই বৈষম্যটা লক্ষ্য করেছিলাম। বড়দের কাছে শুনতাম, শিবের পূজায় কিছু লাগে না, একটু গাল বাজিয়ে দিলেই হয়ে যায়। তখনই আমাকে এটা খুব আকর্ষণ করেছিল। কি সুন্দর দেবতা, তাঁর থাকার জন্য বড় মন্দির লাগে না, কোথাও একটা শিবলিঙ্গ বসিয়ে দিলেই হল। যিনি অনন্ত, তাঁর জন্য মন্দির কেন লাগবে, কি সুন্দর concept। এই আইডিয়াটাকেই গীতায় পরিষ্কার করে বলছেন, যার জন্য আমরা অনেক কিছু যা করি, সেগুলো সব গীতা থেকে আসে।

সাতাশ নম্বর শ্লোকটাও আমাদের মুখস্ত করে রাখা উচিৎ, হাতে লিখে বা কম্প্যুটারে টাইপ করে প্রিন্ট নিয়ে, ঘরের চার পাঁচ জায়গায় লাগিয়ে দিতে হবে। এটাই জীবনে শান্তি লাভের মন্ত্র, শক্তির মন্ত্র, জীবনকে ধন্য করার মন্ত্র। চিরদিনের মত জীবনে শান্তি এসে যাবে, যদি এটাকে কেউ জীবনে পালন করেন।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।।২৭।।

(অতএব হে কৌন্তেয়, যা কিছু অনুষ্ঠান করছ, যা কিছু আহার করছ, যা হোম করছ, যা কিছু দান করছ এবং যে তপস্যা করছ সেই সমস্ত আমাকে অর্পণ করবে।)

হে অর্জুন, যা কিছু করছ, যা কিছু খাওয়া-দাওয়া করছ, যা যজ্ঞ করছ, যা কিছু দান করছ, যে তপস্যা করছ, সব আমাকে অর্পণ কর। আমি গৃহবধূ, আমাকে রান্না করতে হয়, যা রান্না করছি, এই রান্না কৃষ্ণকে দিলাম। আমাকে ও আমার স্বামীকে সংসারের অনেক কাজকর্ম করতে হয়, আমরা সব কাজ ঈশ্বরকে অর্পণ করে দিই। এখানে ভগবান বলছেন না যে, তুমি এই করবে না, সেই করবে না। যার জন্য এখানে যারা ডাকাতি করে, ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে মন্দিরে গিয়ে পূজা করে আসে। বিন্ধ্যাচলে এখনও এই প্রথা আছে। দূর্গাপূজার সময় সব ডাকাতরা বিন্ধ্যাচলের মন্দিরের বাইরে বন্দুক দিয়ে শূন্যে ফায়ারিং করে, ওটাই তাদের পূজো। যে চুরি করছে, যে ডাকাতি করছে, সেটাও সে ঈশ্বরকে অর্পণ করে করছে। সন্তান উৎপত্তির সময়ও যা করে, সেটাও ঈশ্বরকে অর্পণ করে করা হয়। তপস্যা যখন করে, যজ্ঞ যখন করে, সেটাও ঈশ্বরকে অর্পণ করে করা হয়।

আমার এখনও মনে আছে, ক্লাশ ওয়ানে ভর্তি হওয়ার পর আমার জন্য একজন মাস্টারমশাই রাখা হল। খুব বিজ্ঞ এবং কড়া শিক্ষক ছিলেন। উনি প্রথম দিন আমাকে পড়াতে এলেন, প্রথম এসে উনি আমাকে দিয়ে শুরু করালেন, *যা কুন্দেন্দু তুষারহারধবলা,* মা সরস্বতীর এই মন্ত্র দিয়ে। সরস্বতীর এই মন্ত্র আর *ত্বমেব মাতা পিতা ত্বমেব,* এই দুটো মন্ত্র পড়া শুরু করার আগে রোজ করতে হত। বাড়িতে বাচ্চাদের শেখান, বাবা তুমি পড়ার আগে সরস্বতীর বন্দনা কর। আপনি কম্প্যুটারে কাজ করেন? মন্ত্র পাঠ করে কাজ শুরু করুন। ব্যবসাতে আছেন, লক্ষ্মীদেবীর মন্ত্র পাঠ করে ব্যবসার কাজ শুরু করবেন। আপনি কাউকে ভালবাসেন? তাকে কৃষ্ণ মনে করে ভালবাসবেন। আপনার সাথে কারুর শত্রুতা আছে? তাকেও কৃষ্ণ মনে করবেন, কংস যেভাবে কৃষ্ণকে দেখেছিল। দেখবেন আপনার শত্রু ভাবটা চলে যাবে।

এটা সত্যিই সাংঘাতিক একটা মন্ত্র। এটা শ্লোক না, মন্ত্র। ঠাকুর গিরিশ ঘোষকে এটাই বলছেন, সকাল সন্ধ্যে ঈশ্বরকে একটা করে প্রণাম করবে, গিরিশ ঘোষ পারবে না; তাহলে শোওয়ার আগে প্রণাম করবে, সেটাও গিরিশ ঘোষ পারবে না। তাহলে বকলমা দাও। এটা হল বকলমা দেওয়া। খেতে বসেছি, ঠাকুরকে অর্পণ করে খাওয়া শুরু করছি। তামাক, সিগারেট খাচ্ছি, ঠাকুরকে অর্পণ করছি। আপনি কি মদ খান? ঠাকুরকে অর্পণ করে খান। দিনের শেষে বলুন, হে ঠাকুর আজ অনেক মিথ্যা কথা বললাম, অনেক চালবাজি করলাম; সব তোমাকে অর্পণ করলাম। চারদিন করার পর দেখবেন, মিথ্যে কথা বলতে মন চাইবে না, ছিঃ এটা ঠাকুরকে কি করে দেওয়া যাবে। জীবন এমন কিছু কঠিন না, জীবন অত্যন্ত সহজ; আমরা কঠিন বানিয়ে নিই। সব কিছু মন্ত্র দিয়ে শুদ্ধি করে নিতে হয়, সমস্ত কিছু অর্পণ করে দিতে হয়। শুধু আমার দেহ মনকে অর্পণ করে দেওয়া না, আমার যত ক্রিয়া, সেগুলোকেও ঈশ্বরকে অর্পণ করে দিতে হয়। আমাদের এখানে পাপ বলে কিছু হয় না, বাজে কর্ম বলে কিছু হয় না, সবটাই ঈশ্বরকে অর্পণ করা যায়। তারপর একটা সময় মনই বলে দেবে, এটা দেওয়া যাবে না। এটা অর্পণ করতে মন খুঁত খুঁত করছে? তাহলে এটা অর্পণ করব না। সেইজন্য আমাকে ঐ কাজ করাটা বন্ধ করতে হবে, কারণ আমি বলেছি সমস্ত কিছু ঈশ্বরকে অর্পণ করব। টাকা-পয়সা, চাল, ডাল, বস্ত্র যা কিছু দান করছি, এই মনে করে করছি, প্রভুর পাদপদ্মে অর্পণ করছি। শুভ অশুভ যা কিছু করছি সব ঈশ্বরকে অর্পণ করছি।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি।।২৮।।

(এইভাবে আমাতে সমস্ত কর্ম অর্পণ দ্বারা শুভাশুভ ফলবিশিষ্ট কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আমাতে শুভাশুভ কর্ম-সমর্পণরূপ সন্ন্যাসযোগে যুক্ত হয়ে জীবিতকালেই মুক্তিলাভ করবে এবং দেহান্তে আমাকে প্রাপ্ত হবে। এর অর্থ, পুনরায় আর দেহধারণ করতে হবে না।)

ভগবান কত সহজ করে দিচ্ছেন, এই ভাবে কর্মকে তুমি অর্পণ করতে আরম্ভ করলে, সমস্ত শুভঅশুভ কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। সব কর্মেই কর্মবন্ধন হবে, শুভকর্ম করলে শুভের বন্ধন হবে, অশুভ কর্ম করলে অশুভের বন্ধন হবে; শুভটাও বন্ধন, অশুভটাও বন্ধন। কিন্তু সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করে করলে তোমার কোন কর্মবন্ধন হবে না, কারণ তুমি সমস্ত কর্ম ঈশ্বরকে অর্পণ করে দিয়েছ। এই কর্মরূপ বন্ধন থেকে তুমি বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবে। উদ্দেশ্য হল মুক্তি, উদ্দেশ্য হল আনন্দ, উদ্দেশ্য জীবনে শান্তি পাওয়া, উপায় অত্যন্ত সহজ। হে প্রভু, আমার সমস্ত ভাল, সমস্ত মন্দ তোমাকে দিলাম।

এটা তুমি মুখে বলে দিলে আর সব কর্মবন্ধন খসে পড়ে যাবে, তা তো হয় না। তোমাকে এর অনুশীলন করতে হবে। অনুশীলন করার একটা সহজ উপায় হল, মোবাইল ফোনে এলার্ম সেট করে রাখুন, সকাল ছটা, দুপুর বারোটা, বিকেলে ছটায় আর রাত দশটায়, চব্বিশ ঘন্টায় চারবার এলার্ম বাজবে, সঙ্গে সঙ্গে এক মিনিটের জন্য হাতজোড় করে বলতে হবে, এতক্ষণ এই এই করলাম, যতটুকু মনে এলো, সব তোমার পায়ে অর্পণ করলাম। তখন হয়ত মনে পড়বে, ছি ছি ছি, এটা বাজে কাজ, এটা দেওয়া যায় না। কিন্তু দিতে তো হবে, কেন না আপনি বলেছেন আমি দেব। মাঝখান থেকে আস্তে আস্তে ঐ বাজে কাজ করার প্রবৃত্তিটা আপনার চলে যাবে।

সন্ন্যাস শব্দের অর্থাৎ হয়, *সম্ পূর্বক নি পূর্বক অস্ ধাতু, অস্* ধাতু হয় *ক্ষেপণে* বা ফেলে দেওয়া। *নি পূর্বক* আসা মানে নিঃশেষে আর *সম্ পূর্বক* আসা মানে সম্যক রূপে। সন্ন্যাস মানে সব কিছু নিঃশেষে সম্যক রূপে ফেলে দিয়েছে, সন্ন্যাসীর আর কোন কিছু নেই। এই যে আমি সমস্ত কর্ম, কর্মের সমস্ত বন্ধন ঈশ্বরকে অর্পণ করে দিলাম, এইজন্য বলছেন সন্ন্যাস। কিন্তু অর্পণ করাটাও তো কর্ম, যেহেতু আমি পরিকল্পনা করে কর্মকে অর্পণ করছি, সেইজন্য এটা যোগ। কাজ হলে হয় যোগ আর ত্যাগ হলে হয় সন্ন্যাস। এখানে ফল আমি ত্যাগ করছি, কিন্তু আমার চেতনাতে এটা কাজ করছে যে, আমি অর্পণ করছি, তাই এটা যোগ। সেইজন্য এইভাবে সব কিছু ঈশ্বরকে যে অর্পণ করা হচ্ছে, এটাকে তাই বলা হয় সন্ন্যাসযোগ।

তাহলে এই দাঁড়ালো, আমাদের সন্ন্যাসী হতে হবে না, কিন্তু আমরা সন্ন্যাসযোগী খুব সহজে হয়ে যেতে পারি। *সন্ন্যাসযোযুক্তাত্মা*, সন্ন্যাসযোগী *যুক্তাত্মা*, কারণ মনটা সব সময় ঈশ্বরের সাথে জুড়ে আছে; *যৎ করোষি যদশ্নাসি*, এটা অনুশীলন করা হচ্ছে বলে। *বিমুক্ত মামুপৈষ্যসি*, জীবদ্দশায় তুমি মুক্তি পেয়ে যাবে। আমাদের কাছে অনেকেই আসেন, যাঁদের জীবনে সত্যিকারের একটা আধ্যাত্মিক চাহিদা আছে, আমি সব সময়ই তাঁদের বলি, অবশ্যই হবে, কেন হবে না! আপনার মনে ইচ্ছা জেগেছে, এর চাইতে আর ভাল কিছু হতে পারে না।

আমেরিকা ইংল্যাণ্ডের লোকেদের কথা ছেড়ে দিন, ভারতের দিকে তাকিয়ে দেখুন, দক্ষিণ ভারতের মানুষরা একটু বেশি ধর্মপ্রাণ, তাও তারা ritualistic ধর্মপ্রাণ, কিন্তু ঠাকুরের যে ভাব, যেখানে ধর্ম বলতে আধ্যাত্মিকতা, এই ভাব বাংলার মত কোন রাজ্যে পাওয়া যাবে না। বিভিন্ন রাজ্যে তো আমি ঘুরেছি, কোথাও কিছু নেই, যা আছে বাংলাতেই আছে। এখানেও আপনি ঘুরে দেখুন, কজন লোকের মনে ইচ্ছা জাগে –আমি ঠাকুরকে পেতে চাই, আমি কৃষ্ণকে পেতে চাই, আমি

শিবকে পেতে চাই? You are the best of the best. কঠোপনিষদে নচিকেতাকে যমরাজ বলছেন, *বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে*, আমি মনে করি নচিকেতা সেই বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছ, যে দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকলেই মুক্তি। আপনারা গীতার কথা শুনছেন, মানে আপনার দরজায় টোকা মারছেন। এক ঘন্টা ধরে সাধারণ লোকেরা এই আলোচনা শুনবে? মাথা ফেটে যাবে। আর আমার লেকচারে, কোন মনোরঞ্জন নেই, খোস গপ্প নেই, গান-বাজনা নেই, কত উচ্চমানের মানুষ হলে তবে এই লেকচারগুলো নিতে পারে। ভগবান খুব জোরের সাথে আশ্বাস দিয়ে বলছেন, *বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি*, সে আমাকে পেয়ে যাবে। কে পেয়ে যাবে? যে আমাকে সব কর্ম অর্পণ করবে।

তাহলে তো ভগবানের বৈষম্য দোষ আছে। যে আপনাকে ভালবাসবে সে আপনাকে পাবে, বাকিরা তাহলে কোথায় যাবে? ভগবান সাবধান করে দিচ্ছেন, আমার কোন বৈষম্য দোষ নেই, আর এই রকম কখনই হয়নি, কখন হবেও না। কেন? কারণ,

সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।।২৯।।

(আমি সর্বভূতে সমানভাবে বিরাজ করি, আমার প্রিয় ও অপ্রিয় নাই, কিন্তু যাঁরা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁরা স্বভাবতই আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও স্বভাবতই তাঁদের সবার হৃদয়ে বাস করি।)

সবার প্রতি আমার সমান দৃষ্টি, কারুর প্রতি আমার বিদ্বেষ নেই, আর কেউ আমার বিশেষ প্রিয়ও নয়। ঈশ্বরতত্ত্ব যদি বুঝতে হয় তাহলে এই শ্লোকের দ্বিতীয় লাইনটা বুঝে নিলেই হয়ে যাবে – *যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্*। তুমি আমাকে ভজনা কর, তাই আমি তোমাকে ভালবাসি। তাহলে কি ভগবান ভালবাসেন? আমি নিজেই এক রূপে এই আমি হয়েছি, আবার আমিই এক রূপে ইষ্ট হয়ে আমারই সামনে দাঁড়িয়ে আছি। দেববাণীতে স্বামীজী ঠিক এই কথাই থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ডে তাঁর শিষ্যদের বলছেন। আমার ভালবাসাকে মনে হচ্ছে আমি ঈশ্বরকে দিলাম, এই ভালবাসাটাই প্রতিবিম্বিত হয়ে আমার কাছে প্রতিফলিত হয়। মনে হয় তিনিই আমাকে ভালবাসছেন। ঈশ্বর কি কৃপা করেন? আমি নিজেই নিজেকে কৃপা করি। আপনি নিজেই নিজেকে কৃপা করেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত উচ্চমানের বেদান্ত, আর এটা আমাদের বিষয়ও না, তাই এর বেশি আমরা ঢুকব না।

ভগবান এটাই এখানে বলছেন, *যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা*, ভক্তির সাথে যে আমার ভজনা করে, তাকে আমি ভালবাসি। আচার্য শঙ্কর এখানে খুব সুন্দর বলছেন, *অগ্নিবদ্ অহম্*, ভগবান বলছেন, আমি আগুনের মত। ভগবান আগুনের মত হওয়ার জন্য কি হয়? আচার্য বলছেন, *দূরস্থানাং যথা অগ্নিঃ শীতং ন অপনয়তি সমীপম্ উপসর্পতাম্ উপনয়তি*, আগুনের থেকে যে দূরে থাকে সে আগুনের তাপটা পায় না বলে তার ঠাণ্ডাটা যায় না, আগুনের কাছে যে চলে আসে, তার ঠাণ্ডা চলে যায়। ঠিক তেমনি, ঈশ্বরের নিকটে যে চলে যেতে পারবে, সে ঈশ্বরের ভালবাসা পাবে; ঈশ্বর থেকে যে দূরে থাকবে, ঈশ্বরের ভালবাসা তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। যিনি বলছেন, হে ঠাকুর তুমি আমাকে দেখছ না, তার মানে সে ঈশ্বর থেকে দূরে আছে। আমার ছেলের শরীর খারাপ হয়ে গেল, আমার চাকরি চলে গেল, আমার বাড়িতে আগুন লেগে গেল, ঠাকুর তুমি দেখলে না! তার মানে তুমি ঈশ্বরের কাছে নেই। কারণ ঈশ্বরের কাছে যদি থাকতে, বাড়িতে আগুন লেগে গেলে বলতে, বেশ হয়ছে, যাঃ। মনে প্রচুর অবসাদ, জীবনে প্রচুর অশান্তিতে হতাশায় মুষড়ে পড়ে আছে, এর মানে ঈশ্বর থেকে এরা অনেক দূরে।

একটা সময় আমারও অবসাদ হত, বিষণ্ন হয়ে পড়ে থাকতাম, সব ক্ষেত্রে মহারাজদের ঐ একই উত্তর, ঠাকুরে মন দাও। এর বাইরে আর কোন উত্তর নেই, এর একটাই উত্তর। ঠাকুরে মন

দেওয়া মানে, যত আগুনের কাছে যাবে তত শীত কমবে, আগুনের থেকে যত দূরে থাকবে, তত শীতে কুঁকড়ে থাকতে হবে। আচার্য শঙ্করের কি সহজ উপমা, *দুরস্থানাং যথা অগ্নিঃ শীতং ন অপনয়তি সমীপম্ উপসর্পতাম্ উপনয়তি*, অগ্নি থেকে দূরে থাকলে যেমন শীত যায় না, মনে হচ্ছে যেন আগুন আমাকে তাপ দিচ্ছে না; কিন্তু আগুন সবারই জন্য আছে। যে কাছে যাবে সে তাপ পাবে, যে কাছে যাবে না, সে তাপ পাবে না। সেইজন্য যে আমার ভজনা করে সে তো আমার ভালবাসা পাবেই, আমার কাছে আছে কিনা।

আচার্য খুব সুন্দর আবার ব্যখ্যা করে বলছেন, *স্বভাবত এব ন মম রাগনিমিত্তং ময়ি বর্তন্তে*, রাগদ্বেষ থেকে আমার কিছু হয় না, এটা স্বভাব, যেমন অগ্নির ব্যাপারটা উদাহরণ দেওয়া হল। যে ভক্ত আমাকে প্রেমপূর্বক ভজনা করে, সে আমাতে স্বভাবেই স্থিত, কোন আসক্তি হেতু নয়। আর আমিও স্বভাবত তার মধ্যে স্থিত থাকি, অন্যদের ভিতর থাকি না। তাই বলে ভেবো না যে, আমি তাদের দ্বেষ করি। এটাকেই এবার পরের শ্লোকে ভগবান বলছেন –

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।।৩০।।

(অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্তির সাথে আমাকে ভজনা করেন, তাঁকে সাধু বলে মনে করবে, কারণ তাঁর সঙ্কল্প অতি শুভ।)

যে অত্যন্ত খারাপ আচরণ করে, যাদের আমরা বাজে নোংরা লোক বলে জানি, কিন্তু সেও যদি আমাকে ভালবেসে আমার ভজনা করে, তাহলে তাকে সাধুই বলতে হয়। ভগবান বলছেন, *অপি চেৎ সুদুরাচারো*, দুরাচারী বলছেন না, সুদুরাচারী, মানে বিশেষ ভাবে বলছেন, অত্যন্ত জঘন্য মানুষ। দুরাচার বললেই আমরা বুঝে নিতাম, ভগবান দুরাচার বলে থামছেন না, বলছেন *সুদুরাচারঃ*, এই রকম মানুষও যদি আমার ভজনা করে, *সাধুরেব স মন্তব্যঃ*, তাকে সাধু বলেই জানবে, সাধু বলেই সম্বোধন করতে হবে। খ্রীশ্চান ধর্মে যে এত পাপী পাপী বলে, ওদের ধর্মে ওরা চিরকাল পাপী থাকবে, যতই সে ভজনা করুক। কিন্তু গীতা বলছেন, ঈশ্বরে একবার যার মনে চলে গেছে, সে যত দুরাচারীই হয়ে থাকুক, তাকে সাধু বলে জানবে, *সাধুরেব স মন্তব্যঃ*। আমরা সিনিয়র মহারাজদের কাছে এই ধরণের প্রচুর ঘটনা শুনেছি। আচরণের কোন দাম নেই, আচরণ কিছুই না, এক সেকেণ্ডে চলে যায়। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা পেয়েছিলাম, *জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা*, জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্মকে ভস্ম করে দেয়। ঈশ্বরের ভজনা করছে সে, ডানদিক বামদিক কোন ব্যাপারই না, সে একজন পাকা সাধু। কারণটা বলছেন, *সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ*, এই শব্দটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেন সে শ্রেষ্ঠ? কারণ মনের মধ্যে সে যা নিশ্চয় করে নিয়েছে, সেটা দৃঢ়।

যিনি ঈশ্বরের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছেন আর যিনি লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন, গীতাতে এই দুজনকেই এক ধরা হয়। সেইজন্য যিনি জ্ঞান প্রাপ্ত করে নিয়েছেন, মানে যিনি বিজ্ঞানী হয়ে গেছেন আর যিনি জ্ঞানের পথ ধরে নিয়েছেন, দুজনেই জ্ঞানী। যিনি গীতা অধ্যয়ণ করে বুঝে নিয়েছেন যে, ঈশ্বরই সত্য, এইটা বুঝে যিনি এক পা এই পথে ফেলেছেন তিনি জ্ঞানী হয়ে গেলেন। কেন জ্ঞানী বলা হচ্ছে? এখানে প্রশংসা করা হচ্ছে, আসলে সে হয়তো জ্ঞানী নয়, কিন্তু তাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রশংসা করা হচ্ছে। তাই যে দুরাচারী, শুধু যে দুরাচারী তাই নয়, সুদুরাচারী সেও যদি অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করে তাকে সাধু বলে গণ্য করতে হবে, কারণ *সমগ্ব্যবসিতো হি সঃ*, তার যে অধ্যবসায়, তার যে নিঃশ্রেয়, সেটা দৃঢ় হয়ে গেছে, সত্যিকারের সাধু হতে এখন শুধু অপেক্ষার বাকী, আর বেশি দেরী নেই। আন্তরিক ভাবে যে যথার্থ ভগবানকে চাইছে তখন তার বাইরের এই দুরাচারগুলো খসে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে খসে পড়বে না, কিছু সময় লাগবে, কিন্তু পড়ে যাবে। তখন কি হবে –

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানিহী ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।।৩১।।

(তিনি শীঘ্র ধার্মিক হন ও চির শান্তিলাভ করেন। হে কৌন্তেয়, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না, এটা নিশ্চিত জানবে এবং সানন্দে জগতে প্রচার কর।)

আমার ভক্তের কখন নাশ হয় না, পুরো এই অংশ জুড়ে ভগবান এটাই বলছেন। কতটা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ভগবান অর্জুনকে বলতে বলছেন, শুনলেও আনন্দ লাগে, হে অর্জুন তুমি দুই বাহু তুলে, *প্রতিজানিহী*, খোলাখুলি জগতে সবাইকে বলে দাও, *ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*, আমার ভক্তের কখন নাশ হয় না। এখানে কেবলমাত্র কৃষ্ণ ভক্তের কথা বলছেন না, যিনি সেই সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের ভক্ত, সেই ভক্তের কক্ষণ নাশ হয় না। তাকে কিন্তু ভক্ত হতে হবে। কি রকম ভক্ত? *সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ*, তার মন পুরোপুরি ঈশ্বরের দিকে চলে গেছে, এবং এই ব্যাপারে সে দৃঢ়। যাঁদের মনটন খারাপ হয়, তাঁরা লিখে রাখুন, *ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*, আমি তো ঠাকুরে ভক্ত, আমি কৃষ্ণভক্ত, আমি শিবভক্ত, আমার তো নাশ হবে না। সাধারণ নাশও হবে না, আত্যন্তিক নাশও হবে না। এইগুলিকে ভাগবতাদি গ্রন্থে কথা রূপে, কাহিনী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা, এনারা খুব শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে যান, আর *শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি*, তাঁরা চিরদিনের মত শান্তি পেয়ে যান। ছটি মাস করে দেখুন *যৎ করোষি যদাশ্নাসি*, আর কোন দিন আমার এই ভক্তের নাশ হবে না, ভগবানের এই বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস; দেখুন জীবনে শান্তি আসে কিনা। এই জিনিসটাকে আরও জোর দেওয়ার জন্য ভগবান এবার অন্য দিক দিয়ে বলছেন –

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিতঃ যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।।৩২।।

(হে পার্থ, নিকৃষ্টজন্মা ব্যক্তিগণ এবং স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্রগণও আমাকে আশ্রয় করে শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে।)

পাপযোনি শব্দের অর্থ হয়, যে যোনিগুলিকে অশুভ যোনি বলে মনে করা হয়। আগেকার দিনে অনেক যোনিকে অশুভ বলে মনে করা হত। এটা কিন্তু গীতার মত নয়, অনেকে এটাকে গীতার মত বলে প্রচার করেন। বলেন, যারা এমন ভাবে জন্ম নিয়েছে, তাতে পাপ করার প্রবণতা থাকতে পারে, সেখানে এনারা বলেন, *স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্*। আসলে আগেকার দিনে ব্রাহ্মণদের লোকেরা মনে করত শ্রেষ্ঠ, বা ব্রাহ্মণরাও নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। ব্রাহ্মণ বাদে বাকি সবাইকে এনারা বলতেন নিকৃষ্ট। যার জন্য দেখা যায় বেদের ক্ষেত্রে লোকেরা প্রায়ই ভুল ব্যাখ্যা করেন। বেদ ব্রাহ্মণদের হাতে ছিল, ব্রাহ্মণরা বলতেন, বেদ পড়ার অধিকার শুধু ব্রাহ্মণদের। কেন বলতেন? এটা আলাদা বিষয়, আমরা অন্যত্র এর আলোচনা করেছি। সেখান থেকে ব্রাহ্মণরা হয়ে গেলেন বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেনী, আর বাকিদের বলতে শুরু করলেন, এরা পাপযোনি। এটাই পরে গিয়ে আমাদের দেশের বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

আমরা যেমন শুনে থাকি, মেয়েদের বেদ পাঠ করার অধিকার নেই। মেয়েদের বেদ পাঠ করার অধিকার নেই মানে? কত ঋষিকারা বেদ মন্ত্র রচনা করেছেন, আর বলছেন মেয়েদের বেদ পড়া অধিকার নেই? মহাভারতে কত কাহিনী আছে, বৈশ্যের কাহিনী আছে, ধর্মব্যাধের কাহিনী আছে। আচার্য শঙ্কর এটাকে নিয়ে এক জায়গায় বিরাট আলোচনা করেছেন, যখন বেদের যজ্ঞাদি হত, সেখানে তখন বলা হত – ব্রাহ্মণ হতে হবে, অন্ধ, খঞ্জ যেন না হয়। কিন্তু পরমাত্মার প্রতি যখন মন যায়, তখন সেখানে কোন রকম condition থাকে না। বত্রিশ নম্বর শ্লোকে বলছেন, সমাজ যাদের পাপযোনি মনে করে, তাদেরও ভক্তিতে সমান অধিকার রয়েছে। এখানে নিন্দা করা হচ্ছে না,

স্তুতি করা হচ্ছে। কি স্তুতি? ঈশ্বরভক্তিতে কাউকে আটকানো যায় না। যেমন কেউ যদি স্ট্যাণ্ডফোর্ড, অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি পড়তে যায়, সেখানে তার একটা ডিগ্রি লাগবে, একটা ফিজ্ দিতে হবে, কিন্তু সে যদি ইউটিউব শুনতে চায়, তার জন্য কিছু লাগবে না। ভগবান অনেকটা এই ভাবে বলতে চাইছেন। সমাজ যাদের পাপযোনি মনে করে, তাদের জন্য ঈশ্বরের পথ পুরোটাই খোলা। ঈশ্বরে ভক্তির ব্যাপারে সবারই সমান অধিকার। বেদে যাদের অধিকার খর্ব করা হয়েছিল এরাই ঈশ্বরে ভক্তি লাভ করে মহাপুরুষ হয়ে যাচ্ছে, ব্রাহ্মণদের কথা আর কি কথা। এই কথাই ভগবান পরের শ্লোকে বলছেন –

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পূণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।।৩৩।।

(সেখানে পূণ্যজন্মা ব্রাহ্মণ, ভক্ত এবং ক্ষত্রিয়গণের আর কথা কি? তাঁরা আমাকে আশ্রয় করলে নিশ্চয়ই পরা গতি (পরম মুক্তি) লাভ করবেন। অতএব, যখন এই অনিত্য সুখহীন মর্ত্যলোকে মনুষ্যদেহ ধারণ করেছ, তখন অন্যান্য সব কর্তব্য ত্যাগ করে আমাকেই ভজনা কর।)

যাদের আগে থেকে শুভ সংস্কার আছে, যারা শুভ বংশে জন্ম নিয়েছে, তার মানে আগে থেকে যাদের প্রস্তুতি আছে, প্রথম থেকে যাদের শুরু করতে হচ্ছে না, তাদের তো কিছুই বলার অপেক্ষা থাকে না। এই জিনিসটাকে বুঝে, হে অর্জুন, *অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্*, বুঝে নাও এই জগৎ অনিত্য, এখানে সুখের গন্ধটুকু পর্যন্ত নেই; আচার্য বলছেন, *অনিত্যং ক্ষণভঙ্গুরম্ অসুখং চ সুখবর্জিতম্*, এই জগৎ সুখ বর্জিত আর ক্ষণভঙ্গুর, এটা ভাল করে বোঝ আর বুঝে নিয়ে কেবল আমার ভজনা কর।

যদি কেউ জানতে চান, আমার জীবনের সাধনা কি, তাহলে আমি বলব, আমার জীবনের সাধনা এই তেত্রিশ নম্বর শ্লোকের দ্বিতীয় লাইন। আমাদের সন্ন্যাসী ভাইদেরও কিছু হলে তাঁদেরকেও আমি বলি, এই শ্লোকার্ধটা মনে রাখবেন। একত্রিশ নম্বর শ্লোকে প্রথমে বললেন, আমার ভক্তের নাশ হয় না। আর সাধনা কি? *অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্*, জগৎ অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর, জগতে সুখের গন্ধ পর্যন্ত নেই। লোক, পৃথিবীলোক হোক, স্বর্গলোকই হোক, সব লোক একই; এটা জেনে নিয়ে শুধু আমার ভজনা কর, আমাকে ভক্তি কর। বুঝে নাও, এই জগতে কিছু নেই। কামিনী-কাঞ্চনে কিছু নেই, নাম-যশে কিছু নেই, স্বর্গলোকে কিছু নেই, এটা আগে তুমি বোঝ।

ভগবান এটা বলছেন না যে, আমি বলছি তুমি এটা মানো, বলছেন, তুমি খুব ভাল করে বিচার করে আগে এটা বুঝে নাও। যতক্ষণ এটা বোঝা না হবে, যতক্ষণ মনে করছি, জগৎ থেকে আমি অনেক কিছু পেতে পারি, জগৎ থেকে সুখ পেতে পারি, ততক্ষণ ভজনাও হবে না, ভক্তিও হবে না। আমরা কষ্ট কেন পাই? কষ্টের হেতু মায়া। কিসের মায়া? একজন আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, একজনের কাছ থেকে আমি কষ্ট পাচ্ছি। কিন্তু একটা সময় কোন একটা সুখ তার কাছে পেয়েছিলাম, আমি আশায় আছি, এই সুখটা আবার আসবে। কিন্তু এটাকে যদি অন্য ভাবে দেখা হয়, যে দুঃখটা পেয়েছিলাম, সেই দুঃখটা আবার আসবে, তখনই আমরা বলব, *অনিত্যমসুখম্*। আমাদের সমস্যা হল, সুখের আশায় কুকুরের মত জিভটা বের করে বসে থাকি। কিন্তু আমরা এটা মানতে চাই না, যে আমাকে একবার কষ্ট দিয়েছে, সে দ্বিতীয়বার আবার কষ্ট দেবে। এটা ভাল করে জেনে নিতে হবে, এটাই জীবনের নিয়ম – যে একবার আমাকে অপমান করেছে, দ্বিতীয়বারও সে অপমান করবে, যার কাছে একবার কষ্ট পেয়েছি, দ্বিতীয়বারও কষ্ট পাব। সুখকে অনিত্য জেনে কিভাবে ভজনা করব? যেটা আগে বলা হল, সেটাকেই আবার পুনরাবৃত্তি করছেন –

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।।৩৪।।

(তুমি মদ্‌গতচিত্ত হও; আমার ভজনশীল ও পূজনশীল হও। কায়মনোবাক্যে আমাকে প্রণাম কর। এইভাবে মৎপরায়ণ হয়ে আমাতে মন ও বুদ্ধি সমাহিত করলে আমাকেই লাভ করবে।)

মন্মনা ভব, তোমার মনটা পুরো আমাকে দাও; *মদ্ভক্তঃ*, আমারই ভক্ত হও, আর কাউকে ভক্তি করবে না, কোন মেয়ে, কোন পুরুষ, বস্, কাউকে না, ভক্তি শুধু ঈশ্বরকেই করবে। *মদ্‌যাজী মাং*, পূজা অর্চনা যা করার কেবল আমারই করবে; *নমস্কুরু*, কায়মনোবাক্যে প্রণাম আমাকেই করবে। *মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ*, এইভাবে যখন তুমি পুরোপুরি আমার শরণাগত হয়ে আমাতে যুক্ত হয়ে যাবে, তখন তুমি পরমেশ্বরকে পাবে, অর্থাৎ আমাকেই পাবে।

আচার্য বলছেন, *অহং হি সর্বেষাং ভূতানাম্ আত্মা পরা চ গতিঃ পরম্ অয়নম্*, সমস্ত ভূত, সমস্ত জীবের আমি হলাম আত্মা। এই রূপটা তুমি পেয়ে যাবে, তখন তুমি দেখবে, তুমিই সমস্ত জীবের আত্মা, তুমি দেখবে *মত্তঃ সর্বং প্রবর্তন্তে*, ঈশ্বর থেকে এই সমস্ত কিছুর সৃষ্টি হয়নি, আমার থেকেই এই সৃষ্টি হয়েছে। এই জগতে যত সুখ, সব সুখ আমার থেকে এসেছে, এই জগতে যত দুঃখ হয়, সব দুঃখ আমার থেকেই এসেছে। যত পাপী, খুনী, ধর্ষণকারী, জেহাদী সব আমার থেকেই বেরিয়েছে। জগতে কোন কিছু নেই, যেটা আমার থেকে বেরোয়নি। এটাকেই বলে ঈশ্বরজ্ঞান, এটাই জীবনের উদ্দেশ্য। এই হল নবম অধ্যায়ের রাজবিদ্যারাজগুহ্য যোগ। খুব মিষ্টি, খুব মধুর ভাবে বললেন ভক্তি কি, ভাব কি, ভক্তি কিভাবে করতে হয়।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়ং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগো নাম নবমোহধ্যায়ঃ।।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

দশম অধ্যায়
বিভূতিযোগ

আমরা আগেও বলেছি দশম, একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান পুরোপুরি ভক্তিকে নিয়ে বলে গেছেন। সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায় যেন কিছুটা তত্ত্বচিন্তন। কিন্তু এরপর ভগবান আস্তে আস্তে নিজেকে আমাদের কাছে কেমন যেন খুব আপনজন হয়ে প্রকাশ করছেন, তিনি যেন আমাদের আশেপাশের সব কিছুতে ছড়িয়ে নিজেকে প্রকাশিত করে আমাদের কাছের মানুষ হয়ে গেছেন, কোথাও লুকিয়ে নেই। দশম অধ্যায়ের মূল শ্লোকে যাওয়ার আগে খুব সাধারণ একটা দুটো কথা বলা দরকার।

আমরা যখন রামকৃষ্ণ মিশনে প্রথম জয়েন করলাম, তখন মহারাজ আমাদের মা লক্ষ্মীর বাহন পেঁচাকে নিয়ে একটা মজার কাহিনী বলেছিলেন। মা লক্ষ্মী একবার খুশী হয়ে পেঁচাকে একটা মুক্তার হার উপহার দিয়েছেন। হার দিয়ে বললেন, 'দেখো, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে সব থেকে সুন্দরী, তাকে তুমি এই হারটা উপহার দিতে পার'। আমরা যাকে ভালবাসি তাকে ভালবেসে উপহার দিই। পেঁচা স্বর্গলোক, ভূলোক, পিতৃলোক সব ঘুরে ঘুরে কোথাও সুন্দর আর কাউকে দেখতে পেল না। একদিন হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল একটা গাছের ফোঁকরে এক পেঁচী বসে আছে। পেঁচা দেখল এই হল সব থেকে সুন্দরী। তখন সে গিয়ে পেঁচীর গলায় মুক্তার হারটা পরিয়ে দিল। গল্পটা প্রথম যেদিন শুনলাম তখন আমার বয়স কম ছিল, আমি হেসে লুটোপুটি খেলাম। পেঁচার দৃষ্টিতে পেঁচী হল সবচেয়ে সুন্দরী, পেঁচীর দৃষ্টিতে পেঁচা হল সব থেকে সুন্দর।

গল্পটা শুনলে আমাদের হাসি পায় ঠিকই, কিন্তু আমি আপনি সবাই এই পেঁচা আর পেঁচীর দলে। আমরা বুঝতেও পারি না, যাকে আমি ভালবাসছি কিভাবে সে একটা পেঁচা বা পেঁচী। নবম অধ্যায় যখন শেষ করছিলেন, তখন ভগবান এটাই বললেন, *অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্*, এই জগৎটা অনিত্য, এখানে সুখ বলে কিছু নেই। আমাদের ভাষায় বলতে গেলে এর অর্থ দাঁড়ায়, ভগবান যেন বলতে চাইছেন, তুমি বুঝতেও পারছ না যে, তুমি এই পেঁচা আর পেঁচীর খেলার মধ্যে ঘুরঘুর করছ। পেঁচা পেঁচীকে খুঁজছে, পেঁচী পেঁচাকে খুঁজছে, আর এর মধ্যেই তুমি লক্ষ লক্ষ জন্ম ঘুরপাক করে যাচ্ছ, মাঝখান থেকে মা লক্ষ্মীর দেওয়া অমূল্য মুক্তার হারটা হারিয়ে যাচ্ছে।

এটা যখন তুমি বুঝে নেবে তখন কি করবে? কিছুই করতে হবে না, শুধু *ভজস্ব মাম্*, আমার ভজনা কর, আমাকে ভক্তি কর, আমাকেই পূজা কর, আমাকেই নমস্কার কর। কিভাবে আমি ভজনা করব? আমরা স্বাভাবিক ভাবেই জানি, আমাকে জপ করতে হবে, ধ্যান করতে হবে। জপধ্যান করার জন্য একজন গুরু দরকার। গুরু বলে দেন কি করতে হবে, কিভাবে করতে হবে। তাও কোথাও গিয়ে আমাদের একটু এদিক সেদিক হয়ে যায়। অনেক সময় এই ধর্ম জগতে এগোবার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পাওয়া যায় না। ইদানিং তাও আমাদের উদ্যোগে ইউটিউবে অনেক ধরণের শাস্ত্রের উপর আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আলোচনাগুলো শুনে অনেকেই বলছেন, এই ধরণের কথা আমাদের আগে জানা ছিল না। আমাদেরই বা কি জানা ছিল, সন্ন্যাসী হয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে এতদিন পড়ে আছি বলেই এতটুকু জানা গেছে। অনেক সময় আমরা নিজের মত করে একটা সিদ্ধান্ত বানিয়ে নিই। আমার কাছে এর আগে কয়েকজন এসেছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ বলতেন, স্বপ্নে মন্ত্র পেয়েছেন। স্বপ্নেও অনেকে মন্ত্র পান, আমাদের যোগদর্শনেও এই কথা বলছেন। কিন্তু সব সময় যে সেটা ঠিক মন্ত্র হবে, তা নয়। আমি অনেককে বুঝিয় সুঝিয়ে আমাদের যাঁরা ভাইস প্রেসিডেন্ট

মহারাজরা আছেন, এনারাই কাউকে মন্ত্রদীক্ষা দেওয়ার অধিকার পেয়েছেন, তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি, ওনারা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বলে দিয়েছেন, এই মন্ত্র ঠিক না।

আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছেন, কিন্তু ধর্মের কিছু কিছু ব্যাপারে তিনি তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা নিয়ে চলেন। উনি একদিন একটা খুব সুন্দর কথা বললেন। উনি শিবকে ভালবাসেন, কিন্তু শিবের যে রূপ, যেটা আমরা সাধারণ ভাবে জানি, উনি বলছেন, 'এই রূপ তো কোন আদিকালের একটা পৌরাণিক রূপ, আজকের দিনে ঐ রূপ চলে না। তার চাইতে স্বামীজী যেমন ছিলেন, যেমন তাঁর রূপ, তার উপর সন্ন্যাসীর বেশ, সব দিক দিয়ে আকর্ষণীয়'। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'শিবকে এই রূপে চিন্তন করতে পারেন কিনা'। আমি বলে দিলাম, 'না, করা যায় না'। আমি নিজের মত মন্ত্র বানিয়ে নিতে পারি না, আমি নিজের মত রূপ তৈরী করে নিতে পারি না। আজকে যাঁরা ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত, ঠাকুর এদের বলতেন ইয়ং বেঙ্গল। বাংলায় এই ব্যাপারটা আগে থেকেই আছে, বাঙালীরা চিন্তনপ্রবণ, বাংলার মানুষ চিন্তা-ভাবনা করে, কিন্তু যেখানে লাগানোর কথা না, সেখানেও চিন্তা-ভাবনাগুলি লাগিয়ে দিতে ইতস্তত করেন না।

এটা ঠিক যে, যে জায়গাতে ভেরিফাই করা যায় না, সেই জায়গাতে আমরা চিন্তা-ভাবনাগুলো সহজে লাগিয়ে দিতে পারি। যেমন মনস্তত্ত্বে, সম্পর্কের ক্ষেত্রে, ধর্মে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনাগুলি বুদ্ধি খাটিয়ে লাগিয়ে দিই; কিন্তু ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, গণিতে এভাবে লাগাতে পারব না, লাগালেই জিরো দিয়ে দেবে। নিজের বুদ্ধি যদি ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, বায়োলজিতে লাগাতে যাই, আমাকে জিরো দিয়ে দেবে। কিন্তু যেখানে ভেরিফাই করা যায় না, subjective experience যেখানে হয়, যেমন রিলেশানশিপে, ম্যানেজমেন্টে কত থিয়োরি দিয়ে যাচ্ছে। কারণ সেখানে কোন মাপদণ্ড নেই। ধর্মের ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি হয়। কোন একজন চিন্তক, যার কোন অধিকার নেই ধর্মের ব্যাপারে কথা বলার, তিনি ধর্মের নামে কি একটা উক্তি করে দিয়েছেন, সেটাকে নিয়ে আমরা নাচানাচি করে যাচ্ছি। এই যে শিবের কথা বলতে গিয়ে উনি বললেন, এটা খুব interesting প্রশ্ন। আমাদের মধ্যেও এই রকম প্রশ্ন জাগতে পারে, শিবকে নিয়ে না জাগুক, কৃষ্ণকে নিয়ে জাগবে, কৃষ্ণকে নিয়ে না হোক শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে জাগবে, আমরা এই রকম করতে পারি কিনা।

আমরা তা কখনই করতে পারি না, কারণ ভগবান কোন কল্পনার বিষয় নন। যদি তিনি কল্পনার বিষয় হতেন, এবং আমি যদি ভগবানকে কল্পনা করতে পারতাম, তাহলে অবশ্যই আমি করতে পারতাম। ঈশ্বর সত্য, ভগবান সত্য, তাঁর যে তত্ত্বের কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে, ঋষিরা ধ্যানের গভীরে যে অনুভূতি পেয়েছিলেন, এটাই একমাত্র সঠিক। ঠাকুর সেইজন্য বললেন, সনাতন ধর্মই থাকবে, বাকি সব আসবে যাবে। কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম ধর্ম এক সময় খুব নাম করেছিল, কিন্তু আজ আর কেউ ব্রাহ্ম ধর্মের নাম করে না। কারণ, ওটা সনাতন ধর্ম ছিল না। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে, এখান থেকে সেখান থেকে কিছু কথাকে নিয়ে এসে ব্রাহ্ম ধর্ম হয়েছিল। আকবর যেমন দিনহে ইলাহি করেছিলেন। এভাবে ধর্ম দাঁড়াতে পারে না, ধর্ম তখনই দাঁড়াবে, যদি কেউ প্রত্যক্ষ করে থাকেন। শিবের ঐ রূপ, যেটা আমরা পাই, যোগীরা সেই রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কৃষ্ণের যে রূপ আমরা দেখছি, যোগীরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এবং তাঁরা নিজের নিজের ধর্মগ্রন্থে তার বর্ণনা করে গেছেন। এটাই হল সঠিক পথ।

এখানে খুব সুন্দর একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে সাধনা করছেন, তিনি একদিন পঞ্চবটীতে খালি চোখে দেখছেন, মা সীতা হেঁটে যাচ্ছেন। এই দেখাটা ধ্যানের অবস্থায় যে অনুভূতি হয়, সেই অনুভূতি এখানে হচ্ছে না। কল্পনা আমাদের স্তরে হয়, ঠাকুরের স্তরে তো কল্পনা হবে না। স্থূল জগৎকে আমরা যেমন সহজ ভাবে দেখি; সূক্ষ্ম জগৎ, কারণ জগৎকে ঠাকুর সেইভাবে দেখছেন। ধ্যান করে সিদ্ধি লাভ করলে যে কেউ এই সূক্ষ্ম জগৎ,

কারণ জগৎ দেখতে পারবেন। ঠাকুর দেখছেন, মা সীতার হাতে দুটি ডায়মণ্ড কাটা বালা, দেখে ঠাকুরের খুব ভাল লাগল। ঠাকুরের ইচ্ছে হল, শ্রীশ্রীমায়ের জন্য ঠিক ঐ রকম বালা গড়িয়ে দেবেন, এবং দিয়েছিলেনও। ঠাকুর বর্ণনা করছেন, মা সীতার সেই হাসি হাসি মুখ, এসে ঠাকুরের শরীরে মিশে গেলেন। বলছেন, মা সীতার যে হাসি মুখ, সেই হাসিটাই নাকি ঠাকুরের মুখে লেগে থাকত। এবার যদি কেউ এই দৃশ্যের ছবি আঁকেন, সেই হাসি, যে হাসির পিছনে এক গভীর বেদনা রয়েছে, কিন্তু হাসি; হাতে ডায়মণ্ড কাটা বালা, এই দৃশ্যকে ছবি এঁকে যে কেউ ধ্যান করতে পারে, কারণ ঠাকুর প্রত্যক্ষ করেছেন। তার মানে, একটা নূতন রূপ আমরা পেয়ে যাচ্ছি। কেউ যদি ধর্ম জগতে একটা নূতন কথা দিতে চান, একটা ভাব দিতে চান বা একটা রূপ দিতে চান, দিতে পারেন; কিন্তু আগে তাঁকে সেটাতে সিদ্ধি লাভ করতে হবে, সিদ্ধি লাভ করে যেমন যেমন প্রত্যক্ষ করবেন, যেমন যেমন কথা বলবেন, তেমন তেমন সেটাও একটা সাধনার পথ হয়ে যাবে। দশম, একাদশ, দ্বাদশ বা পুরো গীতাটাই প্রায় সাধনার পথ। আমাদের সাবধান হতে হবে, আমাদের কল্পনা যেন কিম্ভূতকিমাকার হয়ে বেলাগাম ঘোড়ার মত না দৌড়ায়, কল্পনা যাতে এই রকম বেলাগাম না হয়ে যায়, সেইজন্য শাস্ত্র, গীতা আমাদের বেঁধে দিচ্ছেন।

দশম অধ্যায় খুব মধুর এবং মিষ্টি। এখানে যে দশ এগারোটা শ্লোক আছে, সুর দিয়ে গান করার চেষ্টা করলে খুব সুন্দর শোনাবে। এরজন্য ক্ল্যাশিকাল সিঙ্গার বা বড় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী হতে হবে না, গলায় একটু সুর থাকলেই এই কটা শ্লোক সুর করে গান গাওয়া যাবে। পুরো গীতার এই দশ এগারোটা শ্লোক, আমারও থেকে থেকে ইচ্ছে হয় চেঁচিয়ে গান করি। কিন্তু আমার গানের গলাও নেই, গানের ট্রেনিংও নেই। এক আধবার চেঁচিয়ে একটু গান করার চেষ্টা করেছি, মহারাজরা আমাকে বকে দিয়েছেন, এখানে গান করে আমাদের বিরক্ত করো না। আপনাদের যাঁদের গলায় সুর আছে, যদি পারেন এই কটা শ্লোক গান করবেন। গীতার দশম অধ্যায়ের প্রথম কয়েকটি শ্লোকে ভগবান নিজের স্বরূপ খুলে দিচ্ছেন, এই স্বরূপ খুলছেন ভক্তদের জন্য। নবম অধ্যায় ভক্তিযোগ, কিন্তু সেখানেও জ্ঞানের কথা চলেছে, রাজবিদ্যারাজগুহ্য যোগ নাম কিনা, খুব গভীর দর্শন আছে। দর্শন এই অধ্যায়েও আছে, কিন্তু তার সাথে একটা মাধুর্য রয়েছে। এই মাধুর্যতে আমরা যেন ভাব রাজ্যে কোথায় হারিয়ে যাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাসদেব রাসলীলার বর্ণনা কেন করলেন? শাস্ত্র না জানা থাকলে, সাথে সাথে একটা ছবি না থাকলে, তত্ত্বটা ঠিক বোঝা যায় না। যে কোন শাস্ত্র, উপনিষদও যদি বুঝতে হয়, লীলাবর্ণন একটু জানা দরকার। মহাভারত যদি বুঝতে হয়, গীতা যদি বুঝতে হয়, একটু এগুলো জানা দরকার। বেদ উপনিষদে ঠিক ঠিক কি আছে একটু জানতে হয়, না হলে এই জিনিসগুলো বোঝা যায় না। সপ্তম আর নবম দুটি অধ্যায়ে ভগবানের বিভূতি, বিশেষ শক্তির কথা বলা হয়েছিল। দশম অধ্যায়ে বলবেন, ভগবানকে কি কি রূপে চিন্তন করা যায়। তবে মনে রাখতে হবে, এর আগে যেমন বলা হল; আমরা নিজের মত ভগবানের চিন্তন করতে পারি না।

আমরা যে ধ্যান করি, এই ধ্যান তিন প্রকার; যার মধ্যে তত্ত্ব চিন্তন হল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। তত্ত্ব চিন্তন ঋষিরা করেন, ঈশ্বরের এই এই তত্ত্ব, ঋষিরা এটাকে নিয়ে চিন্তন করছেন। ঈশ্বরের তত্ত্ব আমরা এর আগে পর পর দেখে এলাম, বিশেষ করে সপ্তম আর নবম অধ্যায়ে। ধ্যানের দ্বিতীয় প্রকার হয়, গুণচিন্তন, যেটা এই জগতে প্রকাশ হচ্ছে, তত্ত্ব হল ঈশ্বরের বাস্তব স্বরূপ। ধ্যানের তৃতীয় প্রকার হয় লীলাচিন্তন। ভগবান অবতার হয়ে যখন আসেন, তখন অবতার রূপে তাঁর লীলাগুলো ভাল জানা যায়। অবতার না হলেও, আমাদের পুরাণাদিতে যা যা বর্ণনা আছে, ভগবান বিষ্ণু এই রকম করেছেন, শিব এই রকম করেছেন, এগুলোই লীলা। এই তিন প্রকার ধ্যানকে মিলিয়ে হয় নাম, যেমন বিষ্ণুসহস্রনাম, শিবসহস্রনাম আছে। নাম যখন দেওয়া হয়, তখন এই তিনটেকে মিলিয়ে – তত্ত্ব, গুণ আর লীলাকে আধার করে নাম আসে। কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বা

রামকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নামজপ করছেন, কিন্তু ঐ নামের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্ব, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব, এটাকেও চিন্তন করতে হয়, তা না হলে জপের ফল হয় না। শুধু জপ করলে কি হবে না? আপনি ট্যাক্সিতে চাপলে শুনতে পাবেন *ভূর্ভুবঃ স্বঃ* বেজেই যাচ্ছে, তার জন্য কি সিডি প্লেয়ারের মুক্তি হয়ে যাবে? কোন দিন হবে না। মুক্তি পথে এগোবার জন্য তত্ত্ব, গুণ আর লীলা চিন্তন করতে হয়। শ্রীশ্রীমা বলছেন জপাৎ সিদ্ধি, জপ করতে করতে ধীরে ধীরে চেতনা জাগে। জপে সরাসরি হয়, কিন্তু ঐ ভাবটা এসে যায়, ঐ ভাব দিয়ে হয়। তত্ত্ব চিন্তনের জন্য ভগবান আগে আগেও বলছেন, পরেও আবার বলবেন। এবার কিন্তু পুরোদমে ভাব নিয়ে চলবেন, পরে একাদশ অধ্যায়ে ভগবান শুধু তাঁর একটি বিশেষ রূপ দেখাবেন।

এই যে তত্ত্ব, ভাব ও লীলা, ওখান থেকে রূপ আসে। লীলা আর রূপ একসাথে জড়িয়ে আছে। আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, *তত্ত্বং চ ভগবতো বক্তব্যম্ উক্তম্ অপি দুর্বিজ্ঞেয়ত্বাদ্*, ভগবানের তত্ত্ব অত্যন্ত কঠিন, আচার্য শঙ্করের মত মানুষ বলছেন, *দুর্বিজ্ঞেয়*, এটাকে বোঝা অত্যন্ত কঠিন। কিছু দিন আগে এক নেতা বললেন, বাচ্চা বয়স থেকে গীতা পড়ানো দরকার। কয়েকদিন আগে বাংলাদেশ থেকে কয়েকজন আমার কাছে এসেছিলেন, ওনারা ইউটিউবে আমাদের লেকচার শোনেন। এখানে এসেছেন, খুব ইচ্ছে আমার সাথে দেখা করবেন। আমি তখন ক্লাশে ছিলাম। অনেকক্ষন অপেক্ষা করলেন। ওনাদের কাছে শুনলাম, এখন বাংলাদেশে সরকারের তরফ থেকে একশোর উপর গীতার স্কুল করা হয়েছে। উনি খুব বিনম্র ভাবে জানতে চাইলেন, এতে কি কিছু ভাল হবে? আমি বললাম, কিছু না করার থেকে কিছু করা তো ভাল। তবে যদি জানতে চান, গীতা পড়লে তার একটা চেতনা জাগবে কিনা, বলা খুব মুশকিল, কারণ গীতা দুর্বিজ্ঞেয়, ধর্মতত্ত্ব অত্যন্ত কঠিন। আচার্য যেখান থেকে গীতার ভাষ্য লেখা শুরু করলেন, সেখান থেকেই তিনি বলতে শুরু করেছেন, ঈশ্বরের তত্ত্ব, ধর্মের তত্ত্ব অত্যন্ত সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম বলেই এত দুর্বিজ্ঞেয়, কিন্তু ক্যালকুলাস, রকেট বিজ্ঞানের মত অন্য কোন complexity নেই, অত্যন্ত সহজ, অত্যন্ত সরল। আমাদের মন অত্যন্ত স্থূল হয়ে গেছে বলে আমরা ধরতে পারি না। সাধনা করতে করতে মন যখন সহজ সরল হয়, তখন এই সূক্ষ্ম জিনিসগুলো ধরা যায়। আচার্য বলছেন, দুর্বিজ্ঞেয় হওয়ার জন্য এর বারবার বর্ণনা করা দরকার।

আমরা এবার মূল শ্লোকে প্রবেশ করছি। প্রথম শ্লোকটাই খুব সুন্দর, যাঁরা গান করতে পারেন করবেন, ঐ মাধুর্যটা যদি আনতে পারেন, প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। এর মধ্যে যা ভক্তির রস, ভক্তির মাধুর্য রয়েছে, জগৎ সংসারের কথা ভুলে যাবেন।

শ্রীভগবানুবাচ
ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যৎ তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া।।১।।

(শ্রীভগবান বললেন –হে মহাবাহো, তুমি আমার বাক্যশ্রবণে আনন্দিত হও। সেইজন্য আমি তোমার শ্রেয়ঃকামনায় উৎকৃষ্ট তত্ত্বকথা, পুনরায় বলছি, মনোযোগ সহাকারে তা তুমি শ্রবণ কর।)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে অনেকবার অনেক ভাবে ভালবেসে সম্বোধন করেছেন। ভগবান যখন থেকে বলতে শুরু করেছেন, সেই *কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং* থেকে, কিন্তু অর্জুন যে তাঁর সখা, অর্জুন যে তাঁর প্রেমের পাত্র; এই প্রথম ভগবান সেই মাধুর্য নিয়ে অর্জুনকে সম্বোধন করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন ভাবে নরেন নরেন করে যাচ্ছেন; ভালবাসার, প্রেমের কি মাধুর্য সেখানে, শ্রীকৃষ্ণ সেই ভাবে অর্জুন অর্জুন করে যাচ্ছেন। *ভূয় এব মহাবাহো,* হে বাহুবলশালী অর্জুন আবার আমি তোমাকে বলছি। কি কথা? *শৃণু মে পরমং বচঃ, পরমং* মানে আমার তত্ত্বগুলি, এটাই ভগবানের পরম কথা, এর উপরে আর কিছু কথা হয় না। আপনারা এই কথাগুলো শুনছেন, ধন্য আপনারা, আপনাদের কত সঞ্চিত পূণ্য রয়েছে, পূণ্যাত্মা না হলে এই ধরণের ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ করার সুযোগ পেতেন না। কত

ইঞ্জিনিয়ার আছেন, কত বড় বড় ডাক্তার আছেন, কত উচ্চ শিক্ষিত, কতজন আবার পদমর্যাদায় অনেক উচ্চস্থানে আছেন, তাঁরা মন দিয়ে শুনছেন, কমেন্ট করছেন। আমি ভাবি কত জন্মজন্মান্তরের কত পূণ্য সঞ্চিত হয়েছে বলে, আজ ওনাদের গীতার কথা শোনার ইচ্ছে হয়েছে। এখানে কোন প্রলোভন দেখান হচ্ছে না যে –গীতার ব্যাখ্যা শ্রবণ করলে আপনি স্বর্গে যাবেন। এখানে কোন ভয় দেখান হচ্ছে না যে, শ্রবণ না করলে তুমি নরকে যাবে। আপনি শুনছেন, কারণ আপনার ভাল লাগছে, মধুর লাগছে। তাঁর নিজের ভিতরে যে একটা তৃষ্ণা, তাঁর হৃদয়টা যেন ধর্ম লাভের জন্য মরুভূমি হয়ে অপেক্ষা করছিল, ঈশ্বরীয় এই কথাগুলি যেন সেখানে বৃষ্টি ধারার মত তাঁর হৃদয়ে বর্ষণ করছে, বৃষ্টির জল হৃদয়কে সবুজ করে দিচ্ছে। এটাই ভগবান বলছেন, তোমাকে আবার বলছি, কারণ ভগবানের পরম কথাগুলো খুব কঠিন। আমরা নবম অধ্যায় শেষ করে দশম অধ্যায়ে প্রবেশ করলাম, তার মানে গীতার পঞ্চাশ শতাংশ আমরা পেরিয়ে এসেছি, তারপরেও ভগবান বলছেন, অর্জুন তোমাকে আবার আমি আমার পরম তত্ত্ব বলছি শোন।

যৎ তেহহং প্রীয়মাণায়, কারণ তুমি আমাকে ভালবাসো, আমি তোমার প্রিয়, তুমিও আমার প্রিয়; এই যে তোমার ভালবাসা, আমার প্রতি তোমার যে এই প্রেম, *বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া,* তোমার হিতের জন্য, তোমার ভালর জন্য আবার তোমাকে বলছি, তুমি শোন। এমনিতে সাধারণ ভাবে তো তুমি বুঝতে পারবে না, তাই আরও একবার আমি তোমাকে বলছি। ভগবান আবারও বলবেন। জানি না কেন, *বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া,* এই একটা কথা সারাদিন আমার মাথায় বাজতে থাকে। ভগবান বলছেন, তোমার হিতের জন্য, তোমার মঙ্গলের জন্য বলছি। কথামৃতেও দেখতে পাই, এই ভাব বার বার আসে, অবতার আসেন জ্ঞান ভক্তি শেখাতে। সেই একই কথা তিনি বার বার বলছেন। আমাদেরও অনেক সময় মনে হয়, একই কথা বার বার কেন বলছেন। কারণ উনি বুঝতে পারছেন, আমরা এখনও সম্পূর্ণ ভাবে ধারণা করতে পারছি না।

প্রীয়মাণায়, আমরা যেভাবে বলি, I love you, I love India, I love Kolkata, এভাবে এই শব্দের সরাসরি অনুবাদ হয় না, সংস্কৃত একটু indirect language কিনা। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের ভালবাসা কি রকম? আচার্য বলছেন, *মদ্বচনাৎ প্রীয়সে ত্বম্ অতীব অমৃতম্ ইব পিবন্,* তোমার ভালবাসা আমাকে নিয়ে না, আমার শরীরকে নিয়ে না, আমার মুখমণ্ডলকে নিয়ে না, আমার ক্ষমতাকে নিয়ে না, আমি যে কথাগুলি বলছি, সেই কথার প্রতি তোমার ভালবাসা। এই যে আমি তত্ত্বগুলি তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি, এটার প্রতি তোমার ভালবাসা। আর এটাকে তুমি কিভাবে গ্রহণ করছ? অমৃতের মত পান করছ। শ্রীকৃষ্ণও আপ্লুত, এই রকম উত্তম শিষ্য পেয়েছেন, *যৎ তেহহং প্রীয়মাণায়*। তুমি আমাকে ভালবাস, আমার কথগুলিকে ভালবাস, আমার কথাগুলি অমৃতের মত পান করছ। *হিতকাম্যয়া,* তোমার ভালর জন্য বলছি। *হিতকাম্যয়* অনেক অর্থে হতে পারে, হিত এই অর্থ হতে পারে যে, তোমার ভাল লাগবে এই অর্থেও হতে পারে। দ্বিতীয় শ্লোকটাও গানের জন্য।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ।।২।।

(ব্রহ্মাদি দেবতা বা ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষি কেউই আমার উৎপত্তি অবগত নন। কেন না, আমি সমস্ত দেবতা ও মহর্ষিগণের সর্বপ্রকারে আদি কারণ।)

ভগবানের স্বরূপ কেউ জানতে পারে না। স্বামীজী দেববাণীতে বলছেন, You can be one with God but you can never know God, ঈশ্বরের সাথে এক হওয়া যায়, কিন্তু তাঁকে জানা যায় না। কারণ কোন কিছুকে জানার জন্য বুদ্ধি লাগে। বুদ্ধি আবার শুদ্ধ চৈতন্যের তুলনায় স্থূল, তাই বুদ্ধি কোন দিন ঈশ্বরকে জানতে পারবে না। ধ্যানের গভীরে গিয়ে যদি বুদ্ধিকে ত্যাগ করে দিতে পারে, তাহলে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যাবে, কিন্তু ঈশ্বরকে জানতে কোন দিন পারবে না।

ঠাকুর বার বার বলছেন, বোধে বোধ করে। বুদ্ধি দিয়ে সগুণ সাকারকে যদি জানতে চান, জানতে পারবেন, কিন্তু সীমিত রূপে, পুরোটা জানা যাবে না। এই জিনিসটাকেই কবিতার মাধ্যমে বলছেন, যাতে মানুষ বুঝতে পারে – *ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ*, হে অর্জুন, দেবতারা আমাকে জানতে পারে না। তাহলে তুমি কি আমাকে জানতে পারবে? কোন প্রশ্নই নেই জানার, তুমি আমাকে কি করে জানবে! আমাকে জানা যায় না বলে, বিভিন্ন ভাবে আমি এটা তোমার সামনে রাখছি। এই কথাতেই বোঝা যায় গীতার শ্লোক বোঝা কত কঠিন। আমরাই কত দিন ধরে এতেই লেগে আছি, যবে ব্রহ্মচারী হয়ে মঠে জয়েন করেছি, তবে থেকে গীতা পড়েই যাচ্ছি। এখন যে বলব বুঝি, কি করে বলব! আরও দশ বছর পরে আমার মনে হবে, কিছুই বুঝিনি। কিন্তু যখন প্রথম প্রথম পড়তাম, তখন মনে হত সব বুঝে গেছি। ট্রেনিং সেন্টারে এসে গীতা পড়াচ্ছেন, মনে হত সব বুঝতে পারছি। তারপরেও যখন পড়ছি, তখনও মনে করতাম সব বুঝে গেছি। এখন এই বয়সে এসে মনে হচ্ছে, সব বুঝে নিয়েছি। দশ বছর পর হয়ত মনে হবে কিছুই বুঝিনি। কারণ যতক্ষণ ঈশ্বর দর্শন না হয় ততক্ষণ এভাবেই চলবে। নাসদীয় সূক্তমে এই যে বলছেন, *কো অদ্ধা বেদ*, কে জানতে পারে সৃষ্টি কিভাবে হল। কার্য কারণকে কখনই জানতে পারবে না। যেটা কারণ সে কার্যকে জানতে পারে, কার্য কারণকে জানতে পারে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাঁরা আছেন, তাঁরা হলেন কার্য আর ঈশ্বর হলেন কারণ। সেইজন্য ঈশ্বরকে কেউ কোন দিন জানতে পারবে না।

প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ, যাঁরা মহর্ষি তাঁরাও আমাকে জানেন না। *প্রভবং* দুটো অর্থে বলছেন, ভগবানের যে অতিশয় শক্তি, ভগবানের যে ক্ষমতা আর দ্বিতীয় অর্থ ভগবানের যে মূল, ভৃগু আদি মহর্ষিরাও জানেন না। কারণ, *অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ*, আমি হলাম সবারই আদি, দেবতাদেরও আদি মহর্ষিদেরও আদি, তাঁরা কি করে আমাকে জানবে! তাঁরা হলেন কার্য, আমি হলাম কারণ। যৌগিককে জানার জন্য সহজের সাহায্য নিতে হয়। যৌগিককে দিয়ে সহজকে জানা যায় না। মন, বুদ্ধি যৌগিক, শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ সহজ।

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।৩।।

(যিনি আমাকে আদিহীন, জন্মরহিত ও সর্বলোকের মহেশ্বর বলে জানেন, মনুষমধ্যে তিনিই মোহশূন্য হয়ে জ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত সর্বপাপ থেকে প্রমুক্ত হন।)

পাপ থেকে কিভাবে মুক্তি হয় বলছেন। খুব সহজ। আচার্য শঙ্করের কত করুণা, বলছেন, *মতিপূর্বামতিপূর্বকৃতৈঃ*, জেনে শুনে পাপ করে থাকুক, অজান্তায় পাপ করে থাকুক, সমস্ত পাপ থেকেই সে মুক্তি পেয়ে যাবে। কি ভাবে? যদি তুমি ঈশ্বরের স্বরূপ জানতে পার। কি সেই স্বরূপ? ভগবান বলছেন –*যো মামজমনাদিঞ্চ*, আমি সবারই কারণ। ইন্দ্রাদি দেবতারা হলেন সীমিত, ঈশ্বর শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, তিনি অনন্ত। যখন সেই সচ্চিদানন্দের উপর এক একটা মুখোশ লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তখন তিনি এক একটা শক্তি, এক একটা গুণ। সেই শক্তি বা গুণকে দেবতা বলা হয় বা ঈশ্বরের একটা রূপ বলা হয়। যেমন সরস্বতী, সরস্বতীকে ঈশ্বরের একটা রূপ বলা হয়, একটা শক্তি বলা হয়। কিন্তু ইন্দ্রাদিরা হলেন দেবতা। আমার আদি অন্য কেউ না, কারণ আমি অজন্মা। সেইজন্য জগতে যে ছয়টি বিকার দেখা যায়, আমার মধ্যে তার একটি কোন বিকার নেই।

ঠাকুর বলছেন, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং মহাকারণ। আত্মার এই তিনটি অবস্থা হয়, যেটা আমরা দেখি। স্থূল –যেটা আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করি। সূক্ষ্ম –যেটা আমরা স্বপ্নে অনুভব করি। কারণ –যেটা আমরা সুষুপ্তি অবস্থায় কিছুটা বোধ করি। এর পারে রয়েছে মহাকারণ, তূরীয়। এনারা বলেন, জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি; স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ ও মহাকারণ। সুষুপ্তির পারে তূরীয়, যা কারণের পারে মহাকারণ। যে আমাকে এইভাবে জানে –ওখান থেকে সব কিছু; সে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে

যায়। আমরা যদি এক মিনিটের জন্য একটু ভাবি, এই যে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড, এখানে মানুষ চাঁদে লোক পাঠিয়ে কত লাফালাফি করছে, মঙ্গলগ্রহে যান পাঠিয়ে কত লাফালাফি, আর তার বাইরে কোথায় তারা, গ্যালাক্সি, ক্লাস্টার কত কিছু আছে যার এক কণাও এখনও মানুষ হদিসই পায়নি। আর এই পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবান থেকে নিমেষে জন্ম নিয়েছে। তাহলে ভগবান কি সাংঘাতিক ভেবে দেখলে বিস্ময়ের ঘোর কাটতে চায় না। ভগবানকে যিনি এই রূপে জানেন, শ্রীকৃষ্ণকে যিনি এই রূপে জানেন, শুধু যে কৃষ্ণ তা না, আপনার আমার যিনি ইষ্ট তিনি, আর আপনার ইষ্টকে যদি এভাবে না দেখেন তাহলে আপনার সাধনা অপূর্ণ, তার মানে সিদ্ধি হবে না।

আচার্য বলছেন, *যো বেত্তি বিজানাতি লোকমহেশ্বরং লোকানাং মহান্তম্ ঈশ্বরং তুরীয়ম্*, তূরীয়, মানে সব কিছুর পারে। যাবতীয় যা কিছু আছে, আমি তার ঈশ্বর, আমি তার নিয়ন্ত্রণ করি, আমার থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সব আমাতেই হয়। যে এটা জানে সে *অসংমূঢ়ঃ*, জ্ঞানী বলছেন না, বলছেন অসংমূঢ়, ছন্দের জন্য বা কবিতার জন্য এইভাবে বলা হতে পারে। *মূঢ়ঃ* মানে মুর্খ –মন যাদের মোহিত হয়ে আছে, আর *অসংমূঢ়ঃ* মানে জ্ঞানী; *স মর্ত্যেষু*, এই জগতে তিনি জ্ঞানী। যিনি এই প্রকার জ্ঞানী, সমস্ত পাপ থেকে তিনি মুক্ত হয়ে যান। সংসারমুক্তি হয়ে যায়, ঈশ্বর তত্ত্ব জেনে যাওয়া মানে, জ্ঞান অজ্ঞানের পারে চল গিয়ে সমস্ত পাপ থেকে তাঁর মুক্তি। কিভাবে তিনি মহেশ্বর? মহেশ্বর বলতে আমরা শিবকে বুঝি, কিন্তু যার যিনি ইষ্ট তিনিই মহেশ্বর। মহেশ্বর কেন? দুটি শ্লোকে এখানে একসাথে আসে –

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ।।৪।।
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোহযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ।।৫।।

(অন্তঃকরণের সূক্ষ্মবিষয়ের বোধসামর্থ্য, আত্মাদি পদার্থের জ্ঞান, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ক্ষমা, সত্য, বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমচিত্ততা, সন্তোষ, তপস্যা, দান, ধর্মনিমিত্ত কীর্তি ও অধর্মনিমিত্ত অকীর্তি –এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রাণিগণের স্ব স্ব কর্মানুসারে আমার থেকেই উৎপন্ন হয়।)

আমরা যেমন বলি ঠাকুরের ইচ্ছা, সব কিছু ঠাকুরের কাছ থেকে আসে; তাঁর ইচ্ছা বিনা গাছের একটা পাতা পর্যন্ত নড়ে না; ঠিক তেমন আমার আপনার মধ্যে যে গুণ, তা ভগবান থেকেই এসেছে। আমার আপনার মধ্যে যে দুর্গুণ সেটাও ভগবান থেকেই এসেছে। তখন মনে হয়, কেন ভগবান দুর্গুণ করেছেন, কেন ভগবান দুষ্ট লোক করেছেন। জগৎরূপ সংসারে সব কিছুরই প্রয়োজন আছে; আমাদের মধ্যে যে কাম, ক্রোধ, লোভ আদি আছে, এরও দরকার আছে, এছাড়া আমরা বড় হতে পারব না। সমস্যা হল আমাদের চোখের সামনে আমরা কয়েকজন আদর্শ পুরুষকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। স্বামীজী বলছেন, এই আদর্শ পুরুষরাই সংসারে বেশি ক্ষতি করেছেন। কারণ মানুষের মধ্যে ক্ষমতা নেই, আদর্শ পুরুষদের দেখে তারা নকল করতে যায়, নকল করতে গিয়ে পারে না, তখন উল্টে পড়ে যায়। আপনার বাস্তবিক যে ক্ষমতা, বাস্তবিক যে দুর্বলতা এগুলোকে আপনি গ্রহণ করুন। হ্যাঁ আমার মধ্যে এই দুর্বলতা আছে, তাহলে কি করব? এটার পারে কিভাবে যাওয়া যাবে বলুন? পারে কেন যেতে চাইছেন? ধরুন একজনের ভিতর কাম আছে, কেন সে ওটার পারে যেতে চাইবে, থাকুক কাম। ঠাকুর মোর ঘুরিয়ে দিতে বলছেন, কামটাকে ঘুরিয়ে দাও, সমস্ত জগৎকে ভালবাসতে শেখো। তার সাথে এটাও জেনে নাও যে, তোমার উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের তত্ত্বটাকে জানা, জানার জন্য ঈশ্বর তত্ত্বটা বুঝতে হয়, বোঝার জন্য ঈশ্বর তত্ত্ব বার বার শুনতে হয়। শুনে শুনে মনে যখন একটা ধারণা হবে, তখন তুমি বুঝবে, বোঝার পর ওটা জানার আগ্রহ হবে, আগ্রহ হলে একদিন না

একদিন তুমি জানতে পারবে। তখন কি হবে? এই কাম ক্রোধ তোমার থাকবে, অথচ তোমার জ্ঞান হয়ে যাব, জ্ঞান হয়ে গেলে এই কাম ক্রোধ আকার মাত্র হয়ে থেকে যাবে। তোমার দুর্বলতাকে কাটাবার জন্য কখন লড়াই করতে যাবে না, এটা তোমার ব্যক্তিত্বের অংশ। ভগবান বুদ্ধ আর শ্রীরামকৃষ্ণ কি এক ধাঁচের? স্বামী বিবেকানন্দ আর ভগবান বুদ্ধ কি এক ধাঁচের? শঙ্করাচার্য আর যীশু খ্রীষ্ট কি এক ধাঁচের? কখনই না। এই জগতে যখন এসেছ, তুমি অনুপম।

আমার টিয়া বইয়ের এটাই theme, You are more than what you think you are। আমি নিজেকে যা ভাবি, আমি তার থেকে অনেক বেশি। অনেকে যেমন বলে, তুমি নিজেকে কি ভাব? আরে ভাই, আমি নিজেকে যা ভাবি, আমি তার থেকে অনেক বেশি। এখানে লজ্জার কিছু নেই, বৈষ্ণব বিনয়ের কোন প্রশ্নই নেই। ভিতরে অহঙ্কার আছে আর দেখাচ্ছি। আমি দাসেরও দাস, কখনই আমি তা নই। আমি শুদ্ধ পরম ব্রহ্ম, আমার হৃদয়ে ঈশ্বরের বাস; কিসের দাস, কার দাস! আমি রেণুর রেণু যারা করছে করুক, যারা দাসের দাস বলছে বলুক, আপনি কেন ওই দলে নাম লেখাতে যাবেন। দুর্বলতা যা আছে থাকুক, কোন সমস্যা নেই; কার দুর্বলতা ছিল না। স্বামীজী যখন রেগে যেতেন, যা সব ভাষা ব্যবহার করতেন কল্পনাই করা যায় না। জাহাজে করে আসছেন, এক পাদরি হিন্দু ধর্মের নিন্দা করছেন, স্বামীজী তার কলার ধরে বলছেন, আরেকটা শব্দ বলবে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেব। ক্রোধের আকার মাত্র, কিন্তু আছে তো। এগুলো আমাদের ভুল ধারণা, এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে সবাইকে উপদেশ দিয়ে বেড়াবে, তোমার সব দুর্বলতা থেকে তুমি বেরিয়ে এসো। কিসের বেরিয়ে আসবে, দুর্বলতা আছে তো আছে।

আত্মবিশ্বাস না থাকাটাই দুর্বলতা, এর বাইরে অন্য কোন দুর্বলতা হয় না। যদি এই বিশ্বাস থাকে, ঈশ্বর আমার হৃদয়ে বাস করেন; তাহলে তত্ত্বটাকে আগে বুঝতে হবে, তত্ত্বটাকে জানার আগ্রহ বাড়াতে হবে। এটা না করে দুর্বলতার বিরুদ্ধে সারা জীবন লড়তে থাকুন, কোন দিন আপনি আপনার দুর্বলতার পারে যেতে পারবেন না। ঠাকুর বলছেন, ভবনাথ পান মাছ ত্যাগ করেছে তাতে কি হল, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই আসল ত্যাগ। ঈশ্বরের দিকে চলতে শুরু করলে দুর্বলতা আপনা থেকেই খসে পড়ে যাবে। মোবাইলে এ্যলার্ম সেট করে প্রত্যেক ঘন্টায় পাঁচ মিনিটের জন্য; এ্যলার্ম বেজে উঠল, যা করছেন বন্ধ করে পাঁচ মিনিট ঈশ্বর চিন্তন করুন। রোগ রোগের মত থাকবে, দেহ দেহর মত থাকবে, আপনি আপনার মত থাকবেন। সকাল সন্ধ্যা যে জপধ্যান করছেন সেটা করুন, কিন্তু এটাও তার সাথে করুন। কাম, ক্রোধ, লোভ এগুলো নিজেই চলে যাবে, বাকি যতটা পড়ে থাকবে থাকুক। কারণ সমস্ত কিছু ঈশ্বর থেকেই আসে। কি কি আসে? বুদ্ধি, জ্ঞান আর সংমোহ। তার সঙ্গে ক্ষমা, সত্য, দম ও শম। আচার্য এগুলোর ব্যাখ্যা করছেন, অনেক জায়গাতে এর আলোচনা হয়েছে। প্রত্যেকটি আলাদা করে সংক্ষেপ আলোচনা করা হচ্ছে।

বুদ্ধি বলছেন, অন্তঃকরণের ক্ষমতা, যেটা দিয়ে মানুষ সূক্ষ্ম জিনিসগুলিকে বুঝতে পারে। আমাদের বুদ্ধি স্থূল বলে আমরা সূক্ষ্ম জিনিস ধরতে পারি না। টিভি সিরিয়াল, খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন পড়ে পড়ে আর অমুক বাবাজী, তমুক বাবাজীর লেকচার শুনে শুনে আমাদের মন এত স্থূল হয়ে গেছে যে, আমরা সূক্ষ্ম জিনিসকে আর ধরতে পারি না। আমাদের আত্মোন্নতির কোন চেষ্টাই নেই, কিন্তু দোষ দেব ধর্মকে, দোষ দেব ভগবানকে। বলছেন, বুদ্ধিমান কে, যিনি সূক্ষ্ম জিনিসগুলিকে বুঝতে পারেন।

জ্ঞান, জ্ঞানের একটা পরিভাষা আচার্য বলছেন, আত্মাদি বিষয়ক পদার্থকে বোধ করা; তার মানে ধর্ম তত্ত্বকে বোধ করাকে জ্ঞান বলছেন। এটা সম্ভব হয়, যদি বুদ্ধি থাকে।

জ্ঞানের পরে যেটা হয়, সেটাকে বলছেন **অসংমোহঃ**। যখন জ্ঞান হয়ে যায় তখন তিনি বুঝে গেলেন, এরপর ওখানে নিজেকে লাগাতে হয়। আমার এক সন্ন্যাসী বন্ধু মজা করে রোজ আমাকে বলতেন, লোকটার বুদ্ধি আছে, কিন্তু কোথায় লাগাতে হয় জানে না। বুদ্ধি, জ্ঞান আর অসংমোহ, এই তিনটে যখন আসে, তখন ঠিক ঠিক জ্ঞানকে ধরে রাখা যায়। বুদ্ধি হল জ্ঞানশক্তি, সেখান থেকে যে কাজ হয় সেটা হল জ্ঞান, যেটা জ্ঞান, সেখানে নিজেকে লাগিয়ে রাখাটা হয় অসংমোহ।

ক্ষমা, কেউ যদি আমার নিন্দা করে, এমনকি যদি পিটিয়েও দেয়, তার প্রতি কোন ক্রোধের ভাব না আসা, অর্থাৎ মনে কোন বিকার আসতে না দেওয়া। এটা সত্যিই কঠিন। আমরা স্বামী ভূতেশানন্দজীকে দেখেছি, কক্ষণ ওনার কোন ধরণের বিকার হত না। আমি ওনাকে জিজ্ঞেসও করেছিলাম, 'মহারাজ আপনি কি কখন রেগে গিয়েছিলেন'? উনি একটা ঘটনা বললেন। তখন উনি রাজকোটে ছিলেন, সেখানে একজন ভক্ত তাঁকে একদিন নিমন্ত্রণ করেছেন। মাঝখান থেকে ভদ্রলোক ভুলেই গেছেন যে তিনি মহারাজকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। যথারীতি মহারাজ সেদিন ওই ভক্তের বাড়ি পৌঁছে গেছেন, অথচ বাড়ির লোকেরাও কিছুই জানত না। 'সেদিন আমি খুব রেগে গেলাম। বাড়ির মূল দরজার সামনে একটা বাচ্চা মেয়ে খেলা করছিল, ওকে আমি রেগেমেগে বলে দিলাম, বাবাকে বলে দিও, অন্য কারুর সঙ্গে এমনটা যেন না করে'। ছয় সাত বছরের বাচ্চা কিছুই বুঝল না, শুনে হেসে ফেলল। ওর হাসি দেখে মহারাজও হেসে ফেললেন। এটা হল ওনার ম্যাক্সিমাম্ রাগ। ভিতরে কতটা শক্তি হলে তবে গিয়ে এই রকম ক্ষমা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হন।

সত্য, সত্যকে আচার্য পরিভাষিত করছেন, *যথাদৃষ্টস্য যথাশ্রুতস্য চ আত্মানুভবস্য পরবুদ্ধিসংক্রান্তয়ে তথা এব উচ্চার্যমাণা বাক্ সত্যম্ উচ্যতে*, আমি যেটা দেখেছি, যেটা শুনেছি আর যেভাবে আমার অনুভব হয়েছে, অপরের বুদ্ধিতে প্রবেশ করানোর জন্য যে কথাগুলো ব্যবহার হয় সেটা সত্য। আমাদের একজন মহারাজ মজা করে বলতেন, দেখো, যদি দুষ্টুমি করতে হয় তাহলে, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে কোথায় গেছে, তখন হুঁ হুঁ বলে দিতে হয়। যদি ঐ হুঁ হুঁ বলে দেওয়া হয়, আর হুঁ হুঁ করার মানে তো অনেক রকম হতে পারে। যদি হুঁ বলে দেওয়া হয়, যে শুনছে, তার মনে ঐটা স্পষ্ট যাবে না, উল্টে তার মন যেমন সেই অনুসারে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবে, এটা খুব বিপজ্জনক। আচার্য সত্যকে একেবারে স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন, যেমনটি দেখেছেন, যেমনটি শুনেছেন, যেমনটি অনুভব করেছেন, ঠিক সেই রকমটি বলতে হবে। আর শুধু বলা না, আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে, যাকে বলা হচ্ছে, সেই শ্রোতার মনে যেন ঠিক সেইভাবে ঢোকে। নেতারা যখন কিছু বলে, তখন অর্দ্ধেক কথা ছেড়ে দিল, অর্দ্ধেক বলল, সেটাও আবার অর্দ্ধ সত্য, সেমি সত্য করে বলে দিল যাতে লোকেরা নিজের মত বুঝে নেয়। নিজের মত না, তাকে ঠিক সেই রকমটি বলতে হবে, জিনিসটা যেই রকমটি হয়েছে। আমাকে নিশ্চিত হতে হবে যে, তিনি এটা বুঝেছেন। এটাই হল সত্য বচন।

তারপর আসে **দমঃ** ও **শমঃ**, বাহ্য ইন্দ্রিয়, হাত, পা এগুলোকে সংযম করা হল দম। শম, ভিতরে যে ইন্দ্রিয়গুলি আছে, সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা। পঞ্চেন্দ্রিয়ের যে সংযম, এটা হল দম; আর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যে সংযম হয়, সেটাকে বলা হয় শম। **সুখম্,** আহ্লাদ, আমরা যে আনন্দ পাই, এটাকে বলে সুখ। **দুঃখম্,** দুঃখ হল সন্তাপ। সুখ যেমন ভগবান দেন, দুঃখটাও তিনি দেন। ভগবান কেন সুখ দেন? যাতে আমরা একটু বিশ্রাম পাই। আধ্যাত্মিক জীবনে যে এগোতে চাইছে, তার জন্য শুধু রয়েছে, লড়াই, লড়াই আর লড়াই; শুধু রয়েছে কষ্ট, কষ্ট আর কষ্ট। সংসারে গিয়ে এটা পরিবর্তিত হয়ে যায় দুঃখে; সংসারে শুধু দুঃখ, দুঃখ আর দুঃখ। সন্ন্যাসীর দুঃখ হওয়ার কথা না, সন্ন্যাসীর লড়াই থাকে। সন্ন্যাসীর কষ্ট হতে পারে, দুঃখ হবে না। দুঃখ বেশি দিলে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যাবে, ভেঙে পড়বে; ভগবান সেইজন্য মাঝে মাঝে একটু সুখ দিয়ে দেন। সুখ দিলে একটু জিরিয়ে

নিতে পারে। জিরিয়ে নেওয়ার পর আবার শুরু হয় দুঃখের মার। পুলিশ যখন নামকরা ক্রিমিনালদের মারে, মারতে মারতে সে যদি বেহুঁশ হয়ে গেল, তখন তাকে মেরে কি লাভটা হবে। জল-টল খাইয়ে একটু জিরিয়ে নিতে দেয়। এরপর আবার মারতে শুরু করে। পুলিশ ক্রিমিনালদের সব গোপন খবর বার করার জন্য মারে। এই জগৎরূপী সংসার থেকে বার করার জন্য ভগবান আমাদের সেই দুঃখটা দিয়ে মারেন। আমাদের জীবনের দিকে একবার যদি তাকাই, দেখা যাবে আমরা যতবার দুঃখ পেয়েছি, ততবার ঐ দুঃখ আমাদের এগিয়ে নিয়ে গেছে, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক জগতে। এমনকি আমাদের অনেক কিছু জিনিস যেটা জগতে আবিষ্কার হয়েছে, এগুলো হল দুঃখ। একটা কিছু সমস্যা আছে, সেটা থেকে বেরোবার জন্য মানুষ আবিষ্কার করে।

ভয়ম্, ত্রাস, ভয়টাও ভগবান থেকে আসে। ভয় যদি না থাকে, আমরা বাঘের সামনে, সিংহের সামনে চলে যাব, এবং শেষ হয়ে যাব। **অভয়ম্,** ত্রাসের বিপরীত, একটা বীরের ভাব, এটাও ভগবান দিয়ে রেখেছেন। সব কিছু ভগবান থেকে আসে। আমাদের ভিতরে যে ভয়, আমাদের ভিতরে যে নির্ভয়, বীরের ভাব, দুটোই ভগবান থেকে এসেছে। যে কাপুরুষ, এই কাপুরুষতাও ভগবান থেকে এসেছে। কাপুরুষ কেন? কারণ সে বাঁচতে চাইছে, তার ভিতর শক্তির অভাব।

অহিংসা সমতা তুষ্টিঃ তপো দানং যশোহযশঃ, **অহিংসা** শব্দকে আচার্য ব্যাখ্যা করে বলছেন, *অপীড়া প্রাণিনাম্,* কোন প্রাণীকে কষ্ট দিতে নেই। **সমতা**, সমচিত্ততা, চিত্তে সমান ভাব। **তুষ্টিঃ**, *সন্তোষঃ পর্যাপ্তবুদ্ধি লাভেষু,* আমার যা প্রয়োজন, তা আমার কাছে আছে, এটাই আমার পর্যাপ্ত, আমার আর কিছু লাগবে না –এটাই *তুষ্টিঃ*। বর্তমান কালে আইটি সেক্টরে, ম্যানেজমেন্টে সবাই টাকার পিছনে দৌড়াচ্ছে। কি করবে তুমি এত টাকা নিয়ে? জানে না, সে জানে শুধু, আমাকে টাকা আয় করতে হবে। উদ্দেশ্য সন্তুষ্টি না, উদ্দেশ্য হল টাকা। চল্লিশ পেরিয়ে পঞ্চাশে যেতে যেতেই বিভিন্ন রোগ এসে তাকে ধরে নিচ্ছে, কিছুটা ফিজিক্যাল, কিছুটা মেন্টাল। এদের কেউ মনস্তাত্ত্বিকদের কাছে যাচ্ছে, কেউ হার্ট বিশেষজ্ঞ, কেউ কিডনি বিশেষজ্ঞদের কাছে যাচ্ছ, আর বাকিরা বাবাজীদের কাছে দৌড়াচ্ছে। আরে ভাই একটু ভেবে দেখ, এইভাবে দৌড়ে দৌড়ে কেন মরতে গেলে? কারণ তোমার তুষ্টির অভাব। আচার্য বলছেন, *পর্যাপ্তবুদ্ধি লাভেষু,* যা পেয়েছ, যতটুকু পেয়েছ, ওতেই সন্তুষ্ট হও। **তপঃ**, তপস্যা – ইন্দ্রিয় সংযম করা, যাতে আধ্যাত্মিক জীবনে উপরে উঠতে পারে।

দানং, আচার্য দানের সংজ্ঞা দিচ্ছেন –*যথাশক্তি সংবিভাগঃ,* যার যেমন ক্ষমতা সেই অনুসারে দান করা। যে কাজ এক টাকা দিয়ে হয়, সেই কাজ পঁচানব্বই পয়সা দিয়েও হয়, একশ টাকা দিয়ে যে কাজ হয়, সেই কাজ পঁচানব্বই টাকা দিয়েও হয়। আয়ের শতকার পাঁচ টাকা সরিয়ে রাখতে হয়। যেখানে যা দেওয়ার দিয়ে একটু যদি আমরা কষ্ট করি, অনেক টাকা আমাদের বেঁচে যাবে। ভারত অত্যন্ত গরীব দেশ, দেশে গরীবদের জন্য কিছু করুন। তাই বলে নিজের সমস্ত কিছু বিলিয়ে দেবেন তাও না। অবাক লাগে ষোল বছর বয়সে আচার্য কি করে এই ভাষ্য লিখেছেন; ষোল না হয়, কুড়িতে, কুড়িতে না হয় বাইশে লিখেছেন। একুশ বাইশ বয়সে আমাদের বুদ্ধিই ছিল না। কি দামী কথা বলছেন –*যথাশক্তি সংবিভাগঃ*। **যশঃ**, আচার্য যশের সংজ্ঞা দিচ্ছেন –*ধর্মনিমিত্তা কীর্তিঃ,* আমি প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলাম, মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেলাম, এটা কীর্তি না, কীর্তি হল –ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি কীর্তি অর্জন করছেন। নেতাজীর এত নাম কেন? কারণ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি যশ লাভ করেছেন। ভারতকে তিনি স্বাধীন দেখতে চাইছিলেন, সেখানে তিনি কোন অসৎ উপায় নিচ্ছেন না। কীর্তি সব সময় ধর্মে আধারিত। এর বিপরীত **অযশঃ**, আচার্য বলছেন ধর্মের দিক থেকে যদি অকীর্তি হয়ে যায়। একজন ইলেকশানে হেরে যাবেন, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু যদি দুর্নাম রটে যায়, সেই নেতা একশ কোটি টাকার ঘুষ খেয়েছে, এটা হল অকীর্তি।

সমস্ত ভূতের মধ্যে এই যে বিভিন্ন ভাব, যত রকমের ভাব দেখছি, *ভবন্তি ভাবা ভূতানাং*, জীবের মধ্যে এইসব ভাব দেখা যায়। খরগোশ ভয়ে পালাচ্ছে, সিংহ আক্রমণ করছে, সন্তানকে মা আদর করছে, এই যে বিভিন্ন ভাব, *মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ*, এই সমস্ত ভাব আমার থেকে এসেছে। ভগবান অর্জুনকে কিছুটা বর্ণনা করে দেখাচ্ছেন, দেখ আমার বিভূতি কেমন, আমার ক্ষমতা কেমন। ভগবান এখানেই থামছেন না, আরও এগিয়ে যাচ্ছেন। আরও কি আছে শোন –

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ।৬।।

(ভৃগু, মরীচি, অত্রি, পুলহ, অঙ্গিরা, ক্রতু ও পুলস্ত সপ্ত মহর্ষি, পুরণকালে সনক, সনন্দন, সনৎকুমার চারজন মহর্ষি এবং স্বায়ম্ভুব, স্বরোচিষাদি চতুর্দশ মনু আমার সঙ্কল্পজাত (মানসপুত্র) এবং মদ্গতচিত্ত হওয়াতে আমার শক্তিসম্পন্ন মনুগণ ও ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষি এই জগতের স্থাবরজঙ্গমাদি সকল প্রজা সৃষ্টি করেছেন।)

যে সকল মহর্ষিদের আমরা সম্মান দিই, ভগবান এবার তাঁদের কথা বলছেন। আমাদের পরম্পরায় সাতজন ঋষির নাম এক সঙ্গে চলে আসছে, যাঁদের সপ্তর্ষি বলা হয়। বিভিন্ন জায়গায় সাতজন ঋষির নাম বিভিন্ন নামে আসে। একটা তালিকায় ভৃগু, মরীচি, অত্রি, পুলস্থ, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। পুরাণে আমরা সনক, সনন্দনাদিদের নাম পাই। এনাদের সবাইকে মহর্ষি বলা হয়। চোদ্দ জন মনু হন, এনাদের মধ্যে সাবর্ণি মনুর নাম আমরা চণ্ডীতে পাই –সাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি আর সাবর্ণ, এই চারজন মনুর নাম বেশি বিখ্যাত। ভগবান বলছেন, এনারা আমারই সামর্থ নিয়ে এগিয়ে ছিলেন। আর এনারা সবাই আমার মন থেকে জন্ম নিয়েছেন। *মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ*, এই যে পুরো জীব-জগৎ দেখছ, যাদের প্রজাপতিরা সৃষ্টি করেছিলেন, পুরাণের কাহিনীতে তাই বলে, কিন্তু এদের সবার আদি হলাম আমি। আমিই আমার মন থেকে প্রজাপতি, মহর্ষি, মনু সবার জন্ম দিয়েছি। সেইজন্য সৃষ্টিতে যাবতীয় যা কিছু আছে, সব আমার দেওয়া। এই হল আমার বিভূতি।

এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।।৭।।

(যিনি আমার এই বিভূতি ও যোগ যথার্থ রূপে জানেন তিনি অবিচলিত সম্যগ্‌দর্শন (তত্ত্বজ্ঞানস্থৈর্য) লাভ করেন।)

আমার এই যে বিস্তার আর আমার যে যোগ, যোগ মানে যা কিছু ঘটছে। একটা হচ্ছে জড়ের বিস্তার, আরেকটা হচ্ছে ঘটনাগুলো। *মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ*, এটাকে যিনি ঠিক ঠিক তত্ত্বতঃ জানেন তার কি হয়? *সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ*, সে পুরোপুরি যোগে নিশ্চিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যা কিছু দেখছি সবই হচ্ছে ভগবানের বিস্তার, যা কিছু ঘটছে তাঁর মাধ্যমেই ঘটছে, এটাকে বুঝে গেলে মনটা স্বাভাবিক ভাবেই স্থির হয়ে যায়। এর আগে ভগবান বলেছিলেন *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে*, যা কিছু প্রকৃতিই করছে। আবার মাণ্ডুক্যকারিকাতে বলছেন কোন কিছুর জন্মই হয়নি, অজাতবাদ। কিন্তু আমরা চোখের সামনে দেখছি কত কি ঘটে চলেছে, তাহলে এগুলো কি দেখছি? জগতে যা কিছু তুমি দেখছ এ সবই তোমার মায়ার কল্পনা।

কিন্তু চার আর পাঁচ নম্বর শ্লোকে বলা হল যা কিছু সব ভগবানই করছেন। এখন কোনটা ঠিক, আর এই দুটোকে কিভাবে সামঞ্জস্য করা হবে? এই সমস্থ কথার মূলে হল বিভিন্ন মানুষের আধ্যাত্মিক চিন্তার স্তর বিভিন্ন রকম। তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলছেন – *অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে*, যে নিজেকে কর্তা মনে করে সে আসলে নিজের অহঙ্কারের সঙ্গে একাত্ম, সে হচ্ছে মহামুর্খ, *বিমূঢ়াত্মা*। যিনি বলছেন কিছুই হচ্ছে না, সবই তোমার মায়ার কল্পনা, তিনি কি করে এই কথা

বলছেন? তার মানে তিনি বলছেন না, অর্থাৎ তাঁর আমিটা চলে গেছে। যিনি বলছেন প্রকৃতিই সব নিজের মত করে যাচ্ছে, সেখানেও তাঁর আমিটাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছেন না, প্রকৃতিকেই সর্বক্ষেত্রে দেখছেন, তার মানে তাঁর আমি বোধটা চলে গেছে। আবার যখন দেখছেন ভগবানই সব করছেন, তখনও আমি বোধটা চলে গেছে। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য একটাই, তা হল এটাকে বোঝান যে যাবতীয় যা কিছু আছে সব কিছু থেকে নিজের মমত্বকে সরিয়ে নাও। এই মমত্বকে যদি না সরিয়ে নাও তাহলে তোমার সম্পূর্ণ বিনাশ অবশ্যাম্ভাবি।

তোমার মমত্বকে তুমি কিভাবে সরাবে? সেটা তুমি যেভাবে খুশি সরাতে পার। তুমি যদি যথার্থ কট্টর জ্ঞানী হও তাহলে তুমি বলবে অজাতবাদ, সৃষ্টিই হয়নি, সব স্বপ্ন। যদি তুমি নেতি নেতি করে এগোও তাহলে বলবে এগুলো সবই প্রকৃতির খেলা, প্রকৃতিই সব কিছু করে যাচ্ছে। আর যদি ইতি ইতি করে বিজ্ঞানীর অবস্থাতে যাও তখন দেখবে সব তিনিই করছেন, সবই ভগবান করছেন। যারা একেবারেই সাধারণ স্তরে রয়েছে তাদেরকে বলা হয় অজাতবাদ বলার তোমার উপায় নেই, নেতি নেতি তুমি কেন করবে তোমাকে তো ঘর সংসার চালাতে হবে, সেইজন্য বল তিনিই সব করছেন। কিন্তু আসলে কি হচ্ছে, সেটাকে বুঝতে গেলে তোমার মনকে বিজ্ঞানের অবস্থায় যেতে হবে। কিন্তু সাধারণ অবস্থাতে একটা যে কোন পথকে ধরে এগিয়ে চলাই হচ্ছে সঠিক পথ, সাথে সাথে তোমার যে কাঁচা আমি যেটাকে বলা হচ্ছে *অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা*, এই অহঙ্কার থেকে তুমি আগে বেরিয়ে এসো। এই অহঙ্কার থেকে বেরিয়ে আসার পর কি দেখে –

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধাঃ ভাবসমন্বিতাঃ।।৮।।

(আমি (বাসুদেবাখ্য ব্রহ্মমূর্তি) সমস্ত জগতের উৎপত্তিস্থান, আমা হতে সমস্তই প্রবর্তিত হয় –এটা জেনে তত্ত্বজ্ঞানীরা পরমার্থতত্ত্বে অভিনিবেশপূর্বক আমার ভজনা করেন।)

যারা বুদ্ধিমান, তারা আমার তত্ত্বটাকে বুঝে নিয়ে কেবল আমারই ভজনা করে। আমার কোন তত্ত্বটা বুঝে নেয়? *অহং সর্বস্য প্রভবো,* আমি সব কিছুর উৎপত্তির স্থান, আর *মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে,* আমা হতেই সব কিছু প্রবর্তিত হচ্ছে, জগতে এমন কিছু নেই যেটা আমার থেকে প্রবর্তিত হচ্ছে না। *অহং সর্বস্য* বলতে আচার্য শঙ্কর বলছেন –যিনি পরব্রহ্ম, যাঁকে বাসুদেব নামে আখ্যায়িত করা হচ্ছে, সেই বাসুদেব থেকেই জগতের যা কিছু আছে সবার উৎপত্তি হচ্ছে। ঈশ্বরই সব কিছুর মূল আর তাঁর থেকেই সব কিছুর জন্ম, ঈশ্বরের এই তত্ত্ব যার মধ্যে বসে গেছে, এই ভাব যখন হয়ে যায় তখন তার লোভ, মোহ, শোক এগুলো ক্ষীণ হয়ে যায়। এই তত্ত্বটাকেই ঠাকুর খুব সহজ করে বলছেন – ভগবান দুবার হাসেন, একবার যখন ডাক্তার রোগীকে বলে আমি তোমাকে বাঁচিয়ে দেব তোমার কোন চিন্তা নেই, আরেকবার হাসেন যখন দুই ভাই ঝগড়া করে দড়ি ফেলে বেলে এদিকটা আমার ঐদিকটা তোর। তার মানে? সবটাই তো আমার, জীবন আমিই দিয়েছি, মৃত্যুও আমিই দিয়ে থাকি। অর্থাৎ যত মৃত্যুধর্মা সব আমার থেকেই বেরিয়েছে, আর যত স্থাবর জিনিস আছে, এই পৃথিবী তার যত জমি জায়গা, গ্রহ নক্ষত্র সব আমারই ব্যবস্থা, এখানে তুমি ও তোমার কোত্থেকে আসছে।

আমি কৃষ্ণ, আমি সেই বাসুদেব, কিন্তু আমি হলাম পরমব্রহ্ম। সমস্ত জগতের আমি হলাম উৎপত্তির স্থান। জগতের যে নাশ, জগতের যাবতীয় ক্রিয়া, সব আমার থেকে চলছে। সমস্ত জীবজন্তুর যে কর্ম, তাদের যে ভাব, তাদের যে স্বভাব, সব আমার থেকে আসছে। যাঁরা তত্ত্বজ্ঞানী, যাঁরা বুদ্ধিমান পুরুষ, তাঁরা এই জিনিসটাকে বুঝে নিয়ে কেবল আমারই ভজনা করেন। যদি কেউ ভগবানকে ভালবাসতে চায়, যদি কেউ শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালবাসতে চান, শিব বা কৃষ্ণকে ভালবাসতে চান, কিভাবে ভালবাসবে? ঠিক এইভাবে –আমার ইষ্ট থেকে সব কিছু বেরিয়েছে। শুধু তাই না, ঠিক ঠিক আমার যারা ভক্ত, তারা কি করে?

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।।৯।।

(যাঁরা তাঁদের মনকে আমাতে অর্পণ করেছেন ও যাঁদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আমাতে উপসংহৃত হয়েছে, তাঁরা পরস্পরের মধ্যে জ্ঞান, বল ও বীর্যাদিবিশিষ্ট আমার কথাপ্রসঙ্গ করে ও মদ্‌বিষয় পরস্পরকে বুঝিয়ে পরম সন্তোষ ও বিপুল আনন্দ লাভ করেন।)

মচ্চিত্তা, তাঁর চিত্ত সব সময় আমাতে ডুবে আছে; *মদ্‌গতপ্রাণা,* তাঁর প্রান, সমস্ত ক্রিয়া আমাকে কেন্দ্র করে চলে। *বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্,* এই ধরণের মানুষ, যাঁদের মন, প্রাণ সব আমাতে ডুবে আছে; যখন এক ভক্তের সাথে অপর ভক্তের সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁরা শুধু আমার যে তত্ত্ব, আমার যে জ্ঞান, আমার যে সামর্থ্য এগুলোকে নিয়েই আলোচনা করে, আর এটাতেই তাঁরা সন্তুষ্টি পান, এতেই আনন্দ পান। কি রকম আনন্দ পান? বলছেন, যে যাকে ভালবাসে, তার থেকে সেই ভালবাসা পেলে সে যেমন আনন্দ পায়। রাসলীলাতে গোপীরা যখন দেখছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের মাঝখান থেকে উধাও হয়ে গেছেন, তখন তাঁরা শ্রীকৃষ্ণেরই লীলাগান, গুণগান করে যাচ্ছেন। ঠাকুর কেশবচন্দ্র সেনকে বলছেন, ভক্তের স্বভাব হল গাঁজাখোড়ের স্বভাব, তুমি একবার গাঁজার কলকে নিয়ে একটা টান দিলে, আমিও একবার টানলাম। ভক্ত আমারই কথা বলে, আমাতেই তুষ্টি পায়, আমাতেই সে রমণ করে, এর বাইরে সে যাবে না। ঠাকুরকে আমরা দেখি, যার সাথেই কথা বলছেন, একটা দুটো কথা বলতে না বলতেই ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে ঢুকে যাচ্ছেন। কিন্তু অর্জুন, তুমি তো এত সহজে বুঝতে পারবে না, সেইজন্য আমি তোমাকে বুদ্ধিযোগ দেব, যার সাহায্যে তুমি এটা বুঝতে পারবে।

এই অধ্যায় ভগবানের গুণচিন্তনের উপর আধারিত। যদি ঈশ্বরের কেউ ধ্যান করতে চান, তাঁর জন্য এই অধ্যায়। জপধ্যান কখন পার্ট টাইম হয় না। পার্ট টাইম হয়, যখন সংসারে কিছু করার জন্য, ধর্ম, অর্থ ও কামের জন্য মানুষ চেষ্টা করে। ভোগবাদের যুগে এখন মানুষ না বুঝেই অনেক কিছুর পিছনে দৌড়াচ্ছে, অনেক কিছু করছে, তার সঙ্গে একটু জপধ্যানও করছে। গীতা উপনিষদ তাদের জন্য নয়; এটা তাঁদেরই জন্য যাঁদের কাছে জপধ্যান ফুলটাইমের ব্যাপার। আমি ব্যক্তিগত ভাবে অনেককে জানি, যাঁরা প্রচুর জপধ্যান করেন, যাঁরা প্রচুর সময় আধ্যাত্মিক জীবনে উত্থানের জন্য দিয়ে দেন।

একটা কি হয়, এক ঘন্টা কি দু ঘন্টা জপধ্যান করার পর অনেক সময় ক্লান্তি আসে। তখন আবার তাঁরা মনটাকে একটু ছেড়ে দিতে চান, ছেড়ে দিয়েও থাকবেন ঈশ্বরের সঙ্গেই, জগতে মন যাবে না, কিন্তু সেইভাবে হয়ত আর জপধ্যান করতে পারছেন না। খাওয়ার সময় যেমন কোন কোন সময় একঘেঁয়েমি লাগে, ধ্যানের সময়েও অনেক সময় আমাদের একঘেঁয়েমি এসে যায়। ঠাকুর এর বর্ণনা করে বলছেন, এর মানে ভাব পাল্টাচ্ছে। অনেক সময় মনে হয় যে, এখন যে মনের ভাব নিয়ে ঈশ্বরের কাছে যাচ্ছি, সেখানে একটা অন্য ভাব নিয়ে যাই। সেইজন্য এই দশম অধ্যায়, বিশেষ করে দশম অধ্যায়ের মাহাত্ম্য সাংঘাতিক। কারণ এখানে অনেক শ্লোক আমরা পাব, যে শ্লোকেগুলির সাহায্যে আমরা বিভিন্ন ভাবে ঈশ্বরের উপর ধ্যান করতে পারব, তাঁর চিন্তন করতে পারব। সব সময় তো আসনে বসে, কি মন্দিরে বসে, বা পূজার ঘরে বসে ধ্যান করা যায় না। অনেক সময় ঘুমানোর আগে বিছানায় শুয়ে আছি, ঘুম আসছে না, শুয়ে শুয়ে জপ করছি। আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন, উনি বার বার আমাদের বলতেন, দেখ শোওয়ার আগে জপ করবে, আসনে না বসতে পারলে শুয়ে শুয়েই জপ করবে, তার ফলে ঐ ভাবটা মনের ভিতর চলতে থাকে। যখন ঘুমোতে গেলাম, বালিশের উপর মাথা রাখা হয়েছে, ঘুম আসা না পর্যন্ত জপ করতে হয়। তখন ঐভাবে ধ্যান হবে না, কিন্তু এই অধ্যায়ে যেভাবে বলা হয়েছে, সেই ভাবে চিন্তন করা যায়। পারলে দশম অধ্যায়টা

মুখস্ত করে নিতে পারলে খুব ভাল। তখন মনে হবে ঈশ্বর কত কাছের, যেমন যেমন আমরা এগোব আমরা দেখতে পাবো।

এই যে বলছেন, *মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণ বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্*, যাঁরা দীক্ষা নিয়ে দুবেলা জপ করছেন, আর ভাবছেন ঠাকুর দেখবেন, এই শ্লোক এনাদের জন্য না, এটা হল যাঁরা চব্বিশ ঘন্টা ঈশ্বরে ঢুকে গেছেন। যাঁদের হাসিঠাট্টা, পরিহাস ঠাকুরকে নিয়ে, এই শ্লোক তাঁদের জন্য। এই শ্লোকের ভাব যদি আমাদের বুঝতে হয়, তাহলে আমাদের ভাগবতের রাসলীলাতে যেতে হবে। গোপীদের মন, প্রাণ, সব শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ডুবে আছে। যখন শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের মাঝখানে নেই, তখন সব গোপীরা শ্রীকৃষ্ণেরই গল্প করে যাচ্ছেন। বাংলার খুব অপ শব্দ যদি ব্যবহার করা যায় তাহলে বলা যেতে পারে, এর মধ্যে কোন ন্যাকামো নেই। ভক্তি করতে গিয়ে আমরা প্রায়ই ন্যাকা হয়ে যাই। আবেগের সাথে ভক্তির কোন সম্পর্ক নেই। ভক্তি অনেক উচ্চ অবস্থার, আবেগ সেই তুলনায় কিছুই না। ঠাকুর বলছেন, বাই রোগীর মত; আমরা যখন বলছি ঠাকুরের কি কৃপা, মায়ের কি কৃপা, এগুলো একেবারে সোজা কথায় ন্যাকামো ছাড়া কিছু না, যারা বলছে তারাও ন্যাকা, যারা শুনছে তারাও ন্যাকা। এই ন্যাকা ন্যাক জিনিসগুলো থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে, ভক্তি পথে চলার আগে এই ধরণের ইমোশানালিজম থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। এগুলো বন্ধ করে বুদ্ধিকে লাগাতে হবে। ঠাকুর বলছেন, অত বিচার করতে যেও না, কিন্তু আমাদের বিচার করা দরকার, কারণ সবারই এক ওষুধে কাজ হয় না। একই রোগের একই ডাক্তার দুজন রোগীকে দুই ভিন্ন প্রকারের ওষুধ দেন। আমাদের বুদ্ধিটা একটু লাগাতে হবে, কারণ আমাদের ভক্তি পুরো ন্যাকামোতে ঢুকে গেছে।

স্বামীজী খুব সাবধান করে দিয়ে গেছেন, বেলুড় মঠ যেন বাবাজীদের আখড়া না হয়। কারণ তিনি চেয়েছিলেন, আমাদের ধর্ম, আমাদের ভক্তি আবেগ সর্বস্ব যেন না হয় যায়, ভক্তি ন্যাকামোতে যেন পর্যবসিত না হয়ে যায়, তার মানে বুদ্ধিকে জাগিয়ে তাকে কাজে লাগাতে হবে। এই যে এখানে গুণচিন্তন হচ্ছে, কতটা উচ্চস্তরে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন, *কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি*, সেখানেই মন রমণ করবে, এতেই মন তুষ্ট হবে। শুনে মনের ভিতর আপনা থেকেই আহা আহা করতে হচ্ছে, এই 'আহা' করাতে কোন ন্যাকামো নেই, 'আহা' গভীর থেকে আসছে। যদি মনে হয় আমি এই রকম ভক্ত, দশ বছর কুড়ি বছর আমি জপধ্যান করছি, যখন বলতে পারছি ঠাকুর ছাড়া আমার আর কেউ নেই; ভগবান বলছেন, যাঁরা এইভাবে আমার ভজনা করেন, আমি তাঁদের উপর কৃপা করি আর এই কৃপাটা প্রত্যক্ষ বোঝা যায়। কিভাবে বোঝা যায়?

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।।১০।।

(যাঁরা নিত্যযুক্ত হয়ে অর্থিত্বাদি পরিত্যাগ করে কেবল প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁদেরকে আমার তত্ত্ববিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান প্রদান করি। এই সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা তাঁরা আমাকে আত্মরূপে উপলব্ধি করেন।)

পরিষ্কার বোঝা যাবে তাঁর হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়েছে কিনা, নাকি ন্যাকামি যুক্ত ভক্তি। পরিষ্কার বোঝা যাবে তাঁর মধ্যে বুদ্ধিযোগ এসেছে কিনা। যদি বুদ্ধিযোগ জন্মে থাকে, তাহলে তাঁর ভক্তি ঠিক পথে আছে, আর তা নাহলে এখনও কেবল খোল করতাল নিয়ে হরিবোল করাতেই ভক্তি লেগে আছে। এই ভক্তি তাকে কোথাও নিয়ে যাবে না। এটা কোন নেতিবাচক কথা বলার জন্য বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে যেখানে আমি সমস্ত চেষ্টা চালাচ্ছি, সময় দিচ্ছি, নিজের ইমোশান ঢালছি, তার ফলটাকে কেন আমি ছেড়ে দিচ্ছি। একটু পাল্টে দিলেই সাংঘাতিক ফল আমি পেয়ে যাব। কি সেই সাংঘাতিক ফল? বুদ্ধিযোগ। ঈশ্বরের কৃপা হলে আমার শরীরের রোগ ভাল হয়ে যাবে না, ঈশ্বরের

কৃপা হলে অবিবাহিতা মেয়ের স্বামী জুটে যাবে না, আর তিনি এসে ভাঙা বাড়ি মেরামত করে দেবেন না। তাহলে ভগবান কি দেবেন? ভগবান দেবেন বুদ্ধিযোগ। বুদ্ধিযোগ হল, যেটা দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায়।

আচার্য বলছেন, *তেষাং সততযুক্তানাং*, এই ধরণের ভক্ত যিনি সব সময় আমাতে যুক্ত হয়ে আছেন, তার সাথে বাহ্য তৃষ্ণাকে যিনি ত্যাগ করে দিয়েছেন, ভগবদ্‌তৃষ্ণা ছাড়া তাঁর আর কোন তৃষ্ণা নেই, কামিনী, কাঞ্চন, নামযশ, লোকৈষণা এগুলো কিছু নেই। তার সঙ্গে *মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্*, তাঁর চিত্তে শুধু আমিই আছি, সমস্ত প্রাণ তাঁর আমাতে আর যখন কথা বলেন তখন সর্বদা আমাকে নিয়েই কথা বলেন, এই ধরণের ভক্তরা যখন আমার ভজনা করেন, সেই ভজনাতে তাঁদের কোন কামনা থাকে না। ঠাকুর কথামৃতে কতবার এই কথা বলছেন, বড়লোকের কাছে কিছু চায় না, তোমার কাছে আমি কিছু চাই না, তোমাকে ভাল লাগে তাই তোমাকে দেখতে আসি। আমাদের কাছে এই ধরণের মানুষ অনেকেই আসেন, আপনার ক্লাশ শুনেছি, আপনাকে দেখতে এলাম। অনেকে বলেন, সামনা সামনি একটু না দেখলে ভাল লাগে না। বলছেন, এই ধরণের ভক্তকে আমি বুদ্ধিযোগ দিই। আমি যখন ব্রহ্মচারী ছিলাম, আমার সমসাময়িক একজন মহারাজ, তিনিও তখন ব্রহ্মচারী ছিলেন, উনি দেওয়ালে এই দশ নম্বর শ্লোকটা খুব বড় করে লিখে লাগিয়ে রেখেছিলেন। ওনার মনে এই ছিল যে, কোন ভাবে বুদ্ধিযোগটা যদি আমি পাই। ঈশ্বরের কৃপা কেউ পেয়েছেন কি পাননি, বোঝা যাবে বুদ্ধিযোগে।

বুদ্ধিযোগ কি? ঈশ্বরের তত্ত্বকে ঠিক ঠিক ভাবে অবধারণ করা। যদি কেউ ঈশ্বর তত্ত্বকে ঠিক ঠিক জানেন, তাহলে বুঝতে হবে তাঁর বুদ্ধিযোগ হয়েছে। ঈশ্বরতত্ত্ব যিনি বুঝে গেছেন, শাস্ত্রের কথা তিনি চটপট বুঝে নেবেন। একটা শ্লোকে, বেদ বা উপনিষদের একটা মন্ত্রে কি বলতে চাইছেন, চটপট বুঝে নেবেন। তাঁকে আর আহা আহা আহা করতে হবে না। শাস্ত্রের কথা চটপট বুঝে যাচ্ছেন, তার মানে ভগবান তাঁর উপর কৃপা করছেন, তাঁকে তিনি বুদ্ধিযোগ দিয়েছেন। এই কথা শ্রীশ্রীমাও বলেছেন, কথামৃতে ঠাকুরও অনেকবার বিভিন্ন ভাবে বলেছেন। বুদ্ধিযোগ মানে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান। কৃষ্ণপ্রেম তাঁদেরই হবে, যাঁদের বুদ্ধি ঠিক আছে। শ্রীমতি রাধা, গোপীরা, এনারা কেউই ইমোশানাল ছিলেন না, তাঁরা জানতেন কাকে ভালবাসছেন, কেন ভালবাসছেন। জ্ঞানী না হলে ভক্ত হওয়া যায় না, ঈশ্বরতত্ত্ব যদি না জানা থাকে, কি করে কৃষ্ণকে ভালবাসবেন! মালপো খেয়ে নাচার জন্য ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি এর থেকে অনেক উপরে। তাছাড়া ভগবান এখানে ভক্তির কথা বলছেন না।

মধুসূদন সরস্বতী গীতার উপর যখন ভাষ্য লিখছেন, তখন উনি দশম অধ্যায়কে ভক্তির মধ্যে রেখেছেন। গীতার সপ্তম থেকে দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তিযোগের মধ্যে পড়ে, আর দশম অধ্যায় তো পুরো ভক্তি, কোন আবেগপ্রবণতা থাকবে না। অথচ নয় নম্বর শ্লোকে পুরো ভক্তির কথা বলছেন, *মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা*। এই রকম কারুর মধ্যে ডুবে থাকলে তার ফল কি হবে? একজনকে কেউ খুব ভালবাসছে, একেবারে তার মধ্যে ডুবে আছে, তাকে ছাড়া আর কিছু সে চিন্তা করতে পারছে না। বাচ্চা ছেলে মা ছাড়া যেমন কিছু বোঝে না। এই রকম ভক্তি বা ভালবাসার ফল –বুদ্ধিযোগ, বুদ্ধিযোগ মানে তত্ত্বজ্ঞান।

বলছেন, এই বুদ্ধিযোগ যখন আসে, তত্ত্বজ্ঞানের জন্য বুদ্ধি যখন খুলে যায়, তখন এনারা কৃষ্ণ কে, এটা বুঝতে পারেন। আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *যেন বুদ্ধিযোগেন সম্যগদর্শনলক্ষণেন মাং পরমেশ্বরম্*, জিনিসটা যেমন, যথাবৎ ঠিক তেমনটি কৃষ্ণকে দেখতে পান; এই কৃষ্ণ কে না, পরমেশ্বর কৃষ্ণ। *আত্মভূতম্ আত্মত্বেন*, কৃষ্ণ আমার ভিতরে, *প্রতিপদ্যন্তে*, তাঁরা এটা সম্যক্ রূপে বুঝে নেন। কৃষ্ণভক্তি হলে কৃষ্ণের স্বরূপকে জানা যায়। কি সেই স্বরূপ? তিনি আমার সঙ্গে এক। এটা নিজে থেকে বোঝা যায় না, ভগবান বুদ্ধিযোগ দেন, সেই বুদ্ধিযোগ দিয়ে বোঝা যায়। ভক্ত যদি ভক্তি

পথের হন, তাহলে তিনি বলবেন ভগবান দেন; যদি না মানেন, তাহলে বলবেন, ভিতর থেকে আসে। কিন্তু বুদ্ধিযোগটা আসতে হবে, বুদ্ধিযোগ যদি না থাকে, এটা হবে না। যোগ হয় জুড়ে যাওয়া আর বুদ্ধি হয় জিনিসটাকে ঠিক ঠিক বিচার করা। তাতে কি লাভ হবে? পরের শ্লোকে এটাকে পরিষ্কার করছেন –

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়ম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।।১১।।

(সেই ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবশেই আমি তাঁদের বুদ্ধিতে আরূঢ় হয়ে তাঁদের সম্যগ্‌দর্শন (তত্ত্বজ্ঞান)- জনিত উজ্জ্বল বিবেকরূপ প্রদীপ দ্বারা তাঁদের অবিবেকজনিত মিথ্যাজ্ঞানরূপ মোহান্ধকার নাশ করি।)

এই ধরণের যিনি ভক্ত, যে ভক্তির কথা নয় নম্বর শ্লোকে শুরু হয়েছিল, দশ নম্বর শ্লোকে তাঁকে বুদ্ধিযোগ দিয়ে দিলেন। এরপর ভগবান এই ভক্তের মঙ্গল করবেন। এই ধরণের ভক্তের ভিতরে অবিবেকতার জন্য যে অজ্ঞান অন্ধকার জমে ছিল, যে বিবেকের অভাবের জন্য ভক্ত ঈশ্বর আর সংসারকে আলাদা করতে পারছিল না, যার জন্য সেখানে যে অন্ধকার জমে ছিল; ভগবান সেখানে জ্ঞানপ্রদীপ জ্বেলে দেন। আলো এসে গেল, সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার চলে গেল। ভগবানে ভক্তি লাভ হলে কি হয়? জ্ঞান ভক্তিই হয়, আর কিছু হয় না। জ্ঞান কি? আত্মাই আছেন, এছাড়া আর কিছু নেই; আমি সেই আত্মা। ভক্তি কি? ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। আমি সেই ঈশ্বরের সাথে এক। এছাড়া অন্য আর কিছু হয় না। অন্য যা কিছু হয়, সংসারের নিয়ম দিয়ে এর ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায়। এটাকে আমরা কর্মফল বলতে পারি, চান্স বলতে পারি, দৈব বলতে পারি, অনেক কিছু বলতে পারি; কিন্তু জ্ঞান ভক্তি ওর মধ্যে পড়ে না। একজনের ভক্তের কিছু ভাল হয়ে গেল, একটা লটারি লেগে গেল। কেউ বলবে, ঈশ্বরের ভক্ত বলেই হয়েছে, কেউ বলবে আরে এটা চান্স, কেউ বলবে তার কপালে ছিল কিংবা আগে আগে ভাল কোন কর্ম করা ছিল। কিন্তু জ্ঞান ভক্তির নামে আজ পর্যন্ত কারুর মুখে কোথাও শুনিনি যে বলবে, কপালে ছিল বলে তার জ্ঞান ভক্তি হয়েছে। বরং সবাই বলে, সাধনা করেই তিনি এটা পেয়েছেন। চেষ্টা, চেষ্টার পর চেষ্টা করে গেছেন, ঐ চেষ্টার পর আসে বুদ্ধিযোগ। সেই বুদ্ধিযোগ এলে ভিতরে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয় এবং ভিতরের সব অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভূত হয়।

কি রকম প্রদীপ? আচার্য শঙ্করের ভাষা এত মধুর, একেবারে স্বাভাবিক কবি তিনি। আমি একজনকে জানি, উনি কবিতা লেখেন না, কিন্তু উনি যখন কিছু বলেন, সব সময় ছন্দে বলেন। আমরা যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে আচার্য শঙ্করের তুলনা করতে যাই, কোথাও কিছু আমরা পাব না, আচার্যের ভাষার মধ্যেই একটা ছন্দ, একটা ব্যঞ্জনা রয়েছে, এমন জিনিস রয়েছে যেটা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। বলছেন, *ভক্তিপ্রসাদস্নেহাভিষিক্তেন*, ভক্তিপ্রসাদ এটা ঘৃতের মত, এই যে প্রদীপ যেটা জ্বলবে, এটা কোন সাধারণ কেরোসিন তেলের প্রদীপ না, ঘি থেকে জ্বলছে; ভক্তিটা হল সেই ঘি। আর ঈশ্বরের ভাবনাকে যিনি নিজের উপর আরোপ করেছেন, এটা হল সেই বায়ু, যা প্রদীপকে প্রজ্জ্বলিত করে। আচার্যের সময়েও ওনারা জানতেন বায়ু না থাকলে প্রদীপ জ্বলবে না। লেবজিয়ার অনেক পরে অক্সিজেনের কথা বললেন ঠিকই, কিন্তু এনারা পরিষ্কার ভাবে জানতেন।

প্রজ্ঞাবর্তিনা বিরক্তান্তঃকরণাধারেণ বিষয়ব্যাবৃত্তচিত্তরাগদ্বেষকলুষিতনিবাতাপবারস্থেন, বলছেন, ব্রহ্মচর্য আদি যে সাধনা এবং সেই সংস্কারযুক্ত যে পরিশ্রুত সুসংস্কৃত শুদ্ধবুদ্ধি, এটা হল বাতি। ভক্তি হল ঘি, ঈশ্বরের চিন্তন ভাবনা হল বাতাস, যার জন্য প্রদীপটা জ্বলছে; অন্তঃকরণ, মন আদি যেটা, সেটা শুদ্ধ হয়ে গেছে, এটা হল আধার, যেটাকে আমরা প্রদীপ বলছি; আর বিষয় বুদ্ধি থেকে যে রাগাদি সরে গেছে, সমস্ত কলুষ অপসারিত হয়ে গেছে, এটা হল প্রদীপের ঢাকা, যাতে প্রদীপ নিভে না যায়। সাধনার জন্য যাবতীয় যা কিছু দরকার, আচার্য দুটো তিনটে বাক্যে বলে দিলেন। প্রথম

কথা ভক্তি হল প্রদীপের স্নেহ বা তেল; ঈশ্বরের প্রতি যে ভালবাসা, ঈশ্বরের যে চিন্তা-ভাবনা দিয়ে মন ভরা, এটা হল বায়ু, যে বায়ু প্রদীপকে জ্বালাচ্ছে। শুদ্ধ বুদ্ধিটা হল প্রজ্ঞা দিয়ে ভরা, এটা হল প্রদীপের সলতে; আসক্তি বিহীন অন্তঃকরণ, এটা হল আধার, প্রদীপ; বিষয় থেকে মন সরে গেছে, রাগদ্বেষ মন থেকে সরে গেছে, এটা হল ঢাকনা, জোরে বাতাস চললে যাতে বাতিটা না নিভে যায়। আর নিরন্তর অভ্যাস, একদিন দুদিন না, *স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য*, এই যে দিনের পর দিন ধ্যান করে যাচ্ছে, এটাই হল সেই প্রদীপের আলো। কারণ ধ্যান যদি না করা হয় তাহলে আলোর মত হয় না। এই প্রকার যে দীপক, এর আলো ভিতরের সমস্ত অজ্ঞানকে নাশ করে দেয়।

আমরা যে বলি স্বামীজী চারটে যোগের কথা বলেছেন, কিন্তু আচার্য শঙ্কর এখানে ঠিক ঐ ভাবেই বলছেন, মনকে শুদ্ধ করা, ভক্তি, জ্ঞান সমস্ত সব কিছু দিয়ে, তখন জ্ঞানের বাতি জ্বলে। তখন জন্মজন্মান্তরের যত কলুষতা, কল্মষ ভিতরে ভরে আছে, যেটা আমাদের ভিতরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছে, সেই অন্ধকারকে সরিয়ে দেয়। ভগবানের বক্তব্য হল, যদি তুমি নিরন্তর আমাকে ভক্তি কর, তার সাথে যদি সাধন ভজন কর, জপধ্যান যদি কর, মনকে শুদ্ধ পবিত্র করে সেই মনকে যদি আমার দিকে লাগাও, তাহলে কিন্তু তোমার অজ্ঞান চলে যাবে।

ভগবানের এই কথাগুলো শুনে বারো নম্বর শ্লোক থেকে কয়েকটা শ্লোকে ভগবানকে এবার অর্জুন কয়েকটা কথা বলছেন। বারো, তেরো আর চোদ্দ আমার খুব প্রিয় শ্লোক। যখন প্রিয় বলছি, তার মানে কোথাও লেকচার দিতে গিয়ে আমি এর ব্যবহার করেছি। ভাল লাগা মানে, আমার খুব মিষ্টি লাগে, মধুর লাগে, জ্ঞানে পরিপূর্ণ মনে হয়। এখানে এমন একটা প্রসঙ্গ চলছে, আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রে এটা আমি দেখিনি। যদিও আমার শাস্ত্র জ্ঞান সীমিত, কিন্তু যাও অল্প একটু পড়েছি, বুঝেছি; এখন যে প্রসঙ্গ আসছে, এটা আর কোথাও দেখিনি। অর্জুন সাক্ষাৎ ভগবানকে বলছেন, হে প্রভু, আপনার বিভূতির কথা আমাকে একটু বলুন। কিন্তু তার সঙ্গে অর্জুন তাঁর সখা শ্রীকৃষ্ণের মহিমার বর্ণনা করে যাচ্ছেন, এটা আমরা কোথাও পাই না। আমরা ভাগবতাদিতে যেটা পাই, সেখানে ভগবানের স্তুতি করা হচ্ছে। যেমন খুব নামকরা স্তুতি হল, ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণুর স্তুতি করছেন, আর তারপরেই ভগবান বিষ্ণু নিজের স্বরূপের বর্ণনা করছেন। কিন্তু এভাবে প্রথমে প্রশ্ন করে, আবদার করে ভগবানের কাছে তাঁর বিভূতির কথা শুনতে চাইছেন, যেন কোন বাচ্চা ছেলে বাবাকে বলছে, বাবা আমাদের কত সম্পত্তি আছে একদিন আমাকে দেখাবে? বাবা খুশী হয়ে বলছেন, আচ্ছা ঠিক আছে, চলো দেখাচ্ছি। এই চাষের ক্ষেতগুলো আমাদের, শহরের এই বাড়িগুলো আমাদের, এই গাড়িগুলো আমাদের, এই বিজনেসগুলো আমাদের, এর বাইরে আমাদের আরও অনেক কিছু আছে, যখন তুমি আমার মত বড় হবে তখন আরও বুঝতে পারবে। অর্জুনও যেন সেই ভাব নিয়ে প্রশ্ন করছেন, প্রভু আপনার মহিমা আরও একটু বিস্তারে বলুন।

অর্জুন উবাচ
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্।।১২।।

(অর্জুন বললেন –হে ভগবন্, আপনি পরমব্রহ্ম, পরম ধাম ও পরম পাবন। আপনি সর্বব্যাপী, সনাতন, জন্মরহিত, দিব্যপুরুষ ও আদিদেব।)

আগে আগে অর্জুনের প্রশ্নগুলো ছিল যেন এক সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, অর্জুন ভগবানের সখা। কিন্তু এখানে যে অর্জুনের প্রশ্ন, এই অর্জুন একজন জ্ঞানী, একজন ভক্ত। ঠাকুরও বলছেন, পাণ্ডবদের মত জ্ঞানী কোথায়, পাণ্ডবদের মত ভক্ত কোথায়। অর্জুন অনেক দিন বন-জঙ্গলে ঘুরেছেন, পণ্ডিতদের সঙ্গ করেছেন, ঋষিদের সঙ্গ করেছেন, সাধুসঙ্গে অর্জুনের বুদ্ধি একটু একটু খুলেছে। অথবা ব্যাসদেব অর্জুনকে এমন ভাবে সামনে নিয়ে আসছেন, যেন তাঁর বুদ্ধি খুলে গেছে। যতই হোক গীতার মধ্যে

ব্যাসদেবের হাত আছে, এই ব্যাপারে প্রথমের দিকে আমরা বিস্তারে আলোচনা করেছি। দশম অধ্যায় আর একাদশ অধ্যায়ে অর্জুনের ছোট ছোট স্তুতি আছে, কারণ গীতাতে সেইভাবে স্তুতি খুব একটা নেই। দশম অধ্যায়ের এই অংশটা হল অর্জুনের স্তুতি। যিনি ঠাকুরের ভক্ত, তিনি যদি ঠাকুরের স্তুতি করতে চান, বা কেউ যদি কৃষ্ণের বা শিবের স্তুতি করতে চান, অর্জুনের এই কথাগুলো দিয়ে স্তুতি করতে পারেন।

পরং ব্রহ্ম, আপনি পরমাত্মা। সংস্কৃতে '*অপর*' হল নীচে, '*পর*' হল উপরে, যেমন পরাবিদ্যা অপরা বিদ্যা। যেটা কার্য ব্রহ্ম, সেটা হল অপর ব্রহ্ম, এই জগতে যে রূপে ব্রহ্মকে দেখা যাচ্ছে, এটা হল অপর ব্রহ্ম। কিন্তু আপনি হলেন সেই *পরং ব্রহ্ম*, পরমাত্মা। *পরং ধাম*, আপনি সেই ধাম, যাকে উল্লেখ করে বেদে বলা হয় *তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্*। বিষ্ণু কোন ব্যক্তি নন, শ্রীরামকৃষ্ণ কোন ব্যক্তি নন, শ্রীরামকৃষ্ণ একটা ভাব, শ্রীরামকৃষ্ণ একটা অবস্থা, শ্রীরামকৃষ্ণ একটা পদ, যে পদে গিয়ে ভক্ত, জ্ঞানী এক হয়ে যান। এই জিনিসটাকে বোঝানর জন্য পরে পরে ভাগবতাদি গ্রন্থে বৈকুণ্ঠ ধামের একটা ধারণা নিয়ে আসা হল। বৈকুণ্ঠ ধাম বলে কোন স্থান আছে নাকি, রামকৃষ্ণলোক বলে কোন স্থান হয় নাকি, এটা চৈতন্যের একটা অবস্থা। তুলসীদাস খুব সুন্দর বলছেন, সিয়ারাম ম্যায় সব জগ জানু, সমস্ত জগৎকে আমি সীতারামময় জানি।

পবিত্রং পরমং ভবান্, আপনি হলেন পাবনকারী, আপনার নাম নিলে সবাই পবিত্র হয়ে যায়। আপনি হলেন *পুরুষং শাশ্বতং*, আপনি নিত্য। এই শব্দগুলি আমরা আগের আগের অধ্যায়ে বিস্তারে ব্যাখ্যা করেছি, আমরা আর বিস্তারে যাব না। *দিব্যম্* আপনি দিব্যলোকে অধিষ্ঠান করেন, দিব্যলোক দেবলোক হতে পারে, বৈকুণ্ঠধাম হতে পারে, শিবলোক হতে পারে। আর বলছেন, *আদি দেবমজং বিভূম্*, আপনি হলেন দেবাদিদেব, সমস্ত দেবতাদের আদি; *অজম্*, আপনি সব সময় আছেন, তাই আপনার কোন জন্ম নেই এবং *বিভূম্*, আপনি সব জায়গাতে ব্যপ্ত হয়ে আছেন। যার যিনি ইষ্ট, তাঁকে এভাবেই দেখতে হবে। এই জগতে আপনি কি কোন মানুষকে ভালবাসেন, যার জন্য আপনি আপনার মান, সম্মান, কীর্তি সব কিছু দিয়ে দিতে প্রস্তুত? এই শ্লোকটা তার উপর খাটাবেন। দেখবেন, হু হু করে আপনার মন আধ্যাত্মিক ভাবে ভরে উঠবে। আমরা পরিষ্কার এভাবে ঈশ্বরকে ধ্যান করতে পারি না, সেইজন্য বলে দেওয়া হয়, গুরুকে ইষ্ট রূপেই ধ্যান করতে। গুরুকে ধ্যান করে তাঁকে ইষ্টের মধ্যে বিলীন করে দিতে হয়, ইষ্টও যা গুরুও তাই। সেইজন্য গুরুর মন্ত্রে যে বলছেন, *গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণো গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ*, আর *পরং ব্রহ্ম পরং ধাম*, একই ভাবকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হচ্ছে।

ভগবান কি রকম হন, তার বর্ণনা করা হচ্ছে। অনেকে প্রশ্ন করেন ঠাকুর কে? আরে ঠাকুর কে আবার, ঠাকুর একটি ভাব। এ-রকম তো কোন দিন শুনিনি। শুনবে কোথা থেকে, কিছু তো পড়লে না; কোন দিন সাধুসঙ্গ করলে না, সাধুদের সাথে বসে শুধু খোশ গল্প করে নিজের সময় নষ্ট কর, সাধুর সময় নষ্ট কর। তা শ্রীরামকৃষ্ণের কি ভাব? ঠাকুরের ভাব হল –*পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্*, এই হল ভাব। যাকে ভালবাসেন, তাকে এভাবে দেখার অভ্যাস করুন। গুরুকে ভালবাসেন? তাহলে গুরুকেও এভাবেই দেখুন। আপনার সন্তানকে পাগলের মত ভালবাসেন? এই ভাব নিয়ে সন্তানকে দেখুন, তারপর দেখুন না কি হয়। রাতারাতি জীবন আপনার পাল্টে যাবে। বৈষ্ণব পরম্পরায় এটাই আমাদের জন্য বিরাট অবদান দিয়ে গেলেন। বৈষ্ণব পরম্পরা আমাদের শিখিয়ে দিল, মন যেখানেই থাকুক, সেই স্তর থেকে মনকে কিভাবে উপরে তুলে নিয়ে আসা যায়। আপনি আপনার স্ত্রীকে, আপনি আপনার স্বামীকে ভালবাসেন? আপনার জন্য এই শ্লোক। দিনে চারবার চিন্তন করুন, ভাবুন, দেখুন তারপর কি হয়।

তের আর চোদ্দ নম্বর শ্লোক, আমি জানি না, আমি বোধ হয় বেশি ইমোশানাল হয়ে শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করছি; কিন্তু আমি জানি না কেন আমার অজান্তেই এই শ্লোকগুলির কথা বলতে গিয়ে আমার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠছে।

আহুস্তামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষিনারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে।।১৩।।
সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ।।১৪।।

(অর্জুন বলছেন –বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ ও দেবর্ষি নারদ এবং অসিত, দেবল ও ব্যাসদেব আপনাকে ঠিক এইরূপে বর্ণনা করেছেন এবং আপনি নিজেও আমাকে এইরূপ বলছেন। হে কেশব, আপনি আমাকে যা বলছেন, তা আমি সত্য বলে মনে করি। হে ভগবন্, দেবতাদের প্রতি অনুগ্রহার্থ আপনার এই আবির্ভাব (অবতারত্ব) দেবগণ জানেন না এবং অসুরদের নিগ্রহের জন্য আপনার এই আবির্ভাব (অভিব্যক্তি) অসুররাও অবগত নয়।)

বারো নম্বর শ্লোকে ভগবানের যে গুণের কথা অর্জুন স্তুতি করে বললেন, অর্জুন এখন বলছেন, আজ আমি শুধু এই কথা বলছি না; *আহুস্তামৃষয়ঃ সর্বে,* যত বড় বড় ঋষিরা ছিলেন, তাঁরাও সবাই এভাবেই আপনাকে বর্ণনা করে গেছেন। বেদে যে মন্ত্রগুলি আছে, সেই মন্ত্রগুলি ঋষিদের দেওয়া, তাঁরা ধ্যানের গভীরে গিয়ে এগুলো সাক্ষাৎ করেছিলেন, সেখানেও ঋষিরা আপনাকে এভাবে দেখেছেন। নারদ দেবর্ষি, উচ্চতম ঋষি তিনি, সেইজন্য তাঁকে দেবর্ষি বলা হয়। ছোটবেলা থেকে কাহিনী পড়ে পড়ে আমাদের মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে যে, নারদ শুধু ঝগড়া লাগিয়ে বেড়ান। আমরাও ছোটবেলায় শিখেছিলাম, কোথাও দুজনের ঝগড়া দেখলে নখ ঘষে জয় নারদ জয় নারদ বলতাম, যাতে ঝগড়াটা আরও বাড়ে। এই নারদ হলেন বোকাদের নারদ, আসল নারদ হলেন দেবর্ষি নারদ। যিনি ঈশ্বরের বর্ণনা করে বলেছিলেন, *পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্*।

শুধু দেবর্ষি নারদই না, তার সাথে *অসিতো দেবলো ব্যাসঃ,* এনারাও আপনার স্বরূপ এইভাবে ব্যক্ত করেছেন। গীতা যদিও ব্যাসদেবের রচনা, তা সত্ত্বেও এখানে ব্যাসদেবের নাম আনা হয়েছে, কিন্তু অর্জুনের মুখ দিয়ে আসছে। অসিত, দেবল এনারা তখনকার দিনের খুব নামকরা ঋষি, যদিও এনাদের রচনা আমরা খুব বেশি পাই না। অসিত, দেবল, ব্যাসদেবের মত ঋষিরাও শুধু এই কথা বলেননি, *স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে,* আপনি নিজেও নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলেছেন। আপনি কি বলেছিলেন? আমি হলাম সেই পরমব্রহ্ম।

ঠাকুরের সম্বন্ধে আমরা কি জানি, কি বুঝি? এটা আমি আমার কথা বলছি। আপনারা এসে আমাকে বুঝিয়ে দেবেন ঠাকুর অবতার। আমি কি মানি ঠাকুর অবতার, ঠাকুর ভগবান? কি করে মানব? আমি কি প্রত্যক্ষ করেছি, আমি কি অনুভব করেছি? করিনি, আমি কি করে বলব যে, ঠাকুর অবতার। তবে হ্যাঁ, অনেক কম বয়স থেকে মহারাজদের সঙ্গ করেছি, ওনাদের শ্রদ্ধা ভক্তি করতাম, সম্মান করতাম; ওনারা বলে দিয়েছেন ঠাকুর অবতার, আমিও মেনে নিয়েছি ঠাকুর অবতার। এটাকে বলে শ্রুতি প্রমাণ। মা বলে দিয়েছে, ও তোর দাদা হয়, আমি জানি ও আমার দাদা। মা বলে দিয়েছে, ইনি তোর বাবা, আমি জানি ইনি আমার বাবা। আমি যাকে ভালবাসি, তিনি বলে দিয়েছেন, ব্যাস্, আমি জেনে গেলাম, আমার আর কিছু লাগবে না। ওনাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কি জানেন? না, আমি যাঁকে সম্মান করতাম, তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন। একটা ধাপের পর এটা চলে যাবে স্বামীজীর উপরে বা শ্রীশ্রীমায়ের উপরে। ঠাকুর বর্তমান কালের অবতার, এই তো গতকালের ঘটনা, যেখানে ঠাকুরের লীলা সংঘটিত হয়েছে, সেই স্থান, সেই ঘর, সেই জিনিসগুলো এখনও জ্বল জ্বল করছে। স্বামীজীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, ঠাকুর কি অবতার ছিলেন? স্বামীজী বুক

ঠুকে বলবেন, আরে হ্যাঁরে ভাই, আমি জানি। আরও দুটো তিনটে ধাপে আমরা পৌঁছে যাচ্ছি, যেখানে ঠাকুর স্বয়ং বিদ্যমান। স্বামীজী খুব সুন্দর বলছেন, ডারউইন বলেছেন, আইনস্টাইন বলেছেন, তাই সেটা সত্য; কিন্তু ঋষিরা যা যা বলছেন, সেটা সত্য না? তা কি কখন হতে পারে? যদি না মানতে হয় কাউকেই মানব না, আর যদি মানতে হয় সবাইকে মানতে হবে। কিন্তু যাঁকে শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি, তাঁর কথা মানব না, তা কি কখন হয়?

ফেসবুকে একজন আমাকে লিখল, কার্ল মার্ক্স কত বড় ঋষি ছিলেন, তার সাথে আরও অনেক কথা সংযোজন করে দিল। কি বলছ তুমি? কার্ল মার্ক্সকে ঋষি দেখছ, আর তোমার এখানে ঋষিরা কত তপস্যা, কত ত্যাগ, কত যোগ, ধ্যান করে একটা জাতিকে এই বিদ্যা দিয়ে গেলেন, আর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সেই জাতি এই বিদ্যাকে এখনও লালন পালন করে যাচ্ছে, এই ঋষিদের কথা তোমার মনে পড়ল না? তুমি কার্ল মার্ক্সকে নিতে পারছ, ঋষিদের নিতে পারছ না কেন? নিতে পারছ না, কারণ তুমি ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের জ্ঞানের ব্যাপারে মুর্খ।

যাঁকে সম্মান করি, যাঁকে ভালবাসি, তিনি যা বলেন, সেটাকে মাথা পেতে গ্রহণ করতে হয়। মাথা পাততে শিখতে হয়। আমি অনেক মহারাজকে জানি, আমি অনেক ভক্তকে জানি, এনাদের মধ্যে অনেককে উচ্চ অবস্থায় পৌঁছাতে দেখেছি, যাঁদেরকে আমি সত্যিই সম্মান করি। যে জিনিসটা লক্ষণীয়, তা হল, এনাদের সবারই একটা গুণ ছিল –মাথা পাততে শিখেছেন। কোথাও না কোথাও তাঁদের মাথাটা নত হয়ে আছে। যত অহঙ্কারী লোক দেখা যায়, কেউই এরা মাথা পাততে শেখেনি। বাবা-মার সামনে মাথা পাততে শিখুন, যদিও অনেকেই মাথা পাতার কথা বলেন, তবে ওটা মুখের কথা, দুদিন পরেই বাবা-মাকে গালাগালি দেবে। আর বলবে, জীবনে কিছুই হল না। হবে কোত্থেকে, ঠাকুর বলছেন নীচু জায়গায় জল জমে, নীচু হতে শিখুন। অর্জুন তাঁর সখার সামনে মাথা নত করে এটাই বলছেন –শুধু যে আমি আপনাকে এই কথা বলছি, তা না, বড় বড় ঋষিরা, দেবর্ষি নারদ থেকে শুরু করে অসিত, দেবল, ব্যাসদেবের মত ঋষিরা এই কথা বলছেন, আর আপনি নিজেও এই কথা আমাকে বলছেন যে, আপনি সেই ভগবান, আপনি সেই পরমব্রহ্ম।

একজন পলিটিক্যাল নেতা এসে বলছে, আমি তোমাদের স্কুল করে দেব, হাসপাতাল করে দেব, তোমাদের অনেক মঙ্গল করব; তখন সেটা আমরা বিশ্বাস করে নিচ্ছি। আর কোথায় আইনস্টাইন একটা থিয়োরী দিয়ে দিলেন, সেটাকে চটকে আমরা রাতারাতি যুক্তিবাদী, বৈজ্ঞানিক হয়ে গেলাম। ঋষিরা, যাঁদের মধ্যে কোন ধরণের স্বার্থপরতা নেই, কোন নামযশের আকাঙ্খা নেই, যাঁদের আদর্শকে কার্যকর করতে মানুষ সব কিছু ত্যাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, তাঁদেরও কোন কামনা-বাসনা নেই; তাঁদেরকে আমরা বিশ্বাস করব না? ফলেন পরিচিয়তে – ঠাকুরের শিষ্যদের যে পরম্পরা চলে আসছে, তাঁদের জীবন দেখুন, ত্যাগের বহ্নিশিখায় জ্বল জ্বল করছে, তাঁদের কথা আমরা মানব না তো কাদের কথা মানব?

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব, অর্জুন এই ব্যাপারে পরিষ্কার, বলছেন, আপনি নিজের ব্যাপারে যে কথাগুলো আমাকে বলেছেন, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাসদেব এনারাও সেই একই কথা বলেছেন, আমি এর সমস্ত কথাকে সত্য মনে করি, কারণ, হে ভগবান – *ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবঃ*, আপনার উৎপত্তির কথা দেব, দানব এরা কেউ জানে না। কেন জানে না, কারণ আপনি সবারই আদি কারণ; আপনিই আদি, আপনাকে কে জানতে পারবে!

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে।।১৫।।

(হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন, হে ভূতেশ, হে দেবদেব, হে জগৎপতে, আপনি বাহ্যসাধননিরপেক্ষ, নিরতিশয় জ্ঞান ও ঐশ্বর্য ও বলাদি-শক্তিবিশিষ্ট এবং নিরুপাধিক। আপনার স্বরূপ আপনিই জানেন, অপরে জানে না।)

ভূত*ভাবন*, যিনি ভূত অর্থাৎ প্রাণীদের জন্ম দেন আর *ভূতেশ*, যিনি সমস্ত ভূতের ঈশ্বর, *দেবদেব*, দেবতাদেরও দেবতা যিনি, *জগৎপতে*, জগতের যিনি পতি; অর্দ্ধেক শ্লোকে ভগবানের কতগুলি বর্ণনা করে দিলেন। তিনি সংসারের জন্মস্থান, তিনি তাঁর ইষ্ট, সব কিছুর নিয়ন্তা, দেবেরও দেব এবং জগৎপতি; কিন্তু আপনাকে কেউ জানতে পারেন না। তাহলে কে জানতে পারেন? অর্জুন নিজেই বলছে –*স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম*, একমাত্র আপনিই নিজেকে জানেন, আপনাকে আর কেউ জানতে পারে না। এখন যদি কেউ বলে, মানুষের ক্ষেত্রেও তাই, এই যুক্তি যদি ভগবানের ক্ষেত্রে লাগানো হয়, তাহলে মানুষের ক্ষেত্রেও লাগানো যেতে পারে। আসলে আমরা তো কেউ কাউকে জানি না, আমরা মনে করি আমি জানি, কারণ আমরা তাদের সহজ কয়েকটা বৈশিষ্ট্যই জানি। কিন্তু ভগবান তো মানুষ নন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, সব কিছু ভগবান থেকে বেরিয়েছে, তার মানে এর সমস্ত গুণ ভগবানের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা অনেক সময় যখন কোন ভাল ছেলে, ভাল মেয়েকে দেখি, আমরা তখন জানতে চাই, তুমি কোন বংশের, তোমার বাবা-মা কি করতেন। এক সময় আমি দেওঘর বিদ্যাপীঠে ছিলাম, সেই সময় আসাম থেকে একটি ছেলে পড়তে এসেছে। তাকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, 'বাপু, অতদূর থেকে তুমি কিভাবে এখানে পড়তে এলে'?

ছেলেটি বলল, অনেক বছর আগে গৌহাটির একটি ছেলে এই বিদ্যাপীঠ থেকে পাশ করে বেরিয়ে যাওয়ার পর গৌহাটির কোন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হয়েছিল। ওই ব্যাঙ্কে এই ছেলেটির বাবার এ্যাকাউন্ট ছিল। বলছে, বাবা সেই ম্যানেজারকে একবার জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এত ভদ্র, আপনার এত মিষ্টি ব্যবহার, আপনার এত কর্মকুশলতা, আপনি কোথা থেকে পড়াশোনা করেছেন'? উনি বললেন, দেওঘর বিদ্যাপীঠ। ছেলেটির বাবা ওখানে বসেই ঠিক করে ফেললেন, আমার ছেলেকেও ওখানেই পড়াবো। এই হল আসামের ছেলেটির দেওঘর বিদ্যাপীঠে ভর্তি হওয়ার ইতিহাস। একটা কালচার, দেখলেই বোঝা যায়। টাটা প্রোডাক্ট মানেই আমরা জানি এর কোয়ালিটি আছে। এই বস্তুর যদি এই কোয়ালিটি হয়, তাহলে আসল যেটা যেখান থেকে এটা তৈরী হয়েছে, সেটা কেমন হবে। এই জগতে এই বৈচিত্র্য, এত কিছুর সমাবেশ, তাহলে এর যিনি স্রষ্টা, তিনি কেমন হবেন! আচার্য বলছেন, এই যে আপনার মধ্যে *নিরতিশয়-জ্ঞানৈশ্বর্যবলাদিশক্তিমত্তম্*, এই যে আপনার মধ্যে ঈশ্বরীয় ভাব, ঈশ্বরীয় ভাব কি, অনন্ত ক্ষমতা, অনন্ত জ্ঞান, এই ভাবকে আপনি ছাড়া আর কে জানতে পারবে, কেউই জানতে পারে না। কারণ আপনি সব কিছুর উৎস।

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি।।১৬।।

(আপনি যে যে বিভূতি দ্বারা এই লোকসমূহ ব্যাপ্ত করে আছেন, সেই সকল দিব্য আত্মবিভূতি সম্যগ্রূপে বর্ণনা করতে একমাত্র আপনিই সমর্থ।)

আপনার যে বিভূতিগুলি, আপনার যে শক্তি, আপনার যে ঐশ্বর্য, একমাত্র আপনিই বর্ণনা করতে পারেন, আপনি ছাড়া কে বর্ণনা করতে পারবে! কারুর সাধ্যি নেই। ঠাকুরের মহিমা কি, ঠাকুরের ক্ষমতা কি, ঠাকুর যদি নিজেকে না দেখিয়ে দেন, আমরা কি করে বুঝব ঠাকুর কি, আমাদের বোঝার ক্ষমতা নেই। ঠাকুর বলছেন, একসের ঘটিতে তিন সের দুধ ধরে না। আমাদের বুদ্ধি হল একসের ঘটি, এই বুদ্ধিতে ধরবে না। একমাত্র তিনি যদি নিজে বলেন, তবেই আমরা কিছুটা ধরতে পারব। অর্জুনও তাই বলছেন, আপনার যা কিছু বিভূতি, যা কিছু মহিমা একমাত্র আপনিই নিজে বিস্তারে বলতে পারেন, আর কেউ পারবে না। যেহেতু আপনিই একমাত্র আপনার বিভূতির কথা বলতে পারেন তাই –

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ ময়া।।১৭

(হে যোগেশ্বর, কিভাবে সর্বদা আপনার চিন্তা করলে আমি আপনাকে জানতে পারব? হে ভগবন্, কোন্ কোন্ বস্তুতে আপনাকে ধ্যান করব?)

আমি আপনার কাছে জানতে চাই, কিভাবে আপনার চিন্তন করতে করতে আপনাকে আমি জানতে পারব। যে গুণচিন্তনের কথা বলা হল, ধ্যানের কথা বলা হল, জ্ঞানের উপায় বলা হল; এবার অর্জুন জানতে চাইছেন, কোন বস্তুতে কিভাবে চিন্তন করা যেতে পারে, যে চিন্তন করে আমি আপনাকে জানতে পারব। এই যে কলম আছে, এই কলমের মধ্যে আমি কোন ভাবটাকে দেখব, যে ভাব দিয়ে বুঝব এখানে ঈশ্বরীয় শক্তির প্রকাশ রয়েছে, এটা যদি একটু দয়া করে আমাকে বুঝিয়ে দেন।

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্।।১৮।।

(হে জনার্দন, আপনার সর্বজ্ঞত্বাদি ঐশ্বর্য এবং যে যে বস্তু অবলম্বন করে আপনাকে ধ্যান করা যায়, সেই সেই ধ্যানবলম্বন বস্তুসমূহ আমাকে কৃপা করে পুনরায় বিস্তৃতভাবে বলুন। এর কারণ আপনার কথামৃত পান করে আমার পরিতৃপ্তি হচ্ছে না; আমি আরও শুনতে ইচ্ছা করি।)

আচার্য *জনার্দন* শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, *অর্দতেঃ গতিকর্মণো রূপম্*, 'জনার্দন' শব্দ অর্দ ধাতু থেকে এসেছে, অর্দ ধাতুর অর্থ গমনে। বিভিন্ন যোনি রয়েছে, প্রাণীদের বিভিন্ন যোনিতে পাঠানো হয় আবার কাউকে স্বর্গে পাঠানো হয়, কাউকে নরকে পাঠানো হয়, ভগবান এই পাঠানোর কাজটা করেন, সেইজন্য তাঁর একটা নাম জনার্দন। 'জনার্দন' শব্দের আরও একটা অর্থ হয়, নিজের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য যাঁর কাছে প্রার্থনা করা হয়। অর্থ যাই হোক, ধাতু অর্দ থেকে যায়, যার অর্থ গমনে।

অর্জুন সেই জনার্দনকে বলছেন, হে জনার্দন, আপনার যে যোগ, আপনার যোগেশ্বরের যে বিশেষ শক্তি এবং বিভূতি, যার চিন্তন করা যায়, ধ্যান করা যায়, এটাকে একটু বিস্তারে বলুন। যাকে আমরা ভালবাসি, অনেক সময় আবদার করে তাকে বলি, তুমি ঐ গল্পটা বলো না, এটা তুমি কিভাবে করেছিলে। এর মধ্যে মধুর একটা আবদারের ভাব মাখানো আছে। ভগবান এটা সবাইকে দেখাবেন না, খুব আপনজন না হলে দেখানো যায় না। আপনি এর আগে অনেক কিছু বলেছেন ঠিকই, কিন্তু প্রার্থনা করছি, আর-একবার সেটাই আর-একটু বিস্তারে বলুন।

এরপর শুরু হয় উনিশ নম্বর শ্লোক, খুব নামকরা শ্লোক। এই জগতে, পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বরকে কিভাবে দেখা হয়, ঈশ্বরের প্রকাশ এখানে কিভাবে আছে। এখানে কয়েকটা কথা না বললে পুরো ছবিটা পরিষ্কার হবে না। ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, এতে কারুর কোন সন্দেহ নেই। তমোগুণে যা কিছু আছে সেটাও ঈশ্বরের, রজোগুণে যা কিছু আছে সেটাও ঈশ্বরের, সত্ত্বগুণে যা কিছু আছে সেটাও ঈশ্বরের, কিন্তু তিনটে গুণের পারে যেটা আছে সেটা তিনি নিজে। সাধনা করার সময় প্রথমে তমোগুণ আর রজোগুণকে ছেড়ে দিতে হয়। এইজন্যই তমোগুণ রজোগুণ ছাড়তে বলা হয়, কারণ জীবনে শারীরিক মানসিক যত দুঃখ-কষ্ট, যত যন্ত্রণা সব এই দুটো গুণ প্রসূত হয়ে থাকে। রজোগুণ মনটাকে এগিয়ে নিয়ে চলে যায়, সেই এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে আশা জড়িয়ে থাকে, আশা যখন পূর্ণ হয় না, তখন মার খেয়ে সেখান থেকে ফেরৎ আসে। তমোগুণ যেখানে রয়েছে, রজোগুণ যেখানে রয়েছে, সেখানেও ঈশ্বরকে দেখা, এটা হল জ্ঞানী পুরুষের লক্ষণ। আমরা অত্যন্ত সাধারণ

মানের মানুষ, আমাদের সেই অবস্থা বা ক্ষমতা নেই যে রজোগুণ, তমোগুণের মধ্যেও ঈশ্বরকে দেখব। আমাদের হল, যেখানে সত্ত্বগুণের প্রকাশ বেশি, সেখানে ঈশ্বরের প্রকাশকে দেখা। দশম অধ্যায়ের এই অংশে জগতে শ্রেষ্ঠতম যেটা, সেটাকে ভগবান দেখাবেন। কিন্তু আগে আগে যেটা হয়েছে, যেমন বেদের বিখ্যাত মন্ত্রে বলছেন *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্*, যাবতীয় যা কিছু হয়েছে সব ঈশ্বরই হয়েছেন। সে তো আমরা কত ছোটবেলা থেকেই এসব কথা শুনে আসছি, কিন্তু কই আমরা তো কেউ আধ্যাত্মিক হচ্ছি না তো, আমরা যে কলু ছিলাম, সেই কলুই আছি।

ভগবান এবার নূতন করে সেই জিনিসগুলি দেখাচ্ছেন, যেখানে শক্তি বিশেষের প্রকাশ, যেখানে জ্ঞানের প্রকাশ বেশি, যেখানে সাত্ত্বিক ভালবাসার প্রকাশ, এটা কোন তামসিক ভালবাসা না, যেখানে আমি তাকে বেঁধে নিয়ে যেতে চাইছি; শুভ শক্তির যেখানে প্রকাশ, যেখানে মিষ্টি, মধুর ভালবাসার প্রকাশ, ভগবান বলছেন আমি সেই জায়গায় আছি। তার মানে এটা নয় যে, ভগবান অন্য জায়গাতে নেই, কিন্তু এগুলো হচ্ছে ধ্যানের জন্য।

শ্রীভগবানুবাচ
হন্ত তে কথয়ষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে।।১৯।।

(শ্রীভগবান্ বললেন –হে কুরুশ্রেষ্ঠ, আমার ধ্যানের অবলম্বন প্রধান প্রধান দিব্য বস্তুসমূহ (বিভূতিসকল) তোমাকে বলব। কারণ আমার বিস্তৃত বিভূতির অন্ত নাই।)

নির্গুণ ব্রহ্মকে জানা খুব সহজ, এই অর্থে সহজ, কারণ নির্গুণ ব্রহ্মকে জানা যায় না, ওর সঙ্গে এক হওয়া যায়; সমাধি থেকে ফিরে আসার পর উনি জানেন আমি জেনে গেছি। কিন্তু সগুণ ব্রহ্মকে জানা যায় না। ভাগবতেও এই কথা আসে, নির্গুণ ব্রহ্মকে তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে জানা যায়। অথচ নির্গুণ ব্রহ্ম হলেন অনেক সুপিরিয়র, কিন্তু তত্ত্ব জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা জেনে যাব। কিন্তু বিস্তারে যদি জানতে হয়, তখন সগুণ ব্রহ্মে আসতে হবে, কিন্তু ওটাকে জানা যায় না। কথামৃত যদি ভাল করে আগাগোড়া না জানা থাকে, শাস্ত্র আমরা বুঝতে পারব না। তেমনি শাস্ত্র যদি ভাল জানা থাকে তখন কথামৃত বুঝতে খুব সুবিধা হয়। ঠাকুর অত্যন্ত সহজ করে এটাকে বলছেন, মা আমাকে এখনও নূতন নূতন অনুভূতি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্বাস হয় না শুনলে, যিনি ভগবান, যাঁর নির্বিকল্প সমাধি হয়ে গেছে; তিনি কিনা বলছেন, মা আমাকে এখনও নূতন নূতন অনুভূতি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তার মানে, সগুণ ব্রহ্মকে জানা যায় না।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি, হে কুরুশ্রেষ্ঠ, তুমি জানতে চাইলে, ঠিক আছে আমি তোমাকে আমার বিভূতির কথা, বিভূতি মানে বিস্তার, তার কথা বলছি। *প্রাধান্যতঃ*, কিন্তু প্রধান প্রধান বিভূতগুলিই বলা যাবে। কারণ আমার সমস্ত বিভূতির কথা যদি তোমাকে বলতে যাই, তাহলে, আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *অশেষতঃ তু বর্ষশতেন অপি ন শক্য বক্তুং যতো*, শত বছর ধরেও আমি যদি বলতে থাকি, আমার বিভূতির বর্ণনা শেষ হবে না। সেইজন্য আমি শুধু প্রধান প্রধান বিভূতির বর্ণনা করছি। তার মধ্যে প্রথম বিভূতির বর্ণনা করছি, তুমি শোন, সগুণ ব্রহ্ম রূপে আমার বিস্তার কি। কুড়ি নম্বর শ্লোক থেকে ভগবান এই অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্যন্ত ভাগবত বিভূতিসমূহ বর্ণনা করছেন –

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ।।২০।।

(হে জিতেন্দ্রিয় অর্জুন, আমিই সর্বপ্রাণির হৃদয়ে অবস্থিত প্রত্যগাত্মা এবং আমিই প্রাণিগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের স্থান।)

হে গুড়াকেশ, আমার প্রথম বিভূতিটা মনে রাখার মত। অর্জুনের একটা নাম গুড়াকেশ, গুড়াকেশ ভগবানকেও বলা হয়। গুড়াকেশ শব্দের অর্থ, যিনি নিদ্রাকে জয় করেছেন, নিদ্রার উপর যাঁর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ আছে। বর্তমান কালে আইটি ইণ্ডাস্ট্রিতে যারা আছে, এদের দেখে বোঝা যায় না, এদের কোনটা দিন আর কোনটা রাত, মজা করে এদের বলা হয় গুড়াকেশ। গুড়াকেশ যখন খুশী ঘুমিয়ে পড়তে পারেন, যখন খুশী ঘুম থেকে উঠে যেতে পারেন, তার মানে তাঁরা তমোগুণ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। গুড়াকেশ এর আরও একটা অর্থও হয় –যার মাথায় ঘন চুল আছে, তাকেও গুড়াকেশ বলা হয়। হে গুড়াকেশ, সমস্ত জীবের হৃদয়ে যে আকাশ, ভগবান ভৌতিক আকাশের কথা বলছেন না, আধ্যাত্মিক আকাশের কথা বলছেন। ধ্যান করতে করতে কুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে সুষুম্না নাড়ি দিয়ে সেই কুণ্ডলিনী শক্তি উপরের দিকে উঠে আসে; তখন যোগী হৃদয়াকাশ দেখতে পান। যতক্ষণ কেউ এগুলো প্রত্যক্ষ না করছেন, ততক্ষণ তাঁদের কাছে এগুলো শব্দ মাত্র।

ভগবান বলছেন, সমস্ত জীবের এই হৃদয়াকাশে আমি বাস করি। সেইজন্য ধ্যান করার সময় আমাদের হৃদয়ে ধ্যান করতে বলা হয়। কারণ আমাদের যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা আধ্যাত্মিক অনুভূতি হবে, সেটা এই জায়গাতেই হবে। আচার্য তাঁর ভাষ্যে বলছেন, *সর্বেষাং ভূতানাম্ আশয়ে অন্তর্হৃদি স্থিতঃ নিত্যং ধ্যেয়ঃ*। বেশির ভাগ সম্প্রদায়ে দীক্ষার্থীদের বলা হয়ে থাকে হৃদয়ে ইষ্টের চিন্তন বা ধ্যান করতে। আচার্য শঙ্করও ঠিক এই কথা নিজের থেকে বলছেন –ধ্যান যদি করতে হয়, তাহলে এটাই ধ্যান করবে যে, সবারই হৃদয়ে আমি বাস করি, তত্ত্বের দিক দিয়ে না, একেবারে বাস্তবে। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে এটাই তুমি প্রত্যক্ষ করবে। আর এভাবেই ধ্যান করতে হয়। আসলে ধ্যান করার সময় আমরা মনে করছি ধ্যান করছি, কিন্তু ধ্যান আমরা পারি না। প্রথমটা বললেন তাঁদের জন্য, যাঁরা উচ্চ অধিকারী। স্বামী ভূতেশানন্দজী আমাদের এক মহারাজকে বলছিলেন, কি বিধবাদের মত খালি জপ করে যাচ্ছ, ধ্যান কর। বিধবাদের জপ করাকে খারাপ বলছেন তা না, আগেকার দিনে বিধবাদের কাজকর্ম থাকত না, কি করবে, সারাদিন যন্ত্রের মত শুধু মন্ত্র জপ করে যাচ্ছে, কিন্তু কিছুই হয় না, মেকানিক্যাল হয়ে যায়। অর্থটা হল, মেকানিক্যাল কেন করছ, ধ্যান কর। ধ্যান করলে বোঝা যায় লড়াইটা কেমন।

এইভাবে হৃদয়ে আমাকে ধ্যান যদি করতে না পার, তাহলে তুমি এইভাবে আমার চিন্তন করতে পার, *অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ*, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আমি আদি, আমি এর মধ্য এবং আমি এর অন্ত। ভগবান এখানে আমাদের ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে এলেন, কারণ আমাদের মন, ইন্দ্রিয় বহির্মুখী কিনা। বাইরের জগতের সঙ্গে আমরা সহজে জুড়ে যেতে পারি, বাইরের জিনিসকে আমরা সহজে ধারণা করতে পারি। প্রথমটায় বললেন, হৃদয়ে ধ্যান কর, যদি সেখানে একাগ্র করতে না পার, তাহলে বাইরের দিকে তাকিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেখ। কি রকম দেখবে? সবারই আদি আমি, মধ্য আমি, অন্ত আমি।

ভগবান আছেন, ভগবানকে আমরা যে শব্দ দিয়েই ডাকি না কেন, ব্রহ্ম বলতে পারি, আত্মা বলতে পারি, যেভাবেই বলি না কেন সেই ভগবানই আছেন। নিরাকার বলি, সাকার বলি, সগুণ বলি, নির্গুণ বলি, যে রূপেই তিনি থাকুন, তিনি শুদ্ধ চৈতন্য, তিনিই আছেন। সেখান থেকে এই জড় জগতের উৎপত্তি। সেই জড় জগৎ থেকে ভগবান পুরো আলাদা হতে পারেন, যেমন কোন কোন ধর্ম মনে করে। কিন্তু হিন্দুরা তা মনে করে না, তারা মনে করে, ভগবান এই জগতে ওতপ্রোত ভাবে, কাদাতে যেমন মাটি আর জল ওতপ্রোত ভাবে থাকে, ঠিক সেইভাবে ভগবান জগতের সাথে ওতপ্রোত ভাবে আছেন। শরবতে যেমন চিনি জলের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে মিশে থাকে।

ঈশ্বরের সাথে জগতের সম্পর্ক যদি দেখতে যাই, আর জগতে ভগবানের মহিমা যদি দেখতে যাই, তখন অনেক ভাবে এর ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এর মধ্যে দুটি প্রধান ব্যাখ্যা হল, একটা

যেটা ঠাকুর প্রায়ই ব্রহ্ম আর শক্তির কথা বলতেন। ব্রহ্ম এবং তাঁর যে ক্রিয়াশক্তি, এই শক্তি তিনি সৃষ্টি করেন, আর এই জগৎ হল তাঁর মহিমা। এই মহিমার মধ্যে তাঁর বিভূতি দেখা যায়। এই বিভূতি বিভিন্ন ভাবে দেখা যায়, যেটা সত্ত্বগুণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সত্ত্বগুণের মাধ্যমে মানে, সেখানে শক্তি রয়েছে, সেখানে জ্ঞান রয়েছে, জীবনের কিছু values গুলি যেখানে রয়েছে, যেগুলো ধর্মে প্রকাশ পায়, বিভিন্ন প্রজাতিতে প্রকাশ পায়। আর-একটি প্রধান ব্যাখ্যা হল মায়া দিয়ে ভগবানের মহিমার ব্যাখ্যা। বেদান্ত ব্রহ্মের এই শক্তিকে ঠিক শক্তি না বলে মায়া রূপে নেয়। কিন্তু মায়াও সেই প্রকাশ, যেখানে আবরণটা একটু কমে গেছে। আলো আছে, আলোর উপর আবরণ আছে, যেমন যেমন আবরণ কমছে, তেমন তেমন আলোর প্রকাশ বাড়ছে।

জগতে যত রকম শক্তির প্রকাশ দেখা যায়, এই শক্তি ভগবানেরই। ভগবান ছাড়া শক্তি হয় না। সপ্তম অধ্যায়ে বলেছিলেন, এখানেও বলবেন। স্বামী-স্ত্রীর যে ভালবাসা, যে ভালবাসা দিয়ে সন্তান উৎপত্তি হয়, সেটাও ভগবান নিজে। ঠাকুর যে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলছেন, ঐ কামিনী আলাদা জিনিস। সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বললেন, *ধর্মাবিরুদ্ধ ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ*, আমি সেই কাম, যে কাম ধর্ম অবিরোধী। যে কাম ধর্ম বিরোধী সেই কাম আমি নই। কারণ ধর্ম বিরোধী হলে ওটা তমোগুণ হয়ে যায়।

ভগবানের যে এই শক্তির প্রকাশ, সেটা আমরা ব্রহ্ম ও শক্তি রূপেই নিই বা আবরণ ক্ষীণ হয়ে আসছে সেই রূপেই নিই; এই জিনিসটাকে বেদে দুই ভাবে দেখা হয়। বেদে বলছেন, *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি*, হে প্রভু তুমিই সব কিছু হয়েছ, এটা খুব উচ্চমানের ভাব, সাধারণদের দ্বারা এর সাধনা হয় না। ঈশ্বরই সব হয়েছেন, মুখে এই কথা বলা খুব সহজ, কিন্তু বাস্তবে ব্যবহারকালে সম্ভব হয় না। হিন্দু ধর্ম একেবারে বাস্তববাদী ধর্ম, একেবারে প্র্যাক্টিক্যাল। একদিকে যেমন তত্ত্ব কথা বলছেন, *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি*, তার সাথে বেদেও আছে আর উপনিষদেও অনেকবার এসেছে, যেখানে শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলিকে দেখানো হচ্ছে। যেমন আত্মতত্ত্বকে দেখাচ্ছেন *মহিষো মৃগাণাম্*, পশুদের মধ্যে পুরুষ মহিষ। আবার বলছেন জঙ্গলের মধ্যে আমি কুঠার, যে জঙ্গলকে কেটে সাফ করে দেয়। প্রথম যখন ঈশ্বরকে দেখা শুরু হয়, তখন প্রথমে দেখতে শুরু করবেন শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলির মধ্যে। সেখান থেকে আস্তে আস্তে সব জায়গায় বিস্তার করতে থাকে। নিজেকে যদি পবিত্র করতে হয়, প্রথমে গঙ্গাজল দিয়েই পবিত্র করতে হয়। তারপর যে কোন জল ছিটিয়ে দিলেই হল। সেখান থেকে যখন আরও উপরে যাবে, তখন গঙ্গার জল আর নর্দমার জল একই মনে হবে। কিন্তু সেটা হল শেষ কথা, অনেক উঁচু কথা।

অনেক আগেকার কথা। একজন নূতন ব্রহ্মচারী জয়েন করেছেন। যা হয়, সংসার থেকে সদ্য এসেছেন, ভিতরে সংসারের ভাব এখনও পুরো মাত্রায় রয়েছে। সাধু সন্ন্যাসী তো একদিনে হয়ে যাওয়া যায় না, সময় দিতে হয়। রঙ একদিনে ধরে না, ধীরে ধীরে ভাব ধরে। নূতন ব্রহ্মচারী ছেলেদের সাথে ভলিবল খেলেছেন, খেলার পর জামা-কাপড় না ছেড়ে কোন রকমে হাত-পা ধুয়ে ঠাকুরের সন্ধ্যারতি করতে চলে গেলেন। ওই আশ্রমের যিনি প্রধান ছিলেন, সেক্রেটারী মহারাজ ব্রহ্মচারীকে বললেন, 'তুমি এটা কি করছ? জামা-কাপড় ছেড়ে আরতি কর'। সেই ব্রহ্মচারী আবার ওনাকে শুনিয়ে দিল, 'পবিত্রতা ভিতরে, বাইরে না'। আশ্চর্য এটাই যে, সেই ব্রহ্মচারী মঠে থাকতে পারলেন না, মঠ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। শুদ্ধ পবিত্রতা মন থেকে হয়, ঠিক কথা, কারুর কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পবিত্রতার সূচনা স্নানাদি করেই হয়। পবিত্রতা শুরু হয় শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে।

বেলুড় মঠে ঠাকুরের গর্ভগৃহে সাধুরাই একমাত্র যেতে পারেন, বাইরের কেউ যেতে পারেন না। কোন সন্ন্যাসীও যখন ঠাকুরের গর্ভগৃহে যান, স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র পরে যান, এমনকি মোজা পরাও নিষেধ। পূজারীদের আলাদা কাপড়, আলাদা সব ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু আমরা সন্ন্যাসীরাও

মোজা পরে যাই না। তারপরে আবার গঙ্গাজল ছিটিয়ে প্রবেশ করতে হয়। কারণ ঠাকুর, যিনি সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম, আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। আমি যে সেন্টারে ছিলাম, সেখানে নেপালের একটি ছেলে কাজ করত, লেখাপড়া কিছু জানতা না। ছেলেটির নিজের মা ছিল না, সৎ মা আছে। একদিন আমাকে এসে বলল, 'মহারাজ, আপনি আমাকে হিন্দীতে একটা চিঠি লিখে দেবেন'? আমি রাজী হয়ে গেলাম। চিঠিটা বাবাকে লিখছে, বলছে, 'মাকে গঙ্গাস্নান করে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাই'। অনেক আগেকার কথা। আমি জানতাম, নেপাল তখন এক হিন্দু রাষ্ট্র, হিন্দু মূল্যবোধ নিয়ে ওরা চলে। কিন্তু নিজের মাকে, তাও আবার সৎ মাকে চিঠিতে লিখছে, গঙ্গস্নান করে মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাচ্ছে। এই হল হিন্দু সংস্কৃতি। শুধু প্রণাম করছে না। সেইজন্য যখন পবিত্রতা শুরু করা হয়, প্রথমে বহিঃআচরণকে দিয়ে পবিত্রতা শুরু হয়। ইংলিশে খুব সুন্দর একটা কথা আছে, Love is not a noun, love is a verb, ভালবাসা একটা শব্দ না, ভালবাসা একটা ক্রিয়া, করে দেখাতে হয়। শুদ্ধি এটা কোন ভাব না, শুদ্ধি ক্রিয়া, করে দেখাতে হয়। ঈশ্বরকে যখন আমরা জগতে দেখব, এটা ভাব না, এটা প্র্যাক্টিস করতে হয়। কুড়ি নম্বর শ্লোক থেকে শুরু হয়েছিল, যেখানে ভগবান বিভূতির বর্ণনা শুরু করছেন, যেখানে বলছেন, জীবন্ত প্রাণী যত আছে, তার আদি, মধ্য ও অন্ত আমি, আর সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে আমি বাস করি, এর উপর আমরা বিস্তারে আলোচনা করেছি।

আচার্য শঙ্কর এখানে খুব সুন্দর বলছেন, সবাই তো এই রকম ধ্যান করতে পারবে না। ধ্যানের কথা মুখে আমরা বলতে পারি, বাস্তবে আমাদের ধ্যান হয় না। যদি আমি এটা মানতে পারি, তাহলে আমার আর মন্দিরে যাবার কি দরকার। ঠাকুরের ভক্তরা দৌড়ে দৌড়ে কেন বেলুড় মঠে আসছেন? সর্বভূতে যিনি ঈশ্বরকে দর্শন করছেন, তিনি কেন আর মন্দিরে যাবেন, কেন বিগ্রহের সামনে যাবেন? এইজন্যই যাচ্ছেন, কারণ তিনি এখনও ওই অবস্থায় পৌঁছাতে পারেননি। ঠাকুরকে যখন একজন জিজ্ঞেস করছেন, আপনি এখনও এগুলো মানেন? ঠাকুর বলছেন, আমি এখনও অত দূর না। ঠাকুর একদিকে অবতার, অন্য দিকে তাঁর অদ্বৈত জ্ঞান হয়ে গেছে, সব কিছু হয়ে গেছে, তারপরেও তিনি বলছেন, আমি এখনও অত দূর না। কারণ *যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ,* তিনি যে রকমটি আচরণ করবেন, ওনার শিষ্যরাও ঐ রকমটিই করবেন। তিনি যদি বলতেন, আমাকে আচার টাচার মানতে হয় না; নরেন যেমন বলছেন, উনি এখনও কালীঘরে যান। কেন যাবেন না, অদ্বৈত জ্ঞানের পরেও যাবেন। কারণ যাঁদের এই কুড়ি নম্বর শ্লোক বোধ হয়ে গেছে, তাঁরাও এইগুলো করছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ, যাঁরা ঐ স্তরে পৌঁছাতে পারেননি, তাঁরা যখন ধ্যান করবেন, তাঁরা যখন ঈশ্বরের চিন্তন করবেন, ঈশ্বরের বিভূতির চিন্তন করবেন, তাঁদের জন্য পরের শ্লোকে আরও সহজ করে বলে দিচ্ছেন –

আদিত্যনামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী।।২১।।

(দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু নামক আদিত্য, প্রকাশকগণের মধ্যে আমি কিরণশালী সূর্য, ঊনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে আমি মরীচি এবং আমি নক্ষত্রগণের অধিপতি চন্দ্র।)

একেবারে নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন, যাতে আরও সহজে আমরা ধ্যান করতে পারি। আদিত্য বেদের দেবতা, পুরাণের কাহিনীতে আমরা পাই, সৃষ্টি যখন হল তখন সেখানে কাশ্যপ মুনি ও প্রজাপতিরা ছিলেন, এনাদের দায়ীত্বই ছিল সৃষ্টির বিস্তার করা। কাশ্যপ মুনির অনেক স্ত্রী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজনের নাম অদিতি, অদিতি থেকে যে বারোজন সন্তান উৎপন্ন হয়েছিল, তাঁদের বলা হয় আদিত্য। ভগবান বলছেন এই দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু। ইন্দ্রও একজন আদিত্য, বিষ্ণুর একটা নাম উপেন্দ্র, ইন্দ্রের ছোট ভাই। এই বিষ্ণু কিন্তু ভগবান বিষ্ণু নন। এই বিষ্ণু দেবতার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, তিনি নিজে কিছু করতেন না। এই যে সাধারণ একটা কথা, *আদিত্যানামহং*

বিষ্ণু, বেদের সময় ইন্দ্র হলেন প্রধান দেবতা, কিন্তু মহাভারত আসতে আসতে বিষ্ণু হয়ে গেলেন প্রধান দেবতা।

আদিত্যানামহং বিষ্ণু হয়ত এর খুব একটা তাৎপর্য বোঝা যাবে না, এর বৈশিষ্ট্য হল, এই বিষ্ণুর অনেকগুলো কাহিনী আছে। যেমন একটা কাহিনীতে আমরা দেখি, বলি রাজাকে পাতালে পাঠাবার জন্য বিষ্ণু দেবতা বামন হয়ে বলি রাজার কাছে এসে তিন পাদ ভূমি চাইলেন। বলি রাজা তাঁকে তিন পাদ ভূমি দান করলেন। দান করতেই সেই বামন এক পায়ে পুরো পৃথিবী আরেক পায়ে পুরো অন্তরীক্ষ ছেয়ে ফেললেন। তৃতীয় পাদ এবার বিষ্ণু কোথায় রাখবেন? বিষ্ণু দেবতার নামই হল উরুক্রম। আবার বেদেই আছে *তদবিষ্ণো পরমং পদম্*।

যাঁরা প্রকাশমান তাঁদের মধ্যে আমি সূর্য। যে সূর্য উদিত হচ্ছে, সেই সূর্য না, যে সূর্য অস্তমিত হচ্ছে, সেই সূর্যও না, সূর্যে গ্রহণ লেগেছে, সেই সূর্যও না, *রবিরংশুমান*। অংশুমান সূর্য, প্রদীপ্ত সূর্য। এটা আমার আপনার উপরেও খাটে। আপনি যিনি অংশুমান, যে প্রদীপ্ত আপনি, দীপ্ত আপনি, এই দীপ্ত যে আপনি আপনাতেই ভগবান আছেন। তেজ যদি না থাকে তাহলে এখনও আপনি তমোগুণে পড়ে আছেন। যেটা মলিন আপনি, গ্রহণ লাগা আপনি, সেই আপনি ভগবান নন, ঐ আপনি শুধু মায়া আর মায়া। ত্রিগুণাত্মিকার যে সত্ত্ব, রজো আরা তমো, এটা তামসিক মায়া। এই এক একটা শ্লোকের উপর বই লিখে দেওয়া যায়। নিজেকে নিয়ে যদি একটু একটু করে আমরা ভাবনা চিন্তন করি, তখন দেখা যাবে অনেক জায়গায় এই ভাবকে খাটানো যাবে।

বায়ু সম্বন্ধীয় যত দেবতা আছেন, তাঁদের মধ্যে আমি মরীচি। ঊনপঞ্চাশ জন মরুৎ দেবতা আছেন, তাঁদের মধ্যে ভগবান হলেন মরীচি। মরীচি আবার একজন ঋষি, সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। যত নক্ষত্র আছে, তাদের মধ্যে আমি চন্দ্রমা। আমাদের ঋষিরা জানতেন চন্দ্রমা সৌরজগতের একজন সদস্য; তাঁকে সূর্যের উপর নির্ভর করে চলতে হয়, সেইজন্য বলছেন নক্ষত্র। সূর্য আর চন্দ্রকে আমাদের শাস্ত্রের অনেক জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে, কিন্তু সেখানে আলোর অর্থে নিয়ে আসা হয়। পরিষ্কার বলছেন, নক্ষত্রদের মধ্যে আমি চন্দ্রমা, আলো দিচ্ছে কিনা। এখান থেকে শুরু করে এবার পর পর বলতে থাকবেন। রাতের আকাশে চন্দ্রমার দিকে তাকালে এটাই ধ্যান করবেন, এই চন্দ্রমা ভগবান নিজে। রাতের আকাশে যত নক্ষত্র আছে, তার মধ্যে চন্দ্রমার মধ্যে তিনি, কারণ সব তারাদের থেকে চন্দ্রম্যা তাঁর প্রকাশ বেশি। সূর্যকে যখন দেখব, এই সূর্য ভগবান নিজে। প্রকাশ যাঁরা দেন, তাঁদের মধ্যে সূর্য সর্বশ্রেষ্ঠ। জগতে সাধারণ ভাবে শ্রেষ্ঠ কোন গুলি? ভগবান এবার এক এক করে বিস্তারে সেটা বলবেন।

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা।।২২।।

(চার বেদের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, আমি ইন্দ্রিয়সকলের প্রবর্তক মন এবং প্রাণিদেহে অভিব্যক্ত চেতনা অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি, ওটা আমি।)

আমরা জানি আমাদের চারটি বেদ, ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব। ঋগ্বেদেই সমস্ত বেদের মূল জিনিসগুলি মোটামুটি রাখা হয়েছে। ঋগ্বেদ থেকে কিছু ঋচাগুলিকে বার করে, যেগুলো যজ্ঞ বিশেষে লাগে, সেগুলোকে সামবেদে রাখা হয়েছে। সামবেদের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হল, এর মন্ত্রগুলি গান করা যায়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সামবেদকে খুব উচ্চ স্থানে রাখা হয়। হিন্দুদের প্রধানতম গ্রন্থ কি যদি বলতে বলা হয়, তাহলে তা হবে সামবেদ। এনারা বিভিন্ন জায়গায় বলেন, ঋগ্বেদ যেন দুধের মত, সেই দুধকে মন্থন করে যে মাখন তোলা হয়, সেই মাখন যেন সামবেদ। সেইজন্য সামবেদকে প্রচুর জোর দেওয়া হয়। ভগবান বলছেন, *বেদানাং সামবেদোঽস্মি,* বেদের মধ্যে আমি সামবেদ।

দেবানামস্মি বাসবঃ, ইন্দ্রের কথা বলছেন। আদিত্য আর দেবতা এই দুটোর পার্থক্য হল, আদিত্য কয়েকজন মিলে একটা গ্রুপ, দেবতা হল আরও larger group, এই বড় গ্রুপের মধ্যে আদিত্যও একটা গ্রুপ। যেমন মরুৎ, এনারাও দেবতাদের মধ্যেই পড়েন। আরও অনেক ছোট ছোট গ্রুপ সব মিলিয়ে হয়েছে দেবতা। দেবতা শব্দ আসে দিব্ ধাতু থেকে, দিব্ ধাতুর অর্থ আলো। যাঁদের মধ্যে আত্মার আলো জ্বলে উঠেছে, তাঁরাই দেবতা। যাঁরা দেবতা নন, তাঁরা অসুর। *অসূর্যা নাম তে লোকা,* যেখানে আত্মার আলো নেই, অন্ধকারাচ্ছন্ন। দেবতা আর অসুর পুরোপুরি নির্ভর করে আত্মার আলোর উপর। সেই সকল দেবতাদের মধ্যে আমি ইন্দ্র।

ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি, আমাদের দশটি ইন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় আর পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, এই দশের সাথে মনকেও ইন্দ্রিয় বলে গ্রহণ করা হয়। হিন্দু ধর্মের ধর্মতত্ত্বের যে আলোচনা হয়, আর মনের বিজ্ঞানকে যখনই আলোচনা করা হয়, সেখানে মনকে সব সময় ইন্দ্রিয় বলেই গ্রহণ করা হয়। কখন বলে *দশৈকম্,* দশ আর এক, একাদশ ইন্দ্রিয়। মন হল সব ইন্দ্রিয়ের রাজা। ঠাকুরের সাথে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমবাবুর এক সাক্ষাৎকারে ঠাকুর বঙ্কিমবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি মনে হয়, জীবনের উদ্দেশ্য কি? বঙ্কিমবাবু একটু হিউমারাস হতে গেলেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে অত কিছু জানতেন না, ঠাকুরের সম্বন্ধে এর তার কাছে কিছু কথা শুনেছেন মাত্র, সেইজন্য হাল্কা কথা দিয়ে বললেন, আহার, নিদ্রা, মৈথুন। ঠাকুর শুনে প্রচণ্ড রেগে গেলেন, তুমি তো বড্ড ছ্যাঁচড়া। বঙ্কিমবাবু এমন ছ্যাঁচড়া কথাও কিছু বলেননি। আহার, নিদ্রা ও মৈথুন, এগুলোই ইন্দ্রিয়ের কার্য। আহার কার্যে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় লাগে, মৈথুন কার্যে দশটি ইন্দ্রিয় লাগে, অর্থাৎ কেউ চাইলে ব্যবহার করতে পারে। নিদ্রা মানে এই দশটি ইন্দ্রিয় যখন ঘুমিয়ে পড়ে। জগৎ মানেই মনের জগৎ, মানে ইন্দ্রিয়ের জগৎ। আর ইন্দ্রিয় জগৎ চলে শুধু আহার, নিদ্রা ও মৈথুনের উপর। পুরো পাঁচটি ইন্দ্রিয়, না হলে দশটি ইন্দ্রিয়, আর তা নাহলে ইন্দ্রিয় ঘুমিয়ে পড়বে। ধর্ম জগৎ যেখানে চলে সেখানে এই দশটি ইন্দ্রিয় শুয়ে থাকে, অথচ মন সেখানে জেগে থাকে।

মনের বিশেষত্ব হল, এই দশটি ইন্দ্রিয় মনের ভিতরে আছে। তার মানে দশটি জিনিস মনকে দিয়ে সরাসরি করা যায়। আমরা কিছু টেস্ট করতে চাই, দেখা যায় ইন্দ্রিয়গুলি ব্যবহার না করেও মন ওটা সরাসরি বুঝে নিতে পারে। কাউকে যদি ভালবাসি, ভালবাসার জন্য যদি কাছে নাও থাকে, মনে মনে আমরা তাকে কাছে নিয়ে আসতে পারি। সেইজন্য মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের রাজা। ইন্দ্রিয়গুলি হল মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্র।

কিন্তু তার থেকেও মনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, আহার, নিদ্রা, মৈথুন সমস্ত মন নিজে করে নিতে পারে তার সাথে মনের আরেকটা খুব বড় বৈশিষ্ট্য হল মন নিজেকে অতিক্রম করে যেতে পারে, যেটা দশটি ইন্দ্রিয় পারে না। চক্ষু দিয়ে আমি কখন চক্ষুকে অতিক্রম করতে পারব না, কিন্তু মন দিয়ে আমি মনকে অতিক্রম করতে পারব। তার মানে মন দিয়ে আহারের কাজ হয়, নিদ্রার কাজ হয়, মৈথুনের কাজ হয় আর জাগ্রত থেকে মন দিয়ে ইন্দ্রিয়গুলিকে শান্ত করে দেওয়া যায়, আর মন মনের পারে চলে যেতে পারে। যিনি যোগী, যোগী মানেই তিনি আহার, নিদ্রার জন্য যে ইন্দ্রিয়গুলি লাগে, সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে সুপ্ত করে দেন। সুপ্ত হলে তো তিনি ঘুমিয়ে গেলেন, না, যোগী না ঘুমিয়ে সুপ্ত করতে পারেন; জাগ্রত অবস্থায় সচেতন হয়ে করতে পারেন। মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে তার ইন্দ্রিয়গুলিও ঘুমিয়ে পড়ে। গভীর ঘুমে দশটি ইন্দ্রিয়ই ঘুমিয়ে পড়ে। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি একটু জেগে থাকে। যোগীরা জাগ্রত অবস্থায় দশটি ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে যান, অথচ তিনি ঘুমিয়ে নেই। তার থেকেও বড় হল, তিনি মনের সাহায্যে মনকে অতিক্রম করে যেতে পারেন। সেইজন্য মন হল ভগবানের প্রকাশ। ইন্দ্রিয়গুলিও ভগবানেরই প্রকাশ, কিন্তু তুলনায় মনে ভগবানের বেশি প্রকাশ।

ভাগবতে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, সৃষ্টি হল, সৃষ্টির সাথে সাথে সমস্ত পদার্থগুলিরও সৃষ্টি হয়ে গেল, আর ইন্দ্রিয়গুলিরও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়রা তাদের নিজের নিজের কোন কাজ করতে পারছে না। তারা তখন ভগবানক গিয়ে জানাল, 'আপনি আমাদের সৃষ্টি তো করে দিলেন, কিন্তু প্রভু আমরা তো কোন কাজ করতে পারছি না'। কারণ ইন্দ্রিয়গুলির নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। ইন্দ্রিয়গুলির যদি নিজস্ব কোন ক্ষমতা থাকত, স্বাধীন হত, তাহলে এক ইন্দ্রিয় দিয়ে আরেক ইন্দ্রিয়ের কাজ করে দেওয়া যেত, চোখ দিয়ে শুঁকে বলে দেওয়া যত এটা কিসের গন্ধ বা নাক দিয়ে আমরা দেখে সব কিছু বলে দিতে পারতাম। তখন ভগবান হেসে বললেন, 'ঠিক আছে এবার তোমরা যে যার নিজের নিজের কাজ করতে পারবে'। এই কথা বলে ভগবান ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে প্রবেশ করে গেলেন, আর সেই মুহূর্তে ইন্দ্রিগুলির মধ্যে চৈতন্য এসে গেল।

এই কাহিনীর দ্বারা পুরাণাকার ঋষি আমাদের কাছে একটা পারমার্থিক সত্যকে বোঝাতে চাইছেন, তা হল, ইন্দ্রিয়ের নিজস্ব কোন স্বাধীন সত্তা নেই, ইন্দ্রিয়গুলিকে পুরোপুরি মনের উপর নির্ভর করে চলতে হয়। মন নিজে নির্ভর করে আছে আত্মার উপর, আত্মা মানেই ভগবান। ভগবান যদি এদের মধ্যে প্রবেশ না করেন, এরা কেউই কোন কাজ করতে পারবে না। এখন যদি ইন্দ্রিয় ভগবান হন, মনও যদি ভগবান হন, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ কেন বলছেন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আমি মন? কথাটা শুনতে খুব সহজ মনে হয়, যাঁরা গীতা পাঠ করছেন তাঁরা বলবেন কত বার পাঠ করেছি *ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি*। কিন্তু ভিতরে ঢুকলে বোঝা যায়, এই কথার মধ্যে কত গভীরতা। এখানে মনে করার কিছু নেই যে, আমি জিনিসটাকে জটিল করে দিচ্ছি। কিন্তু এগুলো জেনে রাখা ভাল। জীবনের উদ্দেশ্য ঠাকুর বলছেন ঈশ্বর দর্শন। ঠিকই বলছেন, কিন্তু আমরা তো পারি না। তাহলে ঈশ্বর দর্শনের নীচে কি হতে পারে? জ্ঞান লাভ, জ্ঞান লাভই মানুষকে মানুষ করে, যত জ্ঞান অর্জন হয়, ততই আমাদের জন্য ভাল।

ভূতানামস্মি চেতনা, যত জীবন্ত প্রাণী আছে, একটা এ্যমিবা, একটা ইউনিসেলুলার থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত বা দেবতা পর্যন্ত সবারই একটা বৈশিষ্ট্য –তা হল চেতনা। চেতনা বৃক্ষ, তরুলতার মধ্যেও আছে, লজ্জাবতী গাছের একটা পাতাকে স্পর্শ করলে সঙ্গে সঙ্গে পাতা কুঁকড়ে যাবে। গাছপালা, জড় পদার্থ আর চেতনের মধ্যে কোথাও একটা মাঝা-মাঝারি অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু চেতনা বিভিন্ন রূপে প্রকাশ দেয়, জ্ঞান রূপে প্রকাশ দেয়, সংবেদনশীলতায় চেতনার প্রকাশ। অপরের দুঃখে আমরা কি কাতর হই, ইমোশানালি না, সত্যিকারের ভিতর থেকে? আমি অপরের কষ্ট কি বুঝতে পারি? এগুলো চেতনা থেকে আসে। জগৎকে জানার ক্ষমতা চেতনা থেকে আসছে, সেইজন্য বলছেন, *ভূতানামস্মি চেতনা*। এর আগে মনকে নিয়ে বললেন, এখানে বলছেন বুদ্ধিবৃত্তিকে নিয়ে। বুদ্ধি বিচার করে, এটা খাব কি খাব না; এর সাথে লড়াই করব, নাকি এর সাথে লড়াই করব না। এখানে আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, *কার্যকরণসংঘাতে নিত্যাভিব্যক্তা বুদ্ধিবৃত্তিঃ চেতনা*, এই যে শরীর ও মনের সংযোগ, এর মধ্যে যেটা নিত্য অভিব্যক্তা, যেটা সব সময় রয়েছে, সেটা হল চেতনা। আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি, তখনও চেতনা রয়েছে। চেতনা কখন ঘুমায় না, চেতনা যদি চলে যায় তাহলে সে মৃত। মৃত যদি হয়ে যাই, তাহলে গীতার ভূত না, প্রেতলোকের ভূত হয়ে যাচ্ছি। গীতাতে যে ভূত বলা হয়, এই ভূত সমস্ত জীবকে বলা হচ্ছে, যার মধ্যে চেতনা রয়েছে।

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্।।২৩।।

(আমি একাদশ রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে আমি কুবের, অষ্ট বসুর মধ্যে আমি অগ্নি এবং উচ্চ শৃঙ্গযুক্ত পর্বতসকলের মধ্যে আমি মেরুপর্বত।)

বিভিন্ন জিনিসকে নিয়ে আসছেন, যে জিনিসগুলো আমাদের হিন্দু পরম্পরায় সেই আদি কাল থেকে চলে আসছে, যা বেদ থেকে চলে আসছে, সেই জিনিসগুলিকে নিয়ে এই শ্লোকে বলছেন। *রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি,* বেদে একাদশ রুদ্রের কথা বলা হয়। এগারো জন রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর একজন রুদ্র। যার জন্য পরে পরে শিব ভারতের একজন খুব নামকরা দেবতা হয়ে গেলেন। রুদ্র, শিব, শঙ্কর পরে সব মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। *বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্,* রাবণকে বলা হচ্ছে রাক্ষস, এটা একটা ট্রাইব আর যক্ষ হলেন কুবের। রামায়ণে আছে রাবণ কুবেরের পুষ্পক রথ অপহরণ করে নিয়েছিল। আবার বলছেন, কুবেরের ছোট ভাই রাবণ। যক্ষ, রাক্ষস এরা হল একটা পুরো সম্প্রদায়, যাদের মধ্যে কিছু মানুষের গুণ রয়েছে, কিছু দেবতার গুণও রয়েছে। এরা তাই দেবতাদের থেকে নীচে আর মানুষের থেকে উপরে। ভগবান বলছেন, যক্ষ রাক্ষসের মধ্যে আমি কুবের। কি রকম কুবের? *বিত্তেশঃ,* বিত্তের যিনি ঈশ্বর, যার টাকার শেষ নেই। একটা গল্প আমরা অনেক আগে পড়েছিলাম, এখন বলতে পারব না কোথায় পড়েছিলাম। ভগবান বিষ্ণু লক্ষ্মীদেবীকে বিয়ে করবেন। বিয়ে করার জন্য ভগবান বিষ্ণুকে পণ দিতে হবে। ঠাকুরও পণ দিয়েছিলেন। বিষ্ণুর কাছে টাকা নেই, এখন কোথা থেকে টাকা দেবেন? ভগবান বিষ্ণু কুবেরের কাছ থেকে টাকা ধার নিলেন। এখন কুবেরকে ঐ টাকা ফেরৎ দিতে হবে। বলা হয় যে, তিরুপতী মন্দিরে হুণ্ডিতে যত টাকা পড়ে, সব টাকা নাকি কুবেরের কাছে চলে যায়। ভগবান বিষ্ণুকে কবের এত টাকা ধার দিয়েছেন যে, এখনও তিনি সেই টাকা শোধ করে যাচ্ছেন। তারপরও বলছেন, *বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্,* সেই কুবের আমি। কুবেরের মত সম্পত্তি আর কারুর নেই। কিন্তু ভগবান তার থেকেও বেশি।

অনেকেই এই কাহিনীটা শুনে থাকবেন। ভগবান আর কুবের, দুজনের তফাৎ কি? ভগবান অনন্ত আর কুবের সান্ত। সসীম আর অসীমের তফাৎ বোঝাবার জন্য এই কাহিনীটা বলা হয়। কুবেরের এক সময় খুব অহঙ্কার হয়, আমি প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী, আমার প্রচুর ঐশ্বর্য আছে। নিজের ঐশ্বর্য দেখনোর জন্য শিবকে গিয়ে নিমন্ত্রণ করেছেন, 'হে দেবাদিদেব মহাদেব, আমার খুব ইচ্ছে একদিন আমার বাড়িতে এসে আপনি দু-মুঠো শাক-ভাত গ্রহণ করুন'। শিব ভগবান, অন্তর্যামী, কুবেরের মন বুঝে নিয়েছেন। 'আমি আর খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে থাকি না, তুমি বরং এক কাজ কর, গণেশকে নিয়ে যাও, ওকে পেট ভরে খাইয়ে দিলে আমারই খাওয়া হয়ে যাবে'। গণেশ কুবেরের মনের খবর এত কিছু জানেন না। গণেশ কুবেরের বাড়ি খেতে গেছেন। পুরী, সব্জী, লাড্ডু গণেশের খুব প্রিয়। কুবের যা দিচ্ছে গণেশ সঙ্গে সঙ্গে শুঁড় দিয়ে টেনে খেয়ে নিচ্ছেন। যা নিয়ে আসছে সব গপাগপ শুঁড় দিয়ে টেনে পেটে চালান করে দিচ্ছেন। গরম গরম পুরী সব্জী বানাচ্ছে আর নিয়ে আসছে, গণেশ নিমেষের মধ্যে সব শেষ করে দিচ্ছেন। যারা রান্না করছিল তারাও আর দৌড়ে সামাল দিতে পারছে না। এক মিনিট দেরী হতেই গণেশ রেগে গিয়ে বলছেন, 'এটা কি হচ্ছে! আমার পেটে ভরছে না, খিদেয় পেট জ্বলছে আর খাবার দিতে এত দেরী করছ কেন'? গণেশ রেগেমেগে ভাণ্ডার ঘরে ঢুকে গেলেন। ভাণ্ডার ঘরে যত আটা, ময়দা, তেল, চাল, ডাল যা কিছু মজুত ছিল শুঁড় দিয়ে টেনে সব খেয়ে নিলেন। তাও পেট ভরছে না।

পেট ভরছে না দেখে গণেশ এবার কুবেরের উপর রেগে তেড়ে গেলেন, 'তুমি আমাকে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে পেট পুরে খেতে দিচ্ছ না, এবার আমি তোমাকেই খাব'। কুবের এখন প্রাণ নিয়ে দৌড়েছেন। দৌড়াতে দৌড়াতে শিবের কাছে হাজির, 'প্রভু আমাকে বাঁচান, আমাকে রক্ষা করুন'। শিব তো সব জানেন। তিনি যেন কিছুই জানেন না, বলছেন 'কি হয়েছে'? সব শুনলেন। গণেশ বলছে, 'আমাকে নেমন্তন্ন করে ডেকে নিয়ে খেতে দিল, আমার পেটও ভরল না; খিদেয় আমার পেট জ্বলছে'। শিব শান্ত ভাবে বললেন, 'বাছা গণেশ, এ-রকম কেন করছ, মার কাছে যাও, মা তোমাকে পেট ভরে খাইয়ে দেবে'। কুবের যাঁকে একবেলা পেট ভরে খাওয়াতে পারছে না, মা পার্বতী, মা অন্নপূর্ণা তাঁকে রোজ দু-বেলা পেট ভরে খাইয়ে যাচ্ছেন। বাচ্চাদের কাহিনী, কিন্তু

ভগবানের যে অনন্ত ঐশ্বর্য তার সাথে কুবেরের অতুল সম্পত্তি, দুটোর মধ্যে এই তফাৎ। কুবেরের অতুল সম্পত্তি হতে পারে, কিন্তু সেটাও ভগবানের ঐশ্বর্যের কাছে খড়কুটো। তাহলে ভগবান বিষ্ণুর পণ নেওয়ার গল্পের কি হবে? এগুলো বানানো গল্প। ভগবান বিষ্ণু পণ নিয়েছিলেন, ভগবানকে অবশ্যই আমাদের সাহায্য করতে হবে; এছাড়া কিছু না।

বসূনাং পাবকচাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্। বলা হয় আটজন বসুর মধ্যে পিতামহ ভীষ্মও একজন বসু। ভগবান বলছেন অষ্টবসুর মধ্যে আমি পাবক, অগ্নিও একজন বসু। উঁচু যত জিনিস আছে, তার মধ্যে আমি হলাম সুমেরু পর্বত। আমরা ভাবব হিমালয় নয় কেন? সুমেরু কিন্তু হিমালয় না, সুমেরু আলাদা জিনিস। হিন্দু ধর্মের উপর গবেষণা করার জন্য আলবেরুনি ভারতে এলেন, তার আগে আর্যভট্ট, ভাস্করের মত ঋষিদের ভারতে আবির্ভাব হয়ে গেছে, পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, এই ধরণের জ্যোতির্বিজ্ঞানের কিছু কথা তাঁরা বলে দিয়েছিলেন। সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ কিভাবে হয়, সব ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। কিন্তু সূর্য সুমেরু পর্বতকে রোজ প্রদক্ষিণ করে যাচ্ছে, এই ধারণাটা তখনও জনগণের মধ্যে ছিল আর মিথলজিতে এখনও সূর্য সুমেরু পর্বতের চারিদিকে ঘুরতে থাকে। বলা হয় যে, সুমেরু পর্বত এত উঁচু যে তার পাদদেশ স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে, সূর্য তারই পরিক্রমা করে।

পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ।।২৪।।

(হে পার্থ, আমি পুরোহিতগণের মধ্যে দেবগুরু বৃহস্পতি, সেনা নায়কগণের মধ্যে আমি দেবসেনাপতি কার্তিকেয় এবং দেবখাত জলাশয়সমূহের মধ্যে আমি সাগর।

পুরোহিগণের মধ্যে আমি দেবগুরু বৃহস্পতি। *সেনানীনামহং স্কন্দঃ*, যত সেনাধিপতিরা আছেন তাঁদের মধ্যে আমি দেবসেনাপতি কার্তিকেয়। শিবের দুই সন্তান গণেশ আর কার্তিক, এই দুজন শিবের বায়োলজিক্যাল সন্তান নন। পুরাণ রচয়িতাদের ব্রেন এত ফার্টাইল আর এত পাওয়ারফুল যে কোথাও তাঁরা একটিও অপসিদ্ধান্ত আনতে দিতেন না। সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে কত রকমের সুন্দর সুন্দর কাহিনী তৈরী করেছেন। দেবতারা ঠিক করলেন অসুরদের সাথে লড়াই করার জন্য তাঁদের একজন সেনাপতি দরকার। দেবতাদের যিনি সেনাপতি হবেন, তাঁর বিশেষ শক্তি থাকতে হবে। কিন্তু এই শক্তি কে দেবেন? এই শক্তি একমাত্র দিতে পারেন শিব। শিব তো আর সেনাপতি হবেন না, তিনি ভগবান। তাহলে শিবের একজন সন্তান হওয়া দরকার। তারপর দেবতারা পার্বতীর মনকে শিবের বর্ণনা করে এমন ভরিয়ে দিলেন যে, পার্বতী শিবকে বিয়ে করলেন। বিরাট লম্বা কাহিনী। শিব পার্বতীর বিবাহ হল, এবার দরকার সন্তান। কিন্তু ভগবানের তো সন্তান হয় না। এরপর কাহিনীতে অনেক প্রকার এদিক সেদিক হয়ে যায়। কিন্তু তাঁকে পার্বতীর সন্তান বলেই গ্রহণ করা হয়। ছয়জন কীর্তিকাম মিলে শিবের শক্তি ধারণ করেছিলেন বলে তাঁর নাম হল কার্তিকেয়, দক্ষিণ ভারতে কার্তিকেয়কে মুরগন্ নামে সবাই জানে, তাঁর ছটি মাথা। তিনি হলেন দেবতাদের সেনাপতি, তাঁকে কেউ পরাস্ত করতে পারে না। ঐদিকে মা পার্বতী নিজেই গণেশের রচনা করেছেন। সেইজন্য বায়োলজিক্যাল সন্তান দুজনের মধ্যে কেউ না। কার্তিক আর গণেশ দুজনেরই অসম্ভব ক্ষমতা। দক্ষিণ ভারতে কার্তিকেয় বড় দেবতা, মহারাষ্ট্রে গণেশের পূজা বেশি হয়, আর সারা দেশে যে কোন শুভ কাজে গণেশকে প্রণাম করেই শুরু করা হয়। জপধ্যান শুরু করার আগে গণেশকেই প্রণাম করা হয়।

সরসামস্মি সাগরঃ, যেখানে যত জলাশয় আছে, সব জলাশয়ের মধ্যে আমি সমুদ্র। সমুদ্র আর কি, একটা বড় গাড্ডা, একটা বিশাল পুকুর, তার বেশি আর কিছু না। সরসামকে আচার্য বলছেন, *দেবখাতানি*, দেবতারা যেটা বানিয়েছেন। এমনি পুকুর বা দীঘি মানুষ তৈরী করে দিতে পারবে, কিন্তু সমুদ্র মানুষ তৈরী করতে পারবে না। বলা হয় দেবতারা খনন করে সমুদ্র তৈরী করেছেন। আমরা পুরী যাই, দীঘা যাই, সী বীচে কত ঘোরাঘুরি করি। আমরা সেখানে সমুদ্রকে

সমুদ্রই দেখি। কিন্তু *সরসামস্মি সাগরঃ,* এবার থেকে সমুদ্র দেখলে বলব, এই যে সমুদ্র, এটা ভগবান নিজে। যত জলাশয় আছে, তার মধ্যে সমুদ্রে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ। ঠাকুরও বারবার বলতেন, বিশেষ প্রকাশ। যে সুন্দর গান করতে, ভাল বাজনা বাজাতে পারে, যে ভাল লেখালেখি করছে, তার মধ্যে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ।

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।।২৫।।

(মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, শব্দসমূহের মধ্যে আমি একাক্ষর ব্রহ্মবাচক ওঁকার, যজ্ঞসকলের মধ্যে আমি জপরূপ যজ্ঞ এবং স্থাবর পদার্থসমূহের মধ্যে আমি দেবতাত্মা হিমালয়।

ভৃগু নাম আমরা অনেক জায়গায় পাই, সপ্তর্ষির মধ্যেও তিনি আসেন, আবার ভৃগু একজন বড় জ্যোতিষার্চার্য। বলছেন, যত মহর্ষি হয়েছেন তাঁদের মধ্যে আমি ভৃগু। *গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্, গিরাম্* শব্দের অর্থ *বাক্*। *গিরাম্* এমনি কোন শব্দ না, এটাকে আচার্য বলছেন, *বাচাং পদলক্ষণানাম্, গিরাম্* কোন আওয়াজ বা ধ্বণি নয়, এটা হল পদ, যেখানে কোন তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ বার করা হয়। দুমদাম্ কিছু শব্দ বললেই হবে না, ঐ ভাষার যে ব্যকরণ রয়েছে তার অনুমোদন থাকা চাই। *পদলক্ষণানাম্,* পদের যে লক্ষণ যেটা কোন জিনিসকে ইঙ্গিত করে, সেই পদের মধ্যে আমি হলাম *একাক্ষরম্,* ওঁমকে বলা হয় *একাক্ষরম্*। ওঁ একটা বিরাট বড় বিষয়, রাজযোগে পতঞ্জলির সূত্রের উপর স্বামীজীর ব্যাখ্যা আছে। ওঁ হল তিনটে ধ্বণির মিশ্রণ – অ উ ম। তিনটে ধ্বণি দিয়ে নির্মিত হলেও একে *একাক্ষরম্* বলা হয়। ওঁ তাই ঠিক ধ্বণিও না, শব্দও না, এটা হল *পদলক্ষণম্*। ওঁ ভগবানকে ইঙ্গিত করে, কিন্তু একাক্ষরী, অথচ তিনটে ধ্বণি ওর মধ্যে মিশে আছে। যত রকম পদলক্ষণ আছে, যেমন গো বললে গরু বোঝায়, গো হল গিরাম্, বচন, অর্থবহ অক্ষর, এদের মধ্যে আমি হলাম *একাক্ষরম্ ওঁ*। আমরা যখন ওঁ বলছি, তখন বুঝতে হবে এটা ভগবান সাক্ষাৎ।

যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি, ব্যাসদেব মহাভারতে যেটা রাখলেন সেটাই ভারতে থেকে গেল। মহাভারতের আগে বেদের ধর্ম ছিল যজ্ঞ। কিন্তু এখন সেভাবে যজ্ঞ কেউ করে না। আর গীতাতে ব্যাসদেব বলে দিয়েছেন, *যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি,* যত প্রকার যজ্ঞ আছে, রাজসূয় যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, পর্জন্য যজ্ঞ, যত এই রকম যজ্ঞ আছে, সব যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম যজ্ঞ হল জপযজ্ঞ। জপযজ্ঞে ভগবান সাক্ষাৎ রয়েছেন। সব যজ্ঞেই ভগবান আছেন, কিন্তু যজ্ঞের মধ্যে জপযজ্ঞ হল শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। ব্রহ্মচারীরা তিন বছর বিভিন্ন সেন্টারে থাকার পর বেলুড় মঠের ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণে যান, এবং দু বছর তাঁদের এখানে প্রশিক্ষণে থাকতে হয়। খুব রুটিন ও ডিসিপ্লিন লাইফ, বিভিন্ন রকমের ক্লাশ থাকে। তার মধ্যে ওনারা মাঝে মাঝে বলেন, আমরা আজ জপযজ্ঞ করব। জপযজ্ঞে সারা রাত বাইরে কোন গাছের তলায় ধুনি জ্বালিয়ে ওখানে জপ করবেন। কেউ কেউ সারা রাত বসে থাকেন, কেউ কেউ এক ঘন্টা কি দু ঘন্টা বসে জপ করেন। রাত দশটা থেকে ভোর চারটে মঙ্গলারতির আগে পর্যন্ত টানা জপ করেন। এই জপযজ্ঞে ভগবান নিজে আছেন। আর *স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ,* যাকে নাড়ানো যায় না সেটা হল স্থাবর, জগতে স্থাবর যা কিছু আছে তার মধ্যে আমি হিমালয়। সুমেরু আর হিমালয়ে এই তফাৎ, সুমেরু হল উচ্চতায়, হিমালয় হল সলিড, একেবারে পুরো স্থবির, একে নাড়ানো যাবে না, পুরো অচল।

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।।২৬।।

(বৃক্ষসকলের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধ পুরুষগণের মধ্যে আমি কপিল মুনি।)

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং, যত রকমের বৃক্ষ হতে পারে, সব বৃক্ষের মধ্যে আমি হলাম অশ্বত্থ। অশ্বত্থ বৃক্ষকে হিন্দুরা খুব পবিত্র মনে করেন। পরে পরে পুরাণে অনেক কাহিনী এসে গেছে। গ্রাম দেশের লোকেরা এখনও বটবৃক্ষ আর অশ্বত্থ এই দুটো গাছ কখন কাটতে চায় না। এই দুটো বৃক্ষ যেখানে খুশী জন্ম নিয়ে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি হয়, কিন্তু এই দুটো গাছ কেউ কাটতে চায় না। কারণ অশ্বত্থ মানেই সবাই জানে ভগবান সেখানে নিজে রয়েছেন। গীতার পঞ্চোদশ অধ্যায়ে এবং উপনিষদেও সংসার বৃক্ষ রূপে অশ্বত্থের উপমা নিয়ে আসা হয়েছে। *দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ*, রাজাদের মধ্যে যিনি ঋষি তাঁকে রাজর্ষি, ব্রাহ্মণদের মধ্যে যিনি ঋষি তাঁকে ব্রহ্মর্ষি আর দেবতাদের মধ্যে যিনি ঋষি তাঁকে দেবর্ষি বলা হয়। এগুলোকে আবার অনেক সময় category রূপে দেখা হয়। শ্রেষ্ঠ ঋষিদের মধ্যে নারদ হলেন শ্রেষ্ঠতম।

গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ, গন্ধর্বও একটা প্রজাতি, যেমন যক্ষ, রাক্ষস, অপ্সরা আছেন, তেমনি গন্ধর্ব আছেন, এনারা দেবতাদের থেকে নীচু কিন্তু মানুষের থেকে উপরে, আর এনারা সবাই সুক্ষ্ম শরীর ধারণ করে বিচরণ করেন। তবে অনেক সময় এনাদের স্থূল শরীরেও দেখা যায়, যেমন অর্জুনের সাথে চিত্ররথের সামনা সামনি লড়াই হয়েছিল। চিত্ররথ হলেন গন্ধর্বদের রাজা, গন্ধর্বদের মধ্যে আমি চিত্ররথ। *সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ*, সিদ্ধ শব্দের অর্থ আচার্য এইভাবে করছেন, *জন্মনা এব ধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্যাতিশয়ং প্রাপ্তানাং*, জন্ম থেকেই এনারা ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্যকে প্রাপ্ত করে আছেন। আমাদের এখানে একজন মহারাজ আছেন, খুব পণ্ডিত, আর ত্যাগী পুরুষ। উনি মাঝে মাঝে তাঁর ছোটবেলার গল্পগুলো আমাদের বলেন। শুনতে শুনতে আমাদেরও খুব হাসি পায়।

একবার বলছিলেন, উনি তখন অনেক ছোট, একদিন তিনি চুল কাটাতে গেছেন। মামার বাড়িতে থাকতেন, দাদু নাপিতের কাছে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়ে চলে এসেছেন। নাপিত চুল কাটছে, আর উনিও বলে যাচ্ছেন আরও ছোট কর, আরও ছোট কর। কত আর ছোট করবে, ছোট করতে করতে চুল আর হাত দিয়ে ধরাই যাচ্ছে না। উনি বাড়িতে এসে কাঁদতে শুরু করেছেন, 'আমি বললাম চুল ছোট করতে, চুল ছোট করল না'। দাদু রেগে গেলেন, 'দু টাকা খরচ করলাম, চুল ছোট করল না! চল এক্ষুণি যাই'। দাদু নাতিকে নিয়ে আবার নাপিতের কাছে গেছে। নাপিত এবার ওকে পুরো নেড়া করা দিয়েছে। এবার উনি খুব খুশী। টাকা খরচ করেছি চুল কাটানোর জন্য, চুলটা এবার ঠিক ঠিক কাটা হয়েছে। আমিও হেসে মহারাজকে বললাম, এবার তাই আপনি সারা জীবনের মত নেড়া থাকুন। এনাদের কোথাও একটা বৈরাগ্যের ভাব বাচ্চা বয়স থেকেই থাকে। কিন্তু এখানে আরও শর্ত দিচ্ছেন, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধর্ম। বাচ্চা বয়স থেকে এই গুণগুলি যাঁদের থাকে, এনারা হলেন সিদ্ধ। ঠাকুর বলছেন, নিত্যসিদ্ধ, জন্মসিদ্ধ। ভগবান বলছে এই সিদ্ধদের মধ্যে আমি হলাম কপিল মুনি। কপিল মুনি জন্ম থেকেই সিদ্ধ, একটু বড় হতেই তিনি নিজের মাকেই উপদেশ দিয়েছিলেন।

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্।।২৭।।

(আমাকে অশ্বগণের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, শ্রেষ্ঠ হস্তিগণের মধ্যে ঐরাবত এবং মনুষ্যগণের মধ্যে রাজা বলে জানবে।)

দেবতা আর অসুররা মিলে যে সমুদ্র মন্থন করেছিলেন, সেই সমদ্র মন্থন থেকে উচ্চৈঃশ্রবা নামে এক দিব্য অশ্ব বেরিয়ে এসেছিল। উচ্চৈঃশ্রবাকে পরে ইন্দ্র নিজের জন্য নিয়ে নিলেন। ঐরাবত ইরাবতীর সন্তান ছিলেন, ঐরাবতও এক দিব্য হাতি। উচ্চৈঃশ্রবা সমুদ্র মন্থন থেকে, আর ইরাবতী থেকে ঐরাবত, ভগবান বলছেন এরা আমারই স্বরূপ জানবে। *নরাণাঞ্চ নরাধিপম্*, মানুষের মধ্যে আমি হলাম রাজা। যেখানেই রাজা, রাজ ক্ষমতা যার আছে, বুঝবে আমি নিজে তার মধ্যে আছি।

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ।।২৮।।

(আমি অস্ত্রসমূহের মধ্যে দধীচির অস্থি-নির্মিত বজ্র, গাভীগণের মধ্যে কামধেনু, আমি প্রাণিগণের প্রজননশক্তি কাম এবং সর্পগণের মধ্যে সর্পরাজ বাসুকি।)

জগতে যত অস্ত্র আছে, তার মধ্যে আমি হলাম বজ্র। বজ্র কখন ব্যর্থ হয় না। কিন্তু কাহিনী রূপে ব্যর্থ হতে দেখা যায়, রাবণের উপর বজ্র চালনো হয়েছিল, কাজ করেনি; হনুমানের উপর চালানো হয়েছিল, কাজ করেনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আয়ুধের মধ্যে আমি বজ্র। গাভীর মধ্যে আমি কামধেনু। কামধেনু নিয়ে আবার অনেক কাহিনী আছে। বশিষ্ঠ মুনির কাছে কামধেনু গাভী ছিল; বশিষ্ঠের আগে কামধেনু স্বর্গে ছিল। কামধেনুর আর-একটা অর্থ হয়, যেখান থেকে সমস্ত কামনা পূরণ হয়। *প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ,* প্রজা উৎপত্তির যত প্রকার উপায় আছে, যেমন বীজ দিয়ে হয়, ক্লোনিং করে হয়, কিন্তু প্রজননশক্তির মধ্যে আমি হলাম কামদেব। এই যে সৃষ্টির কার্য চলছে, এই সৃষ্টি কার্যের মধ্যে যতগুলি শক্তি আছে, এর মধ্যে কামদেব হলাম আমি নিজে। *সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ,* সর্প জাতি বা সর্পকুলের মধ্যে আমি বাসুকি।

আমি সাধারণত ইউটিউবে কোন প্রোগ্রাম দেখি না, এমনকি আমাদের মহারাজদেরও কোন লেকচার কখন শুনি না। আমার জানা নেই অন্যরা কিভাবে বলেন। কদাচিৎ কখন চোখে একটা দুটো পড়ে যায়। একদিন একটা লেকচার চোখে পড়ে গেল, যেখানে একজন খ্রীশ্চান চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হিন্দুদের গালাগালি দিয়ে যাচ্ছে। যে সর্পকে খ্রীশ্চানদের ভগবান লাথি মেরে স্বর্গ থেকে বার করে দিলেন, হিন্দুরা সেই সর্পকে বলে ভগবান। হিন্দুরা নরাধম, অসুর ছাড়া আর কি হতে পারে। *সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ,* এ-জিনিস বোঝার ক্ষমতা এদের আছে? ক্ষমতাই নেই বোঝার। কি বলতে চাইছেন নিজেও জানেন না। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে ঈশ্বরের বাইরে কিছু কি থাকতে পারে? বাসুকির কাহিনী মহাভারত, পুরাণে পাওয়া যাবে। বাসুকি সর্প জাতির একজন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ লোক, ভগবান বলছেন, সর্পদের মধ্যে আমি বাসুকি। ভগবান কেন সাপ হতে যাবেন! সর্প জাতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হলেন বাসুকি, সেখানে আমার প্রকাশ।

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্।।২৯।।

(আমি নাগকুলের মধ্যে নাগরাজ অনন্ত, জলচরগণ বা জলদেবতাগণের মধ্যে আমি রাজা বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে আমি পিতৃরাজ অর্যমা এবং নিয়ামকগণের মধ্যে আমি মৃত্যুরাজ যম।)

নাগ জাতির মধ্যে আমি অনন্তনাগ। অনন্তনাগ, যাঁর উপর নারায়ণ শয়ন করে আছেন। *বরুণো যাদসামহম্,* জল সম্বন্ধীয় যত দেবতা আছেন, তাঁদের মধ্যে আমি বরুণ দেবতা। *পিত্রণামর্যমা চাস্মি,* আমাদের পূর্বপুরুষদের যাঁরা শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ করেছেন তাঁরা মৃত্যুর পর হয় স্বর্গে চলে যাবেন, আর তা নাহলে পিতৃলোকে যাবেন। ভগবান বলছেন, সেই পিতৃলোকের পিতৃদের মধ্যে আমি অর্যমা। *যমঃ সংযমতামহম্,* যত রকমের নিয়মন শক্তি আছে, তার মধ্যে আমি হলাম যম। যমকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না, সেইজন্য যমকে বলা হয় কাল। কাল অর্থাৎ সময়কে একমাত্র আত্মজ্ঞানী অতিক্রম করতে পারেন। যম হলেন শ্রেষ্ঠতম নিয়ামক, সেইজন্য তাঁকে ধর্মরাজ নাম দেওয়া হয়েছে। ধর্ম সব সময় সবার জীবনকে নিয়মণ করে, সংযমিত করে, সেইজন ধর্মরাজ ও যমরাজ একই। যমরাজ সবার মৃত্যু হরণ করেন, এখানে ঐ অর্থে যম নয়।

প্রহ্লাদাশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্।।৩০।।

(দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, সংখ্যাকারিগণের মধ্যে আমি কাল, পশুগণের মধ্যে আমি সিংহ ও পক্ষিগণের মধ্যে আমি বিনতাতনয় গরুড়।)

এর আগে অদিতির কথা বলা হল, অদিতি থেকে আদিত্যরা এসেছেন। আর দিতি থেকে কাশ্যপের যে সন্তানরা জন্ম নিলেন তাঁদের দৈত্য বলা হয়। এই দৈত্যদের বংশে আমি হলাম প্রহ্লাদ, যিনি দৈত্যকুলের শ্রেষ্ঠতম। আর গণনা যা দিয়ে হয়, এখন যেমন কম্প্যুটারের সাহায্যে গণনা হয়, আসলে জিরো আর ওয়ান ছাড়া কম্প্যুটার কিছু বোঝে না। সুইচ্ অফ মানে জিরো আর সুইচ্ অন মানে ওয়ান, এ-ছাড়া কম্প্যুটার কিছু বোঝে না। কম্প্যুউটিং, যার বাংলা নাম সংগণক, গণনা করে; এখানে ভগবান বলছেন গণনা যত কিছুর মাধ্যমে হয়, সুপার কম্প্যুটার, সুপার ডুপার কম্প্যুটার যাই হয়ে থাকুক, এদের সবার মধ্যে আমি হলাম কাল। টাইম, ওর মত কাউন্টিং কেউ পারে না। কাল বা সময় সব কিছু কাউন্ট করছে, ক্ষণ, সেকেণ্ড, ন্যানো সেকেণ্ড। এখন ফিজিক্সে কি একটা এসেছে যেটা ন্যানো সেকণ্ডেরও নীচে চলে যায়। *মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রহহং,* পশুরাজ হল সিংহ। আচার্য বলছেন, মৃগেন্দ্র শব্দে সিংহ বা ব্যাঘ্র দুটোকেই বোঝায়। তাহলে মৃগেন্দ্র কে হবে, কারণ আচার্য শঙ্করও পরিষ্কার বলছেন না। শক্তির দিক থেকে যদি দেখা হয়, উনিশ কুড়ির তফাতে ব্যাঘ্রের শক্তি বেশি। সিংহ ও বাঘের লড়াই দেখে এবং অনেক ভাবে গবেষণা করার পর জানা যায় যে, সাধারণ ভাবে সিংহের তুলনায় ব্যাঘ্র একটু ভারী হয়। কিন্তু সিংহ জিনিসটাই পুরো আলাদা। *বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্,* পাখীদের মধ্যে আমি হলাম বিনতার সন্তান গরুড়।

যদি মনে থাকে, আমরা আগে একটা আলোচনা করেছিলাম, individuality আর universality দুটো একই জিনিস। একটা কাঠের গোডাউনে যে কাঠের টুকরোগুলো থাকে সবই সমান। ঐ কাঠের টুকরো থেকে যখন একটা চেয়ার তৈরী হয়, তখন ঐ চেয়ারের একটা স্পেশালিটি এসে যায়। কিন্তু তার সাথে তার universality এসে যায়, যেখানে চেয়ার বলেও তার পরিচিতি হয় আবার কাঠ বলেও পরিচিতি হয়। সেই চেয়ারকে যদি আরও কারুকার্য করে দেওয়া হয়, তখন তিনটে হয়ে যায় – বিশেষ চেয়ার, চেয়ার এবং কাঠ। এরপর যদি সেই চেয়ারকে সিংহাসন করে দেওয়া হয় তখন চারটে হয়ে যাবে, সিংহাসন রূপে আছে, অলঙ্কৃত চেয়ার রূপে আছে, শুধু চেয়ার রূপে আছে আবার কাঠ রূপেও আছে। যাঁরা বন্য প্রাণীদের নিয়ে রিসার্চ করেন, তাঁরা দেখলেন, জঙ্গলে যত প্রকার প্রাণী হয়, সব প্রাণীর গুণ সিংহের মধ্যে আছে। যেমন বাঘ যে রকম আক্রমণ করতে পারে, সিংহ সেভাবে আক্রমণ করতে পারে। অন্য দিকে নেকড়ে বা হায়না দলবদ্ধ হয়ে যেভাবে আক্রমণ করে, কিন্তু বাঘ দলবদ্ধ ভাবে আক্রমণ করতে পারে না। তার মানে দলবদ্ধ ভাবে আক্রমণ করতে গেলে যে কোর্ডিনেশান দরকার, সেটা বাঘের দ্বারা হয় না। দুটো বাঘ একসাথে কখন কোর্ডিনেট করতে পারে না। সিংহ কিন্তু কোর্ডিনেট করতে পারে। জঙ্গলে যত রকমের আক্রমণকারী পশু আছে, সিংহের মধ্যে তাদের সব কটা গুণ আছে। সিংহ সেইজন্য পশুদের রাজা। যদিও আচার্য এখানে বলছেন, সিংহ বা ব্যাঘ্র, কিন্তু যখন আমরা পশুরাজ শব্দটা ব্যবহার করি, সব সময় সিংহকে উদ্দেশ্য করেই বলি। কারণ এটাই, পশুপাখীর মধ্যে যত গুণ আছে সব কটা গুণ সিংহের মধ্যে পাওয়া যাবে, যেটা ব্যাঘ্রের মধ্যে থাকে না। সেইজন্য ভগবান বলছেন, *মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রহহং*। যেমন দুটো শ্লোক আগে বললেন *নরাণাঞ্চ নরাধিপম্,* ঠিক তেমনি এখানে পশুদের মধ্যে আমি সিংহ।

ভগবান এখানে যে এতগুলো কথা বললেন, এগুলোকে নিয়ে আমাদের গভীরে গিয়ে একটু ভাবতে হবে। নিজেকে একটু বিচার করতে হবে, Are you the best, if you are not the best, তাহলে বুঝে নিতে হবে ঈশ্বরের প্রকাশ তোমার মধ্যে নেই। আমাদের সবারই মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ

বিরাজমান, কিন্তু তাঁর যে বিভূতি, তাঁর যে শক্তি, সেটা প্রকাশ পাচ্ছে না, এবার চেষ্টা করতে হবে to be the best হওয়ার জন্য।

ভগবানকে ধ্যানের গভীরে দেখা যায়, ভগবানকে সমাধির অবস্থায় দেখা যায়, স্বপ্নে ভগবান দর্শন দেন। আবার ভগবান হঠাৎ সামনে এসে দর্শন দেন। সে তো উনি দর্শন দিচ্ছেন, কিন্তু আমি দেখতে চাই। এই যে বলছি, আমি দেখতে চাই, কিন্তু আমার ইচ্ছে মত তো ভগবান দর্শন দেবেন না। অনেক দিন ধরে হাত জোড় করে প্রার্থনা করে যেতে পারি, তাঁর পায়ে মাথা ঠুকে প্রার্থনা করতে পারি, তিনি ইচ্ছে করলে দর্শন দিতে পারেন, আবার নাও দিতে পারেন। একটা ছেলে তার বন্ধুদের বলছে, অমুকের সাথে আমার বিয়ের ফিফটি পারসেন্ট ঠিক হয়ে গেছে। ফিফটি পারসেন্ট মানে? আমার তরফ থেকে আমি রাজি, কিন্তু ওর তরফ থেকে এখনও রাজি হয়নি। আমাদের ঈশ্বর দর্শন এই রকম ফিফটি পারসেন্ট, আমার তরফ থেকে ঠিক আছে, ওনার তরফ থেকে ঠিক নেই। আমি তাঁকে দেখতে চাই, আমি তাঁকে ভিতর থেকে অনুভব করতে চাই। ইমোশানালি আমরা বলতে পারি, আমি আমার হৃদয়ে তাঁকে বোধ করি। ভক্তরাও কেউ কেউ এসে আমাদের এই ধরণের কথা বলেন।

আমরা বলতে পারি, আমি আমার অঙ্গে অঙ্গে তাঁকে বোধ করি, আমার প্রত্যেক কোষিকাতে বোধ করি; কিন্তু আমি চোখ খুলে দেখতে চাই। বিভূতি যোগ এটাই দেখিয়ে দিচ্ছে, এই জগতে আমি ঈশ্বরকে সামনা-সামনি দেখতে চাই। বিভূতি যোগের এটাই বৈশিষ্ট্য। পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত শাস্ত্র আছে, কেউ বলবে না যে এইভাবে আমি ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করতে চাই। তিনি দেখা দিন আর নাই দিন তাতে কিছু আসুক আর নাই আসুক, কিন্তু যিনি বলছেন, আমি ঠাকুরকে দেখতে চাই, তাঁর জন্য রয়েছে এই বিভূতি যোগ। মহাভারতে শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের পর্বে শকুন্তলা বলছেন, পিতা মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে সন্তান হয়ে বেরিয়ে আসে, সন্তানই বাবা। যীশু বাইবেলে বলছেন He who has seen the Son has seen the Father। ধর্মগ্রন্থে সবাই একই কথা বলছেন। ঈশ্বরকে আমি সাক্ষাৎ দেখতে চাই। যদি ঈশ্বরের কথায় বিশ্বাস হয়, গীতার কথা যদি বিশ্বাস হয়, ঠাকুর বলছেন, যে রাম সেই কৃষ্ণ সেই ইদানিং এই শরীরে রামকৃষ্ণ, এই কথা যদি আমাদের বিশ্বাস হয়, তাহলে আমরা selective হতে পারি না।

Selective হওয়া মানে আমি আমার মত বেছে নেব। ষোড়শ অধ্যায় যখন আসবে তখন ভগবান বলবেন, *তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে*, শাস্ত্রই প্রমাণ, ওখানে তোমার বুদ্ধি খাটাতে যেও না। তোমার বুদ্ধির দৌড় যখন দেখবে শেষ হয়ে গেছে, তখন এখানে এসো। একবার যেখানে মাথা নত করেছ ওখানেই মাথা নত করে থাক। ধর্মের ব্যাপারে তোমার যুক্তি লাগিও না। ধর্মের ব্যাপারে তথাকথিত যুক্তিবাদীদের কথা আমরা কেন শুনব! তোমার যে বিষয় সেখানে তোমার বুদ্ধি লাগাও, তার বাইরে তুমি যেও না। শাস্ত্রে যখন আসবে তখন শাস্ত্রই প্রমাণ, যদি তোমার বিশ্বাস থাকে শাস্ত্রই সত্য। অজান্তায় আমরা selective হয়ে যাই, আমার যেটা পছন্দ, মনের মত, সেটুকু নিয়ে বাকি সব কিছুকে বাদ দিয়ে দিই। ঠাকুরের কথা যদি আমরা বিশ্বাস করি, ঠাকুর যে কালে বলেছেন, যে রাম সেই কৃষ্ণ ইদানিং সেই রামকৃষ্ণ, তাহলে কথামৃতে ঠাকুরের সব কথাই সত্য বলে মানতে হবে। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, আমার একটা কথা যদি মিথ্যা হয়, আমার সব কথা মিথ্যা হয়ে যাবে।

আমরা এখানে অন্য ভাবে বলছি, ঠাকুরের একটা কথা যদি সত্য বলে বিশ্বাস হয়, তাহলে তাঁর সব কথাকে সত্য বলে মানতে হবে। গীতার একটি কথাকে যদি সত্য বলে মনে হয়, তাহলে গীতার প্রত্যেকটা কথা সত্য হবে। অনেকে বলে, 'হ্যাঁ মশাই গীতা দেখলাম, ওতে খুব ভাল ভাল কথা আছে', এ-ধরণের কথা বুদ্ধিজীবিরা বলবে, আপনি না। আপনি যদি নেন তাহলে পুরোটাই নেবেন। যদি পুরোটা নেন, তাহলে এই যে ভগবানের বিভূতির কথা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করে যাচ্ছেন, এই দেখো এগুলো আমার বিভূতি, আমার বিস্তার। সন্তানকে যে দেখেছে, সে বাবাকে

দেখেছে। যীশু সেই একই কথা বলছেন, আমরাও ঐভাবে বলছি, যেখানে ঈশ্বরের বিভূতি দেখছি, জানবেন সেখানে ঈশ্বরের প্রকাশ। ঈশ্বরের প্রকাশ মানে, ঈশ্বর নিজে সেখানে। আগেকার দিন মায়েরা সন্তানের বাবাকে যদি অনেকদিন দেখতে না পেত, নিজের সন্তানকে জড়িয়ে ধরত। অনেক সময় বলে, আমার এই সন্তান হল আমার কাছে ওর বাবার চিহ্ন। এখানে চিহ্ন না, তিনি নিজে। সেইজন্য বলা হচ্ছে তাত, যিনি বিস্তার পান, সেই বাবা মায়ের গর্ভে গিয়ে বিস্তার হয়ে সন্তান রূপে বেরিয়ে আসে।

বিভূতি ঠিক একই জিনিস। এই মনের জগতে এসে ভগবান বিস্তার পান, তাই তো এই জগৎ আমাদের কাছে প্রকাশ পায়। সেইজন্য গীতাতে এখানে ভগবান যে কথাগুলো বলছেন, সবটাই হল ভগবানের ঐশ্বর্য, সবটাই ভগবানের বিভূতি, বিভূতি মানে ভগবান নিজে। ঠাকুরের অশেষ কৃপায় এই বোধ যদি কারুর জেগে যায়, তার জীবন ধন্য হয়ে যাবে। গীতা পরিষ্কার আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছেন, তোমার সামনে সাক্ষাৎ ভগবান বিরাজমান। এই যে বলছেন *অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং*, এখনও গ্রামের মহিলারা অশ্বত্থ গাছ দেখলে তার গোড়ায় এক ঘটি জল ঢালে। কারণ তাদের বাপ-ঠাকুরদারা তাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছেন, অশ্বত্থ বৃক্ষ সাক্ষাৎ ভগবান।

ঈশ্বর সাধনা এমন কিছু কঠিন না; কিন্তু আমাদের প্রথম সমস্যা হল আমাদের নিজেদের আলস্যতা আর আমাদের মতলবী। মতলবী হল, নিজের মত একটা ঠিক করে নিয়েছি, সব কিছু ওর ভিতরেই চাই। কি রকম ঠিক করে নেওয়া? হে ঠাকুর, তুমি যদি সত্যিই থাক, তাহলে আমার যে প্রতিবেশি এসে আমাকে গালাগাল দিয়ে গেছিল, তার ঠ্যাং যেন ভেঙে যায়। সকালে দেখছে তার ঠ্যাং ভাঙেনি, ভগবানের উপর বিশ্বাস চটকে গেল। আমাদের ভক্তির স্ট্যাণ্ডার্ড এটাই। স্বামীজী তাঁর ভাববার কথায় খুব সুন্দর কথা বলছেন, আমি আমার সমস্ত কিছু ভগবানের উপর ছেড়ে দিয়েছি, তিনি শরণাগতের রক্ষা করেন; কিন্তু নিজের যত বদমাইসি, বাঁদরামো কোনটাই ছাড়েনি, মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া বন্ধ করিনি; জপধ্যানের দিকে কোন মন নেই। কিন্তু আমি তো সব কিছু তার উপর ছেড়ে দিয়েছি, এবার যদি তিনি না করেন, তাহলে বুঝব তিনিও কথার খেলাপ করেন। এভাবে কখন ধর্ম হয়নি, কোন দিন হবেও না। ঈশ্বর সাধনা অত্যন্ত সহজ, যে কোন একটা কিছুকে নিয়ে ওতেই পুরো মনটাকে লাগিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করতে হবে না।

গীতা আমাদের কত রকম বিভূতির কথা বলছেন, এর মধ্যে যে কোন একটা জিনিসকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করে জীবনকে ধন্য করে দিতে হয়, আর এভাবেই নিজের শক্তির বিস্তার হয়, এভাবেই জীবনে শান্তি নেমে আসে। যাকে ভালবাসো, যার প্রতি শ্রদ্ধা আছে, যার কথায় বিশ্বাস আছে, এই রকম একজনকে আশ্রয় করে তার কথায় বিশ্বাস করে এগোতে শুরু কর। ভগবান কত কিছুর কথা বলে যাচ্ছেন, কখন স্বর্গলোকের কথা, কখন দেবলোকের কথা, কখন নাগলোকের কথা আনছেন। ভগবান পর পর তাঁর বিভূতির কথা বলে যাচ্ছেন –

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী।।৩১।।

(বেগবানদের মধ্যে আমি বায়ু, শস্ত্রধারিগণের মধ্যে আমি দাশরথি রাম, মৎস্যগণের মধ্যে আমি মকর এবং নদীসমূহের মধ্যে আমি গঙ্গা।)

কোথাও ভগবান শক্তি রূপে, কখন ঐশ্বর্য রূপে বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভাবগুলিকে গীতা দেখাচ্ছেন। তাই বলে যে সবাইকে আমাদের পূজা করতে হবে, বাঘ নারায়ণ বলে বাঘের পূজা করতে হবে, তা বলছেন না। কিন্তু বুঝতে হবে ভগবানের প্রকাশ এখানে অনেক বেশি। *পবনঃ পবতামস্মি*, পবিত্রকারী যত কিছু বস্তু আছে, বায়ুর মত কেউ এত পবিত্র করতে পারে না। মনুস্মৃতিতে খুব সুন্দর বলছেন,

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল আর পৃথিবী এই পঞ্চ তন্মাত্রা থেকে যে সৃষ্টি হয়েছে, এই পাঁচটি তন্মাত্রাই পবিত্র করে। আগেকার দিনে শৌচে গেলে হাতামাটি করার কথা বলা হত, মাটি দিয়ে শুদ্ধ করে নিত। জল দিয়ে শুদ্ধ করাটা খুব কার্যকর বলা হত। অগ্নি সব কিছুকে শুদ্ধ করে দেয়, মৃতদেহকেও শুদ্ধ করে দেয়। করোনার সময় বলা হত, বদ্ধ জায়গায় থাকলে করোনা ভাইরাস বেশি আক্রমণ করবে; খোলামেলা জায়গায় থাকলে কম করবে, কারণ বায়ু সব কিছুকে শুদ্ধ পবিত্র করে দেয়। বায়ু সব কিছু উড়িয়ে পরিষ্কার করে দেয়, জঙ্গলে শুকনো পাতা উড়িয়ে গাছগুলোকে পরিষ্কার করে দিচ্ছে। আর আকাশ, পিওর স্পেস, ছেড়ে দিলে জিনিসটা নিজের মতই হয়ে যায়। আকাশ বলতে এই আকাশ না, তন্মাত্রা আকাশ মানে একটা পার্টিকেল। পিওর স্পেস সবাইকে পবিত্র করে, আর সব কিছু ওর মধ্যে প্রবেশ করে যায়। তারপর আসে বায়ু, বায়ু থেকে সব কিছু বেরিয়েছে। বায়ু, জল, অগ্নি আর পৃথিবী এই চারটে ছাড়া অন্য কিছু নেই যে পবিত্র করে। *পবনঃ পবতামস্মি* বলছেন, বায়ু প্রধান, কারণ বায়ু থেকে বাকি সব কিছু বেরিয়েছে।

রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্, এখানে রাম হলেন শ্রীরামচন্দ্র, রাম বলতে দুজনকে বোঝায়, একজন পরশুরাম এবং অন্যজন শ্রীরামচন্দ্র। আচার্য শঙ্কর এই রামকে পরিষ্কার বলছেন, *দাশরথী রামঃ*, দশরথের সন্তান রাম। অস্ত্র চালনার মধ্যে আমি রাম। পরশুরামকেও রাম বলা হত, পরে আলাদা করার জন্য পরশুরামকে পরশুরামই বলা হয় আর শ্রীরামচন্দ্রকে শুধু রাম বলা হয়। আচার্যের সময় এই রাম এতটা জনপ্রিয় ছিলেন, যেভাবে আজকে আছেন। কারণ স্কন্দ রামায়ণ, তুলসীদাসের রামচরিতমানস আর কৃত্তিবাসের রামায়ণ আসার পর শ্রীরাম খুব পপুলার হয়ে গেলেন। আচার্য বলছেন, *শস্ত্রাণাং ধারয়তিণাং দাশরথী রামঃ*, শস্ত্র ধারণ যাঁরা করতে পারেন তাঁদের মধ্যে আমি রাম। বাল্মীকি রামায়ণে রামের যে বর্ণনা, ভাবলেই গায়ে শক্তি এসে যাবে।

ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি, *ঝষা* হল জলচর প্রাণী, জলচর প্রাণীর মধ্যে আমি হলাম মকর। আচার্য বলছেন, *মকরো নাম জাতিবিশেষঃ*, পুরো একটা জাতিকে বলছেন মকর। মকর হল কুমির জাতীয়। কিন্তু যখন সমুদ্রের বর্ণনা করেন তখন বলেন গ্রাহ মকর, যে কোন তিমি মাছ আদিকে বলছেন মকর, মকর হল বড় মাছ। মকর থেকে এসেছে মগর। রুডিয়ার্ড কিপ্লিং ভারতে কিছু বছর ছিলেন, ওনার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা খুব সুন্দর ছিল। ওনার নামকরা বই হল 'কিং', আর 'জঙ্গল স্টোরিস' তাঁর সব থেকে বিখ্যাত রচনা। উনি অনেক গল্পও রচনা করেছেন। উনিই মকরকে মগর নামে প্রচলন করলেন। মগর শব্দ আগে থেকেও ছিল। আমরা সবটাকেই কুমির বলি, কিন্তু মগর আর ঘারিয়াল দুটো আলাদা প্রজাতি। গঙ্গাতে আসলে মগর হয় না, গঙ্গাতে হয় ঘারিয়াল। ঘারিয়াল মানুষকে আক্রমণ করে না, কিন্তু মগর সবাইকেই আক্রমণ করবে। এখানে মকর বলতে বড় মাছ বলছেন।

স্রোতসামস্মি জাহ্নবি, গঙ্গা দর্শনকে ভারতীয়রা অতি পবিত্র মনে করে। যখনই গঙ্গাকে দেখবেন তখনই প্রণাম করে বলবেন, নমামি গঙ্গে; কারণ গঙ্গা ভগবানেরই রূপ। ঠাকুরও গঙ্গার জলকে বলছেন ব্রহ্মবারি। গঙ্গা দর্শনে ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা একসাথে বলে ওঠেন হর হর গঙ্গে। কারণ যত প্রবহমান জলধারা আছে, যত নদী আছে, ঝরণা আছে, এদের সবার মধ্যে আমি হলাম গঙ্গা। বিশ্বে যত নদী আছে আমাজন, মিসিসিপি মুসৌরী, নীল নদ, হোয়ং হো, এদের সবার মধ্যে গঙ্গা হল শ্রেষ্ঠ। আপনার প্রশ্ন করবেন, ওনারা তো এত নদীর কথা তখন জানতেন না। জানতেন কি জানতেন না আমাদের দেখার কাজ না, অত প্রশ্ন করার কি আছে। ভগবানের কথা চোখ বন্ধ করে মানতে হবে, এখানে এসে আর যুক্তিতর্ক হয় না।

স্বামী শিবানন্দের সাথে একবার তৎকালীন এক নামকরা বাবাজীর সাক্ষাৎ হয়েছে। ইদানিং কালে অনেক বড় বড় বাবাজীরা আছেন, সারা ভারত জুড়ে বাবাজীরা চিরকলই আছেন। সেই সাক্ষাৎকারে বাবাজীর একজন চেলা মহাপুরুষ মহারাজকে দু চারটে প্রশ্ন করতে শুরু করেছে।

মহাপুরুষ মহারাজের সাথে তাঁর একজন সেবক ছিলেন, তিনি আবার বিরাট শাস্ত্রজ্ঞ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাবাজীর চেলাকে চেপে ধরেছেন, ধরে বলছেন, 'সিদ্ধান্ত যদি জানতে হয়, তাহলে মহারাজকে জিজ্ঞেস করুন, তর্ক যদি করতে হয় আমার কাছে আসুন'। সাংঘাতিক কথা, এই ঘটনা কোন বইয়ে পাওয়া যাবে না, আমি এই ঘটনাটা আমাদের পরম্পরায় শুনেছি। যে মহাত্মা ছিলেন, উনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের শিষ্যকে আটকে দিলেন, 'কার সামনে কি কথা বলতে হয় জানো না! চুপ করে থাক'। বেরিয়ে এসে সেবক মহারাজ বলছেন, 'সিংহের সামনে থেকে তার খাদ্য যেমন টেনে নেওয়া হয়, সেই রকম আমার মুখের সামনে থেকে গ্রাস কেড়ে নিল, মনে হচ্ছিল, ওকে আমি ছিঁড়ে রেখে দিই'। গীতার বাক্য সিদ্ধান্ত বাক্য, এখানে যুক্তিতর্ক চলে না, যুক্তিতর্ক করার জন্য পণ্ডিতরা আছেন। কলকাতায় এখনও অনেক টোল আছে, যান, ওখানে গিয়ে ওনাদের সাথে তর্ক করুন। আগে কলকাতা, বেনারস, দাক্ষিণার্তে পণ্ডিতদের সাথে তর্ক করে আসুন, তারপর সিদ্ধান্ত বাক্যে আসবেন। সেইজন্য তখন আমাজন নদী ছিল কিনা, এই নদী, সেই নদী তাঁরা জানতেন কিনা, এত কিছু না দেখে ভগবান বলে দিয়েছেন *স্রোতসামস্মি জাহ্নবি*, আর কোন কথা চলে না। মা বলে দিয়েছেন, ও তোর দাদা, ছেলে জানে ও আমার দাদা; মা বলে দিয়েছে উনি তোমার বাবা, উনি আমার বাবা। সবাই গিয়ে ডিএনএ টেস্ট করে দেখতে যায় না, সত্যিই উনি আমার বাবা কিনা।

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্।।৩২।।

(হে অর্জুন, আমি আকাশাদি সৃষ্ট বস্তুসকলের উৎপত্তি-স্থিতি ও সংহার-কর্তা, বিদ্যাসমূহের মধ্যে আমি মোক্ষপ্রদ আত্মবিদ্যা এবং তার্কিকগণের বাদ, জল্প ও বিতণ্ডার মধ্যে আমি বাদ।)

সর্গ মানে সৃষ্টি, ভগবান বলছেন, সৃষ্টির আদি, অন্ত ও মধ্য আমি। আগেও ভগবান এই কথা বলেছিলেন, কিন্তু সেখানে প্রাণীদের নিয়ে বলেছিলেন। এখানে তিনি সমগ্র সৃষ্টিকে নিয়ে বলছেন। সৃষ্টিতে যা কিছু আছে, স্থাবর জঙ্গম, জড়, চেতন সব কিছুর আদি আমি, মধ্য আমি এবং অন্ত আমি। আচার্য এখানে বলছেন, *ভূতানাং জীবাধিষ্ঠিতানাম্ এব আদিঃ অন্তঃ চ ইত্যাদি উক্তম্ উপক্রমে, ইহ তু সর্বস্য এব সর্গমাত্রস্য ইতি বিশেষঃ,* আচার্যও বলছেন, এটা আগেও বলেছেন; কিন্তু এখানে সমগ্র সৃষ্টিকে নিয়ে বলছেন। এটাই হল অরুন্ধতী ন্যায়। প্রথমে একটা বড় স্থূল জিনিসকে দেখানো হয়, সেখান থেকে সূক্ষ্ম, সেই সূক্ষ্ম থেকে আরও সূক্ষ্মে ধীরে ধীরে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে বললেন প্রাণী বিশেষে আমি। ওখান থেকে সরে এসে এবার বলছেন, সৃষ্টিতে যাবতীয় যা কিছু হচ্ছে সবটাই আমি।

অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং, জগতে যত রকমের বিদ্যা হতে পারে, সমস্ত বিদ্যার মধ্যে আমি হলাম অধ্যাত্ম বিদ্যা, যাকে মোক্ষবিদ্যা বলা হয়। মুণ্ডকোপনিষদে দুটো বিদ্যার কথা বলছেন, *দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে,* এই জগতে জানার মত দুটো বিদ্যা আছে *পরা চৈবাপরা চ,* পরা আর অপরা বিদ্যা। অপরা বিদ্যা হল, বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ ইত্যাদি যা কিছু আছে সব অপরা বিদ্যা। তাহলে পরা বিদ্যা কোনটা? *যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে,* যে বিদ্যা দিয়ে অক্ষর অর্থাৎ ঈশ্বরকে জানা যায়। এই পরা বিদ্যাই অধ্যাত্ম বিদ্যা। অপরা বিদ্যা হল practical knowledge of universe। বেদ, বেদাঙ্গ, ধনুর্বেদ, আয়ুর্বেদ, ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি সবটাই অপরার বিদ্যার মধ্যে। একমাত্র হিন্দু ধর্ম, যে নিজের মূল ধর্মশাস্ত্র বেদকে ঐ জায়গাতে নিয়ে ফেলছেন, যেখানে ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, ইতিহাস, ভূগোল দাঁড়িয়ে আছে। এমনকি গীতাকেও যতক্ষণ আমরা শব্দ রূপে দেখছি, গীতাও ততক্ষণ অপরা বিদ্যা, তখন ফিজিক্স, কেমেস্ট্রির সাথে গীতার কোন তফাৎ নেই। কিন্তু গীতাকে যখন আমরা অধ্যাত্ম বিদ্যাতে নিয়ে যাব, তখন এটা যদি আমাকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়, তখন গীতার এই বিদ্যাকে অন্য কোন বিদ্যার সাথে এক করা যাবে না।

সা চাতুরি চাতুরি, কোন চাতুরি, যে চাতুরি আমাদের উপরের দিকে নিয়ে যায়। *সা বিদ্যায়া বিমুক্তে*, বিদ্যা কি, যে বিদ্যা আমাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। স্বামীজী ইংরাজীতে বলছেন, Education is the manifestation of perfection already in man, সংস্কৃতে এটাই বলছেন, *সা বিদ্যায়া বিমুক্তে*, যে বিদ্যা মুক্তি দেয়, কোন বিদ্যা মুক্তি দেয়, অধ্যাত্ম বিদ্যা মুক্তি দেয়। অধ্যাত্ম বিদ্যার মত অন্য কোন বিদ্যা হয় না, ভগবান বলছেন *অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং*, সমস্ত বিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্ম বিদ্যা।

আর বলছেন, *বাদঃ প্রবদতামহম্*, যত রকমের কথাবার্তা হয় তার মধ্যে আমি হলাম বাদ। মোটামুটি তিন ধরণের কথাবার্তা হয় –বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। বাদ হল, গুরু-শিষ্যের মধ্যে যে কথোপকথন হচ্ছে, গুরুকে শিষ্য প্রশ্ন করছেন, শিষ্য শুনছেন, মাঝে মাঝে আবার কিছু প্রশ্ন করছেন, গুরু যেগুলো দরকার নেই সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যান। এই যে গুরু আর শিষ্যের সম্ভাষণ হয়, শিষ্য প্রশ্ন করছেন, গুরু উত্তর দিচ্ছেন, এটাকে বলে বাদ। জল্প হল, একজন কিছু একটা বললেন, অন্য একজন তার কথার বিপরীতে অন্য একটা বলল; সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন বলবে তোমার কথা ভুল, আমিই ঠিক বলছি। খালি বিরোধ করে যাচ্ছে। আমি ঠিক, তুমি ভুল; তুমি ভুল এটাকে প্রমাণিত করার জন্য সমস্ত রকম ছলবল কৌশল লাগাবে। বিতণ্ডা হল, আমার কিছু বলার নেই, কিন্তু তুমি যেটা বলবে আমি সেটা কেটে কুচি কুচি করে রেখে দেব। এই তিন রকম কথাবার্তা – বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। এই তিনটের বাইরে আরেকটা হয়, যেটা সংস্কৃতে নেই –কোলাহল। লোকসভা, বিধানসভায় নিয়ম হল সেখানে বাদ হবে। কিন্তু কখন যে ঐ বাদ জল্পে নেমে যায়, জল্প থেকে বিতণ্ডাতে চলে যাবে, টের পাওয়া যাবে না। আর তারপরেই শুরু হয়ে যায় কোলাহল, স্পীকার তখন মার্শালকে ডেকে নিয়ে আসেন, মার্শাল তাকে চ্যং দোলা করে সভাগৃহের বাইরে রেখে আসে।

অক্ষরাণামকারোস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহহং বিশ্বতোমুখঃ।।৩৩।।

(অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি অকার, সমাসসকলের মধ্যে আমি উভয়পদপ্রধান দ্বন্দ্ব সমাস, আমি ক্ষণাদিরূপে প্রসিদ্ধ অক্ষীণ কাল (বা কালের কাল পরমেশ্বর) এবং আমিই সর্বকর্মফলের বিধান-কর্তা।)

বর্ণমালার ছাপ্পান্নটি অক্ষরের শুরু হয় 'অ' দিয়ে, এই 'অ' দিয়েই সমস্ত কিছুর শুরু। যার জন্য ওঁ এর শুরু 'অ' দিয়ে। আর *দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ*, যখন দুই অক্ষরের মিলন হয়, তখন এটাকে বলে সন্ধি। যেমন এখানে *অকারোস্মি* আছে বিসর্গ আর 'অ' মিলে *অকারোস্মি* হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দুটি পদের যখন মিলন হয়, তখন ওটা সমাস হয়। ব্যকরণে ছয় রকমের সমাস হয়। দ্বন্দ্ব সমাসে দুটো আলাদা পদকে মিলিয়ে দিয়ে এক করে দেওয়া হয়। যেমন রাম আর শ্যাম, রাম আর শ্যাম না বলে আমরা সরাসরি বলি রামশ্যাম। ভগবান বলছেন, সমাসের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব সমাস।

ভাবা যায়, ঈশ্বর, ভগবান নিজেকে কিভাবে সব জায়গায় বিস্তার করে দিচ্ছেন, শুধু আমরা যাতে সহজে তাঁকে ধরতে পারি। এগুলো সব আমাদের পূর্বজদের রচনা। জাতিপ্রথা নিয়ে এত বিভেদ বিতর্ক প্রথম শুরু করল ইংরেজরা, মার্ক্সিস্টরা এটাকে বাড়িয়ে নিয়ে গেল, লিবারালরা আর থামছে না, আর নেতারা যে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কেউ বলতে পারবে না। শুধু ব্রাহ্মণ আর শূদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের বিবাদ এখনও সমানে চলছে। অথচ গীতার যিনি রচয়িতা ব্যাসদেব, উনি শূদ্রার গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছেন, তাঁর গ্রন্থ আমরা পড়ছি। মহাভারত পুরোটাই শূদ্রের সৃষ্টি। বাল্মীকি যাই থাকুন, আগে যিনি রত্নাকর ডাকাত ছিলেন, পরে তাঁকেই বাল্মীকি বানানো হয়েছে। আর শ্রীকৃষ্ণ নিজে যাদব বংশের। যাদবকে কখন বলে ক্ষত্রিয়, কখন বলে বৈশ্য আবার কখন বলে পিছিয়ে পড়া জাতি। জাতিকে নিয়ে যে সবাই এত গালাগাল দেয়, কিসের জাতি, একবার ইতিহাসটা খুলে দেখুক। ভারতে যে সব থেকে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন, তিনি ছিলেন সম্রাট অশোক। সম্রাট অশোকের

বাবা চন্দ্রগুপ্ত, তিনি একজন শূদ্র। তার মানে পুরো চন্দ্রগুপ্ত বংশই শূদ্র। যে বৈষম্য পরে এসেছে সেগুলো অন্যান্য জিনিস। কিন্তু এটা বলা যায় না যে তাদের উঠতে দেওয়া হয়নি। মূল গ্রন্থ আমাদের গীতা, গীতা যিনি লিখলেন তাঁর বাবা ব্রাহ্মণ, মা শূদ্রা। যারা হিন্দু জাতি, ভারতকে ব্রাহ্মণ শূদ্র নিয়ে গলা ফাটিয়ে গালাগাল দেয়, হয় এরা মুর্খ, নয়তো বদমাইস। মুর্খদের সাথে তর্ক করা যায় না; বদমাইসদের সাথেও তর্ক করা যায় না, ওদের থেকে দূরে দূরেই থাকতে হয়। কোন স্তরে নিয়ে যাচ্ছেন – *দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ*, ব্যাকরণের সমাস, সেখানেও দেখাচ্ছেন, দেখ সমাসের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সমাস, এটা আমি, আমি ভগবান।

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহহং বিশ্বতোমুখঃ, কাল হল যিনি গণনা করছেন, আচার্য এখানে খুব সুন্দর বলছেন, আমাদের পরম্পরায় সময়ের যত রকমের ডিভিশন আছে, ক্ষণ, সেকেণ্ড, মিনিট, ঘন্টা, সেই কালেরও আমি কাল, পরমেশ্বর। যে কাল সময়ের ডিভিশন করে সব কিছু আলাদা করে দেয়, যে কাল দিয়ে সব কিছুকে মাপা যায়, আমি সেই কালেরও কাল। *ধাতাহহং*, সমস্ত বিশ্বকে আমি ধারণ করে আছি। আচার্য শঙ্কর ধাতাকে বলছেন, *অহং কর্মফলস্য বিধাতা সর্বজগতো*। ধাতা মানে যিনি ধারণ করে আছেন, আর বিধাতা বলে যিনি কর্মফল দেন। তবে আচার্য যেভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন, আমাদের সেভাবেই নিতে হবে। আমি যে আজকে খাচ্ছি, যে খাওয়া আমার জুটছে, তিনি ধারণ করে আছেন বলেই খাওয়া জুটছে। কিভাবে ধারণ করে আছেন? বিধাতা রূপে। আমার যেমনটি কর্ম, সেই কর্মফলের অনুসারে আমার আজ খাওয়া জুটছে। *বিশ্বতোমুখঃ*, আচার্য বলছেন *সর্বতোমুখঃ*, চারিদিকে তাঁর মুখ। পুরুষসূক্তমে ঠিক এভাবেই ভগবানকে বর্ণনা করা হয়েছে, ভগবানের মুখ সব জায়গায়, ভগবানের পা সব জায়গায়, ভগবানের হাত সব জায়গায়। এটাকেই বলছেন *বিশ্বতোমুখঃ*, এটাই বিশ্বরূপ। এরপরের অধ্যায়েই বিশ্বরূপের বর্ণনা আসবে।

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা।।৩৪।।

(আমি ধনাদিহারি বা প্রাণহারী মৃত্যু (বা প্রলয়ে সর্বহারী ঈশ্বরী)। উৎকর্ষ-প্রাপ্তিযোগ্য ভাবী কল্যাণসমূহের মধ্যে উৎকর্ষ ও তার লাভের কারণ। আমি নারীগণের মধ্যে (ধর্মের সপ্ত পত্নী) –কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা।)

মৃত্যু দুই প্রকার। যদি কারুর ধন, সম্পদ, স্বাস্থ্য সব চলে যায়, এটাকে বলে মৃত্যু। সেইজন্য মহাভারত ও মনুস্মৃতি দু জায়গাতেই বলছেন, যদি দেখা যায় কোথাও নিজের বা অপরের সর্বস্ব হরণ হয়ে যাচ্ছে তখন সেখান এ মিথ্যা কথা বলে নিজেকে বা অপরকে বাঁচাতে হয়। কারণ সর্বস্ব হরণ হয়ে যাওয়াটা মৃত্যুর সমান। আবার যেখানে নিজের বা অপরের প্রাণহানি হওয়ার পরিস্থিত হয়, সেখানেও মিথ্যা কথা বলে নিজেকে বা অপরকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে হয়। কারণ মৃত্যু হয়ে গেলে পরে কি হবে কেউ জানে না, কোথায় কোন যোনিতে গিয়ে জন্ম নিতে হবে কেউ বলতে পারে না। এই জীবন একটা অমূল্য সুযোগ, এই সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করে জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে বেরিয়ে আসা যায়। আপনার জীবনে যদি অবসাদ আসে বা অপর কারুর জীবনে যদি অবসাদ আসতে দেখেন, তাহল নিজেকে বলুন এবং অপরকেও বলুন, এই জীবন হল এক অমূল্য সুযোগ, এই সুযোগকে কোন ভাবেই বৃথা হতে দেওয়া যাবে না। জীবনকে আধার করে আমরা যে কোন জিনিস পেতে পারি। আপনি অর্থ সম্পত্তি চান, মান সম্মান চান, স্বর্গ চান, এই শরীর দিয়ে আপনি সব পেতে পারেন। আপনি মৃত্যু চান, তাও পেতে পারেন এই শরীরেরই সাহায্যে। আপনি যে আত্মহত্যা করবেন, সেটার জন্যও আপনার শরীর দরকার। শরীর যদি সুস্থ না থাকে, আত্মহত্যাও করতে পারবেন না। তার মানে এই শরীরের কি সাংঘাতিক দাম। এই শরীর ও মনের মত অমূল্য সম্পদকে আপনি হেলায় নষ্ট করতে পারেন না। জীবনে যদি কখন দুঃখ আসে, মন যদি একেবারে

ভেঙে যায়, একবার শুধু ভাববেন, এই জীবন এক অমূল্য সম্পদ। কারণ এই জীবনের সাহায্যে আপনি সব কিছু করতে পারেন।

স্বক্রিয়া অভাব, যে কোন জিনিস নিজের উপর কাজ করতে পারে না। আমি আমার ডান হাত দিয়ে ডান হাতকে ধরতে পারব না। কিন্তু জীবন দিয়ে জীবনকে নাশ করে দেওয়া যায়, জীবনের সেইজন্য এক সাঙ্ঘাতিক দাম। আচার্য আগে বলেছেন, আত্মা নিজের নাশ করতে পারেন না, কিন্তু জীবন জীবনের নাশ করতে পারেন। যদি বলেন কেন? জীবন অন্য দেহে, অন্য ভাবে তো চলতে থাকবে, সেটা আলাদা জিনিস, আমরা এই স্থূল শরীরের কথা বলছি। এই স্থূল শরীর দিয়ে বিভিন্ন উপায়ে এই জীবনকে শেষ করে দেওয়া যায়। জীবন তাই এত দামী। বৃথা এই অমুল্য সম্পদকে নষ্ট হতে দেওয়া যায় না।

যে আপনাকে গ্রাহ্য করে না, যে আপনাকে সুখী দেখতে চায় না, তার জন্য আপনি চোখের জল ফেলেন? শুধু যে চোখের জল ফেলেন তা না, যে আপনাকে ছেড়ে চলে গেল, যে আপনাকে গ্রাহ্য করে না, তার জন্য আপনি আত্মহত্যা করে নেবেন? আপনি কার জন্য আত্মহত্যা করতে চাইছেন? যে আপনাকে দু পয়সা দাম দেয় না, তার জন্য? কত বোকা, কত মুর্খ আপনি, একবারও ভেবে দেখেছেন? *মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্*, ভগবান বলছেন, এই যে সর্বস্ব নাশ হয়ে যায়, সর্বস্ব হরণ হয়ে যায়, আর প্রাণঘাতী মৃত্যুতে যে জীবনের নাশ হয়ে যায়, এটা আমি নিজে।

আগে যে সর্গো বলা হল, সেই সর্গের বিপরীত হল প্রতিসর্গ। যখন প্রলয় হয় তখন সব কিছুকে টেনে নেওয়া হয়। প্রলয় কালে ভগবান সব কিছুকে নিজের মধ্যে টেনে নেন। ভগবান হলেন সর্বহর, আমাদের যে টাকা-পয়সা চলে যায়, সেটা তিনিই নিচ্ছেন, আমাদের যে জীবন চলে যাচ্ছে, সেটাও তিনি টেনে নিচ্ছেন আর সৃষ্টির অন্তে সমস্ত কিছুকে তিনি নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেবেন। আর তাই না, *উদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্*, ভবিষ্যতে যে সবার অভ্যুদয় হবে, সবারই হবে, অবশ্যই হবে; সেটাও আমি। যাঁরা নিয়মিত আমাদের গীতা শুনছেন, কিছু কিছু ভগবানের কথা অবশ্যই তাঁদের ভিতরে যাচ্ছে, ভিতরে যাওয়া মানেই শক্তি বাড়বে। গীতা শুনে যদি ভিতরে শক্তি না বাড়ে, জীবনে শান্তি যদি না আসে, তাহলে কি গীতা শুনলেন! একটা বড় হাই তুলে হাত দুটো ছড়িয়ে দিয়ে শরীরটাকে টেনে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আড়ষ্টতা যেভাবে ভেঙে দেওয়া হয়, সেইভাবে যদি সব বন্ধনগুলি না ছিঁড়ে দিতে পারেন, তাহলে গীতা শুনে কি হল! গীতা সাক্ষাৎ সর্বশক্তিমান ভগবানের কথা, ভগবানের কথা শুনে কি করে একজন অবসাদগ্রস্ত হবেন, কল্পনাই করা যায় না। গীতা যাঁরা শুনছেন, ভবিষ্যতে তাঁদের অভ্যুদয় হবেই হবে, হতে বাধ্য। গীতা পড়ছেন বলে পূণ্য হবে, সেই পূণ্যের জন্য অভ্যুদয় হবে, তা একেবারেই না। এটা হবে এই কারণে যে, আপনার জ্ঞান বাড়ছে, শক্তি বাড়ছে। ভগবান বলছেন, এই যে উদ্ভব হবে, অভ্যুদয় হবে, সেটা আমি। এরপর এই শ্লোকের দ্বিতীয় লাইনে ভগবান যেটা বলছেন, এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কীর্তিঃ শ্রীর্বাক চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা। হিন্দুদের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল, যত রকম গুণ আছে, এই গুণগুলিকে হিন্দুরা একটা মানুষের রূপ দিয়ে দেয়। মানুষ হলে তাকে হয় পুরুষ নয় তো নারী করতে হবে। পুরুষ বা নারী হয়ে গেলে তাকে বিয়ে দিতে হবে। বিয়ে হয়ে গেলে তার সন্তান হতে হবে। মানুষের মধ্যে যে বিভিন্ন গুণগুলি আছে, তার মধ্যে বলা হয় নারীদের মধ্যে সাতটি গুণ থাকে। গীতাতে ভগবান এই সাতটি গুণের কথা বলছেন, অথচ হিন্দু ধর্মের নিন্দুকরা সব জায়গায় বলে বেড়ায়, হিন্দুরা নাকি নারী জাতিকে দমিয়ে রাখে, হেয় চোখে দেখে, হিন্দুরা নাকি নারী বিরোধী। কোথা থেকে এরা যে বলে, একবার ভেবেও দেখে না। নারীদের এই সাতটি গুণকে এখানে আলাদা আলাদা করে সাতজন নারী বানিয়ে দিলেন, আর এই সাতজন নারীকে ধর্মের স্ত্রী করে দেওয়া হল। ধর্মের এই সাতজন স্ত্রী। কেন সাতজন স্ত্রী? বলছেন, এই

গুণগুলি মেয়েদের মধ্যেই দেখা যায়, পুরুষের মধ্যে এই গুণগুলি থাকে না। সাতটি গুণ হল – প্রথম হয় কীর্তি, একটা কীর্তির ভাব, কীর্তি নামটাও মেয়েদের; দ্বিতীয় শ্রী, শ্রী মানে ঐশ্বর্য। ইংরাজীতে বলা হয়, Behind the every success man there is a woman। কারুর কপালে ঠিক স্ত্রী যদি লাভ হয়ে যায়, সে আকাশে উঠে যাবে। এখানে মায়ের কথা বলা হচ্ছে না, স্ত্রীর কথা বলা হচ্ছে। তৃতীয় বাণী, একটা মেয়ে যেভাবে কথা বলার ক্ষমতা রাখে, যে মধুর বাণী দিতে পারে, ছেলেরা পারে না।

আমি এক ভদ্রলোককে জানতাম, মধ্যপ্রদেশের লোক, গাড়ির বিজনেস করেন। একবার খুব দুঃখ করে বলছিলেন, সাত আট বছরের ওর এক মেয়ে মারা গিয়েছিল। মেয়ের কথা বলতে বলতে খুব চোখের জল ফেলছিলেন। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল অনেক আগে। তার পাঁচ ছয় মাস পরে মেয়েটি মারা যায়। অনেক দিন পরে যখন দেখা হয়, তখন আমাকে খুব দুঃখ করে বলছিলেন, ‘‘কাজ-টাজ করে যখন বাড়ি যেতাম, মেয়ে দৌড়ে আমার জন্য এক গ্লাশ জল নিয়ে আসত, ছেলে কোন দিন করবে না। যদি দেখত আমার মুখটা শুকনো, আমাকে জড়িয়ে ধরত, জড়িয়ে ধরে বলত বাবা তোমার কি হয়েছে। স্বামীজী জানেন, যেমনি বলত, বাবা তোমার কি হয়েছে, আমি না কেমন বিবশ হয় গলে যেতাম। আমার মনে হত আমি যেন আমার শক্তি ফিরে পেলাম’’। ছেলেরা কোন দিন এটা দিতে পারবে না। গীতা এটাই বলছেন, বাণী, একজন নারী যেভাবে সুন্দর মধুর করে কথা বলতে পারে, পুরুষরা পারবে না।

চতুর্থ গুণ স্মৃতি, খারাপ অর্থে বলে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যখন ঝগড়া হয়, তখন স্ত্রী শুরু করবে কুড়ি বছর আগে তুমি কি করেছিলে। মেয়েদের স্মৃতি একেবারে পাকা, এই দিনে তুমি এই করেছিলে, এই দিনে তুমি আমাকে এই এই কথা বলেছিলে। কম্প্যুটারকে সেইজন্য নারীদের সঙ্গে তুলনা করা হয়। পঞ্চম গুণ বুদ্ধি, মেয়েদের মত পাকা বুদ্ধি পুরুষের হবে না, পাকা বুদ্ধি। ষষ্ঠ হল ধৃতি, লেগে থাকা, একটা জিনিসে লেগে থাকা মেয়েদের সাংঘাতিক ক্ষমতা। সংসারের বিভিন্ন কাজে মেয়েরা যেভাবে লেগে থাকেন, পুরুষরা কখনই পারবে না। আর সপ্তম হল ক্ষমা। সাতটি শব্দই মেয়েদের নাম, এই সাতটি মেয়ে হলেন ধর্মের সাতজন স্ত্রী।

আচার্য শঙ্কর এখানে খুব সুন্দর কথা বলছেন, *ইতি এতা উত্তমাঃ স্ত্রীণাম্ অহম্ অস্মি যাসাম্ আভাসমাত্রসম্বন্ধনে অপি লোকঃ কৃতার্থম্ আত্মানং মন্যতে*, ধর্মের এনারা হলেন উত্তম স্ত্রী। সম্বন্ধের আভাসও যদি হয়, পুরোটাও না, সম্বন্ধের একটু আভাস যদি হয় তাতেই মানুষ নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। তার মানে কোন পুরুষের মধ্যে যদি এর একটুও গুণ থাকে, যেমন বাণী, স্বামীজীর যে সম্বোধন, Sisters and brothers of America, এটাকে মনে করা হয় যে, ভারতে যাঁরা ভাষণ দিয়েছেন, শুধু ভারতেই না, বিশ্বেও মনে করা হয়, one of the finest speech। ধর্মের স্ত্রী বাণী এসে স্বামীজীর জিহ্বাতে বসে গেলেন আর সেই বাণী দিয়ে নূতন হিন্দু ধর্মের জন্ম হল, নূতন ভারতবর্ষের জন্ম হল, ইতিহাসটাই পাল্টে গেল। শুধু একটু আভাস সম্বন্ধ।

এনারা সাতজন ধর্মের স্ত্রী; পুরোপুরি সাতজনের সম্বন্ধ হবে কারুর, এ অসম্ভব। কিন্তু এই গুণগুলি একটু যদি আমাদের কারুকে ছুঁয়ে যায়, *অপি লোকঃ কৃতার্থম্ আত্মানং মন্যতে*, লোকেরা মনে করে আমি ধন্য হয়ে গেলাম। ভগবান বলছেন, *এতা উত্তমাঃ স্ত্রীণাম্ অহম্ অস্মি*, এই উত্তম স্ত্রী সব আমি নিজে। কোন মেয়েক যদি দেখি মিষ্টি কথা বলছেন, কোন পুরুষকে যদি দেখি মিষ্টি কথা বলছে, কাউকে যদি দেখি উৎসাহজনক, প্রেরণামূলক কথা বলছেন, বুঝতে হবে বাণী রূপে ভগবান তাঁর জিহ্বাতে বসে আছেন। কেউ গরীব হতে পারে, কিন্তু ঘরে বাইরে একটা শ্রী আছে। আগেকার দিনের ব্রাহ্মণরা গরীব হতেন, কিন্তু তাঁদের শ্রী থাকত। যেখানে জপধ্যান হয়, যেখানে বিদ্যাচর্চা হয়, সেখানে এই শ্রী থাকে।

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতুনাং কুসুমাকরঃ।।৩৫।।

(সামসমূহের মধ্যে আমি মোক্ষপ্রতিপাদক বৃহৎ-সাম, ছন্দোবিশিষ্ট ঋক্‌সমূহের মধ্যে আমি গায়ত্রী ছন্দ, দ্বাদশ মাসের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ এবং ষড় ঋতুর মধ্যে আমি পুষ্পাকর বসন্ত।)

এর আগে ভগবান বললেন বেদের মধ্যে আমি সামবেদ। বৃহৎসাম ঋকবেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের চতুর্থ সূক্তে আসে। *ত্বামবিদ্ধি হবামহে* বলে মন্ত্রে এবং *অতিরাত্র* নামে একটি যজ্ঞ হয়, সেখানে ইন্দ্রকে সর্বেশ্বর রূপে স্তুতি করা হয়, সেইজন্য এই বৃহৎসামকে মোক্ষপ্রতিপাদক রূপে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। আর যতগুলো ছন্দ আছে তার মধ্যে গায়ত্রী ছন্দকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়, ভগবান বলছেন এই গায়ত্রী ছন্দ আমি নিজে। গায়ত্রী ছন্দে তিনটে পাদ থাকে, প্রতিটি পাদে আটটি করে অক্ষর থাকে। *মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্,* মার্গশীর্ষ অগ্রহায়ণ মাসকে বলা হয়। বারোটা মাস পর্যন্ত বলছেন কোনটা শ্রেষ্ঠ মাস, বলছেন অগ্রহায়ণ ভগবানের মাস। *ঋতুনাং কুসুমাকরঃ,* ষড় ঋতুর মধ্যে আমি ঋতুরাজ বসন্ত। আমার কাছে এটা খুব মজার ব্যাপার মনে হয়। ঋতুর মধ্যে বলছেন বসন্ত হল ঋতুরাজ, আর মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ।

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্।।৩৬।।

(আমি ছলনাকারিগণের মধ্যে অক্ষক্রীড়ারূপ ছল, তেজস্বিগণের তেজ, বিজয়িগণের বিজয়, উদ্যমকারিগণের অধ্যবসায় এবং সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের সত্ত্বগুণ।)

যত রকম ছলনা আছে, চালাকি করা আছে, এদের মধ্যে জুয়া খেলা শ্রেষ্ঠ ছলনাকারি। কল্পনা করা যায়, জুয়া খেলাতেও ভগবান। মহাভারতে এই জুয়া খেলাতে নল রাজা, যুধিষ্ঠির সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন, আর ভগবান বলছেন এই জুয়া খেলা আমি নিজে। নাম না করে অন্যান্য যত ধর্ম আছে, সেখানে গিয়ে কেউ যদি বলে, এই যে জুয়া খেলা এর মধ্যে ভগবান নিজে আছেন, তারপর দেখুন তার কি দুরবস্থা হয়। আর এখানে ভগবান নিজে বলছেন, এই যে জুয়া খেলা হয় এটা আমি। কিন্তু কাদের মধ্যে এটা? যত রকমের ছলনা হতে পারে, মানুষকে যত ভাবে ছলনা করা হয়, এদের মধ্যে জুয়া হল শ্রেষ্ঠ, এটা আমি।

তেজস্তেজস্বিনামহম্, তেজস্বী ব্যক্তির যে তেজ, এই তেজ আমি। *জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্,* যাঁরা জয়ী হন, তাঁর যে বিজয়, সেটা আমি; যাঁরা উদ্যমশীল, পরিশ্রম করে লেগে থাকেন, তাঁর ঐ শক্তিটা আমি নিজে। আর যাঁরা সাত্ত্বিক পুরুষ, তাঁর মধ্যে যে সত্ত্বগুণ, এই সত্ত্বগুণটা আমি। এই সত্ত্বগুণকে বুদ্ধি নিয়ে বলছেন না, শুভ জিনিসকে নিয়ে বলছেন।

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামূশনা কবিঃ।।৩৭।।

(আমি বৃষ্ণিবংশীয়গণের মধ্যে তোমার সখা কৃষ্ণ, পাণ্ডবগণের মধ্যে অর্জুন, মুনিগণের মধ্যে বেদব্যাস এবং সূক্ষ্মার্থবিবেকীগণের মধ্যে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য।)

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি, এই যে বৃষ্ণীবংশ রয়েছে এই বংশের মধ্যে আমি শ্রীকৃষ্ণ। *পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ,* পাণ্ডবদের মধ্যে হে অর্জুন, তুমি শ্রেষ্ঠ। আমি কোথায় কোথায় আছি? পঞ্চ পাণ্ডবদের মধ্যে অর্জুনের ভিতর আমার বিভূতির প্রকাশ সবচেয়ে বেশি, বৃষ্ণীদের মধ্যে কৃষ্ণ, এই যে কৃষ্ণ এখানে ভগবান নিজে আছেন। সব কিছুতেই ভগবান আছে, কিন্তু অর্জুনের মধ্যে বিশেষ প্রকাশ।

বৃষ্ণী বংশে আমি বাসুদেব রূপে, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের নাম। এতে বলতে চাইছেন বৃষ্ণীদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ভেতর ঈশ্বরের বিভূতি সব থেকে বেশি। *পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ*, পাণ্ডবদের মধ্যে আমি অর্জুন। বৃষ্ণী বংশের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ আর পাণ্ডবদের বংশে তুমি শ্রেষ্ঠ, আমি আর তুমি এখন এই আলোচনা করছি। অথচ শ্রীকৃষ্ণ নিজে ভগবান, তাই শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু ভগবান নন, যিনি ভগবান তিনি শ্রীকৃষ্ণ হয়ে এসেছেন। যিনি ভগবান তাঁর বিভূতি বৃষ্ণী বংশে সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ মানে বাসুদেবের মধ্যে। এখন যদি বৃষ্ণী বংশকে সরিয়ে দিয়ে বলা হয়, তখন ভারতের ঐ অঞ্চলে কার মধ্যে ভগবানের বিভূতি সবেচেয়ে বেশি ছিল? তখনও এই উত্তরই হবে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে। ঐ অঞ্চলকে সরিয়ে যদি বলা হয়, পুরো ভারতবর্ষে সেই সময় ঈশ্বরের বিভূতি সবচেয়ে বেশি কার মধ্যে প্রকাশিত ছিল? শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে। দু হাজারের সময়ে কার মধ্যে ঈশ্বরের বিভূতি সবচেয়ে বেশি ছিল? শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে। আমাদের এই সীমিত বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরের ব্যাপারে কতটুকুই বা কল্পনা করতে পারি। ঈশ্বরের বিভূতির যখন প্রকাশ কোথাও হয় তখন তাঁকে নিয়েই ঈশ্বরের কল্পনা করা অনেক সহজ হয়, এখানে শ্রীকৃষ্ণ যেমন বলছেন – বৃষ্ণীদের ভেতর কার মধ্যে সব থেকে বেশি বিভূতি? আমার মধ্যে।

মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ, যত মুনিরা আছেন, তাঁদের মধ্যে আমি হলাম ব্যাস, যাঁর মা একজন শূদ্রা রমণী। *কবীনামূশনা কবিঃ*, কবি হলেন যিনি ত্রিকালদর্শি, যিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, পুরো তিনটে কালের ছবিটা পরিষ্কার দেখতে পান, কবিদের মধ্যে আমি উশনা, উশনা দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যকে বলা হয়। কবি বলতে সংস্কৃতে ত্রিকালদর্শিদের বোঝায়, পদ্য রচনাকারি কবিকে বোঝাচ্ছেন না।

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরসমি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্।।৩৮।।

(আমি শাসকগণের দণ্ড, জিগীষুগণের মধ্যে নীতি, গোপনীয় বিষয়সমূহের মধ্যে মৌন এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞান।)

শাসকগণেরা যে শাস্তি প্রদান করেন তার মধ্যে দমন, যে দণ্ড দিয়ে দমিয়ে দেওয়া হয়, সেই দণ্ডটা আমি। অবাধ্য প্রজাদের ঠাণ্ডা করবার জন্য দোর্দণ্ড প্রতাপশালী কাউকে দিয়ে যে তাদের দমন করা হয় সেটা ভগবান নিজে। *নীতিরস্মি জিগীষতাম্*, জীবনে যাঁরা জয়ী হতে চান, ঐ জয় কিভাবে পাওয়া যাবে, এর জন্য তাঁরা যে নীতি নেন, সেই নীতিটা আমি। *মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং*, যত রকম গুহ্য জিনিস হয়, তার মধ্যে আমি হলাম মৌন। মৌনের মত গুহ্য আর কিছু হয় না। যার জন্য আমাদের রাজধর্মে বলা হয়, যখনই কোন মন্ত্রণা করবে, সেখানে দুইএর বেশি কারুর সাথে মন্ত্রণা করবে না। গুহ্যের যত রকমের ভাব হতে পারে, বাক্সতে লুকিয়ে রাখছেন, আলমারীর লকারে রাখছেন, মাটির তলায় চাপা দিয়ে রাখছেন, কিন্তু মৌনের মত কিছু হয় না। যত বড় প্রশাসক বা রাজনীতিবিদ হোন না কেন তার ট্রেড সিক্রেট কারুর না কারুর সাথে শেয়ার করতেই হয়, হয় তার স্ত্রীর সাথে না হয় খুব নির্ভরশীল কারুর সাথে কিন্তু এটাই আবার কোন না কোন ভাবে বেরিয়ে গিয়ে জানাজানি হয়ে যায়। কিন্তু যারা পাক্কা ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ বা প্রশাসক তাদের পেট চিড়ে দিলেও মুখ থেকে কোন কথা বেরোবে না, যেটা চাণক্যের একটা বড় নীতি, আসল কথা কখনই মুখ থেকে বেরোবে না। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ঠিক এই রকম ছিলেন। *জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্*, জ্ঞানবানদের যে জ্ঞান, সেটা আমি নিজে। এত বিভূতির কথা বলার পর ভগবান অর্জুনকে বলছেন –

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্।।৩৯।।

(হে অর্জুন, সর্বভূতে বীজরূপে যেটা, সেটাও আমি। স্থাবর বা জঙ্গম এমন কোন বস্তু নেই, যা আমাকে ছাড়া সত্তাবান্ হতে পারে। সর্বভূত মদাত্মক।)

সমস্ত যে ভূত, যাবতীয় যা কিছু আছে, তার যে বীজ, সেটা আমি। তার মানে সমস্ত কিছুর উৎপত্তির কারণ আমি। এতটা বলার পর, ভগবান এবার সব কিছুকে গুটিয়ে আনছেন। *ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্,* এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, চরাচরে কোন জীব নেই, যেটা আমি ছাড়া। আমি ছাড়া হলে ওটা সত্তা বিহীন হয়ে যাবে। সৎ, চিৎ ও আনন্দ মিলে সচ্চিদানন্দ, ভগবান হলেন এই সচ্চিদানন্দ। যখনই বলছি আছে, যেমন বলছি এই কলমটা আছে, আছে মানেই এর সত্তা আছে। আর সত্তা আছে মানে সৎ আছে, কলমের মধ্যে ভগবানকে থাকতেই হবে। আমরা ছোটবেলা একটা ইংরাজী কবিতা পড়তাম, এখন অতটা মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে, এক গরীব ভিখারীকে নিয়ে কবিতা, বলা হচ্ছে, সমাজ ওকে বার করে দিয়েছে, আর ভগবানও ওর ভিতর থেকে বেরিয়ে গেছেন। তখন বুঝতে পারতাম না। এখন এই রকম জিনিস পড়লে সঙ্গে সঙ্গে বলব, হে আমার ইংরেজ ভাই, তোমার ধর্ম খুব বিচিত্র ধর্ম, ভগবান কখন কাউকে ছাড়তে পারেন না। কারণ ভগবান যদি না থাকেন তাহলে তার সত্তাও থাকবে না, কারণ সর্বভূত মদাত্মক।

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া।।৪০।।

(হে অর্জুন, আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নেই; আমি সংক্ষেপে এই সমস্ত বিভূতির বর্ণনা তোমাকে করলাম।)

হে অর্জুন, আমার বিভূতি, আমার যে বিস্তার, এর শেষ নেই। আগেকার দিনে কন্যার জন্য পাত্র দেখা হলে জিজ্ঞেস করত, ছেলের সম্পত্তি কত। পরিষ্কার করে বলে দিত, জমি এত বিঘা, কোঠা বাড়ি তিন খানা, তখনকার দিনে লোকেদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স থাকত না, কিন্তু টাকার পরিমাণটা জানাতে হত। এখন যেমন ভোটের সময় ভোটের প্রার্থিদের স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তির সব হিসাব দিতে হয়। ভগবানকে যদি এভাবে বলা হয়, আপনার কত কি সম্পত্তি আছে বলুন তো। তিনি কি আর বলবেন, শুধু এটুকুই বলবেন, আমার বিভূতির কোন অন্ত হয় না। বলছেন, দেবতা হোক, ঋষি হোক, মানুষ হোক কেউ ভগবানের বিভূতি শেষ করতে পারবে না। *এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো,* তোমার কাছে সংক্ষেপে আমার বিভূতি একটা অংশ বলা হল। হে অর্জুন তুমি যদি বুঝতে চাও, তাহলে শুনে রাখো –

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্।।৪১।।

(যা কিছু ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন বা উৎসাহসালী সেই সব কিছুই আমার শক্তির অংশ সম্ভূত বলে জানবে।)

কামী পুরুষরা কোন সুন্দরী নারীকে দেখে আকৃষ্ট হয়, এই যে নারীর সৌন্দর্য, এই সৌন্দর্যেও ভগবানের নিজের প্রকাশ; যেখানে যা কিছু সৌন্দর্য নজরে আসে, সেখানেই ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ। জগতে যে যে বস্তু বিভূতি যুক্ত, যেটাকে দেখলে আমরা বলি, আহা কি সুন্দর, আহা কি বুদ্ধি, কোন কিছু দেখে যখন এই 'আহা' শব্দটা মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, বুঝতে হবে এখানে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ আছে। ভগবানের প্রকাশ যদি না থাকে এই বিভূতি হবে না। শ্রীমান, অর্থাৎ ঐশ্বর্য আর উর্জিত মানে শক্তি, যেখানে বিভূতি আছে, ঐশ্বর্য আছে, শক্তি আছে, বুঝতে হবে ভগবান নিজে সেখানে বিদ্যমান। প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, উচ্চ পদাধিকারি, এনাদের যে শক্তি, এই শক্তি ভগবান নিজে। শক্তিও এক সময় চলে যায়; যদি ঠিক ভাবে ধরে না রাখতে পারেন, শক্তি চলে যাবে। আবার এও আমরা দেখেছি, ক্ষমতার ঐ পদে থাকতে থাকতে গত হয়ে গেছেন, তখনও শক্তি

তাঁকে ছেড়ে যায়নি। অসৎ, লোভী, মিথ্যাচারী যারা, তাদের শক্তিটা চলে যায়। শিষ্ট যাঁরা তাঁদের শক্তি যায় না।

যাদের মধ্যে শ্রী আছে, উৎসাহ আছে, বুঝতে হবে সেখানে ভগবানের প্রকাশ হয়েছে। নিজেকে যদি কেউ ভাবে, I am the best, সেখান থেকে যে উৎসাহটা আসে, সেটাই পরে নিয়ে যাবে –আমি বিশ্ব জয় করতে পারি, এই উৎসাহে। স্বামীজী বার বার এই ভাবটাকে আনতেন। কারুর ভিতরে যদি এই শক্তি থাকে, সে অবশ্যই পারবে। যে শক্তিতে বিল গেটস্ আজ বিল গেটস্ হয়েছেন, সেই শক্তিটা আমার ভিতরে, আপনার ভিতরেও আছে। বিল গেটস্ সেই শক্তিটা জাগিয়েছেন, আমি, আপনি জাগাইনি।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।।৪২।।

(অথবা হে অর্জুন, আমার বিভূতির এত কিছু জানবার তোমার প্রয়োজন কি? এইমাত্র জেনে রাখ যে, আমিই এক পাদমাত্র দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করে আছি।)

বিয়াল্লিশ নম্বর শ্লোক খুব বিখ্যাত শ্লোক, এই শ্লোককে আধার করেই কৃষ্ণভক্তরা বলেন কৃষ্ণই একমাত্র ভগবান। *অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন*, অর্জুন তোমাকে বিস্তারে কত বলব, নিজের কথা কত আর বলব। উর্দুতে এর খুব সুন্দর অভিব্যক্তি আছে, উর্দুতে কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কে, উর্দুতে এটাকে খুব বাজে শব্দে বলা হয়, ওরা বলবে, আপকি তারিফ্? অর্থ হল, আপনি কে, আপনার বর্ণনা দিন। তারিফ শব্দের অর্থ আবার প্রশংসা হয়। উর্দু খুব indirect ভাষা, এবং অত্যন্ত মধুর ভাষা। পার্সি থেকে এসেছে কিনা, পার্সি খুব প্রাচীন ভাষা। ভগবান বলছেন, আমি কত আর আমার প্রশংসা করব। তোমার বোঝার জন্য আমি একটা মূল মন্ত্র তোমাকে বলে দিচ্ছি। এই যে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার একটা খুব ছোট্ট অংশ। আচার্য অংশকে ব্যাখ্যা করছেন, *একাবয়বেন*, আমার একটা ছোট অঙ্গ, *একপাদেন সর্বভূতস্বরূপেণ ইতি এতৎ*, তার সাথে আচার্য তৈত্তেরিয় আরণ্যক থেকে উল্লেখ করছেন, *পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি*। আমাদের চোখের পাতায় যে পাপড়ি, এখানে এক ধরণের বিশেষ ব্যকটেরিয়া থাকে, ওখানেই ওদের পুরো বিশ্ব, ওখানেই জন্মাচ্ছে, ওখানেই বড় হচ্ছে, ওখানেই মরছে। আমাদের কাছে যেমন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ওদের যদি চেতনা থাকত তাহলে ওদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হত আমাদের চোখের পাপড়ির মত অতটুকু জায়গা। আমাদের শরীরে কিছু কিছু অঙ্গ আছে যেখানে ব্যাকটেরিয়ার পুরো একটা কলোনি হয়ে আছে, পুরো একটা ব্রহ্মাণ্ড, ওটাই তাদের কাছে সব। যাই হোক, বলছেন, ভগবানের যে একটি ছোট্ট অঙ্গ, এটাই পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। অর্জুন এতটুকু বুঝে নাও, পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার একটি ছোট্ট অঙ্গে অবস্থান করে আছে, তাহলেই বুঝতে পারবে আমার বিভূতি কি।

এই হল দশম অধ্যায়, এরপর শুরু হবে একাদশ অধ্যায়। ভগবানের কথা শুনে অর্জুন স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছেন। আর বলছেন, এই যে এগুলো বললেন, এটাকে কি একটু বাস্তবে দেখতে পারি? এটা যে শুধু থিয়োরেটিক্যালি মন থেকে বলে দিচ্ছেন, তা না। ঠাকুর বর্ণনা করছেন, একদিন তিনি বিশ্বরূপ দেখছেন, এক একটা ফুলের গাছ যেন ভগবানের সামনে একটা ফুলের তোড়া অর্ঘ্য দেওয়া হয়েছে। এই ভাবটাকে নিয়েই আমরা এবার একাদশ অধ্যায়ে প্রবেশ করব।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপদর্শনযোগ

শুরু করার আগে একাদশ অধ্যায়ের ব্যাপারে একটা দুটো কথা জানা থাকলে আমাদের অনেক কিছু বুঝতে সুবিধা হবে। প্রথম কথা হল, সাহিত্যের দিক থেকে দেখতে গেলে, কাব্যরস যদি আস্বাদ করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে এই একাদশ অধ্যায়কে আমাদের বেছে নিতে হবে। সাহিত্য, কবিতা এই অধ্যায়েই পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যাবে। এই অধ্যায়ের কাব্যিক সৌন্দর্য খুবই উন্নতমানের। ঈশ্বরের বর্ণনাতে যে কাব্যিক সৌন্দর্যকে প্রকাশ করা যায়, একাদশ অধ্যায় না পড়লে বোঝা যাবে না। কিন্তু কাব্যরসের অনুসন্ধান করা আমাদের কাজ নয়, আমাদের লক্ষ্য কিভাবে আমাদের জীবনকে ঈশ্বরাভিমুখী করতে পারি।

আমরা সারা দিন অনেক কিছু করছি, ভাল-মন্দ সব রকম করছি, কারুর সঙ্গে ঝগড়া করছি, কাউকে আবার ভালবাসছি। অনেক সময় আমাদের মনে হয়, জীবনে কি আমরা এটাই চাইছি? তা তো নয়; জীবনে আমরা একটাই জিনিস চাই, এগিয়ে যাওয়া। কাউকে ভালবেসে যদি এগিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে তাই করতে হবে; কারুর সঙ্গে ঝগড়া করে তার থেকে দূরে সরে গিয়ে যদি এগিয়ে যাওয়া যায়, তাহলেও তাই করতে হবে, লক্ষ্য এগিয়ে যাওয়া। সংসারে কর্তব্য পালন করতে হয়, এটাই এগিয়ে যাওয়ার পথ। সন্ন্যাসী সব কিছু ত্যাগ করে দেন, তাতেই তিনি এগোন। আমাকে যে এটাই করতে হবে, এ-রকম বাঁধাধরা কিছু নেই। নিজেকেই নিজের পথ বার করে নিতে হয় ঠিকই; আবার এও ঠিক যে, যিনি গুরু, যিনি আমার হিতৈষী, যিনি আমাকে জানেন, বোঝেন, তিনি আমাকে ঠিক পথ দেখিয়ে দেবেন। এগিয়ে কোথায় যাব? এগোতে এগোতে কোথায় আমরা পোঁছাতে চাইছি? আমি যদি এখান থেকে এগোতে থাকি, দেওয়ালে গিয়ে ধাক্কা লাগবে। তা না, এগিয়ে এগিয়ে এমন জায়গায় যাব, যেখানে আমার মন ঈশ্বর চিন্তন বা চৈতন্যের চিন্তা করতে করতে, তাঁর সাথে আমি এক হয়ে যাব।

মনে যে অবিরাম হাজার রকমের চিন্তা চলে, সব চিন্তাকে সরিয়ে একমাত্র একটি চিন্তাতে মনকে ধরে রাখতে হবে। দীক্ষা নিয়ে যাঁরা মন্ত্র জপ করছেন, খুব ভাল। জপ করলে মনটা একটু প্যাটার্ন হয়, এলেমেলো মনকে একটা জায়গায় গুছিয়ে আনা যায়। বাচ্চাদের গান করে, ছড়া দিয়ে লেখাপড়া শেখানো হয়। ছন্দ, সুর ও তাল থাকলে মানুষের মন ঐ জিনিসটাকে ধরতে পারে। বাচ্চা যদি কোন সাবজেক্ট শিখতে না চায়, ইতিহাস, ভূগোল, ওকে যদি ছড়া করে শিখিয়ে দেওয়া যায়, খুব তাড়াতাড়ি ধরে নেবে। জপে একই জিনিস হয়, মন একটা ছন্দে চলে আসে।

কিন্তু এটাই যথেষ্ট না, শুধু এই দিয়ে পুরোটা হয় না। মন হল ধোপা ঘরের কাপড়, যে রঙে ছোপান হবে সেই রঙে ছুপবে। মনকে তাই ঈশ্বরের রঙে সব সময় ছোপান দরকার। কিভাবে ছোপাতে হবে? দিনে প্রচুর জপ করা হল, মনের একটা প্রস্তুতি হয়ে গেল, মনটা এবার পরিষ্কার হয়ে গেল। জামা কাপড় পরিষ্কার হয়ে গেল, এবার রঙ ধরাতে হবে। আমরা তো এখানে বিজ্ঞান, ইতিহাস পড়ার জন্য আসিনি, ধর্ম পথে চলার জন্য এসেছি। এবার ঐ পরিষ্কার মনকে ঈশ্বরে ডুবিয়ে দিতে হবে। অনেক ভাবেই ঈশ্বরের রঙে ছোপান যায়। একটা ভাল রঙ হল, ঈশ্বরের গুণচিন্তন। সপ্তম অধ্যায় ঈশ্বরের গুণচিন্তন দিয়েই শুরু হয়। আরেকটা ভাল রঙ হল লীলাচিন্তন। গীতাতে লীলাচিন্তন খুব বেশি নেই, লীলাচিন্তন পুরাণে, বিশেষ করে ভাগবত পুরাণে প্রচুর আছে। আমরা হিন্দুরা সেই

ছোটবেলা থেকে প্রচুর কাহিনী শুনে বড় হয়েছি, শিবের কাহিনী, শ্রীরামের কাহিনী, শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী, নানা রকমের কাহিনী শুনে এসেছি। সেইজন্য আমাদের পক্ষে লীলাচিন্তন করা এমন কিছু কঠিন না। যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত আছেন, তাঁরা সবাই আশা করি ঠাকুরের কাহিনী পড়েছেন বা শুনেছেন। ধ্যান করার জন্য চারটে কাহিনী জানলে যথেষ্ট।

মনকে ছোপানর জন্য আরেকটা রঙ –রূপচিন্তন। একাদশ অধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য হল রূপচিন্তন। সামান্য গুণের বর্ণনা আছে ঠিকই, কিন্তু এর থেকে অনেক বেশি ঈশ্বরের গুণকে নিয়ে সপ্তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে; এমনকি এর আগে যে দশম অধ্যায় আমরা করলাম, সেখানেও অনেক বেশি গুণের বর্ণনা আছে। একাদশ অধ্যায় পুরোপুরি রূপচিন্তন। কিন্তু ঈশ্বর তো অনন্ত, অনন্তের রূপ হয় না, ঈশ্বরের কোন রূপ হয় না। যাঁর কোন রূপ হয় না, তার মানেই তাঁর অনন্ত রূপ। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কি করছেন? আমি বললাম কিছু না। তার মানে আমি এখন যে কোন কাজ করতে পারি। আপনি কোথায় যাচ্ছেন? কোথাও না। তার মানে আমি যে কোন জায়গায় যেতে পারি। তার মানে সব কিছু খোলা। ভগবানের রূপ নেই, সেইজন্য তাঁর যে কোন রূপ হতে পারে। ভগবান মানুষ নন, ভগবানের কোন রূপ হয় না। তাহলে আমাদের এত মন্দির, এত বিগ্রহ কেন? আমরা তো নিজের মত আবোলতাবোল কিছু একটা করে নিতে পারি না। সেইজন্য একটা আলম্বন দিয়ে দেওয়া হয়। একটা প্রতীক, একটা রূপ দিয়ে দেওয়া হল, একটা আলম্বন দিয়ে দেওয়া হল, এর সাহায্যে তুমি এবার উপরে দিকে ওঠো। যখন আরও গভীরে কেউ যাবে, তখন সে নিজের মত অনেক কিছু করতেই পারে, তাতে কোন অসুবিধা নেই।

কিন্তু একাদশ অধ্যায় এর থেকে অনেক বেশি এগিয়ে যায়। আমাদের শাস্ত্রজ্ঞান থাকতে হবে, শাস্ত্রজ্ঞান না হলে ধর্ম জীবনে এগোন খুব মুশকিল। ঠাকুরের শাস্ত্রজ্ঞান ছিল, শ্রীশ্রীমায়ের শাস্ত্রজ্ঞান ছিল। ইদানিং কালে বিশেষ করে যারা ইয়ং, কুড়ি-একুশ বছর বয়স কি তার থেকে কম বয়স যাদের, এদের শাস্ত্র জ্ঞান খুব কম। কারণ বর্তমান কালে সমাজে এখন শাস্ত্র শেখানো হয় না। ফলে দু একটা উঠচলতি কথাকে নিয়েই মানুষ নিজেকে ধর্মের লোক বলে মনে করে, কিন্তু এভাবে ধর্ম হয় না, সাধন ভজনও এভাবে হয় না। ঠাকুরের সন্তানদের শাস্ত্রজ্ঞান ছিল, এবং পরে ওনারা সবাই প্রচুর শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। কারণ ঈশ্বরের ব্যাপারে একটা পরিষ্কার ধারণা যদি না হয়, এগোন যায় না। কিন্তু তাতেও হয় না, একাদশ অধ্যায় এটাই দেখাচ্ছে। শাস্ত্রজ্ঞান ভাল ভাবে হয়ে গেছে, ঈশ্বরের ব্যাপারে ধারণা খুব ভাল ভাবে হয়ে গেছে; এতক্ষণ যাবৎ ভগবান তাই করে গেছেন, দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে দশম অধ্যায় পর্যন্ত ঈশ্বরতত্ত্ব শুধু বলে যাচ্ছেন। কিন্তু তাতে পুরোটা হয় না, যার জন্য ভগবান এবার নিজেকে পুরো উন্মুক্ত করে দেখিয়ে দিচ্ছেন, এই দেখো আমি এই রকম।

কিন্তু আবার সেই এক কথা, ভগবানের স্বরূপের ইতি করা যায় না, কিন্তু এই অধ্যায়ে ভগবান তাঁর একটা ভাব দেখাচ্ছেন, বিশ্বরূপদর্শন এটা একটা ভাব। আধ্যাত্মিক জীবনে এই ভাব খুব important, একাদশ অধ্যায়ে এই ভাবটা খুব পরিষ্কার করে নিয়ে আসা হয়েছে, যতক্ষণ কোন রূপদর্শন না হয়, কোন এমনি এলেবেলে কিছু দেখে নিলাম, সেটা না; শাস্ত্র পড়া আছে, সাধনা করা হয়েছে, তারপরে যে রূপ দর্শন হয়, আসল দর্শনটা হল যেখানে জীবনটা পুরো পাল্টে যায়। ভগবান একাদশ অধ্যায়ে বলবেন, আমি এদের সবাইকে আগেই মেরে রেখেছি, *নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচী*, তুমি নিমিত্ত মাত্র হও, তোমাকে কিছু করতে হবে না। এই জ্ঞান –প্রথম, ঈশ্বরই আছেন; দ্বিতীয়, ঈশ্বরই সব কিছু করেন। অনুভূতিতে যদি এই দুটি জ্ঞান না আসে, তার মানে আমিত্বের নাশ যদি না হয়, ঐ দর্শনের কোন দাম নেই। ঠাকুর যদি এসে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলেন, এই দেখো আমি তোমার সামনে এলাম, আমি রামকৃষ্ণ পরমহংস; তাতে হলোটা কি, এই দর্শনে আমার কি লাভ হল?

১৯৮৬ সালে ঠাকুরের মহাসমাধির শতবার্ষিকী, তার সাথে ঠাকুরের দেড়শ বছর জন্মবার্ষিকী। সেই সময় বেলুড় মঠের ম্যানেজার ছিলেন প্রিয়লাল মহারাজ। ঠাকুর বলেছিলেন, একশ বছর পর আমি আবার আসব, যদিও আমরা এগুলোকে খুব একটা ধর্তব্যের মধ্যে আনি না। একজন ঠাকুরের মত দাড়ি লাগিয়ে, ঠাকুরের মত বেশে সেজে এসে প্রিয়লাল মহারাজের কাছে গিয়ে বলছে, 'একশ বছর হয়েছে, মনে আছে তো'? ম্যানেজার মহারাজ বলছেন, 'হ্যাঁ মনে আছে'। 'এই যে এসে গেছি'। প্রিয়লাল মহারাজ খুব সুন্দর বললেন, 'এসেছেন খুব ভাল করেছেন, 'এই কুপনটা নিন, প্রসাদটা খেয়ে যাবেন'। আমার সামনে ঠাকুর এসে যদি বলেন, 'ওহে সমর্পণানন্দ আমি এসেছি'। আমি কি বলব, 'বসুন, দেখি একটা চা-টা কিছু আপনাকে খাওয়াতে পারি কিনা'। এর বেশি কোন দাম নেই। দাম হয়, যদি এই দুটি জিনিস তার জীবনে হয়। প্রথম ঈশ্বরই আছেন, ঈশ্বর বই দ্বিতীয় আর কিছু নেই; দ্বিতীয় সব কিছু ঈশ্বরই করছেন। এই দুটো জ্ঞান যদি হয়, তবেই ঈশ্বর দর্শন বা যে কোন অনুভূতি সার্থক হয়, না হলে সব দর্শন, সব অনুভূতি বেকার।

যখনই এই দুটো হয়ে যাবে, তখনই আসবে শরণাগতির ভাব, প্রভু আমি তো কিছুই না। একাদশ অধ্যায়ে আমরা দেখব, এই অধ্যায়ের মত শরণাগতি আর কোথাও নেই। শরণাগতি জিনিসটা কি, কি করে শরণাগত হওয়া যায়, এই জিনিসটাকে আমরা এই অধ্যায়ে দেখব। ঠাকুর বলছেন, ভাল লোককে অছি করলে সে কখন ক্ষতি করবে না। ভগবানকে কি করে আমি দায়ীত্ব দেব বলুন, আজকে যে করোনার এত বিপদ, আমি কি করে ঠাকুরকে এই বিপদ সামলাতে দেব? আমাকে তো আগে জানতে হবে ঠাকুর এই বিপদ সামলাবার যোগ্য কিনা। আমার বিশ্বাস নেই, তাই আমি ডাক্তারের কাছে যাব, আমাকে ওষুধ খেতে হবে, ভ্যাকসিন নিতে হবে। কিন্তু আমি পরিষ্কার জেনে গেলাম, ঠাকুরই মারেন, ঠাকুরই বাঁচান, তখন এগুলো থেকে মন উড়ে যায়। ঠাকুর যখন গলায় ক্যান্সার নিয়ে ভুগছেন, উনি বলছেন, আমার এখন এমন অবস্থা যে, হয় সবাইকে বিশ্বাস করতে হয়, না হলে কাউকে বিশ্বাস নেই। তবে গিয়ে শরণাগতি হয়।

খুব সুন্দর গল্প, ঠাকুর বলছেন, বৈকুণ্ঠ ধামে ভগবান বিশ্রাম করছেন, হঠাৎ তিনি উঠে বাইরে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। তারপর কিছুক্ষণ পরই আবার ফেরৎ চলে এলেন। লক্ষ্মীদেবী জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার, এই দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন, আবার একটু পরেই চলে এলেন'? ভগবান বলছেন, 'আমার এক ভক্ত আমার নাম করতে করতে যাচ্ছিল, আমার নামে এমন ডুবেছিল যে ধোপারা কাপড় শুকোতে দিয়েছে সেই কাপড় মারিয়ে যাচ্ছিল, ধোপারা আমার ভক্তকে মারার জন্য লাঠি নিয়ে দৌড়ে এসেছে'। 'তাহলে ফিরে এলেন কেন'? 'না, দেখলাম, সেও একটা পাথর তুলে নিয়েছে ধোপাদের মারার জন্য'। প্রহ্লাদের মত বিশ্বাস আমাদের হতে পারে না। তাঁকে পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, হাত-পা বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তিনি সব ভাবে নিজেকে ঈশ্বরের উপর সঁপে দিয়ে নিশ্চিত হয়ে আছেন। আমরা ঈশ্বরকে তো দেখিনি। অনেক সময় অনেকে ইয়ং ছেলেরা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনার কি ঈশ্বরে এক পয়সা বিশ্বাস আছে'? আমি বলে দিই, 'না ভাই, এক পয়সা বিশ্বাস নেই। আমি যাঁকে দেখিনি, কি করে তাঁকে বিশ্বাস করব! ঠাকুরের ছবি দেখেছি, তাঁর বই পড়েছি, হ্যাঁ ঠাকুর ছিলেন এই বিশ্বাসটা আছে, কিন্তু আমি তো ঠাকুরকে কখন দেখিনি। কিন্তু যে গুরুজনদের মুখে ঠাকুরের কথা শুনেছি, সেই গুরুজনদের উপর আমার পুরো বিশ্বাস আছে। এই পুরো ব্যাপারটা বিশ্বাসেই চলে। ডাক্তার যখন আমাদের প্রেসক্রিপশান দেন, ওটা বিশ্বাস চলে, আমি জানি ওনার ওষুধে আমার রোগ ভাল হবে'।

একজন ইয়ং ছেলে অনেক খেটেখুটে ডাক্তারী পড়তে ইংল্যাণ্ড চলে গেছে। সেখান থেকে ইংরাজীতে একটা চিঠি লিখেছে। বাবা-মা ইংরাজী জানে না, চিঠি পড়তে পারছে না, তারপর আবার ডাক্তারের হাতের লেখা এমনিতেই পড়া যায় না। চিঠিটা ওষুদের দোকানে নিয়ে গেছে। 'ছেলে চিঠি লিখেছে, একটু পড়ে দেবেন কি লিখেছে'? দোকানের লোকটি উপর থেকে নীচ পর্যন্ত চিঠিটা পড়ল।

পড়ার পর দুটো প্যারাসিটামল ট্যাবলেট তার হতে ধরিয়ে দিল। এর অর্থ হল, ডাক্তার কি লিখেছে সে বোঝে কিনা ভগবান জানেন। এগুলো জোকস্, সিরিয়াসলি নেবেন না। আমাদের বিশ্বাস আছে যিনি ওষুধ দিচ্ছেন তার উপর। যে কোম্পানিতে ওষুধ তৈরী হয়েছে, আমরা কি করে জানব যে, ওর মধ্যে ওষুধ আছে নাকি শুধু চুন আছে। জগৎটা পুরো বিশ্বাসের উপর চলে। আমি আমার আচার্যদের বিশ্বাস করি, তাই ঠাকুরের উপর বিশ্বাস আছে। কিন্তু যে অর্থে বিশ্বাস হওয়া দরকার, দর্শন না হওয়া পর্যন্ত ঐ বিশ্বাস আসতে পারে না।

স্মৃতি যদি ঠিক থাকে তাহলে এই বিশ্বাসটা গীতায় কোথা থেকে শুরু হয়েছে আমরা মনে করতে পারব। অর্জুনের মন পুরো বিষাদে ভরে গেছে। মনে বিষাদ বা দুঃখ এলে, আমাদেরও এই দুঃখ বা বিষাদ হয়, তখন ঈশ্বরের দিকে এগোন যায় না। জীবনে আর কিছু নেই, যত সম্বল ছিল সব চলে গেছে, মনে হয় আমি শেষ হয়ে গেলাম। সেই সময় হঠাৎ আমি একজনকে দেখলাম, যাকে দেখে আমার বিশ্বাস হল, গিয়ে বললাম, আমাকে বাঁচান – *শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্,* আমি আপনার শিষ্য আপনি আমায় রক্ষা করুন। তখন তিনি আমার হাতটা ধরলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঐ যে শরণাগতির ভাব শুরু হয়েছিল, যেখানে অর্জুন বলছেন, *শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্,* এই শরণাগতির পূর্ণতা প্রাপ্তি হচ্ছে এই একাদশ অধ্যায়ে এসে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুনের ওটা মুখের কথা ছিল, আমরা যেমন ভাবে বলি, ঠাকুরের ইচ্ছা, ঠাকুরই রক্ষা করবেন, এগুলো আমাদের সব মুখের কথা। মুখের কথার কোন দাম নেই, দাম হয় তখন যখন তাঁর সাক্ষাৎ হয়। একাদশ অধ্যায়ে ভগবান সাক্ষাৎ করাচ্ছেন, তখন অর্জুন ঠিক ঠিক বুঝলেন, আপনিই সব করান। এখানে ঠাকুরের ইচ্ছা বলে কিছু হচ্ছে না, ঠাকুরের ইচ্ছায় হয় না, ঠাকুরই তো একমাত্র কর্তা, তিনিই করছেন। ঈশ্বর ছাড়া কেউ কিছু করতে পারে না। কিন্তু আমাদের ভিতর তিনি আমিত্ব, অহং ভাবটা ঢুকিয়ে রেখেছেন, যার জন্য মনে হয় আমি করছি, এটাই সংসার। গুরুকৃপায় আমিটা যদি মুছে যায়, তখন পরিষ্কার দেখতে পারব তিনিই সব করেন। এই বোধটা পাকাপাকি ভাবে হওয়ার আগে আমরা যে শাস্ত্রের কথা শুনছি, সাধুসঙ্গ করছি এতেও একটা বোধ হয়। কিন্তু আসলটা হয়, এই ধরণের অনুভূতি যখন হয়, তখন ঠিক ঠিক ধর্মের দিকে মনটা যায়; এই যে ধর্মের দিকে মন গেল, আর ওখান থেকে মন ফিরে আসবে না। একাদশ অধ্যায় এই জিনিসটা দর্শনের দিক দিয়ে কাব্যিক ভাবে আমাদের সামনে তুলে দিচ্ছেন।

দর্শন আর কাব্য যে একসাথে চলতে পারে একাদশ অধ্যায় না পড়লে বোঝা যায় না। এর যেমন দর্শন, তেমন তার কাব্য। দর্শন হল কাঠখোট্টা কোন রস নেই, তলোয়ারের মত সব কেটে দেয়, অন্য দিকে কাব্য হল মধুর, হৃদয়কে স্পর্শ করে। শ্রীকৃষ্ণের যখন বর্ণনা করা হয় তখনও এভাবেই করা হয়, একদিকে তিনি কত মধুর, প্রেমিক, গোপীদের সাথে লীলা করছেন, তার সাথে কত কঠোর, শত্রুদের ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছেন। মা দূর্গাকে যে আমরা চিন্তন করি, এই একই ভাবে; শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মায়ের কি সুন্দর বর্ণনা, তিনি সৌম্য থেকেও সৌম্য।

এই হল একাদশ অধ্যায়ের প্রেক্ষাপট। এখানে মূল হল ভগবানের বিশ্বরূপদর্শন, তিনি যে সব কিছুতে বিদ্যমান, এই জিনিসটাকে গীতা সামনে নিয়ে আসছেন। আমরা যে শিবের একটা রূপ দেখি, শ্রীকৃষ্ণের একটা রূপ দেখি, এখানে সেটা নেই, এখানে ভগবানকে এক মহাজাগতিক রূপে দেখানো হচ্ছে। বেদের যে মন্ত্র, *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি,* এটাও বিশ্বরূপের ভাব, কিন্তু এখানে পরিষ্কার চোখের সামনে দেখিয়ে দিয়ে বলছেন, এই ভাবে দেখ। যেখানে জীবন-মৃত্যু একসাথে খেলা করছে, উঁচু-নীচু একসাথে চোখের সামনে খেলা করছে।

আচার্য শঙ্কর একাদশ অধ্যায় শুরু করার আগে খুব সুন্দর বলছেন, দশম অধ্যায়ের শেষে ভগবান *একাংশেন স্থিতো জগৎ* বললেন। আপনার এই একাংশেই জগৎ? তাহলে আপনার এক অংশে যে জগৎ অবস্থিত, সেই জগদাত্মক ঈশ্বরীয় বিশ্বরূপ সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা করি। শ্রীকৃষ্ণের কথাতে অর্জুনের ভিতর অনুসন্ধিৎসা জেগে উঠেছে, জানার ইচ্ছে হয়েছে –

অর্জুন উবাচ
মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোহয়ং বিগতো মম।।১।।

(অর্জুন বললেন –হে ভগবন্, আমার প্রতি অনুগ্রহ করে অতিগুহ্য পুরুষার্থপ্রদ আত্মানাত্ম-বিবেকবিষয়ক যে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব আপনি বললেন, তার দ্বারা আমার এই (আত্মার কর্তৃত্বাদিশূন্য স্বরূপের আবরক) মোহ দূর হয়েছে।)

হে প্রভু আমার প্রতি আপনার অশেষ কৃপা, তাই কত গুহ্য কথা সব বলে গেলেন। *পরমং গুহ্যং*, এই কথাগুলো সবার জন্য নয়। গীতার শেষে ভগবান অর্জুনকে বলবেন, যাকে তাকে এই কথাগুলো শুনিও না। গুহ্য এই অর্থে, যাদের প্রস্তুতি নেই, তারা এই সব কথা শুনলে জিনিসটাকে খেলো করে দেব, এরাই বলে বেড়াবে –শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখিয়েছে না ছাই দেখিয়েছে, যত সব গাজাখুঁড়ি কথা। উত্তম শিক্ষা গুরু সেই শিষ্যদেরই দেন যাঁদের আধার তৈরী হয়ে গেছে। এই জিনিসগুলো সবার সামনে দেওয়া হয় না, খুব ব্যক্তি বিশেষকে দেওয়া হয়। আচার্যের ভাষায় অধ্যাত্ম হল *আত্মনাত্মকবিবেক-বিষয়ং*। অনেকে এসে জিজ্ঞেস করে বেদান্ত কি? এর উত্তর একটাই –আত্ম ও অনাত্মক যে বিবেক এই বিবেককে বেদান্ত জাগিয়ে দেয়, এ ছাড়া আর কিছু না।

অর্জুন বলছেন, আপনার মুখ থেকে এসব কথা শুনে আমার মোহ নষ্ট হয়ে গেছে। অর্জুনের যে কতবার মোহ নষ্ট হয়েছে কে জানে। শেষেও আবার বলবেন আমার মোহ নষ্ট হয়ে গেছে। মোহ মানে অবিবেক বুদ্ধি। কিন্তু এর মধ্যে গুরুত্ব হল, অনেকেই আমাদের এই আলোচনা শুনছেন, শুধু শুনে গেলে হয় না, নিজেদের ভিতর এগুলোকে নিয়ে একটা আলোচনা করতে হয়। এখানে কি হচ্ছে, অর্জুন বলছেন, *মোহহয়ং বিগতো মম*, অর্জুনের তাত্ত্বিক জ্ঞানটা ছিল, ঐ theoretical understandingএ তাঁর মোহ নাশ হয়ে গেছে। এই তাত্ত্বিক জ্ঞানেও যদি মোহ নাশ হয়, সেটাও বিরাট ব্যাপার, কারণ তখন সত্যটা জানার সত্যিকারের ইচ্ছা জাগে। অনেকে কথায় কথায় বলে থাকেন, সত্যিই ইচ্ছে করে ঠাকুরের যদি দর্শন হয়, এগুলো সব ইমোশানাল কথা, কোন দাম নেই। হুঁশ নেই, একটা কিছু বলে দিচ্ছে; এক জালা জল খাবো, ঠাকুরের দর্শন চাই, এগুলো ইমোশানালিজম্। আবার ঠাকুর বলছেন, বাচ্চারা যেমন বলে, তোর ঈশ্বরের দিব্যি। আমরা সবাই এই রকমই। কিন্তু গীতার এই তত্ত্বগুলির মধ্যে যদি সব সময় থাকা হয়, লেগে থাকা হয়, তখন বুদ্ধিটা খুলে যায়। বুদ্ধি খুলে গেলে তার কথাবার্তার মধ্যে ইমোশানালিজম্ থাকবে না। সেইজন্য যদি দেখা যায় ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করার সময় কেউ ইমোশানাল কথাগুলো বলে, তখন তাকে সন্দেহ করতে হয়। ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এনারা কক্ষণ ইমোশানাল কথা বলছেন না। কারণ ধর্ম ইমোশানালের উপর চলে না, ধর্ম চলে সব সময় একেবারে যুক্তির উপর। এগুলোকে নিয়ে যত আমরা চর্চা করব, সৎসঙ্গ করব, আলোচনা করব, তত এটা পরিষ্কার হবে।

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্।।২।।

(হে পদ্মপলাশলোচন, ভূতগণের উৎপত্তি ও প্রলয় আপনার থেকে হয় এবং আপনার নিরুপাধিক ও সোপাধিক সর্বাত্মত্বাদিরূপ অক্ষয় মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবেই আপনার কাছে শ্রবণ করলাম।)

হে প্রভু আপনার কাছে সব বিস্তারে শুনলাম, কিভাবে আপনার থেকে প্রাণী থেকে শুরু করে সব কিছুর উৎপত্তি হয় আর লয় হয়। *ভবাপ্যয়ৌ, ভব* মানে জন্ম আর *অপ্যয়ৌ* মানে বিনাশ, *শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া*, সব কিছুর জন্ম ও বিনাশ কিভাবে হয় এই ব্যাপারে আপনি সংক্ষেপে না বিস্তারেই আপনার কাছে থেকে শ্রবণ করলাম। *ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ*, শ্রীকৃষ্ণ চোখ দুটো ছিল পদ্মপাতার মত, সেইজন্য বলছেন *কমলপত্রাক্ষ*। আপনার যে অক্ষয় মাহাত্ম্য, যেটা দশম অধ্যায়ে বলেছেন, এটাও বিস্তারে শুনলাম। আমার অনেক কিছু জানা হয়ে গেল, এখন আমি স্পষ্ট অনেক কিছু ধারণা করতে পারছি। অর্জুন একজন উত্তম শিষ্য ছিলেন। যার জন্য আচার্য গীতার ভাষ্য রচনার শুরুতে এটাই বলছেন, উত্তম শিষ্য পেলে শিক্ষার প্রসার প্রচার ভাল হয়।

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম।।৩।।

(হে পরমেশ্বর, আপনি যে আত্মতত্ত্ব বলেছেন, তা যথার্থ। তথাপি হে পুরুষোত্তম, আপনার জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য ও তেজঃসমন্বিত ঈশ্বরীয় বিশ্বরূপ সাক্ষাৎ করতে আমি ইচ্ছা করি।)

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর, আত্থ মানে বলা, হে পরমেশ্বর, আপনি যেভাবে আত্মতত্ত্ব বলেছেন, এটা যথার্থ, এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হে পুরুষোত্তম, *দ্রুষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং*, কিন্তু আপনার নিজের যে আসল রূপ, যেখানে জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য, তেজ, এই গুণগুলো পরিষ্কার দেখা যায়; এই রূপটা আমি দেখতে চাই। ক্লাশ এইট নাইনে আমরা যখন ফিজিক্স কেমেস্ট্রি পড়তাম, তখন অনেক সময় আমাদের যিনি শিক্ষক এগুলো পড়াতেন, তিনি ল্যাবরটরিতে নিয়ে গিয়ে আমাদের দেখাতেন, জিনিসটা এই। লোকেরা জানতে চায়, দেখতে চায় জিনিসটা কেমন। শুধু থিয়োরেটিক্যাল দিয়ে হয় না, আসলটা প্রত্যক্ষ করতে চায়। ঠাকুরও বলছেন, বই পড়ে ঈশ্বরের এক রকম ধারণা হয়, চিন্তন করে এক রকম হয়, প্রত্যক্ষ হলে আর-এক রকম ধারণা হয়। অর্জুন বলছেন, আপনার যে ঐশ্বর্যময় দিব্যরূপ, তার মানে যেগুলো আপনি বলে যাচ্ছেন, আপনি এর বীজ, ওর সার, এভাবে না, ঐশ্বর্য রূপে দেখতে চাই। লীলাপ্রসঙ্গে আছে, ঠাকুরেরও মাঝে মাঝে এই রকম ইচ্ছা হত, আচ্ছা দেখি তো এটা কি রকম, আর দর্শনও ঐ রকম পেতেন। আমরা এমনই অভাগা যে, আমাদের কোন কিছুই নেই। শাস্ত্র পড়েছি, সিনিয়র মহারাজদের কাছ থেকে দুটো কথা শুনেছি, বুঝেছি, সেটাই এখন আপনাদের শোনাচ্ছি। এটাই আমাদের ঠাকুরের সেবা, এটাই আমাদের সাধনা। ঠাকুর তো কোন আহাম্মক নন যে, এতটুকু সেবাতে খুশী হয়ে আমাকে দর্শন দিয়ে দেবেন। উঁচু মানের যিনি ভক্ত, যিনি ঠিক ঠিক ভক্ত, ঈশ্বরের সাথে সর্বদা জুড়ে আছেন, তাঁরা এই আবদারটুকু করতে পারেন। অধিকার বলাটা ঠিক না, আবদার বলা যেতে পারে, এখানেও অর্জুন যেন আবদারের সুরে বলছেন –

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রুষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্।।৪।।

(হে প্রভো, যদি আমি সেই বিশ্বরূপ দেখবার যোগ্য হই, তা হলে, হে যোগেশ্বর, আমাকে আপনার অব্যয় জগদাত্মরূপ দেখান।)

নিজের সখাকে অর্জুন প্রভু রূপে সম্বোধন করছেন, হে প্রভু, আপনি যদি আমাকে মনে করেন আপনার সেই রূপ দেখার জন্য আমি যোগ্য, কারণ আপনি নিজেকেও জানেন আর আমার মনকেও জানেন; তাহলে হে যোগীশ্বর, আমার খুব ইচ্ছে যে, আপনার সেই বিশ্বরূপটা যদি একবার দেখতে পারতাম। অর্জুন বলছেন, *দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম*, আচার্য বলছেন, *বৈষ্ণবং রূপং পুরুষোত্তম*, যে রূপে সমস্ত বিভূতিগুলি আছে, যেই বিভূতির কথা এর আগে আলোচনা হয়েছে;

দয়া করে এটা যদি দেখাতেন। আপনার যে অবিনাশী স্বরূপ, এটা যদি একবার দয়া করে দেখান। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ খুব ভালবাসেন। ইদানিং কালে খ্রীশ্চানরা একটা নূতন শুরু করেছে, যেখানে বলছে, Jesus loves you। আরে যীশু কাকে ভালবাসেন? মানুষ শুধু নিজের আত্মাকে ভালবাসে। ভগবান তখনই ভালবাসেন, যখন আত্মরূপে দেখেন। যতক্ষণ ঈশ্বর কাউকে ভাল না বাসছেন, ততক্ষণ তিনি নিজের স্বরূপ দেখাবেন না। যতক্ষণ আমাদের তিনি দেখাচ্ছেন না, তার মানে এখনও আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা হয়নি। ছোট্ট শিশু যখন মাকে ভালবাসে, তখন সে যা চায়, যা আবদার করে, যেমন বাচ্চা বলছে, মা ঐ বাক্সতে কি আছে, ঐ আলমারিতে কি আছে, মা দেখিয়ে দেন। মা নাও দেখাতে পারেন, কিন্তু আবদার করলে দেখিয়ে দেন। বাইরের লোককে তো দেখাবেনই না।

শুধু দেখা দাও, দেখা দাও বললে হবে না, আগে তাঁর সন্তান হতে হবে, আর সেটা আমাকে বুঝলে হবে না, ওনাকেও বুঝতে হবে। আমরা হঠাৎ হঠাৎ করে কাউকে বলতে শুরু করি, আমি তোমাকে ভালবাসি। আরে তুমি তো ভালবাস, কিন্তু সে তোমাকে ভালবাসে কিনা আগে দেখ। অনেক সময় ইয়ং ছেলে বা মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এসে বলবে, 'ও আমাকে ধোকা দিয়েছে'। আমাদের তখন বলতে হয়, 'আচ্ছা তোমার মধ্যে কি গুণ আছে যে, একজন লোক দ্বিতীয়বার তোমার সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করবে? তুমি একটা ছেলে, এই অতটুকুই গুণ, তুমি একটা মেয়ে এই অতটুকুই গুণ, এর বাইরে কিছু আছে তোমার'? আমি বলছি আমি ঠাকুরের সন্তান, ঠাকুর এসে যে আমার সাথে কথা বলবেন, সেই রকম কিছু গুণ কি আমার মধ্যে আছে? ঠাকুর তো নরেনের সাথে কথা বলতে চাইতেন, বা ওনার যাঁরা বিশেষ অন্তরঙ্গ, তাঁদের সাথে কথা বলতে চাইতেন। আমার আপনার সঙ্গে কি তিনি কথা বলতে চাইবেন? আমরা কি সেই স্তরে নিজেকে নিয়ে গেছি। এগুলো খুব ভাবতে হয়, অত্যন্ত বাস্তব কথা এগুলো।

অর্জুন হলেন বিশেষ, ভগবান অর্জুনকে ভালবাসেন, দুজনের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের ভাব। সেইজন্য এই একাদশ অধ্যায়ের যে মাধুর্য, যে দর্শন, যে কাব্য এক কথায় অনবদ্য। এর কথাগুলো না বোঝার মত কিছু না, অত্যন্ত সহজ বক্তব্য।

শ্রীভগবানুবাচ
পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ।।৫।।

(শ্রীভগবান্ বললেন –হে পার্থ, নানা বর্ণ ও নানা আকৃতি-বিশিষ্ট শত শত এবং সহস্র সহস্র আমার বিভিন্ন দিব্যমূর্তি দর্শন কর।)

ঠিক আছে পার্থ, তুমি যা দেখতে চাইছ, তুমি আমার প্রিয়, তোমাকে আমি দেখাচ্ছি। কি দেখাচ্ছেন? *শতশোহথ সহস্রশঃ*, আমার যে শত শত, হাজার হাজার রূপ সব দেখ; এক সঙ্গে সব রূপকে এক জায়গায় নিয়ে আসছেন। বেদের পুরুষসূক্তমে বলছেন, *সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ*, এই জিনিসটাকেই এখানে বলা হচ্ছে, কিন্তু পুরোপুরি আলাদা। আমাদের না ধরিয়ে দিলে আমরা এর তফাৎটা ধরতে পারব না। ব্যাসদেব ঋষি ছিলেন, বেদের ঐ মন্ত্রকেই আবার নূতন করে সামনে রেখে দিলেন, পুরো স্টাইলটাই পাল্টে গেছে। এখানে শত শত হাজার হাজার বলতে যে কোন সংখ্যার হতে পারে। *নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ*, এই অসংখ্য রূপের কোনটাই জাগতিক রূপ নয়, সবটাই দিব্য রূপ, যে রূপগুলো এই পৃথিবীতে চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা যায় না। আর কি দেখবে? *নানাবর্ণাকৃতীনি চ*, নানা বর্ণ কি রকম, আচার্য যোগ করছেন –*নীলপীতাদিপ্রকারা বর্ণাঃ*, নীল, হলুদ নানান রকমের রঙের, নানান রকমের আকৃতি বিশিষ্ট আমার দিব্য রূপ। এই রূপের মধ্যে তুমি কি কি দেখবে? কাদের কাদের দেখবে?

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টাপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত।।৬।।

(হে ভারত, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং ঊনপঞ্চাশ বায়ু দর্শন কর এবং বহু অদৃষ্টপূর্ব অদ্ভুত বস্তুও আমাদের বিশ্বরূপে দর্শন কর।)

হে ভারত, আমার এই রূপের মধ্যে তুমি দ্বাদশ আদিত্যকে দেখ। দশম অধ্যায়ে আমরা দ্বাদশ আদিত্যের কথা বলেছি, যেখানে বারোজন আদিত্যের কথা বলা হয়েছিল, যার মধ্যে ইন্দ্র হলেন প্রধান। আটজন বসুকে দেখতে পাবে। আটজন বসুর মধ্যে ভীষ্ম একজন বসু ছিলেন। একাদশ রুদ্রকে দেখতে পাবে। এটা বেদের একটা বিশেষত্ব, শুধু দেবতা না, দেবতাদের যেমন গ্রুপ আছে, তেমন দেবতাদের নীচেও অনেক group of deities আছে। আদিত্য বারোজন, রুদ্র এগারো জন, বসু আটজন। *অশ্বিনৌ*, অশ্বিনী দুজন, যমজ ভাইয়ের মত। আর মরুৎ হল ঊনপঞ্চাশ জন। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী মরুৎ যখন তার মায়ের গর্ভে ছিল তখন ইন্দ্র গর্ভে ঢুকে গর্ভের সাতটা টুকরো করে দেয়, ঐ সাতটা টুকরোর প্রত্যেকটাকে আবার সাতটা করে টুকরো করে দিল। কারণ সে একা যদি গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে, তাহলে এত তার ক্ষমতা হবে যে ইন্দ্রকেই উড়িয়ে দেবে। ওরা ঐ গর্ভাবস্থাতেই কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে, আমাদের কাটছ কেন, তুমি কে? ইন্দ্র বলছেন, *মা রুদঃ*, তোমরা কেঁদো না, সেখান থেকে ওর নাম হয়ে গেল মারুৎ। তুমি কে? আমি তোমার দাদা, তোমার আপনজন। গর্ভেই তার জানা হয়ে গেলে যে, এ আমার দাদা। মরুৎএর মা তপস্যা করেছিল এমন সন্তানের আমি জন্ম দেব যে ইন্দ্রকে সে পরাজিত করে দেবে। কিন্তু ইন্দ্র কায়দা করে ঐ গর্ভের ক্ষমতা হ্রাস করে দিল। তার সঙ্গে বলছেন, *বহূন্যদৃষ্টাপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত*, মনুষ্যলোকে যে জিনিসগুলি দেখা যায় না, সেই অদ্ভুত আশ্চর্য জিনিসগুলিকেও দেখ।

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি।।৭।।

(হে অর্জুন, আমার এই বিরাট শরীরে অবয়বরূপে একত্র অবস্থিত সমগ্র স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব এবং অন্য যাবতীয় যা কিছু দেখতে ইচ্ছা কর, তা আজ দর্শন কর।)

হে গুড়াকেশ, আমার এই শরীরে এক সঙ্গে চরাচর জগৎকে দেখ। হে অর্জুন, তোমার মনে বারবার পঞ্চাশ রকমের প্রশ্ন ঘুরছে যে আমি এই যুদ্ধে জিতব কি হারব, মরব কি মারব, পাপ হবে কি হবে না; কিন্তু এইবার আমার এই যে রূপ, আর এই বিরাট যে শরীর, এই শরীরের মধ্য যখন চর অচর সব দেখে নেবে তোমার এই নানান রকমের প্রশ্নগুলো চিরদিনের মত মিটে যাবে। যা কিছু জগতে আছে তার সবটাই এই একটি শরীরের মধ্যে *একস্থং*, বসে আছে। এই মাইক্রোফোন, এই বোতল থেকে শুরু করে সবটাই এই *একস্থং* শরীরের মধ্যে দেখতে পারবে। এই একটি শরীরের মধ্যে চর অচর যা কিছু আছে, সব কিছুকে যখন *একস্থং* দেখে নেবে তখনই ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে যে ঠাকুরের ইচ্ছাতেই সব হয়, ঠাকুরই সব কিছু করেন। এখানে দুটো জিনিস দেখা যাচ্ছে, আমি এই দৃশ্যকে দেখছি আবার আমি নিজেকেও ওই দৃশ্যের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। আমি যে মারামারি করব, মারামারি করছি সবটাই দেখতে পাচ্ছি। যতক্ষণ বিশ্বরূপ দর্শন না হয় ততক্ষণ ঈশ্বরের উপর সত্যিকারের পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস হয় না।

তার সাথে জানবে, সাধারণ লোকের মত আমার মনের কোন পরিবর্তন হয় না, বিশ্ব সংসারে যা কিছু হবে এগুলো আমার আগে থেকেই সব ঠিক করা আছে। এই যুদ্ধের কি পরিণাম হতে যাচ্ছে সেটাও তুমি দেখে নাও। আর অন্য কিছু যদি জানতে চাও সেটাও তুমি দেখে নিতে পারবে। এই যে অর্জুনকে সাংঘাতিক কথা বলছেন, যা কিছু হচ্ছে দেখে নাও, যা কিছু হবে দেখে

নাও, অন্য কিছু যদি দেখতে চাও, সেটাও দেখে নাও –এটাই হল ঠাকুরের ইচ্ছা। ঈশ্বরই কর্তা, ঠাকুরই সব কিছু করেন, তাঁর ইচ্ছাতেই সব কিছু হচ্ছে – এই দর্শন যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ এসব কথা বিশ্বাস হয় না। এই দর্শন যদি একবার হয়ে যায়, তখন ঠিক ঠিক বোঝা যায়, সবটাই ঠাকুরের ইচ্ছা। তার আগে পর্যন্ত যারা বলে, ঠাকুরের ইচ্ছা, পুরো ধাপ্পাবাজী, সব মুখের কথা। তখন বলবে, না, আমি তো ভাব আরোপ করছি। ভাব আরোপ করছেন তো, নিজের ব্যাপারে আরোপ করে দেখুন। নিজের বেলায় আঁটিসাটি পরের বেলায় দাঁতকপাটি। অপরকে বোকা বানানোর সময় বলতে হয় ঠাকুরের ইচ্ছা, আর নিজের বেলায় হলে; তবে রে, জানিস না আমি কে! তাহলে কিসের ভাব আরোপ করছেন আপনি। এই ধরণের অনুভূতি যখন হয় তখনই ঠিক ঠিক বলা যায় ঠাকুরের ইচ্ছাতেই সব হয়।

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।।৮।।

(তবে তুমি নিজের প্রাকৃত স্থূল চক্ষু দ্বারা আমার এই বিশ্বরূপ দর্শন করতে সমর্থ হবে না। তোমাকে তাই আমি অপ্রাকৃত জ্ঞানচক্ষু দিচ্ছি। এর দ্বারা আমার অঘটনঘটনসামার্থ্যরূপ যোগশক্তি তুমি দর্শন কর।)

আট নম্বর শ্লোক খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক। তুমি দেখতে চাইছ, ঠিক আছে আমি তোমাকে আমার এই বিশ্বরূপ দেখাব, কিন্তু এই চর্ম চক্ষু দিয়ে তুমি আমার এই রূপ দর্শন করতে পারবে না। কথামৃতেও ঠাকুর অনেকবার বলছেন, ঈশ্বরদর্শন এই চর্ম চক্ষু দিয়ে হয় না। আমাদের ইন্দ্রিয়, আমাদের মন এই পদার্থের জগৎ, এই পঞ্চভূতের জগৎকেই ধরতে পারে। অন্য জিনিস যদি দেখতে হয়, যেমন তন্মাত্রার জগৎ যদি জানতে হয়, তাহলে কিন্তু তন্মাত্রার চোখ দিয়েই আমাদের দেখতে হবে। আমাদের সবারই ভিতর তন্মাত্রার চোখ আছে। তাই না, এর পিছনে যে কারণ জগৎ, সেই কারণ জগৎকে যদি দেখতে হয়, তাহলে আমাদের কারণ শরীর দিয়ে সেটাকে অনুভব করতে হবে, সেটাও আমাদের ভিতরে আছে। সাধনা করে মানুষ প্রথমে স্থূল জগৎ থেকে তন্মাত্রার জগতে প্রবেশ করতে পারে। কারণ সেখানে যে ইন্দ্রিয় মন আছে সেটা সক্রিয় হয়ে যায়। সেখান থেকে আরও গভীরে গেলে কারণ শরীরের ইন্দ্রিয় মন সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখন এই দর্শন হয়।

কদাচিৎ কখনো খুব উচ্চমানের আধারের যাঁরা, তাঁদের অনেক সময় গুরু একটু এগিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁকে একটু স্পর্শ করে দেন। ঠাকুরও এই রকম অনেককে করেছেন, একদিন হঠাৎ নরেনকে ছুঁয়ে দিলেন, নরেন সব কিছু চৈতন্য দেখতে শুরু করলেন। তখন আমরাও মনে মনে আশা করব, ঠাকুর যদি আমাকে একটু ছুঁয়ে দিতেন। হৃদয়রামকেও তো ঠাকুর ছুঁয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু হৃদয়রামের সব কিছু এলেমেলো হয়ে গেল, প্রস্তুতি ছিল না কিনা। প্রস্তুতি না থাকলে, গুরু যদি ছুঁয়ে দেন, সব এলেমেলো হয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাই বলছেন, আমার বিশ্বরূপ দেখার জন্য আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দিচ্ছি। ঠাকুর শুধু ছুঁয়ে বা কথা বলে বা নিজের ইচ্ছা মাত্রে যে-কোন লোককে দিব্যজ্ঞান দিয়ে দিতে পারতেন।

আমাদের এই শরীরের পিছনে একটা সূক্ষ্ম শরীর আছে, সূক্ষ্ম শরীরের পিছনে একটা কারণ শরীর আছে। আমাদের মন এখন এই স্থূল শরীরের সাথে একাত্ম হয়ে আছে, সেইজন্য আমরা স্থূল জগৎকেই দেখি। মন যখন সূক্ষ্ম হয়ে যায়, তখন সূক্ষ্ম শরীর দিয়ে সূক্ষ্ম জগৎকে দেখতে পাই। ভগবান অর্জুনের আধার দেখে কৃপা করলেন এবং তাঁকে দিব্যচক্ষু দিলেন। এই দিব্যচক্ষু সাধনার দ্বারা তৈরী হয়, কারণ আমাদের তো শ্রীকৃষ্ণও নেই, ঠাকুরও নেই যে করে দেবেন, আর ঠাকুর থাকলেও করে দিতেন না। কথামৃতে আছে, একজন বলছে, ঈশ্বর যদি থাকেন তাহলে কেউ আমাকে দেখিয়ে দিক। ঠাকুর রেগে বলছেন, তার ভারী বয়ে গেছে কাউকে দেখাতে। কেন দেখাতে যাবেন, আমাদের কি কোন গুণ আছে! সাধনা করে প্রস্তুতি নেওয়ার পর পাত্রতা হলে তখন ভগবান বলবেন,

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌, আমার যে ঐশ্বর্যময় রূপ দেখবে, সেটা দেখার জন্য আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দিচ্ছি। যখন দিব্য শরীরে আসে তখন সবটাই দিব্য হয়ে যায়।

ঠাকুর মাস্টারমশাইকে বলছেন, যেটা শুনে মাস্টারমশাই ফিক্‌ ফিক্‌ করে হাসছেন, বলছেন, এমন কি তার লিঙ্গ আদি সবটাই দিব্য হয়ে যায়। মাস্টারমশাই শুনে লজ্জা পাচ্ছেন, কিন্তু এটাই বাস্তব। আমাদের যে দশটি ইন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় পুরোটাই পাল্টে যায়। আসলে পাল্টে যায় না, এই সূক্ষ্ম শরীর যেটা, স্থূল শরীরের সাথে থাকতে থাকতে সক্রিয় হয়ে যায়। প্রথম সাধনা হল, হে ঠাকুর এই দিব্যচক্ষুটা যেন পাই, তবেই ঈশ্বরের ঐশ্বর্যময় রূপ দেখতে পারব। এখন ধ্যানের সময় যা দেখছি, চর্ম চক্ষু দিয়ে যা দেখছি, জানবেন এটা মনের ভুল। বেশি বেশি যদি দেখি, তাহলে এটা পাগলামোর লক্ষণ বলে মনে করতে হবে। একবার দুবার দেখলে বুঝতে হবে, মনের খেলা, মন এই ধরণের অনেক রকম খেলা করে। অর্জুন এবার প্রস্তুত বিশ্বরূপ দেখার জন্য। ভগবানও প্রস্তুত অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাবেন বলে। সঞ্জয়কে ব্যাসদেব বর দিয়েছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে যা কিছু হবে সব দেখতে পারবেন, তাই সঞ্জয়ও এই বিশ্বরূপ দেখতে পাচ্ছেন, অন্যরা কিন্তু কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

গীতা এবার পর পর ভগবানের বিশ্বরূপের বর্ণনা করে যাবেন। এই জিনিসটাকে বোঝার জন্য আমাদের কয়েকটা বিষয় আলোচনার আগে অবগত হলে, বুঝতে সুবিধা হবে; পুরো ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ভগবান দশম অধ্যায় পর্যন্ত ঈশ্বরতত্ত্ব বলে গেছেন। ঈশ্বরতত্ত্ব হলেই যে মানুষ স্বাভাবিক ভাবে ওটাকে গ্রহণ করতে পারবে, সম্ভব না। তার কারণটাও আমরা অনেক জায়গায় আলোচনা করেছি। আমাদের মন খুব স্থূল, সূক্ষ্ম জিনিসকে মন তাই ধারণা করতে পারে না। দীর্ঘদিন যদি বিদ্যা চিন্তন, শাস্ত্রের অর্থ চিন্তন নিয়ে থাকা হয়, তখন মন ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম হতে থাকে। শাস্ত্র পড়লেই মন সূক্ষ্ম হয় না, পড়ার সাথে সাথে চিন্তন করা চাই। যাঁরা শাস্ত্রের কথা শুনছেন, খুব ভাল, শোনাটাও একটা সাধনা, বিরাট পূণ্যের কাজ আর মঙ্গল তো বটে। কিন্তু ঠিক ঠিক যদি কেউ জীবনে মঙ্গল চান, শাস্ত্রের কথাগুলোকে নিয়ে চিন্তন করতে হবে। চিন্তন মানে, মনে মনে আলোচনা করা, আশেপাশে যারা আছে তাদের সাথে একটু আলোচনা করা। এইভাবে শাস্ত্র চর্চা করলে তখন মনে একটা শুভ ছাপ পড়ে। দু-বছর, তিন বছর ধরে যাঁরা আমাদের শাস্ত্র আলোচনা শুনছেন, তাঁরা এখন ধারণা করতে পারবেন, কি বলছি। কিন্তু সাধারণ মানুষ এসব কথা ধারণা করা দূরে থাক, বুঝতেই পারবে না। তাদেরকে তাই অনেক জাঁকজমক ও অনেক বাহ্য সাহায্যের অবলম্বন করে ধর্ম পথে নিয়ে যেতে হয়। ঠাকুরও বলছেন, এই সব ছোকরাদের মাঝে মাঝে আমি একটু আঁশ ধোয়া জল দিই। আঁশ ধোওয়া জল না দিলে ধর্মের কথা নিতে পারবে না।

হিন্দু ধর্মের ঈশ্বরীয়তত্ত্ব কথা বেদে আছে, উপনিষদে আছে, গীতাতেও আছে, এই ঈশ্বরীয়তত্ত্ব কথা সাধারণ মানুষ সরাসরি নিতে পারে না। তখন দরকার হয় কথা কাহিনীর, পুরাণাদি শাস্ত্রের কাহিনীগুলো তৈরী করা হয়েছে এই জন্যই। তত্ত্ব কথার উপর কাহিনীর একটা আবরণ দিয়ে দিলে ঈশ্বরের তত্ত্বটা গ্রহণ করা সহজ হয়। কোন কোন ধর্ম বলে মূর্তি পূজা করতে নেই। মূর্তি পূজা করো না বলেই আজ তোমরা গর্তে পড়ে আছ, খুনোখুনি ছাড়া আর কিছু তোমাদের করার নেই। ইজরায়েল একটা ছোট্ট দেশ, মরুভূমির দেশ, মরুভূমিতে জন্ম নেওয়া ধর্মের কত আর রস থাকবে। নিতে পারে না, তত্ত্বগত এদের কোন দোষ নেই, দোষ হল, মানুষ পর্যন্ত এরা পোঁছাতে পারছে না। মুখের কথায় কিছু চলে না, গল্পের গরু গাছে চড়ে, মুখে বড় বড় কথা বলে দিলে ওটা যায় না। বিশ্বরূপদর্শন ঐ শ্রেনীতেই পড়ে, মানুষকে একটা ধারণা দেওয়ার জন্য এই বিশ্বরূপদর্শন। বেদের পুরুষসূক্তমে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, ওটা একটা দেখানোর জন্য। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, এটা বলে দিলেই হয় না। সন্ন্যাসীরা ধর্ম জীবনের মধ্যে আছেন, তাঁরা এটা নিয়েই আছেন। যখন আমরা

নূতন ব্রহ্মচারী ছিলাম, তখন আমরা ধর্মকে নিয়ে কি ভাবতাম, সেটা যখন এখন মনে করি তখন বুঝতে পারি সাধারণ মানুষ কোথায় আছে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেমন জননী আছেন, স্থূল জগতে যেমন গর্ভধারিণী মা আছেন, ঠিক তেমনি ধর্ম জগতে গীতা হলেন আমাদের মা। গীতা করুণাময়ী, তিনি আমাদের কৃপা করছেন। মা যেমন সন্তানকে বুকে লাগিয়ে স্তন্যসুধা পান করান, গীতা বা আমাদের শাস্ত্র করুণাময়ী মায়ের মত, বুকে লাগিয়ে আমাদের ধর্মদুগ্ধ পান করান, যাতে আমাদের ধর্মজীবন হৃষ্টপুষ্ট হয়। সেইজন্য বিভিন্ন ভাবে আমাদের কাছে ধর্মতত্ত্বগুলি বর্ণনা করছেন, কখন এভাবে বর্ণনা করছেন, কোথায় অন্য ভাবে বর্ণনা করছেন। কখন একই কথা বিভিন্ন ভাবে ঘুরে ঘুরে বলছেন, কখন আবার ভাবের দিক থেকে ঘুরে ঘুরে আসে। এখানে আমাদের চোখের সামনে একটা visual সৃষ্টি করছেন।

এই যে ভগবান বলে যাচ্ছেন, ভালতেও আমি মন্দতেও আমি; সৃষ্টিতে আমি, সংহারেও আমি, এই জিনিসটা ঠিক কি? বেদে বলছেন, *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি*, একটা ক্লাশে এই কথা শোনার পর একজন কমেন্ট বক্সে লিখছে, 'আপনি কি বলতে চান? একজন খুনী, একজন ধর্ষণকারী, এরাও তাহলে ভগাবনের রূপ'? আমি তাকে লিখলাম, 'হ্যাঁ এটাই সত্য'। দুঃখ হয় এই দেখে, হিন্দুদের আজ কি দুরবস্থা, আমাদের যে কিছু কিছু মূল ধর্মতত্ত্ব, সেটাও আজ হিন্দুরা অনেকেই জানে না। অন্য ধর্মের লোকেরা এই প্রশ্ন করতে পারে। কারণ তাদের ধর্ম বলতে সত্ত্বগুণ পর্যন্ত। আমাদের এখানে সত্ত্বগুণের পারে, সত্ত্বগুণ আমাদের কাছে এগিয়ে যাওয়ার একটা ধাপ। এখন যে বিশ্বরূপের বর্ণনা করতে যাচ্ছেন, এটা হলে সেই ভাব, এতক্ষণ ভগবান যেটা বলে আসছেন, আমি এই রকম, ঈশ্বরতত্ত্ব এই রকম, আমাদের কাছে একটা কাল্পনিক রূপে দাঁড় করাচ্ছেন। আমরা এর আগে বললাম, *দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ,* অর্জুন, তুমি চর্মচক্ষু দিয়ে এই রূপ দেখতে পারবে না, তাই তোমাকে দিব্য চক্ষু দিচ্ছি। সেখানে থেকে আসছে সঞ্জয় উবাচ।

'*সঞ্জয় উবাচ*' এখানে খুব মজার। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমে একবার '*সঞ্জয় উবাচ*' আসার পর এতক্ষণ আমরা আর সঞ্জয়কে পাইনি, অনেকক্ষণ পর সঞ্জয় প্রবেশ করছেন। সঞ্জয়ের কথা গীতার শুরুতে আলোচনা করেছি। যাঁদের মনে নেই, সংক্ষেপে আবার বলে দিচ্ছি, ব্যাসদেব কৌরব পাণ্ডব দুই বংশের জন্ম তিনিই দিয়েছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের খুব ইচ্ছা যুদ্ধে প্রতিদিনের খবর জানার। ব্যাসদেব বললেন, ঠিক আছে আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দিচ্ছি, সব তুমি এখানে বসেই দেখতে পারবে। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমি আমার বংশের সংহার নিজের চোখে দেখতে চাই না। ব্যাসদেব সঞ্জয়কে খুব স্নেহ করতেন, সঞ্জয় একাধারে একজন মন্ত্রী আবার কৌরব পক্ষের একজন সারথীও। ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু দিলেন। অনেকের ভুল ধারণা, সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের সামনে বসে যুদ্ধের ধারাবিবরিণী দিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই তা নয়। সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্রেই ছিলেন, এবং যুদ্ধে রীতিমত অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে যেখানে যাবতীয় যা কিছু ঘটনা হচ্ছিল, সবটাই তিনি জানতে পারছিলেন। যুদ্ধের দশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর হস্তিনাপুরে এসে ধৃতরাষ্ট্রকে দশ দিনের যুদ্ধের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। বর্ণনা দেওয়ার পর তিনি আবার যুদ্ধে ফিরে গিয়েছিলেন। এখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যা কিছু বলেছিলেন, সেটাকে ব্যাসদেব সাতশটি শ্লোকে ছন্দোবদ্ধ করে দিলেন। এই সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের দশদিনের যুদ্ধে যা যা হয়েছিল প্রথম দিন থেকে তার বর্ণনা করে যাচ্ছেন –

সঞ্জয় উবাচ।
এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্।।৯।।

(সঞ্জয় বললেন –হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, মহান্ যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই রকম বলে অর্জুনকে নিজের অলৌকিক বিশ্বরূপ দেখালেন।)

অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ দিব্যচক্ষু দিলেন, এই শ্রীকৃষ্ণ কে, *হরিঃ*, স্বয়ং নারায়ণ, তার সাথে *মহাযোগেশ্বরঃ*। শ্রীকৃষ্ণ একদিকে মহান্, যাঁর থেকে বড় আর কেউ হয় না; আবার তার সাথে তিনি যোগেশ্বর। শ্রীকৃষ্ণকে এখানে অনেকগুলো নামে সম্বোধিত করা হয়েছে। *রূপমৈশ্বরম্*, ঈশ্বরীয় রূপ, যেটাকে আমরা বিশ্বরূপ বলি। আমরা আলোচনা করেছিলাম, ঠাকুর কিভাবে বলছেন যে, জপধ্যান করতে করতে, সাধনা করতে করতে আমাদের সমস্ত অঙ্গগুলি দিব্য হয়ে যায়; সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি দিব্য হয়ে যায়। এই দিব্যতা না হলে ঈশ্বরদর্শন হয় না। লোকেরা যে ধরণের দর্শনের কথা চারিদিকে বলে বেড়ায়, আমার এই দর্শন হয়েছে, সেই দর্শন হয়েছে, এগুলো কিছু না। ঈশ্বরদর্শনের জন্য ইন্দ্রিয়গুলিই অন্য ধরণের হয়ে যায়। যার জন্য অর্জুনই কেবল দেখছেন, যুদ্ধ ক্ষেত্রে এত লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাদের কেউ দেখতে পাচ্ছে না। কারণ ঈশ্বরীয় রূপ একটা সূক্ষ্ম জগতের ব্যাপার, স্থূল জগতের পিছনে যে সূক্ষ্ম জগৎ, সেই জগতের ব্যাপার এটা। তার সাথে আমাদের মনে রাখা দরকার, এগুলোকে আক্ষরিক ভাবে নিতে নেই। এই জিনিসগুলিকে একটু rationally নিতে হয়। আচার্য শঙ্কর এর উপর যে কালে ভাষ্য লিখেছেন, তার মানে এই জিনিসটা rational, আচার্য শঙ্কর কক্ষণ আলতু ফালতু, অযৌক্তিক কথা বলতে যাবেন না। যেমন স্বামী বিবেকানন্দ কক্ষণ আলতু ফালতু কথা বলতে যাবেন না। কিন্তু স্বামীজীর কাছে এই পৌরাণিক কাহিনীগুলির সাংঘাতিক দাম ছিল। কারণ ধর্ম জীবন পৌরাণিক কাহিনী ছাড়া চলে না। আর এই বর্ণনাগুলিরও একটা বিশাল মাহাত্ম্য রয়েছে।

যে কোন সাধক সাধনার সেই উচ্চ অবস্থায় পোঁছালে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ করবেন, কিন্তু বিশ্বরূপ দেখতে চাইলে ঠিক এ-ভাবে দেখবেন না। কারণ যে মন দিয়ে দেখা হচ্ছে, সেই মনের রঙে ওটা একটু না একটু রঞ্জিত থাকবে। তাহলে কি আমরা কখন একই জিনিস দেখব ন? দেখব, যখন মনের পারে চলে যাব। যতক্ষণ মন আছে, মন দিয়ে যতক্ষণ দেখা হচ্ছে, ততক্ষণ মনের রঙটা সেখানে জড়িয়ে থাকবে। মন যখন থাকবে না, তখন আমিও যে জিনিস দেখব, আপনিও সেই একই জিনিস দেখবেন। কিন্তু মন যেহেতু নেই সেইজন্য জানা যাবে না, একই জিনিস দেখছে কিনা। এটাও যুক্তির দিকে থেকেই বলা হচ্ছে। কিন্তু অনন্তকে দেখা হয়ে বলে আর কিছু বলার উপায় থাকে না। ভগবান অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখালেন, অর্জুন সেই বিশ্বরূপ কি রকম দেখলেন সেটারই সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন। সঞ্জয়ের বর ছিল, সেইজন্য তিনি সব কিছু দেখতে পারছেন।

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকদ্ভূতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্।।১০।।

(সেই বিশ্বরূপ অনেক মুখ ও অনেক নেত্র-যুক্ত, অনেক অদ্ভুত আকৃতি ও অসংখ্য দিব্য-অলঙ্কার-বিশিষ্ট এবং অনে উদ্যত দিব্য আয়ুধে সজ্জিত।)

আমরা মা দূর্গার প্রতিমাতে যেমনটা দেখি, মা দশভূজা, তাঁর হাতে অনেক অস্ত্রশস্ত্র। আমরা যদি একটা কল্পনা করি, আমাদের পাড়ায়, শহরে হোক, গ্রামে হোক, যত লোক আছে, হাজার দু হাজার লোককে একসঙ্গে একত্র করলাম। জন্মাষ্টমির সময় বম্বে এবং আরও অনেক জায়গায় বাচ্চারা দইএর হাড়ি ভাঙার খেলা করে। প্রথমে অনেকগুলো বাচ্চা, তাদের উপর আরও কিছু বাচ্চা, এই করে করে বাচ্চাদের একটা পিরামিড হয়ে যায়, এবং সবার উপর একজন থাকে, সেই ঐ দইয়ের হাড়িটা ভাঙে। এবার ঐ হাজারে খানেক লোক ঠিক এইভাবে পিরামিডের মত এক দল লোকের উপর আরেক দল লোক দাঁড়িয়ে আছে, উপর দিকটা সরু হয় গেছে। এবার আরও কল্পনা করুন, হাজারের থেকে দশ হাজার লোক এভাবে পিরামিডের মত দাঁড়িয়ে আছে, যার জন্য উপরে উঠতে বেশি সুবিধে, একটা চারতলা বাড়ির সমান মানুষের পিরামিড। কলকাতা শহরে আগে চ্যাটার্জি

ইন্টারনেশানাল সবচেয়ে উঁচু বাড়ি ছিল, এখন অবশ্য তার থেকে আরও অনেক উঁচু উঁচু বাড়ি হয়ে গেছে। ঐ রকম ভাবে কল্পনায় আমরা মানুষ দাঁড় করিয়ে দিলাম। এবার আমরা কল্পনা করছি, এটা যেন ভগবানের শরীর। ভগবানকে এখন কেমন দেখাবে? কত গুলি মুখ? হাজার হাজার মুখ। পেট কত গুলি? হাজার হাজার। কত গুলি চোখ? হাজার হাজার চোখ। খুব সহজেই কল্পনা করে নেওয়া যায়। এবার এই জিনিসটাকে, যার মধ্যে স্থূল জগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ, কারণ জগৎ যত রকমের জগৎ হতে পারে আর তার সাথে সমস্ত প্রাণীকে এনে একটা পিরামিডের কল্পনা করুন; যেটার বিস্তৃতি এখান থেকে শুরু করে সব চাইতে দূরে যে গ্যালাক্সি আছে, সেই গ্যালাক্সি জুড়ে একটা কল্পনা করলে কি হতে পারে, ভাবুন তো। এটাই ভগবানের শরীর। কিন্তু আমাদের কল্পনা চাঁদ পর্যন্তই পৌঁছাবে না। সেইজন্য ওভাবে কল্পনা না করে, দশ হাজার বা এক লক্ষ এভাবে পিরামিডের মত দাঁড়িয়ে আছে, তাহলে এবার কল্পনা করুন, কত গুলি মুখ, কত গুলো হাত, কত গুলো পা।

অর্জুন যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখছেন, কি রকম দেখছেন? *অনেক-বক্ত্র–নয়নম্,* অনেক মুখ, অনেক চোখ; *অনেকাদ্ভুতদর্শনম্,* ওর মধ্যেই অনেক রকম অদ্ভূৎ দৃশ্য। কারণ সেখানে তো শুধু মানুষ নেই, তাঁর ঐ রূপের মধ্যে হিমালয় পর্বত রয়েছে, আল্পস পর্বত রয়েছে, গঙ্গা নদী আছে, আমাজন নদী আছে, সবটাই তাঁর মধ্যে কিনা, সেইজন্য বিভিন্ন রকম দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। একজন মহাকাশচারী প্রথমবার যখন মহাকাশে যাচ্ছেন, খুব সুন্দর বলছেন, অনেকটা উপরে যখন চলে গেলেন, পরিষ্কার উনি দেখতে পাচ্ছেন আমাজন নদীর উৎস; উনি খুব সুন্দর ভাবে বর্ণনা করে লিখেছেন। এক সময় ছিল, যখন অভিযাত্রীরা কত কষ্ট করে, জীবনকে তুচ্ছ করে কত বন, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমাজন নদীর উৎসের সন্ধানে লেগে থাকতেন। আর আমি মহাকাশ থেকে মুহুর্তের মধ্যে আমাজনের উৎসকে দেখতে পাচ্ছি। কারণ পুরো নদীটাকেই তিনি মহাকাশ থেকে দেখতে পাচ্ছেন। এই বিশ্বরূপে ভগবানের কত পেট, কত মুখ, কত হাত, কত পা, কত বিচিত্র বিচিত্র দৃশ্য, আর কত রকমের দিব্য আভূষণ। আর তার সাথে অর্জুন দেখছেন, ওই বিশ্বরূপের সমস্ত হাতে কত রকমের দিব্য শস্ত্রগুলি শোভা পাচ্ছে; *উদ্যত আয়ুধম্,* মারার জন্য শস্ত্রগুলিকে উঁচিয়ে রেখেছেন। একা মা দূর্গারেই কত রকমের অস্ত্র। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বর্ণনা করে বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই রূপ দেখালেন।

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্।।১১।।

(ওই বিশ্বরূপ দিব্যমাল্য ও দিব্য বস্ত্রে ভূষিত, দিব্য গন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত, অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, জ্যোতির্ময়, অনন্ত ও সর্বত্র মুখবিশিষ্ট।)

এখানেও *বিশ্বতোমুখম্* বলছেন, বিশ্বরূপ আর *বিশ্বতোমুখম্* একই জিনিস। ভগবান, যিনি বিশ্বরূপ ধারণ করেছেন, তিনি অনেক ধরণের দিব্য পুষ্পমালা ধারণ করে আছেন। মরিশাসে একটা ফুল হয়, যেটা অনেক দিন ধরে সতেজ থাকে, প্রায় এক মাস ফুলটা একেবারে সতেজ থাকে, একটুও কোন ধরণের মলিনতা আসে না। ভগবান গলায় যে দিব্য ফুলের মালা ধারণ করে আছেন, এই ফুলও কখন মলিন হয় না। তিনি যে বস্ত্র পরিধান করে আছেন, সব বস্ত্রই তাঁর দিব্য। তাঁর সমস্ত শরীর দিব্য গন্ধাদি দ্বারা অনুলেপন করা। আগেকার দিনে ওনারা অঙ্গে, বস্ত্রে চন্দনাদি লাগাতেন, এখন তার বদলে বাজারে অনেক রকমের বডি স্প্রে এসে গেছে।

তার সাথে বলছেন, সমস্ত জীবের তিনি আত্মা, সেইজন্য সব দিকে তাঁর মুখ, *বিশ্বতোমুখম্*। *বিশ্বতোমুখম্* হল, যাঁর সব দিকে মুখ, পুরো বিশ্বটাই তাঁর মুখ। কারণ যেখানেই যা কিছু জীব আছে সবটাই তিনি নিজে। *সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং,* বলছেন, এ এক আশ্চর্যময় দৃশ্য, সবটাই আশ্চর্যময় কারণ কখন কেউ এই ধরণের দৃশ্য দেখেনি। সেই বিরাট রূপ ভগবান অর্জুনকে দেখালেন, আর এর

বর্ণনা করছেন সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে। ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় যে বর্ণনা করছেন, সবে তখন যুদ্ধ দশ দিন হয়েছে, এই দৃশ্যের বর্ণনা শুনেও যদি ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলতেন, বল যুদ্ধ থামিয়ে দিতে। তাহলে দুর্যোধন সহ অনেকেরই জীবন বেঁচে যেত। কিন্তু কই, তিনি তো তা করলেন না। এবার ভগবানের প্রভাটা কি রকম বলছেন –

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ।।১২।।

(আকাশে যদি সহস্র সূর্যের প্রভা যুগপৎ সমুদিত হয়, তা হলে সেই দীপ্তি বিশ্বরূপের প্রভাব কিঞ্চিৎ তুল্য হতে পারে।)

দ্যু লোক হল অন্তরীক্ষ, আচার্য বলছেন, *অন্তরিক্ষে তৃতীয়াস্যাং বা; দিবি* অর্থাৎ দ্যু লোককে আমরা অন্তরিক্ষ বলতে পারি বা স্বর্গলোক বলতে পারি। আসলে আমরা স্বর্গলোক বললেই উপরের দিকে দেখিয়ে দিই, কিন্তু স্বর্গলোক তা নয়, স্বর্গলোক একটা সূক্ষ্ম জগৎ। উপরের দিকে আমরা যতই যাই, ওটা অন্তরীক্ষই থাকবে। *দিবি* মানে অন্তরীক্ষে যেন হাজারটা সূর্য একসাথে উদয় হয়ে গেছে। হাজারটা সূর্যের যদি উদয় হয়ে যায়, অন্ধ মানুষও ঐ আলো দেখতে পারবে। *যুগপদুত্থিতা,* যুগপদ শব্দের অর্থ এক সঙ্গে, একটার পর একটা না, এক সঙ্গে হাজারটা সূর্যের উদয় হচ্ছে। *যদি ভাঃ সদৃশী সা,* যদি এর সাথে তুলনা করা যায়, কিন্তু তুলনা নাও করা যেতে পারে, কারণ বিশ্বরূপের প্রভা এর থেকেও অনেক বেশি। আমরা কল্পনা করতে পারি, একটা সূর্যের আলো যখন হয়, এখন গ্রীষ্মকাল, সাতটা আটটা বাজতে না বাজতে এমন আলো হয়ে যায়, তাকানো যায় না। বিশেষ করে বিহার ইউপিতে আটটার পর বাইরে লু বইতে শুরু হয়ে যায়, মানুষ ছায়া খোঁজে, ঘরের ভিতরে চলে আসতে চায়। আর সেখানে হাজারটা সূর্যের যদি উদয় হয়, তাহলে কি হবে কল্পনা করা যায় না। তবে এই আলো আমাদের পুড়িয়ে দেবে না, শুধু আলো দেবে, মণির আলোর মত শুভ্র আলো।

আইনস্টাইন নিজের ইক্যুয়েশান দিলেন। পরে কিছু বৈজ্ঞানিকদের মনে হল, এই ইক্যুয়েশান দিয়ে এ্যটম বোমা হতে পারে। তখন বিশ্বযুদ্ধ চলছে, রুজভেল্ট তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। ওনাকে ব্যাপারটা বলা হল, ওনারা তখন ঠিক করলেন, তাড়াতাড়ি করে এ্যটম বোমা বানানো হোক। যার নাম হল ম্যানহ্যটন প্রজেক্ট। লক্ষ লক্ষ লোক ম্যনহ্যটন প্রজেক্টের কাজে নিযুক্ত হলেন। এ্যটম বোমা তৈরী করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। ওপেনহাইমার ছিলেন এই প্রজেক্টের ডিরেক্টর। পুরো প্রজেক্টটাই ছিল একটা মিলিটারি অপারেশন।

আণবিক বোমার প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ করা হয়েছিল খুব ভোরবেলা। মরুভূমির মত এক বিশাল অঞ্চলে এই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণটা ঘটানো হয়েছিল। তার আগে বিশাল জায়গাটাকে ঘিরে রাখা হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা জানতেন যে বিস্ফোরণ হওয়ার সাথে সাথে সাত আট কিলোমিটার জুড়ে আণবিক বিকিরণ ছড়িয়ে পড়বে। যেখানে পরীক্ষামূলক ভাবে বিস্ফোরণ করা হয়েছিল সেখান থেকে অনেক দূরে নিরাপদ একটা বিল্ডিং এর মধ্যে বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। যে তারিখটা বিস্ফোরণের জন্য নির্ধারিত করা ছিল তার কয়েক দিন আগে থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছিল, কিন্তু বিজ্ঞানীরা আর অপেক্ষা করতে রাজী ছিলেন না, কারণ জাপানে বোমাটা ফেলতে হবে।

৯ই আগস্ট জাপানের হিরোসিমায় বোমা ফেলা হয়েছিল, তারও এক মাস আগে ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে এই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ করা হয়েছিল তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছিল। ভোর ছটার সময় নির্ধারিত হয়ে আছে তখনও সব পুরো অন্ধকারে ঢাকা। কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গেছে। মজার ব্যাপার হল সেই সময় রেডিওতে একটা গান বাজছিল, রেডিওর ফ্রিকোয়েন্সির সাথে এই কাউন্ট ডাউনের ফ্রিকোয়েন্সি কি করে মিশে যায়। যারা রেডিওতে গান শুনছিল গানের মধ্যে তারা টেন,

নাইন, এইট কাউন্ট ডাউনও শুনতে পাচ্ছিল। আরও মজার বর্ণনা যেটা আছে তাতে বলছে যে, সেদিন মাঝ রাত থেকে টানা বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছিল, বৃষ্টির জল ব্যাঙের গর্তে ঢুকে যেতে যত সোনা ব্যাঙ ছিল হাজার হাজার সোনা ব্যাঙ সব গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে একসাথে টর্র্ টর্র্ গ্যাঁগোঁ শব্দ করতে শুরু করে দিয়েছে। এবার হয়েছে কি রেডিও স্টেশন থেকে এক দিকে গান সম্প্রচারিত হচ্ছে, এদিকে কাউন্ট ডাউন চলছে, অন্য দিকে ব্যাঙের আওয়াজ হচ্ছে, তিনটে শব্দ একই ফ্রিকোয়েন্সিতে মিশে গিয়ে এমন এক অদ্ভুত শব্দ তৈরী হল যে কেউ বুঝতেই পারছিল না রেডিওতে কি হচ্ছে। ম্যানহাটনের বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারছিলেন কি হচ্ছে। তারপর ওয়ান্ থেকে জিরো যেই হল যেমনি সুইচটা অন্ করা হয়েছে বোমাট ফেটে গেল।

আণবিক বোমার বিস্ফোরণ হতেই যে প্রচণ্ড আলোর ঝলকানি হয়েছিল সেই দৃশ্য দেখতেই রবার্ট ওপেনহ্যাইমারের মুখ থেকে একাদশ অধ্যায়ের এই শ্লোকটা বেরিয়ে এসেছিল – *দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা। যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ* – যদি আকাশে সহস্র সূর্যের যুগপৎ উদয় হয় তখন সেই সহস্র সূর্যের যে দীপ্তি হবে ভগবানের জগদাত্মিকা বিশ্বরূপের দীপ্তির তুলনায় তাও সেটাকে ম্লান দেখাবে। ওপেনহ্যাইমার একজন সত্যিকারের জিনিয়াস ছিলেন, অনেকগুলো ভাষা জানতেন, কোন অজ্ঞাত কারণে তিনি নোবেল প্রাইজ পেলেন না, কিন্তু একজন উঁচু মাপের জিনিয়াস ছিলেন। তিনি গীতা জানতেন, তখন তাঁর মুখ থেকে এই শ্লোকটা বেরিয়ে এলো। তিনি একজন বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন বলে আগে থেকে জানতেন, ওর আলোটা কি রকম হবে, ওর ধ্বংসাত্মক শক্তিটা কেমন হবে। গীতা জানতেন বলে এই শ্লোকটাকে তিনি মাথায় রেখেছিলেন তখন। কিন্তু ওনার আশেপাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সবাই তাঁর মুখ থেকে এই শ্লোকটা শুনেছিলেন।

এই আণবিক বোমার প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের যে বর্ণনা পরবর্তি কালে পাওয়া গিয়েছিল তাতে একটা ঘটনার উল্লেখ আছে। এক ভদ্রলোক গাড়ি চালিয়ে তার শ্যালিকাকে নিয়ে ঠিক সেই সময় ভোর বেলা পিয়ানো বাজান শেখাতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। শ্যালিকাটি আবার জন্মান্ধ ছিল। হঠাৎ করে মেয়েটি চিৎকার উঠেছে – জামাইবাবু এত আলো কোত্থেকে আসছে, এটা কিসের আলো? বাচ্চা মেয়েটি জন্মান্ধ, জীবনে আলোর কোন রেখা পর্যন্ত দেখেনি, যেখানে বিস্ফোরণ ঘটান হয়েছে তার থেকে অন্ততঃ দশ কিলোমিটার দূর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে ভদ্রলোক তার শ্যালিকাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, অত দূর থেকে ঐ আলো যে জন্মান্ধ তারও চোখে এসে ধাক্কা মারছে। ঐ বিস্ফোরণের পর কে কে কি কি দেখেছিল সব রেকর্ড করা হয়েছিল, তার মধ্যে এই জন্মান্ধ মেয়েটির কথাও রেকর্ড করা হয়েছিল।

এই হচ্ছে – *দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা*, হাজারটা সূর্য যেন দুম্ করে আকাশে জ্বলে উঠল। বিশ্বরূপের সাথে তুলনা করার জন্য সহস্র সূর্যের কথা বলা হল, তুলনাত্মক হলেও বিশ্বরূপের দীপ্তি তার থেকে অনেক অনেক বেশি। আসলে জাগতিক কোন কিছু দিয়েই বিশ্বরূপের এই দীপ্তিকে তুলনা করা যাবে না বলে হাজারটা সূর্যের উপমা নিয়ে আসা হয়েছে। এ্যটম বোমার এমন আলো যে, একটা বাচ্চা জন্মান্ধ মেয়ে সেও সেই আলোটা দেখতে পাচ্ছে। যার জন্য কঠোপনিষদে এবং বিভিন্ন জায়গায় এর বর্ণনা করা হয়েছে, *ন তত্র সূর্য ভাতি*, এমন আলোময় জগৎ যে, সূর্যকেও সেখানে ফ্যাকাসে দেখাবে। সূর্যের সামনে জোনাকি পোকা যেমন, ঈশ্বরীয় আলোর সামনে সূর্য জোনাকি পোকার মত। এগুলো কিন্তু কবিতা না, এটাই বাস্তব। বর্ণনাটা কাব্যিক, কিন্তু যত তত্ত্ব আছে, সব তত্ত্বই একশ ভাগ সত্য।

আমাদের একজন খুব নামকরা মহারাজ ছিলেন, আমরাও জানতাম ওনার প্রচুর দিব্য অনুভূতি আছে। আমি তখন ব্রহ্মচারী, বয়স কম, মনে অনেক ধরণের কৌতুহল। ওনাকে আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম। জানি না কেন, উনি খুব স্নেহ করে কিছু কথা বললেন, আমি আশা

করিনি যে তিনি বলবেন, কিন্তু বলেছিলেন। একটু বলেই সঙ্গে সঙ্গে টপিকটা পাল্টে দিয়েছিলেন। তিনি অনেকটা এই ধরণের বর্ণনাই করেছিলেন। আমাদের হৃৎপদ্মের যে আলো, মনে হয় যেন অনেকগুলো সূর্য একসাথে উদিত হয়ে আছে। তবে যেটা আসল কথা বলেছিলেন, তা হল, এই আলোতে চোখ ঝলসে যায় না। কবে সেই ১৯৮৫-৮৬ সালে খুব গম্ভীর ভাবে বলেছিলেন, চোখ ঝলসে যায় না, এই কথাটা আমার মনে চিরদিনের জন্য গেঁথে গেল। বলেই সঙ্গে সঙ্গে টপিকটা পাল্টে দিলেন, বুঝে গেলেন আধার নেই।

এটাই সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন, হে রাজন্, হাজারটা সূর্য যদি অন্তরিক্ষে একসাথে উদয় হয়, এর তুলনা হতে পারে নাও হতে পারে, তাঁর আলো এর থেকেও বেশি। আর তার সাথে বিশ্বরূপের ঐ দীপ্তির মধ্যে অর্জুন কি দেখছেন –

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা।।১৩।।

(তখন অর্জুন সেই দেবাদিদেবের বিরাট শরীরে দেব, পিতৃ, মনুষ্যাদি নানাভাবে বিভক্ত সমগ্র জগৎ অবয়বরূপে একত্র অবস্থিত দেখলেন।)

অর্জুন দেখছেন, ঐ একটি শরীর, কিন্তু তার মধ্যে বিভিন্ন ভাগ হয়ে আছে। কি রকম ভাগ? দেবতাগণ আছেন, পিতৃগণ আছেন; পিতৃরা হলেন, আমাদের পূর্বজদের মধ্যে যাঁরা পূণ্য কর্ম করেছেন; এনারা স্বর্গলোকের নীচে পিতৃলোকে যান। স্বর্গলোকে যাঁরা যান তাঁরা উত্তরায়ণে যান, পিতৃলোকে যাঁরা যান, তাঁরা দক্ষিণায়ণে যান। আচার্য এখানে তিনটে ভাগের কথা বলছেন, দেবতা, পিতৃগণ এবং মনুষ্য। ঐ দেবাদিদেব হরির মধ্যে এক সঙ্গে এনাদের সবাইকে দেখা যাচ্ছে। একবার যদি বুঝে নেওয়া যায় যে, এই যে বহু প্রকার জাতি, শ্রেনী, যোনি রয়েছে, এর মধ্যে একটা একত্ব রয়েছে, সব কিছু মিলে সেই এক; তাহলে তো আর কোন সমস্যাই থাকবে না। অর্কেস্ট্রাতে অনেক প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজে, কিন্তু তার মূল সুর একটাই থাকে। আমরা যদি এক মিনিটের জন্যও ভাবি, যেমন বলা হল হাজার হাজার লোক পিরামিডের আকারে দাঁড়িয়ে আছে, ওটা আসলে কিন্তু ভগবান, যেখানে স্বর্গলোক দেখা যাচ্ছে, পিতৃলোক দেখা যাচ্ছে, মনুষ্যলোক দেখা যাচ্ছে, তখন আমাদের কি অবস্থা হবে। একটা সাপ দেখলে মানুষ আঁতকে ওঠে, জঙ্গলে যেতে যেতে একটা বাঘ দেখলে আমরা আঁতকে উঠব, সেখানে ভগবানের এই বিশ্বরূপ দেখলে কি হবে আমাদের! হঠাৎ এই বিশ্বরূপ দেখে অর্জুনের তাই হল।

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত।।১৪।।

(অর্জুন সেই বিশ্বরূপ দর্শন করে আশ্চর্যান্বিত ও রোমাঞ্চিত হয়ে গেলেন এবং অবনত মস্তকে বিশ্বরূপধারী ভগবানকে প্রণাম করে করজোড়ে বললেন –।)

ভগবানের এই বিশ্বরূপ দর্শন যদি হয়ে যায়, তখনই ঠিক ঠিক বিনয় আসে। কথামৃতে দেখা যায়, থেকে থেকে ঠাকুরের শরীরে রোমকূপগুলো দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, রোমাঞ্চ হচ্ছে। আমরাও যখন কোন কথা শুনি তখন আনন্দে লোমগুলো দাঁড়িয়ে যায়। জপ যদি খুব মন দিয়ে করা হয়, দেখা যায় লোম গুলো দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরের এটা প্রায়ই হত, তাঁর চুল পর্যন্ত শজারুর কাঁটার মত দাঁড়িয়ে যেত।

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো, ভগবানের এই বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জুন বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে গেছেন, *হৃষ্টরোমা,* লোমগুলো সোজা হয়ে গেছে। গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন নিজের কথা বলতে গিয়ে বলছিলেন, *বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে,* তখন অন্য একটা পরিস্থিতিতে তাঁর লোমগুলো

খাড়া হয়ে গিয়েছিল; আর এখন *হৃষ্টরোমা*, চমকে গিয়ে, বিস্ময়ে তাঁর লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেছে, সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে গেছে, ঐ রূপ দেখে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছেন। *প্রণম্য শিরসা দেবং*, হাতজোড় করে নতমস্তক হয়ে গেছেন, অর্জুন একেবারে বিনম্র হয়ে সম্ভাষণ করছেন। কিছু না, একটু নিজে যদি আমরা ভাবি, একটু যদি আমরা চিন্তা করার চেষ্টা করি, আমাদের শরীরে কাঁটা দেবে। কি দৃশ্য, কল্পনা করুন ভগবান আপনার সামনে, এমনি না, এই রকম বিশ্বরূপে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। এই বর্ণনা এখন সবে শুরু হল, এবার চলবে। অর্জুন হঠাৎ এই দৃশ্য দেখছেন। এই দর্শন আমার আপনারও হবে, আজ না হোক, এক জন্ম কি দুই জন্ম বা পাঁচ জন্ম পরে সবারই হবে।

যখন এই ধরণের দর্শন হয়, তখনই ঠিক ঠিক ধর্মে মন যায়, তার আগে যাবে না। একটু অনুভূতি যদি না হয়, কি করে আমাদের আস্থা হবে! ঈশ্বরে ভক্তি, ঠাকুরে ভক্তি এই কথাগুলি আমরা বলি বটে, কিন্তু এগুলো সব মুখের কথা। দুটো কথা শিখে নিয়েছি, ঠাকুর আছেন, ঠাকুর দেখবেন, টিয়া পাখির মত আওড়ে যাচ্ছি। কিন্তু ঠিক ঠিক অন্তর্জগতে প্রবেশ এই ধরণের দর্শনের পরে হয়। এই ধরণের দর্শন হলে তখন ঠিক ঠিক বোঝা যায়, আমি কিছুই না। আসল হলেন তিনি, ঠাকুরই সব করছেন। এই কথা শুনে যদি *হৃষ্টরোমা* হচ্ছেন না, গায়ে আপনার কাঁটা দিচ্ছে না, তাহলে বুঝবেন গীতা আপনার জন্য নয়, গীতা ছেড়ে দিন, ধর্ম জীবন আপনার জন্য নয়। অর্জুন একেবারে হাঁটু গেড়ে নতমস্তক হয়ে ভগবানের স্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। অর্জুন এই বিশ্বরূপের মধ্যে কি কি দেখছেন, কেমন দেখছেন? সেটাই এবার এক এক করে বলছেন –

অর্জুন উবাচ
পশ্যামি দেবাংস্তবে দেব দেহে
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্।।১৫।।

(অর্জুন বলছেন –হে দেব, আপনার এই বিশ্বরূপে সমস্ত দেবতা, চরাচর জগৎ, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ, বাসুকি প্রভৃতি সর্পসমূহ ও পৃথিবীপদ্মের মেরুকর্ণিকাসনে অবস্থিত সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকেও দেখছি।)

অর্জুন কি কি দেখছেন সেটারই বর্ণনা করছেন, এর মধ্যে ব্যাখ্যা করার বিশেষ কিছু নেই। অর্জুন বলে যাচ্ছেন, আমি দেখছি আপনার এই শরীরে দেবতাদের থেকে শুরু করে স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় যা কিছু আছে, যত রকমের জীবজন্তু হতে পারে সমস্ত কিছু আমি দেখছি, শাপ, বিছে, পোকামাকড় যা কিছু আছে সমস্ত আপনার মধ্যে দেখছি। যাদের খুনী বলে সবাই জানে, যাদের ধর্ষণকারী বলে সবাই জানে, সবাইকে আপনার মধ্যে দেখা যাচ্ছে, আপনার বাইরে কিছু নেই। আর তার সাথে আমি দেখতে পাচ্ছি, পদ্মফুলের যে আসন, সেই পদ্মের উপর সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা উপবিষ্ট হয়ে আছেন। ব্রহ্মাকে বলা হয় সৃষ্টিকর্তা, তিনিও সেই ভগবান থেকেই বেরিয়েছেন। এটাকে আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *পৃথিবীপদ্মমধ্যে মেরুকর্ণিকাসনস্থম্*, পৃথিবীকে যদি মনে করা হয় একটা পদ্মফুল, সেখানে সুমেরু পর্বত, তার উপর ব্রহ্মা বসে আছেন। ব্রহ্মার যে ছবি আমরা বেশির ভাগ জায়গায় দেখতে পাই, সেখানেও ব্রহ্মাকে পদ্মের উপর বসে আছেন দেখানো হয়েছে। আর তার সাথে বশিষ্ঠাদি ঋষিদের আমি দেখতে পাচ্ছি, বাসুকি আদি সর্পদেরও আমি দেখছি। এর আগে ভগবান দশম অধ্যায়ে বলেছেন, সর্পের মধ্যে আমি বাসুকি। অর্জুনকে ভগবান এমন দিব্য দৃষ্টি দিয়েছেন যে, অর্জুন সব কিছুকে এক সঙ্গে দেখতে পারছেন।

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।।১৬।।

(হে বিশ্বেশ্বর, সর্বত্র বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও বহু নেত্র-বিশিষ্ট আপনার বিরাট মূর্তি দেখছি। হে বিশ্বরূপ, আমি আপনার আদি, মধ্য ও অন্ত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।)

আপনার অনেক বাহু, অনেক উদর, অনেক নেত্র, আর *সর্বতোঽনন্তরূপম্*, যেদিকেই তাকাই সেই-দিকেই আপনার এই অনন্তরূপ। ঠাকুরের সেই বিখ্যাত পাখির গল্পে আমরা পাই, জাহাজের মাস্তুলে একটা পাখি বসেছিল। সেই জাহাজ কখন সমুদ্রের মাঝখানে চলে এসেছে পাখিটা বুঝতে পারেনি। পাখি এখন যেদিকে উড়ে যাচ্ছে সেই দিকেই শুধু জল আর জল, কোথাও কোন ডাঙা দেখতে পাচ্ছে না। অর্জুনও যেদিকে তাকাচ্ছেন সেদিকেই এই বিশ্বরূপ দেখছেন, অনন্ত। এই অনন্ত কিন্তু আসল অনন্ত নয়। ভগবানের যে বিশ্বরূপ, এটাও কিন্তু সীমিত। তাহলে আসল যে অনন্ত, যিনি সচ্চিদানন্দ, সেই অনন্ত এখন কেমন হবে এবার আমরা একটা কল্পনা করতে পারি। আসলে ঐ জিনিসটাকে কল্পনা করানোর জন্যই, এই বিশ্বরূপের কথা বলা, যাতে মানুষ ঈশ্বরের অনন্ত রূপের একটা ধারণা করতে পারে। সেই এক শরীরের মধ্যে ব্রহ্মাকে দেখা যাচ্ছে, ঋষিদের দেখতে পাচ্ছেন, দেবতাদের দেখতে পাচ্ছেন, পিতৃদের দেখতে পাচ্ছেন, মনুষ্যকুলকে দেখতে পাচ্ছেন, সর্পজাতিদের মধ্যে বাসুকিকেও দেখা যাচ্ছে।

নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং, তাঁর অন্ত দেখতে পারছেন না, কোথা থেকে এর শুরু, সেই আদি দেখতে পারছেন না, তাঁর মধ্য ভাগ কোনটা সেটাও দেখতে পারছেন না, শুধু অনন্ত অনন্ত আর অনন্ত। যাঁরা সমুদ্র দেখেছেন, তাঁরা জানবেন, সমুদ্রের যেদিকে তাকাই সেই দিকেই সমুদ্র, নীল সমুদ্র ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। সমুদ্রের মাঝখান কোনটা, কোথা থেকে শুরু আর কোথায় এর শেষ, বলার কোন উপায় নেই, শুধু জল আর জল। আগেকার দিনে যাঁরা জাহাজ নিয়ে যেতেন, নাবিকরা, জাহাজের যাত্রীর অনেক দিন পর যেদিন মাটি দেখতে পেতেন, তখন তাঁদের কি আনন্দই না হত। অর্জুন বলছেন, হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ, হে পরমাত্মা, আপনার আদি, অন্ত, মধ্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একদিকে যেমন কিছুই দেখা যাচ্ছে না, অথচ দেখা যাচ্ছে, এটাই বিশ্বরূপের বৈশিষ্ট্য।

কিরীটিনাং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্।।১৭।।

(কিরীট, গদা ও চক্রধারী, সর্বত্র দীপ্তিমান, তেজঃপুঞ্জ স্বরূপ, দুর্নিরীক্ষ্য, প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট এবং অপ্রমেয়স্বরূপ আপনাকে সর্বত্র দেখছি।)

কিরীটিনাং, যাঁর মাথায় কিরীটি শোভা পাচ্ছে; *গদিনং*, যাঁর হাতে গদা; *চক্রিণঞ্চ*, আর যাঁর হাতে চক্র রয়েছে। ভগবান বিষ্ণুর যে পরিচিত রূপ, মাথায় মুকুট রয়েছে। তিনি চতুর্ভুজম্, এক হাতে গদা আছে, অন্য হাতে চক্র আছে, পদ্ম আছে, শঙ্খ আছে। গদাযুক্ত, চক্রযুক্ত তার সাথে তেজঃপূর্ণ, যেটা আগে বললেন, *দিবি সূর্যসহস্রস্য*। *সর্বতো দীপ্তিমন্তম্*, তাঁর যে দীপ্তি, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। *পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং*, এত দীপ্তি যে আপনার দিকে তাকানো যাচ্ছে না, *দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্*, চারদিকে মনে হচ্ছে আগুন যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে, আর সূর্যের মত তার তেজ। দীপ্ত অনল, আগুন জ্বলছে, তার সাথে সূর্যের আলো। *অপ্রেয়ম্*, প্রমেয়ম শব্দের অর্থ আসে মাপা থেকে, যেটাকে

মাপা যায়, যেটাকে মাপা যায় না সেটাকে বলে অপ্রমেয়ম, তার মানে ইন্দ্রিয় দিয়ে, মন ও বুদ্ধি দিয়ে যাকে গ্রহণ করা যায় না। ভগবানের এই বিশ্বরূপ মন বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় না।

বিশ্বরূপের এটা একটা বর্ণনা করা হল। এই বর্ণনার পর গীতা আবার আমাদের তত্ত্বে নিয়ে যাচ্ছেন। শাস্ত্র একজন করুণাময়ী মায়ের মত, আমাদের ধর্ম জগৎ, ধর্ম জীবনের তিনি মা। গীতা অধ্যয়নের সাথে সাথে, গীতার তত্ত্ব কথাগুলিতে যদি মন দেওয়া যায়, তবেই গিয়ে ধর্মজীবন শুরু হয়। করুণাময়ী মা নিজের সন্তানকে একই কথা, একই জিনিস কতবার করে, কত রকম ভাবে শেখাতে থাকেন। গীতাও ঠিক সেইভাবে আমাদের শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে।।১৮।।

(আপনি পরব্রহ্ম এবং একমাত্র জ্ঞাতব্য। আপনি বিশ্বের পরম আশ্রয় ও সনাতন ধর্মের রক্ষক। আপনি সনাতন পরমাত্মা –এটাই আমার অভিমত।)

এই শ্লোকে অর্জুন ঈশ্বরকে পরিভাষিত করছেন। সেই ঈশ্বর আর শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে যোগসূত্র, সেই যোগটাকে এনে অর্জুন এই শ্লোকে বলছেন। সেই ঈশ্বরই যে শ্রীকৃষ্ণ হয়ে এসেছেন, অর্জুন এটা কিন্তু অনুমান করছেন। আচার্য এখানে খুব সুন্দর বলছেন, *ইত এব তে যোগশক্তিদর্শনাদ্ অনুমিনোমি*, আপনার যে যোগশক্তি দেখছি, শ্রীকৃষ্ণ এই যে অর্জুনকে বললেন, *পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্*, আমার ঐশ্বর্যটা দেখ, এটা দেখার পর আমি নিশ্চিত হয়েছি। সংস্কৃতে এনারা অনেক কিছু ন্যায়শাস্ত্র থেকে বিভিন্ন শব্দ নিয়ে আসেন, যেটা দিয়ে একটা জিনিসকে ইঙ্গিত করা হয়; ইঙ্গিত মানে জিনিসটা এখনও পরিষ্কার না। কারণ ঈশ্বরকে তো সরাসরি জানা যায় না, এই জিনিসগুলি দেখলে তখন বোঝা যায়। আমরা যদি মনে করি, এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, এর কি কোন স্রষ্টা আছেন? যদি মনে করি একজন স্রষ্টা আছেন, তখন অনুমান করা যাবে ঈশ্বর এই রকম।

অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করেছেন, সেখান থেকে অনুমান করছেন, যাঁরা মুমুক্ষু, যাঁর ভিতর ঈশ্বরকে জানার তীব্র ইচ্ছা জেগেছে, তা তিনি গৃহস্থই হন আর সন্ন্যাসই হন, তাঁরা সেই অক্ষরকে জানেন। অক্ষর মানে যাঁর কখন ক্ষর হয় না, নাশ হয় না। *ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্য*, আপনি সেই অক্ষর, পরম, আর আপনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য, ঈশ্বরই একমাত্র যিনি জানার মত। ঠাকুর বলছেন, এক জানার নাম জ্ঞান, অনেক জানার নাম অজ্ঞান। পরমাত্মাকে জানাই হল জ্ঞান, বাকি সব অজ্ঞান।

ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্, নিধান শব্দের অর্থ আচার্য এই ভাবে করছেন, *নিধিয়তে অস্মিন্ ইতি নিধানং*, যেখানে কোন জিনিসকে রাখা হয় সেটাকে নিধান বলা হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় যা কিছু আছে, সব ভগবানে রাখা আছে। এই ভগবানকে মানুষ যে ভাবে খুশী নিতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ রূপে নিতে পারে, শিব রূপে নিতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে নিতে পারে, সেটা যার যার ব্যাপার, কিন্তু এটা জানতে হবে, পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিধান তিনি। এটা কিন্তু অর্জুন অনুমান করে বলছেন। বাংলায় যে অর্থে অনুমান বলি, সেই অর্থে এই অনুমান না। এর অর্থ হল, এটা আমার conclusion, আমার এই রকম মত। অর্থাৎ এটা যদি এই রকম হয়, তাহলে আমার মতে এই রকম হবে। এই রকম আপনাকে যখন দেখলাম, তাতে আমার এটাই মনে হয় যে, *ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্*।

ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মত মে, হে কৃষ্ণ, আপনার এই দিব্য ঈশ্বরীয় রূপ দেখে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে আমি যেটা বুঝেছি, তা হল, আপনি অবিনাশী, আত্মা যেমন অব্যয় হয়, ভগবানও তেমনি অব্যয়। *শাশ্বতধর্মগোপ্তা,* আপনি সনাতন ধর্মের রক্ষক। আজকে আমরা হিন্দু ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলছি। কিন্তু এখানে ঐ অর্থে বলা হচ্ছে না। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত নিয়মকানুন আছে, তা সে আধ্যাত্মিকতারই হোক, ধর্মেরই হোক বা ফিজিক্স, কেমেস্ট্রিরই হোক, এটাকে সংস্কৃতে *ঋতম্* বলা হয়। এই ঋতমের আপনি রক্ষক। সনাতন ধর্ম মানে যে আধ্যাত্মিক সত্যগুলি আছে, সেগুলির আপনি *গোপ্তা,* আপনি তা রক্ষা করেন। সেইজন্য দরকার হলে ভগবান কখন দেবলীলা করেন, কখন মনুষ্যলীলা করেন আবার অবতার হয়ে এসে অবতারলীলা করেন। সনাতম ধর্ম মানে, যে ধর্ম চিরদিনই আছে। ঠাকুরও বলছেন, সনাতন ধর্মই থাকবে, বাকি সব ধর্ম আসবে যাবে, এই কথা ঠাকুর ব্রাহ্ম সমাজকে নিয়ে বলেছিলেন। *সনাতনস্ত্বং পুরুষো মত মে,* পুরুষসূক্তমে আদি পুরুষের কথা বলা হয়েছে, আপনি সেই আদিপুরুষ, বেদে যাঁকে পুরুষ বলা হয়েছে, আপনি সেই পুরুষ।

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্।।১৯।।

(আমি দেখছি, আপনার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই; আপনি অনন্তশক্তিশালী ও অসংখ্যবাহুবিশিষ্ট, চন্দ্র ও সূর্য আপনার নেত্র; আপনার মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত অগ্নির জ্যোতিঃ এবং আপনি স্বীয় তেজে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করছেন।)

আপনার আদি নেই, মধ্য নেই, অন্ত নেই; তার সাথে আপনি *অনন্তবীর্যম্,* আপনার অনন্ত সামর্থ, আপনার সামর্থের ইতি করা যায় না। *অনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্,* আপনার অনন্ত বাহু, সূর্য চন্দ্রমা আপনার চক্ষুদ্বয়। আকাশে এই দুটো নক্ষত্রই বড় করে দেখা যায় বলে ওনারা এই দুটো নক্ষত্রকে ভগবানের চোখ রূপে দেখেন। *পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং,* আপনার মুখ যেন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, সব সময় জ্বল জ্বল করছে আপনার মুখ। *স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্,* আমি দেখছি সমস্ত বিশ্বকে আপনি সন্তপ্ত করছেন। সূর্যের তাপে না, এমনিই জ্বালাচ্ছেন, একটু পরেই আমরা জানতে পারব কেন এই কথা বলছেন। এখন তিনি যুদ্ধভূমিতে আছেন কিনা, সমস্ত যুদ্ধভূমিকে তাপ দিচ্ছেন। হাজারে হাজারে লোক মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছে। এই যে রূপ, যে রূপ থেকে তাপ বেরিয়ে আসছে, সেখান থেকে পরের শ্লোকে বলছেন –

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।
দৃষ্টাহদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্।।২০।।

(হে ভগবন্, স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ এবং দশ দিক্ আপনি পরিব্যাপ্ত করে আছেন। আপনার এই অদ্ভুত উগ্র বিশ্বরূপ দেখে ত্রিলোক অতিশয় ভীত হচ্ছে।)

ভগবানের এই যে উগ্র রূপ, কালীর যে করালবদনা ভয়ঙ্করা রূপ, এই যে কয়েক বছর আগে করোনার মহামারী যে ভয়ঙ্কর তাণ্ডব চালিয়েছিল, ভগবানের এই ভয়ঙ্কর রূপই করোনার সময় আমাদের মাথার উপর দাঁড়িয়ে ছিল। *দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি,* পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্ত আপনার এই উগ্র রূপে ছেয়ে আছে। *ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ,* সমস্ত দিশা এই রূপে পরিপূর্ণ। কোথাও এতটুকু জায়গা ফাঁকা পড়ে নেই।

দৃষ্টাঽদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্, তিনটে লোক ভগবানের তাপের জ্বালা ও যন্ত্রণায় ব্যথিত হচ্ছে। ভগবানের তাপ অসম্ভব বেড়ে গেছে, তিনটে লোক আপনার এই উগ্র রূপ দেখে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে, মানুষ এই জিনিস নিতে পারছে না। অন্যান্য লোকের যারা বাসিন্দা, তারাও এটা নিতে পারছেন না। নৃসংহ অবতার যখন হিরণ্যকশ্যপুকে বধ করলেন, তখনও তিনটে লোক ভয়ে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছিল। শিব যখন তাণ্ডব নৃত্য করছিলেন, তখনও তিনটে লোক ত্রাহি ত্রাহি করে চিৎকার করছিল; এখনও তাই হচ্ছে।

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ।।২১।।

(শ্রীকৃষ্ণলীলায় ভূভারহরণার্থ ধরাতলে অবতীর্ণ ওই যুধ্যমান মনুষ্যদেহধারী বসু আদি দেবতাগণ আপনাতেই প্রবেশ করছেন। কেউ কেউ ভীত হয়ে করজোড়ে আপনার গুণগান করছেন এবং মহর্ষি ও সিদ্ধগণ 'জগতের কল্যাণ হোক' বলে প্রচুর স্তুতিবাক্য দ্বারা আপনার স্তব করছেন।)

আমাদের পুরাণে এই গল্পগুলি প্রায়ই আসে। পৃথিবীর উপর যখন জনসংখ্যার চাপ খুব বেড়ে যায়, তখন পৃথিবী ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বলে, আমার উপর জনসংখ্যার চাপ প্রচণ্ড বেড়ে গেছে, আমি আর এই ভার সামলাতে পারছি না, আপনি কিছু করুন। ব্রহ্মা তখন কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেন। মহাভারতের সময় এই রকম জনসংখ্য বেড়ে গিয়েছিল, পাপেরও খুব বৃদ্ধি হয়েছিল, তখন ভগবান এসে একটা যুদ্ধ করে জনসংখ্যা কমিয়ে দিলেন। ভগবান তো একে-৪৭ এনে ঢগ্ ঢগ্ করে গুলি মেরে ওড়াবেন না, তিনি কখনো বিশ্বযুদ্ধ লাগিয়ে দেন, কখনো করোনা পাঠিয়ে দেন। কিছু গেল, কিছু থাকল, এই করে একটা ব্যালেন্স করে দেন। বাঁচতে চাইলেও বাঁচা যাবে না, তাই মিছিমিছি কেন কেঁদে মরব। আপনার যদি করোনা নিয়ে এতই ভয় হয়, আপনি ধরে নিন না কেন, সাত দিনের মধ্যে আপনি মারা যাবেন, ঐ সাতটা দিন একটু ভগবানের দিকে মনটা দিয়ে দিন না।

আমার এক বাল্যবন্ধু করোনার সময় আমাকে একটা ম্যাসেজ পাঠালেন, 'আগামীকাল কে দেখেছে, আজকে তাই মৌজমস্তি করে নিই'। কি আর বলার আছে, ষাট বাষট্টি বছর হয়ে গেছে এখনও মৌজমস্তি করতে চাইছে। আপনি ধরে নিন, আর মাত্র কটা দিন হাতে, এতে দুঃখ করার কি আছে, ভগবানে একটু বেশি বেশি মন দিয়ে দিন। পরীক্ষিৎও জেনে গিয়েছিলেন সাত দিনে মারা যাবেন। তিনি সম্রাট ছিলেন, তিনি তো ইচ্ছে করলেই মৌজমস্তিতে নামতে পারতেন, কিন্তু তা না করে, শুকদেবকে ভাগবত কথা শোনাতে বললেন।

এখানে বলছেন, দেবতারা এবার নেমেছেন পৃথিবীর ভার কম করার জন্য। কিন্তু দেবতারা সবাই দৌড়ে দৌড়ে এসে আপনার মধ্যে প্রবেশ করে যাচ্ছে, সব মারা যাচ্ছে। কেউ কেউ পালাতে পারছে না, হাতজোড় করে প্রার্থনা করছে প্রভু রক্ষা কর। কারণ দেবতারাও মৃত্যুকে ভয় পায়। মৃত্যুকে কে না ভয় পায়, সবাই ভয় পায়। সংস্কৃতে শব্দটাই হল *অভিনিবেশ*। যখন যে দেহে থাকবে, তখন সেই দেহতেই আসক্তি আসবে। যে জন্মে আমি ছাগল হয়েছিলাম, তখন ঐ ছাগল দেহেই আসক্তি ছিল, এখন এই মনুষ্য দেহে আসক্তি। এরপর যদি দেবতা হয়ে যাই তখন দেবদেহের প্রতি আসক্তি হবে। যতক্ষণ দেহ থাকবে ততক্ষণ দেহের প্রতি আসক্তিও থাকবে, কিছু করার নেই। কারণ দেহ থাকলেই মন থাকবে, মন থাকলেই অভিনিবেশ থাকবেই। অবিদ্যা যেখানে থাকবে সেখানে অভিনিবেশও থাকবে।

ভগবান তাঁর ঐ উগ্র তেজোময় শরীরের মধ্যে সবাইকে টেনে নিচ্ছেন। কেউ আবার হাতজোড় করে প্রার্থনা করছে। তার সাথে অর্জুন দেখছেন, যাঁরা মহর্ষিরা আছেন, সিদ্ধরা আছেন, তাঁরা দেখছেন, চারিদিকে এক ভয়ঙ্কর উৎপাত চলছে, এক কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে গেছে। তাঁরা সবাই তাই জগতের শুভ কামনা করে, 'জগতের শান্তি হোক শান্তি হোক' বলে স্বস্তিবাচক মন্ত্রোচ্চারণ করে যাচ্ছেন। মানুষ যখন একেবারে অসহায় হয়ে যায়, যখন দেখে আর কোন উপায় নেই, তখন তারা এভাবে প্রার্থনা করে। প্রার্থনা করা ছাড়া তখন আর কোন উপায়ও থাকে না। কারা কারা এভাবে প্রার্থনা করছেন? –

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে।।২২।।

(রুদ্রগণ ও আদিত্যগণ, সাধ্য নামক দেবগণ ও বসুগণ, বিশ্ব নামক দেবতাগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ ও পিতৃগণ এবং হাহা হূহূ প্রভৃতি গন্ধর্ব, কুবের প্রভৃতি যক্ষ, বিরোচন প্রভৃতি অসুর ও কপিলাদি সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হয়ে আপনার বিশ্বরূপ দর্শন করছেন।)

বিভিন্ন লোকের দিব্য বাসিন্দাদের বর্ণনা করছেন, এদের মধ্যে রুদ্র, আদিত্য দেবতারা আছেন, অষ্ট বসু, সাধ্য নামক দেবগণ, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমাররা, মরুৎগণ, উষ্মপা আদি পিতৃগণরা আছেন। তার সাথে আছেন গন্ধর্ব, যক্ষ, সিদ্ধ সমুদয়। হাহা হুহু এনারা সবাই খুব নামকরা গন্ধর্ব, কুবেরের মত যক্ষরা আছেন, অসুরদের মধ্যে বিরোচন। উষ্মপা হচ্ছেন একধরণের পিতৃগণ, যাঁরা অন্য কিছু খাওয়া দাওয়া করেন না, শুধু সূর্যের রশ্মিই পান করে থাকেন, গন্ধর্বদের মধ্যে হাহা হূহূ, দশম অধ্যায়ে ছিল *গন্ধর্বানাং চিত্ররথঃ*, কিন্তু চিত্ররথের থেকেও আরও বিখ্যাত গন্ধর্ব হলে হাহা হূহূ। গন্ধর্বরা সাধারণত সঙ্গীতে পারঙ্গম, কিন্তু হাহা হূহূরা আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্ন গন্ধর্ব। আর কপিলাদি সিদ্ধগণ, সিদ্ধদের মধ্যে কপিল, বিভূতি যোগে বললেন *সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ*, এনারা সবাই অবাক বিস্ময়ে আপনার এই বিশ্বরূপের দিকে তাকিয়ে আছেন। এনারা সকলেই সূক্ষ্ম জগতের বাসিন্দা বলে ভগবানের এই রূপ দেখতে পারছেন। ভগবান এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে নিয়েছেন।

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালাং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্।।২৩।।

(হে মহাবাহো, বহু মুখ, বহু চক্ষু, বহু বাহু, বহু উরু, বহু চরণ ও বহু উদর-বিশিষ্ট এবং অসংখ্য বৃহৎ দন্ত দ্বারা ভীষণ আপনার বিরাট বিগ্রহ দেখে সমস্ত প্রাণী অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছে এবং আমিও অতিশয় ভীত হয়ে পড়েছি।)

একই বর্ণনা চলছে। অর্জুন বলে যাচ্ছেন –হে ভগবান, আপনার এই বিরাট রূপের মধ্যে কত মুখ, কত চোখ, কত বাহু, কত উরু, কত চরণ আর বহু উদর, কত রকমের সেই উদর। আর আপনার হাজার হাজার মুখগুলোর সাথে বিরাটাকার দাঁত গুলো দেখে পুরো ব্যাপারটা এত ভয়ঙ্কর লাগছে যে আমিও অতি মাত্রায় ভয়ে কাতর হয়ে পড়ছি। ঠাকুর বলছেন, যদি কোন মেয়ের প্রতি আসক্তি হয়ে যায় তখন ঐ মেয়ের সব অঙ্গগুলি যদি দ্বিগুণ করে দেখা হয়, তাহলে ওই নারীর প্রতি আসক্তি চলে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সখা, সে নিজেই সখার এই রূপ দেখে ভয়ে কাঁপছে তাহলে অন্য প্রাণীর কি অবস্থা হবে ভাবাই যাচ্ছে না, সমস্ত প্রাণী ভয়ে তটস্থ হয়ে কাঁপতে শুরু করেছে।

মাকে যতই ছেলে ভালোবাসুক, মা যখন রেগে যায় বা বাবা-মা মিলে যদি ঝগড়া শুরু করে তখন সন্তানও ভয়ে কাঁপতে থাকে।

আমেরিকাতে একটা গবেষণা করা হয়েছিল বাচ্চারা কিসে সব থেকে বেশি ভয় পায়। গবেষণার পর যেটা বেরিয়েছে তাতে বলছে যে বাচ্চারা বাবা-মার ঝগড়া আর ডিভোর্সকে বেশি ভয় পায়, আর স্কুলের হেডমাস্টার যদি কোন বাচ্চাকে ডেকে পাঠায়। অর্জুন বলছেন, আপনার এই রূপ দেখে সব মানুষ ভয়ে কাঁপছে, আমিও ভয়ে কাতর হয়ে পড়ছি।

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো।।২৪।।

(হে ভগবান্, আপনার আকাশস্পর্শী তেজোময়, নানা বর্ণযুক্ত ও বিস্ফারিত মুখমণ্ডল এবং উজ্জ্বল বিশাল চক্ষু দেখে আমার হৃদয় ব্যথিত হয়েছে এবং আমি ধৈর্য ও শান্তি পাচ্ছি না।)

ভগবান বিষ্ণু হিরণ্যকশ্যপুকে মারার জন্য যে ভয়ঙ্কর নৃসিংহ রূপ ধারণ করেছিলেন, এখানেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই ভয়ঙ্কর এক রূপ ধারণ করে আছেন। *নভঃস্পৃশং*, আকাশ পর্যন্ত যাঁর শরীর ব্যপ্ত হয়ে আছে; *দীপ্তমনেকবর্ণং*, আর তার সাথে প্রদীপ্ত, আলোময়, সেই আলোতে অনেক ধরণের রঙের ছটা লেগে আছে; লাল, নীল, সবুজ, হলুদ সব রঙের বর্ণচ্ছটা। *ব্যাত্তাননং*, আপনার মুখ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, আর বিশাল দীপ্তময় আপনার চোখ। সবটাই যেন জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। হে বিষ্ণু, হে ভগবান, আপনার এই রূপ দর্শন করে *প্রব্যথিতান্তরাত্মা*, আমার অন্তরাত্মা শুধু ব্যথিত না, প্রকৃষ্ট রূপে ব্যথিত, এত ব্যথিত যে ভয়ে আমার অন্তরাত্মা কাঁপছে। সেইজন্য আমার মন ভয়ে ব্যকুল হয়ে আছে, আমি ধৈর্য ধরে রাখতে পারছি না, আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে যে নিগ্রহ করব, তা করতে পারছি না, কারণ ইন্দ্রিয়গুলি আমার বশে থাকছে না, আতঙ্কে চঞ্চল হয়ে উঠছে।

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্টৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।।২৫।।

(হে দেবেশ, দীর্ঘ দন্ত দ্বারা বিকৃত ও প্রলয়াগ্নিতুল্য আপনার মুখসকল দেখে আমার দিগ্‌ভ্রম হচ্ছে এবং আমি শান্তি পাচ্ছি না। হে জগন্নিবাস, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন।)

এই যে আপনার ভয়ঙ্কর আকৃতি, যেখানে দাঁতগুলি বেরিয়ে আছে, আর প্রলয়কালে যে অগ্নি সমস্ত কিছুকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে, ঐ রকম অগ্নি দেখে আমি এত বিচলিত হয়ে গেছি যে ঠিক ভাবে দিক্ নির্ণয় করতে পারছি না, পূব পশ্চিম কোন দিকে, উত্তর দক্ষিণ কোন দিকে কিছুই বুঝতে পারছি না। হে ভগবান, আপনাকে দেখে যে একটা শান্তি পাব, সেই শান্তি আমি একেবারেই পাচ্ছি না। আমার মাথা ঘুরছে। প্রথমের দিকে অর্জুনের মাথা ঘুরছিল নিজের আপনজনরা সবাই মারা যাবে এই ভেবে, আর এখন মাথা ঘুরছে ভগবানের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে। আমি ভয় পেয়ে গেছি, আপনি শান্ত হন, শান্ত হন। মা খুব রেগে গেলে বাচ্চা যেমন মাকে বলে, মা মা তুমি এমন করছ কেন, ও-রকম কোরো না, অর্জুনও ঘাবড়ে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, প্রভু আপনি শান্ত হন, পূব পশ্চিম আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাহসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ।।২৬।।
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ।।২৭।।

(রাজন্যবর্গ সহ ঐ ধার্তরাষ্ট্রগণ এবং মৎপক্ষীয় ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি প্রধান যোদ্ধাগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের সঙ্গে আপনার দংষ্ট্রাকরাল ভীষণ মুখগহ্বরে দ্রুতবেগে প্রবেশ করছেন। মুখপ্রবিষ্টদের মধ্যে কেউ কেউ চূর্ণিতমস্তক হয়ে ভক্ষিত মাংসখণ্ডসমূহের ন্যায় আপনার দন্তসন্ধিস্থলে সংলগ্ন হচ্ছে, দেখছি।)

এই যে ধৃতরাষ্ট্রের অন্য সন্তানগণ, যেসব রাজারা আছেন, আমি দেখছি এরা সবাই প্রচণ্ড বেগে আপনার মুখের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। এরাই শুধু না, তার সাথে দেখছি, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, এবং আমাদের দিকের যে যোদ্ধারা, ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি যাঁরা আছেন সবাই আপনার মুখে ঢুকে যাচ্ছে। সবাই মৃত্যুর মুখে সাঁ করে ঢুকে যাচ্ছে, ভাক্যুম ক্লিনার যেমন সব কিছু টেনে নেয়, আপনার মুখ সব কিছুকে সেই রকম টেনে নিচ্ছে। সমস্ত যোদ্ধাদের পরিষ্কার আমি দেখছি সবাই আপনার মুখের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। এখনও যুদ্ধ শুরু হয়নি, তার আগেই অর্জুন এই মৃত্যুর দৃশ্য দেখে নিলেন।

কিভাবে আপনার মুখে ঢুকে যাচ্ছে? প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতম বেগে ঢুকে যাচ্ছে। হিমালয়ে গঙ্গাকে কেউ যদি দেখে থাকেন, তাঁরা কিছুটা এই দৃশ্যটার কল্পনা করতে পারবেন। সেখানে গঙ্গা কি প্রচণ্ড বেগে নেমে আসে, ঠিক সেইভাবে তীব্র বেগে সবাই ভগবানের মুখে ঢুকে যাচ্ছে। শুধু কি তাই, এই ভয়ঙ্কর রূপ, তার উপর আবার সব কটাকে আপনি ঐ বিশাল বিশাল দাঁত দিয়ে চিবিয়ে যাচ্ছেন। আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *দন্তান্তরেষু মাংসম্ ইব ভক্ষিতং*, পশুর মত একসাথে প্রচুর মাংস খাওয়ার সময় কিছু মাংস দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকে, ঠিক সেই রকম এই রাজাদের মাথাগুলো আপনার দাঁতের মাঝখানে আটকে আছে। আর সেগুলোকে কড়মড় করে আপনি চিবিয়ে যাচ্ছেন।

যথা নদীনাং বহবোহম্বুবেগাঃ
সমুদ্রেমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যাভিবিজ্বলন্তি।।২৮।।

(যেমন নদীসমূহের বহু জলস্রোত সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে দ্রুতবেগে সমুদ্রে বিলীন হয়, সেই রকম এই বীরপুরুষগণ আপনার সর্বত্র প্রজ্বলন্ত মুখগহ্বরে প্রবেশ করছেন।)

নদীর জলপ্রবাহ যেভাবে সমুদ্রে ঢুকে যায়, কুরুক্ষেত্রে যত বীর আছে সবাই দৌড়ে আপনার মুখে ঢুকে যাচ্ছে। আর আপনি তাদের চিবিয়ে যাচ্ছেন। ভাবলেই আতঙ্ক লাগে। এখন যুদ্ধ হবে বলে এই রকম হচ্ছে তা তো নয়, সারা বিশ্ব জুড়ে প্রতি মুহূর্তে কত লক্ষ লক্ষ লোক, কত কোটি কোটি প্রাণী মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে, মৃত্যু মানেই তো সেই ঈশ্বরের জ্বলন্ত মুখ গহ্বরে ঢুকে যাওয়া। অর্জুন আরেকটি উপমা দিচ্ছেন –

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ।।২৯।।

(পতঙ্গকুল যেমন দ্রুতগতিতে ধাবিত হয়ে মরণের জন্যই জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেই রকম এই লোক-সকলও মৃত্যুর নিমিত্ত অতিবেগে আপনার মুখগহ্বরসমূহে প্রবেশ করছেন।)

আগুন জ্বললে পতঙ্গকুল যেমন আগুনের দিকে ছুটে গিয়ে আগুনের মধ্যে ঢুকে যায়, ঠিক সেই ভাবে *সমৃদ্ধবেগাঃ*, যত আপনার দিকে যাচ্ছে তত তাদের গতি বেড়ে যাচ্ছে, মানে মৃত্যুর দিকে দ্রুতগতিতে দৌড়ে চলে যাচ্ছে, আর হু হু করে আপনার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ যখন চলছিল, কি হবে তখন কেউ জানত না কি হতে যাচ্ছে, কারুর কিছু করার ছিল না। এইসব দেখেই ভগবান বুদ্ধের মধ্যে প্রচণ্ড করুণার উদ্রেক উথলে উঠেছিল –আহা! কিভাবে মানুষগুলো মরছে, যে জীবনধারণ করবার জন্য জন্ম নিচ্ছে সেই মরছে, এইতো জীবন তার উপর আবার এই জগৎ, ইন্দ্রিয়সুখ, এ-সবের প্রতি এতো আসক্তি। কিন্তু বুঝতে পারছে না কিভাবে সে মৃত্যুর দিকে দৌড়ে যাচ্ছে, *সমৃদ্ধবেগাঃ*, দৌড়ানর গতিটা বেড়েই যাচ্ছে আর মৃত্যুও ততই সন্নিকটে চলে আসছে, মানুষের এই ব্যাপারে কোন হুঁশই নেই, ভগবান বুদ্ধ এটাই চেয়েছিলেন কিভাবে মানুষকে এই অসহায় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ দেওয়া যায়।

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ
লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো।।৩০।।

(হে ভগবান্, আপনি আপনার জ্বলন্ত মুখসমূহ দ্বারা দুর্যোধনাদি সকল লোককে গ্রাস করে সর্বদিকে ভক্ষণ করে যাচ্ছেন। আপনার তীব্র প্রভা সমগ্র জগৎকে তেজোরাশি দ্বারা পূর্ণ করে সন্তপ্ত করছে।)

আপনার এই সংহার মুর্তি –দাঁতের ফাঁকে কারুর মাথা আটকে, কারুর মাংস আটকে ঝুলছে, তার মধ্যে আপনি আবার *লেলিহ্যসে*, লেহন করছেন, চেটেপুটে সব খাচ্ছেন। দই, পায়েস যেমন চেটে চেটে খায়, ভগবানও তেমনি চেটেপুটে খাচ্ছেন। কাদের? ঐ মানুষগুলোকে, যাদের মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন, কর্ণের মত বড় বড় মহারথীরাও আছেন, সব কটাকে চেটেপুটে খাচ্ছেন। আস্বাদ করে করে চিবিয়ে, চেটেপুটে গিলে নিচ্ছেন। এটাই হচ্ছে মৃত্যুরূপা কালীর রূপ। তাই বলা হয়, যে মানুষ মৃত্যুকে ভালোবাসতে পারে না, ঈশ্বরকে মৃত্যুরূপে দেখতে চায় না, সেই মানুষের চরম উপলব্ধি কখনই হতে পারবে না। কারণ মৃত্যুটাও ঈশ্বরের একটা অবশ্যম্ভাবি বাস্তব রূপ। হিন্দুধর্মের এটাই বৈশিষ্ট্য যে, মৃত্যুকে অন্য কারুর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয় না, মৃত্যুটাও ঈশ্বরের, জীবন থেকে মৃত্যু সবটাই তাঁর।

তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং, আপনার দেদীপ্যমান তেজ সমস্ত জগতকে প্লাবিত করে দিচ্ছে। হে প্রভু, জগৎ আপনার এই তেজ নিতে পারছে না। আপনি কে? কি করছেন এটা? ঠাকুর নরেনকে ছুঁয়ে দিয়েছেন, নরেন চিৎকার করে বলছে, কি করছেন মশাই, আমার যে বাবা আছে, মা আছে। একই জিনিস, সেখানেও নরেনকে ঠাকুর এই রকম একটা দর্শন দিলেন।

আখ্যাহি মে মো ভবানুগ্ররূপো
নমোহস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তবে প্রবৃত্তিম্।।৩১।।

(এই উগ্রমূর্তি আপনি কে, আমাকে বলুন। আপনাকে প্রণাম করি। হে দেবশ্রেষ্ঠ, প্রসন্ন হন। আদি পুরুষ আপনাকে আমি জানতে ইচ্ছা করি। কারণ আমি আপনার প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি না।)

এই ভয়ঙ্কর আকৃতি আপনার, ভয়ঙ্কর সব কার্য করে যাচ্ছেন, হে দেবাদিদেব, আপনি দেবতাদেরও দেবতা, আপনাকে প্রণাম করছি, আপনি কৃপা করুন। আমি জানতে চাই, হে পরমেশ্বর আপনি কে? আর আপনি কি করতে চাইছেন? আমি তো জানি আপনি আমার সখা কৃষ্ণ, কিন্তু এই ভয়ঙ্কর জগদ্ব্যাপী রূপে আপনি কে, এই রূপ দেখে আমি স্থির থাকতে পারছি না, আমার মাথা ঘুরছে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, আপনিই কি আমার সেই সখা শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু আমার বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের সাথে আপনাকে আমি মেলাতে পারছি না। *নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ*, আপনাকে আমি প্রণাম করছি, আপনি দেবতাদেরও দেবতা, আপনি আমাকে কৃপা করুন আপনি কে আমার জানতে খুব ইচ্ছে করছে। *ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্*, আপনার কি উদ্দেশ্য, আপনি কি করতে চাইছেন কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনার প্রবৃত্তিটা কি? প্রবৃত্তি মানে হচ্ছে কোন কিছু কাজ করতে নামার যে উদ্দেশ্য।

কর্ণাটকের উডুপিতে ওদের রেস্তোরাঁ গুলি খুব সুন্দর হয়। ওনারা মহাভারতকে নিয়ে খুব সুন্দর সুন্দর গল্প বানিয়েছেন। একটা খুব মজার গল্প হল; যখন কৌরব পাণ্ডবরা যুদ্ধ করার জন্য একত্রিত হলেন, তখন উডুপির রাজা গিয়ে বললেন, সমস্ত যোদ্ধাদের খাওয়া-দাওয়ার দায়ীত্ব আমার। সবাই নিজেদের রামায়ণ মহাভারতের সাথে জুড়ে নিতে চায় কিনা। ওরা রান্নাবান্না করে যাচ্ছে। দেখা যায়, কোন দিনও খাওয়া কম পড়ে না, আর উদ্বৃত্তও হয় না। রাজাকে জিজ্ঞেস করা হল, কি করে এটা সম্ভব, যুদ্ধে এত লোকের রান্না করছেন, কিন্তু কোন দিনও খাওয়া কম পড়ে না, উদ্বৃত্তও হয় না? রাজা বললেন, রোজ সন্ধ্যেবেলা কৃষ্ণের টিফিনের জন্য এখান থেকে আমরা বাদাম পাঠিয়ে দিই। শ্রীকৃষ্ণ নিজের মত বাদাম খাওয়ার পর যেটা বাঁচে সেটা নিয়ে আসি। এরপর আর আমরা গুণে নিই, যতগুলি বাদাম তিনি খেলেন, তার সাথে আমরা এক হাজার গুণ করে দিই, আমরাও বুঝে নিই আগামীকাল এত লোক মারা যাবে। সেটা দিয়ে আমরা হিসাব রাখি এত লোক আগামী কাল মারা যাবে, এতজন বেঁচে থাকবে, এরপর আমরা সেই অনুপাতে খাবার তৈরী করি। জন্মটাও ভগবান দেন, মৃত্যুটাও ভগবান দেন। *ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্*। এরপর ভগবান অর্জুনকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন, মানুষকে নাশ করার জন্য আমি এই রূপ ধারণ করেছি।

অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে আতঙ্কিত, কিভাবে সব উভয় পক্ষের যোদ্ধারা নদীর জলপ্রবাহের মত ভগবানের মুখের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছেন, আর ভগবান তাদের নির্বিকারে খেয়ে যাচ্ছেন, চিবিয়ে চিবিয়ে আর চেটে চেটে খেয়ে যাচ্ছেন। আমরা যেমন ঝালমুরি খেয়ে থাকি, মুঠো করে তুলছেন আর মুখে ঢেলে দিচ্ছেন। আমরা যেমন মরলা মাছ, পুঁটি মাছ একসাথে কয়েকটাকে থালা থেকে তুলে মুখে পুরে দিই; খেতে খেতে মাছের মাথা অনেক সময় দাঁতের ফাঁকে আটকে যায়, ভগবানও সেইভাবে খেয়ে যাচ্ছেন, তবে এখানে মাছ না, মানুষের মাথা। *লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ*, আর চারিদিক থেকে গ্রাস করে ভাল করে চেটে পুটে খেয়ে যাচ্ছেন, তার মানে খুব স্বাদ লাগছে। তাদের মাংসগুলো দাঁতের ফাঁকে আটকে যাচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন এতদিন তাঁর বন্ধু রূপে, সখা রূপে দেখে এসেছেন, হঠাৎ সখার এই রূপ দেখে অর্জুন আঁৎকে উঠেছেন; বিস্ময়ে, ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেছেন। অনেক সময় দেখা যায় কোন বংশে একজন বিস্ময়কর ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে; কয়েক প্রজন্মের পর বংশের লোকেরাও এই ভেবে অবাক হন যে, আমাদের বংশে এই রকম একজন বিস্ময়কর ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল। কবি কাজী নজরুল ইসলামের নাতির সাথে আমার পরিচয় আছে। একবার তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ভাবলে তোমার কেমন লাগে, তোমার ঠাকুরদা এই রকম একজন বিস্ময়কর ব্যক্তি

ছিলেন'। নাতি বলল, 'না সে-রকম কিছু মনে হয় না, কারণ আমরা ভাল করেই জানি উনি একজন বিস্ময়কর ব্যক্তি, একটা আলাদা ধরণের প্রতিভা, ওনার সাথে আমাদের কারুর কোন ভাবেই তুলনা হয় না, সেইজন্য কিছু মনে হয় না'। এই যেমন হঠাৎ মনে হয়, আপনি কি এই সেই ব্যক্তি! অবাক লাগে। আমি যাকে এতদিন বন্ধু রূপে দেখে এসেছি, এই কি সেই আমার বন্ধু, যাঁকে এই রূপে আমি দেখব কোনদিন ভাবতেই পারিনি। কিন্তু দেখছেন সেটা একটা ভয়ঙ্কর রূপ।

আগাথা ক্রিষ্টি খুব নাম করা রহস্য কাহিনীর লেখিকা, ওনার নব্বই এর উপর উপন্যাস আছে। ওনার মেয়ে নাকি পড়াশোনা জানত না। অনেক আগে আমি একটা কার্টুন দেখেছিলাম। কার্টুনে দেখাচ্ছে মায়ের লেখা নব্বই খানা উপন্যাস পর পর সাজানো আছে, আর মেয়েটি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে –আমার মা এতগুলো বই লিখেছে! যাঁকে আমি এত আপন মনে করি সেই তিনি এই। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এতদিন নিজের এত আপন মনে করে আসছেন, এখন দেখছেন, তিনি এই। *আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো,* আপনি কে, এই উগ্র রূপ ধারণ করে আছেন? আমরা এগুলো বিস্তারে বর্ণনা করেছি। এরপর বত্রিশ নম্বর শ্লোক খুব নামকরা শ্লোক। যেখানেই আমি দৈন্য দেখি, দুঃখ দেখি, হাহাকার দেখি, কান্না দেখি, সব থেকে বড় যখন মৃত্যু দেখি, তখনই এই শ্লোকটা আমার ভিতর নাচতে থাকে। এর ব্যাখ্যা খুব সহজ, কিন্তু বলব বেশি।

শ্রীভগবানুবাচ
কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তে সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ।।৩২।।

(শ্রীভগবান্ বললেন –আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল। বর্তমানে আমি লোকসংহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। তুমি যুদ্ধ না করলেও বিপক্ষদলে যে বীরগণ আছেন, তাঁরা কেউ জীবিত থাকবেন না।)

আমি কাল, আমি মৃত্যু, মানুষদের মারার জন্য আমি বর্তমানে এই রূপ ধারণ করেছি। অর্জুন দেখছিলেন, সব যোদ্ধারা কিভাবে নদী যেমন সমুদ্রে ঢুকে যায়, ঠিক সেইভাবে ভগবানের মুখের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। আর তিনি সবাইকে চিবোচ্ছেন, মাংসগুলো দাঁতের ফাঁকে আটকে ঝুলছে, তিনি আবার সেগুলোকে আনন্দে চেটে চেটে খাচ্ছেন। অর্জুন সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে? অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে এবার ভগবান তিনি তাঁর এই ভয়াল রূপ ধারণের কারণ বলছেন। কি বলছেন? আমি *কালোঽস্মি,* আমি কাল। দুটো লাইন কিন্তু বক্তব্য পুরো আলাদা। প্রথম লাইনে বলছেন, *কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ, লোকান্* শব্দের অর্থ এখানে মানুষ হতে পারে, কিংবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হতে পারে। কালের অর্থ হয় সময়।

ফিজিক্সের একটা নিয়মে বলা হয়, second law of thermo dynamics, law of entropy, তাতে বলে, যে কোন জিনিস disintegrate করে, আসলে ওটা হিট নিয়ে আসে। দুটো পাত্রকে যদি পাশাপাশি রেখে দেওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে যার হিট বেশি, তার হিটটা নিজে থেকে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে পাশেরটাতে যার হিট কম। তারপর আস্তে আস্তে দুটো ব্যালেন্সে এসে যায়। ব্যালেন্সে সব সময় জিনিসটা উপর থেকে নীচের দিকে যায়। যত কম্যুনিস্ট রিভলিউশান হয় সেখানে সব সময় যারা উঁচু তারা মার খায়। একা একজন খেটেখুটে বড় হয়েছে, কিন্তু কাল এমন একটা জিনিস, বড় সব সময় ছোটকে ছেটেছুটে সব কটাকে সমান করে দেয়, এটাকে বলে এ্যানট্রপি। এ্যানট্রপিকে বলা হয়, Entropy increases with time. Disorder in a system। যখন একটা জিনিসকে গরম করা হয়েছে, সেখানে একটা প্যাটার্ন আনা হয়েছে, এটা কিন্তু আস্তে আস্তে নাশ হয়ে যাবে। এই কারণেই সব বিল্ডিং গুলো সময়ের সাথে আস্তে আস্তে ঝরঝরে হয়ে যায়,

একটা গাড়ী খারাপ হয়ে যায়, মানুষের ধীরে ধীরে খারাপ হয়ে যায়। কাল হল এই disintegrating force। যদি চাল, জল, আগুন আলাদা করে রেখে দেওয়া হয়, ঐ চাল কোন দিন ভাত হবে না। কারণ ভাতের প্রপার্টি যে ভাবে গোছান হয়েছে, এই জিনিসটা সময়ের সঙ্গে হবে না। কিন্তু ভাত বানিয়ে যদি রেখে দেওয়া হয়, আস্তে আস্তে ওটা খারাপ হয়ে যাবে। জগতের এটাই নিয়ম, যদি ধরে না রাখা হয় খারাপ হয়ে যাবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে কোন বস্তুর এই অবস্থাই হবে।

আমি যাঁর কাছে শিক্ষা পেয়েছি, শ্রীমদ্ স্বামী মোক্ষদানন্দজী মহারাজ, একদিন উনি একটা কথা বলছিলেন, সেই সময় আমার মুখ থেকে কঠোপনিষদের সেই মন্ত্রটা বেরিয়ে গেল। উনি আমাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন, 'ও, এ-সব মুখস্ত করা হয়েছে বুঝি'? আমি বললাম, 'হ্যাঁ মহারাজ এক সময় মুখস্ত করেছিলাম, কিন্তু এখন আর আবৃত্তি করার সময় হয় না'। উনি তখন খুব সুন্দর কথা বলেছিলেন। 'দেখ, যারা বিষয়ী লোক, যাদের অনেক ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আছে, অনেক টাকা আছে, তারাও মাঝে মাঝে ব্যাঙ্কের পাশ বইটা উল্টেপাল্টে দেখে, হিসাব করে দেখে কত টাকা হয়েছে, এতে ওরা আনন্দ পায়। তুমি এত খেটেখুটে উপনিষদ মুখস্ত করলে, মাঝে মাঝে এটা আবৃত্তি করে তুমি দেখবে না, কেমন মুখস্ত করেছি'? শ্রোতাদের অনেকে আছেন যাঁরা আমাদের শাস্ত্রের কথা শুনে রোজ চণ্ডী পাঠ করেন, অনেকে অবশ্য আগে থেকেই স্নানের পর নিয়মিত চণ্ডী পাঠ করেন, গীতা পাঠ করেন। এই অভ্যাসটা ছাড়তে নেই, এটাকে অর্জন করেছেন, ধরে রাখুন।

একজন সুফী সম্প্রদায়ের সাধু আমাকে ভক্তি কিভাবে অর্জন করতে হয় প্রশ্ন করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'যেভাবে মানুষ জমিদারী অর্জন করে, সেইভাবে ভক্তিকে অর্জন করতে হয়'। খেটেখুটে আপনি একটা বিদ্যা অর্জন করেছেন, খেটেখুটে শাস্ত্রের প্রতি একটা ভালবাসা অর্জন করেছেন। শাস্ত্রের প্রতি ভালবাসা অর্জন অত সহজ নয়। যে কোন গ্রন্থ, গীতা বলুন, চণ্ডী বলুন, কথামৃত বলুন, নিয়মিত রোজ এই শাস্ত্র পাঠ; এগুলোর প্রতি ভালবাসা কত কষ্ট করে আপনাদের অর্জন করতে হয়েছে, দীর্ঘদিন অভ্যাস করে করে আপনার সিস্টেমে নিয়ে এসেছেন, এই অভ্যাসটা ছাড়তে নেই, কারণ এটাকে কষ্ট করে আপনাকে অর্জন করতে হয়েছে। বিষয়ী মানুষ যেভাবে ব্যাঙ্কের পাশবুক দেখে আনন্দ পায়, কত কষ্ট করে তাকে টাকা আয় করতে হয়েছে। মায়েরা যেমন নিজের সন্তানকে নিজে দেখে, অপরকে দেখিয়ে আনন্দ পায়, মহারাজ আমার ছেলেকে একটু দেখুন, বড্ড দুষ্টু হয়েছে। কেউ তো বলতে পারে না, আমার ছেলে খুব ভাল, সেইজন্য বলে দুষ্টু হয়েছে, কথা শোনে না, আসলে বলতে চাইছে, দেখুন আমার প্রোডাক্ট কত ভাল। সেইভাবে আপনি এত কষ্ট করে যে শাস্ত্রচর্চা, শাস্ত্রের প্রতি ভালবাসাটা অর্জন করেছেন, মাঝে মাঝে একটু শাস্ত্রগুলো উল্টেপাল্টে দেখবেন না? একটু শাস্ত্র পাঠ করে আনন্দ লাভ করবেন না? সেইজন্য এটা ছাড়তে নেই, যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, এ্যনট্রপি ধরে নেবে তাকে, disintegrity ধরে নেবে। আস্তে আস্তে দেখা যাবে মাথা থেকে সব স্লিপ করে বেরিয়ে গেছে। *কালোঽস্মি*, কাল, আমরা সবাই এটা দেখি সময়ের সাথে সাথে সব জিনিস কিভাবে নাশ হয়ে যায়। আমাদের ঋষিরাও এটা জানতেন। আপনারাও তাই শাস্ত্রের প্রতি এই ভালবাসাটা নাশ হয়ে যেতে দেবেন না।

এই কাল বিভিন্ন রূপে আসে। প্রথমটা আসে disintegration রূপে, যেটাকে ফিজিক্সের ভাষায় এ্যনট্রপি বলা হল। দ্বিতীয় আসে মৃত্যু রূপে, আমাদের জন্মের মুহূর্ত থেকে মৃত্যুর সময় নির্ধারিত করা হয়ে গেছে। যেমন যেমন সময় এগোচ্ছে, আমরাও তেমন তেমন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি। আর অন্য দিকে আসে মহাপ্রলয় বা প্রলয় রূপে, যখন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একদিন নাশ হয়ে যাবে। আর এর মাঝখানে থাকে যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, ভূমিকম্প আদি। যাঁদের বয়স হয়ে গেছে, তাঁরা দেখেছেন আগেকার দিনে দুর্ভিক্ষে কত মানুষ না খেয়ে মারা যেত। তারপর আছে মহামারী; কলেরা, প্লেগ, ম্যালেরিয়াতে আগে গ্রামের পর গ্রাম সব উজাড় হয়ে যেত। কিছুদিন আগে চলছিল করোনার মহামারী, সবটাই ভগবান। ভগবান আসেন একটা ব্যালেন্স করে দিতে। কেন?

লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ। লোকেরা সব বোকা বোকা প্রশ্ন করে, ভগবান যদি থাকেন তাহলে জগতে এত দুঃখ কেন? যিনি প্রশ্ন করছেন, তিনি মনে করছেন, কত ইন্টেলিজেন্ট প্রশ্ন করলেন। আরে ভাই দুঃখ তো তোমার দিক থেকে, তোমার যেটা দুঃখ সেটা ভগবানের কেন দুঃখ হতে যাবে। দক্ষিণেশ্বরে মায়ের গয়না চুরি যাওয়ার পর মথুরবাবু বলছেন, ঠাকুর তুমি রক্ষা করতে পারলে না? ঠাকুর মথুরবাবুকে বলছেন, তোমার কাছে এটা সোনা, খুব মূল্যবান, কিন্তু তাঁর কাছে এটা মাটির ডেলা। যাঁর সঙ্গিনী হলেন সাক্ষাৎ রাজরাজেশ্বরী মা লক্ষ্মীদেবী, তাঁর কাছে এগুলো কিছুই না। আমরা এই জিনিসটা কিছুতেই বুঝতে পারি না।

কিছু দিন আগে আমার এক পরিচিত ফোন করে জানতে চাইলেন, আমি কেমন আছি। আমি কেমন আছি মানে, আমার আবার কি হবে। আমি রোজ সকালে উঠি, রোজ আমার একই প্রিন্সিপ্যাল, রেডি ফর দা ডে, রেডি ফর ডেথ্। সকালে উঠে দেখি, কোন কিছু কাজ বাকি থেকে যায়নি তো, আমি যদি পট্ করে মরে যাই তাহলে কোন কিছু বাকি থেকে যাবে না তো। দেখলাম, কিছুই বাকি নেই, যেটা আছে কমপ্লিট করা আছে। উনি শুনে বললেন, 'আপনি তো সন্ন্যাসী, আপনি নিজের পিণ্ডদান করে আত্মশ্রাদ্ধ করে নিয়েছেন, আপনার আর কি'। আমি বললাম, 'আমি যা কিছু শিখেছি সংসারীদের কাছেই শিখেছি'। কিভাবে?

আমি গীতা শ্রীকৃষ্ণের কাছে শিখেছি, যিনি সংসারী ছিলেন, বিয়ে-থা করেছিলেন, সন্তানাদিও ছিল। আর অর্জুনের কাছে, যিনি গীতার শ্রোতা, তিনিও একজন সংসারী। গীতা কোন সন্ন্যাসীদের দেওয়া উপদেশ নয়। আমার কথা শুনে থ হয়ে গেছেন, উনিও খুব হিউমারাস লোক। আমার কথাটা শুনে খুব জোর হাসতে শুরু করলেন। গীতা কোন আশ্রমে বা মঠে বা হিমালয়ের গুহায় বসে ভগবান বলছেন না, বলছেন একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, যিনি বলছেন, তাঁরও ঘর সংসার ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, ঠিকই তিনি ভগবান, কিন্তু আমরা যখন দেখছি, সংসারীদের যা যা থাকে তাঁরও তাই তাই ছিল, বাড়িতে একাধিক স্ত্রী আছেন, তাঁদের আবার আলাদা সন্তানরা আছেন, তার মানে তিনি সংসারেই আছেন। ঠাকুরও বলছেন, আমারও স্ত্রী আছে, ঘটিবাটি আছে, ধারদেনা আছে, কই আমার তো কিছু হয় না, ঠাকুর এটা টেনশানের অর্থে বলছেন।

ঠাকুর তো সংসারে থেকে সন্ন্যাসী ছিলেন, তাহলে আপনি কেন হতে পারেন না? এইজন্য হতে পারেন না, কারণ চারজন পাঁচজনকে নিয়ে আপনার একটা ছোট্ট জগৎ, ওর মধ্যে ঢুকে নদের হাট বসিয়েছেন, ওটাতেই আপনার আনন্দ, ওটাতেই আপনার দুঃখ, এই চার-পাঁজনকে যদি কেউ ছুঁয়ে দেয় আপনার দুঃখে চোখে জল আসবে, ওরা যদি আপনাকে ছুঁয়ে দেয় আপনার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসবে। সন্ন্যাসীরা সবাইকে উড়িয়ে দেন, আমারও কিছু নেই। সব সন্ন্যাসীরাই একটা বৃত্ত টেন দেন, ওর মধ্যে একমাত্র ঈশ্বর, পরমাত্মা ছাড়া কাউকে রাখেন না। কিন্তু আমরা সন্ন্যাসীরা এটা শিখলাম কোথা থেকে? গীতা, উপনিষদ, বেদ থেকে। গীতা শ্রীকৃষ্ণের কথা, তিনি সংসারী ছিলেন। বেদ উপনিষদ ঋষিদের করা, ঋষিরা সংসারী ছিলেন, সবারই স্ত্রী পুত্রাদি ছিল। তাহলে আপনি কেন হতে পারেন না? আপনি এইজন্য হতে পারেন না, কারণ আপনারা হলেন অলস, কেউ physically কুড়ে, কেউ mentally কুড়ে, আর আধ্যাত্মিক কুড়ে তো আমরা সবাই।

ভগবান এই আহাম্মক, অপদার্থদের কত দিন আর রাখবেন! সেইজন্য তিনি মাঝে মাঝে পরিষ্কার করে দেন। পরিষ্কার করে যদি না দেওয়া হয়, তাহলে ভাল শষ্য আসবে কোথা থেকে! আগাছগুলি পরিষ্কার করার জন্য মাঝে মাঝে ভগবানকে আসতে হয় তবে গিয়ে নূতন বিবর্তন হয়। বিবর্তনে যদি আমরা বিশ্বাস করি, তাহলে বিবর্তনে পুরনো প্রজাতির বিলুপ্ত হয়ে যেতে হবে। এতে কান্নাকাটি করার কি আছে। পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছেন মানে জীবনে যা ভাল মন্দ হওয়ার হয়ে গেছে,

এবার তৈরী হন। আর বলুন, হে প্রভু তোমার কত রূপ দেখলাম, মা রূপে এসে আমাকে স্তন্য পান করালে, পিতৃ রূপে এসে আমাকে পথ দেখালে, গুরু রূপে এসে আমাকে শিক্ষা দিলে, বন্ধু রূপে এসে তুমি বিপদে আপদে আমার পাশে এসে দাঁড়ালে, আর দুষ্ট রূপে এসে আমাকে কষ্ট দিলে। এবার তোমাকে মৃত্যু রূপে দেখতে চাইছি। আগের আগের জন্মেও তোমার এই রূপ দেখেছি, কিন্তু মনে নেই। এই জন্মেও দেখব বটেই। আমার কথা শুনেই তিনি হতবাক হয়ে গেছেন, শুনেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের উইল লিখতে শুরু করে দিয়েছেন। *কালোহস্মি*, আমি হলাম কাল। কাল রূপে তিনি তো সব সময়ই আছেন। আর সব সময় আমাদের শরীরকে disintegrate করে যাচ্ছেন, যার জন্য আমাদের পেট খারাপ হয়, হাঁটু ব্যাথা হয়, ঘাড়ে ব্যাথা হয়। কিন্তু এখন তার থেকেও উপরে এসে গেছেন। কোন কাল? *লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ*, মানুষের নাশের জন্য।

এখানে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, জীবনে যে দুঃখ হয়, এর ব্যাখ্যা করা যায় না। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, যদি আপনি ঠিক ঠিক বিচার করেন, নিজেকে যদি যুক্তিবাদী মনে করেন, তাহলে হয় আপনাকে পুরোপুরি শূন্যবাদে চলে যেতে হবে, যেমন বৌদ্ধরা করেন, জগতে কিছু নেই। যেমন পদার্থবাদীরা মনে করে মানুষের শেষ সত্তায় আত্মা বলে কিছু নেই, আর তা নাহলে আপনাকে অদ্বৈতে যেতে হবে, মাঝামাঝারি কোন কিছু হয় না। হয় শূন্যবাদে যেতে হবে, না হয় অদ্বৈতবাদে যেতে হবে। শূন্যবাদ ঠিক ঠিক বৌদ্ধদের শূন্যবাদ না, পদার্থবাদীদের শূন্যবাদ, যেখানে কোন কিছু নেই; শূন্য থেকে এসেছি, কোথা থেকে এসেছি কেউ জানে না, কিছু দিনের জন্য এখানে বাস করলাম, আবার একদিন শূন্যে বিলীন হয়ে যাব। হয় এটা, আর তা নাহলে আমি সেই আত্মা, যাঁর জন্ম নেই মৃত্যু নেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান এই তত্ত্বটাকে তিনটে শ্লোকে খুব সুন্দর ভাবে বললেন, *জাতস্য হি ধ্রুবোর্মৃত্যু*, এই শ্লোকের আগে পিছনে তিনটে শ্লোক, আমরা খুব সুন্দর এর ব্যাখ্যা করেছি, চাইলে আগে গিয়ে দেখে নেবেন। এই যে দুঃখ, এর ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু একবার যদি ভগবানকে ওখানে নিয়ে আসা হয়, তখনই সর্বনাশ হয়ে যায়। বিশেষ করে যারা একেশ্বরবাদী, ঐ এক ঈশ্বরকে আনলেই সমস্যা হয়ে যায়। তিনি যে ঈশ্বরই হন, যে ধর্মেরই ঈশ্বর হন, এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণকে এক ঈশ্বর রূপে যদি নেওয়া হয়, তাহলে ধর্ম দর্শনে এত রকমের সমস্যা হয়ে যাবে যে, ওটাকে আর সামলানো যাবে না। তখন প্রথম প্রশ্ন হবে, তিনি যদি সবজান্তা, তিনি যদি করুণাময় হন, তাহলে আমার এই দুঃখ হচ্ছে কেন? কোন ধর্মের কাছে এর কোন উত্তর নেই। আর এসব বলা, তিনি পরীক্ষা নিচ্ছেন, তিনি কষ্ট দিয়ে আমাকে আরও শক্তিশালী করছেন, এগুলো সব ফালতু উত্তর, লোকেদের বোকা বানানোর প্রয়াস। এগুলো হল বাচ্চাদের লালিপপ দেওয়ার মত, এগুলো কোন উত্তর না। কোন ধর্ম, যে ধর্মে একেশ্বরবাদ, এক ঈশ্বরকে নিয়ে চলে, সেই ধর্মের কাছে এর কোন উত্তর হবে না, কখনই এই প্রশ্নের উত্তর আসতে পারে না।

আপনি বলছেন, তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা কেন? যে কোন ধর্ম, যাঁরা এক ঈশ্বর মানেন, তাঁদের জন্য খুব নামকরা প্রশ্ন রাখা হয়; আপনারা বুঝে নিন কোন কোন ধর্ম হতে পারে, হিন্দু ধর্ম বাদে সবই ঐ রকম; তিনি যদি সর্বজ্ঞ হন, তাহলে ঈশ্বর আমাকে দিয়ে পাপ কাজ করাচ্ছেন কেন? তিনি তো জানেন আমি পাপ করছি, তিনি আটকাচ্ছেন না কেন? যদি নাই আটকান, তাহলে আমাকে নরকে পাঠাবেন কেন? যদি আমি পাপ করলে আমাকে নরকে যেতে হবে, আর তিনি যদি আগে থেকেই জানেন, এটা পাপ আর আমি পাপ করছি, তিনি যদি সর্বশক্তিমান হন, তিনি তো আগে থেকে জানেন আমি পাপ করছি, যদি আগে থেকে জানেন আমি পাপ করছি, আর যদি এটাও জানেন পাপ করলে আমি নরকে যাব, আর তাও আমাকে আটকালেন না, তার মানে তিনি জেনেশুনে আমাকে দিয়ে পাপ কাজ করাচ্ছেন। তাহলে তো এই ভগবান দুষ্ট ভগবান। মা জানে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, বাচ্চা যদি আগুনের দিকে যায়, মা দৌড়ে গিয়ে বাচ্চাকে আগুনের কাছ থেকে

টেনে নিয়ে আসে, বাছা ওরকম করো না। ভগবান আমাকে এভাবে দৌড়ে এসে আটকাচ্ছেন না কেন? কেন আমাকে দিয়ে করাচ্ছেন?

বিদ্যাসাগর মহাশয় এত বড় পণ্ডিত, ঠাকুরের কাছে তিনিও কাঁচা কথা বলে ফেলছেন, জগতে এত দুঃখ কেন? কথামৃতে চেঙ্গিস খাঁর প্রসঙ্গে এই ধরণের কিছু বোকা বোকা কথাবার্তা আছে। তার মানে, তাঁর পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবন দর্শনে তিনি প্রবেশ করেননি। সংস্কৃত জানাটা আলাদা জিনিস, শাস্ত্র জানাটা পুরো আলাদা জিনিস। সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য থাকলেই যে শাস্ত্রের জ্ঞান থাকবে, তা কখনই হয় না। যে কোন দ্বৈতবাদে, যেখানে ঈশ্বর একজন সর্বশক্তিমান, সেখানে এর উত্তর হয় না। হিন্দু ধর্মের কোন সমস্যা নেই, হিন্দু ধর্মে ভালটাও ভগবান, মন্দটাও ভগবান, *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি*, হে প্রভু তুমিই নারী হয়েছ, তুমিই পুরুষ হয়েছ। সব কিছু তুমিই হয়েছ, ভালটাও তুমি, মন্দটাও তুমি। এই কথা শুনে একজন প্রশ্ন করলেন, তাহলে যত টেররিস্ট, রেপিস্ট, যত খুনী, তারাও কি ভগবানের রূপ? অবশ্যই, যদি এটা তুমি না বুঝে থাক, তাহলে হিন্দু ধর্মের কিছুই বোঝনি তুমি। করোনার সেই মহামারী যখন চলছিল, তখনও আমরা বারবার এটাকে নিয়ে আলোচনা করেছি।

আমরা আজ সমস্ত কিছু জীবন থেকে উড়িয়ে দিয়েছি। আমাদের যে একটা ধর্ম জীবন ছিল, সেটাকে আজ সবাই পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছে। তার সাথে বর্ণধর্ম উড়ে গেছে, আশ্রমধর্ম উড়ে গেছে, জাতিধর্ম উড়ে গেছে, যৌথ পরিবারের ধারণাটাই উড়ে গেছে, কোথাও কিছু নেই। ভোগ যারা করে; আমেরিকা, ইউরোপ যেমন করে, তারা ভোগ করার জন্য যে প্রোটেকশান নেয়, সেটাও আমাদের নেই। কারণ আমাদের বুকের পাটা নেই যে, আমি বলব, আমি ভোগ করতে চাই। আমরা দেখাতে চাই আমরা ধর্মপ্রাণ, কিন্তু আসলে ভিতরে ভোগ করার তীব্র ইচ্ছা। আজকে যখন বিপদ এসে মাথার উপর থাবা বসিয়েছে, তখন বাঁচার কোন পথ নেই। দিল্লীতে দু কিলো থেকে চার কিলো মিটার যাওয়ার জন্য একটা এ্যম্বুলেন্স দশ হাজার টাকা চাইছে। যে সমাজে মানুষের মন এত নীচে নেমে যেতে পারে, সেই সমাজ বেশি দিন চলতে পারে না। সমাজ যখন এই অবস্থায় চলে যায়, তখনই ভগবান *কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ* করবেনই করবেন।

সমাজ এত নীচ হয়ে গেছে, যেখানে একজন অসহায় মানুষ নিজের স্ত্রী, পুত্র, বাবা, মা কাউকে করোনা থেকে মুক্ত করার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাবে, সেখানেও শকুনের মত বিপদগ্রস্থ মানুষদের কাছ থেকে অযৌক্তিক পরিমাণ টাকা দাবী করছে। এই সমাজ টিকতে পারবে না। একশ তিরিশ কোটি লোক তো মরবে না, কিছু লোকের নাশ হবে, কিছু লোক থাকবে। বেশির ভাগই বাঁচবে, এদেরকেও আবার মারবে। শোনা যাচ্ছে এরপর নাকি করোনার থার্ড ওয়েভ আছড়ে পড়বে, তখন আরও বেশি লোক মরবে। এতেও যদি মানুষের কিছু শিক্ষা হয়। ভগবান এইজন্যই নাশ করেন, ভগবানই বলছেন, অধর্মের যখন বৃদ্ধি হয় তখন ভগবান এসে কিছু লোকের নাশ করে দিয়ে ব্যালেন্স করে অধর্ম নাশ করে ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন।

জাগতিক দৃষ্টিতে এর ব্যাখ্যা করা হল, কেন তিনি লোকক্ষয়ে প্রবৃত্ত হন। দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখলে এর ব্যাখ্যা হবে –জীবনটাও ভগবানের, মৃত্যুটাও ভগবানের। হিন্দীতে একটা নামকরা প্রবাদ আছে, রামজী কা চিট্টি রামজী কা শের, সিংহটাও রামজীর আর পিঁপড়েটাও রামজীর, তেমনি জীবনটাও রামজীর মৃত্যুটাও রামজীর। এটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে আর জীবনে এটা লাগানোর চেষ্টা করতে হবে। আর সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে, ভগবানের মৃত্যুরূপকে দেখার জন্য। আমার যে বন্ধুর কথা বললাম, যিনি আমাকে ফোন করেছিলাম, তাঁকে এই ধরণের কথা কিছু কিছু বলার পর তিনি সব শুনলেন; শোনার পর তিনি বলছেন, 'দেখুন, আপনারা সন্ন্যাসীরা যে ধরণের লোক, মৃত্যু আপনাদের কাছে আসতে পারবে না। মৃত্যুকে আপনার এ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসতে হবে। আপনারা

যা ডেঞ্জারাস লোক, আপনাদের যে শক্তি, মৃত্যু হাতজোড় করে বলবে, বলুন আপনার কখন সময় হবে, তাহলে আমি সেই সময় আসব'। আমি বললাম, 'ঠিকই বলেছেন, সন্ন্যাসীদের কাছে মৃত্যু এত সহজে আসতে পারে না, অনুমতি নিয়ে আসবে। বাকিদের ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যায়'। সন্ন্যাসী প্রস্তুত থাকে, পাকিস্থান বর্ডারে ভারতের জোয়ানরা বন্দুক মেশিনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এসো এসো। সন্ন্যাসীরাও এই রকমই। আর ঠাকুরের দিক থেকে দেখলে, মৃত্যু রূপে ঠাকুর আসছেন, আসুন আসুন প্রভু, কি সৌভাগ্য। কিসের জন্য কান্নাকাটি! অর্জুন কেন কাঁদছে? কারণ অর্জুনের মন পড়ে আছে, দ্রৌপদীর উপরে, সুভদ্রার উপরে, অভিমন্যুর উপরে, সংসারে ভোগের উপরে, সেইজন্য ভয়, যুদ্ধের আগে সেইজন্য কান্নাকাটি।

দ্বিতীয় লাইনটিতে ভগবান অর্জুনকে আরও স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন, *ঋতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ; ঋতেহপি ত্বাং*, অর্জুন তুমি যদি এদের নাও বধ কর, তুমি যত যোদ্ধাদের, বীরদের দেখছ, এরা কেউই বাঁচবে না, আমিই এদের মারব। কারণ আমি কাল, *কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো*। যখন কোথাও কিছু দেখি, তখন আমি এটাই বলি; ভগবান নিজে এসেছেন বিনাশ করার জন্য। নিজের সৃষ্টিকে বিনাশ করছেন। ইট ইট ইট সাজিয়ে তিনি এই সংসাররূপী প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন, ইট ইট ইট করে তিনি এবার এই প্রাসাদকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবেন। এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ে যাচ্ছেন, আমার লাগবে, আপনার লাগবে। আমি সব সময় গুলিকে স্বাগত জানিয়ে যাচ্ছি, কিসের ভয়!

আমি যে বয়সে ভরত মহারাজকে দেখেছিলাম, তখন তাঁর অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল, স্মৃতিও ততটা ভাল ছিল না। একদিন উনি ওনার জীবনের একটা ঘটনা বলেছিলেন, যেটা আমার জীবনে একটা দাগ কেটে দিয়েছিল। মহারাজকে এক সময় স্বামী তুরীয়ানন্দজীর সেবার ভার দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় অন্য একজন মহারাজের টিবি হয়েছিল, মহারাজকে ওনারও কিছু কাজকর্ম করে দিতে হত। সেই মহারাজ ভরত মহারাজকে একদিন জিজ্ঞেস করছেন, 'আমার টিবি হয়েছে শুনে তোমার কি ভয় করছে'? ভরত মহারাজ তখন ব্রহ্মচারী, উনি বলছেন, 'কিসের ভয়'! আমাদের যখন ঘটনাটা বলছিলেন, ওনার স্মৃতি ওনাকে সাথ দিচ্ছিল না, শুধু এই কটি কথা বারবার বলছেন, 'কিসের ভয়', 'কিসের ভয়', এই কথা বলতেই থাকলেন। বেলুড় মঠে আমি তখন নূতন ব্রহ্মচারী, এই কথাটা আমার মাথায় বসে গেল, 'কিসের ভয়'। ভগবান ঠিক করে নিয়েছেন মারবেন, ভাল, মারলে মারবেন। তাই বলে কি আমরা অসহায় হয়ে সব ছেড়ে ছুড়ে বসে যাব? একেবারেই না।

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রুন্ ভুঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।।৩৩।।

(অতএব, তুমি যুদ্ধার্থ উত্থিত হও ও যশ লাভ কর এবং শত্রুবর্গকে পরাজিত করে নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। আমার দ্বারা এরা সবাই পূর্বেই নিহত হয়েছে। হে সব্যসাচী, তুমি নিমিত্তমাত্র হও।)

এই শ্লোকের শেষাংশে ভগবান বলছেন –*নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্*, এই লাইনটা সবাই লিখে রাখুন। অর্জুন দুই হাতে সমান দক্ষতায় অস্ত্র চালাতে পারতেন, তাই অর্জুনের একটা নাম সব্যসাচী। *তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব*, সেইজন্য বলছি, অর্জুন ওঠো, উঠে দাঁড়াও, যুদ্ধ কর, যুদ্ধ করে যশ লাভ কর। কিভাবে যশ লাভ করবে? *জিত্বা শত্রুন্ ভুঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্*, শত্রুদের উপর জয় লাভ করে নিষ্কন্টক রাজ্য ভোগ কর। *ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব*, তুমি তো দেখলে আমি এদের আগেই মেরে রেখেছি। অর্জুন যেদিন ভীষ্মের উপর বাণ চালাতে শুরু করলেন, সেই সময় রথের সামনে শিখণ্ডী ছিল, শিখণ্ডী ছিল নিমিত্ত। কিন্তু এখানে তাও না, আমি এদের মেরে রেখে দিয়েছি,

এরা ইতিমধ্যেই সব মৃত। তোমাকে কি করতে হবে? সেই মৃতের উপর শুধু তীর চালিয়ে দাও, লোকে বলবে অর্জুন কত বড় বীর, ভীষ্মের মত বীর যোদ্ধাকে মেরেছেন। সেই সময় নিউজ পেপার বলে বেড়াত –কুম্ভমেলা হয়েছে বলে করোনা বেড়েছে, নির্বাচনী সভা, র‍্যালি হয়েছে বলে করোনার এত বাড় বাড়ন্ত। ভগবান তখন কালরূপে এসে দাঁড়িয়ে আছেন, উনি একটা নিমিত্ত খুঁজছিলেন। নিমিত্তের কি কোন অভাব আছে? এটা না হলে, অন্য ভাবে, সেই ভাবে না হলে আরেক ভাবে, তিনি মারবেনই মারবেন, তা যেভাবেই হোক। তিনি সর্বশক্তিমান, মারার জন্য ঠিক করে যখন এসেছেন, তিনি কিভাবে মারবেন এটা কোন ব্যাপারই না। আবার যখন তিনি রক্ষা করবেন বলে আসেন, তখন কত ভাবে তিনি রক্ষা করে দেবেন, কেউ বুঝতেও পারবে না। কুম্ভ বলুন, ইলেকশান র‍্যালি বলুন, আরও পাঁচটা জিনিসের কথা বলুন, কোনটাই কিছু না, এগুলো সব নিমিত্তমাত্র, তিনি এবার মারবেন। আর কিছু লোক আছেন, যাঁরা সেবা করছেন করোনা রুগীদের, তাঁদের যশ লাভ হবে।

আমরা জীবনে কিছু পাওয়ার আশায় কত কাঠখড় পোড়াই, আমাকে এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে, এগুলো কিছু না, সব কিছু ভগবান করে রাখেন। শ্রীরামচন্দ্র একটা ঘাসের টুকরোকে মন্ত্রে অভিষিক্ত করে ব্রহ্মাস্ত্র করে ছেড়ে দিলেন। আমরা হলাম সেই ঘাসের টুকরো, ব্রহ্মাস্ত্রের মন্ত্র আমাদের পিছনে চলছে। ব্রহ্মাস্ত্র আলাদা কোন অস্ত্র হয় না, ওটা একটা মন্ত্র, ওটাই একটা শক্তি। সেই শক্তি যদি একটা ঘাসের টুকরোর উপর দিয়ে দেওয়া হয়, সেই ঘাসের টুকরো যার উপর প্রয়োগ করা হবে, তাকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। ভগবান একটা কিছুকে নিমিত্ত করে নেন। মাস্টারমশাই এক সময় কথামৃত লিখতে চাইছিলেন না। ঠাকুর তাঁকে বলছেন, কারিগরের হাতে অনেক কল থাকে, একটা না ঠিক থাকলে অন্য একটা কল লাগিয়ে দেয়। বলতে চাইছেন, তুমি না করলে আর-একজন করবে।

যাঁরা এই ক্লাশ শুনছেন, আপনারা জানেন এখন হাজার খানেক ভিডিও এখন এই চ্যানেলে চলছে। এটা কি আমার ক্রেডিট, আমি তো দূর ছাই, ঠাকুর তাঁর শক্তিতে যে কোন লোককে দাঁড় করিয়ে মানুষকে শাস্ত্রের কথা, ধর্মের কথা শুনিয়ে নেবেন। এ্যাস্ট্রিক্স কমিকসে একটা খুব মজার ঘটনা আছে। সিনেমা বা নাটকের একজন পরিচালক বলছে, রাস্থা থেকে যে কোন দুটো লোককে ধরে নিয়ে এসো, যত মুর্খই হোক, আমিই তাকে অভিনেতা বানিয়ে দেব। ভগবানও সেই রকম, যে কোন লোককে ধরে এনে বলবেন, চল লোকেদের তোকে শাস্ত্রের কথা শোনাতে হবে। *পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং*, পঙ্গুকেও তিনি এভারেস্টের চূড়ায় তুলে দেবেন।

নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচীন, তুমি নিমিত্ত, ভগবানের শক্তি তোমাকে পাহাড়ের চূড়ায় তুলে দেবে, সেখানে তুমি একজন পঙ্গুই হও আর পর্বতারোহী হও, তাতে কিছু আসে যায় না। উনি যাকে দিয়ে যা করাতে চাইবেন, তাকে দিয়ে তাই করিয়ে নেবেন, কোন ব্যাপারই না। টিয়া বই এত নাম করল, বিশ্বের সাত আটটা ভাষায় অনুবাদ হল, হার্পার কলিংস বই ছাপাল, ইন্দোনেশিয়া থেকেও বেরিয়েছে। আমি ইংরাজীও তেমন জানি না, কোন পরিচিতি নেই। কিভাবে এখানে ওখানে যোগাযোগ ঘটতে আরম্ভ হয়ে গেল। এটাই জীবনের নিয়ম, যেমনি চার জায়গায় চেষ্টা চালানো শুরু হবে, দেখবেন একটা দিকে দরজাগুলো খুলে যাচ্ছে। তখন বুঝতে হয়, ঠাকুর তাকে এই পথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের দিকে। সমস্যা হল আমরা আমাদের মত ভেবে নিই।

দুদিন আগে দেওঘর বিদ্যাপীঠের আমার এক পুরনো ছাত্র কান্নাকাটি করছিল, কারণ তার ঠাকুরমা মারা গেছে। আমি বললাম, 'তুমি চল্লিশ পেরিয়ে গেছ, ঠাকুরমা নব্বই বছরের, এর জন্য তুমি কাঁদছ মারা গেছে বলে'? উল্টে আমাকে বলছে, 'মৃত্যুকে আপনি এভাবে উড়িয়ে দিচ্ছেন কেন'? কত বোকা বোকা কথা। ভগবান আমাদের এই বোকা বোকা জিনিস করাবেন না; আসলে

তিনি যেটা করান, তা হল; তিনি আমাদের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটের দিকে ঠেলে নিয়ে চলে যান। এখানে অর্জুনকে যখন বলছেন *জিত্বা শত্রুন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্*, তখন তিনি অর্জুনকে অর্থ আর কাম, এই দুটোর দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। সব কিছু ভগবানই করেন। এই যে চেষ্টা আমরা করি, আজ হোক কাল হোক করোনার লড়াইতে আমরা জিতবই, জিততে বাধ্য। কেন জিতব? কারণ সৃষ্টি ভগবানের, ভগবান এর নাশ হতে দেবেন না। দু চারটে পরিষ্কার করে আবার রেখে দেবেন। কারুর হাতে যদি যশ লেখা থাকে, তার হাত দিয়ে এমন কিছু বেরিয়ে আসবে, এমন কোন একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে, সে যশস্বী হয়ে যাবে। ঋকবেদের দেবীসূক্তমে বাক্ দেবী এটাই বলছেন, আমি যাকে খুশী ব্রাহ্মণ করি, যাকে খুশী ক্ষত্রিয় করি।

খুব একটা সুন্দর গল্প আছে, আগেও বলেছি, কিন্তু এই জায়গাতে খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে বলে আবার বলছি। এটা কোন গল্প না, সত্যিকারের ঘটনা। এক সময় পেড্রেয়স্কি পোল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ওনার এত সব ঘটনা আছে, অবাক অবাক সব কাহিনী, ওনার জীবনী পড়ে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। খুব উচ্চ মানের একজন মানুষ ছিলেন, অত্যন্ত ভদ্রলোক, ঐ সময় আবার তিনি একজন নামকরা পিয়ানো বাদক ছিলেন। পরের দিকে উনি প্রেসিডেন্টের পদ ছেড়ে দিয়ে পিয়ানোই বাজাতেন। ট্রুম্যান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, তিনি যখন কলেজে ছিলেন তখন পেড্রেয়স্কি ওনাদের কলেজে এসে পিয়ানো বাজিয়েছিলেন। ট্রুম্যান প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরেও তিনি পেড্রেয়স্কিকে মনে রেখেছিলেন।

একবার এক শহরে বিশ্ববিখ্যাত পিয়ানো বাদক পেড্রেয়স্কি পিয়ানো বাজাবেন। সেই শহরে একটা বাচ্চা ছেলে সবে পিয়ানো বাজাতে শিখছে, পিং পাং বাজায়। মা সেই ফাংশানে ছেলেটিকে বিখ্যাত পিয়ানো বাদকের বাজনা শোনাতে নিয়ে এসেছেন। স্টেজের উপর পিয়ানোটা দেখে ছেলেটি কখন সবার চোখের আড়ালে গিয়ে পিং পাং করে টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিট স্টার বাজাতে শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে পেড্রেয়স্কির মঞ্চে আসার সময় হয়ে গেছে। তিনিও এসে পৌঁছেছেন আর পর্দাও সেই সময় খুলে গেছে, আর সবাই দেখছে বাচ্চাটা ওখানে পিয়ানো বাজিয়ে যাচ্ছে। বাচ্চার মা দেখে তো হতবাক, ভয়ে আড়ষ্ঠ। পেড্রেয়স্কি কিছু না বলে বাচ্চাটাকে পিছন থেকে ঘিরে নিয়ে ওনার যেটা বাজানোর কথা সেটা বাজাতে শুরু করলেন। বাচ্চাটি ওর মধ্যেও টুইঙ্কল টুইঙ্কল দিয়ে পিং পাং বাজিয়ে যাচ্ছে। পেড্রেয়স্কিও নিজের পুরো মিউজিকটা দিয়ে যেখানে শেষ করছেন, সেখানে বাচ্চাটার টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টারের সাথে এমন সুন্দর মিলিয়ে দিচ্ছেন যে, কেউ ধরতেই পারছে না যে, একটা বাচ্চা আপন মনে পিং পাং বাজিয়ে যাচ্ছে। হলের সব শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছেন। সবাই হতবাক, কিভাবে উনি নিজের যে মিউজিক্যাল প্রেজেন্টেশান, সেটার সঙ্গে বাচ্চাটার পিং পাং বাজনাটাও মিশিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। টুইঙ্কল টুইঙ্কল দিয়ে যেই প্রোগ্রাম শেষ হল, সারা হল তুমুল করতালিতে ফেটে পড়ল।

বাজনা থামার পর পেড্রেয়স্কি বাচ্চাটিকে স্টেজের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে খুব মিষ্টি করে বলছেন, 'সবাই দেখলেন বাচ্চাটা কি সুন্দর বাজালো'। আবার তুমুল করতালি, থামছে না। ঠিক এভাবেই ভগবান আসল সুরটা বাজিয়ে যাচ্ছেন, আর আমরা মাঝখানে শুধু পিং পাং করে টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার করে যাচ্ছি। নামযশ যখন হয়, তখন বলবে সমর্পণানন্দ কি সুন্দর বললেন; সমর্পণানন্দ কি করবে, করছেন তো উনি। *নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্*, এটা লিখে আপনার যা নাম, সেই নাম সব্যসাচিনের জায়গায় বসিয়ে দিন। একই সুরে ভগবান কি সুন্দর বলছেন, এগুলোকে মারার জন্য আমি এসেছি, তার সাথে বলছেন, তুমি শুধু নিমিত্তমাত্র হও। মারা আর গড়া, ভগবান দুটো এক সঙ্গে করেন কি? একদিকে যেমন মরছে, আর-এক দিকে গড়ছেনও। আপনার দেখে থাকবেন, করোনায় এত লোক মারা যাচ্ছিল, কিন্তু মাঝখান থেকে কিছু লোকের নাম হয়ে গিয়েছিল,

কেউ হয়ত নোবেল প্রাইজ পেয়ে যেতে পারেন। লোকেরা তখন বলবে, তিনি কি বিরাট কাজ করলেন। তিনি কি করবেন? ভগবান তাঁকে দিয়ে করাচ্ছেন।

নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্, জীবনে যদি কারুর কষ্ট থাকে, জীবনে যদি কেউ একটু শান্তি পেতে চান, যদি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের দিকে এগোতে চান, তাহলে তিনি এটাকে নিজের মন্ত্র করে নিন, *নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্*। আপনি নিমিত্ত, সব কিছু ভগবান নিজে করে যাচ্ছেন। আপনি যদি নিমিত্তমাত্র হয়ে যেতে পারেন, তাহলে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে আরামসে এগিয়ে যাবেন। এরপর পিছনে কে আপনাকে ভাল বলল, কে মন্দ বলল তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ আপনি জানেন আপনি কর্তা নন, ঈশ্বরই কর্তা, আসলে সব তিনিই করছেন।

যতক্ষণ অর্জুনের মত এই দর্শন না হয়, ততক্ষণ বিশ্বাস হবে না যে –ঈশ্বরই সব করছেন। আর *ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব*, আগে থেকেই তিনি সব কটাকে মেরে রেখেছেন, আমরা যা কিছু কাজ করছি, তিনি সেটা আগে থেকেই করে রেখেছেন। খিদে পেলে সবাইকে খেতে হয়। ঠাকুরও খিদে পেলে খেতেন, স্বামীজীকেও খিদে পেলে খেতে হত। এই অতটুকু চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়, বাকিটা তিনি করে দেন। অবতার যখন আসেন, তখন তিনি দুটো স্তরে চলেন, ভগবান রূপেও চলেন, মানুষ রূপেও চলেন। বত্রিশ আর তেত্রিশ শ্লোক হল, এখানে তিনি ভগবান রূপে চলছেন। তিনি দেখাচ্ছেন, কিভাবে আমি কাল, কিভাবে আমি *সমাহর্তুম্*, মারার জন্য আমি এই বিশাল রূপ ধারণ করেছি। সেখান থেকে পরের শ্লোকে তিনি নেমে আসছেন মানুষের স্তরে, বলছেন –

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথাহন্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্।।৩৪।।

(ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ এবং অন্যান্য বীর যোদ্ধাকে আমি আগেই নিহত করে রেখেছি; সেই মৃতদেরকেই তুমি বধ কর; ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই; তুমি যুদ্ধে শত্রুদেরকে নিশ্চয়ই জয় করবে, অতএব যুদ্ধ কর।)

মহাভারতের কাহিনী রীতিমত জটিল কাহিনী। কি রকম জটিল, যেমন দ্রোণাচার্য, দ্রোণ একদিকে অর্জুনের আচার্য, অর্জুন তাঁকে বাণ মারবেন না। অন্য দিকে দ্রোণাচার্যের বর আছে, হাতে যতক্ষণ তাঁর অস্ত্র থাকবে তাঁকে কেউ বধ করতে পারবে না। ঠিক তাই হল, অশ্বত্থমা হত ইতি গজ বলে ছল করে ওনার হাত থেকে অস্ত্র ত্যাগ করান হল। আবার ভীষ্ম, তাঁর আবার ইচ্ছামৃত্যুর বর, যতক্ষণ না তিনি চাইছেন, ততক্ষণ তিনি মরবেন না। কায়দা করে তাঁকে এমন করানো হল যে, তাঁকে দিয়ে ইচ্ছামৃত্যু করান হল। জয়দ্রথের উপর বর আছে, যার হাত থেকে ওর মুণ্ড মাটিতে পড়বে সেও সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এটা মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, এমন বাণ মার যে, ঐ বাণ মুণ্ডুটা কেটে যেখানে ওর বাবা তপস্যা করছে সেখানে ওর বাবার কোলে গিয়ে মুণ্ডুটা পড়ে। আর তাই হল, হঠাৎ চমকে উঠে দেখেন কোলে কি একটা পড়ল, দেখেন একটা কাটা মুণ্ডু, তুলে নিয়ে দেখছেন ছেলের মুণ্ডু, আঁৎকে উঠে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিতেই বাবার মাথাটাও চৌচিড় হয়ে ফেটে গেল। কর্ণ সূর্যপুত্র, তাঁর হাতে সূর্যদেবতার শক্তি অস্ত্র রয়েছে, যার উপর চালাবেন তার মৃত্যু অবধারিত।

কে আছে এদের সাথে যুদ্ধ করবে, কি করেই বা এদের হারাবে! কিন্তু কি অদ্ভুত কৌশলে শ্রীকৃষ্ণ চারজনকেই মারিয়ে দিলেন। ভীষ্মের ক্ষেত্রে শিখণ্ডীকে দাঁড় করিয়ে দিতেই ভীষ্ম অস্ত্র চালনা বন্ধ করে দিলেন। দ্রোণাচার্যকে শুনিয়ে দিলেন *অশ্বত্থামা হত ইতি গজ*। জয়দ্রথের ক্ষেত্রে অর্জুন এমন

এক বাণ মারলেন, বাণের ডগায় জয়দ্রথের মুণ্ডুটাকে উড়িয়ে জয়দ্রথের বাবার কোলে নিয়ে ফেলে দিলেন। তার আগে কায়দা করে ভগবান সূর্যাস্ত করিয়ে দিলেন, তাঁর এমন ক্ষমতা। আর কর্ণের ক্ষেত্রে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরী করে দিলেন যে তাঁর সেই অমোঘ অস্ত্রকে অন্যের উপর চালাতে বাধ্য করে দিলেন। ঘটোৎকচ সেদিন এমন যুদ্ধ করতে লাগলেন যে, মনে হচ্ছে আজ একাই সে পুরো কৌরবদের শেষ করে দেবেন, ঘটোৎকচের উপর বাধ্য হয় কর্ণ শক্তি চালিয়ে কর্ণের ক্ষমতাকে শেষ করে রাখলেন। ভগবান বলছেন, তুমি যে ভাবছ এই চারজনকে আমি কি করে মারব, কিন্তু তোমাকে আমি দেখিয়ে দিলাম, এদের আগে থেকেই আমি মেরে রেখেছি। বলে, আইন আছে আইনের ফাঁকও আছে, এই চারজনের বর আছে, আবার বরের ফাঁকও আছে। তুমি এই চারজনের থেকে যদি ভয় পেয়ে থাক, তাহলে জেনে রাখ আমি এদের সব কটাকে মেরে রেখেছি। আচার্য শঙ্কর এখানে এটাই বলছেন, এদের থেকে তোমার ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। যাদেরকে মনে করছ এদের মারা যাবে না, তাদেরকেও আমি মেরে রেখেছি। গীতায় এই চারটে নাম দিয়েছেন। ঐ ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ, সেখান থেকে কিভাবে আস্তে করে নরম হয়ে অর্জুনকে সাহস দিচ্ছেন। মায়ের মত বলছেন, অর্জুন ভয় পেও না, আমি আছি, ভয়ের কিছু নেই।

এরপর দৃশ্যপটটা আবার পাল্টে যাচ্ছে, সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যুদ্ধের বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে এখানে আভাসে যেন সাবধান করে দিতে চাইছেন –শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন সব কটাকে তিনি আগে থেকেই মেরে রেখেছেন। সঞ্জয় যেন বলতে চাইছেন –এখনও সময় আছে মহারাজ, সবাইকে বাঁচিয়ে নিন। তা যদি না করেন, কৌরব কুল আর তাদের বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন কেউ জীবিত থাকবে না।

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটি।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য।।৩৫।।

(সঞ্জয় বললেন –ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যশ্রবণে অত্যন্ত ভীত হয়ে কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণামপূর্বক গদ্গদভাবে অর্জুন বললেন –।)

অর্জুন দুটো জিনিস একসাথে দেখছেন, একদিকে সেই ভয়ঙ্কর রূপ, তার সঙ্গে ভগবানের আশ্বাসন। এই যে বলা হয় বর আর অভয়, এখানেও বর ও অভয় দিচ্ছেন। তুমি ভয় পেও না, তুমিই জিতবে, ওঠো, যুদ্ধ করে জয়ী হও। এদের সবাইকে আমি আগেই মেরে রেখেছি, যাদেরকে নিয়ে তোমার চিন্তা ছিল, ভয় ছিল, তাদেরকেও আমি মেরে রেখেছি।

সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য, অর্জুনের ভিতর কেমন একটা ভীতি ঢুকে আছে। আচার্য শঙ্কর গদ্গদ্ শব্দের খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করছেন, দুঃখ হলে বা ভয় পেলে, এর বিপরীতে মনের ভিতর খুব আনন্দের যখন অনুভুতি হয়; অর্থাৎ এক সময় ভীত, আরেকটা সময় স্নেহযুক্ত, ভালবাসা; দুটো ক্ষেত্রেই চোখ দুটো অশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আর তার জন্য কণ্ঠে কফ এসে আটকে থাকে। কোথা থেকে আচার্য শঙ্কর এই কথাগুলো জানলেন ভগবান জানেন। হয় দুঃখ, নয় আনন্দ, দুটোতেই চোখে জল চলে আসে, সেই ইমোশানের জন্য গলাতে কফ আটকে যায়। ফলে কণ্ঠ দিয়ে কথা স্পষ্ট হয়ে বেরোতে চায় না, এটাকে বলে গদ্গদ্ কণ্ঠ। সাধারণ ভাবে গদ্গদ্ শব্দটা আমরা আনন্দের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি; কিন্তু এটা ভয়ের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়, যখন গলা দিয়ে কথা বেরোতে চায় না। একটু কথা বলতে শুরু করলে ধীরে ধীরে গলার স্বরটা খুলতে শুরু করে। মানব মনস্তত্ত্বের উপর

আচার্যের কি গভীর পর্যবেক্ষণ। আসলে ভয়ে কথা বন্ধ হয়ে যায়, আবার আনন্দেও অনেক সময় কথা রুদ্ধ হয়ে যায়।

আচার্য বলছেন, ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় পরোক্ষ ভাবে সাবধান করলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র কর্ণপাত করলেন না। আচার্য বলছেন, *ভবিতব্যবশাৎ*, এটাই ভবিতব্য, এ হবেই। আমাদেরও অনেক সময় বলা হয়, এ-রকমটি করো না, কিন্তু তাও আমরা সেটাই করি, এটাই ভবিতব্য। মার খেতে হবে জেনেও আমরা সেই কাজ করি, করার পরেও দুঃখ হয় না। আমরাও জানি এটা ভুল করতে যাচ্ছি, বন্ধুরা নিষেধ করছে, এমনটা করো না, এটা ভুল। ভবিতব্য, না হলে কর্ম ক্ষয় হয় না। দু-চারবার মার না খেলে কর্ম ক্ষয় হয় না। যে জীবনে মার খায়নি, সে বড় হতে পারবে না। আচার্য নিজের থেকে বলছেন, সঞ্জয় বলছে, হে রাজা, এই দেখুন কৌরব পক্ষের প্রধান যোদ্ধাদের শ্রীকৃষ্ণ আগে থেকেই মেরে রেখেছেন। এখনও সময় আছে, যুদ্ধ থামিয়ে দিন। ধৃতরাষ্ট্র শুনলেন না।

এবার অর্জুন বলছেন। এই অংশটা খুব সুন্দর। আমরা ভক্তি ভক্তি করি ঠিকই, এরপরেই দ্বাদশ অধ্যায় আসবে, যে অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ, কিন্তু ঠিক ঠিক ভক্তি আমার মনে হয় এই অংশটা। ভক্তযোগের ভূমিকা যেন এখান থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে।

অর্জুন উবাচ
স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ।।৩৬।।

(অর্জুন বললেন –হে হৃষীকেশ, আপনার মাহাত্ম্যকীর্তনে সমস্ত জগৎ প্রহৃষ্ট ও আপনার প্রতি অনুরক্ত হয়। কারণ আপনি সর্বাত্মা ও সর্বভূতের সুহৃৎ। রাক্ষসগণ যে ভীত হয়ে নানাদিকে পলায়ন করছে এবং সিদ্ধগণ যে আপনাকে নমস্কার করছেন; এই সমস্তই যুক্তিযুক্ত।)

ভগবানের যে ভয়ঙ্কর রূপ, সেই রূপকে নিয়ে অর্জুন বলছেন, *স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ*, আপনার স্তুতি করে জগৎ আনন্দ পাচ্ছে। আগে বর্ণনা করা হয়েছিল, কোন কোন রাক্ষসরা পালাচ্ছে, কেউ পালাতে পারছে না, কেউ স্তুতি করছে, কেউ আনন্দ করছে। হে কৃষ্ণ, আপনার কীর্তি, আপনার মহিমার কীর্তন ও শ্রবণ করলে যে জগৎ হর্ষিত হয়, আনন্দ পায়, এটা পুরোপুরি সত্য। কারণ ঈশ্বরই সবার আত্মা, ঈশ্বরের প্রতি এই যে অনুরাগ এটা ঠিক। আর রাক্ষসরা যে ভয়ে পালাচ্ছে, এটাও ঠিক, এখানে ভুলের কোন অবকাশ নেই। আর কপিল আদি সিদ্ধ মুনিরা যে আপনাকে নমস্কার করছিলেন, এটাও ঠিক। এই যে ভগবানের প্রতি তিন রকম প্রতিক্রিয়া – ভয়ে পালাচ্ছে, স্তুতি করছে আর আনন্দ পাচ্ছে। কেন? পরের শ্লোকে সেটা বলছেন।

অর্জুন এবার আস্তে আস্তে শান্ত হতে শুরু করেছেন। শান্ত হয়ে গদ্‌গদ্ স্বরে, এটা স্বাভাবিক স্বর না, ইমোশানে অর্জুনের গলাটা কফে আটকে আছে, সেইজন্য বলছেন গদ্‌গদ্ স্বরে অর্জুন ভগবানকে বলছেন। শ্রোতাদের জ্ঞাতার্থে এখানে বলা যেতে পারে, মধুসূদন সরস্বতী খুব নামকরা বেদান্তী ছিলেন, বাঙালী ছিলেন, আর নাগা সম্প্রদায় ওনারই শুরু করা। গীতার উপর ওনার একটা খুব নামকরা বই আছে, যার নাম গূঢ়ার্থদীপিকা। মধুসূদন সরস্বতী সেখানে বলছেন, যদি কারুর দুষ্ট লোকেদের থেকে ভয় থাকে, উনি অবশ্য রাক্ষসের কথা বলছেন, রাক্ষস তো আর এখন নেই, রাক্ষস মানেই দুষ্ট লোক, তাহলে *ওঁ নমো নারায়ণায়* উচ্চারণ করে এই ছত্রিশ নম্বর শ্লোক যদি পাঠ করা হয় তাহলে দুষ্ট লোকেদের উপদ্রব, দুষ্ট লোকদের থেকে ভয় কমে যাবে। উনি বলছেন গীতার একাদশ অধ্যায়ের এই ছত্রিশ নম্বর মন্ত্র *ওঁ নমো নারায়াণায়* বলে পাঠ করলে খুব শক্তিশালী মন্ত্র হয়ে

যাবে। এই মন্ত্র জপের প্রভাবে আশেপাশে যত দুষ্ট লোক আছে, ওদের উপদ্রব কমে যাবে। কেন অর্জুন এই কথা বলছেন? স্তুতি করে বলছেন –

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ।।৩৭।।

(হে মহাত্মা, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, আপনি ব্রহ্মারও গুরু এবং আদি কারণ। আপনাকে সকলে কেন নমস্কার করবেন না? যা ব্যক্ত ও যা অব্যক্ত তা আপনি এবং এই উভয়ের অতীত (বেদান্তপ্রসিদ্ধ) যে অক্ষর ব্রহ্ম তাও আপনি। আপনি ভিন্ন ত্রিভুবনে অন্য কিছুই নাই।)

অর্জুন বলছেন, আমি বুঝেছি আপনি *গরীয়ান্*, আপনি সবার থেকে বড়। এতক্ষণ যাবৎ অর্জুনের কাছে শ্রীকৃষ্ণ নিজের স্বরূপের কথা বর্ণনা করে গেছেন, বিভূতির কথা বললেন; এবার আর কোন কিছুর বর্ণনা নেই, সেই অর্জুনকেই এবার সরাসরি এই ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ দেখিয়ে দিলেন। অর্জুন এবার স্পষ্ট বুঝে গেছেন শ্রীকৃষ্ণ কে, বলছেন আপনি ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভেরও আদিকর্তা, ব্রহ্মার জন্মও আপনার থেকে, তাই আপনার থেকে আর কে বড় হবে! সেইজন্য আপনাকে দেখে যে সবার আনন্দ অনুভব হচ্ছে, আপনাকে দেখে সবাই যে নমস্কার করছেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, এটাই তো হওয়ার কথা।

অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ, বেদান্তে যাঁকে পরম অক্ষর বলা হয়েছে, যাঁর কখন নাশ হয় না, সেই পরম অক্ষর আপনি নিজে। তার সাথে সৎ অসতের পারে যা, তা আপনি নিজে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ষোল নম্বর শ্লোকে, যেখানে ভগবান বলেছিলেন, *নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ*, এই শ্লোকের আলোচনায় সেখানে আমরা সৎ আর অসতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি। আমাদের বেদের ক্লাশে বেদের নাসদীয় সূক্তমেও এর আলোচনা বিস্তারে করা হয়েছে। সৎ আর অসৎ বিভিন্ন অর্থে আসে। সৎ মানে যেটা আছে, যেটা আছে এর আবার দুটো অর্থ হতে পারে, একটা সৎ যেটা পুরোপুরি আছে, আরেকটা সৎ যেটা ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায়। অসৎ অর্থও দুটি অর্থে ব্যবহার করা হয়, অসৎ মানে যার কোন অস্তিত্ব নেই আর দ্বিতীয় অর্থ যেটা ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না। উপচারের জন্য, অর্থাৎ বোঝানর জন্য ভগবানকে অনেক সময় সৎ বলা হয়। কিন্তু আসলে তিনি সৎ নন, এইজন্য তিনি সৎ নন, কারণ ভগবানকে কোন ভাবে ইঙ্গিত করা যায় না। আমি বলছি এই পেনটা আছে, যখন বলছি এই পেনটা আছে, তার মানে ইন্দ্রিয় দিয়ে আমি পেনকে দেখছি, চোখ দিয়ে দেখছি, মন দিয়ে গ্রহণ করছি বলেই বলতে পারছি আমার হাতে এই পেন আছে। আমরা বলছি ভগবান আছেন, কিন্তু ইন্দ্রিয় দিয়ে, মন দিয়ে তাঁকে জানা যায় না, সেইজন্য এটা বলা যাবে না যে তিনি সৎ। তাহলে কি ভগবান অসৎ? বলছেন, তাও বলা যাবে না। কারণ একটা জিনিস যদি না থাকে, সেটাতেও মন বোধ করে জিনিসটা নেই। সেইজন্য ভগবান সৎ অসৎ এর পার। তাই অর্জুন বলছেন, আমি বুঝেছি আপনি সৎ অসৎ এর পার।

ভগবান অর্জুনকে নিজের বিশ্বরূপ দেখালেন, ভগবানের এই রূপ দেখে অর্জুন খুব ঘাবড়ে গেলেন। অর্জুন জানতে চাইলে ভগবান বললেন, *কলোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ*, আমি কাল, এখন আমি লোকসংহারের জন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছি। আগে আমরা এর সব বর্ণনা করেছি। অর্জুন দেখছেন কিভাবে উভয় পক্ষের যোদ্ধারা ভগবানের মুখের মধ্যে প্রবেশ করে যাচ্ছে। সব কিছু দেখে অর্জুন ভয়ে বিচলিত হয়ে ঘাবড়ে গেছে। সব কিছু দেখে এবং বুঝে অর্জুন ভগবানের স্তুতি করতে শুরু করেছেন। আটত্রিশ নম্বর শ্লোকেও স্তুতি করে অর্জুন বলছেন –

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।।৩৮।।

(হে অনন্তরূপ, আপনি আদিদেব ও অনাদি পুরুষ এবং বিশ্বের পরম প্রলয়স্থান। যা কিছু বেদ্য, তৎসমূহের বেদিতা আপনি। যা কিছু বেদ্য, সেটাও আপনি। আপনি পরম ধাম এবং আপনিই জগৎকে পরিব্যাপ্ত করে আছেন।)

একাদশ অধ্যায়ের আটত্রিশ নম্বর শ্লোকে ভগবানের প্রণাম মন্ত্র। *ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ,* তিনি আদিদেব যিনি জগতের সৃষ্টি করেছেন। *পুরুষঃ,* যিনি এই শরীররূপী নগরীতে বাস করেন, আগে আমরা 'পুরুষ' শব্দের ব্যাখ্যা করেছি। *পুরাণঃ,* আপনি হচ্ছেন সবার আদি, তাই আপনার থেকে পুরনো আর কেউ নেই। *ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্,* যে জিনিসটা যেটার উপর রাখা হয় সেটাকে বলা হয় নিধান। যেমন এই জলটা কোথায় আছে? এই গ্লাশে আছে, এই গ্লাশটা হল জলের নিধান। গ্লাশটা আবার কোথায় আছে? টেবিলে আছে, টেবিলটা গ্লাশের নিধান। টেবিলটা কোথায় আছে? এই মেঝেতে আছে। মেঝেটা কোথায় আছে এই বিল্ডিং এর মধ্যে আছে। এই বিল্ডিংটা কোথায় আছে? এই পৃথিবীতে আছে। পৃথিবী কোথায় আছে? এই সৌরমণ্ডলে আছে। একটা জিনিস একটার মধ্যে রাখা আছে, সর্বশেষে যেটাতে রাখা থাকে তাকে বলা হয় *পরং নিধানম্,* সেটাই হচ্ছে ঈশ্বর, ঈশ্বরই হলেন *পরং নিধানম্*।

বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম, যাবতীয় যা কিছু এই জগতে আছে সব কিছুকে ছাড়িয়ে কাকে জানার আছে আর তাকে কে জানছে? বলছেন আপনিই একমাত্র জ্ঞাতা। এই যে এখানে টেবিলে জলের গ্লাশটা রয়েছে এটাকে ঠিক ঠিক কে জানছেন? ঈশ্বর। আমরা মনে করি আমি জানছি। কিন্তু আমিটা কে? আমি সেই ঈশ্বরের সঙ্গে এক। ভিতরে ঈশ্বরের চৈতন্য সত্তা আছে বলে মন ও বুদ্ধিকে মনে হচ্ছে যেন চৈতন্যময়, মন বুদ্ধি জানছে ঠিকই কিন্তু আসল জ্ঞাতা হলেন সেই শুদ্ধ চৈতন্য। *বেদ্যং চ,* জানার মত যে বস্তু সেটাও আপনি। জানার যোগ্য বলতে আসলে বোঝাচ্ছে আধ্যাত্মিক জ্ঞান। সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানটাও আপনি। *পরঞ্চ ধাম,* আপনি হচ্ছেন পরম ধাম, যাঁকে জানার পর সেখানে পৌঁছাবে, সেটাও আপনি।

মুক্তি পাওয়ার জন্য ঈশ্বরকে জানতে হবে। ঈশ্বরকে জানতে পারলে কোথায় যাবে? ঈশ্বরের মধ্যেই চলে গিয়ে ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যাবে। সেই জ্ঞাতাটি কে? ঈশ্বর নিজেই। সেইজন্য বলা হয় জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান এবং জ্ঞানের যে ফল সবটাই সেই এক বস্তু –ঈশ্বর। এই জিনিসটাকেই অন্য ভাবে এখানে বলা হল –*বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম*। *ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ,* আপনি অনন্তরূপী, আপনাকে বলা যাবে না আপনি সগুণ না নির্গুণ, আপনি সাকার না নিরাকার। আমাদের মন ও বুদ্ধি সীমিত, এই সীমিত মন-বুদ্ধি দিয়ে আপনার অনন্তরূপের কোন বিচারই করা যাবে না। আমরা বিপরীতটা জানি, আমাদের কাছে তিনি যদি সগুণ না হন তাহলে তিনি হবে নির্গুণ, এটা না হলে ওটা হবেন, ওটা না হলে এটা হবেন, সগুণ নির্গুণ ছাড়া আর কি হতে পারেন সেটা আমরা কি করে জানব, তৃতীয় বলে কিছু হতে পারে আমরা জানিই না। কারণ আমাদের বুদ্ধিতো এই তো এতটুকুন।

বেদে অনেক দেবী-দেবতার কথা বলা হয়েছে, দেবী কম, দেবতাদের কথা বেশি বলা হয়েছে। প্রথমে নারায়ণের কথা বলা হল, যিনি আদিকর্তা। সেখান থেকে সরে এসে অর্জুন এবার অন্যান্য দেবতাদেরকে নিয়ে বলছেন –

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।।৩৯।।

(আপনি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ ও চন্দ্র। আপনি কশ্যপাদি প্রজাপতিরূপ লোকপিতা এবং পিতামহ ব্রহ্মারও জনক। আপনাকে সহস্রবার নমস্কার করি। আপনাকে পুনরায় নমস্কার করি। আবার আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি।)

আমরা একবার কল্পনা করে দেখতে পারি –আমি একজনের সঙ্গে দীর্ঘ দিন বাস করছি। হঠাৎ একদিন জানতে পারলাম তিনি বিশেষ কেউ, খারাপ অর্থে না, ভালর অর্থে। তখন সত্যিই আমার কেমন অবাক মনে হবে। অর্জুনেরও ঠিক সেই রকম অবাক লাগছে। অর্জুন বলছেন, আমি মনে করছি আপনি সেই বায়ু দেবতা, আপনি সেই যম দেবতা, আপনি সেই অগ্নি দেবতা, আপনি সেই জলসমূহের রাজা বরুণ, আপনিই চন্দ্রমা, আপনিই কাশ্যপাদি প্রজাপতি। তার সাথে *প্রপিতামহশ্চ*, পিতামহ যে ব্রহ্মা, আপনি তাঁরাও পিতা। পুরাণে বর্ণনা আছে কিভাবে ভগবান বিষ্ণু থেকে এই প্রজাপতিরা, দেবতারা বেরিয়েছেন। *নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ*, অর্জুন তাই বলছেন, আপনাকে বার বার নমস্কার করছি। *সহস্রকৃত্বঃ*, আপনাকে হাজার বার প্রণাম করছি। আমরা যেমন বলি আপনাকে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাই, অর্জুনও সেই ভাব নিয়ে বলছেন –*পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে*, যখন কাউকে হাজার প্রণাম জানিয়ে দেওয়া হয়, কোটি প্রণাম বলে দেওয়া হয়, তারপর আবার প্রণাম বলার প্রয়োজন হয় না। গীতা এখানে কাব্যিক সৌন্দর্য এনে বলছেন *পুনশ্চ ভূয়োঽপি*, সহস্র বলা মানেই কোটি, কিন্তু তাতেও হচ্ছে না, তারপরেও বলছেন –আবার আপনাকে প্রণাম জানাই।

আচার্য এখানে বলছেন, *পুনঃ চ ভূয়ঃ অপি ইতি শ্রদ্ধাভক্ত্যতিশয়াদ্ অপরিতোষম্ আত্মনো দর্শয়তি*, হাজার বার প্রণাম করার পর আবার কেন *পুনঃ* বলছেন? বলতে চাইছেন, হাজার প্রণাম করেও আমি তৃপ্ত হতে পারছি না, সেইজন্য বারবার আপনাকে প্রণাম করছি। মায়ের কাছে বাচ্চারা অনেক কিছু আবদার করে, মা হয়ত বাচ্চাকে দিতে চাইছেন না, কিন্তু বাচ্চা তাও আবদার করতেই থাকে। হঠাৎ মা রাজি হয়ে বাচ্চাকে জিনিসটা দিয়ে দিলেন। তখন আনন্দে বাচ্চা মাকে জড়িয়ে ধরে। মা দিচ্ছিলেন না, মা দিতে রাজি হয়ে যাওয়ার পর বাচ্চারা যেভাবে মাকে জড়িয়ে ধরে, একবার না, বারবার জড়িয়ে ধরে। মায়ের প্রতি সন্তানের সেই মুহুর্তের যে ভালবাসা, এই ভালবাসাটা ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করা যায় না, তাই বার বার জড়িয়ে ধরছে। মেলায় ঘুরতে গিয়ে অনেক সময় বাচ্চারা হারিয়ে যায়, মা অনেক চেষ্টা করার পর যখন বাচ্চাকে খুঁজে পায় তখন মা বারবার করে বাচ্চাকে জড়িয়ে ধরে। শ্রদ্ধার ক্ষেত্রেও এই রকম হয়। আমরা সাধুদের মধ্যেও দেখেছি, যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ সাধুর সাথে বহু দিনের সম্পর্ক আছে, অনেক দিন পর হয়ত তাঁর সাথে দেখা হল, সেখানেও আমরা বারবার মাথা ঠুকে ঠুকে তাঁকে প্রণাম করি। অনেক সময় বড়রা বলেন, অত মাথা ঠুকতে হবে না। কিন্তু ওটা ভালবাসার অভিব্যক্তি, আচার্যের কি সুন্দর বিশ্লেষণ, *শ্রদ্ধাভক্ত্যতিশয়াদ্*, শ্রদ্ধা ভক্তি এত বেশি যে মাথা ঠুকে ঠুকে বারবার করে প্রণাম করছেন।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ।।৪০।।

(হে সর্বাত্মা, আপনাকে সম্মুখ থেকে নমস্কার করছি, আপনাকে পশ্চাত থেকে নমস্কার করছি, আপনাকে সকল দিক থেকেই নমস্কার করছি। হে অনন্তবীর্য, আপনি অসীম বিক্রমশালী। আপনি সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে আছেন, অতএব আপনি সর্বস্বরূপ। আপনি ভিন্ন অন্য কিছুরই সত্তা নাই।)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন বলছেন, আপনাকে সামনে থেকে প্রণাম, আপনাকে পিছন থেকে প্রণাম। এর আরেকটা অর্থ হতে পারে, আপনাকে পূর্বদিশা থেকে প্রণাম, আপনাকে পশ্চিমদিশা থেকে প্রণাম। হে সর্বস্বরূপ, আপনাকে সব দিক থেকে প্রণাম।

ভক্তি যদি শিখতে হয়, হিন্দুদের কাছে শিখতে হয়, ভক্তিভাবটাই হিন্দুদের একটা বৈশিষ্ট্য। সব ধর্মে ভক্তিভাব আছে, কিন্তু ভক্তির ব্যাপারে হিন্দুরা বিশেষ। এখনও যে কোন মন্দিরে গেলে দেখা যাবে, ভক্তরা মন্দির পরিক্রমা করছেন। যাঁরা বৃন্দাবনে গেছেন, তাঁরা দেখে থাকবেন সেখানে গোবর্দ্ধন পাহাড়ের পরিক্রমা করা হয়। কাশীতেও পঞ্চকোশী পরিক্রমা করা হয়। আমরা বেলুড় মঠেও আগে দেখতাম, ভক্তরা এসে মন্দির পরিক্রমা করছেন। ঠাকুরের বিগ্রহকে প্রণাম করে মন্দিরের ভিতরই ভক্তরা পরিক্রমা করেন। আবার অনেক সময় দেখা যায়, যাঁকে খুব শ্রদ্ধা করা হয়, যদি সুযোগ থাকে সেখানেও তাঁকে ভক্তরা পরিক্রমা করে ঘুরে ঘুরে প্রণাম করছেন দেখা যায়। এটাই অর্জুন এখানে করছেন, *নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব*, সামনে থেকে আপনাকে প্রণাম, পিছন থেকে আপনাকে প্রণাম, আপনাকে সব দিক থেকে প্রণাম। ভগবানকে কিভাবে প্রণাম করে? সব দিক থেকে। এই হল হিন্দুদের ভক্তি।

অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ, বীর্য মানে সামর্থ আর বিক্রম হয় পরাক্রম, আচার্য এখানে ব্যাখ্যা করে বলছেন, সামর্থ থাকলেও আমরা অনেক সময় পরাক্রম দেখাতে পারি না। যেমন হিন্দুরা, হিন্দুদের সামর্থ আছে কিন্তু পরাক্রম দেখায় না, যখন যার ইচ্ছে হল খুশী মত হিন্দুদের নিয়মিত ভাবে পিটিয়ে দিয়ে চলে যায়। প্রথম হল হিন্দুদের শুনতে হয় তারা কম্যুনাল, আর মার খাওয়ার সময় আমরাই মার খাই। গতকাল চেন্নাই হাইকোর্ট একটা রায় দিয়েছেন, তামিলনাড়ুতে একটা গ্রামে বছরের পর বছর সেখানকার এক মন্দিরের দেবীকে নিয়ে শোভাযাত্রা বেরোতে, একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেরা সেই শোভাযাত্রা আটকে দিয়েছে, আদালত বলছেন, এই জিনিস করা যায় না; কারণ এভাবে একটা সম্প্রদায়ের চিরাচরিত প্রথাকে জোর করে বন্ধ করে দিলে এর প্রভাব অন্য জায়গায় পড়লে অনেক গভীর সমস্যা হয়ে যেতে পারে। তাই বলে হিন্দুদের যে সামর্থ নেই তা তো না, পরাক্রম দেখায় না।

ভগবানের অনন্ত বীর্য আর তার সাথে আপনার অমিত বিক্রম। যখন যেখানে প্রয়োজন হয় তখন সেখানে আপনি আপনার বীর্য ও বিক্রম দেখান। টাকা থাকলেই হয় না, টাকা খরচ করার জন্য হৃদয়ও থাকা চাই। আমার একটা গুণ আছে, কিন্তু সেটার প্রকাশ নেই, ঐ গুণের কোন দাম নেই। প্রথমে গুণ থাকতে হবে, এবং দ্বিতীয় ঐ গুণ যেন বাইরেও প্রকাশ পায়। ভগবানের কি রকম সামর্থ? *অনন্তবীর্য*, তাঁর সামর্থ অনন্ত। আর পরাক্রমটা? *অমিতবিক্রমঃ*, যা মাপা যায় না। *সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ*, এই জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে, আপনি নিজের স্বরূপ নিয়ে সব কিছুতে ঢুকে আছেন। সেইজন্য ব্যপ্তির দিক থেকে সব কিছুর পরিসমাপ্তি আপনার মধ্যে ঢুকে আছে। আপনি সর্বরূপ, আপনিই সব কিছু হয়ে রয়েছেন, এই জগতে আপনার বাইরে কিছু নেই।

আটত্রিশ, ঊনচল্লিশ আর চল্লিশ, এই তিনটে শ্লোক হল খুব গভীর ভক্তির প্রকাশ। খ্রীশ্চানদের ধর্ম সাহিত্যে কিছু লেখক আছে, যেমন ব্রাদার লরেন্স ছিলেন, ওনার রচিত Practice of present of God আছে, আবার ফিলোকালিয়া বই আছে, এগুলোতে ভক্তির কথা আছে। কিন্তু হিন্দুরা ভক্তিকে অন্য স্তরে নিয়ে চলে যান। *ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ* থেকে *নমো নমোঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ*, সেখান থেকে *নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে*, ভক্ত ভগবানকে সাক্ষাৎ দেখছেন। এখানে যে অর্থে

আমরা উদ্বেগ বলি, এখানে সেই অর্থে কোন ইমোশানস্ নেই, সাংঘাতিক একটা শ্রদ্ধা ভক্তি রয়েছে। বেলুড় মঠে ঠাকুর বিগ্রহ রূপে নেই, স্বদেহে বিরাজমান। বলা হয় কাশীতে শিব চৈতন্য, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ এখনও আছেন।

কিন্তু এখানে তা না, এখানে নিত্য সাকার। যেদিন থেকে অর্জুনের সাথে শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়, সেদিন থেকে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। দুজন সমবয়সী ছিলেন, দুজনের এই ভালবাসার টানে দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধু বলে ডাকতেন, এই ভালবাসার টানে শ্রীকৃষ্ণের ভগ্নিকে অর্জুন বিবাহ করলেন। কিন্তু তখন তো অর্জুন জানতেন না যে, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। বন্ধু ভেবে কত অবিনয় সম্বোধন করেছি, বন্ধুর মত ব্যবহার, শয়ন, বসন করতে গিয়ে ঈশ্বরের প্রতি অজান্তায় কত রকমের আমার দোষ হয়েছে, পরের দুটো শ্লোকে অর্জুন সেটাই বলছেন –

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি।।৪১।।

(আপনার এই জগদাকার রূপের মাহাত্ম্য না জেনে প্রমাদহেতু বা প্রণয়বশতঃ আপনাকে সখা ভেবে হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে, এই ধরণের অবিনয়ে সম্বোধন করে যা বলেছি –)

এটা অত্যন্ত ইমোশানাল শ্লোক, খুব গভীর ইমোশান দ্বারা পূর্ণ এই শ্লোক। আগে *স গদগদং* বলা হল, কন্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, গলা দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। অর্জুন বলছেন, আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি সেই পরমেশ্বর। হে প্রভু আপনার মহিমা আমি এতদিন বুঝতে পারিনি, আপনার প্রকৃত স্বরূপ আমি এতদিন চিনতে পারিনি। এখন সব কিছু সাক্ষাৎ দেখে আমি বুঝতে পারছি, আপনি কে, আপনার স্বরূপ কি। অজান্তায় আপনার প্রতি আমি এতদিন কত অন্যায় করে এসেছি। *সখেতি মত্বা,* আপনাকে আমি আমার সখা বলে, বন্ধু বলে এতদিন মনে করে এসেছি। *প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি,* আমার যে বিপরীত বুদ্ধি, আপনি যে ভগবান, এই বিপরীত বুদ্ধি দিয়ে আপনাকে আমার সখা মনে করেছি। সেইহেতু অবিনয়ের সাথে আপনাকে কখন হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা বলে সম্বোধন করেছি। এইভাবে আপনাকে সম্বোধন করাটা আমার মূঢ়তার, আমার অজ্ঞানের লক্ষণ, আর যা কিনা অত্যন্ত অপমানজনক।

একটা ছোট্ট শিশু জানে না, তার মা দেশের প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী বা কোন বড় লেখিকা বা বিখ্যাত গায়িকা এই ধরণের কোন বড় কিছু। যখন মায়ের ব্যাপারে এই বোধ আসে, হয়ত তখন তার মা মারা গেছেন; তখন বাচ্চার মনে হবে, আমি তো তখন জানতাম না, আমার মা কত বড় মাপের একজন ব্যক্তি ছিলেন। তখন সেই সন্তানের মনে এই ভেবে দুঃখ হবে, ওই সময় কি ভাবে আমি মায়ের সাথে ব্যবহার করেছিলাম। ঠাকুর এর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, পুকুরের জলে পূর্ণিমার চাঁদ প্রতিবিম্বিত হয়েছে। জলের মধ্যে সেই চাঁদের প্রতিবিম্বকে পুকুরের মাছেরা মনে করেছে এটি আমাদের মতই কোন মাছ, সারা রাত চাঁদের সেই প্রতিবিম্বের সাথে খুব আনন্দে খেলা করছে। সকাল হতেই দেখে সেই মাছটি আর নেই। মাছেরা বুঝতে পারছে না, তাদের সেই খেলার সাথী কোথায় গেল। বিশেষ পুরুষরা যখন আমাদের মাঝখানে আবির্ভূত হন, আমাদের মত সাধারণ লোকের সাথে মিশে গিয়ে খেলা করেন। ঠিক সেই রকম অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে মনে করেছিলেন তিনি আমাদেরই মত একজন।

যে কোন সন্ন্যাসীকে প্রথম থেকেই নিষেধ করে দেওয়া হয় ভক্তদের সাথে বেশি মেলামেশা করতে। এতে সন্ন্যাসীর খুব বিশেষ ক্ষতি হয় না, ক্ষতি হয় ভক্তদেরই। কারণ বেশি মেলামেশা

করলে ভক্তরা মনে করে ইনিও আমাদেরই মত একজন। ঠাকুর একবার সমাধি অবস্থায় গাড়ি থেকে নামছেন, সেই অবস্থায় ঠাকুরকে একজন ধরে ধরে নামাতে গেছেন। ঠাকুর তাঁকে ধরতে নিষেধ করছেন, কারণ আমাকে ধরলে লোকে মনে করবে আমি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গেছি। এখন ভগবানকে সমাধি অবস্থায় দেখে কেউ যদি মনে করে যে ইনি একজন মাতাল বা ইনি মদ্যপান করেছেন, এতে ভগবানের কিছু এসে যাবে না, কিন্তু এই রকমটি যে ভাবছে তার কিন্তু অপরাধ হয়ে যাবে। সেইজন্য ঠাকুর বারণ করছেন, এমন কিছু করো না যাতে সাধারণ লোকের ভুল ধারণা হয়।

সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেনা, ইনি কে। যদি কদাচিৎ কেউ বুঝতে পারে, তখন এই কথাই সে বলবে –*সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং*। অর্জুন এখন বুঝতে পেরেছেন, সেইজন্য বলছেন, বিপরীত বুদ্ধিতে আমি আপনাকে হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা বলে সম্বোধন করেছি। *অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া*, এই যে অজ্ঞতাবশতঃ ভুল আমি করেছি, আমি জানতাম না আপনি কে। *প্রমাদাৎ*, প্রমাদ বশতঃ, জিনিসটা আমার কাছে পরিষ্কার ছিল না, আর *প্রণয়েন বাপি*, প্রণয়বশত –কখন ভালবাসায়, প্রণয়বশত, কখন প্রমাদবশত, কখন অজ্ঞানে; এই তিনটে মিলিয়ে সারা জীবন আপনার সাথে যে অসৌজন্য মূলক ব্যবহার করে এসেছি, আর হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা বলে অবিবেচকের মত অবিনয়মূলক সম্বোধন করেছি, আমি খুব অন্যায় করেছি, আমি খুব ভুল করেছি।

তাহলে এই বিশ্বরূপ দর্শন করার পর কি অর্জুন পাল্টে গেলেন? এরপর থেকে অর্জুন কি শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান রূপেই জানতেন? এর উত্তর একটাই – না; এ সম্ভব না। চব্বিশ ক্যারেটের সোনা দিয়ে গয়না হয় না। ত্রিগুণাতীত যদি হয়, কিংবা শুদ্ধ সত্ত্বও যদি হয়, তাকে দিয়ে সংসার চলবে না। সংসার চালাতে হলে খাদ মেশাতে হয়। একটু রজো গুণ, একটু কাম ক্রোধের আকার মাত্র থাকতে হবে, ওটা যদি না থাকে সংসার চলবে না। যিনি ত্রিগুণাতীত, যিনি সব কিছুর পারে, তাঁর দ্বারা সংসার চলে না।

ভাগবতে খুব সুন্দর এর বর্ণনা করা হয়েছে। কংসের কারাগারে ভগবান জন্ম নেওয়ার পর দেবকী ও বসুদেবকে তিনি নিজের স্বরূপ দেখিয়ে দিলেন। স্বরূপ দেখানোর পর ভগবান তাঁর পিতামাতা উভয়কে বললেন, আমার প্রতি তোমাদের সন্তান ভাব আর ঈশ্বর ভাব দুটোই যেন সমান ভাবে বজায় থাকে। কিন্তু পরবর্তি সময়ে দেখা গেল, তাঁরা সেই ভাব বজায় রাখতে পারলেন না, সন্তান ভাবেই আটকে থাকলেন। কারণ এই ঈশ্বর ভাবটা যদি সব সময় থাকে, ইনি তো ভগবান, তাহলে সংসার চলবে না, সন্তানের প্রতিপালন হবে না। লীলাপ্রসঙ্গে বর্ণনা আছে, দক্ষিণেশ্বরে হলধারী মাঝে মাঝেই বলতেন, ও রামকৃষ্ণ, তোকে আমি চিনেছি, তুই সেই। আবার যখন অধ্যাত্ম রামায়ণ আদি পাঠ করতে বসতেন, তখন নাকে নস্যি দিয়ে একটা টান মেরে রেগেমেগে বলতেন, ফুঃ তুই নাকি আবার অবতার! ঈশ্বরীয় ভাব সব সময় থাকে না। কিন্তু এই জায়গাতে অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে বিহ্বল হয়ে গেছেন। পরের শ্লোকে অর্জুন বলছেন, কোন্ কোন্ সময়ে আপনার সাথে এই রকম অশোভন আচরণ করেছি?

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্।।৪২।।

(এবং হে অচ্যুত, বিহার, শয়ন, আসন ও ভোজনকালে আপনার সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে, একাকী বা বন্ধুজনসমক্ষে পরিহাসচ্ছলে আপনাকে যে অসম্মান ও অমর্যাদা করেছি, হে অপ্রমেয়, আপনার নিকট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।)

অনেক সময় হাসি ঠাট্টা করতে গিয়ে আপনাকে অপমানিত করেছি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের বন্ধু কিনা, বন্ধুর সাথে হাসি মজা হয়েই থাকে, কিন্তু এখন এই দৃশ্য দেখার পর অর্জুনের মনে হচ্ছে, ওই ওই সময় আমি বন্ধুকে অপমানিত করেছিলাম। বিহার, শয্যা, আসন, ভোজন বিভিন্ন ক্রিয়াতে ও পরিস্থিতিতে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সাথে কি কি রকম ব্যবহার করেছিলেন, সেইসব ঘটনাগুলো অর্জুনের এখন মনে পড়ছে। যখন দুজনে হাঁটছেন, যখন দুজনে ঘুমোচ্ছেন, যখন দুজনে বসে আছেন, দুজনে যখন খাওয়া-দাওয়া করছেন, আবার আপনার সাক্ষাতে বা আড়ালে, একাকী বা বন্ধুবান্ধবদের সমক্ষে পরিহাসচ্ছলে আপনাকে অসম্মান ও অসৌজন্যমূলক ব্যবহার বা অমার্যাদা করেছি। কথামৃতে বর্ণনা আছে, ঠাকুর কোন ভক্তের বাড়িতে গেছেন, বা কোন প্রিয়জনের বাড়িতে গেছেন, তাঁকে যে সম্মান দেওয়ার কথা সেই সম্মান দেওয়া হয়নি। আমাদের হল উল্টো আমরা সব সময় সম্মান চাই, এই ধরণের উচ্চ আধারের মহাপুরুষরা সম্মান চান না, কিন্তু আমাদের তরফ থেকে কখন অজান্তায় অসম্মান হয়ে যায়, আমরা বুঝতেও পারিনা।

অর্জুন বলছেন, আপনি *অপ্রমেয়ম্,* মন বুদ্ধি দিয়ে আপনাকে জানা যায় না, জানার কোন উপায় নেই। এই যে কখন আপনাকে আমি ছোট করেছি, কখন অপমানিত করেছি, এই যে আমার অপরাধ সমূহ, সমস্ত অপরাধকে একসাথে এনে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। আমি জানি আপনি সেই পরমেশ্বর। বালগোপাল কৃষ্ণ কত দুষ্টুমি করছেন, যশোদা কৃষ্ণকে ভয় দেখাচ্ছেন মারব বলে, আবার দড়ি দিয়ে কৃষ্ণকে বাঁধতে গেছেন। যশোদার যদি সেই বোধ থাকত, আমার কৃষ্ণ ভগবান, তাহলে কি তিনি এগুলো করতে পারতেন? কিন্তু যখন বোধ হবে, তখন ভাববেন, হায় হায় আমি কার সঙ্গে কি করছিলাম।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীতে একটা ঘটনা আছে। ভক্তরা প্রণাম করতে এলে মা চাদর ঢাকা দিয়ে, মুখে ঘোমটা টেনে বসতেন, ভক্তরা এক এক করে প্রণাম করে যেতেন। একবার এক ভক্ত এসে মায়ের ওখানে বসে নানা রকমের ন্যাস, প্রাণায়াম আদি করতে শুরু করে দিয়েছে। অনেকক্ষণ পরে গোলাপ মা এসে দেখছেন, মা গরমে ঘেমে নেয়ে এক বিশ্রী অবস্থা, আর এই ভক্ত ঐ সব করেই যাচ্ছে। গোলাপ মা প্রচণ্ড রেগে গেলেন। 'তোমার কি আক্কেল, ইনি কি কোন প্রতিমা যে, তুমি এসব করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছ'? মায়ের ভাইঝি রাধু এত বছর মায়ের সাথে কাটিয়েছে, রাধুর কি মায়ের ব্যাপারে কোন হুঁশ ছিল? রাধুর মা পাগলী মামীরও মাঝে মাঝে বোধ হত, কিন্তু বোধটা থাকত না। পাগলী মামী কত বার মাকে লাঞ্ছিত, অপমানিত করেছে। অথচ চোখের সামনে দেখছে কত দূর দূর থেকে, দেশ বিদেশ থেকে, নিবেদিতার মত সব ভক্তরা ছুটে আসছেন মায়ের দর্শন পাওয়ার জন্য, প্রণাম করছেন, প্রার্থনা করছেন –মা শরণাগত মা শরণাগত, কৃপা কর মা কৃপাময়ী। সেখানে রাধু, মাকু, পাগলী মামী এদের ব্যবহারের কথা ভাবলে আশ্চর্য তো লাগবেই। আমরা ঠাকুরের ভক্ত যারা, বেশির ভাগই তাই; সবাই ঐ রাধু, মাকু, পাগলী মামী। বোধই নেই যে, কাকে নিয়ে আমরা চলছি। অর্জুন আবার শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করে বলছেন –

পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব।।৪৩।।

(হে অমিতপ্রভাব, আপনি এই চরাচর জগতের স্রষ্টা, পূজ্য, গুরু এবং গুরুরও গুরু। অতএব, ত্রিভুবনে আপনার সমান আর কেউ নেই। ত্রিভুবনে আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কেই বা হতে পারে?)

জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে সবের স্রষ্টা আপনি, সেইজন্য *পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য,* চর অচর, স্থাবর জঙ্গম যা কিছু আছে সব কিছুর আপনি পিতা। আপনি শুধু পিতাই নন, আপনি

পূজনীয়, কারণ আপনি *গুরুর্গরীয়ান্*, আপনি বড় থেকেও বড়, আপনি গুরুরও গুরু। যোগশাস্ত্রে বলেন *স গুরোহপি গুরু*। আমার বাবা, তিনি বাড়ির সবার বড়, কিন্তু আমার বাবার থেকেও বড় তাঁর বাবা আছেন, ঠাকুরদা আছেন। অনেক সময় বাড়িতে ঠাকুরদা থাকেন, এখানে কিন্তু তা হচ্ছে না, ভগবান হলেন সবার থেকে বড়। *ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্*, গুরুরও গুরু, সবারই উপরে ভগবান, তাই তিনিই পূজনীয়।

ন ত্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ, আপনার সমান কেউ নেই, তাই আপনার থেকে অধিক কে হবে! *কুতোহন্য লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাব*, এই ত্রিভুবনে আপনার সমান কেউ নেই, আপনার সমানই যদি কেই না থাকেন তাহলে আপনার থেকে বড় কোথা থেকে হবে। বেদে একটা মন্ত্র আছে, *ন তস্য প্রতিম অস্তি*, তাঁর সমান কেউ নেই। হিন্দু ধর্মের নিন্দুকরা এই মন্ত্রকে এনে বলে বেদে প্রতিমা পূজা নিষেধ করা হয়েছে। এরা সংস্কৃত জানে না, শাস্ত্র জানে না। আচার্য শঙ্কর এখানে বলছেন, *প্রতিমীয়তে যয়া সা প্রতিমা*, পরিষ্কার বলছেন কোন জিনিসকে সমান সমান করা হয় তখন তাকে প্রতিমা বলা হয়। প্রত্যেক হিন্দু জানে, ভগবান যিনি, তাঁরা সাথে কাঠের বা পাথরের প্রতিমা সমান নয়। আমাদের কাছে এই প্রতিমা হল ভগবানের বিগ্রহ, আমাদের ঠিক ঠিক হল প্রতীক। অর্জুন বলছেন, আপনার যে প্রভাব, তাতে তার তো কোন প্রতিমা হয় না, প্রতিমা না হওয়া মানে সমান সমান হয় না, সেইজন্য বলে ভগবান হলেন *অপ্রতিমপ্রভাব*, তাঁর সমান কেউ হতে পারে না। লোকেরা বোঝে না, জানে না, না বুঝে হিন্দুদের নিন্দা করে।

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাধয়ে ত্বামহমীশড্যাম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্।।৪৪।।

(হে পরমপূজ্যদেব, সেই হেতু আপনাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে আপনার প্রসন্নতা প্রার্থনা করছি, পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রিয় যেমন প্রিয়ার অপরাধ ক্ষমা করেন, আপনিও সেইরূপ আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।)

আমাদের যদি কখন ভগবানের কাছে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে হয়, কিংবা যদি কোন দোষ করে থাকি, কিংবা যদি কারুর মনে হয় আমি পাপ করেছি, পাপ করার পর এখন আমি ভগবানের কাছে ক্ষমা চাইব। আবার এমনও হতে পারে, আগে আগে এমন কিছু আমার দোষ হয়ে গেছে, যেটা নিয়ে আমার মনটা খুঁত খুঁত করছে, মনে শান্তি নেই, তখন এই চুয়াল্লিশ নম্বর শ্লোককে মুখস্ত করে যিনি আমার ইষ্ট, তাঁর কাছে গিয়ে একশ আটবার করে এটা এক মাস পাঠ করলে সমস্ত পাপ থেকে সে মুক্ত হয়ে যাবে।

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং, সেইজন্য হে পরমপূজ্যদেব আমার শরীরকে নীচু করে, আচার্য এর ব্যাখা করে বলছেন, *প্রকর্ষেণ নীচৈ ধৃত্বা;* আপনাকে দণ্ডবৎ প্রণাম। একবার একজন এসে বলছেন, আমি প্রণামে বিশ্বাস করি না। প্রণামে যদি বিশ্বাস করেন না, তাহলে ঠাকুরের কাছে আসাই বা কেন? প্রণামে যদি বিশ্বাস না থাকে, সন্ন্যাসীর কাছে আসছেন কেন? আপনি যদি ঠাকুরের কাছে আসেন, আর আপনি যদি হিন্দু হন, হিন্দু মানেই আপনাকে প্রণাম করতে হবে; এর সাথে আপনার লাইকস ডিসলাইকসের কোন সম্পর্ক নেই, এটাই আমদের প্রথা, আপনাকে এটাই করতে হবে। আর যখন সেই শ্রদ্ধা ভক্তি অতিরিক্ত হয়ে যায়, তখন পুরো শরীরকে ঝুঁকিয়ে একেবারে পা স্পর্শ করে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে দিচ্ছেন।

প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্, ঈশ্ শব্দের অর্থ যিনি শাসনকর্তা, *ঈড্যম্,* স্তুতি করছি। প্রণাম কেন করা হয়? অনুগ্রহ করার জন্য –আপনার কৃপা চাই। যত রকমের দোষ করেছি, সব ক্ষমা করে দিন। বিভিন্ন কারণে মনটা আমাদের অবসাদগ্রস্ত হয়ে থাকে, বা চঞ্চল হয়ে থাকে, তখন আমরা দোষ করি। আর দোষ তখনই করি মনটা যখন একটা obsessionএ থাকে, কারুর প্রতি প্রেম থাকে। মানুষ ভুল এই তিনটে অবস্থাতেই করে, অজান্তায়, প্রমাদগ্রস্ত হয়ে, আর খুব বেশি ভালবাসাতে, যেটাকে আমরা obsession বলি। কিন্তু যারা দুষ্ট লোক, রীতিমত প্লান করে, মাথা খাটিয়ে দোষ করছে, এদের এখনও অনেক সময় লাগবে। এই তিনটেতে যদি দোষ হয়ে থাকে তখন সে এইভাবে প্রার্থনা করতে পারে –*তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্,* হে প্রভু ক্ষমা করুন।

এখানে জজ সাহেবের কাছে, রাজার কাছে, পুলিশের কাছে গিয়ে কাকুতি মিনতি করে ক্ষমা চাওয়ার কথা বলছেন না। *পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়াঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্,* পিতা যেমন সন্তানের দোষ ক্ষমা করে দেয়, বন্ধু যেমন বন্ধুকে ক্ষমা করে দেয় আর প্রিয়তমাকে, স্ত্রীকে স্বামী বা প্রেমিক প্রেমিকাকে যেভাবে ক্ষমা করে দেয়, সেইভাবে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। এখানে ধরেই নিচ্ছেন স্ত্রী বা প্রেমিকারাই সব সময় দোষ করবে, আর স্বামী বা প্রেমিক সব সময় ক্ষমা করে যাবে। আচার্য বলছেন, *প্রিয়ঃ ক্ষমতে এবম্ অর্হসি হে দেব সোঢুম্ প্রসহিতুং ক্ষন্তুম্,* ক্ষমা হল ধারণ করে নেওয়া, একটা দোষ করে ফেলেছে, পুরো ব্যাপারটাকে সহ্য করে নেওয়া। সেমেটিক ধর্ম, জুহুদের ধর্ম, খ্রীশ্চান আর ইসলামের সাথে হিন্দু ধর্মে এই জায়গাতে এসে তফাৎ হয়ে যায়। যদিও যীশু খ্রীষ্টের যে ধর্ম, Father is in Heaven, কিন্তু ওর উপর জুদাইজিমের ছাপ অনেক বেশি। জুহুদেদের ভগবান খুব কড়া, ইসলামেও খুব কড়া। হিন্দুরা এভাবে নেয় না, হিন্দুদের ভগবান হলেন, ক্ষমা কর প্রভু।

অর্জুন বলছেন, *অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি,* অজান্তায়, প্রমাদে আর প্রণয়বশাৎ দোষ হয়েছে। এই আমি আপনার চরণে শ্রদ্ধার সাথে সাষ্টাঙ্গ দিলাম, কোন চালাকি নেই। ঠাকুর কথামৃতে খুব সুন্দর বলছেন, কোন দোষ হয়ে গেলে তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিতে হয়, বলতে হয়, আর কক্ষণ এই রকমটি করব না। ভগবান কিভাবে ক্ষমা করবেন? জজ সাহেব যেভাবে ছেড়ে দেন, সেভাবে না; পুলিশ যেভাবে ছেড়ে দেয়; সেভাবে না, একজন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রাজা যেভাবে ক্ষমা করে দেয়, সেভাবে না। *পিতেব পুত্রস্য,* মা তো সব সময়, সব কিছুতেই ক্ষমা করেন, সেইজন্য মায়ের নাম নিচ্ছেন না, বলছেন পিতা যেভাবে পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করে দেন। *সখেব সখ্যুঃ,* আর *প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্।* আমাদের বিচার করে দেখতে হয়, আমি কি সবাইকে নিঃশর্ত ভাবে ক্ষমা করে দিই? যদি না করি, তাহলে ঈশ্বরীয় গুণ আমার মধ্যে এখনও আসেনি। ঈশ্বরীয় গুণ যাঁর মধ্যে এসেছে, তিনি সবাইকে সহ্য করবেন, সবাইকে তিনি ক্ষমা করে দেবেন।

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোমহস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।।৪৫।।

(হে দেব, যা পূর্বে আমি কখন দর্শন করিনি বা অন্য কেউ দর্শন করেনি, আপনার সেই বিশ্বরূপ দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। আমান মন ভয়ে ব্যথিত হয়েছে। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, আমার অতি প্রিয় আপনার সেই আগের রূপই আমাকে দেখান। আমার প্রতি প্রসন্ন হন।)

আপনার এই যে ভয়ঙ্কর রূপ, যে রূপ দেখে আমার ভয়ে সারা শরীরে কাঁটা দিচ্ছে, ভয়ে মন কাঁপছে, এই রূপ এর আগে কেউ কখন দেখেনি। আপনার কাছে আমার এই প্রার্থনা, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, আপনার আগের যে রূপ, যে রূপ আমার বন্ধুর রূপ, সেই রূপ আমাকে দেখান। জগন্নিবাস মানে জগতের যিনি নিবাসস্থান, যাঁর মধ্যে এই জগৎ অবস্থিত। যদি কারুর মনে হয় বাড়িতে, তার জীবনে কেমন একটা দৈবী প্রকোপ চলছে, বা জগতে করোনার মত কোন মহামারী চলছে, যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছে, তখন তাঁর কাছে এভাবে প্রার্থনা করতে হয় –*প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস*। হে প্রভু, আপনার যে এই ভয়ঙ্কর মূর্তি, আপনি এখন কাল রূপে লোকক্ষয়ের জন্য এই যে বিশাল ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছেন, এই রূপকে আপনি প্রশমিত করে নিন।

ঈশোপনিষদে বলছেন, *যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি*, আপনার যে কল্যাণতম রূপ, সেই রূপ আমি দেখতে চাই। করোনার মত মহামারী, যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে যাঁদের মনে ভয় ধরবে, তাঁরা রোজ চণ্ডী পাঠ করুন আর না পারলে, ছোট্ট এইটুকু প্রার্থনা করুন, *প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস*। ডাক্তাররা যা করার করবেন, সরকারের যা কিছু করার করবেন, কিন্তু তারপরেও মনে একটু শক্তি আনার জন্য, ঈশ্বরের কৃপা পাওয়ার জন্য এইভাবে একটু স্তুতি করলে, ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত ভাব রাখলে ভিতরে একটা শক্তি আসে। তাই বলে আজ থেকে সবাই আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুতি না নিয়ে চুপচাপ ঘরে বসে থাকতে হবে, তা কখনই না, দেশের আত্মরক্ষার জন্য সব রকম ব্যবস্থা করতে হবে, অসুখ হলে ডাক্তারের পরামর্শ মত চলতে হবে, ওষুধ খেতে হবে, তার সাথে এইভাবে প্রার্থনা, চণ্ডী পাঠ আদিও নিয়মিত ভাবে করে যেতে হবে।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে।।৪৬।।

(হে সহস্রবাহো, আমি আপনাকে আগের মত সেই কিরীট, গদা ও চক্রধারিরূপে দেখতে ইচ্ছা করি। হে বিশ্বমূর্তি, এখন আপনি আপনার সেই চতুর্ভুজমূর্তি ধারণ করুন।)

আপনার যে সৌম্য রূপ, যেটা এতদিন আমি দেখে অভ্যস্ত, যেমন মাথার উপর আপনার কিরীট, হাতে গদা, চক্র, শঙ্খ, পদ্ম, এই রূপে দেখতে চাইছি। আচার্য বলছেন, *ভব বিশ্বমূর্তে উপসংহৃত্য বিশ্বরূপং তেন এব রূপেণ বসুদেবপুরুষেণ ভব ইত্যর্থঃ*, আপনি আপনার এই বিশ্বরূপকে উপসংহার করে সেই আগের বসুদেবের পুত্রের চতুর্ভূজ রূপে ফিরে আসুন। কংসের কারাগারে ভগবান দেবকীকে এই রূপই দেখিয়েছিলেন। তারও অনেক আগে ভগবান নৃসিংহ রূপ ধারণ করে হিরণ্যকশ্যপুকে বধ করেছিলেন, সেই সময় প্রহ্লাদ ভগবানকে স্তুতি করেছিলেন। প্রহ্লাদের স্তুতিতে ভগবান প্রসন্ন হয়ে ধীরে ধীরে শান্ত হয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও এবার আস্তে আস্তে শান্ত হচ্ছেন।

আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *অর্জুনং ভীতম্ উপলভ্য উপসংহৃতং বিশ্বরূপং প্রিয়বচনেন আশ্বাসয়ন্*, ভগবান তাঁর বন্ধুকে দেখছেন এভাবে ভয় পেয়ে গেছেন, তখন তিনি নিজের ভিতরে এই বিশ্বরূপের উপসংহার করে নিলেন, অর্জুনকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ
ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে তদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্।।৪৭।।

(শ্রীভগবান্ বললেন –হে অর্জুন, তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে স্বীয় ঈশ্বরীয় যোগপ্রভাবে আমার তেজোময়, সমগ্র অন্তশূন্য এবং আদিভূত ও উত্তম বিশ্বরূপ তোমাকে দেখালাম। তুমি ছাড়া অন্য কেউ এর পূর্বে এই রূপ দর্শন করেনি।)

এই যে আমি পরমাত্মা, আমি ঈশ্বর, তোমার উপর যে প্রসাদ করলাম; কারুর উপর যখন কৃপা করা হয়, তখন সেটা হয়ে যায় প্রসাদ, প্রসাদ হল অনুগ্রহ বুদ্ধি; আমার যে ঐশ্বর্য, আমার যে সামর্থ তোমাকে দেখালাম, এই রূপ তোমার পূর্বে কেউ দেখেনি। আসলে তোমার আগেও কেউ দেখেনি, পরেও কেউ দেখবে না। কারণ ভগবানের যে এক একটি বিশেষ রূপ, এটা মন দেখে। সেইজন্য সঞ্জয় যেটা ধৃতরাষ্ট্রকে বর্ণনা করছেন, অর্জুন যেটা দেখেছেন, সঞ্জয় সেটাই দেখেছেন কিনা বলা মুশকিল। গীতার কথা ভগবানের কথা, এগুলোকে প্রশ্ন করতে নেই। *যন্মে তদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্,* এই যে আমার তেজোময় রূপ আজ তোমাকে দেখালাম, আমার এই রূপ এর আগে কেউ দেখেনি, কারণ তুমি আমার প্রিয়, তুমি আমার ভক্ত, তোমাকে আমি ভালবাসি তাই দেখালাম।

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর।।৪৮।।

(হে কুরুশ্রেষ্ঠ, মনুষ্যলোকে চতুর্বেদাধ্যয়ন বা যজ্ঞবিজ্ঞান দ্বারা বা দানের দ্বারা বা অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌত কর্মের দ্বারা বা চান্দ্রায়ণাদি কঠোর তপস্যা দ্বারাও আমার এই বিশ্বরূপ কেউ দেখতে পায়নি। একমাত্র তুমিই এই রূপ দর্শন করলে।)

বেদ ও যজ্ঞের অধ্যয়ন, এখানে বলছেন বেদ মানেই তো যজ্ঞ, তাহলে যজ্ঞের অধ্যয়ন কেন? যজ্ঞ একটা পুরো বিজ্ঞান। আমরা এর আগে বর্ণনা করেছি, বেদের চারটি বিভাগ, প্রথমটাকে বলা হয় সংহিতা, দ্বিতীয় হল ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ যজ্ঞের বিজ্ঞানকে যিনি জানেন। বলছেন, বেদ, যজ্ঞের অধ্যয়ন, প্রচুর দান করছেন, এগুলোর কোনটা দিয়েই আমার এই রূপ দেখা যায় না। তারপর নানা রকমের যে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া আছে, এই ক্রিয়া দিয়ে আমার এই রূপ দর্শন হয় না। *তপোভিরুগ্রৈঃ,* উগ্র তপস্যা, ভয়ঙ্কর তপস্যা করে যাচ্ছেন, চান্দ্রায়াণাদি ব্রত অনেকে করেন, এই উগ্র তপস্যা করলেও আমার এই রূপের দর্শন হয় না। তুমি ছাড়া এই মনুষ্য লোকে কেউ এই রূপের দর্শন পায়নি। ক্রিয়া দিয়ে দর্শন হয় না, তাহলে ক্রিয়া দিয়ে কি হয়? মনের শুদ্ধি হয়। মনের শুদ্ধি হলে ভগবান কৃপা করলে, তিনি অনুগ্রহ করলে তবে দর্শন হয়। আমরা যদি মনে করে থাকি এই জিনিসটা করলে হবে, তা কিন্তু হয় না।

একদিন একজন এসে আমাকে বলছেন, 'আমি প্রচুর জপ করি, আমার সহস্রারে একটু চাঞ্চল্য দেখা গেছে'। প্রথম দিন দেখা করতে এসেছেন, সেইজন্য একটু ভদ্র ভাবেই আমাকে বলতে হল। 'এগুলো কিছু না, মন একটু খেলা করে, এগুলোও মনের খেলা। কারণ আপনার সহস্রারে যদি একটু চাঞ্চল্য হয়, তাহলে তো আপনি অবতার হয়ে যাবেন'। মন্ত্র জপে এগুলো হয় না, মন্ত্র জপে মনটা একটু শান্ত হয়। তিনি কৃপা করলে বিশেষ কোন অনুভূতি লাভ হয়।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য।।৪৯।।

(আমার এই ভয়ঙ্কর বিশাল বিশ্বরূপ দেখে তুমি ব্যথিত ও বিমূঢ় হয়ে যেও না। ভয় ত্যাগ করে প্রসন্নচিত্তে আমার সেই চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর পূর্বরূপ দর্শন কর।)

ভগবান এখনও ঐ ভয়ঙ্কর রূপেই আছেন, সেইজন্য অর্জুনকে ভগবান বলছেন, আমার এই ঘোর রূপ দেখে ভয় পেও না। তোমার চিত্তে যে বিমূঢ় ভাব এসেছে, এই বিমূঢ় ভাবেও তুমি থেকো না। তুমি ভয় পেও না, শান্ত হও। আচ্ছা, এই দেখ আমার শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী শান্ত সৌম্য রূপ। আর ভয়ের কিছু নেই।

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা।।৫০।।

(সঞ্জয় বললেন –শ্রীভগবান্ অর্জুনকে এই কথা বলে বসুদেবগৃহে জাত স্বকীয় চতুর্ভুজ রূপ তাঁকে দেখালেন এবং পুনরায় সৌম্যমূর্তি ধারণ করে ভীত অর্জুনকে আশ্বস্ত করলেন।)

আচার্য বলছেন, *ইতি এবম্ অর্জুনং বাসুদেবঃ ভূতং বচনম্,* বসুদেবের কাছে তিনি যেভাবে নিজের স্বরূপ দেখিয়েছিলেন, সেই রূপেই আবার ভগবান অর্জুনকে বলছেন। ভাগবতের কাহিনী অনেক পুরনো, ভাগবতে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, কিভাবে তিনি নিজের রূপ দেখিয়েছিলেন। এখানেও তিনি সৌম্য মূর্তি রূপ ধারণ করে অর্জুনকে দেখালেন। এর আগে ভগবানের যে ভয়ঙ্কর রূপ ছিল, আগে আমরা যার বর্ণনা করেছি, সেই রূপকে সরিয়ে এবার তিনি শান্ত সৌম্য রূপে ফিরে এলেন। অর্জুনও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। অর্জুনও খুব খুশী হয়ে বলছেন –

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ।।৫১।।

(অর্জুন বললেন –হে জনার্দন, আপনার এই সৌম্য মানুষরূপ দেখে আমি প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ (সুস্থ) হলাম।)

হে জনার্দন, আমি আমার বন্ধুর সেই আগের মানুষের আকৃতি দেখে আর আমার বন্ধুর সৌম্য বদনে সেই চিরপরিচিত হাসি দেখে *সচেতাঃ,* আমার চিত্ত এখন প্রসন্ন হয়ে গেছে। *প্রকৃতিং গতঃ,* আমার বাস্তবিক স্থিতি আমি ফিরে পেলাম, আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। করোনার সময়কার কথা ভাবুন, তখন কেমন দিনকাল চলছিল, আমার অনেক পরিচিতদের খুব কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছিল, খুবই ভয়ঙ্কর। আমি তখন শুধু মনে মনে এই প্রার্থনা করতাম, হে ঠাকুর, তোমার এই ভয়ঙ্কর রূপটা এবার গুটিয়ে নাও। তোমার সেই মানব রূপ, সৌম্য রূপে ফিরে এসো, যাতে *ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ,* আমরা যেন তোমার কল্যাণময়ী শান্ত রূপ দর্শন করতে পারি আর আমাদের মন যে আগের মত আবার শান্ত অবস্থায় ফিরে আসে।

এই হল একাদশ অধ্যায়ের বিশ্বরূপের বর্ণনার উপসংহার। এরপর চারটি শ্লোক বাকি থেকে যাচ্ছে। এই অধ্যায়ের বাহান্ন নম্বর শ্লোক থেকে গীতার যে স্টাইল, আবার ফিলজফিতে ঢুকতে শুরু করলেন। বারো, তেরো ও চৌদ্দ অধ্যায়ে ভগবান বিভিন্ন রূপ ধরবেন, কিন্তু পুরো ফিলজফিতে ঢুকে যাবেন। এর আগেও বলা হয়েছিল, গীতা পুরো জিনিসটার মধ্যে একটা সুন্দর কাব্য রয়েছে। সেই কাব্যিক ভঙ্গিমায় ভগবান এবার অর্জুনকে বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ
সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।।৫২।।

(শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বললেন –তুমি আমার যে অতি দুর্লভদর্শন বিশ্বরূপ দেখলে দেবতারাও সদা এর দর্শনাকাঙ্ক্ষী।)

তুমি আমার যে রূপ দর্শন করলে, এই বিশ্বরূপ অত্যন্ত দুর্লভ, এই রূপ দেখা যায় না। দেবতারা সর্বদা আমার এই বিশ্বরূপ দর্শন করতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু দেবতারাও আমার এই রূপ পূর্ণাঙ্গ রূপে কোন দিন দেখেনি আর ভবিষ্যতেও কোন দিন দেখতে পারবে না। ভগবান অর্জুনকে বলেছিলেন, তোমাকে দিব্য চক্ষু দিলাম, দিব্য চক্ষু না দিলে এই রূপ দেখা যাবে না। আমাদের শাস্ত্রেও এমন কোন বিবরণ পাইনা যে দেবতারা এই রকম কিছু কখন দেখেছেন কিনা। কেন কেউ দেখতে পায়না, আবার সেই একই কথা বলছেন –

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা।।

(তুমি আমার যে রূপ দর্শন করলে এই বিশ্বরূপ বেদপাঠ, চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা, গো-সুবর্ণাদিদানে বা পূজার দ্বারা দর্শন করা যায় না।)

আগে যেটা বলা হয়েছিল, সেটারই ভগবান পুনরাবৃত্তি করছেন। *নাহং বেদৈঃ*, শুধু বেদ অধ্যয়ন করে মনে করবে তোমার জ্ঞান হয়ে যাবে, তা কখন হবে না। *ন তপসা, ন দানেন, ন চেজ্যয়া*, উগ্র তপস্যা করে, প্রচুর দান করে, প্রচুর যজ্ঞ বা পূজা করেও এই বিশ্বরূপের দর্শন হবে না। তাহলে কিভাবে হবে? চুয়ান্ন নম্বর শ্লোকে ভগবান বলছেন –

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ।।৫৪।।

(হে অর্জুন, কেবলমাত্র অনন্যা ভক্তি দ্বারাই ঈদৃশ আমাকে (শাস্ত্র দ্বারা) জানতে ও স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষ করতে এবং আমাতে প্রবেশরূপ মোক্ষলাভ করতে ভক্তগণ সমর্থ হয়, অন্য উপায়ে নয়।)

এখানে ভগবান পরিষ্কার করে বলছেন, ঈশ্বর লাভ কিভাবে হয়। এখান থেকেই ভগবান আবার দ্বাদশ অধ্যায়ে যেটা শুরু হতে যাচ্ছে, সেই ভক্তিযোগে ঢুকে যাচ্ছেন, এখানে ভক্তিযোগের ভূমিকাটা দিয়ে রাখলেন।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য, ভক্তি দিয়েই হয়। লোকেরা যখন বলে শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদী, তখন তারা অদ্বৈবাদ বোঝেও কিনা আমার সন্দেহ হয়। কয়েকদিন আগে একটা বড় সংস্থা থেকে আমাকে একটা আলোচনায় অংশ নিতে অনুরোধ জানিয়ে বললেন, শঙ্করাচার্যের জন্মজয়ন্তী আসছে, এই পাঁচটা টপিক আছে, যদি এর একটার উপর আপনি দু ঘন্টার মত আলোচনা করেন, সঙ্গে প্রশ্নোত্তর থাকবে। আমি টপিকগুলো দেখে উত্তর দিলাম, আমি এই টপিকগুলোর নামই কোন দিন শুনিনি। আচার্য শঙ্কর হলেন আত্মজ্ঞনে প্রতিষ্ঠিত, তাঁর কাছে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, এছাড়া তিনি কিছু বলছেন না। আর তাঁর পরম্পরার শিষ্যরা লড়াই করার জন্য পুরো অদ্বৈতকে কোথায় নিয়ে চলে গেলেন! কি সব কি সব শব্দ বার করেছেন, আচার্য শঙ্কর কোন দিন ঐ শব্দের কল্পনাও করেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের একমাত্র কথা, ঈশ্বরই সত্য। ঠাকুর চলে যাওয়র পর এখন আমরা সবে মাত্র একশ বছর পেরিয়েছি, পাঁচশ বছর হতে দিন, এমন এমন সব শব্দ আসতে শুরু হবে, কেউ কিছু বুঝতেও পারবে না। ইতিমধ্যে কিছু কিছু শব্দ আসতে শুরু হয়ে গেছে। যেমন একটা শব্দ খুব ঘুরছে, বিজ্ঞান বেদান্ত।

বিচিত্র বিচিত্র সব শব্দ আসতে শুরু হবে। কারণ আমাদের মন complicated কিনা, সব কিছুকে complicate করে দিয়ে simplify করতে নেমে যাবে।

আমরা এখানে যেটা বলতে চাইছি, লোকেরা বলে অদ্বৈতে নাকি ভক্তি নেই। আচার্য শঙ্কর গীতাকে সামনে রেখে বলছেন, ঈশ্বরদর্শন ভক্তি দিয়ে হয়। অদ্বৈত সব কিছুকে নিয়ে চলে, অদ্বৈত ভক্তিকেও নেয়, জ্ঞানকেও নেয়, কর্মকেও নেয়। অন্যরা নেয় না, বিশিষ্টদ্বৈতবাদীরা নেয় না, দ্বৈতবাদীরা নেয় না। কিন্তু অদ্বৈতবাদী পুরোটা নেয়। বেদান্ত মানে অদ্বৈত। কাকে বোঝাবেন এই কথা? পণ্ডিতদের? জিনিসটাকে complicate করে তাঁদের পেট চলছে।

ভক্ত্যা তুনন্যয়া, অনন্য ভক্তি দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। এটাই ভগবানের কথা, আচার্য শঙ্কর তার ব্যাখ্যা করছেন। বেদান্তের পরম্পরাতে এই একই কথা বলা হচ্ছে। ভক্তি কি রকম হয়? ঠাকুর যেমন বলছেন, মাইরি বলছি, ঈশ্বর বই আমি কিচ্ছু জানি না, এটাকেই বলে অনন্য ভক্তি। আচার্যও এখানে একই কথা বলছেন, *অনন্যয়া অপৃথগ্‌ভূতয়া ভগবতঃ অন্যত্র পৃথগ্ ন কদাচিদ্ অপি যা ভবতি সা তু অনন্যয়া ভক্তিঃ*, ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কিছুতে যাঁর ভক্তি নেই, এটাই অনন্যা ভক্তি। এই অনন্যা ভক্তি যাঁর, তাঁর শুদ্ধ পবিত্র মনের গভীরে ঈশ্বর ছাড়া কেউ নেই। বাকি সব কথা মুখের কথা, কেন তাকেও তো খেতে হবে, শুতে হবে ইত্যাদি। ঠিক আছে, ঐ পর্যন্তই, এটাকে বেশি ভিতরে যেতে দিতে নেই।

আচার্য বলছেন, সমস্ত ইন্দ্রিয় যখন এক পরমাত্মা বাসুদেবে জড়িয়ে আছে, এর বাদে ইন্দ্রিয় আর কিছু ধরে না। তখন জানতে পারে, এই যে পরমেশ্বর, এনাকে কিভাবে জানা যাবে? *জ্ঞাতুং*, শাস্ত্র অধ্যয়ন করে ধারণা করা যায়, তত্ত্বের দিক থেকে তাঁকে সাক্ষাৎ করা যায় আর পাওয়া যায়; পাওয়া যায় মানে মুক্তি পাওয়া যায়। ভগবানে যখন অনন্যা ভক্তি করা হয়, তখন শাস্ত্রে যাঁর কথা বলা হয়েছে তাঁকে জানতে পারেন। তার সাথে আচার্য বলছেন, শাস্ত্রে যে কথাগুলি বলা হয়েছে, সেখানে যদি ভক্তি লাগানো হয়, তাতে শুধু যে একটা তত্ত্ব জ্ঞান হবে, তা না, পরিষ্কার তাঁকে জানতে পারবেন। বলতে চাইছেন, শাস্ত্রের প্রতি যদি কারুর ভক্তি থাকে, শাস্ত্র শুধু পড়ে গেলে হয় না, শাস্ত্রে ভক্তি থাকলে শাস্ত্র কৃপা করে ঐ জ্ঞান দিয়ে দেবেন। অনন্য ভক্তি থাকলে ঈশ্বরকে তত্ত্ব রূপে জানা যাবে, অনন্য ভক্তি থাকলে মুক্তি পেয়ে যাবেন। আচার্য শঙ্কর সরাসরি স্পষ্ট করে বলছেন, অনন্য ভক্তি দিয়ে মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু অদ্বৈত অদ্বৈত করে, মায়া, বিজ্ঞান বেদান্ত এনে সহজ জিনিসটাকে জটিল করে দিচ্ছে।

একাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোককে আচার্য বলছেন, এটা গীতার সার। গীতার সার, সেইজন্য এই পঞ্চান্ন নম্বর শ্লোক আমাদের সবারই উচিৎ মুখস্ত করে নেওয়া।

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।।৫৫।।

(হে পাণ্ডব, যে ব্যক্তি মৎকর্মকারী, মন্নিষ্ঠ, মদ্ভক্ত ও আত্মীয়স্বজনাদিতে আসক্তিশূন্য এবং সর্বভূতে, এমন কি অত্যন্ত অপকারীর প্রতিও বৈরভাববিহীন, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন।)

আমাকে পাওয়ার কি উপায়? *মৎকর্মকৃৎ*, সমস্ত কর্ম আমার জন্যই করবে, তুমি রান্না করছ, আমার জন্যই রান্না করবে; তুমি অফিসে কাজ করছ, সেখানেও তুমি মনে করবে আমার জন্য কাজ করছ। আচার্য এখানে খুব সুন্দর বলছেন, *মৎপরমঃ করোতি ভৃত্যঃ স্বামিকর্ম ন তু আত্মনঃ পরমা প্রেত্য গন্তব্য গতিঃ ইতি স্বামিনং প্রতিপদ্যতে*, একজন সেবক তার স্বামীর জন্য কাজ করছে বা ধরা যাক আপনি সরকারের জন্য বা রেলওয়েজের জন্য কাজ করছেন, মৃত্যুর পরে আপনার গতি

সরকারে হবে না বা রেলওয়েতে হবে না। কিন্তু ঈশ্বরের জন্য যদি কাজ করা হয়, তাহলে মৃত্যুর পরেও ওখানেই থাকবেন। আমার একজন খুব খিটখিটে বন্ধু আছে। ওনারও সবার মত করোনা নিয়ে খুব টেনশান ছিল, যা হয় আর কি। আমি বন্ধুকে বললাম, 'একবার ভেবে দেখুন তো, আমি আপনি দুজনেই যদি করোনাতে মারা যাই, স্বর্গলোকে দুজনের দেখা হবে, সেখানে গিয়ে আপনি আর খিটখিট করতে পারবেন না। কারণ স্বর্গলোকের সংজ্ঞায় সেখানে খিটখিট করা যাবে না। একবার ভাবুন তো, স্বর্গলোকে আপনার খিটখিট করতে ইচ্ছে করলে আপনার মনের কি অবস্থা হবে যে, এখানে আমি খিটখিট করতে পারছি না? কারণ ওখানে এই জিনিসগুলো আমাদের চলবে না'। তাহলে এখানেই বা করছি কেন? যে কাজটা করছি, সরকারী চাকরিতে আছি, প্রাইভেট কোম্পানির কাজে আছে, যেখানেই যে কাজই করে থাকি না কেন, সেটাকেও মনে করুন এই কাজ আমি ঈশ্বরের জন্য করছি, এটা ঈশ্বরেরই কাজ, এটাই আমার পূজা। করে দেখতে তো কোন ক্ষতি নেই, সবাই আমরা এভাবে কাজ করে দেখতে পারি। আগে থেকেই না বলে একটু চেষ্টা তো আমরা করতে পারি। আপনি স্কুলের শিক্ষক, ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছেন, মনে করুন আমি ঠাকুরের কাজ করছি, বালরূপী গদাধরদের আমি পড়াচ্ছি।

যে আমার অনন্য ভক্ত, সে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে গুটিয়ে আমার মধ্যে নিয়ে চলে এসেছে। সব রকম ভাবে, সব কিছু দিয়ে পুরো উৎসাহে সে আমারই ভজনা করে। *সঙ্গবর্জিতঃ*, আমার ভক্ত পুরো অনাসক্ত। কি রকম *সঙ্গবর্জিতঃ*, আচার্য বলছেন, *ধনপুত্রমিত্রকলত্রবন্ধুবর্গেষু সঙ্গবর্জিতঃ সঙ্গঃ প্রীতিঃ স্নেহঃ তদ্বর্জিতঃ*, টাকা-পয়সা, সন্তান, বন্ধু, স্ত্রী আর বন্ধুবর্গ এই সমস্ত কিছু থেকে সে স্নেহবর্জিত। আমি আমার পরিচিতদের বলি, একটু distance maintain করুন। আমরা বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা, আমরা সবাই ঠাকুরের ভাবে এক সঙ্গে পরস্পরের সাথে জুড়ে আছি। সংসারীদের যেমন সংসারে ধনপুত্রমিত্রকলত্রবন্ধুবর্গ সব রয়েছে, আমাদের এখানে সবাই সন্ন্যাসী, এনারাই আমাদের সুখের সাথী, এনারাই আমাদের দুঃখের সাথী, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে এনারাই আছেন। তারপরেও আমাদের একটা distance আছে, আমরা জানি আমরা সবাই একই পথে যাচ্ছি, সবাই আমরা সহযাত্রী। গৃহস্থদেরও এটাই মনে করতে হয় – fellow travelers। আমরা সবাই যেন একই ট্রেনে একই গন্তব্যে যাচ্ছি, এর বেশি কিছু না। কিন্তু আমরা তা না করে সবেতে ঝাঁপিয়ে পড়ি, আর চাইছি সেও যেন আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সমস্ত দুঃখের উৎস তো এখানেই, একটু distance না হলে হবে না।

আমি, আমার জীবন, আমার অস্তিত্ব যেন ছোট্ট একটা বিন্দু, ঐ বিন্দুকে কেন্দ্র করে আমরা একটা বৃত্ত তৈরী করে নিই, বৃত্তের যে ব্যাসার্ধ, ধনপুত্রমিত্রকলত্রবন্ধুবর্গ সবাইকে বৃত্তের ঐ রেডিয়াসের বাইরে রাখতে হবে, ভিতরে কাউকে আসতে দিতে নেই। এই রেডিয়াস যত দূরে থাকবে, জীবনে তত শান্তি আসবে, যত কাছে আসবে তত অশান্তি। রিভলবারের গুলি কাছ থেকে মারলে বেশি জোরে লাগবে, বাঁচার সম্ভবনা ক্ষীণ। আপনজনদের থেকে যখন কষ্ট হবে, কষ্ট যে কোন কারণেই হোক, ভালবাসাতেই হোক বা বিচ্ছেদেই হোক, কষ্ট অনেক বেশি হবে, একটু দূরে রাখতে হয়। দূরে রাখলে আনন্দটাও বেশি পাওয়া যায়, চলে গেলে কষ্টটাও কম হয়।

আমাদের কয়েকজন মহারাজ একসাথে মিলে গঙ্গোত্রীর ঐদিকে তীর্থে গিয়েছিলেন। সবাই একটা ঘরেই থাকতেন। সন্ধ্যেবেলা সবাই আনন্দে গল্পগুজব করছেন, খুব হাহা হিহি করে যাচ্ছেন। ওইদিককার একজন খুব বড় সাধু একদিন ওখানে ঢুকে পড়লেন, এসে বলছেন, 'একটু দেখতে এলাম, শুনেছি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি খুব ভালবাসা, বন্ধুত্ব। আমাদের আশ্রমে চারজন সাধু আছেন, এক অপরের সাথে কথা বলেন না। আর আপনারা দিনরাত এক সঙ্গে থাকেন, শুধু এই ভালবাসাটা দেখতে এলাম'। কেন এই ভালবাসা? একটাই কারণ, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা সব সময় একটা Distance বজায় রেখে চলেন।

তার সাথে বলছেন *নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু*, জগতে সমস্ত প্রাণীর প্রতি বৈরভাব বিহীন হতে হবে, এমন কি অত্যন্ত অনিষ্টকারীর প্রতিও বৈরভাব থাকবে না। কারুর প্রতি শত্রুর ভাব রাখতে নেই। আচার্য *নির্বৈরঃ* শব্দের সংজ্ঞা দিচ্ছেন, *আত্মনঃ অত্যন্তাপকারপ্রবৃত্তেষু অপি*, যে আপনার অত্যন্ত ক্ষতি করে যাচ্ছে, তার প্রতিও আপনার বৈরী ভাব থাকবে না। *য ঈদৃশো মদ্ভক্তঃ*, এই ধরনের যে ভক্ত, সে আমাকে পাবেই পাবে।

মূল কথা হল, ভক্ত যে কর্ম করছে, ভক্ত যে কথা বলছে, ভক্ত যে চিন্তন নিয়ে আছে, সব কিছু আমাকে নিয়েই। এই রকম যারা হন তারাই আমাকে পায়, এর বাইরে আর কেউ আমাকে পায় না। যে কাজ ঈশ্বরের জন্য করা হয় না, সেটা কাজের মধ্যে গণ্য নয়। এখানেই গীতার একটি খুব সুন্দর অধ্যায় একাদশ অধ্যায় শেষ হল। এরপর আমরা গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রবেশ করব, এট একটি নামকরা অধ্যায়; যেখানে আমরা ভক্তিযোগ নিয়ে আলোচনা করব।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

দ্বাদশ অধ্যায়
ভক্তিযোগ

গীতার দ্বাদশ অধ্যায় একটি খুব নামকরা অধ্যায়। কুড়িটি শ্লোক নিয়ে একটি ছোট্ট অধ্যায়, আপনারা সবাই এটাকে মুখস্ত করে নেবেন এবং স্নান করার পর রোজ এই অধ্যায়ের কুড়িটি শ্লোক আবৃত্তি করবেন। বলা হয়, গীতার দ্বাদশ অধ্যায় আর পঞ্চোদশ অধ্যায় অবশ্যই সবাইকে মুখস্ত করতে হয়। উত্তরাখণ্ড, হরিদ্বার, হৃষিকেশের মত জায়গায় খাওয়ার আগে সাধুরা নিজেকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য যে, আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ যেন আধ্যাত্মিক হয়, সেইজন্য পুরো পঞ্চোদশ অধ্যায় পাঠ করেন। আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনে কোন সাধুর ভাণ্ডারা যখন হয়, সেখানেও তখন ঠিক খাওয়ার আগে পুরো পঞ্চোদশ অধ্যায় পাঠ করা হয়, তারপরে ব্রহ্মার্পণং মন্ত্র পাঠ করে সবাই খাওয়া শুরু করেন। এগুলো নিয়মিত করলে ঈশ্বরীয় ভাবটা পুষ্ট হয় এবং ভিতরে এই ভাব সক্রিয় থাকে। আজকে ভারতের কি দুরবস্থা, না আছি আমরা ধর্মে, না আছি ভোগে; ত্রিশঙ্কুর মত আজ ভারতের অবস্থা, কেউ বুঝতে পারছে না কি করবে। সেইজন্য আজ আমাদের এত কষ্ট। পুরো ভোগে থাকলেও কষ্ট হয় না, পুরো ধর্মে থাকলেও কষ্ট হয় না। যারা মাঝামাঝারিতে থাকে তাদেরই প্রাণ যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ। ভক্তি শব্দ এসেছে 'ভঞ্জ' ধাতু থেকে, যার অর্থ ভজনা করা। ভক্তির কথা উঠলেই আমাদের ঠাকুরের কথা মনে পড়ে, ঠাকুর বলতেন, কলিতে নারদীয়া ভক্তি। যাঁরা অনেক দিন আমাদের এই ক্লাশগুলো শুনছেন আশা করতে পারি তাঁদের ভক্তি জিনিসটা কি, ভক্তি কোথা থেকে, কিভাবে এলো, এগুলোর ব্যাপারে মোটামুটি একটা ভাল ধারণা হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও ভক্তির উপর দু-চারটে কথা বলে আমরা এই অধ্যায়ের মূল শ্লোকে ঢুকে যাব।

ভক্তি জিনিসটা যখনই আমাদের মনে ভেসে ওঠে তখনই আমাদের মাথায় আসে ভক্তি যেন কোথাও বিশ্বাসকে নিয়ে চলে। যার জন্য প্রায়ই আমরা এই কথা শুনতে পাই, science runs on rationality, religion runs on faith, বলতে চাইছেন ধর্ম বিশ্বাসে চলে। সম্পূর্ণ ভুল ধারণা; ধর্ম বিশ্বাসে চলে না, ধর্ম পুরো যুক্তিতে চলে। রাজযোগ পড়লে বোঝা যায়, ধর্মের সব কিছু কিভাবে একেবারে যুক্তিতে বাঁধা। এটা ঠিক যে, একটা স্তরে গিয়ে ওনারা বলবেন, এরপর আর যুক্তি চলবে না। সেটা হতেই পারে। সাধারণ মানুষের কাছে যদি ভক্তির কথা বলা হয়, প্রথমেই তাদের মনে কতকগুলি জিনিস স্বাভাবিক ভাবে ভেসে উঠবে – নানান রকমের যে আচার, উপাচার, তোমাকে এই করতে হবে, সেই করতে হবে, বিরাট করে দূর্গাপূজা করতে হবে, কালীপূজা করতে হবে; তার থেকেও বেশি হল কোথাও যেন একটা ভয় ধরিয়ে দেওয়ার ব্যাপার আসে, এই রকমটি যদি না করি ঈশ্বর আমার উপর রুষ্ট হয়ে যাবেন, অসন্তুষ্ট হবেন; অন্য দিকে লোভ –চাকরি পেতে হবে, পরীক্ষায় পাশ করতে হবে, অসুখ ভাল করতে হবে, এই জিনিসগুলো ভক্তির সাথে ঘুরপাক খেতে থাকে।

এর মূল হল, লোভ আর ভয়। ফ্রয়েড সব কিছুকে লিবিডো আর মর্টিডোতে নিয়ে এলেন, লিভিডো হল ভালবাসার প্রবণতা আর মর্টিডো মানে অপরকে মারার প্রবণতা। উনি ধর্মকেও সেখানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। ফ্রয়েড হিংসার ভাব এই ধরণের জিনিসগুলোকে নিয়ে বেশি বলতেন। কিন্তু যেখানে ভয়ের ব্যাপার, যেখানে লোভের ব্যাপার সেখানেই ভক্তি। ফলে সেখানে আচার, বিধি, উৎসব এগুলো বেশি মাত্রায় চলে আসে। ভক্তি কিন্তু আদপে সেটা নয়।

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান আর্ত, জিজ্ঞাসু আর অর্থার্থীর কথা বললেন। আর্ত আর ভীত, দুটোতে তফাৎ আছে। আর্ত হল, সব কিছুই করা হয়ে গেছে, এরপর আর কোন পথ নেই। কারুর অসুখ হয়েছে, বাড়িতে হাতের কাছে যা যা ওষুধ আছে দেওয়া হল, তাতে অসুখ ঠিক হল না। এবার ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানের কাছে যাওয়া হল, তাতেও হল না, একেজন স্পেশালিস্টের কাছে গেল, সেখান থেকে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে দেওয়া হল। কোন কিছুই যখন কাজে এলো না, তখন অসহায় হয়ে মানুষ ঠাকুরের কাছে যায়, ঠাকুর আমাদের আর তো কিছু করার নেই, তুমি এবার দেখো। কিন্তু যখন বলছি, পরীক্ষায় পাশ করতে হবে, চাকরি পেতে হবে, তখন এটা আর্তের অবস্থা না। ঠাকুরের ভাষায় এগুলো হল বেণে বুদ্ধি, আমি এটা চাই, বদলে আমি এই সন্দেশটা দিলাম, আমিও তোমাকে দিলাম, তুমিও আমাকে দাও।

সত্যিকারের যে ভক্তি, যেটা আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করব, নারদীয় ভক্তিসূত্রে যেটা আলোচনা করা হয়েছে, শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রে যে ভক্তির আলোচনা করা হয়েছে, শ্রীমদ্ভাগবতে যে ভক্তির আলোচনা করা হয়েছে, বিভিন্ন পুরাণে যে ভক্তির কথা বলা হয়েছে – এটা পুরো অন্য জিনিস। লোভ আর ভয় থেকে যে ভক্তির কথা আগে বলা হল, আর এখন যে আসল ভক্তির কথা বলা হবে, এই দুটোর তফাৎ যদি খুব সহজ করে বলা হয়, তাহলে এভাবে বললে জিনিসটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। যারা টিভি সিরিয়াল দেখে, তাদের সিরিয়াল দেখাতে তেমন চাড় নেই, কিন্তু সময় কাটাতে হবে। কিন্তু নিয়মিত এই ক্লাশগুলো যখন শুনছেন, তখন বুঝতে হবে কোথাও শাস্ত্রের প্রতি একটা ভালবাসা জন্ম নিয়েছে। আগে যখন আমাদের ইউনিভার্সিটিতে নিয়মিত ক্লাশ হত, তখন কোথা কোথা থেকে সবাই ক্লাশে এসে ভর্তি হতেন, যাঁদের মধ্যে অনেক গৃহবধূরা থাকতেন, মায়েরা থাকতেন, আমি অবাক হয়ে যেতাম। হয়ত তাঁর গঙ্গার পারেই বাড়ি, কিন্তু সেই সময় হয়ত লঞ্চ নেই, তাঁকে এক ঘন্টা আগেই চলে আসতে হত। বাড়ির লোকেদের খাইয়ে, নিজে খেয়ে, সব কাজকর্ম সেরে দৌড়ে দৌড়ে এক ঘন্টা আগে এসে এখানে চুপচাপ বসে আছেন, না হলে ক্লাশ মিস হয়ে যাবে। শাস্ত্রের প্রতি, সেই বিষয়ের প্রতি কতটা ভালবাসার উদয় হলে এই ভাবে দিনের পর দিন, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব উপেক্ষা করে এখানে এসে বসে থাকা যায়। যখন ক্লাশ চলত কলকাতার এই গরমে পঞ্চাশ থেকে ষাট জন এসে বসে থাকতেন।

এই রকম ভালবাসা যখন ঈশ্বরের প্রতি যায়, সেখানে কোন লাভের আশা নেই, আমি তোমাকে ভালবাসি। ভালবাসা জিনিসটা কি? নারদ খুব সুন্দর পরিভাষিত করছেন, *সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ*, ভক্তিতে, ভালোবাসাতে সমস্ত কামনা বাসনার নিরোধ হয়। যেখানে ঠিক ঠিক ভালবাসা, সেখানে কোন কামনা থাকে না। তিন মাস, চার মাস, ছ-মাসের বাচ্চাকে শুধু মা না, যে কোন মহিলা কত আদর করে, স্নেহ করে। কেন? একটা পবিত্র আনন্দের আস্বাদন করে। ঈশ্বরের প্রতি যখন ঠিক ঠিক এই ভাবটা আসে, ঠিক একই রকম ভাব, তখন ওটাকে বলে ভক্তি। এই ভক্তির কি কি লক্ষণ, কিভাবে ভক্তি হয়, এই জিনিসগুলিকে নিয়ে ভক্তিশাস্ত্র বিস্তারে আলোচনা করে।

হিন্দু ধর্মে যাবতীয় যা কিছু আছে, সব বেদ থেকে এসেছে। বেদে যদি না থাকে, হিন্দুরা ওটা মানবে না। কোন না কোন ভাবে ওটাকে বেদ থেকে নিয়ে আসতে হবে। বেদে স্তুতির ভাবটা বেশি দেখা যায়। যেমন বেদের প্রথম যে সূক্ত অগ্নিসূক্তম্, সেখানে ব্রাহ্মণ অগ্নির স্তুতি করছেন। বেদে ব্রাহ্মণ বা ঋষি যখন স্তুতি করছেন, একটা কিছু চাইছেন, ভয় থেকে মুক্তি পেতে চাইছেন, কষ্ট থেকে মুক্তি চাইছেন, সেখানে একটা কথা বার বার জুড়ে দিচ্ছেন –আমি যে এতদিন তোমাকে ভালবেসে এসেছি। অগ্নিসূক্তমের শেষের দিকে ব্রাহ্মণ কি সুন্দর করে, কত নরম করে বলছেন, আমি রোজ সকাল সন্ধ্যা তোমার উপাসনা করে এসেছি। ঈশোপনিষদেও ঠিক এই ভাব আমরা পাই, *সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে*। আমরা যখন ভগবানের কিছু চাইছি, মিষ্টি, ফুল, ফল নিয়ে ভগবানকে দিলাম,

ভাবছি ভগবান আমার প্রার্থনা শুনবেন। এখানে তা না, সারা জীবন আমি তোমাকেই ভালবেসে এসেছি। আজকে আমার দরকার পড়েছে, সাধারণ কোন দরকার না, এই দরকার খুব উচ্চমানের, এটা তোমার কাছেই চাইব।

বলা হয়, ভারতে নাকি তিন রকমের ইকনমি চলে – white money, black money and wives money। যে টাকা ব্যাঙ্কে আছে, হিসাবের মধ্যে আছে, এটা হল হোয়াইট মানি, ব্ল্যাক মানি, হিসাব বহির্ভূত টাকা। আরও একটা হয় ওয়াইভস মানি, আজকাল বেশির ভাগ মহিলারা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে কাজ করেন, তাদের নিজস্ব এ্যাকাউন্ট আছে সেখানে তাদের অর্জিত টাকা জমা থাকে, কিন্তু তাও ওনারা কিছু টাকা আলাদা করে রাখেন যার খবর স্বামীকেও জানতে দেয় না। এমনকি গৃহবধূরা স্বামীকে না জানিয়ে অনেক সময় টাকা নিয়ে নেন। আমি একজন মহিলাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনি যে স্বামীকে না জানিয়ে টাকা নেন, তাতে উনি বিরক্ত হন না'? মহিলাটি বলছেন, 'ওর আমি চিরসঙ্গিনী, আমার তো অধিকার আছে না জানিয়ে ঐ টাকা নিয়ে নেওয়ার'। কথাটা আমার খুব মিষ্টি লেগেছিল। এই হল অধিকার বোধ, না জানিয়ে নিচ্ছে। স্বামীরা জানেও না স্ত্রীর কাছে কত টাকা আছে, কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। এটা দিয়ে একটা পুরো ইকনমি চলে, বিশেষ করে আগে যখন ব্যাঙ্ক আদি ছিল না, তখন এটাই একটা ইকনমি ছিল। মহিলারা লুকিয়ে চুরিয়ে ওটা চালাত। এই ভালবাসা, যেখান থেকে আসে অধিকার বোধ। ঋষিও বলছেন, সারা জীবন তোমাকে ভালবেসে এসেছি, আমার এখন এটা দরকার পড়েছে। কিংবা, আমার শেষ সময় এসে গেছে, আমি তোমাকে দেখতে চাই।

কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায়, বেদে দুই প্রকার স্তব বা দুই প্রকার বর্ণনা পাওয়া যায়। এটাকে আমরা যদি খুব সহজে শ্রেনীবদ্ধ করি, তাহলে এভাবে করা যেতে পারে – একটা হল নাসদীয় সূক্ত, আরেকটা পুরুষসূক্তম্। নাসদীয় সূক্তে আমরা একটা নির্গুণ নিরাকারের ছবি পাই। তবে এভাবে সরাসরি নির্গুণ নিরাকার বলেন না, নিররাকারের ভাবটা উপনিষদে বেশি এসেছে। আর দ্বিতীয় পুরুষসূক্তম্, যেখানে তাঁকে পুরুষ রূপে দেখছেন এবং বর্ণনা করছেন। এটাকে আমরা একটু সহজীকরণ করে বলতে পারি। যেমন একদিকে বেদে ইন্দ্রাদি দেবতারা রয়েছেন, আবার অন্য দিকে কেমন একটা নির্গুণ নিরাকার ভাব বেদেই এসে গিয়েছিল। এখান থেকেই পরে বেদের দুটো পরম্পরা দাঁড়িয়ে যায়। একটি পরম্পরা উপনিষদের ভাবকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন, যেখানে কেবল নির্গুণ নিরাকারের সাধনার কথা বলা হচ্ছে –যেমন কেনোপনিষদ, কঠোপনিষদ, মুণ্ডকোপনিষদ, আবার মাণ্ডুক্যকারিকা তো আরও এগিয়ে এমন জায়গায় নিয়ে চলে যান যে, যেখানে তাঁরা দেখান সৃষ্টি বলে আদৌ কিছু হয়নি। দ্বিতীয় পরম্পরা পুরাণকে নিয়ে চলে আসছেন। পুরাণেরও সব কিছু বেদ থেকেই আসছে, যেখানে উপনিষদের তত্ত্ব রয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে রয়েছে ভক্তির ভাব, যেখানে সগুণ সাকারের উপাসনার কথা বলছেন। হিন্দুদের এত শাস্ত্র যে, সব এক জায়গায় করলে মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করে দেবে।

গীতা এই দুটো পরম্পরাকে এক প্ল্যাটফরমে নিয়ে এলেন। এরও যদি সহজীকরণ করতে হয় তাহলে বলা যায় –একটা হল জ্ঞানমার্গ, আরেকটা যেন ভক্তিমার্গ। পুরাণকে ভক্তিশাস্ত্র বলা হলেও, পুরাণ কিন্তু পুরোপুরি ভক্তিমার্গ নয়, সেখানেও জ্ঞানমার্গের প্রচুর আলোচনা রয়েছে। অন্য দিকে উপনিষদেও ভক্তির কথা আছে, উপাসনাদির কথা আছে, ছান্দোগ্য উপনিষদে তো রীতিমত প্রতীক উপাসনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বেশি কোনটা আছে, সেটা দেখে বলা হয়, একটাতে ভক্তিমার্গের কথা বলছেন, আর-একটাতে জ্ঞানমার্গের কথা বলা হয়। কিন্তু গীতা খুব সুন্দর ভাবে এই দুটোকেই এক জায়গায় নিয়ে আসছেন। সেইজন্যই গীতাকে বলা হয় সমন্বয় শাস্ত্র, সব রকম দর্শন, মার্গকে সমন্বয় করে দিচ্ছেন।

ভক্তি জিনিসটাকে খুব সহজে যদি বুঝতে হয় তাহলে রাজযোগের সাহায্য নিতে হবে। যোগশাস্ত্র পুরুষ আর প্রকৃতির বর্ণনা করছেন, পুরুষ হলেন সচ্চিদানন্দ, আর প্রকৃতি আমাদের কাছে মন রূপে রয়েছেন। সেই সচ্চিদানন্দ যখন মনের উপর প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন, তখন এই জগৎ আমাদের সামনে প্রতিভাসিত হয়। সেখানে যেন অনেকগুলো আয়না লাগানো আছে, ফলে এই যে প্রতিবিম্ব দেখছি, এই প্রতিবিম্বও কোটি কোটি, শত কোটি, সহস্র কোটি –এটাই জগৎ। কিন্তু কোন ভাবে পুরো জিনিসটাকে যদি আমরা এক করে দিই, তখন ঐ শত সহস্র কোটি খণ্ডিত আয়না, সেটা হয়ে গেল এক। এবার যে ছবিটা দেখাবে, এটাকেই বলে সগুণ সাকার। কারণ আমি সেই ছবি দেখছি, সেই যে সচ্চিদানন্দ, তাঁর ছবি। খুব উচ্চমানের যদি হন, তাহলে তিনি নিজেরই ছবি সেখানে দেখবেন। এই ভাবটাকে স্বামীজী দেববাণীতে খুব সুন্দর ভাবে নিয়ে এসেছেন, এটাই সত্য। কিন্তু সেগুলো আমাদের ব্যাপার না, কারণ আমরা যখন সেই সচ্চিদানন্দকে দেখছি, সচ্চিদানন্দ যেন চৈতন্যের মহাসমুদ্র, আর এখানে চৈতন্যের একটা দূরবীন দিয়ে সেই চৈতন্যের মহাসমুদ্রকে দেখছে, চৈতন্যকে দেখছে একটা যেন ফোঁটা।

কিন্তু চৈতন্যের ফোঁটাও যা, চৈতন্যের মহাসমুদ্রও তাই, দেখছে দূরবীন দিয়ে কিংবা একটা কাঁচের মাধ্যমে। সেই টুকরো টুকরো কাঁচ জগৎ রূপে দেখাচ্ছিল, এখন একটি কাঁচ, একটি কাঁচের মাধ্যমে এবার ঈশ্বর রূপে দেখাবে। এই যে ঈশ্বর রূপে দেখাচ্ছে, এবার তাঁর প্রতি ভালবাসা জন্মাবে, উপাসনা করতে ইচ্ছে করবে, ভক্তি ভাব জেগে উঠবে। এরপর ঐ কাঁচটাকেও যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু ঐ কাঁচটা সরবে না, কাঁচটা সরাবার একটাই পথ, এই ক্ষুদ্র যখন বৃহতের সঙ্গে মিশে যাবে। যতক্ষণ এই ক্ষুদ্র বৃহতের সাথে না মিশছে, যেমনি একটা ফোঁটা আলাদা করা হল, দূরবীন নিজে থেকেই এসে গেল। ফোঁটা যখন মহাসমুদ্রে ডুবে আছে, তখন ফোঁটা, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, এই প্রশ্নগুলো আর হয় না। এটাকে বোঝা খুব মুশকিল, বিশেষ যাঁরা প্রথম শুনছেন তাঁদের পক্ষে ধারণা করা খুব মুশকিল। যাঁরা অনেক দিন ধরে শুনছেন তাঁদেরও ধারণা করা খুব কঠিন। কারণ, আমরা যখনই বৃহতের কল্পনা করি তখন একটা সমুদ্রের কথা ভাবি, সেই সমুদ্র থেকে একটা ফোঁটা তুলে নেওয়া হয়েছে, এটা ভেবে নেওয়া খুব সহজ। কিন্তু চৈতন্য এভাবে হয় না। চৈতন্য হলেন অনন্ত, তাঁর ফোঁটা বলে কিছু হয় না, এটা আমাদের কল্পিত। আমরা যেটাকে কণা বা একটা ফোঁটা বলছি, সেটাই বৃহৎ; যেটা বৃহৎ সেটাই কণা।

বেদে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে একটা স্তুতি আছে, সেখানে বলছেন, সমস্ত কিছুতে তোমারই ছবি বা তোমারই মধ্যে সব কিছুর ছবি। তুমি এই কোটি কোটি হয়েছ বা এই কোটি কোটি সব তোমারই ভিতর রয়েছে। এগুলো থিয়োরেটিক্যাল কিছু না, কিন্তু লোকেদের বোঝান খুব মুশকিল। এগুলো একটা শ্রদ্ধা, এগুলো একটা বিশ্বাসের ব্যাপার, একেবারেই না; এগুলোই বাস্তব। ঠাকুর যদি না আসতেন, আমাদেরও মনে হত আহা কি সুন্দর কথা, কি সুন্দর কবিতা। আমরা মনে করতাম, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আর গীতার কবিতা প্রায় এক, তাহলে রবীন্দ্রনাথ কত শ্রেষ্ঠ কবি! ঠাকুর এসে দুটোর গুণগত পার্থক্যটা দেখিয়ে দিলেন। গীতার সাথে কোন কিছুর তুলনাই হয়, এগুলো আধ্যাত্মিক সত্য। কবিতা হল কবির মনের একটা খুব উচ্চ অবস্থা। একটা উচ্চ অবস্থা আর পরমাত্মার তত্ত্ব দুটো আলাদা জিনিস। যেদিন বোঝার সেদিন বুঝতে পারবেন, তার আগে তর্ক করে লাভ নেই। এখন আমাদের কেবল শুনে যেতে হবে।

ঠাকুর বলছেন, যে গরু সব খায় সেই গরু হুর হুর করে দুধ দেয়, আর যে গরু বেছে বেছে খায়, সেই গরু ছিড়িক ছিড়িক করে দুধ দেয়। আধ্যাত্মিক দুধ যদি বার করতে হয়, যদি কেউ চায় আমার মনকে আমি আধ্যাত্মিক ভাবে ডুবিয়ে রাখব, তাহলে শুধু শুনে যেতে হবে, গরুর ঘাস খাওয়ার মত এক মনে শুনে যেতে হবে। বেছে বেছে যদি খাওয়া হয়, আচ্ছা এটা কেন হল, ওরকম কেন হল না, তাহলে কিছুই শেখা হবে না।

একজন মা তার বাচ্চাকে পড়াচ্ছে। বাচ্চাটা অনেকক্ষণ ধরে পড়ে যাচ্ছে। মা বলছে অক্ষর দেখে দেখে ঠিক করে উচ্চারণ করে পড়। বাচ্চাটা বলছে, আমি ঠিকই পড়ছি, যিনি লেখক তিনি ভুল লিখেছেন। ঘটনাটা শুনে আমি অবাক হয়ে ভাবছি, আমাদের জীবনেও ঠিক তাই হচ্ছে। আমরা মন থেকে একটা বুঝে নিয়েছি, ধর্ম বলতে এই, গীতা বলতে এই, ভক্তি বলতে এই। তারপর আমাদের আচার্যরা যখন বলছেন তখন আমরা বলছি, মহারাজ এটা কেন, ওটা কেন নয়; মহারাজ আপনি ভুল বলছেন। কোন কিছু শিখতে গেলে, বিশেষ করা শাস্ত্রের কথা শেখার জন্য প্রথমে মাথা নীচু করে শুনে যেতে হয়।

এই যে ভিতরে চৈতন্য, সেই চৈতন্য যখন মহাসমুদ্রে মিশে যান, তখন এক হয়ে যান। কিন্তু যেমনি ওটাকে আলাদা করে দেখছি, সেখানে মনটা ঢুকে যায়, মন যখন ঢুকে যায় তখনই ক্ষুদ্র বৃহৎ আলাদ হয়ে যায়, না হলে কখনই আলাদা হতে পারবে না। যখন একটি দেখছে, তখন ঈশ্বর রূপে দেখে; যখন বহু দেখছে তখন জগৎকে দেখছে। যখন এক আর বহুর পার, তখন আর কিছু নেই; যা আছে সেটা আর মুখে বলা যায় না। এটাই আধ্যাত্মিক সত্য, এটাই ঠাকুর প্রত্যক্ষ দেখেছেন, আগে আগে যত ঋষিরা, আচার্য এসেছেন তাঁরাও সবাই এই একই জিনিস দেখেছেন। মূল বক্তব্য, জ্ঞান পথে বা যাকে অক্ষর উপাসনা বলা হয়, উপনিষদে যা বলা হয়েছে, বেদান্ত যেটা বলছে; অবশ্য বেদান্ত দুটো হয়ে যায়, তাতে আমি লয় হয়ে যায়। ভক্তিতে মন থেকে যায় বলে মনে একই বৃত্তি চলতে থাকে, কিন্তু মনটা থেকেই যাচ্ছে, ফলে আমি তুমি এই ভাব সব সময় থেকে যায়। এই আমি তুমি ভাবের মাঝখানে অন্য কোন কিছু নেই, সংসার নেই, ভালবাসা ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। শুধু আমি আর তুমি –এটাই ভক্তি। এই ধরণের ভক্তের মনে অন্য কিছু নেই, মৃত্যুর পর এনারা তাঁর সাথে এক হয়ে যান। কারণ মনে যেটা থাকবে সেটার সাথেই মিশে এক হয়ে যাবে। ভক্ত তাই দেহত্যাগের পর ঈশ্বরের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়। এরপর তাঁর খুশী, তিনি মুক্তি দিতেও পারেন, মুক্তি নাও দিতে পারেন। ছোট্ট শিশু, তার মা তাকে যা খাওয়াবে তাই খাবে, যেমন ভাবে রাখবে তেমন ভাবেই সে থাকবে, ভক্তেরও তাই হয়। এই হল ভক্তি আর জ্ঞানের মূল কথা।

কিন্তু এর সাথে ঠাকুর একটা খুব সুন্দর কথা বলছেন – ভক্তি সহজ পথ। ভক্তি সহজ পথ কারণ, এখানে compromise করা যায়। যেখানে আছেন সেখান থেকেই শুরু করা যায়। অব্যক্ত উপাসনা, জ্ঞান পথ খুব কঠিন পথ, সবার দ্বারা হয় না। আমরা পরে দেখব, ভগবান একটার পর একটা শ্লোকে বলে যাবেন, এটা কর, যদি এটা না পার, তাহলে এটা কর, এটাও যদি না পার, তাহলে এটা কর। জ্ঞান পথে এভাবে হবে না, জ্ঞানপথ নেতি নেতি পথ, তোমাকে সব কিছু ত্যাগ করতে হবে। সমস্ত ত্যাগ যদি না পারো, তাহলে পরিষ্কার তোমার দ্বারা হবে না। জ্ঞানপথ তোমার জন্য নয়, তাহলে আমার কি হবে? তুমি ভক্তির পথ নাও। বিশেষ করে যাদের ভিতর ইমোশানস আছে, যে কোন ইমোশান, তাদের জন্য ভক্তি পথ সহজ পথ। ইমোশানকে কাজে লাগানো যায়, যাঁরা জ্ঞান পথে আছেন, ইমোশান থেকে কারুর প্রতি আসক্তি হয়ে যাবে, সেটা ওনারা কোন মতে হতে দেবেন না। সব মিলিয়ে যদি দেখা হয়, ভক্তিটা একটা পথ নয়, এটা একটা মানসিকতা। জ্ঞানটাও একটা পথ না, এটাও একটা মানসিকতা। হয় আপনি এটার জন্য, নয় আপনি ওটার জন্য। এই জিনিসটাকে ঠাকুর নিজের শিষ্যদের খুব সুন্দর বলতেন –ওর ভাব আলাদা।

আমাদের কাছে প্রচুর মেইলস আসে, মন্তব্য আসে –মহারাজ একটু ব্রহ্মসূত্রটা করাবেন; ব্রহ্মসূত্র কি জিনিস তার কোন আইডিয়া নেই; মহারাজ একটু বেদান্তসার করবেন, কোথাও কারুর মুখে বেদান্তসারের কথা শুনেছে। এই তো সীমিত আয়ু, বোঝার ক্ষমতা এত কম, এরপর আপনার রিসোর্স কি ভাবে নষ্ট করে যাচ্ছেন। যতটুকু হজম করতে পারবেন, যতটুকু একটু কাজে লাগাতে পারবেন, সেটাকে ছেড়ে, এটা করা যায় কিনা, ওটা করা যায় কিনা। সংসারে যাঁরা আছেন, তাঁদের

জন্য ভক্তির পথ, যেটা পথ তার বাইরে বেশি যেতে নেই। আমরা এখানে সময়টা ভাল ভাবে কাটানোর জন্য এই ক্লাশগুলো করি, তাতেও ফোকাস করতে হবে যেটা আপনার জন্য উপযোগী, যেটা আপনাদের ভাবের সাথে মেলে।

এই যে ঠাকুর বলছেন, কলিতে নারদীয় ভক্তি, ভক্তি সহজ পথ, তাই বলে কি ঠাকুর খোল করতাল নিয়ে রাস্থায় নেমে ছিলেন। কারণ তত্ত্ব হল অদ্বৈত। আমার এখন দরকার নেই, মা জানেন, আপনার যিনি ইষ্ট তিনি জানেন, আমার কখন কি দরকার। তাঁর সঙ্গে মিশে যখন এক হয়ে যাবেন, তখন তিনি মনে করলে ওটাও করিয়ে দেবেন। আমাকে প্রায়ই ইনহেলার নিতে হয়। আমি একবার নামকরা চেস্ট স্পেশালিস্ট ডাক্তার ধীমান গাঙ্গুলীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ডাক্তারবাবু এটা না নিয়ে ঐ ইনহেলারটা নিলে হয় না'? উনি হেসে বলছেন, 'আপনাদের সন্ন্যাসীদের এই এক সমস্যা, আপনারা সবজান্তা হয়ে বসে আছেন'। আইডিয়াটা হল, তিনি স্পেশালিস্ট তিনি জানেন আমাকে কোন ইনহেলার দিতে হবে। ভগবান যদি মনে করেন, তাঁর লীলার জন্য আবার তিনি আপনাকে আনবেন, তিনি আনবেন। চণ্ডীতে সমাধি বৈশ্য বলছেন, মা আমাকে ছেড়ে দাও। মা বললেন, যাঃ ঠিক আছে, তোকে মুক্তি দিয়ে দিলাম। তিনি ঠিক করবেন, কাকে কি দিতে হবে। ভক্তি জিনিসটা কি, ভক্তি পথ বলতে কি বোঝা, এই একটা ছোট্ট আইডিয়া দিয়ে বাকিটা আমরা বিস্তারে এই অধ্যায়ে দেখব।

একাদশ অধ্যায় শেষ হয়েছিল, *মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ। নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।।* এই পঞ্চান্ন নম্বর শ্লোকে ভগবান ভক্তিকে পরিভাষিত করলেন। সমস্ত কর্ম আমার জন্যই করবে, কারুর প্রতি তোমার কোন আসক্তি থাকবে না। এটা মুখে বলা যায়, ব্যবহার কালে এ হয় না। এক একজন ভক্ত আসেন, মুখে এমন এমন কথা বলবেন, যেন রাজা জনক। আচার্য শঙ্কর এই অধ্যায়ের শুরুতে খুব সুন্দর একটা ভূমিকা দিচ্ছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের যেখান থেকে মূল তত্ত্ব শুরু হয়েছে, সেখান থেকে দশম অধ্যায় পর্যন্ত, যে কটি অধ্যায় গেল, সেখানে ভগবান *পরমাত্মনো ব্রহ্মণঃ অক্ষরস্য*, অক্ষর ব্রহ্ম, নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের বর্ণনা করে চলে গেছেন। আর বলছেন, *সর্বযোগৈশ্বর্যসর্বজ্ঞানশক্তিমৎসত্ত্বোপাধেঃ ঈশ্বরস্য তব চ উপাসনং তত্র তত্র উক্তম্*, অক্ষর উপাসনার, নির্গুণ নিরাকারের বর্ণনা করে গেছেন, কিন্তু তার সাথে সোপাধিক ঈশ্বর, যোগ, ঐশ্বর্য, জ্ঞান, শক্তি, এগুলো যাঁর মধ্যে সব সময় বিদ্যমান, আর সত্ত্বগুণের উপাধি নিয়ে রেখেছেন, এটারও বর্ণনা করেছেন। তার মানে রজোগুণ, তমোগুণ নিয়েও ভগবান আসেন, ভগবান যখন আসেন তখন তিনি ঠিক করেন রজোগুণ নেবেন, না তমোগুণ নেবেন, নাকি সত্ত্বগুণ নেবেন। সেই ত্রিগুণাতীত কোন একটা গুণকে আশ্রয় করে আসেন, তখনও তাঁর মধ্যে সমস্ত শক্তি, জ্ঞান, ঐশ্বর্য, যোগ থাকে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান জ্ঞানযোগের কথা বলছেন, কর্মযোগের কথা বলছেন, স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে গিয়ে অর্জুন নিরুপায় হয়ে বলছেন, আপনি যা বলছেন, এতে আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে; আপনি আমাকে ঠিক করে বলুন, কর্মযোগ ভাল, নাকি জ্ঞানযোগ ভাল।

এবার অর্জুন এখানে এসে বলছেন, আপনি একবার অক্ষর উপাসনার কথা বলছেন, আবার সোপাধিক ব্রহ্মের উপাসনার কথাও বলছেন, কোনটা ঠিক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভগবান অক্ষরের বর্ণনা করে গেছেন, নির্গুণ নিরাকারের বর্ণনা করে গেছে, সচ্চিদানন্দ যেমনটি, তেমনটি বর্ণনা করে গেছেন। কিন্তু তার সাথে মাঝে মাঝে সগুণ সাকার ব্রহ্মের উপাসনার বর্ণনাও করে গেছেন, আসলে দুটো আলাদা কিছু না। সচ্চিদানন্দ, যিনি নির্গুণ নিরাকার, সচ্চিদানন্দ, যিনি সগুণ সাকার; আলাদা কিছু নয়, একই জিনিস। সেইজন্য গীতা মিলিয়ে মিশিয়ে এভাবে বলছেন। ভাগবতেও আমরা এই জিনিসটা পাই। উপনিষদে এই ভক্তি জিনিসটা পাওয়া যায় না, যার জন্য উপনিষদ অসম্পূর্ণ। স্বামীজীও বলছেন, গীতা উপনিষদ থেকে শ্রেষ্ঠ কারণ ভক্তি জিনিসটা গীতায় পুরোদমে আছে, উপনিষদে প্রায় নেই বললেই হয়। এই দুটো যেমন চলছিল ঠিক আছে, কিন্তু সেখান থেকে একাদশ অধ্যায়ে এসে ভগবান বিশ্বরূপ দর্শনটা নিয়ে এলেন, যেখানে নির্গুণ নিরাকারের ভাবটা পুরোপুরি চলে

গেল। আর তাই না, বলছেন, এর উপরেই তুমি ধ্যান কর। আচার্য বলছেন, *বিশ্বরূপাধ্যায়ে তু ঐশ্বরম্ আদ্যং সমস্তজগদাত্মরূপং বিশ্বরূপং ত্বদীয়ং দর্শিতম্,* পুরো জগৎটা যেন সেই ঈশ্বরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। অর্জুনের মনে সংশয় এসে গেছে, এই যে মিলে মিশে বলা হল, একবার পরিষ্কার করে বলুন তো, আমাদের ভাষায় জ্ঞান আর ভক্তি, দুটোর মধ্যে কোনটা নেব? আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি, যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্র নিয়েছেন, তাঁদের জন্য বলা হয়, ঠাকুরের ভাবটা নিতে হয়। এই ভাবটা কি? ভক্তিযোগে এটাকেই বিস্তারে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঠিক কি জিনিসটা বলতে চাইছেন। শুধু রূপ, যেটা ছবিতে পাই, সেটা না। আরও গভীরে যেতে হয়। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে শুরু করে একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত দুটো একেবারে মিলে মিশে থাকাতে অর্জুন এবার ভগবানকে পরিষ্কার করে জিজ্ঞেস করছেন –

অর্জুন উবাচ
এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ।।১।।

(অর্জুন জিজ্ঞেস করলেন –হে ভগবান্, এইভাবে নিরন্তর ভগবৎকর্মাদিতে নিযুক্ত হয়ে যে-সকল অনন্যশরণ ভক্ত সমাহিতচিত্তে আপনার উপাসনা করেন এবং যাঁরা সমস্ত বাসনা ও কর্ম পরিত্যাগপূর্বক সর্বোপাধিরহিত ইন্দ্রিয়াতীত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন, এই উভয়ের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ যোগী?)

আগে যে দশটি অধ্যায় গেল, সেখানে যদিও আপনি মূলতঃ অক্ষরের কথাই বেশি বলেছেন, আত্মার কথাই বলেছেন। সপ্তম অধ্যায়েও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন নিজের কথা বলে যাচ্ছেন, *রসোহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যোয়ঃ,* সেখানেও তিনি নিজের নির্গুণ নিরাকার রূপটাই বলে যাচ্ছেন। সপ্তম অধ্যায়েই আবার যখন বলছেন, *দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।,* পুরোটা মিলেমিশে বলছেন। দশম অধ্যায় পর্যন্তও যদি রাখা হয় তাহলে পুরোদমে সগুণ সাকার সেখানেও পাওয়া যাবে না। কিন্তু একাদশ অধ্যায়ে সগুণ সাকারের পুরো একটা রূপ ভগবান দেখিয়ে দিচ্ছেন। প্রথম যিনি গীতা পড়বেন, স্বাভাবিক ভাবে তাঁর মনে এই সংশয় হবে।

অর্জুন এখানে বলছেন, *এবং সততযুক্তা যে,* ভক্তি মানেই *সততযুক্তা*। রামকৃষ্ণ ভাবের প্রথম জিনিসটাই হয় *সততযুক্তা,* মনটা সব সময় ঈশ্বরে লেগে থাকা। সকালে উঠে ওঁ নমো ওঁ নমো করে কোন রকমে একশ আটবার জপ করে নিলাম, সন্ধ্যেবেলাও তাই, এভাবে হবে না, *সততযুক্তা* হতে হবে। ভক্তিযোগে প্রথম পরিভাষাই হয়, *সততযুক্তা,* সব সময় লেগে আছে। *যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে,* পরি শব্দের অর্থ ঘিরে নেওয়া, *পরিউপাসনা,* মানে ভক্ত পূর্ণ রূপে উপাসনা করছেন, চিন্তন করছেন, ধ্যান করছেন, পূজা করছেন। এটা হল কিছু মানুষের থাক, তাঁরা এই রকমই করেন, এটাই ভক্তিভাব। কি রকম ভক্তিভাব? *এবং সততাযুক্তা যে* – এনারাই ভক্ত।

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তম্, আবার অন্য দিকে আছে যাঁরা অব্যক্তের উপাসনা করছেন। আচার্য এর ব্যাখ্যা করে বলছেন, *নৈরন্তর্যেণ ভগবৎকর্মাদৌ যথোক্তে অর্থে সমাহিতাঃ,* একাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে যেটা বলা হয়েছিল, সেখানে এটাই বলা হয়েছিল, সমস্ত কাজ ঈশ্বরের জন্যই করেন, যা কিছু করেন ঈশ্বর নিমিত্ত করেন, ঠাকুরের জন্যই করছি, এই ভাব নিয়ে সব কাজ করেন। আর তার সাথে তাঁর একটা অনাসক্তির ভাব আছে। অন্য দিকে রয়েছে, আচার্য যার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, *যে চ অন্যে অপি ত্যক্তসর্বৈষণাঃ,* সন্ন্যাসীর প্রথম হল *ত্যক্তসর্বৈষণাঃ,* সমস্ত এষণাকে ত্যাগ করে দিয়েছেন। এষণা শব্দের অর্থ ইচ্ছা, তাঁর কোন ধরণের ইচ্ছা নেই। আমাদের শাস্ত্রে অনেক জায়গায় বলছেন *পুত্রৈষণা,* রাজা দশরথের ইচ্ছা হল তাঁর সন্তান হোক, জন্ম হল শ্রীরামচন্দ্রের, মহাভারতে কুন্তির ইচ্ছা হল সন্তান হোক, পঞ্চ পাণ্ডবের জন্ম হল। ঠিক তেমনি ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারী, তাঁদেরও

ইচ্ছে হল সন্তান হোক, ব্যাসদেব ব্যবস্থা করে দিলেন, সেখান থেকে কৌরবদের জন্ম হল। যেখানে সন্তান হচ্ছে না, সেখানেও তাঁরা সন্তানের এষণা করছেন। আবার বড় বড় ঋষিরা এসে তাঁদের বংশধরদের বলছেন, পিণ্ড না পেলে আমরা তো নরকে যাব, তাঁরা আবার বিবাহ করে সন্তানোৎপাদন করছেন বংশ চালানোর জন্য। ঠিক তেমনি পুত্র হলে বিত্ত দরকার, এসে গেল *বিত্তৈষণা*। পুত্র বিত্ত হয় কেন, যাতে মৃত্যুর পর আমি ভাল লোকে যেতে পারি, এটাই হয়ে গেল *লোকৈষণা*। সমস্ত এষণার মূলে এই তিনটে এষণা –পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা আর লোকৈষণা। এই তিনটে এষণা প্রাপ্তির জন্য আসে ধর্ম, অর্থ আর কাম। কাম দিয়ে পুত্র পাওয়া যায়, বিত্ত দিয়ে অর্থ হয়, আর ধর্ম হল উত্তম লোকে যাওয়ার ব্যবস্থা করা।

এই তিনটে মূল এষণার বাইরে আনুষাঙ্গিক অনেক ছোট ছোট এষণা এসে জুড়ে যায় –খুব সুন্দর বাড়ি হোক, গাড়ি হোক, সুন্দর চুল হোক, গায়ের রঙ মসৃণ ও উজ্জ্বল হোক, তার জন্য নানা রকমের প্রসাধনী নিয়ে আসছে, সবই এষণা। খুব সধারণ সাধারণ এষণা এসে পড়ে। কিন্তু ঠাকুর এও বলছেন, ভবনাথ পান মাছ ত্যাগ করেছে তাতে কি হল, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই আসল। কামিনী-কাঞ্চন এটা এষণা; পান, মাছ এষণার মধ্যে পড়ে না। এষণা হল, যেটা আমাদের জীবনধারার সাথে জুড়ে আছে। অনেকে নখ বড় করছে তো করছেই। এটাই তার এষণা হয়ে যায়, লোকেরা আমাকে জানবে, আমার নখ এত বড়।

আচার্যে বলছেন, *সর্বকর্মাণো যথাবিশেষিতং*, সমস্ত এষণার ত্যাগ, সমস্ত কর্মের ত্যাগ। সন্ন্যাসী যে শুধু এষণাই ত্যাগ করেন, তা না, সমস্ত কর্মেরও ত্যাগ করেন। সন্ন্যাসী বলেন, আমি পূর্ণকাম্, আমার কোন কিছু লাগবে না। একটু তোমাকে খুশী করলাম, একটু তাকে খুশী করলাম, এর জন্য যেটুকু দরকার করে দিলাম, এর বেশি কিছু না। বাড়িতে কোন অতিথি এলে বাব-মা বাচ্চা মেয়েকে যেমন বলে, 'মা, কাকুকে একটু নেচে দেখাও তো'। মেয়ে একটু নেচে দিল। আচ্ছা একটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনাও, মেয়েটা আতা গাছে তোতা পাখি শুনিয়ে দিল। একটু গান করে শোনাও তো মা, না, আমি গান করব না। ওর ইচ্ছার ইতি হয়ে গেল। বাচ্চা মেয়ে কি করবে, মা বলছে একটু করে দেখিয়ে দিতে, দেখিয়ে খুশী করে দিল। জানে মা-বাবা রেগে গেলে কি থেকে কি হয়ে যাবে।

সন্ন্যাসীরা উপসনা করেন পরম অক্ষরের। কারণ সন্ন্যাসী ছাড়া অক্ষর উপাসনা হয় না, সন্ন্যাসী ছাড়া অদ্বৈত সাধনা হয় না, সন্ন্যাসী ছাড়া সমাধির কল্পনাও করা যায় না। একটু পরেই এই জিনিসটাকেই তিন ও চার নম্বর শ্লোকে ব্যাখ্যা করবেন। সংসারে থাকলে কিছু না কিছু এষণা থাকবেই থাকবে। সংসারী যে শুধু স্বামী-স্ত্রী দুজনেই আছেন, তা তো নয়, আরও অনেক কিছুর সাথে জড়িয়ে থাকবেন। আমি এক সময় কিছু দিন উত্তরকাশীতে ছিলাম, সেখানে আমি দেখতাম ষাট পয়ষট্টি বছরের এক দম্পতি, রোজ উত্তরকাশীর ঐ ঠাণ্ডায় খালি গায়ে, শীতকালে একটা উত্তরীয় চাপিয়ে ভোরবেলা ওখানে বিশ্বনাথ মন্দিরে গিয়ে শিবের মাথায় জল ঢালছেন। আমাকে একজন মহারাজ বললেন, আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনেরই এক সন্ন্যাসীর এনারা বোন আর ভগ্নিপতি। ওনারা এখানে বাণপ্রস্থি হয়ে আছেন। যা টাকা-পয়সা ছিল, সেই টাকা দিয়ে ওখানে একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট কিনেছেন, দুজনে মিলেই উত্তরকাশীতে ধর্ম-সাধন করেন। সকালবেলা এসে শিবের মাথায় জল ঢালবেন, তারপর সারাদিন পূজো, পাঠ, জপধ্যান নিয়ে থাকেন। কিন্তু এই স্বামী-স্ত্রী যদি ওখানে যে অন্নসত্র আছে, সেখানে যদি ভিক্ষা চান, কেউ কি ওনাদের ভিক্ষা দেবেন? কেউ দেবে না।

সেই সময় আমাদের সন্ন্যাসীদের ওখানে ভিক্ষা করে খেতে হত। আমাদের একটা কমণ্ডুলু থাকত, ঐ একটা কমণ্ডুলুর মধ্যে ডাল, ভাত, তরকারী, মিষ্টি, পায়েস যা পাওয়া যেত সব নিয়ে নিতাম। একবার দোলের দিন আমরা চারজন সাধু ভিক্ষায় বেরিয়েছি, বেরিয়ে দেখছি রাস্থাঘাট ফাঁকা,

কোথাও কোন সাধু নেই। রাস্তার উপর এক পরিচিত দোকানদার বলল, ‘স্বামীজী আপনারা এত দেরীতে যাচ্ছেন’? আমরা বললাম, ‘আমরা তো ঠিক টাইমেই আছি’। বিশ্বনাথ মন্দিরে গেলাম, সেখানেও বলছে, ‘আপনারা এত দেরী করে এলেন’? ‘না না, আমরা টাইমেই আছি’। যেখানে ভিক্ষা নিতে হবে সেই অন্নসত্রে গিয়ে দেখছি, সব দরজা বন্ধ। তারপর আরেকটা অন্নসত্রে গেলাম, সেখানেও দরজা বন্ধ। কি ব্যাপার? পরে জানলাম, আগের দিনই নাকি নোটিশ লাগানো ছিল, আমরা দেখতে পাইনি, দোল বলে ভিক্ষা দু ঘন্টা আগে দিয়ে দিয়েছে। কমণ্ডুলু নাচাতে নাচাতে অতটা রাস্তা গেলাম, আবার খালি কমণ্ডুলু নাচাতে নাচাতে ফেরৎ চলে এলাম। দোলের দিন কোন খাওয়াই জুটল না। ভিক্ষাই পাওয়া গেল না, খাবো কি!

সন্ন্যাসীদের এতে কিছু আসে যায় না, সংসারীরা এটা পারবে না। সংসারীরা কি পারবে, খেলাম খেলাম, না খেলাম তো না খেলাম? সংসারীরা পারবে না। কিংবা খিদে পেলে কোন বাড়ির দরজায় আমরা সন্ন্যাসীরা কড়াঘাত করে বললাম, কিছু খেতে দিন। সংসারীরা পারবে? সন্ন্যাসীর পোশাক না হলে কেউ ভিক্ষাই দেবে না। স্বামী-স্ত্রী যদি এই পোশাকেও যায়, কেউ দেবে? খেদিয়ে তাড়িয়ে দেবে। সন্ন্যাসী হল মানসিকতায় সম্পূর্ণ স্বাধীন, এই পূর্ণ স্বাধীন ভাব সংসারে সংসারীদের কোন দিন আসবে না। ঠাকুরকে একজন জিজ্ঞেস করছেন, সংসারে কি হবে না? ঠাকুর বলে দিলেন, কেন হবে না। কিন্তু তারপর যে শর্তগুলি চাপিয়ে দিচ্ছেন, তারপর দেখা যাবে সংসারীদের কারুর পক্ষেই ঐ শর্ত পূরণ করা সম্ভব না। এখানে তর্কের কোন কিছু নেই, সন্ন্যাসীদের সাধনাটাই আলাদা। সন্ন্যাসীদের যে ধরণের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যে ধরণের মন্ত্র দেওয়া হয়, সেইসব মন্ত্র আর তাঁদের ধ্যান-চিন্তন সব কিছুই পুরো আলাদা, তাঁদের মানসিকতাটাই অন্য রকম হয়ে যায়। সন্ন্যাসীদের মন্ত্রও বাইরের কেউ জানতেই পারবে না।

একবার কলকাতা হাইকোর্টে একটা মামলা হয়েছিল। সেই মামলায় একজন সন্ন্যাসীকে প্রমাণ করার ব্যাপার ছিল, সে সত্যিকারের সন্ন্যাসী, নাকি ভেক সাজা সন্ন্যাসী। বেলুড় মঠের তখন জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ। হাইকোর্টের বিচারক মহারাজকে অনুরোধ করে ডেকে পাঠালেন। কারণ একজন সন্ন্যাসী যে মন্ত্রের জন্য সন্ন্যাসী হন, সেই মন্ত্র একমাত্র সন্ন্যাসীরাই জানে, সন্ন্যাসী ছাড়া অন্য কেউ জানে না। এই মামলায় এখানেই সেই সন্ন্যাসী ধরা পড়ে যাবে সে আসল কি নকল সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীকে বিচারক বললেন, ‘আপনি সন্ন্যাসী কিনা প্রমাণ দেওয়ার জন্য আপনার সন্ন্যাসের মন্ত্রটা বলুন’। সন্ন্যাসী বলে দিলেন, ‘আমি আপনাকে এই মন্ত্র বলতে পারব না, কারণ আপনি সন্ন্যাসী নন’। এক সন্ন্যাসী আরেক সন্ন্যাসীকে বলতে পারে। তখন মহারাজকে কোর্ট থেকে অনুরোধ করা হল আসার জন্য। স্বামী মাধবানন্দজী গেলেন, সন্ন্যাসীও কানে ফিস ফিস করে মন্ত্রটা বলে দিলেন, মহারাজও বললেন, ‘হ্যাঁ, ও প্রেষ মন্ত্র জানে, এ সত্যিকারের সন্ন্যাসী’। কোন সন্ন্যাসী কোন দিন সন্ন্যাসী ছাড়া কাউকে এই মন্ত্র বলবেন না।

বলছেন, এনারা হলেন অক্ষর উপাসক। অক্ষর মানে, সমস্ত উপাধি থেকে যে সচ্চিদানন্দ আলাদা, কোন উপাধি নেই সেখানে। এই যে প্রার্থনা করা হয়, হে প্রভু করুণা কর, যিনি এই করুণা শক্তি তিনি এই উপাধি ছাড়া। একাদশ অধ্যায়ে যেখানে অর্জুন ভয়ে কাঁপছেন দেখে ভগবান তাঁকে বলছেন, *কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃত্তো,* আমি কাল – এই উপাধিগুলো অক্ষর উপাসনায় থাকে না। নিরুপাধিক উপাসনা একমাত্র সন্ন্যাসীরাই জানেন, তাঁরাই করেন। অব্যক্ত মানে, যেটাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না। ইন্দ্রিয় দিয়ে যেটা জানা যায়, সেটাকে বলে ব্যক্ত। অক্ষরকে আচার্য বলছেন, *অকরণগোচরম্,* কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে অক্ষরকে জানা যায় না।

অন্য দিকে মহাপুরুষরা বলেছেন, ঈশ্বরের এই এই গুণ। রামানুজপন্থী বা মাধ্বাচার্যের অনুগামীরা যখন ভক্তি ভাব নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করছেন, বা নারায়ণ বা বিষ্ণুর বর্ণনা করছেন,

শিবের যখন বর্ণনা করছেন, তাতে ওনাদের কি সুন্দর সুন্দর সব বর্ণনা আছে। আচার্য বলছেন, *শিষ্টৈঃ চ উচ্চমানৈঃ*, আমি আপনি বললে হবে না, যিনি শিষ্ট পুরুষ, যিনি মহাপুরুষ, তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন, ঠিক সেইভাবে তাঁর উপাসনা করতে হবে। একদিকে নিরুপাধিক অক্ষর উপাসনা, আরেক দিকে শিষ্ট পুরুষদের দ্বারা বর্ণিত সোপাধিক ঈশ্বরের উপাসনা। *তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ*, হে ভগবান, এই দুটো উপাসনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটা যদি আমাকে বলেন –এই হল অর্জুনের প্রশ্ন।

অর্জুনের মন পুরো সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে গেছে, এমন নয় যে, ভগবান অধ্যায়গুলোতে দুটোকে আলাদা আলাদা করে বলেছেন, অধ্যায়গুলোর মধ্যেই এই দুটো দুধ আর চিনির মত মিলেমিশে রয়েছে। ভগবান তখন প্রথমেই এই বলে বলতে শুরু করেছেন, ভক্তিই শ্রেষ্ঠ পথ। কেন শ্রেষ্ঠ? ভক্তি সহজ পথ। গীতার শ্লোকগুলির মধ্যেই দেখাবেন উপলব্ধিতে দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। এটা ভাল, এটা মন্দ বলার কোন উপায় নেই। তফাৎটা রয়েছে পথে। পথেও কেন? যে কোন লোক করতে পারে, যেমন অক্ষর উপাসনার কথা বলা হল, সমস্ত এষণা যদি ত্যাগ না হয়, সমস্ত কর্ম যদি ত্যাগ না হয়, সন্ন্যাসী যদি না হন, আর সন্ন্যাসীর বেশ যদি না ধারণ করে থাকেন, অক্ষর উপাসনা সম্ভবই না। গৃহস্থ রূপে যদি কেউ থাকে, তারও দুটো টাকা লাগবেই, দুটো টাকা তাকে সঞ্চয় করতেই হবে। ব্যস্, ওখান থেকে কৌপিন কি ওয়াস্তে সব এসে জুটে যাবে। কৌপিন ইঁদুর কেটে দিচ্ছে, কৌপিনকে বাঁচাতে হবে। ইঁদুরকে জব্দ করার জন্য বেড়াল দরকার, বেড়ালের জন্য দুধ দরকার, দুধ পাওয়ার জন্য গরু দরকার, গরুকে খাওয়ানোর জন্য ঘাস দরকার, ওগুলো দেখাশোনা করার জন্য একজন মহিলা দরকার, সব কিছু চালাবার জন্য একটা বিয়ে করতে হল। একটা ফেঁকড়ি যদি থাকে, পর পর সব কিছু এসে জুটে যাবে। সাধনার বিধি আলাদা, সাধনার পথ আলাদা, তাই বলে একটা শ্রেষ্ঠ, আরেকটা কম শ্রেষ্ঠ, তা না। বেশি শ্রেষ্ঠ কম শ্রেষ্ঠর ব্যাপার না, সাধনাটা আলাদা। যাই হোক ভগবান এবার বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ
ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ।।২।।

(শ্রীভগবান্ বললেন, পরমেশ্বরের ভজনার দ্বারাই জীবের উদ্ধার হয় – এই বিশ্বাস দৃঢ় করে যাঁরা আমার বিশ্বরূপে মনোনিবেশপূর্বক মচ্চিত্ত হয়ে অহোরাত্র অতিবাহিত করেন, তাঁরাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ যোগী।)

অর্জুনকে ভগবান বলছেন, অর্জুন, ভক্তির পথ শ্রেষ্ঠ। কেন? *ময্যাবেশ্য*, সন্ধি বিচ্ছেদে *ময়ি আবেশ্য*, আমার মধ্যে যে নিজের মনটাকে পুরো ডুবিয়ে দিয়েছে। কি রকম ডুবিয়ে দিয়েছে? আচার্য বলছেন, *ময়ি বিশ্বরূপে পরমেশ্বর আবেশ্য সমাধায়*, পার্ট টাইম না, সব সময়ের জন্য মনটাকে পুরো ডুবিয়ে রেখেছে। আমাদের আশেপাশে যে মন্দির আছে, সেখানে গিয়ে মাথা ঠুকে বললাম, প্রভু এলাম, কৃপা কর। ভগবানও সেই রকম কৃপা করবেন। এভাবে ভক্তি হয় না। *ময্যাবেশ্য*, বুঝতে হবে জিনিসটা কি বলতে চাইছে। আচার্য বলছেন, *সমাধায়*, ভগবানে মন, বুদ্ধি পুরোটা ডুবিয়ে দিয়ে, মা যেমন নিজের ছোট্ট সন্তানের মধ্যে নিজেকে পুরো ডুবিয়ে রাখে। *নিত্যযুক্তা*, পাঁচ মিনিট কি এক ঘন্টার জন্য *ময়ি আবেশ্য* না, *নিত্যযুক্তা*, টানা চব্বিশ ঘন্টা আমার সাথে যুক্ত হয়ে উপাসনা করে।

খুব সংক্ষেপে উপাসনা হল, শাস্ত্রে যে কথা বলা হয়েছে, ঐ ব্যাপারে নিশ্চয় হয়ে দীর্ঘদিন ধরে ওই ভাবের উপর মনকে লাগিয়ে রাখা –*সমবৃত্তি প্রবাহ*, একই ধরণের বৃত্তির প্রবাহ চলতে থাকবে। *মাং উপাসতে*, *মাং* মানে আমার, আমার উপাসনা করে। আমি কে, আচার্য বলছেন, *মাং সর্বযোগেশ্বরাণাম্ অধীশ্বরং সর্বজ্ঞং বিমুক্তরাগাদিক্লেশতিমির দৃষ্টিম্*, আগে বলা হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবের চিন্তন ও ধ্যান করতে হয়। আচার্য শঙ্কর এটাকে এইভাবে এখানে খুব সুন্দর পরিভাষিত করে দিলেন। যখনই ঠাকুরের কথা ভাববেন, ঠাকুরের কথা তাঁদের জন্যই বলছি যাঁরা ঠাকুরের মন্ত্রে দীক্ষা

নিয়েছেন, যাঁরা কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে কৃষ্ণের উপাসনা করছেন, সবারই জন্য একই জিনিস, *সর্বযোগেশ্বরাণাম্*, সমস্ত যোগের তিনি অধীশ্বর, তিনি সর্বজ্ঞ, জগতে এমন কিছু নেই যে তিনি জানেন না, আর *বিমুক্তরাগাদিক্লেশতিমির*, রাগাদি দিয়ে সবটাকে নিয়ে আসছেন, অবিদ্যা, রাগ, দ্বেষ, অস্মিতা, অভিনিবেশ এই পাঁচটি ক্লেশ থেকে তিনি মুক্ত। *তিমির দৃষ্টিম্*, যে কোন ধরণের অজ্ঞান থেকে তিনি সব সময় আলাদা। তার মধ্যে কোথাও কোন ধরণের অজ্ঞান নেই, কোথাও কোন ধরণের দুর্বলতা নেই – এই হলেন পরমেশ্বর, সমস্ত যোগের তিনি অধীশ্বর। ভক্ত এবার নিজের মনকে এই পরমেশ্বরে পুরো ডুবিয়ে নিত্য সমাহিত হয়ে উপাসনা করেন।

এই পরমেশ্বরকে তিনি যে কামধেনু রূপে দেখছেন, তা না। আমার মনে দুঃখ হয়েছে, হে ঠাকুর আমার দুঃখ দূর করে দাও; আমি খুব কষ্টে আছি, হে ঠাকুর আমার কষ্ট দূর করে দাও; এভাবে তো একেবারেই দেখছেন না। ঠাকুর, যিনি হলেন সব কিছুর অধীশ্বর; ঠাকুর, যিনি সব রকম অজ্ঞান থেকে দূরে; ঠাকুর, যিনি অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেশ ও অভিনিবেশ, এই পঞ্চ ক্লেশের পারে। যখনই ঈশ্বরের উপাসনা করা হয়, যখনই ঈশ্বরের চিন্তন করা হয়, তখন এই ধরণের সমস্ত ভাবগুলিকে নিয়ে আসতে হয়। শ্রীশ্রীমা বলেছেন, ঠাকুরের ছবির দিকে তাকালেও হবে; মায়ের কথা সত্য, কোন সন্দেহ থাকার প্রশ্ন নেই। কিন্তু যখন ধ্যান-ধারণা হয়, মনটাকে তখন উপরে আনতে হয়। *নিত্যযুক্তা হল*, একাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে যেটা বললেন, *মৎকর্মকৃন্মৎপরমো*, আমাদের যত কর্ম, যত চিন্তন, যত ভজনা, সবটাই তাঁর প্রতি। আচার্য বলছেন, *নৈরন্তর্যেণ হি তে মচ্চিত্ততয়া অহোরাত্রম্ অতিবাহয়ন্তি অতো যুক্তং তান্ প্রতি যুক্ততমা ইতি বক্তুম্*। শ্রেষ্ঠতম বলতে বলছেন যুক্ততম। যুক্ততম তাঁকে কেন বলছি, *নৈরন্তর্যেণ*, নিরন্তর, এক ক্ষণের জন্যও সেই পরমেশ্বর থেকে তাঁর মন সরছে না।

রাবাইয়া সুফি সম্প্রদায়ের একজন খুব উচ্চমানের সাধিকা ছিলেন। আর-একজন সুফি দরবেশ এসে রাবাইয়াকে বলছেন, 'কষ্ট যখন হয়, তুমি কি তখন মনে কর ভগবান ভালর জন্যই এই কষ্টটা দিয়েছেন'? একটু হেসে রাবাইয়া বলছেন, 'আমি তো সর্বক্ষণ আল্লাকেই দেখি, আমার কষ্ট বলে কিছু বোধ হয় না'। ভক্তরা বলেন, হে প্রভু কষ্ট দিয়েছ, কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতাটাও দাও। অন্ধকার কেন? যাতে আলোর প্রকাশ বাড়ে। ঠাকুর ভাল দিয়েছ, ওই ভালর জন্য আমি সুখ পাচ্ছি, তুমি মন্দ দিয়েছ যাতে ভালটা বুঝতে পারি, মন্দ দিয়ে তুমি আমার পরীক্ষা নিচ্ছ। কিসের ভাল কিসের মন্দ; কত বিচিত্র বিচিত্র কথা, ঠাকুর বলছেন, এগুলো হীন বুদ্ধির কথা। যে নিরন্তর ঈশ্বর প্রেমে ডুবে আছে, সে কিসের মনে করবে এটা ভাল, এটা মন্দ? ভাল ও মন্দ তো মন বিচার করে, যাঁর মন নিরন্তর ঈশ্বরে ডুবে আছে, মন্দ ভালোর বিচার করার সময় কোথায় তাঁর! এগুলো হল হীন বুদ্ধির পরিচয়। কথামৃতে যেখানে লোকেরা এসে এই ধরণের কথা বলছে, ঠাকুর শুনে খুব রেগে যাচ্ছেন – শালারা নিজেরা যেমন ঈশ্বরকেও তেমন ভাবে।

একজন এসে বলছে, ঈশ্বরের বৈষম্য দৃষ্টি আছে; শুনে ঠাকুর এত রেগে গেছেন –নিজের যেমন স্বভাব, ঈশ্বরকেও সেই রকম স্বভাবের ভাবছে। নিজেরা সব সময় বিচার করছে, এটা ভাল এটা মন্দ, ভাল লোকের ক্ষতি হল কেন? করোনার সময় একজন এসে বললেন, করোনার জন্য কত ভাল লোক মারা যাচ্ছে। আমি তাকে বললাম, 'বৃষ্টি যখন পড়ে তখন বৃষ্টির জল ভাল লোকের গায়ে পড়ে কিনা? আর সূর্যের আলো এসে পড়ছে, তখন শুধু ভাল লোকের উপর পড়ে না'? নিজের মত একটা বিচার করে নিয়েছে, ওটা কেন, সেটা কেন, এমন কেন, এমনটা নয় কেন। সমাজ এখন এদের কথাতেই নাচছে। এরাই আবার ঈশ্বরকে নিয়ে বিচার করছে, হিন্দুধর্মকে নিয়ে বিচার করছে। হিন্দুধর্ম বোঝার ক্ষমতা আছে? *নৈরন্তর্যেণ হি তে মচ্চিত্ততয়া*, দিনরাত নিরন্তর সেই ঈশ্বরকে নিয়ে ভাবছে, চিত্তটা সব সময় আমাতেই সমাহিত। এনারাই তো নিত্যযুক্তা, বিচার করার তাঁর আর কি দরকার আছে! শ্যামসঙ্গীতে কি সুন্দর বলছেন, 'আমি তন্ত্র মন্ত্র কিছুই জানিনে মা', আমি কিছুই

জানি না, আমি যে কেবল তোমাকেই জানি গো মা। তাঁকে জানলে, তাঁতে চিত্ত ডুবে থাকলে, তাঁকে আর কিসের মন্ত্রতন্ত্র জানতে হবে। তিনি তো দিনরাত নিরন্তর পরমেশ্বরের ভাবের মধ্যে ডুবে আছেন, তাঁর কাছে আর কিসের ভাল, কিসের মন্দ; তাঁর কাছে কিসের দুঃখ, কিসের সুখ। এই কথা শুনে ভক্ত খুশীতে ডগমগ হয়ে বলবে, আঃ বাঁচলাম, ভক্তি কত ভাল। তাই কি? তিন নম্বর শ্লোকে ভগবান এবার অক্ষর উপাসনার কথা বলবেন।

অক্ষর উপাসনার কথা বলার আগে আমাদের গুটি কয়েক কথা জেনে রাখা খুব ভাল। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত গীতা ভগবানের দুটি রূপের কথা বলে এসেছেন – একটা অক্ষর রূপ, আরেকটা সাকার রূপ। অর্জুন জানতে চাইছেন, কোনটার উপাসনা করা ভাল। আগে আগে বলা হয়েছে, গীতা হল সমন্বয় শাস্ত্র। আমাদের বিভিন্ন শাস্ত্রে যত দর্শন বা মতের কথা রয়েছে, গীতা সব কটা দর্শন ও মতকে এক জায়গায় এনে তার মধ্যে একটা সমন্বয় করছেন। দ্বাদশ অধ্যায়ে অর্জুনের প্রশ্ন করার পর ভগবান প্রথমে বলে দিলেন, যাঁরা আমাকে ভক্তি করে, যাঁরা আমার সাথে নিরন্তর জুড়ে রয়েছেন, এনারা শ্রেষ্ঠ। এই কথা বলার পর ভগবান অক্ষর উপাসনার কথা বলছেন।

মূল আলোচনার শুরুতে সাধনার উপর কয়েকটা কথা জেনে রাখা খুব জরুরী; তা নাহলে দুই আর তিন নম্বরের শ্লোকের তফাৎটা বোঝা যাবে না। একটু পরেই আচার্য সাধনাকে ব্যাখ্যা করবেন। আমরা সিদ্ধির দিক থেকে এর ব্যাখ্যা করছি। কঠোপনিষদে খুব সুন্দর একটা মন্ত্র আছে – *যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং*, শুদ্ধ জলে শুদ্ধ জল মিশিয়ে দিলাম, –*তাদৃগেব ভবতি*, দুটো মিলে এক হয়ে যাবে, তার মতই হয়ে যাবে। *এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম*, হে নচিকেতা, আত্মা ব্রহ্মের সঙ্গে সেভাবেই মিলে যায়, যেভাবে শুদ্ধ জলে শুদ্ধ জল মিলে যা হয়ে যায়। মায়েরা বাড়িতে রান্না করেন, তাঁরা জানেন রান্নাতে যে জিনিসটা যেটার সাথে মেশান দরকার সেটার সাথেই মেশাতে হয়। যেমন তেল, সরষের তেলকে সরষে তেলের সাথেই মেশাতে হয়, যে পাত্রে রিফাইন তেল থাকে তাতেই ঢালতে হয়, তা নাহলে অন্য রকম হয়ে যাবে। সিদ্ধি ও সাধনার একই সম্পর্ক। পওহারি বাবার খুব নামকরা কথা –*যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি*, সাধনটি যেমন হবে সিদ্ধিও তেমনটি হবে। আমি ঠিক এর উল্টোটা বলি –যেমনটি আপনি সিদ্ধি চান, তেমনটি আপনাকে সাধনা করতে হবে।

আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন, আমি জীবনে কি চাই? ভক্তির কথা যখন হয়, ঈশ্বরের কথা যখন হয়, তখন আমরা মুখের কথা বলতে থাকি – ঠাকুরই আমার সব কিছু, ঠাকুরই আমার সব করছেন। ঠাকুর এই ধরণের কথাগুলিকে বলছেন বিষয়ীর কথা। বাচ্চারা যেমন খুঁড়ি, জ্যেঠীর কোঁদল শুনে বলে, তোর ঈশ্বরের দিব্যি। আমাদের কাছে, ঈশ্বর, ভগবান, ঠাকুর, এগুলো শব্দ মাত্র। যদি ঠিক ঠিক ভিতরে ঢুকতে হয় তাহলে জিনিসটাকে আগে ভাল করে বুঝতে হয়। সেই রকম আগে দেখুন, সাধন জীবনে আপনি কি চান? এই যে জগৎ, এই যে সংসার, এর বেশির ভাগ লোকই বিষয়ী, তারা সবাই কোটিপতি হতে চায়, শত কোটিপতি হতে চায়; হওয়া অত সহজ না। আধ্যাত্মিক জীবন অনেক সহজ, ঈশ্বরপ্রাপ্তি অত্যন্ত সোজা, আত্মজ্ঞান পাওয়া অত্যন্ত সোজা। শুধু দুটি জিনিস করতে হবে, প্রথম হল, আপনাকে জানতে হবে আপনি কি চান? ব্রহ্মজ্ঞান চান, নাকি ঈশ্বরের সাথে এক হতে চান? প্রথম এটা আপনাকে বুঝতে হবে। দ্বিতীয় তাঁর মত হয়ে যেতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাবে, কেউ আটকাতে পারবে না।

জ্ঞান এক্ষণে হয়ে যেতে পারে, শত কোটির মালিক এক্ষণে হয়ে যাওয়া যায় না, তার জন্য প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়। আমাদের প্রথম সমস্যা হল, আমরা জানিই না আধ্যাত্মিক জীবনে আমরা কি চাই। ধর্মীয় কথা শুনছি ঠিকই, কিন্তু যে কথাগুলো আগে শোনা আছে, সেই কথাগুলিই শুনতে ভাল লাগে। ধর্মের নূতন কথা আমাদের মাথা নিতে পারি না, মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হয়ে যায়। স্বামী যতিশ্বরানন্দজী মহারাজের খুব নামকরা বই, Meditation and Spiritual Life, ওখানে

মহারাজ খুব সুন্দর একটা কথা বলেছেন –Men would rather died and think। চিন্তা-ভাবনা করার থেকে মরে যাব তাও ভাল। চিন্তা-ভাবনা আমরা নিতে পারি না, মস্তিষ্ক ফেটে যায়। যার জন্য দেখা যায়, যে আলোচনাগুলিতে কথা, কাহিনী, গান, বাজনা আর অনেক জায়গায় যেখানে সঙ্গে নাচ থাকে, সেখানে মানুষ বেশি যায়। কারণ মানুষ গভীর চিন্তা-ভাবনা নিতে পারে না। কিন্তু সত্যিই আপনি যদি ধর্ম জগতে, আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করতে চান, তাহলে আগে নিজেকে পরিষ্কার করে নিতে হবে, আমি এটাই চাই। এরপর যেমন সিদ্ধি চাইবেন, তেমন সাধনা করতে হবে।

তার মানে সব কিছু ঠিক তাঁর মতই হতে হবে, যে কথা নচিকেতাকে যমরাজ বললেন, যদি তুমি শুদ্ধ জল হতে চাও, তাহলে তোমাকে শুদ্ধ হয়ে যেতে হবে। যদি সরষে তেল হতে চাও, তাহলে তোমাকেও সরষে তেলের মত হয়ে যেতে হবে। আগে বলেছিলাম, একজন মহাকাশ বিজ্ঞানীর বই পড়ছিলাম, সেখানে তিনি পরিষ্কার বলছেন, তুমি যদি একজন মহাকাশচারী হতে চাও, তাহলে তোমাকে চিন্তা করতে হবে একজন মহাকাশচারীর মত, আচরণ করতে হবে একজন মহাকাশচারীর মত। ঠিক তেমনি, যিনি অদ্বৈত সাধনা করতে চাইছেন, তাহলে অক্ষর ব্রহ্ম যেমন, তাঁকেও তেমন হয়ে যেতে হবে। তা নাহলে শুদ্ধ জলে নীল বড়ি দিতে গেলে সেতো সেখানে ঢুকতেই দেবে না। ঠাকুরের সাথে যদি কেউ এক হতে চান, তা যে রূপেই হোক, ঠাকুর সন্তান রূপে, ঠাকুরের ভক্ত রূপে, ঠাকুরের সেবক রূপে, যে রূপেই হতে চান, তাঁকে ঠিক ঠাকুরের মতই হতে হবে; তা নাহলে প্রবেশের অধিকারই পাবে না। বলে, মন্দের ভাল, মন্দের ভালটা কিছুই না, এগুলো পরকে ঠকানো আর নিজেকে ঠকানো ছাড়া কিছুই হয় না।

স্বামীজী বেলুড় মঠ স্থাপন করে বলে দিলেন, আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ মুশা। আজকের দিনে আমরা মুশা শব্দের অর্থও জানি না। আগেকার দিনে গয়নার দোকানে যে স্যাঁকরারা কাজ করতেন তাঁদের কাছে একটা পাত্র থাকত, যাতে এক ধরণের এ্যাসিড মেশান তরল পদার্থ থাকত। ওই পাত্রের জলে রূপা বা সোনার গয়না ফেলে সোনা বা রূপা পরিষ্কার করতেন, এই তরল পদার্থটাকেই বলা হত মুশা। এখনও সোনার গয়না, রূপার গয়না পরিষ্কার করার ব্যবস্থা আছে, তবে এখন পদ্ধতি অনেক পাল্টে গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মুশা, এটা আমার খুব প্রিয় শব্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন সেই দিব্য পাত্র, যেখানে রসায়ন রাখা আছে, ওখানে ঢুকে আমার ভিতরের আবর্জনাগুলি সরিয়ে দিতে হবে। কঠোপনিষদের এই মন্ত্রটা আমাদের মনে রাখতে হবে, *যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি*, শুদ্ধ জলে শুদ্ধ জল মিশে গেলে যেমন তদাকার হয়ে যায়। যদি আমি শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে এক হতে চাই, ঠাকুরের নাম করছি, ঠাকুরের চিন্তন করছি, ঠাকুরের ধ্যান করছি, উদ্দেশ্য যদি ঠাকুরের সাথে এক হওয়া। তার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মুশাতে নিজেকে নিয়ে গিয়ে আমার সমস্ত রকম অশুদ্ধি, আবর্জনাগুলিকে পরিষ্কার করতে হবে।

থমাস কেম্পিসের নামকরা খুব সুন্দর একটা বই আছে, Invitation of Christ, রামকৃষ্ণ ভাবধারায় যাঁরা যুক্ত আছেন, তাঁরা অনেকেই এই বইএর নাম শুনে থাকবেন। সেখানে বলছেন, যীশু যেমনটা ছিলেন, যীশুর যে জীবন, এটা হল যেন একটা ছাঁচ। ইট তৈরী করার সময় কাঠের ফর্মা থাকে, ওই ফর্মার মধ্যে মাটি ফেলে ওই ফর্মার আকারের ইট তৈরী করা হয়। কিন্তু সেখানেও যদি আমরা বিচার করি তাহলে দেখতে পাই, সেখানেও যেটা অতিরিক্ত আছে, যেটা ওর মধ্যে ফিট করে না, সেটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। আমরা মুশা রূপেই নিই আর ফ্রেম বা ছাঁচ রূপেই নিই, জিনিসটা একই থেকে যাবে। অতিরিক্ত যে জিনিসগুলো আছে সেগুলোকে ওখান থেকে বার করে দিতে হয়। সাধনা মানে তাই, জ্ঞান আর ভক্তি, এই দুটি ছাড়া তৃতীয় কোন পথ হয় না। আর ঠিক ঠিক শ্রীরামকৃষ্ণ মুশা, যেখানে গিয়ে আমার ব্যক্তিত্বের ভিতরের আবর্জনাগুলি পরিষ্কার করতে হয়।

সব কিছু মিলিয়ে উদ্দেশ্য হল, আপনি আগে ঠিক করুন আপনার আদর্শ কি। কিভাবে ঠিক করবেন? আগে দেখুন আপনার কিসে বেশি শক্তি। দুর্বলতার দিকে তাকাতে নেই, দুর্বলতা বলে কিছু হয় না। দুর্বলতা মানেই, এই পথটা আমার জন্য নয়। কোন মানুষেরই দুর্বলতা বলে কিছু হয় না, যেটা হয় সেটা হল শক্তি। দেখুন, আপনার শক্তিটা কি, আপনার স্বাভাবিক ভাবটা কি। একটা সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, আমার মোবাইলে এবং আমার কম্প্যুটারে কোন এক্সট্রা জিনিস আমি রাখি না। আমার পরিচিতরা এসে দেখেন আমার কম্প্যুটার সব সময় ফাঁকা। জি মেলের ইনবক্স সব সময় পুরো ফাঁকা থাকে, কাজ হয়ে গেল, ফেলে দিলাম। আমার ফোনে হোয়াটস এ্যাপ সব সময় পরিষ্কার। কোন মেসেজ ঢুকলো, দেখে নিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ডিলিট। তার মানে আমার স্বাভাবিকতা হল, ফেলে দেওয়া। আবার অনেকে আছে, যারা সব কিছু সামলে রাখতে চায়, তাদের মধ্যে ইমোশানের ভাব বেশি।

যাদের মধ্যে বৈরাগ্যের ভাব বেশি, তারা স্বাভাবিক ভাবে আত্মজ্ঞানের দিকে যাবে। আর যাদের মধ্যে ইমোশানের ভাব বেশি, তারা স্বাভাবিক ভাবে ভক্তির দিকে বেশি যাবে। ঠাকুরের ভাব আবার বিরাট জিনিস, ঠাকুরের বৈরাগ্যের ভাব যেমন সাংঘাতিক ছিল, তেমনি ঈশ্বরের প্রতি যে ভালবাসা, সেটাও সাংঘাতিক। এর মধ্যে আমাদের কোন একটাকে নিয়ে আগে নামতে হবে। এরপরে বাকিটা হল, আপনাকে আস্তে আস্তে ঠিক ওই ভাবকে ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ মুশাতে গিয়ে পুরো নিজেকে পরিষ্কার করে দেওয়া। যা কিছু অতিরিক্ত আছে, যেটা ওখানে খাপে খাপে বসছে না, ওটাকে ওখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে। যখন একবার ভাব ঠিক করা হয়ে গেল –আমার কি ভাব, তার সাথে জীবনে আমি কি চাইছি; এরপর এবার নিজের ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে, এবং সেই মত নিজের আচরণ, ব্যবহার করতে হবে। এভাবে না করলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে না।

এবার ভগবান অক্ষর উপাসনার কথা বলছেন। এই যে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে ভগবান বলে আসছেন *অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়ম্...* এই যে শ্লোকগুলো, আমাদের মাথা ঘুরে যায় এসব শুনলে। যিনি এইসব শ্লোকের তত্ত্বানুসারে সাধনা করতে চাইছেন, তাঁকে তাহলে সেই রকমই হতে হবে। কি সেই রকম? আমি মন নই, বুদ্ধি নই, চিত্ত নই, আমি *চিদানন্দরূপোহং*। ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন, হাত কেটে দর দর করে রক্ত পড়ছে, বলছেন, কই আমার তো কিছু হয়নি, কারণ আমি তো দেহ নই। হাত দিয়ে দর দর করে রক্ত বেরোচ্ছে ওই অবস্থায় এই কথা বলার কি আমাদের দম আছে? দুটো হাঁচি দিলে, নাক দিয়ে একটু সামান্য দু ফোঁটা জল বেরিয়েছে, তাতেই আমাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়, কখন ডাক্তারের কাছে গিয়ে ওষুধ খাওয়া শুরু করব।

একজন সন্ন্যাসী অসুখ করলে নিজেরা ঘরে চুপচাপ বিছানায় পড়ে থাকেন। কখন কেউ এসে জিজ্ঞেস করল, কিছু লাগবে কি? এই প্রশ্নের অর্থই হল, যদি না লাগে ভাই, তবে বেশি ভাল। নিজের মত পড়ে থাক, বেশি খারাপ হলে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, আর তা নাহলে সেবাপ্রতিষ্ঠান আছে, ভর্তি করে দেবে, ল্যাটা চুকে গেল। সন্ন্যাসীদের যদি এসে কেউ জিজ্ঞেস করে মহারাজ আপনার শরীর কেমন আছে? সন্ন্যাসী বিরক্ত হয়ে যান। আমরা সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর শরীর নিয়ে কেন আলোচনা করতে যাচ্ছেন? সেটা শুনে আমার এক বন্ধু বললেন, 'কি বলছেন কি আপনি! আমার যদি শরীর খারাপ করে, প্রত্যেক পাঁচ মিনিট অন্তর বাড়ির লোক এসে যদি না জিজ্ঞেস করে, একটু জুস খাবে কিনা, একটু চা খাবে কিনা, গা স্পঞ্জ করে দেব কিনা; আমি তো রেগে যাব'। 'সেইজন্যই আপনি সংসারে আছেন, আর আমি কাঠখোট্টা সন্ন্যাসী হয়েছি। আমাদের এসে কেউ যদি জিজ্ঞেসও করে, কিছু লাগবে কিনা, আমরা রেগে যাব। কেমন আছেন, জিজ্ঞেস করলে তাতেই বিরক্ত হয়ে যাই'।

এখানে ভগবান যাঁরা অব্যক্ত উপাসনা করেন তাঁদের কথা বলছেন। অব্যক্ত উপাসনা হল মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য, সবার জন্য নয়, সপ্তম অধ্যায়েই ভগবান বলেছেন –*মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে*। কেন সবার জন্য নয় –

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্।।৩।।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ।।৪।।

(কিন্তু যাঁরা সর্বদা ইষ্ট-ও অনিষ্ট-প্রাপ্তিতে রাগ-ও-দ্বেষরহিত, সমস্ত প্রাণীর কল্যাণে নিযুক্ত এবং ইন্দ্রিয়সংযমী, যাঁরা শব্দ আদি প্রমাণের দ্বারা অপ্রতিপাদ্য, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর, সর্বব্যাপী, মনের অতীত, কূটস্থ (মায়াধিষ্ঠান), অচ্যুতস্বরূপ এবং শাশ্বত নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন।)

তিন আর চার নম্বর শ্লোক একসাথে জুড়ে আছে। যাঁরা ব্রহ্মোপাসক, অব্যক্তের উপাসনা যাঁরা করেন, শ্রীরামকৃষ্ণের যে নির্গুণ রূপ, ওই রূপের যিনি উপাসনা করেন, আর তাঁর যদি এই এই গুণ থাকে; বলছেন, তখন কি হয়? এখন আমরা দুই প্রকার সাধনার কথা বলব।

প্রথমটা হল অব্যক্তোপাসনা। *যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং,* যাঁর কখন কোন রকম ক্ষয় হয় না, তিনি সেই অক্ষর। *অনির্দেশম্,* যেটাকে নির্দেশ করা যায় না। যে জিনিসটা কোন কিছুর বিষয় হতে পারে না। আমরা সেগুলোকেই বিষয় বলি, যে জিনিসকে ইন্দ্রিয় দিয়ে মেপে নেওয়া যায়। এই কলম আছে, আমার চোখ গিয়ে কলমটাকে মেপে নিল। চার পাঁচ মাসের বাচ্চা যদি এই কলম কোন রকমে হাতে পেয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে ও মুখে ঢুকিয়ে দেবে। কারণ বাচ্চাদের ইন্দ্রিয়গুলি এই বয়সে এখনও অতটা সক্রিয় হয়নি, ওরা সব কিছু শুধু মুখে লাগিয়ে বোঝার চেষ্টা করবে, মুখে দিয়ে দেখতে চাইবে জিনিসটা কেমন। সেইজন্য বাচ্চাদের ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতে হয়, কখন কোন জিনিস মুখে দিয়ে দেবে কাউকে বুঝতেই দেবে না। যে কোন বস্তু, যেটাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে ধরে নেওয়া যায় বা গ্রহণ করা যায়, সেটাকেই বলা হয় বিষয়। আর যেটাকে দিয়ে ইন্দ্রিয়কে ধরা যায়, সেটা কিন্তু মনেরও বিষয়, মন আলাদা করে কিছু ধরতে পারে না। ইন্দ্রিয় যেটাকে ধরে, মন সেটাকেই ধরে। এই ব্রহ্মতত্ত্ব, এই অক্ষর *অনির্দেশ্যম্,* যেটাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করাই হয়নি সেটাকে কি করে নির্দেশ করে বলবে, এটা এই। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, ওই কাপটা কোথায় রেখেছ? আমি কাপটা দেখেছি, আমার মন জানে কাপ কোথায় রাখা হয়েছে, আমি বলে দিলাম, কাপটা অমুক জায়গায় আছে। কিন্তু যে জিনিসটাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করা হয়নি, সেটাকে কি করে আমি নির্দেশ করে বলব!

তার সাথে বলছেন, *অব্যক্তম্,* ব্যক্ত করা যায় না। যখন আমরা একটা জিনিস বলতে চাইছি, তখন সেই জিনিসটাকে বিভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করা হয়, সরাসরি বা ঘুরিয়ে – এটাকে বলা হয় প্রমাণ। প্রমাণ মানে একটা জিনিসকে মেপে নেওয়া। প্রমাণের উপর আমরা আগেও আলোচনা করেছি। এই প্রমাণ বাংলা প্রমাণ নয়, প্রমাণ সংস্কৃতে একটা টেকনিক্যাল শব্দ। বেদান্ত ছয় প্রকার প্রমাণের কথা বলেন। সবার আগে আসে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, যেটাকে এনারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল, যেটা আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে সরাসরি জানছি। লোকেরা ভুলভাল ভেবে বলে, ধর্ম বিশ্বাসে চলে; ধর্ম একেবারেই বিশ্বাসে চলে না। ধর্মের সব কিছু প্রত্যক্ষের উপর চলে, অর্থাৎ পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে যেটা জানা যায়। দ্বিতীয় হয় অনুমান, যুক্তি দিয়ে একটা জিনিসকে জেনেছি, সরাসরি জানা হয়নি, ঘুরিয়ে জিনিসটাকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। যেমন, দুপুরে ঘুমিয়ে ছিলেন, বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখছেন রাস্থাঘাট সব ভেজা; বুঝলেন বৃষ্টি পড়েছিল। আপনি বৃষ্টি হতে দেখেননি, কিন্তু বুঝে গেলেন বৃষ্টি পড়েছিল। তৃতীয় প্রমাণ খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ, সেটাকে বলে

আগমপ্রমাণ বা শাস্ত্রপ্রমাণ। কিছু জিনিস আছে, যেমন, ঈশ্বর, স্বর্গ, মুক্তি, পুনর্জন্ম –এই জিনিসগুলিকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না, এই জিনিসগুলো তর্ক দিয়েও জানা যায় না, এগুলো জানতে হয় যাঁরা এগুলোকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁদের কথাকে বিশ্বাস করে; কিন্তু শুধু এই জিনিসগুলিকেই।

এখন প্রশ্ন হবে, কেন বিশ্বাস করব, যদিও এই প্রশ্নকে নিয়ে আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। বিশ্বাস করব কারণ এই কথাগুলি ঋষিদের কথা, ঋষিরা জ্ঞানী ছিলেন, ঋষিরা শুদ্ধ পবিত্র ছিলেন আর তাঁদের কোন রকম স্বার্থ ছিল না, সেইজন্য তাঁদের মিথ্যা কথা বলার কোন কারণ নেই। সবচেয়ে বড় কথা হল, তিনি জ্ঞানী, যে কোন বিষয়ের উপর কথা বলতে বলুন, দেখবেন তিনি সবটাই জানেন। ঘন্টার পর ঘন্টা ধ্যান করেন। আর তার সাথে এনারা হলেন একেবারে শুদ্ধ পবিত্র এবং স্বার্থবিহীন; এই রকম লোক কেন মিথ্যা কথা বলতে যাবেন! এই ধরণের ঋষিদের কথা আমি বিশ্বাস করব না, আর যারা অজ্ঞানী, যাদের ভিতরটা স্বার্থপরতায় ভরে আছে তাদের কথাকে বিশ্বাস করতে যাব? একজন একটা রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে আসছে, যার উদ্দেশ্যই হল ক্ষমতা দখল করা। বর্তমানকালে যখন কারুর নিন্দা করা হয়, দেখা যায়, শুধু নিন্দা করার জন্যই যে এই রকম বলছেন তা না, অপরের ভালর জন্য যে করছেন, তাও না। উদ্দেশ্যটা হল, একে ফেলে দিয়ে কোন ভাবে আমি যদি ক্ষমতায় আসতে পারি। এই ধরণের লোকের কথাকে বিশ্বাস করা যায় কি? টিভিতে, নিউজে, সাইবার মিডিয়াতে সবারই উদ্দেশ্য হল, ওই লোকটার বদনাম করে ওর বারোটা বাজিয়ে দাও, ও পড়ে গেলে আমি ক্ষমতায় আসব। কি বিশ্বাস করব এই ধরণের লোককে, অথচ আমরা বিশ্বাস করি। এদিকে ঋষিরা, যাঁরা সর্বত্যাগী এবং জ্ঞানী, তাঁদেরকে আমরা বিশ্বাস করতে চাইছি না। ঠাকুর খুব মজা করে বলছেন, একজন এসে বলল, মশাই, গীতা বইটা পড়লাম, খুব ভাল বই। ঠাকুর আবার বলছেন, খপর কাগজে বুঝি লেখা আছে? আগামীকাল কোন বিরাট বড়লোক যদি বলে গীতা বইটা খুব ভাল, সঙ্গে সঙ্গে সবাই একটা করে গীতা কিনতে শুরু করে দেবে। এই আগম প্রমাণ হল তৃতীয়, ঋষিদের কথা আপ্ত বাক্য, এটাই প্রমাণ।

চতুর্থ হয় উপমান প্রমাণ। আপনি হয়ত হিমালয়ে যাচ্ছেন বা জঙ্গলে ঘুরতে যাচ্ছেন। আপনাকে বলে দেওয়া হল, ওখানে দেখবেন এই রকম একটা মন্দির আছে, মন্দিরের বর্ণনা দিয়ে দেওয়া হল। বর্ণনা যত ভালই হোক, মুখের কথায় পুরোপুরি বোঝা যায় না। সেখানে গিয়ে হঠাৎ মন্দির দেখে আপনার মনে পড়ে গেল, আরে এ তো সেই মন্দিরটা, যার কথা আমাকে উনি বলেছিলেন। আপনি কোন দিন গণ্ডার দেখেননি, আপনাকে একজন গণ্ডারের একটা বর্ণনা দিয়ে বললেন, গণ্ডার এই রকম দেখতে। আপনিও একদিন জঙ্গলে বেড়াতে গেলেন, ওখানে গণ্ডার দেখতে পেলেন, গণ্ডার দেখার পর আপনি গণ্ডারের বর্ণনার সাথে মিলিয়ে নিচ্ছেন, ও এটাই তাহলে গণ্ডার। পঞ্চম প্রমাণ হল অর্থাপত্তি। আধখানা কথা বলা হয়েছে, বাকি আধখানা কথা বলা হয়নি। এখানে খুব সুন্দর উদাহরণ দেওয়া হয়, *পিনো দেবদত্ত দিবা ন ভুঙক্তে*, দেবদত্ত নামে একজন মোটাসোটা ব্যক্তি দিনের বেলা খায় না। মোটাসোটা কিন্তু দিনে খায় না, তার মানেই রাত্রে খায়। রাত্রে খায় এই কথা কিন্তু বলা হয়নি, পরোক্ষ ভাবে জ্ঞানটা চলে আসছে। আমাদের মনে হতে পারে, এটা তো অনুমান প্রমাণের মধ্যেই পড়ে গেল। তা না, তফাৎ আছে, গভীরে গেলে তফাৎটা বোঝা যায়।

সবচেয়ে বড় প্রমাণ হয় অভাব প্রমাণ। অভাব প্রমাণ নিয়ে আগে আমরা বিস্তারে আলোচনা করেছি। অভাব মানে একটা জিনিস নেই। যেমন আমার এখানে হাতি নেই –হাতি নেই, এই যে হাতির অভাব, এটাকেও প্রমাণ বলে। বলছেন, এই যে অক্ষরের কথা বলা হল, আর যে ছটি প্রমাণের কথা বলা হল, এই ছটি প্রমাণের কোন প্রমাণ দিয়ে অক্ষরকে জানা যায় না। এমনকি আগম প্রমাণ, যেটা ঋষিদের কথা দিয়ে আসছে, সেটা দিয়েও জানা যায় না। আগম প্রমাণ ইঙ্গিত করে দেয়, কিন্তু জানা যায় না। বাকি কোন প্রমাণ দিয়ে তো জানাই যাবে না। তাহলে কিভাবে জানা

যায়? অপরোক্ষানুভূতি দিয়ে জানা যায়। ঠিক প্রত্যক্ষ না, পরোক্ষও না, অপরোক্ষ দিয়ে হয়, অর্থাৎ নিজের অনুভূতি দিয়ে বোধে বোধ করা যায়। নিজের অনুভূতি না হলে জানা যাবে না। এই অনুভূতি ইন্দ্রিয় দিয়ে হয় না, মন বা বুদ্ধি দিয়েও হয় না, সেইজন্য অপ্রত্যক্ষ না বলে বলছেন অপরোক্ষ; অপরোক্ষ অনুভূতি দিয়ে হয়।

পর্যুপাসতে, সমস্ত রকম উপাসনা করেন। আমরা যেখানে উপাসনার আলোচনা শুরু করেছিলাম, আবার আমরা সেখানে ফিরে যাচ্ছি। তার মানে এবার আপনাকে তাঁর মত হতে হবে। উপাসনার সংজ্ঞা নিরুপণ করে আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, আচার্যের ভাষা খুব মধুর, বলছেন, *উপাসনং নাম যথাশাস্ত্রম্ উপাস্যস্য অর্থস্য বিষয়ীকরণেন*, এই যে সবাই উপাসনা উপাসনা বলে যাচ্ছেন, উপাসনা কি –যে জিনিসটাকে আমি পেতে চাইছি, যেমন আমি ভগবান বিষ্ণুকে পেতে চাইছি, বা শ্রীরামকৃষ্ণকে পেতে চাইছি বা শিবকে পেতে চাইছি, কৃষ্ণকে পেতে চাইছি, আমার মনের মত না, শাস্ত্রে যেমনটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে বা বলা হয়েছে, সেই জিনিসটাকে নিজের বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে মনের মধ্যে একটা ধারণা করতে হয়। যাঁরা এখন গীতার কথা শুনছেন, তাঁদের অনেকেই হয়ত ঠাকুরের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন; বেশির ভাগ ভক্ত ঠাকুরকে নিজের মত করে চিন্তা করে নিচ্ছেন। আচার্য বলছেন, এই জিনিস উপাসনাতে চলবে না। শাস্ত্রে যেভাবে ঠাকুরের কথা বলা হয়ে, ঠিক সেইভাবেই মনের মধ্যে ঠাকুরকে ভাবতে হবে।

ঠাকুরের শাস্ত্র কি? কথামৃত আছে, লীলাপ্রসঙ্গ আছে বা সন্ন্যাসীরা ও গুরুজনরা ঠাকুরকে নিয়ে যে ব্যাখ্যা আদি করেছেন, সেই জিনিসটাকে বিষয়ীকরণ করতে হবে। বিষয়ীকরণ মানে, বুদ্ধি দিয়ে ধারণা করা। বিষয়ীকরণ করার পর আচার্য বলছেন, *সামীপ্যম্ উপগম্য*, তাঁর কাছে যাওয়া। উপাসক উপাস্যের কাছে যাবে, তবেই উপাসনা হবে। কিভাবে যাচ্ছে? বুদ্ধিতে ওটাকে বিষয় করে নিয়ে যাচ্ছে। যেখানেই যখন কোন আধ্যাত্মিক ব্যাপারগুলো আসে, তখন সেখানে আচার্য শঙ্কর হলেন সম্রাট, কারণ এক একটা জিনিসকে তিনি একেবারে পরিষ্কার এমন ভাবে বলে দিচ্ছেন যে, কারুর বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না।

উপাসক উপাস্যের কাছে গিয়ে সেখানে কি করবেন? আচার্য বলছেন, *তৈলধারাবৎ সমানপ্রত্যয়প্রবাহেণ*, একটা পাত্র থেকে আরেকটা পাত্রে যখন তেল ঢালা হয়, তখন দেখে মনে হয় পুরো একটা সলিড জিনিস যাচ্ছে, ঠিক সেই রকম *সমানপ্রত্যয়প্রবাহেণ*। রাজযোগে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির কথা বলতে গিয়ে সেখানে সংযমের কথা বলছেন, ওখানেও বলছেন, আগের মুহূর্তের চিন্তা, এখন যে চিন্তা আর পরের যে চিন্তা –এই তিনটে চিন্তা যখন এক হয়ে যায়, এটাকে বলে সমানচিত্তবৃত্তি, রাজযোগে চিত্তবৃত্তি বলেন, এখানে প্রত্যয় বলছেন। এক চিন্তা টানা চলতে থাকবে। কতক্ষণ চলতে থাকবে? আচার্য বলছেন, *দীর্ঘকালং যদ্ আসনং*, অনেক দিন ধরে ওই একটি চিন্তাতে যখন অবস্থিত থাকে –*তদ্ উপাসনম্ আচক্ষতে*, তবেই ওটাকে উপাসনা বলা হয়।

উপাসনার কয়েকটি শর্ত বলে দিলেন –শাস্ত্রে বর্ণিত উপাস্যকে বুদ্ধির বিষয় করা, নিজের মনের পছন্দমত কাউকে উপাস্য করা চলবে না, এটা হল প্রথম শর্ত। দ্বিতীয় শর্ত হল, *সামীপ্যম্ উপগম্য*, তাঁর কাছে অর্থাৎ উপাস্যের সমীপে যাওয়া; কাছে যাওয়া মানে তাঁর চিন্তন করা। *সমানপ্রত্যয়প্রবাহ*, এটা হল তৃতীয় শর্ত, একটাই চিন্তা সমান ভাবে টানা চলতে থাকবে। যেমন কেউ ঠাকুরের ধ্যান করছেন, ঠাকুরের কোন একটা রূপ; ছবি বা ফটো না, একেবারে থ্রী ডাইমেনশান, অনেকক্ষণ ধরে সেই রূপের চিন্তার প্রবাহ চলতে থাকবে, এটাকে বলছেন, *সমানপ্রত্যয়প্রবাহ*। এই জিনিসটাই দীর্ঘকাল ধরে, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর করে যাচ্ছেন। আর যখন বসে আছেন, তখন টানা একটাই চিন্তার প্রবাহ চলতে থাকবে, মন যেন উপাস্যেই অবস্থিত থাকে, মাঝখানে অন্য কোন কিছু যেন না ঢুকে যায়। এই ঠাকুরের কথা ভাবছি, সেখান থেকে সরে গিয়ে মায়ের কথা

ভাবছি, একটু ছেড়ে স্বামীজীর কথা ভাবছি, এই ঠাকুরকে বেলুড় মঠে ভাবছি, একটু পরেই কামারপুকুরে ঠাকুরকে ভাবছি। এভাবে উপাসনা হয় না, সমান প্রত্যয়, একই বৃত্তি টানা সমান ভাবে এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী চলতে থাকবে, তবে গিয়ে উপাসনা হয়।

উড়ো খই গোবিন্দায় নমোর কথা আগে আমরা বলেছিলাম। একজন মাথায় একটা বড় ধামা করে খই নিয়ে যাচ্ছে বাজারে বিক্রী করার জন্য। বাতাসে কিছু খই উড়ে যাচ্ছে, খইগুলো নষ্ট কেন হবে, তাই বলে যাচ্ছে উড়ো খই গোবিন্দায় নমো, ভক্তি এভাবে হয় না। যাঁর উপাসনা করছি, তাঁর সম্বন্ধে শাস্ত্রে কি বলা হয়েছে, এটাকে আগে ভাল করে বুঝতে হয়। সেইজন্য শাস্ত্র না পড়লে সাধনা হয় না। মুখে আমরা যে যাই বলি না কেন, শাস্ত্র না জানলে সাধনা হবে না। শাস্ত্র পড়ে পণ্ডিত হওয়া না, শুধু পড়াও না, শাস্ত্রের কথা ধারণা করতে হয়। ধারণা করে সেটাকে বুদ্ধির বিষয় করে, সমান বৃত্তি, দীর্ঘকাল ধরে ওই একটাই চিন্তন করে, ওই বিষয়ে অবস্থিত হয়ে যাওয়, সেটাকেই আচার্য বলছেন উপাসনা।

সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবং, সেই অক্ষরের, ভগবানের বিশেষণগুলির কথা বলছেন। *সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ,* তিনি সর্বব্যাপী, অনন্ত; ঈশ্বরের একটা পরিভাষা –ঈশ্বর অনন্ত, এছাড়া ঈশ্বরের অন্য কোন পরিভাষা হয় না। ঈশ্বরের একটা কোন নামকরণ করে দিলেন, তিনি আর অনন্ত থাকলেন না। ঈশ্বরের কোন একটা রূপ দিয়ে দিলেন, ঈশ্বর আর অনন্ত থাকলেন না। নাম আর রূপ দিয়ে দিলে তিনি আর অনন্ত থাকেন না, অনন্তকে ইঙ্গিত করে।

সর্বত্রগম্, তিনি সর্বত্র বিদ্যমান, পুরাণে এগুলোকে নিয়ে খুব সুন্দর সুন্দর কাহিনী আছে। হিরণ্যকশ্যপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞেস করছেন, 'তোমার বিষ্ণু সব কিছুর মধ্যে আছেন'? প্রহ্লাদ বলছেন, 'হ্যাঁ তিনি সব কিছুতেই আছেন'। তিনি সর্বত্র বিদ্যমান, এই জিনিসটাকে ধারণা করার জন্য এই ধরণের কাহিনীগুলো তৈরী করা হয়েছে। *অচিন্ত্যঞ্চ,* তাঁর চিন্তন করা যায় না। কেন করা যায় না? যেটা আগে বলা হল, মন ঈশ্বরকে বিষয় করতে পারে না, তাই চিন্তন করা যায় না। ইন্দ্রিয় দিয়ে যাঁকে জানা যাচ্ছে না, মন দিয়ে তাঁকে আমরা কি করে জানব! *কূটস্থমচলং ধ্রুবং,* কূট শব্দের দুটি অর্থ হয়, বাংলাতে কূট মানে খারাপ অর্থে হয়, জিনিসটা সরল নয়, যেমন বলে কূটনীতি। এই যে প্রকৃতি, এটা দুষ্টু, সরল না। প্রকৃতি হল তিনটে গুণের খেলা, তিনটে গুণের খেলাতেই এই সংসার চলছে। ব্রহ্ম এই প্রকৃতির পারে, মায়ার পারে বসে আছেন, সেইজন্য তিনি *কূটস্থম্*।

আচার্য বলছেন, *দৃশ্যমানগুণম্ অন্তর্দোষং বস্তু কূটং কূটরূপম্,* উপর থেকে ভাল দেখাচ্ছে, কিন্তু ভিতরে গোলমেলে, *দৃশ্যমানগুণম্,* উপরে উপরে দেখতে খুব ভাল, কিন্তু বস্তুতঃ *কূটম্,* ভিতরে কূট রূপ। প্রকৃতি ঠিক এই রকম। এরপর আচার্য বলছেন, *ইত্যাদৌ কূটশব্দঃ প্রসিদ্ধ লোকে,* সংসারে সবাই কূট বলতে এটাকেই বোঝায়। *তথা চ অবিদ্যাদি অনেকসংসারবীজম্ অন্তর্দোষবদ,* সংসারে অনেক দোষ, তাঁর উপরে যিনি বসে আছেন তিনি কূটস্থম্ বা অথবা *রাশিঃ ইব স্থিতং কূটস্থম্ অত এব,* জিনিসটাকে যদি আমরা এভাবে দেখি, পুরো জিনিসটা যেন রাশিকৃত হয়ে আছে, পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন একটা থাক, তার উপর ভগবান বসে আছেন। *বা রাশিঃ ইব,* আমরা যদি মনে করি একটা পাহাড়, পুরো হিমালয় পাহাড়, হিমালয়কে এদিক সেদিক নাড়ানো যাবে না, ভগবান ঠিক সেইভাবে অবস্থিত। নাড়ানোর জায়গাই নেই, তিনি যাবেন কোথায়।

কূটস্থ শব্দকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। একদিকে তিনি প্রকৃতি বা মায়ার মালিক, আবার আর-এক দিকে তিনি অনন্ত, দুটো অর্থেই কূটস্থ শব্দ নেওয়া যায়। *কূটস্থমচলং, অচলং,* তিনি অচল, যাবেন কোথায়, কোথাও তো যাওয়ার জায়গা নেই, সর্বব্যাপী হয়ে তিনি কূটস্থ হয়ে আছেন। তার সাথে *অচলং তস্মাদ্ ধ্রুবম্,* যে জিনিসটা কোথাও যায় না, সেই জিনিসটা তো ধ্রুব হবেই,

যেমনটি আছে সব সময় তেমনটিই থাকবে; গতকাল যা ছিল আজকেও তাই আছেন, আগামীকালও তাই থাকবেন। এতক্ষণ উপাস্যের গুণের কথা বললেন। এবার উপাসকের কথা বলবেন, যাঁরা এই ধরণের সাধনা করেন, যেমন ত্রৈলঙ্গ স্বামী এই ধরণের সাধনা করেছিলেন, ঠাকুর সব রকমের সাধনাই করেছেন। কিন্তু যাঁরা এই সাধনা করেন, তাঁরা কি কি করেন, সেটাই এবার চার নম্বর শ্লোকে বলছেন।

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং, গ্রাম শব্দের অর্থ সমূহ। অনেকগুলো পরিবার মিলে যেমন একটা গ্রাম হয়, তেমনি আমাদের সব কটা ইন্দ্রিয় মিলে যেন একটা গ্রাম, ইন্দ্রিয়সমূহ। *সংনিয়ম্য* মানে, *সম্যগ্ নিয়ম্য সংহৃত্য*, পুরো সব কিছুকে গুছিয়ে নিয়ে আসা। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় আর তার সাথে মনকে নিলে মোট একাদশ ইন্দ্রিয়, *সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং*, এই এগারোটা ইন্দ্রিয়, এই পুরো ইন্দ্রিয়গামকে সম্পূর্ণ ভাবে নিজের নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসা। হিমালয়ে অনেক গ্রাম এখনও দেখা যায় যেখানে এগারো কি বারোটা বাড়ি নিয়েই একটা গ্রাম। আমাদের এই দেহরূপ গ্রামে এগারোটি ইন্দ্রিয়ের বাস। তারপর সমুদয় জিনিসটাকে গুছিয়ে নিয়ে আসা।

ফলে কি হয়? *সর্বস্মিন্ কালে সমবুদ্ধয়ঃ*। ভাল-মন্দের বিচার আমরা মন দিয়ে করি, মনটাই এখন গোছান হয়ে গেছে, তারপর কিসের ভাল আর কিসের মন্দ! পেট ভরার জন্য আমি খাচ্ছি, কি করে আমি বলব, এর স্বাদ ভাল, এর স্বাদ খারাপ! কারণ জিহ্বেন্দ্রিয়কে সংযম করে নেওয়া হয়েছে। কর্ণেন্দ্রিয়কে সংযম করে নেওয়ার পর কিসের গালাগাল আর কিসের প্রশংসা! সংযম করার আগে এই কর্ণেন্দ্রিয় এদিক ওদিক দৌড়াচ্ছিল, জিহ্বা ভাল স্বাদিষ্ট খাওয়ার জন্য জল ফেলছিল, নাসিকা ভাল গন্ধ পাওয়ার জন্য ছটফট করছিল, এই ছটফটানি যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণই ভাল মন্দের বিচার চলছিল। আমার নূতন বই ক্রতুতে একটা ছোট্ট চরিত্র আছে বিহান্। বিহান্ ভবিষ্যৎ থেকে এসেছে, দেখার জন্য জগৎটা কেমন। এসেই সবার আগে ওর কাছে দুর্গন্ধটা বড় সমস্যা মনে হল। হে ভগবান, চারিদিকে এত দুর্গন্ধ! কিন্তু বিহান্ যেখান থেকে এসেছে, ওখানে সবার মনের উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। বিহান্ মনের শক্তি বাড়িয়ে নাসিকা আর জিহ্বাকে পিছনের দিকে টেনে নিল। দুর্গন্ধ কেন লাগছে, কারণ নাক গন্ধের দিকেই চলে যাবে। কিন্তু ইন্দ্রিয়টাকে যদি পিছনের দিকে টেনে নেওয়া হয়, তখন ইন্দ্রিয় আর বেরোতেই পারছে না, তাই ভাল না মন্দ জানতে পারছে না।

সমবুদ্ধয়ঃ, এই ধরণের যাঁরা ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংযম করে নিয়েছেন, তাঁদের সমবুদ্ধি হয়ে যায়। আচার্য সমবুদ্ধিকে ব্যাখ্যা করে বলছেন, *সমা তুল্যা বুদ্ধিঃ যেশাম্ ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তৌ তে সমবুদ্ধয়ঃ*, দাঁড়িপাল্লার দুটো দিক যেমন সমান হয়ে যায়, সেই রকম বুদ্ধি যাঁর একেবারে সমান, অর্থাৎ কোনটাতেই বুদ্ধি বিচলিত হচ্ছে না। কিসে বিচলিত হচ্ছে না? ইষ্ট ও অনিষ্ট প্রাপ্তিতে। আমার এক বন্ধু আজকে হোয়াটসাপে একটা মেসেজ পাঠালেন, Acceptance is not spirituality, ইদানিং কালে চারিদিকে প্রচুর গুরুর আবির্ভাব হয়েছে, এদের কারুর কাছ থেকে বন্ধু কিছু শুনেছেন। সেই গুরু নাকি বলছেন, acceptance is not this, not this…., শব্দকোষ থেকে শব্দগুলো নিয়ে বিরাট লম্বা করে লিখে শেষে আমাকে বন্ধু বলছেন, 'আচ্ছা, আমাদের শাস্ত্রে এই ধরণের কোন কথা আছে'? বন্ধু একজন পণ্ডিত মানুষ। আমি লিখলাম, ভাই আমাদের শাস্ত্রে শুধু এই একই কথা আছে – Acceptance is spirituality। স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণে বলছেন, *তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্*, শুভ অশুভ যাই হোক, যেমনটি আছে তেমনটি নিয়ে নাও। সাধক মানে, সিদ্ধপুরুষরা যে রকমটি আচরণ করেন, সাধক তেমনটি অনুসরণ করেন – এটাই acceptance।

ভগবান এখানে বলছেন *সমবুদ্ধয়ঃ*, এটাই তো acceptance। যতক্ষণ বিদেশ থেকে ইংরাজীতে কেউ এই ধরণের একটা কিছু না বলছে ততক্ষণ এরা সেটাকে নিতে পারবে না। সুইস্ চীজ্ একটা বিদেশী খাবার, এই খাবারকে এত পচায় যে যতক্ষণ না পোকা হচ্ছে ততক্ষণ ওর দাম

বাড়বে না। আমাকে এখন পচা জিনিস খেতে হবে? মদকে পচিয়ে দেওয়ার পর নাকি লোকেদের খেতে মজা লাগে। আঙুরের রসকে যত পচাবে তত নাকি ওর দাম হবে। শাস্ত্রের ব্যাপারে এদের বুদ্ধি আর কেমন হবে! পচা খাবার খেলে তামসিক বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়, তামসিক বুদ্ধি দিয়ে কি শাস্ত্র বোঝা যায়? শাস্ত্র বোঝার জন্য সাত্ত্বিক বুদ্ধি দরকার, সাত্ত্বিক বুদ্ধি হওয়ার জন্য সাত্ত্বিক খাবার দরকার।

তার সাথে আরও একটা গুণ হল, *সর্বভূতহিতে রতাঃ*, যেখানকার প্রাণীই হোক, সবারই মঙ্গলে তিনি সব সময় লেগে আছেন। এই নয় যে, তুমি আমার ধর্মের নয়, তাই তোমাকে আমি একে-৪৭ দিয়ে উড়িয়ে দেব, দরকার হলে সুইসাইডাল মানববোমা হয়ে তোমাদের ছাড়খার করে দেব। খ্রীশ্চান ধর্মের ইতিহাস যদি আমরা দেখি, এই জিনিসই দেখি। অন্য ধর্মের নাম নেওয়া যাবে না। হিন্দুরা এই ধরণের নয়, হিন্দুরা হলেন *সর্বভূতহিতে রতাঃ*, তুমি যে ধর্মেরই হও, আমার তাতে কিছু আসে যায় না, আমি তোমারও ভাল চাই। এই করে করে কোথাও আমরা বীর্যহীন হয়ে গেলাম। দুষ্ট লোকরা এসে আমাদের কত ক্ষতি করে দিয়ে গেল। একটা উচ্চমানের ভাবকে পৃথিবী থেকে লোপ করে দেওয়ার জন্য এরা উঠে পড়ে লেগেছে। পশুপাখিদের মধ্যে অনেক প্রজাতি যেমন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, পার্সিরা যেমন ক্ষীণ হয়ে বিলুপ্তি পথে চলে যাচ্ছে, ঠিক তেমনি হিন্দুরাও না একদিন পৃথিবী থেকে বিলুপ্তির পথে চলে যায়। তার কারণ আমরা হিন্দুরাই আমাদের ধর্মগ্রন্থ কি তাই জানি না, আমাদের কি চিন্তা-ভাবনা তাই জানি না।

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব, ভগবান বলছেন, এই ধরণের অক্ষর উপাসকরা আমাকেই পান। এটা অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা। যাঁরা অব্যক্তোপসনা করছেন, তাঁরা আমাকেই পাবেন, কিন্তু পাবেন আমার অক্ষর রূপকেই। যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের নির্গুণ উপাসনা করছেন, তাঁরা ঠাকুরকেই পাবেন, কিন্তু অন্য রূপে। তার মানে, ভক্তি যেখানে নিয়ে যায়, জ্ঞান সেখানেই নিয়ে যায়; জ্ঞান ভক্তি আলাদা কিছু না। একজন ভক্তের সঙ্গে একবার কথা হচ্ছিল, সেই ভক্ত বলছেন, ঠাকুর কি সুন্দর বলছেন, জ্ঞানও যা ভক্তিও তাই। আমি তাঁকে বললাম, আমাদের শাস্ত্রে সব জায়গায় এটাই বলা হয়েছে, ঠাকুর এটা নূতন কিছু বলছেন না; *তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব*, এটাই আমাদের পরম্পরার কথা।

তাহলে উপাসকের কি কি শর্ত? *সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং*, প্রথম শর্ত, ইন্দ্রিয়গুলি পুরো নিয়ন্ত্রণে। দ্বিতীয়, সমবুদ্ধি, *সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ* – প্রিয় অপ্রিয়, ছোট বড়, শুভ অশুভ সব সমান হবে। তাহলে কি চুপচাপ জড় ভরতের মত থাকবে? তৃতীয় শর্ত, *সর্বভূতহিতে রতাঃ*, পুরো সক্রিয়, সমস্ত প্রাণীর মঙ্গলে লেগে আছেন। করোনার জন্য আজ এত দুর্দিন চলছে, মানুষের মঙ্গলের জন্য এগিয়ে আসুন, বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসুন। আপনার এক কিলোমিটার রেডিয়াসে দেখুন কারা অভুক্ত থাকছে, কাদের আয় কমে গেছে, যতটুকু ক্ষমতা তাদের সাহায্য করুন। নিজের ভোগ বিলাসিতা কমিয়ে দিন, নাহলে মন আপনার খুলবে কি করে! রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, সব্জিওয়ালা, কিছু দিনের জন্য তাদের একটু সাহায্য করুন, চিরদিনের জন্য না –*সর্বভূতহিতে রতাঃ*, এটাই প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত। এখন দুর্দিন চলছে, মানুষের কত দুর্যোগ চলছে, লোকেদের সাহায্য করুন। যদি মনে হয় যে আপনাকে ঠকাচ্ছে, ঠকাক; এখন সাহায্য করার সময়, কে ঠকাচ্ছে, কে ঠকাচ্ছে না, ওসব না দেখে সাহায্য করুন, তা নাহলে শাস্ত্র পড়ে কোন লাভ নেই।

যখন বলছেন, *তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব*, এনারা আমাকেই পায়, তাহলে ভক্তি ভাল আর জ্ঞান মন্দ বলার কি আছে! এই যে প্রথমে ভগবান বললেন ভক্তি ভাল, ভক্তরা তো আমার কাছেই আসেন। কিন্তু সপ্তম অধ্যায়ে আগে বলে দিয়েছেন *উদারাঃ সর্বঃ এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্*, সব ধরণের ভক্তই ভাল, কিন্তু জ্ঞানী তো আমার আত্মা, জ্ঞানী আমি, আমিই জ্ঞানী। ভক্তকে কোথাও ভগবান বলছেন না, আমার আত্মা। আচার্য এখানে খুব সুন্দর কথা বলছেন, *নহি ভগবৎস্বরূপাণাং*

সতাং যুক্ততমত্বম্ অযুক্ততমত্বং বা বাচ্যম্, যাঁরা সন্ত, তাঁদের ব্যাপারে *যুক্ততম অযুক্ততম,* এই প্রশ্ন হয় না। আগে বললেন শ্রেষ্ঠ, এখন বলছেন, প্রশ্ন হয় না।

আমার এক সন্ন্যাসী ভাই কদিন আগে আমাকে বললেন –গীতার আলোচনায় আপনি মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধর্মের নাম করে এমন ভাবে বলেন, যিনি প্রবর্তক ইনি আমাদের ঋষির মত, আপনি কি বলতে চান, এনারা কি ঋষির সমান? আমি পরিষ্কার বললাম, 'একেবারে সমান, এখানে যুক্ততম অযুক্ততম হয় না'। 'তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞান আর অন্যান্য যাঁরা এই স্তরের, তাঁদের কি জ্ঞান সমান'? 'একেবারেই সমান'। 'তাহলে ঠাকুরকে কেন বলা হয় অবতারবরিষ্ঠ'? কারণ ঠাকুরের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির যে বিস্তার, এটা আর কোথাও নেই।

যদি বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যেটা জেনেছিলেন, যীশু কি সেটা জানতেন না? এই ধরণের প্রশ্ন করাটাই বোকামো। তবে বিস্তারের দিক দিয়ে ঠাকুর অনেক বেশি। ঠাকুরের যত রকমের সাধনা ছিল, যত রকমের তাঁর সিদ্ধি ছিল, যত রকমের তাঁর অনুভূতি ছিল, এই জিনিস আর কোথাও পাওয়া যাবে না। যেমন স্কুলে দুজন খুব ভাল ছেলে আছে, দুজনই অঙ্কে একশতে একশ পায়, বিজ্ঞানে একশতে একশ পায়। তাহলে এবার দেখতে হবে, অন্যান্য বিষয়ে কার জ্ঞান বেশি। আমার এক বন্ধু আইপিএস অফিসার, কলেজে আমরা এক সঙ্গেই ছিলাম। ওনার খুব ইচ্ছে ছিল আইএএস হওয়ার। উনি একদিন দুঃখ করে বলছিলেন, আইএএসে যে র‍্যাঙ্কিং হয়, তাতে যিনি লাস্ট হয়েছিলেন, তাঁরা সাথে নম্বরে তিনি এক হয়ে গিয়েছিলেন। নম্বর সমান হয়ে যাওয়াতে তখন দেখা হল ইন্টারভিউতে কার বেশি নম্বর ওঠে। সেখানেও দেখা গেল দুজনেই সমান সমান। তারপর দেখতে হল জেনারেল স্টাডিসে, আইএএস পরীক্ষায় জেনারেল স্টাডি থাকে, সেখানে দেখা গেল, বন্ধুর নম্বর থেকে ওর নম্বর বেশি, সেইজন্য ও হয়ে গেল আইএএস আর আমার বন্ধু হয়ে গেলেন আইপিএস। ওনার চিরদিন এই দুঃখটা থেকে গিয়েছিল। আইএএস মানেই, অনেক বিষয়ে তাদের জ্ঞান বেশি থাকে। সব কিছুতে সমান, তাহলে সুপিরিওর কে? যাঁর বিস্তার বেশি। শ্রীরামকৃষ্ণ সেইখানে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যদি মনে করা হয় শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রহ্মজ্ঞান বেশি, অন্যদের কম –এটা একটা ভুল ধারণা। মহাপুরুষদের ক্ষেত্রে যুক্ততম অযুক্ততম বলা যায় না।

এই যে অক্ষর উপাসনার কথা বলা হল, আমরা যার শুরু করেছিলাম *যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসীক্তং তাদৃগেব ভবতি* দিয়ে, তারপর অব্যক্ত বর্ণনা করতে গিয়ে *অনির্দেশ্যম্, অব্যক্তং, অচলং, সর্বত্রগম,* সব কিছু বলে বলে ভগবান এবার বলছেন –

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেববদ্ভিরবাপ্যতে।।৫।।

(যাঁদের চিত্ত নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট, তাঁদেরকে সিদ্ধিলাভের জন্য ভগবৎকর্মাদিপরায়ণ সগুণ উপাসক অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশ পেতে হয়; কারণ নির্গুণ ব্রহ্মে নিষ্ঠালাভ করা দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের পক্ষে অতিশয় কষ্টকর।)

আমরা দেহবৎ, আমাদের আসক্তি দেহের সাথে জড়িয়ে আছে, ইন্দ্রিয়ের সাথে জড়িয়ে আছে; ভাল খেতে চাই, ভাল পরতে চাই, ভাল করে ঘুমোতে চাই, গরমে কষ্ট হয়, শীতে কষ্ট হয়; কারণ আমরা হলাম দেহাভিমানী, দেহতে আমরা পুরো আবদ্ধ হয়ে আছি। অক্ষর উপাসনা করতে গেলে, আমাদের সব রকম বোধ ত্যাগ করতে হবে, দেহাভিমানীদের পক্ষে এটা সম্ভব না। ঠাকুর যেমন ভাবে জ্ঞানীর বর্ণনা দিচ্ছেন, হাত কেটে দর দর করে রক্ত বেরোচ্ছে, বলবে, কই আমার তো কিছু হয়নি।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম, দেহবোধ যাদের আছে, এদের দ্বারা আত্মজ্ঞানের সাধনা হয় না, খুব কষ্ট, অধিকতর ক্লেশ। আচার্য আবার এর সাথে নিজের থেকে যোগ করে বলছেন, *যদ্যপি মৎকর্মাদিপরাণাং ক্লেশঃ*, যারা আমাকে ভক্তি করে তাদেরও কষ্ট হয়। ঈশ্বর সাধনায় আপনার কষ্ট হচ্ছে না, কি করে আপনি সাধনা করছেন! স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের কথা বলেছিলাম, তিনি খুব সুন্দর বলছেন, সাধনার সময় তোমার সব কিছু ভাল চলছে, তাহলে বুঝবে সাধনায় তোমার কিছু গোলমাল আছে। সাধনা করা মানেই, অনেক রকম ঝামেলা ঝঞ্ঝাট আসবে; এই মন খারাপ হবে, এই অবসাদ আসবে, আর একটার পর একটা দুঃখ, ঝামেলা আসতেই থাকবে, কিছু না কিছু সমস্যা থাকবেই, শান্তিতে থাকতে দেবে না। আচার্য তাই বলছেন, যাঁরা আমার ভক্তি করেন তাঁদেরও অনেক ক্লেশ। তবে *এব ক্লেশঃ অধিকতরঃ তু অক্ষরাত্মনাং*, যাঁরা আমার অক্ষর রূপের উপাসনা করেন তাঁরা বেশি কষ্ট পান। কারণ আচার্য বলছেন, *দেহাভিমানপরিত্যাগনিমিত্তঃ*, দেহের অভিমান ত্যাগ করতে হয়। দেহের যদি একটু বোধ থাকে, তাহলে অক্ষর উপাসনা হবে না।

কিছু কিছু ধর্ম আছে কথায় কথায় বলবে, আমরা মূর্তি পূজা মানি না, আমরা অব্যক্তের উপাসনা করি। হায় রে! তোমরা করবে অব্যক্তোপসনা? ধর্ম যদি শিখতে হয় হিন্দুদের কাছেই শিখতে হবে। গ্রামের একজন হিন্দু তাদেরও ধর্মের জ্ঞান অন্যান্য ধর্মের পণ্ডিতদের থেকে অনেক বেশি। ব্রাহ্মণদের নামে যতই গালাগাল দেওয়া হোক, কিন্তু এটা সবাইকেই মানতে হবে, ব্রাহ্মণরা জনগনের মধ্যে ধর্মকে এমন ভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছেন যে, শাস্ত্রের উচ্চতম কথা গ্রামের সাধারণ লোক পর্যন্ত জানে।

আচার্য বলছেন, *অব্যক্তা হি যস্মাদ্ গতিঃ অক্ষরাত্মিকা দুঃখং সা দেহবদ্ভিঃ দেহাভিমানবদ্ভিঃ*, যারা *অক্ষারাত্মিকা*র যে অব্যক্ত গতি, যারা দেহাভিমান তাদের জন্য বড্ড কষ্টের। যেটা বলা হল, *যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধম্*, যদি শুদ্ধ জলের সাথে এক হতে হয়, তাহলে তাকেও শুদ্ধ হতে হবে। অক্ষরের সাথে যদি এক হতে হয়, তাহলে তাকেও অক্ষর হয়ে যেতে হবে। তার মানে দেহাভিমান, ইন্দ্রিয়ের অভিমান, সমস্ত ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু আপনার ভিতরেই যদি দেহাভিমান থাকে, আপনি কি করে অক্ষরের উপাসনা করবেন! সেইজন্য বলা হল, নিজের যে শক্তি, যেটা নিজের বৈশিষ্ট্য সেটার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। দুর্বলতার দিকে তাকাতে হবে না। যদি আমার বৈশিষ্ট্যটা কি জেনে নিতে পারি, তাহলে এটাও দেখতে পাব, হিন্দুরা আমার জন্যও একটা বিশেষ উপায় করে রেখেছেন। আমরা তো আর খ্রীশ্চান মুসলমানদের মত নই, ওই একটাই পথ আছে ওর মধ্যেই সবাইকে ফিট করতে হবে। আমাদের এখানে বিভিন্ন রকম পথ, বিভিন্ন রকম দেবীদেবতার কথা বলা আছে। আপনার মনের জন্য যেটা উপযুক্ত, সেটার জন্য ঠিক একটা উপযুক্ত উপায় ঠিক করা আছে।

ভক্তি এই কারণেই শ্রেষ্ঠ। অব্যক্ত উপাসনাতে বেশি খাটনি, বেশি কষ্ট। অব্যক্ত উপাসনার কথা বলার পর বলছেন, ভক্তের লক্ষণ, এই অধ্যায় ভক্তিযোগ কিনা তাই ভক্ত হতে গেলে কি কি গুণ থাকা দরকার সেটা জানা দরকার। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে মোটামুটি দশম অধ্যায় পর্যন্ত ভগবান যা যা বলেছিলেন, সেই কথাগুলো দিয়ে তিনি আমাদের অব্যক্ত উপাসনার দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তারপর কিছুটা দশম অধ্যায় আর একাদশ অধ্যায় থেকে তিনি আমাদের পুরোপুরি ভক্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। এবার বলবেন, এই ধরণের যাঁরা উপাসনা করেন, তাঁরা কেমন, ভক্ত কেমন হয়; এটাকে বলে ভক্ত লক্ষণ।

গীতার দ্বাদশ অধ্যায় শুরু হয়েছিল অর্জুনের প্রশ্ন দিয়ে – এই যে দুই প্রকার ভক্তের কথা আপনি বললেন; আপনি তাহলে আমাকে বলুন, আমি কোন পথ অবলম্বন করব, আমার জন্য কোন পথটা ঠিক। আমরাও সব সময় জানতে চাই কোনটা করলে ভাল হয়, কোনটা করা ঠিক নয়। বাজারে গেলে ঘুরে ঘুরে আমরা সবাই আনাজের দরদাম করি। আমরা এখানে ভক্তির যে

জিনিসটাকে নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি, এটাকে মাথায় রেখে পুরো জিনিসটাকে আরেক ভাবে দেখা যায়। এর আগে ভগবান বললেন, যারা দেহাভিমানী, দেহে যাদের আসক্তি আছে, যেমন আমরা সবাই দেহাভিমানী; দেহে আমাদের আসক্তি আছে; এদের জন্য অক্ষর উপাসনা নয়, অক্ষর উপাসনা এরা করতে পারবে না। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী খুব সুন্দর বলতেন, হরিদ্বারের ওদিকে যারা বেদান্তের উপর আলোচনা শুনতে যায়, তাদের যদি কিছু জিজ্ঞেস করা হয়, ক্যায়া ক্যায় বাত শুনা? কিছুই বলতে পারে না, শুধু একটা কথাই বলবে –বেদান্ত্ কি বড়ী বড়ী বাতে। বড়ী বড়ী বাতে হলে মনে হয় বিশেষ কিছু একটা শুনলাম। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। কারণ দেহে যদি এতটুকু আসক্তি থাকে, ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন, ছুঁচে সুতো পরাবার সময় সুতোর একটু আঁশ যদি বেরিয়ে থাকে ছুঁচে সুতো প্রবেশ করানো যাবে না। তার মানে, পুরো অনাসক্তি না থাকলে অব্যক্তোপাসনা করা যায় না। কিন্তু তারপরেই ভগবান বলছেন –

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।।৬।।

(হে পার্থ, কিন্তু যাঁরা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণপূর্বক 'আমিই পরম পুরুষার্থরূপে উপাস্য' –এইভাবে মৎপরায়ণ হয়ে অনন্য যোগের দ্বারা আমার উপাসনা ও ধ্যান করেন –)

শরীর মন পুরোটাই আমাতে দিয়ে রেখেছে। কিন্তু অন্য দিকে তার দেহবোধ আছে, 'আমি করছি' এই বোধ আছে; 'আমি ভক্ত, আমি ভক্তি করছি' এই বোধ আছে। এখানে অনেক কিছু আলোচনা করার আছে। যে কজন আমাদের এই আলোচনা নিয়মিত শুনছেন, তাঁদের সবাইকে আমি অনুরোধ করব, যাঁরা আপনারা শাস্ত্র পড়ছেন, যেটাই পড়ুন, ওটা মুখস্ত করে নিন। বিশেষ করে চল্লিশোর্ধ যাঁরা আছেন, তাঁরা যদি নিয়মিত মুখস্ত করতে থাকেন, এতে আপনাদের মন অনেক সতেজ থাকবে। দ্বিতীয় কথা, পঞ্চাশের পর সবারই কাজ করার ক্ষমতা অনেক কমে যায়, এই অবস্থায় শাস্ত্রের আবৃত্তিতে নিজেকে লাগিয়ে রাখলে অনেক ভাল। সবাই এসে জিজ্ঞেস করে ধ্যান কি করে করব, কিন্তু ধ্যান সবার জন্য নয়। এক একটা মনের জন্য এক একটা পথ, হিন্দু ধর্মের এটাই বৈশিষ্ট্য; যেমন মন তেমনটা পথ। আপনাদের জন্য ধ্যান নয়।

ঠাকুর বলছেন, সন্ধ্যে হলে হাততালি দিয়ে হরিনাম করতে হয়। শাস্ত্রের আবৃত্তি করাটা হরিনাম করাই। দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বাদশ অধ্যায়, পঞ্চোদশ অধ্যায় এই অধ্যায়গুলো রোজ আবৃত্তি করতে হয়। সম্ভব হলে পুরো গীতার পারায়ণ করা। প্রথম থেকে অভ্যাস যদি না থাকে ধর্মকার্য করা যায় না। ধর্মের কথা শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু ঠিক ঠিক ধর্মকার্যে নামতে গেলে দেখা যাবে কিছু করা যাচ্ছে না। সেইজন্য প্রথমে দরকার পারায়ণ, পারায়ণ মানে, একটা দিন ঠিক করে নেওয়া হল, এই দিন সকালবেলা স্নান করে গীতা পাঠ শুরু করলাম, প্রথম অধ্যায় পাঠ করা হল, তারপর দ্বিতীয় অধ্যায়, পারলে তৃতীয় অধ্যায়ও পাঠ করা হল। যেখানে থেমে যাওয়া হল, পরের দিন সেখান থেকে আবার শুরু করা, তার মানে দ্বিতীয় দিন চতুর্থ অধ্যায় থেকে শুরু হবে। এইভাবে আঠারোটি অধ্যায় পুরো পাঠ করে যেতে হবে। অষ্টাদশ অধ্যায় যেদিন শেষ হয়ে গেল, পরের দিন থেকে আবার প্রথম অধ্যায় থেকে শুরু হবে, এটাকে বলে পারায়ণ। সারা জীবন এই পারায়ণ করে যেতে হবে। বাড়ির লোকেদের বলে দিতে হয়, আমি আজ থেকে ধর্মসাধন করব, আমার আধ ঘন্টা লাগবে।

কোন কোন গীতাতে মূল অধ্যায়ের আগে কিছু কিছু শ্লোক থাকে, গীতা পাঠের আগে করার জন্য। এগুলো করলে ভাল, না করলেও ভাল, কোন অসুবিধা নেই। বিধি-নিষেধ এক একজন আচার্য এক এক রকম বলেন, এগুলো এমন কিছু না। আমি সরাসরি পাঠ করতে শুরু করে দিই, আজ পর্যন্ত আগে কোন দিন কিছু পাঠ করিনি। জীবনে একটা কিছু করতে শুরু করুন। যত দিন বেঁচে আছেন তত দিন নিয়মিত ভাবে পারায়ণ করে যেতে হবে। কিছু কিছু মন্ত্র বা শ্লোক আছে যেটা নিত্য

পাঠের জন্য নির্দিষ্ট করা। যেমন বেদের অনেক শক্তিশালী মন্ত্র আছে, চণ্ডীর প্রথম অধ্যায়, চতুর্থ অধ্যায়, পঞ্চম ও একাদশ অধ্যায় এগুলোও নিত্য পাঠের জন্য। তার সাথে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়, পুরোটা না পারলে স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণ এবং দ্বাদশ অধ্যায়, দ্বাদশ অধ্যায় খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর পঞ্চোদশ অধ্যায়কে তো ভগবান শাস্ত্র বলছেন, এই একটি অধ্যায়, মাত্র কুড়িটি শ্লোক, সেটাকে ভগবান বলছেন শাস্ত্র। নিজের মত ঠিক করে নিতে হবে, যেটা আপনার ভাল লাগে। এখানে কোন বিধি-নিষেধ নেই, সব ঠাকুরেরই কথা। এগুলো নিয়মিত করলে মন ভাল থাকবে, চঞ্চল মন নিয়ন্ত্রিত হবে, লোকেদের সাথে বেশি কথাবার্তা বলতে ইচ্ছে হবে না। সবচেয়ে বড় কথা, এই যে আমরা শাস্ত্রের আলোচনা করছি, এগুলো বুঝতে পারবেন।

ঠাকুর বলছেন, একসের ঘটিতে কি তিন সের দুধ ধরে। আমার আপনার মন এইটুকু ছোট্ট মন, ওর মধ্যে ঢালতে থাকলে উপছে পড়ে যাবে। পাত্রতা বাড়াতে হয়, পাত্রের যে ধারণ করার ক্ষমতা, ওটাকে বাড়াতে হয়। নিয়মিত ভাবে শাস্ত্র মুখস্ত করতে থাকলে পাত্রের ধারণ ক্ষমতাটা বাড়ে। নিরন্তর আবৃত্তি করতে থাকলে মনের ক্ষমতা বাড়ে। ছয় মাস নিয়মিত শাস্ত্রাদি আবৃত্তি করে দেখুন, দেখবেন মনের ক্ষমতা বাড়তে শুরু হয়ে গেছে, সবচেয়ে বড়, এই শ্লোকগুলিতে শাস্ত্র কি বলতে চাইছেন, এটা বুঝতে পারবেন।

আমাদের শাস্ত্র বলছেন, দুই প্রকার ভাব হয় – মর্কট ভাব আর মার্জার ভাব। ঠাকুরও এই দুটো ভাবের কথা অনেকবার বলেছেন, এটা আমাদের শাস্ত্রেই আছে। বৈধী ভক্তি মানে, আমাকে এতটা জপ করতে হবে, এতটা ধ্যান করতে হবে, এতটা শাস্ত্র পাঠ করতে হবে। তারপর আছে, ঈশ্বরের ভালবাসা চাই, তার জন্য আমি এটা করব, সেটা করব –এটাকে বলে মর্কট। মার্জার ভাব হল, বেড়াল ছানাকে তার মা যেখানে রাখছে সেখানেই সে পড়ে থাকবে। দু মাস, তিন মাসের শিশুকে মা যেমন ভাবে রাখে তেমন ভাবেই থাকে, যা খাওয়ায় তাই খায় আর কেবল মিউ মিউ করতে জানে, আর কিছু জানে না। এই মার্জার ভাব সাধকদের জন্য খুব উচ্চ অবস্থা, সহজে এই ভাব হয় না। আমরাও মাঝে মাঝে মর্কট ভাব আর মার্জার ভাব, এই দুটোর মধ্যে চলতে থাকি। বানরের বাচ্চা মাকে ধরে রাখে, বেড়াল ছানাকে তার মা ধরে রাখে, নিজেকে অসহায় ভেবে সব সময় মায়ের উপর নির্ভর করে থাকে। সারাটা জীবন আমাদের এভাবেই চলতে থাকবে। নিজের তরফ থেকে অনেক রকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, আবার তার সাথে অনেক সময় অসহায় হয়ে সব ঠাকুরের উপর ছেড়ে দিই, ঠাকুর যা করার করবেন, ঠাকুরের ইচ্ছা।

আমাদের একজন সিনিয়র মহারাজ ছিলেন, দক্ষিণ ভারতীয় ছিলেন, ওনার সঙ্গ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। তিনি যখন বেলুড় মঠে ছিলেন, সেই সময় আমিও মঠে ছিলাম। উনি আমাকে বলতেন, কম বয়সে আমরা সবাই সাধারণ ভাবে মর্কট ভাবটাই সব সময় রাখি। কিন্তু যখন বয়স হয়ে যায়, তখন বুঝি চেষ্টা দিয়ে কিছু হয় না, পুরোপুরি শ্রীশ্রীমায়ের শরণাগতি, এছাড়া হয় না। আমরা এখন যে শ্লোকের আলোচনা করছি, এর পুরোটাই শরণাগতিকে নিয়ে।

আগেকার দিনে ভারতবর্ষে অনেক রাজারা ছিলেন। শত্রু কোন রাজ্যকে আক্রমণ করল, রাজা পরাজিত হয়ে গেল। সেই পরাজিত রাজা তখন অন্য কোন রাজার কাছে গিয়ে শরণ নিত। শরণ নেওয়ার সময় নিজের তলোয়ার বার করে বলবে, 'এই যে মহাশয়, আমি আপনার শরণ নিতে এসেছি'। এই ভাবে কি কেউ শরণ নেয়? না, শরণ নিতে এসে রাজমুকুট খুলে নিজের সব কিছু সেই রাজার পায়ে রেখে দেয় –আপনি আমায় রক্ষা করুন। সেই রাজা ইচ্ছে করলে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে পারে, 'আরে! এ কি বলছেন, আমরা বন্ধু। আপনি সসম্মানে এখানে থাকুন'। ভক্তিতে ঠিক তাই হয়। একটুও যদি অহঙ্কার থাকে, শরণাগতি হয় না। আমরা মুখে শরণাগতির

কথা বলি, ঠাকুর দেখবেন, মা দেখবেন, বলি ঠিকই – এভাবে ভক্তি বা শরণাগতি হয় না। আমিত্ব ভাব, অহঙ্কার পুরোপুরি ত্যাগ করে দিতে হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের কাছে একবার একজন ভক্ত মহিলা খুব সেজেগুজে এলেন। বাড়িতে স্বামীর খুব কঠিন অসুখ, কিন্তু খুব সেজেগুজে এসেছেন। মা দেখে খুব বিরক্ত হয়ে গেলেন। মা বলছেন, তার স্বামী বাঁচবে কি বাঁচবে না কোন ঠিক নেই, আর সে কিনা এভাবে সেজেগুজে এসেছে? আরেক দিন একজন বিদেশীনি এসেছেন, তাঁর মেয়ের খুব অসুখ। তিনি একেবারে অন্য ভাব নিয়ে এসেছেন, আমি অসহায়।

বাড়িতে প্রিয়জনের খুব অসুখ, এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক সব রকম চিকিৎসা করা হয়ে গেছে, আর কোন চিকিৎসার বাকি নেই। অসহায় হয়ে সে ঠাকুরের কাছে আর্তি জানাচ্ছে। ঠাকুর কি করবেন, আমরা কিছু জানি না। এটাই শরণাগতি। এই শরণাগতি কিভাবে হয় এখানে পরপর বলবেন। যেখানে শরণাগতি হয় সেখানে আর কোন উপায় থাকে না, বুঝে গেছেন আমার আর কোন পথ নেই, আমি শেষ। ওখানে যে কোন শর্ত লাগানো হবে, তাও নেই। আমরা যখন কোন সম্পর্ক তৈরী করি, সেখানে তখন অনেক শর্ত থাকে, আমি এটা দিলাম, তুমি এটা দিলে। কিন্তু শরণাগতিতে কি হয়, আমি বুঝে গেছি আমি শেষ, আমার আর কোন রাস্তা নেই। সন্ন্যাসীদের শরণাগতির কথা বলতে গিয়ে ঠাকুর বলছেন, সন্ন্যাসী তালগাছ থেকে পড়বে, হাত পা পর্যন্ত নড়বে না। খুব কঠিন, ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। কারণ আমরা প্রথম পা'টা নিইনি, যদি প্রথম পা নেওয়া হয়, এবং একটু একটু করে এগোতে শুরু করি, তখন বোঝা যায় এটা আমরা পারব কি পারব না।

আমিত্ব যদি একটুও থাকে শরণাগতি হবে না। ঠাকুরের খুব সুন্দর গল্প আছে, বৈকুণ্ঠ থেকে নারায়ণ দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন, কিছুক্ষণ পর তিনি আবার ফিরে এলেন। মা লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার'? 'না, আমার এক ভক্ত আমার নাম করতে করতে যেতে গিয়ে ধোপারা কাপড় শুকোতে দিয়েছিল, সেগুলো মাড়িয়ে চলে যাচ্ছিল। ধোপারা তাকে মারার জন্য দৌড়ে এসেছে, ভক্তকে রক্ষা করার জন্য যাচ্ছিলাম'। 'তাহলে ফিরে এলেন কেন'? 'দেখলাম ভক্তও ধোপাদের মারার জন্য একটা পাথর তুলে নিয়েছে'। এগুলো কাহিনী, কাহিনীর মাধ্যমে একটা তত্ত্ব দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে খুব উচ্চমানের ভক্তির কথা বলা হচ্ছে। যতই উচ্চমানের হোক না কেন, এটা জানবেন, আমাদের সবাইকে এই অবস্থা দিয়েই যেতে হবে। আজ না হোক কাল, কাল না হোক পরের জন্মে, এই অবস্থার মধ্য দিয়ে সবাইকে যেতে হবে। গীতার শুরুতে আচার্যের একটা ভূমিকা ছিল, সেখানে আচার্য বলছেন, সাধক দুই প্রকার –এক যাঁরা নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম নিয়েছেন, যাঁরা সমস্ত কিছু ত্যাগ করে দিয়েছেন, তাঁরাই অক্ষর উপাসক। দ্বিতীয়, অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলবেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*, ধর্ম এখানে ভাল মন্দ সব মিলিয়ে, তার মানে মনের যত রকম বৃত্তি আছে, সমস্ত কিছু ত্যাগ করে তুমি আমার শরণে এসো। যেখানে একটা দায়ীত্ব বোধ আছে, আমাকে এটা করতে হবে, সমস্ত দায়ীত্ব বোধ ছেড়ে দিয়ে তুমি আমার শরণে এসো।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষে ভগবান যেটা বলছেন, সমস্ত কিছু ছেড়ে তুমি আমার শরণাগতি নাও, আর এখানে দ্বাদশ অধ্যায়ে বলছেন, *যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ*। এখানে ভক্তির আলোচনা করছেন, এই অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ, কিন্তু এখানে জপধ্যানের কথা বলছেন না। নারদীয় ভক্তিসূত্রে, ভাগবতে ভক্তির প্রসঙ্গে জপধ্যান, তীর্থাদির কথা আসে, কিন্তু এখানে ভগবান কর্মের কথা বলছেন। আচার্য শঙ্কর ছাড়া গীতার বক্তব্য বোঝা সম্ভব না, আচার্য ঠিক এই জিনিসটাই বলছেন। মানুষের মনে দুই প্রকার প্রবৃত্তি খেলা করে –একটা কাজের দিকে প্রবৃত্তি আর-একটা কাজ থেকে সরে এসেছে। কিছু মানুষের ভিতর দায়ীত্ব বোধ আছে, আবার কিছু মানুষ আছে, যে সমস্ত দায়ীত্ব বোধ ছেড়ে দিয়েছেন। যখন ধর্মের কথা আসে, আধ্যাত্মিক ভাবের কথা আসে, সেখানে এই

যে দুটো শ্রেণী, যেখানে সব কিছু ত্যাগ করা হয় আর সমস্ত কর্ম ঈশ্বরের উপর অর্পণ করে দেওয়া হল, এই দুটো ছাড়া তৃতীয় কোন পথ হয় না। এখানে গৃহবধূই হন আর সন্ন্যাসীই হন, সবাই সমান, এখানে কেউ বড়, কেউ ছোট না। কাজে বড় ছোট হওয়াটা সামাজিক ব্যাপার, এর সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।

মৎপরঃ এই শব্দটা গীতাতে অনেকবার আসে। আচার্য *মৎপরঃ* শব্দের অর্থ বলছেন, *অহং পরো যেষাং তে মৎপরঃ*, যে জানে আমি শ্রীকৃষ্ণ তার পরমগতি। শ্রীকৃষ্ণ মানে ঈশ্বর। ইদানিং কালে কিছু কিছু সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণই ভগবান, এই ধরণের বিচিত্র বিচিত্র কথা বলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতার ছিলেন না, সেই সময় তাহলে ভগবান কে ছিলেন, তাহলে বলতে হয় সেই সময় কোন ভগবান ছিল না; সব উদ্ভট উদ্ভট কথা। যিনি ভগবান তিনিই শ্রীকৃষ্ণ হয়ে এসেছেন। যিনি ভগবান তিনিই শ্রীরাম হয়ে এসেছেন। যিনি ভগবান তিনিই কপিল মুনি এবং আরও বিভিন্ন অবতার হয়ে এসেছেন। একটা সম্প্রদায়ের দিক থেকে বলছে ঠিক আছে, কিন্তু হিন্দু ধর্মের দিক থেকে 'শ্রীকৃষ্ণই ভগবান' অত্যন্ত বোকা বোকা কথা। শ্রীকৃষ্ণই ভগবান, এই কথাগুলো যে শুধু ভুল বলছেন তা না, অত্যন্ত অন্যায় করেন। এখানে *মৎ* বলতে ঈশ্বর, যে জানে ঈশ্বরই আমার গতি। আচার্য যেমন আগে বলেছিলেন, যে সেবক সেও জানে মৃত্যুর পর আমার যিনি মালিক, তার সাথে থাকব না। সেও জানে মৃত্যুর পর আমিও স্বর্গে যাব, আমার মালিকও স্বর্গে যাবে, কিন্তু ঈশ্বরই একমাত্র সবারই পরমগতি; ঈশ্বর বাদে কেউ পরমগতি নেই।

কাজ হল এই বোধটাকে সব সময় জাগিয়ে রাখা। এই বোধ যদি কারুর না জেগে থাকে, তাহলে ধর্মজীবন তার জন্য নয়। মৃত্যুর পর আমি কোথায় যাব, এই বোধটা যদি না জেগে থাকে, ধর্মজীবন হয় না। আমি এখান থেকে তীর্থ দর্শনে হরিদ্বার যাচ্ছি, আমার সাথে সন্তানরা আছে। লক্ষ্ণৌতে গিয়ে বাচ্চারা বলল, বাবা চলো আমরা এখানে নেমে যাই, লক্ষ্ণৌ শহরটা দেখব। এভাবে তীর্থ দর্শন হয় না। গন্তব্য হরিদ্বার, আমাকে আগে হরিদ্বার পৌঁছাতে হবে। উদ্দেশ্য ঈশ্বরপ্রাপ্তি, কারণ তিনিই সবার পরমগতি, তখন যত কাজ হবে, যা কিছু হবে, মাথায় সব সময় থাকবে, এই কাজ ঈশ্বরের জন্যই করছি। *যে তু সর্বাণি কর্মাণি*, যা কিছু করছি সব ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই করা হচ্ছে।

আমরা গ্রামে বড় হয়েছি, গ্রামে ছোটবেলা দেখতাম, কেউ একটা হাঁচি দিল, দেওয়ার পরেই বলবে রাম রাম। আমাদের হাসি পেয়ে যেত। এটাই হিন্দু ধর্ম, একটা হাঁচি দিচ্ছে তাতেও রাম রাম বলছে বা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলছে। স্নান করার সময় গঙ্গায় ডুব দিচ্ছে তখনও বলছে, হর হর গঙ্গে। ঈশ্বরকে সব সময় মনে রাখা, এই যে স্নান করছে তখনও ঈশ্বরকে স্মরণ করছে। ইদানিং বাথরুমে স্নান করার সময় সবাই সিনেমার গান করে করে স্নান করে। ঈশ্বরই যে আমার পরমগতি এই বোধটা এখন কেউ জাগিয়ে রাখতে পারছে না, তাই চারিদিকে আজ এত অশান্তি।

ময়ি সংন্যস্য, সব কর্ম, কর্মের ফল আমার উপর সমর্পণ করে দিচ্ছে। মায়েরা যখন বাড়িতে রান্না করছেন, তখন যিনি তাঁর ইষ্ট, রান্নাটা তাঁর জন্য করছেন। বাকিরা প্রসাদ গ্রহণ করছেন। আপনারা এই জিনিসটা না মানেন তো কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু নিজে মনের মধ্যে এই ভাবটা জাগিয়ে রাখতে তো আপনার কোন অসুবিধা নেই। যা কিছু করা হচ্ছে, ঘর পরিষ্কার করছেন, বিছানার চাদর পাল্টাচ্ছেন, সব কাজে এই ভাব। একদিকে সব কর্ম করে যাচ্ছেন, আরেক দিকে এই ভাব –তিনি হলেন আমার পরমগতি। *অনন্যনৈব যোগেন*, এই যে ভগবান, যিনি এই বিশ্বরূপ, এনার বাদে আমার আর কোন অবলম্বন নেই।

আমার এক বন্ধু, কলেজে আমরা একসাথে ছিলাম, দিল্লীতে এখন সে বিরাট বড় একজন ব্যবসায়ী, কিছু না হোক প্রায় হাজার কোটি টাকার মালিক। করোনার সময় বন্ধুটি মাঝে মাঝে

আমার খবর নিত, আমি বেঁচে আছি কিনা। সেই সময় আমার সাথে একদিন কথা হচ্ছিল, বন্ধু বলছিল, এই যে এত করোনার সমস্যা, আমরা বাচ্চা বয়স থেকে শুনতাম, মহামারী যখন আসে তখন কোন কিছুই কাজ দেয় না। বলছেন, এখন চোখের সামনে দেখছি, টাকা-পয়সা, মান সম্মান, যোগাযোগ কোনটাই কাজ করছে না, চোখের সামনে দেখছি লোকগুলো ছটফট করতে করতে মরে যাচ্ছে। সবই করা হচ্ছে, হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, অক্সিজেনও দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তাও কিছু করা যাচ্ছে না। যাঁরা ভক্ত তাঁরা আগে থেকেই জানেন, তাঁরা জানেন ঈশ্বর ছাড়া কেউ নেই। তাহলে কি আমরা কেউ চিকিৎসা করাব না? চিকিৎসা কেন করাবেন না, চিকিৎসা ব্যবস্থাটাও তো ভগবানই দিয়ে রেখেছেন। ওষুধ, অক্সিজেন, ডাক্তার, নার্স সব ভগবানই ব্যবস্থা করে রেখেছেন। ডাক্তার, নার্স, হাসপাতাল, ওষুধ এগুলো কি ভগবানের বাইরে; এরাও ঈশ্বরেরই রূপ।

বেলুড় মঠের বাইরে একটা ওষুধের দোকানে একবার একটা ওষুধ কিনতে গিয়েছিলাম, ওষুধের দোকানে আমাকে দেখে এক ভদ্রলোক বলছে, 'আরে মহাত্মা! আপকো ভী দাওয়াই লাগতি হ্যায়'? বললাম, 'পাপীতাপীদের সঙ্গ করতে হয় কিনা, তাই ওষুধ লাগে'। সন্ন্যাসীর শরীর কি মোষের শরীর না গণ্ডারের শরীর যে, ওষুধ লাগবে না। এমনিতেই সাধুদের শরীর আরও নরম হয়, একটুতেই শরীর খারাপ হয়। সবাই ঈশ্বরেরই রূপ, কিন্তু পরমগতি হলেন সেই ঈশ্বর। কিন্তু এই বোধটা যেন থাকে, ডাক্তার নারায়ণ রুগী নারায়ণের চিকিৎসা করছেন, কিন্তু যিনি আসল নারায়ণ, তিনি হলেন আমার পরমগতি। *মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে,* আমার ভক্ত এই বোধটা রেখে আমার উপাসনা করেন, আমার চিন্তন করেন আর আমার ধ্যান করেন। সমস্ত কর্ম ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে; আর এই জেনে যে তিনি আমার পরমগতি, এখানেও অন্য কোন অবলম্বন নেই।

একটি শ্লোকের মধ্যে কতকগুলি কথা বলছেন –কর্মের কথা বলছেন, পরমগতির কথা বলছেন, মৃত্যুর পর কি হবে সেটার কথা বলে দিচ্ছেন, আর এই জগতে আমরা কিভাবে থাকব, সেটা বলে দিচ্ছেন, তার সাথে উপাসনার কথা বলছেন। চিন্তন সব সময় করে যেতে হবে। নিয়মিত চিন্তন যদি না করা হয়, দিনে দুবার তিনবার যদি না করা হয়, তাহলে মনে করব যে কাজের সময় ঈশ্বরকে মনে রাখব, এটা সম্ভব হবে না। সেইজন্য প্রথম থেকেই কিছু করা শুরু করতে হয়, ধরেই আশি বছরে গিয়ে এভাবে উপাসনা করব, তা কখনই সম্ভব না। ইংলিশে বলে, It is never late to begin। যেখানে আছেন সেখান থেকেই শুরু করে দিন। সকাল সন্ধ্যা, পারলে দুপুরে রাত্রিতে একটু ঠাকুরের নাম, একটু ঠাকুরের ধ্যান করলেন। একবার ঈশ্বর নামের অমৃতরসের আস্বাদ কেউ যদি পেয়ে যান, বাকি সব কিছু তাঁর কাছে আলুনি লাগতে শুরু হয়ে যাবে।

গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের এই ছয় নম্বর শ্লোক একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক, এটাই হিন্দু ধর্মের সাধনাবিধি ও জীবনবিধি। কয়েকটা জিনিস এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে। প্রথম, সমস্ত কর্ম ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করা; দ্বিতীয় ঈশ্বর, তিনি আমার পরমগতি এই ভাব; তৃতীয়, ঈশ্বর ছাড়া আমার অন্য কোন অবলম্বন নেই আর চতুর্থ, ধ্যান ও উপাসনা। এই চারটে জিনিস রোজ করতে হয়। যতটুকু পারা যায় ততটুকুই করুন, একদিন করুন, দু দিন করুন, সাত দিন করুন, এক মাস করুন, যতটুকু পারেন করুন, জীবন ধন্য হয়ে যাবে। ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে চল্লিশ নম্বর শ্লোকে বলেছিলেন, *নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে,* যেটুকু করা হল এটা যে নাশ হয়ে যাবে তা না, এটা না করলে যে পাপ হবে তাও না, যতটুকু করা যাবে ততটাই লাভ। এ হল অমৃত বীজ, এ ফল দেবেই, কোন দিন এর নাশ হবে না। চাষ করার সময় বীজ দেওয়া হল, এরপর যদি জল না দেওয়া হয়, সার না দেওয়া হয়, বীজগুলো শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এগুলো অমৃত বীজ এর কোন দিন নাশ হবে না।

একটা দিন অন্তত করে দেখুন, আজকের গীতার ক্লাশে শুনেছি –প্রথম, যা কিছু করব সব ঈশ্বরের উদ্দেশ্য করব এবং ঈশ্বরকে সব ফল সমর্পণ করব। প্রত্যকে দু-ঘন্টা পর এক মিনিট অপেক্ষা করে দু ঘন্টায় কি কি করলাম মনে মনে ভেবে নিয়ে বলব, হে ঠাকুর তোমাকে এই কর্মের ফল অর্পণ করলাম। সেই সময় নিজেকে এটাও মনে করিয়ে দেওয়া, আহা মৃত্যুর পর আমি তাঁর কাছেই যাব। দ্বিতীয়, বাড়িতে সবাই আছে, ছেলে আছে, পুত্রবধূ আছে, স্ত্রী আছে, স্বামী আছে, বাবা আছে, মা আছে; কিন্তু ঈশ্বর ছাড়া আমার রক্ষা করার কেউ নেই। এর সাথে মনে মনে ঈশ্বরের চিন্তন চলছে। এভাবে কয়েক দিন করার পর দেখবেন নিজেকে কত হাল্কা লাগবে, বাইরে যাই হোক ভিতরটা যেন শান্তিতে ভরে আছে। যদি এই রকম করে তখন কি হয়? এই ধরণের ভক্ত যদি কেউ হতে পারে, তার কি পরিণতি হবে?

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্।।৭।।

(এই ধরণের ভক্ত, যাঁরা মৎপরায়ণ হয়ে অনন্য যোগের দ্বারা আমার উপাসনা ও ধ্যান করেন, মদ্গতচিত্ত সেই সকল ভক্তকে আমি মৃত্যুময় সংসারসাগর থেকে অচিরে উদ্ধার করি।)

সাত নম্বর শ্লোক হল ভক্তের কাছে ভগবানের অঙ্গীকার। ভক্তের ভগবান ভক্তের জন্য কি করেন? একটা বিশেষ কারণে এই শ্লোকটা আমার খুব ভাল লাগে। আমাদের খুব পণ্ডিত মহারাজ ছিলেন, ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত, তিনি হলেন শ্রীমৎ স্বামী ধীরেশানন্দজী মহারাজ। দেওঘরের আমরা কয়েকজন যে সময় নূতন ব্রহ্মচারী হয়েছিলাম, মহারাজ সেই সময় কঙ্খলে থাকতেন। এক সময় উনি দেওঘরে ছিলেন, সেইজন্য মাঝে মাঝে দেওঘর আসতেন। খুব উচ্চমানের সাধু ছিলেন, আমরা তখন তাঁকে জানতামও না, বড়দের কাছে তাঁর কথা শুনতাম। রামকৃষ্ণ মিশনে আমাদের যে সন্ন্যাস দেওয়া হয়, তার অনেকগুলো ধাপ আছে। সাদা কাপড়ে নয় বছর থাকতে হয়। সেখানেও কয়েকটা ধাপ আছে, কিছু দিন থাকার পর মস্তক মুণ্ডন হয়, আর টিকি রাখা হয়। কপাল এমন, মহারাজ যখন এসেছিলেন, তার কয়েকদিন আগেই আমার প্রথম মুণ্ডন হয়। মহারাজ আমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছেন এর প্রথম মুণ্ডন হয়েছে। আমাদের বড় মহারাজ পরিচয় করালেন। আমিও মহারাজকে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করেছি। প্রণাম করার পর উঠতে গেছি, মহারাজ আমার টিকিটা মুঠো করে ধরে টেনে তুলছেন আর খুব মিষ্টি করে বলছেন, *তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ*। সাধুরা এমনিতেই মজা করেন। তারপর বলছেন, 'দেখো, টিকি হয়ে গেছে, ভগবান এই টিকি ধরে সংসারসাগর থেকে তুলে নেন'। উনি যেই বললেন, *তেষামহং সমুদ্ধর্তা*, তখনই আমার মনে এই শ্লোকটা গেঁথে গেল। তখনও আমার দ্বাদশ অধ্যায় মুখস্ত হয়নি। তারপর থেকে যখনই এই শ্লোকটা আসে আমার এই স্মৃতিটা তখন আমার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে, খুব মিষ্টি লাগে। আমার তখন একুশ বাইশ বছর, আর এত সিনিয়র সম্মানের মহারাজ, তিনি আমার টিকি ধরে বলছেন, *তেষামহং সমুদ্ধর্তা*।

সমুদ্ধর্তা শব্দের অর্থ হয়, যিনি উদ্ধার করেন। ছয় নম্বর শ্লোকে যে ভক্তের বর্ণনা করা হয়েছে, সেই ধরণের ভক্তকে ভগবান কি করেন, সাত নম্বর শ্লোকে সেটা বলছেন। বলছেন, এই ধরণের ভক্তকে ভগবান মুণ্ডুটা ধরে তাকে মৃত্যু আর সংসারের মাঝে যে বৈতরণী নদী আছে, সেই নদী পার করিয়ে দেন। আসলে মানুষ মৃত্যুকে সহজ ভাবে নিতে পারে না। পুরো হিন্দী বেল্টে অনেকেরই রামচরিতমানস পুরোটা মুখস্ত। আপনি একটা ধর্মের কথা তাদের বলতে যান, রামচরিতমানস থেকে আপনাকে তিনটে তত্ত্ব কথা শুনিয়ে দেবে। কিন্তু ভিতরে যে তত্ত্ব প্রবেশ করবে, সেটা আর করে না। সেইজন্য আমাদের ঋষিরা বেদের সত্যগুলি, উপনিষদের সত্যগুলিকে কাহিনীতে পাল্টে দিলেন। জন্মমৃত্যুর চক্রের কথা বললে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না, সেইজন্য এনারা কাহিনী নিয়ে এলেন, মৃত্যুর পর বৈতরণী নদী পার করতে হয়। বৈতরণী নদীরই কত বিচিত্র বর্ণনা,

সেটাতে গিয়ে আমাদের কাজ নেই। আর বলা হয়, ওই নদীর মধ্যে মানুষ হাবুডুবু খেতে থাকে। ভগবান সেখান থেকে তাকে তুলে বার করে আনেন। এগুলো পৌরাণিক কথা, আর এগুলোই আমাদের জনমানসে ঢুকে গেছে ঠিকই, কিন্তু বক্তব্যটা হল –*পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্*, জন্ম হচ্ছে, মৃত্যু হচ্ছে, আবার জননীর গর্ভে দশ মাস গর্ভবাস করার পর আবার সেই জন্ম আবার সেই অ আ ক খ শেখা, এই চক্র চলতেই থাকবে। আচার্য বলছেন, *কৃপয়া পারে পাহি মুরারে*, হে কৃষ্ণ, হে ভগবান, তুমিই আমাকে এর থেকে বার করে আনতে পার।

আমাদের বিশ্বাস, মৃত্যুর পর ঠাকুর এসে আমাদের রামকৃষ্ণলোকে নিয়ে যাবেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণলোকে বসে নরেনকে বলছেন, নরেন একটা লিস্ট তৈরী করে নে, কাকে কাকে নেওয়ার জন্য আমাকে পৃথিবীলোকে যেতে হবে। নরেন লিস্টা বানাতে বসে দেখছেন, *যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ*, কে কে আছে। কারণ ভগবান আইনের এদিক সেদিক করবেন না, তিনি যে আইনটা দিয়েছেন, সেই আইনকে তিনিও পাল্টাবেন না। তোমার সমস্ত কর্ম কি ঈশ্বরের উপরে দেওয়া? মৃত্যুর পর ঈশ্বরই তোমার পরমগতি, এটাতে কি তোমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে? যদি বিশ্বাস থাকে, তাহলে সেই রকম কাজ করছ কি? ঈশ্বর বই তোমার কোন অবলম্বন নেই, এটাকে বিশ্বাস করে তুমি সেই অনুসারে আচরণ করছ? আর চিন্তন মনন সব সময় ঈশ্বরেরই করছ কি? তারপর ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন, হ্যাঁরে নরেন কজন হল? নরেন বলছেন, খাতা এখনও ফাঁকাই আছে। এগুলো আমরা মজা করে বলছি ঠিকই, কিন্তু এটাই সত্য। যমালয়ে চিত্রগুপ্ত সব হিসাব রাখেন, যমরাজ চাইলেই চিত্রগুপ্ত সব হিসেব দিয়ে দিতেন। যমরাজ জিজ্ঞেস করবেন, হে চিত্রগুপ্ত বলো, সব ভগবান বিষ্ণুকে জানাতে হবে, কাকে কাকে নিয়ে আসার জন্য ভগবান বিষ্ণুকে নামতে হবে। চিত্রগুপ্ত বলছেন, খাতা এখনও ফাঁকা, এই চারটে শর্ত কেউই পূরণ করছে না। যমরাজ বললেন, ঠিক আছে, তাহলে আমার লোকেরাই যাবে নিয়ে আসতে।

মহাভারতে সত্যবান সাবিত্রীর কাহিনী আছে। যমদূত সত্যবানকে নিতে পারল না। যমরাজকে নিজে আসতে হল। আর এই চারটে শর্ত যিনি করেছেন, তাঁকে নিতে যমরাজও আসতে পারবেন না, সেখানে ভগবানকে নিজে আসতে হয়। সাধারণ মানুষকে যমদূতরা এসে বেঁধে নিয়ে যায়। সচ্চরিত্র বা বিশেষ ভাল হলে, তাঁকে যমরাজ স্বয়ং এসে নিয়ে যান। কিন্তু ছয় নম্বর শ্লোকে যেটা বলা হয়েছে, সেটাকে যাঁরা জীবনে নামিয়েছেন, তাঁদের নিতে ভগবান নিজে আসেন। এটাই এই শ্লোকে বলছেন, *তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ*, তোমাকে আর জন্মমৃত্যুর চক্রে ঘুরতে হবে না।

আচার্য বলছেন, *তেষাং মদুপাসনৈকপরাণাম্ অহম্ ঈশ্বরঃ সমদ্ধুর্তা*, যিনি আমার উপাসনাতে পরায়ণ, তাঁকে আমি ঈশ্বর, নিজে এসে উদ্ধার করি। এখানে আচার্য শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, বলছেন ঈশ্বর উদ্ধার করেন, আমার আপনার যিনি ইষ্ট, তিনি উদ্ধার করেন। কৃষ্ণ উদ্ধার করেন, মা কালী উদ্ধার করেন, এগুলো বোকা বোকা কথা। ঈশ্বর, যিনি সচ্চিদানন্দ, যিনি শুদ্ধ চৈতন্য, কিন্তু ভক্তের যিনি ভগবান, তিনি এই শুদ্ধ চৈতন্য নন, তিনি হলেন করুণাসাগর, তিনি হলেন *সমুদ্ধর্তা*। এই জগতে আমাদের যে কষ্ট, সেই কষ্টেরও তিনি *সমুদ্ধর্তা* আর মৃত্যুর পর যে তিনি নিয়ে যাবেন, সেটারও *সমুদ্ধর্তা* এবং জন্মমৃত্যুর যে চক্র, এটারও তিনি *সমুদ্ধর্তা*। ভক্তের ভগবান, তিনি স্রষ্টা, তিনি সংহারক। নবম অধ্যায়ে ভগবান বলেছিলেন, *মাতা ধাতা পিতামহঃ*; তিনিই সব কিছু, এটা ভক্তের ভগবান। ভক্তের যে ভগবান, তিনিও কিন্তু সেই সচ্চিদানন্দ, যিনি ভক্তের জন্য স্বরূপ ধারণ করে আসেন। মহাবীর হনুমানের জন্য তিনি রাম রূপ ধারণ করবেন, সুদামার জন্য তিনি কৃষ্ণ রূপ ধারণ করবেন। রাধা, রুক্মিণীর জন্য তিনি কৃষ্ণ রূপ আবার সীতার জন্য তিনি রাম রূপ। আপনি যাঁকে ইষ্ট রূপে বরণ করে নিয়েছেন, আপনার উপাসনা যদি সেই রকম হয়, জীবন যদি এভাবে চলে থাকে তাহলে সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম আপনার জন্য সেই ইষ্টের রূপ ধারণ করে আসবেন।

মৃত্যুযুক্তঃ সংসারো মৃত্যসংসারঃ, এই সংসার হল মৃত্যুযুক্ত, *স এব সাগর ইব সাগরো দুরুত্তরত্বাদ,* সন্তরণ দ্বারা সমুদ্র লঙ্ঘন করা যেমন কঠিন, ঠিক তেমনি, এই যে মৃত্যুযুক্ত সংসার সাগর, এই সংসারকে পার করা অত্যন্ত কঠিন। আচার্য সত্যিই এত র‍্যাশানাল যে, কোন ডানদিক বামদিক নেই। আমাদের মনের ভিতর যদি একটু র‍্যাশানালিটির ভাব থেকে থাকে, যুক্তি দিয়ে যদি আমরা বোঝার চেষ্টা করি তখন আচার্যের কথাগুলো সত্যিই আমাদের কাছে খুব সুন্দর এবং যুক্তিযুক্ত মনে হবে। যেমন এখানে আচার্য বলছেন, *মৃত্যুযুক্তঃ সংসারঃ,* এই সংসারে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবি রূপে লেগে আছে। এই সংসারে একটাই যেটা নিশ্চিত তা হল মৃত্যু, মৃত্যু ছাড়া সংসারে অন্য কোন কিছুর নিশ্চয়তা নেই। সেইজন্য আচার্য বলছেন, সংসারটা মৃত্যুসংসার, আর এটা সাগরের মত, যার কোন কুলকিনারা পাওয়া যায় না। সাগরকে যেমন উত্তরণ করা যায় না, এই মৃত্যুসংসাররূপ সাগরকেও উত্তরণ করা যায় না। এইখানে দাঁড়িয়ে ভগবানের অঙ্গিকার, আচার্যের ভাষ্যে এইভাবে বলা হয়েছে –*তস্মাদ্ মৃত্যুসংসারসাগারদ্ অহং তেষাং সমুদ্ধর্তা,* আমিই আমার ভক্তকে এই মৃত্যুসংসারসাগর থেকে তুলে এনে উদ্ধার করি।

তার জন্য কতটা তাঁর ভক্তকে হাবুডুবু খেতে হয়? একেবারেই না, *ভবামি ন চিরাৎ, চির* মানে দেরী করা, আমি এক মুহুর্তও দেরী করি না, *ক্ষিপ্রম্ এব,* সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে মৃত্যুরূপ সাগর থেকে তুলে আনি। আমাদের মনে হতে পারে, অনেকক্ষণ হাবুডুবু খেতে থাকবে, ভগবান উপর থেকে দেখছেন কতক্ষণ হাবুডুবু খেল, যাক অনেক হাবুডুবু খাওয়া হয়েছে, চল এবার তোকে তুলে নিয়ে যাই; একেবারেই তা না, এক ক্ষণের জন্যও হাবুডুবু খেতে দেবেন না, সঙ্গে সঙ্গে ভগবান তুলে নিয়ে যান। এই হল, ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান। ভক্ত যদি ঠিক ঠিক ভক্তিতে থাকে, এখানে কিন্তু বলছেন না যে, ভক্তকে আমি খাওয়া-পরা দিই, এখানে এটাও বলছেন না যে, আমি আমার ভক্তকে রোগ-শোক থেকে উদ্ধার করি, এখানে বলছেন জন্মমৃত্যুর যে সাগর, এই সাগর থেকে আমি আমার ভক্তকে উদ্ধার করে আনি।

স্বামীজী ঠাকুরের স্তবে বলছেন, *মর্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্মিনাশং,* শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ এই মর্ত্যজগতে অমৃতস্বরূপ, কারণ ঠাকুরই হলেন মৃত্যুরূপ তরঙ্গ বিনাশকারী। ধর্ম আসলে এটার জন্যই। ভগবান যে কিছুই দেন না, তা নয়। হাজরা মশাই, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের বারান্দায় বসে থাকতেন, তিনি সবাইকে বলতেন, ঈশ্বর সবই দিতে পারেন, চাইলে তিনি টাকা-পয়সাও দিতে পারেন। ঠাকুর খুব রেগে যেতেন, বলতেন, হাজরা গত জন্মে কাঙালী ছিল, তাই কেবল টাকা টাকা করে। আমাদের মন অত্যন্ত সাধারণ মন কিনা, টাকা-পয়সা, দেহের চিন্তা, এর বাইরে আমরা কিছু ভাবতে পারি না।

ছয় ও সাত এই দুটি শ্লোক যদি বুঝে নেওয়া যায়, এই ভাবে আমাদের সাধনা করতে হয়, এই ভাবে জীবন যাপন করতে হয়, তখন গিয়ে ভগবান তাদের মৃত্যুরূপ সংসারসাগর থেকে উদ্ধার করেন। সেইজন্য হে অর্জুন, আপনার যাঁরা শুনছেন, আজকে যাঁরা শুনছেন, আগামী দিন যাঁরা শুনবেন, পরে পরে যাঁরা শুনবেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে ভগবান বলছেন –

মেয্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্ধ্বং ন সংশয়ঃ।।৮।।

(অতএব আমাতেই তুমি মন সমাহিত কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট করে। এই রকম করলে দেহান্তে তুমি নিশ্চয়ই মৎস্বরূপে স্থিতিলাভ করবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।)

ভগবান কথা দিচ্ছেন, ভগবনের কথার কোন খেলাপ হবে না। হে অর্জুন এই যে ছয় আর সাত নম্বর দুটি শ্লোক বলা হল, এই দুটো শ্লোককে তুমি মনে রাখবে। সেইজন্য আচার্য বলছেন, *ময়ি*

এব বিশ্বরূপে ঈশ্বরে, একাদশ অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করালেন, আমার এই বিশ্বরূপে, *মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকম্ আধৎস্ব স্থাপয়, ময়ি এব অধ্যাবসায়ং কুর্বতীং বুদ্ধিম্ আধৎস্ব নিবেশয়,* তোমার সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিক মনকে আমাতে স্থাপন কর; তোমার বুদ্ধির স্থৈর্য আমাতে স্থাপন কর; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত সব আমাতে ডুবিয়ে দাও। ঠাকুর বারবার বলছেন, ছোট্ট শিশু সে মা ছাড়া কিছু বোঝে না। ঠিক সেই রকম আমাদের মন, বুদ্ধি যা কিছু আছে সব ঈশ্বরে ডুবিয়ে দিতে হয়। এই ভালবাসাটা ঠিক ঠিক বোঝা যায় যেখানে প্রেমিক প্রেমিকার যে ভালবাসা হয় সেখানে তখন এক অপরকে নিজের আমিত্বটা দিয়ে দেয়, তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছু জানি না। জগতে এই ভালবাসাতে দেখি আর মায়ের প্রতি শিশুর যে ভাব তাতে দেখি। ঈশ্বরের প্রতি ওই ভাব, এটা একদিনে হবে না, এরজন্য সময় লাগে। সেইজন্য বলছেন, তোমার মন, তোমার বুদ্ধি, তোমার যে আমিত্ব, যে অহঙ্কার, সব কিছু আমাকে দিয়ে দাও।

যদি এই ভাবে তোমার মন, তোমার বুদ্ধি, তোমার আমিত্ব, অহঙ্কার সব আমাতে দিয়ে দিতে পার, তাহলে কি হবে? *নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ,* এরপর তুমি আমাতেই বাস করবে, এই ব্যাপারে তুমি কোন সংশয় করো না। আমাদের আগে ঠিক করতে হবে, মৃত্যুর পর আমি কোথায় যেতে চাই। রেলওয়ে স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে টিকিট কাটতে গেলে জিজ্ঞেস করবে, কোথাকার টিকিট চাই। রোজ সকালে নিজেকে জিজ্ঞেস করবেন, মৃত্যুর পরে কোথাকার টিকিট চাই। মৃত্যলোকে যমরাজের কাছে যেতে চান? না, যে বংশে জন্মেছেন ঘুরে সেই বংশেই জন্মাতে চান? সেই স্বামীর কাছে, সেই স্ত্রীর কাছেই কি আবার ঘুরঘুর করতে চান? নাকি ঈশ্বরের কাছে যেতে চান, যেখানে গেলে পুনরাগমন আর করতে হবে না? টিকিট কাউন্টারে গন্তব্য স্টেশন বলার পর জানলার ওপার থেকে বলবে, এত টাকা লাগবে। যদি ভগবানের কাছেই যেতে চান, যদি জন্মমৃত্যুচক্রের বাইরে যেতে চান, তাহলে এই টাকা লাগবে। কি সেই টাকা –*ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়*। কত টাকা ভাড়া লাগবে? মন, বুদ্ধি, আমিত্ব আমাতে দিয়ে দাও, ব্যস্, এটাই তোমার ভাড়ার মূল্য। মৃত্যুর পর আপনি কোথায় যেতে চাইছেন, সেই অনুসারে ভাড়াটা আপনাকে দিতে হবে।

এই কথা বলার পর বলছেন, *অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ,* অর্জুন, এরপর আর এটাকে নিয়ে তুমি কোন সংশয় করো না। ভগবান আগে বলেছেন, *সংশয়াত্মা বিনশ্যতি,* যিনি সংশয় করেন, তাঁর বিনাশ হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, তুমি মনে করছ যে, তুমি আমিত্ব ছাড়তে পারবে না, তাই তো? ঠিক আছে, তারও উপায় আছে, আমি তোমাকে বলছি, তুমি কি করব?

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়।।৯।।

(হে ধনঞ্জয়, যদি তুমি আমাকে স্থিরভাবে চিত্ত সমাহিত করতে না পার, তা হলে অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে লাভ করতে যত্নবান হও।)

আমি জানি, আর মানছিও যে, এটা তুমি একদিনে পেরে উঠবে না। সেইজন্য তোমাকে বলছি, তুমি অভ্যাসযোগ করে যাও, অর্থাৎ চেষ্টা চালিয়ে যাও, এতেই সদা লেগে থাকো। ঠাকুরকে একজন এই সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন করাতে ঠাকুর বলছেন, কেন, গীতায় অভ্যাসযোগের কথা আছে। আমার খুব প্রিয় গল্প, আগেও অনেকবার বলেছি। আমার খুব ভাল বন্ধু, আইপিএস ছিলেন, বিহারের ডিরেক্টর জেনারেল পুলিশ থেকে রিটায়ার করেছেন। ইয়ং বয়সে উনি খুব মোটাসোটা ছিলেন। আইপিএসে ভর্তি হওয়ার জন্য রোপ ক্লাইম্বিং করতে হয়। উনি দেখলেন, আর মনে মনে ভাবছেন –এই রোপ ক্লাইম্বিং আমার দ্বারা হবে না, দড়িটা ছেড়ে দেব, হাত পা ভেঙে যাবে, পুলিশের চাকরি হবে না, তারপর কোন কলেজে ফিজিক্সের শিক্ষক হয়ে থাকব। কিন্তু ওখানে যে

সার্জেন্ট দায়ীত্বে ছিলেন, তিনি বুঝে গেছেন বেচারা এবার দড়িটা ছেড়ে দেবে। উনি নীচ থেকে চেঁচিয়ে বলে যাচ্ছেন, লটকে রহো সাব, লটকে রহো, লটকে রহনেসে ভী মাসেলস্ বনেগা। ধরে রাখো, ধরে রাখাটাই অভ্যাস, ধরে থাকলেও মাসেলস্ তৈরী হয়।

ঠাকুরকে ধরে রাখুন, যাঁকেই আপনি শ্রদ্ধা করেন, ধরে রাখুন তাঁকে। ধরে রাখলেই মাসেলস তৈরী হবে। এখন যদি বলেন, আমি যদি এই দড়িটা ধরে রাখি তাহলে কি আমি রাইফেলের গুলি চালাতে পারব? ওভাবে বললে হয় না, সবটার সাথে সবটার লিঙ্ক আছে। ভগবান ধীরে ধীরে কত সহজ করে দিচ্ছেন। ভগবান বলছেন, আমি জানি তুমি পারবে না, কিন্তু চেষ্টা কর। এই কথা তো শুধু অর্জুনকে বলা হচ্ছে না, অর্জুনকে মাধ্যম করে সারা জগৎকে বলা হচ্ছে। কি বলা হচ্ছে? আগে যেটা বলা হল, তোমার সমস্ত মন, বুদ্ধি আমাতে লাগিয়ে রাখ, যদি না পার, চেষ্টা চালিয়ে যাও। লটকে রহেঙ্গে, ছাড়ব না। ঠাকুর তোতাপুরীকে বলছেন, যতক্ষণ বেদান্ত না বুঝছি ততক্ষণ তোমাকে আমি এখান থেকে যেতে দেব না। তোতাপুরী তিন দিনের বেশি কোথাও থাকতেন না, সেখানে ঠাকুরের কাছে এগারো মাস থাকলেন। *অথ চিত্তং সমাধাতুং*, আমাতে চিত্ত যদি সমাহিত না করতে পার, *অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়*, চেষ্টা করে যাও ধনঞ্জয়, এটাই অভ্যাসযোগ।

একজন মহারাজ ছিলেন, খুব সম্মান করতাম ওনাকে। আমি একবার কথায় কথায় মহারাজকে জিজ্ঞেস করলাম, মহারাজ আপনার আধ্যাত্মিক জীবন কেমন? বয়স হয়ে গিয়েছিল, উনি খুব দুঃখ করে বললেন, যখনই আমার আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে ফিরে তাকাই, আমি দেখি আমার আধ্যাত্মিক উপলব্ধি a big zero। তখন আমি ব্রহ্মচারী ছিলাম, বয়স কম, শুনে আমি কেঁপে উঠলাম। এনার মত একজন সিনিয়র মহারাজ এই বয়সে এসে যদি বলেন আধ্যাত্মিক উপলব্ধি a big zero, তাহলে আমাদের কি হবে! এখন এই বয়সে এসে আমিও বুঝতে পারছি, a big zero। তারপরেই উনি বললেন, 'তবে গীতার ওই অভ্যাসযোগটা ধরে রেখেছি'। এটাই আমাদের একমাত্র রক্ষাকবচ। আপনাদের কেউ যদি পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখেন, আপনার আধ্যাত্মিক অগ্রগতি zero, তখন বুঝতে হবে আপনাকে এই অভ্যাসযোগটা চালিয়ে যেতে হবে। অভ্যাসও করতে পারছেন না, জপধ্যানও করতে পারছেন না, তখন কি হবে? তারও উপায় ভগবান পরের শ্লোকে বলে দিচ্ছেন।

অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি।।১০।।

(যদি তুমি এই প্রকার অভ্যাস করতে সমর্থ না হও, তবে ভগবৎপ্রীতিকর কর্মে একনিষ্ঠ হও। কারণ আমার কর্ম করতে করতেই তুমি ক্রমে সিদ্ধিলাভ করবে।)

এই ভাবে অভ্যাস যদি না করতে পার, তাহলে সমস্ত কর্ম আমার জন্য কর। ধাপে ধাপে ভগবান নামিয়ে যাচ্ছেন। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, এটা কিন্তু compromise হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ওটাই হবে, যেটা ছয় নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে। কিন্তু ভগবান হলেন করুণাসাগর। ঠাকুরের কাছে অনেক গৃহীরা আসতেন, গৃহীরা প্রশ্ন করতেন, সংসারে কি হবে না। ঠাকুর বলতেন, কেন হবে না! বলেই এক এক করে শর্ত লাগাতে থাকতেন। সেই থেকে লোকেরা বলে, এই তো ঠাকুরও বলছেন সংসারে থেকেও হয়। সংসারে থেকে হয় নাকি! কত দিকে মন, ভোগবিলাসের কথা বলা হচ্ছে না, সংসারে মানুষকে হাজার দিকে হাজারটা জিনিস সামলাতে হয়। প্রত্যেক দিন সকালে উঠে লম্বা একটা লিস্ট করতে হবে, কি কি লাগবে, লিস্ট নিয়ে বাজারে যেতে হবে। ভুবনেশ্বর মঠের সাধুদের ওখানকার লোকেরা বলত, মঠর খাউছি, খটর শুইছি; মঠে খাচ্ছে, খাটে শুচ্ছে। বলতে

চাইছে সাধুদের আর কি চিন্তা! সন্ন্যাসী মানেই সমস্ত রকম চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসা। ঠাকুর বলছেন তল্পিতল্পাওয়ালা সাধুকে বিশ্বাস করা যায় না।

অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি, অভ্যাসযোগটাও তুমি করতে পারছ না, চেষ্টা করতে পারছ না? ঠিক আছে, *মৎকর্মপরমো ভব*, আমার জন্য কর্ম কর। *মৎকর্মকে* ভাগবতে বলছেন প্রভুসেবা যোগ। প্রভুসেবাতে নয় প্রকার ভক্তি, নবধা ভক্তির কথা বলছেন। যেমন *শ্রবণং*, ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ করা; *কীর্ত্তনং*, ঈশ্বরের নামগুণগান করা, *স্মরণম্*, মনে মনে ঈশ্বরের নাম করা বা স্মরণ করা, *পাদসেবনম্ অর্চনম্*, সেবা ও অর্চনা করা; *বন্দনম্, দাস্যম্, সখ্যম্, আত্মনিবেদনম্*। আমাদের নবধা ভক্তির কথা বলা হয় না, খুব সহজ – যা কিছু করা হচ্ছে সব ভগবানে সমর্পণ করা।

মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি, কোন রকম অভ্যাস যদি নাও কর, কিন্তু আমার জন্য কর্ম করছ, ঈশ্বরের জন্য কর্ম করছি, এই ভাব যদি তুমি নিয়ে চলতে পার, তাতেও তোমার চিত্তশুদ্ধি হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য হল মনকে শুদ্ধ করা। এই যে অনেকে উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে, কেন প্রশ্ন করে? মন অশুদ্ধ, ভিতরে পোকামাকড়গুলো কিলবিল করছে। এই কারণেই হাজারটা উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে, হাজারটা উল্টোপাল্টা কথা বলে। ওই পোকাগুলি বেরোবে, নোংরামিগুলি বেরোবে, তবে গিয়ে মন শুদ্ধ হবে।

অথৈতদপ্যশক্তোহসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতাঃ।।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্।।১১।।

(আর যদি এটাও করতে অক্ষম হও, তবে ইন্দ্রিয়-সংযম-পূর্বক আমাতে সর্বকর্ম-সমর্পণরূপ যোগ আশ্রয় করে সর্বপ্রকার কর্মের ফলত্যাগ কর।)

এটাও যদি না পারো, সমস্ত কর্ম যদি আমার জন্য না করতে পার, তাহলে যে কর্ম করলে, সংযত চিত্ত হয়ে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে সব কর্মের ফল আমাকে অর্পণ কর। ধাপে ধাপে ভগবান নামিয়ে আনছেন। প্রথমে বললেন, তোমার মন বুদ্ধি আমাকে দাও, এটা যদি না পারো তাহলে অভ্যাসযোগ চালিয়ে যাও, এটাও হচ্ছে না; তাহলে সমস্ত কর্ম আমার জন্য কর, এটাও পারছ না; এবার বলছেন তাহলে যত কর্ম করছ সব কর্মের কর্মফল আমাকে অর্পণ করে দাও। ঠিক এই জিনিসটা ঠাকুর করেছিলেন গিরিশ ঘোষের ক্ষেত্রে। গিরিশ ঘোষকে ঠাকুর এক এক করে বলে যাচ্ছেন, এটা কর, এটা না পারলে এটা কর; দেখছেন কোনটাই হচ্ছে না, তখন ঠাকুর বলছেন, তুমি আমাকে বকলমা দিয়ে দাও।

কিভাবে করতে হবে? অত্যন্ত সহজ, আধ্যাত্মিক জীবন এমন কিছু কঠিন না। কিছু দিন আগে আমার এক সন্ন্যাসী ভাইয়ের সাথে কথা হচ্ছিল, আমি তাঁকে বললাম, আপনি যেখানে যেখানে কাজ করেন, সেখানে রিমাইণ্ডার দিয়ে দিন, প্রত্যেক দু ঘন্টা পর দু মিনিটের জন্য থেমে বলুন, হে ঠাকুর এই দু ঘন্টা যা কিছু করলাম, তার ফল তোমার পাদপদ্মে নিবেদন করলাম। এক মাস করুন, দু মাস করুন, তারপর দেখুন কি হয়। নিবেদন করার পর মনে করার চেষ্টা করবেন, এই দু ঘন্টা ভাল কি করেছি, মন্দ কি করেছি। বাজে কাজ যেগুলো করেছেন, সেগুলো বিশেষ করে বলবেন, হে ঠাকুর অমুককে মিথ্যা কথা বলেছিলাম, অমুককে গালাগাল দিয়েছিলাম, অমুকের সাথে ঝগড়া করেছিলাম, সব তোমাকে দিলাম। কয়েকদিন করে দেখুন, দেখবেন মনের নোংরামিগুলি সব বন্ধ হয়ে যাবে, মিথ্যা কথা বলতে ইচ্ছেই হবে না। কারণ তখন নোংরা কাজের ফল ঠাকুরকে দিতে আতঙ্ক লাগবে। এই করে একটা সময় দেখবেন আপনার স্বভাবটাই পাল্টে গেছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান যে সহজ পন্থা বলে দিয়েছেন, এর থেকে সহজ পথ আর হয় না। কিছু করতে হবে না, তোমার কর্মের ফল সব আমাকে দিয়ে দাও। ঠাকুরকে গিয়ে বলুন, ঠাকুর আজ ওই লোকটাকে

আচ্ছা করে টাইট দিতে পেরেছি, এর ফল তোমাকে দিলাম। কিছু দিন পরে দেখবেন, সারা শরীরটা ঘিন্ ঘিন্ করতে শুরু করেছে। ছিঃ! এত বাজে কর্মের ফলও ঠাকুরকে দেব! আস্তে আস্তে বাজে কর্ম করার প্রবৃত্তিটাই চলে যাবে।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসজ্ জ্ঞানাদ্ ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্।।১২।।

(অবিবেকপূর্বক অভ্যাস অপেক্ষা শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা আত্মনিশ্চয় উৎকৃষ্ট। এই প্রকার আত্মনিশ্চয় অপেক্ষা জ্ঞানপূর্বক ধ্যান শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানপূর্বক ধ্যান হতে কর্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ। কর্মফলত্যাগের অব্যবহিত পরেইই সহেতুক সংসার নিবৃত্তিরূপ পরম শান্তিলাভ হয়।)

এখানে বলছেন, কিছু না বুঝে অভ্যাস করার থেকে, যেটা আমরা করি, এর থেকে অনেক ভাল হল জ্ঞান। শাস্ত্রের কথা জানলাম, পুরো ব্যাপারটা বুঝলাম; কিছু না বুঝে অভ্যাস করার থেকে এটা অনেক ভাল। তার থেকেও ভাল জিনিসটাকে বুঝে নিয়ে যদি ধ্যান করা হয়। কিন্তু ধ্যানের থেকেও ভাল হল কর্মফলের ত্যাগ। এর আগে বললেন, কর্মফলত্যাগ হল সবার নীচে, কিন্তু পরের শ্লোকেই বলছেন, কর্মফলত্যাগই শ্রেষ্ঠ। এগারো নম্বর আর বারো নম্বর শ্লোকের বক্তব্য মিলছে না। কারণ প্রথমে বলছেন, তুমি সমস্ত কিছু আমাকে দিয়ে দাও, সেটা যদি না পারে অভ্যাসযোগ করতে বললেন, সেটাও যদি না পারে তাহলে কর্মত্যাগ করতে বলছেন। নামতে নামতে একেবারে শেষে বলছেন, এত কিছুও যদি না পারো তাহলে কর্মফলত্যাগ করে দাও। কিন্তু বারো নম্বর শ্লোকে বলছেন, অভ্যাস হল সবার থেকে সাধারণ, অভ্যাসের থেকে ভাল জ্ঞান, জ্ঞানের থেকে শ্রেষ্ঠ ধ্যান, আর ধ্যানের থেকে শ্রেষ্ঠ হল কর্মফলত্যাগ। আচার্য শঙ্করের এটাই বৈশিষ্ট্য, আচার্যের মত ভাষ্যকাররা পুরো জিনিসটাকে একটা প্ল্যাটফরমে নিয়ে আসেন। আসলে সমস্ত বাসনা ত্যাগটাই হল আধ্যাত্মিক ভাব, আর কর্মফলত্যাগ এখানেও ত্যাগ। বাসনা ত্যাগ আর বাসনার ফলের ত্যাগ, ত্যাগের সমানতার জন্য এটাকে শ্রেষ্ঠ বলছেন। কর্মত্যাগ সন্ন্যাসীরা করেন, কর্মফলত্যাগ, যেখানে বলছেন *সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য*। আচার্য শঙ্কর উদাহরণ দিচ্ছেন, অগস্ত্য মুনির মত একজন শ্রেষ্ঠ মুনি ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে আজও ব্রাহ্মণদের সম্মান করা হয়। ঠিক সেই রকম কর্মফলত্যাগকে গীতায় বারো নম্বর শ্লোকে বলছেন, এটা হল শ্রেষ্ঠতম।

আমরা প্রথমের দিকে আলোচনা করলাম *তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ*, যাঁরা আমার ভক্ত, ভক্ত মানে যিনি আমাকে ভগবান রূপে দেখেন, ভক্ত মানে যিনি ভগবানকে সাকার রূপে দেখেন, এনারা অব্যক্ত উপাসক নন, আমার ভক্তকে আমি এই মৃত্যুরূপী যে সংসারসাগর, সেখান থেকে উদ্ধার করি। ভগবানের দুই প্রকার ভক্ত, এক প্রকার ভক্ত আছেন যাঁরা নিরাকারের সাধনা করেন, আরেক প্রকার ভক্ত সাকার রূপের সাধনা করেন। এই অধ্যায়ে দুই প্রকার ভক্তকে নিয়েই আলোচনা চলছে। একজন প্রশ্ন করলেন, ভগবান মৃত্যুর পরেই কেন তাঁর ভক্তকে উদ্ধার করেন? এটা প্রশ্নকর্তার ভুল ধারণা, ভগবান এখানে বলছেন না যে, মৃত্যুর পরই আমি আমার ভক্তকে উদ্ধার করি। ভগবান বলছেন, জীবন আর মৃত্যুর যে চক্র, এই চক্র থেকে আমি তাঁকে উদ্ধার করি। শাস্ত্রের কথায় অনেক সূক্ষ্ম তফাৎ থাকে, যেটা আমরা বুঝতে ভুল করে ফেলি। বলতে চাইছেন, জন্মমৃত্যুর যে চক্র, জন্মালে মৃত্যু হবে, মৃত্যুর পর আবার জন্মাবে, এই চক্র থেকে ভগবান তাঁর ভক্তকে উদ্ধার করেন। আলোচনার এক জায়গায়তে আমরা বলেছিলাম, ভক্ত মানেই মৃত্যুর পরে তাঁরা স্বর্গে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধাম বা যে কোন ধামে যান। এই সমস্যা যে কটি ভক্তি পথ আছে, যাঁরাই সাকার উপাসনা করেন, তাদের সবার আছে, অন্যান্য ধর্মেও এই একই জিনিস চলে। ঠাকুরের ভক্তরাও মনে করেন মৃত্যুর সময় ঠাকুর এসে তাঁদের রামকৃষ্ণলোকে নিয়ে যাবেন। যত ভক্তির পথ আছে, ভগবান

আলাদা, আমি আলাদা এই ভাবটা যেখানেই আছে, এই সমস্যাটা থেকে যাবে। যার জন্য খুব প্রচলিত কথা আমরা শুনি –কাশীতে মৃত্যু হলে মুক্তি হয়।

শ্রীমৎ স্বামী প্রমেয়ানন্দজী মহারাজ আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, খুব হিউমারাস ছিলেন। অত্যন্ত উচ্চমানের কথা তিনি খুব সহজ ভাষায় বলতেন। রোজ সকালে ওনার সাথে আমার দেখা হত। আমি চেষ্টা করতাম দু পাঁচ মিনিট ওনার সাথে যদি একটু পায়চারি করে নেওয়া যায়। বছরের পর বছর আমি ওনার সঙ্গ করেছি, এভাবেই আমি বড়দের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। আমি একটা টাইম নিয়ে তাঁর কাছে যাব, তিনি দেখা করতে রাজী হবেন কিনা জানি না, এভাবে সেরকম কিছু শেখা যায় না। বড়দের সাথে ঘুরছি ফিরছি, ওনারা কোন সময় কথা বলবেন, কোন সময় কিছু বলবেন না, ঠিক নেই, কিন্তু আমাকে লেগে থাকতে হবে। অনেক সময় বেলুড় মঠে আমরা দেখতাম, মঠের গাছগুলোর ডালপালা ছেঁটে সুন্দর করে সাজানো হয়। দেখে মহারাজ খুব বিরক্ত হতেন, উনি বলতেন, এটা বাগানবাড়ি না, এটা ঋষিদের আশ্রম, গাছপালা এমনিই বড় হবে। ওনার এটা একটা ভাব।

উনি খুব মজা করে বলতেন, ঠাকুর আসার পর কাশীতে মরলে মুক্তি হবে, এই ধারণাটা শেষ। বলতে চাইছেন, বেলুড় মঠে থাকলেই মুক্তি হবে, এখানে মরতে হবে না। এই কথাটা উনি মজা করেই বলতেন। আমাদের একটা প্রচলিত প্রবাদ হল, কাশীতে মরলে মুক্তি হবে। উনি বলতেন, কাশীতে যেতে হবে না, বেলুড় মঠে থাকলে জীবদ্দশাতেই মুক্তি হয়ে যাবে। তখন বয়স অল্প ছিল, শুনে মজা লাগত। কিন্তু এখন বয়স হয়েছে, গভীরে যেতে পারছি, গভীরে গিয়ে এখন বুঝতে পারছি মজা করে বললেও মহারাজ কত গভীর কথা বলেছিলেন। জীবনের উদ্দেশ্য হল আত্মজ্ঞান, তখন সগুণ সাকারের উপর নির্ভর করতে হয় না। শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী প্রায়ই বলতেন, *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো*, এখানেই অর্জন করতে হবে, মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হবে না; আর এটাই বেদান্ত। বেদান্তের দুটি পথ –একটা জ্ঞান পথ, আরেকটা ভক্তি পথ। ভক্তি পথ বলে, যা কিছু হওয়ার মৃত্যুর পর হবে, যেটা অন্যান্য ধর্মও বলে। কিন্তু জ্ঞান পথ বলে, যা কিছু করার এখানেই করে নিতে হবে।

এখন প্রশ্ন হল, ভক্তরা কেন এই রকম দেখেন? মৃত্যুর পরে হবে, কেন বলেন? কারণ, জ্ঞানীর কাছে সংসার মায়া, নাম আর রূপের খেলা মাত্র; ঠাকুর বলছেন, ধোঁকার টাটি। এখান থেকে এক্ষুণি বেরিয়ে আসতে হবে, মনের জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কিন্তু ভক্তের কাছে ঈশ্বর সত্য, ঈশ্বর সত্য বলে ঈশ্বরের কর্তৃক সৃষ্ট যা কিছু আছে, সমস্তটাই সত্য, এই সংসারটাও তাই সত্য। স্বামীজী দেববাণীতে জ্ঞান আর ভক্তি এই দুটোকে খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ইংরাজীতে দেববাণীর উপর আলোচনা চলছে, বাংলাতে আগে হয়ে গেছে, সবারই দেববাণীর আলোচনাগুলি শোনা উচিৎ। স্বামীজী দেববাণীতে ধর্মকে পুরো অন্য ভাবে সামনে রেখেছেন। যে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের কথা বলা হচ্ছে, স্বামীজী দেখাচ্ছেন সমুদ্র আর তার ঢেউ যেমন, তেমনি সেখানে তিনি এই জগৎকেও দেখাচ্ছেন।

জ্ঞানমার্গীরা সহজে এটা মানতে চাইবেন না, জ্ঞানমার্গীরা জগতের অস্তিত্বকে কোন ভাবেই মানতে চান না। ভক্ত ভগবানকে জানেন, ভক্ত শুধু ভগবানকেই দেখছেন। ঈশ্বরের সব কিছুই সত্য, তাঁর সবটাই ভাল। ছোট শিশু জানে আমার বাবা সর্বশক্তিমান, তিনি সব কিছু জানেন, তিনি সব কিছু করতে পারেন। ভক্তের ভগবান ঠিক এই রকম। ভক্তের কাছে ঈশ্বরই এই সংসারের সৃষ্টি করেছেন, ঠাকুর আবার এই সংসারকে ধোঁকার টাটির জায়গায় বলছেন মজার কুটি। জ্ঞানী বলবেন, আমার সংসার লাগবে না, এটাকেও ঠাকুর খুব সহজ কর বলছেন, সংসারটা হল যেন চুষি কাঠি। ছোট শিশু চুষি কাঠি ফেলে দিয়ে বলছে, আমার মা চাই, মাকে লাগবে। ভক্তও তাই বলে, সংসার

সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, আমার সংসার লাগবে না, আমার ভগবানকে চাই। সেইজন্য এই শরীর থাকতে থাকতে ভগবানের যে রূপ, যেটা সত্যলোকে পাওয়া যায়, যেটা বিষ্ণুলোকে পাওয়া যায়, সেটা এখানে দেখা যাবে না; কারণ এই চোখ চর্মচক্ষু কিনা। স্থূল শরীর দিয়ে স্থূল রূপেই দেখা যায়, ভগবানকে স্থূল রূপেই দেখা যায়। সেইজন্য স্থূল শরীরে ভগবানকে স্থূল রূপে তখনই একমাত্র দেখা যাবে, যখন তিনি অবতার হয়ে আসেন। যোগীরা সূক্ষ্ম রূপে দেখতে পান। আরও শ্রেষ্ঠ যোগী, যাঁরা খুব উচ্চমানের ভক্ত হতে চান, তাঁদের তাহলে কারণ শরীরে গিয়ে ভগবানের যে কারণ শরীর, যেটা সত্যলোকাদিতে থাকে, যেটা ঠাকুরের ঠিক ঠিক রূপ, সেটাকে দেখা যায়। এই শরীর থাকতে এভাবে দেখা যাবে না। সেইজন্য বলা হয়, কাশীতে না মরা পর্যন্ত মুক্তি হবে না।

যাঁরা কৃষ্ণ ভক্ত, তাঁরা তো কেউ আর কাশী যেতে চাইবেন না, তাঁরা বৃন্দাবনধামে যাবেন। তাঁরা এটাই বলবেন, বৃন্দাবনে গেলে মুক্তি হবে। আমি যেমন বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী, পুরোপুরি মঠের লোক, আমার কাছে বেলুড় মঠই মোক্ষপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ ধাম। আমি যখন ব্রহ্মচারী ছিলাম তখন থেকেই আমার সখ বেলুড় মঠেই আমি দেহ রাখব। আর মৃত্যুটা আমার কাছে একটা মজার জিনিস –আমি একদিন মরব, এটাই আমার সবচেয়ে বেশি আনন্দের জিনিস। বেলুড় মঠে মরব, ভাবলেই আমার আনন্দ হয়। এতে কোন নেগেটিভিটি নেই, কিন্তু একদিন যখন মরতেই হবে, বেলুড় মঠেই মরব। অন্য জায়গায় মৃত্যু হলে মনে হবে, জিনিসটা ঠিক জমল না, মনের মত হল না। গত চল্লিশ বছর ধরে জীবনে আমার উদ্দেশ্য হল, বেলুড় মঠে মরব।

তার সাথে আরেকটা হল, আগেকার দিনে ব্রাহ্মণ বালকরা গুরুগৃহে বেদ পড়তে যেত, সবাইকে গুরু কাজ দিয়ে দিতেন –ক্ষেতে কাজ কর, গরু চড়াও, ভিক্ষা করতে যাও। সকালবেলায় বেদ মুখস্ত করাতেন। আমার ক্রতু বইতে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে –আগেকার দিনে আশ্রম জীবন কেমন হত। গুরুর আশ্রমে শুধু বেদ মুখস্ত করিয়ে দেওয়া হত, শাস্ত্র বোঝার জন্য ঈশ্বরীয় কৃপা লাগে। চেষ্টা করে বেদ কেউ বুঝতে পারবে না। বেদ যদি মুখস্ত থাকে, তাহলে মন্ত্রগুলি মাথায় যখন তখন ঘুরতে থাকবে, তাতে তখন মন্ত্রের অর্থগুলো স্পষ্ট হয়ে যায়। গীতা যদি মুখস্ত না করা থাকে, কোন দিন সে আশা করতে পারবে না যে, সে গীতা বুঝতে পারবে। যে কোন শাস্ত্র যদি আপনি বুঝতে চান, শাস্ত্র যদি মুখস্ত না করেন আপনি কোন দিন সেই শাস্ত্র বুঝতে পারবেন না, কোন সম্ভবনাই নেই। স্বামী ধীরেশানন্দজীর কাছে আমরা অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি। পঞ্চদশী ওনার কাছেই পড়েছিলাম, পঞ্চদশী মুখস্ত না করলে উনি পড়াবেনই না। আপনি আজ আমার কাছে গীতা শুনছেন, আগামীকাল অমুক আনন্দের কাছে শুনবেন, পরশু আরেক আনন্দের কাছে শুনবেন, যত আনন্দের কাছেই শুনতে থাকুন না কেন, শাস্ত্র মুখস্ত না করে শাস্ত্র যে বুঝবেন তার কোন সম্ভবনাই নেই, আপনি নিরানন্দই থেকে যাবেন; আনন্দ হওয়ার সুযোগ জীবনে আসবে না। শাস্ত্র যদি কেউ লেগে থেকে মুখস্ত করতে থাকে, তখন শাস্ত্র কৃপা করে নিজেকে দেখিয়ে দেন – দেখ বাপু, আমি এই; তবে গিয়ে শাস্ত্রের অর্থ, শাস্ত্রের বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

আট, নয় ও দশ নম্বর শ্লোকগুলিকে আমরা সুন্দর ভাবে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছি। তাহলেও আরেকবার মনে করার জন্য সংক্ষেপে বলে দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা ভক্ত, ঈশ্বরকে যাঁরা সগুণ সাকাররূপে উপাসনা করেন, তাঁদের সাধনাবিধির কথা বলতে গিয়ে সবার আগে অভ্যাস যোগের কথা বলছেন, অভ্যাস; অভ্যাস শব্দের আগে আচার্য নিজের থেকে এই শব্দটা লাগিয়ে দিচ্ছেন – *অবিবেকপূর্বকাৎ*। গুরু বলে দিয়েছেন সকাল বিকাল একশ আটবার করে জপ করবে। কোন চিন্তা-ভাবনা করে যন্ত্রের মত সেটাই করে যাচ্ছেন, একটু যে বোঝার চেষ্টা করবেন ঠাকুর কে, ঠাকুর কি, ঠাকুরকে ডাকব কেন, কোন দিন বোঝার চেষ্টা করবেন না? ওই ছোটদের রামকৃষ্ণ বইটা একবার পড়ে নিয়েছে, কিংবা দীক্ষার সময় একটা চটি বই পড়ে আসতে বলা হয়েছিল, সেটাও ঠিক ভাবে পড়েছে কিনা সন্দেহ আছে। একটু যে ঠাকুর, মা, স্বামীজীর কথা পড়বেন, মনন করবেন, এগুলো যে

করা দরকার, সেটাও সময় থাকতে ঠিক ঠিক ভাবে করা হয়নি। গুরু বলে দিয়েছেন জপ করতে, যতটুকু করলে হয় ততটুকু করলেন। এরা হল প্রথম ধাপ, এবং নিম্নতম।

এর থেকে একটু উপরে যখন যায়, তখন হয় জ্ঞান। তখন একটু বোঝার চেষ্টা করেন, তত্ত্বটা কি। জিনিসটাকে বুঝে যাওয়ার পর যদি ধ্যান করা হয়, তবেই তখন গাড়ি চলতে শুরু হয়। গাড়ি চালাতে হলে জ্ঞানপূর্বক ধ্যান করতে হবে। জিনিসটা বোঝা হয়ে গেছে, তত্ত্বটা কি জানা হয়ে গেছে, এবার হবে জ্ঞানপূর্বক ধ্যান। যেমন নবম অধ্যায়ে তেত্রিশ নম্বর শ্লোকে বলছেন, *অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্,* এই জগৎ অনিত্য, এখানে সুখের গন্ধমাত্র নেই, হে অর্জুন এটা বুঝে নাও, এটাকে বুঝে নিয়ে এবার আমাকে পাওয়ার জন্য এগিয়ে পড়।

কথামৃতে দেখবেন, ঠাকুর মা কালীকে কত ভালবাসছেন, ভালবেসে তাঁর কত আনন্দ হচ্ছে। আমাদের কাজ এই আনন্দটাকে বোধ করা –আমি বুঝেছি ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু। যদি এতটুকুও কেউ বুঝতে পারে, ইমোশানালি না, ভিতর থেকে যদি বুঝতে পারে ঈশ্বরকে ভালবেসে কত আনন্দ, তাতেই জীবন ধন্য হয়ে যাবে। আজকেই আমার এক বন্ধু মহারাজের সাথে কথা হচ্ছিল। উনি এর ওর ব্যাপারে অনেক কিছুই বলে যাচ্ছিলেন, যেটা ওনার পছন্দ না, সব বলার পর বললেন, 'মহারাজ আপনার কি মত? এদের ব্যাপারে আপনি কি ভাবেন? আপনি কিভাবে এগুলোর ব্যাখ্যা করবেন'? আমি বললাম, '*অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্,* আমি বুঝে গেছি সবটাই অনিত্য, জগতে সৎ বলে কিছু নেই, নিত্য বলে কিছু নেই। আমি যদি আশা করতে যাই আপনি একটু ভাল হবেন, আমি যদি আশা করি উনি একটু ভাল হবেন, এটা আমার বোকামো, কারণ এখানে কেউ ভাল হবে না। এই সংসারে বাঘ, সিংহ থাকবে, মানুষের মধ্যেও বাঘ সিংহ থাকবে। সূক্ষ্ম প্রাণীর মধ্যেও করোনা কোভিড থাকবে, মানুষের মধ্যেও করোনা স্বভাবের লোক থাকবে, একবার যদি এই ধরণের মানুষ কারুর ভিতর ঢুকে যায়, তাকে ঝাঁঝরা করে বেরিয়ে আসবে। জগতে সব কিছু এই রকমই চলবে, এটাকে ভাল করে বুঝে নিন, বুঝে নিয়ে এবার ঈশ্বরের দিকে মন দিন'।

বারো নম্বর শ্লোকে কর্মফলত্যাগকে শ্রেষ্ঠ বলছেন, এই জায়গাতে আমাদের আলোচনাটা চলতে চলতে ঘুরে একটু অন্য দিকে চলে গিয়েছিল। কর্মফলত্যাগের কথা আমাদের বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আচার্য শঙ্করের যে মত, যে মতে তিনি বেদান্তের জ্ঞান পথে নিয়ে যান, সেখানে হল কর্মত্যাগ। কর্মত্যাগ মানে, কোন দায়ীত্ব বোধ থাকবে না, অথচ তিনি কর্ম করবেন; এটা শুধু সন্ন্যাসীদের জন্য। গৃহস্থদের জন্য কর্মত্যাগ নয়, গৃহস্থ কর্মফল ত্যাগ করবেন। এই জিনিসটার উপর দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে। আমরা আর বিস্তারে যাচ্ছি না। সেখানে আচার্য খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন, অগস্ত্য মুনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর অনেক ক্ষমতা ছিল, সেইজন্য এখনও ব্রাহ্মণদের সম্মান দেওয়া হয়। সন্ন্যাসীদের সম্মান দেওয়া হয়, কারণ সন্ন্যাসীর পরম্পরাতেই শঙ্করাচার্য হয়েছেন, স্বামী বিবেকানন্দ হয়েছেন। এই যে ত্যাগের সমানতা, একটা হল ফলত্যাগ করা, আরেকটা হল কর্মত্যাগ। যাঁরা বেদান্তের ধর্মতত্ত্ব ঠিক ঠিক জানেন, তাঁরা কর্মত্যাগ করেন, যাঁরা ওটা পারেন না, তাঁদের জন্য বলছেন তোমরা কর্মফলত্যাগ করবে। আসলে কর্মফলত্যাগ দিয়েই প্রথম শুরু হয়, সেখান থেকে আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে ধ্যান হয়, ধ্যান থেকে কর্মত্যাগ হয়। এখানে একটু অন্য ভাবে বলছেন ত্যাগকে উৎসাহিত করার জন্য। ঠাকুর বলছেন, দশবার গীতা বলতে বলতে ত্যাগী হয়ে যায়। ত্যাগই গীতার বক্তব্য, ঠাকুর সেই ত্যাগের বাদশা। ত্যাগের ভাব যদি না আসে আধ্যাত্মিক সাধনা হবে না। বারো নম্বর শ্লোকে এই কথা বলার পর বিষয়টা পাল্টে যাচ্ছে।

আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, এতক্ষণ আগের কয়েকটি শ্লোকে যা বলা হল, *অত্র চ আত্মেশ্বরভেদম্ আশ্রিত্য বিশ্বরূপে ঈশ্বরে চেতঃসমাধানলক্ষণো যোগ উক্ত ঈশ্বরার্থ কর্মানুষ্ঠানাদি চ,* এখানে গীতা মেনে নিয়েছে আত্মা আর ঈশ্বরে ভেদ রয়েছে, ফলে কর্মযোগের অনুষ্ঠানাদির কথা বলা হচ্ছে, এই যেমন বলা হচ্ছে অভ্যাস কর, ধ্যান কর, এগুলো বাস্তবিক ভাবে বলছেন। এগুলো মেনে নেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তত্ত্বের দিক থেকে আত্মা আর ঈশ্বর এক। আসলে এটা যার যার ভাবের ব্যাপার। কিছু কিছু সাধক আছেন যাঁরা স্বভাবেই অব্যক্ত উপাসনার দিকে ঝুঁকে পড়েন, আবার কিছু কিছু আছেন যাঁরা স্বভাবেই আমি আলাদা তুমি আলাদা এই ভাব নিয়ে চলেন। কথামৃতে ঠাকুর তিন প্রকার ভক্তের কথা বলছেন, যারা সাধারণ ভক্ত তারা মনে করে, ঈশ্বরে উপরে আছেন, তিনি নিয়ন্তা। আসলে এটাই আমাদের ভাব। দ্বিতীয় প্রকার ভক্ত মনে করেন, ঈশ্বর অন্তর্যামী, আমাদের সবার ভিতরে তিনি আছেন। তৃতীয় প্রকার ভক্ত মনে করে, ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন।

আগে বলা হল ভক্ত দুই প্রকার, একজন ভগবানকে নিরাকার রূপে সাধনা করেন, এনারা হলেন অব্যক্ত উপাসক। আর-একজন হলেন ব্যক্ত উপাসক, দুজনকেই ভক্ত বলছেন। এখানে আচার্য বলছেন, যিনি জেনে গেছেন আমি আর ঈশ্বর তত্ত্বতঃ এক, সেখানে সেব্য সেবকের ভাব কি করে আসবে! এই কথা আচার্য আগেও বলেছেন, এখনও বলছেন। এটা আমাদের কাছে অতটা জরুরী না। কিন্তু তিনি বলতে শুরু করেছেন, ভগবানের প্রিয় ভক্ত কে?

গীতাতেও এখন পর পর কয়েকটা শ্লোকে বলছেন, ভগবানের ভক্ত হওয়ার জন্য তাঁর কি কি গুণ থাকতে হবে। আচার্য যোগ করে বলছেন, এখানে তাঁদের গুণের কথাই বলা হচ্ছে, যাঁরা অক্ষর উপাসক। কিন্তু আমার ঠিক তা মনে হয় না, কারণ তিনি ধর্মসমূহ শব্দটা ব্যবহার করছেন। তেরো নম্বর শ্লোক থেকে আটটি শ্লোকে ভগবান যে যে গুণের কথা বলছেন, এটাই হল ধর্ম। একজন হিন্দুর কি কি গুণ থাকতে হবে, একজন ভক্তের মধ্যে কি কি গুণ হবে, একজন সাধকের মধ্যে বা একজন সিদ্ধের মধ্যে কি কি গুণ হবে, এই আটটি শ্লোকে বলা হয়েছে। ঠাকুর শ্রেষ্ঠ ভক্তের কথা বলছেন –যিনি আমার ভিতর আছেন, তিনিই সমস্ত জীবের মধ্যে আছেন। এই মুহূর্তের কিছুক্ষণের জন্য আমরা মনে করার চেষ্টা করে দেখতে পারি –কারা কারা আছেন যাঁদের আমি পছন্দ করি না, যাঁদের আমি সত্যিকারের মন থেকে ঘৃণা করি। এবার ভাবতে হবে, আমার ভিতরে যে শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন, যে শ্রীকৃষ্ণ আছেন বা যে শিব আছেন, তাঁদের সবার ভিতরেও তিনি আছেন; এরপর তাঁর প্রতি আমার ব্যবহার কেমন হবে? পিঠোপিঠি ভাই-বোন থাকলে ছোটবেলায় দুজনের মধ্যে প্রচুর ঝগড়া-বিবাদ হয়, বড় হয়ে গেলে তাদের মধ্যে মধুর ভাব হয় যায়। ঠিক তেমনি আমরা যতক্ষণ ধর্মের ক্ষেত্রে শিশু থাকি তখনই এই ধরণের ঝগড়া ঝাঁটি হয়, আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা হয়ে গেলে এটা নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যায়।

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহাঙ্করঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।।১৩।।
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যার্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।।১৪।।

(যিনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি দ্বেষহীন, মিত্রভাবাপন্ন, দয়ালু, মমত্ববুদ্ধিশূন্য, নিরহংকার, সুখে আসক্তি ও দুঃখে দ্বেষ বর্জিত, ক্ষমাশীল, সর্বদা সন্তুষ্ট, সদা সমাহিতচিত্ত, সদা সংযতভাব, সদা তত্ত্ব বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় এবং যাঁর মন ও বুদ্ধি সর্বদা আমাতে অর্পিত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।)

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং, ঈশ্বরের যিনি ভক্ত হন বা ভক্ত হতে চাইছেন, কোন জীবের প্রতি তাঁর দ্বেষ ভাব থাকবে না। একটা গল্প আছে, একজন ভক্ত হিংসা করবে না, পাড়ার একটা বেড়াল উৎপাত করে। একজন বেড়ালটাকে ধরেছে, ভক্ত বলছেন, না না ওকে মেরো না। হিংসা করতে

নেই, বস্তায় বেঁধে নদীতে ফেলে এসো। বৌদ্ধরা জীব হিংসা করবে না। কিন্তু তিব্বতে তো কিছু পাওয়া যায় না, চাষবাশ হয় না, মাংস ছাড়া খাবেটা কি। ঘোড়া, ইয়াকের মাংস বেশি খায়। কিন্তু এদের তো মারা যাবে না, সেইজন্য মুখের উপর একটা বস্তা বেঁধে দেবে, নিঃশ্বাস না নিয়ে মরে যাবে, কিংবা পাহাড়ের উপর থেকে ফেলে দেবে। এভাবে মরে যাওয়ার পর তার মাংস খাবে। এটা কি ধরণের হিপোক্রেসি? আপনার খাদ্য আপনি খাবেন, কেউ তো বারণ করছে না; কিন্তু তাই বলে এভাবে জীব হত্যা করতে হবে?

এখানে শ্লোকের শব্দগুলির আচার্য খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন, *অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং*, এর ব্যাখাতে আচার্য বলছেন, *ন দ্বেষ্টা আত্মনো দুঃখহেতুম্ অপি ন কিঞ্চিদ্ দ্বেষ্টি সর্বাণি ভূতানি আত্মত্বেন হি পশ্যতি*, যিনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি দ্বেষভাব রহিত, এমনকি যে সকল প্রাণী থেকে আমাদের দুঃখ ও ক্লেশ উৎপন্ন হয়, সেই প্রাণীর প্রতিও বিন্দুমাত্র দ্বেষভাব থাকবে না। তাহলে মশা, মাছি, আরশোলা এদেরকে কি করা যায়? দ্বেষ রাখব না, কিন্তু আমাকে বাঁচার জন্য জানালাতে নেট লাগাতে হবে, মশারি খাটিয়ে শুতে হবে, ওদের হানি না করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবশ্যই নিতে হবে। এমন কোন স্প্রে রাখতে হবে, যার গন্ধে ওরা পালিয়ে যাবে। কিন্তু তোমাকে আমি মেরে শেষ করে দেব, মারতে না পারলে বস্তায় ভরে পুকুরে ফেলে দিয়ে আসব, এই রকম মনোভাব যেন না থাকে।

মৈত্রঃ – মিত্রভাবো মৈত্রী মিত্রতয়া বর্ততে ইতি মৈত্রঃ, সবার সাথে মৈত্রী ভাব, বন্ধু ভাব; অমুক লোক প্রিয়, তমুক লোক অপ্রিয়; এই ভাব নেই। *করুণ এব চ – করুণা কৃপা দুঃখিতেষু দয়া*, দীনদুখী যারা তাদের প্রতি করুণা করা, দয়া কর। করোনা মহামারীর সময় দেশে এক সঙ্কটজনক পরিস্থিতি তৈরী হয়েছিল, কত মানুষ কত কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। সেই সময় অনেকেই সেবার ভাব নিয়ে অনেক কিছু সেবামূলক কাজ করেছিলেন। দেশের বা সমাজের সঙ্কট পরিস্থিতিতে সবারই কিছু না কিছু করা উচিৎ। করুণা হল ভক্তের লক্ষণ। আচার্য করুণার সাথে যোগ করে বলছেন, *সর্বভূতাভয়প্রদঃ সন্ন্যাসী ইত্যর্থঃ*, সন্ন্যসী মানে সবাইকে তিনি অভয়প্রদান করেন, তিনি নিজে কারুর কাছ থেকে ভীত হন না, অপর কেউও তাঁর কাছ থেকে ভীত হন না। আমরা এতটা পারি না। *নির্মমো –মমপ্রত্যয়বর্জিতো*, মমতা তার নেই, মমতা মানে স্ত্রী, পুত্র, স্বামী এদের প্রতি আসক্তির ভাব, এদেরকে ধরে রাখার ভাব, বা কোন বস্তুর প্রতি আসক্তির ভাব, ঈশ্বরের ভক্তদের এই ভাব থাকবে না। অল্প বয়সে আমার দেখে অবাক লাগত, বেশির ভাগ মহারাজদের দেখেছি, তাঁদের জগতের সব কিছুর প্রতি কেমন আসক্তিশূন্য ভাব।

ভক্তের গুণাবলীর বর্ণনার প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে গেল। আমি একটা খুব সাধারণ ঘটনার কথা বলি, এক সময় ভাল পেন পেলে আমার খুব ভাল লাগত। একবার আমি স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছে গিয়েছিলাম। ভক্তের এই বর্ণনাগুলো প্রত্যেকটা স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর উপর খাটে। আমি শুনেছিলাম ওনার কাছে ভাল ভাল পেন থাকে। আমি যখন মহারাজের কাছে যাই, উনি তখন উপনিষদের কিছু অনুবাদ করছিলেন। আমি বললাম, 'মহারাজ আমার খুব ইচ্ছা, আপনার কাছ থেকে একটা পেন নেব'। উনি যে পেন দিয়ে লিখছিলেন, ওই পেনটাকে বন্ধ করে আমাকে দিয়ে দিলেন। বললেন, 'এই পেন পেলিকেন পেন, খুব সুন্দর পেন'। 'মহারাজ, আপনি এটা দিয়ে লিখছেন, অন্য পেন দিন'। 'না না কোন ব্যাপার না'। মহারাজের তখন বয়স হয়ে গিয়েছিল, তার কিছু দিন পরেই উনি গত হন। চেয়ার থেকে উঠে থপ থপ করে গিয়ে আরেকটা পেন বার করে লিখতে বসে গেলেন। আমি বেরিয়ে এলাম উনিও লিখতে শুরু করে দিলেন, সম্পূর্ণ নির্বিকার।

আমি বললাম, 'মহারাজ আমার খুব খারাপ লাগছে'। উনি বলছেন, 'আমারও খুব খারাপ লাগবে, যদি তুমি এই পেন দিয়ে লেখালেখি না কর'। আজ পর্যন্ত কোন মহারাজকে দেখলাম না

যে, তাঁর কোন কিছুর প্রতি কোন স্পৃহা আছে। আপনি যে কোন মহারাজের কাছে গিয়ে বলুন, 'মহারাজ এটা নেব'? 'যাঃ যাঃ নিয়ে যা'। আজ পর্যন্ত কোন জিনিসের প্রতি কোন মহারাজের এতটুকু স্পৃহা দেখলাম না। অহংতা মমতা শূন্য কি জিনিস হতে পারে, মহারাজদের না দেখলে আমি বুঝতেই পারতাম না। ভাগ্যিস অল্প বয়স মহারাজদের কাছ থেকে দেখেছি বলে বুঝতে পারছি, অবাক লাগত না কোন দিন, এনারা এই রকমই।

নিরহঙ্কারো – নির্গতাহংপ্রত্যয়ঃ, নিজের শরীর যে এত প্রিয়, সেই শরীরের প্রতিও তাঁদের কোন আসক্তি থাকে না। আর বলছেন, *সমদুঃখসুখঃ – সমে দুঃখসুখে দ্বেষরাগয়োঃ অপ্রবর্তকে যস্য স সমদুঃখসুখঃ,* সুখ হোক দুঃখ হোক সবটাই ভক্তের কাছে সমান। *ক্ষমী –ক্ষমাবান্ আকৃষ্টঃ অভিহতো বা অবিক্রীয় এব আস্তে,* কেউ গালাগাল দিচ্ছে, কেউ হয়ত দু চার ঘা লাগিয়ে দিল, ভক্ত সব তাতেই নির্বিকার। স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজকে একবার আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'মহারাজ আপনি কি কখন রেগে যান'? উনি বলছেন, 'হ্যাঁ, একবার রেগে গিয়েছিলাম'। বলে উনি একটা ঘটনা বললেন, সেই ঘটনার সাথে রাগের সম্পর্ক শুনে আমার জোর হাসি পেয়ে গিয়েছিল।

কেউ একজন মহারাজকে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিল, তারপর নিমন্ত্রণকর্তা ভুলে গেছে। ওনার সেদিন আর খাওয়াই হয়নি। উনি ভদ্রলোকের বাচ্চা মেয়েকে ডেকে বলে দিলেন, 'বাবাকে বলে দিও, এই রকম যেন আর কারুর সাথে না করে'। এটাই ওনার রাগের চরম সীমা। বাচ্চা মেয়েটা শুনে হাসতে লাগল, মহারাজও হাসতে লাগল, ব্যস্ সব রাগের ওখানেই সমাপ্তি। খুব উচ্চমানের সন্ন্যাসী না হলে, খুব উচ্চমানের ভক্ত না হলে এই স্তরে বিচরণ করা যায় না। কোন কারণে অন্যথা কিছু হয়ে গেলে মনে করেন, আমার ইষ্ট কোন কারণে এটা করিয়েছেন, বা মনে করেন আমার কর্মই আমাকে এই রকম করিয়েছে। ব্রহ্মচারী অবস্থায় আমি একটা ঘটনা শুনেছিলাম, হাওড়া স্টেশনে আমাদের এক সিনিয়র মহারাজকে একটা ট্যাক্সি ধাক্কা দিয়েছে, উনি রাস্তায় উল্টে পড়ে গেছেন। লোকজন সব মিলে ট্যাক্সিওয়ালাকে মারতে যাচ্ছে, উনি উঠে বলছেন, 'ওকে মারবেন না, মারবেন না, এটা আমারই কর্ম, আমার অদৃষ্টে এটাই ছিল'। লোকেরা বুঝতে পারছে না মহারাজ কি বলতে চাইছেন, অদৃষ্ট কি, কর্ম কি, কিছুই বুঝতে পারছে না।

শ্লোকের শব্দগুলি পরিষ্কার বোঝা যায়, এখানে ব্যাখ্যা করার কিছু নেই। আচার্য দু চারটে শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন, সেগুলো শুধু বলে যাচ্ছি। এখানে শ্রেষ্ঠতম ভক্তদের কথা বলা হচ্ছে, আপনার আমার সবারি জীবনে এটাই উদ্দেশ্য।

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী, ভগবানের ভক্ত সব কিছুতে, সব রকম পরিস্থিতিতেই সন্তুষ্ট থাকেন। আচার্য বলছেন, *নিত্যং দেহস্থিতিকারণস্যলাভে অলাভে চ উৎপন্নলংপ্রত্যয়ঃ, তথা গুণবল্লাভে বিপর্যয়ে চ সন্তুষ্টঃ সততম্,* দেহ ধারণ করার জন্য যে ক্রিয়াগুলো আবশ্যক, তাতে ভাল মন্দ, লাভ অলাভ যাই হোক, সবেতেই তিনি নির্বিকার। *আলম্ব প্রত্যয়ঃ,* ছেড়ে দাও, বাদ দাও, এটাতে বলতে চাইছেন দেহ ধারণের জন্য যতটুকু লাগে, ততটুকু রেখে বাকি সব কিছু বাদ দাও। যাঁরা গীতার এই আলোচনা শুনছেন, তাঁরা কি পারবেন এগুলো অনুশীলন করতে? খুব মুশকিল, কারণ ধর্মপথ অত সহজ পথ নয়। কিন্তু ভক্ত হতে গেলে এগুলো করতে হবে, আপনার দুশো খানা শাড়ি আছে, তার থেকে পাঁচটা ছেড়ে দিন। এখানে বলা হচ্ছে না, পাঁচটা রেখে বাকি সব ছেড়ে দিতে, পাঁচটাই ছাড়ুন আগে। মাসে দশ হাজার টাকা মাইনে, পাঁচশ টাকার তার থেকে ছাড়ুন। *যতাত্মা – সংযতস্বভাবো,* সমাহিত চিত্ত, মনটাকে সব সময় গুছিয়ে রেখেছেন এবং নিজের স্বভাবকে জয় করেছেন।

সব থেকে বড় হল *দৃঢ়নিশ্চয়ঃ,* আঁট চাই। ঠাকুর বলছেন, আঁট নেই, এত জপ করে কিন্তু কই কারুরই তো কিছু হয় না। ভক্ত মানেই দৃঢ়নিশ্চয়, বলেছি যখন এটা করবই। বেশির ভাগ

ভক্তেরই চিড়ে ভেজা বুদ্ধি। ঠাকুর বলছেন, ও দেশে গরু কিনতে গেলে ল্যাজে হাত দিয়ে দেখে, ল্যাজে হাত দিলে গরু যদি শুয়ে পড়ে, ওই গরু কেনে না। বেশির ভাগ ভক্তই এই রকম। দৃঢ়নিশ্চয়, ঠিক করে নিয়েছি, এটাই করব, কেউ আটকাতে পারবে না। ইদানিং কালে লাইফ ম্যানেজমেন্টে এই কথাগুলো বলে, কিন্তু আমাদের কাছে এগুলো স্বাভাবিক জিনিস, এটাই আমাকে করতে হবে।

ময্যার্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ, একজন সফল নেতা আর আরেকজন আধ্যাত্মিক পুরুষ, দুজনেই দৃঢ়নিশ্চয়, তাহলে দুজনের তফাৎ কোথায়? যে শুধুমাত্র একজন নেতা, তার ঈশ্বরে মন থাকে না, কিন্তু যে উন্নতমানের ভক্ত, তার দুটোই আছে, একদিকে সে দৃঢ়নিশ্চয় আর তার সাথে ভগবানে মন আছে। *যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ, স মে প্রিয়ঃ,* এই কথাটা এত মধুর কথা; ভগবান বলছেন সে আমার প্রিয়। ভগবানের কিন্তু কোন বৈষম্য দোষ নেই, আগেও আমরা এটা আলোচনা করেছি। ভগবানের কাছে সবাই সমান, কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্মা, *জ্ঞানী আত্মৈব মে মতম্*। জ্ঞানী মাত্রই inclusive, সবাইকে তিনি নিজের করে নিয়েছেন। কেন নিয়েছেন? বুদ্ধি লাগিয়ে, মন লাগিয়ে নিয়েছেন? না, তিনি দেখছেন সবার ভিতরে সেই তিনি, যিনি তাঁর ভিতরেও।

আগেকার দিনে মুদির দোকানের মালিক সব খদ্দেরদের চিনত, খদ্দেররাও দোকানদারকে চিনত, একটা পারিবারিক সম্পর্ক থাকত। তা সত্ত্বেও খদ্দের দোকানীকে বলবে, ভাল জিনিসটা দেখে দেবে, দেখ ভাই দাম একটু কম করা যায় কিনা। এখন সুপার মার্কেটের জমানা এসে গেছে। সুপার মার্কেটে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত একই জিনিস দিয়ে সাজানো। চোখ বন্ধ করে আপনি প্যাকেটগুলো নামিয়ে নিন, একই জিনিস একই দাম; কোন দরদাম করার সুযোগ নেই, বাছাবাছির কিছু নেই। ঠিক ঠিক যিনি ভক্ত, তাঁর কাছে এই জগতে যত মানুষ আছে সবাই সুপার মার্কেট একটা সেল্‌ফের, মধ্যে সমস্ত কিছু সাজিয়ে রাখা থাকে, এও যা সেও তাই। অন্যদের কাছে জগৎ হল আগেকার দিনের মুদির দোকানের জিনিস, ভাল আছে মন্দ আছে, দরদাম করা যাবে। যোগীরা জগৎকে এভাবেই দেখেন, এটাই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী, এনারাই হলেন ভগবানের আত্মা। আত্মা সবারই প্রিয়, ঈশ্বরেরও প্রিয়।

যাঁরা কোন কিছুই মুখস্ত করেন না, তাঁরা যদি পারেন তো পনের নম্বর শ্লোকটা অবশ্যই মুখস্ত করে নেবেন। আমাদের একজন মহারাজ আছেন, আমারই সমবয়সী। কারুর সাথে খিচিমিচি খটামটি হলেই তিনি বলতে থাকবেন, দ্বাদশ অধ্যায়ের পনের নম্বর শ্লোকটি দেখুন। ওনার এই কথা শুনে আমার খুব হাসি পেত, উনি কি বক্তব্য সেটা বলবেন না, উনি শুধু বলবেন, দ্বাদশ অধ্যায়ের পনের নম্বর শ্লোক দেখুন।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।।১৫।।

(যিনি কাউকে উদ্বিগ্ন করেন না, যিনি কারও দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না এবং যিনি হর্ষ ও বিবাদ, ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।)

ভগবান বলে যাচ্ছেন কারা আমার প্রিয়। যাঁকে দেখে সংসারের কেউ উদ্বিগ্ন হয় না, আর যিনি সংসারকে দেখে কখন উদ্বিগ্ন হন না। আপনি কোথাও গেলেন, সেখানাকার লোকেরা আপনাকে দেখে আতঙ্কিত, ও মাগো, দুর্বাশা মুনি আবার এসেছেন। দুর্বাসা মুনি যেখানেই যেতেন, সেখানেই লোকেরা আতঙ্কিত হয়ে যেত। একজন কুলগুরু এই শিষ্যের বাড়িতে গেছেন। গুরু বাড়িতে এসেছেন দেখে তাঁর শিষ্য অনেক রকম রান্না করেছে। আগেকার দিনের ব্রাহ্মণরা প্রচুর খেতে পারতেন। গুরুকে থালা ও অনেক বাটিতে রান্না করা বিভিন্ন পদ সাজিয়ে খেতে দেওয়া হয়েছে। গুরু হাতে জল

নিয়ে চুমুক করে খেলেন। বাচ্চা ছেলে মাকে জিগ্যেস করছে, মা উনি কি করলেন। মা বুঝিয়ে দিলেন, উনি আচমন করলেন, খাওয়ার আগে করতে হয়। যত রকমের রান্না করা জিনিস গুরুকে দেওয়া হয়েছিল, সবটাই তিনি খেয়েছেন। বাচ্চাটা হাঁ করে গুরুর খাওয়া দেখে যাচ্ছে। অন্য দিকে চোখেও জল, বাড়িতে এত রকম রান্না হয়েছে কিছুই পেলাম না। খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর গুরু আবার আচমন করলেন। বাচ্চা ছেলেটা এবার আর কিছু বলল না, খালি কেঁদে চেঁচিয়ে বলছে, মা, উনি আবার আচমন করলেন। মনে করেছে, গুরু আবার প্রথম থেকে খেতে শুরু করবেন। বাচ্চার কাছে আতঙ্ক হয়ে গেছে। তেমনি অন্যদের দেখলে আমরা আতঙ্কিত হই।

রামচরিতমানসে তুলসীদাস খুব সুন্দর বলছেন, সজ্জনকে প্রণাম, দুর্জনকে প্রণাম; একজন কাছে এসে কষ্ট দেন, আর-একজন চলে গিয়ে কষ্ট দেন। যাঁরা ভাল মানুষ তাঁরা চলে গিয়ে কষ্ট দেন আর দুর্জনরা কাছে এসে কষ্ট দেন। আমাদের সবাইকেই ভেবে দেখতে হয়, এই জগতে এমন কেউ কি আছে, যার কাছে গেলে আমি ভয় পেয়ে যাই –বুঝতে হবে আমার ব্যক্তিত্বে কিছু গোলমাল আছে, গোলমালটা আমাকেই ঠিক করতে হবে। এই জগতে কেউ কি আছে, যাকে দেখে আমি ঘাবড়ে যাই? বুঝতে হবে গোলমাল আমার ব্যক্তিত্বেই। কিন্তু আমাদের চিন্তা-ভাবনা অন্য রকম –কে আমাকে মানে না মানে তাতে আমি কোন কেয়ার করি না। আমি অনেককে জানি যারা এই ভাষায় কথা বলে – কে আমার ব্যাপারে কি ভাবছে, আমি তাতে কোন কেয়ার করি না। আপনার আমার সবারই দরকার আমাকে নিয়ে কে কি ভাবছে। শুধু তাই না, আমি অপরের ব্যাপারে নেগেটিভ ভাবছি, তাহলে আমাকেই ভাবতে হবে যে, অপরকে ঠিক করতে যাওয়াটা কখনই আমার উচিৎ হবে না।

ভগবান পরিষ্কার বলছেন, *যস্মান্নোদ্বিজতে লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ*, আচার্য বলছেন, *উদ্বেগং গচ্ছতি*, আপনাকে দেখে কারুর উদ্বেগ উৎপন্ন হচ্ছে, কাউকে দেখে আপনার ভিতর উদ্বেগ উৎপন্ন হচ্ছে; দুটো ক্ষেত্রেই নিজেকে ঠিক করতে হবে, নিজেকে ঠিক করা কিছু না। আচার্য বলছেন, *ন সংতপ্যতে ন সংক্ষুভ্যতে* – কাউকে দেখে আপনার ভিতরে সন্তাপ হয় না, মন ক্ষোভিত হয় না; আপনাকেও দেখে কারুর সন্তাপ হয় না, মনে কোন ক্ষোভণ হয় না।

হর্ষ – প্রিয় বস্তু পেলে বা প্রিয়জনকে কাছে পেয়ে ভিতরে যে অনুভূতি হয়, এটাকে হর্ষ বলে। কিভাবে হর্ষ হয়? আচার্য বলছেন, *হর্ষঃ প্রিয়লাভে অন্তঃকরণস্য উৎকর্ষো রোমাঞ্চনাশ্রুপাতাদিলিঙ্গঃ*, কোন প্রিয় জিনিস পেলে মানুষের কেমন রোমাঞ্চ হয়, গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়, আনন্দে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। *অমর্ষ* – অসহিষ্ণুতা, বিষম পরিস্থিতিতে আমরা অসহিষ্ণু হয়ে যাই। *ভয়* –উদ্বেগ, উদ্বিগ্ন হওয়া, মনের মধ্যে একটা ত্রাসের সৃষ্টি হয়ে যাওয়। ভগবানের যিনি ভক্ত তিনি এই হর্ষ ও অমর্ষ থেকে মুক্ত। আচার্য এগুলোকে ধর্মসমূহ বলছেন, ধর্ম বলতে এটাই। এই গুণগুলির একটা গুণও যদি কারুর মধ্যে না দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে বুঝে নিতে হবে তার মধ্যে গোলমাল আছে। কাউকে কি ভয় পান? যদি পান, গোলমাল আছে। একটুতেই উদ্বিগ্ন হয়ে যান, ঘাবড়ে যান? গোলমাল আছে। আনন্দে উৎফুল্ল হয় যান? গোলমাল আছে। ভগবান বলছেন, যাঁরা এগুলোর উপরে তাঁরা আমার প্রিয়।

ছোটবেলা থেকে আমাদের খুব ইচ্ছে যে সবারই যেন আমি প্রিয় হই। বাবা-মা ভালবাসুক, পাড়া-প্রতিবেশিরা ভালবাসুক, স্কুলের বন্ধুরা ভালবাসুক, কিন্তু আমাদের একটু ইচ্ছে করে না, ভগবান আমাকে ভালবাসুক। জগৎকে খুশী করার জন্য আমরা সব কিছু করতে রাজী থাকি, চালবাজী, মিথ্যা কথা বলা, সব রকম শঠতার আশ্রয় নিতে রাজী আছি। ভগবানকে কিভাবে খুশী করতে হবে, এই ব্যাপারে আমাদের কারুর কোন মাথা ব্যাথা নেই। দীক্ষা নিয়েছি, শেষ সময় ভগবান এসে নিয়ে যাবেন, এর জন্য আবার ভগবানের কেন প্রিয় হতে হবে! এগুলো ভাবলেও কেমন অবাক লাগে।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।।১৬।।

(যিনি নিঃস্পৃহ, বাহ্যাভ্যন্তর শুচি, দক্ষ, পক্ষপাতশূন্য, ভয়হীন এবং সকাম কর্মের অনুষ্ঠান-ত্যাগী, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।)

কারা কারা ভগবানের প্রিয় হন, আরও তাঁদের বর্ণনা করছেন। *অনপেক্ষঃ,* ভক্ত কোন কিছুর অপেক্ষা রাখেন না। আচার্য এখানে বলছেন, *দেহেন্দ্রিয়বিষয়সসম্বন্ধাদিষু অপেক্ষাবিষয়েষু,* দেহ ইন্দ্রিয়ের সব রকম সম্পর্ক থেকে তিনি নিঃস্পৃহ। খেতে হবে, পেট ভরতে হবে, এর বেশি কিছু আমার লাগবে না। আমরা মঠে জয়েন করার পর অনেক মহারাজদের দেখেছি, সব কিছুতে একেবারে নির্বিকার। *শুচিঃ* –বাহির ও ভিতর দুটোই সব সময় পরিষ্কার।

আমার ঘরে একদিন একজন ইলেক্ট্রিসিয়ান কাজ করতে এলো। আমাকে বলল, 'কোন ন্যাকড়া আছে'? আমি বললাম, 'হ্যাঁ আছে, দিচ্ছি'। পুরনো একটা গামছা সুন্দর করে ভাঁজ করা ছিল। দেওয়ার পর তার আর হাসি থামছে না, একটা ন্যাকড়া, সেটাকে আবার এত পরিষ্কার আবার গুছিয়ে রাখা! বলল, 'আপনি না থাকলে ভাবতাম আপনার ব্যবহারের গামছা'। আমি বললাম, 'ওটা ন্যাকড়াই, ওটা দিয়ে আমি ঘর মুছি'। দরকারি অদরকারি সব কিছু পরিষ্কার থাকতে হবে। এই পরিষ্কার বাইরে যেমনটা হতে হবে, ভিতরটাও একই রকম পরিষ্কার হতে হবে। পরিষ্কার রাখা, শুচিতা শুরু হয় বাইরে থেকে। বাহির আর ভিতর পরিষ্কার যদি না থাকে, আপনি আর যাই হন, ভক্ত কোন দিন হতে পারবেন না। আপনার ঘর যদি গোছান না থাকে, কাজের টেবিল যদি অগোছাল থাকে, খাওয়ার সময় খাবার-দাবার যদি গোছান না থাকে, এঁটো যেটা ফেলা হচ্ছে সেটা যদি গোছান না থাকে, কাগজ যখন ডাস্টবিনে ফেলছেন, সেটাকেও সুন্দর করে ভাঁজ করে ছিঁড়ে যদি না ফেলা হয়, বুঝতে হবে আপনি ভক্ত হওয়ার যোগ্য নন, আধ্যাত্মিক পথে পা ফেলতে আপনার অনেক সময় লাগবে। শ্রীশ্রীমা বলছেন, ঝাঁটাটিরও একটা সম্মান আছে, ওকেও ঠিক ভাবে যথা স্থানে গুছিয়ে রাখতে হবে।

দক্ষঃ –আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, একসাথে অনেকগুলো কাজ যদি এসে পড়ে আমরা সবাই ঘাবড়ে যাই, বুঝতে পারি না, কোনটা আগে করব, কোনটা পরে করব। কিন্তু যিনি দক্ষ তিনি জানেন, কোনটা আগে করতে হবে, কোনটা পরে করতে হবে। বর্তমান কালে যাঁরা ম্যানেজমেন্ট পড়ান, তাঁরা এই জিনিসটা ম্যানেজমেন্টের ছাত্রদের শেখাতে পারেন না। *উদাসীনঃ –ন কস্যচিদ্ মিত্রাদেঃ পক্ষং ভজতে,* কারুর পক্ষ নেয় না। শ্রীমদ্ স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজের কাছে বাচ্চা বয়স থেকে আমি বড় হয়েছি, ওনার ছাত্রও ছিলাম, ওনার কাছেই জয়েন করলাম, আমার ট্রেনিং ওনার কাছেই। উনিও এই রকম উদাসীন। দুজন এসে নালিশ করছে, উনি কারুর পক্ষ নেবেন না। একজন এসে নালিশ করল, শুনে উনি বললেন, 'ও তাই নাকি, আচ্ছা ঠিক আছে'। তারপরেই যার নামে নালিশ করে গেল সে এসে বলতে শুরু করল, সব শুনে উনি বললেন, 'ও তাই নাকি, আচ্ছা!' উনি জানেন কে কি করেছে, কারুর পক্ষ নেবেন না। মঠের এ্যসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী ছিলেন, সেক্রেটারী ছিলেন, সবটাই বোঝেন, সবটাই জানেন, কিন্তু কোথাও তিনি কারুর পক্ষ নিতেন না। সুন্দর করে পাশ কাটিয়ে দিতেন।

গতব্যথঃ –এর অর্থ হয় যিনি সমস্ত রকম ব্যাথার বাইরে, কিন্তু আচার্য এখানে বলছেন নির্ভয়, তাঁর কোন ভয় নেই। আসলে কি হয়, পুরনো ব্যাথা-বেদনাগুলিকে তিনি পেরিয়ে এসেছেন, ফলে ওনার ভয় বলে কিছু থাকে না। ভয় আমাদের সব সময় হয় অতীতের পুরনো ব্যাথা-বেদনা থেকে। বলা হয় আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই, এর আগে আগে আমাদের অনেক মৃত্যুর অভিজ্ঞতা আছে,

মৃত্যুর সময় অনেক কষ্ট পেয়েছি বলে মৃত্যুকে আমরা ভয় পাই। সবার হয় না, আমি মারা যাব ভাবলেই আমার আনন্দ হয়। *গতব্যথঃ*, পুরনো ব্যাথার যে তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে, সেটা থেকে তিনি পেরিয়ে গেছেন।

সর্বারম্ভপরিত্যাগী –যে কোন জিনিসের যে আরম্ভ করা হয়, সেটাকে তিনি ত্যাগ করে দিয়েছেন। তার মানে নূতন করে তিনি কোন কর্মে জড়াবেন না, যেটা এই জগতে ফল দেবে বা অন্য জগতে ফল দেবে। তিনি যেটাই করেন নিষ্কাম ভাবে করেন, যেটাই করেন তিনি এই ভেবে করেন, আমার এটা কর্তব্য এই বোধে তিনি সব কাজ নিষ্ঠার সাথে নিষ্কাম ভাবে করেন।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ।।১৭।।

(যিনি ইষ্টপ্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না, অনিষ্টপ্রাপ্তিতে দ্বেষ করেন না, প্রিয়বিয়োগে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত ইষ্টবস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং শুভাশুভ সকল কর্ম পরিত্যাগ করে দিয়েছেন, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।)

হৃষ্যতি মানে খুশী হওয়া, *দ্বেষ্টি*, কোন কিছুর প্রতি দ্বেষ ভাব রাখা। আচার্য বলছেন, *ন হৃষ্যতি ইষ্টপ্রাপ্তৌ*, মনের মত কিছু পেলে আনন্দ হয়, *ন দ্বেষ্টি অনিষ্টপ্রাপ্তৌ*, অপছন্দের কিছু পেলে দ্বেষ হয়। *ন শোচতি প্রিয়বিয়োগে*, আর *ন চ অপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি*। খুশী হওয়া *হৃষ্যতি*, দুঃখ পাওয়া *দ্বেষ্টি*, প্রিয় বিয়োগ হয়ে গেল *শোচতি*, আর কিছু পাওয়ার ইচ্ছা, এটাকে বলছেন *আকাঙ্ক্ষা*। ভগবানের প্রিয় ভক্ত যিনি, তিনি এই সব কটার বাইরে –ইষ্টপ্রাপ্তিতে অর্থাৎ মনের মত কিছু পেলে তিনি খুশিতে ডগমগ হন না, অপছন্দের কিছু পেলে তাঁর দ্বেষ হয় না, প্রিয়বিয়োগে তিনি শোকগ্রস্ত হন না আর তিনি কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না। *শুভাশুভপরিত্যাগী*, শুভ ও অশুভ কোনটাতেই আগ্রহ নেই, দুটোকেই ত্যাগ করে দিয়েছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আগে বলা হয়েছিল *দৃঢ়নিশ্চয়ঃ*।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ।।১৮।।
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ।।১৯।।

(যিনি আসক্তিহীন এবং শত্রু ও মিত্রে সমবুদ্ধি, যিনি সম্মানে ও অপমানে অবিচলিত, যিনি শীতোষ্ণজনিত সুখে ও দুঃখে নির্বিকার, পরমাত্মাতে স্থিরবুদ্ধি, প্রশংসায় হর্ষ ও নিন্দায় বিষাদশূন্য সুতরাং সংযতবাক্, সর্বাবস্থায় যৎকিঞ্চিৎলাভে সন্তুষ্ট এবং নির্দিষ্ট বাসস্থানহীন তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।)

একই গুণগুলিকে আবার অন্য ভাবে ঘুরিয়ে নিয়ে আসছেন। শত্রু মিত্র তাঁর কাছে সমান, মান অপমান সমান। *শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু*, দ্বিতীয় অধ্যায়েও এই শব্দটা এসেছিল; মূল বক্তব্য হল, পরিস্থিতি যেমনই হয়ে যাক, ভগবানের ভক্তের মনে কোন কিছুই কোন রকম চাঞ্চল্য তৈরী করতে পারবে না। *সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ*, সব কিছু থেকে তিনি অসঙ্গ; কোন কিছুকে তিনি নিজের কাছে ধরে রাখতে চান না, যেটা আছে সেটা চলে গেলেও তাঁর মধ্যে কোন প্রকার ক্ষোভণ হয় না।

ভক্ত ভগবানের ব্যক্তিত্বের সাথে এমন ভাবে একত্ব অনুভব করেন যে জগৎটাকে তিনি পাঁচ বছরের বাচ্চার মত দেখেন। মুর্খ যদি স্তুতি করে তারও দাম নেই, আবার মুর্খ যখন নিন্দা করে তারও কোন দাম নেই। পাকিস্তানের বিজ্ঞানী আব্দুস সালাম যিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে নোবেল প্রাইজ পেয়ে আপনার কি রকম লাগছে। আব্দুস সালাম বলছেন, 'কি আর লাগবে, আমার মেয়ে ক্লাশ ফাইভে পড়ে, সে দিনরাত

আমাকে বলে –বাবা তুমি একটা মুর্খ’। একদিন মেয়েটি একটা অঙ্ক পারছিল না বলে বাবার কাছে অঙ্কটা বুঝতে গেছে। বাবা অঙ্কটা বুঝিয়ে দেওয়ার পর পরের দিন ক্লাশে গিয়ে টীচারকে মেয়েটি ঐভাবে অঙ্কটা করে দেখিয়েছে। কিন্তু টীচার বলে দিয়েছেন এই প্রসেসে করলে হবে না। মেয়ে বাড়ি ফিরে সালামকে বলছে –বাবা তুমি একটা মহামুর্খ, কিচ্ছু জানো না। সালাম তাই বলছেন, জগৎ আমাকে নোবেল প্রাইজ দিল কিন্তু বাড়িতে আমি এখনও মহামুর্খই। কিন্তু তাই বলে সালাম কি গালে হাত দিয়ে বসে শোক করছেন? আবার মেয়েটি যদি বলে –বাবা তুমি কি বিরাট পণ্ডিত। তাতেও সালামের কিছুই মনে হবে না। সালাম সাহেব তাঁর বিজ্ঞানের সাম্রাজ্যে হারিয়ে গেছেন, এখন তাঁকে কে কি বলছে তাতে তিনি থোরাই গ্রাহ্য করবেন।

আইনস্টাইন অত বড় বিজ্ঞানী, তাঁর থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি বেরিয়ে গিয়ে তিনি তখন নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেছেন। সেই সময় তাঁর দুটো বিখ্যাত ছবি আছে, একটা ছবিতে তিনি মা কালীর মত জিভ বার করে রয়েছেন, আরেকটি ছবিতে নিজের টুপিটা আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে তিনি হাঁ করে ক্যাবলার মত আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। সবাই তাঁকে বলছে –আপনি এতো বড় একজন বিজ্ঞানী হয়ে এই রকম জোকারদের মত কেন ছবি তুলতে গেলেন। আসলে যারা প্রেস ফটোগ্রাফার আইনস্টাইনকে যেমন যেমন পোজ নিয়ে ছবি দিতে বলছে তিনিও সেই রকম পোজ করে ছবি দিয়ে যাচ্ছেন। পরে একজন আইনস্টাইনের জীবনীতে বলছেন, তিনি এত বিশাল মাপের ছিলেন যে এই জগৎটা তাঁর কাছে বাচ্চার মত মনে হত, আর তিনিও এই জগতের সাথে বাচ্চার মত ব্যবহার করতেন। অথচ তিনিই আবার যখন কাগজ কলম নিয়ে বসে যেতেন তখন অন্য এক জগতের মানুষ।

তিনি যখন থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি লিখছেন তখন তাঁর একটি ছেলে ছয়-সাত বছরের, আরেকটি ছেলে দুই-এক বছরের। বাড়িতে ওনার স্ত্রী নেই, বাচ্চা দুটোকে তাঁর কাছে দিয়ে তিনি কোথাও কাজে ব্যস্ত হয়ে আছেন। একদিকে তিনি থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি লিখে যাচ্ছেন অন্য দিকে ছোট্ট বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়াবার জন্য গায়ে চাপড় দিয়ে যাচ্ছেন। আর-এক দিকে বড় ছেলেটি স্কুলের কি একটা পড়া বুঝতে চাইছে। একদিকে তিনি ছোটটাকে চাপড়ে যাচ্ছেন, অন্য দিকে বড়টিকে বলে যাচ্ছেন, ইয়েস স্যার, ওয়ান মিনিট, ওয়ান মিনিট, আবার আরেক দিকে থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি লিখে যাচ্ছেন। নিজের লেখার ব্যাপারে যখন ডুবে যাচ্ছেন তখন তাঁর আর কোন হুঁশ নেই, অথচ ফটোগ্রাফার যখন বলছে টুপিটা আকাশে ছুঁড়ে দিতে, ছুঁড়ে দিচ্ছেন, জিভ বার করুন, জিভ বার করে দিচ্ছেন। এখানেও তিনি কাউকেই গ্রাহ্য করছেন না। যাঁরা মহাপুরুষ হন তাঁরা এই রকমই হন, জগতকে তাঁরা গ্রাহ্যই করবেন না।

স্বামীজী চিকাগো ধর্মমহাসভাতে যখন সিস্টার এণ্ড ব্রাদার্স বলে যে হাততালি পেলেন তাতেও তাঁর মাথা ঘুরে যায়নি, আবার যখন সেলুনে চুল কাটতে গেছেন তখন সেখানে যখন তাঁকে বলা হল নিগারদের এখানে চুল কাটা হয় না, স্বামীজীও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। একবারও বলতে গেলেন না যে আমি নিগ্রো নই, আসলে জগৎ তাঁকে কি বলল তাতে তিনি থোরাই কেয়ার করছেন। এটাই হচ্ছে ঠিক ঠিক *মানাপমানয়োঃ*, কোন কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে না। আর বলছেন –

স্তুতি আর নিন্দা দুটোই ভক্তের কাছে সমান। *মৌনী* শব্দের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আচার্য বলছেন *সংযতঃ বাক্*। মৌনী বলতে আমরা মনে করি তিনি কোন কথা বলেন না, কিন্তু তা না, মৌনী মানে সংযত বাক্, যে কথাই বলেন সামলে বলেন। *সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ*, আচার্য এর ব্যাখ্যায় বলছেন, *শরীরস্থিতিমাত্রেণ*, শরীর রক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন সেটুকু হয়ে গেলেই তিনি সন্তুষ্ট, যৎকিঞ্চিৎ যা পান তাতেই তিনি পরিতৃপ্ত। *অনিকেতঃ*, মানে ভক্তের নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান নেই। সেইজন্য আচার্য বলছেন, এই ভাব সন্ন্যাসীদের জন্য। তাহলে সংসারে যাঁরা আছেন তাঁদের কি হবে?

তাঁদেরও ওটাই হবে, একটার পর একটা বাড়ি বানিয়ে যাচ্ছি, এ রকম করা চলবে না, একটা বাড়ি আছে তাতেই সন্তুষ্ট। আর বলছেন, *স্থিরমতিঃ*, বুদ্ধিটা একেবারে স্থির। মূল বক্তব্য এটাই –বুদ্ধি এমন স্থির হয়ে গেছে, ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু এই ভাবটা এমন ভাবে বসে গেছে যে, এই সংসারে ছোটখাটো জিনিস আর তাঁকে নাড়াতে পারে না। শেষ শ্লোকে সব কিছুকে একত্র করে বলছেন –

যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ।।২০।।

(যে-সকল মৎপরায়ণ ভক্ত এই মোক্ষদায়ক ধর্ম উক্ত প্রকারে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে সাধন করেন, তাঁরাই আমার অতীব প্রিয়।)

এতক্ষণ উত্তম ভক্তির যে লক্ষণের কথা বলা হল, এটাই *ধর্মামৃতম্*। অমৃতত্বের যে হেতু, যাঁরা এই অমৃত পেতে চান, যাঁরা অমৃতের সন্ধান করেন, তাঁদের জন্য এই ধর্ম। যাঁরা ঠিক ঠিক এই ধর্মের পালন করেন সেবন করেন, আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *উত্তমাং পরমার্থজ্ঞানলক্ষণাং ভক্তিম্ আশ্রিতাঃ*, যাঁরা এই যথার্থ জ্ঞানরূপ উত্তম ভক্তির ভাবটাকে আশ্রয় করেন, তাঁরাই আমার প্রিয়। আগে আগে যে ভাবগুলি বলা হয়েছে, এটাই আমাকে অমৃতের দিকে নিয়ে যাবে আর এটাই হল ধর্মরূপ অমৃত। *শ্রদ্দধানা মৎপরমা*, যাঁরা এই পুরো জিনিসটার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেছেন, আমাকে এটাই করতে হবে, এটাই আমার কাছে সত্য; এই ধরণের ভক্তই আমার অতীব প্রিয়।

আচার্য শঙ্কর দুই ধরণের ভক্তির কথা বলছেন, একটা হল সাধারণ ভক্তি, আরেকটি হচ্ছে উত্তম ভক্তি। উত্তম ভক্তি মানেই প্রকৃত জ্ঞান, ঈশ্বর আর আমার মধ্যে কোন ভেদ নেই, এই অভেদবুদ্ধিকে বলা হচ্ছে উত্তম ভক্তি, তার মানে ঈশ্বর আর আমি তত্ত্বতঃ এক। আর সাধারণ ভক্তিতে আমি আর ঈশ্বর আলাদা। যখন আমি আর ঈশ্বর আলাদা এই বোধ থাকে তখন নবধা ভক্তির কথা বলা হয়, যেটা এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম। এই ভক্তিকেই ঠাকুর বলছেন অপরা ভক্তি। আর এই অধ্যায়ের শেষের দিকে জ্ঞানীর যে লক্ষণের কথা বলা হল এটাই ঠিক ঠিক পরা ভক্তি। অপরা ভক্তির অনুশীলন যতক্ষণ না করা হয় ততক্ষণ পরা ভক্তি হয় না। কথামৃত পড়লে মনে হয় যেন রাগাত্মিকা ভক্তি বা পরা ভক্তিই হচ্ছে উদ্দেশ্য। কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে যদি এত জপ, এত ধ্যান, এত নৈবেদ্য, এত পূজো, এত উপাচার এইভাবে অপরা ভক্তির অনুশীলন না করা হয়, তাহলে উন্মাদ ভক্তি, রাগাত্মিকা ভক্তি বা পরা ভক্তি হয় না। সেইজন্য বলা জ্ঞান হল উত্তম ভক্তির লক্ষণ। ঈশ্বরের তত্ত্বকে যতক্ষণ না জানা হয় ততক্ষণ কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি শুদ্ধ ভালোবাসা হয় না।

ঠাকুর যাকে পরা ভক্তি বা রাগাত্মিকা ভক্তি বলছেন গীতায় তাকে জ্ঞান বা ঈশ্বরের তত্ত্বকে জানার কথা বলা হচ্ছে। তত্ত্বতঃ জানা মানে জ্ঞান, সেইজন্য জ্ঞানকে বলা হচ্ছে উত্তম লক্ষণ। শাস্ত্রাদি পড়ার পর, জিনিসটাকে বোঝা হল, তারপর মানুষ দীর্ঘ দিন ধরে জপ, ধ্যান, নিষ্ঠা, পূজো, আচার এইসব অপরা ভক্তি করে যায়। অপরা ভক্তি করতে করতে তত্ত্বটা ঠিক ঠিক বুঝতে পারে। তত্ত্বটা যখন বুঝতে পারে তখন সে তাঁকে ভালোবেসে ফেলে। যখন ভালোবেসে ফেলে তখন আর তার অন্য দিকে দৃষ্টি যায় না, পূজো উপাচারের দিকেও আর মন যায় না। এই জিনিসটাকে আধার করে একটা সুন্দর গল্প আছে।

অনেক কাল আগে এক ব্যক্তির ইচ্ছে হল সোমরস পান করবে। সোমরস তৈরী করতে সোম পাতা চাই, আর সোমরস হচ্ছে দেবতাদের অর্ঘ্য। এক দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে সোম পাতা আছে? দোকানদার বলছে, হ্যাঁ আছে, তুমি কত টাকা দেবে? লোকটি বলছে দশ টাকা দেব। দোকানদার বলছে –*সোমরাজা ততোঽভূয়াৎ*, মানে সোমরাজার দাম তার থেকেও বেশি। বলেই লোকটিকে ভাগিয়ে দিয়েছে। আরেকটি দোকানে গেছে সেই দোকানদারও বলছে *সোমরাজা*

ততোহভূয়াৎ। এইভাবে অনেকগুলো দোকান ঘোরা হয়ে গেছে, যেখানেই যাচ্ছে সেখানে যত দাম বলছে দোকানদার এই একই কথা বলে যাচ্ছে, সে যত দাম দিতে চাইছে দোকানদার বলছে সোমরাজার দাম তার থেকে বেশি। শেষ যে দোকানে গেছে সেখানেও এই একই কথা বলতেই লোকটি ঝাঁপিয়ে পড়ে বলছে – নিকুচি করেছে তোমার *ততোহভূয়াৎ*, আমার সোম পাতা চাইই চাই। বলেই সে যেখানে সোম পাতা রাখা ছিল সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে টেনে সোম পাতা যা পেরেছে নিয়ে এসেছে। লোকটি আস্তে আস্তে দাম বাড়িয়ে যাচ্ছে, প্রথমে দশ টাকা, তারপর কুড়ি টাকা, তিরিশ টাকা এইভাবে দাম বাড়াতে বাড়াতে যখন তার সর্বস্ব সোম পাতার জন্য দিতে প্রস্তুত হয়ে গেছে তখনও যখন বলছে সোমরাজা *ততোহভূয়াৎ*, বলছে নিকুচি করেছে তোমার *ততোহভূয়াৎ*, আমার চাইই চাই। বলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে সোম পাতা নিয়ে এসেছে।

এখানে প্রথমের দিকে যেটা হচ্ছিল কুড়ি টাকা, তিরিশ টাকা করে যে দাম বাড়াচ্ছিল এটা হল অপরা ভক্তি। ঈশ্বরের জন্য এটা করছি, ঈশ্বরের জন্য এটা ছাড়লাম, ওটা ছাড়লাম। এইভাবে একটা অবস্থার পর সে বলে ঈশ্বর ছাড়া আমি থাকতেই পারবো না। তখন সে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে সংসার ফংসার সব ফেলে দিয়ে ঈশ্বরকেই চাই বলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এটাই পরা ভক্তি। কিন্তু সেই এক কথাই বলতে হয়, পরা ভক্তি কখনই হবে না যতক্ষণ সাধক এই পূজা, জপ, ধ্যান ও উপাচারের মধ্যে দিয়ে না যায়।

সব শেষে আচার্য সংক্ষেপে বলছেন, পুরো জিনিসটার বক্তব্য আমরা শেষের যে কটি শ্লোক বললাম; যাঁরা সেই বিষ্ণুধাম পেতে চান, বিষ্ণুলোক বলুন, শিবলোক বলুন, রামকৃষ্ণলোকই বলুন, যাঁরা মৃত্যুর পর মুক্তি চাইছেন, বৈকুণ্ঠধামে সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য – এই তিন প্রকার ভক্তি ভক্তদের জন্য। ওই লোকে গিয়ে বাস করা, ঈশ্বরের কাছে থাকা বা ঈশ্বরের মত রূপ পাওয়া, যাঁরা এগুলো চান, তাঁদের জন্য জরুরী –তের থেকে ঊনিশ যে শ্লোকগুলি বলা হল, এই সাতটি শ্লোকের প্রত্যেকটি কথাকে আক্ষরিক ভাবে জীবনে নামিয়ে আনা।

জীবনে নামিয়ে আনার পর যেখানে জ্ঞানী বা ভক্ত দেখেন তিনি ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে গেছেন, সেখানে তিনি কি করে পর দেখবেন; ভেদ বলে কোন শব্দই নেই তাঁর! পর যদি না দেখেন, তখন কাকেই বা তিনি ভয় পাবেন, কাকেই বা তিনি ভয় দেখাবেন, কার থেকেই বা তিনি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন, কাকেই বা তিনি দূরে রাখবেন।

এই হচ্ছে দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিযোগ। এরপর শুরু হয় ত্রয়োদশ অধ্যায়। প্রথমের দিকে বলা হয়েছিল, বিভিন্ন পণ্ডিতরা গীতার অধ্যায়গুলিকে বিভিন্ন ভাবে শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। তার মধ্যে সপ্তম অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায়কে বলা হয় ভক্তি, তার আগের অধ্যায়গুলিকে বলা হয় জ্ঞান। এখানে জ্ঞান আর ভক্তিকে সমন্বয় করা হল। ত্রয়োদশ অধ্যায় একটু উচ্চমানের। এই অধ্যায়ের দু নম্বর শ্লোকে (১৩/২) আচার্য শঙ্করের খুব নামকরা আলোচনা আছে। ওই আলোচনায় তিনি পাতার পর পাতা লিখে গেছেন, যেখানে তিনি অদ্বৈত দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ১৩/২ শ্লোকের উপর আচার্যের পুরো আলোচনার উপর আলোকপাত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না, তবে যতটা পারা যায় আমরা আলোচনা করে দেখব আচার্য কি বলতে চাইছেন।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়ং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ।।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ

ত্রয়োদশ অধ্যায়কে গীতার এক বিশেষ অধ্যায়রূপে গণ্য করা হয়। যেমন যেমন আমাদের আলোচনা এগোবে তেমন তেমন আমরা বুঝতে পারব কেন এই অধ্যায়কে বিশেষ অধ্যায়রূপে গণ্য করা হয়। যাঁরা ধর্মচর্চা করেন, শাস্ত্রচর্চা করেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারার সাথে যুক্ত থাকার সুবাদে যাঁদের কিছু জ্ঞান আছে, তাঁরা কিছু কিছু শব্দ শুনে থাকবেন, যেমন তার মধ্যে জ্ঞানযোগ শব্দটা অনেকেই শুনে থাকবেন। জ্ঞানযোগের মধ্যে আবার বিবেক-বিচার কথাটাও অনেকেই শুনে থাকবেন। কথামৃতে ঠাকুর অনেকবার বিবেক-বিচারের কথা বলছেন। বাংলাতে বিবেক একটা জিনিস, কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাপারে বিবেক শব্দ যখন আসে তখন সেটা আরেকটা অর্থবহ জিনিস। তার সাথে ঠাকুর অনেকবার আরও একটা শব্দ বলছেন, তা হল নিত্যানিত্য বিচার –ঈশ্বরই নিত্য, বাকি সব অনিত্য এই বিচার। এই জিনিসগুলিকে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, এই অধ্যায় হল বিশুদ্ধ বেদান্ত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এগারো থেকে ত্রিশ নম্বর শ্লোক থেকে যেটা শুরু হয়েছিল, যেখানে আত্মার ব্যাপারে আলোচনা করছেন –এই কুড়িটি শ্লোক হল হিন্দু ধর্ম, হিন্দু ধর্মের দর্শন, অদ্বৈত বেদান্তের প্রাণ। এই কুড়িটি শ্লোক সব হিন্দুদেরই মুখস্ত করে রাখা দরকার। তবে গীতা যত মুখস্ত করা হবে তত গীতা বুঝতে সুবিধা হবে। তাছাড়া এটাই আমাদের ধর্ম, আমাদের পূর্বপুরুষের দেওয়া অমূল্য সম্পদ। আত্মার ব্যাপারে এই কুড়িটি শ্লোকে একটু একটু করে বলা হয়েছে। সেখানে এটাই বলা হয়েছে, দুটি সত্তা – দেহ আর দেহী। দেহ মানে শরীর আর দেহী মানে শরীরের মধ্যে যে চৈতন্য সত্তা বিরাজমান। এই জিনিসটাকেই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিস্তারে নামানো হয়েছে।

ধর্মে যখন ইমোশানালিজম্ ঢুকে যায় তখন ধর্মের অধোগতি প্রাপ্ত হয়, তা যে কোন ধর্মই হোক। ধর্ম পুরো যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ধর্মের যুক্তি পুরো অন্য ধরণের। বিজ্ঞানের যুক্তি এক রকম চলে, দর্শনে আবার আর-এক রকম যুক্তি চলে, ইতিহাসে আর-এক রকম চলে। কিন্তু ধর্মের যুক্তি নিজের মত চলে। যেভাবে ধর্মে যুক্তি চলে, ওই যুক্তিটাকে যদি ধরতে পারেন তাহলে দেখতে পাবেন, ওনারা কিভাবে যুক্তিকে চালান, সেই জায়গাতে ওনারা ইউনিফর্ম, একেবারেই এলেমেলো কোন যুক্তি চলতে দেন না। সেইজন্য হিন্দু ধর্মে আজ এত দর্শন, শুধু হিন্দু ধর্মেই না, খ্রীশ্চানিটিতেও প্রচুর ধর্ম দর্শন আছে। বর্তমান ফিলজফি বা পাশ্চাত্য দর্শন বলতে আমার যেটা বুঝি, পুরোটা বাইবেল থেকেই বেরিয়েছে, ওনারা সবাই নিজেদের সময়ের নামকরা দার্শনিক ছিলেন।

দর্শন বোঝার জন্য খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার। অনিত্য জিনিসগুলিকে কেটে ছেঁটে পরিষ্কার করার জন্য যে কুড়াল দরকার, সেই কুড়ালটা হল এই ত্রয়োদশ অধ্যায়। ত্রয়োদশ অধ্যায়কে যদি ঠিক ঠিক নিয়মিত ভাবে মনন করা হয়, তাহলে আমাদের আশেপাশে যত জঞ্জাল, ঝোপঝাড় আছে, সব কিছুকে খুব সহজে কেটেছেঁটে বাদ দিয়ে দেওয়া যায়। ত্রয়োদশ অধ্যায় হল আধ্যাত্মিক জীবনে চলার পথে প্র্যাক্টিকাল গাইড। প্রায়ই লোকের এসে জিজ্ঞেস করে, কি করতে হবে বলুন – ত্রয়োদশ অধ্যায় পরিষ্কার তাদের বলে দেয়, কি করতে হবে।

আচার্য শঙ্করের বৈশিষ্ট্য হল, তিনি বেশি কথা বলবেন না, যুক্তিকে দাঁড় করানোর জন্য যতটুকু বলা দরকার ততটুকুই বলবেন, এর বাইরে একটি শব্দও বলবেন না। সেইজন্য আচার্যকে বোঝার জন্য আমাদের দম বেরিয়ে যায়। যাঁরাই বেশি কথা বলেন, তাঁরা নিজেরাও বোঝেন না কি বলতে চাইছেন। যাঁরা কম কথা বলেন, বুঝতে হবে তাঁর কথা বোঝার জন্য একটু বুদ্ধি খাটাতে হবে। শাস্ত্রেও শাস্ত্রকাররা বেশি কথা বলেন না, সেইজন্য শাস্ত্রের কথা বোঝার জন্য বুদ্ধি খাটাতে হবে, এমনি বুদ্ধি না, একেবারে পরিস্রুত বুদ্ধি লাগাতে হবে।

আচার্য শঙ্কর ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সূচনাতে খুব সুন্দর বলছেন, *সুচিতে দ্বে প্রকৃতি ঈশ্বরস্য*। সপ্তম অধ্যায়ের চার নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছিল, *ভূমিরাপোহনলো বায়ূঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ* আর তারপরে পাঁচ নম্বর শ্লোকে বলছেন, *অপরেয়মিতস্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্;* মাত্র দুটি শ্লোকের মধ্যে পুরো সৃষ্টির পদ্ধতিটা কি, সুন্দর ভাবে পুরো বর্ণনা করে দিচ্ছেন। আচার্য বলছেন, সপ্তম অধ্যায়ের সূচনাতে দুটো শ্লোকে যেটা খুব সংক্ষেপে বলে দেওয়া হয়েছিল, সেটাকে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আরও বিস্তারে বলছেন। গীতার এটা একটা বৈশিষ্ট্য, কোথাও খুব সংক্ষেপে বলছেন, কোথাও আবার সেটাকেই বিস্তারে বলছেন, আবার আরেকটা জায়গাতে গিয়ে সেটাকেই আবার সংক্ষেপে বলে দিচ্ছেন। দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষের দিকে তেরো নম্বর শ্লোক থেকে অর্থাৎ *অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ* থেকে শুরু করে ঊনিশ নম্বর শ্লোকে *তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী* পর্যন্ত জ্ঞানী ভক্তের যে গুণের কথা বলা হয়েছে, সেটা দেখার পর আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হবে ভক্ত মানে কোন দিকে খেয়াল নেই, হরিনাম করতে করতে চলে যাচ্ছে, কোথায় পা ফেলছে কোন ঠিক নেই। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখছি, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজাগ আর নিজের শিষ্যরা যদি কেউ একটু অসাবধান বা অমনোযোগী থাকতেন ঠাকুর খুব বিরক্ত হয়ে যেতেন। লাটু মহারাজ, স্বামী অদ্ভুতানন্দজী একদিন ঠাকুরের মশলার বেটুয়াটা নিতে ভুলে গেছেন; আরও একবার হাত মোছার গামছা নিতে ভুলে গেছেন। পরে ঠাকুর অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, আমার মন সব সময় সমাধিতে তাতেও আমার কিছু ভুল হয় না, আর তোদের একটু উদ্দীপন হয় তাতেই এই।

ত্রয়োদশ অধ্যায় বর্ণনা করছেন, ওই যে দ্বাদশ অধ্যায়ে শুচি, দক্ষ, *অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং* ইত্যাদি গুণের কথা বলা হয়েছিল, এই গুণগুলি কি করে অর্জন করতে হয়? আমাদের কি কখন মনে হয়, আমিও অপরের জীবনের একজন আদর্শ পুরুষ হব? আমাদের মধ্যে কেউ কারুর দাদা, কেউ কারুর দিদি, কারুর মা, কারুর বাবা। আপনজনরা আমাদের ভালবাসবেই। অনেকে হয়ত বলে বেড়াবে, আমার বাবা একজন শ্রেষ্ঠ বাবা। আমাদের এই ছোট্ট গণ্ডী, এই যে কুয়োর ব্যাঙ হয়ে যারা আছে, তাদের কেউ কি ওই কুয়ো থেকে বেরিয়ে এসে চাইবে –এনার মত যদি আমি একটু হতে পারতাম? কখন কি মনে হয় যে, নিজের গণ্ডীর বাইরের লোকেরাও আমাকে দেখে বলবে, আমি যদি এনার মত একটু হতাম? যদি ইচ্ছে করে, তাহলে আগে দেখতে হবে আমার মধ্যে কোন গুণটা আছে, যে গুণের উপর জোর দিলে সেই গুণে আমি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে পারব।

গান্ধীজী অত্যন্ত সাধারণ মানুষ ছিলেন, উকিল হিসাবে ব্যর্থ। কিন্তু উনি যখন ঠিক করলেন, সত্য আর অহিংসা এই দুটো আদর্শকে আমি পালন করবেন। তিনি সত্য আর অহিংসাকে ধরে রাখলেন। আর সত্যিই তিনি সাধারণ থেকে অসাধারণে উঠে গেলেন। লোকেরা অনেকে তাঁর নিন্দা করে, সমালোচনা করে, তাতে কোন দোষ নেই। উনি কখন বলছেন না যে, আমি অবতার, উনি একজন সাধারণ মানুষ। মাত্র দুটো গুণকে নিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন। গীতাতে আমরা বিস্তারে আলোচনা করে যাচ্ছি, এগুলো শুনে একটু যদি কারুর মনে হয়, আমি আরও দুজনের রোল মডেল যদি হতাম, আদর্শ হতাম? তাহলে আপনি দেখুন, কিছু উপলব্ধি আপনার আছে কি? উপলব্ধি যে শুধু বাইরে হয় তা না, নিজের ভিতরেও হতে পারে। এই উপলব্ধির কথা দ্বাদশ অধ্যায়ে বলছেন –

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। আমার পরিচিতদের যদি বলি, আপনি কিন্তু রেগে যাচ্ছেন। ওনার নিশ্চিত একটাই উত্তর হবে –আমি কিন্তু কখন রেগে যাই না, আমার মধ্যে রাগ নেই। যিনি বলেন, আমি কখন রাগি না, তার মানেই তিনি রেগেমেগে উত্তর দিচ্ছেন। আপনি যদি কখন রেগে না যান, সেটা আপনি কেন অপরকে বলতে যাবেন। আপনার কি মন খারাপ? আমার কখন মন খারাপ হয় না। এটা আপনার কি ধরণের উত্তর?

এই যে গুণগুলি, *অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং* থেকে পর পর যে গুণের কথা ভগবান দ্বাদশ অধ্যায়ে বলে গেছেন, এই গুণগুলি কিভাবে আমরা অর্জন করব? এটার জন্য দরকার ত্রয়োদশ অধ্যায়, যার বর্ণনা এই অধ্যায়ে ভগবান করছেন – নিত্য-অনিত্য বিচার করে সেই নিত্যে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বা নিত্যকে ভালবাসা। শ্রীরামকৃষ্ণ মহাপুরুষ, কামারপুকুরে জন্মে ছিলেন, এগুলো না; শ্রীরামকৃষ্ণ একজন ভাবাদর্শ। ওই ভাবাদর্শে গিয়ে আমরা নিজেকে ঢালব আর সেখান থেকে কিছু গুণ আয়ত্ত করে আমরা বেরিয়ে চলে আসব। ভাবমূর্তি, ভাবাদর্শ, এই শব্দগুলিকে নেওয়া। শ্রীকৃষ্ণ, একজন ভাবাদর্শ। শ্রীকৃষ্ণের কোন গুণটা আপনার ভাল লাগে, সেই গুণকে নিজের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করা। ত্রয়োদশ অধ্যায় বলে দিচ্ছেন নিত্য জিনিসটা কি, উদ্দেশ্য এই নিত্যে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। যদি প্রতিষ্ঠিত না হতে পারেন তাহলেও সব সময় চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া –এটাই আমার আদর্শ, হাজার বার আমার পতন হয়ে যেতে পারে, এই আদর্শকে আমি ছাড়ব না।

একজন মহারাজের গল্প শুনেছিলাম, তাঁকে আমি কখন দেখিনি, আর-একজন মহারাজের কাছে তাঁর গল্প শুনেছিলাম। রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীরা প্রকৃত সন্ন্যাসী, পুরো এক নূতন ধরণের সন্ন্যাসী, স্বামীজী একজন যুগপ্রবর্তক, তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই সন্ন্যাসীকুল। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যত স্কুল আছে সেখানে মহারাজরাও ছেলেদের সাথে খেলাধূলা করেন। আমিও খেলতাম, দেওঘরের প্রিন্সিপাল ছিলাম, তখনও খেলতাম। আমাদের শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজীও দেওঘরের প্রিন্সিপাল ছিলেন, উনিও খেলতেন। সেক্রেটারী হয়ে যাওয়ার পর ও বয়স হয়ে যাওয়ার জন্য পরের দিকে আর খেলতেন না। আমাদের অনেক সেন্টারে খেলাধূলার ব্যবস্থা আছে। যেখানে স্কুল নেই সেখানেও খেলাধূলার ব্যবস্থা আছে। বৃন্দাবনে আমাদের একটা সেন্টার আছে, অনেক আগে সেই সেন্টার যমুনার পারে ছিল। এখনও সেই আশ্রম আছে, পুরনো আশ্রম বলে। ওখানে মহারাজরা ভলিবল খেলতেন। একজন মহারাজ ছিলেন ওনার তখন একটু বয়স হয়ে গিয়েছিল, তিনি খুব ভাল খেলতে পারতেন না। অন্যরা এই নিয়ে ওনার সাথে একটু মজা করতেন, তাতে তাঁর খারাপ লাগত।

একদিন রাত্তিরে একটা জায়গা থেকে ধুপ্‌ধাপ্ আওয়াজ আসছে। সবাই ভাবছে কি হচ্ছে, কিসের আওয়াজ? রাত্রিবেলা কয়েকজন বেরিয়ে গিয়ে দেখছেন, অন্ধকারের মধ্যে একটা ভলিবল নিয়ে নেটের কাছে উনি চাপ মারার প্র্যাক্টিস করে যাচ্ছেন। আমি ঘটনাটা শুনলাম, তখন আমার বয়স কম ছিল, যিনি ঘটনাটা বলছিলেন তাঁকে বললাম, 'এটা কি ভাল, একজন সন্ন্যাসী মাঝরাত্রে ভলিবল প্র্যাক্টিস করছেন'? উনি বললেন, 'না না, নিষ্ঠাটা দেখ। ছাড়ব না, এই সমস্যাটা এসেছে এটাকে না মেটানো পর্যন্ত আমি ছাড়ছি না'। বাচ্চারাই এই রকম করে, সমস্যা হলে ছাড়ে না, লেগে থাকে। ঈশ্বর নিত্য, এই নিত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য চেষ্টা আমি চালিয়ে যাব, ছাড়ব না। তবে উচ্চতম ধর্ম আদর্শ, আমরা যাকে আধ্যাত্মিক ভাব বলি, ঠাকুর বার বার যেটাকে বলছেন, পুরোপুরি ঈশ্বরের প্রতি যাওয়া, এটা খুব কম মানুষের জন্য। ধর্ম কখন সবার জন্য নয়।

ধর্মে কিছু আচার আচরণ আছে, সেটা অনেকেই পালন করতে পারে, কিন্তু সেটা হল ethical qualities, ethical qualitiesএর জন্য ধর্মের দরকার পড়ে না। Ethical হয়ে হয়ে যখন খুব উচ্চমানের হন, সেখান থেকে শুরু হয় ধর্ম। লোকেরা এগুলোকে গুলিয়ে ফেলে। ধর্ম জীবনে যাঁরা যাবেন, আগে তাঁদের একজন ভদ্রলোক হতে হবে। আমাদের রামকৃষ্ণ ভাবধারায় এটা

বারবার আসে –Before becoming a monk be a gentleman, আগে ভদ্রলোক হও, তারপর সন্ন্যাসীর জীবন। কারণ যে গুণগুলি থাকলে একজন মানুষ ভদ্রলোক হন, সেই গুণগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে শুরু হয় ধর্ম জীবনের যাত্রা। মানুষ ভদ্রলোকই হয়নি, এরা কি ধর্ম করবে! কথায় কথায় হিংসায় প্রবৃত্ত হচ্ছে, কথায় কথায় মারামারি করছে, কি করে এরা ধর্ম করবে! ভদ্রলোক মানে তাঁর আত্মসংযম থাকতে হবে, কিন্তু কারুরই আত্মসংযম নেই। আজও বৃটিশরা কারুর সাথে যদি ঝগড়া হয়ে যায়, দুর্ব্যবহার কখন করবে না। ফরাসী, বৃটিশ এরা দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য খুব বিখ্যাত, যুদ্ধের আগেও এরা হাত মেলাবে, যুদ্ধের পরেও হাত মেলাবে, যদিও বেশির ভাগ সময় একজন মারা যেত, কিন্তু হাত মেলাবে। ভদ্র ব্যবহার ছাড়তে নেই, সেখান থেকে শুরু হয় ধর্ম জীবন। আজ দেশ ও সমাজের চারিদিকে যা পরিস্থিতি, সেখানে কি করে আমরা ধর্ম জীবনের আশা করতে পারি। ত্রয়োদশ অধ্যায় সার আর খোসা এই দুটোকে আলাদা করে দেয়। রাইস মিলে ধান থেকে খোসা আর চালকে আলাদা করে দেয়, ঠিক তেমনি ত্রয়োদশ অধ্যায় পুরো আলাদা করে দেখিয়ে দিচ্ছে নিত্য বলতে এই, অনিত্য বলতে এই, তুমি অনিত্যকে ছাড়। অনিত্যকে ছেড়ে আমার কি হবে?

এই যে বলা হল উচ্চতম ধর্ম মুষ্টিমাত্র কয়েকজনের জন্য, কেন বলা হয়? ধর্ম করে আমার কি লাভ? খুব সহজ ও স্বাভাবিক প্রশ্ন। আপনাকে আপনার বন্ধুরা, আপনার বাড়িরা লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করবে, এত ধর্ম ধর্ম করে কি হবে? ধর্ম করলে অনেক কিছু হয়। প্রথম যেটা হয়, তা হল, জীবনে অশান্তি কমে যায়। এই সংসারের পিছনে যে উন্মত্ত পাগলের মত মানুষ ছুটছে, এই দৌড়ানিটা কমে যায়, মানুষ অনেক শান্ত হয়ে আসে, শান্তি পায়। অবধূত গীতাতে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, কথামৃতে ঠাকুরও বলছেন, একটা চিলের মুখে মাছ। কাকগুলো কা কা করে চিলকে তাড়া করছে। চিলের শান্তি নেই। কোন ভাবে চিলের মুখ থেকে মাছ পড়ে গেল। কাকগুলো সঙ্গে সঙ্গে চিলকে ছেড়ে মাছের দিকে দৌড়ে গেল। চিলের শান্তি ফিরে এলো। সংসারের পিছনে মানুষ যখন দৌড়ায় তখনই অশান্তি এসে হাজির হয়। অনেকদিন ছোটাছুটির পর একটা সময় মানুষের মধ্যে চেতনা আসে, কিসের জন্য আমি ছুটে চলেছি? তার এই বোধ আসে –আমার তো এতটুকু লাগবে, এর অতিরিক্ত কিছু লাগবে না।

এই বোধ আসার ফলে জীবনে এসে যায় এক অনাবিল শান্তি। এই শান্তি আসার পর স্বাভাবিক ভাবে যেটা আসে, সেটা হল শক্তি। এই শক্তি শারীরিক শক্তি না, মনের মধ্যে একটা আলাদা শক্তি আসে। আমরা জানি রোগ শোকে শরীর দুর্বল হয়ে যেতে পারে, কিন্তু মনে একটা সাংঘাতিক শক্তি আসে। কারণ নিত্য অনিত্যের বিচার করতে পারছেন বলে এই সাংঘাতিক শক্তি হয়। ফলে যাকে যেটা বলা হবে সে সেটা শুনতে বাধ্য হয়। ঠাকুরও বলছেন, ঈশ্বরে যার ভক্তি হয়, তিনি যদি কৃপা করেন, সবাই তার কথা মানে। এই শান্তি আর শক্তি যার আসে, ভিতরে তার একটা আনন্দ আসে। জীবনে যার আনন্দ নেই, বুঝতে হবে ধর্ম জীবনে তার গোলমাল আছে। যার মনে অবসাদ চলছে, বুঝতে হবে ধর্ম জীবন তার এলেমেলো চলছে। হরিনাম করছে, দেখলেই বোঝা যাবে ভিতরে সে আনন্দে টগবগ করছে। স্বামীজী খুব কঠোর বাক্যে বলছেন, মুখ যেদিন তোমার গোমড়া থাকবে সেদিন ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাক, তোমার গোমড়া মুখ কাউকে দেখিও না।

এই যে তিনটে বলা হল, শান্তি, শক্তি ও আনন্দ; এই তিনটের সাথে চতুর্থ যেটা আসে তা হল, যে কোন ধরণের ভয় জীবন থেকে চলে যাবে। যার ভিতর শান্তি, শক্তি ও আনন্দ এসে গেছে, সে কোন কিছুকে, কাউকে ভয় সে করবে না, সে রাজাই হোক আর যেই হোক, কাউকে ভয় করে না। এই যে সাধারণ সাধারণ জিনিসকে ভয় করা, রোগকে ভয় করা, শোককে ভয় করা, এগুলো কোনটাই তার থাকবে না। রোগ, মহামারী, দুর্ভিক্ষে, যুদ্ধে কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হয়ে যায়, খারাপ সময় চলছে, চারিদিকে মৃত্যুর মিছিল, কত লোক কত রকম কথা লিখে যাচ্ছে। মরে যাবে তো মরে

যাবে, কি করা যাবে। মূল কথা, ভয় থেকে সে মুক্ত। এটা আমি পাবো না, এর থেকে যে ভয়; এটা আমার হাত থেকে চলে যাবে, এটার যে ভয়; এই ভয়গুলো কেটে যাবে।

আচার্য খুব সংক্ষেপে প্রথমের দিকে বলেছিলেন – শোক আর মোহ এই দুটোর নিবারণ। আর তার সঙ্গে হল, জ্ঞানশক্তি প্রচণ্ড বেড়ে যায়। লোকেরা জানতে চায়, ধর্ম করে কি হবে? আমরা খুব প্র্যাক্টিক্যাল দিক থেকে সংক্ষেপে বললাম, কারণ আমাদের মূল উদ্দেশ্য অন্য জিনিসকে নিয়ে আলোচনা করা। ধর্ম করলে কি লাভ? পাঁচটি জিনিসের লাভ – শান্তি, শক্তি, আনন্দ, অভয় আর সবচেয়ে বড় হল জ্ঞান। রাজযোগে পতঞ্জলি ধর্মমেঘ সমাধির কথা বলছেন। তার আগে বলছেন *ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা,* সমস্ত জ্ঞান জলভরা মেঘের মত তাঁর মনের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায়, মেঘ থেকে যেমন ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ে, এনাদের জ্ঞান ঠিক সেই ভাবে ঝমঝম করে পড়তে শুরু হয়।

ধর্ম জীবনে কেউ প্রতিষ্ঠিত কিনা, এই পাঁচটি জিনিস দিয়ে বোঝা যাবে। একটা কি দুটো না, পুরো পাঁচটাই থাকতে হবে। দ্বাদশ অধ্যায়ে তেরো নম্বর শ্লোক থেকে শুরু করে পর পর কয়েকটা শ্লোক ধরে যে গুণগুলো নিয়ে বলতে শুরু করেছেন, সেখানেও একই জিনিস, এটাই বলছেন। এখানে অন্য ভাষায় বলা হল, যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়। যাঁরা গীতার আলোচনা নিয়মিত শুনে যাচ্ছেন, তাঁদের এই পাঁচটাই হওয়া দরকার। এই পাঁচটা যদি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে আপনার কোথাও একটা ধর্ম জীবন পালন করতে ভুল হচ্ছে বা ধর্ম বুঝতে ভুল হচ্ছে। এই জন্যই ধর্ম দরকার, এই ধর্মের জন্যই গীতা দরকার। আর গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায় হল অদ্বৈত বেদান্তের প্রাণ। গীতা হল বেদান্ত, আর গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এগারো নম্বর থেকে তিরিশ নম্বর শ্লোক হল পুরো হিন্দু ধর্মের সার। সেই সারকে আরও বিস্তারে প্র্যাক্টিক্যাল বানিয়ে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখলেন। এই জিনিসটাকেই এবার ভগবান পর পর বলে যাবেন।

শ্রীভগবানুবাচ
ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ।।১।।

(শ্রীভগবান্ বলছেন –হে অর্জুন, এই ভোগায়তন শরীররূপী দৃশ্যটিকে ক্ষেত্র বলা হয়। যিনি এই শরীরকে জানেন অর্থাৎ স্বাভাবিক বা ঔপদেশিক জ্ঞানের বিষয় করেন, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রবিদ্‌গণ তাঁকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন।)

ইদং শরীরং কৌন্তেয়, হে কৌন্তেয় আমার তোমার এই যে শরীর, এই শরীরকে *ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে,* ক্ষেত্র বলা হয়। *এতদ্ যো বেত্তি,* এই শরীরকে যিনি জানেন, *তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ,* তাঁকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়, আমাদের ভাষায় অন্তর্যামী। কিন্তু বেদান্তে অন্তর্যামী না বলে ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন, এটা বেদান্তের একটা টেকনিক্যাল শব্দ। এই শরীরটা যেন একটা ক্ষেত, ক্ষেতের যেমন একজন মালিক থাকেন, তেমনি এই ক্ষেতের মালিককে বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ।

এই শ্লোক শুরু করার আগে আচার্য শঙ্কর দুটো লাইনে খুব সুন্দর বলছেন –*প্রকৃতি চ ত্রিগুণাত্মিকা সর্বকার্যকরণবিষয়াকারেণ পরিণতা পুরুষস্য ভোগাপবর্গার্থকর্তব্যতয়া দেহেন্দ্রিয়াদ্যাকারেণ সংহন্যতে সঃ।* রাজযোগে পুরুষ আর প্রকৃতির কথা বলা হয়, পুরুষ হল চৈতন্য আর প্রকৃতি হল সমস্ত শক্তি ও সমস্ত বস্তু। পুরুষ অর্থাৎ চৈতন্য কোন কারণে যদি প্রকৃতির কাছে চলে আসে তখনই সৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। এই সৃষ্টি কিসের জন্য হয়? সাংখ্য ও যোগ যেটা বলেন, আচার্য শঙ্করও এখানে ঠিক সেটাকেই নিচ্ছেন। পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে এসে যেন মুগ্ধ হয়ে যায়। আমরা যেমন জগৎকে নিয়ে মুগ্ধ হয়ে আছি। এই প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণ নিয়ে প্রকৃতি, আগে আগে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই তিনটে গুণের বিস্তারে এই জগৎ, আর এর যে ভোগ আর অপবর্গ, এই দুটোর যে সম্পাদন করা হবে; এর জন্য অনেক কিছু দরকার। যে কোন কাজ

করতে গেলে, যেমন আমি ক্ষেত চাষ করতে চাইছি, আমরা সবাই জানি ক্ষেত চাষ করার জন্য বিভিন্ন ধরণের যন্ত্র লাগে, আগেকার দিনে লাঙল ছিল, ইদানিং ট্র্যাক্টর হয়েছে, এছাড়া কোদাল লাগে, খুরপি লাগে, কি কাজ করতে চাইছি সেই কাজের উপর নির্ভর করবে কি কি ধরণের যন্ত্র লাগবে। পুরুষ বা আত্মা যখন সংসারে থাকেন, তখন এখানে তাঁর লাগবে ভোগ আর লাগবে মুক্তি; ভোগ আর মুক্তি দুটোই তাঁর লাগবে। তাই এই সংসার ভোগ আর যোগ দুটোরই জন্য। এই সংসারে থেকে একদিকে যেমন ভোগ হয়, আবার এই সংসারে থেকেই যোগও হয়। এই ভোগ আর যোগ সম্পাদন করার জন্য দরকার এই শরীর, শরীর ছাড়া কোনটাই হবে না। ভূত, প্রেত এরা কোনটাই করতে পারে না; ভোগও করতে পারে না, যোগও করতে পারে না। দেবতারা ভোগ করেন, কিন্তু যোগ করতে পারেন না। ভোগ আর অপবর্গ এই দুটো জিনিস একমাত্র এই শরীর দিয়েই সম্পাদন হয়। সেইজন্য আমাদের শরীরের একটা সাংঘাতিক দাম আছে। আমরা মনে করি, ধর্ম জীবন নিয়ে যাঁরা থাকেন, তাঁরা শরীরের দিকে দৃষ্টি দেন না। ভুল ধারণা, শরীরকে তাঁরা কখনই অবহেলা করেন না, তাঁদের কাছে শরীর সাংঘাতিক মূল্যবান জিনিস। এই সংসার এক মহাসমুদ্র, এই মহাসমুদ্রের পারে যাওয়ার জন্য একটা বড় জাহাজ দরকার, শরীরটা হল সেই বড় একটা জাহাজ। এই শরীর দিয়েই আমাদের মুক্তি পেতে হবে। আমি ভোগ করতে চাই, শরীর লাগবে। আমি যোগ করতে চাই, শরীর লাগবে।

এই যোগ আর ভোগ, এটা দুই স্তরের আত্মা। শরীরের ভিতর যিনি আছেন, তাঁর ভোগ আর যোগ, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যিনি আছেন তাঁরও যে ভোগ আর যোগ, দুটো আলাদা স্তরের। ঠাকুরও বলছেন, সৃষ্টি হল তাঁর লীলা, তিনি মজা করার জন্য এই সৃষ্টির রচনা করেন। তবে তিনি নিত্য-মুক্ত-শুদ্ধ-বুদ্ধ কিনা, তাই তিনি কখন বন্ধনে পড়েন না। এখানে ঈশ্বরকে উপদেশ দেওয়ার জন্য তো গীতা রচিত হয়নি, মানুষকে মুক্তির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই কথা বলছেন। মানুষকে তো বোঝাতে হবে শরীর জিনিসটা কি, সেইজন্য বলছেন, *ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যাভিধীয়তে*, আর এই শরীরকে যিনি জানেন তিনি হলেন ক্ষেত্রজ্ঞ।

ইদং হল সর্বনাম, এই শরীর; আচার্য বলছেন, *ক্ষতত্রাণাৎ ক্ষয়াৎ ক্ষরণাৎ ক্ষত্রবদ্ বা অস্মিন্ কর্মফলনির্বৃত্তেঃ*, ধাতু, পদ ব্যাকরণের এই নিয়মগুলি মেনে আচার্য বলছেন *ক্ষতত্রাণাৎ*, ক্ষত হওয়া থেকে শরীরকে বাঁচানো হয়, শরীরে কোন আঘাত লেগে শরীরে যেন ক্ষতি না হয়ে যায়, সেইজন্য এটাকে বলা হয় ক্ষেত্র। *ক্ষয়াৎ*, ধীরে ধীরে শরীরের ক্ষয় হয়, সেইজন্য শরীরের আরেকটা নাম ক্ষেত্র। শরীরকে কেন ক্ষেত্র বলছেন, এর তিনটে কারণ বলছেন, প্রথম, যে কোন আঘাত থেকে শরীরকে রক্ষা করতে হয়, ধীরে ধীরে এই শরীরের ক্ষয় হতে থাকে আর ক্ষেত যেমন ফসল দেয়, ঠিক তেমন এই শরীর দিয়ে কর্মফলের ভোগ হয়। আমরা যেমন যেমন কর্ম করি তেমন তেমন সেই কর্মের ফলভোগ করি, এই ফলভোগ সব সময় শরীরের উপর দিয়ে হয়, সেইজন্য শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয়।

শরীরকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত যিনি নিজের জ্ঞান দিয়ে প্রত্যক্ষ করেন, আমরা যেটা জানতে পারি না, যেমন আমার পিঠ আমি দেখতে পাইনা, কিন্তু আমরা জানি আমার পিঠ আছে; আর তার সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে বা উপদেশের মাধ্যমে অনুভবগুলো পরিষ্কার ভাবে যিনি জানেন, মোদ্দা কথা এইভাবে শরীরকে যিনি জানেন বা বিভিন্ন যে জ্ঞান আমাদের কাছে আসে বা প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা যিনি জানেন, তাঁকে বলছেন ক্ষেত্রজ্ঞ। এই শরীরকে যিনি জানেন, এই শরীরের কার্যগুলিকে যিনি জানেন, এই শরীরের মাধ্যমে যত রকম উপলব্ধি হয় সেগুলোকে জানেন। কিন্তু এই শরীর তো জড়, এই শরীরের পিছনে যে চেতনা রয়েছে, যে চৈতন্য শক্তি রয়েছে, তাঁকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলছেন। সহজ ভাষায় বলা যেতে পারে, আমাদের শরীরের ভিতরে যিনি আত্মা আছেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ।

এই ক্ষেত্রজ্ঞ কিন্তু জীবাত্মা নন, এটাই আসল আত্মা। *এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ,* এই দুটোকে পরিষ্কার যিনি জানেন, তিনি হলেন জ্ঞানী। জ্ঞানী আর ভক্তের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। যদি কেউ ঠিক ঠিক ভক্ত হতে চান, ঠিক ঠিক জ্ঞানী যদি কেউ হতে চান, ধর্মে ঠিক ঠিক প্রতিষ্ঠিত হতে যদি চান, তাহলে তাঁকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই দুটোকে পরিষ্কার ভাবে জানতে হবে। পরিষ্কার ভাবে না জানলে আমরা দুটোকে মিশিয়ে ফেলব, ক্ষেত্রকে কখন ক্ষেত্রজ্ঞ মনে করি, ক্ষেত্রজ্ঞকে কখন ক্ষেত্র মনে করি, আত্মা আর দেহকে আমরা মিশিয়ে ফেলি। কারুর মনে হয়ত প্রশ্ন হতে পারে, এত ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলার কি দরকার, আত্মা আর দেহ বলে দিলেই হয়। না বলা যায় না, এর মধ্যে দর্শন রয়েছে, কাব্য রয়েছে, সেইজন্য এনারা এভাবেই দর্শনকে একটা কাব্যিক রূপ দিয়ে বলবেন। তাহলে কোন জ্ঞানে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞকে জানা যেতে পারে? এর উত্তর আসছে পরের শ্লোকে, গীতার খুব নামকরা শ্লোক। গীতার ১৩/২ শ্লোকের উপর আচার্যের ভাষ্য খুব বিখ্যাত ভাষ্য। এত উচ্চমানের ভাষ্য যে ভাবা যায় না।

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম।।২।।

(হে অর্জুন, সকল ক্ষেত্রের দ্রষ্টা ক্ষেত্রজ্ঞ এক। ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্র হতে পৃথক্। আমাকে সেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জানবে। ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্ত সর্বদেহই প্রকৃতির পরিণাম। এক ক্ষেত্রজ্ঞ দেহাদি উপাধি দ্বারা প্রবিভক্তের ন্যায় প্রতীয়মান হন। তাঁকে সর্বোপাধিবিবর্জিত, সদসদাদি সমস্ত শব্দ ও প্রত্যয়ের অগোচর 'আমি' বলে জানবে। কারণ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের এই প্রকার জ্ঞানই আমার মতে প্রকৃত জ্ঞান।)

হে অর্জুন, ক্ষেত্র কি তোমাকে বললাম, ক্ষেত্র হল objective knowledge আর subjective knowledge হচ্ছে শরীরের ভেতরে যিনি থাকেন, এবং যিনি এই পুরো বিষয়কে জানছেন তিনি হলেন ক্ষেত্রজ্ঞ। এই দুটোই শুধু নয়, এর সাথে আমি আরেকটি তত্ত্ব যোগ করছি – *ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি,* আমিই সেই ক্ষেত্রজ্ঞ। আমি কে? মানে, ভিতরে যিনি জীবাত্মা আছেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ আর এই শরীরের বাইরে যে বিরাট রূপে আছেন তিনিও শ্রীকৃষ্ণ, যেটা আগেই বিশ্বরূপদর্শনযোগে বলে দেওয়া হয়েছে। দশম অধ্যায়ে ভগবান বলে দিলেন – যেখানে যা কিছু আছে সব আমি। এটা বলার পর একাদশ অধ্যায়ে গিয়ে তিনি তাঁর বিরাট স্বরূপকে দেখিয়ে দিলেন। এরপরেই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এখানে এসে বলছেন –তোমার শরীরে যিনি সব কিছুকে জানতে পারছেন সেটা আমিই, আমিই বিরাট আবার আমিই স্বরাট। যে বিরাট রূপকে দেখে একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন ভয়ে কাঁপছেন, তাকাতে পারছেন না, সেই বিরাট রূপী তিনিই আবার তোমার শরীরের ক্ষেত্রজ্ঞ, অন্তর্যামী, আত্মা রূপে বিরাজ করছেন। আমিই সেই বিরাট যাকে তুমি কিছুক্ষণ আগে দেখেছিলে, আবার আমিই এই স্বরাট।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের এই শ্লোকটি (১৩/২) খুব বিখ্যাত একটি শ্লোক। এই শ্লোকটির উপর শঙ্করাচার্য যে ভাষ্য দিয়েছেন, এক কথায় তা অনবদ্য এবং খুব নামকরা ভাষ্য। আচার্য এই শ্লোকের উপর একটা বিরাট লম্বা ভাষ্য দিয়েছেন। আচার্য এখানে নিজেই বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করে নানা রকমের প্রশ্ন উত্থাপন করে তিনিই আবার তর্ক যুক্তির সাহায্যে তিনি নিজেই সেগুলোকে খণ্ডন করছেন। যদি জীবাত্মা আর শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন হন তাহলে তো বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। কারণ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দর্শন দাঁড়িয়ে আছে এই একটি তত্ত্বের উপরে। কি সেই তত্ত্ব? আমি আর শ্রীকৃষ্ণ আলাদা। দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলেছিলেন –*তেষামহং সমুর্দ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ,* শ্রীকৃষ্ণ বলছেন আমার ভক্তকে আমি এই জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে উদ্ধার করি। তাহলে এখানে আমি আর শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন কি করে হলাম? এই প্রশ্নের উপর এখনও বিরাট তর্কবিতর্ক চলছে তো চলছেই।

আমাদের হিন্দুধর্মের তৎকালীন যত দর্শন ও মত ছিল, তার প্রধান প্রধান মূল বিষয়গুলো এইখানে উত্থাপন করা হচ্ছে। সেগুলোকে আচার্য এক এক করে খণ্ডন করেছেন। শঙ্করাচার্যের যুক্তিগুলিকে বিরোধীরা আবার খণ্ডন করছেন, সেগুলোরও আচার্য আবার উত্তর দিচ্ছেন। সেইজন্য এই ১৩/২ এর শ্লোকটি অত্যন্ত দুর্বোধ্য। প্রত্যেকটি দর্শনের উপর অগাধ দখল না থাকলে এর যুক্তিতর্ককে বোধগম্য করা যায় না।

এই যে ক্ষেত্রজ্ঞ, যিনি এই শরীরকে জানেন, যিনি অন্তর্যামী, আত্মা যিনি; হে ভারত, যেখানেই ক্ষেত্র দেখছ, যেখানেই জীব আছে, যেখানেই মনে হবে এখানে প্রাণ আছে, প্রাণন ক্রিয়া হচ্ছে, এই সমস্ত শরীর পিঁপড়ে থেকে নিয়ে ব্রহ্মা পর্যন্ত, তার যে ক্ষেত্রজ্ঞ আমি নিজে। আচার্য বলছেন, *ক্ষেত্রজ্ঞং যথোক্তলক্ষণং চ অপি মাং পরমেশ্বরম্ অসংসারিণাং*, আমি পরমেশ্বর, আমি অসংসারী, তাঁকে জানো। *সর্বক্ষেত্রেষু*, এমন কোন দেহ নেই যেটা আমি নই। শ্রীরামকৃষ্ণ তিন প্রকার ভক্তের বর্ণনা করছেন, অধম ভক্ত মনে করে উপরে ঈশ্বর বসে আছেন, তিনি সব দেখছেন। মধ্যম ভক্ত দেখে সমস্ত প্রাণীর ভিতরে ঈশ্বর আর উত্তম ভক্ত দেখেন, তিনিই সব কিছু হয়েছেন, এই জিনিসটাকেই এখানে বলছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম*, আমার মতে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই দুটোকে পরিষ্কার ভাবে জানার নামই জ্ঞান। আমার আপনার ভিতর যিনি অন্তর্যামী, আর যিনি ঈশ্বর, দুটো এক। বেদান্তের যত সম্প্রদায় আছে, রামানুজের সম্প্রদায়, মাধ্বাচার্যের সম্প্রদায়, চৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায়, বৈষ্ণবদের সম্প্রদায়, এখান থেকেই সবারই মধ্যে বাগবিতণ্ডা বেঁধে যায়। ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, কোনটা কি, বিভিন্ন ভাবে এনারা ব্যাখ্যা করেন। আর আচার্য শঙ্কর এটার উপর একটা দীর্ঘ ভাষ্য দিয়েছেন, আর অত্যন্ত কঠিন ভাষ্য। আচার্যের এই ভাষ্য নিজে থেকে সরাসরি পড়ে বুঝতে গেলে কঠিন হয়ে যাবে, বোঝাই যাবে না। এখানে আমরা খুব সংক্ষেপে আর সহজ করে বুঝিয়ে বলছি আচার্য কি বলতে চাইছেন, আর কেন বলতে চাইছেন। *জীবব্রহ্মৈকৈবনাপর*, খুব নামকরা কথা, জীব আর ব্রহ্ম এক। তার মানে আমার ভিতর যিনি আছেন আর ব্রহ্ম এক। এখানে বলছেন যিনি ঈশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ আর যিনি অন্তর্যামী, এই দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

ঈশ্বর আর জীবের মধ্যে যে তফাৎ, এটা হল জ্ঞান আর অজ্ঞানের তফাৎ। এর উপর আগে আগে বিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। যদি ধরে নেওয়া হয়, ঈশ্বর অন্তর্যামী, ঈশ্বরই ভিতরে বাস করছেন, তাহলে অনেক সমস্যা এসে যায়। অন্যান্য দর্শন থেকে অদ্বৈত বেদান্তকে এই জায়গাতে আক্রমণ করা হয়। প্রথম সমস্যা হয়, তাহলে ঈশ্বর সংসারী হয়ে যান। কারণ মানুষ জন্মাচ্ছে মরছে, এদিকে বলা হচ্ছে ঈশ্বরই ক্ষেত্রজ্ঞ, তাহলে ঈশ্বর হয়ে গেলেন সংসারী যাঁর বারবার জন্মমৃত্যু হচ্ছে। দ্বিতীয় সমস্যা হয়, সংসারের অভাব হয়ে যায়। যিনি ঈশ্বর, তিনিই যদি সবার ভিতরে থাকেন, তাহলে আর কিসের সংসার। কারণ অজ্ঞান যদি আর নাই থাকে, তাহলে সংসার কি করে চলবে। আমরা জানি আমাদের মধ্যে অজ্ঞান আছে, কিন্তু ভগবানের তো অজ্ঞান কোথা থেকেও আসতে পারে না, তাহলে তো সংসাররে অভাব হয়ে যাবে। আর সংসারই যদি না থাকে, তাহলে বন্ধন আর মুক্তি দুটোই অর্থহীন হয়ে যায়। একমাত্র ঈশ্বরই যদি থাকেন, তাহলে কিসের বন্ধন আর কিসের মুক্তি।

তার সাথে যত শাস্ত্র আছে এগুলোও সব অর্থহীন হয়ে যাবে। কারণ আমাদের যত বেদ, উপনিষদ আছে, সেখানে এনারা সবাই মুক্তির পথ দেখাচ্ছেন, সংসারই নেই তাহলে কিসের বন্ধন আর কিসের মুক্তি। বন্ধন নেই তাই মুক্তিও নেই, তাহলে শাস্ত্রের কিসের দরকার। যদি আপনি বলেন ঈশ্বরই আত্মা রূপে আছেন, আমার আপনার ভিতর যিনি আছেন তিনি হলেন সেই ঈশ্বর। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, আমিও তাহলে সর্বজ্ঞ, আমি যদি সর্বজ্ঞ হই তাহলে তো সংসার নেই। যারা বেদান্ত বুঝতে যায় তারা সবাই এই জায়গাতে এসে সব গোলমাল করে বসে। আমি যদি সেই ব্রহ্ম হই, তাহলে

আমার জ্ঞানের কি দরকার, না বুঝে সবাই এই ধরণের কথা বলে যাচ্ছে – যারা বলছে তারাও বোঝে না, যারা শুনছে তারাও বোঝে না। আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে এই জিনিসগুলিকেই আলোচনায় নিয়ে আসছেন।

এখানে কিন্তু অহং ব্রহ্মাস্মি কোথাও বলছেন না, অহং ব্রহ্মাস্মি পুরো আলাদা জিনিস। এখানে বলছেন যিনি ঈশ্বর তিনিই সবার ভিতরে রয়েছেন। যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত, তাঁর ভিতরে শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তাঁর ভিতর শ্রীকৃষ্ণই আছেন। তাই এই প্রশ্নটাই আসবে, শ্রীরামকৃষ্ণ যদি আমার ভিতরে থাকেন তাহলে আমার অজ্ঞান কোথা থেকে আসবে, অজ্ঞান থাকার কোন প্রশ্নই নেই। অজ্ঞান যদি না থাকে সংসার নেই, সংসার যদি না থাকে বন্ধন মুক্তি এই শব্দগুলি অর্থহীন হয়ে যাবে। বন্ধন মুক্তি যদি অর্থহীন হয়ে যায়, তাহলে আর শাস্ত্রের কিসের প্রয়োজন, বেদ, উপনিষদের তো আর কোন দরকার নেই।

এখান থেকে আচার্য শঙ্কর সব প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করছেন। ঠিকই বলছ, যদি জ্ঞানের স্তর থেকে দেখা হয়, তাহলে কিন্তু ভগবান কখন সংসারী নন। ভগবান কখনই কোন ভাবে সংসারে লিপ্ত হন না। জ্ঞানী পুরুষ আর অজ্ঞানী পুরুষদের মধ্যে তফাৎ দেখলেও এটা বোঝা যায়। যিনি মুক্ত পুরুষ, তাঁকে জ্ঞানের দৃষ্টি থেকে যদি দেখা হয়, এটা লোকেদের পক্ষে সম্ভব না, কারণ জ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখা অত্যন্ত কঠিন। জ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখলে তিনি কখনই সংসারী নন। অজ্ঞানের দৃষ্টিতে যদি দেখা হয় তবেই এই জিনিসগুলো খাটবে। আমরা যখন ঈশ্বরকে নিয়ে আলোচনা করি বা শ্রীকৃষ্ণকে আলোচনা করি, শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে আলোচনা করি, সবটাই হল অজ্ঞানের দৃষ্টিতে মনে করা হয় ঈশ্বর শরীর ধারণ করেছেন। কারণ ঈশ্বর কোন পরিস্থিতিতে সংসারী হন না। এখন শরীরের যে দোষগুলো রয়েছে, সংসারের যে দোষগুলো রয়েছে, এগুলো কখনই ঈশ্বরকে স্পর্শ করতে পারে না। তার মানে বলতে চাইছেন, আত্মা যিনি আমার ভিতরে আছেন, আমার যে অজ্ঞান, আমার যে দেহ, দেহের যে দোষ, জ্ঞানের দৃষ্টিতে এগুলো আত্মাকে কখন স্পর্শ করে না।

এই যে আমরা বলে থাকি, আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, আমি জ্ঞাতা; আত্মাই যদি সত্য হন তাহলে এই কথাগুলো কেন বলা হয়? বেদান্ত বলেন, জিনিসগুলিকে বোঝানর জন্য এগুলোকে উপাধি রূপে দেওয়া হয়, আসলে আত্মা কখনই কর্তা হন না, আত্মা কখনই জ্ঞাতা হন না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যখন আলোচনা চলছিল, সেখানেও এই জিনিসটাকে বারবার বলেছেন; আত্মার জন্ম নেই, আত্মার মৃত্যু নেই। কিন্তু সব সময় আমরা দেখছি সমস্ত প্রাণীই জন্মাচ্ছে, মরছে। বলছেন, ঠিকই বলছ, এটা সংসারের দৃষ্টিতে যখন দেখা হয় তখনই একমাত্র এই জিনিসগুলো হয়। ফলে এই জিনিসগুলিকে বোঝানর জন্য ধরে নেওয়া হয়; এই যে যখন ধরে নেওয়া হয় বলা হচ্ছে, তখন কিন্তু দুটো সত্তা এসে যায় –পারমার্থিক সত্তা ও ব্যবহারিক সত্তা। বেদান্তে এই দুটো সত্তা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আচার্য সরাসরি এটা বলেননি, কিন্তু পরমার্থতঃ বলছেন।

স্বামীজী এই দুটোকে বলছেন – absolute truth and relative truth। আত্মা বা ঈশ্বর আর আমার ভিতরে যিনি অন্তর্যামী, এটা দুটো পৃথক সত্তাতে চলেন –একটা হল পরমার্থতঃ, পারমার্থিক সত্তা; যেখানে কোন কিছু নেই, না আছে সংসার, না আছে কোন দোষ, না আছে কোন অজ্ঞান, আরেকটা হল ব্যবহারিক সত্তা। এই ব্যবহারিক সত্তাতে দেহ আছে, মনে হয় ঈশ্বর যেন সংসারের দোষে লিপ্ত হন, মনে হয় যেন তিনি অজ্ঞানে পড়ে আছেন। আচার্য শঙ্করের বেদান্তে পারমার্থিক সত্তা আর ব্যবহারিক সত্তা এই দুটো সত্তাকেই মেনে নেওয়া হয়। বেদান্তে সবটাই হয়, বেদান্তী যাঁরা তাঁদেরও খিদে পায়, বেদান্তী যাঁরা তাঁদেরও জলতৃষ্ণা পায়, বেদান্তী যাঁরা তাঁদেরও ক্রোধ হয়, বেদান্তী যাঁরা তাঁরাও ভালবাসেন, কিন্তু সবটাই ব্যবহারিক সত্তাতে হয়। ব্যবহারিক সত্তাকে লোকে মনে করে মিথ্যা, মায়া, কিন্তু এগুলো কোনটাই মিথ্যা বা মায়া না। কিন্তু শঙ্করাচার্যের পরে

পরে যে বেদান্তীরা এলেন, এনারা দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের সাথে তর্ক করতে গিয়ে ব্যবহারিক সত্তাকে পাল্টে দিলেন মায়াতে। মায়া মানে মিথ্যা, সেখান থেকে অদ্বৈত বেদান্ত যেন হয়ে গেল মায়াবাদ। অদ্বৈত বেদান্ত কোন ভাবে, কোন দিক দিয়ে একেবারেই মায়াবাদ নয়, অদ্বৈত বেদান্ত হল পরমার্থবাদ, ব্রহ্মবাদ। ব্রহ্মবাদে, ব্রহ্ম ছাড়া যাবতীয় যা কিছু আছে সবটাই হল ব্যবহার কালে। এই যে একটা জিনিস দুটো স্তরে থাকতে পারে, এটাকেই বলছেন মায়া।

বেদান্ত মত বলতে আমরা এখানে আচার্য শঙ্করের মতকেই মনে করে চলছি, কিন্তু বেদান্ত মতের মধ্যে রামানুজ ও মাধ্বাচার্যের মতকেও যুক্ত করা হয়। আচার্য শঙ্করও বলছেন, সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, কিন্তু ব্যবহার যেটা হচ্ছে অর্থাৎ যেটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, এটাকে কখনই অস্বীকার করা যাবে না। এই কারণে বেদান্তে দুই ধরণের সত্তাকে গ্রহণ করা হয় – (১) পারমার্থিক সত্তা ও (২) ব্যবহারিক সত্তা। ব্যবহারিক সত্তা বলতে আমি এই মুহূর্তে যা দেখছি, আমি আপনি সবাই আলাদা। কিন্তু পরমার্থত তা নয়, পারমার্থিক সত্তাতে কোন ভেদ নেই, তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। ব্যবহার কালে এই অভিন্নতটা থাকে না, তখন এটা পাল্টে যায়। আচার্য শঙ্কর যেটা বারে বারে বলছেন, তোমার যে ব্যবহারিক সত্তা আছে সেই সত্তাকে অতিক্রম করে তুমি পারমার্থিক সত্তাতে উঠে এসো, তাহলে জাগতিক ব্যপারে যে দুঃখ-যন্ত্রণা আছে সেটাতে তুমি আর কষ্ট পাবে না।

তোমরা যে প্রশ্ন করছ, সবই যদি ঈশ্বর হন তাহলে মুক্তির আর কি দরকার, শাস্ত্রেরই বা আর কিসের প্রয়োজন, আমিই যদি শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামকৃষ্ণ হই তাহলে সাধনার করার কি দরকার। আচার্য বলছেন, তোমাদের এই প্রশ্ন করার অধিকারই নেই, কারণ তোমার অজ্ঞান এখনও দূরীভূত হয়নি, তুমি এখনও ব্যবহারিক সত্তাতে আছে। যত দিন তুমি ব্যবহারিক সত্তাতে থাকবে তত দিন তোমাকে সব কিছু মানতে হবে, শাস্ত্র মানতে হবে, বন্ধন ও মুক্তিকে মেনে নিতে হবে, পূজো অর্চনা মানতে হবে। কিন্তু তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর আসল সত্যটা কি; তখন বলতে হবে অদ্বৈতই আসল সত্য। অদ্বৈত মানে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই, তিনিই একমাত্র আছেন। তাহলে ব্যবহারিক কি করে হয়ে যাচ্ছেন? বলছেন, এটাই মায়া, মায়াতে ব্যবহারিক মনে হয়। এই মায়াটা কার? ভগবানরই মায়া। তিনি তাঁরই মায়া দিয়ে আসল জিনিসটাকে ঢেকে দিয়ে সেই জিনিসটাকে নতুন করে অন্য একটা জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছেন।

বেদান্তীরা এটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমুদ্র আর ঢেউয়ের উপমা নিয়ে আসেন। সমুদ্র এক, সমুদ্রের উপর ঢেউ উঠছে, ঢেউয়ের সমুদ্র নয়, সমুদ্রেরই ঢেউ। কোনটা বড় ঢেউ কোনটা ছোট ঢেউ, সমুদ্র থেকে ঢেউ উঠে আবার সমুদ্রেই মিলিয়ে যাচ্ছে। যদি ঢেউ রূপে দেখি তখন সব ঢেউই আলাদা আলাদা, কিন্তু ঢেউকে যখন জলরাশি রূপে দেখি তখন সবটাই এক। আমি আর আপনি নাম রূপে দুজন আলাদা, মানুষ রূপে আমরা এক। আচার্য এইটাই বলছেন, পরমার্থ সত্যের দিক থেকে আমরা সবাই এক, কিন্তু ব্যবহার সত্তাতে দুই এসে যাবে। ব্যবহার সত্তাটাই অজ্ঞান। অজ্ঞান হল, যেখানে আমি আমার মনটাকে শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ইত্যাদির সঙ্গে জুড়ে রেখেছি। যখন এগুলো থেকে মনটা সরে আসবে তখন দেখতে পাব যে, এরা নিজের মত নাচানাচি করে, এরা তো আমার কথা মত চলে না, অকারণে আমি এদের সঙ্গে এক হয়ে কেঁদে মরছি।

ইদানিং কালে একটা ভিডিও খুব চলছে। সেই ভিডিওতে একজন নামকরা বড় পদার্থ বিজ্ঞানী বলছেন, কোয়ান্টাম ফিজিক্স নিয়ে যখন আমি আলোচনা করি তখন আমি বুঝতে পারি না, আমি কোয়ান্টাম ফিজিক্স বলছি নাকি বেদান্ত বলছি। কোয়ান্টাম ফিজিক্সে ইলেক্ট্রন একই সঙ্গে দুটো স্তরে থাকে, কখন ম্যাটার কখন ওয়েভ। একটা জিনিস একদিকে একটা বস্তু, অন্য দিকে আবার সেটাই তরঙ্গ, একই জিনিসের দুটো স্তর কি করে হবে? হয় তরঙ্গ হবে, নয়তো বস্তু হবে। কিন্তু দেখা

যাচ্ছে এ্যাটমের ভিতরে যাবতীয় যা কিছু আছে সবটারই দুটো সত্তা। এটা কিন্তু পদার্থ জগৎ থেকে বলা হচ্ছে। আচার্য শঙ্কর আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অনেক আগে এই জিনিসটাকে নিয়ে এলেন –পারমার্থিক সত্তা এবং ব্যবহারিক সত্তা। একই জিনিস দুটো জায়গায় একই সময়ে থাকছে। ঠিক তেমনি আমরা যদি ইলেক্ট্রনকে বুঝতে চাই, আমাকে বলা হবে – আপনি বলুন কি জানতে চান। এই ইলেক্ট্রন কোথায় আছে সেটা জানতে চান, নাকি এর গতি কত সেটা জানতে চাইছেন? যেমনটি আপনি জানতে চান তেমনটি হবে। ঠিক তেমনি আমার আপনার ভিতর যে আধ্যাত্মিক সত্তা আছে, আগে আমাকে ঠিক করতে হবে আমি কোনটা জানতে চাই। আমি পরমার্থতঃ জানতে চাইছি, নাকি ব্যবহারকালে জানতে চাইছে। পারমার্থিক সত্তাকে যদি জানতে চান, তাহলে তাঁর জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, কোন বিকার নেই, ক্ষয় নেই, তিনি কর্তাও নন, ভোক্তাও নন। আর যদি ব্যবহারকালে জানতে চাই, তাহলে এই শরীরের সাথে তিনি কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা। আগে আমাদের ঠিক করতে হবে আমি কোনটা জানতে চাইছি।

বর্তমান কালের ফিজিক্সের একটু আইডিয়া যদি কারুর থাকে, তাহলে এই জিনিসটা বুঝতে তার পক্ষে সহজ হবে। এটাই বেদান্তের মূল কথা –পারমার্থিক সত্তা এবং ব্যবহারিক সত্তা। এই কথা আমার আপনার কথা না, আচার্য শঙ্করের কথা। আচার্য শঙ্কর ফিজিক্সের কথা বলেননি, আমরা বোঝাবার জন্য কোয়ান্টাম ফিজিক্সের এই বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে বললাম। এর সাথে বেদান্তের কোন মিল নেই ঠিকই, কিন্তু একটা জায়গায় এর পুরো মিল রয়েছে, একই বস্তু দুটি অবস্থাতে থাকে।

এরপর আচার্য অবিদ্যা নিয়ে বলছেন, যেটা ব্যবহারকালে হয়। যত বাস্তবিকতা রয়েছে, এগুলো সব অজ্ঞানীদের জন্য, জ্ঞানীদের জন্য এগুলো কখনই আসবে না। অবিদ্যা কি? অবিদ্যাকে আচার্য পরিভাষিত করছেন –*অগ্রহণ*, একটা জিনিসকে জানতে না পারা; দ্বিতীয়, বিপরীত গ্রহণ, জিনিসটাকে উল্টো বোঝা; তৃতীয় সংশয়, জিনিসটাকে সন্দেহ করা। যখন ঠিক ঠিক জ্ঞান হয়, তখন সমস্ত কিছু সরিয়ে দেয়। একটা জিনিসকে দেখতে পারছি না –বিপরীত জ্ঞান, জিনিসটা আছে, যেমন রাত্রিবেলা আমরা সূর্য দেখতে পাই না, সূর্য তো আছে, কিন্তু দেখা যায় না। বিপরীত গ্রহণ –রাতের অন্ধকারে সাপ আর দড়ি এক রকম হয়ে গেছে। সংশয় –একটা জিনিসকে ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি না, জ্ঞান হয়ে গেলে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গিয়ে জিনিসটা যেমন ঠিক তেমনটা দেখাবে। অবিদ্যা মানে এই তিনটে –অগ্রহণ, বিপরীত গ্রহণ আর সংশয়। আমাদের চোখে যদি কোন দোষ হয়, ওই দোষটাকে যদি সারিয়ে দেওয়া হয় তখন দৃষ্টি আগে এক রকম ছিল এখন অন্য রকম হয়ে গেছে। যাদের চোখে ছানি হয়, ছানি কেটে দেওয়ার পর তাদের দৃষ্টি পুরো অন্য রকম হয়ে যায়। জ্ঞান ঠিক এই জিনিসটাই করে, নূতন করে কোন জিনিসকে নিয়ে আসে না। যেমন চোখের একটা দোষ ছিল, দোষটাকে ঠিক করে দেওয়া হল, জিনিসটাকে এবার যেমন আছে তেমন দেখাবে; যেমন মনের দোষ, জ্ঞান মনের দোষটাকে সরিয়ে দেয়। ত্রয়োদশ অধ্যায় মনের দোষটাকে সরিয়ে দেয়।

তাহলে মায়া কি? পরে আচার্যের মুখের এর আলোচনা আসবে। মায়া মানে, statement of facts, যে জায়গাতে মায়ার উপর আচার্য বলবেন, সেখানে আবার আমরা বিস্তারে আলোচনা করব। মায়া যদি বাস্তবিক হয়, তাহলে কারুর যদি মুক্তি হয়ে যায়, আবার সে বন্ধনে পড়ে যাবে। যেমন জেলে যারা বন্দী হয়ে আছে, জেল থেকে তারা ছাড়া পেয়ে গেলে আবার সে জেলে যেত পারে। দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা এই জায়গাতে এসে বিরাট সমস্যায় পড়ে যান। বন্ধনকে যদি সত্য মনে করি, তাহলে মুক্তি বলে কোন কিছু হয় না, আবার আমাকে বন্ধনে পড়তে হবে। দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের কাছে মিথ্যা, মায়া এগুলো সত্য; কারণ জগৎটা তাদের কাছে সত্য; সাংখ্য ও যোগে প্রকৃতি সত্য, জগৎ সত্য, এখানে মুক্তি হয়ে যাওয়ার পর আবার বন্ধনে পড়ে যেতে পারে। তাহলে শাস্ত্রে যে আত্যন্তিকি মুক্তির কথা বলা হয়, এটা কখন সম্ভবই না। শাস্ত্রই মিথ্যা হয়ে যাবে। অদ্বৈত বেদান্ত তাই বলে, এই আত্মা আসলে কখন বন্ধনে পড়েন না, আমরা কেউই আসলে

কোন বন্ধনে পড়িনি। আমরা যদি সত্যিকারের বন্ধনে পড়ে থাকতাম, তাহলে সমস্ত শাস্ত্রই মিথ্যা হয়ে যেত, কারণ সমস্ত শাস্ত্রই আত্যন্তিক মুক্তির কথা বলছেন। এখন আমরা যে বন্ধনে আছি, আসলে আমরা মনে করি এই বন্ধনটা বাস্তবিক। বন্ধন যদি বাস্তবিক হয়, তাহলে মুক্তি হয়ে যাওয়ার পর আবার তিনি বন্ধনে পড়বেন। তার মানে মুক্তি মানেই সর্বকালে সর্বাবস্থায় আমরা মুক্ত। একটা জিনিস স্বাভাবিক ভাবেই শক্তিমান, কোন দোষবশাৎ যেমন অন্য রকম দেখায়। মুক্তির উপলব্ধি, মুক্তির জ্ঞান স্বাভাবিক ভাবে আমাদের আসে না, দোষটা মুক্তির সঙ্গে নেই, দোষ হল যেটা দিয়ে দেখা হচ্ছে সেটার। চোখের দৃষ্টিতে বস্তু অন্য রকম দেখায়, বস্তুতে দোষ নেই, দোষ চোখের। মুক্তি আমাদের সব সময় হয়ে আছে, মনের বোঝার দোষে আমরা মনে করছি আমরা বন্ধনে পড়ে আছি। কারণ এই বন্ধন যদি সত্য হয়, তাহলে মুক্তিও কোন দিন সম্ভব হবে না।

তাহলে আমরা যদি বাস্তবিক মুক্ত হয়ে থাকি তাহলে শাস্ত্রের আর কি প্রয়োজন? সত্যিই জ্ঞানীদের জন্য শাস্ত্র লাগে না। ঠাকুরও বারবার এই কথা বলছেন, জ্ঞানীর একটা লক্ষণ হল জ্ঞানীর সাথে কোন বই থাকে না। তবে অজ্ঞানীদের পথ দেখাবার জন্য জ্ঞানী শাস্ত্রের মর্যাদা পালন করেন এবং লোকশিক্ষার জন্য শাস্ত্রকে সামনে রাখেন আর শাস্ত্রের কথা বলেন। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে আগেও বলেছেন, লোকসংগ্রহের জন্য, লোককল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখে জ্ঞানীরা এগুলো করেন। পরে বলবেন, কিন্তু জ্ঞানী তো বলেন, আমি এই রকম, আমি সেই রকম? আচার্য শঙ্কর পরে এই প্রশ্নের খুব সুন্দর উত্তর দেবেন। সেখানে আচার্য বলছেন, সমস্ত জ্ঞানীরা এই রকমই, তাঁরা দেহকে আত্মা মনে করেন। আচার্য পরে নিজের ভাষ্যে আরও সুন্দর ও বিস্তারে বলবেন।

তার সাথে তিনি আরেকটা জিনিসের উপর খুব জোর দিনে –সম্প্রদায় বিদ্যা। আসলে হিন্দু ধর্মটাই সম্প্রদায় বিদ্যার উপর দাঁড়িয়ে আছে। অনেকেই আমরা জিনিসটা ঠিক বুঝি না। অনেকে বলেন, হিন্দু ধর্ম কোন ধর্মই না। হিন্দু ধর্ম একটা বিরাট বড় স্টেডিয়ামের মত। সেই স্টেডিয়ামে অনেকগুলো ছাতা লাগিয়ে লাগিয়ে বিভিন্ন ছোট ছোট গ্রুপ দাঁড়িয়ে আছে। আমরা হলাম সম্প্রদায় বিদ্যার। ইনি শঙ্করাচার্যের সম্প্রদায়ের, উনি রামানুজের সম্প্রদায়ের, তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের। এখানে আচার্য শঙ্কর নিজের সম্প্রদায়ের কথা বলছেন। যদি সম্প্রদায়বিৎ না হয়, যার কোন সম্প্রদায় নেই, তাদের সম্বন্ধে আচার্য পরিষ্কার বলবেন –*সর্বশাস্ত্রবিদ্ অপি মূর্খবদ্ এব উপেক্ষণীয়ঃ*, সমস্ত শাস্ত্রও যদি সে জেনে থাকে তবুও মুর্খের মত তাকে ত্যাগ কর। বেশির ভাগ আচার্যরাই অসম্প্রদায়বিৎ। তুমি বিখ্যাত হতে পার, কথা দিয়ে লোকেদের আকর্ষণ করতে পার, কামিনী-কাঞ্চন তোমার কাছে প্রচুর আসছে, কিন্তু তুমি অসম্প্রদায়বিৎ, তোমাকে আমি মানব না। আচার্য শঙ্করের খুব নামকরা কথা –গুরু পরম্পরায় যদি তুমি শাস্ত্র অধ্যয়ণ না করে থাক, তাহলে তোমার কথাকে বিশ্বাস করা যাবে না। আচার্য নিজেও যখন উপনিষদের ব্যখ্যা করছেন, গীতার ব্যাখ্যা করছেন, সেখানেও তিনি বার বার বলছেন, বেদান্ত সম্প্রদায় থেকে তিনি এটা ব্যাখ্যা করছেন। এখন কোন সম্প্রদায় ঠিক বলছেন, এটা যার যার মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে।

কিছু আছেন যাঁরা আচার্যের সম্প্রদায়ের, আবার কিছু আছেন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতে চলেন, এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু আমরা যদি পুরো যুক্তি নির্ভর হই; এই যে দুটো তিনটে কথা বলছেন, যেখানে পারমার্থিক সত্তা ও ব্যবহারিক সত্তার কথা বলছেন, বন্ধনকে নিয়ে যেটা বলছেন, বন্ধন যদি সত্য হয়, তাহলে মুক্তি কোন দিন হবে না, তাহলে শাস্ত্র মিথ্যা হয়ে যাবে। ওরা এর ঠিক উল্টোটা বলছে, মুক্তি যদি সব সময়ই থাকে তাহলে শাস্ত্র মিথ্যা হয়ে যাবে, কারণ জ্ঞানীদেরও শাস্ত্র দরকার, কারণ তাঁরা অজ্ঞানেই আছে। যারা ভাবছে আমি অজ্ঞানে আছি, এরাই অজ্ঞানী। বাস্তবে তারা মুক্ত, কিন্তু মনে করছে আমি অজ্ঞানী, আমি বন্ধনে আছি, এদের জন্য শাস্ত্র দরকার।

এই হল ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের উপর আচার্য শঙ্করের ভাষ্যের খুব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা। এরপর দু-তিনটে জিনিস আছে, যেগুলো আমাদের আলোচনা করা দরকার। একটা হল বিবেকশীল পুরুষ কারা? আর তার সাথে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নিয়ে চর্চা করবেন –কিছু কিছু মত আছে, যারা মনে করে ঈশ্বর আলাদা, আমি আলাদা। ঈশ্বর আলাদা, আমি আলাদা, এই বোধ দ্বৈতবাদীরা করেন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা করেন আর আমরাও মনে করি শ্রীরামকৃষ্ণ আলাদা আমি আলাদা, ঠাকুর আমাকে মুক্তি দেবেন। আচার্য এই পয়েন্টটাকে আলোচনা করবেন, আর খুব জোরালো যুক্তি দিয়ে এই মতের সমালোচনা করবেন। তিনি বলবেন, সম্প্রদায়ে কোথাও এই ধরণের কোন কথা নেই। তত্ত্বের দিক থেকে আমিও যা শ্রীকৃষ্ণও তাই, যারা এটা মনে করে না, তারা মুর্খ। আর তারপরে বলবেন অবিদ্যার স্বভাব। এই তিনটে জিনিসকে নিয়ে এরপরে আলোচনা চলবে।

আমাদের কয়েকজন শ্রোতাবন্ধু বলছেন, তাঁরা এই আলোচনাটা বুঝতে পারছেন না। এখানে বলে রাখা দরকার, আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম, এটা হল যাঁরা অদ্বৈত বেদান্ত বুঝতে চান, তাঁদের জন্য। অদ্বৈত বেদান্ত বোঝা এমনিতেই অত্যন্ত কঠিন। আমরাও যখন প্রথম এই কথাগুলো শুনেছিলাম, তখন কিছুই বুঝতে পারিনি, বুঝতে কিছু সময় লেগেছিল। দ্বিতীয় কথা হল, আমরা যে সময় আচার্যদের কাছে এগুলোর উপর পড়াশোনা করছিলাম, সেই সময় আমাদের আচার্যরা সবাই খুব উচ্চমানের আচার্য ছিলেন। ওনারা বলে চলে যেতেন, যতটুকু পারলাম নোটস্ নিলাম, ওই নোটস্ থেকেই পরে যতটুকু বোঝার বুঝে নিতাম, আর বুঝতে না পারলেও তখন কিছু করার থাকত না। বর্তমান কালে ইউটিউব আসার পর আমাদের সব লেকচার ইউটিউবে রাখা থাকে, বুঝতে না পারলে আলোচনাটা আরেকবার শুনে নেওয়া যায়। রেকর্ডিং হয়ে থাকলে এটাই সুবিধা, অনেকবার শোনা যায়। যতক্ষণ না বুঝতে পারছি, ততক্ষণ যতবার খুশী শোনা যায়।

আমরা আগে যেটা আলোচনা করলাম, সেটাকেই আবার খুব সংক্ষেপে বলছি। *ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি*, এটাকে নিয়ে আগের আগের বিভিন্ন আচার্যরা বিভিন্ন ভাবে এই জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা রামানুজ বা মাধাচার্যের কথা এখানে বলছি না, তাঁরা আরও পরে এসেছেন। এখানে বলা হচ্ছে সেই সব আচার্যদের কথা যাঁরা আচার্য শঙ্করের সময়ের বা তারও আগের। অনেকে মনে করেন গীতা আচার্য শঙ্করের লেখা, বিদেশীরা এই ধরণের কথা বেশি বলতেন। স্বামীজী যখন বিদেশে গেলেন, তখনও সেখানে এটা একটা মত ছিল। আমি নিজেও কয়েকজন মহারাজদের জানি, যাঁরা বেশি গভীরে না গিয়ে, ভাসা ভাসা একটু গীতা পড়ে মনে করতেন শঙ্করাচার্যই গীতা লিখেছেন, তিনিই আবার গীতার ভাষ্যও লিখেছেন। কিছু বলার নেই, পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা এই বিষগুলো আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। বর্তমান কালে বৈষ্ণবরা এক ভাবে অদ্বৈত বেদান্তকে আক্রমণ করেন, মাধ্বাচার্যের মতাবলম্বীরা আরেক ভাবে করেন, রামানুজের মতাবলম্বীরা অন্য আর-এক ভাবে করেন। এনারা সবাই কেউই ইমোশানাল নন, যুক্তি দিয়ে অদ্বৈত বেদান্তকে আক্রমণ করছেন। অদ্বৈত বেদান্তকে ভিতর থেকে মেনে নেওয়া অত সহজ না, যদিও তখন এনারা কেউ ছিলেন না। অদ্বৈত বেদান্তকে গ্রহণ করতে বুকের পাটা লাগে। এমনি হরিবোল হরিবোল করলাম, ঠাকুর আছেন, তিনি আমাকে দেখছেন; এগুলো সহজে মেনে নেওয়া যায়, আবার সহজেই উড়িয়ে দেওয়াও যায়। এভাবে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে বিচার করতে হয়, চিন্তন করতে হয়, নিদিধ্যাসন করতে হয়, *শ্রোতব্যং, মন্তব্যং,* শুনতে হয়, চিন্তন করতে হয় আর ধারণা করতে হয়।

বেদান্তের বিরুদ্ধে যে মূল আপত্তিগুলি, যেমন এই যে বলছেন ঈশ্বর সংসারী হয়ে যাবেন, কারণ আমি যখন মরব, আমার শরীরে যিনি আত্মা, সেই ঈশ্বর গিয়ে আরেকটা শরীর ধারণ করবেন, তাহলে তো ঈশ্বর সংসারী হয়ে যাচ্ছেন। আচার্য পরিষ্কার যুক্তি দিয়ে এই জিনিসটাকে খণ্ডন করে দিলেন, ঈশ্বর এভাবে সংসারী হন না। আমরা আগে বিস্তারে এর উপর বলে দিয়েছি। সেখানে

আচার্যের মূল বক্তব্য হল, জ্ঞানীরা জিনিসটাকে এভাবে দেখেন না, জ্ঞানীরা আত্মাকে সব সময় দেখেন তিনি নির্লিপ্ত, নির্বিকার। অজ্ঞানীরাই এভাবে দেখে। ঠাকুর বর্ণনা করছেন, যেখানে ছাগ বলি হচ্ছে, ঠাকুর দেখছেন ছাগ, যে বলি দিচ্ছে, বলির যূপ, যে খড়্গা দিয়ে বলি দেওয়া হবে, সবটাই সচ্চিদানন্দ। সেখানে কিসের পরিবর্তন, কিসের দেহান্তর, কিছুই নেই। আমরা অজ্ঞানী বলে আমাদের মনে হয় আত্মা শরীর ধারণ করলেন, আত্মার দেহান্তর হল ইত্যাদি। আমাদের কাছে সবাটাই জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ বলে বোধ হয়।

এভাবে বোধ করাতে কেউ আপত্তি করছে না, কিন্তু তাই বলে যেটা সত্য, সেই সত্যকে আমি মানব না বললে তো হবে না। স্বামীজী বলছেন, আপনি যদি একটা আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারেন, তাহলে বলুন আমি পারছি না, তাই বলে আদর্শকে খাটো করে দেবেন না। বেদান্ত আপনি নিতে পারছেন না, আপনি বলুন আমি বেদান্তী হতে পারছি না, কিন্তু তাই বলে আপনি জিনিসটাকে নীচে নামিয়ে দিতে পারেন না। আপনার কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি আছে, আপনি বলুন আমার কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি আছে, আমি ভোগ করতে চাই, তাহলে তো সব মিটে গেল, ঝামেলা চুকে গেল। আপনি সন্ন্যাসী হতে পারছেন না, আপনার দম নেই, কিন্তু তাই বলে নেতারা যে ভাষায় সন্ন্যাসীদের গালাগাল দেয়, সেই ভাষায় গালাগালি দিয়ে বলবেন, এদের এই এই সমস্যা আছে বলে এরা সন্ন্যাসী হয়েছে। সন্ন্যাসী হওয়ার আপনার সেই মুরদ নেই, তাই বলে আপনি সন্ন্যাসীদের এভাবে গালাগাল দিতে পারেন না। এই কারণেই সমাজ আজ গোল্লায় যাচ্ছে।

আচার্য বলছেন, জ্ঞান সাধনায় আমরা নূতন কিছু জানি না, যেটা চিরদিন ছিল সেটাই আমরা জানি। জ্ঞান সাধনা শুধু জ্ঞানের উপর থেকে আবরণগুলি সরিয়ে দেয়। এটাও আমরা আগে আলোচনা করেছি। তার সাথে আরেকটা আপত্তির কথা বলা হয়েছিল, তাহলে শাস্ত্রের কি দরকার। আমাদের প্রায়ই এই বোকা বোকা প্রশ্ন শুনতে হয়, আমি যদি আত্মাই হই তাহলে আমার এটা কেন হয়, সেটা কেন হয়? আগে তুমি যে আত্মা এটাকে উপলব্ধি করে আত্মাস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও, তারপর এটা কেন, সেটা কেন বুঝতে পারবে। যতক্ষণ তুমি অজ্ঞানী, ততক্ষণ তোমাকে অজ্ঞানীর মতই আচরণ করতে হবে। শুধু তোমাকে জানতে হবে, আত্মা মানে এই, মুক্তি মানে এই, আমাকে সেখানে পৌঁছাতে হবে। এগুলো সবটাই আমরা আগে আলোচনা করে নিয়েছি।

আচার্য এরপর বলছেন, বেদান্তের আপত্তি করতে গিয়ে এরা বলে, কেন, যাঁরা জ্ঞানী আছেন, সমাজ যাঁদের জ্ঞানী বলে তাঁরাও তো বলে, *অহম্ এবম্ মম এব ইদম্ ইতি পণ্ডিতানাং*, যাঁরা পণ্ডিত তাঁরাও তো আমি, আমার, এইভাবে বলেন। আচার্য এইসব পণ্ডিতদের জঘন্য ভাষায় গালাগাল দিয়েছেন। আমি আলাদা, ঈশ্বর আলাদা, পাণ্ডিত্য কি আর তার সাথে সম্প্রদায় বিদ্যা এই জিনিসগুলিকে নিয়ে এবার আচার্য বলছেন। এরপর আমরা আলোচনা করব অবিদ্যা জিনিসটা কি, এবং অজ্ঞান জিনিসটা কি। বেদান্তের পপুলার বক্তাদের লেকচার শুনে আমাদের এসে অনেকে প্রশ্ন করেন, আমার মধ্যে অজ্ঞান কোথা থেকে এলো, অজ্ঞান কেন এলো? সব কিছু systematically শুনতে হয়, উড়ো উড়ো হয়ে শুনলে হয় না। প্রজাপতির মত একটু এই ফুলে বসলাম, একটু ওই ফুলে বসলাম, এভাবে কোন কিছুই হয় না। তা না করে, ধারাবাহিক ভাবে একটা জিনিসকে না শুনে বোকা বোকা প্রশ্ন করতে থাকে, বোকা জামাইয়ের প্রশ্ন শ্বশুর মশাই আপনার কি বিয়ে হয়েছে, লোকেরাও এই ধরণের বোকা বোকা প্রশ্ন করে।

এর সাথে আত্মা এবং আরও তিন চারটে জিনিসকে নিয়ে আচার্য আলোচনা করবেন। আমরা আগেই বলেছি, ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের উপর আচার্য একটা বিরাট ভাষ্য দিয়েছেন, যে ভাষ্যে তিনি পুরো অদ্বৈত বেদান্তকে অকাট্য যুক্তি দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন; তার সাথে অদ্বৈত বেদান্তের উপর যত রকম আপত্তি হতে পারে, সেগুলোরও উত্তর দিয়েছেন। আগেও বলা হয়েছিল,

আচার্য বলছেন, অদ্বৈত বেদান্তের উপর আপত্তি জানিয়ে বলা হয় –কেন পণ্ডিতরাও তো ‘আমি’, ‘আমার’ এভাবে বলেন। সেখানে আচার্য বলছেন, *শৃণু ইদং তৎ পাণ্ডিত্যং যৎ ক্ষেত্রে এব আত্মদর্শনম্*, তুমি যে পণ্ডিতদের কথা বলছ, এই পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য এতটুকু, কেবলমাত্র ক্ষেত্রেই তাঁরা আত্মাকে দেখেন। ক্ষেত্র বলতে, শরীরকে আত্মা দেখেন, মনকে আত্মা দেখেন, আর মনের জগতে অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সবের মধ্যেই আত্মাকে দেখেন, এই তো এনাদের পাণ্ডিত্য!

স্বামীজী বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর স্বামীজী চেন্নাইতে একটা ভাষণ দিচ্ছেন। সেখানে তখনকার সমাজের বড় বড় পণ্ডিতরা শ্রোতা রূপে উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজীর তখন মাত্র চৌত্রিশ পয়ত্রিশ বছরের একজন যুবক। আর তিনি সেই পণ্ডিতদের বলছেন, তোমরা সবাই গোঁফওয়ালা শিশু। বর্তমান সমাজ একই রকম আছে। সমাজে যারা ভদ্রলোক, বুদ্ধিজীবি বলে বেড়ায়, অপসংস্কৃতি, শুভসংস্কৃতি নিয়ে বড় বড় কথা বলে যাচ্ছে, আর হিন্দু শব্দ শুনলে ওদের কানে আঙুল দিতে হয়। যে কোন একটা কথা বলতে শুরু করলেই একজন বলতে শুরু করলেন, আপনারা স্বামীজীর আদর্শ থেকে সরে যাচ্ছেন। স্বামীজীকে আপনি পড়েছেন? ওই একই কথার পুনারবৃত্তি – জনগণের জন্য আপনারা কিছু করেছেন? অত কথা না বলে আগে বলুন, আপনি কি কিছু করেছেন আজ পর্যন্ত? নিজের দেহ মন, পরিবার ছাড়া তো আর কিছু জানেন না; সবচেয়ে বড় নিজের অহঙ্কার। একটা ডিগ্রি আছে, আর রবীন্দ্রনাথের দুটো বই পড়ে নিয়ে ভদ্রলোক হয়ে গেছে, কিন্তু ভেতরটা পুরো ফাঁপা। ডিরোজিওর সংস্কার আন্দোলনে গরুর মাংস খেয়েছিল, সেটাই নাকি হয়ে গেল বিরাট বড় বিপ্লব। এদের বিপ্লব মানে এটাই, চলবে না, চলবে না, চলতে দেব না। যেটা চলছে সেটার বিরোধিতা করতে হবে, এটাই এদের কাছে বিপ্লব। এরা যেটা ভাববে সেটাই ঠিক, সেটাই চলবে, বাকি কিছু চলবে না। আপনার রাজনীতি এভাবে চলতে পারে, আপনার সাহিত্য এভাবে চলতে পারে; ধর্ম এভাবে চলে না। আমরা এখন এই জিনিসটাকে নিয়ে আলোচনা করব।

আচার্যের ভাষ্য মন দিয়ে শুনলে আমাদের শিউড়ে উঠতে হয়, যেমন বলছেন, *শৃণু ইদং তৎ পাণ্ডিত্যং*; এই পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য কতটুকু জানো? এই যে কলেজ, ইউনিভার্সিটির প্রফেসাররা, যারা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আমেরিকাতে প্লেনে যায়, প্লেনে আসে, এদের পাণ্ডিত্য কতটুকু তোমাকে বলছি। ক্ষেত্র, ক্ষেত্র মানে একটা ক্ষেত, যেখানে ফসল হয় – দেহে কর্মের ফসল হয়, মনে কর্মের ফসল হয়, এটাকেই এরা ঈশ্বর মনে করে; এই তো এদের বুদ্ধি; মোচওয়ালা শিশু। আমি, আপনি, সবাই অজান্তায়, না বুঝেই ক্ষেত্রকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলে মনে করি, ক্ষেতকে ক্ষেতের মালিক মনে করি, কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ হলেন ঈশ্বর। আমাদের সমস্ত অজ্ঞান এখানেই, আমাদের সমস্ত দুঃখ কষ্টের মূলে এই অজ্ঞানতা, আমাদের সমস্ত চোখের জলের উৎস এই অজ্ঞানতা, কারণ আমরা ক্ষেতকে ক্ষেতওয়ালা মনে করি। আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, ক্ষেত্রজ্ঞকে যদি একবার কেউ বুঝে নেন –ইনি হলেন নির্বিকারী, ক্ষেত্রজ্ঞের কোন বিকার নেই, তিনি সব কিছুর বাইরে; এইভাবে এই জিনিসটাকে বুঝে নিলে কি হয়? তখন এটাই হয় –এই যে নানা রকমের আকাঙ্ক্ষা, আমি এই রকম ভোগ করব, আমার এই রকম সুখ হোক, এই ধরণের আকাঙ্ক্ষা কোন দিন আর তাঁর হবে না।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ খুব কঠিন একটা বিষয়, আমরাও মানছি যাঁরা প্রথম শুনছেন তাঁদের পক্ষে ধারণা করা সত্যিই খুব কঠিন। আমরাও প্রথমের দিকে বুঝতে পারতাম না। সহজ করে একটা গল্প বললে কিছুটা ধারণা করা যাবে। একবার তুলসীদাস ও সুরদাসের সাথে কাশীতে দেখা হল। তুলসীদাস রামের ভক্ত, সুরদাস কৃষ্ণের ভক্ত। সুরদাস অন্ধ, দুজনে মিলে কাশীর রাস্তা দিয়ে কথা বলতে বলতে যাচ্ছেন। এমন সময় একটা রব উঠল, পাগলা হাতী আসছে। তুলসীদাস বলছেন, আমার চিন্তা নেই শ্রীরামচন্দ্র আছেন, উনিই আমাকে রক্ষা করবেন। সুরদাস তুলসীদাসকে বলছেন, ভাই, আমার ইষ্ট তো নাড়ুগোপাল, ছোট্ট বাচ্চা গোপালকে আমাকেই সব কিছু করে দিতে হয়, আমিই তাঁর সেবা করি, আমিই তাঁর সব কিছু দেখাশোনা করি; ওই ছোট্ট গোপাল আমাকে কি

দেখবেন, আমাকে তিনি বাঁচাতে পারবেন না, আমি চললাম। এই বলে পুটলি বগলে করে পাশের গলিতে পালিয়ে গেলেন।

এই কাহিনীটা যিনি বুঝতে পারবেন, তিনি চেষ্টা করলে অদ্বৈত বেদান্ত বুঝতে পারবেন। আমাদের নিজেদের মধ্যে কোন সমস্যা হলে আমি মজা করে সন্ন্যাসী ভাইদের বলি, 'আমাদের ইষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ, তিনি নিজের কোমড়ের ধুতি সামলাতে পারতেন না, কোমড় থেকে ধুতি আলগা হয়ে মাটিতে লোটাত বা তিনি বগলে পুরো কাপড়টা দলা পাকিয়ে রাখতেন, তিনি এই সৃষ্টিকে সামলাচ্ছেন, এর থেকে কি আর ভাল সামলাবেন তিনি! শান্ত হন আপনারা, এর থেকে বেশি কিছু আশা করবেন না'। কি প্রার্থনা করব ঠাকুরের কাছে! ঠাকুরের দেহ চলে যাবার পর শ্রীমা কামারপুকুরে দিনের পর দিন না খেয়ে থাকতেন। ঠাকুর নিজের সহধর্মীণির জন্য কিছু করতে পারলেন না। আমিও তাই ঠাকুরের কাছে কোন কিছু প্রার্থনাও করি না, কোন কিছু আশাও করি না। তাহলে কিসের জন্য ঠাকুরের এখানে পড়ে আছি? ভালবাসি, তাই পড়ে আছি। মা যেমন তিন মাসের সন্তানকে ভালবাসে, সব কিছুই তার জন্য মা করে যাচ্ছে, মা জানে আমি আর আমার শিশু এক। আমি জানি, আমি আর ঠাকুর এক। এখানেই সব শেষ, কোন আশা করি না। কাশীপুরে ঠাকুরের শেষ অসুখের সময় ভক্তরা চাঁদা করে টাকা জোগার করতেন কাশীপুরের থাকা খাওয়ার খরচ মেটাবার জন্য। সেই টাকার আবার হিসাব চাওয়া হত; তাই নিয়ে কত সমস্যা। এই ঠাকুর আমাকে কি দেবেন আর কি দেখবেন?

এই যে দুটো ঘটনার কথা বলা হল, এগুলো সবটাই সত্য। এবার যদি আমরা নির্বিকারী আত্মাতে যাই, আমরাই সেই আত্মা, যিনি নির্লিপ্ত, নির্বিকার। কিসের তিনি আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করবেন, কি আমাদের দেবেন, কোন প্রশ্নই নেই। তখন আমাদের যত রকমের চাহিদা ছিল, সব মিটে যাবে। জগৎ জগতের মতই চলবে, আমি তো জগৎ নই। ভাবলে অবাক লাগে, কার জন্য আমরা দিনরাত খেটে খেটে শেষ হয়ে যাচ্ছি, ঠিক আছে দায়ীত্ব রূপে কিছু কাজ এসে গেছে, করে দিলাম, ওর মধ্যে হেঁদিয়ে হেঁদিয়ে মরে যাওয়ার কিছু নেই। ভোগ আর কর্ম, এই দুটো আমাদের জীবনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সারাদিন কাজ করছি, ওটা হয়ে গেল কর্ম, এই কর্মের যে ফল উৎপন্ন হয়, এই ফলটাই ভোগ। কর্ম আর ভোগ দুটোই হল বিকার। আত্মা সমস্ত বিকারের বাইরে। সেইজন্য আমি কি করে কর্ম হব, আমি কর্ম হতেই পারি না। এটা অত্যন্ত উচ্চমানের অদ্বৈত, ধারণা করা খুব কঠিন। তবে সবাইকে শুনে রাখতে হয়, মাঝে মাঝেও যদি এই ভাব মনের মধ্যে জেগে ওঠে, সেই চিন্তাকে একটু ধরে রাখতে হয়, এই করতে করতেই এগোতে হবে। আমরা সাধুরাও এই অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত নই, মাঝে মাঝে আমাদের মনে এই ভাব জেগে ওঠে। জেগে উঠলে কিছুক্ষণের জন্য আটকালাম, এই করতে করতে একদিন এটাই স্বভাবে দাঁড়িয়ে যাবে।

এরপরে বলছেন, ক্ষেত্রজ্ঞ হলেন ঈশ্বর। ঠাকুর বলছেন, অধম ভক্ত বলে ঈশ্বর উপরে। যাঁরা ঠাকুরকে উপরে দেখছেন, তাঁরা মনে করছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণলোকে বসে আছেন, ঠাকুরের কথায় তাঁরা অধম ভক্ত। আচার্য এখানে বলছেন, *ইদং চ অন্যৎ পাণ্ডিতং কস্যচিদ্ অস্তু ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর এবং ক্ষেত্রং চ অন্যৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্য বিষয়ঃ*, ভক্ত হোক, পণ্ডিত হোক, যেই হোক, আমাদের সবারই মত হল ক্ষেত্রজ্ঞ আলাদা, তার যে বিষয় ক্ষেত্র সেটা আলাদা আর আমি এই দুটো থেকে আলাদা। চোখ কান দিয়ে বোঝার পর আমরা জানি, জগৎ একটা জিনিস আর ঠাকুর আর-একটা জিনিস আর এই দুটো থেকে আমি আলাদা। আমি কিন্তু জগৎ নই, এটাকে মানছে; আর তার সাথে বলবে, আমি কিন্তু ঈশ্বরের সাথে এক নই। এইভাবে দেখলে তিনটে সত্তা এসে যায়। রামানুজের মত অনেকটা এই রকমই, মাধ্বাচার্যের মতও এই রকম, তাঁর মনে ঈশ্বর এক, জগৎ আর-এক, আমি আর-এক। অজান্তায় আমরা মনে করি, আমি এই সংসার থেকে আলাদা, মৃত্যুর সময় ঠাকুর আমাকে নিয়ে যাবেন; কারণ আমি আর ঠাকুর আলাদা কিনা, আমাদের ভিতরে এই ভাবটাই জেগে থাকে। যারা

সংসারী মানুষ, যারা বিষয়ী মানুষ তারা মনে করে, সে জগৎ থেকে আলাদা ঠিকই, কিন্তু মৃত্যুর পর সে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাবে, এখানেই সব কাহিনী শেষ। ভক্তরা মনে করে, এটা ঠিক যে আমি জগতের না, কিন্তু ঈশ্বর আমাকেও দেখছেন জগৎকেও দেখছেন। আমরা যদি খুব ভাল করে ভিতরে ঢুকে বিচার করে দেখি, দেখা যাবে আমাদের সবারই কিন্তু এটাই মত।

আচার্য বলছেন, সেইজন্য কি হয় –*সংসারোপরমঃ চ মম কর্তব্যঃ,* সংসার থেকে নিবৃত্তি আমার কর্তব্য, সংসার থেকে মুক্ত হওয়াটা আমার কর্তব্য। *ঈশ্বরং ক্ষেত্রজ্ঞং সাক্ষাৎ কৃত্বা তৎস্বরূপাবস্থানেন ইতি,* সংসার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, যিনি ঈশ্বর, তাঁর দর্শন লাভ করতে হবে, তাঁর সাক্ষাৎ করতে হবে, সাক্ষাৎ করে তাঁর স্বরূপে অবস্থিত হয়ে সংসারের নিবৃত্তি করতে হবে। আমাদের সবারই এই চিন্তাধারা। আমি খুব উচ্চমানের কয়েকজন সাধু সন্ন্যাসী ছাড়া সবাইকে দেখেছি এই একই মতের –আমি আলাদা, সংসার আলাদা, ঠাকুর আলাদা; ঠাকুরকে ভক্তি করে, তাঁর দর্শন লাভ করে তাঁর স্বরূপে অবস্থিত হতে হবে। আচার্য বলছেন, *যঃ চ এবং বুধ্যতে যঃ চ বোধয়তি ন অসৌ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি,* যাঁরা এই রকম বোঝে এবং অপরকে বোঝায়, যেমন এই বৈষ্ণবরা অপরকে ভুল বুঝিয়ে বেড়ায়, যারা এই ধরণের ভুলভাল কথা বলে –এই যে জীবাত্মা, আপনার ভিতরে যিনি অন্তর্যামী, তিনি ঈশ্বর নন; পণ্ডিত হয়ে যারা এই ধরণের কথা বলে, এরা হল আচার্যের ভাষায় *পণ্ডিতাপসদঃ,* পণ্ডিতদের মধ্যে এরা অধম, অধমাধম।

কিছু বছর আগে আমার এক সন্ন্যাসী ভাইয়ের সাথে এমনি আলোচনা হচ্ছিল, তিনি নিজেও একজন পণ্ডিত মানুষ। আমি তাঁকে কথায় কথায় বললাম, 'ঠাকুরকে তো না মানার কিছু নেই, তিনি তো আমার হৃদয়ের মধ্যে'। শুনে তিনি বললেন, 'ওই ধরণের ঠাকুরকে আমি মানতে চাই না, আমি ওই ঠাকুরকে মানি, যিনি উপর থেকে আমাদের সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছেন'। তখনই আমার এই কথাটা মনে পড়ে হাসি পেয়ে গেল। বাচ্চা বয়স থেকে আমাদের যে একটা ধারণা হয়ে আছে, আমি আলাদা, ঈশ্বর আলাদা, জগৎ আলাদা; ভক্তি করে, ধ্যান করে, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে, ঈশ্বরের দর্শন লাভ করে তাঁর স্বরূপে অবস্থিত হয়ে আমার সংসার নিবৃত্তি হবে, এই ধারণা থেকে কিছুতেই বেরিয়ে আসা যায় না। আচার্য এদের বলছেন, এরা পণ্ডিতদের মধ্যে অধমাধম। কারণ সংসার নিবৃত্তির কথাই যদি আসে, তাহলে আমাকে আর ঈশ্বরকে এক হতে হবে, তা নাহলে কখনই মুক্তি হবে না।

আচার্য শঙ্কর থামছেন না, বলে যাচ্ছেন, *আত্মহা স্বয়ং মূঢ়ঃ অন্যান্ চ ব্যমোহয়তি,* এরা আত্মহত্যা করছে, এরা নিজেরা মুর্খ এবং অপরকেও মুর্খ বানাচ্ছে। *শাস্ত্রার্থসম্প্রদায়রহিতত্বাৎ শ্রুতহানিম্,* শাস্ত্র সম্প্রদায় বহির্ভূত, এরা শাস্ত্র জানে না, বোঝে না। শাস্ত্র কি বলছে সেটা না জেনে, না বুঝে উল্টো কথা বলে। ইদানিং একজন হয়েছেন, তাঁর নামে আমার কাছে প্রচুর মেল আসে, তিনি নাকি বলে বেড়াচ্ছেন পুনর্জন্ম বলে কিছু নেই। অবাক হয়ে ভাবি এরা নামের আগে স্বামী কেন লাগায়। নামের আগে স্বামী লাগাচ্ছেন, একজন হিন্দু হয়ে কি করে এই ধরণের শাস্ত্র বিরোধী কথা বলছেন। নামের আগে স্বামী লাগিয়েছেন, শাস্ত্র নির্ভর কথা বলুন। তা নাহলে নামের আগে থেকে স্বামী সরিয়ে দেন, খ্রীশ্চান বা ইসলামের পোশাক পরিধান করুন তারপর এই ধরণের শাস্ত্র বিরোধী কথা বলুন। যখন কিছু বলবেন শাস্ত্রের কথা বলবেন, শাস্ত্রে যেমনটি বলা আছে তেমনটি বলবেন। আচার্য খুব কঠোর ভাষায় এদের বলেছেন *আত্মহা স্বয়ং মূঢ়ঃ,* এরা আত্মহত্যাকারী মুর্খ। পরের লাইনেই আচার্য তাই বলছেন, *তস্মাদ্ অসম্প্রদায়বিৎ অপি মূর্খবদ্ এব উপেক্ষণীয়ঃ,* সম্প্রদায় বিদ্যাতে যদি শাস্ত্রের শিক্ষা না পেয়ে থাকে, এই ধরণের পণ্ডিতদের মূর্খের মত উপেক্ষা করবে।

অনেক আগে রজনীশ একবার একটা জায়গায় ভাষণ দিচ্ছিলেন, সেখানে শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজও উপস্থিত ছিলেন, স্বামী ভূতেশানন্দজী ছিলেন বলেই আমি রজনীশের নাম নিলাম, তা নাহলে আমি নাম নিতাম না। তখনও রজনীশ এতটা বিখ্যাত হননি। তিনি তাঁর ভাষণে

উপনিষদ থেকে উল্লেখ করে নিজের মত ব্যাখ্যা করে গেছেন। স্বামী ভূতেশানন্দজী সভার সভাপতি ছিলেন। তখন তিনি রাজকোট আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন, অনেক আগেকার কথা। মহারাজ শুনে চমকে উঠলেন, উনি জানতেনও না ইনি কে। উনি সমস্ত পয়েন্টস্ গুলি নোট করলেন। মহারাজের বলার সময় উনি উঠে বললেন –আমার সভাপতির ভাষণ দেওয়ার কথা, কিন্তু পূর্ববর্তী বক্তা উপনিষদের অপব্যাখ্যা করেছেন, আমি এটাকে আগে ঠিক করে আপনাদের জানাচ্ছি। এরপর রজনীশ যা যা বলেছিলেন, এক একটা মন্ত্র ধরে ধরে তিনি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন তিনি উপনিষদের কি কি ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। আচার্য এদেরকেই বলছেন, এরা হল অসম্প্রদায়বিৎ, আচার্যের মুখ থেকে এরা শাস্ত্রের শিক্ষা পায়নি। আমাদের হিন্দু ধর্ম পুরোপুরি সম্প্রদায় বিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত। কেউ একজন দুম্ করে উঠে কথামৃতের ব্যাখ্যা করে দিলেন, গীতা, উপনিষদের ব্যাখ্যা করে দিলেন, হিন্দু ধর্মে এই জিনিস একেবারেই চলে না। যার জন্য আমাদের এখানে বলা হয় গুরুমুখী বিদ্যা, গুরুর মুখে শুনতে হয়, শোনার পর চিন্তন মনন করে শাস্ত্রের কথাকে আত্মস্থ করতে হয়। ইদানিং খুব জনপ্রিয় একজন বাবাজী আছেন, তিনি শাস্ত্রের কথা বলে বেড়ান। ওনাকে জিজ্ঞেস করা হল, 'আপ কাঁহাসে শিখে'? 'সব অন্দর সে আয়া'। আরে ভায়া, অন্দর সে আয়া অন্দর মে ঘুসা দো, ভিতর থেকে বেরিয়েছে ভিতরেই ঢুকিয়ে নাও, বাইরে বের করো না। এরাই এখন ফ্যামাস, হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি বানিয়ে নিয়েছে।

এরপর আসছে অবিদ্যার উপর আলোচনা। খুব সংক্ষেপে বলছেন, যে কোন জিনিস যেটাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে মন দিয়ে বোধ করা যায়, অর্থাৎ যেটাই ইন্দ্রিয় ও মনের বিষয় সেটা ক্ষেত্রজ্ঞ নয়। চৈতন্য কি, আমার অন্তর্যামী কি, ঈশ্বর কি? যে জিনিসটা আছে কিন্তু ইন্দ্রিয় ও মন দিয়ে জানা যায় না, সেটাই ক্ষেত্রজ্ঞ। ইন্দ্রিয় আর মন দিয়ে যেটাই জানা যাবে সেটাই ক্ষেত্র। তাহলে কেন এই রকম উল্টো দেখায়? অবিদ্যার জন্য। তখন জিজ্ঞেস করছে, অবিদ্যা কার? এর উত্তর খুব নামকরা। *অবিদ্যা কস্য*, অবিদ্যা কার? আচার্যের বিদ্যার এই ব্যাখ্যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। আচার্য বলছেন, *যস্য দৃশ্যতে তস্য এব*। মায়া কি, অবিদ্যা কি, মায়া কোথায় থাকে, অবিদ্যা কোথায় থাকে, এই রামানুজ, মাধ্বাচার্য, বৈষ্ণব, সবাই মিলে শুধু এই অবিদ্যাকে নিয়ে আমাদের ধর্মগ্রন্থের বারোটা বাজিয়ে রেখেছে। অবিদ্যা কোথায় থাকে, তার অবস্থান কি, কবে জন্ম নিল, সব প্রশ্নের উত্তরে আচার্য একটা বাক্যে বলে দিলেন, *যস্য দৃশ্যতে তস্য*। আমরা এটাকে আরও ছোট করে নিতে পারি, *অবিদ্যা কস্য? যস্য তস্য*। আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন কথায় কথায় বলতেন, *যস্য তস্য*। আমরা তাঁকে বোঝালাম, মহারাজ *যস্য তস্য* নয়, এটা হবে *যস্য দৃশ্যতে,* যে দেখছে তার।

মায়াকে স্বামীজী আরও সুন্দর ভাবে define করে বললেন –Maya is a statement of fact। মায়াকে এরপর আর বোঝানর কিছু নেই। একজন মা তার সন্তানকে ভালবাসে, সন্তান মায়ের সাথে দুর্ব্যবহার করে, মা তাও তাকে ছাড়তে পারছে না, এটাই মায়া। কার মধ্যে মায়া আছে, কিভাবে আছে, এর ব্যাখ্যা কি ভাবে হবে? ইউটিউব চ্যানেল হওয়ার পর থেকে অনেক মায়েরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন; তাঁদের বাড়িতে কত কষ্ট, স্বামীরা তাঁদের সাথে কত দুর্ব্যবহার করছে, যন্ত্রণা দিচ্ছে। তাও তারা সংসারকে ধরে আছে, বেরিয়ে আসতে পারছে না, এটাই মায়া। বেরিয়ে না আসতে পারার পিছনে সামাজিক বন্ধন হতে পারে, কিন্তু তাও ভালবাসছে এই আশায়, আগামী দিনগুলোতে আমাদের সম্পর্ক আবার ভাল হবে, এটাই মায়া।

সার্কাসের এক গাধা একদিন বেড়াতে গিয়ে নদীর ধারে এক ধোপার গাধার সাথে দেখা হয়েছে। ধোপার গাধাকে সার্কাসের গাধা জিজ্ঞেস করেছে, 'ভাই, তোমার জীবন কেমন চলছে'? ধোপার গাধা খুব ভারাক্রান্ত মনে দুঃখ করে বলছে, 'দিবারাত্র শুধু কাজের পর কাজ করে যেতে হয়, মালিক খাওয়াটাও দুবেলা ঠিক মত দেয় না, খুব কষ্টের জীবন ভাই আমার। তোমার জীবন কেমন চলছে'? সার্কাসের গাধা বলছে, 'ভাই আমারও খুব কষ্ট, তবে আমার একটা ভাল ভবিষ্যৎ আছে'।

'কি রকম ভবিষ্যৎ'? 'আমাদের ওখানে খুব সুন্দর একটা মেয়ে আছে, সার্কাসে রোপ ডান্স করে, দড়ির উপরে নাচে। ম্যানেজার ওকে বলেছে, দড়ি থেকে যদি তুমি পড়, তাহলে ওই গাধার সাথে তোমাকে বিয়ে দিয়ে দেব'। 'তাতে কি হল'? 'না, এখনও পড়েনি, কিন্তু দড়ি থেকে কোন না কোন দিন পড়বে। এই আশাতেই আমি এখনও সার্কাসে পড়ে আছি'। আমাদের এক মহারাজ এই গল্পটা বলতেন, ওনার একটাই কথা –প্রসপেক্ট আছে। ঠাকুরও ষাঁড়ের গল্প বলছেন, একটা শিয়াল দিনরাত ষাঁড়ের পিছনে পিছনে ঘুরছে। ষাঁড় যখন শুয়ে থাকে শিয়াল তার কাছেই শুয়ে থাকে। যখন চলে তখন পিছন পিছন চলতে থাকে। একদিন ষাঁড়ের অণ্ড খসে পড়বে, শিয়াল সেটা খাবে এই আশায় ষাঁড়ের পিছন ছাড়ছে না, এটাই মায়া। আগামীকাল আমি সুখের দিন দেখব, এটাই মায়া। এই মায়াকে এরপর আর কি ব্যাখ্যা করার আছে, কিছু ব্যাখ্যা করার নেই। *যস্য দৃশ্যতে তস্য*।

দুনিয়াতে সবাই তাই, ছেলে মেয়ের পিছনে দৌড়াচ্ছে; মেয়ে আশায় আছে ওকে আমি ফাঁসাবো, ও আমাকে বিয়ে করবে, আমার দেখাশোনা করবে। মা সন্তানকে নিয়ে কত আশার জাল বুনে যাচ্ছে। যারা চাকরি করছে, তারা আশা করে যাচ্ছে –আমার প্রমোশন হবে, আমার মাইনে বাড়বে, আমার আর্থিক নিরাপত্তা হবে। আমি জগৎ থেকে আশা করে যাচ্ছি, জগতের সবাই বাকি সবার থেকে আশা করে যাচ্ছে। বেদনার বালুচরে সবাই খেলাঘর বানিয়ে যাচ্ছে। কোথাও স্থির বলে কিছু নেই, সবটাই খেলাঘর। এটাই মায়া, এর ব্যাখ্যা করার কিছু নেই, একটা ব্যাখ্যা – *যস্য দৃশ্যতে তস্য*। পাগলকে নিয়ে আমরা হাসাহাসি করি, কিন্তু বুঝতে পারছি না যে, আমরা সবাই এই পাগলের দলে, সবাই বোকা।

কিন্তু যে তর্ক করছে সে ছাড়ছে না, নানা রকমের তর্ক করে যাচ্ছে। আচার্য তখন তাকে জিজ্ঞেস করছেন, 'ঈশ্বর ছেড়ে তুমি অবিদ্যাকে নিয়ে এত কিছু জিজ্ঞেস করছ, এটা জেনে তোমার কি হবে'? 'কেন, অবিদ্যাই তো সব অশান্তির মূলে। যদি জানা যায় তাহলে মায়া আমি ত্যাগ করব'। আচার্য বলছেন, 'যার সমস্যা সে সমাধান করবে, তোমার এত মাথাব্যাথা কেন? কেন তুমি এত মায়াকে নিয়ে পড়েছ'? বলছেন, 'কেন, আমার ভিতরে অবিদ্যা আছে। আমি বেরোতে চাই, আমার সমাধান চাই'। আচার্য বলছেন, 'তাহলে তো তুমি জেনেই গেলে অবিদ্যা কোথায়, আর এটা তুমি নিজেও জান যে, তুমি এই অবিদ্যার সাথে যুক্ত হয়ে আছ'। সেখান থেকে বলছে, 'না জানি, কিন্তু প্রত্যক্ষ রূপে জানি না'। এইভাবে তর্ক চলতে থাকে। এখানে আচার্য আবার খুব উচ্চমানের যুক্তিতর্ক এনে দেখাচ্ছেন, এই যে তুমি অবিদ্যা, মায়ার কথা বলছ, আসলে আত্মার সাথে মায়ার কক্ষণ কোন সম্পর্ক হয় না। এই মায়া হল মিথ্যা। এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম কি করে বিপরীত গ্রহণ হয়, অগ্রহণ হয়, সংশয় হয়, এটাই মায়া। এটা statement of fact, আমরা সবাই এটাতেই আছে।

আচার্য বলছেন এটা মনে রাখবে, আত্মা সর্বাবস্থায় নির্লিপ্ত, অক্রিয়, অবিকারী। দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করার সময় এগুলোকে নিয়ে বিস্তারে আলোচনা করা হয়েছিল। আর ওর মধ্যে যে জ্ঞাতা, ভোক্তা ইত্যাদির ভাব; যেমন আজকে আমার শরীর ভাল আছে, আজ গীতা ভাল বুঝতে পারছি, এগুলো উপাচার; শুধু বোঝানর জন্য এভাবে বলা হচ্ছে, আসলে এগুলো কিছু না। আচার্য বলছেন, এটাই গীতার বক্তব্য। *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে* এই সব শ্লোকের বক্তব্য একটাই, আত্মাই আছেন, আত্মার বাইরে কিছু নেই। কথামৃতেও এই একই বক্তব্য বিভিন্ন ভাবে আসছে। কিন্তু তাঁর সামনে মায়া এসে যায়। কোথা থেকে আসে, কেন আসে, কিভাবে আসে, আমরা জানি না; কিন্তু *যস্য দৃশ্যতে তস্য*। যে এই মায়ায় আছে সে ফেঁসে আছে, আমরা সবাই মায়াতে ফেঁসে আছি। কিন্তু যখন আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বর দর্শন করে এই মায়া থেকে বেরিয়ে আসা যায়, তখন দেখে মায়া তো কখন ছিলই না।

মায়াকে কক্ষণ জানা যায় না, কারণ এটা মনের একটা সৃষ্টি। মায়া অন্ধকারের মত, অন্ধকার দিয়ে অন্ধকারকে জানা যায় না। আলো নিয়ে এলে অন্ধকার থাকে না। যতক্ষণ আমরা অজ্ঞানে আছি ততক্ষণ অজ্ঞানকে জানা যায় না। জ্ঞানের উদয় হয়ে গেলে তখন আবার অজ্ঞান থাকে না। অজ্ঞানকে কখনো জানা যাবে না, সেইজন্য বলছেন, এটা statement of fact, *যস্য দৃশ্যতে তস্য*। এই অবিদ্যা, মায়াকে নিয়ে এরপর আর বিশেষ ভাবে আলোচনা সেই রকম আসবে না। এবার আমরা পরের ধাপে এগিয়ে যাচ্ছি।

এবার শুরু হতে যাচ্ছে ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞকে নিয়ে আলোচনা। প্রথমে বলে দিলেন *ইদং শরীরং কৌন্তেয়*, ক্ষেত্র হল এই শরীর আর ক্ষেত্রজ্ঞ হলেন অন্তর্যামী, যিনি ঈশ্বর তিনিও অন্তর্যামী। তাহলে সাধনা কিভাবে হবে? সাধনা এই ভাবে হবে –আমি আমার ইষ্টের সাথে অভিন্ন, তিনি আমার থেকে আলাদা কিছু নন। আমাদের বেলুড় মঠ থেকে দীক্ষা নেওয়ার সময় গুরু বলে দেন, এই তোমার ইষ্ট, তোমার হৃদয়ে ইষ্টের ধ্যান করবে, তিনি তোমার থেকে আলাদা কিছু নন। ঈশ্বরের বাইরে তো কিছু নেই, সব ঈশ্বরেরই রূপ বা অভিব্যক্তি। যারা তাদের পাণ্ডিত্যের জোরে, ইমোশান দিয়ে বোকা বোকা থিয়োরিজ্‌গুলি নিয়ে আসেন, তাদের সাথে কি কথা বলেবন! আমার পরিচিত একজনের সাত বছরের বাচ্চা সারাদিন প্রচুর বই পড়াশোনা করে। বাচ্চাটি অনেক চিন্তাভাবনা করে বলল, I unaderstand that God is a story। এখন ওই বাচ্চার সাথে আমরা কি তর্ক করতে যাব? অনেক ইয়ং ছেলেমেয়ে আমাদের কাছে আসে, অনেক রকম থিয়োরিজ্‌ নিয়ে কথা বলে, এদের সঙ্গে কি তর্ক করব? বড় বড় গোঁফওয়ালা লোক, যাদের কাছে দেহই আত্মা, তাদের সাথে কি তর্ক করতে যাব?

কিছু দিন আগে আমাদের অন্যতম সহাধ্যক্ষ গত হলেন, এক সময় তিনি রহড়া আশ্রমের বিদ্যাপীঠের প্রিন্সিপাল ছিলেন। ওখানকার একটা রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী কিছু অধ্যাপক একদিন প্রিন্সিপালের চেয়ারে বসে ওনার সামনে সিগারেট খেতে শুরু করেছেন। আমাদের চোখের সামনে এই সব ঘটনা ঘটতে দেখেছি। কাপে চা খাচ্ছে, চা'টা আবার ওনার গায়ে ছুড়ে দিচ্ছে –এই সাধু নে চা খা। এদেরকে আমরা কি বোঝাব? অবিদ্যা, মায়া, জগৎ, ঈশ্বর এরা বুঝবে? নিজের দেহ ছাড়া এরা কিছু বোঝে না, শুধু অপরকে মারতে জানে, আর মার খেলে পালাতে জানে। এর বাইরে এরা কিছু জানে না, এদেরকে আপনি এই তত্ত্ব বোঝাবেন? এই ধরণের তথাকথিত যারা ভদ্রলোক, মানুষ হতে এদের অনেক সময় লাগবে। অবশ্য তারা একই কথা আমাদের নামেও বলে। ওদের কাছে আমরা হলাম আফিং খেয়ে ঘুরে বেড়ানোর দল। যাই হোক, আমরা গীতার আলোচনায় ফিরে আসছি। ভগবান এবার ক্ষেত্রকে ব্যাখ্যা করছেন –

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্‌ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু।।৩।।

(সেই ক্ষেত্র যেমন ও যে প্রকার, যাদৃশ ধর্মযুক্ত, যেরূপ বিকারযুক্ত, যা থেকে যেভাবে উৎপন্ন হয় এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপতঃ যেমন ও যেরূপ উপাধিকৃত শক্তিশালী তা সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর।)

প্রথম শ্লোকে *ইদং শরীরং কৌন্তেয়* যেটা বলা হল; শরীরকে নিয়ে বলছেন, তার মানে ক্ষেত্র জিনিসটা কি, এর ধর্ম কি, এর বিকার কি রকম, এর বিস্তার কি রকম আর কিভাবে এর জন্ম, এর কার্য কি রকম, সব কিছু আমি তোমাকে বিস্তারে বলব। আলোচনার শুরুতে বলা হয়েছিল, যাঁরা জ্ঞানযোগ অনুশীলন করেন, যাঁরা বিবেক বিচার করেন, তাঁদের পরিষ্কার ভাবে জানতে হয় ক্ষেত্র কি আর ক্ষেত্রজ্ঞ কি। ক্ষেত্রকে আমাদের ধীরে ধীরে ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে, ছেড়ে দিয়ে ক্ষেত্রজ্ঞের দিকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মুখের কথা বলা সহজ, কৃষ্ণ আছেন, আমি কৃষ্ণের ভক্ত,

আমি কৃষ্ণের সামনে মীরাবাঈএর মত নৃত্য করছি, ইমোশানালি আমরা এগুলো বলতে পারি, কিন্তু তত্ত্বতঃ এগুলো কোন কাজে লাগে না।

স চ যো যৎ, এখানে *যঃ* বলতে ক্ষেত্রজ্ঞের কথা বলছেন। তার মানে, ক্ষেত্র কি, ক্ষেত্রজ্ঞ জিনিসটা কেমন, ক্ষেত্রের প্রভাব কি, সৃষ্টি কোথা থেকে, সব কিছু আমি বিস্তারে বলব। ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ নিয়ে বলা মানেই প্রকৃতি ও ঈশ্বরকে নিয়ে বলা। যোগেও প্রকৃতি ও পুরুষকে নিয়ে বলা হয়, তবে সেখানে এভাবে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ধারণাটা নেই। যাই হোক, ম্যাটার কি, কনসাসনেস কি, এনার্জি কি, প্রকৃতি কি, পুরুষ কি; এই সব কটা প্রশ্নকে শুধু ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞ দিয়ে পরিষ্কার করে দেবেন। জড় ও চৈতন্যকেই এখানে বলছেন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বা জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, অর্থাৎ যিনি জানছেন আর যাকে জানছেন। ক্ষেত্র মানে যাকে জানা হয়, ক্ষেত্রজ্ঞ মানে যিনি জানছেন। যেটা আমরা প্রথমের দিকে বলেছিলাম, যে জিনিসটা ফল দেয়, দেহেই সব ফল আসে, মনেই সব ফল আসে –দেহ, মন এগুলো ক্ষেত্র।

শ্রীকৃষ্ণ এবার পরের শ্লোকে বলতে যাচ্ছেন, এই যে তত্ত্বগুলো আমি তোমাকে বলতে যাচ্ছি এগুলো কোনটাই আমার নিজের কোন মনগড়া বানানো কথা নয়। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন এগুলো তাঁর কথা নয়, তাহলে কার কথা? আমরা এর আগেও সত্যের তিনটি পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করেছি। একটা জিনিসকে যে সত্য বলছি, এটা সত্য কিনা কিভাবে বুঝতে পারব? এর তিনটে পরীক্ষা হয় – শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি। শ্রুতি হচ্ছে পরম্পরা, আমি যেটাকে সত্য বলে মনে করছি তার কথা বেদে আছে কিনা, যদি বেদে থাকে তাহলে সত্য বলে মেনে নিতে কোন দ্বিধা থাকবে না। বিচারকরা যখন বিচার করেন তখন তাঁরা দেখেন এর আগের আগের ক্ষেত্রে এই রকম ঘটনাতে কি রায় দেওয়া হয়েছিল, তারপর দেখেন এই ব্যাপারে আইন কি বলছে, আর আমাদের কাছে ঘটনার যা নথিপত্র আছে তাতে কি বলা হচ্ছে। এই তিনটে যখন মিল হবে তখনই বিচারক তাঁর রায় দেন।

আধ্যাত্মিক দর্শনের ক্ষেত্রেও ঠিক এইভাবে বিচার করে একটা তত্ত্বকে সত্য বলে গণ্য করা হয় – শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি। শ্রুতি মানে বেদ, বেদে এটা আছে কিনা, পরম্পরাতে এর আগে এটাকে রাখা হয়েছি কিনা। আর কথাটা যুক্তিযুক্ত কিনা। যেটা বলা হয়েছে সেটা বাস্তব অনুভূতিতে উপলব্ধ হয়েছে কিনা। শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ব্যাপারে যা কিছু বলতে যাবেন সেটা এই শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতিতে আগেই পরীক্ষিত হয়ে গেছে, ক্ষেত্রকে নিয়ে না বলে এটাই ভগবান পরের শ্লোকে বলছেন –

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ।।৪।।

(এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যাথাত্ম্য বশিষ্ঠাদি ঋষিরা বহু প্রকারে বর্ণনা করেছেন। ঋগাদি বেদচতুষ্টয়ের নানা শাখাতেও এই তত্ত্ব বিবিধ ছন্দের দ্বার বিভিন্নভাবে গীত হয়েছে এবং যুক্তিযুক্ত ও ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদক বেদবাক্যসমূহ দ্বারা এই তত্ত্ব অসন্দিগ্ধভাবে নির্ণীত হয়েছে।)

পাঁচ নম্বর শ্লোকে এই বিদ্যার স্তুতি করছেন। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে তত্ত্ব, এই তত্ত্বের কথা এই অধ্যায়ে বলছেন, আমরা আগেও বলেছি, এই অধ্যায়টা খুব সুন্দর। পরিষ্কার করে বলে দেবেন, সংসার কি আর ঈশ্বর কি। যতটুকু এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারব ততটুকু আমরা সংসারকে ত্যাগ করতে পারব, আর যতটা সংসার ত্যাগ করতে পারব, ততটাই আমরা শান্তি পাব। *ঋষিভির্বহুধা গীতং*, বশিষ্ঠ আদি যাঁরা ঋষিরা ছিলেন, অর্থাৎ বেদের ঋষিরা এই বিদ্যার কথা অনেকভাবে বলেছেন। *ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্*, ছন্দ মানে এখানে ঋক্, সাম আদি বেদের কথা বলছেন, ঋষিরা এই বিদ্যার কথা অনেক ভাবে বলেছেন আর বেদেও এই বিদ্যার বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব, ব্রহ্মসূত্র এখানে ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের কথা বলা হচ্ছে না, উপনিষদের যে বাক্যগুলি ব্রহ্মসূচক, আত্মা ও ব্রহ্মকে নিয়ে যে বাক্যগুলি বলা হয়েছে, এই সমস্ত কিছু দিয়ে আত্মাকেই জানা যায়, অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞকেই জানা যাচ্ছে।

হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চৈতৈঃ, প্রত্যেকটি বাক্য একেবারে যুক্তিযুক্ত, কোথাও কোন সংশয় নেই। সেইজন্য এই বিদ্যার দ্বারা যে জ্ঞানের উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান একেবারে ঠিক ঠিক। ঋষিরা এই বিদ্যার কথা বলে গেছেন, বেদেও এই কথা বলা হয়েছে আর উপনিষদের ব্রহ্মসূচক বাক্যগুলিকে যুক্তি দিয়ে নিঃসংশয় করেছেন। এখানে শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি এই তিনটেকে এনে দেখাচ্ছেন, শ্রুতি হল বেদে বলা হয়েছে, অনুভূতি হল বশিষ্ঠাদি ঋষিরা এই কথাই বলে গেছেন আর উপনিষদ আদিতে বিভিন্ন জায়গায় যুক্তি দিয়ে এটাকে দাঁড় করানো হয়েছে। হিন্দু শাস্ত্রে যেখানেই কোন তত্ত্বকে বলা হয়, সেখানেই এনারা এই তিনটে জিনিসকে নিয়ে আসেন –শ্রুতি এই কথাই বলছেন কিনা, যুক্তি এই কথাই বলছে কিনা এবং অনুভূতিতেও এই কথা বলছেন কিনা। এখানে তিনটে স্তরে বলছেন, *ঋষিভির্বহুধা গীতা* –এটা হল অনুভূতি থেকে, *ছন্দোবির্বিবিধৈঃ পৃথক্* - এটা হয়ে গেল শ্রুতি বা বেদ আর *ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব* –উপনিষদে যেখানে সব কিছুকে যুক্তি দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এটা হয়ে গেল যুক্তি।

চার নম্বর শ্লোকটা কেন এভাবে এখানে বলা হল? খুব সহজ ব্যাপার। ঠাকুর গল্প বলছেন, এক বড় জমিদারের বাড়িতে একটা বড় নিমন্ত্রণের ভোজ হয়েছে। আগেকার দিনে বড়লোকের বাড়িতে গণমান্য লোকেদের সাথে সাধারণ লোকেদেরও নিমন্ত্রণ করা হত। গ্রামের সাধারণ লোকেরা আলাদা জায়গায় খেতে বসেছে। তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তোমরা কি অম্বল নেবে? গ্রামের সাধারণ লোকেরা জানেই না অম্বল জিনিসটা কি, ওরা তাই জিজ্ঞেস করছে, বাবুরা কি খেয়েছেন? বাবুরা যদি খেয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই ভাল হবে, আমাদেরও দিন। বাবুরা খেয়েছেন কিনা, এই কথাটার খুব গুরুত্ব। ঠিকে এটাই এখানেও বলা হয়, বেদেও কি এই রকম কথা বলা হয়েছে কিনা? ঋষিরাও কি এই একই কথা বলেছেন কিনা? যদি বলে থাকেন তাহলে আমাদেরও ভাল হবে। সব সময় খুঁজতে হয় কারা এই ধরণের কথা বলেছেন, আমরা যেমন বর্তমানে বলি, ঠাকুর এই কথা বলেছেন, স্বামীজী এই কথা বলেছেন। বাবুরা যে কালে খেয়েছেন সেই কালে অবশ্যই ভাল হবে। এবার ক্ষেত্রকে পরিভাষিত করছেন, প্রথমে বলছেন *ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রম্*, দেখা যাক শরীর কত দূর বিস্তারে যেতে পারে –

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ।।৫।।
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্।।৬।।

(পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত, মহাভূতের কারণ অহঙ্কার, অহঙ্কারের কারণ বুদ্ধি, বুদ্ধির কারণ মূলা প্রকৃতি (অব্যাকৃত ব্রহ্মশক্তি), দশ ইন্দ্রিয় ও মন, ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয় স্থূল এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, দেহ-সংঘাতে অভিব্যক্ত চেতনা ও ধৃতি –এই সকল বিকারযুক্ত ক্ষেত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হল)

সাংখ্য আর যোগের চব্বিশটা তত্ত্ব পাঁচ নম্বর শ্লোকে দেওয়া আছে, তাই এই শ্লোকটা মুখস্ত করে নিতে পারলে চব্বিশটা তত্ত্ব সব সময় মনে থাকবে। সবার উপরে হলেন প্রকৃতি, প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলা হয়, প্রকৃতির নীচে মহৎ। মহৎ হল সমষ্টি মন। মহৎ থেকে আসে সমষ্টি অহঙ্কার বা আমিত্ব। অহঙ্কার থেকে আসে পঞ্চ তন্মাত্রা –শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। পঞ্চ তন্মাত্রার নানা রকম সংমিশ্রণে তৈরী হয় ইন্দ্রিয়গুলি –পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ও পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং তার সাথে মন, এই

একাদশ ইন্দ্রিয়। আর অন্য দিকে তৈরী হয় পাঁচটি ভূত –আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী, এই হল মোট চব্বিশটি তত্ত্ব।

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ, মহাভূতকে আচার্য বলছেন সূক্ষ্ম ভূত, এটাকেই পরে বলবেন ইন্দ্রিয়গোচর। প্রথমে বলছেন পঞ্চ তন্মাত্রা, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত –এই আটটাকে আটটি প্রকৃতি বলা হয়। এই আটটি একেবারে পিওর ফর্মে থাকে। এখান থেকে যেগুলো আসে সেগুলোকে অনেক সময় বলা হয় বিকৃতি, মিলেমিশে আসে, যেখানে তৈরী হয় এগারোটি ইন্দ্রিয় ও পাঁচটি স্থূল ভূত। *ইন্দ্রিয়গোচরাঃ* মানে ইন্দ্রিয়গুলি যেখানে বিচরণ করে। এই চব্বিশটি তত্ত্বই হল ঠিক ঠিক ক্ষেত্র। কিন্তু তাতেও পরিষ্কার হয় না। পরিষ্কার হয় না বলে বলছেন, বৈশাষিক নামে আমাদের একটা দর্শন ছিল, তাদের মতে ক্ষেত্র হল যেটা ছয় নম্বর শ্লোকে বলছেন –*ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ। এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্।।*

গীতার বিভিন্ন যে ভাষ্যগুলি আছে, সেগুলো যদি স্বাধীন ভাবে কেউ পড়তে যান তাহলে দেখা যাবে সবারই এই পাঁচ আর ছয় নম্বরে এসে সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যাবে। আচার্য শঙ্করের এটাই বৈশিষ্ট্য, তিনি পুরো জিনিসটাকে একটা প্ল্যাটফরমে নিয়ে আসছেন। যদি আমরা নিজে থেকে পাঁচ আর ছয় নম্বর শ্লোকের চব্বিশটা তত্ত্বকে গুনতে যাই, আমাদের সব গুলিয়ে যাবে। পঁচ নম্বরে বলছেন মহাভূত, পঞ্চ মহাভূত জিনিসটা কি, তার সাথে বলছেন, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, দশ আর এক মিলে এগারোটা ইন্দ্রিয় আর এগুলোর সাথে আসছে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা ও ধৃতি, এগুলো সবই প্রকৃতি, কিন্তু হিসাবে তো মিলছে না।

ঠিকই, হিসাবে মিলবে না। আচার্য বলছেন, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি এগুলো মনের এক একটা অবস্থা, সেইজন্য এগুলোকেও ক্ষেত্রের মধ্যেই ধরা হয়। ইচ্ছাকে বলছেন, যে জিনিসটা আমি উপভোগ করেছি, সেই জিনিসটাকে আবার উপভোগ করতে চাইছি। কারুর হয়ত কোল্ডড্রিঙ্কস খুব পছন্দ, তার মানে আগে উনি হয়ত কোন দিন খেয়েছেন, খাওয়ার পর সুখ পেয়েছিলেন। পরে একদিন কাউকে কোল্ডড্রিঙ্কস খেতে দেখেছেন, তাঁরও ইচ্ছা হল, আজ একটা কোল্ডড্রিঙ্কস খাই। বাঙালীরা ঝালমুরি খেতে খুব ভালবাসে। বৃষ্টি পড়ছে, আজ পেঁয়াজি দিয়ে ঝালমুরি খাবে, এটাকে বলে ইচ্ছা। অতীতে ভোগ করে সুখ পেয়েছিল, স্মৃতিতে সেটা থেকে গেছে, সেই জিনিসটা পুনরায় সে ভোগ করতে চাইছে।

যে জিনিসটা থেকে দুঃখ পায়, সেই জিনিসটাকে থেকে দূরে থাকতে চায়, এটাকে বলে দ্বেষ। যেখানে মন আগে খুশী হয়েছিল, মন প্রসন্ন হয়েছিল, সেটাকে আবার সে অনুভব করতে চাইছে – এটাকে বলে সুখ। সুখ হল, যেখানে মন খুশী হয়, মনের একটা সাত্ত্বিক ভাব। যেহেতু এটা মনের ভাব, সেইজন্য এটা ক্ষেত্র। দুঃখ মানে, সুখের বিপরীত যেটা সেটাই দুঃখ। দেহ আর ইন্দ্রিয় মিলে যে সংঘাত হয়, এটাকে বলছেন সংঘাত।

এটা আবার বিজ্ঞানের সাথে মিলবে না। লোহার গোলা আগুনে যদি গরম করে দেওয়া হয়, তখন মনে হবে লোহার গোলাটাই যেন আগুন, ঠিক তেমনি দেহ আর ইন্দ্রিয়ের এই সংঘাত, এর মধ্যে আত্মার প্রকাশ হয় বলে মনে হয় আমরা চৈতন্য। কিন্তু আসলে এই দেহ ও ইন্দ্রিয় কোনটাই চৈতন্য না, পুরোটাই জড়। চেতনা হল, আত্মচৈতন্য, নিজের যে চৈতন্য, সেই চৈতন্যই হলেন ঈশ্বর। যখন এই চৈতন্য শরীর ও ইন্দ্রিয়ে এসে এগুলোকে প্রকাশিত করে দেয়, যে প্রকাশ দেখে আমাদের মনে হয় উনি বেঁচে আছেন, ওনার ইন্দ্রিয় ভাল কাজ করছে। এই যে চৈতন্য যখন দেহের মধ্যে, মনের মধ্যে প্রকাশ পায় তখন এটাকে বলে চেতনা। চেতনা আর চৈতন্য এই দুটো আলাদা। এই চেতনাও কিন্তু ক্ষেত্র, প্রকৃতির এলাকার।

বিভিন্ন কারণে শরীর যখন ব্যাকুল হয়ে যায়, ইন্দ্রিয় যখন চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখন এই চঞ্চলতা ও অস্থির ভাবকে ধরে রেখে আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করে, এটাকে বলে ধৃতি। গীতাতে ধৃতি শব্দটা অনেকবার এসেছে। আমাদের বেশির ভাগ লোকেরই ধৃতি থাকে না। উড়িষ্যা থেকে একজন শ্রোতা ইউটিউবে আমাদের এই ক্লাশগুলো শোনেন, মাঝে মাঝে আমাকে মেইল করেন। একটা মেইলে উনি বলছেন, 'আগে আমি দিনে একশ আট পাঁচ বার করে জপ করতাম। আপনার ক্লাশগুলো শোনার পর থেকে এখন দশ গুণিতক একশ আট জপ সকাল বিকাল করি, আরও বাড়াবার চেষ্টা করছি'। এই যে ধরে রাখা, এটাকে বলে ধৃতি। ধৃতি থাকলে তবে গিয়ে জপধ্যান হয়।

এরপর আচার্য অন্তঃকরণ নিয়ে বলছেন, আমাদের মনের যত রকমের কাজ, মনের পুরো ধর্ম, এই কটি শব্দ দিয়ে এটাকে ইঙ্গিত করা হল। ন্যায়, বৈশাষিকরা এগুলোকে আত্মার ধর্ম বলে মনে করেন। কিন্তু গীতা এখানে পরিষ্কার করে দিলেন, এগুলো কখনই আত্মার ধর্ম হতে পারে না, এগুলো সব ক্ষেত্র। আমরা জানি না, বৈশাষিকরা কি করে এই কথা বললেন। আমাদের কাছে জিনিসটা অত্যন্ত সহজ, মনের এলাকা যত দূর, তত দূর হল ক্ষেত্র। মনের এলাকার মধ্যে শরীর পড়ে, মনের এলাকার মধ্যে ইন্দ্রিয় পড়ে। এর সব কিছুর বাইরে হল ক্ষেত্রজ্ঞ। গীতা বলছেন, এই হল আমাদের ক্ষেত্র, আর এর বাইরে যা আছে, সেটা ক্ষেত্রজ্ঞ, এর বাইরে যেটা সেটাই আত্মা, এর বাইরে যেটা সেটাই ঈশ্বর। ঈশ্বর যিনি, তিনিই আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম। গীতা এবার কেবল ক্ষেত্রজ্ঞকে নিয়ে বলবেন।

'বিবেক বিচার' বা শুধু 'বিচার' এই শব্দ আমরা, বিশেষ করে যাঁরা ধর্ম জীবনের সাথে জড়িয়ে আছেন তাঁরা অনেকবার শুনেছেন, আসলে জ্ঞানমার্গে এই শব্দের বেশি ব্যবহার হয়। কথামৃতেও ঠাকুর অনেকবার বিবেক বিচারের কথা বলেছেন। বিচার জিনিসটা কি? নিত্য অনিত্যের বিচার, কোনটা নিত্য আর কোনটা অনিত্য এই বিচার করা। এটাকেই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অন্য ভাবে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ দিয়ে বলছেন। এটাই যখন সাংখ্য বা যোগে আসে তখন প্রকৃতি ও পুরুষ দিয়ে বলা হয়। প্রকৃতি হল জড়, শক্তি ও মন। ইদানিং কালে কেউ কেউ বলেন God is energy, God is particle, কোথা থেকে এই ধরণের উদ্ভট আইডিয়াজ্‌গুলো এনারা পান, ভাবলে অবাক লাগে। আমরা আগে আলোচনা করলাম, যেখানে আচার্য বলছেন, *অসম্প্রদায়বিৎ সর্বশাস্ত্রবিদ্ অপি মূর্খবদ্ এব উপেক্ষণীয়,* সম্প্রদায় থেকে যদি বিদ্যা না পেয়ে থাকে, তারপরেও সব শাস্ত্র সে যদি জেনে থাকে, তবুও তাকে মুর্খের মত উপেক্ষা করবে।

ফিজিক্সে একটা term আছে, ওটাকে Heavy particles বলে, এটাকেই একজন রেগেমেগে বললেন, God dampared। সেখান থেকে সারা বিশ্বে আগুন লেগে গেল, they have found God particle, টিভিতে দেখাচ্ছে, সেমিনার হচ্ছে, কত কি হচ্ছে। ওর নাম ছিল God dam, ঠাকুর যেমন বলছেন, শালার বাড়ি, God dam মানে তাই। কারণ ফিজিক্সের হিসাব মত এই পার্টিকেল হওয়ার কথা না, কিন্তু আছে। যিনি প্রথম এই জিনিসটাকে নিয়ে কাজ করছিলেন, তিনি এর নাম দিলেন God dam particle। আর তারপরেই সবাই চিৎকার শুরু করে দিল, they have found God particle।

অসুখ হলে চিকিৎসা করাবার জন্য আমাকে একজন ভাল ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। মামলা যদি লড়তে হয় তাহলে আমাকে একজন ভাল উকিলের খোঁজ করতে হবে। বাড়ি বানাতে গেলে একজন ভাল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের খোঁজ করতে হবে। কিন্তু ধর্মের কথা জানার সময় সবাই গুরু হয়ে উপদেশ দিতে চলে আসেন। হাসপাতালে অপারেশন করার জন্য কেউ একজন বড় ইঞ্জিনিয়ারকে ডাকবে না। একটা হাসির গল্প আছে। একজন ডাক্তার খুব ভাল সার্জারি করে। কিন্তু

সমস্যা হল, যে রোগীকে অপারেশন করবে অপারেশন টেবিলে সেই রোগীকে উপুড় করে শুইয়ে দেয়, তারপর টেবিলের তলায় গিয়ে রোগীর অপারেশন করে। এতেও কিন্তু সে একজন সফল সার্জন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, এত ভাল সার্জন কিন্তু এভাবে অপারেশন করেন কেন? সেখান থেকে জানা গেল, ডাক্তার হওয়ার আগে তিনি গাড়ির একজন ভাল মেকানিকস্ ছিলেন। এটা হাসির গল্প হিসাবে ঠিক আছে, কিন্তু গাড়ির মেকানিককে দিয়ে কখন ডাক্তারি হয় না, আর ডাক্তারকে দিয়ে গাড়ির মেরামত হয় না। ঠিক সেই রকম, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, এনাদের দিয়ে ধর্মের কথা হয় না। যাঁরা সব সময় ধর্ম রাজ্যে বাস করেন, ধর্ম রাজ্যে সব সময় বিচরণ করেন, একমাত্র তাঁদেরকে দিয়েই ধর্মের কথা চলতে পারে। ধর্মের কথা শোনার জন্য মানুষ আমাদের কাছে আসে, আমরা মানে সন্ন্যাসীরা, যাঁরা এই লাইনের লোক।

ক্ষেত্র, অর্থাৎ এই প্রকৃতি হল অনিত্য, অনিত্যকে ছাড়তে হয়। আমরা সবাই পুরুষ আর প্রকৃতি মিলিয়ে। আমার এই শরীর প্রকৃতি, আমার মন প্রকৃতি, আমার শরীরে যে প্রাণশক্তি কাজ করছে সেই প্রাণও প্রকৃতির। এই জিনিসটাকেই ত্রয়োদশ অধ্যায় বলছেন ক্ষেত্র। ক্ষেত্রজ্ঞ হলেন পুরুষ, শুদ্ধ আত্মা। ছয় নম্বর শ্লোক পর্যন্ত ক্ষেত্রের বর্ণনা করলেন। এরপর আলোচনা করছেন ক্ষেত্রজ্ঞকে নিয়ে। কারণ অধ্যায়ের শুরুতেই ভগবান অর্জুনকে বলেছিলেন, তোমাকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ দুটোকে নিয়েই বলব, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ জিনিসটা যদি না জানা থাকে তাহলে দুটোকে আলাদা করতে পারবে না। আগে তোমাকে জানতে হবে কোনটাকে তুমি ধরবে, আর কোনটা তোমাকে ছাড়তে হবে। ভগবান বললেন, তোমাকে এবার ক্ষেত্রজ্ঞের কথা বলব।

কিন্তু সাত নম্বর শ্লোকে এসে ভগবান এমন কিছু গুণের কথা বলছেন, যেটা আমাদের সবারই থাকা দরকার। রাজযোগে এটাকেই যম-নিয়ম বলছেন। আচার্য বলছেন, ক্ষেত্রজ্ঞকে জানার জন্য যে জিনিসগুলো দরকার লাগে, ভগবান আগে সেই জিনিসগুলোর বর্ণনা করে নিচ্ছেন। ক্ষেত্রের কথা বলার সময় প্রথমে সরাসরি বলতে শুরু করে দিলেন – *মহাভূতান্যহঙ্কারো* ইত্যাদি, যেটা আমরা সবাই জানি। বাচ্চা ছেলেকে যেমন শেখান হয় –এটা কি বাবা, এটা হাত; এটা কি বাবা, এটা চোখ, এটা কি, এটা কান। ঈশ্বরীয় কথা যদি জানতে চাই, আত্মাকে যদি জানতে চাই, ব্রহ্মকে যদি জানতে চাই, ক্ষেত্রজ্ঞকে যদি জানতে চাই, পুরুষকে যদি জানতে চাই, সরাসরি কোন দিন জানা যাবে না। জানার জন্য প্রথমে আমাদের কিছু গুণ থাকা দরকার।

ইউটিউবের দৌলতে ধর্মকে নিয়ে বলার জন্য প্রচুর বক্তা এসে গেছেন, বেশির ভাগ বক্তাই ধর্মের ভুলভাল কথা বলে যাচ্ছেন। কেউ ঠিক কথা বলছেন, কেউ ভুলভাল কথা বলছেন, দুজনেরটাই সবাই শুনছেন, আর একটা হিড়িক লেগে গেছে, আমাকে ধর্ম জীবনে এগোতে হবে –কিন্তু এভাবে ধর্ম জীবনে কখনই এগোন যাবে না। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম, *শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া*। অনেক সময় লাগে, জন্মজন্মান্তর লেগে যায়। আমাদের কাছে অনেক মেইল আসে, মেইল দেখেই বুঝতে পারি কে মূর্খ আর কে পাগল। একজন বলছে, মহারাজ এত দিন গেল কিছুই তো হল না। কি হবে, দুটো শিং বেরোবে কি আপনার? মহারাজ কিছুই তো করতে পারলাম না। কে বারণ করেছে আপনাকে করতে? আসলে এদের আত্মজ্ঞানের নীচে কিছু চলবে না, ব্রহ্মজ্ঞানের নীচে কিছু চলবে না। ক্লাশ সিক্সের বায়োলজি পড়ে আপনি ডাক্তারি বিদ্যা ফলাতে যেতে পারবেন না। এই জ্ঞান প্রাপ্তির আগে জীবনের অনেক কিছু পাল্টাতে হয়, পাল্টাতে অনেক সময় লাগে। সেইজন্য আচার্য বলছেন, এই জ্ঞান প্রাপ্তির যে উপায়, আগে সেই উপায়ের কথা ভগবান পরের কয়েকটি শ্লোকে বর্ণনা করছেন।

আচার্য বলছেন, *যস্মিন্ সতি তজ্জ্ঞেয়বিজ্ঞানে যোগ্যঃ অধিকৃতো ভবতি যৎপরঃ সন্ন্যাসী জ্ঞাননিষ্ঠ উচ্যতে*, একটু আগে যে বলা হল, ধর্মের কথা বলার অধিকার সন্ন্যাসীর, কারণ এনারা

হলেন জ্ঞাননিষ্ঠ। জ্ঞাননিষ্ঠ মানে, ধর্মের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানে এনারা প্রতিষ্ঠিত। কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হন? এই আচরণগুলি পালন করে, এই আচরণগুলি যদি পালন না করতে পারেন তাহলে আপনি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন না। অনেকে রেগেমেগে সন্ন্যাসীদের বলে ভণ্ড সন্ন্যাসী; ভণ্ড সন্ন্যাসী মানে তিনি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত নন, থিয়োরেটিক্যাল জ্ঞানই হোক, তিনি সেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত নন। কিন্তু তিনি তো শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, তাহলে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত নন কেন? কারণ আচরণ নেই।

কেউ যদি ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, জিওগ্রাফি পড়তে যায়, সেখানে এই বিদ্যার্জনের সাথে তার চরিত্রের কোন সম্পর্ক নেই। আইনস্টাইন এত বড় বিজ্ঞানী, তাঁর অনেক মহিলার সাথে সম্পর্ক ছিল, রিচার্ড ফাইনম্যানও তাই। বড় বড় অনেক স্কলার, বিজ্ঞানী, কবি, সাহিত্যক আছেন, ব্যক্তিগত জীবনে তাঁদের চরিত্রের অনেক রকম দোষ থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে তাঁদের প্রতিভাকে কেউ ছোট করতে পারেন না। কিন্তু ধর্ম জীবন এভাবে হয় না। ধর্ম জীবন অক্ষর জ্ঞানে হয় না, ধর্ম জীবন আপনার জীবন যেমন, আপনার জ্ঞান তেমন। কেন আপনার ঈশ্বরে ভক্তি হয় না? কারণ আপনার জীবন এলেমেলো, জীবনে আপনার ত্যাগ তপস্যা নেই, একটা নিয়মিত ভাবকে অনুসরণ করে আপনার জীবন সংঘটিত হয়নি। আমি ক্লাশ সেভেন থেকে আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজীকে দেখে আসছি, একেবারে ঘড়ির কাঁটার মত তাঁর রুটিন। যত ঠাণ্ডা পড়ুক, যত গরম হোক, যত বৃষ্টিপাত হোক, বেলুড় মঠে ভোর চারটের সময় দরজা খোলে, উনি ঠিক সাড়ে তিনটের সময় এসে দাঁড়িয়ে যান। জেনারেল সেক্রেটারী থাকার সময় রাত একটার সময় কোথা থেকে প্লেনে এসেছেন, ঠিক সাড়ে তিনটের সময় মন্দিরের দরজার সামনে হাজির হয়ে গেছেন। এই পঁচাশি ছিয়াশি বছর বয়েসেও মাথা ব্যাথা বলে যেন ওনার কোন দিন কিছু হয় না, শরীর খারাপ বলে যেন ওনার কিছু নেই।

এই যে একটা ভাব, মানুষ যেমন ভোগের প্রতি প্রবৃত্ত হয়, এই ধরণের শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসীরা ঠিক সেই ভাবে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি প্রবৃত্ত হন। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, সারাটা জীবন এই ভাবে লেগে আছেন। আচার্য বলছেন, যখন কেউ এইভাবে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় এক ভাবে ধর্মাচরণে লেগে থাকেন, তখন সন্ন্যাসী জ্ঞাননিষ্ঠ হন। ঈশ্বরে আমাদের ভক্তি হয় না কেন? এই কারণেই হয় না। এসব কথা শুনলেই লোকেরা ছেড়ে পালিয়ে যায়, ধুর্ এত কিছু করতে হবে! আচার্য পরে বলবেন, এটাই জ্ঞান; কারণ জ্ঞানের সাধন আর জ্ঞান দুটো এক। আচার্য এই জিনিসটাকে নিয়ে অনেক জায়গায় অনেকবার বলেছেন, সাধন আর যেটার জন্য সাধন, দুটো একই। তার মানে জ্ঞানের সাধন, এটাই জ্ঞান।

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ।।৭।।

(উৎকর্ষ সত্ত্বেও আত্মশ্লাঘারাহিত্য, দম্ভশূন্যতা, প্রাণিপীড়নে অনিচ্ছা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, বহিরন্তঃশৌচ, মোক্ষমার্গে স্থিরতা, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে সংযত করে সন্মার্গে পরিচালনা করা,)

কোন গুণের বশবর্তী হয়ে মানুষ ধর্ম জীবনে আসে? আমাদের কোন গুণ থাকা দরকার, যে গুণ দিয়ে আমরা আত্মজ্ঞানের দিকে এগোব? আত্মাই বা কি? এই জিনিসগুলিকে এবার আস্তে আস্তে পরিষ্কার করবেন।

অমানিত্বম্, আচার্য বলছেন, *মানিনো ভাবো মানিত্বম্ আত্মনঃ শ্লাঘনং তদভাবঃ অমানিত্বম,* মানুষের এটা স্বভাব, নিজের প্রশংসা না করে থাকতে পারে না, এই আত্মাশ্লাঘার অভাবকে বলছেন *অমানিত্বম্*। সরাসরি যদি নিজের প্রশংসা না করতে পারে নিজের বাচ্চাকে দিয়ে দেখাবে। বাড়িতে কোন অতিথি এসেছে, বাচ্চাকে ডেকে বলবে, বাবা কাকুকে ওই কবিতাটা শুনিয়ে দাও তো, বাচ্চা

মেয়েকে বলবে, কাকুকে তোমার ওই নাচটা একটু নেচে দেখিয়ে দাও তো মা। কায়দা করে নিজের আত্মশ্লাঘাকে বার করে নিয়ে আসবে। আত্মাশ্লাঘা থেকে আমরা বেরোতে পারি না, কারণ আত্মশ্লাঘার সাথে আমাদের অস্তিত্ব জুড়ে আছে। কোন বিষয়ে আমি সাফল্য পেয়েছি কিনা, জানার কি উপায়? বলা হয়, যখন হিসাব করা ছেড়ে দেয়। যে বিরাট ধনী, সে জানে না তার কত টাকা আছে, কি কি সম্পত্তি আছে। ঠাকুর খুব সহজ করে বলছেন, কুবের রাজা জানে না তার ভাণ্ডারে কত ধনরত্ন আছে। শ্লাঘা কখন আমরা করি? যতক্ষণ না আমি সাফল্য পাচ্ছি। সাফল্য পেয়ে গেলে সে আর শ্লাঘা করবে না। আত্মপ্রশংসা মানুষ তখনই করে, যখন তার ক্ষমতা আছে কিন্তু অপূর্ণ। ক্ষমতা হয়ে গেলে শ্লাঘা থাকে না। আর অপূর্ণ যদি থাকে ধর্ম জীবনে সে চলতেই পারবে না। ধর্ম জীবন মানেই বীরপুরুষ। আত্মশ্লাঘা যদি থাকে, তার মানে সে অপূর্ণ কাম। অঙ্ক যেমন ইক্যুয়েশানে চলে, এখানেও সেই রকম চলে। নিজের প্রশংসা করে যাচ্ছে, ভিতরে ভিতরে মনে করছে আমি ভাল, তার মানেই সে অপূর্ণ। ধর্ম তার দ্বারা এখন হবে না, সময় লাগবে। এই আত্মশ্লাঘার অভাব হল *অমানিত্বম*।

অদম্ভিত্বম্ হল দম্ভের অভাব। দম্ভকে আচার্য ব্যাখ্যা করছেন, *স্বধর্মপ্রকটীকরণং দম্ভিত্বং*, নিজের ধর্মকে প্রকটা করা হল দম্ভ। ধর্মের এখানে অর্থ হয়, বৈশিষ্ট্য। আগেরটা হল আত্মশ্লাঘা বা আত্মপ্রশংসা, আর দম্ভ হল – বেশ করে তিলক কেটে দেখাবে যেন বিরাট ভক্ত। কিন্তু আসলে কি? ঠাকুর স্যাকরা দোকানের কেশব কেশব, গোপাল গোপাল গল্প বলছেন, কথামৃতে আছে। নিজের একটা যে বৈশিষ্ট্য আছে, যেদিক দিয়েই হোক, ধর্মের ক্ষেত্রে হতে পারে, অন্য ক্ষেত্রে হতে পারে, কায়দা করে ওই বৈশিষ্ট্যকে বেশি করে জাহির করা, এটাকে বলছেন দম্ভ। মুখে কিছু বলে না, কিন্তু দেখিয়ে বেড়ায়। এর আরেকটা শব্দ হল, *ধর্মধ্বজিত্ব*। আগে আগে যেখানে কুম্ভমেলা আদি হত, সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুদের আখড়া থাকত তাতে একটা উঁচু ঝাণ্ডা লাগিয়ে দিত। এটাকে বলা হয় ধর্মধ্বজ, ধর্মের পতাকা। যার পতাকা যত উঁচু হত তার ধর্ম তত উঁচু, *ধর্মধ্বজিত্বম্*, এটা অত্যন্ত বাজে জিনিস। এই দম্ভের অভাবকে বলছেন *অদম্ভিত্বম্*।

অহিংসা, কোন প্রাণীকে কোন ধরণের পীড়া না দেওয়া। *ক্ষান্তিঃ* –আচার্য বলছেন, *পরাপরাধপ্রাপ্তৌ অবিক্রীয়*, অপরে যদি কোন অপরাধ করে থাকে তার জন্য আমার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এই গুণগুলোর উপর খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, মা জগজ্জননী আমাদের মধ্যে শান্তি রূপে থাকেন, আমি যদি অপরের অপরাধ ক্ষমা না করতে পারি, একটুতেই যদি রেগে যাই, বুঝতে হবে আমার উপর মায়ের কৃপার অভাব আছে। আমার মধ্যে যদি আত্মশ্লাঘা থাকে, দম্ভ যদি থাকে, বুঝতে হবে জগজ্জননীর কৃপার অভাব আছে।

আর্জবম্ - ঋজু ভাব, *অবক্রতম্*। আমরা অনেককেই দেখে থাকি যারা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এমন ব্যাঁকা ব্যাঁকা কথা বলে, আমরা বলি, 'শুনলে গা-পিত্তি জ্বলে যায়'। যদি একটু সাহায্য চাই, হয়ত আমার উপর রেগে আছে, বলবে আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারব, আমার সাহায্য কি আপনার পছন্দ হবে; এত ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলার কি দরকার, সাহায্য করবেন না সোজাসুজি বলে দিলেই হয়। এদের মাথায় যদি পেরেক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, স্ক্রু হয়ে বেরিয়ে আসবে, মাথায় এত প্যাঁচ। কথামৃতে ঠাকুর অনেকবার বলছেন, সরল না হলে ধর্ম হয় না। শ্রীশ্রীমাও বলছেন, অনেক জন্মের সঞ্চিত পূণ্য না থাকলে মানুষ সরল হয় না। আমরা আমাদের মহারাজদের দেখেছি, কোন ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলবেন না, যা বলার সহজ সরল ভাবে বলে দেবেন। কেউ কোন দোষ করেছে, তার এই দণ্ড পাওয়া উচিত, সেখানেও সরাসরি বলে দেবেন, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কিছু বলতে যাবেন না। যাদের মধ্যে ঘোরপ্যাঁচ থাকে ধর্ম জীবনে আসতে তাদের অনেক সময় লাগবে।

আচার্যোপাসনং, যিনি আমাকে শাস্ত্র জ্ঞান দিচ্ছেন, যিনি আমাকে মোক্ষ পথের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের কোন কিছু দরকার আছে কিনা খোঁজ নেওয়া, তাঁদের সেবাশুশ্রুষা করা,

এগুলোই হল আচার্যের উপাসনা করা। এখন যদি প্রশ্ন করে, আচার্যের সেবা করলে কি হয়? এর কি উত্তর দেব? শাস্ত্র বলে দিয়েছে করতে, ব্যাস্ এর বেশি উত্তর আর হয় না। ধর্ম জীবন অত্যন্ত কঠিন। আমরা শাস্ত্রের কথা খুব সহজ করে বলি বটে, কিন্তু এগুলোর অনুশীলন করা খুব কঠিন। তবলার বোল মুখে বলা সহজ, কিন্তু হাতে নামানোর জন্য প্রচুর খাটতে হয়। আমার সন্ন্যাসী ভাইরা আমাকে বলে দিয়েছেন, মহারাজ বক্তৃতা দিচ্ছেন দিন, কিন্তু গান আপনি একদম করতে যাবেন না। আমিও জানি আমার দ্বারা গান হবে না, কিন্তু আমিও তো সা রে গা মা বলে দিতে পারি। টিয়া পাখিও ধর্মের কথা বলে দেয়। শাস্ত্রকৃপা যদি না হয়, ধর্মের কথা কোন দিন বুঝতে পারা যাবে না। ঠিক সেই রকম আচার্যের কৃপা যদি না হয়, শাস্ত্রের মর্ম বুঝতে পারবে না।

শ্রদ্ধেয় রাম মহারাজের কাছে আমি অনেক কিছু শিখেছি, অনেক দিন হয়ে গেল তিনি গত হয়েছেন। উনি বলতেন, ঘরে যে বইগুলো আছে সেগুলোকে রোজ ঝেড়ে মুছে সাজিয়ে রাখবে, তাতেও শাস্ত্রকৃপা হবে। আমরা ছোটবেলায় দেখতাম বাড়িতে ধর্মগ্রন্থ গুলিকে বড়রা খুব সুন্দর লাল কাপড় দিয়ে মুড়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতেন। তার সাথে আরেকটা হল শাস্ত্রের পারায়ণ করা। গীতা হোক, চণ্ডী হোক যেটা যার আদর্শ ধর্মগ্রন্থ, সেটাকে রোজ পারায়ণ করা, তখন তিনি কৃপা করেন। ধর্মের লোক না হলে এই জিনিসগুলোকে মানুষ বুঝতে পারবে না। এ এক অন্য জগৎ, এটা ফিজিক্স কেমিস্ট্রির জগৎ না। ফিজিক্স কেমিস্ট্রির বই ঝেড়ে মুছে রাখলে কারুর ফিজিক্সের বা কেমিস্ট্রির জ্ঞান হবে না। এই ধর্ম মনের জগতে চলে, আত্মার জগতে চলে, পুরো অন্য জিনিস। ঠিক তেমনি যে আচার্যের কাছে শিক্ষা নিচ্ছি, সেই আচার্য যদি কৃপা করেন, তাহলে শাস্ত্রের মর্মটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এটা কেন হয়, কিভাবে হয়, আমরা জানি না, কিন্তু এটাই হয়। হিন্দিতে খুব নামকরা একটা প্রবাদ আছে, হরিদ্বারের ওদিকে সবাই এই প্রবাদটা বলে –গুরু মেহেরবান্ তো চেলা পালোয়ান্। গুরু যদি কৃপা করে তাহলে চেলা পালোয়ান হয়ে যায়। গুরুকে খুশী করতে হলে, তাঁর সেবা শুশ্রুষা আদি করতে হবে। *আচার্যোপাসনং*, বলছেন আচার্যের উপাসনা করতে হয়, কিন্তু উদ্দেশ্য হল মোক্ষ প্রাপ্তি। আচার্যের উপাসনা করতে করতেই জীবন চলে যাবে তা না, উদ্দেশ্যটা হল মোক্ষের পথে এগোন।

তার সাথে বলছেন, *শৌচং*, ভিতর ও বাহির দুটোরই শৌচ হওয়া চাই। আচার্য বলছেন, *কায়মলানাং মৃতজ্জলাভ্যাং প্রক্ষালনম্*, এখন লোকেরা নানা রকমের সাবান দিয়ে শরীর মার্জন করে। আগেকার দিনে সাবান ছিল না, ওনারা মাটি দিয়ে প্রক্ষালন করে নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতেন। করোনা থেকে বাঁচার জন্য সেই সময় বলা হত –সব সময় সাবান দিয়ে ভাল করে হাত-পা ধুতে, ভাল করে স্যানিটাইজ করতে; সেই সুদূর প্রাচীন কাল হতে আমাদের এখানে এটাই নিয়ম। শৌচে আমাদের সব সময় প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। তার সাথে, *অন্তঃ চ মনসঃ প্রতিপক্ষভাবনয়া রাগাদিমলানাম্ অপনয়নং শৌচম্*। রাজযোগের একটা খুব নামকরা সূত্র হল, *বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্*, আমার ভিতরে যে গোলমাল আছে, সেটাকে কাউন্টার করার জন্য প্রতিপক্ষ ভাবনা আনতে হয়, যদি কোন জিনিসের প্রতি আকর্ষণ থাকে, তাহলে ওটার মধ্যে দোষ দেখতে হয় যাতে ওই জিনিসের প্রতি আকর্ষণটা কেটে যায়। মনের মধ্যে যে ময়লাগুলো রয়েছে, সব ময়লা পরিষ্কার করতে হবে। কিভাবে ময়লা পরিষ্কার করব? *প্রতিপক্ষভাবনম্*, যে জিনিসটা বা যে ভাবটা আছে, তার বিপরীত ভাব আমাকে নিয়ে আসতে হবে।

স্থৈর্যম্, মোক্ষ মার্গে একটা স্থির ভাব থাকতে হবে। কথামৃতে ঠাকুরকে একজন বলছেন, ঈশ্বরের চিন্তা ক্ষণিকের জন্য আসে, আবার ক্ষণিকে চলে যায়। ওখানে বলতে গিয়ে ঠাকুর বলছেন, তাহলেই হবে। আজকে সারা বিশ্বে সাতশ কোটির জনসংখ্যা। একবার ভাবুন তো, কজন মানুষ ঈশ্বরে ঠিক ঠিক বিশ্বাস করে? আর হিন্দু ধর্মের যে ভাব, যেখানে সব উচ্চমানের আধ্যাত্মিক সত্যগুলি রয়েছে, এতদিন যাঁরা আমাদের এই ক্লাশগুলো শুনছেন, আশা করি তাঁদের একটা ধারণা

হয়ে গেছে, হিন্দু ধর্ম অত্যন্ত উচ্চমানের ধর্ম। হিন্দু ধর্মের ভাব, এর উচ্চমানের আধ্যাত্মিক সত্য সাধারণ বুদ্ধি, সাধারণ লোকেদের জন্য নয়।

ইংরাজীতে simplistic একটা শব্দ আছে, ধর্মকে সহজীকরণ করা –সরল করে বলে দিলেন, বুঝলি ভগবান আছেন, সকাল বিকেল ভগবানের নাম করবি বুঝলি, হাত পা ধুয়ে নিবি বুঝলি। সহজীকরণ করে ধর্ম হয় না, ধর্ম অনেক সূক্ষ্ম জিনিস। যখন মনে ঈশ্বরীয় ভাব জাগে, অর্থাৎ ধর্মের পথে যাত্রা শুরু হয়ে যখন একটা স্তর আসে, তখন সুখ-দুঃখ যাই থাকুক, তখনও সে বলতে পারবে ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। বাচ্চা এমনিতে একটু কষ্ট হলেই মাকে জড়িয়ে রাখে, তার কষ্ট যদি আরও বেশি হয়, তখন সে আরও জোরে মাকে জড়িয়ে ধরে। রামচরিতমানসে তুলসীদাস খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন, বন্ধু কে। দুঃখ যখন আসে তখন যে বন্ধু, সে শতগুণ স্নেহ দিয়ে তাকে আবেষ্টন করে রাখে। ঠিক তেমনি ঈশ্বরও ভক্তের আপদ বিপদ হলে স্নেহ মমতা দিয়ে ঘিরে রাখেন, কিন্তু এটুকু পাওয়ার জন্য ঈশ্বরকে সব সময় ধরে রাখতে হয়, এটাকেই বলছেন স্থৈর্য, স্থির ভাব, চাঞ্চল্যের অভাব না থাকাটা এখানে প্রযোজ্য হবে না। সেইজন্য ভাষ্য খুব দরকার, ভাষ্য পড়া না হলে ঠিক বোঝা যায় না। এমনিতে স্থৈর্য বলতে আমরা মনে করব চাঞ্চল্যের অভাব। ঈশ্বরের প্রতি যে বিশ্বাস, এটা দৃঢ়, এটাকেই বলছেন স্থৈর্য – কোন কিছুতে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস একচুলও নড়বে না।

আত্মবিনিগ্রহঃ, আমাদের যে শরীর, এই শরীরের স্বাভাবিক একটা প্রবৃত্তি হল ভোগের দিকে যাওয়া। শরীর স্বাভাবিক ভাবেই আরাম চায়। আমরা কাজ কেন করতে চাই না? কারণ শরীর কোন কষ্ট নিতে চায় না, *আত্মবিনিগ্রহ* মানে, শরীরের এই বেগড়বাইকে নিয়ন্ত্রণ করা। আচার্য এখানে খুব সুন্দর বলছেন, *আত্মনঃ অপকারকস্য আত্মশব্দবাচ্যস্য কার্যকরণসংঘাতস্য বিনিগ্রহঃ*, আচার্যের সংস্কৃত এত মধুর, বলছেন, এই দেহটা হল আত্মার ক্ষতিকারক, দেহ আত্মার ক্ষতি করে, অথচ দেহকেই মানুষ আত্মা বলে জানে। যখন আমরা বলছি, আমি, আপনি তো আসলে আত্মা, কিন্তু 'আমি' যখন বলছেন তখন নিজের শরীরকে দেখান, সত্যিই কি আশ্চর্য! অথচ এই শরীর আত্মার বিঘ্নকারী। কেন বিঘ্নকারী? কারণ এই যে গুণের কথা বলা হচ্ছে, আত্মা যখন সেই গুণের দিকে নিয়ে যায়, শরীর তখন ঠিক তার বিপরীত দিকে তাকে নিয়ে যায়। আত্মজ্ঞানের জন্য দরকার, সকাল-বিকাল জপধ্যান করা; শরীর বলবে, আজ থাক কাল থেকে শুরু করা যাবে, দিব্যি দিয়ে বলবে, অবশ্যই কাল থেকে হবে। ছোটবেলা আমরা সবাই বলতাম, কাল থেকে অবশ্যই আমি মন দিয়ে পড়ব। এই করতে করতে পরীক্ষা এসে যেত। এই শরীরকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হয়, শরীরকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা, এটাই *আত্মবিনিগ্রহঃ*।

অমানিত্ব, অদম্ভ, অহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জবম্, আচার্যের উপাসনা, শৌচ, স্থৈর্য ও আত্মবিনিগ্রহ, এই গুণগুলি যদি না থাকে, আমরা আত্মজ্ঞানের দিকে এগোতে পারব না।

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনম্।।৮।।

(ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে বিরক্তি, অভিমানশূন্যতা; জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিরূপ দুঃখে পুনঃপুনঃ দোষদর্শন,)

ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের অর্থকে নিয়ে আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি, দ্বিতীয় অধ্যায়েই করা হয়েছে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হল, তাদের নিজের নিজের বিষয়ের প্রতি ধাবিত হওয়া। চোখ ভাল জিনিস দেখতে চায়, কর্ণ ভাল জিনিস শুনতে চায়, জিহ্বা সুস্বাদু খাবার আস্বাদ করতে চায়, এগুলোকে বলে ইন্দ্রিয়ের অর্থ, অর্থাৎ যেগুলো ইন্দ্রিয়ের জন্য রয়েছে। *ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্*, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই যে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের অর্থ, এগুলো থেকে সরে আসা। কিন্তু আচার্য আরও এগিয়ে গিয়ে বলছেন, *দৃষ্টাদৃষ্টেষু ভোগেষু বিরাগভাবো*, চোখের সামনে যে

জিনিসটা আছে, সেটা থেকে আর যেটা চোখের সামনে নেই, সেটা থেকেও মনকে টেনে সরিয়ে আনাটাই বৈরাগ্য। তার মানে স্বর্গসুখ, ইদানিং কালে কেউ আর স্বর্গাদি বিশ্বাস করে না, সেইজন্য আমরা এর বিস্তারে যাচ্ছি না। স্বর্গসুখটাও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই পড়ে। যারা কথায় কথায় বৈকুণ্ঠধাম, রামকৃষ্ণলোকে যাওয়ার কথা বলেন, তাঁরাও কিন্তু অজান্তায় পঞ্চ ইন্দ্রিয় নিয়েই কথা বলছেন।

নিত্য অনিত্য বিচারের কথা যে বলা হয় বা ঠাকুর যখন বলছেন ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, সেখান এই শ্লোকের দ্বিতীয় লাইন খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জন্ম, মৃত্যু, জরা অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থা, রোগ আর দুঃখ, এই সব কিছুকে আলাদা আলাদা ভাবে দোষ রূপে দেখা। এখানে আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, উনি যে রকমটি বলেছেন, ঠিক সেই রকমটি বলে যাচ্ছি, *জন্মনি গর্ভবাসযোনিদ্বারা নিঃসরণং দোষঃ*, জন্ম জিনিসটা কত বাজে, গর্ভে বাস করতে হচ্ছে, যোনিদ্বার দিয়ে তাকে বেরোতে হচ্ছে, কত কষ্ট! আমার ক্রতু উপন্যাস লেখা এটার জন্যই। সংসাটা নিজেই কি ভয়ঙ্কর কষ্টের জায়গা, তার উপর জন্ম জিনিসটা কত কষ্টকর। গর্ভবাস মানে একটা জেলের অন্ধকার সেলে দশ মাস বন্দী হয়ে থাকা। *তস্য অনুদর্শনম্ আলোচনম্*, এই জিনিসটাকে বিচার করতে হয়, আবার যখন আমার জন্ম হবে তখন দশটা মাস ওই অন্ধকার গর্ভে বাস করতে হবে আর এভাবে সবাইকে যোনিদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে।

জন্মের মত মৃত্যুতেও দোষ দেখা, প্রাণটাকে টেনে বার করে নেওয়া হচ্ছে। বলে, মৃত্যযন্ত্রণার মত কষ্ট আর কিছু হয় না। জন্মটা যতটা বাজে, মৃত্যুটাও ঠিক ততটা বাজে, আর যে জন্ম নেবে, মৃত্যু তার আসবেই। *তথা জরায়াং*, এটা সবাই ভাল বুঝতে পারবেন, আমি নিজেও খুব ভাল বুঝতে পারছি। কি রকম? *প্রজ্ঞাশক্তিতেজোনিরোধদোষানুদর্শনং*, বয়স হয়ে গেলে প্রজ্ঞা শক্তির অভাব হয়ে যায়। আজকেই আমার এক সন্ন্যাসী ভাইএর সাথে কথা হচ্ছিল, ওনাকে আমি একটা জিনিস ব্যাখ্যা করছিলাম। একটা শ্লোক বলতে গিয়ে শ্লোকের দ্বিতীয় অর্দ্ধটা মনে পড়ছে কিন্তু প্রথম অর্দ্ধটা কিছুতেই মনে পড়ছিল না। আমি হেসে বললাম, 'ষাট পেরিয়ে গেছি জরারূপী দোষ আমাকে আশ্রয় করে নিয়েছে'। বৃদ্ধ হয়ে গেলে প্রজ্ঞাশক্তি কমে আসে আর তার সাথে তেজটাও হ্রাস পায়। কিছু দিন আগে একজনের সাথে বহু বছর পর দেখা হল। দেখা হতেই আমাকে বলছেন, 'বাবাঃ! আপনি যখন দেওঘরে ছিলেন তখন আপনার কি তেজ দেখেছিলাম'। তখন আমার তিরিশ বছর বয়স, সেই সময় আমি দেওঘরের প্রিন্সিপ্যাল ছিলাম। তিরিশ বছরের তেজ আর ষাট বছরের তেজ কি এক থাকে। বয়সের সাথে সাথে প্রজ্ঞা শক্তি আর তেজের অভাব হয়ে যায়।

আর তার সাথে তিরস্কার; লোকেরা আপনাকে মানবে না, বাড়ির লোকেরা আপনাকে গ্রাহ্য করবে না। আপনারা জানবেন, কয়েক বছর আগেও সারা দেশ থেকে বাড়ির লোকেরা বিধবাদের কাশী, বৃন্দাবনে ছেড়ে দিয়ে আসত। হরিদ্বারেও আগে ছেড়ে আসত, কিন্তু অন্যান্য জায়গার তুলনায় হরিদ্বারে এই ব্যাপারটা কম হয়। এই বিধবাদের দেখার কেউ নেই। এই দুরবস্থা দেখে কাশীতে আমাদের সেবাশ্রমের কাজ শুরু হয়েছিল। এই খবর শুনে স্বামীজী খুব খুশী হয়েছিলেন। বৃন্দাবনে বিধবাদের দেখলেই বোঝা যায় অত্যন্ত ভদ্র বাড়ির মহিলা, কিন্তু ভিক্ষা চেয়ে বেড়াচ্ছেন। বিধবাদের বাড়ি থেকে বার করে এখানে ছেড়ে দিয়ে গেছে, কেউ দেখার নেই। কাশীর নামে একটা নামকরা দোঁহা আছে, রাঁঢ় ষাঁড় সিঁড়ি সন্ন্যাসী ইনসে বাচে তো সেবই কাশী। পুরো কাশী বিধবাতে ভর্তি, আর যেখানেই যান ষাঁড় আর সিড়ি, তার সঙ্গে সাধুতে ভর্তি। নিজের ইচ্ছায় যদি যায়, সেটা সন্ন্যাসী। কিন্তু মা, ঠাকুরমা, দিদিমা, পিসিমাদের বয়স হয়ে গেছে, কাশীতে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসছে, বলে দিয়ে যায়, আমাদের সাথে আর যোগাযোগ রেখ না। শুধু বৃন্দাবনেই দশ হাজারের উপর বিধবা আছে। আমাদের রামকৃষ্ণ মিশন থেকে অনেক কিছু করা হয়, কিন্তু একা রামকৃষ্ণ মিশন কত করবে।

এটাই এখানে বলছেন, বৃদ্ধাবস্থায় প্রজ্ঞা শক্তির অভাব, তেজের অভাব, তিরস্কার আর নানান রকমের ব্যাধি এসে গ্রাস করবে –এই দোষগুলো দেখতে হয়, বিচার করতে হয়। সেইজন্য ঠাকুরের কাছে কাতর হয়ে প্রার্থনা করতে হয়, ঠাকুর আর না, আর না, কারণ এরপর আবার যদি জন্ম নিতে হয় ঘুরে ঘুরে এগুলোই এসে আমাকে ভোগ করতে হবে –সেই জন্ম নেওয়া মানেই দশ মাস জেলের অন্ধকূপে বন্দী হয়ে থাকতে হবে, ওই নোংরা যোনিদ্বার দিয়ে বেরোতে হবে, সেই বৃদ্ধ হয়ে এই দুর্গতি ভোগ করতে হবে আর তার সাথে মৃত্যুর যন্ত্রণা সহ্য করা। তার সাথে বিচার করতে হয় এই যে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখগুলো হয়, এই দুঃখগুলিকে সব সময় নিজেকে মনে করাতে থাকা এবং দেখতে থাকা।

বলছেন, এটা বিভিন্ন ভাবে হয়, দুঃখটাই দোষ বা দুঃখটাও দোষ, এই যে বিভিন্ন রকম দুঃখ এটাই দোষ। অর্থ হল, সব সময় বিচার করা, জীবনে দুঃখ ছাড়া কিছু নেই। আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, *পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নং*। প্রকৃতি সব সময় চাইছে আমরা তার গোলাম হয়ে থাকি, কে না চায় তুমি আমার গোলাম হয়ে থাকো। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ডে ছেলে চলে গেছে। সেখানে বিয়ে করে সন্তান হওয়ার পর হঠাৎ করে বাবা-মার কথা মনে পড়ে, মা তুমি বাবাকে নিয়ে কিছু দিনের জন্য এসো, আমি যাতায়াতের সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কেন এই ব্যবস্থা? আসলে বাচ্চাকে সামলাতে হবে। মা-বাবা কি করবে, নাতির মুখ দেখতে চাইছে, ভালবাসে, সোহাগ করতে ইচ্ছে করছে, চলে যায়, বেশ কিছু দিন থাকে। তারপর যখন দেখে খরচ বেশি হয়ে যাচ্ছে, তখন বাবা-মাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়। প্রকৃতি ঠিক তাই করে, সবাইকে গোলাম করে রাখতে চায়। প্রকৃতি আমাদের বিচার করতে দেবে না, কারণ বিচার করে করে আমরা সত্যটাকে যদি জেনে যাই, তখন বলব, আর না, আর না। সেইজন্য বিচার কর, বাপু বিচার কর। ঠাকুর বলছেন, নারী দেহে কি আছে বা পুরুষ দেহে কি আছে? কিসের এত আকর্ষণ? বারবার এগুলোকে নিয়ে বিচার করা, আলোচনা করা, কারণ এটাই আমাদের জ্ঞানের দিকে নিয়ে যায়, সেইজন্য এটাকে বলে জ্ঞান।

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু।।৯।।

(বিষয়ে অনাসক্তি, স্ত্রী, পুত্র ও গৃহাদিতে মমত্বাভাব, শুভাশুভপ্রাপ্তিতে সদা চিত্তের সাম্যভাব,)

এখনও বলে যাচ্ছেন, কি গুণে মানুষ ঈশ্বরের দিকে এগোয়। ঈশ্বরের পথে কোন সহজীকরণ হয় না, এটাই বাস্তব। *অসক্তিঃ*, আচার্য বলছেন, *সক্তিঃ সঙ্গনিমিত্তেষু বিষয়েষু প্রীতিমাত্রং তদভাবঃ অসক্তিঃ, অসক্তি* মানে আসক্তি, যে জিনিসের সাথে আমরা থাকছি, সেই জিনিসটার প্রতি আমাদের একটা প্রীতি জন্মে যায়। যে বাড়িতে থাকছি, সেই বাড়ির প্রতি একটা আসক্তি হয়ে যায়। স্বামীজীর পৈতৃকবাটিতে বহু দিন থেকে প্রচুর বাইরের লোকেরা দখল করে বসবাস করত। পরে বেলুড় মঠ ঠিক করল স্বামীজীর পৈতৃকবাটি গ্রহণ করবেন, সরকারও অনেক ভাবে সাহায্য করতে থাকল। যারা ওখানে ছোট্ট একটা ঘরে চার পাঁচজন মিলে থাকত, তাদের তিন কামরা, চার কামরার ফ্ল্যাট, তার সাথে মোটা অঙ্কের টাকা দেওয়া হল, তাতেও তারা সন্ন্যাসীদের, রামকৃষ্ণ মিশনকে অভিশাপ আর গালাগাল দিতে দিতে দখল ছেড়েছে। ওই ছোট্ট ঘরটাতেই তাদের আসক্তি হয়ে গেছে। এখন যদি বলা হয়, চলে আসুন আপনাদের ওই ছোট্ট ঘরটাই ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে, এখন আর রাজী হবে না। এটাই মানুষের স্বভাব, যেখানে থাকে, যেটার সঙ্গে থাকে, সেটার উপর আসক্তি হয়ে যায়। যত অসুবিধাই থাকুক, ওটাকে ছাড়তে চাইবে না। অক্টোপাস যেমন নিজের হাতগুলো বাড়িয়ে জড়িয়ে নেয়, আমাদের মনও চারিদিক থেকে ছড়িয়ে বিষয়কে জড়িয়ে নেয়। আপনার খুব কাছের বন্ধু একটা দুষ্ট বদমাইশ লোক, তাকে আপনি প্রেম করেন, আপনি তাকে ছাড়তে পারবেন না। কারণ আপনি তো তাকে ভালবাসেন না, আপনার ভালবাসাটা আপনার থেকে বেরিয়ে অক্টোপাসের মত তাকে ঘিরে

নিয়েছে, আর যখন ওকে চাটছেন, মানে ভালবাসছেন, তখন নিজেকেই চাটছেন। প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজেকেই ভালবাসে কিনা। মা যে ছেলেকে ভালবাসছে, আসলে মায়ের ভালবাসাটা ছেলেকে ঘিরে রেখেছে, আর নিজেকেই চাটে। এখানে objectivity বলে কিছু হয় না, সবটাই subjectivity।

অনভিষ্বঙ্গঃ, আমার বাইরে কোন জিনিস বা কোন ব্যক্তি, তার সুখে আমার সুখ, তার দুঃখে আমার দুঃখ। কিসে *অনভিষ্বঙ্গ* হয়? বলছেন, *পুত্রদারগৃহাদিষু*, পুত্র, স্ত্রী, বাড়ি –যেমন আপনার স্ত্রী; কে সে? আমার স্ত্রী। কিসের স্ত্রী, অন্য বাড়ির মেয়ে এসে আপনার কাছে জুটেছে। কিন্তু আমাদের কি হয়, আমার ভালবাসা গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে, তার ব্যক্তিত্বের উপর আমার ভাব গিয়ে মধুর মত এমন ছড়িয়ে যায়, নিজের ভালবাসা কিনা, তারপর চেটে চেটে সেই মধু খাচ্ছে। বাস্তবিক খাচ্ছে না। আসলে তখন কি হয়, তার চোখে জল দেখে আমার চোখেও জল চলে আসছে, তার মুখের হাসি মানে আমার হাসি। ছেলের সাথে মা এমন জড়িয়ে আছে যে, তার শরীরে কষ্ট মায়ের শরীরেও কষ্ট অনুভব হয়, ছেলের চোখে হাসি, মায়ের মুখেও হাসি।

ভগবান বুদ্ধ নিজের স্ত্রী যশোধারা আর পুত্র রাহুলকে ছেড়ে চলে গেলেন; এটাকে প্রচুর হাইলাইট করা হয়। অনেকেই এই রকম করেন। কিছু দিন আগে দেখলাম খুব বড় জৈন বাড়ির একজন সেও এই রকম সব ছেড়ে চলে গেছে। স্বামী জৈন মুনি হয়ে গেছেন, স্ত্রী সাধ্বী হয়ে গেছেন, ছেলেটা রয়ে গেছে। এই রকম যে কেউ করে না, তা না। তবে ভগবান বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব হওয়াটা অনেক উঁচু ব্যাপার কিনা, তাই ওই রকম ভাবে হাইলাইট করা হয়। *অভিষ্বঙ্গ* হল, আমার বাইরে যে আরেকজন আছে, তার সুখে দুখে আমি নিজেকে এক মনে করছি। একটা হল ওকে নিয়ে আমি সুখ-দুঃখ ভোগ করছি, আরেকটা হল তার মনের অবস্থার সাথে আমার মনের অবস্থা জুড়ে গেছে।

অভিষ্বঙ্গ সবার মধ্যে থাকতে বাধ্য, *অভিষ্বঙ্গ* যদি না থাকে তাহলে এই জগতের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যাবে। মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের খেলা হয়েছে, খেলার পর হারা জেতা নিয়ে দুই দলের সমর্থকের মধ্যে কত মারামারি কাটাকাটি, এটাই *অভিষ্বঙ্গঃ।* মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলে কটা প্লেয়ার খেলছে, একটা বলকে নিয়ে গোলের মধ্যে ঢোকাচ্ছে, আবার পরের বছর দুই দলের প্লেয়াররা দল পাল্টে অন্য দলে নাম লেখাচ্ছে। যে খেলছে তার প্রতি একাত্মবোধ নেই, একটা ক্লাব, তার একটা নাম, সেই নামের সাথে নিজেকে একাত্ম বোধ করে এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করা, এর থেকে মুর্খতা, এর থেকে হাস্যকর আর কি হতে পারে। আমি একজনকে ভালোবাসি, তার ভালো কিছু হলে আমিও আনন্দ পাচ্ছি, তার খারাপ কিছু হল আমারও মন খারাপ হয়ে গেল, এটাই হচ্ছে *অভিষ্বঙ্গঃ*।

সাধনার প্রথম অবস্থায় এই *অভিষ্বঙ্গকে* আটকাতে হয়, নিজের শরীর মনের বাইরে যা কিছু আছে তার থেকে সংযোগটা কেটে দিতে হবে। আমার কর্তব্য যেটা সেটা অবশ্যই করতে হবে, যেহেতু আমি সংসারে আছি, সংসারে থাকতে গেলে কিছু কর্তব্য কর্ম আমাকে করতেই হবে। আনন্দও করব কিন্তু ভেতরে যেন কোন দাগ না কাটে। বাইরের সংযোগটা কাটার পর নিজের দেহ মন ও ইন্দ্রিয় দিয়ে যে আসক্তি হয় সেটাকে কাটতে হবে। *অনভিষ্বঙ্গ* কিসের থেকে বলছেন? *পুত্রদারগৃহাদিষু*, পুত্র মানে সন্তানাদি থেকে, নিজের সন্তানের যখন ভালো কিছু হয় তখন কি আনন্দ, এক গাল হাসি নিয়ে সবাইকে সন্তানের সুখ্যাতি বলে বেড়াবে। *দার*, মানে স্ত্রী, মানুষ সত্তর বয়সেও নিজের স্ত্রীকে খুশি করতে উঠে পড়ে লেগে থাকে। *গৃহাদিষু*, বাড়ি, গাড়িতেও প্রচণ্ড অভিষ্বঙ্গ লেগে থাকে, গাড়িটা খারাপ হয়ে গেল, মন খারাপ করে বাড়িতে বসে আছে। গাড়ি খারাপ হলে মন খারাপ হবেই কিন্তু তার জন্য ভেঙ্গে পড়াটা কোন কাজের কথা নয়। আমার যত কিছু শান্তি, আনন্দ সব আমার স্ত্রী, পুত্র, গাড়ি, বাড়িকে নিয়ে, এই মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসার কথা বলা হচ্ছে।

তারপরে বলছেন, *নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বম্,* চিত্ত মানে মন, *সমচিত্তত্বম্* মানে মনের সাম্য ভাব, *নিত্যঞ্চ,* সর্বদা। সব সময় মনের সাম্য ভাবকে বজায় রাখতে বলা হচ্ছে। *ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু,* সন্ধি ভেঙে হয় *ইষ্ট অনিষ্টঃ উপপত্তিষু*। *ইষ্ট* মানে আমার মনের মত, *অনিষ্টঃ* মানে যেটা আমার মনের মত নয়। বলছেন, ইষ্ট প্রাপ্তিই হোক আর অনিষ্ট প্রাপ্তিই হোক, সব অবস্থাতেই *সমচিত্তত্বম্,* মনের সাম্য ভাব বজায় থাকবে। ক্ষণিকের জন্য মনটা চঞ্চল হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মন নিজের সাম্য অবস্থায় ফিরে আসবে। বলছেন, প্রিয় জিনিসকে পেলে বিরাট খুশী, অপ্রিয় জিনিস পেলে ভেঙে পড়া, দুটোর কোনটাই যেন না হয়।

বৌদ্ধধর্মে এটাকে বলছেন awareness, যে কাজই করি না কেন, কাজ করার সময় সব সময় সচেতনশীলতাকে জাগিয়ে রাখতে হয়। আমরা যখন খাওয়া দাওয়া করি তখন কখন খাওয়া শুরু হল আর কখন খাওয়া শেষ হল খেয়ালই থাকে না, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া করাটাও একটা ধ্যান। প্রত্যেকটা গ্রাস আমি মুখে দিচ্ছি, চর্বন করছি, গলাধঃকরণ করছি, সব সময় আমি সচেতন। শুধু খাওয়াতেই নয়, হাঁটা চলা, কথা বলা, দেখা সব কিছুতে আমি সচেতন যে আমি হাঁটছি, আমি কথা বলছি। শিক্ষক ক্লাশে পড়াচ্ছেন, কোন ছেলে হাত নাড়ছে, পা নাড়ছে, কথা বলছে কোনটাই শিক্ষকের নজর এড়িয়ে যাবে না, ঠিক সেই রকম চব্বিশ ঘন্টা নিজের ব্যাপারেও সজাগ থাকতে বলা হচ্ছে, আমি এই জিনিসটা করছি, awareness is the alertness।

আমি এই কাজটা করছি, এই যে awareness, this is alertness, এই ধরণের মানুষ কাজ করার সময় কোন ভুল করে না। এমনকি যখন সে কোন ভুল কাজ করে ফেলে তখনও কিন্তু সে সজাগ থাকে যে আমি ভুল কাজ করে ফেলছি। মিলিন্দা নামে এক রাজা ছিলেন, নাগসেন নামে এক সাধুর সঙ্গে তাঁর প্রশ্নোত্তর হয়েছিল। প্রশ্নগুলোর মধ্যে awareness জিনিসটাকে highlight করার জন্য একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল –একজন লোক জেনেশুনে পাপ করছে, আরেকজন না জেনে পাপ করছে, এখানে কার বেশি দোষ হবে? তখন নাগসেন উত্তর দিচ্ছেন –যে না জেনে পাপ করে সব সময় তার দোষটাই বেশি হয়। মিলিন্দা উত্তর শুনে চমকে উঠেছে, এটা কি করে হবে? মিলিন্দার সংশয় দূর করবার জন্য নাগসেন বলছেন –একটা তপ্ত লোহা সামনে রাখা আছে, এখন একজন না জেনে সেই তপ্ত লোহাটাকে ধরল আরেকজন জেনে বুঝে গরম লোহাটাকে ধরল, এখানে কার হাত বেশি পুড়বে? রাজা মিলিন্দা বলছে, যে না জেনে ধরবে, কারণ সে পুরোটাই ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরবে। আর যে জানে এই লোহাটা গরম সে সাবধান হয়েই ধরবে। তারও হাত পুড়বে, কিন্তু যেহেতু সে সজাগ ছিল তাই সাবধান হয়ে ধরবে। তখন নাগসেন বলছেন, পাপের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। যে সজাগ সে জানে যে আমি যে কাজটা করতে যাচ্ছি সেটা ভুল কাজ করছি তখন তার দোষটা তাকে বেশি ধরে না। এই awarenessকে বলে *সমচিত্তত্বম্,* equanity of mind, যখন এই *সমচিত্তত্বম্* আসে তখন সে বেশি দুঃখও করে না আবার আনন্দে বেশি উৎফুল্লও হয় না।

একটি গরীব লোকের নামে এক কোটি টাকার লটারি উঠেছে, লোকটাকে যদি খবর দেওয়া হয় তাহলে লোকটা হয় পাগল হয়ে যাবে, না হয়তো খবর পেয়েই হার্ট এ্যটাকে মরে যাবে। তাই পোস্টম্যান লটারির চিঠি নিয়ে এসে বলছে –আচ্ছা তোমার নামে যদি লটারি ওঠে তাহলে তোমার কি রকম লাগবে? আমি খুব খুশি হব। আচ্ছা যদি লটারিতে তুমি দশ হাজার টাকা পাও তাহলে তুমি কি করবে? আমার একটা মোষ কেনার আছে, আমি একটা মোষ কিনব। যদি তুমি এক লাখ টাকা পাও? তাহলে একটা জমি কিনে চাষবাশ করব। আর যদি পাঁচ লাখ টাকা পাও? তাহলে একটা বাড়ি কিনব। এই ভাবে পোস্টম্যান আস্তে আস্তে আসল খবরটার দিকে নিয়ে যেতে যেতে পঞ্চাশ লাখ টাকা পর্যন্ত নিয়ে গেছে। শেষে বলছে তুমি যদি এক কোটি টাকা পাও? তাহলে পঞ্চাশ লাখ তোমাকে দিয়ে দেব। এটা শুনেই পোস্টম্যানই হার্টফেল হয়ে মরে গেল। কেন এই রকম হল?

সমচিত্তত্বমের অভাব। যে ঐ গরীবলোকটাকে সামলাতে যাচ্ছে যাতে মনের সাম্যভাব না হারিয়ে ফেলে, শেষে সে নিজেই ডুবে গেল।

ভালো জিনিসই প্রাপ্ত হোক আর খারাপ জিনিসই প্রাপ্ত হয়ে থাকুক, সবেতেই তার মন একই থাকবে। মনের এক রকম স্থিতি থাকা মানে, *সমচিত্তত্বম্*। খুব জপ-ধ্যান, অনেক দিন তপস্যা না করা থাকলে এই গুণগুলো অর্জন করা যাবে না। এমনিতেও জপ ধ্যান করলে ছোট খাটো দৈনন্দিন সমস্যা গুলো চলে যায়। আর দশ হাজার জপ যদি দিনে না করতে পারেন তাহলে কিছুতেই মনের সাম্যভাবে আসতে পারবে না। শ্রীমাও বলছেন, সবাই এসে বলে মন স্থির হয় না, দিনে দশ হাজার জপ করে দেখুক না মন শান্ত হয় কিনা। পাঁচ হাজার, দশ হাজার দিনে জপ করলে নিজেই বুঝতে পারবে *সমচিত্তত্বম্* কাকে বলে, নিজে থেকেই মনের মধ্যে সাম্যভাব এসে যাবে। এগুলোকে বলে বোঝান যায় না। এরপর ভগবান আরও কিছু গুণের কথা বলছেন, আসলে বলতে চাইছেন শুধু এই গুণগুলো দিয়েই হবে না, সাথে সাথে আরও অনেক কিছু গুণ থাকতে হবে। কি সেই গুণগুলি –

মযি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যাভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি।।১০।।

(ভগবানই একমাত্র গতি –এই নিশ্চিত বুদ্ধি দ্বারা আমাতে অচলা ভক্তি, নির্জন বাস, প্রাকৃত জনের সংসর্গ ত্যাগ,)

তুমি এখন ক্ষেত্রজ্ঞকে জানতে চলেছ, মানে ভগবানকে জানতে চলেছ, শুধু ভগবানকেই নয় সেই ভগবান যিনি সবারই হৃদয়ে বিরাজমান এই বোধটাকে তুমি অনুভব করতে চলেছ, সেইজন্য আরও কিছু বিশেষত্বকে তোমায় অর্জন করতে হবে। কি সেই বিশেষত্ব? *ময়ি চানন্যযোগেন*, অনন্য যোগ, অন্য কোন দিকে আর মন যাবে না, এই ভাবে সাধনা করতে হবে। আচার্য বলছেন, *অপৃথকসমাধিনা ন অন্যো ভগবতো বাসুদেবাৎ*, বাসুদেব ছাড়া আর কেউ নেই। এই কথাকে নিয়েই ইদানিং কালে কিছু কিছু সম্প্রদায়, কিছু কিছু বক্তা বলতে থাকেন, কৃষ্ণই একমাত্র ভগবান। এই ভাষা তো অন্য ধর্মের লোকেদের ভাষা, হিন্দুদের এটা ভাষাই না। এখানে বক্তব্য হল আমার যিনি ইষ্ট, তাঁর বাইরে আমি কিছু দেখি না। আমার ইষ্ট যেই হন না কেন, শিব হন, শ্রীরাম হন, শ্রীকৃষ্ণ হন, শ্রীরামকৃষ্ণ হন, তাতে কিছু আসে যায় না। অনন্য চিত্তে আমি আমার ইষ্টকেই চাইছি।

আমার এটাও দরকার ওটাও দরকার, জগৎটাকেও হাত বাড়িয়ে খাবলাব আবার ভগবানকেও মাঝে মাঝে খাবলাব, এভাবে হবে না। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন –আগে ঈশ্বর লাভ কর, তারপর সংসারে থাকো, হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙলে কাঁঠালের আঠাতে হাত আটকে যাবে না। অনন্য যোগ হচ্ছে একমুখি ভক্তি যোগ। আর বলছেন *অব্যভিচারিণী ভক্তি*, ব্যভিচারিণী মানে যখন মন দুই বা দুইয়ের বেশি দিকে যায়, ব্যভিচারিণী ভক্তির আচরণের মধ্যে বিভাজন আছে, অর্থাৎ দুই নৌকাতে পা রাখা। এখানে বলছেন তোমার ভক্তি হতে হবে অব্যভিচারিণী, *ন অন্যো ভগবতো বাসুদেবাৎ পরঃ অস্তি*, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আমার আর কেউ নেই, শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আমার আর কোন কিছুতে মন যায় না। এই জিনিসগুলিকে নিয়েই ওনারা আক্ষরিক ভাবে নিয়ে ঝগড়া, তর্ক করতে গিয়ে উল্টোপাল্টা কথা বলে বেড়ান। এখানে অর্থ, ইষ্ট বাদে অন্য কোন দিকে আমার মন যায় না। আর সেইজন্য তিনি আমার পরম গতি, আগেও অনেকবার আমরা এর উপর আলোচনা করেছি। যার এই রকম অবিচল বুদ্ধি, তার বুদ্ধি নিজের ইষ্ট থেকে কখন নড়ে না।

এখানে দুটো জিনিস বললেন, *অনন্যযোগেন* আর *অব্যভিচারিণী*। আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বলছেন –প্রথমটা হল আমার ভক্তি একমাত্র বাসুদেবের প্রতি, দ্বিতীয় হল, ভগবান বাসুদেব ছাড়া আর কিছু নেই –*ন অন্য ভগবতো বাসুদেবাৎ পরঃ*, মানুষ, পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গ যা কিছু আছে

বাসুদেব ছাড়া আর কিছু নেই। *স এব নো গতি*, তিনিই আমার গতি, মৃত্যুর পর তিনিই আমার আশ্রয়, তিনিই আমার আলয়, তিনিই আমার পরমপদ। *ইতি এবং নিশ্চিতাঃ অব্যভিচারিণী*, এই নিশ্চিত বুদ্ধি যে শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু নেই, আমার শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কোন আশ্রয় নেই আর শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আমার কোন গতি নেই, এই নিশ্চিত বুদ্ধিকেই বলা হচ্ছে অব্যভিচারিণী।

বিবিক্তদেশসেবিত্বম্, বিবিক্ত দেশ মানে একান্ত নির্জন ও পরিষ্কার পবিত্র জায়গা। জপধ্যান, সাধনা একান্তে করতে হয়। Community meditation হয় না, লোকজন নিয়ে ধ্যানজপ হয় না। বেলুড় মঠের মন্দির হল বিবিক্তদেশ, এখানে যাঁরা আসেন তাঁরা জপধ্যানের জন্যই আসেন। আচার্য শঙ্কর যে সময় গীতার ভাষ্য রচনা করেছেন, সেই সময় তীর্থাদিতে এত ভিড় হত না। আমরাও যখন কম বয়সে তীর্থে গিয়েছি তখনও এত ভিড় দেখতাম না। এখন তো তীর্থস্থান সব ট্যুরিস্টদের দখলে চলে গেছে, শুধু ট্যুরিস্ট আর ট্যুরিস্ট। বলছেন, একান্ত ও পবিত্র জায়গায় ঈশ্বরের চিন্তন করা, এই একান্ত বাস ও পবিত্রতার সেবন করা। ঠাকুরও বার বার নির্জনবাসের কথা বলছেন, নির্জন আর তার সঙ্গে পবিত্র হতে হবে। ষষ্ঠ অধ্যায়েও ভগবান নির্জন বাসের কথা বলেছিলেন, *যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ*, যিনি যোগী হতে চাইছেন তাঁকে নির্জন স্থানে একাকী যোগ সাধনা করতে হবে। সংসারের কোলাহলে, যেখানে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, বন্ধু বান্ধবের হৈচৈ, এই হৈচৈএর মাঝখানে আর যাই হোক আধ্যাত্মিক সাধনা হয় না।

এখানে সাধারণ মানুষের কথা বলা হচ্ছে না, সাধারণ মানুষ দু চার দিনের জন্য কর্মস্থল থেকে ছুটি পেলে সংসার ছেড়ে এদিক সেদিক বেরিয়ে পড়ে, এই ধরণের নির্জন বাসের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। কিন্তু ভক্তরাও এই নির্জনবাসকে সেই ভাবে কোন গুরুত্ব দিতে চান না। বেশির ভাগ ভক্ত আশ্রমে গিয়ে ভালো ঘরের খোঁজ করবেন, খাবারদাবার কেমন দেখবেন, আশ্রমের আশে পাশে কি কি বেড়ানোর জায়গা আছে, এই সব খোঁজ করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ঠাকুরের নামে বেরিয়ে পড়ে তিনি যেখানে যেভাবেই রাখুন এই মনোভাব নিয়ে শুধু একটু ঈশ্বর চিন্তা করবার জন্য নির্জনবাস করতে ভক্তরাই চান না। যতক্ষণ নির্জনবাস না করা হচ্ছে ততক্ষণ তোমার দ্বারা আধ্যাত্মিক সাধনা হবে না। এখানে আচার্য বলছেন, *বিবিক্তেষু হি দেশেষু চিত্তং প্রসীদতি যতঃ*, নির্জন ও পবিত্র দেশে মন প্রসন্ন হয়। মন প্রসন্ন না হলে সাধন ভজন হয় না, অবসন্ন মন দিয়ে আর যাই হোক জপধ্যান হবে না। প্রায়ই অনেকে এসে বলেন, আমার দ্বারা তো কিছু হচ্ছে না। অনেক সময় মন হয় সত্যি কথাটা বলে দিই – হবেও না। সন্ন্যাসী ভাইরা আমাকে সাবধান করে দিয়ে বোঝান, সব সময় সবাইকে উপদেশ দিতে যাবেন না। উপদেশটা হল, চিত্ত যদি প্রসন্ন না থাকে ধর্ম জীবন তার দ্বারা হবে না। একান্তে নির্জন ও পবিত্র স্থানে গেলে মন প্রসন্ন হয়।

আর বলছেন, *অরতির্জনসংসদি*, রতি মানে মিলন, যেখানে জনসংসদ রয়েছে, ঘন জনবসতি থেকে *অরতি*। স্বামীজীও বারবার বলছেন আত্মিক শক্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ কখনই অনেক লোকের ভীড়ের মধ্যে হতে পারে না। জনসংসদকে আচার্য কয়েকটি বিশেষণ দিয়ে এভাবে পরিভাষিত করছেন, *জনানাং প্রাকৃতানাং সংস্কারশূন্যনাম্ অবিনীতানাং সংসৎ সমবায়ো জনসংসৎ*, প্রথম হল *প্রাকৃতানাং*, যাদের ভিতর ধর্মের কোন জ্ঞান নেই; দ্বিতীয় *সংস্কারশূন্যনাম্*, যাদের মধ্যে ধর্মীয় কোন সংস্কার নেই আর *অবিনীতানাং*, ধর্মের প্রতি যাদের শ্রদ্ধা নেই, বিনয় নেই। এই ধরণের লোকেদের সঙ্গ করা তো দূরের এরা যেখানে থাকে সেখানেও থাকতে নেই। এই ধরণের লোকেদের মাঝখানে থাকলে ধর্মভাব নষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য।

এরপর আচার্য এর উল্টোটা বলছেন, *তস্যা জ্ঞানোপকারকত্বাৎ*, এর বিপরীত যাঁরা তাঁরা ধর্ম পথে সাহায্য করেন। এমন লোকের মাঝখানে আছেন, যাঁদের মধ্যে ধর্মের সংস্কার অনেক ভাল, যাঁরা আপনার মনের মত, ভাবের মিল আছে; এনারা ধর্ম জীবনে এগোতে সাহায্য করেন। আমাকে

অনেকে বলে, রামকৃষ্ণ মিশনেরই সন্ন্যাসী কেন হতে হবে? সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য হিমালয়ে চলে যান। এভাবে হবে না, মঠে সন্ন্যাসীদের সেই সমুদয় রয়েছে, যাঁরা সবাই ওই একই ভাবের। একই ভাব থাকার জন্য আধ্যাত্মিক অগ্রগতিটা অনেক সুচারু ভাবে হবে। আচার্যও একই কথা বলছেন। ঠাকুর যেটা সাধুসঙ্গের কথা বলছেন, এখানে সাধুসঙ্গ থেকে আরেক ধাপ এগিয়ে, কারণ একই ভাবের মানুষের সাথে সব সময় ওঠাবসা হয়।

অধ্যাত্ম জ্ঞান নিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা।।১১।।

(আত্ম ও অনাত্ম বিবেক জ্ঞানে নিষ্ঠা ও তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন –এগুলোই আত্মজ্ঞানের সাধন বলে কথিত হয়। এর বিপরীত মানিত্ব ও দাম্ভিকতাদি অজ্ঞান বলে জ্ঞেয় এবং সংসার প্রবৃত্তির কারণ বলে পরিহার্য।)

জ্ঞান যদি না থাকে তাহলে ক্ষেত্রজ্ঞকে, আত্মাকে জানা যাবে না। সাত থেকে দশ নম্বর শ্লোকে যে এতগুলো গুণের বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হল, এগুলোই জ্ঞান, বাকি সব অজ্ঞান। *অধ্যাত্ম জ্ঞান নিত্যত্বং*, নিত্য শাস্ত্র অধ্যয়ন, শাস্ত্রের তত্ত্বার্থ নিয়মিত আলোচনা করতে হয়। যাঁরা এই গীতার আলোচনা শুনছেন, তাঁরা পরে একটা সময় ঠিক করে নিয়ে পরস্পরের মধ্যে, বন্ধুদের সাথে, পরিচিতদের সাথে এগুলোকে নিয়ে আলোচনা করলে শাস্ত্রের অর্থ অনেক পরিষ্কার হয়ে যাবে। আলোচনা না করলে শাস্ত্রের অর্থ পরিষ্কার হয় না। শুধু শুনে যাচ্ছি, শুধু পড়ে যাচ্ছি, এতে শাস্ত্রার্থ পরিষ্কার হয় না। অনেকে নোটস্ নিচ্ছেন, এটাও অনেক ভাল, নোটস্ নেওয়াটাও এক ধরণের আলোচনা। কিন্তু সমভাবাপন্নরা, সমান বুদ্ধি সম্পন্নরা যদি পরস্পর এগুলোকে নিয়ে আলোচনা করেন, শাস্ত্রের কথা আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। ঠাকুর বলছেন মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর ওঠে। বাচ্চারা গোয়েন্দার কমিকস পড়ে পড়ে এমন হয়ে যায় যে, সব জায়গাতে গোয়েন্দাগিরি করতে থাকে, যেখানে গোয়েন্দাগিরির কিছু নেই সেখানেও গোয়েন্দাগিরি করবে, কারণ এটাই, মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর ওঠে। ঠিক তেমনি, যদি শাস্ত্রের মধ্যে থাকা যায়, তাহলে শাস্ত্রের কথাই মুখ দিয়ে বেরোবে। তাই বলছেন, *তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্*, তত্ত্বজ্ঞান নিয়ে সব সময় আলোচনা করা।

এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তম্, অমানিত্বম্ থেকে শুরু করে এতক্ষণ যা যা গুণ ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করলেন, বলছেন, এটাই জ্ঞান। তখন প্রশ্ন করছেন, এগুলো কি করে জ্ঞান হবে, এগুলো তো যম নিয়মাদি, এগুলো মূল্যবোধ, গুণের কথা? উত্তরে বলছেন –না, এটা তোমাকে জ্ঞানের দিকে নিয়ে যায় বলে এটাও জ্ঞান। জ্ঞান আর জ্ঞানী দুটো খুব মজার শব্দ। যাঁরা জ্ঞানের পথ নিয়েছেন, তাঁরা সবাই জ্ঞানী; আগেও এই জিনিসটাকে আমরা গীতার আলোচনায় দেখেছি। জ্ঞানী শব্দটার একটা বিরাট ব্যপ্তি আছে। যাঁরা গীতার এই আলোচনা শুনছেন, আপনারা সবাই জ্ঞানী। ভক্তি পথে যিনি পা রেখেছেন তিনিই ভক্ত, আপনারা সবাই ভক্ত ও জ্ঞানী। এগুলো যে শুধু সৎগুণ তা না, যেমন যাঁরা ভদ্রলোক হন, ভদ্রলোকেরও সৎগুণ হয়, কিন্তু যাঁরা ধর্মের পথে পা রেখেছেন এই সৎ গুণগুলো তাঁকে জ্ঞানের দিকে নিয়ে যায়। একজন ভদ্রলোক আর একজন ধর্মপ্রাণ পুরুষের মধ্যে এটাই তফাৎ। যিনি ভদ্রলোক তাঁর কাছে এগুলো সৎগুণ, কিন্তু একজন ধর্মপ্রাণ পুরুষের জন্য এই সৎ গুণগুলি হল সিঁড়ি, যেটা দিয়ে তিনি উপরে উঠে আসবেন। সেইজন্য একজন ধর্ম পথের মানুষ একজন ভদ্রলোকের থেকে শ্রেষ্ঠ হন। কারণ একজন ভদ্রলোকের কাছে ভদ্রলোক হওয়াটাই শেষ কথা। আর ধর্মপ্রাণ পুরুষের তত্ত্ব জ্ঞানের আহরণ সেখান থেকে শুরু হয়। আর যাঁরা আধ্যাত্মিক পথে আসেন, ধর্ম একজনকে যতদূর নিয়ে যায়, সেখান থেকে তাঁদের জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে যাত্রা শুরু হয়। সন্ন্যাসীদের আগে একজন ভদ্রলোক হতে হয়। সেখান থেকে হতে হয় ধর্মপ্রাণ, সেখান থেকে শুরু হয় আধ্যাত্মিক পথে আসার প্রস্তুতি।

এখানে প্রশ্নটা এসেছিল *ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি,* মানুষের হৃদয় মধ্যে যিনি অন্তর্যামী তিনিই নারায়ণ, তিনিই পরমব্রহ্ম। যিনিই পরমব্রহ্ম, তিনিই নারায়ণ, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই আত্মা, তিনিই বিভু, তিনিই প্রভু, তিনিই সব। এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। ক্ষেত্রের কথা বলে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞকে জানতে হলে তোমাকে কিছু গুণের অধিকারী হতে হবে। সেই গুণগুলো কি বলে দেওয়া হল। এখন একজন সাধারণ ভক্ত এসে বলছেন –আপনি যা যা করতে বলেছেন আমি সব শুনতে রাজী আছি, কিন্তু যাঁকে জানব, সেই ক্ষেত্রজ্ঞের সম্বন্ধে একটু কিছু বলুন, তাঁর কি কি গুণ, কি কি বৈশিষ্ট্য। উত্তরে তাকে বলা হল –যিনি একমাত্র সত্তা তিনি সগুণ আবার তিনিই নির্গুণ, আবার এগুলোর পারেও তিনি। এইটুকু কথাতে অনেকেরই ক্ষেত্রজ্ঞের ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা হবে না। তখন ভগবান সাধারণ মানুষদের বোঝাবার জন্য বলছেন –

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বাহমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে।।১২।।

(হে অর্জুন, যেটা জ্ঞাতব্য, যেটাকে জেনে অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ হয়, তার ব্যাপারে তোমাকে বলব। তিনি আদিহীন পরব্রহ্ম। তিনি সৎশব্দ ও সৎপ্রত্যয়ের অগোচর এবং অসৎশব্দ ও অসৎ প্রত্যয়েরও অগোচর। কারণ ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুই সৎ বা অসৎ শব্দ প্রত্যয়ের গোচর হয়; কিন্তু ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াতীত।)

ভগবান বলছেন, যে জিনিসটাকে তোমার জানা দরকার, সেই জিনিসটার সম্বন্ধে তোমাকে আমি ভাল করে বলছি, যেটা জেনে গেলে তুমি অমৃতত্ব পেয়ে যাবে। *অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে,* ব্রহ্ম অনাদি, *পরং,* ব্রহ্ম সৎও না অসৎও না। এটাকে নিয়ে পরে পরে যারা আপত্তি করে, তারা বলছে, বাঃ দু বাহু তুলে বলে দিলে তোমাকে ঈশ্বরের ব্যাপারে সব কথা বলে দেব। তারপরেই তুমি কি বলছ? ঈশ্বর সৎও না অসৎও না। এ তোমার কি ধরণের কথা?

সাত নম্বর থেকে শুরু করে এগারো নম্বর পর্যন্ত এই পাঁচটি শ্লোকে বলে দিলেন কোন কোন গুণ থাকলে মানুষ ক্ষেত্রজ্ঞকে জানতে পারে, ঈশ্বর লাভ করে। ভগবান প্রথমে বললেন, সমস্ত জীবের মধ্যে আমি সেই আত্মা। এগারো নম্বর শ্লোক পর্যন্ত তিনি অনেক কিছু বললেন, যার ব্যাখ্যা এতক্ষণ আমরা করলাম। এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞেয় বস্তুকে নিয়ে বলছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে খুব সুন্দর বলছেন, এককে জানার নাম জ্ঞান, জানার মধ্যে একমাত্র তিনি। এই কথা শাস্ত্রে বারংবার ঘুরে ঘুরে বলা হয়। অন্যান্য ধর্মেও তাই। জ্ঞেয় ভগবান, ভগবানই একমাত্র জানার মত। মুণ্ডকোপনিষদে শিষ্য প্রশ্ন করছেন, কোনটাকে জানলে সবই জানা হয়ে যায়। প্রশ্নের উত্তরেই শুরু হয় আত্মা আর ব্রহ্মকে নিয়ে আলোচনা। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের সবারই কিছু না কিছু ধারণা আছে। বিশেষ করে হিন্দুদের এই ব্যাপারে অনেক সুবিধা, হিন্দুদের শ্রীরাম আছেন, শ্রীকৃষ্ণ আছেন, শিব আছেন, বিষ্ণু আছেন। ভগবান শিব আর বিষ্ণু দুজনে মিলে সারা ভারতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অর্থাৎ এই দুজনের পূজাই ভারতে বেশি হয়। আর আছেন অবতারগণ, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ। রামায়ণ থেকে, মহাভারত থেকে, ভাগবত থেকে, কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ থেকে এনাদের ব্যাপারে আমরা জানি। কিন্তু এটা হয়ে গেল ভক্তি। তুলসীদাসের রামচরিতমানস পুরোপুরি ভক্তিশাস্ত্র। এই ব্যাপারটা ঠিক ঠিক ভক্তি পথ। অন্য দিকে গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায় বিচারের পথ। আমরা বলতে পারি, আমার বিচারের কি দরকার? আমি তো ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি ঠাকুর আছেন, ঠাকুর অবতার, ঠাকুর ভগবান।

এখানেই হয়ে যায় সমস্যা। যাদের আধখ্যাঁচড়া জ্ঞান, তাদের বিশ্বাসটা কোন বিশ্বাসই না। আগেকার দিনে রাস্থায় বড় বড় গাড্ডা থাকত, গাড়ি চালাতে গেলে সব সময় গাড়ি গাড্ডায় টালমাটাল খেতে খেতে এগিয়ে যেত। এরাও ধর্ম পথে চলতে গেলে শুধু গাড্ডায় পড়ে। মনে নানা রকমের প্রশ্ন ওঠে, যার উত্তর পাওয়া যায় না। সেখান থেকে আরেক ধাপ এগোতেই এরা পুরোপুরি

ইমোশানালিজমে নেমে যায়। আগেকার দিনে আমরা দেখতাম, বাড়ির দিদিমা, ঠাকুরমা, পিসিমারা সন্ধ্যেবেলা তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বালতেন। থালায় নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজো দিতেন। এখানেই এনাদের ধর্মের সব কিছু শেষ হয়ে যায়। আমরা বলতে পারি, ওনারা তো ভালই ছিলেন। ঠিকই, ভালই ছিলেন। কিন্তু আজকে আমরা কেউই গ্রামের একটা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ নই। জগতের মাঝখানে আমরা এখন বিচরণ করছি। গ্রামের ছেলে এখন সারা বিশ্বে যাচ্ছে। স্মার্ট ফোন, ইন্টারনেটের দৌলতে জগৎটা আজ হাতের মুঠোয় এসে যাওয়াতে সবাইকে বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্মের লোকেদের সামনে দাঁড়াতে হচ্ছে। অন্য ধর্মের, অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা পাঁচটা প্রশ্ন করবে, পাঁচ ভাবে আক্রমণ করবে। এই ইমোশানালিজম্ দিয়ে এদের সাথে কত দূর মোকাবিলা করবে? এই ইমোশানালিজম্ থেকে আরেক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার পর এরাই সব মৌলবাদী হয়ে যায়, আমার কথা আপনাকে মানতে হবে, তা না হলে ঝামেলা হয়ে যাবে।

আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট মহারাজের মুখে আমরা একটা সত্যিকারের ঘটনা শুনেছিলাম। অনেক আগে মহারাজ একবার কলকাতার বই মেলায় গেছেন। একটা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বইএর স্টলে ঢুকে দেখছেন এনারা কি ধরণের বই বিক্রী করেছেন। স্টলে একটা বই তুলে দেখছিলেন, বইটা ছিল একটা উপনিষদ, দেখছেন এই উপনিষদে এনাদের দৃষ্টিভঙ্গী কিভাবে রাখা হয়েছে। সেই সম্প্রদায়ের এক সাধুবাবা এসে মহারাজের হাত থেকে বইটা কেড়ে নিলেন। কেড়ে নিয়ে বলছেন, 'আপনি কি বুঝবেন এই বইয়ের! আপনার বোঝার দম আছে'? ঠিক এই ভাষায়। 'আপনি বলুন কি আছে বইতে, বলুন কি আছে'? আরে মহারাজ তো বইটা দেখার জন্যই হাতে নিয়েছেন, কি আছে বইতে দেখতে। ওটা ছিল ঈশাবাস্যোপনিষদ, পূজনীয় স্মরণানন্দজী মহারাজ পুরো উপনিষদটা গড়গড় করে তাঁকে মুখস্ত শুনিয়ে দিলেন। 'না না, আপনাকে এই বই কিনতে হবে না, আপনি এখান থেকে যান'। এটা কিসের ধর্ম! কতটা কূপমণ্ডুক হলে মানুষ এই রকম নির্লজ্জের মত ব্যবহার করতে পারে। এটাই ইমোশানালিজমের সমস্যা, কারণ ইমোশানালিজমই পরে ফ্যানাটিক হয়ে যায়। গীতা, উপনিষদ, কথামৃত কাউকে ইমোশানালিজমে ঢুকতেই দেবে না, এখানে হল পুরো বিচার। যদি তোমার বুদ্ধি থাকে, তবেই তুমি ঠিক ঠিক হিন্দু ধর্মের লোক হওয়ার যোগ্য।

আমি অনেক দিন কানপুর আশ্রমে ছিলামে। ওখানে কিছু অটো, কিছু বাস ছিল, যার নামই ছিল ডাগ্‌গামার গাড়ি। যেখানকার সওয়ারি পেয়ে যাবে সেদিকে বেরিয়ে যাবে, ওদের নির্দিষ্ট কোন রুট নেই। কিন্তু শহরের সব অটো, বাসের নির্দিষ্ট রুট ঠিক করা আছে। ধরুন বেলুড় মঠে দাঁড়িয়ে আছেন, একটা মিনিবাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে, বাসে লেখা আছে 'হাওড়া যাইবে', হঠাৎ সে উত্তরপাড়ার প্যাসেঞ্জার পেয়ে গেল, বাসটা এবার চলল উত্তরপাড়া, কিন্তু বাসের উপরে লেখা আছে হাওড়া। কানপুরে এই ধরণের প্রচুর গাড়ি চলত, যার নামই ছিল ডাগ্‌গামার গাড়ি। মাঝে মাঝে পুলিশ এদের ধাওয়া করত। সেখান থেকে কানপুরে আমরা বলতাম ডাগ্‌গামার ডাক্তার। ডাক্তাররা রোগী পেত না, যে রোগী পেয়ে যেত, বলে দিত, আমি এটারই স্পেশালিষ্ট। ভক্তরা সব এই রকমই, আজকে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা, কাল সাঁইবাবার পূজা, পরশু লোকনাথ বাবার পূজা, তারপরের দিন আর-একজনের পূজা। এটা কি ধর্ম? আবার বলে, কলি যুগে নাকি একজন গুরু ও একজন ভগবানকে দিয়ে চলে না, কয়েকজনকে রাখতে হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায় হল পুরোপুরি জ্ঞানমার্গ। এখানে কোন ইমোশানালিজম্ নেই। আমাদের গীতার ক্লাশগুলি যাঁরা শুনছেন, বা যদি রাজযোগ শুনে থাকেন, দেববাণী শুনে থাকেন, আপনারা দেখে থাকবেন সেখানে সব কিছুকে কি রকম যুক্তিনির্ভর প্রণালী দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গীতা এই কথা বলছেন বলে আপনাকে মানতে হবে না, গীতা শুধু আপনাকে একটা বর্ণনা করে দিচ্ছেন। লালকেল্লার উপর লেখা একটা বই পেলাম, যেহেতু এই বইতে লালকেল্লার কথা লেখা আছে সেইহেতু আমাকে বিশ্বাস করতে হবে না। আমি যদি লালকেল্লা যাই, সেই রকমই দেখব যে রকম

বইতে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে একটা জিনিস হল, যার জন্য এত লম্বা একটা ভূমিকা দিতে হল, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন বলে আমাকে মানতে হবে না। এটাই সত্য, আমাদের সমস্ত শাস্ত্রে এভাবেই বলা হয়েছে। কেউ যদি ধ্যান ধারণা করেন, মনের জগৎ কে ছাড়িয়ে যদি উপরে তিনি উঠে আসেন, তিনি নিজেই দেখতে পারবেন জিনিসটা এই। তাহলে এত ধর্ম এত রকমের কথা বলা হয় কেন? কারণ, মন যেন এক একটা রঙিন চশমা, সেই চশমা দিয়ে তাঁরা অনন্তকে দেখছেন বলে বিভিন্ন রকম দেখেন ও বলেন। চশমা খুলে যদি দেখা হয়, তখন জিনিসটা অন্য রকম দেখাবে।

তৎ প্রবক্ষ্যামি, আমি তোমাকে যেটা বলব, *যজ্ জ্ঞাত্বাহমৃতমশ্নুতে*, যেটা জানলে তুমি অমৃতত্ব লাভ করবে। আমাদের শাস্ত্রে কতবার অমৃতের কথা বলছেন, শুধু অমৃত আর অমৃতের কথা। দেবতা আর অসুররা মিলে সমুদ্র মন্থন করলেন অমৃত পাওয়ার জন্য। মন্দরাচল কত বড় পাহাড়, সেই পাহাড়কে নিয়ে রেখে দিলেন সমুদ্রে। যত রকমের বনস্পতি ছিল সব সমুদ্রে দেওয়া হল যাতে ভাল ভাবে মন্থন হয়। বাসুকি বিরাট সর্পকে দড়ি করা হল, পুরো পাহাড়কে বাঁধতে হবে। দইকে মন্থন করার সময় যেটা দিয়ে মন্থন করা হয়, সেটা অনেক সময় নেমে যায়, সেইজন্য মাঝে মাঝে তুলতে হয়। মন্দরাচল পাহাড় যাতে বসে না যায়, ভগবান নিজে কচ্ছপ হয়ে নীচে নেমে গেলেন, কচ্ছপের পিঠের উপর পাহাড়কে স্থাপন করা হল। একদিকে দেবতারা আরেক দিকে দৈত্যরা, মন্থন শুরু হল। প্রথমেই বেরিয়ে এলো এমন হলাহল, যা পুরো জগৎকে পুড়িয়ে ভষ্ম করে দিতে পারে। দেবতারা দৌড়ে শিবের কাছে পৌঁছে গেলেন, প্রভু এই হলাহল ধারণ করুন, জগৎকে রক্ষা করুন; তা নাহলে পুরো জগৎকে এই হলাহল পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। শিব হলেন যোগীশ্বর, তিনি ওই হলাহল পান করে কণ্ঠে ধারণ করে নিলেন। এই কাহিনী প্রথম বাল্মীকি রামায়ণ থেকেই আমরা পাই। পরে অন্যান্য জায়গাতেও এসেছে। এইসব কাহিনী হল রূপক।

আমাদের অনেকেই মেইল করে বলেন, 'স্বামীজী আমি গুরু খুঁজছি, ভাল গুরু কোথায় পাই বলতে পারেন'? প্রথমেই আমি লিখে দিই, 'দয়া করে আমাকে গুরু করতে যাবেন না। যে কাউকে গুরু করুন, আপনার মত শিষ্যের যে কোন গুরু হলেই হবে। আপনার যখন ভাল আধার তৈরী হবে, ভাল গুরু নিজে থেকেই তখন আপনার কাছে এসে যাবেন। যেদিন থেকে দিনে ছয় থেকে আট ঘন্টা দীর্ঘ দিন জপ করতে শুরু করবেন, তারপর যখন ঠিক ঠিক বিধিতে ধ্যান করতে আরম্ভ করবেন, প্রথমেই তখন দেখবেন আপনার ভিতর থেকে হলাহল, বিষ বেরোতে শুরু করবে। এই হলাহল আপনাকে পুড়িয়ে দেবে, আপনার আশেপাশে যারা আছে তাদেরকেও পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। এটাকে যদি না নিয়ন্ত্রণ করে নেওয়া হয়, যদি হজম করে নিতে না পারেন, হয় আপনার মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে, না হলে অন্য কিছু ভাবে আপনাকে শেষ করে দেবে।

ঈশ্বরীয় কৃপায় যদি হজম হয়ে যায়, তারপরে আস্তে আস্তে ধ্যানের ফল আসতে শুরু হবে। আর শেষে আসে অমৃত। কিন্তু তার আগে হাতি আসবে, ঘোড়া আসবে, লক্ষ্মী আসবে, নানা রকম প্রলোভন আসতে থাকবে, শেষে আসবে অমৃত। বিদেশীরা এসব কাহিনী পড়ে এর অন্তর্নিহিত ভাব না বুঝেই বলে দেবে, যত সব গাঁজাখুড়ি গল্প। কিন্তু এই অমৃতই হল আত্মজ্ঞান, এই অমৃতই হল ঈশ্বর জ্ঞান। ধ্যান শুরু হওয়ার পর প্রথমের দিকে কি কি হয়, তারপর ধীরে ধীরে কিভাবে অমৃতত্বের দিকে এগিয়ে যায়, সেটাকেই সমুদ্র মন্থনের রূপক দিয়ে বলছেন। এটাই গীতায় এখানে বলছেন, *যজ্ জ্ঞাত্বাহমৃতমশ্নুতে*, যেটাকে জানলে মানুষ অমৃতত্ব পায়। এটাই জ্ঞেয়, এটাই জানার মত বস্তু, এটাকে যদি তুমি জেনে যাও তাহলে তুমি অমৃতত্ব পেয়ে যাবে। আমি এই মাইক্রোফোনকে যেভাবে জানছি, এই জানা না, এটাকে বোধে বোধ করতে হয়। প্রথমে এর তত্ত্বটাকে ধারণা করতে হয়, তারপর এর উপর ধ্যান করতে হয়, তারপর আসে উপলব্ধি।

অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে, জানার মত জিনিস একটাই, সেই এক। উপনিষদে বলছেন *একাক্ষর,* সেই এক অক্ষর আছেন, এক ঈশ্বরই আছেন, যিনি অনন্ত। *অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম,* খুব সুন্দর একটা শব্দ। যেটারই আদি হয়, সেটাকে আদিমান বলে। আদিমান বলে শব্দ আছে, কিন্তু অনাদিমান বলে কোন শব্দ হয় না, যুক্তিতেই অনাদিমান শব্দ দাঁড়ায় না। *অনাদিমৎ* যখন বলছেন, তাহলে তো অনাদিমান হয়ে যাচ্ছে, যেটা কখনই সম্ভব না, সংস্কৃতে অনাদিমান বলে কোন শব্দ হয় না। সেইজন্য আচার্য শঙ্কর এখানে বলছেন, অনেক ভাষ্যকার আছেন যাঁরা এটাকে *অনাদি মৎ পরং,* এভাবে ভাঙেন। কিন্তু গীতাতে পরিষ্কার *'অনাদিমৎ'* একটি শব্দে বলা হয়েছে। বলছেন, যদি অনাদিতে ভেঙে দেওয়া হয়, তাহলে হয়ে যাবে অনাদি আর মৎ পরং। কিন্তু *অনাদি মৎ পরং* যদি বলা হয়, তাহলে অর্থ হয়ে যাবে – শ্রীকৃষ্ণ হলেন ব্রহ্মের শক্তি। যার জন্য ব্রহ্ম একটা জিনিস হয়ে গেল, শক্তি আরেকটা জিনিস হয়ে গেল। পরের দিকে যেটা বলা হয়েছে, তার সাথে এই বক্তব্যের বিরোধী কথা এসে যাবে। রামানুজরা জিনিসটাকে এভাবেই বিচার করেন। আচার্য বলছেন, এভাবে অর্থ করলে গীতার দুই রকম কথা এসে যাবে, দুই রকম কথা হলে তো বিরোধ হয়ে গেল, সেইজন্য এটাকে *অনাদিমৎ* করতে হবে। কিন্তু বলা হল সংস্কৃতে *অনাদিমৎ* কোন শব্দ হয় না। আচার্য তখন ব্যাকরণের একটা খুব পুরনো নিয়ম দিয়ে দেখাচ্ছেন, এখানে পদকে মেলানোর জন্য এভাবে করা হয়েছে। যদি আমরা এটা না মেনে নিই, তাহলে এর অর্থটা উল্টোপাল্টা হয়ে যাবে। অর্থ বার করার জন্য পরিষ্কার করে বাউণ্ডারী ঠিক করে দেওয়া হয়, এই বাউণ্ডারীর বাইরে যাওয়া যাবে না। ভগবান সেই অনাদি সময় থেকে আছেন। লোকেরা প্রশ্ন করেন, শিবকে কে সৃষ্টি করেছেন? শিবকে কে সৃষ্টি করবেন, তিনি *অনাদিমৎ,* তিনি স্বয়ম্ভূ, তিনি *অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম,* তিনিই শেষ কথা।

ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে, তিনি সৎও নন, অসৎও নন। এই টপিকটার উপর আমরা অন্যান্য অনেক ক্লাশে অনেকবার বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমের দিকেও এই টপিকটা এসেছিল। সৎ ও অসৎ এই দুটো আমাদের টেকনিক্যাল শব্দ। সৎ মানে যেটা আছে। যেটা আছে, এই আছে ব্যাপারটা আবার দুটো অর্থে হয়। এর একটা অর্থ হয়, যেটা সব সময়ই আছে, ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনটে কালেই এক রকম আছে। ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনটে কালে ঈশ্বর ছাড়া কেউ এক থাকতে পারে না, সেইজন্য ঈশ্বরকে সৎ বলা হয়, ব্রহ্মকে সৎ বলা হয়। সৎ শব্দের আরেকটা অর্থ হয়, যেটাকে মন ও ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায়। কিন্তু ঈশ্বরকে মন দিয়ে জানা যায় না, তিনি অনন্ত আর মন সীমিত; সীমিত জিনিস দিয়ে অনন্তকে কখনই জানা যাবে না, শুধু মাত্র ইঙ্গিত করা যাবে। যেহেতু মন দিয়ে ঈশ্বরকে জানা যায় না, সেইজন্য তিনি সৎ নন।

সৎএর পর আরেকটি শব্দ আসে অসৎ, অসৎ মানে যেটা নেই। যেটা নেই –এটাও আবার দুটো অর্থে হয়। যেটা কোন পরিস্থিতিতেই নেই, বোঝাবার জন্য এনারা একটা শব্দ নিয়ে এলেন – অলীক। যেমন বন্ধ্যাপুত্র, আকাশকুসুম, এগুলো কখনই হবে না। অসৎএর আরেকটা অর্থ হয়, যেটাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না।

সৎ আর অসৎ এই দুটি শব্দ এমন টেকনিক্যাল শব্দ, আর হিন্দু ধর্ম এত প্রাচীন আর হিন্দুদের ঋষিরা এই সৎ আর অসৎ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করেছেন, যার জন্য ভাষ্যকার ছাড়া বোঝা যাবে না কোন জায়গায় সৎ আর অসৎএর কি অর্থ হবে। আর ভাষ্যকাররাও নিজের মত এই শব্দ দুটো ব্যবহার করে নেন। অনেকে সৎ বলতে ব্রহ্মকে বোঝান, আমরা যেমন সচ্চিদানন্দ বলি। অনেক জায়গায় সৎ বলতে প্রকৃতি, কারণ প্রকৃতিকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায়। আবার প্রকৃতিকে কখন অসৎ বলা হয়। কিন্তু ঈশ্বরকে কখনই অসৎ বলা হয় না। হয় ঈশ্বরকে বলা হয় সৎ, আর তা না হলে বলে সৎ অসতের পার। এখানে বলছেন সৎ অসতের পার। সৎ অসতের পারে কেন? ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না, মন দিয়ে জানা যায় না, সেইজন্য তিনি সৎ নন। তাহলে এটাই স্বাভাবিক যে, তিনি নেই। বলছেন, না, তা নয়। কারণ এই যে নেই বলছেন, এটাও

জ্ঞানের বস্তু। আমার হাতে এই কলম আছে, তার মানে এটা জ্ঞানের বস্তু। আমার হাত থেকে কলমটা পড়ে গেল। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার হাতে কি কলম আছে? আপনি বললেন, না তো। কি করে বললেন নেই? এই যে নেই, নেতি, এটাও আপনার জ্ঞানের বিষয় হয়ে গেল। যাঁরা প্রথম প্রথম এই ধরণের কথা শুনবেন তাঁদের পক্ষে এই জিনিসটা ধারণা করা কঠিন হবে। কিন্তু এমন কিছু কঠিন না।

ভারতীয় দর্শন, বিশেষ করে হিন্দু দর্শন অতি উচ্চমানের দর্শন। ওনারা এই শব্দগুলিকে খুব পরিষ্কার করে আমাদের বুঝিয়ে দেওয়ার মত করে দেখিয়ে দিচ্ছেন। যখন আমরা একটা জিনিসকে বলি এটা নেই, তখন সচারচর আমাদের মনে হয় যদি জিনিসটা নেই, তার মানে এটাই হয় যে, জিনিসটা নেই। কিন্তু আমরা ভুলে যাই, যেটা নেই সেটাও কিন্তু জ্ঞানের বিষয়। কথামৃতেও ঠাকুর বলছেন, তিনি অস্তি নাস্তির পার। অস্তি নাস্তির পার কেন? অস্তির পার মানে তিনি মন ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় নন। নাস্তির পার কেন? কারণ তিনি নেই, এই বোধ আসবে না। আমার হাতে কলম নেই, এটা আমরা বোধ করতে পারছি। ঈশ্বর আছেন, এটা কোন ভাবে প্রমাণ করা যাবে না, কোন ভাবেই না। শাস্ত্র ছাড়া এটা প্রমাণ হয় না। ঠিক তেমনি, ঈশ্বর নেই, এটাও প্রমাণ করা যাবে না। কেউ যদি বলে ঈশ্বর আছেন এটা প্রমাণ দিতে পারবেন? ঠিক তেমনি তাকে উল্টোটা জিজ্ঞেস করুন। ঈশ্বর নেই, এটা প্রমাণ করতে পারবেন? ঈশ্বর যেমন জ্ঞানের বিষয় নন; ঠিক তেমনি, ঈশ্বর নেই, এটাও জ্ঞানের বিষয় নয়, এটাও প্রমাণ করা যাবে না, ওটাও প্রমাণ করা যাবে না। তাহলে ঈশ্বরজ্ঞান কিভাবে হয়? শাস্ত্র দিয়ে। আর তা নাহলে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। এই হল শ্লোকের অর্থ।

এবার আচার্য এখানে এর উপর একেবারে খুব সার কথা বলছেন। উনিও *অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম* বলছেন, *অনাদি* আর *মৎ পরং* হবে না, *অনাদিমৎ* আর *পরং ব্রহ্মই* হবে। অন্যান্য মতে কি বলছেন, অন্যান্য টীকাকাররা কি বলছেন, তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। আচার্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, ব্যাকরণের নিয়মে অর্থ বিশেষে এটা করা যায়, তাই এভাবে বলা হয়েছে। এবার বিরোধী পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, *ননু মহতা পরিকরবন্ধেন কণ্ঠরবেণ উদ্‌ঘুষ্য জ্ঞেয়ং প্রবক্ষ্যামি*, কোমরে হাত দিয়ে খুব গম্ভীর স্বরে বলা হচ্ছে –আমি তোমাকে আজ ঈশ্বরের ব্যাপারে সব বলব। ঠাকুর একবার শিষ্যদের বলছেন, আজ তোমাদের সব বলব সমাধি কেমন। উনি বলতে শুরু করে চুপ হয়ে গেলেন। মনটা যখন নামল, আবার বলতে শুরু করলেন। কিন্তু একটু বলেই বলছেন, কে যেন আমার মুখটা চেপে ধরছে। এখানে পূর্বপক্ষ থেকে আচার্যকে বলা হচ্ছে –বাঃ খুব তো মশাই আপনি বলে দিলেন ঈশ্বরের ব্যাপারে সব বলব, জ্ঞেয় বস্তু সব বলে দেব, এবার কি হল?

আচার্য তখন বলছেন, ভগবান ঠিকই বলেছেন, *ন, অনুরূপম্ এব উক্তম্। কথং সর্বাসু হি উপনিষৎসু জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম 'নেতি নেতি'*, উপনিষদে যখনই ওনারা আত্মার বর্ণনা করেন, ব্রহ্মের বর্ণনা করেন তখন তাঁরা নেতি নেতি দিয়েই করেন, ব্রহ্ম এটা নন, ব্রহ্ম ওটা নন, সেটা নন। ঈশ্বরকে নিয়ে একই কথা বলা যায় – ঈশ্বর এটা নন, এটা নন। হিন্দুদের নিন্দা করে যারা বলে, হিন্দুরা প্রতিমা পূজা কেন করে, তারা এটা ভুলে যান যে, যখন তারা ঈশ্বরের কোন নাম দিচ্ছে, সেটাও প্রতিমা পূজারই অনুরূপ। ঈশ্বরকে জানা যায় একমাত্র এটা নয়, এটা নয়, তিনি সৎও নন, তিনি অসৎও নন এই নেতি নেতি করে। বলছেন, তাহলে ঈশ্বর নেই; না, ঈশ্বর নেই, এই জ্ঞানটাও হয় না। এটা বলা যাবে না যে ঈশ্বর নেই।

তার সাথে আচার্য বলছেন, আচার্য শঙ্করের কি প্রখর বুদ্ধি চিন্তা করা যায় না, শুধু অবাক হওয়া যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। বলছেন, যে কোন বক্তা যখন কিছু বলেন, তিনি তখন একটা অর্থকে সামনে আনার জন্য বলেন। একটা জিনিসকে কেউ যদি বোঝাতে চান, তখন তিনি কি করেন? বলছেন, *সর্বো হি শব্দঃ অর্থপ্রকাশনায় প্রযুক্তঃ শ্রূয়মাণঃ চ শ্রোতৃভিঃ*

জাতিক্রিয়াগুণসম্বন্ধদ্বারেণ সঙ্কেতগ্রহণসব্যপেক্ষঃ, একটা জিনিস বক্তা শ্রোতাকে বোঝাতে চান, তাঁকে সেটা ইঙ্গিত করতে হয়। ইঙ্গিত করার সময় এই চারটে জিনিসের একটি বা একের অধিক জিনিস লাগতে পারে বা চারটেই হতে পারে। এই চারটি হল, জাতি, ক্রিয়া, গুণ এবং সম্বন্ধ। যেমন গরু আলাদা ঘোড়া আলাদা, দুটো আলাদা জাতি, এখানে জাতিগত ভাবে তফাৎ হচ্ছে। আমি গান শুনছি, আমি রান্না করছি, এগুলো ক্রিয়া, ক্রিয়া দিয়ে তফাৎ বা আলাদা করা যায়। কি করছ, জিজ্ঞেস করলে, ক্রিয়া দিয়ে আলাদা হয়ে যায়। গুণ দিয়ে কিভাবে আলাদা করা হয়? এটা সাদা গরু, এটা কালো গরু, গুণ দিয়ে আলাদা করা হয়। যখন একটা শব্দ বলা হয়, সেখানে একটা সম্পর্ক এসে যাচ্ছে। যেমন গোযান, গরুর সঙ্গে সম্পর্ক এসে যাচ্ছে। *ন তু ব্রহ্ম জাতিমদ্ অতো,* কিন্তু ব্রহ্ম এই চারটের মধ্যে কোনটাই নয়।

ব্রহ্মের কোন জাতি নেই, জাতি দিয়ে ব্রহ্মকে জানা যাবে না। জাতি মানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতির কথা বলা হচ্ছে না, এখানে জাতি মানে একটা গ্রুপ। আমি যখন বলছি এটা কলম, কলম একটি জাতির পর্যায়ে আসছে, এই জাতি দিয়ে বুঝতে পারছি এটা কলম জাতীয় জিনিস। আমি যদি বলি নীল কলম, তখন আমি দুটো জিনিস নিয়ে এলাম, কলম এবং তার গুণ নীল রঙ। ব্রহ্মের না আছে কোন জাতি, না আছে কোন গুণ, সেইজন্য সৎ এই শব্দ দিয়ে তাঁকে বলা যাবে না। ঈশ্বর নির্গুণ, তাঁর কোন গুণ নেই, সেইজন্য কোন গুণ দিয়ে তাঁকে বলা যাবে না। ব্রহ্ম অনন্ত, তাই তাঁর কোন ক্রিয়া হতে পারে না। ক্রিয়া করার জন্য জায়গা দরকার, যিনি অনন্ত, যিনি সর্বব্যাপী, যাঁর বাইরে কিছু নেই, ক্রিয়া করার জন্য তিনি জায়গা পাবেন কোথায়, সেইজন্য তাঁর কোন ক্রিয়া নেই। তিনিই আছেন, তিনি এক অদ্বিতীয়, সেইজন্য কারুর সাথে তাঁর কোন সম্বন্ধ নেই। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় তো কেউ নেই, কার সাথে তাঁর সম্বন্ধ হবে?

যাঁরা মনযোগ সহকারে, শ্রদ্ধার সাথে এই আলোচনা শুনছেন, আপনারা শুধু এক মিনিটের জন্য ভাবুন, ব্যাসদেব কত হাজার হাজার বছর আগে এই গীতা রচনা করেছেন, খুব টেনেটুনে নামালেও সাড়ে তিন হাজারের নীচে কিছুতেই নামানো যাবে না। পাশ্চাত্যের কিছু ছিদ্রান্বেষী পণ্ডিতরা আছেন, তাঁরা বলেন, গীতা ভগবান বুদ্ধের পরে রচিত হয়েছে। অথচ গীতার রচয়িতা ব্যাসদেবকে কোন মতেই পনেরশ খ্রীষ্টপূর্বের নীচে আনাই যাবে না। ব্যাসদেব উপনিষদকে আধার করে পুরো গীতাকে সাজালেন। উপনিষদ মানেই খুব কম করেও ছয় থেকে সাত হাজার বছর আগের। একবার ভাবুন, আমাদেরই পূর্বপুরুষরা ঈশ্বরকে নিয়ে কি বলছেন। ঈশ্বরকে একমাত্র নেতি নেতি দিয়ে বলতে হয়। না আছে তাঁর জাতি, না আছে তাঁর কোন গুণ, না আছে তাঁর কোন ক্রিয়া আর না আছে তাঁর কারুর সাথে কোন সম্বন্ধ। ঈশ্বরকে একমাত্র বলা যেতে পারে এই ভাবে – তিনি এটা নন, তিনি ওটা নন, তিনি সেটা নন। তিনি সৎ-অসৎএর পারে, অস্তি-নাস্তির পারে, এ-ছাড়া আর কোন ভাবে ঈশ্বরকে বর্ণনা করা যায় না।

তাহলে আমরা কেন মূর্তি, প্রতিমা তৈরী করে পূজা-অর্চনা করি? বেলুড় মঠের গর্ভগৃহে কেন ঠাকুরের বিগ্রহ রাখা আছে? ছাদে ওঠার জন্য সিঁড়ি লাগে, এই বিগ্রহের ধ্যান করতে করতে আমরা সাকার থেকে নিরাকারে পৌঁছে যাব। ঈশ্বর সাকার নিরাকার দুটোই, কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, যাঁর সাকার তাঁরই নিরাকার। এই জায়গাতে আবার আমাদের সাবধান হতে হবে। ত্রয়োদশ অধ্যায় হল ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ কি; এই নিয়ে। যখন ভক্তির ব্যাপার ছিল, যেমন দশম অধ্যায়, একাদশ অধ্যায়, দ্বাদশ অধ্যায়, সেখানে ভক্তির কথা বলা হয়েছে। হিন্দুরা একটা পথকে অবলম্বন করে চলেন না, হিন্দুদের কাছে মত পথ, যত মন তত মত, যত মত তত পথ। গীতা একটা একটা করে সমস্ত পথের বর্ণনা করে আমাদের সামনে সাজিয়ে দিলেন। এবার যার যেটা ভাল লাগে, সে সেটাকে নিয়ে এগিয়ে যাক, কোন অসুবিধা নেই। যার মনে ভক্তির ভাব আছে, সে নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ অধ্যায়ের পথ নিয়ে চলুক। আবার যাদের বিবেক বুদ্ধি খুব শক্তিশালী, যারা সব কিছুকে যুক্তি দিয়ে,

বিচার করে দেখতে চান, তাঁদের জন্য ব্যাসদেব নিয়ে এলেন ত্রয়োদশ অধ্যায়। ঈশ্বর কি? তিনি অনন্ত। তাঁকে কি ভাবে বলা যাবে? নেতি নেতি করেই বলা যাবে। কিন্তু মনের মাধ্যমে যখন তাঁকে দেখছি তখন তাঁকে নাম দেওয়া যায়, তাঁর একটা আকার দেওয়া যায়। ভিতর থেকে আমরা জানছি তিনি অনন্ত, কিন্তু যখনই আমরা রাম, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ বলছি, তখন আসলে তিনি অনন্তের মুখ হয়ে যান। এতে দোষের কিছু নেই।

কিন্তু ত্রয়োদশ অধ্যায়ে কোন মুখ নেই, কোন মুখোশ নেই, কোন নাম নেই; আত্মা, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর যেমনটি আছেন তেমনটি জানছি। তাহলে তো সবারই সমস্যা হয়ে যাবে, ধারণাই করতে পারব না, কার পূজো করব, কার ধ্যান করব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও জানেন সমস্যা হয়ে যাবে। নেতি নেতি করতে গিয়ে ঈশ্বরের গলাটাই কেটে দিলেন না তো? ঈশ্বরের গলা কেটে এবার কার গলা কেটে বেড়াবেন কে জানে। পরের শ্লোকে ভগবান এই জিনিসটাকে আটকে দিচ্ছেন। তুমি এটা মনে করো না যে তিনি নেই। কারণ কোথাও যেন ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বারো নম্বর শ্লোকটা বৌদ্ধদের শূন্যবাদের মত হয়ে যায়। সেইজন্য বলছেন, তিনি সৎ অসৎএর পারে, কিন্তু আবার –

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।১৩।।

(তিনি (পরব্রহ্ম) সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে বিরাজিত আছেন। সকল শরীরের হস্ত ও পদ, চক্ষু ও কর্ণ, মস্তক ও মুখ তাঁর হস্ত ও পদ, চক্ষু ও কর্ণ এবং মস্তক ও মুখ।)

প্রথমটা জ্ঞানকে নিয়ে ব্যাখ্যা করলেন, এবার ভক্তির কথা বলছেন। জ্ঞান আর ভক্তি আলাদা কিছু না। নিরাকার সাকার আসলে আলাদা কিছু নয়। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের এই তেরো নম্বর শ্লোক অত্যন্ত সুন্দর শ্লোক। গীতা যাঁরা পুরোটা মুখস্ত করতে পারছেন না, ঈশ্বরের ভাব আনার জন্য তাঁরা যদি এই তেরো নম্বর শ্লোকটা মুখস্ত করে নেন খুব ভাল হবে। জীবনে সদা সর্বদা এই জিনিসটাকে অনুভব করতে পারবেন। যত প্রাণী আছে, আপনার বাড়িতে যাঁরা আছেন, আপনার পাড়াতে, আপনার শহরে যত মানুষ আছেন, তাঁদের সবার যত মুখ আছে সেই ঈশ্বরেরই মুখ, যত হাত সেই ঈশ্বরেরই হাত, যত পা, যত চোখ, যত ইন্দ্রিয় সবই তাঁর, সেই ঈশ্বরের। এটাই ভগবানের বিরাট রূপ। বেদে একটা বিখ্যাত মন্ত্র আছে, *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি*, তুমিই নারী, তুমিই পুরুষ, তুমিই শিশু, তুমিই বৃদ্ধ, সবই তুমি। একবার স্থির হয়ে এক দু মিনিটের জন্য যদি আমরা চিন্তন করি, একটু যদি ভাবি, জগতে, আমার দেশে, আমার শহরে যত লোক আছে, যত প্রাণী আছে সব তাঁরই রূপ। একটা বড় রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন থামছে শয়ে শয়ে লোক নামছে, ট্রেন ছাড়ছে শত শত লোক ট্রেন ধরতে যাচ্ছে, কল্পনা করুন, এটা সেই ভগবানেরই বিরাট রূপ। *সর্বতঃ পাণিপাদং*, সব জায়গায় তাঁর হাত পা; পিঁপড়ে আছে, হাতি আছে, বাঘ আছে, পাখি আছে, মাছ আছে, সবটা তাঁরই রূপ, কারণ তিনিই একমাত্র চৈতন্য কিনা।

এই যে আত্মা, এই আত্মার উপর এগুলো সবটাই উপাধি। বেদান্তে এনারা এই জিনিসটাই করেন; কোন জিনিসকে বুঝে নেওয়া বা ধারণা করা কঠিন হলে তাঁরা সেই জিনিসটার উপর উপাধি লাগিয়ে দেন, উপর থেকে একটা জিনিসকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। চাপিয়ে দেওয়ার পর আবার অন্য ভাবে সরিয়ে দেন, যাতে জিনিসটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। শাস্ত্র হল মা, মা যেমন শিশুকে বোঝানর জন্য, শেখানোর জন্য অনেক রকম ভাবে চেষ্টা করেন, ঠিক তেমনি একটা কঠিন বিষয়কে শাস্ত্র আমাদের এখানে বোঝানর চেষ্টা করছেন। একবার এইভাবে বলছেন, আরেকবার অন্য ভাবে বলছেন।

একবার এক কোম্পানীতে মালিক গ্রুপ ইনসিওরেন্স লাগু করতে চাইছিল। গ্রুপ ইনসিওরেন্সে সব কর্মচারীকেই ইনসিওর করাতে হয়। এই কোম্পানীতে কিন্তু একজন কর্মচারীই শুধু সাইন করতে চাইল না। সব স্টাফরা বোঝালেন, ইনসিওরেন্স কোম্পানীর লোকেরাও বোঝালেন, কিন্তু সেই ভদ্রলোক কিছুতেই সাইন করতে চাইছিল না। একজন সাইন না করলে গ্রুপ ইনসিওরেন্স হবে না। কোম্পানীর কর্তার কাছে খবর গেল। মালিক সেই কর্মচারী ডেকে বলে দিলেন, 'সই কর, তা নাহলে তোমার চাকরি যাবে'। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি সই করে দিল। সত্যিকারের ঘটনা। মালিক জিজ্ঞেস করল, 'এতক্ষণ সই করছিলে না কেন'? কর্মচারীটি বলছেন, 'এত পরিষ্কার ভাবে এখনও পর্যন্ত কেউ আমাকে বলেনি'।

শাস্ত্র এটাই করেন, কখন এদিক থেকে বলেন, কখন ওদিক থেকে বলেন। কারণ কোনটাতে আপনার কাছে সব পরিষ্কার হবে জানা নেই, সবারই আলাদা আলাদা মন কিনা। প্রথমে শাস্ত্র বললেন তিনি সৎও নন, অসৎও নন। তারপর বলছেন, যেখানেই ইন্দ্রিয় সেখানেই তিনি আছেন। প্রথমে সব কিছুকে বাদ দিয়ে বললেন, পরে আবারও সব সরিয়ে দেবেন। জ্ঞেয় বস্তুকে ধারণা করার জন্য প্রথমে এই ধরণের উপাধি লাগিয়ে দেবেন, পরে আবার উপাধিগুলিকে সরিয়ে দেবেন।

একটা খুব সুন্দর উদাহরণ দেওয়া হয়, যাঁরা বায়োলজিতে বোটানি নিয়ে পড়াশুনো করেছেন, তাঁরা এই জিনিসটা ভাল ধরতে পারবেন। একটা খুব পাতলা জিনিস আছে, যেমন কোন গাছের পাতা, গবেষণার জন্য পাতাকে ভার্টিকাল সেকশান করতে হয়। পাতাকে কাটা না গেলে মাইক্রোস্কোপে দেখা যাবে না। সেইজন্য পাতার দু দিকে মোম লাগিয়ে দেওয়া হয়, এক ধরণের খুব সফিস্টেকেটেড স্পেশালাইজড্ মেশিনে মোম লাগানো পাতাটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। মেশিনে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর মোম যেমন যেমন কাটতে থাকে তার সাথে সাথে পাতাটাও মাঝখান থেকে কাটা হয়ে যায়। তারপর যে মোম পাতার উপর চাপানো হয়েছিল, সেটাকে কায়দা করে সরিয়ে দেওয়া হয়। সরাসরি পাতা মেশিনে দিলে কাটা যাবে না। এটাকে বলে অধ্যারোপ ও অপবাদ।

প্রথমে একটা জিনিস চাপিয়ে দেওয়া হয়, পরে সেটাকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তাতে জিনিসটা যেমনটি ঠিক তেমনটি পরিষ্কার বেরিয়ে আসে। বলছেন, জ্ঞেয় যিনি তিনি আছেন, এটাকে বোঝানর জন্য এভাবে বলা হচ্ছে। শরীরের যত অঙ্গ হতে পারে, হাত, পা আর ইন্দ্রিয়গুলি তখনই কাজ করতে পারে, যখন জ্ঞেয় শক্তি পিছনে থাকে। কারুর মস্তিষ্ক যদি অচল হয়ে যায় তখন তার হাত, পা, ইন্দ্রিয় কাজ করে না। কয়েকজন বিজ্ঞানী মিলে একটা বই লিখেছেন, দেখানোর জন্য যে, এই সৃষ্টি ঈশ্বরই করেছেন, এর অন্যথা হতে পারে না।

ইদানিং কালে কিছু কিছু বিজ্ঞানী আছেন, রিচার্ড ডকিন তার মধ্যে খুব নামকরা, তাঁরা বলছেন, আমাদের ভিতরে যে জিনগুলি রয়েছে, এটাই হল মালিক। কিন্তু জিনের মধ্যে একটা চেতনা রয়েছে। তাহলে জিনের মধ্যে এই চেতনা কোথা থেকে এলো? বিজ্ঞানীদের একটা বিচিত্র ধারণা হল, এই এ্যালিয়েন্সগুলো আমাদের চেতনা দিয়েছে। কিন্তু চেতনা জিনিসটা একমাত্র চৈতন্য থেকেই আসতে পারে। আমাদের হাত, পা, ইন্দ্রিয়গুলি যে কাজ করছে, কারণ এর পিছনে চৈতন্য আছে বলেই এরা চেতন। চৈতন্য না থাকলে চেতন হবে না। এই যে আমি হাত নাড়ছি, এই হাত নাড়া জানিয়ে দিচ্ছে আমি এখনও চেতন আছি। এই চেতনের পিছনে রয়েছেন চৈতন্য।

সব মাথা তাঁর, সব হাত তাঁর, সব পা তাঁর, যত চোখ আছে সব তাঁর, সব ইন্দ্রিয় তাঁরই, *সর্বতঃ পাণিপাদং সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্*। এটা কোন কবিতা না, এটাকে বলা হয় অধ্যারোপ, উপধি চাপিয়ে দেওয়া হয় ওটাকে সরানোর জন্য। এর অর্থ হল, জগতে যত প্রাণী সমুদয় আছে, সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সেই ঈশ্বর বিরাজমান হয়ে আছেন। কিন্তু ঈশ্বর তো পাঁচটা ঈশ্বর না, আমার ঈশ্বর

আপনার ঈশ্বর তো আলাদা কিছু না। তার মানে সব হাত, সব পা, সব চোখ তাঁরই। তাহলে তো ভগবান হাত-পাওয়ালা হয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীমা এক জায়গায় বলছেন, তোমাদের ঠাকুর হাত-পাওয়ালা ঠাকুর। কিন্তু ঠাকুর হলেন অবতার, আর শ্রীশ্রীমা এখানে অন্য অর্থে বলতে চাইছেন। কিন্তু এভাবে বলা হলে তো ভগবান হাত-পাওয়ালা হয়ে যাবেন। যেমন আমরা ছবিতে দেখি, ভগবান অনন্ত নাগের উপর শুয়ে আছেন, লক্ষ্মী পদসেবা করছেন। সাধারণ লোকেরা এই ভাবকে নিয়েই অভ্যস্ত। না, তোমরা এই ভুলটা করে বসো না। সেইজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবার অন্য দিকে চলে যাচ্ছেন। আগে শ্লোকে বললেন, তিনি সৎ অসৎএর পার, সেখান থেকে সরে এই শ্লোকে বলছেন, সমস্ত ইন্দ্রিয় তাঁর।

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ।।১৪।।

(সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয়ের ও বহিরিন্দ্রিয়ের কার্যসমূহের দ্বারা তিন অবভাসিত (প্রকাশিত) হন। তিনি ইন্দ্রিয়কার্যে লিপ্ত আছেন এরূপ প্রতীত হলেও বস্তুতঃ তিনি কোন ইন্দ্রিয়ব্যাপারে ব্যাপৃত নন। কারণ তিনি সকল ইন্দ্রিয়বিহীন। তিনি সমস্ত সংশ্লেষরহিত। তথাপি মরুভূমি যেমন মৃগতৃষ্ণিকার আস্পদ, সেরূপ তিনি সর্বভূতের আশ্রয়। তিনি ত্রিগুণরহিত, অথচ তিনি মায়া দ্বারা ত্রিগুণের পরিণাম সুখ, দুঃখ ও মোহের উপলব্ধা।)

এবার নিয়ে আসছেন পুরো এর বিরোধী ভাবকে; অবশ্য নেতি নেতিকে বোঝানর জন্য। বলছেন, যত ইন্দ্রিয় আছে সেটা দিয়ে তিনি অবভাসিত, ইন্দ্রিয়সমূহের কার্য দ্বারা বোঝা যায় যে, তিনি আছেন। উপনিষদেও বিভিন্ন ভাবে এই জিনিসটাকে নিয়ে আসা হয়েছে, যেমন খুব নামকরা মন্ত্রে বলছেন, *ধ্যায়তি ইব লেলায়িতি ইব*, মনে হচ্ছে যেন ধ্যান করছেন, মনে হচ্ছে যেন চেষ্টা করছেন, আসলে তিনি কিছু করেন না। কেউ বলতে পারে, মহারাজ হাত-পা নাড়ছেন, কথা বলছেন; মহারাজ তো শুদ্ধ আত্মা, স্বামী সমর্পণানন্দ তো শুদ্ধ আত্মা, তিনি হাত-পা নাড়ছেন, কথা বলছেন। মনে হচ্ছে আমার ভিতর যিনি আত্মা আছেন, যেন তিনি হাত-পা নাড়ছেন। ঠাকুরকে একজন বলছেন, বাবা, তুমি খাচ্ছ, না আহুতি দিচ্ছ। যেন খাচ্ছেন। ঠাকুর গল্প বলছেন, ব্যাসদেব যমুনা নদী পার হবেন, সব ননী ক্ষীর খেয়ে বলছেন, হে যমুনে আমি যদি না খেয়ে থাকি তাহলে তুমি দুই ভাগ হয়ে যাও। যাঁরা কথামৃত প্রথম পড়বেন তাঁরা এই গল্পটা শুনে কিছুই বুঝতে পারবেন না, কি বলতে চাইছেন। আমারও বুঝতে সময় লেগেছিল। অনেক পরে বেদান্তের তত্ত্বগুলি বোঝার পরে বুঝতে পারলাম, মনে হচ্ছে যেন তিনি খেয়েছেন, আসলে ওনার শরীর খেয়েছে, ব্যাসদেব তো শরীর নন।

আমাদের যত ইন্দ্রিয় আছে, এগুলো উপাধি, জ্ঞেয়ের উপর উপাধি দেওয়া হয়েছে। আসলে কিন্তু এগুলো তিনি নন। অনেক সময় এই উপাধি দেওয়া হয়। সমাজ থেকে আপনাকে একটা সম্মান দেওয়া হল, একটা উপাধি দেওয়া হল, আসলে আপনি তো তা নন। জলের ঢেউএর মত সমস্ত কিছু প্রতিভাসিত হচ্ছে। পুকুরে একটা ঢিল ছুড়লে জলে ঢেউ হয়, দেখে মনে হবে ঢেউ চলছে, কিন্তু ঢেউ কখন চলে না। ক্লাশ নাইনের ফিজিক্সে এটা প্রথম পড়ার সময় আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। সমুদ্র হোক, নদী হোক, পুকুর হোক, মনে হবে যেন ঢেউ খেলে যাচ্ছে, ঢেউ কখন চলে না, শুধু জল উপর নীচ করে। দেখে মনে হবে যেন ঢেউ এগিয়ে যাচ্ছে। ফিজিক্সের শিক্ষক বলেছিলেন, it is the disturbance that travels, disturbanceটা চলছে, জল কোথাও যাচ্ছে না, জল নিজের জায়গায় উপর নীচ করছে। ব্রহ্ম কোথাও যান না, মায়া চলছে। এখানে তাও জল উপর নীচ করছে, ব্রহ্ম সেটাও করেন না, শুধু মায়া খেলে যাচ্ছে।

জ্ঞেয়, অর্থাৎ আত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সাথে মিশে যায়, অথচ আত্মা ইন্দ্রিয়ের বাইরে। আত্মা কারুর সাথে মেশেন না। এটাই আশ্চর্যের। *সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্*, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তিনি ভাসমান, তা নাহলে ইন্দ্রিয়গুলি কাজই করতে পারবে না। ভাগবতে এই জিনিসটাকে নিয়ে খুব সুন্দর কাহিনী তৈরী করা হয়েছে, যখন ইন্দ্রিয়গুলি তৈরী হল, তারা কেউই কাজ করতে

পারছে না। সবাই মিলে ভগবানের কাছে দরবার করলেন, প্রভু, আপনি তো আমাদের সৃষ্টি করে দিলেন, কিন্তু আমরা তো কোন কাজ করত পারছি না। ওদের মধ্যে চৈতন্য নেই কিনা। ভগবান তখন তাদের মধ্যে প্রবেশ করে গেলেন, এবার তারা সবাই যে যার নিজের নিজের কাজ করতে পারছে। *সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্*, আসলে জ্ঞেয়র কোন ইন্দ্রিয় নেই।

অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব, সব কিছু থেকে তিনি আলাদা। আলাদা হবেনই, এই যে জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সম্বন্ধ, এগুলোর কোনটার সাথে ভগবানের কোন সম্পর্ক নেই। এটাই দৈবী রহস্য, তাঁর হাত নেই পা নেই, তাও মনে হয় যেন তিনি চলছেন। অনন্ত যিনি তিনি কোথায় চলবেন, সবটাই তো তিনি। এটাকেই বেদান্ত বলছে মায়া। জড় পদার্থ বল আর চৈতন্য পদার্থ বল, ভগবান ছাড়া কিছুই নেই। তাহলে আমি যে ঘাড় নাড়ছি, আর এই মাইক্রোফোন যে ধ্বণি সম্প্রসারণ করছে এটা কি হচ্ছে? বেদান্ত বলছেন, হ্যাঁ ঠিকই এগুলো আত্মাই করছেন, কিন্তু তুমি কোন কিছু করাটাকে যে অর্থে নিচ্ছ সেই অর্থে এটা করা নয়। এটাকে বলছেন যেন করছেন। এই যেন করছেন বলে এটাকে বেদান্তে বলা হয় ব্যবহারিক সত্তা। আমি যদি পরমার্থ নাও জানি, বাস্তব সত্তাকে যদি নাও জানি তাতে কিছু আসে যায় না, ব্যবহারিক সত্তাতে তোমার কাজ চলে যাবে। তাহলে পরমার্থটা কি? *শুদ্ধ ব্রহ্ম পরাৎপর রাম*। তিনি অনন্ত, নির্গুণ, নিরাকার, তাই তিনি কোথায় যাবেন আর কিই বা করবেন! মায়াতে এসে সেই শুদ্ধ ব্রহ্মকে যেন করছেন বলে মনে হচ্ছে, এইটাই ব্যবহারিক সত্তা।

নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ, তিনি নির্গুণ, কোন গুণ তাঁর নেই, অথচ মনে হয় তিনি সমস্ত গুণের ভোক্তা। আমাকে কেউ তিরস্কার করলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়, কেউ আমার প্রশংসা করলে খুশী হয়ে যাই। এই যে সুখ-দুঃখের রূপ, আমি বলছি আমি খুশী হলাম, আমার মন খারাপ, আমি হাঁপিয়ে গেছি, আমার খিদে পেয়েছে, এই কথাগুলো যখন বলছি, মনে হচ্ছে যেন আমি গুণ ভোগ করছি, কিন্তু আমি আসলে সমস্ত গুণের পারে। এই চোখ কান নাক দিয়ে আমরা জগতকে ভোগ করছি। একদিকে তিনি নির্গুণ আবার অন্য দিকে তিনি *গুণভোক্তৃ*, বেদান্তে এই ধরণের দ্বন্দ্বাত্মক ও বিপরীত ভাবকে নিয়ে আসা হয়, এটাই বেদান্তের বিশেষত্ব। কারণ যে জিনিসটাকে বাক্য দ্বারা বোঝান যাবে না, কোন ভাবেই প্রকাশ করা যাবে না, অথচ আমাকে বোঝাতে হবে। কিন্তু বোঝাব কি করে, তখন এই ধরণের বিপরীত শব্দ দিয়ে বোঝান হয়। ঈশ্বর কি বস্তু সেতো কখনই কোন ভাবে বোঝান যাবে না, কারণ তিনি বুদ্ধির বিষয় নয়, সব কিছুকে বিষয়ীকরণ করা যাবে কিন্তু ব্রহ্ম বা আত্মাকে বিষয়ীকরণ করা যায় না। তখন বোঝানর জন্য বিপরীতার্থক বস্তু দিয়ে বোঝান হয়, যেমন এখানে বলছেন তিনি নির্গুণ কিন্তু গুণের ভোক্তা। অনেক দিন জপধ্যান, তপস্যা, নির্জনবাস আর সাধুসঙ্গ করা না থাকলে এই ধরণের ঈশ্বরীয় তত্ত্বের ধারণা হওয়া খুবই কঠিন। তবে এটা দৃঢ় ভাবে বলা যেতে পারে গীতাতে এখানে এই যা কিছু বলা হচ্ছে সবটাই ধ্রুব সত্য, এর বেশি আর কিছু বলা যায় না। এতক্ষণ উপাধি নিয়ে বলা হয়েছে এবার ঈশ্বরের গুণ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে –

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদ্বিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ।।১৫।।

(তিনি চরাচর সর্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে এবং স্থাবর ও জঙ্গম দেহসমূহে বিরাজিত। অতি সূক্ষ্ম হওয়ার জন্য তিনি অবিজ্ঞেয়। তিনি অ-জ্ঞানীর অজ্ঞাত বলে অতিদূরে এবং আত্মরূপে জ্ঞাত হওয়ার কারণে জ্ঞানীর অতি নিকটে।)

উপনিষদে যে নামকরা ভাবগুলো রয়েছে, সেই ভাবগুলোকে নিয়ে বলছেন। এই যে আমাদের শরীর, এই শরীরের বাইরে পুরোটাই তিনি। আর এই শরীরের ভিতরেও তিনি – এটাই বলছেন *বহিরন্তশ্চ*। *ভূতানামচরং চরমেব চ*, শুধু আমার না, সমস্ত ভূতের শরীরের ভিতরেও তিনি বাইরেও তিনি। তিনি কোথায় যাবেন, তিনি তো অনন্ত, চলার জন্য তো একটা জায়গা তাঁকে দিতে

হবে, তিনিই তো সর্বব্যাপী হয়ে আছেন, তাঁর বাইরে তো কিছু নেই আর, তিনি কোথায় চলেফেরা করবেন! কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে যেন তিনি চলছেন। অধ্যাত্ম রামায়ণে ঠিক এইভাবেই বলা হচ্ছে – শিব পার্বতীকে বলছেন, শ্রীরাম কোথাও যান না, শ্রীরাম কোথাও চলেন না অথচ মনে হচ্ছে তিনি এই করছেন সেই করছেন। রামায়ণে এত যে শ্রীরামচন্দ্রের লীলা কাহিনী আমরা পড়ি, আসলে তিনি কোনটাই কিছু করেননি। যিনি অনন্ত তাঁর চলা ফেরার জন্য আলাদা একটা জায়গার দরকার, এখন তিনিই সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন তাই জায়গা কোথায় যে তিনি চলে ফিরে বেড়াবেন। তাই বলা হয় ঈশ্বর কিছুই করেন না, কিছু করার জায়গাই তো তাঁর নেই। সেইজন্য বলছেন, *অচরং চরমেব চ*, মনে হচ্ছে তিনি করছেন, আসলে তিনি কিছু করেন না।

সূক্ষ্মত্বাৎ তদ্বিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ, এত কিছু বলে যাচ্ছেন, কিন্তু তাও আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারছি না কেন? লোকেরা প্রায়ই বলে, এত কিছু করছি, কিন্তু কিছুই তো জানতে পারছি না। এই সমস্ত কিছু, জগতে যা কিছু আছে, সবটাই তারঁ স্বরূপ। অদ্বৈত না বুঝে প্রায়ই লোকেরা অদ্বৈতকে ভুল ভাবেন। তাঁরা মনে করেন, অদ্বৈত মনে করে জগৎ নেই, সৃষ্টি নেই। কিন্তু তা নয়। দেববাণীতে স্বামীজী বারবার বলছেন, এই জগৎ ঈশ্বরেরই রূপ, কিন্তু এটা ঈশ্বর না। সমস্ত দৃশ্য ওনারই স্বরূপ, তবে তিনি হলেন সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। এখানে সূক্ষ্ম মানে যাঁর বুদ্ধি অত্যন্ত সূক্ষ্ম একমাত্র তিনিই ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ ধরতে পারছেন, স্থূল বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরকে ধরা যায় না।

আমরা যত সূক্ষ্ম বস্তু জানি; এ্যাটম, ইলেক্ট্রন, কোয়ার্ক্স, সব কিছু থেকেও তিনি সূক্ষ্ম। আত্মরূপে, এই আমি রূপে তিনি জ্ঞেয়, তাঁকে জানতে পারছি। কিন্তু যারা অজ্ঞানী, যাদের বোধ নেই, তারা কোন দিন ঈশ্বরকে জানতে পারে না। আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *অবিজ্ঞাততয়া দূরস্থং বর্ষসহস্রকোট্যাপি অবিদুষাম্ অপ্রাপ্যত্বাদ্*, যারা অজ্ঞানী, যারা ঈশ্বর মানে না, হাজার কোটি বছর ধরেও তারা জ্ঞেয়কে বা আত্মাকে কোন দিন জানতে পারবে না। বিগ ব্যাং থিয়োরীতে ওনারা যে টাইম স্প্যান দিচ্ছেন, তার থেকে এনারা বেশি বলছেন, অজ্ঞানী এত দিনেও কোন দিন আত্মাকে জানতে পারবে না। অথচ খুব সহজেই জানা যায়, কারণ আমাদের সবারই ভিতরে তিনি আছেন, চেষ্টা করলেই আমরা জানতে পারি। ইন্দ্রিয়কে, মনকে নিয়ন্ত্রণ করে, ধ্যানধারণা করে, সমাধিস্থ হয়ে যে কেউ নিজের স্বরূপকে জেনে যেতে পারেন। সেইজন্য বলছেন, ঈশ্বর অত্যন্ত নিকট, কিন্তু যারা অজ্ঞানী, তাদের জন্য তিনি অনেক দূরে।

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ।।১৬।।

(ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন হয়েও সর্বভূতে বিভক্তরূপে প্রতীত হন। রজ্জু যেমন কল্পিত সর্পাদির সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, সেই রকম তিনি সর্বভূতের পালক, সংহারক ও স্রষ্টা।)

ঈশ্বরের গুণের বর্ণনা করে যাচ্ছেন। *অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্*, তিনি অবিভক্ত, কোথাও তাঁর কোন ধরণের বিভাজন নেই, কিন্তু সমস্ত প্রাণীর মধ্যে বিরাজ করছেন বলে তিনি বিভক্ত বলে বোধ হন। কারণ আত্মারূপে তাঁর যে প্রতীতি, সমস্ত জীবের মধ্যে তিনি রয়েছেন। আর যত জীব আছে, সবারই ভরণ পোষণ তিনিই করেন। *গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ*, যখন প্রলয় হয় তখন তিনি *গ্রসিষ্ণু*, সব কিছুকে গ্রাস করে নেন। যখন উৎপত্তি হয়, তখন সব কিছুর জন্ম তিনিই দেন। তিনিই সৃষ্টি করেন, তিনিই পালন করেন আবার তিনিই সব কিছু সংহার করে নিজের মধ্যে গ্রাস করে নেন; তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই মহেশ। এই হচ্ছে ঈশ্বরের রূপ, মানুষ রূপে, জীবজন্তু রূপে, গাছপালা রূপে তিনি থাকতে পারেন, আর আমরা তাঁর বিগ্রহ মূর্তির পূজা করতে পারি না!

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য ধিষ্ঠিতম্।।১৭।।

(ব্রহ্ম আদিত্যাদি জ্যোতিসমূহেরও জ্যোতিঃ এবং অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের দ্বার অসংস্পৃষ্ট। জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানগম্যরূপে তিনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন।)

সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি জগতে যত রকমের জ্যোতি হতে পারে, সমুদয় জ্যোতিরও জ্যোতি তিনি। আমরা এই টিউব লাইটের আলো দেখছি, এই আলোটা কোথা থেকে আসছে? ইলেক্ট্রিসিটি থেকে আসছে। ইলেক্ট্রিসিটি কোথা থেকে আসছে? জল থেকে। জল কোথা থেকে আসছে? মেঘ থেকে যে বর্ষণ হচ্ছে তার থেকে। মেঘ কিভাবে হচ্ছে? সূর্যের তাপে। তাহলে এই টিউবলাইটের আলোটা আসলে কি? সূর্যেরই আলো। সূর্যেরা আলোটা আসলে কি? মূলতঃ এ্যটমিক ফিউশান আর ফিশান। তাহলে সূর্যের এই আলোই কি শেষ কথা? না তা নয়। এরও পেছনে তিনি আছেন বলেই সূর্য আলো বিকিরণ করছে। তিনি জ্যোতিরও জ্যোতি, তিনি আছেন বলেই সূর্য আলো দিচ্ছে। *তমসঃ পরমুচ্যতে,* সমস্ত অন্ধকারের পারে তিনি, সমস্ত অজ্ঞানের পারে তিনি।

সাধনা করতে করতে যদি কারুর মনে হতাশা চলে আসে, তাকে বলছেন, মনে রাখবে, *জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য ধিষ্ঠিতম্;* জ্ঞানরূপে, জ্ঞাতারূপে এবং জ্ঞেয়রূপে তিনিই সবার হৃদয়ে বিরাজমান। এই যে পরমাত্মার স্বরূপ বলা হল, প্রথমের দিকে *অমানিত্বম্, অদম্ভিতম্* ইত্যাদি যে গুণগুলো বলা হচ্ছে, এই সমস্ত গুণ *জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং*। জ্ঞান হল জ্ঞানের যেটা সাধন আর *জ্ঞানগম্যং* হল, জ্ঞানকে যখন সাক্ষাৎ করে নেওয়া হয়, তখন ওটাকে বলছেন *জ্ঞানগম্যং* আর *জ্ঞেয়ং* হলেন পরমাত্মা। এই তিনটে মানুষের ভিতরেই আছে, বাইরে কোথাও কিছু নেই।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।।১৮।।

(এইভাবে তোমাকে ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সংক্ষেপে বলা হল। আমার ভক্ত ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হয়ে ব্রহ্মভাব লাভে সমর্থ হন।)

হে অর্জুন তোমাকে সংক্ষেপে ক্ষেত্রের ব্যাপারে বললাম, জ্ঞানের ব্যাপারে বলা হল আর জ্ঞেয়র ব্যাপারে বললাম। জ্ঞান মানে যেটা দিয়ে জানা যাবে। কাকে জানা যাবে? জ্ঞেয়কে। জ্ঞেয় কে? ঈশ্বর বা ব্রহ্ম। ব্রহ্মের বিষয়ে বলা হল। ব্রহ্মের কাছে কিভাবে পোঁছাবে সেটাও বললাম। তার বাইরে যে অজ্ঞানের অবস্থা, ক্ষেত্রের মাধ্যমে সেটাও বর্ণনা করা হল। মূল কথা হল ঈশ্বর কি, সংসার থেকে ঈশ্বরের কাছে যাবার পথ কি এই তিনটের ব্যাপারে তোমাকে সংক্ষেপে জানান হল।

মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে, ভগবান জ্ঞান আর ভক্তিকে আবার এক জায়গায় নিয়ে আসছেন। এর আগে আমরা আলোচনা করলাম ক্ষেত্র কি, অর্থাৎ প্রকৃতির এলাকা কত দূর, তার সঙ্গে জ্ঞান কি বলা হল, আর ক্ষেত্রজ্ঞ বা ঈশ্বর কি। ভগবান বলছেন, আমার যে ভক্ত, ঈশ্বরের যে ভক্ত, সে এই তিনটে জিনিসকে জেনে গেলে মোক্ষ লাভে সমর্থ হয়, সে আমাকেই পায়। অমৃতত্ব লাভ করার পথ কি? ঈশ্বরের যে তত্ত্ব এতক্ষণ বর্ণনা করা হল, এটাকে জানা। এটাকে জেনে, ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করা।

গীতা মোক্ষ শাস্ত্র, অত্যন্ত উচ্চমানের গ্রন্থ। ভক্তি বলতে আমরা ইমোশানালিজম্ মনে করি। একজন ভদ্রলোক আজকে একটা মন্তব্য করেছেন দেখলাম, তিনি বলছেন, গীতাতে যেখানে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলা হয়েছে, তারপরেও আপনারা শ্রীরামকৃষ্ণকে কি করে ভগবান বলেন? আমি তাঁকে খুব কড়া করে উত্তর দিলাম। শাস্ত্র যদি গুরুমুখে না শোনা হয়, গুরু পরম্পরায় না শোনা হয়,

বলাই হচ্ছে এই বিদ্যা সম্প্রদায় বিদ্যা, তখন এই ধরণের কথাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে। এই যে ভক্তি, ভগবানের যিনি ভক্ত, আর জ্ঞান, যিনি জ্ঞানী, দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। জ্ঞান হল, পুরুষ কি, প্রকৃতি কি, ঈশ্বর কি, এটাকে পরিষ্কার ভাবে জানা। পুরুষ, প্রকৃতি, ঈশ্বরের তত্ত্বগুলি যদি পরিষ্কার ভাবে জানা হয়, তবেই মানুষ আধ্যাত্মিক পথে এগোতে পারবে। কেউ যদি কোথাও বেড়াতে যেতে চায়, তাকে আগে সেই জায়গার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে হবে। কোথায় ট্রেন ধরতে হবে, কোথায় নামতে হবে, কোথায় বাস ধরতে হবে, কোথায় কোথায় থাকার জায়গা পাওয়া যাবে; এই জিনিসগুলি আগে থেকে না জানা থাকলে বেড়াতে গিয়ে অনেক সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে। ঠিক সেই রকম, অধ্যাত্ম পথে এগোবার সময় কোনটাকে ছাড়তে হবে, কোনটাকে ধরতে হবে, কোন দিকে এগোতে হবে, এই জিনিসগুলি যদি না জানা থাকে অনেক সমস্যায় পড়তে হবে।

সমস্যা হল, ছোটবেলা থেকে আমরা বাবা-মা, দিদিমা, ঠাকুরমার কাছ থেকে কিছু গতানুগতিক ধর্মের কথা শিখে রেখেছি। ওই বিদ্যাকে অবলম্বন করে যখন গীতা আদির মত ধর্মশাস্ত্রে নামি তখন সব কিছু এলেমেলো হয়ে যায়, কিছুই আর মেলাতে পারা যায় না। ভগবান এই আঠারো নম্বর শ্লোকে বলছেন, আমার ভক্ত, তা তিনি কৃষ্ণের ভক্ত হন, ঈশ্বরের ভক্ত হন, যে সম্প্রদায়েরই ভক্ত হয়ে থাকুন, সবাইকে এটা ভাল ভাবে বুঝে নিতে হবে –প্রকৃতি কি; প্রকৃতিকে এখানে ক্ষেত্র বলছেন, ক্ষেত্রজ্ঞ কি, ঈশ্বর কি, জ্ঞান কি, এই জিনিসগুলিকে আগে ভাল ভাবে বুঝে নিতে হবে।

আচার্য বলছেন, *মদ্ভক্তো ময়ি ঈশ্বরো সর্বজ্ঞে পরমগুরৌ বাসুদেব সমর্পিতসর্বাত্মভাবো যৎ পশ্যতি শৃণোতি স্পৃশ্যতি বা সর্বম্ এব ভগবন্ বাসুদেব ইতি এবংগ্রহাবিষ্টবুদ্ধি মদ্ভক্তঃ*। আচার্যের এটা খুব নামকরা একটি বাক্য, *মদ্ভক্ত* জিনিসটাকে বোঝার জন্য এর মত সুন্দর বাক্য আর হয় না। এই অধ্যায়ে প্রথমে যেটা শুরু করলেন, *মহাভূতান্যহঙ্কারো* থেকে ক্ষেত্রকে বলা হল, *অমানিত্বম* থেকে জ্ঞানকে বলা হল আর *জ্ঞেয়ং যত্তৎ* থেকে জ্ঞেয়র স্বরূপ বলা হল। আঠারো নম্বর শ্লোকের বৈশিষ্ট্য কি আচার্য বলছেন, *এতাবান্ সর্বো হি বেদার্থো গীতার্থঃ চ উপসংহৃত্য উক্তঃ*, সমস্ত বেদ, সমগ্র গীতার যে সার, সেটা এই জায়গাতে বলা হচ্ছে। জড় কি, চৈতন্য কি এবং এই দুটোর মালিক যিনি, সেই ঈশ্বর কি, প্রথমে এই তিনটি জিনিসকে ভাল করে বুঝে ধারণা করতে হবে। এখানে এসেই আমরা সবাই গোলমাল করে বসি। আমরা বোঝার চেষ্টা করি না, জড় কি, চৈতন্য কি; বোঝার চেষ্টা করি না ঈশ্বর কি। এই তিনটেকে বুঝে নিলে কি হবে? ঈশ্বরের দিকে এগোতে সুবিধা হবে? না, ঈশ্বরের দিকে এগোয় না।

ঈশ্বর কোন বস্তু নন, হিমালয়ের মত তিনি কোন একটা বিশেষ স্থান না, এখান থেকে ট্রেনে বাসে করে হরিদ্বার হয়ে হিমালয়ে যাচ্ছি, এভাবে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া বোঝাচ্ছেন না। তাহলে ঈশ্বরের দিকে যাওয়া মানেটা কি? এখানে বলছেন, আমার যিনি ভক্ত, তিনি কি করেন? খুব সুন্দর ভাবে পরিষ্কার করে বলছেন। কি বলছেন? প্রায়ই লোকেরা প্রশ্ন করে, ঈশ্বর কে, ঈশ্বর কি, ঈশ্বরের পরিভাষা কি? আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর এই আঠারো নম্বর শ্লোকে বলছেন, ঈশ্বর হলেন সর্বজ্ঞ, যিনি ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনটেকেই জানেন। এর আগে আগে বলেছেন, তিনি সর্বশক্তিমান। যখনই আমরা শক্তির কথা ভাবি, শক্তির তারতম্য, শক্তির কম বেশি স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মাথায় চলে আসে। স্বাভাবিক ভাবে আসার জন্য আমরা তখন জানতে চাই, এমন কেউ কি আছেন যিনি সমস্ত শক্তি সম্পন্ন? হ্যাঁ, আছেন, তিনি ভগবান। যখনই কোন সীমিত জিনিসের কথা আমাদের মাথায় আসে, যেমন জ্ঞান, জ্ঞানের কথা ভাবলেই আমাদের মাথায় আসে আমার তো সীমিত জ্ঞান। সীমিত জ্ঞানের কথা যখনই মাথায় আসে, তখন অসীম জ্ঞানের ভাবনাটাও আমাদের মাথায় আসে। এটাই স্বাভাবিক, দুটো ভাবনা একসাথে চলে। যদি কোন জিনিস সত্যিই সীমিত হয়, সেটা সত্যিই সীমাহীনও তো হতে পারে। তাই জ্ঞান যদি সীমিত হয়, তাহলে সীমাহীন জ্ঞানও হতে পারে।

বলছেন, ঈশ্বর হলেন যিনি সর্বজ্ঞ, তিনি সবটাই জানেন। জ্ঞানই শক্তি, তাই তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

তার সাথে তিনি পরমগুরু, গুরুও গুরু। এই জগতে আমরা যাঁদের গুরু রূপে জানি, বাবা, মা, শিক্ষক, আচার্য, দীক্ষগুরু যাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছি, এই সমস্ত গুরুরও তিনি গুরু। ভগবানের জ্ঞানের দৃষ্টিতে এই দুটি পরিভাষা আচার্য শঙ্কর এখানে দিচ্ছেন। প্রথম, তিনি সর্বজ্ঞ, সেইজন্য তিনি সর্বশক্তিমান। দ্বিতীয়, তিনি পরমগুরু, ঠাকুর বলছেন, সচ্চিদানন্দই গুরু; বাকি সব গুরু ওই সচ্চিদানন্দ থেকেই আসছেন। তাই বাসুদেব, শ্রীকৃষ্ণই পরমগুরু। শ্রীকৃষ্ণকে কেন পরমগুরু বলা হচ্ছে? কারণ এটা গীতা গ্রন্থ, গীতা শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে কথা বলবেন না, শ্রীকৃষ্ণকে নিয়েই কথা বলবেন। তার থেকে বড় কথা হল, একটি শাস্ত্রকে যদি আমি বিশ্বাস করি, তাহলে সমস্ত শাস্ত্রকে আমার বিশ্বাস করতে হবে। আমি এই কথা কখন বলতে পারব না যে, আমি গীতার কথা পুরো মানব, রামায়ণকে পুরো মানব না। আমি যদি গীতাকে বিশ্বাস করি, তাহলে অন্য যত গ্রন্থ রয়েছে সেগুলোকেও বিশ্বাস করতে হবে। সেইজন্য নিজের বুদ্ধি লাগাতে হয়, পুরোপুরি বুদ্ধিকে ছেড়ে দিলে কূপমণ্ডুক হয়ে যায়। একজন একটা কথা বলে দিল, সেটা শুনে আর কোন চিন্তা-ভাবনা না করে সেটাই করে যাচ্ছি, এভাবে ধর্ম পথে এগোন যায় না।

এই যে গুরু, যাঁকে পরমগুরু বলা হচ্ছে, যিনি পরমগুরু তিনিই সর্বশক্তিমান। সেই সর্বশক্তিমান, পরমগুরুর কাছে গিয়ে কি করতে হয়? এই যে বলা হচ্ছে, ভগবানকে আমি ভালবাসব, এই যে বলছেন, *মদ্ভাবায়োপপদ্যতে*, আমার ভাবের মধ্যে যিনি প্রবেশ করেন; প্রবেশ করা মানে, *যৎ পশ্যতি শৃণোতি স্পৃশতি*, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা যা কিছু কাজ হয়; যেটা আমি দেখছি, যেটা আমি শুনছি, যেটা আমি স্পর্শ করছি, সবটাতেই সেই পরমাত্মার ভাব নিয়ে আসতে হয়। তার মানে সব কিছু আমি প্রভুকে অর্পণ করলাম। সাধনা মানে কি? সাধনা মানে একটাই, এটাকে পরে এখানে ব্যাখ্যা করবেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান শেষে গিয়ে বলবেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*, সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে সব কিছু আমাকে অর্পণ কর।

এ এক অদ্ভুত কথা বলছেন, *মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায়*, প্রথম আমি ভক্ত কিনা, দ্বিতীয় আমার জ্ঞান আছে কিনা। জড় কি, চৈতন্য কি, শক্তি কি, যখন এই জিনিসগুলিকে ভাল করে বুঝে নেওয়া হবে, যখন বুঝে নিলাম যিনি আমার ইষ্ট, তিনি শিব হন, রাম হন, কৃষ্ণ হন, শ্রীরামকৃষ্ণ হন, তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি পরমগুরু, তখন আমার শরীরের যত কার্য, যত আমার ইন্দ্রিয়ের কার্য, যত আমার মনের কার্য, সব কিছু তাঁকে সমর্পণ করলাম। যখন সমস্ত কিছু সমর্পণ করা হয়ে যায় তখন *মদ্ভাবায়োপপদ্যতে*, সেই পরমগুরুর ভাবে সম্পূর্ণ ভাবে ডুবে যায়। এই যে আচার্য বলছেন, *মম ভাবো মদ্ভাবঃ পরমাত্মভাবঃ*, শ্রীকৃষ্ণের ভাবে ডুবে যাওয়া মানে পরমাত্মার ভাবেই ডুবে যাওয়া। আপনি যাঁকে পরমাত্মা ভাবছেন, যদি শিবকে মনে করেন, শিব পরমাত্মা; যদি শ্রীরামকৃষ্ণকে মনে করে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমাত্মা। এই পরমাত্মার ভাবে ডুবে গেলে *উপপদ্যতে মোক্ষং গচ্ছতি*, মোক্ষ লাভ করে, এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে সে মুক্ত হয়ে যায়।

এই আঠারো নম্বর শ্লোকে ভক্তি করলে কি হয়, এটাই আচার্য শঙ্কর বললেন, *এতাবান্ সর্বো হি বেদার্থো গীতার্থঃ চ উপসংহৃত্য উক্তঃ*, বেদ, গীতা, সমস্ত শাস্ত্রের সার এই একটি শ্লোকে ভগবান বলে দিলেন। কি সেই সার? তুমি যদি মোক্ষ পেতে চাও, মুক্তি যদি পেতে চাও, মুক্তি মানে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া; তাহলে তোমাকে ঈশ্বরের ভাবে ডুবে যেতে হবে। ঈশ্বরের ভাবে ডুবে যাওয়া মানে, মন, ইন্দ্রিয়, শরীরের যত কার্য, সব ভগবানকে অর্পণ করা। এই আঠারো নম্বর শ্লোককে যদি কেউ বোঝার চেষ্টা করেন, যদি বুঝে নিতে পারেন, তাহলে আর কিছু না হোক এটাই জীবনে একটা শান্তির বাতাবরণ নিয়ে আসবে। এরপর হবে সাধনা। সেইজন্য বাড়িতে, কর্মস্থলে,

ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপের ছবি রাখতে হয়। যাঁরা কৃষ্ণ ভক্ত তাঁরা কৃষ্ণের ছবি রাখবেন, যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত তাঁরা ঠাকুরের ছবি রাখবেন। ছবি দেখলে তাঁকে মনে পড়ে যাবে, উদ্দীপন হবে। অনেকে পকেটে ঠাকুর দেবতার ছবি রাখেন, অনেকে লকেটের মধ্যে ছবি রাখেন। অনেকে মনে করে এগুলো কিছুই না, ভণ্ডামি। তা নয়, এতে ভাব তৈরী হয়, হে প্রভু আমি যা করছি সব তোমাকেই অর্পণ করছি। এটাই হল শেষ সাধনা। জপধ্যান মনের সেই শক্তিটা তৈরী করে, যে শক্তিতে আমরা সব সময় আমাদের সব কিছু ঈশ্বরে অর্পণ করতে পারি।

আঠারো নম্বরের শ্লোক হল শেষ কথা, এতক্ষণ ভগবান যেটা বলে এলেন, এই শ্লোকে সেটা উপসংহার করছেন। এরপর থেকে শুরু হচ্ছে পুরো দর্শনের উপর আলোচনা। এখান থেকে পরের তিন চারটে শ্লোকে পুরো সৃষ্টি তত্ত্বকে নিয়ে বলবেন। আমাদের খুব পরিচিত একজন ছিলেন, তিনি খুব ঠাকুর ঠাকুর করতেন। সব সময় বলতেন, সব ঠাকুরের ইচ্ছা, সব ঠাকুরের কৃপা। এখন খুব বিপদে পড়ে গেছেন, বিপদ হতেই পারে, সবারই কিছু না কিছু বিপদ এসেই থাকে। আমি মজা করে বললাম, 'কি, এখনও কি মনে হচ্ছে সব ঠাকুরের কৃপা'? 'না, এখন তা মনে হচ্ছে না'। একটা মজার কার্টুনে দেখাচ্ছে, পাঁচ ছয় বছরের একটা খুব দুষ্টু ছেলের চিকেন পক্স হয়েছে। ডাক্তার এসে বাচ্চাটাকে দেখলেন, দেখার পর ওর মাকে বলছেন, ওর চিকেন পক্স হয়েছে। বাচ্চাটা খুব রেগেমেগে ডাক্তারকে বলছে, আপনি কি ভেটেনারির ডাক্তার, আমাকে চিকেন পক্স বলছেন? যাদের ডাক্তারের উপর পুরো বিশ্বাস, ডাক্তার যে ওষুধ দেবেন নিয়মিত ভাবে সেবন করবে। ডাক্তার যদি বলে সার্জারি করতে হবে, সার্জারি করতে রাজী হয়ে যাবে। কিন্তু ডাক্তারের ওষুধে বিশ্বাস করব না, সার্জারিতে বিশ্বাস করব না, ডাক্তারের প্রতি তোমার এটা কি ধরণের বিশ্বাস? আর ডাক্তারই বা কি করে তোমাকে সুস্থ করবেন!

যদি আমি ঠাকুরকে বিশ্বাস করি, যদি আমার ঠিক ঠিক বিশ্বাস যে ঠাকুরই সব করেন, তাহলে যখন আমার দুঃখ-কষ্ট আসবে তখনও আমাকে খুব ভাল করে এটা মাথায় রাখতে হবে, এই দুঃখ-কষ্ট যা আসছে সব তাঁরই কৃপা। পওহারি বাবার গুহায় কাল সাপ ঢুকেছে, তিনি হেসে বলছেন, আমার প্রিয়তমের দূত এসেছে। এত দূর আমরা পারব না, আমাদের সেই ক্ষমতা নেই। কিন্তু একবার এটা বলা যে, এখন আমার বিশ্বাস নেই, তার মানে আমার এতদিন বিশ্বাসটা ঠিক ছিল না। স্বাভাবিক ভাবেই তাহলে মনে প্রশ্ন উঠবে, বিশ্বাসটা ঠিক কেন থাকে না? ঠিক থাকে না কারণ তত্ত্বটা জানা নেই। তত্ত্ব জানা থাকলে এই বিশ্বাস নড়বে না। যিনি জানেন আমার এই অবস্থায় ডাক্তারই হলেন একমাত্র ভরসার জায়গা। তিনি তখন ডাক্তারের উপর সব ছেড়ে দেন, ডাক্তারবাবু আপনি যা ভাল বুঝেছেন তাই করুন। এনারা হলেন উত্তম রোগী। তেমনি ভাল ভক্তও হয়, প্রভু, তুমি আমাকে মারবে, এই আমি মাথা পেতে দিলাম; ভাল কিছু দেবে, এই আমি মাথা পেতে দিলাম। এর জন্য আগে ঈশ্বরীয় তত্ত্ব বুঝতে হয়। সেইজন্য গীতায় ঘুরে ঘুরে কখন ঈশ্বর তত্ত্ব, কখন সৃষ্টি তত্ত্ব, কখন জীব তত্ত্ব, সব রকম তত্ত্ব নিয়ে আসছেন। এখন ভগবান গীতায় সৃষ্টি তত্ত্বকে নিয়ে আসছেন।

উনিশ নম্বর শ্লোক শুরু করার আগে কয়েকটা জরুরী কথা বলা দরকার। এই কথাগুলো আমরা হয়ত অনেকবার অনেক আলোচনায় শুনেছি, তা সত্ত্বেও আরও একবার শোনা দরকার। হিন্দুদের মূল গ্রন্থ হল বেদ। বিভিন্ন জিনিসকে, জীব বলুন, জগৎ বলুন, ঈশ্বর বলুন, বেদে বিভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে। পরবর্তি কালে যে ঋষিরা এলেন, এনারা কেউ সাধারণ ছিলেন, কিন্তু সবাই অনুভূতি সম্পন্ন জ্ঞানী পুরুষ। কপিল মুনি সাংখ্য দর্শন দিলেন, পতঞ্জলি যোগ দর্শন দিলেন, এনারা খুবই উচ্চমানের ঋষি ছিলেন। এনারা জীবন দর্শন, জীবন দর্শন যেখানে জীব আছে, জগৎ আছে, চৈতন্য বা ঈশ্বর আছেন, এই তিনটে জিনিসকে ব্যাখ্যা করেছেন।

হিন্দুদের ছয়টি দর্শন, যাকে ষড়দর্শন বলা হয় –সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশাষিক, মীমাংসা আর বেদান্ত। এই ষড়দর্শনে সাংখ্য দর্শন হল মূল দর্শন। সাংখ্য দর্শনের প্রণেতা কপিল মুনিকে স্বামীজী বলছেন, father of Indian philosophy। সাংখ্য দর্শন বর্তমান কালে কেউ তেমন পড়েন না, ডিগ্রি কোর্সে যাঁরা দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করেন, তাঁদের সাংখ্য দর্শন পড়তে হয়। কিন্তু যোগ দর্শন এখনও প্রচুর মানুষ পড়াশোন করেন। যোগ দর্শন পড়তে গেলে সাংখ্য দর্শনকে ভাল করে অধ্যয়ন করতে হয়। কারণ সাংখ্য দর্শন না বুঝলে যোগ দর্শন বোঝা যাবে না।

সাংখ্য দর্শনে পুরুষ আর প্রকৃতির কথা বলা হয়, পুরুষ হলেন চৈতন্য এবং প্রকৃতি হল জড়। পদার্থ মানেই এনার্জি। বিংশ শতাব্দীতে আইনস্টাইন এসে বললেন, এনার্জি আর ম্যাটার সমান, অর্থাৎ এনার্জি যা ম্যাটারও তাই। এই তত্ত্ব আমরা অনেকদিন আগে থেকেই জানি। যুক্তিবাদীরা দিনরাত বিজ্ঞান বিজ্ঞান করে যাচ্ছে, আর বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে যুক্তিবাদীরা আমাদের আক্রমণ করে। বিজ্ঞানই জানত না যে, এনার্জি যা ম্যাটারও তাই, দুটো জড়িয়ে আছে। নিউটন এসে ফিজিক্সের খুব নামকরা ইক্যুয়েশান নিয়ে এলেন –কাইনেটিক এনার্জি, এনার্জি = হাফ্ এমবি স্কয়ার। তিনি দেখালেন কিভাবে ম্যাটার আর এনার্জি এক অপরের সাথে জড়িয়ে আছে। আইনস্টাইন এসে বললেন, ম্যাটারও যা এনার্জিও তাই। এই জিনিসটা আমাদের ঋষিরা হাজার হাজার বছর আগে থেকে জানতেন, শুধু জানতেন না, এই জিনিসটাকে নিয়ে, ঠিক এইভাবে না, একটা আলাদা দর্শন দাঁড় করিয়ে দিলেন, আমরা তাই জানি জিনিসটা কি।

প্রকৃতি হল ঈশ্বরের পিওর এনার্জি, যেখান থেকে সমস্ত পদার্থ বেরিয়ে আসে। প্রকৃতি হল ত্রিগুণাত্মিকা, সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটে গুণের সমাহার। প্রকৃতি হল পিওর এনার্জি, সমস্ত পদার্থ মিলে প্রকৃতি। ইদানিং কালে অনেক বলে God is energy; না, God is not energy, Prakriti is energy। ঈশ্বর হলেন এগুলোর পারে। এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রথম থেকে ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ আর তার সাথে ঈশ্বর, এই তিনট জিনিসকে নিয়ে বলে যাচ্ছেন। ক্ষেত্র হল প্রকৃতির এলাকা, ক্ষেত্রজ্ঞ হল আমাদের সবার ভিতরে যে চৈতন্য রয়েছে, আর ঈশ্বর। বলছেন, ঈশ্বর আর ক্ষেত্রজ্ঞ সমান। এবার এই বলে শুরু করছেন –

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদি উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্।।১৯।।

(প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে অনাদি বলে জানবে। বুদ্ধি আদি দেহেন্দ্রিয় পর্যন্ত বিকারসমূহ এবং সুখ-দুঃখ ও মোহাত্মক গুণসমূহ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন বলে জানবে।)

সৃষ্টি তত্ত্বকে নিয়ে বলছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঈশ্বর আছেন। হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরকে সচ্চিদানন্দ বলা হয়, তিনি নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম। সেই নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম, যে কোন কারণেই হোক, আমরা জানি না কেন, তিনি ঠিক করলেন সৃষ্টি করবেন। যেমনি তিনি ইচ্ছা করলেন, এই ইচ্ছাটাই তাঁর শক্তি। তখন নির্গুণ ব্রহ্ম হয়ে যান সগুণ ব্রহ্ম, তিনি হয়ে যান ঈশ্বর। আর তাঁর এই দুটি প্রকৃতি, পুরুষ আর প্রকৃতি তাঁর থেকে বেরিয়ে চলে আসে। এই জায়গাতে এসে যাঁরা প্রথম এই কথাগুলো শুনছেন তাঁদের বুঝতে কঠিন হয়ে যাবে। কিন্তু যখনই মনে হবে বুঝতে কঠিন হয়ে যাচ্ছে, তখন দুবার তিনবার শুনলে পরিষ্কার হয়ে যাবে, একটু খাটতে হবে। স্কুল কলেজে বিদ্যার্জনের জন্য কত খেটে ডিগ্রি পেতে হয়, সঙ্গীত বিদ্যা শিখতে হলে কত অনুশীলন করতে হয়, জাতীয় স্তরে ভাল খেলোয়াড় হতে গেলে কত পরিশ্রম করতে হয়। আর এদিকে লোকেরা মনে করে এমনি এমনি দুটো তিনটে লেকচার শুনে ধর্ম তত্ত্ব শিখে নেবে।

খুব সহজ করে বলা হচ্ছে, সচ্চিদানন্দ নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম। তিনিই একমাত্র সত্য। ঠাকুর এটাকে আরও সহজ করে বলছেন, জল স্থির থাকলেও জল, জল হেললে দুললেও জল। এই জল যখন হেলতে দুলতে শুরু করে, কেন হেলতে দুলতে শুরু করে আমরা জানি না; কারণ তখন নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। তিনি ইচ্ছা করলেন, আমি এক আমি বহু হব। কেন তিনি ইচ্ছা করেন, কারুর পক্ষে জানা সম্ভব না। কারণ তখন মন ছিল না। যেমনি তিনি ইচ্ছা করলেন, তখন মনের জগৎ এসে যায়। মনের জগৎ যেমনি এসে যায়, তখন পুরুষ আর প্রকৃতি এসে যায়। পুরুষ হলেন প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে জীবাত্মা রয়েছে, যেটা আগে বলা হল, এই জীবাত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ, এই দেহ হল ক্ষেত্র। ভগবান বলছেন, *প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদি উভাবপি*, এই পুরুষ আর প্রকৃতি দুটোকেই অনাদি বলে জানবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, সাংখ্য আর যোগ দর্শনে এনারা বলছেন, পুরুষ আর প্রকৃতি অনাদি, কিন্তু দুজনের কেউই ঈশ্বর মানে না। লোকেদের ভুলভাল ধারণা যে, হিন্দুরা পৌত্তলিক, মূর্তি পূজা করে। অথচ হিন্দুদের মূল যে দুটো দর্শন সাংখ্য আর যোগ ঈশ্বরকেই মানে না। যদিও যোগ-দর্শন ঈশ্বরের কথা বলে, কিন্তু আমরা যেভাবে ঈশ্বর বলে জানি, সেভাবে তাঁরা মানেন না। মীমাংসা দর্শন, বেদের কর্মকাণ্ড নিয়ে যাঁরা চলেন, হিন্দুদের আরেকটা খুব শক্তিশালী দর্শন; তাঁরাও ঈশ্বর মানেন না। গীতা হল সমন্বয় শাস্ত্র, গীতা সব কটা দর্শনকে এক জায়গায় নিয়ে আসছেন। সাংখ্য, যোগ এই দর্শনগুলিকে গীতা বেদান্তের সাথে সমন্বয় করিয়ে দিচ্ছেন। বর্তমান কালে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা conscious নিয়ে প্রচুর গবেষণা করছেন। তাঁরা বোঝার চেষ্টা করছেন, পদার্থ কি, চৈতন্য কি। তাঁদের কাছে চৈতন্য হল মন। চৈতন্য যে আত্মা, এটা তাঁরা বোঝেন না, ধারণাতেই নেই। আমাদের কাছে মনটাও জড় পদার্থ। প্রথম প্রথম এই কথাগুলো শুনলে বুঝতে কঠিন মনে হবে। শুনতে শুনতে একদিন নিজে থেকেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। ক্লাশ ওয়ান, ক্লাশ টু, ক্লাশ থ্রী যেমন ধাপে ধাপে বিদ্যা অর্জন হয়, এখানে এভাবে হয় না। এটা হল মিছরির রুটি, সবটাই মিলে মিশে রয়েছে।

সমস্যা হল আমরা যদি সাংখ্য আর যোগ দর্শনকে মেনে নিই, যেখানে পুরুষ আর প্রকৃতি, চিজ্জড়গ্রন্থির কথা বলছেন, এখানে আচার্য বলছেন, ব্যাকরণের কিছু নিয়মকে যদি মনে রাখা হয়, তাহলে পুরুষ আর প্রকৃতি এই দুটোকে স্বাধীন সত্তা রূপে নেওয়া যায়। এটা অবশ্য কিছু লোকের মত। যোগ দর্শনের সমস্যা হল, যোগে ঈশ্বরকে বলা হয় সর্বজ্ঞ, তিনি গুরুরও গুরু, কিন্তু পুরুষ আর প্রকৃতি আলাদা। তাহলে কিসের ঈশ্বর? ঠাকুর এটা খুব সহজ করে বলছেন, যে বাবুর বাগান নেই, বাড়ি নেই, সেই বাবু কিসের বাবু! যে ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ নন, যে ঈশ্বরের কোন কিছুই নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নেই, সেই ঈশ্বর কিসের ঈশ্বর! আচার্যের যুক্তি খুব সহজ যুক্তি, পুরুষ আর প্রকৃতি যদি স্বাধীন হয়, দুজনেই স্বাধীন ভাবে যদি সৃষ্টি করতে থাকে, যেমন যোগ দর্শনে বলছেন, তাহলে তো কোথাও গিয়ে দর্শনটা এলেমেলো হয়ে যাবে। সাংখ্য ও যোগদর্শনের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে; যেমন সাধনা কিভাবে করতে হয়, এটা যোগ দর্শনে খুব সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্য দিকে সাংখ্য দর্শন তত্ত্ব নিরুপণ খুব সুন্দর ভাবে করে। কিন্তু শেষ পর্যায়ে গিয়ে তাঁরা দাঁড়াতে পারেন না। ঠাকুরের ভাষায় দুটো দর্শনই হয়ে যায়, আমার মামার গোয়ালে অনেক ঘোড়া আছে, অর্থাৎ তত্ত্ব কথায় গিয়ে এলেমেলো করে ফেলে।

আপনি একদিকে বলছেন পুরুষ আছে, প্রকৃতি আছে, ঈশ্বরও আছেন। ঈশ্বর হলেন পরমগুরু, সর্বজ্ঞ অথচ তাঁর সৃষ্টি করার কোন ক্ষমতা নেই, কোন কিছু নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নেই, ষড়ৈশ্বর্য তাঁর নেই, তাহলে তিনি কিসের ঈশ্বর! কারণ ঈশ্বর শব্দের অর্থই হয়, যিনি নিয়ন্তা। যদি পুরুষ আর প্রকৃতিকে দিয়ে প্রথম থেকেই নিয়ন্ত্রণ না করতে থাকেন, তাহলে তিনি কিসের ঈশ্বর! তার মানে এটাই দাঁড়ায় যে, এই জগতের আসল কর্তা ঈশ্বর; পুরুষ আর প্রকৃতির মাধ্যমে তিনি সব কিছু করেন।

কারণটা খুব সুন্দর বলছেন, সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান যেখানে বলছেন, আমার দুটো প্রকৃতি, পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃত। এখন ভগবান যদি নিত্য হন, অর্থাৎ অনাদি যদি হন, তাহলে স্বাভাবিক ভাবে তাঁর প্রকৃতিকেও অনাদি হতে হবে। আমি যেদিন জন্ম নিয়েছি, সেই সময় আমার প্রকৃতিও জন্ম নিয়েছে। সেই প্রকৃতি আস্তে আস্তে খুলছে, কেউ বলবে ভাল মানুষ, কেউ বলবে বদমাইস লোক, কেউ বা দু চারটে বিভিন্ন রকম কথা বলবে। সে যাই হোক, এই প্রকৃতি সেই দিন জন্ম নিয়েছে যেদিন আমি জন্ম নিয়েছি। ঠিক তেমনি ঈশ্বর যেদিন থাকে আছেন, সেদিন থেকেই পুরুষ আর প্রকৃতি আছে। সেইজন্য পুরুষ আর প্রকৃতি দুটোকেই অনাদি মনে করাটা পুরোপুরি ঠিক। সৃষ্টি কবে হয়েছে? যবে থেকে ঈশ্বর আছেন। এবার বার করে নিন, ঈশ্বর কবে থেকে আছেন। এগুলো অত্যন্ত সহজ যুক্তি।

বাইবেলকে খ্রীশ্চানরা বাইবেল বলেই মনে করে, বাইবেলের সমস্ত কথা সত্য বলে বিশ্বাস করে। বাইবেলের সমস্ত কথা যদি সত্য হয়, তাহলে আদম আর ঈভকে স্বর্গ থেকে যখন বিতাড়িত করে দেওয়া হল, তারপর সেখান থেকে যে বংশ পরম্পরাগুলি চলতে শুরু হল, কে কত বছর বেঁচে ছিল, সবাই হিসাব করতে বসে গেল। চার্চের এক বড় ফাদার তিনি সব যোগ করে, হিসাব করে বার করলেন –এই সৃষ্টি চার হাজার আটাশ বিসিতে হয়েছিল। যাঁরা বিজ্ঞান জানেন তাঁরা এই কথা শুনে হাসতে শুরু করবেন। আইজ্যাক নিউটনের মত অত বড় বিজ্ঞানী, তিনি আবার ওটাকে আরও ভাল করে হিসাব নিকাশ করতে বসে গেলেন, সব দিক হিসাব কষে তিনি বললেন, এই সৃষ্টির বয়স চার হাজার আটাশ না, চার হাজার বত্রিশ বিসি হবে। সবাই বলে, ধর্ম কি বিজ্ঞান সম্মত? নিউটনের মত একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বলছেন, সৃষ্টি কবে হয়েছে? চার হাজার বত্রিশ বিসিতে, অর্থাৎ এখন আমরা চোখের সামনে যে সৃষ্টিকে দেখছি, এই সৃষ্টি আজ থেকে প্রায় ছয় হাজার বছর আগে হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, আমাদের বেদ তার থেকেও পুরনো। যেমনি বিজ্ঞান দেখাতে শুরু করল, এই সৃষ্টি লক্ষ কোটি বছরের পুরনো; সমস্ত চার্চ এই বিজ্ঞানীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। খ্রীশ্চান বিরোধী এই সব কথা বলা তোমরা বন্ধ কর, নাহলে তোমাদের সবাইকে শেষ করে দেওয়া হবে। এখন আর কিছু করার নেই, মানতে বাধ্য হয়েছে, বিজ্ঞানীরা দেখছেন প্রায় পনেরশ কোটি বছর আগে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা তো বিজ্ঞানসম্মত ভাবে দেখিয়ে দিলেন কত কোটি বছর আগে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল। তাহলে এখন বাইবেলের কি হবে? যে কোন ধর্ম শাস্ত্রকে যদি ধরা হয়, আর ওর ভিতরে যদি ঢুকতে শুরু করা হয় তাহলে, একটা কুমড়োর মধ্যে যদি একটা ডিনামাইট লাগিয়ে ওকে ফাটানো হলে কুমড়োর যে দুরবস্থা হবে, এদের থিয়োলজির সেই দুরবস্থা হবে। ধর্মের কিছু হবে না, যেটা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, তার কিছু হবে না। আমাদের সৃষ্টি তত্ত্ব বলে সৃষ্টি অনাদি, ঈশ্বর অনাদি। ঈশ্বর কবে থেকে আছেন, এই প্রশ্নই হয় না। সৃষ্টি কবে থেকে আছে, এই প্রশ্ন হয় না। সৃষ্টি নাশ হয়ে গেলে কতদিন সৃষ্টি এভাবে থাকবে? এই ধরণের কোন প্রশ্ন হয় না। সৃষ্টি নাশ হয়ে যাওয়ার পর আবার কবে সৃষ্টি হবে? কোন প্রশ্ন হয় না। কারণ সৃষ্টি মানেই মনের জন্ম, যত প্রশ্ন মনের এলাকাতে, মনের এলাকার পারে কি আছে এই প্রশ্ন হয় না। সৃষ্টি যখন শেষ হয়ে যাবে, তার মানে এনার্জি ম্যাটার, মন সব মিলে ঈশ্বরের মধ্যে মিলে এক হয়ে যাবে। তখন তিনি আর ঈশ্বর থাকবেন না, কারণ কাউকে নিয়ন্ত্রণ করার মত কেউ নেই কিনা। কিছুই তো নেই, কাকে কিভাবে কে নিয়ন্ত্রণ করবেন, এটাকেই বলছেন নির্গুণ ব্রহ্ম।

অনেকে বলতে পারেন, সাংখ্য দর্শন তো ঈশ্বরকে মানে না, ঈশ্বরকে না মানলেই তো ঝামেলা চুকে যায়। সমস্যা হল, ঈশ্বর যদি কর্তা না হন, তাহলে তো ঈশ্বর অনীশ্বর হয়ে গেলেন, কারণ ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই। তার থেকে ভাল বাপু ঈশ্বরকে উড়িয়ে দাও। ঈশ্বরকে যদি

উড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে ধর্মে তখন আরও বেশি সমস্যা এসে যাবে। সব থেকে বড় সমস্যা হবে, আমার আপনার কাছে এই জগতের খেলা, এই জগতের লীলা কোন দিন শেষ হবে না। পুরুষ প্রকৃতি যদি নিজের মত খেলা করে যেতে থাকে, এই খেলা কোন দিন শেষ হবে না। তার মানে কেউ যদি মুক্তি পেতে চায়, তার কোন দিন মুক্তি হবে না, বন্ধন আর মুক্তির ব্যাপারটাই নিরর্থক হয়ে যাবে, যদি ঈশ্বরকে উড়িয়ে দেওয়া হয়। নাগরদোলায় আমরা বসে আছি, নাগরদোলা ঘুরে যাচ্ছে, এই উপরে যাচ্ছি, এই নীচে নামছি – এই খেলা কোন দিন শেষ হবে না। যোগশাস্ত্রে বা সাংখ্যে যেমন বলা হয়, পুরুষ প্রকৃতির যখন মিলন হয় তখন এই সংসার। আলাদা যখন হয় তখন মুক্তি। ঠিকই বলছেন, কিন্তু পুরুষ প্রকৃতির তো আবার মিলন হবে, তখন যে সংসার আসবে, তাতে আবারও সেই সংসার খেলায় আমরা সবাই অংশগ্রহণ করতে চলে আসব। তাহলে কিসের মুক্তি হল? এর থেকেও বড় সমস্যা হল, ঈশ্বরকে যদি উড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে শাস্ত্রের আর কোন দরকার থাকবে না। সমস্ত শাস্ত্র নিরর্থক হয়ে যাবে। আমি বহু কষ্ট করে, অনেক টাকা পয়সা খরচ করে গঙ্গোত্রী গেলাম। সেখানে গিয়ে আমি বলছি, আমি গঙ্গাকে দেবী মনে করি না। তাহলে এত কষ্ট করে আমি কেন এখানে এলাম। না, আমি ভ্রমণ পিপাসু। ঠিক আছে, আপনি একজন ট্যুরিস্ট, এত কষ্ট করে তো আসার আপনার কোন দরকার ছিল না। অনেক কম কষ্ট করে এর থেকেও অনেক ভাল ভাল জায়গায় ঘুরতে যেতে পারতেন। উদ্দেশ্য সব সময় পরিষ্কার থাকতে হবে। আপনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন, আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করছেন, তাহলে মুক্তি আপনার কাছে সত্য, আপনার কাছে ধর্মগ্রন্থ সত্য, প্রকৃতি আর পুরুষ এটা সত্য, ঈশ্বরও সত্য। ঈশ্বর যদি সত্য না হন তাহলে এর সব কিছুই মিথ্যা হয়ে যাবে।

আরও একবার যুক্তিটা বলা হচ্ছে। বিভিন্ন দর্শনকে এনে এখানে প্রশ্ন উঠছে, ঈশ্বর থাকবেন, কিন্তু প্রকৃতি আর পুরুষকে যদি স্বাধীন মনে করে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে কি হবে? তার উত্তর হল –তাহলে ঈশ্বর শব্দটাই মিথ্যা হয়ে যাবে। ঈশ্বর শব্দের মানেই যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। পুরুষ আর প্রকৃতিকে যদি স্বাধীন মনে করা হয়, তাহলে ঈশ্বর একটা ঢ্যামনা সাপের মত হয়ে যাবেন, যেটা কোন কাজের না। তাহলে ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু ঈশ্বরকে যদি বাদ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তো শাস্ত্রগুলি মিথ্যা হয়ে যাবে। এই শাস্ত্রগুলি কত পুরনো, কত হাজার হাজার বছর ধরে শাস্ত্রগুলি চলে আসছে। গীতা খুব কম করে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে রচিত হয়েছে। যে বেদ দশ হাজার বছরের পুরনো, সেই বেদ-উপনিষদের সারটুকুকে টেনে গীতা এক জায়গায় এনে সবার উপযোগী এক সার্বজনীন দর্শনকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। ঈশ্বরকে বাদ দিলে বেদ, উপনিষদ, গীতা, পুরাণাদি এই শাস্ত্রগুলি মিথ্যা হয়ে যাবে। একেবারে পরিষ্কার যুক্তি। আশা করি আপনারা যুক্তিটা ধরতে পেরেছেন। আমরা আবার গীতার ঊনিশ নম্বর শ্লোকের মূল আলোচনায় ফিরে আসছি।

বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্, প্রকৃতির যখন বিবর্তন হতে শুরু হয়, মানে প্রকৃতি থেকে আসছে মহৎ, মহৎ থেকে অহঙ্কার, অহঙ্কার থেকে সূক্ষ্ম ভূত, স্থূল ভূত, স্থূল ভূত থেকে ইন্দ্রিয়াদি, এগুলো সব বেরোচ্ছে প্রকৃতি থেকে। এখানে বক্তব্য হচ্ছে পুরুষ যিনি, যাকে চৈতন্য বলা হচ্ছে, আত্মা যিনি তাঁর কখনই কোন রকমের বিকার বা বিবর্তন হয় না। যা কিছু বিকার, পরিবর্তন সব প্রকৃতিতেই হয়, আত্মাতে এই ধরণের কিছু হয় না। এই জায়গাটাকে আমরা অনেকেই ধরতে পারি না, এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। যে জিনিসের পরিবর্তন হয় সেটাই প্রকৃতির অন্তর্গত। আমাকে কেউ প্রশংসা করলে মনটা খুশিতে ডগমগ হয়ে গেল, কেউ গালাগাল দিলে মনটা বিমর্ষ হয়ে গেল। তাহলে মনটা এক সময় ভালো থাকছে, অন্য সময় খারাপ থাকছে, মনটা তাই জড় পদার্থ বা প্রকৃতির এলাকার বস্তু হয়ে গেল। আমরা ছোটবেলা থেকে শিক্ষা পেয়ে এসেছি যে মনই সব, মনের বাইরে আর কিছু নেই। কিন্তু বেদান্তে ও সাংখ্যে মন অতি সাধারণ একটি জড় পদার্থ। আমাদের এই শরীরের যাবতীয় যা কিছু আছে সবই বয়স বাড়ার সাথে সাথে পাল্টে যাচ্ছে, তাই

এই শরীরের সব কিছুই জড় পদার্থ। মহাকাশে যত নক্ষত্র, তারা, নক্ষত্রপুঞ্জ, এই পৃথিবীর যা কিছু আছে সবই প্রকৃতির অন্তর্গত। বিকারধর্মী যা কিছু আছে সবই প্রকৃতি মানে জড়। তাহলে পুরুষ আর প্রকৃতির স্বভাব কি?

কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।।২০।।

(প্রকৃতি কার্য এবং করণের উৎপত্তির কারণ এবং পুরুষ (জীব) সুখ ও দুঃখসমূহের উপলব্ধির কারণ বলেই কথিত হন।)

প্রথমে ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞ দিয়ে বলেছিলেন, এটাকেই এবার প্রকৃতি আর পুরুষ দিয়ে বলছেন। এই জগতে আমরা যাবতীয় যা কিছু দেখছি, এটা হল প্রকৃতি। আর এই প্রকৃতিকে যিনি ভোগ করেন, তিনি হলেন পুরুষ। পদার্থ আর শক্তির যত বিবর্তন, এটা হল প্রকৃতি। পদার্থ আর শক্তি যাঁর জন্য, যিনি এগুলোকে ভোগ করেন তাঁকে বলছেন পুরুষ। খুব সহজ ভাষায় এটাই পুরুষ ও প্রকৃতির সংজ্ঞা। যেমন, আমার একটা বাড়ি আছে, বাড়িটা হল প্রকৃতি। বাড়িকে ভোগ করার জন্য আমি আছি, আমি হলাম সেই পুরুষ। এখানে আমরা এই ভুল যেন না করি, পুরুষ আর প্রকৃতি মানে ব্যাটাছেলে আর মহিলা নন। প্রকৃতি মানে জড়, প্রকৃতি মানে শক্তি, প্রকৃতি মানে যেখানে চৈতন্যের অভাব, প্রকৃতি মানে যিনি পুরুষের চৈতন্যকে ধার করে চালান।

কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে, এগুলো অনেক পুরনো শব্দ হওয়ার জন্য এর অনেকগুলো অর্থ নিরুপণ করা হয়। কিন্তু যেটা বলা হল, এটাকেই মূল রূপে মনে রাখতে হবে। সব সময় আমাদের কল্পনা করতে হবে, একটা গাড়ী, গাড়ীটা প্রকৃতির মত। আর গাড়ীতে যিনি চড়েন, তিনি হলেন পুরুষের মত। যখন পাঁচটা জিনিসকে মিশিয়ে একটা জিনিস করা হয়, যেমন সংসার, পাঁচটা জিনিসকে মিশিয়ে একটা জিনিস করা হচ্ছে, এটা হল প্রকৃতি। সেই প্রকৃতিকে যিনি ভোগ করেন, তিনি পুরুষ। বলবেন, যিনি ভোগ করছেন তিনিও তো অনেক কিছু। না, পুরুষ বা আত্মা single, এটাকে বোঝানর জন্যই এই ধর্মশাস্ত্রগুলি দরকার।

কার্য-করণ, কার্যের একটা অর্থ হয় দেহ, আর দেহের সাথে যুক্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে বলছেন করণ। দশটি ইন্দ্রিয় আর মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার, এগুলো সব করণ। এই সমস্ত কিছু প্রকৃতি। এটাকে ভোগ করার জন্য যিনি আছেন, যেমন চোখ দেখার জন্য, চোখকে ভোগ করার জন্য যিনি আছেন, তিনি হলেন সেই আত্মা, তিনিই হলেন সেই পুরুষ। সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছিল, *ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ*, সেখানে এই জিনিসগুলিকে প্রকৃতি বলা হচ্ছে। *কার্যকরণকর্তৃত্বে*, কার্য মানে এখানে শরীর আর করণ এই ইন্দ্রিয়গুলো, কর্তৃত্ব হচ্ছে আমি কাজ করছি এই বোধ হওয়া। যত রকমের কার্য ও কার্যের যত রকমের রূপ, তার করণ আর এই বোধ যে আমি করছি, এগুলো সবই *প্রকৃতিরুচ্যতে*, প্রকৃতির অন্তর্গত। তার মানে কার্য হল দেহ, আর করণ হল ইন্দ্রিয়াদি। এর যিনি কর্তা তিনি হলেন প্রকৃতি। প্রকৃতি থেকে শরীর ইন্দ্রিয়াদি আসে।

এর দ্বিতীয় আরও একটা অর্থ হতে পারে। *কার্যকরণকর্তৃত্বে*, এটাকে ব্যাকরণের নিয়মে অর্থ করা হয়। এখানে বলছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত রকমের বিকার আছে, চব্বিশ তত্ত্ব বলা হয়, এর তেইশটি তত্ত্ব প্রকৃতি থেকে বের হয়, সেইজন্য প্রকৃতি হলেন *কার্যকরণকর্তৃত্বে*। একটা সমষ্টির স্তর থেকে বলছেন, আরেকটি বলছেন ব্যষ্টির স্তর থেকে। ব্যষ্টির স্তরে দেহ মনকে নিয়ে বলছেন। আর সমষ্টির স্তরে সব কিছুকে মিলিয়ে বলছেন। দুটো ক্ষেত্রে যিনি ভোগ করার জন্য আছেন, তিনি হলেন আত্মা। ভোগ করেন আত্মা, তা আমার আপনার দেহের আত্মাই হন আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আত্মাই হন।

প্রকৃতিই সব কিছুর কারণ, এনার্জিই সব কিছুর কারণ, পদার্থ সব কিছুর কারণ, কিন্তু এর টেকনিক্যাল শব্দ হল প্রকৃতি।

পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে, পুরুষই সব কিছু ভোগ করেন। কি করে ভোগ করেন? সুখ আর দুঃখ রূপে। কিন্তু পুরুষের তো কোন বিকার নেই, আত্মার তো কোন বিকার হয় না। তাহলে কার বিকার হয়? মনের বিকার হয়। ধর্ম জীবনের কেন দরকার? এই জায়গাতে এসে বোঝা যায়। এই জগৎ আছে, এই জগৎকে ধরে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়গুলিকে যোগান দেয় মন, এই তিনজনই হল এক বাড়ির সদস্য। পরিবারে নিজেদের ভিতর যতই ঝগড়া-ঝাটি থাকুক, যাই খেয়োখেয়ি থাকুক, কিন্তু সবাই এক পরিবারের, ঠিক সময়ে একজোট হয়ে যায়। এই পেন আছে, পেন একটা বস্তু, চোখ দেখছে পেনকে, আর মন ইন্দ্রিয়কে চালিত করছে, তিনজন একই পরিবারের।

এখন শরীর, মন, ইন্দ্রিয়, বস্তু এগুলো এক পরিবারের লোক, আত্মা অন্য ঘরের। সাহিত্যে magical realism বলে একটা শব্দ আছে, জিনিসটা কেমন একটা যেন সত্য বলে বোধ হয়, অথচ ম্যাজিক্যাল। যেমন এ্যলিজিন ওয়াণ্ডার্ল্যাণ্ডের কাহিনী খুব নামকরা কাহিনী, পুরো জিনিসটাকে সত্য বলে বোধ হচ্ছে, কিন্তু পুরো জিনিসটা কাল্পনিক, ম্যাজিক্যাল। বেশির ভাগ সাহিত্যই simply realism, উচ্চমানের সাহিত্য হল magical realism। এই সৃষ্টি, এই জগৎটা হল magical realism। সত্য বলে বোধ হচ্ছে, কিন্তু আসলে সবটাই মায়ার খেলা, এটাই আশ্চর্যের। এ্যলিজিন ওয়াণ্ডার্ল্যাণ্ডের কাহিনীতে কিভাবে সে গর্তের মধ্যে পড়ে গেছে। সেখানে তার সব কিছু সত্য বলে বোধ হচ্ছে, কিন্তু সবটাই স্বপ্ন।

জগৎটা ঠিক তাই, কিভাবে আমরা গর্তে পড়ে গেছি, সেখান থেকে সব কিছু সত্য বলে বোধ হয়। এই যে সত্য বলে বোধ হওয়া, এই magical realismএর জন্য কি হয়, আত্মা যিনি ভিতরে রয়েছেন, তিনি মনের নানা রকমের খেলার সাথে এক হয়ে গিয়ে মনের সুখে সুখী হন, মনের দুঃখে দুখী হন। এটাই এখানে ভগবান বলছেন, *পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে*। ইন্দ্রিয় যখন নিজের মনের মত জিনিস পায় না, ইন্দ্রিয় সেখান থেকে ফেরৎ চলে আসে। ইন্দ্রিয় ফেরৎ চলে আসে বলে মন কুঁকড়ে যায়। মন যখন কুঁকড়ে যায়, তখন মন খারাপ হয়ে গেল, মন খারাপ হয়ে যাওয়া দেখে আত্মা মনে করে আমার মন খারাপ লাগছে। সন্তানের যদি মন খারাপ হয়, মায়েরও মন খারাপ হয়ে যায়। মনের সাথে জড়িয়ে আত্মা ঠিক এইভাবে আচরণ করেন। আত্মার আসলে কোন দুঃখ হওয়ার কথা না, সুখে আহ্লাদিত হওয়ার কথা না। কিন্তু তাও হয়ে যায়, কারণ গায়ের জোরে আত্মা মনের সাথে নিজেকে জুড়ে নিয়েছে।

জুড়ে যাওয়া নিয়ে আমাদের অনেক কাহিনী আছে। আমরা সবাই কেমন এক অপরের সাথে নিজেকে জুড়ে ফেলি। বিশেষ করে যারা সরল মনের হন, কেউ একটু সাহায্য চাইতে এলো, সরল মনের মানুষ সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়ে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়। তারপর দেখা গেল, যাকে সাহায্য করতে গেল তার পুরো সমস্যা, পুরো ঝামেলা তার উপর চেপে বসে গেল। হঠাৎ একদিন তার মনে হল, আমি কেন ওর সমস্যা, ঝামেলা বয়ে বেড়াচ্ছি? তখন তার বেরোবার আর কোন পথ থাকে না। ঠিক এইভাবে পুরুষ প্রকৃতির পাল্লায় পড়ে, প্রকৃতির সাথে জুড়ে গিয়ে আর ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না।

কঃ পুনঃ অয়ং সংসারো নাম, জিজ্ঞেস করছেন সংসার জিনিসটা কি। সংসার কি? এটাকে খুব ভাল করে মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নিন –*সুখদুঃখসংভোগঃ সংসারঃ পুরুষস্য চ সুখদুঃখানাং সংভোক্তৃত্বং সংসারিত্বম্ ইতি*, সুখদুঃখের ভোগ, এটাই সংসার। আমরা যত চেষ্টাই করি না কেন, এই সুখ আর দুঃখের বাইরে কোন ভাবেই যেতে পারব না। আর এর সাথে যে পুরুষ জড়িয়ে যায়,

এটাই হল তাঁর সংসারিত্ব। আত্মার কখন সংসারিত্ব হয় না। একজন জিজ্ঞেস করছিলেন, দেহ নাশের পর আমাদের চেতনার কি অবস্থা হয়? কি আর অবস্থা হবে, চেতনা যেমন আছে তেমনই থাকবে, কিছুই হয় না। মৃত্যুর পর যে প্রেত হয়েছে, চেতনা সেই প্রেতাত্মার সাথে ঘুরে বেড়ায়। এগুলো কোন প্রশ্নই না। এখন শুধু শুনে যান, ফাঁকা পাত্র একটু ভরতে দিন, তারপর প্রশ্ন করবেন। উপনিষদে আছে, কোন ঋষির কাছে কেউ প্রশ্ন করতে এলেই বলতেন, তুমি প্রশ্ন করতে এসেছ? খুব ভাল। কিন্তু তার আগে এখানে এক বছর থেকে তপস্যা কর, জপধ্যান কর; এক বছর পর তুমি প্রশ্ন করবে। যদি আমি উত্তর জানি, তাহলে বলব। যাই হোক এখানে অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে; তাহলে আত্মার মধ্যে এই সংসারী ভাব কেন আসে? এর উত্তর একুশ নম্বর শ্লোকে বলবেন।

আচার্য বললেন, *সুখদুঃখসংভোগঃ সংসারঃ*, সুখ আর দুঃখের ভোগ এটাই সংসার। এখন আমরা যে শ্লোকগুলির উপর আলোচনা করতে যাচ্ছি, এর মূল আলোচ্য বিষয় হল জ্ঞান ও ধ্যান। সমগ্র গীতা জুড়ে যা কিছু আলোচনা হয়, এর মূল কেন্দ্রবিন্দু আত্মা ও আত্মজ্ঞান। ঘুরে ঘুরে এই দুটোর উপরেই আলোচনা চলতে থাকে। এমনিতে গীতার প্রত্যেকটা অধ্যায় নিজের মধ্যে স্বতন্ত্র, আগে পিছনে কোন অধ্যায়ের সাথে সম্পর্ক নেই, কিন্তু আত্মা ও আত্মজ্ঞান ঘুরে ফিরে বারবার আসতে থাকবে। ভাগনে হৃদয়রাম ঠাকুরকে একদিন বলছেন, মামা তুমি একই কথা সবাইকে কেন বলতে থাক? ঠাকুর খুব বিরক্ত হয়ে গেছেন, যত বার খুশী আমি বলব, তাতে তোর কিরে শালা। নিজের ভাগনেকে শালা বলছেন, তার মানে ঠাকুর খুব রেগে গেছেন।

শুনে শুনে কখন আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয় না। একবিংশ শতাব্দীতে আজ ইউটিউবের সৌজন্যে শাস্ত্রের উপর, ধর্মের উপর কত আলোচনা শোনার সৌভাগ্য আমাদের হচ্ছে। আমাদের প্রায় সব সেন্টার থেকে মহারাজরা লেকচার দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু যতক্ষণ কেউ সেই অবস্থায় না পৌঁছে যাচ্ছে, যে কথাগুলি বলা হচ্ছে, সে নিজেও যদি সেই অবস্থায় না পৌঁছে যায়, কিংবা ওই অবস্থা থেকে ঠিক এক ধাপ পিছনে যতক্ষণ না পৌঁছাচ্ছে ততক্ষণ সে এই আলোচনাগুলি বুঝতে পারবে না। জাগতিক দৃষ্টিতে যদি দেখানো হয়, তাহলে বলা যেতে পারে, ক্লাশ টুতে যে পড়ছে তাকে ক্লাশ ফাইভের জিনিসগুলি যদি কেউ শেখাতে যায়, সে বুঝবে না। ক্লাশ টুয়ের ছাত্রকে একটু এগিয়ে দিলে আরেকটু এগিয়ে যাবে, এক পা এক পা করে এগোতে হয়। ধর্ম জগতেও তাই হয়। বর্তমান কালে ইন্টারনেটের দৌলতে ইমেইল হয়ে যাওয়াতে কত লোকের কত রকম কথা শুনতে পাই, কত বিভিন্ন রকম মন্তব্য পাই। কারুর কুণ্ডলীনি জাগরণ হচ্ছে, কেউ অনাহত ধ্বণি শুনতে পাচ্ছে, কারও ঈশ্বর দর্শন হচ্ছে। আমি যে এদের উত্তর দেব, কি উত্তর দেব, আমার নিজেরই এগুলোর কোনটাই হয়নি। অন্য দিকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসতেই থাকে –অশান্তি কিসে যাবে, ধ্যান কেন হয় না, মনের নিয়ন্ত্রণ কেন হয় না, সংসারে কিভাবে অনাসক্ত থাকা যায়? একটা পাথর অনাসক্ত থাকতে পারে না, পাথরের উপর অনবরত রোদ পড়ে, বৃষ্টি পড়ে, ঝড়ের দাপট ওর উপর দিয়ে বয়ে যায়, এগুলোর একটা প্রভাব পাথরের উপর পড়ে। কি করে পাথর অনাসক্ত থাকবে? সংসারের কোন প্রভাব আপনার উপর পড়বে না, তা কি কখন হয়! একটা পাথরেরও হয় না। সেখানে কি করে আপনি ভাবছেন, আপনার উপর সংসারে কোন প্রভাব পড়বে না! পাথরের থেকেও নীচে কিছু হয় কিনা আমার জানা নেই, যার উপর কোন প্রভাব পড়বে না। আমাদের শাস্ত্র কখন এই ধরণের উল্টোপাল্টা কথা বলেন না।

জগতে কার সমস্যা নেই, সবারই সমস্যা থাকে, সন্ন্যাসীদেরও সমস্যা থাকে। গীতা কতবার বলছেন, *অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্*, আমাদের জীবনের এই একটা কথা, কিন্তু কেউ তো শুনবে না। কারণ আমরা কত শত শত জন্মের অশুভ কর্মের পুটলি নিয়ে এসেছি। এই অজ্ঞান, এই দুঃখরাশি আমাদের এগোতেই দেবে না। বারবার বলা হচ্ছে এই সংসার হল শুধু দুঃখ আর দুঃখের সাগর, এটাকে ভাল করে বুঝতে হবে, *ইম প্রাপ্য ভজস্ব মাম্*, এটাকে বুঝে নিয়ে আমার

শরণাগত হও এবং শুধু আমার ভজনা করে যাও। সুখ-দুঃখ এটাই সংসার, এর উপর আমাদের আলোচনা চলছে। যীশুকে ক্রুশিফাই করে দিল, ভগবান বুদ্ধ অখাদ্য খাবার খেয়ে পেটের যন্ত্রণায় মারা গেলেন, শ্রীরামচন্দ্র বনে বনে চৌদ্দ বছর ঘুরে বেড়ালেন, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কারাগারে। জগতে কার কষ্ট নেই! আমি মনে করছি, শুধু আমারই কষ্ট আছে।

সুখ-দুঃখ কেন হয়? অজ্ঞানের জন্য, আত্মজ্ঞানের অভাব, তাই সুখ-দুঃখ। এখন আমাদের আলোচনার বিষয় হল ধ্যান ও জ্ঞান। কিসের সুখ, কিসের দুঃখ, আপনি তো শুদ্ধ আত্মা।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভূঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু।।২১।।

(পুরুষ (ভোক্তা, ক্ষেত্রজ্ঞ) প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়ে সুখ-দুঃখ-কার্য-করণরূপে পরিণত ও মোহাকারে অভিব্যক্ত প্রকৃতির গুণসমূহ ভোগ করেন। এই সকল গুণেতে আত্মভাবই পুরুষের দেবাদি সৎ জন্ম ও পশ্বাদি অসৎ জন্ম ও সদসদ্‌যোনিরূপে মনুষ্য-জন্ম-গ্রহণের প্রধান কারণ।)

একই কথা বিভিন্ন ভাবে বলছেন। আমরা সন্ন্যাসীরা তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে একই শাস্ত্র পড়ে যাচ্ছি, নিয়মিত পাঠ করে যাচ্ছি। অন্য কেউ এইসব শাস্ত্র পাঠ করার সময় এই কথাগুলো আমাদের কানে ভেসে এলে কত ভাল লাগে। কারণ আমরা এই ভাবের মধ্যেই আছি কিনা। শাস্ত্র পাঠ প্রথম করা হয় সাধনার জন্য, আর দ্বিতীয় পাঠ করা হয় এই ভাবের মধ্যে ডুবে থাকার জন্য। যতক্ষণ ঠাকুরের মত না হয়ে যাচ্ছেন, ততক্ষণ এগুলোকে নিয়েই থাকতে হবে। সাঁতার শেখার আগে প্রথমে চেষ্টা করে সাঁতার কাটতে হয়। সাঁতারে পটু হয়ে যাওয়ার পর জলের উপর শরীরটা ছেড়ে দিয়ে ভেসে থাকা যায়। বেদ, উপনিষদ, গীতা আদি সমস্ত শাস্ত্রে যখন এই রকম ভেসে থাকার ক্ষমতা এসে যাবে, তখন বুঝতে হবে তার মন এখন প্রস্তুতি নিয়েছে। যখন শাস্ত্রের কথা শুনে গলা দিয়ে আহা আহা কি শুনছি, নূতন শুনছি বলে আহা আহা করছে না, আমি জানি শাস্ত্র কি বলতে চাইছে, সেই আনন্দে ভাসছে। এবার তার সাধনা শুরু হবে।

এখানে বলছেন, প্রকৃতি সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণের সমাহার। আগেও আমরা এর উপর অনেকবার আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়ের পর চৌদ্দ নম্বর যে অধ্যায় আসছে, সেখানে পুরোপুরি এই তিনটে গুণকে নিয়েই চলবে। এখানে খুব সংক্ষেপে বলা হচ্ছে – জড় ভাব তমোগুণের জন্য হয়, দৌড়াদৌড়ির ভাব রজোগুণের জন্য হয় আর সত্ত্বগুণ হয় শান্ত স্বভাবের। এই তিনটে গুণ মিলে প্রকৃতি। এই প্রকৃতির কোলে গিয়ে পুরুষ বসে যায়, বসে গিয়ে মনে করে, আমি যে তুমি, তুমি যে আমার। চলতি গানে যেমন আছে, আবার উচ্চমানের গানে, যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুন্দর সুন্দর গান আছে, যেখানে এই ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে –আমি যে তোমার ভিতরে, তুমি যে আমার ভিতরে, তুমিই আমি আমিই তুমি। আর আমাদের যে অজ্ঞান, আমাদের জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণা, গীতা এখান থেকেই শুরু হয়। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু আমরা প্রকৃতির সাথে জুড়ে গেছি, প্রকৃতির খেলাকে আমার খেলা মনে করে যাচ্ছি।

ট্রেনে সফর করার সময় প্রায়ই হয়, এমন একজন সহযাত্রীর সাথে যাচ্ছি যার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু কিভাবে কিভাবে মনে মনে একটা সম্পর্ক হয়ে যায়। এরপর ওর যত ঝামেলা সব আমার ঝামেলা, ওর যত ভাল আমার ভাল বলে মনে হতে শুরু হয়ে যায়। এটা দেখা যায়, যাদের ভিতর অপূর্ণতার ভাব বেশি থাকে, এরাই খুব তাড়াতাড়ি অপরের সাথে জড়িয়ে যায়। যার নিজের স্ত্রী, সন্তান রয়েছে, সে অপরের স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে কেন লাফালাফি করতে যাবে! আত্মার উপর অজ্ঞান চলে আসে; এটা এক রহস্য, কোথা থেকে আসে, কেন আসে, কেউ জানে না, কিন্তু এসে যায়। অজ্ঞান আসার পর মোহ এমন ভাবে ছেয়ে যায় যে, তারপর শুরু হয়, আমি যে তোমার,

তুমি যে আমার। পুরুষ প্রকৃতিকে বলছে আমি যে তোমার, তুমি যে আমার। প্রকৃতির ভারি বয়ে গেছে, প্রকৃতি কোন গ্রাহ্যই করে না। ইয়ং ছেলে ও মেয়েরা এক অপরের পিছনে যেমন তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে বেড়ায়, আত্মাও ঠিক এই রকম প্রকৃতির পিছনে তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে বেড়ায়। কারণ আত্মা তাঁর স্বরূপ, তাঁর যে মর্যাদা, তাঁর যে রাজকীয় ভাব, সব ভুলে গেছে।

প্রকৃতি ত্রিণগুণাত্মিকা, সে সংসারী, সে এই রকমই চলতে থাকে। আত্মা ওর মধ্যে ঢুকে গিয়ে মনে করে, তুমি আমি, আমি তুমি। চোখ প্রকৃতি, দৃশ্যও প্রকৃতি, প্রকৃতি প্রকৃতির সাথে মিলতে যায়। চোখ দৃশ্যের দিকে যেতে চায়, কোন দৃশ্য চোখের মনের মত, কোন দৃশ্য চোখের পছন্দ না। মাঝখান থেকে, আত্মা যিনি আমার ভিতরে বসে আছে, তিনি লাফালাফি করতে থাকেন। কোন দৃশ্য দেখে বলেন, কি দারুণ লাগছে, আবার কোন দৃশ্য দেখে বলছেন, উঃ আমার চোখের সামনে থেকে এক্ষুণি এটা সরিয়ে নাও। আত্মার সাথে দৃশ্যের কোন ব্যাপারই না। বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা আর ব্রাজিলের খেলা হচ্ছে। ভারতবর্ষের একটা গ্রামের দুটো গ্রুপের একটা গ্রুপ আর্জেন্টিনাকে সমর্থন করছে, আরেকটা গ্রুপ ব্রাজিলকে সমর্থন করছে। খেলা নিয়ে গ্রামে দুটো গ্রুপের মধ্যে মারামারি লেগে গেল। কোথায় আর্জেন্টিনা, কোথায় ব্রাজিল, ভারতের কোন এক অজ গ্রাম, কেউ কাউকে জানে না, চেনে না, কিন্তু গ্রামের মধ্যে মারামারি হচ্ছে। ঠাকুর বলছেন, লঙ্কায় রাবণ মলো বেহুলা কেঁদে আকুল হলো। মানুষ কত মুর্খ হতে পারে, ভাবা যায়! আশ্চর্যের কিছু না, কারণ মানুষ স্বভাবেই মুর্খ, আত্মার উপর অজ্ঞান এসে গেছে, অজ্ঞানের জন্য আত্মা সব কিছুতে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে, আর তার ফলে সব জায়গায় বেহুলা কেঁদে আকুল হয়।

প্রকৃতি পরিবর্তনশীল, সব সময় পাল্টাচ্ছে, এই সত্ত্বগুণ রজোগুণে যাচ্ছে, এই রজোগুণ তমোগুণে যাচ্ছে, তমোগুণ রজোগুণে পাল্টে যাচ্ছে। আমরা যখন সিনেমা দেখি, সিনেমাতে দৃশ্যগুলি পাল্টে যাচ্ছে। সিনেমার মধ্যে এমন মজে গেছি যে, হিরো হিরোইন এই হাসছে, সাথে সাথে আমরাও হাসছি; এই ওরা কাঁদছে, আমরাও কাঁদছি। এই হাসি, এই কান্না, লেগেই আছে। এই যে পরিবর্তন গুলি হচ্ছে, আত্মা মনে করে আমার এখানে জন্ম হল, আমার সেখানে জন্ম হল। লোকেরা বলে দুঃখ থেকে মুক্তি চাই। আপনার কিসের দুঃখ? প্রকৃতি একটার পর একটা রূপ পাল্টাচ্ছে, ওই রূপের সাথে আপনি নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন। ভেবে দেখুন, দুঃখ যদি এতই খারাপ হত, তাহলে লোকেরা এত এত পয়সা খরচ করে দুঃখের সিনেমা দেখতে যেত? মারামারি যদি এতই খারাপ হত, লোকেরা কি টাকা খরচ করে সিনেমাতে মারামারি দেখতে যেত? সব নির্ভর করে আপনার মনের উপর। আপনি মনে করছেন খারাপ, তাই জিনিসটা খারাপ। মানুষ যখন সুখে থাকে, তখন মানুষ বসে গেল, সুখ মানেই সে ধসে গেল। দুঃখ না পেলে মানুষ কি কখন এগোতে পারে, দুঃখই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়। একজন বড় কবি বা বড় লেখক, তাঁর ভিতরের যদি খবর নেন, দেখতে পাবেন, তাঁর কত জ্বালা, হয় বাইরে জ্বালা নয়তো ভিতরে জ্বালা। ভিতরে আগুন যদি না জ্বলে স্টীম কোথা থেকে তৈরী হবে, স্টীম তৈরী না হলে ইঞ্জিন চলবে কি করে! যারা সুখে আছে, বুঝতে হবে, তাদের কয়লা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, গাড়ি আর চলছে না। কষ্ট যে পাচ্ছে, সে এগোবার এক মহা সুযোগ পেয়েছে।

কিন্তু আত্মার না আছে সুখের সঙ্গে সম্পর্ক, না আছে দুঃখের সঙ্গে সম্পর্ক। *পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভূঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্,* প্রকৃতি তার গুণের প্রভাবে নিজের মত চলছে, আত্মা সেই গুণের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে, এর ফলে তাঁর নানা রকমের যোনিতে জন্ম হয়। অথচ আত্মার জন্ম নেই মৃত্যু নেই। কিন্তু ওই দৃশ্যের মধ্যে পড়ে আত্মা মনে করছে, এটা আমি। আত্মার সামনে সবটাই শুধু দৃশ্য আর দৃশ্য। এটাকে পরে আরও ব্যাখ্যা করবেন। এই জিনিসটা না বুঝলে জ্ঞান হবে না, ধ্যান হবে না। সবাই এসে প্রশ্ন করে, মশাই, ধ্যান কিভাবে করব? কিসের ধ্যান করবেন যদি না জানা থাকে আপনি কিসের ধ্যান করবেন।

আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতিম্ আত্মত্বেন গত*, আত্মা প্রকৃতিকে আমি মনে করে। স্ত্রী যেমন স্বামীকে আমি মনে করে, স্বামী যেমন স্ত্রীকে আমি মনে করে, স্বামী-স্ত্রী আবার নিজের সন্তানকে আমি মনে করে, ঠিক তেমনি আত্মা প্রকৃতিকে আমি মনে করে। এখান থেকে যত ঝামেলা, যত কষ্ট। ফলে কি হয়? *সুখী দুঃখী মূঢ়ঃ পণ্ডিতঃ অহম্ ইতি এবম্*, ওই গুণের খেলার জন্য মনে করে, আমি সুখী, আমি দুখী, আমার দুঃখ কবে যাবে, আমার ভয় কবে দূর হবে, আমার চোখের জল ফেলা কবে শেষ হবে। তুমি যত দিন প্রকৃতির গুণের সাথে জড়িয়ে থাকবে, ততদিন এগুলো থাকবে, জড়িয়ে আছ বলেই তোমার যত সমস্যা। দুটো হাতের আঙুল জড়িয়ে দিয়ে আমি চেঁচিয়ে যাচ্ছি, আমার হাত কবে ছাড়বে? তুমি যখন ছাড়বে, তখন ছেড়ে যাবে। তুমি ছাড়া আর কেউ ছাড়াতে পারবে না। কেউ যদি জোড় করে টেনে ছাড়িয়ে দেয়, আবার সে ধরে নেবে। কিসের বন্ধন! তুমিই তোমাকে বন্ধনে রেখে দিয়েছ। বলছেন, তদ্রুপ হয়ে যায়, পুরুষ প্রকৃতি সঙ্গে মিশে এক রূপ হয়ে যায়, এটাই সর্বনাশের কারণ, জন্মের প্রধান কারণ। জ্ঞান ও ধ্যান হল পুনর্জন্মকে আটকানোর জন। পুনর্জন্মকে যদি আটকাতে হয় তাহলে প্রকৃতি থেকে নিজেকে আলাদা করতে হবে।

এখানে বলছেন, প্রকৃতির সাথে যে জড়িয়ে যায়, এটাই পুনর্জন্মের কারণ। আমরা যদি জগৎকে নিত্য বলে মনে করি, এখন আমরা যেটা মনে করছি; তাহলে আমাদের মনে প্রশ্ন আসে, কেন আমাদের ভাল জন্ম হয়, কেন খারাপ জন্ম হয়, কেউ বড়লোক হয়ে জন্মাচ্ছে, কেউ সাধারণ লোক হয়ে জন্মাচ্ছে, কেউ দেবতা হয়ে জন্মাচ্ছে, কেউ তির্যক যোনিতে সাপ, বিছে হয়ে জন্ম নিচ্ছে? এই রকম হয় কারণ প্রকৃতির সঙ্গে সবাই জড়িয়ে আছে বলে। যেখানেই জন্ম নিক, প্রকৃতির গুণের সাথে যেমন জড়াবে, প্রকৃতি তেমন তাকে খেলাবে। আমার যদি দুর্বলতা না থাকে, কেউ কি আমাকে নাচাতে পারবে, দুর্বলতা যখন থাকে তখনই প্রকৃতি নাচায়। জীবনে কখন কেউ কি আপনাকে নাচিয়েছে? জীবনে কখন কি মনে হয়েছে, এই লোকটা আমাকে শোষণ করেছে? জীবনে কখন কাউকে দেখে মনে হয়েছে, এই লোকটা মহাস্বার্থপর, পুরো আত্মকেন্দ্রিক? আপনার নিজের দুর্বলতা আছে বলেই, এই জিনিসগুলো হচ্ছে, সামনের লোকের কোন দোষ নেই।

অবিদা আর আসক্তি এই দুটোই দুর্বলতার হেতু। প্রকৃতিকে আমি মনে করা, এটাই অবিদ্যা। প্রকৃতির যে তিনটে গুণ, সত্ত্ব, রজো আর তমো, এই গুণগুলির সাথে জড়িয়ে যাওয়া এটাই আসক্তি। সমস্ত সমস্যার মূলে এই দুটো –অবিদ্যা আর আসক্তি। যতক্ষণ এই দুটোর সাথে খুব ভাল করে পরিচয় না হয়, ততক্ষণ ধ্যান হবে না। ঠাকুরের জীবনীতে, বিশেষ করে লীলাপ্রসঙ্গে আমরা দেখছি, মা কালীর জন্য ঠাকুর যখন কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছেন, সমস্ত জগৎকে তিনি তখন ভুলে গেছেন। জগতের কোন কিছুতে তিনি নেই। এমন কি, যখন শুনলেন সমস্ত চিহ্ন ছেড়ে দিতে হবে, তখন তিনি পৈতে, যেটা ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন, সেটাও খুলে ফেলে দিলেন, পরিধাণ বস্ত্রটাও ছেড়ে দিলেন, যেটা পুরুষ মানুষের চিহ্ন। সব চিহ্ন ছেড়ে দিলেন, তবে গিয়ে মা কালীর জ্ঞান হল। সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণ থেকে অনাসক্ত হতে হবে, প্রকৃতি থেকে সরে আসতে হবে, তবে গিয়ে শুরু হবে সাধন জীবন। এই সরে আসা আপনাকে সিদ্ধি পাইয়ে দেবে না, এই সরে আসাটাই আপনার সাধন জীবন শুরু করায়। এটা যত দিন না আমরা বুঝতে পারছি, সাধনা আমাদের শুরু হবে না। ভাল মন্দ যা হচ্ছে, সব প্রকৃতির মত হচ্ছে, তাতে আমার আপনার কি! মাঠে বাচ্চারা খেলছে, তারা এই মারামারি করছে, এই একে অপরকে জড়িয়ে ধরছে, তাতে আমার কি এসে যায়, আমি তো একজন দ্রষ্টা মাত্র।

আচার্য কি সুন্দর বলছেন, *অস্য চ নিবৃত্তিকারণং জ্ঞানবৈরাগ্যে স সন্ন্যাসে গীতাশাস্ত্রে প্রসিদ্ধম্*, গীতাশাস্ত্র কিসের জন্য প্রসিদ্ধ? এই অবিদ্যা, আসক্তিকে গীতা সরিয়ে দেয়। ঠাকুর বলছেন, দশবার গীতা বললে যা হয় গীতা তাই, অর্থাৎ গীতা সব কিছুকে ত্যাগ করতে বলছেন। এটাই

আচার্য তাঁর ভাষায় বলছেন, *অস্য চ নিবৃত্তিকারণং*, নিবৃত্ত হওয়া, সব কিছু থেকে সরে আসা। কিসের থেকে সরে আসা? এই অবিদ্যা আর আসক্তি থেকে। সব কিছু থেকে সরে এসে *জ্ঞানবৈরাগ্যে স সন্ন্যাসে*, জ্ঞানবৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, এটাই সন্ন্যাস। গীতাশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল, প্রকৃতিকে ছেড়ে দাও। যতক্ষণ না তুমি প্রকৃতিকে না ছাড়ছ, ততক্ষণ জীবনে কোন দিন সুখ শান্তি আসবে না। এবার সাক্ষাৎ নির্দেশ দিচ্ছেন আত্মজ্ঞান কি। আগে আগে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে আত্মজ্ঞানকে নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে, এবার আমাদের শরীরকে কেন্দ্র করে এটাকে বলছেন –

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ।।২২।।

(যিনি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষীস্বরূপ এবং অনুমোদন কর্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর পরমাত্মারূপে শ্রুতিতে উক্ত হন, তিনিই সেই পুরুষোত্তম, তিনি এই দেহে বর্তমান আছেন, অর্থাৎ উপলব্ধ হন।)

বাইশ নম্বর শ্লোক আমাদের মুখস্ত করে নেওয়া দরকার, কারণ এখানে আত্মাকে খুব সুন্দর ভাবে বর্ণনা করছেন। এই শ্লোকটা ভাল করে বুঝে নিতে পারলে আত্মা ও প্রকৃতির সম্পর্কটা আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারব। সব জায়গায় এই শ্লোকটা কাজে লাগে, রাজযোগেও পুরুষ আর প্রকৃতির সম্পর্ক বুঝতে গেলে এই শ্লোকটা কাজে লাগবে। আমরা আমাদের দেহকে জানি, ইন্দ্রিয়গুলিকে জানি, মন বুদ্ধিকে আমরা জানি। কিন্তু এদের সবার পিছনে আছেন আত্মা, যাঁর ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না। এবার এই শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির পিছনে যে আত্মা আছেন, তাঁকে নির্দেশ করে বলছেন। বাহ্য জগৎ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এগুলো সব প্রকৃতির মধ্যে; তুমি এই সব কিছুর বাইরে। সেই তুমিটা কে? আত্মা। সেই আত্মা কি? শরীরের দিক থেকে দেখলে তিনি *উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ*।

আচার্য শঙ্কর এমনিতে তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য খুব কম দেখান। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর ভিতর থেকে জ্ঞান যেন ফেটে বেরিয়ে আসে। যেমন মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর ওঠে। আচার্যের ভিতরে জ্ঞান ঠাসা হয়ে আছে, তাই মাঝে মাঝে জ্ঞানের ঢেকুরটা বেরিয়ে আসছে। আচার্য আত্মাকে উপদ্রষ্টা বলার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনটে অর্থে বলছেন। প্রথম হল আত্মা সব কিছুকে নির্বিকার ভাবে দেখে যাচ্ছেন। যেমন স্কুলে যখন বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়, সেখানে একজন ভিআইপিকে প্রধান অতিথি করে নিয়ে আসা হয়। সব প্রতিযোগীদের মধ্যে কেউ দৌড়াচ্ছে, কেউ হাই জাম্প দিচ্ছে, কেউ লং জাম্প দিচ্ছে, প্রধান অতিথি নির্বিকার ভাবে সব খেলা দেখে যাচ্ছেন। উপদ্রষ্টার দ্বিতীয় আরেকটা অর্থ, যিনি সবচেয়ে কাছের দ্রষ্টা। দেহটাও একটা দ্রষ্টা, সংসারকে দেখছে; ইন্দ্রিয়গুলিও দ্রষ্টা, সংসারকে দেখছে; মন একজন দ্রষ্টা, সেও সংসারকে দেখছে। কিন্তু সব কিছুরে পিছনে আমাদের সব থেকে কাছের দ্রষ্টা হলেন সেই জীবাত্মা। সবচেয়ে কাছের দ্রষ্টা হলেন আত্মা, আচার্যের শব্দটা হল, *দেহচক্ষুর্মনোবুদ্ধ্যাত্মানো দ্রষ্টাঃ*, দেহ, চক্ষু, মন, বুদ্ধি ও আত্মা এরা সবাই দ্রষ্টা, সবাই জগৎকে দেখছে। মাণ্ডুক্যকারিকাতেও দেহ, ইন্দ্রিয়, মন সবাইকে দ্রষ্টা রূপেই নেওয়া হয়েছে। এদের সবার মধ্যে আত্মা হলেন সব থেকে ভিতরের, অন্তরতম, সেইজন্য আত্মাকে বলা হয় উপদ্রষ্টা।

উপদ্রষ্টার তৃতীয় অর্থ হয়, আত্মা সব কিছুকে ভোগ করেন, কারণ আত্মা সব কিছুতে জড়িয়ে আছেন কিনা। জড়িয়ে থাকার জন্য আত্মা 'আমি' 'আমি' করে, আসলে ভোগ করেন আত্মা। আচার্য শঙ্কর যজ্ঞের উদাহরণ দিয়ে বলছেন, যখন যজ্ঞ হয় তখন সেখানে একজন থাকেন, যেমন পূজাতে তন্ত্রধারক হন, তিনি সব কিছু লক্ষ্য রাখেন, সব কিছু ঠিকঠাক নিয়মমাফিক বিধি অনুসারে হচ্ছে কিনা। সব কিছু তিনি লক্ষ্য রাখছেন, ওই অর্থে আত্মাকে উপদ্রষ্টা বলছেন। আমরা যে অর্থে অন্তর্যামী বলি, অন্তর্যামী সব দেখছেন, তিনি সব কিছু দেখে যাচ্ছেন, কিন্তু কোন কিছুতে জড়ান না। আবার

আমরা যেমন বলি, জীবনে কত দুঃখ, কত কষ্ট; এখানে আমি ভোক্তা, সেইজন্য উপদ্রষ্টা বলছেন। শরীর ইন্দ্রিয়ের তুলনায় আত্মা সব থেকে ভিতরে সবচেয়ে কাছের, আমিত্বের সবচেয়ে কাছের; সেইজন্য উপদ্রষ্টা বলছেন।

অনুমন্তা, তিনি সব কিছুর অনুমতি দেন। উপনিষদে বিশেষ করে কঠোপনিষদে খুব সুন্দর বলছেন, একটা শহরে রাজা আছেন, দ্বারপালরা দৌড়ে দৌড়ে এসে রাজাকে খবর দিয়ে যাচ্ছেন। রাজা তখন আদেশ দিয়ে বলছেন, অমুক কাজ কর। আত্মা হলেন সেই রাজা। সব ইন্দ্রিয়গুলি এসে থেকে থেকে তাঁকে খবর দিয়ে যাচ্ছে, আর আত্মা অনুমতি দিচ্ছেন, এটা কর, সেটা কর, সেইজন্য তিনি অনুমন্তা। অনুমন্তার আরেকটা অর্থ হয়। মনে হয় যেন আত্মা সব কিছুতে জড়িয়ে আছে। আবার সাক্ষী অর্থেও হয়। সাক্ষী মানে, সব কিছু দেখে যাচ্ছেন, কিন্তু কোন কিছুতে হস্তক্ষেপ করেন না। ঠাকুর সাংখ্য দর্শনের খুব সুন্দর ও সহজ উদাহরণ দিচ্ছেন, বাড়িতে একটা বড় অনুষ্ঠান হচ্ছে, মনে করুন বিবাহ হচ্ছে। গিন্নি চারিদিকে দৌড়ে দৌড়ে কাজ করে যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এসে বাড়ির কর্তাকে খবর দিয়ে যাচ্ছে। বাড়ির কর্তা এক জায়গায় বসে শুধু ভুরুরু ভুরুর করে তামাক খেয়ে যাচ্ছে, গিন্নি যেই এসে কোন খবর দিচ্ছে কর্তাও মুখে একটা হুঁম্ শব্দ করে সম্মতি জানিয়ে যাচ্ছে। পুরুষ আছেন বলেই তো প্রকৃতির এত নাচ, এই হল *উপদ্রষ্টানুমন্তা চ*। আসলে আমি কে, আমি উপদ্রষ্টা; আসলে আমি কে, অনুমন্তা। দেহ, মন, ইন্দ্রিয়কে আমি অনুমতি দিচ্ছি বলে সব কিছু চলছে।

চৈতন্য রয়েছে একমাত্র আত্মাতে, সেই চৈতন্য গিয়ে দেহে গিয়ে, ইন্দ্রিয়ে গিয়ে প্রকাশ পায়। এই আমি এত হাত পা নাড়ছি, চোখ নাড়ছি। হাত, পা, চোখের নিজের নড়ার কোন ক্ষমতা নেই। মানুষ মরে গেলে, তার সব কটা ইন্দ্রিয়ই তো থাকে, কিন্তু তার হাত নড়ে না, চোখ নড়ে না, মুখ নড়ে না। কেন? জীবাত্মা ছেড়ে চলে গেছে, যে আসল চৈতন্য, সে ছেড়ে চলে গেছে। আত্মার চৈতন্য সমস্ত দেহে ইন্দ্রিয়ে জড়িয়ে আছে বলে দেহ সচল হয়ে থাকে। বৈরাগ্য যদি আনতে হয় তাহলে দেহে দোষ দেখতে হয়, ঠাকুরও কথামৃতে এই কথা বলছেন। এই অধ্যায়েও আগে আমরা দেখলাম যেখানে বলছেন *দুঃখ-দোষানুদর্শনম্*। এত কিছু জেনেও কেন আমরা শরীর দুঃখ দেখি না? কারণ এই শরীরের পিছনে সেই আত্মার শক্তি চলছে। অফিসে বড় সাহেবের ছেলেও যদি অফিসে এসে যায়, সবাই সেই বাচ্চাকে বলবে, হ্যালো স্যার, কেমন আছেন, সেলাম নেবেন। সেই ছেলে কি তাদের অফিসার? সেই ছেলে কি তাদের কোম্পানির মালিক? কিছুই না। তাহলে এই ধরণের আচরণ কেন করছে সবাই? কারণ পিছনে সাহেবের ক্ষমতা জুড়ে আছে। আসলে আমরা দেহকে কেউ ভালবাসি না, আমরা ভালবাসি সেই আত্মাকে, যে আত্মা এই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন দিয়ে প্রকাশ পান। বর্তমান কালে এত ডিভোর্স কেন হচ্ছে? কারণ লোকেরা এত কিছু না বুঝে, না জেনে, দেহকে দেখে এগিয়ে যাচ্ছে, মনে করছে ওখানে ভাল কিছু আছে। কিন্তু যে আছে সে এত সাধারণ যে, ওখানে আত্মার প্রকাশ একটুতেই থেমে যায়। তখন আর তাকে ভাল লাগে না। তোমাকে মনে করেছিলাম আমাকে খুব ভালবাসবে, কিন্তু এখন দেখছি তোমার মন স্থির না, আমাকে ছেড়ে অন্য দিকে ঘাস খেতে চড়তে যাচ্ছ। অন্য দিকে ঘাস খেতে যাচ্ছে এই জন্য যে, তোমার ভিতর ঘাস নেই। তোমার দেহ মনে আত্মার প্রকাশ নেই, তোমার দিকে এগিয়ে এসে সে থেমে গেছে। কারণ আত্মার প্রকাশ মন দিয়ে বেশি আসে। আসলে সব কিছুরে পিছনে আছেন আত্মা।

ভর্তা মানে যিনি পালন-পোষণ করেন, আত্মাই পালক। আর তার সাথে *ভোক্তা,* ভোগের কর্তা। আত্মাই সব কিছুকে ভোগ করছেন। এই যে মনে করা, আমি সুখী, আমি দুখী, আমি পণ্ডিত, আমি মুর্খ, আমি মোটা, আমি রোগা, কারণ ভোক্তা তিনিই। তার সঙ্গে *মহেশ্বরঃ,* আত্মাই রাজা, আত্মাই একমাত্র স্বাধীন স্বতন্ত্র। আচার্য বলছেন, *মহেশ্বরঃ সর্বাত্মত্বাৎ স্বতন্ত্রত্বাৎ চ মহান্ ঈশ্বরঃ চ ইতি মহেশ্বরঃ,* তিনি সবারই আত্মা হওয়ার কারণে এবং স্বতন্ত্র হওয়ার কারণে মহান্ ঈশ্বর, এইজন্য তিনি

মহেশ্বর, সবার মালিক। এই আত্মাই বিষ্ণু, এই আত্মাই শিব, এই আত্মাই কৃষ্ণ, এই আত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ। ভগবান প্রথমে বললেন, *ক্ষেত্রজ্ঞাঞ্চাপি মাং বিদ্ধি,* ইনিই ব্রহ্মা, ইনিই বিষ্ণু, ইনিই মা কালী, সব তিনি। এটাই আত্মজ্ঞান। কিন্তু এমন অবিদ্যার প্রভাব যে, প্রকৃতির সমস্ত গুণের প্রতি আমরা আসক্ত হয়ে আছি।

হরিদ্বারের কঙ্খলে আমাদের খুব নামকরা হাসপাতাল আছে, ওখানে সব সম্প্রদায়ের সাধুদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করা হয়। ওখানে এমনিতেই সাধু-সন্ন্যাসীদের কেউ দেখে না, খুব কষ্টকর জীবন তাঁদের। দু চারজন খুব নামকরা সাধুদের দেখে সাধারণ মানুষরা মনে করে সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে প্রচুর টাকা। আমরা তো সন্ন্যাসী আমরা জানি সাধুদের কি অবস্থা। একজন সন্ন্যাসীর কাছে যদি টাকা থাকে, বদলে একশজন সন্ন্যাসী আছেন যাঁদের কাছে কিছুই নেই। এনাদের চিকিৎসার কথা ভেবেই রামকৃষ্ণ মিশন কঙ্খলে হাসপাতাল তৈরী করে, যেখানে সব সাধুদের নিঃখরচায় চিকিৎসা করা হয়। এই রকম একজন সাধু কঙ্খল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য এসেছেন। তাঁকে একটা ছোট্ট সার্জারি করতে হবে। ডাক্তাররা জিজ্ঞেস করছেন, 'সাধুবাবা আপনার কষ্ট হবে না তো'? সাধুবাবা খুব রেগে গেলেন, 'কিসের কষ্ট, আমি শুদ্ধ আত্মা, আমার দেহ নেই মন নেই'। ডাক্তার ছুরি চালিয়ে দিয়েছে। দেওয়া মাত্রই খুব চেঁচাতে শুরু করেছেন সাধুবাবা। 'এই যে বললেন, আপনার আবার কিসের কষ্ট, আপনি শুদ্ধ আত্মা'? 'আরে ও গীতা মে হ্যায়'। এগুলো মুখে বলা সহজ, যখন বাস্তবে শরীরে কষ্ট লাগে তখন বলে, 'ও গীতা মে হ্যায়'। সবাই আমাদের মনে করে, হয় ভণ্ড, নয়তো আত্মজ্ঞানী। আমরা দুটোর কোনটাই না। সাধু-সন্ন্যাসী মানে একজন আধ্যাত্মিক পথের যোদ্ধা। ব্যবসাতে নামলেই সবাই বিল গেটস্ হয়ে যায় না, লড়াই করতে হয়, খাটতে হয়। আত্মজ্ঞানও অত সহজে হয় না। তবে তত্ত্বগত ভাবে যদি কেউ বুঝে নেন, আত্মজ্ঞানের ধারণা যদি হয়ে থাকে, বিশ্বাস যদি এসে যায়, তাহলে তিনি অনেকটা এগিয়ে গেলেন।

তার সাথে বলছেন, পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো, যতগুলি গুণের কথা বলা হল, উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা; এই গুণগুলি পরমাত্মা ছাড়া আর কারুর হতে পারে না, কারণ তিনি পরমাত্মা। *দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ,* সেই আত্মা, সেই পুরুষ কোথায় নিবাস করেন? যত দেহ আছে সমস্ত দেহে নিবাস করেন। ভগবান উপরে কোথাও নেই। যতই আমরা ঢাক ঢোল বাজিয়ে হরিনাম করি কিছুই হবে না। যা হবার এখান থেকেই হবে, আমার আপনার ভিতর থেকেই হবে, সমস্ত শক্তি এখান থেকেই আসবে। তাহলে আমরা কেন বাইরে পূজা করি, মঠ মিশনে কেন সন্ধ্যার সময় খণ্ডন ভব বন্ধন করা হয়? কারণ প্রথমে বাইরের উপাচার দিয়ে ওই শক্তিকে ভিতরে নিয়ে আসতে হয়। ঠাকুর বলছেন, অধম ভক্ত মনে করে ঈশ্বর সেই উপরে আকাশে। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তিনি ওখানেও আছেন, কিন্তু আসলে এখানে এই শরীরের ভিতরে তিনি আছেন। যখন সংসারে খুব কষ্ট হয়, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে; বা যখন খুব আনন্দে লাফালাফি করি, তখন নিজেকে মনে করাতে হয়, তিনিই সব কিছুর উপদ্রষ্টা, তিনিই সব কিছুর অনুমতি দেন, তিনিই পালক, তিনিই ভোক্তা। আসলে ইন্দ্রিয় নিজের জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখানে মজা পাচ্ছে, মাঝখান থেকে আমি ইন্দ্রিয়ের সাথে জড়িয়ে ফেলে মনে করছি, আমি আনন্দ পাচ্ছি, আমি দুঃখ পাচ্ছি, কষ্ট পাচ্ছি। একবার ভাবুন, আমি আছি বলে ইন্দ্রিয়, মন, দেহ সব কিছু চলছে। আমি না থাকলে এগুলো কোনটাই চলত না।

সব *দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ,* দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রকৃতির যে সাম্রাজ্য; পুরুষ প্রকৃতির এই সব কিছুর পারে। 'সব কিছুর পারে', এই সব কিছুর পারেটাকেই *পরঃ* বলা হয়। আমি সব কিছুর পারে, আমার কিসের দুর্বলতা, কিসের কষ্ট, কিসের দুঃখ। এই শাস্ত্র পড়ার পর যদি ভিতরটা শক্তিতে টগবগ না করে থাকে, তাহলে এই শাস্ত্র পড়াটাই বৃথা। গীতা পড়া বা শোনার পরেও যদি চোখে জল আসে, তাহলে স্বামীজীকে পড়ুন। স্বামীজী বলছেন, গীতা পড়ার থেকে ফুটবল খেলা অনেক ভাল, ফুটবল খেললে গীতাটা ভাল বুঝতে পারবে। এর অর্থ হল, গীতা পড়ার দম এখনও

আপনার হয়নি। আপনি ঠাকুরের কথা পড়ছেন, গীতা উপনিষদের কথা পড়ছেন, কিন্তু ভিতরে চার্জড আপ হচ্ছেন না; আপনার মনে হচ্ছে না, এই দুটো মুঠি দিয়ে পৃথিবীটাকে আমি মুচড়ে দিতে পারি, এই ফিলিংটা চব্বিশ ঘন্টা স্থায়ী ভাবে যদি না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে শাস্ত্র পড়ার মধ্যে কোথাও কিছু গোলমাল আছে।

আমার এক বন্ধু আছেন, প্রচুর লেকচার শোনেন। আমাকে বলছেন, আমার আশেপাশে অনেক নিন্দুক আছে, এদের মধ্যে থাকব কি করে? থাকব মানে! কবিতায় অতিশয়োক্তি অলঙ্কার আছে, অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে বলে – তোমার খাপ থেকে বেরিয়ে এলো তলোয়ার, তাই দেখে শত্রু সব গেল উল্টে পড়ে। তলোয়ার চালাতে হল না, খাপ থেকে শুধু তলোয়ার বেরিয়েছে, তাতেই শত্রুরা সব উল্টে পড়ে গেল। এই হল কবিতা। তোমাকে দেখে নিন্দুকরা যদি পালিয়ে না যায়, তোমার তাহলে কিসের শক্তি! তার কথা শেষ হতেই তুমি সোজা দাঁড়িয়ে বলে দিলে, এবার আমি উত্তরটা দিচ্ছি। এতেই যদি না পালায়, তাহলে তোমার কিসের শক্তি! ভগবান বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের নীচে জ্ঞান পাওয়ার পর উঠে দাঁড়ালেন। চলতে শুরু করলেন, গয়া থেকে গেলেন সারনাথ। সেখানে তাঁর আগের পরিচিত, যাঁরা সাধনা করছিলেন, তাঁদের সাথে দেখা হল। তাঁরা দূর থেকে ভগবান বুদ্ধকে দেখে নিজেদের মধ্যে বলছেন, ওই যে আসছে, আমরা এর সাথে কথা বলব না, কারণ সে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। ভগবান বুদ্ধ গিয়ে তাঁদের সামনে দাঁড়ালেন, পাঁচজনেই তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। এই হল আধ্যাত্মিক জ্ঞানোপলব্ধির ক্ষমতা। এই ক্ষমতা যদি তোমার না হয়ে থাকে, শাস্ত্র পড়া তোমার বৃথা। এইসব শ্লোক পড়ে যদি তুমি চার্জড আপ না হয়ে থাক, তাহলে বুঝতে হবে এখনও তুমি শাস্ত্রে প্রবেশ করোনি। তোমার মুখ খোলারও দরকার হবে না, শুধু বলবে, এবার আমি উত্তরটা দিচ্ছি, এই একটা কথা শুনেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, যদি তুমি চার্জড আপ হয়ে থাক।

দেওঘর বিদ্যাপীঠে থাকার সময় একটা ঘটনা শুনেছিলাম। বিহারের একজন মন্ত্রী, নামকরা ক্রিমিনাল। ট্রেনে কোথাও যাবেন, কিন্তু বার্থ গুলো আলতু ফালতু লোকেরা আগে থেকেই দখল নিয়ে বসে গেছে। মন্ত্রীর বডিগার্ড নিজেদের বার্থের কাছে গিয়ে শুধু জামাটা একটু সরিয়ে দিল, ওখানে কোমরে রিভলবারটা রাখা আছে। ওই দেখেই সব লোকজন যে বার্থগুলো ধরে রেখেছিল, ছেড়ে পালিয়েছে। বার্থ ছাড়ার জন্য কিছু বলতেও হয়নি, শুধু জামাটা সরিয়ে দেখিয়ে দিল ওখানে কি রাখা আছে। গুলি আমি চালাচ্ছি না, কিন্তু অর্থটা বুঝে নাও। চারটে কথা বলতে যাওয়া মানেই, শক্তি নেই। *উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ*, আপনি সেই মহেশ্বর, আপনি সেই বিষ্ণু, আপনি সেই কৃষ্ণ। সেই মহেশ্বর শিব কোথায় বাস করেন? কোন কৈলাশে না, কোন বৈকুণ্ঠে না, আপনার ভিতরে। তারপরেও আপনার চোখে জল আসছে? ঠাকুরের ভাষায় ঢ্যামনা শালা।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে।।২৩।।

(যিনি পুরুষকে (ব্রহ্মকে) সাক্ষাৎ আত্মভাবে জানেন ও সকল বিকারের সাথে অবিদ্যারূপ প্রকৃতিকে মিথ্যা বলে জানেন, যে কোন অবস্থায় বিদ্যমান হয়েও তিনি পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন না।)

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ, এইভাবে আত্মাকে যিনি জেনেছেন, এইভাবে যিনি নিজেকে জেনেছেন, তাঁকে আর জন্ম-মৃত্যুর চক্রের মধ্যে ঘুর ঘুর করতে হবে না। প্রথম থেকে প্রকৃতির বর্ণনা করছেন, পুরুষের বর্ণনা করছেন, ক্ষেত্রের বর্ণনা করছেন, ক্ষেত্রজ্ঞের বর্ণনা করছেন। করার পর বলছেন, এই জিনিসটাকে যিনি ঠিক ঠিক জানেন, তিনি সব কিছুই করবেন, কোন কাজই তাঁর জন্য অকাজ নয়। একজন এসে একদিন জিজ্ঞেস করল, 'মহারাজ সংসারে কিভাবে থাকা যায়'? 'কিভাবে থাকা যায় মানে, আমরা সন্ন্যাসীরা কি সংসারের বাইরে আছি? সংসারে এমন কোন কাজ কি আছে যেটা আমরা করি না? হাসপাতাল চালাচ্ছি, স্কুল চালাচ্ছি, কলেজ চালাচ্ছি,

ইউনিভার্সিটি চালাচ্ছি, রিলিফের কাজে আছি, লোকেদের সেবা করছি, ঝগড়া-ঝাটিও করছি, সবই করছি। আমাদের কাছে চোরেরাও আসে, বদমাইশরাও আসে, নেতারাও আসে, সব রকম লোক আসছে, সবারই সাথে মিশছি, আলাপ করছি'। সংসারীদের যত exposure হয়, তার থাকে আমাদের অনেক বেশি exposure হয়। যত ধরণের লোকেদের সাথে আমাদের মিশতে হয়, সংসারীরা কল্পনাও করতে পারবেন না। এটাই বলছেন, *সর্বথা বর্তমানোহপি*, এইভাবে নিজেকে সক্রিয় রাখতে হয়, সচল রাখতে হয়, সব কিছুর মধ্যে আপনি আছেন। যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন। শাস্ত্রের জ্ঞান একবার হয়ে গেলে তখন আর কোন কিছুর তফাৎ থাকে না।

ন স ভূয়োহভিজায়তে, তাঁকে আর পুনর্জন্ম নিতে হয় না। আত্মজ্ঞানের সব থেকে বড় প্রাপ্তি হল, তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না। আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, *সাক্ষাদ্ অহম্ ইতি*, আমিই সাক্ষাৎ সেই, এই জ্ঞান যদি ঠিক ঠিক হয়ে যায়, আমার আশেপাশের যে প্রকৃতি, এই প্রকৃতির ঠিক ঠিক জ্ঞান যদি হয়ে যায়, তাকে আর জন্ম নিতে হবে না। এখানে বিরুদ্ধ পক্ষ থেকে আচার্য নিজের তরফেই কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করে একটা লম্বা আলোচনা নিয়ে আসছেন, যেখানে পূর্বপক্ষ থেকে বলছে, এই কর্ম থাকবে, সেই কর্ম থাকবে; আমরা এর বিস্তারে যাচ্ছি না।

বেদান্তের একটা conclusion হল, যদিও এর সাথে আমি এক মত নই, এনারা তীর চালানোর উদাহরণ এনে বলেন, তুণীরে অনেক বাণ রাখা আছে, একটা তীর ধনুকের উপর চড়ানো আছে, আরেকটা তীর ছাড়া হয়েছে। এনারা বলেন, যে তীরটা ছাড়া হয়ে গেছে, সেটাকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না, তুণীরে যে তীরগুলো রাখা আছে, সেগুলোকে ফেলে দেওয়া যায়, যে তীরটা ধনুকে চড়ানো আছে, সেটাকেও ফেরৎ আনা যায়। বক্তব্য হল, যে কর্মের জন্য এই শরীরটা ধারণ করা হয়েছে আর আত্মজ্ঞান হওয়ার আগে যে সংস্কারগুলি ছিল, মৃত্যু পর্যন্ত সেটা চলতে থাকে। কিন্তু একবার আত্মজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর নূতন করে তাঁর আর সংস্কার তৈরী হয় না। দ্বিতীয় হল, আগের আগের যে কর্মগুলি রয়েছে, সেই কর্মগুলি আর ফল দেয় না। চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান বলেছিলেন, *যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন*, কাঠের বিরাট একটা স্তূপে আগুন লাগিয়ে দিলে নিমেষের মধ্যে সব কাঠ ছাই হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি আত্মজ্ঞানের অগ্নিতে যত কর্ম আছে, সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, কোন কিছু অবশিষ্ট থাকে না। এমনকি আত্মজ্ঞান লাভের পরে যে কর্মগুলি করেছেন, সেই কর্মও তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু আগের জন্মের কোন কর্মে এই জন্মে সে অন্ধ হয়ে জন্মেছে, আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে তার অন্ধত্ব ঘুচবে না। বক্তব্য হল, যে কর্মের জন্য যে শরীর ধারণ করতে হয়েছে, সেই শরীরের যে ধর্মগুলি রয়েছে, সেটা থাকবে, সেটা যাবে না। এগুলো নিয়ে প্রচুর আলোচনা-বিতর্ক আছে, কিন্তু আহামরি কিছু না। মূল গুরুত্ব হল, আত্মজ্ঞানের পর এই শরীরের যখন নাশ হয়ে যাবে, তাঁর আর পুনর্জন্ম হবে না। এটাই মূল কথা। *সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে*, আত্মজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর তিনি যে কাজই করুন, যেমন কাজই করুন, তাঁর আর পুনর্জন্ম হবে না। এরপর চব্বিশ আর পঁচিশ নম্বর শ্লোক দুটোকে মিলিয়ে আমরা বলছি –

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে।।২৪।।
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বাহন্যেভ্য উপাসতে।
তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ।।২৫।।

(কোন কোন সাধক ধ্যানের দ্বারা শুদ্ধ অন্তঃকরণ সহায়ে বুদ্ধিতে সাক্ষীভূত প্রত্যক্‌চৈতন্যকে দর্শন করেন। অন্য কেউ কেউ জ্ঞানযোগ দ্বারা এবং অপর কেউ কেউ কর্মযোগ দ্বারা আত্মদর্শন করেন। অপর কেউ কেউ এইরূপে আত্মাকে জানতে না পেরে আচার্যের নিকট উপদেশ গ্রহণপূর্বক উপাসনা করেন। তাঁরাও গুরুদত্ত উপদেশ নিষ্ঠার সাথে সাধন করে এই মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করেন।)

জ্ঞান কি বলা হল, অজ্ঞান কি বলা হল। আত্মা প্রকৃতির সাথে নিজেকে জড়িয়ে নেন, এটাই অজ্ঞান। আর এটা জেনে নেওয়া, *উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ*, এটা হল জ্ঞান। আমিই সেই আত্মা, এই জ্ঞান কি করে হবে? ঈশ্বর জ্ঞান কিভাবে হবে? *ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা*, বলছেন, ধ্যান কর, শুধু ধ্যান কর। গীতা ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চব্বিশ নম্বর শ্লোকে ধ্যান কি বর্ণনা করছেন। আচার্য এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে খুব সহজ ভাষায় ধ্যানের খুব সুন্দর সংজ্ঞা দিচ্ছেন –*ধ্যানং নাম শব্দাদিভ্যো বিষয়েভ্যঃ শ্রোত্রাদীনি করণানি মনসি উপসংহৃত্য মনঃ চ প্রত্যক্ চেতিয়িতরি একাগ্রতয়া যৎ চিন্তনং তদ্ ধ্যানম্*, আমাদের যে ইন্দ্রিয়গুলি আছে, চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, যেগুলো স্ব স্ব বিষয়ের পিছনে দৌড়াচ্ছে, সব ইন্দ্রিয়গুলিকে তাদের বিষয় থেকে টেনে এনে মনে সমাহিত করে দেওয়া। যার জন্য একান্তে পালকি মেরে আসনে বসে চোখ বন্ধ করে নিজেকে সংযম করতে হয়। পালকি মেরে বসা মানে, শিরদাঁড়া সোজা করে না বসলে উচ্চ চিন্তন হবে না। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে মনের মধ্যে সমাহিত করতে হয়।

বলছেন, *শব্দাদিভ্যো বিষয়েভ্যঃ*, ইন্দ্রিয়ের যত বিষয় আছে, সমস্ত বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে টেনে এনে, *মনসি উপসংহৃত্য*, মনের মধ্যে সমাহিত করতে হয়। ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদা মন থেকে বেরিয়ে বাইরে বিষয়ের দিকে দৌড়াচ্ছে, এই দৌড়ানটা বন্ধ করে ইন্দ্রিয়গুলিকে টেনে ভিতরে নিয়ে আসতে হয়, ভিতরে নিয়ে আসা মানে অন্তর্মুখী করতে হয়। অন্তর্মুখী করার জন্য পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়গুলিকেও আগে শান্ত করতে হয়, সেইজন্য ধ্যানে বসতে হয়। হাত নড়বে না, পা নড়বে না, শরীরের কোন অংশ যদি চিড়বিড় করে, বুঝতে হবে ওটা মনের খেলা, ওই খেলাটাকেও আটকে দিতে হবে। আর জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে মনের মধ্যে, অর্থাৎ অন্তরাত্মাতে লয় করে একাগ্র ভাবে চিন্তন করতে হয়। কি চিন্তন করবে? ইষ্ট চিন্তনই করবে। যদি দীক্ষা না হয়ে থাকে, একটা শ্লোক আগে বললেন, *উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ*, আমি সেই শুদ্ধ আত্মা। ধ্যান মানে, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে টেনে মনের ভিতর বসিয়ে দিয়ে ওই এক চিন্তন –*উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ*।

কিভাবে হবে? *ইতি উপমোপাদানাৎ তৈলধারাবৎ*, কোন পাত্রে যখন তেল ঢালা হয়, তখন এক *সংততঃ অবিচ্ছিন্নপ্রত্যয়ঃ*, অবিচ্ছিন্ন ধারায় তেল পাত্রে পড়তে থাকে, দেখে মনে হবে যেন একটা লোহার দণ্ড। ঠিক সেই রকম মনে অন্য কোন চিন্তা যেন না ঢোকে, শুধু এক চিন্তন চলতে থাকবে। *ধ্যানং তেন ধ্যানেন আত্মনা বুদ্ধৌ পশ্যন্তি আত্মানং*, বুদ্ধি দিয়ে মনকে মনে সমাহিত করতে হবে। তাহলে ধ্যান কিভাবে হবে? প্রথম –আসনে বসতে হবে। দ্বিতীয় –কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে শান্ত করতে হবে। তৃতীয় –পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে তাদের বিষয় থেকে টেনে মনের মধ্যে সমাহিত করে দিতে হবে, মন যেন ধ্যেয় বস্তু ছাড়া অন্য কোন দিকে না যায়। চতুর্থ –আত্মাকে নিয়ে, ঈশ্বরকে নিয়ে *সমানপ্রত্যয়*, এক ভাবে চিন্তন করে যেতে হবে, সেখানে অন্য কোন চিন্তা যেন না ঢোকে। যাঁরা ঠাকুরের মন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁরা ঠাকুরের ধ্যান কিভাবে করবেন? সমস্ত রকমের চিন্তাকে সরিয়ে এক ভাবে ঠাকুরের চিন্তন করে যেতে হবে, ঠাকুর আছেন, এটাই ধ্যান। মন দিয়ে মনকে মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে, একাকার করে দিতে হবে, এটাই ধ্যান।

তাহলে কি শুধু ধ্যান দিয়েই আত্মাকে জানতে হবে? না, আরও পথের কথা গীতা বলছেন, *কেচিদাত্মানমাত্মনা*, আত্মার দ্বারা আত্মাকে জানা যায়। আর বলছেন, *অন্যে সাংখ্যেন যোগেন*, ত্রয়োদশ অধ্যায় এই সাংখ্যেরই বর্ণনা। সাংখ্য পুরুষ ও প্রকৃতির বর্ণনা করেন। কিন্তু সাংখ্য বলতে এখানে জ্ঞানযোগ। বলছেন কেউ ধ্যানযোগ দিয়ে করেন, কেউ সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ দিয়ে করেন, এখানে এর অর্থ হল, প্রকৃতি আর পুরুষকে আলাদা করা। আর *কর্মযোগেন*, আচার্য কর্মযোগের সংজ্ঞা দিচ্ছেন –*ঈশ্বরার্পণবুদ্ধয়া অনুষ্ঠীয়মানং ঘটনরূপং*, যা কিছু কর্ম করছি, সব ঈশ্বরকে

অর্পণ দিয়ে কর্ম করছি। তিনটে পথের কথা এখানে বললেন – ১) উচ্চমানের ধ্যান, ২) বিবেক-বিচার, যেটা জ্ঞানযোগ আর ৩) কর্মযোগ।

চব্বিশ নম্বর শ্লোকে যে কটি পথের কথা বলা হল, এর বাইরেও অনেক পথ আছে; যেটাকে পঁচিশ নম্বর শ্লোকে বলছেন। ঠাকুর বলছেন মত পথ। অনেকে আচার্যের মুখে, এখানে গুরু মুখে না, গুরু হলেন যাঁর কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা নেওয়া হয়, আচার্য হলেন যিনি আমার কাছে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করছেন। আচার্যের কাছ থেকে শাস্ত্রের কথা জেনে নিয়ে, *শ্রুত্বাহন্যেভ্য উপাসতে;* সেটাকে এবার সব সময় মনের মধ্যে ঘোরান। আমি হয়ত আত্মতত্ত্ব নাই জানলাম, কিন্তু আচার্য মুখে বলে দিলেন জিনিসটা এই, এটা শুনে নিয়ে ওটাকে নিয়েই চিন্তন করতে থাকা। আচার্য হয়ত বলে দিলেন, এই ভেড়াই তোর ইষ্ট, এই ভেড়ার উপরই ধ্যান করবি। শিষ্য যদি আচার্যের বাক্যকে শ্রদ্ধাপূর্বক পালন করতে থাকে, তাতেও হবে। আবার অনেকে আছেন, যাঁরা মনে করেন আমি অন্য কিছু করতে পারি না, তাই শ্রদ্ধার সাথে আমি শাস্ত্র শুনব, এতেও হবে। এদেরই যদি হয়, তাহলে যাঁরা বিবেকী পুরুষ তাঁদের আর কথা কি। এখানে শ্রুতিপরায়ণাদের কথা বলছেন।

অনেক আগে আমাদের একজন পণ্ডিতমশাই ছিলেন, তিনি এই কাহিনীটা আমাদের বলতেন। এক গ্রামে একজন ভাগবত পণ্ডিত ভাগবত পাঠ করতে যেতেন, সেখানে এক বৃদ্ধা অনেক দূর থেকে একটা লণ্ঠন নিয়ে লাঠি হাতে ঠক্ ঠক্ করতে করতে সবার সামনে গিয়ে লণ্ঠনটা রেখে বসতেন, বসেই ঘুমিয়ে পড়তেন। পণ্ডিত একদিন সেই বৃদ্ধাকে বললেন, 'বুড়ি মা, তুমি রোজ ভাগবত শুনতে এসে রোজ ঘুমিয়ে পড়ো, কিছুই তো শোন না। এত কষ্ট করে আসার কি দরকার'। শুনে ওই বৃদ্ধা বলছেন, 'সে কি বাবা, ঘুমিয়ে পড়লে কি হবে, কানে ঠাকুরের দুটো কথা তো যাচ্ছে'। এই একটা আমাদের ধারণা যে, ঈশ্বরীয় কথা কানে গেলেই হবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চব্বিশ আর পঁচিশ দুটি শ্লোক খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক। গীতা ভগবানের কথা। আচার্য শঙ্করকে ঠাকুর অবতার বলছেন। তিনি কথায় কথায় শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলছেন। এমনকি উপনিষদের ব্যাখ্যাতেও কোথাও কোথাও তিনি গীতার শ্লোক নিয়ে আসছেন। গীতা হিন্দুদের অত্যন্ত পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, ঠাকুর গীতাকে মোক্ষশাস্ত্র বলছেন। তাই না, যেভাবে বিষয়বস্তু রাখা হয়েছে, তাতে আচার্য শঙ্কর হিন্দু ধর্মের মূল আধারকে নীচের দিকে শক্তপোক্ত করে দিলেন, উপরের দিকে সাজিয়ে দিলেন। সেই কবে ব্যাসদেব, মাঝখানে শঙ্করাচার্য আর তারপরেই স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ বলা মানে শ্রীরামকৃষ্ণকেও ওর মধ্যে ধরাই আছে। এই তিনজন হিন্দু ধর্মকে একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠা দিলেন। প্রতিষ্ঠা মানে, হিন্দু ধর্মের ভিতটাকে শক্ত করে দিলেন, সম্মান তো বটেই, হিন্দু ধর্মের একটা নিজস্ব সম্মান আছে। বাস্তব ধর্ম বলতে হিন্দু ধর্ম, এটা অনেকেই ইমোশানালি জানেন, কিন্তু এখানে ইমোশানের কিছু নেই। মহাভারতে যেমন খুব সুন্দর কথা আছে, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই ব্যাপারে জগতে যা কিছু আছে সব মহাভারতে আছে। যেটা মহাভারতে নেই সেটা কোথাও নেই। ধর্মের ব্যাপারে যা কিছু আছে, সবটাই হিন্দু ধর্মে আছে। হিন্দু ধর্মে এমন এমন অনেক কিছু আছে, যা অন্য কোথাও নেই। হিন্দু ধর্মকে যদি তুলনা করা যায়, তাহলে একমাত্র একটা জিনিসের সাথেই তুলনা করা যেতে পারে, তা হল বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা কে? এই প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। কোন মানুষ বিজ্ঞানের ব্যাপারে পুরোপুরি জানতে পারে না। বিজ্ঞান বহির্জগতের ব্যাপারে জ্ঞানসমূহ, অন্তর্জগতের ব্যাপারে হিন্দু ধর্ম জ্ঞানসমূহ।

অন্যান্য ধর্ম একটা জিনিসকে নিয়েই চলে, যেমন ফিজিক্স একটা জিনিসকে নিয়েই চলে, বায়োলজি একটা কিছুকে নিয়েই চলে, কেমেস্ট্রি একটা কিছুকে নিয়ে চলে; অন্যান্য ধর্ম ঠিক এইভাবে চলে। হিন্দু ধর্ম পুরো বিজ্ঞান। কবে থেকে বিজ্ঞান? আদি অনন্ত কাল থেকে। কে এই বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা? ভগবান নিজে। হিন্দু ধর্মও তাই। কবে থেকে চলছে? আদিমকাল থেকে। কে

প্রতিষ্ঠাতা? ভগবান নিজে। হিন্দু ধর্ম বলা যা, ধর্ম বলাও তাই; ধর্ম বলা যা, হিন্দু ধর্ম বলাও তাই। এখানে কোন ইমোশানালিজম্ নেই, এটা পুরোপুরি বাস্তব। যাঁরা বোঝেন না, তাঁরা বুঝবেন না। সমস্যা হল, হিন্দু ধর্ম এত বিশাল যে, আমরা নিজেরাও জানি না। আমি নিজেও হিন্দু ধর্মের বেশির ভাগ জিনিসই জানি না, জানা সম্ভবই না। আঠারোটি পুরাণ, আঠারোটি উপপুরাণ, সব মিলিয়ে এগারো লক্ষ শ্লোক। তন্ত্রে শতকরা নব্বই ভাগ বই পুঁথি আকারে পড়ে আছে, এখনও ছাপাই হয়নি। জানার উপায়ও নেই যে, হিন্দু ধর্মে কত গ্রন্থ আছে। একটা দুটো চটি বই পড়ে আমরা হিন্দু ধর্মের একটা ধারণা করে নিই, কারণ আমাদের উদ্দেশ্য হল জীবনটাকে কোন ভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু হিন্দু ধর্মের একটু গভীরে প্রবেশ করলে খেই হারিয়ে যাবে, সত্যিই খেই পাওয়া মুশকিল। এই কথা এইজন্যই বলা, মিডিয়া হয়ে যাওয়াতে আমাদের কাছে প্রচুর প্রশ্ন আসে, আমরা উত্তর দিই, বেশি জানতে গেলে বেশি পড়তে হবে আপনাকে। আপনি শাস্ত্রের আলোচনা শুনবেন না, জানার আগ্রহ নেই, পড়াশোনা নেই, এভাবে ধর্ম হয় না। বিজ্ঞানকে জানতে হলে যেমন পড়াশোনা করতে হয়, হিন্দু ধর্মকে জানতে হলে প্রচুর পড়াশোনা খুব দরকার। আমার একান্ত অনুরোধ, ইউটিউবে আমাদের প্লে লিস্টের যে কোন একটা বিষয়কে নিয়ে তার পুরো লেকচারগুলো শুনুন, তাহলে গিয়ে কিছুটা আইডিয়া পাবেন।

চব্বিশ ও পঁচিশ নম্বর শ্লোক বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যে, ঠিক ঠিক হিন্দু ধর্ম হল – বেদ, উপনিষদ ও গীতা। শ্রীমদ্ভাগবতে এর তত্ত্বগুলিকে ভক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, আমরা পরে এর আলোচনা করব। বাইশ নম্বর শ্লোকে বলেছিলেন, *উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ,* আসলে বলতে চাইছেন, তুমি হলে সেই আত্মা। সমস্ত বেদ, উপনিষদও এই একই কথা বলে যাচ্ছেন। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে আমি জানি, আমি দেহ, আমি মন। নিজের ব্যাপারে স্বাভাবিক ভাবে জানি, আমি অমুকের সন্তান, অমুকের স্বামী, অমুকের স্ত্রী ইত্যাদি। আসলে তো আমি আত্মা। যে কোন কারণেই হোক, এই আত্মা মনকে বরণ করে নিয়েছেন। মন ইন্দ্রিয়কে বরণ করেছে, ইন্দ্রিয় দেহকে বরণ করেছে। ইন্দ্রিয়ের যখন যেমন ইচ্ছা হয়, মনের যখন যেমন ইচ্ছে হয়, তখন তারা তেমন করতে থাকে। আত্মা এসবের কোন কিছুতে লিপ্ত হন না, আত্মা হলেন উপদ্রষ্টা, সব কিছুকে দেখে যাচ্ছেন।

আত্মা অনুমন্তা, তিনি অনুমতি দেন। আমাদের ভাগ্য যেমনই হোক, ভাল হোক, মন্দ হোক, জীবনে যে অবসাদ, জীবনে যে দুঃখ আসে, এই সব কিছুর জন্য দায়ী আমি নিজে, আমি ছাড়া কেউ দায়ী না। এটা কোন উপদেশ দেওয়া জন্য বলা হচ্ছে না, এটাই সত্য। একবার একজন মহারাজের সামনে কথা হতে হতে আমি বললাম, অমুক লোকের জন্য অমুকের জীবনটা সর্বনাশ হয়ে গেল। ওই মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আটকে দিলেন, 'দেখ, কেউ কারুর সর্বনাশ কোন দিন করতে পারে না, যা কিছু আমাদের জীবনের সর্বনাশ হয়, পুরোটাই নিজের জন্য। আর দ্বিতীয় কথা, আত্মা রূপে কখন কারুর সর্বনাশ হয় না'। যে সময়ের কথা বলছি, তখন আমি কোন বাচ্চা ছেলে ছিলাম না, বয়সের সাথে পরিপক্কতাও একটু হয়েছিল। কিন্তু কথাটা শুনে আমি চমকে গিয়েছিলাম। সাধু সন্ন্যাসীদের এটা একটা বিরাট সুবিধা। আমরা এখানে সাধু সন্ন্যাসীদের সাথে সব সময় আছি কিনা, পথ একটু ডানদিক বামদিক হলে আরেকজন সন্ন্যাসী ভাই সঙ্গে সঙ্গে আটকে দেবেন। তিনি আবার কিছু উল্টোপাল্টা করলে আমি আটকে দেব। এক অপরের হাত ধরে আছেন। এই কারণেই সাধুসঙ্গের কথা বলা হয়। একজন সন্ন্যাসী যে জানেন না তা না, তিনি যে মানেন না, করেন না, তাও না, সন্ন্যাসী সবই বোঝেন, জানেন, সবই মানেন, করেন কিন্তু মাঝে মাঝে লিঙ্কটা কেটে যায়। শাস্ত্রের মধ্যে থাকলে, সাধুসঙ্গের মধ্যে থাকলে হঠাৎ করে মনে করিয়ে দেয়, তোমার এই মত ঠিক না, তোমার এই পথটা ভুল, ফেরত এসো।

জীবনে আমরা যাবতীয় যা কিছু করেছি, সব আমাকেই ভোগ করতে হবে। আমার যা কিছু ভাল মন্দ যা কিছু জীবনে আসে, তার জন্য কেউ দায়ী না, আমিই নিজে আমার ভাল মন্দকে ডেকে এনেছি। ভগবান কোন কিছুতে জড়ান না, তিনি আছেন বলেই সমস্ত সৃষ্টি চলছে। তিনি যে কাউকে বড়লোক করবেন, কাউকে গরীব করবেন, শিশুরা আজকাল কত রকমের রোগ নিয়ে জন্মাচ্ছে, ভগবান কি কখন এই রকম নিষ্ঠুর হতে পারেন! কেন ভগবান কাউকে ভাল শরীর দিয়ে, কাউকে অত্যন্ত বাজে একটা শরীর দিয়ে পাঠাবেন! তাহলে কেন বাচ্চাটা এই রকম রোগ নিয়ে জন্ম নিল? কেন আমার শরীরে এত ব্যাধি হয়? কারণ আগের আগের জন্মে আমি কোন জিনিসকে দেখে আমারও সেই জিনিসটা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। তার ফলস্বরূপ আজকে আমার এই জিনিসটাই করতে হচ্ছে। বৃহতের ছবিটা পরিষ্কার হলে বুঝতে পারি, আমরা যেভাবে ভাল-মন্দ মনে করি, ভাল-মন্দ এভাবে হয় না।

উইনস্টন চার্চিল খুব বিখ্যাত লোক। উনি বিরাট ধনী পরিবারে জন্মেছিলেন। ওই পরিবারের বিশাল সম্পত্তি ছিল, যার মধ্যে ছিল একটা বিরাট স্টেট, স্টেট মানে কয়েকশ একর নিয়ে বিশাল এক জমির মালিক, ওর মধ্যে সব কিছুই থাকত, একদিকে জঙ্গল, আবার নদী, পোল, অনেক কিছু। চার্চিল ছোটবেলা পরিবারের বাচ্চাদের নিয়ে জঙ্গলে খেলা করতে যেতেন। একটা জায়গায় লাফাতে গিয়ে ওনার পা জখম হয়। পায়ের ওই ব্যাথাটা তাঁর সারা জীবনের মত থেকে গেল, ঠিক ভাবে হাঁটাচলা করতে পারতেন না। যার জন্য খেলাধূলাতে তিনি অনেক কিছু করতে পারলেন না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উনি সৈন্য বাহিনীর ক্যাপ্টেন ছিলেন। পায়ের ব্যাথার জন্য সব যুদ্ধে উনি ঘোড়ার পিঠে যেতেন, আর রাইফেলের বদলে রিভলবার সঙ্গে করে চলতেন।

একবার একটা যুদ্ধে ঘোড়ার পিঠে যাচ্ছেন, রাস্থার ধারে শত্রু পক্ষের অনেক সৈন্য মরে পড়ে আছে। হঠাৎ একজন মৃত সৈন্য পাশ থেকে রাইফেলটা নিয়ে দুম্ করে দাঁড়িয়ে পড়ল চার্চিলকে মারার জন্য। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রিভলবারটা নিয়ে গুলি করে লোকটাকে শেষ করে দিলেন। স্মৃতিচারণে তিনি বলছেন, বাচ্চা বয়সে আমার পায়ে যদি ওই চোট না পেতাম, তাহলে সেদিন অবশ্যই আমি মারা যেতাম। কারণ পায়ে ব্যাথা বলে আমাকে ঘোড়া দেওয়া হয়েছে আর বিশেষ অনুমতিতে আমাকে রাইফেলের বদলে রিভলবার ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছিল। ছোটবেলা আমার পা যদি জখম না হত, ওই দিন অবশ্যই আমি মারা যেতাম, কারণ রাইফেল ওঠাতে ওঠাতেই লোকটা আমাকে মেরে দিত। জীবনে ভালমন্দ আমাদের অনেক কিছুই হয়, কিন্তু সর্বনাশ কিছু হয় না। আজ আমি যে অবস্থায় আছি, এই অবস্থার জন্য দায়ী আমি নিজে। আমার অবস্থার জন্য আমি ছাড়া কেউ দায়ী নয়, এটাকে যদি ভাল করে বুঝে নেওয়া হয়, এরপর শুরু হবে নিজেকে ঠিক করে নেওয়ার প্রক্রিয়া।

দ্বিতীয় আরেকটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, আসলে আমি হলাম উপদ্রষ্টা ও অনুমন্তা। সব কিছুকে আমি নির্বিকার ভাবে দেখে যাচ্ছি, কেবল একবার করে মাথাটা নেড়ে দিচ্ছি। ফলে আমরা বুঝে যাব যে, আমার যা কিছু হয়েছে বা হচ্ছে, আমার অনুমতিতেই সব হচ্ছে। যিনি শেষ অনুমতি দিচ্ছেন, এটা হবে কি হবে না, সেই তিনি হলেন আমি নিজে। আমি যদি অবসাদগ্রস্ত হই, দায়ী আমি নিজে। আমার শরীরে যদি বিশেষ কোন সমস্যা হয়, আমি নিজে এই সমস্যার জন্য দায়ী। কারুর স্ত্রী বা স্বামী গত হয়ে গেছেন, সেটার জন্য সে দায়ী না, তার কর্ম দায়ী। কিন্তু এর জন্য সে অবসাদগ্রস্ত হবে কিনা, এটা পুরোপুরি তার নিজের উপর নির্ভর করছে। মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট লেগেই থাকে, অল্প বয়স থেকে যদি প্রস্তুতি না নিয়ে থাকে, সামান্য একটু দুঃখ-কষ্টে, কারুর সামান্য কথাতে মন ভেঙে যাবে। স্বামী গত হয়ে গেলে মন ভেঙে যাওয়ারই কথা, কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ভেঙে পড়ে থাকাটা আটকাতে হবে। মন ভেঙে গেছে, আবার সোজা হয়ে নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরৎ চলে আসতে হবে। এই জিনিসটাকে সব সময় মনে করানো –আমিই অনুমন্তা। আজ

যে আমি আপনাদের সামনে বসে শাস্ত্র আলোচনা করছি, আমিই এর অনুমন্তা। আমার জীবনে যত দুঃখ-কষ্ট, আমিই ডেকে নিয়ে এসেছি। আমি যদি অনুমতি না দিতাম, আমার জীবনে এই দুঃখ-কষ্ট আসতে পারত না। স্বামীজী বলছেন, বাতাসে কত ভাইরাস ব্যক্টেরিয়া সব সময় ভেসে বেড়াচ্ছে, আমার শরীর যদি দুর্বল হয় তবেই তারা আমার শরীরে ব্যাধির সঞ্চার করতে পারবে। করোনার জন্য সেই সময় আমাদের ভ্যাকসিন নিতে হয়েছিল, যাতে করোনার ভাইরাস শরীরে ঢুকে আমাদের কিছু করতে না পারে।

চব্বিশ আর পঁচিশ নম্বর শ্লোকে বলছেন আত্মজ্ঞান কিভাবে হয়, ঈশ্বরদর্শন কিভাবে হয়। আত্মজ্ঞান লাভের বা ঈশ্বরদর্শনের অনেকগুলি পথ এই দুটো শ্লোকে বলছেন। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হল ধ্যানের পথ। তারপর বললেন সাংখ্যযোগের দ্বারা কিভাবে ঈশ্বরজ্ঞান হয়। এই ত্রয়োদশ অধ্যায় হল সাংখ্যযোগ, সাংখ্যযোগ মানেই পুরুষ আর প্রকৃতির বিচার। কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ দিয়েও ঈশ্বরজ্ঞান হয়। এগুলোর কোনটাই যদি না পারে, *শ্রুত্বাহন্যেভ্য উপাসতে*, তাহলে শাস্ত্রের কথা শুনতে থাকুক, শাস্ত্র শুনতে শুনতেও হয়। আচার্য এখানে খুব সুন্দর বলছেন, *শ্রুতি পরায়ণাঃ শ্রুতিঃ শ্রবণং পরম্ অয়নং গমনং মোক্ষমার্গপ্রবৃত্তৌ পরং সাধনম্*, আচার্যের মুখে শাস্ত্রের কথা শুনে যাচ্ছেন, আচার্য বলে দিয়েছেন আত্মার স্বরূপ, ঈশ্বরের স্বরূপ এই রকম, এটাই বার বার শুনতে শুনতে ঈশ্বর জ্ঞান হয়ে যাবে। কোথা থেকে, কিভাবে হয়ে যাবে কারুর জানা নেই, কারণ ওর মধ্যেই ডুবে আছেন কিনা।

ঠাকুর একটা খুব সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছেন, এক জায়গায় একজন গীতা পাঠ করছেন, একজন লোক শ্রোতাদের পিছনে বসে গীতা শুনে যাচ্ছেন আর তাঁর চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল পড়ে যাচ্ছে। লোকটি কিছুই জানে না, বোঝে না, কিন্তু নিষ্ঠার সাথে শুনছেন আর কেঁদে যাচ্ছেন। একজন গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই যে তুমি গীতাপাঠ শুনছ, কিছু বুঝতে পারছ'? 'আমি কিছুই বুঝি না, আমি শুধু দেখছি যুদ্ধক্ষেত্রে রথে বসে ঠাকুর অর্জুনকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন'। অন্য জায়গায় ঠাকুর বলছেন, একজন ভাগবত পণ্ডিত রাজাকে ভাগবত শোনাত, আর মাঝে মাঝে রাজাকে জিজ্ঞেস করত, 'রাজা বুঝেছ'? রাজাও পণ্ডিতকে বলতেন, 'আগে তুমি বোঝ'। বাড়ি ফিরে পণ্ডিত ভাবতে থাকে, রাজা কেন বলে 'আগে তুমি বোঝ'। কিছু দিন পর পণ্ডিত বুঝতে পারল, ও এই ব্যাপার। পণ্ডিত আর রাজাকে ভাগবত শোনাতে যায় না। রাজা লোক পাঠিয়েছে খবর নিতে, পণ্ডিত আসছে না কেন। রাজার লোককে পণ্ডিত বলে দিল, তুমি তোমার রাজাকে বলে দিও, আমি এবার বুঝেছি।

এই যে এতগুলো উপায়ের কথা বলছেন, ধ্যানের কথা বলছেন, সাংখ্যের কথা অর্থাৎ বিবেক বিচারের কথা বলছেন, কর্মযোগের কথা বলছেন আর এমনি যোগ, প্রাথমিক স্তরে যে সাধনা করা হয় তার কথা বলছেন আর তার সাথে শাস্ত্র শ্রবণের কথা বলছেন। তাহলে এর মধ্য কোন একটা সূত্র আছে কি, যে সূত্র এই সব কিছু যোগ করে দিচ্ছে? হ্যাঁ আছে, সেটা হল নিষ্ঠা। ভক্ত ধ্রুব সৎ মায়ের লাঞ্ছনায় রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেল। সে কিছুই জানে না। ধ্রুবকে ঈশ্বর কৃপা করলেন। পুরাণের কাহিনী, এর থেকে বেশি কিছু জানা যায় না। কিন্তু এর থেকেও বেশি হল, যেটা সব জায়গায় প্রামাণিক ভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, সেটা হল ঠাকুরের সাধনা। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের একজন কালী পূজারী। মন্ত্র না নিলে পূজা করার অধিকার হবে না, মন্ত্র তাঁকে নিতে হয়েছে। কিন্তু সাধনা বলতে পরম্পরাতে সবাই যা বলে, সেদিকে না গিয়ে শুধু ব্যাকুলতার জোরে, মা দেখা দাও, দেখা দাও মা, শুধু এইটুকু আকুতির জোরে তিনি মা কালীর দেখা পেলেন। নিষ্ঠা কি জিনিস, ঠাকুরের জীবন না দেখলে বোঝা যাবে না। যেটাই করবেন সেটার জন্য চাই নিষ্ঠা। ধ্যান করব, নিষ্ঠা; জপ করছি, নিষ্ঠা; কর্মযোগ করছি, নিষ্ঠা; বিবেক-বিচার করছি, নিষ্ঠা। তোতাপুরীর কাছ থেকে সন্ন্যাস নিয়েছেন। হৃদুকে ডেকে বলছেন, ওরে হৃদু আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, ঘরে ঢুকব না, চাঁদনিতে আমি খাব; নিষ্ঠা।

গীতা যে মত পথের কথা বলছেন, তাতে এই নিষ্ঠার কথাই বলতে চাইছেন। নিষ্ঠা কখন বাইরে থেকে আসবে না। এই ভক্তিশাস্ত্রগুলি সর্বনাশ করে দিয়েছে। হিন্দী বেল্টে খুব নামকরা কথা প্রচলিত আছে –বিনু সত সঙ্গ বিবেক ন হোই রামকৃপা বিনু সহজন সই। সৎসঙ্গ ছাড়া বিবেক হয় না, আর রামের কৃপা না হলে সৎসঙ্গ হবে না। রামের কৃপা না হলে সৎসঙ্গ হবে না, এখানে এসেই হয়ে গেল সর্বনাশ। ধর্ম পথে কেন যাচ্ছেন না? ভগবান কৃপা করে টানছেন বলে যাচ্ছি না। এটা আমাদের ধর্ম নয়, তুলসীদাসের ধর্ম এটা। কেন? তুলসীদাসের এটা ভাবজগৎ, তাঁর ভাবজগতে একমাত্র রাম আছেন। যা কিছু হচ্ছে সব রাম করছেন। ঠাকুরও কথায় কথায় মায়ের ইচ্ছা বলে যাচ্ছেন। তুলসীদাসের মুখে যেটা সাজে, আমাদের মুখে সেটা সাজে না। আমাদের জন্য হল, ভাল মন্দ যা করছি, সব আমি করছি; এটাই আমাদের ঠিক ঠিক পথ। যখন ভাবজগতে ঢুকে যান, যেখানে অসহায়, ঠাকুর নিজের শরীর সামলাতে পারছেন না, তিনিই বলতে পারেন, মা সব কিছু করছে। এটা আমাদের জন্য নয়, আমি আপনি যা করছি, সব আমি করছি। আধ্যাত্মিক জীবনে যাবতীয় যা কিছু আছে, এটার জন্য আমি নিজে দায়ী। নিষ্ঠা অন্য কেউ দেবে না, এটা আমাকে নিজেকে আনতে হবে।

এই দুটি শ্লোকে অনেকগুলো পথের কথা বলে দিলেন, এর যে কোন একটা পথ বেছে নিয়ে নিষ্ঠার সাথে ওই পথ ধরে এগোতে হবে। একটা ফোরাম আছে, সেখান থেকে একজন লিখে পাঠালেন আমিষ খেয়ে কি গীতা পাঠ করতে পারে? আমি উত্তর দিলাম, আগে পাঠ করতে শুরু করুন। এই উত্তর যদি মনের মত না হয়, তাহলে আরেকটা অজুহাত বার করবেন যাতে গীতা পাঠ না করতে হয়। আগে শুরু করুন দেখি, ঠাকুরের নাম করুন, সকালে করুন, বিকালে করুন, রাত্রিতে করুন, শুয়ে করুন, দাঁড়িয়ে করুন, স্নান করতে গিয়ে করুন, দাঁত ব্রাশ করতে করতে করুন, আগে শুরু করুন, কিছু তো একটা করুন। কিছু না করেই শুধু প্রশ্ন আর প্রশ্ন। কোথাও যদি আইনের একটা ফাঁক পাওয়া যায়, যাতে খাটতে না হয়। স্বামীজী তাঁর ভাববার কথা বইতে এই জিনিসগুলিকে ব্যঙ্গ করে প্রচণ্ড আক্রমণ করেছেন। সব তিনি দেখছেন, ব্যস্‌ আমাকে আর কিছু করতে হবে না। কিন্তু নিজের যত চালাকি, বদমাইসি, ফাঁকিবাজি, এই জায়গাতে সব ঠিক থাকবে। কিছু অন্তত করুন, করে ঈশ্বরের দিকে এগোন।

এখানে আচার্য শেষে খুব সহজ ভাষায় এই ব্যাপারে খুব ছোট্ট করে বলছেন, আচার্যের কথায় কোন কোটেশান নেই, নিজেরও লম্বা লম্বা বক্তব্য নেই। আমাদের কাউকে গরুর উপর প্রবন্ধ লিখতে দিলে শুরু করবে, রবীন্দ্রনাথ গরুর উপর কি বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র কি বলেছেন, শরৎচন্দ্র কি বলেছেন, সব বলবে কিন্তু গরুর উপর কিছু লেখা হবে না। আচার্য শঙ্কর তত্ত্বটাকে সহজ ভাষায় খুব ছোট্ট করে বলে দিচ্ছেন, একটি শব্দ বেশি নেই, একটি শব্দ কম নেই, অমুক কি বলেছে, তমুক কি বলেছে, এসব কিছু নেই। যে জায়গাতে প্রমাণের দরকার হয়, সেখানে ছোট্ট করে লিখে দিচ্ছেন – *ইতি শ্রুতে,* শ্রুতিতে এই রকম বলা আছে। আচার্য বলছেন, শ্রুতি পরায়ণ কারা করেন? *কেবলপরোপদেশপ্রমাণাঃ স্বয়ং বিবেকরহিতা ইতি অভিপ্রায়ঃ,* পরের উপদেশকে যিনি প্রমাণ মনে করেন। তিনি হয়ত নিজে শাস্ত্র পড়েননি, ধ্যান-ধারণা করা নেই, নিজের হয়ত বিবেক নেই, শুধু অপরের কথাকেই প্রমাণ রূপে গ্রহণ করে যাচ্ছেন। যেমন ছোট শিশু মায়ের কথাকে বিশ্বাস করে, শ্রুতিপরায়ণ মানে ঠিক এই নিষ্ঠা। অপরে যা বলছে সেটাকেই প্রমাণ বলে ধরে নিচ্ছেন, কিন্তু তারপরেও তিনি লেগে আছেন।

কিমু বক্তব্যং প্রমাণং প্রতি স্বতন্ত্রা বিবেকিনো মৃত্যুম্‌ অতিতরন্তি ইতি অভিপ্রায়ঃ, বিবেক-বিচার না করে, ধ্যানজপ না করে, শাস্ত্র না পড়ে, শুধু অপরের উপদেশকে প্রমাণ রূপে নিয়েই যদি এনাদের হয়ে যায়; তাহলে যিনি শাস্ত্র ঠিক ঠিক জানেন, যাঁর বিবেক বিজ্ঞান আছে, তাঁদের তো কোন কথাই নেই। সেইজন্য বলা হয়, হিন্দু ধর্ম সবার জন্য। যাদের পড়াশোনা নেই তাদের জন্যও

হিন্দু ধর্ম আছে, যাঁদের পাণ্ডিত্য আছে তাঁদের জন্যও হিন্দু ধর্ম আছে, যাঁরা দরিদ্র তাদের জন্যও হিন্দু ধর্ম আছে, যাঁরা বড়লোক তাঁদের জন্যও হিন্দু ধর্ম আছে। হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রগুলো সবারই জন্য। অবিবেকী, শাস্ত্র পড়ে না, কিন্তু কারুর প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস আছে, নিষ্ঠার সাথে তাঁর উপদেশ শুনে যাচ্ছে, এনারাই হলেন *শ্রুতিপরায়ণ*।

আগে বলা হয়েছিল, *যজ্ জ্ঞাত্বাহমৃতমশ্নুতে*, সাংখ্য জিনিসটা অর্থাৎ বিবেক-বিচার কিভাবে এটা মুক্তির কারণ হয়? আসলে যে পথই নেওয়া হোক না কেন, জ্ঞানপথ নিক, ভক্তিপথ নিক, যোগপথ নিক, ধাপ্পাবাজির পথ ছাড়া, নিষ্ঠা যদি থাকে, শেষে বিবেক-বিচার আসবেই আসবে, আসতে বাধ্য। কিন্তু ধর্ম পথে বেশির ভাগ লোকই ধাপ্পাবাজ হয়। আমাদের একজন মহারাজ আছেন, তিনি বলেন, 'আমাকে এসে যদি কেউ বলে, মহারাজ আমি ভক্ত, সঙ্গে সঙ্গে আমি ভিতর থেকে সাবধান হয়ে যাই। এই রে, এক্ষুণি হয়ত বলবে, মহারাজ গেস্ট হাউসে একটা ব্যবস্থা করে দিন, তারপরেই হয়ত বলে বসবে, মহারাজ দুপুরে প্রসাদ পাওয়া যাবে তো', ইত্যাদি।

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ।।২৬।।

(হে অর্জুন, যা কিছু স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ উৎপন্ন হয়, সেই সকলই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে উৎপন্ন হয়, জানবে।)

এই জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে, যে জিনিসের জন্ম হয়, নাশ হয়; জানবে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই দুটোর সংযোগ হয়েছে। আমরা পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুটো অনেকবার ব্যবহার করেছি। ত্রয়োদশ অধ্যায়েও ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই দুটো শব্দ ঘুরে ঘুরে আসছে; সেই একই জিনিস, পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষ প্রকৃতিকে নিয়ে অনেকে অনেক রকম প্রশ্ন করেন। যেমন পুরুষ বলতে যেমন রাধা আর কৃষ্ণ, রাধা হলেন প্রকৃতি কৃষ্ণ হলেন পুরুষ, শিব আর শক্তি, এখানেও পুরুষ আর প্রকৃতি আর শ্রীশ্রীমায়ের নামে স্তব রচিত হয়েছে *প্রকৃতিং পরমাভয়ম্*, এটাকে নিয়ে অনেকের মনে সংশয় উৎপন্ন হয়। এটাকে নিয়ে তাই একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার।

যে শাস্ত্র বা দর্শন নিয়ে আমরা যখন আলোচনা করি, তখন সেই শাস্ত্রের, সেই দর্শনের শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়। একটু আগে বলা হল, ধর্ম মানে হিন্দু ধর্ম। আমাদের ঋষিরা একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন, একটা তত্ত্ব দিয়েছেন, সেই শব্দকে নিয়ে অন্য কোন ঋষি অন্য একটা ভাব নিয়ে আসছেন। এটা হয়, শব্দের অর্থগুলো পাল্টায়; সব কিছুতেই এই জিনিসটা লক্ষ্য করা যায়, সাহিত্যেও হয়। সাংখ্য দর্শন, যোগ দর্শন আর বেদান্তের জ্ঞানকাণ্ড, এনাদের কাছে পুরুষ মানে চেতন, প্রকৃতি মানে জড়। বেদান্তের যে আরেকটি শাখা ভক্তি বেদান্ত, ভক্তি বেদান্তে পুরুষ নিষ্ক্রিয় থাকে, এই যে বলা হল, *উপদ্রষ্টানুমন্তা চ;* পুরুষ উপদ্রষ্টা। তাহলে কাজ কে করে? সমস্ত কিছু প্রকৃতি করে। শক্তি মতে বা তন্ত্র মতে শিব আর শক্তি এই দুজনই আছেন। হিন্দুদের এত শাস্ত্র আর শাস্ত্রগুলিতে এত কিছু মিশে রয়েছে যে, এক একটা শাস্ত্রকে যদি ঠিক ঠিক বোধগম্য না করা হয় তাহলে এই শাস্ত্রের দর্শনটা ঠিক কি বোঝা যাবে না, ফলস্বরূপ সব কিছু গুলিয়ে যাবে।

শক্তি মতে শিব আর শক্তি, যখন সৃষ্টি নেই, ঠাকুর যেমন বলছেন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি, অগ্নি যখন নেই তখন কাঠের মধ্যেই অগ্নিটা রয়েছে, দাহিকা শক্তি তার মধ্যেই আছে। সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে চুপচাপ বসে আছে, তার যে তীর্যক গতি ওর মধ্যেই বসে আছে। আগুন যেখানে নেই, কিন্তু একটা দূর পর্যন্ত আগুনের তাপ বোঝা যায়। শক্তি বা তন্ত্র মতে পুরুষ প্রকৃতিকে তাঁরা এইভাবে নেন, পুরুষ আর প্রকৃতি মিশে আছে। তার মানে পুরুষ আর প্রকৃতিকে তাঁরা মানছেন। সৃষ্টির পর তাঁরা আলাদা, ঠিক যেমন সাংখ্য দর্শন বলছেন। সৃষ্টি মানেই পুরুষ আর প্রকৃতির খেলা,

সাংখ্য দর্শনেরও একই মত। কিন্তু সৃষ্টি যখন নেই, তখন পুরুষ আর প্রকৃতি মিলে এক হয়ে যায় – এটা তখন বেদান্ত মত হয়ে যায়। আমরা বর্তমানে হিন্দু ধর্মকে নিয়ে যত কথা বলি, তার মধ্যে কখন কোনটা আমরা যোগ মতে বলছি, কোনটা কখন শক্তি মত থেকে বলছি, কোনটা বেদান্ত মত থেকে বলছি, বলা খুব মুশকিল। শাস্ত্র পড়তে গেলে আমাদের সব গুলিয়ে যায়, এমনকি, আচার্যদের প্রণাম জানিয়ে বলছি, বেশির ভাগ আচার্যরাই এটা গুলিয়ে ফেলেন। কারণ ওনারা সব শাস্ত্র দেখেননি। সব শাস্ত্র দেখলে বোঝা যায়, এই গোলমালটা কেন হচ্ছে। আমার Living Hinduism গ্রন্থে হিন্দু ধর্মের এই জিনিসগুলিকে গুছিয়ে সুন্দর করে রাখা আছে।

হিন্দুদের খুব নামকরা একটি গ্রন্থ হল অধ্যাত্ম রামায়ণ। অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে, দেবর্ষি নারদ এসে শ্রীরামকে বলছেন, পুং বলতে যা কিছু আছে সব আপনি আর স্ত্রী বলতে যাবতীয় যা কিছু আছে সব সীতা। তার মানে সেখানে পুরুষ আর প্রকৃতির যে ভাব, রাম আর সীতার উপর সেই ভাব নিয়ে এসেছেন। কারণ তাঁদের কাছে জড় চেতন বলে কিছু নেই, সবটাই তো ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বর তো কর্তা নন, তিনি *উপদ্রষ্টানুমন্তা চ*। তাহলে কে করেন? প্রকৃতিই করবেন। প্রকৃতি কে? প্রকৃতি ভগবানের শক্তি। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের সহধর্মিণী, শুধু লীলাসহচরীই নন, মা ঠাকুরের শক্তি, ঠাকুরের সব কিছু এই শক্তিতে চলে। আমাদের এক মহারাজ বলতেন, যা চাওয়ার মায়ের কাছে গিয়ে চাইবি, ঠাকুর তো গভীর সমাধিতে মগ্ন হয়ে আছেন। যার জন্য পার্বতীকে বলা হয় অন্নপূর্ণা। শিবের নামে কত কাহিনী, সবাইকে সব দিয়ে যাচ্ছেন, নিজের জন্য কিছু নেই, ভিখারীর মত ঘুরে বেড়ান, অথচ মা অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার সব সময় পরিপূর্ণ। ফলে কি হয়, শক্তি মতে এসে পুরুষ হয়ে যান ভগবান, আর প্রকৃতি হয়ে যান সেই ভগবানের শক্তি। এই প্রকৃতিকে মায়া বলা হয়, এই প্রকৃতিকে শক্তিও বলা হয়। সেইজন্য ঠাকুর যেখানে পুরুষ প্রকৃতির কথা বলছেন, বা অন্যান্য জায়গায় যখন বলা হয়, তখন দেখতে হয় কোন প্রসঙ্গে পুরুষ প্রকৃতির কথা বলছেন। পুরুষ প্রকৃতি বলতে সেখানে কি চেতন আর জড় বলা হচ্ছে, নাকি ঈশ্বর আর তার শক্তিকে বলা হচ্ছে, নাকি পুরুষ ও নারীকে বলা হচ্ছে – এই কটা জিনিসকে দেখতে হবে। কারণ পুরুষ আর প্রকৃতি এই তিনটে অর্থেই হয়। কোন শাস্ত্র পড়া হচ্ছে, সেখানে কি বলা হচ্ছে দেখে পুরুষ আর প্রকৃতির অর্থ করতে হবে।

এখানে বলছেন, *ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ*, যেখানে যা কিছুর জন্ম সব কিছু ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে হয়। বাস্তব সম্পর্ক হলে অনেক ধরণের সমস্যা হয়ে যাবে। আচার্য এখানে পূর্বপক্ষ থেকে প্রশ্ন উত্থাপন করে বলছেন, দাদা, এই যে শ্লোকে বলা হল ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে সব জন্ম নেয়। ক্ষেত্রজ্ঞ তো আত্মা, আত্মার তো কোন অঙ্গ নেই। একটা ঘটের সাহায্যে কুয়ো থেকে জল তুলতে হলে ঘটের সাথে দড়ি বাঁধতে হয়। ঘটি আর দড়ির সাথে কোন সম্পর্ক হবে না, কারণ এদের কোন অঙ্গ নেই। মাঝে মাঝে বলতে শোনা যায়, অমুকে গলায় দড়ি দিয়ে দিল, গলাটা অঙ্গ বলে দড়ি দেওয়া যাবে, কিন্তু যার অঙ্গ নেই কি করে দড়ি দেবেন এই যে আকাশ, আকাশের সাথে কোন কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক দেওয়া যাবে? দেওয়া যাবে না।

বেদান্তী আচার্য শঙ্কর এবার উত্তর দিচ্ছেন, বলছেন, এই সম্পর্কটা অধ্যাস। অধ্যাস একটা টেকনিক্যাল সম্পর্ক। মনে হচ্ছে সম্পর্ক আছে, আসলে কিন্তু কোন সম্পর্ক নেই। সুক্তিতে যেমন রজতের, দড়িতে যেমন সর্পের ভ্রম হয়; ভ্রম মানে একটা জিনিসের উপর আরেকটা জিনিস চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আসলে আমাদের মনে যে ভাব থাকে, সেই ভাবটা তার উপর আমরা চাপিয়ে দিই। যতক্ষণ যাকে ভালবাসছি, ততক্ষণ তার গুণগান করতেই থাকি, তার এই গুণ আছে, সেই গুণ আছে। যেমনি তার উপর রেগে গেলাম, তেমনি যেগুলো তার গুণাবলী সেগুলোকে অন্য রকম ভাবে নিতে শুরু করি। একটা রিপোর্ট পড়েছিলাম, খুব সুন্দর। একটা স্কুলে বাচ্চাদের ব্যাপারে বাবা-মার কাছে রিপোর্ট পাঠানো হয়। স্কুলের একটা বাচ্চা খুব মারকুটে, সবার সাথে ঝগড়া করে। রিপোর্টে সেটা লেখা যাবে না, সেইজন্য খুব সুন্দর ভাবে লিখছে, Your son is highly individualistic।

কোন বাচ্চা হয়ত মিথ্যা কথা বলে স্কুলে ধরা পড়েছে, He is very good in acting। একই জিনিস, যখন আমরা ভালবাসি, তখন তার গুণগুলি বলতে থাকি; অপছন্দ যখন করি, ওই গুণগুলিকেই ঘুরিয়ে অন্য ভাবে বলা হয়।

অধ্যাসে ঠিক তাই হয়। যাদের মনে টাকা-পয়সার কামনা আছে, ঝিনুকে তাদের রূপো বলে বোধ হবে। যাদের মনে ভয় আছে, দড়িতে তারা সাপ দেখবে। কোথাও যে কোন পরিবর্তন হয়, শুধু আমাদের ভিতরে যে ভাব, সেই ভাবটা বাইরে এসে প্রতিফলিত হয়। পুরুষ বা আত্মার মনে ইচ্ছা জেগেছে, আমি এক আমি বহু হব, তখন প্রথমে সে প্রকৃতি হয়ে যায়, প্রকৃতি হয়ে গিয়ে নিজের ভালবাসাটা তার উপর চাপিয়ে দেয়। শুরু হয়ে যায় খেলা। প্রকৃতি নিজের মত খেলা করে যাচ্ছে, আসলে প্রকৃতি তো সে নিজে, আত্মা ছাড়া তো কিছু নেই কিনা। কিন্তু সে এই খেলাকে দেখে যাচ্ছে *উপদ্রষ্টানুমন্তা* রূপে। কারণ চেতন রূপে তিনি যদি না থাকেন, এই সংসার চলবে না।

আচার্য বলছেন, *সঃ অয়ম্ অধ্যাসস্বরূপঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগো মিথ্যাজ্ঞানলক্ষণঃ*, ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের যে সংযোগ এটা মিথ্যা জ্ঞান। আমি যে আমাকে দেহ মনে করছি, এটাই মিথ্যা জ্ঞান। কিন্তু এটাই সংসার। যবে থেকে ভগবান আছেন তবে থেকে সৃষ্টি, সেইজন্য সৃষ্টিকে অনাদি বলা হয়, মিথ্যা জ্ঞানও থাকবে। আর আজকে যত জীবাত্মা আছে সবারই জ্ঞান হয়ে গিয়ে যদি মুক্ত হয়ে যায়, ভগবান আবার অতগুলো জীবাত্মা বানিয়ে নিয়ে সংসার চালাতে থাকবেন। তারপরে কি হয়? এনাদের খুব সুন্দর উদাহরণ আছে, বলছেন, মুঞ্জ ঘাসের ভিতর থেকে খুব সাবধানে সাদা অংশটা বার করা হয়, ঠিক সেই ভাবে ক্ষেত্রজ্ঞকে খুব সাবধানে, ধৈর্য ধরে, সামলে ক্ষেত্র থেকে আলাদা করতে হয়, তখন সে বুঝতে পারে ক্ষেত্র কি, ক্ষেত্রজ্ঞ কি। কেউ আপনাকে বার করে দেবে না, আপনাকেই এটা নিজে বার করে নিয়ে আসতে হবে।

স্বামীজী কঠোপনিষদের মন্ত্রকে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন, *যমৈবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য*, আত্মা যাঁকে বরণ করেন, সেখানে স্বামীজী বলছেন, আত্মাকে যখন ভিতর রূপে দেখা হয় ততক্ষণ ওটা ঠিক আছে, কিন্তু এই আত্মাকে যদি বাইরের রূপে দেখা হয়, তাহলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে। যেমনি কেউ মনে করবে, ঠাকুর কৃপা করে আমাকে মুক্তি দেবেন, এই একটি মনে করাতে তিনি নিজের সর্বনাশ করে দেবেন, শুধু বেদান্তের না, পুরো ধর্মটাকেই সর্বনাশ করে দেবেন। সংসারে যে ভোগ করছে, সে নিজের ইচ্ছাতেই ভোগ করছে। সংসারে যে দুর্ভোগ হয় সেটাও নিজের জন্য। সংসারে মন্দ যা হয় নিজের জন্য, ভাল যা হয় নিজের জন্য। আত্মজ্ঞান পেতে হবে, নিজেকেই চেষ্টা করে পেতে হবে।

কিভাবে পাবে? আচার্য শঙ্কর পরিষ্কার বলছেন, প্রথমেই এই জ্ঞান –যেখানে যা কিছু সৃষ্টি হয় সব ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞর সংযোগের ফলেই হয়। যেটার সৃষ্টি হয়নি, সেটাই অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, এই অধ্যায়ে তাঁকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলছেন। কাদাতে মাটি আর জল মিশে থাকে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ ঠিক তেমনি মিশে রয়েছে। ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রজ্ঞকে এবার আলাদা করে বার করে নিয়ে আসতে হবে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যাপার, খুব সাবধানে বার করতে হবে। বাচ্চা বয়সে আমরা খেলা দেখতাম, ইলেক্ট্রিক সারকিট রয়েছে তার মাঝখান দিয়ে রড নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কোথাও লেগে গেলে ক্রিং করে ঘন্টি বেজে উঠবে। খুব সাবধানে ওটাকে বার করতে হত। বার করে নিয়ে আসার পর দেখে কোথাও কিছু নেই, আসলে সবটাই মিথ্যা। কারণ এই সংযোগটা যদি বাস্তব হত, তাহলে মুক্তি কখনই হত না। মুক্ত হয়ে যাওয়া মানে খেলাঘর যেন ভেঙে গেল। বাচ্চারা যেমন নানা রকমের খেলা করে, একটা খেলা শেষ হয়ে গেল, আরেকটা খেলা শুরু হয়ে গেল। ঠিক তেমনি, সংযোগটা যদি বাস্তব হয়, তাহলে একজন বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে গেল, আবার নূতন করে খেলা শুরু হবে, খেলা শুরু মানে আবার সে বন্ধনে পড়ে যাবে। শাস্ত্র তাহলে মিথ্যা হয়ে যাবে, মুক্তির ব্যাপারটাই থাকবে না।

আচার্য আরও বলছেন, পুনর্জন্ম হয় এই মিথ্যা জ্ঞানের জন্য, সেই মিথ্যা জ্ঞান, অর্থাৎ এই ক্ষেত্রেরই যদি নাশ হয়ে যায়, পুনর্জন্ম আর কোথা থেকে হবে! ঠাকুর এটাকে খুব সহজ ভাবে বলছেন, কুমোর যখন ঘট আদি তৈরী করে, তখন মাটির হাড়ি যতক্ষণ কাঁচা থাকে, একটু ভেঙে গেলে আবার ওটাকে চাকের মধ্যে ফেলে দিয়ে নূতন ঘট তৈরী করে। কিন্তু একবার আগুনে দেওয়ার পর ঘট বা হাড়ি হয়ে গেলে, আর ওটাকে অন্য আকার দেওয়া যাবে না। সাতাশ নম্বর শ্লোকে বলছেন, আগে যদিও বলা হয়েছে, এখানে আবার সেটাকে পুনরাবৃত্তি করছেন-

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।২৭।।

(যিনি বিনাশশীল, সর্বভূতে নির্বিশেষভাবে অবস্থিত অবিনাশী পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনিই সম্যগ্‌দর্শী।)

পঞ্চম অধ্যায়ে যেমন বলা হয়েছিল, *বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি*, এই ধরণের ভাবগুলি আগেও অনেকবার এসেছে, এখানেও আবার বলছেন। ঠিক ঠিক জ্ঞান কি? *সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্*, ছোট হোক বড় হোক, মানুষ হোক হাতি হোক, ব্রাহ্মণ হোক চণ্ডাল হোক তিনি দেখেন আত্মাই সব জায়গায় রয়েছেন; যিনি জানেন তিনিই জানেন, তিনিই ঠিক ঠিক জ্ঞাতা। বলছেন যে, আরে ভাই, এই কথা তো সবারই জন্য, তাহলে বিশেষ ভাবে কেন বলা হচ্ছে? আচার্য তখন বলছেন, সবাই দেখেন ঠিকই, কিন্তু বিপরীতে দেখেন। চোখে যদি কোন দোষ হয়ে যায়, দৃষ্টি দোষ হলে জিনিসটাকে পুরো অন্য রকম দেখায়। ফলে আমরা সবাইকে বিভাজিত করে দেখি –এ ভাল, সে মন্দ, সে অমুক, ও তমুক, এভাবেই আমরা দেখি। ব্রহ্মজ্ঞানী সবটাই সমান দেখেন, কোথাও কোন বিভাগ দেখেন না, যেখানে যা কিছু আছে তিনি দেখেন সেই আত্মাই রয়েছেন। সব জায়গায় যদি আত্মাকেই দেখেন, তিনি কার নিন্দা করবেন আর কারই বা স্তুতি করবেন।

সমং সর্বেষু ভূতেষু, সেই পরমেশ্বর সমস্ত ভূতে সমান ভাবে বিরাজ করে আছেন, এই জ্ঞান যাঁর এসে যায়; *বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং*, সৃষ্টির সব কিছু বিনাশ হয়ে যাওয়ার পরেও অবিনাশী পরমেশ্বরের বিনাশ কখনই হয় না, যাঁর এই জ্ঞান হয়ে যায়; তার মানে আমি একটা নাম ও রূপ নিয়ে যে এই শরীর ধারণ করে আছি, মৃত্যুতে নাম ও রূপধারী এই শরীরের যখন বিনাশ হয়ে যাবে কিন্তু তখনও আমার ভেতরে যিনি পরমেশ্বর আছেন তাঁর কিন্তু নাশ হয়নি, তিনি সেই একই ভাবে চলতে থাকেন। অন্য দিকে এই পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা সবাই আতঙ্কিত হয়ে বসে আছি এই পৃথিবী যখন ধ্বংস হয়ে যাবে তখন আমাদের কি হবে? কিছুই হবে না। এইজন্য বেদান্ত বলছে যে অর্থে আমরা বিনাশের কথা চিন্তা করে আতঙ্কিত হয়ে থাকি সেই অর্থে কোন কিছুরই বিনাশ হয় না। পুরো পৃথিবী যখন ধ্বংস হয়ে যাবে তখন সে বাষ্পীভূত হয়ে এণার্জিতে চলে যাবে। এই পৃথিবীটা কার? ঈশ্বরের। এণার্জিটা কার? সেটাও ঈশ্বরের। শুধু আকারটা পাল্টাচ্ছে। সৃষ্টি কখনই নাশ হয়ে যায় না, এইজন্য বেদান্তীরা সৃষ্টির বিনাশ নিয়ে কখনই উদ্বিগ্ন হয় না।

কারা উদ্বিগ্ন হয়? খ্রীশ্চান আর মুসলিমরা। কারণ এদের মতে আল্লা বা ঈশ্বর এই সৃষ্টিকে শুধু একবারের জন্য সামনে নিয়ে আসেন। যদি সৃষ্টিটা এককালীন হয় তাহলে আল্লার কাছে অনেক সমস্যা এসে যাবে। কিন্তু বেদান্তীদের কাছে কোন সমস্যা হয় না। যদি সারা পৃথিবী বা পুরো ব্রহ্মাণ্ডই যদি বিনাশের দিকে চলে যায় তাহলেও আমাদের কাছে কিছুই হবে না, কারণ সব এণার্জি ফর্মে চলে যাবে। এণার্জিও চলে গেল, তখন ভগবানের প্রকৃতিতে বীজরূপে সব পড়ে থাকবে। যখন আবার কোথাও সৃষ্টি হবে সেই বীজ থেকে আবার এণার্জি ফর্মে চলে আসবে, এণার্জি ফর্ম থেকে আবার এই পুরো সৃষ্টি দাঁড়িয়ে যাবে। সেইজন্য আমাদের কাছে সৃষ্টির কোন গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব হলেন সেই পরমেশ্বর, পরমেশ্বরের বাইরে আমাদের কাছে কোন কিছুরই গুরুত্ব নেই। মানুষ মরে

যাক, পশুপাখি সব মরে যাক, সমগ্র সৃষ্টিই ধ্বংস হয়ে যাক কিন্তু পরমেশ্বরের কোন বিনাশ নেই, তিনি আদি ও অনন্ত। এই জ্ঞান যার এসে যায় তখন রোগ, শোক তাকে আর কাবু করতে পারেনা।

সমং পশ্যন হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্।।২৮।।

(সেই সমদর্শী সর্বত্র নির্বিশেষরূপে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করেন বলে নিজে নিজেকে হিংসা করেন না। সেই হেতু তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন।)

পরম গতি যদি পেতে হয়, নিজের মুক্তি যদি কেউ পেতে চায়, তাহলে নিজেকেই সব কিছু করতে হবে অন্য কেউ করে দিতে পারবে না; আর সমস্ত জায়গায়, সব কিছুতে সেই ঈশ্বরকে সমান ভাবে দেখতে হবে। আর নিজের প্রতি কোন হিংসা করা যাবে না। প্রথমে বলা হয়েছিল, আমাদের ভাগ্য আমাদের নিজের হাতেই। নিজের প্রতি হিংসা করা যাবে না, নিজের প্রতি যদি হিংসা করা হয়, তার দ্বারা ঈশ্বর দর্শন হবে না, আত্মজ্ঞান হবে না। নিজের প্রতি হিংসা কি রকম? নিজের প্রতি হিংসাকে দু-ভাবে বলা হয়। প্রথমটাতে বলেন, আত্মজ্ঞান যদি না হয়, ক্ষেত্রজ্ঞকে যদি না জানতে পারে, তাহলে তাকে আবার জন্ম নিতে হবে। এই শরীরের যে নাশ হল, এর জন্য দায়ী সে। কারণ সে যদি আত্মজ্ঞান লাভ করে নিতে পারত, তাহলে এই শরীরটার নাশ হত না, তাকে আর শরীর ধারণ করতে হত না। ঈশোপনিষদে এই জিনিসটাকে খুব সুন্দর ভাবে বলা হয়েছে, *অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ।।* যারা আত্মহত্যা করে তারা যেমন আত্মহন্তা, আমরাও সবাই আত্মহন্তা। কত জন্ম পেরিয়ে পেরিয়ে আজ এই মানব শরীর ধারণ করতে হয়েছে, কত বার জন্ম নিতে হয়েছে, যতবার জন্ম নিয়েছি ততবার আমাদের মৃত্যু হয়েছে। এত মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? আমি নিজে, আমরা হলাম সুইসাইড স্কোয়াড্। নিজেকে নিজে মারছি, কারণ, আমরা আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারছি না।

এই যে বারবার আমাদের জন্ম নিতে হচ্ছে, বারবার এই শরীরকে নাশ করতে হচ্ছে, এর জন্য দায়ী আমি নিজে। অন্য কেউ দায়ী না, ভগবানের ভারি বয়ে গেছে আমাদের বন্ধনে রাখতে, ভগবানের ভারি বয়ে গেছে আমাদের মুক্তি দিতে, কারণ সবটাই তো তাঁর। *ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং,* নিজেই নিজের আত্মাকে হনন করছে। সেইজন্য নিজেকে কখন সাধারণ ভাবতে নেই, নিজেকে কখন ছোট ভাবতে নেই। কোন ধরণের নেগেটিভিটি নিজের ভিতরে আসতে দিতে নেই। তাই প্রাণপন চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, হে প্রভু যা হওয়ার হয়েছে, আর যেন আত্মহত্যা না করতে হয়, আত্মহন্তা যেন আর না হতে হয়।

কিন্তু তার থেকে আরও মারাত্মক ব্যাপার হল, শুধু শরীর না, আমরা আসলে তো আত্মা। কিন্তু আমরা জানি না যে, আমি আত্মা। তাহলে কি করেছে তারা? নিজের আত্মাকে মেরে রেখেছে। যে লোকের টাকা নেই, তাকে যেমন আমরা বলি দরিদ্র। সময়ের সদ্ব্যবহার যদি না করা হয়, what are doing, killing times, সময়কে মারা হচ্ছে। আমি আপনি কি করছি? আত্মা, যিনি আমাদের মধ্যে বিরাজ করে আছেন, তাঁকে আমরা মেরে রেখেছি, কাজে লাগাচ্ছি না, কারণ তাঁকে জানিই না, আমরা হলাম আত্মহন্তা, আত্মাকে মার্ডার করে রেখেছি। নিজের আত্মাকে হনন করা বন্ধ করলে কি হবে? *ততো যাতি পরাং গতিম্,* পরম গতি পেয়ে যাবে। যারা এই রকম আত্মাকে মেরে বেড়াচ্ছে, এদের দ্বারা আত্মজ্ঞান তো হবেই না, কোন কিছুই হবে না। বলছেন, এই দুই প্রকার যেটাকে গণ্য করা হয়, এটাই হল পরম গতি পাওয়ার উপায়, এটা আমাকে আপনাকে নিজেই করতে হবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায় এবার সমাপ্তির দিকে চলে এসেছে। গীতা শাস্ত্রে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একটা বিশেষ দাম আছে। ঠিক ঠিক জ্ঞানযোগ বলতে যা বোঝায়, ত্রয়োদশ অধ্যায় ঠিক তাই –জ্ঞানযোগ। জ্ঞানযোগ মানে বিচারপথ। আমাদের যত শাস্ত্র আছে, বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত সবার একটাই উদ্দেশ্য, মানুষের জীবনে কিভাবে শান্তি আসবে। আমাদের একজন পূজনীয় মহারাজ অনেকদিন আগে বলছিলেন, 'দেখো, সারাটা জীবন এই রামকৃষ্ণ মিশনের গণ্ডীর মধ্যে থাকলাম। বাইরে কাজকর্ম করতে হত, করেওছি, কিন্তু আপন হয়ে কারুর সঙ্গে সেভাবে মেলামেশা করিনি। আজ এই শেষ বয়সে এসে আমাকে দীক্ষা আদি দিতে হয় বলে, অনেকের কথাই শুনতে হয়। এখন সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে বাইরে একটা যেন দাবানল জ্বলছে, সংসারে কত রকমের কষ্ট'। কত রকমের কষ্ট হতে পারে শুনে আমার অবাক লাগে। একটা বড় হাসপাতালে, বিশেষ করে সেটা যদি একটা সরকারী হাসপাতাল হয়, সেখানে গেলে দেখা যায় কত ধরণের রোগে আক্রান্ত মানুষ চিকিৎসার জন্য উদ্গ্রীবের সাথে হাসপাতালে এসে নাম লেখাচ্ছে, কত রকমের রোগ মানুষকে আক্রমণ করছে। সংসার মানেই রোগ, কত রকমের রোগ হয় আমরা কল্পনাই করতে পারি না।

শান্তি একমাত্র হয় সংসার থেকে মুক্তিতে। সংসার থেকে মুক্তি মানে কি শ্মশানে গিয়ে হবে? শ্মশানে নিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার পর এই স্থূল শরীরের পিছনে যে আসল আমি, সেটা স্থূল শরীর থেকে বেরিয়ে ঘুরতে থাকে কোথায় একটা নূতন শরীর পাওয়া যায়। একটা শরীর পেয়ে গেলে আবার সেই খেলার পুনারবৃত্তি চলতে শুরু হয়ে যায়। একজন মহারাজ মজা করে আমাকে নিয়ে বলতেন, 'কি দাদা, এই ভিডিও গেম কবে শেষ হবে'? ভিডিও গেম চলছে তো চলছেই, থামছে না। সেইজন্য মৃত্যুতে শান্তি হয় না, মৃত্যু অশান্তির আরেকটি দরজা। শান্তি যদি পেতে হয়, এখানেই পেতে হবে, এই জীবদ্দশাতেই পেতে হবে। কোন মানুষের চালচলন, ব্যবহার, রুচি-অরুচি দেখলেই বোঝা যায়, মৃত্যুর পর তার কি গতি হবে, পরের জন্ম কে কি রকম হবে মোটামুটি দেখলেই বোঝা যায়। তাহলে কিসের থেকে মুক্তি? জুড়ে থাকা থেকে মুক্তি। আপনজনদের সাথে জুড়ে থাকা থেকে মুক্তি না, প্রকৃতির সাথে জুড়ে থাকা থেকে মুক্তি। পুরো ত্রয়োদশ অধ্যায় শুধু এই একটা কথাই বলে যাচ্ছে। প্রকৃতি কি, পুরুষ কি, প্রকৃতি আর পুরুষ কিভাবে জড়িয়ে আছে, দুটোকে আলাদা কিভাবে করা হবে, ত্রয়োদশ অধ্যায় মূলতঃ এই কটি জিনিসকে নিয়ে বলে যাচ্ছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়কে প্রথম থেকে পুরোটা কয়েকবার পড়তে হবে। আমাদের খুব প্রচলিত কথা –ঠাকুর আছেন ঠাকুর দেখবেন, কৃষ্ণ আছেন কৃষ্ণ দেখবেন। হয়ত দেখবেন, প্রমাণ তো কিছু নেই। যে প্রমাণগুলো আছে সেগুলো আবার কাহিনী রূপে আছে। কাহিনী দিয়ে চলে না, সাধকদের জীবন নিয়ে যদি নাড়াচাড়া করা হয়, তখন আমরা দেখতে পাবো, আধ্যাত্মিক জগতে এগোনর জন্য সবাইকে কি খাটনিটাই না খাটতে হয়। সারা ভারতের যে কোন সম্প্রদায়ের সাধকের জীবনের দিকে তাকালেই বোঝা যায় আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধনের জন্য কি প্রচণ্ড খাটনি লাগে, বাকিগুলো সব কাহিনী। কাহিনী মানেই, গল্পের গরু গাছে ওঠে। আপনি যে পথেই থাকুন, ভক্তি পথে থাকুন বা জ্ঞান পথেই থাকুন, খাটতে হবে সবাইকে। জিনিসটাকে তো আপনাকে আগে জানতে হবে। এইটাকে জানাতে গিয়ে গীতা আমাদের কাছে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের কথা বলছেন। ক্ষেত্র মানে প্রকৃতি, আর ক্ষেত্রজ্ঞ মানে আমাদের ভিতরে যিনি আছেন, যিনি ভিতরে আছেন তিনিই ঈশ্বর।

ঠাকুর কথামৃতে বলছেন, নিজেকে মারার জন্য একটা নুড়ুন হলেই হবে, অপরকে মারার জন্য ঢাল তলোয়ার লাগে। একজন নিজের মত বিশ্বাস করে নিলেন –আমার ভিতর যিনি আছেন তিনিই ঠাকুর বা তিনিই শ্রীকৃষ্ণ; খুব সহজেই হয়ে গেল। কিন্তু যেমনি অন্য একজন এসে তার সাথে কথা বলতে যাবে, সে তার ভাবকে উড়িয়ে দেবে; অন্য বা বিপরীত ভাবের কথা শুনলে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে চিন্তা-ভাবনাগুলিকে উড়িয়ে দেবে। সেইজন্য শাস্ত্রের কথা জানতে হয়, যাতে অন্য কেউ এসে আমাকে উড়িয়ে দিতে না পারে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আর-একটা দিক হল, শাস্ত্রের মধ্যে থাকতে হয়,

শাস্ত্র নিয়মিত অধ্যয়ন করলে বুদ্ধি নির্মল হয়। ঘরবাড়ি যেমন আমরা নিয়মিত পরিষ্কার করি, ঠিক তেমনি নিয়মিত শাস্ত্র অধ্যয়ন ও মনন করলে মনের আবর্জনাগুলি পরিষ্কার হয়। পাঁচ মিনিট গীতা, পাঁচ মিনিট চণ্ডী, পাঁচ মিনিট কথামৃত পড়লাম, তার সঙ্গে দৈনন্দিন জপধ্যান রয়েছে। দিনে যদি এক ঘন্টা জপধ্যান, শাস্ত্র পাঠে নিয়োজিত করা যায়, তাহলে মন মোটামুটি পরিষ্কার থাকে।

চারিদিকে যাবতীয় যা কিছু হচ্ছে, এটাই ক্ষেত্র, এটাই প্রকৃতি। ক্ষেত্রজ্ঞ কে? এই শরীরের ভিতরে যিনি বসে আছেন, যিনি পুরো প্রকৃতিকে চালাচ্ছেন, এই দেহের সব কিছুকে চালাচ্ছেন, ইনিই সেই ঈশ্বর। আমি এক আর ঈশ্বর আর-এক, তা নয়; যিনি ঈশ্বর তিনিই অন্তর্যামী হয়ে ভিতরে বসে আছেন। এই হল এই অধ্যায়ের মূল বক্তব্য। কিন্তু এটুকু বলে দিলে তো হবে না। এরপর বলছেন, এরজন্য আমাদের চরিত্রের কি কি গুণ দরকার। তাই বলে দিলেন, *অমানিত্বম, অদম্ভিতম,* তার সাথে *অসক্তিঃ, অনভিরসঙ্গঃ* ইত্যাদি গুণের কথা। উদ্দেশ্য কি বলে দিলেন। এই পথে যাওয়ার জন্য আমাদের কি কি পাথেয় লাগবে সেটাও বলে দিলেন। এবার পথে যাব কিভাবে, সেটাকে বলে দিলেন *ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা*। এই তিনটি শ্লোক মনে রাখলে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কি বক্তব্য মনে থাকবে –*ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত, অমানিত্বমদম্ভিত্বম,* আর *ধ্যানেনাত্মনি* – এই তিনটি শ্লোক।

প্রথমের দিকে আমরা আলোচনা করলাম, মুক্তি কেন আমাদের এখানেই পেতে হবে। যে প্রকৃতি এতদিন আমাকে জ্বালিয়েছে, এতদিন যে আমাকে নাচিয়েছে, সেই প্রকৃতি থেকে একটু সরে এসে প্রকৃতির এই অঘটনঘটনপয়সী খেলা যদি না দেখতে পাই, তাহলে আর মজা কিসের। স্কুল থেকে যারা পাশ করে বেরিয়ে গেছে, মাঝে মাঝে তারা স্কুলে যায়, দেখতে স্কুলটা কেমন চলছে। ছোটবেলা ট্রেন দেখতে ঝাঝা, কিউল স্টেশনে যেতাম, সেখানে ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকত। বড় হওয়ার পর একটা বিরাট এ্যক্সপ্রেস ট্রেনে করে যাচ্ছি, সেই ঝাঝা, কিউল স্টেশনে না দাঁড়িয়ে হু হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে। ওই স্টেশন দেখার জন্য দৌড়ে গিয়ে ট্রেনের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতাম, আর ভাবতাম, লোকাল ট্রেনগুলিকে এখানে কত সময় ধরে দাঁড় করিয়ে রেখে খুব জ্বালিয়েছিলে, এখন কেমন হুশ্ করে স্টেশনটাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছি। একটু যদি প্রকৃতির খেলা নাই দেখলাম, এতদিন প্রকৃতি কিভাবে আমাকে নাচিয়েছে, তা নাহলে মজা কিসের। তুলসীদাসজী কী সুন্দর বলছেন, অবলোনা সানি আপনা না সেঁও, হে রাম এতদিন প্রচুর নাচালে, আর না। এবার একটু দূর থেকে দেখি। এটা যদি নাই হল তাহলে মজা কোথায়।

আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন, পড়াশোনা ওনার টুকটাক ছিল, এমন কিছু না। চা খেতে খেতে একদিন কথা হচ্ছিল, উনি বলছিলেন, 'জীবনমুক্তি আমার যদি নাই হল, তাহলে লাভটা কি। মরার পর কি হবে আমরা কেউ জানি না। সত্যিই কারুর জানা নেই মরে কি হবে। আমার জীবদ্দশা হল একমাত্র প্রুফ, দ্বিতীয় একটু আনন্দ যদি নাই করলাম, বাজারে কেনাকাটা করার পর বাজারটা যদি একটু নাই ঘুরে দেখলাম, তাহলে আনন্দ কোথায়'! সেইজন্য পঞ্চম অধ্যায়ে ভগবান বলছেন, তোমাকে এখানেই এই জীবদ্দশাতেই সব কিছু করে নিতে হবে, জীবনমুক্তি এখানেই পেতে হবে। ভগবান একবারও বলছেন না যে, তুমি শুভকর্ম কর, মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবে, বিষ্ণুলোকে যাবে। বলছেন, *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো*। পূজ্যপাদ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী অনেক লেকচারে, প্রবন্ধে গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের এই শ্লোকটাকে উল্লেখ করে বারবার বলতেন, যা কিছু পাওয়ার এখানেই পেতে হবে, জীবনমুক্তি পাওয়ার লড়াইটা এখানেই শেষ করে দিতে হবে।

আমার শরীর চলে যাওয়ার পর যে জিনিসটাকে আমি পেতে চাই, সেটা এখানেই পেতে হবে, এটাই আমার সিদ্ধি। এই একটা কথা আগেও আমরা অনেকবার বলেছি, আবারও বলছি; বেশির ভাগ যাঁরা ধর্ম পথে থাকেন, সন্ন্যাসীরাও তার মধ্যে আছেন –এটা অত সহজ না, খুব সূক্ষ্ম

বুদ্ধি দরকার, অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। আমি যদি সত্যিকারের বুঝতে পারতাম, তাহলে কি আমার এ-রকম দুরবস্থা হত? এখনও একটু কিছু হলে মন তিড়িং করে রেগে যায়, একটু কিছু হলে মন চুপসে যায়। *সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র* এই ভাবকে ধরে রাখা এত সহজ না। তাই বলে একেবারেই যে কিছু নেই, তাও না। যখন ঈশ্বর দর্শনের কথা বলছি, যখন আমরা জীবনমুক্তির কথা বলছি, তখন নিজের দিকে তাকিয়ে একটু বিচার করে দেখতে হয়। ম্যানেজমেন্টে বলে, আগামী দশ বছরের মধ্যে তুমি নিজেকে কোথায় দেখছ? এই প্রশ্নটাই আমি শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলছি, মৃত্যুর পর আপনারা নিজেকে কোথায় কিভাবে দেখতে চাইছেন? উত্তরগুলি তিনটে চারটে পয়েন্টে লিখুন। কিন্তু দয়া করে এই বিচিত্র কথাগুলো দয়া করে লিখতে যাবেন না, স্বর্গে গিয়ে স্বর্গসুখ ভোগ করতে চাই, সেখানে অপ্সরারা থাকবে, তারা নৃত্য করবে দেখব। মৃত্যুর পর আধ্যাত্মিক ভাবে নিজেকে কিভাবে দেখতে যান লিখুন। আপনি হয়ত বলবেন শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে থাকতে চাইছি, আপনি হয়ত বলবেন, আমি আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছি। সেই জিনিসটা আপনার এখানেই হবে, জীবনমুক্তির অর্থটা তাই। মৃত্যুর পরে যেটা আমরা পেতে চাইছি, মৃত্যুর আগেই সেই একই জিনিস হবে।

কি সেই একই জিনিস হবে? এটাই আগের শ্লোকে বলেছিলেন, *সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্*। জীবনমুক্তি কি, *পরম্ গতিম্* কি? *সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র*, সবাইকে সমান দেখা। হিন্দু ধর্মের উপর টুকটাক যা কাজ করেছি, সেটাকে নিয়ে আমার বন্ধুরা মিলে খুব সুন্দর সুন্দর কার্ড তৈরী করে সেগুলোকে ইউটিউবে আপলোড করে ছেড়ে দেন। কোন একটা কার্ড দেখে ফেসবুকে একজন ভদ্রলোক বললেন, 'হিন্দু ধর্ম না, আমি মানবতায় বিশ্বাস করি'। ভাই, তুমি কি সেই মানবতায় বিশ্বাস করতে পারবে, যেটা এখানে বলছেন, *সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র*?

এগুলো হল ঢপের শাঁখ। এক গরীব ব্রাহ্মণ শিবের প্রচুর তপস্যা করে, বহু কষ্ট করে কোন রকমে কৈলাসে শিবলোকে গিয়ে হাজির হতে সক্ষম হয়েছে। সেখানে শিবের সঙ্গে দেখা করে শিবকে বলছে, প্রভু আমার প্রচুর কষ্ট। শিব দেখলেন, বেচারা এত কষ্ট করে এখানে এসেছে, ওকে একটা শাঁখ দিয়ে দিই, শাঁখকে যা বলবে সে তাই দিয়ে দেবে। ব্রাহ্মণ বেজায় খুশী হয়ে দৌড়ে দৌড়ে কৈলাস থেকে নেমে এলো। রাতে সে একটা ধর্মশালায় ছিল। সেখানে পরীক্ষা করার জন্য শাঁখকে বলা হল, এই এই খাবার নিয়ে এসো, সঙ্গে সঙ্গে সব খাবার চলে এলো। ধর্মশালার লোকটি সব দেখে অবাক হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে পড়ার পর লোকটি ওই শাঁখটি চুরি করে ওই রকম আরেকটা শাঁখ ওর পাশে রেখে দিয়েছে। বাড়ি ফিরে সবাইকে যখন দেখাতে গেল, তখন দেখছে কিছুই হচ্ছে না। খুব দুঃখ হল। সে আবার অনেক কষ্ট করে কৈলাস গেছে। ভগবান শিবকে সব ঘটনা বললেন। শিব তখন আরও একটা শাঁখ দিয়ে বলছেন, 'ঠিক আছে তুমি এই শাঁখটা নিয়ে যাও, এর একটা বৈশিষ্ট্য আছে'। ভগবান বলে দিয়েছেন, যে সরাইখানায় ছিলে সেখানেই থাকবে। সেখানে গিয়ে ব্রাহ্মণ বলছে দশটা টাকা দাও তো। শাঁখটি উত্তর দিচ্ছে, কুড়ি টাকা দেব। আচ্ছা ঠিক আছে কুড়ি টাকাই দাও। চল্লিশ টাকা দেব। আচ্ছা ঠিক আছে একশ টাকা দাও। দুশো টাকা দেব। এক থালা খাবার নিয়ে এসো। না, দু থালা খাবার নিয়ে আসছি। ওই দেখে ধর্মশালার ম্যানেজার অবাক, এতো দেখছি দ্বিগুণ দেয়। আবার রাত্রিবেলা ব্রাহ্মণ ঘুমিয়েছে, ম্যানেজার প্রথম শাঁখটাকে রেখে এই শাঁখটা নিয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ খুশী খুশী মনে বাড়ি এসে পৌঁছে গেছে। আর সেই ধর্মশালার কর্তা শাঁখকে বলছে, একশ টাকা দাও। শাঁখ বলছে, তোমাকে আমি দুশো টাকা দেব। আমাকে দুশো টাকা দাও। তোমাকে চারশ টাকা দেব। শাঁখ বলছে ঠিকই, কিন্তু দিচ্ছে না। শাঁখের শুধু লম্বা লম্বা বাত। এটা হল ঢপের শাঁখ। সব হল এই ঢপের শাঁখ –আমি মানবতায় বিশ্বাস করি।

বেদান্ত মানবতায় বিশ্বাস করে না, বেদান্ত বিশ্বাস করে *সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র*, যা কিছু আছে সব কিছুর সাথে নিজেকে এক মনে করা। সাপ, বিছে, কেঁচো, গরু, ছাগল যা আছে, সব কিছুর সাথে নিজেকে এক মনে করাকে বেদান্ত বিশ্বাস করে। কিন্তু মুখে আমরা বেদান্তের কথা যতই বলি

না কেন ব্যবহার কালে অন্য রকম, কারণ ব্যবহার কালে সমান হয় না। যখন সবাইকে সমান দেখে, তখন সে কাকে ভালবাসবে আর কাকেই বা ছাড়বে! ফলে নিজের হিংসা সে নিজে করে না। তখন প্রতিপক্ষ থেকে একজন উঠে বলছেন, *স্বক্রিয় অভাবঃ*, নিজের উপর ক্রিয়া হয় না, তাই কি করে নিজের হিংসা করবে?

আচার্য তার উত্তরে বলছেন, *অজ্ঞানাম্ আত্মতিরস্করণোপপত্তেঃ*, অজ্ঞানী যারা, আমরা সবাই অজ্ঞানী, তারা নিজের তিরস্কার করতে পারে। কারণ, সবাই জানে অজ্ঞানীরা নিজের দেহকেই আত্মা বলে মনে করে। শরীরের পিছনে যে জীবাত্মা আছে, এটাকে তারা মানে না, বোঝে না, বুঝলেও উপলব্ধি নেই। জীবাত্মার পিছনে যে শুদ্ধ আত্মা, সেই শুদ্ধ আত্মার ব্যাপারে তো এদের কোন ধারণাই নেই। এই দেহকেই যেহেতু সব কিছু মনে করে, সেইহেতু তারা ভাল কর্ম করে, মন্দ কর্মও করে; ধর্মকর্ম করে, অধর্মমূলক কর্মও করে। ফলে ওই কর্ম থেকে আবার নূতন কর্মের সৃষ্টি হয়, সেই কর্মকে বার করার জন্য তার নূতন দেহ দরকার। যার ফলে একটার পর একটা দেহ তারা ধারণ করতেই থাকে। তাই বলছেন, নিজের দেহের মৃত্যুর জন্য নিজেই দায়ী। প্রতিটা দেহকে হত্যা করার পাপ সবাই আমরা মাথায় বয়ে বেড়াচ্ছি। তার উপর আত্মতত্ত্বকে তারা জানে না, ফলে ভিতরে আত্মা স্বয়ং বিরাজিত থাকা সত্ত্বেও মানুষ মরার মত জীবন ধারণ করে। এরপর মানুষ কি করে সবাইকে সমান দেখবে, কখনই সম্ভব না। এই যে নাটকীয়তার ভঙ্গীতে খুব গভীর স্বরে বলছে, আমি মানবতায় বিশ্বাসী, এটা কি কখন সম্ভব? যিনি বেদান্তী, স্বামী বিবকানন্দ কি মনে করবেন সবাই এক? এটা কি সম্ভব? এটা সম্ভব, যদি, ঊনত্রিশ নম্বর শ্লোকে বলছেন –

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি।।২৯।।

(কায়মনোবাক্য দ্বারা কৃত সকল কর্ম প্রকৃতি দ্বারাই সর্বপ্রকারে সম্পাদিত এবং আত্মাকে সর্বোপাধিবিবর্জিত রূপে যিনি দর্শন করেন, তিনিই সম্যগ্‌দর্শী।)

ঊনত্রিশ নম্বর শ্লোক হল, প্রকৃতি থেকে যে মুক্তি হয়, আসলে কি হয় এখানে সেটাই বলা হচ্ছে। যত রকমের ক্রিয়া চলছে, এই যে আমি হাত নাড়ছি, কথা বলছি, সব প্রকৃতি করছে। আত্মা, যিনি ভিতরে বসে আছেন, তিনি নির্বিকার, সব কিছু থেকে তিনি আলাদা। এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হল, আচার্য বলছেন, *মহদাদিকার্যকরণাকারপরিণতয়া কর্মাণি বাঙ্মনঃকায়ারভ্যাণি*, চব্বিশটি তত্ত্বকে নিয়ে এই প্রকৃতি, সে-ই এই বাঙ্ মন আর শরীর দিয়ে সমস্ত কর্ম করে। দেহ, মন, ইন্দ্রিয় যাবতীয় যা কিছু আছে, সব প্রকৃতির এলাকা। আগে বলা হয়েছিল *উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ*, আত্মা বিলক্ষণ, এ-সব কিছু থেকে আত্মা আলাদা। যিনি এইভাবে আত্মা আর প্রকৃতির ব্যাপারটা দেখে নিয়েছেন, আত্মার অকর্তার ভাব আর প্রকৃতি সব কিছু করে, এটা যিনি সম্যগ্ রূপে দেখে নিয়েছেন, তিনি প্রকৃতি থেকে এবার মুক্ত হয়ে যাবেন। স্বামীজী দেববাণীতে একটা জায়গায় বলছেন, কুকুরের বাচ্চাগুলো যেমন নিজেদের মধ্যে খেলা করতে থাকে, এই খেলা করছে, এই দৌড়াদৌড়ি করছে, এই কামড়া-কামড়ি করছে, বাচ্চাগুলোর মা দূর থেকে নির্বিকার ভাবে ওদের দেখে যায়। যখন ছুটোছুটি করে খেলে তখনও মা জানে, ও কিছু না; যখন মারামারি করে ক্যাঁ ক্যাঁ করতে থাকে, তখনও মা জানে, ও কিছু না। জগৎটা ঠিক এই রকমই, প্রকৃতি নিজের মত করে যাচ্ছে, ইন্দ্রিয়গুলি তার প্রিয় বস্তুর দিকে দৌড়ে যাচ্ছে, অপ্রিয় বস্তুকে দেখে পিছিয়ে আসে, আত্মা নির্বিকার, তুমি সেই আত্মা।

যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি, এই বোধ যখন এসে যায় তখন তিনি দেখেন, আরে এই বদমাইশ লোকটা যত বদমাইশি করছে আসলে সব প্রকৃতি করে যাচ্ছে, সে তো আত্মা। এর খুব কাছাকাছি যদি দৃষ্টান্ত দিতে হয়, তাহলে এই দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। বাড়ি ছেলেরা

একটা নাটকে অভিনয় করছে, একজন হিরোর অভিনয় করছে, একজন ভিলেনের অভিনয় করছে। বাড়ির অন্যান্যরা বসে নাটক দেখছে। যখন হিরোকে ভিলেন খুব মারছে, বা হিরো ভিলেনকে মারছে, বাড়ির সবাই বসে বসে দেখে যাচ্ছে। হয়ত তার ছেলে হিরোর অভিনয় করছে, তাকে ভিলেন খুব মারছে, ভিলেনের অভিনয় আবার দেওরের ছেলে করছে। ওরা দুজন খুব মারামারি করছে, ঠিক আছে করুক, এটা তো অভিনয়, মাথায় আছে এরা দুই ভাই, আর ও তো আমার ছেলে। ফলে কোন identification হয় না।

আমাদের কাছে প্রকৃতির সব ক্রিয়াগুলো সত্য, আমাদের কাছে ক্রিয়াগুলো আমি করছি। কিন্তু জ্ঞানীর কাছে ক্রিয়াগুলো প্রকৃতি করছে, আমি আত্মা, আমি নির্বিকার, কিছুই করি না। ছেলে স্কুল থেকে আসার পর তার বাবা একটা রেজাল্ট নিয়ে ছেলেকে খুব তিরস্কার করছে, 'ছিঃ তোমার এত খারাপ রেজাল্ট হয়েছে'! মা ভিতর থেকে বলছে, 'ওটা ছেলের রেজাল্ট না, ওটা তোমার বাচ্চা বয়সের রেজাল্ট'। প্রকৃতিই সব করছে, আত্মা কিছু করছে না, আমিই সেই আত্মা; কে আর ভাল, কে আর মন্দ। তাহলে স্বামীজী কেন শিক্ষা দিচ্ছেন? এই জন্য শিক্ষা দিচ্ছেন, তুমিই আত্মা, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে তুমি নিজেকে জুড়ে দিয়ে এক মনে করছ বলে তোমার এই দুঃখ-কষ্ট। এই এক দেখাটা বন্ধ কর।

যদা ভূতপৃথগ্ ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চা বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।।৩০।।

(যখন তিনি পৃথক পৃথক ভূতসমূহকে আত্মাতেই একত্র অবস্থিত দর্শন করেন এবং সেই আত্মা থেকেই ভূতসকলের বিকাশ উপলব্ধি করেন, তখন তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হন।)

সৃষ্টিতে যাবতীয় যা কিছু আছে, ভাল লোক আছে, সাপ আছে, বিছে আছে, দুষ্ট লোক আছে, সব কিছু সেই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। যেমন একটা সমুদ্র, সমুদ্রে ঢেউএর পর ঢেউ উঠছে, নামছে। এই ঢেউগুলো সমুদ্রেরই ঢেউ, ঢেউএর কখন সমুদ্র হয় না। আমার ঈশ্বর হয় না, আপনার ঈশ্বর হয় না; আমরা সবাই সেই ঈশ্বরেরই। *অনুপশ্যতি*, এই জিনিসটাকে সাক্ষাৎ দেখা, এটা কোন থিয়োরেটিক্যাল কিছু না, কল্পনার কিছু না। কি রকম? আচার্য বলছেন, *শাস্ত্রাচার্যোপদেশতোমত্বা আত্মপ্রত্যক্ষত্বেন*, শাস্ত্রের কথা শুনেছে, আচার্য সেটার ব্যাখ্যা করেছেন, সেটাকে মনন করেছে, মনন করে আত্মাকে প্রত্যক্ষ ভাবে সাক্ষাৎ করেছে। আত্মাকে প্রত্যক্ষ ভাবে যতক্ষণ না দেখা হয়, ততক্ষণ সব কিছু এভাবেই চলবে। সবাই ইউটিউবে লেকচার শুনে যাচ্ছে, কিন্তু কারুর কিছুই হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? কারণ আত্মাকে যে প্রত্যক্ষ করতে হবে, সেদিকে কারুর দৃষ্টি নেই। আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা মানে, দেখছেন সমস্ত কিছু সেই আত্মাতেই অবস্থিত।

তার সঙ্গে দেখছেন, *তত এব চ তস্মাদ্ এব চ বিস্তারম্*, শুধু স্থিতি না, এদের যে জন্ম, এদের যে বিস্তার, সেটাও সেই আত্মা থেকেই হয়। উপনিষদ বলছেন, *মত্তঃ সর্বং প্রবর্তন্তে*, যাবতীয় যা কিছু আছে সব আমার থেকেই বেরিয়েছে। আমার মানে আত্মা থেকে বেরিয়েছে, আমি সেই আত্মা। আফগানিস্থানে তালিবানরা এখন কত মানুষকে মেরে যাচ্ছে। কোথা থেকে এই তালিবানীরা বেরিয়েছে? আমার থেকে। এই জিনিস নেওয়ার দম কারুর আছে, ধর্ম তাই সবার জন্য নয়, বুক ফেটে যাবে। কিন্তু আত্মার সাক্ষাৎ সবাইকেই করতে হবে। ঈশ্বর মাছ ভাজছেন, কিছু মাছ কড়াইতে ভাজা হচ্ছে, কিছু মাছ পাশে রাখা আছে। আমাকেও ভাজা হবে, আপনাকেও ভাজা হবে। যখন এই অবস্থায় গিয়ে প্রত্যক্ষ করেন, তবেই তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হন।

এই ব্রহ্মকে পেয়ে লাভ কি হবে? আমরা এই প্রশ্নের অনেকবার আলোচনা করেছি। মানুষ বাইরে থেকে, কর্মস্থল থেকে যখন নিজের বাসায় ফিরে আসে, তখন তার শান্তি আসে। আমার

আপনার বাসা, আমার স্বরূপ হল স্বস্থ, নিজেতে অবস্থান করা। আত্মা হলেন আমার স্বরূপ, আত্মাতে গিয়ে অবস্থান করা। কিন্তু আমাদের মন মানে না, কারণ আমরা জানি লোকেরা বদমাইশি করছে, খারাপ কাজ করছে, এদের পাপ কোথায় যাবে, এদের দোষ কোথায় যাবে? ইউটিউবে একজন প্রশ্ন করলেন, ব্রহ্ম থেকে সবার সৃষ্টি হয়েছে, এই ব্রহ্মকে কে সৃষ্টি করেছেন? ব্রহ্ম বা আত্মা যদি বস্তু হতেন তাহলে অবশ্যই কেউ না কেউ তাঁকে সৃষ্টি করে থাকবেন। আত্মা বা ব্রহ্ম তো কোন বস্তু নন।

অনাদিত্বান্নির্গুণাত্বাৎ পরমাত্মহয়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।।৩১।।

(হে কৌন্তেয়, এই পরমাত্মা অনাদি ও নির্গুণ, তাই তিনি অব্যয়। সেই হেতু তিনি শরীরসমূহ অবস্থিত থাকলেও কোন কর্ম করেন না। সুতরাং কখনও কোন কর্মফলে লিপ্ত হন না।)

যেটারই কোন কারণ থাকে, তাকে বলা হয় আদি। কারণ যদি না থাকে তাহলে বলা হয় অনাদি। অনাদির যে এই ভাব, এটাকে অনাদিত্ব বলা হয়। এই পরমাত্মা অনাদি, সেইজন্য বলছেন অনাদিত্ব। আর যেটা আদিমান, অনাদিমান বলে কিছু হয় না, আদিমানই হয়। আদিমান মানেই তার সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণ আছে। আর কারণ থাকলেই তার যে উৎপত্তি হয়েছে, তার নিজের অবস্থা থেকে পতন হবে। কিন্তু পরমাত্মা অনাদি, সেইজন্য তার কোন অবয়ব নেই। অবয়ব মানে কোন অঙ্গ নেই, অবয়ব হল components, যা দিয়ে কোন জিনিস তৈরী হয়। ওই অবস্থায় গিয়ে কখন তাঁর পরিণতিই হবে না, কোন চ্যুতি হবে না। সেইজন্য কখন তাঁর ক্ষয় হয় না, যেমন আছেন তেমনই আছেন। *নির্গুণাত্বাৎ*, তিনি নির্গুণ, সেইজন্য অব্যয়, কোন গুণ থাকলেই তার গুণের খরচ হবে। একটা জিনিসের যে গুণ থাকে, সেই গুণ যদি চলে যায় বা কোন কারণে যদি ক্ষয় হয়; তখন আমরা বলব এই জিনিসটা ক্ষীণ হয়ে গেছে, ক্ষয় হয়ে গেছে। পরমাত্মা হলেন অব্যয়, সেইজন্য কি হয়, এই শরীরে থাকলেও তাঁর শরীরে কোন প্রভাব পড়বে না। তিনি অনাদি, তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেননি, সেইজন্য ভগবান শিবকে বলা হয় স্বয়ম্ভূ।

শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে। পরমাত্মা যিনি, তিনি স্বয়ম্ভূ, তিনি অনাদি, তিনি নির্গুণ, তিনি কি করে শরীরে থাকবেন! আসলে শরীরে থাকেন না, মনে হয় যেন তিনি শরীরে আছেন। শরীরে বাস করেন ঠিকই, কারণ, মনে হয় যেন শরীরে বাস করছেন, কিন্তু তিনি কিছু করেনও না, কোন কিছুতে লিপ্তও হন না। যিনি কর্তা কর্মফল তাঁরই পাওয়ার কথা। ভাল কাজ করলে ভাল ফল, মন্দ করলে মন্দ ফল পাবে। যে কোন কিছুই করেনি সে কেন ফল পাবে। পূর্বপক্ষ থেকে এবার আচার্যকে আক্রমণ করা হচ্ছে। আচার্য শঙ্কর নিজেই এই আপত্তিগুলো উত্থাপন করছেন।

পূর্বপক্ষ থেকে বলছে, ভাই, প্রথমে তুমি বললে, এই শরীরের ভিতরে যিনি তিনি হলেন ক্ষেত্রজ্ঞ, এটাই পরমাত্মা। এখন বললে পরমাত্মা কিছু করেন না। পরমাত্মা যদি কিছুই না করেন, তাহলে পরিষ্কার করে বল, কে দায়ী? তাহলে বলতে হয় পরমাত্মার বাইরে কেউ আছেন, যিনি ভিতরে থেকে সব কিছু করছেন। আমি যা কিছু করছি, এর জন্য তো কেউ একজন দায়ী হবে। বলার পর বলছেন, *সর্বথা দুর্বিজ্ঞেয়ং দুর্বাচ্যং চ ইতি ভগবৎপ্রোক্তম্ ঔপনিষদং দর্শনং পরিত্যক্তং বৈশেষিকৈঃ সাংখ্যাহর্তবৌদ্ধৈঃ চ*, এই যে গীতায় ভগবান উপনিষদের তত্ত্বের ব্যাখ্যা করছেন, এই উপনিষদের তত্ত্বের ব্যাখ্যা *সর্বথা দুর্বিজ্ঞেয়ং*, বোঝা যায় না; *দুর্বাচ্যং*, বোঝানও যায় না; সেইজন্য তোমাদের আজ এই দুরবস্থা আর সেইজন্য বৈশাষিকরা তোমাদের ছেড়ে চলে গেছে, সাংখ্যরা ছেড়ে চলে গেছে, জৈনরা ছেড়ে চলে গেছে, বৌদ্ধরা ছেড়ে চলে গেছে। তুমি ঠিক করে বল।

আচার্য তখন বলছেন, পরিষ্কার করে ভগবান তো বলেছেন, *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে*, প্রকৃতি নিজের মত করে যাচ্ছে। পূর্বপক্ষের এই আপত্তি খুব সুন্দর আপত্তি। বিশ্বের সমস্ত ধর্মগুলো শুধু

Do’s and Don’tএর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে, এটা কর, এটা করবে না। খ্রীশ্চানরা যখন বলে, I am a good Christian , তখনই বলে দেবে, আমি এটা করি না, সেটা করি না আর চার্চে যাই। চার্চ হল প্রথম, তারপরে Thou shall not। খাবার সময় ভগবানের নামে একটা প্রার্থনা করি। এগুলো করার জন্য ধর্মের কি দরকার আছে! অন্যান্য ধর্মের দিকে তাকালে দেখতে পাই, শুধু আচার আর আচরণ। হিন্দু ধর্মে এসব হয় না। হিন্দু ধর্মের আচার আচরণের আসলে কোন দাম নেই। হিন্দু ধর্মের আদর্শ হলেন সন্ন্যাসী। হিন্দু ধর্ম বলছে, ধর্মের যত রকম আইন আছে, যত রকম বিধি-নিষেধ আছে, সন্ন্যাসী তার পারে। আর ধর্মের তত্ত্বগুলি সহজ করে বলার জন্য আমাদের রয়েছে ইতিহাস পুরাণ, মহাভারত, পুরাণ, যেখানে বিভিন্ন ভাবে কাহিনীর মাধ্যমে ধর্মের তত্ত্বগুলিকে মানুষের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। শিবের যত কাহিনী আমরা শুনি, বিষ্ণুর যত কাহিনী আছে, শ্রীকৃষ্ণের যত কাহিনী শুনি, এগুলো হল সাধারণ মানুষের কাছে কঠিণ তত্ত্বগুলো সহজ করে বোঝানর জন্য। এমনকি গীতা যা কিনা এত উচ্চমানের গ্রন্থ, হিন্দুদের ঘরে ঘরে গীতা রাখা থাকে, সেই গীতাতে কোথাও কোন বিধি-নিষেধ নেই, শুধুমাত্র তত্ত্ব আর তত্ত্ব। বৌদ্ধ ধর্ম খুব ভাল ধর্ম, কিছু নেই; রাধাকৃষ্ণের নাম দিলেন Ethical Idialism। পরে পরে ওনারা হিন্দু ধর্ম থেকে অনেক কিছু নিয়ে গেলেন, সেগুলোকেই অন্য ভাবে উপস্থাপিত করলেন। চত্বারি, আর্যসত্য, অষ্টাঙ্গমার্গ, এগুলো সবই ethical। হিন্দু ধর্ম এ-রকম না, হিন্দু ধর্ম প্রথমেই এগুলোকে নামিয়ে দেয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ সেভাবে প্রস্তুত নয়, আগেকার দিনে আমাদের যাঁরা পূর্বজরা ছিলেন, তাঁদের সেই জ্ঞানগরিমা ছিল। কিন্তু এখন আমরা প্রচণ্ড স্থূল মানসিকতার হয়ে গেছি, সেইজন্য ধর্মের তত্ত্ব নিতে পারি না।

অবিদ্যামাত্রস্বভাবো হি করোতি লিপ্যতে ইতি ব্যবহারী ভবতি ন তু পরমার্থত একস্মিন্ পরমাত্মনি তদ্ অস্তি, এই কথা আচার্য বারবার বলবেন। যাবতীয় যা কিছু হচ্ছে, সব ব্যবহারকালে হয়, পরমার্থতঃ কিছু হয় না। দেখে মনে হয় যেন আমি করছি, কিন্তু আসলে আমি কিছু করছি না। লীলাপ্রসঙ্গে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, ঠাকুর একদিন খাচ্ছেন, গ্রামের এক মহিলা ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন, ‘বাবা তুমি খাচ্ছ, নাকি ভিতরে যিনি আছেন, তাঁকে আহুতি দিচ্ছ’? এই হল হিন্দু ধর্ম। গ্রামের একজন মহিলা, যে কিনা স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষাটাও পায়নি, অবশ্য তখন নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার একেবারেই ছিল না; কিন্তু তা হলে কি হবে, ধর্মের যে শেষ কথা, সেটা ওই মহিলার ভাল করে জানা আছে। খাওয়া মানে, শরীরের ভিতর যিনি আছেন, তাঁকে আহুতি দেওয়া হচ্ছে। এই ধর্মে আমরা জন্ম নিয়েছি, এই একটি কথা ভাবলেই তো আমাদের বুকটা গর্বে ফুলে ওঠে। কিন্তু আশ্চর্য যে, আমরা আমাদের ধর্মের মাহাত্ম্য, গরিমা ভাবতে চাই না। হিন্দীতে একটা খুব সুন্দর কথা আছে, কুছ্ তো শরম করো। দোকানদার যখন খুব দাম হাঁকায় বা কেউ যখন প্রচুর ঘুষ খায়, তখন তাকে বলা হয়, ভায়া কুছ্ তো শরম করো। এই ধর্মে আমরা জন্ম নিয়েছি, কিন্তু কোথাও কারুর মধ্যে কিছু নেই, কুছ্ তো শরম করো। অল্প একটু তো জানুন। পরমাত্মা কিভাবে নির্লিপ্ত, এটাকে পরের শ্লোকে বলছেন –

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে।।৩২।।

(যেমন সর্বব্যাপী আকাশ পঙ্কাদি সকল পদার্থে অবস্থিত হয়েও অতি সূক্ষ্ম বলে কোন বস্তুতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ সকলপ্রকার দেহে থেকেই আত্মা দৈহিক গুণ বা দোষে কখনও লিপ্ত হন না।)

এখানে আকাশের দৃষ্টান্ত দিয়ে আত্মার বৈশিষ্ট্যকে পরিষ্কার করছেন। এই আকাশ আমাদের মাথার উপরের আকাশ না। পাঁচটি ভূত দিয়ে এই সৃষ্টি রচিত –আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী; এখানে এই পাঁচটি ভূতের আকাশ তত্ত্বকে দৃষ্টান্ত রূপে নিচ্ছেন। এই পাঁচটি হল পার্টিকেলস, যার মধ্যে আকাশ হল সব থেকে সূক্ষ্মভূত। এগুলো পার্টিকেলসের নাম; আকাশাদি নাম না দিয়ে এ, বি,

সি, ডি নাম দিয়ে দিলেও কিছু দোষ নেই। এই তত্ত্ব দিয়েই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি তৈরী হয়, এই তত্ত্বগুলি দিয়েই জগৎ নির্মিত হয়েছে। অনেক বলতে পারেন, তাহলে কেমেস্ট্রি যে elementsএর কথা বলে সেগুলো কি? বিজ্ঞানে Elementsকে অন্য দিক থেকে দেখা হয়, atomic structureএর দিক থেকে দেখা হচ্ছে। এখন একশ খানা elements আছে, নাকি পাঁচশ খানা elements আছে, তাতে আমাদের কি আসে যায়। যখন আমরা কোন জিনিসকে দেখছি, যেমন এই মাইক্রোফোনকে দেখছি, আমি কিভাবে দেখছি? এটা মেটাল দিয়ে তৈরী, এখানে কিছু পার্টস আছে, দেখতে এই রকম, সাইজ এই রকম। তার মানে, জগৎ যে রকম থাকার থাকুক, আমি জগৎকে নিচ্ছি আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে নেওয়ার সময় এক অপরের সাথে যাতে এলেমেলো না হয়ে যায়, তখন বলে সৃষ্টি এইভাবে হয়েছে। এখন এর এ্যাটোমিক কম্পোজিশানকে, পরে বিজ্ঞান এসে অন্য কিছু বলে দিলো, তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না।

বলছেন, যেখানেই সৃষ্টি আছে, সেখানে আকাশ সমস্ত কিছুর মধ্যে ব্যপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু আকাশ কোন কিছুতে লিপ্ত হয় না। ঠিক সেই রকম আত্মা সমস্ত রকম দেহে অবস্থিত হয়েও দৈহিক কোন গুণ বা কোন দোষে লিপ্ত হন না। এই আকাশ, যেটাকে আমরা স্পেস রূপে দেখছি, সেটাকে দৃষ্টান্ত রূপে নিয়ে অন্য ভাবে বোঝানর জন্য বলছেন –

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত।।৩৩।।

(হে ভারত, যেরূপ একমাত্র সূর্য সমগ্র জগৎকে আলোকিত করেন, সেইরূপ এই পরমাত্মা সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন। কিন্তু তিনি কখনও প্রকাশ্য ক্ষেত্রের ধর্ম দ্বারা লিপ্ত হন না।)

সূর্য যেমন সব জায়গায় আলো দিচ্ছে বা সকালে দূর্বা ঘাসের ডগাতে যে শিশির পড়েছে, সেই শিশিরে পুরো সূর্য প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। বাতাসে ঘাসের পাতা নড়ছে, পাতা নড়ছে জলও নড়ছে, জলে প্রতিবিম্বিত সূর্যও নড়ছে। আয়না দিয়ে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেওয়ালে ফেলছি, আয়না নড়ছে সূর্যও নড়ছে। কিন্তু সূর্য কিছু করে না, সূর্য যেমন আছে, তেমনই সব সময় আছে। বলছেন, এই সূর্য যেমন সমস্ত কিছুকে প্রকাশিত করে, ঠিক তেমনি প্রকৃতি থেকে শুরু করে আমার শরীর পর্যন্ত যেটা এসেছে, এই সমস্ত কিছুকে ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকাশিত করছেন। আমি চোখ পিটপিট করছি, হাত নাড়ছি, কথা বলছি, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি কাজ করছে, কিন্তু সব কিছু ক্রিয়াদির পিছনে রয়েছেন সেই ক্ষেত্রজ্ঞ। বলছেন, জলের মধ্যে অনেক বুদ্ বুদ্ হচ্ছে, সব বুদ্ বুদের মধ্যে সূর্যের প্রতিবিম্ব হচ্ছে, তার মধ্যে একটা বুদ্ বুদ্ যদি ফেটে যায়, তাতে সূর্যের কি হবে, কিছুই হবে না। অন্য বুদ্ বুদের মধ্যে সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়তে থাকবে। এখানে নানা রকমের উপমা নিচ্ছেন, যাতে আমরা জিনিসটাকে সহজে ধারণা করতে পারি। শাস্ত্র মায়ের মত বিভিন্ন ভাবে বোঝানর চেষ্টা করেন। এইবার সমগ্র জিনিসটাকে একটা জায়গায় গুছিয়ে এনে বলছেন –

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্।।৩৪।।

(যাঁরা উক্ত প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পরস্পর প্রভেদ জানেন এবং ভূতসমূহের অবিদ্যারূপ প্রকৃতির মিথ্যাত্ব জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা জ্ঞাত হন, তাঁরা পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।)

আচার্য যেভাবে বলেছেন, আমরাও সেভাবেই বলছি। বলছেন যে মানুষ আচার্যের উপদেশ বা শাস্ত্রের পরিষ্কার ব্যাখ্যা শুনেছে; শুধু নিজে পড়লে হয় না, আচার্যের মুখে শুনতে হয়, তখন আত্মসাক্ষাৎকারী জ্ঞাননেত্র খুলে যায়। এই সাদা চোখে আত্মার সাক্ষাৎ হয় না। আত্মার সাক্ষাৎকার যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ এগুলোর কোন দাম নেই। সেই জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞ, পুরুষ

আর প্রকৃতির পরিষ্কার তফাৎ দৃষ্ট হয়। প্রথমে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে বোঝে, তারপরে আচার্যের মুখে শাস্ত্রের পরিষ্কার ব্যাখ্যা শ্রবণ করে, তারপর দেখে আত্মার পরিষ্কার স্বরূপ। প্রথমটা হয় শোনা, কর্ণশুদ্ধি; এটাকে পরে আচার্য পরিষ্কার করে দেবেন আর তৃতীয় হল সাধনা করে আত্মার সাক্ষাৎ করা। যতক্ষণ আত্মার সাক্ষাৎ না হয়, ততক্ষণ কোন কিছুরই দাম নেই।

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ, ভূত আর প্রকৃতির যে অবিদ্যা, জড় জগতের যখন অত্যন্ত অভাব হয়, মানে ভূত, প্রকৃতির অবিদ্যাকে নাশ করে দিতে যাঁরা সক্ষম হন তাঁরাই *বিদুর্যান্তি তে পরম্,* পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া মানে আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, ঈশ্বরজ্ঞান। এই ঈশ্বরজ্ঞান যাঁদের হয় তাঁরা জানেন দেহ আলাদা আত্মা আলাদা। ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের যে প্রভেদ, ভূত সমূহের অবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতির মিথ্যাত্ব এটাকে জ্ঞানচক্ষু দিয়ে বুঝে নেওয়া হয়ে গেলে সে পরম্ তত্ত্ব, পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়ে যায়।

প্রথমে জানতে হবে প্রকৃতি কি, পুরুষ কি; পুরুষ ও প্রকৃতির ব্যাপারে আচার্যের মুখে ব্যাখ্যা শুনতে হবে, তারপর সাধনার দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎ করতে হবে। যিনি সাক্ষাৎ করতে চাইছেন, তারজন্য তাঁর মধ্যে কিছু গুণ থাকা দরকার, এবং সাধনা করা দরকার। সাক্ষাৎ হয়ে গেলে তখন স্পষ্ট বুঝে নেবে, এটা আমার, এটা তোমার, তোমাকে আমার লাগবে না, তুমি এবার আসতে পার। বাচ্চারা সাবান জল সরু পাইপ দিয়ে টেনে সেটা দিয়ে হাওয়াতে গুড়ি গুড়ি বেলুন ছাড়ে। বেলুনগুলো হাওয়াতে ভাসতে থাকে। সব বেলুনে সূর্য প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, মাঝখান থেকে একটা বেলুন ফেটে গেল, কোথায় গেল, হয়ে গেল শেষ, আর কিছু নেই, ওই বেলুন মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল। কিন্তু পিছন থেকে বাচ্চা ফুঁ দিয়েই চলেছে, আর শত শত বেলুন বেরিয়ে আসছে। ঠিক সেই রকম জীবাত্মার কখন অভাব হবে না, সংসারের কখন অভাব হবে না। আমি একটা বেলুন, আপনিও একটি বেলুন। একটু ফুঁ দিলেই বেলুন শেষ, আর তার পুনর্জন্ম হবে না। মৃত্যুতে মুক্তি নেই, শান্তি নেই। মুক্তি আর শান্তি একমাত্র আসে পুনর্জন্মের অভাবে। এই হল ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ যোগ। এরপর আমরা গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে প্রবেশ করব, যেখানে তিনটে গুণ; সত্ত্ব, রজো ও তমোর উপর আলোচনা করবেন।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়ং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

চতুর্দশ অধ্যায়
গুণত্রয়বিভাগযোগ

আমরা চতুর্দশ অধ্যায়ে প্রবেশ করছি, এই অধ্যায়ের নাম গুণত্রয়বিভাগযোগ। ত্রয়োদশ অধ্যায় আমাদের পক্ষে একটু কঠিন ছিল। সেই তুলনায় চতুর্দশ অধ্যায় একটু সহজ; অন্ততঃ ধারণা করে নেওয়ার জন্য সহজ মনে হতে পারে, কিন্তু তত্ত্বের দিক থেকে সমান। তবে আমাদের মাথায় রাখা দরকার যে, গীতার দর্শন, গীতার বক্তব্য অর্থাৎ গীতা মানবজাতিকে কি বলতে চাইছে বোঝার জন্য সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার। সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণ এবং আমাদের জীবনে ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই তিনটে গুণের যে খেলা, চতুর্দশ অধ্যায় ঠিক এই জিনিসটাকেই এই অধ্যায়ে বর্ণনা করছেন। গীতার একমাত্র উদ্দেশ্য মুক্তি। মুক্তি দুটো স্তর থেকেই হয়, আমাদের দেহ-মন থেকে মুক্তি, তার সাথে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে মুক্তি। আমাদের যোগশাস্ত্রাদিতে আছে, দেহ-মন থেকে মুক্তি পেয়ে গেলেন, কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শেষ অবস্থায় গিয়ে ফেঁসে গেলেন। সেখানে কোটি কোটি বছর কাটিয়ে আবার নামতে হবে। চতুর্দশ অধ্যায় আলোচনা করবে, এই দুটো থেকেই মুক্তি কিভাবে হয়।

আমার ব্লগে আমি কয়েকজন বরিষ্ঠ মহারাজের স্মৃতিচারণ করেছি। সেখানে উপেন মহারাজের উপর কিছু কথা লিখেছিলাম। মহারাজ অনেক দিন আগেই গত হয়েছেন। মহারাজের তখন একশ বছর হয়ে গেছে। ক্লাশ ফাইভ থেকে, মানে দশ বছর বয়স থেকে উনি আমাকে জানতেন। খুব স্নেহ করতেন। ২০১০ কি ২০১১ সালের ঘটনা। আমি মাঝে মাঝেই ওনার সাথে দেখা করতে যেতাম। দেখা হলেই আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, 'কেমন আছ'? লেখাটার আমি নামই দিলাম 'কেমন আছ?'। যেদিনের কথা বলছি সেদিনও তিনি ওই এক প্রশ্ন করেছেন, 'কেমন আছ?' যেমন সবাই উত্তর দিয়ে থাকেন, আমিও বললাম, 'ভাল আছি মহারাজ'। সেদিন 'ভাল আছি মহারাজ' বলতেই উনি বলছেন, 'কচু ভাল আছ, এখনও তোমার জীবনমুক্তি হল না, ঈশ্বর দর্শন হল না, ব্রহ্মজ্ঞান হল না (তিনটে একই কথা) আর তুমি বলছ, ভাল আছ!' এটা দিয়েই আমার লেখাটা শুরু করেছিলাম।

কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্তিই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। সেদিক থেকে মহারাজ আমাকে ঠিকই বলছেন। চতুর্দশ অধ্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থটা পুরো অন্য রকম হয়ে যায়। ঠাকুরের ভাষায় না, সাধারণ ভাষায় যেমনি আমরা বলছি, 'ভাল আছি', তার মানে আমি বেদম ফাঁসা ফেঁসে আছি। এসব কথা শুনলে আঁৎকে উঠতে হবে। যখনই বলছি হে ঠাকুর ভাল রেখো, আমরা জানিও না কিভাবে আমাদের পায়ে ভাল করে শিকল পরিয়ে দেওয়ার জন্য বলছি। এই আলোচনটাই আমরা এখানে করব।

ঈশ্বরদর্শন হওয়া বা আত্মজ্ঞান হওয়া বা জীবনমুক্ত হওয়া আর ভাল থাকা –এই দুটো পুরো বিপরীত। কথামৃতে ঠাকুর অনেকবার বলছেন, তিনি ভাল মন্দের পার, পাপ-পূণ্যের পারে, ধর্ম-অধর্মের পারে। প্রথম প্রথম কথামৃত পড়ার সময় আমরাও এই কথাগুলি বুঝতাম না। এখন বয়স হয়েছে, আর এই পরিমণ্ডলে থাকতে থাকতে এখন একটু একটু বুঝতে পারছি, জিনিসটা কি। পুরো বোঝা তখনই হয় যখন এগুলোর পারে যাব। মায়ার পারে, প্রকৃতির পারে না যাওয়া পর্যন্ত এই কথাগুলো ঠিক ঠিক বোঝা যাবে না। চতুর্দশ অধ্যায় সেইজন্য বোঝা সহজ, কারণ এখানে আমাদের নিয়েই শুরু করছেন, আমাদের সবাইকে কেন্দ্র করেই সব কথা বলছেন।

এই যে আমরা 'আমি' 'আমি' বলছি, আমরা জানি আমাদের শরীর আছে, মন আছে। কিন্তু তার সাথে যদি আমরা একটু বিচার করি, তাহলে দেখা যাবে আমরা তিনটে অবস্থার মধ্যে যে কোন একটি অবস্থায় থাকি। প্রথমটা হল আলস্য বা ঘুম, আলস্য বা ঘুম এটা শরীর খারাপকে নিয়ে বলা হচ্ছে না, স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের আলস্য আসে, ঘুম আসে। এই অবস্থায় আমাদের কিছু করতে ইচ্ছে করে না। সব কিছু ঠাকুরের উপর ছেড়ে দিয়ে তোতা পাখির মত বলতে থাকি –ঠাকুর আছেন, ঠাকুর দেখবেন। এগুলো হল আসল তামিসকতা। একজন মেল করে জানতে চাইলেন, জপ করা কি তপস্যা? আমি উত্তরে বললাম, জপ করাটা একটা তামসিক রিচ্যুয়াল, গুরু বলে দিয়েছেন, করতে হবে তাই করে যাচ্ছি; ঘোর তমস। এগোনর ইচ্ছে নেই, গতানুগতিক ভাবে জপ করে যাচ্ছি, একটা কিছু তো করতে হবে। রান্না করতে হবে, করে দিলাম; বাসন মাজতে হবে, মেজে দিলাম। ছোটবেলায় মা রেগেমেগে আমাকে বলতেন, পড়াশোনা তো তুমি করো না, আমাকে আগে তোমার পড়াটা করে দাও। বলা হয়েছে পড়তে, এই নাও পড়ে দিলাম, এর বেশি না। পাশ ফেলের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। পরীক্ষায় কিছু লিখতে হবে, লিখে দিলাম; সবটাই ঘোর তমোগুণ।

আমরা এটা বুঝতেও পারি না, কিভাবে আমাদের সবারই ভিতরে তমোগুণ ঢুকে আছে, ভয়ঙ্কর তমোগুণ ঢুকে আছে। যারা খুব ডীপ্ রঙের পোশাক পরে, বিছানার চাদর খুব ডার্ক রঙের, ঘোর তামসিকতার লক্ষণ। কথামৃতে ঠাকুর এগুলোকে নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। রাজসিক হল চলছে, চলবে। আমাকে জয় করতে হবে, জয় করে দেখাব; এগুলো রজোগুণ থেকে আসে। কিন্তু রজোগুণী হিংসাতে নামে না, হিংসা তমোগুণের লক্ষণ। ঠাকুর তমোগুণীর খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন, চোর ধরা পড়লে আগে তাকে খুব মারবে, সব কিছু কেড়ে নিয়ে আবার পুলিশে দেবে। রজোগুণের মধ্যে একটু দয়ার ভাব উদয় হয়, কিন্তু তার সঙ্গে থাকে, আমাকে মানতে হবে।

তমোগুণের বিস্তার অনেক বেশি। স্বামীজী বলতেন, সমগ্র ভারতবর্ষ তমোগুণে ডুবে আছে। স্বামীজী যখন বলছেন, গীতা পড়ার থেকে ফুটবল খেলা অনেক ভাল, আসলে তিনি বলতে চাইছেন, রজোগুণের উদয় হলে গীতা একটু বুঝতে পারবে, তমোগুণ দিয়ে গীতা কি বুঝবে! আগে ফুটবল খেলে রজোগুণটাকে বাড়াতে বলছেন। সত্ত্বগুণ হয় যখন সুখে আছে, যেটা আমি উপেন মহারাজকে বলেছিলাম, 'ভাল আছি মহারাজ'। যখনই 'ভাল আছি' এই ভাবটা থাকবে, কিংবা জ্ঞানের প্রতি স্পৃহা আছে; তার মানে সত্ত্বগুণের প্রভাব পড়েছে। সত্ত্বগুণে জ্ঞান আর সুখ দুটো পরস্পর মিশে আছে। কোন কিছুকে জানার পর আমরা সুখী হই, জ্ঞান আর সুখ জড়িয়ে আছে। এই তিনটেই বন্ধন। তমোগুণ হল, ঠাকুরের ভাষায়, আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা আর স্ক্রুপ মারা। রজোগুণে স্ক্রু গুলো একটু আলগা হয়ে খুলছে। সত্ত্বগুণে লোহার শিকল খুলে এবার সোনার শিকল দিয়ে বাঁধা হয়েছে। লোহারই হোক আর সোনারই হোক, শিকল শিকলই।

চতুর্দশ অধ্যায় এই তিনটে গুণকে আলোচনা করে দেখাবেন কিভাবে আমরা এই তিনটে গুণের বন্ধনে পড়ে আছি, আর কিভাবে এই তিনটে গুণের বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসা যায়। তিনটে গুণ থেকেই আমাদের বেরোতে হবে। আগে তমোগুণের প্রমাদ, আলস্য, হিংসা বৃত্তি থেকে বেরিয়ে আমি জয়ী হব, এই ভাব আনতে হবে। তুমি মানবে না, মানিয়ে ছাড়ব। কিন্তু যেমনি পায়ে পড়ে গেল, আচ্ছা ঠিক আছে থাক। তমোগুণী বলবে, পায়ে পড়লে তোমাকে ছেড়ে দেব ভেবেছ, কি মনে করেছ আমাকে! সত্ত্বগুণী বলছেন, ক্ষমা চেয়ে নিয়েছ, ঠিক আছে ঠিক আছে। গায়ে পড়ে যারা ঝগড়া করে, এই ধরণের ঝগড়ুটেকে নিয়ে একজন খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করছিলেন –যারা খুব ঝগড়ুটে হয়, আপনি হয়ত সাইকেল নিয়ে যাচ্ছেন, তার গা ঘেঁষে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড় করিয়ে বলবে, 'সাইকেল এভাবে চালাচ্ছেন কেন'? 'আরে ভাই আপনার পাশ দিয়ে গেলাম তো, আপনার গায়ে লাগেনি তো।' 'না, যদি লেগে যেত'? 'আরে ভাই লাগেনি তো'। 'সেটা কথা না, যদি লেগে

যেত’। ‘আরে দাদা কোথাও আপনার লাগেনি, তাও আপনি খামোকা চেঁচাচ্ছেন কেন?’ ‘যদি লেগে যেত, লেগে গেলে আমি পড়ে যেতাম।’ এরা হল ঘোর তামসিক।

কথামৃতে ঠাকুর তিন ডাকাতের গল্প দিয়ে তিনটে গুণকে খুব সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। একজন লোককে তিনজন ডাকাতে ধরেছে। তমোগুণী ডাকাত বলছে, লোকটার সব কিছু কেড়ে নিয়ে কেটে ফেলি। রজোগুণী ডাকাত বলছে, কেটে ফেলার দরকার নেই, ওর সব কিছু কেড়ে ভাল করে বেঁধে এখানে ফেলে রেখে চলে যাই। তিন ডাকাত চলে যেতেই, একটু পরে সত্ত্বগুণী ফিরে এসে তার বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে বনের বাইরে এনে বলে, ‘ওই দেখ তোমার রাস্তা দেখা যাচ্ছে, এই রাস্তা দিয়ে গেলেই তোমার বাড়ী পোঁছে যাবে’। লোকটি বলছে, ‘আপনি আমার এত উপকার করলেন, চলুন আমার বাড়িতে’। সত্ত্বগুণী ডাকাত বলছেন, ‘না, আমি শহরে গেলে পুলিশ আমাকে ধরবে’। এই কাহিনীগুলো তত্ত্বের দিক থেকে বলা। মঠে জয়েন করার পর অনেক দিন কাটাবার পরেও গল্পগুলি ঠিক বুঝতাম না। এখন এগুলো বুঝতে পারি, বুঝতে পারি যে সত্ত্বগুণটাও বন্ধন। এখানে যেমন মানুষের স্তর থেকে তিনটে গুণের কথা বলা হল, ঠিক তেমনি সৃষ্টির দিক থেকেও এই তিনটে গুণের কথা বলা হয়।

সৃষ্টি তত্ত্বের উপর আমাদের অনেকগুলো থিওরী আছে। আমার উপন্যাস ক্রতুতে থেকে থেকে সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। আমাদের দর্শন শাস্ত্রে অনেক রকমের সৃষ্টিতত্ত্ব আছে। যারা বস্তুবাদী, materialist, তাদের মতে সৃষ্টি এক রকম হয়। সাংখ্য দর্শনে ও রাজযোগের সৃষ্টি তত্ত্বে এই সত্ত্ব, রজো আর তমোকে আনা হয়েছে। বৈশাষিক দর্শনের মতে অণু আছে, সেই অণু দিয়ে সৃষ্টি হয়। বৌদ্ধ দর্শনে শূন্যবাদ, ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদে বিভিন্ন সৃষ্টি তত্ত্ব আছে। তার সাথে, ভগবান সৃষ্টি করেন, ভক্তদের এই মতটাও আছে। গীতা যে সৃষ্টি তত্ত্বের কথা নিয়ে আসছেন, সেখানে পুরোপুরি হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা না করে এই ধরণের সব সৃষ্টি তত্ত্বকেই নিয়ে আসা হয়েছে।

আচার্য শঙ্করের মজা হল, উনি কোন জিনিসকে ধরে রাখেন না। আচার্য শঙ্কর একজন সত্যিকারের আচার্য। কিছু কিছু বই আছে যেখানে আচার্যকে একজন বড় দার্শনিক রূপে বলছেন। আচার্য শঙ্কর কখনই একজন দার্শনিক নন। বেদান্ত হল দর্শন, আর আচার্য হলেন ঠিক ঠিক আচার্য। যেখানে যেমনটা বলা আছে, আচার্য সেটারই হয়ে সেটার ব্যাখ্যা করবেন। তিনি এটা বলবেন না যে, এটা ঠিক না, আমার মতে......। যিনি বলছেন, ‘আমার মতে’, তিনি হলেন দার্শনিক। আচার্য শঙ্কর একজন আচার্য, তিনি কক্ষণ নিজের মত ব্যক্ত করবেন না। আচার্য শঙ্করের সব রচনা পড়ার পর বোঝাই যাবে না, ওনার নিজের মত কি, কারণ যেখানে যেমনটা বলা হয়েছে, সেখানে কি বলতে চাওয়া হয়েছে, সেটাই তিনি ব্যাখ্যা করে বেরিয়ে গেছেন।

তাহলে বক্তব্য কি দাঁড়ায়? বক্তব্য হল, সমস্ত হিন্দু শাস্ত্র একই কথা বলছেন –ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, ঠাকুরের অত্যন্ত সহজ কথা। একমাত্র তিনিই সত্য, ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, এটাকে যদি বুঝতে হয়, তাহলে আমাদের গীতা, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্রের উপর আচার্যের ভাষ্য পড়তে হবে। যেখানে যেমন সৃষ্টিতত্ত্ব বলা হয়েছে, সেখানে তিনি সেই ভাবে নিয়ে আসছেন। যেখানে বলছেন, পাপ আছে পূণ্য আছে, উনিও বলবেন পাপ আছে পূণ্য আছে। যেখানে বলছেন, পাপ নেই পূণ্য নেই, উনিও বলবেন পাপ নেই পূণ্য নেই, স্বর্গ আছে নরক আছে, উনিও বলবেন স্বর্গ আছে নরক আছে, যেটা যেমন আছে সেটাকে তেমন ভাবেই বলবেন। কিন্তু শুধু একটা জিনিসকে ছাড়বেন না –ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু। অবস্তুর ব্যাখ্যা তুমি যত ভাবেই কর না কেন, ওনার কোন আপত্তি নেই। যেমনি ব্রহ্ম সত্য এসে গেল, এটাকে ছাড়বেন না।

আমাদের জীবন থেকে সবাই চলে যাবে, মা, বাবা, ভাই, বোন, সন্তান, বন্ধু; এরা সবাই অবস্তু, এই আছে এই নেই। কিন্তু ঈশ্বর কক্ষণ কোন দিন যাবেন না। আমাদের কাছে অনেকেই প্রচুর

দুঃখ-কষ্ট নিয়ে আসেন, আমিও তাঁদের বলি, মন প্রাণ দিয়ে ঠাকুরকে ধরুন। মন প্রাণ দিয়ে ঠাকুরকে ধরা সম্ভব না। যে জায়গাতে আমাদের লোভ আছে, যেখানে কিছু পেতে চাই, আসলে ওই জায়গাতেই আমরা ঠাকুরকে ধরে রাখতে চাই, তার বাইরে ঠাকুর নেই। মন প্রাণ দিয়ে ঠাকুরকে ধরতে পারলে, তার জাতই আলাদা হয়ে গেল। আমাদের অনেকে লেখেন, ছেলে অবাধ্য, স্ত্রী এই রকম, স্বামী এই রকম। কি বলব তাঁদের? একটাই উত্তর, ঠাকুরের কাছে মাথা ঠুকুন। কত দিন? দিনের পর দিন। শুধু এইটুকুর জন্য? তাহলে তো পাটোয়ারি বুদ্ধি হয়ে গেল। সব কিছুর জন্য।

এই একটা ছোট্ট ভূমিকা দিয়ে আমরা চতুর্দশ অধ্যায় যেখানে তিনটে গুণকে নিয়ে বলছেন, আমরা তার আলোচনা শুরু করছি। আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছিল –*পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি*, পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে থেকে সব কিছু করেন বা *যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ*, সব কিছু ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে উৎপন্ন হয়। আচার্য শঙ্করও এই অধ্যায়ের ভূমিকাতে বলছেন –বলা হয়েছিল সমস্ত কিছু ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, চিৎ আর জড়, আত্মা বা চৈতন্য আর জড়, এই দুটোর সংযোগে সব কিছু উৎপন্ন হয়। আবার বলা যায় যে, ঈশ্বর হলেন সবার উপরে আর ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ হল এটার কারণ। অর্থ হল, সাংখ্যবাদে বা যোগে যেমন বলা হয়, পুরুষ আর প্রকৃতি স্বাধীন, দুটো স্বাধীন আলাদা সত্তা নিজের মত সব করে যাচ্ছেন। এটা কিন্তু গীতার মত নয়।

এই প্রকৃতির মধ্যে, অর্থাৎ জড় জগতের মধ্যে পুরুষ বা চৈতন্য যে বসে আছেন, এর ফলে পুরুষের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি আসক্তি এসে যায়। এবার এটাকেই আমরা বিস্তারে আলোচনা করে দেখব –এই আসক্তিটা পুরুষের মধ্যে কিভাবে আসে? আমরা কেন বন্ধনে আছি? বিভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি আমাদের কেন আসক্তি? শ্রীশ্রীচণ্ডীতে প্রথমের দিকে বর্ণনা আছে, রাজা সুরথ আর সমাধি বৈশ্য ঋষির কাছে গিয়ে বলছেন, আমাদের উপর এই রকম অন্যায় হয়েছে, তা সত্ত্বেও আমরা তো তাদের ভুলতে পারছি না। সূরথ রাজার রাজ্যের প্রতি এবং সমাধি বৈশ্যের স্ত্রী-পুত্রের প্রতি এখনও আসক্তি। কেন এই আসক্তি?

আমাদের যত শাস্ত্র আছে, এনারা সবাই একই কথা বলবেন, *পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভূঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্*, পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে নেমে ভোগ করছেন, আসক্ত হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু পুরুষ আর প্রকৃতির স্বভাব তো আলাদা। স্বভাব যদি আলাদা হয় তাহলে পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে কেন ভোগ করছেন? এই জিনিসটাকে এখানে বলা হচ্ছে। কেন আমরা আসক্তির মধ্যে ফেঁসে যাচ্ছি, কেন আমি তোমাকে না দেখে থাকতে পারছি না? কেন তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারছি ন? আরও জঘন্য, তুমি যে আমাকে ছেড়ে চলে গেলে, এত কিছুর পরেও কেন তোমার জন্য আমার চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে? কি উপায় আছে, যাতে এই আসক্তি থেকে আমি বেরিয়ে আসতে পারি? এটা ঠিক যে, এই আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে নিজের জন্য সামগ্রিক মুক্তি ও পূর্ণ রূপে মুক্তির পথও বেরিয়ে আসবে। চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ভগবান বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ
পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ।।১।।

(শ্রীভগবান্ বললেন –ব্রহ্ম অত্যন্ত দুর্বোধ্য। সেই হেতু সর্বজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞান আমি পুনরায় তোমাকে বলব এই পরমার্থজ্ঞান লাভ করে মুনিগণ দেহত্যাগের পর মুক্তিলাভ করেন।)

ভগবান বলছেন, হে অর্জুন তোমাকে আবার আমি জ্ঞান সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের কথা বলব। ভগবান বারবার জ্ঞানের কথা বলে যাচ্ছেন। শাস্ত্র কত কঠিন জিনিস এখানেই বোঝা যায়। গীতার মত শাস্ত্র এই একই বিষয়কে কতবার করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছেন। *পরং* বলতে বোঝায় যেটা দূরে, কিন্তু এখানে *পরং* বলতে বলছেন পরম জ্ঞান, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, সেই জ্ঞানের কথা তোমাকে বলব।

যত প্রকার জ্ঞান হতে পারে তার মধ্যে এই জ্ঞান শ্রেষ্ঠ জ্ঞান –আসক্তিশূন্য কিভাবে হওয়া যায়। আচার্য শঙ্কর যে সময় এই ভাষ্য রচনা করছেন বা গীতা যে সময় রচিত হয়েছিল, সেই সময় যজ্ঞাদি বিষয়ক জ্ঞান, যজ্ঞের জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলা হত। এই ভাব হিন্দু সংস্কৃতির মূলেই রয়েছে। কিন্তু আসক্তি থেকে কিভাবে মুক্ত হবে, এই জ্ঞান যজ্ঞাদি বিষয়ক জ্ঞানের থেকেও উপরে। এই বিষয়টাই আলাদা, ঠাকুর বলছেন বাকি সব অবস্তু, সমস্ত জ্ঞান অবস্তু, যজ্ঞের জ্ঞানও অবস্তু। আসক্তিশূন্য হওয়ার জ্ঞান ভগবানের জ্ঞান, সেইজন্য এটা পরম, আর তার সাথে এই জ্ঞানের যে ফল, সেই ফলটাও শ্রেষ্ঠ ফল। ভগবান বলছেন, এর আগেও অনেকবার তোমাকে এই জ্ঞানের কথা বলেছি, আরও একবার বলছি এবং ভাল করে বলছি।

বলছেন, যত কর্ম আমরা করি, সব কর্মই আমাদের চিত্তশুদ্ধির জন্য করা হয়। কিছু দিন আগে বেলুড় মঠে একজন মহারাজ প্রচুর কাজ করছিলেন, তিনি ভাল করেই জানতেন এই কাজে কোন ফল হবে না। তিনি খুব মিষ্টি করে বলছেন, 'এই কাজটা করছিলাম, জানি কোন ফল হবে না, শুধু আমার চিত্তশুদ্ধির জন্য করছিলাম'। রামকৃষ্ণ মিশনের সমস্ত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীদের এই ট্রেনিং দেওয়া হয় –যত কর্ম, যত জপ, যত ধ্যান সব চিত্তশুদ্ধির জন্য। গীতা তৃতীয় অধ্যায়ে বা চতুর্থ অধ্যায়ে বারবার বলছেন, নিষ্কাম ভাবে কর্ম করতে করতে ত্যাগের ভাব আসে, কর্ম করা মানে নিজেকে শুদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়া, কর্মের দ্বারা আমি নিজেকে পবিত্র করছি, আমার মনের আবর্জনাগুলো পরিষ্কার করা হচ্ছে। কারুর জীবনে যদি প্রচুর দুঃখ-কষ্ট থাকে বুঝতে হবে তার মধ্যে প্রচুর আবর্জনা জমে আছে। ঠাকুর বলছেন, হাসপাতালে নাম লেখালে রোগের কসুর না হওয়া পর্যন্ত হাসপাতাল থেকে ছাড়বে না। এই কষ্টগুলিই চিত্তশুদ্ধির উপায়। ডাক্তারবাবু কখনো ওষুধ দেন, কখনো ইঞ্জেকশান দেন, কখনো সার্জারি করেন। ক্যান্সারের রোগীকে কেমো দিচ্ছেন, অপারেশান করছেন, ইঞ্জেকশান দিচ্ছেন, ওষুধ দিচ্ছেন, কত কি করা হচ্ছে। বলবেন, এত কিছু করার পরেও তো ক্যান্সারের রোগী মারা যাচ্ছে। কিন্তু ঠাকুরের হাসপাতালে নাম লেখানো মানে এখানে এই দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের পরম মুক্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, এখানে জিনিসটা পুরো অন্য রকম হয়ে যায়।

যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ, মুনি কারা, *সন্ন্যাসিনো মননশীলাঃ*, যাঁরা সন্ন্যাসী, যাঁরা মননশীল তাঁরাই মুনি। সংসারে থেকে আপনি সন্ন্যাসী নাও হতে পারেন কিন্তু চেষ্টা করলে মুনি হতে পারেন। শাস্ত্রের একটা কথা শুনলেন, সেটাকে নিয়ে সর্বক্ষণ মনন করে যাচ্ছেন –আপনি মুনি। *সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ*, এই জ্ঞান প্রাপ্তিতে মুনিরা দেহের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে যান। তার মানে, আমরা এই যে অধ্যায়ের মধ্যে আছি, এটাই শ্রেষ্ঠজ্ঞান, এই পরমার্থ জ্ঞান লাভ করে মুনিরা দেহের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন। যাঁরা শুনছেন, আপনারাও মুনিদের মত, সন্ন্যাসীদের মত *পরাং সিদ্ধি* পেয়ে যেতে পারেন। *পরাং সিদ্ধি* মানেই মোক্ষ, জন্মমৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি।

জগতের একটা কঠিন বাস্তব নিয়ম এই যে, সবাই আসল জিনিসকে নিজের কাছে রাখে আর নকল জিনিসকে নিজের কাছ থেকে তাড়াতাড়ি বিদায় করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। টাকা অর্জনের জন্য সবাই ছুটছে, কিন্তু নকল নোট যদি কারুর কাছে এসে যায় আর সে যদি জানতে পারে যে এই পঞ্চাশ টাকার নোটটা নকল, তখন সে চেষ্টা করে যত তাড়াতাড়ি অপরকে গচিয়ে দেওয়ার। আসলটাকে সবাই ধরে রাখে আর নকলটাকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেয়। যদি কোথাও চালাতে না পারে শেষে সব নকল নোট মন্দিরে প্রণামীর বাক্সে পড়ে। এতে দুটোই হল, পূণ্যও হল আর নকল নোটটাকে চালিয়ে দেওয়াও হল। কোনটা আসল আর কোনটা নকল বোঝার জন্যই এই চতুর্দশ অধ্যায়কে ভগবান বেছে নিয়েছেন। এখানেও জগতের আসলটা কি আর নকলটা কি জেনে নিয়ে নকলটাকে ফেলে দেওয়ার কথাই বলা হচ্ছে। ভগবান বলছেন, এই আসলটাকে জেনে আগের আগের মুনি-ঋষিরা পরম সিদ্ধি, মানে আধ্যাত্মিক জগতের চরম অনুভূতিটুকু উপলব্ধি করে শ্রেষ্ঠ

পুরুষ হয়ে গেলেন। তার মানে জ্ঞান অনেকেরই ছিল, কিন্তু যাঁরা মুনি, মুনি মানে যিনি মননশীল, তাঁরা এই আসলটাকে জেনে মহৎ হয়ে গেলেন। ভগবান বলতে চাইছেন, এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানটি লাভ করলে তোমার মুক্তি পেতে সুবিধে হবে। কিসের থেকে মুক্তি? বন্ধন থেকে। কিসের বন্ধন? যিনি বিশুদ্ধ চৈতন্য তাঁর উপরে যে একটা আবরণ পড়ে গেছে, এই আবরণটাই বন্ধন। এই আবরণটা কিসের? জড়ের বা প্রকৃতির।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।।২।।

(এই জ্ঞানকে আশ্রয় করে মুনিগণ আবার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তাঁরা আর সৃষ্টিকালে জন্মগ্রহণ করেন না এবং প্রলয়কালেও লীন হন না।)

হে অর্জুন, যে জ্ঞানের কথা আমি বলতে যাচ্ছি, তুমি ঠিক ঠিক ভাবে যদি এই জ্ঞানের আশ্রয় নাও, তাহলে *মম সাধর্ম্যমাগতাঃ, সাধর্ম্যম্* অর্থাৎ একেবারে সমানে সমানে, ঈশ্বর যেমন তুমি তেমন হয়ে যাবে। অর্থাৎ তুমি আমার স্বরূপত্ব পেয়ে যাবে। আচার্যও বারবার বলবেন, শ্রোতা বা পাঠকের মনে একটা আকর্ষণ তৈরী করার জন্য অনেক সময় এভাবে বলা হয়। বলছেন, এই ভাবে ঈশ্বরের সাথে যদি কেউ এক হয়ে যায়, তাহলে ব্রহ্মা যখন আবার নূতন করে সৃষ্টি করবেন, তখন ওই সৃষ্টিতে তাকে আর জন্ম নিতে হবে না, চিরদিনের জন্য তার মুক্তি হয়ে যাবে। ঠাকুর এর খুব সুন্দর উদাহরণ দিচ্ছেন। কুমোর মাটি দিয়ে অনেক কিছু তৈরী করে। যেগুলো ভাল করে তৈরী হয় না, বা কাঁচা অবস্থায় গরুতে ছাগলে মাড়িয়ে ভেঙে ফেলে, সেগুলোকে কুমোর আবার চাকে ফেলে হাড়ি, কলসি বানায়। কিন্তু একবার সেগুলোকে আগুনের পুড়িয়ে দিয়ে হাড়ি তৈরী হয়ে গেলে, এরপর ভেঙে গেলেও আর তাকে চাকে দেবে না। জ্ঞানাগ্নিতে একবার পুড়িয়ে দিলে, আর তাকে জন্মমৃত্যুর চাকে ফেলা হবে না, এটাই মোক্ষ।

আচার্য এই শ্লোকের ভাষ্যে বলছেন, এই শ্লোকটি জ্ঞানের স্তুতি করার জন্য বলা হয়েছে। ঈশ্বরের মত হয়ে গেলে, ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে গেলে, এটা তখন সালোক্যও হবে না, সামীপ্যও হবে না, সারূপ্যও না, একেবারে সাযুজ্য। *সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে,* সর্গ মানে সৃষ্টি, আবার যখন নূতন করে সৃষ্টি হবে, *নোপজায়ন্তে,* তখন তাকে আর জন্ম নিতে হবে না; জন্ম নেই তাই মৃত্যুও নেই। এখানে *সাধার্ম্যম্* বলতে সমান ধর্মের কথা বলছেন না, ঈশ্বরের যে গুণ আছে সেই গুণের সমান গুণ হবে, তা না। তার মানে সামীপ্য, সালোক্য না। এর আগে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান ক্ষেত্রজ্ঞ নিয়ে বলতে গিয়ে বলেছিলেন; ক্ষেত্রজ্ঞ কে? ভিতরে যিনি আত্মা, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই ঈশ্বর। এই যে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের কথা বলা হল, ক্ষেত্রজ্ঞ যদি ঈশ্বর হন, তাহলে কেন আমরা এই দুঃখের মধ্যে পড়ে আছি? এটাকে পরিষ্কার করবার জন্য বলছেন –

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।।৩।।

(হে ভারত, মহৎ নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম আমার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। এই প্রকৃতি সর্বভূতের উৎপত্তির কারণ। এই প্রকৃতিতে আমি গর্ভাধান (সৃষ্টির বীজ নিক্ষেপ) করি। সেই গর্ভাধান থেকে হিরণ্যগর্ভাদি সর্বভূতের সৃষ্টি হয়।)

ভগবান বলছেন, আমি সেই ঈশ্বর, আমার যে ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি, যেটাকে মায়া বলা হয়, প্রকৃতি বলা হয়, এটা হল সমস্ত ভূতের, অর্থাৎ যারই নাম আছে, রূপ আছে, তার এটা যোনি। ওই ভাণ্ডার থেকে সমস্ত কিছু বেরিয়েছে। প্রকৃতি না বলে বলছেন *মহদ্‌ব্রহ্ম,* এটাই মহৎযোনি। সৃষ্টিতে যাবতীয় যা কিছু আছে সব কিছুকে এই *মহদ্‌ব্রহ্ম* ধারণ করে আছে। নিজে থেকে গীতা পড়লে মহদ্‌ব্রহ্মের অর্থ আমরা কেউ বুঝতে পারব না, সেইজন্য আচার্যের দরকার। আচার্য শঙ্কর ভাষ্য দিয়ে গেছেন বলে গীতার অর্থগুলো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা নিজে থেকে পড়লে অর্থটা

অন্য রকম হয়ে যেত। মূল কথা *মহদ্‌ব্রহ্ম* মানে প্রকৃতি। বলছেন, *মহদ্‌ব্রহ্ম*রূপ যোনি, যেখান থেকে সমস্ত কিছুর জন্ম হয়।

ভগবান বলছেন, আমি (ঈশ্বর) বলছি, ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞ, জড় ও চেতন, এই দুটো আমার প্রকৃতি। সপ্তম অধ্যায়েও ভগবান এটাই বলছেন, পরা ও অপরা আমার দুটি প্রকৃতি। এখানে অপরা প্রকৃতি হল ক্ষেত্র আর পরা প্রকৃতি হল ক্ষেত্রজ্ঞ। আসলে দুটোই ভগবান, কিন্তু তাঁর এমনই শক্তি, এমনই মায়া যে, একটাতে তিনি জড় হয়ে আছেন, আর-একটাতে চেতন হয়ে আছেন। পুরাণে খুব নামকরা সমুদ্র মন্থনের কাহিনী আছে। সেখানে দেখাচ্ছেন, ভগবান একসাথে কত কি হয়ে আছেন, একদিকে তিনি কুর্মাবতার হয়ে পুরো পাহাড়কে নিজের পিঠে ধারণ করে আছেন, তিনিই আবার শক্তি হয়ে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে রয়েছেন, একই ভগবান কত রূপে। এখানেও দেখাচ্ছেন, সেই ভগবান ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে এসে এবার তিনি হিরণ্যগর্ভের জন্ম দিচ্ছেন। হিরণ্যগর্ভ হল, যেখান থেকে সমস্ত কিছুর জন্ম হয়। ভগবান সরাসরি সৃষ্টি করেন না, মাধ্যমটা পুরো আলাদা। সমস্ত কিছুর জন্মের আদি কারণ হল হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা। সেই আদি কারণ হিরণ্যগর্ভকে স্থাপন করলেন, এবার সেখান থেকে এই সৃষ্টি শুরু হবে।

আমাদের জন্য ঠাকুর খুব সহজ একটা উদাহরণ দিয়ে জিনিসটাকে পরিষ্কার করে দিচ্ছেন, আগেকার দিনে গ্রাম দেশের বাড়িতে গিন্নিদের একটা হাড়ি থাকত, তাতে ছোট ছোট পুটলির কোনটাতে শশার বীজ, কোনটাতে লাউএর বীজ, কোনটাতে কুমড়োর বীজ রেখে দিতেন। যখন যেটার চাষের সময় হত, তিনি সেটার বীজ হাড়ি থেকে বার করে দিয়ে দিতেন। হিরণ্যগর্ভ হল সেই হাড়ি, যেখান থেকে সব বীজগুলো বেরিয়ে আসে, যেখান থেকে সৃষ্টি বিস্তার পায়।

এই সংসারটা কি? আচার্য বলছেন, *অবিদ্যাকামকর্মোপাধিস্বরূপানুবিধায়িনং ক্ষেত্রজ্ঞং ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামি ইত্যর্থঃ,* ভগবান যখন বীজ স্থাপন করে দিলেন, সাথে সাথে সেখানে অবিদ্যা, কাম ও কর্ম এসে যায়। সৃষ্টি মানেই অবিদ্যা, অবিদ্যা মানে নিজের স্বরূপকে ভুলে যাওয়া। অবিদ্যা থেকে আসে কাম; আমি অপূর্ণ, আমি পূর্ণ হতে চাই; আমার এটা চাই, সেটা চাই। এই কাম পুর্তির জন্য তাকে কর্ম করতে হয়। কর্ম করলেই তার থেকে ভাল মন্দ ফল আসবে। ভাল মন্দ ফল হলে অবিদ্যা বাড়বে, ফলস্বরূপ কাম বাড়বে, যত কাম বাড়বে তত কর্মও বাড়বে। আজ আমি যে এই দুরবস্থায় আছি, এর পিছনে রয়েছে জন্মজন্মান্তর ধরে কর্ম করে করে আমার কামনার পুটলিটা বিরাট হয়ে গেছে। কামনার পুটলি মানে, এত অবিদ্যা এসে জমা হয়েছে যে, সরানো যাবে না। একটা পথ হল চিত্তশুদ্ধি করা। চিত্তশুদ্ধি কিভাবে হবে? যে কাজই করি না, রান্না করছি, বিছানার চাদর পাল্টাচ্ছি, সব কাজই খুব সুন্দর ভাবে করতে হবে, এতে চিত্তশুদ্ধি হবে। কিন্তু আমাদের স্বভাব হল, করতে বলেছে বলে করে দিলাম, আর তা নাহলে প্রশংসা পাওয়ার জন্য করছি। বলছেন, আমিই এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মিলন করিয়ে দিই। ভগবান আছেন বলেই জড় আর চেতনের মিলন হয়। তার মানে সাংখ্য দর্শন যে পুরুষ আর প্রকৃতির কথা বলছেন, গীতাও এটা মানছেন, কিন্তু সেখানে ভগবানকে নিয়ে আসছেন। ফলে কি হয়, *সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত,* সেখান থেকেই সমস্ত জীবের জন্ম সম্ভব হয়।

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা।।৪।।

(হে কৌন্তেয়, দেব, পিতৃ, মনুষ্য ও পশু আদি যোনিতে যে সকল দেহ (যার অবয়বসকল অভিব্যক্ত ও কার্যক্ষম) উৎপন্ন হয়, বিভিন্ন অবস্থায় পরিণত প্রকৃতি তাদের জননী এবং আমি তাদের গর্ভধানকর্তা পিতা।)

নবম অধ্যায়ে ভগবান বলেছিলেন *পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ,* আমি বাবা, আমি মা, আমি পিতামহ। এখানে এটাই আবার অন্য ভাবে বলতে চাইছেন। *সর্বযোনিষু কৌন্তেয়*

মূর্তয়ঃ সমভবন্তি যঃ, যত রকমের যোনি থাকতে পারে, যেমন দেব, গন্ধর্ব, পিতৃ, মানুষ এগুলো সব যোনি; যোনি মানে এক একটা প্রজাতি, পৃথিবীতে যত রকমের প্রজাতি দেখছি, এই পৃথিবীর বাইরেও স্থূল সূক্ষ্ম সব মিলিয়ে অনেক প্রজাতি আছে; সেই সকল যোনিতে যে মূর্তি হয়ে রয়েছে, অর্থাৎ বিভিন্ন শরীরের যে আকার হয়ে আছে, সেটা আমার জন্যই সম্ভব। সবাই এক-একটা মূর্তি, আমরাও সবাই এক-একটা মূর্তি। অন্যান্য ধর্ম হিন্দুদের পৌত্তিলক বলে, জানে না যে তোমরা নিজেরাও এক-একটা মূর্তি। *তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিঃ,* আবার প্রকৃতির কথা বলছেন; এই যে প্রকৃতি বা মায়া, যিনি সমস্ত গর্ভকে ধারণ করেন। সমস্ত সৃষ্টি প্রকৃতি থেকেই হয়, *অহং বীজপ্রদঃ পিতা,* সেখানে আমি সৃষ্টির বীজ প্রদান করি।

এখানে কয়েকটা জিনিস বোঝার আছে। পদার্থবাদীরা অর্থাৎ বিজ্ঞান যে বলছে, সমস্ত কিছু এনার্জি থেকে আসে, তাঁরা ভুল কিছু বলছেন না। মাটি থেকে জন্ম, মাটিতে মিশে গেলাম, ভুল কিছু বলছেন না। গীতাও তাই বলছেন। কারণ সমস্ত কিছুর মা হলেন এই প্রকৃতি, প্রকৃতি জড়, তিনি সমস্ত কিছুর সমূহ, কিন্তু তার ভিতর রয়েছেন চৈতন্য, যেটা চেতনা আকারে এই দেহের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। এই জায়গাতে এসে পদার্থবাদীরা, বর্তমান যুগের বিজ্ঞান আর তার সাথে স্বজাতীয় দর্শনগুলি ঈশ্বরের কোন ভূমিকা দেখতে পান না। আগেকার দিনের বিজ্ঞানীরা এই রকম ছিলেন না, নিউটন আদি বিজ্ঞানীরা পুরো ভগবানে বিশ্বাসী ছিলেন, বাইবেলে বিশ্বাসী ছিলেন। ফরাসী বিপ্লব থেকে সব উল্টোপাল্টা হতে শুরু হয়ে গেল। আর কার্ল মার্ক্স তো এসে পুরোটাই অন্য দিকে নিয়ে চলে গেলেন। এই শ্লোকে ভগবান বলছেন, আমি হলাম সেই পিতা, আমিই গর্ভে বীজ প্রদান করি, কারণ আমি চৈতন্য। কিন্তু মাও তিনি, পিতাও তিনি; পিতা ও মাতা এই দুজন আলাদা কিছু না।

এখানে এসে শক্তি মত, তন্ত্র মত বেদান্ত থেকে আলাদা হয়ে যায়। তন্ত্র মতে শিব আর শক্তি আছেন, সৃষ্টি যখন হয়ে গেল, এনারা দুজন আলাদা। বেদান্ত মতে ভগবানই প্রকৃতি, ভগবানই মা, সৃষ্টি হয়ে গেলেও ভগবান প্রকৃতি রূপে থাকবেন। প্রকৃতি কি? ত্রিগুণাত্মিকা, সত্ত্ব, রজো ও তমো এই গুণের সমাহার, প্রকৃতি থেকেই সব বেরিয়েছে, যেটা দিয়ে আমরা এই অধ্যায়ের আলোচনা শুরু করেছিলাম। একজন রসায়নবিদ বলবেন, আমার কাছে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম থেকে শুরু করে ১১০ কি ১১২টা তত্ত্ব আছে, আমার কাছে এটাই জগৎ। অন্য দিকে ধর্মশাস্ত্র বলে পঞ্চ তত্ত্ব দিয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। কিন্তু ধর্ম তত্ত্বের আরও পিছনের দিকে গেলে ওনারা তখন বলবেন, সৃষ্টি মানেই তিনটে তত্ত্ব – সত্ত্ব, রজো ও তমো। এই সত্ত্ব, রজো ও তমোকেই পঞ্চ তত্ত্ব রূপে দেখা হয়, এই সত্ত্ব, রজো ও তমো রসায়ন বিজ্ঞানে যে একশ বারোটা তত্ত্বের কথা বলা হয়, সেই রূপেও দেখা হয়। আগামীকাল যদি জানা যায় এক হাজারটা element আছে, তখনও ওই হাজারটার মধ্যে সত্ত্ব, রজো ও তমোই থাকবে। যেমন তিনটে প্রাইমারি রং দিয়ে যত খুশী রং হয়ে যায়, ঠিক তেমনি দেবতা, পশু, পাখি, মানুষ, দুষ্ট মানুষ, ভাল মানুষ সমস্ত কিছু এই সত্ত্ব, রজো ও তমো দিয়ে তৈরী, এই তিনটে গুণ দিয়ে সবাই বাঁধা।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্।।৫।।

(হে মহাবাহো, প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ –এই গুণত্রয় পরমার্থতঃ নিষ্ক্রিয় আত্মাকে দেহাভিমান দ্বারা শরীরে আবদ্ধ করে।)

সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে গুণ পারিভাষিক। যখন আমরা কোন কিছু দেখি, আমরা তখন বলি 'আহা! কি সুন্দর', এখানে একটা গুণের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু এই তিনটি গুণ বলতে তা না। সত্ত্ব, রজো ও তমোগুণ এখানে মৌলিক। গুণ দুই প্রকার, যেমন এই কলমের একটা রং আছে, নীল রং, এটা কলমের একটা গুণ; ঠিক সেই ভাবে সত্ত্ব কারুর গুণ না, সত্ত্ব নিজেই আধার। আবার

আমরা যেমন বলি এই ইটগুলো ভাল, ওই ইটগুলো ভাল না; ভাল এখানে গুণ আর ইট হল বস্তু। এইভাবে সত্ত্ব, রজো ও তমো গুণ না, যদিও বস্তুর নিজস্ব যে গুণ থাকে তাকেও গুণ বলা হয়, এই দুটো তফাৎ। সাধারণ ভাবে আমরা যখন কোন বস্তু বা ব্যক্তির গুণের কথা বলি সেটা বিশেষণের মধ্যে চলে যায়। যেমন ভাল মন্দ, এগুলো কোন বস্তুকে আধার করে থাকে। সত্ত্ব, রজো ও তমো কোন কিছুকে আধার করে থাকে না, এর আধার ভগবান নিজে। সত্ত্ব, রজো ও তমোকে যদিও গুণ বলা হচ্ছে, কিন্তু আমরা যে অর্থে গুণ শব্দের ব্যবহার করি, সেই অর্থে এই তিনটে গুণ না, এই তিনটে গুণ একেবারে মৌলিক, একেবারে মূলে রয়েছে।

এই তিনটে গুণ ক্ষেত্রজ্ঞকে বেঁধে নেয়। ক্ষেত্রজ্ঞকে যখন বেঁধে নেয়, তখন এরপর এই তিনটে গুণ নিজেকে দেখাতে পারে। ক্ষেত্রজ্ঞ যদি না থাকে, তাহলে তিনটে গুণ নিজের স্বরূপ দেখাতে পারবে না। কেউ দেখার যদি না থাকে, তাহলে দামী গয়না, ভাল দামী পোষাক পরে কি করবে! বেলুড় মঠে একবার একটা বাচ্চা ছেলেকে কেউ মেরেছে বা কিছু একটা হয়েছে, বাচ্চাটি জোরে চেঁচিয়ে কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছে, দেখছে তাকে দেখার মত কেউ নেই, কিছু দূর গিয়ে চুপ হয়ে গেল। বাইরে বেরিয়ে গিয়ে যেখানে ওর পাড়ার লোকজনরা আছে, সেখানে গিয়ে আবার চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল। দেখানোর যদি কেউ না থাকে, তাহলে সেজেগুজে কি হবে। ঠিক তেমনি পুরুষ যদি না থাকে, প্রকৃতি তার কেরামতি দেখাবে কি করে! সত্ত্ব, রজো ও তমোর যে বৈশিষ্ট্য, তাদের যে গুণ, দেখাবার জন্য কাউকে তো থাকতে হবে। তার থেকেও বাজে, তিনটে গুণের আধারই নেই, এদের শরীর দরকার।

ক্রতু বইতে আইডিয়াসের উপর খুব সুন্দর একটা অংশ আছে, সেখানে দেখানো হয়েছে, আইডিয়াসগুলি নিজেদের প্রকাশ দেখাতে পারছে না, তার জন্য শরীর দরকার। সত্ত্ব, রজো ও তমো এরা যে নিজেদের খেলা দেখাবে, সেই খেলা দেখাবার জন্য তাদের শরীর দরকার। যেমন ভূত, ভূত নিজে কিছু করতে পারবে না, ওর একটা শরীর লাগবে। দুর্বল মস্তিষ্ক যাদের, তাদের ভিতর ঢুকে গেলে ভূত তার খেলা দেখাতে শুরু করে দেবে। যত শরীর আছে, সব শরীর দিয়ে সত্ত্ব, রজো আর তমো প্রকাশ পাচ্ছে। এই প্রকাশ পাওয়াটেকেই বলে বাঁধা, আসলে বাঁধে না, গুণগুলি প্রকাশ পাচ্ছে। সবারই ভিতরে এই সত্ত্ব, রজো ও তমো ঢুকে বসে আছে, আর প্রকাশ দিয়ে যাচ্ছে। যখনই আমরা কোন মানুষের, কোন বস্তুর গুণের কথা বলি, দুর্গুণের কথা বলি, আসলে আমরা তখন এই তিনটে গুণ ওই শরীরের মাধ্যমে কেমন প্রকাশ পাচ্ছে, তার কথা বলছি।

আমরা সবাই শুদ্ধ আত্মা, আমাদের কোন গুণ নেই, আমাদের আধার করে এই তিনটে গুণ খেলা করে যাচ্ছে। করোনার সময় কোথাও যদি মানব শরীর না থাকত, তাহলে করোনা ভাইরাসের কি হত? সব ভাইরাস সেখানেই মরে যেত। এই রকম অনেক কিছু আছে, যারা শরীর যদি না পায় তারা শেষ হয়ে যাবে। সত্ত্ব, রজো ও তমো শরীর যদি না পায়, শেষ। একজন মুক্তি পেয়ে গেলে আরও অনেক শরীর থেকেই যাবে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শরীর থেকেই যাবে। আমাদের হাসি সত্ত্বগুণের প্রকাশ, আমাদের ক্রোধ রজোগুণের প্রকাশ, আমাদের কান্না তমোগুণের প্রকাশ।

রিচার্ড ডকিন্স, একজন বৈজ্ঞানিক, তিনি The Selfish Gene নামে একটা বই লিখলেন, তারপর থেকে লিখেই যাচ্ছেন। তিনি বলছেন, আমাদের ডিএনএ গুলো আমাদের শরীরগুলো ব্যবহার করে নিজের স্বপ্রকাশের জন্য। তোমরা তো ডিএনএ এর কথা বলছ, আমরা ডিএনএ-এর ডিএনএকে জানি। ডিএনএর ডিএনএ কি? সত্ত্ব, রজো ও তমো। সত্ত্ব, রজো ও তমো শুধু শরীরকেই ব্যবহার করে না, এরা ডিএনএকেও ব্যবহার করে, জীনকেও ব্যবহার করে নিজের খেলা দেখাবার জন্য। এটাকেই ঠাকুর বলছেন, লাগ ভেল্কি লাগ। কারুর ভিতর প্রচুর রাগ, একটুতেই রেগে যায়, রাগ তমোগুণ থেকেও হয়, রজোগুণ থেকেও হয়। একজন কুঁড়ে মানুষকে দেখলে বুঝতে হবে, এর মধ্যে তমোগুণ খুব প্রকাশ পাচ্ছে। আমাদের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন, সত্ত্বগুণের প্রকাশ, সত্ত্বগুণ

টগবগ করছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সত্ত্বগুণের প্রকাশ, সত্ত্বগুণ না থাকলে ওই রকম কবিতা বেরোতই না। তমোগুণী, রজোগুণী লেখকের থেকে ওই ধরণের উচ্চমানের লেখা কখনই বেরোবে না। সাহিত্যিকের লেখা দেখলেই বোঝা যায়, কে সত্ত্বগুণী লেখক, কে রজোগুণী লেখক আর কে তমোগুণী লেখক। লেখা পড়লে বোঝা যায় এনার মনটা কেমন। মনটা কেমন মানে, কোন গুণ খেলা করছে, কিভাবে খেলা করছে। এই তিনটে গুণ আবার সব সময় একসাথে থাকবে। কারুর মধ্যে শুধু সত্ত্বগুণ বা শুধু রজোগুণ বা শুধু তমোগুণ থাকবে না; তিনটে গুণই কমবেশি থাকবে, আর থাকবে একসাথে।

পূর্বপক্ষ এবার প্রশ্ন করছে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তুমি বড় বড় কথা বললে, দেহী কখন লিপ্ত হয় না, তাহলে এখন আবার কোথা থেকে বন্ধন এসে গেল। তার উত্তরে আচার্য বলছেন, বললাম তো 'ইব', মনে হয় যেন বেঁধেছে, আসলে বাঁধে না। আমি, আপনি, আমরা সবাই যেন বন্ধনে আছি, আসলে কোন বন্ধন নেই। কি করে কোথা থেকে বন্ধন হবে? আমি শুদ্ধ আত্মা, কিন্তু আমার এই ব্যবহার, কার্য দেখে মনে হচ্ছে যেন বাঁধা হয়ে আছি, আসলে বাঁধা নেই। এখানে বলছেন, *মহাবাহো*, অর্জুনের আরেকটা নাম *মহাবাহো*, যার দুই বাহু জানু পর্যন্ত বিস্তৃত, শ্রীরামচন্দ্রেরও হাত এই রকম লম্বা ছিল, তাঁকেও মহাবাহো বলা হত, আজানুলম্বিতবাহু। বলা হয়ে থাকে যে, এনারা বিশেষ লোক হন। এবার প্রথম বন্ধনের কারণ বিশ্লেষণ করছেন –

তত্র সত্ত্বং নির্মলাত্বাৎ প্রকাশকমনায়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।।৬।।

(হে নিষ্পাপ, এই গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ স্ফটিকমণির ন্যায় নির্মল, স্বচ্ছ চৈতন্যপ্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হেতু নিরুপদ্রব ও প্রকাশক। এই সত্ত্বগুণ 'আমি সুখী' এই রকম সুখাসক্তি এবং 'আমি জ্ঞানী' এই প্রকার জ্ঞানাসক্তি দ্বারা আত্মাকে যেন আবদ্ধ করে।)

সুখ আর জ্ঞান এই দুটো দিয়ে সত্ত্বগুণ আত্মাকে বাঁধে। আমার জ্ঞানের প্রতি খুব স্পৃহা, আমি সুখে থাকতে চাইছি, সুখে থাকতে আমার ভাল লাগে, তার মানে সত্ত্বগুণ আমাকে বেঁধে রেখেছে। ঠাকুর কি কখন সুখে থাকতে চাইতেন? পুরো কথামৃতে কোথাও দেখা যাবে না যে, ঠাকুর একটু সুখে থাকতে চাইছেন। শুধু মা মা করছেন, এনারা ত্রিগুণাতীত। বলছেন, সত্ত্বগুণ *নিরুপদ্রবম্*, কোন উপদ্রব করে না। আর *নির্মলাত্বাৎ প্রকাশকমনায়ম্*, নির্মল, স্ফটিকের মত প্রকাশময় আর *অনায়ম্*, কোন উপদ্রব করে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও বন্ধন। যেন সোনার শিকল দিয়ে বাঁধা বা সুন্দর রেশম দিয়ে বেঁধে রেখেছে।

কিভাবে বাঁধে? সুখের আসক্তিতে। মহারাজ একটু আশীর্বাদ করুন, যাতে একটু ভাল থাকি। আসলে বন্ধন চাইছেন। আচার্য বলছেন, *অহম্ ইতি বিষয়ভূতস্য সুখস্য*, আমি সুখী, এই ভাবটাই হল বন্ধন। ফলে এই যে আত্মা, আত্মাকে সুখের সাথে বেঁধে দেয়। এটাই অবিদ্যা। বিদ্যাসাগর মহাশয় আর শ্রীরামকৃষ্ণ এই দুজনের মধ্যে কি তফাৎ? দেওঘর বিদ্যাপীঠে আমি যখন ক্লাশ ফাইভে পড়তাম, আমাদের বলা হল, তোমরা একটা করে বই এখান থেকে কিনতে পার। আমি তখন কিছু বুঝতাম না, জানতাম না। কিন্তু আমি জীবনে প্রথম বই নিজে থেকে কিনলাম হিন্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (হিন্দীতে 'বচনামৃত'। বইটা খুলেই প্রথমে বিদ্যাসাগরের নাম পেলাম। আমার প্রথম মাথায় এলো, ঠাকুর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উত্তর দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর তখন আমাদের কাছে বিরাট কিছু। বড় হবার পর এই জিনিসটাকে নিয়ে যখন ভাবতে শুরু করলাম – দুজনের মধ্যে তফাৎ কোথায়। অনেক দিন ধরে ভাবতে লাগলাম। তখন দেখছি, বিদ্যাসাগর সত্ত্বগুণে বাঁধা, অন্য দিকে ঠাকুর ত্রিগুণাতীত। যার জন্য যাঁরা গুণের প্রশংসা করেন, তাঁরা সব সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শ্রেষ্ঠ বলে মনে

করবেন। কিন্তু যাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য গুণের পারে যাওয়া, তাঁরা জানবেন ঠাকুর পুরো আলাদা জিনিস, দুজনের মধ্যে কোন তুলনাই হয় না।

বলছেন, বিষয়ের ধর্ম কখন বিষয়ীর ধর্ম হতে পারে না। সেইজন্য, এই যে ধর্মগুলোর কথা বলা হচ্ছে, এই ধর্মগুলো কক্ষণ আত্মার ধর্ম হতে পারে না। কারণ আত্মা সমস্ত গুণের পারে। এই যে সত্ত্বগুণের কথা বলা হচ্ছে, এগুলো আত্মার গুণ না। আত্মার উপর একটা অধ্যারোপ করে দেয়, যেখান থেকে সে মনে করে আমি সুখী। আর জ্ঞান হল সুখের সাথী, সুখী না হলে জ্ঞান হয় না। এই জ্ঞান ধর্মের জ্ঞান, তখনকার দিনে ধর্মের জ্ঞানটাই বেশি ছিল, জ্ঞানের সঙ্গে বেঁধে ফেলে। জ্ঞানের প্রতি যদি স্পৃহা থাকে, যেমন বিদ্যাসাগরের ছিল, সত্ত্বগুণ তাঁকে বেঁধে নেবে। ঠাকুর বলছেন, জ্ঞানীর (আত্মজ্ঞানী) একটা লক্ষণ হল, তার কাছে কোন বই থাকবে না। সে সমস্ত কিছু জেনে গেছে, আর তার জ্ঞানের প্রতি স্পৃহা থাকে না।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্।।৭।।

(হে কৌন্তেয়, রজোগুণ রাগাত্মক। রজো অপ্রাপ্তের অভিলাষ ও প্রাপ্ত বিষয়ে মনে প্রীতির উৎপাদক বলে জানবে। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলের নিমিত্ত কর্মে আসক্তি দ্বারা রজো আত্মাকে যেন আবদ্ধ করে, অর্থাৎ যেন 'আমি করি' –এই অভিমান দ্বারা কর্মে প্রবর্তিত করে।)

কোন বস্তুকে আমরা পেতে চাইছি, এটাকে বলে তৃষ্ণা। আর যে জিনিসটাকে পেয়ে আছি, সেটাকে ধরে রাখার যে ইচ্ছা, এটাকে বলে আসক্তি। আমাদের জীবন আসক্তি আর তৃষ্ণার মধ্যেই চলে –যেটা নেই সেটাকে পেতে চাই, যেটা আছে সেটাকে ধরে রাখতে চাই। এই তৃষ্ণা আর আসক্তি রজোগুণ থেকে আসে। সাদা কাপড়কে কোন রঙের মধ্যে চুবিয়ে দিলে কাপড় যেমন সেই রঙ ধরে নেয়, মন ঠিক সেইভাবে রঙ ধরে নেয়, আর আত্মা নিজেকে মনে করে আমি এই রকমই। এই রজোগুণ মানুষকে কর্মের প্রতি আসক্তির সাথে বেঁধে দেয়। আমি যখন ব্রহ্মচারী হলাম তখন বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট পূজ্যপাদ স্বামী সুহিতানন্দজী সেই সময় দেওঘর বিদ্যাপীঠের প্রিন্সিপাল ছিলেন। ওনাকে আমি বলতাম, মহারাজ, যত কাজ আছে আমাকে দিয়ে দিন। বয়স তখন কম, রজোগুণের একটা ডিপো নিয়ে ঘুরছি। আর উনি সবাইকে মজা করে বলতেন, এর ভিতরে এখন রজোগুণের তোড়। পরে তমোগুণ বেড়ে গেল, চুপচাপ পড়ে থাকতে ইচ্ছে হত।

কর্ম দৃষ্ট আর অদৃষ্ট ফল দেয়, কিছু ফল সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেয়, কিছু ফল পরে আসে। ঐটাতেই আসক্তি। ফলের ইচ্ছা যদি না থাকে মানুষ কাজ কেন করবে। আর-একটা হল, দায়ীত্ব বোধে মানুষ কাজ করে। ঠাকুরকে একজন বলছে, আমি কাজ ছাড়া থাকতে পারি না। ঠাকুর আবার নিন্দা করে বলছেন, কোন কাজ নেই, তাই দড়ি বানাচ্ছে, বলে, আমি কাজ ছাড়া থাকতে পারি না, আসলে আসক্তিই মানুষকে কাজ করায়, এই আসক্তি রজোগুণ থেকে আসে।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত।।৮।।

(হে ভারত, তমোগুণ আবরণশক্তিপ্রধান প্রকৃতির অংশ থেকে উৎপন্ন এবং দেহধারিগণের মোহজনক (হিতাহিত-বিবেকের প্রতিবন্ধক) জানবে। তমোগুণ প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা আত্মাকে দেহে যেন বদ্ধ করে, নির্বিকার আত্মাকে যেন বিকারপ্রাপ্ত করে।)

তমোগুণ কিভাবে বাঁধে? জীবের যে অন্তঃকরণ, সেই অন্তঃকরণে মনের মধ্যে মোহ, অবিবেক তৈরী করে দেয়। তার সাথে তমোগুণ জীবের মধ্যে প্রমাদ তৈরী করে। *প্রমাদ* হল, কেয়ারলেসনেস, কাজ করছে কিন্তু কাজের প্রতি কোন যত্ন নেই, নিষ্ঠা নেই। বিছানার চাদর পাতছে, তারে কাপড়

মেলছে, টান টান আর সমান ভাবে যে চাদরটা পাততে হবে সেদিকে কোন হুঁশ নেই, প্রচণ্ড কেয়ারলেসনেস। আমাদের মনে আছে, যখন কম বয়স ছিল, এই ধরণের অগোছাল, অবিন্যস্ত কাজ দেখলে সিনিয়র মহারাজরা তখন কি প্রচণ্ড রেগে যেতেন। বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারীদের দু-বছর ট্রেনিংএ থাকতে হয়। তাদের বিভিন্ন ডিউটি দেওয়া হয়। ডিউটিতে কোন কাজে ত্রুটি হলে বড়রা খুব রেগে যেতেন, প্রচুর বকতেন। এটা হল *প্রমাদ*।

আলস্য হল, হবে, পরে করা যাবে; সোজা কথা হল কুঁড়েমি। আর *নিদ্রা*; ঘুম থেকে উঠতেই ইচ্ছে করেন, বেশি সময় ধরে ঘুমনো। প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা, তার সাথে আরও যা যা আছে, এগুলো দিয়ে তমোগুণ বাঁধে। রজোগুণ কর্মে আসক্তি দিয়ে বাঁধে আর সত্ত্বগুণ সুখ আর জ্ঞান দিয়ে বাঁধে। সত্ত্বগুণ আর তমোগুণ এই দুটোকে বাইরে থেকে দেখলে অনেক মিল পাওয়া যাবে। আলস্য আর সুখ, দুটোকে মনে হয় একই জিনিস, কিন্তু তফাৎ আছে। সত্ত্বগুণী চাইলেই রজোগুণে নেমে যেতে পারে, যেটা তমোগুণী পারে না। ফলে অনেক সময় দেখা যায় আসলে লোকটি তমোগুণী, কিন্তু দেখায় সত্ত্বগুণীর মত। বেশির ভাগ ভক্তদের মধ্যে তমোগুণের প্রভাব। শুনতে হয়ত আমাদের খারাপ লাগবে, কিন্তু বেশির ভাগ ভক্তই তমোগুণী। জপ করতে বসলেই ঘুম পেয়ে যাবে, তারপর ঈশ্বরের নানান রূপ দর্শন হতে শুরু হবে। আসলে জপ করতে বসে ঘুমের মধ্যে ওগুলো দেখছে – সব তমোগুণের লক্ষণ।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত।।৯।।

(হে ভারত, সত্ত্বগুণ সাধ্য বিষয়ে ও রজোগুণ সাধ্য কর্মে জীবকে আবদ্ধ করে এবং তমোগুণ সত্ত্বকৃত বিবেককে আবৃত করে জীবকে প্রমাদ ও আলস্য প্রভৃতিতে নিমজ্জিত করে।)

একই জিনিস আরও একবার বলছেন, সত্ত্বগুণ সব সময় সুখের দিকে নিয়ে যায়, রজোগুণ কর্মের দিকে নিয়ে যায়। সত্ত্বগুণ যে বিবেকবিজ্ঞান তৈরী করে, তমোগুণ এটাকে আবৃত করে দিয়ে প্রমাদ আর আলস্যে নিমজ্জিত করে দেয়, তাকে দিয়ে আর কর্তব্য কর্ম করতে দেবে না। আজকের ভারতবর্ষে এটাই বিরাট বড় সমস্যা। কেউ নিজের কাজ করতে চাইছে না। সবাই চুরি, চামারি, ফাঁকিবাজি করে যাচ্ছে, এটাই তমোগুণের লক্ষণ। আগে তমোগুণের জন্য আলস্যে ছিল। এখন এরা একটা ডিগ্রি পেয়ে গেছে, ডিগ্রি পেয়ে একটা সরকারী বা বেসরকারী চাকরি পেয়ে গেছে বা ব্যক্তিগত ভাবে কিছু করতে শুরু করেছে। এরপর সেখান থেকে চুরি চামারি করতে শুরু করে দেয়, এটাই প্রমাদ। প্রমাদ মানে হল, কর্তব্য থেকে সরে যাওয়া। এরপরের শ্লোক থেকে বলবেন, এই তিনটে গুণ কিভাবে থাকে।

পরের শ্লোকে যাওয়ার আগে, এখানে শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কয়েকটা দরকারী কথা বলে নেওয়া দরকার। চতুর্দশ অধ্যায় গীতার অন্যান্য অধ্যায়ের তুলনায় সহজ। কিন্তু আমাদের জীবনে এই অধ্যায়টাই ঠিক ঠিক প্রয়োজন। বোঝা যায় এই মহুর্তে আমি কোন জায়গায় অবস্থিত। ষোড়শ আর সপ্তদশ অধ্যায় যেন এই অধ্যায়েরই বিস্তার। চতুর্দশ, ষোড়শ আর সপ্তদশ এই তিনটে অধ্যায় যেন মিলেমিশে আছে, মাঝখানে পঞ্চদশ অধ্যায় একটু অন্য রকম। আমরা যদি সব শাস্ত্রের কথা ভাল ভাবে বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে এই জিনিসটাও তখন ভাল করে বুঝতে পারব যে, সমস্ত শাস্ত্র একই কথা বলছে। সব শাস্ত্র একই কথা বলছে –এই জিনিসটাকে যেদিন আমরা বুঝতে পারব, সেদিন এটাও বুঝতে হবে যে, এবার যেন শাস্ত্রের কথা একটু ধারণা হচ্ছে।

মাণ্ডুক্য কারিকা বলছে সৃষ্টি নেই, আর গীতার যেখানে আমরা এখন আছি, সেখানে বলছেন সৃষ্টি ত্রিগুণাত্মিকা, রামায়ণে দেখছি ভগবান অবতার হয়ে রাবণকে বধ করতে যাচ্ছেন। আপাতদৃষ্টিতে কথাগুলো আলাদা মনে হলেও, আসলে এনারা সবাই একই কথা বলছেন। এক্ষুণি হয়ত আমরা

বুঝতে পারব না, কিন্তু যখন বুঝতে পারব তখন বুঝতে হবে এবার শাস্ত্র বোঝাটা শুরু হল, এবার ধর্মকে আমরা বুঝতে শুরু করলাম। রাজযোগে যে চিত্তবৃত্তি নিরোধের কথা বলছেন, সেখানেও একই কথা বলছেন। মাণ্ডুক্য কারিকাতে যখন বলছেন, সৃষ্টি নেই, অন্য দিকে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে যখন মা মহিষাসুরকে বধ করতে রণক্ষেত্রে হুঙ্কার দিয়ে নামছেন, একই কথা বলছেন। অন্যান্য ধর্মের লোকেদের এই জিনিসগুলিকে ধারণা করা একেবারেই সম্ভব না।

তিনটে গুণের কথা বলছিলেন – সত্ত্ব, রজো ও তমোগুণ। সত্ত্বগুণে বলছেন, জ্ঞান আর সুখের প্রতি স্পৃহা। রজোগুণ রঞ্জনাত্মক, একটা জিনিসের দিকে এগিয়ে যায়। আর তমোগুণ উলটে পড়ে থাকে। আমাদের জীবনে যে বন্ধন, আর ওই বন্ধনের জন্য জীবনে যে কত রকমের জঘন্য জঘন্য ঘটনা ঘটে, কল্পনাতীত। দৈনন্দীন জীবনে নোংরামো, মৃত্যুর পরেও নোংরামো। অহঙ্কারী মানুষে সমাজ একেবারে ভরে আছে, তাদের কিসের জন্য এত অহঙ্কার একটু ভেবেও দেখে না। আমাদের খুব নামকরা মহারাজ ছিলেন, শ্রীমৎ স্বামী স্বাহানন্দজী মহারাজ, গত হয়েছেন। তিনি কথা কথায় একবার বলেছিলেন, মুর্খের অহঙ্কার থেকে বিদ্বানের অহঙ্কার অনেক ভাল। তমোগুণীর যে অহঙ্কার, তার থেকে সত্ত্বগুণীর অহঙ্কার অনেক ভাল। কারুর যদি একটা বিদ্যার্জন হয়, তাতে যদি তার অহঙ্কার হয়, সেটা অনেক ভাল। কিন্তু কোন জ্ঞান নেই, বিদ্যা নেই, কর্মের কুশলতা নেই অথচ অহঙ্কারের ডিপো, চারিদিকে আজকে এদেরই রমরমা। ভারতবর্ষের আজ তাই এই দুরবস্থা, সবাই সবজান্তা। কোন শাস্ত্র পড়েনি, কোন বই পড়েনি, কিন্তু সবাই ধর্মের উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে।

আমাকে একজন লিখে পাঠালেন –যারা অজ্ঞানে আছে তাদের আপনি তাচ্ছিল্য করেন। আমি যদি কাউকে তাচ্ছিল্য করি তাহলে আমি শাস্ত্রের চর্চা করতে যাব কেন। যারা অজ্ঞানে আছে, তারা যখন উপদেশ দিতে আসে, তখন তাদের শিক্ষার জন্য দুটো কথা বলতে হয়, এটা কোন তাচ্ছিল্য না। একবার একজন আমার সাথে যোগাযোগ করার পর আজকাল যে চলতি বাবাজী, চলতি গুরুরা ইউটিউবে উপদেশ দিয়ে বেড়ায়, তাদের একজনের নাম করে আমাকে বলছে, 'আপনি এনার ভিডিওটা একবার দেখুন'। আমি জানিয়ে দিলাম, আমার সময় নেই। আমাকে তখন বলছে, 'নিজেকে এই রকম সঙ্কীর্ণ করে ফেলবেন না'। তাকে আমি কি আর বলব, এই হয়, কিছু পড়া নেই, বোঝা নেই, কয়েকজনের কটা ভিডিও দেখে সন্ন্যাসীকেই উপদেশ দিতে শুরু করেছে। এরাই তমোগুণী, ঘোর তমোগুণী। এদেরকে একটা ধাক্কা মারতে হয়। ধাক্কা মারার জন্যই একটা দুটো কড়া কথা বলতে হয়। আপনি জানতে এসেছেন, আপনাকে জানানো আমার কাজ। রজোগুণ বলবে, এটা আমি করেছি, একটু দেখবেন। এখানে এবার এই বর্ণনাটাই করছেন, সত্ত্ব, রজো ও তমো কি রকম, মৃত্যুর পর কি হয় আর এই তিনটে গুণের খেলা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কি।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা।।১০।।

(হে ভারত, সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করে প্রবল হয়। রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করে প্রবল হয়। আর তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করে প্রবল হয়।)

সত্ত্ব, রজো ও তমো, তিনজন একসঙ্গে থাকে এবং তিনটে মিলে এক। এমন একটা অবস্থার কথা কল্পনা করা যেতে পারে, যেখানে বরফও আছে, জলও আছে। যেমন ফ্রীজে জলও আছে, বরফও আছে। একটা বিশেষ অবস্থায় ট্রিপল পয়েন্টে তিনটে জিনিস এক সঙ্গে থাকে – জল, বরফ ও বাষ্প। তবে ফ্রীজে জল আর বরফ একসাথে আছে। ফ্রীজের ঠাণ্ডা যদি একটু বেড়ে যায় ওই জলটাও বরফ হয়ে যাবে, ঠাণ্ডা যদি একটু কমে যায়, বরফটা জল হয়ে যাবে। এখন ওটা জল হোক আর বরফ হোক, সবটা মিলে ওই এক গ্লাশ জলই থাকবে। আর ট্রিপল পয়েন্টে যদি যায়, সেখানেও

বাষ্প হোক, জল হোক আর বরফ হোক, সাম্ টোটাল ওই এক গ্লাশ জলই থাকবে। সত্ত্ব, রজো আর তমো যে কোন বস্তুতে সাম্ টোটাল সমান থাকে, ওটা কখন পাল্টায় না।

তার সাথে সব সময় এই তিনটে গুণ এক অপরকে সব সময় দাবানোর চেষ্টা করতে থাকে, এই ব্যাপারে এরা তিনজনই প্রচণ্ড ভাবে সক্রিয়। কুকুরের বাচ্চাগুলো যেমন খেলা করতে করতে এ ওর উপর চেপে যাচ্ছে, ও এর উপর চেপে যাচ্ছে। তিনটে গুণও সব সময় এক একের উপর চেপে যাচ্ছে। কুকুরদের মা পাশেই আছে, কিন্তু এদের কোন কিছুতে মা কুকুর হস্তক্ষেপ করে না, বাচ্চাগুলো সারাক্ষণ ক্যাঁ ক্যাঁ করে যাচ্ছে; সত্ত্ব, রজো আর তমোও সারাক্ষণ এই রকম ক্যাঁ ক্যাঁ করতে থাকে। এক অপরকে দাবায় আর তার সাথে এক অপরে পরিবর্তিত হতে থাকে।

যাঁরা নিজের জীবনকে ধন্য করতে চাইছেন, শ্রেষ্ঠ পদে উত্তীর্ণ হতে চাইছেন, এনাদের জন্য এই দশ নম্বর শ্লোক খুব জরুরী। আমাদের সবারই ভিতরে সত্ত্ব, রজো ও তমো তিনটে গুণই আছে, কোন গুণ বেশি থাকে, কোন গুণ কম থাকে। সবাই মনে করে আমার মধ্যে সত্ত্বগুণ বেশি। কিন্তু সাম্ টোটাল, সত্ত্ব, রজো, তমো তিনটে একত্রে সমান থাকে। তার মানে, কেউ যদি তমোগুণকে রজোগুণে পরিবর্তিত করে দেন, রজোগুণকে যদি সত্ত্বগুণে পরিবর্তিত করে দেন, তাহলে নূতন করে তাঁর তমোগুণ আসবে না। শুরুতে এক তৃতীয়াংশ করে হতে পারে, কিন্তু এখন অর্দ্ধেক বা চার ভাগের এক ভাগ হয়ে যেতে পারে। অর্দ্ধেক হল পঞ্চাশ ভাব সত্ত্ব আর বাকিটা রজো ও তমোগুণ হতে পারে বা পচাত্তর ভাগ সত্ত্বগুণ আর বাকি পঁচিশ ভাগ রজো ও তমো মিলে হয়ে যেতে পারে। সেখান থেকে কেউ যদি চেষ্টা করে, সাধনা করে, তাহলে তার নিরানব্বই ভাব সত্ত্বগুণ হয়ে যেতে পারে। নিরানব্বই ভাগ সত্ত্বগুণ হয়ে গেলে, এক শতাংশ রজোগুণ ও তমোগুণ থাকবে। এই পরিবর্তনটাই আমাদের সবার জীবনের উদ্দেশ্য।

আমার উদ্দেশ্য সব সময় থাকবে, কিভাবে আমি সত্ত্বগুণে যেতে পারি। সত্ত্বগুণে সরাসরি যাওয়া যায় না, রজোগুণ ছাড়া হয় না। তবে ভারতের বেশির ভাগ মানুষ তমোগুণী। স্বামীজী সেইজন্য গীতা ছেড়ে ফুটবল খেলতে বলেছিলেন, রজোগুণ বৃদ্ধি হলে তবে গিয়ে গীতা বুঝতে পারবে। আমরা সবাই তমোগুণী, মেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। আমার রোগ আছে মেনে নিলেই হল। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, যার রোগ হয়েছে সে মানতে চায় না যে আমার রোগ হয়েছে। আগেকার দিনে কুষ্ঠ, যক্ষ্মা হলে চেপে রাখত, কাউকে বলতে চাইত না। যদি বুঝে গেলাম আমার ভিতর তমোগুণ আছে, এবার কাজ, শুধু কাজ, প্রচুর কাজ করতে হবে তমোগুণকে কাটিয়ে রজোগুণে পৌঁছানর জন্য। স্বামীজী এই যে সেবার আদর্শ দিয়েছেন, সেখানে সেবাটা কখন উদ্দেশ্য না, উদ্দেশ্য হল মুক্তি। সেবা করলে রজোগুণ বাড়ে, সেবাকার্য মানুষকে তমোগুণ থেকে বার করে আনে। যদি কেউ মনে করে কাজ করলে সত্ত্বগুণ কমে যাবে, কমুক, কোন অসুবিধা নেই তাতে; কারণ এই কর্মই তাকে টেনে সত্ত্বগুণের দিকে নিয়ে যাবে। আর যারা বলে যাচ্ছে, ঠাকুর আছেন, ঠাকুর দেখবেন, এরা যে কত ঘোর তমোগুণী মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না।

উপনিষদে বলে, গাধা, ঘোড়া পশুরা যেমন মানুষের ভার বহন করে বেড়ায়, মানুষ ঠিক সেইভাবে দেবতাদের ভার বহন করে। আমাদের কাছে গাধা, ঘোড়া যেমন, দেবতাদের কাছে আমরা ঠিক সেই রকম। এই অবস্থা থেকে বেরোনর একমাত্র পথ হল, আগে তমোগুণ থেকে রজোগুণে আসা, তারপর রজোগুণ থেকে সত্ত্বগুণে উত্তীর্ণ হওয়া। স্বামীজী যে এত ভাষণ, ভাষণের পর ভাষণ দিয়ে গেলেন, এটা হল আমাদের রজোগুণ বাড়ানোর জন্য। ঠাকুরের সমস্ত কথা হল ত্রিগুণাতীত, এই অধ্যায়ে গীতা ত্রিগুণাতীতেরই কথা বলবেন। কিন্তু ধারণা করা সম্ভব না, ধারণা করার জন্য আগে আমাদের সত্ত্বগুণে পৌঁছাতে হবে। তার আগে যত গীতা আমরা শুনতে থাকি না কেন, কিছুই হবে না। কিভাবে আমরা বুঝতে পারব, শাস্ত্র শোনার জন্য কি আমি প্রস্তুত? যদি সত্ত্বগুণ বাড়ে তবে গিয়ে শাস্ত্র বুঝতে পারব, ততদিন আমরা বুঝতে পারব না। কিভাবে বুঝতে পারব?

সর্বদ্বারেষু দেহঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত।।১১।।

(যখন এই ভোগায়তন দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, তখন জানবে যে সত্ত্বগুণ বর্ধিত হয়েছে।) [প্রসাদ, লাঘব প্রভৃতি সত্ত্বগুণবৃদ্ধির চিহ্ন]

সত্ত্বগুণ বর্ধিত হয়েছে কিনা কিভাবে বোঝা যাবে? আমাদের যত ইন্দ্রিয় আছে, এই ইন্দ্রিয়গুলো আত্মার দ্বার, এই আত্মার দ্বারের আলোর প্রকাশ যদি বেড়ে যায়, বুঝতে হবে এর মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। যাদের বড় বাড়ি আছে, তার সাথে অর্থও আছে, সন্ধ্যার পর তাদের সমস্ত ঘরের আলোগুলো জ্বালানো থাকে। ঠাকুরও বলছেন, সন্ধ্যা হলে ঘরে আলো জ্বলতে থাকে। বড়লোকের বাড়িতে যেমন সব জায়গায় দীপ জ্বলতে থাকে, ঠিক তেমনি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিতে যদি দীপ জ্বলতে থাকে, অর্থাৎ জ্ঞানের আলো যদি জ্বলতে থাকে, বুঝতে হবে সেখানে সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। তার মানে আলোর প্রভাবে একবার নজর পড়তেই বুঝে গেলেন, জিনিসটা কি। একটু ঘ্রাণ নিলেন, বুঝে গেলেন কি হতে পারে। কানে একটা মাত্র শব্দ এলো, পুরো ব্যাপারটা বুঝে গেলেন। ঠাকুরও একজনের নামে বলছেন, সে এখন চটপট সব বুঝে নেয়। বুঝে নেওয়া মানে, ইন্দ্রিয়গুলি তার প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে। এরা সবাই হলেন সত্ত্বগুণী। যে সাধু প্রকৃতির, ভাল মানুষ, তার ইন্দ্রিয়গুলো প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ।

তাহলে অন্ধদের কি হবে? এখানে সেই ইন্দ্রিয়গুলির কথাই বলা হচ্ছে, যে ইন্দ্রিগুলি কাজ করে। যে অন্ধ, যে বোবা, তার বাকি যে ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করে, সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ে বলছেন। এখানে বলছেন, *সর্বদ্বারেষু*, এদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারটাই বন্ধ। যেমন ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন, তার চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারটা বন্ধ, সেটাকে নিয়ে আলোচনা করছেন না, যে দ্বারটা খোলা আছে সেটাকে নিয়ে বলছেন।

বোঝানর জন্য এখানে একটা গল্প বলা যেতে পারে, যে গল্প আমরা অনেকেই ছোটবেলা শুনে থাকব। খুব উচ্চমানের এক সাধুবাবা ছিলেন। তাঁকে সেখানকার রাজা নিমন্ত্রণ করেছেন রাজপ্রাসাদে অন্ন গ্রহণ করবার জন্য। অত উচ্চমানের একজন সাধু রাজার ঘরে এসেছেন। খুব রাজকীয় ভাবে নানান রকম ব্যঞ্জনাদি দিয়ে সুন্দর বাসমতি চালের অন্ন সাজিয়ে সাধুবাবাকে শ্রদ্ধা সহকারে ভোজন করার জন্য নিবেদন করেছেন। অন্ন মুখে তুলে সাধুবাবা নাক সিঁটকে বলছেন, ‘দুর্গন্ধ, খুব দুর্গন্ধ এই অন্ন খাওয়া যাবে না, অন্নের মধ্যে মড়া মানুষের দুর্গন্ধ’। এত দামী বাসমতি চালের অন্ন, তাও রাজার বাড়িতে, বলছেন মড়ার দুর্গন্ধ? রাজা তো খুব বিব্রত, সাধুবাবা বলে যাচ্ছেন, ‘আমি এই অন্ন খেতে পারব না, প্রচণ্ড দুর্গন্ধ’। রাজা খুব অপমানিত বোধ করলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে চালের খোঁজ নিতে আদেশ দিলেন। খোঁজ নিতেই জানা গেল, এই চাল যে ক্ষেত থেকে এসেছে, সেই ক্ষেতের পাশেই শ্মশান। শ্মশানের পাশের ক্ষেতে এই চালের চাষ হয়েছে, শ্মশানের মড়ার গন্ধ ওই চালে ঢুকেছে। সাধুবাবার ঘ্রাণ শক্তি এত প্রবল যে, চালের মধ্য থেকে তিনি মড়ার দুর্গন্ধ পাচ্ছেন।

আর ঠাকুরকে আমরা দেখছি, সমাধি অবস্থায় বিষয়াসক্ত কোন ব্যক্তি তাঁকে স্পর্শ করলে তাঁর মনে হত যেন শিঙ্গি মাছের কাঁটা মেরেছে। কোন দুশ্চরিত্র লোক ঠাকুরের জলের গ্লাশ স্পর্শ করেছে, তিনি জানেনও না কে ছুঁয়েছে, মুখে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ওয়াক্ থু করে ফেলে দিচ্ছেন। ইন্দ্রিয় কত তীক্ষ্ণ হলে গিয়ে বুঝতে পারছেন, কেমন লোক স্পর্শ করেছে। আমরা মনে করতে পারি, ঠাকুর অবতার ছিলেন বলে তাঁর এই ক্ষমতা ছিল; না, এই ক্ষমতা আমার, আপনার সবারই হতে পারে।

বেশির ভাগ মহারাজদের, যাঁদের আমি খুব শ্রদ্ধা সম্মান করেছি, কোন দিন কোন ভক্তের দেওয়া জিনিস তাঁরা খেতেন না, খুব বাছাই করা দু-একজন ভক্তের জিনিস কখন সখন গ্রহণ করতেন। আমি এমনও দেখেছি, খাওয়ার সময় মনে করেছেন আমাদের আশ্রমের তৈরী জিনিস, কিন্তু যখনই শুনলেন বাইরের কোন ভক্তের দেওয়া, সঙ্গে সঙ্গে বাইরে গিয়ে বমি করে দিয়েছেন। পবিত্রতা যখন একটা চরম অবস্থায় চলে যায়, ইন্দ্রিয়গুলি যখন খুব তীক্ষ্ণ হয়ে যায়, এক দৃষ্টিতে বুঝে নেবেন জিনিসটা কি, একটা কথা শুনলেই বুঝে নেবেন, কি বলতে চাইছে। তার মানে সত্ত্বগুনের বৃদ্ধি হলে শোনার ক্ষমতা, ঘ্রাণ নেওয়ার ক্ষমতা, আস্বাদ করে বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা এগুলো প্রচণ্ড বেড়ে যায়। আমাদের পরম্পরাতে এই ধরণের হাজার হাজার কাহিনী পাওয়া যাবে। সাধুবাবা খাওয়া-দাওয়া করেন না, নিম পাতার রস খেয়ে থাকেন; কিন্তু ভাল কিছু দিলে সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবেন এর মধ্যে কি কি আছে। এগুলো কাহিনী না, ঠাকুরের জীবনের আমরা সরাসরি দেখতে পাই। আর রজোগুণের যদি বৃদ্ধি হয় –

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ।।১২।।

(হে ভরতশ্রেষ্ঠ, লোভ, কর্মে প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টা, হর্ষ ও অনুরাগাদির অনিবৃত্তি এবং বিষয়ভোগের স্পৃহা – এইগুলি রজোগুণের বৃদ্ধিকালে উৎপন্ন হয়।)

লোভ যখন খুব বেড়ে যায়, অপরের কাছে এটা আছে আমারও সেটা চাই; আর প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি মানে সাংসারিক প্রচেষ্টা আর কর্ম, আমাকে অনেক কিছু করতে হবে, আমাকে এটা পেতে হবে, আমাকে এই করতে হবে; সব সময় এই চিন্তা করে যাচ্ছে তখন বুঝতে হবে তার মধ্যে রজোগুণের আধিক্য হয়েছে। *অশমঃ*, সব সময় মনটা চঞ্চল থাকে, চঞ্চলতা থেকে মন অশান্ত হয়ে ওঠে। ওকে শেষ করতে হবে, তাকে দমাতে হবে, এটা পেতে হবে, সেটা পেতে হবে; মনটা সব সময় চঞ্চল হয়ে ছটফট করছে, আর এতেই মন সব সময় অশান্ত হয়ে থাকে। রজোগুণ থেকে এই অশান্তির জন্ম। *ক্ষণে রুষ্টম্ ক্ষণে তুষ্টম্*, এই রেগে যাচ্ছে, এই খুশীতে ফেটে পড়ছে, রজোগুণের বৃদ্ধির প্রভাবে এই ভাবটা বেশি বেড়ে যায়। বলছেন, সাধারণ ভাবে সব কিছুতে রজোগুণীদের তৃষ্ণাটা খুব বেড়ে যায়, সব কিছুর প্রতি তৃষ্ণা। লোকেরা যখন ইনক্লাব জিন্দাবাদ করে, সেটা তাও তমোগুণের থেকে ভাল। বোঝা যায় ভিতরে রজোগুণ এসেছে, আমাকে ক্ষমতা পেতে হবে। কিন্তু সেখানেও এমন ক্ষীণ সুরে বলে যে, বোঝাই যায় যে ভিতরে দম নেই; ভিতরে একটু রজোগুণ আনুন। কিন্তু আমরা তো তা নই, আমাদের সব কিছু তমোগুণে আচ্ছাদিত।

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন।।১৩।।

(হে করুনন্দন, কর্তব্যাকর্তব্য বিবেকের অভাব, অনুদ্যম, কর্তব্যে অবহেলা ও মূঢ়তা প্রভৃতি লক্ষণ তমোগুণ বৃদ্ধি পেলে জন্মায়।)

অপ্রকাশঃ, তমোগুণের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে অবিবেকী, একটা জিনিসকে বারবার বুঝিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তমোগুণী কিছুতেই সেটা বুঝতে পারে না। তমোগুণীর লক্ষণ মন্দবুদ্ধি, যেটা বলব তার উল্টোটা বুঝবে। তমোগুণীর বুদ্ধি বলতে কিছুই থাকে না, যার ফলে কোনটা কর্তব্য কোনটা অকর্তব্য বুঝতেই পারেনা, এটাই প্রমাদ। অবিবেকী, প্রমাদ, মোহ এগুলো তমোগুণীর লক্ষণ। একবার এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি করে ফিরছিলাম। সবার সাথেই আমি টুকটাক কথা বলতে থাকি। আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে নামিয়ে আপনি আবার প্যাসেঞ্জার ধরতে ছুটবেন'? 'না, এখান থেকে আমি সোজা বাড়ি চলে যাব'। 'তারপরে'? 'আজকের মত ভাত-মাছের টাকা জুটে গেছে, আর কেন'। ওরা নাকি সারাদিন ক্যারাম খেলতে থাকে। দিনে একটা দুটো ট্রিপ মেরে

দিল, ব্যস। একটা গাড়ি নামাতে কত টাকা ইনভেস্ট করতে হয়েছে, দিনে অন্তত আট ঘন্টা কাজ করবে না! কাজ করার কি দরকার, যা আয় হয়ে যায় ওতেই যথেষ্ট, যা আছে তাতেই মানুষকে সন্তোষ থাকতে হয়, অত টাকার পিছনে দৌড়ে কি হবে। উলটে আমাকেই সে উপদেশ দিতে শুরু করেছে। এদের থেকে আমরা কি আশা করব!

তমোগুণীরা যে কাজই করুক না কেন, সব কাজেই প্রমাদ, পরিষ্কার কোন আইডিয়া নেই। আর সব কিছুতে অবিবেকী, আমার কে হিতৈষী, এতটুকু বোঝার ক্ষমাতাও এদের নেই, এতটাই তমোগুণ। তমোগুণীর বুদ্ধির অভাব, কোন কিছু বিচার করার ক্ষমতা তাদের থাকে না। ঠাকুর আছেন, ঠাকুর দেখবেন, এরা ঘোর তমোগুণী, কুঁড়েমিতে ভরা। কথাগুলো শুনতে খারাপ লাগবে ঠিকই, কিন্তু এটাই সত্য। এই তমোগুণ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, বেরিয়ে এসে উঠে দাঁড়াতে হবে। এই অধ্যায়টা আমাদের ওঠার জন্য বলছেন।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যান্তি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে।।১৪।।

(সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে মানুষ দেহত্যাগ করলে হিরণ্যগর্ভাদি উপাসকদের সুখময় ব্রহ্মলোকাদিতে গমন করে।)

তমোগুণ, রজোগুণের খেলা কি এই জীবনেই শেষ হয়ে যাবে? একেবারেই না, মৃত্যুর পরেও তিনটে গুণের খেলা চলতে থাকবে। সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত থেকে যদি কেউ দেহত্যাগ করেন, *তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে*, তাঁরা উচ্চতম লোকে যাবেন, দেবতাদের লোকে, বৈকুণ্ঠধামে গিয়ে উচ্চ যোনিতে জন্ম নেবেন। আর যারা এই আশায় বসে আছে যে, ঠাকুর এসে শেষ সময়ে নিয়ে যাবেন। নিয়ে যাবেন ঠিকই, কিন্তু নিয়ে কোথায় রাখবেন কেউ জানে না। কারণ সবটাই তো ওনার, স্বর্গটাও ঠাকুরের, নরকটাও ঠাকুরের। বলছেন, প্রকৃতিলীন পুরুষরা, শ্রেষ্ঠ যোগীরা যেখানে যান, মৃত্যুর আগে সত্ত্বগুণ যাঁদের অনেক বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, তাঁরা সেখানেই যাবেন।

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে।।১৫।।

(রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে কর্মভূমি মনুষ্যলোকে জন্ম হয় এবং তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে পশ্বাদি মূঢ়জন্ম প্রাপ্ত হয়।)

মৃত্যুর আগে পর্যন্ত রজোগুণ যদি বেড়ে থাকে তাহলে কর্মের আধিক্য যে জায়গাতে আছে, সেখানে গিয়ে জন্ম নেবে। আমেরিকা, ইউরোপ, যেখানে সব মানুষ সারাদিন দৌড়াচ্ছে, ওই রকম জায়গাতে গিয়েই জন্ম নিয়ে দৌড়াতে থাকবে। কোথায় দৌড়াচ্ছে জানে না, কি পাবে জানে না, কিন্তু দৌড়াচ্ছে। আর তমোগুণ যদি বৃদ্ধি হয়, তাহলে হয় তাকে পশু যোনিতে জন্ম নিতে হবে, আর তা নাহলে পশুর মত হয়ে মনুষ্য যোনিতে জন্ম নেবে।

দুই কাঠুরিয়া জঙ্গলে কাঠ কাটতে গেছে। একজন কাঠুরে কাঠ কেটেই যাচ্ছে, আর-একজন কাঠুরে গাছের নীচে ছায়ায় আরাম করে শুয়ে আছে। যে কাঠুরে কাঠ কেটে যাচ্ছে, সে তাকে বলছে, 'ভাই একটু পরিশ্রম কর, শুয়ে থাকলে চলবে'! এই কাঠুরে জিজ্ঞেস করছে, 'খেটে কি হবে'? 'না, আরও কাঠ কাটবে'। 'তাতে কি হবে'? 'না, শহরে গিয়ে কাঠ বিক্রি করতে পারবে'। 'বিক্রি করে কি হবে'? 'কেন, টাকা হলে তখন একটা কাঠের ঠেলগাড়ি কিনতে পারবে, তখন আরও কাঠ বাজার বিক্রি করতে নিয়ে যেতে পারবে'। 'এত করে কি হবে'? 'না, একটা বিরাট বাড়ি হবে, অনেক টাকা হবে'। 'তারপর কি হবে'? 'তখন আরামসে শুয়ে বসে দিন কাটাতে পারবে'। 'এখন আমি তো তাই করছি, কি সুন্দর শুয়ে শুয়ে আরাম করছি'। দুটোতে তফাৎ আছে। এটা ঘোর তমোগুণের লক্ষণ। আরেকটা হল, রজোগুণের মাঝখানে পৌঁছে একটা স্থিতি পাচ্ছে।

ভল্টায়ার খুব নামকরা ফরাসী দার্শনিক এবং লেখক। বলে যে, ফরাসী বিপ্লবে রুশোর অবদান ছিল, কিন্তু পিছনে ছিলেন একমাত্র ভল্টায়ার। ভল্টায়ারের এক একটা লেখা যেন আগুন। The Learned Brahmin তাঁর লেখা একটা খুব সুন্দর গল্প। একজন ফরাসী লোক ভারতে একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণের বাড়িতে অতিথি হয়ে এসেছেন। সেই ফরাসী ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করছেন, 'তোমার এত পড়াশোনা, কিন্তু জীবনে তোমার শান্তি আছে'? ব্রাহ্মণ বলছেন, 'না, জীবনে আমার একটুও শান্তি নেই'। অন্য দিকে ফরাসী ভদ্রলোক দেখছেন, এক বৃদ্ধা মহিলা রোজ সকালে পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে এসে প্রণাম করে যায়। ভল্টায়ার প্যারিসে বসে ভারতের চরিত্র জানতেন, একেই বলে পাণ্ডিত্য। ফরাসী ভদ্রলোক সেই বৃদ্ধা মহিলাকে জিজ্ঞেস করছেন, 'বুড়ি মা, তোমার জীবনে কি শান্তি আছে'? 'হ্যাঁ বাবা, আমি খুব শান্তিতে আছি'। 'কি করে তোমার শান্তি হল'? 'এই তো, রোজ সকালবেলা একটু গঙ্গাজল খাই, তুলসী পাতা খাই, আর এই ব্রাহ্মণ দেবতাকে রোজ প্রণাম করি'। ভদ্রলোক এসে পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে বলছেন, 'তোমার মনে হয় না কি, ওই বৃদ্ধা মহিলা তোমার থেকে বেশি শান্তিতে আছে'? 'হ্যাঁ, আমিও মনে করি সে আমার থেকে অনেক বেশি শান্তিতে আছে, ওকে দেখে আমার হিংসাও হয়। কিন্তু কোন পরিস্থিতিতে আমি ওর মত হতে চাই না, সে একটা পাথর, জীবনটা তার স্থবির হয়ে গেছে'। ভল্টায়ার লিখছেন, ফরাসী ভদ্রলোক পণ্ডিতকে বলছেন, 'আমি তোমার সাথে এক মত'।

ঘোর তমোগুণ এটা। আমরা এটা চিরদিন জানি। জীবনে যদি কোন উদ্দেশ্য না থাকে তাহলে এই সব উপাচার হল অর্থহীন, উপহাসের পদবাচ্য। স্বামীজী রীতিমত গালাগাল দিচ্ছেন, ভারতের ধর্ম রান্নাঘরে ঢুকে গেছে, ঘটি বাটিকে ছুঁলে কে অপবিত্র হল, এই বিচার করতে করতেই তোমার সারাটা জীবন চলে গেল। গুডউইন তাঁর মাকে চিঠিতে লিখছেন, 'এই ভারতবাসীরা কোন দিন পাল্টাবে না, স্বামীজীর লেকচার শুনে জোর হাততালি দেয় আর বাড়ি ফিরে সেই একই জিনিস করে'। মৃত্যুর পর এরা পশু যোনিতে জন্ম নেবে আর তা নাহলে পশুর স্বভাব নিয়ে মানুষ যোনিতে জন্ম নেবে, এই ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত, এটা গীতার কথা, ভগবানের কথা।

ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান অসুর যোনি আর দৈব যোনির কথা বলবেন। আমাদের একজন মহারাজ মজা করে বলতেন, মহারাজরা এমনিতেই খুব হিউমারাস হন, বলছেন, 'জানো ভায়া, আমার চরিত্রের বর্ণনা গীতায় আছে?' 'আপনার কথা কি করে গীতায় এসেছে?' 'কেন, ষোড়শ অধ্যায় পড়োনি, ওখানে অসুরদের যে বর্ণনা আছে, আমার সাথে সব মিলে যাবে।' মজা করে বলছেন। সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, তমোগুণের আলোচনা করতে গিয়ে এই অধ্যায়ে আমাদের সবার বর্ণনা করছেন, আমাদের ভবিষ্যতের বর্ণনা পর্যন্ত বলা আছে, মৃত্যর পর কে কোথায় যাবো সেটাও বলা আছে। এখনই ঠিক করে নিতে হবে আমি কোথায় যেতে চাই।

কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্।।১৬।।

(শিষ্টগণ বলেন –সাত্ত্বিক কর্মের ফল নির্মল সুখ, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ ও তামসিক কর্মের ফল মূঢ়তা [–পশু প্রভৃতি জন্মে দৃশ্যমান অজ্ঞান]।)

সত্ত্বগুণের ধাক্কা পেয়ে মানুষ যে কাজ করে, সে কাজের ফল সব সময় সাত্ত্বিক হয়, নির্মল হয়। জ্ঞানের প্রতি স্পৃহার জন্য সত্ত্বগুণ তাকে জ্ঞান দেবে আর সুখ দেবে। রজোগুণ থেকে যে কাজ হয়, তাতে তার দুঃখ আসবে। জীবনে কি কেউ দুঃখ পান? কোন কিছু করে কি দুঃখ পান? আমাদের কাছে অনেক ইয়ং ছেলেমেয়েরা আসে, এসে ন্যাকা ন্যাকা কথা বলবে, 'মহারাজ ভালবাসাটাই দুঃখ, কাউকে ভালবাসতে নেই'। একটা চড় লাগালে সব ভালবাসা বেরিয়ে যাবে। নিজেকে ছাড়া জীবনে কাউকে তোমরা ভালবেসেছ? সব ঘোর স্বার্থপর। কিন্তু জীবনে যদি কেউ দুঃখ

পেয়ে থাকে, সবাই বলবে কাউকে ভালবাসতে নেই। নিজের সন্তানকে নিয়েও বলবে, এই সন্তানকে সারা জীবনে ভালবেসে শেষে এই পেলাম? দুঃখ যদি জীবনে পেয়ে থাকে, তার মানে ভিতরটা রজোগুণে ভরা। যেখানে দুঃখ, সেখানেই রজোগুণ অবধারিত ভাবে পিছনে লেগে আছে।

ভালই তো হল, দুঃখ এসেছে, একটা ধাক্কা মেরেছে, এবার একটু ছাড়ুন, ছেড়ে সত্ত্বগুণের যাবার জন্য চেষ্টা লাগান। কিন্তু এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা, তবুও আমাদের চেতনা হয় না। একবার জাগুন, উঠে দাঁড়ান। স্বামীজী বারবার বলছেন, তুমি ভেড়া নও, তুমি সিংহ। প্যান প্যান না করে হুঙ্কার দাও। সত্ত্বগুণের কর্মের ফল নির্মল, জ্ঞান আর সুখ। রজোগুণের কর্মের ফল দুঃখ।

আর *অজ্ঞানং তমসঃ ফলম্*, তমোগুণের প্রেরণায় যে কর্ম করে, সেই কর্মই আরও অজ্ঞানের দিকে তাকে নিয়ে যায়। এটাও বলা হয় যে, যত পাপকর্ম হয়, সব তমোগুণ থেকেই প্রেরিত। এটাই অজ্ঞান, নিজের স্বরূপটাই ভুলে যায়। এরা নিচ থেকে আরও নিচে নেমে যায়। তমোগুণীর জীবনে শুধু দুঃখই দুঃখ।

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোহজ্ঞানমেব চ।।১৭।।

(রজো ও তমোগুণকে অভিভূত করবার পর সত্ত্বগুণ থেকে সকল ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান জন্মে। সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভবের পর রজোগুণ থেকে লোভপ্রবৃত্ত্যাদি জাত হয়। আর তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোকে অভিভূত করলে সেখান থেকে অবিবেক, অনবধানতা ও মূঢ়তা উৎপন্ন হয়।)

একই কথা আবার ঘুরিয়ে কোন গুণের বৃদ্ধিতে কি বৃদ্ধি পায় বলছেন। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে জ্ঞান বাড়ে, রজোগুণের বৃদ্ধিতে লোভ বাড়ে আর তমোগুণের বৃদ্ধিতে প্রমাদ, মোহ আর অজ্ঞানের দিকে আরও বেশি করে নিয়ে যায়। একজন নেতা প্রায়ই আমার কাছে এসে হিন্দু ধর্ম নিয়ে আমাকে অনেক কথা বলেন। আমার সাথে অনেক দিনের পরিচয়। আমি বললাম, 'আপনি যে হিন্দু ধর্মকে নিয়ে এত কথা বলেন, ভাল মন্দ যাই বলুন, কিন্তু আগে বলুন তো হিন্দু ধর্মকে নিয়ে আপনি কোন কোন বই পড়েছেন'? 'তেমন কিছু পড়িনি।' 'আমার নিজের তিন তিনটে বই আছে হিন্দু ধর্মের উপর লেখা, একটা বই পড়েছেন?' বলছেন 'তবে বাংলাতে আপনার হিন্দু জীবনধর্ম যে বইটা আছে সেটা দু পাতা পড়েছি।' 'এর জোরে আপনি হিন্দু ধর্মকে নিয়ে এত কথা বলছেন, ভাল মন্দ যাই হোক তাতে কিছু আসে যায় না'। যিনি নিন্দা করছেন, তিনিও অজ্ঞানে আর যিনি প্রশংসা করছেন, তিনিও অজ্ঞানে। যিনি বলছেন, আমার ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সে ততটাই মুর্খ, যতটা মুর্খ যে ধর্মকে গালাগাল দেয়।

কেউ যখন গান্ধীজী, নেতাজীর মত কোন নেতাকে গালাগাল দিতে আসে বা প্রশংসা করতে আসে, সবাইকে আমি প্রথমেই জিজ্ঞেস করি, আপনি নেতাজী বা গান্ধীজীর উপর কি কি বই পড়েছেন? তখন বলবে, 'ওগুলো পড়া কিছু না, নেতাজী আমাদের বাঙ্গালীর গর্ব।' এগুলোই তমোগুণের লক্ষণ। আপনার জাতীর গর্ব বলছেন, দেশের গর্ব বলছে, আর একবার আপনি পড়ে দেখবেন না? যাকে ভালবাসেন, তাঁর কার্যকলাপ নিয়ে একটু পড়ে দেখবেন না? যাকে ভালবাসেন, তার ব্যাপারে দুটো কথা জানতে ইচ্ছে হবে না?' সব আহাম্মকের দল।

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ।।১৮।।

(সত্ত্বগুণে অবস্থিত (শাস্ত্রীয় উপাসনা ও কর্মে নিরত) ব্যক্তিগণ দেবলোকাদিতে গমন করেন, রজোগুণী (লোভাদিবশতঃ কাম্য-নিষিদ্ধাদি কর্মে নিযুক্ত) ব্যক্তিগণ দুঃখবহুল মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন এবং জঘন্যগুণবৃত্তিতে (নিদ্রা-আলস্যাদিতে) স্থিত তামসিক ব্যক্তিগণ পশ্বাদি হীন জন্মলাভ করে।)

আবার বলছেন মৃত্যুর পর কোন গুণের অধিকারী মানুষ কোন লোকে যান। যাঁরা সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত মৃত্যুর পর তাঁরা দেবলোকাদিতে যান। রজোগুণের যাঁরা তাঁরা মনুষ্যযোনির মধ্যেই বিচরণ করেন। আর *জঘন্যগুণবৃত্তস্থা*, যারা তমোগুণের মত জঘন্য গুণে প্রতিষ্ঠিত, এরা *অধো গচ্ছন্তি*, একেবারে অধো থেকে অধোতম অবস্থায় এদের গতি হয়।

ভবিষ্যৎ আপনার হাতে, এখনই যদি না জেগে ওঠেন, তাহলে নিজের ভবিষ্যৎটা বুঝে নিন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন। ভবিষ্যত কেমন হবে আগে থেকেই বোঝা যায়, মানুষের ভবিষ্যৎ জানার জন্য হাত দেখাতে হয় না, কপাল দেখাতে হয় না, নিজের ভিতরের চিন্তা-ভাবনা আর বাইরের কার্যাবলী দেখলেই বোঝা যায় ভবিষ্যতে সে কোথায় যাবে, আগে থেকেই সব জানা যায়।

এর আগের অধ্যায়ে যেখানে বলছেন, *পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্*, সেখানে বর্ণনা করা হল পুরুষ কিভাবে ভোগ করে। আত্মা এই সব কিছুর পারে, এ-সবের সাথে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু প্রকৃতির এই সত্ত্বগুণের খেলা, রজোগুণের খেলা, তমোগুণের খেলা দেখতে দেখতে পুরুষ বা আত্মা মুগ্ধ হয়ে, প্রকৃতির মতই আত্মার সব কিছু হয়ে যায়। আর সেখান থেকেই তার জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্না, পাপ-পূণ্য, ধর্ম-অধর্মাদি সব চলতে থাকে, সেখান থেকে তার শুভ যোনি, অশুভ যোনিতে শরীর ধারণের খেলা চলছে। এই রকমই কি চিরদিন চলতে থাকবে? তাহলে উপায় কি? আমাদের এক মহারাজ ছিলেন, আমার থেকে বয়সে বড়, কিছু দিন আগে গত হয়েছেন। আমাকে খুব স্নেহ করতেন, আমাকে দেখলেই বলতেন, 'কি দাদা, ভিতরের এই ভিডিওটা কবে বন্ধ হবে? এই ভিডিওটা কি চলতেই থাকবে, নাকি থামার কোন উপায় আছে?' স্বর্গের বর্ণনা করা, নরকের বর্ণনা করা গীতার উদ্দেশ্য না, গীতার উদ্দেশ্য মোক্ষ, জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি। কিভাবে এগুলোর পারে আমাদের নিয়ে যাবে?

নান্যং গুণেভ্য কর্তারং যদা দ্রষ্টাহনুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোহধিগচ্ছতি।।১৯।।

(যখন জীব কার্য-কারণ-বিষয়াকারে পরিণত ত্রিগুণ ব্যতীত অন্য কাউকেও কর্তা বলে দেখেন না এবং ত্রিগুণের অতীত ও তাদের কার্যসমূহের সাক্ষী আত্মাকে জ্ঞাত হন, তখন তিনি ব্রহ্মস্বরূপ অধিগত হন।)

গীতা আবার নিজের স্বরূপে চলে এলেন। ঠাকুরও বলছেন, গীতা মোক্ষশাস্ত্র। এই শ্লোকে ভগবান পরিষ্কার বলছেন – যিনি সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান, তিনি তখন পরিষ্কার বুঝতে পারেন, এই যে তিনটে গুণ, সত্ত্ব, রজো ও তমো, এই তিনটে গুণ এক উপরের উপর চেপে বসছে, এগুলো এভাবেই খেলা করে যাচ্ছে আর এটাই কার্য, এটাই ফল, এটাই কারণ; তার সাথে বস্তু, যেটার উপর কাজ করছে, বিষয়; সবটাই সমান। আমার একটা খাবার খেতে ভাল লাগে, তার মানে জিহ্বা ওই খাবারটা আস্বাদ করতে চাইছে, কিন্তু এই জিহ্বাটাও সত্ত্ব, রজো, তমোর একটা খেলা। তার সাথে খাবারটাও সত্ত্ব, রজো ও তমোগুণের খেলা। আমার খাওয়ার ইচ্ছা, এটাও সত্ত্ব, রজো ও তমো, আর ভাল লাগাটা, এটাও সত্ত্ব, রজো ও তমো। আমি কিন্তু এর মধ্যে কোথাও নেই। কিন্তু ভাল খাবার দেখলে জিভে জল চলে আসছে, আর ভাবছি কখন খাবারটা আমার কাছে আসবে। কিন্তু যিনি মুক্তির পথ বেছে নিয়েছেন, তিনি ভাল খাবার খেলেও মুগ্ধ হন না, মন্দ খাবার খেলেও মন খারাপ করেন না। কারণ তিনি জানেন, আমি এগুলোর কোন কিছুর মধ্যে নেই, সবটাতেই সত্ত্ব, রজো আর তমোগুণের খেলা।

আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন, তিনি সারা জীবন সাধনা করে গেছেন, কোন কাজকর্মে নিজেকে জড়াতে চাইতেন না। রামকৃষ্ণ মিশনে তাঁর খুব সম্মান ছিল। তিনি যখন যে সেন্টারে থাকতেন, সেখানে মাঝেসাজে ওখানকার অধ্যক্ষকে বলতেন, 'ওহে ভাই শোন, আমার না রজোগুণটা একটু বেড়েছে, তোমাদের এই ফাঁকা জমিটুকুতে আমি কিছু একটা চাষ করব'। রজোগুণকে বার

করার জন্য তিনি এইভাবে একটা কাজ তৈরী করে ওর মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে নিতেন। কখন ভুট্টার চাষ করতেন, কখন অন্যান্য সবজীর চাষ করতেন। তখন উনি মহারাজদের ডেকে বলতেন, 'আমি এই গাছগুলো লাগাচ্ছি আমার রজোগুণকে বার করার জন্য, আগামীকাল যদি তোমাদের এই জমিতে কিছু করার দরকার পড়ে গাছগুলো তুলে ফেল, এটা মনে করো না যে আমি লাগিয়েছি বলে তুলে ফেলা যাবে না।' তিনি বেশির ভাগ সময় ভুট্টা চাষ করতেন। চাষও হয়ে গেল, চাষের ফসল মঠের সবাই খেয়ে নিতেন। পরিষ্কার বুঝতে পারছেন, আমার রজোগুণ বাড়ছে, আমি কিন্তু এটা থেকে আলাদা, আমি ওর মধ্যে জড়াবো না।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি, তিনি জানেন গুণই সমস্ত কর্মের কর্তা, আমরা কর্তা না। সংসারে যা কিছু হচ্ছে, সবই সত্ত্ব, রজো আর তমোর খেলা। গুণ নিজের উপর খেলা করে যাচ্ছে। স্বামীজী দেববাণীতে খুব সুন্দর বলছেন, এই জগৎ হল play of puppys। কুকুরের বাচ্চাগুলো এই পরস্পরের মধ্যে ভালবেসে লাফালাফি করছে, এই পরস্পরের মধ্যে কামড়াকামড়ি করছে, ক্যাঁ ক্যাঁ করে যাচ্ছে। সত্ত্বগুণ, রজোগুণ আর তমোগুণ নিজেদের মধ্যে play of puppysএর মত দিনরাত কামড়া-কামড়ি করে যাচ্ছে। মাঝখান থেকে আমরা বোকার মত ওর মধ্যে জড়িয়ে গিয়ে অযথা কষ্ট পাই। ভগবান বলছেন, যখন দ্রষ্টার ভাব দৃঢ় হয়ে যায়, আমি সাক্ষী, আমি এগুলোর কোনটাই না, *মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি,* তখন সেই ব্যক্তি আমার ভাব পায়, আমার কাছে সে চলে আসে। কিভাবে এই ভাব পাবে?

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে।।২০।।

(দেহোৎপত্তির কারণ এই অবিদ্যাময় গুণত্রয় অতিক্রম করলে জীব জন্ম-মৃত্যু ও জরারূপ দুঃখ থেকে জীবনকালেই বিমুক্ত হন এবং ব্রহ্মানন্দস্বরূপ অমৃতত্ব লাভ করেন।)

দেহের যে জন্ম হয়, এর বীজ হল এই সত্ত্ব, রজো ও তমো। আমাদের কে জন্ম দিয়েছে? বাবা মা কি? না, সত্ত্ব, রজো ও তমো আমাদের জন্ম দিয়েছে। যদি বাবা মা জন্ম দিতেন, তাহলে তো আমরা বাবা মার সাথেই থাকতাম, কিন্তু সবাই তো তা থাকে না। একটি যদি ব্যতিক্রম হয়, তার মানে ওটা নিয়ম না। কোন মানুষকে তার বাবা মা জন্ম দেয় না, এই তিনটি গুণ সবাইকে জন্ম দেয়। যখন বুঝতে পারে এই মায়া উপাধির সত্ত্ব, রজো আর তমো গুণ আমাকে জন্ম দিয়েছে, তখন বলে, আমার আর লাগবে না, আমি চললাম। কাকের বাসায় বড় হয়ে কোকিল যখন বুঝে যায় আমি এখানকার না, আমি চললাম। কা কা করে কাকগুলো ধাওয়া করবে, যত ইচ্ছা করুক।

ভগবান বলছেন, তখন এই অবস্থায় সে তার জীবদ্দশাতেই সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে চলে যায়, তখন জন্ম, মৃত্যু, বার্ধক্য, দুঃখ, কোনটাই তাকে ছুঁতে পারে না। জন্ম, মৃত্য, বার্ধক্য তো শরীরের, আমি তো শরীর নই। চতুর্দশ অধ্যায়ের এটাই বক্তব্য, জগতে যা কিছু আছে, সমস্ত এই সত্ত্ব, রজো আর তমোর খেলা, আমি এটা থেকে আলাদা। ভগবান বলছেন, আমার ভাব যদি কেউ পেতে চায়, তাহলে তাকে এই তিনটে গুণের বাইরে আসতে হবে। অজ্ঞানের পারে, আমি জয়ী হবো, এটারও পারে; প্রভু ভক্তি দাও, এরও পারে; জ্ঞানের যে সুখ, এটারও পারে; সবটাই এই তিনটে গুণে বাঁধা। অর্জুন শুনে ঘাবড়ে গেছেন, ভগবানের কাছে জানতে চাইছেন –

অর্জুন উবাচ
কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে।।২১।।

(অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন –হে ভগবান্, গুণাতীতের লক্ষণ কি, তাঁর আচরণ কিরূপ এবং কি উপায়ে তিনি গুণাতীত হন?)

এই তিনটে গুণ থেকে যিনি বেরিয়ে গেছেন, কি কি লক্ষণ দেখে তাঁকে চিনতে পারব যে তিনি তিনগুণের পারে চলে গেছেন? তাঁর আচরণ কেমন? দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞকে নিয়ে অর্জুন যে কথাগুলো বলেছিলেন, সেখানেও সেই একই কথা বলা হয়েছিল, এখানেও সেই একই কথা বলছেন।

হিন্দু ছাড়া যে কোন ধর্মের যে শাস্ত্র আছে, সেখানে ঈশ্বরকে, যেমন খ্রীশ্চান ধর্মে সমস্ত কিছুতে গড্, গড্কে একটাই ভাবের মধ্যে সব কিছুতে রাখা হয়েছে। হিন্দুদের এই রকম হয় না। শুধু গীতাতেই কত রকম ভাবে জিনিসটাকে নিয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যেকটা অধ্যায়ের ভাব আলাদা আলাদা। এই হল হিন্দু ধর্ম, এক বিশাল বটবৃক্ষ। এই বিশাল বটবৃক্ষের যে কোন একটা ডাল ধরে নিলেই হল, সেখানেই বাসা পেয়ে যাব। যত মন হতে পারে, সব মনের জন্য একটি করে ডাল আছে। অন্যান্য ধর্মে একটাই ডাল, ওই একটা ডালকেই সবাইকে ধরতে হবে, হিন্দু ধর্ম তা হয় না। এখানে এটাকে তিনটে গুণের মাধ্যমে বলছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শব্দটা ছিল স্থিতপ্রজ্ঞ, আর এখানে শব্দটা হল গুণাতীত, ব্যাপারটা একই। স্থিতপ্রজ্ঞের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল, যিনি কর্মযোগের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধি করে এগুলোর পারে চলে গেছেন। এখানেও একই জিনিস বলছেন, কিন্তু অন্য ভাবে অর্থাৎ তিনটে গুণের মাধ্যমে বলা হল।

উপনিষদের কথা, গীতার কথা, রামায়ণের কথা আর মহাভারতে যেখানে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের বর্ণনা করা হচ্ছে, সব জায়গায় একই কথা বলে যাচ্ছেন। পাণ্ডবদের বনবাস, যুধিষ্ঠিরের জুয়া খেলা, এগুলো তমো-রজোতে মিশে আছে। রজোগুণে বলছে আমি জয়ী হব, আর তমোগুণে আসছে প্রমাদ, বুদ্ধির উপর আবরণ পড়ে যাচ্ছে। আমাদের সবাইকে এই একই রকম অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে তিনটে গুণের পুরো জিনিসটাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়ে বলছেন, এগুলো থেকে বেরিয়ে এসো। কিন্তু অত সহজে বেরিয়ে আসা যায় না। বেরিয়ে আসার জন্য মহাভারতের যুদ্ধের মত যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়; জীবনে এই রকম যুদ্ধ হবে, যেখানে হাজারে হাজারে লাশ পড়বে। আমাদের সবারই ভিতরে মহাভারতের যুদ্ধ চলছে, কামনা-বাসনা যুদ্ধের দামামা বাজিয়েই চলেছে। মহাভারতের যুদ্ধে ভগবান যেভাবে অর্জুনের রথের সারথী হয়ে অর্জুনের রথকে যুদ্ধভূমিতে চালিত করে নিয়ে গেছেন, আজও ভগবান আমাদের হৃদয়ে সারথী হয়ে জীবনযুদ্ধে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এখানে ভগবান শাস্ত্র রূপে আমাদের নিয়ে চলেছেন। আমরা এই জীবন সংগ্রামে লিপ্ত, আজও একই মহাভারতের যুদ্ধ চলছে। ঠাকুর বলছেন, ভক্ত, ভাগবত ও ভগবান; শাস্ত্র রূপে তিনি সব সময় আমাদের সঙ্গে আছেন। ওঠো অর্জুন, তুমি বীর, তুমি ওঠো; বারবার অর্জুনকে বলে যাচ্ছেন। আমাকেও উঠতে বলছেন, উঠতে হবে, আপনজনদের বধ করতে বলছেন; থাক না, আপনজনদের মেরে কি লাভ! বেরোন যায় না, অত সহজ না।

শ্রীভগবানুবাচ
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি।।২২।।

(শ্রীভগবান্ বললেন –হে পাণ্ডব, গুণত্রয়ের কার্য –প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ আবির্ভূত হলে যিনি দ্বেষ করেন না এবং এই সব কিছুর নিবৃত্তিরও আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনিই গুণাতীত।)

কিভাবে বেরোন যাবে তার উপায় বলছেন। প্রথমে বলছেন, যাঁরা ত্রিগুণাতীত তাঁদের লক্ষণ কি। এই ধরণের মানুষ কোন কিছুকে দ্বেষ করেন না, কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না। *প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব*, সত্ত্বগুণের কার্য প্রকাশ, রজোগুণের কার্য প্রবৃত্তি আর তমোগুণের কার্য মোহ। *ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি*, যদি এই গুণগুলির কার্য এসে যায় তাতেও তাঁর কিছু এসে যায় না, চলে গেল তাতেও কিছু আসে যায় না। আগে যে মহারাজের কথা বলা হল, তিনি বলছেন, আমার মধ্যে রজোগুণ এসেছে, ঠিক আছে, এসেছে তো কি হয়েছে, কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, এসেছে ঠিক আছে,

আমি বার করে দিচ্ছি। কিংবা তমোগুণ একটু বেশি এসে গেছে, ঠিক আছে। সাধারণ মানুষরা হল *অযথার্থদর্শি*, ঠিক ঠিক জিনিসগুলিকে দেখতে পায় না বলে, হয় আকর্ষণ থাকে, নয়তো বিদ্বেষ থাকে। কিন্তু যিনি গুণাতীত তিনি এসবের পারে। তিনি সত্ত্বগুণকে চান না, লড়তে হবে জিততে হবে, এসবেও নেই আবার আজ থাক কাল হবে, এটাতেও নেই। কোন কিছুর প্রতি আকর্ষণ নেই, যেমন পরিস্থিতি আসছে সেই পরিস্থিতি অনুযায়ী সেটা করে দিলেন। তিনি পিছনের দিকেও তাকান না, সামনের দিকেও তাকান না।

আসলে সমস্যা যেটা হয় তা হল, এখন কার মধ্যে কি গুণ জেগেছে এটা আমরা কেউই বুঝতে পারব না, কারণ এটা স্বসংবেদ্য। স্বসংবেদ্য একটা টেকনিক্যাল শব্দ, যার মধ্যে যে গুণ জেগেছে সেই একমাত্র জানতে পারবে যে, আমার মধ্যে এই গুণের এখন আধিক্য চলছে, বাইরের কেউ জানতে পারবে না। নিজের কোন কিছুর প্রতি দ্বেষ আছে কিনা, কোন কিছুর প্রতি আকাঙ্খা আছে কিনা, তা একমাত্র সে নিজেই জানবে। আর তার মধ্যে যে নেই, সেটাও সে নিজেই জানবে। সেইজন্য আমরা নিজেকেই নিজেরা ভাল জানি। এর ফলে যে তমোগুণী সে বুম্ মেরে চুপচাপ বসে আছে, দেখে সবাই মনে করবে এ যেন বিরাট সত্ত্বগুণী লোক। কিন্তু আমাদের এখানে আলোচনা তাঁদের জন্যই করা হচ্ছে যাঁরা আধ্যাত্মিক পুরুষ বা ত্রিগুণাতীত হতে চাইছেন, তাই এখানে সাধারণ লোকেদের নিয়ে কোন কথা হচ্ছে না।

ত্রিগুণাতীত পুরুষ পরিষ্কার বুঝতে পারেন আমার এখন রজোগুণ জেগেছে বা তমোগুণ একটু ধাক্কা মারছে। সাধারণ মানুষ যারা তাদের কার ভেতরে কি বৃত্তি জেগেছে বাইরে থেকে কেউ জানতে বা বুঝতে পারবে না। সেইজন্য যার তমোগুণ জেগেছে সেটাকে সে সত্ত্বগুণ বলে চালিয়ে দিতে চাইবে, যখন রজোগুণ জেগেছে তখন সমাজের সেবা করে জাহির করবে আমি সমাজসেবক। সাধু নিজেকে সমাজসেবায়, দেশোদ্ধারে লাগিয়ে দিয়ে বলছে আমি মানুষের জন্য কাজ করতে চাই, কিন্তু যে কথাটা বলতে পারছে না, তা হল আমার মধ্যে কামনা-বাসনা জেগেছে, নাম-যশের ইচ্ছে জেগেছে, সেটা বলারও ক্ষমতা নেই, আর বাইরে থেকে দেখে কারুর বোঝারও ক্ষমতা নেই।

সত্যি কথা বলতে জগতে ত্রিগুণাতীতের সংখ্যা খুবই নগণ্য। এনারাই হলেন সত্যিকারের মহাপুরুষ। এখানে মহাপুরুষদের কথাই বলা হচ্ছে, তিনি বুঝতে পারেন আমার এই গুণটা জাগছে কিন্তু তাঁকে বাঁধতে পারবে না। আমাদের মধ্যে যখন যে গুণটা জাগবে সেই গুণ তার ধর্ম দিয়ে আমাকে বেঁধে ফেলবে। যেমন হস্টেলের ঘন্টা পড়লে প্রাক্তন ছাত্র জানে যে আমাকে এখন খাওয়ার ঘরে যেতে হবে, কিন্তু সে ইচ্ছে করলে হস্টেলের ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে গিয়ে হোটেলেও খেয়ে আসতে পারে, কিন্তু যে বর্তমান ছাত্র সে তা করতে পারবে না, তাকে খাওয়ার ঘরেই যেতে হবে। ত্রিগুণাতীতের আর কি লক্ষণ –

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে।।২৩।।

(উদাসীন ব্যক্তি যেমন কারুর পক্ষ অবলম্বন করেন না, সেইরূপ যিনি গুণকার্যের দ্বারা আত্মস্বরূপ দর্শনরূপ অবস্থা থেকে বিচ্যুত হন না এবং গুণসকল গুণে প্রবৃত্ত এরূপ জেনে কূটস্থ জ্ঞানেই অবিচলভাবে অবস্থান করেন ও আত্মস্বরূপে অবস্থিত থাকেন, তিনিই গুণাতীত।)

সব কিছুতে, ভাল মন্দ সবটাতেই তিনি উদাসীন। কারুর পক্ষ তিনি নেবেন না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে একই কথা বলা হয়েছিল, দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষের দিকেও একই কথা বলেছেন। একই জিনিসকে বারবার করে বলছেন। কিন্তু যে পথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, সেই পথগুলো পাল্টে যাচ্ছে। কারণ তাঁরা বুঝে গেছেন, গুণগুলি এক অপরের উপর খেলা করে যাচ্ছে।

আমরা বেশির ভাগ ছোটবেলায় গ্রামে বড় হয়েছি। তখনকার দিনে ভারত খুব গরীব ছিল, পাকা বাড়ি খুব কম দেখা যেত। মাঝে-সাঝে গ্রামের বাড়িতে আগুন লেগে যেত। আগুন লাগলেই আগে দৌড়ে গিয়ে খবর নিতাম যে, আমাদের বাড়িতে আগুন লাগেনি তো। যখন শুনলাম অন্য একজনের বাড়িতে আগুন লেগেছে, একটু শান্তি হত, যাক আমাদের জিনিসগুলো পুড়ে যায়নি। একবার সত্যি সত্যিই আমাদের বাড়িতে আগুন লেগেছিল। মাঠে খেলছিলাম, সেখানেই খবর পেলাম গ্রামের একজনের বাড়িতে আগুন লেগেছে, খেলে ফেলে দৌড়াচ্ছি দেখতে কার বাড়িতে আগুন লাগল। দূর থেকে দেখছি আমাদের বাড়ির দিক থেকেই আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে কাছে আসতেই দেখি, আরে এতো দেখছি আমাদের বাড়িটাই জ্বলছে। এটুকু সময়ের মধ্যে সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল।

যখন দেখে অপরের বাড়িতে আগুন লেগেছে, তখন আমরা নিশ্চিন্ত হই। এরপর পুরো গ্রামের সবাই মিলে আগুন নেভানোর জন্য নামবে, বালতি নিয়ে এসো, জল আনো, হাঁকডাক শুরু করবে। নিজের বাড়িতে যদি আগুন লেগে থাকে, সেখানেও আগুন নেভানোর জন্য সবাইকে নিয়ে ঝাঁপাবে, কিন্তু মনে মনে দুঃখটাও বোধ করতে থাকবে। ঠিক তেমনি, একবার যখন বুঝে গেলাম, গুণ গুণের উপর খেলা করছে, এটা আমার কিছু না, তখন সব করবে, কিন্তু কোন দুঃখ, কোন হতাশা, কিছুই থাকবে না। ব্রহ্মচারী অবস্থায় কোন কাজে গোলমাল হওয়াতে একবার বড় মহারাজ আমাকে ডেকে পাঠালেন, আমাকে খুব জোর ধমক দিতে শুরু করলেন। তারপর বুঝলেন, ওটা আমি করিনি, অন্য কেউ করেছে, আমিও সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আমি করিনি অমুকে করেছে। যেমনি বুঝে গেলাম, আমার গোলমাল না, ও এই ব্যাপার, ওরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে সব গোলমাল করছে তখন মন শান্ত হয়ে যাবে।

ঠিক তেমনি, যিনি গুণাতীত তিনি সব কিছুকে দেখতে থাকেন – এবার আমার রজোগুণ বেড়েছে, তার মানে আমার ইন্দ্রিয়গুলো এখন কাজ করবার জন্য নিশপিশ করবে, এবার আমার তমোগুণ বেড়েছে, আমার শরীর এখন ঘুমোতে চাইছে। গুণাতীত পুরুষরা এগুলো পরিষ্কার বুঝতে পারেন, কিন্তু তাঁকে কোন গুণই নাচাতে পারবে না। সাধুর কখনও ইচ্ছে হল তীর্থ করার, তিনি তখন বুঝতে পারেন যে আমার এখন রজোগুণ বেড়েছে, এটাকে মেটাবার জন্য তিনি কি করলেন? ঠিক আছে আমি পায়ে হেঁটে কাশী চললাম। একদিকে তীর্থ করাও হয়ে গেল অন্য দিকে রজোগুণ যেটা জেগেছিল সেটাও বেরিয়ে গেল, এবার তিনি শান্ত হয়ে অনেক দিন চুপচাপ কূটস্থ হয়ে অবিচলিত ভাবে মনকে আত্মস্বরূপে নিয়ে গিয়ে বসে যাবেন। এর ফলে কি হয়?

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।।২৪।।

(যিনি সুখে ও দুঃখে রাগদ্বেষশূন্য এবং আত্মস্বরূপে অবস্থিত, মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর ও সুবর্ণে যাঁর সমদৃষ্টি, যিনি প্রিয় ও অপ্রিয়ে তুল্যজ্ঞান, নিন্দা ও প্রশংসায় যাঁর সমবুদ্ধি, সেই ধীর ব্যক্তিই গুণাতীত।)

এই ভাবগুলিকে নিয়ে আগেও গীতা বলেছেন। *স্বস্থঃ* মানে আত্মস্বরূপে অবস্থিত থাকা। সুখ হোক দুঃখ হোক, সবেতেই তাঁর সমান ভাব আর সব সময় আত্মস্বরূপে অবস্থিত থাকেন। *স্বস্থঃ* মানে সব সময় তিনি প্রসন্ন চিত্ত। *সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ,* ঠাকুর বলছেন, টাকা মাটি, মাটি টাকা; কোন কিছুতে তাঁর লোভ নেই। *তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো,* প্রিয় অপ্রিয় কোন কিছুতেই তিনি মনকে বিচলিত হতে দেন না। *ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ,* তাঁর কেউ প্রশংসা করুক কি নিন্দা করুক, সব সময় তাঁর তুল্য জ্ঞান। এখানে সবটাই সাধকদের কথা বলা হচ্ছে, যিনি তিনটে গুণের পারে চলে গেছেন, এটা তাঁদের কথা। লক্ষ্য আমাদের এটাই।

অনুশীলন করলেই যে এই গুণগুলো আমাদের মধ্যে এসে যাবে, তা না। যতক্ষণ না আমরা এই আধ্যাত্মিক সত্যটা বুঝতে শুরু করছি –যাবতীয় যা কিছু হচ্ছে সব সত্ত্ব, রজো ও তমোগুণের খেলা, ততক্ষণ এই গুণগুলির উপস্থিতি বোঝা যাবে না। বোঝার পর সেখান থেকে একটা বৈরাগ্যের ভাব নিয়ে আসতে হয়, পরের ধাপে সাক্ষী চৈতন্য রূপে তিনটে গুণের খেলা দেখে যেতে হয়। লঙ্কাকাণ্ডের পর শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করছেন, তাঁকে দেখে রাবণের মা নিকষা ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। লক্ষণ শ্রীরামচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করছে, 'সব সন্তানরা মারা গেছে, তারপরেও এই বৃদ্ধার এখনো এতো বাঁচার ইচ্ছা?' শ্রীরামচন্দ্র বললেন, 'বৃদ্ধাকে ধরে নিয়ে আসা হোক।' নিকষাকে শ্রীরামের সামনে নিয়ে আসা হলে, তিনি জিজ্ঞেস করছেন, 'তুমি পালাচ্ছো কেন?' নিকষা বলছেন, 'হে রাম, এতদিন বেঁচেছিলাম বলে তোমার কত লীলা দেখলাম, বেঁচে থাকলে আরও কত তোমার লীলা দেখতে পারবো।' নিকষা সাক্ষী রূপে সব দেখে যাচ্ছেন। ত্রিগুণাতীত যিনি তিনিও সাক্ষী রূপে গুণত্রয়ের খেলা দেখে যাচ্ছেন।

মানাপমানয়োস্তুল্যোস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভাপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে।।২৫।।

(যিনি সম্মান ও অপমানে নির্বিকার, যিনি শত্রুপক্ষে নিগ্রহ ও মিত্রপক্ষে অনুগ্রহ করেন না, যিনি দৃষ্টাদৃষ্ট ফলার্থ সকল কর্ম ত্যাগ পূর্বক কেবলমাত্র দেহধারণোপযোগী কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি গুণাতীত বলে কথিত হন।)

এই ভাবগুলিও আগে আগে আলোচনা করা হয়েছে। ত্রিগুণাতীতের কাছে মান, অপমান সবই সমান আর বন্ধু হোক শত্রু হোক সবাই সমান। কারণ ত্রিগুণাতীতের শত্রু বলে কেউ নেই, তাঁর বন্ধু বলেও কেউ সেভাবে হয় না। তিনি সবারই শুধু ভাল করতে জানেন, আপন পর বলে তাঁর কেউ হয় না। আচার্য শঙ্কর এখানে বলছেন, তিনি আপন মনে উদাসীন, তিনি মনে করছেন আমার কাছে সবাই সমান। কিন্তু অপরে মনে করেন, উনি আমাকে ভালবাসেন, তিনি তাকে বেশি ভালবাসেন, ওকে কম ভালবাসেন। কথামৃতেই এই ধরণের মানুষের বর্ণনা আছে, একজন ঠাকুরকে বলছেন, 'আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি, শুধু নরেন নরেন করে যাচ্ছেন?' মানুষের এই স্বভাব থাকবে, কিন্তু ঠাকুরের কাছে সবাই সমান। নরেনকে তিনি বিশেষ কাজের জন্য সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে তাঁর পার্ষদ করে নিয়ে এসেছেন, পুরো আলাদা জিনিস।

আমাদের ভাল করে এটা জেনে রাখা দরকার, উচ্চমানের সাধুপুরুষদের কাছে সবাই সমান। কিন্তু আমাদের বেণিয়া বুদ্ধি বলে, আমরা আমাদের মত করে সবাইকে মাপি, ফলে আমরা মনে করি, উনি তাকে বেশি ভালবাসেন, ওকে কম ভালবাসেন; সেইজন্য তাঁর একজন বন্ধু হয়ে গেল, একজন শত্রু হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর কাছে সবাই সমান। যখন আমরা বলি, তিনি শত্রু, বন্ধু সবাইকে সমান দেখেন, আসলে তখন এটাই বলতে চাওয়া হচ্ছে যে, তাঁর কোন শত্রু নেই, সেই কারণে তাঁর কোন বন্ধুও নেই, বন্ধু হওয়ার কোন প্রশ্নই নেই।

সর্বরম্ভাপরিত্যাগী, তিনি নিজে থেকে কোন কাজ হাতে নেন না। এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে, এটা হল রজোগুণের লক্ষণ। তিনি *সর্বরম্ভাপরিত্যাগী*, নূতন করে কোন কাজের উদ্যোগ নিতে হবে, এই ধরণের কোন পরিকল্পনা তাঁর মধ্যে থাকে না। আসলে এগুলো সব সন্ন্যাসীর লক্ষণ। তবে সবটাই স্বসংবেদ্য, নিজের ভিতরটা নিজেই জানে। ঠিক ঠিক সন্ন্যাসীর গুণ যাঁর মধ্যে আছে, একমাত্র তিনিই সেটা জানেন।

মাঞ্চ যোহব্যাভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।২৬।।

(যে নিষ্কাম কর্মী ঐকান্তিক ভক্তির সাথে সর্বান্তরযামী নারায়ণকে উপাসনা করেন, তিনি ত্রিগুণাতীত হয়ে ব্রহ্মত্বলাভে সমর্থ হন।)

সন্ন্যাসী হন আর কর্মযোগীই হন, কিন্তু যখন দেখেন সবারই ভিতরে সেই নারায়ণ রয়েছেন আর তার সাথে অব্যাভিচারিণী ভক্তি, যে ভক্তির কোন ব্যভিচার হয় না, তিনিই ত্রিগুণাতীত হয়ে যান। ঠাকুর কথামৃতে যে অব্যাভিচারিণীর কথা বলছেন, তার সাথে এটা একটু তফাৎ আছে। এখানে অর্থ হল, যে ভক্তির কখন কোন ওঠা নামা নেই, একমুখী ভক্তি। এখানে বলতে চাইছেন, যে ভাবটা ঈশ্বরীর প্রতি নেওয়া হয়েছে, সেই ভাবে একেবারে একশ ভাগ দৃঢ়। তখন তিনি মুক্তি লাভের যোগ্য হয়ে যান। কেন?

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ।।২৭।।

(কারণ, আমি (প্রত্যগাত্মা) অব্যয়, অমৃত, সনাতন, জ্ঞানযোগরূপ ধর্মপ্রাপ্য ও অব্যভিচারী সুখস্বরূপ ব্রহ্মের (পরমাত্মার) প্রতিষ্ঠা।)

(২য় ব্যাখ্যা –আমিই (নিরুপাধিক ব্রহ্মই) অমৃত, অব্যয়, সোপাধিক ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা এবং আমি জ্ঞাননিষ্ঠারূপ সনাতন ধর্মের স্বরূপ, সেইজন্য ঐকান্তি নিয়ত সুখেরও আশ্রয়।)

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহম্, ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা আমি। দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্ঠাদ্বৈতবাদীরা এই শ্লোকটাকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেন। আমরা আচার্য শঙ্করের ভাষ্যকেই অনুসরণ করি বলে আচার্যের ভাষ্যকেই আধার করে চলব। আমরা জানি না অন্যরা এর কি ব্যাখ্যা করেন, জানার কোন আগ্রহও নেই। আচার্য শঙ্কর সব সময় ব্রহ্ম, পরমাত্মা, শক্তি সবটাকে এক বলছেন। বিশেষ করে এই শ্লোকে আচার্য বলছেন, *ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ,* আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ ব্রহ্ম আমাতে প্রতিষ্ঠিত। কি ধরণের ব্রহ্ম? *অমৃতস্য অব্যয়স্য,* এখানে অমৃত মানে অবিনাশী, আর অব্যয় মানে নির্বিকার। আর *শাশ্বতঃ,* সব সময় যিনি বিদ্যমান। *ধর্মস্য,* ধর্ম দিয়ে যাঁকে পাওয়া যায়, অমৃতের স্বভাব যাঁর, এনার প্রতিষ্ঠা হল জীবের অন্তরাত্মা, এখান থেকেই সমস্ত জ্ঞান বের হয়।

আচার্য বলছেন, *যয়া চ ঈশ্বরশক্ত্যা ভক্তানুগ্রহাদিপ্রয়োজনায় ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠতে প্রবর্ততে সা শক্তিঃ ব্রহ্ম এব অহং শক্তিশক্তিমতোঃ অনন্যত্বাদ্ ইতি অভিপ্রায়ঃ,* এই একটি লাইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলছেন, ঈশ্বরীয় যে শক্তি, আমরা যেমন বলি শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের শক্তি, এই শক্তির দ্বারা ভক্তের উপর অনুগ্রহাদি করার জন্য ব্রহ্ম প্রবর্তিত হন। ব্রহ্ম নির্গুণ নিরাকার, তিনি কি করে ভক্তের উপর কৃপা করবেন? শক্তির মাধ্যমে তিনি ভক্তকে কৃপা করবেন। সেই শক্তি আমি নিজে। কারণ শক্তি আর শক্তিমান অভেদ। খুব নামকরা কথা।

ঠাকুরও বলছেন, ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। আচার্য শঙ্করও একই কথা বলছেন, শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। যে শক্তি দিয়ে ভগবান ভক্তের উপর অনুগ্রহ করেন, সেই শক্তিটা ব্রহ্ম নিজে। অন্য একটা অর্থে বলছেন, আমি হলাম নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, তার মানে আমার মধ্যেই নির্গুণ ব্রহ্ম অবস্থিত। এর অর্থ করলে এটাই হয়, নির্গুণ ব্রহ্ম আর সগুণ ব্রহ্মের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। ঈশ্বর একটা, ব্রহ্ম আর-একটা এরকম কিছু নেই। ভগবান তাই বলছেন, যে কোন মানুষ যদি আমাতে আশ্রয় নেয়, সেই আমি কে? *ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ।।*

ঈশ্বরকে যখন আমরা ভজনা করব, যেমন যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত, তিনি ঠাকুরকে দেখবেন এই সাতাশ নম্বর শ্লোক দিয়ে। ঠাকুর সেই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, তুমিই ব্রহ্ম রামকৃষ্ণ, তুমিই সেই শক্তি, তুমিই সেই নির্গুণ ব্রহ্ম। কোন নির্গুণ ব্রহ্ম? যিনি অমৃত, অব্যয়, শাশ্বত; ধর্ম দিয়ে যাঁকে পাওয়া যায়

আর যিনি অনন্ত সুখের খনি। সেইজন্য কেউ যদি আমার ভজনা করে, তখন ছাব্বিশ নম্বর শ্লোকে নিয়ে যাচ্ছেন, আমাকে যদি কেউ অব্যাভিচারী ভক্তি করে, তাহলে তিনিও ত্রিগুণাতীত হয়ে যাবেন।

সংক্ষেপ এই অধ্যায়ে বলছেন, প্রথমে শুরুতে বলছেন, এই সৃষ্টিটা হল সত্ত্ব, রজো আর তমের খেলা। এই তিনটে গুণের মধ্যে আমরা সবসময় ছটফট করছি, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম ব্যবহার করছি। এই তিনটে গুণই আমাদের বিভিন্ন যোনির মধ্যে নিয়ে গিয়ে পুনর্জন্ম করায়। জীবনের উদ্দেশ্য এই তিনটে গুণের পারে যাওয়া। কিভাবে যাবে? অব্যাভিচারী ভক্তি দিয়ে। কাকে ভক্তি করবে? ভগবানকে। কোন ভগবানের? যিনি নির্গুণ নিরাকার, যিনি ভক্তের জন্য সগুণ সাকার রূপ ধারণ করেন।

অনেকে প্রশ্ন করেন, আমার মা কিংবা বাবা ঈশ্বর নয় কেন? বোকা বোকা প্রশ্ন। হ্যাঁ তোমার বাবা বা মা বা দুজনেই তোমার ঈশ্বর হতে পারেন, যদি তাঁদের এভাবে দেখা হয়। *ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহম্*, যদি তুমি মনে কর নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম, সগুণ সাকার ব্রহ্ম, ঈশ্বরের শক্তি, সব কিছু তোমার মায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, তবেই তিনি ঈশ্বর রূপে তোমার পূজিত হতে পারবেন। তা নাহলে এগুলো শুধু কথার কথা, শব্দের প্রদূষণ ছাড়া আর কিছু না। আমাদের সবারই উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরকে সেই রূপে ভক্তি করা।

এরপরেই শুরু হয় পঞ্চোদশ অধ্যায়, যে অধ্যায়কে শাস্ত্র বলা হয়েছে। পঞ্চোদশ অধ্যায় সবাইকে মুখস্ত অবশ্যই করতে হবে, তা নাহলে গীতা শোনা বৃথা। শুধু মুখস্ত করে নেওয়াই নয়, এই অধ্যায়ের ভাব, দর্শন নিত্য অনুধ্যান ও আবৃত্তি করা দরকার।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়ং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগ নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ।।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুরুষোত্তমযোগ

পঞ্চোদশ অধ্যায়ে মাত্র কুড়িটি শ্লোক, কিন্তু এই অধ্যায়কেই ভগবান শাস্ত্র বলছেন। প্রথমে আমরা তাই এটাই ব্যাখ্যা করব, শাস্ত্র বলতে কি বোঝায় আর কেন পঞ্চোদশ অধ্যায়কে ভগবান শাস্ত্র বলছেন। সবার কাছে নিবেদন –এই অধ্যায়কে সবাই মুখস্ত করবেন। যাঁরা এই গীতার আলোচনা শুনছেন, তাঁদের নিশ্চয়ই কোন শুভ সংস্কার আছে বলেই শুনছেন। উত্তরাখণ্ডে সাধুরা খাওয়ার আগে পুরো পঞ্চোদশ অধ্যায়কে আবৃত্তি করেন। আমাদের মঠ মিশনেও, বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের সময় খাওয়ার আগে এই অধ্যায় পুরোটা পাঠ করা হয়। বাড়ির লোকেরা অনেকে বিরক্ত হতে পারেন, অনেকে নানা রকম ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতে পারেন, কিন্তু আপনি আপনার কাজ করে যান, পুরো এই অধ্যায়কে জোরে জোরে পাঠ করুন। এগারোই সেপ্টেম্বর ১৮৯৩, শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে স্বামীজী বক্তৃতা করতে উঠতে গিয়ে সামনে অত লোক দেখে মনে মনে ভয় পাচ্ছিলেন। ঠাকুর স্বামীজীর সামনে দর্শন দিয়ে বলছেন, লোক না পোক। আপনারাও সবাই ওটাই মনে করবেন, যারা নিন্দা করছেন, বিদ্রুপ করছেন, হাসিঠাট্টা করছেন, তাঁরা লোক না পোক।

ঠাকুর ব্রাহ্ম সমাজকে নিয়ে বলতেন –ইদানিং কালের ব্রহ্মজ্ঞানীরা। প্রথমে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম সমাজের নেতা ছিলেন। কেশব সেনের পর থেকে নামকরা সবাই যাঁরা ব্রাহ্ম সমাজে ছিলেন, তাঁদেরকে নিয়েই ঠাকুর এই কথা বলছেন – ইদানিং কালের ব্রহ্মজ্ঞানী। তেমনি ইদানিং কালের যাঁরা পণ্ডিত বা intellectual হয়েছেন, এনাদেরই একজন লিখলেন, বেদকে আমি ধর্মগ্রন্থ বলে মনে করি না, বেদ এক উচ্চমানের কাব্য; প্রতিভাবান ঋষি মুনিরা বেদ রচনা করেছেন। তাঁকে আমি উত্তর দিতে গিয়ে বললাম, 'ধর্মগ্রন্থের পরিভাষা, ধর্মের পরিভাষা, শাস্ত্রের পরিভাষা আপনি কি নিজের মত তৈরী করতে থাকেন?' আধ্যাত্মিকতা কি, ধর্ম কি, ধর্মগ্রন্থ কি, বর্তমানে সবাই এই জিনিসগুলোর পরিভাষা নিজের মত দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে, এদের এটাও জানা নেই যে, এভাবে কোন কিছুর পরিভাষা দেওয়া যায় না।

যখন কোন আলোচনা হবে, আমি যখন আপনার সাথে কথা বলব, তখন তার একটা সীমা (parameteras) নির্দিষ্ট রাখতে হবে। প্যারামিটার যদি ঠিক না করা হয়, তাহলে প্রচলিত গল্পে যেমন বলা হয়েছে, যে গল্প আগে বলা হয়েছিল – আগে যদি জানতাম শ্রাদ্ধ এত দূর গড়াবে তাহলে আরেকটু বেশি জায়গা গোবর দিয়ে লেপে রাখতাম। যে কোন দর্শনের আলোচনাতে একটা সীমা বেঁধে দিতে হয়।

যে কোন দর্শনকে চারটে জিনিসকে আগে পরিভাষিত করতে হবে, মূলতঃ তিনটে – জীব, জগৎ আর ঈশ্বর। যে কোন দর্শন, তা সে বিজ্ঞানের দর্শন হোক, মার্ক্সিজিমের দর্শন হোক, মানবদর্শন হোক, অদ্বৈত দর্শন হোক, খ্রীশ্চান ধর্মের দর্শন হোক, ইসলামের দর্শন হোক, সব দর্শনকে আগে এই তিনটের পরিভাষা ঠিক করে নিতে হবে। তোমার দর্শন জীব অর্থাৎ 'আমি' বলতে কি বোঝায়, জগৎ অর্থাৎ আমাদের আশেপাশে যা কিছু আছে, এটা বলতে কি বোঝায় আর ঈশ্বর বলতে কি বোঝায়, এই তিনটে জিনিসকে তোমাকে আগে ব্যাখ্যা করতে হবে। পঞ্চোদশ অধ্যায়ে মাত্র কুড়িটি শ্লোকে এই তিনটে জিনিসকে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে। তার মানে এই অধ্যায় পূর্ণ রূপে একটি দর্শন শাস্ত্র। ধর্মগ্রন্থ তার সাথে বলে দেন, জীব ঈশ্বর পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছাবে। পঞ্চোদশ অধ্যায় সেই

দিকে দিয়ে ঠিক ঠিক ধর্মগ্রন্থ। যে কোন ধর্মগ্রন্থ সব সময় এমন একটা জিনিসকে নিয়ে বলে, যেটা মন দিয়ে, ইন্দ্রিয় দিয়ে বা যুক্তি দিয়ে জানা যায় না।

হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বেদ, এই বেদ কি বলছে? ঠাকুরের কথামৃতে কত রকমের কথা আছে, সাংসারিক কথা আছে, হাসিঠাট্টা আছে, তৎকালীন সমাজের কথা আছে। এটাই কি কথামৃতের বৈশিষ্ট্য? কোন ভাবেই কথামৃতের এটা বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। যে জ্ঞান ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যাবে না, অর্থাৎ অপরের কাছে শুনে পাওয়া যাবে না, কোথাও চোখের দেখা পাওয়া যাবে না, চিন্তন করে পাওয়া যাবে না, সেই জ্ঞানের কথা যে গ্রন্থে পাওয়া যায়, সেই গ্রন্থই হল ধর্মগ্রন্থ। ধর্মগ্রন্থের একটাই পরিভাষা – অতিন্দ্রিয় জিনিসের যিনি বর্ণনা করেন। তাহলে তো ভুলভাল কথাও তো বলতে পারেন, কারণ যাচাই করে দেখার কোন পথ নেই। সেইজন্য ওখানে বলা হয় – সম্প্রদায় বিদ্যা। এই জিনিসটাকে যদি ভাল করে বুঝে নেওয়া হয়, তাহলে তাকে ধর্মের ব্যাপারে কোন দিন কোন সংশয় আসবে না, কেউ তাকে ভুলভাল কথা দিয়ে বিচলিত করতে পারবে না। বাইবেল হোক, কোরাণ হোক, যে কোন ধর্মগ্রন্থ সব সময় অতিন্দ্রিয় জিনিসকে বর্ণনা করেন।

তাহলে কি প্রমাণ আছে যে, এনারা কোন ভুলভাল কথা বলছেন না, কারণ ভেরিফাই করার কোন পথ নেই। একমাত্র প্রমাণ হল – সম্প্রদায়। আমি আমার আচার্যের কাছে শিখেছি, তিনি তাঁর আচার্যদের কাছে শিখেছেন, এই ভাবে পিছনের দিকে যেতে যেতে শেষে যিনি অবতার, তাঁর কাছে গিয়ে আমরা পৌঁছে যাব। এর মধ্যে কোথাও যদি একটা শৃঙ্খল কেটে যায়, বিদ্যাটা চলে যাবে। তবে কি হয়, যেমন হিন্দু ধর্ম বা ইসলাম ধর্ম, এই ধর্মকে পালন করার জন্য তাঁদের পরম্পরায় এত লোক আছেন যে, যেমন কোন কারণে বাবা হয়ত ধর্মে বিশ্বাস করেন না, স্বামী হয়ত বিশ্বাস করেন না, কিন্তু তারপরে যিনি এলেন, যেমনি তিনি বুঝে গেলেন, আমি এই ধর্মের, তিনি আবার ওই জায়গাতে ফেরত চলে গিয়ে পরম্পরার বিদ্যাকে এগিয়ে নিয়ে যান।

সেইজন্য ধর্মে কমিউনিটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যান্য বিষয়ে কমিউনিটির ভূমিকা থাকে না। কিন্তু ধর্মে কমিউনিটির ভূমিকা থাকে। সম্প্রদায় হল গুরুমুখী, শিক্ষা, জ্ঞান গুরু থেকে শিষ্যে যায়। যতদিন আমরা পরম্পরার ওই পরিস্থিতিতে না পৌঁছে যাই, ততদিন নিজের পরিবারের পরম্পরার মাধ্যমে শিখে নেওয়া হয়। মূল কথা হল, অধ্যাত্ম তত্ত্ব, যে জিনিসগুলিকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যাবে না, যার একমাত্র আধার হল ধর্ম জীবন। ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যাবে না, মৃত্যুর পর কি হয় ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না, কর্মের বিধান ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না। একবার একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'মৃত্যুর পর আত্মা কত বেগে যায়?' আমি বললাম, 'মরলে জানতে পারবেন।' মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়, কত বেগে যায়, কিভাবে যায়, আমরা কি করে বলব! শাস্ত্রে বর্ণনা করা আছে। আমরা এটা বলতে পারি, গরুড় পুরাণে বর্ণনা আছে মৃত্যুর পর জীব কোথায় যায়, ঋষিরা বলে গেছেন। এখন এটা কতটা সত্য, কতটা কল্পনা, আমাদের জানার কোন উপায় নেই। যখন আমরা বর্ণনা করি, তখন একশ ভাগ সত্য মনে করেই আমরা বলে দিই। মূল ধর্মগ্রন্থ, যেটাকে শাস্ত্র বলা হচ্ছে, শাস্ত্র মানে যিনি শাসন করেন। শাস্ত্র বা ধর্মগ্রন্থ বলতে বোঝায়, জীব অর্থাৎ আমি কে, তিনি কে আর এই দুটোর মধ্যে যে সম্পর্ক, এই সংসার; এই তিনটেকে বিস্তারে শাস্ত্র বর্ণনা করে।

পঞ্চোদশ অধ্যায় এই তিনটে জিনিসকে রীতিমত বিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে, সেইজন্য ভগবান এই অধ্যায়কে শাস্ত্র বলছেন। এই অধ্যায়ে মাত্র কুড়িটি শ্লোক, এই কুড়িটি শ্লোক মুখস্ত করলে ভিতর থেকে আনন্দ স্ফুরণ হতে শুরু করবে, এটাই শাস্ত্রের আনন্দ। শাস্ত্রের আনন্দ ভিতর থেকে আসে। তুবড়ি জ্বালালে যেমন আলোর ফোয়ারা বেরিয়ে আসে, তেমনি ভিতর থেকে আনন্দের ফোয়ারা বিচ্ছুরিত হতে থাকে। বেদে যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে, তার পুরো সার এই পঞ্চোদশ অধ্যায়ে রাখা হয়েছে। অন্যান্য জায়গাতেও আছে, তবে একটা জিনিসকে সেখানে জোর দেওয়া

হয়েছে। যেমন চতুর্দশ অধ্যায়েও আছে, ত্রয়োদশ অধ্যায়তেও আছে, কিন্তু এখানে পুরো সাজিয়ে সুন্দর ভাবে একটা জায়গায় রাখা হয়েছে। আর ভগবান নিজেই বলছেন, তোমাকে আমি শাস্ত্র বললাম। ঈশ্বর তত্ত্ব, জীব তত্ত্ব, ধর্ম তত্ত্ব, সমস্ত কিছু এখানে পুরো দমে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনাতে বলা হয়েছিল, গীতার অনেক শ্লোক সরাসরি বেদ থেকে, বিশেষ করে কঠোপনিষদ থেকে নেওয়া হয়েছে। আর এই অধ্যায় শুরুই হয় কঠোপনিষদের একটি মন্ত্র দিয়ে। পুরোপুরি কঠোপনিষদের মন্ত্র না, কিন্তু ভাবটা ওখান থেকে নেওয়া হয়েছে। হিন্দুদের কাছে বেদের একটা উচ্চ সম্মান, সেখান থেকে একটা মন্ত্র এনে যখন শুরু করা হচ্ছে, তাতে এই অধ্যায় একটা অন্য স্তরে চলে যায়। কঠোপনিষদের মন্ত্র দিয়ে শুরু করাতে আরও বেশি মাহাত্ম্য হল, যীশু এক জায়গায় বলছেন, এক খাপে যেমন দুটো তলোয়ার থাকতে পারে না, তেমনি গড্ আর ম্যামন, ঈশ্বর আর মানুষ এই দুজনকে তুমি এক সঙ্গে সেবা করতে পার না। ঈশ্বরকে যদি পেতে হয়, সংসার তোমাকে ত্যাগ করতেই হবে। এখানে শুরুই হয় এই সংসারকে দিয়ে। পরেই বলবেন, এই সংসারকে কিভাবে উৎখাত করতে হবে।

অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা, এই যে তুমি নদের হাট বসিয়েছ, এই হাট তোমাকে নিজের হাতে উপড়ে ফেলতে হবে। আমার নাতি, আমার সন্তান, আমার স্ত্রী/স্বামী, আমার বন্ধু, আমার আত্মীয় সব জুটিয়ে যে নদের হাট বানিয়েছ, এটাকে তোমাকে নিজে উপড়ে ফেলতে হবে। এই হাট তুমি বসিয়েছ, তোমাকেই এই হাট ভাঙতে হবে, অন্য কেউ এসে ভাঙবে না। ভগবান ভাঙবেন না, তোমার গুরু ভাঙবেন না, তোমাকে নিজে ভাঙতে হবে। কত কঠোর কথা বলছেন, *অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েণ ছিত্ত্বা*, এই সংসারকে ছেদন করার জন্য শস্ত্র তোমাকে নিজে আনতে হবে। কি সেই শস্ত্র? *অসঙ্গশস্ত্রেণ*, বৈরাগ্যরূপী অস্ত্র আর *দৃঢ়েন ছিত্ত্বা*, এক কোপে এই সংসাররূপী বৃক্ষকে কেটে ফেলতে হবে। সংসারবৃক্ষকে যতক্ষণ না কাটা হবে, ততক্ষণ কিছু হবে না। যত গ্রন্থ পড়ে থাকুন, সব ভুলে যান, বিশ্বাস করুন কোন কাজে দেবে না। চল্লিশ বছরের সন্ন্যাস জীবনে আমি এখানে মহাপুরুষদের সাথে আছি। কল্পনা করা যায় না, এমন এমন মহাপুরুষদের দেখেছি, প্রথম জীবনে এনাদের দেখে অবাক হয়ে ভাবতাম, মানুষ এই স্তরের হতে পারে।

হয় না, দু নৌকাতে পা রেখে মানুষ চলতে পারে না। হো হো করে হাসব আবার মুখ গোমড়া করে রাখব, দুটো একসাথে হয় না। সবাইকে সংসার ত্যাগ করতেই হবে। ঠাকুরকে একজন জিজ্ঞেস করছেন, সংসারে থেকে কি ঈশ্বর লাভ হয় না? ঠাকুরও বলছেন, কেন হবে না। কিন্তু তারপরই যা যা শর্ত রাখছেন, সেই শর্তগুলি পালন করা কতটা সম্ভব, সেটা আমার থেকে আপনারাই ভাল বলতে পারবেন। এই সংসারকে আপনিই বানিয়েছেন, আপনাকেই এই সংসারকে উৎখাত করতে হবে। সংসারকে উৎখাত করার আগে জানতে হবে সংসারবৃক্ষের স্বরূপ কি। সংসারবৃক্ষের বর্ণনা দিয়ে এই অধ্যায় শুরু করছেন। আগেও বলা হয়েছে, এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটি কঠোপনিষদ থেকে নেওয়া হয়েছে।

পঞ্চোদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর প্রথমেই বলছেন, *যস্মাদ্ মদধীনং কর্মিণাং কর্মফলং জ্ঞানিনাং চ জ্ঞানফলম্ অতো ভক্তিযোগেন মাং যে সেবন্তে তে*, শ্রীকৃষ্ণ কোন মানুষ নন, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। ইদানিং কালে কিছু বোকা বোকা লোক বোকা বোকা কথা বলে বোকা বোকা মানুষকে আরও বোকা বানিয়ে যাচ্ছে। বৈষ্ণবরা প্রচণ্ড গোঁড়া মানসিকতার হয়। গোঁড়াদের কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী ঘন্টাকর্ণের গল্প বলতেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, ভগবানকে যে নামেই ডাকা হোক, তাঁকে শিব বলুন, কালী বলুন, শ্রীরাম বলুন, শ্রীরামকৃষ্ণ বলুন, তাতে কিছু যায় আসে না।

এই ভগবানের পরিভাষা কি? *যস্মাদ্ মদধীনং কর্মিণাং কর্মফলং*, যাঁরা কাজ করেন তাঁদের কর্মফল, যাঁরা জ্ঞানচর্চা করেন, জ্ঞানের যে ফল, কর্মের যে ফল, তা ভগবানই দেন, নিজে থেকে ফল

আসে না। আমরা কার্য-কারণের কথা বলতে থাকি, কার্য-কারণ দিয়েও হয় না। নবম অধ্যায়ে ভগবান বলছেন, *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*, আমার ভক্তের সব কিছু আমি নিজে বহন করে নিয়ে যাই। তাহলে বাকিদের কে দেন? বাকিদের ভগবানই দেন, কিন্তু তাদের কর্ম করিয়ে তারপর দেন। ঠাকুরও বলছেন, ভক্ত হল রাজার ব্যাটা, মাসে মাসে তার মাসোহারা এসে যায়। কাকে কি দিতে হবে, সব তাঁর ঠিক করা আছে। কাউকে তিনি কাজ করিয়ে দেন, কাউকে আবার কাজ না করিয়েই দেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাই ভক্তির ক্ষেত্রেও তাই। কি করতে হবে আমাদের? শাস্ত্রে যেভাবে বলছে, ঠিক সেইভাবে আমাদের সব কিছু করতে হবে। আমি তো তাহলে বলতে পারি, তিনি যখন দেন, তাহলে আমাকে আর কিছু করতে হবে না, আমি বসে থাকি, তিনি আমাকে জ্ঞান দিয়ে দেবেন, তিনি আমাকে ভক্তি দিয়ে দেবেন। তিনিই দেন, কিন্তু খাটিয়ে নিয়ে তবেই দেন। ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় মা আর তার ছোট শিশুর সম্পর্কের মাধ্যমে এই জিনিসটাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। মা কখন ছোট শিশুকে ছেড়ে থাকেন না। কখন সখন একটু আড়ালে চলে যান। কিন্তু বাচ্চা যখন মাকে দেখতে না পেয়ে কাঁদতে শুরু করে, মা ছুটে এসে সন্তানকে কোলে তুলে নেন।

এই ছোট্ট শিশুর মত আমি আপনি কি ভগবানের জন্য কাঁদতে পারব? আমাদের সোনার হরিণ চাই, সোনার হরিণী চাই, সোনার হরিণের বাচ্চা চাই। আমরা সবাই একজন চন্দ্রমুখ আর একজন চন্দ্রমুখীকে নিয়ে মহা আনন্দে দিন কাটিয়ে যাচ্ছি, এদের কি ঈশ্বরের কথা মনে পড়বে? অসম্ভব। এই চন্দ্রমুখ বা চন্দ্রমুখীকে যেদিন থেকে জ্বালামুখী মনে হতে শুরু হবে, যখন সব কিছুকে ফেলে দিয়ে বলতে পারবে, নিকুচি করেছে, তখন পাল্টাবে, তার আগে হয় না। যদি বসে থাকি, আর ভাবতে থাকি ঠাকুর আমার উপর কৃপা করবেন, কোন দিন কৃপা করবেন না। আবার চেষ্টা করছি বলেই যে তিনি কৃপা করবেন, তাও না। কারণ ভগবান কোন আলু পটল নন।

আচার্য বলছেন, *অতো ভক্তিযোগেন মাং যে সেবন্তে*। ভাগবতে নবধা ভক্তির কথা বলা হয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণে খুব সুন্দর শবরীর কাহিনী আছে, এই কাহিনীকেই পরে তুলসীদাস রামচরিতমানসে ভক্তির খুব উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। বলছেন, এই ভক্তিযোগ দিয়ে যাঁরা আমার সেবা করেন, আমি যদি চাই আগে তাঁকে গুণাতীত করে দিই, আর সেখান থেকে তাঁর জ্ঞানপ্রাপ্তি এবং জ্ঞানপ্রাপ্তি থেকে তাঁকে মোক্ষ লাভ করিয়ে দিই। আচার্য শঙ্কর জ্ঞানকে সর্বোপরি রাখেন। সত্যিই তো, একটা জিনিসকে না জানলে কি করে হবে, উনি সব জায়গায় এটাকে যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু বৈষ্ণব সম্প্রদায়, বিশেষ করে রামানুজ সম্প্রদায় বা মাধ্বাচার্যের সম্প্রদায় এই জিনিসটাকে মানতে চান না, কারণ তাঁদের কাছে ভগবানই সব। কিন্তু আচার্যের কাছে জ্ঞান না হলে কিছু হবে না। সেই উপনিষদকে আধার করে আচার্য বলছেন, জ্ঞান ছাড়া হবে না। সেই উপনিষদকে আধার করে মাধ্বাচার্য বলছেন, ভক্তিই সব। আমরা তাহলে কোনটাকে মানব? যেটা যার মনে বসে যায়, সেটাকেই ধরে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, বাকিটা তিনিই দেখবেন।

আমি শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্প্রদায়ের লোক, আমি এই সম্প্রদায়েই বড় হয়েছি, এই সম্প্রদায়েই শিক্ষা পেয়েছি, এই সম্প্রদায়ের কথাই আপনাদের শোনাচ্ছি। ঠাকুর, স্বামীজী সবটাই নিয়েছেন, আর এই অদ্বৈত হল একটা সম্পূর্ণ ছবি, আংশিক কিছু নেই। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, এগুলো হল ছবির একটা টুকরো অংশ। আচার্য বলছেন, ভগবানকে যাঁরা এভাবে ভক্তি করেন তাঁদেরকে নিয়ে যান। যাঁরা তত্ত্বটা জানেন, তাঁদের কথা আর বলার অপেক্ষা থাকে না। যাঁরা ভক্ত তাঁদেরকে আমি এভাবে নিয়ে যাই, আর যাঁরা তত্ত্ব জানে, তাঁরা তো রাজার ব্যাটা। যাদের রেলের টিকিট আছে তারা ট্রেনে ভ্রমণ করতে পারবেন, আর যে রেলকর্মী তার পাশ আছে, তার তো কোন কথাই নেই, পাশ দেখিয়ে যে কোন ট্রেনে যে কোন স্টেশনে ওঠা নামা করতে পারে। জ্ঞানী অনেকটা তাই।

আচার্য বলছেন, অর্জুন যদিও কোন প্রশ্ন করেননি, কিন্তু ভগবান চাইছেন নিজের তত্ত্ব নিজের প্রিয়জনকে বলবেন – দেখ আমি এই রকম। মহারাজরা মজা করে বলেন, আমি যদি বলতে যাই,

'আমি এই রকম', তখন বলবে, 'দেখ দেখ, মহারাজ কি রকম অহঙ্কারী, শুধু নিজের কথা বলে'। আর ভগবান যখন নিজের কথা বলেন, তখন ওটা সাধারণ বিষয় হয়ে যায়। আসলে আমরা সন্ন্যাসী কিনা, আমরা তো আমাদের আপনজনকে নিয়ে মজা করবই। সন্ন্যাসীদের আপনজন ভগবান। স্বামীজী বলছেন, মজাও যদি করতে হয় ঈশ্বরকে নিয়েই করবে। যার জন্য পরে পরে, শ্রীকৃষ্ণ, রাধা, গোপীদের নিয়ে খুব সুন্দর সুন্দর কাহিনী তৈরী হল। আমরা যখন এই মজাগুলো করি তখন খুব আপনজন মনে করেই করা হয়। তবে অধিকার যদি না হয়ে থাকে, তাহলে এগুলো নিয়ে মজা করা যায় না। যার জন্য একজন ঠাকুরের সামনে নকল করতে যাওয়াতে ঠাকুর তাকে আটকে দিয়েছেন। যতক্ষণ খুব আপন বোধ না হয়ে যায়, ততক্ষণ এই ধরণের মজা করতে নেই।

ভগবান এখানে নিজের প্রিয় শিষ্যের কাছে নিজের তত্ত্বকে বলছেন। এই তত্ত্বকে বোঝা এবং বুঝে ধারণা করার জন্য আগে দরকার বৈরাগ্য, বৈরাগ্য না হলে ঈশ্বরের তত্ত্ব জানা যাবে না। এখানে প্রথমে ভগবান বৃক্ষরূপে সংসারের বর্ণনা করছেন। শুধু যে বৃক্ষরূপেই সংসারের বর্ণনা করা যায়, তা নয়, বিভিন্ন রূপেই করা যেতে পারে। যেমন আমরা প্রায়ই বলে থাকি, সংসার হল দাবানল, দাবানল রূপে সংসারকে দেখছেন। আমাদের ট্রেনিং সেন্টারে একজন সংস্কৃতের পণ্ডিত ছিলেন, বয়স হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সংস্কৃত পড়াতেন, বেদ পড়াতেন। কোন কারণে তাঁকে নিজের বাড়ি যেতে হয়েছিল সম্পত্তির কোন ঝামেলা সামলাতে। তিন চার দিন পর ফিরে এসে আমাদের বলছেন, বাবা তোমাদের কি বলব, নরক ঘেঁটে এলাম। সংসারকে তিনি নরক রূপে দেখছেন।

ভগবান এখানে সংসারকে বৃক্ষ রূপে বলছেন। কেন এভাবে বলছেন? আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *বিরক্তস্য হি সংসারাদ্ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারো ন অনস্য ইতি*, সংসার থেকে যিনি বিরক্ত হয়ে গেছেন, একমাত্র সেই পুরুষের ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান জানার অধিকার হয়েছে। আমাদের কাছে এসে অনেকে প্রশ্ন করেন, মহারাজ আমাদের কি হবে? সংসারকে আপনি আঁকড়ে ধরে রেখেছেন, আবার জিজ্ঞেস করছেন, আমাদের কি হবে। ঠাকুর আপনাদের জন্য নরকের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। জন্মজন্মান্তর ধরে সংসার থেকে যখন প্রচুর মার খেতে থাকবেন, মার খেতে খেতে সংসার থেকে যেদিন বিরক্ত হবেন, তখন যদি কিছু হয়। স্বামীজী আমেরিকাতে এক জায়গায় আত্মার স্বরূপ, ব্রহ্মতত্ত্ব নিয়ে বলছিলেন, সেখানে এক মহিলা বলতে শুরু করলেন, 'স্বামী, আমি তো আমার গয়নাগাটি, আমার নামযশকেই ভালবাসি।' স্বামীজী তাঁকে বলছেন, 'কোন ক্ষতি নেই, ভালবাসতে থাকুন, তারপর হাজার হাজার বছর ধরে সংসার থেকে যেদিন মার খেতে থাকবেন, মার খেয়ে খেয়ে যখন বৈরাগ্য হবে তখন আপনি এদিকে আসবেন'। ঈশ্বরতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মার কথা শোনার এরা যোগ্যই না। আগেকার দিনে বেদের ব্রাহ্মণরা মনে করতেন, তুমি অধিকারী নও, তোমাকে এসব কথা বলে কি হবে!

আইনস্টাইনকে যদি গ্রামের একটা স্কুলে শিক্ষকতার জন্য পাঠানো হয়, তিনি সেখানে পড়াবেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর সেই উচ্চমানের থিয়োরীগুলো, থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি কাকে বলবেন, অধিকারীই তো কেউ নেই। আইনস্টাইনের নামে খুব নামকরা কথা আছে, উনি জানতেন এই কথাগুলো কেউ বুঝবে না। উনি যখন কোথাও বক্তৃতা দিতেন, সেখানে তিনি নিজের সঙ্গে কথা বলতেন। তিনি জানেন, শ্রোতারা কেউ এগুলো বুঝবেই না। ঠাকুরও একই কথা বলছেন, কাকেই বা বলি, কেই বা বুঝবে। এখন পড়াশোনা অনেক এগিয়ে গেছে, সংস্কৃতও অনেক এগিয়েছে, বুদ্ধির বিকাশ আগের থেকে অনেক বেশি হয়েছে। আগে যেখানে কোন শিক্ষার প্রসার ছিল না, সেখানেও আজ শিক্ষার আলো পুরোদমে পৌঁছে গেছে। ফলে এগুলো বলা যায়, তবে যদি কেউ মনে করে ভগবৎ তত্ত্ব শুনলেই হয়ে যাবে, তা কখনই হবে না।

একটা খুব সুন্দর কথা আছে। কেউ যদি এসে বলে, তোমাকে আমি এই কথা বলছি, এটা তুমি আর কাউকে বলো না। কিংবা খুব সহজ করে বলছে –তোমাকে এই জিনিসটা শিখিয়ে দিচ্ছি,

এটা তুমি আর কাউকে দেখাতে যেও না। তখন বিচার করতে হয়, এতে কার লাভ হচ্ছে, এই জিনিসটা থেকে কে লাভ পেতে যাচ্ছে। কোন বাবাজী আপনাকে বলছে, 'তোমার হবেই হবে, তুমি শুধু দক্ষিণাটুকু দিয়ে যাও'। কার লাভ হচ্ছে এখানে? যে দক্ষিণা পাচ্ছে। ইদানিং কালে অমুক গুরু, তমুক বাবাজীতে দেশ ছেয়ে গেছে, খুব সহজ করে তাঁরা আমাদের সামনে ভগবানকে দেখিয়ে দিচ্ছেন। এতে কার লাভ হচ্ছে, বলার আর প্রয়োজন হবে না। এগুলো বিচার করতে হয়। সেইজন্য শাস্ত্র ছাড়া কোন কিছু শুনতে নেই। ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান বলবেন, *তস্মাচ্ছস্ত্রং প্রমাণং তে*, তোমার কাছে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। তবে সবাই এসব কথা নিতে পারে না। শুভ সংস্কার না থাকলে শাস্ত্রের কথা শোনার ইচ্ছাই হবে না। আমাদের এই আলোচনাগুলি যাঁরা দিনের পর দিন শুনে যাচ্ছেন, শুভ সংস্কার না থাকলে তাঁদের শোনার আগ্রহই হত না।

স্বামী বিবেকানন্দ কোন দিন কাউকে বললেন না, তোমাদের দ্বারা হবে না। তিনি এটাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেন, আগে তোমরা দেশের সেবা কর, মানুষের সেবা কর। স্বামীজী জানতেন, এই জাতির দ্বারা এখন ঈশ্বরতত্ত্ব ধারণা করা সম্ভব না। এই জাতি এখন নির্বীজ হয়ে আছে, পুরো তামসিকতায় ডুবে আছে, মাটিতে পড়ে আছে, এদের দ্বারা ঈশ্বরদর্শন হবে না, সম্ভব না। স্বামীজী আচার্য, আচার্য কখনই এই কথা বলবেন না যে, তোমাদের দ্বারা হবে না, তিনি তাই বললেন, দেশের সেবা কর, মানুষের সেবা কর। দেশের সেবা করে, মানুষের সেবা করে একটু যদি শক্তি আসে, তবে গিয়ে যদি কিছু হয়। আজকে যারা আমাদের কথাগুলো শুনে বলছে, মহারাজ কি দারুণ বলছেন, তারা এটা জানে না যে, তাদের ঠাকুর্দারা এই জিনিসগুলো অনায়াসে জানতেন। যে কোন পরিবারে খোঁজ নিলে দেখা যাবে, বংশ পরম্পরায় বাবা-মা না হলেও তাঁদের ঠাকুরদা-ঠাকুরমারা অবশ্যই এই কথাগুলো জানতেন। কিন্তু এই প্রজন্মে এসে আমরা সব কিছু হারিয়ে ফেলেছি। হারিয়ে ফেলারই তো কথা, কারণ সবাই এখন হোয়াটসাপ, ফেসবুকে ঢুকে গিয়ে সারাদিন চ্যাট করে যাচ্ছে। সমস্ত জ্ঞানের উৎস এখন হোয়াটসাপ আর ফেসবুক। হোয়াটসাপ, ফেসবুক, ইউটিউব হল এখন আমাদের গুরু। ঠাকুর বলছেন, ইত্যাদি গুরুর ইত্যাদি চেলা। সংসার থেকে যদি বৈরাগ্য না আসে ঈশ্বরতত্ত্ব কোন ভাবেই ধারণা করা যাবে না। সেইজন্য ভগবান প্রথমে সংসারবৃক্ষের বর্ণনা করছেন –

শ্রীভগবানুবাচ
ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ।।১।।

(শ্রীভগবান্ বললেন – এই সংসাররূপ মায়াময় বৃক্ষের মূল (কারণ) ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ মায়াশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মে; হিরণ্যগর্ভাদি শাখা নিম্ন দিকে ও কর্মকাণ্ডরূপ বেদসমূদয় এই বৃক্ষের পত্র। এই অনাদি সংসারকে বেদপুরাণাদি শাস্ত্র অশ্বত্থ বলে থাকেন। যিনি ঠিক এই প্রকারে সংসার বৃক্ষকে জানেন, তিনিই বেদজ্ঞ।)

গীতার সংস্কৃত খুব সহজ, এর প্রত্যেকটি শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহার হয়, হিন্দীতে হয়, অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও হয়। আমাদের শিক্ষার জগতে কিছু বিখ্যাত পণ্ডিত এলেন, কিছু বিখ্যাত বুদ্ধিজীবিরা এলেন, আর কিছু বিখ্যাত ইতিহাসবিদরা এলেন, এসে তাঁরা বলতে লাগলেন, তোমাদের পূর্বজরা ছিলেন মুর্খ, গবেট, এদের চর্চিত সংস্কৃত ভাষার শিক্ষাটা আগে বন্ধ কর। সেই থেকে সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা বন্ধ হয়ে গেল, আজ তাই আমাদের সংস্কৃতের কোন জ্ঞান নেই। সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান না থাকার জন্য, শাস্ত্রে যে বিচারগুলি দেওয়া আছে সেগুলো আমরা ধারণা করব কি করে! ইংরাজী ভাষায় এর ভাবকে ব্যক্ত করা যায় না, ইংরাজী ভাষা বেনিয়াদের ভাষা, বিজনেস কম্যুনিকেশানের জন্য ঠিক আছে; কিন্তু আধ্যাত্মিক উচ্চমানের ভাবের চিন্তন করার জন্য ইংরাজী অত্যন্ত নিকৃষ্ট ভাষা।

বলছেন, *ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখম্*, অশ্বত্থ গাছের মূলটা উপরের দিকে আর তার শাখা নীচের দিকে বিস্তার করে আছে। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের বিখ্যাত বট গাছকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা

জানেন, কি বিশাল বটবৃক্ষ। তার শাখা, প্রশাখা, উপশাখা বিস্তার করে এত বড় হয়ে গেছে যে, কেউ জানেই না ওর আসল মূল কোনটা। অশ্বত্থ বৃক্ষও যত বড় হতে থাকে তার শাখা-প্রশাখা বাড়তে থাকে, আর ডাল থেকে ঝুড়ি নীচের দিকে নামতে থাকে, মাটির সংস্পর্শে আসার পর সেই ঝুড়ি মাটির নীচে প্রবেশ করে শিকড়ের কাজ করতে থাকে। কারণ বিশাল বৃক্ষ, খাদ্য তার বেশি লাগবে, বেশি লাগবে বলে শিকড়ও বেশি দরকার। যখনই বৃক্ষের কথা আমরা ভাবি, তখন আমাদের মাথায় এটাই থাকে যে, বৃক্ষের উপরের অংশ উপরের দিকে বাড়তে থাকে আর তার মূল নীচে মাটির গভীরে বিস্তার করতে থাকে। কিন্তু জীবের ক্ষেত্রে গিয়ে উল্টোটা হয়; মূলটা উপরের দিকে থাকে। ঠাকুরও কথামৃতে বলছেন, কি আশ্চর্যের আমাদের গোড়াটা উপরের দিকে। মাথাটা আমাদের গোড়া, সেটা উপরের দিকে থাকে, কিন্তু গাছের গোড়া নীচের দিকে থাকে। এই যে সংসারবৃক্ষ, এর গোড়াটা উপরের দিকে – *ঊর্ধ্বমূলম্*। আর তার শাখাগুলো নীচের দিকে, *অধঃশাখম্*। যদি আমরা কোন অশ্বত্থ বৃক্ষের ছবি দেখি, সেই ছবিটাকে যদি উল্টো করে দেখি, সেটাই হয়ে যাবে সংসারবৃক্ষ। *প্রাহুরব্যয়ম্*, বলা হয় এই বৃক্ষ অব্যয়, এই সংসার অনাদিকাল থেকে চলে আসছে, কেউ জানে না কবে থেকে চলে আসছে।

ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি, এই অশ্বত্থ বৃক্ষের পাতাগুলো হল ছন্দ, ছন্দ মানে বেদ। সংসারবৃক্ষের পাতাগুলি হল বেদ। *যস্তং বেদ স বেদবিৎ*, যিনি এই জিনিসটাকে জানেন, তিনিই ঠিক ঠিক জানেন। সংসারের স্বরূপকে যিনি জেনে গেছেন তিনিই ঠিক ঠিক বেদবিৎ। আমরা কথায় কথায় বলি, তোমাকে আমার চেনা আছে। আমাদের পরিচিত অনেকে আছেন, তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হয়ে গেলে আমাদের কাছে এসে দুঃখ করে বলেন, মহারাজ, বুঝে গেছি সংসারে কিছু নেই। আপনি কিচ্ছু বোঝেননি। আগামীকাল একজন এসে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে, যে জগৎটা এখন তিক্ত মনে হচ্ছে, সেই জগৎটাই তখন মধুর বলে মনে হবে। বেদবিৎ কে, বিদ্বান কে, জ্ঞানী কে? যিনি এই জিনিসটা বুঝেছেন, এই সংসার হল *ঊর্ধ্বমূলম্*, অর্থাৎ যার সৃষ্টি ভগবান থেকে। বৃক্ষকে পাতা যেমন রক্ষা করে, ঠিক তেমনি এই সংসারবৃক্ষকে রক্ষা করছে বেদ। বেদ বলতে এখানে জ্ঞানরাশি না, বেদ বলতে এখানে পরিষ্কার ঋক্, সাম ও যজু, এই তিনটে বেদের কথা বলছেন। *যস্তং বেদ স বেদবিৎ*, যিনি এটাকে জানেই তিনিই ঠিক ঠিক বেদজ্ঞ।

ঊর্ধ্বমূলম্, আচার্য শঙ্কর এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, *কালতঃ সূক্ষ্মত্বাৎ কারণত্বাৎ নিত্যত্বাৎ মহত্বাৎ চ ঊর্ধ্বম্ উচ্যতে*, ব্রহ্ম থেকেই এই সৃষ্টি, ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, যিনি চৈতন্য, সেখান থেকে সব সৃষ্টি। সেই ব্রহ্মের গুণ কি? কাল হল সব থেকে সূক্ষ্ম, ব্রহ্ম কালের থেকেও সূক্ষ্ম। ব্রহ্মই সমস্ত কিছুর কারণ, ব্রহ্ম নিত্য, ব্রহ্মই আছেন, ব্রহ্মই সত্য। যে জিনিসগুলিকে আমরা বৃহৎ মনে করি, সেই জিনিসগুলি থেকেও ব্রহ্ম বৃহৎ, যাঁর শক্তি মায়া, সব সময়ই তাঁর সঙ্গে আছে। তার সাথে ব্রহ্ম অব্যয়, তাঁর কখন ক্ষয় হয় না, কখন কোন পরিবর্তন হয় না। এটাই সংসারের মূল। এই পরমব্রহ্ম তিনি তাঁর প্রাণ শক্তিতে প্রাণ হয়ে গিয়ে তাঁর মধ্যে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে এই জগৎ রূপে আমাদের সামনে আসেন। সপ্তম অধ্যায়ে যেমন ভগবান বললেন, পরা ও অপরা প্রকৃতি আমারই, অপরা প্রকৃতি হয়ে জগৎ রূপে দেখাচ্ছেন, আর পরা প্রকৃতি হয়ে জীবের ভিতরে প্রবেশ করে অবস্থান করে থাকেন।

কঠোপনিষদের মন্ত্র বলছেন, *ঊর্ধ্বমূলবাক্ শাখা*। আবার পুরাণ থেকে আচার্য উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাচ্ছেন, বেদের যা বক্তব্য পুরাণেরও সেই একই বক্তব্য। সেইজন্য গীতাতে যা বলা হচ্ছে, সেটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য, প্রমাণ করার জন্য আচার্য অনেক সময় পুরাণ থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে আসেন। আবার মহাভারত থেকে, মনুস্মৃতি থেকেও উদ্ধৃতি নিয়ে আসছেন, যদিও ওনার এই উদ্ধৃতি আনার কোন দরকার ছিল না। উদ্দেশ্য হল এটা দেখানো যে, সমস্ত শাস্ত্র একই কথা বলে। অন্যান্য ধর্মে একটিই শাস্ত্র। ক্লাশ ওয়ান টুতে আমরা পড়ার সময় সেখানে আমাদের একটি বই হলেই হয়ে

যেত। মাস্টার ডিগ্রিতে গেলে একটি বইতে হবে না। হিন্দু ধর্মের এক বিশাল ব্যপ্তি, কত রকম বিষয়কে নিয়ে আসা হচ্ছে, সব কিছুকে পরিষ্কার করে বলার জন্য একটি বইতে সম্ভব না।

পুরাণে কি বলছেন, সেটাতে আমাদের যাওয়ার দরকার নেই। আচার্য বলছেন, *ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখম্*, শাখাগুলো নীচে কিভাবে আসছে? আমরা আগে অনেকবার সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করেছি, সেখানে বলা হয়েছে, কিভাবে সেই ব্রহ্ম থেকে প্রকৃতি আসছে। সাংখ্য দর্শনে পুরুষ আর প্রকৃতি দুটো আলাদা সত্ত্বা। এই প্রকৃতি থেকে সৃষ্টি যখন ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করে, তখন প্রথমে আসে মহৎ, আর মহৎ থেকে আসছে অহঙ্কার। বুদ্ধি এসে গেছে, আমিত্ব এসে যাওয়াতে অহঙ্কার আসে। এই অহঙ্কার মানুষের অহঙ্কার না, এটা অনেক উচ্চস্তরের অহঙ্কার। এই অহঙ্কার থেকে আসছে তন্মাত্রা গুলো, এখান থেকে একটু একটু করে সৃষ্টি আরও এগোতে থাকে। আমাদের মনে হয় একটা বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গমের পর গাছটা একটু একটু করে বাড়তে থাকে, এখানে জিনিসটা অন্য রকম। ব্রহ্ম উপরে আছেন, প্রকৃতি তাঁর সাথে আছে; সেখান থেকে নীচের দিকে ডালপালা ছড়াতে শুরু করে। যত নীচের দিকে আসে, তত যেন সরল জিনিসটা জটিল হয়ে আসে। আচার্য বলছেন, *শাখা ইব অস্য অধো ভবন্তি ইতি সঃ অয়ম্ অধঃশাখঃ*, শাখাগুলি নীচের দিকে প্রসারিত হয়ে ঝুলতে থাকে, সেইজন্য বলা হচ্ছে *অধঃশাখ*।

অশ্বত্থ কেন বলা হচ্ছে? *ন শ্বঃ অপি স্থাতা ইতি অশ্বত্থঃ*, আগামীকাল পর্যন্ত এটা থাকবে না, সেইজন্য এই জিনিসটাকে বলছেন *অশ্বত্থঃ*। সংস্কৃত ভাষার তুলনা অন্য কোন ভাষার সাথে হয় না। সংস্কৃতের প্রত্যেকটি শব্দের পিছনে একটি সুগভীর চিন্তা ভাবনা জড়িয়ে থাকে। সংসারকে কেন অশ্বত্থ বৃক্ষ বলতে গেলেন? আম গাছ বলতে পারতেন, কাঁঠাল গাছ বলতে পারতেন? অশ্বত্থ এই জন্য বলছেন, কারণ আগামীকাল পর্যন্ত এটা থাকবে না। তার মানে, আমার সংসার, আপনার সংসার, কারুর সংসারই চিরস্থায়ী নয়। চিরস্থায়ী নয় বলেই সংসারকে বলছেন অশ্বত্থ। *তং ক্ষণপ্রধ্বংসিনম্*, এই সংসার ক্ষণভঙ্গুর, এই আছে এই নেই। তার সাথে বলছেন, *সংসারমায়াময়ম্ অনাদিকাল-প্রবৃত্তত্বাৎ সঃ অয়ং সংসারবৃক্ষঃ অব্যয়ঃ*, এই সংসার মায়াময়, ঈশ্বর বৈ কিছু নেই; অথচ এটাকে সংসার রূপে দেখাচ্ছে, আমাকে দেখাচ্ছে, আপনাকে দেখাচ্ছে, সব কিছুকে আলাদা আলাদা দেখাচ্ছে, এটাই মায়, মায়াময় সংসার। এর থেকে বড় ম্যাজিক আর কি হতে পারে। ম্যাজিকে বলা হয়, ম্যাজিকে একটা কিছু দেখালে এটাকে বলে ট্রিক্, চালাকি। তাস নিয়ে খেলা, টুপি থেকে পায়রা বার করা, এগুলো হল ট্রিক্। অনেকগুলো ট্রিক্কে মিলিয়ে দিয়ে সুন্দর করে ওটাকে উপস্থাপনা করা হয়, তখন ওটাকে বলে মায়া, illusion।

আমাদের কাছে ইয়ং ছেলেমেয়েরা এসে দুঃখ করে বলে, মহারাজ, এখন বুঝেছি, ভালবাসা বলে কিছু হয় না। এই ধরণের কথা শুনে শুনে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি, সবারই ওই এক কথা, মহারাজ বুঝতে পেরেছি, সংসারে কিছু নেই। এখন শুনলে জোর হাসি পায়। আপনি একটা বুঝেছেন, কিন্তু এই সংসারটাই মায়াময়। আপনি যে সংসারের কথা বলছেন, এটা হল মরীচিকা। এই মরীচিকা যখন বৃহদাকারে হয়, পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্কেলে যখন হয়, তখন এটাই হয়ে যায় ঈশ্বরের মায়া, কারণ ঈশ্বর মায়াবী কিনা, তিনি অতি কুশল জাদুকর। তাঁর কাছে লক্ষ, কোটি নেই, একসাথে অনন্ত মায়ার খেলা চলছে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে জাদুর খেলাই চলছে – এটাকেই আচার্য বলছেন, সংসার মায়াময়। এই সংসার মায়া ছাড়া কিছু না, অথচ অনাদিকাল ধরে চলে আসছে। পিসি সরকার যে জাদুর খেলা দেখান, তিনি সেটা একটা সময় শুরু করেন, আর একটা সময় তাঁকে শেষ করে দিতে হয়। কিন্তু এই মায়ার রাজ্যে এখানে থামাথামি নেই, সৃষ্টি যবে থেকে চলছে, এই মায়াময় সংসার তবে থেকে চলছে আর চিরদিন এভাবেই চলতে থাকবে। এই সৃষ্টির যখন নাশ হয়ে যাবে, তখন এই শক্তিটা সেই ঈশ্বরের মধ্যেই থাকবে। তারপর আবার যখন সৃষ্টি হবে, তখন এটাই আবার সামনে চলে আসবে।

কিভাবে এই সংসার থাকে? আচার্য বলছেন, *অনাদ্যন্তদেহাদিসন্তানাশ্রয়ো*, অনাদি, অন্তহীন এই সংসার, আর শরীরাদির আশ্রয়ে এই সংসার। সংসার না থাকলে শরীরও থাকবে না। *ঊর্ধ্বমূলম্* কেন? সংসার ভগবান থেকে এসেছে। *অধঃশাখম্* কেন? চব্বিশটি তত্ত্ব ওখান থেকে বেরিয়েছে। *অশ্বত্থঃ* কেন? এই সংসার ক্ষণভঙ্গুর। *অব্যয়ঃ* কেন? অনাদিকাল থেকে চলে আসছে, আর অনাদিকাল ধরে চলতে থাকবে। *ছন্দাংসি* আসছে *ছাদনাৎ* থেকে। ছন্দ কাকে বলে? যিনি ছায়া করে আছেন। কবিতায় সব সময় একটা ছন্দ থাকে। তাই বলে, এই জীবন যেন রেল, দৌড়ে যাচ্ছে সিগনালের পারে, এগুলো কবিতা না। কবিতাতে একটা ছন্দ থাকে, মুক্ত ছন্দটাও ছন্দ। ছন্দ কি করে, *ছাদনাৎ*, ছেয়ে আছে। আচার্য ভাষ্যে বলছেন, *ছন্দাংসি ছাদনাদ্ ঋগযজুঃসামলক্ষণানি যস্য সংসারবৃক্ষস্য পর্ণানি ইব পর্ণানি*, বৃক্ষের পাতা যেমন বৃক্ষে ছেয়ে থাকে, বৃক্ষকে রক্ষা করে; ঠিক তেমনি বেদ, যা সংসারকে রক্ষা করে – *যথা বৃক্ষস্য পরিরক্ষাণার্থানি পর্ণানি তথা বেদাঃ সংসারবৃক্ষপরিরক্ষাণার্থা*। সেইজন্য বেদ যদি সুরক্ষিত না থাকে সংসার রক্ষিত হবে না।

যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহলে অন্যান্য ধর্মের কি হবে? না, অন্যান্য ধর্ম হবে না। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, ভারত যদি নাশ হয়ে যায়, তাহলে কে থাকবে! ভারত যদি নাশ না হয়ে যায়, তাহলে কে যাবে! ভারত হল বিশ্বগুরু। আমার আপনার সবার উপর দায়ীত্ব, নিজেকে আগে হিন্দু ধর্ম বুঝতে হবে হিন্দু ধর্ম কি জিনিস। তারপর লোকেদের বোঝাতে হবে হিন্দু ধর্ম কি। বেদের ধর্ম যদি নাশ হয়ে যায় এই বিশ্বের নাশ হয়ে যাবে, কারণ ধর্ম বলতে হিন্দু ধর্ম, হিন্দু ধর্মের আধার বেদ। এখানে কোন অন্ধ বিশ্বাস বা গোঁড়ামি ভাব নিয়ে বলা হচ্ছে না। হিন্দু ধর্মের বিস্তার দেখুন। কোথায় একটা গ্রামের মুদি দোকান আর কোথায় মুম্বাই, কলকাতার একটা সুপার মার্কেট। হিন্দু ধর্ম হল ধর্মের সুপার মার্কেট, সব কিছু এখানে পাওয়া যাবে। হিন্দু ধর্ম যদি নাশ হয়ে যায়, কেউ বাঁচবে না। মারামারি করুক, বন্দুক চালাক, চালাকি করুক, হিন্দু ধর্মের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। স্বামীজী একা মুখ খুললেন, স্বামীজীর মুখ থেকে Sisters and brothers of America শুনে পুরো আমেরিকা স্তম্ভিত হয়ে চুপ করে গেল। একা একটা মানুষ সমস্ত মানুষকে চুপ করে রেখে দিলেন, আর সেখানে যদি হাজার হাজার মানুষ গর্জে ওঠে তাহলে তখন সেখানে কি হবে কেউ কল্পনা করতে পারবে না।

বেদ কিভাবে রক্ষা করেন? *ধর্মাধর্মতদ্ধেতুফলপ্রকাশনার্থত্বাৎ*, ধর্ম কি, অধর্ম কি, তার ফল কি, এটাকে বেদ প্রকাশ করেন। যদি এই রকম কোন ধর্মগ্রন্থ হয় যে, সমস্ত কর্মের কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম, পুরো কারণ দিয়ে প্রকাশ করবেন এবং তার ফল বলবেন, সেই জ্ঞানরাশিই হয়ে যাবে বেদ। আচার্য তাই বলছেন, *যথাব্যাখ্যাতাং সংসারবৃক্ষং সমূলং যঃ তং বেদ স বেদবিৎ*। বেদবিৎ কে? যিনি সংসার, সংসারের মূল, সংসারের যে চরিত্র, এই পুরো জিনিসটাকে যিনি বুঝে নিয়েছেন। যদি পুরো চরিত্র না বোঝা হয়ে থাকে, তাহলে তাঁকে বেদবিৎ বলা যাবে না, তিনি বেদার্থ জানেন না। তাঁকে বেদ জানতে হবে না, *অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং*, এগুলো জানার দরকার নেই, কিন্তু বেদ কি বলতে চাইছে সেটা তাঁর জানা দরকার। কি জানা দরকার? সংসারবৃক্ষ কি? সংসারবৃক্ষ মানে, যা ভগবান থেকে প্রকৃতির মাধ্যমে, মহৎ, অহঙ্কার, তন্মাত্রাদি হয়ে মানব শরীর পর্যন্ত বিস্তৃত হচ্ছে।

পরের শ্লোকগুলিতে আরও বিস্তারে বলবেন –ধর্ম-অধর্ম দিয়ে, তার ফল দিয়ে এই সংসার কিভাবে আসছে। ধর্ম, অধর্ম, তার কারণ, তার ফল এই সমস্ত যা কিছু ঋক্, সাম, যজুর্বেদে বিস্তারে বলা হয়েছে, যেটা এই সংসারকে রক্ষা করে। যিনি এই জিনিসটাকে, যিনি এই তত্ত্বটা বুঝে নিয়েছেন, একমাত্র তিনিই এই সংসারকে উৎখাত করতে পারেন। শত্রুকে মারার জন্য দুটো জিনিস জানতে হয় – শত্রু কোথায় লুকিয়ে আছে, আর শত্রুর স্বরূপ কি। ধর্ম পথে শত্রু হল এই সংসার, সংসারের স্বরূপ না জানলে কি করে আমরা তাকে মারব!

আচার্যের কি অপূর্ব ভাষ্য –*ন হি সংসারবৃক্ষাদ্ অস্মাদ্ সমূলাদ্ জ্ঞেয়ঃ অন্যঃ অণুমাত্রঃ অপি অবশিষ্টঃ*, সংসারবৃক্ষের চরিত্র জানা ছাড়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অণুমাত্র জানার কিছু নেই। ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, অঙ্ক, ইতিহাস জেনে কিছু হবে না। তাহলে কি পড়াশোনা করা ছেড়ে দেব? কি করে ছাড়বে, তোমার ভিতরে এখনও এত কামনা-বাসনা, গিজ্‌গিজ্ করছে। এই বিষয়গুলির জ্ঞান অর্জন করলে মন একটু শান্ত হবে, রজোগুণ যখন একটু বাড়বে তখন গিয়ে সংসারবৃক্ষকে জানার একটু ইচ্ছা হবে। ডাক্তারী শাস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং শাস্ত্র, বিজ্ঞানের সব শাস্ত্র তোমাকে আগে পড়তে হবে। এই শাস্ত্রগুলির জ্ঞান অর্জন করার পর তোমার বুদ্ধির বিকাশ হবে, বুদ্ধির বিকাশ হলে মন শান্ত হবে, বিবেক-বিচার আসবে, তখন তমোগুণ রজোগুণ একটু শান্ত হয়ে সত্ত্বগুণের উদয় হবে, এরপর সংসারবৃক্ষের ব্যাপারে যেতে হবে। আচার্য বলছেন, *অস্তি অতঃ সর্বজ্ঞঃ*, যিনি এই সংসার তত্ত্বকে বুঝে নিয়েছেন, তিনি হলেন সর্বজ্ঞ। এই হল প্রথম শ্লোকে সংসারবৃক্ষের বর্ণনা। এরপর বলবেন এই সংসারবৃক্ষ এবং তার যে বিভিন্ন অঙ্গ, এটাকে কিভাবে উৎখাত করতে হবে।

অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে।।২।।

(এই সংসাররূপ অশ্বত্থের শাখাসমূহ গুণত্রয় দ্বারা বর্ধিত ও বিষয়রূপ প্রবালবিশিষ্ট এবং অধোদেশে ও ঊর্ধ্বদেশে বিস্তৃত। দেবলোকাদি অপেক্ষা নিয়ে মনুষ্যলোকে এর ধর্মাধর্মজনক মূলসমূহ অধোদেশে প্রসারিত হয়েছে।)

এই সংসারবৃক্ষের বিস্তার কি রকম দেখাচ্ছেন। এর আগে সংক্ষেপে বলা হয়েছিল, হিন্দুরা এই পুরো সংসারবৃক্ষকে কিভাবে দেখেন। সংসারবৃক্ষের প্রথমে আসে মূল, এই মূল হল সগুণব্রহ্ম, নির্গুণব্রহ্ম এখানে আসছে না। উপনিষদে দুই ব্রহ্মের কথা বলা হয় – সগুণব্রহ্ম ও নির্গুণব্রহ্ম। নির্গুণব্রহ্ম সব সময় নিরাকার। সৃষ্টি সব সময় আসে সগুণব্রহ্ম থেকে, সগুণব্রহ্ম যিনি তিনিই সব সৃষ্টি করেন। তত্ত্বের দিক থেকে এই দুই ব্রহ্মের কোন তফাৎ নেই, কিন্তু উপাসনার দিক থেকে তফাৎ আছে। যাঁরা ভক্ত, তাঁরা সবাই সগুণব্রহ্মের উপাসনা করেন। আর যাঁরা জ্ঞানী, এনারা নির্গুণব্রহ্মের উপাসনা করেন। উপনিষদে নির্গুণব্রহ্ম ও সগুণব্রহ্ম দুটোরই কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কঠোপনিষদে পরিষ্কার ভাবে দুটোকে একসাথেই রাখা হয়েছে। সগুণব্রহ্মকে অনেক সময় বলা হয় মায়োপাধিক ব্রহ্ম। নির্গুণব্রহ্ম আর সগুণব্রহ্ম আলাদা কিছু না, মায়ার জন্য দু ভাবে দেখায়।

মায়া জিনিসটা আবার কি, সেটা কেউ জানেন না। 'মায়া' শব্দের সন্ধি ভাঙলে হয় মা+যা। 'মা' মানে হয় না, 'যা' মানে অস্তিত্ব; যার অস্তিত্ব নেই সেটাই মায়া। মায়ার জন্য দেখাচ্ছে আছে, কিন্তু আসলে এর কোন অস্তিত্ব নেই। যিনি মানছেন অস্তিত্ব আছে, তার জন্য আছে। যিনি মানছেন অস্তিত্ব নেই, তাঁর জন্য নেই। মায়া এক বিচিত্র জিনিস। সেইজন্য মায়াকে নিয়ে সবাই বিচিত্র বিচিত্র প্রশ্ন করেন – মায়াকে কে সৃষ্ট করলেন, মায়া কোথায় থাকে। কিছু কিছু জিনিস আছে যেটা কেউ আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারবে না, কিন্তু নিজে আমাকে বুঝে নিতে হয়। গুরুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ করলে বোঝা যায়, ঊনচল্লিশ নম্বর সুতো কোনটা, চল্লিশ নম্বর সুতো কোনটা। চা খেতে খেতে, কফি খেতে খেতে বাড়িতে আরাম কেদারায় বসে বেদান্ত শুনবে, আর প্রশ্ন করবে, আচ্ছা মশাই মায়া কি? এভাবে কোন কিছুই হয় না।

সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখা হল, যোগে যেমন বলছেন, মহৎ, মহৎ থেকে অহঙ্কার, অহঙ্কার থেকে তন্মাত্রা গুলি; এগুলোই হল সংসারবৃক্ষের মূল শাখা। আর এই সংসারবৃক্ষকে রক্ষা করার জন্য আচ্ছাদিত করে আছে বেদ। বেদ কি করে? ধর্ম কি, অধর্ম কি, এই ধর্মাধর্মের শিক্ষা

দেওয়ার জন্য বেদ। বেদ হল জ্ঞানরাশি, তবে আচার্য এখানে পরিষ্কার বলছেন, এখানে বেদ বলতে ঋক্, সাম ও যজু। বেদ সংসারবৃক্ষকে ধারণ করে আছে, তা নাহলে এই সংসার বিনষ্ট হয়ে যাবে।

শাখাগুলিতে যে নূতন নূতন পাতা গজায়, এটাকে বলছেন প্রবাল। প্রবাল হল সংসারবৃক্ষের বিষয়, যেটাকে ভোগ করা হয়, এটা একটা রূপক। তার সাথে আছে ইন্দ্রিয় সমুদয়। ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যবস্তু হল এই প্রবাল। ওখান থেকেই গাছের পাতাগুলি বেরোতে থাকে। সেখান থেকে আবার দ্বিতীয় শিকলগুলি বেরোতে শুরু হয়। শিকলগুলি হল সংস্কার, আর তার সঙ্গে থাকে রাগ ও দ্বেষ। রাগ আর দ্বেষ মানে, কোন জিনিসকে সে ভালবাসে, কোন জিনিসকে সে অপছন্দ করে। লাউ কুমড়ো গাছের মত লতানে গাছে প্রবাল হয় না, কিন্তু শিকলের মত একটু আঁকশি বেরিয়ে থাকে। আমি একটা বইতে পড়ার পর নিজেই লক্ষ্য করতে গিয়ে দেখলাম, লাউ কুমড়োর লতায় যে আঁকশি বেরিয়ে থাকে, সেটা খুব ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে। একদিকে বড় হতে থাকে আর-এক দিকে ঘুরতে থাকে। এক ঘন্টা কি দেড় ঘন্টায় মোটামুটি তিনশ ষাট্ ডিগ্রি ঘুরে নেয়। যেমনি আঁকশিটা কোন আশ্রয় পেয়ে যায়, সেটাকে পেঁচিয়ে নেয়। যার জন্য লাউ কুমড়ো গাছকে বাড়ার জন্য মাচা করে দেওয়া হয়। মাচার কঞ্চিগুলোকে ধরে ধরে গাছ বাড়তে থাকে, আর মাচার নীচে ঝুলতে থাকে।

এটাই সংসার, ঘুরছে, যেখানে একটা আশ্রয় পেয়ে গেল, সেটাকে এবার জড়াতে থাকে, ওটাকে জড়িয়ে নেওয়ার পর আবার এগোতে থাকে। ভাল ভালকে জন্ম দেয়, মন্দ মন্দকে জন্ম দেয়। যে জন্ম নিয়েছে, সে আবার মা হয়ে সেও আবার জন্ম দেয়। আগে যেটা কার্য থাকে, পরে সেটাই কারণ হয়ে যায়। এটাও কিছুটা আমাদের সংসারের মত, মেয়ে জন্ম নিয়ে এক সময় সে মা হয়, তার থেকে যে মেয়ে জন্ম নিল, সেও পরে আবার সন্তানের জন্ম দিয়ে মা হয়ে যাবে। এই সেকাণ্ডারি শিকলগুলি, যেটা ধর্ম, অধর্ম, রাগ দ্বেষ থেকে হয়, এটাই হল ঠিক ঠিক সংসার। প্রাইমারি শিকলগুলো, যেটা মহৎ, অহঙ্কারাদি, এগুলো সংসারে জড়ায় না, এগুলো মূল। এরপরে যেটা রয়েছে, এগুলোই সংসারকে জড়াতে থাকে।

অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা, আমাজন নদীর দুই তীরে এমন গভীর জঙ্গল, বৃক্ষগুলির শিকলগুলো এক অপরকে এমন জড়িয়ে থাকে যে, রোদ ঢুকতে পারে না। আমাজনের জঙ্গলে কোথায় সাপ আছে, কোথায় হিংস্র প্রাণীরা আছে বোঝার উপায় নেই। ভারতবর্ষে আমরা এই ধরণের গাছ দেখতে পাই না। বলছেন, এমন এমন ধরণের গাছ আছে যে, যার শাখা প্রশাখা ঊর্ধ্বে নীচে সব দিকে ছেয়ে আছে – *অধোশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা*। কত দূর পর্যন্ত ছেয়ে আছে? যত দূর মনের জগৎ। মনের জগৎ কোথায় শেষ হয়? কোথাও শেষ হয় না। যত দূর মন যাবে তত দূর পর্যন্ত মনের এলাকা। মনের এলাকার পারে কি? এই প্রশ্নটাই হয় না। যত দূর মনের এলাকা, তত দূর সৃষ্টি।

গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ, সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণ আর তার সাথে বিষয়, এই সব কটা মিলে এই সংসারবৃক্ষ। এই বৃক্ষ প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে তো চলেছে, কোন দিন এই বৃক্ষ ছোট হয়ে যাবে না, কোন দিন কমেও যাবে না; যেমন আছে তেমনই চলতে থাকবে। আচার্য এখানে বলছেন, *অধো মনুষ্যদিভ্যো যাবৎ স্থাবরম্,* সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণ দিয়ে এই বৃক্ষ নিজেকে বিস্তার করতে থাকে। এই তিনটে গুণ তার বাড়ার উপাদান, এই উপাদান তাকে ঠেলে ঠেলে বাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর বিষয়রূপ যে প্রবাল, জীবের যেমন কর্ম, যেমন তার জ্ঞান, উপরে দেবতা থেকে নীচে স্থাবর পর্যন্ত যত রকম যোনি আছে, এই কর্ম ও জ্ঞান মিলে তাকে বিভিন্ন যোনিতে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে আর নীচে স্থাবর পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। সাপ বিছেরও নীচে স্থাবর, গাছপালাদি আরও নীচে। ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, শিবলোক, রামকৃষ্ণলোক, যে লোকই হোক, 'লোক' শব্দটা যেমনি আনা হল, তত দূর এই সংসার। মনের এলাকা কত দূর? রামকৃষ্ণলোক অবধি, সত্যলোক পর্যন্ত। আর কর্মফল, কর্ম যা করা হয়েছে তার যে ফল, এটা হল দেহ, এটাও শাখা। এই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার শেষ নেই।

আমরা কি রকম বৃক্ষে বাস করছি, এক মিনিট যদি এটাকে নিয়ে চিন্তা করি, অবাক হয়ে যেতে হয়। এমন এক বৃক্ষে আমরা সবাই বাস করছি, যেখানে আমরা ফল রূপে এলাম। ওই ফলটাই কিছুক্ষণ পর এই বৃক্ষেরই শাখা হয়ে যাচ্ছে। শাখা হয়ে যাওয়ার পর সেই শাখা থেকে আবার শাখা বেরোচ্ছে, এই শাখা বেরোনর শেষ নেই। এটাই আচার্য বলছেন – *দেহাদিকর্মফলেভ্যঃ শাখাভ্যঃ*। দেহটাই শাখা, আর তার সাথে সেখানে নানা রকমের যে ভোগের বিষয়, এটাকেই বলছেন *বিষয়প্রবালাঃ*। এই বিষয় প্রবাল থেকে আরও নূতন নূতন শাখা বেরোতে থাকে। বৃক্ষের মূল সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণ। কিন্তু এরপর যে সেকেণ্ডারী রুটস্ গুলো চলছে, সেগুলো চলে রাগ আর দ্বেষ থেকে। যে জিনিসগুলিকে আমরা ভালবাসি, সেগুলোর দিকে আমরা যেতে চাই, যেগুলোকে পছন্দ করি না, সেগুলো থেকে সরে আসতে চাই। চুম্বকের মত, চুম্বক রেখে দিলে তার নর্থপোল যদি হয় ঘুরে যাবে, সাউথপোল যদি হয় ওর দিকে ঘুরে যাবে, যাবে অবশ্যই।

আমার একজন হৈতষী বড় প্রফেসর ছিলেন, পণ্ডিত মানুষ ছিলেন, কিছু দিন আগে মারা গেছেন। উনি ফিজিক্সের প্রফেসর ছিলেন, আমাকে খুব সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন। কেমস্ট্রির পিরিয়ডিক টেবিলে যেখানে যা element আছে, সমস্ত element কারু না কারুর সাথে react করে, এদের action reaction থাকবেই। কিন্তু একমাত্র যত নোবেল গ্যাস আছে, হিলিয়মাদির মত গ্যাস, এরা কারুর সাথে সহজে react করে না। আমাদের নোবল গ্যাস হয়ে যেতে হবে, নামটাও তেমনি, নোবল গ্যাস। ভদ্র হওয়া মানে? কোথাও কোন reaction নেই। নোবল গ্যাস, ভদ্রলোক, কোথাও কোন reaction নেই। হিলিয়াম কিছুতে react করতে চায় না। কিন্তু যে কোন element যে কোন জায়গায় গিয়ে react করবেই। React করছে মানে? রাগ আর দ্বেষ, এক অপরের সাথে টক্কর লাগবেই লাগবে।

জীবনের উদ্দেশ্যই হল, হিলিয়াম গ্যাস হয়ে যাওয়া, নোবল গ্যাস। ভিতরে সমস্ত শক্তি আছে, কিন্তু কিছু করতে চাইবে না; কারণ যত শক্তি বাড়ে তত নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তিটাও বাড়ে। আমরা কেন সব কিছুতে এত প্রতিক্রিয়া করি? কারণ আমাদের শক্তি নেই। শক্তি থাকলে কি আমরা এত react করতাম! সামান্য সামান্য ব্যাপারে আমরা হয় রেগে যাচ্ছি, না হলে খুশীতে লাফাতে থাকি।

কর্মানুবন্ধীনি, যেমন যেমন কর্ম হতে থাকে তেমন তেমন এগুলো চলতে থাকে। এই যে বাসনারূপ মন, এটা চাই সেটা চাই, এই বাসনা থেকে আসে রাগ আর দ্বেষ। আর এই রাগ আর দ্বেষ থেকে সংসারবৃক্ষ প্রসারিত হতেই থাকে। তার সাথে যেমন যেমন কর্ম হবে, সেই কর্মানুসারে পাপপূণ্য হবে, যেমন পাপপূণ্য হবে তেমন আবার কর্ম হবে। এর শেষ নেই, বাঁচার কোন পথ নেই। সংসারবৃক্ষে একবার এসে পড়লে আর তার বাঁচার পথ নেই। বাসনা থাকবেই, বাসনা থাকলে কর্ম করবে, কর্ম করলে ভালমন্দ ফল হবে, ভালমন্দ ফল হলে বাসনা বাড়বে, সেই বাসনা আরও কর্মের দিকে প্রেরিত করবে। এর থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। দেবতারাও যদি এই সংসারবৃক্ষে নেমে আসেন, তাঁরাও বাঁচতে পারবেন না। শাস্ত্র বলছেন, অবতার পুরুষ সব সময় মুক্ত, গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান বলছেন, *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যং*, অবতারের জন্ম ও কর্ম দিব্য, ফলে এগুলো তাঁর উপর ছাপ পড়ে না। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে যখন শ্রীরামচন্দ্রকে দেখছি, যীশুকে দেখছি, ঠাকুরকে দেখছি, দেখে মনে হয় তাঁদেরও কিছু জিনিস ভাল লাগে, কিছু জিনিস খারাপ লাগে। এটা আমাদের দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিতে কিছু হয় না। তাঁর উপরেও ছাপ পড়ে। মনের জগতে যে ঢুকবে, কার্য-কারণ সম্পর্ক তাকে টানবে, এখানে কারুর কিছু করার নেই।

কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে, মনুষ্যলোকে এখানে কেন বলছেন? তার উত্তরে বলছেন, মনুষ্যলোকে কর্মের স্বাধীনতা বেশি। অন্যান্য যোনিতে সবাই বাঁধা। সাপ, বিছে, গরু, মোষ, পাখি

এদের কার্যগুলো সব সময় সীমাবদ্ধ, আগে থেকেই বোঝা যায় ওরা কি করতে চাইছে। কিন্তু মানুষ unpredictable। আগেকার দিনে গাড়ী চালানো শেখানোর সময় বলা হত, যদি গাড়ির সামনে দিয়ে কুকুর, বেড়াল যায়, তাহলে তুমি গাড়ী চালিয়ে বেরিয়ে যাবে। কারণ ওরা যে করেই হোক নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে নেবে। গরু যদি যায়, ওর পিছন দিয়ে যাবে, কারণ গরু সামনে দিয়ে যেতে দেবে না। আর মানুষ যদি গাড়ী চালাতে গিয়ে সামনে এসে যায়, তাহলে তুমি গাড়ী থামিয়ে দেবে। কারণ মানুষ কোন দিকে যাবে কেউ বলতে পারবে না, সামনে যেতে পারে, পিছনে যেতে পারে, যে কোন জিনিস করতে পারে। কুকুর, বেড়াল, গরু, মোষ, সবারই ক্রিয়া বলে দেওয়া যায়। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বলা যায় না, কারণ তার স্বাধীনতা অনেক বেশি।

কর্মের বন্ধন সব লোকেই আছে, কর্ম সবারই পিছন পিছন যায়, মনুষ্যলোকে একটু বেশি। মূল বক্তব্য উপর থেকে নীচে, ডান দিক থেকে বাঁ দিকে সংসার, সর্ব দিকে বৃক্ষ ছড়িয়ে আছে। বাসনার জন্য কর্ম, কর্ম থেকে বাসনা, কর্ম আর বাসনা, বাসনা ও কর্ম, এর কোন শেষ নেই। সংসার বৃক্ষে একবার এসে গেলে বাঁচার আর কোন পথ নেই।

অনেক আগেকার একটা গল্প, গ্রীস দেশের গল্প, তবে গ্রীস থেকে ভারতে এসেছিল, নাকি ভারত থেকে গ্রীসে গিয়েছিল, সেটা কারুর জানা নেই। একজন লোক আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যা মহাপাপ, এই পাপকর্ম করার জন্য যমরাজ তাকে নরকে পাঠাবেন। নরকে পাঠানো হবে শুনে লোকটি যমরাজকে গিয়ে বলছে, 'হে যমরাজ আপনি আমাকে নরকে পাঠাবেন, অবশ্যই পাঠান, আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমি হাতজোড় করে আপনাকে বলছি, আপনি একটি বার পৃথিবীতে যান, ওখানে ঘর সংসার করুন। তারপর আমাকে এসে বলুন, মর্ত্যের সংসার বাস করার জন্য উপযুক্ত জায়গা, এরপর আপনি আমাকে নরকে পাঠিয়ে দেবেন'। যমরাজ লোকটির কথা শুনে রেগে গেছেন। কিন্তু কি করবেন, পৃথিবীর একটা লোক এসে আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছে, একবার ঘুরে এসে দেখা যাক।

যমরাজ পৃথিবীলোকে এসে সংসার করতে শুরু করলেন। যমরাজ সারাক্ষণ বিচার করে যাচ্ছেন, এর বাইরে কোন কাজ জানেন না। আমরা তাও কম্প্যুটার চালাতে পারি, যমরাজ থোরাই চালাতে পারবেন। মান্ধাতা আমল থেকে চিত্রগুপ্তকে দিয়ে সেই পেল্লাই এক খাতায় নোট করাতেন। যাই হোক, পৃথিবীতে এসে যমরাজ বৈদ্যের কাজ করতে লাগলেন। যমরাজের স্ত্রী সারা দিন তাঁকে গালাগাল দিতে থাকে, এত গালাগাল দেয় যে যমরাজের জীবন অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে তাঁর একটা ছেলেও হয়েছে। স্ত্রীর গালাগাল আরও বেড়ে গেছে – না আমি খেতে পারলাম, না আমার ছেলেকে খাওয়াতে পারলাম। স্ত্রীর জ্বালায় যমরাজ শেষে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হলেন। যমলোকে এসে লোকটিকে বলছেন, ভাই, বুঝলাম সংসারে কি জ্বালা। লোকটিকে তিনি ক্ষমা করে দিলেন।

ইতিমধ্যে পৃথিবিতে যমরাজের ছেলেটি বড় হয়ে গেছে। যমরাজের খারাপ লাগছে, ছেলের জন্য আমি কিছুই করে আসতে পারলাম না। তিনি ছেলেকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, 'আমি যমরাজ, তোমার বাবা, তোমার মায়ের জ্বালায় আমাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল। তুমি বৈদ্যের কাজ করা শুরু করে দাও, আমি তোমার সাথে আছি। তুমি যে ওষুধই দেবে তাতেই রোগী ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু রোগীর শিয়রে যদি আমাকে দেখ, তাহলে বুঝবে এই রোগী বাঁচবে না'। যমরাজের কথা মত বৈদ্যের কাজ করে ছেলেটির ভালই রোজগার হতে লাগল।

ইতিমধ্যে এক রাজকুমারীর শরীরে এক দুরারোগ্য ব্যাধি ঢুকেছে। কোন বৈদ্য রাজকুমারীর রোগ নিরাময় করতে পারছে না। ইতিমধ্যে রাজা ঘোষণা করে দিয়েছে, আমার মেয়েকে যে ভাল করে দিতে পারবে, তাকে আমি আমার অর্দ্ধেক রাজ্য ও আমার মেয়ের সাথে বিয়ে দেব। ছেলেটি খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছে গেছে। গিয়ে দেখছে মেয়েটির শিয়রে যমরাজ দঁড়িয়ে আছেন। সে অনেক

করে বলছে, বাবা, আপনি চলে যান। যমরাজ কিছুতেই যাবেন না। তখন ছেলেটির মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। সে দরজার বাইরে গিয়ে মিছি মিছি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে, 'মা তুমি অনেক দিন ধরে বাবাকে খুঁজছিলে, এই তো বাবা এখন এখানে দাঁড়িয়ে আছে'। ওই শুনে যমরাজ সেখান থেকে এমন দৌড়ে পালালেন যে, আর তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। এই হল সংসার জ্বালা, যার ভয়ে যমরাজকেও পালাতে হল।

সংসার জ্বালা এমন জ্বালা, ঠাকুর বলছেন, সেখানে যাওয়ার কথা হয়েছিল, আমি বললাম রামলালের খুড়িকে জিজ্ঞেস কর, অর্থাৎ শ্রীশ্রীমাকে। শ্রীশ্রীমা বলে পাঠালেন, গিয়ে কাজ নেই। ঠাকুরের আর যাওয়া হল না। ঠাকুর বলছেন, আমি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী সন্ন্যাসী, স্ত্রী বলল, গিয়ে কাজ নেই; আমার আর যাওয়া হল না। সংসারে যারা আছে তাদের তাহলে কি দুরবস্থা। কি আর অবস্থা! *অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।* এখানে কোন পথ নেই, পুরো ফেঁসে যেতে হবে। সংসার বৃক্ষের এমন জাল যে, বাঁচার কোন পথ নেই, এ এক মহাজাল।

> ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
> নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
> অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
> মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা।।৩

(ইহলোকে এই সংসাররূপ অশ্বত্থের উক্তপ্রকার রূপ উপলব্ধ হয় না, কারণ স্বপ্ন-মরীচিকার ন্যায় এটা দৃষ্ট-নষ্ট-স্বরূপ। এই সংসারের আরম্ভ নাই, কারণ এটা অনাদি। এর অন্ত নাই, কারণ এটা ব্রহ্মজ্ঞাননাশ্য, অন্য প্রকারে নাশ্য নয়, এবং এর মধ্যও (সংস্থিতিও) জানা যায় না; কারণ এটা প্রমাণগম্য নয়, প্রতীতিমাত্র। এই দৃঢ়মূল সংসার-বৃক্ষকে তীব্র বৈরাগ্যরূপ (পুত্র, বিত্ত ও লোকের এষণা ত্যাগরূপ) শাণিত অস্ত্র দ্বারা ছেদন করে......)

বাঁচার কোন পথ নেই ঠিক কথা, তবে একটি উপায় আছে। তোমার সংসার আলাদা, আমার সংসার আলাদা, সংসারের কোন objective reality নেই। আমার হাতে একটা পেন আছে, আমাদের মনে হয় পেনের একটা objective reality আছে। কিন্তু এই পেনকে আধার করে যে সংসার, এটা আমার সংসার। কিছু জিনিস আছে, যেমন আগুন, আগুনের ধর্ম হল দাহিকা শক্তি। কিন্তু ওই আগুন দিয়ে কারুর বাড়ি পোড়ান হচ্ছে বা কেউ রান্না করছে; এটা হল আমার সংসার। বাহ্য জগৎ আর সংসার, দুটো আলাদা জিনিস। গীতাতে এখানে জগতের বর্ণনা করা হচ্ছে না, বর্ণনা করা হচ্ছে সংসারবৃক্ষের। বাহ্য জগৎ আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করে থাকি, কিন্তু সংসার হল আমার মনের প্রতিক্রিয়া। আমি যদি মুক্ত হয়ে যাই, তারপরেও জগৎ থাকবে। আমি যদি মুক্ত হয়ে যাই, বাকিদের সংসার থাকবে। আপনি যদি মুক্ত হয়ে যান, আপনার সংসার নাশ হয়ে যাবে, কিন্তু আমার সংসার থাকবে। আমি মরে যাই, মুক্তি পেয়ে যাই, যেটাই আমার হয়ে যাক, জগৎ থাকবে। কারণ জগৎ ঈশ্বরেরই একটা রূপ।

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখম্, ভগবান যত দিন থাকবেন সৃষ্টিও তত দিন থাকবে, এর কোন ব্যতিক্রম নেই। তার সঙ্গে থাকবে এই মহাজালে যারা আছে, তাদের সংসার। আমার আপনার ব্যক্তিগত যে প্রতিক্রিয়া, আমার আপনার যে ব্যক্তিগত ধারণা, যেটাকে ভিত্তি করে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, এটা থাকবে, এটা কোন দিন যাবে না। তাহলে উপায় কি? এই যে বলছেন, *ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে,* এই সংসারবৃক্ষকে সাক্ষাৎ দেখা যায় না। আপনার সংসারকে আমি দেখতে পারব না, আমার সংসারকেও আপনি দেখতে পারবেন না।

নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা, এই সংসারের না আছে আদি, না আছে অন্ত, না আছে মধ্য। এই সংসারের আদি, অন্ত, মধ্য কিছুই দেখা যায় না। একাদশ অধ্যায়ে ভগবান যখন তাঁর বিশ্বরূপ

অর্জুনকে দেখালেন, তখন এটাই অর্জুন ভগবানকে বললেন, আপনার এই রূপের না আছে অন্ত, না আছে আদি, না আছে মধ্য। সংসার বৃক্ষ ঠিক সেই রকম। আচার্যও বলছেন, *ন রূপম্ অস্য ইহ যথা বর্ণিতং তথা ন এব উপলভ্যতে*। এই রকম কোথাও পাওয়া যায় না। কি রকম? আচার্য বর্ণনা করছেন, *স্বপ্নগরীচ্যুদকমায়াগন্ধর্বনগরী সমত্বাদ্*, মৃগমরীচিকার জল আর মায়া দ্বারা রচিত গন্ধর্বনগরীর মত এই সংসার, এই আছে এই নেই। যেমনি ধরতে যাব দেখা যাবে ওটা নেই, আসলে সংসার জিনিসটাই নেই। ঠাকুর বার বার বলছেন, জাদুকরই সত্য জাদুটা মিথ্যা। গভীরে যেমনি যাওয়া যাবে, দেখবে কিছু নেই।

মজনু বাদশাকে লায়লার নামে বলছে, জাঁহাপনা! আপনার চোখ দিয়ে লায়লাকে দেখবেন না, আমার চোখ দিয়ে দেখুন লায়লা কত রূপসী। আমরা যাকে ভালবাসি, সে যে রকমই দেখতে হোক তার মত রূপ আর কারুর নেই, নিজের চোখ দিয়ে দেখছি কিনা। আমার স্ত্রীর মত বা আমার স্বামীর মত দুনিয়ায় আর একটিও পাওয়া যাবে না, আমার সন্তানের মত সন্তান হয় না। কলকাতার লোকেদের কাছে কলকাতার মত শহর আর কোথাও নেই। বাঙ্গালীদের কাছে বাংলার মত ভাষা নেই, হিন্দুদের কাছে হিন্দু ধর্মের মত ধর্ম হয় না, আমেরিকানদের কাছে আমেরিকার মত দেশ নেই, ভারতীয়দের কাছে ভারতবর্ষের মত দেশ হয় না; এটাই আমাদের স্বভাব। কারণ objective দিয়ে আমরা কোন দিন প্রমাণ করতে পারব না। যাকে পছন্দ করি না, তার চলন ব্যাঁকা। এই হিন্দু ধর্মকে স্বামীজী কত বিরাট বলেছেন, সেই হিন্দু ধর্মকেই বর্তমান কালের লিবারেলরা কত গালাগালি দিয়ে যাচ্ছে। এটাই আমার সংসার, এটাই আপনার সংসার।

বস্তুতঃ যদি এই সংসার সত্য হত, সংসারের সত্তা যদি থাকত তাহলে সবাই একই রকম কথা বলত। সূর্যোদয় হয়, এটা সবাই দেখে। কিন্তু সূর্যোদয় হলে আমি এক রকম করব, আপনি আর-এক রকম করবেন, কারণ এটা আমার সংসার, আপনার সংসার। জগৎ আর সংসার, এই দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। সংসারের সত্তা যদি থাকত তবে আমরা বলতে পারতাম কবে এর সৃষ্টি হয়েছে, কবে এর নাশ হবে। সংসার হল মায়া, মায়ার কোন সত্তা হয় না। যেমন মরীচিকার কোন সত্তা নেই, গন্ধর্বনগরীর সত্তা নেই, তেমনি এই সংসারেরও কোন সত্তা নেই। মরুভূমি থাকলে মরীচিকা থাকবেই, মরীচিকা আমাদের মনের উপর নির্ভর করে। মরীচিকা থাকবেই, এখানে কারুর কিছু করার নেই, অথচ এর বাস্তবিকতা নেই। সেইজন্য বলছেন, না আছে এর আদি, না আছে এর মধ্য, না আছে এর অন্ত। প্রথম থেকে এই সংসার চলে আসছে। তার সাথে আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *ইত আরভ্য অয়ং প্রবৃত্ত ইতি ন কেনচিৎ গম্যতে*, কেউ জানে না কিভাবে কবে থেকে এই সংসার সৃষ্টি হল।

স্টিফেন হকিংসের মত বড় বড় ফিজিক্সের লোকেরা খুব বলবেন, সৃষ্টি এই পর্যন্ত হয়েছে, ওই পর্যন্ত হবে ইত্যাদি। কিন্তু সংসার যেখানে আমিত্বে জুড়ে আছে, এর সৃষ্টি কিভাবে হল, কবে হল, কেউ জানে না। সেইজন্য এর না আছে আদি, না আছে মধ্য, না আছে অন্ত, তাই এর স্থিতিও নেই। যার আদি আছে অন্ত আছে তাকে মারা যাবে। কিন্তু যার আদি নেই অন্ত নেই, তাকে আমরা মারব কিভাবে? মারা যাবে না। *অশ্বত্থম্ এনং যথোক্তং সুবিরূঢ়মূলং*, এই যে অশ্বত্থ বৃক্ষ, যেটা সংসার রূপে দাঁড়িয়ে আছে, এর যে শিকড়, আর তার আনুষঙ্গিক শিকড়গুলো এত গভীরে ঢুকে আছে যে, একটু সামান্য কিছু হয়ে গেলে আমরা বিলাপ করতে শুরু করে দিই – ওগো আমার কি হলো গো, আমাকে কে দেখবে গো, আমি শেষ হয়ে গেলাম। কেন আমাদের এই রকম হচ্ছে? কারণ আমাদের শিকড়গুলো এমন ভাবে গেঁথে রয়েছে, *সুবিরূঢ়মূলম্*। এই শিকড় গাজর মূলো না যে, এক টান মেরে তুলে নেব। আর সংসারবৃক্ষ এমনি গাজর মূলো না যে, যেটাকে আমরা রোজ কুচি কুচি করে কেটে স্যালার্ড বানিয়ে খাব। এই সংসার অশ্বত্থ বৃক্ষ, *সুবিরূঢ়মূলম্;* যার না আছে আদি, না আছে অন্ত, না আছে মধ্য।

আমরা যারা এই কথাগুলো শুনছি, শুনতে শুনতে ভাবছি এটাকে যদি জীবনে লাগাতে পারতাম, কি উপকারই না হত। সব কিছুকে এভাবে দাড়িপাল্লা দিয়ে মাপতে যাবেন না, সব কিছুকে এভাবে মাপা যায় না। এটা জ্ঞান, এই জ্ঞান আমাদের পূর্বজদের জ্ঞানরাশি। আমরা এই জ্ঞানরাশিকে জানছি, এটাই অনেক। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাদের ধর্মের প্রতি, জ্ঞানের প্রতি একটু রুচি আছে, তাদের এটা ভাল করে বুঝে নিতে হবে, ঠাকুরও বলছেন, মানুষ আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা এবং স্ক্রুপ দিয়ে মারা। তাই বাঁচার আমাদের কোন পথ নেই। আমরা সবাই এই সংসারে ফেঁসে আছি, যদিও এটা আমার নিজের সংসার, আমার সংসার আমার সংসার, আপনার সংসার আপনার সংসার, সার্বজনীনতা এখানে নেই। সমষ্টি সংসার না, সংসার ব্যষ্টি, কিন্তু এই সংসার হল *সুবিরূঢ়মূলম্*, মূল যার *সুবিরূঢ়*। যে বৃক্ষের মূল *সবিরূঢ়*, তার শাখা-প্রশাখা কি রকম হবে? একেবারে জাঁদরেল।

ন্যাকা ন্যাকা ভক্তরা এসে বলে, মহারাজ কিসে ভক্তি হয় একটু বলবেন? আমার নিজেরই হল না, আপনাকে আমি কি বলব! ভক্তি এত সহজ না। জন্মজন্মান্তরের অনেক তপস্যা করা থাকলে একটু ভক্তিভাবের উদয় হয়। আচার্য শঙ্কর বলছেন, তিল তিল করে অনেক জন্মের পূণ্য সঞ্চয় হলে সাধুসঙ্গের ইচ্ছা জাগে। বেলুড় শহরে কত লোক আছে, কজন লোক বেলুড় মঠে আসে সাধুসঙ্গ করার জন্য? কজন আসে সাধুদের শ্রদ্ধা করার জন্য? আমরা খবর পাই, আমাদের লেকচার শুনছে বলে বাড়ির লোকেরা তাকে গালাগাল দেয়। এদের কোন পূণ্য নেই। অনেক জন্ম ধরে একটু একটু করে পূণ্য সঞ্চয় হলে গিয়ে সাধুসঙ্গ বা শাস্ত্রসঙ্গ, সাধু আর শাস্ত্র একই, করার রুচি আসে। সেখান থেকে হয়ে হয়ে আরও পূণ্য সঞ্চয় হলে তখন ইচ্ছে হয়, সংসারটাকে এবার আমি উৎখাত করব। এই সংসার গাজর মূলো নয়, লাউ কুমড়ো নয় যে, কচ্ কচ্ করে কেটে দেব। সেতো একটা বাচ্চাও কেটে দিতে পারে। তাহলে কিভাবে কাটা যাবে? *অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা*।

জীবনে যদি কেউ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চায়; জীবনে যদি কেউ একটু টাকা-পয়সা চায়, জীবনে যদি একটু নামযশ চায়, তাহলে তাদের জন্য *অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা*, গীতার এই শ্লোকটি একটি সাংঘাতিক শ্লোক। যতক্ষণ না সে অসঙ্গ হচ্ছে, যতক্ষণ সে ওই সব কিছু থেকে সরে না আসছে, কোন দিন সে সাফল্য পাবে না। জীবনে আমরা সফল কিভাবে হব? একটু পিছিয়ে আসতে হবে। যাঁরা ক্রিকেট খেলেন বা ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা জানেন, যদি ব্যাটের উপর বল রেখে ছক্কা মারতে যায়, কোন দিন সে ছক্কা মারতে পারবে না। ছক্কা মারতে হলে, বল থেকে ব্যাটকে একটু পিছিয় এনে তারপর বলটাকে ছক্কা মারে। দূরত্ব যত রাখা যাবে, তত জীবনে সাফল্য আসবে। অনাসক্ত যত হওয়া যাবে, তত সফল হবে।

ঠাকুর বর্ণনা করছেন, দুই বন্ধু মেলাতে গেছে। এক বন্ধু ঠাকুরদেবতার মূর্তি দেখছে, আর-এক বন্ধু অন্য একটা জায়গায় এক উপপত্নী তার উপপতিকে ঝাঁটা দিয়ে পেটানোর মূর্তি দেখে যাচ্ছে। এই বন্ধুটি চিৎকার করে আগের বন্ধুকে ডাকছে, 'ওরে তুই ওখানে কি দেখছিস, এখানে দেখবি আয়'। ভোগের জিনিস দেখলেই, ভোগের একটু গন্ধ পেলেই মানুষ সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কি ভোগ করবে, সেখানে কি ভোগ করা সম্ভব। যারা ভোগ করে, তারা ভোগের জিনিসের থেকে একটু দূরে থাকে।

রম্ভা আর মেনকার মধ্যে একবার ঝগড়া লেগেছিল, দুজনের মধ্যে কে ভাল নৃত্য করতে পারে। বিচার করার জন্য একজন ঋষিকে ডেকে পাঠানো হল। ঋষিকে কেন ডাকা হল? কারণ ঋষি এই সমস্ত কিছু থেকে আলাদা। ঋষি এসেছেন, তিনি এসে কায়দা করে দুজনের হাত ফুল দিয়ে বললেন, এই ফুল নিয়ে তোমার নৃত্য করে দেখাও। উনি কায়দা করে দুটো ফুলের মধ্যে পোকা রেখে দিয়েছেন। পোকা এবার দুজনকেই অল্প অল্প কামড়াতে শুরু করেছে। তার মধ্যে একজনের পোকার কামড়ের জ্বালায় তার তালটা একটু কেটে গেল। এর যে তাল কেটেছে, এটা কেউ বুঝতে পারছে না, একমাত্র ঋষিই বুঝতে পেরেছেন। দেবতারাও ধরতে পারলেন না, কারণ তাঁরা দিনরাত

এই ভোগের মধ্যে আছেন, তাঁরা আর কি বুঝবেন। Appreciate যদি কোন জিনিসকে করতে হয় ওই জিনিস থেকে তাকে সরে আসতে হবে। যে কোন কিছুর মূল্যায়ন করার জন্য, শিল্প, কলা, সাহিত্য এই জিনিসগুলোকে যদি মূল্যায়ন করতে হয় তাহলে perspective দরকার হয়, perspective মানে একটু পিছনে সরে আসা।

অসঙ্গশস্ত্রেণ, কি সেই অস্ত্র, যেটা দিয়ে সংসার বৃক্ষকে উৎখাত করতে হবে? সেটা হল *অসঙ্গ*, সম্পূর্ণ অনাসক্ত। এই অনাসক্ত অস্ত্র দিয়ে এক কোপে বৃক্ষকে কেটে দিতে হবে। এটা মূলো, গাজর না, এটা অশ্বত্থ বৃক্ষ। এই অশ্বত্থ বৃক্ষ, আগে যার বর্ণনা করা হল, *ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখম্*, সেখান থেকে বলা হল *অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা*, সেখান থেকে এবার বলছেন, *ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে*, এর যে কি শক্তি, কি *সুবিরূঢ়মূলম্* বলার পর বলছেন, উপায় নেই ভাই, কোন উপায় নেই। উপায় একমাত্র হল *অসঙ্গশস্ত্রেণ*, অনাসক্তরূপী এই অস্ত্রে এক কোপে সংসারকে কেটে উৎখাত করে দিতে হবে। এটা এমনি কুড়োল নয়, সাধারণ কুড়োল না। খুব বিশেষ কুড়োল লাগে, কি বিশেষ? সম্পূর্ণ অনাসক্ত। বোকা বোকা ভক্তরা এসে বলে, মহারাজ কি ভাবে হবে, সংসার থেকে কিভাবে বেরোব? *অসঙ্গশস্ত্রেণ*, ঠাকুরের নামে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেখান তো কত দম আছে আপনার। কে আপনাকে আটকাবে। পায়ে হেঁটে উত্তরকাশী, হিমালয়ে চলে যান দেখি। অত ঢং ঢাং করার কি আছে, যেন এক্ষুণি সমস্ত বৈরাগ্য আপনার ভিতরে এসে গেছে। এখান থেকে হাওড়া পর্যন্ত যেতে যেতেই দেখবেন বৈরাগ্য কমতে শুরু হয়ে গেছে। অসঙ্গ মানে, যখন কোন কিছুর সাথে জুড়ে নেই। সংসারকে কাটতে হবে, তাই সংসারের সাথে যেন জুড়ে না থাকে, এই কুড়োল সংসার থেকে যেন আলাদা থাকে।

সংসার থেকে যদি আলাদা থাকে তাহলে কি হবে? আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *অসঙ্গঃ পুত্রবিত্তলোকৈষণাদিভ্যো ব্যুত্থানং*, পুত্র, বিত্ত, লোকৈষণা এই সব কিছু থেকে সে এবার সরে এসেছে। তার সন্তানের প্রতি কোন মোহ নেই, স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি কোন মায়া নেই, টাকা-পয়সার দিকে কোন আসক্তি নেই, আমার কি হবে এই ভেবে সে কখন অস্থির হয় না। একবার কোন কিছু নিয়ে অশান্তি হওয়াতে আমাদের এক সিনিয়র মহারাজকে বললাম, 'মহারাজ, আমি চললাম'। সেই মহারাজ আমাকে তখন বললেন, 'হ্যাঁ যাও, তোমার কিসের অসুবিধা, তুমি সন্ন্যাসী, ঠাকুর তোমাকে দেখবেন'। সন্ন্যাসীকেই শুধু দেখেন না, ঠাকুর সবাইকে দেখেন। আপনি বলুন, ঠাকুরের জন্য আমি সব কিছু ছেড়ে দিচ্ছি। ঠাকুর গল্প বলছেন, গোয়ালিনী ভগবানের নাম করে রোজ দুধ নিয়ে যায়। একদিন কোন মাঝি না থাকাতে সে ভগবানের নাম করতে করতে নদীর জলের উপর দিয়ে হেঁটে দুধ নিয়ে ব্রাহ্মণের বাড়িতে হাজির হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ জানতে চাইলেন, তুমি এত সকালে কিভাবে এলে? সব শুনে ব্রাহ্মণও নদীর উপর দিয়ে হেঁটে যাবে বলে এসেছে। জলে নামতে গিয়ে তাঁর ভয় হচ্ছে, আমার ধুতিটা না ভিজে যায়। তিনি ধুতি গোটাতে থাকলেন। সব কিছু ছাড়তে রাজী, মুখে বলা সহজ, কিন্তু অত সহজ না। পুত্র, বিত্ত আর লোক, এই তিনটেকেই ছাড়তে হবে। শুধু কামিনী কাঞ্চনই না, এই জগতে এমন কিছু অবশিষ্ট থাকবে না, যাতে সামান্যতম আকর্ষণ থাকবে। নিজের জীবনের প্রতি কোন আকর্ষণ থাকবে না, মৃত্যুর প্রতি না, সম্মানের প্রতি না।

তার সাথে বলছেন, *অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন*, অসঙ্গ শস্ত্রটা দৃঢ় করতে হবে। কি ভাবে দৃঢ় হবে? সংসার থেকে সরে আসার কথা বলা হল, তার সাথে *পরমাত্মাভিমুখ্যনিশ্চয়দৃঢ়ীকৃতেন*, পরমাত্মার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দৃঢ় করতে হবে। কুড়োলকে, তরোয়ালকে ধার দিতে হয়। এই শস্ত্রটাই হল অসঙ্গের, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা, কোন এষণা থাকবে না। সন্ন্যাসের সময় বিরাট একটা তালিকা থাকে, কেশৈষণা থাকবে না, চুল, দাড়ি, গোফের প্রতি কোন এষণা থাকবে না। অস্থৈষণা, নিজের হাড়ের প্রতি কোন এষণা থাকবে না, কোন এষণা থাকা চলবে না। এষণা মানে ইচ্ছা, কোন কিছুর প্রতি ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা থাকবে না।

আমাদের একজন খুব ভাল সাধু, ভিতরে প্রচণ্ড ত্যাগের ভাব। উনি এক সময় স্বামী রঙ্গনাথানন্দের সঙ্গে ছিলেন। উনি নিজের মুখে একটা ঘটনা বলছিলেন। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ তখন অধ্যক্ষ। এক ভক্ত পরিবার অধ্যক্ষ মহারাজকে প্রণাম করতে এসেছে, সঙ্গে তিন-চার বছরের একটি ছোট বাচ্চাও এসেছে। অধ্যক্ষ মহারাজকে প্রণাম করে পরিবারটা বেরিয়ে আসছে, সেই সময় এই মহারাজ বাচ্চাটির গালে হাল্কা করে আদর করেছেন। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজীতে 'নো' 'নো' করে উঠেছেন, ওই মহারাজকে সঙ্গে সঙ্গে আটকে দিলেন। বাচ্চাটাকে দেখে তোমার মনে হচ্ছে খুব আদরের, তোমার আদর করতে ইচ্ছে জেগেছে মানে তুমি শেষ। কল্পনা করা যায়, কি ধরণের ত্যাগ লাগে! এই ঘটনা দেখিয়ে দেয়, স্বামী রঙ্গনাথানন্দের ত্যাগ কোন স্তরের। তিনি নিজে শুধু ত্যাগের ওই পর্যায়ে পৌঁছে থেমে থাকেননি, তাঁর আশেপাশে যাঁরা আছেন, কাউকে তিনি একটু ডান দিক বাম দিক হতে দিচ্ছেন না। এটাকে বলে অসঙ্গ।

এই শস্ত্রটাকে আমরা ধার দেব কি করে? ওর তেজ, ওর শক্তি কোথা থেকে আসবে? মনের জোর আসবে পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা থেকে সরে এসে, কিন্তু ধার কোথা থেকে আসবে? ধার আসবে, ঠাকুরের কাছে গিয়ে বারবার বলতে হবে, প্রভু তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়, তুমিই আমার পরমগতি; তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকে জানি না, চিনি না। আমরা হয়ত ভুলে গেছি, নবম অধ্যায়ে বলা হয়েছিল *অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্*, সেখানে বলা হয়েছিল, এই সংসার অনিত্য, অসুখম্, এটাকে ভাল করে বুঝে নাও। ভাল করে বুঝে নিয়ে *অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা*, সংসারকে কেটে উৎখাত করে দাও। এখানে কেউ নেই, বাবা নেই, মা নেই, ভাই নেই, বোন নেই, স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, কেউ নেই। কবীর দাসের ভজনে বলছেন, যে এই পথে আসতে চাইছ, সে নিজের বাড়িতে আগে আগুন লাগিয়ে বেরিয়ে আসুক। এই দম যদি ভিতরে থাকে, তাহলে এগিয়ে এসো। তা নাহলে ধর্ম জীবন তোমার জন্য নয়। আসলে ধর্ম জীবন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্যই ঠিক করা থাকে। বাকিরা হরিবোল হরিবোল করবে।

এটা করার পর কি করতে হবে? *পুনঃ পুনর্বিবেকভ্যাসাশ্মনিশিতেন*, বার বার, দিনরাত বিবেক বৈরাগ্যের অভ্যাস করে যাচ্ছে। ছুরি কাঁচিতে যেমন ধার দেয়, পাথরের উপর বার বার ঘষছে, সেই রকম বিবেক বৈরাগ্যের অভ্যাস মানে ঘষা হচ্ছে, ধার দিয়ে যাচ্ছে। কুড়োল চালাতে দুটো জিনিস লাগবে, কুড়োলের ধার থাকতে হবে আর কুড়োলকে চালানোর জন্য হনুমানজীর মত শক্তি। হনুমানজীর চরিত্র বাল্মীকি অতটা ভেবে করেছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। শ্রীরামচন্দ্র ছাড়া আর কাউকে হনুমানজী জানেন না, শ্রীরাম ছাড়া অন্য সব কিছুতে পুরো নির্বিকার। অথচ কি প্রচণ্ড শক্তি, এই শক্তির প্রকাশ একমাত্র রাম কাজে। তুলসীদাস বলছেন, রাম কাজো করি বৈ কো আতুর, রামের কাজ করার জন্য হনুমানজী আতুর। ঈশ্বর বই, শ্রীরাম ছাড়া হনুমানজী আর কিছু জানেন না। সেখান থেকে বারবার ধার দিয়ে যাচ্ছেন, দিয়ে এক কোপে সংসারকে কেটে দিলেন।

অনেক এসে আমাদের বলে, মহারাজ, আমার না সংসার ছেড়ে চলে যেতে খুব ইচ্ছা করে। চলে যান না, কে বারণ করেছে! কত দূর যাবেন, হাওড়া যাবেন, সেখান থেকে হরিদ্বার যাবেন। ঠাকুর এই রকম একজনের বর্ণনা করছেন, কাশীতে গিয়ে বাড়িতে চিঠি লিখছে, তোমরা আমার জন্য চিন্তা করিও না, এখানে আমার একটি কর্ম হইয়াছে। আমার পরিচিত একজনের খুব এই রকম ইচ্ছে হয়েছিল, বয়স কম, সন্ন্যাসী হতে চাইছে। কোন কারণে রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাস হবে না। আমাকে জিজ্ঞেস করছে, আমি হরিদ্বার যাব, ওখানে এ্যাটাচড্ বাথরুম পাওয়া যাবে, বাথরুমে কমট থাকবে? আমি বলতে বাধ্য হলাম, এত হিসাব করে কি সন্ন্যাসী হওয়া যায়? এ্যাটাচড্ বাথরুম পাওয়া যাবে কিনা, ঘরে জানলা থাকবে কিনা, রিডিং ল্যাম্প থাকবে কিনা, এত হিসাব করলে কি আর সন্ন্যাসী হওয়া যাবে। আগে তো সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে পড়। পেট খারাপ বা কোন কারণে আমাকে বাধ্য হয়ে একটা শৌচালয়ে যেতে হয়েছে, যেটা অত্যন্ত নোংরা। কোন রকমে সেখানে কাজ সেরে প্রাণ

ছেড়ে ওখান থেকে বেরিয়ে আসব, এই সংসারটাও ঠিক ওই রকম শৌচালয়, সংসার থেকেও ঠিক সেই ভাবে বেরিয়ে আসতে হবে। এটাকেই উপনিষদে বলছেন, *তপ্তশিরোবৎ*, মাথার চুলে আগুন লেগে গেছে, এবার সে দৌড়াচ্ছে কোথায় পুকুর আছে, সেখানে ঝাঁপ দেবে।

সংসার ছেড়ে বেরিয়ে তো এলো, ঝাঁপ তো দিল, কিন্তু তারপর কি হবে? সংসার চলে গেল, জগৎ চলে গেল, গ্যারান্টি এবার সে একটা বদ্ধ পাগল হয়ে যাবে। আমরা এই লাইনে আছি বলে জানি, সংসার ছাড়লে পাগল হয়ে যাবে, কারণ দুটোই চলে গেল কিনা। বানর এক ডাল থেকে আরেক ডালে ঝাঁপ মারল, মাঝখানে এখন ঝুলে আছে। সংসার ছাড়লে পাগল হয়ে যাবে। বাড়িতে একদিন কেউ করে দেখুন, বাড়ির লোকদের বলুন, আমি তিন দিনের জন্য সন্ন্যাসী হয়েছি। তারপর এক ঘরে তিন দিন চুপচাপ নিজেকে বন্ধ করে রাখুন। মানুষ পাগল হয়ে যাবে, দু ঘন্টা পরেই কি করব, কার সাথে কথা বলব, ভেবেই পাগল হয়ে যাবে। শুধু সংসারকে উৎখাত করলেই হবে না, সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরকেও ধরতে হয়। কিভাবে ঈশ্বরকে ধরতে হবে? সেটাই এবার ভগবান পরের শ্লোকে বলছেন।

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।।৪।।

(এই দৃঢ়মূল সংসার-বৃক্ষকে তীব্র বৈরাগ্যরূপ (পুত্র, বিত্ত ও লোকের এষণা ত্যাগরূপ) শাণিত অস্ত্র দ্বারা ছেদন করে, যাঁকে প্রাপ্ত হলে সংসারে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, সেই পরমপদের অন্বেষণ করতে হয়। যাঁর থেকে এই অনাদি সংসারপ্রবাহ নিঃসৃত হয়েছে, আমি সেই আদি ব্রহ্মপুরুষেরই শরণাপন্ন হই।) (শরণাগতিই পরমপদের অন্বেষণ)

সংসার উৎখাত করলেই হয় না, সাথে সাথে প্রভুকে ধরতে হয়। *ততঃ পদং তৎ*, পদ হল সেই অবস্থা, যে অবস্থায় গিয়ে মনের লয় হয়ে গেলে জন্মমৃত্যুর চক্রে আর ঘুরপাক করতে হয় না, যেমন বলা হয় বিষ্ণুপদ, রামকৃষ্ণপদ। কিভাবে সেই পদে পৌঁছান যাবে? সেই পদ কিভাবে পাওয়া যাবে যেখানে পৌঁছালে আর এই সংসার বৃক্ষে ঘুরপাক খেতে হবে না? সংসার বৃক্ষ মানেই তো জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখ, রাগদ্বেষ, পাপপূণ্য, ধর্ম অধর্ম এর মধ্যে ঘুরপাক। *যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ*, সেই পরমপদে চলে গেলে আর এই সংসার বৃক্ষে ঘুরপাক খেতে হবে না।

কিভাবে সেই পরমপদের অন্বেষণ করতে হবে? *তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তি প্রসৃতা পুরাণী*, যিনি এই সংসার বৃক্ষের সৃষ্টি করেছেন, আগে মায়াপোধিক ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছিল, যিনি এই মায়ার রচনা করেছেন, এই জাদুর যিনি কারিগর, তিনি সেই আদিপুরুষ, সগুণ সোপাধিক ঈশ্বর। তাঁকে আমরা যে নামেই সম্বোধন করি না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। পূজো সব সময় সোপাধিক ব্রহ্মেরই করা হয়। এই জিনিসটা আমরা অনেক সময় বুঝি, অনেক সময় বুঝি না। যেমন না বুঝেই অনেকে বলে, আমার মা-বাবাই ঈশ্বর, সব বোকা বোকা কথা। পরম্পরাগত ভাবে এমনি যত পূজা হয়, বেদ পুরাণ থেকে যত রকম পূজা আমাদের পরম্পরাতে এসেছে, সব পূজাতে এই আদিপুরুষের পূজাই হয়। আদিপুরুষ কে? যিনি এই সংসার বৃক্ষকে সৃষ্টি করেছেন। সেই আদিপুরুষের যে অবস্থান এটাই পরমপদ, যেখানে পৌঁছে গেলে আর এই সংসার বৃক্ষে ফিরে ফিরে আসতে হয় না।

পরে এই জিনিসটাকে নিয়ে আবার প্রশ্ন উঠবে। সেখানে প্রশ্ন করা হবে, এই যে বলছেন, সংসারবৃক্ষে আর ফিরে আসতে হয় না; তা কি করে হবে, কারণ কোন জিনিস যখন কোথাও যায় সেই জিনিস সেখান থেকে আবার ফেরৎ আসে। তখন সেখানে আচার্য খুব সুন্দর উত্তর দেবেন।

আচার্যের এটাই বৈশিষ্ট্য যে, তিনি এত সুন্দর ভাবে প্রশ্নগুলি তোলেন, ধর্মকে নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে যত রকমের প্রশ্ন উঠতে পারে, সমস্ত প্রশ্নগুলিকেই তিনি উত্থাপন করে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে উত্তর দিয়ে সব রকম সংশয়ের অবসান করে দিয়েছেন। কোন প্রশ্নকে তিনি বাকি রাখেননি। আমরা যত রকমের যুক্তি ঠিক করে রেখেছি, উনি আগেই ওই প্রশ্নটা নিয়ে এসেছেন। তুমি এটা বলতে চাইছ, তোমার মনে এই প্রশ্ন এসেছে তো, ঠিক আছে, এই হল উত্তর।

ততঃ পরং তৎ পরিমার্গিতব্যং, সেই পরমপদের তুমি অন্বেষণ কর। *যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে*, প্রার্থনা এইভাবে করতে হবে, যাঁর যিনি ইষ্ট তিনি সেই ইষ্টকে প্রার্থনা করবে, হে ঠাকুর, বা হে কৃষ্ণ, বা হে রাম, বা হে মহাদেব, বা হে মা দূর্গা, হে মা কালী আমি তোমার শরণাগত, আমি তোমার শরণাগত। নিজের ইষ্টের শরণাগতি নিতে হয়, শরণাগতি ছাড়া হয় না। ইদানিং কালের কিছু অর্দ্ধ শিক্ষিতরা যাঁরা ধর্মের উপদেশ দিয়ে বেড়ান, তাঁরা নিজেদের মত করে কিছু কিছু কথা বলেন। কিন্তু এখানে যে শরণাগতির কথা বলছেন, খুব উচ্চস্তর থেকে শরণাগতির কথা বলছেন। এখানে পরিষ্কার বোধ আছে, আমার কি চাই –সংসারবৃক্ষের উৎখাত। এই বৃক্ষের উৎখাত কি দিয়ে হবে? কুড়োল দিয়ে। এই কুড়োল কি? এই কুড়োলটা হল সম্পূর্ণ বৈরাগ্য, অনাসক্ত, *অসঙ্গ শস্ত্রেণ*। কুড়োলের ধার হবে কি করে? ভগবানের সম্মুখে দণ্ডয়মান হয়ে বারবার বলতে হবে, প্রভু আমি শুধু তোমাকেই চাই, এই দুনিয়াতে তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়, তুমি আমার পরমগতি। এই বোধ যদি না থাকে সংসার উৎখাত হবে না। সংসার যদি উৎখাত না হয়, তাঁকে পাওয়া যাবে না, দুটো এক অপরে সাথে জুড়ে আছে। প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে বার বার বলতে হবে, হে প্রভু, আমি তোমার শরণাপন্ন, আমি তোমার শরণাগত। এই ভাবটাকে রেখে অসঙ্গশস্ত্রকে ধার দিয়ে যাচ্ছে, ধার দিতে দিতে কুড়োলের ধার তীক্ষ্ণ হয়ে গেল, তার সাথে পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা, যত রকমের এষণা হতে পারে, সব এষণা চলে গেছে। এরপর এক কোপ মারল, বৃক্ষ উৎখাত হয়ে গেল।

তার মানে, আমাদের নিজের তরফ থেকে প্রথম দরকার ত্যাগ। আর নিয়মিত, একদিন দুদিন না, এটাই চলতে থাকবে। কত দিন? বছরের পর বছর চলতে থাকেব, যত দিন না এই সংসার বৃক্ষ উৎখাত না হয়ে যায়। আর পথ হল, প্রভুর কাছে মাথা নত করে বারবার বলে যেতে হবে, হে প্রভু, আমি তোমার শরণাগত, শরণাগত। ঠাকুর খুব সুন্দর উদাহরণ দিচ্ছেন, যার চাকরি চলে গেছে, সে রোজ অফিস খোলার পর অফিসের বড়বাবুর সামনে গিয়ে বলবে, আজ কি কোন কর্ম খালি হয়েছে? তত দিন ঠিক এইভাবে আমাদের ঠাকুরের কাছে আমাদের হাতজোড় করে দাঁড়াতে হবে, যত দিন না সেই শক্তি আসছে, যে শক্তিতে সংসারকে উৎখাত করে দেওয়া যাবে।

কিভাবে ঈশ্বর লাভ হয়? এটা পাঁচ নম্বর শ্লোক থেকে বলবেন। এতক্ষণ সংসারের বর্ণনা করলেন, সংসারে আমাদের কি স্থান সেটা বললেন। সংসার উৎখাত করা দরকার, সেটা বললেন। কিভাবে হবে সেটাও বললেন। এবার বলবেন, আমাদের চরিত্র কেমন হবে, যেটা দিয়ে এই সংসার উৎখাত হবে। যতক্ষণ চরিত্রের মধ্যে এই গুণগুলির প্রকাশ না হয় ততক্ষণ আমরা সংসারবৃক্ষের ছেদন করতে পারব না। পাঁচ নম্বর শ্লোকে বলবেন, অব্যয় পদ যদি পেতে হয়, তাহলে তার এই এই গুণ লাগবে। আমাদের মনে যেন কোন মোহ না থাকে, কোন আসক্তি যেন না থাকে, আর কোন সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব যেন না থাক।

আলেকজাণ্ডার বিশ্ববিজয়ের জন্য বেরিয়েছেন। যদিও বিশ্ববিজয় বলা হচ্ছে, কিন্তু এশিয়ার কিছু দেশ শুধুমাত্র জয় করেছিলেন। তখনকার দিনে একটা প্রবাদ ছিল, যদিও এর পিছনে একটা লম্বা কাহিনী আছে, খুব সংক্ষেপে হল, একটা স্তম্ভে প্রচুর গিট দিয়ে বাঁধা একটা দড়ি বা বস্ত্র ছিল। প্রবাদ ছিল যে, যে এই গিট খুলে দিতে পারবে, সে পুরো এশিয়ার সম্রাট হবে। গিটগুলো এমন ভাবে ছিল যে তার আদি অন্ত কোনটাই খুঁজে পাওয়া যায় না। এই যে ভগবান এখানে খুব সুন্দর

বলছেন, *ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ণ চ সম্প্রতিষ্ঠা*, গর্ডিয়ান নট্ ঠিক ওই রকমই ছিল। আলেকজাণ্ডারের খুব ইচ্ছে সারা বিশ্বের সম্রাট হবে, তখন এশিয়াই ছিল বিশ্ব। আলেকজাণ্ডার নিজের ঘোড়ার পিঠে বসে ওই গর্ডিয়ান নটে তলোয়ারের এক কোপ মেরেছে। গিট কোথায় শুরু কোথায় গিয়ে শেষ হয়, কিছুই বোঝার উপায় নেই। আলেকজাণ্ডার তলোয়ারের এক কোপে সব গিটের সমস্যা মিটিয়ে দিল। লোকেরা মেনে নিল। আলেকজাণ্ডার এসব মানত না, লোকেদের মধ্যে বিশ্বাসের জন্য এক কোপে কেটে দিলেন। গীতা ঠিক এটাই বলছেন, এই সংসার হল গর্ডিয়ান নট্, কোথায় শুরু, কোথায় শেষ কিছু জানার উপায় নেই। এর গিট ছাড়াতে গেলে কটা গিট ছাড়াবে, সম্ভব না। আমরা যদি জীবন থেকে কাউকে বাদ দিতে চাই, কাকে জীবন থেকে বাদ দেব! এভাবে হয় না, একমাত্র পথ ধারালো অস্ত্র দিয়ে এক কোপ মারা।

কথামৃতে ঠাকুর খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন, একজন স্ত্রী তার স্বামীকে বলছে, 'ওগো অমুক কি সুন্দর এক এক করে নিজের স্ত্রীদের ছেড়ে দিচ্ছে'। স্ত্রী বলতে চাইছে, তুমি কত কামী, আমাতেই তুমি সব সময় পড়ে আছ। স্বামী তাকে বলছেন, 'ওরে ক্ষেপী এভাবে একটা একটা করে ত্যাগ হয় না, এই দেখ আমি চললাম'। বলে কাঁধে গামছা দিয়ে বেরিয়ে গেল। হিসেব করে ত্যাগ হয় না। এটা করে, সেটা করে, এই দিকটা একটু গুছিয়ে নিয়ে তারপর আমি বেরিয়ে যাব, এভাবে ত্যাগ কোন দিন হবে না। আর সংসার ত্যাগ করে দিলেই হল না। আমাদের কাছে এরকম অনেকেই আসে। দু পা এগিয়ে যারা সংসার ত্যাগের জন্য প্রস্তুত, ভিতরটা তাদের ভ্যাক্যুম্ হয়ে যায়। এদেরকে একটা সময় ঘোর তমো গুণ ধরে নেয়।

হরিদ্বার থেকে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত যত মঠ, আখড়া আছে সেখানে যত সাধু সন্ন্যাসীরা আছেন, তাঁদের ব্যাপারে আমাদের অনেক কিছু জানা আছে। আর ওঁকারেশ্বরের ওই দিকেও জানা আছে। খুব মুশকিল, ধরে রাখতে পারে না, তমোগুণ ধরে নেয়। আমাদের সাধুদেরও দেখেছি, কিভাবে তমো গুণ ধরে নেয়। একটু কাজে কর্মে না থাকলে তমোগুণ ধরে নেয়। কিন্তু সাধু সন্ন্যাসীরা কাজ কোথায় পাবেন, তাঁরা তো সংসার ছেড়ে এসেছেন। সেইজন্য ঈশ্বরকে ধরতে হয়। যাঁরা সংসার ছাড়তে চাইছেন, আগে তাঁদের ঈশ্বরকে ধরার অভ্যাসটা করে নিতে হয়। সংসার ছাড়া এমন কিছু কঠিন না, কোপ মেরে বেরিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরকে ধরে রাখা সহজ না।

চার নম্বর শ্লোকে বলছেন, *ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ*, সেই বৈষ্ণবপদ, কঠোপনিষদে বলছেন, *তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্*, ওই পরমপদকে পাওয়ার জন্য ভগবানের কাছে হাতজোড় করে স্তুতি করতে হয়, নিজের জোরে হয় না। সেই ভগবান কে? *যতঃ প্রবৃত্তি প্রসৃতা পুরাণী*, যিনি সেই জাদুকর, যিনি এই সংসার মায়াকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। বলছেন এমন সংসার, যার আদি নেই, অন্ত নেই, গর্ডিয়ান নট্; তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, প্রভু, কোপ মেরে দিয়েছি, এবার তুমি কৃপা কর, নাহলে আমি শেষ।

স্বামীজী সাধু সন্ন্যাসীদের নিয়ে বলছেন, যাঁরা ধর্ম পথে আসেন, তাঁদের আশি শতাংশ শার্লটন (charlatan), শার্লটন শব্দের ঠিক ঠিক অর্থ হয় ধুর্ত, ভণ্ড, বুজরুক ইত্যাদি, কিন্তু এর আসল অর্থ হয়ে যায় insincere, এদের নিষ্ঠা থাকে না। বলা হয় যে, ঢপবাজী দিয়ে চালায়। পনের শতাংশ পাগল হয়ে যায়। মাত্র পাঁচ শতাংশ ঠিক ঠিক হয়। এই যে আশি শতাংশ, পনের শতাংশ, এরা হল তারা যারা ধর্ম পথে আসছেন, বাকি পাঁচ শতাংশ ঠিক ঠিক সাধু সন্ন্যাসী হন। সেইজন্য বলা হয়, সাধু সন্ন্যসীদের সম্মান করতে হয়। কারণ ধর্ম পথ কি কঠিন পথ কল্পনা করা যায় না। লোকেরা মনে করে সাধু সন্ন্যাসীরা মঠ্ঠর খাউছি খট্টর শুইছি, মঠে খাচ্ছে, খাটে শুচ্ছে। স্বামীজীর কথা অনুসারে যদি পচাশি শতাংশ শার্লটন হয়ে যায়, insincere হয়ে যায়, তাদের মনের অবস্থা আমরা কি কল্পনা করতে পারব? না ঘরকা, না ঘটকা, দ্বিবিধা মে দোনো গয়ে ন মায়া মিলি

ন রাম, মায়াকেও পেল না, রামকেও পেল না, কত কঠিন জীবন হয়ে যায়। আরও জঘন্য, পনের শতাংশের মাথা খারাপ হয়ে যায়। তাও তো লোকেরা এই পথকেই এখনও বেছে নিচ্ছে।

লোকেরা বলে সংসারে কত দুঃখ কষ্ট। ঠিকই, কিন্তু সংসারের বাইরে অন্য দিকে যারা যায় তাদের পঁচানব্বই শতাংশ তো গোল্লায় যাবে। যারা insincere হয়ে গেল, যাদের মাথাটা খারাপ হয়ে গেল, তাদের আর কি অবশিষ্ট থাকল, শেষ হয়ে গেল। সংসারে পঁচানব্বই শতাংশ কোন রকমের ডাল-ভাত খেয়ে, রুটি সবজি খেয়ে নিজের জীবন চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। তারা জানে, আমার এই ছোট্ট জীবন, আমি আছি, আমার স্ত্রী আছে, আমার সন্তান আছে, বন্ধুরা আছে – এর মধ্যেই সংসারীরা সন্তুষ্ট। সেইজন্য ধর্ম পথে যাঁরা আছেন, তাঁদের সম্মান করতে হয়। এনার যে কি দুর্গম পথ বেছে নিয়েছেন, একমাত্র তাঁরাই জানেন – *ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া*, ক্ষুরের ধারের উপর দিয়ে এনারা চলেছেন। এই পথে এটা নিশ্চিত যে পচানব্বই শতাংশ মানুষ শেষ, মরবেই মরবে। এই কথা আমার না, স্বামীজীর কথা। এই পাঁচ শতাংশ কারা, কিভাবে তাঁরা ভগবানকে পান? সেটাই এবার পরের শ্লোকে ভগবান বলছেন –

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ।।৫।।

(অহঙ্কাররহিত ও অবিবেকশূন্য, আসক্তিদোষজয়ী, পরমার্থজ্ঞাননিষ্ঠ, বাসনাবর্জিত, সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্ব হতে বিমুক্ত, অজ্ঞানশূন্য বিবেকী ব্যক্তিগণ সেই পরমব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।)

পদমব্যয়ং তৎ, সেই পরমপদের কথা বলা হচ্ছে, এই বৈষ্ণবপদ পাওয়ার জন্য কি কি গুণ দরকার? কথামৃতে ঠাকুর এই কথাগুলো খুব সহজ করে বলে দিয়েছেন। ছুঁচে যখন সুতো ঢোকান হয়, তখন সুতোর একটু আঁশ বেরিয়ে থাকলে সুতো ছুঁচের ভিতর প্রবেশ করানো যাবে না। আঁশটা কি, এখানে বিস্তারে বলা হচ্ছে। *নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা*, *নির্মান*, এই নির্মানে 'ণ' নেই। সেইজন্য সংস্কৃতে উচ্চারণে একটু ভুল হলে এর অর্থ পাল্টে যাবে। নিঃ+মান, সন্ধি হয়ে *নির্মান*, *নির্মানমোহা*, যার মান আর মোহ চলে গেছে। মান মানে অভিমান, অভিমান এখানে অহঙ্কারের অর্থে বলা হচ্ছে, যেটার সাথে আমিত্বটা জুড়ে রয়েছে। আমরা যেমন প্রায়ই বলে থাকি, তোমার প্রতি আমার অভিমান হয়েছে। কেন অভিমান হয়েছে? তোমাকে আমি 'আমি' মনে করি, তুমিই আমি। তুমি যা করলে, এই জিনিসটা তো আমি নিজের সাথে করতে পারব না, তুমি করলে তাই এই জিনিসটা আমি নিতে পারছি না। আমি যে বাইরের সার্কেলে রয়েছি, তাদের প্রতি যে মান আর মোহ, এই মান ও মোহকে যিনি ছেড়ে দিয়েছেন –*নির্মানমোহা*।

আগে আগে আমরা এর উপর অনেক কথা বলেছি। যাদের প্রতি কারুর এই মান থাকে, তাদের প্রতি তার মোহ জন্মায়; সাথে সাথে আমরা চাই না, এরা বর্তমানে যে অবস্থায় আছে সেখান থেকে তাদের স্খলন হোক। স্খলন এখানে এই অর্থে বলা হচ্ছে, তাদের যেন অসুখ বিসুখ না হয়, মারা যেন না যায়, তাদের সম্পদ আদি যেন বৃদ্ধি পেতে থাকে ইত্যাদি। আচার্য এখানে বলছেন, *মানঃ চ মোহঃ চ মানমোহৌ তৌ নির্গতৌ যেভ্যঃ তে নির্মানমোহা মানমোহবর্জিতাঃ*, অজ্ঞানের ভাব যার চলে গেছে, কোন বিষয়ের প্রতি আসক্তি নেই। কারুর প্রতি আসক্তি না থাকার মানে এই নয় যে কারুর সাথে মেলামেশা করবে না। সবার সাথে মেলামেশা করবে, সব ঘটিতে একটু একটু জল ঢালবে, কিন্তু কোন ঘটি তার আপন নয়।

কি করে আপন হবে! একজন সন্ন্যাসীর কে আপন হতে পারে? সন্ন্যাসী যদি কাউকে আপন করে, তাহলে সন্ন্যাসী মরবে। কারণ সন্ন্যাসীর আপন কেউ হতে পারে না। আপন-পর এই জিনিসটা

শুধু সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রেই না, সংসারেও এই জিনিসটা প্রযোজ্য হতে পারে। আমি মনে করছি এ আমার আপন, কিন্তু সংসারেও কেউ কারুর নয়। এটা সহজে বোঝা যায় না। সন্ন্যাসী হওয়ার সুবাদে স্বাভাবিক ভাবেই অনেকের সাথে আমাদের যোগাযোগ হয়ে যায়। মাঝে মাঝেই আমরা এই ধরণের অনেক মেল পাই, মেসেজ পাই –স্ত্রীর কাছে বা সন্তানের কাছ থেকে আঘাত পেয়েছে, তারপর লিখছে, মহারাজ বুঝতে পারছি সংসারটাই মায়া, মায়া ছাড়া কিছু না। যখন বিয়ে করেছিলে তখন তোমার সংসারটা মায়া মনে হচ্ছিল না, এখন মনে হচ্ছে মায়া। কাল সম্পর্কটা ভাল হয়ে গেলে, মিষ্টি মিষ্টি দুটো কথা বললেই মেল পাঠাবে, মহারাজ আপনার আশীর্বাদে সব ঠিক হয়ে গেছে। সংসারীদের সংসার এভাবেই চলে। কিভাবে চলে? যার সঙ্গে নিজেকে জুড়ে রেখেছে, যার সাথে মোহটা এত তীব্র হয়ে রয়েছে যে, আমি যেমনটি চাইছি সে যদি তেমনটি করতে থাকে, সেই রকমটি যদি বলতে থাকে, তাহলে মনে হবে আমি যেন বিরাট সুখে আছি।

তুমি কোথায় বিরাট সুখে আছ? গুটি পোকা হয়ে তো মরছ। তোমাকে যদি কেউ কষ্ট দেয়, যদি তোমার কথা কেউ না শোনে, সেই ক্ষেত্রে সে বরঞ্চ তোমাকে এগোতে সাহায্য করছে। কারণ সংসার যদি তুমি এক কোপে নাও উড়িয়ে দিতে পার; কষ্ট দিয়ে, দুটো কটূ কথা শুনিয়ে সে তো তোমাকে কয়েকটা কোপ মারার সুযোগ করে দিল। সংসারটা তাই কেটে উড়িয়ে দাও, কারণ কেউ কারুর না। বিশ্বাস যদি না করতে চাও, তাহলে দেখবে মৃত্যুর সময় যমরাজ এসে কেমন তোমাকে পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে চলে যাবেন। যা আছে পড়ে থেকে গেল। অনেক আগেকার কথা, একবার একটা মরা কুকুরকে কেউ পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে এনে আমাদের বেলুড় মঠের গেটের সামনে ফেলে রেখে গিয়েছিল। কারণ যে ফেলেছে সে জানে এখানে ফেলে দিলে মিউনিসিপ্যালিটি তাড়াতাড়ি এসে পরিষ্কার করে দেবে। এই দৃশ্যটা দেখে আমার বুকটা কেঁপে গিয়েছিল। একটা কুকুর মরে গেছে, তার পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে এসেছে। মরা কুকুরটাকে কেউ ছোঁবেও না। যমরাজ তাই করেন, পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে চলে যান, চোখে আঙুল দিয়ে বৈরাগ্য দেখিয়ে দেন। কিন্তু আমরা তো শেখার লোক না।

আবার জন্ম নেব, মরব; আবার জন্ম হবে, এই জন্ম নিতেই থাকব আর জন্মালে মরতেই হবে। হতে হতে একটা জায়গায় গিয়ে কোথাও আমাদের মধ্যে একটু চেতনা জাগবে, তখন মনে হবে –মহারাজ, সব মায়া। যাকে আমার সব দিয়ে দিলাম, আমার জীবন, আমার শরীর, আমার সুখ, আর সে কিনা আমার সাথে এই রকম করল! আরে ভাই, তুমি একটু বোঝার চেষ্টা কর, আগেও হাজার হাজার বার তোমার সাথে এই রকমই হয়ে এসেছে। তুমি হলে মুর্খাধিরাজ, মুর্খের রাজা। মুর্খ কে? একই ভুল যে বারবার করে। জন্মজন্মান্তর ধরে মানুষ একই ভুল করে যাচ্ছে।

এই *নির্মানমোহা*, মান আর মোহ থেকে যিনি বেরিয়ে এসেছেন, *জিতসঙ্গদোষা*, আসক্তি রূপ দোষকে তিনি জয় করে নিয়েছেন। কোন কিছুর প্রতি আসক্তি নেই। পরমহংস উপনিষদে বলছেন, *যৎ আয়াতু তৎ আয়াতু যৎ ব্রয়ন্তু ব্রয়ন্তু তৎ*, যেটা আসার সেটা এলো, যেটা যাওয়ার সেটা চলে গেল। এই জীবনটা একটা বিশাল বটবৃক্ষের মত। বটবৃক্ষে পাখি আসে, এসে বসে, বিশ্রাম করে, তারপর উড়ে চলে যায়। সম্পর্কও এই রকমই আসে আবার চলে যায়। স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, বন্ধু, এরা সব পাখি, এরা আমার জীবনে আশ্রয় নিয়েছে, কিছু দিন বিশ্রাম করে উড়ে যাবে, কারুর সাথে কারুর কোন সম্পর্ক নেই।

এই কথাগুলো শুনতে তো ভালই লাগছে, কিন্তু এই কথাগুলো নিশ্চয় আমাদের জন্য নয়। অবশ্যই আপনার জন্য নয়, ভগবান আগেই বলে রেখেছেন, *মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে*, লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন এই পথে আসে। এই সব কথা সবার জন্য নয়, সবাই নিতে পারে না। ভগবান আপনার আমার মতই ফাঁকিবাজ, তিনি খাটতে চান না। সবারই যদি মুক্তি হয়ে যায় তাহলে তাঁকে আবার নূতন করে সব সৃষ্টি করতে হবে। সৃষ্টির খেলা উনি

চালাতে থাকবেন, সৃষ্টি তো বন্ধ হবার না। যদিও তিনি কলকাঠি নেড়ে জীব সৃষ্টি করেন না, ইচ্ছামাত্র সব সৃষ্টি করে দিতে পারেন। এটা আমি মজা করে বললাম। সেইজন্য বলছেন, যাদের সৃষ্টি করে দিয়েছি তাদেরই ঘোরাতে থাক।

ছোটবেলায় একটা গল্প শুনেছিলাম, জানি না আদৌ এটা সত্যি কিনা, পুরাণে আমরা কোথাও এই কাহিনী পাইনি। স্বর্গ থেকে গঙ্গা নামবে, গঙ্গাকে কে ধারণ করবে? শিবই একমাত্র গঙ্গার বেগকে ধারণ করতে পারবেন। গঙ্গা তখন এক কিশোরী মেয়ের মত তিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছে। গঙ্গা ঠিক করল শিব যদি আমার বেগকে ধারণ করতে আসে, আমি শিবকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাব। ঠিক তাই হল, গঙ্গা শিবকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। শিব তখন সঙ্গে সঙ্গে নিজের জটা ছড়িয়ে দিলেন। শিবের সেই জটার ভিতর গঙ্গা হারিয়ে গেল, বেরোবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না কোথা দিয়ে কোথায় যাবে। গোমুখ, গঙ্গোত্রী গেলে বোঝা যায়, কত রকমের জলের ধারা। ভাবলে অবাক লাগে কি করে যে বের হয়, জলের অবশ্য একটা নিয়ম আছে। তারপর ভগবান শিব ওই জটাকে আবার বেঁধে ফেললেন, চিরদিনের জন্য গঙ্গা ওখানেই বন্দী হয়ে গেল। অনেক বছর পর সাগর বংশের ভগীরথ শিবের কাছে প্রার্থনা করাতে ভগবান এক ফোঁটা জল ওখান থেকে গোমুখে ছেড়ে দিলেন। ওই এক ফোঁটা জল থেকে হাজার হাজার বছর ধরে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, আর উনি সমাধিতে লীন। এই হল শিবের ক্ষমতা; এক ফোঁটা জল ছেড়ে দিলেন যার জোরে গঙ্গা হাজার হাজার বছর ধরে প্রবাহিত হতে থাকবে।

ভগবান সমাধিতে লীন, সৃষ্টিকার্য করতে তাঁর যত আলস্য, সৃষ্টি যেন করতে চান না। সেইজন্য যত জীব সৃষ্টি হয়ে গেছে, এদেরকেই ঘোরাতে থাকবেন, জন্মমৃত্যুর চক্রে আপনা থেকেই সবাই ঘুরে যাচ্ছে, নূতন করে ভগবানকে আর সৃষ্টির কার্যে নামতে হচ্ছে না। এখন আমি ঘুরতে চাইছি কিনা সেটা আমাকে নিজেই দেখতে হবে। যদি না ঘুরতে চাই তাহলে হাতজোড় করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয়, *তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে*। তুলসীদাস খুব সুন্দর বলছেন, হে প্রভু, তুমি আমাকে অনেক নাচিয়েছ, আর না, আর আমাকে নাচিও না। এই বোধ যতক্ষণ না আসছে, ততক্ষণ ঘুরতেই থাকব। হাতজোড় করে প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে বলতে হবে, হে প্রভু আর না, আর আমাকে ঘুরিও না, আমি তোমার শরণাপন্ন।

জিতসঙ্গদোষা, সমস্ত আসক্তিকে জয় করে নিয়েছে। আমার আর কিছু লাগবে না। সক্রেটিসের নামে কাহিনী আছে, অবশ্য যাঁরা মহাপুরুষ হয়ে যান, তাঁদের নামে অনেক কাহিনী তৈরী হয়। সক্রেটিস এথেন্স শহরে থাকতেন। তিনি এথেন্সের বাজারে প্রায় প্রতিদিনই ঘুরে বেড়াতেন, কিন্তু কোন দিন কিছু কিনতেন না। কেউ কেউ প্রশ্ন করতেন, আপনি বাজার শুধু ঘুরেই বেড়ান, কিছুই তো কেনাকাটা করেন না। সক্রেটিস বলছেন, 'দেখছি এই জগতে কি কি জিনিস আছে, যেটা ছাড়া আমি থাকতে পারি'। এই হল ঠিক ঠিক *জিতসঙ্গদোষা*। আমরা কি কখন ভেবে দেখেছি, কি কি জিনিস ছাড়া আমরা থাকতে পারব? নিজের জীবনের দিকে যদি একবার ফিরে তাকাই, কোন বন্ধু ছিল যাকে দেখে কত আনন্দিত হতাম, কোন জিনিস ছিল যেটা পাওয়ার জন্য কত চেষ্টা করেছি, মনের মত কোন জায়গা ছিল যেখানে গেলে মন খুশীতে ভরে যেত। কিন্তু এখন এগুলো থেকে সরে এসেছি, এগুলোর কোনটাই আর মনকে আকর্ষিত করে না। কারণ মানুষের মন কখন স্থির থাকে না। যিনি সংসারবৃক্ষকে উৎপাটিত করে সেই পরমপদকে পেতে চাইছেন, তাঁকেও ঠিক এই রকম জগতের সব কিছু থেকে *জিতসঙ্গদোষা* হয়ে যেতে হবে, এই যে সঙ্গের অর্থাৎ আসক্তির দোষ, এটাকে জয় করে নেওয়াটাই *জিতসঙ্গদোষা*।

অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ, নিত্য অধ্যাত্ম-চিন্তন, পরমাত্মার চিন্তন আর তার সাথে সাথে *বিনিবৃত্তকামাঃ*, বাসনাতে আগুন লাগিয়ে দিতে হবে। এখানে এসে বোঝা যায়, ধর্ম পথে চলা কত কঠিন। আমি যদি কোন ভক্তকে জিজ্ঞেস করি, 'আপনার কি মান মোহ চলে গেছে'? সঙ্গে সঙ্গে

উত্তর হবে, 'হ্যাঁ মহারাজ ওতো কবেই চলে গেছে। কথামৃত যেদিন থেকে পড়া শুরু করেছি সেইদিন থেকেই আমার অহঙ্কার, কামনা, বাসনা সব চলে গেছে'। 'আর সঙ্গ দোষ'? 'কি বলছেন মহারাজ, আমার তো কারুর সাথে কথা বলতেই ভাল লাগে না'। 'আর *অধ্যাত্মনিত্যা'*? এবার মাথা চুলকানো শুরু হয়ে যাবে। আপনি কি সব সময় এটা নিয়েই থাকেন, সব সময় একমাত্র ঈশ্বর চিন্তন আর শাস্ত্রকথা নিয়েই থাকেন? সবার বাইরেরটা আর ভিতরটা এখানে এসেই ধরা পড়ে যায়। বিজ্ঞান বলে আর আমরাও বলি, যে জিনিসটা মাপতে পারব না, সেই জিনিসটাকে আমরা বিশ্বাস করি না। আমার বিবেক বৈরাগ্য আছে কিন, মান-মোহ থেকে বেরিয়ে এসেছি কিনা, এটা subjective জিনিস, কিন্তু মন সব সময় ঈশ্বর চিন্তনে আছে কিনা, অধ্যাত্ম চিন্তনে আছে কিনা, এটা মাপা যায়।

বিনিবৃত্তকামাঃ, যত রকমের কামনা-বাসনা থাকতে পারে, সমস্ত রকমের কামনা-বাসনা থেকে তিনি আলাদা হয়ে গেছেন। এবার আচার্য একেবার স্পষ্ট করে বলছেন, *সঙ্গ এব দোষঃ*, কারুর সাথে, সে যেই হোক না কেন, সঙ্গ থাকা, এটাই দোষ। শুধু যে দুষিত লোকের সঙ্গ করাটাই দোষ, তা না, সঙ্গ জিনিসটাই দোষযুক্ত। আর তার সাথে *অধ্যাত্মনিত্যাঃ পরমাত্মস্বরূপালোচননিত্যাঃ*, পরমাত্মার যে স্বরূপ, ঈশ্বরের যে স্বরূপ, এটাকে নিয়ে সব সময় চিন্তন করা।

আমাদের ইউনিভার্সিটির ব্রহ্মচারীরা দেশ বিদেশ থেকে বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন, কেউ আমেরিকা, কেউ ইংল্যাণ্ড থেকে ফিজিক্স, কম্প্যুটারের পিএইচডি করা। মাঝে মাঝে ব্রহ্মচারীদের সাথে আমার কথা হয়। আমাকে একজন ব্রহ্মাচারী কথায় কথায় বলছিলেন, 'আপনি তো অনেক বই পড়েন'? আমি বললাম, 'গত পাঁচ সাত বছর বই পড়া ছেড়ে দিয়েছি, আমার আগ্রহ চলে গেছে। কারণ এখন আমি তত্ত্বটা বুঝে গেছি, শাস্ত্রের তত্ত্ব ছাড়া অন্য কিছুতে মন যায় না। এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, এর জেনেটিক কোড আমার মত করে বোঝা হয়ে গেছে। আমার কাছে শাস্ত্র বলতে উপনিষদ, কথামৃত আর স্বামীজীর রচনাবলী। কিন্তু সেটাও শুধু পড়ার জন্য পড়া না, চিন্তনের মধ্যে নিজের মনটাকে ডুবিয়ে রাখা। চিন্তন করতে করতে একটা কোন আইডিয়া যদি স্পষ্ট হয়ে যায়, তখন সেটাই চলতে থাকবে, যতদিন না আত্মদর্শন না হয়ে যায়'।

যোগশাস্ত্রেও বলা হয় যে, একটা অবস্থা আসে যখন যোগী বলে দেন, এই জগতের ব্যাপারে আমার যা জানার জানা হয়ে গেছে। সেই ব্রহ্মচারী আমাকে বললেন, 'ইনফরমেশানের দিক থেকে আপনার আগ্রহ চলে গেছে'। আমি বললাম, 'না, ঠিক তা নয়। আসলে যখনই কোন কিছু পড়ি, মস্তিষ্কে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, একটা ভাল সিনেমা দেখছে, তখনও মস্তিষ্কে একটা উত্তেজনা তৈরী হয়। নিজের পুরনো বন্ধুকে দেখলে উত্তেজনা হয়, কোন নূতন জায়গায় গেলে উত্তেজনা হয়। ঠিক তেমনি একটা নূতন কিছু জানলে, সেটা উত্তেজনা তৈরী করে। আমার ব্যক্তিত্ব পুরোপুরি উত্তেজনার মধ্যেই দাঁড়িয়ে ছিল। ঠাকুরের অশেষ কৃপা, ব্যক্তি বলুন, বস্তু বলুন, জায়গা বলুন, বই বলুন, উত্তেজনা তৈরী হওয়াটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। উত্তেজনা একটা ক্ষেত্রেই এখন শুধু হয়, গীতা, উপনিষদ পড়ছি, পড়তে পড়তে বা চিন্তন করতে করতে একটা তত্ত্ব যদি বেরিয়ে আসে, সেটা আমাকে আনন্দ দিতে থাকে। কারণ ওটা আমার কাছে এতদিন সত্যিকারের অনাবিস্কৃত ছিল'।

অধ্যাত্মনিত্যা মানেই, সংসারের কোন জিনিস, কোন কিছুই তাঁর মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারবে না। সাধু সন্ন্যাসীরা কোথাও বেড়াবার উদ্দেশ্যে যান না, তীর্থে যান। তীর্থে গেলে ওনাদের উত্তেজনা হত না, কারণ ওটা হল *অধ্যাত্মনিত্যা*। সংসারীরা কত প্ল্যান করে, এবার পূজাতে হিমালয়ের এমন একটা কোণায় যাব, যেখানে কেউ নেই; কারণ ওটা তাকে উত্তেজনা দেবে। নিত্য অধ্যাত্ম চিন্তন মানেই, জগতের কোন কিছুই তাঁকে আর উত্তেজিত করতে পারে না। আলুনি লাগতে পারে, ঠাকুর যেমন কথামৃতে বলছেন, একটা জিনিস বার বার করতে করতে আলুনি লাগে। এনারা তখন তীর্থে বেরিয়ে পড়েন। অর্থ হল, ঈশ্বর ছাড়া আর কোন দিকে তাঁর মনকে নিয়ে যাওয়া যাবে না, কোন কিছুই তাঁর মনকে উদ্বেলিত করতে পারবে না। কারণ অন্য দিকে তিনি *বিনিবৃত্তকামাঃ* হয়ে

গেছেন। কোন কামনা থাকলে তবেই মনের মধ্যে উত্তেজনা তৈরী হবে। কোন কামনাই নেই, উত্তেজনা আর কোথা থেকে তৈরী হবে। উনুনের কয়লা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, ওর মধ্যে কাগজ দিন, কাঠ দিন আর জ্বলবে না। এটাই *অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ*। আমরা বলেছিলাম পঞ্চোদশ হল শাস্ত্র। এই একটি অধ্যায় ঠিক ঠিক বুঝে নিতে পারলে সমস্ত ধর্মের মর্ম বুঝে যাবেন, আর হিন্দু ধর্মের মর্ম তো বুঝতেই পারবেন।

দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ, দ্বন্দ্ব মানে যেখানে একটা জিনিসের সাথে তার বিপরীতটাও আছে, যেমন প্রিয়, প্রিয়র সাথে আছে অপ্রিয়, তেমনি সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, শীত-উষ্ণ। মহারাজ আপনার সাথে কথা বলতে কি ভালই না লাগে। তার মানে অন্য কারুর সাথে কথা বলতে তার মন্দ লাগে, তার মানে সে এখন danger zoneএ আছে। ব্রহ্মচারী অবস্থায় আশ্রমে যেখানেই আড্ডার আসর বসত, চায়ের আড্ডা হোক বা অন্য কোন আড্ডা হোক, দৌড়ে চলে যেতাম। অনেক দিন হল ওই অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছি। যতটুকু কাজ করতে হবে করে দিলাম। শাস্ত্রের গভীর তত্ত্ব ছাড়া আর কোন কিছুতেই মন যায় না। কথাবার্তায় প্রিয় অপ্রিয় বলে আর কিছু নেই।

নারদীয় ভক্তিসূত্রে খুব সুন্দর বলছেন, শরীর চালানোর জন্য ভক্ত যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করবে। খাওয়ার সময় যা খেতে দিচ্ছে আমরা তাই খেয় নিই। আমাদের রাঁধুনিকে মজা করে আমরা বলি, 'আমরা তো গরু মোষের মত হয়ে গেছি, যা দিচ্ছে তাই খেয়ে নিচ্ছি', কোন বিকার নেই। নুন বেশি হয়েছে কি কম হয়েছে, মাথাতেও আসে না। তার মধ্যে আবার ভক্তদের কেউ কেউ এসে জিজ্ঞেস করে, মহারাজ আপনার কি খেতে ভাল লাগে? হাসি পায় শুনে। বাচ্চা যখন ছিলাম তখন হয়ত কোন কোন বিশেষ খাবারের প্রতি লোভ ছিল, এখন কোন প্রশ্নই নেই। ঘন্টা পড়ল, খাওয়ার সময় হয়ে গেল, খেয়ে নিলাম। একটা কাজ, একটা ঝামেলা মিটে গেল।

এই গুণগুলি যদি কারুর ভিতরে থাকে, তবেই *গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ* তিনি সেই পরমপাদ প্রাপ্ত করতে পারবেন। এখানে শব্দটা হল *অমূঢ়ঃ*, বাংলায় মূঢ় মানে মূর্খ। *অমূঢ়ঃ* শব্দের আচার্য ব্যাখ্যা করছেন, *মোহবর্জিতঃ*, যার কোন মোহ নেই। মূর্খ কে? যার মোহ আছে। বাচ্চা ছেলে পড়তে চাইছে না, কারণ তার খেলার প্রতি আসক্তি রয়েছে। এই বাচ্চাই যখন বড় হয়ে যায়, তখন খেলা ছেড়ে অন্য কত কিছুতে আসক্তি এসে যায়। ইংরাজীতে একটা খুব সুন্দর কথাই আছে, no fool like a old fool, বয়স্ক মানুষ যদি বোকামো করে, তার মত বোকা আর কেউ হয় না। এর আর-একটা অর্থ হয়, একই ভুল যে বারবার করছে। কেন মানুষ বারবার ভুল করে? কারণ হল মোহ, মোহের মধ্যে পড়ে আছে। আপনি বলতে পারেন, আমার কোন কিছুর প্রতি মোহ নেই, কোন কিছুই আমার আর ভাল লাগে না। এটা নিজেকে আপনি মনে করছেন, কিন্তু বাস্তবে হয় না। কিন্তু তার সাথে যদি আপনার *অধ্যাত্মনিত্যা* থাকে, যদি নিত্য অধ্যাত্ম চিন্তন নিয়ে থাকেন, তাহলে বলা যেতে পারে যে, আপনি অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে লক্ষ্যের কাছাকাছি এসে গেছেন। কিন্তু পুরো আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত কারুরই *মোহবর্জিতঃ* হবে না, সম্ভবই না।

একজন শিষ্য তার গুরুকে বলছে, 'গুরুদেব আমি কাম জয় করে নিয়েছি'। গুরু বললেন, 'বাঃ! খুব ভাল'। একদিন গুরু বাইরে গেছেন। শিষ্য কুঠিয়ায় একা আছেন। সন্ধ্যে থেকে খুব ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। হঠাৎ দরজায় কে যেন টোকা দিল। শিষ্য দরজা খুলতেই দেখে এক সুন্দরী নারী দরজার বাইরে বৃষ্টির জলে ভিজে চুপসে দাঁড়িয়ে আছে, একটু আশ্রয় চাইছে। শিষ্য খুব রেগে গিয়ে বলছে, 'এটা আশ্রম এখানে কোন মেয়েকে থাকতে দেওয়া হয় না'। মেয়েটি বলছে, 'আমি এই জঙ্গলে একটা কাজে এসে ফেঁসে গেছি, আমি শুধু রাতটুকু এই কোণায় বসে কাটিয়ে দেব, কাল সকাল হতেই চলে যাব'। যাই হোক, অনেক আকুতি-মিনুতি করার পর শিষ্য মেয়েটিকে একটা কোণায় চুপ করে বসে থাকতে দিল।

শিষ্য নিজের জীবনকে এখনও পরীক্ষা করে দেখেনি, একটু তপস্যা করে মনে করছে আমি বিরাট কিছু হয়ে গেছি। মেয়েটি চুপচাপ বসে আছে। দুটো প্রাণী নারী ও পুরুষ ঘরে আবদ্ধ, বাইরে বিরাট ঝড় বৃষ্টি। 'কোথায় যাবে তুমি'? এই প্রশ্ন দিয়েই শুরু হল বাক্যালাপ, দু-চারটে বাক্যালাপের পর এসে গেল প্রশ্ন, 'তোমার কি নাম'? এইভাবে আধ ঘন্টা বাক্যালাপ এগোতে এগোতে শেষ পর্যায়ে গিয়ে শিষ্য বলছে, 'তুমি আমাকে বিয়ে করবে'? মেয়েটি বলছেন, 'আপনি একজন সন্ন্যাসী, ত্যাগী পুরুষ, ত্যাগী সন্ন্যাসীদের তো বিশ্বাস নেই, আজকে বলছেন বিয়ে করবেন, দুদিন পর বৈরাগ্যের ভাব এলে তখন সব ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন, আমার তখন কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছেন! তবে আমাকে আপনার কাঁধে বসিয়ে অগ্নিকে সাক্ষী রেখে এই ঘরে সাত পাক ঘুরুন আর মুখে বলতে থাকুন 'আমি কোন দিন তোমাকে ছেড়ে চলে যাব না', তাহলে আমি রাজী আছি'।

শিষ্যের মনের তখন যা অবস্থা, যা করতে বলবে এখন সে তাই করতে রাজী হয়ে যাবে। কাঁধে বসিয়ে অগ্নিকে সাক্ষী রেখে শিষ্য এবার প্রদক্ষিণ করতে শুরু করেছে আর মুখে বলছে, 'আমি তোমাকে কোন দিন ছেড়ে যাব না'। একবার করে প্রদক্ষিণ করার মুখে যেই ওই কথা বলতে শুরু করতে যাবে তখনই মাথায় এক জোর চাটি। শিষ্য থতমত খেয়ে গেছে। শিষ্য তখন দেখছে, কোথায় সেই সুন্দরী মহিলা, তার জায়গায় স্বয়ং গুরু দাঁড়িয়ে আছেন। শিষ্যের ভুল ভাঙাবার জন্য গুরুই ওই মহিলার বেশ ধারণ করে এসেছেন। 'কি বলছিলে, তুমি কাম জয় করেছ, অত সোজা! সবাই মনে করে আমার কাম জয় হয়ে গেছে। যখন মাথায় চাটি পড়তে শুরু হয়, তখন বোঝা যায় শুকনো মাঠে ধান কাটছিল'।

কামনার মূল সমেত উপড়ে ফেলা চাই। যাদের মান শূন্য হয়ে গছে, মোহ চলে গেছে, আসক্তি রূপ দোষের নাশ হয়ে গেছে, কামনার লেশ মাত্র যাদের আর নেই, যে যে গুণগুলির কথা এই শ্লোকে বলা হল, এই ধরণের সন্ন্যাসীরা তখন এই অবিনাশী বৈষ্ণব পদ লাভ করেন। সেই অব্যয় পদ একমাত্র সেই পায়, যার মধ্যে এই গুণগুলি আছে, যে গুণের কথা পঞ্চম শ্লোকে বলা হল। এই গুণগুলি অর্জন করার জন্য হাড়ভাঙা খাটতে হয়।

কিভাবে খাটতে হয়? যদিও এটা আমাদের বিষয় নয়। ঠাকুর কত সহজ করে বলছেন, বাচ্চা খেলনা নিয়ে খেলে যাচ্ছ, হঠাৎ তার মায়ের কথা মনে পড়ে গেল, সব খেলা ফেলে এবার চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল, 'মা যাব'। একবার শুধু উদ্দেশ্যটা ঠিক করে নেওয়া, এটাই আমার চাই। সাধুদের একটা কাহিনী বলেছিলাম। একজন যজ্ঞ করবেন, যজ্ঞের জন্য সোমপাতা দরকার। একটা দোকানে গেছে সোমপাতা কেনার জন্য। দোকানদার জিজ্ঞেস করছে, কত দাম দেবে সোমপাতার জন্য? লোকটি একটা দাম বলেছে। দোকানদার বলছে, *সোমরাজা ততো ভূয়াৎ*, সোমরাজার দাম এর থেকে বেশি। মন খারাপ করে আরেকটা দোকানে গেছে, দরদাম হওয়ার পর সেই দোকানদারও বলল, *সোমরাজা ততো ভূয়াৎ*। যে দোকানেই যাচ্ছে, সবাই একই কথা বলছে, *সোমরাজা ততো ভূয়াৎ*। শেষ একটা দোকানে গেছে। দোকানদার যেমনি সোম বলেছে সঙ্গে সঙ্গে লোকটি ঝাঁপ মেরে দোকানদারের হাত থেকে সোমপাতা কেড়ে নিয়েছে। আমার এটা লাগবে, নিকুচি করেছে তোমার *সোমরাজা ততো ভূয়াৎ*, এই বলে দোকানির হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। বেদের এটি বিখ্যাত একটি কাহিনী।

এই যে একটা কিছুতে লেগে থাকা, এটা হয় না। ঠাকুরের কৃপাতে আমি জীবনে অনেক কিছু দেখে নিয়েছি, আর মনের সঙ্গে অনেক বেশি interact করেছি। দেওঘরে ছিলাম, নরেন্দ্রপুরে ছিলাম, আলংএ ছিলাম। খুব কাছ থেকে অনেক ধরণের সাধু সন্ন্যাসীদের মন দেখেছি, একটাতে মনকে সব সময় লাগিয়ে রাখা সোজা না। কখন ইন্দ্রিয় টেনে নিয়ে চলে যাবে বুঝতেই দেবে না। বড় হোক, ছোট হোক, ইন্দ্রিয় সবাইকে টেনে নিয়ে চলে যায়। আর তমোগুণ এমন টানে যে, কোন টেরই পাওয়া যাবে না। যার জন্য আচার্য বলছন, *বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্না*। বয়স হয়ে গেলে নিজের

পুরনো দিনের চিন্তা ছাড়া মানুষের কিছু থাকে না। সেইজন্য প্রথম থেকে দিনকে ছোট ছোট টুকরো করে নিতে হয়, সকাল আটটা পর্যন্ত একটা অংশ, আটটা থেকে বারোটা, বারোটা থেকে চারটে, আবার চারটে থাকে আটটা। এইভাবে ভাগ করে নিজেকে ঠিক করে নিতে হবে এতটা থেকে এতটা জপ করব, এতটা থেকে এতটা পূজা করব, এতটা থেকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করব।

বেলুড় মঠে একজন মহারাজ ছিলেন, উনি প্রচুর জপ করতেন। সন্ন্যাসীরা ওনার নামে মজা করে বলতেন, উনি সকালবেলা ঠাকুরকে নিয়ে থাকেন, দুপুরে মাকে নিয়ে থাকেন আর বিকালে স্বামীজীকে নিয়ে থাকেন। আসলে প্রচুর জপ করতেন কিনা, ফাঁকা থাকলেই তিন জপ করতে বসে যেতেন, বিভিন্ন মন্দিরে জপ করেই যাচ্ছেন, করেই যাচ্ছেন। আমি আপনি এই জিনিস পারব না। মায়েদের কাছে বাচ্চাদের খাওয়ানো একটা বড় সমস্যা, বাচ্চারা কিছুতেই খেতে চায় না। অনেকে মায়েরা তাই বাচ্চার খাবারটা টুকরো করে অনেকগুলো গোল্লা পাকিয়ে দেয়। এবার গল্প করতে করতে একটা করে গোল্লা মুখের মধ্যে দিতে থাকে। কিন্তু একসাথে অনেকটা খাবার দেখে বাচ্চা মনে করে অত খেতে হবে, ওটা ভেবেই বাচ্চা নার্ভাস হয়ে যায়। সারা দিন জপ করব ভাবলে আমরা কখনই করতে পারব না। সেইজন্য টুকরো টুকরো করে নিতে হয়। সকালে উঠলাম, প্রাতঃক্রিয়াদি করার পর এতটা সময় আমি আসনে বসে এই ভাবে জপ করব, তারপর এতটা সময় এই এই শাস্ত্র পাঠ করব, তারপর এতটা সময় আমি হেঁটে হেঁটে জপ করব।

অনেক এসে প্রশ্ন করেন, মহারাজ সংখ্যা রেখে কি জপ করতে হবে? কে বলেছে সংখ্যা রেখে জপ করতে? এতদিন দীক্ষা হয়ে যাওয়ার পরেও হাতে গুণে জপ করছেন, আপনার মত অভাগা আর কেউ নেই। গুরু একশ আটবার জপ করতে কেন বলছেন? যাতে মানুষ এই মিনিমাম সংখ্যায় অন্তত জপটুকু করে, তা নাহলে তো মন্ত্রই ভুলে যাবে। মনে মনে জপ করুন, হাত আপনার যেভাবে সুবিধা হয় রাখুন। হাতটা মুঠো করে রাখা হয় মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য যে, আমি এখন জপ করছি। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে জপ করুন, হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্তি এসে গেলে আসনে বসে বা চেয়ারে বসে মন স্থির করে জপ করুন। এগুলো কেউ শেখায় না, নিজেকে নিজের সুবিধা মত ঠিক করে নিতে হয়।

সমস্যা আমাদের একটাই, নিষ্ঠা নেই। কেন নিষ্ঠা নেই? ইচ্ছাটাই নেই। আরও পাঁচটা জিনিসের মত এটাও আছে। এভাবে কি সেই পরমপদ, বিষ্ণুপদ পাওয়া যায়? প্রথম হল মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে হয়, *তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে*। মুক্তি কে পাবে? আর মুক্তি জিনিসটা কি? আমরা কোন জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার আগে সেই জায়গায় যারা গেছেন তাঁদের কাছে খোঁজ নিই, ইন্টারনেটে খোঁজ খবর নিই। ওই জায়গার কি বৈশিষ্ট্য, হরিদ্বার গেলে কি দেখব, গঙ্গোত্রী গেলে কি দেখব, সব খোঁজ নিই।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।।৬।।

(যাঁকে লাভ করলে সংসারে আর পুনর্জন্ম হয় না, যাঁকে চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি প্রকাশ করতে পারে না, তাঁহাই আমার পরম ব্রহ্মপদ।)

পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্, যদি কেউ এই জন্মমৃত্যুতে বিরক্ত হয়ে থাকেন, কত দিন আর সেই একই খাবার খেতে হবে, সেই সকালে উঠে দাঁত মাজতে হবে, সেই স্নান করতে হবে; তার মধ্যে যদি ভাবা হয়, হে ভগবান মৃত্যুর পর আবার জন্ম নিতে হবে, যে বংশে জন্ম নিয়েছি ওই ধরণের আরেকটা বংশে জন্ম নিতে হবে, সেই মা, সেই বাবা, সেই ঠাকুর্দা আবার সেই ক্লাশ ওয়ান থেকে অ আ ক খ শিখতে হবে। ওই একই জিনিস নূতন করে আবার পুনরানুষ্ঠান করে যেতে হবে। তাতেও লোকেরা বলে যে জন্ম জন্ম যেন আমি তোমাকেই

পাই। একটা জন্ম চালাতে পারে না, তার উপর আবার জন্ম জন্ম ধরে সেই একই মুখ নিয়ে ঘর করতে চাইছে, রক্ষা করুন ভগবান। আমরা সন্ন্যাসীরা ভাবি, এই জন্মে যদি মুক্তি না হয়, তাহলে আবার আর-একটা জন্মে সন্ন্যাসী হয়ে বেলুড় মঠে এসে সেই ঝোল চচ্চড়ি খেতে হবে। হে ঠাকুর রক্ষা কর, আর না। আমার তো আরও বাজে অবস্থা। কি খেয়ালে কয়েকটা বই লিখে ফেলেছি, পরের জন্মে ওই বইগুলোই আমাকেই আবার না পড়তে হয়। স্কুলে মাস্টাররা বলবেন, স্বামী সমর্পণানন্দের এই বই লিখে গেছেন, ভাল করে পড়। আমার লেখা বই আমাকেই পড়তে হবে। মুক্তি না হলে যে কি দুরবস্থা, এটাই এখানে বলছেন।

কিন্তু যিনি মুক্তি পেয়ে যাবেন এবং মুক্তির পর যেখানে যাবেন, সেই অব্যয় পদ, সেই পরমপদ কেমন, এই শ্লোকে তার বর্ণনা করছেন। *ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ*, নিজের জ্যোতিতেই তিনি ভাসমান, সূর্য তাঁকে আলোকিত করতে পারে না, সেখানে চন্দ্র, অগ্নি কি আর আলোকিত করবে। বেদের বিষ্ণূসূক্তে বলছেন, তোমরা যেন সেই বিষ্ণুধামে যাও, সেই বিষ্ণূধাম সর্বদা আলোকিত।

যত গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম, সেখানে একবার চলে যাওয়ার পর আর এই জন্মমৃত্যুর চক্রে ফেরৎ আসতে হয় না, সেটাই আমার পরম ধাম। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, মুক্তি কি? তার উত্তর হল, মুক্তি হল সেই অবস্থায় পৌঁছে যাওয়া, যেখান থেকে তাকে আর এই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে নেমে আসতে হবে না। সেই অবস্থা হল স্বয়ংজ্যোতি, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি তাঁকে আলোকিত করতে পারে না। বিজ্ঞানের পণ্ডিতরা বলবেন, তা কি কখন হয়! নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রে বলছেন, যতটা শক্তি প্রয়োগ করা হবে, তার ততটাই গতি হবে। এটা ঠিক যে, যেটা চলছে সেটা চলতে থাকবে। কিন্তু এখানে তো চলার ব্যাপার নেই, সেই পরমপদে গিয়ে সে স্থিতি পেয়ে যাচ্ছে। তার সাথে ফিজিক্সে একটা second law thermo dynamix আছে, যেখানে বলা হয়, সব জিনিসই ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়।

আচার্য শঙ্কর সেটাকে প্রশ্ন রূপে বলছেন, *ননু সর্বা হি গতিঃ আগত্যন্তা সংযোগা বিপ্রযোগান্তা ইতি হি প্রসিদ্ধং কথম্ উচ্চতে তদ্ধামগতানাং নাসি নিবৃত্তিঃ, ননু* শব্দের অর্থ প্রশ্ন করছেন, আপনি বলছেন ওখানে গিয়ে, যে জিনিসের যেখানে গতি হয়, সেই গতির পুনরাগমন হবেই। একবার যদি গতি হয়ে থাকে দ্বিতীয়বার হবেই। যে কোন গতি, কেউ স্বর্গে যদি গিয়ে থাকে, তাকে আবার সেখান থেকে নামতেই হবে, কারণ সে আবার স্বর্গে যাবে। তাহলে মুক্তি হয় কি করে বলছেন? স্বামীজী বিশ্বের নামকরা যত দ্বৈতবাদী ধর্ম আছে, তাদের এই যুক্তিতে আক্রমণ করেছেন। ফিজিক্সের এটা একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত, শক্তি যতটা দেওয়া হবে, ততটাই তার গতি হবে। যে পূণ্যের জোরে স্বর্গে গেছে, সেখান থেকে কি করে তার অনন্ত স্বর্গ হবে। পতন হবেই হবে। এটা খুব ইন্টারেস্টিং। অন্যান্য ধর্মের কথা বলে লাভ নেই, কারণ এটা তারা বুঝতেও পারবে না।

আমি একটা ভাল কাজ করেছি, আমি একটা ভাল জীবন-যাপন করেছি, শুদ্ধ জীবন অতিবাহিত করেছি, আমি এর একটা ভাল ফল অবশই পাব। হিন্দুরাও একই কথা বলে, কিন্তু তারা বলে তুমি ফল ঠিকই পাবে কিন্তু, *ক্ষীণে পূণ্যে মর্ত্যলোক বিশন্তি*, তোমার পূণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে আবার তোমাকে ওখান থেকে ফেরৎ চলে আসতে হবে। কিন্তু কিছু কিছু ধর্ম আছে, তারা অনন্ত স্বর্গের কথা বলে। কি করে অনন্ত স্বর্গ হবে! যে কোন গতি যদি হয়, তাকে আবার ফেরৎ আসতে হবে, বা নিউটনের যদি থার্ড ল অফ মোশান এ্যাকশান রিএ্যাকশান লাগানো হয়, একটা জিনিসের উপর এ্যাকশান হয়েছে এবার তার রিএ্যাকশান হবে, এটাই আচার্য শঙ্কর প্রশ্ন রূপে রাখছেন। ফিজিক্সের সিদ্ধান্তগুলি যদি লাগানো হয় যুক্তিতে এটাই দাঁড়াবে – কোন জিনিসের যদি গতি হয়ে থাকে তা কখনই কোন ভাবে permanent হবে না, তার আবার সেই গতি হবে। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, দিন হলে রাত হয়, রাত হলে দিন হয়। যে জিনিসটা গতিতে আছে, ওই গতিটা

থাকবেই থাকবে। তাহলে এটা কি করে সম্ভব যে, একবার সেখানে পৌঁছে গেলে আর ফেরৎ আসতে হয় না? এটা তো যুক্তি সঙ্গত হল না। যুক্তিতে দাঁড়াচ্ছে না, বিজ্ঞান সম্মত হল না। ভগবান এবার এর উত্তর দিচ্ছেন। আমি জানি, যেখানে গতি হয় সেখানে পুনর্গতি হয়। মুক্তি একটা গতি, কিন্তু সেখানে পুনর্গতি হয় না। কেন হয় না?

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।।৭।।

(আমাকে বা আত্মাকে লাভ করলে পুনর্জন্ম হয় না; কারণ সংসারে কর্তাভোক্তারূপে প্রসিদ্ধ জীব আমারই সনাতন অংশ। দেহাদিসংঘাতের প্রভু জীব যখন শরীর থেকে উৎক্রমণ করে, তখন কর্ণবিবরাদিস্থানে অবস্থিত শ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ করে।)

পুনর্গতি কেন হয় না, এবার সাত নম্বর শ্লোকে ব্যাখ্যা করছেন। সেখান থেকে আট আর নয় নম্বর শ্লোকে বলবেন, মৃত্যুর পর জীবাত্মা ঠিক কিভাবে শরীর থেকে বেরিয়ে যায় আর পুনর্জন্ম কিভাবে হয়, তার সাথে বলবেন মুক্তি জিনিসটা কি। মুক্তির ক্ষেত্রে তাকে আর ফেরৎ আসতে হয় না, পুনর্জন্ম হলে ঘুরতে থাকে। ঘুরপাকটা কেন হয়, আর মুক্তি কেন হয়, এই জিনিসটাকে এবার পর পর কয়েকটা শ্লোকে পরিষ্কার করবেন।

গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে যাওয়ার আগে প্রসঙ্গ থেকে সরে এসে একটি গুরুরত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনা করে নিতে চাইছি, যাতে আমাদের কিছু সংশয় পরিষ্কার হয়ে যায়। অনেকে প্রশ্ন করেন, গীতা পাঠ, চণ্ডী পাঠ করতে গিয়ে যদি উচ্চারণে ভুল হয়, বিধিতে যদি ভুল হয়, তাতে কি কোন অপরাধ হবে? এটা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, তিনি হলেন ভাবগ্রাহী জনার্দন। গীতা পাঠ করছেন, চণ্ডী পাঠ করছেন, এটাই যথেষ্ট। বলা হয় যে, দূর্গা পূজা হল জাঁকজমকের পূজা, কালী পূজা হল মন্ত্রের পূজা। এক একটা পূজার এক এক রকম চলন। একজন বললেন, বাংলাতে সরস্বতী পূজা হল ইণ্ডিয়ান ভ্যালেন্টাইন ডে, যেখানে পূজা কম, ছেলেমেয়েদের সাজগোজ বেশি। কিন্তু কেউ যখন চণ্ডী বা গীতা পাঠ করছেন, তিনি কাউকে খুশী করার জন্য পাঠ করছেন না। প্রথমে আমাদের এই জিনিসটাকে মন থেকে নামিয়ে দিতে হবে যে, আমি কোন দেবী বা দেবতাকে খুশী করার জন্য শাস্ত্র পাঠ করছি। যখন পূজা করছি, জপ করছি, বা পাঠ করছি, তখন এটাকে মাথায় রাখতে হবে যে, অন্তর্যামী বা অন্তরাত্মা রূপে আমার ভিতরে যিনি আছেন তাঁকে খুশী করার জন্য এত কিছু করছি।

যাঁর যেটা করতে ভাল লাগে, যেটা করলে মন সন্তুষ্ট হয়, তিনি সেটাই করবেব। যেটা করতে গিয়ে মন খুঁত খুঁত করবে, সেটা কখনই করা উচিত না। অনেকেই গান করতে পারেন না, গলায় হয়ত সুর নেই বা গান করতে জানেন না, মনে মনে কিন্তু সবাই গান করেন, বাথরুমে গান করেন, নিজের ঘরে একাকী যখন আছেন তখন গান করেন। এই যেমন নিজের আনন্দের জন্য মনে মনে কেউ গান করছেন, ঠিক তেমনি মানুষ গীতা পাঠ করবে, চণ্ডী পাঠ করবে, জপধ্যান করবে, পূজা অর্চনা করবে নিজের আনন্দের জন্য করবে। ঈশ্বরকে খুশী করার জন্য কিছু করার দরকার নেই। আগে নিজে প্রসন্ন হতে হবে, নিজে খুশী হতে হবে, ভিতর থেকে আনন্দ বাইরে ফেটে ফেটে পড়ুক। লোকে তাকে দেখে বলবে, আগে তো তুমি এত খুশী খুশী থাকতে না, এখন তোমার কি হল? বলবে, আমি এখন রোজ গীতা পাঠ করি। শুনে তারও ইচ্ছা হবে জানতে গীতা কি, গীতা পাঠ করলে কি হয়। সেইজন্য সন্ধি জুড়ে হোক, সন্ধি ভেঙে হোক, যেভাবে হোক পাঠ করতে শুরু করে দিন। ঠাকুর যদি মনে করেন তিনিই আপনার কাছে কাউকে পাঠিয়ে দেবেন, যে এসে বলে দেবে, তুমি এই এই ভাবে পাঠ কর।

আমরা আবার মূল আলোচনায় ফিরে আসছি। যতক্ষণ বলছি ব্রহ্মই বস্তু বাকি সব অবস্তু, ব্রহ্মই হচ্ছেন সেই চৈতন্য স্বরূপ, এই পর্যন্ত না হয় সব ঠিক আছে, আচার্যও এটাকে মেনে নিচ্ছেন। কিন্তু কেউ যখন প্রশ্ন করে, তাহলে এই জড় কোথা থেকে এলো? তখন আচার্য বলবেন এটা মায়া। ভালো করে চিন্তা ভাবনা করলে বোঝা যায় সত্যিই এটা মায়া ছাড়া কিছু হতেই পারে না, অথচ চিন্তা ভাবনা করে এই মায়াকে কিছুই বোঝার উপায় নেই। ব্রহ্মের উপর যে একটা আবরণ পড়ে গেল, যেটাকে মায়া বলা হচ্ছে, সেটাও তো তাঁরই শক্তি, ব্রহ্ম আর শক্তিতে কোন ভেদ নেই। কিন্তু মায়ার আবরণ এসে গেলেই ব্রহ্মকে অন্য রকম দেখাচ্ছে। আচার্য বলছেন – এই যে মায়ার ছায়া, এই ছায়ার এমনই খেলা যে সেখানে সেই ছায়ার মধ্যে মন তৈরী হয়ে যায়। এই মনের মধ্যে সেই ব্রহ্মই প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন।

আমরা জানি এই পৃথিবীর জন্ম সূর্য থেকে, পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই সূর্যের জন্যই আছে, কারণ সূর্য থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি। এই পৃথিবীর মাটি দিয়ে যদি একটা ঘট তৈয়ার করা হয়, তাহলে এই ঘটটাও সেই সূর্য থেকেই এসেছে বলা যায়, ঘটের মধ্যে যদি জল রাখা হয় সেই জলও সূর্যেরই। এখন সেই জলপূর্ণ ঘটটি যদি সূর্যের আলোর মধ্যে রেখে দেওয়া হয়, তখন সেই জলে কি প্রতিবিম্বিত হবে? সেই সূর্যই প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। কোথায় প্রতিবিম্বিত হচ্ছে? জলের উপর। জলটা কার? সূর্যের। ঘটটা কার? সূর্যের। কে প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন? তিনি নিজেই প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন। এবার জলটা শুকিয়ে বাষ্প হয়ে উবে গেল বা ঘটটা গেল ভেঙ্গে। এখন সেই প্রতিবিম্বিত সূর্যটা কোথায় গেল? কোথাও যায়নি, যেখানে ছিল সেখানেই আছে। সূর্য কখন নীচে আসেনইনি, অথচ আমি ভাবছিলাম সূর্য এই ঘটের মধ্যেই আছে। আমি সূর্যের দিকে তাকাতে অভ্যস্ত নই, গরু, ভেড়া, ছাগলের মত মাটির দিকে তাকিয়েই চলি।

এখন এখানে হাজারটা ঘট আছে, এবার আমি একটা একটা করে ঘটগুলো ভাঙ্গতে থাকলাম। এগুলোর মধ্যে যে সূর্য প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল ভাঙার পর সেগুলো কোথায় গেল? কোথাও যায়নি, যেখানে ছিল সেখানেই আছে। যেটা ভাঙ্গলো সেটা কার? সেটাও তাঁরই। এই যে মন, যেখানে চৈতন্য প্রতিভাসিত হয়ে আমি বোধ হচ্ছে। যাঁরা জ্ঞানী তাঁদের যে ঈশ্বরের জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানটা কোথায় হয়? তাঁর মনেই জ্ঞান হয়। এই মনটা কার? সেটাও ভগবানেরই। সেই মনটা কোথায়? দেহে। দেহটা কোথা থেকে এসেছে? সেইখান থেকেই এসেছে। ঈশ্বরের বাইরে তো কিছু নেই। কিন্তু মনের মধ্যে যেটা হচ্ছে সেটা প্রতিবিম্বিত। ঠিক তেমনি, একটা কাঁচের গ্লাশে যে আকাশ আছে সেটা আবদ্ধ আকাশ। এবার এই কাঁচের গ্লাশটাকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়, এখন কাঁচের ভেতরের আকাশটা কোথায় গেল? কোথাও যায়নি। যে আকাশে ছিল সেই আকাশেই আছে। সেইজন্য বলা হচ্ছে – এর কোন আসা যাওয়া হয় না। যতক্ষণ আমাদের বালবুদ্ধি বা মূঢ়বুদ্ধি থাকে ততক্ষণ আমরা মনে করি অমুক লোকটি মারা গেল। কিন্তু তাঁর কাছে কিছুই হচ্ছে না, তিনি দেখছেন তিনি কোথাও আসেনও না যানও না।

যে কোন ধর্ম, বিশেষ করে হিন্দু ধর্ম, তার মধ্যে আবার বেদান্তের নিজস্ব যুক্তি আছে – যত দূর যুক্তি যাবে, বেদান্ত তত দূর যুক্তিকে নিয়ে গিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেবেন। এর আগে বলা হয়েছিল, যেখানে গেলে আর ফেরৎ আসতে হবে না, এটা কিভাবে সম্ভব? আকাশের দিকে যে জিনিসটা ছোঁড়া হয়, সেই জিনিসটা আবার নীচে ফেরৎ চলে আসে। আচার্যও এই প্রশ্ন তুলে বলছেন, *ননু সর্বা হি গতিঃ আগত্যন্তা সংযোগা বিপ্রযোগান্তা ইতি হি প্রসিদ্ধং*, যে কোন গতির পুনর্গতি হয়, জগতে এটাই প্রসিদ্ধি। সেখানে বলা হয়েছিল, অন্যান্য ধর্মে যে স্বর্গের কথা বলা হয়, বেদে যে স্বর্গের কথা বলা হয়েছে, এই স্বর্গ থেকে সবাইকে ফেরৎ আসতে হয়। সেদিক থেকে দেখলে বিষ্ণুলোক থেকেও সবাইকে ফেরৎ আসতে হবে, রামকৃষ্ণলোক থেকেও ফেরৎ আসতে হবে, সব লোক থেকেই ফিরতে হবে। কিন্তু ছয় নম্বর শ্লোকে বলা হল, যেখানে গেলে আর ফেরে না।

তাহলে বিষ্ণুলোক, শিবলোকের ব্যাপারে আমাদের ধারণা কি? সেই ধারণার উপর নির্ভর করবে, আমাকে ফিরতে হবে কি হবে না? তার সাথে আমাদের জানতে ইচ্ছে করে মৃত্যুর পর আমাদের কি হয়। একটা লোক মরে গেল, মরে গিয়ে লোকটা কোথায় গেল? যদি সে দেহ হত, তাহলে তো তার দেহ সামনেই পড়ে আছে, কিন্তু কোন সাড়া দিচ্ছে না কেন? এমন কিছু একটা কি আছে, যেটা এই দেহ থেকে বেরিয়ে গেছে? এই যে কিছু একটা আছে, যেটা বেরিয়ে গেছে, সেটা কিভাবে বের হল? বেরিয়ে কোথায় গেল? এবার এই জিনিসগুলোকে নিয়ে আলোচনা হবে।

তার আগে মুক্তি জিনিসটা কি বোঝার জন্য সাত নম্বর শ্লোক খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে দুটো শ্লোক ছয় আর সাত নম্বর শ্লোক জুড়ে আছে। ছয় নম্বরে বলছেন, *যত গত্বা ন নিবর্তন্তে*। আমি যদি রামকৃষ্ণলোকে যাই, আর যেন আমাকে ফেরৎ না আসতে হয়। অদ্বৈত বেদান্ত ছাড়া সবাই দ্বৈতবাদী। দ্বৈতবাদী ধর্ম যতই বলুক, স্বর্গ, নরক যাই বলুক, ফেরৎ সবাইকে আসতে হবে। যতই বলি, আমি মরব না, মরতে আমাকে অবশ্যই হবে। যতই অনন্ত স্বর্গের কথা বলা হোক, ফেরৎ সবাইকে আসতেই হবে।

সাত নম্বর শ্লোকের প্রথম লাইনে বলছেন, মুক্তি কি আর দ্বিতীয় লাইনে বলছেন, মৃত্যু কিভাবে হয়। এই হল একজন ঋষির রচনা, একটি শ্লোকে দুটি পঙতি, প্রথমটাতে বলছেন, মুক্তি কি, কিভাবে মুক্তি হয়; আর দ্বিতীয় পঙতিতে বলছেন মৃত্যুর পরে কি হয়। *মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*, আচার্য শঙ্কর এই শ্লোকের ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে বলছেন, *মাম এব পরমাত্মনঃ অংশো*, *মাম* বলতে শ্রীকৃষ্ণ নন, যিনি পরমাত্মা; শ্রীরামকৃষ্ণকে যদি আমি পরমাত্মা মনে করি তবেই সেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমাত্মা, অন্য কোন শ্রীরামকৃষ্ণ না। আপনি বিষ্ণুকে মানেন, উনি শিবকে মানেন, যাকেই মানুন, পরমাত্মা রূপে মানতে হবে। সেই পরমাত্মা বলছেন, জীব আমারই অংশ। এই হল ঈশ্বর প্রদত্ত মেধা, যে মেধার সাহায্যে আচার্য শঙ্কর হিন্দুদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সব শাস্ত্রগুলিকে এক জায়গায় নিয়ে আসছেন। আগেও কয়েকবার আমরা বলেছি, তিনজন এই কাজটা করেছেন। প্রথম ব্যাসদেব, দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য আর শেষ করেছেন ঠাকুর ও স্বামীজী। বাকিরা জিনিসগুলিকে আরও ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন, যাঁরই নাম নিই না কেন, রামানুজ বলুন, মাধ্বাচার্য বলুন, ইদানিং কালের ব্রহ্মজ্ঞানী বলুন, ইদানিং কালের ভক্ত বলুন, সবাই জিনিসগুলিকে ছড়িয়ে নিয়ে গেছেন। কিন্তু এই তিনজন হিন্দুদের সব কিছুকে গুছিয়ে নিয়ে এসেছেন।

কথামৃতে ঠাকুর এক জায়গায় নিজেই জিজ্ঞেস করছেন, অংশ না কলা? কলা যখনই বলা হয় তখন সেখানে চন্দ্রমার ষোলটি কলা আসবে, যেটাই হবে শতকরা হিসাবে ছয় শতাংশ করে হবে। অংশ বললে সেখানে কম হতে পারে, শতকরা এক কিংবা পয়েন্ট এক হতে পারে। ভাগবত ধর্মে অংশ ও কলা দিয়ে অবতারদের আবির্ভাবের শক্তির প্রকাশকে বিচারের উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। ব্যাসদেব বলছেন, এই যে জীব, জীব পরমাত্মারই অংশ। আচার্য শঙ্কর আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন – এই যে জীবরূপী শক্তি, এই যে আমিত্ব, যে শক্তি আমাকে আমি বানায়, এই দেহের ভিতর যিনি অবস্থান করেন, যাঁর অবস্থানের জন্য সমর্পণানন্দ আজ সমর্পণানন্দ হয়েছে, যাঁকে কেউ বলে ভোক্তা, কেউ বলে কর্তা, এটা হল সেই পরমাত্মার অংশ। আচার্য শঙ্কর এই জিনিসটাকে পুরো গুছিয়ে এনে বলছেন, *অংশো ভাগঃ অবয়ব একদেশ ইতি অনর্থান্তরং*। আচার্য শঙ্কর বলতে চাইছেন – যেটা জীবের শক্তি, যাঁরা এই গীতার কথা শুনছেন, সবারই এই নাম সেই নাম আছে, যাঁরা নিজেকে মনে করছেন আমি কর্তা, মনে করছেন আমি ভোক্তা, যেমন এইখানে আমি বক্তা আপনারা শ্রোতা, যেখানে ক্রিয়ার সম্পর্ক রয়েছে, এটা পরমাত্মারই অংশ। আচার্য এখানে তার সাথে যোগ করে দিয়ে বলছেন, ভাই, তুমি এটাকে অঙ্গ বল, ভাগ বল, একদেশী বল, একদেশী মানে একই রকম শরীর, অংশ বল, কলা বল, ভাগ বল, যাই বল, আসলে এটা পরমাত্মারই অংশ। এই হল আচার্য শঙ্করের মেধা।

আমার তো মনে হয় না, এই তিনজনের থেকে বেশি মেধাসম্পন্ন কোন ব্যক্তিত্ব ভারতবর্ষে আজ পর্যন্ত এসেছেন – ব্যাসদেব, শঙ্করাচার্য আর স্বামী বিবেকানন্দ; স্বামীজীর পিছনে ঠাকুরের শক্তিকে ধরে নিয়েই এটা বলা হচ্ছে। জীব আর পরমাত্মার যে সম্পর্ক, এই সম্পর্ককে নিয়ে বিভিন্ন ভাবে বলা হয়। ঠাকুরও যেমন অংশ, কলার কথা বলছেন, শক্তি বিশেষের কথা বলছেন। ঠাকুর যখন এগুলোকে নিয়ে বলছেন, তখন তিনি বিভিন্ন দিক থেকে বলছেন। আমাদের শাস্ত্রও যখন এগুলোকে নিয়ে বলছেন, বিভিন্ন দিক থেকে বলছেন। আচার্য শঙ্কর সব কটাকে একটা জায়গায় নিয়ে এসে বলছেন, ভাই, অংশ বল, অঙ্গ বল, ভাগ বল, অবয়ব বল, একদেশী বল, যা বল, সব হল পরমাত্মারই অংশ। আমরা যত শাস্ত্র পড়ি না কেন, শাস্ত্র পড়ে যতই বোঝার চেষ্টা করি না কেন, আচার্য শঙ্করের মত শাস্ত্র কোন দিন বুঝতে পারব না। ঠাকুরও তাই আচার্যকে অবতার বলছেন। তার মানে যেখানেই জীব আছে, যেখানেই কর্তা, ভোক্তার ভাব আছে, সেখানেই পরমাত্মার অংশ থাকবে। ভাইরাস ব্যাক্টেরিয়া এদের কর্তা ভোক্তার ভাব নেই, এরা মৃত্যুধর্মা, জন্মাচ্ছে মরছে। গরুর কি এই ভাব আছে যে, আমি কর্তা ভোক্তা? না, নেই। একটা বাচ্চার কি এই বোধ আছে, আমি কর্তা আমি ভোক্তা? না নেই। যে জায়গাতে জীব আছে, যেখানে এই বোধ আছে যে, আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, সেই জায়গাতে ঈশ্বরীয় শক্তির প্রকাশ। তাহলে ভাইরাস, গরু, বাচ্চার মধ্যে কি ঈশ্বরীয় শক্তি নেই? পশু, পাখি, গরু, ভাইরাস, শিশু, সবারই মধ্যে সেই ঈশ্বরীয় চেতনা, ঈশ্বরীয় এগুলোতে শক্তি সুপ্ত রয়েছে। একটি বাচ্চার ভিতর কয়েকদিনের মধ্যে আমি কর্তা আমি ভোক্তার ভাব জেগে যাবে। যেমন যেমন তার বিবর্তন হবে, সে সব বুঝতে পারবে।

ছয় নম্বর শ্লোকে আগে বলা হল, *যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম*, আমার এই অংশ বা ভাগ, যেটাই বলি না কেন, যখন আমার কাছে চলে আসে, তাকে আর ফেরৎ যেতে হয় না। এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে, এটাকে শুধু উদাহরণ রূপেই দেখতে হবে, উদাহরণকে বেশি টানা হ্যাঁচড়া করা যাবে না। এই উদাহরণটা বুঝে নিতে পারলে বাকি সব শ্লোকগুলো বুঝে নিতে সহজ হবে।

আমার কাছে এমন একটা আয়না আছে যেটাকে আমি ছোট করতে পারি, বড় করতে পারি। তার সঙ্গে আয়নাকে ট্যারা করতে পারি, ব্যাঁকা করতে পারি, কনকেভ বানাতে পারি কনভেক্স বানাতে পারি। আর ওই আয়নাকে আমি ডান দিকে নিয়ে যেতে পারি, বাঁ দিকে নিয়ে যেতে পারি, উপরে নিয়ে যেতে পারি নীচে নিয়ে যেতে পারি। এবারে ওই আয়নাতে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হলে প্রতিবিম্ব হবে, ওর প্রতিবিম্ব কি রকম হবে? যেমনটি আয়না তেমনটি প্রতিবিম্ব হবে। যেখানে যাবে আয়না, সেখানে যাবে প্রতিবিম্ব। আয়নাটা যদি ভেঙে যায় তাহলে প্রতিবিম্বের কি হবে? আয়নাতে যে সূর্যটা ছিল, আয়না ভেঙে যাওয়ার পর সেটা কোথায় গেল? কোথাও যায়নি, কারণ আসেইনি তো যাবে কোথায়! এই একটি উপমা যদি কেউ ভাল করে বুঝে নিতে পারেন, পুরো বেদান্তকে তিনি বুঝে নিতে পারবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই।

এবার মনে করা যাক, একটি আয়না না হয়ে হাজার খানেক আয়না আছে। মনে করা যাক একটা পার্কে হাজারটা বাচ্চা খেলছে, সবার হাতে একটি করে আয়না। সব আয়নাতেই ম্যাজিক্যাল পাওয়ার আছে, যাতে সব আয়নাকেই কনকেভ, কনভেক্স, প্লেইন, ছোট বড়, ডান দিক বাঁ দিক যেমন খুশী করা যেতে পারে। হাজারটা বাচ্চা কেউ দৌড়াচ্ছে, কেউ বসে আছে, কেউ দাঁড়িয়ে আছে। কি হবে এখন? আকাশের সেই একটি সূর্য হাজারটা সূর্য হয়ে বিভিন্ন রূপে প্রতিবিম্বিত হয়ে যাচ্ছে। কোন কারণে সব আয়নাতে প্রতিবিম্বিত সূর্যের যদি চেতনা হয়ে যায়, 'আমি এই, এই আমার রূপ', এখন কি হবে? আমি ছোট হয়ে গেলাম, আমি বড় হয়ে গেলাম, আমি দৌড়াচ্ছি, আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমি বসে আছি। ছোট প্রতিবিম্ব বড় প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে বলবে, আমি ছোট ও কেন এত বড়, আমি কেমন বড়, ও কেমন ছোট। এইভাবে হতে হতে আয়নাটা ভেঙে গেল, এখন

কি হবে? এই যে আয়নাটা ভেঙে গেল, এর প্রতিবিম্ব সূর্যে ফেরৎ চলে গেল। ফেরৎ গেল কি? কখন আসেইনি, ফেরৎ যাবে কি করে?

এই যে মন, মনের যে জগৎ, ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করেন তখন ঈশ্বর কিছুই সৃষ্টি করেন না, শুধু এই মনই সব সৃষ্টি করে। মন সৃষ্টি হওয়া মানেই, টাইম এসে গেল, স্পেস এসে গেল, সব কিছু মনেতেই হয়, প্রকৃতি কিনা। রাজযোগে খুব সুন্দর এই জিনিসটাকে তুলে ধরা হয়েছে। পুরুষ যখনই চান সৃষ্টি হোক, তখনই চলে আসে প্রকৃতি। পুরুষের আলো যখন প্রকৃতির উপর পড়ে, সবার আগে আসে মহৎ, এর আরেকটা নাম বিশ্বমন। বিশ্বমন দুই প্রকার কাজ করে, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি, শত কোটি, হাজার কোটি, যত কোটি বলি না কেন, যত মন আছে সব আয়না। মন মানেই আয়না, মন মানে চৈতন্যকে প্রতিবিম্বিত করছে। তার সাথে আছে সমষ্টি মন, সমস্ত আয়না মিলে একটি সমষ্টি আয়না। আগেকার দিনে দেখা যেত, একটা আয়না আছে, তার মধ্যে অনেকগুলো ছোট ছোট আয়না ফিট করা আছে। প্রকৃতিকে যদি আমরা মনে করি সেই বিরাট একটি আয়না, তাহলে ছোট ছোট আয়নাগুলো হল এক একটা মন। কিন্তু সব আয়নার ম্যাজিক্যাল পাওয়ারস্ আছে, ছোট হতে পারে, বড় হতে পারে, গোল হতে পারে, ব্যাঁকা হতে পারে, কনকেভ হতে পারে, কনভেক্স হতে পারে। সেই এক সূর্য, কিন্তু কত তার প্রতিরূপ। যেমনি একটা মন বা আয়না ভেঙে গেল, সে ফেরৎ চলে গেল, বাকি যেমন ছিল তেমনই থাকবে।

তাহলে মুক্তি কি? যে মনের উপর সেই পরমাত্মার যে চিৎশক্তি প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল, সেই মনরূপী আয়নাটা ভেঙে গেছে। এই মন ভাঙা কোন ইমোশানের না, কবিতার ভাব নিয়ে না। যখন সেই পরমাত্মার চিৎশক্তি মনের কাছে এসে মনের সাথে জুড়ে যায়, এটাকেই বলে জীব, এটাই আমি, এটাই নিজেকে আমি কর্তা, আমি ভোক্তা মনে করা, কখন নিজেকে মনে করে আমি সুখী, কখন মনে করে আমি দুখী। কিন্তু যেটা বোঝান হল, আত্মা কোথাও আসেন না, কোথাও যান না। মনটা চলতে থাকে, সমান গতিতে চলতে থাকে। আমরা আধ ঘন্টা ধরে এই আলোচনা করছি, এই আধ ঘন্টা ধরে আমার মন চলছিল, আপনাদেরও মন চলচিল। এই আধ ঘন্টায় মনের পরিবর্তন হয়েছে, শরীরের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না, কারণ এই পরিবর্তনটা খুব ধীর গতিতে হচ্ছে। মৃত্যুতে এক ঘর থেকে আর-একটা ঘরে চলে গেল বলে মনে হয় টপ্ করে মৃত্যুটা হয়ে গেল। কিন্তু তা না, ওটাও ধীরে ধীরেই হয়। যেমন স্বর্গে যাচ্ছে, পাতালে যাচ্ছে, নরকে যাচ্ছে, চলতে থাকে। চলতে চলতে যখন চেতনা জাগে, আমার আর কিছু লাগবে না, তখন বলে, আমি যে এই প্রতিবিম্বতে বন্দী হয়ে আছি, এই প্রতিবিম্ব আমার আর লাগবে না, এটাকে ভাঙ এবার। যে আয়নাটার সাথে জুড়ে ছিল, সেই আয়নাটাকে ভেঙে দিল।

প্রকৃতি একটা আয়না ভাঙলে প্রকৃতি আরও দশটা আয়না বানিয়ে নেবে। জীব কোথাও থেকে আসে না, কারণ সেই এক সূর্য। তাকে যত আয়না দেওয়া হবে, সে তত প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে দেবে। লোকেরা বোকা বোকা প্রশ্ন করে, এত লোক মরছে তাও জনসংখ্যা কি করে বাড়ছে? না বাড়ার কিছু নেই, ভগবান যত খুশী আয়না বানিয়ে নিতে পারেন, তাঁকে তো কিছু করতে হয় না। মনের জগৎ, এ এক বিরাট আয়না। এই বিরাট আয়নাতে যত খুশী ছোট আয়না বানিয়ে দেওয়া যেতে পারে, অনন্ত সংখ্যায় আয়না বানিয়ে দেওয়া যায়। যত আয়না তত জীব। যে আয়নাটা ভেঙে গেল, তার মানে সেই প্রতিবিম্বিত জীব ফেরৎ চলে গেল। যে জীব ফেরৎ চলে গেল, সে আর কোথা থেকে আসবে? তার সম্পর্কটাই তো কেটে গেল। সে তো আসেইনি, ফেরৎ আসবে কি করে! তাহলে বাকীগুলোর কি হবে? বাকিগুলোও আসেনি, আমিও আসিনি, আপনিও আসেননি। কিন্তু এই জিনিসটা আমরা কেউই বুঝতে পারছি না, বুঝতে পারছি না বলেই আমাদের এত দুঃখ-কষ্ট, এত কান্না।

আচার্য শঙ্কর অন্য উদাহরণ দিচ্ছেন, *যথা জলসূর্যকঃ*। আচার্য দর্পণের উদাহরণ নেননি, তখন আয়নার এত প্রচলন ছিল না, তাই অন্য উদাহরণ নিয়ে বলছেন, একটা পাত্রে বা ঘটে জল আছে, সেই জলে সূর্য প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। জলের যেমন আকার, প্রতিবিম্ব তেমন হবে। আর বলছেন, জল যদি শুকিয়ে যায় তাহলে সব শেষ। আমার কর্ম শুকিয়ে গেল, সব শেষ। তখন ওই পরমাত্মার যে অংশ তার কি হয়? পরমাত্মার সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। পরমাত্মার সাথেই তো ছিল।

অন্য উদাহরণ দিচ্ছেন, এটাকে এনারা বলেন ঘটাকাশ। আকাশ মানে স্পেস, এই যে বিশাল আকাশ, এর মধ্যে একটা ঘট রেখে দিলাম। এখন তিনটে আকাশ হয়ে গেল। চারিদিকে যে আকাশ, এই একটি আকাশ, ঘট নিজে একটা আকাশ, ঘটের ভিতরে যে স্পেস, সেটা আর-একটি আকাশ। ছিল এক আকাশ, হয়ে গেল তিনখানা আকাশ। এবার ঘটটাকে যদি ভেঙে দেওয়া হয়, তখন সেই আকাশের কি হবে? কিছুই হবে না, যেমন ছিল তেমনটাই থাকবে, আকাশ আকাশই থাকবে। ঠাকুর উদাহরণ দিচ্ছেন, জলের উপর একটা লাঠি ফেলে দেওয়া হল, জল দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। লাঠি তুলে নেওয়া হল, এখন কি হবে? যে জল ছিল সেই জলই থাকল। জল কখন আদপে বিভাজন হয়নি, আমি ভাবছিলাম। দর্পণে প্রতিবিম্বিত সূর্য, এই উদাহরণ যদি আমরা মনে রাখতে পারি, বেদান্ত বুঝতে আমাদের কক্ষণ অসুবিধা হবে না, জন্ম বুঝতে অসুবিধা হবে না, মৃত্যু বুঝতে অসুবিধা হবে না, পুনর্জন্ম বুঝতে অসুবিধা হবে না, দেহান্তর বুঝতে অসুবিধা হবে না।

এখানে পূর্বপক্ষ আবার প্রশ্ন উত্থাপন করছেন, ভগবানের অংশ যদি হয়, তাহলে তো ভগবানের ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। আচার্য বলছেন, না তা হয় না। কারণ এটা হল, *ন এষ দোষঃ অবিদ্যাকৃতোপাধিপরিচ্ছিন্ন একদেশঃ অংশ ইব কল্পিতো যতঃ,* অবিদ্যাবশতঃ অংশ, কলা, অঙ্গ ইত্যাদি কল্পনা করা হচ্ছে, আর বলছেন, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই জিনিসটাকে নিয়ে বিস্তারে বলা হয়েছে, সেইজন্য আর বিস্তারে কিছু বলা হচ্ছে না। যদি বাস্তবিক অংশ হত, বাস্তবিক যদি কলা হত, বাস্তবিক যদি অঙ্গ হত, তাহলে কিন্তু পরমাত্মার অনেক অশান্তি হয়ে যেত। এই অংশটা পরমাত্মা থেকে বেরিয়ে চলে গেলে, এই অঙ্গটা ফেরৎ চলে এলো। যেমন রাজার সেনা, কিছু সেনা বাইরে গেল, কিছু সেনা ফিরে এলো, এখানে তো তা নয়। তাহলে জীব সংসারে কিভাবে আসে আর কিভাবে শরীর ছাড়ে? এখানে স্থূল শরীর ছাড়ার কথা বলা হল। সেটাই এবার পরের অংশে বলছেন। আগের অংশে ভগবান মুক্তির কথা বললেন। এবার মৃত্যুর পর কি হয়, সেটা বলছেন।

মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি, ছয়টি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। জীব, যে কিনা মনের সাথে জুড়ে আছে, সে ইন্দ্রিয়গুলিকে টেনে নেয়। আমাদের চোখ, কান, নাক, এগুলো হল গোলক, যেমন মাইক্রোস্কোপ, টেলিস্কোপ হয়। কিন্তু আসল ইন্দ্রিয় ওর পিছনে মনের ভিতর থাকে। ইন্দ্রিয়গুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, গোলকগুলি স্থূল। ভিতরের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলে অনেক সমস্যা হয়ে যাবে, কিন্তু গোলক যদি খারাপ হয়ে তাহলে অতটা ঝামেলা হবে না। যেমন চোখে ছানি পড়েছে, দেখতে অসুবিধা হচ্ছে। ডাক্তার ছানিটা কেটে চোখে একটা নূতন লেন্স লাগিয়ে দেবেন, চক্ষু ইন্দ্রিয়ের গোলক আবার দেখার কাজ শুরু করে দেবে। কিন্তু ভিতরের ইন্দ্রিয়ের যদি হানি হয়ে থাকে, ব্রেন সেন্টার যদি ড্যামেজ হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু মুশকিল হবে। ভি এস রামচন্দ্র একজন নামকরা নিউরো বিজ্ঞানী, ওনার খুব নামকরা বই 'ফ্যান্টমস্ ইন দা ব্রেন'। সেখানে তিনি বলছেন, কখন সখন ইন্দ্রিয়গুলি ড্যামেজ হয়ে যায়, কিংবা কোন অঙ্গ যদি বাদ চলে যায় তখন ওই ইন্দ্রিয়ের ব্রেইন সেন্টার বা অঙ্গের ব্রেইন সেন্টারটা অন্য অঙ্গকে টেনে নেয়। তবে ওটার সাথে এই জিনিসের মিল নেই, তবে কি যত পড়াশোনা করা যায় তত বুদ্ধি খোলে।

মন এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, মন ক্রমাগত চলতে থাকে। এই জগতে সব কিছু স্থির থাকতে চায়, নিউটনের প্রথম নিয়মে এটাই বলছেন। সব কিছু রেস্টে থাকতে চায়, কিন্তু মন সব সময় দৌড়াচ্ছে। ফলে কি হয়, মনের সঙ্গে যারা যারা জুড়ে আছে, তাদের সবাইকেও মন টেনে নিয়ে

চলতে থাকে। ইন্দ্রিয়গুলির অস্তিত্ব মনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। পাথরের কোন ইন্দ্রিয় নেই, পাথরের নিজস্ব পরিবর্তন হচ্ছে ঠিকই। তবে যেমন ধরুন চন্দ্রমা, সেখানে প্রকৃতির এত শক্তি, কিন্তু কোন কাজ করে না; চাঁদের পাথর চিরদিন পাথরই থেকে যায়। যেহেতু ইন্দ্রিয়গুলি মনের সাথে জুড়ে আছে, সেইহেতু ইন্দ্রিয়গুলিও মনের সাথে চলতেই থাকবে। বলছেন, *মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি*, মন বলতে এখানে ব্যষ্টি মন, সমষ্টি মন না। উদাহরণ দেওয়ার জন্য আমরা আয়নার কথা বলেছিলাম, এই আয়না হল মন আর ইন্দ্রিয় মিলে। আসলে সব ইন্দ্রিয় আর মন মিলেই মন হয়। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের যা যা গুণ আছে, সব গুণগুলি মনেরও রয়েছে। ফলে মন সরাসরি চোখের কাজ করতে পারে, মন সরাসরি কানের কাজ করতে পারে, মন যে কোন ইন্দ্রিয়ের কাজ করে দিতে পারে। কিন্তু করে না, প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের কাজ বিভাজিত হয়ে যায়।

জীবাত্মা যখন স্থূল শরীর ছেড়ে আরেকটা শরীরে যায়, তখন সেই সময় মন ইন্দ্রিয়গুলিকে টেনে নিয়ে চলে যায়। যদি আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করি, আপনি কে? আপনি বলবেন, অহং ব্রহ্মাস্মি, আমি সেই ব্রহ্ম। তা হবে না, যেমনি আপনি মুখে বলছেন, অহং ব্রহ্মাস্মি, তখন আপনি সেই জীব, যেখানে মন আর পঞ্চ ইন্দ্রিয় জড়িয়ে আছে, এটাই আমি, এটাই আপনি। বিদেশী ধর্মে যখন সোল বলে, তখন তারা এটাকেই সোল বলে। আমরা ইংরাজী soul (সোল) শব্দের অনুবাদ করি আত্মা, মনে করি তারা আত্মার ব্যাপারেই বলতে চাইছে, কিন্তু আত্মা পুরোপুরি আলাদা জিনিস। এখানে জীবাত্মাকে নিয়ে আলোচনা চলছে। অন্যান্য ধর্মে জীবাত্মাকেই আত্মা বলে মনে করা হয়, সেইজন্য ওদের কাছে শেষ কথা হল স্বর্গ, আমাদের কাছে স্বর্গ শেষ কথা নয়। মৃত্যু যখন হয়, তখন কি হয়?

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ।।৮।।

(বায়ু যেরূপ পুষ্পাদি থেকে গন্ধ আহরণ করে, জীব সেইরূপ শরীরান্তর গ্রহণকালে পূর্বদেহ থেকে মন ও ইন্দ্রিয়াদি সংস্কার সঙ্গে নিয়ে যায়; অর্থাৎ পূর্বদেহের ইন্দ্রিয়াদি নূতন দেহে প্রবেশ করে।)

ফুলের উপর দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হল, বাতাস ফুলের গন্ধটা টেনে নিয়ে চলতে লাগল। ঠিক তেমনি *শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ*, এই ঈশ্বর হলেন *দেহাদিসংঘাতস্বামী জীবঃ*, এই ঈশ্বর পরমাত্মা না, জীব, দেহের ঈশ্বর। দেহ, ইন্দ্রিয় আর মন, এই যে সংঘাত, কমপ্লেক্স যেটা রয়েছে, এর যে স্বামী, তিনি ঈশ্বর। এই ঈশ্বর যখন এই দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যান, তিনি কাঁদতে কাঁদতে যান না। আমরা সবাই নিশ্চয় মৃত্যু দেখেছি, বাড়িতে বাবা, মা, ঠাকুর্দা, কারুর না কারুর মৃত্যু দেখে থাকতে পারি, তিনি গত হয়েছেন বলে তখন আমরা চোখের জল ফেলেছিলাম। আমরা অবাক হয়ে ভাবতাম, বলতাম, তিনি আমাদের ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন! স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে তার কাছের লোকেরা জিজ্ঞেস করে, ব্যাঙ্কে টাকা-পয়সা রেখে গেছে তো। অনেক সময় আমরা অন্যদের উপদেশ ছলে বলে থাকি, একদিন তোমাকে চলে যেতে হবে, তখন তোমার সব কিছু এখানেই পড়ে থাকবে। তাই কি হয়? না, যখন কেউ মারা যায় তখন সবাই নিজের আসল সম্পত্তিটা নিয়ে বেরিয়ে চলে যায়।

অনেক আগে একটা গল্প শুনেছিলাম। এক বাড়িতে একজন মহিলা অনেক দিন কাজ করে। একদিন সেই মহিলা তার মালকিনকে দুঃখ করে বলছে, 'এতদিন আপনার বাড়িতে কাজ করছি এখনও আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না'। মালকিন বলছে, 'বিশ্বাস করি না মানে, আমার সব বাক্সের চাবি, আলমারির চাবি বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে চলে যাই, তারপরেও তুমি কি করে বলছ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না?' কাজের মহিলা বলছে, 'ছেড়ে দিয়ে যান ঠিকই, কিন্তু কোন চাবিই কোন তালাতে লাগে না'। এই গল্পটা কাউকে অসম্মান করার জন্য না, এটা একটা জোক। কোন

চাবি তালাতে লাগে না, তার মানে, মালকিন আসল চাবিটা নিয়ে বেরিয়ে যায়। কেউ যখন মারা যান, তিনি তখন আসল জিনিসটা নিয়ে বেরিয়ে যান। আসল জিনিসটা কি? তার আমিত্ব। আমিত্বটা কি? তার মন, আর তার পাঁচটি ইন্দ্রিয়।

আমার সাম্প্রতিক উপন্যাস ক্রতুতে ঠিক এই জিনিসটাকেই দেখানো হয়েছে, কিভাবে একজন জন্মাচ্ছে, মরছে, আবার জন্ম নিচ্ছে, আবার মরছে, আর তার অনুভবগুলি স্মৃতিতে জড়ো হয়ে থাকছে। কোন একটা অভিশাপে ক্রতু কোন জন্মের কথা ভুলতে পারছে না, সমস্ত জন্মের কথা তার মনে আছে। স্বর্গে গেছে, স্বর্গের সব কথা মনে আছে; কোন জন্মে যমরাজের কাছে গিয়েছিল, সেটাও তার মনে আছে। ক্রতু বইতে হিন্দু সংস্কৃতির সব কিছুকে তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের মন যে এক শরীর থেকে আরেক শরীরে চলতে থাকে, তখন মন আমাদের সংস্কারগুলিকে নিয়ে চলে। ক্রতু তার প্রত্যেকটি জন্মে সংস্কারের সাথে সাথে পূর্ব পূর্ব জন্মের স্মৃতিটাও নিয়ে চলছিল। আমাদের পূর্ব জন্মের স্মৃতিটা থাকে না। কত কিছু আমরা করছি, কত কিছু দেখছি, কোন স্মৃতিই আমাদের থাকে না, কিন্তু সব কিছুই মনের মধ্যে একটা সংস্কার তৈরী করে দেয়। কোন জন্মে কাউকে সাপের কামড়ে মরতে দেখেছিলাম, বা আমারই হয়ত কোন জন্মে সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়েছিল, সেই থেকে যে সাপের ভয় তৈরী হয়ে সেটা এখনও চলছে। স্মৃতিটা নেই কিন্তু ভয়ের সংস্কারটা থেকে গেছে। বাঘ কোন দিন আমাকে আক্রমণ করেনি, কিন্তু তাও আমি বাঘকে ভয় পাই। কোন জন্মে কোথাও বাঘের কথা শুনেছিলাম বা কোথাও বাঘ দেখেছিলাম, সেটা হয়ত আমার মনে নেই, কিন্তু বাঘের ভয়ের সংস্কারটা থেকে গেছে। স্মৃতি আমাদের চলে যায়, কিন্তু সংস্কারগুলি থেকে যায়।

মৃত্যুর সময় মানুষ এই সংস্কারগুলিকে সঙ্গে নিয়ে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। তার সাথে নিয়ে যায় পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে, এই ইন্দ্রিয় মানে যে চোখ দিয়ে দেখছি, যে কান দিয়ে শুনছি, এগুলোকে নিয়ে যায় না, এই স্থূল ইন্দ্রিয়ের পিছনে যে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলি আছে, সেগুলিকে নিয়ে চলে যায়। এই জন্মে আমি যদি বোকা থাকি, আগামী জন্মে আমি বোকা হয়েই জন্মাব। এই জন্মে আমি যদি খুব রাগী হয়ে থাকি, আগামী জন্মে আমি রাগী হয়েই জন্মাব। কারণ এর সাথে পুরো একটা ধারাবাহিকতা আছে, কোথাও কোন ব্রেক হয় না।

পুরাতন শরীর ছেড়ে নূতন শরীর যখন পায়, তার আগে বলছেন, *গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ*, যখন এই শরীরটা ছেড়ে দিচ্ছে, বাতাস যেমন গন্ধকে নিয়ে চলে, তেমনি ওই শরীরের যিনি স্বামী, তিনি কাঙালী হয়ে যাননি, সব ছেড়ে যাননি, আসল জিনিসটা নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। আসল জিনিসটা কি? তার মন, মনের সংস্কারগুলি, মনের ক্ষমতা, এগুলোকে নিয়ে বেরিয়ে যান। শচীন তেণ্ডুলকার এক জন্মে এত বড় ক্রিকেটার হননি, আগের আগের জন্মে তাঁর ক্রিকেটের উপর অনেক সাধনা করা আছে। টাকা-পয়সা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু সেখানেও ঠাকুর বলছেন, আগের জন্মে দানপূণ্য করা থাকলে এই জন্মে টাকা-পয়সা হয়। সেটা আবার কর্মের দিক থেকে আসছে, এখানে আমরা সংস্কারের দিক থেকে বলছি। কর্মফল আলাদা জিনিস, সংস্কার আলাদা জিনিস, কিন্তু দুটোই থাকে এই মনেতে।

জীবাত্মা যখন চলে, তখন সেই আয়নার মত চলে, আয়নাটা হল সেই মন আর ইন্দ্রিয়। তার সঙ্গে রয়েছে প্রতিবিম্বিত পরমাত্মা, ঈশ্বর। এই তিনটে মিলে চলল। কোথায়? নূতন কোন শরীর ধারণ করতে। শরীর খুঁজতে থাকে। কিন্তু সেভাবে খুঁজতে পারে না। কারণ সূক্ষ্ম শরীর খুব হাল্কা হয়ে যায়, বাতাস যেমন যেমন চলবে গন্ধও তেমন তেমন চলবে। আমরা মনে করি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা আছে, নিজের ইচ্ছা মত দেহধারণ করে নেব। কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু থাকে না। খিদে পেলে খেতে হয়, তৃষ্ণার্ত হলে জল খেতে হয়, স্বাধীন কোথায় আমরা! এই জীব যখন ইন্দ্রিয়কে নিয়ে চলে, সেও ততটা পারে না। নিজের ইচ্ছে মত যে যে কোন গর্ভে ঢুকে যাবে, সেটাও হয় না। উপনিষদে বলছেন, *যথাকর্ম যথাশ্রুতম্*, যেমন যেমন কর্ম, যেমন যেমন তার উপলব্ধি, তেমন তেমন যোনিতে

গিয়ে তাকে পড়তে হবে। তাহলে আমি যে বংশে জন্মেছি, কেন এই বংশে জন্ম নিলাম? কারণ আমি একমাত্র এই বংশের জন্যই উপযুক্ত। যদি দেখি বাবা-মার সাথে আমার জমছে না, তাহলে সেখানে বাবা-মার দোষ না, দোষ আমার। আমার যেমন কর্ম, যেমন আমার জ্ঞান, যেমন আমার মন, যেমন আমার ইন্দ্রিয়, তেমন তেমন আমার কর্ম ঠেলে ঠেলে আমাকে ঠিক সেই জায়গায় নিয়ে গেছে, যেটার জন্য আমি উপযুক্ত। যদি উপযুক্ত না হই, তাহলে অকাল মৃত্যু হয়ে ওখান থেকে চলে যেতে হত। চিকিৎসা বিজ্ঞানেও বলে, জন্ম নেওয়ার আগেই অনেক গর্ভপাত হয়ে যায়। হয়ত কোন জীবাত্মা গর্ভে চলে এলো, আসার পর বুঝতে পারল এই জায়গাটা আমার উপযোগী নয়, বেরিয়ে চলে গেল।

আগে আলোচনা করা হয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও আরও পরিষ্কার হওয়ার জন্য আবার এই প্রসঙ্গটা নিয়ে বলতে হচ্ছে। বলছেন, *যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ*, যখন একটা শরীর ছেড়ে আরেকটা শরীরে জীবাত্মা যায়, তখন জীবাত্মা মন আর ইন্দ্রিয়কে টেনে নিয়ে বেরিয়ে চলে যায়। এখানে যে ঈশ্বরের কথা বলা হচ্ছে, এই ঈশ্বর হলেন দেহাদিসংঘাতের যিনি মালিক। ভগবান যিনি, প্রতিবিম্বিত চৈতন্যও তিনি। মৃত্যুর সময় তিনিই এই শরীর থেকে বেরিয়ে আরেকটি শরীরে যান। কিভাবে যান? *বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ*, যেমন বাতাস যখন প্রবাহ হয় তখন সে ফুল থেকে তার গন্ধটাকে টেনে নিয়ে চলে যায়। বাতাস যেমন সুগন্ধ দুর্গন্ধ সবই টেনে নিয়ে চলে যায়, ঠিক তেমনি, ঈশ্বর, যিনি জীবাত্মা তিনি এই ইন্দ্রিয়গুলোকে টেনে নিয়ে চলে যান। এইখানে স্বামীজী বারবার বলছেন, তন্মাত্রা কোন গুণ বা ধর্ম নয়, তন্মাত্রা হচ্ছে বস্তু কণা। ফলে, জীবাত্মা যখন চলতে থাকে তখন এক অপরকে ধরে থাকে। বাবা আর বাচ্চা যখন নদী পার হয় তখন বাবাও বাচ্চাকে ধরে থাকে বাচ্চাও বাবাকে ধরে থাকে, কেউ কাউকে ছাড়ে না। ঠিক তেমনি যখন জীবাত্মা এক শরীর থেকে বেরিয়ে চলে আসে তখন জীবাত্মা ঐ ইন্দ্রিয়গুলোকে ধরে রাখে আর ইন্দ্রিয়গুলোও জীবাত্মাকে ধরে রাখে। এইভাবে গিয়ে জীবাত্মা আরেকটা শরীরকে আশ্রয় করে নেয়।

এটা ঠিক কম্প্যুটারের মত, কম্প্যুটারের মনিটর থেকে শুরু করে মাউজ সব কিছু পাল্টে গেলেও তার হার্ডডিস্ক একই থাকবে, আর হার্ডডিস্কে যতই নতুন নতুন ডাটা, নতুন প্রোগ্রাম দিচ্ছে ততই তার জিনিসগুলো পাল্টাচ্ছে। এই ভাবে চলতে চলতে এক সময় মনিটর থেকে শুরু করে সব কিছু খারাপ হয়ে গেলে, সব ফেলে দিলাম, কিন্তু হার্ডডিস্কটা নিয়ে চলে গেলাম, সেটাকে অন্য একটা কম্প্যুটারে বসিয়ে দেওয়া হল, আবার কম্প্যুটার চলতে থাকল, আবার নতুন নতুন ডাটা, প্রোগ্রামিং লোড হতে থাকল। কিন্তু কোন প্রোগ্রামে আগে যেটা ভুল ছিল সেই ভুলটা এখানেও থেকে যাবে; মেমোরিতে যেমন ছিল তেমনই থাকবে। কম্প্যুটার হওয়াতে আমাদের শাস্ত্রের কথাগুলো বোঝাতে এবং বুঝতে অনেক সুবিধা হয়ে গেছে। আমি যতই পাল্টে যাই না কেন, কম্প্যুটারের কিবোর্ড, মনিটর, মাউজ যেটাই খারাপ হয়ে যাক না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না, আবার সব কিছু দোকান থেকে কিনে লাগিয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু হার্ডডিস্ক কখন পাল্টান যাবে না। যা যা ভুল করেছি, যা যা ভালো করেছি সব প্রোগ্রাম এই হার্ডডিস্ক ধরে রেখেছে। এক কম্প্যুটার থেকে আরেক কম্প্যুটারে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু হার্ডডিস্ক যেমন থাকার তেমনই থাকছে। কি কি ইন্দ্রিয় জীবাত্মার সঙ্গে সঙ্গে শরীর থেকে বেরিয়ে চলতে থাকে?

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে।।৯।।

(দেহস্থিত জীবাত্মা চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্ জিহ্বা ও নাসিকা আশ্রয় করে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়কে মনের সাহায্যে উপভোগ করে।)

আমরা কেউ সাধারণ লোক নই, আমি আপনি সবাই সেই পরমাত্মারই অংশ। পরমাত্মা সমস্ত জগৎব্যাপী রাজ করেন, আমরা এই দেহরূপী জগতে রাজ করি। কারণ আমরা সবাই প্রতিবিম্ব।

মনে রাখতে হবে, জীবনে যদি কখন মনকে হতাশা গ্রাস করে নেয়, নিজেকে যদি ছোট মনে হয়, তাহলে মনে করিয়ে দিতে হবে আমি দেহরূপী সংসারে সেই ঈশ্বর। আমরাও রাজ করছি এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের উপর আর মনের উপর, এই ছয়টি জিনিসকে আশ্রয় করে জীবাত্মা সংসারকে ভোগ করতে থাকে। রাজার যেমন মন্ত্রী থাকে, সেনাপতি থাকে, তাদের দিয়ে যেমন রাজা রাজ্যভোগ করতে থাকে, ঠিক তেমনি এই জীব মন আর পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে নিয়ে সংসারকে ভোগ করতে থাকে। যখন চলে যাওয়ার সময় হয়, তখন রাজা হাঁক দিয়ে বলে, 'মন্ত্রীগণ, সেনাপতিগণ এবার এখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে সবাই চল'। ইন্দ্রিয়গুলি তখন কাজ করা বন্ধ করে দেয়। মৃত্যুর আগে ইন্দ্রিয়গুলি আস্তে আস্তে সব কাজ বন্ধ করে দেয়, কান শুনতে পায় না, চোখ ভাল দেখতে পায় না। মৃতপ্রায় ব্যক্তি বলে, এত অন্ধকার কেন, আলোটা বাড়িয়ে দাও। যখন কোন অসুস্থ রোগী বলে, আলো এত কম কেন, আলোটা বাড়াও, বুঝে নিতে হবে, তার সময় হয়ে গেছে। ইন্দ্রিয়গুলি এখন গুটিয়ে নিচ্ছে, জীবাত্মা হাঁক দিয়ে বলছে, চল চল, আর দেরী করা যাবে না।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ।।১০।।

(যিনি দেহান্তরে গমন করেন, যিনি শরীরে অবস্থানপূর্বক বিষয় ভোগ করেন বা যিনি ত্রিগুণের পরিণাম সুখ-দুঃখ ও মোহের সাথে সংযুক্ত হন, সেই জীবাত্মাকে বিমূঢ় ব্যক্তিরা জানতে পারে না; কারণ তাদের মন বিষয়-আকর্ষণের দ্বারা বহির্মুখী। কিন্তু অন্তর্মুখী জ্ঞানিরাই শাস্ত্রজ্ঞানরূপ চক্ষু দ্বারা সেই আত্মাকে অবগত হন।)

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্, জীবাত্মা বর্তমান শরীরকে ছেড়ে নতুন শরীর ধারণ করছেন বা এই শরীরে বসে আছেন বা বিষয়ের ভোগ করছেন, জীবাত্মার এই যে নানা রকম ক্রিয়াকলাপ, আর এগুলো যে ভাবে হচ্ছে এর সব কিছুই স্পষ্টতঃ দৃষ্টিগোচর। কিন্তু *বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি,* সাধারণ মানুষ এই জিনিসগুলিকে দেখতে পায় না, বুঝতে পারে না। *পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ,* যাঁদের জ্ঞানচক্ষু আছে, যাঁরা জ্ঞানী পুরুষ একমাত্র তাঁরাই জীবাত্মার সব রকম ক্রিয়াকলাপগুলো পরিষ্কার দেখতে পান।

গুণান্বিতম্, সুখ, দুঃখ, মোহ এই জিনিসগুলিকে যখন ভোগ করে, আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *অত্যন্তদর্শনগোচরপ্রাপ্তং,* তখন এগুলো পরিষ্কার দেখা যায়, কিন্তু সাধারণ মানুষরা দেখতে পায় না। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখানে জীব বসে আছেন, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে জীব বেরিয়ে চলে যাচ্ছেন, কিন্তু যারা মুর্খ, মূঢ়, তারা দেখতে পায় না। মুর্খ কে? বিষয়ের প্রতি যার ভালবাসা, দৃষ্ট-অদৃষ্ট ভোগের প্রতি যার ভালবাসা। ফলে কি হয়? আচার্য বলছেন, *দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়ভোগ–বলাকৃষ্টচেতস্তয়া অনেকধা মূঢ়া,* মুর্খ কে, দৃষ্ট-অদৃষ্ট বিষয়ের প্রতি যার লালসা, আমি লুটে পুটে খাব, এটা তার বুদ্ধিকে কলুষিত করে দেয়, মূঢ় বানিয়ে দেয়। এরাই জীবাত্মার এই স্পষ্ট জিনিসগুলো দেখতে পায় না। যারা দেহ দেখে, তারা আত্মাকে দেখতে পায় না। যাঁরা আত্মাকে দেখতে পান, তাঁরা আবার দেহ দেখেন না।

ব্যসদেব যেমন গোপীদের থেকে সব ননী, মাখন খাওয়ার পর যমুনাকে বলছেন –হে যমুনে, আমি যদি কিছু না খেয়ে থাকি তাহলে তুমি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যাও, আমরা মাঝখান দিয়ে তোমাকে পার করে যাই। ব্যাসদেব জানেন যে, আমি কিছু খাইনি, আহুতি দেওয়া হয়েছে, এখানে আমি বোধ নেই। যিনি আত্মজ্ঞানী, যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, তিনি পরিষ্কার দেখতে পান যে, ভিতরে একজন আছেন তিনিই এগুলো চাইছেন তাই এগুলো করাচ্ছেন বলেই এই সব কিছু হচ্ছে, আমি তো সেই নির্লিপ্ত আত্মা, আত্মা তো কিছুই করেন না। রামপ্রসাদের গানে যেমন বলা হচ্ছে – সকলি তোমারি ইচ্ছা, এটা ঐ তোমার নয়, এই তোমারটা হচ্ছে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য। আত্মা আর ঈশ্বরে কোন ভেদ নেই। আমরা কথায় কথায় বলি ঠাকুরের ইচ্ছা। ঠাকুরের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে এতে কোন সন্দেহ

নেই। কিন্তু ঠাকুর আর আমার আত্মা কি আলাদা? আমার আত্মাই তো ঐগুলো করছে, আমি আর আমার আত্মাও আলাদা নয়, তাহলে আমিই তো ওগুলো করছি। ভাইপো অক্ষয় মারা যাওয়ার সময় ঠাকুর পরিষ্কার দেখছেন কিভাবে জীবাত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে গেল। শুধু মাত্র জ্ঞানীই এটা দেখতে পান, অজ্ঞানী দেখতে পায় না। শুধু কি মৃত্যুর সময়ই দেখতে পান? না, সব সময়ই দেখতে পান। এই দেহের মধ্যে অবস্থিত, সব কিছু ভোগ করছে, মৃত্যুর সময় শরীর থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। আমাদের মত যারা মুর্খ মানুষ, যাদের মধ্যে নানা রকমের কামনা-বাসনা গিজ গিজ করছে, তারা দেখতে পায় না। কিন্তু যিনি জ্ঞানী, তিনি এটা পরিষ্কার দেখতে পান। এই জ্ঞানী কে?

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোহপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ।।১১।।

(সমাহিতচিত্ত যোগিগণ এই আত্মাকে স্বীয় বুদ্ধির সাক্ষিরূপে অবস্থিত দর্শন করেন। কিন্তু যাদের চিত্ত তপস্যা ও ইন্দ্রিয়জয় দ্বারা সংস্কৃত ও শুদ্ধ হয় নাই, সেই অবিবেকিগণ যত্নশীল হলেও এনাকে দেখতে পায় না।)

যিনি যোগী, শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে যিনি যোগের অভ্যাস করেছেন, যিনি মনকে গুছিয়ে একটা জায়গায় নিয়ে চলে আসতে পেরেছেন, যিনি জানেন আমি শরীর নই, এই শরীরের ভিতর যিনি আমি সেটা; এই যে আত্মার প্রকরণ চলছে, এটাকে তিনি পরিষ্কার দেখতে পান। শরীরে যখন আত্মা অবস্থান করে আছেন, তখনও দেখতে পান; শরীর থেকে যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন, তখনও দেখতে পান। কিভাবে জীব নিজের মন আর ইন্দ্রিয়কে নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল, কখন সে স্বর্গে চলে যাচ্ছে, কখন একটা নূতন শরীর ধারণ করছে, পরিষ্কার তিনি দেখতে পান। আচার্য এটাই বলছেন, *অয়ম্ অহম্ অস্মি ইতি উপলভন্তে*, জ্ঞানী পরিষ্কার দেখতে পান, অন্তঃকরণে যিনি আছেন, এটাই আমি।

কথামৃতে, লীলাপ্রসঙ্গে এর প্রচুর বর্ণনা পাওয়া যায়। পুরো হিন্দু ধর্মে এই বর্ণনা ছেয়ে রয়েছে। কিন্তু যারা তপস্যা করেনি, ইন্দ্রিয়াদি জয় করেনি, নিজের অন্তঃকরণ অর্থাৎ মন ও বুদ্ধিকে শুদ্ধ করেনি আর মন্দ কাজ করা থেকে এখনও বিরত হয়নি, যারা অশান্ত, অহঙ্কারী, এই ধরণের অবিবেকী পুরুষ শাস্ত্রের কথা বিশ্বাসই করতে চায় না, দেখা তো দূরের কথা। এর শব্দটা হল *অকৃত-আত্মানঃ*, অতি সাধারণ, বুদ্ধি যাদের প্রাকৃত। এটাকে আচার্য বলছেন *অসংস্কৃতাত্মানা*, বুদ্ধি যাদের সংস্কৃত হয়নি। এরা তপস্যা করেনি, ইন্দ্রিয় জয় করেনি, দুশ্চরিত্র। দুশ্চরিত্র কে? ঈশ্বর পথে যাওয়া, এটাই সৎ চরিত্র, ঈশ্বর পথ থেকে দূরে থাকা এটাই দুশ্চরিত্র। ঠাকুর বলছেন, পায়ের উপর পা তুলে গোফ চাপরাচ্ছে, এদের দিয়ে কি ধর্ম হয়! তার মধ্যে কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো সমাজ মানে না; চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি। প্রথমবার এই জিনিসগুলো করার পর আমাদের মন খুঁত খুঁত করে। পরে ঠাকুর বলছেন, ময়লা বইতে বইতে ময়লার প্রতি ঘেন্না চলে যায়। ভুল কাজ করতে করতেও মনের খুঁত খুঁতানিটাও চলে যায়।

আচার্য আরও বলছেন, *দুশ্চরিতাদ্ অনুপরতা অশান্তদর্পাত্মানঃ*, ইন্দ্রিয়গুলো চঞ্চল, মন চঞ্চল আর *দর্পাত্মানঃ*, অহঙ্কারী। নিজের সমাজ, নিজের পাড়ার দিকে আমরা একবার যদি আমাদের নজরটা ফেলি, দেখব সবাই এই রকমই। শাস্ত্রে যে এত কিছুর বর্ণনা রয়েছে, এরা জানেই না, পড়তেই চায় না, পড়লেও বুঝতে পারে না। এরা কখনই আত্মা, ঈশ্বর, পুনর্জন্ম, মৃত্যুর পর কি হয়, এই জিনিসগুলোকে জানা দূরের কথা মানতেও চায় না। আপনি বলতে পারেন, আমি কেন আপনার কথা মানব? কে বলেছে আপনাকে মানতে, সেইজন্য হিন্দুরা কাউকে জোর করে ধর্ম শেখাতে যায় না। হিন্দুরা নিজেদের সন্তানকে শেখায়, যখন পড়াশোনা করায় তার সাথে ধর্মটাও তাদের শেখায়, জোর কখনই করা হয় না।

এই হলে দুটি শ্লোকের ব্যাখ্যা, প্রথমে দেখালেন মুক্তিতে কি হয়। আয়নাটা যেন ভেঙে গেল। আর মৃত্যুর পরে আয়নাটা যেন চলছে। আত্মা তো কোথাও যায় না, মন আর ইন্দ্রিয়ের সাথে

জড়িয়ে আছে বলে মনে হয় চলছে। মুক্তির কথা বলা হল, জীবের কথা বলা হল, সংসারের কথা বলা হল, এরপর ভগবান বলবেন, আমি কে অর্থাৎ ভগবান কে।

পরের চারটি শ্লোকে এবার ভগবান তাঁর বিভূতির কথা বলছেন। আচার্য এখানে খুব সুন্দর বলছেন, সেই যে পরমপদ, যেটা ভগবানের সাথে সম্পর্কিত, সেখানে গেলে কেউ আর ফেরে না। ফিরবে কি করে, আমরা এর আগে ব্যাখ্যা করলাম, ভগবানের সাথে এক হয়ে মিশে গেছে, কোথায় আর ফিরবে। সেটা হল *সর্বাত্মত্বং*, সমস্ত কিছুর আত্মা, এই যে কলম, তিনি এই কলমেরও আত্মা, আমারও আত্মা, আপনারও আত্মা, এই মাইক্রোফোনেরও আত্মা। আর *সর্বব্যবহারাস্পদত্বং*, সমস্ত কিছুর ব্যবহারের আধারত্ব; আচার্যের কি ভাষা, জগতে যত রকমের ব্যবহার আছে, সব রকম ব্যবহারের আধার তিনি। এই মাইক্রোফোনের আধার ভগবান নিজে, আমি যে আছি আমার আধার সেই ভগবান নিজে। স্বর্গে যাওয়ার জন্য আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না। আমাদের হিন্দুদের জীবনের উদ্দেশ্য হল, এই পরমপদকে এই জীবনেই প্রত্যক্ষ করা। কি প্রত্যক্ষ করা? সর্বশক্তিমান ভগবান।

তিনি আমাকে এসে বলবেন না, আমাকে তোমরা ভজনা কর, তা নাহলে আমি তোমাদের নরকে পাঠিয়ে ছাড়ব। কত দিনের জন্য পাঠাবেন প্রভু? অনন্তকালের জন্য নরক। আমাদের এখানে বলে, কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে, ঘূর্ণিপাকে বাপু তুমি ঘুরতে থাকবে। আমার পরম বইতে নাগরদোলার কথা বলা হয়েছে। এই নাগরদোলাতে আমরা ঘুরছি, এই উপরে উঠছি, এই নীচে নেমে নামছি। যদি উপর নীচ ওঠানামা থেকে বেরিয়ে আসতে চাও, বেরিয়ে এসো। কিভাবে বেরোবে? এই যে ঈশ্বর, যাঁকে পরমপদ বলা হয়, তিনি *সর্বাত্মত্বং*, সমস্ত কিছুর আত্মা, আর যত রকম ব্যবহার হচ্ছে, ক্রিয়া হচ্ছে, তার আধার। এটাকে শুধু মন দিয়ে তত্ত্বতঃ বুঝে নিলে হবে না, এটাকে আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হবে। প্রত্যক্ষ হলে বুঝতে পারা যাবে, কিভাবে সমস্ত মানুষের, সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সেই জীব বিরাজ করছেন। সেই জীবটা কে? ভগবান নিজে।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।।১২।।

(যে জ্যোতিঃ সূর্যে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে আছে এবং যে জ্যোতিঃ সমগ্র জগৎকে প্রকাশ করে, সেই জ্যোতিঃ আমার জানবে।)

ভগবান বলছেন, সূর্যের যে প্রকাশ, অগ্নির যে প্রকাশ, চন্দ্রমার যে প্রকাশ, তারার যে প্রকাশ, সমস্ত প্রকাশ আমি। জগতে যত রকমের প্রকাশ আমরা কল্পনা করতে পারি, সব ভগবানের প্রকাশ। ঘরে টিউবলাইটের আলো জ্বলছে, এটা ভগবানের নিজের আলো। সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করছে যে সূর্য, সেটা আমারই জ্যোতি। ফ্ল্যাডলাইটে রাত্রিবেলা ক্রিকেট খেলা হয়, ফুটবল খেলা হয়, ওই ফ্লাডলাইটের আলো ভগবান নিজে। বলছেন, তেজে সমস্ত রকমের যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, যে তেজে সমস্ত রকমের আলোর যে প্রকাশ হয়, সেই তেজটা আমি নিজে। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, এনারা স্থূল জ্যোতির কথা খুব কম বলেন, তার জায়গায় এনারা বলেন চৈতন্যজ্যোতি। সূর্যের মধ্যে একটা চেতনা আছে, চন্দ্রমার মধ্যে সেই চেতনাই আছে। এই কলমের মধ্যেও একটা চৈতন্যজ্যোতি আছে, যেটার জন্য কলম কাজ করে, তা নাহলে কলম কোন কাজ করতে পারত না। সব কিছুর মধ্যে একটা শক্তি কাজ করছে, এনারা চৈতন্যজ্যোতি শব্দটা ব্যবহার করেন। চৈতন্য এখানে জীবিত অর্থে বলছেন না, একটা শক্তি আছে। আমরা যে সূর্যের পূজা করি, এই সূর্য তো স্থূল, স্থূল সূর্যের পূজা হয় না, সূর্যের পিছনে যে চৈতন্যজ্যোতি আছে, যে ঈশ্বরীয় শক্তি আছে তাঁর পুজা করা হয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই চৈতন্য শক্তি তো সব জায়গাতেই আছে, তাহলে গীতাতে কেন হঠাৎ সূর্য, চন্দ্র, অগ্নির কথা কেন বলা হচ্ছে? এই প্রশ্ন আচার্য শঙ্কর নিজেই উত্থাপন করেছেন, কারণ এই

ধরণের প্রশ্ন সাধারণ মানুষের মনে স্বাভাবিক ভাবে আসতে পারে। আচার্য এর উত্তরে বলছেন, *ন এষ দোষঃ সত্ত্বাধিক্যাদ্*, সত্ত্বগুণের আধিক্য যেখানে হয়, সেখানে চৈতন্যজ্যোতির প্রকাশ বেশি দেখা যায়। আমার আপনার জীবনের উদ্দেশ্য হল সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। অহং ব্রহ্মাস্মি, ঈশ্বরদর্শন মানবজীবনের উদ্দেশ্য, এইসব বড় বড় কথা এখন থাক। প্রথমে সবাইকে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ আগে আমার আপনার মাধ্যমে হোক, তারপরে বাকিটা দেখা যাবে। প্রথমে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজের ভিতরের ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশকে আগে দেখাতে হবে, পরে বাকি সব হবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন, ঈশ্বর কি কাউকে বেশি শক্তি কাউকে কম শক্তি দিয়েছেন? ঠাকুর তার উত্তরে বলছেন – অবশ্যই দিয়েছেন, তা নাহলে তোমাকে দেখতে এলাম কেন? এই কথা বলার পরেই ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, তোমার যে এই দয়ার ভাব। দয়া মানেই সত্ত্বগুণের প্রকাশ। সত্ত্বগুণের প্রকাশ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যে অনেক বেশি। এই সত্ত্বগুণ ঈশ্বর দিয়েছেন, কিংবা তাঁর নিজের জন্য ওই সত্ত্বগুণ বেড়েছে, ফলে প্রকাশ বেশি দেখা যাচ্ছে, এটা কোন ব্যাপারই না। ব্যাপারটা হল, সত্ত্বগুণের প্রকাশ বেশি।

সত্ত্বগুণ কি, চতুর্দশ অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করে এসেছি, ষোড়শ আর সপ্তদশ অধ্যায়ে শুধু এটাকে নিয়েই আলোচনা করবেন। আচার্য বলছেন, সূর্যাদিতে সত্ত্বগুণ অনেক বেশি, সেইজন্য *আদিত্যাদিষু হি সত্ত্বম্ অত্যন্ত প্রকাশম্*, সত্ত্বের প্রকাশ বেশি। আমাদের ভিতরে তমোগুণের প্রকাশ অনেক বেশি। যার জন্য আমরা ঝগড়া-ঝাটি করি, কাজ করতে চাই না, খাটাখাটনি করতে চাই না, জপধ্যান করতে ইচ্ছে করে না, প্রার্থনা করতে চাই না, উপোস করলে মাথা ঝিমঝিম করে। ভাল করে খাও দাও, আর ভোঁশ ভোঁশ করে ঘুমোও, এর থেকে আর সুখ কিছুতে নেই। আহার-নিদ্রা-মৈথুনের বাইরে কিছু নেই, এগুলোই তমোগুণের লক্ষণ।

আচার্য শঙ্কর পরিষ্কার বলছেন, *ন তু তত্র এব তদ্ অধিকম্ ইতি*, ওখানে যে ব্রহ্মজ্যোতি বেশি আছে তা না, এটা হল বেদান্তের আধার। ঈশ্বরের কোন বৈষম্য দোষ নেই। তাহলে একজন বড়লোকের বাড়িতে জন্মাচ্ছে, আর-একজন গরীব বাড়িতে জন্মাচ্ছে, এটা কি বৈষম্য দোষ? একেবারেই না। এটা অন্যান্য ধর্মের সমস্যা। ওরা ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাঁর ইচ্ছা, তিনি পরীক্ষা নিচ্ছেন ইত্যাদি করে আরও সমস্যা তৈরী করে দেয়। এদিকে বলছে, ঈশ্বর দয়ালু, তিনি দয়াময়, মৃত্যুর পর তিনি আমাকে স্বর্গে পাঠাবেন, সেই দয়ালু কেন এখানে আমাকে দুটো রুটি দিতে পারছেন না? কিসের পরীক্ষা? যিনি আমাকে মৃত্যুর পর অনন্ত স্বর্গে নিয়ে যাবেন, তিনি আমাকে পঙ্গু, বিকলাঙ্গ করে গরীবের বাড়িতে জন্ম দিলেন কেন? স্বামীজী বলছেন, I do not believe in a God, who cannot give me bread here but will give eaternal heaven after death। আমি যে কথাগুলি বলি, সব স্বামীজীরই কথা, ঠাকুরেরই কথা, ঘুরিয়ে ব্যাখ্যা করে বলি।

হিন্দুদের ভগবান এই ধরণের উল্টোপাল্টা কাজ করেন না। এর সব কিছুর পিছনে রয়েছে আমার আপনার নিজের মন, সত্ত্বগুণ হলে মন এক রকম হবে, রজোগুণ হলে অন্য রকম হবে আর তমোগুণ হলে আর-এক রকম হবে। লুটেপুটে খেতে ইচ্ছে করলে লুটেপুটে খান, আর ত্যাগ তপস্যা নিয়ে যদি থাকতে চান, তাহলে ত্যাগ তপস্যা নিয়ে থাকুন। ভগবানের তাতে কোনটাতেই কিছু আসে যায় না। আপনার সত্ত্বগুণ বাড়লে আপনার চেহারাতেই ধরা পড়বে। তমোগুণ হলে চেহারাতেই বোঝা যাবে। আচার্য এখানে উদাহরণ দিচ্ছেন, *যথা হি লোকে তুল্যে অপি মুখসংস্থানে ন কাষ্ঠকুড্যাদৌ মুখম্ আবির্ভবতি আদর্শাদৌ তু স্বচ্ছে সচ্ছতরে চ*, মুখ দেখতে গেলে যেমন আয়না লাগে, যদি কেউ কাঠে গিয়ে মুখ দেখতে চায়, পাথরে গিয়ে যদি নিজের মুখ দেখতে চায়, মুখ দেখতে পায় না। এখানে আয়নার কোন বৈষম্য দোষ নেই, ভগবান যে এই রকম করছেন তা না। আয়নার প্রতিবিম্বিত হওয়ার শক্তি অনেক বেশি, ফিজিক্সে বলে reflective index, সেইজন্য আয়নাতে মুখ দেখা যায়। সেই শক্তি পাথর বা কাঠের নেই, সেইজন্য পাথরে বা কাঠে মুখ দেখা যাবে না, তাতে ঈশ্বরের কোন

কিছু নেই। আপনি ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাঁর ইচ্ছা বলছেন, সেটা আপনার খুশী, কিন্তু এই যে তারতম্য যেটা থাকে, এটা হচ্ছে তার কেমন ক্ষমতা। ভাল লোকের মধ্যে আমি আছি যদি বলেন, তার মানে সত্ত্বগুণের আধিক্য তার মধ্যে আছে। গীতার দশম অধ্যায়ে এই জিনিসটা বারবার বলা হয়েছিল। সেখানেও বলা হয়েছিল, সত্ত্বগুণের প্রকাশ যেখানে বেশি সেখানে ঈশ্বরের প্রকাশ বেশি, কারণ প্রতিবিম্বিত হওয়ার শক্তিটা সেখানে বেশি, এছাড়া আর কিছু না, ভগবানের কোন বৈষম্য দোষ নেই।

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ।।১৩।।

(আমি ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা পৃথিবীতে প্রবেশপূর্বক চরাচর ভূতসকল ধারণ করি এবং রসাত্মক চন্দ্ররূপে ব্রীহি-যব-ধান্যাদি ওষধি পুষ্ট করি।)

পঞ্চোদশ অধ্যায়ের এই তের নম্বর শ্লোক ঈশ্বরীয় শক্তির প্রকাশকে এক সাংঘাতিক মাত্রায় নিয়ে যায়। চন্দ্র আছে, পৃথিবী আছে, যত তারা আছে, নক্ষত্র আছে, এগুলো ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে না কেন? ভগবান নিজের শক্তিতে মহাকাশের সমস্ত গ্যালাক্সি, তারা, নক্ষত্র সমস্ত কিছুকে ধরে আছেন বলে। *গাম্* শব্দটা খুব মজার, *গাম্* শব্দ গরু অর্থে নেওয়া হয়, *গাম্* আবার পৃথিবীর অর্থেও নেওয়া হয়, যে জিনিস চলে সেই জিনিসের অর্থেও নেওয়া হয়। বেদের যাঁরা অনুবাদ করেন, তাঁরা *গাম্* শব্দের অনুবাদ করতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে দেন। এই শ্লোকে *গাম্* বলতে পৃথিবী। *গামাবিশ্য*, পৃথিবীর মধ্যে ভগবান নিজে ঢুকে আছেন।

ছোটবেলায় গ্রামে আমরা দেখেছিলাম, গ্রামে গরম জল মাটিতে ফেলতে দেওয়া হত না। কারণ পৃথিবীকে তারা এক জাগ্রত দেবী রূপে দেখে। গ্রামের লোকেরা পৃথিবীকে দেবী রূপে কেন দেখে? কারণ ভগবান নিজে পৃথিবীর মধ্যে ঢুকে বসে আছেন। তিনি যদি ঢুকে না থাকতেন, তাহলে পৃথিবী ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে বেরিয়ে মহাবিশ্বে বিলীন হয়ে যেত। আমার শরীর কেন টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে না? যে শক্তি এটাকে ধারণ করে আছে, এই শক্তি ভগবানের শক্তি। ফিজিক্সে একটা সিদ্ধান্তে বলা হয় law of entropy, যেখানে বলা হয় সমস্ত কিছু যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে ধীরে ধীরে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে বেরিয়ে যাবে। একটা গাড়ি রাস্তায় দিনের পর দিন পড়ে থাকলে, কিছু দিন পরে গাড়িটার কি হয় দেখুন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় না? আমার শরীরটা ভেঙে যাচ্ছে না কেন? ভগবান ওর মধ্যে ঢুকে ধরে আছেন, না হলে প্রকৃতি ছিটকে বেরিয়ে যাবে।

আমার যে ওজ, আমার যে শক্তি, এই ধরণের যত রকম শক্তি আছে; ফিজিক্সে যে চারটে শক্তির কথা বলে, সব রকম শক্তি ভগবানেরই শক্তি। এই যে মাধ্যাকর্ষণ, ভগবানেরই শক্তি, ওই শক্তি দিয়ে তিনি সব কিছুকে ধরে আছেন, তা নাহলে সব ছিটকে বেরিয়ে যেত। রোজ সকালে সূর্যোদয় হচ্ছে, বিকালে অস্তমিত হয়ে যায়, গ্রীষ্মকালে গরম, শীতকালে ঠাণ্ডা, বর্ষাকালে বৃষ্টি, সব ভগবানেরই শক্তি। আপনারা বলবেন, কেন, এগুলোতে সব ফিজিক্সের নিয়ম লাগানো আছে। ফিজিক্সের নিয়মটাই তো ভগবান নিজে।

বেদে ঋতমের কথা বলছেন, যেখানেই দেখবেন কোন order আছে, সেটা ভগবান নিজে। যখনই দেখবেন disorder, বুঝবেন ভগবান ওখানে সংহার করতে আসছেন। Order মানে ধরে রাখতে চাইছেন, যখন ধরে রাখতে চান তখন তিনি pattern energy হয়ে আসেন। যখন মারতে চান, তখন disorder রূপে আসেন। এই করোনার মহামারী, ভগবান নাশ করতে চাইছেন, একটা disorder এনে দিলেন, চারিদিকে সব system failure। Disorder মানেই ভগবান এখন সংহার মূর্তিতে আছেন, এই disorderটাও ভগবান, সংহার করার জন্য। যেখানে সব কিছুকে ধরে আছেন, আমার কম্প্যুটার ঠিক চলছে, মোবাইল ঠিক চলছে, ভগবান সেখানে pattern energy

হয়ে order রূপে ধরে আছেন। কিভাবে ধরে আছেন? *ওজসা*, নিজের শক্তিতে, ভগবান নিজে ওর মধ্যে ঢুকে যান।

পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ, গাছপালা, লতা, গুল্ম, এরা পৃথিবী থেকে রস টেনে নেয়। এই রস সাধারণ জল না, আমাদের শরীরে যেমন রক্ত চলাচল করে, ঠিক তেমনি গাছাপালাতেও রস সঞ্চারিত হয়। এটাকে বলা হয় সোম, সোম হল সেই রস, যেটাকে সমস্ত বনস্পতি জগৎ ধারণ করে আছে, এই সোম ভগবান নিজে। গাছের যে রস, যেটা দিয়ে গাছের ডালপালা, পাতা, ফুল, ফল জীবনী শক্তি পায়, এটা ভগবান নিজে। বেদে সোমরসের কথা আছে, সেখান থেকেই সোম শব্দটা এসেছে। যে কোন রস যেটা জীবনী শক্তি দেয়, সেটাকে বলছেন সোম। অনেক সময় রসের সাথে চন্দ্রমাকে জুড়ে দেওয়া হয়, এর পিছনে লম্বা কাহিনী চলে। যখন সৃষ্টি হল তখন থেকে সোমকে চন্দ্রমার সঙ্গে এক দেখা হয়। সেই সোমকে আবার বলছেন রস। যদিও কোথাও সরাসরি বলা হয়নি, বলে যে পৃথিবী আদি যে রস টানে, রাত্রির দিকে বেশি টানে। বনস্পতিতে যত রকমের যা কিছু আছে, গাছাপালা, লতা, গুল্ম; এই যে আম, খেতে কত সুস্বাদু, হিমসাগর বেশি পছন্দের, এটা হল সেই সোম। সোম যখন আম গাছে ঢোকে, তখন ওর আলাদা টেস্ট হয়ে যায়। শুধু আম না, যে কোন জিনিস, যেমন চাল খাচ্ছি, ডাল খাচ্ছি, তার যে রস, যে রসের জন্য সমস্ত প্রাণীজগৎ, বনস্পতির জগৎ বেঁচে আছে, ভগবান নিজে সেটা।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্।।১৪।।

(আমি উদরাগ্নিরূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয়পূর্বক প্রাণ ও অপান বায়ুর সাথে সংযুক্ত হয়ে চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয় –এই চার প্রকার খাদ্য পরিপাক করি।)

খাওয়-দাওয়া করার পর ভুক্ত খাদ্যকে হজম করার শক্তিটুকুও আমাদের নেই। ভগবান আছেন বলে হজম হয়। আগে আগে বলা হল, একদিকে ভগবান সূর্য, চন্দ্রমা ও অগ্নিতে জ্যোতি, অন্য দিকে পৃথিবীকে তিনি ধারণ করে আছেন, তার সাথে বনস্পতিতে সোমরস হয়ে তিনি প্রাণ সঞ্চার করছেন, আর আমাদের উদরে তিনি ঢুকে হজম করার শক্তি হয়ে আছেন। এই যে ভগবান যিনি হজম করার শক্তি, তিনি যদি সেখান থেকে সরে যান, কেউ কোন কিছুই হজম করতে পারবে না। যত এ্যনজাইম্ খাক, যত ডাইজেস্টিভ ফুড খাক, কিছুই হজম করতে পারবে না। মানুষের কোন নিজস্ব শক্তি আছে কি, আমরা শুধু বড় বড় কথা বলতে থাকি, আমি এই করতে পারি, সেই করতে পারি, আমি এই করে দেখাব, তুমি আমাকে জানো না, ইত্যাদি। কোন মুরদ নেই, শুধু বড় বড় বাত। বৈশ্বানর হল উদরস্থ অগ্নি, খিদে পেলে মানুষ বলে খিদেয় পেটে আমার আগুন জ্বলছে। আমরা এখন বিজ্ঞানের দৌলতে জানি, পেটে যে এ্যসিড সিক্রেশান হয়, ওটাই আগুন, আগুন বলেই ভুক্ত খাবারটা হজম করে।

বারো নম্বর শ্লোকে ভগবান এটাই বলছেন –*অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ*, আমি আগুন হয়ে প্রাণীর উদরে ঢুকে আছি। আবার মুখ দিয়ে যে কথা বের হয়, ওই বাণীটাও অগ্নি। বেদে একটা মন্ত্রে বলা হয়েছে কিভাবে বাণীকে অগ্নি বলা হয়। যত রকমের অগ্নি আছে, ভগবান নিজেই সব অগ্নি। বলছেন, সমস্ত প্রাণী যে অগ্নিতে খাওয়া হজম করছে, সেই অগ্নি ভগবান নিজে, সমস্ত প্রাণীর উদরে তিনি এই অগ্নি হয়ে ঢুকে বসে আছেন। *পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্*, আমাদের সব খাওয়া চার রকমের হয় – *ভোজ্যং ভক্ষ্যং চোষ্যং লেহ্যং* –এই চার রকমের খাদ্য আমি জঠরাগ্নি হয়ে, যে অগ্নির নাম বৈশ্বানর, সব সময় হজম করি।

ভোজ্যং না চিবিয়ে গপ্ গপ্ করে গিলে নেওয়া, *ভক্ষ্যং*, চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়া, *লেহ্যং*, যে খাবারটা চেটে চেটে খাওয়া হয় আর *চোষ্য*, চুষে চুষে খাওয়া। চার রকমের খাওয়া হয় – জল

যেমন না চিবিয়ে সরাসরি খাওয়া হয় এটা হল পেয়, চিবিয়ে খাওয়া, চেটে চেটে খাওয়া আর চুষে চুষে খাওয়া। সাধারণ ভাষায় এই চারটেকে আমরা এই ভাবে বলি – চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়। ভেবে দেখুন, আমাদের পূর্বজদের কি উচ্চমানের সংস্কৃতি ছিল, এই জিনিসটা লেখা হয়েছে খুব কম করে আজ থেকে চার থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে। পূর্বজদের এই অবদান আমরা ভুলেই গেছি। আমরা পূর্বপুরুষদের শুধু মনে করি যখন মনুকে গালাগাল দিতে হবে।

এখানে মজার ব্যাপার হল, তের নম্বর শ্লোকে বলছেন, আমি পৃথিবীর ভিতরে ঢুকে তাকে ধারণ করে আছি। কথামৃতে জগদ্ধাত্রী দেবীর নামে ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, তিনি ধারণ না করে রাখলে জগৎ পড়ে যেত, নষ্ট হয়ে যেত। তারপরে বলছেন, সোমরস হয়ে ভগবান বনস্পতিতে ঢুকে আছেন। তার মানে দাঁড়ায়, আমরা যে রোজ ভাত, ডাল, সব্জী খাচ্ছি, এগুলো ভগবান নিজে। আর মাছ খাচ্ছি, মাংস খাচ্ছি, ভগবান নিজে ওই মাছ, ছাগল। ছাগলের পেটের যে অগ্নি, সেটা যেমন ভগবান নিজে আর ছাগল যে ঘাস খাচ্ছে, সেই ঘাসের যে রস সেটাও ভগবান নিজে। চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় রূপে যেটা আমাদের উদরে যাচ্ছে, উদরে ওই আগুন যেটা এগুলোকে হজম করছে, সেটাও ভগবান নিজে। তার মানে আমরা যখন খাচ্ছি, আমরা আহুতি দিচ্ছি।

কিসের আহুতি? সোমের আহুতি। কোথায় দেওয়া হচ্ছে? অগ্নিকে, পেটের অগ্নিকে আহুতি দেওয়া হচ্ছে সোম দিয়ে। খাওয়ার আগে আমরা যে মন্ত্রোচ্চারণ করি, চতুর্থ অধ্যায়ের চব্বিশ নম্বর শ্লোকের যে *ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ*.....বলা হচ্ছে, সেখানেও এই ভাব। উদরের যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হচ্ছে, সেই অগ্নি ভগবান নিজে। যেটা দেওয়া হচ্ছে, সেই সোম, সেটাও ভগবান নিজে। এই ভাবটাকে যদি আমরা ধরে রাখতে পারি, আমাদের জীবনটাই পাল্টে যাবে। যখন বুঝে নেব যে, প্রত্যেকটি খাওয়া হল আহুতি; আহার, নিদ্রা, মৈথুন, এই ভাবটাই তখন আমাদের চলে যাবে। ঈশ্বরের আহুতি ঈশ্বরকে দিয়েই হয়।

প্রথম থেকে গোটা জিনিসটাকে দেখলে বোঝা যায়, পুরো ব্যাপারটা কেমন একটা systematic চলছে – প্রথম বললেন সূর্যের যে আলো, অগ্নির যে তেজ, চন্দ্রের যে আলো, সেটা আমি; পরের ধাপে বললেন, পৃথিবী যে নিজের জায়গায় স্থির হয়ে একটা নির্দিষ্ট কক্ষ পথে ঘুরছে, পৃথিবী ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে না বা নিজের কক্ষ পথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে না, কারণ আমি পৃথিবীর মধ্যে ঢুকে তাকে ধারণ করে আছি। উদ্ভিদ, বনস্পতির যে প্রাণশক্তি সোম, সেটা আমি। প্রাণীর যে হজম শক্তি, সেটা আমি; মানুষ যে খাওয়া-দাওয়া করছে, ঈশ্বরকে আহুতি দেওয়া হচ্ছে। এই উচ্চচিন্তন আর কোন ধর্মে পাওয়া যাবে? অসম্ভব। আমাদের এখানে ভগবান কৃষ্ণ এসে কখনই বলেন না, আমার ভজনা করো, নাহলে তোমাকে নরকে পাঠিয়ে দেবো। আমাদের এখানে বলছেন, তুমি ভজনা কর আর নাই কর সোম হয়ে আমি গাছে আছি, তোমার পাতে আছি, বৈশ্বানর হয়ে আমি তোমার উদরে আছি, তুমি জেনে কর আর না জেনেই কর, তুমি যে আহুতি দিচ্ছ, আমাকেই আমাতে আহুতি দিচ্ছ।

আরও মজার ব্যাপার হল –অন্যান্য ধর্মের শেষ কথা স্বর্গ। সেই স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য আমাকে মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অথচ গীতা আমাদের এই অঙ্গিকার দিচ্ছেন। জীবিত অবস্থায় যদি কেউ আমার এই জিনিসটাকে কেউ জেনে যায়, সে এই সৃষ্টির নাগরদোলা থেকে নেমে যাবে। যদি না জানতে পারে, তাহলে নাগরদোলায় উপর থেকে নীচে, নীচ থেকে উপরে ঘুরতেই থাকবে, বাকিটা তোমার ইচ্ছে, তুমি কি করবে সেটা তোমাকেই ঠিক করতে হবে। মানুষকে ভগবান এখানে ছেড়ে দিয়েছেন, তুমি খুশী, তুমি যা চাও তাই করতে পার। তিনি কাউকে অভিশাপও দেন না, কাউকে নরকেও পাঠান না, আর কাউকে স্বর্গেও পাঠান না।

এটা জেনে আমার কি হবে? আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর কথা তাঁর ভাষ্যে বলছেন, *ভোক্তা বৈশ্বানরঃ অগ্নিঃ ভোজ্যম্ অন্নং সোমঃ তদ্ এতদ্ উভয়ম্ অগ্নীষোমৌ সর্বম্ ইতি পশ্যতঃ অন্নদোষলেপো ন ভবতি*, খাওয়ার সময় যদি কেউ এটা মনে রাখে যে, ভিতর অগ্নি রূপে ভগবান, আহুতি দেওয়া হচ্ছে ভগবানেরই, তাহলে অন্নের যদি কোন দোষ থেকে থাকে, ওই দোষ আর লাগবে না। আমাদের স্মৃতি শাস্ত্রাদিতে বলা হয়েছে কত রকম অশুদ্ধ অন্ন হতে পারে, একবার যেমনি বলে দেওয়া হল, *ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ*, যার কাছে যাচ্ছে সেটাও ভগবান, যেটা যাচ্ছে সেটাও ভগবান, যেটা দিয়ে পাঠানো হচ্ছে সেটাও ভগবান, যে পাঠাচ্ছে সেও ভগবান, আর এই পাঠানোর যে ক্রিয়া এটাও ভগবান, ক্রিয়ার যে ফল সেটাও ভগবান।

স্বামী বিবেকানন্দ নরেন্দ্র রূপে যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসতেন, সেই সময় ঠাকুর সবাইকে বলতেন এটা করতে, সেটা করতে, এটা করতে নেই, কিন্তু নরেনকে কিছু বলতেন না। নরেনকে বলতেন দাবানল, ওখানে কলাগাছ ফেলে দিলেও পুড়ে যাবে। তার মানে, এই যে ভাবের কথা বলা হল, এই ভাব নিয়ে খেলে অন্নের কোন দোষ তার লাগবে না। এখনও অনেক হিন্দু পরিবারে খাওয়ার ঘরে পেঁয়াজ রসুন ঢোকে না, মুরগীর মাংস, ডিম তো একেবারেই না। এগুলোকে আমাদের এখানে অশুদ্ধ বলে মনে করা হয়। কিন্তু স্বামীজীর ক্ষেত্রে এগুলো কোনটাই খাটবে না, কারণ, তিনি একটা দাবানল, কলাগাছও ভস্ম হয়ে যাবে ওই দাবানলে। দাবানল মানে, তিনি ঈশ্বর জ্ঞানে এমন প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন যে, তাঁর আমিত্ব বলে কোন বোধ থাকছে না। আমিত্ব বোধ থাকলে তবেই দোষ হবে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে আসবে, *যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে*, যাঁর আমি ভাব, আমিত্বটা চলে গেছে, তাঁর কোন দোষ লাগে না। পরের শ্লোকেও ভগবান খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন –

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্।।১৫।।

(আমি ব্রহ্মা থেকে কীট পর্যন্ত সকলের হৃদয়ে অবস্থিত আছি। আমা হতেই প্রাণিমাত্রের স্মৃতি ও জ্ঞান উৎপন্ন ও বিলোপ হয়। আমিই চতুর্বেদের প্রতিপাদ্য এবং আমিই বেদান্তার্থ-প্রচারের সম্প্রদায় প্রবর্তক ও বেদার্থবিৎ।)

সমস্ত প্রাণীর আত্মা আমি। সমস্ত প্রাণী, যেখানেই প্রাণন ক্রিয়া হচ্ছে, সব প্রাণী আমি নিজে। আগে বললেন, গাছপালা আমি, সেখান থেকে এগিয়ে বলছেন উদরের অগ্নি আমি। এবারে বলছেন, সমস্ত প্রাণীর যে চেতনা শক্তি, সেই শক্তি আমি নিজে। ফলে সমস্ত প্রাণীর যে স্মৃতি, তার যে জ্ঞান আর তার যে স্মৃতির লোপ, এই সব কিছু আমার জন্যই হয়। সংসারে বেশির ভাগ জায়গায় বিধ্বংসই চলে, এই যে বলা হল, যে কোন জিনিসকে ছেড়ে রেখে দিলে আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায়। বেশ কয়েক বছর আগে আমি একটা নূতন শব্দ তৈরী করেছিলাম – info energy, খুব ইচ্ছে ছিল এটাকে নিয়ে একটা আর্টিকেল তৈরী করার, লেখাটা এখনও আমার কাছে আছে, কিন্তু গুছিয়ে লেখা নেই আর এখন আগের সেই আগ্রহটাও নেই।

Information আর energy, energy সব সময় unpatterned হয়। Infomration যখন যায়, তখন ওটাকে patternএ নিয়ে আসে। একটা বাড়ি যখন তৈরী করা হয় তখন ওখানে energyটাকে patternএ আনা হয়। ফলে বাড়ি সুন্দর হয়। Information আসে consciousness থেকে, বোঝার ক্ষমতা থেকে, এই বোঝার ক্ষমতা আসে ঈশ্বরের চৈতন্য থেকে। আমাদের স্মৃতি শক্তি, এটা ভগবানেরই। জ্ঞান ভগবানের, স্মৃতি লোপ হয়ে যাওয়াটাও ভগবানের,

disorder হয়ে যাওয়াটাও ভগাবনের। যখন আমরা দেখি স্মৃতি ভাল থাকছে না, তখন বুঝতে হবে ঈশ্বরের যে শক্তি সত্ত্ব রূপে আসে, সেটা দুর্বল হয়ে গেছে। তখন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়।

এখানে আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *যেষাং পূণ্যকর্মিণাং পূণ্যকর্মানুরোধেন জ্ঞানস্মৃতি ভবতঃ*, পূণ্যাকর্মা হলে তবেই স্মৃতি ভাল থাকে। যাঁরা বলেন, আমার স্মৃতি ভাল নেই, তার মানে, আচার্য বলছেন, *পাপকর্মিণাং পাপকর্মানুরূপেণ*, যারা অনেক পাপকর্ম করে, পাপকর্ম হয় আগের আগের জন্মে নিজের স্বার্থের জন্য সব কিছু করেছেন; পাপকর্ম মানেই তাই। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য, এগুলো সব কিছু হয় স্বার্থপরতার জন্য, কাঁচা আমির জন্য। পাপকর্ম কি? কাম, ক্রোধাদিতে মানুষ যখন বেশি মাত্রায় জড়িত থাকে, তখন স্মৃতি তার লোপ পেয়ে যাবে। স্মৃতি হল, বেদ-বেদান্তের যে জ্ঞান, এই শাস্ত্রের জ্ঞান চলে যাওয়াটাই স্মৃতি লোপ হয়ে যাওয়া। এমনিতে যদি সাধারণ জিনিস ভুলে যায়, তখন বুঝতে হবে তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। ডাক্তারকে গিয়ে বলছে, ডাক্তারবাবু ইদানিং আমার কিছু মনে থাকছে না। বুঝতে হবে প্রচুর পাপকর্মে লিপ্ত।

স্মৃতি যাতে খারাপ না হয়ে যায়, সেইজন্য নিয়মিত শাস্ত্রাদি পাঠ করতে হয়। গীতা পাঠ, চণ্ডী পাঠ আর তার সাথে ঈশ্বরের পূজা দীর্ঘদিন ধরে করে যেতে হয়। দশ বছর, কুড়ি বছর যদি করতে থাকে, তখন ঈশ্বরের সংহার মূর্তি পাল্টে যদি করুণার মূর্তি হয় তবে গিয়ে যদি স্মৃতি ভাল হয়। এই ধরণের কথা শুনতে আমাদের খারাপ লাগারই কথা। একজন ভক্ত শ্রীশ্রীমাকে বলছেন – ঠাকুর বলেছেন ঈশ্বরের নামে পাগল হয়ে যেতে, মা আশীর্বাদ করুন যাতে ঈশ্বরের নামে পাগল হয়ে যেতে পারি। মা সেই ভক্তকে বলছেন – বাবা, পাগল কেন হতে যাবে, কত পাপ করলে গিয়ে মানুষ পাগল হয়। পাগল মানে, স্মৃতিটা তার পুরো এলেমেলো হয়ে গেছে। কার সামনে কি কথা বলতে হবে, কি কথা বলতে নেই, কি রকম ব্যবহার করতে হবে, সব তার হারিয়ে গেছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুটি শ্লোকে *ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ* থেকে শুরু করে দ্বিতীয় শ্লোকের শেষে বলছেন – *স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি*; স্মৃতিভ্রংশ হওয়া মানে সে শেষ হয়ে গেছে। এগুলো বারবার শুনলে পরিষ্কার হবে – ভগবান থেকে স্মৃতি, ভগবান থেকে জ্ঞান, ভগবান থেকেই স্মৃতিলোপ। পূণ্যকর্ম করতে থাকলে জ্ঞান থাকবে, স্মৃতি থাকবে; পাপকর্ম করলে স্মৃতি চলে যাবে। ভগবান কাউকে স্মৃতি দেন না, কারুর স্মৃতিলোপ করান না, ভগবানের এখানে কোন বৈষম্য দোষ নেই।

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো, চারটি বেদের বক্তব্য হল ঈশ্বরতত্ত্ব, ঈশ্বররজ্ঞান। আমরা যে বেদ অধ্যয়ন করি, বেদ অধ্যয়ন করে আমরা ঈশ্বরের স্বরূপ, ঈশ্বরতত্ত্ব জানতে পারছি। *বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্*, বেদান্ত কি আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি, উপনিষদ, গীতা আর ব্রহ্মসূত্র এই তিনটে থেকে বেদান্তের যে ভাব আসে, এটা ভগবান নিজেই করেছেন। তাই না, ভগবান বলছেন, *বেদবিদেব চাহম্*, বেদকে আমিই ঠিক ঠিক বুঝি, অন্য কেউ বোঝে না। আমরা অল্প একটু যে বেদ বুঝেছি বা বুঝতে পারছি, এটাও ঈশ্বরীয় কৃপা ছাড়া হয় না। বেদের বক্তব্য একমাত্র হল ঈশ্বরতত্ত্ব, ধর্ম তত্ত্ব। এই হল বারো, তের, চোদ্দ ও পনের নম্বর শ্লোক, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কি রকম, কিভাবে তিনি সর্বশক্তিমান, সবটাই দেখিয়ে দেওয়া হল। পৃথিবী তিনি, বৃক্ষ তিনি, আমাদের উদরস্থ অগ্নি তিনি, স্মৃতি তিনি আর এই স্মৃতি দিয়ে যে বেদবেদান্তকে জানা হয় সেটাও তিনি। এই জিনিসটাকে যিনি জেনে গেছেন, একমাত্র তিনিই *বেদবিৎ*। এই হলেন সর্বশক্তিমান ভগবান। এবার সব কিছুকে গুছিয়ে এক জায়গায় নিয়ে আসছেন। পরের তিনটে শ্লোকে ভগবানকে কেন পুরুষোত্তম বলা হয়, সেটাকে নিয়ে বলবেন।

ভগবানের একটা নাম পুরুষোত্তম। কিভাবে তিনি পুরুষোত্তম, সেটাকেই গীতা আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছেন। বলছেন, যত রকমের প্রাণী আছে, যত রকমের বস্তু আছে, এদের ক্ষয় হতে থাকে, এটাকে বলছেন ক্ষর। প্রথম সারি হল ক্ষর, সব ক্ষরকে যদি এক জায়গায় জড়ো করে দেওয়া হয়, তাহলে আর কোন কিছুর ক্ষর হচ্ছে না। কারণ যখন ক্ষয় হয়, তখন একটা জিনিস আরেকটা

জিনিসে যায়, যেমন দুধ পাল্টে দই হয়ে যাচ্ছে, দই আবার পচে যাচ্ছে, কিন্তু জিনিসটা থাকছে ওটাই। এই যে নিউট্রন, প্রোটন, ইলেক্ট্রন এটা ওটাতে যাচ্ছে, ওটা সেটাতে যাচ্ছে, কিন্তু সমষ্টিটা তাই থাকছে। এই সমষ্টিটাই অক্ষর, এই অক্ষর মানে প্রকৃতি। প্রকৃতি হল তার মা, এই সমস্ত কিছু তাঁর প্রকাশ। প্রকৃতি হল বীজ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হল সেই বীজ থেকে যেন গাছ। তার মানে দুটো জিনিস – ক্ষর আর অক্ষর। এই কলম আগে ছিল না, তখন অন্য কিছু ছিল। কলমটা যখন ভেঙে যাবে, তখন নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু ম্যাটার হিসাবে, ম্যাটার থেকে এনার্জি হিসাবে কলমটা থাকবে। তার মানে একটা হল ক্ষর ভাব, আর সমস্ত ক্ষরের যে এক রাশি সেটাকে বলা হচ্ছে অক্ষর। ভগবান ক্ষর অক্ষরের পারে। তিনি ক্ষরও নন, অক্ষরও নন। সেই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান শুধু আত্মাকে নিয়ে বলে গেছেন। সেখান থেকে দশম অধ্যায়ে এক রকম বললেন, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এক রকম বললেন, এখানে আর-এক ভাবে বলছেন; যেটা দিয়ে আমরা আত্মা, ভগবানকে অন্তত বুঝতে পারি। আসলে এখানেও তিনি সেই একই কথা বলছেন।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।।১৬।।

(প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা অনুভূয়মান ইহলোকে ক্ষর ও অক্ষর নামক দুই পুরুষ প্রসিদ্ধ আছেন। ক্ষর পুরুষই জগতের সমস্ত বিনাশী বিকার (কার্য) এবং মায়াশক্তিই কূটস্থ অক্ষর পুরুষ।)

ব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় যা কিছু আছে, যত রকম পদার্থ রয়েছে, সবটাই ঈশ্বর। আজ হোক কাল হোক সব পদার্থ নাশ হয়ে যাবে। কূট হল রাশি, যেমন আপনার একটা বড় বাড়ি আছে, আপনার বাড়ির জিনিসপত্র এই ঘর থেকে সেই ঘরে নিয়ে যেতে পারেন, আবার সেই ঘরের জিনিস ওই ঘরে নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু ঘরের কোন জিনিস আপনি বাইরে কোথাও নিয়ে রাখবেন না, আপনার বাড়ির সব জিনিস আপনার বাড়ির মধ্যেই থাকছে, ঘরগুলো শুধু আলাদা। ক্ষর মানে জিনিসগুলো এই ঘর থেকে সেই ঘরে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে। অক্ষর মানে সব বাড়ির সব কিছুকে মিলিয়ে যখন পুরো জিনিসটা এক ধরা হয়।

অক্ষরকে কূট বলা হয়। কূট মানে রাশি, যেমন অন্নকূট মানে অন্নের রাশি। আবার কূট মানে হয় কুটিল। কুটিল কেন? জগতে যা কিছু হয় সব এলেমেলো। বলছেন *কূটস্থোঽক্ষর*, এই যে কূট, তার উপরে যিনি বসে আছেন, কে বসে আছেন, মায়া। পুরো জিনিসটাই মায়া। এটাই বলছেন, সমুদয়ের দিক থেকে যদি গুছিয়ে দেখা হয়, তাহলে দুটো হয়ে যায় – ক্ষর আর অক্ষর। আমরা যেটাকে বলছি সমষ্টি আর ব্যষ্টি। ব্যষ্টি হল ক্ষর আর সমষ্টি হল অক্ষর, প্রকৃতি। এটাকেই মায়া বলা হয়, আচার্য বলছেন, *কূটো রাশী রাশিঃ ইব স্থিতঃ*, অথবা *কূটো মায়া বঞ্চনা জিম্মতা কুটলতা ইতি পর্যায়া অনেকমায়াদিপ্রকারেণ স্থিতঃ*, বিভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে, কেউ মায়া বলে, কেউ কুটিল বলে, কেউ ছল বলে; কারণ এই মায়া ঈশ্বরকে জানতে দেয় না। কিন্তু তারপরেই বলছেন –

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ।।১৭।।

(এই উভয় পুরুষ (ক্ষর এবং অক্ষর) থেকে অত্যন্ত ভিন্ন পুরুষোত্তম পরমাত্মা নামে বেদান্তশাস্ত্রে অভিহিত। সেই অব্যয় ব্রহ্ম চৈতন্যবলশক্তিরূপে সমগ্র বিশ্বে প্রবেশ করে স্বরূপসত্তা দ্বারা এটিকে পরিপালন করেন।)

এই ক্ষর ও অক্ষর থেকে যিনি শ্রেষ্ঠ, ক্ষর ও অক্ষর থেকে যিনি উত্তম, দুটো থেকে যিনি সম্পূর্ণ আলাদা, এটাকেই বলা হয় পরমাত্মা। পরমাত্মা ক্ষরও নন, অক্ষরও নন। সাংখ্য যোগে যেমন পুরুষ-প্রকৃতি বলা হয়, পরমাত্মা তা নন। বলছেন, প্রকৃতি যিনি আমার আপনার শরীর নির্মাণ করেছেন, এর যে আত্মা, এর যিনি ঈশ্বর তিনি এটারও পারে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অন্য রকম বলেছিলেন সেখানে অন্য একটা perspectiveএ বলেছিলেন, এখানে অন্য একটা perspective

থেকে বলা হচ্ছে। আমাদের যে শরীর-ভাব, যে ভাব শরীরের সাথে জড়িয়ে আছে, শরীরের সঙ্গে যেটা জড়িয়ে আছে, যে কোন জিনিস হতে পারে, পরমাত্মা সেটার পারে। আর সমস্ত প্রাণীর অন্তরাত্মা সেই ভগবান।

প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে কি অক্ষর চৈতন্যহীন? বেদান্তের এটা একটা বড় সমস্যা। বেদান্তে এক-একটা শব্দ এক-এক জায়গায় এক-এক ভাবে ব্যবহার হয়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অক্ষর বলতে বোঝাচ্ছেন ভগবানকে। ভগবানকে কেন অক্ষর বলছেন, যেহেতু ভগবানের কোন ক্ষরণ হয় না, এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বলছেন ভগবান অক্ষর। এইজন্যই আমাদের জন্য ভাষ্যকারের দরকার হয়। যদি এই শ্লোকের অক্ষর শব্দকে ভগবান রূপে নেওয়া হয়, তাহলে পরে যে বলছেন, এর বাইরে পরমাত্মা, তখন পুরো জিনিসটার অর্থই অন্য রকম হয়ে যাবে। অর্থ যদি অন্য রকম হয়ে যায়, তাতে একটা বড় সমস্যা হবে, তাহলে গীতার বক্তব্য এলেমেলো হয়ে যাবে। আগেকার ঋষিরা শাস্ত্রের অর্থ কিভাবে বার করা হবে, এই ব্যাপারে পরিষ্কার বিধান দিয়ে গেছেন। তার মধ্যে একটা বিধান হল, *উপক্রম-উপসংহার*, যেটা দিয়ে শুরু হয়েছে সেটা দিয়েই যেন শেষ হয়।

এক জায়গায় শ্রাদ্ধ হবে, শ্রাদ্ধে গুরু শিষ্যের মধ্যে মারামারি, বৌমা বলছে, আগে যদি জানতাম শ্রাদ্ধ এত দূর গড়াবে তাহলে আরও জায়গা লেপে রাখতাম। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একটা জায়গায় আচার্য শঙ্কর বলছেন, এখানে ব্যাকরণের এই নিয়ম যদি লাগানো হয় তাহলে অর্থটা বেরিয়ে আসবে ঠিকই, কিন্তু আগে ভগবান যেটা বলে এসেছেন, তার অর্থটা বিপরীত হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি ষোল নম্বর শ্লোকের অক্ষর বলতে যদি ভগবান নেওয়া হয়, তাহলে ষোল আর সতের নম্বর শ্লোকে যেটা আসছে, সেটা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যেটা বলা হয়েছে, সেটার বিপরীত হয়ে যাবে। ভগবান তো কখন অসামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারেন না, তিনি সব সময় একই কথা বলবেন। এইজন্যই ভাষ্যকারের দরকার হয়। আমরা যদি নিজে থেকে গীতা পড়ে বুঝতে যাই, আমাদের বোঝাটা গোলমেলে হয়ে যাবে, গীতা ঠিক কি বলতে চাইছে ধরতে পারব না।

ভোজনেন অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা, খাওয়াটা একটা ক্রিয়া আর পাচন ক্রিয়াটা হলেন ভগবান, বিগত আঠারো বছর গীতা পড়ে এই অর্থ বুঝেছেন। যদি গীতা বুঝতে হয়, বা যদি কোন উপনিষদ বুঝতে হয়, তাহলে ভাষ্যকার যিনি, তিনি যে সম্প্রদায়েরই হন, যেমন কেউ হয়ত রামানুজ সম্প্রদায়ের, তিনি ওই সম্প্রদায়ের ভাষ্যকারের ভাষ্যটাই অনুসরণ করবেন, ওই অর্থটাই তিনি মানবেন। কারণ উনি তাঁর সম্প্রদায়ের দর্শন অনুসারে অর্থটাকে একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে সামঞ্জস্য নিয়ে এসেছেন। আমরা আচার্য শঙ্করের সম্প্রদায়ের, উনিও গীতা উপনিষদের ভাষ্যে একটা সামঞ্জস্য নিয়ে এসেছেন। সেইজন্য অক্ষর শব্দের অর্থ এখানে আমরা প্রকৃতি করছি। অসৎ শব্দের অর্থও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। আমরা কোন অর্থটা অনুসরণ করব এটা ঠিক করতে হয় আমার সম্প্রদায়ের ভাষ্যকার ওখানে কি অর্থ করছেন। ষোল নম্বর শ্লোকের ক্ষর বলতে জগতে যত বস্তু আছে আর অক্ষর বলতে প্রকৃতি বা মায়া।

আঠারো নম্বর শ্লোকে ঈশ্বর বা পরমাত্মাকে নিয়ে বলছেন। বলছেন, এই হলেন পুরুষোত্তম, ভগবানের স্বরূপ বলতে গিয়ে তিনটে জিনিসকে আনছেন। সপ্তম অধ্যায়ের শুরুতে ভগবান পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতির ব্যাপারে বলেছিলেন। সেখানে পরা প্রকৃতি হল জীবাত্মা আর অপরা প্রকৃতি হল পদার্থ। এখানে বলছেন পদার্থ আর প্রকৃতি আলাদা জিনিস।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।।১৮।।

(যেহেতু আমি ক্ষরের (অশ্বত্থনামক মায়ারূপ সংসারবৃক্ষের) অতীত এবং অক্ষররের থেকেও উত্তম (ঊর্ধ্ব), সেইহেতু ইহলোকে (কাব্যাদিতে এবং ভক্তজনে) ও বেদে আমি পুরুষোত্তমনামে প্রখ্যাত।)

পঞ্চোদশ অধ্যায় শুরু করেছিলেন *ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখম্* দিয়ে, এই যে সংসাররূপী অশ্বত্থবৃক্ষ, এই সংসারবৃক্ষকে অতিক্রম করে আমি এর পারে অবস্থিত। তার মানে ভগবান দেশ, কাল ও কার্যকারণের পারে। সংসার বৃক্ষ কি? ক্ষর আর অক্ষর। ক্ষর প্রতিমুহুর্তে পাল্টে যাচ্ছে, অক্ষর কসমিক স্তরে, অক্ষর হল sum total, ওটা কখন আর পাল্টাবে না। সৃষ্টি মানেই অক্ষর। অক্ষর শব্দের অর্থ আবার অনেক জায়গায় প্রকৃতি না হয়ে ভগবানের অর্থেও নেওয়া হয়, যেহেতু ভগবানের কোন ক্ষয় হয় না। ওই জায়গায় অর্থ করার সময় দেখতে হবে, কি প্রসঙ্গে অক্ষর শব্দটা ব্যবহার করা হচ্ছে।

বলছেন, এই যে ঈশ্বরের কথা বলা হল, যিনি সব কিছুর মধ্যে ঢুকে আছেন আর নিজের স্বরূপ সত্তা দিয়ে সমস্ত কিছুকে ধারণ করে আছেন, এনার কক্ষণ নাশ হয় না, ইনিই হলেন নারায়ণ আর তিনি ক্ষর অক্ষর সব কিছুর পারে, সেইজন্য তিনি পুরুষোত্তম। তিনি কেন পুরুষোত্তম? সংসারবৃক্ষের তিনি পারে, ক্ষর অক্ষরের পারে। সেটাই এখানে বলছেন, *অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ*, সেইজন্য বেদে আমাকে পুরুষোত্তম বলা হয়। আর জ্ঞানী পুরুষরা যখন বিভিন্ন ধরণের শাস্ত্র রচনা করেন, কাব্যাদি রচনা করে, সেখানেও তাঁরা আমাকে পুরুষোত্তম বলে উল্লেখ করেন। পঞ্চোদশ অধ্যায়ের নাম হল পুরুষোত্তমযোগ। ঈশ্বর কে? প্রথমে সংসার বৃক্ষকে নিয়ে বললেন, এই সংসার বৃক্ষকে যিনি অতিক্রম করে আছে তিনি ঈশ্বর, এটা প্রথম। দ্বিতীয়, সংসার বৃক্ষের পারে অথচ তিনি এই সংসারের সব কিছুতে ঢুকে আছেন এবং সব কিছুকে ধারণ করে আছেন। কিভাবে? স্বরূপ সত্তা মাত্র। যিনি এই রকম ভাবে আমাকে জানেন, তাঁদের কি হয়?

যো মামেবসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত।।১৯।।

(হে ভারত, যিনি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহে 'আমি' বুদ্ধি ত্যাগ করে কথিত প্রকারে পুরুষোত্তম (পরব্রহ্মস্বরূপ) আমাকে আত্মারূপে জ্ঞাত হন, সর্বজ্ঞ ও সর্বাত্মা তিনি সর্বতোভাবে মদ্‌গতচিত্ত হয়ে আমাকে ভজনা করেন।)

যো মামেবসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্, যিনি এই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের পুরো জিনিসটাকে ঠিক ঠিক বোঝেন, এবং সাথে সাথে ঠিক ঠিক জানেন যে ভগবান সব কিছুর পারে, অবতার হয়েও তিনি যখন আসেন তখনও তিনি সব কিছুর পারে। *স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত*, হে ভারত, সেই সর্ববিদ্ সর্বতো ভাবে আমার ভজনা করেন, তিনি সর্বদা আমাতে সমাহিত হয়ে থাকেন। ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপকে ঠিক ঠিক ভাবে না জানলে কি করে আমরা তাঁর ভজনা করব, আমরা যাঁকে জানি আমরা তাঁরই ভজনা করি। এটাই এই শ্লোকের ভাব, যিনি ঈশ্বরকে জানেন, ঈশ্বর স্বরূপকে যিনি জেনেছেন তিনিই সর্বদা ঈশ্বরে সমাহিত চিত্ত হয়ে ঈশ্বরেরই ভজনা করেন। ঠাকুর কেন মায়ের জন্য মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে বুক ফাটা কান্না কাঁদলেন? কারণ তিনি বুঝেছিলেন মায়ের স্বরূপ কি। আমরা তাঁর স্বরূপই জানি না, আমরা কি তাঁর ভজনা করব, সেখানে তাঁর জন্য ব্যাকুলতা, তাঁর জন্য কান্না তো দূরের কথা। এর ফল কি হয়?

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়াঽনঘ।
এতদ্ বুদ্ধ্যা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত।।২০।।

(হে নিষ্পাপ অর্জুন, তোমাকে এই গুহ্যতম শাস্ত্র বললাম। এই তত্ত্ব অবগত হয়ে যোগী প্রকৃত বুদ্ধিমান এবং কৃত্যকৃত্য (কৃতার্থ) হন, অন্য প্রকারে নহে।)

হে নিষ্পাপ অর্জুন, এই যে তোমাকে এতক্ষণ যা বললাম, এ অতি গুহ্যতম। গুহ্য কেন? ঈশ্বরের ব্যাপারে সব কিছু বুঝে নেওয়ার ব্যাপারটা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়। *ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রম্*, এটাই গুহ্যতম শাস্ত্র। শাস্ত্র কেন বলছেন? আচার্য বলছেন, পুরো গীতাটাই শাস্ত্র, তাহলে কেন এই

অধ্যাকেই শাস্ত্র বলা হচ্ছে? বলছেন, যদিও গীতা পুরোটাই শাস্ত্র, কিন্তু এই একটি অধ্যায়ে সমস্ত বেদের সার বলে দেওয়া হয়েছে। আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *সর্বো হি গীতাশাস্ত্রার্থঃ অস্মিন্ অধ্যায়ে সমাসেন উক্তো*, পুরো গীতার যা বক্তব্য, সেটাকেই এখানে সংক্ষেপে বলে দেওয়া হয়েছে। সংক্ষেপে কি বলে দেওয়া হয়েছে? জীব, জগৎ আর ঈশ্বর, এই তিনটের স্বরূপ এখানে পরিষ্কার করে বলা দেওয়া হয়েছে।

এতদ্ বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত, যিনি এই জিনিসটাকে জানেন, যিনি শাস্ত্রের বক্তব্যকে বুঝে নিয়েছেন, তিনিই বুদ্ধিমান, তিনিই কৃতকৃত্য হয়ে যান। *কৃতকৃত্য* শব্দের অর্থ হল, যা কিছু করার মত আছে তিনি তার সবটাই করে নিয়েছেন। আর *বুদ্ধিমান্* হল, যা কিছু জানার মত আছে, তিনি সব জেনে নিয়েছেন। তার মানে, অন্য সব কাজ করলাম, বা অন্য অনেক কিছু করলে কর্তব্য কর্ম শেষ হয়ে যায় না। ঈশ্বরের স্বরূপকে যখন বুঝে নিলাম, এবং বুঝে নেওয়ার পর সব কিছু ছেড়ে তাঁর স্বরূপের দিকে চলতে শুরু করলাম, একমাত্র তখনই মানুষ কৃতকৃত্য হয়।

পঞ্চোদশ অধ্যায় একেবারে সার, কোন সংক্ষেপে না, একেবারে নির্যাসটুকু, এই হল গীতা শাস্ত্রের বক্তব্য, এটাকে একেবারে স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন। পঞ্চোদশ অধ্যায়কে যিনি ঠিক ঠিক বুঝে নেবেন, তিনি গীতার মূল বক্তব্য, গীতা কি বলতে চাইছেন, বুঝে যাবেন। যিনি গীতা বুঝে নেবেন, তিনি পুরো বেদ-বেদান্ত বুঝে যাবেন। বলছেন, হে অর্জুন, তুমিও এই কথাগুলো শুনলে, তুমিও তাই কৃতার্থ। এই হল *গুহ্যতমং শাস্ত্রম্* পঞ্চোদশ অধ্যায়।

এরপর আমরা ষোড়শ অধ্যায়ে প্রবেশ করব, যেখানে বলা হবে, কোন গুণে মানুষ দেবতা হয়, কোন গুণে মানুষ দানব প্রকৃতির হয়; সেটকেই এবার পরের অধ্যায়ে ভগবান বলতে যাচ্ছেন। কে ভাল মানুষ, কে দুষ্ট মানুষ, কে ধর্ম পথে আছে, কে অধর্ম পথে আছে, ষোড়শ অধ্যায়ে এই জিনিসগুলিকে এবার একেবারে পরিষ্কার করে বলে দেবেন।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে পুরুষোত্তমযোগ নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

ষোড়শ অধ্যায়
দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ

এবার আমরা ষোড়শ অধ্যায় আলোচনা শুরু করব। ষোড়শ অধ্যায়ের প্রত্যেকটি শ্লোক আমাদের জীবনের সাথে কোথাও না কোথাও, কোনও না কোন ভাবে মিলে যায়, এদিকে দিয়ে এই অধ্যায়টা খুব interesting। আলোচনা শুরু করার আগে গুটি কয়েক প্রয়োজনীয় কথা বলে নেওয়া দরকার। আমাদের গীতার আলোচনা অনেকেই মন দিয়ে শুনছেন। অনেকেই আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে যোগাযোগ করেন, বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন। কিন্তু সবাই গতানুগতিক ভাবে টিয়া পাখির মত একটা কথাই বেশি বলেন – জীবনে যদি এগুলোকে একটু নামাতে পারতাম। জীবনে নামানোর জন্য সব কথা নয়। গ্রাজুয়েশানে যাঁরা ফিজিক্স পড়ছেন, সেখানে তাঁদের এ্যটম বোমার ব্যাপারে শিখতে হয়। তাই বলে তাঁরা বাড়িতে এসে এ্যটম বানাতে শুরু করে দেন না। যাঁরা জুডো ক্যারাটে শেখেন, তাঁরা বাড়িতে এসে ভাই বোনের উপর জুডো ক্যারাটের কৌশলগুলি প্রয়োগ করেন না।

জীবনে যদি এই কথাগুলো একটু কাজে লাগাতে পারতাম – এগুলো হল খুব নীচু মানসিকতার লক্ষণ। জীবনে যদি একটু লাগাতে পারতাম –কথাট শুনে অনেকের মনে হতে পারে, এ যেন কত কাব্যিক কথা, মনে হবে যেন গীতার কথাগুলির প্রতি বক্তার কত আন্তরিক ভালবাসা। কিন্তু আমাদের কাছে কথাগুলো খুব শ্যালো মনে হয়। এভাবে হয় না। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, সময় না হলে কিছু হয় না, তবে শুনে রাখতে হয়। শাস্ত্রের কথা শুনতে হয়, শোনা মানেই জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়া। সেইজন্য ধৈর্য ও শ্রদ্ধা সহকারে শাস্ত্রের কথা শুনে যাওয়াটাও একটা সাধনা। এই জ্ঞান আমাদের ঐতিহ্য, জ্ঞানকে জ্ঞান রূপেই আগে গ্রহণ করতে হবে। যখন দেখব একটা জিনিস আমি পারছি না, তখন বুঝতে হবে ওই জিনিসটাকে আয়ত্ত করার জন্য এখনও আমার সময় হয়নি। যখন সময় হবে তখন ওটা নিজেই হয়ে যাবে, ওর জন্য চেষ্টা করতে হয় না; লেগে থাকতে হয়। কিসে লেগে থাকতে হবে? যেটা আমার দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে হচ্ছে, তার সাথে আর-একটা হল আদর্শ। ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বর চিনির পাহাড়ের মত। চিনির একটা দানাতেই পিঁপড়ের হেউঢেউ হয়ে যায়। হিন্দিতে খুব সুন্দর একটা কথা আছে, হরি অনন্ত হরি কথা অনন্ত, অর্থাৎ হরি অনন্ত, তাঁর কথা, তাঁর বর্ণনাও অনন্ত। শাস্ত্রেও এই বর্ণনা আমরা পাই, ঈশ্বর অনন্ত। আমাদের এক দানা হলেই হয়ে যায়।

জীবনে কাজে লাগানোর জন্য সামনে অনেক সময় পড়ে আছে। কিন্তু তার আগে আমাদের লেগে থাকতে হবে। আমাদের যখন বয়স অল্প ছিল, মঠের প্রাচীন সাধুরা, আমাদের সিনিয়র সাধুরা একটি কথাই আমাদের বলতেন – ঠাকুরকে ধরে রাখ। অনেকেই হয়ত বিশ্বাস করবেন না, মঠে আমার প্রায় চল্লিশ বছর হয়ে গেছে, আজ পর্যন্ত কখন কোন মহারাজ এটা করবে, এটা করবে না বলে কোন উপদেশ দেননি। কোন সমস্যা নিয়ে গেলে হয়ত একটা কিছু বলে দিলেন, কিন্তু নিজে থেকে কিছু বলতে যাবেন না। গুরু ইষ্ট মন্ত্র দিয়ে যেভাবে জপ করতে বলে দিয়েছেন, ওটাই শেষ কথা। ওটা আমার জন্য যা, আপনার জন্যেও তাই। কেউ যদি কোথাও গায়ত্রী মন্ত্র নিতে যায়, সারা ভারতের যেখানেই যাক, সব জায়গায় একই মন্ত্র বলবেন, একই অর্থ বলবেন, একই বিধি বলবেন। এগুলো জ্ঞানরাশি। আমরা সাধুরা জীবনে কত কিছু পড়ি, কত কিছু শুনি, দেখি, কিন্তু আমরা সবটাই জীবনে লাগাতে যাই না। এই যে বলা হল, আমরা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসী, আমাদের কক্ষণ কেউ কিছু বলে দেননি। জেন মাস্টাররা কথা বলেন না, উপদেশও দেন না, চুপচাপ থাকেন। ঠাকুর বলছেন, একজন এসে বলছে, মশাই আমাকে সমাধিটুকু শিখিয়ে দিন। সে একদিনে ঠাকুরের কাছ

থেকে সমাধিটুকু শিখে নিতে চাইছে। জেন মাস্টারদের নিয়ে অনেক গল্প আছে। নূতন একজন এসে জেন মাস্টারকে কিছু প্রশ্ন করেছে। মাস্টার তাকে জিজ্ঞেস করছেন, 'তোমার চা খাওয়া হয়েছে'? বলল, 'হ্যাঁ হয়েছে'। 'যাও চায়ের পাত্রটা ভাল করে ধুয়ে নিয়ে এসো'। ব্যস, এইটুকু কথা, চা খাওয়া হয়েছে, যাও পাত্রটা ধুয়ে নিয়ে এসো। আর কিছু বলবেনই না। যদি বলে, 'হ্যাঁ পাত্র ধোয়া হয়ে গেছে'। তখন বলবেন, 'যাও বাগানে গিয়ে পায়চারি কর'। আর কিছু বলবেন না।

এই কথা শুনে অনেকেরই হয়ত আশ্চর্য লাগবে – শাস্ত্র পড়ে কেউ কোন দিন আধ্যাত্মিক হতে পারবে না। নিজের ভিতরে যে উন্নতি হবে, আমাকে শ্রেষ্ঠ হতে হবে, এই ভাব যে আসবে, এটা শাস্ত্র পড়ে হয় না। তবে কিসে হয়? এটা হয়, শ্রেষ্ঠ পুরুষের সঙ্গে থেকে তাঁদের সেবা করে। শাস্ত্র আমাদের শুধু কিছু তথ্য দিয়ে দিচ্ছে। শাস্ত্র পড়ে যদি লাভ হত, তাহলে আমি এই জীবনে পাঁচ থেকে সাতবার ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে যেতাম, অথচ আমি যে কলু ছিলাম, সেই কলুই আছি। মহাপুরুষদের সঙ্গে থাকছে, সে তার নিজের মত জীবন যাপন করছে। তাঁর মুখ থেকে একটা কথা শুনল, তার মনে হল, আরে এই কথাটা তো আমার কাজে লাগবে। ঠিক অতটুকুই তার জীবনকে পাল্টে দেবে। কিংবা তাঁর জীবনটা কাছ থেকে দেখে যাচ্ছে, তিনি কিভাবে আচরণ করছেন, কিভাবে কাজকর্ম করছেন, সেখান থেকে সে তার চলার অনেক রসদ পেয়ে যাচ্ছে। আমরা জীবনে যাবতীয় যা কিছু শিখেছি সব বড় বড় সাধুদের সঙ্গে সঙ্গে থেকেই শিখেছি। তাঁদের সঙ্গে রাতদিন ছিলাম, খুব কাছ থেকে তাঁদের জীবনধারা দেখেছি।

একটা অতি সাধারণ ঘটনা এখানে বলা যেতে পারে। আমি দেওঘরে ব্রহ্মচারী হয়ে জয়েন করেছিলাম। সেই সময় বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী দেওঘর বিদ্যাপীঠের প্রিন্সিপাল ছিলেন, আমাকে খুব স্নেহ করতেন, এখনও করেন। একদিন ছুটির সময় লাইব্রেরীতে বসে কোন ম্যাগাজিন পড়ছি, উনিও আমার পাশেই বসে ছিলেন। আমাদের যা স্বভাব, আমি বসে খুব পা নেড়ে যাচ্ছি। উনি সঙ্গে সঙ্গে আমার জানুতে একটা চাপড় দিয়ে বললেন, 'পা নাড়া বন্ধ কর'। আমাদের মনে হতে পারে যে, পা নাড়া মানে, যত পা নাড়বে মন তত একাগ্র, কিন্তু জিনিসটা পুরো উলটো। আপনারা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, তখন আমার একুশ বছর, জীবনে আজ পর্যন্ত একবারও আর পা নাড়িনি। এখন এমন হয়ে গেছে যে, আমার সামনে বসে কেউ যদি পা নাড়ে, আমার মন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, আমি নিষেধ করে দিই তাকে পা নাড়তে। এই ধরণের শিক্ষা আচার্য, মহাপুরুষ, শ্রেষ্ঠ পুরুষদের সঙ্গে থেকে লাভ হয়।

এত লম্বা কথা বলা হচ্ছে, কারণ এই ষোড়শ অধ্যায় আমাদের জীবন-আদর্শ কি রকম হবে, কিভাবে আমরা নিজেদের তৈরী করব, এটাকে স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন। সপ্তাহে একদিন বা মাসে একদিন এই অধ্যায়টা আমাদের সবারই পড়া দরকার। তাহলে আমরা বুঝতে পারব আমি কোথায় আছি। দরকার হলে পয়েন্ট করে লিখে রাখলে ভাল হয়, কি কি দুর্গুণ আমার মধ্যে আছে, কি কি সৎগুণ আমার মধ্যে এসেছে। আমার ভিতর কি কি দুর্গুণ আছে, কি কি গুণ আছে, এটা আমরা নিজেরাই বুঝতে পারব, বোঝার জন্য কারুর কাছে যেতে হবে না। সপ্তাহের শেষে নিজের দিকে তাকিয়ে একবার দেখতে হবে, কি কি দোষ আমার মধ্যে আছে, তাহলে সেই দোষগুলি সংশোধন করা আমার পক্ষে সহজ হয়ে যাবে, আমি নিজেই বলতে পারব, এটাকে আমার ঠিক করতে হবে।

গীতার আলোচনায় আমরা সৃষ্টিতত্ত্বকে নিয়ে অনেকবার আলোচনা করেছি। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছেন, ভগবান সৃষ্টি করেছেন, যেভাবেই নিই না কেন কোন অসুবিধা নেই। বেদে নাসদীয় সূক্তম্ আছে, পুরুষসূক্তম্ আছে, হিরণ্যগর্ভ সূক্তম্ আছে, এত রকমের সৃষ্টির বর্ণনা কিন্তু ঘুরে ফিরে সব বর্ণনাতে একটা জিনিসই আসে, সৃষ্টি মানে তিনটে গুণ – সত্ত্ব, রজো ও তমো। কথামৃতে ঠাকুর বারবার এই তিনটে গুণের কথা বলছেন। সৃষ্টিতে যাবতীয় যা কিছু আছে, সব কিছুতে এই তিনটে গুণ মিলে মিশে রয়েছে। খাওয়াতে সত্ত্ব, রজো ও তমো রয়েছে, মানুষের মধ্যে সত্ত্ব, রজো ও তমো

রয়েছে, সমস্ত বস্তুর মধ্যে সত্ত্ব, তমো ও রজো রয়েছে, দেবতাদের মধ্যে রয়েছে, ঋষিদের মধ্যে রয়েছে। আমরা শাস্ত্রগুলিতে সত্ত্ব রজো তমোর যত কথা পাই, কথামৃতে ঠাকুর সেই তুলনায় সত্ত্ব, রজো ও তমোর অনেক বেশি বর্ণনা করেছেন। এই সত্ত্ব, রজো ও তমো যখন মানুষের চরিত্রে, তার স্বভাবে নামে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তিন রকম চরিত্রের মানুষ হয়ে যায় – সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ, রাজসিক প্রকৃতির মানুষ আর তামসিক প্রকৃতির মানুষ।

তবে পুরোপুরি সাত্ত্বিক কেউ হয় না, পুরো রাজসিক কেউ হয় না, পুরো তামসিকও কেউ হয় না। সেখানে একটা গুণের প্রাধান্য থাকে, কারুর মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, কারুর মধ্যে রজোগুণের প্রাধান্য আবার কারুর মধ্যে তমোগুণের প্রাধান্য থাকে। ষোড়শ অধ্যায়ে গীতা সাত্ত্বিক গুণগুলিকে বলছেন দৈবীগুণ, এই গুণে মানুষ দেবতা হয়। রাজসিক গুণকে বলছেন আসুরীক গুণ, অসুররা এই ধরণের হয়। তামসিক গুণকে বলছেন রাক্ষস গুণ। তার মানে ষোড়শ অধ্যায়ে এই তিন ধরণের সম্প্রদায়ের বর্ণনা করা হয়েছে –দেবতা, অসুর আর রাক্ষস। কিন্তু অধ্যায়ের নাম দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগ যোগ, দৈবী গুণ আর আসুরীক গুণের বর্ণনা করা হচ্ছে। আসুরীকের মধ্যে আবার দুটি হয়ে যায়, আসুরীক আর তামসিক। তার মানে সত্ত্বগুণগুলিকে একদিকে নেওয়া হচ্ছে, বাকিগুলিকে অন্য দিকে নিচ্ছেন।

আধ্যাত্মিক জীবনে এবং আমাদের যে সাধারণ জীবনে, সাধারণ জীবন মানে সাংসারিক জীবন, দাম্পত্য জীবন; দুটো জীবনেই আমাদের সাত্ত্বিক গুণ সম্পন্ন হওয়া খুব দরকার। আমরা যদি আমাদের আগের কয়েকটা প্রজন্মের দিকে ফিরে তাকাই, আমাদের ঠাকুরমা, দিদিমাদের জীবন যাঁরা দেখেছেন; তাঁরা দেখে থাকবেন তখনকার দিনে মানুষ সাত্ত্বিক বেশি হতেন। ওনাদের আহার, নিদ্রা, ওনারা যেভাবে কাজকর্ম করতেন, ঘুমোনোর অভ্যাস, খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস, সবটাই সাত্ত্বিক ছিল। ভারতবর্ষ সত্ত্ব প্রধান দেশ, ভারতের মানুষ শুভ গুণ সম্পন্ন, দৈবীগুণ অনেক বেশি। আধ্যাত্মিক জীবন মানে, প্রথমে তাঁকে সাত্ত্বিক হতে হবে। সাত্ত্বিক বা দৈবীগুণগুলি কি, প্রথমে একটা একটা করে তার বর্ণনা করছেন। এই গুণগুলি সম্বন্ধে আমাদের সবারই ওয়াকিবহাল হওয়া খুব জরুরী। তার সাথে আসুরী ও রাক্ষসী গুণেরও বর্ণনা করবেন। মানুষ কিভাবে কামান্ধ হয়ে যায়, কিভাবে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে যায় –আমাকে এটা পেতেই হবে, আমার চাইই চাই, না পেলে তোমাদের সবাইকে নাশ আমি করবই করব।

বেদে আমরা অনেক কাহিনী পাই, উপনিষদেও অনেক কাহিনী পাওয়া যায়, যেগুলো পুরাণে এসে অনেক লম্বা হয়ে যায়। সেখানে একটা কাহিনীতে বলছেন, প্রজাপতি যখন সৃষ্টির রচনা করলেন, তখন প্রথমে তিনি দুটি সম্প্রদায়ের রচনা করলেন – দেবতা এবং অসুর। অসুর শব্দ এসেছে অসু থেকে। অসু মানে প্রাণশক্তি, যারা প্রাণকেই আত্মা মনে করে, তারা হল অসুর। প্রাণ হল মন ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি। যারা মন আর ইন্দ্রিয়ের শক্তিকেই শেষ কথা বলে মনে করে, এরা সবাই অসুর। যেমন বৈজ্ঞানিকদের কাছে মনের শক্তি ও ইন্দ্রিয়ের শক্তিই শেষ কথা। ফলে তাঁরা এ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা বানিয়ে যাচ্ছেন, উন্নতমানের মিসাইল প্রযুক্তি নিয়ে আসছেন, ড্রোন তৈরী করে এক অপরকে মারার অস্ত্রবিদ্যাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

দেবতারা প্রাণশক্তিকে মানেন, কিন্তু তার সাথে তাঁরা আত্মজ্ঞানের আলোতে প্রতিষ্ঠিত। এদিকে দিয়ে দেখলে, দেবতা আর অসুরের মধ্যে খুব বেশি তফাৎ নেই। দুজনেই ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে মানছেন, দুজনেই বুদ্ধির শক্তিকে মানেন। কিন্তু অসুররা আত্মা বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, দেবতারা বিশ্বাস করেন। ফলে দেবতাদের মধ্যে দয়ার ভাব, দানের ভাব বেশি; অসুরের মধ্যে এই দুটো জিনিস থাকে না। অসুরদের ভাব হল, এই জগতে যা কিছু আছে আমার ভোগের জন্যই আছে, যা কিছু আছে আমি ও আমার লোকেরাই লুটেপুটে খাব। অসুরদের 'আমি' ভাব প্রচণ্ড মাত্রায় বেশি; শুধু 'আমি আমি আমি', এই 'আমি' ছাড়া ওরা আর কিছু বোঝে না।

আমার লেখা Carving a Sky যাঁরা ড়েছেন, তাঁরা দেখবেন সেখানে Inclusive আর Exclusiveকে খুব সুন্দর ভাবে দেখানো হয়েছে। Inclusive হল সবাইকে স্থান দেওয়া, সবাইকে নিয়ে চলা। Exclusive হল শুধু আমি আর আমার দলের লোকেরাই থাকবে। কিছু কিছু ধর্ম আছে, যারা শুধু নিজেদেরকেই জানে, আমি আর আমার গোষ্ঠী, বাকিদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই, এরা সবাই হল Exclusive। অসুর এবং রাক্ষস এরা হল Exclusive, দৈবী হল Inclusive। কিভাবে জানব, কারুর মধ্যে দৈবী গুণ বা সাত্ত্বিক গুণ আছে কিনা, আধ্যাত্মিক জীবনে উপরে উঠতে পারবেন কিনা? এখানে একটা কথা বলি, ঠাকুর কিন্তু তামসিক ভক্তদের কথাও বলছেন, রাজসিক ভক্তদের কথাও বলছেন। কিন্তু ওর মধ্যেও ঠাকুর আবার তমের মধ্যে সত্ত্বগুণ ইত্যাদির কথা বলছেন, আমাদের অত বিস্তারে যাওয়ার দরকার নেই। আমাদের মূল হল, কোন গুণে মানুষ মুক্তির দিকে এগোয়, কোন গুণে মানুষ মহাপুরুষ হয়, মহৎ হয়, কোন গুণে মানুষ দেবতা হয়। ওই গুণগুলি যদি আমার আপনার না থাকে, তাহলে আমাদের বন্ধন বাড়তেই থাকবে।

উপরে যাওয়ার জন্য সবাইকে প্রচুর খাটতে হয়। পাহাড়ে বা দশতলা বারোতলা বাড়িতে ওঠার সময় দৌড়ে দৌড়ে কয়েক তলা সিঁড়ি ভেঙে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু যেমন যেমন উপরের দিকে উঠতে থাকবে তেমন তেমন কষ্ট হতে শুরু হয়, দম যেন ফুরিয়ে আসে। নীচে নামার সময় কোন খাটনি লাগে না, নামতেই থাকে। একটা বড় পাথর উপরে যদি ছুঁড়তে যায়, যত উপরে ছুঁড়বে তত বেশি শক্তি লাগে। কোন জিনিস যখন উপর থেকে পড়ে, তখন যত নামে তত তার শক্তি বাড়ে। সত্যিই খুব আশ্চর্যের ব্যাপার। শ্রেষ্ঠ হতে গেলে খাটনি অনেক বেশি লাগে। দুষ্ট হলে শক্তি বেড়ে যায়, এটাই আশ্চর্যের। নিউটনের ইক্যুয়েশানসে বলে, একটা জিনিস যখন পড়ে তখন ওর গতি হাফ জিটি স্কয়ার হয়ে বাড়তে থাকে, এগুলো ক্লাশ নাইন টেনে পড়ানো হয়। তার মানে যত পড়বে তত তার পড়ার গতি বাড়বে, ফলে শক্তিটাও বাড়তে থাকবে। আর উপরে যদি পাঠাতে হয়, তাহলে যত উপরে পাঠাতে চাইবে তত শক্তির জোগান দিতে হবে। ভিতরে দৈবী গুণ যদি কেউ আনতে চায়, একটা গুণ আনতে তার দম বেরিয়ে যাবে। দুষ্ট যদি হতে চায়, নোংরামিতে যদি কেউ নামতে চায়, তখন চেষ্টা তো করতেই হবে না, বরঞ্চ যত নামবে তত তার শক্তি বাড়বে। এই অধ্যায়ে বলবেন, *অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি*, এই শত্রুকে নাশ করেছি, এবার ওকে সোজা করতে হবে। ষোড়শ অধ্যায় হল আমাদের আয়না, মাঝে মাঝে ষোড়শ অধ্যায়ের ভিতরে ঢুকলে বোঝা যাবে, আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি।

আচার্য এই অধ্যায়ের ভাষ্য এই ভাবে শুরু করছেন, *দৈবী আসুরী রাক্ষসী চ ইতি প্রাণিনাং প্রকৃতয়ো নবমে অধ্যায়ে সুচিতাঃ*, নবম অধ্যায় যখন হচ্ছিল তখন সেখানে ভগবান বারো নম্বর শ্লোকে বলেছিলেন, *মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ। রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ।।* সেখানে আসুরী বৃত্তি আর রাক্ষসী বৃত্তিকে হাল্কা করে বলা হয়েছিল, এবার এখানে এটাকেই ভগবান বিস্তারে বলছেন। বঙ্গদেশের মধুসূদন সরস্বতী খুব বড় সাধু ছিলেন, গূঢ়ার্থদীপিকা নামে তিনিও গীতার উপর ভাষ্য রচনা করেছেন। তবে আচার্য শঙ্কর যে কথাগুলি লিখেছেন, সেগুলোকে তিনি নূতন করে আর লেখেননি, কিন্তু যে জায়গায় বেশি কিছু বলেননি, সেই জায়গায় তিনি আরও বিস্তার করে লিখেছেন। গূঢ়ার্থদীপিকা আসলে টীকা, নূতন করে তিনি কোন দর্শন দিচ্ছেন না। তাঁর বক্তব্য হল, যাঁরা আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে যান, তাঁদের মধ্যে এই দৈবীগুণগুলি আগে ফুটে ওঠে। আচার্য এটাকেই বলছেন, *তত্র সংসারমোক্ষায় দৈবী প্রকৃতিঃ*।

ঠাকুর ভক্তির কথা বলছেন, সেখানে তিনি ভক্তির তমো বলছে। জ্ঞানের কিন্তু তমো হয় না, মুক্তির তমো হয় না; এখানে দৈবীসম্পদ না হলে হবে না। আর আমাদের ঠাকুরের কাছে তমো জিনিসটা চলে না, চলে শুদ্ধ সত্ত্ব। তমোগুণ রজোগুণ দুটো মিলে মিশে রয়েছে, সেখান থেকে উঠে সত্ত্বগুণে পৌঁছাতে হবে, সত্ত্বগুণ থেকে শুদ্ধ সত্ত্ব, সেখান থেকে ত্রিগুণাতীত। ত্রিগুণাতীত মানে তিনটে

গুণের পারে। ত্রিগুণাতীত হওয়া তো চারটি খানা কথা না, তবে শুভ সংস্কার, শুভ গুণ যদি নিজের ভিতর থাকে সেখান থেকে সত্ত্ব গুণে গেলে অনেকটা এগিয়ে থাকল। বলছেন, দৈবীসম্পদ মুক্তির দিকে নিয়ে যায়, আসুরী আর রাক্ষসী সংসার বন্ধনের দিকে নিয়ে যায়। একটু আগে যেটা বলা হল, নীচের দিকে যত যাবে তত তার পতনের শক্তি বাড়বে। যারা মদ খায়, প্রথমের দিকে ভাল লাগে না, তারপর খেতে খেতে তার এত ভাল লাগে খেতে যে, উল্টে পড়ে থাকে, আরও খাচ্ছে, খেয়েই যাচ্ছে। ড্রাগের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা হয়, হিংসা বৃত্তিতেও একই সমস্যা হয়। আবার ঠাকুর বলছেন, নিন্দনীয় কাজ, ঘৃণার কাজ করতে করতে তার ঘৃণা চলে যায়। মাথায় নোংরা বইতে বইতে ওটার প্রতি নোংরা ভাবটা চলে যায়। যাই হোক এবার আমরা শ্লোক ধরে ধরে আলোচনা করছি।

শ্রীভগবানুবাচ
অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্।।১।।
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্তং মার্দবং হ্রীরচাপলম্।।২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহ নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত।।৩।।

(শ্রীভগবান্ বলছেন –হে অর্জুন, যাঁরা দৈবী (সাত্ত্বিকী) অবস্থালাভের যোগ্য হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের ভয়শূন্যতা, ব্যবহারকালে পরবঞ্চন- ও মিথ্যাকথন-বর্জন, জ্ঞান ও যোগে নিষ্ঠা, সামর্থ্যনুসারে দান, বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম, যজ্ঞ (বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি এবং স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত পঞ্চবিধ যজ্ঞ), স্বাধ্যায় (বেদপাঠ, ব্রহ্মযজ্ঞাদি), তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, ক্রোধহীনতা, ত্যাগ, শান্তি, পরদোষ প্রকাশ না করা, দীনে দয়া, লোভরাহিত্য, মৃদুতা, অসৎ চিন্তা ও অসৎ কর্মে লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ, অবৈরভাব, অনভিমান –এই ছাব্বিশটি সদ্‌গুণ লাভ হয়।)

পরিবার বা বংশের কথা বলতে গিয়া আমরা আভিজাত্যের কথা খুব বলি। এখানেও বলছেন *দৈবীমভিজাতস্য*। আভিজাত্য কি? আড়াইটে শ্লোকে যে গুণগুলির কথা বলা হয়েছে, এই গুণগুলিই আভিজাত্য। কি কি সেই গুণগুলি? *অভয়ং, সত্ত্বসংশুদ্ধি, জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ, দানং, দমঃ, যজ্ঞঃ, স্বাধ্যায়ঃ, তপঃ, আর্জবম্, অহিংসা, সত্যম্, অক্রোধঃ, ত্যাগঃ, শান্তিঃ, অপৈশুনম্, দয়া, অলোলুপ্তং, মার্দবং, হ্রীঃ, অচাপলম্, তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতিঃ, শৌচম্, অদ্রোহ* ও *ন অতিমানিতা*। একটা একটা করে কি এই গুণগুলি আয়ত্ত করতে হবে? না, কোন একটি গুণে যদি কেউ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় আর অন্য দিকে তার উদ্দেশ্য যদি ঠিক থাকে, আমাকে মুক্তির দিকে এগোতে হবে, আমাকে ভক্তি লাভ করতে হবে, বাকি গুণগুলি নিজে থেকেই তাঁর মধ্যে এসে যাবে।

এই গুণগুলির কথা আমরা সবাই মোটামুটি জানি; ষোড়শ অধ্যায়ে যা কিছু বলবেন, তার মধ্যে একটিও নূতন কোন কথা নেই। তবে কি হয়, যখন আমরা একটা জিনিসকে অনেক দিন ধরে শুনতে থাকি, দেখতে থাকি, আমাদের মনটা ওই ব্যাপারে ভোঁতা হয়ে যায়। মন ভোঁতা হয়ে গেলে জিনিসটার মাহাত্ম্য, ওর গুরুত্ব বোঝা যায় না। এর জন্য দরকার নূতন করে ওই জিনিসটাকে নিয়ে আলোড়ন তৈরী করা। সেইজন্য এই গুণগুলিকে আলাদা আলাদা করে আমরা আলোচনা করব এবং এগুলোকে কেন এত গুরুত্ব দেওয়া হয় সেটারও আলোচনা করা হবে।

প্রথম হল *অভয়ম্*। অভয় শব্দ দুটি অর্থে আসে, প্রথমটা হল কাউকে ভয় না দেওয়া, যেমন বলা হয় *অভয়ম্ সর্ব ভূতেভ্যো*। দ্বিতীয় অর্থ নিজের ভিতরে কোন ভয় না থাকা। আচার্য *অভয়ম্* শব্দের অর্থ করছেন, অভীরুতা; ভীরুতার ভাব, কাপুরুষতার ভাব সরিয়ে বীরভাব আশ্রয় করা। ভীরুদের জন্য, কাপুরুষদের জন্য ধর্ম জীবন নয়। ধর্ম জীবন, যারা খাপ খোলা তলোয়ার, তাদের জন্য। স্বামীজীও বারবার বলছেন, মিনমিনে, পিনপিনে স্বভাবের লোকেদের দ্বারা ধর্ম জীবন হয় না।

ভিতরে তেজ থাকতে হবে, ঠাকুরের কথায়, গরুর লেজে হাত দিলে গরু তিড়িং করে লাফিয়ে উঠবে। ভয় কোথা থেকে আসে, ভয় জিনিসটা কি? যখন আমরা কোন কিছুর প্রতি বড্ড বেশি আসক্ত হয়ে যাই, এই আসক্তি দেহের প্রতি হতে পারে, নিজের মনের প্রতি হতে পারে, কোন ব্যক্তির প্রতি, কোন আদর্শের প্রতি বা কোন বস্তুর প্রতি, তা সোনা, গয়না, বাড়ি, গাড়ি; ছোট বাচ্চার যেমন খেলনার প্রতি আসক্তি থাকে, মা ভয় দেখানোর জন্য বলে তুমি যদি দুষ্টুমি কর তাহলে তোমার খেলনা কেড়ে নেওয়া হবে, বাচ্চা ভয়ে সোজা হয়ে যায়, খেলনাটা তার প্রাণ।

মানুষ মানুষের প্রতি আসক্ত হয়ে যায়, যেটা আমরা দিনরাত দেখছি। মা বলে, তুমি আমার প্রাণ নিয়ে নাও, আমার সন্তানকে ছেড়ে দাও। ছেলের উপর যদি কোন আঘাত আসে, মা ভয়ে কাঁপতে শুরু করে। দরকার হলে মা বাঘিনীর মত হয়ে যাবে। দেহের প্রতি আসক্তি মৃত্যুভয়, রোগের ভয়, শোকের ভয় নিয়ে আসে। অনেকে বলে, আমি কাজ করতে করতে মরতে চাই, বিছানায় পড়ে থেকে মরতে চাই না। এগুলোর কোনটাই আমাদের হাতে নেই, কিন্তু সবাই এটাই চাইছে। আসলে সেখানে ভয় আছে, আমাকে অপরের উপর নির্ভর করে থাকতে হবে। আমি আমার আমিত্বকে হারিয়ে ফেলব। এই যে আমি সারা জীবন সবার উপর আমার তেজ দেখিয়ে গেছি, বিছানায় পড়ে গেলে তো আমি আর আমার সেই তেজ দেখাতে পারব না। ফলে সেখানে ভয় কাজ করে।

ভয় পাওয়ার হাজারটা কারণ আছে। আমরা অন্ধকারকে ভয় পাই। আমরা বাঘ, সাপ, বিছে এদের ভয় পাই। আমরা ভূতকে ভয় পাই। আমরা ঈশ্বরের ক্রোধকে ভয় পাই। আমরা রাজাকে ভয় পাই, আমরা পুলিশকে ভয় পাই। কত রকমের ভয় আমাদের মনকে বিচলিত করে দিচ্ছে। কিন্তু অভয় হওয়ার জন্য শুধু একটি জিনিসের দরকার – আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, যার জন্ম নেই মৃত্যু নেই কিংবা আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সন্তান, মৃত্যুর পর আমি ঈশ্বরের কাছেই থাকব। আমরা যখন বেদান্ত, উপনিষদের কথা শুনি, বা পড়ি, তখন মনে হয় আহা কি অপূর্ব সব কথা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপনিষদকে আধার করে কত সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখেছেন।

আজকাল পজিটিভ থিঙ্কিং, মোটিভেটিভেশানের উপর কত বই লেখা হচ্ছে, আর লক্ষ লক্ষ বই বিক্রিও হয়ে যাচ্ছে। লোকেদের কিছু ভাল হয় বলেই তো এত কপি বিক্রি হচ্ছে। শুধু এতটুকু বিশ্বাস – আমিও পারি, এটাতেই মানুষের জীবনে কত কিছু হয়ে যাচ্ছে। অন্য দিকে জেহাদীরা বিশ্বাস করে যে, আমার জন্য আমার ঈশ্বর অপেক্ষা করে আছেন, এই বিশ্বাসের জোরে তারা সুইসাইডাল বোম্বার হয়ে যায়, নিজের প্রাণ, নিজের দেহ যে এত প্রিয়, সেটাও হেলায় বিসর্জন দিয়ে দিচ্ছে। আর কারুর যদি বিশ্বাস হয়ে যায়, সে হল সেই শুদ্ধ আত্মা, যার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, তখন কি হবে তার? আমরা কল্পনাই করতে পারব না। শুধু যখন বলে দেওয়া হল, তুমি পারবে, তোমার মধ্যে সেই শক্তি আছে, তাতেই মানুষ কোথাও পৌঁছে যায়। যুদ্ধের সময় সৈন্যদের তাদের কমাণ্ডার বলে দিল, 'আমি জানি, তোমরাই এই লড়াই জয় করার জন্য যোগ্য, আমি জানি তোমরাই পারবে। এই এতটুকু কথা শুনে তাতেই সৈন্যরা মৃত্যুকে উপেক্ষা করে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেখানে যে মানুষ জানে আমিই সেই আত্মা, আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই; আমি সেই আত্মা, যার না আছে জন্ম, না আছে মৃত্যু; তার কি কোন কিছু থেকে আর ভয় হবে? কিসের আর ভয়। কিন্তু মানুষ নিজেকে ছোট ছোট জিনিসের সাথে যুক্ত করে রেখেছে। একটা ছোট্ট একটা নোটিশ যদি এসে যায়, তিন দিন বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে, তাতেই লোকেরা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেবে। বা বলা হল, পাঁচ ঘন্টা ইন্টারনেট ডাউন থাকবে, তাতেই আমরা উদভ্রান্তের মত অস্থির হয়ে উঠি। মানুষ ছোট ছোট জিনিসের সাথে এমন ভাবে নিজেকে জুড়ে রেখেছে যে, আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এভাবে আধ্যাত্মিক জীবন কখনই চলতে পারে না। আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম পাঠ হল অভয়।

একটা খুব সাধারণ কথা বলা যেতে পারে, জানি না, অনেকের হয়ত আপত্তি থাকতে পারে। এই যে এখন করোনার সমস্যা হয়েছে, এর জন্য বিজ্ঞানীরা যাই হোক খেটেখুটে একটা ভ্যাকসিন

দাঁড় করালেন। আমেরিকার লোকেরা নাকি এখনও ভয়ে ভ্যাকসিন নিতে চাইছে না, সব ভয়ে মরছে, নিলে নাকি অনেক রকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। আমাদের ভারতে ভ্যাকসিন নিয়ে কত রকমের ভ্রান্তিমূলক খবর ছড়িয়ে আছে। কিসের ভয়, এত ভয়ের কি আছে। বিজ্ঞানীরা কত খেটে গবেষণা করে এই ভ্যাকসিন তৈরী করেছে, সরকার বিনা পয়সায় ভ্যাকসিন নিতে উৎসাহ দিচ্ছে। তারপরেও সংশয়, তারপরেও ভয়? আরে বাবা পাঁচজনের যা হবে, আমারও তাই হবে, এত ভয়ের কি আছে! শুধু এতটুকু আমরা যদি মাথায় রাখি, আরও পাঁচজনের যা হবে, আমারও তাই হবে এটুকু মাথায় রাখলে আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে, কি হবে! আরও পাঁচজনের যা হবে, তোমারও তাই হবে। আমরা কেউই শ্রেষ্ঠতার সিঁড়িতে সবচেয়ে নীচে নই, আমাদের চেয়েও নীচে অনেকে আছে। তারা যদি বেঁচে থাকে, আমরাও বেঁচে থাকব, এত ভয়ের কি আছে! মরে যাব, যাবেন; সম্মান চলে যাবে, যাক; তাতে কি আছে, ধর্মে যেন আমি প্রতিষ্ঠিত থাকি। *অভয়ম্*, কোথাও যেন কোন ধরণের ভয় না থাকে। যদি আমাদের মনের ভিতর এতটুকু ভয় থাকে, তাহলে জানতে হবে, আমার ভিতর দৈবীসম্পদ নেই।

সত্ত্বসংশুদ্ধি, সত্ত্ব মানে হয় বুদ্ধি। *সংশুদ্ধি*, শুধু শুদ্ধি না, সম্যক্ রূপে পূর্ণ রূপে শুদ্ধি। আচার্য শঙ্কর এর খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করছেন, *সত্ত্বস্য অন্তঃকরণস্য*; মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার মিলে অন্তঃকরণ। চিত্ত মানে, যে জিনিসগুলিকে বাইরে থাকে ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে। যার জন্য আমরা বাজে জিনিস দেখতে চাই না, ভাল জিনিস দেখতে চাই। যেটা আমাকে বেশি আনন্দ দেয়, সেটার দিকে বেশি চোখ যায়। মন হল, যে শুধু বিচার করে, এটা ঠিক, নাকি ওটা ঠিক। বুদ্ধি হল সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। মা-বাবা গুরুজনদের কাছে শুনেছে, আচার্যের কাছে শুনেছে, শিক্ষকের কাছে শুনেছে, শাস্ত্র পড়েছে, শাস্ত্রের কথা আচার্যের বা গুরুর মুখে শুনেছে, সব শুনে শুনে মনটা তৈরী হয়। বুদ্ধি দাঁড়িপাল্লার মত নিশ্চিত করে বলে দেয়, কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল। দ্বিতীয় অধ্যায় আলোচনার সময় বুদ্ধি নাশের কথা যখন এসেছিল, তখনও এই বিষয়টা আমাদের আলোচনায় এসেছিল। এখানে বুদ্ধি নাশের কথা বলছেন না, বুদ্ধির কথাও বলছেন না, বলছেন *সত্ত্বসংশুদ্ধি*, অন্তঃকরণের সম্যক শুদ্ধি। আর অহঙ্কার হল, যে জিনিসটার সাথে গিয়ে মন নিজেকে একাত্ম করে ফেলে। এই অহঙ্কার বাংলার অহঙ্কার না, যোগের এটা একটা টেকনিক্যাল শব্দ, যার অর্থ হয় একটা জিনিসের সাথে মনকে যুক্ত করে ফেলা। এই অহঙ্কারের জন্যই কোন একটা জিনিস আমাদের বেশি ভাল লাগে, কোন একটা জিনিস কম ভাল লাগে।

তারপরেই আচার্য বলছেন, *সংব্যবহারেষু পরবঞ্চনমায়ানৃতাদিপরিবর্জনং শুদ্ধভাবেন*, ভাব যেন শুদ্ধ থাকে। আচার্য বলতে চাইছেন, লোকের সাথে যখন ব্যবহার করবে তখন কোন মানুষকে ঠকানোর মনোভাব ভিতরে যেন না থাকে। বাচ্চা ছেলে মাকে ঠকাচ্ছে, বোকা বানাতে চাইছে, সেটা আলাদা জিনিস। মা বাচ্চাকে বোঝানর জন্য একটু অন্য ধরণের কথা বলতে পারেন, সেটা অন্য জিনিস। কিন্তু লোকের সাথে ব্যবহার কালে ভিতরে ভিতরে কোন স্বার্থসিদ্ধির সঙ্কল্প যেন না থাকে। আশির দশকে আমি তখন দেওঘর বিদ্যাপীঠে ছিলাম। সেখানে এক ছাত্রের পরিবারের একটা ঘটনা আমি পরে জেনে ছিলাম। ছেলেটি দেওঘরে পড়ে আর তার বাবা-মা যে শহরে থাকে সেই শহরেও একটা রামকৃষ্ণ মঠের সেন্টার আছে। বাবা-মা ওই সেন্টারের ভক্ত, নিয়মিত আসা-যাওয়া আছে। বাবা-মা এসে একদিন সেই ছেলের নামে সেন্টারের অধ্যক্ষের কাছে কমপ্লেন করে বলছে, 'এই দেখুন মহারাজ, ছেলেটাকে বাড়িতে রেখে আমি আর আমার স্ত্রী দুজনে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখছি ছেলেটা বাড়িতে পুরো ভাঙচুর করে দিয়েছে। দেওঘর বিদ্যাপীঠে পড়ে, বলুন এটাই কি স্বামীজীর আদর্শ'? রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলে ছেলেকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে মানে, ছেলে এবার হাফ সাধু হয়ে বেরোবে।

সেই সেন্টারের অধ্যক্ষ মহারাজের চিন্তা ভাবনা খুব পরিষ্কার। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'ছেলেকে বাড়ি রেখে স্বামী-স্ত্রী মিলে বাইরে গিয়ে সিনেমা দেখবে, সেটা স্বামীজীর আদর্শ, তাই না'? এই ঘটনার কথা সেই মহারাজ আমাকে নিজেই বলেছিলেন, তখন আমি দেওঘরে ব্রহ্মচারী ছিলাম। খুব তাৎপর্যপূর্ণ কথা।

নিজের স্বার্থের জন্য আমাদের এসে বলবে, 'আপনি সন্ন্যাসী হয়ে, সাধু হয়ে আপনি এই ধরণের কথা বলছেন, এই রকম কাজ করছেন'? স্বার্থ ভাব তোমার ভিতরেই রয়েছে, আর তুমি কিনা আমার সাধুগিরি নিয়ে প্রশ্ন করছ। একটা অন্য কোন রকম কিছু বললে বা লিখলে, খুব গভীর স্বরে বলবে – এরা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ থেকে সরে যাচ্ছে। আমি সরে যাচ্ছি না ভাই, তোমার নিজের স্বার্থ রয়েছে, তুমি নিজে একটা ধারণা করে রেখেছ, ওই ধারণার সাথে মিলছে না বলে তুমি আমাকে গালাগাল দিচ্ছ। তুমি বল, আমি কোথায় ঠিক না ভুল। সমস্যা হল তোমার নিজের স্বার্থ রয়েছে, সেই স্বার্থের জন্য আমাকে গালাগাল দিয়ে দিচ্ছ, যার জীবনের আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ, সেখান থেকে নাকি আমি সরে যাচ্ছি।

আমরা একটু বিচার করলেই দেখতে পাব চারিদিকে এই অশুদ্ধ ভাব; চারিদিকে শুধু চালাকি আর চালাকি আর স্বার্থপরতা। আমরা বাজারে গিয়ে দরদাম কেন করি? আসলে আমাদের ভিতরেই কপটতা আছে বলে মনে করছি, সবজী বিক্রেতাটাও কপটতা করছে। ইদানিং তাই সবাই সবাইকে ঠকানোর চেষ্টা করছে। আমি যখন দেখি কেউ কাউকে মিথ্যা কথা বলে ঠকাচ্ছে, তখন ভাবি, হে ভগবান, এভাবে তুমি তোমার কর্ম কত খারাপ করছ, এরপর কোথায় গিয়ে পড়বে ভেবেছ? বলছেন, ঠকানো, কপট ব্যবহার, কপট ব্যবহার মানে, তুমি এক রকম আছ, কিন্তু দেখাচ্ছ আর-এক রকম। মিথ্যা কথা আমরা বলি সাধারণত মানুষকে ঠকানোর জন্য, আসলে সবটা মিলিয়েই ঠকান হয়। আবার অনেক সময় মিথ্যা কথা বলি, কারণ তাকে আমি ভালবাসি। ছেলে মাকে ভালবাসে, বাবাকে ভালবাসে; সে তাদের দৃষ্টিতে নীচু হয়ে যেতে চায় না। সে জানে আমি যদি সত্যি কথা বলে দিই, তাহলে ওনাদের চোখে আমি নীচু হয়ে যাব। সেইজন্য যাকে আমি ভালবাসি, সে যদি কখন মিথ্যা কথা বলে, আমার কখনই তাকে আঙুল দেখানো উচিত হবে না। কারণ সে আমাকে ভালবাসে, সে চায় না যে আমার দৃষ্টিতে সে নীচু হয়ে যাক।

কিন্তু যিনি আধ্যাত্মিক জীবনকে বেছে নিয়েছেন, তার মিথ্যা কথা বলার আর কিসের প্রয়োজন। তিনি দু নম্বরী কাজ কখনই করেন না, তাই দু নম্বরী ব্যবহারও তাঁকে করতে হয় না। সন্ন্যাসী কোন গোলমাল করলে তবেই না লুকোতে চাইবেন। শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী আমাদের বলতেন, সাধুর জীবন পোস্টকার্ডে লেখা চিঠি, যে কেউ পড়ে নিতে পারে। কিন্তু এখন আমাদের জীবন হল রীতিমত খামে লেখা চিঠি, সেটাকে আবার সীল করে, রেজিস্ট্রী করে পাঠাতে হবে, কেউ যেন পড়তে না পারে, জানতে না পারে।

আধ্যাত্মিক জীবনে যাঁরাই আছেন, তাঁদের জীবন হল পোস্টকার্ডে লেখা চিঠির মত, যে কেউ পড়ে নিতে পারে, কোথাও লুকোবার কিছু নেই। লোকেরা ঠকাতে চাইলে ঠকাবে, কিন্তু যে ঠকাচ্ছে সে নিজেই মরবে। দেখা যাবে তাঁর হয়ে কেউ দাঁড়িয়ে বলবে, তুমি ওনাকে ঠকাচ্ছ, লজ্জা করে না? সেইজন্য আগে নিজেকে পরিষ্কার রাখতে হয়। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অনেক সময় এই জিনিসগুলো থাকে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলোর অনুমোদন আছে, যার জন্য মহাভারত এটাকে হিসাবের মধ্যে ধরেন না। তবে একটা অবস্থায় গিয়ে চিটিং জিনিসটা মানুষ নিতে পারে না। আমার নিজস্ব মত হল, আপনজন, সে আমাকে ভালবাসে, সে যদি আমাকে মিথ্যা কথা বলে, বুঝতে হবে আমার থেকে সে দূরে সরে যেতে চায় না, তাই সে মিথ্যা বলছে। আচার্য তাই বলছেন, *অনৃত* ব্যবহারকে ছেড়ে দিয়ে *শুদ্ধভাবেন* ব্যবহার, যার যা ভাব, সেই ভাব শুদ্ধ থাকতে হবে। একজনের

কাছে যা, অপরের কাছেও তাই, শুদ্ধ ব্যবহার ও শুদ্ধ ভাব। ভাল করে একটু বিচার করলে দেখা যাবে, কত অশুদ্ধ ভাব নিয়ে আমরা বেশির ভাগ সময় থাকি।

জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ, জ্ঞান আর যোগে অবস্থান করা। আচার্য জ্ঞানকে বলছেন, *জ্ঞানং শাস্ত্রতঃ আচার্যতঃ আত্মাদিপদার্থানাম্ অবগমঃ*, শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, আচার্যের মুখে শাস্ত্রের বর্ণনা শ্রবণ করে আত্ম ও অনাত্ম পদার্থকে ঠিক ঠিক তত্ত্বতঃ বুঝে নেওয়া, এটাই জ্ঞান। ঈশ্বরের ব্যাপার তত্ত্বতঃ বুঝে গেছে, আত্মার ব্যাপার তত্ত্বতঃ বুঝে গেছে, তত্ত্বতঃ বুঝে গেছে সংসার জিনিসটা কি, মোহ মায়া জিনিসটা কি বুঝে গেছে; বলছেন, এটাই জ্ঞান। প্রথমে বুঝতে হয় জ্ঞান জিনিসটা কি। যার জন্য পরে স্বাধ্যায়ের কথা ভগবান বলবেন। স্বাধ্যায় সবাইকেই করতে হয়। এগুলো হল যাঁরা জ্ঞান সাধনাতে আছেন, জ্ঞানীদের জন্য এগুলো নয়, জ্ঞানী এগুলোর পারে। শাস্ত্রের কথা ঠিক ঠিক জানা, আচার্যের কথা ঠিক ঠিক বোঝা, বিশেষ করে শাস্ত্রের যে কথাগুলো আচার্যের মুখ দিয়ে আসছে, সেগুলোকে ঠিক ঠিক ভাবে ধারণা করা। কিন্তু বেশির ভাগ আচার্য শাস্ত্রকে নিজের মত ব্যাখ্যা করেন, সেইজন্য ঠিক ঠিক আচার্য পাওয়াও খুব কঠিন।

এই জ্ঞান পাওয়ার পর কি করতে হবে? আচার্য বলছেন, *ইন্দ্রিয়াদ্যুপসংহারেণ*, ইন্দ্রিয়গুলিকে টেনে ভিতরের দিকে নিয়ে আসতে হয়, *একাগ্রতয়া*, মনকে একাগ্র করে, *স্বাত্মসংবেদ্যতাপাদনং যোগঃ*। প্রথমে ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করে ভিতরে টেনে নিয়ে আসা, তারপর মনকে একাগ্র করে আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা। আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা মানে আত্মজ্ঞান পাওয়া, কিন্তু এখানে আত্মজ্ঞানের কথা বলছেন না, এখানে বলতে চাইছেন অন্ততঃ কিছুটা এগিয়ে যাওয়া। তবে আচার্য এখানে বলছেন *সংবেদ্য*, অর্থাৎ জিনিসটাকে জানা – এটাই *জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ*, জ্ঞান আর যোগে অবস্থান করা।

এখানে এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। ভাল মানুষ আর একজন সাধুপুরুষে তফাৎ আছে। যে কোন ধর্ম প্রথমে মানুষকে একজন ভদ্রলোক বানায়। দ্বিতীয় ধাপে তাকে ধার্মিক বানায়, তারপর তাকে আধ্যাত্মিক বানায়। যাঁরা আধ্যাত্মিক পুরুষ, যেমন ঠাকুর ছিলেন, স্বামীজী ছিলেন, এনারা সবাই কিন্তু একজন ভদ্রলোক, সেখান থেকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, আর সেখান থেকে আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত। এই তিনটে ধাপ। একজন ভদ্রলোক কাউকে কখন ঠকান না, তিনি কখন কথার খেলাপ করবেন না। যাঁরা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত তাঁরাও এই রকম হন। আর যাঁরা ঈশ্বর জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তাঁরাও এই রকম হন। যার জন্য স্বামীজীকে আমরা দেখছি একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক। কিন্তু ধর্মের সাথে তফাৎ আছে। কোথায় তফাৎ হয়ে যায়? এই *জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ* তে এসে। যেমন অভয় ভদ্রলোকেরও হয়, সত্ত্বসংশুদ্ধি ভদ্রলোকেরও হয়, দান, দম এগুলো ভদ্রলোকেরও হয়। কিন্তু *জ্ঞানযোগব্যবস্থিতঃ* একমাত্র তাঁদেরই হয় যাঁরা ধর্মের পথে আছেন, ভদ্রলোকের হয় না।

ইদানিং কালে একটা বাক্য খুব প্রচলিত হয়ে গেছে, বেশির ভাগ ভক্তদের মুখে মুখে এই বাক্য ভাসছে –I am spiritual, I am not religious। এদেরকে উদ্দেশ্য করেই ঠাকুর বলছেন, একে তাঁতি আবার লম্বা লম্বা কথা। এরা আদৌ কি বোঝে আধ্যাত্মিকতা কি, ধর্ম কি? ধর্মে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে কেউ কোন দিন কক্ষণ আধ্যাত্মিকতাতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। *জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ*, আগে তোমাকে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তোমাকে দীর্ঘকাল ধরে ধর্মের প্রচুর অভ্যাস করতে হবে। দীর্ঘ দিন ধর্ম অভ্যাস না করলে কারুর পক্ষে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া একেবারেই সমভব না। এখানে জ্ঞান বলতে, শাস্ত্রের জ্ঞান, আচার্যের মুখ থেকে পাওয়া শাস্ত্রের জ্ঞান।

আর যোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানে, যেখানে সে এই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করছে। প্রত্যক্ষ করার জন্য কি কি করতে হবে? সেটাই এখানে আচার্য বলছেন, *ইন্দ্রিয়দ্যুপসংহার*, ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা চাই। এই যারা বলে, I am spiritual, I am not religious, পারবে তারা ইন্দ্রিয় সংযম

করতে? যারা কিনা পান থেকে চুন খসলে হাতাহাতি শুরু করে দেয়, তারা নাকি করবে ইন্দ্রিয় সংযম! মনকে সম্পূর্ণ একাগ্র করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে, কি রকম একাগ্রত, *যথা দীপো নিবাতস্থো*। যেখান কোন বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে না, সেখানে দীপ যেমন জ্বলে, আলোক শিখা সোজা ও স্থির হয়ে জ্বলে যাচ্ছে, মনকে ওই রকম একাগ্র হতে হবে। আর হল প্রত্যক্ষ, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে সেই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা। আত্মাকে যদি প্রত্যক্ষ না করতে পারে, তাহলে সেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বতে প্রতিষ্ঠিত থাকা এত সোজা জিনিস না। স্খলন হতে বেশিক্ষণ লাগে না, অত্যন্ত সোজা। যার জন্য ঠাকুর বলছেন, *জ্ঞানী ভয়তরাসে*, জ্ঞানীর মধ্যে ভয়ের ত্রাস লেগে আছে, এই বুঝি পতন হয়ে যাবে, এই বুঝি পড়ে গেলাম। *যোগব্যবস্থিতি*, যোগে যদি প্রতিষ্ঠিত না হয়ে থাকে, আত্মাকে যদি প্রত্যক্ষ না করে থাকে, যে কোন মুহুর্তে এই লব্ধ জ্ঞান থেকে পড়ে যাবে। সেইজন্য জ্ঞানী ভয়তরাসে।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্, দানের ভাব থাকা চাই, দান করতে হয়, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করতে হয়, যজ্ঞ করতে হয়, স্বাধ্যায় করতে হয়, তপস্যা করতে হয় আর মনের কুটিল ভাবকে সরিয়ে দিতে হয়।

একটা জিনিসকে বোঝাবার জন্য আমাদের বিষয় থেকে একটু সরে আসতে হচ্ছে। আধ্যাত্মিক জীবনে শাস্ত্র অধ্যয়ন কিন্তু খুব একটা জরুরী নয়। অদ্বৈত বেদান্ত এই কথা বারবার বলেন, আর বাস্তবিক জীবনেও আমরা দেখি, ঠাকুর শাস্ত্র না পড়েই সব সিদ্ধি পেয়েছিলেন। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আচার্য শঙ্কর বলছেন, যাঁরা এখনও সিদ্ধি পাননি, তাঁদের জন্য শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের দরকার আছে। আগেকার দিনে আমরা ট্রেনে প্রথমবার যে রুটে যেতাম, ট্রেনের টাইমটেবিল দেখে সব আমরা লিখে নিতাম আমাদের গাড়ি কোন কোন স্টেশনে থামবে, কতক্ষণ দাঁড়াবে। সেই দেখে আমরা আন্দাজ করে নিতাম কোথায় নেমে একটু চা বা অন্য কিছু খেয়ে নেওয়া যেতে পারে। কাগজে যত কিছুই লিখি না কেন, ওই দিয়ে আমার রেল ভ্রমণ হবে না। রেলে ভ্রমণ তখনই হবে, যখন আমি রেল ট্রেনে চাপব, ট্রেন একটার পর একটা স্টেশন পেরিয়ে পেরিয়ে আমাকে আমার গন্তব্য স্থলে পৌঁছে দেবে। যে-সব শাস্ত্রগুলি আমরা পড়ছি, শুনছি; এই শাস্ত্রগুলি হলে মানচিত্রের মত। মানচিত্র আমাদের সব দিকের রুটগুলো দেখিয়ে দেয়, এই রুটে গেলে ওখানে পৌঁছে যাবে, ওই রুটে গেলে আর-একটা জায়গায় পৌঁছে যাবে। ম্যাপ দেখে সব কিছু বুঝে নিয়ে যখন পথে নেমে চলতে শুরু করবে, তখন তার কাছে পরিষ্কার থাকে যে, এই সময় এই জায়গাগুলো আসবে, ওই পথে গেলে আসল জায়গায় পৌঁছাতে দেরী হয়ে যাবে।

এখানেও গীতা মানচিত্রের মত দৈবসম্পদ, আসুরীক সম্পদ সম্বন্ধে আমাদের ওয়াকিবহাল করিয়ে দিচ্ছেন। দৈবীসম্পদ হল সাত্ত্বিক গুণ। দৈবীসম্পদের কোন একটা গুণ যদি কারুর মধ্যে থাকে, বুঝতে হবে এবার তিনি ঈশ্বরদর্শনের দিকে, ঈশ্বরজ্ঞানের দিকে এগোচ্ছেন। আমাদের পরিচিত কারুর মধ্যে এই ছাব্বিশটা দৈবী গুণের একটি গুণও যদি থাকে, বুঝতে হবে তিনি ঈশ্বরের জ্ঞানপ্রাপ্তির দিকে এগোচ্ছেন। একটা গুণের অভাব যদি থাকে, ওটা কিছুই না, একটা গুণের অভাবের কোন দাম নেই; দেখতে হবে একটা কোন গুণ আছে কিনা।

আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাসে এই রকম অনেক ঘটনা আছে। কেউ হয়ত সাধু হতে এসেছেন; তাদের মধ্যে কেউ হয়ত কোন সমস্যায় পড়ে সাধু হতে এসেছেন বা কেউবা কারুর সাথে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাধু হতে এসেছেন। বড়রা অন্যান্য মহারাজদের জিজ্ঞেস করতেন, ছেলেটার মধ্যে কি কোন গুণ আছে? কোন একটা গুণের খবর হয়ত বলা হল। সঙ্গে সঙ্গে ওনারা বলে দিতেন, ঠিক আছে, ছোকরাকে রেখে দাও, ওই গুণেই সে বড় হয়ে যাবে। ছাব্বিশটা গুণের মধ্যে দরকার মাত্র একটা গুণ। এই অধ্যায়ের প্রথম তিনটে শ্লোকে যে ছাব্বিশটা গুণের বর্ণনা

করছেন, এগুলো সব হল সাত্তিকী গুণ। যদি কারুর মধ্যে এর একটি গুণ থাকে, তাহলে বুঝে নিতে হবে ঠাকুর তাঁকে নিজে হাতে ধরে নিয়েছেন, এবার ঠাকুর তাঁকে টেনে নিয়ে চলে যাবেন।

আসুরী ও রাক্ষসী গুণগুলি হল ঠিক ঠিক দুর্গুণ। গুণের অভাব আর দুর্গুণ, দুটো আলাদা জিনিস। যেমন *অভয়ম্* একটা গুণ, তার বিপরীত ভয়, এটাকে ঠিক দুর্গুণ বলা যাবে না; ভয় হল সেই শক্তির অভাব। এর উপর আমরা আগে আগে বিস্তারে আলোচনা করেছি। সদ্গুণের অভাব, এটা একটা অন্য জিনিস; দুর্গুণ জিনিসটা এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দুটো জিনিস দিয়ে সদ্গুণ আর দুর্গুণ আলাদা হয়ে যায়। যাঁরা আমার লেখা Carving a Sky পড়েছেন, তাঁরা দেখে থাকবেন, সেখানে এই দুটো জিনিসকে খুব সুন্দর ভাবে দেখানো হয়েছে। এই দুটো জিনিস হল – Inclusiveness and Exclusiveness, Inclusive মানে নিজেকে বিকেন্দ্রিত করে দেওয়া আর Exclusve মানে নিজেকে আত্মকেন্দ্রিত করে দেওয়া। আত্মকেন্দ্রিতটা হল দুর্গুণ, কিন্তু যখন কেউ জগতের সবার জন্য ভাবতে শুরু করেন, তখন তাঁর মধ্যে সদ্গুণগুলি আসতে আরম্ভ হয়। একটা গুণ এসে গেলে ধীরে ধীরে সব কটা গুণই তাঁর মধ্যে এসে যায়। এগুলো আমাদের জানতে হয়। জানা থাকলে, নিজের ভিতর যখন কোন দুর্গুণ প্রবেশ করতে শুরু করে, তখন বোঝা যায় আমি এখানে ভুল করছি।

ইউটিউবে আমাদের শাস্ত্রের উপর অনেক ক্লাশ হচ্ছে। অনেক ইয়ং ছেলেমেয়েরা শাস্ত্রের উপর এই আলোচনাগুলো শুনছে। শোনার পর তারাও নূতন করে কিছু শুরু করতে চাইছে। অনেকেই এসে বলে, আমরা একটু মানবসেবা করতে চাইছি, বর্তমানে বস্তুবাদ, ভোগবাদ অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে গেছে। বয়স জিজ্ঞেস করলে বলে ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়স। ছাব্বিশ সাতাশ বয়সে মানব সেবা করতে চাইছ, তোমরা কাকে বোকা বানাতে চাইছ? এই কাজ সন্ন্যাসীরা করে। মজা করে একজনকে একটা গল্প বললাম। একটা কাক একদিন একটা রুটি পেয়েছে। সেটা দেখে একটা শেয়াল কাককে বলছে, অনেক দিন তোমার গান শুনিনি, একটা গান করবে? কাক শেয়ালের কথা শুনে ঠোঁট থেকে রুটিটা নামিয়ে ডালের উপর রেখে পা দিয়ে চাপা দিল। তারপর কাক বলল, ‘এই গল্পটা আমরা নার্সারিতেই শুনে এসেছি। এবার বল কোন গান শুনতে চাও’? দৈবীসম্পদ, আসুরী সম্পদ এগুলো জানা থাকলে বোঝা যায়, কে বোকা বানাতে চাইছে, কে আমাদের ভুল পথে নিয়ে যেতে চাইছে। সমাজে দৈবীসম্পদের যেমন দরকার আছে আসুরী সম্পদেরও দরকার আছে। কিন্তু যিনি ঈশ্বর পথে যেতে চাইছেন, তাঁকে একমাত্র দৈবীগুণ রাখতে হবে। দরকার হলে খেটেখুটে আসুরীক গুণ, আত্মকেন্দ্রিক যে জীবন, সেটা থেকে সরে আসতে হয়। এটাই হল গুণ, এরপর আর কোন কিছু লাগে না।

আমরা এখনও প্রথম শ্লোকের অর্দ্ধাংশের মধ্যেই আছি। *অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি*, কোন কিছুকে ভয় পাবে না। ভগবান বুদ্ধ নির্বাণ লাভের একেবারে শেষ অবস্থায় এসে গেছেন, মাড় এসে তাঁকে ভয় দেখাচ্ছে। ভগবান বুদ্ধ তখন বলছেন, যার ইন্দ্রিয় পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নেই, সে ওই প্রলোভনকে সামলাতে পারবে না। আমাদের মধ্যে ভয় থাকার কারণ, আমাদের শরীর ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করা নেই। *সত্ত্বসংশুদ্ধি* মানে মন একবারে পুরো পরিষ্কার, কারণ ইন্দ্রিয় ও শরীর থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছেন। এতটা আমরা আলোচনা করে নিয়েছি। তার সাথে জ্ঞান আর যোগে প্রতিষ্ঠিত। মূল গুণটা আগেই বলে দিলেন। এরপরে আর যে যে সাত্ত্বিকগুণ হতে পারে এবার সেটার বর্ণনা করছেন। আবারও বলছি, এর মধ্য থেকে একটি গুণ যদি কেউ ধরে নিতে পারেন, বাকি গুণগুলো আপনা থেকেই এসে যাবে। গান্ধীজী যেমন বললেন, আমি মরে যাব কিন্তু অহিংসা আর সত্যকে ছাড়ব না। গান্ধীজী খুবই সাধারণ মানুষ, সাধারণ ঘর থেকে এসেছেন, শুধু এই একটি গুণকে ধরে অসাধারণ হয়ে গেলেন।

পরের লাইনে বলছেন, *দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্*। দানের উপর আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। এর আগের ক্লাশে একজন লিখলেন, ঠাকুর তো বলেছেন, ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন। আমরা যখন কাউকে কিছু দিয়ে থাকি, ওটা দানের ভাবে দান করা হয়। বাড়িতে বাবা-মা জানেন সন্তান দুষ্টুমি করে এসে তাঁদের বোকা বানাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ দুষ্টুমি করে এসে যশোদাকে বোকা বানাচ্ছেন, তখন কি যশোদা বলছেন, ভক্ত হবি বলে বোকা হবি কেন? কিন্তু তা নয়, ওখানে একটা অপত্য ভালবাসা আছে। যেখানে ভালবাসা আছে সেখানে এগুলোকে পার করে যায়। এগুলো বোঝার চেষ্টা করতে হয়। সব কিছুতে আপত্তি করার বদ অভ্যাসটা পাল্টানো দরকার। সবাইকে দান করুন, দান করতে হয়। সব ধর্মেই দান করতে বলে। ট্যাক্সের বাইরে দান করতে হয়। সংসারে যে কাজ একশ টাকায় হয়, সেই কাজ পঁচানব্বই টাকাতেও হয়। সাধু সন্ন্যাসীকে দান করতে হয়, গরীব দুঃখীদের দান করতে হয়। দেশে বা সমাজে যেখানে ভাল কাজ হচ্ছে, যেখানে চ্যারিটি হচ্ছে, সেখানেও কিছু দান করতে হয়। আর ভারতবর্ষে এখনও প্রচুর গরীব দুঃখী আছে।

কিছু দিন আগে হরিদ্বারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যেবেলা গঙ্গার তীর ধরে হাঁটছি, সেখানে দেখছি রীতিমত এজেন্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে। এজেন্ট একজনকে ধরে বলছে, কিছু লোককে খাওয়াবেন? প্রথমে বুঝতে পারিনি, পরে জানলাম; ওখানে যাঁরা পিতৃকর্মাদি করতে যান, তাঁদের কিছু গরীব লোকেদের খাওয়াতে হয়। ওখানে এজেন্ট আছে, যারা গরীব লোকেদের খাওয়াবার জন্য গরীব লোক জোগাড় করে রাখে। এটা ঠিক ওই অর্থে এখানে বলা হচ্ছে না, বলার উদ্দেশ্য হল, এগুলো করতে হয়।

আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, *দানং যথাশক্তি সংবিভাগঃ, সংবিভাগঃ* মানে বিভাগ করা। একজন খ্রীশ্চান ফাদার আমেরিকাতে এক বিরাট বড়লোকের কাছে দান নেওয়ার জন্য গেছেন। গিয়ে বলছেন, 'আমরা কিছু ভাল কাজ করছি, আপনি তো কোটিপতি, কিছু অর্থ যদি আপনি আমাদের দান করেন'। সেই ভদ্রলোক ফাদারকে বলছে, 'আপনি কি জানেন আমার এক বিধবা বোন আছে, যাকে দেখাশোনার কেউ নেই? আপনি কি জানেন আমার এক বেকার ভাইপো আছে, যাকে দেখাশোনার কেউ নেই'? এই করে করে ভদ্রলোক আরও তিন চারজনের নাম বলল, যাদের দেখাশোনার কেউ নেই। খ্রীশ্চান ফাদার খুব ভাল মানুষ, তিনি খুব বিনম্র ভাবে হাতজোড় করে বললেন, 'দেখুন আমি তো জানতাম না যে, আপনার উপর এত দায়ীত্ব'। তখন ভদ্রলোক বলছে, 'দায়ীত্ব-টায়িত্ব ভুলে যান, এদেরকেই যখন আমি একটি পয়সা দিই না, সেখানে আপনি কি করে ভাবলেন আমি আপনাকে পয়সা দেব? বেরিয়ে যান এখান থেকে'। এই হচ্ছে মানুষের স্বভাব।

ঠাকুর দুঃখ করে বলছেন, পাশের বাড়িতে না খেয়ে মরছে, আর নিজের বাড়িতে মেয়ের বিয়েতে হাজার হাজার টাকা খরচা করে। গীতা, কথামৃত শুধু পড়লে হবে না, পড়ে দেখুন সেখানে কিছু অত্যন্ত সাধারণ জিনিসকে নিয়ে বলছেন, কিন্তু আমরা সেগুলো করি কি! কি কৃপণ ভাব নিয়ে আমরা সব সময় চলি, একটু ভেবে দেখুন। ঠাকুর বলছেন, কৃপণ মানুষকে যদি বলা হয় এখানে প্রস্রাব কর, সেটা করবে না, কারণ এতে যদি তার কিছু ভাল হয়ে যায়।

যথাশক্তি সংবিভাগঃ, মহাভারতে ব্যাধগীতায় ধর্মব্যাধের কথা বলছেন, সেখানে বাবা-মার সেবা, অতিথির সেবা, আর তার সাথে কিছু অর্থ বাঁচিয়ে রাখার কথা বলছেন। *যথাশক্তি* মানে, সবটাই যে দান-ধ্যান করে উড়িয়ে দেব, তা নয়। ইদানিং কালে সব কিছুতে খুব সহজেই ব্যাঙ্ক লোন দিচ্ছে। তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকার একটা চাকরি হল, সঙ্গে সঙ্গে ইএমআই কত কাটবে তার হিসাবে করতে নেমে গেল। এখানে বলছেন, তুমি যা আয় করছ তার থেকে কম করে চার ভাগের এক ভাগ বাঁচিয়ে সঞ্চয়ের জন্য রাখ। কিন্তু চাকরি পেয়েই ব্যাঙ্কের লোনে বড় একটা বাড়ি, দামী একটা গাড়ি কিনে মাসে মাসে মোটা টাকার ইএমআই দিয়ে যাচ্ছে। তারপর মাঝখান থেকে চাকরিটাই হয়ত চলে গেল। এখন কি হবে? গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া আর কি করবে! এত করে

শাস্ত্র নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলে যাচ্ছেন, কিন্তু কেউ শুনছে না। এদিকে ঈশ্বরলাভ, জ্ঞান, ধ্যান নিয়ে কত কথা, আবার ইদানিং অদ্বৈতের নীচে কেউ কথাই বলবে না। কিন্তু সাধারণ জিনিসগুলি, বেসিক জিনিসগুলিই জানে না, শেখে না। অতি সাধারণ একটা জিনিস হল *দানম্*।

তারপর বলছেন, *দমঃ*। *দমঃ* হল, বাহ্যেন্দ্রিয়গুলি অর্থাৎ হাত, পা-আদি পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখা। আমি গীতার ক্লাশ নিচ্ছি, আপনারা কম্প্যুটারে বা মোবাইলে শুনছেন। একটু শুনেই খট্ খট্ করে টাইপ করে লিখে পাঠালো, মহারাজ, আমি এক মত হতে পারলাম না। আপনার কি সেই জ্ঞান আছে যে আপনি এক মত হবেন কি হবেন না? আসলে নিজের ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই, বাক্‌সংযম নেই। এখানে মনের কথা বলা হচ্ছে না, এখানে শুধু বাহ্যেন্দ্রিয়ের কথাই বলছেন। নারী পুরুষের যে কামের ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করা, এটাও দমের মধ্যেই পড়ে। ব্রহ্মচর্য বলা হয় ঠিকই, কিন্তু এটা আসে দম থেকে। আচার্যও বলছেন, *দমঃ চ বাহ্যকরণানম্ উপশমঃ অন্তঃকরণস্য উপশমং শান্তি বক্ষ্যতি*, শান্তি শব্দটা যখন আসবে সেই সময় অন্তঃকরণ অর্থাৎ মন আর ইন্দ্রিয়গুলির নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হবে। আচার্য দুটোকে আলাদা করছেন। ধর্মজীবনের প্রথম ধাপ অর্থাৎ, ধর্ম সাধনের শুরু হয় বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলির নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে।

দান আদি এবং আরও কিছু কিছু গুণ অর্জনের কথা বলছেন, এগুলো করার পর আসে ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ। ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের পর মনকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা আসে। মনের নিয়ন্ত্রণ হওয়ার পর শুরু হয় আসন। আগে যম আর নিয়মের অনুশীলন করতে হয়। কিন্তু আমাদের এখানে সবাই প্রথমেই বলবে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। ঠাকুরকে একজন এসে যেমন বলছেন, মশাই আমাকে সমাধিটুকু শিখিয়ে দিন। যাঁরা ধর্মজীবনে আসতে চাইছেন, তাঁদের প্রথমেই ঠিক করে নিতে হবে, আমি দান আর দমে প্রতিষ্ঠিত থাকব, আমার বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখব আর দান করব। দান করার সময় মনে রাখতে হবে, আলতু-ফালতু খরচ করব না, ইএমআইতে যাব না, উচ্চাকাঙ্খী হওয়ার বেশি স্বপ্ন দেখব না। দান হবে যথা শক্তি, সবটাই যে বিলিয়ে দেব, তা না। আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রেও, বিশেষ করে রামায়ণ মহাভারতেও বলা হয়, ধর্ম, অর্থ আর কাম এই তিনটেতেই সমান জোর দিতে হয়। দানের ব্যাপারে বলছেন, এমন যেন না হয় যে, ধর্ম করতে গিয়ে সব টাকা-পয়সা উড়িয়ে দেব। ধর্ম হল, তীর্থাদি করা, দান করা। সেইজন্য বলছেন, ধর্ম করতে গিয়ে তুমি অর্থ আর কামকে উড়িয়ে দিও না, তিনটেকে সমান সমান রাখতে হবে।

যজ্ঞ, স্বাধ্যায় আর *তপঃ*, এই তিনটে পরস্পরের সাথে জড়িয়ে আছে। ধর্ম জীবনের প্রথম হল, দন করা। দান করলে কি হয়, এই যে নিজের প্রতি যে একটা তীব্র আসক্তি, নিজেকে যেভাবে আঁকড়ে রেখেছি; দান করলে, এই আঁকড়ে থাকাটা, আসক্তির ভাবটা একটু আলগা হয়। সেখান থেকে শরীর মন একটু একটু করে বিস্তার পেতে শুরু করে। সেখান থেকে ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ। ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণের সাথে শুরু হয় যজ্ঞ। আচার্য বলছেন, দুই প্রকার যজ্ঞ হয় –শ্রৌত ও স্মার্ত। শ্রৌত যজ্ঞে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম হয়, আর স্মার্ত, যেখানে দেবযজ্ঞাদি সম্পন্ন করা হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান বিস্তারে বর্ণনা করেছেন, কিভাব সমস্ত কর্মকে যজ্ঞে রূপান্তরিত করতে হয়। আমরা এখানে পঞ্চ মহাযজ্ঞ দিয়ে যজ্ঞের আলোচনা করছি।

পঞ্চ মহাযজ্ঞের প্রথমে আসে ব্রহ্মযজ্ঞ। ব্রহ্মযজ্ঞে যিনি সাধক, যিনি ধর্মজীবনে আছেন; তাঁর জন্য ঈশ্বর চিন্তন করা, শাস্ত্র অধ্যয়ন করা, এগুলো সব ব্রহ্মযজ্ঞের মধ্যে পড়ে। দেবতাদের পূজা করা, মন্দিরে যাওয়া, এগুলো হল দেবযজ্ঞ। পিতৃদের নামে যজ্ঞ করা, এটা হল পিতৃযজ্ঞ। তারপর ভূতযজ্ঞ, রোজ খাওয়ার পাতে একটু খাবার আলাদা করে রেখে পরে সেটা পশুপাখীদের খাইয়ে দেওয়া। পঞ্চম হল, নৃযজ্ঞ, অতিথিদের সেবা করা, দান করা। পঞ্চ মহাযজ্ঞের চারটি যজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ এবং ভূতযজ্ঞ, এই কটিকে আমরা সাধারণ যজ্ঞ বলছি, গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের এক নম্বর শ্লোকে ভগবান এই যজ্ঞকে নিয়েই বলছেন।

তারপরেই যে স্বাধ্যায় বলছেন, এই স্বাধ্যায় হল ব্রহ্মযজ্ঞ। ধর্মজীবনকে সক্রিয় রাখার জন্য নিয়মিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হয়। শাস্ত্র পাঠ ও অধ্যয়নের জন্য প্রত্যেককে দিনে অন্ততঃ এক ঘন্টা সময় বার করে নিতে হবে, আর নিয়মিত ভাবে গীতাপাঠ, চণ্ডীপাঠ, কথামৃত পাঠ বা আপনার বংশে যে ধর্মগ্রন্থকে অনুসরণ করা হয় সেটার পাঠ করতে হবে। নমো নমো করেই প্রতিদিন একটু জপধ্যান করুন, শাস্ত্র পাঠ করুন। জপধ্যান করতে পারছেন না, শাস্ত্র পাঠ হচ্ছে না, চেয়ারে বসে বসেই একটু হরিনাম করুন। এতটুকু না করলে কিছুই হবে না।

তপঃ, এরপর তপস্যার কথা বলছেন। পরের অধ্যায়ে ভগবান শরীরের তপস্যা, বাণী আদির তপস্যা বিস্তারে বলবেন। আধ্যাত্মিক জীবনে তপস্যা হল ঠিক ঠিক শক্তির জোগানদার। *আর্জবম্,* ঋজুভাব, ঋজুর বিপরীত কুটিল। এই অধ্যায়েই পরে আসুরী ভাবাপন্ন লোকেরা কি রকম হয় বলবেন, সেখানে দেখাবেন আসুরীক গুণের লোকেরা কি রকম কুটিল ভাবের হয়। মনে মনে যখন ভাবছি, তোমাকে আমি দেখে নেব, তার মানে মনের মধ্যে কুটিল ভাব। মুখে যখন বলছি, তোমাকে দেখে নেব, তখন সেটা হয়ে গেল আসুরী ভাব। *আর্জবম্* মানে মন একেবারে পরিষ্কার থাকবে, মনের মধ্যে যেমন কোন রকম কুটিল ভাব থাকবে না, তেমনি মুখ দিয়েও কোন প্রকার কুবাক্য বেরোবে না। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, বেশির ভাগ মানুষ জীবনে সফল হয় না, তার কারণ হল তাদের বুদ্ধিটা কুটিল। মানুষ বিভিন্ন সময়ে কুটিল ভাবে থাকতে থাকতে মনটা একটা সময়ে এসে এলেমেলো হয়ে যায়।

যদি দেখা যায় কারুর মন খুব চঞ্চল, সব সময় ছটফট করছে, বুঝতে হবে সে তার কুটিল ভাবটা মনের ভিতর অনেক দিন পুষে রেখেছে। ছোটবেলায় ইচ্ছে করত পড়াশোনা না করে কি করে পরীক্ষায় নম্বর বাড়ানো যায়। পরিশ্রম না করে আর-একজনকে কি করে টেক্কা দেওয়া যায়। না খেটে কি করে একটা ভাল চাকরি জোটানো যায়। চাকরি পাওয়ার পর চেষ্টা করছে কি করে বেশি করে ঘুষ পাওয়া যায়। আমরা এখানে দান নিয়ে বলছি, একজন বলল, দান করলে নাকি দম্ভ হয়ে যায়। এখানেই বোঝা যাচ্ছে, বক্তার মনটা কত কুটিল; একজন দান করছেন, তাঁর দানটা দেখছে না, তাঁর দম্ভটা দেখছে। আপনারা যদি ভাল করে লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, জীবনে যাঁরা প্রচুর সাফল্য পেয়েছেন, তাঁরা কখনই কুটিল হন না। বুদ্ধি থাকতে পারে, বুদ্ধিটাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সেই দিকে নজর আছে, তাঁরা আসুরীক হতে পারেন, কিন্তু কুটিল কখনই হবে না।

স্বাধ্যায়, তপস্যা আদি করলে ধর্ম জীবন খুব মসৃন ভাবে এগিয়ে যায় আর তার সাথে *আর্জবম্,* মনটা একেবারে পরিষ্কার, মনের মধ্যে কোথাও কোন প্যাঁচ নেই। কথা বলতে না চাইলে বলবেন না, আমরাও সব কথা সব সময় বলি না। কিন্তু তাই বলে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলা একেবারেই করতে নেই। সাধারণ জীবনের জন্য এটা অত্যন্ত ক্ষতিকর, আর আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য এটা বিষ। কারুর ক্ষতি করতে চাইছেন, কারুর প্রতি দ্বেষ ভাব আসছে, এগুলোকে মনের মধ্যে পুষে রাখছেন আর এই নিয়ে মনে মনে ভেবে যাচ্ছেন আর ফন্দি আটছেন; সবটাই হল কুটিল ভাব। এদের মনটা সাপের তীর্যক গতির মত, মন সব সময় এঁকেবেঁকে চলে। এই ধরণের লোকেদের কথা শুনলে মনে হবে কত সুন্দর কথা বলছেন। *আর্জবম্,* মন পরিষ্কার রাখতে হয়, ঠাকুরও বলছেন সরল না হলে ঈশ্বর লাভ হবে না। একটু ভেবে দেখুন, সরল না হওয়া মানেটা কি। সরল যদি না হয়, মনের ক্ষমতা অসম্ভব ভাবে কমে যাবে। ঈশ্বরদর্শন তো অনেক দূরের ব্যাপার, জীবনেও আপনি কোন কিছুতে সফল হতে পারবেন না। আপনাদের মনে হতে পারে, নেতারা এত কুটিল মনের, কিন্তু তারা তো এমএলএ, এমপি হচ্ছে, মন্ত্রী হচ্ছে। কিন্তু হায়ার লেভেলে দেখুন, যাঁরা খুব উচ্চমানের নেতা, তাঁদের পলিটিসিয়ান বলা হয় না, Statesman বলা হয়। জহরলাল নেহরুকে পলিটিসিয়ান বলা হয় না, তিনি Statesman। যিনি Statesman হয়ে যান, ওনার প্রতিটি কথার তখন অনেক দাম হয়ে যায়। ওনারা কখন মিথ্যা কথা বলেন না, ওনারাই প্রকৃত সরল হন।

প্রথম শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ, *অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ,* আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য এটা শেষ কথা। আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য যে প্রস্তুতি নিতে হয়, যে গুণে মানুষ ঈশ্বরদর্শন লাভ করে, যে গুণে মানুষ মুক্তি পায়, সেই গুণ দিয়ে এই অধ্যায় শুরু করলেন। শ্লোকের পরের অর্দ্ধে ছয়টি দৈবীগুণের কথা বলছেন, *দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্।* যে ছটি গুণ বললেন, ভেবে দেখুন, আপনি ছটি গুণে প্রতিষ্ঠিত আছেন কিনা? তবে যেটা বলা হয়, এর মধ্যে একটা গুণে যদি কেউ ঠিক ঠিক প্রতিষ্ঠিত থাকেন, জানবেন বাকি গুণগুলি কিছু না কিছু মাত্রায় তাঁর মধ্যে এসে গেছে, এক্ষুণি না এলেও এসে যাবে। কেউ যদি বলেন, আমি তো এটা সব সময় করি, কিন্তু অন্যগুলি তো নেই। এরজন্য চিন্তার কিছু নেই, ঠাকুরকে ধরে রাখুন বাকি গুণগুলিও ঠিক সময়ে আপনার মধ্যে এসে যাবে।

দ্বিতীয় শ্লোকে আরও কিছু দৈবীগুণের বর্ণনা করছেন –*অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্। দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্।*।২।।

অহিংসা, কোন প্রাণিকে কষ্ট না দেওয়া। তবে আমাদের জীবন ধারণের জন্য কোন প্রাণী যদি ক্ষতিকারক হয় সেখানে অহিংসা একটু করতে হবে। মশা, আরশোলা কত রকমের রোগ ছড়াচ্ছে, মশা মারার, আরশোলা মারার জন্য সব রকম প্রযুক্তি প্রক্রিয়া নিতে হবে। তবে এমন কিছু ব্যবস্থা যদি করা যায়, এরা কাছে যাতে না আসতে পারে, তাহলে সেটা অনেক ভাল। অহিংসাকে আচার্য বলছেন, *অহিংসনং প্রাণিনাং পীড়াবর্জনম্,* কাউকে পীড়া দিতে নেই। ইদানিং কালে শুরু হয়েছে Prevention of cruality towards animals বা Wild life preservation। কিন্তু আমরা এগুলো অনেক দিন ধরেই জানি, গীতা কত হাজার হাজার বছর আগে বলছেন কোন প্রাণীকেই পীড়া দিতে নেই, কারণ তাদের ভিতরেও আত্মা আছেন। অহিংসাতে কেউ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন কিনা কি করে বুঝব? পতঞ্জলি রাজযোগে বলছেন, *অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ,* অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির সান্নিধ্যে এলে যে কোন প্রাণীর হিংসা ভাব চলে যাবে।

সত্যম্ শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য বলছেন, *অপ্রিয় অনৃত বর্জিতম্।* অপ্রিয় কথা যেন না হয় এবং অনৃত যেন না হয়। মনুস্মৃতির খুব বিখ্যাত শ্লোকে মনু বলছেন, *সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়ান্ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্। প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রুয়াদেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।।* সত্য কথা বলবে, প্রিয় কথা বলবে কিন্তু সত্য কথা অথচ কথাটা অপ্রিয়, সেই কথা কখনই বলবে না। কিন্তু তারপরে আরও মূল্যবান কথা বলছেন *প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রুয়াদেষ ধর্মঃ সনাতনঃ,* প্রিয় কথা কিন্তু সত্য নয় কক্ষণ বলবে না। মিথ্যে কথা যদি মিষ্টিও হয় কখনই বলবে না। *এষ ধর্মঃ সনাতনঃ,* এটাই সনাতন ধর্ম। যারা বলে সত্য বলতে আমি ভয় পাই না, সাধু হোক, অসাধু হোক, বুঝবেন এরা কেউ মানুষ নয়, একটা রাক্ষস। সত্য বলতে আমি ভয় পাই না, এটা দৈবীগুণ নয়। দৈবী গুণ হল, অপ্রিয় অনৃত কথা বলা হবে না। পরে গীতায় বলবেন *অনুদ্বেগকরং বাক্যম্,* যে বাক্য বললে শ্রোতার উদ্বেগ সৃষ্টি হয়, সেই রকম বাক্য কক্ষণ বলবে না।

আমাদের ভেবে দেখতে হবে, আমার বাক্যে বা কথায় কেউ কষ্ট পায় কি? আমার কথায় শ্রোতার মনে উদ্বেগ সৃষ্টি করে কি? যদি তা হয়, তাহলে আমি কিন্তু দৈবীগুণে প্রতিষ্ঠিত নই, আধ্যাত্মিক গুণ অর্জনের জন্য আমি অনুশীলন করছি না। এই একটা সাধারণ জিনিস, আজই ঠিক করে নিতে হবে, আমি সত্য কথা বলব। সত্য কথা বলা মানে, অপ্রিয় সত্য কথা কখন কাউকে বলা যাবে না, অনৃত হলেও বলব না। অপ্রিয় সত্য হলে আমাকে চেপে যেতে হবে, আমি বলব না। এখানে তো পুলিশ কোন নির্যাতন করতে আসবে না যে, আমাকে বলতেই হবে। আর এটা ঠিক যে, মূল্যবোধের অনুশীলন করতে করতে এমন অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবেন যে, কেউ আপনার থেকে কোন কথা বার করতে পারবে না।

আমার সৌভাগ্য যে সন্ন্যাস জীবনে আমি অনেক মহারাজদের সঙ্গ করার সুযোগ পেয়েছি, জীবনে অনেক কিছু দেখে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আসলে শুধু উপদেশ শুনে গেলে কিছু হয় না। আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন, ওনাকে কেউ এই ধরণের কিছু জিজ্ঞেস করলে সঙ্গে সঙ্গে বলতেন, 'ওটা তো হয়ে গেছে, যেটা হয়ে গেছে ওটাকে নিয়ে আলোচনা করে কি হবে, আমি সব জানি কিন্তু এই ব্যাপারে আমি আর কোন কথা বলব না; বলতেও চাইন।'। এসব ব্যাপারে উনি একেবারে পরিষ্কার। এটাই মূল কথা, অপ্রিয় সত্য আর অসত্য কথা জীবনে কখনই বলবেন না। জীবনে সবাইকে এটা পালন করতে হবে। কোন পরিস্থিতিতে অপ্রিয় কথা বলতে নেই। তাই বলে কি প্রিয় মিথ্যা কথা বলব? একেবারেই না। মনুস্মৃতিতে মন খুব সুন্দর বলছেন, *ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্......এষ ধর্ম সনাতনঃ*, এটাই সনাতন ধর্ম –অসত্য প্রিয়, সেটাও বলব না। কোনটা বলব? যদি সত্য হয়, যদি প্রিয় হয়। এটাই সনাতন ধর্ম। যদি আপনি হিন্দু হন, এভাবেই আপনাকে কথা বলতে হবে। যারা জোর গলায় বলে, সত্য বলতে আমি ভয় পাই না, এদের সাবধান করে বলে দেবেন, ভাই তুমি হিন্দু ধর্মের লোক নও।

অক্রোধঃ, আচার্য অক্রোধ শব্দের ব্যাখ্যা করছেন, *পরৈঃ আকৃষ্টস্য অভিহতস্য বা প্রাপ্তস্য ক্রোধস্য উপশনম্*, সামনের লোক যদি আপনাকে কটূ কথা বলে, এমনকি যদি শারীরিক ভাবে আঘাতও করে, সেখান থেকে ভিতরে যে ক্রোধের জন্ম হয়, সেই ক্রোধকে দমন করাকে বলছেন *অক্রোধঃ*। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা ক্রোধ জিনিসটাকে নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমাদের সবারই ভিতরে একটা আমিত্ব বোধ আছে। যখন কেউ আমাদের কোন কটূ কথা বলে, দুর্ব্যবহার করে, এমনকি গায়ে হাত তোলে; তখন এই আমিত্বটা একেবারে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। ওই মুহূর্তের পরিস্থিতিটাই আমাদের আমিত্বকে ঠেলে একেবারে কোণাঠাসার দিকে ঠেলে দেয়, আমাদের স্পেসটা কমে যায়। আমিত্বকে ছোট করে দিলে, সঙ্কুচিত করে দিলে মানুষ রেগে যায়। রাগটা যদি ভিতরে পুষে রাখে, ওই রাগ তাকে এবার পোড়াতে শুরু করে দেবে। এটাকেই বলে দুঃখ। দুঃখ মানে, রাগটাকে আপনি বাইরে বার করে দিয়ে হাল্কা হতে পারছেন না।

আচার্য বলছেন, *আকৃষ্টস্য অভিহতস্য বা*, যাঁরা সাধুপুরুষ হন, তাঁরা কোন কিছুকেই প্রতিহত করার চেষ্টা করেন না। যেমন গান্ধীজী, সত্যগ্রহ করছেন, পুলিশ এসে ডাণ্ডা মেরে তাঁর ওই কেশহীন মাথাটা ফাটিয়ে চৌচির করে দিল, সেই সময় তিনি হাত পর্যন্ত তুললেন না। লড়াই করা দূরের কথা, আমাদের আগে এই ক্ষমতাটা অর্জন করতে হবে, তারপর গান্ধীজীর সমালোচনা করবেন। বড়দের নিন্দা করার আগে দেখে নেবেন ওই জায়গায় আপনি পৌঁছেছেন কিনা। যদি না পৌঁছে থাকেন, তাহলে মুখ বন্ধ করে রাখার অভ্যাস করুন। কথায় কথায় মহাপুরুষদের নিন্দা করাটা আমাদের স্বভাব হয়ে গেছে। যে কোন বড় মহাত্মার নামে, আজকে গান্ধীজীর নামে, কাল নেহরুর নামে, পরশু নেতাজীর নামে, তারপরে স্বামীজীর নামে নিন্দা করেই যাচ্ছে। আগে ওনাদের জায়গায় পৌঁছান, পৌঁছানর আপনি যদি মনে করেন তাঁরা এই এই জায়গায় গোলমাল করেছেন, সব গোলমালগুলো ঠিক করে এসে বলবেন, উনি এই এই গোলমাল করেছিলেন, আমি গিয়ে ঠিক করে দিয়েছি। আসলে এগুলো হল ভিতরের জ্বালা, ভিতরের জ্বালাটা শব্দ রূপে বার করছে। এটাকে উপশম করতে হয়, এই উপশম করাকে বলছেন, *অক্রোধঃ*।

তারপর আসছে *ত্যাগঃ*। ত্যাগকে আচার্য বলছেন *সন্ন্যাসঃ পূর্ব দানস্য উক্তত্বাৎ*, ত্যাগ দুটো অর্থে হয়, দান করার অর্থেও ত্যাগ হয়। যেহেতু দান করার কথা আগে বলে দিয়েছেন, সেইজন্য এখানে বলছেন, ত্যাগ হল সন্ন্যাস। সাংসারিক ভাবকে ত্যাগ করতে হয়। *শান্তিঃ*, আগে বলেছিলেন দম, এবারে বলছেন শান্তি। শান্তিকে আচার্য বলছেন, অন্তঃকরণকে, অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়কে শান্ত করা। মন আর ইন্দ্রিয়কে শম আর দম দিয়ে শান্ত করতে বলা হয়। বিশ্বের সমস্ত ধর্মের শাস্ত্রে নিজের নিজের ভাষায় প্রথমেই কিংবা ওনাদের যে শাস্ত্রীয় পরিভাষা আছে, সেটা দিয়ে অবশ্যই তাঁরা শম

আর দমের কথা বলবেন। মনের উপর নিয়ন্ত্রণ না হলে কিছুই হয় না। শান্তি বলতে, ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ, মনের নিয়ন্ত্রণ। ধাপে ধাপে এগুলো করতে হয়। প্রথমে দান দিয়ে শুরু করতে হয়, সেখান থেকে দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তারপর ধীরে ধীরে এক অপরের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়।

এরপর আসছে *অপৈশুনম্*। আচার্য পিশুনি বৃত্তিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, আচার্যের সংস্কৃত এত সরল আর মিষ্টি, কি সুন্দর বলছেন, *পরস্মৈ পররন্ধ্রপ্রকটীকরণং পৈশুনং*। পাহাড়ে যারা গেছেন তাঁরা জেনে থাকবেন, সেখানে পিশ্রু নামে এক ধরণের পোকা হয়, বিছানায় শুয়ে থাকলে ছারপোকার মত এসে পিছনে কামড়ায়। সকালে উঠে দেখা যাবে পুরো বিছানা রক্তে ভিজে রয়েছে। এই পিশুনি থেকে পিশ্রু শব্দ এসেছে। আমাদের এক মহারাজকে একদিন কথায় কথায় বলছিলাম, ‘প্রবাদ যে, আচার্য নাকি ষোল বছর বয়সে গীতা, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্রের উপর ভাষ্য রচনা সমাপ্ত করে দিয়েছিলেন। আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না। ষোল বছর বয়সে আধ্যাত্মিক, সাংসারিক সব কিছুর জ্ঞান অর্জন করে নেওয়াটা কি কখন সম্ভব’। শব্দের চয়ন কি মারাত্মক, *পররন্ধ্রপ্রকটীকরণং*, অপরের দোষকে সবার সামনে বলে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া। আমাদের এক মহারাজ বলতেন, Never discuss the third person। থার্ড পারসন মানে, আমি আপনি কথা বলছি, এই কথা বলার মধ্যে তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে আনতে নেই। তার সাথে এটাও বলতেন, যদি বলতেই হয়, তাঁর প্রশংসাই করবে –এটাই হল *অপৈশুনম্*। *অপৈশুনম্* মানে কারুর নিন্দা না করা। পররন্ধ্র, অপরের যে ছিদ্রগুলি রয়েছে, সেগুলোর আলোচনা কখনই করা যাবে না।

যাঁরা উচ্চ মনের অধিকারী, তাঁরা সব সময় আইডিয়াস নিয়ে আলোচনা করেন, মাঝারী মনের অধিকারীরা ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেন আর সাধারণ মনের অধিকারীরা মানুষকে বা ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা করেন। মনে রাখবেন, কোন মানুষকে নিয়ে আপনি যদি আলোচনা করছেন, আপনি নিজে হলেন একজন থার্ড গ্রেড মানুষ। আমিও ব্যক্তিগত ভাবে থার্ড পার্সন নিয়ে আলোচনা একেবারেই পছন্দ করি না। আমার এক ব্রহ্মচারী ভাই একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, ‘বই লেখা, ক্লাশ নেওয়া, ওয়ান টু ওয়ান আলোচনা করা, এর মধ্যে কোনটা আপনার পছন্দ’? আমি বললাম, ‘আমার একটাই পছন্দের জায়গা, আইডিয়ার জগতে বিচরণ করা’। যদি দেখি আমার লেখাতে নূতন নূতন আইডিয়াস আসছে না, লেখা বন্ধ করে দেব। যেদিন দেখব আমার ক্লাশে আইডিয়াসের জগতে বিচরণ করতে পারছি না, ক্লাশ নেওয়া বন্ধ করে দেব। যখন দেখি কারুর সঙ্গে আলোচনায় আইডিয়াস আসছে না, তার সাথে কথা বলাই ছেড়ে দিই। মনটাকে সব সময় উচ্চ অবস্থায় রাখতে হয়।

বেশির ভাগ লোকই জীবনের নানান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে, এতে এদের মনটা নীচে নেমে যায়। এই যে ঠাকুর বলছেন, বেশির ভাগ মানুষের মন লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভি এই তিনটের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে, কারণ সবাই মানুষকে নিয়েই আলোচনা করে। সবাই ঠেলে মনটাকে নীচে নামিয়ে রেখেছে, কিন্তু মনকে সব সময় উপরে রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই বলে যারা বলছে, আমি তো ওর সামনেই ওর নিন্দা করব, এরা কি? এটাকে বলে ঔদ্ধত। এখানে নিষেধ করা হচ্ছে। আগে যেটা বলা হল *সত্যম্, সত্যম্* মানে কারুর সামনে অপ্রিয় সত্য বলবেন না। কারুর পিছনে তাকে নিয়ে আলোচনা করবেন না। আধ্যাত্মিক পথে এগুলোই হল কার্যকরী পদক্ষেপ। এই অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোককে যদি আমরা মাথায় অনবরত ঘোরাতে থাকি, দেখা যাবে জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

ঠাকুর বলছেন, জ্ঞানী ভয়তরাসে। জ্ঞানী কে? ঠাকুর একেবারে নাম ধরে বলছেন, বশিষ্ঠ। তার মানে বশিষ্ঠ মুনির মত অত উচ্চমানের ঋষিদেরও ব্রহ্মজ্ঞান হচ্ছে না। ঠাকুরকে কে ভালবাসতে পারেন? বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রের মত মানুষরা। এনাদের অবস্থায় পৌঁছাতে গেলে আগে আমাদের অনেক প্রস্তুতি নিতে হবে। পিশুন বৃত্তি আর পারুষ বৃত্তি, পারুষ বৃত্তি মানে কঠোর ভাবে কথা বলা। জীবনে

আমাদের আগে একটা নিয়ম তৈরী করে নিতে হবে, পিশুন বৃত্তি ও পারুষ বৃত্তি থেকে আমাকে মুক্ত হতে হবে। কারুর সামনে কঠোর কথা বলা আর কারুর পিছনে নিন্দা করা, সবার আগে এটা বন্ধ করতে হবে।

আর তারপর আসছে, *দয়া ভূতেষু*, দয়া মানে কৃপা করা। আচার্য এখানে বলছেন, *দুঃখিতেষু*। যারা দুঃখী মানুষ, তাদের প্রতি দয়ার ভাব রাখতে হয়। কিছু না পারলে দুঃখী মানুষকে দুটো ভাল কথা তো শুনিয়ে দিতে পারি বা তাদের দুঃখের কথা মন দিয়ে ধৈর্য ধরে শুনলেও তাদের অনেক দুঃখের লাঘব হয়ে যায়। ডাক্তারদের এই রকম খুব ধৈর্যের দরকার, অবশ্য বেশির ভাগ ডাক্তারদেরই এই ধৈর্য থাকে। একই রকমের রোগী আসছে, একই রকম কথা রোগীর কাছে শুনতে হচ্ছে। রোগীরা সংক্ষেপে না বলে বিস্তারে রোগের বর্ণনা করতে চায়। ডাক্তাররাও কখনই রোগীদের বলেন না সংক্ষেপে বলতে। ডাক্তাররা ধৈর্য ধরে তার কথা শোনেন, তাতেই রোগীর অনেক কষ্ট লাঘব হয়ে যায়।

অলোলুপ্ত্বং, আচার্য এর ব্যাখ্যাতে বলছেন, *ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়সন্নিধৌ অবিক্রিয়া*, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক হেতু যে বিকার হয়, এই বিকার হতে না দেওয়াটাই *অলোলুপ্ত্বং*। ইন্দ্রিয় আর বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক হল আগুন আর তেলের সম্পর্ক, তেল জ্বলে উঠবে। ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সম্পর্কে ইন্দ্রিয়গুলি জ্বলে ওঠে, এটাই বিকার। মহিলারা অপর মহিলা একটা সুন্দর শাড়ি বা দামী গয়না পড়লে, তাকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে, 'দিদি এই শাড়িটার কত দাম, কোথা থেকে কিনলেন', ইত্যাদি। আপনার জেনে কি হবে, কেন জানতে চাইছেন? কারণ ইন্দ্রিয় আর বিষয়ের যেমনি সম্পর্ক হচ্ছে বুম্ করে ভিতরটা জ্বলে উঠছে। আপনার দরকার নেই, তাতেও আপনি জানতে চাইছেন। যদি দরকার থাকত তাহলে ঠিক আছে। অনেক সময় হয়, এই জিনিসটা আমার দরকার ছিল, কিন্তু কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। একজনের কাছে জিনিসটা দেখতে পাওয়ার পর তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করছি, এটা কোথায় পেলেন, আমারও খুব দরকার। এটা অন্য জিনিস। কিন্তু ইন্দ্রিয় আর বিষয়ের সংযোগ হলেই দুম্ করে বিষয়তৃষ্ণার আগুনটা জ্বলে ওঠে। এগুলোকে যদি আমরা লিখে পয়েন্ট করে করে একটু বিচার করতে যাই, দেখবেন আমরা কি দুরবস্থায় আছি। এই ধরণের লোকেদের ধর্ম জীবন শুরু হতেই এখনও কত কত দেরী, ভাবলেই অবাক লাগে। মোটামুটি ভাবে এই সমস্ত গুণ যদি এসে যায়, তখন বুঝবেন একটু আশা আছে।

তারপর বলছেন, *মার্দবম্*, মৃদু ভাব; স্বভাবে, আচরণে একটা মাধুর্য থাকে, কথাবার্তায় একটা মধুর ভাব, মিষ্ট ভাব থাকে। লোকেরা যাকে দেখলে ভয় পায়, এরিয়ে চলতে চায়; বুঝতে হবে তার মধ্যে মৃদু ভাবের প্রচুর অভাব আছে। *হ্রী* শব্দের উপর আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। *হ্রী* শব্দের অর্থ লজ্জার ভাব। সাধারণ ভাবে আমরা লজ্জা বলতে যেভাবে জানি, এই লজ্জা সেটা নয়, আসলে হ্রী মানে চক্ষুলজ্জা। যেমন, আমি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী হয়ে আমি অনেক কিছু করতে পারি না। মহিলাদের সাথে আমরা কোন গাড়িতে এক সঙ্গে যেতে পারি না। কোন বার কাম রেস্টুরেন্টে আমরা যেতে পারি না, কোন সিনেমা হলে যেতে পারি না। এই ধরণের হাজারটা জিনিস আছে যেগুলো আমরা সন্ন্যাসীরা করতে পারি না, চক্ষুলজ্জাই সন্ন্যাসীদের এ-সব কাজ করতে আটকে দেবে। ধর্ম জীবন যাঁরা যাপন করতে চান, তাঁদের সবার জন্য প্রথম হল হ্রী। হ্রী যখন হয়, তখন সে জানে এই কাজগুলো আমাকে করতে নেই। ঠাকুর বলছেন, মানুষ প্রথম যখন নোংরা কাজ করতে শুরু করে, ভুল কাজ করতে শুরু করে, প্রথমের দিকে তার মনের মধ্যে কিন্তু কিন্তু ভাব, সঙ্কোচের ভাব থাকে। কিন্তু করতে করতে কখন যে তার ঘেন্নাটা চলে যায়, নিজেও বুঝতে পারেনা। ঘেন্না একবার চলে গেলে সে একেবারে শেষ। যে খুনী, প্রথমবার কোন খুন করতে গেলে তার হাত কাঁপে, অনেক কিছু হয়। দুটো তিনটে খুন করার পর তার হাত পা কাঁপা বন্ধ হয়ে গিয়ে পেশাদার হয়ে

যায়। কারণ তার মধ্য থেকে হ্রীটা চলে গেছে। কাউকে খুন করতে নেই, খুন করার প্রতি যে লজ্জা থাকবে, এই জিনিসটা তার ভিতর থেকে মুছে গেছে।

চিকাগো শহরে আল কাপুন নামে একজন খুব নামকরা গ্যাংস্টার ছিল। বিশ্বের নামকরা সব গ্যাংস্টারদের মধ্যে আল কাপুন একজন। একাই সে পুরো চিকাগো শহরকে কন্ট্রোল করত। ইউনিয়ন গর্ভনমেন্টকে নামতে হল ওকে কন্ট্রোল করার জন্য। এত ধুর্ত ছিল যে ধরা পড়ার সময় সব রকম জালের ফাঁদ ছিঁড়ে সে বেরিয়ে আসত। কিন্তু একবার সাধারণ একটা ট্যাক্সি চুরি করার ব্যাপারে তাকে ধরা হয়েছে, সেখান থেকে তাকে জেলে বন্দী করে রেখে দেওয়া হয়েছে। জেলে ভিতর আস্তে আস্তে তার মধ্যে নানা রকমের ব্যাধির প্রকোপ দেখা দিল। শেষে সে হ্যালুসিনেট করতে শুরু করেছে। সম্পত্তির জন্য যাদের যাদের সে খুন করেছিল, তারা সবাই সামনে এসে তাকে ভয় দেখাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত পুরো পাগল হয়ে গেল। জেলেই মারা গেল। ওর আশেপাশে যত বন্দীরা ছিল, ওকে দেখে তাদের মধ্যেও ওর প্রতি করুণা হতে লাগল। জেলের আধিকারিকদেরও করুণা হতে লাগল। জেলের অধিকারিকরা শুধু জেলের দাগী অপরাধীদেরই দেখেছে। কিন্তু সকলের এই পরিণতিই হয়।

আমরা যখন মিথ্যা কথা বলতে শুরু করি, বাঁদরামো করতে শুরু করি, তখন আমরা বুঝতে পারি না, কি ভয়ঙ্কর বিপদের দিকে আমরা এগোচ্ছি। এর ফল হয়ত অনেক দিন পর দেবে, কিন্তু দেবেই। বাচ্চা বয়সে শুনেছিলাম, তালগাছ যে রোপণ করে, তার নাতি সেই গাছের ফল খায়। আজকে যে গোলমালগুলি আমরা করছি, এর ফল পেতে হয়ত আপনার তিন চার জন্ম লেগে যাবে, কিন্তু পাবেন। এই যে ধর্মের নামে জেহাদীরা এত হত্যা, খুন, জখম করে যাচ্ছে, এরা কেউ বাঁচবে না। বাঘ, সিংহ হয়ে, সাপ, বিছে হয়ে কোন যোনিতে জন্ম নেবে ভগবান জানেন।

অচাপলম্, চপল ভাব যেন না থাকে। মনুস্মৃতিতে খুব সুন্দর একটা শ্লোকে বাকচপল, হস্তচপল, পদচপল নিয়ে বলছেন। বসে আছে পা নেড়ে যাচ্ছে, বসে আছে হাত নেড়ে যাচ্ছে। বক্তারা অনেকে যখন ভাষণ দেন, তখন দেখা যায় খুব হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে, মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলতে থাকেন। এগুলো হল very bad form of oratory। শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ একটা সময় মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। উনি খুব ফর্সা ছিলেন, আর শরীরটা খুব ভারী ছিল। ওনার ব্যাপারে আমরা একটা ঘটনা শুনেছিলাম। উনি একবার কানপুর গিয়েছিলেন। দীক্ষা হবে। মহারাজ বসে আছেন, ভক্তরাও বসে আছেন। কেউ কোন কথা বলছেন না। মহারাজ ওনার হাতটাকে তুলে মুখের কাছে নেড়েছেন, কোন মশা বা মাছি কিছু ছিল হয়ত। তিন বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে হঠাৎ চিৎকার উঠল, 'মা, মা, ঠাকুর নড়ছেন'। মেয়েটি বেলুড় মঠে ঠাকুরের বিগ্রহ দেখেছে। মহারাজ এমন স্থির হয়ে বসে ছিলেন যে, মেয়েটি ভেবেছে এটাও কোন ঠাকুরের বিগ্রহ, সাক্ষাৎ ঠাকুর যেন ওখানে বসে আছেন। মহারাজ হাত নেড়েছেন, মেয়েটি বলছে, মা দেখ দেখ ঠাকুর হাত নাড়ছেন।

কথা বলার সময় চোখ নাচানো, ভ্রূ কোঁচকানো, হাত নাড়ানো, পা দোলানো, ঘাড় দোলানো; এগুলো অত্যন্ত অশোভনীয়। আচার্য এখানে বলছেন, *অসতি প্রয়োজনে বাক-পাণিপদাদিনাম্ অব্যাপারিয়তৃত্বম্*, বিনা কারণে বক্ বক্ করা, অকারণে হাত পা নাড়া, এই চপল ভাব যাদের থাকে, এদের দ্বারা ধর্ম তো অনেক দূরে, জাগতিক কোন ভাল কাজও হয় না। এর বিপরীত হল *অচপল*।

ষোড়শ অধ্যায় হল একেবারে প্র্যাক্টিক্যাল আধ্যাত্মিকতা, এখানে বেদান্তের লম্বা লম্বা কথা নেই। এখানে যে কটি গুণের কথা বলছেন, এই গুণগুলো আপনার আমার জীবনে যতক্ষণ না আসছে, ততক্ষণ আমাদের জপধ্যান হবে না। সবাই ইদানিং ধর্ম জীবনের জন্য উদ্‌গ্রীব, সবাই ধর্ম জীবন চাইছেন, জপধ্যান করতে চাই, শাস্ত্র পড়তে চাই, অদ্বৈত জানতে চাই। ঠাকুরকে একজন

বলেছিল, মশাই আমাকে সমাধিটুকু শিখিয়ে দিন। এভাবে কিছু হয় না, ধর্ম জীবনে প্রবেশ করার জন্য, জপধ্যান করার জন্য, শাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য একটা প্রস্তুতি দরকার। মাত্র দুটি শ্লোকে যে গুণগুলির কথা বলা হল, এই গুণগুলি শুধু যে ধর্ম জীবনেই লাগে তা না, সংসারেও দরকার পড়ে। যদি এই গুণগুলি আপনার থাকে তাহলে আপনি একজন সাধুপুরুষ, আপনি একজন ভাল মানুষ। ভাল মানুষ কি কখন ক্যাবলা হয়? না, যারা ভাল মানুষ তাঁরা কখনই ক্যাবলা হবেন না।

তিন নম্বর শ্লোকে শেষ কয়েকটি দৈবীগুণের বর্ণনা করে বলছেন – *তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহ নাতিমানিতা। ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত।।৩।।*

এখান শব্দটা হল *আভিজাত্য*। পরের দিকে কম্যুনিস্টরা আভিজত্যকে বুর্জোয়া বলতে শুরু করল। কারণ, আমাদের মাথার উপরে যারা আছে, তাদের টেনে নিজেদের স্তরে নামিয়ে আনাটা মানুষের স্বভাব। একজন চাইনিজ্ লেখকের একটা বই আছে, 'Worshiping Necked God' সেখানে লেখক চীনে মাও সে তুঙএর বিপ্লবের সেই সময়কার বর্ণনা দিয়েছেন। লেখক সেই সময় চীনের বিপ্লবকে কাছ থেকে সেখানে দেখেছিলেন। কমরেডরা লেখককে একটা গ্রামে নিয়ে গেছে। লেখক দেখছেন, একজন বয়স্ক ভদ্রলোককে, আশির উপর বয়স, কম্যুনিস্টদের একটা সভায় তাঁর বিচার করা হচ্ছে। গ্রামের সব লোক তাকে ঘিরে রেখেছে। বিচার করার সময় লোকটি নিজের পক্ষে কিছু বললেন না। বিচারের পর সবাই উঠে চটি খুলে ভদ্রলোকটির মাথায় মারতে শুরু করল। ভদ্রলোক কোন আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করলেন না, নিজের হাত পর্যন্ত নাড়লেন না, চুপচাপ মার খেয়ে যাচ্ছেন। তারপর দেখা গেল, ওই গ্রামের একজন ওই বৃদ্ধকে প্রচুর গালাগাল দিয়ে জুতো দিয়ে ওর মাথার উপর পেটাইয়ের পর পেটাই করে যাচ্ছে। তখনও ভদ্রলোক কিছু বললেন না। তারপর তাঁকে ওখান থেকে তুলে এনে জেলে পুরে দেওয়া হল। বোঝা গেল, লোকটি একজন সরকার বিরোধী।

লেখক একজন গাইডকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভদ্রলোক জেলে তো যাচ্ছিলই, তা সত্ত্বেও তাকে এত কেন মারা হল'? গাইড বলল, 'আসলে লোকটি খুব ভাল মানুষ। গ্রামের লোকেরা তার কাছ থেকে টাকা-পয়সা ধার নেয়। আর যে লোকটি প্রচুর মারল, সেই লোকটি এর থেকে প্রচুর টাকা ধার নিয়েছে'। ওর দুশ্চিন্তা লোকটি যদি বেঁচে যায়, তাহলে তাকে ধারের টাকাটা শোধ করতে হবে। সেইজন্য সব থেকে জোরে তার নিন্দা করছিল। কনডেম করাটা কম্যুনিস্টদের নিয়ম, আবার self condemn আছে, নিজের নিন্দা নিজেই করতে হবে। এটা মানুষের স্বভাব, যে উপরে আছে তাকে টেনে নামানো। যার জন্য যার কাছে টাকা বেশি আছে, তাকে অন্য চোখে দেখা হয়। সেইজন্য কম্যুনিস্টরা বলে সব সমান করে দিতে হয়। বর্তমান কালে মনুস্মৃতি আদির নিন্দা না করলে নাকি এদের স্ট্যাটাস থাকবে না। কারণ যাঁরা সংস্কৃতির দিক দিয়ে একটা উচ্চ পর্যায়ে চলে গেছেন, তাঁকে সেখান থেকে নামাতে হবে। এটাকে বলে শূয়োরের স্বভাব। শূয়োর চায়, পাঁকে আপনি নেমে ওদের সাথে লড়াই করুন। তবেই শূয়োর ঠিক ঠিক আনন্দ পায়। সেইজন্য অনেক সময় আমরা শিং ভেঙে বাছুরের দলে মিশে যাবার চেষ্টা করি। বড় একটা বলদ বাছুরদের সঙ্গে ঘাস খায়, তারও খুব ইচ্ছে আমি বাছুরের মত হব। সে নিজের শিং ভেঙে নিচ্ছে, শিং ভাঙলে কি আর বাছুরের মত হতে পারবে!

গীতা শাস্ত্র মোক্ষ শাস্ত্র, সমস্ত বন্ধন থেকে আমাদের মুক্তির পথ দেখাচ্ছেন। তিন নম্বর শ্লোকের শুধু প্রথম লাইনটাকে আমাদের মনে রাখতে হবে। আমার আভিজাত্যকে আমি কখনই ছাড়ব না। বিভিন্ন জায়গায় এর নিন্দা করা হয়েছে। ফরাসী বিপ্লবে তাই করা হল, রাজা-রানীর গলা কেটে দিল। এর কিছু দিন পরেই তারা নেপোলিয়নকে সম্রাট বানিয়ে দিল। ছিল কিং, হয়ে গেল এ্যাম্পারার। কিসের বিপ্লব তোমার? বিপ্লব হল, কোন কারণে কিছু লোকের প্রতি তোমার বিক্ষোভ পুঞ্জিভূত হয়েছে। ঠিক আছে, হতেই পারে, কি আর করা যাবে। কিন্তু তাই বলে এটা নয় যে, এর

জন্য তুমি কিছু পরিবর্তন আনবে। প্রত্যেক দিনই কিছু না কিছু পরিবর্তন হচ্ছে, মানুষের শরীরের পরিবর্তন হচ্ছে, মনের পরিবর্তন হচ্ছে, সব কিছুরই পরিবর্তন হচ্ছে। সেই থেকে এনারা বুর্জোয়া শব্দ নিয়ে এলেন। আভিজাত্য বুর্জোয়া কেন হতে যাবে, আভিজাত্য হল মানুষের গুণ। এই গুণগুলিকে অর্জন করতে গেলে, নিজের মধ্যে আনতে গেলে প্রচুর খাটতে হয়, অনেক কাঠখড় পোড়ালে গিয়ে তবে এই গুণগুলি অর্জন করা যায়।

তিন নম্বর শ্লোকে প্রথমটা হল তেজ। ভাল তেল মেখে, দামী দামী ক্রীম লাগিয়ে শরীরকে ঝকঝক করলাম, বলছেন, এটা তেজ নয়। তেজ হল এমন এক গুণ, তেজসম্পন্ন ব্যক্তি কোথাও ঢুকলে বাকিদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। যাঁরা আমার ক্লাশগুলো অনেকদিন ধরে শুনে আসছেন, তাঁরা একটা জিনিস লক্ষ্য করে থাকবেন, দুটি ভাব যখনই আমার লেকচারে আসে, আমি নিজেও চার্জড্ আপ হয়ে যাই – একটা হল মুক্তি, যে কোন স্তর থেকে; আরেকটা হল শক্তি। কারণ শক্তি ছাড়া ফ্রিডম্ হয় না, ফ্রিডম্ ছাড়া শক্তি হয় না। স্বামীজী হলেন প্রফেট অফ ফ্রীডম্, আমাদের ইতিহাসে প্রফেট অফ ফ্রীডম্ স্বামীজী ছাড়া আর কেউ নেই। শঙ্করাচার্য আছেন, বেদান্ত নিজেই আছে, কিন্তু যেভাবে স্বামীজী মুক্তির উপর জোর দিয়ে গেছেন, সেভাবে কেউ দেননি। আর শক্তি, শক্তির উপর স্বামীজী প্রচুর জোর দিয়েছেন, পৌরুষ জিনিসটা কি জিনিস স্বামীজী নিজে দেখিয়ে গেছেন। পৌরুষের সাথে পুরুষ জাতির কোন সম্পর্ক নেই, একজন নারীরও পৌরুষ থাকতে পারে। সেইজন্য সব কটাকে মিলিয়ে তেজ বলা হয়।

আপনাদের সবারই তেজস্বিতা, তেজ ব্যাপারে নিজস্ব একটা ধারণা থাকতে পারে। আমাদের সবারই ভিতর একটা আমিত্ব ভাব আছে। আপনারা নিজেরাই বিচার করুন, ওই আমিত্ব জিনিসটা কি। আপনাকে নিজেই বিচার করতে হবে, এই 'আমি'টা কি। ওই আমিত্বকে কেউ যদি ছুঁয়ে দেয়, এগারো হাজার ভল্টের কারেন্ট লাগবে তার। সেই আমিত্বটা সমস্ত অবস্থায় যেন স্থির থাকে। সবাই তাকে পিষে দিয়ে চলে যাচ্ছে, কিন্তু সেই আমিত্বটা, সেই সত্তাটা স্থির থাকবে। ক্রতু বইতে হোমা পাখির একটা চরিত্র আছে। তাকে গৃধ্র পক্ষী বলছে, সরষে যখন পিষে দেওয়া হয় তখন সেখান থেকে তেল বেরিয়ে আসে, তার মানে তেলটা হল সরষের আমিত্ব, তার সার, তোমাকেও যখন পিষে দেওয়া হবে তখন তোমারও আমিত্বটা বেরিয়ে আসবে। লবণের সার হল লবণত্ব। ঠিক তেমনি প্রত্যেক মানুষের একটা সার আছে, ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, মানুষ মানে যার মানে আছে হুঁশ। মান মানে আত্মসম্মান, আমিত্ব। এই আমিত্ব প্রত্যেক মানুষের আলাদা আলাদা হয়, আপনাকে নিজে খুঁজে নিতে হবে আপনার আমিত্ব কোথায় লেগে আছে। যখন আপনি সাধারণ অবস্থায় আছেন, তখনও ওটা যেন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যখন আপনাকে দাবিয়ে দিচ্ছে, পিষে দিচ্ছে, ওই আমিত্বটা যেন চলে না যায়। ওই অবস্থায়ও যদি না যায়, তবেই বোঝা যাবে আপনার মধ্যে তেজ আছে। বোঝার জন্য এখানে কয়েকটা উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে।

আমাদের সঙ্ঘে স্বামী সোমেশ্বরানন্দজী ছিলেন, বিভিন্ন কারণে পরে তিনি সঙ্ঘ ছেড়ে বেরিয়ে যান। উনি আমাদের খুব সম্মানীত মহারাজ ছিলেন। সোমেশ্বরানন্দজীর সাথে আমার খুব ভাল সম্পর্ক ছিল, আমাকে খুব স্নেহ করতেন। উনি এক সময় মুম্বাই মঠে ছিলেন। একবার বম্বের খুব বড় একজন বিজনেস ম্যান ওনাকে ডেকে ছিলেন, মঠে কিছু ডোনেশান দেবেন। উনি সময় মত গেছেন। গিয়ে দেখছেন সেই ভদ্রলোক মদ খেয়ে টং হয়ে পড়ে আছেন। মহারাজকে দেখে বলছেন, 'ও স্বামীজী এসেছেন, ব্রীফকেসে টাকাটা রাখা আছে, আপনি নিয়ে নিন'। সোমেশ্বরানন্দজী একটি কথাই ভদ্রলোককে বললেন, 'I am a monk, I am not a beggar।' এই একটি কথা বলে মহারাজ ভদ্রলোকের অফিস ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। এই হল তেজ, সন্ন্যাসের তেজ।

আলেকজাণ্ডার আর পোরাসের ঘটনা ইতিহাস হয়ে আছে। পোরাস যুদ্ধে হেরে গেলেন, আলেকজাণ্ডার তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন, 'তুমি আমার থেকে কি রকম ব্যবহার প্রত্যাশা করছ?'

পোরাস বললেন, ‘যেমন এক রাজা আর-এক রাজার সাথে ব্যবহার করে।’ পোরাসকে পিষে দিয়েছে, কিন্তু তাঁর inviduality, I am a king, এই আমিত্বটা গেল না। এর থেকেও খুব বড় একটা ঘটনা আছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান ভারতের দিকে এগিয়ে আসছে, আসার পথে তারা কোরিয়ায় ঢুকেছে। কোরিয়ার মানুষরা জাপানীদের থেকে একটু বেশি লম্বা। কোরিয়ার একটা অঞ্চল জয় করে জাপানীরা সেই শহরের কোরিয়ার সব পুরুষ আর মহিলাদের দুটো দিকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। সেই সময় জাপানী সৈন্যরা অত্যন্ত নৃশংস ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাহিনী পড়লে বোঝা যায় জাপানীরা কতটা নৃশংস ছিল, আঁতকে উঠতে হয়, জার্মান সৈন্যরাও অত নৃশংস ছিল না। যা হয়, এখানেও জাপানী সৈন্যরা কোরীয়ানদের অত্যাচার, গালাগাল দিতে শুরু করল। সেখানে একজন বয়স্কা মহিলাকে একজন জাপানী সৈন্য এক চড় মেরেছে, তার সাথে গালাগালও দিয়েছে। মহিলাটির তেজ জেগে উঠল, তার আমিত্বটা বেরিয়ে এলো, পুরোদমে মহিলা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। কোরীয়ানরা বেশি লম্বা হয় না, কিন্তু জাপানীদের তুলনায় অনেকটাই লম্বা। পুরো সোজা হয়ে মহিলা দাঁড়িয়ে গেছেন, জাপানী সৈন্য আর চড় মারতেই পারবে না। জাপানী সৈন্যরা ওকে চড় মারার জন্য একটা ছোট্ট টুল নিয়ে এলো, যেটার উপর দাঁড়িয়ে এবার তাকে চড় মারবে। মহিলাটি দাঁড়িয়ে একটার পর একটা চড় খেতে থাকলেন, কিন্তু যেটা উনি বলতে চাইছিলেন, সেটা বলা হয়ে গেল। তুমি আমার থেকে ইনফিরিয়র, আমাকে মারার জন্য তোমাকে টুলে দাঁড়াতে হয়েছে। এই হচ্ছে তেজ। এই ঘটনাটা যখন পড়ে ছিলাম, আমাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, এত তেজ! একজন মহিলা, বয়স হয়ে গেছে, ওই রকম জয়ী সেনার সামনে সোজা দাঁড়িয়ে গেলেন।

আমাদের মত যাঁরা আছেন, আপনি, আমি ধর্ম জীবনে যখন আসছি, তখন দেখতে হবে আমার আমীত্বটা কি। আপনারা শুনে থাকবেন, স্মৃতি শাস্ত্রের একটা কথাকে নিয়ে প্রচুর নিন্দা করা হয়। যদিও এটা মনুর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু এখানে মনুর কোন ভূমিকাই নেই – কথাটা হল, পতি পরমেশ্বর। পতি পরমেশ্বর মনুর ভাব নয়, এটা ভারতীয় ভাব, মনুর আগে থেকেই চলে আসছে। এতে মনুর কোন হাত নেই, কোন ভাবে আমাদের পরম্পরাতে এসে গিয়েছিল। রামায়ণেও আমরা পাই, স্ত্রী স্বামীর সাথে যুদ্ধে যাচ্ছেন। তার মানে, স্ত্রীকে একটা identity দিয়ে দেওয়া হল, স্বামী পুত্র এরা তোমার identity। বর্তমান কালে সমাজ পাল্টে গেছে, তাতে কোন দোষ নেই। একটা identity অন্ততঃ থাকুক, যে identityতে আপনি কখন আপোষ করবেন না। ওই জায়গাতে কেউ যদি ছোঁয়, তখন যেন কারেন্ট লাগে। এই identity যে কোন কিছুতে হতে পারে। যেমন স্বামী সোমেশ্বরানন্দজীর কথা বলা হল, তিনি সন্ন্যাসীর আদর্শের সাথে identity করে নিয়েছেন, I am not a beggar। পোরাস বললেন, আমি রাজা, আমি ভিখারী না। এই জিনিসটাকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে দেখা, কোথায় আমার আমিত্বটা লেগে আছে, ওই জায়গা থেকে আমি সরব না, এটাই হল আপনার তেজ, আপনার শক্তি। এটাই আপনাকে টেনে উপরে নিয়ে চলে যাবে।

কল্পনা করুন, এই মানবজাতি, আমরা সবাই বিরাট এক অন্ধ কূপে পড়ে আছি, এই অন্ধ কূপ থেকে বেরিয়ে আসা, এটাই মুক্তি। আর বেরিয়ে আসার জন্য দরকার শক্তি। এই শক্তিটা হল দড়ি, দড়িটা বাইরে থেকে ঝুলবে। এই দড়িটাকে ধরে আমরা আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠে আসব। এই দড়িটা হল, আপনার আমার আমিত্ব, অহঙ্কার। এটা যত শক্তপোক্ত হবে তত উপরের দিকে উঠতে সুবিধা হবে। ঠাকুর যেমন বলছেন, আমি মায়ের শিশু। এই ভাবকে আধার করে কত সুন্দর সুন্দর গান আছে – আমরা মায়ের ছেলে। ঠাকুর আবার আর-এক জায়গায় বলছেন, সাধুর সব অহঙ্কার চলে যায়, কিন্তু সাধুত্বের অহঙ্কার যায় না। আপনার কিসের ভয়, কি করবে, খুব হলে অপমানিত করবে, করবে তো করবে, লাঞ্ছিত করবে, করুক; ঘর বাড়ি ভেঙে দেবে, ভাঙুক। মেরে ফেলবে, ফেলুক, কি হবে তাতে। আপনি মরে গেলে আপনার বাচ্চা অনাথ হয়ে যাবে ভাবছেন। কত

লোক অনাথ হয়ে থাকছে, তারা কি বড় হয় না। কত অনাথ আছে যারা জীবনে সাফল্য লাভ করেছে। স্টীভ জগস্ এত বড় কোম্পানী দাঁড় করিয়ে দিলেন, তিনি একজন অরফ্যান বয়, বাবা তাঁকে দত্তক নিয়ে ছিলেন। অত ভাবতে নেই, আমিত্বটাকে ধরে রাখতে হবে, যে আমিত্ব আপনাকে উপরে নিয়ে যাবে।

শ্রীরামচন্দ্র, আমি ক্ষত্রিয় বীর, এই ভাবটাকে কখনই ছাড়লেন না। ক্ষত্রিয় বীরের যে ধর্ম, সেই ধর্মে কেউ যদি হাত দেয়, তিনি কাউকে ছাড়বেন না। সীতা উদ্ধারের সময় বলছেন, আমি ক্ষত্রিয়, আমার স্ত্রীকে তুমি অপহরণ করে নিয়ে গেছ, তোমাকে ছাড়া যাবে না। আমি ক্ষত্রিয় বীর, এটাকে নিয়েই তাঁর সব তেজ। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে বলছেন, আত্মজ্ঞানই আমার সম্বল। যার জন্য অর্জুন যুদ্ধের সময় যখন কাপুরুষের মত আচরণ করছেন, তিনি অবাক হয়ে যাচ্ছেন। ঠাকুর এটাকেই খুব সহজ ভাষায় বলছেন, আঁট থাকতে হয়; আঁট মানে একটা জিনিসকে ধরে রাখা। এটা যদি কারুর না থাকে, আপনি জানবেন ধর্ম তার দ্বারা হবে না। হয় আপনার আছে, নয়তো নেই। নেই মানে, ধর্ম জীবন আপনার জন্য নয়। আপনি আর যাই করুন, রাস্থায় নেমে দু হাত তুলে হরে রাম হরে রাম করুন, অপরের মোসায়েবী করুন, অপরের গোলামী করুন, আপনি পার্টিবাজী করুন, ধর্ম জীবন আপনার জন্য নয়।

ধর্ম জীবনের জন্য দরকার তেজ, আচার্য যাকে বলছেন *প্রাগলভ্যং*। আমরা যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, ক্যাবলা, যদি ক্যাবলা হন, ধর্ম আপনার জন্য না। দুর্ভাগ্যের যে, বেশির ভাগ মানুষ ক্যাবলা। কথামৃতে ঠাকুর পরিষ্কার বলছেন, গরুর লেজে হাত দিলে তিড়িং বিড়িং করে গরু যদি লাফাতে শুরু করে, লোকেরা সেই গরু দাম দিয়ে কেনে। তুমি আমার লেজে হাত দিতে পার না, এই তেজ।

এরপর আসছে ক্ষমা; বাচ্চাদের হাতে একটা খেলনা পিস্তল ধরিয়ে দিলে, যাকে তাকে দুম্ দাম্ করে গুলি মারতে শুরু করে দেবে, তাহলে বাচ্চাদের মধ্যে তেজ আছে বলতে হবে? না, তেজ আছে কিন্তু ক্ষমার ভাব নেই, এটাকে সেইজন্য তেজ বলা যাবে না। বাল্মীকি তাঁর রামায়ণ গ্রন্থে শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রে এত সুন্দর ভাবে ফুটিয়েছেন, আমি অন্য কোন চরিত্রের এত সুন্দর বর্ণনা পাইনি। একদিকে তেজ, অন্য দিকে ক্ষমা। তেজের প্রভাবে রাবণকে বধ করে দিলেন। রাবণ মারা যাওয়ার পর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন, শত্রুতা তত দিন যত দিন মানুষ বেঁচে আছে, সম্মানের সাথে রাবণের শেষ কার্য সম্পন্ন করতে হবে। শত্রুতা শেষ, শ্রীরাম ক্ষমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন।

ক্ষমা কাকে বলে? আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *আকৃষ্টস্য তাড়িতস্য বা অন্তর্বিক্রিয়ানুৎপত্তঃ উৎপন্নায়াং বিক্রিয়ায়াং প্রশমনম্*, কেউ গালাগাল দিল, কিংবা গায়ে হাত তোলার পর ভিতরে যে ক্রোধের উৎপত্তি হয়, ক্ষমা হল ওই ক্রোধের জন্ম না হতে দেওয়া, ওখানেই ক্রোধকে ঠাণ্ডা করে দেওয়া। রাজযোগে পতঞ্জলি মনের বিভিন্ন ধরণের নিয়ন্ত্রণের কথা বলছেন, সেখানে বলছেন, *ব্যুত্থান নিরোধসংস্কার*। মনের মধ্যে সব সময় নান রকমের বৃত্তি উঠছে। একটা বৃত্তি উঠল, সেটাকে দাবিয়ে দেওয়া হল। পরের ধাপ হল, বৃত্তি ওঠার আগেই সেটাকে শান্ত করে দেওয়া। একটা বীজ বপন করা হল, বীজ থেকে গাছ হয়ে গেল, পরে সেই গাছটাকে উপড়ে ফেলে দিলাম, এটা একটা দিক। আরেকটা হল, বীজটা মাটিতে পড়েছে, অঙ্কুর বেরোবার আগেই বীজটা মাটি থেকে তুলে ফেলে দিলাম। ক্ষমা হল, রাগ আসছে কিন্তু সেখানেই রাগকে প্রতিহত করে দেওয়া। আমরা স্বামী ভূতেশানন্দজীকে খুব কাছ থেকে দেখেছি, কোন দিন তাঁকে আমরা রাগতে দেখিনি। একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, মহারাজ জীবনে আপনি কখন রাগ করেছেন? উনি মনে করতে পারছিলেন না। মনে করতে করতে একটা ঘটনা বললেন, কিন্তু সেই ঘটনা শুনে আমাদের হাসি পেয়ে গেল। স্বামী সারদানন্দজীর নামে স্বামীজী বলতেন, শরতের শরীরে বেলে মাছের রক্ত, ওর কখন রাগ হয় না।

গীতা এখানে বেলে মাছ বলছেন, অর্থাৎ রক্তটা ঠাণ্ডা বলছেন না। বিকার একটা হবে, কিন্তু বিকারের পর যে তরঙ্গ উঠবে, তার আগেই তরঙ্গটাকে শান্ত করে দেওয়া হচ্ছে। কি রকম? *আকৃষ্টস্য তাড়িতস্য বা অন্তর্বিক্রিয়ানুৎপত্তঃ*, কেউ আপনাকে গালাগাল দিল, এমন কি পিটিয়ে দিল, তাতেও আপনি শান্ত থাকছেন। গান্ধীজী ওই অবস্থায় পৌঁছেছিলেন। পুলিশ লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারছে, গান্ধীজীর মাথা ফেটে দরদর করে রক্ত পড়ল, উনি হাত পর্যন্ত তুললেন না। বলছেন, রাগ হয়ে গেল, তারপর ওটাকে দাবিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা করে দেওয়া হল, এটা হল *অক্রোধ*। দ্বিতীয় শ্লোকে *অক্রোধঃ* যখন আলোচনা হচ্ছিল, সেখানে বিস্তারে বলা হয়েছে। অক্রোধ আর ক্ষমা দুটো আলাদা শব্দ। অক্রোধ হয়, ক্রোধ এসে গেছে কিন্তু দাবিয়ে দেওয়া হল আর ক্ষমা হল, ভিতরে ক্রোধের যে একটা প্রতিক্রিয়া হবে, তার আগেই ক্রোধটাকে দাবিয়ে দেওয়া হল।

মহাভারতে বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ সংবাদ আছে। বিশ্বামিত্র জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে পৌঁছে গেছেন। আশ্রমে কামধেনু গাভী নন্দিনীকে দেখে বিশ্বামিত্র গাভীকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন। নন্দিনী আশ্রম ছেড়ে যেতে চাইছে না, বিশ্বামিত্রের লোকেরা নন্দিনীকে মেরে মেরে নিয়ে যেতে চাইছে। নন্দিনী বশিষ্ঠ মুনিকে বলছে, আপনি আমায় রক্ষা করুন। বশিষ্ঠ মুনি বলছেন, হে নন্দিনী আমি কি করব, আমি ক্ষমাবান ব্রাহ্মণ, আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারব না। তুমি যদি পার, তুমি নিজেই নিজের রক্ষা করে নাও। এরপর নন্দিনী বিশ্বামিত্রকে নিজের শক্তি দেখিয়ে দিল। এই হল, ক্ষমাবান, কিন্তু তেজ পুরোদমে আছে। বিশ্বামিত্রের লোকেরা যখন বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমের উপর অস্ত্র চালাতে শুরু করলেন, তখন বশিষ্ঠ মুনি তাঁর ব্রহ্মদণ্ড তুলে নিয়ে সমস্ত অস্ত্রের শক্তি ওর মধ্যে আহরণ করে নিলেন। এখানে তেজ আর ক্ষমা দুটো একসাথে থাকছে। দেববাণীতে স্বামীজী একটা খুব সুন্দর গল্প বলছেন, একটি ষাঁড়ের শিঙে একটি মশা বসেছে। অনেকক্ষণ বসার পর মশা এসে ষাঁড়কে বলছে, 'ভাই তোমাকে অনেক কষ্ট দিলাম'। ষাঁড় বলছে, 'তোমার পরিবারের সবাই মিলে আমার শিঙে এসে এক মাস বাস করে যাও, আমার তাতে কিছু আসে যায় না।' এমন শক্তি আর তেজ, কোথায় ষাঁড় আর কোথায় মশা। তার সাথে ক্ষমা – আমার তাতে কিছু আসে যায় না।

তেজ আর ক্ষমার পর আসছে *ধৃতিঃ*। ধৃতির উপর আমরা অনেক জায়গায় আলোচনা করেছি। ধৃতি ছাড়া জীবনে কোন কিছুতে এগোন যায় না। ধৃতি ছাড়া আধ্যাত্মিক জীবন একেবারেই চলতে পারবে না। আচার্য খুব সহজ সরল সংস্কৃতে ধৃতিকে ব্যাখ্যা করছেন, *দেহেন্দ্রিয়েষু অবসাদং প্রাপ্তেষু তস্য প্রতিষেধকঃ*, আমাদের দেহ আর ইন্দ্রিয় ক্লান্ত হয়ে অবসাদ প্রাপ্ত হয়ে গেছে, ধৃতি হল এর প্রতিষেধক, অবসাদকে আটকে দিচ্ছে। আর বলছেন, *অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষো যেন উত্তম্ভিতানি করণানি দেহঃ চ ন অবসীদন্তি*, অন্তঃকরণের, অর্থাৎ মনের বৃত্তি তাকে তুলে ধরে, তাকে ক্লান্ত হতে দেয় না, অবসাদ আসতে দেয় না। ধর্ম জীবন ছেড়ে দিন, ধৃতি ছাড়া কোন জীবনই চলে না।

একবার দেরাদুনের মিলিটারি এ্যাকাডেমিতে আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। ওখানে আমার পরিচিত একজন ক্যাডেট ছিল। আমাকে দেখে সে আনন্দে ভরে গেছে। একদিন সে আমাকে মিলিটারিদের ট্রেনিং দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল/ ট্রেনিং দেখতে দেখতে আমার সারা শরীরের রোমকূপ কাঁটার মত দাঁড়িয়ে গেছে। ট্রেনিংএ ওদের শুধু শাস্তি আর শাস্তি। একটু ডান দিক থেকে বাম দিক হয়েছে, শাস্তি। আমাকে একটা ঢালু জায়গা দেখালো, জায়গাটা ছোট ছোট পাথরে ভর্তি হয়ে আছে। আমাকে বলল, ওদের রেগুলার একটা শাস্তি হল, মাঝ রাত্রে যখন ঘুমোনর কথা, ওই সময় ওকে ডেকে এনে বলা হল, কুড়ি বার রোল করতে করতে উপরে যাও আর নীচে নেমে এসো। এটাই শাস্তি, এবং এটাই করতে হয় তাদের, কোন ছাড় নেই। রাইফেল, গোলা, বারুদ সব শুদ্ধু কুড়ি কিলো ওজন নিয়ে পাঁচ কিলোমিটার দৌড় করাবে। যাঁরা ট্রেনিং নিচ্ছেন তাঁরা সবাই অফিসার, আর সার্জেন্টরা এসে বলবে, সাহেবজী পাঁচ কিলোমিটার দৌড় শুরু করুন। অফিসাররা ওই কুড়ি কিলো ওজন নিয়ে দৌড়াচ্ছে।

আমি এক ক্যাডেটকে, যে ক্যাডেটরা কিছু দিন পরে অফিসার হবে, লেফটেনেন্ট হবে, জিজ্ঞেস করলাম, 'কি করে দৌড়াও'? স্বামীজী, আমাদের সার্জেন্ট কথায় কথায় আমাদের বলেন, Everything is in mind। অনেক আগেকার ঘটনা, Everything is in mind আমরা সবাই জানি। রাজযোগ থেকে শুরু করে যত শাস্ত্র আছে সবাই বলে, Everything is in mind। কিন্তু একজন মিলিটারি অফিসারের থেকে শোনা, Everything is in mind, বিস্ময় লাগে। পরে আমি আমেরিকান কমাণ্ডোসদের ট্রেনিং এর উপর কিছু পড়াশোনা করেছিলাম, সেখানেও ওই রকমই সব ট্রেনিং। সাধারণ মানুষ পাগল হওয়া তো পরের কথা, কল্পনাই করতে পারবে না, মিলিটারিতে কি ধরণের ট্রেনিং দেওয়া হয়। কমাণ্ডো যারা হবে, তাদের একটা ট্রেনিং দেওয়া হয় – জল তেষ্টায় পড়ে আছে, কোন জল নেই; একটা জীবন্ত কোবরাকে ধরে ছুড়ি দিয়ে কেটে তার রক্ত পান করে জল তেষ্টা মেটাবে। কারণ জঙ্গলে যখন তাদের যুদ্ধ করতে হয়, তখন এভাবেই তাদের পরিস্থিতিকে সামাল দিতে হয়। Everything is in mind। আমাদের শুনলেই আতঙ্ক লাগবে।

আচার্য শঙ্কর হাজার হাজার বছর আগে বলে গেছেন, দেহ ইন্দ্রিয় যখন অবসাদ প্রাপ্ত হয়, *অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষ*, তখন মনের একটা বিশেষ বৃত্তি হয়। Everything is in mind কোনটা? আমি আর পারছি না, এটা হল মনের বৃত্তি। আর যে বৃত্তি তাকে ঠেলে ওখান থেকে বার করে আনে তা হল – পারছ না মানে, তুমি পারবে, কেন পারবে না ভাবছ। এই বৃত্তিটাই ধৃতি, লেগে থাকা। আমি আর পারছি না, এটাও একটা মনের বৃত্তি। আর মনের যে বৃত্তি এসেছে, সেটাকে এই বৃত্তি কেটে দেয়। *বিতর্ক ভাবনে প্রতিপক্ষ ভাবনা*, মনের মধ্যে অবসাদ এসেছে, এটা একটা মনের ভাব; এই ভাবকে কাটতে হবে ধৃতি দিয়ে। তেজ আর ধৃতির মধ্যে কোথাও একটা সংযোগ রয়েছে, পারবে না মানে, পারতেই হবে। মায়ের কথা একবার ভাবুন, সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে শরীর অবসন্ন হয়ে গেছে, বা অসুস্থ শরীর নিয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন, সন্তান কোথা থেকে ক্ষুধার্ত হয়ে মাকে বলছে, 'মা কিছু খাওয়া পাওয়া যাবে'? সেই মুহুর্তে মা কোথা থেকে একটা শক্তি পেয়ে যান, কোন না কোন ভাবে সন্তানের মুখে খাওয়ার তুলে দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দেন। মায়ের এই শক্তি কোথা থেকে আসে? ধৃতি।

আমরা যে অবসাদের কথা বলে যাচ্ছি, এই মনের অবসাদগ্রস্ত হওয়ার কথা বলা হচ্ছে না, ডিপ্রেশানও না। অবসাদগ্রস্ত মানে মনের শক্তির অভাব, আর এই অবসাদ মানেও শক্তির অভাব, শরীর ও ইন্দ্রিয়ের শক্তির অভাব হয়ে গেছে। আমরা সবচেয়ে বেশি অবসাদের শিকার হই যখন আমরা ধর্ম জীবন যাপন করতে যাই। আজকের দিনটা থাক, দিব্যি খেয়ে বলছি কাল ভোর চারটে থেকে জপ করতে বসব। আর দিনে দু বার জপ করবই করব, একশ আট না, দশ হাজার করে জপ করব। কিন্তু সেই কাল আর কোন দিন আসে না। অনেক আগেকার কথা, তখন আমি ব্রহ্মচারী ছিলাম। একজন ভক্ত এসে আমাকে খুব খুশী হয়ে বলতে লাগলেন, 'মহারাজ আমি আজ ধন্য হয়ে গেছি'। 'কি ভাবে'? 'রাস্থা দিয়ে যাচ্ছিলাম, সেখানে আমার গুরুদেবের দর্শন হয়ে গেল'। 'তাতে কি হল'? 'আরে গুরুদেবের দর্শন হয়ে গেছে, গুরুদেবের দর্শন যদি হয়ে যায়, তাহলে এক লক্ষ জপের ফল পাওয়া যায়'। ভাবছি, এরা কতটা ফাঁকিবাজ ভক্ত! দিনে একশ আট বার যদি জপ করে থাকে, তাহলে হিসাব করে দেখুন গুরুদেবের দর্শনের জন্য তার কত দিনের জন্য জপ করা থেকে ছুটি হয়ে গেল। এদের কথাই এখানে বলছেন, আঁট নেই, তেজ নেই। তেজ হল, আমাদের আমিত্বটা, তেজ হল আমাদের যেটা সার। আধ্যাত্মিক জীবনে যদি আপনার সার হয়, আত্মজ্ঞান লাভ করাটাই যদি একমাত্র ইচ্ছা থাকে, তাহলে অবসাদ প্রাপ্ত হবে কি করে, ওই ইচ্ছাটাই আপনাকে সর্বক্ষণ চাঙ্গা করে রাখবে! সারাদিন কাজকর্ম করে মা যত পরিশ্রান্ত হয়ে থাকুন না কেন, সন্তানকে পেলে নূতন করে শক্তি পেয়ে যান।

উইলিয়ম জেমস্ খুব নামকরা দার্শনিক এবং মনোবিজ্ঞানী ছিলেন। Pragmatism নামে উনি একটা নূতন দর্শনের জন্ম দিয়েছিলেন, স্বামীজীর সাথেও তাঁর দেখা হয়েছিল। উনি একটা নূতন শব্দ এনেছিলেন, Second wind, রিজার্ভ এনার্জি, দ্বিতীয় শক্তি পাওয়া। উনি এগুলোকে নিয়ে অনেক গবেষণা করেছিলেন। ধরুন আপনি গান করেন বা পেইন্টিং করেন। গান করতে করতে আপনি এমন থোকে গেলেন যে, এরপর আর আপনি গান করতে পারবেন না। সেই সময় যদি নিজেকে ধাক্কা দেন, তখন একটা শক্তি চলে আসে, এটাকে বলছেন, Second wind। ধরুন কেউ শিল্প কর্মে আছে, ভাল ডিজাইন করেন, ছবি আঁকেন বা গান করেন। করতে করতে তিনি ক্লান্ত হয়ে গেলেন, আর পারছি না। তখন এই ধৃতি, বৃত্তি বিশেষ ধাক্কা মারে, তখন তাঁর থেকে যে সৃষ্টিটা বেরিয়ে আসে, সেটা অমর হয়ে যায়।

পৃথিবীর খুব বিখ্যাত চিত্র শিল্পী ভ্যান গগ্ যত দিন বেঁচে ছিলেন, খুব খারাপ অবস্থার মধ্যেই দিন কাটিয়েছেন, টাকা-কড়ি কিছুই ছিল না। একদিন ওনার এক বন্ধুর কাছে গিয়ে বলছেন, 'আমাকে কটা টাকা দাও, কিছু খাবার নেই'। বন্ধু টাকা দিল না। 'আমি না খেতে পেয়ে মরে যাব'। বন্ধু বলছে, 'তোমার মরে যাওয়াটা অনেক ভাল হবে। তুমি যে থার্ড গ্রেড ছবিগুলো আঁকছ, তার থেকে তোমার মরে যাওয়া ভাল। শুধু যে আমিই তোমাকে টাকা দেব না, তা না; আমি নিশ্চিত যে, যাদের কাছে তুমি টাকা চাইতে যাবে, তারা কেউই তোমাকে টাকা দেবে না'। ভ্যান গগ্ নিজের ঘরে ফিরে এলেন, অভুক্ত, শরীর নড়ছে না। সেই অবস্থায় তিনি ছবি আঁকলেন – The Sunflower, ভ্যান গগের খুব নামকরা ছবি। ধৃতি, উইলিয়ম জেমসের ভাষায় – Second wind। জীবনে উপলব্ধিটা সমান থাকে, বাজনাতে যে উপলব্ধি, গানেও সেই উপলব্ধি, ছবি আঁকাতেও সেই একই উপলব্ধি, আধ্যাত্মিক জীবনেও সেই একই উপলব্ধি। এর উল্টোটা হল, ঠাকুরের ভাষায় চিড়ে ভেজা বুদ্ধি। চিড়ে এমনিতেই নরম প্রকৃতির, তার মধ্যে আবার মিশিয়ে দিলাম জল; এটাই হল চিড়ে ভেজা বুদ্ধি, ভেদভেদে বুদ্ধি।

তেজ, ক্ষমা আর ধৃতির পর আসছে শৌচ। শৌচ জিনিসটা হিন্দুদের বৈশিষ্ট্য। শৌচের অনুশীলন করতে করতে আমাদের জাতিটাই শুচিবাঈগ্রস্ত হয়ে গেছে। শ্রীশ্রীমায়ের ভাইঝি নলিনীদেবীর মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল শৌচ করে করে। মাঝ রাতে তার মাথায় নাকি কাকে প্রস্রাব করে দিয়েছে। কিন্তু ধর্ম জীবনে শৌচ অত্যন্ত জরুরী। আচার্য বলছেন, *দ্বিবিধং মৃজ্জলকৃতং বাহ্যম্ আভ্যন্তরং চ*, মাটি আর জল দিয়ে বাহ্য ও আভ্যন্তর পরিষ্কার করা। আগেকার দিনে সাবান ছিল না, মাটি আর জল দিয়েই সব পরিষ্কার রাখতেন। বলছেন, নিয়মিত ভাবে নিজেকে পরিষ্কার রাখা। নূতন ব্রহ্মচারী ভাইদের আমি বলি, পরিষ্কার থাকা, নিজেকে ফিটফাট রাখা, এটা সাধনার অঙ্গ। জপধ্যান করা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ফিটফাট থাকাটাও ততটা গুরুত্বপূর্ণ। আমার যিনি আচার্য ছিলেন, তিনি আমাকে বলতেন, স্নানের সময় সমস্ত জামা কাপড় ধোবে, রোজ দাড়ি কামাবে। ফিটফাট থাকাটা ফ্যাশান করা, লোক দেখানো না, এটা সাধনার অঙ্গ।

মানুষ যখন শৌচে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, পরিষ্কার থাকাটা যখন স্বভাবে এসে যায়, তখন এই যে দেহ, যেটা মানুষের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু, সেটার প্রতিও তার একটা ঘেন্নার ভাব এসে যায়, আর অপরের দেহের সাথে যে সংসর্গ হবে, লোকেদের সঙ্গে আড্ডা মারা, ঘোরাঘুরি করা, এগুলো আর করতে ইচ্ছে হবে না। কারুর শরীরের সাথে স্পর্শ হয়ে গেলে গা ঘিন ঘিন করে উঠবে। যোগীরা বা যাঁরা ধর্ম জীবনে আছেন, তাঁরা পছন্দ করেন না ওনার শরীরকে কেউ স্পর্শ করুক। এটা গেল বাহ্য।

আর অন্তঃ শৌচে আচার্য বলছেন, *মনোবুদ্ধ্যোঃ নৈর্মল্যং*, মন আর বুদ্ধিকে নির্মল করা। কিভাবে করবে? কপটতা, কামনা-বাসনা, এই জিনিসগুলিকে মন থেকে সরিয়ে দিতে হবে। মনের যত রকম কলুষ ভাব, দুর্বলতা, সংসারের প্রতি আসক্তির ভাব, এগুলোকে পরিষ্কার করা। সন্ন্যাস একটা বিশেষ ধরণের সাধনা। অনেকে মনে করেন, আমি গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করে নিলাম, আমি

সন্ন্যাস নিয়ে নিলাম, তা না, সন্ন্যাস একটা বিশেষ সাধনা। সন্ন্যাস নেওয়ার সময় বিরজা হোম করা হয়, বিরজা হোম ছাড়া, বিরজা মন্ত্র ছাড়া সন্ন্যাস হয় না। বিরজা হোম একটা বিশেষ ধরণের হোম, যেটা একমাত্র সন্ন্যাসীরাই জানেন, সন্ন্যাসী ছাড়া আর কেউ জানে না, কাউকে জানতেও দেওয়া হয় না। বিরজা, রজ মানে ধুলো, বিরজা মানে জন্মজন্মান্তরের যত ধুলো জমে ছিল, বিরজা হোমের দ্বারা সব ধুলোকে পরিষ্কার করে দেওয়া হল।

আমাদের একজন সিনিয়র মহারাজ ছিলেন, তিনি ট্রেনিং সেন্টারে আচার্য ছিলেন, অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল, সবাইকে তিনি মহারাজ বলেই ডাকতেন আর ছোট বড় সবাইকে আপনি বলে সম্বোধন করতেন। আমার সন্ন্যাস হয়ে যাওয়ার পর উনি আমাকে বললেন, 'মহারাজ, জন্মজন্মান্তরের ময়লা বিরজা হোমে দিয়ে দিলেন, পরিষ্কার হয়ে গেলেন। কিন্তু এরপর যে নিত্য ময়লা জমবে, পারলে নিত্য, আর না পারলে সপ্তাহে একবার অবশ্যই মনে মনে এই বিরজা হোমটা করবেন'। উদ্দেশ্য নিজেকে পবিত্র শুদ্ধ রাখা। শৌচ মানে, বাহ্য এবং অন্তঃ দুটোই নিয়মিত পরিষ্কার করা। হিন্দুরা যত ঠাণ্ডাই হোক নিত্য স্নান করবেই করবে। আভ্যন্তরের ময়লা, মনের যে ময়লা এটাকেও নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে, বাইরে ভিতরে কোথাও কোন ধরণের নোংরা যেন না থাকে।

অদ্রোহঃ, আচার্য বলছেন, *পরজিঘাংসাভাবঃ অহিংসনম্,* পরের ক্ষতিসাধন করব, ওকে শেষ করে দেব, এটা হল জিঘাংসা, এর অভাবকে বলছেন অদ্রোহ। ইদানিং চারিদিকে হিংসার ভাব কি প্রচণ্ড বেড়ে গেছে কল্পনাই করা যায় না। যাকে আমি পছন্দ করি না, কিভাবে তার ক্ষতি করতে পারি সেই চেষ্টা। এখানে ক্ষতি হওয়াটা না, কারুকে ক্ষতি করার ইচ্ছা। একটা সময় আমি স্বামীজীর বাড়িতে ছিলাম। সেখানে আমি একজন দাড়োয়ানকে দেখে ছিলাম। ওখানে একটা সহজ সরল বাচ্চা ছেলের একটা সাইকেল ছিল। দাড়োয়ান একদিন ওর সাইকেলটা চাইল, কোন কারণে ছেলেটা ওর সাইকেলটা দিল না। ফিরে এসে দেখে সাইকেলের হাওয়া নেই। দোকানে নিয়ে গেছে হাওয়া দিতে। হাওয়া দিতে গিয়ে দেখছে চাকাটা পাঞ্চার হয়ে গেছে। পাঞ্চার ঠিক করতে গিয়ে অবাক হয়ে গুণে গুণে দেখছে প্রায় পচাত্তরটা পেরেক ওর সাইকেলের চাকায় মারা হয়েছে, তার মানে টিউবটার আর কোন কাজেই লাগবে না, টিউবটা গেল। ছেলেটি অতি সাধারণ ঘরের। ওখানে কার্পেন্টারদের কাজ হচ্ছিল, ওখান থেকে পেরেক নিয়ে নিয়ে সাইকেলের চাকায় লাগিয়ে গেছে। দেখে আমার আতঙ্ক লেগে গিয়েছিল, মানুষের মনের মধ্যে কি ভয়ানক হিংস্র ভাব থাকতে পারে! টানা পচাত্তরটা পেড়েক মেরে গেছে সাইকেলে! বাচ্চা ছেলে হাউ হাউ করে কাঁদছে। আমরা রাবণ, হিটলারের কথা বলি, কিন্তু আমাদের স্তরে কেউ ওদের থেকে কম হিংস্র না। চিন্তা করা যায়, গুণে গুণে পচাত্তরটা পেরেক মেরে গেছে! এখনও ওই ঘটনা মনে করলে হাত পা আমার ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কতটা হিংস্র! রাবণ হিটলারের মত লোকেরা আমাদের আশেপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বিহারের এক নামকরা ক্রিমিনালের একটা উক্তি সেই সময় খুব ভাইরাল হয়েছিল – ইতনিহি গোলি মারুঙ্গা পোস্টমর্টেম মে খালি তামাহি তামা মিলেগে। কতটা হিংস্র হলে মানুষ এই ধরণের নৃশংস কর্ম করতে পারে বা করার কথা ভাবতে পারে! এখানে বলছেন, দৈবীগুণ মানে, কোন হিংস্র ভাব যেন ভিতরে না থাকে। বৈষ্ণবরা খুব সুন্দর বলে, বেড়ালকে মেরো না, দরকার হলে বস্তায় বন্দী করে নদীতে ফেলে এসো। মনের মধ্যে এই রকম ভাবও থাকবে না। বেড়ালকে মারবেনও না, আর নদীতে নিয়ে ফেলতেও হবে না। বেড়ালের থেকে যদি আপনার সমস্যা হয়, বেড়াল থেকে আপনি নিজের একটা প্রটেকশান নিয়ে নিন।

নাতিমানিতা, একদিকে তেজ বলছেন, ধৃতি বলছেন, অন্য দিকে বলছেন অতিমানিতা থাকবে না। *নাতিমানিতা,* আমাদের সহজ ভাষায় বিনয়ের ভাব। অতিমানীর আচার্য খুব সুন্দর সংজ্ঞা দিচ্ছেন, *অত্যর্থ মানঃ অতিমানঃ স যস্য বিদ্যতে,* মান অর্থাৎ আমিত্ব ভাব যার অনেক বেশি হয়ে যায়। মান অবশ্যই থাকবে। যাদের মধ্যে মানের ভাব নেই, তাদের জন্য ক্যাবলা শব্দটা উপযুক্ত।

বাচ্চাদের মধ্যে যদি আমিত্বের অভাব দেখা যায়, বুঝে নিতে হবে, ওর দ্বারা বেশি কিছু হবে না। বাচ্চা ছেলে তেজী হবে, বদমাইশি করে সবাইকে উদ্‌ব্যস্ত করে দেবে। তখন আশা করা যায় ছেলেটা বড় হয়ে কিছু হবে। হ্যাঁ, তার জন্য তাকে ভাল, উপযোগী ট্রেনিং দিতে হবে। তাই বলে যেন অতিমান না থাকে, আপনার যে সাফল্য আছে, সেটাকে পুঁজি করে যেন কখন কাউকে বলবেন না যে, তুমি জান আমি কে? এই অতিমান যেন না থাকে, সব সময় আমি, আমি ভাব যেন না থাকে। একটা মজার জোক আছে, বেদান্তে বলে আমি কে, Who am I, এটাকে জানো, আর দিল্লী শহরে সবাই বলে, Do you know who I am।

আচার্য এবার এটাকে বলছেন, *পূজ্যতাতিশয়ভাবনাভব ইত্যর্থঃ,* নিজের মধ্যে নিজের পূজা করার ভাবটা বড্ড বেশি। পূজা করার ভাব থাকে, I am the best, কোন সন্দেহ নেই। এই ভাবটা I am the best, রাখতে হবে, কিন্তু এটা বেশি হয়ে গেলে ঝামেলা হয়ে যাবে। Self respect and respect for others, দুটোকেই সমান ভাবে বজায় রাখতে হবে। কিন্তু একটা খুব বেশি হয়ে গেলে এটাই রোগের আকার নিয়ে নেবে। সকালে মঠে ঠাকুরকে প্রণাম করতে যাই। আজকেও প্রণাম করে ফিরছি, ভক্তদের জন্য ততক্ষণে মন্দির খুলে গেছে। দেখছি কয়েকজন ইয়ং মেয়ে সেলফি তুলছে। একবার এই ভাবে নিচ্ছে, আরেকবার ওই এ্যাঙ্গেল থেকে নিচ্ছে। আমার ইচ্ছে হল, একবার গিয়ে বলি, খুকি এত বেশি করো না, একবার এই এ্যাঙ্গেল, একবার ওই এ্যাঙ্গেল করছ, আমি কেমন দেখাচ্ছি, Am I beautiful, মেন্টাল ডিজিজ হয়ে যাবে, সাইকলজিক্যাল ডিজর্ডার হয়ে যাবে। কম বয়সে সব খেঁদি পেঁচিরা মনে করে আমি নূরজাহান। এগুলো বন্ধ কর, *অতিমানিতা* এনো না। কিন্তু তাই বলে তেজ তোমার চলে যাবে না।

ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত, হে অর্জুন, এতক্ষণ তোমাকে যতগুলো গুণের কথা বলা হল, এই গুণগুলিই হল দৈবী সম্পদ। যাদের মধ্যে ঠিক ঠিক এই দৈবী সম্পদ আছে, এগুলোই হল ঠিক ঠিক আভিজাত্যের লক্ষণ। আভিজাত্য, অভিজাত হল যাদের মধ্যে সংস্কৃতি আছে, যারা ভদ্রলোক, তাদের মধ্যে এই গুণগুলি থাকে। এই গুণগুলিতে আপনি যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবেন, তখনই আপনার ধর্ম জীবন শুরু হবে। এর বিপরীত হল আসুরীক গুণ; আসুরী আর রাক্ষসী দুটো মিলিয়ে আসুরীক বলা হয়েছে। চার নম্বর শ্লোকে একটু বলবেন, তারপর বিস্তারে বলতে থাকবেন। সেখানে আপনি পরিষ্কার বুঝতে পারবেন, আপনার দ্বারা ধর্ম হবে কি হবে না। এতক্ষণ যে গুণগুলির কথা বলা হল, এর মধ্যে একটি গুণ যদি পুরোদমে আপনার মধ্যে থাকে, তাহলে বুঝবেন বাকি গুণগুলি আস্তে আস্তে আপনার মধ্যে এসে যাবে, অবশ্য যদি চেষ্টা চালিয়ে যান। তেমনি একটি দুর্গুণ যদি কারুর মধ্যে থাকে, সব কটা দুর্গুণগুলি আস্তে আস্তে তার মধ্যে এসে যাবে। এটাকে বলে Vicious cycle Virtuous cycle। এই হল ছাব্বিশটা দৈবী গুণের বর্ণনা।

ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোককে আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধি* থেকে শুরু করে নাতিমানিতা পর্যন্ত, যেখানে ছাব্বিশটি গুণের কথা বলা হল, এগুলো হল দৈবী সম্পদ, *কিং বিশিষ্টা সম্পদং? দৈবীম্, দেবানাং সম্পদম্,* এগুলো কাদের সম্পদ? দেবতাদের সম্পদ। দেবতাদের সম্পদ নিয়ে কি হবে? আচার তৈরী করব? *ভাবী কল্যাণস্য,* ভবিষ্যতে যার মঙ্গল হতে যাচ্ছে, এটা তার জন্য। আজকে আমি যা আছি, আপনি যা আছেন, বা আগের আগের কর্মের জন্য ভাল মন্দ যা কিছু হচ্ছে, এর জন্য ঠাকুরের উপর তো দোষ দেওয়া ঠিক না। 'আমি' বুদ্ধি যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ ঠাকুর নেই। কবীর দাস খুব সুন্দর বলছেন, যব ম্যায় থা তব হরি নহি হ্যায়, অব হরি হ্যায় ম্যায় নাহি, প্রেমগলি অতি সঁকরি জাহা মে দো ন সমাহি। প্রেমের গলি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, সেখানে দুই থাকতে পারে না, আমি থাকলে তিনি থাকেন না। যার আমি বোধ আছে, অথচ কথায় কথায় বলে, সব ঠাকুরের ইচ্ছা; এতে আর কিছু না বোঝা যাক, এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে সে একজন ধাপ্পাবাজ। এদের এখানে তো কিছু হবেই না, পরপারে নরকে এদের জায়গা ঠিক করা আছে।

এর আগে আগে আমি যা কিছু করেছি, আজকে আমার যে মূর্তি, আমার অতীতের সব কর্মের দ্বারা আজ এই মূর্তি নির্মিত হয়েছে। আমি তখন সবে ঘরবাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছি। একজন ঘোর সংসারী এসে আমাকে বলছে, 'ভাই তুমি কি পাপ করেছিলে যে তোমাকে সাধু ভিখারী হতে হল। এখন এমন কিছু পূণ্য কর্ম কর যাতে পরের জন্মটা একটু ভাল হয়'। এখনও ওই ভদ্রলোকের কথাটা ভাবলে আমার খুব হাসি পায়। পুনর্জন্মে বিশ্বাস আছে, পূণ্য কর্মেও বিশ্বাস আছে; কিন্তু তার সাথে এটাও আছে যে, এমন কর্ম করেছিলে যে তোমাকে সাধু ভিখারী হতে হল। হিন্দুরা সবাই এটা বিশ্বাস করে যে, আজকে যা কিছু ভাল করছি, ভবিষ্যতে এটা আমাকে শুভ ফল দেবে। ঈশ্বর আছেন এই বিশ্বাস করে বিশেষ ধর্মের লোকেরা সুইসাইড বোম্বার হয়ে যাচ্ছে, নিজেকে মেরে ফেলছে। জগতে যিনি জয়ী হন, তিনি বিশ্বাসের জোরেই জয়ী হন, বিশ্বাস ছাড়া এই জগতে কেউ সফল হয় না। কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে, জীবনে সাফল্যের মুখ কিভাবে দেখতে পারব? উত্তর একটাই, নিজের উপর বিশ্বাসে। আমি যে কাজই করি না কেন, সেখানে পুরো বিশ্বাস থাকা চাই। যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখেন, আসলে তাঁরা নিজের উপরেই বিশ্বাস রাখেন। এই ধরণের মানুষের সব রকম মঙ্গল হয়।

বিশ্বাস হলেই বুদ্ধি কেন্দ্রিত হয়ে যায়। কেন্দ্রিত বুদ্ধি নিয়ে মানুষ যেটাই করবে, সেটাতেই সে সফল হবেই হবে। সেই বুদ্ধিকে যদি টাকা উপার্জনে লাগায়, সেই অবশ্যই টাকা উপার্জন করতে পারবে। যদি যুদ্ধে লাগায়, বিরাট ক্ষত্রিয় হয়ে সে জয়ী হবে, ব্রক্ষবিদ্যাতে যদি লাগায়, ঈশ্বরদর্শন করতে পারবে। দরকার নিজের উপর বিশ্বাস, যেটা করছেন সেটাতে বিশ্বাস। আর ভবিষ্যতকে যদি ভাল করতে হয় তাহলে বর্তমানকে ঠিক করতে হবে। যদি কখন আপনার মনে হয়, আমার ভাগ্য কত খারাপ; যদি কখন মনে হয়, সব খারাপ জিনিসগুলি কি আমার সাথেই হয়, তাহলে বর্তমানকে ঠিক করুন। মৃত্যুর সময়েও যদি ভাল কিছু করেন, সেটাও ভাল ফল দেবে; কিছু করুন। আচার্য বলছেন, যার এই বিশ্বাস হয়েছে যে, আমার ভবিষ্যতকে ভাল করতে চাই, যার এই বিশ্বাস আছে, আমার ভবিষ্যত ভাল হতে পারে, যার এই বিশ্বাস আছে, শুভ কর্ম করলে ভবিষ্যত ভাল হয়, ভবিষ্যত তাদের ভাল হবেই হবে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, চারটেতেই তিনি সফল হবেন। আমার ভবিষ্যতকে আমি ভাল করতে চাই, এই ইচ্ছাটা যদি থাকে আর এভাবে যদি এগোনো যায়, গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে এটাই বলছেন, এই গুণগুলি যদি আপনার থাকে বা এই গুণগুলিকে নিজের ভিতরে আনার চেষ্টা করেন, ভবিষ্যত আপনার ভাল হবেই হবে।

চার নম্বর শ্লোকে যাওয়ার আগে একটা ঘটনা বলছি। ইদানিং কালে আমাদের অন লাইন ক্লাশগুলি শুনে অনেকেই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁদের মধ্যে কম বয়সের লোকেরাও আছেন, বিদেশের লোকেরাও আছেন আর কলকাতার অনেকেই আছেন। সত্তর আশি বছরের বয়স্করাও অনেকে আসছেন। দেখে আমি অবাক হয়ে যাই, এনারা সবাই একই কথা বলেন, গীতার এই ক্লাশগুলি শুনে তাঁদের জীবন পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমার নিজের কি পরিবর্তন হয়েছে আমি জানি না। কদিন আগে যাদবপুর থেকে একজন মহিলা এলেন, বয়স হয়েছে, খুব পুরনো ভক্ত। তিনি বলছেন, 'আপনার কথা শুনে এই বয়সে আমি গীতা মুখস্ত করতে শুরু করেছি'। আর জীবনটাকেও খুব সুন্দর ভাবে তাঁর গোছান হয়ে গেছে। শুনে ভাল লাগল। সঙ্ঘ আমাকে কাজ দিয়েছে, গাধার মত কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু এতে কারুর যদি ভাল হয়, শুনে ভাল লাগারই কথা।

আর-একজন দম্পতি এলেন, বাষট্টি চৌষট্টি বয়স হবে, ওনারাও ঠাকুরের ভক্ত। আমাদের ক্লাশ কিছু কিছু শুনেছেন। কিন্তু ঠাকুরের ভাবে এমন ডুবে আছেন যে, পঁচিশ তিরিশ বছর আমেরিকায় থাকার পর সব কাজকর্ম ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছেন। কোন কারণে দেখা করতে এসেছিলেন। আমি মজা করে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা সময় কি করে কাটান; কারণ ওনাদের সন্তানাদি নেই। মহিলা বললেন, 'মহারাজ আমি এখন একেবারেই সময় পাইনা। ভোর সাড়ে চারটেয়

উঠি। গুরুর আদেশ মত জপধ্যান করি'। তারপর আরও কিছু কথা বললেন। কিন্তু তার মধ্যে খুব সুন্দর একটা কথা বললেন, যেটা বলার জন্য আমি এই প্রসঙ্গটা আনলাম।

উনি বলছেন, আমেরিকায় থাকতে থাকতে আমি বাচ্চাদের একটু একটু করে বেদান্ত শেখানো শুরু করেছিলাম। ওই দেশে আমাদের পরিচিতরা যাঁরা আছেন, তাঁদের বাচ্চারা তো আমাদের শাস্ত্রের কথা জানে না। আমরা দুজনেই নিয়মিত পড়াশোনা করি, আর বাচ্চাদের বেদান্ত শেখাই। উনি হিন্দু ধর্ম বলতে চাইছেন, কিন্তু বেদান্ত শব্দটা ব্যবহার করছিলেন। হিন্দু ধর্ম কি, হিন্দু ধর্মের কাহিনীগুলিকে নিয়ে সপ্তাহে একদিন বা দুদিন বাচ্চাদের ক্লাশ নেন। তার সঙ্গে যেটা বললেন, ওখানে উনি মহিলাদের একটা সংগঠন তৈরী করেছেন, সেখানে ওনারা সপ্তাহে একদিন স্বামীজীর একটা বই থেকে একটি প্যারাগ্রাফ নিয়মিত পাঠ করেন, আর এক-একজন ওটার উপর আলোচনা করেন। সবটাই অনলাইন করেন। উনি বলছেন, সারা দিনে সত্যিই আমার একেবারে সময় নেই। এই হচ্ছে, স্বামীজী যেটা বলছেন, be and make। আপনার মধ্যে এই দৈবী গুণগুলি যদি এসে থাকে ভাল। কিন্তু মনে রাখবেন, প্রদীপ থেকে প্রদীপ জ্বলে, আপনারও যাতে এই রকম কিছু করতে পারেন, সেইজন্যই এই কথাগুলো বলা। এমন দু-চারজন অবশ্যই পেয়ে যাবেন, যাঁদের সাথে নিয়ম করে অনলাইনে কিছু ধর্মীয় কথা আলোচনা করলেন। ঠিক করে নিতে হবে, আমরা কোন বৈষয়িক জিনিস নিয়ে চর্চা করব না। দ্বিতীয় বাচ্চাদের তাদের মত করে ধর্মীয় কিছু কথা বলা। তৃতীয় যাদের বয়স হয়েছে, তাদের সঙ্গ দেওয়ার জন্য কিছু ধর্মীয় কথা বলা।

তিনটে শ্লোকে ভগবান দৈবী গুণের কথা বললেন। চতুর্থ শ্লোক থেকে আসুরী গুণের কথা বলতে শুরু করবেন, যে গুণগুলোর সাথে আমাদের জীবনের অনেক মিল পাওয়া যাবে। আমাদের একজন মহারাজ খুব হিউমারাস ছিলেন, তিনি মজা করে বলতেন, 'জানো ভাই, শাস্ত্রে আমার কথা লেখা আছে'? কিভাবে? 'গীতার ষোল নম্বর অধ্যায় খোল, চার নম্বর শ্লোক থেকে পুরো আমার বর্ণনা পাবে'। দৈবী আর আসুরী গুণের কথা আবার ছয় নম্বর শ্লোকে আসবে, সেখানে আমরা আরও বিস্তারে আলোচনা করব। বাচ্চা বয়সে আমাদের সবারই কাহিনী শুনতে খুব ভাল লাগত, তবে কাহিনীটা সব সময় সুখের কাহিনী হতে হবে। ইংরাজীতে যেমন কাহিনীর শেষে বলা হয়, and they live happily ever after, শুনে আমাদের খুব ভালই লাগত। বড় হওয়ার পর দুঃখের কাহিনীগুলো পড়তে ভাল লাগত।

সাহিত্যে বেশির ভাগ কাহিনীই দুঃখের, আর পুরো বিশ্ব সাহিত্যে একই জিনিসের প্রতিচ্ছবি। দুঃখ কেন? দুঃখের পিছনে অনেকগুলো কারণ আছে। জগতে সবারই দুঃখ, যত মানুষ তত প্রকার জগতের দুঃখ। আমার টাকা-পয়সা আছে, এটা কেউ বলতে চায় না, পাছে লোকে টাকা চাইতে আসে; সুখের কথা মানুষ কাউকে বলতে চায় না, পাছে নজর লেগে যায়। কেউ যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলতে থাকে, জানো জানো আমার কি কি ভাল হয়েছে, অন্যরা তাকে পাগল ভাববে। গরীব, ভিখারী সবাই দুঃখের কথাই বলতে থাকে।

শাস্ত্রে, বিশেষ করে পুরাণাদি গ্রন্থে স্বর্গের বর্ণনা খুব কম আছে, নরকের বিশাল বিশাল বর্ণনা। ঠিক তেমনি গীতাতে ষোড়শ অধ্যায়ে তিনটি শ্লোকে দৈবী গুণের কথা বলে দিলেন, বাকি অধ্যায় জুড়ে শুধু আসুরী গুণের বর্ণনা করে যাবেন। আমাদের বলা হয় দেবতাদের এবং অসুরদের নিজস্ব লোক আছে, হয়ত আছে – যাকে বলা হয় দেবলোক এবং অসুরলোক। তবে আমরা জানি মনুষ্যলোক হল কর্মভূমি। এখানে আমরা যা করব, এই কর্মই আমাকে আপনাকে দেবতা বানাবে, অসুর বানাবে।

দেবতা থেকে সরাসরি কেউ অসুর হতে পারে না, অসুর থেকেও সরাসরি কেউ দেবতা হতে পারে না। দুজনকেই মাঝখানে মনুষ্যলোকে আসতে হয়। হাওড়া থেকে দিল্লীতে আপনি পাটনা হয়েই

যান আর গয়া হয়েই যান, আসানসোল আপনাকে যেতেই হবে, আসানসোল হল জংশন। মনুষ্যলোকটাও হল জংশন। সেইজন্য গীতা আগে থেকেই সব মানুষকে সাবধান করে দিচ্ছেন –দেখ ভাই, তোমার চরিত্রে যদি এই এই গুণগুলি থাকে, বুঝে নাও তুমি অসুরলোকের দিকে এগোচ্ছ। আর তুমি যদি মনে কর তোমার মধ্যে এই এই গুণগুলো প্রকাশ পাচ্ছে, তাহলে বুঝবে তুমি দেবতাদের দিকে অর্থাৎ দেবলোকের দিকে এগোচ্ছ। পছন্দ তোমার, তুমি ঠিক কর তুমি কোন দিকে যাবে। আর একটা জানবে, কোন একটা গুণ যদি তোমার মধ্যে খুব জোর থাকে, তাহলে ওর ভাইয়েরা সবাই এসে জুটে যাবে। একজন এসে গেলে পুরো গুষ্টি এসে যাবে, Vicious cycle Virtuous cycle।

ছোটবেলায় বিক্রমাদিত্যের একটা গল্প পড়েছিলাম, গল্পটা এখন পরিষ্কার মনে নেই। একদিন বিক্রমাদিত্য কোন মহিলার বিরাট কান্না শুনে বেরিয়ে পড়েছেন খোঁজ নিতে। দেখছেন রাজপ্রাসাদের বাইরে এক মহিলা ক্রন্দন রত। মহিলার কিছু একটা হয়েছিল। বিক্রমাদিত্য মহিলাটিকে প্রাসাদে আশ্রয় দিতে চাইলেন। মহিলাটি বলছে, 'আমাকে আশ্রয় দিলে আপনার সর্বনাশ হয়ে যাবে'। বিক্রমাদিত্য বললেন, 'ঠিক আছে, দেখা যাবে'। রাজা রোজ রাত্রিবেলা রাজবাড়িতে ঘুরতে বেরোন। একদিন দেখছেন, একজন মহিলা রাজমহল থেকে বেরিয়ে প্রাসাদের বাইরে চলে যাচ্ছেন। রাজা জানতে পারলেন, ইনি হলেন রাজলক্ষ্মী, রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তারপর আর-এক দিন আর-একজন মহিলা বেরিয়ে যাচ্ছেন, রাজা জানতে পারলেন, ইনি বিদ্যার দেবী সরস্বতী। আর-এক দিন অন্য এক দেবী বেরিয়ে যাচ্ছেন। রাজা খুব দুঃখী হয়ে ভাবতে লাগলেন কি করবেন।

শেষে একদিন দেখেন, একজন দেবী খুব মন খারাপ করে চলে যাচ্ছেন। বিক্রমাদিত্য হাতজোড় করে বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কে, কোন দেবী আপনি?' তিনি বললেন, 'আমি ধর্মের দেবী, তুমি ওই মহিলাকে আশ্রয় দিয়েছ, তাই আমিও চলে যাচ্ছি'। বিক্রমাদিত্য খুব কাতর ভাবে মাথা নত করে বলছেন, 'হে দেবী, সব চলে যাক আমার কোন অসুবিধা নেই, আপনি চলে যাবেন, এটা আমি মেনে নিতে পারছি না। আমি তো অধর্মের কোন কাজ করিনি, শুধু একজনকে আশ্রয় দিয়েছি। আপনাকে আটকাবার আমার কোন ক্ষমতা নেই, তবে এটুকু আমি বলতে পার, আমি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত'। দেবী কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে থাকলেন, তারপর তিনি রাজপ্রাসাদের দিকে ফিরে এলেন।

পরের দিন থেকে রাজা দেখছেন, লক্ষ্মী, সরস্বতী, যশ, কীর্তি, শ্রী সব দেবীরা এক এক করে ফিরে আসছেন। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল আপনার সবাই এক এক করে ফেরত চলে আসছেন?' সবাই একটাই কথা বললেন, 'আমরা তো ধর্মের সাথেই বাস করি, ধর্মের দেবী যেখানে আমরা সেখানেই থাকব'। ছোটবেলায় গল্পটা পড়েছিলাম, খুব ভাল লেগেছিল। কথামৃতেও ঠিক এই ধরণের কথাই বলছেন, ঠাকুর এক এক করে যখন সব ছেড়ে দিচ্ছেন, শেষে সত্যকে ছাড়তে পারলেন না। ঠাকুর বলছেন সত্যকে আমি কি করে ছাড়ব! সত্যকে ছেড়ে দিলে, এই যা কিছু ছাড়লাম, এটাও মিথ্যা হয়ে যাবে। দৈবী বা আসুরী গুণের একটা গুণ যদি খুব জোরালো থাকে, জানবেন, ওর গুষ্টি শুদ্ধু সবাইকে এক এক করে নিয়ে আসবে। আমরা এবার চতুর্থ শ্লোকে যাচ্ছি।

দম্ভো দর্পোভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্।।৪।।

(হে পার্থ, যারা আসুরী অবস্থালাভের যোগ্য হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের মধ্যে ধর্মধ্বজিত্ব, ধন ও স্বজননিমিত্ত দর্প, অহঙ্কার, ক্রোধ, বাক্যে ও ব্যবহারে কর্কশভাব ও কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে অবিবেচক –এই সকল (ভাবী অকল্যাণের কারণ) আসুরী সম্পদ্ আবির্ভূত হয়।)

খুব সংক্ষেপ আসুরী গুণের কথা বলছেন, পরে আরও বিস্তারে বলবেন। দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্যম্ ও অজ্ঞান, যে মানুষের মধ্যে এই গুণগুলি থাকে, এরা সবাই অসুর। এরা সবাই পতনের দিকে যাচ্ছে, যে পতনের কথা একটু পরেই বলবেন। আচার্য খুব সহজ ভাবে প্রত্যেকটি গুণের ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন।

দম্ভকে আচার্য বলছেন, *ধর্মধ্বজিত্বম্* আগেকার দিনে কুম্ভমেলার মত বড় বড় মেলাতে লোকেদের জানান দেবার জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আখড়াগুলোতে তাদের আখড়ার ধ্বজা লাগিয়ে দিতেন। বিভিন্ন মন্দিরের চূড়াতেও পতাকা লাগানো থাকে। সেখান থেকে কি হয়, যার পতাকা যত উঁচুতে থাকবে সে নাকি তত বড় ধর্মের লোক। প্রতিমা নিরঞ্জন হবে, তার জন্য বিরাট লাউড স্পীকারে গান বাজাতে বাজাতে, ঢাক ঢোল পিটিয়ে নাচতে নাচতে যাবে। হয়ত তিন চারজন যাচ্ছে, ভ্যানওয়ালা কটি টাকা পাবে, প্রতিমার নড়াচড়া করার উপায় নেই, বাঁধা আছে। বাকি তিনজন মদ খেয়ে নাচতে নাচতে যাচ্ছে আর তার সাথে একটা বিরাট ডিজে বাজিয়ে বিকট আওয়াজ করতে করতে যাবে, মনে হবে যেন বিরাট কিছু যাচ্ছে। এটাকে বলে ধর্মধ্বজিপনতা।

আমাদের চারিপাশে একটু নজর ফেললেই আমরা এই ধর্মধ্বজিপনতা দেখতে পাব, দেখাচ্ছে আমার মত এর বড় ধর্মের লোক নেই। দূর্গাপূজার সময় বিভিন্ন সংস্থা থেকে বিচার করা হয় কোন প্যাণ্ডেল সব চাইতে ভাল হয়েছে, তার জন্য সেই ক্লাব পুরস্কার স্বরূপ টাকা পাবে, মেডেল পাবে। এরা পূজা করছে, নাকি প্যাণ্ডেল বানানোর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে চাইছে? আবার বিভিন্ন রকমের থিমের পূজা, কোন পূজাতে নেতা-নেত্রীদের মূর্তি বানাচ্ছে, কোনটাতে ট্রেন এ্যকসিডেন্ট, কোনটায় মারামারি দৃশ্য দেখাচ্ছে। এটা কি ধর্ম হচ্ছে? এটাকেই বলে ধর্মধ্বজিপনতা। ধর্মধ্বজিপনতা শুধু ধর্ম নিয়েই হয় না, যে কোন জিনিসকে নিয়ে হয়। এর সবচেয়ে ভাল দৃষ্টান্ত বিল গেটস্, কম্প্যুটার দিয়ে এখনও লোকেদের প্রচুর টাকা মেরেই যাচ্ছে। অন্য দিকে কোথায় কোথায় কি কি দান করছে, সেটাকে ফলাও করে প্রচার করে সাধারণ মানুষকে জানাবেই জানাবে। কোথাও কোথাও কি কি ভাল কাজ করে লোকেদের মঙ্গল করছে, তার একটা তালিকা তাকে দিতেই হবে। এগুলো দিয়ে আরও নাম কামাবে, তাতে আরও টাকা মারতে পারবে। আমি এত টাকা দান করি, আমি এই করি, সেই করি, এগুলোকেও বলে ধর্মধ্বজিপনতা।

কে কত বড় বিনয়ী, সেখানেও ধর্মধ্বজিপনতা। ভোরবেলা একজন বৈষ্ণবের সাথে অন্য এক বৈষ্ণবের দেখা হতেই বলছে, 'অধমের প্রণাম নেবেন'। এই বৈষ্ণব সঙ্গে সঙ্গে বলছে, 'অধমাধমের প্রণাম নেবেন'। অন্য বৈষ্ণব ছাড়বে না, সেও বলল 'অধমাধমাধমের প্রণাম'। অন্য বৈষ্ণবও বলছে 'অধমাধমাধমাধমের প্রণাম নেবেন'। এই করে সকাল থেকে দুপুর হয়ে গেল, অধমাধমাধমা, অধমের অধমের অধমের প্রণাম নেবেন। লোকেরা অবাক হয়ে শুনছে দুজনে শুধু ধমাধমাধমা করেই চলেছে। এটাই ধর্মধ্বজিপনতা। এটাকেই বলে দম্ভ। ভিতরে আমার যে গুণ আছে, যে কোন গুণ, সেটাকে বাইরে যখন জাহির করা হয় তখন সেটাকে বলছেন দম্ভ।

তার সাথে বলছেন দর্প। দম্ভ আর দর্প দুটো জুড়ে আছে। দম্ভকে আচার্য বলছেন, *ধনস্বজনাদিনিমিত্ত্ব উৎসেকঃ*, যেখানে সত্যিকারের আপনার একটা সাফল্য আছে, ঐশ্বর্য আছে, সমাজে আপনার পরিবারের একটা সুনাম আছে; এখান থেকে আপনার মধ্যে একটা দম্ভের ভাব উদয় হয়। মধ্য যুগের ভারতে নীচু জাতির প্রতি উচ্চবর্ণের লোকেদের দ্বারা দুর্ব্যবহার একটা যেন সাধারণ ব্যাপারে পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিল। শঙ্করাচার্যের জীবনের একটা ঘটনাতেও পাই, যেখানে তিনি চণ্ডালকে দূরে সরে যেতে বলছেন। আচার্যের মধ্যে প্রথমের দিকে সত্যিই এই রকম জাত্যাভিমান ছিল কিনা, আর তিনি এই ধরণের আচরণ করেছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। তবে নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের এই ধরণের আচরণ ভারতে চিরদিনই ছিল, আমি ব্রাহ্মণ তুমি চণ্ডাল

আমার কাছ থেকে সরে যাও, এই ভাবটা তখন ছিল। এটা হল দর্প, তুমি জানো আমি কে, এটাই দর্প। এই দম্ভ আর দর্প যদি থাকে, জানবেন, সে পতনের দিকে পা বাড়িয়ে রেখেছে।

ইংরাজীতে খুব সুন্দর একটা expression আছে, running train and run away train। Running train ট্রেন দৌড়াচ্ছে আর Run away train, ট্রেনটা বেলাগাম হয়ে গেছে। দুটো ট্রেনের তফাৎ আছে। যখন দৈবী সম্পদ থাকে, এখন আপনি Running train। কাঠগুদামের থেকে ট্রেন যখন বেরিলির দিকে যায়, তখন ট্রেনটা ধীরে ধীরে ক্রমশ উঁচুর দিকে উঠতে থাকে। বছর কয়েক আগে খবরের কাগজে দেখেছিলাম, কোন কারণে একটা ট্রেনের ড্রাইভার ওই অবস্থায় ট্রেন থেকে নেমে পড়েছিল। আর সেই সময় হঠাৎ অন্য যে ড্রাইভার ছিল, সেও অন্য দিকে নেমে গেছে। দুজনেই নেমে যাওয়াতে ব্রেক আলগা হয়ে গেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন পুরোদমে পিছনে নিচের দিকে দৌড়াতে শুরু করেছে। সেটাকে আবার ভিডিও করে ছাড়া হয়েছিল। ওই স্পীডে ট্রেন প্রায় তিরিশ কিলোমিটার চলে গিয়েছিল। যাই হোক খবর আদান প্রদান করে কিভাবে কিভাবে ট্রেনটাকে দাঁড় করানো হল। একটি ট্রেন ধীরে ধীরে পাহাড়ের দিকে উঠছিল, হঠাৎ ব্রেক ফেল।

ধর্মের পথে ধীরে ধীরে বেশ এগোচ্ছিল, রানিং ট্রেন। হঠাৎ কামিনী-কাঞ্চন, নাম-যশের আকাঙ্খা চাড়া দিল; ব্রেক ফেল, এবার পিছনের দিকে গাড়ি গড়িয়ে চলল, রান এ্যওয়ে ট্রেন। যত নিচের দিকে নামতে থাকবে তত তার গতি বাড়বে। আমাদের বিচার করে দেখতে হবে, আমি রানিং ট্রেন নাকি রান এ্যওয়ে ট্রেন। আপনি হয়ত বলবেন, না, আমার ট্রেন স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। না, তা হতে পারে না, জীবনে কেউ স্ট্যাটিক হয় না। জীবন মানেই চলমান, হয় আপনি উপরে উঠছেন, নয় আপনি নিচে নামছেন, হয় আপনি রানিং ট্রেন, নয় আপনি রান এ্যওয়ে ট্রেন, বিচার করে দেখুন। হয় আপনি ইঞ্চি ইঞ্চি করে উপরের দিকে উঠছেন, নাহলে পুরোদমে নীচের দিকে যাচ্ছেন, কারণ নিচের দিকে যাওয়ার সময় ইঞ্চি ইঞ্চি করে যায় না, ওটা পুরোদমে নামতে থাকে।

অতিমান মানে, আগে যেটা বলা হয়েছিল, নিজেকে বিরাট কিছু মনে করা। এই গুণ আমাদের সবারই আছে। 'আমি' ভাব যার মধ্যে নেই তিনি তো অবতার, অবতার ছাড়া এমন কেউ হতে পারবে না, যার মান হবে না। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, সাধু সব ত্যাগ করে দেয়, কিন্তু তার সাধুত্বের অহঙ্কার ছাড়তে পারে না। আমিত্ব থাকবে, আপনার আমার সবারই আছে। আমি যাকে ভালবাসি তার সামনে মাথা নত করতে পারি, ঠাকুরের কথায়, তার সামনে জুজু হয়ে থাকে। কিন্তু তাই বলে যে তার আমিত্ব নেই, তা না। মান থাকা ভাল। অতিমান, এটাকে আটকে দিচ্ছেন। মান যদি বেশি হয়ে যায়, তখন এটাই হয়ে যায় অতিমান। আমাকে সম্মান দিল না, আমি দেখ নেব। এক গ্রামে দুই মহিলার মধ্যে ঝগড়া ছিল। এদের একজনের সন্তান মারা গেছে। কান্নাকাটি যা হবার হল, তারপর শ্রাদ্ধও হল। শ্রাদ্ধে সেই অপর মহিলাকে নেমন্তন্ন করা হয়নি। সেই মহিলাটা রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে, আর বলছে, 'সে কি মনে করেছে, আমাকে ডাকল না! সে কি জানে না, আমারও ছেলে আছে'। অতিমান এমন হয়ে গেছে যে বলছে, আমারও ছেলে আছে। তার মানে, তার ছেলে যদি মরে, ছেলের শ্রাদ্ধে সেও তাকে ডাকবে না। কোথায় আমাদের পতন হয়ে যায়, আমরা বুঝতেও পারি না।

ক্রোধঃ, ক্রোধকে আমরা আগে ব্যাখ্যা করেছি। যেখানে বলছেন, যখন আমরা আমাদের মনের মত কোন কথা শুনতে না পাই, বা কেউ আমার নিন্দা করছে, গালাগাল দিচ্ছে, তখন মনের মধ্যে একটা ক্ষোভ উৎপন্ন হয়, এই ক্ষোভটাই ক্রোধ। ওই ক্ষোভকে ওখানেই নির্বাপিত করে দেওয়াটাকেই বলছেন অক্রোধ। *পারুষ্য* হল কটূ কথা বলা। আচার্য পারুষ্য শব্দের ব্যাখ্যাতে বলছেন, *পরুষবচনং*, কঠোর বাক্য প্রয়োগ করা; এমন কঠোর বাক্য যে সামনের লোকের হৃদয়কে বিদির্ণ করে চলে যাবে। *পারুষ্য* হল আসুরীক গুণের একটা বড় লক্ষণ, তার মানে, এবার আপনি পুরোদমে নীচের দিকে নামছেন।

আচার্য উদাহরণ দিচ্ছেন, *পরুষবচনং যথা কাণং চক্ষুষ্মান্, বিরূপং রূপবান হীনাভিজনম্ উত্তমাভিজন* ইত্যাদি, আমাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, এত কম বয়সে আচার্য শঙ্কর এই ধরণের কথা কি করে লিখতে পারলেন। বলা হয়, তিনি ষোল বছর বয়সে এই ভাষ্যগুলির রচনা করেছিলেন, কি করে এত অল্প বয়সে এত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব জানি না, অসম্ভব। তবে আমরা স্বামীজীকে যখন দেখছি, তিনিও তিরিশ বছর বয়সে আমেরিকায় গিয়ে যেভাবে লেকচার দিয়ে বেড়ালেন, কি গভীর জ্ঞান, চিন্তাই করা যায় না। যাই হোক, এখানে আচার্য বলছেন, যে কানা তাকে গিয়ে বলা তোমার চোখদুটো তো খুব সুন্দর, যে কুরূপ তাকে রূপবান বলা, হীন জাতির লোককে উত্তম জাতি বলা, এভাবে বলার উদ্দেশ্য তাকে ঠেস দিয়ে কষ্ট দেওয়া। আচার্য এখানে শুধু উদাহরণ দিয়েছেন। আপনারা সমাজে আছেন, এগুলো আপনারা আরও ভাল দেখেছেন, বুঝেছেন। কিন্তু যাঁরা উচ্চবংশের হন, তাঁরা ঠিক উল্টোটা করেন। নিজের বিরাট সাফল্যকে ছোট করে বলেন। লক্ষ্ণৌ শহরের মুসলমানরা অত্যন্ত সুসংস্কৃত, সেখান থেকে হিন্দীতে একটা শব্দ ঢুকে গেছে – গরীবখানা। গরীবখানা মানে গরীবদের ঝুপড়ি। লক্ষ্ণৌয়ের নবাবদের বড় বড় মহল আছে, সেখানে আপনি যদি যান, আপনাকে বলবে, ইয়ে গরীবখানে মে আপকা স্বাগত্ হ্যায়।

এক মিলিটারি অফিসারের কাছে কানপুরের একটা ঘটনা শুনেছিলাম। একবার সেখানে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়ে গিয়েছিল। দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ করতে মিলিটারি নামাতে হয়েছিল। মিলিটারি নামানোর পর সব শান্ত হয়ে গিয়েছিল। ওখানে এক মুসলিম পরিবার ছিল, যাদের চামড়ার ব্যবসা ছিল। সেই মুসলিম ভদ্রলোক খুব বিনয় করে একদিন মিলিটারি অফিসারকে বলছেন, একবার হামারে গরীবখানেমে পাধারিয়েগা? ওনারা সব দিক হিসাব করে দেখে নিয়ে বললেন, আমরা সকাল আটটায় যেতে পারি। মুসলিম ভদ্রলোক খুব খুশী, বহুত মেহেরবানী হোগী। গরীবখানাতে গিয়ে দেখছেন, সে এক বিরাট মহল। স্ত্রীকে ডেকে বলছেন, বেগম সাহেবা, অফিসার লোকরা এসেছেন, এনাদের মুখ একটু এঁটো করিয়ে দিন। দশ বারো মিনিটের মধ্যে খাবারের আয়োজন করে অফিসারদের ডাকা হল। ওনারা ভেবে ছিলেন, সকাল আটটার সময় এক কাপ চা আর কিছু নাস্তা খাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু খাওয়ার জায়গায় ঢুকে তাজ্জব বনে গেছেন, খাওয়ার এলাহি ব্যাপার। যে অফিসার আমাকে বলছিলেন, তিনি বলছেন, স্বামীজী এত রকমের খাবার জীবনে আমি দেখিনি। তারপরেও তাঁরা কি বলছেন? মুহুঝুটা। এই হল আভিজাত্য।

অজ্ঞানং চাভিজাতস্য, অজ্ঞান শব্দটা গীতায় অনেক জায়গায় আসে, বিভিন্ন জায়গায় আচার্য অজ্ঞানকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেন। এখানে অজ্ঞানকে আচার্য বলছেন, *অবিবেকজ্ঞানং মিথ্যাপ্রত্যয়ঃ কর্তব্যাকর্তব্যাদি-বিষয়ম্*, কর্তব্য আর অকর্তব্য এই দুটোর ব্যাপারে ভ্রান্ত জ্ঞান। তার মানে, যেটা করার সেটা করবে না, যেটা না করার সেটা করবে। গুরুজনের সঙ্গ করেনি, গুরুজনদের কথা শোনেনি, শাস্ত্র পড়েনি, ভাল বই পড়েনি; ফলে কোনটা কর্তব্য আর কোনটা অকর্তব্য এই জ্ঞানটা তার হয়নি। সেইজন্য যেটা কর্তব্য সেটা করবে না; যেটা অকর্তব্য, সেটা করবে; এটাই অজ্ঞান। পরে আবার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নিয়ে বলবেন। গীতাতে অজ্ঞান যেমন যেমন যেখানে আসে, সেখানে তেমন তেমন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন কোথাও অজ্ঞানকে বলছেন, ঈশ্বরের মায়াতে যে মিথ্যা জ্ঞান হয়। এখানে সেটা বলছেন না। এখানে বলছেন, কর্তব্য আর অকর্তব্যের ব্যাপারে জ্ঞান না হওয়াটা অজ্ঞান।

পার্থ সম্পদমাসুরীম্, হে পার্থ, এই লক্ষণগুলো হল আসুরীক। আচার্য এখানে বলছেন, *অসুরাণাং সম্পদ্ আসুরী তাম্ অভিজাতস্য*, অসুরের গুণগুলো যেটা মানুষের মধ্যে থাকে। আসুরীক গুণগুলো দেখার জন্য যে আমাকে অসুরলোকে যেতে হবে তা না, এখানে এই পৃথিবীলোকেই আমরা দেখতে পাব। ইদানিং কালে একটা কথা খুব উঠেছে, স্বর্গ নরক সব এখানেই। স্বর্গ নরক এখানেই কিনা আমার জানা নেই, কিন্তু স্বর্গের বাসিন্দাদের যে লক্ষণ আর অসুরলোকবাসীদের যে লক্ষণ সেটা

এখানেই দেখা যায়। এই লক্ষণগুলি আমার মধ্যেও আছে, আপনার মধ্যেও আছে, কারণ আমরা সবাই মানুষ। মানুষ মানেই, তার মধ্যে কিছু আসুরীক গুণ কিছু দৈবী গুণ পাওয়া যাবে। তার মধ্যে দেখতে হবে আমাদের মধ্যে মূলটা কি। অনেক সময় দেখা যায়, কাউকে দেখলে ভাল লাগে। আমাদের একজন মহারাজ বলতেন, সন্ন্যাসী এমন হবে, তাঁকে দেখলেই তাঁর কাছে কিছুক্ষণ বসতে ইচ্ছে করবে। কারণ সন্ন্যাসী অভয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, সন্ন্যাসী থেকে কারুর যেন ভয় না থাকে। তার জন্য কি হয়, সন্ন্যাসীর কাছে কিছু সময় বসলেই প্রাণটা জুড়িয়ে যায়।

প্রাণ শীতল কেন হয়? কারণ যে কোন সন্ন্যাসী, তিনি আপনার স্বরূপ। আপনার আসল স্বরূপ –আপনি আত্মা, আপনার আসল স্বরূপ –আপনি ঈশ্বরের সন্তান। সন্ন্যাসী সেই স্বরূপের দিকে এগিয়ে গেছেন, ফলে তিনি এখন আত্মজ্ঞানের পথিক; আমি ঈশ্বরের সন্তান, এই জ্ঞানের তিনি এখন পথিক। সেইজন্য তিনি এখন আপনার স্বরূপ। আমি একটা খুব মজার ঘটনা শুনেছিলাম। শুনলে মনে হবে এগুলো খুব গেঁয়ো কথা, গেঁয়ো কথা ঠিকই, কিন্তু একটা আইডিয়াকে পরিষ্কার করে দেয়, ভাল লাগে। সত্যিকারের ঘটনা। এক আশ্রমে একটি তিন চার বছরের বাচ্চা খেলা করছিল। খেলতে খেলতে হঠাৎ বলছে, আমি বাড়ি যাব। কোন ভক্ত ওকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বাড়ি কোথায়'? বাচ্চাটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছে, 'তুমি জানো না, বাড়ি কোথায়'? ভক্তটি বলল, 'না, আমি জানি না'। বাচ্চাটি ওর মত করে বোঝাচ্ছে, 'আরে বাড়ি, বাড়ি জান না, যেখানে মা থাকে'। যখন ঘটনাটা শুনেছিলাম, এত ভাল লেগেছিল যে কি বলব। বাড়ি কোথায়? যেখানে মা থাকে। যাই হোক, ভক্তটি কি বুঝলেন জানি না, উনি হেসে ফেললেন। বাচ্চাটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছে, উনি হাসছেন কেন? বাড়ি মানে, যেখানে মা বাস করে। যেখানে আত্মার প্রকাশ সেটাই আপনার স্বরূপ, সেটাই বাড়ি, সেইজন্য সেখানেই শান্তি। সাধু, সন্ন্যাসীর কাছে গেলে কেন শান্তি লাগে? কারণ ওখানে আপনার আসল মা বাস করছেন। মা যেখানে, বাড়িও সেখানে। কিন্তু সেটা তো আপনিও হতে পারেন, আপনাকে হতে কে আটকাচ্ছে। পাঁচ নম্বর শ্লোকে বলছেন –

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডব।।৫।।

(দৈবী সম্পদ্ সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তির হেতু এবং আসুরী সম্পদ্ সংসার-বন্ধনের কারণ। হে পাণ্ডব, শোক করো না। তুমি দৈবী সম্পদের যোগ্য হয়েই জন্মগ্রহণ করেছ।)

ভিতরে দৈবী সম্পদ আসা মানে, এবার এই সম্পদ আপনাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে। এর উল্টোটা; ভিতরে আসুরীক সম্পদ এসে যাওয়া মানে, এই সম্পদই এবার আপনার সংসার বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বেশির ভাগ ভক্তরা এসে বলেন, মহারাজ সংসারে খুব কষ্ট। সংসারে কিসের কষ্ট! ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, এরা সবাই এসে বলে সংসারে বড্ড কষ্ট। তা কেন হবে, আমিও তো সংসারে আছি, আমারও দুটো ঘটি বাটি আছে, আমারও মাগ আছে, আমারও দুটো দেনা আছে। তাহলে সংসার বন্ধন কার জন্য? কার জন্য সংসার কষ্টের? যার মধ্যে আসুরীক বৃত্তি আছে। আপনি একটু নিজেকে বিচার করে দেখুন, আপনার মধ্যে আসুরীক বৃত্তি আছে কিনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতে আমরা একটা কথা বলেছিলাম – সংসারী মানুষ জগৎকে ভালবাসে, মানসিক রোগী মৃত্যুকে ভালবাসে, সন্ন্যাসীর জীবনেও স্পৃহা নেই, মৃত্যুতেও স্পৃহা নেই। মহাপুরুষ মহারাজের খুব নামকরা একটা গল্প আছে। যে কেউ আসুক মহারাজ সবাইকে আশীর্বাদ দিতেন। এক মহিলা এসেছেন মহারাজকে প্রণাম করতে, মহারাজকে প্রণাম করার পর মহারাজ আশীর্বাদ করে মহিলাকে বলছেন, 'সন্তানবতী হও'। পাশ থেকে একজন বলছেন, 'মহারাজ কি বলছেন, উনি বিধবা'। মহারাজ নির্বিকার ভাবে বলছেন, 'বিধবাও ভাল, সধবাও ভাল'। এটা আমাদের ভিতরকার

জোক। আপনার জীবনটাও ভাল, মৃত্যুটাও ভাল, কোনটাতেই আপনার কিছু আসে যায় না। কারণ আপনি দুটোরই পারে – এটাও যেমন বেকার, সেটাও তেমন বেকার।

আমার ছোটবেলার একটা গল্প বলেছিলাম। যশিডি থেকে ট্রেনে করে যেতাম। ঝাঝা আর কিউল স্টেশনে দাঁড়ালে ট্রেন আর ওখান থেকে যেন ছাড়তে চায় না। পরে বড় হয়ে সুপার এ্যক্সপ্রেস ট্রেনে পাটনা থেকে আসছিলাম, পাটনা থেকে ছেড়ে সোজা যশিডি থামত। কি আনন্দ আমার, ঝাঝা কিউল থামছে না। আপনার ট্রেন এমন জায়গায় যাচ্ছে, ঝাঝা কিউল আর থামবে না, জীবনেও থামবে না, মৃত্যুতেও থামবে না। থামবে কোথায়? নিজের স্বরূপে গিয়ে, আত্মজ্ঞানে, যেখানে জীবন নেই মৃত্যু নেই। আমার জন্য জীবনও না, মৃত্যুও না; এই বোধ হয়ে গেলে দুটো থেকেই মুক্তি। মরলে বাঁচি। মরলে বাঁচার কোন চান্স নেই, মরলে তো আবার জন্ম নিতে হবে। জীবন আর মৃত্যুর, এই দুটোর পারে যেতে হবে। এই বোধ সহজে আসে না। মুখে বলা খুব সহজ।

অর্জুনের মনের মধ্যে চিন্তা ঢুকে গেছে। আমি যুদ্ধে করতে এসেছি, আমার মধ্যেও কি এই রকম আসুরীক গুণ আছে কিনা কে জানে। ভগবান হাত তুলে অভয় দিচ্ছেন – *মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব*, অর্জুন তুমি চিন্তা করো না, তোমার মধ্যে দৈবী গুণই আছে। অর্জুন নামই অর্জুন, আর্জবম্। অর্জুনের মধ্যে কোন রকম কুটিল ভাব ছিল না, অর্জুনের মন একেবারে পরিষ্কার মন। স্বর্গে গেছেন, সেখানে স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী এসেছেন অর্জুনকে সেবা করার জন্য। অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে না করে দিয়েছেন। আপনি আমার মা হন, আমাদের বংশের মা। উর্বশী বলছেন, স্বর্গে ওসব মা-ফা কিছু হয় না। অর্জুন বলছেন, সে আপনার জন্য হতে পারে, আমার জন্য আছে। উর্বশী রেগেমেগে অভিশাপ দিলেন অর্জুনকে, তুমি নপুংসক হয়ে থাকবে। অর্জুন মাথা নত করে সেই অভিশাপ মাথায় নিয়ে নিলেন। ভগবানও তাই বলছেন, অর্জুন তুমি চিন্তা করো না, তোমার মধ্যে দৈবী গুণ আছে।

আপনারা যাঁরা এখন গীতার আলোচনা শুনছেন, আপনাদেরও সবার মধ্যে দৈবী গুণ আছে, তা নাহলে এত ধৈর্য ধরে গীতার এই ক্লাশগুলো শুনতেন না। গীতার উপর আমাদের প্রথম ক্লাশের ইউটিউবে সোয়া আট লক্ষ ভিউয়ার্স হয়েছে, কিছু দিনের মধ্যে দশ লক্ষ পেরিয়ে যাবে। তার মানে মানুষের মধ্যে দৈবী গুণ আছে। প্রায়ই আমরা বলি সমাজ গোল্লায় যাচ্ছে, এই হচ্ছে, সেই হচ্ছে। তাতেই বোঝা যায় মানুষের মধ্যে গুণ আছে। আর আমি তো কাউকে ধরে বেঁধে নিয়ে আসছি না, কেউ আমাকে প্রজেক্টও করছে না। তার মানে, মানুষের মধ্যে গুণ আছে। আমি কোন ধর্মগুরু না, কেউ প্রজেক্টও করছে না। তা সত্ত্বেও এত লোকে যখন নিষ্ঠার সঙ্গে শুনছেন, কি গুণে শুনছেন? মানুষের স্বাভাবিক গুণে। ধৈর্য ধরে এভাবে শোনা, সাধারণ মানুষের ক্ষমতা না। তামসিক লোক ফাঁকা সময়ে টিভি সিরিয়াল দেখবে, রাজসিক লোক ফাঁকা সময়ে টী-পার্টি করবে, সাত্ত্বিক লোক ফাঁকা সময়ে নির্জনে ঘরে বসে শাস্ত্র অধ্যয়ন করবে, বা কোন ভাল লেকচার শুনবে। দৈবী গুণের যে গুণগুলির কথা বলা হচ্ছে, এগুলো সবই সাত্ত্বিক গুণ, এছাড়া কিছু না।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু।।৬।।

(হে পার্থ, এই জগতে দেবস্বভাব ও অসুরস্বভাব –এই দুই প্রকার মানুষ সৃষ্ট হয়েছে। দেবভাবাসম্পন্ন মানুষের কথা বিস্তৃতভাবে বলেছি। এখন অসুরস্বভাববিশিষ্ট মানুষের কথা আমার নিকট শ্রবণ কর।)

সৃষ্টি কিভাবে হয়েছিল আমরা জানি না। সৃষ্টি সম্বন্ধে যদি কারুর জানার ইচ্ছে থাকে, তাঁরা সৃষ্টির বর্ণনা আমাদের দুটো জায়গায় পাবেন। বেদের নাসদীয় সূক্তম্ ও পুরুষসূক্তমে সৃষ্টির বর্ণনা করা হয়েছে। আর ভাগবতে কোথাও কোথাও সৃষ্টির প্রকরণ আছে। আমাদের বই Living Hinduism বা The Hindu Way বইতেও সৃষ্টির বর্ণনা আছে। মূল কথা, আমরা জানি না সৃষ্টি

কিভাবে হয়। কারণ সৃষ্টি মানেই মনের সৃষ্টি আর ঈশ্বর মানেই হল, মন সেখানে নেই, সেইজন্য বলা যাবে না কিভাবে সৃষ্টি হল। কিন্তু ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করেন, তখন একজন স্রষ্টার কল্পনা করা হয়, তিনি হলেন ব্রহ্মা। প্রথমের দিকে ব্রহ্মা মন দিয়ে সব কিছু সৃষ্টি করতে শুরু করেন। গীতার শুরুতে আমরা যে আলোচনা করেছিলাম, সেখানেও এর বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রহ্মা মন দিয়ে সৃষ্টির কাজ করতে গিয়ে প্রথমে সৃষ্টি করলেন চারজন ঋষিকে দিয়ে, সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার।

একজন বললেন, মন থেকে সৃষ্টি হচ্ছে, এটা একটা অবৈজ্ঞানিক কথা। আমি তাকে লিখে পাঠালাম, এটা higher science; সবটাই বিজ্ঞান। আরে ভাই, তুমি একাই বিজ্ঞান জান, আমি কি বিজ্ঞান জানি না? বার বার বলা হচ্ছে, এটা একটা সৃষ্টির মডেল, ব্যাখ্যা করার জন্য বলা হচ্ছে। কেউ বলেছে কি, এটাই সত্য? এটা একটা পৌরাণিক ব্যাখ্যা, এটা একবার শুনে নিলাম, মনটা শান্ত হয়ে গেল। আমাদের শাস্ত্র বারবার বলছেন, তুমি তোমার মুক্তির কথা ভাব। মনে তোমার অনেক প্রশ্ন আসে, এই নাও একটা উত্তর দিয়ে দিলাম। যখন এর থেকে ভাল কোন উত্তর পেয়ে যাবে, তখন এটাকে ফেলে দিও; ল্যাটা চুকে গেল। যতক্ষণ ভাল উত্তর না পাচ্ছ, ততক্ষণ এটাকে নিয়েই থাক। ভাল উত্তর পেলে ওটাকে ধরে এগিয়ে যেও।

যাই হোক, যখন সৃষ্টি হল, কোথাও আছেন প্রজাপতি, কোথাও আছেন কশ্যপ। প্রজাপতির দুই সন্তান হলেন দেবতারা আর অসুররা। দেবতাদের নেতা হলেন ইন্দ্র আর অসুরদের নেতা হলেন বিরোচন, যেটা আমরা উপনিষদেও পাই। প্রথম দিন থেকেই ইন্দ্র আর বিরোচনের মধ্যে নানা রকম ঝামেলা শুরু হয়ে গেল। দুজনেরই ইচ্ছে হল আমরা অমর হব। দুজনে এটা জানে যে আত্মা কি জানলেই আত্মজ্ঞান হয়ে যাবে, আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে আমি অমর হয়ে যাব। দুজনেই গেলেন প্রজাপতির কাছে, আত্মা কি জানতে। আমাদের উপনিষদে যে ব্যাখ্যাগুলি আছে, সেখানে বারবার বলতে চাইছেন তুমিই সেই। প্রজাপতি দুজনকে বলে দিলেন, তুমি সেই। দুজনেই খুশী হয়ে চলে এলেন, দুজনেই বুঝলেন আমিই আত্মা।

বিরোচন অসুরদের গিয়ে বলছে, আমি জেনে গেছি ভাই, আমিই আত্মা, এই শরীরটাই আত্মা। ভাল করে খাওয়া দাওয়া করে শরীরকে চাঙ্গা রাখ, খুব করে ফুর্তি কর, আনন্দ কর। অসুর শব্দ এসেছে অসু থেকে, অসু মানে প্রাণ। যেখানেই প্রাণন ক্রিয়া হচ্ছে, অর্থাৎ যেখানে মন, ইন্দ্রিয়, আমাদের শরীর; এটাকে যারা শেষ কথা বলে মনে করে, এরাই অসুর। যারাই বলে মৃত্যুর পর কিছু নেই, এরা অসুর। যারাই মনে করে, মনটাই সব কিছু, এরা অসুর। শরীর, মন, ইন্দ্রিয়কেই যারা শেষ কথা মনে করেন, তার মানে এরা সবাই অসুর।

ইন্দ্রের মনেই এই সমস্যা হল, ইন্দ্রের থেকে দেবতাদেরও এই সমস্যা হল। ইন্দ্র প্রথমে মনে করলেন, দেহটাই আত্মা। কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ইন্দ্রের মনে সন্দেহ হল। আত্মা তো অজর, অমর কিন্তু দেহের তো ক্ষয় হয়, নাশ হয়। ইন্দ্র আবার প্রজাপতির কাছে গেলেন। প্রজাপতি ঘুরিয়ে তাঁকে একই কথা বললেন, তুমিই সেই। তখন ইন্দ্র মনে করলেন, প্রাণটাই তাহলে আত্মা। আবার ইন্দ্রের মনে সন্দেহ হওয়ার পর প্রজাপতির কাছে গেলেন। প্রজাপতি ইন্দ্রকে বললেন, তুমি এক বছর এখানে থাক, তপস্যা কর, তারপরে প্রশ্ন করবে। প্রজাপতিও কোন প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, উত্তর না দিয়ে তিনি ইন্দ্রকে বললেন, 'এক বছর এখানে থাক, তপস্যা কর, তারপর তোমার প্রশ্ন করার পাত্রতা আসবে।' এবার ইন্দ্র তপস্যা করতে থাকলেন। তপস্যা করছেন, আর ইন্দ্র প্রশ্ন করছেন, প্রজাপতির একটাই উত্তর, তুমিই সেই। যেমন যেমন তপস্যা করছেন, ইন্দ্রের মন পরিষ্কার হচ্ছে। সেখান থেকে ইন্দ্র বুঝলেন প্রাণ কি, মন কি, বুদ্ধি কি, শেষ বুঝলেন আত্মা কি। প্রজাপতি কোন উত্তর দিলেন না, ইন্দ্র কিন্তু উত্তর পেয়ে গেলেন। তপস্যা করলে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। এইভাবে দেবতা আর অসুর পুরো আলাদা হয়ে গেল, এদের চরিত্র পুরো আলাদা হয়ে

গেল। অসুররা বলে, জগৎটা আমার জন্য – I, me and my। দেবতারা মনে করেন, জগতে আমি আছি কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আসুর এব চ, সমগ্র সৃষ্টিকে ভূতসর্গ বলা হয়। সমগ্র সৃষ্টিতে দুই প্রকার প্রাণী, দেবতা আর অসুর। অসুর হলেন, যাঁরা দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধিকে শেষ কথা মনে করেন। দেবতা শব্দ এসেছে দিব্ ধাতু থেকে, দিব্ শব্দের অর্থ আলো। যাঁরা আত্মার আলোতে রমণ করেন বা বাস করেন, এনারাই হলেন দেবতা। আমি শুদ্ধ আত্মা, আমি ঈশ্বরের সন্তান, এই ভাব থেকে কখন নীচে চলে এলেও এনারা নিজের স্বরূপে ফেরত চলে যাবেন।

হে অর্জুন *অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ* থেকে শুরু করে বিস্তারে তোমাকে দৈবী সম্পদের কথা বললাম। আসুরীক সম্পদ চারটে শব্দে তোমাকে বলেছি, কিন্তু এইবারে তোমাকে আসুরী সম্পদের কথা বিস্তারে বলব। কেন ভগবান বিস্তারে বলছেন? আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *আসুরো বিস্তরশঃ অতঃ তৎপরিবর্জনার্থম্*, কেন বিস্তারে বলছি, *তৎপরিবর্জনার্থম্*, পরিবর্জন করার জন্য বলছি। আমার টিয়া বইটা *তৎপরিবর্জনার্থম্*, এই সিদ্ধান্তটাকে নিয়েই লেখা। একটা জিনিসকে জানতে হয়, জিনিসটা যদি জানা না থাকে, জীবনে কক্ষণ আপনি এগোতে পারবেন না। কথামৃতেও ঠাকুর বলছেন, ভোগান্ত না হলে হয় না, আগে একটু ভোগ করে নিতে হয়। ভোগ মানে জ্ঞান। একটা জিনিসকে যখন জেনে গেলেন, তখন তার উপর আপনার ক্ষমতা এসে যায়। ক্ষমতা এলেই সেখানে ত্যাগ এসে যায়। ত্যাগ এমনি এমনি হয় না। পরিষ্কার বলছেন, ভোগ মানে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে শক্তি অর্জন হয়, সেই শক্তির সাহায্যে ভোগের পরিত্যাগ করা হয়। ত্যাগ হলেই তবে গিয়ে জপধ্যান হয়, তার আগে হয় না। জ্ঞান, শক্তি, ত্যাগ, পরস্পর সংযুক্ত।

আচার্য যখন এখানে বলছেন, *বিস্তরশঃ*, এটা ভগবান গীতায় বলেননি, আচার্য নিজের তরফ থেকে যোগ করে জিনিসটাকে পরিষ্কার করে দিলেন। আসুরী সম্পদের কথা বিস্তারে কেন বলছি, যাতে তুমি এই আসুরীক সম্পদকে পরিত্যাগ করতে পার। জগৎকে যতক্ষণ না আপনি জানতে পারছেন, ততক্ষণ আপনি জগৎকে পরিত্যাগ করতে পারবেন না। আপনি মনে করছেন আপনি ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু কোথা দিয়ে যে মহামায়া আপনাকে বাঁধবেন আপনি বুঝতেও পারবেন না। যার জন্য ঠাকুর বলছেন, মা বেড়াল পুষিয়ে সংসার করিয়ে নেন। জগতে আপনার নিজের বলতে কেউ নেই, কিন্তু একটা বেড়াল, একটা কুকুর পুষে আপনি নদের হাট বসিয়ে দিয়েছেন। কারণ আপনার জ্ঞান নেই, জ্ঞান নেই বলে পরিত্যাগ করার ক্ষমতা আপনার মধ্যে আসেনি। ত্যাগ না হলে এগুলো ধারণাও করা যায় না। মনে বাসনা থাকলে দোষের কিছু নেই, বাসনা আছে মিটিয়ে নিন। মিটিয়ে নিয়ে বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে যান, জীবনের উদ্দেশ্য মুক্তি। বসে বসে কান্নাকাটি করাটা জীবনের উদ্দেশ্য না।

একটা সময় দেওঘর বিদ্যাপীঠের আমি প্রিন্সিপাল ছিলাম। বিদ্যাপীঠে বড় বড় বাড়ির লোকেদের ছেলেরা পড়ত। একজন বড় পুলিশ অফিসারের ছেলে পড়ত। বাবার যে বডিগার্ড ছিল, তার সাথে ছেলেটির খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। ছুটিতে ছেলেরা সবাই যাবে। সেই বডিগার্ডও তার অফিসারের ছেলেকে নিতে এসেছে। সেখানে অন্য একটা ছেলে বডিগার্ডকে বলছে, আপনার রিভলবারটা একটু নিতে পারি? রিভলভারটা পার্সোনাল ছিল। সিনেমা দেখে দেখে বড় হয়েছে, হাতে নিয়ে রিভলবারটা একবার এদিকে তাক করছে, আরেকবার ওদিকে তাক করছে। দেখে আমারও হাসি পেয়ে যাচ্ছে। পুলিশ অফিসারটি ওকে বলছে, 'আরে ধুর্ ওরকম করে দেখার কি আছে, একটা চালিয়ে দাও'। ছেলেটির আর সাহস হচ্ছে না। একটু নাড়াচাড়া করে ফেরৎ দিয়ে দিল। জিনিসটা জানা থাকলে ত্যাগ সম্ভব হয়। জানা না থাকলে ত্যাগ করবেন কি করে, আর ত্যাগ না হলে জপধ্যান করবেন কি করে, জপধ্যান না করলে মুক্তি হবে কি করে। এই হল মুক্তির সোপান।

অনেকেই আমাদের অনলাইন ক্লাশগুলো নিয়মিত ভাবে শুনে যাচ্ছেন। সেই সূত্রে অনেকেই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চান। ইউটিউবে আমাদের প্লে-লিস্টে প্রচুর লেকচার আপলোড করা আছে। অনেকে প্রশ্ন করেন, কোন লেকচারটা আগে, কোন লেকচারটা পড়ে শুনব। আমাদের হিন্দু শাস্ত্র ঠাকুরের কথায় মিছরির রুটির মত, যেখান থেকেই খান, যেভাবেই খান মিষ্টি লাগবে। আমাদের ক্লাশগুলো শুনে অনেকে বলেন যে, দেখি জীবনে কতটুকু লাগাতে পারি। ওনাদের আমি এটাই বলি, জীবনে অত সহজে এগুলো লাগানো যায় না। আমরা সন্ন্যাসী, আমরা বুঝতে পারি, এগুলো জীবনে লাগানো কত কঠিন। জীবনে লাগানোর চেষ্টা না করে এখন আপনারা শুধু নিষ্ঠা সহকারে মন দিয়ে শুনে যান, শুনে যাওয়া, এটাই সাধনা। এই সাধনাই আপনাদের ধীরে ধীরে উপরে নিয়ে যাবে। পরে কোন একটা সময় আসবে, হঠাৎ করে মনে পড়বে, আরে তাই তো, এই রকম একটা কথা তখন শুনেছিলাম। এই মনে পড়ার জন্য, আমি কি করব, কি করব না, একটা বিচার আসবে। সেখান থেকে আস্তে আস্তে অনেক কিছু পরিষ্কার হতে শুরু করবে। হুটহাট করে ধর্ম জীবন চলে না, এখানে সব কিছু ধীরে ধীরে চলে। আমরা এবার সাত নম্বর শ্লোকে যাব।

আগের শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষ করতে গিয়ে আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *আ অধ্যায়পরিসমাপ্তে আসুরী সম্পৎ প্রাণিবিশেষণত্বেন প্রদর্শতে প্রত্যক্ষকরণেন চ শক্যতে অস্যাঃ পরিবর্জনং কর্তুং*, এই যে আসুরীক প্রবৃত্তি, অসুরদের মত ব্যবহার, যেটা দিয়ে মানুষ পতনের দিকে যায়, এটাকেই গীতা এখানে প্রদর্শন করছেন এই জন্যই যে, এটাকে যদি ত্যাগ করতে হয় তাহলে আগে এই আসুরীক প্রবৃত্তিগুলিকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। কারণ এই আসুরীক সম্পদ্‌গুলি যদি পরিষ্কার করে না বোঝা হয়, তাহলে এগুলোকে পরিবর্জন করা যায় না। এটাকে নিয়েই আমরা এতক্ষণ এর আগে বিস্তারে আলোচনা করলাম।

সাত নম্বর শ্লোক থেকে বলবেন, মানুষের কিভাবে পতন হয়। এখানে আমাদের তিনটে জিনিসকে আগে জানতে হবে, গীতাও সেই দিকেই আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যেক মানুষের একটি জীবনদর্শন থাকে, সেই জীবনদর্শন তার মনের এত গভীরে থাকে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের মত মহাপুরুষরা ছাড়া এটা অন্যরা কেউ জানতেও পারেন না। কারণ আমরা মানুষরা মুখে এক রকম বলি, করার সময় অন্য রকম করি আর চিন্তা-ভাবনা আর-এক রকম করি, ফলে অন্যদের জীবনদর্শন বোঝা যায় না। বিচার করে দেখলে দেখা যাবে, আমাদের সবারই প্রায় একই রকম অবস্থা। যে কোন ভক্ত বা ধার্মিক লোককে জিজ্ঞেস করলেই বলবেন, ঈশ্বর দর্শনই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। এতই কি সহজ। এটা ঠিকই যে, প্রত্যেক মানুষরেই একটি জীবনদর্শন আছে। এইজন্য দরকার, একটু নিজের দিকে তাকানো, ভিতর থেকে আমি সত্যিকারের কি চাই।

প্রথমে জীবনদর্শনটা ঠিক করতে হয়। যেমন আপনি মনে মনে ঠিক করলেন একটা বাড়ি বানাবেন। বাড়ি করার জন্য আগে একটা জমি ঠিক করতে হবে, তারপর একটা নক্সা তৈরী করতে হবে, সেখান থেকে পরিকাঠামো, মূল স্তম্ভগুলি ঠিক করতে হবে, তারপর ধীরে ধীরে কাজ এগোতে থাকবে। প্রথমে আমার জীবনদর্শনটা কি জানতে হবে। জীবনদর্শনের পর মূল কয়েকটা দিক এবং সেখান থেকে ছোট ছোট জিনিসগুলিকে ঠিক করতে হবে। একটা দুটো লেকচার শুনে সবাই বলে, মহারাজ এটাকে আমি জীবনে নামাবো, বা বলবে মহারাজ দেখি এটাকে কিভাবে জীবনে নামানো যায়। আপনার জীবনদর্শনই ঠিক হয়নি, আপনি কি করে নামাবেন। আর জীবনদর্শন ঠিক হওয়া এত সহজ নয়। জন্মজন্মান্তরের কত কামনা-বাসনা নিয়ে জন্ম নিয়েছি। পতন যাদের হয়, তাদেরও একটা পরিষ্কার জীবনদর্শন থাকে – আমি এই চাই বা আমি এটাকেই ঠিক মনে করি। এর সাথে কিছু দিক আছে, যেগুলোর সাথে সীমানা বাঁধা আছে, তার মধ্যে আরও কিছু কিছু জিনিস জুড়ে আছে। সাত নম্বর শ্লোক থেকে ভগবান যেটা বলতে শুরু করছেন, সেটা শুনে আপনাদের আতঙ্ক লাগবে। কারণ বিচার করলে দেখা যাবে, এই গুণগুলি আমার আপনার সবারই মধ্যে কমবেশি বিদ্যমান। এই

গুণগুলিতে একটাই জিনিস হয় – পতন। এই পতন কেন হয়, এটারই গীতা এখন আলোচনা করতে যাচ্ছেন। মনে রাখতে হবে, মহৎ জীবন যদি তৈরী করতে হয় বড় জিনিস দিয়ে তৈরী হবে না। তাহলে কিভাবে তৈরী হয়? সীমা, দিক, ছোট ছোট জিনিসগুলি দিয়ে তৈরী হয়।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে।।৭।।

(অসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ ধর্মবিষয়ে প্রবৃত্ত এবং অধর্মবিষয় থেকে নিবৃত্ত হতে জানে না; তাদের শৌচ নাই, সদাচার নাই এবং সত্যও নাই।)

শ্লোকের অর্থ খুব সহজ। এই শ্লোকে অসুরস্বভাবের দিকগুলিকে পরিভাষিত করছেন, তার সঙ্গে জীবনদর্শন। সাত আর আট নম্বরে শ্লোকে মূল কটি কথা বলার পর আরও বিস্তারে বলবেন। *প্রবৃত্তি*, কোনটা করা উচিৎ এরা জানে না, জানলেও করবে না। *নিবৃত্তি*, কোথা থেকে সরে আসতে হবে জানে না, বা জানলেও সরে আসবে না। দুর্যোধনের খুব নামকরা কথা, যদিও মূল মহাভারতে নেই, শ্রীকৃষ্ণকে দুর্যোধন বলছেন, ধর্ম কি আমি জানি কিন্তু সেখানে প্রবৃত্তি আসে না, অধর্ম কি আমি জানি কিন্তু অধর্ম থেকে নিবৃত্ত হতে আমার মন চায় না। এই প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি আসে ধর্ম থেকে। Self-help বই থেকে আসে না, নাটক নভেল থেকে আসে না, কথা কাহিনী, টিভি সিরিয়াল থেকে আসে না, রামায়ণ মহাভারত টিভি সিরিয়াল থেকে আসে না। শাস্ত্র না পড়লে, গুরুসঙ্গ না করলে, গুরু বলতে আচার্য, গুরুজন, সমাজে যাঁদের সম্মান আছে; সম্মান টাকা-পয়সার জন্য না, সৎ আচরণের জন্য, এই ধরণের মানুষের সঙ্গ না হলে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি আসবে না।

স্পিরিচুয়াল এন্টারটেইনমেন্ট দিয়েও আসবে না। একটু গান বাজনা (ভক্তিগীতি, কীর্তনাদি) শুনলেন ঠিক আছে, কিন্তু ওই স্পিরিচুয়াল এন্টারটেনমেন্টেই জীবনের সব কিছু হয়ে যাবে, তা হবে না। এমনকি রামায়ণ মহাভারত সিরিয়ালও যদি দেখতে থাকে, হবে না। খেটে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে ধারণা করতে হবে। তারজন্য আচার্যের সঙ্গ করতে হবে; অর্থ হল, আচার্যের মুখ থেকে শাস্ত্রের কথা শুনতে হবে। গুরুজনদের সঙ্গ না করলে এই জিনিসগুলি শেখা যায় না। আর এমন মানুষের কাছে ঘুরঘুর করতে হয়, যাঁরা শুধু শাস্ত্রই জানেন না, জীবনে শাস্ত্রকে নামিয়েছেন, ব্যবহারিক জীবন আর শাস্ত্র জ্ঞানের মধ্যে যাঁদের কোথাও কোন ফারাক নেই। তবে গিয়ে *প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিঞ্চ* জানা যাবে। যাদের আসুরীক স্বভাব তারা জানে না, কোনটাতে প্রবৃত্ত হতে হবে, কোনটা থেকে নিবৃত্ত হতে হবে।

কর্তব্য কর্ম করলে তবে পুরুষার্থ হয়। জীবনের একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই, জীবনে আমি কি পেতে চাই এবং কি হতে চাই। যে কজন এই ক্লাশ শুনছেন, তাঁরা বলুন তো, আপনাদের জীবনের কি উদ্দেশ্য, কি পুরুষার্থ? পুরুষার্থ মাত্র চারটি, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ঈশ্বরদর্শন মুখের কথা, এটাকে বাদ দিয়ে ভাবতে হবে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটের যেটা পুরুষার্থ হবে, চব্বিশ ঘন্টা ওটাতেই লেগে থাকতে হবে। বর্তমান কালে আমরা বলি বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগ। যদি একবার ঠিক করে নেন, আমার পুরুষার্থ এই, আমি এটাই পেতে চাই, এটাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য, তবেই মানুষ সেটাতে নামে। উদ্দেশ্য না জানা থাকলে মানুষ কর্তব্যবিহীন হয়ে যাবে। খুব নামকরা একটা জোক আছে। এক বাবু ঘোড়ার পিঠে বসেছে, ঘোড়া বাবুকে নিয়ে জোর ছুটছে, ঘোড়াকে সামলাতে পারছে না। একজন জিজ্ঞেস করছে, 'বাবু কোথায় যাচ্ছেন'? বাবু বলছে, 'আমি জানি না, ঘোড়াকে জিজ্ঞেস কর'। আপনাকেও যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, আপনার জীবনের উদ্দেশ্য কি? আপনি কি উত্তর দেবেন? একটাই উত্তর – আমার জানা নেই, আমার মন যেখানে নিয়ে যাবে। এটাই আসুরীক স্বভাব, যেখানে আপনি জানেন না, জীবন থেকে আপনি কি চান। চাওয়ার পর, সেটার প্রতি লেগে থাকা।

আমাদের এক মহারাজ ছিলেন, তিনি আমাকে এবং আরও অনেককে মজা করে বলতেন, ‘এর বুদ্ধি আছে কিন্তু কোথায় লাগাতে হবে জানা নেই।’ সবারই তাই, বুদ্ধি আছে কিন্তু কোথায় লাগাবে জানে না। যিনি যত তাড়াতাড়ি এটা জেনে যান, তিনি পতন থেকে তত তাড়াতাড়ি বাঁচতে পারবেন। নাহলে বাবুর মত অবস্থা হবে। কারণ আমাদের মন হল এক দুরন্ত ঘোড়া, মন দৌড়ে নিয়ে গিয়ে কোথায় ফেলবে বুঝতেও দেবে না। বলছেন, আসুরীক স্বভাবের লোকেরা মনকে কোন কাজে, কোন কর্তব্যে লাগাবে, কোন কাজ থেকে মনকে সরিয়ে আনতে হবে; অকর্তব্য, অর্থাৎ যেটা করতে নেই, সেটা থেকে মনকে সরাবে, এই জিনিসগুলি এরা জানেই না।

অকর্তব্য কেন? আচার্য বলছেন, *অনর্থহেতঃ,* যেটা করতে নেই সেটা করলে অনর্থ হয়। অর্থসাধন আর অনর্থসাধন, জীবন ধন্য করার জন্য অর্থসাধন করতে হয়। অর্থসাধনের অর্থ টাকা-পয়সার জন্য সাধনা না, পুরুষার্থ। এর উল্টোটা হল অনর্থ। অনর্থ থেকে সরে আসতে হয়, সরে এসে পুরুষার্থের দিকে মন দিতে হয়। কি করে বুঝব কোথায় মন দেব, কোথায় মন দেব না? প্রথমে এক, দুই, তিন নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে। অনর্থ, কোথা থেকে মনকে সরাতে হবে, এখন এর বর্ণনা শুরু হয়েছে।

প্রথমটা বলছেন, *ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে*। অসুর ভাবাপন্ন মানুষের শৌচ থাকে না। প্রথমের দিকে যেখানে শুভ দৈবী গুণগুলির কথা বলা হয়েছিল সেখানে শৌচের কথা বিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। শৌচ শুধু স্বাস্থ্যের জন্য না, শৌচ মনের শুদ্ধির জন্য। জামা-কাপড় নিত্য পরিষ্কার করা, নিত্য স্নান করা, যে কোন অশুদ্ধ জিনিস স্পর্শ হয়ে গেলে নিজেকে পরিষ্কার করা, এর সাথে স্বাস্থ্যের কোন সম্পর্ক নেই। জাস্টিফাই করার জন্য এখানে কোন বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার দরকার নেই। বলতে পারেন, এগুলো করলে শুচিবাঈ হয়। শুচিবাঈ হোক, হলে ভাল। যেখানে খুব শুদ্ধ আচারে পূজাদি হয়, সেখানে কোন কারণে পূজারী যদি মন্ত্রোচ্চারণ ছাড়া কোন কথা বলে ফেলেন, সঙ্গে সঙ্গে আচমণ করে মুখ শুদ্ধ করে নেন। কথা বলাটাও অশুদ্ধি। যাঁদের অকারণে কথা বলার রোগ আছে, তাঁরা এটা অনুশীলন করতে পারেন। কথা বলে মুখে একটু আচমন করবেন, দেখবেন কথা বলা অনেক কমে যাবে। যাঁদের ফোনে খুটুর খুটুর করার রোগ আছে, তাঁরাও ফোন খুটুর খুটুর করে একটু আচমন করে নেবেন, নিজের উপর জল ছিটিয়ে শুদ্ধ করে নেবেন। শৌচকে এই পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু যাদের আসুরীক স্বভাব, শৌচ তারা কিছুতেই করতে চাইবে না, স্বাস্থ্যবিধির জন্য যতটুকু দরকার করবে। স্নান করলে শরীর শুদ্ধ হয়। কিন্তু শরীর শুদ্ধ করা আমাদের উদ্দেশ্য না, উদ্দেশ্য শরীরকে পবিত্র করা। শুভ চিন্তন করা কেন, মনের স্বাস্থ্য ভাল রাখা; কিন্তু তা না, উদ্দেশ্য মনকে পবিত্র রাখা। এই পবিত্রতাকে এমন স্তরে নিয়ে যেতে হবে, যেখানে ঠাকুর বলছেন, বাবুরামের হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ। মাঝে মাঝে গঙ্গাজল ছিটিয়ে নেবেন। গঙ্গাজল যদি না পাওয়া যায়, এমনি জলই বোতলে আলাদা করে রেখে ‘গঙ্গা’ ‘গঙ্গা’ বলে ছিটিয়ে নেবেন।

তার সঙ্গে *নাপি চাচারো,* আচার, এমনি আচার ব্যবহার না, একেবারে সদাচার। এই জিনিসটা অসুর ভাবাপন্ন লোকেরা জানে না। ইদানিং কালে মনুস্মৃতিকে নিয়ে সারা দেশে অনেক হাঙ্গামা, বিতর্ক হচ্ছে। সবাই আম্বেদকর সাহেবের অনুগামী, ওদের একটাই বক্তব্য মনু নাকি বর্ণ ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন। মনু কেন বর্ণব্যবস্থা করতে যাবেন, বর্ণব্যবস্থা তো ঋকবেদেই আছে, বর্ণব্যবস্থা তো রামায়ণেই আছে। মনু তো অনেক পরে এসেছেন। তিনি শুধু কোডিফাই করে দিয়ে গেছেন। বলছে মনুকে জ্বালিয়ে দাও। আমার ক্রতু বইতে একটা অধ্যায় আছে Monu burns।

কিন্তু মনু যে সদাচারের কথা বলছেন, মহাভারত যে আচারের কথা বলছেন, সেই সদাচারের দিকে কেউ তাকাচ্ছে না। এদের মাথায় নেই যে, কিছু না হোক মনুস্মৃতি আড়াই হাজার বছর আগেকার। আড়াই হাজার বছর আগের মনুস্মৃতিকে ছেড়ে দিন, বিভিন্ন ধর্ম কোনটা পনের’শ কিংবা হাজার বছর আগেকার, তাদের আচার-সংহিতাগুলি একটু উল্টেপাল্টে দেখুন, কত জঘন্য। তাহলে

মনুকে দোষ দিচ্ছেন কেন? আর মনু যে আচারের কথাগুলি বলে গেছেন, সেগুলোর দিকে কেউ তাকাচ্ছে না। ভাগ্যিস পুরাণে আমাদের ত্রিশঙ্কুর বর্ণনা করে দিয়ে গেছেন। রাজার খুব ইচ্ছে সশরীরে স্বর্গে যাবে। বিশ্বামিত্র নিজের তপস্যার জোরে রাজাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দিলেন। ইন্দ্র স্বর্গ থেকে রাজাকে এক ধাক্কা মারতেই রাজা স্বর্গ থেকে পড়তে শুরু করেছে। বিশ্বামিত্র বলছেন, থেমে যাও সেখানে। রাজা ত্রিশঙ্কু হয়ে এখনও সেখানে অবস্থান করে আছেন, না আছেন পৃথিবীতে, না আছেন স্বর্গে। আমাদের ভারতবর্ষ এখন ত্রিশঙ্কু হয়ে গেছে। একটা যে আচার থাকবে, সেটা এখন আর দেখাই যায় না। যাঁরা খুব ভাল পরিবার থেকে এসেছেন, তাঁরা জানবেন তাঁদের বাবা, মা, ঠাকুরদা, ঠাকুরমাদের কেমন সব খুব শুভ সংস্কার ছিল। কি সুন্দর সুন্দর তাঁদের আচারগুলি ছিল। সন্ধ্যেবেলা তুলসীতলায় গিয়ে প্রদীপ জ্বালছেন, রান্না শেষ করে অগ্নিতে রান্না থেকে একটু আহুতি দেওয়া, এই ধরণের কত রকম আচার ছিল। এখন আমরা সব ছেড়ে দিয়েছি। যেগুলো impersonal values, যেগুলো আমাদের আচার শেখায়, সেগুলোকেও ছেড়ে দিয়েছি।

ভারতের বড় বড় শহরগুলি, দিল্লী, বোম্বে, চেন্নাই, কলকাতা, ব্যঙ্গালোর, কোথাও এখন শৌচ বলতে কিছু নেই। এঁটোকাটার কোন বিচার নেই। বললে আবার বলবে, এঁটো কেন খাওয়া যাবে না? বাবা-মাকে এখন ছেলে মেয়েরা নাম ধরে ডাকছে। দেখলে আতঙ্ক লাগছে, কোথায় গেল আমাদের সামাজিক আচারগুলি। শৌচ নেই, আচার নেই, এগুলোই তো পতনের পথ। বড়দের পা ছুঁয়ে প্রণাম করা উঠেই গেছে। সাধু সন্ন্যাসীদের দেখলে প্রণাম করবে না, হ্যালো স্বামীজী বলে হাতটা বাড়িয়ে দেবে। আমাকেও যখন কেউ দেখি হ্যালো স্বামীজী করছে, বুঝতে পারছি সমাজটা গোল্লায় গেছে।

ন সত্যং তেষু বিদ্যতে, শৌচ আর আচার যাদের নেই, এদের সত্য থাকে না। এর খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত হল হিটলার। হিটলারের না ছিল আচার, না ছিল শৌচ, বিদেশীদের এমনিতেই শৌচটা কম থাকে। স্বামীজী প্যারিসে গিয়েছিলেন। ভাল একটা হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখানেও স্নানের ব্যবস্থা নেই, দেখে স্বামীজীর মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড়। আচার্য এখানে বলছেন, *অশৌচা অনাচারা মায়াবিনঃ অনৃতবাদিনো,* শৌচ বলে যাদের কিছু নেই, তারা মিথ্যা কথা বলে, দুরাচারী, কপট; সব কটাই আসুরীক বৃত্তি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপর একটা বই আছে, তাতে বর্ণনা আছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে নানারকম রাজনৈতিক ঘটনা চলছিল। হিটলার চেকোস্লোভাকিয়া দখল করবে। চেম্বারলিন তখন ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী, তিনি চেষ্টা করছেন হিটলারকে যদি খুশী রাখা হয়। দুজনের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছে। চেম্বারলিন চুক্তি সম্পাদন করে চলে যাওয়ার পর হিটলারের লোকেরা হিটলারকে জিজ্ঞেস করছে, 'আপনি তো এই চুক্তি পালন করবেন না, তাও কেন চুক্তি করলেন'? হিটলার বলছে, 'চেম্বারলিন কেমন দাদু দাদু দেখতে, এই বুড়ো বয়সে কেন তার মনটা ভাঙব, আমার অটোগ্রাফ রাখতে হয়ত সে পছন্দ করবে, তাই সই করে দিলাম'। যা চুক্তি করেছিল, সাত দিনের মাথায় সব চুক্তিকে হিটলার ভেঙে দিল। কত দুষ্ট লোক। এই রকম বর্ণনা গীতাতে এই শুরু হল, পরে আরও বর্ণনা আসবে।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্।।৮।।

(আসুরভাববিশিষ্ট ব্যক্তিরা বলে, এই জগৎ সত্যশূন্য; এটা ধর্মাধর্মের ব্যবস্থাহীন। এর কর্মফলদাতা ঈশ্বর নাই এবং কামবশতঃ স্ত্রী-পুরুষের সংযোগেই এটা উৎপন্ন; এর উৎপত্তির অদৃষ্ট ধর্মাধর্মাদি অন্য কোন কারণ নাই।)

এই হল এই ধরণের লোকেদের জীবন দর্শন। *অসত্যম্,* এই যে সংসার এটা মিথ্যা, এর কোন দাম নেই, মরে গেলে সব শেষ। *অপ্রতিষ্ঠং* কে আচার্য বলছেন, *ধর্মাধর্মৌ প্রতিষ্ঠা অতঃ অপ্রিতষ্ঠং চ ইতি,* অনীশ্বরকে আচার্য বলছেন, *ধর্মাধর্মব্যপেক্ষকঃ অস্য শাসিতা ঈশ্বরো,* ঈশ্বর হলেন যিনি ধর্ম ও অধর্মকে নিয়মন করেন। এরা কোন ঈশ্বরেই বিশ্বাসী না। আমরা ঈশ্বর-ফীশ্বর মানি না। আর *অসত্যমপ্রতিষ্ঠং,* অসত্যে এমন প্রতিষ্ঠিত যে, বলে আমি মিথ্যায় ভরা, তারাও মিথ্যায় ভরা। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে একজন প্রফেসর ছিলেন, তিনি বলতেন, বর্তমান ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হল সবচেয়ে বড় ফ্রড, আর তার ঠিক পিছনে হল আইটি সেক্টর। উনি নিজেও একজন কম্প্যুটারের প্রফেসর ছিলেন। এনারা সত্যিকারের বড় প্রফেসর, এনারা চাইতেন যে সবারই বিদ্যা যেন উঁচুর দিকে যায়। তার নীচে সবটাকেই উনি খেলো করে উড়িয়ে দিতেন।

বর্তমান ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা এখন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে শুধু হল, আমি তোমাকে কিভাবে বোকা বানাতে পারি। সেও ভাবছে আমি তোমাকে কিভাবে বোকা বানাতে পারি। বাজারে যে আনাজ বিক্রি করছে, সে ভাবছে, আমি কি করে দুটো পয়সা বেশি পেতে পারি, তাহলে ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে পড়াতে পারব। আমরা বাজারে গিয়ে অনেক সময় ভাবি, সব্জিওয়ালা আমাকে বোকা বানাতে চাইবে, আমি নিজেকে বোকা বানাতে দেব না। ম্যানেজমেন্টে তা নয়, এই যে বড় বড় কোম্পানীগুলি ব্যবসা ফাঁদছে, এদের উদ্দেশ্যই হল কি করে লোকেদের বোকা বানানো যায়। আমার ফোনে এয়ারটেলের নম্বর, দশ বছর ধরে চলছিল। হঠাৎ একদিন রাত্রিবেলা দেখি ফোন বন্ধ। আজকের দিনে ফোন বন্ধ হয়ে গেলে হাজারটা কাজ আটকে যায়। দৌড়ে সালকিয়াতে এয়ারটেলের অফিসে গেলাম, গিয়ে বললাম এই এই হয়েছে। শুনে বলল, 'আপনার ফোন বন্ধ হয়ে গেছে'? কম্প্যুটারে আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে কিছুক্ষণ খুটুর খুটুর করে বলল, 'আসলে আপনি একই নামে দশটার বেশি সিম নিয়ে রেখেছেন'। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আমার তো একটাই সিম কার্ড'। 'ও তাই, তাহলে কেউ আপনার নামে নিয়েছে, সেইজন্য ব্লক করে দেওয়া হয়েছে। আপনি পুলিশের কাছে যান'। সেখান থেকে আরেকটা অজুহাত, তার থেকে আরেকটা অজুহাত দেখাতে লাগল। শেষে আসল কথায় আসছে, 'আপনি নূতন একটা সিম নিয়ে নিন'। আমি বললাম, 'আমার তো সারা বছরের টাকা এডভান্স পেমেন্ট করা আছে, নূতন সিম নিলে ওই টাকাটা কি হবে'? আমাকে সরাসরি বলে দিল, আমরা কিছু করতে পারব না।

আমার মত একজন সন্ন্যাসীকে এরা আড়াই ঘন্টা বসিয়ে রাখল। কোম্পানী শুধু দেখছে কোয়ার্টারলি প্রফিট কি করে বাড়ানো যায়। কাকে কত বোকা বানাতে পারে। চিন্তা করুন, কি দুরবস্থায় সাধারণ মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে। ফ্রড করে ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট ফাঁকা করে দিচ্ছে। রিটায়ারড লোকগুলো কাঁদছে। কেউ শোনার নেই। সবাই এত কিছু বোঝেও না। এদের যদি জিজ্ঞেস করেন, এরা বলবে, আরে ওর প্রচুর টাকা আছে। তার সাথে বলবে, আমরাও সমাজের সেবা করি, আমরাও দান দক্ষিণা দিয়ে থাকি। কত বদমাইশ হতে পারে কল্পনাও করা যায় না।

জগদাহুরনীশ্বরম্, এরা বলে, এই জগৎ অনীশ্বর, এখানে ঈশ্বর নেই। এরা মন্দিরে যাবে, বা যে ধর্মের লোক সে সেখানে যাবে, কিন্তু তার সাথে এই যে বলা হল, মনের ভিতরে ঈশ্বর-ফীশ্বর বলে কিছু নেই। ঈশ্বর সব কিছু চালাচ্ছেন, এটা বিশ্বাস করা কি অত সোজা! খুব নামকরা কথা, কুকুর হইতে সাবধান লেখা থাকলে মানুষ Dogকে ভয় পায়, কিন্তু ভগবান হইতে সাবধান লেখা থাকলে মানুষ Godকে ভয় পায় না। বিশ্বাসই নেই যে ঈশ্বর আছেন, *জগদাহুরনীশ্বরম্।* এখনও গ্রামে গঞ্জে যদি যান, দেখবেন, গ্রামের লোকেরা এখনও কত ভাল মানুষ, টেকনলজির ছোঁয়া আজ সেখানেও যাচ্ছে। তিরিশ চল্লিশ বছর পর কি যে হবে, ভগবানই জানেন। কোভিড শুরু হওয়ার পর অনলাইনে আমাদের এমএ ক্লাশ চলত। আমাদের একজন ছাত্র কানেকশান পেত না বলে মাঠে গিয়ে বসে থাকত নেটওয়ার্ক পাওয়ার জন্য। সেখানে কিছু গ্রামের লোক, মাঠে গরু চড়াত, ধর্মের কথা

হচ্ছে বলে ওরা ওখানে বসে পড়ত। ভাই, তুমি তো এমএ পড়ছ, আমাদেরও একটু শুনতে দাও। গরু চড়ায়, ধর্মের কথা শোনার জন্য এক ঘন্টা বসে শুনছে। কদিন পর এই জিনিস থাকবে কিনা আমরা কেউ বলতে পারব না। বরঞ্চ এদের বিশ্বাস আছে ঈশ্বর আছেন, তিনি সব দেখছেন, পাপ করলে সাজা পেতে হবে।

ঈশ্বর নেই, তাহলে সৃষ্টি হল কি করে? এই আসুরবিশিষ্ট লোকেরা এর উত্তরে তখন বলে, *অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্*, আমার বাবা-মার ভিতর কাম জন্ম নিল, নারী পুরুষের মিলন হল, সেখান থেকে আমার জন্ম হল। পুরো সৃষ্টিটাই সেখান থেকে জন্ম। সমস্ত জড়বাদী দর্শনের পুরোটাই এটাকে নিয়ে চলে – ঈশ্বর বলে কিছু নেই, ধর্ম অধর্ম বলে কিছু নেই আর নারী পুরুষের সম্পর্ক থেকে জগতের সৃষ্টি। এর পিছনে কোন অদৃশ্য কারণ নেই, ধর্মটর্ম বলে কিছু নেই। গীতা সেই কবেকার কথা, সেই তিন হাজার বছর আগে এই ধরণের আসুরভাবাপন্ন লোকেদের কথা গীতা লিপিবদ্ধ করে গেছেন; যাদের উপস্থিতি আমরা এখনও সব জায়গায় দেখতে পাই।

আচার্য এখানে মন্তব্য করছেন, *লোকায়তিকদৃষ্টিঃ*, *লোকায়তিক* মানে চার্বাক দর্শন। লোকায়তিক একটা মত, লোক শব্দ থেকে লোকায়তিক এসেছে। লোক মানে লুক্কতে, যেটা দেখা যাচ্ছে। বর্তমান কালের পুরো বিজ্ঞান, আগেকার বিজ্ঞান না, নিউটন আদি বিজ্ঞানীরা খুব ঈশ্বর ভীরু ছিলেন, যত মার্ক্সবাদীরা আছে, যারা নিজেদের লিবারেল বলে, সবার মত এই আট নম্বর শ্লোকে ভগবান বলে দিয়েছেন। যারা চোর হয়, যারা গ্যাংস্টার হয়, যারা ক্রিমিনাল হয় তাদের মধ্যেও একটা কোড অফ কনডাক্ট থাকে। তারা নিজেদের কোড মানে, অপরেরটা মানে না। এদেরও একটা কোড অফ কনডাক্ট আছে, তুমি যদি আমার পিঠ আঁচড়াও আমিও তোমার পিঠ আঁচড়াব। কিন্তু আমরা দুজন মিলে পুরো জগতের পিঠ আঁচড়াব, কারণ তারা আমাদের আঁচড়াতে পারবে না। বাইরে ভাল মানুষী দেখাবে। কিছু কিছু ধর্মেও এই ভাবটা আছে, হিন্দু ধর্মে নেই। আর কিছু কিছু জীবন দর্শন আছে, তারাও এই ভাবটা রাখে। ওরা নিজেরা নিজেদের মনে করে শ্রেষ্ঠ, আর পুরো জগৎকে মনে করে ওদের খাদ্য। গীতা পরে এদের বর্ণনা করবেন।

ঈশ্বর বলে কিছু নেই, পুরো জড়বাদী দর্শন মানে এটাই। তাহলে সৃষ্টি কোথা থেকে হয়, কোথা থেকে আর হবে, বাবা মার মধ্যে কামবেগ জেগেছিল, সেখান থেকে আমার জন্ম হয়েছে। সারা জগতের সৃষ্টি এভাবেই হয়েছে। হিন্দুদের এভাবে হয় না। মনু পরিষ্কার বলছেন, গর্ভাধান সংস্কার করতে হয়। স্বামীজী বলছেন, সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়। আপনারা খোঁজ নিন, দেখবেন আপনাদের বেশির ভাগ বাবা মায়েরা ঈশ্বরের কাছে কত প্রার্থনা করেছিলেন আমার সন্তান হোক বলে। অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর কত ভাবে ওনারা পূজা প্রার্থনা করেছেন। কারণ তাঁরা জানেন, একটা শিশু যে আমাদের বংশে এসেছে, ঈশ্বর দিয়েছেন বলেই এসেছে, এই হল হিন্দুদের ভাব। জন্ম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত হিন্দুদের জীবন জাতকর্ম দিয়ে বাঁধা। কিন্তু আসুরভাবাপন্নদের জীবন তা নয়, এদের জীবনটাই হল আসুরীক জীবনদর্শন, যেটা মানুষকে, মানবজাতিকে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যায়। এদের ভাবটাই হল, আমি যেমন মিথ্যাচারে আছি, জগৎটাই মিথ্যাচার। আর আমি যেমন ভোগবাদী জগৎটাও ভোগবাদী। আমি যেমন ঈশ্বর মানি না, তেমনি ঈশ্বর বলেও কিছু নেই।

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ।।৯।।

(এই লোকায়তিক মত আশ্রয়পূর্বক পারলৌকিক সাধনচ্যুত ক্রূরকর্মা, অনিষ্টকারী ও অল্পবুদ্ধি আসুরপ্রকৃতি ব্যক্তিরা জগতের বিনাশের জন্য জন্মগ্রহণ করে।)

এই ধরণের যাদের জীবনদর্শন, যাদের মধ্যে এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে, এই মতের আশ্রয় নিয়ে যারা চলছে, এরা সবাই পরলোক সাধন থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। দান্তে যখন ডিভাইন কমেডি লিখছেন, সেখানে তিনি নরকের বর্ণনা করছেন, এই নরক আমাদের নরক না, ইংরেজদের নরক। পর পর তিনি শুধু নরকের বর্ণনাই করে গেছেন। মানুষ পূণ্য কর্ম করে স্বর্গে যাবে, ক্রমাগত তার উন্নতি হবে, সেখান থেকে মুক্তির দিকে যাবে – এই ভাবটা এদের নাশ হয়ে গেছে। *এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য*, এই ধরণের যাদের দৃষ্টি, এরা শেষ। কথামৃতে বর্ণনা আছে, ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার সরকার আসতেন। একদিন কি একটা কথায় ডাক্তার সরকার ঠাকুরকে বলছেন, তুমি আমার কথা শোন। যে ঠাকুর ডাক্তার সরকারকে এত সম্মান প্রদর্শন করতেন, ফ্রীতে ডাক্তার সরকার যে ঠাকুরের চিকিৎসা করছেন, সেই ঠাকুরই ডাক্তার সরকারকে বলতে শুরু করলেন –তোমার কথা কি শুনব! তুমি কামী, অহঙ্কারী, লোভী। এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা।

আপনারা যার কথা শুনছেন, তিনি বৈজ্ঞানিক হন, কোন নেতা হন, সাহিত্যিক হন, যেই হন, তিনটে জিনিস দেখতে হবে। লোকটা কামী কিনা, লোকটা লোভী কিনা, আর লোকটা অহঙ্কারী কিনা। এই তিনটে জিনিস যদি থাকে, তাহলে তাঁর কথা শোনার দরকার নেই। উনি বড় বৈজ্ঞানিক হতে পারেন, বড় সাহিত্যিক হতে পারেন, তিনি একজন বড় বক্তা হতে পারেন, যেই হন, কিন্তু তিনি আপনার জীবনকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন না। কারণ তাঁর জীবন দর্শনটাই এলেমেলো চলছে। এই তিনটেই হল পরীক্ষা। আপনি কামী কিনা, আপনি লোভী কিনা আর আপনি অহঙ্কারী কিনা। এদের কথা শুনে চললে আপনার যে একটা সৎ জীবন, সেটাই শুধু যে চলে যাবে তা না, আপনার ধর্ম জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

এই ধরণের লোকেরা আস্তে আস্তে *প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ*, এদের যত রকমের কাজ উগ্র ও হিংসাত্মক হয়, নিজের বাবা-মাকেও মারধোর করতে ছাড়ে না, অপরকে লুটেপুটে খাবে। আর *ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ*, জগতের অহিতের জন্যই এরা তাদের জীবনটা পুরোপুরি অর্পণ করে দেয়। এরা অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন, পরলোক সাধন থেকে ভ্রষ্ট, সংসারকে কিভাবে নাশ করবে এটাতেই তাদের সব বুদ্ধি নিয়োজিত। হিটলার এমন করল যে, আমেরিকা জাপানে গিয়ে এ্যটম বোম ফেলল, যারা কোন দোষ করেনি তারাই মারা গেল।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাহসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেহশুচিব্রতাঃ।।১০।।

(এদের হৃদয় দুষ্পূরণীয় বাসনায় পূর্ণ। দম্ভ, অভিমান ও মদযুক্ত হয়ে অবিবেকবশতঃ অশুভনিচয় গ্রহণপূর্বক সেই অশুদ্ধব্রত ব্যক্তিরা দুরদৃষ্ট-উৎপাদক কর্মে প্রবৃত্ত হয়।)

কাম হল ইচ্ছা বিশেষ। *কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং*, দুষ্পূরণীয় কামনা হল, যে কামনাগুলি, যে ইচ্ছাগুলিকে কোন দিন পূর্ণ করা যাবে না। মহাভারতে যযাতি দেবযানীর কাহিনী আছে, সেখানে দেখাচ্ছেন, যযাতির ভোগের ইচ্ছা যাচ্ছে না। তাঁর দুই স্ত্রী, সন্তান হয়ে গেছে, তাও তাঁর ভোগের ইচ্ছা মিটছে না। ভোগ মেটানোর জন্য যযাতি নিজের সন্তানের সাথে নিজের বার্ধক্য ও সন্তানের যৌবন বিনিময় করল। তারপরেও ভোগ করার পর দেখছে তাঁর ভোগের শান্তি হচ্ছে না। ভোগ দ্বারা কখন শান্তি হয় না, আগুনে ঘৃতাহুতি দিলে আগুন যেমন আরও অধিক মাত্রায় জ্বলে ওঠে, ভোগের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। কাম আগুনের মত, যত তাতে ইন্ধন দেবেন তত দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে। *কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং*, কামনাকে পূরণ করা যায় না, চাহিদার কি কোন শেষ আছে! *দম্ভমানমদান্বিতা*, দম্ভ, আমাকে জানো না আমি কে আর মান, দম্ভ আর মান হল অতিমান, নিজের প্রতি অহঙ্কার। এরা এই দুটোতে একেবারে মদমত্ত হয়ে আছে। আগে অতিমান আলোচনা করা হয়ে গেছে, এখান আর বিস্তারে যাচ্ছি না।

মোহাদ্ গৃহীত্বাহসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেহশুচিব্রতাঃ, এই ধরণের যারা হয়, নিজেকে তারা বিরাট কিছু মনে করে আর এদের জীবনের সবটাই গোলমালে ভরা। ইদানিং রাজনীতিতে এই জিনিসটা খুব চোখে পড়ে। যারা একটু তার বিরোধিতা করল, হাতে ক্ষমতা আছে, সমস্ত সরকারী এজেন্সিকে ওর বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিল। নেতা, মন্ত্রী, যারাই ক্ষমতায় আছে, সব সময় চিন্তা করে যাচ্ছে কার ক্ষতি করা যায়, কাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো যায়। কারণ এদের বুদ্ধিটা মোহ দিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তার সাথে শাস্ত্রচর্চা করছে না, সাধু সঙ্গ তো নেইই; ফলে অজ্ঞান এদের আরও বেশি করে বেঁধে ফেলেছে। *অশুচিব্রতাঃ,* এদের আচরণ অত্যন্ত খারাপ, এত খারাপ যে সবারই চোখে লাগে, আর কোন আচরণই শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে না। তাতে কি হয়, *অসদ্গ্রাহান্,* অশুভ কর্মে নিশ্চয় ভাব, অর্থাৎ কোনটা করা উচিৎ, কোনটা করা উচিৎ নয়, এই বোধবুদ্ধিটাই তার বিলুপ্ত হয়ে গেছে, ফলে সব কিছুতে এদের সমস্ত চিন্তাভাবনাগুলো এলেমেলো হয়ে যায়। এরা নিজেরাই জোর করে কিছু সিদ্ধান্ত তৈরী করে সেই অনুযায়ী তারা জীবনটাকে চালাতে থাকে। এইভাবে চলতে চলতে মনটাই এদের নোংরা ধরণের হয়ে যায়। এত ধরণের এদের কামনা, এত ধরণের ইচ্ছা, যেগুলোকে কখন পূর্ণ করা যায় না, সম্ভবই না, উপরুন্তু ওর মধ্যেই সব সময় হাবুডুবু খাচ্ছে, তার মধ্যেই আবার নিজের হামবড়া চলছে।

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ।।১১।।
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্।।১২।।

(কামভোগই জীবনের পরম পুরুষার্থ –এইরূপ নিশ্চয়পূর্বক মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্বীয় যোগক্ষেমবিষয়ে অপরিমেয় চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করে অসংখ্য আশাপাশে আবদ্ধ এবং কাম ও ক্রোধের অধীন হয়ে এরা বিষয়ভোগের জন্য পরস্বার্থপহরণাদিরূপ অসদুপায়ে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করে।)

একই ভাব, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছেন। *চিন্তামপরিমেয়াং,* আচার্য বলছেন, *ন পরিমাতুর শক্যতে যস্যাঃ,* এদের কত রকমের আশা, সে আশাকে ঘিরে কত রকমের পরিকল্পনা, এটা চাই, সেটা চাই, এই আশাগুলো *অপরিমেয়,* পরিমাপ করা যায় না; মেপে যেটা শেষ করা যায় না, সেটাকে বলে অপরিমেয়। কত দিন পর্যন্ত আশা করতে থাকে? *প্রলয়ন্তামুপাশ্রিতঃ,* মৃত্যু পর্যন্ত এই আশা চলতে থাকে। কথামৃতে ঠাকুর বর্ণনা করছে, মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছে, আর কিছুক্ষণ পরেই মারা যাবে, কিন্তু তখনও বলছে, পিদ্দিমের সলতেটা কমিয়ে দে, তেল পুড়ছে। সারা জীবন গয়না, শাড়ি, জমি, জায়গা, বাড়ির পিছনে দৌড়ে গেল, এখন মরতে যাচ্ছে, এগুলো কে নেবে কেউ জানে না; সবাই এই কথাগুলো একটু ভেবে দেখুন।

কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ, কাম আর কামের ভোগের মধ্যে সর্বদা ডুবে আছে, কাম ভোগ ছাড়া এরা কিছু জানে না। এদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, পুরুষার্থ কি, জীবনের উদ্দেশ্য কি? একটাই উত্তর –*কামোপভোগপরমা,* কামের ভোগ করা। ঈশ্বর বলে কিছু নেই, ধর্ম-অধর্ম বলে কিছু নেই। আমার বাবা মার মনে কামবেগ এসেছিল, সেখান থেকে আমার জন্ম হয়েছে। আমার বাবা মা যা করেছে, আমিও তাই করব, কাম ভোগ করব। আমাদের এসে জিজ্ঞেস করে, আপনি কেন সন্ন্যাসী হলেন? তুমিও তোমার বাবাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, বাবা আপনি বিয়ে করলেন কেন?

তুমি তো একা ছিলে, একা এসেছ, একাই চলে যেতে পারতে, একা থাকতে তোমার সমস্যা কোথায় ছিল, হঠাৎ মাঝখান থেকে একটা স্ত্রী জোগাড় করতে গেলে কেন? কারণ বাচ্চা বয়স থেকে মাথায় ঢুকে আছে, আমাকে ভোগ করতে হবে। ইদানিং কালে এই ভাবটা একটু কমেছে, আগেকার দিনে যদি জিজ্ঞেস করা হত, তুমি বিয়ে করলে কেন? তখন একটাই উত্তর হত, আর কি করব,

বাবা-মা বিয়ে দিয়ে দিল। জীবনে বাবা-মার কোন কথা শুনল না, শুধু বিয়ে করার সময় বাবা-মার বাধ্য সন্তান হয়ে গেল। এদের জন্মই হল জন্মজন্মান্তরের জমে থাকা কাম-বাসনা ভোগ করার জন্য। এরা হল পতন অভিমুখী।

বারো নম্বর শ্লোকে বলছেন, *আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ*। ঠাকুর বলছেন, মানুষ আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা, আবার স্ক্রুপ মারা। আমরা সবাই এই রকম স্ক্রুপ মারা। একটু বিচার করে দেখলে দেখা যাবে, কত রকমের আশা দিয়ে আমাদের মনটা ভরে আছে। কত রকম আশা দিয়ে আমরা বাঁধা হয়ে আছি, শত শত আশা রূপ রজ্জু দিয়ে আমরা সবাই বাঁধা। একটা আশা মিটতেই ভাবতে থাকে, এবার এই আশাটা মেটাতে হবে, সেটা মিটে গেলে ভাবতে থাকবে, এরপরে কি করব। আগেও বলেছিলাম, আমার এক পরিচিত ম্যানেজমেন্টের লোক জিজ্ঞেস করেছিল, 'মহারাজ দশ বছর পর আপনি নিজেকে কোথায় দেখতে চান'? 'দশ বছর পর তো আমার জানা নেই, আরও এগিয়ে জানা আছে'। 'কোথায় দেখছেন'? 'বেলুড় মঠের শ্মশানে, আমার সন্ন্যাসী ভাইরা আমাকে কাঁধে নিয়ে পোড়াতে যাচ্ছে। মাঝখানে আমি এক ঘন্টার কথা বলতে পারি, তার বেশি বলতে পারব না'।

মানুষের কত প্ল্যান, কত স্বপ্ন! বর্তমান কালে কর্মক্ষেত্রে প্রশ্ন করে Where do you see yourself after five years now? Where do you see yourself after ten years now? নিকুচি করেছে, ভাবি, ভাগ্যিস আমি সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলাম, এদের সঙ্গে যদি থাকতে হত, ভেবে আতঙ্ক লাগে, আমিও তো এদের মতই হতাম। ভাল সাধু না হতে পারি, ঈশ্বরের দিকে না গিয়ে থাকতে পারি, শ্রীশ্রীমা যেমন বলছেন, আমার ছেলে ঘুমিয়ে বাঁচবে। তোমার মত প্ল্যানিং, দু বছর পর এখানে থাকব, পাঁচ বছর ওখানে থাকব, এটা অন্ততঃ আমাকে করতে হয় না। আমার কলেজের বন্ধুরা, সবাই বিরাট বড় বড় পজিশানে আছে, আমার কাছে তারা জানতে চায়, 'রামকৃষ্ণ মিশনের হায়ারারকিতে তুমি কোথায় আছ'? আমি বলি, 'কোথাও নেই ভাই। নূতন ব্রহ্মচারী অবস্থায় যেখানে ছিলাম, আজও সেখানে আছি'। সেই বন্ধু বলছে, 'তুমি সগর্বে বলছ তুমি কোথাও নেই, মনে হয় যেন এটা বিরাট বড় achievement'? 'তুমি বুঝতে পারছ না, এটা যে কত বড় achievement এই জীবনে তুমি বুঝতে পারবে না।

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ, আমি এমএলএ হব, আমি এমপি হব, আমি মন্ত্রী হব, আমি প্রধানমন্ত্রী হব, কত রকমের আশা। তার সাথে *কামক্রোধপরায়ণাঃ*, শুধু কাম আর ক্রোধ নিয়ে এরা চলে। কামনা, কামনায় বিঘ্ন হলে ক্রোধ, দেখে নেব তোমাকে। আগে আগে যে সত্ত্ব, রজো আর তমো তিনটে গুণের কথা বলা হয়েছিল, যাদের মধ্যে রাজসিক আর তামসিক গুণ বেশি, এদের বর্ণনা করা হচ্ছে। এরাই পতনের দিকে যায়।

ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্, কাম ছাড়া জীবনে এদের কিছু নেই। মিথ্যা কথা বলে, ঘুষ নিয়ে এরা টাকা সঞ্চয় করবে। আমাকে একজন শ্রোতা বলছিল, 'মহারাজ জীবনে কতটুকু এগুলো নামাতে পারব?' আমি তাকে বললাম, 'ভাই তুমি যদি সরকারী চাকরি করতে, অবশ্যই ঘুষ নিতে। তখন তুমি বলতে, অফিসের কাজ করে তো সরকারের কাজ হল, আমি এতে কি পেলাম? এই মানসিকতা নিয়ে শাস্ত্রের কথাগুলো তুমি শুনতে পারছ, কত সৌভাগ্য তোমার। শাস্ত্রে যেমনটি আছে তেমনটি তোমাকে বলা হচ্ছে, এটাও কি কম সৌভাগ্যের কথা। তাতেও তোমার হচ্ছে না। সব সময় চিন্তা, আমি কতটুকু পাব'। দেওঘরের এক পরিচিত ছাত্র, পড়াশোনায় খুব ভাল ছিল। ভাল একটা সাইনটিস্টের চাকরি পেল। কিন্তু তাতে ওর মন ভরছিল না, ওর ইচ্ছা বিহার সরকারের কিংবা ভারত সরকারের অধীনে কোন সরকারী চাকরি করবে। ভাবটা এই –একবার চাকরিটি পেয়ে যাই, খাঁখোড় কর্ খা যাউঙ্গা। 'খাঁখোড়' শব্দের বাংলা অনুবাদ নেই। কপাল এমন, চাকরি পেল সেলস ট্যাক্সে। জানি না, এতদিনে কত টাকা কামিয়েছে। এই হল অসুরের দৃষ্টান্ত।

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্।।১৩।।

('আজ আমার এই লাভ হল', 'ভবিষ্যতে আমার এই মনোরথ পূর্ণ হবে', 'এই ধন আমার আছে, ভবিষ্যতে এই ধনও লাভ হবে'।)

এখন এটা পেয়ে গেছি, আগামীকাল ওটা পেয়ে যাব। আইটি সেক্টরে চাকরি পেয়ে গেছি, আমেরিকা ঘোরা হয়ে গেছে, এবার শুধু ইউরোপে একটা পোস্টিং হয়ে গেলে মোটামুটি সব হয়ে যাবে। *ইদমদ্য ময়া লব্ধম্,* আজ আমি এটা পেয়ে গেছি; কোনটা পেয়ে গেছি? আচার্য বলছেন, *মনস্তুষ্টিকরম্,* কোনটা পেয়েছি, যেটা আমার মনকে খুশী করে। খালি হিসেব কষে যাচ্ছে, এটা করে নিয়েছি, এরপর এটা করতে হবে। *আগামিনি সংবৎসরে পুনঃ,* এই বছরে এটা পেয়ে গেছি, আগামী বছরে এই প্রমোশন হবে, এত টাকা মাইনে বাড়বে, আমার পার্কস্ এই এই হবে। মাথার মধ্যে কি পেয়েছি, কি কি পেতে যাচ্ছি, সব ঘুরছে। আচার্য কি সুন্দর বলছেন –*তেন অহং ধনী বিখাতো ভবিষ্যামি*, আমার এত টাকা-পয়সা হবে, আমি বিরাট ধনী হয়ে যাব, বিখ্যাত হয়ে যাব, দেশে বিদেশে মিডিয়াতে, নিউজপেপারে আমার নাম ছড়িয়ে যাবে – আমি ওই কোম্পানীর সিইও হয়ে গেছি, সেই কোম্পানীর সিইও হয়ে গেছি। এই কোম্পানীকে টেকওভার করেছি, ওই কোম্পানীকে লাটে উঠিয়ে দিয়েছি।

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্ সুখী।।১৪।।

('এই দুর্জয় শত্রু আমি নাশ করেছি', 'অন্য তুচ্ছ শত্রুদেরও নাশ করব', 'আমি সকলের নিগ্রহে সমর্থ', 'আমি ভোগী', 'আমি পুরুষার্থসম্পন্ন, বলবান্ ও সুখী'।)

শুধু কাম দিয়ে হবে না, জীবনে কি কি পেয়েছি, আরও কি কি পেতে হবে, আগামী বছর কি পাব, দু বছর পর কি পাব, শুধু এতে হবে না। আমার বেশ কয়েকটা শত্রু আছে, সব কটাকে আমি একটা একটা করে দেখে নেব। *অসৌ ম্যা হতঃ শত্রুঃ,* আমার এই শত্রুকে শেষ করা হয়ে গেছে, ব্যাটা খুব লাফাচ্ছিল, শেষ করে দিয়েছি, জানে না কার সাথে পাঞ্জা কষতে চাইছিল। আগেকার দিনে ছিল প্যালেস পলিটিক্স এখনকার দিনে অফিস পলিটিক্স। বিদেশী সিনেমাতে এই ধরণের অফিস পলিটিক্স নিয়ে প্রচুর কাহিনী আছে। ভারতে এখনও সেইভাবে আসেনি, কিন্তু বিদেশে প্রচুর ঘটনা আছে। এই কোম্পানীকে কিনে নিয়ে শেষ করে দেওয়া।

আচার্য এখানে খুব সুন্দর বলছেন, *দেবদত্তনামা ময়া হতো দুর্জয়ঃ শত্রুঃ,* দেবদত্ত নামে আমার এক দুর্জয় শত্রুকে আমি শেষ করে দিয়েছি। *অন্যান্ বরাকান্,* আর অন্য কয়েকটা যে শত্রুগুলো আছে, এরা দুর্বল; ওকেই শেষ করে দিয়েছি, এদের তুড়ি মেরে শেষ করে দেব। *কিম্ এতে করিষ্যন্তি তপস্বিনঃ সর্বথা অপি ন অস্তি মত্তুল্য,* এরা সব খড়কুটো, এরা আমার সামনে কি দাঁড়াবে, এদের এমনিই শেষ করে দেব। আচার্য *তপস্বিনঃ* শব্দ দিয়ে বলতে চাইছেন, এরা আকিঞ্চন, এদের কাছে কিছু নেই। আমি হলাম ঈশ্বর, সবচেয়ে ক্ষমতাবান। আমেরিকাতে যারা বড় বড় বিজনেসম্যান, চীনের ক্ষমতাবান রাষ্ট্রপ্রধানরা যারা আছে, সবাই নিজেদেরকে এটাই মনে করে। আমি যদি চোখ রাঙিয়ে তোমার দিকে একবার তাকাই, তুমি শেষ।

ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্ সুখী, আমি ঈশ্বর, আমি ক্ষমতাবান, আমার জীবনে শুধু সাফল্য আর সাফল্য, আমি বলবান, আমি সুখী। সিদ্ধ কিভাবে? আচার্য বলছেন, *সর্বপ্রকারেণ চ সিদ্ধঃ অহং সম্পন্নঃ পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ নপ্তৃভিঃ,* সন্তান, পৌত্র, পৌত্রী সব আমার, আমি সুখী, আমি সিদ্ধ। তাহলে বাকীরা কি? আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *অন্যে তু ভূমিভারায় অবতীর্ণাঃ,* অন্যরা তো এই

পৃথিবীর ভারস্বরূপ, এরা জগতের বোঝা হয়ে জন্মেছে, এদের শেষ করা দরকার। হিটলার ঠিক এই জঘন্য একটা আদর্শকেই অবলম্বন করেছিল; জুহুদিরা হল ভারস্বরূপ, এদের শেষ করতে হবে। আর যাদের এই রোগ, সেই রোগ আছে, এদেরকেও নির্মূল করে পরিষ্কার করে দিতে হবে। এই পৃথিবীতে এরা জীবন ধারণ করার যোগ্য না। ধর্ম বিশেষ আছে, ওরা মনে করে, ওদের ধর্ম বাদে যারাই আছে সবাই মরার জন্যই এই পৃথিবীতে এসেছে, এদেরকে মেরে শেষ করে দিতে হবে। আমরা একটু চুপচাপ শান্ত মনে বসে যদি ভেবে দেখি, তাহলে দেখা যাবে কোন না কোন ভাবে এই চিন্তা-ভাবনাগুলি আমাদের মনের মধ্যেও উঁকিঝুকি দেয়। এই কারণেই আমাদের পতন হয়।

উপর উপর এদের দেখলে আমরা অনেক সময় মনে করতে পারি যে, এদের সংস্কৃতির অভাব। না, আসলে এরা নিজেকে মনে করছে ঈশ্বর, ঈশ্বর বলতে এখানে বোঝাতে চাইছে, আমি তোমার থেকে বেশি ক্ষমতাবান। সিদ্ধান্তের দিক থেকে যদি দেখা হয়, ভুল কিছু না, কারণ মানুষ মাত্রই ঈশ্বরের সন্তান। সত্যিই কেউ কারুর থেকে কম না। তবে যে পরম্পরা চলে আসছে, সেটাকে ভাঙতে নেই। পরম্পরায় যেটা আছে, বিধির যে বিধান, সেটা ভাঙতে নেই। নিজেকে ঈশ্বর ভাবছে, ঠিক আছে, কিন্তু তার থেকেও মারাত্মক হল, *অনিষ্যে চাপরানপি*, এই ধরণের মানুষের ভদ্রতাটা হারিয়ে যায়। রাজনীতিতে এটা বেশি দেখা যায়, তুই-তাকারি করে কথা বলে, পরিষ্কার বোঝা যায় এরা আসুরীক বৃত্তির। শুধু ক্ষমতার দম্ভ কি? না, তার ক্ষমতা চারিদিকে দেখাতে হবে।

পরের শ্লোকে আপনি ভাল করে নিজেকে জুড়ে নিতে পারবেন, চারিদিকেই এটা দেখা যায়। অন্যগুলিও দেখা যায়, এই যে তেরো নম্বর শ্লোকে বললেন, *ইদমদ্য ময়া লব্ধং*, এটা পেয়েছি, এবার এটা পেতে হবে, এটা করে ফেলেছি, ওটাও এবার করে দেখিয়ে দেব, এগুলোও আমরা একটু চোখ খোলা রাখলে চারিদিকেই দেখতে পেয়ে যাবো। এবার বলছেন।

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশ ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ।।১৫।।

(এইরূপ অবিবেক-মুগ্ধ ব্যক্তিরা মনে করে, 'আমি ধনী ও উচ্চবংশজাত কুলীন', আমার সমান আর কে আছে', 'আমি যজ্ঞ করব, দান করব, আনন্দ করব'।)

আঢ্যঃ শব্দের বাংলা অর্থ হল, কোন একটা জিনিস যখন অতিরিক্ত মাত্রায় থাকে, যেমন গুণাঢ্য, ধনাঢ্য। আমার প্রচুর টাকা-পয়সা আছে, এই বোধটা অল্প বিস্তর অনেকের মধ্যেই থাকে। *অভিজনবান্*, আচার্য এর ব্যাখ্যা করে বলছেন, *সপ্তপুরুষং শ্রোত্রিয়ত্বাদিসম্পন্নঃ*। সাত পুরুষের কথা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। আগেকার দিনের যাঁরা উচ্চ কুলের ব্রাহ্মণ হতেন, যাঁদের বেদের জ্ঞান ছিল; বলছেন, এরা মনে করত, আমার দুটোই আছে, টাকা-পয়সা আছে আর আমার আভিজাত্য আছে, এরা হল ধনাঢ্য। বর্তমান কালে আমেরিকা যেমন, ডলারও আছে বোমাও আছে, সারা দুনিয়াকে শাসন করে বেড়াচ্ছে, কে পাল্লা দিতে যাবে এদের সাথে! নিজেকে কে দেখে তার ঠিক নাই, অহঙ্কার। টাকা আর বন্দুক যদি হাতে থাকে, তাকে কে সামলাবে! এখানে বলছেন, টাকা আছে আর আভিজাত্য আছে। আভিজাত্য হয়ত আছে, কিন্তু সংস্কৃতি নেই, সংস্কৃতি থাকলে এই ধরণের কথা বলবে না।

কোঽন্যোঽস্তি সদৃশ ময়া, আমার মত কে আছে! আচার্য এদের সম্বন্ধে বলছেন, *তেন অপি ন মম তুল্যঃ অস্তি কশ্চিৎ*। যাদের প্রচুর ক্ষমতা হয়ে যায়, আগে যেমন আমেরিকার ছিল, ইংল্যাণ্ডের ছিল, বর্তমান কালে চীনের হয়েছে, বলে, We will protect the interest of our citizens। আমাদের লোকেদের স্বার্থ আগে দেখতে হবে, তাতে বাকিরা পিষে মরে গেলে, তাদের কিছু আসে যায় না। এরা সব অসুর, অসুর ছাড়া কিছু না। ভারত কখন এই রকম চিন্তাই করত না, বলা তো দূরের কথা। নিজেদের মধ্যে একটু মারামারি করত ঠিকই, কিন্তু বাইরের লোকেদের সাথে কখনই

এই রকম করত না। পাটনাতে আমাকে একজন বিহারের লোক বলেছিলেন, আপনারা বাইরে বিহারের এত দুর্নাম করেন, বিহারে এই হয়, সেই হয়; কিন্তু জানবেন এখানে যা কিছু গোলমাল সব নিজেদের ভিতরে। এরা যা মারামারি করার নিজেদের ভিতরে করে। বাই চান্স আপনি যদি ওখানে চলে যান, আপনাকে বলবে, আপনি সরে যান, আপনার লেগে যেতে পারে, এই লড়াই আমাদের মধ্যে। কিন্তু অন্যান্য জায়গায় যারা বদমাইশ লোক হয়, তারা অজানা লোককেও মেরে দেবে। বিহার সহজে অজানা লোককে কেউ কিছু করবে না। যাই হোক, এখানে বলছেন *কোহন্যোহস্তি সদৃশ ময়া*, আমার মত কে আছে! বিশ্ব ইতিহাসে এই ধরণের অসুরদের নিয়ে অনেক ঘটনা আছে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বলছেন, Are you with us or against us, একদিকে ক্ষমতা অন্য দিকে হাতে প্রচুর সোনা, গোল্ডেন গান, এদেরকে সামলানো যায় না। শাস্ত্রে এদেরই বর্ণনা করা হচ্ছে। ইদানিং আমাদের এখানেও দিনরাত এটাই হচ্ছে।

যক্ষ্যে দাস্যামি, শুধু যে আমার টাকা-পয়সা আছে, শুধু যে আমার আভিজাত্য আছে তা না, আমি এমন যজ্ঞ করব, এমন পূজা করব, অন্যরা কেউ কোন দিন করেনি, ভবিষ্যতেও কেউ কোন দিন করতে পারবে না। এমন যজ্ঞ করব, এমন দান করব, সেটা দিয়ে আমি অন্যদের অপমান করে ছাড়ব। মহারাষ্ট্রে গণেশ পূজা আর কলকাতায় দূর্গাপূজা, এর জ্বলন্ত উদাহরণ। এদের সমান কেউ হয় না। পূজা বলে কিছু নেই, যা একটু সাত্ত্বিক ভাবে, নিষ্ঠা নিয়ে পূজা হয় তা কয়কেজনের বাড়ির ভিতরেই হয়, আর কোথাও পূজা বলে কিছু হয় না। পূজা কমিটিগুলির মধ্যে রেষারেষি, আমাদের মত এমন প্যাণ্ডেল আর কেউ করে দেখাতে পারবে না, এটাই এখন বর্তমান কালের সংস্কৃতি হয়ে গেছে। পূজা এখানে কিছু নেই, মা দূর্গা হলেন নিমিত্ত মাত্র।

দূর্গাপূজা করে এই রকম এক পুরোহিতের সাথে অন্য এক দূর্গাপূজার পুরোহিতের দেখা হয়েছে। একজন আরেকজনকে বলছেন, 'একটা পূজা করতেই আমার দম বেরিয়ে যায়, তুই একসাথে দশটা জায়গায় কি করে পূজা করছিস'? এই পুরোহিত বলছে, 'আরে দশটা জায়গায় দূর্গাপূজা করা যায় নাকি, কোন প্রতিমাতে আমি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করি না। প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলে ওটা আর প্রতিমা থাকে না, জীবন্ত বিগ্রহ হয়ে যান। সেবার ত্রুটি হয়ে যেতে পারে, তাই আমি প্রাণ প্রতিষ্ঠাই করি না'। প্যাণ্ডেল, লাইটের কারুকার্য, তারপর আছে বিভিন্ন রকমের থিমের পূজা। মা দূর্গা মণ্ডপে ছটফট করে যাচ্ছেন, সবাই মণ্ডপ সজ্জা, আলোর রোশনাই দেখতেই ব্যস্ত। পূজা মানে একক ভাবে বা সমষ্টি ভাবে পাড়াতে পূজা করব, আমরা সবাই ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হব। এই যে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হব, এর মাধ্যম হল দূর্গা পূজা কিংবা যে কোন পূজা।

সরস্বতী পূজা, এখন যেন এটা একটা ফ্যাশান প্যারেড হয়ে গেছে। এই জিনিসগুলির বর্ণনা হাজার হাজার বছর আগে আমাদের শাস্ত্র বর্ণনা করে দিয়ে গেছে। বড়লোকরা যখন যজ্ঞ করে, একটা যজ্ঞই বারো বছর ধরে করতে থাকবে, দেখাবে আমার মত কেউ যজ্ঞ করতে পারে না। আর তার সাথে *দাস্যামি*, এমন দান করব লোকেরা যাতে সারা জীবন মনে রাখতে পারে, এনার মত দাতা নেই। *মোদিষ্য*, আমি এগুলো করে আনন্দ পাব। একেই আমার আগে থেকে এত ধন সম্পদ আছে, তার উপর আমি এত কিছু করছি, লোকে কত প্রশংসা করবে আমার, এতে আমার আনন্দ হবে। আগে বলছিলেন, আমি এটা অর্জন করেছি, এবার এটা অর্জন করব; একে শেষ করেছি, ওকে শেষ করব, ওতো কিছুই না; সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে এখন বলছেন, শুধু এগুলোই না। যজ্ঞ এমন করব, এমন পূজা করব, যেখানে সব কটাকে আমি ছোট করে ছাড়ব।

এখন তো পূজায় কোথাও যাওয়া আমি বন্ধ করে দিয়েছি। অনেক বছর আগে একটা পূজায় আমাকে উদ্বোধন করতে নিয়ে গিয়েছিল। একজন পরিচিতের মাধ্যমেই যোগাযোগ হয়েছিল। যাওয়ার সময় সারা রাস্তা হিসাব করে যাচ্ছে, পূজারীকে এত দিতে হবে, আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি আপনাকেও পাঁচশ টাকা দিতে হবে। আমি হাতজোড় করে বললাম, আমার টাকা-পয়সা কিছু লাগবে না, আমাকে

ছেড়ে দিন আমার কোন কিছু লাগবে না। ওটাই একটা গ্ল্যামার, বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীকে দিয়ে উদ্বোধন করছি। তারা আবার বাংলাতে কার্ড ছাপিয়ে তাতে গুগুল ট্রান্সলেটে ইংরাজীতেও ছাপাবে। ওই রকম একটা দেখেছিলাম, গুগুল ট্রান্সলেট করে বেলুড় মঠের স্বামী সমর্পণানন্দ হয়ে গেছে Belur Math’s Husband Samarpanananda। এগুলো কি হচ্ছে? একটু ভেবে দেখেছেন? পূজার দিকে কোন আগ্রহ নেই। এদিকে বলবে, বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীকে এনে পূজার উদ্বোধন করিয়েছি, এখানেও অহঙ্কার করবে। *মোদিষ্য*, আনন্দ করব, স্ফুর্তি করব। *ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ*, এমন অজ্ঞান যে মোহে পড়ে আছে।

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ।।১৬।।

(এই ধরণের অসুরস্বভাব ব্যক্তিরা অবিবেকমুগ্ধ হয় এবং বহু সংকল্পে বিক্ষিপ্তচিত্ত, মোহজালে জড়িত ও বিষয়ভোগে আসক্ত হয়ে বিন্মূত্রাদিময় রৌরবাদি নরকে পতিত হয়।)

এই পুরো জিনিসটা কয়েকটা শ্লোক পরে তেইশ এবং চব্বিশ নম্বর শ্লোকে গিয়ে পরিষ্কার করবেন, যেখানে শাস্ত্রের মহিমা বলবেন। জীবন যাপন করতে গিয়ে যা কিছু করছি, সবটাই শাস্ত্র মতে করতে হয়, পূজা অর্চনা শাস্ত্র মতেই করতে হয়। দান দক্ষিণা শাস্ত্র মতে করতে হয়, এটাকে পরের অধ্যায়ে বেশি করে ব্যাখ্যা করবেন। এখানে শুধু বর্ণনা করছেন, শাস্ত্র মতে যারা চলে না, তারা কি রকম হয়।

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা, মাথায় কত রকমের চিন্তা-ভাবনা, এটা চাই, সেটা চাই, এটা করব, ওটা করব, ওকে আমি সাহায্য করেছিলাম, এখন আমাকে ভুলে গেল, যখন সময় আসবে ওকে দেখে নেব, এই সব চিন্তা শুধু মাথার মধ্যে ঘুরে যাচ্ছে। *মোহজালসমাবৃতাঃ*, মোহের জালে একেবারে ফেঁসে আছে। মোহ মানে, একটা জিনিসের প্রতি মন যখন খুব বেশি মাত্রায় চলে যায়। যে কোন একটা জিনিস, যেটা আপনার কাছে নেই, সেটার দিকে দৃষ্টি গেল, আর সেটাতেই আপনার মনটা আটকে থাকল।

প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ, বিষয় ভোগের মধ্যে এমন ডুবে আছে, শুধু ভোগ আর ভোগ, এছাড়া আর কিছু নেই। একদিকে ভোগ করে যাচ্ছে, অন্য দিকে মনের মধ্যে নানা রকমের চিন্তা-ভাবনা ঘুরছে, তার সঙ্গে পূজা অর্চনা যখন করছে, যেখানে একটু মনের শুদ্ধি ভাব আনবে, সেখানেও অহঙ্কার। দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণি, যিনি বিশাল জমিদারের কর্ত্রী, পূজার সময় নানা রকম বিষয় চিন্তা করে যাচ্ছেন, *অনেকচিত্তবিভ্রান্তা* ; ঠাকুর আর থাকতে পারলেন না, একটা চাপড় মেরে তাঁকে সজাগ করে দিলেন। অনেক আগেকার কথা, বেলুড় মঠের এক মহারাজকে একজন শেঠজী কটা টাকা দেবেন বলেছিলেন। মহারাজ গেছেন টাকা আনতে। শেঠজী মহারাজের সামনে বসে পা নেড়েই যাচ্ছে, চঞ্চল মন কিনা। মহারাজ আর থাকতে পারলেন না, What nonsense বলে উঠে বেরিয়ে চলে এলেন। এই রকম লোকের ডোনেশান আমার লাগবে না। মনটা এদের পুরো চঞ্চল, অনিয়ন্ত্রিত মন, এদের ছোঁওয়া জল খেয়ে নিলে শরীর খারাপ করবে। ভিতরে কামনা-বাসনা গিজগিজ করলে মন স্বাভাবিক ভাবেই চঞ্চল হবে, অনিয়ন্ত্রিত হবে। বানরের মত স্বভাব, একটা কিছু পেয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে ধরে নিল, আর ফেলতেও ততক্ষণ। এই চঞ্চল মনের স্বভাবের লোকেদের সাথে বেশিক্ষণ থাকলে আমাদের মনটাও বানরের মত হয়ে যাবে। চঞ্চল মন আবার অজ্ঞানে ভরা। এদের পরিণাম কি? *পতন্তি নরকেহশুচৌ*, এদের নরকে পতন হয়।

বর্তমান কালে সারা দেশে কিছু কিছু বুদ্ধিজীবি আছে, তারা একটা কথা প্রায়ই বলে, মন্দির করার কি দরকার, মন্দিরের বদলে হাসপাতাল করলে কত লোকের চিকিৎসা হত। আরে ভাই, তোমার বড় বড় মল, সিনেমা হলগুলো ভেঙে হাসপাতাল করে দিলেই পার। অন্যান্য ধর্মের যে

ধর্মস্থানগুলি আছে সেগুলোকে নিয়ে বলতে পারছ না, শুধু হিন্দুদের ধর্মস্থান নিয়েই কেন এত গলাবাজী! হিন্দুরা কি শুধু মার খাবার জন্যই দাঁড়িয়ে থাকবে? একটু অন্য ধর্মের নামে বলে দেখো দেখি। মল, সিনেমা হল তোমাদের ভাঙতে ইচ্ছে করে না, মন্দিরের নামেই যত তোমার আপত্তি। আহার, নিদ্রা, মৈথুনের বাইরে মানুষগুলোর আর কিছু নেই।

কোথায় যাবে এরা? *পতন্তি নরকেঽশুচৌ*, এমন নরকে যাবে, যেটা অত্যন্ত অশুচী, অত্যন্ত অপিবত্র। আচার্য শঙ্কর বলছেন, এরা বৈতরণী আদি নরকে গিয়ে পড়বে। নর্দমাতে কিছু পোকা থাকে, পোকাগুলো সেখানে আনন্দে থাকে। মানব শরীর দিয়ে যদি বেশি ভোগ করা হয়, ভগবান দেখছেন, কত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উন্নত হতে হতে আজ এই দুর্লভ মানব শরীর পেয়েছে, যে শরীর দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের সাথে এক হতে পারবে, সেই মানব শরীরকে সেই কাজে না লাগিয়ে ভোগের দিকে ঢেলে দিয়েছে। তোমার এই মানব শরীর দিয়ে পুরোপুরি ভোগ করতে পারবে না। তাই ভগবান এদের নর্দমার পোকা করে আবার ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। যাও এবার চব্বিশ ঘণ্টা শুধু ভোগের মধ্যে ডুবে থাক।

বাইবেলে যীশুর গল্প আছে, Story of Twenty Talents, একজন বড়লোক তার দুই সেবককে টুয়েন্টি ট্যালেন্টস করে দিয়েছেন, দিয়ে বলে দিলেন, পরে আমি তোমাদের কাছ থেকে টুয়েন্টি ট্যালেন্স চেয়ে নেব। এক বছর পর যখন সেই বড়লোক সেবকদের কাছে চেয়েছে, তখন প্রথম সেবক বলল, 'হুজুর আপনার দেওয়া টাকা আমি খুব সমলে রেখে দিয়েছি'। মালিক সেই সেবককে বললেন, 'তুমি একটা অলস', বলে টাকাটা ফেরত নিয়ে নিয়েছেন। দ্বিতীয় সেবক বলল, 'আমি এই টাকাটা ব্যবসাতে লাগিয়ে দিয়েছি, সেখান থেকে বেড়ে এত টাকা হয়েছে'। সেই সেবককে বলা হল, 'তুমি নিজে খেটে করেছে, টাকাটা তুমিই রেখে দাও'। ভগবানও ঠিক এটাই করবেন, আহার, নিদ্রা, মৈথুনই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তিনি তাকে সেখানেই পাঠাবেন, যেখানে সব সময় খুব ভাল করে আহার, নিদ্রা, মৈথুন ভোগ করতে পারবে। কি আর করা যাবে, *তেন উপচিতকল্মষাঃ*, আচার্য বলছেন, জঘন্যতম অশুদ্ধ নরকাদিতে এদের পতন হবে। কারণ এরা ভোগ ছাড়া কিছু জানে না, আর মানব শরীর দিয়ে এই ভোগ হবে না, এই ধরণের ভোগ করার জন্য দরকার নর্দমার কীটের শরীর।

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্।।১৭।।

(এরা আত্মশ্লাঘাবিশিষ্ট এবং ধননিমিত্ত মান ও স্ফীত হয়ে দম্ভের সাথে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনপূর্বক নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে।)

আগে দূর্গা পূজাকে নিয়ে যেটা বলা হল, সেটারই এখানে বর্ণনা করছেন। আচার্যের ভাষায় এরা নিজেদের মনে করে *সর্বগুণবিশিষ্টতয়া আত্মনা সম্ভাবিতা আত্মসম্ভাবিতা ন সাধুভিঃ*, *আত্মসম্ভাবিতা* কাকে বলে? যে মনে করে আমার মত আর কেউ নেই। *সর্বগুণবিশিষ্টতয়া*, বলে আমার মত গুণী কেউ নেই। অনেক সময় নিজের প্রশংসা নিজে বলতে পারে না বলে, নিজের রাজ্যের উপর নিয়ে যাবে, নিজের ভাষার উপর নিয়ে যাবে; আমার রাজ্যের মত আর রাজ্য নেই, আমার বাংলা ভাষার মত আর ভাষা নেই, আমার সংস্কৃতের মত ভাষা নেই। ইদানিং কালে একটা কথা খুব চলছে, সংস্কৃত যদি কম্প্যুটারের ভাষা হত তাহলে খুব ভাল হত। নিজেরা বলতে পারে না, আমার মত ওস্তাদ নেই, সংস্কৃতের নামে চালিয়ে দিচ্ছে। কেউ এটা জানে না যে, সংস্কৃত যদি কম্প্যুটারের ভাষা হয়, কম্প্যুটার কনফিউজড্ হয়ে শাট্ ডাউন করে যাবে। কারণ সংস্কৃতের একটা শব্দেরই পঞ্চাশ খানা অর্থ হয়। আবার একই বস্তুর পঞ্চাশ খানা নাম হয়। আসলে মানুষ নিজের প্রশংসা নিজে সরাসরি করতে পারে না, কারণ আমার মত কেউ নেই বললে, লোকেরা তাকে

একজন অহঙ্কারী বলে মনে করবে, সেই জন্য তখন নিজের ভাষা, নিজের ধর্ম, নিজের রাজ্যের উপর চলে যায়।

আত্মসম্ভাবিতাঃ আরও খারাপ কেন? আচার্য বলছেন, *ন সাধুভিঃ*, যাঁরা সাধুপুরুষ, সমাজের যাঁরা ভাল মানুষ, তাঁরা তাকে পাত্তা দেয় না, তাকে মানে না। একজন খুব নামকরা রাজনৈতীক নেতা, ওনার সময়ে খুব বিরাট বড় নেতা ছিলেন, এখন সে-রকম কিছু না। উনি খুব দুঃখ করে বলতেন, রামকৃষ্ণ মিশন আমাকে কখন ডাকে না। আমরা অনেক ঘটনা জানি, শুনেছি না, জানি; আমাদের বড়রা নাকচ করে দিয়েছেন, 'ওই রাজনৈতীক নেতা যদি যেখানে থাকবে আমি সেখানে যাব না। তখন তিনি শুধু নেতাই নন, রাজা। তোমার ক্ষমতা থাকতে পারে, কাজের জন্য তোমার কাছে আমি যাব, কিন্তু সম্মান আমি দিতে পারব না।

স্তব্ধ মানে বিনয়ের অভাব, ভিতরে একটুও বিনয়ের ভাব নেই। *ধনমানমদান্বিতাঃ*, সব সময় মনে করছে আমার এত টাকা, আমার এত সম্পত্তি, আমার এত মান, আগে যেটা বলা হল; ফলে কি হয়, *যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্*, যজ্ঞ যখন করে, পূজা যখন করে, যেটাই করুক, যজ্ঞ বা পূজাটা নামমাত্র বাকিটা আড়ম্বর, লোক দেখানো। নাম কা ওয়াস্তে একটা প্রতিমা রেখে দিল, আর ওটাকে উপলক্ষ করে চারদিন পাঁচদিন ধরে ঢাক বাজিয়ে, মাইক বাজিয়ে শুধু হৈ হুল্লোড় করবে। আমাদের এক মহারাজ ছিলেন, অনেক দিন আগে গত হয়েছেন। উনি পূজার উদ্বোধন করতে ডাকলে যেতেন। কিন্তু যাওয়ার আগে এক গুচ্ছ শর্ত আরোপ করতেন, তোমরা কথা দাও, পূজার এই কদিন সিনেমার গান বাজাবে না, কোন আধুনিক গান বাজাবে না, এই ধরণের অনেকগুলো শর্ত দিতেন, যদি এতে কেউ রাজী হত তবেই তিনি যেতেন।

যাঁরা গীতার এই কথাগুলো শুনছেন, তাঁদেরকে এটাই বলা যে, যখন পূজা করবেন, বা কোন পূজার সঙ্গে যুক্ত হবেন, দেখবেন যেন *নামযজ্ঞৈস্তে*, নাম কেনার জন্য, আড়ম্বর দেখানোর জন্য নামমাত্র পূজা যেন না করা হয়। একটা বিশেষ দল ক্ষমতা আসার পর দূর্গাপূজা তো এখন একটা সামাজিক উৎসব হয়ে গেল, পূজাতে কোন নিষ্ঠা নেই, নিয়ম নেই, বিধি নেই, এগুলো কি হচ্ছে! প্রদর্শনী কর, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কর, কেউ আপত্তি করছে না, পূজার সঙ্গে কেন?

আচার্য বলছেন, এই ধরণের লোকেরা *নামমাত্রৈঃ যজ্ঞৈঃ তে দম্ভেন ধর্মধ্বজিতয়া অবিধিপূর্বকং বিহিতাঙ্গেতিকর্তব্যতারহিতৈঃ*, ধর্মধ্বজিতা আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, শুধু ঝাণ্ডাটাই বিরাট উঁচু, ভিতরে কিছু নেই। আমাদের বেশির ভাগ পূজাবিধি আসে তন্ত্র থেকে, সেখানে পূজার বিভিন্ন অঙ্গ ভাগ করে বলে দেওয়া হয়েছে এই এই ভাবে করবে, এভাবে নৈবেদ্য দেবে, এভাবে হোম করবে ইত্যাদি। কিন্তু এখন কোন পূজাতে কিছুই পালন করা হয় না। এমন কি কিভাবে করতে হয় সেটাও জানে না, কর্তব্য জ্ঞানও নেই।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ।।১৮।।

(এরাই আবার সন্মার্গবর্তীদের গুণে দোষ আবিষ্কার করে এবং তাঁদের অনুকরণ না করে অহঙ্কার, পরপীড়াদায়ক বল, ধর্মলঙ্ঘনের হেতু দর্প, স্ত্রী প্রভৃতি বিষয়ে কাম ও ক্রোধ সম্যক্-রূপে আশ্রয়পূর্বক স্বীয় দেহে ও অপর দেহে (বুদ্ধি ও কর্মের সাক্ষিরূপে) অবস্থিত আমাকে (ঈশ্বরকে) দ্বেষ করে এবং শ্রুতি ও স্মৃতিরূপ আমার শাসন অতিক্রম করে।)

সব কিছুতে 'আমি' 'আমি' শুধু 'আমি' 'আমি' করা, এটাকে বলছেন অহঙ্কার। এই অহঙ্কারে কি হয়? আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *অহঙ্করণম্ অহঙ্কারো বিদ্যমানৈঃ অবিদ্যমানৈঃ চ গুণৈঃ আত্মনি*, যে গুণগুলো আছে, আর যে গুণগুলো নেই, সেই গুণগুলিকে নিজের উপর আরোপিত করে নেয়। আপনি শুদ্ধ আত্মা, আপনি উপাধিশূন্য, আপনি ঈশ্বরের সন্তান, আপনি ঈশ্বরের ভক্ত; এই

জিনিসগুলোকে ভুলে গিয়ে মানুষ নিজের সামান্য একটু যে গুণ আছে, সেই গুণগুলিকে ঢাকঢোল পিটিয়ে পিটিয়ে চারিদিকে জাহির করবে। একটা বাচ্চাকে যদি একটা ট্যামট্যামা ধরিয়ে দেন, সেই বাচ্চা এমন বাজান বাজাবে, না ভেঙে যাওয়া পর্যন্ত বাজিয়েই যাবে। তারপর সেটা যদি ভেঙে যায় তারপর যত জিনিস আছে সেটাকে ট্যামট্যামা বানিয়ে দেবে। আমাদের গুণের ঢাকঢোল পেটাতে আমরা এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, যেখানে ঢাকঢোল পেটাতে নেই সেখানেও পেটাতে শুরু করে দিই। নিজের গুণের ঢাক নিজেই পেটাচ্ছে, বেশি কথা বললে যা হয়, দুটে চারটে গুণ যেটা তার মধ্যে নেই, সেটাও বলতে থাকবে, এটাকেই বলে অহঙ্কার। এটা আচার্য শঙ্করের ব্যাখ্যা।

আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, অহঙ্কার, বল, দর্প এগুলো অবিদ্যা থেকেই হয়। এখন অহঙ্কারকে নিয়েই শুধু বলে যাচ্ছেন, *কষ্টতমঃ সর্বদোষাণাং মূলং সর্বানর্থপ্রবৃত্তিনাং*, সমস্ত অনর্থের মূলে অহঙ্কার। ঠাকুর কি সুন্দর একটা সাধারণ গল্প দিয়ে অহঙ্কারের দুর্গতির চিত্রটা আমাদের মনে গেঁথে দিচ্ছেন। গরু হাম্বা হাম্বা করে বলে তার কত কষ্ট, রোদে জলে লাঙল টানছে। মরে গেলেও রেহাই নেই, তার চামড়া দিয়ে ঢাক তৈরী করা হচ্ছে, সেই চামড়াকে লাঠি দিয়ে কত পেটায়। শেষে নাড়ী থেকে তাঁত তৈরী হয়ে ধুনুরীর হাতে পড়লে তখন বলে তুঁহু তুঁহু, তখন গিয়ে তার মুক্তি হয়। এগুলো কাহিনী, কাহিনীর ভাবটুকু নিতে হয়, কি বলতে চাইছেন বুঝতে হয়। সমস্ত অনর্থের মূলে হল হাম্বা হাম্বা, আমাদের ভাষায় আমি আমি, হিন্দীতে ম্যায় ম্যায়। ছাগল ম্যা ম্যা করে, গরু হাম্বা হাম্বা করে, মানুষ আমি আমি করে, এটাই সর্বনাশের মূল। এই অহঙ্কারের ফলেই মানুষ কামনা আর আসক্তি দিয়ে অপরকে দাবাতে চেষ্টা করে। আর এটাকে ওয়ার্ক আউট করার জন্য যে শক্তি দরকার, সেটাকে বলে বল।

বল কি? কাম আর রাগের অর্থ অনুরাগ, এই দুটোর জন্য যে শক্তি তৈরী হয়, যে শক্তি দিয়ে অপরকে দাবানোর যে ক্ষমতা আসে, আর এই ক্ষমতাটা বাস্তবিক হয়, এটাকেই বলছেন বল। আর এই ক্ষমতা দিয়ে দু-চারজনকে যখন দাবিয়ে দিতে সফল হয়ে যায়, সেখান থেকে তখন উৎপন্ন হয় দর্প। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, ব্যাঙের একটা টাকা হয়েছে, কোথাও থেকে হয়ত কুড়িয়ে পেয়েছে। একটা হাতি ব্যাঙের গর্তের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, হাতিকে লাথি দেখিয়ে ব্যাঙ বলছে, 'তোর এত দুঃসাহস, আমার বাসাকে ডিঙিয়ে যাওয়া!' ঠাকুরের কথাই শাস্ত্র, শাস্ত্র এখানে দর্শনের মাধ্যমে বলছেন, সেটাকেই ঠাকুর গল্পের মাধ্যমে বলেছেন। দর্প হয়ে গেলে মানুষ তখন ধর্ম পথকে উল্লঙ্ঘন করে যায়, এরা আর ধর্ম পথে টিকে থাকতে পারে না। ধর্মকে উল্লঙ্ঘন করা মানে, নিজের ভিতর যে ঈশ্বর আছেন, আর অপরের ভিতর যে ঈশ্বর আছেন, সেই ঈশ্বরকেই এরা লঙ্ঘন করে দেয়। সবারই ভিতর সেই এক অন্তর্যামী, আমাদের ব্যবহার দ্বারা অপরকে কষ্ট দেওয়া মানে সেই অন্তর্যামীকেই কষ্ট দেওয়া, সেই ঈশ্বরকেই অবহেলা করা।

অন্তর্যামীর ব্যাপারটা আমাদের সবারই খুব ভাল করে বুঝে নেওয়া দরকার। সবারই ভিতর যে চৈতন্য শক্তি, যে চৈতন্য সত্তা রয়েছেন, তিনি আমাদের সব কিছুকে নির্বিকার ভাবে দেখে যাচ্ছেন, তিনি শুধু অনুমোদন করেন, কিছু বলেন না। তিনি কাউকে চালিত করেন না, কাউকে নির্দেশ দেন না, কিন্তু তিনি আছেন বলেই মন, ইন্দ্রিয় সব কাজ করছে। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে, জীবন চালাতে গিয়ে মানুষ ঈশ্বরের যে আদেশ, শাস্ত্রের যে আদেশ সেটাকে লঙ্ঘন করে বসে। কিভাবে করে? ক্রোধ দিয়ে, ক্রোধ যখন করছে তখন তাতে নিজেরও ক্ষতি, অপরেরও ক্ষতি হয়।

কাম, এখানে কাম বলতে আচার্য পরিষ্কার বলছেন, নারীর প্রতি পুরুষের, পুরুষের প্রতি নারীর যে আকর্ষণ। *ক্রোধ*, এখানেও ক্রোধকে আচার্য বলছেন, ক্রোধ হল এই সমস্ত কিছুর জন্য অপরের অনিষ্ট করার যে ইচ্ছা, এটাই ক্রোধ। ক্রোধকে আচার্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আবার বলছেন, এই ক্রোধ সমস্ত কিছুকে আলম্বন করে আছে। আচার্য এখানে শেষে খুব

সুন্দর বলছেন, *স্বদেহে পরদেহেষু চ তদ্বুদ্ধিকর্মসাক্ষিভূতং*, কর্মসাক্ষী মানে সমস্ত কর্মের যিনি সাক্ষী, তিনি সাক্ষী রূপে বিদ্যমান, তিনি কোন কিছুতে জড়ান না, সাক্ষী রূপে চুপচাপ শুধু দেখে যাচ্ছেন। পরে কর্মফলের যখন কার্যকর হওয়ার সময় হবে, তখন তিনি অনুমোদন করে বলে দেবেন, হ্যাঁ এই লোকটাই এই কর্মের হোতা। আদালতে সাক্ষী যেমন ধরিয়ে দেয়, হ্যাঁ এই লোকটাই এই এই অন্যায় কাজ করছিল, তিনিও ঠিক সেই রকম দেখিয়ে দেন।

প্রদ্বেষঃ তং কুর্বন্তঃ অভ্যসূয়কাঃ, অভ্যসূয়কাঃ মানে সৎপুরুষদের যারা নিন্দা করে বেড়ায়। নিন্দাকে আচার্য বলছেন, *সন্মার্গস্থানাং গুণেষু অসহমানাঃ*, যাঁরা ভাল মানুষ, সজ্জন ব্যক্তি, তাঁদের গুণকে ও তাঁদেরকে এরা সহ্য করতে পারে না। আপনারা যাঁরা গীতার এই ক্লাশ শুনছেন, দেখবেন আপনি যে শুনছেন, এটাকেই অনেকে পছন্দ করতে পারছে না। কেউ যদি বেশি মন্দিরে যায় বা ধর্মাচরণ করে তাকে পিছন থেকে টিটকারি মারবে, এটাকে বলে *অভ্যসূয়কাঃ*। আপনি ভাল আছেন, এটা তাদের সহ্য হবে না; সহ্য হয় না বলে আপনার সামনে পিছনে কটূ কথা বলবে। পর পর রাজসিক, তামসিক লোকের কত রকম আসুরীক বৃত্তির বর্ণনা করে যাচ্ছেন। এদের কি গতি হয়? সেটাই এবার পরের শ্লোকে ভগবান বলছেন।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু।।১৯।।

(ধর্মাধর্মফল-প্রদাতা আমি সন্মার্গ-দেষপরায়ণ, ক্রূর, অশুভকারী নিকৃষ্ট নরগণকে অধর্মদোষবশতঃ এই নরকরূপ সংসারপথে আসুর যোনিতে পুনঃপুনঃ নিক্ষেপ করি।)

যারা *অভ্যসুয়কাঃ*, এরা হল সৎমার্গের বিরোধী, সাধুপুরুষদের দ্বেষ করে, এটাকে বলে বৈষ্ণব অপরাধ। ভাল মানুষের প্রতি যদি কোন অন্যায় আচরণ করা হয়, এই অপরাধের ক্ষমা হয় না। ভগবান বলছেন, এদের সবাইকে আমি আসুরী যোনিতে বারবার নিক্ষেপ করতে থাকি। এতক্ষণ তিনি সাক্ষীরূপে ছিলেন, কিন্তু তিনি ভগবান কিনা, তাই কর্মফলটাও তিনি দেন; এবার তিনি কর্মের ফলটাও দিচ্ছেন। আচার্য বলছেন, *এব নরকসংসরণমার্গেষু অধর্মদোষবত্ত্বাৎ প্রক্ষিপামি সংততম্ অশুভকর্মকারিণ ক্রূরকর্মপ্রয়াসু ব্যাঘ্রসিংহাদিযোনিষু ক্ষিপামি*, এক ধাপেই নরকে যাওয়া যায় না, স্বর্গে যাওয়ার জন্য যেমন একটা প্রস্তুতি দরকার, নরকে যাওয়ার জন্যও প্রস্তুতি লাগে। নরকে যাওয়ার কি সেই প্রস্তুতি? ক্রূরকর্মা যারা, বাঘ, সিংহের মত হিংস্র যোনিতে কিছু দিন রাখেন, সেখানে এরা আরও ভাল ভাবে তৈরী হয়ে যায়। ওইসব যোনিতে কয়েকজন্ম থেকে যখন ফল পাকল; এবার ওকে নরকে পাঠিয়ে দেবেন। কত দিনের জন্য? অনেক দিনের জন্য, তুমি এটারই যোগ্য, এখানেই থাক। শাস্ত্র মতে যদি না চলে, ঈশ্বরের আদেশকে যদি লঙ্ঘন করা হয়, ধর্ম পথে যদি না থাকে, প্রথমে এদের অশুভ যোনিতে কয়েকটা জন্ম রাখবেন, তারপর সেখান থেকে অশুচী নরকে রাখবেন। এটাই চলতে থাকবে, সৃষ্টি তো আর একদিনে শেষ হয় না, এর মধ্যেই ঘুরপাক করতে থাকবে।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্।।২০।।

(হে অর্জুন, মূঢ়গণ জন্মে জন্মে আসুর জন্ম প্রাপ্ত হয় এবং আমাকে লাভ করা দূরে থাকুক, সন্মার্গ ও ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত না হয়ে পূর্বজন্মাপেক্ষা আরও নীচযোনি লাভ করে।)

যারা ঈশ্বরবিমুখ, শাস্ত্রবাক্য ও শাস্ত্রের আদেশ যারা মানতে চায় না, এখানে তাদের অবস্থার বর্ণনা করছেন। কিছু বাঘ সিংহ আছে, যারা বিবর্তন হতে হতে এসেছে, কিছু বাঘ সিংহ আছে যারা উপর থেকে অধঃপতন হয়ে এসেছে। একটা অশুভ যোনিতে সবাই যে উপর থেকে নীচে নেমেছে তা না, নীচ থেকেও আসে। যেগুলো বেশি হিংস্র, বুঝবেন ওগুলো উপর থেকে নীচে নেমেছে। যে যোনিগুলি কম হিংস্র, বুঝতে হবে এরা নীচের থেকে আস্তে আস্তে ক্রমশ উপর দিকে উঠছে।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি, এই রকম আসুরী যোনিতে জন্ম জন্ম ধরে এরা ঘুরতে থাকে। *মামপ্রাপ্যৈব*, অন্য কোন যোনিতে আমাকে পাওয়া যায় না। এই সব যোনিতে ঈশ্বরের প্রতি এদের ভক্তি হয় না, ভক্তি হয় না বলে ঈশ্বরকেও এরা পায় না। ঈশ্বরে ভক্তি না হওয়ার জন্য আরও নীচ যোনিতে এদের পতন হতে থাকে। এই জন্যই কিছু কিছু ধর্মে ওরা নরককে চিরন্তন করে দিয়েছে। এই শ্লোকটাকে আধার করেই মাধ্বাচার্য এবং কিছু কিছু বৈষ্ণবরা নরককে চিরদিনের জন্য স্থায়ী বানিয়ে দিলেন। এটা কিন্তু হিন্দুদের মত না।

ততো যান্ত্যধমাং গতিম্, অধম গতি প্রাপ্ত হওয়াটা চলতেই থাকে। কেন চলছে? কারণ এই সব যোনিতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হয় না। কেউ যদি উপরের দিকে উঠতে চায়, তার জন্য তাকে শাস্ত্রে প্রীতি এবং ঈশ্বরের প্রতি আগে ভক্তি অর্জন করতে হবে। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও শাস্ত্র প্রীতি যদি না থাকে কোন দিন সে উপরের দিকে উঠতে পারবে না। খেটেখুটে কিছু ভাল কাজ করে মানুষ পর্যন্ত হয়ত এসে গেছে, কিন্তু আবার সেই নীচে ঠেলে দেবে, প্রমোশন হয়েছিল আবার ডিমোশন হয়ে যাবে। এতক্ষণ যা কিছু বলা হল, খুব সংক্ষেপে একুশ নম্বর শ্লোকে বলছেন। একুশ নম্বর শ্লোকটা যদি কারুর বোধগম্য হয়ে যায়, তাহলে ষোড়শ অধ্যায়ের সার সে বুঝে নেবে।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ।।২১।।

(কাম, ক্রোধ এবং লোভ –এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ। এই তিনটি জীবের অধোগতিদায়ক। এই তিনটি দ্বারে প্রবেশ করলে মানুষ পুরুষার্থের অযোগ্য হয়। অতএব এই তিনটি বিষবৎ ত্যাগ করা উচিত।)

বিনাশের দরজা তিনটি – কাম, ক্রোধ ও লোভ। একটা বিরাট উঁচু বাড়ি, কোন ছাদ নেই, রেলিং নেই, দরজা দিয়ে আপনি হাঁটতে হাঁটতে ভিতরে চলে গেলেন, ধাঁই করে পড়ে গেলেন, সব শেষ। কদিন আগে খবরের কাগজে পড়লাম, একটা কুকুর বানরের একটা বাচ্চাকে মেরে ফেলেছে। বানরদের স্বজাতি প্রীতি অন্যান্য পশুদের থেকে অনেক বেশি। বানরের বাচ্চাকে মেরে দেওয়াতে সব বানরগুলো প্রচণ্ড হিংস্র হয়ে উঠেছে। সব কটা বানর একত্র হয়ে এক-একটা কুকুরকে ধরছে, ধরে একটা উঁচু গাছে উঠে ওখান থেকে কুকুরটাকে নীচে ফেলে দিচ্ছে। কুকুরের ওখানেই মৃত্যু। এই করে ওই এলাকায় প্রায় দুশোটা কুকুরকে বানররা মেরে দিয়েছে। অত উঁচু থেকে যদি কারুর পতন হয়, সে শেষ।

আমাদের মরার পথ কি? কাম, ক্রোধ ও লোভ। এই তিনটের ব্যাখ্যা অনেকবার করা হয়েছে। বিভিন্ন জিনিসের প্রতি কামনা-বাসনা এটাই কাম, কামের পূর্তি না হলে সেটাই ক্রোধে রূপান্তরিত হবে, আর যতক্ষণ ওই জিনিস না পাচ্ছে ততক্ষণ ওই জিনিসটার প্রতি একটা আসক্তির ভাব থাকবে, এটাই লোভ। সেইজন্য বলছেন, কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি হল বিনাশের দ্বার। বিনাশের হাত যদি বাঁচতে চাও, তাহলে *তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ*, এই তিনটকে ছাড়ো।

বিনাশ থেকে কিভাবে বাঁচব? এবার ভগবান সেই পথটা দেখিয়ে দিচ্ছেন।

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্।।২২।।

(হে কৌন্তেয়, দুঃখমোহাত্মক ও শ্রেয়ঃপ্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক এই তিনটি নরকদ্বার থেকে মুক্ত হলে মানুষ ঈশ্বরারাধনাদিরূপ স্বীয় কল্যাণসাধনে সমর্থ হয় এবং সেই শ্রেয়ঃ অনুষ্ঠানবশতঃ ইহলোকের সুখভোগ ও মনুষ্যজন্মের সার্থকতারূপ শ্রেষ্ঠগতি (মোক্ষ) লাভ করে।)

নানান রকমের যে কামনা-বাসনা, নানান রকমের যে দুঃখ, এবং তার যে তিনটে দ্বার, এটা থেকে যে মুক্ত হয়ে যেতে চাইছে, বিনাশের পথে যে আর যেতে চাইছে না, তাকে কি করতে হবে? এই তিনটেকে –কাম, ক্রোধ ও লোভ ছাড়তে হবে। যিনি এই তিনটেকে ছেড়ে দিয়েছেন, এবার তিনি জীবনের সুপথে চলতে শুরু করলেন। এটাই আত্মকল্যাণের সাধন। আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *যৎপ্রতিবদ্ধঃ পূর্বং নাচরতি তদপগমাদ্ আচরতি*, এই যে তিনটে জিনিস, কাম, ক্রোধ, লোভ, আমাদের কোমরে দড়ি দিয়ে একদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, আপনি সেই দড়িটা কেটে দিয়েছেন, এবার আপনি চললেন অন্য পথে। *যৎপ্রতিবদ্ধঃ*, কাম, ক্রোধ, লোভ আমাদের এমন ভাবে বেঁধে রেখেছিল যে, আমরা সৎ আচরণ করতে পারছিলাম না। আমরা চাইলেও কেন সৎ আচরণ করতে পারি না? কারণ কাম, ক্রোধ, লোভ আমাদের বেঁধে রেখেছে। এই তিনটে থেকে যদি মুক্তি পেয়ে যান, যেভাবেই হোক, নিজে চেষ্টা করে হোক, গুরু কৃপায় হোক, যেভাবেই হোক, মুক্তি আপনাকে পেতে হবে। ধর্ম জীবন এমনি শুরু হয় না, আমাদের জীবনে শুধু সমস্যা আর সমস্যা। একটু কাম, ক্রোধ, লোভ থেকে বেরিয়ে আসুন না, সমস্যা কোথায় চলে যাবে টেরও পাবেন না। এই তিনটে থেকে যতক্ষণ না বেরিয়ে আসছেন, ততক্ষণ আপনার আধ্যাত্মিক জীবনও শুরু হবে না।

মানুষ কেন আত্মহত্যা করে? কাম, ক্রোধ আর লোভের জন্য। এই তিনটে কারণ ছাড়া মানুষ অন্য কোন কারণে কক্ষণ আত্মহত্যা করে না। মানুষ কেন হতাশায় নিমজ্জমান হয়ে যায়? কাম, ক্রোধ আর লোভের কারণে। মানুষ কেন অপরের ক্ষতি করে বা করতে চায়? কারণ, কাম, ক্রোধ ও লোভ। সারা বিশ্বে যেখানে যা সমস্যা আছে, আপনার জীবনে সমস্যা, আপনার আশেপাশে যারা আছে তাদের সমস্যা, সব সমস্যার পিছনে কাম, ক্রোধ ও লোভ। ক্রোধের এত শক্তি যে মানুষকে দিয়ে আত্মহত্যা করিয়ে নেয়। আমার এক বন্ধুর স্ত্রী আত্মহত্যা করেছিলেন। বন্ধু খুব নামকরা ডাক্তার, স্ত্রীও নামকরা ডাক্তার ছিলেন। বন্ধুটি পরে দুঃখ করে বলছিলেন যে, আমার স্ত্রীর মধ্যে এত ক্রোধ ছিল যে, একটা অবস্থায় গিয়ে নিজেকে আর সামলাতে পারল না।

একবার যদি কেউ এই তিনটে থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, তবেই সে এবার পরমপ্রাপ্তির পথে চলতে শুরু করল। এমনকি সে মোক্ষও পেয়ে যেতে পারে। যিনি ঈশ্বর লাভ করতে চাইছেন, মোক্ষপ্রাপ্তি করতে চাইছেন, তাঁকে কি করতে হবে? বিনাশের এই তিনটে দরজাকে বন্ধ করে দিতে হবে। দরজা বন্ধ, জানালা বন্ধ, উত্তুরের কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস, দমকা হাওয়া কোনটাই আর আসতে পারবে না। কাম, ক্রোধ, লোভের এই তিনটে দরজা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। এবার তাঁর ধর্ম আচরণ শুরু হবে। যাঁরা শুনছেন, তাঁদের বলছি, জপধ্যান আপনাদের দ্বারা হবে না, পূজা অর্চনা, প্রার্থনা, ধর্ম জীবন কোনটাই হবে না, যতক্ষণ না কাম, ক্রোধ, লোভ এই তিনটে শত্রুর প্রবেশ দ্বারকে বন্ধ করে দিচ্ছেন। কিভাবে এগুলো ত্যাগ হবে, কি হবে মানুষ ভাল পথে যাবে?

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।।২৩।।

(যে কর্তব্যাকর্তব্য-নির্ধারণের কারণ শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধ উল্লঙ্ঘনপূর্বক স্বেচ্ছাচারী হয়ে বিহিতের আচরণ করে না, অথচ নিষিদ্ধের আচরণ করে, সে চিত্তশুদ্ধরূপ পুরুষার্থলাভের যোগ্য হয় না। সে ইহলোকে স্বর্গ বা মুক্তি লাভ করতে পারে না।)

খুব মূল্যবান শ্লোক। যে শাস্ত্রের বিধানকে ছেড়ে দিয়েছে, তার মানে কর্তব্য অকর্তব্য জ্ঞান থেকে বিমুখ, শাস্ত্রের বিধি নিষেধ যে মানে না, এই ধরণের লোক যখন কোন কাজে নামে, বা কোন কামসিদ্ধির আশায় কোন দিকে যায়, *ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্*, সে সিদ্ধিও পায় না, সুখও পায় না, আর মোক্ষ তো পাবেই না। বিনাশের এই তিনটে দরজা যদি খোলা থাকে, এই

তিনটেকে নিয়ে যদি জীবনে চলতে থাকে, সে না পাবে কোন সিদ্ধি, না পাবে কোন সুখ, মুক্তি তো পাবেই না।

তার জন্য কি করতে হয়? শাস্ত্র বিধিকে মানতে হয়, অর্থাৎ শাস্ত্র যেটা বলে দিয়েছেন সেটাকে পালন করতে হয়। মৃত্যুর পর আপনি যদি স্বর্গে যেতে চান, তাহলে আগে শাস্ত্র মেনে চলুন। আর এই জীবনেই যদি সিদ্ধি পেতে চান, অবশ্যই শাস্ত্র মেনে চলুন। আর আপনি যদি মুক্তি পেতে চান, শাস্ত্র মেনে চলুন। স্বর্গ, মুক্তি, এই জীবনে সিদ্ধি; শাস্ত্র ছাড়া কোনটাই চলবে না। এবার পুরো জিনিসটাকে একটা জায়গায় গুটিয়ে এনে উপসংহার করে দিচ্ছেন। বাইশ, তেইশ আর চব্বিশ নম্বর শ্লোক পরস্পর সংযুক্ত হয়ে আছে।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি।।২৪।।

(অতএব কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই তোমার জ্ঞাপক (উপদেষ্টা); নিজের বা অন্যের কল্পনাদি না। অতএব শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধের স্বরূপ জেনে ইহলোকে তোমার কর্ম করা উচিত, অর্থাৎ নিষিদ্ধ পরিত্যাগপূর্বক বিহিতানুষ্ঠান করা উচিত।)

ভগবান এবার উপসংহার করছেন। হে অর্জুন, কি করণীয় আর কোনটা অকরণীয়, এটার জন্য একমাত্র প্রমাণ হল শাস্ত্র। ঈশ্বরের কথা, আগে যেটা বললেন, *মামাত্মপরদেহেষু,* আমি যে বিধান দিয়ে রেখেছি, সেটাকে লোকেরা লঙ্ঘন করে বলে তাদের জীবনে এই সমস্যা হয়। শাস্ত্রপ্রমাণ মানে ঈশ্বরীয় কথা। ঈশ্বরীয় কথা কোনটা? এতগুলো শাস্ত্র রয়েছে কোনটা আমি মানব? যে শাস্ত্রকে আমার সম্প্রদায়ের পরম্পরাতে মান হয়, যেটা আমার গুরু আমাকে বলে দিয়েছেন। আমার যদি গুরু না থাকে, তখন বাড়ির পরম্পরায় যেটা আমি পেয়েছি সেটাকেই মানব, সেটাই শাস্ত্র। কারণ, ধর্ম পথে চলার জন্য সমস্ত শাস্ত্র একই কথা বলে। গ্রামেগঞ্জে যিনি পুরোহিত আছেন, যিনি পূজারী আছেন, তিনি যে কোন একটা চটি বই পড়ে আমাকে যা বলবেন, বড় বড় বেদ পড়ে সেই একই জিনিস পাওয়া যাবে। তবে বড় শাস্ত্রের জ্ঞান যদি থাকে, তাহলে ধর্মের ব্যাপারে আরও ভাল বোঝা যায়, মনে সংশয় কম আসবে।

আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী মানে আমরা হিন্দু পরম্পরাতে চলি। তদুপরি আমাদের কথামৃত আছে, স্বামীজী অনেক কথা বলে গেছেন, আমাদের আইন আছে, মোটামুটি ভাবে আমরা ওটাকেই মেনে চলি। কোথাও কোন সংশয় হলে আমরা বড়দের জিজ্ঞেস করে নিই। লঙ্ঘন যদি হয়, আমি যদি নিজের মত করতে শুরু করি, যেটা ইদানিং কালে চারিদিকে দেখা যায়, আর যারা অত্যন্ত অভদ্র তারা বলবে, আমি শাস্ত্রটাস্ত্র মানি না, কিসের হিন্দুফিন্দু; আর যারা একটু সূক্ষ্ম, তারা সরাসরি বলে না, কিন্তু মনে মনে বলবে, ধুস্ হিন্দু শাস্ত্র আবার কি! মহাভারতে যক্ষ ও যুধিষ্টির সংলাপে যক্ষ প্রশ্ন করছেন, পথ কি? যুধিষ্ঠির উত্তরে বলছেন, মহাপুরুষরা যে পথে গেছেন, এটাই পথ। মহাপুরুষরা যে কথাগুলি বলে দিয়ে গেছেন, এটাই শাস্ত্র। ঈশ্বরীয় বিধান তো হয় না, কিন্তু যাঁরা ঈশ্বরদর্শন করেছেন, তাঁদের কথাই শাস্ত্র।

বলছেন, *তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ,* কোনটা কার্য আর কোনটা অকার্য, এটা ঠিক করার জন্য শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। এখানে তোমার নিজের বুদ্ধি লাগাতে যেও না। কারণ তোমার এই বুদ্ধি কাঁচা বুদ্ধি। বুদ্ধি কখন কাম প্রেরিত, কখন ক্রোধ প্রেরিত, কখন লোভ প্রেরিত, কখন কিসে প্রেরিত হয়ে কোন দিকে তোমাকে নিয়ে যাবে কোন ঠিক নেই। যাঁকে আপনি আচার্য মনে করেন, যাঁকে আপনি গুরু মনে করেন, আর সবচেয়ে বড় হল বাড়ির পরম্পরা, এগুলোকেই আপনার প্রমাণরূপে গ্রহণ করতে হবে। আপনার বড়রা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা মুর্খ ছিলেন না, পাগল ছিলেন না, তাঁরা যা যা করতেন সব করুন, সন্দেহ হলে আমাদের জিজ্ঞেস করুন, আমরা বলে

দেব। *জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি,* আগে জানুন কি করতে হয়, কি করতে হবে, পুরোপুরি সেই অনুসারে চলুন। কারণ নিজের মত যদি চলেন, ঈশ্বরের আদেশ যদি লঙ্ঘন করেন কখন আপনি কাম, ক্রোধ আর লোভে পড়ে যাবেন, বুঝতেও পারবেন না। আগেই বলে দিয়েছেন, কাম, ক্রোধ, লোভ এই তিনটে নরকের দ্বার।

খ্রীশ্চান, ইসলাম আর জুদাইজম্ এরা হল এ্যব্রাহামিক রিলিজিয়ন, এদের মধ্যে আদম আর ঈভের গল্পের খুব প্রচলন আছে। আদম আর ঈভকে ঈশ্বর নিষেধ করে দিয়েছেন, স্বর্গের আপেল খেও না। কিন্তু ঈশ্বরের নিষেধ অমান্য করে তারা স্বর্গের আপেল খেয়ে নিয়েছে, আর সেইজন্য স্বর্গ থেকে তাদের বার করে দেওয়া হল। এইসব কাহিনী থেকে আমরা এটাই পাই, ঈশ্বরের যে আজ্ঞা, ঈশ্বরের যে আদেশ, এটাকে লঙ্ঘন করতে নেই। এর থেকেও খুব স্পর্শকাতর আর-একটা কাহিনী আছে। ইসলামের পরম্পরায় ইবলিসের কাহিনী আছে। ইবলিস প্রথমে দেবদূত ছিল, সে আল্লাকে এমন ভালবাসে যে, আল্লার বাইরে সে আর কিছু জানে না। আল্লা যখন মানুষ তৈরী করলেন, তখন তিনি বলে দিলেন মানুষ হল শ্রেষ্ঠতম, সবাই তোমরা তার সামনে মাথা নত কর। তখন ইবলিস বলে দিল, আল্লা ব্যাতিরেকে আর কারুর সামনে আমার মাথা নোওয়াব না। আল্লা খুব রেগে গেলেন, আল্লার আদেশের উল্লঙ্ঘন! এমন রেগে গেলেন যে ইবলিসকে তিনি শয়তান বানিয়ে দিলেন। সেই থেকে ইবলিস হয়ে গেল শয়তানের রাজা।

সুফিরা আবার অন্য রকম ভাবে নেন, সেই এক যিনি, একমাত্র তাঁর সামনে আমার মাথা নুইবে। কিন্তু এগুলো থেকেও খুব সুন্দর আরেকটা কাহিনী আছে, অল্প বয়সে আমি যখন পড়েছিলাম, তখন আমিও ঠিক বুঝতে পারিনি। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন রাজা মহারাজ রাখালকে তামাক সেজে দিতে বললেন। রাখাল তামাক সাজার জন্য উঠলেন না। সেখানে লাটু মহারাজও ছিলেন। তিনি দেখলেন রাখাল তামাক সেজে দিলেন না। লাটু বলছেন, 'ঠাকুর তামাক সাজতে বললেন, তুমি শুনছ না কেন'? রাখাল লাটুকে বলছেন, 'তোর যদি অত গরজ হয়, তুই গিয়ে সাজ না'। রীতিমত ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে। লাটু অত্যন্ত রেগে গেছেন। ঠাকুর মজা দেখে যাচ্ছেন। পরে তিনি একজনকে জিজ্ঞেস করছেন, বল কে ঠিক? ঠাকুর নিজেই বলছেন, রাখাল ঠিক।

প্রথম বার পড়ার পর জিনিসটা আমি বুঝতে পারিনি, রাখাল ঠাকুরের কথা শুনছেন না, লাটু মহারাজের রেগে যাওয়াটা তো ঠিকই। কিন্তু ঠাকুর বলছেন, না। রাখাল ঈশ্বরপ্রেমে এমন ডুবে আছেন, সেখানে হয়ত একটু ডান দিক, বাঁ দিক হল; কিন্তু লাটুর মধ্যে ক্রোধ এসে গেছে। মজার ব্যাপার হল, এখানে দুটো লঙ্ঘন হচ্ছে। একজনকে একটা কিছু বলা হল, মিষ্টি করে উপেক্ষা করে উনি শুনলেন, আরেকজনের ভিতর ক্রোধ জন্ম নিল। দুজনের মধ্যে কে ভুল করছে? একজনের মধ্যে ক্রোধের মাত্রা এত বেশি যে, বলে দিচ্ছেন লাটুই ভুল। ইমোশানস্ গুলো যখন আমাদের পেয়ে বসে, আমরা কার্য অকার্য ভুলে যাই। বিভিন্ন উদাহরণ বলা হল, আদম কামে পড়ে গোলমাল করে বসল, লাটু মহারাজ ক্রোধে পড়ে এলেমেলো করে বসলেন। ইবিলিস ঈশ্বরকে ভালবাসে কিন্তু এমন একটা অহঙ্কার এসে গেছে, আমার মত ভক্ত নেই, আমি আল্লা ছাড়া আর কোথাও মাথা নোয়াব না; অহঙ্কারটাও কাম ক্রোধ থেকেই হয়।

পুরো ষোড়শ অধ্যায়ের মূল বক্তব্য হল, আপনি কি বিনাশ থেকে বাঁচতে চান, আপনি কি নিজের আধ্যাত্মিক উত্থান চান, তাহলে একজন গুরুকে আশ্রয় করুন। গুরু যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে, আপনার বাড়ির যে পরম্পরা, আপনার আশেপাশে যাঁদের একটু ভাল মনে হয়, পুরো ভাল তো মনে হবে না, তিনি যা করেন আপনিও তাই করুন। যে কোন একটা শাস্ত্রকে অবলম্বন করুন এবং ওই শাস্ত্রকে মেনে চলুন। আর আমরা ভারতবাসী, ভারতবাসী বলতে পুরোটা, একেবারে থাইল্যাণ্ড থেকে শুরু করে বাংলাদেশ হয়, বার্মা হয়ে পাকিস্থান পর্যন্ত, আমরা জানি ধর্ম বলতে কি বোঝায়, সেটাকে

পালন করুন। আর গীতা এত সুন্দর ও পরিষ্কার করে বলছেন আর সতের ও আঠারো অধ্যায়ে আরও পরিষ্কার করে বলবেন।

মূল হল কাম, ক্রোধ ও লোভ যেন না থাকে; মূল হল রজোগুণ আর তমোগুণকে দাবিয়ে দেওয়া এবং সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি; মূল হল আসুরীক যে বৃত্তিগুলির বর্ণনা করা হল, এই বৃত্তিগুলিকে নাশ করে দৈবীসম্পদগুলি অর্জন করা। তবেই মানুষের আধ্যাত্মিক উত্থান হবে, তবেই মানুষ বিনাশ থেকে বাঁচতে পারবে। এই হল ষোড়শ অধ্যায়ের মূল বক্তব্য।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়ং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ।।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ

আমরা এখন সপ্তদশ অধ্যায়ে প্রবেশ করছি, এই অধ্যায়ের নাম শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ। তিন নম্বর শ্লোক হল এই অধ্যায়ের প্রাণ, যেখানে বলবেন, *যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ*, যার যেমন শ্রদ্ধা সে তেমন। আপনি কেমন? যেমনটি আপনার শ্রদ্ধা আপনি তেমন। শ্রদ্ধা কিভাবে আমাদের প্রত্যেকটি অঙ্গে ঢুকে আছে, গীতা তার একটা নমুনা এখানে দেবেন। হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রগুলির কত বিস্তার, জীবনের এমন কোন বিষয় নেই যেটা হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রে পাওয়া যাবে না। আমার খুব পরম সৌভাগ্য যে হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রগুলিকে আমি জানতে পেরেছি, পুরোপুরি বোঝা হয়ত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু জানতে পেরেছি যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ এই শাস্ত্রগুলি আছেন, এটা ভেবেই অবাক লাগে। উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, স্বামীজীর চারটি যোগের কথা আপনারা সবাই শুনেছেন, তার বাইরে আমাদের যে শাস্ত্রগুলি রয়েছে, সেই কোথায় বেদ থেকে শুরু করে উপনিষদ, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র কত দিকে জ্ঞানরাশি বিস্তার করে আছে।

যে কোন ধর্মের চারটি স্তম্ভ থাকে। প্রথম স্তম্ভ হল সেই ধর্মের দর্শন, দ্বিতীয় স্তম্ভ হল পুরাণ, যেখানে ধর্মের কথা কাহিনী, বিভিন্ন দেবী-দেবতাদের নিয়ে বিভিন্ন কাহিনী রাখা আছে; ধর্মের তৃতীয় স্তম্ভ হয় পূজা অর্চনাদি এবং চতুর্থ স্তম্ভ হয় আচার। অন্যান্য ধর্মে এই চারটি স্তম্ভ এমন ভাবে মিলেমিশে আছে যে, আলাদা করে বোঝার উপায় নেই, কোনটা কিসের স্তম্ভ। মিলেমিশে থাকতেই পারে, তাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু হিন্দুরা নিজেদেরকে ধর্মের মধ্যে এমন ভাবে ডুবিয়ে দিয়েছেন যে, এই চারটি স্তম্ভের প্রত্যেকটি স্তম্ভকে যে কেউ আলাদা আলাদা করে চিহ্নিত করে বুঝে নিতে পারবেন –এগুলো হিন্দু ধর্মের দর্শন, ওগুলো পুরাণ, উপাচার ইত্যাদি। ভারতে বিবেকানন্দ বইতে স্বামীজী এই জিনিসটাকে আরও বিস্তারে দেখিয়েছেন। আমাদের ক্লাশগুলিতে আমরা একদিকে উপনিষদ, গীতা নিয়ে আলোচনা করছি, যেখানে হিন্দু ধর্মের মূল দর্শন; সেখানেও আবার মাণ্ডুক্যকারিকার মত একেবারে কট্টর অদ্বৈত দর্শনকে নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। ইংরাজী, হিন্দী এবং বাংলা এই তিনটে ভাষাতে অত্যন্ত সহজ ভাষায় আমরা এখানে সব কটি দর্শনকে নিয়েই আলোচনা করছি। মন দিয়ে নিষ্ঠা সহকারে একটু শোনার চেষ্টা করলেই বোঝা যায় আমাদের শাস্ত্রগুলি কি বলতে চাইছেন।

বিদেশ থেকে আসার পর স্বামীজী সারা ভারতে বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু ধর্মের উপর ভাষণ দিলেন। শ্রীলঙ্কা, তামিলনাড়ু সব জায়গায় স্বামীজী ইংরাজীতেই ভাষণ দিয়েছেন, হাজার হাজার লোক সেই ভাষণ শুনতেন, কজন আর ইংরাজী বুঝতেন, কিন্তু শুনতেন। শুনতে হয় এবং আচার্যের ভাষাতেই শুনতে হয়, আচার্যের ভাষা তাই শিখতে হয়। আচার্যের ভাষা না শিখলে পিছিয়ে যেতে হয়। একদিকে মাণ্ডুক্যকারিকা, কোথায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন। অন্য দিকে ভক্তিশাস্ত্রে রাসলীলা। এই একই হিন্দু ধর্মে একদিকে মাণ্ডুক্যকারিকার মত কট্টর অদ্বৈতকে নিয়ে আসছেন, অন্য দিকে রাসলীলার বর্ণনা করছেন, অন্যান্য ধর্মে এ-জিনিস কল্পনাই করা যাবে না। আর সেখান থেকে নিয়ে যাচ্ছেন যোগে, পতঞ্জলির রাজযোগের দর্শনে; সাধন, সিদ্ধি, ধর্ম জীবনের সব কিছুকে পুরো যুক্তি সঙ্গত ভাবে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে আমাদের সামনে উপস্থাপন করে রেখে দিয়েছেন। ঠাকুর খুব সুন্দর বলতেন, একজনের একটা রঙের গামলা ছিল। এমন রঙের গামলা যে, যে যা রঙ চাইত সে সেই রঙে ছুপিয়ে দিত। তোমার কি রঙ চাই? লাল রঙ। এই নাও তোমার লাল রঙ। তোমার কি রঙ

চাই? নীল রঙ। এই নাও নীল রঙ। তোমার কি রঙ চাই? সাদা রঙ। এই নাও তোমার সাদা রঙ। ওই একই গামলা থেকে কাউকে লাল রঙে ছুপিয়ে দিচ্ছে, কাউকে সবুজ রঙে ছুপিয়ে দিচ্ছে, কাউকে হলুদ রঙে ছুপিয়ে দিচ্ছে। হিন্দু ধর্ম ঠিক এটাই, রঙের গামলা; এমনি সাধারণ রঙের গামলা না, একেবারে ম্যাজিকাল রঙের গামলা।

হিন্দু ধর্ম ম্যাজিকাল। তোমার কি চাই? তুমি পরা ভক্তিটা কি জিনিস বুঝতে চাইছ? এই নাও ভাগবত পুরাণের রাসলীলার বর্ণনা। পৃথিবীর কোন ধর্ম শাস্ত্রে কোথাও পরা ভক্তির বর্ণনা নেই, রাসলীলাতে দেখুন, পরা ভক্তি কি জিনিস, এমন সুন্দর বর্ণনা, কারুর বুঝতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা না। শুধু পরা ভক্তির বর্ণনা, কোন নাচ গান নেই, অথচ লোকেরা ভুলভাল ভাবে। অন্য দিকে মাণ্ডুক্যকারিকা, আবার অন্য দিকে যোগ আমাদের কোথায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন। তার সাথে জীবন কিভাবে চালাতে হবে, মনুস্মৃতিতে সেটাকেও বিশদ ভাবে বলে দিচ্ছেন। ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়, আড়াই হাজার বছর আগে মনুস্মৃতি রচিত হয়েছে, কিন্তু যে সিদ্ধান্তগুলো এখনও সেই একই। খুঁটিনাটি জিনিসগুলো পাল্টে যেতে পারে, স্মৃতিশাস্ত্রের এটাই নিয়ম। সেইজন্য যেমন যেমন সময় পাল্টায় স্মৃতিশাস্ত্রও পাল্টায়। লোকেরা মনুস্মৃতিকে দোষ দেয়, আসলে বেশির ভাগ মানুষ মূল জিনিসগুলো জানে না। না জেনে শুধু এঁড়ে তর্ক করবে, একটা শব্দ বললে মূল বক্তব্যকে ছেড়ে ওই শব্দকে নিয়ে আপনার সাথে তর্ক লাগিয়ে দেবে।

কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রের সব থেকে বড় হল তার বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্যটা কি? আপনারা এত শাস্ত্র শুনছেন, লোকেরা আপনাদের জিজ্ঞেস করতে পারে, হিন্দু শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য কি? হিন্দু শাস্ত্রের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য হল, অকাট্য। অন্য কোন ধর্মে এই রকম নেই। হিন্দু শাস্ত্রের প্রত্যেকটা কথা অকাট্য, হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রের এটাই বৈশিষ্ট্য। উদাহরণ দিন। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরদর্শন মানব জীবনের উদ্দেশ্য, এটা অকাট্য। কেন অকাট্য? আপনার নিজের মত ঈশ্বরের পরিভাষা করলে হবে না, ঈশ্বরের ঠিক ঠিক যে পরিভাষা, ঈশ্বরদ্রষ্টা ঋষিরা যখন ঈশ্বরের বর্ণনা করেন তখন ঈশ্বর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এটাই বলেন –ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী। আপনি এখন জীবনে যেটাই করছেন, আপনার যত চেষ্টা, যত কর্ম, এগুলো হল কোনটা পুকুর, কোনটা দীঘি, কোনটা নদী। কিন্তু ঈশ্বরদর্শন যখন উদ্দেশ্য হয়ে যায় তখন সেটাই হয়ে যায় মহাসমুদ্র, সব কিছু সেখানে গিয়ে হারিয়ে যায়।

যদি না বুঝে থাকেন, তাহলে আরও সহজ করে বলছি। আপনি ভেবে দেখুন, আপনার কাছে জীবনের উদ্দেশ্যটা কি? একবার ফ্রান্সের কয়েকজন ম্যানেজার এসেছিলেন, তাঁদেরকে আমি একটা লেকচার দিচ্ছিলাম। আমি হিন্দু ধর্মের উপর কয়েকটা কথা বলাতে একজন ভদ্রলোক ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে বললেন, 'আমি আপনার এই কথাগুলো মানতে পারছি না, জীবনের একটিই উদ্দেশ্য সেক্স'। ফ্রান্সের লোক কিনা, সেক্স ছাড়া কিছু বোঝে না। আমি বললাম, 'খুব ভাল, আমাকে বলুন তো সেক্স করে লাভটা কি? কিসের জন্য সেক্স? শান্তি তো। যারা কামী পুরুষ, তারা কামের বস্তু পেয়ে গেলে কি হয়? মনে একটা আনন্দ বোধ করে, মনে একটা শান্তি বোধ করে। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই মনে আবার সেই কাম ভাব এসে যায়। যিনি খেতে খুব ভালবাসেন, তাঁকে মনের মত রান্না করে খেতে দিন, খাওয়ার পর তিনি বলবেন, 'বাঃ খুব ভাল খেলাম, খেয়ে তৃপ্ত হয়ে গেলাম'। চার থেকে পাঁচ ঘন্টা পর আবার খিদে হবে'। বৃকোদর বা ভীমের মত যদি হয়, একটু পরেই আবার খিদে পাবে। পেট ভরে গেলে একটা আনন্দ হয়, একটা তৃপ্তির ভাব আসে।

ঈশ্বরের ব্যাপারে এটাই তো বলা হয়, তৃপ্তির ভাব, আনন্দের ভাব। এ এমন আনন্দ, যেটা কখন কমে না। ঈশ্বরদর্শনে এমন আনন্দ যে, এই আনন্দ ভোগ করার পর অন্য কিছু ভোগ করতে ইচ্ছে হবে না। কিন্তু আমরা যখন বিষয়বস্তু সেবন করি, তখন একটু কিছু পরে পরেই নূতন জিনিস

লাগে। ঈশ্বরদর্শনে এই জিনিস হয় না। যাঁরা মহাপুরুষ হয়েছেন, তাঁদের সবাইকার জীবনে এটাই দেখি। বস্তু লাভ করার পর ওনারা অন্য কোন কিছুর দিকে দৌড়ান না। এটাই অকাট্য।

হিন্দু ধর্ম কখন আমাদের এই কথা বলবে না যে, বিষ্ণুই একমাত্র দেবতা, কালীই একমাত্র দেবী। ইদানিং কালে কিছু কিছু সম্প্রদায় থেকে বলা হয়, কৃষ্ণই সর্বোপরি। এই ধরণের কথা হিন্দু ধর্ম কখনই বলবে না; এই ধরণের চিন্তা-ভাবনা বিদেশী ধর্ম থেকে ধার নেওয়া। যেমনি কেউ বলবে, শ্রীরামই একমাত্র দেবতা, এটাকে নিয়ে তর্ক করা যায়, এটাকে যুক্তি দিয়ে কেটে দেওয়া যায়। বিদেশী ধর্মগুলি প্রথম দিন থেকে এই নিয়েই মারামারি করে আসছে। জুহুদিরা বলে আমার ধর্ম সত্য, খ্রীশ্চানরা বলে আমাদের ধর্ম সত্য, মুসলমানরা বলে আমার ধর্ম সত্য। তার মানে, আমার যিনি ঈশ্বর তিনি শ্রেষ্ঠ, এই বলে নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করে আসছে। আমি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, আমি বলতে পারি, ঠাকুরই একমাত্র ঈশ্বর; তাহলে ঠাকুরের ভাবধারা কিন্তু আর সার্বজনীন সত্য হল না, সার্বভৌমিকতাটাই কেটে গেল।

হিন্দুদের এটাই বৈশিষ্ট্য, এনারা যা কিছু বলেন, সবটাই সার্বভৌম সত্য, সবারই জন্য যেটা সত্য ওনারা সেটাই বলেন। আমার 'হিন্দু জীবনধারা' বইতে এই জিনিসটাকেই তুলে ধরা হয়েছে। হিন্দু ধর্ম হল Universal principles, সেইজন্য হিন্দু ধর্মের আর-একটা নাম হল সনাতন ধর্ম। আমরা জোর করে বলছি না যে, আমরাদের ধর্মই সনাতন ধর্ম। এইজন্যই সনাতন ধর্ম, এই ধর্ম যে সত্যগুলি বলছি, এর সব কটাই অকাট্য। ধরা যাক, অন্য ধর্মের একজন লোক এসে বলল, আমার ধর্মের যিনি ঈশ্বর তিনিই সত্য। তা হোক, তোমার জন্য ওটাই সত্য, আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি এটা মানছ তো, তুমি যে ঈশ্বরকে একমাত্র সত্য বলে মানছ, সেই ঈশ্বরের দর্শন করাটাই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য? তখন বলবে, না মরার পরে দর্শন হবে। জীবন মৃত্যুতে কি তফাৎ আছে ভাই? হিন্দুদের কাছে জীবনও যা, মৃত্যুও তাই। সুতরাং এই জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন, এই যে কথা এটা সার্বভৌম সত্য হয়ে গেল।

ঠিক তেমনি, গীতাতে যে কথাগুলি আছে, এর সব কটা কথা ইউনিভার্সাল। অন্য কোন ধর্ম গ্রন্থে এত বেশি ইউনিভার্সাল জিনিস পাওয়া যায় না। আমরা এই যে সর্বধর্ম, সম ভাবের কথা বলি, বলি ঠিকই, কিন্তু এই ধর্মগ্রন্থগুলি যে উচ্চ অবস্থায় আছে, এর তুলনা আর কোথাও পাওয়া যাবে না। স্বামীজীর রচনাবলীর শুধু ভারতে বিবেকানন্দ বইটা নিন, যেখানে স্বামীজীর ভারতে প্রদত্ত লেকচারগুলো দেওয়া হয়েছে, সেই লেকচারগুলো যদি কেউ পড়েন, তিনি সেখানে দেখবেন সবাইকে গ্রহণ করা, সব ধর্মকে নিয়ে চলার কথা স্বামীজী বলে গেছেন। এই inclusiveness অন্য ধর্মে নেই। কারণ হিন্দু ধর্মের প্রত্যেকটি কথা অকাট্য। যে কথাগুলো কেটে দেওয়া যায়, সেই কথাগুলো আমাদের মূল সিদ্ধান্ত নয়, secondary। সেইজন্য যাঁরা বলেন শ্রীরাম একমাত্র ঈশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ঈশ্বর, এনারা আর যাই হোক, বুঝবেন এনারা হিন্দু ধর্মকে এখনও বুঝতে পারেননি।

এই যে বলা হয় হিন্দু ধর্ম হল সহনশীল ধর্ম, সহনশীলতা কিছু না। আমাদের মূল কথা হল ঈশ্বরদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য। এখন তোমার ঈশ্বর কে তুমিই ভেবে দেখ। আর তারপর কি হবে? *যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ*, তুমি সেখানেই যাবে, যেমনটি তোমার শ্রদ্ধা। তোমার ঈশ্বর যদি সীমিত হন, তুমি সীমিত জায়গায় যাবে। এটাও একটা ইউনিভার্সাল কথা। হিন্দুদের তাতে কোন সমস্যা নেই। তুমি যাও না ভাই তোমার যেখানে যাওয়ার, আমিও আমার যেখানে যাওয়ার সেখানেই যাব।

একটা খুব সাধারণ ঘটনা বলছি। মায়াবতীতে আমাদের অদ্বৈত আশ্রম আছে। টনকপুরে নেমে লোহাঘাট যেতে হয়, সেখান থেকে মায়াবতী আসতে হয়। আগে আগে আমিও লোহাঘাট থেকে আট কিলোমিটার পায়ে হেঁটে মায়াবতী গিয়েছি। একবার আমি ট্রেনে আসছি। সেই ট্রেনে একজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে ছিলেন, উনি পিলভিট নামবেন। পিলভিটের পর আসে টনকপুর। ভদ্রলোক

আমাকে পিলভিট নামিয়েই ছাড়বেন, কারণ পিলভিটে ট্রেন দু ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে। বাকিরা ভদ্রলোককে বোঝাচ্ছেন, ভাই ওনাকে টনকপুর যেতে দাও, টনকপুর থেকে অনেক বাস পেয়ে যাবেন। কিন্তু সেই ভদ্রলোক আমাকে যেন টেনে পিলভিটেই নামিয়ে ছাড়বেন। আমি যত বলছি, আমার পিলভিটে নেমে কোন সুবিধা হবে না, কারণ পিলভিটে নামতে হলে আমাকে ভোর চারটের সময় নামতে হবে, টনকপুর আরও পরে নামা যায়, আর টনকপুর থেকে অনেক কিছু পেয়ে যাব।

এই যারা বলে আমার ধর্মটাই ঠিক, এটা যেন টেনে পিলভিটে নামিয়ে নেওয়া, যদিও আমার নামার কোন দরকার নেই। গীতাতে শত শত বাক্য রয়েছে, যেটা আমাদের মনকে অনন্তের দিকে নিয়ে যায়। অবাক হয়ে ভাবি, আমারই পূর্বজরা এইসব বাক্য বলেছেন – তুমি কে? তুমি সেটা যেটা তোমার শ্রদ্ধা। ইংরাজীতে একটা নূতন কথা এসেছে, Attitude is everything। Attitude এখানে একটা অন্য অর্থে নেওয়া হয়, কিন্তু এখানে এটাই এর অর্থ। ঠাকুর যেটা বলছেন, যেমন ভাব তেমন লাভ, এটা এখানে একটু আলাদা।

এর আগের অধ্যায় শেষ করলেন এই বলে, *তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে,* ভগবান অর্জুনকে বললেন, তোমার সব কিছুতে যেন শাস্ত্র প্রমাণ থাকে। কিন্তু সবাই তো শাস্ত্র জানেন না, বেশির ভাগ মানুষ শাস্ত্র পড়েননি, এনাদের কি হবে? এই জিনিসটাকে ভেবে অর্জুন প্রশ্ন করছেন, আর এই প্রশ্ন দিয়েই সপ্তদশ অধ্যায়ের শুরু। আসলে এই প্রশ্নগুলিকে তৈরী করেছেন ব্যাসদেব ধর্মের আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

অর্জুন উবাচ
যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়াণ্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ।।১।।

(অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন –হে ভগবান্, যারা শাস্ত্রীয় বিধান পরিত্যাগ করে আস্তিক্যবুদ্ধিপূর্বক দেবাদির পূজা করে, তাদের সেই নিষ্ঠা সাত্ত্বিকী, রাজসী অথবা তামসী?)

সত্ত্ব, রজ ও তম, এই তিনটে গুণের কথা সেই দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে চলছে। অনেকবার এই তিনটে গুণ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, চতুর্দশ অধ্যায়ে বিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। তাই নূতন করে পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে না। যে কোনদিন শাস্ত্রের কথা শোনেনি, শাস্ত্র পড়েনি, শাস্ত্রের কথা জানে না, এদেরকে নিয়ে অর্জুনের প্রশ্ন। আচার্য অবশ্য পরে বলবেন, যে শাস্ত্র জানে অথচ মানে না, এদের কোন গতি হয় না। আবার এটাও অনেক সময় হয় যে, শাস্ত্রের কথা জানেই না। রামকৃষ্ণ মিশনে দক্ষিণ ভারত থেকে অনেক সন্ন্যাসী আছেন। ওনাদের ধর্মের জ্ঞান যখন দেখি, আর ওনাদের বেদ আদির এত স্তব মুখস্ত যে, দেখে অবাক হয়ে যাই। বাচ্চা বয়স থেকে ওনাদের তৈরী করে দেওয়া হচ্ছে। ইএমএস নাম্বুদিরিপাদ কেরলের কম্যুনিস্ট নেতা, কিন্তু তিনি যে পরিবারের সেখানে তাঁকে পুরো ঋক্ বেদ মুখস্ত করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নাম্বুদিরিপাদ পুরো বেদ জানতেন। পরে অবশ্য তিনি আফশোষ করে বলতেন, ওই সময় আমার জীবনের সবচেয়ে বেশি অপচয় হয়েছে। কম্যুনিস্ট হয়ে গিয়েছিলেন কিনা। সে যাই হোক, দেখে অবাক লাগে, কত বাচ্চা বয়স থেকে এনারা বেদ শিখে এসেছেন। আমাদের এখানে এই কালচার নেই, আমরাও বাচ্চা বয়সে এত কিছু শিখিনি, কিন্তু পূজা অর্চনা এগুলো নিয়মিত করতাম। এখানে এটাই অর্জুন প্রশ্ন করছেন, শাস্ত্র জানে না, কিন্তু নিষ্ঠার সাথে পূজা অর্চনা করে যাচ্ছেন, *যজন্তে* পূজার অর্থে হয়, আবার যজ্ঞের অর্থেও হয়, *তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ,* হে কৃষ্ণ, তাঁকে আপনি কি বলবেন, তিনি কি সাত্ত্বিক, না রাজসিক, নাকি তামসিক?

টলস্টয়ের একটা খুব সুন্দর গল্প আছে, আগেও আমরা বলেছিলাম। টলস্টয় খুব গোঁড়া খ্রীশ্চান ছিলেন। আমাদের এখানে যদি কোন লেখক গোঁড়া হন, ওনার লেখা কেউ পড়তে চাইবে না।

টলস্টয় গোঁড়া খ্রীশ্চান, ওনার লেখাতে খ্রীশ্চানিটির কথা পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। একটা জাহাজে করে কয়েকজন খ্রীশ্চান ফাদার যাচ্ছেন। ওনারা শুনেছেন, পাশেই একটা দ্বীপ আছে যেখানে কিছু খ্রীশ্চান আছেন। ফাদাররা সেই দ্বীপে গেলেন, দেখলেন তিনজন খ্রীশ্চান সেখানে তপস্যা করছেন। গিয়ে দেখেন সারা দিন ওই তিনজন তপস্বী হাতজোড় করে তপস্যা করে যাচ্ছে –হে প্রভু আপনি তিন, আমরাও তিন, কৃপা করুন। খ্রীশ্চানিটিতে তিন হয়, ফাদার, সান্ আর হোলি ইন স্পিরিট। ওরা তিনজনই তপস্বী ছিলেন। একজন ফাদার গিয়ে তাঁদের শিখিয়ে দিলেন, দেখো, আমাদের খ্রীশ্চানদের ঠিক ঠিক প্রার্থনা হল এই এই, বলে উনি তিনজনকে প্রার্থনাটা বলে দিলেন। তপস্বীরা সেই ফাদারের পায়ে পড়ে গেলেন, আমরা ধন্য হয়ে গেলাম। জল ও অন্যান্য সামগ্রী জাহাজে ভরে নিয়ে জাহাজ সেই দ্বীপ ছেড়ে তাদের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে গেল।

সন্ধ্যের দিকে ফাদাররা দেখছেন, সমুদ্রের উপর দিয়ে তিনটে আলো দৌড়ে আসছে। প্রথমে ওই আলো দেখে জাহাজের সবাই ভয় পেয়ে গেল। পরে দেখে, ওই দ্বীপের তিন তপস্বী জলের উপর দিয়ে অবলীলায় আলো রূপে এগিয়ে আসছেন। জাহাজের কাছে এসে তাঁরা ফাদারকে জিজ্ঞেস করছেন, 'ফাদার, আপনি আমাদের যে প্রার্থনা শিখিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা ভুলে গেছি, আর-একবার যদি দয়া করে একটু শিখিয়ে দেন'। ওনাদের দেখে ফাদারের বুদ্ধিটা একটু খুললো, 'তোমরা যা করছিলে তাই কর'।

ঠাকুর ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নিয়েছিলেন, তিনি আগে থেকেই অনেক কিছু জানতেন, কিন্তু পরিবর্তিকালে তিনি যে সাধনা করেছেন, সেটা পুরো শ্রদ্ধার জোরে। পরে ব্রাহ্মণী এবং অন্যান্যরা এসে পুরো বিধি অনুযায়ী ঠাকুরকে সব শিখিয়ে দিলেন। পুরো শ্রদ্ধা নিয়ে যে করা যায় না, তা না। আচার্য বলছেন, শাস্ত্রে যেমনটা বলা হয়েছে, তার মানে শ্রুতি, স্মৃতি আদিতে যা বলা হয়েছে, যে কোন মানুষ যদি শাস্ত্রের সব রকম বিধি ছেড়ে শুধু শ্রদ্ধার সঙ্গে দেবতাদির পূজন-জপন্ করেন, সেটাও সাত্ত্বিক পূজা হবে। স্বামীজী যখন পূজা করতেন তখন তিনি শাস্ত্র বিধি পালন করতেন না, ওনার সেই ট্রেনিংই ছিল না। উনি আসনে বসে ধ্যানে ডুবে যেতেন, ঠাকুরের সাথে পুরো এক হয়ে গেলেন, তারপর ঠাকুরের দিকে সব ফুল নিবেদন করে বেরিয়ে আসতেন, হয়ে গেল তাঁর পূজা। এই রকম পূজা করার দমই নেই আমাদের।

এখান থেকে পুরোদমে শ্রদ্ধা জিনিসটার উপর আলোচনা চলতে থাকবে। পুরো সপ্তদশ অধ্যায় এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে কিছুটা এই শ্রদ্ধার উপর আলোচনা চলবে। শ্রদ্ধা শব্দের ঠিক ঠিক অর্থ হল আস্তিক্য বুদ্ধি। আস্তিক্য বুদ্ধি মানে, অস্তি ভাবে বিশ্বাস। কঠোপনিষদে শ্রদ্ধা জিনিসটাকে খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে, যেটা স্বামীজীও অনেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। নচিকেতার বাবা এক যজ্ঞ করছেন, সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের প্রচুর দান করতে হয়। কিন্তু নচিকেতা দেখছেন দানের ক্ষেত্রে তাঁর বাবার মধ্যে কৃপণ ভাবের উদয় হয়েছে। নচিকেতা তখন বাবাকে জিজ্ঞেস করছেন, 'বাবা, আমাকে আপনি কাকে দান করবেন'? কারণ এই যজ্ঞে সমস্ত কিছুই দান করতে হয়, পুত্রও তো পিতার সম্পত্তি। বাবাকে নচিকেতা একবার দুবার জিজ্ঞেস করলে বাবা নিরুত্তর থাকলেন, তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করতেই বাবা রেগেমেগে বললেন, 'তোমাকে যমকে দান করলাম'।

যমও একজন দেবতা। নচিকেতার খুব মন খারাপ হয়ে গেল, আমাকে বাবা কেন যমকে, অর্থাৎ মৃত্যুকে দান করলেন? নচিকেতা বলছেন, *বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ*। নচিকেতার মধ্যে তখন শ্রদ্ধা জন্ম নিল। সেইজন্য আচার্য শ্রদ্ধার অর্থ করছেন আস্তিক্য বুদ্ধি, নিজের উপর বিশ্বাস। নচিকেতা ভাবছেন, অনেকের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠতম, অনেকের মধ্যে আমি মাঝারি, কিন্তু কোন ভাবেই আমি সাধারণ নই। এই জিনিসটার উপর স্বামীজী খুব জোর দিতেন, সব সময় বিশ্বাস রাখবে you are the best। শ্রদ্ধা মানে আস্তিক্য বুদ্ধি, ওখানে নচিকেতার শ্রদ্ধা নিজের প্রতি এসেছে। কিন্তু এখানে গীতাতে শ্রদ্ধাকে বলছেন, বৃদ্ধ ব্যবহার। আমাদের বড়রা যাঁরা আছেন, বাড়িতে

বাবা, মা, দাদা, দিদি, ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, ওনাদের যে আচার আচরণ, এটাকে বলে বৃদ্ধ ব্যবহার, বৃদ্ধ ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধা বর্তমান কালে সারা ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলায়, বড়রা যাঁরা ছিলেন বা আছেন, তাঁদের প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে।

কিছু দিন আগে ইউটিউবে একজন আমাকে লিখলেন, 'আপনি গেরুয়া পরেছেন, তারপরেও এই রকম কথা আপনার'? কি ভাষা! গেরুয়া পরে কি আমি এ্যক্টিং করছি? গেরুয়া পোষাকটা কি এ্যক্টিংএর পোষাক? এদের কারুর প্রতি শ্রদ্ধা নেই, নিজের প্রতিও কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। পুরো দেশটার আজ কার প্রতি শ্রদ্ধা আছে? শ্রদ্ধা আছে একমাত্র ডাণ্ডার প্রতি; তবে এটাকে শ্রদ্ধা বলে না, ভয় বলে। অনেকটা চাইনিজদের মত ডাণ্ডা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। কারুর প্রতি এদের সম্মান নেই, শ্রদ্ধা নেই; ডাণ্ডা ছাড়া এরা আর কিছু বুঝবে না। স্বামীজী একটা লেকচারে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বলছেন, স্কুলে গেলেই বাচ্চাদের শেখান হয় তোমার বাপ একটা মুর্খ, তোমার ঠাকুরদা একটা পাগল, তোমার আচার্যরা সব কপট, তোমার শাস্ত্রগুলি মিথ্যা, এই তোমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। স্বামীজীর রচনাবলী খুলে দেখবেন, স্বামীজী আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কি কি বলে গেছেন। কিছু নেই, কোন দিকে দৃষ্টি নেই, শুধু ইমোশানালিজম্।

অনেক আগে আমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়ছিল লেকচার দেওয়ার জন্য। আমাকে বলা হল, মায়ের উপর বলতে। মায়ের উপর বলতে গেলেই আমার মুখ বন্ধ হয়ে যায়, বুঝতে পারি না কি বলব। একজন শ্রোতা আবার আমাক মনে করিয়ে বলে দিলেন, 'মহারাজ, মায়ের ওই কথাটা বলবেন, শরৎ যেমন আমার ছেলে, আমজাদও সেই রকম আমার ছেলে'। আমি তাঁকে বলেই ফেললাম, 'আপনার যখন এটা জানা আছে তাহলে আবার বলার কি দরকার'? আর আমি সত্যিই ভেবেছিলাম এটা বলব, কিন্তু বলে দিলেন বলে আর বলিনি। নাগপুর মঠে শ্রীশ্রীমায়ের ১৫০তম তিথি উদযাপন হচ্ছিল, সেখানে একজন বক্তা এলেন, তিনি শরৎ যেমন আমার ছেলে আমাজাদও তেমন আমার ছেলে নিয়ে বললেন, দ্বিতীয় বক্তা এলেন, তিনিও শরৎ যেমন আমার ছেলে বললেন, তৃতীয় বক্তা যখন এলেন শ্রোতাদের থেকে একজন বলে উঠলেন, 'দয়া করে শরৎ যেমন আমার ছেলে আমজাদও আমার ছেলে আর বলবেন না, ওটা বাদ দিয়ে অন্য কিছু বলুন। এনারা যে একটু বোঝার চেষ্টা করবেন সেটা নেই, কারণ সব কিছু হারিয়ে যাচ্ছে। স্বামীজী এই যে বলছেন, বাবা মুর্খ, ঠাকুরদা পাগল, তোমার আচার্যরা সবাই কপট, সেখান থেকে হয়ে হয়ে আজ এমন হয়ে গেছে যে, সব কিছু হারিয়ে গেছে।

আপনারা যাঁরা এই ক্লাশ শুনছেন, আপনারা সবাই খোঁজ নিয়ে দেখুন, দেখবেন আপনাদের পূর্বপুরুষরা যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগই শাস্ত্র খুব ভাল জানতেন। আর বর্তমান কালে ব্রাহ্মণ শূদ্র নিয়ে যে শুরু হয়েছে, আমি ব্যক্তিগত ভাবে অনেক শূদ্রদের জানি, তাঁরা শাস্ত্রের কথা অনেক ভাল জানতেন। লোকেরা যারা জাতপাত নিয়ে এত নিন্দা করে, তারা জানে না যে, কবীর দাস এত নামকরা লোক ছিলেন তিনি একজন শূদ্র ছিলেন, রুই দাস শূদ্র ছিলেন, এই কথাগুলো কেউ আপনাদের বলবে না। আর হিন্দু ধর্মের যে প্রাণপুরুষ, যিনি হিন্দু ধর্মের মূল, তিনি মায়ের গর্ভের দিক থেকে শূদ্র ছিলেন। এই জিনিসগুলি কেউ আপনাদের বলবে না, শুধু বলবে, মনুস্মৃতিকে পুড়িয়ে দেওয়া উচিৎ। হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রগুলি একবার তোমরা খুলে দেখ হিন্দু ধর্ম কি জিনিস, কারুর কোন শ্রদ্ধা নেই। কিছু করার নেই, দেশ ও সমাজ একটা সর্বনাশের দিকে যাচ্ছে। বলছেন, বৃদ্ধ ব্যবহার, বড়রা যাঁরা ছিলেন, তাঁদের আচার আচরণ দেখুন।

রামকৃষ্ণ মিশন থেকে যাঁরা দীক্ষা নিয়েছেন, তাঁরা রামকৃষ্ণ মিশনের পরম্পরাটা একটু দেখুন। পর পর দেখুন, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ শাস্ত্রের পণ্ডিত, তাঁর আগে স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ শাস্ত্রের পণ্ডিত, তাঁর আগে স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ, শাস্ত্রের পণ্ডিত, তাঁর আগে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ, শাস্ত্রের পণ্ডিত, তাঁর আগে স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ শাস্ত্রের পণ্ডিত। কি

বিশাল পরম্পরা, পর পর শাস্ত্রের দিগগজ পণ্ডিতরা আসতেই থেকে গেছেন। নচিকেতা বলছেন, *অনুপশ্যযথা পূর্বে প্রতিপশ্য তথাহপরে,* বাবা, আপনি দেখুন আগেকার ঋষিরা কেমন ছিলেন, পরের ঋষিরা কেমন এসেছেন, কত উচ্চ পরম্পরার আপনি একজন।

সমস্ত পরম্পরাকে ছেড়ে দিয়ে শুধু খোস গপ্প, আর বক্তাও চোখ দিয়ে জল ফেলছে, শ্রোতারাও জল ফেলছে। শ্রদ্ধা হয় দুটো, একটা হল বৃদ্ধ ব্যবহার, যেটা নচিকেতা বলছেন, *অনুপশ্যযথা পূর্বে প্রতিপশ্য তথাহপরে;* আর শুদ্ধ মন থেকে যেটা ওঠে। শ্রদ্ধা এই দুটো জিনিস থেকে হয়। আর উচ্চতম শ্রদ্ধা যেটা হয়, সেটা হয় শাস্ত্র পড়ে, গুরুর কথা শুনে যে শুদ্ধ মন তৈরী হয়ে যায়, সেই মনে যে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, সেই শ্রদ্ধা হল উচ্চতম শ্রদ্ধা। এখানে যে শ্রদ্ধার কথা বলছেন সেটা শুধু আগের দুটোকে নিয়ে বলছেন, বৃদ্ধ ব্যবহার আর শুদ্ধ মন। নচিকেতা শুদ্ধ মন থেকে বলছেন, *বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ,* নচিকেতার শুদ্ধ মন এই কথা বলে দিচ্ছে, আমি অনেকের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, অনেকের মধ্যে আমি মধ্যম, কিন্তু কখনই সাধারণ নই।

কেন বৃদ্ধ ব্যবহারকে নেওয়া যাবে? হিন্দু ধর্ম খোলামেলা ধর্ম, হিন্দু ধর্ম কোন একটা চটি বইকে আধার করে চলে না। মহাভারতে যুধিষ্ঠির আর যক্ষ সংবাদে যক্ষ প্রশ্ন করলেন, 'যুধিষ্ঠির বলো, পথ কি'? যুধিষ্ঠির প্রশ্নের উত্তরে বলছেন, *'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা'*, মহাজনরা যে পথে গমন করেছেন সেটাই পথ। এটাই বৃদ্ধ ব্যবহার। সবাই তো আর শাস্ত্র পড়তে পারে না, সুযোগও পায় না, তারা বড়দের দেখেই চলে। আমি আমার কথা বলতে পারি, তখন রামকৃষ্ণ মিশনে আমি নূতন ব্রহ্মচারী। একজন মহারাজের কাছে শুনলাম, তিনি রোজ কথামৃত পড়েন। শোনার পর ঠিক করে নিলাম, আমিও তাই করব। এগুলোই বৃদ্ধ ব্যবহার। গুরুজনদের কাছ থেকেই ঠিক ঠিক ধর্ম শেখা হয়, বই পড়ে এই জিনিস হয় না।

আচার্য এখানে এই জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করছেন, *শ্রুতিলক্ষণং স্মৃতিলক্ষণং বা কশ্চিৎ শাস্ত্রবিধিম্ অপশ্যন্তো বৃদ্ধব্যবহারদর্শনাদ্ এব,* যারা শ্রুতি জানে না, শ্রুতি মানে বেদ, বেশির ভাগ লোক বেদকে জানে না, স্মৃতি জানে না, পালন করে না, একমাত্র বড়দের ব্যবহার দেখেই যারা সব কিছু পালন করে, তখন তাদের কি হয়? এখানে আচার্য পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, শাস্ত্র যারা জানে অথচ পালন করে না, তাদের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। সন্ন্যাসীরা নন, যারা সাধারণ মানুষ, যারা জানে এই জিনিসটা করতে হবে, তারা জানে আমাকে ওই রকমই করতে হবে। কারণ, আপনি জানেন কিন্তু যদি না পালন করেন, তাহলে ওটাই হয়ে যাবে আপনার তামসিক ভাব।

অনেকেই একটা গল্প জানেন, একজন নাপিত ছিল, যার ফোঁড়া বা ওই ধরণের কিছু হত, সে ওই নাপিতের কাছে যেত, সেই নাপিত খ্যাঁচ করে কেটে সারিয়ে দিত। এই করে নাপিতের খুব নামডাক হয়ে গেছে। নাপিতের খ্যাতি শুনে একজন বড় ডাক্তার দেখতে এসেছে, কিভাবে সব সারিয়ে দেয়। সব দেখেশুনে ডাক্তার নাপিতকে বলছে, 'দেখো তুমি যা করছ ঠিকই করছ, কিন্তু চল তোমাকে সার্জারের বেসিক ট্রেনিংটা একটু দিয়ে দিই'। হাসপাতালে নিয়ে নাপিতকে বেসিক ট্রেনিং দেওয়া হল। ফিরে এসে দেখছে সে আর আগের মত খুড় চালাতে পারছে না। বেসিক ট্রেনিংটা নেওয়া হয়ে গেছে কিনা। একজন জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার আগে কি সুন্দর খুড় চালিয়ে সারিয়ে দিতে এখন পারছ না কেন? নাপিত বলছে, ওরে বাবা! এখন খুড় চালাতে গেলেই মনে হয় এই নার্ভ কেটে যাবে, ওই মাসেল বাদ পড়ে যাবে, এই চিন্তা করতে গিয়ে আর আমার খুড় চলে না। যতক্ষণ জানা ছিল না ততক্ষণ এগুলো ঠিক ছিল, কিন্তু জেনে যাওয়ার পর আর বিধির বাইরে যাওয়া চলবে না।

আচার্য আরও বলছেন, এটা কল্পনাও করা যায় না, একজন লোক শাস্ত্রবিধি জানবে, তাও পালন করবে না। সেইজন্য এখানে এই শ্লোকটা তাদের জন্যই বলা হয়েছে, যারা শাস্ত্র জানে না।

অর্জুনের প্রশ্ন এখানে এটাই, তাহলে এরা যে শাস্ত্র না জেনে পূজা অর্চনা করে, এদের এই পূজা বা যজ্ঞটা কি, সাত্ত্বিক, রাজসিক না তামসিক?

ভগবান এবার অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করেছেন, আর বলছেন এটা সাধারণ মানুষকে নিয়ে বলা হচ্ছে। আচার্য এবার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন, *সামান্যবিষয়ঃ অয়ং প্রশ্নো ন অপ্রবিভজ্য প্রতিবচনম্ অর্হতি ইতি*, এটা সাধারণ মানুষের জন্য, সেইজন্য এটা বিনা বিভাজনে হবে না। যখন একটা জিনিস সাধারণের জন্য হয়, সেখানে তখন তারতম্য থাকে, উঁচু নীচু থাকে। অনেকে হিন্দু ধর্মের অনেক কিছুকে নিয়ে নিন্দা করে, তার মধ্যে একটা হল, হিন্দু ধর্মে অনেক বৈষম্য। কোন ধর্মে বৈষম্য নেই ভাই? তোমাদের ধর্ম নিয়ে যদি বৈষম্যের কথা বলতে শুরু করি, তোমরা তো একে-৪৭ নিয়ে বেরিয়ে আসবে। যে কোন ধর্মের একবার আপনি নিন্দা করে দেখুন আপনার কি অবস্থা হয়! একমাত্র হিন্দু ধর্মের নিন্দা করা যায়। কিন্তু একমাত্র হিন্দু ধর্ম বলে সাম্য আসবে একমাত্র আধ্যাত্মিকতাতে গিয়ে। তুমি বাচ্চা না বুড়ো, তুমি ব্রাহ্মণ না শূদ্র, তুমি বিবাহিত না তুমি অবিবাহিত, তুমি নারী না তুমি পুরুষ তাতে হিন্দু ধর্মে কিছু আসে যায় না, কিন্তু যদি তুমি আধ্যাত্মিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও, তাহলে তুমি আমার প্রণম্য। ব্যাসদেব, কবীর দাস, রুইদাস, তাঁরা যাই হয়ে থাকুন, শূদ্র হন বা চণ্ডাল হন, সবাইকে আমার প্রণাম।

কিন্তু তুমি যদি সাধারণজন হও, তাহলে কিন্তু বরাবর তারতম্য থাকবেই। সাধারণজন হলে, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি আর সেখানে যারা দেহরক্ষী, এদের মধ্যে তফাৎ থাকবেই, সান্ত্রী মন্ত্রী তফাৎ থাকবেই, আর্দালি আর অফিসারে তফাৎ থাকবেই। যাঁরা equalityর কথা বলেন, জানবেন তাঁরা আমাদের সবাইকে বোকা বানাতে চাইছে। রাশিয়াতে বেশ কিছু দোকান আছে যেখানে দামী দামী জিনিস বিক্রি করা হয়, রাশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টি উচ্চ পদাধিকারীরা ছাড়া ওসব দোকানে অন্যরা কেউ ঢুকতে পারে না, সাধারণ মানুষের ওখানে প্রবেশ নিষেধ। এরা যারা equalityর কথা বলছে, এদের মধ্যেই সব থেকে বেশি inequality। অনেকে বলেন, চীন এত উন্নত করেছে যে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। একবার ভাল করে দেখুন ওখানে ক্রোড়পতি কজন আছে। ক্রোড়পতি যদি হয় তাহলে কিসের কম্যুনিজম্। মুখে কম্যুনিজম্ অন্য দিকে এত ক্রোড়পতি, কাকে বোকা বানাচ্ছেন? সব বড় বড় প্রতারক। হিন্দুরা প্রতারণা করে না। হিন্দুরা বলেন, হাতের পাঁচটা আঙুল সমান না, এই সমাজে যদি থাক তাহলে এটা জেনে নাও যে, সমাজে কেউ সমান না, বৈষম্যটাই এখানে নিয়ম। একমাত্র আধ্যাত্মিক স্তরে গিয়ে সবাই সমান হয়। ভগবান সেইজন্য প্রথমের দিকেই তিন প্রকার শ্রদ্ধার কথা বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু।।২।।

(শ্রীভগবান্ বললেন –দেবাদিপূজাবিষয়ক সাত্ত্বিকী, যক্ষরাক্ষসাদিপূজাবিষয়ক রাজসী এবং ভূতপ্রেতাদি-পূজাবিষয়ক তামসী –মানুষের এই তিন প্রকার শ্রদ্ধা জন্মে। এই শ্রদ্ধা জন্মান্তরকৃত ধর্মাদিসংস্কার থেকে জাত হয়। সুতরাং জীবের ত্রিবিধ স্বভাব হতে জাত শ্রদ্ধাও তিন প্রকার। এর বিষয় শ্রবণ কর।)

মানুষ যখনই জন্ম নিল তখনই পূর্ব পূর্ব জন্মে সে যে কর্মগুলি করেছিল, ওই কর্মগুলিই ঠেলে তার স্বভাব হয়ে তার জন্মের সাথে চলে আসে। স্বভাব মানে? *স্ব স্ব ভাবঃ*, নিজের নিজের ভাব। আমি কে? আমার যা স্বভাব সেটাই আমি। এই যে বলা হয়, তোমার স্বভাবটা পাল্টাও। পুনর্জন্ম আছে কি নেই এই নিয়ে এখানে কোন প্রশ্ন আসে না। কারণ প্রত্যেক ধর্ম মনে করে মৃত্যুর পরেও কোন না কোন ভাবে জীবন চলতে থাকে। এই জিনিসটাকে যে ধর্ম মানে না, সেটা কোন ধর্মই না। বিজ্ঞান কখন ধর্ম হতে পারে না। ধর্ম মানেই, যেখানে মৃত্যুর পরেও জীবনকে কোন না

কোন ভাবে চলতে হবে। এতটুকু জীবন আর বাকি পুরোটা স্বর্গ, এই জিনিস হিন্দুরা মানে না। খেলা চলতে থাকে। আর এই জিনিসগুলো শাস্ত্রপ্রমাণ, সেখানে আমার আপনার বুদ্ধি দিয়ে কিছু আসে যায় না। যে শাস্ত্র মুক্তির কথা বলেন, সেই শাস্ত্র পুনর্জন্মের কথা বলেন। আমি একটাকে নেব, আর-একটাকে নেব না, এভাবে কিছু হয় না।

স্বভাব কি? আচার্য এখানে বলছেন, *জন্মান্তরকৃতো ধর্মাদিসংস্কারো মরণকালে অভিব্যক্তঃ স্বভাব,* সারা জীবন আপনি যেটা করেছেন, জন্মজন্মান্তরে যেটা করে এসেছন, মৃত্যুকালে সেটাই আপনার মনে ভেসে উঠবে। আমাদের একজন মহারাজ এই ব্যাপারে খুব সুন্দর বলতেন, মৃত্যুকালে বোঝা যাবে সারা জীবন নোঙর ফেলে নৌকা চালিয়ে ছিলে নাকি নোঙর তুলে নৌকা চালিয়ে ছিলে। এক মাতাল সারা রাত ধরে নৌকা চালিয়ে গেছে। সকালে উঠে দেখছে, নৌকা যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। কেন এমনটা হল? নোঙর তোলা হয়নি। সংসার থেকে কি নোঙর তুলেছেন? সবাই ধ্যান করতে চায়, সবাই ঈশ্বরের দিকে যেতে চাইছে কিন্তু সংসার থেকে নোঙরটা তুলতে চায় না। একবার বিচার করে দেখুন, সংসার থেকে নোঙর তোলা হয়েছে কি? আগেকার দিনে উত্তরাখণ্ডের সাধুদের সাথে দেখা হলে পরস্পর পরস্পরকে সম্বোধন করে বলতেন, 'মহাত্মাজী দর্শন সাফ্ হ্যায় না'? তার মানে, জীবনের যে উদ্দেশ্য, যে পথ, সেটা পরিষ্কার আছে কিনা। আপনি যাই করুন, সাধুসঙ্গ, জপধ্যান, পূজা অর্চনা, শাস্ত্র পাঠ, কিন্তু নোঙরটা কি তুলেছেন?

কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, সংসারে বড়লোক বাড়ির ঝিয়ের মত থাকবে। সংসার থেকে যদি নোঙর না তুলে থাকেন, তাহলে মরণকালে যে স্বভাবটা ফুটে উঠবে, সেটাও পুরো সংসারের স্বভাবই হবে। আমি অনেক জ্ঞানীগুণী মহারাজদের সঙ্গ করেছি। পরম পূজনীয় স্বামী প্রমেয়ানন্দজী মহারাজ ছিলেন, বেলুড় মঠেই থাকতেন। আমাদের মন্দিরের পশ্চিম দিকে জুতোঘরের সামনে থেকে একটা রাস্থা আছে, যেটা মঠের ভিতরের দিকে চলে গেছে। আমার সমস্ত বই ওই রাস্থায় পায়চারি করতে করতে লেখা। মোটামুটি সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে নটা ওখানে পায়চারি করতাম। আর ওই সময় স্বামী প্রমেয়ানন্দজী মহারাজ মঠের ভিতর থেকে আসতেন। ওনার সাথে কিছুক্ষণ পায়চারি করতে করতে অনেক কথা বলতাম, অনেক প্রশ্ন করতাম। এগুলো অনেক আগেকার কথা।

একবার আমি মহারাজকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, নোঙর তোলা হয়েছে কিনা এটা কিভাবে বোঝা যায়? উনিও ঠিক এই কথাটাই বলে ছিলেন, মৃত্যুকালে বোঝা যায়। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, অনেক সংসারী ভক্ত আছেন, যাঁদের সজ্ঞানে মৃত্যু হতে দেখা যায়। উনি ঠিক এই শব্দটা নেননি, কিন্তু অর্থটা একই, নোঙর তোলা। তিনি বলতে চাইলেন, সংসারে থেকেও নোঙর তোলা যায়। সন্ন্যাস জীবনে নোঙর তোলা হয়েছে কিনা বলা খুব মুশকিল। মূল কথা, নোঙর তুলেছেন কিনা। বাংলাতে খুব সুন্দর একটা গান আছে, দে তুলে দে পাল তুলে দে। ঈশ্বরের নামে পাল তুলে দিয়েছেন কিনা, সংসার থেকে নোঙরটা তুলেছেন কিনা। যদি না তোলা হয়ে থাকে, তাহলে যেটাই করুন না কেন, কিছু হবে না, যেমন কে যেমন তেমনই থাকবেন। ঠাকুরের কথাতেই আছে, সাধুর কমণ্ডুলু সব তীর্থ ঘুরে আসে, কিন্তু যেমন তেতো তেমন তেতো থাকে। সাধুদের কমণ্ডুলু চালকুমড়ো দিয়ে তৈরী হয়। চালকুমড়োর খোলটা তেতো হয়, তাই যেমন তেতো ছিল, তেমন তেতোই থাকে। পরের জন্ম ঠিক এভাবেই নির্ধারিত হয়, যেটা অষ্টম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বলছেন, এই শ্রদ্ধা তিন প্রকার হয়। যাদের স্বাভাবিক বৃত্তি দেবতাদের পূজা করার প্রতি, তাদের এই শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা। যক্ষ, রাক্ষসদের যারা পূজা করে; মারামারি, ক্ষমতা নিয়ে কামড়াকামড়ি করছে, বুঝতে হবে ভিতরে রজোগুণ আছে। যারা ভূত, প্রেতের পূজা করে, টোটকা আদি করে বেড়ায়, এরা সবাই তমোগুণী। শাস্ত্র জানে না, তার সাথে জন্মজন্মান্তর ধরে যেভাবে জীবনযাপন করে এসেছে, সেটাকেই ধরে রেখেছে; এটা তামসিক। ভগবান এখানে প্রথমেই বলে দিচ্ছেন, অর্জুন তুমি যে প্রশ্ন করছ যারা শাস্ত্র জানে না, অজান্তে বড়দের আচরণ দেখে ব্যবহার

করছে, কিংবা মনে একটা শুদ্ধ ভাব নিয়ে কিছু করছে, কি করে বুঝব এটা সাত্ত্বিক, রাজসিক নাকি তামসিক? ভগবান আগেই বলে দিচ্ছেন, মানুষ যখন জন্ম নেয়, এই তিনটে গুণের স্বভাবকে নিয়েই জন্ম নেয়, ফলে তার সমস্ত প্রবৃত্তিগুলি ওই রকমই হয়ে থাকে।

ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান পরিষ্কার দৈবীগুণ অর্থাৎ সাত্ত্বিকগুণ, রাজসিকগুণ ও তামসিকগুণের কথা বলছেন, এর আগে এগুলোকে নিয়ে আমরা বিস্তারে অনেকবার আলোচনা করে এসেছি। এবার ভগবান ভক্তির দিকে নিয়ে আসছেন, তার সাথে আরও অন্যান্য জিনিসও আসবে। বলছেন, এই স্বভাব মানুষের নূতন করে তৈরী হয় না, জন্ম থেকেই সে নিয়ে আসছে। ঠাকুর গল্পচ্ছলে বলছেন, এক ধোপা মরার পর রাজার ব্যাটা হয়ে জন্ম নিয়েছে। বন্ধুদের সাথে খেলতে গিয়ে বলছে, 'আমি উপুড় হয়ে শুই আর তোরা আমার উপর হুশ হুশ করে কাপড় কাচ।' যে কোন মানুষের আচার ব্যবহার দেখলেই বোঝা যায় লোকটা সাত্ত্বিক নাকি রাজসিক নাকি তামসিক।

কিছু দিন আগে একটি ছেলে আমাকে এসে জিজ্ঞেস করল, 'মহারাজ, আমাকে দেখে আপনার কি মনে হয়'? বললাম, 'একবার দৃষ্টি দিয়ে তোমার ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যত সব বলে দিতে পারি। তোমার past imperfect, present imperfect, future imperfect। জীবনে একটুও তো খাটনি, তোমার মুখ দেখলেই বোঝা যায়, বলবটা কি'। সেখানে আমার সঙ্গে একজন বড় ডাক্তার ছিলেন, পরে তিনি আমাকে বলছেন, 'মহারাজ আপনাকে যেন খুব কঠোর লাগছিল'। আমি বললাম, 'কি আর বলব, যত সব অপদার্থগুলি মনে করে সাধুদের কাছে পৌঁছে গেলে ম্যাজিকালি সব কিছু হয়ে যাবে। আমাদেরই কিছু হল না, তোমার কোথা থেকে হয়ে যাবে'! এরা মনে করে, মহারাজের সাথে দেখা হল, ব্যস জীবন পাল্টে যাবে। জীবন যে পাল্টায় না তা না, পাল্টায়, ভিতরে শক্তি আছে কিন্তু আটকে আছে, আশীর্বাদ করলে খুলে যায়। কিন্তু বেশির ভাগেরই ভিতরে কিছু নেই, ফাঁকা হাড়ি, আগুনে চাপিয়ে ভিতরে হাতা নেড়ে যাচ্ছে আর ঢ্যাং ঢ্যাং করে খালি আওয়াজ করে যাচ্ছে। আমাদের বেলুড় মঠে খাওয়া পরিবেশন করতে গিয়ে অনেক সময় হয়ত ভাত শেষ হয়ে গেল, তখন ওরাও মজা করে শুধু হাতার ঢ্যাং ঢ্যাং করে খালি আওয়াজ 'ভাত' 'ভাত' করতে থাকে। আমি মজা করে বলতাম, ফাঁকা কর্মফলের মত এটাকে আর বাজাবেন না। তোমার ভিতরে কিছু নেই তো, কি করে হবে, শুধু ঢ্যাং ঢ্যাং আওয়াজটাই বেরোবে। এরপর ভগবান বলছেন, এই শ্রদ্ধা তিন প্রকার।

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।।৩।।

(হে অর্জুন, সকল মানুষের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকাদি সংস্কারযুক্ত অন্তঃকরণের অনুরূপ তিন প্রকার হয়ে থাকে। মানুষ শ্রদ্ধাময়, কারণ যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি সেইরূপই হন। সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী শ্রদ্ধাভেদে মানুষ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হয়।)

যেমনটি তোমার শ্রদ্ধা, তুমি তেমনটি। বলছেন, শুধু যে মানুষ তা না, সমস্ত প্রাণী, গরু, ছাগল, পাখী, দেবতা সবারই ভিতর এই তিনটে গুণের তারতম্য অনুসারে তিন প্রকার শ্রদ্ধা দেখা যায়। যার জন্য কথামৃতে ঠাকুর সত্ত্ব, রজো ও তমোকে নিয়ে এতবার করে বলছেন। যেমন ধরুন নিঃশ্বাস, আমরা একটু দৌড়ে দৌড়ে কাজকর্ম করলে আমাদের নিঃশ্বাস খুব জোরে জোরে চলতে থাকে, রাজসিক। ধ্যানে বসলে নিঃশ্বাস খুব ধীরে ধীরে চলে, সাত্ত্বিক। আর ঘুমের মধ্যে হা করে একটু শ্বাস নিয়ে ফুস্ করে ছেড়ে দেয়, এর মানে তামসিক। নিঃশ্বাস চলাচলকে পর্যন্ত তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক এই তিনটে গুণে বিভাজন করে দেওয়া যায়। শুধু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকেই না, সব কিছুতে; মানুষের হাঁটা, চলা, বসা, খাওয়া, কথা বলা, সবটাতেই সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক গুণ

লেগে আছে। কারণ, সবটাই হল আমাদের মস্তিষ্কে, আমাদের মনটাই আসল, এটাই আসল, এটাই হয় সাত্ত্বিক হবে, নয় রাজসিক, নয়তো তামসিক হবে।

তবে চেষ্টা করে এটাকে পাল্টানো যায়। অনেকে মনে করেন, ভগবান যা দিয়েছেন এটাকেই নিয়েই আমাদের চলতে হবে। আমরা এটা মানি না, চেষ্টা করলে পাল্টানো যায়। যদি প্রাণপন চেষ্টা না করা হয়, তাহলে কিন্তু পাল্টাবে না। ঠাকুর যেমন অনেকগুলো গল্প বলছেন, হাতের আটকেল আছে বলছেন। এগুলো হল বোঝার জন্য, তুমি যদি চেষ্টা না কর, পুরো প্রাণ যদি না লাগাও তাহলে পাল্টাবে না, কিন্তু চেষ্টা করলে পাল্টে যাবে। এটা পাল্টালে আপনার সব কিছু পাল্টে যাবে। আপনার রক্ত প্রবাহ পর্যন্ত ঠিক হয়ে যাবে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া ঠিক হয়ে যাবে, হাঁটাচলা ঠিক হয়ে যাবে। পর পর সব আসবে, কথাবার্তা, কাজকর্ম, তপস্যা সব কিছুর মধ্যে কিভাবে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভাব মিশে থাকে। সেইজন্য এই অধ্যায়টা খুব সুন্দর অধ্যায়।

বলছেন, অন্তঃকরণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই যে চারটে, এরও সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক হয়। সংসারে যত জীব আছে, সংসারে যারা ঘোরাফেরা করছে, সংসারে যারা এসে গেছে, সবার মধ্যে এই তিনটে গুণ সত্ত্ব, রজো আর তমো থাকবেই থাকবে। শুদ্ধ আত্মার সাথে এই তিন গুণের কোন সম্পর্ক নেই, শুদ্ধ আত্মার কখন কিছু হয় না, কারণ আত্মা শুদ্ধ। কিন্তু শুদ্ধ আত্মা জুড়ে নিয়েছে একটা মনের সাথে, মন হল এই সংসারের বস্তু। এই সংসারে এমন কোন জিনিস নেই যেটাতে সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণ নেই। সব কিছুতে এই তিনটে গুণ থাকবে, মনেও সত্ত্ব, রজো ও তমো থাকবে। ফলে মানুষ কখন সাত্ত্বিক হয়ে যায়, কখন রাজসিক বা তামসিক হয়ে যায়। তবে এটা আসল transformation নয়, কিন্তু ধরে নিয়েছে। আমরা সবাই জানি এই জগতে কেউ কারুর নয়, কিন্তু স্বামী মনে করে স্ত্রী আমার, পুত্র আমার। স্ত্রী মনে করে আমার স্বামী, আমার পুত্র, আমার সংসার। আমরা সবাই জানি, জন্মের আগে এরা আমার ছিল না, মৃত্যুর পরে আমার কেউ থাকবে না, কিন্তু যত দিন বেঁচে থাকব তত দিন মনে হবে এরা আমার এবং আমি ওদের চিরদিনের। জীব ঠিক এই রকম। গভীরে জীব জানে এগুলো কিছুই আমার না, কিন্তু যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আছে, কোটি কোটি জন্ম ধরে এটাই মেনে চলছে। অতীব ভয়ঙ্কর সব কথা। এগুলো ভাবলে রাতের ঘুম উড়ে যাবে। ভাগ্যিস কেউ ভাবে না। স্বামী যতিশ্বরানন্দজী মহারাজ বলতেন, মানুষ মরে যাবে কিন্তু চিন্তা-ভাবনা করবে না। চিন্তা-ভাবনা করার থেকে মরে যাওয়া ভাল।

আচার্য এখানে বলছেন, *যো যচ্ছ্রদ্ধো যা শ্রদ্ধা যস্য জীবস্য স যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব তচ্ছ্রদ্ধানুরূপ এব স জীবঃ*, যেমনটি আপনার শ্রদ্ধা, তেমনটি আপনি। এই শ্রদ্ধাটা কি? এটাকে এবার পর পর ব্যাখ্যা করবেন। আপনি কার পূজা করেন? ঠাকুরের খুব সুন্দর গল্প, একজন জমিদার খুব জাঁকজমক করে দূর্গা পূজা করত। পরে পূজা বন্ধ করে দিয়েছে। জিজ্ঞেস করা হল, 'মশাই, আপনি এত জাঁকজমক করে দূর্গা পূজা করতেন, বন্ধ করে দিলেন কেন'? বন্ধ হওয়ার কারণ বলছেন, দাঁত গুলো সব পড়ে গেছে। দূর্গা পূজা করবেন, পাঁঠা বলি হবে, পাঁঠার মাংস চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে। কিন্তু সব দাঁত পড়ে গেছে, পাঁঠার মাংস আর খেতে পারবে না, পাঁঠাবলি বন্ধ করে দিতে হল। সেইজন্য দূর্গা পূজাটাই বন্ধ করে দিতে হল। লোকটা তো খুব করে দূর্গা পূজা করত, তাহলে লোকটা কি সাত্ত্বিক ছিল? একেবারেই না, ঘোর তামসিক। আগে রজোগুণী ছিল, এখন ঘোর তামসিক হয়ে গেছে। আপনার ভিতরে যে শ্রদ্ধা, আপনি কেমন লোকের সাথে থাকতে চান, কেমন দেবতার পূজা করতে আপনার মন চাইছে, কেমন কাপড় পরতে চান, এগুলো দিয়ে বোঝা যায় আপনি কেমন মানুষ, আপনার শ্রদ্ধা কেমন।

আমি কার্ল মার্ক্সকে মানব, আমি লেনিনকে মানব, কিন্তু হিন্দুদের ঋষি মুনিদের মানব না, এটা কি ধরণের যুক্তি! আমি নিউটনের কথা মানব, আমি আইনস্টাইনের কথা মানব কিন্তু ঋষি মুনিদের মানব না, এটা কিসের যুক্তি! আমি কান্টকে মানব, আমি হেগেলকে মানব, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ,

স্বামীজীকে মানব না। তুমি তো কোনটাই ভেরিফাই করে দেখনি। যে জিনিসটাকে হিন্দুরা হাজার হাজার বছর ধরে সম্মান করে আসছে, সেটাকে তুমি মানবে না। অবশ্যই তুমি মানবে না। কেন মানবে না? কারণ তোমার বুদ্ধি সেই রকম, তোমার শ্রদ্ধা সেই রকম, আর তোমার মধ্যে যে ঘোর তামসিকতা সেটা আর নাই বা বললাম। আপনি কাকে ভালবাসেন, কার প্রতি আপনার শ্রদ্ধা, আর যদি সেই জিনিসটাকে আমরা বোঝার চেষ্টা করি, তাহলেই বোঝা যাবে আপনার বুদ্ধির গঠন কেমন। আর তার সাথে সঠিক ভাবে predict করে বলে দেওয়া যাবে, আপনার ভবিষ্যত কিরকম, আগামীকাল আপনি কি করতে যাচ্ছেন। যারা মারামারি, কাটাকাটি এগুলোকে সম্মান দেয় তাদের ব্যবহার এক রকম হবে, যারা বলছে যা চলছে চলুক, আমি ওতে নেই, তাদের ব্যবহার আরেক রকম হবে। যাঁরা ধর্মে সত্যিকারের প্রতিষ্ঠিত, ঋষি মুনিদের প্রতি যাঁদের সম্মান, বোঝা যায় ওনাদের ব্যবহার কেমন হবে, এনাদের কাজকর্ম কোন দিকে যাবে।

এখান গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, যদি কেউ শাস্ত্র জানে না, তাহলে কি সে ধর্মের পথে আসতে পারে? আর যদি ধর্মের পথে আসতে পারে, তাহলে কি শুধু শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে ধর্ম পথে এগোতে পারবে? এখানে অনেকগুলি কথা বলা যায়, কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে দেশ এত স্পর্শকাতর হয়ে গেছে যে, আমাদের পক্ষে সব কথা বলা যাবে না। কারণ ধর্ম একটা জিনিস, রাজনীতি আর-একটা জিনিস। এখন ধর্মে এনারা রাজনীতি এমন ভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছেন যে, সব কথা বলা যায় না। কিন্তু মূল কথা হল, যাদের শাস্ত্র পড়ার অধিকার ছিল না বা যারা মনে করত তাদের জন্য শাস্ত্রের দরকার নেই, তাদের বলা হত, তোমার সমাজের যাঁরা শ্রেষ্ঠ পুরুষ তাঁদের ব্যবহার দেখে তুমিও সেই রকম আচরণ করবে। পরিবারে বাচ্চারা ওটাই করে যেটা বড়রা করে। আগেকার দিনে বাচ্চারা ঠাকুরমা, দিদিমার কাছে বড় হত। সন্ধ্যেবেলা তুলসীতলায় ঠাকুরমা প্রদীপ দিতে যাচ্ছেন, সেটা দেখে আগেকার বাচ্চারা বলত, আমাকে দাও আমাকে দাও, আমি প্রদীপ দেখাব। এইভাবে অনেক কিছু দেখে দেখে বাচ্চারা পরিবারের আচার আচরণ, রীতিনীতিগুলি শিখত।

আমেরিকাতে আমাদের একজন মহারাজ আছেন, অত্যন্ত গুণী মহারাজ, তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করা হল, এই যে বিদেশে বাচ্চারা এত ভাল কাজ করে, কি সুন্দর গুছিয়ে পরিষ্কার ভাবে সব কিছু করে, কি করে ওরা পারে? উনি ঠিক এই একই কথা বললেন। আমাদের দেশে বাচ্চারা যেমন বড়দের দেখে ধর্মের আচার, ধর্মের জ্ঞান অর্জন করে, ঠিক তেমনি বিদেশে, একেই কর্মপ্রধান দেশ, সেখানে বাচ্চারা দেখছে, বাবা, মা, বয়স্করা সবাই কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের এখানে বাচ্চাদের কাজ করতে দিই না, বিশেষ করে ছেলে হলে তো কোন কথাই নেই। আমরা যৌথ পরিবারে বড় হয়েছে, সেখানে দেখতাম ছেলেরা নিজে থেকে এক গ্লাশ জলও গড়িয়ে খাবে না। বাড়ির মা, জ্যাঠিমা, কাকিমা, ঠাকুরমারাই করতে দিতেন না। বিদেশে আবার অন্য রকম, বাচ্চা বয়স থেকেই বাবা-মায়েরা কাজ করাতেন, খাবার সময় ডাইনিং টেবিলে প্লেটা সাজাও, জল আনো, এটা ওখানে রাখো। আমাদের তো প্রশ্নই নেই যে আমরা এসব কাজ করব। পালা পার্বণে বাড়িতে কোন অনুষ্ঠান হলে একটু আধটু করতে হত। এক-এক জায়গার এক-এক রকম সংস্কৃতি।

ভারত হল ধর্ম প্রধান দেশ, স্বামীজীর প্রায় সব লেকচারে এই কথা বলে গেছেন, আমাদের ভারতবর্ষে ধর্মই সব কিছু। যা কিছু এখানে করবে সব ধর্মকে সামনে রেখে, ধর্মের মাধ্যমে করবে। এই ধর্মটাই আবার বড়দের দেখে বাচ্চারা শেখে। আমাদের ইউনিভার্সিটিতেই আমি দেখেছিলাম, ইসরোর নামকরা তিনজন বড় প্রফেসর এসেছিলেন, আর-একবার ইসরোর ডিরেক্টর নিজে এসেছিলেন। তিনজন প্রফেসর, সবাই ফিজিক্সের, ওনারা বললেন, আমরা তিনটে জায়গায় যাব, কালীঘাট, স্বামীজীর পৈতৃক ভিটে এবং দক্ষিণেশ্বর। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, বিদেশে এই জিনিস কেউ কল্পনাই করতে পারবে না, ফিজিক্সের বড় বড় প্রফেসররা মন্দিরে পূজা দিতে যাবেন? ওনারা ক্যাথিড্রেল দেখতে যাবেন, কিন্তু সেই যাওয়াটা হল, মানুষ যেমন মিউজিয়াম দেখতে যায়। কিন্তু এই

তিনজন প্রফেসরদের দেখলাম পূজা দিতে যাচ্ছেন। ইসরোর ডিরেক্টরকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গেলাম, ওনাকে গর্ভ মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হল, দেখলাম সেখানে তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করছেন। এই হল ভারতবর্ষ, যাদের শিরায় শিরায় ধর্ম। কিন্তু সবাই শাস্ত্র পড়তেন না, সবাইকে পড়তে দেওয়া হত না, বিভিন্ন কারণ ছিল। কারণ, শাস্ত্র বুঝতে গিয়ে একটা বিরাট সমস্য হয়, পাত্রতা যদি না থাকে, প্রস্তুতি যদি না নেওয়া থাকে, তাহলে শাস্ত্রের কথা ভুল বুঝে নিয়ে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। ভুলভাল বুঝে নিলে ক্ষতি তো হয়ই। সেইজন্য বলছেন, তুমি বড়দের দেখে কর। বড়রা যেমনটি করছেন, তাঁদের দেখে তুমি তেমনটি করতে থাক, তাতেই তোমার হবে।

যার যেমন শ্রদ্ধা, সে তেমনটি, এর উপর বিস্তারে আলোচনা করেছি। যে গাঁজাখোড়, সে যেখানেই যাবে সেখানেই গাঁজার ঠেক ঠিক খুঁজে বার করে নেবে। মাতালরা যে শহরেই যাক, সে ঠিক খুঁজে বার করে নেবে মদের দোকান কোথায় আছে। ঠিক তেমনি আপনার মনের ভিতর যে ভাব, ঠিক সেই অনুযায়ী আপনি খুঁজে নেবেন আপনার মনের মত আচার্য। ভিতরে একটা আলোড়ন চলতে থাকে, সেই আলোড়নটাই তাকে নিয়ে যাবে তার মনের মত জায়গায়। কেউ এসে আমাদের যখন বলে, মহারাজ আমি অমুক মহারাজের লেকচার শুনি। তাতেই আমরা বুঝে নিই লোকটি কেমন। কার লেকচার আপনি শুনছেন, তাতেই বোঝা যায় আপনার মনের গভীরতা কেমন। কারণ আপনার ভিতরে শ্রদ্ধা যেমন, আপনি তেমন। আপনি ঠিক তেমন গুরু খুঁজে বার করে নেবেন। এতে ভাল মন্দের কিছু নেই। শিষ্যরা যেমন হন, গুরুও তেমন হন। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে, A man is known by the company he keeps। ঠিক তেমনি আপনি কার কাছে শাস্ত্র শুনছেন, তাতে বোঝা যাবে আপনার শ্রদ্ধা কেমন, আপনার ক্ষেত্র কেমন প্রস্তুতি নিয়েছে।

এখন বলছেন, আগেকার দিনে ব্রাহ্মণ সন্তানরা আচার্যের আশ্রমে গিয়ে বেদ অধ্যয়ন করত, এখানে এই ব্যাপারে কিছু বলা হচ্ছে না, কারণ তাঁরা ওটাই করবেন। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, আমাদের একটা কাঠামো তৈরী হয়ে গেছে। আমরা জানি দূর্গা পূজা হলে এই রীতিনীতি মেনে পূজা হবে, কালী পূজা হলে এই এই রকম হবে, সরস্বতী পূজাতে এই এই করা হবে। ফলে যে কোন উৎসবে রামকৃষ্ণ মিশনের যে কোন সন্ন্যাসীদের আচার আচরণ একই রকম হবে; একটা কলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্তরা এই রকম নন। আর যখন আমরা কলকাতা শহরের হিন্দুদের দেখব, সেখানে সব কিছু আরও ছড়িয়ে গেল, কারণ তাদের কলে ফেলা হয়নি, বৃদ্ধ আচরণটাও তারা ঠিক ভাবে নেয়নি। ফলে দূর্গা পূজা এক-একটা জায়গায় এক-এক ভাবে করা হয়। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের যেখানেই যান দূর্গা পূজা একই রীতিনীতিতে, একই ভাবে অনুষ্ঠিত হতে দেখবেন।

তেমনি যারা রামকৃষ্ণ মিশনের সত্যিকারের ভক্ত, তারা বিভিন্ন পূজা-পার্বণে শ্রদ্ধার সঙ্গে কিছু গরীব লোককে খাওয়াবেন, পূজাতে তাঁদের একটা সাত্ত্বিক ভাব দেখা যাবে। আবার কলকাতায় যারা আছে, তারা কোন কোন পূজার প্যাণ্ডেল দেখতে যাবে, কোথায় ফুচকা খাবে, কোন রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়া করবে, পূজার কদিন তারা এই প্ল্যানই করতে থাকবে।

এখান থেকে এবার বলবেন, ট্রেনিং যেখানে নেই, ব্রাহ্মণ বংশের ছেলেদের বাচ্চা বয়স থেকে যে একটা ট্রেনিং দেওয়া হত, প্রথমে বাড়িতে, সেখান থেকে গুরুর আশ্রমে; এই ট্রেনিংটা যেখানে নেই, সেখানে তখন জন্মজন্মান্তরে যে কামনা-বাসনাগুলি চলে আসছে, যেটা তার ব্যক্তিত্বকে তৈরী করেছে, তার মত সে গুরু বার করে নেবে। ঠাকুর বলছেন, অনেকে সাধুসঙ্গ করে যাতে গাঁজা খেতে পারে। ও ঠিক খুঁজে বার করে নেবে কোন সাধুবাবার কাছে গাঁজা পাওয়া যায়, কোন সাধুবাবার কাছে কোন সিদ্ধি পাওয়া যায়। আমাদের এখানে অনেকে এসে প্রথমেই বলবেন, মহারাজ আমার অমুক অমুক মহারাজের সাথে পরিচিতি আছে। আগে এসে এই পরিচয়টা দিয়ে দেন। এতে বুঝতে পারি, ইনি স্ট্যাটাসের পিছনে দৌড়ান, নাকি ভক্তির পিছনে দৌড়ান। আজ পর্যন্ত যে কজন

আমার এখানে এসেছে, একজন পেলাম না যে কারুর মুখে সাধুর নাম বলতে শুনলাম না, যাঁকে আমরাও সম্মান করি, এই অর্থে সম্মান করি তিনি একজন অন্তর্মুখী সাধু। সেই সব মহারাজদের নাম করবে, যাঁদের নামডাক আছে, খবর কাগজে নাম আসে, টিভির চ্যানেলগুলিতে দেখা যায়, এনাদের নামই করবে। দিল্লীতে যেমন বলে, আমি রেইকি করেছি, আমি আর্ট অফ্ লিভিং করেছি, এতেই বোঝা যায় কে কেমন প্রকৃতির। এটা আমাদের কথা কিছু না, শাস্ত্রের কথা *যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ*।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ।।৪।।

(সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবগণের পূজা করেন, রাজসিক ব্যক্তিগণ যক্ষ ও রাক্ষসগণের পূজা করেন এবং তামসিক ব্যক্তিগণ ভূত প্রেতাদির পূজা করেন।)

ভারতবর্ষ হল পূজা-অর্চনার দেশ, ভারত হল ধর্মপ্রাণ দেশ। সব রকমের পূজাই এখানে হয়। বৈদিক যুগের যে সংস্কার, ব্রাহ্মণের ছেলে গুরুর আশ্রমে গিয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ন করবে, সেটা অনেক আগেই উঠে গিয়েছিল। ফলে সব কিছু খুলে গেছে, ইন্টারনেটের দৌলতে সবটাই খোলামেলা হয়ে গেছে। এতে সুবিধা হয়ে গেল, আপনার জন্য উপযুক্ত গুরু আপনি ঠিক খুঁজে বার করে নেবেন। এখানে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। অনেক আগেকার ঘটনা, একজন ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে, হঠাৎ তাকে দেখা গেল, কাপালিক, তান্ত্রিক এদের সাথে ঘুর ঘুর করছে। যে সময়কার ঘটনা, সেই সময় হিন্দুরা মুরগীর মাংস খেত না, এখন অবশ্য সবাই খাচ্ছে। পরে জানা গেল, ওর মধ্যে মুরগী খাওয়া, মদ খাওয়ার আকাঙ্খা জন্মেছে, যার জন্য ওদের সাথে ঘুর ঘুর করত। আমরা তখন বাচ্চা ছিলাম, সব কিছু বুঝতে পারতাম না। আর গ্রামের সবাই সবাইকে জানে, ব্যাপারটা জানাজানি হতে বেশি সময় লাগেনি।

ব্যাসদেব যখন গীতা রচনা করলেন, কত বছর আগে আমাদের জানা নেই, তিন হাজার বছর আগে হতে পারে, চার হাজার বছর আগে হতে পারে, সেই সময় হিন্দু ধর্ম মূলতঃ ব্রাহ্মণদের ধর্ম ছিল, যেখানে বেদের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু তাই বলে হিন্দুরা কখন সাধারণ লোকেদের ক্রীতদাস বানিয়ে রাখেনি, গোলাম তৈরী করেনি। ভারতের বাইরে অন্যান্য সমাজে এটা করেছিল। এখানে বলছেন, তুমি সাধারণ হও, যাই হও, আমাদের মধ্যে যাঁরা গুণী মানুষ আছেন, এনাদের মত আচরণ কর, তুমিও উপরে উঠে যাবে। এই ভাবে আমাদের মুনি ঋষিরা কত সাধারণ, কত নিম্নবর্ণের লোকেদের উচ্চবর্ণে তুলে দিতেন। এগুলো অন্য কথা। এখন সাধারণ লোকেরা এই পূজা অর্চনা এবং আরও অনেক কিছু দেখছে, এদের মধ্যে যাঁদের ভিতরে সাত্ত্বিক ভাব তাঁরা দেবতাদের পূজা করেন। যাঁদের রাজসিক ভাব তাঁরা যক্ষ, রাক্ষসাদর পূজা করেন। যদিও এই পূজা ইদানিং বন্ধই হয়ে গেছে। আর যাদের তামসিক ভাব, তারা ভূত, প্রেত, সপ্তমাতৃকাদির পূজা করে।

ভারতের যেসব অঞ্চলে বেদের সংস্কৃতি সেভাবে প্রবেশ করেনি, যেখানে বেদের প্রভাব একটু কম, সেই সব অঞ্চলে এখনও এই ধরণের পূজার আড়ম্বর দেখা যায়। পূজাতে মাছ, মাংস, মদ সব কিছুই নিবেদন করা হয়। তান্ত্রিকদের মধ্যে কিছু ছিলেন যাঁদের এগুলোর দিকে বেশি ঝোঁক ছিল। আবার কিছু তান্ত্রিক ছিলেন যাঁদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবকে অবলম্বন করে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতি খুব বেশি ঝোঁক দেখা যেত। গীতা এখানে বলছেন, যাদের দেবতাদের পূজা করাতে বেশি আগ্রহ, এরা হল সাত্ত্বিক। কিন্তু এটা হতে পারে না।

আচার্য এখানে খুব সুন্দর বলছেন, *তত্র কশ্চিদ্ এব সহস্রেষু দেবপূজাদিতৎপরঃ সত্ত্বনিষ্ঠাঃ ভবতি*, দেবতাদের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা এটা সবার হয় না, হাজারে হয়ত একজনের হয়। স্বাভাবিক শ্রদ্ধা বলতে আচার্য এখানে বোঝাচ্ছেন, যাঁরা শাস্ত্র পড়ছেন, এই যেমন আপনারা শাস্ত্রের কথা শুনছেন, আপনারা কথামৃত পড়ছেন, গীতা পড়ছেন। বর্তমান কালে সব বইগুলো ছাপা হয়ে গেছে,

সেইজন্য আমরা সবাই জানি কোন বই বেশি ভাল, উপনিষদের কথা লোকেরা শুনছেন, পড়ছেন; এনাদের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। আজ থেকে দুই কি তিন হাজার বছর আগে ইদানিং কালের মত বিদ্যার চর্চা এত ছিল না। ব্রাহ্মণদের দেখে দেখে নিজেদের আচরণ করতেন, কিন্তু আচরণ করতে গিয়ে নিজের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, সেই প্রবৃত্তি অনুসারে যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, প্রেত এগুলোর পূজার দিকে চলে যেতেন। এখনও অনেকে আমাদের কাছে এসে বলে, মেইল করেও জানতে চায়; বাড়িতে অনেক সমস্যা, তন্ত্রের কোন টোটকা যদি বলে দেন, খুব ভাল হয়। যখন বলে দিই যে, আমার এসব কিছু জানা নেই, তখন অনেকে মন খারাপ করে আর যোগাযোগ করে না, অনেকে আবার দুটো গালাগাল দিয়ে চলে যায়। কিন্তু মনের মত কাউকে না কাউকে ঠিক খুঁজে বার করে নেবে। সমাজেও আপনারা দেখবেন, আপনাদের পরিচিতদের মধ্যেও দেখবেন অনেকেই যারা অঘোরী, তান্ত্রিক এদের কাছে ঘুর ঘুর করছে, এই tendencyটা এদের মধ্যে আগে থেকে আছে বলেই ওসব জায়গায় ঘুর ঘুর করে। ওদের মধ্যে কি শক্তি আছে আমার জানা নেই, তবে শক্তি মানতে হয়, শ্রীশ্রীমাও বলেছেন, শক্তি মানতে হয়। আচার্য বলছেন, বেশির ভাগ মানুষ রাজসিক আর তামসিক হয়।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ।।৫।।
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্।।৬।।

(দম্ভ ও অহঙ্কারযুক্ত এবং কামনা ও আসক্তিকৃত-বলান্বিত হয়ে যে অবিবেকিগণ দেহস্থ ইন্দ্রিয়সমূহকে এবং বুদ্ধির সাক্ষীভূত আত্মস্বরূপ আমাকে ক্লিষ্ট করে (অর্থাৎ আমার শাসন অতিক্রম করে) শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং নিজের ও অপরের পীড়াপ্রদ তপস্যার অনুষ্ঠান করে, তাদেরকে আসুরীকবুদ্ধিবিশিষ্ট বলে জানবে।)

তামসিক রাজসিক প্রকৃতির লোকেরা যারা পূজা আদি করে, তাদের পূজার ধরণ নিয়ে বলছেন। শাস্ত্র পড়েনি, বেদ পড়েনি, উপনিষদের কোন ধারণা নেই, গীতা পড়েনি, কিন্তু বিচিত্র বিচিত্র জিনিসকে নিয়ে এরা চলে। আপনারা কাপালিকদের কাহিনী শুনে থাকবেন। আগেকার দিনে কিছু কাহিনী আছে, এমনকি বিক্রমাদিত্যের যে কাহিনীগুলো আছে সেখানেও কাপালিকদের নিয়ে অনেক কাহিনী আছে। বলছেন, *অশাস্ত্রবিহিতং*, আমাদের মূল শাস্ত্রগুলির কোথাও নৃশংস উপাচারের কথা বলা হয়নি। *ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ*, ঘোর তপস্যা করছে, হাত উঁচু করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, এই ধরণের বিচিত্র বিচিত্র তপস্যা করবে, শাস্ত্রে কোথাও এই ধরণের তপস্যার কথা বলা নেই। নিজের মত একটা কিছু বার করে সেটাই করে যাচ্ছে। এগুলোতে একটা যোগ সিদ্ধি তো অবশ্যই হবে। যাঁরা এই শাস্ত্রের কথা শুনছেন, তাঁদেরও কিছু যোগ সিদ্ধি আছে। দশজনকে যদি দশটি ভাল কথা বলেন, দেখা যাবে আটজনের ক্ষেত্রে সেই কথা লেগে যাচ্ছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক পথে এগুলো কিছুই না।

দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ, গঙ্গাসাগর, কুম্ভমেলায় অনেক সাধুবাবাদের দেখা যায়, তাঁরা নানা ভাবে নিজেদের শরীরকে কষ্ট দিচ্ছেন। গীতা এই ধরণের জিনিসকে কখনই অনুমোদন দিচ্ছেন না। শরীরকে কষ্ট দেওয়া, অপরকে কষ্ট দেওয়া, কাপালিকরা নরবলি দিচ্ছে, তন্ত্রে ছাগ বলি দিচ্ছে, গীতা কখনই এই জিনিসগুলিকে সহ্য করতেন না। বেদেও অনেক যজ্ঞ ছিল যেখানে পশুবলি দেওয়া হত, যার জন্য ভগবান বুদ্ধ এগুলোর বিরোধিতা করতেন। বেদ কিন্তু আসলে হিংসার শাস্ত্র নয়। বলছেন, এই যে নানা রকম কসরৎ করে শরীরকে কষ্ট দেওয়া, এমনকি না খেয়ে তপস্যা করা, গীতা কোথাও অনুমোদন করছেন না।

ঠাকুরের কাছে কয়েকজন মহিলা দেখা করতে এসেছেন, ঠাকুর জানতে পারলেন যে মহিলারা উপোস করে এসেছেন। শুনে ঠাকুর খুব কষ্ট পেলেন, তিনি মহিলা ভক্তদের বলে দিলেন, এবার থেকে এখানে যখন তোমরা আসবে খাওয়া-দাওয়া করে আসবে। মনুস্মৃতিতে চান্দ্রায়ণ ব্রতাদির মত বিভিন্ন রকমের কৃচ্ছ সাধনের কথা বলা হয়েছে ঠিকই; কিন্তু সাধারণ অবস্থায় এই ধরণের কৃচ্ছ সাধনা সবার করার দরকার পড়ে না। প্রায়শ্চিত্ত আদি করার জন্য বা জোর কদমে সাধনা করার ক্ষেত্রে এই ধরণের কৃচ্ছতা করা যেতে পারে, সেখানেও আবার এই কৃচ্ছ সাধন *শাস্ত্রবিহিতং* হতে হবে, *অশাস্ত্রবিহিতং* কোন কিছু করার অনুমোদন নেই। বেশির ভাগ মানুষ নিজের মত কিছু একটা ঠিক করে কৃচ্ছ সাধনা করতে শুরু করে দেবে, যেমন কাঠের উপর পেরেক পুতে সেটার উপর শুয়ে থাকবে, এটাই তার একটা সাধনা। গীতাতে এই জিনিসটাকে নিষেধ করা হচ্ছে। এর পিছনে দম্ভ অহঙ্কারাদি জুড়ে থাকে, দেখ আমি কত বড় তপস্বী। এই শরীরের ভিতর অন্তরাত্মা, যিনি সাক্ষী রূপে আছেন, এইভাবে এরা তাঁকে কষ্ট দিয়ে থাকে।

কাউকে কটূ কথা কেন বলতে নেই? কারণ যখন আপনি কাউকে কটূ কথা বলছেন, তখন তাঁর ভিতরে যিনি অন্তরাত্মা আছেন, তাঁকে কষ্ট দেওয়া হয়। সেইজন্য কাউকে কোন ভাবে, দেহ দিয়ে, বাক্য দিয়ে কষ্ট দিতে নেই। আমরা মনে করতে পারি, তিনি তো সাক্ষী, তাঁর তো কষ্ট হওয়ার কথা না। হ্যাঁ ঠিকই, তিনি সাক্ষী, কিন্তু তিনি সব লক্ষ্য করেন। কিছু লোকের কাছে গেলে আমাদের খুব ভাল লাগে, মনপ্রাণ শীতল হয়ে যায়, ভিতরটা স্নিগ্ধ হয়ে যায়। আবার কিছু লোকের কাছে গেলে মনটা কেমন একটা ছটফট করে, বেশিক্ষণ থাকতে ইচ্ছে করে না। তার ব্যবহারের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। যখনই দুজন মানুষের যোগাযোগ হয়, তখনই একটা সম্পর্ক তৈরী হয়ে যায়। এই যে বলা হয় love at first sight, শুধু ভালবাসা না, সমস্ত সম্পর্ক at first sight হয়। এর অন্তর্যামী ওর অন্তর্যামীকে বলে দেয় লোকটি কেমন। এর অন্তর্যামী ওর অন্তর্যামীর কাছে জানতে চান, কিগো লোকটি কেমন? ভিতরে এলেমেলো আছে। এর অন্তর্যামী ওর অন্তর্যামী থেকে সরাসরি সব খবর নেন; চৈতন্য কিনা। সেখান থেকে মনকে বলে দেওয়া হয়, মন এর দিকে এগিয়ে যেত পার কিংবা মন একে এড়িয়ে চল। বাস্তবিক এই রকমটাই হয়।

ঠাকুর বলছেন, কোন লোক এলে আমি পরিষ্কার বুঝতে পারি লোকটা কেমন। কাঁচের আলমিরাতে রাখা জিনিসগুলি যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, সেই রকম বুঝতে পারি সামনের লোকটির ভিতরটা কেমন। আমরা অতটা পারি না ঠিকই, কিন্তু একেবারেই যে পারি না তা না, আমাদের সবারই ভিতর এই বোধটা হয় – কাউকে দেখে ভাল লাগে, কাউকে দেখে কেমন একটা ভয় ভয় করে। আর এটা জানবেন, কাউকে দেখে প্রথম যে অনুভূতিটা হয়, ওই অনুভূতিটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সঠিক হয়। এখানে ছবি দেখার কথা বলা হচ্ছে না, মুখোমুখি সাক্ষাৎ, ছবি দেখে অতটা স্পষ্ট হবে না। পিছনের দিকে যদি তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো, প্রথম যেদিন দেখা হয়েছিল, দেখার পর মনে যে ভাবটা এসেছিল, দেখা যায়, শেষ দিন পর্যন্ত ওই ভাবটাই চলে। এটা আমাদের ক্ষেত্রে খুব কম হয় যে, যেমন বলি, প্রথম তোমাকে দেখে অন্য রকম ভেবে ছিলাম, এখন তোমাকে অন্য রকম দেখছি।

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ, ইন্দ্রিয় সমুদয়ের পিছনে যে চৈতন্য রয়েছেন, তাঁকে *কর্শয়ন্তঃ; কর্শয়ন্তঃ* শব্দের অর্থ কষ্ট দেওয়া। আমাদের দেহে ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যে চৈতন্য বিদ্যমান, তাঁকে যাঁরা কষ্ট দেয়, *মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্,* জানবে, এই ধরণের লোকেরা সবাই আসুরী স্বভাবের। যারা এইভাবে নিজেকে এবং অপরকে কষ্ট দিয়ে বেড়ায়, কিভাবে কষ্ট দেয়? অশাস্ত্রীয়বিধিয় উগ্র তপস্যা দ্বারা, অপরকে মানসিক ও শারীরিক পীড়ন করা দ্বারা, এরা সবাই আসুরী। চার, পাঁচ আর ছয়, এই তিনটে শ্লোকে পুজা বিধিকে নিয়ে বলছেন। তবে এখানে যে পূজার কথা বলা হচ্ছে, এগুলো সরাসরি পূজোর সঙ্গে সম্পর্ক নেই, কিন্তু আচার ব্যবহারে সম্পর্ক আছে।

একজনের সারা শরীরে চুলকানি হয়েছে। যারা ভাল মানুষ হয়, তারা ঠাকুরের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করবে, মা আমার এই চুলকানিটা সারিয়ে দাও। যে দুষ্ট লোক, সে গিয়ে বলবে, মা চুলকানিতে খুব কষ্ট পাচ্ছি, আমার গ্রামের সবারই যেন এই চুলকানি হয়ে যায়। এরাই হল আসুরী স্বভাবের, এদের পূজা অর্চনা দেখলেই বোঝা যায়। একজনের দাড়িতে আগুন লেগে গেছে। লোকটি বাঁচাও বাঁচাও বলে চেঁচাচ্ছে। একজন দৌড়ে এসে বলছে, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান আগুন নিবিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে আমার বিড়িটা ধরিয়ে নিতে দিন'। চারিদিকে তাকিয়ে দেখুন, সব জায়গায় এদেরই রাজত্ব চলছে। আপনার আমার কষ্টকে মূলধন করে এরা টাকা আয় করছে, ভবিষ্যতে আমার আপনার কষ্ট হতে পারে, সেখান থেকে আয় করছে। আমাদের সমাজে এই জিনিস কখনই ছিল না, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব থেকে এসেছে। পাশ্চাত্যের লোকেরা শুধু জানে কিভাবে টাকা বানাতে হয়। গীতাতে ভগবান কেন এই ধরণের কথা বলছেন? সাবধান করে দিচ্ছেন –যখন বুঝবে যে, সামনের লোকগুলো এই ধরণের স্বভাব ও প্রবৃত্তির, তখন তাদের থেকে দূরে সরে থাকবে। হে অর্জুন, যখন দেখবে লোকেদের মধ্যে এই ধরণের স্বভাব আছে, এদের থেকে সরে আসতে হয়। এই অধ্যায়ের পরের দিকে এগুলোকে আরও ভাল ভাবে দেখন হবে। অর্জুন যে প্রশ্ন করেছিলেন, সেই প্রশ্নকে সামনে রেখে ভগবান এরপর এক এক করে বলে যাবেন।

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু।।৭।।

(পূর্বোক্ত তিন প্রকার লোকের আহারও সত্ত্বাদি গুণভেদে তিনি প্রকার প্রিয়। সেইরূপ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ত্রিগুণানুসারে তিন প্রকার। এদের প্রভেদ শ্রবণ কর।)

এখানে প্রথমে সংক্ষেপে বলে দিলেন। খুব জাঁকজমক করে পূজার আয়োজন করা, খুব করে বলি দিয়ে পাঁঠার মাংস খাওয়া, এগুলো দিয়ে বোঝা যায় লোকটির প্রকৃতি কেমন। কিন্তু সেখান থেকে এবার বলছেন, খাওয়া-দাওয়া দিয়ে যদি বিচার করা হয় তাহলে সেখানেও তিন প্রকার পৃথক ধরণের খাদ্য বেরিয়ে আসবে। বলছেন, আহারটাও তিন রকমের হয় – সাত্ত্বিক আহার, রাজসিক আহার এবং তামসিক আহার। আহারের মত যজ্ঞ, তপস্যা আর দান, এগুলোও তিন প্রকার হয়। মোট চারটে জিনিসকে এখানে এই চারটের তিন প্রকার ভেদের কথা বলছেন।

এই প্রসঙ্গটা খুবই সুন্দর, এবং আপনারা সবাই সহজেই বুঝতে পারবেন। আপনি ধর্ম পথে আছেন; ধর্ম পথের কথা ছেড়ে দিন, আপনি একজন ভাল মানুষ হতে চাইছেন, একটা ভাল জীবন যাপন করতে চাইছেন; তখন আপনার খাদ্যাভ্যাস কি রকম হবে, কি ধরণের খাদ্যে আপনার রুচি হবে, খুব সুন্দর ভাবে বলে দিচ্ছেন। পরের তিনটি শ্লোকে শুধু তিন ধরণের আহার্য বস্তুকে নিয়ে বলছেন। আপনি যদি সাত্ত্বিক ভাবের মানুষ হন তখন কি ধরণের খাদ্যে আপনার রুচি হবে?

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকাপ্রিয়াঃ।।৮।।

(যে-সকল আহার আয়ু, উদ্যম, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বৃদ্ধি করে, এবং সরস, স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর এবং মনোরম সেইগুলি সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হয়।)

যাঁরা সাত্ত্বিক প্রকৃতির, যাঁরা ভাল মানুষ তাঁরা সাত্ত্বিক আহারই গ্রহণ করবেন। ঠাকুর সাত্ত্বিক লোকেদের আহারের কথা বলছেন, সাত্ত্বিক লোকেদের একটু ঝোল ভাত হলেই হয়ে যায়, খাওয়াতে বেশি আড়ম্বর নেই। সাত্ত্বিক লোকেরা দুধ খায়, দই খায়, পায়েস খায়, ঘি খায়। বেদের সময় থেকেই দুধ, ঘি আমাদের আহারের অঙ্গ হয়ে আছে। খুব জরুরী কথা বলছেন, যে আহার থেকে এই ছয়টি জিনিসের পুষ্টি যোগান আসে, সেই আহারই গ্রহণ করতে হয়। এই ধরণের সাত্ত্বিক আহার থেকেই এই ছয়টি জিনিস বৃদ্ধি পায়। কি সেই ছয়টি জিনিস –আয়ু, সাত্ত্বিক আহার করলে আয়ু বৃদ্ধি

পায়; সত্ত্ব, সত্ত্ব মানে বুদ্ধি, সাত্ত্বিক আহারে বুদ্ধি বাড়ে তার সাথে উদ্যম, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বৃদ্ধি করে।

একটা জোক আছে। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণদের ছেলেরা পণ্ডিতদের বাড়িতে অধ্যয়ন করতে যেত। একজন পণ্ডিত খুব গরীব, ভিক্ষে করে খায়। ছাত্রদের ভাত নুন আর একটু ঘি দেওয়া হতে। ব্রাহ্মণীকে পণ্ডিত বলেছেন, 'যারা ন্যায়ের ছাত্র তাদের পাতে একটু ঘি দিয়ে দেবে'। ব্রাহ্মণী স্বামীকে বলছেন, 'আপনার তো কাব্যের ছাত্র আছে, বেদান্তের ছাত্র আছে, ব্যাকরণের ছাত্র আছে শুধু ন্যায়ের ছাত্রদের কেন ঘি দিতে বলছেন'? ব্রাহ্মণীর কথায় পণ্ডিত একটা বাক্য বললেন, বাচ্চা বয়সে গল্পটা শুনেছিলাম, বাক্যটা তাই এখন আমার আর মনে নেই। ব্রাহ্মণীকে বলছেন, 'আজকে খাওয়ার সময় সবার সামনে তুমি এই বাক্যটা বলবে'। ব্যাকরণের ছাত্ররা বাক্যটা শুনেই বলল, 'এই বাক্যে ব্যাকরণের দোষ আছে, কিন্তু ঠিক আছে চলবে। কারণ কিছু বিধান আছে, যার মতে এই রকম হতে পারে'। বেদান্তের ছাত্ররাও বলল, 'হ্যাঁ এই রকম হতেই পারে'। কাব্যের ছাত্র শুনে বলছে, 'আহা এই বাক্যট কি সুন্দর কাব্য'। ন্যায়ের শাস্ত্র শোনার পর বলছে, 'বাক্যের কথাতে ত্রুটি আছে, এটা অযৌক্তিক'। বাক্যে কিছু কথা বলা হয়েছিল যার অর্থটা হল, গরু গাড়ি আকাশে উড়ে গেছে, তাই আজ কোন খাওয়া নেই, এই ধরণের একটা বিচিত্র কথা ছিল। গরু গাড়ি কখন আকাশে উড়তে পারে না, এটা অযৌক্তিক। তখন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বলছেন, 'দেখলে কি বুদ্ধি'।

এই বিশ্বাসটা আমাদের প্রাচীন কাল থেকেই ছিল, ঘি খেলে বুদ্ধি বাড়ে। বুদ্ধি বাড়ুক আর নাই বাড়ুক, যেটাতে বুদ্ধি ঘোলাটে হয়ে যায়, যেমন মদ, মদ খেলে বুদ্ধির উপর পর্দা পড়ে যায়। ড্রাগস, ভাঙ, গাঁজা এগুলো সেবন করলে বুদ্ধির উপর পর্দা এসে যায়। হিন্দুরা তাই এগুলোকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন, কাউকে খেতে দিতেন না। ইদানিং কালে তো ছেলে-বুড়ো সবাই এগুলোর পিছনেই ছুটছে। একটা কথা মনে রাখবেন, হিন্দু শাস্ত্র অন্যান্য ধর্মের মত কক্ষণ কোন জিনিসকে নিষেধ করে না। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র একজন হিতৈষীর মত সাবধান করে দেয়, এই কাজগুলো করো না, এই এই খাবার খেও না। কেন নিষেধ করছেন? এই ব্যাখ্যাগুলো শুনলে আমরা বুঝতে পারি। যে খাদ্য আমাদের আয়ু বৃদ্ধি করবে, বুদ্ধি বাড়াবে, যে খাদ্য বলদায়ক, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করবে আর সুখ ও শান্তি নিয়ে আসবে তার সাথে মনটাও শান্ত স্নিগ্ধ থাকবে, এই ছয়টি জিনিসকে যে খাবার বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে, সেটাই সাত্ত্বিক আহার। সাত্ত্বিক আহারের কি কি গুণ বা লক্ষণ?

চারটে লক্ষণের কথা বলছেন – *রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা*। আহারটা সাত্ত্বিক কিনা কি করে বুঝব? প্রথম লক্ষণ বলছেন *রস্যাঃ*, খাবারের মধ্যে রস থাকবে। মনুস্মৃতিতে দেখবেন, রসগোল্লা, দইবড়া, এগুলোকে নিংড়ে খেতে নিষেধ করছেন। মনুস্মৃতিতে কেন নিষেধ করছেন? কারণটা এখানে বলা হয়েছে, যে জিনিসটা রসযুক্ত, *রস্যা*, যেটা রসে মধ্যে রেখে তৈরী হয়েছে, সেটাকে রস শুদ্ধুই খেতে হবে। একজন মহারাজের সাথে কথা হচ্ছিল, তিনি বলছিলেন যে রস চিপে না খেলে রসগোল্লা গলায় লেগে যেতে পারে। হতে পারে, কিন্তু এটা হল সাত্ত্বিক আহার, যে কোন সাত্ত্বিক খাবারে সব সময় রস থাকবে।

দ্বিতীয় *স্নিগ্ধাঃ*, খাবারটা রুক্ষ বা শুষ্ক থাকবে না, তার মানে ঘি, তেল জাতীয় স্নেহ পদার্থ দিয়ে তৈরী করা খাবার হতে হবে। আর এটা শরীরকেও শীতল করবে। তৃতীয় *স্থিরাঃ*, স্থিরাটা খুব জরুরী, এমন খাবার হতে হবে, যেটা শরীরে অনেকক্ষণ থাকবে, এক ঘন্টা, দু ঘন্টা অন্তর অন্তর যেন খেতে না হয়। যার জন্য ভাতের সাথে রুটি খাওয়া খুব দরকার। কারণ ভাত তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যায়, রুটি কিছুক্ষণ থাকে। আর চতুর্থ গুণ *হৃদ্যা*, খাবারটা খেতে মনের যেন ভাল লাগে। খেতে ভাল লাগছে না, খেতে ইচ্ছে করছে না, তাও খেতে হচ্ছে, এটা সাত্ত্বিক আহার হবে না।

খাবারের মধ্যে এই চারটে গুণ থাকলে তবেই সেটা সাত্ত্বিক খাবার হবে, এই ধরণের খাবারই *আহারাঃ সাত্ত্বিকাপ্রিয়াঃ*, সাত্ত্বিক প্রধান মানুষের প্রিয় খাবার। খাবারটা খেতে যেন ভাল লাগে, খাবারটা পেটে যেন কিছুক্ষণ থাকে, খাবারটা স্নিগ্ধ হবে এবং রসযুক্ত হবে। আগেকার দিনের ব্রাহ্মণরা তাই দই চিড়ে, দুধ খৈ এগুলো বেশি খেতেন। ডাল ভাত আমাদের নিত্য খাবারের মধ্যে পড়ে, ভাত তাড়াতাড়ি হজম হয় কিন্তু ডাল কিছুক্ষণ থাকে। নিজেকেই ঠিক করে নিতে হয়, এই চারটে গুণ মিশ্রিত কোন কোন খাবার আমার জন্য উপযুক্ত। দেখতে হবে, শরীর যেন খাবারটা নিতে পারে, সাত্ত্বিক খাবার মানেই শরীর ওটাকে নিতে পারছে। আর তার সাথে দেখতে হবে, নেওয়ার পর আয়ু, বুদ্ধি, শক্তি, স্বাস্থ্য, সুখ ও প্রীতি, এই ছয়টি জিনিস যেন বৃদ্ধি পায়। যাঁরা এই ধরণের খাবার পছন্দ করেন, এনারা হলেন সাত্ত্বিক মানুষ। এরপর রাজসিক খাবারের কথা বলছেন –

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ।।৯।।

(যে-সকল আহার দুঃখ, শোক ও রোগ সৃষ্টি করে এবং অতি তিক্ত, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি শুষ্ক এবং অতি প্রদাহকর, সেইগুলি রাজসকি ব্যক্তিগণের প্রিয় হয়।)

এবার রাজসিক খাবারের বর্ণনা করছেন। আপনি যে খাবেন না, তা না, সাবধান করে দিচ্ছেন, এগুলো রাজসিক খাদ্য। যাঁরা জপধ্যান করতে চাইছেন, ধর্ম জীবন যাপন করতে চাইছেন, তাঁদের জন্য রাজসিক খাবার, তামসিক খাবার ভাল না। তাঁদের সব সময় সাত্ত্বিক খাবারের দিকে বেশি যেতে হয়।

এখানে রাজসিক খাবারের যে কটি গুণের কথা বলছেন, আচার্য তাতে বলছেন, এর প্রত্যেকটির সাথে 'অতি' এই শব্দটা লাগাতে হবে। অতি তিক্ত, তেতো বলে বাচ্চারা করলা খেতে চায় না, বড়রা তাদের ধমক দিয়ে খাইয়ে ছাড়েন। বাচ্চারা যদি এই শ্লোকটা জানত, ওরা সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারত, এই তো শাস্ত্রে, গীতার মত শাস্ত্রে তেতো খেতে নিষেধ করছেন। কিন্তু না, অতি তিক্ত খেতে নিষেধ করছেন। নিম পাতা খুব তেতো, তাও স্বাস্থ্যের কারণে, চিকেন পক্স, হাম থেকে মুক্ত থাকার জন্য সবাইকে অল্প অল্প করে খেতে হয়। কিছু তেতো জিনিস ওষুধ রূপে খেতে হয়। অম্ল, অতি টকযুক্ত খাবার রাজসিক খাদ্য। দক্ষিণ ভারতে কিছু কিছু জায়গায় ওদের সাম্বারে খুব টক থাকে। অতি লবণ যুক্ত খাবার, খাবারটা যদি অতি গরম হয়, তীক্ষ্ণ অর্থাৎ প্রচণ্ড ঝাল; রুক্ষ, খাবারটা শুকনো; *বিদাহিনঃ*, খাবারটা শরীরে জ্বলন ধরিয়ে দেবে, এগুলোকে বলছেন রাজসিক আহার।

আসামের দিকে এক ধরণের খুব ছোট্ট লঙ্কা হয়, ওর নাম ভূত ঝল্কা, লঙ্কা খেতে হবে না, শুধু একটু জিভে ঠেকিয় দেখুন, সঙ্গে সঙ্গে পুরো শরীর দিয়ে গরম বাতাস বেরোতে শুরু করে দিয়েছে। স্বামীজী ঝাল মশলা খুব পছন্দ করতেন, এগুলো নিষেধ কিছু না, এগুলো স্বাভাবিক। কিন্তু স্বামীজী তো অন্য ধরণের, ভিক্ষা করে সারা ভারত ঘুরলেন; ভিক্ষাতে কে কোথায় কি দেবে জানা নেই, হজম করার একটাই পথ, লঙ্কা খেয়ে নেওয়া। লঙ্কা খেয়ে খেয়ে ওনার পেটটাই শেষে খারাপ হয়ে গেল। ঠাকুরের জীবনীতে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, ভৈরবী ব্রাহ্মণী পূর্ববঙ্গের ছিল, তিনি ঝাল, মশলা এগুলো একটু বেশি পছন্দ করতেন। এমন লঙ্কা দিয়ে রান্না করতেন যে, খেতে বসে শ্রীশ্রীমায়ের নাক দিয়ে চোখ দিয়ে জল বেরোতে থাকত। ভৈরবী আবার জিজ্ঞেস করতেন, 'কি বৌমা কেমন রান্না হয়েছে'? মা ভয়ে ভয়ে বলতেন, 'খুব ভাল খুব ভাল'।

আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ, এই ধরণের আহার রাজসিকগুণ সম্পন্ন লোকেদের খুব প্রিয়। বলছেন, এই রাজসিক ধরণের খাবার দুঃখ, শোক আর রোগের বৃদ্ধি করে। আমাদের শরীরে যে বিভিন্ন রকম রোগের প্রকোপ দেখা যায়, এগুলো সব রাজসিক খাবার থেকেই আসে। এখানে আশ্চর্যের এটাই যে, মাছ আমিষ খাবার, কিন্তু এই মাছকেই আপনি সাত্ত্বিক ভাবে রান্না

করতে পারেন, রাজসিক ভাবে রান্না করতে পারেন আবার তামসিক ভাবেও রান্না করতে পারেন। যেমন মাংস, মাংস নিজে থেকেই রাজসিক খাবার, কিন্তু ওই মাংসকেই স্টু আদি করে রান্না করা হল, যেখানে *রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা* নিয়ে আসা হল, ওটাই তখন সাত্ত্বিক খাবার হয়ে যাবে। কিন্তু প্রচুর মশলা দিয়ে কষা মাংস, শিকের মধ্যে ঢুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে মাংস, এটাই তখন রাজসিক খাবার হয়ে গেল। এবার তামসিক আহার নিয়ে বলছেন, যেটা আমাদের সবারই খুব প্রিয়।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্।।১০।।

(মন্দপক্ক, রসহীন, দুর্গন্ধময়, বাসী, উচ্ছিষ্ট ও যজ্ঞে নিশিদ্ধ আহার তামসিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হয়।)

যত রকমের পিৎজা, বার্গার আছে, এগুলো সব তামসিক খাবার। সাত্ত্বিক খাবার বলা হল, রাজসিকটাও বলা হল। এবার সাত্ত্বিক খাবারের যেটা উল্টো, সেটাই হয়ে যাবে তামসিক খাবার। সাত্ত্বিক খাবার বললেন *রস্যাঃ*, পুরো রসযুক্ত হবে, তামসিকে কোন রস থাকবে না, পুরোটাই শুকনো থাকবে। এছাড়া তামসিক খাবার স্নিগ্ধ করবে না, বেশিক্ষণ পেটে থাকবে না।

যাতযামং, এর অর্থ হল, আচার্য বলছেন, অর্দ্ধ সেদ্ধ, তার মানে ভাল ভাবে রান্না করা হয়নি। এই ব্যাপারে আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি, একবার দিল্লীতে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে অনেক রকম রান্না করা হয়েছে। আমাকে কি একটা রান্না করা খাবার দিল, মুখে দিয়ে দেখি সেদ্ধই হয়নি, পুরো কাঁচা থেকে গেছে। যারা রান্না করছিল তারা বলল, এই রান্নাটা এই রকমই হয়। আমার ভাই লাগবে না, আমার কিছু লাগবে না। মাথায় তখন আমার গীতার এই *যাতযামং* ঘুরছিল, অর্দ্ধপক্ক, ভাল ভাবে রান্না করা হয়নি।

গতরসং, খাবারটার মধ্যে কোন রস নেই, রস যেটা ছিল শুকিয়ে গেছে। জিনিসটা প্রথম থেকেই রুক্ষ নয়, আগে এর মধ্যে রস ছিল, কিন্তু শুকিয়ে গেছে বা রসগোল্লাকে নিংড়ে দিয়ে খাচ্ছে। *পূতি*, খাবারটা পচে গেছে, খাবারের মধ্যে দুর্গন্ধ এসে গেছে। আপনারা বলবেন, পচা, দুর্গন্ধ যুক্ত খাবার তো কেউ খাবে না। কেন খাবে না, মদ যেটা খায় তাতে দুর্গন্ধই থাকে, আর ফলকে পচিয়েই মদ তৈরী করা হয়। যারা মদ খায় তাদের কাছে ওটাই সুগন্ধ মনে হবে। এই যে গ্রামের লোকেরা হাড়িয়া খায়, দুর্গন্ধ ছাড়া এগুলো আর কি! নাকে কাপড় দিতে হয়। আপনি বলবেন, এটা তো subjective জিনিস। হোক subjective, আমার লাগবে না।

পর্য্যুষিতং, এর অর্থ বাসি খাবার। বাসিকে আচার্য পরিষ্কার বলছেন, *একং সদ্ রাত্র্যন্তরিতং চ*, রান্না হয়েছিল রাত্রিতে, খাচ্ছেন সকালে। *উচ্ছিষ্টং*, উচ্ছিষ্ট জিনিস একেবারে নিষেধ। একজন হিন্দু কিনা যদি জানতে হয়, তাহলে তার উচ্ছিষ্ট বিচার আছে কিনা দেখতে হবে। ছোটবেলায় আমরা জানতাম, পাঁচ বছরের শিশু যদি এঁটো করে দেয়, সেটা উচ্ছিষ্ট হবে না। মনুস্মৃতিতে একটা লম্বা তালিকা দেওয়া হয়েছে, কোন কোন জিনিস উচ্ছিষ্ট নয়। যেমন বাছুর গাভীর বাঁটে মুখ দিয়ে যে দুধ খায় তাতে সেই দুধ উচ্ছিষ্ট হয়ে যায় না। পাখী যে ফল খায়, সেই ফল এঁটো হয় না। এই রকম কিছু কিছু জিনিস আছে, যেগুলো উচ্ছিষ্ট রূপে দেখা হয় না। কিন্তু এমনিতে উচ্ছিষ্ট জিনিস খাওয়া বা গ্রহণ করা একেবারে নিষেধ। উচ্ছিষ্ট বিচার করা, এটা হিন্দুদের বৈশিষ্ট্য। একটা জিনিস একবার কেউ খেয়ে নেওয়ার পর ওর অবশিষ্ট অংশে ওর তন্মাত্রা এসে যুক্ত হয়ে যাবে।

শুধু খাওয়াতেই উচ্ছিষ্ট বিচার করা হয় না, একটা জিনিস কাউকে দেওয়ার পর সেটা সে হয়ত নিল না, সেই জিনিসটা অপর কাউকে দেওয়াটা একেবারেই ঠিক না। যেমন ধরুন, দুজন আমার কাছে এসেছেন, দুজনকেই এক কাপ চা দেওয়া হল, একজন বললেন, আমি চা খাই না। ওই চায়ের কাপ যদি আমাকে দেওয়া হয়, আমি কখনই নেব না। একটা জিনিস কাউকে অর্পণ করে

দেওয়া মানেই ওটা উচ্ছিষ্ট হয়ে গেল। একজনকে কিছু দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোন জিনিস কেনার পর সেটা তাকে না দিয়ে অন্য কারুকে দেওয়াটাও ঠিক নয়। আমি যে মুহূর্তে ঠিক করেছি যে এটা কাউকে দেব সেখানেই ঐ বস্তুটা একজনের প্রতি উৎসর্গিকৃত হওয়ার জন্য উচ্ছিষ্ট হয়ে গেল, ওটা আর কারুকে দেওয়া উচিৎ নয়।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর জীবনে একটা এই ধরণের ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। মহারাজ এলাহাবাদে বেশির ভাগ সময় থাকতেন। সেখানে একবার এক ভক্ত নিজের বাড়ির গাছের কিছু ভালো জাতের আম নিজের সন্তানের হাত দিয়ে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর কাছে পাঠিয়েছেন। বাচ্চাটি বাস্কেটে করে আম নিয়ে যাচ্ছে, যেতে যেতে উপরের দুটি আম দেখে ভাবছে –আমগুলো বেশ দেখতে, খেতে পারলে হত। বিজ্ঞান মহারাজের কাছে বাচ্চাটি আম নিয়ে হাজির হয়েছে। আমগুলো মহারাজ দেখলেন, দেখার পর বলছেন – বাঃ খুব ভালো আম নিয়ে এসেছ, দাঁড়াও তোমাকে কটা আম দিই। বাচ্চাটি বলছে – না না, আমার আম লাগবে না। কিন্তু ছেলেটি যে কটি আম দেখে ভেবেছিল খেতে পারলে ভালো হত, ঠিক সেই কটি আমই বেছে বেছে তুলে বিজ্ঞান মহারাজ ছেলেটির হাতে দিয়ে বললেন –এই আম কটা তুমি নাও, আমি তোমাকে দিচ্ছি, তুমি রাস্তা দিয়ে খেতে খেতে যেও। মহাপুরুষরা দেখেই বুঝতে পারেন, কোন জিনিসটা শুদ্ধ আর কোন জিনিসটা অশুদ্ধ। বিজ্ঞান মহারাজও বুঝে গিয়েছিলেন কোন আমগুলো এঁটো হয়ে গেছে। ঠাকুরের জীবনে এই ধরণের অনেক ঘটনা আছে। কোন জিনিসের অগ্রভাগ কাউকে দেওয়া হয়েছে, কিংবা ভেবে রেখেছে জিনিসটা কাউকে দেবে, ঠাকুর আর কখনই ওটা গ্রহণ করতেন না।

তামসিক মানসিকতার লোকেরা এই ধরণের খাবার পছন্দ করে এবং খায়। সিনেমাতে দেখবেন, বিশেষ করে বিদেশী সিনেমাতে, একটা গ্লাশে একজন একটু মদ খেয়ে রেখে দিল, সেই গ্লাশ থেকেই আর-একজন একটু খেয়ে নিল। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, মদ কেন খাব না? তখন গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের আট, নয় আর দশ এই তিনটি শ্লোক তাকে দেখিয়ে দেবেন, এখানে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, মদ খাওয়া যাবে না। মদ এর একটাও condition fulfill করে না।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ, আমার খুব প্রিয় শ্লোক। মজা করে একজন গল্প করছিলেন। একটা জায়গায় নদী পার হতে হয়। অনেক জায়গা আছে যেখানে তিন ঘন্টা, চার ঘন্টা নদীর উপর দিয়ে যেতে হবে। ওই সব নদীর ঘাটে খাবার পাওয়া যায়, মাছ ভাত খুব সহজেই ওখানে পাওয়া যায়। আপনি মাছ ভাত খেতে চান, ওরা আপনাকে জিজ্ঞেস করবে, 'মাছটা কি চুইষ্যা খাইবেন, নাকি চিবাইয়া খাইবেন'? চুষে খেলে তিন টাকা, চিবিয়ে খেলে পাঁচ টাকা। চুষে খাওয়ার পর সেই মাছটা আবার আর-একজন খদ্দেরকে চুষে বা চিবিয়ে খেতে দেওয়া হবে। গল্পটা শুনে আমার জোর হাসি পেয়েছিল, সত্যিকারের এই রকম হয় না, কেউ হয়ত বানিয়েছে মজা করার জন্য। তিব্বতের দিকে অনেক জায়গায় চা খাওয়ার সময় গুড়ের মত চিনির ডেলা মুখে রেখে চা খায়। ঠাণ্ডায় চিনি জমে যায়, গলতে চায় না। সেইজন্য চিনির ডেলা মুখে রেখে চা খেতে থাকে, যতটা চা খাওয়ার খেয়ে নিল, চিনির ডেলা যতটা গলার গলে গেল, বাকিটা মুখ থেকে বার করে রেখে দেয়, অন্য আরেকজন সেটা মুখে রেখে চা খাবে। কিছু কিছু খাবার আছে, যেমন মাছকে অনেকে পচিয়ে খায়, শুকিয়ে শুটকি মাছ করে কৌটাতে রেখে দেয়, তারপর অনেক দিন ধরে সেই মাছ খায়।

আমাদের হিন্দু ধর্মে উচ্ছিষ্ট খাবার এবং এই ভাবে খাবারকে পচিয়ে, শুকিয়ে খেতে নিষেধ করা হয়, এগুলো করতে নেই। কারণ এই ধরণের খাবার মনের বৃত্তিকে তামসিক বানিয়ে দেয়। বাজারে অনেক বাসি জিনিস বিক্রি হয়। অনেক সময় লোকেরা healthy unhealthy দিয়ে খাবারের বিচার করে; না, এখানে healty unhealthyর কোন ব্যাপার নেই, সরাসরি মস্তিষ্কের সাথে সম্পর্ক। যে কোন জিনিস যদি বাসি হয়, উচ্ছিষ্ট হয়, দুর্গন্ধ যদি থাকে, রস যদি কম থাকে,

এগুলো সব তামসিক খাবার। তামসিক বৃত্তির লোকেরা এই ধরণের খাবার খেতে পছন্দ করেন। যেমন সন্দেশ অনেকে পছন্দ করেন, সন্দেশে কিন্তু রস নেই, রস শুকিয়ে গেছে। এই তিনটে শ্লোকের বিচারে রসগোল্লা সেদিক থেকে সাত্ত্বিক খাবার, সন্দেশ তামসিক খাবার। এগুলো নিজেদেরকেই ঠিক করে নিতে হয়। কথামৃতে ঠাকুর সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক নিয়ে প্রচুর কথা বলেছেন। এই হল, আমরা কি ধরণের খাবার খাবো, কি ধরণের খাবার খাবো না।

তিন রকমের খাওয়া দাওয়ার কথা বলার পর এবারে তিন রকম যজ্ঞের কথা বলা হচ্ছে। যজ্ঞের মধ্যে অনেক কিছু আছে, পূজো অর্চনা, তীর্থ যাত্রা, নিজের জপ-ধ্যান, শাস্ত্র অধ্যয়ণ এই সব কিছুকেই যজ্ঞের মধ্যে ধরা হয়। সব যজ্ঞই তিন গুণের নিরিখে তিন রকমের হয় – সাত্ত্বিক যজ্ঞ, রাজসিক যজ্ঞ আর তামসিক যজ্ঞ –

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ।।**১১**।।

(যজ্ঞ করাই কর্তব্য এইভাবে মন স্থির করে ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন ব্যক্তি শাস্ত্রবিহিত যে যজ্ঞ করেন, সেটাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ।)

সাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন লোকেরা যে কোন যজ্ঞ করার সময় বা কোন কিছু কর্ম করার সময় বলবেন – যজ্ঞ করা আমার কর্তব্য তাই আমি করছি, এই যজ্ঞ বা এই কর্ম করে আমার পাওয়ার কিছু নেই, হারাবারও কিছু নেই। যাঁরা প্রচুর জপধ্যান করেন, জপধ্যান করার সময় তাঁরা যদি মনে করেন আমি জপধ্যান করছি আমার মুক্তি হবে বলে। তাঁরা নিশ্চিন্তে থাকুন, মুক্তি তাঁদের হবে না। জপধ্যান করছি, ঠাকুরের দর্শন হবে; কোন দিন ঠাকুরের দর্শন হবে না। জপধ্যান করছি, ঠাকুর আমার প্রতি প্রসন্ন হবেন; কোন দিন আমার প্রতি ঠাকুর প্রসন্ন হবেন না। জপধ্যান করছি, কারণ এটাই আমার জীবনধারা, এটাই আমাকে করতে হবে, এটাই আমার জীবন – এবার সব কিছু ঠিকঠাক ভাবে হতে থাকবে।

আমার Carving Sky বইতে বার বার আমি ঠিক এই জিনিসটার উপরে জোর দিয়েছি এবং সব সময় বলি যে, পাশ্চাত্য চিন্তা-ভাবনা এসে আমাদের হিন্দু ধর্মকে পুরো শেষ করে দিল। ইদানিং আমরা Short term goal, long term goal নিয়ে চলি; কিন্তু আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এটা নয়। ভারত এভাবে চলে না, ভারত চলে – এটাই আমার জীবনধারা, এটাই আমি করি, এছাড়া আমি আর কিছু জানি না। এগুলোকে নিয়ে পরে অনেক নিন্দা হয়েছে, যেটা পরে cast system হয়ে গেল। যে নর্তক, হাজার হাজার পুরুষ ধরে তারা ওই নৃত্য বিদ্যাটাই জানে, নাচ ছাড়া আর কিছু জানে না, নৃত্যটাই তাদের জীবনধারা। যার জন্য এই নৃত্যকে তারা এত perfection levelএ নিয়ে গেছে; যার জন্য ভারতের নৃত্যকলা সারা বিশ্বে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। এত উচ্চমানের নৃত্যশৈলী বিশ্বের কোথাও পাওয়া যাবে না। আমাদের যে কটা নৃত্যকলার সম্প্রদায় আছে, তাদের মত একটা কোন নৃত্যশৈলী বিশ্বের কোথাও কেউ খুঁজে বার করতে পারবে না। আর এদের কারুর নৃত্যকলার সাথে কোন মিল নেই, প্রত্যেকটা সম্প্রদায় কোন উচ্চ পর্যায়ে নৃত্যকলাকে নিয়ে গেছে কেউ কল্পনাই করতে পারবে না। আমাদের সঙ্গীতে যে এত রাগরাগিনী, কোথায় আছে এত রাগরাগিনী? কারণ আমাদের পুরো একটা জাতি এতেই হাজার হাজার পুরুষ ধরে পুরো জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তাঁরা জানেন আমাকে এটাই করতে হবে, এছাড়া আমি আর কিছু জানি না।

মহাভারতেও এই জিনিসটার উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। গীতাতে যখন বলছেন, *স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ*, সেখানে বক্তব্য এটাই। তোমার যেমনি মনে হবে, এটা ছেড়ে ওটাতে গেলে আমার বেশি ভাল হবে, ওটাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য, আমি ওটা করতে চাইছি; কেউ নিষেধ করবে না।

কিন্তু জেনে রাখ, আধ্যাত্মিক জীবনে তুমি আরে এগোতে পারবে না। সামাজিক জীবনযাপনের জন্য গীতা নয়, বেদ, উপনিষদ সামাজিক জীবনযাপনের জন্য নয়। যিনি যেটার জন্য, তাঁর কাছে সেটার জন্য যেতে হয়। যিনি কবি, কবিতার জ্ঞান পাওয়ার জন্য তাঁকে একজন কবির কাছে যেতে হবে। একজন কবির কাছে কেউ ন্যায় বা বেদান্ত শিখতে যাবে না। একজন বৈজ্ঞানিকের কাছে মানুষ বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করতে যাবেন। আমাদের শাস্ত্রে দুটো একটা সমাজের কথা আছে। মনুস্মৃতিকে নিয়ে চারিদিকে এত নিন্দা হয়, কিন্তু তারা ভুলে যাচ্ছে যে, মনুস্মৃতি কোন সামাজিক বিধান নয়। মনুস্মৃতি হল, তুমি যেখানে আছ সেখান থেকে তোমাকে আমি ঈশ্বরের পথে নিয়ে চলে যাব। কিন্তু লোকেরা কিছু বোঝে না, না বুঝে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে। গালাগাল দেওয়ার জন্য একটা কিছু তো চাই, মনুস্মৃতি আছে, একেই গালাগাল দিয়ে যাও।

এই জিনিসটাকেই বলে নিষ্কাম কর্ম। যজ্ঞ করাটাই আমার জীবনের আদর্শ, এটাই আমার কর্তব্য, আমি যজ্ঞই করছি। এখান থেকে আমার কিছু পাওয়ারও নেই, হারাবারও কিছু নেই, আমি এটাই করি, এটাই আমার কাজ। বাতাসের কাজ বয়ে যাওয়া, অগ্নির কাজ দাহিকা শক্তি সৃষ্টি করা, ওরা ওদের কাজ ছাড়বে না, ওরা ওদের ধর্ম পাল্টাবে না। অগ্নি, জল, বায়ু, মাটি ও আকাশ এরা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে না। এই ভাব নিয়ে যাঁরা যজ্ঞ করেন, তাঁরা হলেন সাত্ত্বিক। *যষ্টব্যমেবেতি মনঃ*, এটাই আমার কর্তব্য, এটাই আমার জীবন, আমি এটার জন্যই আছি।

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্।।১২।।

(হে অর্জুন, স্বর্গাদি ফল কামনা করে দম্ভপ্রকাশের জন্যই যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাকে রাজসিক যাজ্ঞ বলে জানবে।)

আর ফলাকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে যজ্ঞ করছে, এই যজ্ঞ করে আমি এই ফল পাব, অমুক যজ্ঞ করে অমুক ফল পাব; আমার এটা চাই, সেটা চাই আর তাদের কাছে যজ্ঞ করাটা হল লোকেদের দেখানো আমি কত বড় যাজ্ঞিক। এই ভাবটাকেই এর আগের অধ্যায়ে খুব সুন্দর করে বর্ণনা করা হয়েছিল – *যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য*, আমি যজ্ঞ করব, আমি দান করব, আমি এই করব ইত্যাদি। এখনকার দিনে বড় বড় নেতারা নিজেদের পাড়ার ক্লাবগুলোতে যেভাবে দুর্গাপূজো করে এরা সবই এই ভাব নিয়েই করে। আর তামসিক যজ্ঞ কি রকম?

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে।।১৩।।

(শাস্ত্রবিধিবিবর্জিত, অন্নদানশূন্য, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাবিহীন, শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞকে তামসিক যজ্ঞ বলা হয়।)

এই ধরণের যজ্ঞে কোন শাস্ত্রবিধি নেই। বলছেন, *অসৃষ্টান্নং*, যজ্ঞে কোন অন্ন দেয় না, ব্রাহ্মণকে বা পূজারীকে কোন দান দেয় না। *মন্ত্রহীনম্*, যজ্ঞে কোন মন্ত্র নেই, বেদমন্ত্রে যে স্বর, উদাত্ত এগুলো থাকবে, এর কোন কিছু বালাই নেই। *অদক্ষিণম্*, যজ্ঞে কোন দক্ষিণার ব্যাপার নেই। *শ্রদ্ধাবিরহিতং*, যজ্ঞ করার মধ্যে কোন শ্রদ্ধা ভাব নেই, এগুলো সব তামসিক যজ্ঞ। যজ্ঞ করছে ঠিকই, বিরাট করে দূর্গা পূজা করছে, তাতে না আছে কোন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ থাকলেও মন্ত্রোচ্চারণ ঠিক মত করছে না, কোন বিধি বিধান নেই, কিন্তু করে যাচ্ছে, এগুলো হল তামসিক যজ্ঞ। পূজা কেমন ভাবে করছেন, তাতে বোঝা যায় তিনি কি রকম প্রকৃতির লোক। এরপর বলছেন তপস্যাকে নিয়ে।

গীতার উদ্দেশ্য পরমাত্মাপ্রাপ্তি। প্রথমের দিকে আমরা যখন গীতা শুরু করেছিলাম, সেখান থেকে আচার্য এই কথা বলে যাচ্ছেন – গীতার একমাত্র উদ্দেশ্য পরমার্থ লাভ। সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাসের মাধ্যমে, সংসারীরা প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের অনুষ্ঠান করে, ধর্মের উপর নিজের জীবনকে চালিত করে ধীরে

ধীরে মুক্তির দিকে চলে যাবেন। যাঁরা আমাদের কথাগুলি মন দিয়ে শুনছেন, জীবনে কাজে লাগাতে চাইছেন, তাঁদের জন্য কিছু কথা আগেও বলেছি, পরেও বলব। ধর্ম জীবন কোন সহজ পথ নয়।

অনেকেই আমাদের মেইল করে তাঁদের বিভিন্ন ধরণের মনের ইচ্ছাগুলো ব্যক্ত করেন, কারুর সমাধি চাই, কারুর ঈশ্বরদর্শন দরকার, কেউ বড় বড় বই পড়তে চাইছেন, কত ধরণের মেইল পাই। একটা জিনিস তাঁরা বোঝেন না, বা বুঝতে পারছেন না; যদি সত্যিই আপনি ধর্ম জীবন চান তাহলে বুঝতে হবে যে, শাস্ত্র পড়ার দুটি দিক আছে। তার মধ্যে একটা দিক হল পাণ্ডিত্য, এখন সেটা আপনাদের আর হবেই না। কারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করার জন্য আগে আপনাকে সংস্কৃতের পণ্ডিত হতে হবে, সেটা আপনার এখন আর সম্ভবই না, পাণ্ডিত্য অর্জন করাটা এখন প্রশ্নাতীত। যাঁরা পণ্ডিত তাঁরা আমার এই লেকচারই শুনবেন না, তাঁদের কাছে আমার কথাগুলো খেলো, কিছুই না।

দ্বিতীয় দিক হল শাস্ত্রকে আধার করে নিজের জীবনটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ঠাকুর খুব সহজ করে বলছেন, নিজেকে মারার জন্য একটা নুড়ুন হলেই হয়, অপরকে মারার জন্য ঢাল তলোয়ার দরকার। পাণ্ডিত্য হল ঢাল তলোয়ার রাখার মত। আমার আপনার জন্য নুড়ুন হলেই হয়ে যাবে, আর কিছু লাগবে না। এটা নিজেকে খেটেই বার করে নিতে হয়। আমাদের একজন মহারাজ আছেন, এখন অনেক বয়স হয়েছে, উনি একজন নামকরা লেখক। ওনার লেখাগুলো পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখা। আমি প্রায়ই ওনার কাছে যেতাম। একবার উনি নিজের কথা বলছিলেন। আমাদের যেমন হয়, যদি একটা গরুর উপর লেখা লিখতে বলা হয়, আমরা শুরু করব রবীন্দ্রনাথ গরু সম্বন্ধে কি বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র কি বলেছেন, শরৎচন্দ্র কি বলেছেন।

মহারাজ বলছেন, প্রথমের দিকে লেখালেখি করতে গিয়ে আমি খুব confused হয়ে যেতাম, কি লিখব, কি লিখব। এই রকম অবস্থা ওনার অনেক দিন চলল। অনেক দিন যাওয়ার পর উনি লিখতে শুরু করলেন। প্রথমে ওনার যা বক্তব্য সেটাকে লিখতেন। লেখার পর অন্যরা এই ব্যাপারে কি বলেছেন, সেটা দেখতেন। এইভাবে চলতে চলতে পরে একটা সময় থেকে এটাকেই উনি সিদ্ধান্ত করে নিলেন। এখন উনি যখনই লেখেন, আগে নিজের বক্তব্য, এতদিনে উনি কি বুঝেছেন, এটাকে লেখার পর তিনি দেখেন অন্যান্যরা কি বলছেন। ধর্ম জীবন পুরোপুরি আপনার নিজের জীবন, আপনাকে নিজের মত চালাতে হবে। শাস্ত্র খুলে কেবল দেখে নিতে হয় আমি ঠিক পথে আছি কিনা। সবচেয়ে বড় কথা হল, প্রচুর খাটতে হয়। বেহালার ওদিক থেকে একজন মহিলা এসেছিলেন। উনি বললেন, আমরা যত ক্লাশ নিই, উনি ক্লাশের বক্তব্যগুলোকে আক্ষরিক ভাবে লিখছেন। শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এটাই ওনার সাধনা, যাতে উনি জিনিসগুলো বুঝতে পারেন, আপন করার জন্য। গীতার প্রত্যেকটা ক্লাশ শোনার পর বক্তব্যটা যেটুকু বুঝলেন ততটুকুই খাতায় লিখতে হয়।

ধর্ম জীবন যদি চালাতে চান, একটা ভাল সুসংগঠিত জীবন যদি চালাতে চান, তাহলে এক দুই করে আগে ঠিক করে নিন আমাকে কি কি করতে হবে। আপনাদের বেশির ভাগ শ্রোতারা একটা বয়সে পৌঁছে গেছেন, এখনও যদি নিজেকে ভাল করার জন্য অপরের কথা শোনার দরকার পড়ে, তাহলে জেনে রাখুন আপনার দ্বারা এই জীবনে আর ধর্ম জীবন হবে না। আপনার চল্লিশের উপর বয়স হয়ে গেছে, এখনও অপরের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করে থাকবেন? এখন আপনার দরকার – আমি এই রকমটি বুঝেছি, দেখি এই ব্যাপারে শাস্ত্রে কি বলছে। আমাদের কাছে এসে লোকেরা বলে, মহারাজ, আমি অমুক মহারাজের লেকচার শুনি, তমুক মহারাজের ক্লাশ শুনি; এদের কি আর বলব! এত জন মহারাজের লেকচার যদি রোজ শুনতে থাকেন, মাথা তো এলেমেলো হয়ে যাবে। স্বামীজী বলছেন, Ideas undigested running riot although the life; সারা জীবন মনের ভিতর এগুলো ঘুরতেই থাকবে, নিজেও পাগলের মত ঘুরে যাবেন। এভাবে হয় না। সাধন জীবনে

যদি প্রবেশ করতে চান, যে কোন একজনকে ধরুন। যখন আপনার মনে হবে, আর চলছে না, তখন অন্য একজনকে ধরবেন। উদ্দেশ্য উন্নতির একটা সঠিক পথে এগোনো।

আজকে আপনার নিজেকে সবাই প্রশ্ন করুন, আজ থেকে একশ বছর কি দুশো বছর পরে আপনি নিজেকে কোথায় দেখতে চান? আপনি বলবেন, আমি তো অতদিন বাঁচব না, আমি তো মারা যাব। ঠিকই ভেবেছেন, কিন্তু আপনারা সবাই হিন্দু, আপনারা তত্ত্বটা জানেন, যেটা অন্য ধর্মের লোকেরা জানে না। কি সেই তত্ত্ব? *জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ*, আত্মজ্ঞান লাভ না হওয়া পর্যন্ত যে জন্মাবে সে মরবে। জন্ম তো আপনার আবার হবে, জন্ম নিয়ে আবার মারা যাবেন, আবার জন্মাবেন। এই ভাবে একশ বছর পর আপনি নিজেকে কোথায় এবং কেমন দেখতে চান? আমি সমর্পণানন্দ, আমার মুক্তি যদি না হয়, তাহলে আমার কি হবে? আমার যা মানসিকতা তাতে মৃত্যুর পর আমি সন্ন্যাসী হয়েই জন্মাব, ঠাকুরের কাছেই আসব, ভাব তো আর পাল্টাবে না। একশ বছর পরে তত দিনে কত প্রেসিডেন্ট মহারাজ আসবেন, কত যাবেন, কত কি হয়ে যাবে, কিন্তু আসব আবার এখানেই।

আমার ক্রতু বইটা যদি কেউ পড়ে থাকেন, তাহলে সেখানে দেখতে পাবেন, কাহিনীর প্রধান চরিত্র ক্রতু, ক্রতুর মনের মধ্যে তাঁর সব কটি পূর্ব পূর্ব জন্মের পুরো স্মৃতি থেকে গেছে। ক্রতুর মত যদি আপনার সব স্মৃতি থেকে যায়, তাহলে একশ বছর পর আপনি নিজেকে কি রকম দেখতে চান? একশ বছর আগে যেমনটি ছিলেন, ওই রকমটিই কি দেখতে চান? কারণ আপনাদের বয়স হয়ে গেছে, নূতন করে ভাল কিছু হওয়ার নেই, হরিনাম করা ছাড়া। যেটা আছে, সেটাকেই এখন থেকে একটু একটু করে বাড়িয়ে নিয়ে যেতে হয়। স্বামীজী খুব সুন্দর উদাহরণ দিচ্ছেন – সারা রাত ধরে নিঃশব্দে, নীরবে হিম পড়ে, ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখি গোলাপ ফুটে আছে। একটু একটু করে সারা রাত ধরে যে নীরবে একটু একটু করে হিম পড়বে, আর আপনার ব্যক্তিত্বের পাপড়ি একটু একটু করে খুলবে, একশ বছর পরে যে ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠবে, আপনার নিজের সেই ব্যক্তিত্বকে আপনি কি রকম দেখতে চান? একটু বিচার করে দেখবেন, নিজেকে কেমন দেখতে চান।

যেটাই আপনি ঠিক করুন, আপনি রাজা হয়ে জন্মাতে চান, আপনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে জন্মাতে চান, আপনি নিজেকে একজন সাধু রূপে দেখতে চান, আপনি একজন পণ্ডিতরূপে নিজেকে দেখতে চান, যাই হয়েই জন্মাতে চান, বাধ্যতামূলক ভাবে আপনার দুটি জিনিস লাগবে। হাল্কা স্তরে যদি নিজেকে নিয়ে যেতে চান, তাহলে চাই সাধনা। এই সাধনা হয় পার্টটাইম। যখন আমরা কোন কিছু কিছুক্ষণ করি, যেমন আপনারা অনেকেই সঙ্গীত সাধনা করছেন, রোজ দিনে দু ঘন্টা সঙ্গীত সাধনা করলেন। আরেকটা হয় ফুলটাইম –এটা হল তপস্যা। তপস্যা হয় ফুলটাইম, সাধনা হয় পার্টটাইম। মা যখন সন্তানকে বড় করেন, তখন ওটা হয় তপস্যা। সাধনার একটা পূর্ণাহুতি হয়, কিন্তু তপস্যা শেষ হয়ে যায় না। যখন আপনার গুরু বলবেন, তুমি পূর্ণ, যাও জগৎকে আলো দাও, ঠাকুর যেমন লিখলেন, নরেন শিক্ষে দেবে; মায়েদের তপস্যাতে এটা হয় না। যত দিন তিনি মা, তত দিন তাঁর তপস্যা চলবে। মা আশি বছরের বৃদ্ধা হয়ে গেছে, ছেলের পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে, এখনও ছেলে কোন গোলমাল হলে সেই মায়ের কাছেই আশ্রয় নেয়, মা হলেন সন্তানের শেষ আশ্রয়। আর শ্রীশ্রীমা এসে বলেই দিলেন, আর কেউ না থাকুক জানবে তোমার একজন মা আছে, মা কিনা, মায়ের তপস্যা শেষ হয় না।

একশ বছর পর আপনি যাই হতে চান, আপনাকে তপস্যা করতে হবে। আর সেই তপস্যা আজ থেকেই শুরু করতে হবে। আজ একটু হবে, কাল একটু হবে, একশ বছর ধরে একটু একটু হতে হতে, শীতের রাতের মত হিম পড়তে থাকবে, একশ বছর পর গোলাপ ফুটবে। একজন বন্ধুর সাথে আমার কথা হচ্ছিল, উনি খুব সুন্দর উদাহরণ দিলেন। একজন ভাস্কর পাথরের মূর্তি তৈরী করছেন, তিনি কাজ করে যাচ্ছেন, ছেনি মেরে যাচ্ছেন। যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি, কিছুই

বোঝা যাবে না। দশ দিন পরে এসে দেখে বোঝা গেল, পাথরটা পুরো পাল্টে গেছে। আপনার জীবনকে আপনি গোলাপ রূপে দেখুন, মূর্তি রূপে দেখুন, যে রূপেই দেখুন, কাজ যেটা হবার সেটা ধীরে ধীরেই হবে। আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন, অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন, উনি বলতেন যে, আমি পঞ্চাশ বছর সন্ন্যাস জীবনে আছি, my spiritual achievement is big zero। আমি তখন ব্রহ্মচারী ছিলাম, আমি হেসে বলতাম, 'মহারাজ, মোটামুটি সবারই তো একই অবস্থা'। উনি বলতেন, 'আমি আমার কথা বলছি, অপরের কি হচ্ছে তাতে আমার কি'! কিন্তু উনি যে এটা বুঝতে পেরেছেন, এটাই বিরাট achievement। এই যে একটা জিনিসে আপনি পঞ্চাশ বছর লেগে আছেন, আর জানছেন যে আমার কোন achievement হয়নি, এটাই আপনার বিরাট achievement।

আপনি যদি সাধুদের সাথে গিয়ে কথা বলেন, বেশির ভাগ সাধু বলবেন, কোন achievement নেই। তাহলে কি তিনি failure? কখনই না, মাঠ তৈরী হচ্ছে। বড় বড় যে এ্যারোপ্লেন নামবে, তার জন্য airstrip তৈরী হচ্ছে। যখনই কেউ নিজের কোন অনুভূতির কথা বলতে চান, তাঁকে আগে জিজ্ঞেস করুন, আগে বলুন আপনার কি airstrip তৈরী হয়েছে, সেখানে কোন প্লেন কি নেমেছে? প্লেন এখন কি করে নামবে, এখন তো সবে রানওয়ে তৈরী হচ্ছে, এয়ারপোর্ট তৈরী হচ্ছে। তিরিশ বছর, পঞ্চাশ বছর ধরে এই যে একটা কঠিন অনুশাসনের জীবন, যেখানে কোন আমোদ আহ্লাদ নেই, বেশির ভাগ মানুষ এখানে টিকতেই পারবে না, পাগল হয়ে যাবে। এই যে পঞ্চাশ বছর ধরে লেগে আছেন, এটাই তপস্যা। আপনার বাড়ির লোকেরা, যাদের সাথে এতদিন ছিলেন, তারা এসে যদি জিজ্ঞেস করে, পঞ্চাশ বছরে তোমার কি হল? আপনি বলবেন, কিছুই না।

দিল্লীতে একটা টিভি চ্যানেলের সাক্ষাৎকারে আমাকে ঠিক এই প্রশ্ন করা হয়েছিল –আপনার তো সন্ন্যাস জীবনে চল্লিশ বছর হয়ে গেল, এত দিনে কি হল? আমি বললাম, 'কিছুই না, আমি তো শুধু আগাছাগুলি পরিষ্কার করে গেছি'। 'এটা তো বিরাট কিছু হল না'। আমি বললাম, 'কি করা যাবে, যাদের হয়েছে তারা ভাগ্যবান, আমি তাদের মত অত ভাগ্যবান নই'। আমার জীবনের যে মাঠ, সেখানে আগাছা অনেক বেশি, পরিষ্কার করেই যাচ্ছি। সেইজন্য আগে মনটাকে শান্ত করতে হয়, এই ভেবে যে, আমার জীবনে অনেক আগাছা আছে। এরপর সাধনা হিসাবে সকাল বিকাল এক ঘন্টা ধ্যানজপ, সেখান থেকে ধীরে ধীরে হবে তপস্যা।

তপস্যা কোথা থেকে শুরু হবে? এখন আমরা এর উপর আলোচনা করব। তপস্যাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর এক জায়গায় বলছেন, তপস্যা মানে জ্ঞান। সাধারণ ভাবে তপস্যার অর্থ হয় *তপঃ কায়ঃ*, তপঃ শব্দের শাব্দিক অর্থ হল, উষ্ণতা, শরীরে যখন উষ্ণতা, একটা তাপ তৈরী হয়। যখন একটা জিনিসে লেগে গেছেন, যেমন মায়েরা জানেনে আমার সন্তানকে বড় করতে হবে, সেই সন্তানকে বড় করতে গিয়ে তাঁদের মনে কত তাপ সৃষ্টি হয়। একটা সন্তানকে ঠিক ঠিক ভাবে বড় করতে হলে, একজন মাকে অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয়। নিজের বন্ধু বান্ধবদের ছেড়ে দিতে হয়, নিজের আমোদ আহ্লাদকে ত্যাগ করে দিতে হয়, নিজের শারীরিক আরামের কথা ভুলে যেতে হয়, শুধু একটাই চিন্তা সন্তান কি ভাবে সুখী হবে। শীত হোক, গ্রীষ্ম হোক, বর্ষা হোক, পূজা হোক, উৎসব হোক, নবজাতককে নিয়ে মা সারাক্ষণ ডুবে আছে। বাচ্চার খিদে পেলে তাকে দুধ খাওয়াতে হবে, বাচ্চার ঘুম পেলে ওকে নিজের পাশে শুইয়ে ঘুম পাড়াতে হবে, তা-নাহলে বাচ্চা তো ঘুমোতে চাইবে না। কি কঠোর তপস্যা, চিন্তা করা যায় না। আধ্যাত্মিক জীবনে যে তপস্যা হয়, এভাবেই হয়। চব্বিশ ঘন্টা যখন একটা জিনিস নিয়ে আছে, আর সেটার জন্য শরীরে তাপ সৃষ্টি হচ্ছে। তবে এই তাপ জাগতিক কোন তাপ না, এটা জ্ঞানের তাপ। জ্ঞান জিনিসটাও তাপ সৃষ্টি করে। তপস্যাকে যে

ইংরাজীতে অনুবাদ করে যখন বলে austerity, এতে কিছু বোঝা যায় না। আমাদের পূর্বপুরুষরা পুরোপুরি এটাতে লেগে থাকার দরুণ শব্দগুলো যে অর্থে বলা হয় ঠিক সেই অর্থে গিয়ে বসে যায়।

তপস্যার জন্য কাউকে হিমালয়ে যেতে হবে না, জঙ্গলে যেতে হবে না। তাহলে ঘরে বসে কিভাবে আপনি তপস্যা করবেন? এই যে বলা হল, একশ বছর পর আপনি নিজেকে কোথায় দেখতে চান, দুশো বছর পর আপনি নিজেকে কোথায় দেখতে চান। যদি মনে করেন এই জন্মেই হয়ে যাবে, যাঁদের পুরো বিশ্বাস আছে, মৃত্যুর সময় ঠাকুরে এসে হাত ধরে নিয়ে যাবেন, আমাকে আর কিছু করতে হবে না; এনারা তো জ্ঞানী পুরুষ, এনাদেরকে নিয়ে আর কিছু বলার নেই! তাঁদের আর শাস্ত্র শোনা কেন, আমার কথা তো তাঁরা শুনতেও যাবেন না। তাঁদের গুরুও নিশ্চয় অনেক কিছু বলে দিয়েছেন। তবে আদর্শ ও বাস্তব দুটর মধ্যে তফাৎ থাকে, আপনাদের যাঁদের মনে হয় এটা হবেই, আমরা জ্ঞানী পুরুষ; তাঁদেরকে আর কিছু বলার নেই। এখানে তাঁদের জন্যই বলা হচ্ছে, যাঁরা মনে করছেন, আমাকে কিছু করতে হবে। আপনি যদি বলেন, তত দিনে আমার মুক্তি হয়ে যাবে বা যদি বলেন আমি সময়ের পারে চলে গেছি, তাহলে এই কথাগুলো আপনার জন্য নয়। কিন্তু আপনি যদি তাও বলেন আমাকে কিছু করতে হবে, তাহলে কি মুক্তির চেষ্টা চলছে?

দেওঘর বিদ্যাপীঠের পুরনো ছাত্ররা, তাঁদের অনেকেই যাঁরা এখন বিরাট পজিশানে চলে গেছেন, মাঝে মাঝে কেউ কেউ আমার সাথে দেখা করতে আসেন। অনেক সময় ধর্ম নিয়ে একটা দুটো কথা বলেন। মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘কি মহারাজ, কি মনে হয়, এই জন্মে আপনার মুক্তি হবে তো’? আমাদের সবাইকে নিজেকে নিয়ে ভাবতে হয় – আমার হবে তো? আর যদি বলেন, মা দেখবেন, ঠাকুর দেখবেন, তাহলে আর শাস্ত্র পড়ার কি দরকার। শরণাগতির ভাব অনেক পরে আসে। শরণাগতির ভাব মুখে বলা সহজ। শরণাগতি কি রকম? তাল গাছ থেকে পড়বে, হাত পা নাড়বে না; অনেক উচ্চ অবস্থায় না গেলে এই ভাব আসবে না। তার জন্য প্রচুর খাটতে হয়, অনেক খাটার পর তখন আসে – পাখি তুই ঠিক বসে থাক রামকৃষ্ণ নামের মাস্তুলে। একটা জাহাজ নোঙর তুলে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে। কিভাবে একটা পাখি সেই জাহাজের মাস্তুলে বসে ছিল। জাহাজ সমুদ্রের মাঝখানে আসার পর পাখিটার চটকা ভাঙে। সে এবার বাসাতে ফিরে যাওয়ার জন্য উড়ে পূব দিকে গেল, কোন কিনারা দেখতে পেল না, এইভাবে একবার দক্ষিণ দিকে, একবার পশ্চিম দিকে, একবার উত্তর দিকে অনেক ওড়াওড়ি করে কোন কুল কিনারা দেখতে না পেয়ে এবার সে সব কিছু ছেড়ে মাস্তুলে এসে বসেছে। পাখি বুঝে গেল, কোথাও আর যাওয়ার নেই, তখন রামকৃষ্ণ নামের মাস্তুলে এসে স্থির হয়ে বসে গেল।

মাস্তুলে এসে বসার জন্য এই পাখির মত প্রচুর ডানা নাড়তে হবে, ডানা নেড়ে নেড়ে একেবারে থকে যেতে হবে, তবে গিয়ে এই শরণাগতি আসে, আমার আর কিছু করার নেই, যা হবার হবে। আগে ডানাটি নাড়তে হয়। ডানা নাড়ানাড়ি নেই, কিন্তু বলে যাচ্ছে, ঠাকুর দেখছেন, শেষ সময়ে ঠাকুর এসে নিয়ে যাবেন, এগুলো কিছুই না, ঘোর তমো।

ঘরে বসে তপস্যার কথা এবার বলবেন। এই তপস্যা তিন প্রকার – শরীরের তপস্যা, বাণীর তপস্যা আর মনের তপস্যা। এই তিনটি তপস্যার কথাই এবার পরপর বর্ণনা করবেন। প্রথমে শুধু তপস্যা জিনিসটাকে সাধারণ ভাবে বিশ্লেষণ করবেন। তারপর এই তপস্যাকেই আবার দেখাবেন সাত্ত্বিক তপস্যা, রাজসিক তপস্যা ও তামসিক তপস্যা কাকে বলা হয়। তার মানে তপস্যা তিন গুণিতক তিন সমান নয় প্রকার তপস্যা হয়ে যায় – শারীরিক তপস্যার সাত্ত্বিক, রাজসিক আর তামসিক তপস্যা; বাণীর তপস্যার সাত্ত্বিক, রাজসিক আর তামসিক তপস্যা এবং মনের তপস্যার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। কিন্তু সবটা মিলিয়েই তপস্যা, আলাদা করে দেখা হয় না; তিনটেকে একসাথে দেখেন তপস্যা, সেইজন্য একটিই শব্দ তপস্যা।

এই তপস্যা আমরা বাড়িতে বসে কিভাবে করব? আর এই তপস্যা যেন তামসিক, রাজসিক না হয়ে সাত্ত্বিক তপস্যা হয়। কেন সাত্ত্বিক তপস্যা করার কথা বলছেন? কারণ উপনিষদে ঈশ্বরকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, ঈশ্বরকে যেভাবে গীতাতে বর্ণনা করেছেন, এই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ একমাত্র সাত্ত্বিক তপস্যা দ্বারাই হয়। রাজসিক ও তামসিক তপস্যা দ্বারা এই সাক্ষাৎ হয় না।

আমাদের এই ক্লাশগুলিকে নিয়ে অনেকেই অনেক রকম কটূ কথা বলে। আমাকে কেউ বলে মনুবাদী, কেউ এটা বলছে, কেউ ওটা বলছে, সবাই নিন্দার জন্যই বলছে, দেখে কষ্ট হয়। আমাকে বলছে বলে কষ্ট হচ্ছে না, এই ভেবে কষ্ট হয় যে, এদের ভিতর কত হতাশা। অপরকে গালাগাল কে দেয়? যার নিজের ভিতরে আগুন জ্বলছে। সারা দেশে কত লোকের ভিতর আগুন জ্বলছে? কিসের জন্য? হতাশার জন্য। এই জিনিস আগে আমাদের দেশে ছিল না। আপনি আগে কখন শুনেছেন, ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের মধ্যে মারামারি, ব্রাহ্মণ আর শূদ্রের মধ্যে মারামারি? কক্ষণ না, সবাই জানতেন, আমি যে পথে আছি, এই পথ দিয়েই আমার পরম প্রাপ্তি হবে। এগুলো এখন মানুষের মন থেকে উঠে গেছে, কামিনী-কাঞ্চনই এখন সবার জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে গেছে। সবাই সবারই প্রতি রাগ, ক্ষোভ দেখাচ্ছে।

রাজসিক ভাব, তামসিক ভাবকে ছেড়ে সাত্ত্বিক ভাবের দিকে এগোনোর কথা বলার অর্থ হল, এবার তুমি নিজেকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে চাইছ। তোমার ভিতর আর কোন রাগ, ক্ষোভ নেই। এবার গীতা উপনিষদে ঈশ্বরকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েএক্সহে, তোমার সেই ঈশ্বরের অনুভূতি হবে, সেই ঈশ্বরের জ্ঞান হবে। কিন্তু তামসিক আর রাজসিক ভাব থেকে যদি তুমি বেরিয়ে না আসতে পার, আর অন্য দিকে তপস্যা করছ, তাহলে যেমন বলছেন, যক্ষ, রাক্ষস এরাই হবে তোমার পরম আরাধ্য। তখন ঈশ্বর যে সর্বব্যাপী, এই জ্ঞানটি তোমার হবে না। এই জ্ঞানটি যদি না হয়, তাহলে মুক্তিও সুদূর পরাহত। তামসিক, রাজসিক ভাব দিয়ে তপস্যা হতে পারে, ভক্তিও হতে পারে, কিন্তু মুক্তি কোন দিন হবে না। মুক্তি হবে একমাত্র সাত্ত্বিক তপস্যা দিয়ে, মন যেখানে পুরোপুরি শান্ত হয়ে গেছে। গীতার উদ্দেশ্য মানুষকে সব দিক দিয়ে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া, এমনকি তোমার তপস্যাও যেন সাত্ত্বিক হয়।

আগের শ্লোকে বললেন, *বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষীণম্*, যজ্ঞ করছে, কিন্তু সেই যজ্ঞে নেই কোন বিধি। যজ্ঞে যে ব্রাহ্মণদের দান দেওয়ার বিধি, নেই কোন দান, নেই কোন মন্ত্রোচ্চারণ। এই যে ছট পূজা করে, আসলে ছট আদপে কোন পূজাই না, ছট হল একটা ব্রত। বাংলাতে যেমন ষষ্টি ব্রত করা হয়, ওটাকে এখন নাম দিয়েছে পূজা। ছটও একটা ব্রত। এটাকে justify করার জন্য বলা হয় সূর্যের পূজো। কিসের সূর্যের পূজা। সূর্যকে সাক্ষী রেখে ষষ্টি মায়ের নামে ব্রত রাখা হয় যাতে নিজের সন্তানের সার্বিক মঙ্গল হয়। নাম দেওয়া হল পূজো, যদি পূজা হয় তাহলে তোমার মন্ত্র কোথায়, যদি পূজা হয় তাহলে তোমার পুরোহিত কোথায়, যদি পূজা হয়, তাহলে তোমার দান, দক্ষিণা কোথায়? ছট পূজা নয়, এটা ছট ব্রত। সমাজে যখন অজ্ঞান প্রবেশ করে, তখন ব্রত আর পূজার তফাৎটাও তারা করতে পারে না। শাস্ত্র এই তফাৎট করিয়ে দেয়। ষষ্টি মায়ের ব্রত করে কি তোমার মুক্তি হবে? মুক্তির কথা পরে, তোমার কি কখন ভক্তি হবে? কারণ ব্রতের উদ্দেশ্যটা তো তুমি আগেই অন্য রকম করে দিয়েছ। তপস্যার কথা বলতে গিয়ে ভগবান প্রথমে শরীরের তপস্যার কথা বলছেন। আমাদের এখানে আলোচনা চলছে, ঘরে বসে তপস্যা।

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে।।১৪।।

(দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন, ও প্রাজ্ঞগণের পূজা এবং শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা –এগুলোকে কায়িক তপস্যা বলে।)

ঘরে বসে আপনি তপস্যা করতে পারেন, ঘরে বসে আপনি সন্ন্যাসীর মত হতে পারেন। সন্ন্যাসী আর গৃহস্থের মধ্যে তপস্যার কোন তফাৎ নেই। তফাৎ একটা জায়গায়, যেটা ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, কেল্লার ভিতর থেকে যুদ্ধ করা আর খোলা মাঠে নেমে যুদ্ধ করা। সন্ন্যাসীর একটা ফ্রীডম লাইফ আছে, কারণ সংসারের বোঝা তাঁর কাঁধে নেই, এর জন্য কিছু অসুবিধাও আছে। ঠিক তেমনি সংসারে কিছু সুবিধা আছে আবার প্রচুর অসুবিধাও আছে। একটা কথা জানবেন, আমি আপনি যেটার জন্য প্রস্তুত এবং উপযুক্ত, ভগাবন আমাকে আপনাকে সেখানেই নিয়ে গিয়ে রাখবেন। সাধুবাবা এসে রাজাকে বলছেন, আমার সাথে জঙ্গলে চলো, সেখানে তপস্যা করবে। রাজা বলছে, আমি জঙ্গলে গিয়ে তপস্যা করলে সেখানেও একটা সাম্রাজ্য দাঁড়িয়ে যাবে। সন্ন্যাসীদের লোকেরা বিদ্রুপ করে বলে, মঠর খাউছি খট্টর শুইছি, মঠে খাচ্ছ আর খাটে শুচ্ছ, তুমি আর সংসারের কষ্ট কি বুঝবে। এরা যদি কেউ সন্ন্যাসী হয়ে যায়, সেখানেই সে একটা সংসার পেতে নেবে। যারা এই ধরণের কথা বলে, ঠাকুর না করুন, এদের বাড়ির সবাই যদি মরে যায়, তাহলে কি এরা সন্ন্যাসীর মত থাকবে? প্রশ্নই নেই, থাকতেই পারবে না, মুখে এগুলো বলা। অপরকে দেখে হিংসায় পুড়ছে, এছাড়া আর কিছু না। সংসারী হন আর সন্ন্যাসীই হন, তপস্যা দুজনের জন্যই সমান। এটা শুধু থাকার তফাৎ হয়ে যায়, একজন ঘরে থাকছেন, আরেকজন ঘরের বাইরে থাকছেন।

প্রথমে বলছেন, *দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং*, পূজন সব কটার সাথে লাগবে। আমরা পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা বিভিন্ন ক্লাশে অনেকবার বলেছি, এখানে অন্য ভাবে বলছেন। আপনার বাড়িতে যিনি কুলদেবতা আছেন, পাড়াতে যে দেবদেবীর মন্দির আছে সেখানে দিনে দুবার করে যাওয়া, সকালে মঙ্গল আরতি, বিকালে সন্ধ্যা আরতিতে অংশ নেওয়া আর বিধি অনুসারে পূজা করা। গ্রামে যে দেবী বা দেবতা আছেন তাঁকে কেন্দ্র করে জীবন চালানো। দেবের পর দ্বিজকে নিয়ে বলছেন, দ্বিজ মানে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণরা হলেন ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। আপনি বলবেন, আজকালকার ব্রাহ্মণরা তো সবই করছে। আমরা এটা সেই কবেকার কথা বলছি। ঠিক আছে ব্রাহ্মণ ছেড়ে দিন, সন্ন্যাসীকে নিন। বলবেন, সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেক fraud সন্ন্যাসীও থাকে। আরে ভাই, যে fraud লোক সে তো fraud গুরুই পাবে। কই, আমরা তো কোন কষ্টে নেই যে, আমাদের জীবনে fraud লোকই পেয়েছি বলে কখন চিন্তাতেও আসেনি; আমরা তো highest লোকগুলোই পেয়েছি। আপনার চোখেই কেন সব fraud পড়ে? কারণ ভিতরে ভিতরে আপনি নিজে একটা বড় fraud।

ঠাকুরকে একজন বলছে, ওরকম সন্ন্যাসী আমিও হতে পারি। ঠাকুর খুব রেগে গেলেন, বলছেন, সব ছেড়ে? বাজারে খেলনার নকল দশ, একশ, পাঁচশ টাকার নোট পাওয়া যায়। বাচ্চাদের ওগুলো দেওয়া হয় খেলার জন্য। বড়রা জানেন আসল নোট কি, নকল নোট কি। সাধু জীবনের জন্য আপনি যখন প্রস্তুত হয়ে যাবেন, আসল সাধু আপনার কাছে নিজে থেকেই এসে যাবে। তার আগে তত দিন আপনাকে নকল নোট নিয়েই চালাতে হবে। কারণ আধ্যাত্মিক জীবনে আপনারা এখনও শিশু। যাদের মনে হয় সন্ন্যাসীরা ঢপবাজ, তাদের জন্য ওই রকম লোকই দরকার। কথাগুলি শুনতে অত্যন্ত তেতো লাগবে, কিন্তু এটাই সত্য।

আগেকার দিনে ব্রাহ্মণরা শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু এনারা ব্রাহ্মণকে জাতি রূপে নিয়ে চলে গেছেন। দ্বাদশ অধ্যায়ে আমরা এর উপর আলোচনা করেছিলাম, যেখানে আচার্য বলছেন, অগস্ত্য মুনি কত বড় একজন মুনি হয়েছিলেন, সেই অগস্ত্য ব্রাহ্মণ কুলের ছিলেন বলে ব্রাহ্মণরা আজও সম্মান পাচ্ছেন। শঙ্করাচার্য, স্বামী বিবেকানন্দের মত মানুষরা সন্ন্যাসী ছিলেন বলে আজকেও আমাদের মত সন্ন্যাসীরা সম্মান পান। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস এত বড় দেশনেতা হয়েছিলেন, ফলে বাঙালীরা বিশেষ করে বোসেরা সম্মান পান। ঠিক সেই ভাবে ব্রাহ্মণদের থেকে এত এত উচ্চমানের সব ঋষিরা এসেছেন, সম্মান তো তাঁরা পাবেনই, তাতে কিছু বলার নেই। আর এই নিয়ে ব্রাহ্মণদের গালাগাল দেওয়া, মনুকে গালাগাল দেওয়ার কোন অর্থই হয় না। কি করা যাবে, তাঁদের বংশের লোকেরা ঋষি

হয়েছিলেন বলে এখনও তাঁরা সম্মান পেয়ে যাচ্ছেন। তোমার বংশের কেউ ভাল হলে, তোমারও সবাই পূজা করবে।

গুরু, আপনার যিনি আচার্য, যিনি আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন, গুরু যিনি মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছেন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার ভাব। ভারতবর্ষে গুরুর সম্মান সাংঘাতিক, গুরুকে অনেক উঁচুতে রাখা হয়। একলব্য দ্রোণাচার্যকে শুধু মনে মনে ভেবেছেন ইনি আমার গুরু, সেই গুরু যখন গুরুদক্ষিণা চাইলেন তাঁকে নিজের আঙুল কেটে গুরুদক্ষিণা দিলেন। ভারতের কিছু লোক এখন হিন্দু ফোবিয়াতে ভুগছে, হিন্দু নামটা শুনলেই মনে হয় এদের পাগলা কুকুরে কামড়েছে। কিছু দিন আগে এদেরই একজন বললেন, একলব্যের কাহিনী আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে তখনকার দিনে আদিবাসীদের উপর সবল উচ্চবর্ণের লোকেদের দ্বারা কি ধরণের অত্যাচার হত। কিসের অত্যাচার দেখছেন? কেউ জোর করে কি একলব্যের আঙুল কেটে নিয়েছিল? একলব্য তো বলতেই পারত, আপনার মত গুরু আমার লাগবে না। আর একলব্যও তো গুরুদক্ষিণা দিতে অস্বীকার করল না।

এগুলো কাহিনী, কাহিনীর মাধ্যমে একটা আদর্শকে তুলে ধরা হয়েছে। কুরু বংশের রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষা দেওয়ার পর দ্রোণাচার্য গুরুদক্ষিণা চাইলেন। কি গুরুদক্ষিণা চাইলেন? রাজা দ্রুপদকে বন্দী করে আমার সামনে নিয়ে এসো, এটাই আমার গুরুদক্ষিণা। যুধিষ্ঠির, দুর্যোধন, ভীম, অর্জুন সবাই নেমে পড়ল দ্রুপদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। কুরু বংশের রাজপুত্ররা তো বলল না, দ্রুপদ রাজার সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমরা মারাও যেতে পারি, এই যুদ্ধ আমরা করব না। কিন্তু তারা যুদ্ধ করল, এবং দ্রুপদকে বন্দী করে দ্রোণাচার্যের সামনে গুরুদক্ষিণা রূপে হাজির করল। তোমাদের ভিতরে যে হীনমন্যতা আছে, এই হীনমন্যতাকে ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াও। এতে তোমারও সম্মান হবে, তোমার বংশের সবারই সম্মান হবে। আগেও তোমরা কিছু করোনি, এখনও কিছু করছ না।

গুরুর পূজার পর বলছেন *প্রাজ্ঞপূজনম্*। এখানেই তফাৎ, প্রথমে বললেন দ্বিজ, তারপর গুরু আর এখন বলছেন প্রাজ্ঞ। তার মানে ব্রাহ্মণ মুর্খ হতে পারে, আপনার গুরু মুর্খ হতে পারে, কিন্তু তাও তাঁদের পূজা করবে। আর প্রাজ্ঞ, অর্থাৎ বিদ্বান পুরুষ; যে সমাজ বিদ্যার সম্মান করে না, বিদ্বানকে সম্মান করে না, সেই সমাজ খুব তাড়াতাড়ি দুর্বৃত্তদের দখলে চলে যায়। পার্ল বাকের 'দি গুড আর্থ' খুব নামকরা বই, যার জন্য তিনি নোবেল প্রাইজ পেলেন। মাও সে তুঙের সময় চীনের জনগণ যে বিপ্লব করেছিল, সেই সময় দেশটা তখন পুরো গুণ্ডা বাহিনীর হাতে চলে গিয়েছিল। চীনের যে কালচার ছিল, সেটাকে পুরো শেষ করে দিল তারা। রুশ বিপ্লবে রাশিয়াতে সেই তুলনায় একটু কম হয়েছিল। জ্ঞানীদের, সুসংস্কৃত, ভদ্র মানুষদের যে সমাজ সম্মান দিচ্ছে না, বুঝবেন সেই সমাজ কিছু দিনের মধ্যে গুণ্ডাবাহিনীর হাতে চলে যাবে। এই গুণ্ডাবাহিনীরাই পরে দেবী দেবতাদের সরিয়ে দিয়ে কামিনী-কাঞ্চনের পূজা করবে।

এতক্ষণ বহির্পূজা নিয়ে বললেন। এবার শৌচ নিয়ে বলছেন, নিত্য স্নান করা, জামা-কাপড় পরিষ্কার রাখা এগুলো শৌচের মধ্যে পড়ে, এর আগে আমরা এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি। রোজ স্নান করতে হয়, বাসি জামা-কাপড় রোজ ধুতে হয়। শৌচ হিন্দুদের বৈশিষ্ট্য, এর সাথে স্বাস্থ্যের কোন সম্পর্ক নেই, শৌচ হল তপস্যা রূপে। স্নান করা, নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এগুলোকে তপস্যা রূপে নিতে হয়। *আর্জবম্*, কুটিল ব্যবহার না করা, মনটাকেও পরিষ্কার রাখা, মনের মধ্যে কোন বক্র ভাব থাকবে না। *ব্রহ্মচর্যম্*, আগেও আমরা এর উপর আলোচনা করেছি। মনের ভিতর যে কাম ভাব, যে কামনা-বাসনাগুলি প্রতিনিয়ত উদয় হয়, সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। অনেক ইয়ং ছেলেরা এসে আমাদের এগুলোকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন করে। আমরা সন্ন্যাসী, এগুলোকে নিয়ে আমরা কি আলোচনা করব! এই জিনিগুলোকে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে বুঝিয়ে বলে দেওয়াটা বাড়ির অভিবাবকদের কাজ।

বয়সের একটা ধর্ম আছে, এখানে কিছু করার নেই। কামনা-বাসনার এই ঝড়গুলো আসবে, দ্বিতীয় ঠাকুর বলছেন, স্বদারায় গমনে দোষ নেই। বিয়ে করলে নিজের স্ত্রীর কাছে যাবে, এতে দোষের কিছু নেই। হিন্দী বেল্টে বলে, এক নারী ব্রহ্মচারী। যে পুরুষ একটি নারীর উপর আছে, সে ব্রহ্মচারীর মত। আরে ভাই, তোমার নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নেই বলেই তো তুমি সংসারে আছ, নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নেই বলেই তো তুমি বিয়েথা করেছ। যীশু খুব সুন্দর বলছেন, It is better to marry than to burn। ব্রহ্মচর্য এটাই, বাকি জিনিসগুলো এমন কিছু দামী না, এত কিছু করার আছে একটা কিছু করলেই হল, সাথে ওটাও ঠিক হয়ে যাবে। সবার এত সমস্যা কেন হয়? বাকি যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো নিয়ন্ত্রণে নেই বলে। সব শেষে *অহিংসা*, কোন প্রাণিকে কষ্ট না দেওয়া। এই কটি হল শরীরের তপস্যা।

কেন এটা শরীরের তপস্যা? কারণ এগুলোতে শরীরের involvement বেশি, এগুলোর ভিতর শরীর জড়িয়ে আছে বলেই এই কটাকে শারীরিক তপস্যা বলা হয়। অষ্টাদশ অধ্যায়ে আবার বলবেন, *অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্*, যে কোন কর্মে শরীরের কত গুরুত্ব, এটার ব্যাখ্যা করবেন। বেশির ভাগ মানুষের শরীরে অনেক দোষ থাকে, ব্লাডপ্রেসার, সুগার, রাতে ঘুম হয় না ইত্যাদি। এগুলো কেন হয়? কারণ আগের আগের জন্মে এরা শরীরের তপস্যা করেনি। এখন তো যা হবার হয়ে গেছে, ভবিষ্যৎটা যেন ঠিক থাকে, শরীরের তপস্যা করাটা শুরু করুন।

আমি যে সমাজ, যে পরিবেশ থেকে সন্ন্যাসী হয়েছি, সেখানকার লোকেরা সন্ন্যাস-টন্ন্যাস কিছু বোঝে না। আমাকে তাঁরা বলছেন, 'তোমার কর্ম কত খারাপ ছিল বলে আজ তুমি সন্ন্যাসী হলে'। ওনাদের কাছে সাধুবাবা মানে ভিখারী কিনা। একজন তো এসে আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মত বলছেন, 'দেখ, এই জন্মে ভাল কিছু কর, পরের জন্মে যদি ভাল কিছু হতে পার'। শুনে আমার জোর হাসি পেয়ে গিয়েছিল। উনি এতটুকু বুঝছেন না যে, কত পূণ্যের উদয় হলে মানুষ সন্ন্যাসী হয়। কিন্তু ওনার কাছে এই তত্ত্বটা আছে, আজকে কিছু ভাল কর, পরে ভাল যদি কিছু পাও। হিন্দুদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এটা বসে গেছে। আজকে যদি তপস্যা করেন, এটাই পরে গিয়ে আপনার ভাল হবে। এরপর গীতা বাণীর তপস্যা নিয়ে বলছেন। বাণীরও যে তপস্যা হতে পারে, যারা গীতা পড়েনি, এটা তারা জানতেও পারবেন না।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে।।১৫।।

(অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য এবং বেদাদি শাস্ত্রপাঠকে বাচিক তপস্যা বলে।)

বাণীর তপস্যা আমরা সবাই খুব কম করি। যাঁদের সুসংস্কৃতি আছে, যাঁদের আভিজাত্য আছে তাঁরা তাঁদের কথাগুলো এমন ভাবে বলবেন, যাতে তাঁর কথা শুনে কারুর মনে কোন রকম উদ্বেগ সৃষ্টি না করে, কষ্ট না পায় –*অনুদ্বেগকরং*। আমরা দিনরাত লোকেদের এমন এমন সব কথা বলি, যে কথাগুলোর জন্য সামনের লোকের মধ্যে উদ্বেগ তৈরী হয়ে যায়। তার সাথে কথা যেন সত্য হয়, *সত্যং*। সত্য কথা হলেই তপস্যা হয়ে যাবে না, কথাগুলো যেন প্রিয় হয়। *হিতং*, কথাগুলো যেন ভালর জন্যই বলা হয়। সত্য, প্রিয় আর হিতকারক, এই তিনটে জিনিস কথার মধ্যে থাকতে হবে। হিতকারক কোনটা? আচার্য শঙ্কর বলছেন, ইহলোক আর পরলোক এই দুটো লোকের জন্য যে কথাগুলো হিত করবে, সেই ধরণের কথা বলাই উচিৎ; অর্থাৎ যে কথাগুলো এই জন্ম আর পরের জন্ম দুটোকেই যে কথা ঠিক করে, সেই কথাগুলোই যেন বলা হয়। অর্থাৎ কথাগুলো এমন হবে যে কথা মানুষকে ভাল করবে।

কিন্তু ভাল করতে গিয়ে কথাগুলো যেন সত্য হয়, ভাল করতে গিয়ে কথাগুলো যেন অপ্রিয় না হয়, প্রিয় কথা দিয়ে ভাল করতে হবে। আমরা এখানে ওই আলোচনায় যাব না, শ্রীমা কেন পাঁচ

সের দুধকে জাল দিয়ে ঠাকুরকে বললেন এটা তিন সের দুধ না, এক সের দুধ; আর মহাভারতে কেন বলছেন, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে কখন কখন মিথ্যা কথা বলতে হয়। এখানে তাঁদের জন্য এই কথাগুলো বলা হচ্ছে, যিনি বলে দিয়েছেন সমাজ আমার আর লাগবে না, জগৎ আমার লাগবে না; এবার আমি তপস্যায় ডুব দেব। ভাই আমি আর মিথ্যা কথা বলব না, ওখান থেকে আমি বেরিয়ে এসেছি। কিন্তু যারা সমাজের মধ্যে, সংসারের মধ্যে একেবারে ডুবে আছেন, তাঁদের জন্য অন্য ভাবে বলছেন। শ্রীশ্রীমা বলছেন, রোগী, বাচ্চাদের যাদের দেখাশোনা করতে হয় তাদের কিছু মিথ্যা কথা বলতে হয়, ওই মিথ্যা কথা মিথ্যার মধ্যে না। ঠিক আছে এটাকে মেন নিলাম। কিন্তু মূল কথা হল, *সত্যং প্রিয়হিতং*, হিত যদি কারুর করতে হয়ে সব সময় সত্য কথা আর প্রিয় কথা দিয়েই হিত করতে হয়। এই হিত হল এই জন্মের জন্য হিত আর পরের জন্মের জন্য হিত। সত্য, প্রিয় আর হিত কথা বলার সময় এই তিনটে যিনি পালন করছেন, তিনি বাণীর তপস্যা করছেন। ঘরে বসেই আপনার এই তপস্যা হবে।

কিন্তু তার সাথে আপনাকে আর-একটা করতে হবে –*স্বাধ্যায়*। রোজ নিয়মিত স্বাধ্যায় যদি আপনি না করেন, তাহলে কিন্তু আপনার বাণীর তপস্যা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ছোটবেলায় আমরা দেখতাম যাঁদের বয়স হয়ে যেত, তাঁদের কোন কষ্ট ছিল না, ওই বয়সেও মৃত্যুদিন পর্যন্ত ওনারা এত ব্যস্ত থাকতেন যে, আলতু ফালতু কথা বলা, খোশ গল্প করার সময়ই পেতেন না। আমরা দেখতাম সকাল উঠে স্নান করে হয় চণ্ডী পাঠ করতে বসে গেলেন, না হয় গীতা পাঠ করছেন, না হয়ত কোন একটা শাস্ত্র পাঠ করছেন; এই করেই তাঁদের সারাটা দিন কেটে যেত। বাড়িতে দিদিমা, ঠাকুরমা যাঁরা ছিলেন, তাঁর সংসারের কত কাজ করতেন। যেমন যেমন বয়স হচ্ছে, শরীরের শক্তি যেমন যেমন কমছে, তেমন তেমন তাঁদের কাজ পাল্টে যাচ্ছে। হয়ত চাল বাচছেন বা ডাল বাচছেন, এর থেকেও বেশি হয়ত কিছু করছেন, শরীর আর সাথ দিচ্ছে না, কিন্তু ব্যস্ত থাকছেন। আপনারা কি নিজেকে ব্যস্ত রাখেন? কাজ করতে চান না, শরীরটাও ভারী হয়ে যাচ্ছেন? টাকা খরচ করে জিমে গিয়ে শরীর ঠিক রাখতে চেষ্টা করছেন? বাড়িতে যতটুকু পারুন কাজ করুন, কাজ করলে শরীর ঠিক থাকবে, মনও ঠিক থাকবে।

তার সাথে স্বাধ্যায় অতি অবশ্যই, স্বাধ্যায়ের অভ্যাস তৈরী করতে হবে, নিয়মিত শাস্ত্র পাঠ করা এটাই স্বাধ্যায়। আপনাদের আমি সত্যি কথা বলছি, খুব কম করে এক ঘন্টা স্বাধ্যায় যদি না করেন, গীতা পাঠ, কি উপনিষদ পাঠ আর আপনার যে গ্রন্থ পছন্দের, তা ভাগবত হোক, কথামৃত হোক, চৈতন্যচরিতামৃত হোক, মায়ের কথা হোক যে কোন গ্রন্থ, কম করে এক ঘন্টা পাঠ দিনে যদি না করেন, তাহলে কিন্তু জীবন এগোবে না। আর আপনি ঠিক করেছেন ঘরে বসে তপস্যা করবেন। কি কি তপস্যা? শরীরের তপস্যা বলা হল, যাঁকে যতটুকু সম্মান দেওয়ার দিলেন, যতটুকু পূজা করার করলেন, স্নানাদি ভারতের লোকেরা করেন, আর্জবম্, মনে যতটুকু প্যাঁচঘোচ আছে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হওয়ার হবে, ব্রহ্মচর্য আর অহিংসা। আমরা ধরেই নিচ্ছি আপনার বয়স হয়ে গেছে, কামবেগ আপনাকে আর দৌড় করাচ্ছে না।

বেলুড় মঠে দেখি, খারাপও লাগে, ঠাকুরের মন্দিরে বসে আছে, ভক্তরা আসছে আর 'ও দিদি কবে এলে', বলে শুরু হয়ে গেল অযথা বাক্যালাপ। এতে কার ভাল হচ্ছে? ঠাকুরের স্থানে এসেছেন, একটু শান্ত ভাব অবলম্বন করার চেষ্টা করুন। আর পরনিন্দা পরচর্চা করা ছেড়েই দিন, ওগুলোকে আমরা এখানে আনছিই না। কথার মধ্যে কত আবর্জনা, দুর্গন্ধ যুক্ত কত কথা বলি, কত সময় এইভাবে আমরা নষ্ট করি, কত ইমোশানস আমরা নষ্ট করি এদিকে কারুর কোন নজর নেই। *বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে*, এটাই হল বাণীর তপস্যা।

এখানে আচার্য দুটি খুব সুন্দর কথা বলছেন, যে কোন কথাতে তিনটের মধ্যে একটা কি দুটো না থাকে, তিনটে তো কোন মতেই না, যদি না থাকে সেই কথা বলতে নেই। কথা বলার

সময় এই তিনটে জিনিস বিচার করে দেখতে হয় –এই যে আমি কথা বলতে যাচ্ছি, এই কথাটা কি সত্য, কথাটি কি প্রিয়, এই কথাতে কি কারুর মঙ্গল হবে? এটাকে নিয়ে আচার্য খুব সুন্দর উদাহরণ দিচ্ছেন, গুরু যেমন শিষ্যকে বলেন, *যথা শান্তো ভব বৎস স্বাধ্যায়ং যোগং চ অনুতিষ্ঠ তথা তে শ্রেয়ো ভবিষ্যতি*, হে বৎস! শান্ত মনে স্বাধ্যায় করো, আর যোগ অবস্থিত হও, এতে তোমার কল্যাণ হবে। এই যে গুরু শিষ্যকে কথা বলছেন, তিনি সত্য কথা বলছেন, প্রিয় কথা বলছেন, আর শিষ্যের মঙ্গলের জন্য বলছেন। সংস্কৃত ভাষায় সংক্ষেপে একটা শব্দ দিয়ে অনেক কিছু বলে দেওয়া যায়। প্রত্যেক ভাষার একটা বৈশিষ্ট্য থাকে, এটা সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য। লোকেরা বলে সংস্কৃত জানি না। দেখুন আচার্যের এই সংস্কৃত কত সহজ সংস্কৃত। *শান্তো ভব বৎস*, বাছা শান্ত ভাব অবলম্বন কর। তারপর বলছেন *স্বাধ্যায়ং যোগং চ অনুতিষ্ঠ*, হে বৎস শান্ত ভাবে স্বাধ্যায় করো, যোগে প্রতিষ্ঠিত হও, তার মানে যোগ অভ্যাস করো। আলতু ফালতু কথা একেবারেই বলতে নেই। ফোনে সারাক্ষণ কথা বলে যাচ্ছেন, সবটাই আবর্জনা।

কিন্তু তার আগে আপনাকে ঠিক করতে হবে আপনি তপস্যা করতে চান কি চান না। তপস্যা কেন করতে হবে? একশ বছর পর আপনি নিজেকে কোথায় দেখতে চান? একটা গল্প আছে, তাতে বলছেন, দুই ভাই, দুজনই বাচ্চা; কিছুতেই পড়াশোনা করবে না। বাবা-মা ওদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য শিক্ষকের পর শিক্ষক পাল্টে যাচ্ছে। একজন শিক্ষক এসেছেন, এসে তিনি বাচ্চা দুটোকে আম বাগানে নিয়ে গেছেন। একজনকে একটা আম পেড়ে দিল খাওয়ার জন্য। অন্যজনকেও একটা আম দেওয়া হল। দেওয়ার পর খোকাকে জিজ্ঞেস করছে, 'বলো তুমি কটা আম পেলে'? বাচ্চাটা বলল একটা। 'দাদা কটা আম পেল'? একটা। 'তাহলে মোট কটা আম পারা হল'। দাদা সঙ্গে সঙ্গে ভাইকে বলছে, 'ভাই উত্তর দিস না, উনি আমাদের অঙ্ক শেখাচ্ছেন'। এখন যারা ঠিক করে নিয়েছে, আমাদের কিছু লাগবে না, যা আছি বেশ আছি; থাকুন আপনি ওই ভাবে, আর জন্ম জন্ম ঘুরতে থাকুন। জন্ম নিয়ে মরবেন, মরে আবার জন্ম নেবেন, আবার মরবেন। স্বামীজী উদাহরণ দিচ্ছেন, বরফের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় পরিশ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল, ওখানেই হাইপোথার্মিয়া হয়ে যায়। তখন বলে আমি বেশ আছি। কিন্তু সে বুঝতে পারছে না যে, সে মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে।

ডারউইনের ইভ্যালুয়েশান থিয়োরী যদি জানেন, তাহলে জানবেন এই যে বানর থেকে মানুষ হয়েছিলেন, আবার আপনি মানুষ থেকে বানর হবেন। কারণ আমরা সত্যটা জানি, একটা জন্মই শেষ না। আমরা জানি *পুনরপি জননং পুনরপি মরণং*, যত দিন সাত্ত্বিক তপস্যায় প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছেন, মুক্তি যত দিন না হচ্ছে, তত দিন মহামায়া আপনাকে এভাবেই ঘোরাতে থাকবে। শারীরিক আর বাচিক তপস্যার পর মানসিক তপস্যার কথা বলছেন।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে।।১৬।।

(মনের প্রসন্নতা, সৌম্যভাব, বাক্‌সংযম, মনের নিরোধ, ব্যবহারকালে ছলনারাহিত্য (মন ও মুখ এক করা) – এই সকলকে মানসিক তপস্যা বলে।)

মনঃপ্রসাদঃ, মনকে সব সময় শান্ত রাখতে হবে। মনের প্রসাদ মানে, মন সব সময় আনন্দে ভরপুর থাকবে, প্রসন্ন থাকবে। মনে কখন অবসাদ আসতে দেওয়া যাবে না। তার সাথে মনে কখন উল্লাস আসতে দেওয়া যাবে না। অবসাদ আর উল্লাস দুটোর কোনটাই মনে থাকবে না। মনে সব সময় যেন প্রসন্নতার ভাব বজায় থাকে। যারা গোমড়া মুখে থাকে, তাদের দ্বারা ধর্ম হবে না। বাচ্চারা একটু আনন্দেই লাফাতে থাকে, সেইজন্য বাচ্চাদের দ্বারা আধ্যাত্মিকতা হতে পারে না। রজোগুণের প্রভাবে আনন্দে যারা সব সময় লাফাতে থাকে, এদের দ্বারাও ধর্ম জীবন, আধ্যাত্মিকতা কোনটাই হবে না।

সৌম্যত্বং, সুমনসা হল *সৌম্যত্বং* শব্দের আরেকটা শব্দ। আচার্য সৌম্যের ব্যাখ্যাতে খুব সুন্দর বলছেন, *মুখাদিপ্রসাদকার্যা অন্তঃকরণস্য বৃত্তিঃ*, অন্তঃকরণ, মনের সেই বৃত্তি, সেই ভাব, যেটাতে মুখমণ্ডলকে প্রসন্ন দেখায়। সাধারণ অবস্থাতেও প্রসন্ন দেখাবে, একটা হাসির কথা বলা হল বলে যে তিনি হাসছেন, তা না, এমনিতেই মুখের মধ্যে একটা প্রসন্ন ভাব লেগে থাকে, দেখলেই মনে হবে, আহা কি শান্ত ও মিষ্টি মুখ।

মৌনম্, মৌনকে বলছেন অন্তঃকরণের সংযম। কারণ আগে পনের নম্বরে যেখানে বাণীর তপস্যার কথা বলা হল, সেখানে মৌন আসলে বাণীর তপস্যার মধ্যেই পড়ে। এখানে বিশেষ করে এইজন্য বলছেন, এটা অন্তঃকরণের সমস্যা। এখানে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আগেকার দিনে, বেলুড় মঠ যখন হয়েছে, তখন মঠের প্রাচীন সাধুরা মনে করতেন বেলুড় মঠ লোকেদের কল্যাণের জন্য করা হয়েছে। আর ভক্তরা যে টাকা-পয়সা দেন, সেটা দিয়ে মঠ চলে। সেইজন্য মঠের সব কাজ আমাদের নিজেদেরই করতে হবে। যাঁরা কাজ করতে চাইতেন না, তাঁরা হৃষিকেশ, হরিদ্বারের দিকে চলে যেতেন, সেখানে সাধুরা ভিক্ষা করে খেতেন। এখনও মঠের সন্ন্যাসীরা হৃষিকেশ, উত্তরকাশী আদি জায়গায় তপস্যার জন্য চলে যান এবং ভিক্ষা করে খান। মহাপুরুষ মহারাজ তখন মঠের অধ্যক্ষ। সেই সময় একজন সাধুর কোন কারণে মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছিল। উনি রেগেমেগে মহারাজকে গিয়ে বললেন, 'আমি চললাম হৃষিকেশ, এক বছর তপস্যা করব আর ভিক্ষে করে খাব, আর এক বছর মৌন থাকব, কারুর সাথে কথা বলব না'। ঝগড়া বিবাদ হয়েছে, মাথাটাও গরম হয়ে গেছে। মহাপুরুষ মহারাজ এক বছর মৌন থাকবেন শুনে খুব মিষ্টি করে আস্তে আস্তে বললেন, 'ভিতরটাও।' মানে, বলতে চাইছেন, মুখটা শুধু বন্ধ করলে হবে না, ভিতরটাও যেন মৌন থাকে। এই গল্পটা যখন একজন গুরুজনের কাছে শুনেছিলাম, আমার হাসি আর থামছিল না।

বাইরে মুখে বন্ধ করে দিয়েছেন, কিন্তু ভিতরে অনর্গল বক্ বক্ করে যাচ্ছেন; এই মৌনের কোন দাম নেই। মৌন মানে ভিতরটাকেও মৌন করতে হবে। ভিতরটাও যদি বন্ধ করতে পারেন তাহলে ঠিক আছে। শুধু মুখে কথা বন্ধ করে কোন লাভ নেই, তার থেকে মুখে দুটো কথা বলে দিলে ভিতরটা হালকা হয়ে যাবে। মুখ খোলা থাকলে কোন সমস্যা হয় না। কারণ ঠিক ঠিক তপস্যা হয়, *অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ*, এটাই হল তপস্যা। বাণীকে মৌন করে দেওয়াটা তপস্যা না। মুখ জোর করে বন্ধ করে রেখেছেন, আমি কথা বলব না, মৌনব্রত পালন করছি, এটা কোন তপস্যই নয়। মৌন হবে অন্তঃকরণের। মনের যে মৌন হয়ে থাকা, এটাই মনের তপস্যা। অনেকেই আজকাল লিখছেন, The Yoga of silence, কারণ আমরা সবাই এখন খুব বেশি বহির্মুখী হয়ে যাচ্ছি, তাই এগুলোকে ইদানিং খুব বেশি হাইলাইট করতে হচ্ছে। The Yoga of silence হল ভিতরটাকে মৌন রাখা। ভিতরটা মৌন থাকলে বাইরেও তার ছাপ দেখা যাবে, মুখটা সব সময় শান্ত ও প্রসন্ন দেখাবে। আচার্যও বলছেন, বাণীর যে সংযম হবে, এই সংযমটা হয় অন্তঃকরণের মৌনতা থেকে।

আপনি যদি ঠিক করেন মুখ বন্ধ করে আপনি বাণীর তপস্যা করবেন, কিন্তু যতক্ষণ আপনার অন্তঃকরণের সংযম না হচ্ছে, ততক্ষণ আপনি বাণীর সংযম করতে পারবেন না। তিনটে পরস্পর সাথে জুড়ে আছে। মহাভারতে এক জায়গায় বলছেন, মানুষ যখন কোন খারাপ কাজ করতে যায়, তখন কাজটা করার আগে সে মনে মনে সেই কাজের কথা ভাববে, তারপর অপরকে বাণীর দ্বারা বলে বেড়াবে, আর তারপরেই শরীর দিয়ে সেই অন্যায় কাজ নিষ্পন্ন করে। যেমনি মনে কোন চিন্তা উঠল, আপনি হয়ত বলতে পারছেন না, কিন্তু আগে পাঁচজনকে বলে বেড়াবেন। হয়ত মজা করেই বলে বেড়াবেন। আমাকে যখনই কেউ এই রকম কিছু নেগেটিভ কথা বলে, মহারাজ আমি কিন্তু এই রকম করব। আমি বুঝি, হয়ত মজা করেই বলতে এসেছে, কিন্তু এটা হল, সে আমার কাছ থেকে

এই কাজটা করার জন্য ইয়েস করাতে চাইছে, কারণ ভিতরে তার আগুন জ্বলছে, আমাকে বলা মানে এবার ও কাজটা করবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে ধমক দিয়ে আটকে দিই। কারণ মনের স্তরে যদি আটকে দেওয়া হয়, তাহলে আর শরীরের স্তরে নামবে না। কারণ মনের ছাপটা কম, ঠাকুর বলছেন, কলিতে মনের পাপ পাপ না। কিন্তু শরীরে যদি একবার নেমে যায়, এবার তার সব কিছু এলেমেলো হয়ে যাওয়া থেকে কেউ আটকাতে পারবে না।

তার সাথে বলছেন, *আত্মবিনিগ্রহঃ,* মনকে ইন্দ্রিয়ের সমস্ত বিষয় থেকে টেনে নিয়ে আসা। এবার জপধ্যানের মাহাত্ম্য শুরু হল। কোথায় স্বাধ্যায় থেকে নিয়ে এলেন *সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ,* সেখান থেকে নিয়ে এলেন আত্মনিগ্রহে, নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আসা। জপধ্যান একদিনে হয় না। বৈষ্ণবদের দেখবেন কি সুন্দর মালা নিয়ে সর্বক্ষণ জপ করে যাচ্ছেন। অন্যান্য ধর্মেও আছে, ইসলামেও আছে, বৌদ্ধ ধর্মেও আছে। মালা নিয়ে যখন জপ করে যাচ্ছেন, বা মালা নেই, করে জপ করে যাচ্ছেন। আবার এও আছে, একশ আট গোণাগুনি নেই এমনই মনে মনে জপ করে যাচ্ছেন মনটাকে ঈশ্বরের সঙ্গে জুড়ে রাখার জন্য।

একবার দেখছিলাম, একজন জপ করতে করতে মন্দির প্রদক্ষিণ করছিলেন। উনি নিজের কাছে কিছু গোটা ফল এবং কিছু কাটা ফল রেখেছেন। একবার করে ওখান থেকে একটা করে ফল বা ফলের টুকরো নিয়ে জপ করতে করতে প্রদক্ষিণ করছেন। একশ আট জপ হয়ে গেলে সেই ফলটা সামনে রেখে আবার একটা ফল নিয়ে জপ করতে করতে প্রদক্ষিণ করে যাচ্ছেন। এইভাবে একশ আট খানা ফল বা ফলের টুকরো নিয়ে জপ করতে করতে প্রদক্ষিণ করে সামনের পাত্রে রাখছেন। একশ আট বার ঘুরে ঘুরে জপ করে যাচ্ছেন। এগুলো করা অনেক সহজ। একশ আট খানা সন্দেশ কিনে নিলেন। একবার করে একটা সন্দেশ নিয়ে একশ আট জপ করে মন্দিরে প্রদক্ষিণ করে একটা পাত্রে রেখে দিলেন। এইভাবে একশ আট বার হয়ে গেলে সেটাকে প্রসাদ রূপে লোকেদের খাইয়ে দিলেন।

ভাবসংশুদ্ধিঃ, ভাবের সংশুদ্ধি, ভাবকে শুদ্ধ করা। আচার্য বলছেন, *পরৈঃ ব্যবহারকালে অময়াবিত্বং ভাবসংশুদ্ধিঃ,* অপরের সাথে যখন ব্যবহার করছেন তখন মায়াবীর মত ব্যবহার করবেন না, ছল করবেন না, আপনার মনের মধ্যে যে ভাব আছে, এমন ব্যবহার করবেন যাতে সামনের লোকটি যেন আপনার সেই রকম ভাবটিই বুঝতে পারে। *ইতি এতৎ তপো মানসম্ উচ্যতে,* এটাই মনের তপস্যা। শরীরের তপস্যা বললেন, বাণীর তপস্যা বললেন এবং মনের তপস্যা কিভাবে হয় বললেন। যে কেউ চাইলে ঘরে বসেই আরামসে এই তিনটি তপস্যা করতে পারেন। এই তপস্যা করেই আপনি খুব সহজে একজন মহৎ পুরুষ হয়ে যেতে পারেন, খুব সহজেই এর দ্বারা বর্তমানে আপনার যাই হয়ে থাকুক, আপনার ভবিষ্যৎকে ভাল করতে পারেন। এরপর বলবেন, এই তপস্যাই কিভাবে সাত্ত্বিক, রাজসিক আর তামসিক হয়।

শাস্ত্রের বিধি-বিধান, পূজা অর্চনার জন্য যে বিধি, এগুলো আমাদের সবার জানা থাকে না। যাঁরা পূজা বিধি জানেন না, কিন্তু শ্রদ্ধার সাথে কিছু করতে চাইছেন, তপস্যা করতে চান, দান করতে চান তাঁরা এগুলো কিভাবে করবেন? শাস্ত্রে বিধান দেওয়া আছে, শাস্ত্রগুলি ঋষিরা রচনা করে গেছেন। ঋষিরা তাঁদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সব কিছু দেখার পর তাঁরা বলে দিলেন কোন জিনিসটা কিভাবে করতে হবে। কিন্তু আমরা বেশির ভাগ মানুষ শাস্ত্রের সব কথা জানি না। আমি নিজে পূজা বিধি সেই রকম জানি না। আমাদের মঠ মিশনে পূজা বিধি শিখতে হয় বলে কম বয়সে শিখেছিলাম, কিন্তু সেভাবে কখন করিনি। আর অদ্বৈত আশ্রমে অনেক বছর ছিলাম, যেখানে পূজা অর্চনাই নেই। ঠিক আছে পূজা বিধি আমি নাই জানলাম। কিন্তু যদি আমাকে পূজা করতে হয় তাহলে আমি কিভাবে করব। যদি জপ করতে হয়, আমি কিভাবে করব। যাঁরা মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছেন তাঁরা সবাই জানেন জপ কিভাবে করতে হয়। কিন্তু তার বাইরেও খুব জরুরী কিছু কথা থেকে যায়।

এর আগে আমরা আলোচনা করলাম তপস্যা ও সাধনা, দুটোতে কি তফাৎ। অন্যান্য ধর্মের তুলনায় হিন্দুদের জীবনে দানের এক সাংঘাতিক মাহাত্ম্য রয়েছে। খ্রীশ্চান ধর্মে চ্যারিটির একটা ধারণা আছে, ইসলামে দান ধর্মের অঙ্গ, দানকে ইসলামে জাকাৎ বলে, আয়ের শতকরা ২.৫ ভাগ দান করতেই হয়। দান হিন্দুদের তপস্যার একটা অঙ্গ হয়ে যেতে পারে। মহাভারতের একটা বৈশিষ্ট্য হল, যে জিনিসটা একটা গুণ বিশেষ, সেই জিনিসটাকে তপস্যা রূপে নিয়ে গেছেন। যেমন শুদ্ধি, শুদ্ধি একটা গুণ, মহাভারত ওটাকেই তপস্যার স্তরে নিয়ে চলে গেছেন। ঠিক তেমনি, দান জিনিসটাকেও তপস্যার স্তরে নিয়ে চলে গেছেন।

হিন্দু ধর্ম এক বিশাল ধর্ম, মহাসমুদ্রের মত। সেইজন্য কারুর পক্ষে হিন্দু ধর্মের সমস্ত কিছু জানা অত্যন্ত কঠিন। শুধু তন্ত্রেরই এত শাখা রয়েছে যে, তন্ত্রের সব কিছু একজনের পক্ষে জানা খুব মুশকিল, প্রায় অসম্ভব। এই অধ্যায়ের শেষ কয়েকটি শ্লোকে বলবেন, জপ, তপ, দান, ধ্যান কিভাবে করতে হবে। এই কটি শ্লোক খুব সহজ, বোঝা তেমন কঠিন কিছু না। আমার আপনার এই জিনিসগুলিকে জানা খুব জরুরী। পনের আর ষোল নম্বর শ্লোকে খুব সুন্দর বলেছিলেন, *অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ*, কথা যখন বলবেন তখন কথাগুলো যেন সত্য হয়, মধুর হয় এবং হিতকারী হয়, তবেই ওটা হবে বাণীর তপস্যা। আর মনের তপস্যাকে নিয়ে বললেন। আমাদের কাছে অনেকেই দেখা করতে আসেন, কেউই ব্রহ্মজ্ঞানের নিচে, অদ্বৈত ছাড়া কোন কথা বলবেন না, মায়া ছাড়া তার কোন প্রশ্নই নেই। একটা প্রশ্ন শুনেই বুঝে নিই, লোকটা কতটা খেলো। এরা নিজের সাধন-ভজনের সমস্যা নিয়ে কোন কথা বলবে না। উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করার আগে দেখুন আপনার কোথায় আটকাচ্ছে। সব উড়ো খৈ গোবিন্দায় নম।

একটা মজার গল্প আছে, যদিও এর সাথে মিলবে না, কিন্তু গল্পটা খুব মজার। আগেকার দিনে বড় বড় ডাক্তারদের হাতের লেখাটা খুব খারাপ হত। ডাক্তারদের হ্যাণ্ডরাইটিং পড়তে না পারাটা একটা বিরাট ব্যাপার ছিল। একজন ডাক্তারবাবু বিদেশ থেকে স্ত্রীকে বা মাকে একটা চিঠি লিখেছেন। কিন্তু হাতের লেখা এতটাই খারাপ যে কেউ কিছুই বুঝতে পারছেন না চিঠিতে কি লিখেছে। অনেক ভাবনা চিন্তা করে ওনারা ঠিক করলেন, চল ওষুধের দোকানে যাই। ওরা ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশান পড়ে পড়ে ওই খারাপ হাতের লেখা পড়াটা রপ্ত করে নিয়েছে। ওষুধের দোকানের ভদ্রলোক খুব মন দিয়ে চিঠিটা পড়লেন। পড়ার পর দু পাতা ক্রোসিন টেবলেট দিয়ে দিলেন। বলছেন, এটাই এখানে লেখা আছে। আমাদের শাস্ত্র বোঝাটা অনেকটা ক্রোসিন টেবলেট বোঝার মত। হঠাৎ শাস্ত্রের একটা পাতা খুলে চোখ বোলাতে লাগল, কিছুই বুঝতে পারছে না। তারপর একজন মহাত্মার কাছে গেল, মহাত্মাও কিছুই বুঝতে পারছেন না। সংসার মিথ্যা হ্যায়, এই রকম একটা কিছু বলে দিলেন। মহাত্মাজী নে ঠিকই বোলা। এই যে ডাক্তার মাকে চিঠিতে লিখেছে, মা আমি ভাল আছি ইত্যাদি, মা নিজেও বুঝছে না, যার কাছে নিয়ে গেল সেও বুঝছে না। দু পাতা ক্রোসিন ট্যাবলেট ধরিয়ে দিল। দেখুন আপনার নিজের কি সমস্যা, যেখান থেকে আপনি চলতে শুরু করবেন। অবান্তর প্রশ্নে নামতে নেই। মনের তপস্যা কিভাবে হয়? *মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ*, এটাকে নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম। আর কি? *ভাবসংশুদ্ধিঃ*, ভাব শুদ্ধ রাখতে হয়।

এই যে তিন রকম তপস্যার কথা বলা হল – শরীরের তপস্যা, বাণীর তপস্যা আর মনের তপস্যা, এগুলো আবার তিন প্রকার হয় – সাত্ত্বিক তপস্যা, রাজসিক তপস্যা ও তামসিক তপস্যা। গীতা আমাদের শুদ্ধ সাত্ত্বিক তৈরী করতে চাইছেন। মা যেমন সন্তানের মঙ্গলের জন্য সদা সর্বদা লেগে থাকেন, কখন আদর করছেন, কখন একটু তিরস্কার করছেন, সন্তানকে মা বারবার একই কথা বলতে থাকেন। বাবাদের এত ধৈর্য থাকে না, জ্যাঠা কাকাদের তো আরও কম ধৈর্য। বাবা চেঁচিয়ে বলবেন, এতবার বললাম এখনও বুঝতে পারছ না কি বলতে চাইছি। মায়েরা ওই রকম হন না,

সন্তানকে বলতেই থাকেন; একবার এভাবে, আর-একবার ওভাবে। শাস্ত্র হলেন মা। আপনারা আর কিছু না শিখুন, না শুনুন, শুধু এটুকু মনে রাখবেন গীতা সকলের মা, আমারও মা আপনারও মা। আমাদের দুজনের যে গর্ভধারিনী মা, গীতা তাঁরদেও মা। কারণ গীতা সবারই জন্য কল্যাণকারী, সবারই মঙ্গল চান। গীতা সব সময় চাইছেন, আমরা যেন তমোগুণ থেকে রজোগুণে এবং রজোগুণ থেকে সত্ত্বগুণে আসতে পারি। কারণ একবার যদি কেউ সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, এরপর আত্মজ্ঞান, ঈশ্বরদর্শন হতে বেশি দেরী লাগে না। এই যে জপ, ধ্যান, তপস্যার কথা বলা হল, এই জিনিসগুলো সাত্ত্বিক কিভাবে হয়, এবার সেটাকে নিয়ে বলছেন। আর যেটা করতে নেই, রাজসিক, তামসিক যে জপ, ধ্যান, তপস্যা, দান; সেটাকে নিয়েও বলবেন, যার প্রত্যেকটি কথা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রচুর কাজে লাগবে।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে।।১৭।।

(ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন, সমাহিত ব্যক্তিগণ পরম শ্রদ্ধা সহাকারে পূর্বোক্ত কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা করে, তাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলে।)

প্রথমে শুরু করছেন তপস্যা দিয়ে। শারীরিক, বাণী ও মানসিক তপস্যা আবার তিন প্রকার হয়। বলছেন, কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা যদি কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে করা হয়, সেটাই সাত্ত্বিক তপস্যা। এর অর্থ হল, এটাই আমার কাজ, এছাড়া আমার আর কিছু করার নেই, এটাই আমার জীবনধারা, এটাই আমার ধর্ম। একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে। অনেক দিন রামকৃষ্ণ মিশনে আছি, অনেক বড় বড় সাধুদের দেখেছি। আমাদের মঠের সন্ন্যাসী ছিলেন, শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ। আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগেকার কথা। মহারাজ তখন বেলুড় মঠেই থাকতেন। আমি ওনার কাছে যেতাম, বসতাম, ওনাকে খুব ভাল লাগত। সেই সময় তিনি বেলুড় মঠে এ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। পুরো মঠ মিশনের প্রশাসনের কাজকর্ম দেখতে হত, কত দায়ীত্বপূর্ণ কাজ তিনি তখন চালাতেন। অফিস থেকে ফিরে ঘরে এসেছেন, হাতে জপের মালা, তিনি জপ করছেন। আমি ঘরে ঢুকলাম, দেখছি ঘর অন্ধকার, আমি চমকে উঠেছি, দেখছি তিনি জপ করছেন। 'হ্যাঁ বলো, কি বলবে'? তিনি আমাকে চিনতেন, স্নেহ করতেন। 'মহারাজ, প্রণাম করতে এসেছি'। আমি বললাম, 'আপনার জপে বিঘ্ন করলাম'। 'কিসের বিঘ্ন, আমি তো এটাই করি, এটাই আমার কাজ, কোন অসুবিধা নেই, যখন খুশী তুমি আসবে'।

পরে আমি শুনেছিলাম, তিনি একবার রামেশ্বরম্ গিয়েছিলেন। ওখানে একজন সাধুবাবা একটা আশ্রম করেছিলেন, সেখানেই উঠেছেন। ওনার সাথে আরও কয়েকজন সাধু ছিলেন। সাধুদের মধ্যে কেউ বলছেন, আমি আজ এই কাজটা করে দেব, কেউ বলছেন আমি ওটা করব। গীতানন্দজী বলছেন, আমি জপ করে দেব। সারা রাত উনি সেখানে জপ করে গেছেন। এটাই আমার way of life। যতক্ষণ আপনার আধ্যাত্মিক জীবন পার্টটাইম, ততক্ষণ আপনার আধ্যাত্মিক জীবনে এগোবে না, এগোতে পারবেই না। এটাই আমার way of life, মাঝসাজে একটু ডান দিক বাঁ দিক যাই, যেমন খেতে গেলাম, স্নান করতে গেলাম; স্নান করা, খাওয়া এগুলোও তপস্যা। চতুর্থ অধ্যায়ে যেখানে *ব্রহ্মার্পণং* শ্লোকের কথা আলোচনা করা হয়েছিল, সেখানে আমরা দেখেছিলাম কিভাবে খাওয়টাকেও যজ্ঞ করে নেওয়া হয়। খবর কাগজ পড়ছি, কোন অসুবিধা নেই। খবর কাগজ পড়ছি, ঠিক আছে, কোন অসুবিধা নেই, সংসারের খবরও আমাকে রাখতে হবে, এভাবেই আধ্যাত্মিক জীবন ফুলটাইম্ হয়। আমাকে এখন দু ঘন্টা জপ করতে হবে, কি তিন ঘন্টা জপ করতে হবে, না, এটাই আমার জীবনধারা। এটাকেই বলে ফলত্যাগ। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে যখন বলছিলেন *কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন*, ভগবান তখন এটাই বলছেন। কাজ কর, এটাই তোমার way of life, এটাই করবে, এটা ছাড়া আর কি করবে!

সাধু যদি জপধ্যান না করেন, তপস্যা যদি না করেন, তাহলে কি করবেন, এটাই তো তাঁর কাজ। ঠিক তেমনি, তপস্যাও যখন হয়, তখন আমি এটাই করি, তপস্যা করা ছাড়া আমি আর কিছু জানি না। বাচ্চাদের একটা গল্প আছে। গ্রামের লোকেরা ভক্তি করে না বলে শিব একবার রেগে গেছেন। রেগেমেগে শিব বলে দিলেন আমি আর শাঁখ বাজাবো না। শিব শাঁখ বাজালে তবে গিয়ে ইন্দ্র বৃষ্টি দেবেন। একজন চাষী মাঠে চাষ করছিল। আর-একজন এসে তাকে বলল, 'আরে বৃষ্টি তো হবে না, তুমি মিছিমিছি চাষ করে যাচ্ছ'। চাষী বলল, 'আমি তো চাষ করাই জানি, এছাড়া আমি আর কিছু জানি না। আমি যদি চাষ করা বন্ধ করে দিই, আমি তো চাষ করাই ভুলে যাব'। শিব চাষীর এই কথা শুনতে পেলেন, শুনে তিনিও চিন্তায় পড়ে গেলেন, আমি যদি বারো বছর শাঁখ না বাজাই, আমিও তো শাঁখ বাজানো ভুলে যাব। শিব সঙ্গে সঙ্গে ভোঁ ভোঁ করে শাঁখ বাজাতে শুরু করে দিলেন। বলা কওয়া নেই হঠাৎ করে বৃষ্টি নেমে গেল। এগুলো কাহিনী, এগুলোকে নিয়ে বেশি টানা হিঁচড়ে করার দরকার নেই।

অর্থটা হল, যে যেটা জানে সে সেটাই করবে। এই কাহিনীর যে চাষী, সে জানে চাষ করে আমি ফসল পাব না, তাও সে করে যাচ্ছে। একজন নামকরা ক্রিকেটার, ভারতের হয়ে খেলে তিনি খুব সফল হয়েছেন। তিনি এক জায়গায় বলছিলেন, জিরোতে আউট হলে যেমন, সেঞ্চুরি করলেও তেমন, ওয়ার্ল্ড কাপ পেলেও তেমন। নির্বিকার, খেলে যাওয়াটাই আমার কাজ। আপনি সম্মান দিলেন, খুব ভাল; আপনি সম্মান দিলেন না, খুব ভাল, আমার এটাই কাজ। I am the best worker, I will put my best, এরপর কে আপনাকে সম্মান দিল, কে সম্মান দিল না, তাতে কি আসে যায়। একজন ক্রিকেটার যদি এই রকম করতে পারেন, আপনিও কেন পারবেন না!

অনেক বৈজ্ঞানিকদের আমি জানি, তাঁরা নোবেল প্রাইজের জন্য নির্বাচিত হওয়ার পরেও তাঁরা নোবেল কমিটিকে জানিয়ে দিতেন, আমার লাগবে না। পদার্থ বৈজ্ঞানিক রিচার্ড ফাইনম্যানকে যখন নোবেল প্রাইজ দেওয়া ঠিক হল, তখনি উনি ফোন করে বলে দিলেন, না, আমার নোবেল প্রাইজ লাগবে না। কেন নেবেন না? কারণ publicity হলে আমার কাজে অনেক ব্যাঘাত হবে; শান্তিতে ফিজিক্সের কাজ করতে পারব না। তখন তাঁকে বলা হল, আপনি যদি নোবেল প্রাইজ না নেন, তাতে আরও বেশি publicity হবে। যখন দেখলেন নোবেল প্রাইজ নিলে কম publicity হবে, তখন তিনি নিয়ে নিলেন। আমি যখন লেখালেখি করি, তখন আমি আমার জন্য লিখি, আমার ভাল লাগছে বলে লিখছি। মাঝখান থেকে কিছু লোকের যদি বইটা ভাল লেগে যায়, তাতে আমার কি আর হবে! এটাকেই বলে অফলাকাঙ্ক্ষী, লোকেরা এটা বুঝতে পারে না।

স্বামীজী যে unselfishnessএর কথা বলছেন, গীতা যে অনাসক্তের কথা বলছেন, এই অনাসক্ত কোথায়? কাজে অনাসক্ত না, ফলে অনাসক। কাজে পুরো আসক্ত। কাজ আপনাকে এমন ভাবে করতে হবে, যাতে সবাই বুঝতে পারে, আপনি ছাড়া এই কাজ আর কেউ করতে পারবে না। কিন্তু কাজের ফলে পুরো অনাসক্ত। আমাদের এখানে উল্টোটা হয়ে যায়। আচার্য এক জায়গায় বলেছিলেন, *অহং কর্তা ঈশ্বরার্থায় ভৃত্যবৎ করোমি*, এই কর্মের আমি কর্তা কিন্তু করছি ঈশ্বরের ভৃত্য রূপে। আমরা এর যত খুশী ব্যাখ্যা করি যাই না কেন, যতক্ষণ না এই বোধ ভিতর থেকে আসছে, ততক্ষণ যতই লেকচার শুনতে থাকুন, কিছুই হবে না। অনেক দিন ধরে নিয়মিত ভাবে জপধ্যান করছেন, তপস্যা করছেন, তারপর গিয়ে এগুলো একটু ধারণা করতে পারবেন। ধারণা না হলে কিছু হবে না। গীতা শাস্ত্র, হিন্দুরা হাজার হাজার বছর ধরে গীতা মুখস্ত করে যাচ্ছেন। শঙ্করাচার্যের মত the best mind, গীতার উপর ভাষ্য লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে, এমনি এমনি দিয়ে দেওয়া হয়নি, নোবেল কমিটির সদস্যরা কেউ মুর্খ ছিলেন। কিছু তো বুঝেছেন বলেই ওনারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নোবেল প্রাইজের জন্য নির্বাচিত করলেন। যে জিনিসটাকে হিন্দুরা হাজার হাজার বছর ধরে মুখস্ত করে আসছে, কিছু তো এর মধ্যে আছে। সেটাকে

আপনি চাইছেন পাঁচ মিনিটে আয়ত্ত করে নেবেন, তাতো কোন ভাবেই সম্ভব নয়। বলছেন, *অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে,* তপস্যা করাটাই আমার জীবন; তপস্যা করলে আমার কি হবে কি হবে না, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। কারণ তপস্যা আমার জীবনের উদ্দেশ্য না, এটাই আমার জীবন।

এ্যলবার্ট স্প্যাল্ডিং আমেরিকার খুব নামকরা এবং উঁচু দরের একজন বেহালা বাদক ছিলেন। আমেরিকাতে থাকাকালীন স্বামীজী ওনার বাড়িতে ছিলেন। Rise to follow নামে ওনার খুব সুন্দর আত্মজীবনী আছে। এখন আর বইটা পাওয়া যায় না। হঠাৎ আমি বইটা পেয়ে গিয়েছিলাম, প্রথমে বুঝতে পারিনি কে এই ভদ্রলোক। পরে পড়তে গিয়ে দেখছি এতে স্বামীজীর কথাও আছে। এ্যলবার্ট স্প্যাল্ডিংকে বলা হয় আমেরিকার বিংশ শতাব্দীর greatest instrumentalist। উনি একবার ইউরোপের ট্যুরে গেছেন, সেখানে একটা প্রোগ্রাম করেছেন। পরের দিন সেখানকার খবরের কাগজে তাঁর বাজনার খুব নিন্দা করা হয়েছে। ওটা দেখার পর উনি বললেন, 'আমি আর বেহালা বাজাব না'। ওখানকার একজন নামকরা মিউজিশিয়ানের কাছে গিয়ে খুব দুঃখ করে বলছেন, 'আজকের রিভিউ পড়ে ঠিক করেছি আমি আর বাজাব না'। সেই মিউজিশিয়ান শুনে হেসে বলছেন, But I thought you are a musician। এত সুন্দর কথা যে চিন্তাই করা যায় না।

অর্থ হল, তুমি যদি সঙ্গীতে সমর্পিত হও, তাহলে কে তোমার নিন্দা করল, কে তোমার প্রশংসা করল, তাতে তোমার কি আসে যায়। তুমি একজন মিউজিশিয়ান, মিউজিক পারফরম্ করাটাই তোমার কাজ। সেদিন থেকে এ্যলবার্ট স্প্যাল্ডিং খবরকাগজে ওনার প্রোগ্রামের উপর রিভিউ পড়া বন্ধ করে দিলেন। পরে একবার ওনার এজেন্ট একটা খবরকাগজ এনে দেখালেন, 'এই দেখুন আপনার প্রোগ্রামের প্রশংসা করে কি সুন্দর রিভিউ বেরিয়েছে'। উনি এজেন্টকে বলে দিলেন, 'আমি কোন রিভিউ পড়ব না'। এজেন্ট বলছেন, 'এটা প্রশংসা, এতে নিন্দার কিছু নেই'। 'তাও আমি পড়ব না'। উনি কোন দিন নিজের পারফরমেন্স নিয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করতেন না। আমি আপনি পুরোটা কোন দিন এই রকম হতে পারব না। আমি কিছু লিখলে বন্ধুদের তিন চারবার করে ঘুরে ঘুরে জিজ্ঞেস করি, লেখাটা কেমন হয়েছে। ঠাকুরও মজা করে বলতেন, আমাকে তোমার কেমন লাগে? ঠাকুর অবশ্য নিজের খুব কাছের লোককে জিজ্ঞেস করতেন, সে আধ্যাত্মিক স্তরে কতটা এগিয়েছে দেখার জন্য। এটা হল ফলের প্রতি অনাসক্তি। যে কোন তপস্যা অনাসক্ত হয়ে করে যাচ্ছেন, এটা হল সাত্ত্বিক তপস্যা। সাত্ত্বিক তপস্যা কিভাবে হয়? যেখানে কোন selfishness থাকে না, লোকে আমাকে জানবে, মানবে, এই ভাব থাকে না। এটাকেই পরের দুটি শ্লোকে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন, অন্য রকম তপস্যা কি রকম হয়।

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদীহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্।।১৮।।

(সৎকার, সম্মান ও পূজা পাওয়ার আশায় দম্ভের সাথে যে তপস্যা করা হয়, ইহলোকে কদাচিৎ ফলপ্রদ সুতরাং অনিশ্চিত, সেই তপস্যাকে রাজসিক তপস্যা বলে।)

অনেকে তপস্যা করে যাতে লোকেদের কাছ থেকে সম্মান, সৎকার পাওয়া যায়, পূজা পাওয়া যায়। আচার্য শঙ্কর সৎকারের খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন, *অয়ং তপস্বী ব্রাহ্মণ ইতি এবম্ অর্থ,* ইনি বিরাট শ্রেষ্ঠ পুরুষ, একদিকে ব্রাহ্মণ আবার বিরাট তপস্বী, এই প্রকার প্রশংসা শোনার জন্য যে ছটফট করে, এটা হল সৎকার। *মান* হল, ওনাকে দেখে লোকেরা দাঁড়িয়ে গেল, প্রণাম করল, পদযুগল প্রক্ষালন করে দিল, অর্থাৎ সম্মান দিচ্ছে, আর তার সাথে ভাল ভাল খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করল। সাধু সন্ন্যাসীদের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে, সঙ্গে কিছু গিফট্ নিয়ে গেল। এটাও আবার বলা হয় যে, সাধু সন্ন্যাসীদের যদি সম্মান না দেন, প্রণাম যদি না করেন, তিনি রেগে যান। আমরা মনে

করতে পারি যে, এই ধরণের মনোভাব যাঁর, তিনি কিসের সন্ন্যাসী। তা নয়, মহাভারতে দুর্বাস মুনি ছিলেন, তাঁকে সম্মান দিতে গিয়ে একটু যদি পান থেকে চুন খসে যেত, উনি রেগে আপনাকে ভস্ম করে দিতেন।

মহাভারত এবং বাল্মীকি রামায়ণে আমরা বিশ্বামিত্র মুনিকে পাই, যিনি পুরো তপস্যাটাই করেছেন সম্মান পাওয়ার জন্য। ক্ষত্রিয় বংশে ওনার জন্ম, তপস্যা করে উনি ব্রাহ্মণ হবেন। আর স্বয়ং বশিষ্ঠ ঋষি যেন তাঁকে সম্মান করেন। রজোগুণে পূর্ণ, ফলে হিংসা এসে যাচ্ছে। আর এই হিংসার প্রভাবে তিনি বশিষ্ঠের সন্তানকে মেরে ফেললেন। একটা পর একটা এই রকম করতে করতে একটা সময় মেনকার পাল্লায় পড়ে গেলেন। এরপর সমস্ত কিছু ছেড়ে পুরো যখন সাত্ত্বিক হয়ে গেলেন, তখন তিনি হয়ে গেলেন ব্রহ্মর্ষি। বিশ্বামিত্রের জীবনের পুরোটাই এত সুন্দর কাহিনী যে, তামসিক তপস্যা, রাজসিক তপস্যা, সাত্ত্বিক তপস্যা আর তপস্যায় প্রতিষ্ঠিত কিভাবে হয়, বিশ্বামিত্র থেকে এত বেশি ভাল দৃষ্টান্ত আমাদের পরম্পরাতে নেই।

চেন্নাই মঠ থেকে ইংরাজীতে বেদান্ত কেশরী প্রকাশিত হয়, তাতে কয়েকজন ঋষির উপর বাচ্চাদের জন্য ধারাবাহিক ভাবে কয়েকটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সেখানে বিশ্বামিত্রের উপরেও লিখেছিলাম, যার নামই দিয়েছিলাম, The Maverick Sage, যিনি কোন বিধি বিধান মানেন না, নিজের মত রাস্থা বার করে বীরদর্পে চলে গেলেন। যার জন্য অন্যান্য ঋষিদের নিয়ে, যেমন বশিষ্ঠ, ওনার তেমন কাহিনী নেই, কাহিনী করা যায় না, ভাল মানুষ, ভাল মানুষকে দিয়ে তো উপন্যাস রচিত হয় না। যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে উপন্যাস লেখা যায় না, শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে লেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের কত রকমের দিক। অর্জুনকে নিয়ে উপন্যাস লেখা যায়। দ্রৌপদীকে নিয়ে কত কি প্রসঙ্গ এনে এখনও লোকেরা লিখে যাচ্ছেন। বিশ্বামিত্র তামসিক থেকে রাজসিক, রাজসিক থেকে সাত্ত্বিক, একেবারে শুদ্ধ তপস্যায় গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। এই হল তপস্যায় মানুষ কিভাবে উপরের দিকে ওঠেন, তার দৃষ্টান্ত।

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্।।১৯।।

(দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্তীয় হয়ে দেহেন্দ্রিয়াদিকে কষ্ট দিয়ে বা অপরের বিনাশের জন্য যে তপস্যা করা হয়, তাকে তামসিক তপস্যা বলে।)

উৎসাদানার্থং শব্দের অর্থ কষ্ট দেওয়া, বিনাশ করা, *পরস্য* মানে অপরকে; অপরকে কষ্ট দেওয়া, অপরের বিনশা করা। *মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ*, দূরাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে নিজের শরীরকে কষ্ট দিয়ে বা অপরের ক্ষতি করার জন্য যে তপস্যা করা হয়, সেটাই তামসিক তপস্যা। তান্ত্রিকদের কাছে গেলেই বলবে, বলুন কার ক্ষতি সাধন করতে হবে, আমার কাছে মারণ, উচাটন, বশীকরণ সবটাই আছে। এগুলো করে কারুর ক্ষতি করা যায় কিনা আমার জানা নেই, হয়ত করা যায়। হিন্দু পরম্পরায় এই রকম কোন মুনি বা ঋষি ছিলেন কিনা ঠিক জানা নেই। একটু আগেই আমরা বিশ্বামিত্রের কথা বললাম, যিনি একটা রাক্ষস সৃষ্টি করলেন এবং যার মধ্যে তিনি বশিষ্ঠের সন্তানকে বধ করার শক্তি দিয়ে দিলেন।

বৌদ্ধ পরম্পরায় মিলারেপার খুব নামকরা কাহিনী আছে। কিন্তু বৌদ্ধদের কাহিনীকে আমি খুব একটা বিশ্বাস করি না, কারণ ওনারা এইসব কাহিনীর মধ্যে দেখাতে চান, যাঁরা নামকরা বৌদ্ধ ভিক্ষুক, তাঁরা আগের জীবনে কত জঘন্য লোক ছিলেন, কিন্তু কিভাবে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করার পর বিরাট কিছু হয়ে গেলেন।

যাই হোক, মিলারেপার মাকে সেখানকার জমিদার এক সময় খুব কষ্ট দিয়েছিল। তারপর থেকে মিলারেপার মা ছেলেকে উত্তেজিত করতে লাগলেন, তোমাকে এর কিছু একটা করত হবে, এর বদলা তোমাকে নিতেই হবে। মায়ের কথাতে মিলারেপা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে বেশ কয়েক বছর তন্ত্র সাধনা করে বিরাট তপস্যা করল। তপস্যা করার পর মিলারেপা বিরাট ক্ষমতা নিয়ে আবার গ্রামে ফিরে এসেছে। সেই সময় ওই জমিদারের বাড়িতে বিয়ে উপলক্ষে বিরাট উৎসব চলছিল। সেখানে জমিদারের কয়েক শত অতিথি এসেছে। মিলারেপা ওই জমিদারের উপর তন্ত্রের মন্ত্রোচ্চারণ করে শক্তি চালিয়ে দিয়েছে। বিয়েতে যে প্যাণ্ডেল তৈরী করা হয়েছিল, ওই শক্তি চালিয়ে দেওয়াতে প্যাণ্ডেলে আগুন লেগে প্রচুর লোক মারা গেল। এই ঘটনার পর গ্রামের লোকেদের মধ্যে আতঙ্ক হয়ে গেল, মিলারেপাকে দেখলেই রাস্থা ছেড়ে অন্য দিকে চলে যায়, মিলারেপার মার সামনে ভয়ে কেউ যেতে চায় না, গ্রামের লোকেরা দুজনের সাথে কথাবার্তা করা দূরে থাকুক, এদের সামনেই কেউ যায় না।

এই ঘটনার পর মিলারেপার মনে খুব অনুশোচনা হয়, ছিঃ আমি একি করলাম, এতগুলো লোক তন্ত্রের শক্তিতে আমার জন্য মারা গেল। তিনি সব কিছু ছেড়েছুড়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হয়ে গ্রাম থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন তপস্যা করতে। পরে তিনি খুব উচ্চমানের সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। মিলারেপার আগের তপস্যা করা হয়েছিল অপরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য। আপনারা আমার এই কথা নাও মানতে পারেন, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনি যদি দেখেন কেউ আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে, তাহলে জানবেন, আগে আপনি কোনও পাপকর্ম করেছিলেন, তারই ফল এখন পাচ্ছেন। এখন যদি আপনি এর বদলা নিতে নেমে পড়েন, তাহলে আপনি নূতন করে আর-একটা কর্মের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছেন। যে কষ্ট আসছে সেটাকে মেনে নিতে হয়। আমি এই কথা ধর্ম তত্ত্বের দিক থেকে বললাম, আপনারা এটা মানতে পারেন, নাও মানতে পারেন। অল্প বয়সে সবারই রক্তের খুব জোর থাকে, কোথাও কোন অন্যায় দেখলে, কারুর প্রতি অবিচার করা হচ্ছে দেখলে খুব রাগ হবে। আমারও হত, আমারও তখন ইচ্ছে হত দুটো কথা শুনিয়ে দিই। অনেক সময় শুনিয়েও দিতাম কিন্তু এখন আর না, ওগুলো থেকে পেরিয়ে এসেছি। কেউ যখন কষ্ট দেয় তখন এটাই আমি মন করি, ভালই তো হল, কোন অশুভ কর্ম কাটল।

আমাদের কাছে কোন ভক্ত যদি তাঁর নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা বলতে আসে, আমরা বলি, ‘আপনি আমার দুঃখ-কষ্টের কথা শুনবেন’? শুনে ঘাবড়ে গিয়ে বলেন, ‘আপনি সন্ন্যাসী, আপনার আবার কিসের কষ্ট’! আরে ভাই, সন্ন্যাসীদেরই তো বেশি দুঃখ-কষ্ট হবে। কারণ একজন সন্ন্যাসী মুক্তির পথে একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছে। যার জন্য জন্মজন্মান্তর থেকে জমে থাকা সব কর্ম তাঁকে এবার মোক্ষম একটা ধাক্কা মারবে।

দেববাণীতে প্রথমের দিকে স্বামীজী ঠিক এই কথাই বলছেন, যে যত সৎ হয় তার জীবনের তত বেশি ওঠা নামা হয়। যখন আপনি জীবনে প্রচুর আঘাত পান, তখন বুঝবেন, ভগবান আপনাকে সৎ তৈরী করতে চেষ্টা করছেন। ভগবানের কাজে সাহায্য করতে চাওয়ার নাম করে আপনি যদি মনে করেন, লোকটাকে আমি একটা শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি, বুঝবেন আপনার এখনও অনেক সময় লাগবে। একটা হয় হিংসা, কাউকে হিংসা করা; আর প্রতিহিংসা, কেউ আমাকে কষ্ট দিয়েছে আমিও তাকে কষ্ট দিয়ে বদলা নিলাম, এটাকেই প্রতিহিংসা বলে। গীতায় বারবার করে হিংসা, প্রতিহিংসা করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন কেউ যদি কটূ কথা বলে, আচার্য শঙ্কর আবার পরিষ্কার বলছেন, কেউ যদি পিটিয়েও দেয়, তাও মনের মধ্যে কোন বিক্ষেপ হতে দিতে নেই।

আমরা বলতে পারি, এটা কখনই সম্ভব না। ঠিকই বলছেন, সম্ভব না, সেইজন্যই তো ঈশ্বরদর্শনও সম্ভব না। যতক্ষণ মন থেকে সমস্ত রকমের ইমোশানস, সমস্ত passions না চলে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরদর্শন তো অনেক দূরের, ইহলোকেও আপনি জীবনে কোন কিছুতে

সাফল্যের মুখ দর্শনও করতে পারবেন না। কিন্তু এর থেকেও বাজে হল প্রতিহিংসার ভাব, যদি আপনার মনে প্রতিহিংসার ভাব আসে, আপনি জানবেন আপনার থেকে বাজে লোক আর কেউ নেই। আপনার প্রতি কেউ হিংসা করছে, কষ্ট দিচ্ছে, আপনার চোখে জল আসছে, আসতেই পারে, কিন্তু মনে প্রতিহিংসা ভাব আনলেন, আপনার পতনকে কেউ আটকাতে পারবে না। এই কথাগুলো তাঁদেরই জন্য যাঁরা সৎ পথে যেতে চাইছেন, যাঁরা ঈশ্বরের পথে যেতে চাইছেন। যারা মারামারি করতে চাইছে, চেঙ্গিস খাঁ হতে চাইছে, হিটলার হতে চাইছে, এই কথাগুলো তাদের জন্য নয়।

অনেকে এসে জিজ্ঞেস করে, চারিদিকে এত যে মারামারি, হানাহানি হচ্ছে, এত যে যুদ্ধ হচ্ছে? এগুলোকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করাটা আপনাদের জন্য নয়, এগুলোর প্রতিকার করা আপনার দায়ীত্ব না, তার জন্য অন্যরা আছে। আপনার এই ছোট্ট জীবন, এই ছোট্ট জীবনে সব রকম দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে যতটা পারা যায় সাধন, ভজন, তপস্যা করে জ্ঞান-ভক্তি অর্জন করে নিতে পারা যায়, তার চেষ্টা করা। আমি যে মহারাজদের দেখেছি, তাঁদের জীবনেও প্রচুর ঘাত-প্রতিঘাত হতে দেখেছি। সাধু-সন্ন্যাসীর জীবন মানেই, হাজার রকমের ঝঞ্ঝাট, এই ঝঞ্ঝাট-ঝামেলার মধ্য দিয়েই তাঁদের এগোতে হয়। সব কিছু সহ্য করতে হয়, তার মানে কোন অবস্থায় বা পরিস্থিতিতে মনে কোন বিক্ষেপ হতে দিতে নেই। এরপর ভগবান দানের কথা বলছেন।

দান ধর্মে সবারই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিৎ। আপনার আয়ের কম করেও চার-পাঁচ শতাংশ ভাগ নিয়ম করে দানের জন্য রেখে দিতে হয়, কারণ এখন আপনি ধর্ম পথে এসে গেছেন। সাধারণ মানুষদেরও এই দানধর্ম পালন করা উচিৎ আর যাঁরা গীতার ব্যাখ্যা শুনে যাচ্ছেন, আপনাদের তো অবশ্যই করা উচিৎ। এখানে বলে দিচ্ছেন কাকে দান করতে হবে, কিভাবে দান করতে হবে।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।।২০।।

('দান করা কর্তব্য' এই ভাবে প্রত্যুপকারের আশা না করে পূণ্য স্থানে, শুভ সময় ও উপযুক্ত পাত্রে যে দান করা হয় সেই দানকে সাত্ত্বিক দান বলে।)

দানও তিন প্রকার, সাত্ত্বিক দান, রাজসিক দান ও তামসিক দান। প্রথমে সাত্ত্বিক দানের কথা বলছেন। দান যখন করা হবে, পাঁচ শতাংশ, দশ শতাংশ, কুড়ি শতাংশ, যে দানই করা হোক না কেন, দানটা যেন সাত্ত্বিক দান হয়। সাত্ত্বিক দান কি? *দাতব্যমিতি*, আমাকে দান করতে হবে, দিতে হবে, এটা আমার কর্তব্য। তপস্যার ক্ষেত্রেও এটাই বললেন, তপস্যাটাই আমার জীবনধারা; তেমনি দান, দান করাটাই আমার জীবনধারা, অন্যকে আমার কিছু না কিছু দান করতে হবে, এটা আমার কর্তব্য। ব্যাঙ্কে বা যেখানে সুবিধা হবে আপনি আলাদা একটা এ্যাকাউন্ট খুলে নিন, সেখানে আলাদা করে যে টাকাটা দান করবেন, সেই টাকাটা রেখে দেবেন, আর মনে করবেন এটা আমার বোঝা। বাড়িতে আবর্জনা বেশি জমলে আমাদের যেমন মাথা ব্যাথা হয়, তেমনি এই টাকাটা জমে আছে এবার এটাকে সরাতে হবে।

দান কাকে করতে হবে? *দীয়তেহনুপকারিণে, অনুপকারিণে* শব্দের অর্থ, যিনি পরে দাতাকে কোন উপকার করতে পারবেন না। গরীব, কাঙালী, এরা কেউ আর আপনার উপকার করতে পারবে না, এদেরকে দান করতে হয়। আর দান গ্রহিতার ক্ষমতা যদি থাকে, যেমন সাধু সন্ন্যাসীকে দিচ্ছেন, ব্রাহ্মণকে দিচ্ছেন, সেখানেও প্রত্যুপকারের বা অন্য কোন কিছু পাওয়ার আশা, ভবিষ্যতে এনার কাছ থেকে আমি অনেক সাহায্য বা সুযোগ-সুবিধা পেতে পারি, দান করার সময় এই আশা যেন না থাকে। আমাদের এখানে দেখতে পাই, ভক্তদের অনেকে দশটা টাকা সাধুকে প্রণামী দিয়ে পরে বলবে, মহারাজ একটু প্রসাদের ব্যবস্থা করে দেবেন? সব কিছুতে আমাদের বেণে বুদ্ধি, দাঁড়িপাল্লাতে যেমন ওজন করা হয়, ঠিক সেই রকম কাউকে একটু দান বা সাহায্য করার আগে ভাববে, এই

লোকটি পরে আমার কি কি উপকারে আসতে পারে। অনেককে ম্যাসেজ করে লিখবে, মহারাজ আপনার কথা শুনতে কি ভালই না লাগে। আমি কি আপনার entertainer? মহারাজ, আপনার লেকচার গুলো আমার কত কাজে লাগছে। সব কিছুতেই বেণে বুদ্ধি, আমার এটা কাজে লাগছে, আমার এটা ভাল লাগছে। গীতা, উপনিষদ, কথামৃতের মত শাস্ত্র শিখছেন, জানছেন, আপনি যদি ঠিক ঠিক শেখেন আপনি মৌন হয়ে যাবেন, স্তম্ভিত হয়ে যাবেন।

দান হল কর্তব্য। বেশির ভাগ সময় এমন লোককে দান করতে হয়, যার সামর্থ নেই যে পরে আপনাকে কোন ভাবে সাহায্য করতে পারে। আর যদি সামর্থ্যও থাকে, সেখানে আপনার যেন প্রত্যুপকার পাওয়ার যেন কোন প্রত্যাশা না থাকে। আবার উল্টোটাও আছে, এমন এমন ভক্তদেরও জানি, যে মহারাজদের সাথে খুব ভাল সম্পর্ক আছে, দরকার পড়লে বা বিপদে পড়লে তাঁদের কাছে যান না, অন্য মহারাজদের কাছে যান। ভাল ভক্ত আছে বলেই না রামকৃষ্ণ মিশন দাঁড়িয়ে আছে। যাঁকে চেনেন, দরকার পড়লে কিছুতেই তাঁর কাছে যাবেন না।

দেশে কালে চ পাত্রে চ, দানের সময় এই তিনটে জিনিসকে সব সময় দেখতে হয় – দেশ, কাল আর পাত্র। দেশ, বলছেন সেটাই সাত্ত্বিক দান হবে, পূণ্যভূমিতে যে দান করা হয়। যে কোন তীর্থে যখন যাচ্ছেন, সেখানে তখন দান করতে হয়। বেশির ভাগ সময় তীর্থ করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা যাই না, হরিদ্বার যাচ্ছি, বেড়াতে যাচ্ছি; উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী যাচ্ছি, ট্রেকিং করতে যাচ্ছি। তা না, তীর্থ করতে যাচ্ছি, এই মনোভাব নিয়ে তীর্থে যেতে হয়; আর তীর্থে গিয়ে দান করতে হয়। মন্দিরে যাচ্ছেন, প্রণামী বাক্সে দান করতে হয়। মন্দিরে পুরোহিতদের দান করতে হয়। কথামৃতে একটা ঘটনার বর্ণনা আছে, ঠাকুরকে বলছেন, পাণ্ডারা টাকা চেয়েছিল, কালকে দেব বলে আগের দিন পালিয়ে এসেছে। শুনে ঠাকুর প্রচণ্ড রেগে গেলেন। আবার একজনকে ঠাকুর বলছেন, সব সুখ বুঝি তোমরাই শুধু ভোগ করবে, সাধুরা বুঝি কোন ভোগ করবে না? লোকেরা ধরে নিয়েছে, সাধু মানে চা খাবে না, সাধু মানে পায়ে হেঁটে যাবে। সাধুর শরীর নাকি গণ্ডারের শরীর, তাঁর শীত অনুভব হয় না, রোদ বৃষ্টিতে তাঁদের কিছু হয় না। শুরুতে বেলুড় মঠকে কেন্দ্র করে যে ঝামেলা হয়েছিল, তাতে বলা হচ্ছিল, বেলুড় মঠ নাকি স্বামী বিবেকানন্দের বাগান বাড়ী, তার সাথে একটা allegation হল, সাধুরা চা খায়, খাটে শোয়।

আচার্য এখানে পূণ্যভূমির কথা বলতে গিয়ে কুরুক্ষেত্রের কথা বলছেন, শঙ্করাচার্যের সময় থেকে এখনও কুরুক্ষেত্র বিরাট পূণ্যভুমি। গীতা শুরুই হয় *ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে* দিয়ে। সূর্যগ্রহণের সময় আকবরও কুরুক্ষেত্রে চলে যেতেন। শুধু কুরুক্ষেত্রই না, যেটাই পূণ্যভূমি, যেখানেই পূণ্যভূমি, আপনি যেটাকেই পূণ্যভূমি মনে করেন, বৈষ্ণবরা যেমন মনে করেন শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতিবিজড়িত যত স্থান আছে সেটাই পূণ্যভূমি, শৈবরা অন্য রকম মনে করেন, শাক্তরা অন্য রকম মনে করেন। আপনি যে কোন জায়গাকে পূণ্যভূমি মনে করতে পারেন, কোন অসুবিধা নেই।

কালে, সময়কে নিয়ে আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *সংক্রান্ত্যাদৌ,* দুটো মাসের যে সংক্রান্তি হয়, এই সংক্রান্তিতে দান করতে হয়। মকর সংক্রান্তিতে দানে সাংঘাতিক ফল হয়। শুধু সংক্রান্তি না, আমাদের অনেক তিথি আছে, যে তিথিগুলিতে দান করা খুব ভাল। আমাদের পরিচিত একজন ভক্ত বলছিলেন, দেখুন বেলুড় মঠের প্রভাবে কি না হয়, কলকাতায় আগে দূর্গাপূজার শেষ দিনে সবাইকে একটু করে খিচুরি খাইয়ে দিত, এখন তো সপ্তমী থেকেই খাওয়াতে শুরু করেছে। কারণ তাদের কাছে পূজোর সময় একটা পবিত্র সময়, এই সময় সবাইকে প্রসাদ খাওয়াতে হবে, খাওয়াচ্ছেও। বলছেন, দান করার জন্য সময় দেখতে হয়। যেমন বাড়িতে যখন বাবা, মা, ঠাকুর্দা, ঠাকুরমা এনাদের যে পিতৃকর্মাদি হয় তখন দান করেন। পিতৃকর্ম যখন হয়, যেমন শ্রাদ্ধাদি যখন হয় তখন দান করতে হয়। তেমনি বিবাহ, উপনয়ন বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে দান করতে হয়, এগুলোই কাল, যখন তখন, যেখানে সেখানে দান করতে নেই।

দেশ ও কাল বলার পর এবার বলছেন, *পাত্রে চ*, যাকে তাকে দান করা যায় না। তাহলে কাকে দান করা যায়? আচার্য শঙ্কর পরিষ্কার বলছেন, *ষড়ঙ্গবিদ্বেদপারগে ইত্যাদৌ*, যাঁরা পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, তাঁদেরকে দান করতে হয়। জ্ঞানী পুরুষ দেখলে তাঁকে দান করতে হয়। ঠাকুর বলছেন, সাধু-দর্শনে খালি হাতে যেতে নেই। বলছেন কিছু না পার আমলকি নিয়ে যাবে। আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন, খুব ভাল মহারাজ ছিলেন। একটা সেন্টারে আমি ওনার খুব কাছে ছিলাম। অনেকে ওনার কাছে সাহায্যা পাওয়ার জন্য আসত। উনি পরিষ্কার সবাইকে বলে দিতেন, ঠাকুর বলে দিয়েছেন, সাধুর কাছে যাওয়ার সময় কিছু না পার অন্তত দুটো আমলকি নিয়ে আসবে। মহারাজ প্রয়োজনে হাজার হাজার টাকা সাহায্য করবেন, কিন্তু ওনার কাছে যাওয়ার সময় দুটো আমলকি অবশ্যই নিয়ে আসতে হবে, আগে থেকেই উনি বলে রাখতেন। যদি না নিয়ে আসেন, তাতে উনি যে আপনার কাজ করে দেবেন না তা না, উনি করবেন, কিন্তু খালি হাতে গেলে কোন মতেই না। যাঁরা জ্ঞানী পুরুষ, ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত যাঁরা, এনারা হলে সৎপাত্র। সৎপাত্র, সৎকাল আর সৎ দেশ, এই তিনটে জিনিসকে মাথায় রেখে দান করতে হয়।

যৎ তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্।।২১।।

(যে দান প্রত্যুপকারের আশায় ও কোন পারলৌকিক ফললাভের উদ্দেশ্যে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও করা হয়, তাকে রাজসিক দান বলে।)

সাত্ত্বিক দানের পর রাজসিক দানের কথা বলছেন। রজোগুণে দান কিভাবে হয়? বলছেন, *প্রত্যুপকার*, দান করলে পরে আমি এই দানের ফল এই লোকে বা পরলোকে পাবো। বাচ্চা বয়সে আমরা এটাই শুনে এসেছিলাম যে, দান করলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। সেইজন্য গ্রামে গঞ্জে আমরা লোকেদের বলতে শুনতাম, দান কর, দান করলে পূণ্য হবে, স্বর্গে যাবে। গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্র পড়ার পর জানলাম জিনিসটা অন্য রকম। বলছেন, এই মনোভাব নিয়ে যে দান করা হয়, তাতে মনে ক্লেশ হয়, কষ্ট হয়। কি রকম ক্লেশ? ইস্ এত টাকা দানে চলে গেল। কারণ এই দানের সাথে আপনার আশা প্রত্যাশা লেগে আছে। আমরা অনেক সেন্টারে দেখেছি, বিজয়া দশমীর দিন ভক্তরা সাধুদের প্রণাম করে প্রণামী দেন। সেখানে এটাই স্বাভাবিক যে, যিনি সিনিয়র মহারাজ তাঁকে বেশি দেবেন, জুনিয়র মহারাজদের কম দেবেন। অনেক সময় ভক্তদের মাথায় থাকে, ইনি বড় মহারাজ, এনাকে বেশি দিতে হবে, পরে কাজে লাগবে।

নরেন্দ্রপুরের একটা ঘটনা আগে বলা হয়েছিল। একজন অভিভাবক ছেলেকে নিয়ে নরেন্দ্রপুর ক্যাম্পাসে আসছেন, দূর থেকে দেখছেন এক মহারাজের আসছেন। ছেলেকে জিজ্ঞেস করছেন, 'হ্যাঁ রে, ওই যে মহারাজ আসছেন, ইনি কি তোর কাজে লাগবে'? ছেলে বলল, 'না'। মহারাজকে পাশ কাটিয়ে দুজন চলে গেল। এরপর আর-একজন মহারাজকে আসতে দেখলেন। 'ইনি কাজে লাগবে'? 'উনি তো আমাদের ক্লাশ টিচার'। কাছে আসতেই উনি সঙ্গে সঙ্গে মহারাজকে প্রণাম করে বলতে শুরু করলেন, 'মহারাজ, আমার ছেলে বাড়িতে শুধু আপনারই কথা বলে'। ছেলে কি রকম তৈরী হবে ভগবানই জানেন।

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্।।২২।।

(অশুচি স্থানে, অশুভ সময়ে ও অযোগ্য পাত্রে অবজ্ঞাপূর্বক ও প্রিয়বচনাদি সৎকার-রহিত যে দান করা হয় তাকে তামসিক দান বলে।)

তামসিক দানের কথা বলছেন। যে দান অশুচি দেশে ও কালে দেওয়া হয়; আচার্য শঙ্কর পরিষ্কার বলছেন, *ম্লেচ্ছাশুচ্যাদিসঙ্কীর্ণে অকালে*, ম্লেচ্ছ দেশ মানে, অপবিত্র লোকেরা যেখানে থাকে, সেই জায়গাটা পাপময় দেশ, পাপীদের দান করতে নেই। এটা মনে রাখতে হবে স্বামীজী যে সেবার কথা বলছেন, দান করাটা সেই সেবার মধ্যে পড়ে না, এখানে দানের কথা বলা হচ্ছে। আসলে সেবা ভাব নিয়ে করা, এটাও ছিল তবে যজ্ঞ রূপে ছিল। যেমন *ইষ্টাপূর্ত*, ইষ্ট আর পূর্ত খুব নামকরা যজ্ঞ। তখনকার দিনে বিভিন্ন সময়ে দান করা হত, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, উপনয়ন ইত্যাদি অনুষ্ঠানে দান করা হত, সচরাচর এগুলোকে ইষ্ট বলা হয়। পূর্ত হল জনসাধারণের জন্য পুকুর খনন করে দেওয়া হল, বৃক্ষ রোপণ করা ইত্যাদি। ইষ্টা পূর্ত হল সেবা, ওনারা এটাকে সেবা বলতেন না, যজ্ঞ বলতেন, ইষ্টাপূর্তকে যজ্ঞ রূপেই নেওয়া হত।

দানের কথা যে বলা হচ্ছে, সেখানে বলছেন, অদেশকালে অপাত্রে দান করতে নেই। আমাদের সাধু সন্ন্যাসীদের ট্রেনিং দেওয়ার সময়ও বলা হয়, অপাত্রে দান করবে না। পাপীদের দান করা প্রসঙ্গে কথামৃতে ঠাকুর একটা কাহিনী বলছেন, শ্রাদ্ধ বাড়ীতে নিমন্ত্রীত ব্যক্তিদের খাওয়া-দাওয়া চলছিল। সেই সময় এক কষাই একটা গরুকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল। কষাই খুব পরিশ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল, ভাবল এখানে খাওয়া-দাওয়া চলছে, একটু খেয়ে গায়ে বল আনি, তারপর গরুটাকে টানতে টানতে নিয়ে যাব। কষাই খুব করে শ্রাদ্ধবাড়ির ভোজ খেয়ে গরুটাকে নিয়ে গিয়ে জবাই করল। এবার এই গোহত্যার পাপ যে শ্রাদ্ধ করছিল তারও সেই পাপ লাগল।

আবার বলছেন বিশেষ কোন পূণ্য দিন নেই, কোন সংক্রান্তি নেই, সেই সময় দান করছে। আবার দিচ্ছে কাকে? *মূর্খতস্করাদিভ্যো*, মূর্খকে দান দিচ্ছে, চোর ডাকাতকে দান দিচ্ছে। এদের দান দিতে নেই, জানতে হবে আমি কাকে দান দিচ্ছি। বলতে পারেন, তেলা মাথায় তেল দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, অবশ্যই তেলা মাথা তেল দেওয়া হচ্ছে। এই যে তেলা মাথা, যে সাধু সন্ন্যাসীদের কথা বলা হচ্ছে, তাঁদের আবার অনেকগুলো চ্যানেল খোলা থাকে, সেখান থেকে দানটা অনেক জায়গায় যায়। এই দানের ফলে আপনার ভালই হল, পূণ্য হল, কারণ এই দান অনেক শুভ কাজে ব্যয় করা হবে।

আপনি বলতে পারেন, তাহলে কি গরীব দুঃখীদের দান দেব না? গরীব দুঃখীদের অবশ্য দান করবেন। কিন্তু এখানে চোর, ডাকাত, মূর্খদের কথা বলছেন। মূর্খ বলছেন ব্রাহ্মণের অর্থে। একজন জ্ঞানীগুণী ব্রাহ্মণ আর একজন মূর্খ ব্রাহ্মণ, এই দুজনের মধ্যে অবশ্যই জ্ঞানীগুণী ব্রাহ্মণকেই দান দিতে হবে। কারণ তিনি অনেক তপস্যা করেছেন, সাধনা করেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে রাজা জনক বলছেন, ইনি হলেন ব্রহ্মবেত্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেইজন্য তাঁকে হাজারটা গাভী ও স্বর্ণমুদ্রা দান করা হচ্ছে। জ্ঞানীদের সর্বাগ্রে সম্মান দিতে হয়। আমরা আগেও অনেকবার বলেছি, যে সমাজে জ্ঞানীর সম্মান নেই, সেই সমাজ একদিন গুণ্ডাবাহিনীদের হাতে চলে যাবে।

অসৎকৃতমবজ্ঞাতং, যখন কাউকে দান করা হয় তখন গ্রহীতাকে কিভাবে দান করতে হবে? আচার্য বলছেন, *প্রিয়বচনপাদপ্রক্ষালনপূজাদি*, দান যখন করতে হবে তখন মিষ্টি ভাষণ দিয়ে সম্ভাষণ করতে হয়, তাঁর চরণ ধৌত করে পূজাদি করতে হয়। বলছেন, একজন সন্ন্যাসী যদি আপনার বাড়িতে আসেন, তখন এটা একটা যজ্ঞ। এমনিতে সাধু সন্ন্যাসীদের বাড়িতে ডাকতে নেই, যদি কোন ভাবে পৌঁছে যান, তখন ওটাই একটা যজ্ঞ হয়ে যাবে, কারণ পূজা, পাদপ্রক্ষালন আর তার সাথে প্রিয় বচন দিয়ে আপ্যায়ন করতে হবে। যদি এভাবে আপ্যায়ন করতে না পারেন, তাহলে সাধু সন্ন্যাসীদের ডাকবেন না, মঠে এসে প্রণাম করে যান। সন্ন্যাসী কারুর বন্ধু হতে পারেন না, সন্ন্যাসী একজন সন্ন্যাসী।

অবজ্ঞাতং, অবজ্ঞা করে, অপমান করে দান করতে নেই, এগুলোই তামসিক দান। একটা ঘটনা বলেছিলাম, একজন বড় ব্যবসায়ী মঠে ডোনেশান নেওয়ার জন্য কোন মহারাজকে আসতে

বলেছে। একজন সন্ন্যাসী গেছেন, গিয়ে দেখছেন ভদ্রলোক মদ খেয়ে টং হয়ে আছে। এ্যটাচিতে ব্ল্যাকমানি রাখা আছে, সন্ন্যাসীকে এ্যটাচি দেখিয়ে বলছে, এ্যটাচিতে টাকা রাখা আছে, নিয়ে চলে যান। মহারাজ শুধু একটা কথা বললেন, we are not beggars but royal beggars, বলে বেরিয়ে চলে এলেন। তুমি দান করছ, তোমার মধ্যে এতটুকু সম্মান দেওয়ার ক্ষমতা নেই, আমি তোমার দান নেব না।

কিন্তু অনেক সময় আমাদের জানা থাকে না, কাকে দান করছি, কোথায় দান করছি ইত্যাদি। যজ্ঞ, তপস্যা ও দান সবই হয়ত আমরা ঠিক ঠিক ভাবে করছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও মনের মধ্যে একটা খুঁতখুঁতানি থাকে। যেটা করছি সেটা ভালো হচ্ছে কিনা কে জানে, বা যেটা করছি সেটা আরও ভালো করতে চাইছি, তখন আমাদের কি করতে হবে? ভগবান পর পর কয়েকটা শ্লোকে খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন, কিভাবে আমাদের যজ্ঞ, তপস্যা ও দান করতে হবে।

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ বিহিতাঃ পুরা।।২৩।।

('ওঁ তৎ সৎ' এই বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের ত্রিবিধ নাম শ্রুতি-নির্দিষ্ট হয়েছে। এই ত্রিবিধ নির্দেশদ্বারা পুরাকালে যজ্ঞের কর্তা ব্রাহ্মণ, যজ্ঞের কারণ বেদ ও যজ্ঞরূপ ক্রিয়া নির্মিত হয়েছে।)

ব্রহ্ম, যিনি সর্বব্যাপী, তাঁর তিনটি নাম – ওঁ, তৎ ও সৎ। ওঁ হচ্ছে ব্রহ্মের বাচক, ওঁ এর ব্যাপারে এর আগেও অনেক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তৎ শব্দে ব্রহ্মকে যেন আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ করা হচ্ছে। এগুলো বেদান্তের খুব গভীর তত্ত্ব। সৎ, সৎ মানে অস্তিত্ব, আমি আছি। তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। সৎ যিনি তিনিই চিৎ, যিনি চিৎ তিনিই আনন্দ, তিনিই সচ্চিদানন্দ। ওঁ তৎ সৎ, এটা হচ্ছে সেই যে ব্রহ্ম, তাঁর নির্দেশ, ওঁ তৎ সৎ হচ্ছে ভগবানরই নাম।

ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ –ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ, এই তিনটে জিনিসের উৎপত্তি সেই ব্রহ্ম থেকেই। এখন এই তিনটে জিনিস, ব্রাহ্মণ, বেদ আর যজ্ঞের স্তুতি করার জন্য আমাদের মুনি ঋষিরা এই তিনটে জিনিস 'ওঁ তৎ সৎ' আবিষ্কার করলেন। এরমধ্যে প্রথমে ওঁ সম্বন্ধে বলছেন –

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনম্।।২৪।।

(এইজন্য 'ওঁ' এই ব্রহ্মবাচক প্রথম শব্দ উচ্চারণ করে বেদবাদিগণ শাস্ত্রবিধান-অনুযায়ী যজ্ঞ-দান-তপস্যাদি কর্ম অনুষ্ঠান করেন।)

ঋষিরা, যাঁরা ব্রহ্মবেত্তা, তাঁরা এগুলো সবটাই জানেন। তাই যখন তাঁরা যজ্ঞ করেন, দান করেন, তপস্যা করেন, বা এই ধরণের যা কিছু করেন, পূজাক্রিয়াদি যা কিছু করেন, তখন তাঁরা সব কিছুতে 'ওঁ' বলে শুরু করেন। ইদানিং কালে হিন্দিতে শ্রীগণেশ দিয়ে সব কাজ শুরু করা হয়। কিন্তু আমাদের পরম্পরাতে যে কোন কাজ যখন শুরু করা হয়, তখন ওঁ দিয়ে শুরু করেন। ওঁ বলার মধ্যে একটা অনুমোদন রয়েছে। যেমন জিজ্ঞেস করা হল, 'মহারাজ যাবো?' মহারাজ 'হ্যাঁ যাও' না বলে 'ওঁ' বলে দিলেন, তার মানে তুমি যাও। কিন্তু যে কোন কাজ যখন শুরু করা হয় তখন *তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য*, ওঁ দিয়ে শুরু করা হয়। আমরা যখন খাওয়া শুরু করি, তখন খাওয়টা একটা যজ্ঞ, সেইজন্য *ওঁ ব্রহ্মার্পণং* বলে শুরু করা হয়। ওঁ বলে দেওয়া মান কাজটা শুদ্ধ হয়ে গেল, খাওয়াটা শুদ্ধ হয়ে গেল। যে কোন কিছু শুরু করতে যাচ্ছি, সব কিছুতে ওঁ দিয়ে শুরু করতে হয়। ওঁ সব কিছুকে শুদ্ধ করে দেয়।

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।।২৫।।

('তৎ' এই ব্রহ্মবাচক দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারণপূর্বক মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ফলাকাঙ্ক্ষা না করে নানা প্রকার যজ্ঞতপোদানাদি কর্মের অনুষ্ঠান করেন।)

যাঁরা মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞ করেন, তপস্যা করেন, দান করেন; কি দান করেন, জমি, সোনা, গাভী; এই ধরণের ক্রিয়া করার সময় তাঁরা 'তৎ' এই ব্রহ্মবাচক দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারণ করে ক্রিয়া সম্পাদন করেন। আমরা একসাথে বলি 'হরি ওঁ তৎসৎ'। 'তৎ' হল সর্বনাম, তার মানে যাবতীয় যা কিছু আছে এটাকে তৎ শব্দ দিয়ে নির্দেশ করা হয়। আসলে 'ওঁ' যা, 'তৎ'ও তাই। বলছেন, যাঁরা মুক্তির পথে আছেন, তাঁরা যখন কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না করে তপস্যা করেন, দান করেন বা যজ্ঞ করেন, তাঁরা 'তৎ' বলেন।

যখনই কোন কাজের ব্যাপারে সন্দেহ আসবে, যেমন আমার জন্য এক গ্লাশ জল আনা হল, এখন আমি জানি না এই জল কতটা শুদ্ধ আর কতটা অশুদ্ধ, এই অবস্থায় মনটা খুঁতখুঁত করতে থাকবে। কিন্তু আমি গ্লাশটা হাতে নিয়ে বলে দিলাম '*ওঁ তৎসৎ*', তাহলেই সব কিছু শুদ্ধ হয়ে গেল। ভীড় বাসে বা ট্রেনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছি, যেতে যেতে আমার সামনের সীটের লোকটা নেমে গেল। এখন ঐ খালি সীটে আমি বসতে যাচ্ছি, এই সীটে এতক্ষণ যে লোকটা বসেছিল লোকটি কেমন প্রকৃতির জানি না, কি ধরণের তন্মাত্রা ওই সীটে ছেড়ে গেছে, জানা নেই, মনটা খুঁতখুঁত করতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু বসার আগে একবার '*ওঁ তৎসৎ*' বলে দিলেই সব শুদ্ধ হয়ে গেল। যেটাতেই একবার '*ওঁ তৎসৎ*' বলে দেওয়া হবে সেটাই একেবারে ব্রহ্ম বাচক হয়ে গেল, ফলে এর যত রকমের অশুদ্ধি ছিল সব চলে গেল। এরপর বলছেন *সৎ* শব্দকে নিয়ে –

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে।।২৬।।

(হে পার্থ, সদ্‌ভাব ও সাধুভাব সম্পদানার্থ 'সৎ' এই তৃতীয় ব্রহ্মবাচক শব্দ প্রযুক্ত হয় এবং বিবাহাদি শুভ কর্মেও সৎ-শব্দ ব্যবহৃত হয়।)

যজ্ঞ, তপস্যা ও দান করার সময় ওঁ, তৎ ও সৎ তিনটে একসাথে ওঁ তৎসৎ বলা হয়। যখনই কোন শুভ কাজ করা হয়, যেমন শাস্ত্র পাঠ করতে যাচ্ছি, তখন ওঁ বলে পাঠ শুরু করতে হয়, কোন ক্রিয়া করতে শুরু করছি তখন তৎ বলে দিতে হয়। আর যে জিনিসটা এখন নেই, যেমন একটা যজ্ঞ করা হচ্ছে, যজ্ঞটা কিছু পাওয়ার জন্য করা হচ্ছে; কেউ হয়ত সন্তান চাইছে, কেউ হয়ত টাকা চাইছে, কেউ হয়ত রোগমুক্তি চাইছি, এগুলোর কোনটাই এখন তার কাছে নেই; এই যজ্ঞ যখন করা হবে, তখন সেখানে যিনি যজ্ঞ করছেন তিনি আশা করছেন আমি যজ্ঞের এই ফল পাব, কিন্তু ফলের জিনিসটা সেখানে নেই। এই ফলপ্রাপ্তির রাস্থাকে প্রশস্ত করার জন্য সৎ বলা হয়, সৎ মানে real, যে জিনিসটা আছে।

যে জিনিসটা নেই, সেই জিনিসটাকে নিয়ে আসার জন্য সৎ বলা হয়। তার মানে যজ্ঞের যদি ফল পেতে চান, তপস্যার যদি ফল পেতে চান, দানের ফল যদি পেতে চান, জপের ফল যদি পেতে চান, কোন ক্রিয়ার ফল যদি পেতে চান, তাহলে সৎ বলতে হয়। সেইজন্য এই তিনটেকে মিলিয়ে একসাথে *ওঁ তৎ সৎ* বলে দিলে সবটার জন্যই বলা হয়ে গেল। ঠাকুর এক জায়গায় গিয়েছেন, ওই জায়গাটা শুদ্ধ কিনা সন্দেহ ছিল, ঠাকুর ওঁ তৎ সৎ বলে দিলেন। আপনারা বেশির ভাগই গঙ্গার কাছে থাকেন, পকেটে সব সময় গঙ্গাজল নিয়ে চলবেন। কোথাও একটু সন্দেহ হলে, মন খুঁতখুঁত করলে গঙ্গাজল ছিটিয়ে ওঁ তৎ সৎ বলে দিলে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে, সব কিছু শুদ্ধ হয়ে গেল।

একটা হল অভাব, জিনিসটা নেই, সেটার ক্ষেত্রে সৎ বলে দিলে তার অস্তি হয়ে গেল। আরেকটা হল অসদ্বৃত্তি, জিনিসটার ব্যাপারে সন্দেহ আছে, জিনিসটা ভাল না খারাপ জানা নেই;

যেমন একটা কাপড় কিনে আনা হয়েছে, দোকানে এই কাপড় কত লোক স্পর্শ করেছে, কাপড়টা কতটা শুদ্ধ আমরা জানি না। একটু গঙ্গাজল কাপড়ের উপর ছিটিয়ে ওঁ তৎ সৎ বা হরি ওঁ তৎ সৎ বলে দিলে কাপড়টা শুদ্ধ হয়ে যাবে। যুক্তিবাদীরা নানা রকমের প্রশ্ন করবেন, এটা কি scientific, কি করে শুদ্ধ হবে, এর মধ্যে কি যুক্তি আছে? পুরোটাই scientific, আগেকার দিনের মুনিরা ঋষিরা এটা বলে গেছেন। কি বলে গেছেন? যাঁরা মোক্ষের পথে আছেন, তাঁরা এইগুলো করেন। ব্রহ্মবেত্তারা এই জিনিসগুলো দেখিয়ে গেছেন।

আমাদের আসল বিজ্ঞান, আসল যুক্তি আসছে ব্রহ্মবেত্তাদের কাছ থেক, এনারাই ঠিক ঠিক বৈজ্ঞানিক। গণিতের দুটো ইকুয়েশান জানে, দুটো ডিগ্রি, দুটো পুরস্কার পেয়ে গেছে, এরাও বৈজ্ঞানিক, কিন্তু আসল বৈজ্ঞানিক হলেন যাঁরা ব্রহ্মবেত্তা, যাঁদের পরম্পরা হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে।

যখনই সৎ বলা হয়, তখন তিন প্রকার ফল দেয় – প্রথম ফল, যে বস্তুটা নেই সেই বস্তুকে আসার জন্য রাস্তা পরিষ্কার করে দেওয়া হল। তার মানে যত রকম অশুভ শক্তি আছে, রাক্ষস, ভূতপ্রেত, এদেরকে সরিয়ে দেয়। আর যেগুলো অশুভ, অসৎ সেগুলোকে সৎ শব্দে শুভ করে। আর তৃতীয় ফল হল, কোন মাঙ্গলিক কাজকে, যেমন বিবাহ, উপনয়নাদি কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানকে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে ওঁ তৎ সৎ বলবেই বলবে। আবার তিনটেকে আলাদা ভাবেও বলা যায়, কারণ ওঁ বলাও যা, তৎ বলাও তাই আর সৎ বলাও তাই। তবে তিনটি শব্দের বিভিন্ন রকম অর্থ হয়। যা কিছু করা হোক না কেন সব কিছুতে ওঁ তৎ সৎ বলে দিলে সবটাই শুভ হয়ে যাবে, বস্তু বা কাজ বা সময় এগুলোর মধ্যে যদি কোন দোষ থাকে, সব দোষ কেটে যাবে। মন্দিরে ঠাকুরের কাছে গেলেন, কোন মন্ত্র জানা নেই, ফুল নিয়ে ওঁ তৎ সৎ বা হরি ওঁ তৎ সৎ বলে দিলে সব শুদ্ধ হয়ে যাবে।

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে।।২৭।।

(যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে তৎপরভাবে যে অবস্থিতি (নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা) সেটাও সদ্‌রূপে নির্দিষ্ট হয় এবং ভগবৎপ্রীতির নিমিত্ত যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেটাও সৎ-নামে অভিহিত হয়।)

সৎএর মহিমা বলছেন। এই যে যজ্ঞে, তপস্যায়, দানে যে অবস্থিতি (নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সাথে), এটাই সৎ, বিদ্বানরা এটাই বলেছেন। যে কোন কর্ম যখন ঈশ্বরের জন্য করা হয়, পূজা অর্চনা যখন করা হয়, এটাও সৎ নামে অভিহিত করা হয়। যজ্ঞ, তপস্যা, দানের যে আসল স্বরূপ তা হল, যখন যজ্ঞ করছি, যখন তপস্যা করছি, যখন দান করছি তখন কোন না কোন ভাবে আমরা ঈশ্বরের সাথে জুড়ে যাচ্ছি, সেইজন্য হরি ওঁ তৎ সৎ বলতে হয়। এইভাবে যত কর্ম – যজ্ঞ, তপ, দান করা হলে যদি এর মধ্যে কোন অশুদ্ধি থেকে থাকে, কোন গোলমালও যদি এতে থাকে, তাহলে কিন্তু এবার সবটাই শুদ্ধ হয়ে গেল। যেমন আমরা এখানে গীতার ক্লাশ করছি, ঠিক করা হল ক্লাশের পর আমরা এখানে সবাই একসাথে হরি ওঁ তৎসৎ করব, তাহলে এই ক্লাশে যদি কিছু গোলমাল থাকে, কোন দোষত্রুটি যদি হয়ে থাকে, ঠিক ঠিক ঈশ্বরের কাজ যদি না হয়ে থাকে, এগুলো সব ঠিক হয়ে যাবে। এবারে এই যজ্ঞ, এই তপ, এই দান সবটাই সাত্ত্বিক হয়ে গেল।

এটাকেই শ্লোকের পরের লাইনে বলছেন, *কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে*, যজ্ঞ, তপস্যা, দান করার পর যদি এই কর্মগুলি অসাত্ত্বিক মনে হয়, বিগুণ মনে হয়, তাতেও শ্রদ্ধাপূর্বক যদি আপনি পরমাত্মার তিনটে নাম 'ওঁ তৎ সৎ' বা তার সাথে যদি প্রথমে 'হরি' যোগ করে দেওয়া হয়, তাতেই সব কিছু শুদ্ধ হয়ে যাবে, সব কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম হয়ে যাবে। অনেক সময় আমাদের বাধ্য হয়ে হোটেলে খেতে হয়, ট্রেনের খাবার খেতে হয়, সেখানে বাসনপত্র থেকে খাবার-দাবার সব কিছুই অশুদ্ধ মনে হতে পারে। সব কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে, পরিচ্ছন্নতা আর শুদ্ধতা দুটো

আলাদা জিনিস, তখন একটু জল ছিটিয়ে 'হরি ওঁ তৎ সৎ' বলে দিলাম, এরপর নিঃসংশয় চিত্তে সেখানে খাওয়া যেতে পারে। আগেকার অনেক মহারাজদের আমরা জানি, ট্রেনে বাসে যতক্ষণ সফর করতেন, ততক্ষণ কিছু খেতেন না। এখানে শ্রদ্ধাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন, *যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ*, যার যেমন শ্রদ্ধা সে সেই রকম। কিন্তু এর বিপরীতে বলছেন।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ।।২৮।।

(হে পার্থ, শ্রদ্ধা (আস্তিক্যবুদ্ধি)-শূন্য হয়ে যে যজ্ঞ, যে দান বা তপস্যা অনুষ্ঠিত হয় এবং স্তুতিনমস্কাকারদি যা কিছু করা হয়, সেটা অসৎ। কারণ এই সকল যজ্ঞাদি সৎপ্রাপ্তি-সাধনমার্গের বিপরীত। এই সকল যজ্ঞাদি বৈগুণ্যবশতঃ পরলোকে এবং (অযশস্কর হওয়ার জন) ইহলোকেও নিষ্ফল হয়।)

যজ্ঞ করছেন, দান করছেন, সন্ন্যাসীকে, ব্রাহ্মণকে দান করছেন, তপস্যা করছেন, এগুলো যদি শ্রদ্ধার সাথে, স্তুতি ও নমস্কারাদির সাথে না করা হয়, তাহলে এর সবটাই বেকার হয়ে যায়। তাদের কি পরিণতি হয়? *ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ*, ভগবান বলছেন, আমাকে যে পেতে চাইছে, ব্রহ্মজ্ঞান যে পেতে চাইছে, তার জন্য এই পথ নয়। যজ্ঞ, তপস্যা, দান, জপ, ধ্যান এগুলো সব ঈশ্বরকে পাওয়ার পথ। এগুলো যদি শ্রদ্ধার সাথে না করা হয়, যদি শুদ্ধ না করে নেওয়া হয়, সাত্ত্বিক না করে নেওয়া হয়, তাহলে এগুলো কোন ফল দেবে না। ঠাকুর বলছেন, অমুক মেয়েরা লক্ষ লক্ষ জপ করে, কিন্তু কিছুই তো হয় না। কেন কিছু হয় না? এই কারণেই হয় না, শ্রদ্ধার অভাব।

যজ্ঞ করতে গেলে, তপস্যা করতে গেলে, দান করতে গেলে, জপধ্যান করতে গেলে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু সাধুপুরুষরা এগুলোকে অশ্রদ্ধার সাথে করাকে অনুমোদন করেন না, অশ্রদ্ধার সাথে করলে এই কর্মগুলি ইহলোকেও কোন ফল দেয় না, পরলোকেও কোন ফল দেয় না। ঈশ্বরলাভের তো কোন প্রশ্নই নেই। সেইজন্য যখন দান, তপস্যা, জপধ্যান করবেন, তখন প্রথমে মনে করতে হবে এটাই আমার জীবনধারা, আমি এটাই করি। আর যদি পার্টটাইম করেন, তাহলেও শ্রদ্ধার সাথে করবেন, কোথাও কোন সন্দেহ বা সংশয় থাকলে 'ওঁ তৎ সৎ' বলে দিলে সব সংশয় মিটে যাবে। এই হল সপ্তদশ অধ্যায়ের মূল বক্তব্য। এরপর আমরা গীতার শেষ অধ্যায় অষ্টাদশ অধ্যায় শুরু করব।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়ং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ।।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

অষ্টাদশ অধ্যায়

মোক্ষযোগ

আমরা গীতার শেষ অধ্যায়ে চলে এসেছি, অষ্টাদশ অধ্যায় শুরু হচ্ছে। সপ্তদশ অধ্যায় পর্যন্ত যতটা সম্ভব গীতার ব্যাখ্যা করে হয়েছে। অনেকে হয়ত সব কথা বুঝতে পারেননি, অনেককে হয়ত কিছু কথা বারবার শুনতে হচ্ছে। এখানে একটা কথাই বলার, গীতাতে কোন ভুল কথা নেই। অষ্টম শতাব্দীতে আচার্য শঙ্কর গীতার যে ভাষ্য রচনা করে গেছেন, সেই ভাষ্যকে আধার করে আক্ষরিক ভাবে আমরা গীতার ব্যাখ্যা করে গেছি। যাঁরা হিন্দু ধর্ম মানেন, হিন্দু ধর্মকে বোঝেন, তাঁরা জানেন যে হিন্দু ধর্মের সব থেকে বড় ব্যাখ্যাকার হলেন শঙ্করাচার্য।

সপ্তদশ অধ্যায় পর্যন্ত গীতার যে কটা ক্লাশ নেওয়া হয়েছে, সেখানে যা যা বলা হয়েছে, তার সাথে অষ্টাদশ অধ্যায়ের যে বৈশিষ্ট্য; এই দুটোকে মিলিয়ে যদি দেখা হয় তাহলে একটা প্রশ্ন আসে, এত কিছু কথার মধ্যে গীতার সার কি। প্রথম অধ্যায়ের নাম অর্জুনবিষাদ যোগ। সেখানে আমরা দেখলাম, কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষের সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। অর্জুন উভয় পক্ষে কারা কারা যুদ্ধ করতে এসেছেন দেখতে চাইলেন। সব দেখার পর অর্জুনের মনটা বিষাদে ভরে গেল; ইস্ সামান্য একটা রাজ্য ফিরে পাওয়ার জন্য আমরা এত বড় নরসংহার করতে যাচ্ছি? সেখান থেকে তিনি বলে দিলেন আমি এই যুদ্ধ করব না। এই হল গীতার সূচনা। আমার আপনার সবার ধর্ম জীবনে নামার আগে প্রথমে মনে বিষাদ আসতে হয়। স্বামীজী এই সত্যটাকে খুব সুন্দর করে বলে দিলেন, The religion begins with tremendous dissatisfaction with the present state of affairs। আমি যেখানে আছি, যে অবস্থায় আছি, যে সময়ে আছি, চরম অসন্তুষ্টির মধ্যে আছি। এই অবস্থা থেকে ঈশ্বরের দিকে যদি মন যায়, তবেই ধর্ম শুরু হতে পারে। ঠাকুর বলছেন, সব কিছুই আছে, কোন কিছুর অভাব নেই, তাও কোন কিছুতে মন লাগে না। অভাব থেকে কেউ যদি ধর্ম পথে আসে, তাহলে বলা খুব মুশকিল, ধর্ম পথে সে টিকে থাকতে পারবে কি পারবে না। কিন্তু যেখানে কোন কিছুর অভাব নেই, সব সময় মনে একটা বিষাদ লেগে আছে, তা সত্ত্বেও ঈশ্বরকে চাইছে, এটা নিশ্চিত করে বলা যাবে যে ওই ধর্মটা টিকবে। এই বিষাদের অর্থ কোন কিছুই ভাল লাগছে না। এই বিষাদ না হলে ঠিক ঠিক ধর্ম শুরু হয় না।

দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগ। হিন্দুদের ছয়টি দর্শন, একসাথে বলা হয় ষড়দর্শন। ষড়দর্শনের প্রথম দর্শন হল সাংখ্য দর্শন। সাংখ্যযোগের 'সাংখ্য' শব্দের ঠিক ঠিক অর্থ হল সম্যক জ্ঞান, আমাদের ভাষায় ঠিক ঠিক জ্ঞান। দ্বিতীয় অধ্যায় আলোচনা করার সময় আমরা অনেকবার বলেছিলাম যে, দ্বিতীয় অধ্যায় মন দিয়ে শুনলে হিন্দু ধর্ম কি, বেদ কি, গীতা কি জানা যায়। সূত্রাকারে পুরো বেদকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। অধ্যায়ের বাহাত্তরটা শ্লোকে প্রথমের দিকে কয়েকটা শ্লোকে যদিও অর্জুন নিজের দুঃখ, বিশাদ ও নিজের কিছু ইচ্ছাকে ব্যক্ত করছেন, কিন্তু তারপর থেকে অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত ভগবান অর্জুনকে আত্মার তত্ত্ব, স্বধর্ম, কর্মযোগের মহিমা, তার সাথে শেষে যিনি জ্ঞানী যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, তাঁর কি লক্ষণ, তাঁর স্বভাব কি রকম, এগুলোকে নিয়ে সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করে বলে দিলেন।

তৃতীয় অধ্যায় হল কর্মযোগ। সৃষ্টি মানেই কর্ম। আমরা বিগ্ ব্যাঙের নাম সবাই শুনেছি। বিগ্ ব্যাঙ বলতে বিজ্ঞানীরা বলতে চাইছেন, সৃষ্টি শুরু হল। বিজ্ঞানের ভাষা দিয়ে বিগ্ ব্যাঙের যে বর্ণনা করা হয়, তাতে এটা বোঝাতে চাইছেন যে, সব কিছু যেন গতিশীল। কিন্তু আগেকার দিনের

বৈজ্ঞানিকরা মনে করতেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন স্থিতিশীল হয়ে আছে। ইদানিং আবার বলা হয়, expanding univers। আমরা হিন্দুরা চিরদিন মনে করে আসছি, এই জগতে কোন কিছুর স্থিতি নেই, যেটারই স্থিতি নেই, সেটাই কর্ম করছে, কর্ম মানেই তাই। কর্ম আমাদের সবাইকেই করতে হবে। চুপ করে বসে থাকাটাও যেমন কর্ম, ঘুমনোটাও কর্ম, চোখের পাতা খুলছি বন্ধ করছি, এটাও কর্ম। এই কর্মকে কিভাবে কর্মযোগে পরিবর্তিত করে দেওয়া যে, তৃতীয় অধ্যায়ে এটাকে নিয়ে বললেন।

চতুর্থ অধ্যায়কে বলছেন জ্ঞানকর্মসন্ন্যাস যোগ। এই অধ্যায়ের এটাই নাম, কিন্তু কিছু কিছু ভাষ্যকাররা নামটা একটু পাল্টে দিয়ে শুধু জ্ঞানযোগ বলছেন। কর্মকে ধীরে ধীরে যে ত্যাগ করা হচ্ছে, সেখান থেকে জ্ঞানপূর্বক জিনিসটাকে বোঝা, যে জিনিসটাকে ত্যাগ করা হচ্ছে, আসলে এটাকে ঈশ্বরের সাথে জুড়ে দেওয়া যায়। এই অধ্যায়ে আমরা *ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্* গীতার এই বিখ্যাত শ্লোক পাই। এই যে যজ্ঞের যত ক্রিয়া হচ্ছে সবটাই ব্রহ্ম, ঠিক তেমনি আমি যত ক্রিয়া করছি সবটাই ব্রহ্ম, বেদান্তের এই জ্ঞানের ভাবটাকে এই অধ্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের তফাৎ হল, তৃতীয় অধ্যায়ে অনাসক্তির কথা বলছেন আর চতুর্থ অধ্যায়ে অনাসক্তির সাথে জ্ঞান জিনিসটাকে নিয়ে আসছেন।

পঞ্চম অধ্যায়ের নাম সন্ন্যাসযোগ, এই অধ্যায় শুধু গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীদের জন্য নয়, এর নামটাই সন্ন্যাসযোগ, যেখানে সব কিছুকে মন থেকে ত্যাগ করার কথা বলা হচ্ছে। এখানে তিনি পরিষ্কার বুঝতে পেরে গেছেন যে, সংসার আলাদা আমি আলাদা। এই সন্ন্যাস গেরুয়া পরিধান করে সবাইকে দেখনো, তা না, সত্যিকারের মন থেকে সন্ন্যাস। আর সেই ভাবকে নিয়ে বলা হচ্ছে, যা কিছু আছে সবটাই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই। এই ভাবকে আধার করে পঞ্চম অধ্যায়ে ভগবান খুব সুন্দর বলছেন, *বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।* ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী কে? ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী যিনি, তিনি সব কিছুতে এক ভাব রাখেন। হাতি হোক, চণ্ডাল হোক, গরু হোক আর বিদ্যা-বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হোক সবার প্রতি তাঁর সমান ভাব। কারণ ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই কিনা।

এখানে প্রসঙ্গ থেকে সরে কয়েকটা কথা বলতে হচ্ছে। শ্রোতাদের আমি অনুরোধ করব, গীতা শেষ হয়ে যাওয়ার পর, আপনারা আবার আমাদের চ্যানেলে গীতার লেকচারগুলো প্রথম থেকে শুনবেন। দ্বিতীয় কথা, আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, গীতা মুখস্ত করবেন। শাস্ত্র মুখস্ত না করলে শাস্ত্রের সেবা হয় না। শাস্ত্রের সেবা না হলে শাস্ত্রের কৃপা হয় না। আর শাস্ত্রের কৃপা না হলে আপনি শাস্ত্র বুঝতে পারবেন না। বছরের পর বছর গীতা পড়ে যাচ্ছেন, কিন্তু বুঝতে পারছেন না গীতা কি এবং কেন, কারণ শাস্ত্র আপনাকে কৃপা করছেন না। কেন কৃপা করছে না, কারণ আপনি শাস্ত্রের সেবা করছেন না। শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান অবশ্যই থাকতে হবে, তার সাথে শাস্ত্র মুখস্ত করা। মুখস্ত করে নিয়মিত আবৃত্তি করা। *আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরিয়সী*, শাস্ত্র বুঝে নেওয়ার থেকেও শাস্ত্র আবৃত্তি করা অনেক ভাল। একদিন না খেলেন তো না খেলেন, কিন্তু গীতা আবৃত্তি করা একদিনও ছাড়বেন না। দু-বেলা জপধ্যান, আর প্রতিদিন একটা সময় ঠিক করে গীতা নিয়মিত ভাবে সারা জীবন আবৃত্তি করে যেতে হবে। একদিন যদি না খেয়ে থাকেন শরীরের কিছু হবে না, কিন্তু ঈশ্বরের সাথে যদি জুড়ে না থাকেন শূন্য হয়ে যাবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় ধ্যানযোগ, ধ্যান জিনিসটা কি এই অধ্যায়ে বিস্তারে বলে দিচ্ছেন। ধ্যানের জন্য কি কি প্রস্তুতি লাগে, কিভাবে ধ্যান করতে হয় আর ধ্যানের কি ফল, সব এই অধ্যায়ে বলে দেওয়া হয়েছে। তার সাথে জরুরি কথা বলছেন, যাঁরা যোগভ্রষ্ট, এই জীবনে যিনি যোগে সফল হতে পারলেন না, মৃত্যুর পর তাঁদের কি গতি হয়?

সপ্তম অধ্যায়ের নাম জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ, পুরুষ ও প্রকৃতি, জড় আর চৈতন্যের আলোচনা দিয়ে একটা নূতন ভাব শুরু করলেন, যে ভাবকে দশম ও একাদশ অধ্যায়ে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের পরে অষ্টম অধ্যায় শুরু হয় অক্ষরব্রহ্মযোগ দিয়ে। অক্ষর মানে যাঁর ক্ষরণ হয় না। ক্ষরণ হয় না একমাত্র ব্রহ্মের, সেইজন্য এই অধ্যায়ের নাম দিলেন অক্ষরব্রহ্মযোগ। যোগ শব্দের অর্থ যুক্ত হওয়া, যে ব্রহ্ম নির্গুণ নিরাকার, তাঁর সাথে যুক্ত হওয়া, তাই এর নাম হল অক্ষরব্রহ্মযোগ। গীতার যে কোন একটি অধ্যায়কে নিয়ে যদি সাধনা করা হয়, যে কোন মানুষ সিদ্ধি লাভ করবেন। হিন্দুদের যে ভাব ও বিশ্বাস, কিভাবে স্বর্গলোকে, পিতৃলোকে যাওয়া যাবে আর কিভাবে মুক্তির পথে যাওয়া, অষ্টম অধ্যায়ে এই জিনিসটাকে নিয়ে বলা হয়েছে।

সেখান থেকে আসছে নবম অধ্যায়ের রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ। ভগবান এই অধ্যায়ে অর্জুনকে বলছেন, ধর্ম ও অধ্যাত্ম জগতের যে জিনিসগুলিকে মানুষ জানে না, বুঝতে পারে না, সেই জিনিসগুলিকে আমি তোমাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেব। সেখানে ভগবান শুরুই করছেন আত্মতত্ত্ব দিয়ে। আমার এক বন্ধু মাঝে মাঝে বলেন, বর্তমান কালে কিছু কিছু সম্প্রদায় আছে, যাদের মধ্যে কেউ বলেন কৃষ্ণ ছাড়া কিছু নেই। এনাদের সম্বন্ধে কিছু বলার নেই, ধর্ম কখনই সর্বসাধারণের জন্য হয় না। ধর্মের মূল জিনিসগুলি আগেও বলা হয়েছে, পরে আবারও বলা হবে। জ্ঞানী যদি না হন, তার সাথে ত্যাগী যদি না হন, শাস্ত্র তাঁর কাছে থাকবে না। আপনাকে দুটোই হতে হবে, জ্ঞানী ও ত্যাগী। এই দুটোর সাথে আরেকটা জিনিসকেও জুড়ে দেওয়া যেতে পারে ধ্যানী – জ্ঞানী, ধ্যানী ও ত্যাগী, বেদ-বেদান্তের সমস্ত জ্ঞান, সম্পূর্ণ ত্যাগ তার সাথে চব্বিশ ঘন্টা ব্রহ্ম চিন্তন।

এখন যদি কোন সম্প্রদায় উঠে যায়, বা আগামীকাল কোন ফিল্মস্টার একটা মতবাদ বানিয়ে নূতন কোন হিন্দু সম্প্রদায় শুরু করে দেয়, তাদের চেষ্টা সাময়িক ভাবে হয়ত সফল হয়ে যাবে, ফিল্মস্টার কিনা। তাই বলে কি তিনি হিন্দু ধর্মের ব্যাপারে যা যা বলছেন সব ঠিক বলছেন? কোন একটা শাস্ত্রকে তো আপনাকে মানতে হবে, বেদ মানুন, গীতা মানুন, উপনিষদ মানুন, বা যে কোন একটা পুরাণ মানুন, সব শাস্ত্র একই কথা বলছেন। শঙ্করাচার্য, হিন্দু ধর্মের যিনি সব থেকে বড় জ্ঞাতা, বর্তমান কালে হিন্দু ধর্মকে যিনি দাঁড় করালেন, সেই শঙ্করাচার্য উপনিষদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গীতার শ্লোক নিয়ে আসছেন। কোথাও কোথাও উপনিষদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি মনুস্মৃতি নিয়ে আসছেন। এর অর্থ দাঁড়ায়, হিন্দুদের সমস্ত শাস্ত্র একই কথা বলে, বিশেষ করে যখন তত্ত্বের কথা আসে। এখন আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি, গীতার সার কি, গীতার মর্ম কি; এটা জানলেও বোঝা যাবে হিন্দু ধর্ম কি। কারণ হিন্দু ধর্ম সেটাই, যেটা গীতাতে আছে। তাই বলে এই নয় যে, গীতাতে যা নেই হিন্দু ধর্মে তা নেই। কিন্তু হিন্দু ধর্মের মূল যে জিনিসটা, তা হল গীতাতে যা আছে।

রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ, সেখান থেকে আসছেন বিভূতি যোগে। যে কোন জাতি, প্রজাতি, বস্তু সমূহ, এই সব কিছুর মধ্যে যেটা যেটা শ্রেষ্ঠ, ভগবান বলছেন, সেটা আমি। তাহলে নিকৃষ্ট কে হবে? সেটাও ভগবান। কিন্তু শ্রেষ্ঠ জিনিসের দিকে আমাদের দৃষ্টি আগে যায় বলে, প্রথমে শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলিকে নিয়ে বলছেন। একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপদর্শনযোগ, যেখানে ভগবান দেখাচ্ছেন স্থূল জগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ ও কারণ জগৎ সবটাই আমি, তার সাথে ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সবটাই আমি, জীবনটাও আমি মৃত্যুটাও আমি। আমিই সেই কাল, লোকক্ষয়ের জন্য আমি এই নিজেকে বিশাল রূপে ধারণ করেছি – *কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ।*

হিন্দু ধর্ম কখন কোন কিছুকে না করে না। আমাদের শাস্ত্র কখন কোন কিছুকে নাকচ করে দেয় না। মানুষের যে টাকার প্রতি লোভ, শাস্ত্র সেটাকেও নাকচ করে দিচ্ছেন না। হিন্দুরা জানে, শাস্ত্র আমাদের মা, মা জানে সন্তানের কি দরকার। শাস্ত্র বলেন, কি আর করা যাবে, তোমার মনে ভোগের ইচ্ছা আছে ঠিক আছে, একটু ভোগ করে নাও। কিন্তু মাথায় রেখো ভোগের মধ্যে বেশি ডুবে যেও না, তাহলে তোমাকে এই জন্মমৃত্যুর চক্রে ফেঁসে থাকতে হবে। কি সাংঘাতিক ধর্ম! কল্পনা

করা যায়! আমরা শুধু শাস্ত্র অধ্যয়ন না করে, শাস্ত্রের কোন চর্চা না করে কেবল মাত্র বিক্ষিপ্ত, অর্দ্ধ বিক্ষিপ্ত কিছু কথা শুনে আর কিছু কিছু দুষ্ট লোকের কথা শুনে শুনে এত উচ্চমানের ধর্মকে আমরা ভুলে যেতে বসেছি। কিন্তু এই ধর্ম হারাবার নয়।

আমরা জানি এখন কত ইয়ং ছেলেমেয়েরা ইউটিউবে আমাদের লেকচার নিয়মিত শুনছে। তাদের কারুর কারুর সাথে আমার যোগাযোগ হয়, সবাই পড়াশোনায় খুবই ভাল। তারা আমাকে বলে, বাবা-মা ইউটিউবে আপনাদের একটি কথাও শুনতে চান না, শোনেনও না। তাদের মধ্যে একটি ছেলে আমাদের সমস্ত লেকচার খুব মন দিয়ে শোনে আর গভীর ভাবে শাস্ত্র পড়াশোনা করে। হিন্দু ধর্ম এক অমোঘ বীজ, এই বীজ যাবার নয়, কারুর সাধ্য নেই যে এই ধর্মের কোন রকম ক্ষতিসাধন করতে পারে। আপনারা যদি ভারতে বিবেকানন্দ পড়েন, তাহলে দেখবেন সেখানে স্বামীজী জোর দিয়ে বলছেন, যে জীবাত্মারা মুক্তির পথে শেষ ধাপে পৌঁছে গেছেন, তাঁদের ভারতবর্ষে জন্মাতেই হবে। যারা টাকা-পয়সা, মান-সম্মান চায়, তারা যে কোন দেশে জন্ম নিতে পারে। যাঁরা মুক্তির পথে আছেন, তাঁরা বিভিন্ন দেশে তাঁদের সাধনা চালাতে পারে। মত পথ ঠাকুর বলছেন। কিন্তু মুক্তির শেষ ধাপে যখন পৌঁছাবে, যেখানে পৌঁছে বলবেন, আমার স্বর্গ লাগবে না, আমার আর কোন কিছু লাগবে না, আমার শুধু চাই স্বরূপ জ্ঞান, ভারতের পূণ্যভূমিতে তাঁকে জন্ম নিতেই হবে। সেইজন্য এই বীজ অমোঘ, এই বীজ চিরন্তন, সব সময় থাকবেই।

বিদেশীরা যতই এই দেশক পদানত করে রাখুক না কেন, যে রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, ইতিহাসের দিকে একবার তাকান, হাজার হাজার বছর ধরে হিন্দু ধর্মের উপর কত অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এখনও হিন্দু ধর্ম যেমন ছিল তেমনই আছে। ঠাকুর বলছেন, ঋষিদের দেওয়া সনাতন ধর্মই থাকবে। হিন্দু ধর্মকে কেউ কিছু করতে পারবে না। হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রগুলিকে জানলে জীবনে একটা আত্মিক শান্তি আসে। কত লোক আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন, তাঁদের কারুর স্ত্রী মারা গেছে, কারুরু স্বামী মারা গেছে, কারুর সন্তান মারা গেছে, শোকে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। শোক তো হবেই, আপনজনের মৃত্যু মানে নিজের শরীরের একটা অঙ্গ খসে পড়ে যাওয়া, বিদীর্ণ হওয়ারই কথা। গীতা সেখানে কি আর করবেন, একটু জ্ঞানবিজ্ঞান, ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্যের মলম লাগিয়ে দেন। তাঁর ইচ্ছাতেই এই কষ্ট, তাঁর ইচ্ছাতে এই শোক এসেছে, এই ধরণের উল্টোপাল্টা শিক্ষা গীতা দেন না।

গীতাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে ভিতরে একটা শক্তির উন্মেষ হয়, যে ধাক্কাটা আমাকে উপড়ে মাটিতে ফেলে দিত, সেখানে এই শক্তি আমাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে। একটু নড়বে না যে তা না, নড়বে, কিন্তু আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। ঠাকুর খুব সুন্দর গল্প বলছেন, চাষীর এক সন্তান মারা গেছে, সন্তানের মৃত্যুর খবর শোনার পরেও চাষীর চোখে জল নেই। স্ত্রী বলছে, তুমি কত নিষ্ঠুর। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, চাষী জ্ঞানী ছিল। তার মানে, সে ধর্ম আলোচনা, ধর্ম চিন্তন করেছে। চাষী তার স্ত্রীকে বলছে, 'কেন কাঁদছি না জানো? রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম আমি রাজা হয়েছি, সাত ছেলের বাপ হয়েছি, সবাই রূপে গুণে অতুলনীয়। ঘুম ভাঙতেই স্বপ্নটাও ভেঙে গেল, দেখছি কিছু নেই। ভাবছি কার জন্য কাঁদব, অমন গুণবান, রূপবান সাতটি ছেলের জন্য, না এই একটির জন্য'? এগুলো কাহিনী ঠিকই, কিন্তু এর মর্মটাই আসল। ধর্ম কি দেয়? জ্ঞান, ভক্তির ঐশ্বর্য দেয়, এছাড়া আর কি দেবে। গীতা পড়ে কি আর হবে? আমার কি দুটো শিং বেরোবে, নাকি দুটো ডানা গজাবে? জ্ঞান, ভক্তির ঐশ্বর্য ও তার সাথে শক্তি দেবে, যেটা দিয়ে মানুষ শোক আর মোহ, এই দুটো থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। গঙ্গায় যখন জোয়ার আসে, বিশেষ করে দক্ষিণ বঙ্গে যাঁরা বাস করেন, তাঁরা জানেন এই জোয়ারের কি শক্তি, যখন আসে সব কিছুকে উল্টে ফেলে দেয়। শোক আর মোহ এই জোয়ারের মত। নদীর ঘাট যদি বাঁধানো হয়, জোয়ারের তোড়টা কম লাগবে। আর ঘাট যদি বাঁশের হয়, ভেঙে উড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে।

একাদশ অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখিয়ে দেখাচ্ছেন কিভাবে তিনিই সব কিছু হয়েছেন, মৃত্যুটাও তিনি। সপ্তম অধ্যায় থেকে যে জিনিসগুলিকে নিয়ে আলোচনা করে এসেছেন, সেটাকে দ্বাদশ অধ্যায়ে এক জায়গায় এনে সমাপন করছেন, নাম দিলেন ভক্তিযোগ। খুব ছোট্ট অধ্যায়, কিন্তু গীতার খুব সুন্দর একটি অধ্যায়। ঈশ্বরভক্তি কিভাবে হবে দেখাচ্ছেন। এই ভক্তি বৈধী ভক্তি না, যে ভক্তিতে কোন ইমোশান নেই, যে ভক্তিতে মানুষ নিজের ইষ্টের সাথে এক মনে করতে পারে, ইষ্ট তার সাথে এক, যে ভক্তিতে একটা একাত্ম বোধ জন্মায়। এই ভক্তিতে কোন নাটকীয়তা নেই, সবটাই তার হৃদয়ের ব্যাপার, ঈশ্বরের প্রতি তার যে প্রেম, ভালবাসা, সেটা অন্য লোকে যেন না জানতে পারে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আবার শক্তির খেলা ফিরে এলো, নাম হল ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ যোগ, একদিকে পুরুষ আরেক দিকে প্রকৃতি, একদিকে চৈতন্য অন্য দিকে জড়। কোনটা ক্ষেত্র আর কোনটা ক্ষেত্রজ্ঞ বিচার দিয়ে, যুক্তি দিয়ে দুটোর যে তফাৎ, সেটাকে স্পষ্ট করছেন। ক্ষেত্র হল যেন চাষের জমি আর ক্ষেত্রজ্ঞ হল কৃষক, জড় সত্তা আর চৈতন্য সত্তা, এই দুটো সত্তার মধ্যে যে তফাৎ, তার সাথে মন, বুদ্ধি এবং মন বুদ্ধিকে নিয়ে যত রকম যে ইমোশান আছে, এই জিনিসগুলিকে নিয়ে আলোচনা করছেন।

এই জিনিসটাকে আলোচনা করতে গিয়ে আরও পরিষ্কার করে দেখানোর জন্য নিয়ে আসছেন চতুর্দশ অধ্যায়, যার নাম গুণত্রয়বিভাগ যোগ। যদিও সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটে গুণের আলোচনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসে যায়, কিন্তু চতুর্দশ অধ্যায়ের পুরোটাই এই তিনটে গুণকে অনেক বিস্তারে বলছেন। জগতে যা কিছু আছে সবটাই হল এই সত্ত্ব, রজো ও তমোর খেলা। আমাদের উদ্দেশ্য হল, তমো ও রজোকে ত্যাগ করে সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়াটাই শেষ কথা নয়, সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানে এয়ারপোর্টের রানওয়েতে দাঁড়িয়ে যাওয়ার মত, এবার আপনার প্লেন উড়ে বেরিয়ে যাবে। প্লেনে করে কোথাও যেতে হলে আমাকে এয়ারপোর্টে যেতে হবে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিলাম, ট্যাক্সি আমাকে আকাশে নিয়ে যাবে না। এয়ারপোর্টও আমাকে আকাশে নিয়ে যাবে না। প্লেনে গিয়ে বসে গেলাম, এটাও আমাকে আকাশে নিয়ে যাবে না। কিন্তু যখন রানওয়েতে দাঁড়িয়ে গেল, প্লেনের ইঞ্জিনটা গোঙাতে শুরু করল, এবার আমি বুঝতে পারলাম, আকাশে ওড়ার সবুজ সঙ্কেত এসে গেছে, সব কিছু প্রস্তুত। এটাই হল সত্ত্বগুণের অবস্থা।

গুণত্রয়বিভাগ যোগ হয়ে গেল। এবার আমাকে নিয়ে যাবে। কোথায় নিয়ে যাবে? আমার স্বরূপে। আমার স্বরূপ আমি ঈশ্বরের সাথে এক। সেই ঈশ্বর কে? পুরুষোত্তম নারায়ণ, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই ঈশ্বর। মনের জগতে শ্রেষ্ঠতম যেটা হতে পারে, তাঁকেই বলছেন পুরুষোত্তম। পনের নম্বর অধ্যায়ে এই পুরুষোত্তমকে নিয়ে বলছেন। পনের নম্বর অধ্যায়ের পর, গীতা এবার সমাপনের দিকে এগোতে শুরু করেন। সমাপনের দিকে যখন যান, তখন যাওয়ার পথে প্রথমে নিয়ে আসছেন দৈবাসুরসম্পত্তিবিভাগ যোগ, দৈবী সম্পদ আর আসুরীক সম্পদকে নিয়ে বলছেন। মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখে আমরা কি করে বুঝব, কে ঈশ্বরের দিকে যাবে, কে যাবে না? দৈবী ও আসুরীক সম্পদ দিয়ে সেটাকে বুঝিয়ে দিলেন।

সেখান থেকে আসছেন শেষ ধাপে, মনের যে অবস্থা, শাস্ত্র জ্ঞান যদি না থাকে তাহলে কি কিছু হবে না, এই জিনিসটাকে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগে পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। কিন্তু একবার যিনি শাস্ত্র জেনে গেছেন, এরপর কিন্তু তাঁকে শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ীই চলতে হবে। শাস্ত্রবিধিতে না চললে তামসিক গুণে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। শাস্ত্র জানার পর যদি কেউ নিজের মত সব কিছু করে, তাহলে সেটা তামসিক হয়ে গেল। তামসিক হয়ে যাওয়া মানে, আর তাকে উপরে নিয়ে যেতে পারবে না। এরপর আমাদের এখনকার আলোচ্য অষ্টাদশ অধ্যায় আসছে, যার নাম মোক্ষ সন্ন্যাস যোগ, যেখানে মুক্তির কথা বলবেন। এই হল আঠারোটি অধ্যায়ের সার।

মধুসূদন সরস্বতী একজন খুব বড় ভাষ্যকার, আচার্য শঙ্করের ভাষ্যকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, তার নাম দিয়েছেন – গূঢ়ার্থদীপিকা। এই যে আঠারোটি অধ্যায়ের কথা আধঘন্টা ধরে বললাম, মধুসূদন সরস্বতী এটাকেই বলছেন, গীতা যেন মানুষকে ধাপে ধাপে উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। প্রথমে তিনি কর্মকে নিয়ে আসছেন, কর্ম থেকে কর্মযোগ বা নিষ্কাম কর্ম, নিষ্কাম কর্ম থেকে চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি হয়ে গেলে দেখাচ্ছেন কিভাবে কর্ম ত্যাগ করতে হয়, সেখান থেকে ধীরে ধীরে ভক্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, ঈশ্বরের ভক্তি এসে যাওয়ার পর আসে বিচার। আমার যদি নাই জানা থাকে আমি কাকে ভালবাসি, তাহলে তো তাঁকে পাওয়ার চেষ্টাই আসবে না। অনেকেই প্রশ্ন করেন, কাম ভাব যাচ্ছে না। কাম ভাব যাওয়ার তো কথা নয়, ঈশ্বরের পূর্ণ আস্বাদ না পাওয়া পর্যন্ত কাম ভাব থাকবেই।

আমাদের গুরুজনদের কাছে আমরা শুনেছি, ওনারা বলতেন, 'রামকৃষ্ণ মঠ যখন স্থাপিত হয়, স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ, স্বামী শিবানন্দ মহারাজদের মত ঠাকুরের পার্ষদরা যখন মঠের কর্ণধার ছিলেন, তার কিছু দিন পর আমরা নূতন মঠে এসে জয়েন করেছি, ঠাকুরের সেই পার্ষদ মহারাজরা তখন আমাদের বলতেন – তোমাদের বৈরাগ্য ধন্য, আমরা তো ঠাকুরকে চোখে দেখেছি, তাঁর সাথে থেকেছি, তাঁকে ভালবেসেছি, কথা বলেছি, তবেই তো আমরা আজ এখানে এলাম; তোমরা তো তাঁকে দেখইনি, শুধু তাঁর কথা শুনে চলে এসেছ'। আমি, আপনি, আমরা সবাই ঠাকুরের কথা শুনে মঠে এসেছি। আপনারাও গীতার নাম শুনে গীতার আলোচনা শুনতে এসেছেন, কিছু তো বিশেষ আছে। সিনেমাতে আমরা দেখি একজন আর-একজনকে বলছে, তোমাকে যদি আমি না পাই, সংসারকে আমি লাথি মেরে বেরিয়ে যাব। কিন্তু তার আগে আমি তোমাকে জানব তবেই না আমি তোমাকে ভালবাসব। তোমাকে আমি যদি নাই জানি সংসারকে আমি লাথি মারব কি করে! ঈশ্বরের প্রতি চেতনা যদি একটু না জাগে, ঈশ্বরের প্রতি একটু ভক্তি যদি না হয়ে থাকে, কি করে বৈরাগ্য আসবে, যে বিবেক বিচারের কথা বলা হয়, যে বিচারের পথে কিছু জিনিসকে ত্যাগের কথা বলা হয়, সেই ত্যাগের ভাবটা আসবে কিভাবে!

সেইজন্য আগে দরকার ঈশ্বরে ভক্তি। প্রথম অবস্থায় বৈধী ভক্তি; মন্দিরে যাওয়া, জপ করা, যখন যা যা পূজা অর্চনা হয় তাতে অংশ নেওয়া, এগুলো অনেক দিন করতে করতে ঈশ্বরের প্রতি একটা প্রীতি জন্মায়। আগেকার দিনে সামাজিক বিবাহ হত, ছেলে মেয়েকে দেখেনি, মেয়ে ছেলেকে দেখেনি। মেয়েটি শুধু সেবা করে ছেলের মন জয় করত। ছেলেটি স্ত্রীর জন্য ভাল কিছু পেলে, স্ত্রীর পছন্দের কিছু পেলে লুকিয়ে লুকিয়ে নিয়ে আসত। এই করে আস্তে আস্তে দুজনের ভালবাসাটা গাঢ় হয়ে গেল, এক অপরের সাথে জুড়ে গেল। ফলে আমাদের ধর্মে তালাকের কোন ধারণাই ছিল না। ঠিক তেমনি, ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিটা জন্মাতে হবে। তোমার দ্বারা হবে না, বলে দিলেই হয় না। প্রীতি জন্মে যাওয়ার পর আসে ভক্তি। ভক্তি জন্মাবার পর আসে বিচার, বিচার দ্বারা জাগ্রত হবে বিবেক বৈরাগ্য। এরপর শুরু হয় আধ্যাত্মিক যাত্রা।

ঈশ্বরের প্রতি এত সহজে মন যেতে চায় না। একবার বিচার শুরু হয়ে গেলে, মধুসূদন সরস্বতী বলছেন, এরপর মানুষ জীবনমুক্ত হয়ে যায়। এই জীবনমুক্তি আর বেদান্তের জীবনমুক্ত দুটো আলাদা। মধুসূদন সরস্বতীর জীবনমুক্তে এখনও জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়নি, বা তিনি হয়ত এটা ধরে নিয়েছেন যে, বিচার করে জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়ে গেছে। তিনি বলছেন, জীবনমুক্ত হয়ে গেলে তিনি দৈবী সম্পদ পেয়ে যান। দৈবী সম্পদের সাথে সাথে তাঁর ভিতর শ্রদ্ধার ভাব জন্মায়, শ্রদ্ধা থেকে তিনি সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান। সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হলে তো তিনি জীবনমুক্ত হবেন না। যাই হোক মধুসূদন সরস্বতী জীবনমুক্ত শব্দটা ব্যবহার করছেন। জীবনমুক্তি তামসিক আর রাজসিক যত গুণ ছিল, সবটাকে নষ্ট করে দেয়। ফলস্বরূপ জন্মজন্মান্তরের যত পাপ জমে ছিল, সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়, সেখান থেকে তিনি মোক্ষ পেয়ে যান।

আগে সন্ন্যাস, তারপর জ্ঞান, জ্ঞানাগ্নিতে সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই। চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণনা করছিলেন, *যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ*, জ্ঞান হওয়া আর সমস্ত কর্ম ভস্ম হয়ে যাওয়া এক। এনারা ছিলেন বড় ঋষি, মহাপুরুষ, তাঁরা এই কথা বলছেন। আবার অন্য রকমও আছে। মূল কথা হল, কাঠখড় অনেক পোড়াতে হবে। মধুসূদন সরস্বতীর ভাষায় এটাই গীতার সার। একটু পরে আমরা আরেকবার আচার্যের গীতা উপোদ্‌ঘাতে যাব।

আমাদের প্রথম ক্লাশে বলা হয়েছিল, গীতার উদ্দেশ্য মুক্তি, গীতার উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। যাঁরা প্রস্তুত তাঁরা সমস্ত কিছুকে সন্ন্যাস করে দেবেন। যাঁরা প্রস্তুত নন, তাঁরা কর্ম করবেন, প্রচুর কর্ম করে যেতে হবে। কর্ম করে করে শরীর মন ভরে যাবে। কর্মকে নিষ্কাম ভাবে করতে হবে, তার মানে ফলের কোন আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে কাজ যদি না করতে পারেন, তাহলে কর্মের সব ফল ঈশ্বরকে অর্পণ করে দেবেন। এই ভাবে কাজ করতে থাকলে, এখান থেকে আপনাকে টেনে সন্ন্যাসের দিকে নিয়ে যাবে, এই সন্ন্যাস বাহ্যিক না হয়ে মানসিক হয়ে যাবে। এটাই হল সমস্ত গীতার সার। এটাকেই ঠাকুর খুব সহজ ও সুন্দর করে গীতার সার বলে দিলেন, দশবার গীতা বললে যা হয়, সেটাই গীতার সার, অর্থাৎ ত্যাগী। ত্যাগী তো একদিনে হওয়া যাবে না, তার আগে চুটিয়ে কাজ করে যেতে হবে। জপধ্যান করাটাও কাজ, পূজা অর্চনা করাটাও কাজ। এটাকেই নিষ্কাম ভাবে করতে হয় আর তা নাহলে ঈশ্বরে ফল অর্পণ করে দিতে হয় – এটাই গীতার সার।

বলা হয় যে, গীতার উদ্দেশ্য কি, এটাকে দিয়ে গীতার প্রথম অধ্যায়ে সূচনা করা হল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গীতার বিষয়বস্তুকে সূত্রাকারে বলা হল। তাপরে তৃতীয় অধ্যায় থেকে সপ্তদশ অধ্যায়, এই পনেরটি অধ্যায়ে ওই সূত্রগুলিকে বিস্তারে বলছেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ে এসে এবার পুরো জিনিসগুলিকে গুটিয়ে আনা হচ্ছে। এটা যেন পুকুরে বা নদীতে বা সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য জাল ছড়িয়ে দেওয়ার পর জালটাকে এবার গুটিয়ে আনার মত ব্যাপার। সেইজন্য গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় সবার জন্য খুব আবশ্যক। কারণ অষ্টাদশ অধ্যায় হল পুরো গীতা এবং পুরো বেদের মর্ম, দুটোর সার এই অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। যেহেতু বেদ ও গীতার সার, সেইহেতু গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় খুব কঠিন। মাঝখানে কয়েকটা অধ্যায় খুব সহজ মনে হচ্ছিল, অষ্টাদশ অধ্যায় আবার কঠিন মনে হবে, কারণ এতে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার অনেক টেকনিক্যাল বিষয়কে নিয়ে আসা হয়েছে।

আচার্য বলছেন, আগের সতেরটি অধ্যায়ে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, অষ্টাদশ অধ্যায়ে এর অর্থটা বার করে মর্মটা পরিষ্কার করে উপস্থাপন করে দেওয়া হয়েছে। তার মানে অষ্টাদশ অধ্যায়কে গীতার শেষ অধ্যায় বলা যায় না, এটা হল একটা নিষ্কর্ষ, সমাপন; পুরো জিনিসটাকে সাজিয়ে বেদের তাৎপর্য, গীতার তাৎপর্যকে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হল। গীতার শুরু করার সময় প্রথম দিকে আমরা বলেছিলাম, আচার্য শঙ্কর একটা প্রচলিত কথা বলেছিলেন, বেদ হল হিন্দুদের মূল গ্রন্থ, সমস্ত বেদ কি বলতে চাইছেন সেটাকে খুব সুন্দর করে গীতাতে নিয়ে আসা হয়েছে। মূল বেদ বিশাল এক জ্ঞানরাশি, সমস্ত বেদ মুখস্ত করে ব্রাহ্মণরা মাথায় ধরে রাখতেন।

রামকৃষ্ণ মিশনে দক্ষিণ ভারতের অনেক সন্ন্যাসী আছেন। একজন সন্ন্যাসীকে আমি জানি, যিনি বেদের পরিবার থেকে এসেছেন। আমি একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ঋগ্বেদ এত বিশাল, এক হাজারের উপর সেখানে প্রার্থনা রয়েছে, ব্রাহ্মণরা কি করে সব মুখস্ত রাখেন'? উনি তখন বললেন – সাত আট বছর থেকে বাচ্চাদের বেদের ট্রেনিং দেওয়া শুরু হয়, মোটামুটি কুড়ি পঁচিশ বছরে ওরা পুরোটা মুখস্ত করে নেয়। আর একবার মুখস্ত করার অভ্যাস হয়ে গেলে বাকিগুলো সহজেই হয়ে যায়। কিন্তু সবাই এই বিশাল বেদ কি করে মুখস্ত করে মাথায় রাখবে? সম্ভব না, সংক্ষেপে বলুন। ব্যাসদেব তখন বেদের পুরো বক্তব্যকে গীতায় সংক্ষেপে নামিয়ে দিলেন। অষ্টাদশ

অধ্যায় বলে দিলেন, বেদ কি বলতে চাইছেন, গীতা কি বলতে চাইছেন। দ্বিতীয় অধ্যায় ছিল সূত্রাকারে আর অষ্টাদশ সব কিছুকে একটা জায়গায় নিয়ে আসা হল।

পুরো জিনিসটাকে যদি আরেকবার দেখে নেওয়া যাক। গীতার ভূমিকাতে আচার্য শঙ্কর প্রথমের দিকে বলেছিলেন, বেদ হলেন জ্ঞানরাশি। মানুষের জন্য বেদ দুটি পথ বলে দিলেন – জ্ঞানপথ ও কর্মপথ। যাঁরা বলছেন জগতের কোন কিছুই আমার লাগবে না, অর্থ আর কামের প্রতি আমার কোন ইচ্ছা নেই, স্বর্গের যাওয়ার কোন বাসনা নেই, তাঁরা সমস্ত কিছু ত্যাগ করে সন্ন্যাসের পথে এগিয়ে চলে যাবেন – এটাকে আচার্য বলছেন, নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। ভগবান যখন সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি চারজন কুমারকে এই নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের শিক্ষা দিলেন। এগুলো কাহিনী। কিন্তু সবাই তো নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম পালন করতে পারবে না, সংসারীরা পারবেন না, গৃহস্থরা পারবেন না। তাঁদেরকে শিক্ষা দিলেন, কিভাবে সংসারে থেকে ধর্ম পালন করা যায় – নাম দিলেন প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। প্রবৃত্তি মানে কর্ম করা, কাজে প্রবৃত্ত হওয়া। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম বলছে, তুমি যজ্ঞ কর।

মহাভারতে এসে এটাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। তুমি যেখানে আছ, সেখানে কুল, জাতি, বর্ণ, আশ্রম অনুসারে তোমাকে যে কর্ম করতে হচ্ছে, সেই কর্ম করেই তোমার মুক্তি হবে। বেদে এই ভাব নেই। বেদ ও মহাভারত, এই দুটোকে গীতা খুব সুন্দর ভাবে একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসছেন। গীতা বলছেন, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের যে কাজ, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের যে কাজ, শূদ্র শূদ্রের যে কাজ, সেই কাজটাকে তুমি যজ্ঞ ভাব নিয়ে কর, তোমার মুক্তি হবে। সামাজিক ও অর্থনীতিতে সাম্য নিয়ে আসাটা গীতার কাজ না, এগুলো দেশের সংবিধান করবে। গীতার কাজ মানুষকে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বেদ যেখানে যজ্ঞের কথা বলছেন, বেদ যেখানে নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের কথা বলছেন, সেখানে গীতা সব কিছুকে নিয়ে এলেন স্বধর্মে। স্বধর্মে এটাই বলছেন, তুমি যেখানে আছ সেখানেই তুমি স্বধর্ম পালন করে মুক্তির পথে চলে যেতে পারবে। তুমি ব্রাহ্মণ হয়ে যে কাজটি করছ, তুমি শূদ্র হয়ে যে কাজটি করছ সেটাকে যজ্ঞ ভাবে কর, তাতেই তোমার মুক্তি হবে। এটাকে যদি সমাজের কাজে লাগানো হয়, সেখানেও কিছু সফলতা তো আসবেই। কিন্তু গীতার মূল উদ্দেশ্য মুক্তি।

ব্রাহ্মণদের দায়ীত্ব দিয়ে বলে দেওয়া হল, এই প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম এবং নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম যেমনটি আছে তেমনটি তোমরা ধরে রাখবে। একটা বর্ণকে পুরো দায়ীত্ব দিয়ে দেওয়া হল। শঙ্করাচার্য বলছেন, কিন্তু পরে পরে এই ধর্মটা নষ্ট হয়ে গেল। গীতাতেও ভগবান বলছেন, *স কালনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ*, ভগবান বলতে চেয়েছিলেন, কালের প্রবাহে ধর্ম নষ্ট হয়ে হারিয়ে যায়, সেইজন্য ধর্মকে পুনঃস্থাপন করতে ভগবানকে বারবার অবতার হয়ে আসতে হয়, *সম্ভবামি যুগে যুগে*। তিনি এসে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের শিক্ষা দেন। দুটো অসুর বধ করা, দুটো রাক্ষসের মুণ্ডু কেটে উড়িয়ে দেওয়া, এগুলো অবতারের কাজ না। এই কাজগুলো আমরাও করে দিতে পারি, কিন্তু প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের শিক্ষা আমরা কোন দিন দিতে পারব না, একমাত্র ভগবানই এই দুটো ধর্মের শিক্ষা দিতে পারেন।

আমরা গীতাতে এখানে ভগবানের কথাই শুনিয়ে দিচ্ছি, ভগবান এই এই বলেছেন। আচার্য বলছেন, মানুষের মধ্যে কাম ও লোভ যখন জেগে ওঠে তখন সে ধর্মকে হারিয়ে ফেলে। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম শিক্ষা দেয় – সংসারে থেকে কিভাবে নিষ্কাম কর্ম বা ঈশ্বরে কর্মফল অর্পণ করে কাজ করা যায়। যিনি সংসার ধর্ম পালন করতে চাইছেন না, সমস্ত কিছু থেকে যিনি বৈরাগ্য নিয়ে নিয়েছেন, তিনি হলেন সর্বকর্মত্যাগী সন্ন্যাসী, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, তাঁর জন্য নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। পুরো গীতার যে বক্তব্য সেটাকে আমরা সংক্ষেপে বলে দিলাম। এখান থেকে এবার আমরা শুরু করছি অষ্টাদশ অধ্যায়। আটাত্তরটি শ্লোকে পুরো জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করবেন, যার মধ্যে কিছু গ্রন্থস্তুতিও আছে।

এই অধ্যায়ের ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে আদিতেই শঙ্করাচার্য বলছেন, *সর্বস্য এব গীতাশাস্ত্রস্য অর্থঃ অস্মিন্ অধ্যায়ে উপসংহৃত্য*, সমস্ত গীতার যে অর্থ, গীতা কি বলতে চাইছেন, এই অধ্যায়ে সেটাকে এক জায়গায় রেখে দেওয়া হয়েছে। *সর্বঃ চ বেদার্থো বক্তব্য*, চারটি বেদের জ্ঞানরাশি এত বিশাল যে মনে রাখা খুব কঠিন। এখনও কিছু কিছু ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁরা বেদকে মুখস্ত করে ধরে রাখেন। দক্ষিণ ভারতে অনেক জায়গায়, কাশীতে এবং আরও কিছু কিছু জায়গায় ব্রাহ্মণরা আছেন, যাঁরা বেদ শিক্ষার জন্য টোল চালান। আমি একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই কামিনী-কাঞ্চনের যুগে, ভোগসর্বস্ব যুগে এখনও কি করে মানুষ বেদ পড়তে যায়? উনি বললেন, ওখানে অনেকেই আছেন যাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস যে বেদই একমাত্র আমাদের রক্ষা করেন। সেইজন্য ওনারা সংস্কৃত ভাষা শিখে টোলে বেদ অধ্যয়ন করেন। এনারা চাকরি করেন, সংসার ধর্ম পালন করেন, কিন্তু তাঁদের শ্রদ্ধা পুরোপুরি বেদের প্রতি। আচার্য বলছেন, *ইতি এবম্ অর্থঃ অয়ম্ অধ্যায় আরভ্যতে*, সমস্ত বেদের অর্থ কি আর গীতার অর্থ কি, এটার জন্য এই অধ্যায় শুরু করা হচ্ছে। বেদের যাবতীয় বক্তব্য গীতার মধ্যে রাখা হয়েছে, আর গীতার যে তাৎপর্য, এটাকে সুন্দর করে গুছিয়ে অষ্টাদশ অধ্যায়ে রাখা হয়েছে।

যদিও আগে আগে এই শব্দগুলি গীতাতে আনা হয়েছে, তাও অর্জুন সন্ন্যাস ও ত্যাগ এই দুটি শব্দকে নিয়ে জিজ্ঞেস করছেন।

অর্জুন উবাচ
সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিষূদন।।১।।

(অর্জুন বললেন –হে মহাবাহো, হে হৃষীকেশ, হে কেশিনিষূদন, আমি সন্ন্যাস-শব্দের ও ত্যাগ-শব্দের তত্ত্ব (অর্থ) পৃথকভাবে জানতে ইচ্ছা করি।)

হে মহাবাহো, হে হৃষীকেশ, হে কেশিনিষূদন, সন্ন্যাস জিনিসটা কি, ত্যাগ জিনিসটা কি, এই দুটো জিনিসটা আমি একটু আপনার কাছে পরিষ্কার করে বুঝতে চাইছি। আগের আগের অধ্যায়গুলিতে ভগবান ত্যাগ, সন্ন্যাস নিয়ে অনেক কথাই বলেছেন, সেইজন্য এখানে বিস্তারে বলার দরকার নেই। কেশি একটা ঘোড়া, আসলে সে ঘোড়ারূপী একটা অসুর ছিল, ঘোড়ার রূপ ধারণ করে প্রচুর অত্যাচার করত। ভগবান তাকে বধ করেছিলেন, সেইজন্য ভগবানের এক নাম কেশিনিষূদন। কিছু কিছু সম্প্রদায়ের লোকেরা আচার্য শঙ্করের খুব নিন্দা করেন; কিভাবে করে একটু পরেই বুঝতে পারবেন।

তার আগে এখানে আমরা একটি বাক্য বলছি, তাতেই বোঝা যায় আচার্য কত উচ্চস্তরের আচার্য ছিলেন, এই বাক্য দিয়েই বোঝা যায় কিভাবে তিনি হলেন হিন্দু ধর্মের ঠিক ঠিক রক্ষক – *কেশিনামা হয়চ্ছদ্মা অসুরঃ তং নিষূদিতবান্ ভগবান্ বাসুদেবঃ*, আচার্য গীতা ভাষ্যের যে ভূমিকা রচনা করেছিলেন, যেটাকে উপোদ্‌ঘাত বলা হয়, সেখানে তিনি ভগবানকে বলছেন সর্বশক্তিমান, তাঁর ছটি ঐশ্বর্য –জ্ঞান, ঐশ্বর্য, বল, বীর্য, তেজ ও শক্তি। ভগবান এই ছটি ঐশ্বর্যে সদাসম্পন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ভগবান হয়ে অবতরণ করলেন, তখনও তাঁর মধ্যে এই ছটি ঐশ্বর্য বিদ্যমান ছিল, এই ছটি ঐশ্বর্য ঠাকুরের মধ্যে সব সময় আছে। আচার্য সেখানে আরও বলছেন, *ভূতানুজিঘৃক্ষয়া*, জীবের মঙ্গলের জন্য তিনি *স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য*, নিজের মায়াকে, নিজের শক্তিকে বশে এনে এই সংসারে প্রবৃষ্ট হন।

মহাভারতে যক্ষ ও যুধিষ্টির সংলাপে যুধিষ্ঠিরের প্রতি যক্ষের একটা প্রশ্ন ছিল, *কিম্ আশ্চর্যম্*। এই জগতে সবচেয়ে আশ্চর্য কি? যুধিষ্ঠির বলছেন, প্রতিনিয়ত মানুষ মরছে, কিন্তু মানুষ মনে করে আমি কোন দিন মরব না। আমাকে যদি প্রশ্ন করা হত, *কিম্ আশ্চর্যম্*; আমি বলতাম, যিনি অনন্ত

তিনি মায়ার আবরণে নিজেকে ঢেকে অবতার হয় কি করে আসেন? সত্যিই আমি এটা এখনও বুঝতে পারিনা। কারণ এটা বোঝা যাবে না। কথামৃতে ঠাকুর অনেকবার বলছেন, ঋষিরা শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে বলছেন, আমরা জানি তুমি রাজা দশরথের ব্যাটা, আমরা তোমাকে ভগবান মানতে পারব না। শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান মুখে বলে দেওয়া যায়, শ্রীরামকে, শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান মুখে সবাই বলে দিতে পারে, আবার ইদানিং রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বলে বেড়ায় শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভগবান। যারা বলছে, তারা কি বোঝে ভগবান কি জিনিস, মায়া কি, অবতার কি? যিনি অনন্ত তিনি কিভাবে সাড়ে তিন হাতের মানুষের শরীরে প্রবেশ করে অবতার হয়ে আসেন?

পাশ্চাত্য জগতে খ্রীশ্চান ধর্ম, সেই খ্রীশ্চান ধর্মেও ওই রকম আছে, ভগবান নিজের সন্তানকে পাঠালেন, ভগবানের সন্তানও ভগবান। কিন্তু এই মায়ার জগতে তিনি যে ঢুকলেন, কি করে ঢুকলেন, কেন ঢুকলেন, খ্রীশ্চানদের কারুর কাছে এর কোন ব্যাখ্যা নেই। ব্যাখ্যা তো দূরের কথাত, সেই মায়া শব্দটুকুও তাদের কাছে নেই। তাদের যদি জিজ্ঞেস করেন, যীশু তো অনন্ত, তিনি ভগবান, কিন্তু তিনি কি করে এই মানব দেহ ধারণ করলেন? কোন উত্তর তাদের কাছে নেই। ওরা শুধু ফ্রী উইল কি, ডিভাইন উইল কি, ঈশ্বর ট্রানসেনডেন্ট না ইমানেন্ট; এই ধরণের সব বড় বড় কথা নিয়ে বলবে, কিন্তু যীশুকে নিয়ে কোন ব্যাখ্যা নেই। ঋষিদের পরম্পরা না থাকলে এই রকমই হয়।

যদি আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করে, *কিমাশ্চর্যম্*, এই জগতে আশ্চর্য কোনটা? যিনি অনন্ত, তিনি ফাল্গুনের দ্বিতীয়াতে কিভাবে জন্ম নিলেন, এর থেকে আর আশ্চর্যের কি হবে। কিন্তু তিনি যখন জন্ম গ্রহণ করেন তখন তিনি জ্ঞান, ঐশ্বর্য, বল, বীর্য, তেজ ও শক্তি এই যে ছটি ঐশ্বর্যে সদা সম্পন্ন হয়ে আসেন। এই জিনিসটা বিষ্ণু পুরাণে আছে, আচার্য তাঁর ভাষ্যে বিষ্ণু পুরাণ থেকে এনে দেখাচ্ছেন, বেদের যা বক্তব্য পুরাণেরও সেই একই বক্তব্য এবং পুরো গীতার সেই একই বক্তব্য, মনুস্মৃতিরও সেই একই বক্তব্য। কি সুন্দর বলছেন, ঘোড়ার রূপ ধারণ করে কেশি নামের অসুরকে ভগবান বধ করেছিলেন, তাই ভগবানের আরেক নাম কেশিনিষূদন, যেমন মা দূর্গার নাম মহিষাসুরমর্দিনী।

দ্বিতীয় শ্লোক থেকে ভগবান অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করছেন। আচার্য শঙ্কর এখানে বলছেন, আগে আগে গীতায় ত্যাগ ও সন্ন্যাস এই দুটো শব্দ অনেকবার এসেছে, কিন্তু পরিষ্কার করে বলা নেই, যদিও সেখানে আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে এই দুটি শব্দের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেছেন।

এর আগে আমরা দেখলাম আচার্য বলছেন, অষ্টাদশ অধ্যায় হল গীতার সার আর বলছেন বেদার্থ, অর্থাৎ বেদ কি বলতে চাইছে, বেদের সার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলে দেওয়া হয়েছে। বেদের উদ্দেশ্য একটাই, কি করে মানুষ পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে, কি করে মানুষ ঈশ্বরে পৌঁছাতে পারে। বেদে দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনাদি করা হয়েছে, বেদে যজ্ঞের বিধান আছে, কর্মের বিধান আছে, কিন্তু সেই বেদ উপনিষদে এসে পুরোপুরি ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, সেই উপনিষদের সার এই অষ্টাদশ অধ্যায়। ঈশোপনিষদের প্রথম যে দুটি মন্ত্র, এই দুটি মন্ত্র হল বেদের সার, উপনিষদের সার, হিন্দু ধর্মের সার, সমস্ত ধর্মের সার। প্রথম মন্ত্রে বলছেন, *ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।।* এর মূল অর্থ হল, তুমি যদি সেই পরমাত্মাকে লাভ করতে চাও, তাহলে সমস্ত কিছুকে দেখবে সব ঈশ্বরেরই প্রকাশ। কিন্তু সবাই তো এটা পারবে না, যারা পারবে না, তাদের জন্য দ্বিতীয় মন্ত্রে বলছেন তুমি কাজ করতে থাক, *কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে।।* কাজ করবে কিন্তু কর্মের ফলে তুমি লিপ্ত হবে না।

হিন্দু ধর্মে ত্যাগের ভাব এত বেশি যে, বেশির ভাগ হিন্দু কোন না কোন একটা সময়ে ভাবে, আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাব। আগেকার দিনে এই ভাবটা খুব বেশি মাত্রায় ছিল, ইদানিং কালে

অবশ্য একটু কমেছে। ত্যাগের ভাব এটা আমাদের পরম্পরা থেকে আসছে। আমার এক দক্ষিণ ভারতীয় বন্ধু আছেন, তাঁর কাছে ওখানকার বিবাহের একটা প্রথা শুনেছিলাম, শুনে আমার ভীষণ ভাল লেগেছিল। বিবাহ করতে এসে বর বলে, 'আমি বিবাহ করব না, সব কিছু ত্যাগ করে আমি কাশী চললাম, আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাব'। কন্যার বাবা তখন বরের হাত ধরে বলে, 'না বাবা তোমার কাশী যেতে হবে না, সন্ন্যাসী হয়ে কাজ নেই, আমার মেয়ে তোমার জীবনসঙ্গিনী হয়ে তোমাকে সেটাই উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে, যে উপলব্ধি তুমি সন্ন্যাসী হয়ে কাশী গিয়ে করবে'। বিবাহের মত একটা অনুষ্ঠান, সেখানেও আমাদের পরম্পরার কি এক উচ্চ আদর্শকে প্রথার মাধ্যমে নিয়ে আসছেন। ছেলে বলছে আমি গৃহস্থ হব না, আমি সন্ন্যাসী হব; শ্বশুর বলছেন, না বাবা, তুমি গৃহস্থ ধর্ম পালন কর, আমার কন্যা, যে তোমার স্ত্রী হতে যাচ্ছে, সে তোমাকে এই পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

এর তাৎপর্য হচ্ছে, সব কিছুতেই আমাদের উদ্দেশ্য হল পরমাত্মা লাভ। ধর্মের আদেশ পালন করা উদ্দেশ্য না, উদ্দেশ্য স্বর্গে যাওয়া না, উদ্দেশ্য হল পরমাত্মা লাভ। কেন পরমাত্মা লাভ? কারণ তিনি আমার স্বরূপ, তিনি আর আমি অভিন্ন, আমরা এক। ভারতের জনগণের মনের মধ্যে তাই আমি সন্ন্যাসী হব, এই একটা সুপ্ত ইচ্ছা প্রথম দিন থেকে বসে আছে। আগেকার দিনে বাচ্চারা সাধু সাধু খেলত, ইদানিং অবশ্য টেলিভিশনাদি এসে যাওয়ার পর থেকে বাচ্চাদের আর সে-রকম খেলাধূলা করতে দেখা যায় না। স্বামীজীও ছোটবেলা বন্ধুদের নিয়ে ধ্যান ধ্যান খেলা করতেন। কিন্তু এর থেকেও বেশি হল, পঞ্চাশ বছর আগে পর্যন্ত ভারতীয় যে সভ্যতা, বিশেষ করে আমাদের গ্রামের সভ্যতা, যেখানে সাধু সন্ন্যাসীরা ছিলেন চলমান ধর্ম। সাধুবাবারা গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে ঘুরতেন, ঘুরে ঘুরে সাধুবাবারা ধর্মের শিক্ষা দিতেন। মনুস্মৃতিতে বলছেন, সাধু গ্রামে তিন দিন আর শহরে পাঁচ দিন থাকবেন। সাধু এই তিন দিন যখন ভিক্ষা করতে যাবেন, সেখানে গ্রামের লোকেদের দুটো ধর্মের কথা বলবেন। সন্ধ্যাবেলায় তাঁর কাছে চারজন লোক আসবে, এসে তাঁর কাছে বসে ধর্মীয় কথা ও কাহিনী শুনবেন। এই সাধুবাবাদের মানুষজনরা সম্মান করত। লোকেরাও বুঝতে পারে কে কেমন সাধু। কাদের সম্মান করছেন? এই ধরণের গাছতলার সাধুদের। গাছতলার সাধুকে সম্মান করা মানে, কোথাও তাদের ত্যাগের ভাব আসছে।

দ্বিতীয় হল, অভাব জিনিসটা ভারতে চিরদিন খুব বেশি আকারে ছিল, কাউকে ভেবে ত্যাগ করতে হত না, ত্যাগ এমনিতেই হয়ে যেত। খুব সুন্দর একটা চলিত কথা আছে, পাইনে তাই খাইনে, আমি পাই না তাই খাই না। আমার অত টাকা কোথায় যে কিনব, তাই খাই না। মূল কথা হল, এই যে ত্যাগের ভাব, আমাকে এগুলো ছাড়তে হবে, ভারতভূমিতে এই ভাব আকাশে, বাতাসে, জলে ছেয়ে আছে। ভারতে এই ছবিটা গত পঞ্চাশ বছর আগে পর্যন্ত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, শাস্ত্রের ভাষ্যকাররা ভুলভাল ব্যাখ্যা করে, বিশেষ করে আচার্য শঙ্করের পরে যাঁরা অদ্বৈত বেদান্তের পথে এলেন, এনারা আচার্য শঙ্করকে ছেড়ে নিজের মত বেদান্তের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলেন। আচার্য শঙ্কর বললেন ব্রহ্মই সত্য, আর আচার্যের পরবর্তি বেদান্তীরা মায়াবাদ এন মায়াকেই প্রাধান্য দিতে শুরু করলেন, তাঁদের মতে সব মায়া। কোথায় জোর দিতে হবে সেটার দিকে এনারা গেলেন না। আচার্য শঙ্কর জোর দিলেন ব্রহ্মই সত্য, তোমার চিন্তন, তোমার মনন, তোমার ধ্যান, নিদিধ্যাসন সব ব্রহ্ম চিন্তনে লাগাও। ঠাকুরও বারবার বলছেন, ঈশ্বরই সত্য। পরবর্তি কালের অদ্বৈত বেদান্তীরা মায়া জিনিসটাকে জোর দিতে গিয়ে মায়াবাদে নেমে গেলেন।

কিছু দিন আগে মাধ্বাচার্যের এক ভক্ত আমাকে অভদ্র ভাষায় একটা কমেন্ট করে পাঠালেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি অভদ্র ভাষা কেন ব্যবহার করতে গেলেন? তিনি তার উত্তরে বললেন, 'আপনারা তো মায়া মানেন, এটা তো অভদ্র না, এটা তো মায়া'। শেষে বলছেন, আমি একটু মজা করছিলাম। বাধ্য হয়ে আমাকে খুব কড়া করে উত্তর দিতে হল। উত্তম বৈদ্যের মত এদের যদি কড়া

করে উত্তর না দেওয়া হয়, এরা পেয়ে বসবে। আমি তাঁকে বললাম, 'আপনার এই মজাকে আমিও মায়া রূপেই নিলাম। আপনারা আসলে হলেন confused realismএর পৃষ্টপোষক, দ্বৈতবাদী কিনা, যাঁরা জগৎকে সত্য বলে নেন, সেইজন্য আপনার কথাগুলোকেও আমি অভদ্র ভাষাতেই নিলাম। দুটোকেই নিতে হবে, কিছুটা আপনাকেও নিতে হবে, কিছুটা আমাকেও নিতে হবে, আপনি যেটা বলছেন মজা, সেটা আমার কাছে মায়া, মিথ্যা। আর আপনার ব্যবহারকে আমি অভদ্র বলে নিলাম, কারণ আপনি হলেন confused realist। আপনি একটা জিনিসকে না বুঝে, তত্ত্বকে পাশ কাটিয়ে যখন তর্ক করতে আসছেন, তখন শঠং শাঠ্যে সমাচারেৎ, তোমাকে ঠোকরানো ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। অন্য ধর্মের দুষ্ট লোকেরা, কিছু কিছু অন্য মতের লোকেরা, যাদের জীবন দর্শন আলাদা, কি নোংরা ভাষায় হিন্দু ধর্মকে নিন্দা করে, কল্পনা করা যায় না। কোন উপায় নেই, ওই ভাষাতেই আমাদেরকেও উত্তর দিতে হবে। স্বামীজী জাহাজে এক পাদরীকে বলেছিলেন, আর একটি শব্দ বললে তোমাকে ছুঁড়ে সমুদ্রে ফেলে দেব। সঙ্গে সঙ্গে পাদরি চুপ মেরে গেল।

মায়া নয়, আচার্য শঙ্কর জোর দিলেন ব্রহ্মবাদে, ব্রহ্মই সত্য, সব কিছু ব্রহ্ম। সেইজন্য আসে ত্যাগ, সব কিছু ত্যাগ, সংসার ত্যাগ, কারণ ব্রহ্মই আছেন। ত্যাগ তো একদিনে হবে না। ঈশাবাস্যোপনিষদে যেমন বলা হল, *ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।।* কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য, ভুল বোঝাবুঝির কথা যেটা বলা হল, না বুঝে বেদান্তকে যেখানে সেখানে লাগিয়ে দিচ্ছে। একটা দুটো বেদান্তের কথা শিখে নিয়ে সবাই নামের আগে বেদান্তাচার্য লাগিয়ে দিচ্ছেন, আর সবাইকে বেদান্তের শিক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। ঠাকুর বলছেন, নিজে শুতে পায় না, শঙ্করাকে ডাকছে; নিজে বুঝতে পারে না, তারাই শিক্ষা দিচ্ছে। এখন একটা হয়েছে গাইডেড মেডিটেশান কোর্স। আমরা তো সব জানি, সব কজনকে জানি, আমরা ভিতরের লোক, চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায় কে কত জপধ্যান করে। এরা গিয়ে ধ্যান শেখাচ্ছে, জপ করার বিধি শেখাচ্ছে। এই ধরণের লোকেরা যখন বেদান্ত শেখায় তখন এই রকমই হয়। কি রকম হয়?

বৈরাগ্য হয়ে গেল। কিসে বৈরাগ্য হয়ে গেল? কর্মের প্রতি। এটাই দেশের দুর্ভাগ্য ডেকে আনল। গীতা বলছেন কর্মফলের ত্যাগ, ভারত নিল কর্মের ত্যাগ, শুরু হল ভারতের সর্বনাশ। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে নিয়ে গেল। এর গোড়াতে রয়েছে বৌদ্ধ ধর্ম আর জৈন ধর্ম। ভারতে নিয়ে এলো ভিক্ষুকের ধর্ম, হাতে ভিক্ষা পাত্র ছাড়া কিছু থাকবে না, ভারতবাসী এটাই নিয়ে নিল। কিন্তু কর্ম করে করে ভিতরে একটা যে জোর আসবে, আর বাইরে অভ্যুদয়ের যে বান আসবে, কর্মত্যাগ করে দেওয়ার ফলে সেই জোরটাও আসেনি, বানও আসেনি। ভিতরে দম নেই, ত্যাগের পথে পা দিয়ে সর্বনাশ করে দিয়েছে। ঠাকুর বলছেন, ওরে পোদো শাঁক বাজিয়ে তুই করলি গোল; হৃদয় মন্দিরকে কর্ম করে শুদ্ধ করা হয়নি, বিগ্রহ অর্থাৎ ঈশ্বরকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেনি, কিন্তু ভোঁ ভোঁ করে শাঁক বাজিয়ে যাচ্ছে। ভগবান বুদ্ধ যখন ভিক্ষু ধর্ম শুরু করলেন, তখন হাজারে হাজারে লোক ভিক্ষু হয় গেল। বেশির ভাগ মানুষ ছিল যারা নিজের সমস্যাটাকে এড়িয়ে যাবার জন্য ভিক্ষু হয়ে গেল। আর যেটা বলা হল, তখন মানুষের কাছে আদর্শ ছিল সাধুবাবারা, সাধু সন্ন্যাসীরা ত্যাগী ছিলেন, লোকেরাও মনে করল ত্যাগটাই আসল।

এখন উলটো, সাধুবাবারা নিজেরাই ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত নন, কিন্তু অপরকে ত্যাগের উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। লোকেরা যে জিনিসগুলো ত্যাগ করে দিচ্ছে, সেই জিনিসগুলি নিয়ে সাধুবাবারা বিশাল বিশাল আশ্রম বানাচ্ছে। ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সটা দেখলেই বোঝা যায় এখনকার সাধুবাবারা কি রকমের ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত। এই সমস্যা আগেও ছিল, কারণ তখন মানুষের কাছে সব কিছু পরিষ্কার ছিল না —আমাকে কি ত্যাগ করতে হবে। ভগবান পরিষ্কার করে গীতায় বলে দিচ্ছেন, ত্যাগ কি, সন্ন্যাস কি। কিন্তু এখানে অর্জুন প্রশ্ন করছেন, ভাল যে অর্জুন প্রশ্ন করছেন। কারণ অর্জুন পুরো দস্তুর পণ্ডিত নন,

আর একেবারেই যে কিছুই জানতেন না, সেটাও না। অর্জুন এর আগে বনে বনে যে ঘুরে বেড়িয়ে ছিলেন, সেই সময় তাঁর অনেক সাধুসঙ্গ হয়েছে, শাস্ত্রের অনেক কথা, ধর্মের অনেক কথা শুনেছেন।

আমরা যেমন অনেক সময় প্রশ্ন করি, ঋষি, মুনি, সন্ন্যাসী, এই নামগুলোর তফাৎ কি, ঠিক সেই রকম অর্জুন প্রশ্ন করছেন, ত্যাগ আর সন্ন্যাসের তফাৎ কি। এই প্রশ্নগুলি হল ধর্মের টেকনিক্যাল প্রশ্ন, তার মানে এই প্রশ্নের উত্তর জেনে আমাদের জীবনে কোন কাজে লাগবে না, শুধু কিছু তথ্য জেনে নেওয়ার জন্য এই প্রশ্ন। কিন্তু অর্জুনের এই প্রশ্ন আমাদের জন্য যে পুরোপুরি টেকনিক্যাল প্রশ্ন হবে, তা না। প্রথমে যেটা বলা হল, লোকেদের মনে এই ভাবটা কাজ করত, আমি ত্যাগী হব, আমি সন্ন্যাসী হব। এদের জন্য প্রথমে জানা দরকার, ত্যাগী কে হতে পারে, ত্যাগ কে করতে পারে, সন্ন্যাসী কে হতে পারে। ভগবান প্রথমে এই জিনিসটাকে নিয়ে আলোচনা করছেন।

আমাদের আলোচনা শুরু করার আগে কয়েকটা কথা জেনে নেওয়া খুব দরকার। ব্যাসদেব যখন গীতা রচনা করছেন, সেই সময় লোকেদের বিভিন্ন মত ছিল। কেউ বলতেন সকাম কর্ম ত্যাগ কর, নৈমিত্তিক কর্ম ত্যাগ কর; কেউ আবার নিত্যকর্ম ত্যাগ করার কথা বলতেন। এখানে তাই আমাদের জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কর্ম কয় প্রকার। আগেও আমরা এই জিনিসটাকে নিয়ে আলোচনা করেছি, কিন্তু এখানে যেহেতু বিষয়টা আসছে তাই আরও পরিষ্কার করে বলা হচ্ছে। যত রকম কর্ম আমরা করি, হিন্দু শাস্ত্র মতে কর্মগুলিকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে সাজিয়ে দেওয়া যায়।

প্রথমটা হয় নিত্যকর্ম, যে কর্ম আমাদের সবাইকে নিত্য করতে হবে। যেমন সন্ধ্যাবন্দনা, ইষ্টমন্ত্রের জপ, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, এই তিনটে কর্ম প্রত্যেক দিন করতে হবে। সন্ধ্যাবন্দনা এখন উঠে গিয়ে সেই জায়গায় এসেছে জপ, ধ্যান, পাঠ; এগুলো প্রত্যেক দিন অবশ্যই সবাইকে করতে হয়। আর এই সমস্ত কর্ম পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যেও রয়েছে। পঞ্চ মহাযজ্ঞের উপর আমরা অনেকবার বলেছি। নিত্যকর্ম যদি না করা হয়, বলছেন, পাপ লাগে। নিত্যকর্ম নিয়ে খুব সুন্দর কথা বলা হয় – *অকরণে প্রত্যবায়*, যদি নিত্যকর্ম না করা হয়, তাহলে পাপ লাগবে। পঞ্চ মহাযজ্ঞ করলে, সব কটা নিত্যকর্ম ওর মধ্যে চলে আসে। দ্বিতীয় হল নৈমিত্তিক কর্ম। বিশেষ বিশেষ দিনে যে কর্ম করা হয়, যেমন দূর্গাপূজার সময় দূর্গাপূজা করা, কালীপূজার সময় কালী পূজা করা, বিহার ইউপিতে ছট ব্রত পালন করে, এগুলো নৈমিত্তিক কর্ম। তৃতীয় হয় কাম্যকর্ম। আগেকার দিনে রাজারা উচ্চ স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করতেন, বা কেউ বলছেন আমার সন্তান চাই, তিনি সন্তান প্রাপ্তির জন্য একটা যজ্ঞ করলেন, কেউ টাকা-পয়সা সম্পদ বৃদ্ধির জন্য যজ্ঞ করতেন, এগুলো সবই হল কাম্যকর্ম।

চতুর্থ হল প্রায়শ্চিত্ত কর্ম; জান্তা বা অজান্তায় কিছু ভুল হয়ে গেছে, সেটাকে ঠিক করার জন্য কিছু কর্ম করতে হয়, এই কর্মকে বলা হয় প্রায়শ্চিত্ত কর্ম। কেউ যদি দশ হাজার জপ রোজ এক মাস ধরে করে, সে অবশ্যই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবে। মন তার এমন এক উচ্চ অবস্থায় চলে যাবে যে, ভবিষ্যতেও সে কোন পাপ কর্মে প্রবৃত্ত হবে না, তার সাথে পুরনো পাপগুলিও চলে যাবে। যেমন তীর্থে যাওয়া, একাদশী ব্রত করা, চান্দ্রায়ণ ব্রত করা, এগুলো প্রায়শ্চিত্ত কর্মের অন্তর্ভুক্ত। মনুস্মৃতিতে মনু বলছেন, দিনে হাজার বার গায়ত্রী এক মাস ধরে জপ করলে সে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। আর পঞ্চম একটা কর্ম হল নিষিদ্ধ কর্ম, যে কর্মগুলি করলে পাপ লাগে, যেমন মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা, হিংসা করা ইত্যাদি।

ধর্ম জীবন শুরু করার জন্য প্রথমে নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান বন্ধ করতে হবে। ধর্ম জীবনে নিষিদ্ধ কর্মের তো কোন প্রশ্নই নেই। কিন্তু সমস্যা হয় নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম ও কাম্যকর্মকে নিয়ে। এই নিয়ে বিভিন্ন মতের ঋষিরা বিভিন্ন রকম মত ব্যক্ত করেন। গীতা সমন্বয় শাস্ত্র, সমস্ত মতকে এক জায়গায় নিয়ে আসছেন। বিভিন্ন মতের কথা বলে ভগবান বলবেন, আমার মতে সন্ন্যাস এই ভাবে আসবে। আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করে বলছেন, সন্ন্যাসও যা ত্যাগও তাই, দুটো আলাদা কিছু

না। কিন্তু ঈশোপনিষদের প্রথম দুটি মন্ত্রকে যখন ওই ভাবে নেওয়া হয়, তখন জিনিসটা আরও পরিষ্কার হয়। এতটুকু বলার পর এবার আমরা বিভিন্ন মতে কি বলা হয়েছে সেটা দেখে নিয়ে গীতার মূল শ্লোকে যাব। জিনিসটা একটু টেকনিক্যাল বলে আমাদের একঘেঁয়েমি আসতে পারে, কিন্তু নিজের বোঝার জন্য এগুলো শুনে রাখাটা খুব দরকার। কারণ এই ধরণের মতবাদ সমাজে এখনও আছে। প্রথম শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্ন, সেটার আলোচনা আমরা করে নিয়েছি। দ্বিতীয় শ্লোকে বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ
কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ।।২।।

(শ্রীভগবান্ বললেন –স্বর্গাদি ফলপ্রদ অশ্বমেধাদি কাম্য কর্মের পরিত্যাগকেই (অনুষ্ঠানকেই) পণ্ডিতগণের কেউ কেউ সন্ন্যাস বলে জানেন। যে সকল নিত্য বা নৈমিত্তিক কর্ম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, এবং সেই সব কর্মের যে ফল অনুষ্ঠাতার হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেই সমস্ত ফলের আকাঙ্ক্ষা-পরিত্যাগকে জ্ঞানিগণ ত্যাগ বলে থাকেন।)

কবি হলেন যিনি ত্রিকালদর্শি। ত্রিকালদর্শি মানে এই নয় যে, যিনি আমাদের তিনটে কালকে, ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমানকে দেখেন; ত্রিকালদর্শি মানে যিনি পুরো ছবিটাকে এক সঙ্গে দেখেন। ফলে ওনার জন্য ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান বলে কিছু থাকে না। যাঁরা মনে বাঁধা, তঁদের জন্য ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যত থাকে। যেমন বাচ্চারা যখন পড়ে তখন তারা একটা একটা শব্দকে ধরে ধরে পড়ে। কিন্তু সেই বাচ্চা বড় হয়ে যাওয়ার পর লাইন বাই লাইন পড়ে। কিন্তু আরও স্পীড যদি বেড়ে যায় তখন তারা পাতার পর পাতা পড়ে নেবে, স্বামীজী যেমন পড়তেন, পুরো পাতাটাকে এক দৃষ্টিতেই দেখে নিচ্ছেন। তেমনি কবি মানে পুরো সৃষ্টিকে যিনি একটা দৃষ্টিতেই দেখে নিচ্ছেন, ফলে তাঁর জন্য ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যত বলে কিছু নেই। ঈশ্বরই একমাত্র কবি, কবি ঈশ্বরের একটা নাম। তাহলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কবি কেন বলা হচ্ছে? একই সম্মান দেওয়ার জন্য বলা হয়।

কবি মানে ক্রান্তদর্শি, কবি মানে যিনি ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যত তিনটেকে একসাথে দেখেন। এখানে বলছেন, যাঁরা ঋষি, কবি ও মণীষীরা ছিলেন, তাঁদের অনেক পণ্ডিতরা কাম্য কর্মের ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলেন, *কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ*। কাম্য কর্মের ত্যাগ করলেই হবে। এটা আমাদের হিন্দুদের একটা মত, মনে কোন কামনা-বাসনা রেখ না, তাহলেই সব হবে।

সর্বকর্মলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ, আর যাঁরা বিচক্ষণ জ্ঞানী পুরুষ তাঁরা সমস্ত কর্মফলের ত্যাগকে সন্ন্যাস বলেন। বিচক্ষণ শব্দটাও খুব সুন্দর একটা শব্দ, উপনিষদে *বিচচক্ষিরে* শব্দ আসে। হিন্দু ধর্ম শুধু ধর্মগ্রন্থ দিয়ে চলে না। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, হিন্দুদের ধর্ম সনাতন ধর্ম, ঋষিদের ধর্ম। হিন্দু ধর্মের বাজনা ঋষিরাই বাজান, ভগবানের এখানে কিছু নেই। বলবেন, এখানে ভগবানই তো বলছেন। ভগবান বলছেন ঠিকই, কিন্তু ব্যাসদেবই ভগবানের পুরো বক্তব্যকে গুছিয়ে এক জায়গায় রেখে দিচ্ছেন। আর সৃষ্টির সময় ভগবান নিজে সবার জন্য বেদ দিয়ে দিলেন। যে অর্থে ভগবান এসে বলছেন, বা ভবিষ্যতে বলবেন, ওই অর্থে বেদ হয় না। তাহলে থাকছেন দুই জন – ঋষি যাঁকে কবি বলা হচ্ছে আর কখন বলা হচ্ছে বিচক্ষণ। বিচক্ষণ মানে, তাঁর দৃষ্টি এত পরিষ্কার যে, কোনটা ঠিক কোনটা ভুল স্পষ্টত বুঝতে পারেন। ঋষি মুনিরা বলছেন, অশ্বমেধাদি যে সকাম কর্ম, এই সকাম কর্মের ত্যাগই সন্ন্যাস। সকাম কর্মের ত্যাগের কথা বলার পর বলছেন, নিত্যনৈমিত্তক কর্মের ফল যদি ত্যাগ করে দেওয়া হয়, তখন এটাকে বলে ত্যাগ। কাম্য কর্ম যদি কেউ ছেড়ে দেয়, যেমন সন্ন্যাসী সমস্ত গৃহস্থ কর্ম ছেড়ে দিয়েছেন, তাতে তাঁর কাম্য কর্ম এমনিতেই পড়ে গেল।

বলছেন, কাম্য কর্ম ত্যাগ করলেও সন্ন্যাসী নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম করতে থাকবেন, এটা কিন্তু প্রাচীন মত, গীতার মত না। আমরা সন্ন্যাসীরা যেমন বেলুড় মঠে নিত্যপূজা করছি, বিশেষ দিনে দূর্গা পূজা করছি, বলছেন এটাই মত। আবার অন্য মতও আছে, তাঁরা বলেন, যা কিছুই কর না কেন, কর্মফলটা শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করে দেবে, আমরাও যেমন সব কিছু করার পর বলি শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু, তাহলেই হল।

আচার্য শঙ্কর যখন ভারতের ধর্ম ও অধ্যাত্ম জগতে প্রবেশ করলেন, প্রথমের দিকে তাঁকে সাংখ্যবাদীদের সাথে বিরাট লড়াই করতে হয়েছিল, পরে বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে আর সব থেকে বেশি মীমাংসকদের বিরুদ্ধে প্রচুর লড়াই করতে হয়েছিল। মীমাংসকরা নিজেদের বেদের ঠিকাদার মনে করতেন, ওনারা ভাবতেন বেদকে যেন তাঁরাই রক্ষা করে আছেন। সেইজন্য আচার্য শঙ্কর ভাষ্য লিখতে গিয়ে হয় তিনি বৌদ্ধদের আক্রমণ করে লিখছেন, নয়তো সাংখ্যদের, নয়তো মীমাংসকদের। ন্যায়, বৈশাষিকরাও ছিলেন, কিন্তু তিনি এদের অতটা গুরুত্ব দেননি। ইদানিং একজন বিজ্ঞান বেদান্ত নিয়ে লিখতে গিয়ে অনেক ভুলভাল কথা বলছেন, বেদান্তের মৌলিক জিনিসটাই বোঝেন না। আচার্য এখানে একটা গ্রন্থ রচনা করছেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মীমাংসকদের মুখটা বন্ধ করা, তুমি নিজেকে বেদের ঠিকাদার বলছ, ঠিকই বলছ, কিন্তু আসলে তুমি জিনিসটা ঠিক বুঝছ না। অন্য দিকে ঠাকুর যখন এগুলো মুখে বলছেন, তখন তিনি খোলাখুলি বলে দিচ্ছেন। লেখা ও মুখে বলার মধ্যে তফাৎ হয়ে যাবে। বই লেখার সময় লেখককে সংযত ভাবে চিন্তা-ভাবনা করে কিছু যুক্তি দিয়ে চলতে হয়। বলার সময় ফ্রীলি বলছেন, কিন্তু লেখার সময় একটা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিজেকে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে সামলে লিখতে হয়। আচার্য ভাষ্য লেখার সময় তখনকার দিনের বিভিন্ন মতগুলিকে তঁকে খণ্ডন করতে হচ্ছে। সেটা করতে গিয়ে ভাষ্যে অনেক সময় কিছু কিছু লম্বা লম্বা আলোচনা আনতে হয়েছে। আমরা এর থেকে কিছু কিছু জিনিস আগে আগে আলোচনা করেছি। এখন আর এগুলোর দরকার হয় না, কারণ এটা মেনে নেওয়া হয়েছে যে গীতার এই জিনিসটাই ঠিক। পরের শ্লোকে বলছেন –

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে।।৩।।

(সাংখ্যবাদিগণ বলেন –কর্মমাত্রই বন্ধনের কারণ। অতএব সকলেরই সর্ব কর্ম ত্যাগ করা উচিৎ। কিন্তু মীমাংসকগণ বলেন –যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ বিহিত কর্ম কারও পক্ষে ত্যাগ করা উচিৎ নয়। কারণ, বিহিত কর্মত্যাগে প্রত্যবায় হয়।)

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ, সাংখ্যবাদীরা বলেন সমস্ত কর্মই দোষযুক্ত, বন্ধনের কারণ। কারণ কর্ম মানেই প্রকৃতির এলাকা, প্রকৃতি মানেই বন্ধন। সেইজন্য তাঁরা সমস্ত কর্ম ত্যাগের কথা বলেন। সমস্ত কর্মের ত্যাগ, এটাই ভারতের জন্য দুর্ভাগ্য নিয়ে এলো, এটা গীতার মত নয়। সাংখ্যবাদী যাঁরা তাঁরা সবাই মনীষী, এতে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বললেন, আগে ঈশ্বর লাভ, তারপর কর্ম, তখন শ্রীরামকৃষ্ণকেও অনেকে ভুল বুঝলেন; স্কুল, হাসপাতাল চালানো সন্ন্যাসীদের কাজ নয়, তাঁরা আগে ঈশ্বর লাভ করুক। আচার্যকে বোঝা অত সহজ না। সন্ন্যাসীদের জন্য স্বামীজী কর্মের বিধান দিলেন, সেই নিয়ে কত অশান্তি। শ্রীশ্রীমাকে চিঠি লেখা হল, উত্তরে মা জানালেন, স্বামীজী মহারাজ যেটা করছেন সেটাই ঠিক।

যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে, আবার অনেকে আছেন, বিশেষ করে যাঁরা মীমাংসক, তাঁরা বলেন যজ্ঞ, দান ও তপস্যা, এই তিনটে কর্মকে ত্যাগ করতে নেই, এই কর্মগুলি সব সময় করে যেতে হবে। এগুলো সব বিভিন্ন মত, সংক্ষেপে একটা মতে কাম্য কর্ম ত্যাগ করলেই হবে বলছেন, সেখান থেকে আর-একটা মতে বলছেন, নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের কর্মফল ত্যাগ।

কয়েকটি মতের কথা বলার পর ভগবান এবার নিজের মত বলছেন। চার নম্বর শ্লোক থেকেই ঠিক ঠিক এই অধ্যায়ের শুরু হয়।

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ।।৪।।

(হে ভরতশ্রেষ্ঠ, সেই ত্যাগ ও সন্ন্যাসরূপ বিকল্প বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। হে পুরুষব্যাঘ্র, ত্যাগ-ও সন্ন্যাস-শব্দবাচ্য যে অর্থ, তা তামসাদিভেদে শাস্ত্রে ত্রিবিধ কথিত হয়েছে।)

ভগবান এবার বলছেন –হে ভরতশ্রেষ্ঠ, এবার তুমি ত্যাগ ও সন্ন্যাসের উপর আমার সিদ্ধান্ত মন দিয়ে ভাল করে শোন। সপ্তদশ অধ্যায়ে আহারাদি সব কিছুতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে, এই তিনটেকে নিয়ে বলে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেইভাবে এবার ত্যাগকেও ভগবান তিন প্রকার বলছেন –সাত্ত্বিক ত্যাগ, রাজসিক ত্যাগ ও তামসিক ত্যাগ। এই যে নিত্যকর্ম ত্যাগ, নৈমিত্তিক কর্ম ত্যাগ, কাম্যকর্ম ত্যাগ, ফল ত্যাগ বলা হল, এগুলো ছাড়ো; আমার সিদ্ধান্তে ত্যাগ তিন প্রকার। যাঁকে সম্মান করা হত, তাঁকে পুরুষব্যাঘ্র বলে সম্বোধন করা হত। সম্মানার্থে কখন সিংহ বলা হয়, কখন বাঘ বলা হয়। আগেকার দিন ব্যাঘ্র বলা হত, এখন আর বলা হয় না, বর্তমান কালের সাহিত্যে সিংহ দিয়েই উপমা টানা হয়। এবার ভগবান পরিষ্কার করে বলছেন। আচার্যের মত অদ্বৈতবাদীও বলছেন, এটা ভগবানের কথা, এই কথাকে কাটবার জো নেই।

এখানে আচার্যের যে ভাষ্য আছে, সেই ভাষ্যতে আমাদের ঢুকতে হবে। এর আগে আমরা ঈশোপনিষদের প্রথম দুটি মন্ত্র এনে আলোচনা করেছিলাম। আবার আমরা ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে চলে যাচ্ছি, যেখানে বলছেন, যা কিছু আছে সব কিছুতে দেখ ঈশ্বরই আছেন। সব কিছুতে ঈশ্বরই আছেন, এটা কে ঠিক ঠিক দেখতে পান? যাঁরা খুব উচ্চমানের পুরুষ তাঁরাই সব কিছুতে ঈশ্বরকে দেখতে পান। যাঁরা সব কিছুতে ঈশ্বরকে দেখতে পান না, তাঁরা সংসারে থেকে কাজ করে যাবেন। সেখানে আমাদের মত সন্ন্যাসীরা হতে পারেন, যাঁরা সংসারে থাকতে পারবেন না, অথচ ওই উচ্চমানের পুরুষ নন। এমনিতেই লোকেরা সন্ন্যাসীদের টিটকারি মারে।

হিন্দি বেল্টের একটা জায়গায় আমি চা খাচ্ছিলাম। সেখানে আমাকে দেখে একজন টিপ্পণি মেরে বলছে, আরে সন্ন্যাসী তো স্বামী বিবেকানন্দ থে। আমিও সঙ্গে সঙ্গে বললাম, সংসারী তো মহাত্মা গান্ধী থে, বাকি সব ফুদ্দু হ্যায়। সঙ্গে সঙ্গে মুখটা বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যদি এদের উত্তর না দিয়ে দেওয়া হয়, পেয়ে বসে। আমি তো তোমাকে ইনসাল্ট করতে যাচ্ছি না। আমাকে সরাসরি হয়ত কিছু বলছে না, কিন্তু বিশেষ একটা সম্প্রদায়, সন্ন্যাসী সমাজকে ইনসাল্ট করছে। আমি গেরুয়া পরে আছি, গেরুয়া ঝাণ্ডাকে পোষাকের মাধ্যমে আমি বহন করে ঘুরছি, সমস্ত সন্ন্যাসী সমাজের ইজ্যৎ রক্ষা, হিন্দু ধর্মকে, হিন্দুদের রক্ষা করা আমার দায়ীত্ব। মীরাবাঈ যেমন বলছেন, হো গঈ আপহি দাসী, আমি নিজেই কৃষ্ণের দাসী হয়ে গেছি, আমাকে কেউ দাসী বানায়নি। আমিও সন্ন্যাস ধর্মের দাস, আমি হিন্দু ধর্মের দাস; আমার সামনে যদি এদের কাউকে ইনসাল্ট করতে দেখি, অপমান করতে দেখি, স্বামীজীর মত আমিও তোমাকে তুলে আছাড় দেব।

এখন মাঝামাঝারি অবস্থায় যাঁরা আছেন, তাঁরা কোথায় যাবেন, আমাদের মত সন্ন্যাসীরা যাঁরা সন্ন্যাসের শেষ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত নন, অন্য দিকে গৃহস্থ ধর্মও করতে পারবেন না, এনারা সবাই কোথায় যাবেন। হিন্দুরা এরজন্য খুব সুন্দর একটা বিধান দিলেন। কি সেই বিধান?

আমাদের পরম্পরাতে বলছেন সন্ন্যাস দুই প্রকার – মুখ্য সন্ন্যাস ও গৌণ সন্ন্যাস। মুখ্য সন্ন্যাসে আবার এক প্রকার হয় বিদ্বৎ সন্ন্যাস। ঠাকুর বলছেন, কিছু ফল আছে যার ফল আগে ফুল পরে ফল হয়। জন্ম থেকেই এনারা ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত; এনারা জন্ম থেকেই সন্ন্যাসের জন্য প্রস্তুত।

এনারা এই উচ্চতম অবস্থা আগের জন্মেই পেয়ে এসেছেন। মুখ্য সন্ন্যাসের দ্বিতীয় আরেকটি প্রকার হয় বিবিদিষা। জ্ঞান এখনও হয়নি কিন্তু সন্ন্যাস ধর্মটা আগে নিয়ে নিয়েছেন। সন্ন্যাস নেওয়ার পর সাধনা করতে করতে ধীরে ধীরে উচ্চতম অবস্থায় যেতে থাকেন, অর্থাৎ কাঁচা অবস্থা থেকে পাকা সন্ন্যাসের দিকে যাচ্ছেন। আমাদের যদি কেউ বলে থার্ডগ্রেড সাধু, ঠিকই বলছেন, আমরাও এটা জানি। কারণ আমরা কেউ বিদ্বৎ সন্ন্যাসী নই, বিবিদিষা সন্ন্যাসী। মিলিটারি ইউনিফর্ম পরে নিলেই সবাই ম্যানেকশ বা সুপ্রীম কমাণ্ডো হয়ে যায় না। বিবিদিষা সন্ন্যাসীদের বলা হয় জ্ঞাননিষ্ঠ, এনারা আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য সব সময় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এনাদের মধ্যেও যাঁরা উচ্চমানের, তাঁদের মোটামুটি একটা প্রস্তুতি হয়ে গেছে, জ্ঞান এখনও হয়নি। সেইজন্য এনাদের মূল কাজ হল, জপধ্যান করা, মূল কাজ হল কোন ধরণের কর্মের দিকে বেশি না যাওয়া। অল্পস্বল্প যেটুকু কাজ করার করবেন, সেটাও চিত্তশুদ্ধির জন্য করবেন না, চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য করবেন।

বিদ্বৎ সন্ন্যাস ও বিবিদিষা সন্ন্যাস, এই দুই প্রকার সন্ন্যাসের ঠিক পরের ধাপে আসে গৌণ সন্ন্যাস। আপনারা যতজন এখন গীতার এই আলোচনা শুনছেন, আপনারা সবাই গৌণ সন্ন্যাসী। এনাদের মধ্যে আবার কিছু আছেন যাঁদের ভিতর সাত্ত্বিক ভাব আছে, কারুর ভিতর রাজসিক ভাব আর কারুর ভিতর তামসিক ভাব আছে। এই তিনজনই ত্যাগ করেন। সাত্ত্বিক যিনি তিনিও ত্যাগ করছেন, রাজসিক যিনি তিনিও ত্যাগ করছেন আর তামসিক যিনি তিনিও ত্যাগ করছেন। কিন্তু এনারা প্রত্যেকই হলেন কর্মাধিকারী। কেন কর্মাধিকারী বলছেন? কারণ এনাদের মনের অনেক আবর্জনা এখনও পরিষ্কার হয়নি, তাই আসলে এনারা সবাই কর্মাধিকারী। আগেকার দিনে ট্রেনে কত ভিড় হত, এখন অনেক ট্রেন হয়ে যাওয়াতে আগের মত ভিড় হয় না। ট্রেন ঢুকছে আর প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে, এই কেউ আমাকে টেনে ট্রেনে তুলে নাও। আবার দেখা যায়, কেউ চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে কোন রকমে দরজার হ্যাণ্ডেলটা ধরে নিয়েছে, ট্রেনের ভিতর থেকে কেউ একজন তাকে টেনে তুলে নিচ্ছে। এনারা সবাই ত্যাগী, কিন্তু কর্মাধিকারী।

প্রথম হল, একটা বয়স হয়ে গেছে, কর্মের প্রতি মানসিকতাও আগের মত নেই, শাস্ত্র এদের জন্য বলছেন, তুমি এবার শুধু শ্রবণ মনন নিয়ে থাক। যাঁরা গীতার ক্লাশ শুনছেন, আপনারাও প্রস্তুত, কিন্তু আপনাদের বলছেন, তোমরা ত্যাগ কর। যখনই কেউ ত্যাগ করতে শুরু করে দিল, সে এবার সন্ন্যাসী হয়ে গেল, কারণ ত্যাগী আর সন্ন্যাসীতে কোন তফাৎ নেই। কিভাবে ত্যাগ হবে? সমস্ত কর্ম করে যেতে হবে, কর্ম করা এই জন্যই, কারণ আপনার প্রথম উদ্দেশ্য হল চিত্তশুদ্ধি, আপনার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল ধীরে ধীরে চিত্তবৃত্তি নিরোধের দিকে যাওয়া। আর তৃতীয় উদ্দেশ্য কর্মফলের প্রতি স্পৃহাকে পরিহার করা। অর্থাৎ কর্ম করছেন ঠিকই, কিন্তু কর্মফলের প্রতি যেন কোন স্পৃহা না থাকে। এটাকে বলছেন সাত্ত্বিক ত্যাগ। গৌণ সন্ন্যাসীদের মধ্যে এনারা হলেন শ্রেষ্ঠতম। দ্বিতীয় হল, খাটনির ভয়ে, শারীরিক ক্লেশের ভয়ে যারা কাজ করা ছেড়ে দেন, এরা হলেন রাজসিক ত্যাগী। তৃতীয় হল, পুরোপুরি সংশয়াচ্ছন্ন, এরাও শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী কাজ করা ছেড়ে দেন, অথচ শাস্ত্রের আইডিয়াসগুলি তার কাছে পরিষ্কার নেই, এরা সবাই তামসিক ত্যাগী। এই পুরো জিনিসটাকে এবার ব্যাখ্যা করবেন এবং তার সাথে তামসিক ত্যাগ ও রাজসিক ত্যাগের অত্যন্ত নিন্দাও করবেন।

প্রথম কথা হল, সন্ন্যাসী ও ত্যাগী এক; যদিও আগেকার দিনে অন্য রকম কিছু মত ছিল, তবে ইদানিং আর তফাৎ করা হয় না। সন্ন্যাস আর ত্যাগকে এক করে নেওয়ার পর দু রকম তফাৎ চলে আসছে – একটা হল মুখ্য সন্ন্যাস আর দ্বিতীয় গৌণ সন্ন্যাস। মুখ্য সন্ন্যাস আবার দুই প্রকার। যিনি জন্ম থেকে সন্ন্যাসী, যেমন স্বামী বিবেকানন্দ, রমণ মহর্ষি, এনারা হলেন বিদ্বৎ সন্ন্যাসী। দ্বিতীয় হলেন, যাঁরা জগৎ থেকে কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না, কিন্তু জ্ঞানের চরম অবস্থায় এখনও পৌঁছাননি, অথচ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, কারণ সন্ন্যাস মানেই জ্ঞানের সেই অবস্থায় পৌঁছাতে হবে, যেখানে সমস্ত জগৎ খসে পড়ে যাবে; এনাদের এই সন্ন্যাসকে বলছেন বিবিদিষা সন্ন্যাস। দ্বিতীয় গৌণ সন্ন্যাস,

এনারা হলে কর্মাধিকারী, কর্ম করতে হবে। আপনি যদি বিবিদষা সন্ন্যান না হন, যদি বিদ্বৎ সন্ন্যাসী না হন, তাহলে বুঝতে হবে আপনাকে কর্ম করতে হবে, আপনি কর্মাধিকারী।

ঠাকুর বলছেন, নারকল গাছের বেল্লো জোর করে ছাড়াতে গেলে ছাড়ানো যাবে না, ঘায়ের মামরি না শুকানো পর্যন্ত জোর করে তুলতে নেই, তাতে ঘা সারতে আরও অনেক সময় লেগে যাবে। ঠিক তেমনি জোর করে ত্যাগ করতে নেই, সময় হলে স্বাভাবিক ভাবেই ত্যাগ হয়ে যাবে। যারা কর্মাধিকারী, তাদের ত্যাগ করতে নেই, তাদের মনে ত্যাগ করতে হয়। ঠাকুর সংসারীদের উদ্দেশ্যে বলছেন, তোমরা সংসারে আছ, তোমাদের মনে ত্যাগ। গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী মানে তাঁকে বকলেস পরিয়ে দেওয়া হল, তিনি এখন ঠাকুরের কুকুর। সন্ন্যাসী যা কিছু করবেন সেটাই ঠাকুরের সেবা, পূজা করছি এই ভাব নিয়ে করতে হবে। সংসারীদেরও এই একই ভাব থাকবে, শুধু বহিঃত্যাগ থাকবে না। যদি সে তৈরী থাকত তাহলে সে সংসারে না থেকে বেরিয়ে চলে আসত। এখনও যখন বেরিয়ে চলে আসেনি, তার মানে এখনও তার কর্ম বাকি আছে।

সাত্ত্বিক ত্যাগীদের জন্য বলছেন, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা, এই তিনটে কর্ম তুমি ছাড়বে না। বিদ্বৎ সন্ন্যাসী সব কিছু থেকে মুক্ত, কাজ করল তো করল, না করল তো না করল, শাস্ত্র পড়ল, শাস্ত্র পড়ল না, কোন কিছুতেই তাঁর কিছু আসে যায় না। কারণ তিনি পরমাত্মার তত্ত্ব জেনে গেছেন। কিন্তু যিনি বিবিদিষা, তিনি জপধ্যান করবেন, শাস্ত্র অধ্যয়ন করবেন। এই দুজন ছাড়া বাকি সবাইকে পঞ্চ মহাযজ্ঞ, বৈদিক যজ্ঞ, পূজা, নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা অবশ্যই করতে হবে। গীতা এখন কি বলতে যাচ্ছেন, এটাকেই এতক্ষণ সংক্ষেপে আগে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হল।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্।।৫।।

(যজ্ঞ-দান-ও তপস্যারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিৎ নয়। এই সমস্ত কর্ম করাই উচিৎ। কারণ এই কর্মগুলো ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগী মনীষিগণের চিত্তশুদ্ধিকারক।)

ভগবান বলছেন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা এই কর্মগুলো ত্যাগ করতে নেই। আপনি যা কিছু করেন, সেটা অপরকে দেখানোর জন্য করেন না। যেমন স্নান করছেন, অপরকে দেখানোর জন্য নিশ্চয় স্নান করছেন না, নিজের দেহের শুদ্ধির জন্যই করছেন। ঠিক তেমনি যে কোন কাজ যখন করবেন, সেটা মনের শুদ্ধির জন্য করবেন। এর আগে অনেকবার গীতাতে এই প্রসঙ্গটা এসেছে, যেমন পঞ্চম অধ্যায়ে বলছেন, *যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে*, যোগীরা যত কর্ম করেন, সেটা তাঁরা আত্মশুদ্ধির জন্য করেন। তার মানে কর্মফল ত্যাগ করে যা কিছু করছেন, রান্না করছেন, ভাল করে রান্না করবেন, কারণ আত্মশুদ্ধির জন্য করছেন। প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে পুরো পারফেকশান থাকবে। মিসাইলগুলো যখন যায় কি স্পীডে যায়, ফোর ম্যাক্, ফাইভ ম্যাক স্পীডে যায়; ম্যাক হল শব্দের গতি। শব্দের গতির চার গুণ, পাঁচ গুণ স্পীডে যাচ্ছে আর যেখানে আঘাত করতে হবে, ঠিক সেই জায়গাতে গিয়ে আঘাত করছে। মনটাকে পুরো মিসাইল বানাতে হবে। মিসাইলের মত গতিতে যাবে আর সঠিক টার্গেটকে হিট করবে।

যে কোন কাজে এই পারফেকশান হবে উদ্দেশ্য। যে কোন কাজে, জামা-কাপড় পরছেন, মার্কেটিংএ যাচ্ছেন, আনাজ কিনতে যাচ্ছেন; এই পারফেকশান যদি আপনার হয়ে যায়, আপনি দেখবেন সব্জী কিনতে গেলে আপনাকে দশটা দোকানে ঘুরতে হবে না, সব থেকে ভাল একটা কি দুটো দোকানে আপনি নিজে থেকেই পৌঁছে যাবেন। কারণ মনের কাছে সব খবর থাকে, আমরা মনের আওয়াজ শুনতে পাই না বলে ভুলভাল কাজ করে বসি। মন যখন বুঝে নেয় ইনি হলেন person of perfection, মন আপনাকে ঠিক ওই জায়গাতে নিয়ে চলে যাবে, বেশি ডান দিক বাঁ দিক করতে হবে না। আমি জীবনে কচিৎ কোন সন্ন্যাসীকে দেখেছি, যিনি স্লো ওয়ার্কার। মহারাজদের

দেখেছি, কি দ্রুতগতিতে ওনারা কাজ করেন। রাজা মহারাজ বলতেন, চোদ্দ আনা মন ঈশ্বরে আর দু আনা মন সংসারে দিলে কাজের হেউঢেউ লেগে যায়।

লোকেদের কিছুতেই বোঝান যাচ্ছে না যে, চঞ্চল মন দিয়ে কাজ হয় না। মনকে একাগ্র করে দেখুন, আপনাকে আর পাঁচ জায়গায় যেতে হবে না। শাড়ি কেনার সময় দশটা দোকানে ঘুরে ঘুরে ওই শাড়ি দেখছেন, সেই শাড়ি দেখছেন, মন একাগ্র হয়ে গেলে এটাই পাঁচ মিনিটে হয়ে যাবে। ঠাকুর বলছেন, ভক্ত হবি বলে বোকা হবি কেন। বোকামো না, আপনার মন এত শক্তিশালী হয়ে যাবে যে, দোকানদার সঠিক জিনিসটা বার করে আপনার সামনে রেখে দেবে। যদি দেখেন কোন কাজে আপনার অনেক সময় লাগছে, তাহলে বুঝবেন আপনার মনে কোন গোলমাল আছে, বাইরে কোথাও কোন গোলমাল নেই। জগতে কোথাও কোন গোলমাল নেই, সব গোলমাল আমাদের ভিতরে। কুশল শব্দের এটাই অর্থ, প্রচণ্ড স্পীড আর একাগ্র ও শক্তিশালী মন। কুশল মানে কাজে স্পীড বেড়ে যায়, পারফেকশান বেড়ে যায়। অন্য লোকের কোন কাজ করতে যদি দশ মিনিট লাগে, আপনার ওই কাজ করতে দু মিনিট লাগবে।

খুব ব্যক্তিগত কথা বলছি, আমাদের যিনি আগে ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন, এখন প্রো চ্যান্সেলর, ওনার কাছে কোন সমস্যা নিয়ে কেউ কিছু বলতে গেলে এক মিনিটে তিনি বক্তার দুটো কথা শুনে সমস্যাটা বুঝে নিয়ে সমাধান দিয়ে দেবেন। একটা ঘটনা বলছি, আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন স্বামী আত্মরামানন্দজী মহারাজ, গত হয়েছেন, উনি নিজে এই ঘটনাটা বলেছিলেন। উনি তখন একজন ব্রহ্মচারী হয়ে বেলুড় মঠে দু-বছরের জন্য ট্রেনিং সেন্টারে ছিলেন। ট্রেনিং সেন্টারে বিভিন্ন সেন্টার থেকে ব্রহ্মচারীরা ট্রেনিং নেওয়ার জন্য আসেন। একজন ব্রহ্মচারীর সঙ্গে ওনার আলাপ হয়েছে। সেই ব্রহ্মচারী অনেক কিছু ওনাকে বোঝাতে লাগলেন। ব্রহ্মচারীর কথাগুলো শুনে উনি নিজেও কেমন যেন confused হয়ে যাচ্ছিলেন। ওই ব্রহ্মচারীর বক্তব্য হল, কাজকর্মগুলো বন্ধ কর, বন্ধ করে কেবল ঈশ্বরে মন দাও। খ্রীশ্চান ধর্মের উপর কি একটা বই ফিলোকালিয়ায় পড়ে ওই ব্রহ্মচারী একজন confused ব্যক্তি হয়ে গিয়েছিলেন। অনেক পরে ওই মহারাজ নিজে আমাকে এই ঘটনাটা বলেছিলেন।

উনি তখন গেলেন প্রভু মহারাজের কাছে। প্রভু মহারাজের তখন জ্বর, সেবকরা মহারাজের কাছে কাউকে যেতে দিচ্ছেন না। আত্মরামানন্দজী তখন ব্রহ্মচারী, টেনিং সেন্টারে আছেন, অনেক জুনিয়র। তাও তিনি বললেন, 'আমার একটা প্রশ্নের উত্তরের উপর আমার বাঁচা মরা দাঁড়িয়ে আছে, একবার যেতে দিন'। যাই হোক, প্রভু মহারাজের কাছে ওনাকে নিয়ে যাওয়া হল। মহারাজ জ্বর নিয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। আত্মরামানন্দজী ঘরে ঢুকলেন, হাঁটু গেড়ে প্রণাম করলেন। আত্মরামানন্দজী মহারাজ কিছু বলতে যাচ্ছেন, তার আগেই প্রভু মহারাজ বলতে লাগলেন, 'বাদ দাও ওর কথা, ওর মাথাটা খারাপ, তুমি অমুক মহারাজের সাথে কথা বল'। এই ঘটনা কেউ বিশ্বাস করবে? আত্মরামানন্দজী যখন আমাকে ঘটনাটা বলেছিলেন, আমি বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। সত্যি ঘটনা, প্রভু মহারাজ কারুর কাছ থেকে কোন কথা শোনেননি, কিছুই জানেন না, জ্বরে পড়ে আছেন। ঘটনা বলার আগেই বলছেন, 'ও কিছু না, ওর মাথাটা খারাপ, ওর কোন কথাকে তুমি ধরবে না'। কিছু বলার আগেই তিনি জেনে গিয়েছিলেন সমস্যাটা কি। মনের কি প্রচণ্ড শক্তি কল্পনা করা যায় না। সমস্যা শোনার আগেই সমাধান দিয়ে দিলেন।

এই হচ্ছে কুশল। আমরা তো ওই স্তরের নই, তার থেকে অনেক নিচে। কাজ এমন স্পীডে হবে যে, কাজ দেখেই লোকেরা বুঝে নেবে, এর মধ্যে কিছু একটা স্পেশালিটি আছে। গুগুলের ল্যারি পেজ্, বিল গেটস্, এনারা জীবনে যে এত সাফল্য পেয়েছেন, অন্যান্য বড় বড় রাজনৈতীক নেতারা যে সফল হয়েছেন, কিভাবে হয়েছেন? অনেকগুলো কাজ এসে গেছে, কিন্তু ওনারা জানেন কোন কাজটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর সেই কাজটাই যে স্পীডে তাঁরা শেষ করে দেবেন, আমরা কল্পনাও

করতে পারব না। এনাদের mind sharp, intuition sharp, মুখ খোলার আগে জানেন কি বলতে যাচ্ছে।

আগের আগের জন্মে যদি যজ্ঞ, দান ও তপস্যা করা থাকে, তাহলে আপনি সেই পূণ্যের জোরে শুদ্ধ মন নিয়েই জন্মাবেন। আপনি সেই শুদ্ধ মন নিয়ে জন্মাননি, ক্ষমতা নিয়ে জন্মাননি, এখন থেকে যজ্ঞ, দান, তপস্যা করুন, কিছু একটা করতে শুরু করুন। আমাদের এখানে কম্প্যুটারে একজন দায়ীত্বে আছেন, বিরাট বড় প্রফেসর। উনি নিয়মিত আমাদের ক্লাশগুলো শোনেন। একদিন আমাকে হেসে বলছিলেন, 'আপনি লেকচারে যা বলেন তাতে তো মনে হয় সংসারীদের জলে ঝাঁপ মারতে হবে'। আমি বললাম, 'সত্যি কথাটা কেউ বলে না, আমি বলছি'। সারা জীবন কিছু করেননি, এখন তো করুন। পঞ্চ মহাযজ্ঞ করুন, জপধ্যান করুন, পঞ্চ দেবতার পূজা করুন, মন্দিরে যান, খাওয়ার আগে পিতৃদের উদ্দেশ্যে কিছু অন্ন নিবেদন করুন, পরে সেটা পাখিদের খাইয়ে দিন। লোকেদের সেবার জন্য আপনার উপার্জনের দুই শতাংশ, এক শতাংশ দান করুন, কিছু তো একটা করুন। দান, তপস্যা, একটা দুটো জিনিসকে নিয়ে নিজেকে ওর মধ্যে উৎসর্গ করে দিন। আধ্যাত্মিক কাঙাল হয়ে জন্মেছেন, উঠুন, দাঁড়ান, কিছু করুন। অপরের জন্য কিছু করতে হবে না, নিজের জন্য, আত্মকল্যাণের জন্য করুন।

আগাথা ক্রিষ্টি খুব নামকরা গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক, তিনি এক জায়গায় লিখছেন, Men has to invent works so as not to go insane, কাজ না থাকলে মানুষ পাগল হয়ে যাবে, সেইজন্য কাজ বার করে নেওয়া হয়। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, লোকেরা বলে, আমি বসে থাকতে পারি না, তাই দড়ি তৈরী করছি। আপনাকে বাঁচতে হবে, সেইজন্য যজ্ঞ, দান, তপস্যা করুন। আমেরিকাতে প্রচুর ডাক্তার যেমন আছে, তেমন প্রচুর রোগীও আছে আর প্রচুর ওষুধও আছে। তোমার যদি রোগ হয় তাহলে ডাক্তারের কাছে যাবে, ডাক্তারের ফীস্ দেবে, কারণ ডাক্তারকে বাঁচতে হবে। ডাক্তার প্রেসক্রিপশান দিলে সেটা নিয়ে ওষুধের দোকানে যাবে, ওষুধ কিনবে, কারণ দোকানের মালিক ও ওষুদের কোম্পানীর মালিকদের বাঁচতে হবে। ওষুধ কেনার পর কক্ষণ ওষুধ খাবে না, কারণ তোমাকেও বাঁচতে হবে।

মৃত্যু শেষ নয়, আবার আপনাকে আসতে হবে, এরপর যখন আসবেন তখন আরও জঘন্য অবস্থা পাবেন। আমাদের কাছে এসে অনেকে কান্নাকাটি করে, 'মহারাজ কি দুর্দিনেই না পড়েছি, কি দুরবস্থা আমার'। 'আরে ভাই সবে তো শুরু, এর পিছনে আরও আছে, এর থেকে আরও যে কত বাজে অবস্থা আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছে আপনি বুঝতে পারছেন না। তখন কোথায় যাবেন'? এক ভক্ত এসে শ্রীশ্রীমাকে বলছেন, মা, ঠাকুর বলেছেন ঈশ্বরের নামে পাগল হয়ে যেতে, আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে ঈশ্বরের নামে পাগল হয়ে যেতে পারি। শ্রীশ্রীমা সেই ভক্তকে বলছেন, সে কি বাবা, পাগল কেন হতে যাবে; অমন কথা বলোনি, কত পাপ করলে পরে গিয়ে মানুষ পাগল হয়, ও-রকম কথা আর কক্ষণ বলোনি।

যদি আপনার মনে অনেক হতাশা থাকে, বুঝতে হবে আগে আগে আপনি অনেক গোলমাল করেছেন। এবার দৃঢ়তার সাথে ঠিক করে ফেলুন, প্রকৃতির মুখোমুখি হয়ে বলুন – আর না, হে জীবন, আমি তোমার অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি, আর আমি সহ্য করব না। জীবন, তুমি আমাকে প্রচুর নাচ নাচিয়েছ, আর আমি তোমার হাতে নাচব না। তুলসীদাস গোস্বামী ঠিক এই কথাই বলছেন, হে রামচন্দ্র তুমি আমাকে অনেক নাচিয়েছ, আর না। হে জীবন, তুমি আমার উপর অনেক অত্যাচার করেছ, আর না, এবার আমি তোমার সাথে লড়ব। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের একটা বর্ণনা আছে, একদিন ঠাকুর হঠাৎ ভাবে বলতে শুরু করলেন, তুই আমার কি করবি। ঠাকুর মায়াকে বলছেন, তুই আমার কি করবি। আপনিও বলুন, সংসার, তুমি আমার কি করতে পারবে, আমি

এ্যটম বোম্ পেয়ে গেছি। কি এ্যটম বোম্ – যজ্ঞ, দান ও তপস্যা। পঞ্চ মহাযজ্ঞ করুন, দান করুন আর তপস্যা, একটা জিনিসকে নিয়ে, একটা দিকে লেগে থাকুন।

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্।।৬।।

(হে পার্থ, ফলকামনাপূর্বক অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি কর্মবন্ধনের কারণ হলেও আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ করে এই সমস্ত কর্ম অবশ্য কর্তব্য। এটাই আমার নিশ্চিত ও উত্তম মত।)

যজ্ঞ, দান ও তপস্যা করার সময় মনে কোন ফলাকাঙ্ক্ষা রাখবে না। আমাকে এটাই করতে হবে, আমাকে বাঁচতে হবে, –এগুলো করার সময় শুধু এটুকু মনে রাখলেই হবে, এর বেশি আর কিছু থাকবে না। এরপর আবার আপনারা বলবেন না যে, মহারাজ, এর আগে আপনি বলেছিলেন, কোন কামনা থাকলে গোলমাল হয়, এখানে তো বাঁচার কামনা এসে গেল? হ্যাঁ, এই কামনাটা রাখুন, এই কামনাতে কোন দোষ নেই। এই কামনাটা যখন চলে যাবে তখন আপনি মুখ্য সন্ন্যাসী হয়ে জন্ম নেবেন। যতক্ষণ শরীর বোধ থাকবে, যতক্ষণ এই বোধ আছে যে আমাকে খেতে হবে, ভাল খেতে হবে, ঘুমোতে হবে, যতক্ষণ বোধ আছে ইনি আমার স্বামী, উনি আমার স্ত্রী, ততক্ষণ এই কামনাটা রাখুন। গীতাতে আগে আগেও বলেছেন *সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে*, আত্মশুদ্ধির জন্য আমি এই কাজ করছি। আমাকে বাঁচতে হবে, বাড়ির সব কাজ করব, কিন্তু মনে মনে জানব আমাকে বাঁচতে হবে।

বাড়ির লোকদের বলুন, আমি তোমাদের সব কাজ করে দেব, বদলে আমাকে মাইনে দাও। কি মাইনে? আমাকে জপধ্যান করতে দাও, আমাকে পঞ্চ মহাযজ্ঞ করতে দাও; এটাই আমার মাইনে। আমার শাড়ি লাগবে না, আমার গয়না লাগবে না, আমার কোন সুখ-সুবিধা লাগবে না, আমার শুধু লাগবে জপধ্যান, শাস্ত্রপাঠ আর পঞ্চ মহাযজ্ঞ, এটাই আমার মাইনে। তোমাদের আমাকে কিছু দিতে হবে না, শুধু আমি যখন এগুলো করব আমাকে বিরক্ত করতে এসো না। কারণ আমাকে শুদ্ধ পবিত্র হতে হবে, এরপর আমার কোন জন্ম লাগবে না, আমাকে আগে এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে বেরোতে হবে। আর যদি জন্ম নিতে হয়, তাহলে পরের জন্মে সন্ন্যাসী হয়ে বেলুড় মঠে ঝোল-চচ্চড়ি খেয়ে জীবন কাটাবো, আর বড়দের আদেশ মেনে এক অর্থপূর্ণ জীবন তৈরী করব।

কর্তব্যানীতি মে পার্থ, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এটা আমার কর্তব্য, এটাই আমার দায়ীত্ব, এটাই আমার জীবনধারা। আমার আর কিছু লাগবে না, শুধু যজ্ঞ, দান ও তপস্যা; এটাই হল সাত্ত্বিক ত্যাগ। এখানে আমাকে বলতে হচ্ছে; আসলে আপনারা যাঁরা এই ক্লাশ শুনছেন, আপনারা সবাই সাত্ত্বিক ত্যাগী। যদি সাত্ত্বিক ত্যাগী নাও হন, তবে সাত্ত্বিক ত্যাগী হওয়ার জন্য আপনি প্রস্তুত। এরপর বাকি শুধু দুটো ধাপ – বিবিদিষ সন্ন্যাস আর বিদ্বৎ সন্ন্যাস। এই জন্মে আমার মুক্তি হবে, এই কথা মুখে বলে দেওয়া যায়, কিন্তু এতটা সহজ না। স্কুলে পড়লেই সবাই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পিএইচডি হয়ে যায় না, কিন্তু লেগে থাকলে একটা জায়গা পর্যন্ত অবশ্যই পৌঁছাবে। আমাদের এখানে ওই ঝামেলাটাও নেই। এখানে শুধু লেগে থাকা, তারপর যতটা পারেন এই ভাব নিয়ে থাকুন যে, আমাকে ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কিভাবে? আমি সমস্ত কর্ম করব, কিন্তু কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা করব না। *সঙ্গং ত্যক্ত্বা*, আসক্তির ত্যাগ করতে হবে, আমাকে পারফেক্ট হতে হবে, আমার মনের একাগ্র বাড়াতে হবে, স্পীড বাড়াতে হবে, কোন কামনা-বাসনা নেই, একটাই কামনা আমাকে শুদ্ধি লাভ করতে হবে। এই ধরণের লোকেরাই ত্যাগের জন্য প্রস্তুত। যাদের এই বোধ হয়েছে যে, আমি ঈশ্বরের দিকে যেতে চাইছি, আমার সংসারের সুখ লাগবে না, তাদের সাত্ত্বিক ত্যাগ।

অর্জুন সন্ন্যস শব্দ আর ত্যাগ শব্দ, এই দুটো শব্দের যথার্থ তত্ত্বটা জানতে চেয়েছেন। ত্যাগ আর সন্ন্যাস দুটো একই জিনিস, একটাকে বলা যা, অন্যটাকে বলাও তাই। আসলে তজ্ ধাতু থেকে

ত্যাজতি আসে, ত্যাজতি থেকে আসে ত্যাগ আর অস্ ধাতু থেকে সন্ন্যাস শব্দ আসে। তজ্ মানে ছেড়ে দেওয়া আর অস্ মানে ফেলে দেওয়া। ছেড়ে দেওয়া যা, ফেলে দেওয়াও তাই, সেইজন্য ত্যাগ আর সন্ন্যাস একই জিনিস। ত্যাগ তো সবাই করে, ক্লাশ ফোর ত্যাগ না করলে ক্লাশ ফাইভে কি করে আসবে! নীচের ধাপ না ছাড়লে উপরে ধাপে যাওয়া যাবে না। পানের পিক্, থুতু সবাই ফেলে, মল-মুত্রাদি সবাই ত্যাগ করে, সেই ত্যাগই তো হল। তাহলে কি সবাই ত্যাগী? লোকেরা এগুলোকে নিয়েই তর্ক করতে আসে, বলবে আমিও ত্যাগী, কারণ আমি পানের পিক্ ফেলে এলাম। না, সবাই ত্যাগী হতে পারে না।

এমন এমন জায়গা নিয়ে তর্ক করবে যে, তার উত্তর আপনি খুঁজে পাবেন না। পুরাণের কাহিনী নিয়ে একজন ব্যঙ্গ করে প্রশ্ন করছেন, হিন্দুদের বিজ্ঞান কি এই রকমই? ভাবলাম জবাব দিই, ব্যা ব্যা ব্ল্যাকশিপ হ্যাভ ইউ এনি উল বা টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার, এগুলো দিয়েই বাচ্চারা ইংরাজী শেখা শুরু করে। তাহলে যদি আপনাকে কেউ প্রশ্ন করে, কোন বাচ্চা কি এভাবে কোন ভেড়ার সাথে কথা বলতে পারে? যদি না পারে, তাহলে বাচ্চাদের এভাবে ভুলভাল ইংরাজী শেখাচ্ছেন কেন? আপনি তখন কি বলবেন? আসলে বাচ্চাদের যখন কোন কিছু শেখানো হয় তখন তাকে তার মনের মত করে শেখানো হয়। আর যে ভাষায় জিনিসগুলো বলা হচ্ছে, সেই ভাষায় ওই জিনিসগুলো যেভাবে উপলব্ধ, সেটার সাহায্য নিয়ে করতে হয়। তাই বলে ব্যা ব্যা ব্ল্যাকশিপ যে ইংরাজী নয়, তা তো নয়। কিন্তু আবার ভেড়ার সাথে কথা বলছে সেটাও তো সত্য নয়। এদের কিছু বলার নেই, নিন্দুকরা এভাবেই নিন্দা করবে। আপনারা দেখে থাকবেন, আপনার পাড়া প্রতিবেশিরা অনেকেই বলবে, আমি কি ধর্মকর্ম করছি না, বাবা-মার দেখাশোনা করা সব থেকে বড় ধর্ম। বাবা-মার দেখাশোনা করা এগুলো বিশেষ অর্থে হয়, আবার ত্যাগ, সন্ন্যাস এগুলোও বিশেষ অর্থে হয়। ভগবান এই অধ্যায়ে প্রথম থেকে এগুলোকে ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন, যেটা আমরা আগে আগে আলোচনা করে এসেছি।

পুরো জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করে বললেন, সন্ন্যাস দুই প্রকার, মুখ্য সন্ন্যাস আর গৌণ সন্ন্যাস। মুখ্য সন্ন্যাস, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ, তিনি হলেন প্রকৃত সন্ন্যাসী, তিনি অবতার, সব সময় বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, ঠাকুরের কথায় এনারা হলেন নিত্যসিদ্ধ। এনাদের ঠিক নিচে হলেন তাঁরা, যাঁরা চেষ্টা করে করে সত্যকে জেনে গেছেন। তার নিচে হলেন, যাঁরা সত্য জিনিসটাকে জানার জন্য এখনও প্রাণপন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এনারা হলেন বিবিদিষ সন্ন্যাসী, এনারা এই ভেবে গেরুয়া ধারণ করেছেন যে, আমিও একদিন ওই জায়গায় পৌঁছাব। এনারা সবাই হলেন মুখ্য সন্ন্যাস। আর যাঁরা যে কোন ত্যাগ করছেন, এটা হল গৌণ ত্যাগ। গৌণ ত্যাগে মূলতঃ কর্মফলের ত্যাগ করা।

কিভাবে কর্মফলের ত্যাগ করছেন? যা কিছু করছেন, করার পর সব ফল ঠাকুরের পায়ে অর্পণ করে দিচ্ছেন। এই ত্যাগটাই আবার তিন প্রকার – সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। তাহলে থুতু ফেলা, পানের পিক ফেলা, এগুলো কি ত্যাগের মধ্যে পড়ে? গীতা এখন এই জিনিসটাকেই ব্যাখ্যা করছেন। আগে দেখতে হবে কোন ত্যাগ মানুষকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। ত্যাগের ব্যাপারে বলার পর কর্মের কথা বলবেন। খুব ভাল করে চিন্তা করলে আমরা দেখব, কর্ম করা আর কর্ম ত্যাগ, দুটো আলাদা কিছু না। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা মরে যাব, কিন্তু চিন্তা-ভাবনা আমরা কিছুতেই করব না। খবরের কাগজ পড়ে, টিভি সিরিয়াল দেখে দেখে আমাদের মস্তিষ্কটা এমন ভোঁতা হয়ে গেছে যে, চিন্তা-ভাবনা করার ইচ্ছাটাই চলে গেছে। কিন্তু চিন্তা-ভাবনা করলে দেখবেন, কাজে সফল হতে গেলে যে জিনিসগুলি লাগে, কর্মফল ত্যাগে সেই জিনিসগুলিই লাগে।

এখানে কয়েকটি শ্লোকের মধ্যেই সমস্ত জিনিসগুলি ঘুরে চলে আসবে। চার পাঁচটা শ্লোকে দেখাবেন, ত্যাগে কিভাবে সফল হবেন, শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী আপনি কিভাবে হবেন আর জীবনে শ্রেষ্ঠতম

সাফল্য আপনি কিভাবে পেতে পারেন। আমাদের হিন্দু ধর্ম অন্যান্য ধর্মের মত ভগবান আলাদা, জগৎ আলাদা, আমি আলাদা, এরকম নয়, এখানে সব একই। একবার যদি বোঝা যায়, মানুষ কোন গুণে জীবনে সফল হবে? যে গুণে কর্মে সফল হবে, সেই গুণেই কর্মত্যাগেও সফল হবে। ঠাকুর আমাদের ভাষায় বলছেন, যে নুনের হিসাব জানে, সে চিনির হিসাবও জানে। ঠাকুরের কাছে কত ধরণের লোকই তো আসত, কিন্তু কাদের দিকে ঠাকুর নজর দিলেন, কাদের উপর নিজের আধ্যাত্মিক শক্তি ঢেলে দিলেন? নরেন, কি শক্তি ভিতরে। গিরিশ ঘোষ, নাট্যকার, কিন্তু কি শক্তি। কেশবচন্দ্র সেনকে ভালবাসা ঢেলে দিলেন, তাঁরও কি শক্তি। সাধারণ জিনিসটা হল শক্তি। আঙুরের রস টক হোক আর মিষ্টি হোক, যারা মদ বানায়, ওই রস দিয়েই তারা মদ বানিয়ে দেবে, তাদের শুধু রসটা দরকার। আঙুরে যদি রসই না থাকে, ওই আঙুর দিয়ে কি করবে! কিছু কিছু আম কাঁচা অবস্থায় প্রচণ্ড টক হয়, কিন্তু পেকে গেলে চিনির মত মিষ্টি হয়। ওর ভিতর যদি রস থাকে, যতই টক হোক, পাকার পর মিষ্ট হবে। আমাদের রসটা হল –ভিতরে আঁট থাকা চাই, শক্তি থাকা চাই।

এখানে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক দিয়ে যে ব্যাখ্যা করছেন, তাতে দেখবেন, যে গুণে ত্যাগী হয়, সেই গুণেই কর্মে সফল হয়। আমরা দেখেছি, আমাদের সন্ন্যাসীদের মধ্যে যাঁরা অত্যন্ত সম্মানের, যাঁদের কে আমরা প্রচণ্ড সম্মান করি, বাইরের লোকেরা হয়ত তাঁর নামও শোনেনি, তাঁরা যখন কাজের মধ্যে ছিলেন, কাছ থেকে আমরা নিজের চোখে দেখেছি, প্রত্যেকটি কাজে তাঁরা কি নিখুঁত ছিলেন। রাম মহারাজ, উপেন মহারাজ, এনাদের নাম আগেও অনেকবার করেছি। উপেন মহারাজকে একশ বছর বয়সে তিনি বইয়ে যে মলাট দিতেন, কি সুন্দর নিখুঁত ভাবে মলাট দিতেন। কমন ব্যাপার হল সফল হওয়া। কাজে যেমন সফল, ত্যাগেও তিনি সফল। যার আছে হেথা, তার আছে সেথা। যার নাই এখানে তার নাই সেখানে। ভিতরে শক্তি তৈরী করতে হয়। এবার ভগবান তামসিক ত্যাগের কথা বলছেন।

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ।।৭।।

(অবশ্যকর্তব্য নিত্যকর্ম ত্যাগ করা উচিৎ নয়। কারণ, নিত্যকর্ম চিত্তশুদ্ধিকর। অজ্ঞানবশতঃ নিত্যকর্ম ত্যাগ করাকে তামস ত্যাগ বলে।)

মোহে পড়ে যে ত্যাগ; সমস্ত ধর্ম এই ত্যাগকে বলছেন তামসিক ত্যাগ। কর্মত্যাগ, কর্মফল ত্যাগের কথা এর আগে যখন বলা হয়েছিল, সেখানে বলা হয়েছিল, নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান নিত্য করতে হয়। জপধ্যান আদি নিত্যকর্মের ত্যাগ একমাত্র করতে পারেন ঠাকুর মত পুরুষরা। কথামৃতের প্রথম দিনের বর্ণনাতেই আছে, মাস্টারমশাই ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন, আপনার কি এখন সন্ধ্যাবন্দনা করার সময়? ঠাকুর তখন ভাবে বলছেন, না, তেমন কিছু না। আমেরিকাতে স্বামীজীকে যদি জিজ্ঞেস করা হত, আপনি কত ঘন্টা জপধ্যান করেন? স্বামীজী এই প্রশ্নের কি উত্তর দেবেন। এনারা হলেন পরমহংস, ওনারা এগুলোকে পেরিয়ে এসেছেন। ওনাদের দেখাদেখি আমি আপনি যদি জপধ্যান করা ত্যাগ করে দিই, আমরা আধ্যাত্মিকতার আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে অনেক দূরে অন্ধকারে চলে যাব।

সাত নম্বর শ্লোকে একেবারে নীচ থেকে শুরু করছেন; তামসিক ত্যাগী কারা? মনটা মোহান্ধ হয়ে গেছে। কিসে মোহান্ধ? কামিনী কাঞ্চনে, কাম, ক্রোধে। মোহে পড়ে গিয়ে এরা নিত্যকর্ম করা ছেড়ে দিয়েছে। আচার্য বলছেন, যিনি অজ্ঞানী, যিনি আত্মাকে এখনও জানেন না বা ছুঁই ছুঁই অবস্থাতেও পৌঁছাননি, তাঁরাও কেউ কর্ম ত্যাগ করতে পারেন না। কিন্তু মোহে পড়ে, অজ্ঞানে পড়ে কেউ যদি কর্ম ত্যাগ করে দেয়, সেটাকে তামসিক ত্যাগ বলে। তামসিক ত্যাগ কোন দিন মানুষকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যেতে পারবে না। যেটা কর্তব্য কর্ম, যেটা তাকে করতেই হবে, যদি সেটা না

করে, তাহলে কিন্তু সে কোন দিন ঈশ্বরের দিকে যেতে পারবে না। কেন কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করে দিয়েছে? মোহে পড়ে, মোহান্ধ হয়ে।

এই ব্যাপারটাকে বিশ্বামিত্রের জীবন দিয়ে খুব ভাল বোঝা যাবে। বিশ্বামিত্র ঋষি খুব উচ্চমানের একজন ঋষি, ওনার জীবন দিয়ে আধ্যাত্মিক জীবন খুব সুন্দর বোঝা যায়। প্রথম জীবনে তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন। পরে বশিষ্ট মুনির সাথে ঝগড়া হয়ে গিয়ে তিনি তপস্যায় বসে গেলেন। তপস্যা করে প্রথমেই তিনি বশিষ্টের ছেলেকে মারিয়ে দিলেন। সেখান থেকে এটা সেটা অনেক কিছু করে শেষে তিনি মেনকার পাল্লায় পড়লেন। মেনকাকে নিয়ে বিশ্বামিত্র এমন ডুবে গেলেন যে কোন দিকেই তাঁর কোন হুঁশ ছিল না। দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল, বছর গেল, যুগ গেল, তিনি মেনকার যৌবন, রূপের ঐশ্বর্যতেই ডুবে আছেন। হঠাৎ একদিন কি হল, বিশ্বামিত্র বলছেন, সন্ধ্যা হয়ে এলো, যাই একটু সন্ধ্যাবন্দনা করে নিই। মেনকা হেসে বলছে, 'বারো বছর আপনি আমাকে নিয়ে ভোগে ডুবে আছেন, বারো বছরের মধ্যে একদিনও সন্ধ্যা বন্দনা করার কথা মনে পড়ল না, আর আজ বলছেন সন্ধ্যা বন্দনা করবেন, কিসের সন্ধ্যা বন্দনা!'

বিশ্বামিত্র খুব জোর চমকে গেলেন, 'কি বলছ, বারো বছর এভাবে আমি তোমার কাছে পড়ে আছি'। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মেনকাকে ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন, তৎক্ষণাৎ ত্যাগ। এতে আবার অনেকে বলতে শুরু করবেন, পুরুষ মানুষগুলো এই রকমই হয়, ভোগ করে মেয়েদের ফেলে রেখে চলে যায়। তাঁর কন্যা শকুন্তলাকে এখন কে দেখাশোনা করবে? আমরা এখানে আধ্যাত্মিক জিনিসগুলোর আলোচনা করছি। আমাদের মনে রাখতে হবে এগুলো কাহিনী। অনেক আগে আমাদের একজন জ্ঞানবৃদ্ধ সন্ন্যাসী আমাকে কথায় কথায় বলেছিলেন, 'বিশ্বামিত্রের কাহিনী তোমার সত্য বলে মনে হয়'? 'হ্যাঁ সত্য বলেই তো মনে হয়'। মহারাজ তখন বলছেন, 'সত্য এগুলো কখনই না, এটা একটা কাহিনী। কারণ বিশ্বামিত্র সাধনা করে যে অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ওনার কখনই এই ধরণের পতন হতে পারে না। এগুলো কাহিনী, এই কাহিনীগুলো হল সাধারণ সাধকদের সাবধান করার জন্য'।

স্বর্গের এক সুন্দরী অপ্সরা নারীর মোহে পড়ে বারো বছর তিনি নিত্যকর্ম করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এটাকে বলে তামসিক ত্যাগ। অন্য দিকে আমাদের মন সর্বদা চঞ্চল, একটাতে লেগে থাকতে পারি না, একটা কাজ করতে করতে আরেকটা কাজে জড়িয়ে পড়ি। এখন ভারত পাকিস্থানের মধ্যে খুব উত্তেজনাপূর্ণ খেলা হতে যাচ্ছে, আগে এটা দেখে নিই, পরে এই কাজ করা যাবে। বিভিন্ন ধরণের যে মনের চাঞ্চল্যতা, এটাও অজ্ঞান থেকেই আসে। মন আমাদের কখনই শান্ত হবে না, যেটা করার এর মধ্যেই আমাদের করে নিতে হবে।

এছাড়া, বিভিন্ন সময় আমরা ভুল একটা জীবন দর্শন নিয়ে চলি। এই যেমন সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে আজকাল যারা হিন্দু বিরোধী, এমনকি যারা ধর্ম বিরোধী, তারা এমন এমন কথা বলে, লোকেরা ওটাকেই ঠিক মনে করে। কারণ এদের কথাগুলো হল চার্বাকদের মত, চার্বাক শব্দ ভাঙলে হয় চরু বাক্, তার মানে সুন্দর সুন্দর মিষ্টি মিষ্টি কথা, যাদের কথাগুলো শুনতে খুব ভাল লাগে, এদের কথাগুলোও শুনতে খুব ভাল লাগে। ইউটিউবের দৌলতে কিছু কিছু ইয়ং ছেলেমেয়েদের দেখছি যারা শাস্ত্রে এই বয়সেই প্রচুর জ্ঞান অর্জন করে নিয়েছে। কুড়ি বাইশ বছরের ছেলে বা মেয়ে, কেউ ডাক্তারী পড়ছে, কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, কিন্তু ওদের শাস্ত্রের জ্ঞান দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়, আমাদের অনেক মহারাজদেরও অত জ্ঞান নেই। অথচ এদের বাবা মায়েদের ধর্মের ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই। দেখে অবাক লাগে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সবার সামনে একটা নূতন আদর্শ, দেশপ্রেম, দেশসেবা। সেখান থেকে কখন রাজনৈতিক আদর্শ, কখন সেই আদর্শ, কখন ওই আদর্শ, এই করে করে ওই প্রজন্মটা

পুরো নষ্ট হয়ে গেল। তখন আমাদের দেশে এটাই ছিল প্রধান আদর্শ। আজকে আমাদের যে আদর্শ, যে আদর্শের জন্য ঋষি মুনিরা সমস্ত কিছু ত্যাগ করে দিয়েছিলেন, যে আদর্শকে পুনরায় প্রাণবন্ত করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দের আগমন, বর্তমানে সেই আদর্শও কেমন যেন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যেই কোথা থেকে বেশ কয়েকজন ইয়ং ছেলেমেয়েরা শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করে নিয়েছে, পড়াশোনাতেও তারা অনেক ভাল, এই নয় যে এরা কেউ অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত, একেবারেই তা নয়।

মোহের আর-একটি সুন্দর উদাহরণ হল – এখন কি আমার ধর্ম করার বয়স; এখন সব ধর্ম করে নিলে বুড়ো বয়সে কি করব? এটাও একটা মোহের উদাহরণ। এর থেকেও নিকৃষ্ট মোহের উদাহরণ হল – ঠাকুর আছেন, ঠাকুর দেখছেন। আমি ব্যক্তিগত ভাবে অনেকের পতন হতে দেখেছি, যারা সবাই ঠিক এভাবেই বলতেন – ঠাকুর তো দেখছেন, আপনি জিজ্ঞেস করার কে। এই জিনিসগুলো মোহ থেকে হয়। যারা মনে করছে, ঠাকুরের প্রসাদ খেয়েছি, ঠাকুরই দেখবেন; ঠাকুরের চরণামৃত খেয়েছি, ঠাকুর নিশ্চয় দেখবেন, আমাকে আর কিছু করতে হবে না। এগুলোকে বলছেন – সব তামসিক ত্যাগ।

জপধ্যান এগুলো কি করে? *পাবনানি মণীষীণাম্*, যাঁরা শ্রেষ্ঠ পুরুষ তাঁদেরও জপধ্যান পবিত্র করে। জপধ্যান যদি না করা হয়, মন কখনই পবিত্র হবে না। তামসিক ত্যাগ গৌণ ত্যাগের মধ্যে পড়ে, কিন্তু এই ত্যাগ তাকে সন্ন্যাসের দিকে নিয়ে যাবে না, তাকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাবে না। পরের শ্লোকে রাজসিক ত্যাগের কথা বলছেন।

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ।।৮।।

(কর্ম দুঃখকর মনে করে যিনি দৈহিক ক্লেশের ভয়ে কর্ম ত্যাগ করেন – তিনি এই রাজসিক ত্যাগ করে জ্ঞানসংযুক্ত সর্বকর্মত্যাগের মোক্ষফল লাভ করতে পারেন না।)

কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ, এই কাজে খুব খাটনি, পরিশ্রমের ভয়ে যে কর্মত্যাগ করে, এই কর্মত্যাগ রাজসিক ত্যাগ। একটা হল কর্ম, আরেকটা হল কর্মত্যাগ। এর আগে কর্ম কত প্রকার হয় বলা হয়েছিল, আর বলা হয়েছিল ত্যাগের ফল অমৃত লাভ। উপনিষদ বলছেন, ত্যাগের দ্বারা মানুষ অমৃত লাভ করে। আমরা থুতু ফেলছি, পানের পিক্ ফেলছি, ত্যাগ তো হচ্ছে, তাহলে আমাদেরও অমৃত লাভ হবে। কোন দিন অমৃত লাভ হবে না। সাংসারিক কর্মের ত্যাগ যদি করা হয়, আর তার সাথে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম যদি ত্যাগ করা হয়, তবেই অমৃত লাভ হবে। কিন্তু নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম ত্যাগ সবাই করতে পারে না, একমাত্র যাঁরা পরমহংস তাঁরাই পারেন। তাঁদের নীচে যাঁরা আছেন তাঁদের সবাইকে কর্ম করতে হয়। সমস্ত ত্যাগের ফল ঈশ্বরলাভ, জ্ঞান লাভ, অমৃত লাভ।

শ্রীশ্রীমা বলছেন, ঠাকুর হলেন ত্যাগের বাদশা। আমরাও তো ত্যাগী। কিভাবে আমরা ত্যাগী? ঈশ্বরকেই আমরা ত্যাগ করেছি। একজন সাধুবাবা এক রাজার কাছে গেছেন। সাধুবাবার কথাবার্তা শুনে রাজা বলছে, 'আহা আপনার কি ত্যাগ'! সাধুবাবা বলছেন, 'আমি কি ত্যাগী, আপনার ত্যাগ আরও বড়। আমি তো শুধু সংসার সুখ, ওই ছোট্ট একটা বাড়ি ত্যাগ করেছি, কিন্তু আপনি এত বড় ত্যাগী যে, আপনি ভগবানকেই ত্যাগ করে দিয়েছন।'

বলছেন, রাজসিক ত্যাগে ত্যাগের যে ফল হওয়ার কথা সেই ফল হয় না। অনেকে এসে বলে, এত খেটে কি হবে, এত পড়াশোনা করে কি হবে? আপনি জীবনে কখন পড়াশোনা করেছেন, ঠেলেঠুলে কোন রকমে তো পাশ করেছেন, পরীক্ষার সময় এর খাতা থেকে ওর খাতা থেকে টুকে কোন রকমে পাশ করেছেন। এরা এসে এখন বলছে, এত শাস্ত্র পড়ে কি হবে। কোন কিছু করতে

গেলে, জীবনে সাফল্য পেতে হলে খাটতে হয়, কিন্তু কেউ খাটতে চায় না। মঠের অধ্যক্ষ মহারাজের কাছে দীক্ষা নিয়েছে, মহারাজ বলে দিয়েছেন দুই বেলা অন্ততঃ একশ আটবার করে জপ করবে। একজন গিয়ে অধ্যক্ষ মহারাজকে জিজ্ঞেস করছে, 'মহারাজ চুয়ান্নবার করলে হবে না'? মহারাজ শুনে খুব রেগে গেছেন, 'এতটুকুও যদি না করতে পার, তাহলে দীক্ষা নিলে কেন'? একশ আটবার জপ করতে কতটুকু আর সময় লাগবে। খাটতে হবে, এই খাটনিটাও নিতে পারছে না। যাঁরা হাজার হাজার জপ করেন, তাঁদের একশ আট বার জপ করতে এক মিনিটেরও কম সময় লাগে। যাঁরা নিয়মিত করতে পারেন না, তাঁদের খুব জোর পাঁচ মিনিট লাগবে। হৃদয়ে যদি নিজে থেকেই জপ হতে থাকে, এই অজপাতে একশ আট বার জপ হতে কুড়ি সেকেণ্ড লাগবে। সেটা না হয় সবার হবে না, কিন্তু তাতেও খুব বেশি হলে একশ আট বার জপে খুব জোর পাঁচ মিনিট সময় লাগতে পারে। এত কিছুর পরেও বলছে, চুয়ান্ন বার করলে হবে? এই ধরণের লোকেরাই হল রাজসিক ত্যাগী। অত সকালে উঠে জপ করার কি আছে, বেলার দিকে উঠেও তো জপ করা যায়। আসলে রাজসিক ত্যাগীরা অনেকটা তামসিক ত্যাগীদের মতই। মূল কথা হল খাটাটা শুরু করতে হবে। খাটতে শুরু করে দিলে ঠাকুর নিজেই বুঝিয়ে দেবেন আপনাকে কি করতে হবে আর কি করতে হবে না। কোন গুণে তাহলে মানুষ ত্যাগী হয়? কোন গুণে মানুষ সন্ন্যাসী হয়?

কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ।।৯।।

(হে অর্জুন, কর্তৃত্বাভিনিবেশরূপ আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ করে কেবল কর্তব্যবোধ্যে যে বিহিত কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, কর্মাসক্তি ও কর্মফলের সেই ত্যাগকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে।)

ত্যাগী হতে গেলে, সন্ন্যাসী হতে চাইলে কোথা থেকেও তো তাকে আগে শুরু করতে হবে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, কোথা থেকে ধর্ম জীবন শুরু করব? এর উত্তর, প্রথমে আপনাকে সাত্ত্বিক হতে হবে। গীতার ষোল ও সতের নম্বর অধ্যায়ে সাত্ত্বিক গুণের বর্ণনা করা হয়েছে। সেটাকে টেনে এবার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ত্যাগ জিনিসটাকে তিনটে গুণের মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন। তামসিক ও রাজসিক ত্যাগের কথা বলার পর এবার সাত্ত্বিক ত্যাগীর বর্ণনা করছেন।

কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম, এই কাজ করাটা আমার কর্তব্য, বাবা-মাকে দেখা আমার দায়ীত্ব, সকালে উঠে জপধ্যান করা আমার কর্তব্য, স্নান করে পূজাবন্দনা করা আমার কর্তব্য, দুটো গরীবলোককে সেবা করা আমার কর্তব্য, কিন্তু এই কাজগুলি করার ফলে যে ফলের উৎপন্ন হবে, সেই ফলে আমার কোন আসক্তি নেই। বাবা-মায়ের সেবা করলে স্বর্গসুখ পাওয়া যায়, এই আশা নিয়ে আমি সেবা করছি না, বাবা-মায়ের সেবা না করলে লোকেরা আমার বদনাম করবে, বদনামের ভয়ে আমি সেবা করছি না, বাবা-মার সেবা করাটা আমার কর্তব্য তাই করছি, এখানে আমার কোন ফলের আশা নেই। কর্মফল ত্যাগ করাটা এক দিনেই হয়ে যাবে না। বছরের পর বছর কর্ম করতে থাকলে কর্মফল ত্যাগ হয়।

মঠে জয়েন করার পর বড় মহারাজরা আমাদের যে কাজই দিতেন, ঝাঁপিয়ে পড়ে করে দিতাম; উদ্দেশ্য মহারাজকে খুশী করা। তখন আমি নিষ্কাম কর্ম কি বুঝতাম না, ঠাকুরের কাজ করছি এই ভাবটাও বুঝতাম না, বুঝতাম, এটা আমার নিজের কাজ নয়। দ্বিতীয় বুঝতাম, বড় মহারাজদের খুশী করতে হবে। তিন চারটে সেন্টারে ট্রান্সফার হতে হতে মনে হতে শুরু হল, কত আর বড় মহারাজদের খুশী করব, সেখান থেকে ধীরে ধীরে বৈরাগ্য আসতে লাগল। এখন এই বয়সে এসে, যে যা করে দিতে বলেন করে দিই। যত দিন আমার কার্য ক্ষমতা আছে ততদিন যা বলবেন করে দেব, এতে আমার ভাল মন্দের কিছু নেই। সাত্ত্বিক কাজ এভাবেই হয়। তোমাকে

একটা দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে, যেখানে দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে, সেখানে কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা করবে না –এই যে ফলাকাঙ্ক্ষ ত্যাগ, এটাই সাত্ত্বিক ত্যাগ।

এখানে কিছু কিছু খুব সুন্দর আলোচনা আছে, যদিও আমাদের যেটুকু বুঝে নেওয়া প্রয়োজন, সেখানে এই আলোচনাগুলি না জানলেও কিছু আসে যায় না। কিন্তু কিছু দর্শন জেনে রাখা দরকার। নিত্যকর্ম করব কি করব না, এটাকে নিয়ে আগেকার মনীষীদের মধ্যে প্রচুর বিবাদ ছিল। হিন্দুদের যে মূল ধর্ম, এই ধর্ম দিয়েছে মীমাংসকরা। কুমারিল ভট্ট, মণ্ডন মিশ্র এনারা ছিলেন শঙ্করাচার্যের সময়ের মীমাংসক দর্শনের বড় বড় দিকপাল পণ্ডিত। মীমাংসকরাই হলেন ঠিক ঠিক বেদ পরম্পরার লোক। আজকের দিনে বেদ বলতে আমরা যা বুঝি, এই বেদকে যে ব্রাক্ষণরা ধরে রেখেছিলেন, বর্তমান সমাজে যে ব্রাক্ষণদের নিন্দা করা হয়, এনারা সবাই হলেন মীমাংসক বা কর্মকাণ্ডী। আচার্য শঙ্কর ব্রাক্ষণ শব্দের অর্থটা পালটে নিয়ে এলেন, যাঁরা ব্রহ্মে বিচরণ করেন। কর্মকাণ্ডী ব্রাক্ষণ বা মীমাংসকদের মত ছিল নিত্যকর্ম, সন্ধ্যা বন্দনাদি কেউ ত্যাগ করবে না, সন্ন্যাসীরাও ত্যাগ করবে না।

ইদানিং কালে কিছু কিছু মতবাদ থেকে শঙ্করাচার্যের নিন্দা করা হয়, সেটা করতে গিয়ে এনারা বিজ্ঞানবাদ বলে একটা নূতন শব্দ নিয়ে এলেন। এনারা বোঝেন না যে, আচার্য শঙ্কর হলেন ব্রহ্মবাদী। ঠাকুর যেমন বলছেন, ঈশ্বরই আছেন, বাকি সব অবস্তু, আচার্য শঙ্করও ঠিক একই কথা বলছেন, ব্রহ্মই আছেন বাকি সব মায়া। কিন্তু তিনি মায়াবাদী নন, যাঁরা তাঁকে মায়াবাদী বলেন, হয় তাঁরা দুষ্ট নয়তো মুর্খ। আচার্য শঙ্করের দুই প্রধান প্রতিপক্ষের একদিক মীমাংসকরা এবং অন্য দিকে বৌদ্ধরা। বেদকে নিয়ে আলোচনা করতে করতে যখন এটা সিদ্ধ হয়ে যায় যে, বেদ হল জ্ঞানের দিকে, জ্ঞানের দিকে যাওয়া মানে সন্ন্যাসের দিকে চলে যাচ্ছে। সেটা করতে গেলে বৌদ্ধরা এসে যাবে। আচার্য শঙ্কর অবতার কিনা, তিনি এমন ভাবে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করছেন যাতে, বেদও থেকে যাচ্ছে, সন্ন্যাসও থেকে যাচ্ছে। তাহলে বেদ থাকলে কর্মকাণ্ডীরা এসে যাবে আর সন্ন্যাস থাকলে বৌদ্ধরা এসে যাবে। আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর ভাবে বেদকেও রাখলেন, সন্ন্যাসকেও রাখলেন, এই ভাবে তিনি হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করলেন। ফলে দেখা গেল, আচার্য শঙ্করের যতগুলি তর্ক আছে, তার বেশির ভাগই হল মীমাংসকদের বিরুদ্ধে, কখন কখন বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে বলছেন, আর তার সাথে অন্যান্য যে দর্শনগুলি ছিল, সেগুলিকেও আক্রমণ করছেন।

যখন প্রশ্ন উঠল, সন্ন্যাসীরা কি নিত্যকর্ম করবেন, তাঁরা কি অগ্নিতে আহুতি দেবেন? আগেকার দিনে অগ্নিহোত্র কর্মই ছিল নিত্যকর্ম। আচার্য শঙ্কর এই অগ্নিহোত্রাদি কর্মকে পাল্টে প্রতিদিনের পূজা বন্দনাদিতে নিয়ে এলেন। এইভাবে তিনি সন্ন্যাসীদের অগ্নি থেকে সরিয়ে আনলেন, অগ্নি থেকে সরিয়া আনা মানে মীমাংসকদের থেকে সরিয়ে আনলেন। আচার্য স্পষ্ট বললেন, সন্ন্যাসীকে নিত্যকর্মও ছাড়তে হবে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের মনে হতে পারে এগুলো এমন কিছু না, ঠাকুরও তো তাই করেছিলেন। ঠাকুর যখন পিতৃদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করতে যাচ্ছেন, আঙুলের ফাঁক দিয়ে জল গড়িয়ে যাচ্ছে, তাঁর তর্পণ করা আর হল না। এটাও একটা কর্ম, কিন্তু ঠাকুর করতে পারছেন না, গলিতহস্ত হয়ে গেছেন।

আচার্য শঙ্কর তর্ক দিয়ে প্রমাণিত করে দিচ্ছেন, তুমি যে বলছ নিত্যকর্মের ফল হয় না, কিন্তু তা না, নিত্যকর্মের ফল হবেই। আচার্য শঙ্কর তিনটে কারণ দিয়ে দেখাচ্ছেন কেন নিত্যকর্মের ফল হবে। প্রথম হল, গীতাতেও আগে আগে বলা হয়েছে, যে কোন কর্ম হলে সেই কর্মের ফল হবেই। মীমাংসকরা আবার বলেন অকরণে প্রত্যবায়, নিত্যকর্ম করলে কোন পূণ্য হবে না, কিন্তু যদি না করা হয় তাহলে পাপ হবে। এটা ঠিক না, কর্ম হলে তার ফলও হবে। দ্বিতীয় বলছেন, যাঁরা তত্ত্ব জানেন না, তাঁরা এই ধরণের কল্পনা করে নেন যে, কর্ম ফল দেবে। তোমরা যে প্রত্যবায়ের কথা বলছ, ঠিকই বলছ, নিত্যকর্ম না করলে প্রত্যবায় হবে। নিত্যকর্ম করা থেকে বিরত হয়ে তুমি তোমার দেহ-

মনকে অশুদ্ধ হওয়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছ। কিন্তু তুমি যদি নিত্যকর্ম কর তাহলে তোমার সেই অশুদ্ধিটা আর হল না, তুমি পরিষ্কার হয়ে গেল। নিত্যকর্ম করে এই যে নিজের দেহ-মনকে পরিষ্কার করা, এটাও তো ফল।

কিন্তু যিনি পরমহংস, যিনি সেই উচ্চ অবস্থায় চলে গেছেন, তাঁদের নিত্যকর্ম করার দরকার নেই। ঠাকুর যে স্তরের সন্ন্যাসী, শঙ্করাচার্য যে স্তরের সন্ন্যাসী, ওই স্তরে একজন সাধারণ সংসারী মানুষকে কিভাবে নিয়ে আসা যাবে? এই আলোচনা দ্বাদশ অধ্যায়েও করা হয়েছে। বলছেন, কর্মত্যাগ আর কর্মফলত্যাগ সবটাতেই ত্যাগের সমানতা থাকছে, দুটোতেই ত্যাগ জিনিসটা সাধারণ। একজন কর্ম ত্যাগ করছেন, আরেকজন কর্মফলের ত্যাগ করছেন। বাচ্চা ছেলে যখন ব্যা ব্যা ব্ল্যাকশিপ শিখছে, তখন আমরা বলি, বাঃ খুব সুন্দর ইংরাজী শিখছে। সে ইংরাজীতে মাস্টার হয়ে যায়নি ঠিকই, কিন্তু শিখছে। শিখতে শুরু করেছে মানে, ত্যাগ করতে শুরু করল। ফলের কামনা স্থূল হোক, সূক্ষ্ম হোক সবটাতেই মানুষকে বেঁধে নেয়। কর্মফলের ত্যাগ এই বন্ধনটাকে কিছুটা তো শিথিল করছে, একটা জায়গা থেকে তো আমাদের শুরু করতে হবে, ফলত্যাগ থেকে এই শুরুটা হল।

শুদ্ধি কিভাবে হবে? আধ্যাত্মিক জীবনের প্রস্তুতি কিভাবে নেব? আচার্য শঙ্কর এটাকে খুব সুন্দর ও পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আচার্যের ভাষা খুব প্রাঞ্জল, সহজ, পড়ার সময় মনে হবে যেন কবিতা পড়ছি। বলছেন, *যঃ তু অধিকৃতঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলাভিসন্ধিং চ নিত্যং কর্ম করোতি তস্য ফলরাগাদিনা অকলুষীক্রিয়ামাণম্ অন্তঃকরণং নিত্যৈঃ চ কর্মভিঃ সংস্ক্রিয়মাণং বিশুধ্যতি*, যে কোন অধিকারী, যাঁরা গীতার এই আলোচনা শুনছেন, সবাই অধিকারী, যাঁরা শাস্ত্রের কথা শোনেন না, কিন্তু ধর্ম পথে আছেন, এনারা সবাই অধিকারী। যাঁরা এই রকম অধিকারী, তাঁরা যখন কর্মের প্রতি আসক্তি ছেড়ে দেয় আর তার সাথে কর্মের ফলের যে কামনা, এটাকেও ছেড়ে দিয়ে যে নিত্যকর্ম করেন, অর্থাৎ জপ করছেন, ধ্যান করছেন, তপস্যা করছেন, তীর্থ করেন, দান করেন, এটাই তাঁদের পবিত্র করে, *পাবনানি মনীষিণাম্*।

নিত্যকর্ম করলে একটা বিরাট দোষ হয়, সেটা হল নিত্যকর্ম অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্তি, মীমাংসকদের এই সমস্যাটা ছিল। বলছেন, ফলাসক্তিটাও যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, ঠাকুর আমার উপর খুশী হবেন, ঠাকুর আমার উপর কৃপা করবেন, এটাও ফলাসক্তি; হে ঠাকুর আমি যেন শুদ্ধ পবিত্র হই এটাও ফলাসক্তি; হে ঠাকুর তোমার দর্শন যেন পাই, এটাও ফলাসক্তি; এই ধরণের সমস্ত ফলাসক্তি যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে কি হবে? নিত্যকর্ম করতে করতে সে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যাবে, আচার্য এটাই বলছেন, *নিত্যৈঃ চ কর্মভিঃ সংস্ক্রিয়মাণং বিশুধ্যতি*। বলছেন, করে জপ করলে করশুদ্ধি হয়, মনে মনে জপ করলে মন শুদ্ধ হয়। ভিতরে কামনা বাসনা যদি থাকে তাহলে হবে না। গুরু আমাকে জপ, ধ্যান, পাঠ করতে বলে দিয়েছেন, আমাকে করতে হবে। বলছেন, নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করলে মন শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায়, কিন্তু কোন ধরণের আসক্তি যেন না থাকে। নিত্যকর্ম অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্তি, যেটা মীমাংসকদের ছিল, নিত্যকর্মের ফলে আসক্তি যেটা আমাদের হয়, এই দুটো আসক্তি থাকলে হবে না। তবে ফলাসক্তি একদিনে যাবে না, তবুও লেগে থাকতে হবে। করতে করতে নিজে থেকেই ফলের প্রতি আসক্তি চলে যায়।

দেওঘর বিদ্যাপীঠে আমরা একসাথে কয়েকজন ব্রহ্মচারী অবস্থায় জয়েন করেছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন ব্রহ্মচারী বেলুড় মঠে একটা বড় উৎসবে কাজে এসেছিলেন। উৎসব শেষে দেওঘর মঠে ফিরে গিয়ে সেই ব্রহ্মচারী বলছেন, 'উঃ কি আনন্দ'। উনি এর আগে একসাথে এত সন্ন্যাসীদের একত্রে দেখেননি। বলছেন, 'ওখানে ওই আনন্দে কাম ক্রোধ তো এমনিই উড়ে যায়'। বলতে চাইছেন, বেলুড় মঠের ওই পূণ্যভূমিতে, গঙ্গার পবিত্র বাতাসে আর অত সন্ন্যাসীদের দেখে ভিতরের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ সব এমনিতেই উড়ে যায়। তখন আমার বয়স কম ছিল, আমিও নূতন ব্রহ্মচারী, উনিও নূতন ব্রহ্মচারী, কিন্তু ব্রহ্মচারীর কথাটা তখন আমার খুব সুন্দর লেগেছিল।

একবার যেমনি নিত্যকর্মাদের মধ্য দিয়ে ঠাকুরের সঙ্গ করতে শুরু করবেন, কাম-ক্রোধাদি এগুলো নিজে থেকেই উড়ে যাবে। প্রথমে ফলের কামনা নিয়েই করতে শুরু করুন, একটা সময় তিনি নিজেই ফলের কামনা উড়িয়ে দেবেন, আপনাকে শুধু শুরুটা করতে হবে।

শাস্ত্রের ধারণা কে করতে পারেন? আচার্য বলছেন, *বিশুদ্ধং প্রসন্নম্ আত্মলোচনক্ষমং ভবতি*। আমাদের অনেকে লিখে পাঠান, মহারাজ পঁচিশ বছর ধরে গীতা পড়ছি, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি, এত দিনে বুঝতে পারছি। ভাবলাম লিখি, দুদিন পরে আর-একজন কোন আচার্যের লেকচার যখন শুনবেন, তাঁকেও আপনি একই কথা বলবেন – মহারাজ, সমর্পণানন্দ মহারাজের লেকচারও শুনেছিলাম, কিন্তু ধারণা করতে পারিনি, এখন আপনার লেকচার শুনে ধারণা করতে পারছি। কি করে আপনি ধারণা করবেন, আপনার মন অশুদ্ধ আর অপ্রসন্ন। মন যদি শুদ্ধ হয়, মন যদি প্রসন্ন থাকে, তবেই শাস্ত্রের অর্থ ধারণা করতে পারবেন। যতই শুনুন, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর শাস্ত্রের কথা শুনে যান, মন অশুদ্ধ ও অপ্রসন্ন থাকলে কোন দিন শাস্ত্রের কথা ধারণা হবে না।

জলের সাপ্লাই লাইনে একটু পরেই জল আসবে, কাজের লোককে বললেন, 'ওরে কলের তলায় বালতিটা পেতে রাখ এক্ষুণি জল আসবে'। জল আসার এক ঘন্টা পর গিয়ে দেখছেন বালতিতে এক ফোটা জল জমা হয়নি, ইতিমধ্যে জলও চলে গেছে। কেন জল হয়নি? বালতিটা উল্টো করে রাখা ছিল। নিত্যকর্ম না করলে মন শুদ্ধ হয় না, সন্ন্যাসীদেরও হয় না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য, এগুলো থেকে মন যদি বেরিয়ে না আসতে পারে মন প্রসন্ন হবে না। আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *তস্য এব নিত্যকর্মানুষ্ঠানে ন বিশুদ্ধান্তঃকরণস্য আত্মজ্ঞানাভিমুখস্য ক্রমেণ যথা তন্নিষ্টা স্যাৎ তদ্ বক্তব্যম্,* অন্তঃকরণ যখন বিশুদ্ধ হয়, আর সেখান থেকে যখন মন আত্মজ্ঞান অভিমুখী হয়, তখন কিভাবে সব কিছু এগোয়, এবার তার বর্ণনা করা হচ্ছে।

আমরা আবার আগের জায়গায় আসছি। নিত্যকর্ম যারা করে না, তারা দুই প্রকার হয় – একজন মোহ পড়ে নিত্যকর্ম করা ছেড়ে দিয়েছে, দ্বিতীয়জন খাটার ভয়ে ছেড়ে দিয়েছে। এই দুজনই ত্যাগ করছে, কিন্তু এই ত্যাগ কোন ফল দেয় না। সাত্ত্বিক ত্যাগী নিত্যকর্ম ছেড়ে দেয় না, সে জপধ্যান করবেই করবে। সাত্ত্বিক ত্যাগী বলেন, আমি জপধ্যান করছি, আমি পূজা অর্চনা করছি, যাতে আমার মন শুদ্ধ পবিত্র হয়। শুদ্ধ পবিত্র মনই প্রসন্ন মন। আপনার মনে কি কখন মলিনতা আসে, আপনি কি কখন হাঁড়িমুখ করে থাকেন? আপনার মনে কি কখন ক্রোধ উৎপন্ন হয়? আপনি দেখেছেন, ক্রোধান্বিত হলে মানুষ কেমন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে কথা বলে, আপনি দেখেছেন, অবসাদগ্রস্ত হলে মানুষের মুখে কেমন একটা মলিনতার কালো ছাপ ফুটে ওঠে, আপনি দেখেছেন, মনের মধ্যে অনেক ধরণের চিন্তা ভাবনার উদয় হলে মানুশ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে ঠাকুর পূজা করছেন, রাণী রাসমণি বসে পূজা দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। কেন এই রকম হয়? অশুদ্ধ অন্তঃকরণ।

অশুদ্ধ মনকে কি করে শুদ্ধ করতে হবে? জপধ্যান, পূজা, যজ্ঞ অর্থাৎ বিশেষ পূজা আর দানে। যার তার অন্ন গ্রহণ করতে নেই, যার তার জিনিস ব্যবহার করতে নেই। সতের নম্বর অধ্যায়ে বিস্তারে বলেছেন, কি ধরণের খাবার খেতে হবে, কি কি গ্রহণ করবেন, আর সন্দেহ থাকলে কিভাবে ওঁ উচ্চারণ করে সব রকম সংশয়, সন্দেহ দূর করতে হবে। এভাবে করতে থাকলে মন শুদ্ধ হয়, মন শুদ্ধ হলে মন প্রসন্ন হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণের আলোচনা করতে গিয়ে সেখানেও বলছেন, *প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে,* প্রসন্ন মন সমস্ত দুঃখকে নাশ করে। কিন্তু তার সঙ্গে প্রসন্ন মন ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাওয়া মন না, প্রসন্ন মন মানে শান্ত, শিষ্ট মন। একদিকে যেমন জপধ্যানে, ঈশ্বরের দিকে মনকে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত সহজ, অন্য দিকে অত্যন্ত কঠিনও। এই যে চেষ্টা করে মনকে জপধ্যানে, ঈশ্বরের দিকে লাগানোর জন্য যে খাটনি, যারা মনে করে বুড়ো বয়সে গিয়ে ধর্মকর্ম করব, বৃদ্ধ বয়েসে কি এই খাটনি সম্ভব! বয়স

কম থাকতে থাকতেই এগুলো শুরু করতে হয়। তাহলে কি বুড়ো বয়সে করে কি কিছু হবে না? অবশ্যই হবে, কোথাও তো শুরু করতে হবে। এই জন্মে না হলে পরের জন্মে হবে। শুরুটা তো করে দিন। কিভাবে এই জিনিসটাই আমাদের পর পর নিয়ে যায়?

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ।।১০।।

(কর্মে আসক্তি ও কর্মফল ত্যাগপূর্বক নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠাতা যখন আত্মা ও অনাত্মার বিবেকের কারণ যে সত্ত্বগুণ, তদ্‌যুক্ত হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করেন এবং অবিদ্যাকৃত সর্বসংশয় থেকে মুক্ত হন, অর্থাৎ আত্মস্বরূপে অবস্থানই মুক্তির একমাত্র উপায় – এ-রূপে নিশ্চয়বুদ্ধি লাভ করেন, তখন তিনি কাম্য কর্মে দ্বেষ করেন না ও নিত্যকর্মে আসক্ত হন না।)

মেধাবী কে? ঠিক ঠিক মেধাবী কি? এই জিনিসটাকে এখানে বর্ণনা করছেন। একটু আগে আমরা কর্ম আর কর্মত্যাগ নিয়ে বলছিলাম, এবার এখানে মেধাবী শব্দটা নিয়ে এলেন। মেধাবী শব্দটা আসলে ধর্ম জগতের শব্দ, কিন্তু আমরা জানি মেধাবী বলতে বোঝায় যাদের লেখাপড়াতে খুব মেধা আছে। জিনিসটা কমন। ধর্ম জগতে মেধাবী কে? কার ঠিক ঠিক মেধা আছে? *ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে,* অকুশল কর্মের প্রতি তাঁর কোন দ্বেষ নেই, তার সাথে কুশল কর্মের প্রতিও তাঁর কোন আসক্তি নেই। অর্থ হল, অকুশল কর্ম, যেমন কাম্য কর্ম, যেখানে বলছে আমার এটা চাই, আমার সেটা চাই, টাকা-পয়সা, নাম-যশ, কামিনী-কাঞ্চন, এগুলোর পিছনে যে দৌড়ে যাচ্ছে, এগুলো হল অকুশল কর্ম। এই কর্ম তাকে ধর্ম জীবনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। এই ধরণের কর্মের প্রতিও তাঁর কোন দ্বেষ নেই। তিনি জানেন, এগুলো আমার লাগবে না, আমার যখন লাগবে না তখন দ্বেষ করার কি দরকার। বাচ্চারা অকারণে দ্বেষ করে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে কেন, এক্ষুণি বন্ধ করতে বল; রোদের এত তেজ কেন, গরমে টিকতে পারছি না, এক্ষুণি রোদের তেজ কমাতে বল। এগুলো বাচ্চারা করে, আপনি-আমি এগুলো কেন করতে যাব! কাম্য কর্ম যাদের করার ইচ্ছে করুক, এটা তোমার ব্যাপার, আমার ভাই লাগবে না। যাঁরা উচ্চমানের পুরুষ, তাঁরা বলেন আমার লাগবে না, কিন্তু তোমার লাগবে আমি জানি।

মেধাকে আমাদের শাস্ত্রে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয় – *গ্রহণ ধারণ সামর্থ্যম্*। গ্রহণ, আমি কত তাড়াতাড়ি একটা জিনিসকে ভালো ভাবে বুঝে নিতে পারছি। ধারণ, বুঝে নিয়ে সেটাকে ভেতরে কত ভালো ধরে রাখতে পারছি। মেধাতে দুটো জিনিষ দেখতে হয়, কত তাড়াতাড়ি জিনিসটাকে ভালো করে বুঝে নিয়ে পুরো আয়ত্ত করে নিচ্ছে আর সেই জিনিসটাকে কত ভালো ধরে রাখার সামর্থ তার আছে। এই দুটো ক্ষমতা যদি কারুর মধ্যে থাকে সে যে কোন ক্ষেত্রে সাফল্য পেয়ে যাবে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে আমি কাকে মেধাবী বলব? *ন দেষ্টি অকুশলং কর্ম,* যে কোন বাজে কাজ, যেমন কাম্য কর্ম, কোন অপছন্দের কাজও যদি তার সামনে এসে যায়, তখন সেই কর্মের প্রতি তার কোন দ্বেষ হয় না, অসন্তুষ্ট বোধ করেনা। আর *কুশলে নানুসজ্জতে,* আবার যখন মনের মত কাজ বা ভালো কাজ এসে গেলে সেই কাজের প্রতি যে আসক্তি হবে, তাও হয় না।

মনের মত কাজ দিলে সবাই করতে পারবে। গাধাকে যদি মাঠে ঘাস খেতে ছেড়ে দেওয়া হয় সেতো মাঠে চরে বেড়াবে এতে আশ্চর্যের কি আছে। মনের মত কাজ করে বিরাট কিছু করছে; এতো সে করবেই, এটা তো জানা কথা। কিন্তু যারা ঠিক ঠিক মেধাবী তারা কখন বিচার করে না যে, এটা আমার মনের মত কাজ আর এটা আমার মনের মত কাজ নয়। মনের মত কাজ পেলে বেশি ভাল ভাবে করে দেবে, যেটা মনের মত কাজ নয় সেটাকে অত মন দিয়ে না করে যাহোক তাহোক করে দেবে, এই ধরণের মনোভাব মেধাবীর কখনই থাকে না।

ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো, এরাই হল সাত্ত্বিক ত্যাগী, এরাই ঠিক ঠিক সাত্ত্বিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত। কোন এক সেন্টারে এক মহারাজ ছিলেন, তিনি প্রচুর জপ-ধ্যান করতেন, জপ-ধ্যান নিয়েই তিনি সারাটা সময় কাটিয়ে দিতেন, খুব বেশি কাজে জড়াতেন না। কেন জড়াতেন না? তাঁর কোন কিছু চাওয়া-পাওয়া ছিল না। সেই সেন্টারে বাইরে থেকে এক সিনিয়র মহারাজ এসেছেন, তিনি সেখান থেকে ফিরে যাবেন। সন্ধ্যে বেলা ওনাকে হাওড়া স্টেশনে ছেড়ে আসার জন্য একজনকে তাঁর সাথে যেতে হবে। কিন্তু এমনই কপাল যে সেদিন সেই সেন্টারে এমন কোন মহারাজ ছিলেন না যে তাঁকে হাওড়া স্টেশনে ছেড়ে দিয়ে আসবেন। ওই মহারাজকে যখন ব্যাপারটা জানান হল তক্ষুণি তিনি কাঁধে চাদরটা ফেলে, নিজের জপ-ধ্যান ছেড়ে দিয়ে ওনাকে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে ছাড়তে চলে গেলেন। এই হচ্ছে *ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুসজ্জতে*। শুভ কাজ হোক আর অশুভ কাজই হোক, পছন্দের কাজ হোক আর অপছন্দের কাজই হোক, কোন কাজের প্রতি তার বিদ্বেষ থাকবে না আবার প্রীতিও থাকবে না।

আমাদের পরিচিতরা, এখানকার স্টাফেরা বিয়ে করতে যায়, যাওয়ার আগে আমাদের কাছে এসে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে, আমরাও খুব করে আশীর্বাদ করি। কোন জিনিসপত্র থাকলে গিফট রূপে দিয়েও দিই। আমরা সন্ন্যাসীরা এই পথ থেকে সরে এসেছি, তুমি এই পথে আছ, তাই বলে তোমার প্রতি আমার কোন দ্বেষ নেই। সব থেকে বেশি সমস্যা খ্রীশ্চানদের, ওদের ধর্মের কিছু কিছু বিচিত্র রকমের আইডিয়াস আছে, তুমি পাপী তোমাকে উদ্ধার করতে হবে। আমাকে উদ্ধার করার দায়ীত্ব তোমার না। সে কি করে নিচে নেমে গেছে, যেভাবেই নেমে থাকুক, তাতে দোষ দেখার কিছু নেই। অন্য দিকে কুশল কর্ম অর্থাৎ নিত্যকর্ম, তাতে তার কোন আসক্তি নেই। সে জানে, নিত্যকর্ম হল ধর্মসাধন, ধর্মসাধন অশুভ যোনি থেকে মুক্তি দেয়।

চারটে পুরুষার্থের দুটো পুরুষার্থ অর্থ আর কাম। কাম জিনিসটার মধ্যে ভোগের ব্যাপারটা জড়িয়ে আছে; এই যে ভোগের ইচ্ছা, দেহধারণ করলে ভোগের ইচ্ছা থাকবেই থাকবে। ভোগ পূরণের জন্য অর্থ লাগবেই লাগবে। অর্থ আর কাম, এই দুটির সাধন করতে গিয়ে, ভোগ সাধন আর অর্থ সাধন, এটাই ঠেলে নিয়ে যায় কাম্য কর্মের দিকে। ধর্মসাধনে বলে, অশুভ যোনিতে যেন আমাকে না যেতে হয়। নিত্যকর্মই অশুভ যোনিতে যাওয়াটা আটকে দেয়।

কিন্তু আমি স্বর্গও চাই না, ভাল যোনিতেও যেতে চাই না। কিন্তু আমি যে নিত্যকর্ম করছি, কেন করছি? আমার আত্মশুদ্ধির জন্য। এই যে আমি নিত্যকর্ম করছি, এতে আমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হবে, সেই শুদ্ধ অন্তঃকরণে জ্ঞানের উদয় হবে। এই রকম যখন মনের ভাব হয়, তখনই তার মধ্যে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হওয়ার পরে এবার সে ধর্মজীবনে প্রবেশ করার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দেয়। এভাবেই সবার ধর্মজীবনের প্রস্তুতি হয়। কাম্য কর্ম, নিষিদ্ধ কর্ম, যে কর্ম করতে শাস্ত্রে নিষেধ করা হয়েছে, বা যেগুলোকে আপনি গর্হিত মনে করেন, এগুলো যে করছে করুক, ওটা আপনার পথ নয়। ইদানিং কালে সোস্যাল মিডিয়াতে অনেকে অনেক কিছু জানতে চায়, এটা খাওয়া যাবে কিনা, সেটা করা যাবে কিনা ইত্যাদি। এগুলোতে আপনার কি দরকার, আপনি খাবেন কিনা, আপনি করবেন কিনা, আপনি নিজেই বিচার করে দেখুন। যাঁরা আইনের দেখাশোনা করেন, তাঁরা দেখুন খাওয়া যাবে কি যাবে না, আমার এসবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তুমি যদি অন্ধকারেই থাকতে চাও, তুমি থাক, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। তোমার প্রতি আমার কোন স্নেহও নেই, তোমার প্রতি আমার কোন বিদ্বেষও নেই। গুরু আমাকে বলে দিয়েছেন নিত্যকর্ম করতে, আমাকে এটাই করতে হবে। এরপর নিত্যকর্ম করলে এই ফল দেবে, সেই ফল দেবে, এই ফলের ব্যাপারেও আমার কোন রকম আগ্রহ নেই, আর ফলের কোন আশাও করছি না।

তবে এই ফলের দিকে আমি তাকিয়ে আছি – আমার যে অশুদ্ধ মন, যেখানে অনেক কামনা-বাসনা বাসা বেঁধে আছে, রাগ-দ্বেষ জমে আছে, নিত্যকর্মের অনুষ্ঠানে দ্বারা এই আবর্জনাগুলি

আমি পরিষ্কার করতে চাইছি। বলবেন, এটাও তো ফলকামনা হয়ে গেল। কখনই তা নয়, আমরা প্রত্যেকে জন্মজন্মান্তর থেকে শুদ্ধ, অশুদ্ধিটা বাইরে থেকে নিয়ে এসেছি, নিত্যকর্ম করে আবর্জনা পরিষ্কার করছি আমার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাওয়ার জন্য। রোগ ব্যাধি হলে মানুষ ওষুধ সেবন করে তার স্বাভাবিক অবস্থা, স্বস্থ ফিরে পাওয়ার জন্য। নিত্যকর্মও করা হয় স্বস্থ হওয়ার জন্য। স্বস্থ মানে স্ব স্থ, নিজের মধ্যে অবস্থান করা। ওষুধ খাওয়াটা দেহের স্বস্থের জন্য; জপধ্যান করা, নিত্যকর্ম করা মানে মনকে স্বস্থ করা।

মেধাবী কে? যিনি কর্মের রহস্য জানেন। মেধাবী কে? যিনি জেনে গেছেন, যারা অর্থ ও কামের জন্য কাম্য করছে, তারা করুক, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আর আমি যে নিত্যকর্ম করছি, সেটা করছি আমার নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য। এনারাই হলেন ঠিক ঠিক মেধাবী। তাঁর নিজের আর কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি নেই, কিংবা চেষ্টা করছেন কামিনী-কাঞ্চন থেকে পুরোপুরি ভাবে সরে আসার জন্য, কিন্তু সচেতন ভাবে কখনই কাম্য কর্মে তিনি লিপ্ত হবেন না। চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান খুব সুন্দর বলেছিলেন, একবার যখন এই পথ নিয়ে নেওয়া হয়, তখন তার পূর্ব পূর্ব জন্মের সঞ্চিত কর্ম ঠেলে তাঁকে দিয়ে কিছু কর্ম করিয়ে নেয়। কিন্তু তাতে তাঁর কোন ক্ষতি হয় না, কারণ সে এই ভেবে খেদ করে, ইস্ আমার কর্ম এমন, এখনও আমাকে দিয়ে তিনি এই ধরণের কর্ম করাচ্ছেন, এই কর্ম করে আমি খুব লজ্জিত।

আপনি ত্যাগী না ভোগী কি করে বুঝবেন? ভোগের জিনিস হল কামিনী-কাঞ্চন বা অর্থ আর কাম, এর মধ্যে আপনি যখন নামছেন, তখন ওই কর্ম করে কি আপনার ভাল লাগছে নাকি নিজেকে লজ্জিত বোধ করছেন? যদি নিজেকে লজ্জিত বোধ করেন, তাহলে আপনি ত্যাগের পথে যাচ্ছেন। আর যদি মনে করেন, আহা এটা যদি আর-একবার করতে পারতাম; তাহলে বুঝবেন আপনি এখনও ভোগের পথে আছেন, আপনার সময় লাগবে। যারা এগুলো কিছুই মানে না, হিংস্র পশু যেমন শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক সেই রকম পুরোপুরি যারা ভোগের জিনিস পেলে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, যারা কামিনী-কাঞ্চনে মুখ জুবড়ে পড়ে আছে, এরা অতি সাধারণ মানুষ, এদেরকে নিয়ে এখানে আলোচনা করার কিছু নেই।

এটাই কর্মযোগের অনুষ্ঠান। *স অধিকৃত পুরুষঃ*, অধিকারী পুরুষ এভাবেই কর্মযোগের অনুষ্ঠান করে অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ করে নেন। বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ হয়ে গেলে তিনি ভাল ভাবে বুঝে যান, আমি সেই বিশুদ্ধ আত্মা, যাঁর জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, ষড়বিকার নেই। এই জিনিসটাতে তাঁরা তত্ত্বতঃ বুঝে নেন। তখন কি হয়? পরমহংস যেমন নিষ্কর্ম হয়ে গিয়ে যে ফল ভোগ করেন, ওই একই ফল ওনারাও ভোগ করেন। তার মানে, সাত্ত্বিক ত্যাগী যাঁরা, যাঁরা গৌণ সন্ন্যাসী, তাঁরাও একই জিনিস লাভ করেন। কি লাভ করেন? অমৃতত্ব।

স্বামী মোক্ষদানন্দের আমি প্রচুর সঙ্গ করেছি, তিনি আমাকে আধ্যাত্মিক জগতের অনেক কিছু খুলে দিয়েছিলেন। একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'অদ্বৈত তত্ত্ব যদি একবার তুমি বুঝে নাও, আর জীবনে যদি একশ ভাগ নামাতে পার, তাহলে তো তুমি জ্ঞানী হয়েই গেলে। তখন জ্ঞানী যা যা করেন, তুমিও সেটাই করবে, তফাৎ থাকল শুধু সাক্ষাৎ করাতে। সেতো তাঁর ইচ্ছা, তিনি সেটা তোমাকে কবে দেবেন তিনিই জানেন'। ধরুন আপনি ঠাকুরের মত হতে চাইছেন, চাইলেই তো ঠাকুরের মত সব কিছু হওয়া যাবে না, কিছু জিনিস হওয়া যাবে। যেমন, শ্রীশ্রীমা বলছেন, ঠাকুর ছিলেন ত্যাগীর বাদশা, আপনিও ত্যাগের বাদশা হতে পারেন। কিন্তু ঠাকুরে যে দিব্য দর্শনগুলো হত সেটা আপনার হাতে নেই, কখন হবে কেউ জানে না।

গীতার এই জায়গাটার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য এটাই বলতে চাইছেন – প্রথমে মন, অন্তঃকরণ এগুলোকে একেবারে শুদ্ধ করে নেওয়া, শুদ্ধ মন হয়ে গেলে মন প্রসন্ন হয়ে যাবে, তখন

শাস্ত্রের মর্ম বোঝা যাবে। অন্তঃকরণ যতক্ষণ একেবারে শুদ্ধ ও প্রসন্ন না হয়, ততক্ষণ শাস্ত্রের মর্ম কিছুই বোঝা যাবে না। শাস্ত্রের মর্ম কি? শাস্ত্রের মর্ম এটাই – আমি শুদ্ধ আত্মা, যাঁর না আছে মৃত্যু, না আছে জন্ম, না আছে জগতের সৃষ্টি, না আছে জগতের লয়। এই তত্ত্বটা বুঝে নিলে তখন তিনি হয়ে যান পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য। বাস্তবে তখন তাঁর বাইরের ও ভিতরের আচরণ শ্রেষ্ঠতম সন্ন্যাসীর মতই হয়ে যায়।

কিন্তু যিনি কর্মাধিকারী, যাঁর জন্য এখনও কর্ম করা দরকার, অর্থাৎ যিনি শরীরকেই আত্মা মনে করেন, আর আমি করছি এই ভাব যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ তাঁর পক্ষে কর্মত্যাগ করা সম্ভব না। পরের শ্লোকে এটাই ভগবান বলবেন –আমিত্ব বোধ, আমি বোধ যতক্ষণ আছে, তাঁরা কর্মত্যাগ করতে পারেন না। ধর্মজীবনে প্রথম পা রাখা কিভাবে হয়, বলা হল – যেন মোহবশাৎ ত্যাগ না হয়, রাজসিক ত্যাগ যেন না হয়, সাত্ত্বিক কর্ম করা, মানে নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করে যেতে হবে। নিত্যকর্ম করলে মন শুদ্ধ পবিত্র হবে, সেখান থেকে আসবে শাস্ত্রের মর্ম বোঝার ক্ষমতা। শাস্ত্রের মর্ম বোঝা মানে, আত্মতত্ত্ব কি এটাকে বুঝে নেওয়া। এটাকে বুঝে নেওয়ার পর এবার আচরণে প্রতিফলিত করা। এরপর মুখ্য সন্ন্যাস নিজে থেকেই হয়ে যাবে।

পরের শ্লোকে যাবার আগে আমাদের একটু পিছনের দিকে ফিরে দেখলে পরের জিনিসগুলো বুঝতে সুবিধা হবে। গীতার শুরুতে আমরা দেখেছিলাম, অর্জুনের মন বিষাদে ভরে গেছে, এ আমি কি করতে যাচ্ছি, নিজের গুরুজন, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়স্বজনদের বধ করতে যাচ্ছি। এই যুদ্ধ করাটা কি ঠিক হবে? দ্বিতীয় অধ্যায়ে গিয়ে অর্জুন আরও মারাত্মক কথা বললেন, ক্ষত্রিয় ধর্মটাই আমি ছেড়ে দেব, ছেড়ে দিয়ে ব্রাহ্মণদের যে ধর্ম, সন্ন্যাসীদের যে ধর্ম, ভিক্ষুক হয়ে আমি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে জীবনধারণ করব। অর্জুনের কথা শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অবাক হয়ে গেলেন। এই যে অর্জুনের প্রশ্ন, যুদ্ধ করাটা কি ঠিক, আর সেখান থেকে স্বাভাবিক ভাবে এই প্রশ্নটাও উঠে আসে, কর্ম করাটা কি আদৌ ঠিক?

একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, যখন কাউকে উপদেশ দেওয়া হয় বা শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন ওটাই বলা হয়, যেটা মানুষ করে না। জুহুদিরা এত লড়াই, যুদ্ধবিগ্রহ করত, যীশু এসে তাদের ভ্রাতৃত্বের উপদেশ দিলেন, শান্তির উপদেশ দিলেন; যদিও পরবর্তি কালে খ্রীশ্চানরা যীশুর উপদেশ অনুসরণ করল না, সেটা অন্য জিনিস। হিন্দুরা জন্ম থেকেই ফাঁকিবাজ, সেইজন্য ভগবান এসে গীতায় কর্মের উপদেশ দিলেন। স্বামীজীও কর্মের উপদেশ দিলেন। পরে পরে বৌদ্ধরা এলো। যদিও অনেকে বলেন, গীতা ভগবান বুদ্ধের পরে এসেছে; এর থেকে বোকা কথা আর কিছু হতে পারে না। গীতা ভগবান বুদ্ধের অনেক আগে রচিত হয়ে গেছে। একেই তো ভারতের লোকেরা ফাঁকিবাজ ছিল, বৌদ্ধরা এসে আরও ফাঁকিবাজ বানিয়ে দিল। সেইজন্য গীতার উপযোগিতা অনেক বেশি। যাঁরা বলেন, বৃদ্ধ বয়সে গিয়ে ধর্মকর্ম করব, বৃদ্ধ বয়সে গিয়ে গীতা শুনব, বুঝে নিতে অসুবিধা নেই যে, এনাদের এই জন্মটা তো গেছেই, আগামী জন্মটাও গেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। বৃদ্ধ বয়সে যাওয়ার আগেও যদি গীতা শুনতে শুরু করে দেন, তাহলে একটা সম্ভবনা থাকে যে পরের জন্মটা ঠিক হবে। ভগবান তাই এখানে কর্ম মাহাত্ম, কর্ম করার অধিকারী কে আর কর্মে সফল কি করে হবে, এগুলোকে নিয়ে আলোচনা করছেন।

প্রশ্ন ছিল, এত লোক যেখানে মরতে যাচ্ছে, সেখানে এই যুদ্ধ করাটা ঠিক হবে কিনা? এই প্রসঙ্গটাকে ভগবান সতের নম্বর শ্লোকে এসে ইতি টানবেন। পরের ছয়-সাতটি শ্লোক খুব সুন্দর। কর্ম কিভাবে হয়, আগেও বলেছেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিছুটা শুরু করা হয়েছিল, তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারে বললেন। কিন্তু এখানে পুরো জিনিসটাকে একটা জায়গায় নিয়ে আসছেন। আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, যারা কর্মাধিকারী, আমরা সবাই কর্মাধিকারী, সন্ন্যাসীরাও কর্মাধিকারী। সন্ন্যাসীরাও তো কাজ করেন, সমাজের যত দুঃখ-কষ্ট সন্ন্যাসীরাই নিজের উপর টেনে নেন, সন্ন্যাসীর কাছেই লোকেরা

এসে নিজের জ্বালা-যন্ত্রণার কথা বলে, তারা জানে সন্ন্যাসীরা নিউট্রাল। সন্ন্যাসীরা কিছু না করুক, লোকেদের দুঃখ-কষ্টের কথা শোনেন, এটাই তো একটা বিরাট সমাজ সেবা। মানুষ মনস্তাত্ত্বিকদের কাছে কাউন্সেলিং করতে গেলে টাকা খরচ করে নিজেদের দুঃখ-কষ্টের কথাই বলেন।

পরমহংস পরিব্রাজক যাঁরা, তাঁরাই একমাত্র কর্ম করবেন না। ঠাকুরের মত লোকেরাই কর্ম করবেন না। পওহারী বাবা, ত্রৈলঙ্গস্বামী, এনাদের মত লোকেরা কর্ম করবেন না। বাকি সবাইকে কর্ম করতে হয়। এই জিনিসটা কি করে বোঝা যাবে? দেহাত্মাভিমানী, দেহকে যিনি আত্মা মনে করেন, আমরা সবাই দেহকেই আত্মা মনে করি। দেহবোধ থেকে কিছুতেই বেরোন যায় না। এগারো নম্বর শ্লোকের ভূমিকাতে আচার্য বলছেন, যে নিজেকে দেহের সাথে জুড়ে রেখেছে, সে নিজেকে মনে করে আমি কর্তা। সবাই দেহের সাথে নিজেকে জুড়ে রেখেছে। একজন ভদ্রমহিলা দেখা করতে এসেছেন, সঙ্গে কিছু ফল নিয়ে এসেছেন। আমাকে বলছেন, মহারাজ আপনি কিন্তু ফলগুলো খাবেন। ওনার সামনেই আমি সব ফল ঠাকুর ঘরে পাঠিয়ে দিলাম। নিজের শরীর বোধ আছে, তাই অপরের উপরেও শরীর বোধটা রেখে দেন, অবশ্যই ফলগুলো খাবেন। যার এই বোধ, আমার এই যে শরীর, এটাই আমি, আমার এই যে মন, এটাই আমি, মানুষ এটা থেকে বেরোতে পারে না। ফলে আমি কর্তা, এই কর্তৃত্ব বুদ্ধিটা থেকে যায়। যাদেরই দেহে আত্মবুদ্ধি রয়েছে, তারা মনে করে আমি কর্তা। আর এটাই তার নিশ্চল বুদ্ধি যে, আমি করছি। এরাই ঠিক ঠিক কর্মের অধিকারী, এরা কখনই কাজ ছাড়তে পারে না। তোমরা কখন ত্যাগের কথা, সন্ন্যাসের কথা বলবে না, ভাবতেও যেও না।

আচার্য বলছেন, *অশেষকর্মপরিত্যাগস্য অশক্যত্বাৎ*, এনাদের জন্য সম্পূর্ণ কর্মত্যাগ অসম্ভব। যারা এসে বলে, সংসার আর ভাল লাগে না, বুঝতে হবে কিছু একটা গোলমাল ঘটছে, হয় স্বামীর সাথে গোলমাল, নয়তো স্ত্রীর সাথে, নয়তো সন্তানের সাথে গোলমাল চলছে, কিছু একটা এমন গোলমাল চলছে যে সংসারে আর থাকতে চাইছে না। এদের বলি, তোমার দেহ বুদ্ধি প্রবল অথচ বলছ, সংসার ভাল লাগছে না। এটাই ভগবান এখানে সাবধান করছেন, তুমি কর্মের অধিকারী, কর্ম করাই তোমার জন্য শ্রেয়, কর্ম তোমাকে করতেই হবে। কিন্তু কর্ম করতে থাকলে, এই চক্র তো চলতেই থাকবে, কোন দিন এই চক্রের শেষ হবে না। একটা উপায় তো বার করতে হবে। আমি নিজেকে দেহ মনে করি সেইজন্য কাজ করছি, কাজ করছি বলে আমার দেহে আত্মবুদ্ধি হয়ে আছে।

টিয়া বইতে প্রথমের দিকেই লেখা আছে, Body creates hunger and eating creates body, what a place! শরীর থাকলে খিদে পাবে, খেলেই শরীর হবে, এই চক্রটা চলতেই থাকবে। যার দেহবোধ আছে তার কর্তৃত্ব বোধ থাকবে, কর্তৃত্ব বোধ হলে কাজ করবেই, কাজ করলেই দেহবোধ বাড়বে। এই চক্র থেকে বেরোবার কিছু একটা পথ বার করুন। গীতা তখন তাকে বলছেন, তুমি কর্মফলটা ত্যাগ কর। গীতাতে কর্মফল ত্যাগের কথা অনেকবার এসেছে। কর্মফল তুমি যদি ত্যাগ কর, তাহলেও তুমি ত্যাগী, সন্ন্যাসের মতই। ঠাকুরের মত হবে না ঠিকই, কিন্তু ধর্ম জীবনে তোমার প্রথম পা পড়ে গেছে। একজন মহারাজ আমাকে খুব সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন। ওনাকে প্রবুদ্ধ ভারতের এডিটর করে পাঠানো হয়েছে। উনি প্রথম নিজের এডিটোরিয়াল লিখলেন। সেটা পড়ে তখনকার মঠের জেনারেল সেক্রেটারী খুব সুন্দর একটা চিঠি লিখলেন – A thing will began is half done। একটা জিনিসকে যদি সুন্দর করে শুরু করে দেওয়া হল, অর্দ্ধেক কাজ হয়ে গেল। একবার শুধু সুন্দর ভাবে কর্মফল ত্যাগ শুরু করে দিতে হবে।

কিভাবে করবেন? কিছু করতে হবে না, শুধু সকাল বিকেল দু-বার করে ঠাকুরের কাছে হাতজোড় করে বলা, হে ঠাকুর সারাদিনে যা কিছু করলাম, সব ফল তোমার পায়ে অর্পণ করলাম। আপনারা বলতে পারেন, এটা তো মুখের কথা। মুখের কথা দিয়েই শুরু করুন। আজকালকার বাচ্চারা যখন তার মাকে গিয়ে বলে, Mom I love you, এতো মুখেরই কথা। এটা কি হৃদয়ের কথা? কিন্তু ওই ভাবে এগোতে এগোতে হৃদয়ে ঢোকে, মুখ দিয়েই শুরু করুন। বিকালে একবার,

রাত্রে শোওয়ার আগে দু বেলা বলুন, শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। এইভাবে কর্মফল সমর্পণ যিনি করছেন, তাঁকেও ত্যাগী বলছেন। Half done, আপনার যাত্রা শুরু হয়ে গেল। যাত্রা একবার যখন শুরু হয়ে গেল, যাত্রা গন্তব্যে শেষ হতে বাধ্য। ট্রেনে চেপে পড়েছেন, ট্রেন চলতে শুরু করল, আজ পৌঁছাক কাল পৌঁছাক, দিল্লী পৌঁছাতে বাধ্য। এটাকেই এবার গীতা এগারো নম্বর শ্লোকে বলছেন।

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে।।১১।।

(যেহেতু দেহাভিমানী ব্যক্তিরা নিঃশেষরূপে সকল কর্ম ত্যাগ করতে পারেন না, সেই জন্য তিনি কর্মফলে বাসনা ত্যাগ করেন, তিনি ত্যাগী বলে কথিত হন।)

দেহভৃত, দেহে যার আত্মবুদ্ধি আছে, তার পক্ষে কখনই কর্ম ছেড়ে দেওয়া সম্ভব না। তাহলে কে কাজ করবে? যার দেহে আত্মবুদ্ধি আছে। খাওয়া-দাওয়া করতে আপনার ভাল লাগে? পড়াশোনা করতে আপনার ভাল লাগে? অপরকে খাইয়ে আপনি আনন্দ পান? তার মানে, আপনার দেহাত্মবোধ আছে। শরীর খারাপ করলে দেহের দিকে আপনার মন যায়? যদি যায়, তার মানে আপনার দেহবোধ আছে, আপনাকে কাজ করতে হবে। আর উন্নতি যদি চান, তাহলে সকাল বিকাল ঠাকুরকে যখন প্রণাম করবেন, তখন শরণাগতির জন্য প্রার্থনা করবেন। শরণাগতির প্রার্থনা করে, হে প্রভু এতক্ষণ আমি যা কিছু করেছি তার সব ফল তোমার পায়ে সমর্পণ করলাম। তার সাথে আরেকটা জিনিস করতে হবে, ধীরে ধীরে কাজ করাটা কমাতে হবে।

কথামৃতেও ঠাকুর বলছেন, অনেকের কাজের বাই থাকে, এটাকে কমাতে হবে। যতটুকু সম্ভব নিত্যকর্মটা করে যেতে হবে। নিত্যকর্ম নিজেকেই ঠিক করে নিতে হবে, কি কি আমার নিত্যকর্ম হবে। সকালে উঠে জপধ্যান করা, গীতা পাঠ করা, চণ্ডী পাঠ করা, কথামৃত পড়া বা যিনি যে সম্প্রদায়ের আছেন, তিনি সেই সম্প্রদায়ে যে ধরণের নিত্যকর্ম করার বিধান আছে সেগুলো করবেন, সেই সম্প্রদায়ের গ্রন্থ পড়বেন।

বিষয় থেকে সরে বলছি, আপনারা যারা গীতার কথা শুনছেন, ধরে নিচ্ছি আপনারা সবাই হিন্দু। হিন্দু মানেই আপনাদের গোত্র আছে, গোত্র থাকতেই হবে। হিন্দু মানেই গোত্র, গোত্র মানেই হিন্দু, কারণ হিন্দু ছাড়া গোত্র হয় না, গোত্র ছাড়া হিন্দু হয় না। গোত্র মানে, আপনার যে সংস্কার, এই সংস্কার এক বিশেষ ঋষি থেকে আসছে। কেউ বলবেন আমার ভরদ্বাজ গোত্র, কেউ বলবেন আমার কাশ্যপ গোত্র, কেই বলবেন আমার শাণ্ডিল্য গোত্র, তার মানে ওই ঋষিদের থেকে আপনার পরম্পরা আসছে। সেই ঋষি নিজের জীবনটা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভে পুরোপুরি উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। একদিন একজনের সাথে কথা হচ্ছিল, তিনি খুব সুন্দর বলছিলেন, আহা বাঙালীদের গর্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠিকই বাঙালী সমাজের গর্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু আপনার নিজের গর্ব করার মত বিষয় আগে থেকেই আপনার কাছে আছে; সেটা হল আপনার যে গোত্র, সেটা আপনার গর্ব করার বা যেখান থেকে আপনি দীক্ষা নিয়েছেন, যেখান থেকে সেই সম্প্রদায় শুরু হয়েছে, সম্প্রদায় কর্তা যিনি, আপনার গর্বের জিনিস।

ঠাকুরের যাঁরা ভক্ত, তাঁদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সম্প্রদায় কর্তা। দুটো গোত্র তো আপনার আছেই, যে কোন একটাকে মানলেই হল। এনারা সবাই আধ্যাত্মিক সত্যগুলি প্রত্যক্ষ করার জন্য, ধর্মকে রক্ষা করার জন্য জীবন উৎসর্গ করে দিলেন। কপি রাইট এ্যক্টের জন্য রবীন্দ্রনাথের সব রচনা কপি রাইট থেকে মুক্ত করে দেওয়ার পর অনেকেই রবীন্দ্র রচনাবলী ছাপতে চাইল, এই নিয়ে অনেক হৈচৈ শুরু হয়ে গেল, এই জিনিস করা যেতে পারে না। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে অনেকে যখন নিজেদের মত করে সুর দিয়ে গাইতে গেল, তখনও বিরাট ঝামেলা বেঁধে গেল, এই জিনিস করা যাবে না, ঐতিহ্য বজায় রাখতে হবে। ঠিক তেমনি ধর্মের ঐতিহ্যকেও আমাদের বজায় রাখতে হবে।

কোন ধর্মের? আপনি যে বংশের, আপনি যে গোত্রের, আপনার বংশের যিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ, সেই ধর্মের ঐতিহ্যকে রক্ষা করার দায়ীত্ব আপনার।

আপনাদের মনে কি এই নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা আসে না? আমার এক পরিচিত আছেন, তাঁরা ইদানিং কম্যুনিস্ট হয়ে গেছেন। ভদ্রলোক মারা গেছেন, তাঁর দুই ছেলে, দুজনই কম্যুনিস্ট হয়ে গেছে। বাবা মারা যাওয়ার পর মুখাগ্নির কথা উঠল, দুই ছেলেই বলে দিল, আমরা এগুলো মানি না। তার থেকেও বেশি, আমার পার্টি কি বলবে। একজন ভদ্রলোক তাদের বললেন, 'তোমার পার্টি কি বলবে সেটা নিয়ে তোমার চিন্তা, কিন্তু যে সমাজে তোমরা বড় হলে, যে সমাজে তোমাদের মা এখনও বেঁচে আছেন, আত্মীয়স্বজনরা আছেন, তাঁরা কি বলবে, ভেবে দেখেছ? সেটা নিয়ে তোমাদের কোন চিন্তা নেই?' অমুকে কি বলবে সেই নিয়ে আমরা ভাবছি, অথচ আমার নিজের সমাজ, যে সমাজ আমাকে সংস্কার দিয়েছে, সেটার দিকে আমাদের দৃষ্টি নেই। কোথাও একটা কপটতা আছে কিনা? কোথাও একটা দ্বিচারিতা আছে কিনা? আপনারাই বিচার করে দেখুন।

আপনি যে গোত্রের, সেই গোত্রে কিছু নিত্যকর্ম আছে। যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত তাঁরা কথামৃত পাঠ করবেন। যাঁরা রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের, তাঁরা গীতা পাঠ করবেন, চণ্ডী পাঠ করবেন, তার সাথে কথামৃতও পাঠ করবেন আর জপধ্যান করবেন। এর সাথে সমাজের যে দায়ীত্ব রয়েছে, সেগুলোও পালন করতে হবে। এরপর বাহ্য জগতের ব্যাপারগুলোকে ধীরে ধীরে কমাবার চেষ্টা করতে হবে। তার সাথে গীতা যেটা বলছেন, সমস্ত কর্মের ফল ঠাকুরের পায়ে অর্পণ করে দেওয়া, যাতে মন শুদ্ধ হয়, কর্মের প্রতি বাসনা যাতে কমে যায়। এরপর ধীরে ধীরে কর্ম আপনা থেকেই খসে পড়ে যাবে। জোর করে কর্ম করা বন্ধ করে দিতে নেই।

কথামৃত লেখার সময় কিভাবে মাস্টারমশাইয়ের মাথায় ঢুকে গিয়েছিল যে, আগে ঈশ্বর দর্শন, পরে কর্ম। কোথাও একটু বুঝতে ভুল হয়ে গিয়েছিল, যেটাকে নিয়ে সেই সময় মঠ মিশনে খুব অশান্তিও হয়েছিল। যাই হোক, গীতা বলছেন, এরাও ত্যাগী। আচার্য বলছেন, যিনি দেহাত্ম অভিমানের বাইরে চলে গেছেন, যিনি পরমার্থ জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, একমাত্র তাঁরাই কর্ম ত্যাগ করতে পারেন। এনাদের বাদে অন্য কেউ কর্ম ত্যাগ করতে পারে না। আমাদের মধ্যে এখনও অনেকের মধ্যে এই নিয়ে অনেক ভুল চিন্তা-ভাবনা কাজ করে। কিছু দিন আগে একজন ব্রহ্মচারী মহারাজকে বললাম, 'কি হল, আপনার কোন কাজকর্ম নেই'? তিনি বললেন, 'ঠাকুরের কৃপায় সবাইকে এই জন্মে কাজ করতে হয় না, আগের আগের জন্মে তাদের করা আছে'। কি আর বলব, কালকের ব্রহ্মচারী আমাকেই উপদেশ দিচ্ছেন। যখন এই রকম করে করে আপনি উপরে চলে এলেন, তখন আপনি কর্মের ফল ত্যাগ করতে শুরু করলেন।

কর্মের ফল ত্যাগ করে আমার কি লাভ হবে? একটা কাজ করব, তাতে আমার লাভ দেখতে হবে না? আমি সন্ন্যাসী হয়ে গেছি, আমি কি দেখব না, সন্ন্যাসী হয়ে আমি কি পাব? আমার পরিচিতরা আমাকে জিজ্ঞেস করবে, সন্ন্যাসী হয়ে জীবনে তুমি কি পেলে ভাই? জগৎ ছেড়ে দিলে, বাবা-মাকে ছেড়ে দিলে, আপনজনদের দেখা ছেড়ে দিলে, কি পেলে তাতে? গীতা তখন বলছেন –

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ।।১২।।

(ধর্মাধর্মরূপ কর্মের দেবাদিজন্মরূপ ইষ্ট, পশ্বাদিজন্মরূপ অনিষ্ট ও মানবজন্মরূপ মিশ্র – এই তিন প্রকার ফল দেহাভিমানী আত্মজ্ঞানহীনদিগেরই হয়ে থাকে। কিন্তু দেহাত্মবুদ্ধিরহিত জ্ঞানীদিগের কোন কর্মফল ভোগ করতে হয় না।)

এই যে আপনি ত্যাগী হয়ে গেলেন, ত্যাগী হয়ে আপনার লাভ কি হবে? *অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ,* যখনই কোন কাজ করা হয়, সব কাজেই তিন প্রকার ফল আসে – অনিষ্ট ফল আসে, ইষ্ট ফল আসে আর ইষ্ট-অনিষ্ট মিশ্র ফল আসে। কর্মের এই যে তিন ধরণের ফল আসে, ত্যাগী হয়ে গেলে এই ফল আর তাঁর কাছে আসবে না। কারণ, কর্মের ফল জন্ম নিয়ে ওখানেই শেষ হয়ে যাবে। অনেকে প্রশ্ন করেন, কর্ম হলে তার তো একটা ফল হবে? কর্ম হলে তার ফল তখনই হবে, যখন মন ওই কর্মের সাথে জুড়ে থাকে। মন যদি না জুড়ে থাকে, ফলের জন্ম হয়ে ওখানেই ওটা শেষ হয়ে যায়। এই নয় যে, কর্মের ফল ওর কাছে যাবে, তার কাছে যাবে। আমাদের দেশের বিভিন্ন পণ্ডিতরা বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন একজন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যাঁরা সৎ পুরুষ তাঁরা যে শুভ কর্ম করেন, সেই শুভ কর্মের ফল তাঁর শিষ্যরা পায়, আর অশুভ কর্ম করলে তার ফল তাঁর শত্রুরা পায়। ঠাকুর বলছেন, তাঁর বেতালা পা পড়ে না। সৎ পুরুষের কিসের অশুভ কর্ম? যাঁরা এই ব্যাখ্যাগুলো লিখেছেন, তাঁরা অবশ্যই শাস্ত্র বুঝতেন না। শাস্ত্র বোঝা অত সহজ না, মন শুদ্ধ হলে, অনেক দিন সাধুসঙ্গ করলে, তপস্যা, জপধ্যান করলে তবে গিয়ে শাস্ত্র একটু একটু বোঝা যায়। এই যে তিন প্রকার কর্মের ফল, এই ফল ত্যাগীর কাছে আসা বন্ধ হয়ে যাবে। কর্ম করলে কর্মের বাই হয় না, কর্মফলের সাথে জুড়ে থাকলে কর্মের বাই হয়।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজের নামে অনেকেই শুনে থাকবেন। নরেন্দ্রপুরকে তিনি একা দাঁড় করিয়েছেন। অনেক ধরণের বিরুদ্ধতা, প্রচুর প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাঁকে লড়াই করে নরেন্দ্রপুরকে দাঁড় করাতে হয়েছিল। সব কিছু সুষ্টু ভাবে হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ তাঁকে দরকার হল ইনস্টিট্যুট অফ গোলপার্ক সামলাবার জন্য। বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ তাঁকে বললেন, 'আপনাকে গোলপার্ক আসতে হবে'। সেই মুহূর্তে তিনি নরেন্দ্রপুর ছেড়ে চলে এলেন। মহারাজ যে গোলপার্ক চলে গেলেন, ওনার যে ট্রান্সফার হয়ে গেল, কেউ জানতেও পারলেন না। এটাই দেখিয়ে দিচ্ছে যে, মহারাজের কর্মফলে কোন আসক্তি নেই।

বর্তমান সহাধ্যক্ষ স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ এক সময় নরেন্দ্রপুর স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। হঠাৎ কি হল, রিলিফের কাজে ওনাকে যেতে হবে। ফোন করে ডাকা হল, জিজ্ঞেস করা হল, কতক্ষণের মধ্যে তিনি আসতে পারবেন। উনি বললেন, পাঁচ মিনিট আমাকে সময় দিতে হবে, জপের মালাটা শুধু নিতে হবে। জপের মালাটা নিয়ে নিলেন, বেরিয়ে চলে এলেন। এনারা মঠের এত কাজ করছেন, কিন্তু কোন কিছুতে আসক্তি নেই; না কর্মে, না কর্মফলে। কর্মফলটাই আসলে বাঁধে, কর্ম কখন বাঁধে না। যাঁরা বলেন, আমি সব কাজ নিষ্কাম ভাবে করি, যখন ওখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে তখন বোঝা যাবে কতটা আপনি নিষ্কাম ভাবে কাজ করছেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে কত লীলা করলেন, যে মুহূর্তে তাঁর ডাক এল, একদিনের মধ্যে বৃন্দাবন থেকে বেরিয়ে চলে এলেন, আর কোন সম্পর্ক নেই।

ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্কচিৎ, এই কর্মফলের জন্য কি হয় বলছেন। ফল জমে জমে কি হয়? মৃত্যুর পর সে বিভিন্ন যোনিতে যায়। *অনিষ্টম্,* নরক, পশুযোনি, তির্যক যোনি; *ইষ্টম্,* দেবতাদি হয়ে জন্ম নেয়, আর *মিশ্রম্,* মানুষ হয়ে জন্ম নেবে। আমাদের কিছু শুভ কর্ম আছে, কিছু অশুভ কর্ম আছে। তাই কখন আমাদের ঠাকুরের দিকে মন যায়, কখন পূজা অর্চনা করার দিকে মন যায়, আবার মিথ্যা কথা বলা, পরিনিন্দা পরচর্চা করার দিকেও মন যায়। মাছির মত মন কখন ফুলেও বসছে, কখন পচা ঘায়ে বসে। বলছেন, কর্মফলের সন্ন্যাস করে দিলে এই জিনিসগুলো তার বন্ধ হয়ে যায়। জন্মমৃত্যুর চক্রে, বিভিন্ন যোনিতে যে ঘুরপাক খাচ্ছে, এটা বন্ধ হয়ে যায়। কেন বন্ধ হয়? কারণ যে কর্মফলের জন্য বিভিন্ন যোনিতে, জন্মমৃত্যুর চক্রে আসা-যাওয়া, সেই কর্মের ফল আসাটা বন্ধ হয়ে যায়।

এই কর্মফল জিনিসটা আসলে কি? আচার্য শঙ্কর একজন সত্যিকারের কবি ছিলেন, ওনার ভাষা এত সুন্দর কাব্যিক যে কল্পনা করা যায় না। আচার্য ফলকে পরিভাষিত করছেন, আমরা জীবনে কত কি পেতে চাই, এটা পেতে চাই, সেটা পেতে চাই, আসলে আমরা চাইছি কর্মফল, *বাহ্যানেককারকব্যপারনিষ্পন্নং*, কারকের যে বিভক্তি, প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, তার মানে কর্তা থাকবে, কারকের বিভক্তিগুলি থাকবে, তার সঙ্গে থাকবে ক্রিয়া। যে কোন কর্মে আমরা জানি কর্তা, ক্রিয়া ও কর্ম লেগে থাকে, কিন্তু তার সাথে কারকের বিভিন্ন বিভক্তিও জুড়ে যায়।

আচার্য তারপরেই কর্ম জিনিসটাকে বলছেন, *সদ্ অবিদ্যাকৃতম্ ইন্দ্রজালময়োবয়ং*, যা কিছু করছি সমস্তটাই হল ইন্দ্রজালের মত, বাজিকরের মায়ার মত। *মহামোহকরং*, কর্ম আমাদের এই সংসারে একেবারে মুগ্ধ করে রেখে দিয়েছে। *প্রত্যগাত্মোপসর্পি*, মনে হয় যেন সব কিছু এই জীবাত্মার উপর আশ্রিত, আমি করছি। এই আমিত্বকে আশ্রয় করে বাজিকরের এই মায়ার খেলা চলছে। ঠাকুর বলছেন, আঙুল ঘোরাচ্ছে আর কত কি হয়ে যাচ্ছে। *ফল্গুতয়া লয়ম্ অদর্শনং*, ফল্গু নদীর মত, ফল্গু কেন? *অদর্শনম্*, ফল্গু মানে এই আছে এই নেই। ফল জিনিসটাও তাই, এই এলো, আর এই চলে গেল। এই ফল সারহীন, ঠাকুর বলছেন, সংসার হল আমড়া, আঁটি আর চামড়া, খেলে অম্লশূল। আচার্য বলছেন, *ফল্গুতয়া লয়ম্ অদর্শনং*, ফল্গু নদীর জলের মত, বালির তলায় চলে যায়। কখন যে ফলটা এলো আর কখন যে ফলটা চলে গেল, বুঝতেই পারল না। বাংলায় একটা আধুনিক গান আছে, কি আশায় বাঁধি খেলাঘর বেদনার এই বালুচরে। বালির উপর খেলাঘর পেতেছে, ফলটা হল বেদনার বালুচর।

ফল কেন বলা হয়? *গচ্ছতি ইতি ফলম্ ইতি ফলনির্বচনম্*, অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে আমি যে কাজ করছি, আমার জন্য করছি, এই করছি, সেই করছি, এত কিছু করার পর যে ফলটা হল, সেটা *অদর্শনম্*, কখন এলো আর কখন যে চলে গেল, বোঝাও গেল না। ব্রহ্মার দরবারে বিরাট আওয়াজ, জিজ্ঞাসা করা হল, কি হল? কি আর হবে? রাবণ জন্ম নিল। কিছুক্ষণ পর আবার এক বিরাট আওয়াজ। আবার কি হল, কি আর হবে? রাবণ মারা গেল। *ফল্গুতয়া লয়ম্*, বুম্ একটা আওয়াজ, সব শেষ। মানুশ যে দিবারাত্রি ফলের পিছনে দৌড়ে চলেছে, একবারও ভাবে না যে, ফল এই রকমই; এই এলো এই গেলো। আর এই ফল যেটা আসে, প্রথমেই বলা হল সেটা *অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ*, ফল সব সময় তিন প্রকারের হয়। এখানে সেটাকে নিয়ে আর আলোচনা করছেন না, কারণ আগে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়ে গেছে।

এর আগে আচার্য সংসারের পরিভাষা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, শোক আর মোহ এটাই সংসার আর *ন সুখস্য গন্ধমাত্রং ন অপি অস্তি*, সংসারে সুখের গন্ধমাত্র নেই। বলছেন, যে ফলের পিছনে আমরা দৌড়াচ্ছি, এই ফল ফল্গু নদীর মত। ফলগুলি অজ্ঞানীদের কাছে, কর্মত্যাগ যাঁরা করেছেন, তাঁদের কাছে এই ফল আসে না। যাঁরা সন্ন্যাসী, যাঁরা পরমজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের কাছে আসার কোন প্রশ্নই নেই। এটাই পরে আবার একটা জরুরী প্রশ্ন রূপে আসবে, কারণ অর্জুনের প্রশ্ন ছিল, যুদ্ধ করা ঠিক হবে কিনা, কাজ করাটা ঠিক না বেঠিক। এরপর দুটি শ্লোকে কাজের খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করছেন, কাজে কি ভাবে সফল হওয়া যায়। মানুষ কিভাবে কাজ করবে? একবার যদি জেনে নিই কাজ কিভাবে করতে হবে, তখন কাজে সফল হওয়াটাও সহজ হয়ে যাবে।

পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্।।১৩।।

(হে মহাবাহো, কর্মকাণ্ডের অন্তরূপ বেদান্তে সর্বকর্ম সম্পাদনের এই পাঁচটি কারণ নিরূপিত হয়েছে। এইগুলি আমার নিকট অবগত হও।)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, অর্জুন, কাজ করার জন্য পাঁচটি জিনিস লাগে। এ পাঁচটাকে যদি তুমি ভাল করে বুঝে নিতে পার, তাহলে কর্মের মর্ম তুমি সহজে বুঝে যাবে। অর্জুনকে ভগবান সাবধান করছেন, কারণ তত্ত্বটা কঠিন, আসলে শাস্ত্র জিনিসটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, বুদ্ধি অত্যন্ত সূক্ষ্ম না হলে শাস্ত্র বোঝা যায় না। টেলিভিশনের সিরিয়ালগুলি আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি। রামায়ণ, মহাভারতের মত টিভি সিরিয়ালও খুব সহজে আমরা বুঝতে পারি। যাঁরা পপুলার টকস্ দেন, তাঁদের কথা খুব সহজে বোঝা যায়, কারণ বুদ্ধি লাগাতে হয় না। কিন্তু শাস্ত্র বুঝতে গেলে সূক্ষ্ম বুদ্ধি লাগে। সেইজন্য অর্জুনের মনকে আকর্ষিত করার জন্য 'সাংখ্যে' শব্দটা নিয়ে আসছেন। এই সাংখ্য মানে বেদান্ত, কারণ সাংখ্য মানে সম্যগ্ জ্ঞান, *সাংখ্যে কৃতান্তে*, *কৃত* মানে কর্ম; *অন্তে*, যেখানে কর্মের সমাপ্তি, যে জায়গাতে গিয়ে মানুষ জ্ঞানী হয়ে যায়, কর্মের বাইরে চলে যায়। কর্ম মানে যেখানে কর্তা, ক্রিয়া, কর্ম সব মিলেমিশে আছে। কর্ম আবার মানে হয় দ্বিতীয়া, যেমন আমি রুটি খাই, আমি কর্তা, খাওয়াটা ক্রিয়া আর রুটি হল কর্ম, কর্মের ফল পেট ভরা। *কৃতান্তে* হল, কর্মের যেখানে শেষ, যেখানে এই কর্তা, ক্রিয়া, কর্ম আর তার কারকগুলো সমস্ত কিছু সরে যায়, সরে গিয়ে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান।

কৃতান্ত আর *সাংখ্য* একই জিনিস। বলছেন, আধ্যাত্মিক জীবনে যদি সিদ্ধি পেতে চাও আর কর্মে যদি সফল হতে চাও, কর্মে সফল দুটো দিক থেকে সাংসারিক দিক থেকেও আর আধ্যাত্মিকতার দিক থেকেও, তাহলে তোমাকে আগে বুঝতে হবে কর্ম কিভাবে নিষ্পন্ন হয়, কর্ম কিভাবে সম্পাদিত হয় আর যে কোন ধরণের কাজের ক্ষেত্রে কি কি জিনিস লাগে। এই জিনিসটাকে এবার চোদ্দ নম্বর শ্লোকে বলছেন। যাঁরা পুরো গীতা মুখস্ত করতে পারবেন না, তাঁরা গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের চোদ্দ নম্বর শ্লোকটা অবশ্যই মুখস্ত করবেন।

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্।।১৪।।

(শরীর, অহঙ্কার এবং বুদ্ধি ও মন সহ সমস্ত ইন্দ্রিয়, প্রাণাদির বিবিধ কার্য এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের আদিত্যাদি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা –এই পাঁচটি সর্বকর্মের কারণ।)

যে কোন কাজ যখন হয় তখন এই পাঁচটি জিনিস সেখানে থাকবে। এটা যদি আমরা ভাল করে বুঝে নিতে পারি, তাহলে কর্মফল ত্যাগ সহজ হয়ে যাবে, কর্মের মর্ম জানা হয়ে যাবে, কাজে সফল হওয়া যাবে এবং আধ্যাত্মিক জীবনে সফল হওয়া যাবে।

প্রথম আসছে, *অধিষ্ঠানং*, যেটাকে আশ্রয় করে কর্ম হয়, এখানে শরীরকে আশ্রয় করেই কর্ম হয়। শরীর ছাড়া কর্ম হয় না, শরীর না থাকলে কর্ম হবে না, কর্ম করার জন্য শরীর লাগবেই লাগবে। পরে আবার বলবেন শরীর কিভাবে কাজ করে। আচার্য বলছেন, *ইচ্ছাদ্বেষসুখজ্ঞানাদিনাম্ অভিব্যক্তেঃ আশ্রয়ঃ অধিষ্ঠানং শরীরম্*। শরীরটা হল অধিষ্ঠান। কিসের অধিষ্ঠান? আমাদের মনের মধ্যে যে নানা রকমের ইমোশানস্, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, সমস্ত ইমোশানের অভিব্যক্তি শরীরে প্রকাশ পায়। আমার মন যদি খারাপ হয়, বাড়ির লোকেরা বলবে, 'তোমার মুখটা শুকনো লাগছে কেন'? কেন বলছে মুখ শুকনো? মন খারাপ হলে মুখটা কালো হয়ে যায়, বাইরে থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় মনটা ভাল নেই। আমরা অনেক সময় বলি, 'আপনি দেখছি আমার মনের ভিতর ঢুকে গেছেন'। মনে ঢুকতে হবে কেন, তোমার মুখই বলে দিচ্ছে। শুধু মুখ দিয়েই প্রকাশ পায় না, সমস্ত শরীর দিয়ে অভিব্যক্ত হবে। বাচ্চারা খুশী হলে আনন্দে লাফাতে শুরু করে। আবার ঝগড়া করার সময় আমরা হাত, পা নেড়ে নেড়ে ঝগড়া করতে থাকি। আমাদের যে নানা রকমের ইমোশানস্গুলি রয়েছে, আচার্য সংক্ষেপে বলছেন, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, অজ্ঞান সমস্ত কিছুর অভিব্যক্তি পায় এই শরীরে। শরীরটা তাই সাংঘাতিক জিনিস, এই জিনিসগুলোর সে অধিষ্ঠান। কারণ

যে কর্মগুলি আমরা করব, সেই কর্মের যে ফল আসবে, সেই ফলের অভিব্যক্তি হবে এই শরীরে। মনের উপর ছাপ পড়বে ঠিকই, কিন্তু আসল অভিব্যক্তিটা হবে শরীরে। তার সাথে সমস্ত কর্মের জন্য মূল জিনিস হল এই শরীর।

দ্বিতীয় আসে কর্তা, আত্মা হলেন কর্তা, যিনি নিজেকে জীবাত্মা মনে করছেন। আত্মা কোন কাজ করেন না, কিন্তু আত্মা অজ্ঞানের জন্য মনের সাথে জুড়ে যায়, অজ্ঞানের জন্য বলার মানে আত্মা কখন মনের সাথে জুড়তে পারে না, আত্মা আর মন দুটোই বিপরীত ধর্মী, দুটো বিপরীত ধর্মী কখনই জুড়তে পারে না। কিন্তু অজ্ঞানের জন্য আত্মা মনে করে আমি জুড়ে গেছি। আমরা কাউকে ভালবেসে মনে করি, আমি তার সাথে জুড়ে গেছে, দুজন কখন কি এক হয়, অসম্ভব। কিছুতেই এক হতে পারবে না, দুটো মন আলাদা কিনা। এক তখনই হতে পারবে, যদি কেউ শ্রীরামকৃষ্ণের স্তরে চলে যান, কৃষ্ণ বা রাধার স্তরে যদি চলে যান, কৃষ্ণ যদি গোপীদের স্তরে চলে যান। কারণ সেখানে আত্মা এক, সেখানে তিনি এক হয়ে যাচ্ছেন। মনের স্তরে এক হওয়া মুশকিল, দেহের স্তরে কোন মতেই না। আত্মা সব সময় শুদ্ধ, কোন কিছুতে জড়াবেন না, কিন্তু অজ্ঞান যখন এসে যায় তখন আত্মা মনে করেন যে মনের সাথে জুড়ে গেছি।

অন্য দিকে মন ইন্দ্রিয়ের সাথে জুড়ে আছে, ইন্দ্রিয় দেহের সাথে জুড়ে আছে। আমি সমর্পণানন্দ, আমার বোধ আছে আমার শরীর আছে, আমার বোধ আছে আমার ইন্দ্রিয় আছে, আমার বোধ আছে আমার মন আছে। কিন্তু এগুলো সব জড়, একটু খাওয়া কমিয়ে দিলে বা খাওয়ার স্টাইল একটু পাল্টে দিলে শরীরটা অন্য রকম হতে শুরু করবে। এই যে আত্মা নিজেকে মনের সাথে জুড়ে রেখেছে, এই যে বোধ করছে আমি মন, আমি দেহ, এটাকেই বলছেন জীবাত্মা। এই জীবাত্মা শুধু মনে করে আমি কর্তা, নিজেকে কর্তা ভাবার ক্ষমতা তাঁর আছে, কারণ তিনি চৈতন্য কিনা। আত্মা কিন্তু কখন কর্তা হন না, যে আত্মা শরীরের সাথে, মনের সাথে জুড়ে রয়েছে, সেই হল জীবাত্মা; এই জীবাত্মাই নিজেকে কর্তা ভাবছে।

তৃতীয় আসছে করণম্, করণ মানে যেটা দিয়ে কাজ করা হয়, কারকের বিভক্তিতে করণ তৃতীয়া – কর্তা, কর্ম, করণ। করণ হল, কোন জিনিসকে যেটা আহরণ করে। করণ হল ইন্দ্রিয়; জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি আর পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, মন ইন্দ্রিয়ের মালিক, সব মিলিয়ে মোট এগারোটি করণ। কিছু কিছু ভাষ্যকাররা মন আর বুদ্ধিকে আলাদা করে দেন। মন হল যে সমস্ত কিছুকে আহরণ করে আর বুদ্ধি হল যে নিশ্চিত করে। মধুসূদন সরস্বতী এগারোর জায়গায় বারোটি করণকে নিয়ে এসেছেন। আচার্য শঙ্করের যে গীতার ভাষ্য, সেই ভাষ্যের উপর মধুসূদন সরস্বতী আবার নিজের একটা ভাষ্য রচনা করেছেন, সেখানে তিনি বারোটি করণ বলছেন। শরীর আছে, জীবাত্মা আছে কিন্তু শুধু ইন্দ্রিয় দিয়ে কাজ হবে না। চোখের সমস্যা, কানের সমস্যা, হাতের সমস্যা, পায়ের সমস্যা যদি থাকে, সেখানেও তখন কাজ হবে না। কাজ করার জন্য সবার আগে দরকার শরীর। মানুষ যখন মারা যায় তখন তার শরীর থেকে জীবাত্মা বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, জীবাত্মার সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলি রয়েছে, তার মানে করণগুলি রয়েছে, কিন্তু কাজ করতে পারবে না, কারণ শরীরটাই তো নেই। ভূতপ্রেতগুলো কিভাবে কাজ করে আমাদের জানা নেই, তবে বেশির ভাগ ভূত কিছু করতে পারে না, কারণ তাদের শরীর নেই।

বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা, চতুর্থ আসে চেষ্টা। চেষ্টা হল শরীরের বিভিন্ন রকম যে ক্রিয়াগুলি, যেমন আমরা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছি, চোখের পাতা ফেলছি, কথা বলছি ইত্যাদি। শুধু করণ থাকলেই হবে না, চেষ্টা যদি না করা হয় তাহলে কর্ম হবে না। আর শেষটা বলছেন, *দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্,* এখানে শব্দটা হল দৈব, দৈব মানে যে দেবতারা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলির পিছনে অধিষ্ঠিত আছেন। আমাদের যতগুলি ইন্দ্রিয় আছে, প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের পিছনে একজন করে অধিষ্টাত্রী দেবতা আছেন। এটা আলাদা ভাবে একটা বিরাট বিষয়। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমাদের ঋষিরা দেখলেন এই

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পিছনে যিনি, তিনি হলেন পরমাত্মা। কিন্তু জগতে যত কিছু আছে, সব কিছুর পিছনে, যে কোন বস্তুর পিছনে রয়েছে আধ্যাত্মিক শক্তি। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, সব কিছুর পিছনে রয়েছে এক দৈবী শক্তি। ঠিক সেই রকম আমাদের যতগুলি ইন্দ্রিয় আছে, এই ইন্দ্রিয়গুলির পিছনেও এক দৈবী শক্তি রয়েছে।

আমাদের শরীরের পিছনে রয়েছে পৃথিবীর শক্তি; আমরা যে কথা বলি, এই বাণীর পিছনে রয়েছে অগ্নি দেবতা; আমরা যে নিঃশ্বাস নিচ্ছি এর পিছনে রয়েছে বায়ু দেবতা; চক্ষু ইন্দ্রিয়ের পিছনে রয়েছেন খুব নামকরা দেবতা সূর্য; মনের পিছনে রয়েছেন চন্দ্রমা দেবতা, কর্ণেন্দ্রিয়ের পিছনে আছেন দিক্ দেবতা। কোন কারণে কোন দেবতা যদি অপ্রসন্ন হন, তখন সেই ইন্দ্রিয় ঠিক ভাবে কাজ করবে না, মনের ক্ষেত্রে আমরা এটা সবাই বুঝতে পারি। শুধু হিন্দুরাই বলে না যে, মনের সাথে চন্দ্রমার একটা সংযোগ আছে, সারা বিশ্ব এই কথা বলে। বিদেশে পাগলকে লুনি বলা হয়, লুনি শব্দ লুনার থেকে এসেছে। পূর্ণিমা অমবস্যায় পাগলদের মাথা বেশি খারাপ হয়। আমাদের এক মহারাজ ছিলেন, গত হয়েছেন, উনি জ্যোতিষ বিদ্যা জানতেন। উনি আমাকে বলেছিলেন, আমার চন্দ্রমা একটু ডাউন আছে। চন্দ্রমা যাদের ডাউন থাকে তাদের নাকি মনটা চঞ্চল হয়। এই চাঞ্চল্যটাই বেশি হয়ে গেলে মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। ইন্দ্রিয় সবারই রয়েছে, আর প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের পিছনে একজন যে দেবতারা রয়েছেন, তাঁকেও তুষ্ট করতে হয়। আচার্য শঙ্কর কিন্তু দৈবকে ব্যাখ্যা করেননি, দৈবকে দেব বলে ছেড়ে দিয়েছেন। এর একটা অর্থ হতে পারে, পূর্ব পূর্ব জন্মের আমাদের যে কর্মফল, এটাকেও দৈব বলা হয়। দৈব মানে দেবতারা আর পূর্ব পূর্ব জন্মের যে কর্মফল দুটো অর্থেই হতে পারে।

কাজে যদি সফল হতে হয়, এই পাঁচটা জিনিস –অধিষ্ঠান, কর্তা, করণ, চেষ্টা ও দৈব আমাদের ঠিক রাখতে হবে। চেষ্টা করলেই যে সাফল্য এসে যাবে, তা কখন আসবে না। আর চেষ্টা যদি না করা হয়, কোন দিন সে সফল হবে না। লোকেরা প্রায়ই ভাগ্যের দোহাই দিয়ে বলে আমার ভাগ্যে থাকলে এমনিতেই হবে; সম্পূর্ণ ভুল ধারণা, চেষ্টা না করলে কোন দিন সাফল্য আসবে না। লটারি টিকিট কিনলে আপনি জিততেও পারেন, নাও জিততে পারেন, কিন্তু লটারির টিকিট যদি না কাটেন, কোন দিন লটারি জিততে পারবেন না। যে কোন কাজের ফল যদি পেতে হয়, তাহলে এই পাঁচটা জিনিসকে পুরোপুরি আপনাকে ঠিক রাখতে হবে। আপনার শরীরটা ঠিক রাখতে হবে, আপনার ভাব শুদ্ধ রাখতে হবে। ভাব খুব বেশি যদি মলিন হয়ে যায়, কাম ক্রোধাদি যদি এসে যায়, জীবাত্মা কাজ করতে পারবে না। কাজ ভাল ভাবে করার জন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে খুব তীক্ষ্ণ ও সতেজ রাখতে হবে। আসলে মনকে যদি তীক্ষ্ণ করা যায়, ইন্দ্রিয়গুলিও এমনি তীক্ষ্ণ হয়ে যাবে, যদি না ইন্দ্রিয়ের কোন দোষ থাকে।

যদি ইন্দ্রিয়ে দোষ থাকে, তাহলে কি হবে? ইন্দ্রিয়ে যদি দোষ থাকে, তাতে খুব বেশি সমস্যা হয় না। দৈব যদি ঠিক থাকে, দৈব বলতে দুটোই, ইন্দ্রিয়গুলির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা আর পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মফল, তাহলে আর কোন সমস্যা হয় না। দেবতাদের যদি পূজা করা হয়, ঈশ্বরের কাছে যদি প্রার্থনা করা হয়, তখন দৈবটা ঠিক হয়ে যায়। আপনার সব কিছু ঠিক আছে, শরীর দিয়ে, ইন্দ্রিয় দিয়ে, মন দিয়ে প্রাণপন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু ফল পাচ্ছেন না। তার মানে দৈব আপনার বিপরীত। কিভাবে ঠিক করতে হবে? তপস্যা করুন আর সাথে সাথে প্রার্থনা করুন। খুব তপস্যা করছেন, মন দিয়ে প্রার্থনা করছেন, ফল পাওয়া যাবে কি? চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ঠাকুর কেশবচন্দ্রের নামে বলেছিলেন, কেশবের ধ্যানটুকু ছিল বলে কেশবের এত নামযশ হল।

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ।।১৫।।

(শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা মানুষ যে সৎ বা অসৎ কর্ম করে, সেই সমস্ত কর্মেরই কারণ এই পাঁচটি।)

শরীর, মন, বাণী দিয়ে যত কর্ম করা হয়, সব কর্মে এই পাঁচটা জিনিস লেগে থাকে। কাজে সফল পেতে হলে আগে বুঝে নিতে হবে, কর্মে কোন পাঁচটা জিনিস লাগে। শরীর, কর্তা, করণ, চেষ্টা, ইন্দ্রিয়গুলির চেষ্টা আর দৈব, এর মধ্যে কোন একটি যদি গোলমাল হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু তার কাজ খারাপ হয়ে যাবে, কাজ খারাপ হওয়া মানে কাজে সফলতা আসবে না। *ন্যায্যং বা বিপরীতং বা* বলছেন, ভাল কাজ যেটা হয়, এই পাঁচটা দিয়েই হয়; পাপকর্ম যেটা হয়, সব এই পাঁচটা দিয়েই হয়। সমস্ত রকম কর্ম, এমনকি চোখের যে পাতা ফেলছি, বন্ধ করছি, এই কর্মটাও ওখানের সাথেই জড়িয়ে আছে।

কাজ কিভাবে হয়, আর কাজে সাফল্য কিভাবে পাওয়া যায়, এই জিনিসটাকে একবার ভাল করে বুঝে নিতে পারলে কর্মে সাফল্য নিজেই এসে যাবে। কিন্তু তার থেকেও বেশি জরুরী কথা হল, গীতা এই আলোচনাটা কেন করছেন? আমাদের নিশ্চয় মনে আছে, গীতা শুরু হচ্ছে অর্জুনের এই প্রশ্ন দিয়ে, এই যুদ্ধে নিজের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের যে আমাকে মারতে হবে, এটা কি ঠিক কাজ হবে? দ্বিতীয় অধ্যায়ে এর উপর বিস্তারে আমরা আলোচনা করেছিলাম। আশা করছি এতদিনে আপনারা সব ভুলে গেছেন। খাপছাড়া ভাবে শুনলে হবে না। একটা বিদ্যাকে আয়ত্ত করতে গেলে পুরোটা জানতে হয়। তার সাথে দ্বিতীয় কথা হৃদয়ে ঢোকাতে হয়, মাথা দিয়ে না, হৃদয় দিয়ে ঢোকাতে হবে। যে কোন শাস্ত্র যদি বুঝতে চান, তাহলে শাস্ত্র মুখস্ত করতে হবে; গীতা হোক, উপনিষদ হোক, মুখস্ত করতে হবে। মুখস্ত করলে কি হয়, সারাদিন ওটা মনের মধ্যে ঘুরতে থাকবে। কথামৃত মুখস্ত হবে না, কারণ গদ্যে আছে, সেইজন্য কথামৃত নিত্য নিয়মিত ভাবে পাঠ করে যেতে হয়। কথাগুলো যদি মনের মধ্যে সারা দিন না ঘোরে, শাস্ত্র বুঝতে পারবেন না। একটা বিদ্যাকে অর্জন করতে গেলে প্রচুর খাটতে হয়।

অর্জুন যখন দুঃখ প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করল যুদ্ধ করবে কি করবে না, তখন ভগবান অর্জুনকে বললেন না যে, তুমি যুদ্ধ করবে কি করবে না। অর্জুনের সমস্যা হল যুদ্ধে যে এত লোক মারা যাবে তার কি পরিণাম হবে? ভগবান তখন অর্জুনের সামনে তিনটে জীবন দর্শন রেখে দিলেন। জীবন যখন চালাচ্ছ তখন একটা কিছু জীবন দর্শন তো তোমার আছে, তুমি নিজেকে কিছু তো একটা মনে কর। আমাদের মনে রাখতে হবে এখানে অর্জুনের উপর জোর কিছু চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। ভগবান তিনটে দর্শন দিলেন, এই তিনটের মধ্যে কোন একটা মতকে তো তুমি মানবে। একটা দর্শন হল, তুমি সেই আত্মা, তুমি অনন্ত, তুমি অবিনাশী, কারণ আত্মা মানেই তুমি। তাহলে কিসের মৃত্যু, কার মৃত্যু! দ্বিতীয় দর্শন হল, যেটা বেশির ভাগ হিন্দুরা সচরাচর মেনে থাকে – যে জন্মেছে সে মরবে, যে মরেছে সে আবার জন্ম নেবে; জন্মমৃত্যুর চক্রের মাধ্যমে জীব স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ঘুরেই যাচ্ছে। ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে খুব সুন্দর বলছেন, *জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ*। যুদ্ধে তুমি মরে গেলে কি আর হবে, আবার জন্মাবে, এই নিয়ে তোমার এত ভাবাভাবির কি আছে। তৃতীয় দর্শন দিচ্ছেন, যদি তুমি মনে কর তুমি শুধু দেহমাত্র, আর তাই যদি মনে কর তাহলে তুমি আগেও ছিলে না, পরেও থাকবে না; এতে তো তোমার শোক করার কোন অর্থই হয় না।

এই তিনটে মতের যে কোন একটা মতকে তো তোমাকে নিতে হবে, আর যে মতটাই নাও না কেন, কোনটাতেই তোমার ভাবাভাবির কিছু নেই। বিশেষ করে মৃত্যুকে নিয়ে ভাবার তো কিছু নেই। মৃত্যুকে নিয়ে ভাবার কি আছে? আমরাও কিছু তো একটা মনে করি, হয় মনে করি আমি অদ্বৈত বেদান্তী, নয় ভক্তি বেদান্তী, নয় তো কর্মকাণ্ডী, আর তা নাহলে পদার্থবাদী, কোনটাতেই মৃত্যুকে নিয়ে এত ভাবার কি আছে, মৃত্যুকে নিয়ে এত শোক করার কি আছে? জীবনে যত দিন বাঁচতে হবে, তত দিন সম্মান নিয়ে বাঁচতে হয়, সুখ-সুবিধা নিয়ে বাঁচতে হবে। গীতা কক্ষণ বলবে না যে, তোমাকে অসুবিধা ভোগ করে বাঁচতে হবে, কষ্ট ভোগ করে বাঁচতে হবে। গীতা কখনই বলবে না, তুমি অসম্মান নিয়ে থাক। যদি তুমি সুখ-সুবিধা নিয়ে বাঁচতে চাও, সম্মান নিয়ে জীবন

অতিবাহিত করতে চাও, তাহলে তুমি স্বধর্ম পালন কর। এই জিনিসটাকেই ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিছুটা এবং তৃতীয়, চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারে ব্যাখ্যা করতে থাকলেন। ধীরে ধীরে ভগবান নিয়ে আসছেন উপসংহারে।

তুমি তো যুদ্ধ করতে চাইছ না? ঠিক আছে, তাহলে ভাল করে বুঝে নাও, যার আত্মজ্ঞান হয়নি বা যিনি আত্মজ্ঞানের জন্য এখনও প্রস্তুত নন, এদের সবাইকেই কিন্তু কাজ করতে হবে। অনেকে এসে আমাদের বলে, মহারাজ সংসার আর ভাল লাগছে না, সংসারে আর থাকতে ইচ্ছে করছে না। সংসার ছেড়ে যাবেন কোথায়, আর ছেড়ে গিয়ে করবেনটাই বা কি? ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাণ্বে। কাজ তো আপনাকে করতেই হবে, সংসারেই থাকুন আর সংসার ছেড়ে যেখানেই থাকুন আর স্বর্গেই থাকুন। শুধু বুঝে নিন কাজ জিনিসটা কি। কাজ কে করছে? কাজ করে শরীর, কাজ করে ইন্দ্রিয়; যে জিনিসগুলিকে নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম। যিনি জ্ঞানী, তিনি দেখেন মৃত্যু নেই। কিন্তু কদাচিৎ কেউ কখন জ্ঞানী হন, তাহলে বাকীরা কি করেন? বাকীরা চেষ্টা করছেন, যাতে জ্ঞানীর মত হতে পারেন। যাঁদের জ্ঞান হয়নি, যাঁরা জ্ঞানের পথে এগোচ্ছেন আর দ্বিতীয় যাঁরা জ্ঞানের পথ নিচ্ছেনই না, তাঁদের সবাইকে কাজ করতেই হবে। কাজ করলে দোষের কিছু নেই, এমনকি ভাল ভাবে কাজ যদি না করেন, আপনার অধোগতি হয়ে যাবে, সেখান থেকে অধম গতি নিশ্চিত; এমনকি পশুপাখির যোনি, তির্যক যোনিতে গিয়েও জন্ম নিতে হতে পারে।

গাধা বেশি খাটতে চায় না, চড়তে চায় না, শুধু ঘাস খাওয়াতে মন। যখন দুই ডাণ্ডা মারা হয় তখন গাধা একটু চলতে শুরু করে। আমরা বেশির ভাগই গাধার মত, কাজ করতে চাই না। আত্মজ্ঞানী ছাড়া সবাইকে কাজ করতে হবে। স্বামীজী সন্ন্যাসীদের জন্য কর্মবিধান করে গেলেন, তোমরা কাজ কর। কিন্তু তার আগে ভাল করে বুঝে নাও কাজ জিনিসটা কি।

এক পাগল রোজ সকালে উঠে হাতে একটা ডাণ্ডা নিয়ে রাস্থার ধারে যত চায়ের দোকান আছে দোকানের সামনে যত চায়ের খুরি পড়ে থাকে, সেগুলোকে ভাঙতে থাকে। সারাদিন ধরে সব চায়ের দোকানের খুরিগুলো ভেঙে যাচ্ছে, বিকেল হয়ে সন্ধ্যা নামার পর মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বলে – আর পারি নে, আর পারি নে। আমাদের সবারই কর্ম বেশির ভাগই হল পাগলের চায়ের খুড়ি, মাটির হাড়ি ভাঙার মত। আর তা নাহলে গাধার মত, কাজ করব না, দায়ীত্ব পালন করব না। গীতা কেবল এই দুটি জিনিসের আলোচনা করেন – যাঁদের আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, তাঁরা দেখেন জন্ম নেই মৃত্যু নেই, কেউ জন্মাচ্ছে না, কেউ মরছে না। কর্ম চলছে। কিভাবে চলছে? পদার্থ পদার্থের উপর কাজ করছে।

Futuristic Society নামে একটা খুব সুন্দর গল্প পড়েছিলাম, গল্পটা এখানে উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। ভবিষ্যতের মানুষ কেমন হবে গল্পে দেখানো হয়েছে। ইদানিং কালে যে বক্সিং, জুডো, ক্যারাটে আদি হয়, যেখানে মানুষ মানুষকে মারছে, এই খেলাগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কারণ মানুষের জীবন খুব অমূল্য। মানুষের বদলে ওনারা বড় বড় রোবট বানিয়েছে, রোবটগুলো এক অপরের সাথে লড়াই করছে। কম্প্যুটারস গেম যেমন হয়, কম্পিটাশনে রোবট রোবটের সাথে লড়াই করছে। লড়াইতে এক রোবট আরেকটা রোবটকে ঘুষি মারছে, যার রোবট বা দর্শক যারা আছে, তারা সবাই আঃ উঃ করে যাচ্ছে। একটি রোবট লোহার, আরেকটি রোবটও লোহার, লোহা লোহাকে মেরে যাচ্ছে। এখানে রোবটের যে মালিক সে সুইচ টিপে টিপে চালাচ্ছে। রোবট রোবটকে মারছে, আর সে বলছে, ওঃ কি মারলাম। কিন্তু আমাদের কোন হুঁশ নেই, এটা ফিউচারিস্টিক কিছু না, এটাই বর্তমান।

আমি আপনি, সবাই আমরা এক একটা রোবট। শুধু সমস্যা হল যে, *অধিষ্ঠানং তথা কর্তা,* যিনি বিশুদ্ধ আত্মা, তিনি যখন শরীর মনের সাথে নিজেকে জুড়ে নেন, তখন তিনি নিজেকে কর্তা

মনে করেন, আসলে তো তিনি কর্তা নন। যখন নিজে জুড়ে নেন তখন কর্তা মনে করছেন, নিজেকে জুড়ে না নিলে কর্তা হন না। একটা খুব সুন্দর ঘটনা পড়েছিলাম। ইদানিং দেখে থাকবেন, স্কুলগুলিতে মাস্টাররা পড়ায় কম, আর হোমওয়ার্ক বেশি দেয়। বাচ্চা যত না পড়ে বাবা মাকে বেশি পড়তে হয়। একটা বাচ্চা মেয়ের হোমওয়ার্ক তার মা করে দিয়েছে। স্কুল থেকে বাচ্চা ফিরে এসেছে, বাচ্চাটা খুব খুশী। খুশী হয়ে বলছে, 'মা মা, হোমওয়ার্কে তুমি ফেল করেছ'। ফেল কে করেছে? বাচ্চাটাই ফেল করেছে। কিন্তু সে তো জানে হোমওয়ার্ক মা করে দিয়েছে, আমি তো করিনি। আনন্দে সে মাকে বলছে, 'মা মা তুমি ফেল করেছ'। এটাই যখন পরে আস্তে আস্তে আমির সঙ্গে জুড়ে যাবে, তখন বলবে, আমি পাশ করতে পারিনি। দেখতে হবে, একটা কর্মের সাথে কাকে জুড়ছেন, নিজেকে জুড়ছেন কি জুড়ছেন না? এই জিনিসটাকে নিয়ে এবার বলবেন। কিন্তু তার আগে বলছেন, এই জগতে মুর্খ কে? আমি, আপনি সবাই মুর্খ।

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ।।১৬।।

(যেহেতু দেহাদি পাঁচটি কারণের দ্বারাই কায়িক, বাচিক ও মানসিক সমস্ত কর্ম সম্পাদিত হয়, সেইজন্য যিনি শুদ্ধ অকর্তা আত্মাকে অসংস্কৃত বুদ্ধিহেতু অধিষ্টানাদি পঞ্চ কারণ দ্বারা ক্রিয়মাণ কর্মের কর্তা বলে মনে করেন, সেই ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তি সম্যগ্-দর্শী নন, অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বা কর্মতত্ত্ব অবগত নন।)

দুর্মতিঃ, যার দুর্বুদ্ধি আছে, সে দেখে যে আমিই সব করছি। সদ্বুদ্ধি যার হয়েছে সে দেখে, আমি কিছু করছি না। এর আগের শ্লোকের সাথে এই শ্লোকটা জুড়ে আছে। যে কোন কাজ, মন দিয়েই করা হোক, বাণী দিয়েই করা হোক আর শরীর দিয়েই করা হোক, তারও আগের শ্লোকে বললেন, *পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে*, যে কোন কাজের পিছনে পাঁচটি কারণ থাকে, একটু আগে আমরা যা বিস্তারে আলোচনা করলাম। যাঁদের বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে গেছে, তাঁরা দেখেন, যে কোন কাজ এই পাঁচটি মিলে করে, আমি নির্বিকার। মহাভারত যুদ্ধে বাস্তবিক তাই হল, পঞ্চ পাণ্ডবরা যুদ্ধ করে যাচ্ছেন, শ্রীকৃষ্ণও আছেন, তিনিই চালিত করছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নির্বিকার। ব্যাসদেব যদিও নিশ্চয় ওই ভেবে লেখেননি, যদিও অনেকে নিজের নিজের চিন্তা-ভাবনা এনে অন্য রকম বলেন। কিন্তু পঞ্চ পাণ্ডব লড়াই করে যাচ্ছেন, ভোগ করছেন, কাঁদছেন, হাসছেন; শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন, সম্পূর্ণ নির্বিকার।

দুর্মতি কার? আমার আপনার। আচার্য বলছেন, *তত্র তেষু আত্মানাম্ অনন্যত্বেন অবিদ্যয়া পরিকল্প্য তৈঃ ক্রিয়মাণস্য কর্মণঃ*, ঠিক ঠিক আচার্যের উপদেশ শোনেইনি। এখন ইউটিউব হয়ে সবাই সবাইকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে। যার মনে যা আসছে বলে যাচ্ছে। এই দুটো জিনিস ঠিক ঠিক হওয়া চাই – শাস্ত্রমুখী বিদ্যা আচার্যের কাছে শুনতে হবে, শোনার পর নিজে যুক্তি তর্ক করে বিচার করে শাস্ত্রের অর্থ বুঝতে হবে। আপনি নিজের বুদ্ধিকে সুসংস্কৃত করতে চান? আপনি কি বুদ্ধিকে শুদ্ধ করতে চান? তার জন্য তিনটে জিনিস আপনাকে ধরতে হবে, এর বাইরে চতুর্থ আর কিছু নেই।

প্রথম হল শাস্ত্র, শাস্ত্র কি আমরা অনেকবার ব্যাখ্যা করেছি। পরম্পরাতে যেগুলোকে শাস্ত্র বলা হয়, সেগুলোই আমাদের শাস্ত্র। তাহলে আমরা কি পড়ব? বেদ পড়ব, আচার্য শঙ্কর যে কটি উপনিষদের ভাষ্য লিখেছেন সেগুলো পড়ব, তার সাথে বাল্মীকি রামায়ণ, ব্যাসদেবের মূল মহাভারত, গীতা, ভাগবত পুরাণ, চণ্ডী, তার সাথে মনুস্মৃতি ও তন্ত্র, এগুলোই পড়তে হবে, কারণ এই শাস্ত্রগুলিই আমাদের মূল শাস্ত্র। আরও যদি কম করতে হয় তাহলে গীতা আর উপনিষদ। এরপর এই সমস্ত শাস্ত্র শুনতে হবে আচার্যের কাছে। আচার্যে মুখ থেকে শোনার পর নিজের বুদ্ধিটাকে এবার খাটাতে হবে, যেটা বলছেন সেটা ঠিক ঠিক মিলছে কিনা।

আমাদের ইয়ং বয়সে রজনীশ ছিলেন খুব নামকরা একজন পণ্ডিত। একটা লেখাতে পড়েছিলাম, ওনার আশ্রমের বাইরে নাকি কোন হলের বাইরে লেখা ছিল, "আপনার জুতো ও আপনার মন দরজার বাইরে রেখে প্রবেশ করুন"। আমার জুতো আর মন বাইরে রেখে ভিতরে আসব? তাহলে আপনাকে আমি শুনব কি করে? আপনি বলতে চাইছেন, আমার পূর্ব ধারণা গুলিকে বাইরে রেখে আসব। আমি যে আপনাকে শুনব, এটাও তো ওই পূর্ব ধারণাতেই পড়ে। পূর্ব ধারণা বা সংস্কার কি রকম? আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি, সাধুবাবাদের কথা শুনতে হয়। এই যে বলছেন, keep your shoes and mind outside, মানে open mind হতে বলছেন, open mind কেন হব, তাহলে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করা কেন, শাস্ত্র শোনারই বা কি দরকার? আপনি বলছেন, আপনি ধর্মের কথা বলবেন। ঋষি মুনিরা, ত্যাগী পুরুষরা, যাঁরা শাস্ত্র রচনা করেছেন, আমি তাঁদের কথা শুনব না, আপনার কথা শুনব? আপনাকে শোনার আমার দরকারটা কি? যদি টাকা কিভাবে বানাতে হয়, এটা শেখার জন্য আমি নিশ্চয় কোন সাধুবাবার কাছে যাব না, যারা টাকা বানিয়েছে তাদের কাছেই যাব।

একজন ভিখারী ভিক্ষা চাইছে, যেমন হয় ভিখারীকে কেউ ভিক্ষা দিতে চায় না। ভিক্ষা না পেয়ে সেই ভিখারী বলছে – দেখুন আমি কোন যেসে সাধারণ ভিখারী নই, আমি একটা বই লিখেছি, 'টাকা বানানোর একশটি উপায়'। যার কাছে ভিক্ষা চাইছিল সেই লোকটি বলল, 'তাহলে তুমি ভিক্ষা চাইছ কেন'? ভিখারী বলছে, 'একশটা উপায়ের মধ্যে এটাও একটা উপায়'। যে টাকা বানাতে জানে তার কাছেই লোকে যাবে টাকা বানাতে। তুমি একটা ভিখারী, একটা বাটি নিয়ে 'দে দে রাম দিলা দে রাম' বলতে বলতে লোকেদের কাছে ভিক্ষা চাইছ, আর তুমি বলছ টাকা বানানোর একশটা উপায় নিয়ে বই লিখেছ। কে তোমার কথা বিশ্বাস করবে! কে শুনবে তোমার কথা! ওরে পোদো শাঁক বাজিয়ে করলি তুই গোল, এভাবে হয় না। শাস্ত্রের কথা আচার্যের মুখে শুনতে হবে।

আচার্য কে? যিনি শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত। কিভাবে বুঝব, ইনি শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত কিনা? দুটো কথা শুনলেই বোঝা যায়, একই কথা বার বার বলছেন, নিজের মত করে বলছেন। এখন ছাপাখানা, মিডিয়া এসে যাওয়াতে সমস্ত শাস্ত্র সহজলভ্য হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা তো সব কিছু শুনব না, আমরা দেখি আমাদের মনের মত করে কে বলছেন। উত্তরকাশীতে অনেক গুরুরা আসেন, কিভাবে একজন পরিচিতের মাধ্যমে একজনের সাথে আলাপ হল, তিনি বলছেন, 'আমি এতদিনে ধন্য হলাম, এতদিনে আমি একজন সদ্‌গুরু পেয়েছি'। কি রকম সদ্‌গুরু? 'উনি বলে দিয়েছেন, কোন জপধ্যান করতে হবে না, রাতে শোয়ার সময় একবার যদি এই নাম নিয়ে নাও, তাহলেই হবে'। আবার বলছেন, 'উনি ঠিক আমার গুরু না, গুরুর স্ত্রী'। গুরু কোথায়? 'উনি মারা গেছেন, এখন ইনিই গুরু'। ওনাকে আমি বললাম, 'ধর্ম জীবনে অনেক fraud হয়, কিন্তু কোথাও একটা লাইন টানতে হয়। ফ্রডগিরি কোথায় কোন স্তরে নিয়ে যাচ্ছেন, ভেবে দেখেছেন?'

যাই হোক, আমরা যে বিদ্যাকে আশ্রয় করে চলি, এই বিদ্যা হল সম্প্রদায় বিদ্যা। সম্প্রদায় বিদ্যা মানে, আপনি যে কোন জিনিস যদি শিখতে চান, একটা বিষয়কে যদি জানতে চান, যে কোন বিষয়, ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি; খুব নামকরা কথা – Read the masters। আচার্য এটাই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, দুর্মতি কে? অসংস্কৃত বুদ্ধি যার, অবিদ্যান, যে বিদ্যান নয়। বিদেশ থেকে ফিরে এসে স্বামীজী চেন্নাইতে বক্তৃতা দিচ্ছেন, শহরের সব বিদ্যান গণ্যমান্য অধ্যাপকরা শুনছেন, তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে স্বামীজী বলছে, তোমরা সবাই বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে থাকতে পার, তোমাদের বড় বড় মোচ থাকতে পারে, কিন্তু তোমরা সবাই হলে মোচওয়ালা শিশু। কেন? *বেদান্তাচার্যোপদেশনায়ৈঃ অকৃতবুদ্ধিত্বাদ্ অসংস্কৃতবুদ্ধিত্বাৎ*, বেদান্ত তুমি অধ্যয়ন করোনি, আচার্যের কাছে বেদান্ত শোননি, আর গভীরে গিয়ে যে জিনিসটা চিন্তন মনন করবে, সেটাও করোনি। বেশির ভাগ মানুষ কিছুতেই নিজের বুদ্ধিকে লাগিয়ে শাস্ত্র কি বলতে চাইছে, বোঝার চেষ্টাই করবে না। আমাদের এসে বলবে, একটু

আশীর্বাদ করবেন মহারাজ, যাতে সব হয়ে যায়। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজকে কেউ এই রকম বললেই তিনি বলতেন, আশীর্বাদ করার হলে আগে আমি নিজেকে আশীর্বাদ করব।

দুর্মতি কাকে বলে? আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *কুৎসিতা বিপরীতা দুষ্টা অজস্রং জননমরণ-প্রতিপত্তিহেতুভূতা মতিঃ,* কুৎসিৎ বুদ্ধি, বিপরীত বুদ্ধি, দুষ্ট বুদ্ধি হেতু সব সময় 'আমি' 'আমি' করে যাচ্ছে। যার ফলে বার বার জন্ম আর মৃত্যুর চক্রে ঘুরে যাচ্ছে। এরা বাস্তবে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটাকে দেখতে পায় না, আর মনে করে আমি শাস্ত্রের সব কিছু বুঝি, আসলে কোন বুদ্ধি নেই। আচার্য প্রায়ই তিমির রোগের উদাহরণ নিয়ে আসেন, তিমির রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা একটি চাঁদের জায়গায় অনেকগুলো চাঁদ দেখে। রাতের আকাশে মেঘ ভেসে যাচ্ছে, বাচ্চারা দেখছে চাঁদ দৌড়াচ্ছে। আচার্য আরও একটা উদাহরণ দেন, গাড়িতে কেউ বসে থাকলে সে মনে করে বাড়িঘর গাছপালা, লোকজন চলছে। এটা আশ্চর্যের যে, তখনকার দিনে গাড়ি এখনকার মত এত গতিতে চলত না, কিন্তু আচার্য শঙ্করের সব রকমের জ্ঞান ছিল। তিনি নৌকাকে নিয়েও বলেছেন, নৌকা চলতে থাকলে মনে হয় নদীর তট চলছে।

ঠিক তেমনি যাদের কুৎসিৎ বুদ্ধি, কুৎসিৎ বা অসংস্কৃত বুদ্ধি কার? যিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেননি, আচার্যের মুখে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শোনেননি আর নিজের বুদ্ধি লাগিয়ে শাস্ত্র ও আচার্যের ব্যাখ্যাকে বোঝার চেষ্টা করেননি। ফলে এদের 'আমি' ভাবটা খুব বেশি মাত্রায় থেকে যায়। মহারাজ একটু কৃপা করবেন, মহারাজ একটু আশীর্বাদ করবেন, মহারাজ ঠাকুরকে একটু বলবেন; আমি ভাবি এদের এখনও কত জন্ম লাগবে। ঠাকুর বলছেন, কুমিরের গায়ে যত তলোয়ারের কোপ মারো না কেন, কুমিরের কিছু হবে না। এদেরও 'আমি' ভাব এত জোরাল যে, সব কিছুতে আমিত্ব আর স্বার্থ। কেউ একবারও বলে না যে, আমি মহারাজের এই লেকচারটা শুনেছি, আরও পাঁচজনকে শোনাবার, বোঝানর চেষ্টা করছি। সব কিছুতেই 'আমি', 'আমি' মানেই সেখানে স্বার্থ এসে যায়, কিছুতেই এই আমিত্ব থেকে এরা বেরিয়ে আসতে পারে না। আমিত্ব থেকে যতক্ষণ না বেরিয়ে আসতে পারছে, স্বার্থ থেকে যতক্ষণ না বেরিয়ে আসতে পারছে, ততক্ষণ এই জন্মমৃত্যুর চক্রটা ঘুরতেই থাকে। যদি কেউ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, আচার্যের কাছে শুনে, আর চিন্তা-ভাবনা করে, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে, তখন গিয়ে বুদ্ধিটা সুসংস্কৃত হয়, আমিত্বটা কমতে থাকে।

কখন কি আপনারা নিঃস্বার্থ হন? একটা দিন আমরা চেষ্টা করতে পারি, আজকে সারাটা দিন আমি নিঃস্বার্থ থাকব। নিজের জন্য কিছু প্রার্থনা করব না, নিজের পবিত্রতা, ভক্তি, মুক্তি এগুলোর জন্য প্রার্থনা করব না, সেদিন কোন আমিত্ব ভাব থাকবে না। না, এটা পারা যায় না। এখানে কেবলমাত্র জ্ঞানীর কথা বলছেন না, এখন যে শ্লোকটা বলতে যাচ্ছেন এটাকে তত্ত্বগত ভাবেও যদি বুঝে নিতে পারেন, তাহলে বুঝবেন আপনি অনেকটা পথ চলে এসেছেন। পরের শ্লোকে কি বলছেন?

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে।।১৭।।

(আমি কর্তা এই অভিমান যাঁদের নেই এবং যাঁদের বুদ্ধি কর্মফলে লিপ্ত হয় না, তিনি জগতের সমস্ত প্রাণীর হত্যা করলেও হত্যাকারী হন না, বা হত্যাক্রিয়ার ফলে আবদ্ধ হন না।)

গীতার প্রত্যেকটি শ্লোকই আমার কাছে ভাল বোধ হয়, কিন্তু এই শ্লোকটি আমার বিশেষ ভাবে প্রিয়, এই শ্লোকটি শুনলে কেন জানি না, আমার প্রাণ জুড়িয়ে যায়। আমিত্ব যার মধ্যে নেই, কোন কাজে যার বুদ্ধি জড়িয়ে যায় না, সে যদি সমস্ত জগৎকে মেরে ফেলে, পুরো জগৎকে যদি উড়িয়ে দেয়, তাতেও সে কাউকে মারে না, আর কেউ যদি তাকে মেরে ফেলে, তাতেও সে নিজেকে মৃত বলে মনে করে না।

এই পেনটা আমার হাতে আছে, পেনটা একটা স্পেসে বা স্থানে আছে, শাস্ত্রের ভাষায় যাকে আমরা আকাশ বলি। পেনটা থাকার জন্য আকাশ দুটো ভাগে চলে গেল। আকাশ যদি এই পেনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নেয়, কারণ পেনটাও আকাশ, আছেও আকাশের মধ্যে, এরপর পেনটা যদি ভেঙে যায় আকাশ তখন কি বলবে আমি ভেঙে গেলাম? পেনটা যদি টুকরো টুকরো হয়ে যায়, তাতে আকাশের কি কিছু হবে? কিছুই হবে না। পেন যখন তৈরী হয়ে এলো তখনও কি আকাশের কিছু হল? কিছুই হয়নি। পেনটা যখন এলো, আকাশ কি তখন দুটো টুকরো হয়ে গেল? আদপেই হয়নি। ঠাকুর উদাহরণ দিচ্ছেন, পুকুরের জলে একটা লাঠি ফেলে দিয়েছে, পুকুর দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। আদৌ কি বিভক্ত হল? অবশ্যই না, যেমন ছিল তেমনই থাকল।

এই 'আমি' জিনিসটা কি? 'আমি' মানে বুদ্ধি যেখানে লিপ্ত হয়। এই পেনটাকে যদি ভাঙতে হয়, এটার উপর আঘাত করতে হবে। পেন একটা পদার্থ, কে এর উপর আঘাত করতে পারে? একমাত্র পদার্থই পদার্থকে আঘাত করতে পারে। পদার্থ যদি পদার্থকে আঘাত করে, সেখানে আমার সাথে কি সম্পর্ক থাকছে, কোন সম্পর্কই নেই, কারণ আমি তো শুদ্ধ আত্মা। আসলে বুদ্ধি সেখানে গিয়ে লিপ্ত হয়ে আছে, বুদ্ধিটা লিপ্ত হয়ে যায় বলে মনে হয় আমি করলাম, আমি এর ফল পাব। আর সত্যিই ফল পাওয়া যাবে।

এর আগের শ্লোকে যেটা বলা হল, *তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ, পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ,* অকৃতবুদ্ধি বা অসংস্কৃত বুদ্ধি, বুদ্ধি যাদের অশুদ্ধ, তারা সব সময় মনে করে আমি এই কর্ম করেছি, এই ভাল কাজটা আমি করেছি, মহারাজ আমাকে কৃপা করবেন, ঠাকুরকে আমার কথা একটু বলবেন, শুধু আমি আমি আমি, আমি ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু যে আকাশ পেনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে, সে যখন দেখে আমি তো পূর্ণ আকাশ। আকাশ কখন পেন আকাশ হবে না, পেন আকাশ, খাপ আকাশ, এ-রকম কখন হয় না, আকাশ আকাশ। আমরা আমাদের নিজেদেরকে সব কিছুর সাথে জড়িয়ে সীমিত মনে করি।

কিন্তু বুদ্ধি সেরকম হয় না। হয় না বলে কি হয়? বারবার জন্ম নিচ্ছি, মরছি, কান্নাকাটি করছি, মহারাজ আমার স্বামীর কি হল, মহারাজ আমার স্ত্রীর এই রকম কেন হল, মহারাজ আমার সন্তানের কি হবে, কি আর হবে, এটাই হওয়ার কথা, কারণ তুমি নিজেকে সব কিছুর সাথে জুড়ে রেখেছ। আমারও শুনে খারাপ লাগে; কারণ যাকে চিনি, জানি, তার যদি খারাপ কিছু হয়, খারাপ তো আমারও লাগবে। কারণ আমারও বুদ্ধি পরিষ্কার হয়নি কিনা, আমারও সেই অহঙ্কারটা রয়েছে, অহঙ্কার বলতে এখানে আমির সাথে যিনি জুড়ে আছেন। কিন্তু থিয়োরেটিক্যালিও যদি এখান থেকে বেরোতে পারেন, একদিনের জন্যও যদি বেরোতে পারেন, বুঝবেন আপনি অনেকটা পথ অতিক্রম করে এগিয়ে আসতে পেরেছেন।

একদিন করে দেখুন, আজ একটা দিনের জন্য আমিকে কোন কিছুতে ঢুকতে দেব না – এই আমি লেগে থাকলাম, চব্বিশ ঘন্টা আমিত্বকে ঢুকতে দেব না, সবই আত্মা দেখব। ছেলে যদি দুষ্টুমি করে, আমি দেখব, *অধিষ্ঠানং তথা কর্তা,* ওর ইন্দ্রিয়গুলি দুষ্টুমি করছে। ফলে ওর দুষ্টুমি দেখে আমার হাসি পাবে, ভিডিও গেমসে যেমন রোবটের লড়াই দেখে আমাদের হাসি পায়। চব্বিশ ঘন্টা এভাবে করুন, চব্বিশ ঘন্টা না পারলে ছয় ঘন্টা করুন, ছয় ঘন্টার নীচে হলে আর হবে না। এই জিনিসটাকে জীবনে নামাতে হবে। অনেকে বলে, মহারাজ আপনার কথাগুলো শুনতে খুব ভাল লাগে, জীবনে যদি নামাতে পারতাম। জীবনে খুব সাধারণ এই একটাকে লাগান – আমিত্বটাকে কমান। খুব সাধারণ খাওয়া-দাওয়া, খুব সাধারণ দুটো জামা কাপড়, দুটো মানুষকে ভাল করা, আর এই আমি আমি করাটা কমানো, এইতো জীবনে নামানো হয়ে গেল। কিন্তু আমিটা ভিতরে এমন ভাবে ঢুকে আছে যে, কিছু করার নেই।

মহারাজ ঠাকুরকে একটু প্রার্থনা করবেন, আপনার প্রার্থনাতে আমাকেও রাখবেন, মহারাজ ঠাকুরকে একটু আমার কথা জানাবেন। ভাই তোমার নিজের জানাতে কি হয়েছে, ঠাকুরের কাছে তোমার যে খাতির, আমারও তাই খাতির, তিনি সমদর্শী। খ্রীশ্চান ট্রাডিশান থেকে এই বোকা বোকা কথাগুলো এসেছে। হিন্দুদের মধ্যে এই ধরণের কোন ভাব নেই, তুমিও ঠাকুরের সন্তান, আমিও ঠাকুরের সন্তান। তুমি প্রার্থনা করলে ঠাকুর যতটা শুনবেন, আমি প্রার্থনা করলে ততটাই ঠাকুর শুনবেন। সন্ন্যাসী কেন শ্রেষ্ঠ? সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ এই কারণে – আমির ভাবটা সন্ন্যাসী কমিয়ে দিয়েছে। সে ঘরসংসার ছেড়ে দিয়েছে, মা-বাবা সবাইকে ছেড়ে দিয়েছে, আমিত্বের বোঝাটা কমিয়ে দিয়েছে। এতে কি জীবনটা খুব মসৃন হয়? না, কোন সুবিধাই সে পায় না, বরঞ্চ জীবন অনেক কঠিন হয়ে যায়। একজন নামকরা লেখক বলছেন, জীবন যদি খুব হাল্কা হয়ে যায়, হাল্কা বোঝা মানুষের পক্ষে সহ্য করা খুব দুঃসহ হয়ে যায়, জীবন খুব কঠিন হয়ে যায়। মানুষ বোঝা ছাড়া থাকতে পারে না, বোঝা না থাকলে অন্য অনেক সমস্যা হয়, এটা আবার আলাদা একটা বিষয়।

এখানে বলছেন, *যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো*, আমিত্ব ভাবটা যার চলে গেছে, *অহঙ্কৃত* মানে অহঙ্কার। *বুদ্ধির্যস্য নি লিপ্যতে*, আগে রোবটের উদাহরণ দেওয়া হয়েছিল, রোবটগুলি খেলা করছে, সেখানে বুদ্ধি লিপ্ত হয় না। প্রশ্ন হতে পারে, কর্মফল কোথায় যাবে? কোন কর্মই তো হয়নি, কোন কর্মই যখন হয়নি তখন কর্মফল কোথা থেকে আসবে। আপনি যদি কোন কর্ম করে থাকেন, তবেই না কর্মফল হবে। আপনি তো কর্ম করেননি, যে কর্ম করেছে সে বুঝবে। দুটো রোবট বক্সিং করছে, সেখানে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। ঠাকুর ব্যাসদেবের গল্প বলছেন, যমুনা নদী পার হবেন, সব ননী ক্ষীর খেয়ে বলছেন, হে যমুনে আমি যদি না খেয়ে থাকি তাহলে তুমি দুই ভাগ হয়ে যাও। এগুলো কাহিনী, আমাদের পুরাণে যত কাহিনী আছে, রামায়ণ মহাভারতের যত কাহিনী আছে, এগুলো সব আখ্যায়িকা। কিন্তু এই আখ্যায়িকাগুলি থেকে বেদান্তের সত্য বেরিয়ে আসে।

ব্যাসদেব ছিলেন, *যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে*, তাঁর আমিত্ব ভাব ছিল না। এখান 'হত্যা' ক্রিয়া দিয়ে সমস্ত কর্মকেই বলে দিলেন, শুধু মারামারি না। আমিত্ব ভাব না থাকার অর্থ হয়, যে কোন জিনিস যে ঘটছে, বুদ্ধি সেখানে গিয়ে জুড়ে যায় না। বুদ্ধি হল চোরকাঁটার মত, চোরকাঁটার রাস্থা দিয়ে গেলে প্যান্ট, ধুতি, পাজামাতে হাজার হাজার চোরকাঁটাতে ভরে যায়। বর্তমান কালে যেমন হুকস্ এণ্ড লুপস্ এসেছে, লাগিয়ে দিলে খ্যাঁচ করে আটকে যাবে। বুদ্ধি ঠিক ওই রকম, হাজার হাজার তার হুকস বেরিয়ে আছে, যেখানে লুপস্ দেখবে সেখানেই খ্যাঁচ করে আটকে যাবে, ল্যাজজোড়া হয়ে গেল। দ্বিতীয় অধ্যায়েও ভগবান বলেছিলেন, *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*, এখানেও সেটাকেই অন্য ভাবে বলছেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ের সতের নম্বর শ্লোক মুখস্ত করে রাখুন, আর জীবনে এটাকে নামানোর চেষ্টা করুন।

ভগবান বুদ্ধ এক বাড়িতে ভিক্ষা চাইতে গেছেন, গৃহকর্তা তাঁকে খুব করে গালাগাল দিলেন। ভগবান বুদ্ধ তখন গৃহকর্তাকে বলছেন, 'অতিথিকে কিছু দিতে গেলে সে যদি না নেয় তাহলে সেগুলোর কি হবে'? গৃহকর্তা বললেন, 'ওগুলো আমার কাছেই থাকবে'। 'আমিও তোমার কিছু নিলাম না'। এই গল্পটা প্রায় সবাই শুনেছেন। এর অর্থ কি? ভগবান বুদ্ধ এগুলোকে পার করে গেছেন, তাঁর আমিত্ব বোধ নেই। ফলে গৃহকর্তা যে গালাগাল দিল, সেগুলো তাঁকে স্পর্শ করতে পারল না। তাহলে ভগবান বুদ্ধকে দেওয়া সব গালাগাল গুলো লোকটার ঘাড়ে গিয়ে পড়ল? না, তা হবে না। কুকুর যেমন হয় এর পিছনে দৌড়াবে, নয় ওর পিছনে দৌড়াবে, কর্মফল সেই রকম হয় না। কর্মফল হল, আগেকার দিনে যে ফটোগ্রাফি হত, তখনকার দিনে কাঁচের পিছনে কেমিক্যালস লাগানো থাকত, ওতে ছাপ পড়ে যেত আর ছবি হয়ে যেত। কেমিক্যালস যদি না থাকে, আর ফটো যদি তোলা হয়, কিছুই ছবি হবে না। বাল্মীকি রামায়ণে আছে, হনুমান যখন সমুদ্রের উপর দিয়ে যাচ্ছেন, জলের উপর হনুমানের যে ছায়া পড়েছে, সেই ছায়াকে একজন ধরে নিয়েছে। ফটোগ্রাফি

হল, ছায়াকে ধরে নিচ্ছে। কে ধরছে? যার রীলের উপর কেমিক্যালস দেওয়া আছে, যার কেমিক্যালস দেওয়া নেই সে আর কিসের ছবি ধরবে!

এই যে উদাহরণ দিয়ে বলা হয়, কর্মফল কর্তার পিছনে ঠিক সেই ভাবে যায়, যেভাবে বাছুর গরুর পিছনে যায়। আসলে জিনিসটা তা নয়, জিনিসটা মনের উপর ছাপ ফেলে। মন অন্তর্যামীর সাথে জুড়ে আছে, সেই অন্তর্যামী তখন মনের উপর যেমনটি ছাপ রয়েছে, তেমনটি তার মনের মত করাবে। তাকে নরকে নিয়ে যাবে, পাতালে নিয়ে যাবে, তাকে দিয়ে হিংসা করাবে, খুন করাবে, লুট করাবে। লৌকিক মানুষ মনে করে, আমি মরলাম, আমি মারলাম। আমরা যদি মনে করি, চিকাগোতে স্বামীজী ভাষণ দিচ্ছেন, সিস্টারস্ এণ্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ কি দেখবেন? আমরা বলব, স্বামীজী কি দারুণ বক্তৃতা দিচ্ছেন, শ্রীকৃষ্ণ বলবেন, *অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধাম্*, স্বামীজীর মন, বাণী ক্রিয়া করে যাচ্ছে, উনি নির্লিপ্ত, উনি শুদ্ধাত্মা। শ্রীকৃষ্ণ এই রকম দেখবেন, আমরা দেখব না।

এখানে বলছেন, নিশ্চয় আত্মা জড়ায়, নাহলে কাজ কি করে হবে! তখন বলছেন, কি করে জড়াবে, যে কোন জিনিস যেটা বিকারবান সেটারই সংঘাত হতে পারে; আত্মা নির্বিকার, আত্মাকে কারুর সাথে জোড়া যাবে না। আত্মাতে কখন কোন পরিবর্তন ঘটবে না। সেইজন্য আত্মা কখনই কর্ম করে না, আত্মা কখন কোন কিছুতে জড়ায় না। শুধু বুদ্ধি জড়ায়, কারণ বুদ্ধি হল বিকারবান। যার জন্য আমরা বলতে থাকি, আজ আমার মন ভাল নেই, আজ আমার মনে খুব আনন্দ। সুফিরাও বলে, আত্মা কখন কর্ম করে না। তাছাড়া আত্মার কোন অঙ্গ নেই, কোন অংশ নেই; বলছেন, এটাই হল জ্ঞানের রাজমার্গ। জ্ঞানের রাজমার্গ হল, এই জানা যে, আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, যিনি অনন্ত, যাঁর কোন অঙ্গ নেই, যাঁর কোন অংশ হয় না।

আচার্য শঙ্কর আবার বলছেন, আত্মাকে যদি আপনি বিকারবান মনেও করেন, তাহলেও কিন্তু কর্ম করার পর যে ছাপ ছাড়ে, সেটা আত্মার উপর ছাড়বে না। কারণ, দুজন লোক আছে, কাজ করল একজন, মার খেল আর-একজন, ন্যায় এভাবে চলে না, এক আধবার দৈবাৎ উলটোটা হতে পারে, কিন্তু নিয়মিত হবে না। কাজ করছে দেহ, কাজ করছে মন, কাজ করছে ইন্দ্রিয়, আর তার ফল ভোগ করবে আত্মা, সেকি কখন হয়, সম্ভবই না। আত্মাকে আপনি বিকারবান মনে করুন, অবিকারবান মনে করুন, আপনি কোথাও জড়িয়ে নেই। কিন্তু আমরা ভেবে ভেবেই শেষ হয়ে যাই।

আচার্য শঙ্কর বলছেন, এটাই হল গীতার সার। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেখানে *ন হন্যতে হন্যমানে* শুরু করেছিলেন, সেখান থেকে পুরো একটা দর্শন চলতে চলতে এই সতের নম্বর শ্লোকে এসে জিনিসটার পরিসমাপ্তি দিচ্ছেন। জীবনের উদ্দেশ্য হল এই আত্মজ্ঞান পাওয়া, যেখানে এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া – আমি কর্তা নই। এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে কোন কর্মফল আর তাকে ছুঁতে পারবে না। কর্মফল যদি না ছুঁতে পারে, তিনি তখন জন্মমৃত্যুর পারে চলে যাবেন। অপরকে মারলেও তার কিছু এসে যাবে না, তাকেও যদি কেউ মারে তাতেও তার কিছু এসে যাবে না। ঠাকুর খুব সুন্দর উদাহরণ দিচ্ছেন, বলির ছাগ, খড়্গা, বলিকাঠ, যে বলি দেবে, সবটাই আমি চৈতন্যময় দেখছি। বাস্তবে এটাই হয়, থিওরেটিক্যাল কিছু না। তাহলে বাস্তবে ছাগলটা কাটা গেল কি গেল না? এটা নির্ভর করছে আপনি কিভাবে দেখছেন। আপনি যদি শুদ্ধ চৈতন্য রূপে দেখেন, তাহলে জন্ম নেই মৃত্যু নেই; যদি পদার্থ রূপে দেখেন তাহলে জন্ম আছে, মৃত্যু আছে।

সমগ্র গীতা জুড়ে এই দুটো বুদ্ধি সব সময় চলছে। একটা বুদ্ধি হল, শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, আচার্যের মুখে শাস্ত্রের কথা শুনে, চিন্তা-ভাবনা করে ভাল করে বুঝে গেছেন যে, চৈতন্যই আসল। ঠাকুরও এই একই জিনিস বর্ণনা করছেন, উপনিষদও এই একই জিনিসের বর্ণনা করছেন। এই জ্ঞানে যিনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান তিনি দেখেন, জন্ম নেই মৃত্যু নেই, কর্ম নেই, কর্ম ত্যাগ নেই।

তাহলে এত জিনিস যে দেখছিলাম? তিনি তখন বুঝে যান, আমি এসব ভাবছিলাম, দেখেন এগুলো কিছুই নেই। তাহলে এত কিছু আসছিল কোথা থেকে? এটাই মায়া। যতক্ষণ মায়ার মধ্যে আছি ততক্ষণ এই প্রশ্ন হয় না, মায়া কি, মায়া কেন এলো, মায়া কোথা থেকে এলো, কিভাবে এলো।

আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *এবং চ সতি দেহভৃত্ত্বাভিমানানুপপত্তৌ অবিদ্যাকৃতাশেষকর্ম-সন্ন্যাসোপপত্তে,* যাদের মধ্যে দেহের ভাব এখনও আছে, আমিত্ব বোধ আছে, তারা সবাই কাজ করবে। কিন্তু সব সময় এটা মনে রাখতে হবে, আমার আসল স্বরূপ আত্মা। ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন, অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেধে সংসারের সব কর্ম কর। কাজ আমাদের সবাইকেই করতে হবে, কিন্তু মনে রাখতে হবে আসলে আমি কাজ করি না, কাজ করছে দেহ, কাজ করছে মন, কাজ করছে ইন্দ্রিয়। কার উপর কাজ করছে? এদের সম জাতীয় যে পদার্থ রয়েছে, তার উপর কাজ করছে, পদার্থই পদার্থের উপর কাজ করে। এই জ্ঞানটা হয়ে যাওয়ার পর, নিজেরও মৃত্যু হয় না, অপরেরও মৃত্যু হয় না, কেউ কাউকে মারে না। এটাই গীতার মূল কথা। এই জ্ঞান কিভাবে আসে? এই প্রসঙ্গটাই এবার শুরু করবেন আঠারো নম্বর শ্লোক থেকে।

আঠারো নম্বর শ্লোক শুরু করার আগে দুটো একটা কথা বলে নিতে হচ্ছে। গীতা হল জীবন্ত শাস্ত্র, living scripture।, দৈনন্দীন জীবনে গীতাকে লাগিয়ে নিজের জীবনকে ধন্য করা যায়। গীতা নিত্য নূতন শাস্ত্র। কেন নিত্য? কারণ আপনি নিজের জন্য রোজ নিজেকে আবিষ্কার করবেন। আর এই জন্যই গীতা জীবন্ত শাস্ত্র, এই জন্যই নিত্য নূতন। আমরা যখন জীবন্ত মানুষ দেখি, বিশেষ করে যিনি আমার আচার্য তিনি আয়না দেখিয়ে দেন, তুমি এখানে আর তোমাকে যেতে হবে সেখানে। গীতা অন্যান্য ধর্ম শাস্ত্রের মত নয়। গীতা যে শুধু একটা বলে দিচ্ছেন, তুমি এই রকম করবে, তুমি এটাই করো; গীতা একেবারেই এই রকম কিছু করছেন না বা বলছেন না। কেন করতে হবে সেটাকেও পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। বেদে মন্ত্র দেওয়া আছে, আচার্য ওই মন্ত্রের ব্যাখ্যা দেন। কিন্তু গীতাতে দুটোই আছে, মন্ত্রটাও আছে, সেই মন্ত্র দেখাচ্ছে কোথায় যেতে হবে, আর তার যে বিশ্লেষণ, তাতে বোঝা যায় আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি।

হিন্দুদের জন্য গীতা হল তার জীবনের শাস্ত্র, আর তার যখন মৃত্যু হয়, তখন গীতা পাঠ করতে করতেই তাকে বিদায় দেওয়া হয়। গীতাকে জীবনের চারটে স্তরে রাখতে হয়। প্রথমটা হল গীতা পারলে পুরোটা মুখস্ত করা, না হলে কয়েকটা অধ্যায় মুখস্ত করা, কারণ মুখস্ত না করলে শাস্ত্র কৃপা করবেন না। চাকরির জন্য আমাদের দরখাস্ত করতে হয়, রেলের রিজার্ভেশানের জন্য দরখাস্ত জমা দিতে হয়, তখন তাঁরা কৃপা করেন। শাস্ত্রকেও সেবা দিয়ে প্রসন্ন করতে হয়, নিত্য পাঠ করে তাঁকে খুশী করতে হয়। একটা শব্দ আছে, সেবাপূজা; আমরা পূজাটা করি কিন্তু সেবা করি না। আগেকার দিনে, এখনও অনেক জায়গায় দেখা যায়, শাস্ত্রগুলিকে লাল শালু দিয়ে বেঁধে একটা জায়গায় রাখা থাকে, সেখান ফুল দিয়ে পূজা করা হয়। লাল শালুতে বেঁধে রেখে পূজা করার জন্য শাস্ত্র নয়, শাস্ত্রের সেবা করতে হয়। শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ সেবা হল শাস্ত্র মুখস্ত করা, নিয়মিত পাঠ করা আর শাস্ত্রের মর্মার্থকে নিয়ে চিন্তন করা। চিন্তন করার জন্য আগে মুখস্ত করা দরকার, মুখস্ত যদি না থাকে আপনি চিন্তন করবেন কি করে! ফরর্ ফরর্ করে বলার জন্য, অপরকে দেখাবার জন্য মুখস্ত করা নয়, গীতা হল চিন্তনের জন্য।

দেওঘর আশ্রমে আমি যখন ব্রহ্মচারী ছিলাম, তখন শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী আমাদের গীতা পড়াতেন, তিনি আমাদেরকে দিয়ে গীতা মুখস্ত করাতেন। সেখানেই আমি ওনার কাছে এই কথাটা শুনেছিলাম, 'গীতা যদি মুখস্ত না করিস, তাহলে চিন্তন হবে না'। শাস্ত্র মুখস্ত থাকলে মাথায় শাস্ত্রের কথাগুলো ঘোরে, তখন দপ্ করে অর্থটা পরিষ্কার হয়। কথামৃত নিয়মিত পাঠ করে গেলে দপ্ করে জ্ঞানের বাতিটা জ্বলে ওঠে। প্রথমে মুখস্ত করা হল, নিয়মিত আবৃত্তি করা হচ্ছে, সেখান থেকে চিন্তন মনন চলতে শুরু হল, এই করতে করতে জ্ঞানের আলোটা জ্বলে ওঠে। জ্ঞানের আলো যখন জ্বলে

ওঠে, যখন বুঝে গেলেন শাস্ত্র কি বলতে চাইছেন, তখন ওটাকে জীবনে কাজে লাগানো যায়। ঠাকুর খুব সহজ করে বলছেন, কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দেখেছে আর কেউ দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। অনেকেই আমাদের বলেন, মহারাজ গীতা কথা তো শুনে যাচ্ছি কিন্তু কতটুকু আর কাজে লাগাতে পারছি। গীতার জ্ঞান কাজে লাগাবেন আপনি? মুখস্ত করেছেন? মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কোন একটা শাস্ত্রকে নিয়ে চিন্তন করেছেন? সেই জ্ঞান কি আপনার ভিতরে জ্বলে উঠেছে? তারপরেও বলছেন, গীতাকে কাজে লাগাতে পারছি না। কোথা থেকে কাজে লাগাবেন, কি করে কাজে লাগাবেন?

আচার্যরা অনেক সময় অনেক রকম কথা বলেন, যেগুলো শুনলে কর্ণকটূ মনে হয়, তাই বলে আচার্যরা কাউকে ছোট করার জন্য এই ধরণের কোন কথা বলেন না। চারিদিকে দেখুন, সমাজের সবাই যে কোন ব্যাপারে কেমন খেলো। এখন তো খাওয়া দাওয়াটাও হয়ে গেছে ফাস্ট ফুড। আগেকার দিনে খাবার বানাবার আগে মায়েদের কত কিছু করতে হত, সব্জী কাটা হচ্ছে, মশলা বাটা হচ্ছে, উনুন ধরানো হচ্ছে, ধীরে ধীরে মায়েরা খাবার তৈরী করতে থাকতেন। এখন সব উঠে গেছে, এখন এসে গেছে টু মিনিটস নুডুলস। ভালোবাসা – খেলো হয়ে গেছে, পড়াশোনা – খেলো হয়ে গেছে। শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও তাই, শাস্ত্র, শাস্ত্রের বিদ্যা, শাস্ত্রের জ্ঞান, চিন্তন সব খেলো হয়ে গেছে। খুব চিন্তার বিষয়, কারণ আদতে এটা একেবারেই ভাল না। গীতাকে যদি আমরা জীবন্ত শাস্ত্র মনে করি, যদি গীতাকে জীবনে লাগাতে চাই, যতটুকু সম্ভব মুখস্ত করুন। দিনে অন্তত একটি করে শ্লোক মুখস্ত করলে, দু বছরে গীতা মুখস্ত হয়ে যাবে। মস্তিষ্ক এতে খুব সতেজ ও সক্রিয় থাকবে, এ্যালজাইমার মত কোন রোগ আসতে পারবে না।

গীতা নিত্য পাঠ করতে হবে, চিন্তন করতে হবে, এরপর জ্ঞান যখন জ্বলে উঠবে তখন গিয়ে গীতাকে কাজে লাগাতে পারবেন। এমনি শুধু শুনে গেলে গীতা কাজে লাগানো যাবে না। একজন পুস্তক বিক্রেতা চাষবাশ কি করে ভাল ভাবে করা যায়, এর উপর একটা বই নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরছে। দেখছে একজন চাষী গাছতলায় বসে আছে, পুস্তক বিক্রেতা ভাবল গল্পসল্প করে বইটা একে গছানো যেতে পারে। কাছে গিয়ে বলছে, আমার কাছে খুব ভাল বই আছে, কিভাবে ভাল করে চাষবাশ করা যায়। লোকটা হেসে বলছে, চাষবাশের ব্যাপারে একশটা বিদ্যা আমার জানা আছে, নব্বুইটা আমি কাজে লাগাতে পারছি না, আরেকটা নূতন বই পড়ে আমার কি হবে! এমনিই আমাদের যা জ্ঞান আছে, সেটাকেই আমরা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারছি না, সেখানে থিয়োরেটিক্যাল জিনিস নিয়ে কি হবে। সেইজন্য জ্ঞানের উদয় যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ হয় না। এই জিনিসটাকে যদি আমরা বুঝে নিতে পারি, তখন আমরা বুঝব এখন যে শ্লোকের আলোচনা হতে যাচ্ছে, যাতে দেখানো হচ্ছে জীবনে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, এবং কোথায় যেতে হবে।

এর আগে আলোচনা হয়েছিল *অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্*, সেখানে বলা হয়েছিল কাজ কিভাবে হয়। কাজ এমনি হয় না, কাজের পিছনে একটা চিন্তন থাকতে হয়। আমি একটা নূতন চিন্তা এনেছিলাম – ইনফো-এনার্জি। একটা এনার্জির পিছনে একটা ইনফরমেশান থাকে, তা নাহলে এনার্জি কাজই করবে না, তা নাহলে এনার্জিটা unpatterned হয়ে যাবে। তেমনি যে কোন কাজের পিছনে একটা চিন্তা থাকে। গীতা কত হাজার বছরের, কিন্তু গীতা কি সুন্দর এই জিনিসটাকে গুছিয়ে বলছেন। আগে বললেন কাজ কিভাবে হয়। যিনি জ্ঞানী, তিনি দেখেন শরীর, ইন্দ্রিয় এই কাজগুলি করছে। এবার বলছেন, ওই যে গাড়ীটা চলছে, ওই গাড়ীর ভিতরে ইঞ্জিনটা কি? গাড়ী তো নিজে থেকে দৌড়ায় না, গাড়ির ভিতর ইঞ্জিন থাকে। সেই ইঞ্জিনটা কি?

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ।।১৮।।

(জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা সকল ক্রিয়ার ত্রিবিধ প্রবর্তক। কারণ, এই তিনটি একত্র হলেই সমস্ত ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এবং করণ (ইন্দ্রিয়), কর্ম (ক্রিয়া) ও কর্তা (করণের প্রযোক্তা) –এই তিনটিতে সর্বক্রিয়া সংগৃহীত, সমবেত। অতএব আত্মা কোন কর্মের প্রবর্তক বা আশ্রয় নন।)

আসলে এখানে কর্মসংগ্রহ নিয়ে আলোচনা করছেন। এই যে জন্মে জন্মে আমাদের মধ্যে কর্ম জমা হচ্ছে, এই পুরো জিনিসটা কিভাবে হয়? এই যে আমরা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি, কিন্তু সেই কাজের পিছনে যে জ্ঞান, ওই জ্ঞানটা যদি আমরা না বুঝে থাকি, আমরা কাজ করব কি করে! আমরা জানিনা কেন কাজ করছি। কুকুরের লেজে কাপড় বেঁধে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, কুকুর পাগলের মত দৌড়াচ্ছে। সারা জীবন আমরা কি এভাবেই কাজের পিছনে দৌড়াতে থাকব? কোথায় দৌড়াচ্ছি, কেন দৌড়াচ্ছি, একবারও কি জানতে চাইব না! গ্রামের জমিদারবাবু ঘোড়ার পিঠে চেপে বসেছে, ঘোড়াটা দৌড়াতে শুরু করে দিল, দৌড়াচ্ছে তো দৌড়াচ্ছেই, ঘোড়া এখন তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। একজন প্রজা জিজ্ঞেস করল, বাবু কোথায় যাচ্ছেন? বাবু উত্তর দিচ্ছে, 'আমাকে কি জিজ্ঞেস করছ, ঘোড়াকে জিজ্ঞেস কর'। আমাদের জীবন এই রকমই হয়ে গেছে, আমরা জানি না কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি। গীতা এখানে পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন, তোমার উদ্দেশ্য হল মুক্তি, উদ্দেশ্য হল আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি, উদ্দেশ্য হল এই জিনিসটা জেনে যাওয়া যে, আমার ভিতরে সমস্ত শক্তি, সমস্ত জ্ঞান বিদ্যমান, আমি ঈশ্বরের সাথে এক, আমিই সেই ব্রহ্ম।

কিন্তু এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য আগে আমাদের দেহবুদ্ধি থেকে বেরোতে হবে। দেহবুদ্ধি থেকে বেরোনর আগে এই সংসার আসক্তি থেকে বেরোতে হবে, সংসার আসক্তি থেকে যে বেরোব, তার জন্য সব কাজ আমাকে গুছিয়ে করতে হবে। কাজগুলি যে গুছিয়ে করতে হবে, কিন্তু তার আগে কাজের পিছনে যে জ্ঞান, বর্তমান কালে ম্যানেজমেন্ট বলে incentive, কেন আমি কাজটা করছি; জানতে হবে। আর তার সাথে পুরো process of knowledgটা জানতে হবে। এখানে বলছেন, পুরো জ্ঞান আর কর্ম সাত্ত্বিক, রাজসিক আর তামসিক এই তিনটি গুণের নিরিখে তিন প্রকার হয়। আপনি কেমন মানুষ, কি ধরণের মানুষ, জীবনে আপনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন, পর পর কয়েকটা শ্লোকে পরিষ্কার করে বলে দেবেন।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা, একটা কাজের দিকে যখন মানুষকে নিয়ে যায়, তার পিছনে জ্ঞান থাকে। জ্ঞানের পিছনে তিনটে জিনিস থাকে – জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা বা পরিজ্ঞাতা। এই তিনটেই তিন প্রকার করে হয়। জ্ঞান তিন প্রকার হয়, জ্ঞেয় তিন প্রকার হয় এবং জ্ঞাতা তিন প্রকার হয়। আর কাজ যখন করা হয়, সেখানেও তিনটে জিনিস লাগে – কর্তা, কর্ম ও করণ; কারকের প্রথমা, দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। এই তিনটেও তিন তিন প্রকার। এখানে বলে দিচ্ছি, এগুলো খুব জরুরি নয়, কিন্তু বিদ্যার প্রতি যাদের আগ্রহ আছে, তাদের জন্য এগুলো উপযোগী। এর মধ্যে প্রচুর ইনফরমেশান রয়েছে, সেইজন্য একবার দুবার শুনলে সব মনে থাকবে না।

এই যে চোদ্দ নম্বর শ্লোকে বললেন, *অধিষ্ঠানং তথা কর্তা*, তার মনে বলতে চাইছেন যখনই কোন কর্ম হয়, সেখানে তার পাঁচ খানা হেতু থাকে – অধিষ্ঠান, কারণ আর তিনটি হয় তার আশ্রয়, এই শব্দগুলি টেকনিক্যাল শব্দ। তিনটি আশ্রয় হল, দেহ, মন ও বাণী। এটার জন্য দরকার পড়ে একটা ধাক্কা মারা, এই ধাক্কাটাকে বলছেন *কর্মচোদনা*, কর্মকে যেটা ঠেলে নিয়ে যায়। গায়ত্রী মন্ত্রে বলছেন *প্রচোদয়াৎ*, আমাকে সেই দিকে নিয়ে চল। কর্মকে কে ঠেলে নিয়ে যায়? জ্ঞান ঠেলে নিয়ে যায়। মন যেন ঠিক দিকে যায়, সেইজন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন *ভূর্ভুবঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গ দেবস্য ধীমহি, ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ*। এখানে বলছেন *কর্মচোদনা*, এটাকেই বলা হয় *কর্মারম্ভ*। আমরা অত কিছু বিচারে করে কাজে নামি না ঠিকই, কিন্তু প্রত্যেক কাজের পিছনে তিনটে জিনিস লেগে থাকে – জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা।

জ্ঞান – জগতের ব্যাপারে জ্ঞান, জ্ঞেয় – যেটাকে জানা হচ্ছে, আর পরিজ্ঞাতা – জ্ঞাতা, যিনি জানছেন, যিনি শরীর মনের সাথে জুড়ে আছেন। কাজ করার সময় আবার কারকের বিভক্তিগুলি লেগে যায়, যার মধ্যে কাজের একটা হেতু থাকে। তার সাথে লেগে আছে – কর্তা, কর্ম ও করণ। কর্তা মানে যে কাজ করছে, কর্ম মানে যার উপরে কাজ করা হয় আর করণ মানে যেটার সাহায্যে কাজ করা হয়। যখন কাজ করা হয়, যেটাকে আমরা বলছি ক্রিয়া; এই ক্রিয়া আবার দুই প্রকার হয় – গ্রহণ আর ত্যাগ। একটা জিনিসকে আমরা গ্রহণ করি আবার একটা জিনিসকে ত্যাগ করি। আর এর ফল সুখ আর দুঃখ।

একটা খুব সাধারণ কাজ, যেমন আমি খাচ্ছি, ঠাণ্ডার সময় চা খাচ্ছি, গরমের সময় কোল্ডড্রিঙ্কস খাচ্ছি। এই যে শুধু এক কাপ চা খাওয়া, আমরা কি কখন ভেবে দেখেছি, এক কাপ চা খাওয়ার পিছনে কত রকম শক্তি কাজ করছে? আপনি একজনের বাড়িতে গেলেন, আপনাকে বাড়ির ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'চা খাবেন তো?' আপনি বললেন, 'আমি চা খাই না।' 'চা খাবেন তো' আর 'আমি চা খাই না', এই দুটি কথার পিছনে কত শক্তি কাজ করছে একবার ভেবে দেখুন। বলছেন, পাঁচ খানা হেতু, তার সাথে তিনটে আশ্রয় – দেহ, মন ও বাক্। আর কাজকে যে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, যে আপনাকে বলালো, আমি চা খাই না, তখন জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা তিনটে জিনিস এসে যাচ্ছে। আর কাজের সময়, এই যে আপনি বললেন, তখন কর্তা, কর্ম ও করণ এই তিনটে জিনিস এসে যাচ্ছে। কিভাবে ক্রিয়া হচ্ছে? গ্রহণ ও ত্যাগ, হয় নিলেন, নয় নিলেন না। ফল সুখ-দুঃখ, যে চা খায়, তার চা খেলে ভাল লাগবে। কারুর বাড়িতে সাধারণ কাপে চা দেয়, আপনি বলবেন, আমাকে অসম্মান করা হল, একটা সাধারণ কাপে চা দিয়েছে।

আঠারো নম্বর শ্লোক থেকে গীতা এই জিনিসগুলিকে নিয়ে বিস্তারে বলবেন। প্রথমে বলছেন, জ্ঞান জিনিসটা জ্ঞেয়কে ধরে নেয়, আচার্য বলছেন, জ্ঞান আর জ্ঞেয় এখানে একসাথে হয়ে যায়। পরিজ্ঞাতা হল কর্তা, যে কাজ করছে। কোনটা দিয়ে কাজ করা হয়? বুদ্ধি দিয়ে কাজ করা হয়, এটাকে বলছেন ধৃতি। ধৃতি এর আগে আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি, আবার যখন আসবে তখন আবার আলোচনা করা যাবে। এখানে ফল হল সুখ, কারণ আমরা ওই জিনিসটাকে নিয়েই আলোচনা করছি। আর কর্ম, অর্থাৎ যেটা দ্বিতীয়া এটা ক্রিয়ার মধ্যেই ধরা আছে। এই কয়েকটি জিনিসকে নিয়ে এখানে আলোচনা করবেন, তার মধ্যে মূল হল জ্ঞান, এই জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করবেন। *পরিজ্ঞাতা*, আপনি কেমন মানুষ, কর্তা নিয়ে যেখানে আলোচনা করা হবে সেখানে ঈশ্বরের ব্যাপারে, সত্যের ব্যাপারে আপনার জ্ঞান কি রকম বোঝা যাবে। দুটো জিনিসকে জানলেন। করণ, অর্থাৎ আপনার বুদ্ধি কি প্রকার, সেটা ধৃতি দিয়ে বোঝা যায়, তিনটে হয়ে গেল।

যে কোন কাজ করতে গেলে কয়েকটা জিনিস লাগে – *জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধাঃ কর্মচোদনা। করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ।।* *কর্মচোদনা* আর *কর্মসংগ্রহঃ* এই দুটো জিনিস, একটা কাজের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, আরেকটা কর্ম তৈরী করছে, যেটা আমাদের পাত্রে এসে জমছে, যেটা আমাদের পুনর্জন্মের দিকে নিয়ে যায় (*কর্মচোদনা*), কিংবা যেটা আমাদের শুদ্ধ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়, যেখান থেকে আমরা মুক্তি পাব (*কর্মসংগ্রহঃ*)। এই দুটি জিনিস, একটা যেটা কর্মকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, দ্বিতীয় যে কর্মকে জমা করছে। একটা হল গরুকে ঠেলে ঠেলে ঘাস খাওয়াবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। গরু ঘাস খেল, সন্ধ্যেবেলা এসে গরুর দুধ দুয়ে নিল। আমরা যত কাজ করি তাতে এই দুটো জিনিসই হয়, ঠেলে ঠেলে ঘাস খাওয়াচ্ছে, পরে দুধ দুইয়ে নেওয়া হচ্ছে। কর্মকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, কর্ম সেখান থেকে ফল দিচ্ছে, যেটা কর্মসংগ্রহ হয়ে যায়।

এবার আমরা আলোচনা শুরু করছি, আমি কি রকম, আপনি কি রকম, আমার জ্ঞান কি রকম, ফলে আমার কর্ম কি রকম। জীবনে কখন হা-হুতাশ করেছেন? হা-হুতাশ কেন আমরা করি? কর্মের জন্যই করি। কোন বাজে কর্ম করেছি কিংবা কোন বাজে ফল এসেছে। বাজে কর্ম বা বাজে

ফল যদি হয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে আপনার জ্ঞানে গোলমাল ছিল। আমরা কর্মফল নিয়ে কান্নাকাটি করি, আমাদের জীবন থেকে শুভ কিছু চলে গেলে কেঁদে আকুল হয়ে যাই, আমাদের জীবনে অশুভ কিছু এসে গেলে কেঁদে আকুল হয়ে যাই, জীবনে এমন কিছু অশুভ ঘটনা ঘটে গেলে, ওগো আমার এ কি হল, বলে আছড়ে পিছড়ে কান্না শুরু করে দিই।

কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, ফলটা হল বিষবৃক্ষের ফল। বৃক্ষের রোপণ তো আগেই করা হয়েছে, কর্মটা তো আগেই করে রেখেছি। বিষবৃক্ষ কোথা থেকে এসেছে? কোথা থেকে আর আসবে, বিষবৃক্ষের বিষ বীজটা আপনিই বপন করেছিলেন। বিষবৃক্ষের বীজ কি? জ্ঞান। জ্ঞান, কর্ম আর ফল। যাদের জীবনে দুঃখ আছে, কম বয়স হোক, বেশি বয়স হোক, সবাই একটু বিচার করে দেখবেন, কেন জীবনে এত দুঃখ, কেন এত কষ্ট? কারণ বাজে কাজ করেছেন। আপনি বলবেন, এখন আমি ভাল কাজ করব। ভাল কাজ আপনার দ্বারা হবে না, আপনার জ্ঞানটাই গোলমেলে হয়ে আছে। ভগবান এখন তাই বলছেন।

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি।।১৯।।

(কপিলের সাংখ্য-শাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম (ক্রিয়া) ও কর্তা – সত্ত্ব, রজো ও তমো এই ত্রিগুণভেদে তিন প্রকারই কথিত হয়েছে। সেই সকল ও ত্রিগুণকৃত তাদের ভেদসমূহ যথাযথরূপে শ্রবণ কর।)

জ্ঞান, কর্ম, কর্তা প্রত্যেকটি জিনিস সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার হয়। সতের নম্বর অধ্যায়ে আমরা যেটা শুরু করেছিলাম, এখানে ওই আলোচনাটাই চলছে। দেখাচ্ছেন, সত্ত্ব, রজো ও তমো কিভাবে আমাদের জীবনের সব কিছুতে জড়িয়ে আছে। *প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে*, সাংখ্য দর্শন এই জিনিসগুলিকে যেভাবে বলেছেন, হে অর্জুন, তোমাকে আমি সেভাবেই বলছি, মন দিয়ে শ্রবণ কর।

এখানে আচার্য নিজের তরফে কয়েকটা কথা বলছেন। সাংখ্য-দর্শনের প্রণেতা কপিল মুনি আত্মাকে কখন ব্রহ্ম রূপে মানতেন না। আচার্য বলছেন, *তদ্ অপি গুণসংখ্যানং শাস্ত্রং গুণভোক্তৃবিষয়ে প্রমাণম্*, ওনাদের তত্ত্বটা ঠিক না, কিন্তু সব জিনিসগুলিকে নিরুপণ যেটা করেন সেটা খুব সুন্দর করেন। বলতে চাইছেন, গুণের যে ভোক্তা, মানে জীব, আমি আপনি, আমরা যেভাবে ভোগ করে বেড়াই, এই ব্যাপারে এনারা খুব সুন্দর বিশ্লেষণ করেন। আচার্য শঙ্কর হলেন সমণ্বয়াচার্য, যেটা রামানুজ বা মাধ্বাচার্য ছিলেন না। সমণ্বয়াচার্য মানে, তৎকালীন ভারতবর্ষে ধর্ম ও অধ্যাত্ম ব্যাপারে যাবতীয় যত মতবাদ ছিল, সব কিছুকে তিনি সুন্দর ভাবে একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসেছেন। সাংখ্য, ন্যায়, যোগ সব কটাকে তিনি নিয়ে আসছেন, আবার ওদের অনেক কিছুকে বাদ দিয়ে দিচ্ছেন। এখানে তার উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে, যেমন সাংখ্য দর্শন বলে, বহু আত্মা, আচার্য বহুটাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু সাংখ্যবাদীরা যে দেখাচ্ছেন, কিভাবে জীব ভোগ করে, সেটাকে আচার্য শঙ্কর নিচ্ছেন। এটাই আচার্যের বৈশিষ্ট্য, তিনি দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত সবাইকেই নিচ্ছেন, আচার্য এটাই দেখিয়ে গেছেন যে, অদ্বৈত সবাইকেই নেয়।

জ্ঞান, কর্ম, কর্তা আর তাদের যে ভেদ –সাত্ত্বিক, রাজসিক আর তামসিক, এই যে তিন প্রকার ভেদ হয়; ভগবান বলছেন, এটাকেই আমি তোমাকে এবার বিস্তারে বলছি। গীতাতে পর পর এখন যেটা বলা হবে, সেটাকেই আমরা প্রথমে খুব সংক্ষেপে আগে বলে দিলাম এনারা কি বলতে যাচ্ছেন। প্রথম কথা আমরা যখন কোন কাজ করি, সেই কাজের কিছু ফল হয়। দ্বিতীয়, কাজ যেটা করছি সেই কাজ সম্পর্কিত আমাদের কিছু জ্ঞান থাকে, আমরা যেরূপ বুঝি সেই অনুরূপ আমরা কাজ করি। সবার আগে শুরু করছেন জ্ঞানকে নিয়ে। বলছেন, আমার আপনার সবারই ভিতর তিন প্রকার জ্ঞান থাকে। আমরা যা কিছু করছি, তিনটের মধ্যে কোন একটার জ্ঞান আমাদের ভিতর আছে বলেই

কাজ করছি। জীবনে আমাদের যত দুঃখ-কষ্ট, যাবতীয় ভাল-মন্দ যা কিছু আছে, সবারই জীবনে এগুলো আলাদা আলাদা রকমের আসে, কারণ আমাদের জ্ঞান আলাদা আলাদা রকমের বলে। কথামৃতে ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, মানুষ বাইরে থেকে দেখতে এক রকম, কিন্তু ভিতরের পুর আলাদা আলাদা, পিঠের কোনটায় ক্ষীরের পুর থাকে, কোনটাতে কলাইয়ের পুর থাকে। এখানে পুর হল জ্ঞান। জ্ঞান মানে, ঈশ্বর তত্ত্বকে আপনি কিভাবে দেখছেন, জগৎ তত্ত্বকে আপনি কিভাবে দেখেন, আপনি যেভাবে দেখবেন আপনার আচরণও সেই অনুসারেই করবেন।

উদাহরণ হল, আমি যদি মনে করি আপনি আমার শত্রু, আপনার প্রতি আমার আচরণটাও সেই অনুসারে হবে; আমি যদি জানি আপনি আমার বন্ধু তখন আমার আচরণ অন্য রকম হবে। মা তাঁর সব সন্তানকেই ভালবাসেন, কাউকে হয়ত তিনি একটু বেশি ভালবাসেন, সেটা হতেই পারে, কারণ মানুষের মন কি করবে বোঝা যায় না। মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানে এটা প্রমাণিত যে, যে সন্তান অন্যদের তুলনায় দুর্বল, বা যে সন্তানের রোগ-শোক বেশি হয়, মা তাকে বেশি ভালবাসে। যীশুও বাইবেলে prodigal sonএর কথা বলছেন, একজন লোক তার নিজের ভাগের সমস্ত সম্পত্তি বাবার কাছ থেকে জোর করে আদায় করে ব্যবসা করতে চলে গেল। ব্যবসায় সব টাকা ডুবিয়ে দিয়ে আবার সে নিজের পরিবারে ফিরে এলো। বাবা তাকে ভালবেসেই গ্রহণ করলেন, বাড়ির ছেলে ফেরৎ এসেছে। মা সেই সন্তানকেই বেশি ভালবাসে, যে সন্তান রোগাক্রান্ত, অভাবী, দুর্বল। আবার মায়ের প্রয়োজনে সব সময় যে সন্তানকে বেশি কাছে পাওয়া যায়, সেই সন্তানকে মা আর-এক ভাবে দেখেন। ঠাকুর বলছেন, শুধু নিজের সন্তানকে ভালবাসার নাম মায়া, আর সবার সন্তানকে ভালবাসার নাম দয়া। দেখতে হবে আপনার দৃষ্টিভঙ্গী কি রকম। দৃষ্টি কিভাবে ঠিক হয়? আপনার জ্ঞান কি রকম। গীতা আমাদের একবার করে আয়না দেখাচ্ছেন, আয়নায় দেখ তুমি এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছ, তারপরেই দেখাবেন পথ।

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্।।২০।।

(যে জ্ঞান দ্বারা অব্যক্ত থেকে স্থাবর পর্যন্ত বহুধা বিভক্ত সর্বভূতে এই অবিভক্ত অক্ষর আত্মবস্তু দৃষ্ট হন, সেই অদ্বৈত আত্মদর্শনরূপ সম্যক্ জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে।)

যাঁরা অবতার পুরুষ, জীবনমুক্ত, সত্যিকারের জ্ঞানী, এনাদের কথা এখানে বলা হচ্ছে না, এখানে আমার আপনার মত লোকেদের কথাই বলছেন। এখানে জ্ঞান আর জ্ঞেয় দুটো সমান। তার মানে, ঈশ্বরকে আপনি কিভাবে দেখছেন, ঈশ্বরের সৃষ্টিকে কিভাবে দেখছেন, এই দেখাটাই হল আপনার জ্ঞান। জগৎটাও জ্ঞেয়, ঈশ্বরও জ্ঞেয়।

সাত্ত্বিক জ্ঞান কি রকম? আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *অব্যক্তাদিস্থাবরান্তেষু ভূতেষু যেন জ্ঞানেন একং ভাবং বস্তু*, খড়কুটো থেকে শুরু করে অব্যক্ত পর্যন্ত, অব্যক্ত মানে প্রকৃতি, সব কিছুতে এক বস্তু রয়েছেন, সেই এক বস্তু হল আত্মা। কাজ করার সময় বা অন্যান্য সময় এই বোধ যার সব সময় থাকে, আর এই বোধ যেটা ধর্ম থেকে কক্ষণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ এই জ্ঞান থেকে কখন চ্যুত হয় না; তার সাথে এই আত্মতত্ত্ব, খড়কুটো হোক, দেবতাই হোক, প্রকৃতিই হোক, যেটাই হোক, আত্মাই একমাত্র আছেন, যত প্রাণি আছে সবারই ভিতরে সেই আত্মতত্ত্ব। *অবিভক্তম্*, সেই এক আত্মতত্ত্ব সব কিছুর মধ্যে বিদ্যমান, *অবিভক্তম্*, উপরে শুধু একটার পর একটা উপাধি লাগানো আছে, ফলে আলাদা আলাদা মনে হচ্ছে। এই জ্ঞানকেই বলছেন সাত্ত্বিক জ্ঞান।

ফ্রীজে বরফ জমানোর ট্রে থাকে, যার মধ্যে খোপ খোপ করা থাকে। বরফ জমানোর জন্য ট্রেতে জল ভরে ডীপ ফ্রীজে রেখে দেওয়া হয়। সাধারণ ভাবে ট্রের খোপগুলো একই মাপের থাকে। কিন্তু যদি নানা রকমের ডিজাইনের খোপ থাকে, তাহলে বরফ জমে যাওয়ার পর বরফের

আকারগুলো আলাদা আলাদা ডিজাইনের হবে। জল যেটা জমানো হবে সেটাও আলাদা আলাদা ডিজাইনের হবে। যিনি জল তত্ত্ব বরফ তত্ত্ব জানেন, যিনি জ্ঞানী তিনি জানেন জল একই, কিন্তু খোপ খোপ করা যেটা আছে সেগুলো সব আলাদা, ফলে আলাদা আলাদা দেখাচ্ছে, আসলে সেই এক জলই আছে। তেমনি উপাধিগুলি সরিয়ে দিলে সেই এক অদ্বিতীয়ম্ আত্মাই আছেন।

দক্ষিণেশ্বরে তোতাপুরী যখন ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন, সেই সময়কার একটা কাহিনী আছে। তোতাপুরী একদিন ধ্যান করছেন, একটা ব্রহ্মদৈত্য এসে তোতাপুরীকে ভয় দেখাতে শুরু করল। তোতাপুরী তাকে বলছেন, শোন্, তুইও ব্রহ্ম আমিও ব্রহ্ম, এখানে চুপ্ করে বোস্, ধ্যান কর। ব্রহ্মদৈত্য যে ভয় দেখাতে এসেছিল, সে নিজেই এখন প্রাণ ছেড়ে পালালো। ভারতবর্ষে এই যে এত কিছু করা হয়, বাবা-মাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করা হয়, ইদানিং কালে নাকি সবাই বাবা-মাকে জড়িয়ে ধরে। প্রণাম করার পর বড় যিনি তিনি ইচ্ছে করলে জড়িয়ে ধরতে পারেন, ছোট কেন জড়াতে যাবে! এখানে শিক্ষকে প্রণাম করা হয়, আচার্যকে প্রণাম করা হয়, বড়দের প্রণাম করা হয়, বয়সে যাঁরা বড় তাঁদের প্রণাম করা হয়। কেন প্রণাম করা হয়? এর পিছনে এই জ্ঞানটাই রয়েছে – *অবিভক্তং বিভক্তেষু*। এই ভাব গীতাতে অনেকবার আসে। যারা ঝগড়া করে, কেন ঝগড়া করে? কারণ তার এই বোধ থাকছে না বলেই ঝগড়া করে। এই বোধ যদি কারুর থাকে, আমিও যা, উনিও তাই, শুধু উপাধির তফাৎ।

এই কাহিনীটা আগেও বলেছিলাম। অনেক আগেকার কথা। দেওঘর বিদ্যাপীঠের যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি খুব নামকরা মহারাজ ছিলেন। গরমের ছুটির পর স্কুল খোলার একদিন আগে উনি সব সাধু, ব্রহ্মচারী, শিক্ষকদের ডেকে বলতেন, আগামীকাল বাল নারায়ণরা আসছেন, দেখবে তাঁর সেবাতে যেন কোন ত্রুটি না হয়। *অবিভক্তং বিভক্তেষু*, উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সর্বত্র সেই এক আত্মতত্ত্ব আছে, আত্মতত্ত্বের কোন পরিবর্তন হয় না, আত্মতত্ত্ব যেমন আছে তেমনটাই থাকে। কিন্তু উপাধি চেপে যায়। উপাধি কোথা থাকে আসে? মন থেকে আসে। কেন আসে, কোথা থেকে আসে, এর উত্তর দেওয়া যায় না, এটাই মায়া। আমরা মায়ার মধ্যে আছি, এটাকে আমরা বোধ করছি, তাই ওটাকে নিয়ে আর প্রশ্ন করা যায় না। আমাকে যদি বলা হয়, আপনার হাত আছে প্রমাণিত করুন। আমি তো দেখতে পাচ্ছি যে আমার হাত আছে, তারপরেও আবার কিসের প্রমাণ করব। দক্ষিণেশ্বরে একজন ঠাকুরের সাথে তর্ক করছেন। ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বলছেন, আরে আমি দেখেছি এই রকম, এটাকে নিয়ে তোমার সাথে আমি কি তর্ক করব! আমি তো দেখতে পাচ্ছি আমার মন আছে, এটা নিয়ে তর্ক করার কি আছে! তাহলে শাস্ত্রে এত কথা বলা হচ্ছে কেন? এইজন্যই এত বার করে বলা হচ্ছে। কেউ এসে আমাকে বোঝানর চেষ্টা করে না যে, আমি আছি। যেটা আমরা বুঝি না, যেটা আমরা জানি না, সেটাই আমাদের বোঝানর চেষ্টা করা হয়। সেইজন্য আত্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্বকে বোঝানর জন্য এত শাস্ত্র এত ভাবে, এত আচার্য মিলে বোঝানর চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

মায়াকে বোঝানর কি আছে, আমরা সবাই মায়াতে আছি। মনের জগৎ মানেই মায়া। মায়ার জগতে থেকে মায়াকে বোঝান যায় না। আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *দেহভেদেষু ন বিভক্তং তদ্ আত্মবস্তু*, দেহ ভেদে আত্মবস্তু পাল্টায় না। আমাদের আগের উদাহরণটা মনে রাখতে হবে, জল, বরফের ট্রে, ফ্রিজে বরফ জমে যাওয়ার পর আলাদা আলাদা আকার, কিন্তু একই জিনিস; সেই জল আর সেই বরফ। এই ভাব যাঁর মধ্যে পাকা ভাবে এসে যায়, তখন আগে যেটা বলেছিলেন, *হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্*, এই ভাবটাও তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে এসে যাবে। কিন্তু সেটা তো পরে আসবে, কিন্তু তার আগে কি হবে? আপনি কারুকে ছোট করবেন না, কারুর সাথে ঝগড়া করবেন না, কাউকে কষ্ট দেবেন না।

আচার্য তখন বলছেন, *তদ্ জ্ঞানম্ অদ্বৈতাত্মদর্শনং সাত্ত্বিকং সম্যগ্‌দর্শনং, অদ্বৈত আত্মদর্শনম্*, অদ্বৈত জ্ঞান এটা বাস্তবিক হয়, সত্যিকারের দেখে। ঠাকুর যেমন দেখছেন, বলির কাঠ, ছাগল, যে

বলি দেবে, খড়্গ সব সেই একই আত্মা, সেই সচ্চিদানন্দ। এটা বাস্তবিক দর্শন হয়। তার মানে, যিনি এটা দেখছেন, তিনি দুটো জিনিসকেই দেখছেন, সচ্চিদানন্দকেও দেখছেন আর ছাগল আর বলি দুটোই দেখছেন। *অদ্বৈতদর্শন সম্যগ্‌দর্শন্‌*, একই রকম সব কটাকে দেখছেন। অত কথার কি আছে, মূল কথা হল, সবার সাথে একই রকম ব্যবহার করতে হয়, শত্রু পক্ষ, মিত্র পক্ষ, উদাসীন পক্ষ, সবার সাথে একই রকম ব্যবহার করতে হয়। কারণ, আপনি জানেন যে, ঈশ্বরই শত্রু রূপে এসেছেন, ঈশ্বরই বন্ধু রূপে এসেছেন। ঠাকুরের খুব সুন্দর গল্প আছে, বলছেন, একজনকে পুলিশে ধরেছে, লোকটি সাধুপুরুষ, বলছেন, ডাকাতে ধরেছিল, তারা লুটের সব মাল লোকটির মাথায় চাপিয়ে দিল। পরে পুলিশ তাকে বামাল সমেত ধরেছে। লোকটি মনে করছে সেই একই রাম আমার মাথায় লুটের মাল চাপিয়েছে, সেই একই রাম আমাকে মাল সমেত ধরেছে। ঠাকুরের আবার অন্য একটা গল্পে আছে, এক ব্রহ্মচারীকে কোন জমিদার কোন কারণে প্রহার করেছে। ব্রহ্মচারীটি অজ্ঞান হয়ে গেছে। আশ্রমে খবর গেছে। সাধুরা এসে তাঁকে দুধ খাইয়ে জ্ঞান ফেরাচ্ছে। জ্ঞান ফেরার পর সে দেখছেন, যে রামই আমাকে প্রহার করেছিল, সেই রামই আমাকে দুধ খাওয়াচ্ছে।

এগুলো কথা কাহিনী, কিন্তু সেই অদ্বৈত তত্ত্বকে আমাদের মনে করিয়ে দেয়। দ্বৈত দর্শনে, যেখানে দুই দেখে, সব কিছুকে আলাদা দেখে, আচার্য এদের বলছেন, *যানি দ্বৈতদর্শনানি অসম্যগ্‌ভূতানি রাজসানি তামসানি চ ইতি ন সঞ্জাৎ সংসারোচ্ছিত্তয়ে ভবন্তি*, আপনি কি সংসার উচ্ছেদ করতে চাইছেন, আপনি কি মুক্তি চাইছেন? ইদানিং ইউটিউবের দৌলতে রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীদের লেকচার শুনে অনেকেই ইচ্ছা প্রকাশ করে, আগামী জন্মে আমি সন্ন্যাসী হব। আপনি সত্যিই আগামী জন্মে সন্ন্যাসী হতে চান? আচার্য বলছেন, যেখানে দ্বৈত ভাব, তা দ্বৈতবাদই হোক আর বিশিষ্টাদ্বৈতই হোক, সেখানে তারা সংসার উচ্ছেদন করতে পারেন না। কারণ তাঁদের কাছে জগৎ সত্য। জ্ঞান আপনার যে রকম, আপনার কর্মও তেমনই হবে।

আগেও আমরা বলেছি, রোজ নিয়মিত ভাবে কিছুক্ষণের জন্য চুপচাপ বসুন, চেয়ারে বসুন, পিঠে হেলান দিয়ে বসুন, যেভাবে বসলে কিছুক্ষণ আপনি শান্তিতে বসতে পারেন। মেরুদণ্ড যদি সোজা রাখতে পারেন ভাল, না রাখতে পারলেও কোন অসুবিধা নেই, চুপচাপ বসে চিন্তা করুন এই জগৎ আলোময় কুয়াশার মত আর তার উপর এই ঘর বাড়ি সব কিছু উপাধি। যার উপর আপনি রেগে ছিলেন সেও উপাধি, যাকে বেশি ভালবাসেন সেও সেই উপাধি। রোজ পাঁচ মিনিট সাত মিনিট ভাবুন, দেখবেন আপনি হতবম্ব হয়ে যাবেন।

পৃথকত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্।।২১।।

(কিন্তু যে জ্ঞান দ্বারা প্রতিদেহে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত সমস্ত প্রাণি-শরীরে পরস্পর বিলক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন আত্মার দর্শন হয়, তাকে রাজসিক জ্ঞান বলে জানবে।)

রাজসিক জ্ঞানের কথা বলছেন। রাজসিক জ্ঞানে দেখেন, যত জীব রয়েছে, প্রত্যেকটি জীবের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাব রয়েছে। তার মানে, তোমার ভিতরে আত্মা আছে কিন্তু সেটা আমার আত্মা না। যেমন খ্রীশ্চানরা, খ্রীশ্চানদের সৃষ্টি তত্ত্বে বলে, ভগবান সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করে ওর মধ্যে ফুঁ মেরে দিলেন, মানে স্পিরিট দিয়ে দিলেন। ফলে এক্স ওয়াই থেকে আলাদা, ওয়াই জেড্ থেকে আলাদা। সমস্ত দ্বৈতবাদী ধর্মে এই একই জিনিস হয়। গীতা বলছেন, এই ধরণের জ্ঞান নিকৃষ্ট জ্ঞান। কেন নিকৃষ্ট? কারণ এই জ্ঞান দিয়ে কেউ সংসার উচ্ছেদন করতে পারবে না। সংসার উচ্ছেদন একমাত্র তখনই হবে যখন অদ্বৈত জ্ঞান হবে। অদ্বৈত জ্ঞান না হয়ে থাকলে সংসার উচ্ছেদন হবে না।

একুশ নম্বর শ্লোকে রাজসিক জ্ঞান নিয়ে বলছেন, যে জ্ঞানে মনে করে, তুমিও আছ, আমিও আছি, কিন্তু তুমি আমার থেকে আলাদা। তোমাকে আমি মানছি, কিন্তু তুমি আর আমি আলাদা।

খ্রীশ্চানরা মনে করে, আমিও খ্রীশ্চান তুমিও খ্রীশ্চান, কিন্তু কখনই বলবে না যে, তুমি আর আমি এক। ইসলামেও ভ্রাতৃত্ব বোধের কথা বলবে, আমি তুমি এক বলবে, কোন প্রশ্নই নেই। একত্বের কথা বললে এদের ধর্ম অন্য রকম হয়ে যাবে। এই একত্বের কথা একমাত্র অদ্বৈত বেদান্তই বলে, আর কেউ বলবে না। অদ্বৈত জ্ঞান হল ধর্ম জগতের শ্রেষ্ঠতম উপলব্ধি, এই উপলব্ধিকে আমরা যেন হারিয়ে না ফেলি।

পৃথকত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্, যে জ্ঞান দিয়ে মানুষ পৃথক পৃথক দেখে, এই জ্ঞানই হল রাজসিক জ্ঞান। এর ফলে মানুষ ওই রকম ব্যবহারই করবে, কারণ তার জ্ঞান অন্য রকম হয়ে গেছে। দ্বৈতবাদীরা, বিশিষ্টদ্বৈতবাদীরা জিনিসটাকে এভাবেই দেখেন। বৈষ্ণবরা ঘোর দ্বৈতবাদী, গীতা মানেন, কিন্তু গীতাকে নিজের মত ব্যাখ্যা করেন। দুষ্ট লোকেদের আপনি যদি ভাল কিছু করেন, প্রথমে আপনার ভাল করাটা নিয়ে নেবে। কিন্তু পরে বলতে থাকবে, জানো কেন আমাকে সে সাহায্য করেছিল, এই কথা বলে, যেটা আপনি স্বপ্নেও ভাবেননি সেটা আপনার নামে চালিয়ে দেবে। হয়ত বলবে, আসলে এই সাহায্য করার পিছনে ওর একটা স্বার্থ ছিল, দুষ্ট লোকের এটাই স্বভাব। ঠিক তেমনি, দ্বৈতবাদী কোন পণ্ডিত মানুষ, যেখানে অদ্বৈত ভাব পরিষ্কার লেখা আছে, সেটাকে নিজের মত ব্যাখ্যা করে দেবেন।

রাজসিক জ্ঞানের কথা বলার পর তামসিক জ্ঞান কি রকম, সেটাকে নিয়ে বলছেন। আমরা বেশির ভাগই মুখে বলি আমরা প্রথমটা, অদ্বৈতবাদী। কিন্তু ধর্মের ব্যাপার যখন আসে তখন আমরা সবাই দ্বিতীয়টা, তুমি আমি আলাদা। কিন্তু ঠিক ঠিক যখন কাজের ব্যাপারটা আসে তখন আমরা সবাই তৃতীয়টা, অর্থাৎ তামসিক জ্ঞান নিয়ে চলি।

যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্।।২২।।

(যে জ্ঞান দ্বারা কোন একটি দেহে বা প্রতিমাতে সম্পূর্ণ আত্মা বা ঈশ্বর আছেন –এরূপ অভিনিবেশ হয়, সেই অযৌক্তিক, অযথার্থ এবং তুচ্ছ জ্ঞানকে তামসিক জ্ঞান বলে।)

যে জ্ঞান একটা জিনিসের ভিতরে সীমিত করে দেয়, এতটুকুই আছে, এর বাইরে কিছু নেই, এটাই হল তামসিক জ্ঞান। আচার্য এর খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করছেন, *যৎ তু জ্ঞানং কৃৎস্নবৎ*, হয় শরীরের মধ্যে, নয় শরীরের বাইরে বা কোন প্রতিমাতে যখন লোকে মনে করে, আত্মা মানে এতটুকু, ঈশ্বর মানে এতটুকু, এই জ্ঞানটাই তামসিক জ্ঞান। এখানে জৈনদের উদাহরণ নিয়ে আসছেন, জৈনরা বলে, আত্মা শরীরের মধ্যে রয়েছেন, যে প্রাণীর শরীর যেমন, তার আত্মাও তেমন, এখানেই ওদের সব কিছুর বিচার শেষ হয়ে যায়। জৈনদের সিদ্ধান্ত খুবই সীমিত সিদ্ধান্ত। তার মানে হাতির আত্মা হাতির মত বড়, পিঁপড়ের আত্মা পিঁপড়ের মত ক্ষুদ্র। সূক্ষ্ম শরীরটাকেই আত্মা মনে করে তারা সব কিছু গুলিয়ে ফেলে। তার সাথে আচার্য বলছেন, *জীব ঈশ্বরো বা পাষাণদার্বদিমাত্র*, এই যে পাথর, কাঠের প্রতিমা দেখছ, ঈশ্বর এতটুকুর মধ্যেই আছেন, এর বাইরে ঈশ্বর নেই।

যাঁরা বলেন কৃষ্ণই একমাত্র ঈশ্বর, বা অন্যান্য ধর্মে যেমন বলেন আমার ঈশ্বরই একমাত্র ঈশ্বর, বাকিদের ঈশ্বর ঈশ্বর না। আসলে কোথাও এনারা ঘোর তামসিক হয়ে গেছেন। যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে তিনি বলছেন, কেউ যখন কাউকে ভালবাসে, আসলে তখন সে আত্মাকেই ভালবাসছে, নিজেকে ভালবাসছে। এখানে নিজেকে বলা মানে আত্মা। এখন এই আত্মা কোথায়? মানুষ যখন এই আত্মাকে নিজের সন্তানের মধ্যে দেখে, এটাই আমি, এ আমার সন্তান, ও ছাড়া আমার আর কিছু নেই। আমরা দেখি, সন্তান বিয়োগ হলে মা পাগল হয়ে যায়, স্বামীর বিয়োগে স্ত্রী পাগল হয়ে যায়, টাকা চলে গেলে মানুষ পাগল হয়ে যায়। কেন পাগল হয়ে যায়? কারণ তার যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিকে

সীমিত করে রেখেছে, আমি এতটুকু। আমার জীবন এখানেই শুরু, এখানেই আমার জীবন শেষ। ঈশ্বরের ব্যাপারেও এদের ধারণা ঠিক তাই হয়।

আমার গ্রামের যিনি দেবতা, আমার যিনি কুল দেবতা, আমি যাঁকে ঈশ্বর মনে করি তিনি এতটুকু। কিন্তু তার থেকে আরও মারাত্মক, যে কোন কাঠ বা পাথরের প্রতিমার মধ্যে ঈশ্বরকে সীমিত করে দেয়, বিশেষ করে কিছু কিছু আদিবাসীদের যে মনোভাব, যারা অতটুকুকেই ঈশ্বর বলে মনে করে। ভারতে বিবেকানন্দ বইতে স্বামীজীর যে লেকচার আছে, তাতেও স্বামীজী বলছেন, ঈজিপ্সিয়ান, রোম থেকে প্রথম যে ধর্ম ভাব আসে, সেখানে এনাদের যে ঈশ্বরের অবধারণা এক ট্রাইবাল গডের মত। এটাই ঈশ্বর, তুমি মানছ না, ঠিক আছে তলোয়ার বার কর, মারামারি করে ফয়সালা করে নিই। ঈশ্বর মানে এতটুকু, আমাদের ধর্মের ঈশ্বর এই এতটুকুর মধ্যে। অন্যান্য ধর্মকে নিয়ে আমাদের আলোচনা না করাই ভাল।

বলছেন, যে জ্ঞান হেতু বর্জিতম্, যুক্তিযুক্ত নয়, যেটাতে তত্ত্ব নেই, তত্ত্ব মানে যথার্থ জ্ঞান, ঠিক ঠিক জ্ঞান; যথার্থ জ্ঞান যেখানে নেই, সেটাই তামসিক জ্ঞান। ফলে ওই জ্ঞানটা সীমিত, অল্প; এই যে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর রয়েছেন, সেটাকে এই জ্ঞান একেবারে সীমিত করে দিচ্ছে। আমার ঈশ্বর এতটুকু। তাহলে বাকিরা কারা? সোস্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন ধর্মকে নিয়ে এখন অনেক আলোচনা চলছে। ওদের কি ভাব? আমার ঈশ্বর সত্য, তোমার ঈশ্বর সত্য না। শুধু তাই না, তোমার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। কেন এইসব কথা বলে? কারণ বুদ্ধিটা তাদের সীমিত, যে বুদ্ধিতে বলে, এতটুকু ঈশ্বর, এর বেশি না।

কুড়ি, একুশ ও বাইশ নম্বর শ্লোককে অন্য দিক দিয়ে দেখলে, কুড়ি নম্বরটা অদ্বৈত, একুশ নম্বর বিশিষ্টাদ্বৈত আর বাইশ নম্বরটা দ্বৈত। আসলে বাইশ নম্বর দ্বৈত ঠিক না, দ্বৈতর থেকেও মানসিকতায় নীচে; যেখানে বলছে, এখানে এসেই ঈশ্বর শেষ। এখানে জ্ঞেয়র সাথে জ্ঞান জড়িয়ে আছে। জ্ঞেয় হচ্ছেন, যাঁকে জানা দরকার, তার মানে ঈশ্বর তত্ত্ব। শুধু বিষয়ী হলে হবে না, তার থেকে আরেকটু বেশি যেতে হবে। এখানে দেখতে হবে, ঈশ্বরকে আপনি কিভাবে দেখছেন, আত্মতত্ত্বকে, চৈতন্যকে কিভাবে দেখছেন। যেখানে দেখছেন, ঈশ্বর এই এতটুকুই আছেন, এর বাইরে আর নেই, এরা হল নিকৃষ্টতম, পুরোপুরি তামসিক। সবচেয়ে বেশি হিংসা এরাই করে। রাজসিকরা দেখে, আমার মধ্যেও আত্মা আছেন, তোমার মধ্যেও সেই আত্মাই আছেন, ঈশ্বরই আছেন। এরা বলে, ওকে খেতে দিচ্ছেন দিন, আমাকেও দিতে হবে, নাহলে আমি ছাড়ব না। কিন্তু অদ্বৈত জানে সেই একই বস্তু সব জায়গায়, তোমার খাওয়াতে আমার খাওয়া, তোমার উন্নতিতে আমার উন্নতি। তাঁর মনে কোন ঈর্ষা ভাব থাকবে না, কাউকে তিনি ঘৃণা করবেন না। কারণ তিনি জানেন, সেই এক আত্মতত্ত্ব সব কিছুতে রয়েছে।

এখন আপনি নিজেকে ভেবে দেখুন, আপনি ঈশ্বরকে কিভাবে দেখছেন; আপনি ভেবে দেখুন, জগৎকে আপনি কিভাবে দেখছেন আর আপনি ভেবে দেখুন, মানুষকে কিভাবে দেখেন, পশুপাখিকে কিভাবে দেখেন। আপনার ভিতর কি এই ভাব আছে –*সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে,* অব্যয় ভাব? আর এই ভাবে কি আছে? *অবিভক্তং বিভক্তেষু* অব্যক্ত থেকে স্থাবর পর্যন্ত যেখানে সব কিছুকে বিভক্ত দেখাচ্ছে, কিন্তু এক অব্যয় আত্মতত্ত্ব দ্বারা অবিভক্ত হয়ে আছে? এত জীব, এত প্রাণি, মানছি সবাই আছে, কিন্তু সেই এক যিনি, তিনিই বহুরূপে সব কিছু হয়ে আছেন – এটা হল সাত্ত্বিক জ্ঞান। দ্বিতীয় রাজসিক জ্ঞান হল, এটা আলাদা, ওটা আলাদা। তৃতীয় তামসিক জ্ঞান – এতটুকুতেই আছে, এর বাইরে আর কিছু নেই।

এই জ্ঞান সাপেক্ষেই কর্ম হবে, যার যে রকম জ্ঞান, তার কর্মটাও সেই রকম হবে। কারণ জ্ঞান হল *কর্মচোদনা*, কর্মকে জ্ঞান ঠেলে নিয়ে যায়, ফলে কর্মগুলিও সেই জ্ঞান অনুসারে বিভিন্ন

রকম হবে, তিন জনের জন্য তিন প্রকার কর্ম হয়ে যাবে। তার সাথে কর্তা যিনি কর্ম করছেন, তিনিও তিন প্রকার। আর বুদ্ধি, বুদ্ধিটাও তিন প্রকার। কর্তা, কর্ম ও বুদ্ধি, এই তিনটেই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন তিন প্রকার।

কি গুণে মানুষ একজন ভাল মানুষ হয়? এই কটি শ্লোকে আমরা বুঝতে পারব। আমাদের কাছে অনেকেই অনেক রকম প্রশ্ন নিয়ে আসেন, তার মধ্যে একটা হল, বাড়িতে নানা রকমের ঝামেলা, অসুখ-বিসুখ লেগে আছে, এগুলো থেকে বেরোবার জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করা যায় কিনা, ভক্তি নিয়ে প্রার্থনা করলে এগুলো কি সকাম ভক্তি হয়ে যাবে, নাকি সকাম প্রার্থনা হয়ে যাবে? যেদিন থেকে কথামৃত এসেছে, সেদিন থেকে অনেক ভুলভাল ধারণা আমাদের মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে। আসলে পাত্রতা না থাকলে যা হয়, জিনিসগুলিকে আমরা ভুলভাল বুঝে নিই। স্বামী প্রভানন্দজী, বর্তমানে উনি মঠের সহাধ্যক্ষ, মঠের সাধারণ সম্পাদক থাকার সময় উনি আমাকে মজা করে বলতেন, 'বুঝলে ভায়া, কথামৃত আসার পর থেকে ঈশ্বরকোটি না হওয়া পর্যন্ত কারুর শান্তি নেই। সবাই নিজেকে মাপছে আর মেপে মেপে দেখছে, আমি ঈশ্বরকোটি কিনা বা যাঁদেরকে জানেন তাঁরা ঈশ্বরকোটি কিনা। আবার বিচার করবে, আমি শিবের অংশ থেকে এসেছি, উনি বিষ্ণুর অংশ থেকে এসেছেন।

কোন সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় মানে এই নয় যে, সব সিদ্ধান্ত আমার উপরেই লাগাতে হবে, কারণ আমরা অতি সাধারণ মানুষ। শাস্ত্রে সব ধরণের মানুষের জন্য কথা বলা আছে। হিন্দু ধর্মে বার বার চারটে পুরুষার্থের কথা বলা হয় – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। যদি আপনি মোক্ষের জন্য প্রস্তুত হতেন, তাহলে ঠাকুর আপনাকে সেই রকমই বানাতেন, সেই রকমই পরিস্থিতিই আপনাকে দিতেন। সবার মন তৈরী থাকে না। যার জন্য আমরা কতজনকে দেখেছি সন্ন্যাসী হয়ে মঠে জয়েন করেছেন, কিন্তু কিছু দিন থাকার পর মন এলেমেলো হয়ে মঠ ছেড়ে চলে গেছেন। ব্রহ্মচারী অবস্থায় আমি একজনকে দেখেছিলাম, উনি এসে কিছু দিন থাকার পর বলছেন, নাঃ পারলাম না, আমার দ্বারা সন্ন্যাস জীবন হবে না।

আপনারা সংসারে আছেন, সংসারে থাকা মানে, আপনারা কেল্লা থেকে যুদ্ধ করছেন। কেল্লা থেকে যুদ্ধ করতে গেলে সেখানেও অনেক কিছু দরকার, রেশন দরকার, অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ দরকার, সৈন্য দরকার। সন্ন্যাসী কেল্লা থেকে বেরিয়ে এসেছেন, এবার আঘাত যত আসবে সরাসরি তাঁর উপর পড়বে। আবার কেল্লাতে থাকলে সেখানে অনেক দায়ীত্ব পালন করতে হয়। কথামৃতেও ঠাকুর অনেকবার সংসারীদের দায়ীত্বের কথা বলছেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরের সামনে হাজরা মশায় পড়ে থাকতেন। তাঁর মা দেশ থেকে একে ওকে দিয়ে খবর পাঠাচ্ছেন, চিঠি লিখেছেন, বাড়ির লোকেদের দেখাশোনা না করে হাজরা দক্ষিণেশ্বরে দিনের পর দিন পড়ে আছেন। ঠাকুর হাজরার এই ধরণের আচরণে অত্যন্ত রেগে যেতেন।

আপনার জীবনের সাথে যাঁরা জড়িয়ে আছেন, তাঁদের খাওয়া-পরার দায়ীত্ব কে নেবেন? বাইরের কেউ এসে দায়ীত্ব নেবে না; আপনাকেই নিতে হবে। আর তাঁদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার দায়ীত্বটা কে নেবেন? আপনাকেই নিতে হবে। সেখানে কিসের সকাম আর নিষ্কাম? সব বড় বড় কথা। খুব ভাল করে সকাম ভক্তি, সকাম প্রার্থনা করুন। যেদিন সব পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, আপনাকে ঠাকুর তখন ওখান থেকে বার করে নেবেন। আজকে যে আপনাকে এই অবস্থার মধ্যে থাকতে হচ্ছে, তার কারণ আপনার আগের আগের কর্ম খুব খারাপ ছিল। আর এই অবস্থাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য, দায়ীত্ব পালন থেকে অব্যহতি পাওয়ার জন্য, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব, সন্ন্যাসী হলে ভাল হত, আমি সন্ন্যাসীই হব, এই সব যদি ভাবতে থাকেন বা বলতে থাকন, তার মানে আপনার কর্ম আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। এরপর ঠাকুর কোথায় যে আপনাকে পাঠাবেন ভগবান জানেন।

কথামৃতেই ঠাকুর কি সুন্দর বলছেন, হাসপাতালে নাম লেখালে রোগের কসুর না হওয়া পর্যন্ত তিনি ছাড়বে না। সংসার হাসপাতালে আপনি এখানে ভর্তি হয়ে আছেন, এসব বোকা বোকা চিন্তা-ভাবনা মাথার মধ্যে আসতে দেবেন না। পড়াশোনা করব কিনা, পড়াশোনা করে কি হবে, কাজ করে কি হবে? কি হবে মানে! পড়াশোনা করলে বুঝতে পারবে তুমি কতটা অপদার্থ, কাজে নামলে বুঝতে পারবে তুমি কতটা অপদার্থ। ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার।

১৯৯৯-২০০০ সালে আমি নরেন্দ্রপুরে ছিলাম। লোকশিক্ষা পরিষদ ওখানে গ্রামেগঞ্জে প্রচুর কাজ করে। ওই সময় লোকশিক্ষা পরিষদ ছয় থেকে আট হাজার গ্রামে কাজ করছিল। একবার ঠিক হল ১২ই জানুয়ারী আমাদের এক ব্রহ্মচারী যাবেন, গ্রামের যুবকদের উদ্বুদ্ধ করবেন। ব্রহ্মচারী মহারাজ দেখা করতে এলেন, বললেন, 'আমি ওখানে যাচ্ছি, সেখানে এক বিরাট যুব উৎসব হবে'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ওখানে কিসের উপর লেকচার দেবেন'? বললেন, 'যুবকদের আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ'। খুব ভাল, 'আচ্ছা কোন শ্রোতা যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে, স্বামীজীর আদর্শ নিয়ে কেউ বড়লোক হয়েছেন? কজনের নাম বলবেন'? সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'কেন নেতাজীর নাম বলব'।

ওনাদের ওই একটাই নাম আছে, নেতাজী। আরে ভাই, তিনি একজন আদতে স্বাধীনতা সংগ্রামী, আর নেতাজী নিজের গুণে বড় হয়েছেন। আপনি একটা ফিল্মস্টার, একজন শিল্পপতির নাম বলুন, একজন পলিটিশিয়ানের নাম বলুন, একজন নামকরা গায়ক-গায়িকার নাম বলুন, এই রকম কেউ একজন কি আছেন, যিনি পরিষ্কার বলবেন, আমি স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ পালন করে বড় হয়েছি? আপনি কি উত্তর দেবেন? আপনি যুবকদের আদর্শ স্বামীজী তো বলছেন, কিন্তু ওই আদর্শ পালন করে কে বড় হয়েছেন বলুন? বর্তমানে একজন বড় নেতা নিজের মুখে স্বামীজীর নাম মুখে নিচ্ছেন, খুব ভাল লাগছে দেখে যে, ভারতের একজন বড় নেতা স্বামীজীর নাম নিচ্ছেন, তাঁর আগে পর্যন্ত যে কজন ভারতের বড় নেতা হয়েছে, তাঁদের একজনও স্বামীজীর নাম নিতেন না। তাহলে কি এটাই থাকবে যে, ঠাকুরের যাঁরা ভক্ত, স্বামীজীর যাঁরা ভক্ত, তাঁদের মধ্যে কেউ একজন বড়লোক হতে পারল না?

শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে গীতার উপদেশ শোনার পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন এমন মার মারলেন যে, আজকেও আমরা তাঁর কাহিনী পড়ছি। রামকৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠার একশ পঁচিশ বছর হয়ে গেল, এত দিনে কেউ একজন এমন হলেন না যে, যাঁর দিকে লোকেরা তাকিয়ে বলবে, হ্যাঁ ইনি একমাত্র স্বামীজীর আদর্শকে পালন করে আজ এই অবস্থায় পৌঁছেছেন। আচ্ছা না হয় আমরা মানলাম তখন শিক্ষার অত প্রসার ছিল না। কিন্তু এখন তো হয়েছে, ইউটিউবে এত লেকচার শোনার পরেও যদি আপনার রক্তটা টগবগ না করে ওঠে, কিছু একটা করে দেখাবার শক্তি যদি ভিতরে না জাগে, কিছু না, শুধু আপনি বলুন, I will be national Idol। চাকরি করছে, চাকরিতে একটা সমস্যা এসেছে, চাকরি ছেড়ে পালিয়ে যেতে চাইছে। বাড়িতে এক আধটা সমস্যা, বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে চাইছে। এটাই কি হিন্দু ধর্ম, এটাই কি গীতার আদর্শ, এটাই কি স্বামীজীর আদর্শ! আমরা আসলে কি ত্যাগ করতে চাইছি? নিজের সমস্যা। নিজের সমস্যা ত্যাগ করাটা ধর্ম না। ভগবান গীতাতেই আগে বলেছিলেন, জগতে কিছু নেই যেটা পাওয়ার ক্ষমতা আমার মধ্যে নেই, অথচ আমি কিছু চাই না। আপনারাও একটু করে দেখান। একটু পরেই একজন বলবেন, কি দারুণ কথা বললেন। এখান থেকে যাওয়ার পর আর-একজন মহারাজের লেকচার শুনে তাঁকেও একই কথা বলবেন, মহারাজ কি দারুণ বললেন। একবার একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সব লেকচার শুনে একবারও কি কিছু করার ইচ্ছে হয় না। সব শুনে বললেন, হ্যাঁ ইচ্ছে তো হয়, একটু পরে ইচ্ছেটা আবার চলেও যায়।

আগে জ্ঞান নিয়ে বললেন, ওটা না হয় আধ্যাত্মিক ছিল, কিন্তু এবার কর্ম, কর্তা ও বুদ্ধিকে নিয়ে বলতে যাচ্ছেন। যদি একটু মন দিয়ে শোনেন, শোনার পর একটা কিছু করুন, এবং করে কোথাও দাঁড়ান। আমাদের এখানে কম্প্যুটার সেকশানের একজন আছেন, আগে উনি TIFRএতে কর্মরত ছিলেন। ওখান থেকে আগেই অবসর নিয়ে এখন এখানে কাজ করছেন। ভদ্রলোক আমাদের লেকচারগুলো মাঝে মাঝে শোনেন, অত্যন্ত ভাল মানুষ। উনি একদিন বলছিলেন, 'মহারাজ আপনি যেভাবে ক্লাশগুলো নেন, সংসারে যাঁরা আছেন তাঁরা শুনে তো পুকুরে ঝাঁপ মারবেন'। আমি বললাম, 'একটা দুটো যদি ঝাঁপ মারত তাও ভাল হত'। একটা কিছু তো করুন, এখন যে দুরবস্থায় আছেন সেখান থেকে ওঠার একটু চেষ্টা তো করুন। আপনি মানুন, আপনি এখন পাঁকে পড়ে আছেন, কিন্তু আপনি হলেন পদ্ম ফুলের বীজ, পাঁকে পড়ে এবার জলের উপর উঠে আসুন, আর পদ্ম হয়ে নিজেকে মেলে ধরুন। সমাজকে দেখান, গীতা পড়ে, ঠাকুরকে পড়ে, স্বামীজীকে পড়ে এই দেখো আজকে আমি এইখানে পৌঁছেছি। লোকেরা এটা যেন না বলতে পারে যে, গীতা শুনে, কথামৃত শুনে লোকটি একটা অপদার্থ হয়েছে, একটা যে চাকরি ছিল সেটাও ছেড়ে দিয়েছে, কাজের লোক থেকে নেমে একটা অপদার্থ হয়েছে।

যাই হোক আমরা গীতার আলোচনায় ফিরে আসছি। এবার ভগবান কর্মকে নিয়ে বলছেন। কি বলছেন? কর্ম তিন প্রকার – সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। প্রথমে সাত্ত্বিক কর্ম বলছেন।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে।।২৩।।

(ফলের অভিলাষরহিত ব্যক্তি রাগ বা দ্বেষ বর্জনপূর্বক আসক্তিশূন্য হয়ে যাগ, দান ও হোমাদিরূপ যে নিত্যকর্ম করেন, তাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলে।)

সাত্ত্বিক কর্ম কি? *নিয়তং সঙ্গরহিতম্,* প্রতিনিয়ত কর্ম করে যাওয়া, এটা আমার দায়ীত্ব। লোকেরা আমাদের কাছে যখন কান্নাকাটি করে মেইল করে, মেসেজ করে, দেখা করতে আসে, তখন আমি ভাবি, হে ঠাকুর কিছুই কি এরা আমাদের লেকচারগুলো শুনছে না? কিচ্ছু শুনছে না। খালি বলবে, মহারাজ আশীর্বাদ করবেন, আগামী জন্মে যেন সন্ন্যাসী হতে পারি। ভাবি, আমরা তো অপদার্থরা আছি, ঠাকুর আরও অপদার্থদের নিয়ে কি করবেন! আমাদের বেলুড় মঠে এত এত বড় মহারাজরা আছেন, জেনারেল সেক্রেটারী মহারাজ আছেন, এ্যসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী মহারাজরা আছেন, যদি এনাদের মনে একবার আসত, আরে লোকটি কত ভাল, যদি সন্ন্যাসী হত কি দারুণ হত, আমাদের মঠের একটা এ্যসেট হত। আমি বাস্তবে জানি, স্বামী ভজনানন্দজী মহারাজ নূতন জয়েন করা এমন একজন সাধুকে দেখে বলছেন, 'অনেক দিন পরে দেখলাম একজন দমওয়ালা সাধু এসেছে'। একজন সন্ন্যাসী আপনাকে দেখে বলবেন, তোমার মত লোক যদি সন্ন্যাসী হত, তোমার মত লোক যদি আমার চেলা হত দেখিয়ে দিতাম আমি। বেশির ভাগই এসে বলবে, মহারাজ সংসারে কি জ্বালা, কত কষ্ট, আগামী জন্মে যেন সন্ন্যাসী হতে চাই। হে ঠাকুর, তুমি এদের রক্ষা কর। এসব উল্টোপাল্টা কথা না বলে শুধু কাজ করুন। কি রকম কাজ করবেন?

নিয়তং, নিত্যকর্ম করুন, পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা আমরা অনেকবার বলেছি। জপধ্যান করা, দেবতাদের পূজা করা, মন্দিরে যাওয়া, কুলদেবতার পূজা, তার সাথে রোজ পাখীদের খাওয়ানো, পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে অর্পণ করা আর তার সাথে মানুষের সেবা করা, এগুলোকেই বলছেন পঞ্চ মহাযজ্ঞ। পঞ্চ মহাযজ্ঞ রোজ করতে হয়। হিন্দু মানেই সে রোজ পঞ্চ মহাযজ্ঞ করবে। *একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি,* এটা হল হিন্দুদের সিদ্ধান্ত আর পঞ্চ মহাযজ্ঞ হল আমাদের নিত্যকর্ম। নিজের পেট চালানোর জন্য আপনাকে কাজ করতে হবে, আপনার উপর যারা নির্ভর করে আছে, তাদের পেট চালানোর জন্য আপনাকে পাঁচটা জিনিস করতে হবে। পূজা অর্চনা করার সময়, জপধ্যান করার সময়

জগতের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করুন, আপনার বাড়ির লোকেদের জন্য প্রার্থনা করুন, আপনার প্রিয়জনের জন্য প্রার্থনা করুন, খুব করে প্রার্থনা করুন, সকাম ভাবেই করুন। সকাম ভাবে প্রার্থনা করতে করতে ঠাকুর নিজেই আপনাকে একদিন নিষ্কাম প্রার্থনা শিখিয়ে দেবেন।

জীবনে আর যা কিছু হন, অপদার্থ কখন হবেন না। এমনিতেই ভারতবর্ষ অপদার্থে ভরে গেছে, অন্তত দু-চারটে তো কমুক। নিত্যকর্ম করুন, আর *সঙ্গরহিতম্‌,* কোন সঙ্গ থাকবে না। কেন প্রার্থনা করব? মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করব। সারা জগতের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করব। তাহলে আমার আপনজনের জন্য কেন করব না, আমার দায়ীত্ব এটা। একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে গেল। পরমপূজ্যপাদ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন, অধ্যক্ষ হওয়ার আগে তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তারও আগে তিনি দশ বছর মঠের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। জেনারেল সেক্রেটারী থাকার সময় মহারাজের নিজের বোন একদিন এসে বললেন – আমি বৃন্দাবন যাব। মহারাজকে একটা চিঠি লিখে দিতে বললেন। উনি সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখে দিলেন। কয়েক বছর পর উনি ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। ওনার সেই বোন বা দিদি আবার এসেছেন, বৃন্দাবন যাবেন একটা চিঠি লিখে দিতে বললেন। মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে না করে দিলেন। বোন বলছেন, 'কেন এর আগেরবার তো আপনি লিখে দিয়েছিলেন'। উনি বলছেন, 'ওটা জেনারেল সেক্রেটারীর কাজ, এখন যদি চিঠি লেখাত চাও, তোমাকে জেনারেল সেক্রেটারীর কাছে যেতে হবে'। কল্পনা করা যায় এই জিনিস! নিষ্কাম কর্ম কাকে বলে দেখিয়ে দিচ্ছেন।

Seven Years in Tibet, একটা নামকরা বই, বইটা নিয়ে সিনেমাও হয়েছে, কিন্তু সিনেমাতে সব কিছু অত বিস্তারে নেই যতটা বইতে আছে। সেখানে বর্ণনা আছে, দালাই লামা যখন দালাই লামা হয়ে গেলেন, তখন ওনার বয়স খুব কম। সবাই এসে দালাই লামাকে প্রণাম করছে, ওনার গর্ভধারিণী মা, তিনিও তাঁকে প্রণাম করতে এসেছেন। দালাই লামা সবাইকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করছেন, নিজের গর্ভধারিণী মার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। লেখক তাঁর বইতে খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন, নিজের মায়ের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করছেন, এমন না যে দু বার হাত রেখেছেন, এমন না যে এক সেকেণ্ড বেশি হাতটা রেখেছেন। যেন ঘাস কাটার মেশিন, মেশিনে ঘাস ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে সমান সাইজে কেটে যাচ্ছে। এটাকে বলে সঙ্গ রহিত, এটা আমার দায়ীত্ব এটাই আমি করব। বর্তমান প্রজন্মের ইয়ং ছেলেমেয়েরা তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাফাতে বলবে, কোন purpose না থাকলে কি করে কাজ করব? তখন এদের বলতে ইচ্ছে করে, ভাই তোমার যদি এত বোঝার বুদ্ধি থাকত, তাহলে তুমি তো অন্য রকম হতে।

একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকের হাত ধরে জাপানে যখন বৌদ্ধ ধর্ম প্রথম গেল, জাপানের রাজা বললেন, 'আমি তো জানি না বৌদ্ধ ধর্ম কি। আমার এই মন্ত্রী আছেন, ইনি ছয় মাস আপনার চেলা হয়ে থাকবেন। আপনি যেমনটি বলবেন উনি তেমনটি করবেন, তাতে যদি ওনার কিছু ভাল হয়, তাহলে আমরা সবাই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করব'। বৌদ্ধ ভিক্ষু যেমন যেমন বললেন, মন্ত্রী তেমন তেমনটি করতে থাকলেন। তারপর দেখা গেল মন্ত্রীর একটা জাগতিক উথান হল। তখন জাপানের সবাই বৌদ্ধ হয়ে গেল। কাহিনীটা সত্য না মিথ্যা আমার জানা নেই। কিন্তু একটা ট্রায়াল নিয়ে দেখতে তো আপনাদের কোন দোষ নেই। আপনারাও কিছু দিন নিষ্কাম কর্ম করে দেখুন না। আমার এটা দায়ীত্ব, তাই আমি করছি, এই ভাব নিয়ে ছয় মাস কাজ করে দেখুন ভাল ফল পান কিনা।

আমাদের অনেক মহারাজরা যাঁরা বেশি গুণী নন, তাঁরা অনেক সময় আমাদের বিভিন্ন সেন্টারের অধ্যক্ষ হয়ে সেখানাকার দায়ীত্ব পালন করেন। কিন্তু দেখা যায় এনারা নিষ্কাম ভাবে সেন্টারের সব কাজ খুব সুন্দর ভাবে করে যান। আর দেখা যায় আমাদের বেশি পড়াশোনা করা, বেশি যোগ্যতা সম্পন্ন মহারাজদের সেন্টারের তুলনায় এনাদের বেশির ভাগ সেন্টার অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বেশি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কারণ এনাদের সবারই ঠাকুরের প্রতি সমর্পিত ভাব, এখানে

এটাকেই বলছেন *সঙ্গরহিতম্*। স্বামীজী বলছেন, Unselfishness is more pain, only people do not have the patience to practice it। আমার দায়ীত্ব, এটা আমি করব। রান্নাবান্না করা আমার দায়ীত্ব, লোকেদের খাওয়ানো আমার দায়ীত্ব, আমি খাওয়াব। কিভাবে করব? With best possible way। স্বামী গম্ভীরানন্দজী যেমন জেনারেল সেক্রেটারী থাকার সময় চিঠি লিখে দিলেন। যখন জেনারেল সেক্রেটারীর দায়ীত্বে নেই, তখন নেই। এখানে আমাদের এত বছরের সন্ন্যাসজীবন হয়ে গেছে, এখন আমাদের মা, বাবা, ভাই, বোন বেঁচে আছে না মরে গেছে তাতে আমার কি। কিন্তু যখন সংসারে ছিলাম তখন যতটুকু দায়ীত্ব ছিল ততটুকু করা হয়ে গেছে, এখন সংসার থেকে কিছু নেওয়ারও নেই, সংসারকেও কিছু দেওয়ার নেই।

অরাগদ্বেষতঃ কৃতম্, যেটাই করি না কেন রাগ ও দ্বেষ বর্জন করেই করছি। এটা আমি পছন্দ করি না, এটাকে তাই বার করে দেব বা এটাকে পছন্দ করি, এটাকে আমি ছাড়ব না, সাত্ত্বিক কর্মে এই ধরণের ভাবগুলোর কোনটাই নেই। আমি দায়ীত্ব যখন নিয়েছি এটাই আমি করব, এখানে পছন্দ অপছন্দের কিছু নেই। ইদানিং কালে টাকা-পয়সাই সব কিছু হয়ে গেছে। একটা চাকরি করছেন, সেখানে দেখছেন আপনাকে ভাল মাইনে দিচ্ছে না। আপনিও সেইজন্য মনে মনে বলছেন, প্রতিষ্ঠান যেমনটি মাইনে দিচ্ছে, আমি তেমনটিই তো কাজ করব। তাহলে আপনি চাকরিটা করছেন কেন, ছেড়ে দিন। এরাই হল অতি সাধারণ স্তরের মানুষ। যখনই কোন কাজ করছেন, জানবেন, আপনার কাজের জন্য আপনি মাইনে পাচ্ছেন। যেমন আমাদের প্রধানমন্ত্রী, কাজের জন্য উনি ওই পাদে আছেন বলে লোকে মানছে তার সাথে উনি কিছু মাইনে পাচ্ছেন, সম্মান পাচ্ছেন।

নিজেকে দেখে বিচার করুন –মানুষ হিসাবে ওই পদে থেকে কি আপনি বড় হচ্ছেন? যদি হচ্ছেন, তাহলে বলতে হবে, আপনি কর্মযোগী। যদি হচ্ছেন না, তাহলে আপনি কর্মযোগী নন, কর্মভোগী। আপনার আগের আগের জন্মে কিছু পূণ্য ছিল বলে আজকে আপনি প্রাইম মিনিস্টার বা চিফ্ মিনিস্টার হয়ে গেছেন, যেদিন আপনার পূণ্য ক্ষয় হয়ে যাবে সেদিন আপনি ওখান থেকে উল্টে পড়বেন, কেউ আপনাকে পুছবে না। জীবনে কোন ভাল কিছু যদি আসে, তাহলে দেখুন আপনি কি ওটাকে ধরে রাখতে পারছেন? কারণ পুরনো পূণ্য যদি উদয় হয়, তখন অনেক কিছু ভাল হতে শুরু হয়। যদি ওটাকে ধরে রাখতে হয়ে, তাহলে আপনাকে *নিয়তং সঙ্গরহিতম্ অরাগদ্বেষতঃ* হতে হবে। আমি একটা দায়ীত্ব নিয়েছি, আমি চীফ্ মিনিস্টার, আমি প্রাইম মিনিস্টার, আমার এই দায়ীত্ব আমি পুরোদমে পালন করব। কাউকে যেন বলতে না শোনেন, অমুক এর থেকে বেশি ভাল কাজ করত। তার জন্য আপনাকে দেখতে হবে আপনি *সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ* হতে পেরেছেন কিনা। এখান থেকে আমাকে এটা নিয়ে নিতে হবে, এখান থেকে এটাকে বাদ দিতে হবে, একে পছন্দ করি, ওকে পছন্দ করি না, এই ধরণের মনোভাব থেকে আপনাকে অনাসক্ত হতে হবে। *অফলপ্রেপ্সুনা*, ওখান থেকে যে কোন কর্মফল পেতে চাইছেন, তাও না। *কর্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে*, এই কর্মই সাত্ত্বিক কর্ম।

জীবনে যদি আপনি বড় হতে চান, ভাল মানুষ হতে চান, সাত্ত্বিক কর্ম করুন। কর্মযোগের উপর কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী খুব সুন্দর বলছেন, একজন জুতো সেলাই করে, আর-একজন রাজা, রাজা বলে যে সে মহান হবে তা না। কর্মটা পাল্টে দিন, যে জুতো সেলাই করছে তাকে রাজা বানিয়ে দিন, যে রাজা তাকে বেসিক ট্রেনিং দিয়ে জুতো সেলাইতে নামিয়ে দিন, তারপর দেখা যাক কে কেমন। আমার সৌভাগ্য যে, পুরনো ভারতবর্ষকে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। আমরা সবাই তাই বলি, নিজের সময়ে স্বামীজী এটাই বলতেন, প্রাচীন ভারতবর্ষ। আমি দেওঘরে পড়তাম, সেখানে একজন মুচি কাজ করত, তাকে সবাই কি রকম সম্মান করত দেখেছি। দেওঘর বিদ্যাপীঠে একজন পিওন ছিলেন, ছেলেরা তাঁকে প্রণাম করে পরীক্ষা দিতে যেত। একজন পিওন, কিন্তু নিজের কাজের জোরে এত সম্মানের জায়গায় চলে এসেছিলেন যে, দেখতাম ছেলেরা মহারাজদের প্রণাম করছে, শিক্ষকদের প্রণাম করছে, তাঁর পিওনকেও প্রণাম করে তাঁকে একই স্তরে নিয়ে আসছে।

এটাই পুরনো ভারত। এখন তো প্রণাম করার রীতিটাই উঠে গেছে, পিওন তো দূরের কথা। এরপর আসছে রাজসিক কর্ম।

যৎ তু কামেপ্সু না কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্ রাজসমুদাহৃতম্।।২৪।।

(এবং ফলকামনাযুক্ত বা অহঙ্কারযুক্ত হয়ে বহু কষ্টসাধ্য যে যাগাদি কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, সেই সমস্ত কর্ম রাজসিক কর্ম বলে কথিত হয়।)

আমাদের জীবনে আমরা যত কাজ করি, বেশির ভাগ সময় আমরা রাজসিক কাজই করি। প্রথমেই চাইবে ফল; এই চাকরি করে কত টাকা পাব, বছরে কত ছুটি পাব, অন্যান্য সুবিধা কি পাওয়া যাবে, ইত্যাদি, সব রাজসিক কর্ম। বর্তমান কালে ভারতে ছেলেমেয়েরা ঠিক এই ধরণের মানসিকতার হয়ে গেছে; ভাল, আর কিছু না হোক তামসিক থেকে তো একটু উঠেছে। এমন ঘোর তামসিক যে কল্পনা করা যায় না, গরমের সময় পুকুরে, ডোবায় চুবে থাকা মোষের মত। মোষের শরীর লোম হয় না, লোমকূপ হয় না; গরমের সময়ে গরমে টিকতে না পেরে পুকুরে বা ডোবার জলে গিয়ে বসে থাকে। যতই আপনি ডাণ্ডা মেরে তাড়াতে যান, ডোবা থেকে কিছুতেই উঠে আসতে চাইবে না। এই হল ভারতের চিত্র, গরমের সময় ডোবায় ভেসে থাকা মোষ।

সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ, কাজের মধ্যে আবার অহঙ্কার রয়েছে। এখানে আচার্য শঙ্কর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, নিরহঙ্কারী দুই প্রকার হয়, একটা হয় যাঁদের আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে। অন্য দিকে আত্মজ্ঞান হয়নি কিন্তু বেদের পণ্ডিত, যেমন বৈজ্ঞানিকরা হন, এনাদেরও অনেক সময় নিরহঙ্কারী বলা হয়। কিন্তু এনারা আত্মজ্ঞানী নন। বলছেন, সাত্ত্বিক কর্তা নিরহঙ্কারী হন, রাজসিক কর্তার অহঙ্কার থাকে।

পরমপূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রচণ্ড হিউমারাস ছিলেন। যে কেউ কোন কথা বললে, উনি ঘুরিয়ে তার উপর ফেলে দিতেন। কোন একটা দিন দেখলাম না যে, উনি চুপ করে থেকে গেছেন। আমাদের একজন মহারাজ একদিন ওনাকে বলছিলেন, 'মহারাজ, এই যে আপনি বলেন আজকালকার সাধুরা ঠাকুরের উপর ভরসা না করে কেবল 'আমি আমি' করে, কিন্তু এইতো দেখুন আশ্রমের বড় বড় সেক্রেটারীরা মন্দির নির্মাণ করে বলেন, ঠাকুরের ইচ্ছায় এই মন্দির হল'। স্বামী ভূতেশানন্দজী সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, 'ঠিকই বলছ, কিন্তু তার সাথে জুড়ে দিয়ে বলে আমার সময় হয়েছে।' অর্থাৎ ঠাকুরের ইচ্ছায় আমার সময়ে এই মন্দির তৈরীর কাজ শেষ হয়েছে। এই অহঙ্কার যায় না, তবে তামসিক হওয়ার থেকে ভাল কিছু কাজ করার পর এই অহঙ্কারটা অনেক ভাল।

ক্রিয়তে বহুলায়াসং, বলছেন, খাটনির শেষ নেই, খেটে যাচ্ছে, খেটেই যাচ্ছে। *আয়াস* শব্দের অর্থ পরিশ্রম, খুব পরিশ্রম করে যাচ্ছে। রাজসিক কর্মে কি কি থাকবে? কাজের পিছনে একটা কাম ভাব থাকবে, এই চাই সেই চাই লেগে আছে। দ্বিতীয় অহঙ্কার থাকবে, আমি করেছি, এই আমি আমি ভাবটা থাকবে আর তৃতীয় প্রচুর পরিশ্রম থাকবে। তার মানে ফল পাওয়ার জন্য প্রচুর খাটতে হয়। আপনার কাজ করার ধরণ দেখলেই বোঝা যাবে আপনার কর্ম সাত্ত্বিক, না রাজসিক, না তামসিক। তাহলে কি কাজ করব, কি করব না? অবশ্যই কাজ করতে হবে, কাজ করে করে একটা জায়গায় যখন পৌঁছে যাবেন, তখন ঠাকুর নিজেই আপনাকে উপরে টেনে তুলে নেবেন। এগুলো হল আপনার উন্নতির এক একটা ধাপ। আমার এক বন্ধু বলতেন, কুড়ি বছর আগে খুব চাইতাম কেউ আমার একটু প্রশংসা করবে, কেউ প্রশংসা করার আগেই আমি বলে দিতাম, কি দারুণ করলাম না, এটা কি দারুণ বললাম না? এগুলো মানুষ কেন করে, নিজের ভিতর অপূর্ণতা থাকে বলেই করে। কিছু না করার থেকে, কিছু করে বলুন, হ্যাঁ এটা আমি করেছি।

ঠাকুর বলতেন, গরু কেনার সময় গরুর লেজে হাত দিলে যে গরু তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে, সেই গরু কিনবে। সাত্ত্বিক হওয়ার আগে রাজসিক হন তারপর আপনি সাত্ত্বিক হবেন। সাত্ত্বিক হচ্ছেন বলে আপনি যেটা মনে করছেন, আসলে আপনি একটা তামসিকতার ডিপো, ডোবার মধ্যে বসে থাকা একটা মোষ, একটু কাছে গেলে কি দুর্গন্ধ। দেওঘরে থাকার সময় আমরা মহারাজরা বিকালে হাঁটতে যেতাম। একদিন আমরা চার পাঁচজন মহারাজ, সঙ্গে কয়েকজন গেস্ট মহারাজ ছিলেন। নন্দন পাহাড় থেকে ফিরছিলাম। সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। সোজা মন্দিরে যেতে হবে, একজন মহারাজ একটা পুকুরে গিয়ে ভাল করে হাত মুখ ধুয়ে এলেন। তারপর হঠাৎ আমাদের মনে হল, মোষের গন্ধ কোত্থেকে আসছে। তারপর জানা গেলে যে পুকুরে মহারাজ হাত মুখ ধুয়েছিলেন, আসলে ওটা একটা ডোবার মত ছিল, সারাদিন মোষ ওর মধ্যে বসে থাকে। এমন দুর্গন্ধ যে, ওই জল দিয়ে হাত পা ধুয়েছেন তাতেই দুর্গন্ধ আসছে। আপনি কারুর কাছে চলে গেলে, তার গায়েও ওই দুর্গন্ধটা লেগে যাবে, এমনই তামসিক সব লোক। ঠিক ঠিক তামসিক কে? একটা তামসিক হল যারা কিছুই করবে না, এখানে কিন্তু ক্রিয়ার কথা বলা হচ্ছে।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে।।২৫।।

(ভাবী শুভাশুভ ফল, ধনক্ষয় বা শক্তিক্ষয়, পরপীড়া ও স্বসামর্থ্য বিচার না করে অবিবেকবশতঃ যে যাগাদি কর্ম করা হয়, সেই সমস্ত কর্ম তামসিক কর্ম বলে উক্ত হয়।)

তামসিক কর্ম কোনগুলো? একটা তো হল তামসিকরা কোন কর্মই করবে না, যারাও বা করে তাদের তামসিক রোগ; মন, বুদ্ধি ওদের সব কিছু তামসিকতায় ভরা। তামসিকদের মধ্যে যারা কোন কর্মই করতে চায় না, এখানে তাদের কথা বলছেন না। গীতা সেই সব তামসিকদের কথা বলছেন, যখন এরা কাজ করে, তখন তাদের কর্মগুলি কি রকম হয়?

অনুবন্ধং, অনুবন্ধনকে আচার্য বলছেন, *অনুবন্ধং পশ্চাদ্ ভাবি যদ্ যহ বস্তু সঃ অনুবন্ধ*, শেষে যে পরিণাম হয় এটাকে অনুবন্ধ বলা হয়। শেষে কি পরিণাম দেখি? সব কাজটাজ হয়ে গেল, দেখা গেল সেই কাজে *ক্ষয়ং*, সব ক্ষতি হয়ে গেল, প্রচুর শক্তি ক্ষয় হয়ে গেছে, ধনের ক্ষয় হয়ে গেছে। যেমন যুদ্ধাদি হওয়া, যুদ্ধ একটা তামসিক জিনিস, শক্তির ক্ষয় হয়, মানুষ মারা যায় আর প্রচুর অর্থের অপচয় হয়। যে জয়ী হয় আসলে সে হারে, যে হারে সেও মরে। কোর্টে মামলা করলে সেখানেও একই জিনিস হয়। যে জেতে সে হারে, যে হারে সে মরে, সব তামসিক কর্ম। তামসিক কর্মে জীবহিংসা হয়। তার সাথে কি হয়?

অনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্, পৌরুষের অপেক্ষা করে না, আমার দ্বারা যে এই কাজ সম্ভব না, এই বোধটা তার থাকে না। কথামৃতে একটা ঘটনার খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। ঠাকুর রাখাল ও অন্যান্য অনেকের সাথে এক জায়গায় গেছেন, মাস্টারমশাইও আছেন। রাত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বাড়ির কর্তারা কেউ তাঁদের খাওয়ার জন্য ডাকছেন না। খোঁজ খবর করে যদিও বা খেতে গেলেন, দেখছেন খাবারের জায়গাটা খুব সঙ্কীর্ণ, ঠিকমত পরিষ্কার করা নেই। রাখাল সব দেখে খুব রেগে গেছেন, বলছেন, চলুন, আমরা দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাই। ঠাকুর বলছেন, ফাক্কা রোখ করে কি হবে, আর দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে এত রাতে খাবোটা কি? রাখালের যে রাগ, এই রাগটা হল তামসিক। কারণ *অনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্*, আমার ক্ষমতা আছে কিনা সেটা বিচার না করে কাজে নেমে পড়ছেন। ক্ষয়, ক্ষতি হওয়া, হিংসা, অপরের কষ্ট উৎপন্ন করা আর নিজের শক্তির বিচার না করে যে কাজ করা হয় সেটাই তামসিক কাজ।

কম বয়সে আমরাও কেউ কোন কাজ করতে না বলার আগেই বলে দিতাম, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সব করে দেব, চিন্তার কিছু নেই। কম বয়সে এটা হয়, কিন্তু একটা বয়সের পরেও যদি কেউ এই

রকম থাকে, যেমন রাষ্ট্রনায়করা যারা সামান্য কোন কারণে যুদ্ধ বিগ্রহ বাধিয়ে দেয়, এরা সবাই তামসিক। ভারতের এখন কত সমস্যা, একবার চীন আক্রমণ করছে, একবার পাকিস্থান আক্রমণ করছে। এতে কার কি লাভ হচ্ছে? কারুর কোন লাভ নেই, মাঝখান থেকে কিছু মানুষ মারা যাচ্ছে, প্রচুর অর্থের অপব্যয় হয়ে যাচ্ছে, নিজের মত কিছুই করা যায় না। যে কোন কাজ করার আগে দেখতে হয়, এই কাজ করে আমার ক্ষতি বেশি না লাভ হবে, দেখতে হয় এই কাজের জন্য কারুর হিংসা হচ্ছে না তো, তৃতীয় এই কাজটা শেষ করতে আমি পারব কি পারব না।

মধ্য এশিয়া থেকে আল বেরুনি ভারতে পর্যটক হয়ে এসেছিলেন। ভারতকে নিয়ে তিনি একটা বই লিখলেন, আল্ হিন্দ। ইংরেজরা ভারতে এসে যখন প্রচুর লুটপাট করে নিচ্ছিল, আর বাংলাকে যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দখল করে নিল, তখন চারিদিকে প্রচুর সমালোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। হৈ চৈ শুরু হতেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেখাতে শুরু করল, না না, এই দেখুন আমরা অনেক ভাল কাজ করছি। কি ভাল কাজ? সেই সময় ওরা অনেক বই ছাপাতে শুরু করল। তার মধ্যে ম্যাক্সমুলার বেদের অনুবাদ করতে শুরু করলেন। এক একটা পাতা অনুবাদ করার জন্য ম্যাক্সমুলার দশ পাউণ্ড করে নিতেন বা তাঁকে দেওয়া হত। বেদের অনুবাদ করার সময় ম্যাক্সমুলার কত টাকাই যে লুট করলেন, আর অনুবাদও এমন করেছেন, কিছু বলার নেই, ঠাকুর রক্ষা করুন।

সেই সময় জার্মানের একজন প্রফেসরকে বলা হল আল বেরুনির এই বইটার সবটাই ফার্সি থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করতে। ইস্ট ইণ্ডিয়া সেই সময় সবাইকে প্রচুর টাকা দিচ্ছিল। এই ভদ্রলোক বললেন, আগে দেখি আমি এর অনুবাদ করতে পারব কিনা। উনি আগে জার্মান ভাষায় ওটা অনুবাদ করলেন। কত বড় পণ্ডিত ভাবা যায়! ফার্সি থেকে জার্মান, জার্মান থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করলেন। কেন করলেন? শুধু দেখার জন্য, এটা আমি পারব কিনা, এই হলেন সাত্ত্বিক কর্তা, নিজের পৌরুষ বিচার করে কাজে নামছেন। ইংরাজীতে একটা নামকরা প্রবাদ আছে, Fools are rushing where angels fear to treat। মুর্খরা, তামসিক লোকেরা আগেপিছু কিছু না ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গীতা এর নিন্দা করছেন। কাজ করার আগে দেখ, তোমার শক্তি, টাকা, পরিশ্রম, হিংসা বেশি হচ্ছে না তো, আর তোমার সামর্থ বিচার করে দেখ তুমি কাজটা করতে পারবে কিনা।

মোহাদারভ্যতে কর্ম, মোহ বশতঃ কাজে নেমে পড়ছে, মোহের মধ্যে ডুবে আছে কিনা। যত যুদ্ধ হয়, বেশির ভাগ যুদ্ধ এই মোহের জন্যই হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী এত কিছু করল, কিন্তু কি লাভ হল জার্মানীর, শেষে জার্মানরা কি পেল, মাঝখান থেকে প্রচুর লোক মারা গেল, কত অর্থের অপব্যয় হল। এগুলো হল অত্যন্ত তমোগুণের লক্ষণ। তিনটি শ্লোকে কর্মের কথা বলতে গিয়ে তিন প্রকার কর্মের কথা বললেন। এবার বলছেন, আপনি ভাল মানুষ হবেন কি করে। সেটাকে বলার জন্য কর্তার বর্ণনা করছেন।

মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যাসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে।।২৬।।

(ফলে অনাসক্ত, কর্তৃত্বাভিমানরহিত, ধৃতিশীল ও উদ্যমযুক্ত, ক্রিয়মাণ কর্মের সিদ্ধিতে হর্ষহীন বা অসিদ্ধিতে বিষাদশূন্য কর্তা সাত্ত্বিক বলে কথিত হন।)

ঠিক ঠিক সাত্ত্বিক কর্তাকে বাইরে থেকে দেখে মনে হবে তামসিক, আসলে কিন্তু তিনি একজন সাত্ত্বিক কর্তা। *মুক্তসঙ্গঃ*, কোন কিছুতে তাঁর আসক্তি নেই; *ন-অহংবাদী*, আমি কর্তা এটা কাউকে দেখাতেও যায় না, আর নিজের মধ্যেও এই বোধ থাকে না। অনেক জায়গায় কিছু বিনয়ী লোকে দেখা যায়, তাদের যদি বলেন, বাঃ আপনি কি সুন্দর কাজ করছেন, সঙ্গে সঙ্গে বলবে, ছি ছি ছি এই কথা বলবেন না, সব তাঁর কৃপা। বিনয়ের একজন অবতার। সাত্ত্বিক কর্তা কোন বিনয় ভাবও দেখাবেন না, ও-রকম কথা কখনই বলবেন না।

সফল কে হন? যাঁর কাজের কোন হিসাবই নেই যে, কি কি তিনি করেছেন। একজন যে সফল ক্রিকেটার, কত রান করেছেন, কটা সেঞ্চুরি করছেন নিজেরই মনে নেই। লতা মঙ্গেশকর কিছু দিন আগে গত হয়ে গেলেন, শুনছিলাম যে, তিনি জানেনই না কত গানের রেকর্ড তিনি করেছেন। এটাকে বলে সাফল্য, একেই বলে সাত্ত্বিক কর্তা। একজন যে নূতন নূতন দুটো গানের রেকর্ড করে, আর কেউ যদি একটু প্রশংসা করে, বলবে, না না, আমার কি সেই ট্যালেন্ট আছে! আবার যদি সম্মান না দেওয়া হয়, তখন বলবে, আমাকে সম্মান দিল না! জানে না আমি কত বড় শিল্পী; বাজারে আমার তিনটে রেকর্ড চলছে। বুঝতে হবে অহঙ্কারের একটা ডিপো, বিনয়ের ভান করছে। এটাই বলছেন, আমি কর্তা এই বোধটা তার নেই, বাইরেও না, ভিতরেও না।

ধৃতিঃ, ধারণার শক্তি, ধৃতি নিয়ে বিস্তারে পরে বলবেন। কাজের সময় যে অদম্য উৎসাহ, এই উৎসাহটা কখনই তার প্রশমিত হবে না। সাত্ত্বিক কর্তার মধ্যে এনার্জি সব সময় টগবগ করবে। ভালো কাঠুরেরা যে কুড়াল দিয়ে গাছ কাটে, সেই কুড়ালের ধার কখন কমে যায় না। ঠিক তেমনি কাজ যদি ঠিক ঠিক করেন, তাহলে কাজই আপনার শক্তি বৃদ্ধি করবে। কাজ করার পর আপনারা যদি ক্লান্তি আসে, তাহলে বুঝতে হবে কাজে আপনার কিছু গোলমাল ছিল। কাজ করার পর মানসিক ক্লান্তি যেন না আসে, মানসিক ক্লান্তি যদি আসে তার মানে আপনি ঠিক ঠিক কাজ করছেন না। কারণ কাজে ধৃতি আর উৎসাহ সব সময় লেগে থাকবে। আমার সন্ন্যাস জীবনেই আমি নিজের চোখে এমন এমন মহারাজদের কাজ করতে দেখেছি, যাঁদের মধ্যে কক্ষণ ক্লান্তি ভাব আসতে দেখিনি। কাজ করার পর ঘরে এসে একটু বিশ্রাম করছেন, শরীরকে একটু বিশ্রাম সবাইকেই দিতে হয়। কিন্তু হঠাৎ কেউ এসে বলল, মহারাজ এটা দরকার, সঙ্গে সঙ্গে উঠে বেরিয়ে এলেন। আবার এও দেখেছি, সন্ধ্যেবেলা ঘরে বসে ধ্যান করছেন, হঠাৎ একজন এসে বললেন, মহারাজ, অমুক মহারাজকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আসন ছেড়ে বেরিয়ে এলেন, কোন বিরক্তির প্রকাশ নেই, যেন কোন ব্যাপারই না।

পূজ্যপাদ স্বামী মাধবানন্দজী মঠের তখন সেক্রেটারী ছিলেন, ওনার সেই সময়কার একটা ঘটনা শুনেছি। সন্ধ্যেবেলা লাইট বন্ধ করে নিজের ঘরে বসে জপধ্যান করছেন। হঠাৎ ওনার কানে পায়ের আওয়াজ এলো, বুঝলেন কেউ তাঁর ঘরের দিকে আসছেন। যিনি আসছিলেন মহারাজ জপধ্যান করছেন দেখে তিনি আবার ফিরে যাচ্ছিলেন। উনি ফিরে যাচ্ছেন, হঠাৎ ঘরের আলোটা জ্বলে উঠল, একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'কে'? যিনি এসেছিলেন, তিনি আবার ঘুরে এসে বললেন, 'মহারাজ, একটা জরুরী কাজের ব্যাপার ছিল'। 'তাহলে ফিরে যাচ্ছিলে কেন'? 'দেখলাম আপনি জপধ্যান করছেন, তাই ফিরে যাচ্ছিলাম'। 'কাজের ব্যাপার কি বলছ, ওটাও তো জপধ্যানই, এসো'। উনি বিছানা থেকে নেমে যে কাজের জন্য এসেছিলেন, সেটা করে দিয়ে আবার লাইট অফ্ করে জপধ্যানে বসে গেলেন। সেই মহারাজ পরে বর্ণনা করছেন। কাজ হয়ে যাওয়ার পর মহারাজের ঘর থেকে বেরিয়ে চার পাঁচ পা আসতেই দেখছি, ঘরের লাইট আবার নিভে গেল, মানে আবার জপে বসে গেছেন। এটা যদি না পারেন, তাহলে বুঝে নিন আপনার ভিতর গোলমাল আছে।

বলছেন, উৎসাহ, উদ্যম পুরো দমে থাকবে। বাচ্চারা যেমন, ওরা কখন টায়ার্ড হয় না, ঠিক সেই রকম হতে হবে। সব সময় চার্জড-আপ হয়ে থাকছে, বুঝতে হবে ইনি একজন সাত্ত্বিক কর্তা। আমাদের সমস্যা হল, কাজে আমরা এমন জড়িয়ে পড়ি, কর্মফলে এমন জড়িয়ে পড়ি, ক্লান্তি এসে আমাদের উৎসাহ, উদ্যমকে স্তিমিত করে দেয়। আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *ক্রিয়মাণস্য কর্মণঃ ফলসিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ নির্বিকারঃ*, কাজের সিদ্ধি হল, কি অসিদ্ধি হল, সবটাতেই নির্বিকার। আমাকে কাজ করতে হবে করেছি, এরপর ফলে সিদ্ধি আসুক, অসিদ্ধি আসুক, আমি নির্বিকার। আমাদের ক্ষেত্রে কি হয়, একটু ভাল হলেই লাফিয়ে লাফিয়ে লোকেদের বলতে শুরু করে দিই, খারাপ হয়ে গেল, মুষড়ে পড়ে গেলাম। আরে ভাই, আমার দায়ীত্ব আমি করেছি। যিনি ভাল গান করেন, যিনি

ভাল ছবি আঁকেন, কোন একটা performance যদি ভাল হয়ে যায়, বলবেন, Setting on the Lowrance। ঠাকুর এটাকে খুব সুন্দর বলছেন, কেরানী জেল থেকে ছাড়া পেল, সে কি এখন রাস্থায় ধেই ধেই করে নাচবে, নাকি আরেকটা কেরানীর কাজ খুঁজে নেবে।

আচার্য এখানে বলছেন, *কেবলং শাস্ত্রপ্রমাণপ্রযুক্তো*, শাস্ত্রের যে কাজের কথা বলা হয়েছে, সমাজ যে কাজগুলো করতে বলছে, আপনি যে দায়ীত্বগুলো নিয়েছেন, এগুলোর বাইরে কোন কাজ করা যাবে না। ফলে কি হয়? *ন ফলরাগাদিনা যঃ স নির্বিকার উচ্যতে*, যে দায়ীত্ব পালন করছেন, সেই কাজের ভালমন্দের দিকে ওনার কোন দৃষ্টি নেই, ঠাকুরের কাজ করছি, এছাড়া আর কিছু না, এটাকেই নির্বিকার থাকা বলে। তবেই ভিতরে শক্তি টগবগ করবে। আমরা সবাই হলাম বাচ্চাদের মত, একটা শ্লেটে অ আ ক খ লিখেছে, সেটাকেই বাড়ির সবাইকে দেখাতে থাকবে, দেখ দেখ কি দারুণ লিখেছি। বৃদ্ধ বয়সেও এই স্বভাব আমাদের থেকে যায়।

একদিন বেলুড় মঠে দেখছি, একটা ফ্যামিলি ঘুরতে এসেছে। সেখানে বৃদ্ধ দাদু নাতিকে বলছে, treat me as your friend, আমি তোমার বন্ধুর মত। ভাবলাম একবার বলি, আপনি যদি ওর বন্ধু হন, ওর দাদু কে হবে? কোন শাস্ত্র বলছে না, কোন সমাজ বলছে না, মা, বাবা, দাদু, দিদা এরা বাচ্চার বন্ধু হবে। আসলে বাচ্চার কাছ থেকে নিজের appreciation পেতে চাইছেন। নিজের বাচ্চা বয়সে অ আ ক খ লিখে নিজের বাবা মার কাছ থেকে যে appreciation পাওয়ার স্বভাব ছিল, বৃদ্ধ বয়সে নিজের নাতির কাছে একই appreciation পেতে চাইছেন।

টমাস হ্যারিস নামে একজন ছিলেন, ওনার I am OK you are Ok বইটা খুব পপুলার হয়েছিল। তাতে উনি একটা থিওরি এনেছিলেন যার নাম PAC, Parents Adult Child। সেখানে উনি বলছেন, এই চাইল্ড ভাবটা বয়সকাল পর্যন্ত বরাবর থেকে যায়। যারা বড় বড় ডিক্টেটর হয়, তাদের মধ্যেও এই চাইল্ড ভাবটা থেকে যায়, আমার এটা চাই, আমার ওটাও চাই; একে মারতে হবে, তাকে মারতে হবে, সব করে বলবে, দেখ আমি কি রকম করে দিলাম, দেখ আমি কি করতে পারি। বয়স হয়ে গেছে, এখনও যদি আপনি বাচ্চার মত আচরণ করেন, এটাই আপনার গোলমাল, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, জীবনটা আপনার বৃথা গেল।

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোহশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ।।২৭।।

(বাসনাকুল-চিত্ত, কর্মফলাকাঙ্ক্ষী, পরদ্রব্যে লোভী এবং তীর্থাদিতে স্বীয় দ্রব্যাদি দানে অনিচ্ছুক, পরপীড়ক, বাহ্যান্তর শৌচহীন, ইষ্টপ্রাপ্তিতে হর্ষযুক্ত এবং অনিষ্টপ্রাপ্তিতে ও ইষ্টবিয়োগে শোকযুক্ত কর্তা রাজসিক বলে কথিত হন।)

এবার রাজসিক কর্তার কথা বলছেন। *রাগী*, বাংলা রাগী না, সংস্কৃতে রাগী মানে আসক্তি, কাজের প্রতি তার সাঙ্ঘাতিক আসক্তি, সাথে সাথে কর্মফলের প্রত্যাশী। কর্মে যেমন আসক্তি তেমনি কর্মফলের প্রতিও তীব্র আসক্তি। লোভী, অপরের জিনিসের প্রতি প্রচণ্ড লোভ। আগে ষোড়শ অধ্যায়ে এদের কথা বলেছিলেন, কিভাবে এরা অপরের সব কিছু নিয়ে নিতে চায়, *অসৌ ময় হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি*, একে মেরেছি, ওকে মারতে আমার বেশি কিছু করতে হবে না।

তার সাথে বলছেন, টাকার প্রতি এদের এমন লোভ যে, তীর্থে গিয়ে কোন দান করে না। সাধু সন্ন্যাসীদের প্রণামী দেবে না, মনে মনে চাইছে এই করে যদি দুটো পয়সা বাঁচাতে পারি। তীর্থে গিয়ে দান করতে হয়, সামনে সাধু সন্ন্যাসী পড়ে গেলে প্রণামী দিতে হয়। টাকার প্রতি এদের এমন আসক্তি যে, শাস্ত্রবিহিত এই কর্মগুলোও করবে না। আমাদের একজন ভক্ত ছিলেন, ওনার একটা ঘটনা শুনেছিলাম। তখনকার দিনে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট মানে বিরাট অঙ্কের টাকা। উনি মহারাজকে প্রণাম করে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট পায়ে ছুঁইয়ে বলতেন, 'মহারাজ আপনার

আশীর্বাদ বলে মনে করছি', বলে নোটটা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে দিতেন। এমনই টাকার প্রতি আসক্তি, টাকাটা মহারাজের পায়ে ছুঁইয়ে মহারাজের আশীর্বাদ মনে করে নিজের পকেটে রেখে দিতেন। আচার্য বলছেন, *পরদ্রব্যেষু সঞ্জাততৃষ্ণঃ তীর্থাদৌ চ স্বদ্রব্যাপরিত্যাগী*, একদিকে অপরের দ্রব্যের প্রতি লোভ, অন্য দিকে নিজের টাকা-পয়সা সেটাকেও কিছুতেই হাতছাড়া করতে চাইবে না।

হিংসাত্মকোঽশুচিঃ, অপরকে কষ্ট দেওয়া; *অশুচিঃ*, অর্থাৎ বহিঃশৌচ ও অন্তঃশৌচ, কোনটাতেই প্রতিষ্ঠিত না থাকা, এগুলো রাজসিক কর্তার লক্ষণ। আর বলছেন, *হর্ষশোকান্বিতঃ*, আচার্য তাঁর ব্যাখ্যাতে বলছেন, *ইষ্টপ্রাপ্তৌ হর্ষঃ অনিষ্টপ্রাপ্তৌ ইষ্টবিয়োগে চ শোকঃ*, ভাল কিছু হলে আনন্দে লাফাতে থাকে; মনের মত হল না, চুপসে পড়ে গেল, এই ধরণের মানুষরা হল রাজসিক।

এবার আমরা দেখে নিই, আমি আপনি কোথায় আছেন? কিছু দিন আগেও রেলওয়ে স্টেশনে ওজন মাপার মেশিন থাকত। মেশিনের উপর দাঁড়িয়ে এক টাকার কয়েন দিলে মেশিন থেকে একটা কাগজ বেরিয়ে আসত, তাতে আপনার ওজন কত লেখা থাকত, তার সাথে আপনার ভাগ্যটাও লেখা থাকত। ওজনটা দেখিয়ে দিয়ে আপনার ভাগ্যটাও, কোথায় আপনি দাঁড়িয়ে আছেন দেখিয়ে দেবে।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে।।২৮।।

(বিষয়-বিক্ষিপ্ত-চিত্তহেতু অসমাহিত, বালকবৎ অত্যন্ত অসংস্কৃত বুদ্ধি, অনম্র, বঞ্চক, স্বার্থবশতঃ পরবৃত্তিচ্ছেদনকারী, কর্তব্যে প্রবৃত্তিহীন, সর্বদা অবসন্ন স্বভাবযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী কর্তা তামস বলে কথিত হন।)

তামসিক কর্তার লক্ষণ বর্ণনা করছেন, আমরা বেশির ভাগ এই তামসিক কর্তার মধ্যেই পড়ি। *অযুক্তঃ*, কাজে মন থাকে না। *প্রাকৃতঃ*, বাচ্চাদের মত স্বভাব, মানে বুদ্ধি বিহীন। যখনই কারুর নামে বলা হয়, উনি খুব সরল, আমি বলি, আসলে বোকা। সরল কেউ তো হয় না, বয়স হয়েছে কিসের আপনি সরল, আসলে বোকা আপনি। ঠাকুরের যে সরলতা সেটা আধ্যাত্মিক স্তরের। *স্তব্ধঃ*, আমি ব্যাঁকবো না, আমি মরে যাব তো যাব আমি কিন্তু এক চুলও আমার জায়গা থেকে সরব না। একবার আমি বলে দিয়েছি, আর আমি ঝুঁকছি না। আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *দণ্ডবৎ ন নমতি কস্মৈচিৎ*, কারুর সামনে সে ঝুঁকবে না, মাথা নত করবে না। অনেক জায়গায় সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যেও এই ধরণের মনোভাব দেখা যায় – আমি সিনিয়র-টিনিয়র মানি না, কাউকে ছেড়ে কথা বলি না। কি অহঙ্কার! তুমি কাকে সম্মান করবে কি করবে না সেটা তোমার ব্যাপার, কিন্তু মরবে তুমিই।

শঠো, শঠকে এখানে আচার্য বলছেন, *মায়াবী শক্তিগূহনকারী*, কপট আচরণ। *নৈষ্কৃতিকঃ*, আচার্য বলছেন, *পরবৃত্তিচ্ছেদনপরঃ*, অপরের ব্যাপারে সব সময় ছিদ্র অণ্বেষণ করে বেড়াবে। *অলসঃ*, কাজ করতে চায় না। এমনই অলস যে, তার যেটা নিত্যকর্ম সেটাও করতে চায় না। *বিষাদী*, সব সময় চোখে জল, মহারাজ আমার কি হবে, মহারাজ বাড়িতে এই অশান্তি আর নিতে পারছি না। একজনের সাথে তার বন্ধুর দেখা হয়েছে, বন্ধু জানতে চাইল, What is the news? লোকটি বলছে, দিনকাল আমার একদম ভাল যাচ্ছে না। বন্ধুটি বলছে, I asked what is the news, খবর কি? তোমার এই খারাপ থাকাটা কোন খবর হল না, রোজই তো একই কথা বলো।

দীর্ঘসূত্রী চ, আজ থাক কাল থেকে দেখবে আমি ঠিক করব। আমরা যখন স্কুল কলেজে পড়তাম, তখন আমরাও এই রকমই করতাম। হিসাব করতাম, আচ্ছা এই বইতে তিনশ পাতা আছে, দিনে এক পাতা করে পড়লে পুরো বছরও লাগবে না শেষ করতে। আমি যদি না পড়ি, সে যদি পড়ে, কতটুকু আর এগোবে, কিছুই না। ছয় মাস পরে বলছে, আরে কি আর আছে, দিনে দু পাতা করে পড়লেই হয়ে যাবে। যেমন যেমন মাস এগিয়ে যাচ্ছে, দীর্ঘসূত্রীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে। আর

যেদিন পরীক্ষার দিন এসে গেল, আরে কি আছে, এক রাতে বইটাকে পড়ে স্টেজে মাৎ করে দেব। স্টেজে মাৎ করতে গিয়ে দেখা গেল নিজেই চিৎপটাং হয়ে উল্টে পড়েছে।

বলছেন, এই ধরণের যাদের স্বভাব, এরা সবাই তামসিক কর্তা। তামসিকরা হল প্রচণ্ড ঔদ্ধত, কারুর সামনে ঝুঁকবে না। এই হল ওজন মাপার মেশিন; এবার দেখে নিন আপনি কোথায়, আর আপনার ভাগ্য কোথায়; গীতা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন। এরপর বলবেন বুদ্ধি তিন প্রকার, ধৃতি তিন প্রকার এবং সুখ তিন প্রকার।

বুদ্ধি, ধৃতি আর সুখ, এই তিনটে জিনিসকে নিয়ে এবার পর পর আলোচনা করবেন। প্রথমে বুদ্ধি ও ধৃতিকে নিয়ে বলছেন –

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথকত্বেন ধনঞ্জয়।।২৯।।

(হে ধনঞ্জয়, সত্ত্ব, রজো ও তমোগুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির তিন প্রকার ভেদ পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে নিঃশেষে বলছি, শ্রবণ কর।)

অর্থ খুব সহজ, বুদ্ধি আর ধৃতি, এই দুটি জিনিসের যে সাত্ত্বিক, রাজসিক আর তামসিক গুণানুসারে যে ভেদ, এটা আমি তোমাকে এখন নিঃশেষে ব্যাখ্যা করছি। আমরা যেটাকে মন বলছি, এই মন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের কাজ করে। যখন কোন একটা দিকে নিশ্চিত হয়ে এগিয়ে গিয়ে মন কেন্দ্রিত হয়ে যায়, তখন সে পরিষ্কার বুঝে যায় যে, জিনিসটা এই; এই যে জিনিসটা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে যাওয়া, এটাকে বুদ্ধি বলা হয়। বুদ্ধি শরীরকে শক্তি দেয়, তার সাথে জ্ঞানকেও শক্তি দেয়। আমরা প্রায়ই বলি, তোমার বুদ্ধি কি ভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তোমার বুদ্ধি কি নাশ হয়ে গেছে? আমরা কখন মনোনাশ বলি না, কারণ মনোনাশ খুব উচ্চ অবস্থা। অদ্বৈত জ্ঞান লাভের আগে মনোনাশ হয়। বুদ্ধি হল বিচার করার ক্ষমতা আর সেই বিচারে অবস্থিত থাকা।

অনেক সময় লোকেরা বলে থাকে, আমার ছেলের খুব বুদ্ধি। যে বুদ্ধিকে কাজে লাগানো যাবে না, সেটা বুদ্ধি নয়, এখানে শব্দের ভুল ব্যবহার হচ্ছে। বুদ্ধি মানে, নিশ্চিত ভাবে জানবে জিনিসটা কি, আর জানার পর সেটাতে স্থির থেকে জীবনে সেটাকে কাজে লাগানো। শক্তি দুটো ক্ষেত্রে লাগে, একটা কাজে লাগে আর একটা জ্ঞানে লাগে। জ্ঞান আর কর্ম, এই দুটোতেই বুদ্ধির শক্তি দরকার। আমরা যে কাজ করি, সেটাতেও বুদ্ধি লাগে। চিন্তন করা এটাও একটা কাজ, সেইজন্য তিন প্রকার বুদ্ধির কথা বলছেন। বুদ্ধি যেমন জ্ঞান আর কর্মকে শক্তি দেয়, আর আমাদের যে ইন্দ্রিয়গুলি আছে, যেটাকে করণ বলা হয়, যেটা দিয়ে আমরা কাজ করি, সহজ ভাষায় আমাদের হাত পা, এগুলোকে ধরে রাখার যে ক্ষমতা এটাকে বলছেন ধৃতি। বুদ্ধি দিচ্ছে শক্তি আর ধৃতি ওটাকে ধরে রাখছে। গাড়ির যেমন ইঞ্জিন থাকে, বুদ্ধি হল সেই ইঞ্জিন, শক্তির যোগান দিয়ে যাচ্ছে আর ধৃতি হল ক্লাচ, গিয়ার বক্সটাকে ধরে আছে, যাতে গাড়ি উল্টোপাল্টা না করে।

কিন্তু ধৃতিটাও বুদ্ধির একটা বৃত্তি। দেখা যায়, যারা খুব বুদ্ধিমান হয়, যে কোন কাজ চটপট করে দেয়, কিন্তু লেগে থাকতে পারে না। জীবনে সফল হওয়ার জন্য দুটোই দরকার। ধৃতি হল এই লেগে থাকার ক্ষমতা। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বেশির ভাগ লোকেরই লেগে থাকার ক্ষমতা নেই, কারণ অনুশীলন নেই, চর্চা নেই। একটা জিনিসে লেগে থাকতে থাকতে তখন বুদ্ধিটা খোলে। একটা মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে, জন্ম থেকে তার একটা বুদ্ধি থাকে। দোকান থেকে বটি কিংবা একটা কোদাল কিনে আনার পর ওটাকে একটু ধার দিতে হয়, ঠিক সেই রকম ভগবানের ঘর থেকে যে বুদ্ধি নিয়ে এসেছি, সেটাকে একটু ধার দিতে হয়, আর ধরে রাখার ক্ষমতাটা আনতে হয়। যতই ধারওয়ালা কুড়োল হোক, একটা গাছ কাটতে গেলে কুড়োলকে অনেকবার চালাতে হবে। আশেপাশে, চারিদিকে

যত লোক দেখছি, বেশির ভাগ লোকেদের হয় বুদ্ধি নেই, নয়তো ধৃতি নেই। এটা মনে রাখতে হবে, বুদ্ধি সেই শক্তি দেয় যে শক্তি দিয়ে আমরা জ্ঞান অর্জন করি, বুদ্ধি সেই শক্তি দেয় যেটা দিয়ে আমরা কাজ করি। ধৃতি হল, আমাদের বিভিন্ন যে অঙ্গ বা ইন্দ্রিয় আছে, ধৃতি সেই অঙ্গগুলিকে ধরে রাখার ক্ষমতা দেয়। সত্ত্ব, রজো ও তমো অনুসারে বুদ্ধি আবার তিন প্রকার। প্রথমে সাত্ত্বিক বুদ্ধির কথা বলছেন –

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।।৩০।।

(হে পার্থ, প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ, কর্তব্য (বিহিত কর্ম) ও অকর্তব্য (নিষিদ্ধ কর্ম), ভয়ের কারণ –সংসারপ্রসু অজ্ঞান এবং অভয়ের কারণ –সংসারনাশক জ্ঞান, সহেতুক বন্ধন এবং সহেতুক মোক্ষ –এই সকল বিষয় যে বুদ্ধির দ্বারা জানা যায়, সেটাই সাত্ত্বিক বুদ্ধি।)

প্রথমে সাত্ত্বিক বুদ্ধিকে নিয়ে আলোচনা করছেন। সাত্ত্বিক বুদ্ধি কোনটা? যে বুদ্ধি প্রবৃত্তিকে জানে। কোন প্রবৃত্তিকে বলছেন, *প্রবৃত্তিঃ প্রবর্তনং বন্ধনহেতুঃ কর্মমার্গঃ*, প্রবৃত্তি কর্মের দিকে নিয়ে যায়। *নিবৃত্তিঞ্চ*, কর্ম থেকে নিবৃত্ত। একটা কর্মের দিকে নিয়ে যায়, আর-একটা কর্ম থেকে নিবৃত্ত হওয়া, এই দুটোর একটা কর্মের পথ, আর-একটা সন্ন্যাসের পথ। আচার্য বলছেন, *বন্ধমোক্ষসমানবাক্যত্বাৎ*, বন্ধন আর মোক্ষ এই দুটো একসাথে চলে, সেইজন্য প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তিকে একসাথে আনা হয়েছে। প্রবৃত্তি হল কর্মমার্গ, সংসারের দিকে নিয়ে যায় আর নিবৃত্তি সন্ন্যাসের দিকে নিয়ে যায়।

এখানে কিছুক্ষণের জন্য বিষয় থেকে আমাদের সরে আসতে হচ্ছে। ইউটিউব, সোস্যাল মিডিয়ার দৌলতে সবাই এখন ত্যাগের কথা বলতে শুরু করেছেন, সবাই সংসার ত্যাগের কথা বলছেন। কিন্তু ত্যাগের জন্য যে একটা প্রস্তুতি দরকার, সেই প্রস্তুতির কথা কেউ বলছেন না, এবং সেই প্রস্তুতি কারুরই নেই। হিন্দু ধর্ম প্রথম থেকে চারটি লক্ষ্য এবং চারটি আশ্রমের কথা বলে আসছে – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এবং ব্রহ্মচর্য আশ্রম, গার্হস্থ আশ্রম, বাণপ্রস্থ আশ্রম এবং সন্ন্যাস আশ্রম। এই যে চারটি লক্ষ্য এবং চারটি আশ্রম কেন হিন্দু ধর্ম নিয়ে এলো? হিন্দু ধর্ম কখনই মনে করে না যে, সবারই উদ্দেশ্য এক, হিন্দু ধর্ম কখনই মনে করে না যে, সবাইকে একই পথে যেতে হবে। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বললাম, আমি যদি পূর্ণজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকতাম, তাহলে তো আমার জন্মই হত না। আমাকে জন্ম নিতে হয়েছে মানেই আমার আত্মজ্ঞান হয়নি। কেন হয়নি? ভিতরে আমার নিশ্চয় কিছু গোলমাল আছে। আর আমি যদি সব দিক দিয়ে শুদ্ধ পবিত্র থাকতাম, জন্মের পরেই আমি শুকদেবের মত বেরিয়ে চলে যেতাম। কিন্তু তা তো হয়নি, রামকৃষ্ণ মঠে এসেছি মার খাওয়ার জন্য। সঙ্ঘ একটা মেশিন, যে মেশিন ঘষে মেজে আমাকে তৈরি করবে আত্মজ্ঞানের পথে এগিয়ে যেতে। সংসারেও যাঁরা আছেন, তাঁদেরকেও সেখানে ঘষামাজা করা হচ্ছে।

এই প্রস্তুতি পর্বটা ঠিক ঠিক ভাবে কঠোর অনুশাসনের ভিতর দিয়ে সম্পন্ন করা না থাকলে কঠিন সমস্যায় পড়ে যেতে হবে, এটাকেই ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় উপমা দিয়ে বলছেন, নারকেল গাছের বেল্লো, নারকেল গাছের যে পাতা, সেটাকে জোর করে টেনে ছাড়াতে নেই, ছাড়াতে গেলে ছাড়ানো তো যাবেই না, উপরন্তু ভেঙে গাছের সাথেই ঝুলে থাকবে, পরে একটা গভীর দাগ হয়ে থাকবে। কেউ যদি জোর করে বৈরাগী সেজে বেরিয়ে যান, জীবনটা তাঁর পুরো এলেমেলো হয়ে যাবে, সেইজন্য আপনাদের বারবার সাবধান করে দিতে হচ্ছে। আপনি তামসিক থাকতে চাইছেন না, আপনি রাজসিক থাকতে চাইছেন না; খুব ভাল; কিন্তু তমো, রজো থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আপনাকে সময় দিতে হবে। আপনি এখন যে অবস্থায় যেখানে আছেন, সেখানে নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে, যার যা দায়ীত্ব আছে সেটাকে নিষ্ঠাপূর্বক পালন করে যেতে হবে। বিবাহ করেছেন খুব

ভাল কথা, অন্যায় কিছু করেননি, এবার আপনি সংসার ধর্ম পালন করুন। যদি আপনি অন্য রকম হতেন, তাহলে আপনাকে সংসারে ঢুকতেই হত না।

কথামৃতে ঠাকুর এই কথাই বলছেন, যাদের সময় হয়েছে তিনি তাদের ব্যবস্থা করে দেন। আমরা জন্মজন্মান্তরের কত কোটি কোটি জন্মকে অতিক্রম করে আজকে এখানে এই অবস্থায় পৌঁছেছি। ঠাকুরের যাঁরা নাম নিয়েছেন, ঠাকুরের নাম যাঁরা নিচ্ছেন, তাঁরা অবশ্যই মুক্তির পথে। এখন যদি দৌড়াদৌড়ি করতে যান, মুখ থুবড়ে পড়ে যাবেন। যেখানে যে অবস্থায় আছেন, সেখানে আপনি যে দায়ীত্বটা গ্রহণ করেছেন, যে দায়ীত্বটা আপনাকে দেওয়া হয়েছে, সেই দায়ীত্বটাই ঠিক ঠিক ভাবে নিষ্ঠাপূর্বক পালন করুন। আমরা যাঁরা গীতার এই ক্লাশে আছি, আমরা বেশির ভাগই হলাম প্রবৃত্তি মার্গের লোক। সংসারেও যাঁরা আছেন তাঁরা অনেকে ত্যাগের জন্য প্রস্তুত, তাঁদেরকেও দায়ীত্ব পালন করতে হচ্ছে। যে দায়ীত্বেই থাকুন, দায়ীত্ব পালন করতে করতে বলুন, হে ঠাকুর, আমার কাজ কমিয়ে দাও, সংসারের প্রতি আমার আসক্তি কমিয়ে দাও। কিন্তু জোর করে কমাতে গেলে অনেক মানসিক সমস্যা দেখা দেবে। বর্তমান কালে একটা পাঁচ বছরের মেয়ে যদি জেদ ধরে, বাবা আমায় বিয়ে দিয়ে দাও, তাকে কি বিয়ে দিয়ে দেবে? বিয়ের জন্য তাকে একটা বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, ধৈর্য্য ধারণ করতে হয়। আমাদের শাস্ত্রে তাই এই প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ধর্মের কথাগুলো বলা হয়েছে, এগুলোই আদর্শ।

কার্যাকার্যে, কর্তব্য কি আর অকর্তব্য কি, এটাকে যে বুদ্ধি দিয়ে জানা যায়, সেটাই সাত্ত্বিক বুদ্ধি। বর্তমান কালে দেশ অনেক পাল্টেছে, কিন্তু কিছু দিন আগে পর্যন্ত সন্ন্যাসীর আদর্শ দেশে চাপিয়ে দেওয়া হল, আর ভারতের সর্বনাশ ঘটে গেল। স্বামীজী সেইজন্য diluted materialismএর কথা বললেন, একটু ভোগ দরকার। আমেরিকায় এই কথা বলার পর অনেকে স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁর উত্তরে বললেন, আমি জানি এতে আমাদের ধর্মের আদর্শে একটু অন্য রকম হয়ে যাবে, কিন্তু এটাই করতে হবে। যিনি বৃদ্ধ হয়েছেন তিনি বাচ্চার মত কাজ করবেন না, যিনি সন্ন্যাসী তিনি গৃহস্থের মত কাজ করবেন না, যিনি গৃহস্থ তিনি সন্ন্যাসীর মত ব্যবহার করবেন না।

আপনি হয়ত বলবেন, কথামৃতে তো ঠাকুর অন্য রকম বলছেন। কথামৃত কি শুধু আপনিই পড়েছেন, আমরা পড়িনি? প্রথমে আপনি যেখানে আছেন, আগে সেখানে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়ীত্ব পালন করুন। দায়ীত্ব পালন করতে করতে দেখবেন সব কিছু মনকে নিয়ে। মনের অবস্থা এমন যে, মনকে পাল্টাতে শুরু করলে নিজেই দেখবেন মন এমন কেন্দ্রিত হয়ে যাবে যে, নিজেই অবাক হয়ে যাবেন। আমি যখন ব্রহ্মচারী ছিলাম, তখন শ্রীমৎ স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ আমাকে খুব স্নেহ করতেন। বড়রা আমাদের কাছে শুনতে চাইতেন, নূতন জীবন কেমন চলছে, নিজেরাও কিছু কিছু কথা আমাদের বলতেন। তখন স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ আমাকে খুব মূল্যবান কথা বলেছিলেন, 'কতক্ষণ ধ্যান করছ সেটা বড় না, মন কতটা কেন্দ্রিত হচ্ছে সেটার দিকে নজর দাও'। এক গামলা জলকে রোদে রেখে দিলে সারাদিনেও জল ফুটবে না। ওই জলকে গ্যাসের ওভেনে রাখুন, কিছুক্ষণের মধ্যেই জল ফুটতে শুরু করে দেবে। এটাই হল কার্য ও অকার্য, কোনটা করতে হয়, কোনটা করতে নেই।

অপরকে নকল করতে যাবেন না, সারা বিশ্বের যে কজন মহাপুরুষের নাম আপনি জানেন, তাঁদের একটা তালিকা তৈরী করুন, দেখবেন কোন দুজন সমান ছিলেন না। সারা বিশ্ব ছেড়ে এবার শুধু ভারতে আসুন, ভারত ছেড়ে শুধু কলকাতায় আসুন, এবং গত দুশ বছরের ইতিহাসে যে কজনকে আমরা কলকাতা শহরে বড় মনে করি, তাঁরা কেউ সমান ছিলেন না। নেতাজী আলাদা, স্বামীজী পুরো আলাদা, রবীন্দ্রনাথ আলাদা, বিদ্যাসাগর আলাদা; সবাই এনাদের মানছেন। আপনিও আলাদা, আপনি সবার থেকে আলাদা, আপনি কারুর মত নন এবং আপনার মত কেউ কোন দিন

হতে পারবে না, আপনি নিজের পথেই এগিয়ে যান। স্বামীজী বলছেন, তোমাদের ঠাকুর মৌলিক ছিলেন, তোমরাও সবাই মৌলিক হও। সেইজন্য এই শাস্ত্রের কথা শুনে নিজে বিচার করে নিতে হয়, আমি কোনটা পারব, কোনটা পারব না।

কক্ষণ নিজের দুর্বলতার দিকে তাকাবেন না। নিজের দুর্বলতার দিকে তাকিয়েছেন তো মরেছেন। বুঝে নিতে হবে আমার শক্তিটা কি, শক্তি মানে ওটাই আমার স্বাভাবিক পথ। ওই শক্তিটাকেই বাড়াতে থাকুন, কারণ ওটাই আপনার মুক্তির পথ। এই যে এখানে বলছেন, *কার্যাকার্যে,* তার মানে আপনার যে দুর্বলতাগুলি আছে, থাকুক না, তাতে কি হয়েছে, কোন অসুবিধা নেই। জগতে কোন মানুষকে আজ পর্যন্ত দেখেছেন, যিনি খুব নাম করেছেন তাঁর নামে কোন নিন্দা হয়নি? ঠাকুরের নামে কত লোক কত নিন্দা করছে, খ্রীশ্চানদের দেশে যীশুর নামে কত নিন্দা করে, সবারই নামে নিন্দা হয়। তার মানে কোন একটা দোষ আছে, তবেই না নিন্দা করছে। নিজের দোষের দিকে তাকাবেন না, নিজের শক্তির দিকে তাকাবেন, সেটা দিয়েই আপনি বড় হবেন।

আচার্য তার সাথে বলছেন, *বিধি প্রতিষেধ,* কোনটা করতে হয় আর কোনটা করতে নেই। কিভাবে বিচার করব? শাস্ত্র বলেন, শাস্ত্রে যেটা নিষেধ করা আছে, ওটা করতে নেই। কিন্তু এত শাস্ত্র, কি করে বুঝব কোনটা নিষেধ আর কোনটা নিষেধ নয়? আমাদের সবারই একটা বয়স হয়েছে, এখন এই বয়সে আমরা সবাই মোটামুটি জানি কি করতে হয় আর কি করতে নেই। অত বিচারও করতে নেই, স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, ভারতের দুর্গতির কারণ হল ভারতে অত্যাধিক সামাজিক বিধি, স্মৃতি আদি গ্রন্থে শুধু বলছেন, এটা করবে, এটা করবে না। অত কিছু বিচার করবেন না। আমি যখন The Hindu Way বইটা লিখলাম, তখন খুব সংক্ষেপে লিখলাম, কি করতে হয়, কি করতে নেই। নিজেরাই কাগজে লিখে নেবেন, আমি এই জিনিসের উপর জোর দেব, এই জিনিসগুলিকে আমি সব সময় এড়িয়ে চলব।

আচার্য বলছেন, *দেশকালাদ্যপেক্ষয়া দৃষ্টাদৃষ্টার্থানাং কর্মণাম্,* দেশ কালকে মাথায় রেখে ঠিক করতে হয় কোনটা করতে হবে, কোনটা করতে নেই। এই কয়েকটা জিনিসের ব্যাপারে সজাগ থাকতে হয় –সমাজ কোন জিনিসগুলিকে মান্যতা দিচ্ছে, কোন জিনিসটা আমার ধর্মপ্রাপ্তির কারণ, তার মানে কোন জিনিস আমাকে একজন ভাল মানুষ করবে।

ভয়াভয়ে, সাত্ত্বিক বুদ্ধি জানে এই জিনিস থেকে আমার ভয় আছে, এই জিনিসে আমি অভয় পাই। যে জিনিসটাকে নিয়ে আপনার ভয় আছে, সেই জিনিস আপনি কক্ষণই করবেন না। কোথায় ভয় আছে, কোথায় ভয় নেই, এই জিনিসগুলিকে ভাল ভাবে বুঝতে হয়। যেখানে ভয়ের কারণ আছে, সেখানে যেতে নেই। ভয় কার হয়? যখন কেউ একটা জিনিসের সাথে খুব বেশি জড়িয়ে থাকে, ওই জিনিসটা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থেকে তার ভয় হয়। আমরা প্রত্যেকেই নিজের দেহকে খুব ভালবাসি, সেইজন্য মৃত্যুকে আমরা ভয় পাই। দেহের প্রতি যার আসক্তি নেই তার মৃত্যু থেকে ভয় হবে না। নিজের সম্মানের সাথে যে জড়িয়ে আছে, অসম্মানের সম্ভবনা থেকে তার ভয় হবে। কাউকে খুব বেশি ভালবাসে, মা নিজের সন্তানকে খুব ভালবাসে, এত ভালবাসে যে নিজেকে সন্তানের সাথে জুড়ে রেখেছে। যখন ছেলের বিয়ে হয় তখন মায়ের মনে ভয় হয়, এই বুঝি ছেলে আমার হাত থেকে বেরিয়ে গেল।

ভয়-অভয় ভাল করে বুঝে নেওয়া মানে আমাকে বুঝতে হবে কোন জিনিসটা আমাকে উপরের দিকে নিয়ে যাবে। দেখতে হবে আমাকে ভাল মানুষ কে বানাবে। সেইজন্য সামাজিক জিনিসগুলির দিকে বেশি তাকাতে যাবেন না, কে আপনাকে মানল, কে মানল না, তাতে কি আসে যায়। আপনাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁদের প্রচুর পড়াশোনা আছে, কেউ ডাক্তার আছেন, কেউ ইঞ্জিনিয়ার আছেন, প্রফেসরস আছেন। আপনি যখন স্কুলে ছিলেন, তখন কত ছেলে আপনাকে মানত

না, কত ছেলে আপনাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করত, আপনাকে পাত্তা দিত না; এত কিছুর মাঝখান দিয়েও তো আপনি আজ এই জায়গাতে পৌঁছাতে পেরেছেন। ঠিক তেমনি, আজও এসব জিনিসের দিকে বেশি দৃষ্টি দেবেন না। দৃষ্টি থাকবে শুধু নিজের আধ্যাত্মিক উত্থানের দিকে।

আর *বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি,* কোন জিনিস বন্ধনের দিকে নিয়ে যায় আর কোন জিনিস মুক্তির দিকে নিয়ে যায়, এটাকেও ভাল করে বুঝতে হবে। ছোট ছোট কিছু ইচ্ছা মনের মধ্যে থেকে যায়। চেরাপুঞ্জিতে আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন, অনেক আগেকার কথা, ওনার খুব ইচ্ছে ছিল এ্যারোপ্লেনে চাপবেন। তখনকার দিনে এ্যারোপ্লেনে ওঠা বিরাট বড় ব্যাপার। এগুলো খুব সাধারণ ইচ্ছা, এই ধরণের ইচ্ছাগুলির কোন দাম নেই। সমস্যা হয়, এমন এমন কোন ইচ্ছা মনের মধ্যে বাসা বাঁধে যেটা আপনাকে একেবারে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলবে। পুরুষের মনে যে নারীর প্রতি আকর্ষণ, সমস্যা ওটাকে নিয়ে নয়, পুত্রৈষণা, আমার সন্তান হোক, সমস্যাটা সেখানে তৈরী হয়। কোন নারীকে যখন কোন পুরুষ বলে, তোমার সাথে আমি সারা জীবন কাটাতে চাইছি, সমস্যা সেখানে তৈরী হয়। আপনি যে স্বাভাবিক ভাবে বড় হবেন, সেটাকে আপনি এইভাবে আটকে দিচ্ছেন। বড় বৃক্ষ না হয়ে, শিকল দিয়ে বেঁধে আপনাকে একটা বনসাই বানিয়ে দেওয়া হল।

দেওঘরে থাকার সময় সেখানে কোথাও একটা বনসাই দেখেছিলাম, দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল। স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ তখন দেওঘর বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। আমি আমার কাঁচা মন নিয়ে মহারাজকে বললাম, মহারাজ মঠে কিছু বনসাই গাছ লাগালে হয়। মহারাজ খুব অসন্তুষ্ট হয়ে আমাকে বললেন, 'ছিঃ ও-রকম করতে আছে, একটা গাছের শিকড় কাটতে আছে? সবাইকে বড় হওয়ার সুযোগ দিতে হয়'। বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, সেদিন থেকে জীবনে গাছের শিকড় কাটা তো দূরে থাক, গাছের ডালও কাটতাম না, কাউকে কাটতেও দিতাম না। মানুষ হোক, গাছ হোক, সবাইকেই বেড়ে ওঠার সুযোগ দিতে হয়। কখন-সখন ভালর জন্য একটা দুটো ডাল যাতে রোগ ধরে গেছে বা পোকা ধরেছে, কাটতে হত। আমার হাতে নেই, কিন্তু যেখানেই বনসাই দেখি, ইচ্ছে করে ভেঙে দিই। আপনার দু মিনিট সুখের জন্য, একটা বিরাট বৃক্ষ হতে যাচ্ছিল, সেটাকে আপনি কায়দা করে হতে দিলেন না।

কিন্তু এই জিনিসটা আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে করছি, নিজের শিকড় নিজেই কেটে দিচ্ছি, যা এক বিশাল বটবৃক্ষ হতে যাচ্ছিল সেটার শিকড় কেটে পঙ্গু বানিয়ে দিচ্ছি। বিচার করে দেখুন, সবাই আমরা বনসাই হয়ে গেছি। বন্ধন কি, মোক্ষ কি এটাকে ভাল করে বিচার করে দেখতে হয়। সব কিছুতে দেখতে হবে আমি মুক্তির দিকে এগোচ্ছি কিনা, মুক্তির দিকে এগোনটাই লক্ষ্য। কোন কিছুর জন্য মন ছটফট করছে, মিটিয়ে দিয়ে এগিয়ে যান। তবে মিটিয়ে দেওয়ার আগে ভাল করে বুঝে নিন, এটা মেটাতে গিয়ে কোন ঝামেলায় না জড়িয়ে পড়েন, উল্টে যেন আরও দশটা বন্ধনে পড়ে একটা বনসাই না হয়ে যান। *যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী,* যিনি জানবেন প্রবৃত্তি কি, নিবৃত্তি কি, কার্য কি, অকার্য কি, তার সাথে ভয় কি, অভয় কি এবং বন্ধন কি, মোক্ষ কি, বুঝতে হবে তাঁর বুদ্ধিটা সাত্ত্বিক বুদ্ধি। পরের শ্লোকে রাজসিক বুদ্ধির বর্ণনা করছেন।

যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যঞ্চাকার্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী।।৩১।।

(হে পার্থ, যে বুদ্ধি দ্বারা শাস্ত্রবিহিত ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম এবং কর্তব্য ও অকর্তব্য যথাযথরূপে (সম্পূর্ণ নির্ণয়পূর্বক, নিঃসন্দেহরূপে) জানতে পারা যায় না, সেটাই রাজসিক বুদ্ধি।)

সাত্ত্বিক বুদ্ধির পর এবার রাজসিক বুদ্ধি নিয়ে বলছেন। এর আগে বলা হল, আমাদের সবারই বুদ্ধি আছে, কিন্তু কোথায় লাগাতে হবে জানা নেই। অনেক আগে জামশেদপুরে একটা লেকচার দেওয়ার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। ওখানে একজন বয়স্ক মহারাজ ছিলেন, খুব

হিউমারাস্, এখন অবশ্য দেহে নেই, ব্রহ্মচারী অবস্থায় তিনি আমাকে দেখেছিলেন। উনি মজা করে বলছেন, 'গাড়ি চালাতে জানো কিন্তু ব্রেক মারতে জানো তো'? বুঝলাম উনি বলতে চাইছেন, ভাষণ দেওয়া শুরু করার পর থামতে জানি কিনা, যতটুকু টাইম দেওয়া হয়েছে ওর বাইরে বলবে না। আমি বললাম, 'ওটা ভাল জানি মহারাজ'। যাই হোক উনি আমার লেকচার শুনলেন, টাইমে শেষ করেছি দেখে খুব খুশী হলেন।

বুদ্ধি আছে কিন্তু কোথায় লাগাতে হবে জানে না, কোথায় ব্রেক মারতে হবে জানা নেই। কারুর নামে অনেকে বলবে, ওর ট্যালেন্ট ছিল, কিন্তু নষ্ট হয়ে গেল। কিসের ট্যালেন্ট! যারাই বলে, আমার টীচার বলেছিলেন, আমার অনেক ট্যালেন্ট আছে, কিন্তু আমি সুযোগ পেলাম না। তাদের বলতে হয়, আরে ভাই যাদের ট্যালেন্ট থাকে তারা সুযোগ তৈরী করে নেয়, জগতে কেউ কাউকে সুযোগ করে দেয় না। এই জগতে সবাই হল, Big fish eats small fish। সুযোগ আপনাকে নিজেকেই করে নিতে হবে। যারা বলে ট্যালেন্ট ছিল, সুযোগ পাইনি বলে হলো না, বুঝবেন এরা একটা অপদার্থ ছাড়া কিছু না। আপনারও যদি কখন মনে হয়, এটা হতে পারতাম, ওটা হতে পারতাম, এরা হল *অযথাবৎ* ঠিক ঠিক জানে না; বুদ্ধি নেই তা না, আছে, কিন্তু পুরোপুরি বুঝতে পারে না, এরা হল রাজসিক।

যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যঞ্চাকার্যমেব চ, এরা ধর্মটাও জানে, অধর্মটাও জানে, কার্য কি, অকার্য কি সেটাও জানে, কিন্তু জানে *অযথাবৎ*, পুরোপুরি ঠিক ঠিক জানে না। আমাদের চলতি ভাষায় ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, মাছি আর মৌমাছি। মাছি কখন নোংরাতেও বসে, কখন ভালতেও বসে, মৌমাছি শুধু ফুলে বসে। সাত্ত্বিক হল মৌমাছির মত। কাক খুব সেয়ানা, কিন্তু নোংরা খেয়ে মরে। *অযথাবৎ প্রজানাতি*, ঠিক ঠিক জানে না, এরা হল রাজসিক। বুদ্ধি আছে, সেই বুদ্ধিকে কাজে লাগাবে কিন্তু ভুল জায়গায় লাগাবে। যেমন ধরুন যারা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করছে বা অন্য ধরণের ক্রাইম, সাইবার ক্রাইম করছে, এদের বুদ্ধি আছে অস্বীকার করার নেই। কিন্তু সঠিক ভাবে জানে না বুদ্ধিটা কোথায় লাগাতে হবে। এর থেকেও নীচে হল তামসিক বুদ্ধি।

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ স পার্থ তামসী।।৩২।।

(হে পার্থ, যে বুদ্ধি তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে অধর্মকে ধর্ম মনে করে এবং সব বিষয়ে বিপরীতভাবে বোঝে, সেটাই তামসিক বুদ্ধি।)

তামসিক বুদ্ধিকে নিয়ে বলছেন। তামসিক বুদ্ধিটা এমন অন্ধকারে ঢেকে আছে যে, অধর্মটাকেই ধর্ম মনে করে নিয়েছে। যে জিনিসটা নেই, শাস্ত্র যেটা বলছে না, যেটা শাস্ত্রে নেই, বুদ্ধি খাটিয়ে সেই জিনিসটাকেই কায়দা করে নিয়ে আসবে যে, শ্রোতারা মনে করবে –উনি তো ঠিকই বলছেন। ঠাকুরের কাছে একজন আসতেন যে নিজেকে একজন বড় বেদান্তী বলে জাহির করত, অন্য দিকে অনেক নোংরা কাজ করে বেড়াত। ঠাকুর তাকে বলছেন, তুমি একদিকে বড় বড় কথা বল আবার অন্য দিকে এইসব নোংরা নোংরা কাজ কেন কর? লোকটি আবার বলছে, জগৎটা মিথ্যা আমার এই নোংরা কাজগুলোও মিথ্যা। ঠাকুর লোকটির কথা শুনে এত রেগে গেলেন যে, বলছেন, তোমার এই বেদান্ত জ্ঞানে আমি ইত্যাদি করি। এই যে নোংরামি করার দিকে আপনার মন যাচ্ছে, তার মানে আপনার মধ্যে দুর্বলতা আছে, আপনি এটা মেনে নিন। কিন্তু তা না করে নিজের নোংরামিকে কায়দা করে বেদান্তের কথা দিয়ে সাফাই দিচ্ছে, বেদান্তে তো সব মিথ্যা, আমি যেগুলি করছি সেগুলোও মিথ্যা। পুরো জিনিসটাকেই ঘুরিয়ে দিচ্ছে, এটাই তামসিক বুদ্ধি।

তিন প্রকার বুদ্ধির কথা বলার পর এবার তিন প্রকার ধৃতিকে নিয়ে বলবেন। ধৃতি হল ইন্দ্রিয়গুলিকে ধরে রাখার শক্তি। খুব পরিশ্রান্ত কিন্তু তখনও ইন্দ্রিয়গুলিকে ধরে আছে। সারাদিন

খাটাখাটনির পর বাড়ি ফিরে একজন সঙ্গীত শিল্পী রেওয়াজ করতে বসে যাবেন। একজন চিত্রশিল্পী ক্যানভাস আর রং তুলি নিয়ে ছবি আঁকতে বসে যাবেন। জীবনে যদি কোন কিছুর প্রতি আপনার সত্যিকারে ভালবাসা থাকে, কোন কিছুর প্রতি যদি সাংঘাতিক ভালবাসা থাকে, তখন দেখা যাবে ওই জিনিসের ব্যাপারে আপনার পুরোপুরি ধৃতি থাকবে। মা যেমন নিজের সন্তানকে খুব ভালবাসে। মার যতই শরীর খারাপ থাকুক, যতই পরিশ্রান্ত হয়ে থাকুক, সন্তান যেমনি এসে বলবে, মা খুব খিদে পেয়েছে; মা সঙ্গে সঙ্গে উঠে সন্তানের খাওয়ার ব্যবস্থা করবেই করবে। একজন সতী স্ত্রী তার স্বামীকে খুব ভালবাসে, যতই তার শরীর পরিশ্রান্ত থাকুক স্বামীর জন্য সে আবার যে কোন কাজে নেমে যাবে।

আদর্শ এর থেকেও উঁচু। কোন আদর্শকে যদি কেউ ভালবাসে, যেমন গান্ধীজী আদর্শকে ভালবাসতেন। নেতাজী আদর্শকে ভালবাসতেন। ওই আদর্শের জন্য এনারা যে কোন জিনিস করে দিতে পারবেন। নেতাজী বললেন, আমি ভারতকে স্বাধীন করব, এই একটি আদর্শের জন্য তিনি জীবনের সব কিছু ত্যাগ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আমি একজনকে জানতাম, উনি পেইন্টিং করতে খুব ভালবাসতেন। অফিসের কাজকর্ম করে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরতেন। কিন্তু তারপরেই তিনি তুলি আর রং নিয়ে পেইন্টিং শুরু করে দিতেন। রাতে দু-এক ঘন্টা ঘুমোতেন আর সারা রাত পেইন্টিং করে যেতেন।

আপনাকে খুব ভাল করে দেখতে হবে, এমন কি কি জিনিস আপনার জীবনে আছে, আপনি যতই ক্লান্ত থাকুন, ওই জিনিসটা আপনাকে তরতাজা করে দেয়। ভালবাসা আপনাকে তুলে ধরে, আর আদর্শ গেল আর-একটা উঁচু দিক। এর থেকেও আরও যেটা তুলে ধরে, যখন আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়ে আছেন, আপনাকে শয্যাশায়ী করে দেওয়া হয়েছে, তখনও কিছু কিছু শক্তি আপনাকে ওই অবস্থাতেও তুলে ধরে। মানুষের ভিতরে এই রকম চার প্রকার শক্তি কাজ করে, প্রথমটা হল শরীরের শক্তি, দ্বিতীয় হয় ইমোশান, এটা হল মনের একটা বিশেষ শক্তি যেখানে ভালবাসা জড়িয়ে আছে। তৃতীয় হল, যেখানে মরালিটি রয়েছে। চতুর্থ হয় যেখানে ঈশ্বরের ব্যাপার আসে।

একজন মহিলা, তাঁর শরীর স্বাস্থ্য ভাল, হঠাৎ খবর পেলেন তাঁর সন্তান গত হয়েছে, দেখা যাবে তিনি উল্টে পড়ে যাচ্ছেন। তার মানে শরীরের শক্তি যে কাজ করে, তার থেকে বেশি শক্তি কাজ করে ইমোশানে। বাচ্চাকে যদি তার মার কাছ থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়, বাচ্চার শক্তি ক্ষীণ হয়ে যাবে। সেইজন্য যদি দেখা যায় একজনের শক্তি কমে যাচ্ছে, বুঝতে হবে ওর এখন একটু ইমোশানাল সাপোর্ট দরকার। আপনার আশেপাশে যাঁরা আছেন বা এই সময় আপনিও তাকে একটু ইমোশানাল সাপোর্ট দিতে পারেন, তবে জড়িয়ে না গিয়ে দিতে হবে। কারণ জড়িয়ে গেলে আপনাকেও সে ডুবিয়ে দেবে। যাঁরা খুব ভাল সাঁতার জানেন, তাঁরা কখন জলে ডুবে যাওয়া মানুষকে ওই ভাবে সরাসরি বাঁচাতে যান না। হয় তার চুলটা ধরে নেন, নয়তো একটা লাঠি এগিয়ে দেবেন ধরার জন্য। কারণ ওকে যদি সরাসরি ধরে নেয়, ওই ডুবন্ত লোকটি তাকেও ডুবিয়ে দেবে, যত ভালই সাঁতার জানুক ডোবাবেই তাকে বাঁচার কোন পথ থাকবে না। ঠিক তেমনি ইমোশানাল সাপোর্ট ততটাই দিতে হয়, যতটা দিলে আপনিও ডুবে যাবেন না, সেও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। দেখবেন আস্তে আস্তে তার সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

যদি দুটোই আপনার সমস্যা হয়ে থাকে, শরীরে শক্তি নেই, ইমোশানসের দিক থেকেও আপনি দুর্বল, তখন নিজেকে নিয়ে ভাবতে হয় – আর যাই হোক আমি তো কোন পাপকর্ম করিনি। যাদের পাপপূণ্যের বোধ আছে, তাদের এই জিনিসটা খুব কাজ করে। পাপ বোধ যাদের হয়, তার পঙ্গু হয়ে যায়, সেইজন্য পাপ বোধ কক্ষণ আসতে দিতে নেই। করতে হলে পরিষ্কার করে বলতে হয়, বেশ করেছি। পাপ বোধ মানুষের সব থেকে বড় দুশমন, তার থেকে বলে দেওয়া ভাল, করেছি বেশ করেছি যাঃ। গানে বলছেন, মায়ের নাম করেছি, আমার আবার কিসের পাপ। এটা হল চতুর্থ

শক্তি, এটাই আধ্যাত্মিক শক্তি। সত্যিকারের যদি ঈশ্বরকে আপন মনে করেন, তাহলে তো হয়েই গেল, আমি ঈশ্বরের সন্তান, আমার আবার কিসের পাপ। আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি, আমার আবার অন্য কারুর ভালবাসার কি দরকার! দেখবেন এমনিতেই শরীরে শক্তি এসে যাবে।

সাধন জীবনে একবার যদি এগিয়ে যাওয়া শুরু হয়, দেখা যাবে জীবনে তখন অনেক ওঠানামা চলতে থাকবে। স্বামীজীও দেববাণীতে এই কথা বলছেন, সাধন জীবনে অনেক বেশি ওঠা নামা হয়। অনেক বেশি ওঠা নামার পর যখন একটা স্থিতি আসতে শুরু হবে, তখন মনে হবে জীবনে কেউ আমার পাশে থাকল না; ঠিকই, কেউ পাশে থাকবে না। আজকে মনে হচ্ছে কেউ পাশে আছে, এইজন্য মনে হচ্ছে কারণ আপনার জীবন এখন খুব ধীরে ধীরে চলছে। আপনি আধ্যাত্মিক জীবনে এগোচ্ছেন কিনা, তার একটা লক্ষণই হল, দুম্ দুম্ করে ওঠা নামা হতে থাকবে, এই ভাল, এই খারাপ। এই সব কিছু দিয়ে আপনাকে দেখিয়ে দেবে এই জীবনে কেউ আমার নয়; সংসারে আপন বলে কিছু হয় না। এত দিন যে শুধু বহির্জগতে সুখের সন্ধানে দৌড়াচ্ছিল, সে যখন নিজের অন্তর্যামীর দিকে মুখ ফেরায় এবং তখন বুঝে যায়, সব সুখ আমার এই অন্তরে, সমস্ত শক্তির কেন্দ্র এখানে, এটা একটা super generator।

ধৃতি যদি আনতে হয় তাহলে এই চারটে জিনিস দরকার – শরীরের শক্তি এতটা হতে হবে যাতে তার ক্লান্তি আসবে না, মনে ভালবাসাটা রাখতে হবে, আশেপাশে বন্ধুবান্ধব রাখতে হবে যাতে মনটা সব সময় চাঙ্গা হয়ে থাকে, মনে সব সময় এই বোধটা রাখতে হবে, আমি তো কোন পাপ করিনি, আমি ভুল কিছু করিনি, আমার কিসের শোক; আমার প্রিয়জন মারা গেছে বা ছেড়ে চলে গেছে এতে আমার কোন হাত নেই, সে আমার দোষে থোরাই মারা গেছে বা আমার এই ক্ষতি হয়েছে সেটাকি আমার দোষে হয়েছে, আমি তো ঠিকই ছিলাম, তাতেও যদি আমার দোষ হয়ে থাকে, ঠিক আছে বেশ করেছি যাঃ, আমার আর ঈশ্বরের মাঝখানে একটা জিনিস হয়েছে, সেখানে আপনি ঢোকার কে। ভগবান প্রথমে সাত্ত্বিক ধৃতির বর্ণনা করছেন।

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।।৩৩।।

(হে পার্থ, ব্রহ্মে নিত্যসমাধি-অনুগতা ধৃতি দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসমূহ শাস্ত্রমার্গে বিধৃত হয়, এটাই যোগের দ্বারা ধৃতি। এই প্রকার ধৃতিই সাত্ত্বিকী।)

ধৃতি মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়কে ধরে রাখে, ক্লান্ত হতে দেয় না। ধরে রাখা, এই জিনিসটাকে আচার্য খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করছেন, *শাস্ত্রমার্গপ্রবৃত্তেঃ ধারয়তি*, শাস্ত্রের যে পথ, আপনার যে জীবন পথ, এটাকে ধরে রাখাটাই ধৃতি। অনেকে বলতে পারেন, শাস্ত্র বলতে তো গীতা আছে, উপনিষদ আছে, কথামৃত আছে, আমরা কোনটা শুনব? আপনি ঠিক করে নিন আপনি কি চাইছেন। আপনার যে পথ ওটা আপনারই পথ, ওই পথ কারুর সাথে মিলবে না। আপনার ওই পথকে যদি ছাড়েন, আপনার ক্লান্তি এসে যাবে। আপনার কাছে পরিষ্কার – জীবনে আমি এটাই চাই। জর্জ বার্ণার্ড'শ খুব সুন্দর বলেছিলেন, তুমি লেখক হতে চাও? তোমার বাড়িতে খাওয়ার কিছু নেই, হাতে একটি পয়সাও নেই, তোমার নবজাতক সন্তান খিদেয় কাঁদছে আর সেই অবস্থায় তোমার স্ত্রীর বুকের দুধ বার করে বাজারে সেই দুধ বিক্রি করে সেই পয়সা দিয়ে কালি কিনে এনে লেখার যদি দম থাকে, তবেই তুমি লেখক হতে পারবে। প্রথম বার এই লেখাটা পড়তে গিয়ে আমি কেঁপে উঠেছিলাম।

আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণদের কেন এত সম্মান করা হয়? এই কারণেই সম্মান করা হয়। সন্ন্যাসীরা কেন এত সম্মান পান? এই কারণেই সম্মান পান। সন্ন্যাসীরা বাবা, মা, ভাই, বোন, আত্মীয় সবাইকে বিক্রি করে দিয়ে সেটা দিয়ে ঈশ্বরের নামটা কিনে নিয়েছেন। বিক্রি করা মানে ছেড়ে দেওয়া। ব্রাহ্মণরা সব রকম সুখ ছেড়ে দিলেন, বদলে তাঁরা শাস্ত্র কিনে নিয়ে এলেন। আমরা

সবাই কিছু না কিছু হতে চাইছি, কেউ লেখক হতে চাইছে, কেউ গায়ক হতে চায়, কেউ বড় অভিনেতা হতে চায়, কিন্তু তার জন্য আপনি কি মূল্য দিতে প্রস্তুত? ভগবান যদি বলেন, তুমি লেখক হতে চাইছ তো, তোমার লেখা বই খুব নাম করবে, কিন্তু তার বিনিময়ে তোমার একটা পা চলে যাবে, তুমি রাজী তো? আপনি রাজী আছেন? ইমোশানালি আমরা বলে দেব, হ্যাঁ রাজী, আসলে না। আমি যদি কোন কিছুকে খুব গভীর ভাবে ভালবাসি, একেবারে পরিষ্কার ভালবাসা, তখন দেখবেন আপনার মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের যে ক্রিয়া হবে, সেখানে এরা আপনাকে ক্লান্ত হতে দেবে না।

যাঁরা সত্যিকারের গানকে ভালবেসে একটা বিরাট উচ্চতায় চলে গেছেন, তাঁদের জীবনের ইতিহাস ঘাটলে অনেক অবাক করা ঘটনা বেরিয়ে আসবে। বিসমিল্লা খাঁ কাশীর গঙ্গার এক ঘাটে চুপচাপ বসে বাজিয়ে যাচ্ছেন, আশেপাশে কোন শ্রোতা নেই, তিনি নিজের মনে বাজিয়ে যাচ্ছেন। আমার ক্রতু বইতে এই জিনিসটাকে আমার মত করে সাজিয়ে উপস্থাপন করেছি। গঙ্গার ঘাটে বাচ্চারা স্নান করতে এসে গেছে, বিসমিল্লা খাঁর বাজনা শুনে 'জিও রাজা' বলে গঙ্গায় ঝাঁপ মারছে। পাশে একটা পানওয়ালা বসে পানের খিলি সাজছে আর মাঝে মাঝে 'বাঃ ওস্তাদ' বলে বাহাবা দিচ্ছে। একটা ইন্টারভিউতে বিসমিল্লা খাঁ নিজেই এই ঘটনা বলছিলেন। সারা রাত ধরে এটাই করে যাচ্ছেন, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এটাই করে যাচ্ছেন।

সত্যিকারের যাঁরা পেইন্টার তাঁরা টাকা-পয়সা, সম্মান কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করেন না। ভ্যান গগ্ তো না খেয়েই মারা গেলেন। যাদের টাকা-পয়সা আছে, ক্ষমতা আছে, প্রতিপত্তি আছে, কিন্তু এখানে তপস্যাটা কোথায়? তপস্যার ফলটা আপনি পাচ্ছেন, তপস্যা হল যেখানে সব কিছু দিয়ে যাচ্ছেন। একটা আদর্শের প্রতি পুরোপুরি উৎসর্গিকৃত না থাকলে ধৃতি আসবে না। এখানে অব্যাভিচারিণী ধৃতির কথা বলছেন, কথামৃতে আমরা অব্যাভিচারিণী ভক্তির কথা পাই।

যাঁরা সাত্ত্বিক হন, তাঁরা ভাল করে জানেন আমাকে এটাই করতে হবে, এটাই আমার প্রাণ। এটাকে কে ভাল বলবে, কে মন্দ বলবে, দু-চারজন যাদের আপনি ভালবাসেন, তারা হয়ত ভাল বলবে। তাদের বাইরে কে কি বলল, না বলল, তাতে কি এসে যায়। শুধু লেগে থাকা না, পুরো উৎসাহের সাথে লেগে থাকা। গীতা হল শাস্ত্র, গীতা আমাদের সামাজিক জ্ঞান দেয় না, গীতা মানুষকে মোক্ষের দিকে নিয়ে যায়। তার মানে যিনি জপধ্যান নিয়ে থাকেন, আজকে শরীর ভাল লাগছে না, আজ জপধ্যান করতে ইচ্ছে করছে না, সাত্ত্বিক ধৃতি এই রকম কখন হতে দেবে না। আমি এটাকেই ভালবাসি, হে ঈশ্বর আমি তোমাকেই ভালবাসি, এই ভাবটা সাত্ত্বিক ধৃতিতে সব সময় থাকবে।

রাজসিক ধৃতি কি করে? বাকি যে তিনটে পুরুষার্থ, ধর্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনটে পুরুষার্থের দিকে স্থির রাখে। পরের শ্লোকে এই রাজসিক ধৃতির কথাই ভগবান বর্ণনা করছেন।

যয়া তু ধর্মকার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেহর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী।।৩৪।।

(হে পার্থ, মানুষ যে ধৃতি দ্বারা ধর্ম, অর্থ ও কামকে নিত্য কর্তব্য রূপে অবধারণ করে এবং উচ্চ ধর্মাদি সম্পাদনকালে কর্তৃত্বাদি-অভিনিবেশপূর্বক ফলাকাঙ্ক্ষী হয়, সেটাই রাজসিক ধৃতি।)

সাত্ত্বিক ধৃতি মোক্ষের দিকে নিয়ে যায়, আমরা এটাকে সাধারণ অর্থে বোঝালাম। কিন্তু এই যে ধর্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনটের প্রতি যার ধৃতি, এটা রাজসিক ধৃতি। ধর্ম, অর্থ আর কামকে সামনে রেখে ঠিক করে নেয়, আমাকে এটা করতে হবে, আর এগুলো থেকে সে ফল পেতে চাইছে। আলেকজাণ্ডার মেসিডোনিয়া থেকে এগোতে শুরু করেছে। কিন্তু তাতে লোকজন মারা যাচ্ছে, নিজের আপনজনরা মারা যাচ্ছে, কিন্তু আলেকজাণ্ডার এগিয়ে যাচ্ছে, তার প্রবল ইচ্ছা, আমি সারা বিশ্বের

রাজা হব। সব রকম বাধা বিপত্তিকে এই প্রবল ইচ্ছা উপেক্ষা করে সে এগিয়ে চলেছে, আমাকে সারা বিশ্বের, পুরো বিশ্ব না হলেও গোটা এশিয়ার আমি রাজা হব। তিনটে পুরুষার্থের মধ্যে এটা হল অর্থ বা কাম বলা যেতে পারে, কিছুটা কামনা আছে, লোকেরা আমাকে মানুক জানুক। ধর্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনটে করতে গিয়ে আপনার যদি অবসাদ না আসে, অবসন্ন যদি না হন, তাহলে বুঝবেন আপনার মধ্যে যে ধৃতি এসেছে, এটা রাজসিক ধৃতি।

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী।।৩৫।।

(হে পার্থ, দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি যে ধৃতি দ্বারা নিদ্রা, ভয়, প্রিয়বিয়োগ নিমিত্ত শোক, অবসাদ ও মদ পরিত্যাগ করে না, তাদেরকে ধারণ করে থাকে, সেটাই তামসিক ধৃতি।)

আর-এক প্রকার ধৃতি আছে, যে ধৃতি দিয়ে মানুষ স্বপ্ন দেখা, ঘুমিয়ে থাকা, শোক, বিষাদ আর অহঙ্কার, এগুলোকে ধরে রাখে, ছাড়তে চায় না। এখানে যেন আমাদের অবস্থারই বর্ণনা করছেন। *স্বপ্নং,* স্বপ্ন দেখলেই বলতে থাকবে – কাল কি দারুণ স্বপ্ন দেখলাম, কাল কি বাজে একটা স্বপ্ন দেখেছি। *ভয়ম্,* ভিতরে একটা ভয় ভাব আছে, ওই ভয়টাকে কিছুতেই ছাড়বে না। *শোকম্,* একটা যদি শোকের কারণ পেয়ে যায়, আর সেই শোককে ছাড়তে চাইবে না; কেঁদে ভাসিয়ে দেবে। মহারাজ জীবনে কিছু হচ্ছে না, একটু কৃপা করবেন। এগুলো কিছু না, কোন ইচ্ছে টিচ্ছে নেই, আপনি শোককে ধরে রাখতে চাইছেন, আপনি কাঁদতে চাইছেন। কিন্তু কান্নাটাকে একটু dignify করার জন্য বলছেন, মহারাজ কবে যে ঠাকুর একটু কৃপা করবেন। মহারাজ আমাদের কি কোন দিন কিছু হবে না? আপনি শোক করছেন। কেন ঠাকুরও তো কান্নাকাটি করতেন। আপনি কি ঠাকুর? ব্যাকুলতা আর শোক কি এক?

বিষাদং, অবসাদ; শোক আর বিশাদে তফাৎ আছে। বিষাদ হল depressive tendency, একবার কোন কারণে বিষাদ ভাব এসে গেলে সেটাকে আর ছাড়তে চাইবে না। সে কেন আমার সাথে এই রকম করেছিল? কবে দশ বছর আগে কে কি একটা করেছিল, এখনও সেটা মাথায় বন্ বন্ করে ঘুরছে, একটু সুযোগ পেলেই মনটাকে বিষাদে ভরিয়ে দেবে। আমার টিয়া বইতে লিক্টনস্ নামে একটা চরিত্র আছে, ওর কান্না শুরু করার একটা শুধু অজুহাত চাই, কান্নাতেই সুখ পায়।

তামসিক ধৃতির আরেকটা হল মদ, মদ হল বিষয় সেবন, এটাকেই তারা জীবনের শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্য মনে করে। কাম আর বিষয় সেবন, দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে, কাম আলাদা জিনিস, বিষয় সেবন আলাদা জিনিস। *ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী,* ভোগ ছাড়া কিছু বোঝে না, বিষয়াসক্তি ছাড়তেই পারে না। মদ কি রকম? আচার্য বলছেন, *আত্মনো বহু মন্যমানো মত্ত ইব মদম্,* তুমি জানো আমি কে, তুমি জানো আমি কি করতে পারি? আমাকে কি যা তা মনে করেছ? এটাকে বলছেন মদ, এটাকে তমোগুণীরা ছাড়তে পারে না।

ঠাকুর বলছেন, এই জিনিসগুলিকে মোর ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু গীতা অন্য শাস্ত্র, গীতা এখানে পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিচ্ছেন সাত্ত্বিক বুদ্ধি কি, সাত্ত্বিক ধৃতি কি, রাজসিক বুদ্ধি কি, রাজসিক ধৃতি কি, তামসিক বুদ্ধি কি রকম হয়, তামসিক ধৃতি কি রকম। যে জিনিসটা আপনাকে মোক্ষের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এবং সেখানে আপনাকে যে জিনিসটা ধরে রাখছে, সেটার জন্য উৎসাহ দিচ্ছে, এটা হল সাত্ত্বিক ধৃতি। যেটা আপনাকে ধর্ম, অর্থ ও কামের দিকে নিয়ে যায়, খুব পরিষ্কার বোঝা যায় এই ধৃতি রাজসিক আর সংসারে যেটা আপনাকে ভোগাসক্ত করে রাখছে, সেটা তামসিক ধৃতি। সন্ন্যাসী আর সংসারী, দুজনের মধ্যে তফাৎ কি? সংসারী ত্যাগ করে যাতে আরও ভাল ভাবে ভোগ করতে পারে আর সন্ন্যাসী কদাচিৎ কখন সখন ভোগ করে যাতে সে পুরোপুরি ভাবে ওটাকে ত্যাগ করে ভোগ থেকে বেরিয়ে এসে অনাসক্ত হতে পারে। দুজনের মধ্যে এটাই বিরাট তফাৎ। সন্ন্যাসী

পুরোদমে ত্যাগের দিকে এগোচ্ছে, কখন কিছু হয়ে গেলে, উঁকি মেরে দেখে নেয়, জিনিসটা এই, দেখে নিয়ে সেটাকে ওখানে ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে গেল।

আমাদের বয়স তখন অল্প ছিল, ভারত তখন খুব গরীব। তখনকার দিনে গ্রামের কোন বাড়িতে শ্রাদ্ধ বা অন্য কোন উপলক্ষে ভোজ হবে, গ্রামের লোকেরা সেদিন দুপুর থেকেই খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেবে, কারণ রাতে যাতে ভাল ভাল খাবার বেশি করে খেতে পারে। দুপুরে খাচ্ছে না দেখে আমরা মনে করতুম, বাবা এরা কত ত্যাগী দুপুরে কিছুই খেল না। কেন খাওয়াটা ছাড়ছে? রাত্রে যাতে জমিয়ে খেতে পারে। সংসারী আর সন্ন্যাসীর মধ্যে এই তফাৎ। তামসিক লোক মানেই তাই, ভোগ ছাড়া কিছু বোঝে না, বিষয় সেবন ছাড়া আর কিছু জানে না। তামসিকদের ধৃতি হল নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ, মদ এবং বিষয় সেবনে লেগে থাকে।

গীতার শেষ অধ্যায়ে ভগবান খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করে দেখাচ্ছেন, আমাদের জীবনের সব কিছুতে কিভাবে সত্ত্ব, রজো ও তমো মিশে আছে। ঠাকুরও কথামৃতে ভক্তি ও ভক্তের কথা বলতে গিয়ে সত্ত্ব, রজো ও তমোর কথা বলছেন। এই তিনটে গুণ হিন্দু ধর্মের সব কিছুতে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জুড়ে আছে। জ্ঞান তিন প্রকার, কর্ম তিন প্রকার, কর্তা যিনি তাঁর মধ্যেও এই তিনটে গুণের ভাব থাকে, এইভাবে বলতে বলতে বুদ্ধি কিভাবে তিন প্রকার হয়, বুদ্ধির থেকেও বেশি ধৃতি, সব কিছু তিনটে গুণের নিরিখে তিন প্রকার হয়। ধৃতি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি, আমাদের শরীরের অঙ্গগুলিকে ধারণ করে রাখে, আমরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি, কাজ করতে ইচ্ছে করছে না, তখন ধৃতি আমাদের চাঙ্গা করে দেয়।

আপনারা হয়ত নিশ্চয় জেনে থাকবেন, যে কোন দেশের মিলিটারিতে সেখানকার সাধারণ লোকেদেরই নেওয়া হয়। আমেরিকাতে তো সব সময় মিলিটারিতে রিক্রুটমেন্ট নোটিশ লাগানো থাকে। ভারতবর্ষেও মিলিটারিতে রিক্রুটমেন্টের সময় কয়েকটা বেসিক গুণাবলী ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ঠিক করে রাখা হয়, কারণ সবাইকে তো আর মিলিটারিতে নেওয়া যাবে না। কিন্তু রিক্রুটমেন্ট হওয়ার পর শুধু ট্রেনিং দিয়ে দিয়ে তাদের সবাইকে ফাইটারস বানিয়ে দেয়। প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয় প্রথা ছিল, এনারা সমাজের রক্ষার জন্য নিজের জীবনকে লাগিয়ে দিতেন। ক্ষত্রিয়দের বাচ্চা বয়স থেকে অস্ত্র শিক্ষা করতে হত, গীতাতে বলছেন, অস্ত্র শিক্ষার প্রতি ক্ষত্রিয়দের আগ্রহ তাদের স্বভাবেই চলে আসছে। কিন্তু বর্তমান কালে এই ব্যাপারটা উঠে গেছে, আমরা এখন জানি শুধু ট্রেনিং দিয়ে যে কোন জিনিস করানো যায়। মন যখন আপনার ভাল থাকে, সেই সময় দেখবেন আপনি যে কোন কাজ খুব সুন্দর ভাবে গুছিয়ে করতে পারছেন। আর মন যদি খারাপ থাকে, খুব সুন্দর ভাবে গুছিয়ে যদি কাজ করেন দেখবেন আপনার চঞ্চল মনটাও ধীর স্থির হয়ে গেছে।

অনেক দিন থেকে আমার একটা স্বভাব দাঁড়িয়ে গেছে, রোজ স্নান করে সব জামা-কাপড় ধুয়ে শুকোতে দিয়ে দিই। এরপর সব কাজ সেরে ঘরে এসে, যতই ক্লান্ত হয়ে থাকি না কেন, ধোয়া জামা-কাপড়গুলি সুন্দর করে ভাজ করে ঠিক জায়গায় গুছিয়ে রাখি। মহারাজরা আমাকে দেখে বলেন, আপনি ইস্ত্রি কোথা থেকে করান? কিন্তু কোন দিন আমার জামা-কাপড় আমি ইস্ত্রি করাই না। অনেক আগেকার কথা, একজন মহারাজ, আমারই সমবয়সী, উনি দেখছেন ফিরে এসে আমি সুন্দর করে জামা-কাপড় ভাজ করছি। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি রোজ এই রকম করে সব জামা-কাপড় ভাজ করেন'? 'হ্যাঁ রোজ করি'। শুনে উনি আমাকে বলছেন, 'আপনার বৃদ্ধাবস্থা খুব ভাল কাটবে'। তখন আমার বয়স কম ছিল, শুনে আমার খুব ভাল লাগল, ভাল কথা শুনলে সবারই ভাল লাগে, আমারও ভাল লাগে। কিন্তু এটা আমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে, বিশেষ করে যখন দেখি মনটা একটু চঞ্চল হয়ে আছে, ক্লান্তি লাগছে, তখন গুছিয়ে কাজ করা আমি অবশ্যই করি।

আমার সম্পত্তি এই দুটো মাত্র জিনিস –মনের শান্তি আর হাতের সময়, ইংলিশে time and tranquility। আপনার আর কোন সম্পদ নেই; টাকা-পয়সা, ভাই, বন্ধু কেউ কাজে লাগবে না, এই দুটি জিনিসই কেবল আপনার সম্পদ – time and tranquility, এই দুটোকে কখন নষ্ট হতে দিতে নেই, সময় নষ্ট হতে দিতে নেই আর মনের শান্তি নষ্ট হতে দিতে নেই। নিজের মনের শান্তি এবং সময়ের অপচয় না হতে দেওয়া, এই দুটোকে যে ধরে রাখা, এটা ধৃতি দিয়ে হয়। আগে এর বর্ণনা আমরা বিস্তারে করেছি।

এবার এই সমস্ত কিছুর ফল নিয়ে আসছেন। এগুলো করলে কি হয়? এই যে কর্তা, কর্ম, জ্ঞান, বুদ্ধি, ধৃতি এই সমস্ত কিছুর ফল সব সময় হয় সুখ। মানুষ সুখের সন্ধানেই সব কিছু করে। যারা আত্মহত্যা করতে চাইছে, তারা মনে করছে আমার বর্তমানে যা অবস্থা চলছে, এটাকে আর নেওয়া যাচ্ছে না, কোন সুখ নেই জীবনে, মরে গেলেই সুখ পাবো। মানুষ সুখের সন্ধানেই সব কিছু করে। মদ যারা খায়, তারাও সুখের সন্ধানেই খায়। ড্রাগ যারা নেয়, সুখের সন্ধানেই নেয়। ড্রাগ নিয়ে, মদ খেয়ে সবাই বুঁদ হয়ে থাকে, মনে করছে এতেই সুখ। সুখের সন্ধানে ড্রাগ বা মদ ভুল পথ। একটু পরেই আমরা দেখব এটা কেন ভুল। অন্য দিকে যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হলেন, উনি সুখে প্রতিষ্ঠিত। ঠাকুরের গলায় কঠিন ব্যাধি, কিন্তু তাও তিনি অবিরাম মায়ের কথা বলে যাচ্ছেন, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করে যাচ্ছেন; কারণ, ঈশ্বরেই এনাদের সুখ। স্বামীজী হিন্দু ধর্মের প্রচারের জন্য নেমে পড়লেন, বিদেশ গেলেন, কত বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে, কত কষ্ট, কিন্তু তাও তিনি এই কাজে লেগে থাকলেন, এটাতেই তিনি সুখ পাচ্ছেন। আমরা সবাই সুখের সন্ধানেই সারা জীবন ধরে শুধু দৌড়ে যাচ্ছি। গীতায় ভগবান এবার সুখের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিন প্রকার সুখের কথা বলছেন। কি কি সেই তিন প্রকার সুখ – সাত্ত্বিক সুখ, রাজসিক সুখ আর তামসিক সুখ।

সুখেরই আর-একটা নাম হয় আনন্দ। আনন্দ আর সুখের মধ্যে তফাৎ হল, যেটা ভিতর থেকে আসে সেটা হয় আনন্দ, সুখ বাইরে থেকে আসে। গীতায় এখানে যে সুখের কথা বলছেন, এটা বাইরের সুখের কথাই বলছেন, যার ফল আনন্দেই নিয়ে যায়। তবে আনন্দ সব সময় ভিতর থেকেই আসে, আনন্দ বাইরে থেকে আসে না। আমরা প্রায়ই কথায় কথায় বলে থাকি, ভাই তোমাকে দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে, আসলে এখানে হয় সুখ। যে কোন জিনিস যেটা বাইরে থেকে আসে, কোন ব্যক্তি, কোন বস্তু থেকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে সুখ আসে, এই সুখ বাইরে থেকে আসে। আনন্দ ভিতর থেকে হয়, যেখানে সবটাই মনের ব্যাপার। বিশেষ করে ধর্ম পালনের যে সুখ, জপধ্যানের যে আনন্দ, সমাধির যে আনন্দ, ঈশ্বরীয় যে আনন্দ, এটাকে আনন্দ বলি, বাকি গুলিকে সুখ বলি।

তবে শব্দগুলিকে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন ঠাকুর বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দের কথা বলছেন। যখন বিষয়ের আনন্দ হয়, এটাকে ঠাকুর আনন্দ বলছেন, আসলে বিষয়ে থেকে সুখ হয়। ঈশ্বরের নামগুণগান করার যে সুখ, পূজা অর্চনা করার যে সুখ, জপধ্যান করার যে সুখ, শাস্ত্রীয় কথা শোনার যে সুখ, শাস্ত্রে রমণ করার যে সুখ, এই সুখকে ঠাকুর ভজনানন্দ বলছেন। অনেকে শ্রোতাদের আমি জানি, যাঁদের অনেকেই নিজেদের বাড়ির পরম্পরায়, অনেকে আমাদের এই ক্লাশগুলি নিয়মিত শুনে রোজ বাড়িতে গীতা পাঠ, চণ্ডী পাঠ, জপধ্যান করছেন, শুনে খুব ভাল লাগছে। বিশেষ করে যাঁদের বাড়িতে অশান্তি আছে বা জীবনে অশান্তি আছে, বা মনে করছেন শক্তি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, তাঁদের জন্য পারায়ণ রূপে চণ্ডী পাঠ, প্রথম অধ্যায় থেকে ত্রয়োদশ অধ্যায় রোজ একটা দুটো করে অধ্যায় পাঠ করতে হবে। আজকে প্রথম অধ্যায়, পরের দিন দ্বিতীয়, তারপরের দিন তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় এই ভাবে ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত পাঠ করে যেতে হবে। যদি সময় হয় তাহলে একদিনে পুরো চণ্ডী পাঠ করতে পারেন। যদি আরও বেশি সময় থাকে তাহলে অর্গলা, কবচ, কীলক পুরোটাই করবেন। নিজে থেকেই দেখবেন শক্তি আসছে। আমাদের অনেক মহারাজরা

নিয়মিত চণ্ডী পাঠ করেন। আমরা মজা করে বলি, এমনিই তেজ সামলানো যায় না, তার মধ্যে আবার চণ্ডী পাঠ! সাধুরাও এক অপরের সাথে হাসি মজা করেন।

ব্রহ্মানন্দ হল যাঁরা সিদ্ধ পুরুষ তাঁদের জন্য, যেখানে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করছেন, ঈশ্বরকে নিয়ে সর্বদা মজে থাকেন। গীতাতে যে সুখের কথা বলা হচ্ছে, সেখানে ব্রহ্মানন্দের কথা বলছেন না, ওটা আত্মজ্ঞান। ভজনানন্দকে বলছেন সাত্ত্বিক সুখ, বিষয়ানন্দ আবার দুটো ভাগে চলে, একটা রাজসিক সুখ আরেকটা তামসিক সুখ। এগুলোকে বিভিন্ন আচার্য বিভিন্ন ভাবে বলবেন, এটাই স্বাভাবিক। তিন প্রকার সুখের কথা বলার আগে ভগবান বলছেন।

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি।।৩৬।।

(হে অর্জুন, এখন আমার নিকট তিন প্রকার সুখের বিষয় শ্রবণ কর। যে সুখের দীর্ঘ অভ্যাস (অনুশীলন) দ্বারা মানুষ প্রীত ও পরিতৃপ্ত হয় এবং যে সুখ প্রাপ্ত হলে সব দুঃখ থেকে সম্যগ্‌রূপে মুক্ত হয়।)

এই যে এতক্ষণ এত কিছুর বর্ণনা করা হল, কর্তা, ক্রিয়া, কর্ম, বুদ্ধি, ধৃতি, সব কিছুই করা হয় একটা ফল পাওয়ার জন্য। কি ফল? সুখ। হে ভরত বংশের ঋষভ, তোমাকে আমি এবার বলব এই সুখ কিভাবে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হয়। এত কাঠখড় পুড়িয়ে সুখটাই যদি এলেমেলো হয়ে যায়, তাহলে কি আর লাভ হল।

জীবনে আমরা সবাই সুখ পেতে চাইছি, আপনিও পেতে চাইছেন, আমিও পেতে চাইছি। কিন্তু সুখ জিনিসটা কি? কখন কি আমরা ভেবে দেখেছি সুখ জিনিসটা কি? এই হল শাস্ত্র, অত্যন্ত সাধারণ জিনিসগুলিকে ব্যাখ্যা করেন, একবার যদি আমরা শাস্ত্রের মর্মার্থটা বুঝে নিতে পারি, আমাদের জীবনটা পাল্টে যাবে। শাস্ত্র আমাদের জীবনকে পাল্টে দেয়। জীবনে নামানোর কথা বলা হচ্ছে না, জীবন যদি পাল্টে না যায়, তাহলে বুঝতে হবে শাস্ত্রের কথা শোনাতে কিছু গোলমাল আছে। জীবন পালটানো এই নয় যে, আপনি শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ে যাবেন, এই নয় যে আপনি স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে যাবেন। জীবন পাল্টানো মানে কিছু কিছু জিনিসকে কাঁকড়া বিছের মত যে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন, সেই জিনিসগুলিকে আপনি এবার ছেড়ে দেবেন।

সুখ জিনিসটার কি সুন্দর ব্যাখ্যা গীতা দিচ্ছেন –*অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি*, যেটাকে বারবার দীর্ঘকাল অভ্যাস করে করে সেটাতে রমণ করে মানুষ যে পরিতৃপ্ত হয় সেটাই সুখ। তার মানে গরমের সময় একটা কোল্ডড্রিঙ্কস খেলেন বা একটা আইসক্রিম খেলেন, খেয়ে মনে করছেন, আঃ কি সুখ পাওয়া গেল। কিন্তু এনারা এটাকে সুখের মধ্যে ধরছেন না। বলছেন, *অভ্যাসাদ্ রমতে*, যেটাকে বারবার অভ্যাস করে যেখানে রমণ হয়।

খুব সাধারণ একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, আপনারা যাঁরা এই ক্লাশ শুনছেন, সবাই যে আপনারা আগে শাস্ত্রের কথা শুনতেন তা না। সাধারণ ভাবে আমি যে ক্লাশগুলি নিয়ে থাকি, তাতে কোন কথাকাহিনী নেই, মনোরঞ্জনের কিছু নেই, আবার মিষ্টি মিষ্টি কথাও বলি না, থেকে থেকে গান-বাজনা, নৃত্য, এগুলোও নেই; এই ধরণের ক্লাশকে দিনের পর দিন ধৈর্য নিয়ে শুনে যাওয়া খুব মুশকিল। অনেকে দেখা করে আমাকে বলেন, প্রথমের দিকে আপনার ক্লাশগুলো শুনে আপনার কথাগুলো খুব ক্যাটক্যাটে লাগত বলে আপনার ক্লাশ শোনা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু পরে মনটা আবার এই ক্লাশই টেনে নিল। তার মানে অভ্যাস করে করে আপনি রমণ করছেন, এটা হল সুখ। আপনাদের আশেপাশে সবাই সময় কাটাবার জন্য টিভি সিরিয়াল দেখে, টিভি সিরিয়াল দেখার জন্য সেখানে আপনাকে খাটতে হয় না, এটাকে বলে passive participation। ওখানে আপনাকে কিছু করতে হচ্ছে না, নিজের মত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যেখানে active participation

থাকে, সেখানে আপনাকে খাটতে হচ্ছে। বারবার করে করে আপনার মনটা একটা স্তরে চলে এলো, কিভাবে, *অভ্যাসাদ্ রমতে*, এটা হল সুখ।

আর বলছেন, *যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি*, যেখানে দুঃখের বিনাশ হয়। আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, *অভ্যাসাৎ পরিচয়াদ্ আবৃত্তে রমতে রতিং প্রতিপদ্যতে যত্র যস্মিন্ সুখানুভবে দুঃখান্তং চ দুঃখবসানং দুঃখোপশমং চ নিগচ্ছতি নিশ্চয়েন প্রাপ্নোতি*। যে সুখের বারবার অভ্যাস করলে যেটা হয়, আর যে সুখ অনুভব করলে নিশ্চিত ভাবে দুঃখের অবসান হয়, দুঃখের উপশম হয়। সুখের দুটি পরিভাষা, যে জিনিসটা দীর্ঘ দিন করে করে আপনার মনটা সেটাতেই লেগে গেছে। আগেকার দিন বাবা-মারা দেখাশোনা করে সন্তানদের বিয়ে দিতেন। বিয়ের রাত থেকেই কি একে অপরকে ভালবাসতে শুরু করে দেয়? কখনই না। মিশতে মিশতে ভালবাসা জন্মায়, তারপরেও মিশতে মিশতে ভালবাসা গাঢ় হয়, দাম্পত্য জীবনকে সুখের মনে হয়। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, রোদের তাপে ঝলসে গেলে মানুষ গাছের ছায়াতে গিয়ে সুখ পায়। সংসারের তাপে মানুষ ঝলসে পুড়ে যাচ্ছে, স্বামী মনে করে স্ত্রীর কাছে গিয়ে আমি শান্তি পাব, স্ত্রী মনে করে স্বামীর কাছে গিয়ে আমি শান্তি পাব। কিন্তু এই শান্তি পাওয়াটা তো একদিনে হয় না, অনেক দিন অভ্যাস করে করে সত্যিকারের যদি ভালবাসা জন্মায়, তখন একজন আর-একজনের কাছে গিয়ে শান্তি পায়, তাদের দুঃখের অবসান হয়।

বাল্মীকি রামায়ণে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে এত ভালবাসেন, সেই সীতাকে রাবণ অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার পর শ্রীরাম দুঃখ সাগরে একেবারে নিমজ্জিত হয়ে গেছেন। অন্য দিকে সীতারও তাই। মহাবীর হনুমান সাগর পেরিয়ে লঙ্কায় গিয়ে যখন বলছেন, আমি শ্রীরামের কাছ থেকে এসেছি, শুনে সীতা খুশীত আপ্লুত হয়ে গেলেন। বিবাহের পর থেকে সীতা যে শ্রীরামের নামে, শ্রীরামের ব্যক্তিত্বে দিনের পর দিন রমণ করে যাচ্ছেন, সেখানে গিয়ে সীতার যে সব দুঃখের অবসান হয়, এটাকেই বলে সুখ। এমনিতে একদিন নিমন্ত্রণ বাড়িতে খুব ভাল ভাল খাবার খেয়ে আনন্দ হল, এটাকে সুখ বলছেন না। একটা জিনিস দিনের পর দিন করে করে সেটাতে যে সুখ আসে, যে সুখে নিশ্চিত ভাবে সব দুঃখের অবসান হয়, এটাই হল ঠিক ঠিক সুখ। প্রথমে সাত্ত্বিক সুখের কথা বলছেন।

যৎ তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্।।৩৭।।

(এবং যে সুখ প্রথমে বিষতুল্য দুঃখাত্মক কিন্তু শেষে অমৃততুল্য প্রীতিকর, আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির নির্মলতা থেকে উৎপন্ন, সেই সুখ সাত্ত্বিক সুখ বলে কথিত হয়।)

সাত্ত্বিক সুখ কি? কোন সুখ আপনাকে ঠিক ঠিক সুখ দেয়? আপনারা শাস্ত্র শুনছেন, আধ্যাত্মিক জীবনের হাইওয়েতে ওঠার চেষ্টা করছেন। বলছেন, কি করলে আপনার সুখটা এমন হবে যে, ওই সুখ আর নড়াচড়া করবে না। *যৎ তদগ্রে বিষমিব*, প্রথমের দিকে অভ্যাস বা অনুশীলন করতে গিয়ে একেবারে বিষের মত মনে হয়, কিন্তু যার পরিণাম অমৃতের মত, এটাকে বলছেন সাত্ত্বিক সুখ। প্রথমের দিকে প্রচুর খাটনি। এই ধরণের অনেক কাহিনী আছে। বেশির ভাগ বাচ্চারা পড়াশোনা করতে চায় না, কিন্তু এদের থেকেই পরে কত বড় বড় সব বিদ্বান হয়, ডাক্তার হয়, ইঞ্জিনিয়ার হয়, প্রফেসর হয়। ঠাকুর বলছেন, লেখাপড়া শিখতে গেলে প্রথম কত খেটে খেটে অ আ ক খ লিখতে হত, কিছু পড়তে গেলে বানান করে করে পড়তে হত আর পরে ফস্ ফস্ করে লিখে যাচ্ছে, আর ফরর ফরর করে পড়ে যাচ্ছে।

যে কোন বিদ্যা অর্জন করতে গেলে প্রথমের দিকে কত খাটতে হয়। আজ যাঁরা বড় বড় গায়ক হয়েছেন, ছোটবেলাটা তাঁদের সা রা গা মা করতে করতেই কেটে গেছে, এখনও সকালে উঠে সা রে গা মা করে যাচ্ছেন। কিন্তু এর ফল *অমৃতোপমম্*। ঠাকুর এটাকে খুব সুন্দর উপমা দিয়ে

বলছেন, যখন আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে নৌকা যায় তখন মাঝিকে খুব সামলে সতর্ক হয়ে নৌকার হাল ধরে রাখতে হয়। তারপর নৌকা যেমনি নদীতে এসে পড়ল, এবার শুধু হালটা ধরে রাখলেই হল। তখন বলে, এবার তামাক সাজ। তার মানে, এখন শান্তি। প্রথমের দিকে প্রচুর খাটতে হয়। আমাদের সন্ন্যাস জীবনেও প্রথমে প্রচুর খাটতে হয়। অনেক দিন ধরে খাটতে খাটতে একটা সময়ের পর গতি ধরে নেয়, একটা স্থিতি এসে যায়, তারপর ওটা নিজেই চলতে থাকে। ফিজিক্সেও বলে, যে কোন জিনিসকে চালাতে গেলে প্রথমে যেটা চলবে সেখানে সবচেয়ে বেশি ফ্রিকশান, তারপর ফ্রিকশান অনেক কমে যায়।

কিন্তু এখানে বলছেন, *আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্*, গীতা পড়াশোনা, সঙ্গীত সাধনা বা কোন বিদ্যাকে আয়ত্ত করার খাটনির কথা বলছেন না। আচার্য বলছেন, *প্রথমসন্নিপাতে জ্ঞানবৈরাগ্যধ্যানসমাধ্যারম্ভে*, যেটার জন্য আপনাকে আগে জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধ্যান, সমাধির প্রাথমিক অবস্থাকে প্রাপ্ত করতে হবে, আর এগুলো প্রত্যেকটাই অত্যন্ত শ্রমসাধ্য। আমি আগেও আপনাদের অনেকবার হাতজোড় করে বলেছি, গীতা মুখস্ত করুন, কিছু যদি না পারেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেখানে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলা হয়েছে ওই অংশটা খুব কম হলে ওইটুকু অবশ্যই মুখস্ত করবেন, আরও বেশি পারলে পঞ্চদশ অধ্যায়, আরও বেশি পারলে দ্বাদশ অধ্যায় মুখস্ত করবেন। এতটা যদি করে নিতে পারেন, দেখবেন একটু চেষ্টা করলে পুরোটাই আপনার মুখস্ত হয়ে যাবে। প্রথমের দিকটা হল শ্রমসাধ্য, খাটনি প্রচুর, পরে বেশি খাটনি পড়ে না।

ঠিক তেমনি জপধ্যান শুরু করতে গেলে প্রথমের দিকে খুব খাটনি পড়ে। যাঁরা নিয়মিত জপধ্যান করেন, তাঁরা জানবেন, প্রথমে ইন্দ্রিয়, শরীরের অঙ্গগুলি, বিশেষ করে হাঁটু, কোমড় টনটন করতে থাকে। তারপর দশ পনেরো মিনিট পর থেকে শরীরটা গরম হতে শুরু করে। মন কেন্দ্রিত হচ্ছে কিনা, এতে শরীর গরম হতে থাকে, ঘাম বেরোতে শুরু করে। সেইজন্য জপধ্যান করতে গিয়ে অনেক সময় খুব অস্বস্থি বোধ হয়। এগুলো প্রথমের দিকে হয়, তারপর সাধক বুঝে নেয়, শারীরিক অস্বস্থিগুলো এভাবেই চলে। তারপর আস্তে আস্তে শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ঠিক ঠিক জপ তারপর থেকে শুরু হয়। তার মানে প্রথম কুড়ি পঁচিশ মিনিট শরীর ও মনের স্থিতি আসতে এমনিই চলে যায়। অনেক আগে আমাদের এক সিনিয়র মহারাজকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন এমন হয়। উনি বলেছিলেন, জপধ্যানের প্রথমের দিকে শরীর গরম হয়। আপনাদের এত কিছু করার দরকার নেই, সকাল বিকেল গুরু যেমন বলে দিয়েছেন একশ আটবার জপ করলেই হবে। এরপর একটু গীতা, চণ্ডী পাঠ করবেন, এতেই মন অনেক স্থির শান্ত হয়ে আসবে, তারপর ঠাকুর নিজেই দেখিয়ে দেবেন। আমরা এখানে শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি, শাস্ত্রে যেমন আছে তেমনটি বলে যাব।

ভগবান বলছেন, এই প্রথম অবস্থাটা বিষসদৃশ, খাটনি আছে কিনা। কিন্তু পরে এতে যে সুখ, সেই সুখ হল *আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্*। আমরা যে ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করে থাকি, ঠাকুরের যে আরাধনা হয়েছে, পূজা হয়েছে, তার প্রসাদ। আপনি যে সাধনা করলেন, তার প্রসাদ কি? মনের সুখ। নিজের যে বুদ্ধি, এই বুদ্ধির নাম আত্মবুদ্ধি। বাইরে থেকে কোন সুখ আসে না, নিজের বুদ্ধি থেকেই সুখ আসে। নিজের যে বুদ্ধি, শুদ্ধ জলের মত এই বুদ্ধি যখন শুদ্ধ হয়ে একেবারে স্বচ্ছ নির্মল হয়ে যায়, এটাকে বলছেন *আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্*। আমরা কষ্ট কেন পাই, আমরা কেন দুঃখ পাই? কারণ জলটাই নোংরা। কোন জল? আত্মবুদ্ধি রূপ জল, নিজের যে বুদ্ধি। কি আশ্চর্য!

এই যে আমার বুদ্ধি, এই বুদ্ধি যখন চিত্তবৃত্তি নিরোধ করতে শুরু করে, আমরা যখন মনকে একাগ্র করতে শুরু করছি, তখন এই একাগ্র কিভাবে হবে? এই ভাবে –জীবনকে নিয়মিত করে নিলাম, গীতার ক্লাশ শুনছি, গীতা অধ্যয়ন করছি, পাঠ করছি, চণ্ডী পাঠ করছি, তার থেকেও জরুরী জপ করছি। যাঁরা জপে সিদ্ধ হয়ে গেছেন, যাঁরা এক আসনে এখন চার পাঁচ হাজার জপ করতে পারছেন, আর শেষটা হল ধ্যান, ঠিক ঠিক যে শুদ্ধি হয়, ঠিক ঠিক সিদ্ধি হয় ধ্যানে। জপাৎ সিদ্ধি যে

বলা হয়, সেখানেও জপটাই আপনাকে ধ্যানে নিয়ে যায়। চিন্তন যখন করবেন, তখন আপনার যিনি ইষ্ট, যেই হন, এটাই তখন থাকবে – *সমান প্রত্যয় প্রবাহ*। যেমন শ্রীকৃষ্ণের চিন্তন করছেন, তিনি ভিতরে শ্রীকৃষ্ণের ছবিই দেখে যাবেন। এটাই যখন সমান প্রত্যয় হয়ে যায়, কৃষ্ণ ছাড়া মনে আর কিছু নেই, তখন বাস্তব শ্রীকৃষ্ণ নেমে আসেন, এটা বাস্তবে হয়। তখন পরিষ্কার তিনি দেখেন, ওই তো তিনি এসে গেছেন।

কিন্তু তার আগে অনেক খাটাখাটনি করতে হয়। দীক্ষ নেওয়ার পর দুদিন জপ করেই যদি বলে, আমার এই অনুভূতি হয়েছে, আমার এই দর্শন হচ্ছে; বুঝতে হবে আপনার মধ্যে কিছু গোলমাল আছে। আমরা এই রকম অনেককে দেখেছি, দীক্ষা নিয়েই যাদের বিভিন্ন দেবদেবীর দর্শনাদি হতে শুরু হয়ে যায়। আসলে তখন বুদ্ধিটা নির্মল হয়ে যায়, একেবারে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায় পুকুরের জল এত পরিষ্কার থাকে যে, জলের তলদেশ পর্যন্ত স্পষ্ট সব কিছু দেখা যাচ্ছে। আমাদের এই মনটাও এই রকম স্বচ্ছ হয়ে যায়। আমাদের সমস্ত দুঃখের কারণ এই চঞ্চল মন, ঘোলাটে মন। বাইরে থেকে কোন দুঃখ আসে না, সমস্ত দুঃখ ভিতর থেকে আসে। ঠিক তেমনি শান্ত মন মানেই সুখ।

আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্, কোথা থেকে এই প্রসাদ হয়? আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হয়, আর বলছেন, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধ্যান আর সমাধির প্রথমাবস্থা, সমাধির শেষ অবস্থা যদি হয়ে যায় তাহলে তো জ্ঞান হয়েই গেল, তাঁর আর কিছু লাগবে না; কিন্তু ওই প্রথমাবস্থা থেকেই একটা সুখ আসা শুরু হয়, এটাকেই বলছেন সাত্ত্বিক সুখ –*আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্*। *নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক*, শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে করতে এই বোধটা জাগে। আসল সুখ হল সাত্ত্বিক সুখ। সাত্ত্বিক সুখ শান্ত মনের সুখ। শান্ত মন আসে জ্ঞান, বৈরাগ্য, নামজপ আর ধ্যান থেকে। আমরা বলতে পারি, বৈজ্ঞানিক যাঁরা তাঁদেরও সুখ সাত্ত্বিক সুখ, কিন্তু গীতা ওইদিকে যাচ্ছেন না, গীতা বলছেন *আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্*, শান্ত মন থেকে যেটা বেরিয়ে আসে, সেটাই সাত্ত্বিক সুখ। সত্যিকারের যাঁরা বড় সাহিত্যিক, তাঁরা সবাই শান্ত মন থেকে লেখেন। চঞ্চল মন থেকে যে লেখাগুলো আসে, সেই লেখার কোন দাম হয় না।

আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ সম্বন্ধে আচার্য বলছেন, *আত্মবিষয়া বা আত্মাবলম্বনা বা বুদ্ধি আত্মবুদ্ধিঃ*, যে বুদ্ধি আত্মাকে ধারণ করার চেষ্টা করছে। প্রথমে শান্ত মনের কথা বললেন, যে শান্ত মন জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধ্যান থেকে হয়, আর এখানে বলছেন, যে মন সব সময় আত্মাতে রমণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। শ্রোতাদের মধ্যে নিশ্চয় অনেকেই আছেন, যাঁরা অনেক দিন শাস্ত্র আলোচনা শুনছেন, তাঁদের অনেকরই মনটা আগে যে অবস্থায় ছিল তার থেকে মোটামুটি একটা উচ্চ অবস্থায় চলে গেছে। দেখবেন আপনার ভিতর থেকে সব সময় একটা হাসি বেরোতে থাকবে, আপনার মুখের এই হাসিখুশির ছাপটা বলে দিচ্ছে আপনার ভিতরে আনন্দ আছে, এটাই হল *আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্*। ছোট শিশু মায়ের কোলে গেলে খুশিতে যেমন হাসতে শুরু করে, ঠিক তেমনি আত্মাতে রমণ করলে ভিতর থেকে একটা আনন্দ বোধ হয়, এই হচ্ছে *আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্*। তাহলে সাত্ত্বিক সুখ কাকে বলছেন? যেখানে কোন জিনিসকে মন পরিষ্কার গ্রহণ করতে পারে আর দ্বিতীয় হল ঈশ্বরের দিকে মন যাচ্ছে। সাত্ত্বিক সুখে আগে খাটনি পরে লাভ। রাজসিক সুখ এর বিপরীত।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যৎ তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্।।৩৮।।

(শব্দাদি বিষয় ও শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের সংযোগ থেকে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তা প্রথমে অমৃতবৎ, কিন্তু পরিশেষে বিষতুল্য। সেই সুখ রাজসিক সুখ বলে কথিত হয়।)

ঠাকুর বিষয়ানন্দের কথা বলছেন, বিষয় আর ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যে আনন্দ হয়, সেই আনন্দকেই ঠাকুর বিষয়ানন্দ বলছেন। বিষয় আর ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যে সুখ উৎপন্ন হয়, সেই

সুখকে প্রথম অমৃতের মত মনে হয়। পরে দেখে এর পুরোটাই বিষতুল্য। রাজসিক সুখ কি করে? আচার্য বলছেন, *বলবীর্যরূপপ্রজ্ঞামেধা-ধনোৎসাহহানিহেতুত্বাদ*, বল, বীর্য, রূপ, প্রজ্ঞা, মেধা, ধন, উৎসাহ, রাজসিক সুখ এই সম্পদ্‌গুলির সব কিছু হানি করে। রাজসিক সুখ বিষের মত। কিন্তু প্রথমে যখন করছিল তখন খুব আনন্দ হচ্ছিল, আঃ কি খেলাম, একেবারে অমৃত খেলাম, খুব ভাল খেলাম। তার ফল বিষের মত। কেন বিষের মত?

বলবীর্যরূপপ্রজ্ঞামেধা-ধনোৎসাহহানিহেতুত্বাদ অধর্মতজ্জনিতনরকাদিহেতুত্বাদ্, এই পৃথিবীতে বল, বীর্য, রূপ, বুদ্ধি, যে কোন ব্যাপারে বিচার করে নেওয়ার ক্ষমতা, এগুলো আপনার অমূল্য সম্পদ। রাজসিক সুখ এগুলোকে তো পুরোপুরি নাশ করে দেবে, এমনকি আপনার রূপকেও বিপর্যস্ত করে দেবে। আপনার রূপ যদি ঝকঝকে না থাকে, তার মানে কোথাও আপনি রাজসিক সুখে জড়িয়ে আছেন। সাত্ত্বিক সুখ থাকলে আপনার রূপ সব সময় ঝকঝক করবে। তার সাথে বল, বীর্য, মেধা, মেধা মানে শাস্ত্রের মর্ম গ্রহণ ও ধারণ করার ক্ষমতা, ধন, সম্পদ, রাজসিক সুখ হলে সম্পদের হানি হয়, এগুলোর সব কিছু রাজসিক সুখে নাশ হয়, কোন কিছুতে আর উৎসাহ থাকে না। আপনার কি থেকে থেকে উৎসাহ কমে যায়? আপনি কাজ করছেন ঠিকই, কিন্তু রাজসিক কাজ করছেন। তার মানে এখন আপনার যে সুখ আসছে, এটা রাজসিক সুখ।

আপনাদের দুটো ঘটনা বলছি, প্রথমটা একটা ছড়া আকারে মজার ঘটনা, দ্বিতীয়টা আমার জীবনের একটা সত্য ঘটনা। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণরা প্রচুর খেতে পারতেন। বিশেষ করে মথুরার চৌবেরা খুব খেতে পারত। এক জায়গায় একটা ভোজ দেওয়া হয়েছে, সব ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। একজন চৌবেজী কোন কারণে ভোজে যেতে পারেননি। ওনার খুব ইচ্ছে হল দেখার, আজকের ভোজে খাওয়াতে কে চ্যাম্পিয়ন হল। তিনি দুটো তিনটে গ্রামের পর যে জায়গায় ভোজের আয়োজন করা হয়েছে, সেখানে যাওয়ার জন্য রওনা হয়েছেন। যেতে যেতে দেখছেন একজন চৌবে দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে আসছেন। কাছে এসে তিনি সেই চৌবেকে জিজ্ঞেস করছেন, 'ক্যা চৌবে ক্যায়সে কাটো কাট'? অর্থাৎ বলছেন, কি চৌবে খাওয়াতে সবাইকে কেমন কেটে দিলে, অর্থাৎ কেমন সবাইকে হারিয়ে দিলে? সে বেচারী খুব দুঃখ করে বলছে, 'ম্যায় কেয়া কাটো কাট, উহ্ কাটো কাট লেকর যো আয়ো হ্যায় খাট্'। খাটের উপর যাকে তুলে নিয়ে আসা হচ্ছে সেই আজকের চ্যাম্পিয়ন। এই চৌবেজী আরেকটু এগিয়ে গিয়ে দেখছেন একজনকে খাটে করে নিয়ে আসছে। তাকে দেখে বলছেন, 'ক্যায়সে কাটো কাট চৌবেজী', কেমন তুমি সবাইকে হারালে, কি কি খেলে বলো? সেও খুব দুঃখ করে বলছে, 'ম্যায় কেয়া কাটো কাট, ওহ্ কাটো কাট পোঁছা যো শ্মশান ঘাট', যে শ্মশানে পোঁছে গেছে সেই হল ঠিক ঠিক চ্যাম্পিয়ন।

এই হল রাজসিক সুখ, চ্যাম্পিয়ন হবে বলে এমন খেয়েছে যে তাকে শ্মাশানে নিয়ে যেতে হয়েছে। আমাদের জীবনে বাস্তবিক এটাই হয়। বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছেন, শ্রাদ্ধ বাড়িতে যাচ্ছেন, পৈতে বাড়ি যাচ্ছেন, সেখানে খেয়ে যাচ্ছেন তো খেয়েই যাচ্ছেন, কোন দিকে আর হুঁশ নেই। আমি দেওঘরে ছিলাম, দেওঘরে প্রচুর আম হত। ওখান থেকে কলকাতায় এন্টালিতে অদ্বৈত আশ্রমে আমার পোস্টিং হল। এখানে আবার খাওয়া-দাওয়া সেই রকম আহামরি কিছু ছিল না, বই বিক্রি করে যে কটা টাকা হত তাই দিয়েই আমাদের সব কিছু চালাতে হত। সেখানে বড় মহারাজ স্বামী অনন্যানন্দজী মহারাজ বছরে একদিন আমাদের আম খাওয়াতেন, ওই দিন তিনটে চারটে যে যত খুশী আম খেতে পারত।

তখন আমার বয়স কম ছিল, আমি খুব উৎসাহে বলে দিলাম, খাওয়া-দাওয়ার পর আমি কুড়ি খানা আম খেয়ে নেব। বড় মহারাজ খুব প্রেমিক সাধু ছিলেন, ব্যবহারটা অত্যন্ত মধুর ছিল। তখন আমি রোগা প্যাটকা ছিলাম, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কুড়ি খানা আমি তুমি খাবে'? বললাম, 'হ্যাঁ মহারাজ'। উনি বললেন, 'তুমি যদি কুড়িটা আম খেতে পারো তাহলে সমস্ত আমের

খরচ আমি দেব'। তখনকার দিনে সাধুদের কাছে পয়সাকড়ি কিছুই থাকত না। তারপর আম খাওয়া শুরু হল। খেয়েই যাচ্ছি, সাত খানা কি আট খানা খাওয়ার পর দেখছি শরীর গরম হতে শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু আমি ছাড়ব না। অনেকের রোখ থাকে, আমারও তখন ছিল, একবার যদি লেগে যাই শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছাড়ব না। সতেরটা কি আঠারোটা খাওয়ার পর মনে হল, এবার মনে হয় পেটটা ফেটে যাবে, আমি মরে যাব। কিন্তু ইজ্জতের ব্যাপার, শেষ পর্যন্ত কুড়িটা খেয়ে ছাড়লাম।

বড় মহারাজ হাঁ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, বলছেন, 'তুমি যদি এরপর আর-একটা আম খাতে পার, তাহলে আমি তোমাকে প্রতি আমে পাঁচ টাকা করে দেব'। আর-একটা আম খাওয়ার কোন প্রশ্নই নেই, এখনই আমার বমি হবে কি হবে না বুঝতে পারছি না। আমি বললাম, 'না না মহারাজ, আমি আর আপনার loss করাতে চাই না'। কিন্তু এর পরিণামে আমাকে তিন দিন বিছানায় উল্টে পড়ে থাকতে হল। সেদিনের ঘটনায় যে মহারাজরা ছিলেন, এখনও তাঁরা বলেন, আমি কুড়ি খানা আম খেয়েছিলাম।

এগুলোই হল *পরিণামে বিষমিব*, এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত; উল্টে পড়ে থাক এবার। অনেক সময় এই ধরণের উড়টিয়া কাজ করতে আমরা মজাও পাই, মজা পাওয়ার জন্য ঝাঁপিয়েও পড়ি, কিন্তু পরিণামে এর ফল কি হবে সেদিকে কোন খেয়াল থাকে না। দেখবেন লোকেরা সব কিছুতে অভিযোগ করবে, কেন যে এটা করতে গেলাম, করতে গিয়ে এখন কোথায় ফেঁসে গেলাম। তুমি তো নিজেকেই নিজে ফাঁসিয়েছ, প্রথমে আনন্দ পেতে, মজা পেতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে, পরিণামটা ভেবে দেখোনি। শাস্ত্র আদি পড়া থাকলেও মানুষ ফেঁসে যায়, বাঁচতে পারে না। এখানে গীতা সাবধান করে দিচ্ছেন না, শুধু বলে দিচ্ছেন কোনটা সাত্ত্বিক সুখ আর কোনটা রাজসিক সুখ। বলছেন, জীবনে যাদের এই সব হয়, মরার পরে এরা নরকে যায়। পরের শ্লোকে তামসিক সুখ নিয়ে বলছেন।

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্।।৩৯।।

(যে সুখে প্রথমে ও পরিণামে সৎ ও অসতের কারণ বুদ্ধির বিবেকশক্তি বিনাশ করে এবং যা নিদ্রা, আলস্য ও অনবধানতা থেকে উৎপন্ন হয়, সেটা তামসিক সুখ বলে কথিত।)

তামসিক সুখ শুরু হয় মোহ দিয়ে, শেষও হয় মোহে। প্রথমে যখন শুরু করছে তখনও কষ্ট, এবং পরিণামে তার যে ফল আসবে সেটাতেও কষ্ট। মোহে শুরু করে আর মোহে শেষ হয়। খুব ভাল উদাহরণ হল মদ খাওয়া। মদের পিছনে একগুচ্ছ পয়সা ঢালছে, তারপর মদ খাওয়ার জন্য শরীর খারাপ, সেই শরীরের চিকিৎসা করতে গিয়ে ডাক্তারের পিছনে একগাদা টাকা খরচ। অনেক সময় লোকেরা self inflicted injuryর কথা বলে, খুব দুঃখে আছে বা খুব রেগে আছে, তখন নিজের হাত পা ব্লেড দিয়ে কাটতে শুরু করে। তারপর এর জন্য নিজেকে অনেক দিন কষ্ট ভোগ করতে হয়। এগুলো হল তামসিক সুখ। একটা সুখ অনুভব করে ঠিকই, কিন্তু এরা হল ঘোর তামসিক। মদ খাওয়া, ড্রাগস নেওয়, এগুলো পুরোপুরি তামসিক জিনিস। আমরা অনেক কিছু করতে যাই, অনেক কিছুতে নেমে পড়ি, সেগুলো শুরু হয় মোহে; তার মানে জ্ঞান পরিষ্কার নেই, আর এর শেষ হয়ে মোহে। নিদ্রা, আলস্য, প্রমাদ এগুলোকে নিয়ে বলছেন। এখন একটা কাজ করা খুব দরকার, কিন্তু বলবে, দূর এখন ঘুমোচ্ছি এখন থাক, পরে দেখা যাবে –ঘোর তামসিকতা, মোহে পড়ে আছে। এর যে একটা ফল হবে, সেটাও তামসিক হবে।

দুজন কাঠুরের গল্প আছে। জঙ্গলে দুজন কাঠুরে কাঠ কাটতে গেছে। একজন কাঠুরে কাঠ না কেটে শুয়ে আরাম করছে। অন্য কাঠুরে তাকে বলছে, 'তুমি শুয়ে আছ কেন'? এই কাঠুরে বলছে, 'কাঠ কেটে কি হবে'? বলছে, 'তুমি যদি বেশি বেশি করে কাঠ কাটতে পার, শহরে সেই কাঠ বিক্রি করে দুটো বেশি পয়সা হবে'। 'তাতে আমার কি হবে'? 'একটা গাড়ী কিনবে, তাতে

আরও বেশি করে কাঠ বোঝাই করে বাজারে বিক্রি করতে পারবে’। ‘তাতে কি হবে’? ‘তুমি আরও টাকা পাবে, সেটা দিয়ে আরও বড় একটা গাড়ী কিনবে’। ‘তাতে কি হবে’? ‘তোমার অনেক টাকা হবে, একটা বড় বাড়ী হবে, বাড়ীতে আরামসে শুয়ে থাকতে পারবে’। তখন এই কাঠুরে বলছে, ‘আমি তো তাই করছি’। এটা খুব নামকরা গল্প, ‘আমি তো তাই করছি’।

আমাদের একজন মহারাজ, এদিক সেদিক অনেক বক্তৃতা দিতে যান। উনি একটা ম্যানেজমেন্ট ইনস্ট্যুটে লেকচার দেবেন, বাই চান্স আমিও সেখানে ছিলাম। সেখানে উনি কোন কারণে এই গল্পটা বললেন। শুনে আমি খুব রেগে গেলাম, লেকচার শেষ হতেই আমি ওনাকে বললাম, ‘আপনি এটা কি করলেন’? উনি আমাকে বললেন, ‘জীবনে এত তোড়জোড় করার কি আছে’? ‘কি বলছেন আপনি, গীতার বিরুদ্ধে যাচ্ছেন আপনি’। প্রথম কাঠুরে মোহে পড়ে সে একটা তামসিক হয়ে গেছে। তার সুখের আরম্ভ হচ্ছে তমসে, তার শেষ হচ্ছে তমসে, গীতা এটাকে নাকচ করছেন। স্বামীজী সেইজন্য বললেন, গীতা পড়ার থেকে ফুটবল খেলা ভাল, ভাল ফুটবল খেললে গীতা ভাল বুঝবে। ভক্তরা এসে বলে, এখন আর কাজ করে কি হবে মহারাজ, ঠাকুরের নামে ডুবে থাকতে চাই। এরা হল ঘোর তামসিক।

আমাদের একজন অল্প বয়সী সন্ন্যাসী ভাই এসে বললেন, ‘অমুক আশ্রমে গিয়েছিলাম, খুব ভাল ছিলাম, ওখানে জপধ্যান করতে খুব ভাল লাগল’। ‘ভাল লাগবেই তো, তামসিক কিনা’। সেই সন্ন্যাসী ভাই আমার উপর খুব রেগে গেলেন, ‘আপনি আমাকে তামসিক বলছেন’। ‘হ্যাঁ তামসিকই তো বলব, এখন তোমার জপধ্যান করার বয়স! এখন তোমার কাজ করার বয়স। এখন সকাল সন্ধ্যা জপধ্যান করলেই হবে। যে সুখের কথা বলছেন, একটা জায়গায় গিয়ে এমনিতেই ছয় মাস লেগে যায় মনটা ওখানে বসাতে। আর আপনি দু মাসে তপস্যা করে ঈশ্বরকে তাঁর পা ধরে টেনে নামিয়ে এনেছেন বলছেন। কাকে বোকা বানাচ্ছেন’?

যারাই ভক্তি, মুক্তি নিয়ে কথা বলে সব কটা তামসিক, কাজ করতে চায় না, সব ফাঁকিবাজ। আমরা স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীকে দেখেছি, স্বামী ভূতেশানন্দজীকে দেখেছি, স্বামী গম্ভীরানন্দজীকে দেখেছি, স্বামী তপস্যানন্দজীকে দেখেছি, শেষ দিন পর্যন্ত ওনাদের কাজ করতে দেখেছি। স্বামী গম্ভীরানন্দজী যেদিন গত হলেন, সেদিনও ওই বয়সে তিনি মধুসূদন সরস্বতীর গীতার অনুবাদের ডিকটেশান দিয়ে গেছেন, কল্পনা করা যায়! আর আমাদের এখানে ভক্তরা দীক্ষা নিয়েই ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে যান। মহারাজ ঈশ্বরের আনন্দে ডুবে থাকতে চাই। উনচল্লিশ নম্বর শ্লোক এদের জন্য, তমোগুণে শুরু হয়, তমোগুণে শেষ হয়, মোহে শুরু হয় মোহে শেষ হয়।

আমাদের একজন মহারাজ মজা করে বলতেন – মন্দিরে গিয়ে জপে বসবে, এতে শুধু লাভ আর লাভ। জপ করতে করতে যখন ঢুলতে থাকবে, তখন সবাই দেখে বলবে, আহা জপ করতে করতে ভাবের ঘোরে ঢুলে পড়ছেন। ঘরে বিছানায় যদি পড়ে পড়ে ঘুমোয় লোকেরা গালাগাল দেবে। জপ করছে বলে কারুর সাথে কথা বলতে হয় না, সেইজন ঝগড়াঝাটি হবে না। কোন কাজের জন্য যদি দরকার হয়, কেউ তাকে ডাকতে যাবে না, কারণ জপধ্যান করছে। এই করে তার জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে। এগুলোকে নিয়ে প্রচুর কাহিনী আছে। একটা খুব নামকরা কাহিনী আছে।

শিষ্য এক নম্বরের ফাঁকিবাজ। গুরু বলছেন, ‘ওরে অনেক বেলা হল, ভাতটা উনুনে বসা’। শিষ্য বলছে, ‘গুরুদেব আমি এখন মালায় আছি’। কিচ্ছু করছে না, পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। গুরু বেচারীই উঠে ভাত রান্না করলেন। ভাত রান্না করে শিষ্যকে বলছেন, ‘ওরে রান্না হয়ে গেছে এবার একটু পরিবেশনটা করে দে’। শিষ্য বলছে, ‘গুরুদেব মালা গুনছি’। গুরুদেব উঠে নিজেই আসন পেতে ভাত, ডাল, তরকারী সব বেড়ে দিলেন। সব করে গুরুদেব বলছেন, ‘ভাত বাড়া হয়ে গেছে, এবার খেতে আয়’। শিষ্য বলছে, ‘গুরুদেব এতবার গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছি, এটা ঠিক হয়নি,

আমি আসছি'। শিষ্য মনে করছে, বিরাট কিছু করলাম, কাজ করতে হল না। সর্বনাশ তো তোমার নিজের হল। *যদগ্রে* আর *অনুবন্ধে*, অগ্রে আর শেষে, দুটোতেই মোহ লেগে আছে।

যখনই কোন কিছু করবেন, বিশেষ করে যখন শান্ত হয়ে বসছেন, প্রথমেই বিচার করে দেখুন, এটা কি আমি মোহে পড়ে করছি? কারণ জপধ্যান করা অত সোজা জিনিস না। আমরা এই লাইনে অনেক বছর আছি, আমরা জানি কত কঠিন জিনিস। জপধ্যান করার জন্য আগে থেকে কত খাটাখাটনি করতে হয়। কোথাও তো শুরু করতে হবে। হ্যাঁ, গীতা পরে বলবেন, যখন বর্ণব্যবস্থার কথা বলবেন, তখন বলবেন কিভাবে নিজেকে তৈরী করে আস্তে আস্তে ওই দিকে নিয়ে যেতে হয়, জপধ্যান একদিনে হয় না। ঠাকুরকে একজন বলছে, মশাই, আমাকে সমাধিটুকু শিখিয়ে দিন। একেবারে সরাসরি সমাধিতে তো কখনই যাওয়া যায় না।

বলছেন, অর্জুন তোমাকে তিন প্রকার সুখের কথা বললাম। এটাকেই এবার উপসংহার করে ভগবান বলছেন –

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ।।৪০।।

(পৃথিবীতে বা স্বর্গে এমন কোন প্রাণী (মনুষ্য বা দেবতা) বা বস্তু নাই যা এই প্রকৃতিজাত ও বন্ধনের কারণ ত্রিগুণ থেকে মুক্ত।)

সত্ত্ব বলতে এখানে বলছেন মনুষ্য প্রাণি বা সত্ত্ব মানে যেখানে বুদ্ধি আছে, যে কোন প্রাণি যার বুদ্ধি আছে, মনুষ্যাদি প্রাণি, আর যেটা প্রাণহীন বস্তু, পৃথিবীতে বা স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে এমন কিছু নেই যার মধ্যে সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণ নেই। সৃষ্টি মানেই সেখানে সত্ত্ব, রজো ও তমো থাকবে। পৃথিবীলোকে হোক, স্বর্গলোকে হোক, তীর্যকাদিতে হোক, প্রাণী হোক, প্রাণহীন হোক, এই তিনটে গুণ সবটাতে থাকবেই থাকবে। এতক্ষণ চারটে শ্লোকে সুখের বর্ণনা করা হল। এরপর অন্য প্রসঙ্গে বলছেন, যেখানে চারটি বর্ণের কথা বলবেন – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই চারটি বর্ণও কিভাবে তিনটে গুণের দ্বারা পরিচালিত আর এই বর্ণ ব্যবস্থা কেন করা হয়েছে – গীতা এটাকে নিয়ে এবার বিস্তারে আলোচনা করবেন। এর আগে আমরাও এর উপর বিস্তারে আলোচনা করেছি।

পঞ্চোদশ অধ্যায়ে যেখানে *ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখম্* বলছেন, সেটাকে উল্লেখ করে আচার্য বলছেন, *সর্ব সংসারঃ ক্রিয়াকারমফললক্ষণঃ*, বিশ্ব মাত্রই হল ক্রিয়া, কারক ও ফল; কারক হল কারকের বিভক্তিগুলি, প্রথমা, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান – ক্রিয়া, কারক আর ফল, এটাই সংসার। আমরা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি, ঠাকুর কৃপা করো। প্রার্থনার সাথে সাথে আশাও করছি ঠাকুর কৃপা করবেন। তার মানেই হল, একটা ক্রিয়া হল, ক্রিয়ার একটা ফল চাইছি – এটাই হয়ে গেল সংসার। এখানে প্রার্থনা করাটা ক্রিয়া আর ক্রিয়ার ফল হল তিনি কৃপা করবেন। এবার ভেবে দেখুন, ঠাকুর কি সংসারী জীব? আমরা যখনই বলছি, হে ঠাকুর কৃপা করো, হে ঠাকুর মৃত্যুর পর যেন তোমার কাছে যেতে পারি – সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল ক্রিয়া, কারক ও ফল। ধর্মজীবন যতটা সহজ মনে করছি, ধর্মজীবন অতটা সোজা না। কঠোপনিষদে বলছেন, ঈশ্বর আমার উপর সন্তুষ্ট হন, এই ভাবটাও যেন না থাকে। এই ভাব থেকে গেলে তুমি বন্ধনে পড়ে থাকবে। বলার সময় আমরা কত সহজে বলে দিই, ঠাকুর কৃপা করবেন, ঠাকুর শান্তি দেবেন, মৃত্যুর সময় এসে ঠাকুর আমাকে নিয়ে যাবেন; কিন্তু বলার সময় এর ভিতরটা গভীর ভাবে ভেবে দেখি না। যেখানেই ক্রিয়া, কারক ও ফল, সেখানেই সংসার এসে যাবে; সংসার মানেই তিনটে গুণের খেলা। ক্রিয়া, কারক ও ফল তিনটেই সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণে বাঁধা।

আমাদের সবার ভিতরে সংসার ভাব আছে, এই সংসারে আমাদের থাকতেই হবে, ক্রিয়া, কারক ও ফল যখন আছেই, তাহলে আমরা সাত্ত্বিকই হই না কেন। সংসারে যদি আমাকে থাকতেই হয়, আমাকে যদি ক্রিয়া করতেই হবে, আমাকে যদি কারক হতেই হবে, ফল যদি আমাকে পেতেই হয় তাহলে আমি সাত্ত্বিকই হই না কেন, আমার ক্রিয়াগুলো সাত্ত্বিক হবে, আর ফলটাও সাত্ত্বিক ফল পাব। বলছেন, সংসার যদি এই রকমই হয়, সব কিছু যদি তিনটে গুণে বাঁধা থাকে, তাহালে এই সংসারের উচ্ছেদ হবে কি করে? তখন পঞ্চোদশ অধ্যায়েই বলছেন, *অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েণ ছিত্ত্বা*। একদিনে অসঙ্গ কি করে হবে, বৈরাগ্য একদিনে তো হয়ে যেতে পারে না। ঠিকই, একদিনে বৈরাগ্য হয় না, বৈরাগ্য অর্জন করতে হয়। কিভাবে অর্জন করা যাবে? স্বধর্ম করে।

গীতাতে আমরা অনেকবার স্বধর্মের উপর আলোচনা করেছি। আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি। গীতা বারবার আত্মজ্ঞানের কথা বলছেন, তুমিই আত্মা, তুমিই ঈশ্বর। আত্মজ্ঞানের জন্য তোমাকে সংসার থেকে বেরোতে হবে, সংসাররূপী এই অশ্বত্থ বৃক্ষকে তোমাকে উচ্ছেদ করতে হবে। সবই তো বুঝলাম, কিন্তু উচ্ছেদ করব কিভাবে? ইংলিশে একটা কথা আছে, who will bell the cat, ইঁদুরগুলো বেড়ালকে খুব ভয় পায়, একজন ইঁদুর বলল, একটা উপায় আছে, বেড়ালের গলায় ঘন্টা বেঁধে দাও। বাঃ খুব সুন্দর প্রস্তাব, দারুণ হবে, বেড়াল এলেই আমরা জেনে যাব, কারণ ঘন্টা বাজবে, আমরাও সাবধান হয়ে যাব। খুব ভাল বুদ্ধি, কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘন্টাটা বাঁধবে কে? বলে তো দিলেন অসঙ্গ হলেই সংসার বৃক্ষে কেটে যাবে, কিন্তু অসঙ্গ হবটা কিভাবে?

ভগবান এর আগে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে, বিশেষ করে তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগের কথা বলেছিলেন, এবার এটাকে বর্ণব্যবস্থার মধ্য দিয়ে কিভাবে স্বধর্ম পালন করতে হবে বলছেন। স্বধর্ম মানে তুমি যে ধর্মে আছ, নিজের সেই ধর্ম যদি পালন কর, তাহলে তুমি যেটা করতে চাইছ সেটা হয়ে যাবে। গীতার এটাই মূল – স্বধর্ম পালন।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ।।৪১।।

(হে পরন্তপ, প্রকৃতিজাত (স্বভাবজাত) ত্রিগুণানুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রেরও কর্মসমূহ পৃথক পৃথক রূপে বিভক্ত হয়েছে।)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণ দিয়ে সমাজের এই বর্ণব্যবস্থা নিরূপণ করা হয়েছে। এই বর্ণব্যবস্থা কাউকে কোন শোষণ করার জন্য নয়, এক অপরকে ঠকানোর জন্য নয়, এক অপরকে লুটে নেওয়ার জন্য না; বর্ণব্যবস্থা এমন একটা ব্যবস্থা, যা যার যার মনের প্রবৃত্তি অনুসারে এই বিভাজন করা হয়েছে, যাতে মানুষ খুব সহজে কর্মযোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজেকে শুদ্ধ করতে পারে, যাতে সে সাত্ত্বিক হয়ে যেতে পারবে, সেখান থেকে সে অসঙ্গের অনুশীলন করতে পারবে।

আমরা এখানে খোশ গল্প করছি না, ধর্মের প্রচলিত চলতি কথাগুলিরও আলোচনা করছি না, এখানে আমরা একটা অত্যন্ত উচ্চমানের দর্শন আলোচনা করছি। আমরা জেনে হোক বা না জেনেই হোক কথায় কথায় এমন অনেক শব্দের ব্যবহার করি, যে কথাগুলোর পিছনে একটা গভীর তত্ত্ব রয়েছে। যেমন প্রায়ই আমরা বলে থাকি আমরা সংসারে আছি, আমরা সংসারী; আমরা বলে থাকি, আমি ঈশ্বরের দিকে যেতে চাই; আমরা বলে থাকি, আমি মুক্তি চাইছি ইত্যাদি, কিন্তু এগুলো সব আমাদের মুখের কথা। না বুঝেই আমরা এসব কথা বলি। কথামৃতে আছে, একদিন ঠাকুরের সামনে গিরিশ চন্দ্র ঘোষ একজনকে বলছেন – আমি প্রমাণিত করব কৃষ্ণ ভগবান, না হলে জিভ কেটে ফেলে দেব। শুনে ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বললেন, উগুনো কিছু না। আমরাও জানি না যে, আমরা বেশির ভাগ সময় গিরিশ ঘোষের মত কথা বলতে থাকি। গিরিশ ঘোষ যখন এই কথা বলছেন তখন তিনি মাতাল অবস্থায় বলছেন না, স্বাভাবিক অবস্থাতেই বলছেন।

আমরা জানিও না, বুঝতেও পারিনা যে, দিনরাত কিভাবে আমরা উন্মত্ত প্রমত্তের মত কথা বলে যাই। আমার এই কথা শুনতে কারুরই ভাল লাগবে না, ভাল লাগার কথাও নয়। আমরাও যখন অল্প বয়সের সন্ন্যাসী ছিলাম, বড়রা তখন আমাদের সাথে এভাবেই কথা বলতেন, আমাদেরও মনটা খুব খারাপ হয়ে যেত। আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন, পূর্বাশ্রমে উনি খুব বিদ্বান ছিলেন। অনেক আগেকার কথা, সেই সময় উনি এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি থেকে বায়োলজিতে এমএসসি পাশ করেছিলেন। পিএইচডি করতে করতে ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দিয়েছিলেন। পরে উনি খুব মজা করে বলতেন – সন্ন্যাসী হয়ে মঠ মিশনে যদি না আসতাম বুঝতে পারতাম না আমি কত বড় একটা অপদার্থ। রামকৃষ্ণ মঠ মিশনে প্রথম কেউ যখন জয়েন করেন, প্রথম তাঁর যে অনুভূতি আসে, সেটা হল, আমি একটা আহাম্মক। সত্যিকারের এই অনুভব হয়।

জ্যেঠি খুড়ির কথা শুনে যারা ধর্মকে জানছে, সেটা তো বাস্তবিক ধর্ম নয়, ধর্মের খোলস মাত্র। কথামৃত পড়ার সময় কথামৃতের গভীর তত্ত্বগুলির দিকে আমাদের নজর যায় না, নজর যায় খোলসের দিকে। এটাকে ঠাকুর বলছেন, জ্যেঠি খুড়ির কথা শুনে বাচ্চারা কোঁদল করার সময় বলে, তোর ঈশ্বরের দিব্যি। এখন কেউ যদি আপনাকে বলে, আপনি কেন বাইরে বাইরে ভাসছেন, ভিতরে নামুন, আপনার কথাটা গায়ে লেগে যাবে, মনে করবেন আপনাকে ছোট করা হচ্ছে।

গীতাতে যে শব্দগুলো বলছেন, বা ধর্মে যে শব্দগুলির ব্যবহার হয় তখন এই শব্দগুলিকে বিশেষ অর্থে বলা হচ্ছে। সংসার শব্দ যখন বলছেন, তখন দেখাচ্ছেন সংসারের কিছু গুণ আছে। আমরা কি এত কিছু ভেবে দেখি? আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, যেখানেই ক্রিয়া, কারক ও ফল হয়, সেটাই সংসার। এর আগে আমরা বিস্তারে এর ব্যাখ্যা করেছি। যিনিই জন্ম নিয়েছেন, কর্ম তাঁকে করতেই হবে। একদিন একজন আমাকে বলছেন, 'লোকেদের কথার কি ছিড়ি, একজন মারা গেছে, লোকটার উপর বিরক্ত ছিল বলে বলছে, পাপ করেছিল বলে তাই আগে মরে গেছে'। আমি হেসে তাঁকে বললাম, 'আমার তো উল্টো মনে হয়, হে ঠাকুর কি পাপ করেছিলাম বলে আমাকে জন্ম নিতে হল'। একজন বলছে, পাপ করেছিল বলে মরে গেছে, আর আমি বলছি পাপ করেছিলাম বলে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে। আপনারা এখানে যে কজন গীতার আলোচনা শুনছেন, এবং অন্যান্য যাঁরা ধর্ম পথে আছেন, এই কজন বাদে বাকিরা সবাই নূতন এক প্রাণিকে সংসারে নিয়ে আসার জন্য কি রকম ছটফট করছে। আমাদের কাছে কত লোক ঘুরঘুর করে, মহারাজ একটু আশীর্বাদ করবেন যেন একটা সন্তান হয়। সন্ন্যাসীদের এখন আশীর্বাদ দিয়ে বেড়াতে হবে, লোকেদের যাতে সন্তান হয়। ঈশ্বরকোটি বাদে বাকি সবাইকে কত পাপ থাকলে তবে গিয়ে আবার সংসারে এসে একটা শরীর ধারণ করতে হয়। তুমি সন্ন্যাসী হও আর যেই হও, ক্রিয়া, কারক ও ফলের বিপাকে পড়ে সবাইকে কাজ করতে হবে।

এখান থেকে বেরনোর উপায় কি? ঈশোপনিষদে বলছেন, *অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে, ততো ভূয় ইব তে তমো য উ অবিদ্যায়াং রতাঃ,* যে অবিদ্যার অর্থাৎ কর্মের উপাসনা করে, সে তত অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যায়, যে বিদ্যার উপাসনা করে, সে তার থেকেও বেশি অন্ধকারের দিকে যায়। প্রস্তুতি না নিয়ে কেউ যদি ধর্ম পথে নেমে পড়ে আর বলতে শুরু করে আমার সমাধি চাই, আমার মুক্তি চাই; সে আরও বেশি গভীর অন্ধকার গর্তের মধ্যে যাবে। আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন, শশিকান্ত মহারাজ, গত হয়ে গেছেন, বিরাট পণ্ডিত সাধু ছিলেন, কাটিহারে ছিলেন, কানপুরেও ছিলেন। আমি তখন অদ্বৈত আশ্রমে থাকতাম, উনি সেখানে আসতেন। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। মাঝে মাঝে সাধুদেরও বৈরাগ্য আসে, আমারও এই রকম বৈরাগ্য চাড়া দিয়েছিল, মর্কট বৈরাগ্য বলতে পারেন। আমি মহারাজকে বললাম, আমি হিমালয়ে যাব, কিছু দিন ওখানে তপস্যা করব। বাড়িতে বসে, সংসারে থেকে সাধন ভজন করা কত কঠিন, যাঁরা সাধু সন্ন্যাসী

হয়েছেন তাঁরাই এই জিনিসটা ভাল জানেন। আর যাই হোক, সংসারে বড় সাধুদের সঙ্গ পাওয়া যাবে না, তাঁদের সদ্ উপদেশ পাওয়া যাবে না।

মহারাজ আমার হেড ছিলেন, এমনি কথা হচ্ছিল, আমি বললাম, 'ধুর আর ভাল লাগছে না, কিছু দিন ঘোর তপস্যা করতে হবে'। উনি আমার কথা শুনে খুব মিষ্টি করে বললেন, 'যোগশাস্ত্রকে তুমি মানো তো'? 'হ্যাঁ, খুব মানি'। 'ওখানে যে যম, নিয়মাদির কথা বলা হয়েছে, যেমন অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহের কথা বলা হয়েছে, একটা গুহায় বসে তুমি যদি ধ্যান করতে থাক, আমাকে বল ওখানে তুমি অহিংসার প্র্যাক্টিস কোথায় করবে? সত্যের অনুশীলন কোথায় করবে? ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহের অনুশীলন কোথায় করবে'? আমার জীবনে সত্যিই এটা একটা টার্নিং পয়েন্ট। রামকৃষ্ণ মিশনে তখন আমার সতের আঠার বছর হয়ে গেছে।

ঘটনাটা এজন্যই বললাম, এত সহজে খ্যাঁচমোচ গুলো মেটে না। শাস্ত্র কেন এই কথা বলছেন? এই যে যম-নিয়মাদিগুলি রয়েছে, এগুলো কি গুহায় বসে অভ্যাস করার জন্য? কাজ যদি না করা হয়, মনের ভিতরে যে বিষ বীজগুলো জমে আছে সেগুলো থেকে যাবে। একজন মহিলা নিয়মিত আমাকে মেইল করে যাচ্ছেন, ব্রহ্মজ্ঞানের পথ যে নিয়ে নিয়েছে, তাকে কেন কাজ করতে হবে। এদের বলার কিছু নেই, বলেও কোন লাভ নেই। এই যে মনের মধ্যে যে অঙ্কটবঙ্কটগুলি আছে, কাজ না করলে এগুলোর অস্তিত্ব সামনে আসবে না, এগুলো ওখানেই বসে থাকবে, আপনাকে এগোতে দেবে না। আপনি মনে করছেন, আমি সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে চাই। আপনি তো সমস্ত ছেড়ে চলে যাবেন, কিন্তু ওই বিষ বীজগুলো কোথায় যাবে? একটা কথা আমার সম্বন্ধে বলতে পারি, তপস্যা-সাধনার ক্ষেত্রে আমি শূন্য, সাধু হিসাবে অত্যন্ত সাধারণ, কিন্তু সাধুসঙ্গ প্রচুর করেছি। সাধুর কমণ্ডলু যেমন তেতো ছিল তেমন তেতোই থাকে, সেই হিসাবে হয়ত আমার সে-রকম কিছু হয়নি, কিন্তু জিনিসগুলো বুঝি, এই বোঝার ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। শাস্ত্র কি বলতে চাইছেন, কেন বলতে চাইছেন, গুরুর কৃপায় এটা আমি জানি।

পুরো গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় যখন থেকে শুরু হয়েছে, তখন থেকে বারবার একটা কথাই গীতা বলে যাচ্ছেন, কর্ম, কর্ম, কর্ম, কাজ করে যাও। আমাদের বড়রাও আমাদের বলে গেছেন, কাজ কর। পুরো বেদান্ত ভারতে ডুবে গেল কয়েকজন অপাত্র সাধুদের হাতে পড়ে। কোন কাজ না করে হিমালয় আর গঙ্গার পাড়ে বসে বসে শুধু বলে গেল, ত্রিকাল মে জগৎ নেহি হ্যায়। কাজ না করলে বিদ্যাকে ধারণ করা যায় না, কাজ না করলে বিদ্যাকে ধারণ করার ক্ষমতাটাই তৈরী হবে না। এর পরেও কি করে ভক্তরা, শ্রোতারা মেইল পাঠান, কথা বলেন; হয়ত কিছুই বোঝেন না। বাথরুমে জলের কলটা খুলে বালতিটা উল্টো করে রেখে দিয়েছেন। কল থেকে জল বেরিয়েই যাচ্ছে, বালতিতে এক ফোঁটা জল জমা হচ্ছে না। সংসার বৃক্ষকে যদি উচ্ছেদ করতে হয় তাহলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু কাজ কাজ আর কাজ করে যেতে হবে। কত দিন কাজ করতে হবে? কথামৃতে ঠাকুর এর উপর অনেকবার অনেক কথা বলেছেন।

কত দিন কাজ করতে হবে? গীতা একটা কথাতে বলে দিচ্ছেন, *নানবাপ্তমবাপ্তব্যং*, যেদিন মনে হবে এই জগৎ থেকে আমি কিছু চাই না। আপনি বলবেন, মহারাজ আমি কিছু চাই না, সত্যি বলছি আমার কিছু লাগবে না। না, তাতেও হবে না, এর পরের বাক্যে আসুন – এই জগতে এমন কিছু নেই, যেটা আমি অর্জন করতে পারব না। আপনার কি এই দম আছে? এই জগতের আপনি যা চান, সেটা যাই হয়ে থাকুক না কেন, আপনি সেটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে পারছেন? এই ক্ষমতা যতক্ষণ আপনার না আসছে, আপনাকে কাজ করে যেতে হবে। কাজ কত দিন, যত দিন না আপনি, ইংরাজী খুব সুন্দর শব্দ আছে, outgrow করছেন। আপনারা যাঁরা এই ক্লাশ শুনছেন, ধরে নিচ্ছি আপনারা সবাই হিন্দু। আপনারা যদি হিন্দু হন, আর হিন্দু ধর্ম সব কিছুকে বিশ্বাস করে, তাহলে কর্মবাদকেও বিশ্বাস করে। কর্মবাদ বলছে, একটা কর্ম করা হল, তাতে একটা অনুভব হল

ইত্যাদি। আপনারা যাঁরা শুনছেন, আপনাদের বেশির ভাগেরই বিবাহ হয়েছে। আপনাদের যে কজনের সাথে দেখা হয়, সবাই বলে, সংসারে সুখ নেই মহারাজ। আমি তখন তাদের এটাই বলি, সংসারে সুখ নেই, আগের জন্মে এই বোধটা কি আপনার হইনি? তার আগের জন্মেও কি আপনার এর বোধ হয়নি? তারও আগের আগের জন্মে কি আপনার বোধ হয়নি? তাহলে এই জন্মে এসে বিবাহ করলেন কেন? আপনার স্বভাবে যদি এই বোধ না থাকত, আপনি কখনই বিবাহ করতেনই না। আপনি বলবেন, Need for company, আমার জীবনে একজন দরকার, এই যে দরকার, তার মানে এটাকে আপনি outgrow করতে পারেননি।

সন্ন্যাসী নিঃসঙ্গ, কর্মত্যাগ মানে নিঃসঙ্গ। অনেকে বলবেন, কেন মহারাজ, আমি তো একা আছি। Individually একা আছেন, এগুলো বলে লাভ নেই, কিন্তু জানবেন ঠিক ঠিক কিছু হলে এলেমেলো হয়ে যাবে। মূল একটা কথা শুধু ভেবে দেখুন, যাঁরা বলছেন, সংসার ভাল লাগে না, তাহলে এর আগের জন্মে কি আপনার ভাল লাগছিল? এর আগের জন্মে, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে বা একশ বছর আগে যখনই ছিল, তখন কি সংসার অন্য রকম ছিল? একেবারেই না, সংসার এই রকমই ছিল। তাহলে এটা কি করে হয়ে গেল যে, এতদিন সংসার আপনার ভাল লেগে এসেছে, হঠাৎ এই জন্মে এই দিন থেকে সংসার আর ভাল না লাগতে শুরু করেছে? এটা কখন এ রকম হতে পারে না যে, সংসার এই রকমই ছিল, আপনিও এই রকমই ছিলেন। হাজার হাজার বার আপনি বিয়ে করেছেন, হাজার হাজার বার আপনি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, হাজার হাজার বার আপনি কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু আশা, কি জানি, বোধ হয় ওর সঙ্গে আমার ভাল জমত; কোথাও না কোথাও এই ভাব থেকে যাচ্ছে, এটাকে আপনি outgrow করতে পারছেন না। এটা আমি শুধু বিবাহকে নিয়ে বললাম, এই রকম হাজারটা জিনিস জগতে রয়েছে, যার বীজগুলো আপনার মধ্যে সুপ্ত হয়ে পড়ে আছে, যেগুলোকে আপনি outgrow করতে পারছেন না। কি করে outgrow করবেন? কাজ করতে হবে, যেমনি কাজ করতে শুরু করলেন, দশজন লোকের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হবে, আর আপনার ভিতরে যত রকমের বিষ বীজ পড়ে আছে, সমস্ত বীজ বেরিয়ে আসবে। বেরিয়ে আসার পর তখন সেগুলোকে উপড়ে ফেলতে পারবেন।

আমার এক বন্ধুর সাথে কথা হচ্ছিল, ওকে বলছিলাম, আজ থেকে পনের বছর, কুড়ি বছর আগে আমার জীবনে যাই হয়ে থাকুক, আজকে তো এমন অবস্থা, যখনই একা থাকি তখন মনে মনে ভাবি, একটা খোলা জায়গায় আমি আছি, সম্পূর্ণ একা। নিজের মনের আনন্দে একটা ডম্বুরু বাজিয়ে যাচ্ছি, ডমককে ডম্ ডম্, ডমককে ডম্ ডম। ভাই আমার কাউকে লাগবে না, কাউকে ছাড়ার মতও আমার কেউ নেই, নিজের মনের আনন্দে আছি। যতক্ষণ মনের এই অবস্থা না আসছে, গীতাতেও ভগবান যে বলছেন, *নানবাপ্তমবাপ্তব্যং*, যতক্ষণ এই অবস্থা না আসছে, ততক্ষণ কাজ করতে হবে। তার আগে যদি কাজ করা বন্ধ করে দেন, ঠাকুরের কথায় কাঁচা ঘায়ের মামড়ি যদি জোর করে তুলে নেওয়া হয়, ঘা আর শুকোতে চাইবে না। ঠিক তেমনি, সময়ের আগেই যদি ত্যাগ হয়ে যায়, সৃষ্টিতে জন্মজন্মান্তরের সফরটা আরও লম্বা হয়ে যাবে।

গীতা এই জিনিসটাকে খুব ভাল করে জানেন, সেইজন্য আমাদের মাথাতে এটাকে বসিয়ে দেওয়ার জন্য অনেকবার আলোচনা করেছেন। সেইজন্য বলছেন, এই যে সংসারবৃক্ষ এটাকে উৎখাত করতে হবে। শাস্ত্র শুনে, সাধুসঙ্গ করে, কথামৃত পড়ে, গীতা শুনে আমি বুঝে গেছি, এই সংসারবৃক্ষ আমাকে উৎখাত করতে হবে। মুখে বলে দিলেই তো সংসারবৃক্ষ উৎখাত হয়ে যাবে না। কিভাবে হবে? *অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা*। অসঙ্গ শস্ত্র পাবেন কোথায়? বড় একটা কুড়োল জোগার করতে হবে, যার ধারটা খুব তীক্ষ্ণ হতে হবে। এই যে কাজ করার কথা বলা হল, কাজ হল কুড়োলের ধারটাকে ধারালো করে। একটা ভোঁতা কুড়োল নিয়ে যদি বলেন, এই বিশাল বটবৃক্ষটা আমি কাটব, তা কি কখন সম্ভব! এমন ধারালো হবে যে, এক কোপে ওই গাছকে কেটে ফেলতে হবে।

গীতা এখানে তাই সবাইকে কাজ করতে বলছেন। কি কাজ করব? এই জায়গাতে আমাদের খুব একটা জটিল বিষয় আসছে, যার নাম বর্ণাশ্রম ধর্ম। ভগবান আগে চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছিলেন, *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্*, এখানেও ভগবান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারটে বর্ণের কথা বলছেন। আসলে বলতে চাইছেন, তুমি যেখানে জন্মেছ, যে অবস্থায় আছ, সেখানে থেকেই তুমি বড় হয়ে উঠতে পারবে। আমাদের এটা ভাল করে মনে রাখতে হবে, গীতাশাস্ত্র তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর পুরনো। তখনকার দিনে সমাজকে বর্ণাশ্রম ধরে রেখেছিল। আপনি একটা পরিবারে জন্ম নিয়েছেন, গত পঁচিশ তিরিশ বছরে এই পরিবারের অনেক কিছু পাল্টে গেছে। কিন্তু খুব কম করে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও একটা পরিবারে তার বাবা-ঠাকুর্দা যে কাজ করে আসছিলেন, পরের প্রজন্মও সেই কাজ করত, এটাকে বলা হত জাতি। ভারতবর্ষে এই রকম হাজার হাজার জাতি আছে। এত জাতি যেখানে থাকে, স্বাভাবিক ভাবে সেখানে সবার জন্য এক রকম ধর্ম হতে পারে না, আর সবাই একই কাজ করবে হতে পারে না। বর্তমান কালে সবাই আইটি সেক্টরে ঢুকতে চাইছে, দশ বছর পর এটাও হয়ত পাল্টে যাবে। কিছু দিন আগেও সবাই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইত, কিংবা আইএএস বা আইপিএস হতে চাইত, কিন্তু এখন সবাই আইটি ইণ্ডাস্ট্রিতে ঢুকতে চাইছে। এদের মাইনের বহর শুনলে আমাদের মাথা ঘুরে যায়। অনেকে মাসে নাকি দশ লক্ষ টাকা বেতন পায়। আমি জীবনে একসাথে দশ লক্ষ টাকা দেখিনি। সবাই যদি একটা দিকেই যেতে চায়, তাহলে অন্য কাজগুলো কে করবে?

ভারতবর্ষে দুটো জিনিসের দরকার ছিল – প্রথমটা হল, সমাজ যেন ঠিক ভাবে চলে, দ্বিতীয় সবারই যেন কিছু কাজকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করার সুযোগ থাকে। আমরা এখন বেকারত্বের কথা খুব শুনতে পাই, কেন বেকারত্ব হচ্ছে? বেকারত্ব হচ্ছে তার কারণ, আগে জাতির জন্য যে একটা সুনিশ্চিত স্কিম ছিল, সেটা এখন আর নেই। সবাইকে খেটে, লড়াই করে কাজের জোগার করতে হয়। ভারত তখন খুব গরীব দেশ ছিল, কিছু কিছু জাতির কাছেই টাকা থাকত। ইদানিং কালে শূদ্রদের উপর অত্যাচারের কথা বলা হয়। অত্যাচার হয়েছে, কোন সন্দেহ নেই। অত্যাচারটা ফ্যাক্টর না, ষাটের দশকে, সত্তরের দশকে সারা ভারত গরীব ছিল। তখন শূদ্রও না খেয়ে মরত, ব্রাহ্মণও না খেয়ে মারা যেত। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা এলো, তাতে যে শিক্ষা পাবে সে উপরের দিকে উঠে যাবে। এই শিক্ষাকে গ্রহণ করে ব্রাহ্মণরা এগোতে শুরু করল, শূদ্ররা পিছোতে শুরু করল বলে এই গ্যাপটা বিরাট হয়ে গেল। গীতার উদ্দেশ্য সামাজিক ব্যবস্থাকে ঠিক করা না, এই কাজ রাজার কাজ। রাজা ঠিক করে তার সমাজ কেমন ভাবে চলবে, আর তার জন্য স্মৃতি আদি গ্রন্থ লেখা হত। যেমন যেমন সমাজ পাল্টাবে, তেমন তেমন সমাজ ব্যবস্থাও পাল্টাবে।

সেইজন্য, জাতিপ্রথা, বর্ণপ্রথা নিয়ে যারা গালাগাল দেয়, তারা এগুলো না বুঝেই গালাগালি দেয়। ভিতরে এদের রাগ জমে আছে, নিজের হীনমন্যতা, কুন্ঠাভাব এগুলোই রোষ রূপে শাস্ত্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার হয়ে বেরিয়ে আসে। আম্বেদকর বললেন, মনুস্মৃতিকে জ্বালিয়ে দাও। কেন? মনুস্মৃতি নাকি শূদ্র বিরোধী। মনুস্মৃতিতে যা কিছু আছে, তার বেশির ভাগই মহাভারতে আগে থেকেই আছে। মহাভারত যিনি রচনা করেছেন, সেই ব্যাসদেব, তাঁর মা একজন শূদ্রা। আজকে আমরা যে বেদ অধ্যয়ন করছি, এই বেদ ব্যাসদেবের দেওয়া। তিনি একজন শূদ্রার সন্তান। কিসের discriminationএর কথা বলছেন? শ্রীকৃষ্ণ যাদব বংশে জন্মে ছিলেন, যাদেরকে সাধারণ ভাবে গোয়ালা বলা হয়, তাঁকে কিনা সারা ভারতের লোকেরা পূজা করছে। কোথায় শূদ্র, কোথায় ওবিসি, আরও কত কত ক্যাটাগরির কথা বলা হয়। আপনি সরাসরি বলুন না, আমার এই কথাগুলো পলিটিক্যাল, আর এটার জন্য আপনি শাস্ত্রকে গালাগাল দিচ্ছেন কেন?

ব্যাসদেব, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া হিন্দু ধর্মের চিন্তাই করা যায় না। এই যে আমরা গীতা পড়ছি, গীতা কি? শ্রীকৃষ্ণের কথা, ব্যাসদেব রচনা করেছেন – অথচ কি আশ্চর্যের শ্রীকৃষ্ণ নিজে একজন গোয়ালা

আর ব্যাসদেব শূদ্রার সন্তান। কিসের ব্রাহ্মণ-শূদ্র বলে যাচ্ছেন? কিসের নিন্দা করছেন, কার নিন্দা করছেন? সংস্কৃত সাহিত্যের সবচেয়ে নামকরা লেখক হলেন কালিদাস, তিনি ছিলেন একজন কাঠুরে, জাতিতে শূদ্র। হায়ার কোর্সে সব জায়গায় কালিদাসকে পড়ানো হয়। বিশ্বামিত্র নিজে একজন ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে হয়ে গেলেন ব্রাহ্মণ। অন্য দিকে রাবণ এক ঋষি বংশের সন্তান, সেই কিনা পরে একজন কত বড় রাক্ষস হয়ে গেলেন। আপনারা যদি পুরো ইতিহাসটা দেখেন, তাহলে দেখবেন যখনই বর্ণ ব্যবস্থার কথা বলছেন তখন এনারা জাতিকে নিয়ে কেউ কিছু বলছেন না। আমাদের কোন শাস্ত্রেও দেখবেন না যে, জাতিকে নিয়ে কেউ কিছু বলছেন। কারণ জাতি হল কাজ, ওনারা উপর থেকে বর্ণ দিয়ে চারটে থাক করে দিয়েছেন। নামকরা ঋষি মুনিরা হঠাৎ কোন জাতিকে বলে দিতেন, আজ থেকে তুমি ব্রাহ্মণ, হয়ে গেল ব্রাহ্মণ বা তুমি আজ থেকে ক্ষত্রিয়, সে হয়ে গেল ক্ষত্রিয়।

আজকালকার দিনে একটা শব্দ এসেছে সুপার স্পেশালিটি, এনাদের মূল জিনিসটা ছিল সুপার স্পেশালিটি। বর্ণ ব্যবস্থা – এটা হল সুপার স্পেশালিটি। ব্রাহ্মণদের দায়ীত্ব দিয়ে দেওয়া হল, তোমার সুপার স্পেশালিটি হল বিদ্যায়। সমস্যাটা হল, যাঁরা শূদ্র ছিলেন, তাঁদের দারিদ্রতটা বেড়ে গেল। পরে আরও যেটা মারাত্মক হল, তাঁদের মানুষের মধ্য গণ্য করা বন্ধ করে দিল। সেই থেকে বর্ণের মধ্যে গ্যাপটা খুব বেশি বেড়ে গেল। তা নাহলে বর্ণ ব্যবস্থা খুব সুন্দর ব্যবস্থা। যদি প্রিভিলেজ না নেওয়া হয়, যদি শোষণ না থাকে তাহলে এই ব্যবস্থা খুব সুন্দর একটা ব্যবস্থা। আর সেইজন্য দশ হাজার বছর ধরে এটা এখনও টিকে আছে। স্বামীজী ভারতে বিবেকানন্দ লেকচারে বলছেন, তোমরা যারা বর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লেকচার দিচ্ছ, লেকচার বন্ধ করে এর থেকে ভাল একটা মজবুত সমাজ তৈরী করে দেখাও না কেন! আর সেটাকে খুব কম করে পাঁচশ বছর চালাও, তারপর এসে উপদেশ দেবে। কোন সমাজ ব্যবস্থা কি বিশ্বের কোথাও টিকেছে? একমাত্র বর্ণ ব্যবস্থাই দশ হাজার বছর ধরে টিকে আছে, বাকি সভ্যতাগুলি এলো আবার চলেও গেলো।

এখন কয়েকজন ইংরাজী পড়া লোক কার্ল মার্ক্স থেকে কিছু পড়ে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতিকে, প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থাকে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের ঋষি মুনিদের বক্তব্য হল, তুমি যেখানেই আছ, সেখান থেকেই ওঠো, ওঠা মানে তুমি সাত্ত্বিক হও। এই super speciality তখনই হয়, যখন division of labour হয়, কারণ division of labour না হলে super speciality হয় না। বর্ণ ব্যবস্থার কাজ ছিল division of labour করে super specialityতে নিয়ে যাওয়া, তার সঙ্গে ছিল stability of society and guarantee of job। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, এগুলো সবটাই সামাজিক ব্যাপার, এর সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। স্বামীজী এর সাথে জুড়ে দিলেন, এই ব্যবস্থা হল ভারতকে দেশ হিসাবে রক্ষা করা। ক্ষত্রিয়রা দায়ীত্ব নেবেন, আমরা দেশকে রক্ষা করব। কিন্তু তারা তা পারল না, যার জন্য পশ্চিমী দেশগুলো থেকে ভারতের উপর ক্রমাগত আঘাত আসতে থাকল, বিধর্মীরা ভারতকে দীর্ঘ দিন ধরে শাসন করার সুযোগ পেয়ে গেল। তবে এটার হওয়াও ভারতের জন্য দরকার ছিল।

এখানে গীতাতে ভগবান যেটা বলছেন, উদ্দেশ্য সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলা না, উদ্দেশ্যটা হল ধর্ম লাভ। ধর্ম লাভের একটাই পথ – চুটিয়ে কাজ করা, পূর্ণ উদ্যমে কাজ করা। আমার পরিচিতরা কদাচিৎ কেউ বলেন, এবার কাজ ছেড়ে দেব। আমার এক বন্ধু আইএএস অফিসার, অবসরের পর সরকার থেকে বারবার এক্সটেনশান দিতে চাইছিলেন, উনি রাজী হচ্ছিলেন না। আমি তাঁকে বোঝালাম, ‘কক্ষণ কাজ ছাড়বেন না, আপনি দেশের কত বড় সেবা করছেন, কত লোক আপনার কাছ থেকে কাজ শিখছে, এর মধ্যে দিয়েই আপনার চেষ্টা থাকবে যতটা নিজেকে আরও উপরে তুলতে পারেন।’ আপনাদেরও বলি, চুটিয়ে কাজ করুন, কিছু না পারলে পাড়ার দুটো ছেলেকে পড়ান। আমার কথা মিলিয়ে নিতে আপনাদের পাড়ায় খোঁজ নিয়ে দেখুন, যারা কাজ করেনি, কাজ করছে না, এদের পড়াশোনা থাকতে পারে, হাজারটা গুণ থাকতে পারে, কিন্তু সব কটা

অপদার্থ। কাজ যে ছেড়ে দিয়েছে, তার উন্নতির ধারা থমকে দাঁড়িয়ে গেছে, কোন গ্রোথ হবে না। যদি মনে করেন, কাজ ছেড়ে দিয়ে আমি বই পড়ব, কাজ ছেড়ে দিয়ে আমি জপধ্যান করব, কিচ্ছু হবে না। আমরা সন্ন্যাসী, আমরা জানি কাজ না করে করে মানুষ কি করে অপদার্থ হয়ে যায়।

দুটো জিনিস, প্রথমটা হল কাজ করতে হবে, দ্বিতীয় কাজ কিভাবে করবেন, যে অবস্থায় আছেন সেই অবস্থা থেকেই কাজ করুন। বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারীদের ট্রেনিং সেন্টার আছে। নূতন যাঁরা মঠে জয়েন করেন, সাদা কাপড়ে ব্রহ্মচারী হয়ে বিভিন্ন সেন্টারে তিন বছর থাকতে হয়। তিন বছর নিজের নিজের সেন্টারে থাকার পর তাঁদের দু বছরের জন্য বেলুড় মঠে পাঠানো হয়। বেলুড় মঠের ট্রেনিং সেন্টারে থাকার সময় সেখানকার ক্যাম্পাসের সমস্ত কাজ ব্রহ্মচারীরা নিজেরাই করেন, ক্যাম্পাস ঝাড় দেওয়া, বাথরুম পরিষ্কার করা, বাসন মাজা ইত্যাদি সব কাজ করতে হয়। অনেক আগেকার কথা, আমাদের এক ডাক্তার ছিলেন, তিনি তখনকার দিনের এমডি ছিলেন। ট্রেনিং সেন্টারে একটা মেডিসিন রুম আছে যেখানে ওষুধ ও অন্যান্য ডাক্তারীর সরঞ্জাম রাখা থাকে। তাঁর উপর দায়ীত্ব পড়ল ওই রুমটা পরিষ্কার করার, সবারই দু-মাস দু-মাস করে ডিউটি পড়ে।

উনি খুব মজা করে সেই সময়কার কথা বলতেন। কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন, সেখানে ডাক্তার ঠিক করা আছে, সেই ডাক্তারই তাঁকে দেখবেন। অথচ ইনি নিজে একজন এমডি, কিন্তু ওখান থেকে কোন অসুস্থকে তিনি কোন ওষুধ দিতে পারবেন না। এটাই হচ্ছে part of training, উদ্দেশ্য ডাক্তারী করা না, তুমি তো এখন সেই পথ ছেড়ে ট্রেনিং নিতে এসেছ। নৃপেণবাবু নামে আমাদের একজন ভক্ত আছেন, খুব গুণী মানুষ, অত্যন্ত গুণগ্রাহী, আমেরিকায় থাকেন, মাঝে মাঝে এখানে আসেন। আমার এক পরিচিত ছেলে ব্রহ্মচারী হয়েছেন, তাঁকে উনি খুব মিষ্টি করে বললেন, 'সারা জীবন নিজের মত শুনে আজ এত দূর এসেছ, সব কিছু ত্যাগ করে চলে এসেছ, আর নিজের বুদ্ধি লাগাতে যেও না। এখন থেকে তোমার বড় সন্ন্যাসী যাঁরা আছেন, তাঁরা যেমনটি বলবেন শুধু সেটা শুনে যাবে, এটাই সাধনা'। রামকৃষ্ণ মিশনে টিকে থাকাটাই সাধনা আর কোন প্রশ্ন না করে আমাদের বড়দের আদেশ পালন করা।

শ্লোকের প্রথমে বলছেন, *ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ*, এই বিষয়টাই এখন পর পর চলতে থাকবে। একচল্লিশ নম্বর শ্লোকে ভগবান পরিষ্কার করে সমাজে চারটে বর্ণ মোটামুটি ভাবে ভাগ করে দিলেন; যেখানে লক্ষ লক্ষ পরিবার, হাজার হাজার জাতি, সেটাকে এবার সুন্দর করে চারটে বর্ণে নিয়ে এলেন – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। তারপরে বলছেন, *কর্মাণি প্রবিভক্তানি*, division of labourএর কথা বলছেন। Division of labour কিভাবে করা হয়েছে? *স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ*, যে স্বভাবগুলো তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে, *প্রভব* মানে উৎপত্তি হওয়া, তার মধ্যে যে স্বভাবগুলির উৎপত্তি হয়েছে। এটা এখানে খুব পরিষ্কার নেই। আচার্য শঙ্কর তাই এর তিন রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রথম ব্যাখ্যাতে বলছেন, যে লোক যে বর্ণে আছে সেখানে সেই গুণটা দেখা যায়। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাতে বলছেন, এক-একটি বর্ণ কিছু কিছু স্বভাবের উপর আধারিত। প্রথম পয়েন্টের দিক দিয়ে যদি দেখা হয়, যাঁরা ব্রাহ্মণ তাঁদের মধ্যে ধীরে ধীরে সত্ত্বগুণের প্রকাশ। দ্বিতীয় বলছেন, ব্রাহ্মণ বর্ণ করা হয়েছে সত্ত্বগুণের জন্য। বাকিদের নিয়ে আর বলছি না, এগুলোর আর কোন দাম নেই, কারণ আজকের দিনে এই বর্ণ ব্যবস্থাটাই উঠে গেছে।

আমাদের এখানে একজন ছাত্র ছিল, বর্তমানে আমাদের অমৃত সেতুর চ্যানেলের থাম্বনেইলগুলো তৈরী করে, প্রচুর খাটে। খুব মন দিয়ে আমাদের ক্লাশগুলো শোনে। কিছু দিন আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছিল, এসে বলছে, 'মহারাজ আপনার কথাগুলো শুনে জীবনটার কেমন একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমরা এখন পুরোহিত ট্রেনিং ক্যাম্প করাচ্ছি'। শুনে খুব ভাল লাগল। বলছে, 'আমরা ওখানে কোন বিচার করি না, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যে যেখান থেকে আসছে, তুমি শিখতে চাও, সব সময় ওয়েলকাম। এই নিয়ে আবার কেউ কেউ আপত্তি করতে শুরু

করেছে, শূদ্রদের পুরোহিতের ট্রেনিং কি করে দিচ্ছে ইত্যাদি'। ছেলেটি তাদের বলে দিল, 'স্বামী সমর্পণানন্দ আমাদের ক্লাশে বলে দিয়েছেন, এখন ভারতে সবাই ব্রাহ্মণ। ঠিকই তো, স্বামীজী বলে দিয়ে গেছেন, যবে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের তবে থেকে সত্যযুগের শুরু হয়েছে। সত্যযুগ মানে সবাই ব্রাহ্মণ, হিন্দু মাত্রই ব্রাহ্মণ। চাকরির জন্য সংরক্ষণ করা আছে, সেটা দেখা আমাদের কাজ না'। কথাগুলো শুনে খুব ভাল লাগল।

রামি সেওয়ান নামে একজনের সাথে আমার পরিচয় হয়। কোরা নামে একটা ফোরাম আছে, ওখানে আমি ওনার অনেক লেখা, কমেন্টস পড়ি, পড়ে অবাক হয়ে যাই, কত বড় পণ্ডিত মুখে বলে বোঝান যাবে না। ওখানে বড় করে ওনার পরিচয় লেখা আছে – শূদ্র পুরোহিত। ওনার পাণ্ডিত্য দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। ওনার সঙ্গে আমি যোগাযোগ করলাম, জিজ্ঞেস করলাম, এত পাণ্ডিত্য আপনি কি করে অর্জন করলেন? উনি খুব গর্ব করে বলেন, আমি শূদ্র কিন্তু আমি পুরোহিত। উনি বলছেন, অল্প বয়সে আমি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পর্কে আসি। উনি রামকৃষ্ণ মিশনের লোক নন, সাউথ আফ্রিকায় থাকেন। উনি যেভাবে অন্যান্য ধর্মকে ওদের শাস্ত্র দিয়ে, যুক্তি দিয়ে এমন তুলোধুনো করেন, দেখে অবাক লাগে। বর্ণের বিভাজন যখন ছিল তখন, এখন কিছু নেই। হিন্দু ধর্ম inclusive ধর্ম, সবাইকে টেনে নিচ্ছে। এই জিনিসগুলোকে নিয়ে যেখানেই যত আলোচনা হয় সেখানে যখন হিন্দু ধর্মের প্রসঙ্গ আসবে, তখন সবাই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ শূদ্র এই নিয়ে লড়াই করতে শুরু করে দেবে। সমাজ আগে এক রকম ছিল, এখন আরেক রকম, সমাজ সব সময় পাল্টাতে থাকে।

ভগবান এখানে বলতে চাইছেন, বিভিন্ন লোকের স্বভাব বিভিন্ন রকম। বাড়িতে কোন ছেলের যদি রজোগুণ বেশি হয়, সে মিলিটারিতে যাবে, সত্ত্বগুণ যদি বেশি হয় বিদ্যার্জনের দিকে যাবে। রজোগুণ যদি বেশি হয়, আর পড়াশোনার দিকে যদি যায়, কদিন পরে মাইনে বাড়াবার জন্য আমাদের দাবী মানতে হবে, চলবে না, চলবে না, শুরু করে দেবে। যাঁরা সত্যিকারে উচ্চমানের বৈজ্ঞানিক, তাঁরা পার্কস, প্রিভিলেজ, এসব দিক নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা করেন না।

রিচার্ড ফাইনম্যানের খুব নামকরা গল্প আছে। উনি তাঁর ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষকে মাইনে বাড়াতে বললেন। তারপর নিজেই দেখলেন, মাইনে বাড়লে আমার এই সমস্যা, সেই সমস্যা এসে যাবে। উনি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন, আমাকে যা দিচ্ছিলেন ওটাই দেবেন, মাইনে বাড়াতে হবে না। বিদ্যার প্রতি যিনি সমর্পিত, তিনি কক্ষণ অর্থের পিছনে দৌড়াবেন না। টাকা-পয়সার দিকে যাওয়া, নাম-যশের পিছনে ছোটা এগুলো রজোগুণের লক্ষণ, বৈশ্যবর্ণের লক্ষণ। আমরা বন্ধু আইআইএম, ইন্দোরের প্রফেসর। আমিও ইন্দোরে লেকচার দেওয়ার জন্য যেতাম। ওনাকে আমি মজা করে বলতাম, সমাজ থেকে আমরা ব্রাহ্মণ ছেলেগুলোকে আপনাদের কাছে পাঠাই, আর আপনারা তাদের প্রোডাক্ট রূপে বৈশ্য বানিয়ে ছেড়ে দেন। শিক্ষা নিতে যাচ্ছে, কিছু দিন পর থেকে সবার মাথায় নাচতে থাকে কত মাইনে পাবো।

এটাই ভগবান এখানে বলছেন, *স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ,* যে স্বভাবগুলো তোমার ভিতরে আছে, তোমার কাজে, ব্যবহারে যেগুলো প্রকাশ পাচ্ছে। তাহলে জন্ম থেকে কেন? এটাই এলেমেলো, কারণ কক্ষণ কোন সামাজিক ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হতে পারে না। জন্ম থেকে করুন, কর্ম দিয়ে করুন, যেটা দিয়েই সমাজ ব্যবস্থা নিরূপণ করুন, একটা স্থায়ী stable সমাজ ব্যবস্থা কক্ষণ হতে পারবে না, অসম্ভব। চীনের মাও সে তুং খুব ভাল কথা বলেছিলেন, Every generation must have its own revolution। মাও সে তুং যাই করে থাকুন, যে রকমই হয়ে থাকুন, বুদ্ধি ছিল বলেই তো এত বড় রাজা হতে পেরেছিলেন। ঠিক তেমনি, প্রত্যেক কিছু বছর পর, দরকার না থাকলেও সামাজিক ব্যবস্থা আপনাকে পাল্টাতে হবে। তা না করলে সমাজটা ডোবায় জমে থাকা জলের জন্য একটা পচা ডোবা হয়ে যাবে।

কিন্তু যে তিন গুণের প্রভাবে আপনার যে স্বভাব আপনার ভিতরে আছে, ওটা তো থাকবেই। কারুর মধ্যে সাত্ত্বিক ভাব, কারুর মধ্যে রাজসিক ভাব, কারুর মধ্যে সত্ত্ব-রজোর মিশ্রণ, কারুর মধ্যে রজো-তমোর মিশ্রণ আবার কারুর মধ্যে তমোগুণের আধিক্য। ওনারা সব কিছু ভাল করে দেখে নেওয়ার পর বলে দিলেন, ব্রাহ্মণদের মধ্যে সাত্ত্বিক ভাব বেশি, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে রজো ভাব বেশি, বৈশ্যের মধ্যে রজো তমো মিশে আছে আর শূদ্রের মধ্যে তমো বেশি। আপনি এখন নিজেকে দেখে নিন আপনি কোন বর্ণের মধ্যে পড়ছেন। জন্মগত হওয়ার জন্য বর্ণব্যবস্থায় সমস্যা হয়ে গেল। কিন্তু এখানে কিছু করার নেই। জন্মগত না করে যদি গুণগত বিচার করে বর্ণ ঠিক করে দেওয়া হত, তাহলে আরও সমস্যা হয়ে যেত। জন্মগত বর্ণ তো লোকজনদের দেওয়া হত না, জাতিকে দিত।

আচার্য এখানে বলছেন, আগের আগের জন্মে আপনি যেমন যেমন কর্ম করেছেন, ওই কর্মানুসারে আপনার যেমন যেমন স্বভাব তৈরী হয়েছে, সেই স্বভাবানুসারে আপনি সেই রকম পরিবারে জন্ম নেবেন। হিন্দু ধর্মের এটা একটা বিরাট সমস্যা হয়ে গেছে। যখনই বর্ণ ব্যবস্থার কথা বলা হয়, তখন এনারা বলেন, আগের আগের জন্মে তুমি যেমন কর্ম করেছ, মৃত্যুর সময় যে গুণগুলির আধিক্য পেয়েছে, সেই অনুসারে তোমার সেই রকম পরিবারে জন্ম হয়। বর্ণ ব্যবস্থার উপর আমাদের এর বেশি আর আলোচনা করার দরকার নেই। এখানে ভগবান বলছেন, *স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ*, শাস্ত্রে যেমনটি আছি আমি এর ব্যাখ্যা করে দিলাম। এর আগে চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছিলেন, *গুণকর্মবিভাগশঃ*। এবার ভগবান বলতে শুরু করছেন, কোন গুণে মানুষ ব্রাহ্মণ হয়, কোন গুণ থাকলে ক্ষত্রিয় হয়, কি কি ধরণের কর্ম তারা করবে।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্।।৪২।।

(বাহ্যেন্দ্রিয়ের ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম, কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা; অন্তর্বহিঃ শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, শাস্ত্র জ্ঞান ও তত্ত্বানুভূতি এবং শাস্ত্রে ও ভগবানে বিশ্বাস – এই সকল ব্রাহ্মণদের স্বভাবজাত কর্ম।)

পূজো করা, পূজো করে দক্ষিণা নেওয়া, ব্রাহ্মণের এগুলো একমাত্র কাজ না। অপরকে উপদেশ দেওয়া এটাই ব্রাহ্মণের কাজ না। ব্রাহ্মণের কাজ হচ্ছে, *শমঃ, দমঃ, তপঃ, শৌচঃ, ক্ষান্তিঃ, আর্জবম্*। এই জিনিসগুলো আগে আগে আমরা বিস্তারে আলোচনা করেছি। *শমঃ দমঃ* হল ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ, বাহ্যেন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম। *তপঃ*, তপস্যা নিয়ে আমরা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আবার ষোড়শর অধ্যায়ে আলোচনা করেছি, এছাড়া সপ্তদশ অধ্যায়ে শরীর, বাক্ ও মন, এই তিন রকম তপস্যার কথা নিয়ে বিস্তারে আলোচনা করেছি। *শৌচম্*, শরীর ও মন দুটোরই শুচিতা রক্ষা করা। *ক্ষান্তিঃ*, ক্ষমার ভাব, ব্রাহ্মণকে ক্ষমা ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। মহাভারতে বশিষ্ঠ মুনি ও বিশ্বামিত্র মুনিকে নিয়ে এর উপর অনেক কাহিনী আছে।

একবার বশিষ্ঠের আশ্রম থেকে স্বর্গের কামধেনু গাভী নন্দিনীকে বিশ্বামিত্র জোর করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। নন্দিনী তখন তাঁর মালিক বশিষ্ঠ মুনিকে বলছেন, হে প্রভু আমাকে এদের থেকে রক্ষা করুন আপনি। বশিষ্ঠ মুনি খুব সুন্দর উত্তর দিলেন। *কিংকর্তব্য ময়া তত্র ক্ষমাবান্ ব্রাহ্মণোহম্*, আমি ক্ষমা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ, আমি বিশ্বামিত্রকে কিছু করতে পারব না। মা, তুমি যদি নিজের রক্ষা নিজে করতে পার, রক্ষা কর। যে ব্রাহ্মণ ক্ষমা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত নয়, তাঁর ব্রাহ্মণত্বের সব কিছুই এলেমেলো হয়ে যাবে।

আর্জবম্, মনটা ঋজু, পরিষ্কার মন, মনের মধ্যে কোন লুকোচুরি নেই, যেখানে যে জিনিসটা যেমন, সেখানে তেমনটি বলবেন। মনটা যেন গঙ্গাজল দিয়ে পরিশ্রুত। বাচ্চাদের মত মনটা একেবারে পরিষ্কার, সব কিছুতে নির্বিকার, কোন ধরণের লুকোচুরি কিছু জানে না। বাচ্চা, বিশেষ

করে ছেলে যদি মাকে কোন মিথ্যা কথা বলে, কিছুক্ষণ পরে এসে বলবে, মা জানো, আমি তোমাকে বোকা বানিয়ে ছিলাম। বাচ্চারা লুকোতে পারে না। মিথ্যে কথা যদি বলল, চালাকি যদি করল, ওর কাছে ওটা একটা achievement। কিছুক্ষণ পরে এসে বলবে, দেখলে কেমন বোকা বানালাম বা কিছু দিন পরে ওর নিজের মধ্যে একটা অপরাধ বোধ এসে যাবে, সেদিন আমি ও-রকম মিথ্যা বলেছিলাম। এই হল *আর্জবম্*, ঋজু ভাব। অর্জুনের মধ্যে এই ঋজু ভাব ছিল, একেবারে পরিষ্কার মন। এটা না হলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না; জন্মগত ব্রাহ্মণ, স্বভাবে না।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং, তাঁর জ্ঞান আছে, তার সাথে বিজ্ঞান, জ্ঞানটাকে কাজে লাগাতে জানে। শুধু যে তাঁর শাস্ত্র জ্ঞান আছে তা না, সেই জ্ঞানকে জীবনে লাগাচ্ছেন। *আস্তিক্যং*, শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস আছে, ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে। আবার অনেকে আছে দিনের পর দিন শাস্ত্র পড়ে যাচ্ছে, মুখস্ত করছে, কিন্তু কোন ধারণা নেই। আমি একজনকে জানতাম, পণ্ডিত লোক, শাস্ত্র ভাল জানতেন, শাস্ত্রের খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করতেন, ব্যাখ্যা-ট্যাখ্যা করে বলতেন – আমি এগুলোর এক বর্ণ বিশ্বাস করি না, আমি এগুলো মানি না।

আপনি কি ব্রাহ্মণ? নিজেকে বিচার করে দেখুন আপনার মধ্যে এই গুণগুলি আছে কিনা। জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ না হয়েও আপনি কি স্বভাবে একজন ব্রাহ্মণ হতে চান? তাহলে এই কটি জিনিসকে আয়ত্ব করার জন্য আপনাকে নামতে হবে, বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম, তপস্যা করতে হবে, বাইরে ভিতরে শৌচ পালন করতে হবে, ক্ষমা ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, সরলতা থাকতে হবে আর তার সাথে শাস্ত্রের জ্ঞান আর সেই জ্ঞানকে উপলব্ধি করতে হবে বা তার জন্য অদম্য প্রচেষ্টা থাকবে আর শাস্ত্রে ও ভগবানে বিশ্বাস থাকতে হবে, এগুলোই ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য।

ভারতে বিবেকানন্দ লেকচারে একটা জায়গায় স্বামীজী বলছেন, সমাজের বাস্তবিকতা হল শূদ্র, মনুস্মৃতির আদর্শ হল ব্রাহ্মণত্বে পৌঁছান, উদ্দেশ্য নিম্নতর জাতিকে তুলে ব্রাহ্মণত্বে প্রতিষ্ঠিত করা। এটাই হিন্দু জাতির বৈশিষ্ট্য, আপনারা মানুন আর নাই মানুন। হিন্দু জাতির উদ্দেশ্যই হল যে যেখানে আছে, তাকে সেখান থেকে তুলে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণত্বের এই গুণগুলিতে নিয়ে আসা। আমরা এই কাজ করতে পারিনি, তাই বলে তো আদর্শকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। এগুলো কোন রাজনৈতিক ব্যাপার না, রাজনীতি যারা করছে তারা করুক এবং তারা তাই করবে। আমাদের কাজ হল আগে দেখুন সমাজে আপনার কি কর্তব্য। আজকে হিন্দুদের এই দুরবস্থা কেন, বিদেশী শক্তিগুলি, বিদেশী ধর্মগুলি হিন্দুদের উপর এত আক্রমণ করছে কেন? স্বামীজী এর উত্তরে খুব সুন্দর বলছেন, জনগণের যে আমিত্ব বোধ সেটাই তাদের হারিয়ে গেছে। তাদের আমিত্বকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, যার জন্য আজ ভারতের এই দুরবস্থা।

আম্বেদকার এটাই করতে চেয়ে ছিলেন, সংবিধান তৈরী করে এদেরকে তুলে নিয়ে আসার চেষ্টা করলেন, এটা আমার কাজ, আপনার কাজ, সবারই কাজ। সবারই জন্য শাস্ত্রের দরজা খুলে দিন। রানী রাসমণী একজন শূদ্রা মহিলা, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কাছে চাকরি করেছিলেন। কারণ তাঁদের পড়াশোনাটাও ছিল, সংস্কৃতিটাও ছিল। এই দুটো জিনিস, পড়াশোনা আর সংস্কৃতিকে ওদের ফিরিয়ে দিন, দেখবেন সব কিছু তাদের খুলে যাবে, সমস্ত কিছু ঠিক হয়ে যাবে। এরপর ক্ষত্রিয়ের স্বভাব বলছেন।

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্।।৪৩।।

(পরাক্রম, তেজ, ধৃতি, কর্মকুশলতা, যুদ্ধে অপারাঙ্মুখতা, দানে মুক্তহস্ততা ও শাসনক্ষমতা – এইগুলি ক্ষত্রিয়ের (স্বভাবজ সত্ত্বমিশ্র রজোগুণ দ্বারা প্রবিভক্ত) কর্ম।

ক্ষত্রিয়ের মধ্যে কি কি গুণ থাকতে হবে? *শৌর্যং তেজঃ,* এমন পরাক্রম আর তেজ থাকবে যে, কেউ তাকে কোন দিক থেকে দাবাতে পারবে না। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর প্রচুর খ্যাতি। সারা বিশ্বে বলা হয় যে, ইণ্ডিয়ান মিলিটারির মত solid fighters বিশ্বে কোথাও নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সবচেয়ে প্রশংসা প্রাপ্ত মিলিটারি হল ইণ্ডিয়ান সোলজার্সরা। তখন বলাই হতে যে, ইণ্ডিয়ান সোলজার আর বৃটিশ কমাণ্ডার যদি হয়, এই আর্মিকে কেউ হারাতে পারবে না। কারণ প্রথম থেকে ভারতের ক্ষত্রিয়রা এই ক্ষত্রিয় গুণে বড় হয়েছিল। সবাই ক্ষত্রিয় ছিলেন, কিন্তু মূল্যবোধ গুলি এগুলোই ছিল।

ধৃতিঃ, ধারণা শক্তি – লড়াই করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে, তখনও অস্ত্র কিন্তু ছাড়বে না, শরীরে ও মনে কখন অবসাদ আসতে দেবে না। *দাক্ষ্যং,* দক্ষতা, যেটা আগে ভক্তদের জন্য বলেছিলেন, এবার সেটাই ক্ষত্রিয়দের জন্যও বলছেন। দক্ষতা কি রকম, হঠাৎ যদি একসাথে অনেক কাজ এসে পড়ে, তাতে সে ঘাবড়াবে না। যুদ্ধে কখন কোন দিক থেকে আক্রমণ আসবে বলা যায় না, কখন কখন আবার চারিদিক থেকে আক্রমণ শুরু হয়ে যায়, তখনও মনকে ঠিক রেখে সব দিক সামলে ওই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসবে। আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *অপরাঙ্মুখীভাবঃ শত্রুভ্যঃ,* শত্রুর সামনে কখন পিঠ দেখাবে না। ভারতীয় সৈনকরা ঠিক এই রকম, মরে যাবে তবু পিঠ তারা কখন দেখাবে না।

দানমীশ্বরভাবশ্চ, কিভাবে ক্ষত্রিয়রা দান করবে, মুক্ত হস্তে দান করে। কর্ণের স্বভাব ছিল ক্ষত্রিয়ের, যদিও সে বড় হয়েছিল শূদ্র বংশে। কর্ণ জানত না যে আসলে সে কুন্তির পুত্র। কর্ণ কত বড় একজন দানবীর ছিলেন। *ঈশ্বরভাবঃ* মানে শাসন করা। ক্ষত্রিয়ের ভিতর স্বাভাবিক ভাবে এই শাসনক্ষমতার ভাব থাকবে। চন্দ্রগুপ্ত দাসীপুত্র ছিলেন, মানে শূদ্র। কিন্তু চাণক্য দেখছেন বাচ্চা বয়স থেকেই এর মধ্যে কি রকম ঈশ্বরভাব, তার কথাই সব জায়গায় চলত, এই হল ক্ষত্রিয়ের ঈশ্বরভাব, সবাইকে শাসনে রাখা, এটা একেবারে তার স্বভাবজাত। পরে এই চন্দ্রগুপ্ত কত শক্তিশালী রাজা হয়ে রাজত্ব করে গেলেন। অশোক এই বংশেরই ছেলে। চাণক্য নীতিতে চাণক্য এটা লিখেছিলেন, *বলং বিদ্যাঞ্চ বিপ্রাণাম্,* ব্রাহ্মণের শক্তি হল বিদ্যা। *রাজ্ঞং সৈন্যং বলঞ্চ,* রাজার শক্তি হল সৈন্যবল। *বলং বিত্তঞ্চ বৈশ্যানাম্,* বৈশ্যের শক্তি হল বিত্ত, টাকা-পয়সা। *শূদ্রাণাং পরিচর্যকাম্,* সেবাতে কে বেশি ভাল? সেবাতে মায়ের উপর কে আছে, মা-ই সেবাতে সবচেয়ে ভাল। তাহলে মা শূদ্র? কাজের দিক থেকে শূদ্র বলছেন। এই হল ক্ষত্রিয়দের স্বভাবজাত কর্ম। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের স্বভাব বলার পর অন্য দুটোকে নিয়ে বলছেন।

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্।।৪৪।।

(কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবজাত (স্বভাবজ তমোমিশ্র রজোগুণের দ্বারা প্রবিভক্ত) কর্ম। পরিচর্যা শূদ্রদের স্বভাবজাত (রজোমিশ্র তমোগুণের দ্বারা প্রবিভক্ত) কর্ম।)

বৈশ্যের যে স্বাভাবিক ভাব, তা হল, কৃষি, গোরক্ষা আর বাণিজ্য। তাই কি? চাষবাশ কি বৈশ্যরা করে? সবাই চাষবাশ করছে। ব্রাহ্মণদেরও জমি-জায়গা আছে, ক্ষত্রিয়দেরও চাষবাশ আছে। এখানে বৈশ্য সাধারণ ভাবে বলছেন, যারা পয়সাকড়ি নিয়ে সমাজ বা দেশের অর্থের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করছে। তার মানে যারা যুদ্ধ করছে, তারা হল ক্ষত্রিয়, বিদ্যাচর্চা নিয়ে আছে, তারা ব্রাহ্মণ, যেখানেই টাকা উপার্জনটা মূল, তারা হল বৈশ্য। আর *পরিচর্যাত্মকং কর্ম,* যেখানেই সেবার কাজ করা হচ্ছে, সেটাই হল *শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্।* এটা একটা সামাজিক ব্যবস্থা, যাই হোক, আমার যা কিছু বলার ব্যাখ্যা করে দিলাম। কিন্তু exploitationটা উদ্দেশ্য না, উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক উত্থান, উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ, উদ্দেশ্য মুক্তি। কিভাবে ঈশ্বরলাভ বা মুক্তি হবে? সেটাই এবার ভগবান বলবেন।

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণূ।।৪৫।।

(মানুষ নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমের কর্মে নিরত হয়ে জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতারূপে সিদ্ধিলাভ করে। স্বীয় কর্মে তৎপর মানুষ কিভাবে সিদ্ধিলাভ করে, এবার সেটা শ্রবণ কর।)

যাঁরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কথা এখানে বললেন, তাঁরা কি কোথাও বলছেন, শূদ্রদের মুক্তি হবে না? তাঁরা কি বলছেন, ব্রাহ্মণরা একটা লোকে যাবে, শূদ্রা অন্য লোকে যাবে। কোথাও ওনারা এই সব উল্টোপাল্টা কথা বলছেন না, বলছেন, তুমি যে কাজই করো না কেন, সেই কর্ম দিয়েই তুমি উপরে উঠে আসতে পারবে। বর্তমান কালে ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, যে কাজ সামনে এসে গেল, সেই কাজটা করে দেওয়া। কিন্তু এটা যতটা সহজ বলা হল, সেভাবে হয় না। সমাজ চালানোর সময় পরিষ্কার করে বলে দিতে হয়।

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ, নিজের নিজের স্বধর্মের কাজে যদি লেগে থাক, নিষ্ঠাপূর্বক যদি কর; এটা আমার দায়ীত্ব, এই দায়ীত্ব রূপে যদি কাজ কর, *সংসিদ্ধিম্ লভতে নরঃ*, তুমি সিদ্ধি লাভ করবে। জীবনের উদ্দেশ্য হল *সংসিদ্ধিম্*, সিদ্ধিলাভ করা। কি ভাবে এই *সংসিদ্ধিম্* আসবে? এই কাজটা আমার, এই ভাব নিয়ে প্রত্যেকটি কর্মের সম্পাদন করা; এর উদ্দেশ্য মনকে শুদ্ধ করা। *স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ*, ব্রহ্মচারী ট্রেনিং সেন্টারে ডাক্তার মহারাজের কথা বলেছিলাম, তাঁর কাজ হল মেডিসিন রুম পরিষ্কার করা। নিজের কাজ ঠিক ভাবে যদি করা হয়, তাহলে কি হবে? *সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ*। আপনি বলবেন, আমার তো মহারাজ কোন কাজ নেই। আপনি কাজ বার করুন। পাড়ার দু-চারটে ছেলেকে পড়াতে শুরু করুন। যদি না পড়তে চায়, তাহলে বলুন, চা বিস্কুট খাওয়াব। তার কোন লাভ হবে না, লাভ হবে আপনার।

আমাদের পূজনীয় অধ্যক্ষ মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ বলতেন, এই জগৎটা হল কুকুরের লেজ। দ্বিতীয়, কুকুরের লেজটাকে সোজা করার চেষ্টা কর। তৃতীয়, এটা কোন দিন সোজা হবে না। চতুর্থ, কুকুরের লেজ সোজা করতে গিয়ে তুমি নিজেই সোজা হয়ে যাবে। কুকুর লেজকে সোজা করাটা উদ্দেশ্য না, নিজেকে সোজা করা, যার জন্য মজা করে এটাকে বলে সপুচ্ছবাদ সিদ্ধান্ত। কাজ কেন করা, যাতে আমি ভাল হয়ে যাই, আমার চিত্তশুদ্ধ যেন হয়। তাহলে কাজেই কি আমার মুক্তি হয়ে যাবে? না, তা হবে না। মুক্তি হবে, যেটা পরের শ্লোকে গিয়ে বলছেন।

পরবর্তি শ্লোকের আলোচনা শুরু করার আগে কয়েকটা কথা বলে নিতে হচ্ছে, আগেও আমরা এর উপর অনেকটাই আলোচনা করেছি। আমরা গীতার এখন শেষ অধ্যায়ে আছি। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বীজ ছড়িয়ে দিলেন। তৃতীয় অধ্যায় থেকে সপ্তদশ অধ্যায় পর্যন্ত সেই বীজগুলি যেন বিরাট বৃক্ষ হয়ে গেল। এবার ভগবান সব কিছুকে সুন্দর করে গুছিয়ে নিয়ে আসছেন। হিন্দুদের জন্য গীতা অত্যন্ত জরুরী গ্রন্থ। আসলে গীতা শুধু হিন্দুদের জন্য নয়, গীতার বেশির ভাগ কথা সারা বিশ্বের জন্য এক শাশ্বত বিজ্ঞান। আর আধ্যাত্মিক ব্যাপারে বলতে গেলে, বিশ্বের কোন ধর্মে কিছু নেই যেটা গীতাতে নেই, সমস্ত ধর্মের সার গীতাতে আছে।

গীতার আলোচনা আমাদের শেষ হতে চলেছে। এর আগে অনেকবার আপনাদের কাছে অনুরোধ করেছিলাম, যতটা পারা যায় গীতা মুখস্ত করা। আপনাদের মধ্যে অনেকেই মুখস্ত করেছেন, তাঁরা নিজেরাই যোগাযোগ করে বলছেন। শুনে ভাল লাগে, এটাই হল নিজের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা। খোঁজ নিলে দেখবেন, আপনাদের বাবা, ঠাকুরদারা, কেউ না কেউ নিয়মিত গীতা, চণ্ডী, ভাগবত এগুলো পাঠ করতেন, ওনাদের মুখস্ত ছিল। গীতা মুখস্ত করার জন্য কাউকে পণ্ডিত হওয়ার দরকার নেই, যে কেউ মুখস্ত করতে পারেন। এগুলোই সাধনার অঙ্গ, জীবনটা এতে সুবিন্যস্ত হয়, তার চাইতে বড় হল, মন সতেজ ও সজাগ থাকে। মহারাজদেরও আমরা দেখেছি, যাঁরা গীতা উপনিষাদি

মুখস্ত করে রাখতেন, শেষ দিন পর্যন্ত তাঁদের মনের সজাগ ভাব, সতর্কতার ভাব সাঙ্ঘাতিক থাকতে দেখেছি।

এর আগের শ্লোকে ভগবান নিজের দায়ীত্ব পালন করার কথা বললেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে সেখান থেকে সে সিদ্ধি লাভ করে। এই যে বলা হল, কিভাবে ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে জালটাকে ছড়িয়ে দিলেন, এবার ভগবান জালটাকে গুটিয়ে আনছেন। এখন যে কথাগুলো আমরা বলব, এই কথাগুলো আগে আগে বিস্তারে আলোচনা করা হয়ে গেছে। একটা খুব দরকারী কথা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, মন শুদ্ধ পবিত্র না হলে ধর্ম জীবনে এগোন যায় না। কিভাবে মন শুদ্ধ পবিত্র হবে? যে দায়ীত্ব সমাজ আপনাকে দিয়েছে, সেই কাজকে ঠিকমত করা, এটাকে বলে বহিরঙ্গ সাধন। ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভূমিকাতে আচার্য খুব সুন্দর বলেছিলেন, প্রথমে হয় বহিরঙ্গ সাধন – বহিরঙ্গ সাধনকে সাধারণ ভাবে কর্ম বলা হয়। এরপরে হয় অন্তরঙ্গ সাধন; জপধ্যান, পুজা, ইত্যাদি এগুলো হল অন্তরঙ্গ সাধন, সেখান থেকে মানুষ শরীর মনের প্রস্তুতি লাভ করে, ঠাকুর বলছেন পুরো নূতন শরীর হয়, বাস্তবিকই একটা নূতন শরীর তৈরী হয়।

এখানে আমরা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা খুব সহজ ভাবে করছি, কিন্তু এটা যেন কেউ মনে না করেন যে, ধর্ম সাধনাটাও এই রকম সহজ। রূঢ় বাস্তব হল, আমাদের যে শরীর, মন, এই শরীর, মন দিয়ে ধর্ম জীবনে এগোন যায় না। সাধনা করে, তা বহিরঙ্গের সাধনাই হোক আর অন্তরঙ্গ সাধনাই হোক, পুরো নূতন একটা শরীর তৈরী করে দাঁড় করাতে হবে। নূতন শরীর তৈরী হয়েছে কিনা কিভাবে জানা যাবে? যাঁদের হয় তাঁরা বুঝতে পারেন। এর জন্য প্রথমে চুটিয়ে কাজ করতে হবে। আপনারা হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন, ঠাকুর যে বলছেন, আগে ঈশ্বর দর্শন, পরে কাজ? হ্যাঁ কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, কিন্তু সেটা একটা অন্য পরিপ্রেক্ষিতে ঠাকুর বলছেন, সেইজন্য শাস্ত্র নিজে পড়তে গেলে অনেক সংশয় আসবে, তাই বলা হয়, ভাল আচার্যের কাছ থেকে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনে নিতে হয়। ঠাকুর আবার এটাও বলছেন, কর্ম হল আদিকাণ্ড।

মনের মধ্যে আগাছা ভরে আছে, এগুলোকে পরিষ্কার করার জন্য দরকার প্রচুর কাজ করা। যখনই কোন কাজ করবেন, উদ্দেশ্যটা যেন পরিষ্কার থাকে – আত্মশুদ্ধি/চিত্তশুদ্ধি। সন্তানকে লালন-পালন করে বড় করছেন, বাড়ির লোকেদের জন্য রান্না করছেন, অফিসে কাজ করছেন, সব সময় এই উদ্দেশ্যটা যেন পরিষ্কার থাকে –আমাকে চিত্তশুদ্ধি করতে হবে। টাকা আয় করা, অপরকে খুশী করা, এগুলো কর্মের উদ্দেশ্য নয়, কর্মের উদ্দেশ্য একমাত্র আত্মশুদ্ধি। কাজ করতে একটু ভাল না লাগতে পারে, কোন কাজ করতে বেশি ভাল লাগতে পারে, মনের মধ্যে একটু অশুদ্ধি ভাব থাকতে পারে, কিন্তু একেবারে পুরোপুরি এগুলোর দিকে ঢলে পড়াটা ঠিক না। বর্ণাশ্রম ধর্মের এটাই উদ্দেশ্য ছিল, তুমি যে কাজ করছ, সেই কাজ করেই তুমি ঈশ্বরদর্শন করতে পারবে। কাজ পাল্টে নিলেই যে তোমার ঈশ্বরদর্শন পেতে সুবিধা হবে, তা কখনই না। আত্মশুদ্ধি যাঁর হয়ে যায়, তখন তিনি নিজেই বুঝতে পারবেন, আমার আর লাগবে না। যতটুকু হলে তাঁর হয়ে যায়, ততটুকুতেই তিনি খুশী থাকেন, কোন চাহিদা থাকে না। এগুলো আগেও আমরা আলোচনা করেছি।

কাজ করলেই তো হবে না, কর্ম তো একটা সাধনা। কর্ম যে একটা সাধনা, এটা যদি না বুঝে থাকেন, ধর্ম জীবন আপনার এখনও শুরু হয়নি। এই ধর্ম জীবন কিভাবে শুরু হয়, সেটাই অর্জুনকে এখন ভগবান বলছেন – *স্বকর্ম নিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু*, নিজের কাজ করতে করতে কিভাবে সিদ্ধি লাভ হয়, এবার আমি তোমাকে আমি বলছি, তুমি শোন।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।।৪৬।।

(যে সর্বান্তার্যামী পরমেশ্বর থেকে প্রাণিগণের উৎপত্তি বা কর্মচেষ্টা, যিনি এই সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, তাঁকে মানুষ স্বীয় বর্ণাশ্রমের কর্ম দ্বারা অর্চনা করে সিদ্ধিলাভ করে।)

আপনাদের অনুরোধ করি আপনারা সবাই এই শ্লোকটা অবশ্যই মুখস্ত করবেন, গীতার এটি খুব সুন্দর এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি শ্লোক। এই শ্লোকে ভগবান বলে দিচ্ছেন, কর্মজীবন কিভাবে মানুষকে জ্ঞানের দিকে, ঈশ্বরদর্শনের দিকে নিয়ে যায়, খুব পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন। আচার্য ব্যাখ্যাতে বলছেন, *যতো যস্মাৎ প্রবৃত্তিঃ উৎপত্তি চেষ্টা বা যস্মাদ্ অন্তর্যামিণ ঈশ্বরাৎ,* প্রবৃত্তি হল উৎপত্তি, আমাদের ভিতরে যিনি অন্তর্যামী রূপে ঈশ্বর হয়ে আছেন, তিনিই ঈশ্বর হয়ে জগৎ চালাচ্ছেন। ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়, শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎ চালাচ্ছেন, শ্রীকৃষ্ণ জগৎ চালাচ্ছেন, ইনিই আবার আমাদের ভিতরে বসে আছেন। হিন্দু ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম মানুষকে এই স্তরে নিয়ে যেতে পারে না। যিনি জগৎ চালাচ্ছেন তিনিই যদি আমার ভিতরে বসে থাকেন, তাহলে এই জগৎকে কে চালাচ্ছে? আপনি।

রাশিয়া আজ ইউক্রেনকে আক্রমণ করেছে, কেন করেছে? আপনি চেয়েছেন বলে। চীন, পাকিস্তান মিলে ভারতের এত সমস্যা তৈরী করছে কেন? আপনি চেয়েছেন বলে। কে এই সব কিছু করাচ্ছে? আপনিই করাচ্ছেন। এসব ভাবলে কেমন আতঙ্ক লাগে, কিন্তু এটাই সত্য। সব কিছু ভগবান করাচ্ছেন, সব তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে, সেই ভগবান বসে আছেন আপনারই ভিতরে। ভিতরের তিনি আর বাইরের উনি এক, কোন তফাৎ নেই। এটাই আপনার আসল সত্তা। জগতে যত চুরি, মারামারি, কাটাকাটি হচ্ছে, কে করাচ্ছে? আপনি। কি আশ্চর্য, বিশ্বাস হয় না, কিন্তু এটাই সত্য। আমরা মানতে পারি না, বিশ্বাস করতে চাই না, কারণ মানতে গেলে আতঙ্ক লাগে, বিশ্বাস করতে গেলে অবাক লাগে। বেশির ভাগ সময় আমরা মুখে বলে দিই, কি দারুণ কথা। কিন্তু গীতাতে একবার ডুব দিয়ে দেখুন, এই রকম কত ভাল ভাল কথা, কত হীরে, জহরৎ, মণি, মাণিক্য গীতার পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। সাধে কি আমি আপনাদের বলি পুরো গীতা মুখস্ত করতে। ঠাকুরকে একজন বলেছিলেন, মশাই, গীতা পড়লাম, খুব ভাল বই। ঠাকুরও তো ছাড়ার লোক নন, বলছেন, ওগুলো বুঝি তোমার খবর কাগজে আছে? সমস্ত জগতের সৃষ্টি কোথা থেকে? আপনার থেকে – *মত্তঃ সর্বং প্রবর্তন্তে,* আপনার ভিতর থেকেই সব কিছু বেরিয়েছে।

সমস্ত মানুষের সমস্ত রকমের যে চেষ্টা চলছে, এটা আপনার জন্যই হচ্ছে। *যেন সর্বমিদং ততম্,* সেই ঈশ্বর সমগ্র জগৎকে ব্যপ্ত করে রেখেছেন, তিনি আপনার ভিতরে, আপনিই ব্যপ্ত করে রেখেছেন। হিন্দুরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছে, আমাদের সবার ভিতরে অন্তর্যামী আছেন, আমরাও কথায় কথায় বলি, তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু তিনি যে আপনার ভিতরে, আপনার ভিতরে তিনি আছেন বলেই আপনি আজ এই আপনি হয়েছেন। যেখানে যা গোলমাল হচ্ছে, সব আপনার এখান থেকে। মহাত্মা গান্ধীজী কিন্তু এই সিদ্ধান্তেই চলতেন। গান্ধীজী বলতেন, আমার ভারতবর্ষে এই সমস্যা, এটাকে সারানো যাবে না। কিন্তু আমি যদি নিজেকে শুদ্ধ করে নিই, যদি আত্মশুদ্ধি করি, সেখানে তাহলে আমার কিছুটা অবদান থাকল। গান্ধীজী উপোসে বসে যেতেন, উপোস করে আমি নিজেকে শুদ্ধ করব। গান্ধীজীর কোন authentic biography পড়েন তাহলে বাকিটা জানতে পারবেন।

ইউটিউবে আজকে আমার এত লেকচার মানুষ দেখছেন, শুনছেন এর পিছনে একজন ইয়ং ছেলের প্রচুর অবদান। প্রথম প্রথম সে লুকিয়ে ভিডিও করে ইউটিউবে আপলোড করতে শুরু করেছিল। ইউটিউবে কোন ভিডিও দেখে আমার একজন বন্ধু পুলিশ অফিসার আমাদের একটা ক্যামেরা কিনে দিলেন, সেখান থেকে রেকর্ডিংএর কাজগুলো পরিকল্পিত ভাবে শুরু হয়েছিল। একদিন সেই ছেলেটি ক্লাশে এসেছে, দিনটা ছিল একটি ধর্মের বিশেষ উৎসবের দিন। ক্লাশের পর ছেলেটিকে ডাকলাম, 'চা খেয়ে যাও'। ও বলল, 'আজকে চা খাব না মহারাজ, আজ আমার উপোস'। 'আজ আবার কিসের উপোস'? 'না, আজ তো অনেক গোহত্যা হবে, সেইজন্য আমি

উপোস করছি’। শোনার পর আমি চমকে উঠলাম, কি ভাব! আপনারা অনেকে হয়ত এক মত হবেন না, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু এই ভাব, ভাবটাই বড়।

মায়েরা কি করেন? সন্তানকে বললে শুনবে না, সন্তান তো অবোধ, সন্তান জানে আমার মা আছে। সন্তানের মঙ্গলের জন্য মা ব্রত রাখেন। আজকে আমরা বড় হয়েছি, আমরা মনে করছি, আমি আমার জোরে বড় হয়েছি। না, সেই ষষ্ঠী ব্রত থেকে শুরু করে মায়েরা কত রকমের ব্রত করেন, আজকে নির্জলা উপোস, কাল ফল খেয়ে উপোস, আজকে নিরামিষ, কত রকমের ব্রত, কত রকমের উপোস দিনের পর দিন করেই যাচ্ছেন। কিসের জন্য? আজ এই উপোস সন্তানের মঙ্গলের জন্য, কাল সেই উপোস স্বামীর মঙ্গলের জন্য। কারণ, *যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্*, সব কিছু আসলে এখান থেকেই হচ্ছে। যখনই আপনি কোন উপোস করছেন, সেটা কারুর মঙ্গলের জন্য, সেখানে কোন স্বার্থের ভাব নেই, কারণ যে অন্তর্যামী আমার ভিতরে, তিনিই সমস্ত কিছুকে চালাচ্ছেন। রক্ষা করেন তিনি, মারেনও তিনি। পুরো ভারতবর্ষের লোকেরা যে অন্যান্য দেশের তুলনায় এত ভাল মানুষ, অন্যান্য জাতির মত এত হিংস্র নয়, এর একমাত্র কারণ হল, মায়েদের ব্রত। মায়েরা অতটা জেনেবুঝে সব কিছু করছেন না, আর কেন হয়, কি হয় তাও অতটা জানেন না, কিন্তু এখানে বলছেন *যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং*, যিনি অন্তর্যামী তিনি জগৎ চালাচ্ছেন, তিনিই আবার সমগ্র জগতে ব্যপ্ত হয়ে আছেন।

সেই ঈশ্বরের পূজা করতে হয়। কিভাবে পূজা করা হবে? *স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য*, তাঁর অর্চনা কর। অর্চনা কিভাবে হবে? সেটাই অর্চনা হবে আপনি যখন আপনার কাজ, আপনার দায়ীত্ব পালন করছেন, যখন বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করছেন। ইদানিং কালে ইংরাজী পড়া কিছু লোক নানা রকমের বোকা বোকা প্রশ্ন করেন। সব কিছুতে তাদের বক্তব্য হল, নারীকে সম্মান দেওয়া হয় না। কোথায় সম্মান দিচ্ছে না, কাজের বিভাজন করে দিয়েছেন, তুমি এটা করবে, আমি এটা করব। এখানে আগে বাচ্চাদের কিছু করতে দেওয়া হত না। বিদেশে বাচ্চারাও কাজ করে, এখানে করতে দেওয়া হত না। যেখানেই যান আপনারা এখনও দেখবেন, যখন ধর্ম পালন হবে, স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলে একসাথে ধর্ম পালন করছে। আমি দেওঘরে অনেক দিন ছিলাম, বাবা বৈদ্যনাথের মন্দির আছে, আমি প্রায়ই যেতাম। সেখানে দেখতাম, স্বামী-স্ত্রী পূজা দিতে এসেছেন, বয়স হয়েছে, তাঁদের আবার ধুতি আর শাড়ি একসাথে বাঁধা, এক সঙ্গে বসে বৈদ্যনাথের পূজা করছেন। দুজনে এক, কোথায় আপনি সেকেণ্ড ক্লাশ সিটিজেন দেখছেন, কে আপনাকে ইনফিরিওর বানাচ্ছে। বিদেশী মানসিকতা এনে সমাজকে বিষাক্ত করে দিচ্ছে।

বলছেন, পূজা কিভাবে হয়, *স্বকর্মণা*। আমি ক্লাশ নিচ্ছি, এটাই আমার পূজা। দেওঘরে ব্রহ্মচারী ছিলাম, স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ বিদ্যাপীঠের প্রিন্সিপাল ছিলেন, আমি সেখানে ক্লাশ নিতাম। অত কম বয়সে, একুশ বাইশ বছর আমার, তখন আবার দুর্দান্ত সব ছাত্রদের ওয়ার্ডেন ছিলাম। আমার থেকে ওরা পাঁচ-ছয় বছরের ছোট। তার সাথে কোলিয়ারি থেকে কয়লা আনা, সিমেন্ট ফ্যাক্টরি থেকে সিমেন্ট আনা, দিনের পর দিন এই ধরণের নানা রকমের কাজ আমকে করতে হত। তখন ওই ভাবেই সব কাজ করে গেছি। তখন ওতো বুদ্ধিও ছিল না, জ্ঞানও সেই রকম ছিল না, এখনও যে বুদ্ধি জ্ঞান হয়েছে তা না। কিন্তু যিনি আমার হেড ছিলেন, শ্রীমৎ স্বামী চন্দ্রনাথানন্দজী, গত হয়েছেন, আমার কাছে তিনি ভগবানের মত, খুব স্নেহ করতেন। তিনি বলে দিয়েছেন কয়লা আনতে হবে। সারা রাত ট্রাকে চেপে কোলিয়ারি যাওয়া, সকালবেলা কয়লা লোডিং করানো, বিকালে বেরিয়ে আবার সারা রাত ট্রাকে করে কয়লা দেওঘর বিদ্যাপীঠে নিয়ে আসা, কয়লাকে আনলোডিং করানো, বিকালে আবার কয়লা আনতে যাওয়া। মাসে দশ বারটা করে এই রকম ট্রিপ দিতে হত। মহারাজ বলে দিয়েছেন, আমাকে ওটাই করতে হবে; আমরা সন্ন্যাসী আমাদের জন্য তো বর্ণাশ্রম নেই।

আমি নিজেকে জানি, আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই, সত্যিই জীবনে আমার কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। আজকে শাস্ত্রের চর্চা করছি, শাস্ত্রের কথা যে কিছু কিছু বুঝতে পারছি, কাজে সমর্পিত ছিলাম, সেইজন্য এখন বুদ্ধি একটু খুলেছে, তা নাহলে এটুকুও খুলত না। কর্ম হল বুলডোজারের মত, মনের মধ্যে যত যা কিছু আবর্জনা আছে, সব পরিষ্কার করে দেবে। ফ্যাক্টরির কাজ বলুন, অফিসের কাজ বলুন, সব জায়গাতে তাই হবে, যদি উদ্দেশ্য থাকে *তমভ্যর্চ্য*, যে কাজই করি না কেন, আমি ঈশ্বরের পূজা করছি, ভগবানের অর্চনা করছি।

যে কোন কাজ করার আগে আপনি দেখুন আপনার উদ্দেশ্যটা কি। উদ্দেশ্য যদি ইনক্লাব জিন্দাবাদ করা হয়, তাহলে আর আবর্জনা পরিষ্কার হবে না। উদ্দেশ্য যদি টাকা আয় করা হয়, তাহলে আবর্জনা পরিষ্কার হবে না। আগেকার দিনে যারা চুরি ডাকাতি করত তারা মা কালীর পূজা করে ডাকাতির কাজে নামত, কালীর নামই ছিল ডাকাতে কালী। বেনারসের কাছে বিন্ধ্যাচলেও তাই হত, ডাকাতি করার আগে ডাকাতরা সেখানে এসে পূজা করে যেত। এদের কি ভাব ছিল? মা, আমার তো অন্য কোন পথ নেই, আমাকে এটা করেই বাঁচতে হবে, সেইজন্য সেটাও তারা পূজা করে কাজে নামছেন। এই হল হিন্দু ধর্ম, কাজকে কোথায় কোন পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

এই কথাগুলো শুনে লোকেরা মনে করতে পারে, ধর্ম মানেই চুরি ডাকাতি করা। না না, তা কেন হবে। যা কিছু করছে, সবটাতে ঈশ্বরকে স্মরণ করে করছে। একটা হাঁচি হয়ে গেলে তখনও বলছে, রাম রাম। ওজন করছে, এক রাম, দুই রাম, তিন রাম করে করে। কত উচ্চমানের কর্ম, কত উচ্চমানের সভ্যতা ভাবা যায়! যাবতীয় যা করছি, সবটাই ঈশ্বরের পূজা। সবচেয়ে উচ্চমানের পূজা হল *তমভ্যর্চ্য*। মায়েরা রান্না করেন, যা রান্না করার করুন, মাছ, মাংস, ডিম, বিরিয়ানি যাই করছেন করুন, রান্না করার পর ঠাকুরের সামনে পুরো খাবারটা একবার রেখে দেবেন, দিয়ে বলুন, তোমার জন্য এই রান্না, আমরা প্রসাদ রূপে গ্রহণ করব। তখন আর অত হিসাব করার দরকার নেই, ঠাকুর এটা খেতেন কিনা, সেটা খেতেন কিনা। আমাদের বেলুড় মঠ এই ধর্ম পালন করেন, ওনারা দেখেন ঠাকুরের কোন খাবারটা বেশি প্রিয় ছিল, কোন খাবার তিনি খেতেন না। আপনার মন খুঁত খুঁত করলে সে খাবারটা দেবেন না, আপনিও খাবেন না। যা কিছু করছেন, তাঁর পূজা, ফলটাও তাঁকে সমর্পণ করে দিচ্ছেন।

গীতার নবম অধ্যায়ে ভগবান এটাই বলছেন, *যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ*, হে অর্জুন যা কিছু তুমি করছ, খাওয়া-দাওয়া করছ, যজ্ঞ করছ, দান করছ, যা তপস্যা করছ; কৌন্তেয় *তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্*, হে কুন্তিপুত্র, সব আমাকেই অর্পণ কর। আমাদের গীতা ক্লাশের সব রেকর্ডিং ইউটিউবে আমাদের প্লেলিস্টে রাখা আছে, গীতার ক্লাশগুলো প্রথম থেকে সারা জীবন শুনতে থাকুন, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত পারায়ণ রূপে শুনতে থাকুন, কারণ কখন কোন কথা আপনার ভিতরে আলো জ্বেলে দেবে ঠিক নেই। *সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ*, এটা দিয়েই মানুষ সিদ্ধি পায়।

আচার্য এখানে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, *জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণাম্*, এটা একটা খুব দামী কথা। সিদ্ধি লাভ কিভাবে হবে বা সিদ্ধি লাভ জিনিসটা কি? বেশির ভাগ লোক সিদ্ধি বলতে সিদ্ধাই মনে করে, সিদ্ধি মানে সিদ্ধাই না, সিদ্ধি হল *জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণাম্*। এই যে আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়, সেখান থেকে বজ্রপাত হয়। সেই বজ্রপাত গাছকে ফেলে দেয়, বাড়ি পর্যন্ত গুড়িয়ে দেয়, বজ্রপাতে একসাথে সাত আটজন মানুষও মারা যায়। ইউরোপে খ্রীশ্চানরা মনে করত, বাজ পড়াটা হল ডেভিল। পরে যেদিন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন আবিষ্কার করলেন, এটাই তো ইলেক্ট্রিসিটি, তখন ওনারা মাথা খাটিয়ে বার করতে লেগে গেলেন বজ্রপাত থেকে কিভাবে মানুষের জীবন, সম্পদকে রক্ষা করা যেতে পারে। সেখান থেকে ওনারা আবিষ্কার করলেন লাইটনিং কনডাক্টর, যা কিনা আজ সমস্ত বড় বড় বহুতল বাড়িতে লাগানো থাকে। সেদিন থেকে খ্রীশ্চানদের মাথা থেকে ডেভিল উড়ে গেল। খ্রীশ্চনরা যেটাই বুঝতে পারে না, সেটাই ডেভিল। তারপর দেখা গেল, ডেভিলের সাথে এর

কোন সম্পর্কই নেই, এটা একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। আমরা কিন্তু চিরদিন জানতাম বজ্রপাত প্রকৃতিরই একটা রূপ। তবে এতটা বিস্তারে জানা ছিল না, কারণ তখনও মানুষ প্রকৃতির সব কিছুর গভীরে গিয়ে অত চিন্তা-ভাবনা করতেন না।

আধ্যাত্মিক জ্ঞান ভিতরে গেলে বুম্ করে সব কিছু উড়ে যাবে, যেভাবে বাজ পড়লে সব কিছু উড়ে যায়। আধ্যাত্মিক জ্ঞান এক নূতন শরীর, নূতন ইন্দ্রিয়, নূতন মন তৈরী করে দেয়। এই যে জপধ্যান করা হয়, তপস্যা করা হয়, উপবাস করা হয়, কর্ম করা হয়, এগুলো করা হয় আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের যোগ্যতা অর্জনের জন্য। কল্পনা করুন, পাশাপাশি দুটো পুকুর আছে, তাদের মাঝখানে ছোট্ট একটা মাটির বাঁধ আছে। দুটো পুকুরের জল একই। দুটো পুকুর এক অপরের সাথে মিশে যেতে চাইছে কিন্তু পারছে না। কে আটকাচ্ছে? মাটির বাঁধ। বাঁধ যদি ভেঙে দেওয়া হয়, তখন কি হবে? দুটো পুকুরের জল এক হয়ে যাবে।

আমাদের সবার ভিতরে যিনি অন্তর্যামী রূপে আছেন, আর বাইরে যে ঈশ্বর, দুটো এক। দুটোর মাঝখানে কে বাঁধ হয়ে দুটোকে আলাদা করে রেখেছে? আমাদের মন সেই বাঁধ হয়ে দুটোকে আলাদা করে রেখেছে। ঈশ্বর আর অন্তর্যামী, দুটো এক। ওই বাঁধটাকে যদি ভেঙে দেওয়া হয়, তখন দেখবেন জলে জলাকার, এই পুকুরের জল আর ওই পুকুরের জল মিলে এক হয়ে গেছে। সমস্ত সাধনা করা হয় এই বাঁধটাকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য। ভগবান সব সময় পুরোদমে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে এই যে অন্তর্যামী আছেন, তাঁর সাথে মিলে এক হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু আমরা হতে দেব না। আগেকার দিনে যেমন হত, কোন ছেলে কোন মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করতে চাইছে, বাবা-মা ব্যাগড়া দিতেন, এসব চলবে না। এখন অবশ্য বাবা-মায়েরা বাধা দেন না।

অন্তর্যামী আর ঈশ্বর মিলে এক হয়ে যেতে চাইছেন, দুজনে ছটফট করছেন এক হওয়ার জন্য। দুজনেই জাতে এক, কিন্তু আমরা এক হতে দেব না। সিদ্ধি কেন হচ্ছে না? কারণ আমরা চাইছি না। দরকার দুটোকে এক করা, দুটোর মিলনের পথে সব বাধা-বিপত্তিকে উড়িয়ে দেওয়া। এটাকে অন্য ভাবে বলছেন – পাত্রতা। পাত্রতাটা কি? একটা সোনার তাল আছে, একেবারে সলিড সোনা। ওর মধ্যে কেউ যদি জল রাখতে যায়, জল ধরবে না। সোনা এমন একটা ধাতু, যে ধাতুকে যত খুশী পাতলা করা যায়। সোনার তালের উপর দুটো হাতুড়ির ঘা মারলে একটু চ্যাপ্টা হবে, ওতে এবার একটু জল ধরবে। যত হাতুড়ি মারতে থাকবেন তত সোনা পাতলা হয়ে ছড়াতে থাকবে, তত ওর পাত্রতা বাড়তে থাকবে, যত পাত্রতা বাড়বে তত ওতে জল বেশি রাখা যাবে। এটাকেই বলে পাত্রতা। মনও সোনার মত এমনই একটা বস্তু। যত কাজ করা হবে, যত পড়াশোন করবে, যত চিন্তন মনন করা হবে তত মনের পাত্রতা বাড়বে।

অনেক শ্রোতাদের সাথে আমার দেখা হয়, দেখা হলে সবাই বলেন, প্রথমের দিকে আপনার ক্লাশগুলো অত বুঝতে পারতাম না। কিন্তু আট দশটা ক্লাশ শোনার পর মনে হতে লাগল যে, এবার সব কথাগুলো বুঝতে পারছি। অনেকে আবার বলেন, যখন বুঝতে শুরু করেছি তখন অন্য কারুর ক্লাশ আর শুনতে ইচ্ছে করে না। অবশ্য এতে আবার যার যার পছন্দের ব্যাপার আছে। মূল কথা, কাজ যত করবেন মনের ক্ষমতা তত বাড়বে, পড়াশোনা যত করবেন, উচ্চ চিন্তন যত করবেন মনের পাত্রতা তত বাড়বে, চিন্তা-ভাবনা যত গভীর করবেন পাত্রতা তত বাড়বে। কর্ম, পড়াশোনা আর চিন্তন, এই তিনটে করলে মনের পাত্রতা বাড়ে।

এটাকেই আরও সুন্দর করে বলছেন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। পাত্রতা বাড়লে তবে গিয়ে ধ্যান হবে। ঠাকুরের সময় অনেকে ছিলেন, যেমন গোপালের মা, তাঁর কোন পড়াশোনা ছিল না, কিন্তু নিজের জীবনে তিনি প্রচুর কর্ম করেছেন। গোপালের সেবা পুরো নিষ্ঠা সহকারে করতেন, আর গোপালকে এমন ভক্তি করতেন যে, যেন নিজের সন্তানকে খাওয়াচ্ছেন, ঘুম পাড়াচ্ছেন, শাসন

করছেন; আর তাতেই তাঁর আধ্যাত্মিক পাত্রতা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সেই নিষ্ঠা নেই। এই নিষ্ঠাটা কিভাবে তৈরী হয়? পাত্রতা দিয়ে। বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা চিন্তন করতে করতে এমন একটা স্তরে এগিয়ে চলে যান যে, বাকিরা আর তাঁর পাশে থাকতে পারে না, তাঁকে আর সঙ্গ দিতে পারে না। খুব উচ্চমানের কবি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদিনে তো আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়ে যাননি। চিন্তা ভাবনা করতে করতে এমন ডুবে গেলেন, কেউ আর তাঁর খেই পেলেন না। যে কোন ক্ষেত্রে কাউকে যদি শ্রেষ্ঠ হতে দেখেন, দেখবেন সবার ক্ষেত্রে একই জিনিস হয়েছে – একটা জিনিসকে নিয়ে এত পরিশ্রম করেছেন, এত চিন্তা ভাবনা করে এত গভীরে চলে গেছেন যে, তাঁর পাত্রতা দিনে দিনে বেড়েই চলে গেছে। ধর্মজীবনে পাত্রতার প্রচণ্ড দরকার। হাতুড়ির ঘা মারতে মারতে পাত্রতা তৈরী হয়। কর্ম করা, শাস্ত্র অধ্যয়ন করা, চিন্তন-মনন করা, জপধ্যান করা, এগুলো হল হাতুড়ির ঘা। পাত্রতা হলে তখন বোঝা যায় শাস্ত্র কি বলতে চাইছে।

বর্ণাশ্রম ধর্মের কর্ম অতি সহজ কর্ম, কারণ ওই বর্ণেই আপনার জন্ম হয়েছে। কাজ করে করে এই যে পাত্রতা হল, কিসের পাত্রতা? *জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণাম্*। ঠাকুরের নাম করে গেলেই ঠাকুর দর্শন দেবেন না, মায়ের নাম করলেই মা এসে দেখা দেবেন না। এখানে সবাই এসে কত শাস্ত্র শুনছেন, কিন্তু কিছু হচ্ছে না কেন? পাত্রতা নেই কিনা, পাত্রতা নেই বলে শাস্ত্রের কথা ধারণা করতে পারছে না। কারণ আগে আগে ঠিক ভাবে কাজ করা হয়নি, তার সাথে আপনি শাস্ত্র চর্চা করেননি, চিন্তন মনন করেননি। কর্ম, পড়াশোনা আর মনন এই তিনটে যখন করা হয় তখনই হয় *জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা*। ঈশ্বর দর্শন, ব্রহ্মজ্ঞান হওয়ার আগে যোগ্যতা প্রাপ্তি করতে হয়, এই যোগ্যতা প্রাপ্তি কর্ম দিয়ে হয়। যোগ্যতা যদি না থাকে এগুলোর কোনটাই হবে না। পরের শ্লোকে এসে ভগবান আবার সেই আগের আগের কথা বলে অর্জুনকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।।৪৭।।

(অতএব, স্বীয় বর্ণ ও আশ্রমবিহিত ধর্ম অঙ্গহীন ভাবে অনুষ্ঠিত হলেও সম্যগ্রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, স্বভাবনিয়ত কর্ম করলে মানুষ পাপভাগী হয় না।)

স্বধর্মের ব্যাখ্যা করছেন, তোমার যেটা কর্ম সেটা যদি করতে থাক, সেই কর্ম যে-রকম কর্মই হয়ে থাকুক, তাতে কোন দোষ হবে না। আগেও বলেছিলেন, যে কীট বিষে উৎপন্ন হয়, বিষ তার কোন ক্ষতি করে না। নর্দমার জলে কত পোকা থাকে, কিলবিল করে, ওরা ওই নর্দমার পাঁকের মধ্যেই থাকে, ওখানে ওদের কোন সমস্যা হয় না। ওর মধ্যে অন্য কোন প্রাণীকে রেখে দিলে মরে যাবে। যে পরিবারে আপনার জন্ম হয়েছে, যে পরিস্থিতিতে আপনার জন্ম হয়েছে, সেই বংশের, সেই পরিস্থিতি বশাৎ যা যা কর্ম আছে সেগুলো করলে আপনার কোন দোষ হবে না। এটাকে দেখানোর জন্য মহাভারতে ধর্মব্যাধের খুব নামকরা কাহিনী নিয়ে আসা হয়েছে।

জন্ম থেকেই সে ব্যাধের কর্ম করে যাচ্ছে, কিন্তু সে একজন জ্ঞানী। আপনারা বলবেন, বর্তমানে তো আর বর্ণাশ্রম নেই। তাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু কর্ম তো আছে, কর্ম চিরকালই আছে ও থাকবে; আপনি অফিসে কাজ করছেন, আপনি সরকারি কর্মচারী, আপনি প্রাইভেটে টিউশান করেন, যাই করে থাকুন, আপনাকে শুধু মনে রাখতে হবে এই কর্ম আমার স্বাভাবিক কর্ম, আমার সহজ কর্ম, আমার জন্য এটা সহজ পথ, path of least resistence। আপনি সেই পথটাই নেবেন, যে পথে সবচেয়ে কম বাধা। সবার জন্য সব কর্ম নয়। যে কর্ম আপনার জন্য সব থেকে ভাল খাপ খায়, এই রকম চার পাঁচটা কর্ম হতে পারে, এর মধ্যে যে কর্মের দায়ীত্ব আপনার কাছে আসছে, আপনার জন্য ওটাই সহজ পথ, ওই কর্ম থেকে আপনার কোন দোষ উৎপন্ন হবে না। তা নাহলে আপনি কাজ করতেই পারবেন না, নিজেই চাকরি ছেড়ে দেবেন।

বলছেন, আমাদের পূর্ব পূর্ব কর্মগুলিই আমাদের স্বভাব হয়ে পরের জন্মে আসে, আপনার সেই প্রকৃতি বা স্বভাবই আপনাকে নিয়ে গিয়ে আপনার জন্য একটা উপযুক্ত জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেবে। আপনি আজকে যে অবস্থায় আছেন, জন্মজন্মান্তর ধরে ওই রকম কর্ম করে করে আপনি আজকে এই অবস্থায় পৌঁছেছেন। সেইজন্য পরিস্থিতির বদনাম করতে নেই, কোন অভিযোগ করতে নেই। আপনি নিজেই চেয়েছিলেন বলেই আজ এই অবস্থায় এই পরিস্থিতিতে এসে পৌঁছেছেন, স্বাভাবিক কর্ম দিয়ে এবার এটাকে ঠিক করুন। আমি যখন সন্ন্যাসী হলাম, তখন আমার গর্ভধারিনী খুব সুন্দর করে আমাকে বোঝাতে এলেন, বাবা, এর আগে আগে তুমি কত পাপ করেছিলে যে আজকে সব কিছু ছেড়েছুড়ে তোমাকে সাধুবাবা হতে হল, এখন থেকে কর্মগুলি একটু ভাল কর, পরের জন্মটা যেন ঠিকঠাক হয়। ওনাদের আইডিয়াটা হল, সাধুবাবা মানেই ভিখারী হয়ে ঘুরে ঘুরে থাকতে হবে, কোথায় থাকবে, কোথায় শোবে তার কোন ঠিক নেই, কর্ম খারাপ ছিল বলেই এই দুর্বিপাকে পড়েছে, এখন কর্মটা ঠিকঠাক যাতে হয়, দেখতে হবে পরের জন্মটা যেন ভাল হয়।

আজকে আপনি যেখানে আছেন, আপনার আগের আগের কর্ম ও জ্ঞান আপনাকে সেখানে নিয়ে এসেছে, এটাকেই এবার পুরো সদ্ব্যবহার করে আপনি নিজেকে উপরে তুলে আনুন, make the best use of it। বেণহার খুব নামকরা বই, বড়লোক ছিলেন, তখনকার দিনের জাহাজে তাঁকে গোলাম হিসাবে বিক্রি করে দেওয়া হল। কারুর কাছে কোন সাহায্য চাইল না, শুধু জাহাজের ক্যাপ্টেনকে গিয়ে বলল, সাত দিন আমাকে বাম দিকে আর সাত দিন ডান দিকে বসাবেন। ক্যাপ্টেন শুনে অবাক, জানতে চাইলেন কেন? তাহলে আমার দু দিকের পেশী সমান ভাবে তৈরী হবে। পরে সেটাই ওর কাজে লাগল। সংসারে ভালমন্দ কিছু হয় না, হয় পরিস্থিতি, ওই পরিস্থিতিকে সদ্ব্যবহার করে আপনি নিজের কাজে কিভাবে লাগাবেন সেটা আপনার উপর নির্ভর করে। আপনারা যে কজন বড় লোকেদের জানেন, তাঁদের সবার জীবন দেখবেন, কেউ কিন্তু নিজের পরিস্থিতি তৈরী করেননি, এনারা সবাই যে পরিস্থিতিতে ছিলেন, তাঁরা ওই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়েছেন। অনেক বড় বড় কোম্পানী, ইনফোসিস, গুগুল্, মাইক্রোসফট, এনারা সবাই এই কথা বলেন; সাধারণ ভাবে শুরু করে আজ কিভাবে এত বড় হয়েছেন। যে টাকা নিয়ে ওরা শুরু করেছিল, আজকে ওদের তার দশ গুণ টাকা দিয়ে বলুন আরেক বার একটা বড় কোম্পানী দাঁড় করিয়ে দেখান তো। পারবে না, পরিস্থিতি ছিল, সেই পরিস্থিতিকে সবচেয়ে ভাল নিজের মত করতে গিয়ে আজ বিরাট হয়ে গেলেন। আজ পরিস্থিতি অন্য রকম, আজকে যদি উনি করতে যান, অত বড় হতে পারবেন না। সেইজন্য বলা হয়, পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে হয়।

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।।৪৮।।

(হে কুন্তীপুত্র, দোষযুক্ত হলেও জন্মনির্দিষ্ট কর্ম (স্বধর্ম) ত্যাগ করা উচিৎ নয়। কারণ, অগ্নি যেমন ধুমে আচ্ছন্ন হয়, সেই রকম স্বধর্ম বা পরধর্ম সমস্ত কর্মই ত্রিগুণাত্মক বলে দোষযুক্ত হয়।)

যেখানেই আগুন জ্বলবে সেখানেই ধুয়ো থাকবে, ধুয়ো অগ্নিকে ঢেকে রাখে। আগেকার দিনে কাঠ জ্বেলে সব কিছু করা হত কিনা, তাই এই উপমাটা নিয়ে আসছেন। এখনকার দিনে আপনারা বলবেন, কই গ্যাসে তো ধুয়ো থাকে না। *সহজং কর্ম,* সহজ কর্ম, তোমার স্বভাবের সাথে যে কর্মটা মিশে যাচ্ছে। বর্ণাশ্রম ধর্মে বলছেন, বর্ণাশ্রম ধর্মে তোমার জন্য সহজ কর্ম ঠিক করা আছে। একজন মহিলার পক্ষে, বা মায়েরা যাঁরা আছেন, তাঁদের জন্য ঘর সংসার করাটা সহজ কর্ম। তাঁরা যে অফিসের কাজ করতে পারবেন না তা তো নয়, তাঁরাও পারবেন, ইদানিং কত মহিলা আইপিএস, আইএএস অফিসার আছেন। কিন্তু উদ্দেশ্য যদি ঈশ্বর লাভ হয়, আত্মজ্ঞান লাভ হয়, তখন আর এগুলোর কোন তফাৎ থাকে না। উদ্দেশ্য যদি হয়ে যায় টাকা-পয়সা আয় করা, তখন তফাৎ হয়ে যায়। উদ্দেশ্য যদি সমাজে সম্মান পাওয়া হয়, তখন সেখানে তফাৎ হয়ে যায়।

সদোষমপি ন ত্যজেৎ, তোমার জন্য যেটা সহজ কাজ, সেই কাজে যদি কোন দোষও থাকে তাও সেই কাজ ছেড়ে দিও না, কারণ তোমার জন্য এটাই সহজ পথ; অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলছেন। *সর্বারম্ভা হি দোষেণ,* যে কোন কাজ যেটা করা হয় তাতে কিছু না কিছু দোষ থাকবে। প্রত্যেক কাজেই দোষ আছে। ব্রাহ্মণের কাজে দোষ আছে, ক্ষত্রিয়ের কাজে দোষ আছে, বৈশ্যের কাজে দোষ আছে আর শূদ্রের কাজেও দোষ আছে। আগে আপনি দেখে নিন, আপনার জন্য স্বাভাবিক কর্ম কি, উচৎ হল সেই স্বাভাবিক কর্মে স্থির থাকা। কারণ কর্ম সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণ দিয়ে তৈরী। যেখানেই এই তিনটে গুণ আছে, সেখানেই গোলমাল থাকবে। আমাদের মন সত্ত্ব রজো ও তমো এই তিনটে দিয়ে তৈরী, তাই মনে গোলমাল থাকবেই। কোন মানুষ কোন দিন পারফেক্ট হবে না। কারণ আমরা মানুষকে মন রূপেই দেখে থাকি, আর মন সত্ত্ব, রজো ও তমো, তাই মনে গোলমাল থাকবেই। প্রত্যেক কর্মে দোষ থাকবে, প্রত্যেক মানুষে দোষ থাকবে, প্রত্যেক সমাজে দোষ থাকবে, প্রত্যেক ধর্মে দোষ থাকবে – কারণ এগুলো ত্রিগুণাত্মিকা।

যেটা তিনটে গুণের পারে সেখানে কোন দোষ থাকবে না, সেইজন্য আত্মাতে কোন দোষ নেই। উদ্দেশ্য তাই সেখানে যাওয়া। কিভাবে যেতে হবে? এই ত্রিগুণ দিয়েই যেতে হবে। কোন কারণে আপনার পেটের গণ্ডগোল হয়ে গেছে। আর আপনি হয়ত কোন গ্রাম দেশের রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় আছেন। ট্রেন আসতে দেরী আছে। সেই সময় আপনার প্রচণ্ড বেগ এসেছে। আপনি জানেন অজ গাঁয়ের রেল স্টেশনগুলো খুব নোংরা, টয়লেটে ঢুকলেই বমি এসে যায়। কিন্তু আপনি বেগ আর সামলাতে পারছেন না, ওর মধ্যেই আপনাকে যেতে হবে। নাক, মুখ, চোখ বন্ধ করে কোন রকমে ওখানে ঢুকে নিজের সমস্যাটা বার করে বেরিয়ে আসা, এ-ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

এই সংসারটা হল গ্রামের ছোট্ট রেলওয়ে স্টেশনের নোংরা টয়লেট, কোন রকমে ঝামেলাটা মিটিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে আসুন, মনটা যাতে শান্ত থাকে। সংসার এটাই – বেরিয়ে আসা, জ্ঞান অর্জন করা। এখানে ভালমন্দের বিচার করার কিছু নেই, এটা এই রকমই। এর থেকে ভাল কিছু সংসারে আপনি কোথাও পাবেন না। যে কোন সমস্যা হলে, যা পাবেন সেটা দিয়েই কোন রকমে চালিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে আসুন। যোগ্যতা অর্জন করার পর কিভাবে জ্ঞান পাবেন পরের শ্লোকে বলবেন। এটাকে বলে *নৈষ্কর্মসিদ্ধি,* নিষ্কর্মের ভাব, যেখানে কাজের প্রতি আর স্পৃহা থাকে না, কাজের আর কোন দায়ীত্ব থাকে না। এই নৈষ্কর্ম মানুষকে সিদ্ধির দিকে নিয়ে যায়।

এর আগে পর্যন্ত আমরা দেখলাম কিভাবে বর্ণধর্মগুলি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটে বর্ণের ধর্মগুলির কাজ হল সমাজের প্রতি প্রত্যেকটি বর্ণের জন্য যে কাজ নির্ধারিত সেই কাজগুলি কিভাবে তারা ভাল ভাবে করে সমাজের উন্নতি করবে, এবং আশ্রম ধর্ম হল নিজের উন্নতির জন্য নির্ধারিত। আজকাল যদিও রাজনীতির কারণে এবং অন্যান্য কারণে বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রচুর নিন্দাবাদ করা হয়। কিন্তু স্বামীজী অন্য দিকে বলছেন, এর থেকে ভাল কোন সমাজ ব্যবস্থা কেউ করে দেখাক যেটা হাজার বছর ধরে এক ভাবে চলবে। হিন্দু ধর্ম যে সমাজ ব্যবস্থা দিয়ে এসেছে, সেখানে পরিষ্কার দুটোর উপর দৃষ্টি দিয়ে করার হয়েছে, তোমার নিজের উন্নতি আর তার সাথে সমাজের অভ্যুদয় –নিঃশ্রেয়স আর অভ্যুদয়।

যাঁরা বড় বড় কোম্পানীতে কাজ করছেন, যাঁরা সরকারী কর্মচারী, রেলওয়েতে কাজ করছেন, স্কুলে শিক্ষকতা করছেন, সেখানে তাঁরা তাঁদের কোম্পানীর যাতে উন্নতি হয় তার জন্য ভাল ভাবে কাজ করছেন, বিনিময়ে তাঁরা মাইনে পাচ্ছেন, তাই দিয়ে তাঁদের দৈনন্দিন জীবন চলছে। কিন্তু এত কাজ করার পরেও আপনার যে উত্থান হবে, মৃত্যুর পর আপনার যে একটা সদর্থক গতি হবে, সেটার জন্য কোন কোম্পানী কি দায়ীত্ব নিচ্ছে? বড় বড় হাসপাতাল হয়েছে, বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারিং

ফার্ম হয়েছে, কত রকমের বহুমুখী কাজের সুযোগ এসে গেছে। আপনার যে ক্ষমতা, আপনার যে দক্ষতা, আপনার যে স্পেশালিটি, কোম্পানীগুলি আপনাকে সেটার মূল্য দিচ্ছেন, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এনারা কি মানুষ হতে আপনাকে সাহায্য করছে? বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুল, কলেজে ছেলেমেয়েদের বেশি নম্বর পেতে, দুটো সাবজেক্ট শিখিয়ে দিচ্ছে, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একজন প্রকৃত মানুষ হওয়া, মানুষ মানে চরিত্র, চরিত্র মানে ভাল আর মন্দের তফাৎ করার ক্ষমতা, কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল, আর সেটাকে জীবনে নামানোর যে কৌশল, এগুলো শেখানোর কাজটা কি এরা করছে? কেউ করছে না।

তার মানে এই যে বর্তমান সমাজ, আমরা যখন ছোট ছিলাম, যে গ্রামে আমরা বড় হয়েছি, দেখেছি প্রায় অর্দ্ধেক গ্রাম এক বেলা খেয়ে থাকত, দেশে খাদ্য ছিল না, বস্ত্র ছিল না, বাসস্থান ছিল না, রাস্তা ছিল না, আজকে দেশে এগুলো সব হয়েছে। কিছু লোক এখনও অত্যন্ত গরীব, কিন্তু মোটামুটি এখন সবাই খেতে পরতে পারছে। কিন্তু মানুষ হওয়ার যে বিদ্যা, যেটা বর্ণাশ্রম শিক্ষা দিত, সমাজের প্রতি তোমার দায়ীত্ব আবার তোমার নিজের প্রতি দায়ীত্ব, যেমন যেমন তোমার বয়স বাড়বে তেমন তেমন তোমার আশ্রম ধর্ম পাল্টাবে, তোমার দায়ীত্বগুলি পাল্টাবে, মন অন্তর্মুখী হবে, এই বিদ্যাটা আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বাচ্চার মন চঞ্চল মন, যুবকের মন সব কিছু জয় করতে চায়, সেটাকে আধার করে বর্ণাশ্রম ধর্ম হয়েছিল। আবার নূতন করে আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম একটা কিছু করতে হবে।

আমার 'The Hindu Way' বই, সেখানে অনেকটা দেওয়া হয়েছে, কিভাবে নূতন করে জীবন চালাবো। বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করলে মনের ভিতর যে একগাদা আবর্জনা জমে আছে, এগুলো পরিষ্কার হয়ে যায়। ক্লাশ ইলেভেনের ছেলে, বাবা-মার সাথে বেলুড় মঠে এসেছে। আমাকে দেখে দৌড়ে এসে প্রণাম করতে চলে এলো। মহারাজ আপনার লেকচার শুনি। কোন লেকচার গুলো? ধ্যানের উপর। শুনে আমার হাসি আর থামতে চাইছে না। তুমি ক্লাশ ইলেভেনের ছাত্র, তোমার জন্য এখন ধ্যান? এখন পড়াশোনা কর, খেলাধূলা কর, মারপিট কর, জগতে যে সুখগুলো আছে সেগুলোকে ভাল করে দেখতে থাক। সমস্ত কিছু দেখা হয়ে যাওয়ার পর যখন বলবে, আমার এসব কিছুই লাগবে না, তখন তোমার জন্য ধ্যান। না হলে চরিত্রবান গরুর মত হয়ে থাকবে। চরিত্রবান গরু মানে, যে গরু সারা জীবনে কিছু করেনি, বাছুর দেয়নি, দুধ দেয়নি, ষাঁড়ের কাছে যায়নি। এই চরিত্র দিয়ে তোমার কিছু হবে না।

আগেকার দিনে ব্রাহ্মণ ছেলেদের যখন উপনয়ন হত, তখন ওদের গায়ত্রী মন্ত্র দিয়ে বলে দেওয়া হত, দু মিনিট ধ্যান কর আর গায়ত্রী মন্ত্র একশ আটবার কর, চুয়ান্ন বার কর, বারো বার কর, বা দশবার কর শুধু গায়ত্রী মন্ত্রটা মনে রাখার জন্য। যখন তোমার বয়স হয়ে যাবে, তখন তুমি আরও এর ভিতরে ঢুকবে, এখন না। তারপর ছেলেটিকে বললাম, মনের মধ্যে যে জন্মজন্মান্তরের আবর্জনা জমে আছে, কাজ করে করে এই সমস্ত আবর্জনাকে পোড়াতে হবে। তারপর সেখান থেকে ধীরে ধীরে ঈশ্বরের দিকে মন যেতে শুরু হবে।

এগুলো আমরা আগে বিস্তারে আলোচনা করে নিয়েছি। ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ যে হবে, আপনি যে আত্মজ্ঞান লাভ করবেন, এবার ভগবান সেটার প্রস্তুতি কিভাবে হবে বলছেন। বড় হাওয়াই জাহাজ এয়ারপোর্টে নামবে, তার জন্য আগে এয়ারপোর্টে উপযুক্ত রানওয়ে তৈরী করা দরকার। আগের শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলে দিলেন, হে অর্জুন, কাজে যে দোষই থাকুক তুমি কিন্তু কাজ করা কখনই যেন ছেড়ে দিও না। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, আমাদের ঠাকুরের ভক্তরা কেউ কাজ করতে চায় না। এমনিতেই ভারত তামসিক দেশ ছিল, এখন ঠাকুরকে সামনে রেখে ভক্তরা ফাঁকিবাজি শুরু করেছে, যেহেতু ঠাকুর বলে দিয়েছেন আগে ঈশ্বরদর্শন তারপর কর্ম। ঠাকুরের কথা শুধু আপনারাই বুঝেছেন?

আমরা সন্ন্যাসীরা কি কিছুই বুঝিনি? তাহলে রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষার ক্ষেত্রে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে, গ্রামের মহিলাদের স্বনির্ভর করার জন্য এত এত কাজ করছেন কেন? এগুলো একটু ভাল করে ভেবে দেখুন। যাই হোক, আমরা আবার গীতার আলোচনায় ফিরে আসছি। ভগবান পরের শ্লোকে বলছেন।

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্মসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি।।৪৯।।

(সকল বিষয়ে অনাসক্ত, সংযতচিত্ত এবং দেহ ও জীবনে ভোগস্পৃহাশূন্য আত্মজ্ঞ ব্যক্তি সম্যগ্দর্শন (ব্রহ্মজ্ঞানলাভ) দ্বারা বা তৎপূর্বক সর্বকর্মসন্ন্যাসের দ্বারা নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপে অবস্থানরূপ (পূর্বোক্ত কর্মজাত সিদ্ধি অপেক্ষা বিলক্ষণ) প্রকৃষ্ট সিদ্ধি (সদ্যোমুক্তি) লাভ করেন।)

শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী, বর্তমানে ভাইস প্রেসিডেন্ট, ওনার কাছেই আমি বড় হয়েছি। সকাল থেকে সন্ধ্যে, সন্ধ্যা থেকে রাতের খাওয়া অব্দি বছরের পর বছর ওনার পাশে পাশে ঘুরতাম। পরে আমার অন্য জায়গায় ট্রান্সফার হয়ে গেল। আমার এখনও মনে আছে, আমি বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারী ট্রেনিং সেন্টারে দু বছরের জন্য ট্রেনিংএ এসেছি। ব্রহ্মচারী ট্রেনিং সেন্টারে দুটো বছর আমাদের ঘোর সাধনার জীবন, যেখানে বাইরের জগতের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক থাকে না। এতদিনের একটা অন্য রকম জীবনধারা থেকে হঠাৎ একেবারে অন্য একটা জীবনে চলে আসা। সেই সময় মহারাজ আমাকে খুব সুন্দর একটা চিঠি লিখেছিলেন, ছোট্ট চিঠি তিন চার লাইনের। তার মধ্যে এই কথাটি লেখা ছিল – 'শরীরের ভিতরে রজোগুণ, সেটাকে 'expend' করার জন্য', এই 'expend' শব্দটা এখনও আমার মনে আছে, 'অর্থাৎ এই রজোগুণকে শেষ করার জন্য তোমাকে কর্ম করে যেতে হবে'।

আমরা যে কাজকর্ম করি, তা যে কাজই হোক না কেন; আপনারাও সবাই যে কাজকর্ম করেন; সমস্ত মানুষ যে কাজকর্ম করে, সবাই এটাই করে – জন্মজন্মান্তরের যত কর্ম করা হয়েছে, সেগুলো সব তমোগুণ রজোগুণ হয়ে আছে, তমোগুণকে কাটার জন্য চাই রজোগুণ, আর রজোগুণকে কাটার জন্য চাই কাজ করা। কাজ করতে করতে একবার যখন বুঝে গেলেন মনটা চাঙ্গা হয়ে গেছে, তার মানে আপনি expending রজোগুণ। রজোগুণ কমতে থাকলে তখন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়। স্বধর্ম পালন করে করে, কাজ করে করে ভিতরের আবর্জনাগুলি যখন পরিষ্কার হয়ে গেল, তখনই হয় ঠিক ঠিক *অসক্তবুদ্ধিঃ*। কিসে অসক্তবুদ্ধি হয়? বলছেন, স্ত্রী, পুত্র আর যত রকমের আসক্তির বিষয় আছে, সমস্ত কিছু থেকে তার অসক্তবুদ্ধি হয়ে যায়। ভিতরে যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি, বিশেষ বিশেষ বস্তুর প্রতি যে প্রীতির ভাব আছে, সেটার নাশ হয়ে যায়। আপনি বলতে পারেন, আমারও তো চলে গেছে। আপনি তো কিছু করেনইনি, আমি জানব কি করে।

একবার আমাকে এক ভদ্রলোক কথায় কথায় বলছিলেন, তিনি জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত এবং জৈন মহাত্মারা কত উচ্চমানের হন ইত্যাদি। আমি হেসে বললাম, একটু কাজে নামিয়ে দেখুন আগে, বলদের জায়গায় ওনাকে লাঙলের সাথে একটু জুতে দিন, তারপর দেখুন কেমন থাকে। আমাদের সাধু সন্ন্যাসীরা অনেকে দরজা বন্ধ করে থাকেন, সবাই মনে করেন বিরাট যোগী। আমাদের একজন মহারাজ খুব সুন্দর বলতেন, ফিল্ডে নামুন তখন আমরা বুঝতে পারব আপনি কত বড় যোগী। কাজের ময়দানে না নামলে বোঝা যায় না, কে বড় যোগী আর কে বড় ভোগী। আগেকার দিনে অল্প বয়সে যারা বিধবা হয়ে যেত, বাল বিধবা; জীবনে সে কিছুই দেখেনি, কোন সুখ ভোগ করল না, কিছুই দেখল না, সে কি ধর্ম পালন করবে? এখন অবশ্য ও-সব নেই, হিন্দু সমাজ এখন অনেক পাল্টে গেছে। আগে দরকার রজোগুণ, রজোগুণে হবে কাজ, শুধু কাজ, কাজ করতে করতে সেখান থেকে বুদ্ধি কিছুটা নিজে থেকেই খুলবে। বলছেন, তখন আসবে *অসক্তবুদ্ধিঃ*।

আমাদের এখানে সংস্কৃতে এমএ পড়ানো হয়। আমাকেও কোর্সের একটা সাবজেক্ট পড়াতে হয়। ছাত্রদের একদিন বললাম, 'মৃত্যুর পর তোমরা কি স্বর্গে যেতে চাও'? 'না না মহারাজ, একেবারেই না, কারণ স্বর্গ থেকে আবার ফেরৎ আসতে হবে'। শুনে মনে হবে কি দারুণ কথা এই বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা বলছে! 'আর যদি সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর করে দিতে চায়'? 'কোন প্রশ্নই নেই মহারাজ'। 'আর কোটি টাকা দিয়ে যদি তোমাকে কেউ মিথ্যা কথা বলতে বলে, তাহলে'? 'না না, টাকার লোভে কখনই মিথ্যা কথা বলতে যাব না'। বাঃ কি সুন্দর আদর্শ। 'আর পরীক্ষায় যদি দু নম্বর এক্সট্রা দেওয়া হয়'? 'মহারাজ দু নম্বর দিলে তো খুবই ভাল হয়'। 'এই দেখ, পরীক্ষায় দুটো এক্সট্রা নম্বর পাওয়ার জন্য তুমি ছটফট করছ, আর এদিকে বলছ আমার ইন্দ্রপদ লাগবে না, কি দুরবস্থা তোমাদের কল্পনা করতে পারছ?' তরকারীতে একটু নুন বেশি হয়ে গেলে রেগে কাঁই হয়ে যাচ্ছ, খাওয়া দিতে একটু দেরী হয়ে গেলে রেগে আগুন হয়ে যায়, বাসে একটু কারুর সাথে ধাক্কা লেগে গেল, অমনি বলবে, কি দাদা বাসটা কি কিনে নিয়েছেন নাকি, আর এনারাই কিনা বলেন স্বর্গ তুচ্ছ, আমার স্বর্গ-ফর্গ লাগবে না। মুক্তি, ঈশ্বরদর্শনের নীচে কোন কথাই কেউ বলবে না। নিজেরা জানেও না যে, কত ঘোর তমোতে পড়ে আছে, বুদ্ধি যে কত সঙ্কীর্ণ এটাও বোঝার ক্ষমতা নেই। স্বামীজী বলছেন, গীতা পড়ার চাইতে ফুটবল খেলা ভাল। ফুটবল খেললে রজোগুণটা বাড়বে, রজোগুণ বৃদ্ধির সাথে সাথে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হবে, সত্ত্বগুণ এলে তখন গীতা বুঝতে পারবে।

সর্বত্র জিতাত্মা, ইন্দ্রিয়কে পুরো জয় করে রেখেছে। তার সাথে অন্তঃকরণ, মন, বুদ্ধি পুরো নিয়ন্ত্রণে। এই জিনিস এক জন্মে হয় না। জন্মজন্মান্তরের প্রচুর তপস্যার জোরেই একটা জন্মে গিয়ে এই *অসক্তবুদ্ধিঃ* জাগে। *বিগতস্পৃহঃ*, এই শব্দগুলি গীতাতে আগেও এসেছে, জীবনের প্রতিও কোন স্পৃহা নেই, মৃত্যুর প্রতিও তাঁর কোন স্পৃহা নেই। এমনকি যাঁরা মুক্তির সাধক তাঁদের মুক্তির প্রতিও কোন স্পৃহা থাকে না। ভক্তরা এসে বলে, মহারাজ ভক্তি-কামনাটাও তো কামনা, এই চিন্তা থাকলে কোন দিন ভিতরে ভক্তির উদয় হবে না। আপনি ভালবাসবেন, এটাকে কি কামনা বলা হয় কখনো? মা সন্তানকে ভালবাসে, এটা কি কখন কামনা হতে পারে? আপনি হিমালয়কে ভালবাসেন, হিমালয়ের প্রতি এই ভালোবাসাকে কি আপনি কখন কামনা বলবেন? ভালবাসছেন, স্বাভাবিক ভালবাসা, এখানে কামনা কি করে আসছে? একটু পরেই আচার্য বলবেন, আত্মজ্ঞান আর আত্মা এক জিনিস। এটাই ঠিক ঠিক *বিগতস্পৃহঃ*। কঠোপনিষদে বলছেন, ঈশ্বর আমার উপর প্রসন্ন হন, এই ইচ্ছাটাও যেন না থাকে, কোন স্পৃহা নেই, *বিগতস্পৃহঃ*।

অনেক সময় এখান থেকে মানুষ তামসিক হয়ে যায়। এখানে যে আত্মজ্ঞানীর কথা বলছেন, এই আত্মজ্ঞানী মানে যিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে নিয়েছেন। এনারাই এবার নৈষ্কর্মসিদ্ধির জন্য প্রস্তুত। একটা হল তামসিকতা, একেবারে অজগর সাপের মত যেখানে পড়ে আছে, সেখানেই পড়ে আছে। ওই তামসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার পর আসে ছটফটানি। সেটাকেও যিনি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছেন, তাঁর আর কর্মের দরকার নেই। সংসারে কেন আমরা কাজ করি? মনের মধ্যে অনেক কামনা-বাসনা আছে। যাঁর মনে এই কামনা-বাসনাও নেই, তখন তিনি আর কিসের জন্য কাজ করবেন। সামনে যেটুকু দায়ীত্ব রূপে আসছে করে দিলেন। সেই দায়ীত্ব বোধ থেকেও আপনি এখন বেরিয়ে এসেছেন, *নৈষ্কর্মসিদ্ধিং*। ষাট বছর হয়ে গেছে, এবার *নৈষ্কর্মসিদ্ধি*, অর্থাৎ মনটাকে এবার গুটয়ে নিয়ে আসুন, গুটিয়ে এনে ভক্তিভাব কি উচ্চভাব নিয়ে থাকুন। ইউটিউবে একজন আমাকে খুব সুন্দর লিখলেন, মশাই আপনি যে সারাদিন এত লেকচার মারেন, জপধ্যান করেন কখন? সারাদিন কোথায় আমি লেকচার দিচ্ছি, তবে মজা লাগল দেখে যে, বুদ্ধিটা খুলেছে।

বলছেন, ঈশ্বরের পূজা কিভাবে হবে? – স্বধর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা। স্বধর্মের অনুষ্ঠান করে সেখান থেকে পায় জ্ঞাননিষ্ঠা, সেখান থেকে এবার এগোতে থাকল সিদ্ধির দিকে।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা।।৫০।।

(হে কৌন্তেয়, এই ধরণের সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তির (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র) জ্ঞাননিষ্ঠা ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের পরমনিষ্ঠা বা পরিসমাপ্তিরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। জ্ঞাননিষ্ঠার উক্ত প্রাপ্তিক্রম আমার নিকট এখন সংক্ষেপে শ্রবণ কর।)

সিদ্ধি মানে এই যে প্রস্তুতিটা হয়ে গেল। বলছেন, প্রস্তুতি পেয়ে এই যে তুমি অধিকারী হয়ে গেলে, এবার জ্ঞাননিষ্ঠা ক্রমে পরিসমাপ্তি রূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হবে। বেশির ভাগ ভক্তরা অধিকারী নন, কারণ স্বধর্ম করেনি, কাজ করেনি। ব্রহ্মজ্ঞান কিভাবে হয়, আত্মজ্ঞান কিভাবে হয়, হে কৌন্তেয় সেটা এবার *সমাসেন*, সংক্ষেপে শোন। আগে আগে ভগবান বিস্তারে বলেছেন। এই যে ব্রহ্মজ্ঞানের নিষ্ঠা বা জ্ঞাননিষ্ঠা, এটা কেমন? আচার্য বলছেন, *কিদৃশী সা, যাদৃশম্ আত্মজ্ঞানম্*, ব্রহ্মজ্ঞান কিসের মত বলছেন, আত্মজ্ঞানের মত। *কীদৃক্ তৎ, যাদৃশ আত্মা*, আত্মজ্ঞান কার মত, আত্মার মত, আচার্যের ভাষা কি সাংঘাতিক, কল্পনাই করা যায় না। ব্রহ্মজ্ঞান কার মত? আত্মজ্ঞানের মত। আত্মজ্ঞান কার মত? আত্মার মত। কথামৃতেও ঠাকুর বলছেন, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান এক হয়ে যায়। আত্মা আর আত্মজ্ঞান দুটো আলাদা কিছু নয়। আর আপনি সেই আত্মা, কার জন্য, কিসের জন্য আপনি স্পৃহা করবেন। এই যে ভক্তরা এসে বলে, মহারাজ, ভক্তির কামনা কি কামনার মধ্যে না? আপনি কার ভক্তি করছেন, কাকে ভক্তি করছেন, নিজেকেই তো ভক্তি করছেন। আপনার ভিতরে যিনি আত্মা আপনার অন্তর্যামী রূপে বিরাজ করছেন, যেটা আপনি নিজে। মন দিয়ে যখন আত্মাকে দেখছেন, তখন তিনি অন্তর্যামী, তিনিই সেই বিশুদ্ধ আত্মা, তিনিই সেই ঈশ্বর। কাকে ভালবাসছেন, কাকে ভক্তি করছেন, নিজেকেই নিজে ভালবাসছেন, নিজেকে নিজেই ভক্তি করছেন। নিজেকে ভালবাসা কি কখন স্পৃহা হয়? আচার্য কি সুন্দর বলছেন, আত্মজ্ঞান কি রকম? আত্মজ্ঞানই আত্মা, আত্মাই আত্মজ্ঞান।

ঈশ্বর কোন বস্তু নন। কোন জিনিসকে দেখার জন্য, ধরুন এই কলম, কলমকে দেখার জন্য তিনটে জিনিসের দরকার, আমি মানে দ্রষ্টা, কলম অর্থাৎ দৃশ্য আর জ্ঞান। মন যখন মাধ্যম হয়ে যায়, তখন কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া এই তিনটে এসে যায়। যখন মনের নাশ হয়ে যায়, তখন কিসের কর্তা, কিসের কর্ম আর কিসের ক্রিয়া। একটা বড় পুকুর আছে আরেকটা ছোট পুকুর আছে, মাঝখানে কাঁচের ব্যবধান আছে। ছোট পুকুর কাঁচের মধ্য দিয়ে বড় পুকুরের দিকে তাকাচ্ছে। কাঁচের ব্যবধানটাকে এখন ভেঙে দেওয়া হল, তাতে কি হল? কিছুই হবে না, আমি যা ছিলাম তাই আছি। তাহলে এতক্ষণ কি হচ্ছিল? কিছুই হচ্ছিল না, একটা ব্যবধান ছিল, ব্যবধানটাকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কি হবে তাতে? কিছুই হবে না, আপনি যা ছিলেন তাই থাকবেন, শুদ্ধ আত্মা ছিলেন, শুদ্ধ আত্মাই থাকবেন।

এগুলো শুনতে শুনতে কোন একদিন গিয়ে মনের উপর ছোট্ট একটা দাগ পড়বে। আগেকার দিন গ্রাম দেশে যেখানে কুয়ো থাকত, অনেক সময় কুয়োর পারে একটা পাথর রেখে দেওয়া হত, জলের পাত্র রাখার জন্য। অনেক বছর পর দেখা যেত জলের পাত্র ঘড়া বা কলসী ওর উপর রাখতে রাখতে সেই পাথরের উপর একটা দাগ পড়ে গেছে। আমাদের মন ওই পাথরের মত, এই কথাগুলো যখন বার বার ভিতরে যেতে থাকছে, তত বার মনের উপর ছোট্ট একটা দাগ পড়ে যাচ্ছে। শাস্ত্রের কথা বার বার শুনতে শুনতে একদিন ধারণা হবে ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, আত্মা এই তিনটে এক। এই জিনিসটাকে আচার্য শঙ্কর ব্যাখ্যা করছেন, আর ঠাকুরও সেই একই কথা বলছেন।

আচার্য ব্যাখ্যা করছেন, *কেচিৎ তু পণ্ডিতংমন্যা নিরাকারত্বাদ্ আত্মবস্তু ন উপৈতি বুদ্ধিঃ*, কিছু কিছু মানুষ আছে যারা নিজেকে পণ্ডিত মনে করে, বিশেষ করে বৈষ্ণবরা, বলে আত্মা বলে কিছু নেই, আত্মাকে জানাই যায় না, আত্মা বলে কিছু আছে নাকি? ইত্যাদি। সেইজন্য ওরা রেগেমেগে

অদ্বৈত বেদান্তের নাম দিয়েছে মায়াবাদ। মায়াবাদ কোথা থেকে আসছে, অদ্বৈত বেদান্ত হল ব্রহ্মবাদ। আবার বলে, উপনিষদে বলেছে, আত্মাকে বুদ্ধি পেতে পারে না, তাহলে আত্মজ্ঞান কোথা থেকে হবে। উপনিষদে তো ঠিকই বলছেন, বুদ্ধি দিয়ে আত্মাকে তো কখনই জানা যাবে না। আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর এর উত্তর দিচ্ছেন, *সত্যম্ এবম্*, ঠিক বলেছ ভাই, এই যে পণ্ডিতরা বলে আত্মজ্ঞান বলে কিছু হয় না, একদম ঠিক কথা বলেছ, কারণ, *গুরুসম্প্রদায়রহিতানাম্ অশ্রুত-বেদান্তানাম্*, গুরু পরম্পরায় যে বিদ্যা গ্রহণ করেনি, বেদান্ত বাক্য যে ভাল করে শ্রবণ করেনি, বিধিপূর্বক শোনেনি, যার বুদ্ধি সাংসারিক বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত আর যথার্থ জ্ঞান দেওয়ার জন্য যে প্রমাণ, এটাতে যে পরিশ্রম করেননি, তাদের জন্য এই কথাই ঠিক – আত্মা বলে কিছু নেই, আত্মাকে জানা যায় না ইত্যাদি।

আমাদের বেদের ক্লাশে একজন কমেন্ট করে পাঠালেন, 'ও বাবা! রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী কথামৃত, গীতা ছাড়াও অন্য শাস্ত্রের কথাও বলে'; বেদের ক্লাশ নিচ্ছিলাম কিনা। শাস্ত্র বাক্য জানতে হয়, যতক্ষণ শাস্ত্র বাক্য ধারণা না করা হবে, ঠাকুরকে যখন একজন বলছেন, মশাই আপনি কি জানেন, আপনি তো পড়াশোনা জানতেন না। ঠাকুর বলছেন, শুনেছি কত আমি। শাস্ত্রকে ধারণা করতে হয়। আচার্য বললেন, বিধিপূর্বক বেদান্তবাক্য শ্রবণ করতে হয়। নিজে পড়ে নিলে কোন দিন হবে না। বেদান্তের বই পড়ে আমরাও বুঝতে পারতাম না। অনেক এসে বলেন, মহারাজ আপনার ক্লাশগুলো শুনে বুঝতে পারি না। আমি বললাম, একবার শুনে যদি বুঝে নিতে পারতেন, তাহলে তো বেলুড় মঠ স্থাপন করার কোন দরকারই হত না। বেলুড় মঠ হল বেদান্ত বিজ্ঞানের মহাকেন্দ্র। স্বামীজী কি এমনি এমনি এই কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করলেন? বই পড়ে, লেকচার শুনে সব কিছু যদি জানা যেত, তাহলে এত লোক সন্ন্যাসী হতে কেন বেলুড় মঠে এলেন? এই জন্যই এই বেদান্ত বিজ্ঞানের কেন্দ্র করা হল। সেইজন্য শাস্ত্রের কথা বার বার শুনতে হয়। এখানে এসে আবার বলে, মহারাজ গীতা-ফিতা আমার পড়া হয়ে গেছে। শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম, আমি বললাম, 'আপনি এখনও কথা বলতে শেখেননি? গীতার সাথে 'ফিতা' লাগাচ্ছেন? মা সরস্বতীকে এখনো সম্মান দিতে শেখেননি, আপনি বুঝবেন বেদান্ত?'

আচার্য এখানে কয়েকটা শর্তের কথা বললেন। আপনি যদি ব্রহ্মজ্ঞান চান, ঈশ্বরজ্ঞান যদি চান, তার আগে আপনাকে কি কি করতে হবে। প্রথম শর্ত হল গুরু পরম্পরায় বিদ্যা অর্জন করতে হবে। আপনারা যে গীতার কথা আমার কাছে শুনছেন, গুরু পরম্পরাতেই শুনছেন। বেদের সময় ঋষিরা যে জ্ঞান দিয়েছিলেন, সেই জ্ঞান ঘুরে ঘুরে ব্যাসদেবের কাছে আসে, সেখান থেকে গৌড়পাদ, গোবিন্দপাদ হয়ে হয়ে আচার্য শঙ্করের কাছে আসে। শঙ্করাচার্য থেকে এই জ্ঞান দশনামী সম্প্রদায়ের কাছে আসে, সেখান থেকে তোতাপুরী, তোতাপুরী থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে হয়ে হয়ে আমার মাধ্যমে সেই গুরু পরম্পরাতেই শুনছেন।

দ্বিতীয় শর্ত বেদান্ত বাক্যকে বিধিপূর্বক শোনা, সেটা আপনারা করেন না। তৃতীয় শর্ত হল, সাংসারিক বিষয়ে আসক্তি শূন্য হওয়া, এটাকে আপনারাই বিচার করে নিজেদের দেখুন, আমার কিছু বলার নেই। চতুর্থ শর্ত, যথার্থ জ্ঞানের প্রমাণের জন্য যে পরিশ্রম – স্বধর্ম পালন, জপধ্যান, গুরুবাক্য পালন। আচার্য বলছেন, এই ধরণের মানুষ আর কি বলবে। বিতৃষ্ণায় মনে ভরে যায় যখন দেখি, দুটো ইংরাজী পড়ে সবার সাথে এমন ব্যবহার করেন। সব কথাতেই বলবেন, 'ধর্মকে এখানে আনবেন না'। 'কি বলছেন! ধর্মকে আনব না মানে, তাহলে কি অধর্মকে আনব? অধর্মকে নিয়েই বাস করব'? কারণ এই দেশ হল সেকুলার দেশ। শুধু হিন্দুদের নামেই সেকুলার। তাই না, স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজীকে শান্তিনিকেতনে একটা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রীত করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সন্ন্যাসীদের যেমন রীতি, উনি মঞ্চে উঠে বক্তৃতা দেওয়ার আগে সংস্কৃতে মন্ত্রোচ্চারণ করে বক্তৃতা শুরু করেছেন। সেই নিয়ে নিউজপেপারে কত আপত্তি, কত চেঁচামেচি। আসলে ওখানে অনেকে ছিল যাঁরা হিন্দুদের কিছু শুনতে চায় না। প্রত্যেক দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমাদের আশপাশ থেকে লাউডস্পীকারে

কত কিছু আমাদের কানে ভেসে আসে, আমরাও তো এগুলো শুনতে চাই না, আপনি পারবেন এগুলোকে বন্ধ করাতে? হিন্দুদের নামে যত আপনাদের সেকুলারিজম্ এসে যায়। আচার্য এদের কথাই বলছেন, এদের কোন ধারণাই নেই। এদের মধ্যে যারা একটু আধটু পড়ে নিয়েছে, তারা বলে, আত্মজ্ঞান হতেই পারে না।

আচার্য বলছেন, ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে আগেই বলে দিয়েছেন, *যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ,* সাধারণ মানুষ যেখানে দেখে এটা সম্ভব না, মুনি দেখেন এটাই সম্ভব। আমেরিকার বিখ্যাত নিউয়র্ক টাইমস্ নিউজপেপার, ওরা হল পণ্ডিতদের শিরোমণি, সারা জগৎকে উপদেশ দিয়ে বেড়ায় আর ভারতের নামে নিয়মিত লিখবে – ভারত একটা ধর্মান্ধ দেশ। নিজেদের পুরো দেশটা যে একটা cowboy country, যেখানে পিস্তল নিয়ে সবাই ঘুরে বেড়ায়, সেটা আর তারা দেখতে পায় না। ১৯০৯ সালে কি এই রকম কোন একটা সময়ে এরাই লিখেছিল, মানুষ যে একদিন আকাশে উড়বে, এটা হল একটা বিরাট বড় ফ্রড, ধাপ্পাবাজী। অথচ তার দুই কি তিন বছর বাদেই রাইট ভ্রাতৃদ্বয় এ্যারোপ্লেন উড়িয়েছিল। ১৯৬৯ সালে যখন চাঁদে মানুষ গেল, তার এক বছর আগে পর্যন্ত, এই নিউজপেপারের সব পণ্ডিতরা বলে গেল, সব ধাপ্পাবাজী, এগুলো কিছুই না, কিন্তু তারপরেও মানুষ চাঁদে চলে গেল। সব বৈজ্ঞানিকরা তারপর বলতে শুরু করল – কিভাবে মানুষ চাঁদে গিয়ে বাস করবে, কিভাবে স্পেসে বাস করবে, আজ পর্যন্ত যার কিছুই হয়নি। অথচ আজ মহাকাশে মানুষ স্পেস স্টেশন তৈরী করেছে আর কম্প্যুটার, ইন্টারনেটের যে এমন বিপ্লব হবে, কেউ ধারণাই করতে পারেনি, এই তো এদের পাণ্ডিত্য! আবার এসে জিজ্ঞেস করবে, ধর্ম কি বিজ্ঞান ভিত্তিক? আমিও গলাটা খুব গম্ভীর করে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিই, আচ্ছা বিজ্ঞান কি ধর্ম ভিত্তিক?

আচার্য বলছেন, যাঁরা বিবেকী, গুরু পরম্পরায় বিদ্যার্জন করেছেন, উপনিষদ আদি অধ্যয়ন করেছেন, আর এই জ্ঞানকে নিয়ে অনেক খাটা-খাটনি করেছেন; তাঁরা জানেন, আত্মা সত্য, আত্মজ্ঞান সত্য। যাঁরা করেনি, তাঁরা আর কি জানবেন, তাঁদের কথাকে আমরা কেন মূল্য দেব? আচার্য এখানে আরও যুক্তিতর্ক নিয়ে এসেছেন, এগুলো আমাদের অত জানার দরকার নেই। শুধু এটুকু জানা, যে কোন জ্ঞান অন্য জ্ঞানের বস্তু হয় না। আত্মজ্ঞান আছে কি নেই, এটাকে বুদ্ধি লাগিয়ে যদি কেউ বুঝতে চায়, যা কোন দিন কোন ভাবেই হবে না। এই যে লোকেরা বোকার মত বলে, ঈশ্বর আছেন এর কি প্রমাণ দেবেন? এই উল্টোটাও তো আমরা বলতে পারি, ঈশ্বর নেই এর প্রমাণ কি আপনি দিতে পারবেন? একটা বস্তু যদি না থাকে, তার একটা প্রমাণ থাকে। জ্ঞান কখনই জ্ঞানের বস্তু হয়ে যায় না। এই কলম আমার জ্ঞানের বস্তু, জ্ঞান কখন জ্ঞানের কোন বস্তু হয় না।

বলছেন, *অনাত্ম বুদ্ধি,* শুদ্ধ আত্মাতে বুদ্ধি না লাগিয়ে যেটা আমার আত্মা নয় সেটাতে আমার বুদ্ধি লেগে আছে। আমার বুদ্ধিতে দেহ আমার আত্মা, আমার মন আমার আত্মা, আমার স্ত্রী, পুত্র আমার আত্মা, এই জগৎ আমার আত্মা। কিন্তু আমি জানি না যে, এগুলো আসলে সবই অনাত্মা। যত সাধনা হয়, সব সাধনার লক্ষ্য অনাত্মা বুদ্ধির নাশ। গীতা, উপনিষদ আর যত শাস্ত্র আছে, সব শাস্ত্র আমাদের অনাত্মা থেকে নিবৃত্ত করে। আপনারা এই একটি কথা খুব ভাল করে বুঝে নিন, আত্মজ্ঞান মানে কোন একটা জিনিসের দিকে এগোচ্ছেন, তা না; আত্মজ্ঞান মানে অন্য দিকে যে দৌড়ে যাচ্ছিলেন, সেটাকে থামিয়ে দেওয়া, এতদিন অনাত্মা বস্তুর দিকে দৌড়াচ্ছিলেন, এটাকে আটকে দেওয়া। আটকে দিলে যেটা হবে, সেটাই আত্মজ্ঞান। আমরা সব সময় অনাত্ম বস্তুর দিকে দৌড়াচ্ছি, এই দৌড়ানিটা পুরোপুরি থামিয়ে দিতে হবে। প্রথমে সংসারের পিছনে দৌড়ানটা বন্ধ করা, সেখান থেকে নিজের শরীরের দিকে দৌড়ান, সেটাকে বন্ধ করা; তারপর নিজের যে মন, বুদ্ধির পিছনে দৌড়ান, এটাকে বন্ধ করা, শেষে নিজের যে আমিত্ব ভাব, অহং ভাব, এটাকে ছেড়ে দেওয়া। ধর্ম মানে প্রাপ্তি নয়, ধর্ম মানে ত্যাগ। আমরা কথায় কথায় বলি, বস্তু লাভ, ঈশ্বর লাভ; কোন লাভ না, আসলে হল ত্যাগ, ধর্ম মানে আবর্জনা ত্যাগ। আত্মা ব্যতিরেকে সব কিছু আবর্জনা। কিভাবে হয়?

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ।।৫১।।

(আত্মাকে ব্রহ্মরূপে নিশ্চয়পূর্বক সংশয় ও বিপর্যয়শূন্য বুদ্ধিযুক্ত হয়ে, ধৈর্যের সহিত শরীর ও ইন্দ্রিয় বশীভূত করে, শরীর স্থিতির জন্য মাত্র যেটুকু প্রয়োজন তদ্ব্যতিরিক্ত শব্দাদি বিষয় পরিত্যাগপূর্বক, শরীরস্থিতির উপযোগী বিষয়েও আসক্তি ও দ্বেষ বর্জন করে –)

এখন যে শ্লোক গুলো আসবে, এগুলো আগে আগে গীতাতে অনেকবার এসেছে এবং বিস্তারে আলোচনা করা হয়ে গেছে। এখন সংক্ষেপে একটু বলে আমরা এগিয়ে যাব। *বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া*, বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ করতে হয়, মানে কপটরহিত, কোন ধরণের কপটতা থাকবে না, ভিতরে যেমনটি আছে বাইরেও তেমনটি থাকবে, একেবারে স্পষ্ট। *ধৃতি*, অর্থাৎ লেগে থাকা, আর তার সঙ্গে শরীরকে সংযমিত রাখা। কিভাবে? রূপ, রস, গন্ধাদি যে বিষয়, অর্থাৎ সামনে যে জগৎ রয়েছে, এখান থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আসা, বহির্বস্তু থেকে টেনে নিজেকে ফেরৎ এনে অন্তর্মুখী হওয়া। মোদ্দা কথা, বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ করতে হবে আর নিজের যে অধ্যাত্ম ভাব, এটাকে ধরে রাখতে হবে। শরীর চালানোর জন্য যতটুকু দরকার, তার বাইরে অন্য কোন কিছুর জন্য মনের ছটফটানিটা বন্ধ করতে হবে। জীবন ধারণের জন্য যেটুকু দরকার, সেটুকু হয়ে গেলে আমার আর কিছু লাগবে না।

ভারত থেকে কত লোক আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড যাচ্ছে, কিসের জন্য যাচ্ছে? যাতে প্রচুর অর্থোপার্জন করতে পারে। এত টাকা নিয়ে তারা কি করবে? যাতে ভাল ভাল খাওয়া-দাওয়া করতে পারে। অথচ খাবে সেই একটা পেটে যতটুকু ধরে। যাতে প্রচুর দামী দামী পোশাক কিনতে পারে। অথচ গায়ের উপর পরবে একটাই জামা। হাজারটা পোশাক আছে কি দশটা পোশাক আছে, তাতে তফাৎ কি হয়? যাতে বিশাল টাকার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স তৈরী করতে পারে। জীবনের শেষে এসে কি করবে? তখন বলবে, ভাল কোন সংস্থা আছে যেখানে দান করলে সারা জীবন খেটে যে অর্থ উপার্জন করেছি, তার সদ্ব্যবহার হবে? আমরা রামকৃষ্ণ মিশনে আছি, আমরা জানি কত লোক এই রকম টাকা দেওয়ার জন্য ছটফট করছে। আমরাও বিরক্ত হয়ে বলে দিই, আমাদের দ্বারা সম্ভব না, এভাবে টাকা নিতে পারব না।

কিসের জন্য আপনি এত দৌড়াচ্ছেন? দু বেলা এক পেট খাওয়া আর দু সেট পোশাক। কত পোশাক আপনার লাগবে? আপনার নিত্য নূতন পোশাক পরতে ভাল লাগে, রাখুন না পঞ্চাশ খানা পোশাক। বেশির ভাগই যাদের দুটো পয়সা আছে, পাঁচশ ছশোর নীচে এদের পোশাক থাকে না। এটা একটা রোগ, মানসিক রোগ। গীতা বা আচার্য শঙ্কর এনাদের আলোচনাতেই আনছেন না, এনারা তো রোগী। যাদের পাঁচশ খানা আছে তাদের বলছে, তুমি পঞ্চাশে নিয়ে আস, যার পঞ্চাশটা আছে তাদের দশটাতে নামিয়ে আনতে বলছেন। শেষে আমাদের মত একটা জামা আর একটা ধুতি, গত চল্লিশ বছর ধরে তাই আমি পরে আসছি, ওই একটি জামা আর একটা ধুতি, বোঝাও যায় না, কটা সেট ব্যবহার করছি।

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ।।৫২।।

(নির্জন স্থানে অবস্থান ও পরিমিত আহার করে বাক্য, শরীর ও মন সংযত করে, নিত্য ধ্যাননিষ্ঠা ও যোগপরায়ণ হয়ে দৈহিক ও পারত্রিক সকল বিষয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করে –)

যদি তুমি ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যেতে চাও, আত্মজ্ঞানের দিকে যদি এগোতে চাও, কিছু কিছু অভ্যাস ও কিছু কিছু জিনিস তোমার জীবনে নামিয়ে আনতে হবে। *বিবিক্তসেবী*, জগতে একটু আলাদা থাকার, একা একা থাকার অভ্যাসটা তৈরী করে নিতে হবে। Socialising হল পাপ, দু-চারজন বন্ধু অবশ্যই থাকবে যার সঙ্গে আপনার সুখ-দুঃখের কথা বলবেন, কিন্তু *বিবিক্তসেবী*, একান্ত

হতে হবে। বেশি যদি socialize করেন, আপনার এই যে আত্মজ্ঞানের সাধনা, সামাজিকতা জিনিসটা ধরে রাখলে এই সাধনার প্রচুর ক্ষতি করে দেবে। আপনাদের ছোটবেলার কথা যদি মনে থাকে, জানি না আপনাদের মনে আছে কিনা, বিশেষ করে যাঁরা ছোট্ট শহরে বা গ্রামে থাকতেন তাঁরা দেখে থাকবেন, যেখানে কোন অনুষ্ঠান যদি হত সেখানেও চারটে ভজন গান থাকত, সামাজিক অনুষ্ঠান করছে সেখানেও ভজন, সেখানেও পূজা। আর আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন, কি জঘন্য রুচির ছাপ ফেলছে সেখানে।

লঘ্বাশী, খাওয়া-দাওয়া কম। যেটার পিছনে বর্তমান সমাজ ছুটছে সেই সোস্যাল মিডিয়াতে একটা কিছু পোস্ট করে সবাই দেখবে কটা লাইক এসেছে, কটা শেয়ার হয়েছে, ফেসবুকে কটা বন্ধু আছে ইত্যাদি। আচার্য এখানে খুব সুন্দর বলছেন, *বিবিক্তসেবী* আর *লঘ্বাশী*, এই দুটো জিনিস যদি হয়, আহার যদি পরিমিত হয় আর একান্ত যদি থাকা হয়, অর্থাৎ বেশি socialize যদি না করা হয়, তাহলে তাঁর নিদ্রা আদি দোষ কেটে যায়। রাজযোগে বিস্তারিত ভাবে যোগ বিঘ্নের বর্ণনা আছে, সেখানে বলছেন, ব্যাধি, নিদ্রা এগুলো যোগ বিঘ্ন। বেশি socialize যদি করেন বা প্রস্তুতি ছাড়া বেশি যদি একা একা থাকেন, খাওয়া-দাওয়া যদি বেশি করেন বা খাওয়া-দাওয়া যদি একেবারেই কম করেন তাহলে নিদ্রা, ব্যাধি, অবসাদ, শরীরে কম্পন, একটুতেই রেগে যাওয়া, এই সমস্ত দোষ হাজির হয়ে যাবে।

আর বলছেন, *যতবাক্কায়মানসঃ*, শরীর, মন ও বাণী এই তিনটেকে নিয়ন্ত্রণ করা। *ধ্যানযোগপরো*, তার সাথে ধ্যানযোগ। আপনার প্রস্তুতি হয়ে গেছে, স্বধর্ম পালন হয়ে গেছে, নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে গুছিয়ে নিয়ে এসেছেন, এবার আপনার জন্য ধ্যানযোগ।

এখানে আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *নিত্যং নিত্যগ্রহণং মন্ত্রজপাদ্যন্যকর্তব্যাভাব*, মন্ত্রজপ আদি বন্ধ করার কথা বলছেন। সাধন-ভজনের প্রথম দিকে জপ খুব দরকার, জপ না করলে মনের নিয়ন্ত্রণ হবে না, কারণ মন সব সময় ছুটতে থাকে। স্বধর্ম পালনের সময়, বর্ণাশ্রম ধর্ম করার সময় মন্ত্র জপ খুব প্রয়োজন। সেইজন্য উপনয়ন হয়ে যাওয়ার পর দিনে একবার কর, তিনবার কর, আর একশ আটবার করে কর, চুয়ান্ন বার করে কর, বারো বার করে কর, যাই কর, গায়ত্রী মন্ত্র জপ প্রত্যেক দিন করে যেতে হবে। কিন্তু বর্ণাশ্রম পালন করে করে, স্বধর্ম পালন করে করে মন যখন শুদ্ধ হয়ে যায়, তখন আপনার প্রস্তুতি হয়ে গেল, এরপর আপনি জগৎ থেকে সরে এলেন, খাওয়া-দাওয়াও আপনার সংযমিত হয়ে গেছে, শরীর মন ইন্দ্রিয় সব নিয়ন্ত্রণে এনেছেন, এখন আপনার জন্য আর মন্ত্র জপ নয়, ধ্যানের অভ্যাস করতে হবে। যার জন্য সন্ন্যাসীদের বেশি করে ধ্যান করতে বলা হয়। ঠাকুরও ধ্যানের কথা বলছেন, কেশব সেনকে নিয়ে বলছেন, কেশবের ধ্যানটুকু ছিল বলে এত তার নাম সম্মান। কিন্তু প্রথমেই যদি ধ্যানের দিকে বেশি জোর দেন, তাহলে কিন্তু কিছুই হবে না। ক্লাশ ফাইভের ছেলেকে প্রথমেই যদি এমএসসির ফিজিক্স শেখাতে গেলে কিছুই মাথায় ঢুকবে না। ধাপে ধাপে এগোতে হবে।

বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ, তার সাথে বলছেন, সমস্ত রকমের তৃষ্ণার ত্যাগ করতে হবে। এই জগতের, পরের জগতের যত রকম বাসনা আছে, কামনা আছে, সমস্ত রকমের কামনা-বাসনা থেকে বেরিয়ে আসার কথা বলছেন।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।৫৩।।

(দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি, কামরাগাদিযুক্ত বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ ত্যাগ করে দেহে ও জীবনে মমতাবর্জিত এবং চিত্তবিক্ষেপশূন্য যতি এই জীবনেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হন।)

ব্রহ্মজ্ঞান পাওয়ার যোগ্য কে, আত্মজ্ঞান লাভ করার যোগ্য কে হয়? এটারই এখন বর্ণনা করছেন। অহঙ্কার, বল ও দর্প এই তিনটে জিনিসের যাঁর ত্যাগ হয়ে গেছে। বলছেন, আমাদের ইন্দ্রিয়াদি যা কিছু আছে, হাত, পা, কান ইত্যাদি, এগুলোর মধ্যে যে আমিত্ব ভাব, ত্রয়োদশ অধ্যায়েও এই প্রসঙ্গ বলেছিলেন, যেখানে বলছেন, *ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্*, এই যে ইন্দ্রিয়ের প্রতি আমি ভাব, মনের প্রতি যে আমি ভাব, এটাই অহঙ্কার, এই অহঙ্কার বাংলার অহঙ্কার না। সামর্থ যেটা, যেটা কামনার সাথে জুড়ে আছে, কারণ শরীরের সামার্থ তো থাকবেই, সেখানে নাকচ করার কিছু নেই; কিন্তু এটা আমি করে নেব, এটাকে আমি পেয়েই ছাড়ব, এই জিনিসটাকে বলে বল, এটাকেও ত্যাগ করতে হবে। *দর্প*, দর্প জিনিসটা হল, খুব বেশি আনন্দ হয়েছে, ওই আনন্দের জন্য মানুষ ছ্যাবলামো করতে শুরু করে দেয়, ছ্যবলামোর জন্য ধর্মের উল্লঙ্ঘন হয়ে যায়, এটাকে বলে দর্প। আমি করব, কে আমাকে আটকাবে, এই যে ভাব, এই ভাবটাকে বলছেন দর্প। তার সাথে বলছেন, *কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্*। কাম, ক্রোধ একেবারে প্রথম থেকে চলছে, মনে যে কামনা-বাসনা আর সেটার বিঘ্ন হলে মনে ক্রোধ তৈরী হয়। আত্মজ্ঞান পাওয়ার জন্য এই সমস্ত কিছুকে ত্যাগ করতে হবে।

বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তঃ, কোন কিছুতে তাঁর মমতা নেই, দেহের প্রতিও মমতা নেই, এই জীবনের প্রতিও মমতা নেই। আর *শান্তঃ*, সব কিছু ছেড়ে দিয়ে মনের ভিতর সন্ন্যাসের ভাব এসে গেছে। কি রকম? আচার্য বলছেন, *পরমহংসঃ পরিব্রাজক*। ঠিক ঠিক সন্ন্যাসীকে বলা হয় পরমহংস পরিব্রাজক। সন্ন্যাসী মানে, কোন পরিশ্রমে আর তিনি থাকছেন না। এই ভাবটা গোটা ভারতবর্ষ নিয়ে নিল নিজের জন্য – আমরা কাজ করব না। এই ভাব শ্রেষ্ঠতম সন্ন্যাসীর ভাব। তাঁকে যদি বলা হয়, তিন দিন খাওয়া পাবে না, তাতেও তাঁর কোন ভ্রুক্ষেপ হবে না। একমাত্র এনারাই আত্মজ্ঞানের জন্য প্রস্তুত।

প্রথমে তমোগুণ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, তার জন্য চাই প্রচুর কাজ। প্রচুর কাজ করার পর তমোগুণ থেকে বেরিয়ে রজোগুণে আসবে। রজোগুণে যে কর্ম হবে, এই কর্ম হবে স্বধর্ম পালনের মাধ্যমে, স্বধর্ম পালন হল বর্ণাশ্রম ধর্ম। স্বধর্ম পালন থেকে শুরু হবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কর্ম করা, যে কোন ভাবে ঈশ্বরের সাথে জুড়ে যাওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। সেখান থেকে নিজের শরীর ও মনের প্রতি যে কিছু কিছু আকর্ষণ রয়েছে, আর কিছু গুণ যে রয়েছে, যে গুণগুলো মানুষকে চঞ্চল করে দেয়, এগুলোকে ত্যাগ করা। এখন তাঁর আর কোন কিছুর প্রতি আকর্ষণ নেই, এবার সে প্রস্তুত। পরম ভক্তি কিভাবে হবে?

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।।৫৪।।

(এই ক্রমে ব্রহ্মভূত ও অন্তরাত্মাতে আবির্ভূত আনন্দ প্রাপ্ত হয়ে যতি কোন বিষয়ে শোক করেন না এবং কিছু আকাঙ্ক্ষাও করেন না। তিনি সর্বভূতের সুখ ও দুঃখ নিজের সুখ ও দুঃখের ন্যায় দর্শন করেন। এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি মদ্বিষয়ক জ্ঞানরূপ উত্তম ভক্তিলাভ করেন।)

ভগবান বলছেন, আমার পরম ভক্তি কিভাবে আমাকে পাবে? আত্মা, আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান আর কৃষ্ণকে পাওয়া এক। এখানে এসেই বৈষ্ণবরা গোলমাল করে ফেলে। অদ্বৈত বেদান্ত পুরো ছবিটাকে নেয়, বৈষ্ণবরা ওই ছবির একটুখানি অংশকে নেয়। সেটারও দরকার আছে, কারণ সাধারণ মানুষ খোল করতাল নিয়ে নাচ, গান এগুলোকেই ধর্ম মনে করে। কিন্তু যদি এটাকেই শেষ কথা বলে দেন, তাহলে ধর্ম সাধনের প্রতি এটা ঘোরতর অন্যায় হয়ে যায়।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা, এখানে থিয়োরেটিক্যাল জ্ঞানের কথা বলছেন, শেষ অবস্থার কথা বলছেন না। এই যে সমস্ত কিছু করে মন শুদ্ধ হয়ে গেল, ঠাকুরের কথা ভাবলে, কৃষ্ণের কথা

ভাবলেই মনটা আনন্দে ভরে যায়। জীবনে যদি কাউকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে থাকেন, সে যেই হোক, স্বামী হোক, স্ত্রী হোক, বন্ধু হোক, তার কথা ভাবলেই ভিতরে যে আনন্দের একটা স্ফুরণ হয়, ইষ্টের কথা ভাবলে ঠিক সেই রকম আনন্দের স্ফূরণ হয়। এই ভাব তখনই উদয় হবে, যখন তমোগুণ রজোগুণ কেটে গিয়ে সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়ে গেছে। শুধু সত্ত্বগুণে হবে না, সত্ত্বগুণের আধিক্য যেখানে এসেছে। এনারাই হন *প্রসন্নাত্মা*, সব কিছুতে প্রসন্নতা। বলছেন, এনারা অধ্যাত্ম প্রসাদ পেয়ে গেছেন। এই ধরণের মানুষ কোন পরিস্থিতিতে শোক করেন না; কষ্ট হতে পারে, দুঃখ হতে পারে, কিন্তু তার জন্য শোক করবেন না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণের কথা যেখানে বলছেন, সেখানেও ঠিক এই কথাই বলছেন, *দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ*, তিনি কখন উদ্বিগ্ন হন না।

একটা মজার কথা বলছি, আমাদের এখানে মাঝে মাঝেই ভক্ত সম্মেলন হয়, অন্যান্য জায়গাতেও হয়। একজন মহারাজ তিনি ঘর থেকে খুব কম বের হন। একদিন দেখলাম সকাল সকাল কোথায় যেন যাচ্ছেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার মহারাজ, আপনি এই সকালবেল কোথায় চললেন'? 'আর কি বলব আপনাকে, একজন ভক্ত বলেছেন ভক্ত সম্মেলনের একটা টিকিট কিনে রাখতে, না তো করা যায় না'। সত্যিই কিছু বলার নেই, ভক্ত সম্মেলন হবে, তার একটা টিকিটের জন্য উদ্বিগ্ন করছেন একজন সন্ন্যাসীকে? টিকিট যদি না পান, তখন মন খারাপ হয়ে যাবে—মহারাজ আপনাকে বললাম একটা টিকিটের ব্যবস্থা করতে, আপনি করলেন না? একজন সন্ন্যাসীকে যে বিব্রত করতে নেই, এই এতটুকু বুদ্ধিও এদের নেই, এরা আবার ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে যাচ্ছে? খিচুরি প্রসাদ পাওয়ার জন্য বলবে, মহারাজ আমরা আসব, আমাদের জন্য ব্যবস্থা করে রাখবেন। ভক্তদের কত চাহিদা, কত আবদার, এদিকে ব্রহ্মজ্ঞানের নীচে কোন কথা নেই। পুরো শাস্ত্র বিরোধী আচরণ। *ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি*, যিনি প্রসন্নাত্মা তিনি কোন কিছুর জন্য যেমন কোন শোক করেন না, তেমনি কোন কিছুর জন্য কোন আকাঙ্ক্ষাও করেন নাই।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু, যাঁরা সবাইকে সমান দেখেন, তবে গিয়ে এনারা *মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্*, আমার পরা ভক্তি লাভ করে। কিন্তু তার আগে অনেক কিছু রয়েছে, সেগুলিকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে। সেইজন্য দুম্ করে হঠাৎ একটা শ্লোক নিয়ে যে আপনি বলবেন, এইতো গীতাতে ভগবান এই কথা বলছেন, তা নয়, এতক্ষণ পুরো প্রস্তুতির কথা বলা হল।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।।৫৫।।

(উক্ত জ্ঞান লক্ষণা ভক্তি দ্বারা তিনি আমাকে জানেন যে আমি উপাধিকৃত ভেদবিশিষ্ট এবং স্বরূপতঃ নিরুপাধি, অদ্বিতীয় চৈতন্যমাত্র উত্তম পুরুষ। আমার এই তত্ত্ব অবগত হওয়া মাত্রই তিনি আমাতে প্রবেশ করেন।)

এর আগে যে ভক্তির কথা বলা হল, ওটা ছিল থিয়োরেটিক্যাল জ্ঞান, কিন্তু তারপর যখন মন প্রাণ পুরো ঈশ্বরের দিকে চলে এলো তখন *ভক্ত্যা মামভিজানাতি*, ওই ভক্তি দিয়েই সে আমাকে জানতে পারে। গীতা প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞানের, আত্মজ্ঞানের কথা বলছিলেন, সেখান থেকে নিয়ে এলেন ভক্তিতে। এই ভক্তি শুধু কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি না, শিবের প্রতি ভক্তিও হতে পারে, এই ভক্তি রামের প্রতি ভক্তিও হতে পারে, এই ভক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিও হতে পারে। যারা বলে, এই দেখ গীতাতে শুধু কৃষ্ণের ভক্তির কথা বলছেন, এরা তত্ত্বটাই জানে না, হিন্দু পরম্পরাকেই জানে না। মনে হয় অন্যান্য ধর্ম থেকে ভুল বশাৎ এখানে জন্ম নিয়ে ফেলেছে। অন্যান্য ধর্মে যেমন বলে, আমার এই গ্রন্থ, এর বাইরে কিছু নেই, আমার যে ঈশ্বর, এর বাইরে আর কোন ঈশ্বর নেই, এদেরও ঠিক এই ভাব, এই ভাব একেবারেই হিন্দু ভাব নয়।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি, কিভবে ভক্তি দ্বারা এরা আমাকে জানতে পারে? *যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*, আমার তত্ত্ব যেমনটি তেমনটি জেনে। আমার কি তত্ত্ব জানতে পারে? উপাধি সহিত এবং উপধি রহিত আমাকে জানতে পারে। বেদে পুরুষসূক্তমে যেখানে বলছেন, *সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ*, সেখানে বলছেন, *এতাবানস্য মহিমা*, এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, এটা তাঁর মহিমা, এটা উপাধি। ভগবান কিন্তু এর থেকে বেশি, গীতায় দশম অধ্যায়ে আগে যেটা বলা হয়েছে, *একাংশেন স্থিতঃ জগৎ*, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার ছোট্ট একটা অংশে অবস্থিত, এটাও উপাধি। বলছেন ভগবানের এই দুটো দিককেই জানতে হয় – উপাধি সহিত ও উপাধি রহিত। সেটা কি রকম? আচার্য বলছেন, *অদ্বৈতং চৈতন্যমাত্রৈকরসম্ অজম্ অজরম্ অমরম্ অভয়ম্ অনিধনং*, আচার্য শুধু 'অ' শব্দ দিয়ে বলে যাচ্ছেন। এটাই বলার অভিপ্রায় যে, উপাধি সহিত বিস্তার ভেদে আমি যা কিছু হয়ে আছি সেটাও জানতে পারে আর আমার যে উপাধি রহিত আকাশের মত আমি যে সর্বত্র ব্যপ্ত হয়ে আছি সেই অদ্বৈত, অজর, অমর, অভয় আর নিধন রহিত, এই যে আমার তত্ত্ব, এটাকেও তত্ত্বতঃ আমাকে জানতে পারে।

যখন জেনে যায় তখন কি হয়? *বিশতে তদনন্তরম্*, তখন আমাতেই সে প্রবেশ করে যায়। ঈশ্বরকে না জানা পর্যন্ত আপনি ঈশ্বরে প্রবেশ করতে পারবেন না। মৃত্যুর সময়ে এসে তিনি আমাকে হাত ধরে নিয়ে যাবেন, এসব কিছু না, তাঁকে জানতে হয়। দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলেছিলেন, *তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ*, ওখানে সংক্ষেপে বলা হয়েছিল, কিন্তু বিধি এটাই। বলছেন, আত্মার কোন বিকার নেই, অবিকারী স্বরূপ, এটাকে ঠিক ঠিক জানা, এটাই মুক্তি, এটাই মোক্ষ। এই যে এখানে বলা হল, আমাতে প্রবেশ করে যায়, অবিকৃত রূপেই প্রবেশ করে যায়। ঠাকুর এক জায়গায় হাজরকে বলছেন, তুমি শুদ্ধাত্মাকে ঈশ্বর বল কেন? ঈশ্বর জ্ঞান মানেই হয় উপাধি সহিত ও উপাধি রহিত। উপাধি রহিত হল শুদ্ধাত্মা, ঈশ্বরে প্রবেশ করা মানে বিকার রহিত হয়ে গেল। পরের শ্লোকে ভগবান এই বিদ্যার স্তুতি করছেন। সেখানে ভগবান বলবেন – এই রকম ভক্ত যখন জেনে যায় আমিই তার একমাত্র আশ্রয়, তখন সে তার সমস্ত কিছু আমাকে অর্পণ করে দেয়, তখন সে আমার কৃপায়, আমার অনুগ্রহে, সেই শাশ্বত অব্যয় পদ, বিষ্ণুপদ পায়।

পরের শ্লোকে যাবার আগে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে নিতে হচ্ছে। আজ আমরা গীতার শততম ক্লাশ শুরু করছি। ২০১৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী অফ্ লাইনে আমাদের গীতা ক্লাশ শুরু হয়েছিল, বিরাট লম্বা সময় নিয়ে ক্লাশ চলেছে। মাঝখানে করোনা মহামারী এসে গেল। লকডাউনের জন্য বেশ কিছু দিন ক্লাশ বন্ধ থাকার পর আমরা অন লাইনে গীতার ক্লাশ আবার শুরু করলাম। গীতার একেবারে শেষের দিকে আমরা চলে এসেছি, একটা কি দুটো ক্লাশে গীতার এই আলোচনা শেষ হয়ে যাবে আশা করছি। এটাও একটা বিরাট বড় সাধনা, পরে ভগবানও বলবেন শাস্ত্রের কথা শ্রবণ করাটাও একটা সাধনা। যাঁরা আমাদের গীতার ক্লাশ শুনছেন, তাঁদের দু-একজন খুব সুন্দর লিখলেন, গীতা শেষের দিকে এসে গেছে, চোখে জল চলে আসছে। ঠিকই বলছেন, এটা তো বিরাট বড় যজ্ঞ, এখন পূর্ণাহুতির সময় এসে গেছে। মেয়েকে স্নেহ ভালবাসা দিয়ে বড় করা হয়, বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়, মেয়ে শশুড় বাড়ী চলে যায়, বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন সবারই চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। মেয়েকে বড় করাটা একটা যজ্ঞ সম্পাদন করা, বিয়ে দেওয়া এটাও একটা যজ্ঞ সম্পাদন হল। ছেলেকে বিয়ে দেওয়া এটাও একটা যজ্ঞ সম্পাদন হল। ঘরে নূতন একটা মেয়ে বধূ রূপে এসে গেল, আপনার দায়ীত্ব অনেক কমে গেল।

সাতশ শ্লোকে গীতা কত কথাই না বললেন। ভগবান প্রথমে অর্জুনকে বললেন, *কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্*, এই সঙ্কট সময়ে কোথা থেকে তোমার মধ্যে অনার্যের মত আচরণ এসে গেল। সেখান থেকে ভগবান শুরু করলেন *আত্মতত্ত্ব*। সেখান থেকে দায়ীত্ব পালন, কর্মযোগ, সেখান থেকে জ্ঞানযোগ, সন্ন্যাসযোগ, ধ্যানযোগ, সেখান থেকে ভক্তিযোগের বিভিন্ন দিক, সেখান থেকে চলে গেলেন ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযোগ, পুরুষোত্তমযোগ, সেখান থেকে চলে গেলেন তিনটে গুণের

বিভাজনে। এত কিছু কথা বলে একেবারে শেষের দিকে এসে ভগবান বলছেন, সব কিছু ছাড়, ছেড়ে আমার শরণাগতি নাও। জগতে যত ধর্ম আছে, যত শাস্ত্র আছে, কি বলতে চাইছেন তাঁরা? আমার শরণ নাও।

গীতার প্রথম তিনটে ক্লাশে গীতার যা কিছু বক্তব্য আমরা বিস্তারে ব্যাখ্যা করেছি। সেখানেও আচার্য শঙ্কর বলছেন গীতার সার কি? *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*, সব কিছু ছেড়ে হে অর্জুন তুমি আমার শরণে এসো, আমরা এখন ওই দিকেই এগোচ্ছি। রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, সবাই আমরা একটা পরিবারের মত, এটা আমাদের পরিবার। আমরা সবাই সবার কাছে যেতে পারি। আমাদের এখানে hierarchy আছে, অধ্যক্ষ আছেন, সহাধ্যক্ষ আছেন, জেনারেল সেক্রেটারী আছেন, কিন্তু যে কোন সাধু, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী যে কোন মহারাজের কাছে যেতে পারেন। ফলে আমরা অনেকেরই কাছে অনেক কিছু শেখার সুযোগ পাই, এবং শিখিও। স্কুল কলেজের হেডমাস্টার, প্রিন্সিপালের মত না, এখানে সব খোলামেলা। আমিও অনেকের কাছে শাস্ত্রের কথা শিখেছি, কখন প্রশ্ন করতাম, কখন চুপচাপ অবাক হয়ে শুনতাম।

আমাদের এই রকম একজন মহারাজ ছিলেন, স্বামী মোক্ষদানন্দজী মহারাজ, ডাক নাম রাম মহারাজ, আগেও কয়েকবার ক্লাশে ওনার কথা বলেছি। আমি এক সময় কলকাতায় অদ্বৈত আশ্রমে ছিলাম, প্রত্যেক শনিবার রবিবার অদ্বৈত আশ্রম থেকে বেলুড় মঠে ওনার কাছে আসতাম। মহারাজের কাছে চুপচাপ বসে থাকতাম, উনি ঘন্টা খানেক বলতে থাকতেন, আমি শুনতাম। মহারাজ বিরাট বড় পণ্ডিত ছিলেন, ওনার যদিও স্কুল কলেজে পড়াশোনা ছিল না। কিন্তু পরে টোল ও অন্যান্য জায়গায় পড়াশোনা করে ব্যাকরণে বিরাট পণ্ডিত হয়েছিলেন। বাংলাতে পণ্ডিত ছিলেন, আর সংস্কৃতে তো আইকন। স্বামী গম্ভীরানন্দজী যিনি এত উপনিষদের অনুবাদ করলেন, তিনি ওনারা সাথে পরামর্শ করতেন। বাংলা, সংস্কৃত ছাড়া অত্যন্ত সুন্দর ইংরাজী জানতেন, অথচ আমরা শুনেছি যে উনি ক্লাশ টেনও পাশ ছিলেন না। পরে সংস্কৃতে ডিগ্রি নিয়ে ওনাকে মঠে জয়েন করানো হয়। ফ্রেঞ্চ ভাষা জানতেন। আমাদের সবার কাছে তিনি একজন সম্মানীয় আচার্য ছিলেন।

মহারাজ একদিন আমাকে খুব সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন। কথাটা শুনে তখন আমার খুব অবাক লেগেছিল। নিজের চোখে দেখেছি সেই সময় স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ মধুসূদন সরস্বতীর গীতার উপরে যে বই লিখেছেন, সেটার অনুবাদ করছিলেন। একদিন তিনি স্বামী মোক্ষদানন্দজী আছেন কিনা জানতে চাইলেন। মহারাজ গম্ভীর মহারাজের কাছে গেলেন। গম্ভীর মহারাজ ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই শব্দের অর্থ ঠিক ঠিক কি হয়'? রাম মহারাজ তখন পতঞ্জলির সংস্কৃতের মহাভাষ্য থেকে গড় গড় করে বলতে থাকলেন, কি স্মৃতিশক্তি! আমি লাইব্রেরিতে পতঞ্জলি মহাভাষ্য দেখেছি, কোন দিন পড়িনি, ব্যাকরণের একটা বিরাট বই। সেদিন মহারাজ আমাকে বলছেন, 'এখন নুড়ুনটুকু হলেই হয়'। ঠাকুর কথামৃতে বলছেন, অপরকে মারার জন্য ঢাল তলোয়ার লাগে, নিজেকে মারতে একটা নুড়ুন হলেই হয়। মহারাজের কথাটা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম, যিনি এত বড় পণ্ডিত, আর শুকনো পণ্ডিত না, বিশ্ব সাহিত্য তাঁর পড়া, তিনি তাঁর জীবনের সায়হ্নে এসে কিনা বলছেন, এখন নুড়ুনটুকু হলেই হয়। কথাটা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

এমনই কপাল যে, সেই সময় আরোগ্য ভবনে আমাদের দক্ষিণ দেশের এক বয়স্ক মহারাজ থাকতেন, তিনিও আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আরোগ্য ভবনে, যেখানে আমাদের প্রাচীন সাধুরা থাকেন, সেখানে ঢোকার মুখে শ্রীশ্রীমায়ের একটা তৈল চিত্র আছে। দক্ষিণ দেশীয় এই মহারাজ কেরলে ছিলেন, সেখানে তাঁর খুব নাম ছিল, খুব ভাল বক্তৃতা দিতেন। সব সময় তাঁর মুখে হাসি লেগে থাকত, খুব মধুর হাসি। একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর হাসি দেখলে বোঝা যায়, হাসিটা কেমন। হাসি দেখলে বোঝা যায়, দুই বাহু তুলে নৃত্য করছেন, নাকি বগলে সুতোর বাণ্ডিল লুকিয়ে এক হাত তুলে নৃত্য করছেন। তিনি শেষের দিকে মায়ের ছবির সামনে বসে খুব মিষ্টি করে হেসে আমাকে

বলতেন, 'সারা জীবন কত কি করলাম, ঠাকুরের সেবা, সঙ্ঘের সেবা, আজকে এখন আমার সমস্ত অঙ্গ শিথিল হয়ে যাচ্ছে, এখন কেবলই মনে হয়, শুধু মা, আর শুধু মা, মা ছাড়া আর কোন গতি নেই। এখন কর্মের ক্ষমতা নেই, জপধ্যানের ক্ষমতা নেই, এখন শুধু শরণাগতি, শরণাগতি'।

স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের সেক্রেটারীর কাছে শুনেছি, মহারাজ তখন মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ। ওনার একটা বই অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত হবে, সেই বইটা তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নামে উৎসর্গ করতে চাইছিলেন। মহারাজ খুব উচ্চমার্গের দার্শনিক ছিলেন, সব সময় গম্ভীর হয়ে থাকতেন, সহজে কেউ তাঁকে কেউ হাসতে দেখতে পেতেন না। একবার কি একটা ছবি তোলার সময় বলা হল, মহারাজ একটু হাসুন, উনি খুব গম্ভীর মুখে বলছেন, 'তুমি জানো না আমার নাম গম্ভীরানন্দ'? তিনি একদিন বলছেন, 'দেখো, আমার এখন বয়স হয়েছে, আমি ভক্ত হয়েছি'। উঃ কি মিষ্টি কথা, 'বয়স হয়েছে, ভক্ত হয়েছি, মায়ের নামে বইটা উৎসর্গ করতে চাইছি'। বইটা অদ্বৈত আশ্রম থেকে বেরোবার কথা, অদ্বৈত আশ্রম থেকে খুব নম্র ভাবে ওনাকে বলা হল, 'মহারাজ, আমাদের এই রকম প্রথা নেই, আমরা কোন বই উৎসর্গ করতে দিই না'। উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'ও, ঠিক আছে, আচ্ছা'।

এই যে কথাগুলি বলা হচ্ছে, গীতার কথা, রাম মহারাজের কথা, স্বামী গম্ভীরানন্দজীর কথা, সবটাই কি রকম সব সুন্দর সুন্দর কথা। ঠাকুর কথামৃতে গল্প বলছেন, মা দূর্গার গলায় মুক্তাহার শোভা পাচ্ছে। মা দূর্গা কার্তিক আর গণেশকে বললেন, যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা করে আমার কাছে আগে আসতে পারবে তাকে আমি আমার গলার এই মুক্তাহার দেব। কার্তিক নিজের ময়ূরে চেপে বেরিয়ে পড়লেন ব্রহ্মাণ্ডের পরিক্রমায়। দিব্য ময়ূরের তুলনায় গণেশের বাহন ইঁদুরের আর কতটুকু ক্ষমতা। গণেশ জানে শিব-পার্বতী, এনারাই আমার ব্রহ্মাণ্ড, গণেশ দুজনকে প্রদক্ষিণ করে মা দূর্গার সামনে এসে প্রণাম করে দাঁড়ালেন। মা গণেশের গলায় মুক্তাহার দিয়ে দিলেন।

কথামৃতে ঠাকুর বানরের ছায়ের ভাব আর বিড়ালের ছায়ের ভাবের কথা অনেকবার বলেছেন। বানরের বাচ্চা মাকে ধরে রাখে। আর বেড়ালের বাচ্চা শুধু মিউ মিউ করতে জানে, তার মা তাকে কখন বিছানায় রাখছেন, কখন আস্তাকুড়ে নিয়ে রাখছেন। আমরা যে গীতায় একটার পর একটা এতক্ষণ যেটা দেখে এলাম, এটা যেন বানরের ছায়ের ভাব। এবার গীতা আস্তে আস্তে যত সমাপ্তির দিকে এগোচ্ছেন, তত যেন মার্জার-ভাব নিয়ে আসছেন। কিন্তু মিউ মিউ করতে গেলে আমাদের জন্য একটা সাবধান বাণী উচ্চারিত হবে – ঘোর তামসিক হয়ে যাবেন। যারাই বলে, ঠাকুর আছেন, ঠাকুর দেখবেন, ঠাকুরের ইচ্ছে, এই কথাগুলো নির্দ্বিধায় বলে দেওয়া যায়, কিন্তু এরা হল ঘোর তামসিক। কাজ করতে চায় না বলে এই রকম কথা বলে নিজের নিষ্কর্মণ্যতাকে আড়াল করে। তফাৎটা কি? তফাৎ হল, আগে আগে আপনার কত খাটনি করা আছে। একটু আগে যে কজন মহাপুরুষদের নাম নিলাম, সবাই সারা জীবন কত খেটেছেন, সারা জীবন খেটে আসার পর শেষকালে এসে বলছেন – *নিরালম্বো লম্বোদর জননীং ত্বং যামি শরণম্*, মাগো, তুমি ছাড়া কার শরণ নেব মা!

শ্রীশ্রীমা বলছেন, যাঁর আছে মাপো, যাঁর নেই জাপো; আমি আবার এর উল্টোটা বলছি, যে পারো জাপো, যে পারবে না, মাপো। যদি আট ঘন্টা, দশ ঘন্টা জপ করতে পারেন তাহলে জপ করুন। তা যদি না পারেন, তাহলে মাপো। কি মাপবেন? কিছু মাপতে হবে না। ইউটিউবে আমাদের অনেক মহারাজরা অনেকেই ক্লাশ নিচ্ছেন, যাঁর কথা আপনার শুনতে ভাল লাগছে, সেই কথাগুলোকে নিজের মত সাজিয়ে একটা খাতায় লিখতে শুরু করুন। আমাদের এত শাস্ত্র রয়েছে, কোন একটা শাস্ত্র নিয়ে নিন, শাস্ত্রটা পড়ুন, পড়ার পর আপনি যা বুঝলেন, নিজের ব্যাখ্যা লিখুন। ছাপানোর জন্য না, নিজের জন্য, দশ বছর পর পড়ে দেখবেন কেমন লাগছে।

আমাদের এখানে একজন ভক্ত ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকে ক্লাশ করছেন। ২০০৮ সাল থেকে আমি যত ক্লাশ নিয়েছি, সব কটা লেকচার উনি অনুলিখন করে রেখেছেন, পুরোটাই যা কিনা আরকাইভ ওআরজিতে রাখা আছে। দিনের পর দিন তিনি রোজ আমার লেকচারগুলো শুনছেন, আর তিন চার ঘন্টা ধরে সেটাকে তিন চার পাতা করে লিখছেন। বর্তমানে সাতাত্তরের উপর বয়স, এই বয়সে আমি এতটা সময় ঠাকুরে মন দিয়ে রাখতে পারব কিনা সন্দেহ হয়। আর উনি এই বয়সে সংসারের ঝড়ঝাপ্টা সব কিছুকে সামাল দিয়ে কি করে লিখে যাচ্ছেন, অবাক হয়ে যেতে হয়। এখনও পর্যন্ত এ-ফোর সাইজের পাতায় ৭৫০০ পাতা লেখা হয়ে গেছে। এখন উনি আমার কথামৃতের ক্লাশের লেকচার লিখতে শুরু করেছেন। চিন্তা করলেই অবাক লাগে। সেইজন্য আপনাদের বলা, যদি জপ করতে পারেন তাহলে ছয় থেকে আট ঘন্টা দিনে জপ করুন, যদি না পারেন তাহলে এইভাবে লিখুন, এটা যে পারবে না, সে মাপো।

শ্রোতাগণ, পনের মিনিট ধরে যেটা আলোচনা করে যাচ্ছি, আপনার শরীর, মন, ইন্দ্রিয়, পুরোপুরি যদি ঈশ্বরে না ঢুকে যায়, তাহলে কিন্তু কোন গতি নেই। ঠাকুর যখন বেড়াল ছানার কথা বলছেন, মিউ মিউর কথা যখন বলছেন, এটাই মিউ মিউ, হে ঠাকুর তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকে জানি না। *নিরালম্বো লম্বোদর জননীং ত্বং যামি শরণম্*, কোথায় আর আমি যাব মা। সেইজন্য দরকার খুব কাজ, জপধ্যানও কাজ। কথামৃত নিন, পড়ুন, আপনি নিজে যেটা বুঝলেন, সেটা লিখুন বা আমরা যে ক্লাশগুলো নিচ্ছি, সেগুলো শুনে আপনার কি মনে হচ্ছে, সেটা নিজের মত করে লিখুন, এটাই একটা সাধনা, আপনার ভিতরে ঈশ্বরীয় ভাবগুলো ঢুকবে।

আমাদের কাছে অনেকে আসেন, দেখেই মনে হয় ভিতরটা হতাশায় ভরে আছে, দেখে কষ্ট হয়। সব কিছু আছে, কিন্তু মনটা অবসাদগ্রস্ত। একটাই কথা সব সময় আমাদের শুনতে হয় – মহারাজ জীবনে শান্তি নেই। কেন শান্তি নেই, কাজ করেননি বলে শান্তি নেই। কি কাজ করবেন ভাবছেন? ভাবার কি আছে, ঈশ্বরীয় কাজ করুন। খাওয়া-পরার সুবিধা যদি থাকে, তাহলে এই ধরণের কাজ করুন, এটা একটা সাধনা। আমার বন্ধু মহারাজ আছেন, ওনাকে দেখতাম সকাল থেকে জপধ্যান করেই যাচ্ছেন। আমি পারতাম না, আমি পড়াশোনাটা করে গেছি।

ছাপান্ন নম্বর থেকে গীতা পূর্ণ শরণাগতির দিকে যাচ্ছেন। পূর্ণ শরণাগতি মানে, আর হাত-পা নাড়ানাড়ি নেই। হাত-পা নাড়ানাড়ি কোথায়? জাগতিক ব্যাপারে। কিন্তু একটা নবজাতক শিশু দুধ খাওয়ার জন্য ওঁয়া ওঁয়া করে, চার-পাঁচ বছরের ছোট্ট শিশু, সেও মায়ের জন্য ওঁয়া ওঁয়া করে হাত-পা ছোড়ে। আপনাকে সেই রকম করতে হবে, মিউ মিউ করতে হবে। কিভাবে মিউ মিউ করতে হবে সেটা বলা হল। সেটা হল ঈশ্বরীয় কথায় ডুবে থাকা। অত সময় ধরে বসে বসে জপধধ্যান সবার দ্বারা হয় না, বই পড়া সবার দ্বারা হয় না। কিছু তো একটা করুন, এই যে আমাদের একজন ভক্তের কথা বলা হল, প্রত্যকে দিন কত ঘন্টা ধরে তিনি লিখে যাচ্ছেন, আর আজ থেকে না, ২০০৮ সাল থেকে এটাই করে যাচ্ছেন। ওনার এখান যে বয়স, এই বয়সে বেশির ভাগ মানুষের হাত-পা নড়তে চায় না। আর উনি এই বয়সে দিনে চার-পাঁচ ঘন্টা ধরে টুক টুক করে শাস্ত্রের কথাগুলি লিখেই যাচ্ছেন। archive.orgতে এই বইগুলিকে আপলোড করা আছে, ফ্রীতে ডাউনলোড করে যে কেউ পড়তে পারেন। তারপরেও লোকেরা এসে জিজ্ঞেস করে, বইগুলি কোথায় পাওয়া যাবে? এরা করবে ধর্ম লাভ! একটু খাটতে চায় না। এই বইগুলি পড়ে কার কি লাভ হল জানি না, কিন্তু উনি ঈশ্বরীয় ভাবে ডুবে গেলেন। ছাপান্ন শ্লোকে এটাই ভগবান বলছেন।

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্।।৫৬।।

(সকল প্রকার ''আমি, আমার'' ভাব আমাতে অর্পণ করলে সর্বদা সমস্ত কর্ম করেও ভক্ত আমার অনুগ্রহে সনাতন অক্ষয়স্থান প্রাপ্ত হন।)

এই হল শরণাগতি, পুরোপুরি শরণাগতির ভাব। এই শ্লোকটির মর্মার্থ খুব গভীর। যে মানুষ যে কোন কাজ, যা কিছু করছে, সেই কাজ করার সময় যদি সে মনের মধ্যে এই ভাবটাকে সদা জাগ্রত রাখতে পারে, হে প্রভু তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়, তুমি ছাড়া আর আমার কোন আশ্রয় নেই, শঙ্করাচার্য এখানে নিজের থেকে যোগ করছেন – *সর্বকর্মাণি প্রতিসিদ্ধানিহোপি*, প্রতিসিদ্ধ কাজ, শাস্ত্রে যে কাজটা নিষেধ করা আছে এই কাজটি করো না, সেই কাজও যদি করতে থাকে কিন্তু সে যদি বলে আমার আশ্রয় একমাত্র ঠাকুর, তখন কি হয়? *মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্*, আমার কৃপায় সে শাশ্বত পদ পেয়ে যায়, শাশ্বত পদকে গীতা বলছেন *শাশ্বতং পদমব্যয়ম্*।

বলছেন, তিনি সমস্ত কর্ম করছেন, কিন্তু *মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ*, তাঁর সমস্ত কিছু আমার উপর দিয়ে রেখেছেন। এমন কি যে নিষিদ্ধ কর্ম করে, আমাদের শাস্ত্রে বিভিন্ন রকম কর্মের কথা বলা হয়েছে, অনেকবার অনেক জায়গায় আমরা এর আলোচনাও করেছি; আচার্য শঙ্কর পরিষ্কার বলছেন, যে গর্হিত কর্ম করছে, সেও যদি ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত থাকে, *মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ*, মানে আমি বাসুদেব, আমিই হলাম তার পূর্ণ আশ্রয়। সে দু হাত দিয়ে ঠাকুরকে ধরে আছে, হে ঠাকুর, আমি তোমাকে ধরে আছি। আর বলছেন, যে আমাকে সব কিছু অর্পণ করে দেয়, তখন আমার অনুগ্রহে, আমার কৃপায় কি পায়? সেই অব্যয় পদ, যেটার কখন কোন ক্ষয় হয় না, বিষ্ণুপদ আমার কৃপায় পেয়ে যায়। আমাদের বেদেও আছে, *তদ্বিষ্ণো পরমং পদম্*।

পুরো আলোচনাটাই এখন চলবে শরণাগতিকে নিয়ে। গিরিশ ঘোষকে ঠাকুর বলছেন, তুমি বকলমা দাও, তুমি যে কর্মই করে থাকো না কেন, কোন ক্ষতি নেই। তুমি পুরোপুরি আমার উপর আশ্রিত হয়ে যাও। তুমি যদি আমাকে ধরে থাক, আর যদি তুমি নিষিদ্ধ কর্মও করে থাক, তাও তোমাকে আমি বৈষ্ণবপদ দিয়ে দেব। আপনি বলবেন, এটা তো যুক্তিতে দাঁড়ায় না। একশ ভাগ যুক্তিতে দাঁড়ায়। কারণ, কর্মের ক্ষেত্রে কি হয়, আগে চতুর্থ অধ্যায়ে, যেখানে বলছেন, *যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতে তথা*, একটা বিশাল স্তূপিকৃত কাঠ পাহাড়ের মত পড়ে আছে, কিন্তু অগ্নির একটা ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ স্তূপিকৃত কাঠের রাশির উপর এসে পড়লে নিমিষে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কর্পূরের পাহাড়, দেশলাইয়ের একটা কাঠি মেরে দিন, সব শেষ। ভগবান কৃপা করে আপনার স্বরূপ দিয়ে দিলেন, এরপর আর কি লাগবে! আত্মজ্ঞান কি? ঈশ্বরেরই স্বরূপ, দুটো এক। লোকেরা বোকা বোকা কথা বলে, আত্মজ্ঞান, ঈশ্বরজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান এগুলো আলাদা আলাদা, না, সব একই জিনিস।

আপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্, এই যে এতক্ষণ আমরা যা বললাম, আপনাদের হয়ত একঘেঁয়ে মনে হচ্ছিল, কিন্তু বলাটা খুব জরুরী ছিল – শুধু নুড়ুনটুকু চাই। আপনি কি করছেন তাতে কিছু আসে যায় না। আপনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী, আপনি বড় ডাক্তার, বড় ইঞ্জিনিয়ার, বিল গেটসের মত বড় বড় কোম্পানির মালিক, এগুলো কিছুই থাকে না। এই জন্মে এগুলো আছে, পরের জন্মে থাকবে না। হিন্দু ধর্ম শুধু এই জীবনকে নিয়ে চলে না, এর পরে পরে যা আছে, যা আসবে, সবটাকে নিয়েই চলে। এই দেহের ভিতরে যেটা আছে, সেটাকেও নিয়ে চলে। *শাশ্বতং পদমব্যয়ম্*, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগীরা যেখানে যান, যে নিষিদ্ধ কর্ম করে সেও সেখানে যাবে। মনে রাখতে হবে, এখানে কোন ভক্তির উচ্ছ্বাস নেই। ভক্তির উচ্ছ্বাস শঙ্করাচার্যের কাছ থেকে আমরা কল্পনাই করতে পারি না। একেই গীতা মোক্ষশাস্ত্র, তার ভাষ্য দিচ্ছেন আচার্য শঙ্কর, যেখানে নিষিদ্ধ কর্মের উল্লেখ নেই, অথচ আচার্য শঙ্কর এই শব্দকে নিয়ে আসছেন। সব কিছু দেখে আমাদের মনে হতে পারে, ভক্তির উচ্ছ্বাস, কোন উচ্ছ্বাস নেই। কিন্তু ওই যে কাহিনীগুলো আছে, মৃত্যুর সময় হরিনাম করল, আর তার মুক্তি হয়ে গেল? কিন্তু এখানে তা বলছেন না, বলছেন, শরণাগতির জন্য সারা জীবনব্যাপী সংগ্রাম করে যাওয়া। চেষ্টা করে করে শেষে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে ফেলে দেওয়া, এ-ছাড়া আর কোন পথ নেই।

এরপর কি হবে? কি আর হবে, আমি তোমার মুরগী, তুমি সামনে দিয়ে কাটবে না পিছন দিয়ে কাটবে, সে তো তুমিই জানো। রামকৃষ্ণ মঠ মিশনে আমরা সন্ন্যাসীরা আছি, এটাও একটা সংসার, সংসারে যা হয়, অনেক সময় মতান্তর, তর্কবিতর্ক হয়। আমার কাছেও অনেকে নিজেদের সমস্যা নিয়ে আসেন। প্রথমে তাঁদের আমি শুধু একটা কথাই জিজ্ঞেস করি, আপনি কি ঠাকুরকে ধরে রাখতে চান? যদি না, তাহলে আর রামকৃষ্ণ মিশনে থেকে কি হবে, ছেড়ে দিন। যদি হ্যাঁ, তাহলে ঠাকুরই আপনাকে দেখবেন। আপনি মানুন আর নাই মানুন, কেঁদে কেটে ঠাকুরকে ধরে আছেন, ঠাকুর আপনাকে অবশ্যই দেখবেন। দুষ্টুমি করলে তিনি হয়ত দুটো চড় মারবেন, কিন্তু ওটা ওখানেই শেষ। আমাদের কত সৌভাগ্য, আমরা ঠাকুরের সন্তান নই, আমরা ঠাকুরের নাতিপুতি। সন্তান থেকে নাতিপুতি অনেক বেশি প্রিয় হয়, ঠাকুরের আমরা বিশেষ প্রিয়। দুষ্টুমি করলেন ঠিক আছে, একটু বকাঝকা না হয় দিলেন, কিন্তু আমাদের কাজ হল ধরে রাখা। এরপর তোমার মুরগী পিছনে দিয়ে কাট, সামনে দিয়ে কাট তাতে আমার কিছু আসে যায় না। এটাই এখানে মনে রাখার –*আপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্*, নিজের মুখে ভগবান বলছেন – সে আমার সেই শাশ্বত পদ, বিষ্ণুপদ পায়। একই কথা পরের শ্লোকে অন্য ভাবে বলছেন।

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব।।৫৭।।

(বিবেকবুদ্ধি দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণপূর্বক মৎপরায়ণ হও এবং সিদ্ধিতে ও অসিদ্ধিতে হর্ষ-বিষাদশূন্যরূপ বুদ্ধিযোগ অবলম্বনপূর্বক আমাতে সর্বদা চিত্ত সমাহিত কর।)

নবম অধ্যায়ে আগে যেটা বলা হয়েছিল, *যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ*, এই ভাবটাকে নিয়েই এখানে বলছেন। সব কিছু, তোমার যা কিছু আছে সমস্ত ঈশ্বরে অর্পণ করে দাও। ভাল-মন্দ যা করছ, সব অর্পণ করে দাও। মন্দ কিছু করার পর আপনি যখনই ঠাকুরকে অর্পণ করতে যাবেন, একবার, দুবার, তিনবার মন্দ করার পর অর্পণ করতে গেলে মনের মধ্যে খুঁত খুঁত করতে থাকবে, নিজেরই খারাপ লাগতে থাকবে। আমরা চলতি ভক্ত দেখেছি, পূজো করতে যাচ্ছে, ফুল নিতে হবে, দোকানীকে বলবে, ওই পূজোর জন্য ফুল, একটা কিছু ফুল দিয়ে দাও। অথচ নিজের স্ত্রীর জন্য যখন ফুল কিনবে, তখন বেছে বেছে ভাল ভাল দেখে ফুল কিনবে। আবার এই রকম ভক্তও দেখেছি, ফলের দোকানে গিয়ে বলবেন, ঠাকুরের জন্য ফল নেব, ভাল থেকে বেছে বেছে দাও। সাধু সন্ন্যাসীরা তো বটেই, আমাদের পরিচিত যে কজন ভাল ভক্ত দেখেছি, ঠাকুরের জন্য যখন কোন কিছু কিনবেন শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম জিনিসটা কিনবেন। বাজে জিনিস যেমন ঠাকুরকে দিতে পারা যায় না, ঠিক তেমনি একটা সময় আপনার মন্দ কর্মটাও ঠাকুরকে দিতে পারবেন না।

যারা অলস, নোংরা, অপদার্থ, তারা যখন বলে, ঠাকুর আমি তোমার উপর নির্ভর করছি, তাদের জন্য একটাই কথা, তুমি ঠাকুরকে কি দিচ্ছ ভেবে দেখেছ? আপনার জীবনের আবর্জনাগুলি। কাজটা কি ঠিক করছেন? কাকে ঠোকরানো ফল নিজে খেতেও সন্দেহ হয়, ঠাকুরকে কি দেবেন? জীবনে যেখানে আপনার কোন শক্তি নেই, সাফল্য নেই, কাকে ঠুকরে ঠুকরে জীবনটাকে শেষ করে দিয়েছে, এই ফল ঠাকুরকে দিয়ে কি হবে? এগুলো একটু ভেবে দেখবেন, আপনি কি ধরণের ফল। মুখে বড় বড় কথা যাই বলুন, আমি আপনি সবাই হলাম কাকে ঠোকরানো, শেয়ালে কামড়ানো ফল। তাহলে তো ঠাকুর কলকাতার যে কোন লোককে নিজের চেলা বানিয়ে নিতেন, কিন্তু তিনি তো বেছে বেছে নরেনকে নিলেন, রাখালকে নিলেন, তারককে নিলেন। ফাঁকা সময়ে এগুলো একটু ভাববেন, ভাবলে রাত্তিরের ঘুম উড়ে যাবে। আর আপনারা বলবেন, 'প্রণাম মহারাজ, কি দারুণ কথা বললেন', বলেই ঘুমিয়ে পড়বেন।

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ, দৃষ্ট, অদৃষ্ট যত তোমার কর্ম আছে, বিবেক বুদ্ধি দিয়ে চেষ্টা করে করে সমস্ত কিছু আমাকে অর্পণ কর। সেখানে এই ভাব রাখবে – আমি হলাম পরম গতি, আমি সেই পরম ঈশ্বর। আর তোমার বুদ্ধিটা আমার উপর স্থির কর। ঈশ্বরে সমর্পিত এই বুদ্ধির যখন তুমি আশ্রয় নেবে, তখন তোমার মন সব সময় আমাতেই থাকবে। উদ্দেশ্য হল, আপনার মন পুরোপুরি, সমস্ত ভাবে, পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরে লাগিয়ে রাখা।

আমার এক বন্ধু, আমারই ব্যাচমেট, স্বামী পরিতুষ্টানন্দ মহারাজ, বর্তমানে আমেরিকায় আছেন, ডাক নাম সোমনাথ মহারাজ। আগে উনি আমাদের মিশন অফিসে কাজ করতেন। কাজ করতে করতে একটু ফাঁকা হলেই মন্দিরে গিয়ে পাঁচ মিনিটের জন্য বসে জপ করতেন। একজন মজা করে বলতেন, সকালে ঠাকুরকে নিয়ে থাকে, দুপুরে মাকে নিয়ে থাকে আর সন্ধ্যেবেলা স্বামীজীকে নিয়ে থাকে। মজা করেই বলছেন, কিন্তু মূল কথা হল, সোমনাথ মহারাজ সব কিছুকে পুরো ঈশ্বরের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছেন, ঠাকুরের বাইরে আর কিছুই দেখছেন না, পুরো চিত্তটাকে ওর মধ্যে ঢোকান, অথচ অত বড় মিশন অফিসের কাজ সামলাচ্ছেন। নিজের যে কোন কাম, ক্রোধ থাকবে, তা না। এর আগে যে ভক্তের কথা বললাম, কিভাবে এই বয়সে জীবনটাকে পুরো শাস্ত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন, অত বই টাইপ করে সেগুলোকে ইন্টারনেটে ছেড়ে দিচ্ছেন। এতে ওনার কি হবে, না দুটো পয়সা পাবেন, না একটু নাম পাবেন, আর পয়সা, নাম এগুলোও আর কদিনের জন্য পাবেন, তাহলে এসব করে লাভটা কি? এই যে মহারাজের কথা বললাম, পাঁচ মিনিট সময় ফাঁকা পেলেন, ওইটুকু সময় তিনি মিশন অফিস থেকে মন্দিরে গিয়ে বসে জপ করলেন, তাতে ওনার কি হবে? কারুরই কিছু হবে না, কিন্তু ভিতরটা সোনা হয়ে যাচ্ছে।

বলছেন, *মচ্চিত্তঃ সততং ভব*, চব্বিশ ঘন্টা তোমার মন যেন আমাতে লেগে থাকে, একটু সময়ের জন্যও যেন এদিক সেদিক মন না যায়। যে পারবে জাপো, যে পারবে না মাপো। মা বলেছেন দিনে এক লক্ষ জপ করতে, কিন্তু আমাদের দ্বারা এক লক্ষ জপ তো হবে না, একমাত্রা যাঁরা খুব উচ্চ আধারের তাঁরাই এক লক্ষ জপ করতে পারেন। এক লক্ষ না হোক দশ হাজার জপ দিনে বিভিন্ন ভাবে করুন। এক নাগাড়ে বসে করতে পারবেন না, ঘুরতে ফিরতে করুন।

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি।৫৮।।

(আমাতে তোমার চিত্ত অর্পণ করে মদ্‌গতচিত্ত হলে আমার অনুগ্রহে তুমি দুস্তর সংসার ও তার কারণসমূহ অতিক্রম করবে। আর যদি তুমি পাণ্ডিত্যাভিমানশতঃ আমার কথা না শোন, তা হলে তুমি পুরুষার্থের অযোগ্য হবে।)

এবার ভগবান সাবধান করছেন। যদি তুমি তোমার চিত্তকে আমাতে ঢুকিয়ে দাও, তাহলে তুমি সমস্ত সমস্যাকে অতিক্রম করে যাবে। এখানে বলছেন *সর্বদুর্গাণি*, দুর্গম, *দুর্গম দুস্তরাণি*, মা দূর্গার নাম এখান থেকেই এসেছে। মা দূর্গা, যিনি দুস্তর জীবনটা পার করিয়ে দেন। এখানে দুস্তর মানে টাকা-পয়সা নেই, টাক-পয়সা হয়ে যাবে, বাড়ি ভেঙে গেছে, বাড়ি মেরামত হয়ে যাবে, তা না; জন্মমৃত্যুর যে চক্র, এটাকে তিনি পার করিয়ে দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকার কথা চিন্তা করুন, শত্রু পক্ষের সাথে লড়াই চলছে, লোকেরা পালাচ্ছে। একটা তিন বছরের বাচ্চা ছেলেকে কোলে নিয়ে মা পালাচ্ছে। মায়ের কোলে থাকা ছেলেটি কি ভাবছে নৌকাতে উঠতে গিয়ে মা পড়ে না যায়, চারিদিকে গুলিগোলা চলছে, সে কি ভাবছে মার গুলি না লেগে যায়? বাচ্চাটা জানে আমি মায়ের কোলে আছি, আমার আবার কিসের দুশ্চিন্তা। ঠিক সেই রকম, ঠাকুরকে যে পুরোদমে ধরে আছে, কিন্তু শর্ত হল, তার পুরো চিত্তটা যেন ঠাকুরে ঢুকে থাকে। চিত্তটা কি ওখানে পুরো ঢুকে আছে? যদি না, তাহলে হবে না। সুতোর আঁশ বেরিয়ে আছে, ছুঁচে সুতো ঢুকবে না।

আবার বলছেন, *অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারাৎ*, তোমার ভিতরটা একটা অহঙ্কারের ঢিপি হয়ে আছে, এই অহঙ্কার বশাৎ তুমি যদি আমার কথা না শোন, শুনেও যদি না মানো, জীবনে যদি না লাগাও, তাহলে বাপু তোমার এই জীবনটা নষ্ট হয়ে সব কিছু বৃথা হয়ে যাবে, বলছেন *বিনঙ্ক্ষ্যসি*, তুমি বিনষ্ট হয়ে যাবে, কোন পুরুষার্থই তোমার জন্য যোগ্য হবে না। তার মানে, তোমার চিত্ত যদি পুরোপুরি আমাতে না আসে, তোমার নাশ হয়ে যাবে। নাশ হওয়া মানে, তুমি জন্মমৃত্যুর চক্রে আবার ঘুরতে থাকবে। এখানে খুব মজার জিনিস আছে, স্বামীজী খুব সুন্দর কথা বলছেন, Each soul is potentially divine, the goal is to manifest the divnity within, do this either by work, worship, psychic control or knowledge, by one or more of these।

এটাকে রাজযোগ কি বলছে? রাজযোগ বলে, *চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ*, আমাদের ভিতরে যে বৃত্তিগুলো রয়েছে, সমস্ত বৃত্তিকে শান্ত করে দেওয়া। জ্ঞানযোগ কি বলছে? নিত্যানিত্য বিবেক, ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, এই বিচার করে করে অবস্তুকে ফেলে দেওয়া, শুধু ঈশ্বরে চিত্তকে ডুবিয়ে রাখা। কর্মযোগ কি বলছে? আমিত্বের নাশ করা, সবাই আমার। ভক্তিযোগও একই কথা বলছেন, যা কিছু করছ সব ঈশ্বরের জন্যই করছ। এই চারটেতে একটাই সাধারণ জিনিস – আমিত্বের নাশ। চিত্তবৃত্তি মানে আমিত্ব; ঈশ্বরই বস্তু, অবস্তু কি, আমিত্ব; কর্মযোগ বলে আমরা আমিত্ব নিয়ে আছি, ভক্তিযোগও আমিত্ব নাশের কথা বলছেন। সব পথ একই কথা বলছে। যীশু বলছেন, তোমাদের কাঁধে বোঝা? আমার কাছে এসো। কেন? তিনি আমাদের বোঝা হাল্কা করে দেবেন। শুধু যীশুই কি হাল্কা করেন? না, আপনি নিজেও করতে পারেন, রাজযোগের অনুশীলন করুন, চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে যাবে, কর্মযোগ করুন, দেখবেন পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনার ভিতরে। জ্ঞানযোগের অনুশীলন করুন, সমস্ত কিছু ত্যাগ হয়ে যাবে। ভক্তিযোগ করুন, দেখবেন যা কিছু আছে সব ঈশ্বরই আছেন, এরপর আমিত্ব আর কোথায় থাকল!

মৎ-চিত্তঃ, আমাতে পুরো চিত্তটা ঢুকিয়ে দাও, *সর্বদুর্গাণি*, এই দুস্তর সংসার হেতু যে জন্মমৃত্যুর চক্র, *মৎ-প্রসাদাৎ*, আমার কৃপায় *তরিষ্যসি*, উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। আর যদি আমাতে চিত্ত না দাও, *মদ্গতচিত্ত* যদি না হও, তাহলে কি হবে? *বিনঙ্ক্ষ্যসি*, তোমার নাশ হয়ে যাবে, অর্থাৎ এই জন্মমৃত্যুর চক্রে তুমি ঘুরতেই থাকবে।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়ার পর একজন ভক্ত মহারাজকে জিজ্ঞেস করছে, 'আচ্ছা মহারাজ যদি জপ না করি, তাহলে কি হবে'? মহারাজ বলছেন, 'কি আর হবে, যেটা হওয়ার ছিল সেটা হবে না'। উনি ভেবেছিলেন, জপ না করলে হয়তো পাপ আদি হবে। কিন্তু মহারাজ অত কিছু না বলে শুধু এটুকু বলে দিলেন, যা হওয়ার ছিল, তা হবে না। তার মানে, আপনার, আমার সবারই মুক্তি হওয়ার কথা, উদ্ধার হওয়ার কথা, সেটা হবে না। তাহলে আমাদের কি হবে? নাশ হবে। দ্বাদশ অধ্যায়ে কি সুন্দর বলছেন, *তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ*, মৃত্যুরূপী যে সংসার সাগর, এই সাগরে যে হাবুডুবু খাওয়া, এটাকেই বলে নাশ হওয়া। এ-ছাড়া নাশ হওয়া অন্য কিছু না, নরকে যাওয়া, এগুলো ফালতু কথা, এসব কথা আমরা মানি না। জন্মমৃত্যু চক্রের কথা ভাবলেই আতঙ্ক লাগে, মুক্তি যদি না হয় তাহলে কি হবে! তখন বাচ্চা বয়সের কথা ভেবে আতঙ্ক লাগে। আপনারা যাঁরা গীতার কথা শুনছেন, আপনারা ভক্ত মানুষ, আপনাদেরই কোন পরিবারে গিয়ে আমাকে আবার জন্ম নিতে হবে। কি দুরবস্থা হবে ভেবেই ভিতরটা ভয়ে চুপসে যায়, যাঁদেরকে আজ আমি গীতার প্রবচন দিচ্ছি, তাঁদের বাড়িতে গিয়েই যদি আমাকে জন্ম নিতে হয়, তাহলে কি দুরবস্থাটাই না আমার হবে! আপনারাও বোধ থাকবে না যে আমি এর কাছে গীতার প্রবচন শুনেছিলাম, আমারও বোধ থাকবে না, আমি এদেরই বাড়ির একজনকে গীতার প্রবচন দিয়েছিলাম। ম্যানেজমেন্টে বলে, আজ থেকে পাঁচ বছর পর তুমি নিজেকে কোথায় দেখতে চাও? আপনারা ভাবুন, একশ বছর পর আপনি নিজেকে কোথায় দেখতে চান? ভাবলেই আতঙ্ক লাগে।

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি।।৫৯।।

(অহঙ্কারকে আশ্রয় করে 'যুদ্ধ করব না' এ-রকম যা মনে করছ, তোমার এই নিশ্চয় ভ্রমমূলক। কারণ, তোমার ক্ষাত্র স্বভাবই তোমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করবে।)

আপনাদের যাঁদের রুচি আছে, তাঁরা শুধু গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ঊনষাট নম্বর শ্লোকের এইটুকু *প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি* খুব গভীর ভাবে চিন্তন ও মননের দ্বারা বোঝার চেষ্টা করে মাথায় বসিয়ে নিন। বলছেন, যদি তুমি অহঙ্কারকে আশ্রয় করে, 'আমি আমি' করে বল, আমি স্বধর্ম পালন করব না, অর্জুনের স্বধর্ম পালন করা মানে যুদ্ধ করা, আর তুমি যদি যুদ্ধ করব না বল, তাহলে কি হবে? *মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে*, তোমার এই চেষ্টাটাই মিথ্যা, কারণ *প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি*, তোমার প্রকৃতিই তোমাকে দিয়ে যুদ্ধ করাবে। গঙ্গার ধারে যাঁরা থাকেন, তাঁরা দেখে থাকবেন গঙ্গাতে শুশুক দেখা যায়। শুশুকগুলো নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য জলের উপর দু-এক সেকেণ্ডের উপর ভেসে উঠেই আবার জলে ডুব মারে, কিছু দূর গিয়ে আবার ভুস্ করে উপরে ভেসে উঠেই ডুব মারবে। বাচ্চা বয়সে আমাদেরও দেখতে মজা লাগত, কিছুক্ষণের জন্য দেখা গেল, আবার উধাও, কোন জায়গায় আবার ভেসে উঠবে সেটাও আমরা বুঝতে পারতাম না।

জীবনটা হল এই ভেসে ওঠার মত, আবার ডুবে গেল। তাতে শুশুকটা কি শেষ হয়ে গেল? কেন শেষ হবে, একটু পরে আবার ভেসে উঠবে। তাতে কি শুশুকটা কিছু পাল্টে যাচ্ছে? কিছুই পাল্টাচ্ছে না, ডুব মারার সময় যেমনটা ছিল, ভেসে ওঠার সময়ও তেমনটাই থাকছে। কয়েক সেকেণ্ড সময়ের যেটুকু পরিবর্তন হওয়ার হবে, তার বেশি কিছু না। আত্মহত্যা করে যদি মরে যান, তাতে কি আপনার কোন কিছুর পরিবর্তন হবে? কিছুই পরিবর্তন হবে না, এটাই আবার চলতে থাকবে। শুধু একটাই পরিবর্তন হবে, এখন জানা-চেনা পরিবেশ, তখন একটা অজানা-অচেনা পরিবেশ হবে। তাতে আরও বিপদ। আমার মৃত্যুর পর আমার জীবাত্মা যদি এদিক সেদিক করতে করতে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকাতে গিয়ে জন্ম নেয়, তখন পুরোটাই অজানা, ওই দেশের, ওই পরিবেশ, কি সর্বনাশটাই হবে।

অনেক সময় ভক্তরা আমাদের জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা মহারাজ আপনাদের সন্ন্যাসীদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি হয়'? 'ঝগড়া-ঝাটি হয় না, তর্কাতর্কি হয়'। 'সাধু হয়েও আপনারা তর্কাতর্কি করেন'? 'তাতে কি হল, সাধু হলে কি তার মাথায় দুটো শিং গজিয়ে গেছে, নাকি লেজ বেরিয়ে গেছে? সে যা ছিল তাই না থাকবে'! গায়ে গেরুয়া চাপিয়ে দিল, সন্ন্যাসী হয়ে গেল, তাই বলে লোকটা পাল্টে গেল নাকি! কি করে পাল্টে যাবে? কারণ *প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি*, তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছিলেন, *প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি*, সমস্ত প্রাণি নিজের নিজের প্রকৃতিতে চলে, ওটাকে হাজার চেষ্টা করেও আটকাতে পারবেন না।

এখানে খুব সহজ যুক্তি, এই যুক্তিটাকে বুঝে নিতে হবে, একটা কাজ আপনি না করতে পারেন, কিন্তু আপনার প্রকৃতিকে কখন আপনি না করতে পারবেন না। যেটা আপনার স্বভাব, যেটা আপনার প্রকৃতি, ওটা কোন দিন আপনার চলে যাবে না। একজন সাধু রাজাকে বলছেন, 'কি এখানে পড়ে আছ, সব ত্যাগ করে সাধু হয়ে চলে এসো, আমার সঙ্গে জঙ্গলে থাকবে'। রাজা বলছে, 'সাধুবাবা, আমি জঙ্গলে গেলে সেখানেও একটা রাজ্য দাঁড়িয়ে যাবে'।

অর্জুন যখন বলছেন, 'আমি যুদ্ধ করব না, এই লোকে আমি ভিক্ষা করে থাকব, আমি ব্রাহ্মণের ধর্ম, সন্ন্যাসীর ধর্ম নিয়ে নেব'। ভগবান তখন অর্জুনকে এটাই বুঝিয়েছিলেন, অর্জুন তুমি কি সন্ন্যাসীর ধর্ম বা ব্রাহ্মণদের ধর্ম নিয়ে জীবন ধারণ করতে পারবে? কোন দিন পারবে না। কারণ তোমার প্রকৃতিই তোমাকে দিয়ে যুদ্ধ করাবে, তুমি বাঁচতে পারবে না। মাঝখান থেকে কি হবে? তুমি

এই যুদ্ধ না করার জন্য তোমার কলঙ্ক হবে, তোমার দুর্নাম হবে, ধন-সম্পদ, মান-সম্মান-যশ সমস্ত কিছু হারাবে। আবার ঘুরে ফিরে তোমাকে করতে হবে ওটাই, এখন যেটা তুমি করতে চাইছ না। আজ আমি যদি সন্ন্যাসী না হতাম, তাহলে কি হত? এই রকমই হতাম, কোন স্কুলে মাস্টারী করতাম, বিরাট কিছু হতে পারব না, যা আছি তাই থাকব, আমার প্রকৃতিতে যা আছে তাই থাকবে। সন্ন্যাসী হলে কি আমি নেতাদের মত, বিজনেস ম্যানেজমেন্টের লোকেদের মত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতাম? সম্ভবই না, আমি যেমন খিটখিটে তেমন খিটখিটেই থাকব। যারা মধুরভাষী, তারা মধুরভাষীই থাকবে, সে সন্ন্যাসী হোক আর সংসারেই থাকুক, কারণ *প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি*। অর্জুনকে ভগবান সাবধান করে দিচ্ছেন, তোমার প্রকৃতিকে কখনই পাল্টাতে যাবে না, বরঞ্চ তোমার যেটা স্বধর্ম, প্রকৃতিকে মেনে নিয়ে সেটাতেই ডুবে থেকে স্বধর্ম পালন কর।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ।।৬০।।

(হে কৌন্তেয়, অজ্ঞানবশতঃ যেটা করতে ইচ্ছা করছ না, স্বভাবজাত স্বীয় ক্ষত্রিয়োচিত কর্মে আবদ্ধ হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেটাই তুমি করবে।)

উনষাট নম্বর শ্লোকে যেটা বললেন, সেটাকেই ষাট নম্বর শ্লোকে যেন অনুবাদ করছেন। তোমার এই যে স্বভাব, তোমার যে এই সুর-বীরত্ব, যুদ্ধ করার কৌশল, ক্ষমতার মধ্যে থাকা, এগুলো দিয়ে তুমি আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। এখন অবিবেক তোমাকে ধরে নিয়েছে, যার কারণে তুমি বলছ আমি যুদ্ধ করব না, তাই বলে কি তোমার ক্ষত্রিয়ের স্বভাব চলে যাবে? একটা ছাগলের গলায় দড়ি, আরেকটা বাঘের গলাতেও দড়ি, গলায় দড়ি দুজনেরই, কিন্তু ছাগল ছাগল, বাঘ বাঘ। আজকে আমি অবিবেক পূর্বক একটা কাজ করলাম, আপনিও অবিবেক পূর্বক একটা কাজ করছেন, তার মানে অবিবেক দড়ি দিয়ে আপনিও বাঁধা, অবিবেক দড়ি দিয়ে আমিও বাঁধা। কিন্তু আমি একজন অতি সামান্য গোবেচারা, আর আপনি একজন সাংঘাতিক লোক। কারণ আপনার ভিতরে যে ক্ষমতা আছে, সেটাকে কেউ দাবাতে পারবে না। কিন্তু কোন কারণে অবিবেক এসে গেছে। হাতি পাঁকে পড়ে গেলে হাতি হাতিই থাকে, হাতি ব্যাঙ হয়ে যায় না। সেইজন্য তোমাকে বলছি অর্জুন, এই ভুলটা তুমি করো না।

ঠিক এই জিনিসটাই স্বামীজী বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর ভারতবাসীকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন, হে ভারত তোমার এটা স্বভাব তুমি ভুলে যেও না, ওঠো, দাঁড়াও, বীর হও; নিজের ধর্মকে জানো, ধর্মকে জেনে সেই ধর্মে নিজে প্রতিষ্ঠিত হও এবং অপরকেও জানাও। তোমার পূর্বজরা এটাই করে এসেছেন, তোমাকেও এটাই করতে হবে। কারণ, *প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি*। হাজার হাজার বছর ধরে এই ভারতভূমিতে তুমি জন্ম নিয়েছ, মরে আবার এই ভারতের মাটিতেই জন্ম নিয়েছ, তোমার পূর্বজরা তোমাকে ওই রকম জেনেটিক কোড দিয়ে গেছেন, এর বাইরে তুমি যেতে চাইলেও যেতে পারবে না।

ইউটিউবে আমাদের এই ক্লাশগুলি শুনে ইদানিং অনেক ইয়ং ছেলেমেয়েরা আমাদের মেইল করে, মেইল করে অত্যন্ত দুঃখ করে বলে, আমি একটা সদর্থক ধর্ম জীবন যাপন করতে চাই, কিন্তু আমার বাবা-মা অত্যন্ত বিষয়ী। আমি বুঝে উঠতে পারি না, ওদের কি বলব। এত কম বয়সে, যেখানে সংসারে এত রকমের আকর্ষণ ছড়িয়ে আছে, সেগুলোর দিকে আকর্ষিত না হয়ে বলছে আমি ধর্ম পথে যাব। তার মানে, এরা পূর্ব পূর্ব জন্মের কত শুভ সংস্কার নিয়ে এসেছে। আমি একটু ধাক্কা দিই, যাতে দূরে সরে যায়। কিন্তু যার ভিতরে এই সংস্কার আছে, সেকি সরবে! আমার কাছে এসে অনেকেই এখানে জয়েন করেছে, বর্তমানে সবাই যে যার ক্ষেত্রে একজন নামকরা লোক।

প্রথমে সবাইকে আমি একটা ধাক্কা মেরে দিই, কিন্তু আমি জানি ঠাকুর যদি তাঁকে আনতে চান, তাকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না, সে আসবেই। তার ভিতরে যদি ঠাকুরের কাছে আসার

সত্যিকারের ইচ্ছে থাকে, কে তাকে আটকে রাখবে, কেউ পারবে না, সে আসবেই। আমারই পরিচিত একজন যে কিনা আইআইটি থেকে পাশ করে অক্সফোর্ডে গণিতে পোস্ট ডক্টরাল, তাকে আমি প্রচুর চেষ্টা করেছিলাম যাতে এদিকে না আসে, সমাজে থেকে সমাজের যাতে মঙ্গল করতে পারে। কিন্তু জানি ওর ভিতরে ঠাকুরের প্রতি টান, সন্ন্যাস জীবনের প্রতি টান প্রবল, আর ঠিক তাই হল। তারপর জানলাম জয়েন করার জন্য আমাদের বিভিন্ন সেন্টারের সাথে যোগাযোগ করতে শুরু করেছে। আমি তখন বাধ্য হয়ে বললাম, এত যোগাযোগ করা বন্ধ কর, এখানে চলে এসো, শেষ পর্যন্ত এখানেই চলে এলো। শিক্ষা জগতে যে পর্যায়ে পৌঁছাতে যে যোগ্যতা লাগে, সেই যোগ্যতার ধারে কাছে পৌঁছানোর কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না, আর সে কিনা বিটেক, এমটেক, অক্সফোর্ডে পোস্ট ডক্টরাল করার পর সব কিছুকে খড়কুটোর মত অগ্রাহ্য করে সন্ন্যাস জীবনে চলে এসেছে। কি করে সব কিছুকে লাথি মেরে বেরিয়ে আসতে পারল? এনারা জন্মজন্মান্তরের যোগী, ভিতরে যোগীর সংস্কার। *প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি*, সিদ্ধি লাভ হয়নি, আবার জন্ম নিয়েছে। তোমার কর্ম তোমাকে অবশ করে তোমাকে দিয়ে সেটাই করাবে। কেন করাবেন? কারণ

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।।৬১।।

(হে অর্জুন, অন্তর্যামী নারায়ণ সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে সর্বভূতকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় মায়া দ্বারা চালিত করছেন।)

তোমার ভিতরে যে ঈশ্বর আছেন, সমস্ত ভূতের যিনি অন্তর্যামী, তিনি তোমার সমস্ত কিছু রেকর্ড করে রাখছেন; সবার অন্তরের সব কিছু তাঁর জানা। এটিএম কার্ড দিয়ে আপনি যত টাকা তুলছেন, যত টাকা জমা দিচ্ছেন, ব্যাঙ্কের কম্প্যুটার তার সব হিসাব ধরে রাখছে। আপনি যা কিছু করছেন, আপনার অন্তর্যামীও সব খবর রাখেন। সেখান থেকে আপনার প্রকৃতি, আপনার স্বভাব তৈরী হচ্ছে। একবার একজন সন্ন্যাসীর মন কোন ভাবে চঞ্চল হয়ে গিয়ে তিনি সন্ন্যাস ধর্ম ত্যাগ করে সংসার ধর্মে ফিরে গেলেন। আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল দেখে আমার এক বন্ধু মহারাজ আমাকে খুব সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন। বললেন, 'দেখুন মহারাজ, সংসারে গিয়ে যদি দেখেন তাঁর ভাল লাগছে, তাঁর সব কিছু ঠিকঠাক চলছে; তাহলে বুঝবেন সন্ন্যাসের জন্য সে কোন দিন ছিলই না। যদি সে সন্ন্যাসের জন্যই থেকে থাকে, তাহলে সে সংসারে টিকতে পারবে না'। এমনই কপাল যে, কিছু দিন পর ওই মহারাজ সব কিছু ছেড়ে আবার সন্ন্যাসের পথে চলে এলেন। অতটুকু ভোগ ছিল, মিটে গেল, *প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি*।

তোমার ভিতর যদি বৈরাগ্যের ভাব থাকে, সংসারে তুমি টিকে থাকতে পারবে না। আর যার মধ্যে সংসারী ভাব, সন্ন্যাসী হয়ে সে বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে না। এই যে আপনার শাস্ত্রের কথা শোনার ইচ্ছে, ধর্ম পথে এগোনর ইচ্ছে, ভিতরে আপনার অন্তর্যামী আপনাকে সেভাবেই তৈরী করে রেখেছেন। ঠাকুর যেমন বলছেন, উনুনের উপর হাড়ির ভিতর আলু, পটলগুলো যখন লাফায় বাচ্চারা মনে করে আলু, পটল লাফাচ্ছে। কিন্তু ওরা জানে না যে, নীচে আগুন আছে বলে আলু, পটল লাফাচ্ছে। ভিতরে অন্তর্যামী আছেন বলে সব প্রাণীরা লাফাচ্ছে। বক্তব্য কি? বক্তব্য হল, তুমি শরণাগত হও। তুমি যাই করে নাও না কেন, কাজ তোমাকে করতেই হবে, চেষ্টা করলেও তুমি কাজ করা ছাড়া বাঁচতে পারবে না। তোমার প্রকৃতিই তোমাকে দিয়ে কাজ করাবে। তোমার অন্তর্যামী যিনি আছেন, তিনি তোমাকে দিয়ে করাবেন। খাটতে যখন হবেই, তোমার স্বভাব যখন তোমাকে দিয়ে করাবেই, তাহলে সব কাজ ঈশ্বরকে অর্পণ করেই বা করি না কেন।

টাকা নিয়ে বাজারে গেছেন, ওই টাকা দিয়ে আপনি বাজার থেকে পচা সব্জীও কিনতে পারেন, টাটকা সব্জীও কিনতে পারেন, তাতে দোকানদারের কিছু যায় আসে না। আপনি নিজেই

এখন ভেবে ঠিক করুন, আপনি কোনটা নেবেন। সংসারে যখন কাজ করতেই হবে, তাহলে মজুরিটা ঠিকঠাক নিন না। কি মজুরি? কিছুই না, ঈশ্বরে পুরো মজুরিটা ঢুকিয়ে দেন, তার বিনিময়ে তিনি আপনাকে মুক্তি দিয়ে দেবেন। কিছুই না, শুধু দৃষ্টিভঙ্গীটা পালটানো, এর জন্য আপনাকে খাটতেও হচ্ছে না। আপনার মনের ভাবটুকু শুধু পাল্টাতে হচ্ছে, নিষ্ঠার সাথে কাজ। সেইজন্য বলছেন –

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।।৬২।।

(হে ভারত, সংসারার্তিনাশের জন্য তুমি চিন্তা, বাক্য ও কর্মের দ্বারা সর্বতোভাবে তাঁরই শরণাগত হও। তাঁর প্রসাদে তুমি পরম শান্তি ও শাশ্বত পদ লাভ করবে।)

হে অর্জুন, যে কোন একটা ভাবকে অবলম্বন করে তুমি সেই ঈশ্বরের শরণ নাও। কাজ যখন তোমাকে করতেই হবে, তোমার স্বভাব, তোমার প্রকৃতি যখন তোমাকে দিয়ে কাজ করাবেই, তাহলে তুমি তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁর জন্য কাজ কর। তাহলে কি হবে? সেই ঈশ্বরের কৃপায় তুমি পরম শান্তি পাবে, সংসার আর তার সব কিছুর সাথে যেভাবে তুমি জোঁকের মত আটকে আছ, তার সবটাই খসে পড়ে যাবে। আর তার সাথে ভগবান বিষ্ণু, মানে আমি, সেই বিষ্ণুর নিত্যধাম তুমি পেয়ে যাবে, তুমি আমার কাছেই চলে আসবে। এই কথা বলার পর ভগবান বলছেন –

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু।।৬৩।।

(আমি সর্বজ্ঞ ঈশ্বর। আমি তোমার নিকট গুহ্য থেকে গুহ্যতর গীতাশাস্ত্ররূপ পরম জ্ঞান বললাম। তুমি এটা নিঃশেষরূপে বিচার করে যা তোমার ইচ্ছা হয় তাই অনুষ্ঠান কর।)

গুহ্য থেকে গুহ্যতর আমার যা কিছু বলার, যা আমার বক্তব্য, সব আমি তোমাকে বলে দিলাম। গুহ্য থেকে গুহ্যতর এইজন্যই বলছেন, সাধারণ মানুষ এই কথাগুলো বুঝতে পারবে না। যা যা তোমাকে বোঝাবার ছিল সব বুঝিয়ে দিয়েছি, এরপর *যথেচ্ছসি তথা কুরু*, যেমনটি তোমার খুশী তুমি তেমনটি কর। কিন্তু মনে রেখো, তোমার প্রকৃতি তোমাকে ছাড়বে না। এই যে লোকেরা বোকা বোকা কথা বলে, শ্রীকৃষ্ণ নাকি অর্জুনকে যুদ্ধ করতে প্রোরচিত করেছিলেন। ভগবান কোথাও অর্জুনকে যুদ্ধ করার জন্য প্রোরচিত করছেন না, বলছেন, *যথেচ্ছসি তথা কুরু*, তোমার যেমনটা ইচ্ছে করতে মনে হয়, তুমি তেমনটাই করো।

ঠাকুরের খুব সুন্দর হাতি নারায়ণ আর মাহুত নারায়ণের গল্প আছে। গুরু বলে দিয়েছেন, সব নারায়ণ। মাহুত নারায়ণ সবাইকে সাবধান করে বলে দিচ্ছে – হাতি আসছে, হাতির সামনে থেকে সরে যাও। শিষ্য হাতি নারায়ণ বলে হাতির সামনে এসে স্তুতি করতে শুরু করল। হাতি শিষ্যকে শুড়ে পেঁচিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল। গুরু শিষ্যকে পরে বলছেন, সবই নারায়ণ, কিন্তু তুমি মাহুত নারায়ণের কথা কেন শুনলে না? তার মানে শেষে নিজের বুদ্ধি লাগাতে হয়। গীতার এটা একটা ব্যতিক্রমী উপদেশ, যেটা অন্য কোন শাস্ত্রে পাওয়া যাবে না – *যথেচ্ছসি তথা কুরু*। আমার যা বলার সব বলে দিয়েছি, গুহ্য থেকে গুহ্যতর, পবিত্র থেকে পবিত্রতম সব কথা বললাম, এরপর তোমার নিজের বুদ্ধিটাকে লাগাও।

হে শ্রোতা বন্ধুগণ, আমি আপনাদের এই কথাই বলতে চাই, আপনারা এত শাস্ত্র শুনছেন, ইউটিউবে আমাদের যত ভিডিও আপলোড করা আছে, দিনে একটা করে শুনতে গেলে চার বছর লেগে যাবে। সব শোনার পর আবার নূতন করে যখন শুনবেন, তখন মনে হবে – আরে মনে হচ্ছে যেন আগে এই কথা শুনিনি। শাস্ত্র কিনা, এটা তো আর সিনেমার গান না। কিন্তু করার সময়, *যথেচ্ছসি তথা কুরু*, নিজের মতই আপনাকে করতে হবে।

এতক্ষণ যে দুটি শ্লোকের আলোচনা করলাম, তার মধ্যে একষট্টি নম্বর শ্লোক খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি শ্লোক, গীতার সব শ্লোকই আমাদের জন্য জরুরী, কিন্তু তার মধ্যে কিছু বিশেষ শ্লোক বিশেষ ভাবে দরকার। একাদশ অধ্যায়ে ভগবান যেখানে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাচ্ছেন, সেখানে তিনি অর্জুনকে বলছেন, *ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব*, আমি এদের সবাইকে আগেই মেরে রেখেছি, *নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্*। শুধু এখানে অর্জুনের জন্যই না, সমস্ত জগতে যা কিছু হওয়ার সব ভগবান আগেই করে রেখেছেন। এই দেখুন, গীতার মত এত উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বে সমৃদ্ধ শাস্ত্র, ব্যাসদেবের রচনা, ভগবানের শ্রীমুখের বাণী, অর্জুনের মত শ্রোতা আর তার সাথে শঙ্করাচার্যের ভাষ্য, আর তার উপর ব্যাখ্যা আমার মত একজন সাধারণ সন্ন্যাসী আপনাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছে আর এই ক্লাশ একশ একতম ক্লাশে পা রাখল। মানুষের পক্ষে এটা কি সম্ভব? ঈশ্বরীয় কৃপা না হলে সম্ভব হবে না। তিনি সব করে রেখেছেন, কিন্তু আমরা যে অর্থে মনে করি সেই অর্থে নয়।

আপনাদের বলি, গীতার একটি করে অধ্যায়, এক অধ্যায় না হলে কম করে দশটা করে শ্লোক নিয়মিত ভাবে রোজ পাঠ করবেন। তার সাথে ইউটিউবে আমাদের গীতার সমস্ত ক্লাশ আপলোড করা আছে, প্রথম থেকে আবার শুনবেন। কিন্তু তার থেকেও বেশি জরুরী, গীতার যে কথাগুলো মনে করছেন খুব ভাল লাগছে, সেগুলোকে খাতায় লিখবেন। প্রত্যেকটা ক্লাশে যে আলোচনা করা হয়েছে, তাতে কয়েকটা পয়েন্ট অবশ্যই লিখবেন – গীতার বক্তব্য, আচার্য শঙ্করের কথা আর আপনাদের মত করে আমি যেটা ব্যাখ্যা করছি; এই কয়েকটি পয়েন্ট লিখে, এরপর সব কটা পয়েন্টকে মিলিয়ে আপনি নিজে কি ভাবছেন, সেটাকে নিজের মত করে বিস্তারে লিখুন। তিন-চারজন আমাকে জানালেন, তাঁরা এই জিনিসটা করছেন, শুনে খুব ভাল লাগল।

এতে যে শুধু আপনারই উত্থান হবে তা না, ভেবে দেখুন, এগুলো আপনি নিজের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য রেখে যাচ্ছেন। আপনারা কত কিছুই তো সন্তান-সন্ততিদের জন্য রেখে যান, সম্পত্তি, টাকা-পয়সা, বাড়ি, গাড়ি কত কিছু, তার সাথে আমাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যটাও একটু রেখে যান। আজ থেকে পনের কুড়ি বা চল্লিশ বছর পর আপনার সন্তান, আপনার নাতিরা বড় হয়ে বলবে, দেখি তো এর মধ্যে আমার বাবা/মা/দাদু আমার জন্য কি রচনা করে গেছেন? ভগবান এটাই অর্জুনকে বলছেন, আমি সব করে রেখেছি, তুমি একটু হাত লাগালেই তোমার যশ হয়ে যাবে। আপনারাও একটু হাত লাগান। ভগবান অর্জুনকে দুটি কি তিনটি কথা বললেন, ব্যাসদেব সেটাকে সাতশ শ্লোকে গীতাশাস্ত্র রচনা করলেন, আচার্য শঙ্কর তার ভাষ্য দিলেন, আমি আমার মত ব্যাখ্যা করে যাচ্ছি, সেখান থেকে আপনি যখন বুঝে নিয়ে নিজের মত করে লিখবেন, তখন আপনারই জয়জয়কার হবে। আপনার ভবিষ্যতের প্রজন্ম খুলে দেখবে, অবাক হয়ে বলবে, আমার মা কি সুন্দর লিখে গেছেন, আমার বাবা কত লেখা রেখে গেছেন, আমার ঠাকুর্দা, আমার ঠাকুরমা কি সুন্দর লিখে দিয়ে গেছেন, কত অমূল্য সম্পদ আমাদের জন্য রেখে গেছেন।

আমেরিকায় আমার সন্ন্যাসী বন্ধু আছেন, সোমনাথ মহারাজ, উনি ওখানে আমাদের ক্লাশগুলো শোনেন। সেদিন রাত্রিবেলা উনি একটা মেসেজ পাঠালেন, খুব কমই মেসেজ পাঠান। স্বামী ধীরেশানন্দজী মহারাজ আমাদের খুব বিরাট শাস্ত্রজ্ঞ সাধু ছিলেন, উনি আমাকে পঞ্চদশী পড়িয়েছিলেন। মহারাজ ছিলেন ঘোর অদ্বৈত বেদান্তী। সোমনাথ মহারাজ মেসেজ করে স্বামী ধীরেশানন্দজীর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বললেন, শেষ বয়সে মহারাজ বলতেন, সারা জীবন বেদান্ত, অদ্বৈত পড়লাম, এই বয়সে এসে শুধু ইচ্ছে হয় কামারপুকুরের একটা কুঠি বাড়িতে থাকব, আর ঘন কালো মেঘে ঢাকা আকাশের বুক চিরে বকের সারি ডানা বিস্তার করে উড়ে যাচ্ছে, ওই দৃশ্য হাঁ করে দেখতে থাকব। এই হল পূর্ণ শরণাগতি। শরণাগতি নিয়ে আমাদের আলোচনা চলছিল। এখানেও আমরা শরণাগতি নিয়ে একটা শেষ আলোচনা করব। ভগবান বলছেন, *যথেচ্ছসি তথা কুরু*, শুধু এইটুকু না, তার সাথে বলছেন, *বিমৃশ্যৈতদশেষেণ*, *বিমৃশ্য*, ভাল করে বিচার কর। আমি বলছি বলে

তোমাকে করতে হবে না, ইসলামে যেমন বলে, কোরাণ বলেছে বলে তোমাকে এটাই করতে হবে, এখানে তা না, যা কিছু আমি বললাম, এটাকে বাপু তুমি বিচার কর, এই জিনিসটাকে নিয়েই আমরা একটু বাদে আবার আলোচনা করব। পরের শ্লোকে ভগবান বলছেন।

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্।।৬৪।।

(তুমি সব সময় আমার অত্যন্ত প্রিয়। এইজন্য তোমার হিতকর, সর্বাপেক্ষা গুহ এবং সর্বহিতের শ্রেষ্ঠ আমার উৎকৃষ্ট বাক্য পূর্বে অনেকবার বলা হলেও পুনরায় বলছি। এর দ্বারা তোমার পরমপুরুষার্থ লাভ হবে। সুতরাং এটা শ্রবণ কর।)

পরমং বচঃ, এই কথাগুলো পরম বাক্য। ভগবান পরম কথা অনেকবার বলছেন, এগুলো গুহ্য থেকেও গুহ্য। এই গুহ্য গোপনীয় অর্থে না, কথাগুলো সহজে ধারণা করা যায় না। আমাদের বুদ্ধি অত্যন্ত স্থূল, স্থূল বুদ্ধি হলে কি হয়; শাস্ত্রের বক্তব্য, ঈশ্বরীয় কথা, আধ্যাত্মিক সত্যগুলি ধারণা করা খুব মুশকিল হয়ে যায়, সেইজন্য গুহ্য বলছেন। *ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্*, আগেও অনেকবার তোমাকে এই কথাগুলো বলেছি, তবুও আবার বলছি। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ইষ্ট, আমি যাকে ভালোবাসব সেই তো আমাকে ভালোবাসবে। আমি যাকে ভালোবাসি না, সে একদিন দুদিন আমার পেছনে ঘুরঘুর করে আমাকে পেল না বলে চলে যাবে। যার আমি ইষ্ট, তার মানে তাকেও আমাকে ইষ্ট করতে হবে। বন্ধু বন্ধু তখনই যখন দুজন দুজনকে ভালোবাসে, তা না হলে বন্ধুত্ব হয় না। অর্জুন তুমি আমাকে ভালোবাস, তাই তুমিও আমার ইষ্ট, মানে তুমিও আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেইজন্য তোমাকে এই শ্রেষ্ঠ গুহ্য কথা বলছি। কি সেই গুহ্য কথা?

ভগবান চৌষট্টি আর পয়ষট্টি এই দুটি শ্লোকে শরণাগতি, পূর্ণাহুতি নিয়ে বলবেন। বলা হয়, সমস্ত বেদের সার উপনিষদ, সমস্ত বেদ ও উপনিষদের সার গীতা। আর গীতার সার কি? আচার্য শঙ্কর প্রথমের দিকেই বলে দিয়েছেন, গীতার সার হল *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে, হিন্দু ধর্মের সার কি? *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। কিন্তু তার আগে কি কি করতে বলছেন?

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।।৬৫।।

(তুমি আমাতে চিত্ত স্থির কর। আমার ভজনশীল ও পূজনশীল হও এবং আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। সেইজন্য আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি যে এইরূপেই তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে।)

ভগবান বলছেন, হে অর্জুন তোমাকে সত্য কথা বলছি, প্রতিজ্ঞা করে বলছি, কথা দিচ্ছি, তুমি আমাতে এসে মিশে যাবে। কিভাবে মিশে যাবে? যদি তুমি তোমার মন, প্রাণ পুরোপুরি আমাতে দাও। যে কোন মেয়ে ছেলেকে বা ছেলে মেয়েকে ভালবাসার পর বলে, আমাদের এই রকম ভালবাসা আর কোথাও কোন দিন হয়নি, হবেও না। সবাই বলে, কিন্তু দুদিন পরে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। লায়লা-মজনু, রোমিও-জুলিয়েত, হীর-রাঞ্ঝা, এই ধরণের প্রেম কাহিনী অনেক আছে, কোথাও কি আছে যে, ভালবেসেছে বলে এক অপরের মধ্যে মিশে গেছে? এই মিশে যাওয়া জিনিসটা একমাত্র ঈশ্বরের সঙ্গেই হয়। তোমাকে আমি ভালবাসলাম, ভালবাসার পরেও যদি আমি-তুমি থেকেই গেল, আমি-তুমি থাকবেই, তাহলে এক হয়ে যাওয়াটা তো হল না। মুখে যাই বলুক, বড় বড় কথা যতই বলুক, দুই থাকবেই, এক কোন দিন হবে না। মা যতই ছেলেকে ভালবাসুক, ছেলে যতই মাকে ভালবাসুক, কোন দিন দুজনে মিলে গিয়ে এক হয়ে যাবে না, কোন অবস্থাতেই হবে না।

কিন্তু হে অর্জুন, *মন্মনা ভব*, তুমি যদি আমাকেই মন দাও, আমার সাথে এক হয়ে যাবে। *মন্মনা ভব*, কিভাবে এক হয় যাবে? খুব সহজ, আমরা যখনই ঈশ্বরপ্রেমের কথা বলি, বোঝাবার জন্য আমাদের নারী-পুরুষের কথা আনতেই হয়, যার জন্য ভক্তির যে শেষ কথা, ঠাকুর যাকে প্রেমাভক্তির কথা বলছেন, এই প্রেমাভক্তি রাসলীলা, যেখানে গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভালবাসা, ভক্তির যে অভিব্যক্তি, সেখানে গিয়ে শেষ হয়। সেইজন্য আমাদের নারী-পুরুষের ব্যাপারটা নিয়ে আসতে হয়। একটা ছেলে একটা মেয়েকে যখন পুরোপুরি ভালবাসা ঢেলে দিচ্ছে, তাহলে সেটা কি শেষ কথা হচ্ছে? না, শেষ কথা হয় না। যত গভীর, যত বড় প্রেম কাহিনী হয়ে থাকুক, কখনই ওখানে গিয়ে ওটা শেষ কথা হয়ে যাবে না। যাকে ভালবাসে তার জন্য একটা গাড়ি কিনতে হবে, যাকে ভালবাসে তার জন্য একটা বাড়ি করতে হবে, যাকে ভালবাসে তার জন্য শাড়ি কিনে আনতে হবে, দামী গয়না কিনতে হবে। আর যদি সম্রাট বা বাদশা হয়, তাহলে প্রেয়সীর জন্য একটা তাজমহল দাঁড় করাতে হবে, কোথাও শেষ নেই।

ভগবানের জন্য কিছুই করতে হচ্ছে না, ভগবানের ক্ষেত্রে একটাই জিনিস হয়, যত মন দিচ্ছেন, যত ভালবাসছেন, তত আরও আরও ভগবানের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছেন। দেবর্ষি নারদ তাঁর নারদীয় ভক্তিসূত্রে বলছেন, *সা তৃস্মিন্ পরম প্রেমরূপা*। পরম প্রেম, পরম প্রেমের নিচে কিছু নেই। পরম প্রেম কেন? কারণ অন্য কিছু আর থাকবে না, টাকা-পয়সা, গাড়ি, বাড়ি, শাড়ি, গয়না কিচ্ছু থাকবে না, থাকবে শুধু পরম প্রেম। যার জন্য যত প্রেম হয়, কোথাও পরম প্রেম থাকে না। পরম প্রেমের একটু নীচে যেটা হয়, সেটাকে বলে *মন্মনা ভব*।

শ্রোতাদের বলছি, আপনাদের জ্ঞান বুদ্ধি আছে, এদিকে ওদিকে শাস্ত্রের কথা শুনছেন, সব ঠিক আছে, কিন্তু এগুলোকে ধারণা করা দরকার। চোখ বুজে গভীর ভাবে যদি বোঝার চেষ্টা করেন, একটু যদি ধারণা করার চেষ্টা করেন, ভগবান এখানে কোন ভালবাসার কথা বলছেন, যে ভালবাসা হল পরম প্রেম, সেখানে আর কিছু নেই, উভয়েরই আর কিছু লাগবে না।

মদ্যাজী, শুধু আমাকেই পূজা কর, আর কাউকে পূজা করতে হবে না। এখানে গোঁড়ামি কিছু আসছে না, ইসলামে ওরাও এই জিনিসটাই করেন, কিন্তু গোঁড়ামিতে চলে যায়। এখানে গোঁড়ামি থাকে না, ভালবাসাটাই শুধু থাকে। *মাং নমস্কুরু*, আমাকেই প্রণাম করবে। একটা ছেলে একটা মেয়েকে ভালবাসল, তারপর তাকে বিবাহ করল, বিবাহের পর এবার মেয়ের বাবাকে প্রণাম করতে হবে, মেয়ের মাকে প্রণাম করতে হবে, মেয়ের যত আত্মীয় আছে তাদের সবাইকে প্রণাম করতে হবে। আমার একজন বন্ধু পুলিশ অফিসার ছিলেন, ওনার সম্পর্কে একজন শশুড় ছিলেন, তিনিও পুলিশের একজন কর্মচারী, র‍্যাঙ্কের দিক থেকে জামাই বড় ছিলেন। বাড়ির বাইরে জামাইকে স্যালুট মারতে হচ্ছে, আর বাড়িতে তাকে প্রণাম করতে হচ্ছে। কিছু দিন আগেকার ঘটনা, একটি মেয়ে আইপিএস অফিসার হয়েছে, তার বাবা ওই রাজ্যেরই একজন কনস্ট্যাবল। বাবার তাতে এত আনন্দ যে, নিজের মেয়েকে স্যালুট করছে, মেয়ে আইপিএস অফিসার বলে কথা। মেয়ে এত বড় পুলিশ অফিসার, তার বাবা একজন কনস্ট্যবল, অনেকে চাকরি ছেড়ে দিতে বলল। বাবা গর্বের সাথে বলছে, 'না আমি চাকরি ছাড়ব না, আমার মেয়েকে আমি স্যালুট দিতে পারছি'। বাড়িতে এসে মেয়ে বাবাকে, মাকে প্রণাম করছে। ঈশ্বরকে ভালবাসলে এসব কিছু করতে হয় না, ঈশ্বরই তো আছেন, হে কৃষ্ণ তোমা ছাড়া আমার আর কিছু নেই, এটাই শরণাগতি। পূজা একজনকে, প্রণাম একজনকে আর ডুবে যাওয়া একজনেতে – এটাই শরণাগতি। নিজের জীবন চালাতে যতটুকু দরকার, অল্প থেকে অল্প, অতটুকুর বাইরে আর কোন কিছু চাই না।

ভগবান তখন ভক্তকে অঙ্গীকার করে বলছেন, হে অর্জুন, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমাতে তোমার মনটা ফেলে রাখ, আমারই ভক্ত হও, আমারই পূজা কর আর আমাকেই নমস্কার কর, তুমি আমাতে ডুবে যাবে। বলছেন, সাধ্য, সাধন ও প্রয়োজন, এই যে তিনটে জিনিস, চেষ্টা

করা, চেষ্টা করতে গিয়ে যে জিনিসগুলো লাগে, চেষ্টা সিদ্ধি হলে যা হয়, সব কিছু তুমি আমাকে দিয়ে দাও। আমি দিনের পর দিন ব্যাখ্যা করে যেতে পারি, কিন্তু আপনাদের কাছে এটা পরিষ্কার হবে না। নিজে যদি চিন্তা-ভাবনা করেন, এক সেকেণ্ডে পরিষ্কার হয়ে যাবে। পয়েন্টস্ গুলি যদি তিন চার লাইনে করে লেখেন, সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে যাবে। কারণ সমস্ত জ্ঞান ভিতর থেকেই আসে। মহারাজদের লেকচার শুনে কোন দিন কোন জ্ঞান হয় না, জ্ঞান সব সময় ভিতর থেকেই আসে। সেইজন্য দেখবেন, আপনি যেমন আপনি সেই ধরণের বক্তার কথা শুনতে চাইবেন। কারণ যে তথ্যগুলি আসছে সেগুলো আপনাকে নাড়া দেয়। এবার কর্মযোগ নিষ্ঠার শেষ কথা বলছেন।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।৬৬।।

(সকল ধর্মাধর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্বক গর্ভ, জন্ম, জরা ও মৃত্যুবর্জিত পরমেশ্বরস্বরূপ একমাত্র আমার শরণাগত হও। আমা হতে অতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই, এরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে আমাকে সদা স্মরণ কর। তুমি এই রকম নিশ্চিতবুদ্ধিযুক্ত ও স্মরণশীল হলে তোমার নিকট আমি স্বাত্মভাব প্রকটিত করে সকল ধর্মাধর্ম বন্ধনরূপ পাপ থেকে তোমাকে মুক্ত করব। অতএব, শোক করো না।)

এর আগে বললেন, তুমি আমাতে প্রবেশ করে যাবে। এবার বলছেন, তোমার যত রকম কর্ম আছে, সবটা আমি নিয়ে নিলাম। কিন্তু তার জন্য তোমাকে কি করতে হবে? *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। অনেকে এই শ্লোকের ভুলভাল ব্যাখ্যা করেন। হঠাৎ একটা শ্লোক তুলে আপনি ব্যাখ্যা করতে পারেন না। পুরো গীতার যে আদর্শ, গীতার যেটা মূল বক্তব্য, সেগুলোকে মিলিয়ে জিনিসটাকে দেখতে হয়। যে কোন জিনিস, যেটা চিত্তবৃত্তি তৈরী করে, মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, ওটাই অধর্ম। ভাল জিনিসও মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, ভগবানের প্রতি যে ভালবাসা, এটাও মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, জপধ্যানও চাঞ্চল্য তৈরী করে; কিন্তু অন্য চাঞ্চল্যগুলিকে কমিয়ে, গুটি কয়েক চাঞ্চল্যতে নিয়ে আসতে জপধ্যান সাহায্য করে। কিন্তু আত্মজ্ঞানের দৃষ্টিতে এগুলো সবই চাঞ্চল্য। কথামৃতে ঠাকুর পাপ-পূণ্য, ধর্ম-অধর্ম, ভাল-মন্দ ইত্যাদির পারে যেতে বলছেন, কারণ এগুলো সবই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ভগবান এটাই বলছেন, আমিত্বের ভাব যেখানে যেখানে আছে, যেখানে যেখানে তোমার চিত্তবৃত্তি জড়িয়ে আছে, এই সব কিছু থেকে তুমি সরে এসো।

সরে এসে কি করবে? যেটা আগের শ্লোকে বললেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাজি মাং নমস্কুরু*, আমারই ভজনা কর, আমারই অর্চনা কর, আমাকেই প্রণাম কর, আমাতেই ডুবে যাও। মনে তখন একটি বৃত্তিই থেকে যাচ্ছে, সেই একটা বৃত্তি হল আপনার ইষ্ট। এখানে যে *মদ্ভক্ত* বলছেন, এটা এই নয় যে শুধু শ্রীকৃষ্ণই হতে হবে, আপনার ইষ্ট যে কেউ হতে পারেন, শ্রীরাম হতে পারেন, বিষ্ণু হতে পারেন, শিব হতে পারেন, কালী, দূর্গা, যে কেউ হতে পারেন। তবে তাঁকে ভগবান হতে হবে, দেখতে হবে তাঁর স্বরূপটা কি। এই যেমন অনেকে বলে, আমার মা-বাবাই ঈশ্বর; না, মা-বাবা ঈশ্বরের স্বরূপ হতে পারেন না।

আপনার যে স্বভাব, স্ব-ভাব, আপনি আসলে যেটা, সেই স্ব-ভাবে যদি প্রতিষ্ঠিত হতে হয় তাহলে কোন বিচ্যুতি চলবে না। স্কুলের ছেলেমেয়েদের যে ড্রিল করানো হয়, সেখানে যিনি ড্রিল করান, তিনি বলছেন এ্যাটেনশান, সবাই এ্যাটেনশানে চলে এলো, অর্থাৎ আর কেউ নড়বে না। স্বভাব হল আর কোন নড়াচড়া নেই, আপনি যেটা, সেটাতে অবস্থিত থাকুন। এটাকে বলে স্বস্থ, ‘স্ব’ অর্থাৎ নিজেতে ‘স্থ’, মানে স্থিত থাকা। ওখান থেকে যেমনি নড়ল, মনের জগতে নেমে এলো। কিন্তু আপনি যখন নিজেকে পুরোপুরি কৃষ্ণে দিয়ে দিলেন, তখন আর নড়বে কোথায়, সব কিছুকেই তো আপনি কৃষ্ণকে দেখছেন। যা কিছু করছেন, সব কৃষ্ণের জন্য করছেন, রান্না করছেন কৃষ্ণের জন্য করছেন, খাচ্ছেন, কৃষ্ণকে আহুতি দিচ্ছেন, কাপড় কাচছেন, কৃষ্ণের কাপড় কাচছেন, কৃষ্ণ ছাড়া কিছু নেই, মন

তখন আর কোথায় যাবে! এটাই *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য*। ভগবান বলছেন, সমস্ত ধর্ম যদি আমাতে দাও, তাহলে তোমার যত অধর্ম, পাপ, সব আমি নিয়ে নেব। এখানে পাপ মানে, মনের দৃষ্টিতে যে কোন চিত্তবৃত্তি, এটাই পাপ। এখানে আমাদের রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, সবটাই এক, আলাদা কিছু না।

আচার্যের ব্যাখ্যা ছাড়া এগুলো বোঝা সম্ভব না। আচার্য এখানে বলছেন, *ধর্মশব্দেন অত্র অধর্মঃ অপি গৃহ্যতে,* এখানে ধর্ম বলতে অধর্মকেও ধরা হয়েছে। আচার্য মহাভারত থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন, *ত্যজ ধর্মমধর্ম চ,* ধর্ম, অধর্ম দুটোকেই ছাড়তে হয়। ঠাকুর কথামৃতে বারবার এই কথা বলছেন। সমস্ত ধর্মকে ছাড়া মানে, সমস্ত কিছু থেকে সন্ন্যাস, সমস্ত কর্ম থেকে সন্ন্যাস, শুধু আমার শরণে এসো। আমি কে? কি সুন্দর আচার্যের ভাষা, *মা একং সর্বাত্মানং সমং সর্ভূতস্থম্,* আমি সবারই আত্মা, সবার মধ্যে আমি সমান ভাবে আছি, ছোট বড়, কম বেশি কোনটাই না। আর বলছেন, *ঈশ্বরম্ অচ্যুতং গর্ভজন্মজরামরণবিবর্জিতম্ অহম্ এব ইতি একম্*। এই যে বলে, আমার মা-বাবাই ঈশ্বর, আসল ঈশ্বরে বাবা-মার তফাৎ কোথায়? আসল ঈশ্বরের পরিভাষা দিচ্ছেন –সবারই যিনি আত্মা। আপনার বাবা কি সবারই আত্মা? আর বলছেন, সমস্ত জীবে সমান ভাবে অবস্থিত, সমস্ত বলতে, আমি ঈশ্বর, সবারই নিয়ন্তা, শুধু আপনার বাড়ির নিয়ন্তা না। *অচ্যুতম্,* নিজের অবস্থা থেকে যিনি কখন নড়েন না। *গর্ভজন্মজরামরণবিবর্জিতম্,* ভগবান কখন কারুর গর্ভে আসেন না। দেবকীর গর্ভে যে বাসুদেব, এটাই মায়া। আচার্য শঙ্কর যার জন্য প্রথমেই ব্যাখ্যা করছেন, আচার্য শঙ্করের থেকে বড় বেদান্তী কে, তিনি ঈশ্বরের সংজ্ঞা দিচ্ছিনে *–স চ ভগবান জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নস্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য*। মায়ের গর্ভে যখন আছেন তখনও সদা সম্পন্ন, কিসের গর্ভবাস! সেইজন্য আচার্য বলছেন *দেহবান কুর্বন্ ইব,* মনে হচ্ছে যেন তিনি দেহবান হলেন, যেন তিনি এই কাজগুলি করলেন। এগুলো আগেও অনেকবার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ইদানিং নূতন একটা শব্দ শুনছি – ভাট্ বকা, একশ একটা ক্লাশে আমি তো আর ভাট্ বকছিলাম না, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করছিলাম। ওই ক্লাশগুলো একবার, দুবার, তিনবার শুনবেন, পয়েন্টস গুলি লিখবেন, দেখবেন মা গীতা কৃপা করে তাঁর সব বক্তব্য পরিষ্কার করে দেবেন। বলছেন, ভাল করে বুঝে নাও, আমি সেই পরমেশ্বর, আমি ছাড়া আর কিছু নেই। অদ্বৈত এটাই বলে আত্মা ছাড়া কিছু নেই। জ্ঞানমার্গ এটাই বলে আত্মা ছাড়া কিছু নেই, ভক্তিমার্গ বলে ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। জ্ঞান আর ভক্তির মধ্যে তফাৎ কোথায় থাকল? কোন তফাৎ নেই, দুটোতেই আমিত্বের নাশ। মন থাকলে তখন আমি থাকে, তখন বলে আমি ভক্ত, তুমি ভগবান। কিন্তু যখন ভক্ত আর ভগবান মিশে যায়, তখন পরমেশ্বরই আছেন। জ্ঞানী দেখেন, আত্মাই আছেন, বাকি সব নাম আর রূপ। ভক্ত দেখেন, যাবতীয় যা কিছু আছে সব ভগবানেরই রূপ। এই যে কলম, জ্ঞানী বলবে এটা নাম রূপের খেলা, এটা মিথ্যা, মায়া। ভক্ত বলবে, কলমটা ভগবান না, কিন্তু ভগবানরই একটা রূপ। জ্ঞান আর ভক্তিতে এই হল তফাৎ। এভাবে যদি দেখেন, তখন ভগবানেই আপনি পুরো ডুবে যাবেন।

ভগবানে ডুবে গেলে কি হবে? আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *অহং ত্বা ত্বাং এবং নিশ্চিতবুদ্ধিং সর্বপাপেভ্যঃ সর্বধর্মাধর্মবন্ধনরূপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি স্বাত্মভাবপ্রকাশীকরণেন,* এটা খুব গুরুরত্বপূর্ণ বাক্য *–স্বাত্মভাব-প্রকাশীকরণেন,* আমার যে ভাব এটা তোমাকে দেখিয়ে দেব। এতক্ষণ আপনি যা কিছু করেছেন, সেখান আপনি নিজের চেষ্টাতে, নিজের বুদ্ধিতে নিজের মত ভেবে করেছেন, ভগবান এরপর আপনাকে দেখিয়ে দেবেন। এই জিনিসটাকে কাশীখণ্ডে খুব সুন্দর বর্ণনা করেছেন, ঠাকুরও যেটা বলছেন, কাশীতে কিভাবে মুক্তি হয়? কাশীতে মা অন্নপূর্ণা আছেন, শিব আছেন। কাশীতে কেউ মারা গেলে মা এসে গ্রন্থি কেটে দেন, আর শিব এসে বলেন, এই দেখ আমার অখণ্ড রূপ। আপনি যখন ঈশ্বরে, আপনার ইষ্টে পুরো ডুবে গেলেন, তখন ভগবান এসে দেখিয়ে দিয়ে বলবেন, এই দেখ আমার ঈশ্বররূপ। কি ঈশ্বররূপ? *সর্বাত্মানং সমং সর্ভূতস্থম্ ঈশ্বরম্ অচ্যুতং গর্ভজন্মজরামরণবিবর্জিতম্*

অহম্ এব ইতি একম্, আমিই আছি আমা ছাড়া আর কিছু নেই। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের সময় শুম্ভ যখন মাকে বলছেন, *অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য,* তুমি অপরের বলকে আশ্রয় করে যুদ্ধ করছ, তখন জগন্মাতা এটাই বলছেন, *একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয় কা মমাপরা,* জগতে আমিই তো আছি, আমা ছাড়া আর আছেটা কে! দেখুন, শ্রীশ্রীচণ্ডীও সেই একই কথা বলছেন।

কাশীতে ঠাকুর যেটা সাক্ষাৎ করেছেন, শিব এসে বলছেন, এই দেখ আমার অখণ্ড রূপ, চণ্ডীতেও একই কথা মা বলছেন, আমিই তো কেবল আছি, দ্বিতীয় আর কোথা থেকে আসবে! অদ্বৈত বেদান্তে আচার্য শঙ্করও একই কথা বলছেন। তাহলে অদ্বৈতের শেষ কথা কি? *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। কিভাবে হবে? থিওরেটিক্যালি হবে না, ভগবান নিজের স্বরূপ দেখিয়ে দেবেন। কেন দেখাবেন? কারণ আপনি অন্য কিছু তো আর দেখছেন না। সেইজন্য ভক্তিশাস্ত্রের খুব সহজ ভাবে বলা হয়, ভগবান দেখিয়ে দেন। অদ্বৈত বেদান্তে পরিষ্কার করে বলা নেই, ভগবান কেন, কিভাবে দেখিয়ে দেন। কঠোপনিষদেও বলছেন, *যমেবৈষা বৃণুতে,* আত্মা যাকে বরণ করেন, কেন বরণ করেন কেউ জানে না। এতটুকু জানা আছে যার প্রস্তুতি হয়ে গেছে, তাঁকে বরণ করেন।

দশম অধ্যায়ে আমরা একটা শ্লোক পেয়েছিলাম যেখানে বলছেন, *নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা,* অজ্ঞানজনিত মোহান্ধকারকে নাশ করে হৃদয়ে আমার জ্ঞানের দীপ জ্বালিয়ে দিই। ঠাকুর বলছেন, হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে আলো জ্বাললে সেই মুহূর্তে অন্ধকার চলে যায়, একটু একটু করে অন্ধকার যায় না। সেইজন্য আচার্য শঙ্কর গীতা শুরু করতে গিয়ে প্রথমেই এই কথা বলেছেন, গীতার সার কি – *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। ধর্ম ত্যাগ করে কি অধর্ম নেব? একেবারেই না, ধর্ম অধর্ম সমস্ত ত্যাগ করে তুমি আমার শরণে এসো। এটাকেই ঠাকুর বলছেন বেড়ালের ছা মা ছাড়া কিছু জানে না। কেউ যদি আপনাদের জিজ্ঞেস করে, গীতার সার কি, তখন এটাই বলবেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। হিন্দু ধর্মের সার কি? এটাই। বেদান্তের সার কি? *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। ভক্তির সার কি? এটাই, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। যোগের সার কি? এটাই। ছেষট্টি নম্বর শ্লোকের প্রথমার্দ্ধটা কম্প্যুটারে টাইপ না করে, নিজের হাতে সুন্দর করে বড় বড় অক্ষরে লিখে কাঁচের ফ্রেমে বাঁধিয়ে বাড়ির চার পাঁচটা জায়গায় টাঙিয়ে দেবেন। এটাই হিন্দু ধর্মের শেষ কথা, রাজযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ এই চারটে যোগের এটাই শেষ কথা। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও এই একই কথা বলছেন। ঠাকুর কাশীর যে বর্ণনা করছেন, সেখানেও এটাই বলছেন। ঠাকুর বলছেন, মাইরি বলছি ঈশ্বর বৈ আমি আর কিছু জানি না, সবাই একই কথা বলছেন। এখানেই গীতার বক্তব্য শেষ। আচার্য বলছেন, তাহলে এবার আলোচনা করা যাক গীতার দর্শনটা কি।

আচার্যের ভাষ্যে এখানে একটা বিরাট লম্বা আলোচনা আছে। আমাদের অত কিছু জানার দরকার নেই। আচার্য শঙ্কর যখন ভাষ্য রচনা করছিলেন, সেই সময় তখন কর্মকাণ্ডীরা, যাদের মীমাংসক বলা হয়, প্রচণ্ড শক্তিশালী ছিল। এদের সাথে লড়াই করার জন্য আচার্য বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে এদের সাথে অনেক লড়াই করেছিলেন। বর্তমান যুগে এগুলোর আর দরকার নেই, মীমাংসক বলতে গেলে উঠেই গেছে। এখন কেবল বেদান্তরেই বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা, দর্শন রয়েছে। আচার্য বলছেন, তাহলে বিচার করা যাক, পরমকল্যাণ মোক্ষ সাধন কি – জ্ঞান নাকি কর্ম, নাকি দুটো মিলিয়ে জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয়? আচার্য এখানে একটা কথাই বলে বেরিয়ে গেলেন। বলছেন মোক্ষ কর্ম দিয়ে হয় না, জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয় দিয়ে হয় না আর জ্ঞান দিয়েও হয় না। তাহলে কি করে হবে? হবে কেন, কি করে হবে, কারণ যখনই আমরা হওয়া বলি, তার একটা ফল হয়। একটা ক্রিয়া আছে আর তার একটা ফল হবে। জ্ঞান যদি ক্রিয়া হয় আর তার ফল যদি আত্মজ্ঞান হয়, তাহলে তো আত্মজ্ঞান আবার চলেও যাবে। তাহলে জ্ঞান কি করে? এই যে আমরা এত শাস্ত্র পড়ছি, শাস্ত্র শুনছি এতে কি হচ্ছে? বলছেন, অবিদ্যাকে সরিয়ে দেয়। কর্ম কি করে? আবর্জনাগুলিকে

কেটে পরিষ্কার করে দেয়। জীবনে যদি কাজ না করে থাকেন, ধর্ম আপনার দ্বারা হবে না, সোজা কথা। রাজযোগে বলা হয়, এক আসনে এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা যদি বসতে না পারেন, মন আপনার স্থির হবে না। বহিরঙ্গ সাধন আর অন্তরঙ্গ সাধন, প্রথমে এই দুটো পথ – কর্ম আর যোগ।

এরপর দুটো পথ নিয়ে নেয়, একটা নেয় জ্ঞানপথ, আরেকটা নেয় ভক্তিপথ। ভক্তিপথে পরমেশ্বরই আছে, জ্ঞানপথে আত্মাই আছেন। ভক্তিপথে পরমেশ্বরই আছেন, এই ভাবে থাকা আবার জ্ঞানপথে আত্মাই আছেন, এই ভাবে থাকা। এটা একটা সত্য, সেইজন্য কি হয়, এটা কখন কর্ম দিয়ে সিদ্ধি হয় না, যোগ দিয়ে সিদ্ধি হয় না, জ্ঞান দিয়েও সিদ্ধি হয় না আর ভক্তি দিয়েও সিদ্ধি হয় না। শাস্ত্রের পরিভাষায় এটাকে বলে *ফলরূপত্বাৎ*, ক্রিয়া যেটা ফলও সেটা। ক্রিয়া আর ফল যদি আলাদা হয়, তাহলে ওটা গোলমেলে। নারদীয় ভক্তিসূত্রে বলছেন, ভক্তিটাই ক্রিয়া, ভক্তিটাই ফল, ভক্তি করলে তার ফল হবে ভক্তি। সেইজন্য জ্ঞানের ফল কখনই আত্মজ্ঞান হয় না, আত্মজ্ঞান সদা সর্বদা বিদ্যমান। জ্ঞান কি করে, আবর্জনাগুলিকে সরিয়ে দেয়। আয়নাতে অনেক ধুলো পড়েছে, মুখ দেখা যাচ্ছে না। আপনি একটা কাপড় দিয়ে আয়নার ধুলোগুলো ঝেড়ে পরিষ্কার করে দিলেন, এবার মুখ দেখা যাচ্ছে। কাপড় দিয়ে ঝাড়ার জন্যই কি মুখ দেখা যাচ্ছে? মুখ দেখা যাচ্ছে আয়নার জন্য, ধুলো জমে গিয়েছিল।

এখানে আচার্য লম্বা একটা আলোচনা করছেন, তাতে নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম, প্রায়শ্চিত্ত কর্ম, নিষিদ্ধ কর্ম সবটারই আলোচনা করছেন। আচার্য মীমাংকদের বলছেন, তোমরা যে এত কর্ম কর্ম বলছ, কর্ম দিয়ে কখনই মোক্ষ হয় না। আগে আগেও আচার্য এই কথা বলেছেন। কর্ম হল চিত্তশুদ্ধির জন্য, চিত্তশুদ্ধি হয়ে গেলে ধীরে ধীরে কর্মত্যাগ হয়ে যায়। নিত্যকর্মটুকু রাখতে হয়, শেষে ভালবাসা এসে গেলে ওটুকুও নিজে থেকেই খসে পড়ে যায়। গীতার উদ্দেশ্য হল আত্মজ্ঞান, পরমেশ্বর যিনি, ঈশ্বর যিনি জ্ঞান হয়ে গেলে তিনিই তাঁর স্বরূপ দেখিয়ে দেবেন। জ্ঞানমার্গীরা জানবে আত্মাই সব কিছু। কিন্তু এই জ্ঞান পাওয়ার জন্য প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়। দিনে বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টা জপধ্যান যদি না করেন, আর এটা যদি দিনের পর দিন, বছরের পর বছর না করেন তাহলে জ্ঞান হবে না। আমরা পারি না কেন? কারণ আমাদের প্রস্তুতি নেই। ওই হাড়ভাঙা খাটুনির জন্য আপনার শরীরটাই এখনও তৈরী হয়নি। ঠাকুরের বারো বছরের সাধনার ইতিহাস দেখুন, স্বামীজীর তপস্যার ইতিহাস দেখুন। পনের থেকে ষোল ঘন্টা ওর মধ্যেই ডুবে থাকতে হয়, এই ধরণের সাধনার জন্য আলাদা শরীর দরকার, আলাদা মন দরকার। এখানেই গীতা শেষ। এরপর কয়েকটা শ্লোকে স্তুতি করছেন।

ইদং তে নাহতপস্কায় নাহভক্তায় কদাচন।
ন চাহশুশ্রূবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি।।৬৭।।

(সংসার-নিবৃত্তির জন্য তোমাকে উপদিষ্ট এই গীতাশাস্ত্র তপস্যাহীন ব্যক্তিকে বলবে না। তপস্বী হলেও গুরু ও ঈশ্বরে ভক্তিরহিত ব্যক্তিকে কখনও এটা বলবে না। ভক্ত ও তপস্বী হলেও শ্রবণেচ্ছু না হলে এটা কাউকেও বলবে না। আমি ভগবান বাসুদেব। আমাকে প্রাকৃত মানুষ মনে করে আত্মপ্রশাংসাদি দোষ আমাতে অধ্যারোপপূর্বক অজ্ঞানবশতঃ যিনি আমার ঈশ্বরত্বে অবিশ্বাসী, তাঁকেও এটা বলবে না। কেবলমাত্র ভগবানে অসূয়াশূন্য, তপস্বী, ভক্ত ও শুশ্রূষু ব্যক্তিকেই এই গীতাশাস্ত্র বলবে।)

এখানে ভগবান অর্জুনকে সাবধান করে দিচ্ছেন, কাদের কাছে গীতার কথা বলা যাবে না, কাদের কাছে গীতা পাঠ করবে না। প্রথম হল *অতপস্কায়*, যে তপস্যা করে না, কোন সাধন-ভজন নেই, তাদের সামনে গীতা পাঠ করবে না। দ্বিতীয়, তপস্যা করে কিন্তু গীতার প্রতি ভক্তি নেই, এই ধরণের লোকের কাছেও গীতা পাঠ করবে না। তৃতীয় *ন চাহশুশ্রূবে*, শুশ্রূব মানে শোনার ইচ্ছা, তার সবই আছে, তপস্যা আছে, ভক্তিও আছে কিন্তু গীতা শুনতে চায় না, গায়ে পড়ে কাউকে শোনাতে যাবে না। চতুর্থ, তপস্যা আছে, ভক্তিও আছে আর শুনতেও চাইছে কিন্তু *ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি*, সূয়

শব্দের অর্থ নিন্দা করা, অর্থাৎ আমার প্রতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যার ভক্তি নেই, তাকেও গীতা শোনাতে যাবে না। এখানে আচার্য বলছেন, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে দোষ দেখে, যেমন অনেকে বলে, কৃষ্ণ তো মানুষই ছিলেন। ঠাকুরকেও অনেকে বলেন, উনি তো আমাদের মতই একজন মানুষ। আর তার সাথে বলে, কৃষ্ণ তো আত্মপ্রশংসাই করে গেছেন, গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ 'আমি আমি' করে বলে গেছেন, এটাকে এরা আত্মপ্রশংসা রূপে দেখে। অর্জুনকে ভগবান নিষেধ করে দিলেন, এই কয়েক ধরণের লোকের সামনে গীতার কথা বলবে না।

এটাকে যদি ঘুরিয়ে দেখা হয়, তখন এটাকে বলা হবে *অর্থাপত্তি*, ষট্ প্রমাণে অর্থাপত্তি একটা প্রমাণ। যেমন দেবদত্ত নামে একজন মোটা লোক দিনে খায় না, মোটা লোক, অথচ বলছে দিনে খায় না, তাহলে কখন খায়? নিশ্চয় তাহলে রাত্রে খায়। যখন কোন নেগেটিভ ঘটনা বলা হয়, সেখান থেকে পজিটিভটাকে উপসংহার করে নেওয়া হয়। এখানে এতক্ষণ নেগেটিভ দিকগুলো বলা হল, এর পজিটিভ হল, যিনি তপস্যা করেন, যিনি ভক্ত, যিনি গীতা শুনতে আগ্রহী আর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁর শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, তাঁদেরকেই গীতার কথা শোনাবে। প্রথমে বলে দিলেন কাকে কাকে গীতা শোনাবে না, এটা গেলে নেগেটিভ দিক, এবার এটাকে পজিটিভে ঘুরিয়ে দেওয়া হল, এটাকে বলে অর্থাপত্তি।

কাদের কাদের গীতা শোনাবে না বলা হল। এবার যে গীতা অপরকে শোনাবে, তাদের জন্য কি ফল হবে, সেটাকে এবার বলছেন।

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ।।৬৮।।

(এই গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা দ্বারা আমি ভগবানের শুশ্রূষা করছি –এই জ্ঞানে যিনি এই পরম গুহ্য গীতাশাস্ত্র আমার ভক্তের নিকট পাঠ ও ব্যাখ্যা করবেন, তিনি পরা ভক্তি লাভ করে আমাকে প্রাপ্ত হবেনই, এতে সন্দেহ নাই।)

যিনি গীতা অপরকে পাঠ করে শোনাবেন, বা ব্যাখ্যা করবেন, তাঁর কি ফল হবে বলছেন। ধরুন চারজন কি পাঁচজন লোক একত্র হয়ে বললেন, আমাদের তো সে-রকম খুব বেশি সাধন-ভজন নেই, আচ্ছা চলুন আমরা সবাই মিলে নিয়মিত বা সপ্তাহে তিন দিন শ্রদ্ধা-ভক্তির সাথে গীতা পাঠ করব, ভগবান বলছেন, *ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা*, আমাতে ভক্তি রেখে যদি কেউ অপরকে এই শাস্ত্র শোনায়, তাহলে *মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ*, এটা গ্যারান্টি যে, সে আমাকে পাবেই পাবে, তার মুক্তি হবেই হবে, এতে কোন সংশয় নেই। এখানে দুটো জিনিস বলছেন, একটা বলছেন, এই শাস্ত্র যিনি অপরকে শোনাবেন, কিন্তু আগের শ্লোকের condition গুলো আছে, তাহলে কিন্তু সে মুক্ত পুরুষ হয়ে যাবে। শুধু গীতা পাঠ করে করে, গীতা অপরকে শুনিয়ে শুনিয়েই সে মুক্ত হয়ে যাবে। যদি আপনি কাউকে শোনাবার জন্য না পান, কোন অসুবিধা নেই, ঠাকুরের ছবি সামনে রেখে তাঁর সামনে নিয়মিত পাঠ করুন, তাতেই আপনার মুক্তি হয়ে যাবে।

উপনিষদে আচার্য হওয়ার যোগ্যতাবলীর মাপকাঠি দেওয়া আছে, আচার্য কে হতে পারেন, সেখানে বলছেন, *শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠম্*, তাঁকে শ্রোত্রিয় হতে হবে, উচ্চ ব্রাহ্মণ হতে হবে, ব্রহ্মে নিষ্ঠা থাকতে হবে। এখানে যিনি শোনাবেন তাঁকে কোন condition দিচ্ছেন না, শুধু বলছেন, আমার প্রতি যাঁর পরা ভক্তি আছে, বিশেষ ভক্তি আছে, এটা থাকলেই হবে, আর কিছু লাগবে না। শ্রোত্রিয় হতে হবে না, ব্রহ্মনিষ্ঠও হতে হবে না। শুধু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি থাকলেই যথেষ্ট। যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি থাকে আর যদি অপরকে গীতা পাঠ করে শোনান, ব্যাখ্যাও করতে হবে না, শুধু গীতার বইটা নিয়ে পাঠ করে শোনানো, আর যদি পারেন শ্লোকের সরল অর্থটা যদি বলে দেন, আর যদি বছরের পর বছর শুনিয়ে যান, এটাই আপনার মুক্তির গ্যারান্টি। এটা গেল গীতার ফল।

প্রথমটা বললেন কাদের গীতা শোনাবে না, দ্বিতীয়টাতে বললেন, যারা গীতা শোনাবে তারা কি ফল পাবে, ফল এটাই –তাদের মুক্তি নিশ্চিত। কিন্তু ভগবান এখানে একটা শর্ত লাগিয়ে দিচ্ছেন, শ্রীকৃষ্ণে বা আপনার ইষ্টে পরা ভক্তি থাকতে হবে। এছাড়া আর কোন শর্ত নেই, একজন সিদ্ধ পুরুষ হতে হবে না, ব্যাকরণ জানতে হবে না, শাস্ত্রের পণ্ডিত হতে হবে না। শুধু ঈশ্বরের ভক্তি থাকলেই হবে। এই আটষট্টি নম্বর শ্লোকটাকে আপনারা গ্রন্থস্তুতি ভাববেন না, এটা বাস্তব হবে বলছেন। ঠাকুরের খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, একজন পণ্ডিত রাজাকে ভাগবত শোনাতে যেতেন। পণ্ডিত কিছুটা পাঠ করেই রাজাকে জিজ্ঞেস করে, 'রাজা মশাই কিছু বুঝলে'? রাজা বলছে, 'আপনি আগে বুঝুন'। রোজই রাজাকে জিজ্ঞেস করেন আর রাজাও একই উত্তর দেয়, 'আগে আপনি বুঝুন'। বাড়িতে গিয়ে পণ্ডিত রোজ ভাবতে শুরু করে। এই রকম ভাবতে ভাবতে একদিন হঠাৎ অন্তর থেকে তাঁর সব পরিষ্কার হয়ে গেল। রাজাকে পণ্ডিত আর ভাগবত শোনাতে যায় না। রাজা লোক পাঠিয়েছে খবর নিতে। রাজার লোক গিয়ে দেখছে পণ্ডিত ভাগবত খুলে শুধু চোখের জল ফেলে যাচ্ছে। রাজার লোক পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করেছে রাজাকে কেন ভাগবত শোনাতে যায় না। পণ্ডিত বলছেন, 'রাজাকে গিয়ে বলে দাও, আমি এবার বুঝেছি'। পণ্ডিত যে লোভে পড়ে, ঢং করার জন্য রাজাকে ভাগবত শোনাতে যেতেন তা না, সত্যিকারের ভাগবত শোনাতেই যেতেন, কিন্তু তখনও ভিতরে তাঁর পরা ভক্তিটা আসেনি। কিন্তু রাজার কথা শুনে মনন করতে করতে একটা ধাপে গিয়ে এসে গেছে, এসে যেতে তিনি নিজেকে সব কিছু থেকে সরিয়ে এনে ভাগবতেই ডুবে গেলেন।

আচার্যও এই শ্লোকের ভাষ্যে বলছেন, *অভিধাস্যতি বক্ষ্যতি গ্রন্থতঃ অর্থতঃ চ স্থাপয়িষ্যতি*, যেমনটি গ্রন্থে আছে তেমনটি সামনে রেখে দিতে হবে। আপনাকে এখানে কেউ ব্যাখ্যা করতে বলছেন না, ভগবানও তাই বলছেন, *মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি*, আমার যারা ভক্ত তাদের কাছে *অভিধাস্যতি*, যেমনটি আছে তেমনটি রেখে দেবে, এর বেশি আপনাকে আর কিছু করতে হবে না।

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি।।৬৯।।

(মনুষ্যগণের মধ্যে গীতাব্যাখ্যাতা অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয় এ জগতে কেউ নেই এবং আর কেউ হবেও না।)

যাঁরা গীতার এই পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের চাইতে প্রিয় আমার কেউ নেই। এটাই জ্ঞানযজ্ঞ, এটাই ঠাকুরের কাজ। ঠাকুরের কাজ কোনটা? ঠাকুরের যে পরম্পরা আছে, ওটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এটাই জ্ঞানযজ্ঞ, এটাই ঠিক ঠিক ঠাকুরের কাজ। স্বামীজী যখন গুরুভাইদের বলতেন, প্রচারকার্য চালাতে হবে, এই কথা শুনে অনেকে আপত্তি করলে স্বামীজী প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট হয়ে যেতেন। প্রচার কার্য অবশ্যই করবেন, আপনি কিভাবে করবেন সেটা আলাদা। আপনি লেকচার দিয়ে প্রচার কার্য চালাতে পারেন, ক্লাশ নিয়ে চালাতে পারেন, গ্রন্থ পাঠ করে করতে পারেন, পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে করতে পারেন, এগুলো আলাদা, কিন্তু আপনাকে প্রচার কার্য চালিয়ে যেতে হবে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একমাত্র কাজ হল প্রচার কার্য, এটা আমাদের সঙ্ঘের প্রতি দায়বদ্ধতা। প্রচার কার্য মানে, এই যে ছয় সাত হাজার বছরের যে পরম্পরা, বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, ঠাকুরের কথা, এই পরম্পরাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া।

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ।।৭০।।

(এবং যে ব্যক্তি আমাদের উভয়ের এই ধর্মজনক সংবাদরূপ গ্রন্থ অধ্যয়ন করবেন, তাঁর সেই জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আমি পূজিত হব, এটা নিশ্চয় জানবে।)

ভগবান বলছেন, অর্জুন, তোমার আমার এই যে সংবাদ, যে এটাকে অধ্যয়ন করবে, স্মরণ করবে, জানবে সে আমরই পূজা করছে। কিভাবে পূজা করছে? জ্ঞানযজ্ঞ দিয়ে। এটা শ্রেষ্ঠতম যজ্ঞ, আপনি যে যজ্ঞই করুন, দানযজ্ঞ করুন, জপযজ্ঞ করুন, এর উপর আর কোন যজ্ঞ হয় না। আপনি যখন জপযজ্ঞ করছেন, তখন আপনি একাই জপ করে যাচ্ছেন। আর আপনি যদি কোথাও ঠাকুরের কথা শোনান, আপনি জানেন আমি অন্যদের ঠাকুরের কথা শোনাচ্ছি, শোনাচ্ছি কাদের, ঠাকুরের ভক্তদের। এটা যে কত উচ্চতম একটা পরিবেশ কল্পনাই করা যায় না। এই যে আপনারা একশ একটা ক্লাশ শুনলেন, এটাই জ্ঞানযজ্ঞ। বলছেন, জ্ঞানযজ্ঞ হল শ্রেষ্ঠতম, *জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ,* সেইজন্য সে আমার প্রিয়। যে আমার ও তোমার এই সংবাদ পড়ছে, শুনছে, যে শোনাচ্ছে এরা সবাই কিন্তু সেই জ্ঞানযজ্ঞই করছে। এরা সবাই আমারই পূজা করছে।

আমাদের ইউনিভার্সিটিতে যখন অফলাইন ক্লাশ হত, তখন দেখতাম, শ্রোতারা গরমেও ক্লাশে আসছেন, বৃষ্টিতেও আসছেন, শীতেও আসছেন, আর কত দূর দূর থেকে আসছেন। আমি জানতাম ওনারা একনিষ্ঠ ভক্ত, কোন দিন আমার জ্বর হলেও, শরীর খারাপ হলেও ক্লাশ নিতাম, আমি জানি এই গরমে, এই বর্ষায় এনারা সবাই কত দূর দূর থেকে আসছেন, আমি কি করে ক্লাশ বন্ধ করে দিই, ক্লাশ নিতাম। আপনি এই যজ্ঞে একা যাচ্ছেন না, আরও দশজনকে নিয়ে এগোচ্ছেন, সেইজন্য এই যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। এই যে একটা collective consciousness, এই জিনিসটাই এখানে যাঁরা শুনছেন তাঁদের উন্নত করছে, সাথে সাথে আমারও উন্নতি হচ্ছে। সেইজন্য বলছেন জ্ঞানযজ্ঞের মত আর কোন যজ্ঞ হয় না।

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপিমুক্তঃশুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্।।৭১।।

(যিনি শ্রদ্ধালু অসূয়াশূন্য হয়ে অর্থবোধ না হলেও এই গীতা শ্রবণ করেন, তিনিও পাপমুক্ত হয়ে অগ্নিহোত্রাদি পূণ্যকারিগণের প্রাপ্য পূণ্যলোক লাভ করেন।)

এগুলোকে বলা হয় গ্রন্থস্তুতি। *শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ,* এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ হল, অনসূয় অর্থাৎ দোষদৃষ্টিরহিত। বলছেন যাঁরা এই গীতা গ্রন্থকে শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনবেন, শুধু শুনে যাবেন, তাতেও শ্রোতা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন, তারও মুক্তি গ্যারান্টি। ভগবান বলছেন, *প্রাপ্নুয়াৎ পূণ্যকর্মণাম্,* যাঁরা অগ্নিহোত্রাদি করেন, যজ্ঞাদি করছেন, মৃত্যুর পর এই ধরণের লোকেরা যে লোকে যান, যাঁরা শুধু শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনছেন, তাঁরাও সেই লোকে যান। সেইজন্য আগেকার দিনে দেখা যেত গ্রামে অন্য কোথাও যেখানে ভাগবত কথা হত, রামচরিতমানস বা রামায়ণ পাঠ হত, সেখানে সবাই দলবেধে শুনতে যেত। এখনও অনেক জায়গায় এই দৃশ্য দেখা যায়। যেখানেই ঈশ্বরীয় কথা হয় সেখানেই শুনতে যেতে হয়, কারণ ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ করাটাই একটা যজ্ঞ। যিনি শোনাচ্ছেন, তাঁর মুক্তি তো নিশ্চিত, আর যিনি শুনছেন, তাঁরও মুক্তি গ্যারান্টি।

ঠাকুর একটা খুব সুন্দর গল্প বলছেন, একজন পণ্ডিত গীতা পাঠ করছেন। একজন শ্রোতা পিছনে বসে শুনছে আর অঝোরে কেঁদে যাচ্ছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, 'তুমি গীতার কথা কিছু বুঝতে পারো'? 'না মহারাজ, কিছু বুঝি না, আমি শুধু দেখছি রথের উপর ঠাকুর বসে আছেন, তিনি অর্জুনকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া আমি আর কিছু দেখছি না'। ভাবতে গেলে সারা শরীরে কাঁটা দেয়, হে ঠাকুর, আমাদের কি কোন দিন এই রকম ভাব হবে? আর এই যে দোষের কথা বলছেন, অনসূয়, গীতাতে দোষ দেখবে না। কিন্তু এখানেই আমাকে একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা দেখতে হয়েছে।

খুব শ্রদ্ধার সাথে এসে অনেকে বলেন, মহারাজ, আপনার ক্লাশগুলো শুনি, কি সুন্দর লাগে! একদিন এই রকম একজন শ্রোতা দু-একটা কথা বলে আমাকে বলছেন, 'মহারাজ একটা প্রশ্ন

ছিল'। প্রশ্নের কথা শুনেই আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, 'দেখুন আমি যা বলার ক্লাশে বলে দিয়েছি, তার বাইরে কিছু বলার নেই'। তাও তিনি বলতে লাগলেন, 'না, বলছিলাম যে, গীতায় যে স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্রের নিন্দা করা হয়েছে'? আমি শুনে অবাক হয়ে গেলাম, 'গীতার কোথায় স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্রের নিন্দা করা হয়েছে? আপনি আমার ক্লাশগুলো শুনেছেন'? 'হ্যাঁ শুনেছি'। 'আমি কি বলেছি'? 'মনে নেই'। 'গীতা পড়েছেন কখন'? 'হ্যাঁ পড়েছি'। 'গীতাতে কি বলেছে'? 'না, আমার মনে নেই'। তর্ক করেই যাচ্ছে। তখন আমি বলতে লাগলাম, 'যখন ছিল তখন ছিল, এখন তো নারী পুরুষ সব সমান হয়ে গেছে, এখন কেন আবার এই কথা উঠছে? কি সব উল্টোপাল্টা কথা বলে যাচ্ছেন? গীতা বলছেন, সমাজে এই রকম করা হয়ে থাকে, কিন্তু ভগবানের প্রতি যাদের ভক্তি আছে, তারা সবাই সমান। আর আপনি পুরো উল্টো করে বলছেন'? আমি হাতজোড় করে বললাম, 'দয়া করে আপনি এবার আসুন'। কি হবে এদের ভেবে দেখছে না? আবার এসে বলবে, এই কষ্ট, সেই কষ্ট; কষ্ট হবে না কেন, আপনি ঈশ্বরে দোষ দেখছেন, আপনি শাস্ত্রে দোষ দেখছেন, হিন্দু ধর্মে দোষ দেখছেন, এরপর কষ্ট যদি না হয় কবে কষ্ট হবে। যাই হোক, ভগবান এবার শেষ কথা বলছেন। শিষ্যকে তো উপদেশ দিয়ে দিলাম, কিন্তু সে ভাল ভাবে আত্মস্থ করতে পারল কিনা? অর্জুনের শাস্ত্রার্থগ্রহণ হয়েছে কিন জানার ইচ্ছায় এবার শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকেও একই প্রশ্ন করছেন।

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়।।৭২।।

(হে পার্থ, তুমি একাগ্রচিত্তে এই গীতাশাস্ত্র শুনেছ? হে ধনঞ্জয়, এই শ্রবণের ফলে তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ কি বিনষ্ট হয়েছে?)

অর্জুন এই যে এতক্ষণ তোমাকে সব গুহ্য কথা বললাম, মন দিয়ে আমার সব কথা শুনেছ কি? না আমি বলে গেলাম, সেটা তোমার এক কর্ণকুহরে প্রবেশ করে অন্য কর্ণকুহর দিয়ে বেরিয়ে গেল? যেমন ওই ভদ্রলোক এসে বললেন, হ্যাঁ শুনেছি, মনে নেই। সবারই ওই এক কথা, নারীকে অপমান করা হয়েছে। যাদবপুর থেকে একজন আমার কাছে এসে প্রশ্ন করছে, দ্রৌপদীর চিরহরণ হল কেন? পুরো মহাভারতে তোমার এই প্রশ্নটাই মনে হল? অন্য ধর্মে গিয়ে তাদের ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন করতে পারবে? না, আমি হিন্দু, আমার অধিকার আছে প্রশ্ন করার। প্রশ্ন করার অধিকার তোমার আছে, কিন্তু তোমার কি দায়ীত্ব নেই নিজের ধর্মকে জানার? পরে শুনলাম বাইরে বেরিয়ে গিয়ে আমার নাম করে বলছে, এরা কি ধরণের সন্ন্যাসী? আরে ভাই আমি এই ধরণেরই সন্ন্যাসী। নিজের ধর্মের প্রতি কোন দায়ীত্ব পালন করবে না, এদিকে নিজের ধর্মকে নিয়ে প্রশ্ন করা চাই। যদি বলা হয়, আমাদের ক্লাশগুলো মন দিয়ে শুনুন, তখন বলবে অত লেকচার শোনার আমার সময় নেই। নিজের ধর্মের প্রতি কোন দায়ীত্ব পালন করবেন না, শাস্ত্রের এত আলোচনা চলছে, সেগুলো শুনবেন না, তাহলে আপনি এত প্রশ্ন করছেন কেন? নিজেকে যে কত খেলো করে দিচ্ছে, এটা বোঝারও ক্ষমতা নেই এদের। এইজন্যই হিন্দুদের সবাই এসে মেরে যাচ্ছে, যে যখন পারছে হিন্দুদের মেরে যাচ্ছে। অন্য ধর্মে একটা ছোট্ট একটা বই আছে, সেটাকে মুখস্ত করে চালিয়ে দেয়। হিন্দু ধর্মের বিশাল গ্রন্থরাশি, লোকেদের পড়ে বোঝার ক্ষমতা নেই, সেইজন্য বোঝার চেষ্টাও করে না। অর্জুন এবার উত্তর দিচ্ছেন।

অর্জুন উবাচ
নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।।৭৩।।

(অর্জুন বললেন –হে অচ্যুত, আপনার প্রসাদে আমার মোহ ও অজ্ঞান নষ্ট হয়েছে এবং পরমাত্মাবিষয়ক ধ্রুবা স্মৃতি লাভ হয়েছে। আমি নিঃসংশয় হয়ে অবস্থিত, এখন আপনার উপদেশ পালন করব; আমার অন্য কোন কর্তব্য নাই।)

নষ্টো মোহঃ, ভীষ্ম, দ্রোণ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুদের দেখে আমার যে মোহ উৎপন্ন হয়েছিল, আপনার কৃপায় আমার সেই মোহ নষ্ট হয়ে গেছে। *স্মৃতির্লব্ধা*, এই স্মৃতির অর্থ হল *আত্মতত্ত্ববিষয়ঃ*, আমার স্মৃতি আবার ফিরে এসেছে। আমার সমস্ত সন্দেহ মিটে গেছে, আমি আমাতে আবার অবস্থিত হয়েছি। আপনি যে রকমটি বলেছেন, আমি সেই রকমটিই করব। কয়েকটা শব্দ আছে যেমন মোহ, স্মৃতি, এগুলোকে আমাদের বোঝার দরকার। আমরা জীবনের বেশির ভাগ সময় মোহতেই জড়িয়ে থাকি। আমি কে, মনে নেই; আমার কি কর্তব্য, ভুলে গেছি। স্মৃতি হল আত্মতত্ত্ব বিষয়ে ছোটবেলা থেকে মা, বাবা, সমাজ, গুরুজন, শাস্ত্র এনাদের কাছ থেকে শুনে শুনে বা ঈশ্বরই সত্য এই কথা শুনে শুনে একটা বুদ্ধি তৈরী হয়, এটাকে বলা হয় স্মৃতি। দুঃখ যখন আসে, যখন লোভ, মোহ আসে, কিংবা মনে যখন কোন চাঞ্চল্য আসে, তখন এই স্মৃতি অনেক সময় হারিয়ে যায়।

ইউটিউবের দৌলতে আজকাল মহারাজরা বিভিন্ন শাস্ত্রের আলোচনা করতে পারছেন, আপনারা অনেকেই মন দিয়ে শুনছেন। অনেকে বলতে পারেন, কই আমাদের তো লাভ সেই রকম কিছু হচ্ছে না। ঠিকই এখন কিছু হবে না, শাস্ত্রের কথাগুলো তিল তিল করে আপনার ভিতরে জমছে, এই যে জমছে, এটাই আপনার স্মৃতি তৈরী করে দিচ্ছে। কাল যদি আপনার কোন গোলমাল হয়, আর কোন উচ্চমানের কোন লোক দুটি কথা আপনাকে যখন বলে দেবেন, দেখবেন তখন আপনার ভিতরে যে মেঘ ছেয়ে আছে, সেটা উড়ে যাবে। আপনি যা, আপনি তাই হয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন। অর্জুন আগে থেকেই শক্তিমান পুরুষ, তাঁর যুদ্ধ করার ক্ষমতা আছে, তাঁর স্মৃতি আছে, স্মৃতি আছে মানে অর্জুন আগে আগে বড় বড় মহাত্মাদের কাছে শাস্ত্র শুনেছেন। সেইজন্য তাঁর মধ্যে ক্ষমতা আছে, ক্ষমতা থাকার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যেমনি সব কিছু বলে দিলেন, তাঁর মোহ আদি সব নাশ হয়ে গেল, অর্জুন তাই বলতে পারছেন, *নষ্টমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা*। মোহটা হল মেঘের মত, মেঘ কেটে গেছে, সূর্য যেমন দেখা যাচ্ছিল, তেমনটাই আবার দেখা যাচ্ছে।

স্মৃতি দিয়েই মানুষের সারা জীবন চলে। স্মৃতিটা কখন কখন মোহের জন্য ঢাকা পড়ে যায়, যেমন অর্জুনের স্মৃতিটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। এই যে জ্ঞানযজ্ঞ হল, ভগবান অর্জুনকে লম্বা যে উপদেশ দিলেন, এতে অর্জুনের স্মৃতি যেটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, সেটা খুলে গেল। অর্জুন বলছেন, *ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত*, আপনার কৃপায় এটা সম্ভব হল। হে কৃষ্ণ, সব রকম সংশয় আমার কেটে গেছে, আমি আপনার আজ্ঞার অধীন, আপনি যেমনটি বলেছেন আমি তেমনটি করব। সংশয় কেটে গেছে এর অন্যটাও হতে পারে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুন বলছিলেন, *শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্* আমি আপনার শিষ্য, আমি বুঝতে পারছি না আমার জন্য কোনটা ঠিক, আপনি আমাকে বলে দিন আমার জন্য কোনটা ঠিক। তারপরে এখানে বলছেন আমার সংশয় চলে গেছে, এখানে অন্যটাও তো হতে পারে, আমার সংশয় চলে গেছে, আমি বুঝে গেছি যুদ্ধ করাটা ঠিক হবে না, তাই আমি আর যুদ্ধ করব না। এখানে কিন্তু তা হবে না, অর্জুন বলছেন, *স্থিতোহস্মি*, আপনার কথা মতই আমি দাঁড়িয়ে গেছি, *করিষ্যে বচনং তব*, আপনার আদেশ মতই আমি সব কিছু করব, আমার আর কোন কর্তব্য নেই। এই শ্লোকের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর সব শেষে ছোট্ট একটা কথা বলে দিচ্ছেন, *ন মম কর্তব্যম্ অস্তি*। তার মানে, আগে আগে ভগবান বার বার অর্জুনকে বলছিলেন, তুমি যদি নিজের অহঙ্কারের জন্য আমার কথা না শোন, তুমি নাশ হয়ে যাবে। এই যে সংশয় ভাব ছিল, আমি করব কি করব না, এই ভাব যেটা ছিল, এটা শেষ হয়ে গেল। আমি এখন কি করব? আপনি আমাকে যে রকমটি করতে বলেছেন।

জীবনে আপনি যদি কোন পাপ করেন, তাতে আপনার তেমন কোন সমস্যা হবে না, যদি পূণ্য করেন, তাতেও কোন সমস্যা হবে না, ভাল করুন খারাপ করুন কক্ষণ কোন সমস্যা হবে না। সবচেয়ে বেশি সমস্যা তখনই হয় যখন জীবনে অনিশ্চয়তা থাকে। দ্বিতীয়তঃ জীবনে যদি সংঘাত

থাকে, দ্বন্দ্ব থাকে, করব কি করব না, এই দ্বন্দ্ব যদি থাকে তখনও সমস্যা হয়, করে নেনা বাবা, ঝামেলা চুকে যাক। আমাদের সাধু জীবনে এই রকম অনেক কাহিনী আছে, যেখানে বলে দেয়, যা করতে ইচ্ছে হয়েছে, করে নাও, করে নিয়ে শান্ত হয়ে যাও, ঝামেলা মিটিয়ে দাও। কিন্তু করব কি করব না, এই জিনিস মাথায় যদি একবার ঘুরতে থাকে সমস্যা হয়ে যাবে, শান্তিতে থাকতে পারা যাবে না।

স্বামী যতিশ্বরনান্দজী এক জায়গায় লিখছেন, ভোর চারটের সময় উঠবে, না পাঁচটার সময় উঠবে সেটা বড় ব্যাপার না, কিন্তু চারটের সময় উঠে যদি ভাবি আরও এক ঘন্টা ঘুমোতে পারলে ভাল হত আর পাঁচটার সময় উঠে যদি ভাবি এক ঘন্টা দেরীতে উঠলাম, এটা খুব বাজে হল – সমস্যা হয়ে যাবে। করব কি করব না, এই ধরণের conflict আর uncertainityতে কক্ষণ থাকতে নেই। দ্বন্দ্বের ভাব আর অনিশ্চিত ভাব, এই দুটো ভাব মানুষকে শেষ করে দেয়। যাঁরা জীবনমুক্ত, যাঁরা জানেন ঈশ্বরই সব কিছু করছেন, চৈতন্য ছাড়া কিছু নেই কিনা, তাঁরা বলেন আমি ঠাকুরের ইচ্ছাতেই চলব। ঠাকুরের ইচ্ছা মানে কি? শাস্ত্র যেমনটি বলছে, তেমনটি চলা। যদি আমাকে compromise করতে হয়, করব, করে প্রায়শ্চিত্ত করে নিলাম বা ক্ষমা চেয়ে নিলাম, মাথায় কোন দ্বন্দ্ব, কোন সংশয় বা conflict থাকতে দেওয়া যাবে না।

অর্জুন এখনও জীবনমুক্ত নন, এই বোধ এখনও হয়নি যে ঈশ্বরই সব করছেন, ওনার এখন বোধ হচ্ছে, এটাই ঈশ্বরের আদেশ, এটাই আমাকে করতে হবে। গীতার শুরুতে এবং মাঝে মাঝে আলোচনা করার সময় বলেছিলাম, কিছু লোক বদমাইশি করে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বলবে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধ করার জন্য প্রোরচিত করেছিলেন। অর্জুনকে একবারও ভগবান কোথাও যুদ্ধ করার জন্য বলছেন না। অর্জুন নিরাশাবাদী হয়ে গিয়েছিলেন, নিজে থেকেই দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলছেন, হে ভগবান, আমি জানি না আমি কোনটা করব। ভগবান অর্জুনকে তখন ধর্মের জ্ঞানটা দিয়ে দিলেন। ভগবান প্রথমে আত্মার জ্ঞান নিয়ে শুরু করলেন, সেখান থেকে তিনি দেখালেন মীমাংসকরা আত্মাকে কিভাবে দেখে, যেমন বলছেন *জাতস্য হি ধ্রুবো,* সেখান থেকে আবার বলছেন, তুমি গতকাল ছিলে না, আগামীকালও থাকবে না, অত ভাবার কি আছে! এরপর ভগবান ধর্মকে বিস্তারে বললেন।

আমি আপনাদের গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, আপনি যদি মন দিয়ে গীতা শোনেন, গীতা যদি বোঝার চেষ্টা করেন, আর জীবনে যদি গীতাকে নামাতে পারেন, আপনার একশ শতাংশ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আপনার মোহ নষ্ট তো হবেই, সন্দেহও দূরিভূত হবে। কিন্তু আমাদের সেই ভক্তি কোথায়। আমরা হলাম সব উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমো, সব পথ চলতি ভক্ত। মন্দিরের জন্য বাজারের সব সস্তার বাসি ফল আর নিজেদের জন্য বেছে বেছে ভাল ফল নিয়ে আসবে। শ্রীশ্রীমা বলছেন, ঠাকুর যখন ছিল তখন কেউ দেখল না, এখন কত রকম আয়োজন করছে, নিজেরা খাবে বলে। এখানে এগুলো বিষয় না, বিষয়টা হল অর্জুন নিরাশায় ডুবে গিয়েছিল। ভগবান তাকে ধর্মের উপদেশ দিলেন। এখানে কোন talk of positivity নেই, ভগবান শুধু পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, অর্জুন এই হল ধর্ম। ধর্মটাকে অর্জুনের ভিতর যেই ঢুকিয়ে দিলেন, মন নিজে থেকেই একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল। গীতার কি কাজ? আমাদের মনকে পরিষ্কার করা।

অর্জুন বলছেন, *স্মৃতির্লব্ধা,* স্মৃতি না থাকলে ধর্ম কোন মতেই হবে না। অর্জুনের স্মৃতিটা চলে গিয়েছিল, সেটা এবার তিনি ফিরে পেলেন। বাংলাদেশ থেকে একজন মুসলিম মহিলা আমাকে জানালেন – আমি আপনার অনেক লেকচার শুনি, এই লেকচারগুলি শোনার পর আমার নিজের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাটা অনেক বেড়ে গেছে। আসলে ওনার মনটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। গীতার উদ্দেশ্য কাউকে হিন্দু বানানো নয়, গীতার উদ্দেশ্য তোমার বুদ্ধিটাকে পরিষ্কার করা। কিন্তু যার কিছু বুদ্ধিই নেই, যেমন ক্লাশ টু বা থ্রীর বাচ্চাদের যদি আমি গীতার উপদেশ দিতে যাই, আমি কি তাদের গীতা বোঝাতে পারব? মানুষ ভোগ করেনি, ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা নেই, দেহের ক্ষমতা নেই, গীতা সে কি

বুঝবে? গীতার একমাত্র উদ্দেশ্য, তিয়াত্তর নম্বর শ্লোকে অর্জুন যেটা বলছেন, আসলে এটাই গীতার ফল। শাস্ত্র শুনলে আপনি যেটা ছিলেন সেটাই হয়ে যাবেন, কিন্তু আগে আপনি ছিলেন না, তাহলে এখন আর কিছু হবে না। শুনতে খুব কটূ লাগবে। আমার কাজ শাস্ত্রে যেটা আছে বলে দেওয়া। গীতাশাস্ত্র এখানে বলছেন, গীতা আপনার স্মৃতিটা ফিরিয়ে দেবে, আপনি যা ছিলেন, সেটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, ওটাকে গীতা সরিয়ে দেবে। কিন্তু ভিতরে যদি কিছুই না থাকে, যদি আগে থেকে আপনি গুরুজনদের কাছ থেকে কিছু শিক্ষা না পেয়ে থাকেন, শাস্ত্রের কথা যদি না শুনে থাকেন, সাধুসঙ্গ যদি না হয়ে থাকে, তাহলে গীতার উপদেশ আপনি ধারণাই করতে পারবেন না, ভিতরে কিছু নেই কিনা। একবার মজা করে বলেছিলাম, বেলুড় মঠে খাওয়ার সময় বালতি করে পরিবেশন করা হয়। ভাল একটা তরকারি হয়েছিল সেটা সামান্য একটু পড়ে আছে, পরিবেশনকারীরা হাতা দিয়ে বালতিতে শুধু ঢ্যাঙন ঢ্যাঙন আওয়াজ করে যাবে। হাতা যতই নাড়াক কিছুই বেরোবে না, কিছু নেই তো ভিতরে, বেরোবে কোথা থেকে। আপনার উপর যে মোহের আবরণ পড়েছে, গীতা ওই আবরণকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। সেখান থেকে কি বেরোবে? ভিতরে যা আছে সেটাই বেরোবে। যদি সোনা হয়, সোনা বেরিয়ে আসবে। যদি রূপা হয়, রূপ বেরিয়ে আসবে, যদি লোহা থাকে লোহা বেরিয়ে আসবে। আর যদি শুধু মাটি থাকে, মাটিই বেরিয়ে আসবে। তারপর এরা বলবে, ধুর্ সব গালগপ্পো। আপনার ভিতরে কিছু নেই, তাই কিছু হয়নি। আগে থেকে খাটা না থাকলে ধর্ম তো দূরে, জাগতিক অভ্যুত্থানও কিছুই হবে না। বহিরঙ্গ সাধন অর্থাৎ কর্ম এবং অন্তরঙ্গ সাধন অর্থাৎ যোগ, এই দুটোকে নিয়ে যদি প্রচুর সাধন করে থাকেন, তবেই সেখান থেকে স্মৃতি ফেরত আসবে। কিন্তু স্মৃতিই যদি না থাকে, তাহলে আর কি হবে, কিছুই হবে না।

আচার্য বলছেন, মুণ্ডকোপনিষদ, ঈশোপনিষদে যেমন বলা হয়েছে আত্মজ্ঞান হলে কি হয় – *তত্র কো শোকঃ কঃ মোহঃ*, শোক ও মোহের নাশ হয়ে যায়। গীতা যাঁরা শুনছেন পড়ছেন, যাঁরা চিন্তন করছেন, মনন করছেন, তাঁদেরও শোক আর মোহ নাশ হয়ে যাচ্ছে। আপনি যা, এবার তাতে আপনি স্থিত হয়ে যাবেন। গীতা পাঠ করে বা শুনে আপনি কি স্বর্গে যাবেন, আত্মজ্ঞান হবে? একটা জিনিসই হবে, মোহ নাশ, স্মৃতি পুনর্লাভ, যা ছিলেন তাতেই ফিরে আসবেন। আপনি যদি বলেন, স্বামীজী তো বার বার বলছেন, তুমি সেই শুদ্ধাত্মা? আপনি যদি মনে করেন আপনি শুদ্ধাত্মা, হ্যাঁ আপনার সেই স্মৃতি লাভ হয়ে যাবে যে, আপনি আসলে সেই শুদ্ধাত্মা, আপনি তো শুদ্ধাত্মা বটেই। আচার্য সব কিছু বলে এবার বলছেন, *পরিসমাপ্তঃ শাস্ত্রার্থঃ অথ ইদানিং কথাসম্বন্ধপ্রদর্শানার্থ সঞ্জয় উবাচ*, শাস্ত্রের অর্থ পুরো শেষ, এবার মূল যে কাহিনী, কথাসম্বন্ধ, সেখানে নিয়ে গিয়ে সঞ্জয় বলছেন। আপনাদের আরও একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, মহাভারতে যখন যুদ্ধ শুরু হওয়ার উদ্যোগ শেষ হয়েছে, তখন ব্যাসদেব এসে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, তুমি যাতে ঘরে বসে যুদ্ধ দেখতে পাও, তাই তোমাকে আমি দিব্য চক্ষু দিচ্ছি। ধৃতরাষ্ট্র বলে দিলেন, নিজের চোখে এই সংহার দৃশ্য দেখতে পারব না। সঞ্জয় যুদ্ধভূমিতে ছিলেন, সঞ্জয় সব সময় যুদ্ধভূমিতেই থাকতেন। পিতামহ ভীষ্মের পতনের পর সঞ্জয় খবরটা ধৃতরাষ্ট্রকে দিতে এসেছেন। খবরটা শুনে ধৃতরাষ্ট্র কেঁদে ফেললেন, 'এ কি করে সম্ভব, পিতামহ ভীষ্মের মত অজেয় বীরের পতন বিশ্বাস করা যায় না। তুমি আমাকে বিস্তারে প্রথম থেকে বল ঠিক কি কি হয়েছিল'। ধৃতরাষ্ট্রের এই কথা দিয়ে গীতা শুরু – *ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ। মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়*। সঞ্জয় তখন এক এক করে বর্ণনা দিতে শুরু করলেন, সব বর্ণনা করে এখানে এসে মূল কাহিনীর সাথে গীতাকে এবার মিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্।।৭৪।।

(সঞ্জয় বললেন –আমি এইভাবে ভগবান্ বাসুদেব ও অর্জুনের এই রোমাঞ্চকর অদ্ভুত কথোপকথন শ্রবণ করলাম।)

হে রাজা, এই যে এতক্ষণ আমি ভগবান বাসুদেব ও অর্জুনের যে রোমহর্ষক, গায়ে কাঁটা দেওয়ার মত সংলাপ শুনলাম, শুনে আমার শরীরের প্রতিটি লোমকূপ দাঁড়িয়ে গেছে।

ব্যাসপ্রসাদাচ্চ শ্রুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্।।৭৫।।

(আমি ব্যাস-প্রসাদে লব্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা এই পরম গুহ্য যোগ যোগেশ্বর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখ হতে সাক্ষাৎ শ্রবণ করেছি।)

সঞ্জয় বলছেন, ভগবান ব্যাসের কৃপাতে আমি এই পরম গুহ্য সংবাদ শুনেছি। ব্যাসদেব সঞ্জয়কে এই বর দিয়ে রেখেছিলেন যে, যুদ্ধে যেখানে যা কিছু হবে সঞ্জয় সেটা জানতে পারবেন। কৌরবদের হয়ে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু অর্জুনের রথে শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনের সাথে কথা চলছে, ব্যাসদেবের কৃপায় তিনি জানতে পারছেন তাঁরা কি নিয়ে কথা বলছেন। সঞ্জয় বলছেন, যোগ বিষয়ক পরম গুহ্য কথা আমি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে শুনেছি, যিনি নিজেই যোগীশ্বর। আচার্য এখানে বলছেন, *যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং ন পরম্পরাতঃ*, পরম্পরাতে আমি এই পরম গুহ্য কথা শুনিনি, সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে শুনেছি। জ্ঞান এই দুই ভাবে আসে, যেমন ঠাকুরের সময় যাঁরা ঠাকুরের কাছে ছিলেন, তাঁরা সাক্ষাৎ ঠাকুরের কাছেই শুনেছেন, আমরা পরম্পরাতে সেই কথাগুলো শুনে জ্ঞান লাভ করছি। পরম্পরাতে শোনাও অনেক ভাল। কিন্তু যারা সাক্ষাৎও শোনেনি, পরম্পরাতেও শোনেনি, তা সত্ত্বেও হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করেন, এদেরকে ধিক্ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ।।৭৬।।

(হে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, শ্রীকৃষ্ণার্জুনের এই পূণ্য অদ্ভূত কথোপকথন পুনঃপুনঃ স্মরণ করে আমি মুহুর্মুহুঃ রোমাঞ্চিত ও আনন্দিত হচ্ছি।)

হে রাজন্, সমস্ত পাপকে যিনি নাশ করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনের এই পূণ্য কথপোকথন আমি বারবার মনে স্মরণ করছি আর মুহুর্মূহুঃ রোমাঞ্চিত হচ্ছি আর আনন্দ পাচ্ছি। এই অদ্ভূত কথোপকথন বারবার চিন্তন করলে পাপ নাশ হয়ে যায়, আর বারবার মনে করাতে আমার ভিতরে আনন্দের অনুভব হচ্ছে। যুদ্ধ দশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর সঞ্জয় এই কথাগুলো ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন, এখনও বারবার তাঁর এই কথোপকথন মনে পড়ছে, এবং যতবার মনে পড়ছে ততবারই সঞ্জয় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছেন। দশ দিন ধরে যুদ্ধ চলছিল, সঞ্জয়ও যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করছিলেন, কিন্তু মাঝে মাঝেই তাঁর এই দৃশ্য – অর্জুনের রথের উপর বসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন, মনে পড়ে যাচ্ছিল। তার মানে গীতার এই আলোচনা তিনজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, শ্রীকৃষ্ণ বললেন, অর্জুন শুনলেন আর সঞ্জয়ও শুনলেন।

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ।।৭৭।।

(হে মহারাজ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই অত্যদ্ভূত বিশ্বরূপ বারবার স্মরণ করে আমার মহাবিস্ময় হচ্ছে এবং আমি পুনঃপুনঃ হৃষ্ট হচ্ছি।)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়ে ছিলেন, অর্জুন ছাড়া সঞ্জয়রেও দিব্যদৃষ্টি থাকার জন্য ভগবানের বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ দর্শন করার দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছিল। তাই বলছেন ভগবান হরির যে বিশ্বরূপ আমি দেখেছিলাম। সঞ্জয় বলছেন, ভগবানের ওই বিশ্বরূপের কথা ভেবে ভেবে আমার মহাবিস্ময় হচ্ছে, আর বারেবারে হর্ষিত হচ্ছি।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থ ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতিমম।।৭৮।।

(যে পক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুন সেই পাণ্ডব পক্ষে রাজ্যশ্রী, বিজয়, অভ্যুদয় ও অব্যাভিচারিণী নীতি বিরাজ করে, এটা আমার নিশ্চিত অভিমত।)

সঞ্জয় যেন ধৃতরাষ্ট্রকে আর-একবার সাবধান করে দিতে চাইছেন। *নীতির্মতিমম*, হে রাজন্ এটা আমার নীতি, এখানে নীতি মানে সিদ্ধান্ত, আমার এই সিদ্ধান্ত যে, যেখানে যোগীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনের মত ধনুর্ধর রয়েছেন, আমি আপনাকে পরিষ্কার বলে দিতে চাইছি, সেখানে শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী থাকবে, সেখানেই বিজয় হবে অর্থাৎ পাণ্ডবদের বিজয়, অভ্যুদয়, বিভূতি, শ্রী পাণ্ডবদের হবেই হবে। মনে রাখবেন, আপনারাও কিন্তু ধনুর্ধর পার্থ, বিজয় আপনাদের নিশ্চিত। আমি, আপনি সবাই কোন না কোন ভাবে মোহগ্রস্ত। প্রার্থনা করছি, ভগবানের কথা শুনে আমাদেরও যেন মোহ নাশ হয়। সমস্ত যোগের বীজ হলেন শ্রীকৃষ্ণ, তাই তিনি যোগীশ্বর। যেখানে যোগের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ রয়েছেন আর যেখানে গাণ্ডীবধারী অর্জুনের মত বীর রয়েছেন, সেখানেই শ্রী, সেখানেই জয়, সেখানেই বিভূতি, সেখানেই অভ্যুদয়। যেখানে ধর্ম সেখানেই বিজয়। ধর্ম বলতে মহাভারত বলছেন, *যতো ধর্ম ততো জয়ঃ*, ধর্ম মানে শ্রীকৃষ্ণ। সঞ্জয়ের এখানে বক্তব্য হল, দশ দিন যুদ্ধ হয়ে গেছে, হে রাজন্ এখনও সময় আছে, যদি দুর্যোধনকে বুঝিয়ে এই যুদ্ধকে আপনি থামাতে পারেন।

গীতার দর্শনের মূল বক্তব্য হচ্ছে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। কিন্তু সবার দ্বারা এই জীবনেই ঈশ্বর লাভ সম্ভব নয়। কারুর এই জন্মেই ঈশ্বর লাভ হতে পারে, কারুর আগামী আগামী জন্মে ক্রমান্বয় উন্নতি লাভের মধ্য দিয়ে। এই ক্রমান্বয় উন্নতি কিভাবে হবে? যাঁরা ঈশ্বর লাভের জন্য প্রস্তুত আছেন, যাঁদের কোন দেহ বোধ নেই, সংসারের প্রতি কোন আশা আকাঙ্খা নেই, জগৎ থেকে কোন কিছুর প্রত্যাশা করেন না, এঁরা জ্ঞানযোগকে অবলম্বন করে ঈশ্বরের বা আত্মার চিন্তা করে করে উন্নতির দিকে এগোবেন। যাঁরা ঈশ্বর লাভের জন্য প্রস্তুত নয়, যাঁদের এখনও অনেক কামনা-বাসনা রয়েছে, তাঁরা কর্ম করবেন। কিভাবে কর্ম করবেন? স্বধর্ম পালনের দ্বারা। স্বধর্ম পালন করতে করতে ফলস্পৃহা চলে যাবে। ফলস্পৃহা চলে যাবার পর এক সময় কর্মস্পৃহাও চলে যাবে। কর্মস্পৃহা চলে যাবার পর ঈশ্বরের চিন্তনে মনকে সব সময় নিযুক্ত রাখবে, তখন তাঁর মনটা পরিষ্কার হতে থাকবে। এরপর ঈশ্বরের কৃপাতে তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়ে যাবে। যখন ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান এসে যাবে তখন সে ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে গেল। এটাই গীতার মূল বক্তব্য। এই বলে জয় শ্রীগুরুমহারাজের জয়ধ্বণি দিয়ে এত দিনের গীতা অনুধ্যান শেষ করা হচ্ছে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে মোক্ষযোগ নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমাপ্তা।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ তৎসৎ।
ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু ।।

শ্লোকের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ৫/৪	৪২৪
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা মোক্ষ্যসে মহীম্ ২/৩৭	১৮০
হন্ত তে কথয়ষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ ১০/১৯	৭১০